মাসিক বসুমতী
॥ বৈশাখ, ১৩৬৭ ॥

(কাঠ খোদাই)

ভারত-রবি

—অরুণকুমার পাইন খোদিত

মাসিক বসুমতী

৩৯শ বর্ষ—বৈশাখ ১৩৬৭] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

মূর্তিপূজা

দুই-একটি ছাড়া সকল ধর্মেই ব্যক্তিবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ব্যতীত বোধ হয় জগতের সকল ধর্মই সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকে, আর সগুণ ঈশ্বর মানিলেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি উপাসনাদি ভাব আসিয়া থাকে। বৌদ্ধ ও জৈনেরা যদিও সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে, ইহারাও ঠিক সেইভাবে স্ব স্ব ধর্মের প্রবর্তকগণের পূজা করিয়া থাকে।... জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব প্রতীক বা বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক আকৃতিবিশেষের সহায়তায় সূক্ষ্মকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের বাহ্য অঙ্গস্বরূপ ঘণ্টা, সঙ্গীত, শাস্ত্র, প্রতিমা, অনুষ্ঠান—এই সবগুলিই ঐ পর্যায়ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে কোন বস্তু মানুষকে সূক্ষ্মের স্থূল আকার দিবার সহায়তা করে, তাহাই লইয়া উপাসনা করা হয়।

জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খৃষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমা-পূজা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং তাঁহারা অবাধে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম এই সহায়তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধু ও ধর্মার্থ প্রাণোৎসর্গী ব্যক্তিগণের কবর একরূপ প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রটেষ্টাণ্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন।

খ্রীষ্টান মনে করেন, ঈশ্বর যে ঘুঘুর রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাত্মক।

ইহুদীরা মনে করেন যে, দুইদিকে দুই দেবদূত-বসান সিন্দুকের আকৃতি একটি প্রতিমা নির্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন প্রতিমা গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর দোষাবহ। মুসলমানেরা মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া কাবা নামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটির আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চের আকৃতি ভাবিলেই তাহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমাপূজায় এইরূপ গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কারূপ দোষ বিদ্যমান। তথাপি প্রতিমাপূজা প্রভৃতি সমুদয় ধর্মের চরমাবস্থায় আরোহণের জন্য প্রয়োজনীয় সোপানাবলী বলিয়া বোধ হয়।

আপনাদের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন। উহা ভাবিবার চেষ্টা করুন দেখি। সর্বব্যাপী বলিতে কি বুঝায়, আপনাদের মধ্যে কয়জন ইহার কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারেন? যদি খুব চেষ্টা করেন, তবে হয়ত সমুদ্র বা আকাশ বা মরুভূমি বা একটা সুবৃহৎ হরিদ্বর্ণ প্রান্তরের ভাব মনে আনিতে পারেন। এই সমুদয়গুলিই জড় পদার্থ আর যতদিন না আপনারা সূক্ষ্মকে সূক্ষ্মরূপে, আদর্শকে আদর্শরূপে ভাবিতে পারেন, ততদিন এই সকল জড়বস্তুর সহায়তা আপনাদিগকে লইতেই হইবে। ঐ জড়মূর্তিগুলি আমাদের মনের ভিতরে অথবা মনের বাহিরে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা সকলেই পৌত্তলিক হইয়া জন্মিয়াছি, আর পৌত্তলিকতা অন্যায় নহে, কারণ উহা মানবের প্রকৃতিগত। কে ইহা অতিক্রম করিতে পারে? কেবল সিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই পারেন। অবশিষ্ট সকলেই পৌত্তলিক। যতদিন আপনারা বিভিন্ননামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছেন, ততদিন আপনারা পৌত্তলিক। আমরা জগৎরূপ এই প্রকাণ্ড পুত্তলির অর্চনা করিতেছি। যাহার আপনাকে দেহ বলিয়া বোধ আছে, সে ত পৌত্তলিক হইয়াই জন্মিয়াছে। আমরা সকলেই আত্মা—নিরাকার আত্মস্বরূপ—অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ—আমরা কখনই জড় নহি। অতএব যে ব্যক্তি সূক্ষ্মধারণায় অক্ষম, যে ব্যক্তি নিজেকে জড় না ভাবিয়া, দেহস্বরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি নিজ স্বরূপচিন্তায় অসমর্থ, সে পৌত্তলিক। তথাপি দেখুন, কেমন লোকে পরস্পরকে পরস্পর পৌত্তলিক বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ উপাস্যকে ঠিক মনে করে, কিন্তু অপরের উপাস্য তাহাদের মতে ঠিক নয়।

সাধারণ মানবের ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে উপাসনা না করিলে চলে না। যদি সে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের পূজা না করে, তবে তাহাকে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বন্ধু, আচার্য বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত করিয়া পূজা করিতেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের আবার ইহা অধিকতর আবশ্যক।... আমাদের ভগবানের ধারণা ও উপাসনা স্বভাবতঃই মানুষী। সত্য সত্যই "এই শরীর ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির।" সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকে মানুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় ও আমাদিগকে চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এইসব বিভিন্ন উপাসনাপ্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে কেন সেগুলির সৃষ্টি হইল?...জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফল নাই। যেদিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সেদিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সহিত সেগুলিরও লোপ পাইবে, আর যতদিন এই প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন তোমরা যতই উহাদের তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই উহার বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। তরবারি বন্দুকের সাহায্যে জগৎকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যতদিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন প্রতিমা-পূজা থাকেবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান সকল অবশ্যই থাকিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে
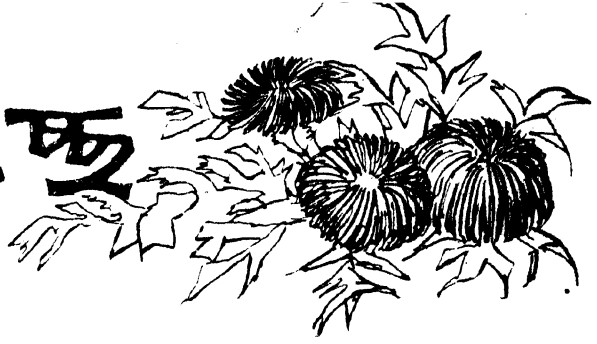
গ্যেটের প্রেমপত্র ঃ কবির দ্বিতীয় মানসী

গ্যেটের কৈশোরের প্রথম স্পর্শালু প্রেম বয়ঃসন্ধিকালে হতাশা এনেছিল। যাকে তিনি মানসী ভেবেছিলেন, সেই গ্রেচেন নাম্নী মহিলা কবিকে ভাই হিসাবে দেখেছিলেন। এই কথা শুনে কবি আহত হন। মানসিক অবসাদে শয্যাশায়ী হন। জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিয়েছিল কবির। দীর্ঘ রোগভোগের পর কবিকে আইন পাঠ করবার জন্ম লাইপজিগে পাঠান হয়। প্রবঞ্চিত কবির কাছে ফ্রাঙ্কফার্ট শহর শূন্য বলে মনে হয়েছিল। গৃহে পিতার কঠোর শাসনও কবির কাছে অসহ্য লাগছিল। অচিরেই তিনি লাইপজিগে চলে আসেন। সেখানে তিনি কাপ্তান হয়ে উঠলেন। মেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্ম যে কোন কাজ পেলে কবি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠতেন। তাঁর হাবভাব দেখে না হেসে উপায় ছিল না। তাস খেলতেন। ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকতেন। কোন উদ্দেশ্যও জীবনে ছিল না। এই সময় তিনি আহার করতেন সনকফ পরিবারে। সনকফ পরিবারের গৃহিণী ফ্রাঙ্কফার্টের অধিবাসী ছিলেন। স্বাভাবিক প্রবণতা বশতঃ স্বদেশীয়দের তিনি আপ্যায়ন করতেন। এই পরিবারের মদের ব্যবসা ছিল। এই পরিবারের অনূঢ়া কন্যা কুমারী কেটহেন সনকফের সহিত কবির পরিচয় হয়। সামাজিক বংশ-মর্য্যাদা এই পরিবারের তেমন ছিল না। তবে গ্যেটে এই সামাজিক মর্য্যাদা মানতেন না। এই যুবতীকে দেখে গ্যেটে মুগ্ধ হন। কুমারী সনকফ তখন পূর্ণ বিকশিত। ইনি বেশী লেখাপড়া জানিতেন না। তবে গ্যেটে বুঝেছিলেন সেই যোবার হৃদয় আছে। কোন কুণ্ঠা বোধ এই যুবতীর মধ্যে ছিল না। এই জন্ম সেই যুবতীকে গ্যেটে আরও ভালবাসতেন। কবি একবার সহোদরাকে লিখে জানালেন যে, বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস তাঁর ইতিহাসের নামকরণ সঙ্গীতের নয় জন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামানুসারে করেছিলেন, তাই তিনিও বারটি কবিতা প্রেয়সীর নামে লিখে প্রেয়সীকে সমর্পণ করবেন। তারপর আকস্মিক ভাবে সহোদরাকে গ্যেটে জানালেন, ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর যেমন সম্পর্ক নাই সেইরূপ তার কবিতার সঙ্গে কেটহেন সনকফের কোন সম্পর্ক নাই। এখানে বলা যেতে পারে, এই প্রমদার সঙ্গে গ্যেটে এক সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন লেসিং রচিত একটি নাটকে। সে যাই হোক, কবি লাইপজিগে বল্গাহীন জীবন যাপন করেছিলেন। পানাহারের ফলে কবির হজম শক্তি হ্রাস পায়। উদ্দাম জীবন যাপনের জন্ম লাইপজিগের ভদ্র সমাজ হতে কবি একবার বহিষ্কৃত হন। এই কেটহেন সনকফকে তিনি অভিশাপগ্রস্ত রমণী বলেছিলেন। জনৈক বন্ধুর কাছে জানান এই প্রেয়সী রমণীকে স্বপ্নে দেখে জাহান্নামে নেমে গিয়েছিলেন। এই কুমারীর সম্পর্কের সহিত অবশেষে গ্যেটের শিথিলতা আসে। কবি সম্পূর্ণ অধিকারের দাবী জানান নি। সুতরাং কুমারী কেটহেনকেও পথ দেখতে হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে কবি বলেছিলেন ছাড়াছাড়ি হয়ে তিনি সুখী হয়েছেন এই জন্ম যে, বিচ্ছেদের পরও বন্ধুত্ব থাকবে। এই সময় কবি অসুস্থ হন। কবির মনে হত তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রবঞ্চিত প্রেমিকের এটি কল্পনাবিলাস। অবশ্য অসুখ তাঁর হয়েছিল। এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অনূদিত পত্রের অন্তঃসঙ্গতি দেখে গ্যেটের মানসিক পটভূমি ধরা দুরূহ হবে না।

Fankfert Sept. 1768

প্রিয় কেটহেন সনকফ,

গ্যেটে জানে যে, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি জিনিষের প্রতি তোমার আকর্ষণ আছে, তাই তোমাকে এক জোড়া সুন্দর কাঁচি পাঠালাম। এর সঙ্গে এক জোড়া মজবুত চটি এবং ভাল চামড়ার দু' জোড়া স্লিপারও পাঠালাম। জিনিষগুলো ভাল এবং এর পেছনে বেশ মেহনত আছে কারণ এগুলো ধৈর্য্য ধরে বানাতে হয়েছে, তবু মনে হয়, এগুলো হয়ত তোমার হাতে বেশীক্ষণ থাকবে না, যেমন থেকেছিল নির্মেতার হাতে। আমি যা ভাবি তাই বলি—তাই আমাকে মন্দ বল না। আশা করি, আড়াই বছরের মধ্যে তুমি স্লিপার আর ছুরির আব্দার করবে না- অবশ্য এর ভার তোমার ওপর রইল। ইষ্টারের ছুটীর আগে অবশ্য তুমি এগুলো ভেঙ্গে তচনচ করে দিতে পার—তা হলে তোমাকে এগুলো দেবার জন্ম আবার তৈরী থাকব—আর এই তুচ্ছ জিনিষের মধ্যে আমাকেও তুমি স্মরণে আনতে পারবে, আমার দেবতা তোমাকে চিঠি লেখার ইচ্ছে বর্ত্তমানে আদৌ রাখে না কারণ সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, মাসের প্রথম দিক ছাড়া তোমাকে সে আর লিখবে না। সে-প্রভুর ইচ্ছে, আমি যেন তার প্রতি অনুগত হই। সেই হিসাবে আমিও দাবী করছি, তুমিও আমার প্রতি অনুরক্ত হও। ইতি—

আমার প্রিয় বান্ধবী, 1 Nov. 1768

চিরকালের সঙ্গীব! চিরকালের ঘৃণ্য! কৃত্রিম আলোতে তোমার মহত্ত্ব উদ্ভাসিত। প্রবঞ্চিতের কাছে তোমার করুণা নাই। তুমি হাসছ। যে আর্জি পেশ করে তাকে ভর্ৎসনা করছ। এই ক্রূর আনন্দ তোমার চিঠিতে। তবে গ্রাম্য মেয়ে এ ছাড়া আর কী লিখবে। এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছ যে, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি এই বলে যে ভবিষ্যতে পুণ্য তিথিতে আমাকে চিন্তা কর। এতে আমার কত সুখ, তোমার সজীবতায় কত যে আনন্দ পাই! তোমার উচ্ছলরূপ, তোমার হাসি—তা যত তুচ্ছ হোক না কেন তা কত গৃঢ়সঞ্চারী।

যে ছবিকে আমি বিকৃত করেছি, তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না. আমার লেখনী যে ছবি কাটছে তা আমি বেশ অনুমান করতে পারি, যখন বুঝি অপরের সঙ্গে কী ঘটেছে তখন কোন ভবিষ্যৎ বক্তার প্রয়োজন হয় না এই ভেবে যে কী ঘটবে, এতেই আমি সন্তুষ্ট। যে বিদায় নেয় তার ভাগ্যে এই রকম হয়। এখনও যারা পিছনে আছে এবং যে-সব প্রেমিক আসবে তারা প্রবঞ্চিত বিতাড়িত প্রেমিকের কবরের উপর নাচবে।

আমাদের নাট্যসঙ্ঘের পরিচিত কর্মাধ্যক্ষ, পরিচালক প্রভৃতি কে কেমন আছে। তারা কেউ কী সেই অগ্রগামী অভিনেতার কথা ভাবে যে সব সময় ট্র্যাজেডীতে এবং কমেডীতে স্বাভাবিক ভাবে ঘৃণ্য প্রবঞ্চিত প্রেমিকের ভূমিকায় মনোহারী অভিনয় করছে, আমার সেই শূন্য স্থানে কাউকে মনোনয়ন করা হয়েছে কী? তবে মনে হয় সে স্থান পুরোপুরি ভাবে পুর্ণ হবে। তুমি হয়ত দশজন অভিনেতা আমার স্থানে পাবে।

আমার মা আমাকে একটা বইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যা আমি ভালবাসি তা আমি ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে পছন্দ করব। আমাদের পাঠাগারের কথা আমি প্রায় স্মরণ করি। তুমি বিশ্বাস করতে পার, সে পাঠাগার আরও বেড়ে যাবে, যা আমি প্রতিজ্ঞা করি তা আমি সঙ্গে সঙ্গে পালন করি না, তবে প্রতিজ্ঞার চেয়েও আরও বেশী কিছু করে থাকি।

তুমি হয়ত ঠিকই ভেবেছ, লাইপাজিগে যে পাপ করেছি তার আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি।

বর্ত্তমানে গৃহের পরিবেশ আমার খুব খারাপ লাগছে। এর চেয়ে আমার কাছে লাইপজিগ প্রীতিপদ হত যদি এখন এইখানে আমার হয়ে কেউ থাকত। আমাকে যদি দোষ দাও, তা হলে তোমাকে ঠিকভাবে কাজ করতে হবে। কী কারণে আমার এত অসন্তোষ আর বিদ্রোহ তা তুমি জান। সুশ্রী মেয়েদের কাছে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে আমি সৌজন্য দেখালে তুমি বড় রূঢ় হয়ে ওঠ। তুমি আমার হৃদয় পেয়েছ, ভালবাসা পেয়েছ। আর যতই সহস্র শ্রদ্ধা হো'ক না কেন তার ভগ্নাংশ হবে না। অভিনয় করলেও তুমি জান তোমার বন্ধুর চিত্তদাহ বা আনন্দ বস্তুটি কী। এ দুটো হয়ত তোমার কাছে সমান। তবে মনে হয় এ-সব তুমি ভাব না। তোমার পত্রে তুমি আমার বিদায়ের কথা বলতে চাও; কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক।

আমার এই চিঠি—এই চিঠিই বা কেন—সব চিঠি তোমার মা-বাবাকে তুমি দেখিও। তবে কারও আড়ালে যেন এ-পত্র দেখিও না। আমার কথামত তোমাকে আমি আন্তরিকতার সঙ্গে লিখি। তাই আমার ইচ্ছে এর ওপর চোখ বুলিয়ে কেউ যেন তার কদর্থ না করে। ইতি—

•

ফ্রাঙ্কফার্ট। ৩০শে ডিসেম্বর ১৭৬৩

আমার প্রিয়তম বান্ধবী,

নব-বৎসরের বাণী আমি যে রোগমুক্ত হয়েছি তা তুমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছ। রোগমুক্তি আমিও স্বীকার করলাম। আমার প্রিয়তম মেষ মরে গেছে। এ তোমাকে সান্ত্বনা দেবে ভবিষ্যতে, যখন শুনবে আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমার ধাত খুব শক্ত। তবে এখন আমি ভাল আছি। অবস্থা আরও অবনতির দিকে নেমেছিল। যা আমার বর্ত্তমান অবস্থার চেয়ে অবস্থা সঙ্কটজনক হয়েছিল। ভীষণ ব্যথায় আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন খারাপের মধ্যেও ভাল আছি। যখন অসুস্থ ছিলাম সে-সময় অনেক কিছু শিখেছি। সুস্থ থাকলে সে-সব হয়ত আর শেখা হত না। যাক যা হবার তা হয়েছে। আমি এখন ভাল আছি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর আগে আমি তিন হপ্তা ঘরের বাইরে বার হই নি। ডাক্তার ছাড়া আমার কাছে আর কেউ আসে না। সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেও লোকটা শ্রদ্ধার পাত্র নয়। মানুষ কী বোকা। আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন আমার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠত—সমস্ত পৃথিবী আমাকে ত্যাগ করেছে এখন। আমি সজীবতা ফিরে পেয়েছি কারণ অসুস্থ অবস্থায় আমার উৎফুল্ল ভাব দেখে আমার সংসারের লোকজন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত। আমার নির্জীবভাব ধরা পড়লে কেউ আর তাদেরকে সান্ত্বনা দেবার ছিল না। কল্পনার খেয়ালে একটা নব-বর্ষের গান আমি রচনা করেছিলাম। সেটা তুমি সম্ভবতঃ পেয়ে থাকবে এবং তার পিছনে সময়ও নষ্ট করে থাকবে। সেগুলো আমি ছাপিয়েছি। আমি ভালোর দিকে যাচ্ছি, গল্প লিখছি। মোট কথা আমি সন্তুষ্ট। ঈশ্বর কৃপা করুন। সব কিছু আমার কাছে যেন শুভ হয়। আমরা যদি কিছু নাও চেয়ে থাকি, তবু আমরা আশা করব এর চেয়ে জাগৃতির বাণী আমরা পাব। আমি যদি এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বাঁচি তা হলে আমি ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করব। তা হলে আমার ভাল হবে। প্রতিদিন স্বাস্থ্যেরও আমার উন্নতি হবে। আমার অভিযোগ কোথায় তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বুক বেশ সুস্থ আছে তবে পাকস্থলীতে কোন কিছুর গণ্ডগোল আছে। আমি বুঝতে পারছি জীবনের সঙ্গে যথার্থভাবে আমি খাপ খাইয়ে নিতে পারব। অন্য কারও সঙ্গ ছাড়া সুস্থ হলে আমি বিদেশ ভ্রমণে যাব। তোমার সব কিছু চিন্তা তখন আমার হবে। তারপর ব্যবস্থা করব কত তাড়াতাড়ি লাইপজিগ ভ্রমণে যাব। আমি ঠিক করেছি ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসীদের জীবন-যাত্রা দেখব, তাদের ভাষা শিখব। তা হলে তুমি বুঝতে পারছ কত সুভদ্র হয়ে উঠব—তোমার সঙ্গে পুনরায় মিলনের আগে। একটা কথা শুধু চিন্তা হয়—মূর্খের মত কেন যে ভাবতাম ইষ্টারের পূর্বে আমার যেন মৃত্যু হয়—আমার এ-সব পরিকল্পনা থাকা

সত্বেও। কবরখানায় কবরের পাথর রাখার জন্ত তা হলে প্রস্তাব করতাম যাতে করে সেন্টজনের পবিত্র দিনে আমার কবর তুমি একবার দেখে আসতে। এ-বিষয়ে তুমি কী বল ?

তোমার মা বাবার কাছ থেকে যাতে স্নেহ পাই সে বিষয়ে বল। আমার জন্ত তোমার বন্ধুদের চুমু খেও এবং যারা আমার বিষয়ে উৎসাহী সেই সব বান্ধবীদের ধন্তবাদ জানিও। তা হলে সেই সব বান্ধবীদের আমি চিঠি লিখব। তোমাদের প্রতিবেশী বিষয়ে আমি দুঃখিত। আর দুই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এটা কী দুঃখের নয়, তারা হতভাগ্য। খুব বিড়ম্বনায় তারা পড়েছে। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করুন বা না করুন এর জন্ত তারা কৃতজ্ঞ থাকবে। তুমি বেঁচে থাকবে দেখবার জন্ত এবং সম্ভবতঃ বলবে গোটে তুমি এ-কথা বল না ? নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারি, আজকাল বিয়ে একটা মজার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের বা অপরজনের নিজস্ব ইচ্ছে নাই, হে সন্ত ! পৃথিবীতে অবতরণ করে একটা অলৌকিক কিছু দেখাও।

পুনঃ—যারা এ থেকে সাহায্য পেতে না পারে তাদের অন্ত কাউকে এ পথ দেখিও না। প্রিয়তমা, বিদায়। সুখে দুঃখে আমি তোমারই।

ইতি গ্যেটে।

আমার বন্ধু হর্ণকে তুমি যে চিঠি * দিয়েছ, তা থেকে জানলাম তোমার আশা আর আনন্দের কথা। বর্তমানে আমার মনোভাব কী তা তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছ। তবে তুমি এ কথা ঠিক বুঝতে পারবে না এই ভেবে যে কতখানি আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বাগ্‌দত্তা স্বামী সত্যিই মহান্। তার কাছে আমার পরিচয় দিও। তোমাকে বহুদিন যাবৎ লিখিনি বলে হয়ত তুমি ভেবেছ অবহেলা ভরে আমি তোমাকে লিখি নি। এর জন্ত তুমি আমাকে অপরাধী ভাবতে পার অবশ্য তুমি যদি আমার পত্রের জন্ত অধীর হয়ে থাক। এ আমি জানতাম, তাই আমি লিখি নি। তোমার এখন যা অবস্থা তাতে তোমার কাছে আমার চিঠি নগণ্য, এটাই অবশ্য আসল কথা। আমার অবস্থা সেই মাছের মত—যে মাছকে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি—না আর প্রতিজ্ঞা করব না, কারণ আমি যে তোমার প্রতি অনুরক্ত এ কথা তুমি ভাবতে পার না।

যারা গুণী তারা ভাবতে পারে না যে নারীর হৃদয় পাথরে তৈরী, সে-ই প্রেমিক যে সহজে ভালবাসতে পারে, সহজে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু প্রেম বিষয়ে যথার্থ ভাবে অন্য কিছু সে ভাবতে পারে না। উঃ। কী মর্মান্তিক যখন একজনের প্রেম নিঃশেষ হয়ে পড়ে। যে প্রেমিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না সে তত হতভাগ্য নয় ; এ-দিক থেকে যে বিতাড়িত হয় সে-ই তত হতভাগ্য প্রেমিক। প্রথম জন তবু আশা রাখে, ভয় সে গ্রাহ্য করে না ; আর হ্যাঁ—অপরজন বুঝেছে অন্তর থেকে মানসীকে সরিয়ে দিতে হবে, যে জ্যোতির্ময়ী হয়ে অন্তরে উদ্ভাসিত হতে থাকে—এ ব্যথার বর্ণনা আর নাই।

আমার গানগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নি। ছাপা হলে তোমাকে তৎক্ষণাৎ এককপি পাঠিয়ে দেব, কারণ আমি জানি লাইপজিগের কোন অধিবাসীকে বিশ্বাস করা যায় না। আমার খাতিরে গরীব দুঃখীকে কিছু অর্থ বিলিও। তুমি আমার কথা যখন চিন্তা করবে তখন অন্তজন যেন তোমার সঙ্গে খেলা করে। এ-গান গুলো আমি যখন লিখেছিলাম তখন আমি অন্ত ধরণের মানুষ ছিলাম। আমি পূর্বে কী ভাবে জীবন কাটাতাম তা জানলে তুমি উল্লসিত হতে।

তোমাকে লিখতে আমার এত ঘৃণা হয়। এ-চিঠির উত্তর যদি না পাই, তা হলে অক্টোবরের আগে তোমাকে আর পত্র দেব না। হে আমার প্রিয় বান্ধবী, এখনও যদি তুমি আমাকে তোমার প্রিয় বান্ধব বলে ডাক, কারণ তুমি আমাকে মাঝে মাঝে প্রিয়তম বন্ধু বলে ডেকেছ—তবু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে প্রিয়তম বন্ধু বলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

টাটকা সিম পেলে কে আর বাসি সিম চায়। টাটকা ফলেই সকলের রুচি। কিন্তু বাসি হবে বলে কেউ যদি ভয় করে তবে অনেকে জারক রসে ডুবিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য কেউ যদি নিয়ে যেতে চায়। নিশ্চয়ই তোমার হাসি পায় এই ভেবে যে দল নির্বিশেষে গুণগ্রাহীরা বন্ধুত্বের ওপর নুনের ছিটে ছড়িয়েছে। তবে সেই সব অনুরাগীদের কথা ভেবে আমি হাসি। আমার সঙ্গে পত্র লেখা বন্ধ কর না। কারণ মাছের যে আচার বানিয়েছ তার মধ্যে আমি এখনও বেশ সরস আছি।

পাছে আমি ভুলে যাই সেইজন্ত তোমার কাছে সামান্ত জিনিষ পাঠালাম। এটা তোমার হাতে বা তোমার প্রিয়তম বন্ধুর হাতে মানান-সই হবে। তোমার জন্ত যে-সব জিনিষ বানাতে দিয়েছিলাম সে-গুলো এখন তৈরী-ই হয় নি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি প্রাণখোলা মানুষ। তবে ছবি আঁকতে গেলে আমার গলা শুকিয়ে আসে। বসন্তে মেষপালকেরা গাছে নানা প্রতিমূর্তি আঁকে। ফুলের সময়ে লোকে মালা গাঁথে। সব কিছু স্মৃতি মনে পড়লে বড় দুঃখিত হয়ে পড়ি। আমার চেয়ে তোমার জন্ত যদি কোনদিন কিছু কম করে থাকি তবে আমাকে ক্ষমা কর।

আমি তোমাকে বহুবার বলেছি, তোমাদের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে। সম্ভবতঃ এ-কথাটা তুমি তাড়াতাড়ি বুঝবে। খুব তাড়াতাড়ি এমন সংবাদ হয়ত শুনবে, যা তুমি আশা কর নি। তোমার মা বাবাকে এবং তোমাদের পরিবারের অন্ত সকলকে যতখানি সম্ভব ততখানি শ্রদ্ধা জানাই। ইতি

26. 8. 69

আমার শরীর বিষয়ে তুমি উদ্বিগ্ন ; এর জন্ত তোমাকে ধন্তবাদ। তবে তোমার সান্ত্বনার জন্ত বলছি যে, এর আগে অসুস্থতার কথা লিখেছিলাম, সে বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবার কারণ নাই। আমি নিজেকে বেশ উৎফুল্ল মনে করি। তবে পূর্বে যতটা উৎফুল্ল ছিলাম, এখন আর ততটা নাই। তুমি বুঝতে পারছ, কেবল অসুস্থতার জন্তই তোমাকে লিখতে পারিনি। তবে আশা করছি যে, অন্ত কোন কারণে আমার পক্ষে তোমাকে চিঠি দেওয়া সম্ভব হবেনা। ভাবতে অবাক লাগে কারণ আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে তোমাকে দেখেছিলাম। ভাবতে আরও অবাক লাগে এই ভেবে

* পত্রে বাগদানের কথা ছিল।

যে, এক বছরের মধ্যে কত পার্থক্য আসে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাকে আবার যদি দেখতে হয় তবে তোমার আর খোঁজ নেব না। এরকম ঘটনা যদি তিন বছর আগেও ঘটত তা হলেও হয়ত এই রকম প্রতিজ্ঞা করতাম। প্রতিজ্ঞার আর দরকার নাই। এক সময় তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারতাম না। এমন কী তোমাকে এক পাতা লিখতে আর আমার উৎসাহ আসে না। আমি যে আর কিছুই ভাবতে পারি না—আর এটা যে তুমি মেনে নিতে পার না। আমি যদি বুঝি, তুমি সুখী সব দিক থেকে তা হলে আমি সন্তুষ্ট হব। একথা কী বিশ্বাস কর, আমার মেজাজ খিঁচরে গেছে। যদি লাইপজিগে থাকতাম তা হলে তোমার পাশে বসে থাকতাম, তা হলে তোমার পাশে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকতাম। তুমিও অতীতের কথা কিছু ভাবতে পার। কিন্তু থাক। যদি তোমার পাশে বসতে পারতাম, জীবনটা কত মধুর হত। ওঃ! গত আড়াই বছরের কথা আমি স্মরণে আনতে পারি। কেটহেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি বেশ ভালভাবে চলব। ইতি—

I2.12.69

আমার প্রিয়বন্ধু,

গতরাত্রে এক স্বপ্ন স্মরণ করিয়ে দিল তুমি আমার কাছ থেকে একটা পত্রের উত্তর পাবে। অবশ্য এ-কথাটা আমি সম্পূর্ণভাবে ভুলিনি। তবে তোমাকে যে চিন্তা করিনি—এমনও নয়; না, না আমার প্রিয় বান্ধবী। দিনগুলো বলে দেয়, তোমার কাছে আমার কত পাওনা। তবু তুমি বুঝতে এ এক কী তীব্র উত্তেজনা যখন পুরোণো বন্ধুদের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে পড়ে, যদিও সে বন্ধুত্বকে সময় ধুয়ে মুছে দিতে পারে না। আমাদের জীবনের বিবর্ধণ, নতুনের সঙ্গে পরিচয়—সংক্ষেপে অবস্থার পরিবর্তন আমাদের মনে ধুলো আর ধুঁয়োর সৃষ্টি করে তৈলচিত্রের ওপর; তা যেন ক্ষীণ অদৃশ্য টানাটানা রেখার মত—যদিও অন্যজনে সহজে এটা বুঝতে পারে না এই ভেবে যে কী ভাবে এটা হল।

আমি কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এতে সুখ নাই। বিশ্রামের অবসরে শক্তি বিষয়ে আমার ধারণা নমনীয়। ফলে অতীতের নানা স্মৃতি আমার মধ্যে আসে না। স্বপ্নে মনে হয় শুধু হৃদয়কে ফিরে পাই—সেই স্বপ্নে অতীতের সুখাবহ স্মৃতি আমি ফিরে পাই; আমার বোধগুলো সজীব হয়ে ওঠে। আগেই তোমাকে স্বপ্নের বিষয় বলেছি। এর জন্য তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমি তোমাকে দেখলাম, তোমার পাশে আমি বসে আছি—যেন খুব বুড়ো হয়ে গেছি। তোমাকে আমার এ-সব বলতে অবাক লাগছে। অর্থাৎ তোমাকেও বিবাহিত রূপে দেখলাম। এ কী হতে পারে? তোমার চিঠিটা নিয়ে দেখলাম কবে সে-চিঠিটা লেখা হয়েছিল। বিয়ে যদি তোমার হয়ে থাকে তবে তোমার জীবনের সুখ ও শান্তি যেন সুরু হয়।

যখন তোমাকে তোমার প্রিয় স্বামীর বাহুবন্ধনে দেখি, তখন কত না প্রীত হই। অপরে তোমার ঈর্ষা করতে পারে। কিন্তু তুমি যে আমার বন্ধু। তোমার প্রশান্ত রূপের মধ্যে তোমার সেই মহৎ রূপ দেখলাম। সেখানে তুমি স্ব-মহিমায় আসীন। তোমার আভাসিত সুখ, তোমার স্বামীর সুখ-স্বপ্ন দেখে সত্যিই আমি প্রীত। তোমার স্বামী তোমাকে ভালবেসে যথার্থ পুরস্কার পেয়েছে। তোমার স্বামীর কাছে আমার বন্ধুত্ব রেখ। তুমিও আমার বন্ধু হয়ে থেক। বন্ধুত্বের মধ্যে যে যোগসূত্র থাকে। স্বপ্নে যদি বিশ্বাসী হয়ে থাকি তা হলে আমরা পরস্পরকে আবার দেখব। তবে এ সাক্ষাৎ খুব শীঘ্র হবে বলে মনে হয় না। নিয়তির বিপক্ষে যুঝতে হলে এর পূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। আভাসে তোমাকে জানিয়েছিলাম আমার কী হবে। এবার তা খুলে বলছি। এ বসন্ত-বাটী আমি পালটাব আর তোমার কাছ থেকে আরও বহুদূরে চলে যাব। তা হলে স্বপ্ন ছাড়া লাইপজিগের কথা আর মনে আসবে না। যে সব বন্ধু আসে বা যায় তাদের কথাও আর মনে পড়বে না। তবু মনে হয় না যে আমি মুক্ত হব। সময়, দূরত্ব ও ধৈর্য্য বেশ ফল দিয়ে থাকে। অন্য জিনিষ দিয়ে এ-রকম ফল পাওয়া যায় না। তারপর অতীতের ক্লান্তিকর স্মৃতি মুছে ফেলে আবার নতুনভাবে জীবন সুরু কর। তারপর বহুদিন পর দেখা হলে, আমাদের চাহনি ভিন্ন হলেও অন্তরের অনুরাগ সেই ঠিকই থাকবে। তারপর বিদায়! না তারপর 'তারপর' নয়। তিনমাসের মধ্যে তুমি আমার একখানা পত্র পাবে। তা থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য পথ তুমি জানতে পারবে। বিদায়ের রাগিণীর কলি জানতে পারবে। যে-সব প্রলাপ বকেছি তাও বুঝতে পারবে। তোমার উত্তর না পেলেও হবে। তবে একটা মিনতি আমার আছে। কোন বন্ধু মারফৎ জানিও আমার কাছ থেকে তুমি কী কী পেয়েছ। এই আমার একটা করুণ মিনতি। তুমি নারী। তোমাকে আর বন্ধু বলব না। কারণ আমার কাছে সব অর্থহীন। তোমার হাতের লেখা বা কণ্ঠস্বরে আমি আর আদৌ ইচ্ছুক নই। কারণ তাহলে স্বপ্নে হয়ত সেই সব বিভীষিকা জাগাবে। আমার কাছ থেকে তুমি আর একটা পত্র পাবে। তাহলে আমার জীবনের ঋণ অনেকটা লাঘব হবে। আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি এই ভেবে যে, আমাদের সব সংস্রবে ছেদ পড়েছে।

যে বই তুমি চেয়েছ তা আমি পাঠিয়ে দেব। তুমি যে আমার কাছে বই চেয়েছ এর জন্য আমি আনন্দিত। যত উপহার দিয়েছি, তার মধ্যে এইটাই হবে আমার সেরা দান। এই দান তোমার মনে থাকবে আর আমিও তোমার মনে জাগরূক থাকব।

বিয়ের কবিতা তোমাকে আর পাঠাব না। অনেক কবিতা আমি লিখেছিলাম। সেই সব অনুভূতি খুব বেশী আর না হয় খুব কম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আর তোমার আনন্দ-উৎসবে আমার মাঝে সুরেলা গানই বা তুমি আশা কর কী ভাবে। কিছুদিন থেকে মস্তিষ্কের উত্তাপে আমার কাছে কবিতা ও গান বেসুরো হয়ে পড়েছে—যে-সব কবিতা ছাপা হয়েছে তা থেকে তুমি বুঝতে পারবে। আরও যদি দেখ তবে দেখবে যে বাদবাকী যে-গুলো ছাপা হবে সে গুলোও সেই রকম হবে। তোমার মাকে ভাইকে আমার কথা বল। তোমার ভাই নিশ্চয়ই এতদিনে সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছে। শুধু স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে—যার ফলে এত কথা বললাম। স্বপ্ন না দেখলে হয়ত এত আর কথা বলতাম না। ইতি—

অনুবাদক—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

শ্রীহারাধন দত্ত

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস বেশী দিনের নহে। গত উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে বাঙালীর যে চিত্তবিস্ফোরণ ঘটেছিল, বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকা তার অনবদ্য প্রকাশ। জাতি চিত্তের ঐ যুগসন্ধির মধ্যেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার জন্মলগ্ন সূচিত হয়। আর এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বাংলার গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠে। সাময়িকপত্র ও গদ্যসাহিত্য মূলত: ইউরোপীয় শিক্ষার দান। উনিশ শতকের বাঙালী সেদিন আর একবার নবজাগৃতির প্রত্যক্ষ দর্শক হয়েছিল। নবজাগৃতির বাণী মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে তা সম্পন্ন হয় না। নবজাগৃতি সার্থকতা লাভ করে তখনই যখন ইহা লোকায়ত হয় এবং সাধারণ লোকের জীবনে ও কর্মে ইহার ছাপ পরিস্ফুট হয়। এর জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রবর্তন এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বিগত শতাব্দীতে আমাদের দেশে সংবাদপত্র ও সাধারণ শিক্ষার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিকি সাহেব 'বেঙ্গল গেজেট' নামক যে পত্রিকা প্রকাশ করেন—আমাদের দেশে ইহাই প্রথম সংবাদপত্র—কিন্তু ইহা দেশীয় ভাষাতে মুদ্রিত ছিলনা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হতে প্রকাশিত মার্শম্যানের 'দিক্‌দর্শন' এবং একই বৎসরে গঙ্গাকিশোর শিরোমণি-সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। ইহার পরবর্তী কালে কত সংবাদপত্র আগাছার মত জন্মলাভ করেই মৃত্যু বরণ করেছে—কোন কোনটির জন্ম-ইতিহাসও আজ আমাদের বিস্মৃতির মধ্যেই রয়ে গেছে। তবু সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২৩), সংবাদ-কৌমুদী (১৮২৩), সংবাদ-প্রভাকর (১৮৩১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), বিবিধার্থসংগ্রহ (১৮৫১), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮), বঙ্গদর্শন (১৮৭২), সাধারণী (১৮৭৩), আর্যদর্শন প্রভৃতি উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিতব্য। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই সময় স্বদেশীয় মনীষিগণ মাসিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও জাতির উন্নতি চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নব্যভারত, নবজীবন, জন্মভূমি, বঙ্গদর্শন, প্রচার, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি মাসিকগুলি সে যুগের মনীষী ও চিন্তানায়কদের নব ভাবনায় জাতির আদর্শ ও মর্মবাণী প্রচারে ব্রতী হয়েছিল। গত যুগের বিচিত্রমুখী ভাবনা, চিন্তা, জ্ঞান, মনীষা ও জাতীয় আন্দোলনের বার্তাবাহী ছিল এই সমস্ত পত্র-পত্রিকা। ইতিমধ্যে কেহ কেহ ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকার কার্যক্রম ও প্রাণপ্রবাহকে সুনিপুণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাসকে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের গোচরীভূত করেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের অষ্টম দশক হতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একা 'বঙ্গবাসী' কোন্ জাতীয় ভাবধারা ও আন্দোলনকে লালন করেছিল—বাংলা গদ্যের কোন শিল্পীসমাজ 'বঙ্গবাসী'র প্রশ্রয় পেয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস আজ পর্যন্ত কেহই নির্ণয় করেননি। কোন উৎসাহী বাণী-সেবকের দ্বারা এ কাজ অচিরে সম্পন্ন হলে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের এক অনালোকিত প্রদেশ আলোকপ্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই বঙ্গবাসীর সংগে সুদীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবাসী-সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অধুনা প্রায় বিস্মৃত। সমসাময়িক দেশ ও কালের পটভূমিকায় এই কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্লভ জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনায় প্রয়োজন আছে। এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী আলোচনা কালে বঙ্গবাসীর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অবদানের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হবে।

বঙ্গবাসীর প্রথম প্রকাশকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর, বাংলা ২৬শে অগ্রহায়ণ ১২৮৮ সাল। "বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। ইহা রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদপত্র। স্বল্পমূল্যের এই সুবৃহৎ পত্রিকা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তদীয় বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এল।" ১ এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর জন্মলগ্নের পশ্চাৎ পটটি একটু দেখে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বঙ্গবাসীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাংলার নবজাগৃতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। ইউরোপীয় বিদ্যার মানবতাবাদ, যুক্তি ও বিজ্ঞান জাতির সুপ্তচিত্তকে উত্তপ্ত করে তুলছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রামমোহনের প্রতিষ্ঠালাভের পর হতেই নবযুগের বার্তা ঘোষিত হয়। ১৮১৭ সনে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এখানেই বাঙালী তারুণ্যের বৃহত্তর মুক্তিক্ষেত্রের নির্মাতা হিসাবে দেখা দেন ডিরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ও ইংরেজী জ্ঞানজগৎ ও ভাবজগৎ তাদের চর্চার বিষয়বস্তু হয়ে রেনেসাঁর মুক্তিপথ আলোকিত করতে চলল। ভারতের প্রথম ইংরেজী পণ্ডিত রামমোহন ইংরেজী বিচার-বুদ্ধির সংগে ভারতীয় নিষ্ঠার সংযোগ ঘটালেন। এলেন বিদ্যাসাগর ইংরেজের প্রথম বিচারবোধের সংগে গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয়কে সংগে নিয়ে। রামমোহন—বিদ্যাসাগর-অক্ষয় চন্দ্র ও ডিরোজিও—প্রতিভার এই ত্রিবেণী ধারায় বাংলার নবজাগৃতি মুক্তিস্নান-প্রয়াসী হল। দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ-জীবনের চরিত্র ও চেহারা এই সংগে নবযুগের অভিমুখী হয়েছিল। তা না হলে কয়েকজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অন্তরাগ্নির তেজে চারিদিকে এমন বহ্ন্যুৎসব হতো না। এমনই করেই জাতির চিত্তাকাশ আত্ম-সচেতনা, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি, মধ্যযুগ-বিমুখতা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠল। গতানুগতিক আচার পালনে নির্জীবতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাঙ্গালী ব্যক্তিত্ব আত্মমোক্ষণের পথে ক্রমশ: এগিয়ে চলল। ব্যবহার ও ভাবের জগতে যুগপৎ বন্ধন মুমুক্ষুতার প্রবণতা চিন্তা-জগতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধতা উৎপাটনের জন্য উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ নানা প্রকার বিমুখী কর্ম ও ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে অতিবাহিত হল। আর

(১) বাংলা সাময়িক পত্র—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কাল বঙ্গসাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যূষকাল মাত্র। বাংলা গদ্য, সাময়িক পত্র, বাংলা অভিধান, বাংলা শব্দ সংকলন, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি নবীন ও দুরূহ কার্য্যের ব্রতেই জাতীয় শক্তি নিয়োজিত থাকে। নবযুগের বাণীকে লোকায়ত ও সার্থক করার জন্য এইরূপ প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময়ে মাধ্যমিক, বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল। আর সাময়িক পত্র তথাকথিত আপামর জনসাধারণের কাছে নবযুগের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কার্য্যে রত হল। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের সাহিত্যরথীরা তখনও পরিপূর্ণ ভাবে অবতীর্ণ হননি। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন এই পর্বের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। আর ঐ আলোক-উচ্ছ্সিত জীবনপথের শিল্পী ভগীরথ মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন আরও কয়েক বৎসর পরে (১৮২৪), বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮-এ, দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রের জন্মও ঐ সালে, বিহারীলালের বছর দুই আগে অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে, নবীনচন্দ্রের ১৮৫২ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে উপরি উল্লিখিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক অক্ষয় কুমারের কিছু কিছু বই পত্র বার হয়। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র—উনিশ শতকের লব্ধকীর্তি সাহিত্যিকদের রচনাবলীর প্রকাশ শতকের তৃতীয়পাদ হতেই সুরু হয়। আর ১৯ শতকের প্রথমার্দ্ধে যেটুকু সাহিত্য বিকশিত হয়েছে তার অতি সামান্য অংশই সাহিত্যের পংক্তি ভোজে আহূত হতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের পর মধুসূদন, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আর্বিভাবের ফলে ১৯শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ নবযুগান্তরের সম্মুখীন হয়। এই শতকের প্রথমার্দ্ধে তারই প্রস্তুতি চলে। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য প্রথমার্দ্ধের সাহিত্যেই সুপ্ত ছিল। সেজন্যই পরবর্তীকালের সাহিত্যসমৃদ্ধির কারণ তার প্রথমার্দ্ধের রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও মানবজীবনে অনুসন্ধেয়। গত শতকের তৃতীয় পর্ব থেকে সাহিত্যের সর্বাংগে জোয়ার এল বটে—কিন্তু যে রেনেসাঁসের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা এই শতকের তৃতীয় পর্ব থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগলো। নবযুগের বাণী শতকের প্রথমার্দ্ধেও নির্দ্দন্দ্ব হতে পারেনি। নূতনকে প্রতিরোধ করার মত বাধা এসেছিল অনেক। নবযুগের পথিকদের কর্মে ও বক্তব্যে অনেক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গোড়া থেকেই ভবানীচরণ, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি নায়কেরা পুরাতনপন্থী ছিলেন। সেজন্যই নবযুগের বাণী শতকের প্রথমার্দ্ধে নানা বাদ-বিতণ্ডার স খীন হয়ে শক্তিহীন হয়েছিল—শতকের তৃতীয়পাদে এই গোঁড়ামিই আরও দানা বেঁধে উঠার সুযোগ অর্জ্জন করলো বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। অতীত শাশ্বত সভ্যতা সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকেই অনেকে রেনেসাঁসের অর্থ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিক যুক্তিসহ নয়। রেনেসাঁসের মূল কথা হচ্ছে, হিউম্যানিজম্ বা মানবতন্ত্র। এই মানব তন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য স্বয়ং মানুষ। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, দেবদেবী বা ঐ জাতীয় অতিমানবিক কল্পনা নয়। মানবতন্ত্রী দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতামুক্ত। মানুষ সব কিছুর রূপকার্টী—বাস্তব নরনারীকে নিয়েই মানবতন্ত্রের যত ভাবনা চিন্তা। অথচ যুক্তিসহ বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমাদের দেশে যে রেনেসাঁস এসেছিল তা ত্বরান্বিত হতে পারেনি বা সফলতা অর্জ্জন করেনি—শেষার্দ্ধের এই অধ্যাত্মমুখী হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্য। সিপাহীযুদ্ধের পর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নব ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। ইহার পরবর্তীকাল হতেই ভারতবর্ষের নানাকেন্দ্রে বিশেষ করে বাংলাদেশে ধর্ম-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মরা পুরাতন ও নব ব্রাহ্ম দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ঈশ্বরকে নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি সুরু করে। ইউরোপের মুক্ত স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি ক্রমশঃ জাতির আবেগ প্রবণতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে। পুনরায় মধ্যযুগীয় চিন্তা ধর্মের আসর অধিকার করতে থাকে। এমন কি ইহবাদ পুষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম চিন্তাও মধ্যযুগীয় চিন্তার দ্বারা খানিকটা আচ্ছন্ন হয়েছিল। আর বুদ্ধিবাদকে যুক্তিবাদকে অস্বীকার করে শুধু হৃদয়সর্ব্বস্বতা ও অধ্যাত্মবাদের পথে ভারতকে জাগ্রত করার যে পরিকল্পনা বিবেকানন্দের ছিল—কালের রূপান্তরশীল চেতনার সংগে তার কোন মিল ছিলনা বলেই তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। নূতনকালকে সৃষ্টি করার শক্তি ও ব্যবহারিক ঐশ্বর্য তার ছিল না! ১৮৬৭ সনে নবগোপাল, রাজনারায়ণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের প্রচেষ্টাতে হিন্দুমেলার প্রবর্ত্তন হল। এই সময় হতে মুসলমানদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আন্দোলনের জয়যাত্রা সুরু হলো ওয়াহবী আন্দোলনের মাধ্যমে। শতকের তৃতীয় পাদে এমনি করেই রেনেসাঁসের জয়যাত্রা ব্যাহত হল। তাছাড়া রেনেসাঁসের বাণী কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে চায়। অথচ ভারতীয় রেনেসাঁসে মুসলমানরা শতকের প্রথমার্দ্ধে জাগরণের কোন প্রেরণাই অর্জ্জন করেনি। তাছাড়া নবজাগরণকে লোকায়ত করার পক্ষে ভীষণ বাধা ঘটাল ইংরাজী শিক্ষা—যে ইংরাজী শিক্ষার স্পর্শে আমাদের পুনরুজ্জীবন হয়েছিল—লর্ড হার্ডিঞ্জের পর হতে সেই ইংরেজীই আমাদের নবজাগরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কারণ হার্ডিঞ্জের সময় হতে—ইংরেজী শিখলেই চাকরী মিলবে এই ধারণা উচ্চতর বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলা চর্চার ক্ষতি করলো। এমনি করেই রেনেসাঁসের বাণী যেমন একদিক হতে ব্যর্থ হল—অপর দিকে হিন্দুজাতীয়তাবাদের দ্বারাই শাসিত হতে চলল উনবিংশ শতকের শেষ পাদের বাঙালী চিত্ত। সেজন্যই উনিশ শতকের বাঙালী রেনেসাঁর সার্থকতার উৎস ইউরোপীয়তার প্রাণস্পর্শে ভারতীয় হিন্দু জীবন দর্শনের পুনর্মূল্যায়নে। বঙ্গবাসীর আবির্ভাব এই রক্ষণশীল হিন্দু আন্দোলনের মধ্যেই। হিন্দুর প্রাচীন চিন্তা ও ধ্যানধারণাই বঙ্গবাসীর প্রাণ। বঙ্গবাসী সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং ঐ হিন্দু মানসিকতার উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদক-পদে বৃত হতে পেরেছিলেন।

বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত শিক্ষার হলকর্ষণ এবং রামমোহনের যে যুক্তিবাদী মন জাতির জীবন-যজ্ঞে অগ্ন্যাধান করেছিল—উনিশ শতকের শেষ পাদের পূর্বাহ্ণেই তা ধূসর হয়ে আসে। যুক্তি অপেক্ষা ভক্তি, বিশ্বাস, হৃদয়াবেগ ও অতীত ঐতিহ্যের প্রতি মোহ, নবজাগৃতির সাফল্যকে বিলম্বিত করে। কেশবচন্দ্রের নব ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কাল হতেই ঐ মানবমুখী যুক্তিবাদ অপেক্ষা জাতীয়

ঐতিহ্য, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় কীর্তির কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার ও ধর্মপ্রচারকে এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাধারণী ও নবজীবনে হিন্দুর অতীত কথা যুক্তি সহকারে বিচার ও প্রচারে ব্রতী হন। এই সাধারণীতেই কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারই কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্য পথের গুরু। অক্ষয়চন্দ্র গত যুগের একজন বিখ্যাত গদ্যশিল্পী ও চিন্তানায়ক ছিলেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় তাঁর মানসিক পরিপুষ্টি হয়েছিল। সাধারণী ও নবজীবনের মারফত তিনি শিক্ষিত বাঙালীর মন নব্য হিন্দু তত্ত্ব আলোচনার দিকে ফিরুতে চেয়েছিলেন। ২ নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় তিনি লেখেন—"নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।... নিয়মিতরূপে সাময়িক পত্রে এ বিষয়ের চর্চা করিয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে আছে।" ৩. সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্রের রাজনীতিজড়িত সাহিত্যিক সক মেটাবারও উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে এই সাধারণীতেই যোগদান করেন। সাধারণী অফিসেই বঙ্গবাসী-প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্রেরও হাতে খড়ি হয় এই সাধারণীতে। কৃষ্ণচন্দ্র সে সময় সাধারণীর সহ-সম্পাদক ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা-সৌন্দর্য্য সাধারণীর শ্রীসংবর্দ্ধনে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে উঠেছিল। এঁরা দুজনেই সাধারণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অক্ষয়চন্দ্রের যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। এই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের অচ্ছেদ্য সৌহার্দ হয়। কিন্তু সাধারণীতে যোগদানের পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্রের মানসিক প্রস্তুতির পশ্চাদ ভূমিটি দেখে নেওয়ার দরকার। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সুরুতেই অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১২৫৭ সালে। নদীয়ার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রাম শিবনিবাসে তাঁর জন্ম। এই শিবনিবাস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচেষ্টাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশে অন্যতম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহারাজ এখানে অনেকগুলি দেববিগ্রহ স্থাপন করে কুলীন ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করেন। মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেকগুলি সংস্কৃত টোলের প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর হ'তে শিবনিবাসের ঐশ্বর্য ও গরিমা ক্রমশঃ হৃতশ্রী হতে থাকে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মনীতিতে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থা জড় ও জঙ্গমে পরিণত হয়। আর এই সমাজই ক্রমে অচলায়তন হয়ে ব্যক্তির শ্বাসরোধ করতে চলে। ঠিক অপর দিকে ইউরোপীয় বিদ্যার সংস্পর্শে একটা অজ্ঞাত অপরিচিত গতিপথ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শনের প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও যুক্তিমন্ত্রে জাতির চিত্তভূমি আকর্ষণ করতে চলেছিল। সেই নবযুগের বোধনকেন্দ্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর ছিল একটি। কৃষ্ণনগর রাজবংশের সংগে শিবনিবাসের রাজবংশের যোগাযোগ তখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই নবযুগের বাণী এই সুদূর পল্লীভূমিতেও সহজেই প্রসারিত হতে পেরেছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে নব্যবাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অন্যতমকেন্দ্রে পরিণত হল। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন। ইনি ডিরোজিয়ান ও ইয়ং-বেঙ্গলদের মধ্যে গুরুস্থানীয় ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বীটন সাহেব স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সংগে সংগে কৃষ্ণনগর ও বারাসাত প্রভৃতি মফঃস্বল শহরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ইতিপূর্বে ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেবের শিক্ষা রিপোর্টে শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও ৪৫০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়। তদানীন্তনকালে এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন নিয়ে কোলকাতার হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হোল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী শিক্ষার বৈধতা প্রমাণের জন্য গ্রন্থ রচনা করলেন। অপরদিকে নাট্যকে রামনারায়ণ স্ত্রী শিক্ষাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সুরু করলেন। ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন—

যত ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এ, বি, শিখে বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই, পথেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

বাংলার নবজাগৃতির অর্দ্ধশতাব্দী জুড়ে এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জাতির চিন্তা, ভাবনা ও কর্মে মুখর হয়ে আছে। সে যুগে মুক্তির ঐ আশ্বাসই ছিল বড় আশ্বাস। ভেবে দেখার অবকাশ ছিল না। বাঙালীর প্রাণ নিছক চিন্তাবিলাস অপেক্ষা ভাবের উন্মাদনাতেই অতি সহজে তৃপ্তিলাভ করে এবং তত্ত্বের সত্য অপেক্ষা তত্ত্বের ভাবাবেগ তাকে বিচলিত করে। এইরূপে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে নবযুগের সেই মানবধর্মের কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হোল। দেশের ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠলেন। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধপথেই দ্বিধাগ্রস্ত হল। সংবাদপত্রসেবী কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের পূর্বমুহূর্তেই জাতীয়-জীবনের ঐ দ্বিধা ঘন পিনদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মানুষ ক্ষুদ্র নয়, এই বিশ্বাস যেমন এসেছিল—তেমনই নবলব্ধ বিদ্যা তার মনুষ্যত্বকে পরিবর্দ্ধিত না করে অহঙ্কারকেই পুষ্ট করতে লাগল—আত্মপ্রসারের পরিবর্তে আত্মসঙ্কোচ ঘটাতে লাগল—গ্রহণ অপেক্ষা বর্জনই শ্রেয়তর হয়ে উঠল। পাপ, পুণ্য, শুচি, অশুচি, শ্লীল, অশ্লীল, ভব্য অভব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে এক নূতন বিবেকবুদ্ধি অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল। ইহাও একপ্রকার মানসব্যাধি। বলাবাহুল্য এই Morality সংস্কার জাতীয় সংস্কৃতির বিরোধী। তথাপি সেযুগের প্রায় সকল মনীষী ও কর্ষিতচিত্ত মানুষ এই সংস্কারের অল্পাধিক বশীভূত হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রও এই মানস ব্যাধি হতে মুক্ত ছিলেন না। সেকালের নবযুগের ঐ বাণীতে যেমন তাঁর দীক্ষা হয়েছিল—তেমনই সে-যুগের ধর্ম ও Morality নামক মানসব্যাধি হতেও তিনি মুক্ত হ'তে পারেননি।

২। "সাধারণী হিন্দুজাতির পক্ষপাতিনী—বাঙালীর পক্ষপাতিনী"—প্রথম সংখ্যা সাধারণী। ৩। সূচনা, নবজীবন, প্রথম সংখ্যা।

তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরিবারে বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। শৈশব হতেই সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি মোহ তাঁর সহজাত প্রকৃতির মধ্য হতেই আবির্ভূত হয়েছিল। সমসাময়িক যুগপ্রবৃত্তির একটি প্রবল ধারাও তাঁকে হিন্দুচিন্তার দিকে প্রবুদ্ধ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম ও সাধনায় যুগের ঐ দৈবসত্তার মধ্যে হিন্দুমুখী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাই প্রবল। তৎসত্ত্বেও তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের একজন আধুনিক মানুষ।

কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকাল ও সেই যুগের দ্বিধাবিভক্ত ভাবধারার কথা সংক্ষেপে বলেছি। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ছিলেন ফুলিয়া মেলের নৈকষ্য কুলীন ৺রামেশ্বর চক্রবর্তীর সন্তান। লেখাপড়াতে বাল্যকালেই কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে মেধা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনিবাসেই সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী পিতা রামচন্দ্রের কাছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। পিতার দৃঢ় চরিত্র ও হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞান তাঁর কৈশোর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—সে প্রভাব থেকে তিনি কখনই মুক্ত হতে পারেননি। বরং পরিণত বয়সে ঐ পিতৃ-স্মৃতিই তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তৎসত্ত্বেও পিতা রামচন্দ্র তাঁকে তৎকালে প্রচলিত বিলাতি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেন নি। কৃষ্ণচন্দ্র সেজন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় শিক্ষারই আলোক লাভ করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে এই দুই শিক্ষার ভাগবতী স্রোত প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। তৎকালে প্রচলিত ফার্ষ্ট আর্ট বা এফ-এ পাশ করার পর কৃষ্ণচন্দ্র চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে কৃষ্ণচন্দ্র তিন বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করেন। নিজের মধ্যে যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ হতে দেখে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। যক্ষ্মার লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু ইহা কখনও রীতিমত রোগে পরিণত হয়নি। লোকান্তরের ২।৩ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সুদৃঢ় সবল ও সুস্থ ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী'তে সহ-সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। সাধারণীর সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের যোগাযোগের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র চুঁচুড়া হতে এই সাপ্তাহিক পত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্র। অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, প্রমুখ সাহিত্য-রথীদের রচনা সাধারণীর পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করতো। ইংরাজী ১৮৮৬ সালের দিকে 'নববিভাকর' সাধারণীর সংগে যুক্ত হয়। নববিভাকর সাধারণী ৪র্থ ভাগ ২১ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইবার পর তিরোহিত হয়। নববিভাকর-সাধারণী যুক্ত হবার বহু পূর্বেই কৃষ্ণচন্দ্র সাধারণী পরিত্যাগ করে স্বগ্রাম শিবনিবাসে চলে যান। সেখানে নূতন ইংরেজী শিক্ষার প্রচারে তিনি কার্য শুরু করেন। যথাস্থানে কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষাব্রতী জীবন সম্বন্ধে আলোচিত হবে। যাহোক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর হতে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মজীবন সুরু হয়। এখন হতে সাহিত্য, সংবাদপত্র ও দেশসেবাই তাঁর ব্রত হ'ল। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলনের একটা প্রবল স্রোত জন-গণ-মন মথিত করে তুলেছে। কৃষ্ণচন্দ্র জাতীয়-জীবনের এই সর্বগ্রাসী ভাবধারাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু তৎকালের অতিমাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন দেশসেবীদেরও তিনি সুচক্ষে দেখেন'নি। তৎসত্ত্বেও তদানীন্তন জাতীয় জীবনের ঐ বাণীকে তিনি জীবনে আর এক দিক দিয়ে চরিতার্থ করেছিলেন—কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তী জীবন আলোচনাকালে তাহাও পরিস্ফুট হবে। এমন সময় 'বঙ্গবাসী' হতে আহ্বান এল। সংবাদপত্র সেবার আহ্বান। কৃষ্ণচন্দ্র সে আহ্বান উপেক্ষা করেননি। অতঃপর বঙ্গবাসীই কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম ও কীর্তি ক্ষেত্র হয়ে পড়ে; এবারে আমরা সে প্রসঙ্গেই প্রবেশ করবো।

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবাসী একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী কেবলমাত্র সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যোগেন্দ্র চন্দ্র বাংলা দৈনিক, সান্ধ্য ইংরেজী দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' হিন্দী বঙ্গবাসী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন এবং নানা সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করে সুলভ মূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কোলকাতার চাঁপাতলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী হতে বঙ্গবাসী প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্র বন্ধু উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহের প্রচেষ্টাতে এই সময় বাংলা দৈনিকের জন্ম হয়। দৈনিকের প্রতিষ্ঠার জন্য যোগেন্দ্র চন্দ্র একজন সুলেখক অথচ কর্মী লোকের অনুসন্ধান করছিলেন। সাধারণী কার্য্যালয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সংগে যোগেন্দ্র চন্দ্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময় যোগেন্দ্র চন্দ্র সর্ব কর্মপটু বিচক্ষণ ও সুলেখক কৃষ্ণচন্দ্রকে ডেকে আনেন। কৃষ্ণচন্দ্র দৈনিকের সম্পাদনা ভার গ্রহণ করলেন। পূর্ব সৌহার্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠানের কার্য প্রসারের পরিপোষক হয়ে উঠল। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনার গুণে দৈনিকের মান বাড়ল। দু'এক বছর পরেই বঙ্গবাসীর অন্যতম সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়ের সহিত যোগেন্দ্র চন্দ্রের মনোমালিন্য হয়। উপেন্দ্র চন্দ্র সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন। ফলে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হতে প্রকাশিত 'দৈনিক' ও 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্য একটু রদবদল ঘটে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের দিকে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দৈনিকে'র সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করে বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর চরিতকার বিহারীলাল সরকার লিখছেন—"১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্গবাসীর প্রিণ্টারী কার্য্যে নিযুক্ত হই।...যখন প্রিণ্টারী করি, তখন যোগেনবাবু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ বঙ্গবাসীর সত্ত্বাধিকারী। যোগেন্দ্রবাবু সম্পাদক বলিয়া গণ্য ছিলেন, ৺উপেন্দ্রবাবু ম্যানেজারী করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দৈনিকের সম্পাদক এবং বামদেব দত্ত বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন।...উপেন্দ্রবাবু সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। নূতন বন্দোবস্ত হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় [4] ম্যানেজারী ভার লইলেন। বামবাবু দৈনিকের সম্পাদক এবং আমি সহকারী সম্পাদক হইলাম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার অধিকারী নহেন, এখন এই নিয়ম হইল।" [5] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গবাসীর মূল সম্পাদক হ'ন এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত

৪। ইনি নদীয়া জেলার শিবনিবাসের অধিবাসী ছিলেন।

৫। বঙ্গভাষার লেখক।

ছিলেন। ইংরেজী ১৮৯২ সনে সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৫ সনে ঐ পত্রিকার মূল সম্পাদক হন। বামদেবও বেশীদিন দৈনিকের সংগে যুক্ত ছিলেন না।* অল্পদিন অন্ত হস্তে হস্ত থেকে দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তে ন্যস্ত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'মদনমোহন' শিক্ষা ও উপদেশ, দৈনিকেই প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বসুমতী ও বঙ্গবাসীর সংগে সুদীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্রমোহনের সমকক্ষ সে কালে দুর্লভ ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'সাহিত্য মঙ্গল' রচয়িতা ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক হিসাবে বঙ্গবাসীতে যোগদান করলেন। তিনি নিজেও পাক্ষিক সমালোচক ও মাসিক 'মালঞ্চের' সম্পাদক ছিলেন। পাঁচকড়ির সংগে 'বঙ্গবাসীর' সংস্রবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর সম্পাদনা বিভাগে যোগদানের পূর্বে বঙ্গবাসী কার্যালয় হতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র টেলিগ্রাফের সম্পাদক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। এইসময় ১৮৯৬ সালের ২৬শে আগষ্ট সাপ্তাহিক বসুমতীর আবির্ভাব ঘটে। পাঁচকড়ি কংগ্রেস-বিরোধী বঙ্গবাসী বর্জন করে ১৮৯৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হতে কংগ্রেস সমর্থনকারী বসুমতীর সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়েও কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর সংগে সংস্রব ত্যাগ করেননি। এই সকল কথা পরে আলোচনা করা হবে। ঐতিহাসিক কুমুদনাথ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে একস্থলে লিখেছেন—"যৌবনে ইনি মনীষী শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত সাধারণীর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন, পরে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ পূর্বক তাঁহার স্বাভাবিক রচনা পারিপাট্যে উহার শ্রীসংবর্দ্ধন করেন, তারপর দৈনিক চন্দ্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন।" ৭ এই শেষোক্ত দৈনিক চন্দ্রিকার সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্রবের কথা আমরা অন্য কোথাও জানিতে পারি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সংবাদপত্র সেবার জীবন এইভাবে দূর লক্ষ্যে ধাবিত হ'ল। এবারে তাঁর কর্মকীর্তিগুলো বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশই সংবাদপত্র-সেবায় অতিবাহিত হয়। আর বঙ্গবাসী সম্পাদনা তাঁর সংবাদপত্রসেবী জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাস্তবিকই কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা গুণে বঙ্গবাসী এত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ১৮৮৩ হতে ১৮৯৫ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল তিনি বঙ্গবাসীর মূল সম্পাদক ছিলেন। ইহার পূর্বে ও পরে তিনি বঙ্গবাসীর পরিচালনা বিভাগের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। যাঁরা বঙ্গবাসীর সম্পাদনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন—তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিনাথ ভট্টাচার্য, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মত কেহই সুদীর্ঘকাল বঙ্গবাসীর সংগে যুক্ত ছিলেন না। বঙ্গবাসীর উদ্ভব রক্ষণশীল হিন্দু মনোভাবের আওতাতে। হিন্দুর ধর্ম-কর্ম আচার অনুষ্ঠান রক্ষাই যেন বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—"বঙ্গবাসী শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্র রূপে পরিণত হইল। ইহা এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মফঃস্বলে সংবাদপত্র বলিতে বঙ্গবাসীকেই বুঝাইত।" ৮ সেকালের অতিরিক্ত ধর্মান্তর গ্রহণ, অত্যধিক মাত্রায় বিজাতীয় অনুকরণ এবং ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম বিগর্হিত আচার অনুষ্ঠান রক্ষণশীল হিন্দুদিগের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গবাসীর লক্ষ্য হইল এই সমস্ত অনাচারের প্রতিরোধ করা। হিন্দুশাস্ত্র-বিদ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গবাসীর ন্যায় এইরূপ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করে যোগেন্দ্রচন্দ্র দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যে নিস্পৃহ জ্ঞানবাদ ও মানবতা এই শতকের অক্ষয় দান, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মধ্যে জাগরিত হয়েছিল—বঙ্গবাসীর কর্ণধারগণের মধ্যে তা দেখা যায়নি। বঙ্গবাসীর সাধনা ও সেবা একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেই ধাবিত হতে লাগল। বাংলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সেবার পরিবর্তে বঙ্গবাসী খণ্ড হিন্দু-সম্প্রদায়ের সেবক হল। তাই উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নবযুগের যে তরঙ্গ কল্লোল বাঙালীর অর্গলরুদ্ধ মানস দ্বারে আঘাত করেছিল—শতকের শেষে তা বিভিন্ন স্রোতপথে প্রবাহিত হ'ল। নানা প্রকার ধর্ম-আন্দোলন এবং অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবাষ্পে রেনেসাঁসের স্বপ্ন বিফল হ'ল। ডক্টর সুকুমার সেন এই কাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—"সংক্ষেপে বলিতে গেলে পিছাইয়া পড়িতে চাওয়া হিন্দুসমাজ ও আগাইয়া চলিতে চাওয়া ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শঘটিত দ্বন্দ্বই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয় বছরে বাঙ্গালার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।" ৯ কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বাঙালী নবযুগের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'ল না। তা হিন্দুর জাতীয় জাগরণ ও পরিপার্শ্বচেতনা। ইহারই ফলে বাংলার সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান অপরূপ কায়াকান্তি লাভ করল। এই পরিপার্শ্বচেতনার দিক থেকেই নবযুগের বাণী কতকটা সার্থক হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণচন্দ্র সে যুগের ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির খাদ্য-পানীয় আকণ্ঠ গ্রহণ করেও সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যকে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিরক্ষার মত রক্ষা করেছিলেন। এই কৃষ্ণচন্দ্র আস্তিক্যবাদে ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বহু পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগর খাঁটি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়েও আস্তিক্যবাদে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা ব্যতীত তিনি জীবনের কোন সত্যকেই বিশ্বাস করতেন না। কৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানতাপস হয়েও ছিলেন ধর্মপরায়ণ ভক্তহিন্দু। তিনি সেকালের নব্য হিন্দু নেতাদেরও একজন ছিলেন। শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিসহ হিন্দুধর্মের আলোচনা শুরু করেছিলেন—পরে তিনি এই পথ হতে সরে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর পাইক পেয়াদারা ক্ষান্ত হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে চন্দ্রনাথ বসু বঙ্গবাসী ও নবজীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। বঙ্কিমের মনীষা, মহত্ত্ব ও ঔদার্য বঙ্গবাসীর হিন্দু নেতাদের ছিল না। চিন্তা ও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রই ছিল এঁদের প্রধান অস্ত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের

৬। সাহিত্য সাধক চরিত মালা ৮২ সংখ্যক পুস্তিকা।
৭। নদীয়া কাহিনী, ২য় সং (১৩১১) পৃষ্ঠা—১৮৫
৮। সাহিত্য সাধক চরিত মালা—৩৮ সংখ্যক পুস্তিকা।
৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪।

মধ্যে জ্ঞান ও প্রেম, ধ্যান ও কর্মের একটা বিচিত্র দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল—আর এ দ্বন্দ্ব সেকালের বাঙালী জীবনের আত্মার দ্বন্দ্ব। কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় সেকালের বাঙালী হিন্দু মনীষীদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও রচনাগুলিই তার প্রমাণ। এই কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মদক্ষতার গুণেই বঙ্গবাসী সেকালের বাঙালীর হৃদয় জয় করেছিল। "অষ্টম দশকে যুগোপযোগী পত্র-পত্রিকা কয়েকখানিই বাহির হইল। সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এই সময়ের দুই বিখ্যাত সাপ্তাহিক।" ১০ বঙ্গবাসীর প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছিল বাঙালীর হৃদয় জয়করা। যোগেন্দ্রচন্দ্রের পরিচালনায় এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনা-গুণে বঙ্গবাসী বাঙালী মাত্রেরই সেবায় আন্তরিক ভাবে আত্মনিয়োগ করে। সেকালে বাংলার জনজীবনে 'বঙ্গবাসীর' প্রভাব সম্বন্ধে হরিনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—"তাহাদের (বাঙালীর) অভাব অভিযোগ, তাহাদের অধিকার, তাহাদের সুখ-সুবিধা, তাহাদের দুঃখকষ্ট, তাহাদের হিতাহিত সকল বিষয়েই বঙ্গবাসী এমন নিরপেক্ষ নির্ভীক ও সরল ভাবে আলোচনা করিত যে, তাহাকে সকলেই একান্ত কল্যাণকামী বন্ধুর মতই আদরের পাত্র বলিয়া মনে করিত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বঙ্গবাসী এইভাবে সকলের শ্রদ্ধার, স্নেহের ও ভালবাসার ভিতর দিয়া দেশের একটা শক্তিকেন্দ্ররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতায় বসিয়া বঙ্গবাসী পরিচালনা করিতেন, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের প্রতি পল্লীর পর্ণকুটীরে পর্যন্ত তাহার প্রভাব পরিস্ফুট হইত। বঙ্গবাসীই ছিল বাঙালীর একমাত্র সংবাদপত্র। তখন কেহ আর সংবাদপত্র বলিত না। সংবাদপত্র বুঝাইতে হইলে বঙ্গবাসী বলিত।" ১১ অতি দুর্গম পল্লীগ্রামে—রেল ধরিতে হইলে দুইদিন গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়—বহু দূরবর্তী পোষ্ট অফিস হইতে সপ্তাহে মাত্র একদিন ডাক আসে—এমন স্থানেও বঙ্গবাসীর গ্রাহক ছিল। বঙ্গবাসীর জনসেবা তার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে পশ্চিমবংগের কয়েকটি জেলায় ভীষণ প্লাবন দেখা দেয় ফলে প্লাবিত অঞ্চলের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সম্মুখীন হয়। বঙ্গবাসী এই সময়ে বিপর্যস্ত জনসাধারণের সেবায় সহযোগের হস্ত প্রসারিত করে। ঐ সময় বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের জন্য বঙ্গবাসী সরকার-বিরোধী আন্দোলন সুরু করে। লাখারা নামক স্থানে দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গা হেতু এক হানা বা হ্রদতুল্য জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতি বৎসরে দামোদরের বন্যার বেগে এই হানার পথে জল প্রবেশ করে বহু ক্রোশব্যাপী শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে দিত। বঙ্গবাসী এই বন্যার প্রতিকারের জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধে অগ্নিবর্ষী লেখনীর দ্বারা জনসাধারণের প্রীতি অর্জনে সমর্থ হয়। এই আন্দোলন ও জনপ্রিয়তার পিছনে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচেষ্টা মুখ্য ছিল। তিনি নিজে পদব্রজে ঐ সমস্ত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট জনসাধারণের দুর্দশার কথা বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় দিনের পর দিন বর্ণনা করে চলেন। এই সমস্ত কারণে বঙ্গবাসীর ইতিহাসে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। বঙ্গবাসী, কেবলমাত্র নীরস সংবাদের সমষ্টি ছিলনা। ইহার ভাষাও ছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বঙ্গবাসীর এই জনপ্রিয়তার মূলে কৃষ্ণচন্দ্রের কথা স্মরণ করতেই হবে। কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্তীকালে বঙ্গবাসীর জনপ্রিয়তা কমেছিল। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—মাঝে বৎসর কয়েক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভা-পরিচালিত হইয়া বঙ্গবাসী, হিন্দুপ্রেজার, পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থের মুখপত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর সে বিশিষ্টতা নাই। ১২ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ ছিল এবং কৃষ্ণচন্দ্র যখন বঙ্গবাসী সম্পাদক, ইন্দ্রনাথ তখন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় এই ইন্দ্রনাথের হাতে সেকালের অনেক সাহিত্যিকেরই শিক্ষানবিশি হয়। পাঁচকড়িও ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। পাঁচকড়ি তাঁর সাহিত্যগুরু হিসাবে ইন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হননি। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে এ বিষয়ে লিখে গেছেন। ১৩ বঙ্গবাসী-হিতৈষী যোগেন্দ্রচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালে বাংলার জাতীয় জীবন নানাভাবে আন্দোলনের সম্মুখীন হয়। বঙ্গবাসী এই ভাব আন্দোলনের পথ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। বরং যুগচিত্তের ঐ উদ্দাম গতি-প্রকৃতিকে একটা স্থির পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনাকাল যুগের ঐ ঘনঘটার মধ্যেই অতিবাহিত হয়। তিনি বঙ্গবাসীকে বাঙালীর চিত্ত জাগরণের উৎসবে পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন। বঙ্গবাসী, শাণিত আয়ুধের ন্যায় জাতির তামসিক চিত্ততলে আঘাত হানিতে থাকে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে স্বাধীনতা ঔৎসুক্য জাগে। ইহা সেযুগের নব্য ইতিহাস চর্চার ফল। টডের রাজস্থান কাহিনী নিয়ে রঙ্গলাল প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ অস্ফুট রাষ্ট্রীয় চেতনাকে জাগরিত করেন। যে সমস্ত ব্যক্তির চিত্তে এই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, রাজনারায়ণ তাঁদের মধ্যে অগ্রণী। তিনি ব্যাকুল ছিলেন দেশের সর্বাংগীণ জাগরণের জন্য। তাই রাজনারায়ণ ও তাঁর সুহৃদবর্গের জাতীয়তা আত্মনির্ভর কর্মপরায়ণতার পথ ধরে। তারই ফলে শতকের অষ্টম দশক হতে জাতীয় আন্দোলন আরও সক্রিয় আকার ধারণ করে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের লেখনীগুণে বঙ্গবাসী এদেশের মানসিক চিত্ততলে জাতি বৈরের ভাবটি ব্যাপক করে তোলে। কৃষ্ণচন্দ্র লিখিত অনুবন্ধগুলি তখন থেকেই তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙালীর মনে বহ্নিকণা ছড়িয়ে দিতে থাকে।

উনিশ শতকের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সমাজ সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শতকের ৬ষ্ঠ ও ৭ম দশক থেকে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় চেতনার সুষ্ঠু রূপপ্রকাশের জন্য ১৮৭৬ সনে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত সভা গঠিত হয়। অষ্টম দশক হতে সভার কাজ ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১৮৭২ খৃঃ হিন্দু সহবাস বিল আইন সভায়

১০। বাংলার নব জাগরণের কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল, বসুধারা—পৌষ, ১৩৬৫।

১১। যোগেন্দ্র-কথা (১৩৩১)।

১২। শিশিরকুমার ঘোষ—প্রবাহিনী ২০শে পৌষ ১৩২১।

১৩। প্রবাহিনী—২০শে বৈশাখ ১৩২২।

অনুমোদন লাভ করে। ইহার দ্বারা অল্পবয়স্কা বালিকাদের বিবাহ রহিত হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তন হয়। ইহাতে সারা দেশে এক ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়। ইহা ছাড়া ইলবার্ট বিল, মিউনিসিপ্যাল বিল, এবং পরিশেষে ন্যাশাল্যাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলনের উদ্ভব বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপুল সাড়া এনে দেয়। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় যুগের এই নবাগত ঘটনাগুলিকে নবযুগের তোরণদ্বারে পৌঁছে দেওয়ার কার্য্যে ব্রতী হন। বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখাতেও এই যুগ-চাঞ্চল্যের আভাস মেলে। "During the year 1883 the native Press was much excited on various subjects, such as, the Ilbert Bill, the Local Self Govt. and Municipal Bill, and the imprisonment of the editor of the Bengali by the High Court for Contempt." ১৪ এই সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কারারুদ্ধ হন। বঙ্গবাসী, ধর্ম্ম সমাজ ও সাহিত্য চিন্তার সংগে সংগে রাষ্ট্রীয় চিন্তাতেও উৎসাহ প্রদর্শন করে। তৎকালীন কংগ্রেসকে বঙ্গবাসী সমর্থন করেনি বটে—কিন্তু জাতিবৈরের ভাবটি ঘনীভূত করে তোলার ব্যাপারে বঙ্গবাসীর কৃতিত্ব অসামান্য। বঙ্গবাসী প্রকাশ্যভাবে বিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুদক্ষ সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্নিবর্ষিলেখনী জাতিচিত্তে নূতন সাড়া এনে দেয়। তাঁর লিখিত অনুবন্ধগুলি বঙ্গবাসীর পাঠকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। তৎকালে বঙ্গবাসীর অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই লিখতেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন—"বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হইবার সময় প্রত্যেক সংখ্যায় একটি বা দুইটি কখনো কখনো ততোধিক প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, কলিকাতা মফঃস্বল প্রভৃতি লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। কৃষ্ণবাবু তখন সম্পাদক। তবে অনুবন্ধ তিনি অধিকাংশই লিখিতেন।" ১৫ বঙ্গবাসী সর্বাগ্রে সহবাস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তোলে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে নবযুগের বাণী তখনও মূর্ত হয়ে ওঠেনি। ধর্ম্মসংস্কার তখনও প্রবল। বঙ্গবাসী সহবাস আইনের বিরোধিতা করে রক্ষণশীলতারই পরিচয় প্রদান করে। বঙ্গবাসীর এই আন্দোলনের পিছনে নবযুগের কোন মুক্ত আলোক ত ছিলই না, বরং গোঁড়ামির জন্য সঙ্কীর্ণ অচলায়তন সৃষ্টি করে তোলে। বিদ্যাসাগর—মধুসূদনের মুক্ত মানবতার কোন পরশই ছিল না এই আন্দোলনের পিছনে। তবু বঙ্গবাসীর এই আন্দোলন সাধারণ ধর্মভীরু বাঙালীর হৃদয় জয় করে ফেললো। বঙ্গবাসী দূর পল্লীবঙ্গের মানুষের মধ্যে সহবাস আইনের বিরুদ্ধে নূতন মন তৈরীর কাজে লেগে গেল। যোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গবাসী-হিতৈষীগণ সহবাস আইনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এক প্রতিবাদসভা আহ্বান করেন। গড়ের মাঠের ঐ প্রতিবাদসভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হয়ে ঐ আইনের প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদসভাকে কেহ কেহ ভারতের প্রথম বৃহৎ জনসভা বলে অভিহিত করেন। সে যুগের ঐ সহবাস আইনকে কেন্দ্র করে দেশের সংবাদপত্র-জগতে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল। অনেকেই সহবাস বিলকে সমর্থন করেছিল। বালিকাসখী, সঞ্জীবনী, ওনিমব্রাহ্ম, সময়, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সহবাস বিলের সমর্থন করে অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ করতে থাকে। অপর দিকে বঙ্গবাসী, দৈনিক, বঙ্গনিবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, হিন্দুরঞ্জিকা, ঢাকাপ্রকাশ, টাইমস্, সুধাকর প্রভৃতি সংবাদপত্র সহবাস-আইনের ঘোর বিরোধিতা করে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় সহবাস বিলের বিপক্ষে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তা সেকালের মানুষকে সচকিত করে। সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বঙ্গবাসীর এই আন্দোলনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজী ১৮৯১ সালের দিকে অনুসন্ধান পত্রিকার বিবিধ প্রসঙ্গে দেখিতে পাই "সম্মতির বয়স লইয়া হিন্দুসমাজে বড়ই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুই এই বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন। এমন গ্রাম নাই বা এমন নগর নাই যে, সেখান হইতে এই বিলের সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে না। সকল হিন্দুই ধর্মহানি ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এসকল দেখিয়াও যে বিল পাশ করিতে অগ্রসর হইবেন, এইরূপ ত মনে হয় না। বিল পাশ হইলে যে কি অনিষ্ট সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, এসম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া বিলের প্রতিবাদ জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ সহযোগী বঙ্গবাসী একজন্য সর্বাপেক্ষা ধন্যবাদ পাইবার পাত্র। গত দুইবারের বঙ্গবাসীর প্রতিবাদ সংগ্রহ বড়ই উচ্চ অঙ্গের।" ১৬ ১২৯৭এর ৩০শে ফাল্গুনের অনুসন্ধানেও সহবাস বিল সম্পর্কে প্রভূত আলোচনা দেখা যায়। উক্ত সংখ্যাতেও অনুসন্ধান বঙ্গবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করে। অনুসন্ধানে প্রকাশিত, আশঙ্কার কথা, কি দেখিলাম ও কি শিখিলাম, প্রভৃতি আলোচনায় বঙ্গবাসীর সহবাস বিল সম্পর্কীয় আলোচনার ব্যাপক উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই বঙ্গবাসী সেকালে সহবাস বিলের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন তুলে ধর্মভীরু বাঙালীজনের চিত্ত জয় করেছিল। সেকালে বঙ্গবাসীর এই খ্যাতি প্রতিপত্তির পিছনে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, এবং তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীই যে প্রধান ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র এজন্যই কৃষ্ণচন্দ্রের উপর সুগভীর আস্থা রেখে চলতেন। বিহারীলাল সরকার তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"তখন কৃষ্ণবাবু বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন বলিয়া যোগেনবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন।"

এই সময়ে ইলবার্ট বিল পাশ হয়ে সমগ্র জাতিকে প্রবল তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল। এই ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে জাতির রাষ্ট্রীয় চিত্ত জাগরণ আর একধাপ অগ্রসর হ'ল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ তারিখে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের বি-এল-গুপ্ত শাসনতন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই সময় বাংলার গভর্ণর ছিলেন Sir Augustus

১৪। Bengal under the Lieutenant Governors —vol. II—C. E. Buckland.

১৫। বঙ্গভাষার লেখক।

১৬। অনুসন্ধান। ১৫ই মাঘ ১২৯৭।

Rivers Tompson (1882-87). ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে সভাহতে উক্ত প্রস্তাবটি পাশ করে নেন এবং তদানীন্তন Law member স্যার পি, সি, ইলবার্টের নামানুসারে বিলটি ইলবার্ট এ্যাক্ট নামে অভিহিত হয়। এই ইলবার্ট বিলে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, কোন কোন শ্রেণীর ভারতীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার-বিভাগে ইউরোপীয় জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সমান মর্য্যাদা ভোগ করবেন। এই প্রস্তাবে দেশের গোটা ইউরোপীয় সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এতদিন ইউরোপীয়েরা যে সব সুখসুবিধা ভোগ করে আসছিল—সে সবের উপরে দেশীয় বিচারকদের হস্তক্ষেপ তারা কিছুতেই গ্রাহ্য করতে চাইল না। কেন না, নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে ভারতীয়েরা নাকি ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক হীন ছিল। যাদের মধ্যে জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, প্রতিমাপূজা প্রভৃতি প্রচলিত তারা বিদ্যাবুদ্ধিতে যতই উন্নত হোক তবু ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারক হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ভারতীয়দের মর্যাদার উপর এইভাবে যে আঘাত পড়ল তা বিচিত্র ফল প্রসব করতে চলল। সমসাময়িক দেশীয় পত্র-পত্রিকা মারফত আন্দোলন সুরু হল! দেশীয় পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জাতীয় আন্দোলনের ঘূর্ণিবার্ত্তা সৃষ্টি করে তুলল। অপরদিকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় 'ইলবার্ট বিলের' বিরোধিতা করতে লাগল। তারা ইংল্যাণ্ড ও এদেশ হতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য। বঙ্গবাসী, স্বদেশের পক্ষ অবলম্বন করে 'ইলবার্ট বিলের' সমর্থন করে জনগণচিত্তে সঞ্চিত শতাব্দীর বহ্নিকুণ্ড হতে অগ্নিচয়ন করে দীপশলাকা জ্বালিয়ে দিল। এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গবাসী' ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে জাতিবৈরের ভাবটি প্রশমিত করে দেয়। ফলে দেশী ও ইউরোপীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করে। ইলবার্ট বিল কেন্দ্র করে যে জাতিবৈরিতার ঝড় সেযুগের মানুষের চিত্ত বিক্ষেপ ঘটিয়েছিল—সে সম্বন্ধে C. E. Buckland লিখেছেন—The storm of indignation which had broken out in the European Community smouldered during the year, while the report called for were under submission. All India was in alarm, on the lookout for any manifestation of the intentions of the Govt. "Nothing could be more lamentable it has been said than the animosities of race that were aroused, the prejudices, the bitterness and bad feeling between Euporpeans and natives that were excited."১৭ এই সময় বঙ্গবাসী স্বদেশসেবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে। বঙ্গবাসী এই সময় কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, স্বদেশী নেতাদের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসকেও তিরস্কৃত করেছিল। স্বাধীনতার জীবন উল্লাস ও রাষ্ট্রীয় চেতনার পাবক স্পর্শে, বঙ্গবাসী, কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে অপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে। কেবল বঙ্গবাসী নয়, সেকালের প্রায় সকল সংবাদপত্রই এই 'ইলবার্ট' আন্দোলনের সংগে জড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত কবি মনীষিগণ ইলবার্ট বিলকে অবলম্বন করে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-কবিতা ও রচনাদি প্রকাশ করতে থাকেন। বঙ্গবাসীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যসেবিগণ এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হয়েছিলেন। এখানে সেই রকম কয়েকটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

হায় কি হলো—কপাল পোড়া উমেদারের পেশা
পড়ল চাপা জুতার তলে—সাহেব বড় পোষা!
অন্ন গেল বাঙালিরই, আর কি হোল তার!
এ পোড়া ছাই, "ইলবার্ট বিল" কেন হায় হায়।
—(হায় কি হলো)

হুসিয়ার ইলবার্ট দেখছে রিপণ লাট
সাহেব রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছু-পোঁচ তে-পোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দিছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলো 'এম্ফিবিয়স' জুটেছে।
হিপ্-হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আইরে ফিরিঙ্গি ভাই সবরত্তা ডাকে সবাই
সিন্ধুপারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাবো আন্ত্র পিত্র নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাবো বেছে নেবে কেবা?
হুরে হিপ্—হুরে-হো শিঙা বাজে ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ
এদেশী বুটন মোয়া গোরাদের ব্যাটা?
—(নেতায় নেতায়)

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' উপলক্ষে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটি রচনা করেন—নেতায়, নেতায়। ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদে কলিকাতায় দেশীয় নেতাগণ যে সভা করেন, ব্রানসন প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকেরা এবং ইংলিস ম্যান প্রভৃতি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিবিধ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহাদিগকে উপলক্ষ করেই হেমচন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড টেম্পল্ কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যাল আইন রচিত হলে হেমচন্দ্র আর একটি রহস্যপূর্ণ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি হ'ল—'সাবাস হুজুক আজব সহরে'। আজিও ভোট প্রদান কালে বাঙালীর এই কবিতাটির কথা মনে হয়। সমসাময়িক ঘটনার প্রতি এই প্রকার হুজুকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত সেকালের সাময়িক পত্রে বিস্তর ছড়িয়ে আছে। 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায় ইলবার্ট বিল নিয়েও এইরূপ অজস্র ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমসাময়িক এই সমস্ত কবিতা ইলবার্ট বিল আন্দোলনের ব্যাপকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

[ক্রমশঃ।

১৭। Bengal under the Lieutenant Governors —Vol. II, p. 787.

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

হাসিটা হঠাৎ দুনিয়া থেকে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। লোকে প্রাণখোলা হাসি হাসতে ক্রমেই ভুলে যাচ্ছে। হাসির গল্প আর হাসির কথা আজ যেন লোকের কাছে বিলাসের বস্তু। আর কি নিয়েই বা লোকে হাসবে? কোথায় সেই হাসির খোরাক? সভ্যতার গোলামীতে আর অর্থনৈতিক যূপকাঠে মানুষ তো সব মেসিন হয়ে গেছে। দিলখোলা লোক যদিও দেখা যায়, বিপর্যস্ত মন থেকে যদিও বা কিছু রস বেরোয়—তা হয়ে যায় নিদারুণ ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ। রসনির্ঝর অনাবিল খোলা মনের কলধ্বনি আজকের দিনে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কোথায়? তথাকথিত 'অপচয়' করার মত সময় বা অর্থ কই! সেকালের সে বৈঠকও নেই, সে মজলিসি মানুষও নেই। ছিল একদিন যখন গানে, কবিতায়, সাহিত্যে রসের ঝরণা ঝরতো, রসবেত্তা ধনী-সমাজ কর্তৃক পুষ্ট হয়ে এই রসের পরিবেশন হতো। তখনও—

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ
তবু রঙ্গ ভরা……"

তখনও—

"ওকথা আর বলো না
আর বলো না
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাসবে লোকে
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।"

যাক্, হাসি নিয়ে আমি গবেষণা করতে নামিনি, প্রবন্ধ লিখতেও সক্ষম নই। আমার নেশা সেকালের লোকদের জীবনী ঘাঁটা। তাই তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্বনামধন্য সাহিত্যরসিক যাঁরা ছোট ছোট গুটিকয়েক কথার ভেতর দিয়ে পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন—তারই কিছু আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি—

সেকালের কলকাতার এক বিখ্যাত ধনীর বাড়ীর 'হল' ঘরে কয়েকজন যুবক সাহেবী কায়দায় খানা খাচ্ছে। এমন সময় নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাই সে দিক দিয়ে বাড়ীর কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই তারা বললে—

লোক, 'খানা' খাও, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, 'খানায়' মলত্যাগ করি।

[রামনারায়ণ তর্করত্ন (১২২১—১২৯২) নাট্যকার। ইনি নাটুকে রামনারায়ণ নামে খ্যাত ছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি এঁর প্রসিদ্ধ নাটক।]

ঐ তর্করত্ন মশাই একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশাই-এর বাড়ীতে এসেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন—'ওরে কে আছিস, তর্করত্ন মশাইকে চৌকী দে'। তর্করত্ন মশাই কপালে হাত দিয়ে বললেন—'হা ভগবান, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চোরও নই, ঝাঁটপাড়ও নই—আমাকেও 'চৌকী' (পাহারা) দেবে!

[মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২২৩—১৩১২) ব্রাহ্ম-সমাজের

সভাপতি ও প্রধান আচার্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা এবং শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা।]

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রূপাত্মক ও রসাত্মক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর জ্যাঠতুত ভাই মহেশচন্দ্র রসাত্মক রচনায় কিছু কমতি ছিলেন না। তাঁদের উভয়ের মধ্যে কবিতার লড়াই চলত। কোন কারণে মহেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কবিতার যুদ্ধ করবেন না। তাতে ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপ করে বলেন—"দাদা, ল্যাজ গুটলে কেন ?"

তার প্রত্যুত্তরে মহেশচন্দ্র বললেন—

"ওরে তুই ভাইয়ের তুই থাকলে ল্যাজ—
থাকতো না সংসার।
একে তোমার ল্যাজে মজে গেছে
সোনার লঙ্কা ছারখার।"

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৩—১২৬৫) 'সংবাদ-প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন', 'সংবাদরত্নমালা', 'পাষণ্ড-পীড়ন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।]

এণ্টালির দেবনারায়ণ দের ছেলের জমকালো পাকা দেখা। প্যারীচাদ মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেনা-পাওনার ফর্দ চলছে। প্যারীচাদ দফায় দফায় দেবনারায়ণ বাবুকে টাকা দিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন—প্যারীবাবু, আপনি তো বেশ লোক, প্রত্যেকবারেই আমাকে টাকা দিতে বলছেন। তাতে প্যারীবাবু সহাস্তে বললেন—বাপু, তুমি দেবে না তো কে দেবে ? তোমার আগে 'দে' শেষে 'দে' সুতরাং তুমিই দেবে। সকলেই হেসে উঠলেন।

[প্যারীচাদ মিত্র (১২২১—১২৯০) সাহিত্যাকাশে টেকচাঁদ ঠাকুর নামে খ্যাত। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস তাঁরই রচনা।]

একদিন ভূদেববাবুর কোন বন্ধু ভূদেববাবুকে বললেন—কালিদাস মৈত্র বলেছেন—ভূদেব আমার 'মানব-দেহতত্ত্ব' কলম দিয়ে কেটেছে, আমি তার 'প্রকৃতির বিজ্ঞান' কোদাল দিয়ে কাটব। তাই শুনে ভূদেববাবু হেসে বলেন, যার যা অস্ত্র সে তাই দিয়ে কাটে।

এক সময় ভূদেববাবু কোন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান। নীচু ক্লাশের একটি মেয়েকে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়—ব্রজবালা দাসী।

আবার জিজ্ঞাসা করেন—কি পড় মা ?

এবার মেয়েটি কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল—দ্বি তীয় ভাগ।

সেই কথা শুনে তিনি বেশ গম্ভীরভাবে বললেন—"ব্রেশ, ব্রেশ।"

এখন হয়েছে কি, সেই মেয়েটির ডাক নাম বেজা ছিল। তার বাড়ীতে বলেছিল—কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে—ভাল নাম বলতে হয়। তাই মেয়েটির ধারণা হল—চলতি নাম বেজাকে 'র'-ফলা দিয়ে ভাল নাম ব্রজ হয়েছে—সেইজন্তে দ্বিতীয়তে 'র' ফলা দিয়ে ভাল নাম করে দিলে। ভূদেববাবুও সেই রহস্য বুঝতে পেরে তিনিও 'র'-ফলা দিয়ে উত্তর দিলেন।

[ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৩৩-১৩০০) শিক্ষাব্রতী ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। হিন্দুধর্মের উন্নতি ও হিন্দুধর্মে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্ম তিনি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।]

বিদ্যাসাগর মশাই যখন সামাজিক আচারগুলির সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন—সেই সময় তাঁর এক বন্ধু কালীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু আমের আচার স্বহস্তে তৈরী করে পাঠান। পরে উভয়ের দেখা হলে বিদ্যাসাগর আমের আচারের খুব প্রশংসা করেন। তাই শুনে কালীকৃষ্ণ বলেন—তাহলে বিদ্যাসাগর তুমিও স্বীকার কর, এদেশের সব আচার কু-আচার নয়, কেমন ?"

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১২২৭—১২৯৮) বাংলা সাহিত্যের গুরু, সমাজ-সংস্কারক ও পণ্ডিত। কালীকৃষ্ণ মিত্র বারাসাত আশ্রমবাসী জনৈক বন্ধু।]

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী বালি-ব্যারাকপুর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। তিনি এক সময়ে পাঠাগারের বই সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় বিদ্যাসাগর মশাই-এর বাড়ীতে আসেন। বিদ্যাসাগর মশাইকে তিনি আগে কখনও দেখেননি। সুতরাং তাঁকে তিনি চিনতেন না। বিদ্যাসাগর মশাই-এর বাড়ীতে তাঁর ঘরে তখন অনেক লোক বসেছিলেন আর তিনি রোয়াকে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে চৌকীর ওপর এক ভদ্রলোককে দেখে বিদ্যাসাগর ভেবে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন—তিনি বাইরে বিদ্যাসাগরকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর তা দেখে বললেন—আজকাল দেখছি, সবারই উঁচু দিকে নজর, নীচের দিকে দৃষ্টি পড়বে কেন ?

তাতে কান্তিচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিলেন—"ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও আমরা তাঁর আশায় উঁচু দিকেই চাই।"

এই উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর মশাই খুব খুসী হলেন—আর তাঁর প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন।

[কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী (১২৫৩—১৩২১) পণ্ডিত এবং 'ভারতের ইতিহাস' ও 'নবদ্বীপ-মহিমা'র গ্রন্থকার।]

একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু কৃষ্ণনগর থেকে নদী পার হবার জন্য খুব ভোরে ঘাটে এসেছেন। খেয়াঘাটের মাঝি নৌকোর ভেতর গভীর ঘুমে মগ্ন। দীনবন্ধু নৌকোর কাছে তীরে দাঁড়িয়ে মাঝিকে ডাকতে লাগলেন—ও বাবা, মাঝি, একবার ওঠ, উঠে আমাদের পার করে দিয়ে আবার ঘুমোও। দীনবন্ধুর ধীর কণ্ঠ মাঝির কানে গেল না। তখন মধুসূদন বললেন—ওরকম করে ডাকলে কি মাঝি সাড়া দেবে? তখন তিনি সাহেবি ঢংএ বললেন—Oh, You, বলে গুরুগম্ভীর ভাবে ডাকা মাত্র মাঝির ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে ওঠে তাঁদের নৌকোয় তুললে।

"সেই ঘাটে খেয়া দিল তন্দ্রালু পাটুনী
ত্বরায় বাহিল নৌকা 'মধু' স্বর শুনি।"

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বিখ্যাত কবি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রচয়িতা। দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৮-১২৮০) নাট্যকার 'নীলদর্পণ' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা]

কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গীত-শিক্ষক ও 'গীতসূত্রধার' রচয়িতা শর্মিষ্ঠা নাটকের শর্মিষ্ঠার অংশগ্রহণ করেছিলেন। দীনবন্ধুর সঙ্গে মাইকেল তাঁর পরিচয়ে বলেন—ইনি আমাদের লাইনে আছেন। দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি কি Lawyer ?

মধুসূদন বললেন—না হে না, ইনি নাট্যশিল্পবিদ্। আমাদেরই লাইন তো।

রত্নাবলী নাটকের মহড়া। পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্যান-বাটিকায় হলে সোফায় বসে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর মধুসূদন।

মধুসূদন—বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হলে নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই।

যতীন্দ্রমোহন—প্রবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য ও পদবিন্যাস বাংলা ভাষার উপযোগী নয়।

মধুসূদন—আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নহি—একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

যতীন্দ্রমোহন—কেন আপনার মনে নেই, ঈশ্বর গুপ্তের লেখা—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

[মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১২৩৮—১৩১৪) বহু জনহিতকর, শিক্ষা, শিল্প, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'বুঝলে কি না' 'গীতমালা' প্রভৃতি তাঁর লেখা]

মধুসূদন একদিন রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীতে কোন সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এসেছেন। সকলে ধুতি চাদর পরে এসেছেন কেবল মধুসূদন এসেছেন কোট প্যান্টলুন পরে। তাঁকে দেখে দিগম্বর মিত্র বললেন—মাইকেল, আজকে তুমি কাপড় পরে এলে না কেন?

মধুসূদন হেসে বললেন—কাপড় পরে আসলে গাড়ু গামছার দরকার। এটা Ruling raceএর পোষাক—এতে সে ভয় নেই।

[ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র (১৮১৭—১৮৭৭) বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।]

চুঁচুড়ার সরকারী উকীল কবি দীননাথ ধরের সঙ্গে মাইকেলের গুরু-শিষ্য সম্পর্ক। তা হলেও দুজনের মধ্যে বেশ রসিকতা চলত। তখন মাইকেল লালবাজারে থাকতেন, মাইকেল একদিন রহস্য করে বললেন—দেখ দীনু! লালবাজারে এসে লালপানি খাওয়াই সঙ্গত; আবার লালপানি খেলেই লালবাজারে গতি হয়। সৌরচক্র কি না। তুমি কিন্তু দেখতে পাই—কেবল সাদা জলই খাও। লালবাজারের লালপানিও খেলে না টলেও পড়লে না, বেশ খাড়া আছো।

মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটক লেখবার সময় বললেন—'ও' শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র, দূরে প্রতিধ্বনি হল তার ধ্বনি মাত্র। মাইকেলের পত্নী, তাঁকে সম্বোধন হলে 'dear' বলতেই তিনিও 'dear' বলে উত্তর দিতেন। তাই শুনে দীননাথ রহস্য করে বললেন—মিঃ দত্ত, আপনি দেখছি পরমাসতী মিসেস দত্তের প্রতিধ্বনি।

দীননাথ এক কবিতা লেখেন। মাইকেল পড়ে বললেন—এ ত poetry নয় এ যে pottery.

[দীননাথ ধর (১৮৩১—?) 'কংস-বিনাশ' 'ত্রিশূল' 'উষাচরিত' প্রভৃতির রচয়িতা]

মাদ্রাজের এক হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করে মধুসূদনের মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য ভগ্ন ও বিকৃত হয়ে যায়। মাইকেল দেখতে কাল, তদুপরি হল গলাটা ভাঙা। কোন এক সুপুরুষ লোক মাইকেলের চেহারা আর গলার আওয়াজ নিয়ে কটাক্ষ করে। তাই শুনে মাইকেল হেসে বলেন—তবুও আমি গলাভাঙা কোকিল, সাদা হাঁসের মত করি না ত প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।

বন্ধু রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র একবার নিজ বংশ-মর্যাদার গর্ব করায় মাইকেল রহস্য করে বলেন—কিন্তু যতই বল তুমি দাদা, knave, slave, বামুনের মোট মাথায় করে তোমার বাপ-দাদারা বাঙলায় আসে, আর আমি—'দত্ত' কারো ভৃত্য নয়।

[রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। 'শিল্পিক দর্শন' 'শিবাজীর চরিত্র' প্রভৃতি অনেকগুলি বই-ও লেখেন।]

রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হয়ে কাশীতে গিয়ে পৈতে ফেলে আসেন—বাপ বার বার নিষেধ করেন, বাপের সঙ্গে তর্ক করে আলাদা বাড়ীতে গিয়ে থাকেন।

একদিন রামতনু বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওহে, আমাকে একটা রাঁধুনি বামুন যোগাড় করে দিতে পার?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন হে, তোমার আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি খানসামা হলেও তো চলে।

রামতনু বললেন—হ্যাঁ, আমার কোন আপত্তি নেই বটে, কিন্তু বাড়ীর ভেতর যে বামুন ছাড়া চলবে না।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—বাপের কথায় পৈতেগাছটা রাখতে পারলে না, এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ? রামতনু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

[রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—১৮৯৮) ডিরোজিও সাহেবের শিক্ষার আদর্শে সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী হন।]

এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে মহাসমারোহে আদ্যশ্রাদ্ধ। সভাপণ্ডিত চতুর্ভুজ ভট্টাচার্যের ও প্রধান নৈয়ায়িক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ওপর নিমন্ত্রণের ভার। এক গরীব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য উভয়কেই অনুরোধ করেন। চতুর্ভুজ বললেন—মশাই, আমার এ বিষয়ে কোন হাত নেই। আপনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে যান, তাকে ধরুন। একথা শুনে ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে বললেন—"চতুর্ভুজস্য ভুজো নাস্তি নির্ভুজঃ কিং করিষ্যতি"—পণ্ডিত মশাই, চতুর্ভুজ হয়ে আপনার যদি হাত না থাকে, তবে জগন্নাথের হাত থাকা কি সম্ভব? বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন।

[হুগলী-ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১১০১-১২০৩) বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও অদ্ভুত মেধাশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। 'বিবাদভঙ্গার্ণব' প্রভৃতির রচয়িতা। চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য হুগলীর বিখ্যাত পণ্ডিত]

বিদ্যাসাগর মশাই-এর কাছে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ দেখা করতে এলেন—সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে কেউ প্রণাম করলেন না দেখে, সেই ব্রাহ্মণ বড় অপমানিত বোধ করলেন আর অব্রাহ্মণদের লক্ষ্য করে বললেন—এই সকল অর্বাচীনদের মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ, এক সময় তাঁরা এদেশের কল্যাণ সাধন করেছেন, তাঁরা সকলেরই প্রণম্য।

বিদ্যাসাগর তাই শুনে হাস্যমুখে বললেন—পণ্ডিত মশাই,

শ্রীকৃষ্ণ একদিন বরাহরূপ ধরেছিলেন বলেই কি ডোমপাড়ায় যত শূকর আছে, তাদের ভক্তি বা প্রণাম করতে হবে?

ব্রাহ্মণের রাগ নিরসন হল।

সাহিত্যরসিক দামোদর মুখুজ্যে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কিত বেহাই। তাঁর বাড়ীতে উৎসব। আসর জমকালো। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আসতে দেখে বেহাই-এর সাদর আহ্বান—এস, এস বঙ্কিম চট্টো (অর্থাৎ বাঁকা চটিজুতো)। বঙ্কিমও রসজ্ঞ, প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়লেন না, বললেন—কোন দিকে? দামোদর মুখোয়? (অর্থাৎ দামোদরের মুখে)।

[দামোদর মুখোপাধ্যায় (১২৫১-১৩১৪) গ্রন্থকার ও 'প্রবাহ', 'অনুসন্ধান', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রের সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১২৪৫-১৩০০) সাহিত্য-সম্রাট্। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।]

একবার কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নামে আদালতে অভিযোগ করে যে, সে তার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে সেই মোকদ্দমা ওঠে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সাক্ষী আছে? প্রথম ব্যক্তি বললে, হুজুর আমার স্ত্রীই সাক্ষী, সেই দেখেছে। বঙ্কিম সহাস্যে বললেন—তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীরও পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করা অভ্যাস আছে নতুবা তিনি কি করে জানলেন যে, এই ব্যক্তিটি তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে?

একবার প্রতাপ চাটুজ্যের গলির বাড়ীতে বঙ্কিম রোয়াকে বসে তেল মাখছেন। এমন সময় দীনবন্ধু মিত্তির এসে হাজির। দীনবন্ধুর হঠাৎ নজরে পড়ল দ্বিতলের ঘরের জানালায় বঙ্কিম-গৃহিণী দাঁড়িয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে দীনবন্ধু বললেন—ওহো, এখানে কি চাঁদের শোভা! বঙ্কিম ওপরের দিকে একবার চেয়েই উত্তর দিলেন—আহা, যেন দিনের (দীনবন্ধুর) গালে হেগে দিয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ স্কুল পাঠকালীন তাঁর সহাধ্যায়ীদের মাথায় চাপড় বা চাঁটি মারতেন। তাঁরা একদিন শিক্ষক মশায়ের কাছে নালিশ করলে, শিক্ষক মশাই তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। কালী সিংহ কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বরং গর্ব করে বললেন—আমি জাতে সিংহ। জাত্যভিমান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারি না—তাই এরকম করে থাকি।

[কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০) মহাভারতের অনুবাদক। এ ছাড়া তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও আরও কতকগুলি বই লেখেন।]

একদিন কবি রসময় লাহা তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'ছাইভস্ম' নামে গ্রন্থখানি কান্তকবি রজনীকান্তকে উপহার দেন। রজনীকান্তও তাঁর অমৃত নামে কবিতার বইখানি উপহার দিয়ে বলেন—'ছাইভস্ম' দিয়ে 'অমৃত' নিয়ে যান।

আর একদিন লাহা মশাই তাঁর রচিত 'আরাম' বইখানি রজনীকান্তকে তাঁর রোগশয্যায় উপহার দিলে পরিহাস করে রজনীকান্ত বললেন—আমায় এই ব্যারামে 'আরাম' দিলেন বেশ।

[কবি রসময় লাহা (১২৭৬—১৩৩৫) কবি কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। রজনীকান্ত সেন (১২৭২—১৩১৭) বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কান্তকবি নামে পরিচিত। ইনি একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। 'বাণী', 'কল্যাণী' এঁর বিখ্যাত বই।]

এক সময় রজনীকান্ত তাঁর কোন বন্ধুর দ্বিতীয় বারের বিয়েতে গিয়েছিলেন। বর-কন্যা সমেত ফেরার পথে নব-বধূর প্রবল জ্বর হয়। বন্ধুটি তাঁর কাছে এসে বললেন—জ্বর ১০৩ হয়েছে। রজনীকান্ত হেসে বললেন—আগেও এক সতীন। এখনও ১০৩।

কান্তকবি আইনজীবী ছিলেন। আদালতে উকীলদের মাঝে রসালাপ চলছিল। রজনীকান্ত বললেন—একটা রাখাল ছটো গরু নিয়ে যাচ্ছে—একটি মোটা আর একটি রোগা। একজন উকীল সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাখালকে জিজ্ঞেস করলে—তোর ও গরুটা অত মোটা আর এ গরুটা এত রোগা কেন রে? খেতে দিস না না কি? রাখাল উকীলকে বললে—আজ্ঞে তা নয়, মোটা গরুটা উকীল আর রোগাটা মক্কেল। রাগ করবেন না যেন।

তহবিল তছরূপের মামলা। প্রতিবাদী পক্ষের উকীল ইন্দ্রনাথ আদালতে দেখার জন্যে বাদীপক্ষ থেকে একখানি খাতা দাখিল করার আবেদন করলে পরদিন অপর পক্ষের উকীল মশাই ক্রোধভরে বহু খাতা নিয়ে আসেন। খাতার স্তূপ দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিম...

বললেন—আমি একটু বিশল্যকরণী চেয়েছিলুম কিন্তু আমার সুপণ্ডিত বন্ধু একেবারে গোটা গন্ধমাদন এনে হাজির করেছেন। আদালতে হাসির রোল উঠল।

[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৫৫-১৩১৭) আইনজীবী ও রস-সাহিত্যিক। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে বঙ্গবাসী পত্রে 'পাঁচু ঠাকুর' 'ক্ষুদিরাম', 'ভারত উদ্ধার' প্রভৃতি লেখেন।]

দু'পয়সার কাগজ বঙ্গবাসীর যখন খুব প্রতিপত্তি তখন কোন ব্যাপারে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন। সে সময় ইন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চলে গেলে ইন্দ্রনাথ যোগেনবাবুকে বললেন—আপনার দু'পয়সার কাগজের এমন প্রতিপত্তি হয়েছে যে, ইংরেজি কাগজের সম্পাদকরাও আপনার মতামত জানতে বাড়ী পর্যন্ত ছুটে আসেন। এর জন্ত আপনার একটা 'কাল' পাথরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। যোগেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের এই রসময় ইঙ্গিতে হাসলেন—অর্থাৎ কাল পাথরের উল্লেখে তাঁর দেহের বর্ণের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

শাস্ত্রী মশাই রসিক লোক ছিলেন। তাঁর গৃহিণীও সুরসিকা। শাস্ত্রী মশায়ের লেখাপড়ার সময়ে কখনও কখনও গৃহিণী এসে সংসারের কথাবার্তা শুরু করতেন—তাতে শাস্ত্রী মশায়ের কাজের ব্যাঘাতও ঘটত—তাই একদিন তিনি যাত্রা অভিনয়ের মত হাত নেড়ে বলেছিলেন—

"লিখিতে পড়িতে শিখিতে দিলে কই,
বিবা'বধি নিরবধি জানি না আর তোমা বই।"

শাস্ত্রী মশাই বেশ তোয়াজ করে আহার করতে ভালবাসতেন—গৃহিণী কিন্তু স্বহস্তে সুব্যঞ্জনাদি রেঁধে তাঁকে খাওয়াবার সুযোগ পেতেন না। তাই নিয়ে গৃহিণীর কাছে অনুযোগ করলে তিনি যাত্রা অভিনয়ের মত হাত নেড়ে বললেন—

"রাঁধিতে বাড়িতে শিখিতে দিলে কই,
বিবা'বধি নিরবধি জানি না আর আঁতুর বই।"

[মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত। হাজার বছর আগেকার বাংলাভাষার আবিষ্কারক।]

নবদ্বীপ রসিকতার দেশ। নবদ্বীপের কোন এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত আহার করতে বসেছেন। তাঁর ব্রাহ্মণী তাঁকে পরিবেশন করছেন। উভয়েই অতি বাল্যে বিবাহিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে রসিকতা চলত। গৃহিণীর নাম সম্ভবতঃ পঞ্চাননা দেবী। আহারে বসলে পণ্ডিতের জলের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি ডাকলেন—পাঁচী, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, পঞ্চাননি, বারি আনয়।

গৃহিণীও সুরসিকা। উত্তর দিলেন—আর্য, আচার্য, ভট্টাচার্য শিরোধার্য, গঙ্গোদকং বা কূপোদকম্ (গঙ্গার জল না কুয়োর জল?)।

তবু

অসীম সরকার

স্বপ্ন দেখি না আমি।
কতো দিন, কত মাস, পার হ'য়ে গেছে:
শত শীত শরতের তারা-জ্বলা-রাত;
কতো রাত বাদলের মাদলে মাতাল।—
মনের আঁধারে তবু, জ্বললো না কোন দিন—
স্বপ্নের মশাল।

নতুন শিশুরা এলো
লাজুক লাজুক সব মায়েদের কোলে।
কান্নার পাট সেরে তাদেরও তো দেখলুম;—
তেপান্তর পার হয়ে পথে পথে পোড় খেলো তারা:
ইস্পাত-ঋজু দেহ, হাতে পায়ে শিরার শিকড়
ঢেউ থমকালো বুঝি মেয়েদের শ্যামল শরীরে।—
ওরাও কি কোন দিন, পারবে না স্বপ্নসাধ
এনে দিতে ফিরে?

পুরানোরা ঝরে গেল।
এ পৃথিবী কাঁদলো না, দিন-রাত্রি এলো গেলো ঠিক;
বনস্পতি রিক্তশাখা আকাশের পটে দিল এঁকে;
অনন্ত আকাশে ফের কাঁদলো করুণ চিল;
বর্ষার জটায়ু মেঘ বাতাসের যুদ্ধে এলোমেলো।
ওই সব ঝরাপাতা, ওরাও কি কোন দিন
স্বপ্ন দেখেছিলো?

তবু তো ফাগুন আসে
আগুনের মতো সব ফুলে।
সোনালি হরফে রোজ, আকাশ আশার চিঠি লেখে,
কাজল রাতের মায়া তারায় তারায় শুধু কাঁপে,
এখানে অসাড় মাটি বার বার হয় দিশাহারা।—
কোন দিন পৃথিবীতে পথ খুঁজে পাবে না কি—
আমার স্বপ্নেরা?

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২২

সকলে তখন অদ্বৈতের কাছে গেল। তার নবদ্বীপের বাসায়।

'নিমাই কী হয়েছে দেখবেন চলুন।'

'কী হয়েছে?' যেন কিছুই জানে না, বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তাকাল অদ্বৈত।

'সে নিমাই আর নেই।'

'কোন্ নিমাই?'

'পাণ্ডিত্যে জগৎজয় করে ধরাকে যে সরাজ্ঞান করত। সেই উদ্ধতের শিরোমণি। সেই গর্বে পর্বতায়মান।'

'এখন কী হয়েছে?'

'কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। ধরেছে দীন-হীন কাঙালের সাজ। অঙ্গে ধুলো, চোখে অবিরাম অশ্রু।'

'হয়েছে? এসেছে?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল অদ্বৈত। 'আমার সঙ্কল্প সফল করেছে?'

কত ডেকেছে অদ্বৈত, কত হুঙ্কার দিয়েছে, কত তুলসী-গঙ্গাজলে ভজন করেছে একমনে। জীবকুল মলিন হয়ে রয়েছে, কত জন এসে নালিশ করেছে সকাতর। অদ্বৈত আশ্বাস দিয়েছে সকলকে, আর বেশি দেরী নেই, আসবেন শ্রীহরি, পতিতকে উদ্ধার করবেন, মলিনকে প্রদীপ্ত করবেন। শুষ্ককে দ্রবীভূত করবেন। সকলের নয়নগোচর হবেন।

'জানো না কাল কী হয়েছিল?' বলতে লাগল অদ্বৈত, 'কাল সন্ধ্যায় গীতা পড়ছিলাম। একটা শ্লোকের অর্থ নানা বিচারেও প্রাঞ্জল হচ্ছিল না। তাই উপোস করে ছিলাম রাত্রে। ঘুমিয়ে ছিলাম, স্বপ্ন দেখলাম অপরূপ। কে যেন আমাকে ডাকছে। বলছে, আচার্য, ওঠ, কেন উপোস করে আছ? উঠে ভোজন কর। ভোজন করব কী, শ্লোকের যে এখনো ব্যাখ্যা পাইনি। আগন্তুক বললে, তার জন্যে কী হয়েছে, আমি বলে দিচ্ছি অর্থ। উচ্চ কণ্ঠে শ্লোক পড়ে অর্থ করে দিল আগন্তুক। তুমি কে? যার জন্যে এত দিন অপেক্ষা করেছ, সাধন ভজন ক্রন্দন করেছ, আমি সেই। একবার দেখতে পাই না তোমাকে? একবার কাছে এসে দাঁড়াও।'

'দাঁড়াল?'

'দাঁড়াল। দেখলাম আমাদের সেই বিশ্বম্ভর।' অদ্বৈত আকুল উজ্জ্বল চোখে তাকাল সকলের মুখের দিকে।

'ঠিক চিনতে পারলেন?'

'বা, পারবনা চিনতে?' বললে অদ্বৈত, 'ওর দাদা বিশ্বরূপ গীতা পড়তে আসত আমার কাছে। পড়তে পড়তে বেলা বেড়ে যেত, বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকতনা। কত দিন ছোট্ট শিশু বিশ্বম্ভর ডাকতে আসত দাদাকে। বলত, দাদা, তোমার খিদে পায়না? মা রান্না শেষ করে বসে আছে। কী সুন্দর দেখতে সেই শিশুকে, কী মধুর তার কথা! দাদার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত মার কাছে। মন আপনা থেকেই শিশুর দিকে ছুটে যেত। নিজের মনে বিচার করতাম, আমি কৃষ্ণের দাস, সর্বক্ষণ আমার চিত্ত কেন ঐ শিশুতে আকৃষ্ট হবে, কেন ঐ শিশু আমার চিন্তা জুড়ে বিরাজ করবে? কে ঐ শিশু? ওই কি তবে আমার সেই আরাধনের ধন?'

'কিছু বলল সেই স্বপ্নমূর্তি?'

'বললে, নগরে-নগরে ঘরে-ঘরে এখন কৃষ্ণকীর্তন হবে। ভয় নেই, ত্রাণ পাবে জীবকুল।'

'আর কী দেখলেন?'

'ঐ কথা বলেই অন্তর্হিত হল।' অদ্বৈত আনন্দের লহর তুলে বললে, 'এখন যখন তোমরা বলছ সেই বিশ্বম্ভর ভক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে, তখন কী না-জানি অঘটন ঘটে! অতুলন ঘটে। কী না-জানি মঙ্গলের বন্যা নামে সংসারে।'

'একবার যাবেন তাকে দেখতে?' কে একজন কানের কাছে মুখ এনে জিগগেস করল।

'না, সে যদি আমার জিনিস হয়, সত্যবস্তু হয়, নিজেই সে উদ্যোগী হয়ে আসবে আমার কাছে।' অদ্বৈত হাসতে লাগল। 'আমার সঙ্গে তার তো সেই রকমই কথা হয়ে আছে।'

ঠিক একদিন গৃহদ্বারে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই এসে হাজির।

এসে দেখল অদ্বৈত জলসিঞ্চনে তুলসীর সেবা করছে।

'আমি এসেছি।'

'এসেছ?' মহামত্ত সিংহের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল অদ্বৈত। বাহু আস্ফালন করে হরি-হরি বলে নৃত্য করতে লাগল। পূজার্চন ভুলে গেল। তোমার যখন দর্শন পেয়েছি তখন আর আমার কিসের পূজা?

প্রহ্লাদ বলছে নৃসিংহকে, তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে আমি আনন্দ-সমুদ্রে ডুবেছি, আমার ব্রহ্মানুভূতির গোষ্পদ দিয়ে কী হবে? সাক্ষাৎকরণানন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ, অল্প, যৎসামান্য। অনুভবের চেয়ে দর্শন বেশি সুখের। ব্রহ্মানন্দ সামান্য নয় কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমানন্দ অধিকতর। 'কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।' ব্রহ্মানন্দ ছোট গর্ত, কৃষ্ণনামানন্দ অম্বুনিধি।

অদ্বৈতকে দেখে, তার ভাবভক্তির বন্যা দেখে, নিমাই মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

'এই যে, এই আমার প্রাণনাথ।' অদ্বৈত নির্নিমেষে দেখতে লাগল নিমাইকে। 'কিন্তু ও কী? তুমি না কালো, তবে তোমার গৌরবরণ কেন? আর তুমি যে এখন আসবে, এ তো শাস্ত্রে বলেনি। তবে, তুমি তো শাস্ত্রের হয়েও শাস্ত্রের অতীত। তুমি যে যুগের হয়েও শাশ্বতের।'

সন্দেহ কী, এই অদ্বৈতের সাধন ধন।

অদ্বৈত দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এল, গঙ্গাজল আর তুলসী-চন্দন। গঙ্গাজলে পা ধুইয়ে দিল নিমাইয়ের। তুলসীতে চন্দন মেখে নিমাইয়ের পায়ের উপর রাখতে লাগল। আর সনমস্কার বলতে লাগল:

'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥'

যিনি বেদজ্ঞদের পূজনীয়, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি সর্বজগতের হিতকারী, যিনি গোপালক, সেই কৃষ্ণকে বারংবার নমস্কার।

গদাধর কাছেই ছিল, কাণ্ড দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রায় সত্তর বছর বয়স অদ্বৈতের, সে কিনা নবীন এক যুবকের পা পূজো করছে। ছি-ছি, লজ্জায় জিভ কাটল গদাধর। চেঁচিয়ে উঠল, 'গোঁসাই, এ আপনি কী করছেন?'

কী করছি তো দেখতেই পাচ্ছ। গোঁসাই কথাটা কানেও নিল না।

'নিমাই সামান্য বালক, আপনার কত ছোট, ওর পা-পূজো করে ওকে অপরাধী করছেন কেন?' গদাধর আবার প্রতিবাদ করল। 'কেন ওর অকল্যাণ করছেন?'

'যিনি সর্বজীবের কল্যাণ করতে এসেছেন, তাঁর অকল্যাণ করে, এমন সাধ্য কোন্ মানুষের? আর বালক বলছ কাকে? কদিন পরেই জানতে পারবে এ বালক না আর কেউ! আর বালক হলেই বা কোথাকার বালক!'

গদাধর থমকে দাঁড়াল। এ বলে কী গোঁসাই? তবে নিমাই কি সত্যিই অবতীর্ণ ভগবান?

ভয় করতে লাগল গদাধরের। নিমাই শুধু পণ্ডিত ছিল, মানুষ ছিল, গদাধরের একলার ছিল। কিন্তু যদি সে এখন ভগবান বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে সে তো সকলের হয়ে যাবে, আর পুছবেও না গদাধরকে। কী জানি কী অপরাধ সে করেছে এতদিন না জেনে, নিমাইকে সামান্য চোখে দেখে, তাকে শুধু সখা ভেবে। এক পা দু পা করে এখন ভয়ে-ভয়ে সরতে লাগল গদাধর।

নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। চোখ চেয়ে দেখল অদ্বৈত তাকে পূজো করছে। উলটে দুহাতে তার পায়ের ধুলো নিল নিমাই। করুণবচনে বললে, 'গোঁসাই, তুমি আমাকে কৃপা কর। আমি ভবসাগরে

পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, উদ্ধার করো আমাকে। আমার এই দেহ তোমাকে অর্পণ করলাম, তুমি আমার মাথায় তোমার পা দুখানি একটু রাখো। আমাকে পবিত্র করো। তুমি কৃপা করলেই তবে মুখে কৃষ্ণ নামের স্ফুরণ হবে। তুমি কৃপা করলেই তবে নষ্ট হবে ভববন্ধ। তুমিই তো সমস্ত কিছুর প্রেরণা। সমস্ত কিছুর মূল। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।'

কী রকম খটকা লাগল অদ্বৈতের। নিমাই যদি ভগবানই হবে তবে আমাকে, ক্ষুদ্র মানুষকে, প্রণাম করছে কেন? কেন তবে আমার কাছে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকছে? কেন প্রকট হচ্ছে না?

তার পরে এত দৈন্য কেন নিমাইয়ের? কেন এত নির্বেদ ও বিষাদ, কেন এত উদ্বেগার্তি? যে ভগবান, সে কেন নিজেকে হীন বা নিকৃষ্ট মনে করবে? তার কেন এত শোক হবে? এত চিন্তা, এত অশ্রু, এত বৈবর্ণ্য? কেন সে নিজেকে আর্তির প্রহারে অবমাননা করবে? তবে কি নিমাই ভগবান নয়?

মনের সন্দেহ মনে চেপে রেখে অদ্বৈত বললে, 'আমি আর কী আশীর্বাদ করব? তুমি নিত্য কৃষ্ণ-কথা-কৌতুকে থাকো। যা বলেছ, সকল বৈষ্ণবকে নিয়ে কীর্তন করো। কীর্তন-আটোপে সমস্ত পৃথিবী টলমল করে উঠুক।'

'তাই, তাই করব।' নিমাই ফিরে গেল নিজ গৃহে।

কলিকালে যুগধর্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

দ্বাপরে ভগবান শ্যাম, কলিতে ভগবান গৌর। এঁরা দুই পৃথক অবতার নন, একই অবতারের দুটি ভাব বা দুটি আবির্ভাব। গৌরসুন্দর শ্যামসুন্দরেরই আরেক অভিব্যক্তি। বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা পৃথক লীলা নয়, একই লীলা-সমুদ্রের দুটি তরঙ্গ। পূর্বতরঙ্গ বৃন্দাবন, উত্তর তরঙ্গ নবদ্বীপ।

জীবকে ব্রজপ্রেম দেওয়াই নবদ্বীপ লীলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ব্রজপ্রেম কী করে দেওয়া যায় রাধিকা ছাড়া? রাধিকাই তো ব্রজপ্রেমের মালিক। আর রাধিকা গৌরাঙ্গী। তাই রাধিকার ভাব ও কান্তি ছাড়া ব্রজপ্রেম অসাধ্য। সেই ভাব আর কান্তিকে অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে বলেই শ্রীকৃষ্ণ পীত বা গৌর হয়েছেন নবদ্বীপে।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে ধর্ম—নামসঙ্কীর্তন সার॥

অদ্বৈত ফিরে গেল শান্তিপুর। ওখানে বসে পরীক্ষা করব নিমাইকে। নিমাই যদি সত্যি ভগবান হয়, যদি সত্যি তার প্রকাশ হয়ে থাকে, সে আমাকে দূরে ফেলে রাখবে না, তার নিজের কাছে টেনে নেবে। 'সত্যি যদি প্রভু হয়, মুঞি হঙ দাস। তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥' আমাকে করবে না উপেক্ষা।

কেউ কেউ ভাবলে এ নিমাইয়ের বায়ুরোগ ছাড়া কিছু নয়। নইলে কেন এত কম্প, এত কান্না, ক্ষণে ক্ষণে কেনই বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি, কেনই বা নবনীতময়। শচী পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন। এ কী হল নিমাইয়ের? শ্রীবাস এসে আশ্বস্ত করল শচীকে। এ বায়ুরোগ নয়, এ কৃষ্ণভক্তি। শরীরে কৃষ্ণ বিহার, কৃষ্ণস্ফুরণ।

শচীর তবু সান্ত্বনা কই? যদি কৃষ্ণপ্রেমের ঢেউয়ে নিমাই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে?

না, শোক করি কেন? আমিও চোখ ভরে দেখি এই কৃষ্ণ-মাধুর্য।

যে মাধুরী, ঊর্ধ্ব আন নাহি যার সমান
পর ব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতারী পরব্যোমে অধিকারী
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে॥

অন্য স্বরূপের কথা দূরে থাক, যিনি সমস্ত অবতারের মূল, যিনি পরব্যোমধামের অধিপতি, সেই নারায়ণেও শ্রীকৃষ্ণের সমান মাধুর্য নেই। থাকলে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে সমস্ত কামভোগ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের আশায় তপস্যা করতে বসতনা।

দেখ, দেখ নিমাইকে।
কনক মানস যেন পুলকিত অঙ্গ
ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে বহুরঙ্গ।
ক্ষণে হয় আনন্দ মূর্চ্ছিত প্রহরেক
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥

বহিরঙ্গ লোক দেখলে নিমাই এড়িয়ে যায় আর ভক্ত দেখলেই নমস্কার করে, কারুর পায়ের কাছে বা লুটিয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে।

সবাই হায়-হায় করে ওঠে। কী কর কী কর বলে পিছিয়ে যায়। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে, তার আন্তরিকতায় বাধা দিতেও কুণ্ঠা আসে।

কারু ফুলের সাজি বয়ে দেয় নিমাই, কারু বা স্নানের কাপড়। স্নানের শেষে কারু বা ভিজে কাপড় নিংড়ে দেয়।

কিন্তু এসবের কি অর্থ? নিজেকে তৃণাদপি কি তুচ্ছ মনে করা?

'শুনেছি ভক্তের সেবা করলে কৃষ্ণকৃপা হয়, তাই আমি সেবা করছি আপনাদের।' বললে নিমাই, 'আমাকে কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?'

> কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
> ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥

নিমাইয়ের বিনয়ে সকলে মুগ্ধ। অকৈতবে সকলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল: কৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করুন। তোমার থেকে আমাদের সকলের দুঃখ যাক। যারা অজ্ঞ, রুক্ষ, কঠিন, যারা নিন্দুক, বিমুখ, বিরুদ্ধ, তারাও সকলে কৃষ্ণরসে মগ্ন হোক। তুমি যেমন শাস্ত্রে সর্বসংসার জয় করেছ, তেমনি ভক্তিতে পাষণ্ডদের সংহার কর। যারা অধ্যাপক আছে নবদ্বীপে তাদের মুখেও কৃষ্ণনাম নেই। 'এই নবদ্বীপে বাপ, যত অধ্যাপক। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সভে হয় বক।' আর যারা বিষয়ী পাপাশ্রয়ী তারা তো আমাদের পীড়ন আর অপমান করতেই ব্যস্ত।'

ভক্তের দুঃখের কথা শুনে, পাপিষ্ঠদের অত্যাচারের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে নিমাই। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে— আমি সেই—আমিই সেই। দুর্জনদের বিনাশ করতে আমি এসেছি। দূরে সরো অভক্তের দল। অসুরের দল।

> আপন ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।
> পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
> সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার।
> মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারবার॥
> আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
> ক্ষণে বোলে ছিঙোঁ ছিঙোঁ পাষণ্ডীর মাথা॥
> দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
> গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥

এ আবার আরেক প্রকাশ। আরেক কৃষ্ণস্ফূর্তি। কৃষ্ণোদ্দীপন।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার বিপুল বিরহভারে ভেঙে পড়ে নিমাই। অশ্রুর স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ দেয়।

কোথায়, আমার নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? আমার শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়? আমার মন্দ্রমুরলীরব কোথায়? কোথায় সুরেন্দ্রনীলদ্যুতি? কোথায় রসরাসতাণ্ডবী? কোথায় আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধ? আমার সুহৃত্তম অমূল্যরত্ন কোথায়? সেই বিধিকে ধিক যে আমাকে আমার এমন প্রিয়তমের থেকে বিচ্যুত করল।

> কাঁহা সে চূড়ার ঠান, শিখিপঞ্ছের উড়ান,
> নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
> পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বক পাঁতি
> নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু॥

সর্বত্রই ঐ এক ধ্বনি, কোথায়, কোথায়? কানাই কানাই, কাহাঁ নাই, কাহাঁ নাই।

শ্রীবাস নিমাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল কীর্তন করাতে। তারা চার ভাই, সকলেই কীর্তনে কীর্তিমান। সকলে আনন্দ করে উঠল। তারপরে আসবে মুকুন্দ-মুরারি, সদাশিব আর গদাধর। আসবে আরো অনেক কৃষ্ণপ্রণত—কৃষ্ণপ্রণীত। জয়-জয়কার হবে।

কিন্তু কীর্তন কোথায়? কাঁদতে বসল নিমাই। সে ক্রন্দন বুঝি কীর্তনের চেয়েও মধুর।

'জানো গয়া থেকে ফেরবার সময় কানাই-নাটশালা নামে এক গ্রামে এসে উঠেছিলাম। সকালে দেখলাম সেখানে একটি শিশু এসে উপস্থিত। আহা, কী সুন্দর সে শিশু। তমাল-শ্যামল। কুন্তলে নবগুঞ্জা, তার উপরে বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ। ছোট-ছোট মণি তাতে ঝলমল করছে। মুক্ত কমলদলের মত চোখ, কানে মকরকুণ্ডল। পরনের পীত ধটিটি কী মনোহর! আর হাতে মোহন বাঁশি, পায়ে মধুর নূপুর। সে অতি চঞ্চল শিশু হাসতে হাসতে আমার কাছে এল, এল নাচতে-নাচতে, আর আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়েই মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল সেই শিশু, সেই আমার মধুর মধুর স্মেরাকার, সেই আমার মানসনয়নোৎসব।'

কিমিহ বৃণুমঃ কস্য ক্রমঃ কৃতং কৃতম আশয়া। হা হা সখি কি করি উপায়। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়।

নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছাভঙ্গে হাসতে লাগল নিমাই। গৌরকলেবর স্থির হল। আনন্দের সরোবরে ভাসতে লাগল সন্তোষের শ্বেতপদ্ম।

এ আমরা কোথায় আছি? মর্তে না বৈকুণ্ঠে?

এ আমাদের কী অবস্থা? জাগ্রত না নিদ্রামগ্ন? এ কি আমরা বিষাদ দেখছি না প্রসাদ দেখছি? এ কি আমাদের সেই নিমাই, না কি এ শুকদেব না প্রহ্লাদ? না কি এ যুগলায়িত রাধাকৃষ্ণ?

বলতে লাগল সবাই, 'আমাদের আজ বড় পুণ্য, তোমার সঙ্গ পেয়েছি। আর আমাদের কী চাই। তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে। ত্রিলোকে তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে। পাষণ্ডদের বাক্যে ব্যবহারে শরীর দগ্ধ হয়ে আছে, তোমার প্রেমজলে এবার শীতল হব।'

'কোথায় কৃষ্ণ?' বাড়ি ফিরে এসে সঙ্গী গদাধরকে আবার জিগ্‌গেস করল নিমাই। শিশুর মত চাউনি, শিশুর মত প্রশ্ন।

'কোথায় আবার যাবেন?' বললে গদাধর, 'তোমার হৃদয়েই শুয়ে আছেন।'

'হৃদয়ে? সত্যি?' দুই হাতের নখ দিয়ে বুক চিরতে লাগল নিমাই। রক্ত ঝরতে লাগল।

যাকে আমি ত্যাগ করব ভাবছি, সে আর জায়গা না পেয়ে আমার হৃদয়ে এসে লুকিয়েছে? 'যারে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিতে, কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥' যাকে ভোলবার জন্যে এত চেষ্টা তার কিনা হৃদয়শয়ন?

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে নিমাইয়ের দুই হাত ধরে ফেলল গদাধর। শিশুর মতই প্রবোধ দিল। 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন? শিগ্‌গিরই আসবেন কৃষ্ণ।'

'আসবেন?'

'হ্যাঁ, হৃদয় থেকে উঠে আসবেন বাইরে।' বললে গদাধর, 'তুমি দেখবে, সকলে দেখবে।'

আশ্বস্ত হল নিমাই। নিরস্ত হল।

শচী কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'বাবা গদাধর, এমন শিশুর বুদ্ধি আর কোথাও দেখিনি। আমি তো ভয়ে ওর সামনেও যেতে পারি না, বউয়েরও সেই দশা, তুমি ছিলে বলেই ও আজ রক্ষা পেল। বল তুমি ওর সঙ্গ ছেড়ে যাবেনা কোথাও, ওকে চোখে-চোখে রাখবে।'

'কৃষ্ণই ওকে চোখে-চোখে রাখবেন।'

[ক্রমশঃ।

সময়হারা

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগ্‌চী

অনেক রাতের পর এল যে সকাল
মধুঝরা শীতের রোদ্দুর—
বন-মন মাঠ-বন দূর সমুদ্দুর
নেমেছে অনেক রঙ মনের উঠানে;
ঘুরে ফিরে কোণে,
ঊর্ণনাভ মন তবু খালি জাল বোনে!
অনেক সূর্য্যাস্ত শেষ সাগরের পারে,
আবার অরুণোদয় পুবের পাহাড়ে।
বহুক্লান্ত দিন সন্ধ্যা ললিত আভায়
আসে আর যায়;
চিত্রলেখা তেমনি মিলায়!
অনেকদিনের পর এল সেই বেলা
স্মৃতির পথের প্রান্তে দলিতে একেলা।
হরিৎ ঘাসের পরে রোদ ঝিরি ঝিরি ঝরে,
পীতাভ অচেল ফুল
রোদে ডুবে স্নান করে।
নীল পীতধারা মিঠে শীত রোদ্দুরে,
সকালের আলো মনের 'বোরবোদুরে'।
নীল প্রবাহিণী প্রাণের গোপন পুরে,
নীল ঢেউ বয় সারাটি হৃদয় জুড়ে।
সময় হারাই নীল তীর্থের তীরে।

নীলপাখি! কত দুপুর বিকেল সারা
অগুনতি ফুল ফুটলো টুটলো,
নিবলো কত যে তারা!
আকাশ বিহার এখনো তোমার অবিচ্ছিন্ন ধারা।
নীড়ের মায়ায় তোমার ও মন
কখনো হয়না হারা?
গেছে সে অনেক কাল—
রিক্ত সন্ধ্যা, উষার কনক জাল।
অনেক ব্যথা যে হেলো লালফুল
আলো ছায়া রোদ্দুরে।
নীলপাখা মেলে দূরে
উদাসীন তুমি ভেসে ভেসে চল ক্লান্ত দিগম্বরে।
রোদ-সায়রে 'ন্যাভস্-নীল' চোখ,
রোদ-সাগরে গুঞ্জ তোমার কাণে;
রোদ-সায়রে স্নেহ অনাবিল ভাসে,
স্মৃতি রামধনু ঘোরে ফেরে চারপাশে।
নীল পাখি!
হোলো কত না সকাল সারা;
কত রাঙা-উষা মনের বাগানে কত ফুল মাতোয়ারা।
আমায় ভেবে কি তোমার ও মন
কখন হয়না হারা?

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

কালাপাহাড়কেও আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু হরিপদ বাবু ভালোরূপেই চিনতো। কলিকাতার স্থানীয় কুস্তী ক্লাবগুলিতে একজন পলোয়ান বলে তার নাম-ডাক ছিল। তবে আমাদের এই কালাপাহাড় কলিকাতার সেই কালাপাহাড় কি না, তাতে আমার সন্দেহ ছিল। দেওঘরে আমাদের অগণিত নূতন বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে মধুপুরে যাবার জন্য ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছি। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মধুপুর থানার অফিসার-ইন্‌চার্জ্জ এস, রায়। তিনি পরে বিহার গভর্ণমেণ্টের এ, আই, জির পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। এ ছাড়া তিনি সর্ব্বতোভাবে আমাদের এই কালাপাহাড়কে গ্রেপ্তার করতে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রী এস, রায় দেওঘর কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। এই জন্য তাঁর আগ্রহাতিশয্যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা তাঁর সঙ্গে রাত আটটার গাড়ীতে মধুপুর রওনা হয়ে গেলাম। আমরা গালগল্প করতে করতে মধুপুর থানার নিকট বড় রাস্তার উপর এসেছি; এমন সময় হরিপদ এক ব্যক্তির দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, অ-ওই তো কালাপাহাড়। আমরা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম, মসীবর্ণ, স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী, কাপড় ও ফতুয়া পরা এক ব্যক্তি, আমাদের দেখা মাত্র সে পথের পাশ হতে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের দিকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই সময় আমরা আরও জোরে চীৎকার করা মাত্র সে বিরাট বৃক্ষের সারির পিছনে ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই সময় সেখানে দাশুবাবু নামে এক শক্তিমান স্থানীয় বাঙ্গালী প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। এই মহা সাহসী ভদ্রলোকের সহিত রায় বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। আমরা চার জনে মিলে কালাপাহাড়ের জন্য এদিক ওদিক বহু খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও আর একটুখানির জন্য তাকে আমরা দেখতে পেলাম না। প্রায় চার পাঁচ দিন তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য আমরা মধুপুরে ছিলাম। কিন্তু কোথায়ও তাকে আমরা আর দেখতে পাইনি। এর পর আর এখানে কালবিলম্ব না করে আমরা কলিকাতায় রওনা হয়ে গেলাম। কলিকাতায় পৌঁছে প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমরা থানায় পৌঁছে দেখলাম যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, দেওঘর ত্যাগ করার পূর্ব্বে আমরা ইনেস্‌পেক্টার সুনীল রায়কে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম—"খোকা এরেসটেড নো ক্যাসুয়েলটী"। এ ছাড়া মধুপুর থেকেও আমরা কোলকাতায় রওনা হলাম বলে একটা তার পাঠিয়েছিলাম। থানায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, সেখানে আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য বহু নাগরিক অপেক্ষা করছেন। এঁদের মধ্যে কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, ৺কর্ম্মযোগী রায়, ৺উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও ছিলেন। এঁরা আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং থানার সন্নিকটে বসবাস করতেন। এ ছাড়া শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ডাঃ পশুপতি ভট্টচার্য্য এবং ৺ভবতোষ ঘটক টেলিফোনে আমাকে এ সম্বন্ধে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রাত্রের দিকে অন্যান্য নাগরিকদের সহিত বহু রূপজীবিনীও বিভিন্ন স্থান হতে থানায় এসে খোকাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে গিয়েছিল। তাদের সকলেরই মুখে সেই একই কথা—এক নম্বরের পাবলিক এনিমি তাহলে এতো দিনে ধরা পড়লো। এদের কেউ কেউ আমাদের সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িতও করেছিল। কিন্তু এতো অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ সত্বেও সব ভুলে আবার আমাদের খুনের তদন্তে আত্মনিয়োগ করতে হলো। এই সময় ডাইরী পাতাগুলি ঘেঁটে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখনোও তদন্তের ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটী কাজ বাকি। আমাদের অবর্ত্তমানে ইনেস্‌পেক্টার সুনীল বাবু কয়েকজন দরিদ্র বিধবা ও অনুরূপ কয়েকটী দুঃস্থ ভদ্র পরিবারকে খুঁজে বার করেছিলেন। খোকাবাবু এই সব দরিদ্র পরিবারগুলিকে মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। এঁদের কাউর কাউর কন্যার বিবাহে খোকাবাবু নগদ টাকা ও বহু অলঙ্কার যৌতুক দিয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই ঐ সকল গহনা চোরাই গহনা বলে সন্দেহ করে আটক করেছেন। এ ছাড়া খোকাবাবুর কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে ও তার দেওঘরের ডেরা তল্লাস করে বহু অলঙ্কার পাওয়া গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হলো, বিভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন সিঁদেল চুরির নথী-পত্র হতে ঐ সকল চুরির ফরিয়াদীদের খুঁজে বাহির করা এবং ঐ সকল চোরাই গহনার মালিকদের দ্বারা সেইগুলি সনাক্ত করানো। এই জন্য আমাদের থানার জুনিয়ার অফিসারদের রুমের কয়েকটি টেবিল একত্রিত করে তার উপর এই সকল গহনাগুলি পর পর সাজিয়ে রেখে আমরা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম। সকাল-সন্ধ্যায় বহু মামলার ফরিয়াদীরা একে একে এইগুলি ভালো করে দেখে তাদের আপন আপন দ্রব্য ব'লে সনাক্ত করে গেলেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেরামতির দাগ সহ ওজন প্যাটার্ণ হতে তাঁরা এইরূপ সনাক্তি করণের কার্য্য সমাধা করতে পেরেছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্যাকরারা এসে উহাদের কয়েকটি গহনা নিজেদের তৈরী বলে দাবী করে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, এক এক জনের কাজের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। সাধারণ মানুষের চক্ষে এই সকল সুক্ষ্ম প্রভেদ ধরা না পড়লেও কারিগরদের হাতে তা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এ ছাড়া এমন অনেক খিঁচখাঁচ এখানে ওখানে থাকে

যা থেকে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজের নিজের দ্রব্য সহজেই চিনে নিতে পারে। এ ছাড়া কয়েকটি গোল্ড ক্যাপড ফাউন্টেন পেনের জন্ত আমরা দ্রব্য সনাক্তি করণেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। চোরাই দুইটি ফাউনটেন পেনের সহিত হুবাহু অনুরূপ সাত আটটা কলম বার হতে এনে সেগুলির সহিত একত্রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে আমরা চোরাই ফাউনটেন পেনের মালিকদের তাদের আপন আপন কলম অতোগুলো অনুরূপ কলমের মধ্য হতে বেছে নিতে বলি। আশ্চর্য্যের বিষয়, তারা তাদের নিজেদের কলম দুইটী অতোগুলো কলমের মধ্যে হতে অতি সহজেই বেছে নিতে পেরেছিল। এই ভাবে সনাক্ত করণের দ্বারা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে আমরা বিরানব্বইটি সিঁদেল চুরির মামলাও খোকাবাবুর বিরুদ্ধে রুজু করে কোর্টে বিচারের জন্ত অভিযোগ পত্র বা চালান পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই কয়টি মামলা ছাড়া পাগলা হত্যা মামলা এবং শিউচরণ হত্যা মামলা সম্পর্কেও আমাদের তাকে কলিকাতায় আনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই জন্ত নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের মারফত বিহার হাইকোর্টের মাধ্যমে খোকাকে কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা করে আমি কলিকাতা প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামী কেষ্টোর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত অনুমতি চাইলাম। চীফ্-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ক্রমে জেলে আসামীর সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে, সে এখোন ভিন্ন প্রকারের মানুষ হয়ে গিয়েছে। জেল-হাজতে বসেই সে খোকার গ্রেপ্তারের বার্ত্তা পেয়ে গিয়েছিল। আমার নিকট এই সময় সে পূর্ব্বাপর সকল তথ্য প্রকাশ করে কুমারটুলী অঞ্চলের যে সরু গলিটায় দেওয়ালের খাঁজে খোকার পরিত্যক্ত রক্তমাখা জুতা ও রুমাল খোকা গুজে রেখেছিল, সেই স্থানটি সে আমাকে এইবার দেখিয়ে দিতে রাজী হলো। আমি পরদিন তাকে কলিকাতা শহরের প্রধান হাকিমের অনুমতি ক্রমে পুলিশ-হেপাজতিতে নিয়ে সেইখানে এলে সে খুশী মনেই সেইখানকার ভাঙ্গা দেওয়ালের ভিতরকার একটি গহ্বর হতে খোকার রক্তমাখা জুতা দুইটি দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে বার করে দিয়েছিল। পাগলার দেহ হতে কাটা মুণ্ডটা গঙ্গার জলে ফেলে ফিরে আসবার সময় তার পায়ের এই জুতো দুটো রক্তে ভিজে যায়। এইজন্য খোকা ওদুটো ঐ দেয়ালের গর্ত্তের মধ্যে গুজে রেখে শুধুপায়ে তার কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। যাইহোক, কেষ্টোর এই শেষ বিবৃতি অনুযায়ী আমরা এই জুতা দুটি সরকারী রক্তপরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই সম্পর্কে রক্ত পরীক্ষকের মন্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"জুতা দুইটির উপর রক্ত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বহুদিনের ব্যাবধানে উহাদের কণিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায়, উহা মনুষ্য রক্ত কিনা তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়।"

এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, উপরোক্ত মন্তব্যে রক্ত-পরীক্ষক উহা যে মনুষ্য রক্ত নয়, তা'ও বলেননি। এই জন্ত পারিবেশিক প্রমাণের ক্ষেত্রে উহার মূল্য ছিল অসামান্ত। তবে এই জুতা দুইটি যে খোকার তা সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, আমরা দেওঘরে খোকার পা' হতে তার জুতা জোড়াটি গ্রহণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। তা না হলে উভয় জুতা তুলনা করে প্রমাণ করা যেতো যে, উভয় জুতা জোড়াটিই খোকার। রক্তমাখা জুতাটি কেটে ওদের শুখতলার উপর হতে খোকার পায়ের ছাপ হয়তো সংগ্রহ করা যেতো। কিন্তু সুনীলবাবু এইভাবে জুতাটি নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে আদালত-কক্ষে জুরীদের সামনে খোকার পায়ে তার ঐ জুতা পরিয়ে তা পায়ে ফিট্ করিয়ে দিয়ে প্রমাণ করা যাবে ঐ দুটো খোকারই জুতো। এদিকে কেষ্টো আসামী বিধায় তাকে এ বিষয় সাক্ষীরূপে ডাকা যাবে না।" নানাদিক বিবেচনা করে আমরা জুতো জোড়াটা খোকার দয়িতা মলিনা সুন্দরীকে একবার দেখানো উচিৎ মনে করলাম। তাহাকে এই জুতা জোড়াটা দেখানোর পর সে এই সম্বন্ধে একটি নূতন বিবৃতি দিয়েছিল। এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিধায় নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"কিছুকাল আগে নানা অপরাধ ও খুনখারাপি করার জন্ত খোকার মনে একটু অনুতাপ এসেছিল। সে প্রায়ই অভিযোগ করে বলতো যে, তার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এর পর একদিন সে আমাকে নিয়ে পুরীর জগন্নাথধামে কয়েকদিন কাটিয়ে আসবার জন্ত প্রস্তাব করেছিল। আমি এতে মত দিলে সে আমাকে নিয়ে পুরী শহরের সমুদ্রধারে বাসাভাড়া করে কয়েকদিন বসবাস করে। এই সময় ঐ শহরের একটি জুতার দোকানে পায়ের মাপ দিয়ে সে ঐ জুতা জোড়াটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। বহুদিন সে এই জুতা জোড়া পরে আমার বাড়ীতে এসেছে। এইজন্ত এই জুতা জোড়াটি খোকার ব'লে আমি নিঃসন্দেহরূপে সনাক্ত করতে পারছি।"

মলিনার এই বিবৃতি অনুযায়ী সেইদিনই মলিনা প্রদত্ত ঠিকানা ও ঐ জুতাসহ আমরা একজন অফিসারকে পুরী শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের সেই অফিসারটি পুরীতে সেই দোকানদারকে খুঁজে বার করে তাকে এ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র সে উহা তার নিজের তৈরী ব'লে সনাক্ত করেছিল। এছাড়া তার দোকানের অর্ডার-বই হতে তারিখ সহ প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, খোকা ঐ দিনে তার পায়ের মাপ দিয়ে ঐ জুতা তৈরী করার জন্ত তাকে অর্ডার দিয়েছিল। এরপর যে বাড়ীটা খোকা সেখানে ভাড়া নিয়েছিল, তার বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের অফিসার বুঝতে পেরেছিল যে, খোকা সত্য সত্যই ঐ সময় কয়দিন পুরীতে কাটিয়ে গিয়েছে।

এরপর আরও কয়েকদিন সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্ত এখানে ওখানে ঘুরাঘুরি করার পর আমরা এই হত্যা মামলার ডাইরীর পাতা খুলে আসামী কেষ্টো বাবুর পূর্ব্বতন বিবৃতিটি পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে দেখলাম। এই বিবৃতিতে কেষ্টো বলেছিল যে, পাগলাকে ট্যাক্সিতে করে ধরে নিয়ে যাবার সময় সে গরাণহাটায় মন্দিরের সামনে চেঁচিয়ে উঠে। এই সময় সত্য গোয়ালা ও হারু গোঁসাই নামক দুই ব্যক্তি তাদের দিকে ছুটে এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এ ছাড়া সে আরও বলেছিল যে, তারা যখন পাগলাকে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন গৌরীয়া নামে এক পুরাণো চোর চোরাই মালের আশায় তাদের সঙ্গ নিয়ে পরে খুনের ব্যাপার বুঝে সরে পড়ে। গৌরীয়ার এই অপরাধের জন্ত খোকা

কয়েকদিন বাদে শেওড়াফুলিতে গৌরীরার রক্ষিতার বাড়ীতে এসে তাকে মারধর করে এসেছিল। এ ছাড়া কেষ্টো এই কথাও বলেছিল যে, খোকা কাটা মুণ্ডটা জলে ফেলে উপরে উঠবার সময় তার সঙ্গে পিতার বন্ধু সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। এই সময় তিনি একটি কুকুর সঙ্গে করে গঙ্গার ঘাটের সোপানে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন। খোকাকে কি একটা জলে ফেলে দিতে দেখে তিনি সেই সম্বন্ধে খোকাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। খোকা তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল যে, সে সেখানে একটা মরা বেড়াল ফেলে দিয়েছে। এরপর কেষ্টো বাবু আরও বলেছিল যে, জামা কাপড় ছাড়বার পর কৃপানাথ লেনের বাড়ী থেকে বার হয়ে আসবার সময় তাদের বন্ধু দেবেন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। এই সময় দেবেন বাবু খোকাদের বাটীর রোয়াকে বসে হাওয়া খাচ্ছিল।

আমরা এর পর এই কেষ্টোর বিবৃতি অনুযায়ী প্রতিটি সাক্ষীকে খুঁজে বার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিলাম যে, কেষ্টো এই খুন সম্বন্ধে একটি যথার্থ সত্য বিবৃতি আমাদের কাছে দিয়েছে। এর পর আমরা শেওড়াফুলিতে গিয়ে গৌরীরার স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গৌরীয়াকে খুঁজে বার করেছিলাম। সেখানকার মেয়েরা খোকাকে ভালো রূপেই চিনতো। তারা সাক্ষ্য দিল যে, সত্য সত্যই খোকা সেখানে গিয়ে গৌরীয়াকে মারধোর করে গিয়েছে। এ ছাড়া গৌরীয়া নিজেও কেষ্টোর বিবৃতি অনুযায়ী একটি বিবৃতি দিয়েছিল। এই সম্বন্ধে গৌরীয়াকে আমি কয়েকটি প্রশ্নও করেছিলাম। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—তুমি খোকা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে অতদূর গিয়েও পরে সরে পড়েছিলে কেন? তুমি কি খুনে নও? তুমি কি শুধু চুরি করো?

উঃ—আজ্ঞে না। আমি খুনিও নয় কিংবা চোরও নয়। আমি গঙ্গা পার হয়ে তাদের সঙ্গ নিয়েছিলাম চোরাই মালের আশায়। খুনখারাপীতে আমাদের বড়ো ভয়। এর কারণ, আমি জানতাম যে, এরা খুনের সঙ্গে দস্যুতাও করে। ওরা পাগলাকে ট্যাপ করতে যাচ্ছে শুনে আমি ভয়ে সরে পড়েছিলাম।

প্রঃ—তোমার কি মনে আছে যে, কতো রাত্রে ওদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে তোমার দেখা হয়েছিল? কোন মাস বা তারিখ সেদিন ছিল, তা মনে করে বলতে চেষ্টা করো। ঐ সময়কার অন্ত কোনও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি এই ঘটনার তারিখ ও সময় ও মাস বলবার চেষ্টা করো।

উঃ—ঘটনার মাস বা তারিখ আমার মনে নেই। তবে গঙ্গা পার হবার রাত্রের ঐ সময়টাতে পূর্ণো চাঁদ উঠেছিল। এর আগের দিন হাওড়ার ঘাটে ওখানকার রঘুনাথ গুণ্ডা ধরা পড়েছিল। ওখানকার থানার নথিপত্র হতে তারিখটা আপনি জেনে নিতে পারেন।

গৌরীয়ার এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে আমি একটা বর্ষ-পঞ্জিকা আনিয়ে নিলাম। এই পঞ্জিকা হতে জানতে পারলাম যে, খুনের রাত্রি পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। এই থেকে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের কাছে গৌরীয়া সত্য কথাই বলেছে। এরপর এই পঞ্জিকাটি আমি বিচারের সময় আদালতে পেশ করার জন্তে উহাকে প্রদর্শনী-দ্রব্যের তালিকাভুক্ত করে নিলাম। এই পঞ্জিকা অনুধাবন করে জজ ও জুরীরাও গৌরীয়ার এই বিবৃতি সত্য বলে মেনে নেবেন বুঝেই আমি পঞ্জিকাটি বিশেষরূপে সংরক্ষণ করি। [ক্রমশঃ।

রুদ্র বৈশাখ

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

অসহ এ সূর্যের শ্রান্তিঘন তির্যক প্রহার
চাবুকে আহত করে ; গলে গলে ঝ'রে পড়ে অগ্নি-গ্রেসিয়ার,
বৈশাখ তোমার বুকে।
যদি এতো ছিল তেজ
হে বৈশাখ তোমার বুকে, তবে কেন হে আশ্চর্য দিন
এই মৃত্যু-জীর্ণ ক্লান্ত কলকাতার নারকীয় শব
যেথা ক্রুর প্রেতাত্মা প্রহরে প্রহরে ঢালে বিষ—
মুহূর্তে ভস্ম করো, লগ্ন তাই কিরণোৎসবে
এই ক্ষণে ;
তাই অহর্নিশ
বিষাক্ত বাষ্পের কান্না থরে থরে কুয়াশার মায়া
নিয়ত যন্ত্রণা দেয়, অসহ এ যখন যন্ত্রণা
গর্ভে ধরি ; মুক্তি দাও, মুক্ত করো হে দক্ষিণী হাওয়া
কলকাতার এই বুকে একটু আনো নীলাঞ্জনছায়া,
ক্লান্ত আমি বৈশাখের শ্রান্তি-ঘন কিরণ-প্রহারে।

(যদি এমনই চাবুকে আহত করবেই তবে
বলো নি কেন, তাহলে মনের অশুভ প্রদীপ
যে জলে আমাকে জ্বালালো কেবল তাকে মুহূর্তে
মুক্ত করেই নিতাম মুক্তি, সে তবে পুড়তে
ব্যস্ত থাকতো, তবে বৈশাখী কিরণোৎসবে
ব্যর্থ হতো না যাতনার এই বহ্নি-দীপ।)

অসহ এই সূর্যের ঢেউ, সূর্যের ঢেউ
এখনো মেটেনি তৃষ্ণা, হায় রে, বৈশাখ তোর,
দ্বিপ্রহরের এই কাল হতে আমাকে কেউ
মুক্তি দিবি কি আষাঢ়ে-শ্রাবণে, কই জিজে তোর।
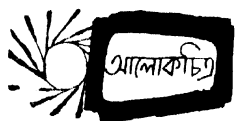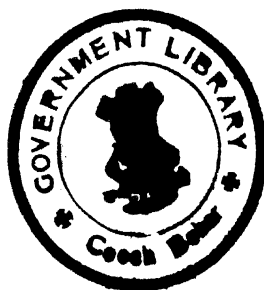
—পুষ্পরাণী পাল

—নিমাইরঞ্জন গুহ

খো
কা
খু
কু

—রাধা কান্ত বসু

—পুরবী ঘোষ

রাজস্থানী —নীরোদ রায়

খেলার সাথী —বিভাস মিত্র

স্থাপত্যশিল্প —জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
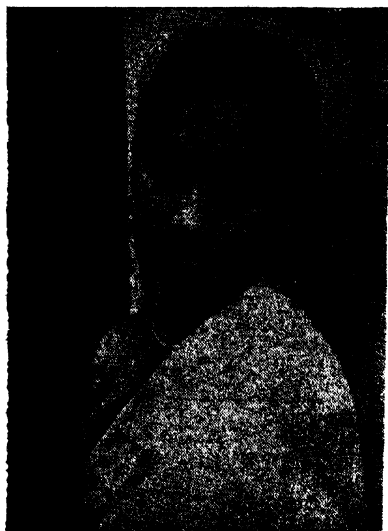
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

সতেরো

১৯শে জুলাই, ১৮৫৭। বিঠুরের আকাশ লাল করে আগুন উঠছে। নানাসাহেবের প্রাসাদে অতিথি হয়ে এসেছে মেজর ষ্টিকেনসনের বিজয়ী ব্রিগেড।

সম্মানিত অতিথিদের সাদর সম্বর্ধনা জানাতে আজ কেউ নেই। নানাসাহেব পলাতক। সতীচৌড়া ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় নায়ক সুদর্শন আজিমুল্লা খানের অভ্যর্থনার হাসিতে স্মিত উজ্জ্বল মুখখানাও অনুপস্থিত।

দাঁড়িয়ে আছে শুধু পরিত্যক্ত প্রাসাদ। দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তির নীরব সাক্ষী হয়ে।

বীরপ্রেমিক প্রথম বাজীরাও, ন্যায়পরায়ণ মাধব রাও, কটহৃদয় রঘুনাথ রাও এবং তাঁদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার স্মৃতি ও ঐতিহ্য আজ বিদেশী সৈন্যের হাতে বিপন্ন। বহু যুদ্ধ ও গৌরবের স্মৃতিবিজড়িত কারুকার্যখচিত কামানগুলি বহিরঙ্গনে অপেক্ষা করছে তাদের শেষ পরিণতির জন্য। দেওয়ালে সারি সারি ঢাল, কোনটি বা নাগারা ও চামরচিহ্নিত, কোনটিতে বা সিন্ধিয়ার সূর্য ও নাগের চিহ্ন দেখা যায়, আগুনের আভায় তারা একবার ঝলকে উঠছে, আবার ম্লান হয়ে যাচ্ছে আঁধারে।

দূরে জ্বলছে আজিমুল্লার প্রাসাদ। তার আলো এখানেও এসে পড়ছে। ঘরে ঘরে ধ্বংস ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত ইংরাজ ও শিখ সিপাহীরা মশাল হাতে অগ্নিসংস্কার করছে আসবাবে—মূল্যবান চন্দনকাঠের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে—শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ার একটা সুবিশাল অজগর কুণ্ডলী খুলতে খুলতে এ-ঘর থেকে ও-ঘর তাদের অনুসরণ করছে। তবে সে অজগরের গর্জন শোনা যায় না। নিঃশব্দ তার গতি। উল্লাসের চীৎকার ওঠে শুধু সৈন্যদের কণ্ঠ থেকে। সৈন্যরা জেনেছে নানাসাহেব এক অতুল ধনভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে গেছেন। তবু যা পড়ে আছে, তার পরিমাণও নগণ্য নয়। ব্রিগেডিয়ার ও ক্যাপ্টেনদের মনে আছে, একদিন এই সব হলঘরে বসে তাঁদের কত উৎসবসন্ধ্যা কেটেছে। সোনার আতরদান, গোলাপপাশ, ট্রে ও ফর্সীর কথা তাঁদের মনে পড়ে। তাঁরা উন্মত্ত হয়ে খুঁজে বেড়ান ঘর থেকে ঘরে।

হলঘরগুলির দেওয়াল মোড়া বড় বড় আয়নায়। মাথার ওপরে পাঁচশো ও হাজারবাতির স্ফটিকের দীপাধার দুলতে থাকে। অভ্রের কুচি দেওয়া জরির মালা দোলে সাথে সাথে। তাতে আগুনের আভা পড়ে মণিমুক্তার বিভ্রম রচনা করে। আয়নার পিতলের ফ্রেমকে মনে হয় সোনা। সৈন্যরা স্বর্ণতৃষায় অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায়। মদ না খেয়েই মত্ত তাদের গতি। সুরার চেয়ে অনেক বড় নেশায় তারা উন্মত্ত, অস্থির।

চন্দন ও মেহগনির সোফা ও কৌচের ভাঁজে ভাঁজে না জানি পলায়নকালে পুরবাসীরা কত কি রেখে গিয়েছে। রেশম ও কিংখাবের আস্তরণ সৈন্যরা তরোয়াল দিয়ে চিরে কেঁড়ে ফেলে। কখনো কিছু মেলে, কখনো মেলে না। রেশমের নরম তাকিয়াগুলি ফুটো করে দেখে তারা। তুলো আর পালক ঝরঝর উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

সহসা উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে একজন। পেয়েছে সে। সোফার ভাঁজ থেকে পেয়েছে একটি রেশমের থলি। স্বর্ণমুদ্রার লোভনীয় নিক্বণ তাতে বেজে উঠছে। একহাতে থলি, ও অন্যহাতে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সে ছুটতে ছুটতে আসে। আর এক বৃদ্ধ শিখ, রক্তাক্ত তার চোখ স্খলিত তার পদক্ষেপ, কৃপাণের খোঁচা দেয় সে থলিতে।

ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়ে মোহর। উপুড় হয়ে তার ওপরে পড়ে অন্যরা।

নর্তকীরা আজ পেশোয়াজ ও ঘাঘরার বিভ্রম রচনা করে নগ্ন পায়ে নূপুর বাজিয়ে অতিথিদের প্রলুব্ধ করছে না। তাই কি! তাদের পায়ে নূপুর যে সুর তুলতে পারেনি—সেই অপরূপ ঝঙ্কার আজ বার বার বেজে বেজে উঠছে। স্ফটিকের দীপাধারে গুলী করতে করতে চলেছে অফিসাররা। অতি সূক্ষ্ম সুন্দর কাজকরা সে ভিনিসীয় কাচের আধার, একটি গোলাপের মতো যার রক্তিম আভা, গোলাপের পাঁপড়ির মতো-ই যার কাচ পাতলা, গোলাপের বুকের রক্ত যেমন গাঢ় গোলাপী, এবং ধীরে ধীরে সে রক্ত যেমন পাঁপড়ি থেকে পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে—এই দীপাধারের মধ্যের ঝাড়টি-ও তেমনই গোলাপী, এবং তার বাইরের দীপগুলির রক্ত-ও তেমনই একটু একটু করে ফিকে হয়ে এসেছে। গুলীর আঘাতে এইসব দুর্মূল্য দীপাধার ঝনঝন করে ভেঙে পড়ছে। তার কাচে কাচে লেগে শব্দ উঠছে নূপুরের মোহ বিস্তার করে। আর দুর্মূল্য ইতালীয় গালিচার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে সে শব্দ ডুবে যাচ্ছে এক বোবাকান্নার নিঃশব্দে।

পানপাত্র রাখবার স্ফটিকের টেবিল তুলে আয়নাগুলির বুকে আছাড় মারে কেউ। দেওয়াল আয়নায় ঢাকা। তাও এই লুণ্ঠনকারীদের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে বিভ্রম জাগায় বুঝি বা এরা সংখ্যায় অগণন।

আর এক কথা থেকে চীৎকার ওঠে সমবেত কণ্ঠে। সে উল্লাসধ্বনি যেন থামতে চায় না।

ইংরেজসৈন্সরা নানাসাহেবের বহুখ্যাত, বহুশ্রুত পানাগারের সন্ধান পেয়েছে।

পেশোয়াশাহীর দাবী অস্বীকৃত হবার পরে-ও নানাসাহেবের বিশ্বাস ছিল কোম্পানী সরকারকে তিনি রাজী করাতে পারবেন। ফিরে পাবেন তাঁর বৃত্তি।

তাই, একদিন, কানপুরের ইংরেজ গ্যারিসনের অভ্যর্থনার জন্ম মহামূল্যবান পানীয় সংগ্রহ করে সাজিয়েছিলেন তাঁর পানাগার।

দেওয়ালের গায়ে সারি সারি আলমারী। তাতে ফরাসী, ইতালীয় ও বিলিতী মদের বোতল। ইতালী ও স্পেনের দ্রাক্ষাকুঞ্জের ভূমধ্যসাগরের বাতাস ও রোদের প্রসাদে পুষ্ট আঙুরের গুচ্ছ, যা একদিন সেই দেশের মেয়েরা চয়ন করেছিলো কোমল হাতে। এবং একদিন সুরাট, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বন্দরে সেই দ্রাক্ষাসবের পেটিকাগুলি ইংরেজ ওভারশিয়ারের চাবুকের সামনে নামিয়েছিলো ভারতীয় কুলীরা—সেই সব পানীয় আজ টেনে টেনে বের করে ইংরেজরা। বাইরে আগুন জ্বলছে। তার আগে ভেতরটাকে জ্বালিয়ে নেয় তারা। যত বা পান করে, তত বা ফোয়ারার মতো ঘরে ছড়ায়।

ধোঁয়ার সে অজগরটা এ-ঘরেও ঢুকেছে। তার কুণ্ডলীর পাকে পাকে বিচরমান এই পানোম্মত্তদের নরকের প্রেতসেনানী বলে ভুল হয়। দুর্মূল্য পানাধারগুলি দেওয়ালে আছড়ে ভাঙে কেউ।

আগুনটা আজিমুল্লার প্রাসাদ ছেড়ে এবার বাইরের বাগানে এসেছে। আগুন দেখে সভয়ে আর্তনাদ করে বাগানের শিকারখানার বন্দী চিতা ও হরিণ, বাঘ ও ময়ূর।

এক বিশালদেহ বারশিঙ্গা হরিণ, আগুন দেখে প্রাণভয়ে ছুটে আসে হলঘরে। দেওয়ালে দেওয়ালে, আয়নায় আয়নায় নিজের ছায়া দেখে সে বিভ্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে আয়নার ওপর। তারই দেহের চাপে, শিঙ উপড়ে আসে গোড়া থেকে। রক্ত পড়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

সৈন্সরা উল্লাসে চ্যাচাতে চ্যাচাতে তার চার পা ধরে তুলে বাইরের আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে নিয়ে চলে। ভাঙা শিঙটা মাটিতে ঘসতে ঘসতে যায়। রক্ত পড়ে ছিটকে ছিটকে। আর হরিণের যে চোখের স্তুতিতে কবিদের লেখনী এত মুখর, সেই চোখ শুধু অন্তিম বিস্ময়ে অবাক মানে, যে অরণ্যের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বর্বর এ কোন্ নতুন জাতের পশু?

দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, ইউক্যালিপটাস ও চন্দনের গাছ পুড়ে এবার এক অদ্ভুত গন্ধ ছড়াতে থাকে বাতাসে।

কোথায় আছে নানার সে অতুল ঐশ্বর্য? সৈন্সরা এবার ঘর থেকে ঘরে, মহল থেকে মহলে ছড়িয়ে পড়ে। দেওয়াল থেকে বড় বড় গিল্টির ফ্রেমে বাঁধাই তৈলচিত্র ভেঙে পড়ে মাটিতে। আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে চলে তারা।

থেকে থেকেই ওঠে বিজয়োল্লাস। পেয়েছে তারা। টাকা মোহর, নাচওয়ালীদের রূপার অলঙ্কার, সোনা ও রূপার বাসন।

বাইরের আস্তাবলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ওঠে আরবী ঘোড়াগুলি। একদিন অশ্বপরীক্ষার সকল শুভচিহ্ন মিলিয়ে তাদের কেনা হয়েছিলো। আজ তারা বোঝে, এই বদ্ধ আস্তাবলে তাদের পুড়ে মরতে হবে। তাদের তীব্র আর্তনাদে আকাশ চিরে যায়।

এ এক মহা দীপান্বিতা। এত উৎসব হয়েছে এ প্রাসাদে কিন্তু এমন মহাসমারোহে উৎসব কোন দিন হয় নি।

বড় বড় উট ও ঘোড়ারগাড়ী পাল্কী, মেনা ও তাঞ্জাম—যার গায়ে কত না নকশা কাটা, কত না সাজপোষাকে বাহার—সেগুলিতে আগুন লাগিয়ে মজা দেখে সৈন্সরা।

আজকের এ উৎসবে ইভান্সের-ও এক মহান্ ভূমিকা। উদ্যত তরবারি হাতে সে-ও এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটছে। লুঠ এবং মদ, দুই নেশা তাকেও মত্ত করেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই শেষ নয়। নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে হীরে জহরৎ, বহুমূল্য অলঙ্কার। খুঁজতে খুঁজতে সে ঠিকই পেয়ে যাবে। কোথায় যে আছে, সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। ইভান্স শুধু খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে সে দলছাড়া হয়ে পড়ে। এবার সে ঢোকে অন্দরের মহলে।

এ সব ঘর বুঝি বিলাসকথা হবে। বড় বড় ডিভান, সুমসৃণ মেঝে—নর্তকীদের নাচের জন্ম বুঝি এখানে গালিচা পাতা হয়নি। দেওয়ালে নগ্ননারীদের চিত্র। বিদেশী তৈলচিত্রের সে অনুকরণ দেখে ইভান্সের আজ আর কোন উত্তেজনা হয় না। স্বচ্ছন্দে সে তরোয়ালের খোঁচায় নগ্নদেহ স্নানরত সুন্দরীর স্ফীত বক্ষ ও অশ্লেষ জাগানো জঙ্ঘা চিরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন দেহ সুন্দরীর আধখানা মাটিতে পড়ে যায়, আধখানা তবু চেয়ে থাকে অধরে হাসি ও কামনা মেখে।

ইভান্স এবার একজনের পর একজনকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে চলে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না। ভেনাস ও এ্যাডোনিসের যুগ্মবিহারের ছবির পাশ থেকে এক থলি সোনার রামচান্দী মোহর মিলে যায়। অতএব ভেনাসকে ছেড়ে দেয় ইভানস। এ্যাডোনিসের আলিঙ্গন থেকে ভেনাস কামনাবিজড়িত রাঙাচোখে চেয়ে থাকেন অপরাপর ভাগ্যহীনাদের দিকে।

সহসা চমকে থেকে যায় ইভানস। ছায়ামূর্তির মতো কক্ষের গভীর থেকে এগিয়ে আসছে কে। এ কি কোন প্রেতিনী? অথবা এই সব ছবিতে জাদু পড়া ছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্ম প্রাণ পেয়ে উঠে আসছে কেউ? ইভানসের বুকের তলা থেকে অরক্যানেজে মানুষ হওয়া, ভূতপ্রেতের কুসংস্কারে ভীতু একটা ছেলের অন্ধবিশ্বাসগুলো নাড়াচাড়া দিতে থাকে।

—সাহেব! সাহেব!

খিলখিল করে নিঃশব্দে হাসছে এই রমণী। হাসতে হাসতে এগোচ্ছে ইভানসের দিকে।

ইভানস তবু চেয়ে আছে। রমণী ক্রমশঃ আরো কাছে আসে। ইভানসের বুকে হাত রেখে বলে—সাহেব!

—ওঃ!

আশ্বস্ত হয়ে একটা মস্ত নিশ্বাস ফেলে ইভানস। বলে—চম্পা!

—সাহেব।

—চম্পা তুমি এখানে?

চম্পা নিশ্চিন্ত আশ্বাসে হাসে। এমন করে হাসে, যেন এটা ধ্বংসোন্মুখ প্রাসাদের কোন ঘর নয়—ইভানস এই ধ্বংসের অন্যতম

নায়ক নয় এবং তাদের চারি পাশে এক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত পরিবেশ নেই। সবই যেন যেমন ছিল তেমনই আছে।

চম্পার কণ্ঠ থেকে এক নিশ্চিন্তায় লাবণ্য ঝরে পড়ে হাসিতে। সে বলে—বা, তুমি বলেছিলে না আসতে? তোমার কথামতোই ত' এসেছি।

—চম্পা!

—কখন এসেছি। ধনরত্ন খুঁজে তোমরা যে কাণ্ড করছো, দেখে হাসতে হাসতে আমি একেবারে···

—কি বলতে চাও চম্পা?

—সাহেব!

চম্পা এবার বুকে লেপটে আসে। একদিকের অনাবৃত উন্নত বুকটা ইভান্সের জামায় ঘসে যায়। চম্পা বলে—সাহেব, নানা সাহেবের আসল ঐশ্বর্য তোমরা কেউ পাওনি। নানাও নিয়ে যেতে পারেনি। আমি তাই দেখছিলাম।

—চম্পা!

চম্পা আরো কাছে। আরো নিঃশব্দ তার গলা। বসে বলে—সাহেব, হীরার টায়রা, মুক্তোর কণ্ঠি, পান্নার বালা, কঙ্কণ, আর হীরের আংটি. চুড়ি, হার, চন্দ্রটিকা, সে যে কত, তোমায় কি বলব! সারাদিন সেইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

—কোথায়, চম্পা?

ইভান্স চম্পার হাত চেপে ধরে। চম্পা হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে—আমার সঙ্গে এসো। আমি কি একলা সব নিয়ে যেতে পারি? দুটো বড় বড় পেটি···

—চম্পা, তুমি কি করে জানলে?

—বা, আমি নাচতাম না এখানে? মনে নেই?

চম্পা ইভান্সের হাত ধরে চলতে সুরু করে। বলে—খুব চুপি চুপি এসো। আমি আর তুমি দুইজনে সবগুলো নিয়ে—কোথায় যাব সাহেব?

—চম্পা, তোমাকে আমি বিবি বানাব।

—জানি সাহেব···তাই ত তোমার জন্তে বসে আছি। এসো।

ইভান্স চম্পাকে অনুসরণ করে। আঁধার। তবু চম্পার কোন কষ্ট হয় না। সে বলে—চল, আমার সঙ্গে চল।

ইভান্স নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেকে ছেড়ে দেয় চম্পার হাতে। সে চলতে থাকে। যার চম্পা আছে, তার ভয় কি? ইভান্সের চম্পা আছে। ইভান্সের মনে আজ চম্পার জন্তে এক নতুন অনুরাগ উছলে উছলে পড়ে।

অন্দরমহল পেরিয়ে তারা এসে পড়েছে এক চত্বরে। সে চত্বরের পর আঁধারগলি ও বারান্দা পেরিয়ে সুরু হয় রসুইশালা।

চম্পাকে এখন আঁধার দিয়ে গড়া, আঁধারেরই কোন অশরীরিণীর মতো দেখাচ্ছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই পরিবেশ। তবু ইভান্স ভয় পায় না। নিজের হাতটা পরম আশ্বাসে ছেড়ে রাখে চম্পার হাতের মুঠোয়। একবার শুধু চমকে ওঠে সে। মনে হয় পাশের বিশাল ঘরখানা থেকে তাকে লক্ষ্য করছে কারা। নীরবে, শুধু চোখ তুলে।

তারপরে ভুল ভাঙে। সেগুলি গঙ্গাজল রাখবার বড় বড় পিতল ও তামার জালা।

এবার সিঁড়ি ধরে নামে চম্পা। আবার সুরু হয়েছে সঙ্কীর্ণ গলিপথ। দুই পাশে সারি সারি ঘর। বুঝি বা চাকরদের থাকবার ঘর এগুলি। তার পরে আরো চত্বর, আবার বারান্দা, ঘর ও সিঁড়ির পুনরাবৃত্তি।

পরিসর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। চলতে চলতে দুই পাশের দেওয়ালে গা ঘেঁষে যায় ইভান্সের। চম্পা বলে—এই সব ঘর থেকে নিঃশ্বাস পাচ্ছ?

—চম্পা!

চম্পা হাসে। প্রেতের মতো নিঃশব্দে। বলে—এই সব ঘরে, হাওয়া না পেয়ে, জল না পেয়ে গুমরে গুমরে মরেছে অনেকে। তাদের কথা দুনিয়ার কেউ জানে না। কঙ্কালগুলো আজও পড়ে আছে দেওয়ালের সঙ্গে শেকলে-বাঁধা। আজ সন্ধ্যাবেলা, আমি তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পাচ্ছিলাম আমার গায়ে। তুমি পাচ্ছ না?

ইভান্সের ভয় করছে। সে বলে—আর কতদূর চম্পা?

চম্পা জবাব দেয় না সে-কথার। বলে—ওপরের দিকে চাও। আকাশ দেখতে পাচ্ছ?

ওপরে, অনেক ওপরে একটুকরো আকাশ দেখতে পাচ্ছে ইভান্স। তারায় ভরা আকাশ। চম্পা বলে—দেখে নাও। এবার আমরা মাটির নিচে যাব। পাতালে যাব। পাতাল বোঝ?

—বুঝি।

—যত হীরে-জহরৎ সব ঐখানে আছে। এসো।

ছোট ছোট সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নামছে। ইভান্স যে কত সিঁড়ি নামে, আর কতবার যে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যায়, তার হিসেব থাকে না। দেওয়ালের গা অমসৃণ, তার খাঁজে খাঁজে চটচটে ঠাণ্ডা কি লেগে আছে। চম্পা বলে—দাঁড়াও, দরজা খুলি।

শিকল টানবার শব্দ হয়। কাঠের পাল্লা টানে চম্পা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ, একটা বদ্ধবাতাস কিছুক্ষণের জন্ম ইভান্সের মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। ইভান্স নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে। ঈষৎ টলে গিয়ে হাত থেকে তরোয়ালটা গড়িয়ে পড়ে যায়।

সেই ইস্পাতের শব্দ. পাথরের ওপর ঘসে ঘসে, ঠুকে ঠুকে, কত নিচে যে নেমে যাচ্ছে, শুনে ইভান্স চম্পার দিকে তাকায়। বলে—আরো নামতে হবে?

—আর কত, দশটা সিঁড়ি।

—তরোয়ালটা কোথায় গেল?

—ও কিছু নয়, ঘরের মাঝখানে পড়েছে বোধ হয়।

—তাতেই ও রকম শব্দ হলো, চম্পা?

—ঘরের মাঝখানে একটা কুয়ো আছে।

—সে কি?

—সেই কুয়োতে বোধ হয় পড়লো তরোয়ালটা।

—চম্পা, পা রাখতে পারছি না।

—বড় পিছল। আমার হাত ধর।

শেষের ধাপ কয়টা পা হড়কে নেমে আসে ইভান্স। তারপরই অস্ফুট আর্তনাদ করে। পা তার ডুবে যায় নরম কাদায়। নরম চটচটে, আঠার মতো কাদা।

চম্পা বলে—ভয় পেও না। কাদা বেশী নেই। বেশী ডুববে না পা।

চম্পা সামনে দাঁড়িয়ে সরীসৃপের মতো নিশ্বাস ফেলে। কিছুক্ষণ কথা বলে না।

ইভান্‌সের চোখে এবার আঁধারটা সয়ে এসেছে। চম্পাকে এবার দেখা যায়। ঘরটার চারিপাশেও দেখে ইভান্‌স। কই, কোথাও ত' কোন নিশানা চোখে পড়ে না? আর কত নিচে এসেছে তারা? কম্পেক্ষ শো' ফৌজের কণ্ঠধ্বনিও পৌঁছয় না এখানে? এত নিস্তব্ধ কেন এই পরিবেশ? সত্যিই কি তারা পাতালে এসেছে? যমের রাজ্যে?

চম্পাই বা কথা কয় না কেন? ইভান্‌স বলে—চম্পা, কোথায়? বল? দেরী হয়ে যাচ্ছে না?

চম্পা আবার হাসে। বলে—দেরী? আমাদের হাতে এখন অফুরন্ত সময় ইভান্‌স! সময় এখানে থেমে রয়েছে দেখছ না? বুঝতে পারছ না?

—চম্পা, এখন হেঁয়ালী ক'রো না। বল, কোথায়?

—কি, কোথায়?

—সেই হীরে জহরৎ?

চম্পা জবাব করে না। নিচু হয়ে কি যেন শোনে। তার পর দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলে—পায়ের নিচে জল টের পাচ্ছ?

হ্যাঁ। এবার মনে হচ্ছে কাদা ছাপিয়ে যেন জলের স্পর্শও পাচ্ছে ইভান্‌স। বলে—জল···হ্যাঁ জলই ত। কিন্তু চম্পা···

চম্পা বলে—ইভানস মনকে প্রস্তুত কর। জল এখন বাড়বে।

—তার মানে?

—তার মানে আমি আর তুমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে ঘরটা মাটির অনেক নিচে। তার মানে গঙ্গার জল আসছে। জোয়ার এসেছে কি না। জায়গাটা নদীর খুব কাছে।

—তার মানে কি চম্পা?

—তার মানে তুমি আমি কোনদিনও এ ঘর ছেড়ে যাব না। এই ঘরটা ভরে যাবে গঙ্গার জলে।

—চম্পা শয়তানী!

—নাই বা মিললো হীরে জহরৎ ইভানস। আমি ত' তোমার কাছে আছি। আমাকে না তুমি ভালবাস?

—তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ চম্পা?

—নিশ্চয়। তুমি কি ভেবেছিলে নানাসাহেব এতই মূর্খ? যত হীরে জহরৎ আর গহনা—সব সে নিয়ে গেছে। তোমরা তার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছ।

—শয়তানী!

চম্পার গালে চড় মারে ইভান্‌স। সে শব্দটা ঘরটায় ঘুরে ঘুরে ডুবে যায়। চম্পা বলে—মনকে প্রস্তুত কর ইভান্‌স। যে ভগবানকে বিশ্বাস কর, তার নাম নিতে চাও ত নাও। জল উঠছে।

ইভান্‌স মরিয়া হয়ে বন্দুকের বাঁটটা দিয়ে মারতে চায় চম্পাকে। বন্দুকটা হাত ছিটকে জলে পড়ে যায়। পা তুলতে পারে না ইভান্‌স। পা কাদায় ডুবে আছে। সে আর্ত এক জন্তুর মতো ছটফটিয়ে ওঠে মিনতিতে।

—চম্পা, আমাকে বাঁচাও, আমি মরতে চাই না!

—[illegible] ইভানস। শান্ত কণ্ঠে চম্পা বলে। বলে—এ ঘরে যখনই নেমেছি আমরা, তখনই পাল্লা পড়ে গিয়েছে ওপরে। এ ঘরে যারা নামে, তারা কি ফেরে ইভান্‌স? না, তুমি আর ফিরবে না!

—চম্পা, আমাকে বাঁচাও!

চম্পাকে জড়িয়ে ধরে ইভান্‌স। চম্পা বলে—বাঁচবে কেন ইভান্‌স? তুমি যে মরবে। এখনি মরবে। জল যে হাঁটু ছাপিয়ে এল। বুঝতে পারছ না তার মানে কি?

—চম্পা!

—চন্দনকে না তুমি ভগবানপুরে ফাঁসী দিয়েছ? চন্দন কি মরতে ভয় পেয়েছিল? অমনি করে মর ইভান্‌স।

—আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই।

—তাই বললেই কি বাঁচা যায় ইভান্‌স? চন্দন বাঁচতে চেয়েছিল। আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—তাতে কি হলো?

ইভান্‌স এবার ধস্তাধস্তি করে পা-টা কাদা থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে।

চম্পা বলে—কোন লাভ নেই। চোরাস্রোতে পড়ে যাবে।

জল উঠে আসছে। জল উঠে আসছে কোমর ছাড়িয়ে বুকের দিকে—ইভান্‌স বলে—চম্পা, তুমি যা চাও তাই দেব, শুধু আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচতে দাও, চম্পা!

চম্পার কণ্ঠ এই জলের চেয়েও গভীর, আরো ঠাণ্ডা। সে বলে—আমি চন্দনকে চাই। আমি তার কাছে যাচ্ছি। কিন্তু ইভান্‌স, তুমি এমন কাপুরুষের মতো মরছ? আমার যে কষ্ট হচ্ছে ইভান্‌স! তুমি যে তোমার নরকেও ঠাঁই পাবে না।

—চম্পা!

—এমনি করে মরো।

চম্পা ইভান্‌সের হাঁটু জড়িয়ে ধরে। কাছে আসে। তারপর ইভান্‌সের শরীরটা নিয়ে সেও ভেঙে পড়ে মাটিতে।

জল ওঠে নিঃশব্দে। জল ওঠে পাক খেয়ে খেয়ে। জল ওঠে নাগিনীর প্রেমে ইভান্‌সকে পাকে পাকে জড়িয়ে।

উঠতে উঠতে জলে ভরে ফেলে ঘরটা। সিঁড়ি ছাপিয়ে দরজার দিকে চলে যায়।

তারপর আর কোন শব্দ থাকে না। শুধু থাকে জল—আর অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ দুটি নর-নারী।

* * * *

নভেম্বর—১৮৫৮। Queen's Proclamation পড়া হয় ভারতের শহরে শহরে—বিভিন্ন জনপদে। মহাশান্তি পুনর্বাসিত হয়েছে এক মহাশ্মশানে। চতুর্দিকে শ্মশানের নীরবতা। সমস্ত উত্তরভারত দগ্ধ, ধ্বংসীকৃত, শত শত মাইলব্যাপী একদিনের সমৃদ্ধ বসতি আজ জনমানবশূন্য। পুরুষদের ফাঁসী হয়েছে—নারীরা উন্মাদ ও শ্মশানচারিণী—শিশুরা অনাথ এবং পথের শিয়ালকুকুরের মুখে তারা অসহায়।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র—ক্ষমা ও শান্তির আশ্বাসে প্রসারিত দক্ষিণহাতের বরাভয় তাই পড়া হয় এক মহাশ্মশানে।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে স্বয়ং মহারাণী নিচ্ছেন

ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেসিয়ার উপনিবেশের শাসনভার। তাই—

"এই সকল সীমানাভুক্ত দেশের প্রজাপুঞ্জকে আমরা—কিন্তু বিশ্বস্ত হইতে বলিতেছি—আমাদের উত্তরাধিকারী এবং তাহাদের উত্তরাধিকারীদের প্রতি-ও তাহারা বিশ্বস্ত থাকিবে এবং আমরা যাহাদের উক্ত দেশসমূহের শাসনভার দিবার যোগ্য বিবেচনা করিব —তাহাদের আদেশ মানিতে তাহারা বাধ্য থাকিবে।

...পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির উপর ভারতের নেটিভরা কিরূপ আসক্ত ও আবদ্ধ, তাহা আমরা জানি ও তাহাদের সে অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি। আমরা তাহাদের সে বিষয়ে অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তাহার আশ্বাস দিতেছি।

...কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, তাহাদের স্বদেশবাসীকে মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত করিয়া উন্মুক্ত বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করিয়া যে দুঃখ ও অনাচার আনিয়াছে—তাহার জন্য আমরা দুঃখিত। সেই বিদ্রোহ দমনে-ই আমাদের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। যাহারা বিভ্রান্ত হইয়া ভুল করিয়াছে, অথচ এখন যাহারা কর্তব্যের পথে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছুক তাহাদের আমরা আমাদের দয়াপ্রদর্শন করিতে চাহি।

...আমাদের দয়া প্রদর্শিত হইবে সকল অপরাধীর প্রতি—শুধু যাহারা ব্রিটিশ প্রজাদের হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিল বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ও যাইবে—তাহাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শিত হইবে না। তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার হইবে।

...যখন, ভাগ্যের আশীর্বাদে আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, যে ভারতে শান্তিপূর্ণ ভাবে শিল্প বৃদ্ধি হয়, জনসাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলার্থে কার্য করা হয়, এবং আমাদের প্রজাদের উপকারার্থে সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে চলে।

...তাহাদের সমৃদ্ধিতে আমাদের শক্তি—তাহাদের সন্তোষে আমাদের নিরাপত্তা—এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতায় আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন আমাদের এবং আমাদের যাহারা শাসন কার্যে ভারপ্রাপ্ত তাহাদের, আমাদের প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলবিধানার্থে এই সকল কার্য করিতে শক্তি দেন।"

সব সমাপ্ত হলো। এক রক্তস্নানের পর ভারতের ইতিহাসে নতুন করে ব্রিটিশ শাসনের এক নতুন ইতিহাসের গোড়াপত্তন হলো এই ঘোষণাপত্রে।

* * * *

উত্তর ও মধ্যভারতের গাছ থেকে মৃতদেহ পচে পচে খসে পড়লো। গলিত রক্তমাংসের সে সারে ভিজতে ভিজতে মাটি চিন্তা করলো—এবার সে কি ফসল দেবে। তাকে উর্বরা করবার জন্য এই নতুন সার থেকে সে কি নতুন কোনো ফসল দেবে? এবার কি গম, যব, আখ, ছোলা ও অড়হরের গাছগুলি বেশী সতেজ হবে? তার শীষগুলি যখন গর্ভিনী হবে, তখন কি ফসলের দানাগুলি বেশী পুষ্ট এবং রসালো হবে? এই গম পাকলে, সোনার সঙ্গে কি এবার রক্তিম আভার আভাস পাওয়া যাবে?

সহজে জমি পাবার ভরসা, এবং প্রাথমিক কৃষিকাজ সুরু করতে, প্রাথমিক কৃষিঋণের সাহায্যের আশ্বাস—হালবলদ ও বীজ পাবার আশ্বাস—তাতেও প্রথমে চাষী পাওয়া গেল না। অবশিষ্ট চাষীরা ভয়ে দূরদূরান্তে আত্মগোপন করেছিলো। চাষীর প্রাণ তার জমি ও ঘরের সঙ্গে বত্রিশ নাড়ীতে বাঁধা—তবু তারা সাহস ক'রে ফিরে আসতে পারেনি।

তাই বলে হাজার লক্ষ বিঘা জমি অনাবাদী পড়ে থাকতে পারে না। এ যে উপনিবেশের লক্ষ্মী বাঁধা চাষের ক্ষেতে। সেখান থেকেই চাষীর চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ, দুর্ভিক্ষ ও অনাহার, জোতদার ও মহাজনের টাকা—এবং রাজকোষে রাজকর। তাই নতুন করে নরমানুষের নরাবসতি স্থাপনার প্রয়োজন হলো।

নতুন নতুন মানুষের দিন সুরু হয়েছে। জমির মালিকানা গেল যারা এই যুদ্ধে ইংরাজের সহযোগিতা করেছে, যা নিরপেক্ষ থেকেছে, সেই সব নতুন তালুকদার জোতদার ও ঠাকুর সাহেবদের হাতে।

জাগচাষীদের তারাই দূর দূর জায়গা থেকে প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এলো। কাদার গাঁথনিতে পাতা বা খড়ের চাল বসিয়ে ঘর বানাবার জন্য সাহায্য করতেও ভরসা দিলো। গ্রামগুলির নাম পুরনো রইলো—তবে নতুন মানুষ এসে বসতি করলো সেখানে।

আর ১৮৫৯ থেকে নতুন করে সুরু হলো সব। তাদের জানপ্রাণের ওপর ব্রিটিশের জীবনে-মরণে সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে যারা এলো, তারাই হলো এই নতুন দিনের মানুষ।

পুরনো দিনের সব-কিছুই চলে গেল। সেই ধীর মন্থর চালের দিন—যে দিনের ঢুলকি চালে বোঝা যেতো উট, হাতী, মোষ ও বলদের গাড়ীর চালে—তীর্থভ্রমণের খাতিরে পদব্রজে পথ চলাতে—সে দিন চলে গেল।

শিল্পী কারিগর, পণ্ডিত, মৌলভী, সেই চারু ও কারুকলার প্রকাশে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সব মানুষ—যারা ছিলো মনে প্রাণে ভারতীয় জরি ও রেশমের কাজে যাদের পারদর্শিতা ছিলো, পাথর, কাঠ, তামা বা পিতলের জিনিষে যারা অপরূপ নক্‌শা জারী করতে পারতো—চন্দেরী ও বেনারসীতে যারা ভারতের শিল্পমানসের মর্মবাণী ফোটাতে পারত—রাজারাজড়াদের প্রসাদে রুজী রোজগারের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যে সব কলাবন্ত গায়ক সুর তান দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারতো সেই সব মানুষ এবং সেই সব সময়সাপেক্ষ শিল্পকলার ওপর চোট পড়লো। তাদের কপালে পাশা উল্টে গেল। চোট পড়লো গ্রাম ও গ্রামীন সাংস্কৃতির ওপর। গ্রামের মানুষ গ্রামের কারিগরের তৈয়ারী কাপড় পরে খুশী থেকেছে—তাদের হাতে গড়া পুতুল ও দেবপ্রতিমা তাদের খেলা ও পূজার সাধ মিটিয়েছে। এখন সব জায়গায় জালের মতো সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হয়ে, তাদের জীবনের সর্বত্র প্রবেশ করলো নতুন দিনের ব্যবসার প্রতিযোগিতা। চোটটা লাগলো মর্মস্থলে। আস্তে আস্তে তারা কাজ ও রুজী হারাতে সুরু করলো এবং পরিবর্তে কিছু না পেয়ে আরো আরো নিরন্ন ও বেকারের সংখ্যা বাড়াতে সুরু করলো।

এ প্রক্রিয়া চললো ধীরে, অতি ধীরে—তবে বোঝা গেল এই ভাবে চললে শতবর্ষের মাথায় ভারতের গ্রামীন সংস্কৃতি নিঃশেষ হতে দেরী হবে না এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে সেদিন যদি সত্যিই ব্রিটিশ চলে যায় এ মহা উপনিবেশ ছেড়ে, তাকে সকল দিকে নিজস্বতা বর্জিত করে অন্তঃসারশূন্য করেই রেখে যাবে।

এ সব মানুষ এই নতুন দিনে কোন কাজেই লাগলো না। কেন না, তারা যা যা জানতো, দেখা গেল সে জীবনবোধ—দুই জাতির রক্তাক্ত সংঘর্ষের সময় তাদের বাঁচাতে পারেনি। যাদেরও ফাঁসীতে ঝুলতে হয়েছে এবং আরো অবমাননার মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

বহু দিন, বহু মাস প্রায় বৎসরাধিক ধরে—উত্তর ও মধ্যভারতের গাছের ডালে ডালে মৃতদেহ ঝুলতে লাগলো। তবে তখন আর তাদের দেখে ভয় পাবার মতো মানুষ অবশিষ্ট ছিল না।

তার পরে বৃষ্টি এলো। প্রথমে ধুলো ও শুকনো পাতা উড়িয়ে বৈশাখী বৃষ্টি—তার পর এলো বর্ষা।

বর্ষার জল পেয়ে সেই সব গাছেই নতুন তেজ সঞ্চার হলো। তারা সতেজ ও সুপুষ্ট হয়ে উঠলো।

সাকাখানার ভগ্ন বাংলোর উপান্তেও—চন্দন ও ম্যাকমোহনের প্রেমসিঞ্চিত সে বনভূমিতে বন্যগোলাপ গাছগুলি সেই বর্ষার পরের বসন্তে নতুন নতুন ফুলের গুচ্ছে ফেটে পড়লো। সে গোলাপগুলির যেগুলি লাল—তাদের রঙ সমস্ত ১৮৫৭-৫৮র সমগ্র রক্তপাতের চেয়ে অনেক বেশী লাল এবং দীর্ঘস্থায়ী—সে গোলাপগুলির যেগুলি শাদা তাদের শুভ্রতা, ১৮৫৭-৫৮র মৃতদেহগুলির হাড়ের চেয়ে অনেক বেশী শাদা। এবং সেই লাল ও শাদা ফুলের মুঞ্জরিত সুষমার অবদানও অনেক চিরন্তন। কেননা, সেই সব ফুল থেকে মধু পান করে উড়ে গিয়ে মৌমাছি ও ছোটপাখীর ঝাঁক নিজেদের সঙ্গিনীদের মধ্যে আর এক ভবিষ্যৎ পুরুষ সৃষ্টি করলো। সেই সব বিহঙ্গীর জঠরে যে সন্তান এলো, তারাও আবার 'আর এক মৌসুমে এমনি করেই এই সব ফুলের রক্তরাগ ও শুভ্রতা 'থেকে প্রাণসঞ্চয় করে আর এক উত্তরপুরুষ সৃষ্টির কাজে সযত্নে ব্রতী হবে। এমনি করে এই সব ফুলগুলি ক্ষণস্থায়ী হয়েও চিরন্তন জীবনসৃষ্টির কাজে প্রকৃতিকে সাহায্য করলো।

* * * *

ভেরাপুরে সেঙ্গার নদীর তীরে, চন্দন ও চম্পার স্মৃতিসিঞ্চিত সে বটগাছ, দীর্ঘদিন ধরে মৃতদেহগুলির পচমান গন্ধে অশুচি বোধ করে ম্রিয়মাণ হয়ে রইলো।

তারপর, মৃত্যুর নিষ্ফল প্রয়াসের ওপর জীবনের জয় যে সত্য এই কথা পুনর্বার মনে হলো তার দুইটি বর্ষার ঋতু শেষ হলে। তখন সে গভীর তৃষ্ণায় মাটির নিচে তার নতুন নতুন শিকড় চালিয়ে দিলো এবং সূর্যের দিকে অসীম আগ্রহে কিছু নতুন ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর গন্ধ ছাড়িয়ে ওপর দিকে মাথা তুললো। এই ভাবে সে মাটির গভীর থেকে প্রাণরস এবং সূর্য থেকে উত্তাপ ও শক্তি আহরণ করতে চাইল। এবং এই ভাবে, উত্তাপ ও রস আহরণ করে সে গত যুদ্ধের সে বিভীষিকা বিস্মৃত হতে চাইলো। সে এমন পরিপূর্ণ এবং জীবনপ্রেমী ভাবে বাঁচতে চাইলো, যাতে তার এই ভয়ঙ্কর নরকের দুঃস্বপ্নের কথা মনে না থাকে। সে ভুলতে চাইলো, দুইটি পরস্পর-বিদ্বেষী জাতির পরস্পরকে না জানবার ও না বুঝবার জন্ত এই নির্বোধ সংঘর্ষের কথা—এবং সে বাঁচতে চাইলো সেই দিনের জন্ত, যখন এই নির্বোধ রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা গল্পকথা হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ করে নয়, হত্যা করে নয়—পরস্পরকে জানবার বুঝবার ও ভালোবাসবার তাগিদে পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পরের অন্তরের আরো কাছাকাছি আসবে। হয় তো সেদিন সুদূর—তবু—বটগাছটা জানলো, যে তার শিকড়, ঝুরি ও ডালপালা পাতার মধ্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য আছে।

গাছটা এই সব কথা ভাবতে যত দিন ব্যস্ত থাকলো, তার মধ্যেই শীত পড়লো। উত্তরদেশ থেকে মৌসুমী পাখীরা উড়ে এসে তার ডালে বসে নিশ্চিন্তে নীড় রচনায় ও সঙ্গিনীর দেহের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শীতের টানে নদীতে জল শুকোলে—ওপারের বন থেকে হরিণ ও হরিণী এসে নিশ্চিন্তে তার গোড়া থেকে সতেজ ঘাস খেতে ব্যাপৃত হলো। বহুদূর ও একান্ত নিকট থেকে আরো পাখী এলো—কাঠবিড়ালীরা ত্রস্তভাবে বটফল আহরণ করে শীতের সঞ্চয়ে ব্যস্ত হলো—গাছের গোড়ার গর্তে এবারও একজোড়া গোখরো সাপকে দেখা গেল, বোঝা গেল শীতকালটা তারা ঐ গর্তের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।

এমনি করে চারিদিকে শুধু জীবন সৃজন এবং বাঁচবার কাজই চললো। মৃত্যুর গন্ধ সে পরিবেশ থেকে তখনই কেটে যাচ্ছে। জীর্ণ হয়ে খসে যাচ্ছে মৃত্যুর প্রভাব।

সমাপ্ত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

নয়

পরের দিন ভোরবেলা চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল—কে যেন তীব্র কশাঘাত করল মনের উপরে। ঘুম ভেঙ্গে, কি যে হল—দু এক মিনিট কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। সহসা মনে পড়ল মার্লিন! মার্লিন মিথ্যাবাদিনী? মার্লিন অবিশ্বাসিনী?

একবার পাশে চেয়ে দেখলাম মার্লিন চিৎ হয়ে চুপ করে শুয়ে আছে, চোখ দুটি খোলা, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছাদের দিকে নিজের ভাবে তন্ময়। চোখ ফিরিয়ে নিলাম—চাইতে ইচ্ছে করল না।

ক্রমে মন জুড়ে বসল ভায়লেটের কথাগুলি—আপনি আমাদের দেশের মেয়েচরিত্র কিছুই বোঝেন না, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অন্য প্রেমিক থাকা স্বাভাবিক—স্ত্রী যদি সুন্দরী হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। ভায়লেটকে কি ভগবান পাঠিয়েছেন আমার চোখ খুলে দেওয়ার জন্য? সত্যিই কি আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম?

যখন অসহ্য হল, তখন মনকে নানা দিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। জীবনে মার্লিনের প্রেম নিবেদনের নানা মধুর রূপ বারে বারে কল্পনা করে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। মার্লিনের নানা কথা একে একে মনে হতে লাগল। এইত সেই দিনও বলেছে—বিকো! বিকো! তুমিই যে আমার একান্ত আশ্রয়, তাই আমাকে ভুল বুঝ না। 'লু'র কথা মনে হল। প্রেমের কথার আলোচনায় বলেছিল—আমি তা পারব না। তাহলে তোমারও যে মুখ পুড়বে, তা আমি কিছুতেই সইতে পারব না। এইরকম টুকরো টুকরো অনেক কথা মনে হল। সবই অভিনয়? না—না। অভিনয় নয়—কেমন যেন অসম্ভব বলে মনে হল।

'লু'তে মার্লিনের আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল—জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বলে একটা কুৎসিত ব্যাধি আছে, জীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মনকে বোঝালাম তাই হয়েছে। একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝিই হয়েছে—হয়ইত এরকম জীবনে। সময়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনের সেই নিদারুণ ব্যথা একটু শান্তও হল। কিন্তু আবার মনটা যেন হঠাৎ চমকে উঠল।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না। মার্লিন আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, পরিষ্কার মিথ্যে কথা যে—কেন?

তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গিয়ে দেখি মার্লিন ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বসে আছে, আমার ব্রেকফাষ্ট সাজিয়ে নিয়ে। কোনও কথা বলার ইচ্ছে হল না। মার্লিনও চুপ করেই বসে রইল—সেই গম্ভীর বিষণ্ণ চোখ। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাকে আর একখানা টোষ্ট দেব? সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম, না।

ব্রেকফাষ্ট খেয়েই বেরিয়ে গেলাম সার্জ্জারীতে। অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকালেই রওয়ানা হলাম।

সার্জ্জারীতে ঢুকতেই ভায়লেটের সঙ্গে দেখা হল। ভায়লেট যেন একটু অবাক হয়ে তাকাল আমার মুখের দিকে—এত সকালে ত সার্জ্জারীতে কোনও দিন আসি না। ভায়লেটের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সহজেই টের পেলাম—তার প্রতি কেমন যেন একটা বিরাগে মনটা উঠেছে ভরে। ও যেন একটা অভিশাপের মতন এসেছে আমার জীবনে। না এলেই যেন ভাল হত। কিন্তু কেন? যুক্তিসঙ্গত কারণ ত কিছু নাই। তবুও, ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করল না। ঈষৎ মাথা দুলিয়ে তার সম্ভাষণের জবাব দিয়ে গম্ভীরভাবে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কোনও রকমে রোগী দেখার পর্ব্ব শেষ করলাম। এখন কি করি? ভায়লেট এখুনি 'চা' নিয়ে ঘরে ঢুকবে—তার সঙ্গে চা খেতে খেতে কোন কথা বলার ইচ্ছে আমার আদৌ নাই অথচ এখুনি বাড়ী ফিরে যেতেও চাইনা। ভাবছি, এমন সময়ে ভায়লেট 'চা' নিয়ে ঢুকল ঘরে। যেমন রোজই করে—চা তৈরী করে আমাকে দিয়ে নিজেও এক পেয়ালা চা নিয়ে বসল।

একটু চুপ করে থেকে শুধাল, আপনার শরীরটা আজ ভাল নাই বুঝি?

গম্ভীর ভাবে বললাম, আমি ভালই আছি।

না—না। কিছুতেই ভায়লেটকে আমার মনের কথা টের পেতে দেওয়া হবে না। সহজ ভাবে একটা কিছু বলা দরকার।

বললাম তোমার সেই কথাটা—সেই ম্যানচেষ্টারে গিয়ে প্র্যাকটিস্ করার কথা—প্রায়ই ভাবি। শুধাল, মিসেস চাউধুরী রাজী হয়েছেন ?

বললাম, তাঁর অরাজী হওয়ার কি আছে ?

বলল, শুনে অত্যন্ত খুসী হলাম।

কথাটা কেমন যেন ভাল লাগল না। স্ত্রী স্বামীর উন্নতির পথ সমর্থন করবে—এইটেই ত স্বাভাবিক। তাতে বিশেষ করে খুসী হওয়ার কি আছে ?

তবে কি ভায়লেট মার্লিনকে স্বাভাবিক মনে করে না ?

তীক্ষ্ণ ভাবে শুধালাম, কেন ? খুসী হওয়ার কি আছে ?

ভায়লেট মাথা নীচু করে বলল, সব স্ত্রী ত সমান হয় না।

আবার। আবার সুরু হল ঐ ধরণের কথা। অসহ্য হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম, থাক্। ও-সব আলোচনার এখন সময় নয়। আমি এখন যাই। বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলাম।

* * * *

সেই সময় ৫।৭টা দিন, আমার মনের দিক দিয়ে যে কি ভাবে কেটেছিল, বুলা ! বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নাই, কল্পনা করে নিও। দুটো কি চারটে কথা ছাড়া বাড়ীতে মার্লিনের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। আমিও বলি না এবং মার্লিনও জিনিষটাকে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে সহজ করার কোনও চেষ্টাই করে না। সেই গম্ভীর বিষণ্ণ ধরণ। এক একবার মনে হয়েছিল—কথাটা মার্লিনের সঙ্গে পরিষ্কার করে নিলেই হয়, সোজা জিজ্ঞাসা করি না কেন, কেন সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সত্য যাই হোক, সহজ ভাবে তার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি আমার থাকা উচিত। কিন্তু মার্লিনের ধরণ-ধারণে সে প্রবৃত্তি হয় না—তারই ত উচিত এগিয়ে এসে আমার কাছে সত্য কথা বলে সব পরিষ্কার করে ফেলা। পারে না যে, তার কারণ কি—সত্যই অবৈধ প্রণয় ? বুকের মধ্যে আবার অগ্নিশিখা জ্বলে।

এই সময় একদিন সুধাকে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটা আজও পরিষ্কার মনে আছে এবং তোমাকে বলি।

সেই যেন তোমাদের কলকাতার বাড়ী। আমি ত সে বয়সে খুব আড্ডাবাজ লোক ছিলাম—একদিন ক্লাবে তাস খেলে বাড়ী ফিরে আসতে আমার যেন অনেক রাত হয়ে গেল। বোধ হয় রাত প্রায় একটা বাজে। সেই তিন তলায় ত আমাদের শোবার ঘর ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি—সুধা ঘরের মেঝের এক কোণে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে, ঘরে আমার খাবার ঢাকা। সুধাকে ডাকলাম, জবাব দিল না। কাছে গিয়ে আদর করে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম। জবাব নাই। ক্রমে আমারও যেন রাগ হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কৈ, সুধা ত বিছানায় নাই ! বিছানার পাশে কেউ শুয়েছে বলেও মনে হল না। সুধাকে ডাকলাম, ঘরেও সুধা নাই। সমস্ত বাড়ী যেন খুঁজে বেড়ালাম—বাড়ীতেও সুধা নাই। তার পর যেন কত মাঠ কত পথ সুধাকে খুঁজে বেড়ালাম—সুধা নাই। তার পর যেন ডভিংটনের মাঠে মাঠে, সেই ডভিংটনের চার্চ্চে, সুধাকে খুঁজে বেড়ালাম—সুধা নাই। সুধা ! সুধা ! ডেকে কোনও সাড়া পেলাম না। জীবনে সে যেন হারিয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা অসহনীয় বেদনায় ভোরবেলা চট করে ঘুম গেল ভেঙ্গে।

মনটা কিছুক্ষণ ভরে রইল সুধাকে নিয়ে। ক্রমে মনে পড়ল বর্ত্তমান জীবনের অশান্তির কথা। আজ যে জীবনে এই অশান্তি—এ কি অবহেলায় সুধাকে হারিয়ে ফেলার অভিশাপ ?

* * * *

তারপর দু'-চার দিন সুধার কথা প্রায়ই মনে হতে লাগল। মনে হল—আজ মার্লিনকে নিয়ে এই অশান্তি এ যেন আমার ন্যায্য পাওনা। জীবনে সুধার ধার ত আমাকে শোধ করতেই হবে। কিন্তু তাতেই বা মনে সান্ত্বনা পাই কই ?

যাই হোক, এই ভাবে ১০।১২ দিন কাটার পর একদিন মন যেন ক্লান্ত হয়ে আপনা থেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ওষুধ মন নিজেই নিল যোগাড় করে।

ভোর হতে না হতে ইদানীং রোজই ঘুম ভেঙ্গে যায়—মনটা ভরে ওঠে একটা অশান্তিতে। কিন্তু সেদিন ঘুমটা ভাঙ্গল না। ভাঙ্গল না বললে ঠিক কথাটা বলা হবে না—ঘুমটা পাতলা হয়ে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রইলাম শুয়ে। তার মধ্যেই বেশ মনে আছে, মনটা ভরে উঠল একটা বেদনায়—মার্লিন মিথ্যে কথা বলল কেন ? তবে কি ?

কিন্তু আশ্চর্য ! সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মনের ভিতর থেকে যেন সাড়া পেলাম—মিথ্যা কথা বলেছে কে বলল ? মিথ্যা নাও হতে পারে। হয়ত মার্লিন রোলাণ্ডকে দেখেনি। রোলাণ্ড হয়ত বাড়ীতে ঢোকেনি। ঢুকবে ভেবেছিল কিন্তু হয়ত অসময়ে মার্লিনের সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক হবে না মনে করে দরজার কাছ থেকেই গেল ফিরে। আমি যে সদর দরজা খুলে বেরুতে দেখেছিলাম—হয়ত আমার ভুল, আমি ত ফটকের কাছ থেকে দেখেছিলাম। তা আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল কেন ? সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সাড়া উঠল—আমাকে হয়ত দেখেনি, আমি ত অন্ধকারে ফটকের কাছে ছিলাম। হয়ত তার গাড়ী অন্য ফটকের দিকে ছিল। সেই দিক দিয়েই ত ম্যানচেষ্টারে যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা আছে।

বুলা ! আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সেদিন উঠলাম অনেক বেলা করে।

সকালবেলা তৈরী হয়ে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে গিয়ে দেখি—মার্লিন আমার জন্য বসে আছে। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, আজ অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে।

মার্লিনের মুখের এই মৃদু হাসি যেন অনেক দিন দেখিনি। আমিও মৃদু হেসে মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, হ্যাঁ। আজ সকালবেলা ঘুম যেন ছাড়ছিল না। তা তুমি কখন উঠেছ ?

বলল, আমার ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর কিছুতেই ঘুম হয় না।

* * * *

এর পর থেকে মার্লিনের প্রতি মনোভাব ক্রমেই সহজ হয়ে গেল। যত দিন যায় ততই সেদিন সন্ধ্যেবেলার ব্যাপারটা তুচ্ছ ও ছোট বলে মনে হতে লাগল। ক্রমে একটা লজ্জা এল ভাবতে, এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে মার্লিনকে আমি কি যা-তাই না ভেবেছি।
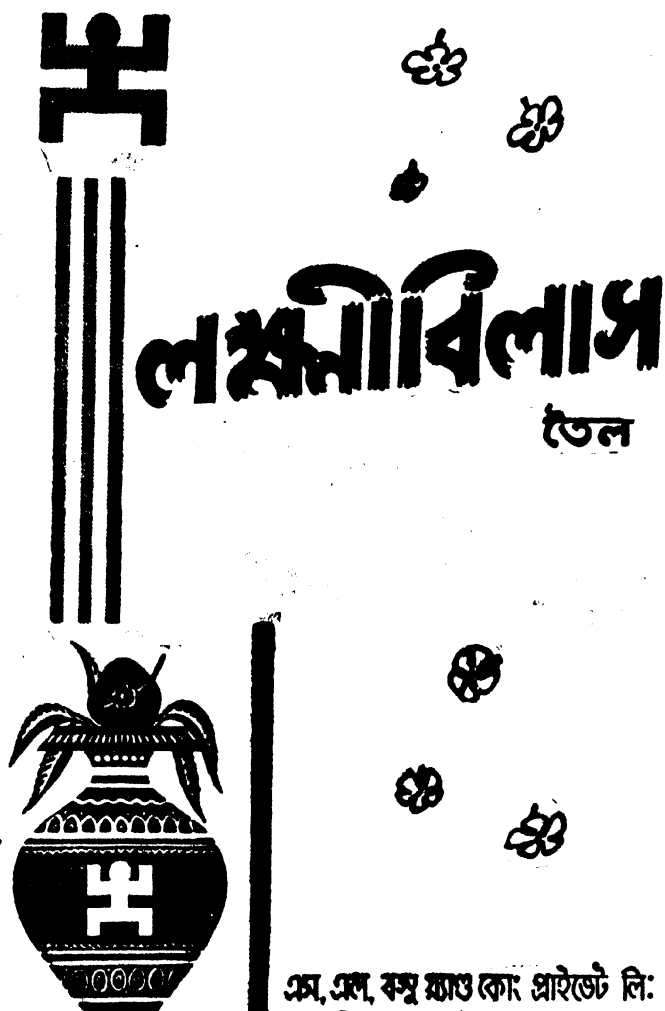
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এস, এল, বসু এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

ক্রমে মনে হল মার্লিনকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে কথাটা পরিষ্কার করে নিই। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয়ে উঠত না। বলতে গেলেই বাধত, একদিন কথাটা সুরুও করলাম—জান লীনা, সার আর্থার একদিন এসেছিলেন।

একটু যেন অবাক হয়ে শুধাল, কবে?

বললাম, এই কয়েক দিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা।

শুধাল, কোথায়? তোমার সার্জ্জারীতে?

এত সহজ ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করল যে মার্লিন সেদিন রোলাণ্ডকে দেখেনি, সে বিষয় আমার মনে আর সন্দেহের লেশ মাত্র রইল না।

হেসে বললাম, না—এই বাড়ীতেই। আমি সার্জ্জারী থেকে ফিরে আসতে দেখলাম, অন্য গেট দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

মার্লিন চুপ করে গম্ভীর হয়ে গেল, কোনও কথা বলল না।

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, তা এসে ওরকম করে চলে গেলেন কেন? দেখা না করে?

সংক্ষেপে উত্তর দিল, জানি না।

আর কিছু কথা হল না। যাই হোক, এদিক দিয়ে মনটা যখন সহজ হয়ে গেছে—এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে মন সঙ্কুচিত হল। মনে হল রোলাণ্ডকে নিয়ে আর কোনও কথা না বলাই ভাল।

আমার মনের গ্লানি আর নাই বটে, মার্লিনের দিক দিয়ে কিন্তু বিশেষ কিছু ভাবান্তর হল না। কথাবার্ত্তা অনেকটা সহজ হলেও সেই গম্ভীর বিষণ্ণ অন্যমনস্ক ধরণ। ভাবলাম, যাই হোক, আমার ব্যবহারে একটা আঘাত ত পেয়েছে মনে। বড় কোমল প্রাণ মার্লিনের যে, সামলে উঠতে হয়ত একটু দেরী হবে।

ভায়লেটের প্রতি কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক সহজ হল না। তার প্রতি একটা মানসিক বিরাগ রয়েই গেল। কেন? বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার ব্যাপারটা দেখে, তা নিয়ে এই যে ক'দিন একটা মানসিক আলোড়ন চলল, এর জন্য কি ভায়লেটকেই আমি মনে মনে দায়ী করেছিলাম? ঠিক বলতে পারি না। ফলে, ভায়লেটকে কথায়-বার্ত্তায় সুবিধে পেলেই একটু খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি মনে জেগে উঠতে লাগল।

এই সময় একদিন মিঃ ও মিসেস প্যান আমার সার্জ্জারী থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেল। আমার চিকিৎসায় মিঃ প্যান সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে—আর চিকিৎসার দরকার নাই। মিসেস প্যান কি কৃতজ্ঞ! মুখে মিষ্টি হাসি মাখিয়ে বারে বারে আমাকে মনের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে যেন তার ক্লান্তি নাই এবং তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব যে এতটুকুও ছিল না—একথা আমি জোর করে বলতে পারি। চীনে মুখে পিট পিট করে চেয়ে এবং মৃদু মৃদু হেসে মিঃ প্যানও যতটা সম্ভব তার প্রাণের অভিনন্দন জানিয়ে গেল এবং মিঃ প্যানের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল—তার প্রাণের শান্তিতে আর যেন কোনও ভেজাল নাই। আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহা আনন্দে হাত ধরাধরি করে দুজনে আমার ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

সেদিন রোগী দেখার পরে 'চা' খেতে খেতে ভায়লেটকে বললাম, দেখ ভায়লেট! তোমারই ভুল। মিসেস প্যানের অন্য প্রেমিক আছে, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

ঠোঁটের উপর একটু মৃদু হাসি খেলে গেল—আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

মুখে বলল, হবে।

একটু দৃঢ়স্বরে বললাম, তুমি যে ওর অন্য প্রেমিক দেখছ সেটা তোমারই দৃষ্টিভঙ্গির দোষ।

গম্ভীর ভাবে বলল, হতে পারে।

বললাম, হতে পারে না—নিশ্চয়ই। এই ক'দিন ধরে ওদের দুজনার মধ্যে যে ভালবাসা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে অন্য লোকের দাঁড়াবার জায়গা নেই।

ভায়লেট একটু চুপ করে রইল। তারপর একটু যেন জোরের সঙ্গে বলল, ভালবাসা জিনিষটাই আমি মানি না।

মৃদু হেসে শুধালাম, কি রকম?

বলল, ওটা একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। কোনও একটা বিশিষ্ট আবহাওয়ায় তৈরী হয় এবং সে আবহাওয়াটা চলে গেলেই সরে যায়। কতকটা season flowerএর মত।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, হাজার হলেও তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আর কতটুকুই বা বোঝ।

একটু দৃঢ়স্বরে বলল, আমি যা বুঝি খুব কম লোকই তা বোঝে।

মৃদু হেসে একটু অবজ্ঞার সুরে বললাম, এই বয়সেই এত বুঝে ফেললে?

বলল, হাঁ বোঝাবুঝি নির্ভর করে অভিজ্ঞতার উপরে। বয়সের উপর নয়।

হেসে উঠলাম। বললাম, তোমার আবার কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা হতে পারে?

সোজা চাইল আমার দিকে। বলল, শুনবেন আমার জীবনের কথা? আমার বলতে কোনও আপত্তি নাই।

বললাম, বেশ ত বল।

বলল, অনেক দিন থেকে ভেবেছি—আপনাকে বলব। কারণ আপনার প্রতি আমার একটা করুণা আছে, আপনি আমাদের দেশের জীবন কিছুই চেনেন না। অন্ধের মতন একটা আদর্শের স্রোতে ভেসে চলেছেন, বোধ হয় আপনাদের দেশেরই আদর্শ।

একটু রাগ হল। বললাম, তা আমাকে বাদ দিয়েই কথাগুলি বল না।

বলল, কেন আপনাকে বলছি, সেইটেই জানিয়ে রাখলাম। আমাদের জীবনে বাইরের দিকটায় একটা চাকচিক্যের বাহার আছে বটে কিন্তু উল্টো দিকটা বেশীর ভাগই কুৎসিত। সেদিকটার খবর আপনি কিছুই রাখেন না।

একটু তীক্ষ্ণ সুরে বললাম, প্রয়োজন কি আমার সে সব খবরে?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, জানেন, আমি কুমারী নই বিবাহিতা।

অবাক হলাম। শুধালাম, তুমি বিবাহিতা—সে কি?

বলল, বিবাহ আমার হয়েছিল—ডিভোর্স হয়ে গেছে।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, তখন আমার বয়স ১৮.১৯ বৎসর। একটি সুদর্শন

যুবকের প্রেমে পড়ে আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি, সেই যেন জীবনের একমাত্র আলো, সে নইলে আমার জীবনের সবই অন্ধকার, এইরকম একটা মনোভাব। সে শুধু দেখতেই ভাল ছিল না, কি মিষ্টি মার্জ্জিত ধরণ-ধারণ ছিল তার—অন্য অন্য অনেক যুবকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি—তার যেন তুলনা ছিল না। সেও আমাকে দারুণ ভালবেসেছিল সে যুগে, একথাও আমি জোর করে বলতে পারি—একদিন আমাকে না দেখতে পেলে পাগলের মত হয়ে উঠত।

একটু চুপ করল। শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হল—হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। বছর খানেক বেশ শান্তিতেই কাটল। আমরা ছিলাম লণ্ডনের বেজওয়াটারের দিকটার একটা বোর্ডিং-হাউসে একটা ঘর নিয়ে। বেশ বড় বোর্ডিং-হাউস। একই কম্পাউণ্ডে তিনখানা বাড়ী—বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন ঘরে থাকে। মাঝের বাড়ীখানার তিনতলার উপরে ছিল আমাদের ঘর।

শুধালাম, বোর্ডিং-হাউসে ছিলে কেন? একটা ছোটখাট বাড়ী বা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে পারতে?

বলল, প্রথমতঃ নিজের সংসার নিজে গুছিয়ে করা মস্ত বড় হাঙ্গামা, আমার ঠিক আসে না। আর তাতে খরচাও বেশী। সামান্য মাইনের একটা অপিসে কাজ করত সে। বোর্ডিং-হাউসে আমাদের কোনও রকমে যেত চলে।

যাই হোক—বলে যেতে লাগল।

বছর খানেক পরেই তার বিকৃত রূপটি চোখে পড়তে সুরু হল। সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে আর বেরুতে চাইত না—নানা ছুতোয় বেশীর ভাগ একলাই বেরুত এবং রাত্রে ফিরে আসত দুর্দ্দান্ত মাতাল হয়ে। তারপর সুরু হল—আমার উপর কি অত্যাচার!

বললাম, দুঃখের কথা।

বলল, ক্রমে সে অত্যাচার কি রূপ নিল আপনি তা ধারণাও করতে পারবেন না। কিছুদিনের মধ্যে এমন হল আমাকে একবার না মারলে সে যেন সুস্থ হয়ে ঘুমুতে পারত না।

বললাম, নিশ্চয়ই তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দিতে রাগিয়ে?

জোরের সঙ্গে বলল, মোটেই নয়। ও মাতাল অবস্থায় ফিরে এলে আমি চুপচাপই থাকতাম—ওর কোনও কথায় প্রতিবাদ করতাম না। কতকটা অবশ্য ভয়ে। কিন্তু একটা না একটা ছুতো করে সে আমাকে প্রহার দেবেই। ক্রমে চাবুক এল। ক্রমে (মাথা নীচু করে একটু চুপ করে থেকে) আমার কাপড় সরিয়ে চাবুক মেরে যেন তার তৃপ্তি হত।

বললাম, লোকটা পাগল নাকি?

বলল, না—স্যাডিষ্ট (Sadist)। পরে বুঝতে পেরেছিলাম। মাতাল অবস্থায়ই সেই প্রবৃত্তি উঠত জেগে।

একটু ভেবে বললাম, তা হবে। যাই হোক, ডিভোর্স হয়ে বেঁচে গেছ তা হলে?

বলল, আরও কথা আছে—শুনুন। একদিন ঐ অবস্থায় সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই ফুরিয়ে গেছে দেখে একটা কুৎসিত ভাষায় আমাকে গালাগালি করে চাবুক দেখিয়ে বলল—যা, যেখান থেকে পারিস একটা দেশলাই নিয়ে আয়।

তখন রাত প্রায় বারোটা—দোকান পসার সব বন্ধ। কোথায় দেশলাই পাই? বললাম—এত রাত্রে দেশলাই কোথায় পাব? বলল কি জানেন?

শুধালাম, কি?

বলল, যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়—না হয় রাস্তায় লোক জুটিয়ে নে—ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম—ওর হাত থেকে ত খানিকক্ষণ রেহাই পাওয়া যাবে। তারপর—চুপ করে গেল।

শুধালাম, তারপর কি?

বলল, আমাদের বোর্ডিং-হাউসে একটি যুবক থাকত। সে আইনের ছাত্র ছিল। নাম গ্লাডিং। আমরা ত আমাদের কম্পাউণ্ডের মাঝের ব্লকে থাকতাম। সে থাকত পাশের একটা ব্লকে, রাস্তার ধারেই, তিনতলার উপরে। তার আমার উপর একটু দৃষ্টি ছিল, সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম—সেটা বুঝতে মেয়েদের মোটেই দেরী হয় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি তাকে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু আস্কারা দিই নাই। ভুল বুঝবেন না—তার কারণ এ নয় যে, আমার মনটা তখন আমার স্বামীতেই ভরপুর। সে ভাবটা তখন আমার অনেকটা কেটে গেছে। তার কারণ—লোকটিকে আমার পছন্দ হয়নি, কেমন যেন অতিরিক্ত রোগা, আলগা ধরণের গড়ন, চলতে ফিরতে যেন ভেঙ্গে পড়ে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তায় চলে এলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখি—গ্লাডিংয়ের ঘরে জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে। কি খেয়াল হল আমার জানি না, সোজা চলে গেলাম গ্লাডিংয়ের ঘরে। দরজায় করাঘাত করলাম। গ্লাডিং জেগেই ছিল। দরজা খুলে—এত রাত্রে আমাকে দেখে বিস্ময়-উৎফুল্ল হয়ে যেন ভেঙ্গে পড়ল। আমার পিঠে হাত দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল ঘরে।

চুপ করে রইল। কৌতূহল হয়েছিল।

শুধালাম, তারপর?

বলে যেতে লাগল গ্লাডিংকে অবশ্য একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—দেশলাই আছে কি না। কিন্তু দেশলাই নিয়ে তখুনিই ঘরে ফেরার আমার ইচ্ছে ছিল না—জানি খানিকটা দেরী করে ফিরলে মাতাল অবস্থায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে—আজকের রাতটা অন্ততঃ যাব বেঁচে। তাই সোজা গিয়ে গ্লাডিংয়ের বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম—গ্লাডিং এল পাশে—ভ্রূকুঞ্চিত করে বললাম, এত সহজে—

বলল, তাইত বলি, একটা আদর্শের স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন—চোখ চেয়ে জীবনটা দেখেন না।

যাই হোক বলে যেতে লাগল, এইবার আমার কাহিনী শেষ করি। রাত প্রায় ৩ টার সময় চুপি চুপি পা ফেলে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। যা আশা করেছিলাম—ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু কি দৃশ্য। সমস্ত শরীর মন ঘৃণায় রী-রী করে উঠল। ঘরে আলো জ্বলছে, উপুড় হয়ে খাটের এক প্রান্তে আছে শুয়ে—একটা হাত ও একটা পা খাট থেকে বেরিয়ে মাটি ছুঁয়ে আছে, হাতের পাশে সিগারেটটা আছে পড়ে। মুখটা কাত হয়ে আছে খাটের কিনারায় হাঁ করা; দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। রাগ ও ঘৃণায়ই সংমিশ্রণের একটা কুৎসিত প্রলেপে কি বিকৃত রূপ নিয়েছে—আমি সেদিকে বেশীক্ষণ চাইতে পারলাম না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই জানোয়ারটাকে

সুপুরুষ ভেবে একদিন ভালবেসেছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। আর তার সঙ্গে দেখা করিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, জানেন—সেই থেকে কোনও ইংরেজের মুখের দিকে আমি সুদৃষ্টিতে চাইতে পারি না—তখুনিই কল্পনায় ভেসে ওঠে তার উল্টো দিকের কুৎসিত রূপ, ঐরকম জানোয়ারের মতন শুয়ে থাকা। শুধু তাই নয়, জীবনে সুন্দর কিছু দেখলে আমি যেন তা বিশ্বাস করি না কিছুতেই—যেন সুস্থ হই না যতক্ষণ না তার কুৎসিত রূপটি দেখতে পাই! কেননা, কুৎসিত রূপ তার অন্তরালে আছেই।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, ভায়লেট! তোমার জন্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত—জীবনে ঐ রকম একটা আঘাতে তোমার মনটা বেঁকে গেছে—একটা ব্যাধির মতন। কিন্তু তুমি ত বুদ্ধিমতী মেয়ে, ভেবে দেখ তোমার জীবনের এই একটা ব্যাপার নিয়েই সমস্ত জীবনটা বিচার করা উচিত।

একটু উত্তেজিত ভাবে বলল, আমি যে দেখেছি—আমাদের দেশের কুৎসিত উল্টো রূপ, আমি অনেক দেখেছি। আমি যে বোর্ডিংয়ে থাকতাম, আমাদের মতন অনেক স্বামিস্ত্রীই সেখানে থেকে বাইরের দিক দিয়ে সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করত। কিন্তু স্বামীরা আপিসে চলে গেলে, দুপুরবেলা সেই সব স্ত্রীদের নানা রকমের বিকৃত রূপ ত আমার চোখ এড়ায়নি?

ঘড়ির দিকে চাইলাম—এ কি! একটা বেজে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সে সব শোনার ইচ্ছেও আমার নাই। ভাল-মন্দ জীবনে দুই আছে—সব দেশেই। তোমার একান্ত দুর্ভাগ্য, তোমার চোখে খালি মন্দ দিকটাই পড়েছে।

যাওয়ার সময় মনে হল—ভায়লেটের চোখে যেন একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছে।

[ক্রমশঃ।

সে কি তুমি?

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কে শাড়ী পালটালো! তার বড় চোখে কচি নীল'ঘুম
ঘন কালো স্নিগ্ধ কেশে—কপালের নিটোল কুমকুম
এখন লেপ্‌টে গেছে! মনে হয় রাত্রির আকাশ
সেখানে সে নিরিবিলি! নীলাভ নরম খোঁপা
দূর দিগন্তের
এখন এলিয়ে পড়ে চোখের মুখের ক্লান্তি
মুছে নিল'; গভীর ঠোঁটে
মৃদুহাসি—বাঁকা চাঁদ! চারিদিকে নির্জন বাতাস
নদীতে ঢেউয়ের স্বরে ঘুম-পাড়ানিয়া গান। কাঁপে
অশ্বত্থের ডালে ডালে শিশির জড়ানো পাতা। ঘুম
নক্ষত্রে ছাড়িয়ে গেছে—মুছে গেছে পা'র ঝুমঝুম।

এখন ডেকো না তাকে। সারাদিন রৌদ্রের উত্তাপে
ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত। ঢেউ-জল-নদী-পাখী-অরণ্য-পর্বত, পৃথিবী।
এখন ঘুমের ঘরে—ঝরে পড়ে শান্তির শিশির।
আমরাও ঘুমোব তবে—আমরা যারা দিনে শ্রমজীবী
এনপরে পথ চলি—দুই হাতে ঠেলে ঠেলে এই সব প্রত্যহের ভিড়।
ভোরে সে বেরিয়ে আসবে অরণ্যের অন্ধকার থেকে
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে—মেঘের প্রাসাদে তুলে রেখে
রাত্রির ক্লান্তির সজ্জা। নীল শাড়ী রেশমী শরীর
জড়াবে সলজ্জ হাতে, সোনালী জরির কাজ করা
আঁকাবাঁকা পাড় পড়বে পায়ের কাছে: দিনের গভীরে
কী সুন্দর দেখাবে যে—আলো কাঁপা আকাশ অপ্সরা!

তার চোখে চেয়ে চেয়ে সারাদিন কাজ করে যাব
কঠিন শ্রমের শিল্পে নিজেকে ছড়িয়ে দেব। হয়তো কখন
ক্লান্তি এলে, উজ্জ্বল আয়ত মুখে
আবার শান্তি ফিরে পাব:
সোনালী নক্সাকাটা হাতে পিঠে কোমল গলায়
মেঘের ওপারে দূরে হৃদয়ে অরণ্যে এই মন
তখন প্রমুক্তি পাবে—ছোট ছোট কাজ করা নদীর আঁচলে।
সে কি তুমি—অথবা নক্ষত্র-নদী পৃথিবীর পা'র
আমার প্রণাম রাখি—কাজ করি হেমকান্তি হিরণ্য-প্রভায়
নিজেকে নতুন করে চিনি আর মধুকর ভাসাই এ জলে॥

LUX
TOILET SOAP

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৫। বলরামের শ্রীমুখের বিস্ময় ও আনন্দ-হাস্য তখন চীৎকার দিয়ে বলছে—"দেখুন, দেখুন, আপনারা সকলেই দেখুন, অঞ্জন-স্নিগ্ধকে দেখুন, ঐ দেখা দিয়েছে আমার ভাইয়ার মণিময় অলঙ্কার ; ভুজঙ্গটার দাঁতের কামড়টাতে লেগে রয়েছে বিষের স্ফুলিঙ্গ। তাদের সমস্ত চাকচিক্যই হার মানল গো হার মানল ! হ্যাঁ, বিক্রম বটে ভাইয়ার হাত দুখানার। ঐ দেখুন, যতই তাড়া খাচ্ছে সাপ, ততই শিথিল হয়ে যাচ্ছে তার ফণার চাপ। উষ্ণীষের পাশের কোঁকড়ানো ভাঙা ভাঙা চুলগুলোও দেখা দিয়েছে। পীতবসন !···বনমালা ! ওরে আমার শোভার ঘরের আলাল-দুলাল মূর্তি রে। কোমর বেঁধে নেচে উঠেছেন···কালিয়ের ফণার চূড়োয়···পদাঘাতের মুদ্রায়। ঐ দেখুন, পরিকরদের সুখদর্শনের ক্ষুধা মিটিয়ে কৃষ্ণ আমার এসেছে, ফণার মণির তেজ ঘুচিয়ে কৃষ্ণ আমার নাচছে। নৃত্যোৎসবে বেড়ে উঠছে ওর অঙ্গের জ্যোতিঃ। কী প্রভা ! ভয় পেয়েছে, ঐ যাঃ, নিবে গেল ফণার মণির আলোগুলো। কী আনন্দ, কী আনন্দ ! আপনারা দেখুন, আমার তত্ত্বকথা বুঝুন, পরমানন্দের উদয় হয়েছে। এবার বিস্মৃত হোন বৈকল্য, এক-কল্যাণ নিরাময় হোন।"

শ্রীবলরামের এই অদ্ভুত হাস্যরস-মিশ্র বাণীতে খণ্ডিত হয়ে গেল গোপ-পরিজনদের শোক। প্রীতিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তাঁদের নয়ন। একদিকে যেমন তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের নয়নানন্দ-কন্দ শ্রীকৃষ্ণকে, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা দেখতে পেলেন সেই ভয়ানককে, সেই অহীন্দ্রকে। মনের মধ্যে তাঁদের যুগপৎ বিচিত্র রেখাপাত করতে লাগল···প্রবর্ধমান আনন্দ ও ভয়।

২৬। তটস্থ হলেও এ যেন এক অতটস্থদের ছবি। অতি-মগ্নতায় মর্মরিত হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের মতি। তাঁর করুণ-রসময় কটাক্ষের দেহে ভর করল কৃপা। কটাক্ষ-কৃপায় কৃতার্থ হয়ে গেলেন সকলে। নর, কিন্নর, সুর, সিদ্ধাদি সকলেই তাঁর নৃত্যভঙ্গি দর্শন করে মুখর হয়ে উঠলেন সম্মানিত সাধুবাদে। মান বেড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশিল্পের। আনত ভক্তদের উদ্ধারকর্তা তখন স্থির করলেন ফণীর ফণার উপরেই তিনি নাচ দেখাবেন।

ততঃপর যেই তিনি নৃত্য-সহচর করে নিয়েছেন নিজের মনটিকে, অমনি অকস্মাৎ জ্ঞানোদয় হল দেবতাদের। মুহূর্তে তাঁরা রচনা করে ফেললেন গন্ধর্ব বিদ্যাধর অপ্সরাদের এক রসিকগোষ্ঠী। নৃত্য-সাহায্য সম্পাদনায় মধুর মধুর ধ্বনিত হয়ে উঠল মৃদঙ্গ, মুরজ ও পণবের স্তব।

২৭। কিন্তু শ্রীভগবানের অনন্ত রহস্য বোঝা দায়! নিখিল কলায় যিনি সৌভাগ্যবান্, তিনি তখন কর্কশ মার্গরীতি অবলম্বন ক'রে আরম্ভ করে দিলেন দাক্ষিণাত্য প্রবন্ধ-বন্ধ। গন্ধর্বেরাও তাল দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'গুরু' 'লঘু' 'প্লুত' 'দ্রুত' 'দ্রুতার্দ্ধ' ও 'বিরামে'র রমণীয়তার মাধুর্য দেখিয়ে এবং 'সশব্দ' ও 'নিঃশব্দ'াদি ভেদবিচারের চাতুর্য দেখিয়ে আনন্দোন্মত্ত হয়ে উঠলেন বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ তালধারীরা। চঞ্চল করপুটে তাল-মহিমা উদ্‌ঘাটন করলেন গন্ধর্বেরা।

"থৈয়া তথ তথ থৈয়া থৈ থৈ থৈয়া তথ থৈয়া"···

উচ্চৈঃস্বরে তালের পাঠ দিতে দিতে আনন্দের স্ফূর্তিতে বাদ্য আরম্ভ করে দিলেন গন্ধর্বেরা। যখন উদ্‌ঘাটিত হল তালপাঠের শব্দগুলি, তখন মনে হল তথায় যেন পঠিত হচ্ছে চণ্ডবৃত্ত মঙ্গর্য্যাদি—লক্ষণ গদ্য-পদ্যময়ী কাব্য (বিরুদ)। আর সেই তাল-পাঠের তথা-শব্দের ছন্দে তথা-নৃত্য আরম্ভ করে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ফণীর এক ফণা থেকে ফণান্তরে ছুটে চলল সেই নাচ।

এ নৃত্য-গীত তাঁর নিজের কল্পনা। স্বৈরী কৃষ্ণ নাচছেন। সে গতিরাগের অনুরূপ কি কখনও গাওয়া চলে গান, না বাজানো যায় বীণা, না তোলা যায় বোল ? গন্ধর্বেরাও কি পারলেন ? না।

ফণিপতির এক মাথা থেকে আর এক মাথায় একলা নেচে নেচে চললেন কৃষ্ণ। চন্দ্র-মুখে সমীরিত হোলো আক্লিপ্ত শব্দমালা। পণ্ডিত তাণ্ডবেশ নাচলেন, চরণকমলের আঘাত-ভঙ্গির প্রত্যেকটি আঘাতে শীর্ণ করে নুইয়ে দিলেন অহিরাজ কালিয়ের উন্নমস্ত ফণা···একটির পর একটি।

"দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি থোঙ্গ থোঙ্গ থোঙ্গ"

মুখ থেকে উত্তাল ছুটে চলেছে বোল আর পাঠের অনুরূপ বেগে ফণিফণায় নির্দয় আঘাতে হেনে চলেছে শ্রীকৃষ্ণের উদার শ্রীচরণের পদ্ম। যিনি রঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গী, মরি তার বালাই নিয়ে মরি।

২৮। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় এই নৃত্যগতিবিশেষটির অনুকরণ করতে না পেরে লজ্জায় লীন হয়ে গেলেন স্ফীতগর্ব গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ। যত্ন করেও যখন সিদ্ধি লাভ হল না তখন তাঁরা বিপুল উৎকণ্ঠায় এবং বিপুল হর্ষে স্বতন্ত্র আরম্ভ করে দিলেন নৃত্য-গীত।

২৯। দিব্যলোকে তুমুল হয়ে উঠল দুন্দুভির হুঙ্কার, গম্ভীর হয়ে উঠল ভেরীর ঘন ঝাঙ্কার। আপনা হতেই স্তবন-মুখর হয়ে উঠলেন মুনিগণ, এবং বৃষ্টির মত অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল নন্দন-বনের ফুলদল। দিব্যলোকবাসীদের ও ঘোষবাসীদের যেমন বহু ভাবে বেড়ে যেতে লাগল প্রমোদের পর প্রমোদ, দেবদ্রোহীদেরও তেমনি বহু ভাবে বেড়ে যেতে লাগল উদ্বেগের পর উদ্বেগ। আর শ্রীবনমালীর তখন সে কী অপূর্ব তাণ্ডব-চণ্ডিমা! নিদয় পদাঘাতে খেদখিন্ন হয়ে যাচ্ছে সর্পরাজের প্রত্যেকটি ফণা, আর প্রত্যেক ফণা থেকে উদ্বমিত হচ্ছে রক্তধারা, বেঁকে ভেঙে যাচ্ছে চক্ষু, অতিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ফণার বিশালতা। সে কী আকুলতা, সে কী ম্রিয়মাণতা

সর্পরাজের! হৃদয় ভেঙে গেল তাঁর মহিষীদের। পতির অবস্থা দেখে হ্রদ থেকে তাঁরা বেরিয়ে এলেন সন্তানদের বুকে নিয়ে। চাহনিতে গুপ্ত কাতরতা, গভীর মমতা। তাঁদের মন বলে উঠল—

"ভগবানের অনুগ্রহ ছাড়া এখন আর স্বামীর নিরাসক নেই মুক্তির।"

বিপুল ভাবনা তাঁদের ভাবিত করে তুলে। ভগবানের ভাবী অনুকম্পাই হল একমাত্র এই ভাবনার বিষয়। অনুকম্পা লাভই হয়ে দাঁড়াল তাঁদের অভিকাঙ্ক্ষা। হৃদয়ক্ষেত্রকেই যখন চষতে থাকে দুর্নিবার শোক, তখন তার পক্ষে লজ্জা ত্যাগ স্বাভাবিক। অসংহিত লজ্জায় তাঁরা উপস্থিত হলেন ভগবানের সমীপে এবং স্তব করলেন শোক-কাতর কলমধুরতায়।

৩০। হে দেব, হে 'দেবঘটা-মুকুট মহামারকত, আপনার জয় হোক। আপনার পরে পরতত্ত্ব কিছু নেই, আপনিই পরংব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং শিতিকণ্ঠের কণ্ঠে আপনিই রত্নায়মান গুণরত্নাকর। রত্নাকর-তনয়ার করলালিত আপনার পদকমলমধু মাংস সুখে আস্বাদন করতে করতে সুযোগী পরমহংসেরা পুরুষার্থ-সার্থমুখ্য মোক্ষকেও সুখে পরিহারযোগ্য করে তোলেন···ক্ষীর ও নীরের সম্বন্ধে যেমন করে হংসেরা।

৩১। হে দেব, আপনার চরণে নতি স্বীকার করেছেন বেদ। আমাদের নিবেদনে কর্ণপাত করুন, আপনি সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি, আপনি নিত্য নবীন, আপনার বিগ্রহ মাত্রেই সংহৃত হয় বিশ্বদানব। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-নারায়ণ প্রমুখ নবব্যূহের আপনি আত্মা। হে পরমপুরুষ, অপহার করুন রোষ।

৩২। অভিনব-প্রাণদাতা আপনিই বাসুদেব, নিখিল তাপ সঙ্কর্ষণ আপনিই সঙ্কর্ষণ; অখিল ঘোষবাসীদের প্রেমের পরা-ধন-মূর্তি আপনিই প্রদ্যুম্ন; আত্মমায়ায় যোগমায়ার বিরুদ্ধ হলেও আপনিই অনিরুদ্ধ, এবং যেহেতু আপনি অখিল দেবআত্মা, সেই হেতু ব্রজবাসীদের আপনি আত্মা। প্রসন্ন হোন্, অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন ফণিরাজ।

৩৩। আপনার যে চরণকমলের বন্দনা করেন সুরাসুরকিন্নর, নরঋষি এবং দেবর্ষিরা, যে চরণকমল থেকে রমণীয়তার সংযোজন হয় আত্মারামদের অন্তরে এবং হত হয় আধি···সেই সমাধিদুর্লভ চরণকমল আজ সকৌতুকে এবং অনায়াসে নৃত্যচ্ছলে বিচরণ করছে সর্পরাজের প্রতি ফণায়। যিনি সেই চরণকমলের সুখবর্দ্ধন করছেন, সেই ফণিপতির, স্বীকার করতেই হবে, এখনও নিঃসন্দেহে অবশিষ্ট রয়েছে কিছু সুকৃতি, কিছু পরমভাগ্য।

৩৪। হে ত্রিগুণাতীত, ভবতাপহারী হলেও আপনিই স্বয়ং নিখিলের মনঃশোধনে সত্ত্বগুণের সাহায্যে প্রতিপালন করছেন এই ত্রিগুণকৃত প্রপঞ্চটিকে কপিকচ্ছু চূর্ণের অনুকরণকারী রজোগুণের সাহায্যে সৃজন করছেন; নিবিড়নিশীথিনীগন্ধী তমোগুণের সাহায্যে সংহার করছেন। হে মহাভুজ, এক্ষেত্রে গরুড়াসন কমলাসন ও বৃষাসন···সেগুলি নাম মাত্র।

৩৫। গুণের তারতম্যেই জীবের তারতম্য হয়। হে নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়, কোনো জীব, নিজের গুণের গুণ দোষ ত্যাগ করতে পারে না। ক্রোধোৎপন্ন তামসিকতায় জন্ম হয়েছে ফণিপতির, সেইজন্য খলতার প্রভাবে সেখানে সৌজন্য পরিণত হয়েছে আকাশকুসুমে, জনকল্যাণ হয়েছে কদর্থিত, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় আপনার এই মায়াটুকু কাটিয়ে ওঠা। বিবরবাসীদের মধ্যে এই রীতিই প্রচলিত।

৩৬। সেই হেতু বলছি, ইনি তো কোনো অপরাধ করেননি। আপনি অপার করুণ-রসের মণি, আপনার অনুকম্পা থাকলে উপেক্ষার যোগ্য কি কেউ হতে পারে? আপনি সমদর্শী, সর্ব পন্থাই আপনার কাছে সমান ও প্রচুর মঙ্গলময়। এই পামর জীবের প্রতি আশু কৃপা করুন, এঁর জীবন হরণ করা আপনার যোগ্য নয়।

৩৭। আপনি ভগবান। শিব ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীরাও আপনার ভাগবত্তার জ্ঞানবিচার করতে পারেন না···হৃদয়ের সমস্ত অবধান শক্তির সযত্ন প্রয়োগ করেও পারেন না।

তামস প্রকৃতির অধিকারী চিরস্থায়ী দুষ্ট গর্ব্বের মহিমায় পুষ্টবুদ্ধি সেই ফণিপতি কেমন করে বিচার করবেন আপনাকে? এ-ও কি সম্ভব?

৩৮। ফণিরাজ মহাবলশালী, তবুও অভিভূত হয়ে পড়েছেন, সহ্য করতে পারছেন না আপনার হেলানৃত্যের গতিরাগ, টনটন করছেন বেদনায়, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ত্রাণোৎপত্তির মত শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে তাঁর। অশিষ্ট হলেও উনি মহাপ্রাণ, হে দেব, যাতে উনি প্রাণে বাঁচেন, তার ব্যবস্থা আপনি করুন।

৩৯। ক্ষমা করুন ওঁর অপরাধ। আমাদের বৈধব্য যেন না হয়। আমাদের দান করুন আমাদের স্বামীকে।

অহি-মহিলাদের এই অতিকাতর নিবেদন, অনুগ্রহ-ভিক্ষা ও স্মিতমধুর আলাপে বিচলিত হয়ে উঠলেন ভগবান। অনুগ্রহ প্রদর্শনের অভিলাষে তিনি শিথিল করলেন তাঁর কৃত্রিম নিগ্রহ। বিগলিত হয়ে গেল রোষ, দয়ার উদ্রেক হল। মনে জাগল উদ্ধারের বাসনা। একটু হেসে মধুর চেয়েও মধুর বাক্যে বললেন—

৪০। ভয় করবেন না, মা ভৈঃ, প্রচুর হলেও, আমার এই অনির্ব্বচনীয় ক্রোধ, আপনাদের বাণীতে শান্ত হয়েছে—মহানল যেমন শান্ত হয় সলিলে। অতএব শুনুন—এই পন্নগ গোচরীভূত হবেন না মৃত্যুর। আমার এই ক্রীড়াহ্রদ পরিত্যাগ করে আশা করি ইনি ফিরে যাবেন, যেখান থেকে ইনি এসেছিলেন সেখানে, এবং আমার চরণচিহ্নের চারু শোভা চিরসঙ্গিনী হয়ে থাকবে এর উত্তমাঙ্গে। সেটি দেখলে গরুড়ও এঁকে দেবেন নিষ্কৃতি। শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত এই পরমাশ্বাস-বাণীতে অভয় পেলেন সর্পরাজ। একটি প্রচণ্ড লৌহভার যেন নেমে গেল। হঠাৎ অতি লঘু হয়ে গেল তাঁর হৃদয়। ভয়ে ভয়ে ভক্তিতে গর্ব্বহীন শ্রদ্ধায় তিনি বললেন—

৪১। হে ভগবন্, ঐশ্বর্য-গরিমায় পৃথিবীতে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন—সাধুদের শ্রীবৃদ্ধি ও অসাধুদের অভিভবের জন্য, এবং ভাবী ভক্তজনের মঙ্গল উৎপাদনের জন্য। আচন্দ্র-সূর্য নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মনোবিনোদন, পরম অশুভের দূরীকরণ ও প্রকাশ-সমূহের দ্রুত উন্মেষ—আপনার কাম্য।

৪২। হে দৈবতোত্তম, দুর্দৈববশতঃ এখানে আপনার চরণ-কমলে নীতিবিগর্হিত কাজ করে ফেলেছি আমি। হে মকরধ্বজ কুণ্ডল সেটিকে ক্ষমা করুন।

হে দয়ামন্দির, এই হ্রদের জল আপনারই ক্রীড়াযোগ্য। দূষণ করেছিলেম। আপনি দণ্ড দিয়েছেন, আবার সেই একই সময়ে এসেছে আপনার অদ্ভুতম অনুগ্রহ। এ দয়া আপনি ছাড়া আর

কে করে? কোপভরে আপনি নৃত্য করলেন, আর আমার প্রত্যেক ফণায় চিরদিনের চিহ্ন রয়ে গেল সর্বমঙ্গলাস্পদ লক্ষ্মী-লালিত চরণ আপনার কমলের, অতএব হে বলানুজ, হে রমারমণ, আমার নিবেদন, আপনার আজ্ঞা পেলেই আমি "রমণক"—দ্বীপে যাত্রা করি।

এই বলে ফণিপতি একখানি দিব্যাম্বর, শ্রেষ্ঠ মণিরাশির মধ্যে গণনীয় ও হিতস্বরূপ কৌস্তভমণি এবং একটি মুক্তাহার উপহার দিলেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে, প্রণামান্তে সপরিকর নিলেন বিদায়।

৪৩। কালিয়নাগ বিদায় নিতেই তৎক্ষণাৎ অমৃতবৎ অতি মধুর ও স্বাদুরস হয়ে গেল হ্রদের জলরাশি।

ব্রজরাজকুমারের তখন কী অপরিসীম শোভা! বলয়োজ্জ্বল করের ও দিব্যাম্বরখানির জ্যোতিতে তখন লজ্জা পাচ্ছে বিদ্যুৎ-বলয়।··কূলে উত্তীর্ণ হয়েই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পিতাকে,··· ভয়, কৌতুক, বিস্ময় ও আনন্দের যেন একটি সমুদ্র। দেখতে পেলেন মাতাকে। বন্যা বহে গেল যেন আনন্দের। দেখতে পেলেন মাননীয়া ঘোষবৃদ্ধাদের সমৃদ্ধাদের। নিকটে এসে সকলকে তিনি প্রণাম করলেন। প্রণামে প্রকাশ পেল অকপট পরমাদর।

পিতা নন্দ, মাতা যশোদা, তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। তাঁকে আলিঙ্গন দিলেন ব্রজের পুরস্ত্রীরা এবং পরম কুতূহলী হলী। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর প্রত্যেকটি সখাকে আলিঙ্গন করতে করতে এগিয়ে চলতে লাগলেন, তখন ঐ যাঃ; সৃষ্টি হয়ে গেল আর একটি আমোদের জগৎ!

শ্রীকৃষ্ণ চলেন, আর তাঁর পানে মধুর-মধুর চাহনি হানেন পরমানুরাগিণী বধূরা ও কন্যারা, সে চাহনিতে যেন লেখা রয়েছে যার যত অনুরাগ তার তত ভাগ্যি। তাঁদের পানেও নয়ন হেনে চলেন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ চলেন আর তাঁর চিরতুষ্ট চিরবশ ধেনুগণ যেন ঐ একই ধারায় তাঁকে পান করতে থাকে—অশ্রুসজল নয়নপুট দিয়ে; যেন ঘ্রাণ করতে থাকে প্রফুল্ল নাসিকা উত্তোলন করে; যেন দ্রুত লেহন করতে থাকে রস—বিজয়শালী রসনা দিয়ে, এবং যেন গদগদ মধুর হাম্বারবে সপ্রণয় প্রশ্ন করতে থাকে, সব কুশল ত?

৪৪। প্রত্যেক সখাটিকে নিয়ে আলিঙ্গনের আমোদপর্ব যখন শেষ হয়ে এল, তখন আমোদ-মত্ত বন্ধুদের আনন্দে আমোদিত ও ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিলেন শ্রীভগবান ব্রজবাস-রমণ। ব্রজরাজ শ্রীনন্দও তখন লক্ষ্য করলেন জরাজীর্ণ বাসরখানির মতই অস্তগৃহ-পথের পথিক হয়েছেন বাসরমণি। তাই, আজ আর বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত হবে না···মনে মনে এই বিচার করে দেশকালোচিত ভাষায় তিনি নির্দেশ দিলেন—

আপনারা সকলেই দেখছেন···এগিয়ে আসছেন শর্বরী। ক্রূর রীতির মতই তিনি বিষমদর্শনা। তিনি তমোবহুলা এবং উগ্রা। অতএব এই স্থানেই আমাদের পক্ষে বাস্তব্য করা বিধেয়। হ্রদের তটভাগ এখন স্তবনীয় হয়ে উঠেছে; বৎস শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণে খণ্ডিত হয়ে গেছে তার গরলানলজ্বালা। হ্রদের কূল এখন অনুকূল। এইখানেই যামিনী যাপন তাহলে স্থির করা হোলো।

ব্রজরাজের বাণীতে আনন্দিত হলেন সকলেই। বিশেষতঃ আনন্দিত হলেন অনুরাগিণীরা, মুগ্ধা রমণীরা, এবং কন্যারা। কারণ, মেঘেন্দ্রবর্ণ একটি সুন্দর-কান্তি কমনীয় কিশোরের বাস্তবতম অভিলষনীয়তম দর্শন তো মিলবে, সুলভেই তো মিলবে, বাধা তো আর কেউ দিতে আসছে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও তো নির্বাপিত হবে একটি ঐ মন-শিরশিরে কুটকুটে উৎকণ্ঠা। তাই হবে।

৪৫। শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রেখে তাঁকে ঘিরে বসলেন ব্রজরাজাদি সকলে। তার পরে বসলেন ব্রজরাণী। তার পরে সখীরা, মাতার নিকটস্থা কুমারীরা, শাশুড়ীর নিকটস্থা বধূরা। মণ্ডলের বাইরে বসলেন অপরাপর গোপেরা; গোপেদের বাইরে ধনুকধারী রক্ষিগণ; রক্ষীদের বাইরে ধেনুগণ। ধেনুদের নিকটে রইলেন মহাবীর নবীন অস্ত্রধারিগণ।

৪৬। মণ্ডলীব্যূহ রচনা করে তাঁদের মধ্যে চলতে লাগল কালিয় মর্দন নিয়ে নানান খুঁটিনাটি কথা। ঘটনার বিচিত্রতা, বৈচিত্র্যের চারুতা, চারুতার গরিমায় নানান্ বিচিত্র কথা। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অর্দ্ধেক রাত, স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে নেমে এলেন নিদ্রাদেবী। কিন্তু দৈবের এমনি খেলা! সেই রসময় সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে দেখতে অনুরাগের ইসারায় নিমেষ হারাচ্ছে বধূদের ও কুমারীদের নয়ন; যখন তাঁরা নির্বাধে অনুভব করছেন চাক্ষুষ ও মানসিক সম্ভোগ; চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মুখ্যা সখীদের নয়নে যখন সীমা ছাড়িয়ে চলেছে নিভৃত উৎসব; তখন দুজনের মধ্যে প্রেমের পূর্ব্বাঙ্কুর জেগে উঠেছিল বলেই হোক্ অথবা আকস্মিক শুভযোগ বশতঃই হোক্, রাধাকৃষ্ণের উভয়েরই নয়নে এল দর্শনের লালসা, এবং লালসার সমরূপ সমুৎকণ্ঠা। কণ্ঠ তুলে কথা কইতে চাইল যেন আনন্দের নিবিড়তা। অকস্মাৎ দুজনেরি মুখ দুজনেরি দিকে ফিরল। অকস্মাৎ প্রকাশ পেল·· চাতুরক্ষিক এক অক্ষিকমল-খেলা। সে খেলায়,—

রাধার দিঠি এগিয়ে আসে, আর কৃষ্ণের দুলে ওঠে দৃষ্টিপাত। খঞ্জন-পুচ্ছের আঘাত লেগে ও কি তবে কেঁপে উঠল পদ্মফুলের রাশ?

কৃষ্ণের দিঠি এগিয়ে আসে আর রাধার কটাক্ষ ঝিমিয়ে যায়। পদ্মফুলের আঘাত লেগে ও কি তবে ভেঙ্গে গেল রতিপতির নীলকমলী শর?

৪৭। মূর্চ্ছা যায় যেন মূর্ত্তিমান একখানি মুহূর্ত্ত, মনের চোখে আঁধার নামিয়ে আনে অনুরাগ-ফুলের পরাগ। অনুভব করেন কৃষ্ণ, অনুভব করেন রাধা। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীদের হৃদয়েও অনুমান বলে ওঠে—বৃষভানুনন্দিনীতে নতুন ভালবাসা দেখছি কৃষ্ণের।

এমন সময়, কেউ কেউ তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, দু-একজন বা তখনও জেগে জেগে কৃষ্ণের কথাই কইছেন···হঠাৎ সমুত্থিত হল এক অশুভ চীৎকার···সর্বনাশ হয়েছে সর্বনাশ!

৪৮। শোনা মাত্রই বিরাট বিহ্বলতায় নিদ্রা ভুলে শয্যা ত্যাগ করে উৎকর্ণ হয়ে লাফিয়ে উঠল ধেনুর দল। কি হয়েছে, কি হয়েছে প্রশ্ন করলেন আতঙ্কিত গোপ-প্রধানেরা। হুঁ হুঁ করতে করতে নিদ্রা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন নিদ্রালেরা। ভয়ে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কুলবধূরা, কুলকন্যারা। এবং শ্রীব্রজপুরপুরন্দরনন্দনও তখন সপ্রণয় গাম্ভীর্যে সকলের প্রতি আশ্বাস বিতরণ করতে করতে বলে উঠলেন—

ভয় করবেন না, ভয় করবেন না। কিন্তু মা ভৈঃ শুনলেই মন থেকে তো আর এক মুহূর্ত্তে মুছে ফেলে দেওয়া যায় না দুশ্চিন্তা? একদল তাই বলে উঠলেন—তবে কি তীর-পথ ধরে আবার ফিরে আসছে কালিয়?

আর একদল বললেন—নিশ্চয়ই তাই। অপমান যা সয়েছে তাতে তো প্রচণ্ড ক্রোধ হবারই কথা।

আর একদল বলে উঠলেন—না হে না, বুনো হাতীর দল বোধ হয় ক্ষেপে ছুটে আসছে। গণ্ড-শৈল বেয়ে মদধারা ঝরছে। গন্ধ পাচ্ছ না?

৪৯। তর্ক-বিতর্কের মধ্যপথে অকস্মাৎ ঘোষণা হল, দাবানল! দাবানল!···নিবারণের উপায় নেই; নিজে যে বিনষ্ট হয়ে নিবে যাবে এমন লক্ষণও নেই।

উদ্‌ঘোষণার নিদারুণতায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর। সহসা তাঁর স্মৃতিপথে সমুদিত হল মহর্ষি গর্গের বাণী। অতএব কালবিলম্ব না করে কালিয়-মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বললেন—রক্ষা কর বৎস, রক্ষা কর। একেশ্বর ব্রজভূমিকে দহন করতে করতে এগিয়ে আসছে আরণ্য মহাবহ্নি। নির্ব্বাণের কোনো উপায় নেই। তুমি ছাড়া এর উপশম হবে না। এর ধ্বংসই আনবে কল্যাণ।

৫০। জনক, জননী, পরিজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইলেন শ্রীকৃষ্ণের মুখের পানে। শ্রীমুখ থেকে শুধু বেরোল, ভয় করবেন না।

মা ভৈঃ বাণীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। অন্য বনে জ্বলে উঠতে পারে দাবানল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে কেমন করে সম্ভব হয় দাবানল? সবই সম্ভব, যদি স্বয়ং প্রভাবিনী হন সর্ব-চমৎকারকারিণী লীলাশক্তি। তাই শ্রীমাধব এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন,—দাবানল। শুকনো গাছগুলোর সারা গায়ে আগুন লেগেছে। চট চট করে বিকট আওয়াজও হচ্ছে, কিন্তু গাছগুলো মরছে না, তাদের পাতাগুলো কেবল পুড়ছে; ছাই হয়ে যাচ্ছে চারদিকের ঘাস। ত্রস্ত হয়ে উঠছে রুরু রঙ্কু প্রভৃতি মৃগকুল। তারা দৌড়চ্ছে আর দেখছে··দূর থেকে দেখছে··দাবানলের শিখা লেহন করছে আকাশ।

৫১। দাবানল দর্শন করে শ্রীমাধব স্বগত চিন্তা করতে লাগলেন—ধূম-ধ্বজের মহাধূম আকাশ ছুঁয়েছে, নামিয়ে আনছে পাখীদের। বন্ধুরা ব্যথা পাবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! করুণ···তরুশ্রেণীর এই পত্রহীন দশা! ভয়ে কান খাড়া করে ধেনুর দল; ওদের আর্ত্তধ্বনি বিদীর্ণ করছে কর্ণ। চতুর্দ্দিকে রেখা, পক্ষিশ্রেণী অন্ধ হয়ে উড়ছে। ভীতিক্রস্ত হরিণযূথ। কি করি? মেঘ থেকে যে বৃষ্টি নামবে বা নদী থেকে জল তু আগুন নেবানো হবে এমন সম্ভাবনা নেই; দেশ কাল বিবে অবসর নেই আমাদের; অতএব···চিন্তা করতে করতে শ্রীভগ অন্তর থেকে প্রাদুর্ভূতা হলেন এক অনির্ব্বচনীয়া ঐশ্বরী শ পলক ফেলতে না ফেলতে অগ্নিশিখাগুলিকে কেশগুচ্ছের মত করে পান করে ফেললেন দাবানল।

৫২। দরিদ্রদের মনোরথের মত জন্মাতে না জ প্রণষ্ট হয়ে গেল বন-বহ্নি, হতভাগ্যদের বৈভবোদয়ের মত লাগতে না লাগতেই বিগলিত হয়ে গেল বন-বহ্নি। সে চি হল না বৈদ্যুৎ বহ্নির মত। অদৃশ্য হয়ে গেল স্বপ্নদৃষ্টের মত, মত, যাদুকরের মুখের ভাষার মত। লজ্জাজনক হয়ে উঠল সক বলাবলি করতে লাগলেন সকলে—কি আশ্চর্য, আমর সত্যিই প্রমত্ত হয়ে গিয়েছিলাম? বকছিলাম···দাব দাবানল?

৫৩। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। প্রস্থান ক বিভা-বরণীয়া বিভাবরী। ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দরাজের আর ধরে না। প্রভার উদয়ের মত ব্রজপুরকে প্রমোদিত করতে, ব্রজবাসীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন। আর সাথে এলেন, যিনি তাঁর স্বজনকল্যাণ, যিনি তাঁর স্বকুলভূষণ, লীলার যিনি আধান, বহু শোভার যিনি নিধান, যিনি আ সার, যিনি সর্ব-সৌভাগ্যের মূল।

৫৪। ব্রজরাজ চলে গিয়েছিলেন ব্রজনগরী থেকে; সারারাত ব্রজনগরীর দশা হয়েছিল প্রোষিতভর্ত্তৃকার মত ব্যথা ব্রজরাজ যেই ফিরে এলেন, অমনি তিনিও ফিরে গেলেন তাঁর রূপরাগ। [ক্রম

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে
কালিয়দমনো নাম
নবমঃ স্তবকঃ

অভিযান

শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়

আঁধারের পানে মোরা অভিযান করিয়াছি আলো নিয়ে,
আসুক ঝঞ্ঝা প্রলয় তুফান ভয়াল ভ্রুকুটি নিয়ে।
ডরিব না মোরা দলে পিষে যাব বাধা-বিপত্তি সব,
আলোকের গান গাহিয়া চলিব এক হয়ে মোরা সব।
আঁধার রাজ্যে জ্বালিব প্রদীপ কাঁপিয়ে সভয়ে কালো,
আলোর পরশে পালাবে সকল জঞ্জাল গ্লানি কালো।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৭

ওষুধের দোকানে ম্যানেজারের অভ্যর্থনা কি রকম হতে পারে ধীরাপদ সেটা আঁচ করেই এসেছিল। পর পর দু দিনের সঞ্চিত রাগ তাঁর। ভিতরে ভিতরে বেশ ধৈর্যচ্যুত বলেই বাইরে কিছুটা শান্ত দেখালো তাঁকে। ইস্কুল পালানো ছেলেকে আওতার মধ্যে পেয়ে কড়া মাষ্টার খানিকক্ষণ নির্বিকার থেকে যে-ভাবে ছাত্রের শঙ্কাটুকু উপভোগ করেন, অনেকটা তেমনি নির্বিকার। কিন্তু অপরাধী ছাত্রের ভাব ভঙ্গীতে উল্টে ঔদ্ধত্যের আভাস পেলে কতক্ষণ আর ধৈর্য থাকে? কর্মচারীদের এখানে যথেচ্ছ আনাগোনার নজির নেই, স্বেচ্ছাচারিতার তুল্য অপরাধ সেটা।

দু দিন বাদে এসেও বাবু একবার মুখ কাঁচু-মাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল না। প্রথম দিন না বলে কয়ে, ডিউটি কখন না জেনে চলে যাওয়াটাই বেশ একটা অপরাধ। গতকাল খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, দুপুরের দিকে একবার ঢুঁ দিয়ে চলে গেছে। তারপর আজকের এই বেলা পাঁচটায় হাজিরা। এখানে একসঙ্গে এতগুলো অপরাধের বিচার এর আগে আর তাঁকে কখনো করতেও হয়নি বোধহয়। তার ওপর কাউকে একটিও কথা না বলে চুপ চাপ ওই বেঞ্চিতে বসে থাকা!

শুধু ম্যানেজারই ক্রুদ্ধ নয়, ধীরাপদর মনে হল তার আচরণে কর্মচারীরাও বিস্মিত। রমেন হালদারের সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপে ওর প্রতি নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ, কাছে এসে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে চাপা অস্বস্তি।

খদ্দের বেশি ছিল না। আর একটু হালকা হতেই স্থূল-বপু ম্যানেজার কাছে এসে দাঁড়ালেন।—এই যে বাবু, আপনি এসে গেছেন দেখছি। কাজ করবেন তা হলে?

এর পরেও উঠে না দাঁড়ানোটা ধীরাপদর ইচ্ছাকৃত নয়। মজার আভাস পেলে মজা দেখাটা বহু কালের অভ্যাস। ঘুরে বসে নিরীহ চোখ দুটো তাঁর ব্যঙ্গ-তপ্ত ভারী মুখখানির ওপর স্থাপন করল শুধু।

ঘন মেঘের সঙ্গে বর্ষানো ঠাণ্ডা হাওয়া যোগ হলে যা হয়। ম্যানেজার ফেটে পড়লেন। কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া-চুল মাথাটা শূন্যের ওপর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে তাল ঠুকতে লাগল। গোল চোখ দুটো ড্যাবডেবিয়ে উঠল। এটা কোনো মাতুল সম্পর্কিত বিশ্রামের জায়গা নয়, বেঞ্চিতে বসে দেখার জন্যে থিয়েটারের ষ্টেজও নয়, এখানে নিয়ম কানুন বলে কিছু কথা আছে, এখানে ঘড়ি বলে একটা জিনিস আছে, এখানে ডিউটি বলে একটা ঝামেলা আছে, ওর মত লোক দিয়ে এখানে কাজ চলবে না সেটা আজ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন, বেঞ্চিতে বসে হাওয়া খেতে হলে গড়ের মাঠ এর থেকে ভালো জায়গা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আরো চলত হয়ত কিছুক্ষণ। কিন্তু ধীরাপদ এক কাণ্ড করে বসল। এখানে ওর জোর সম্বন্ধে অমিতাভ ঘোষের গতকালের আশ্বাস বা চাকরির কথার প্রতিক্রিয়া কিনা নিজেও জানে না। প্রথম পশলার পর দম নেবার জন্য ম্যানেজার একটু থামতেই হাত দিয়ে বেঞ্চির খালি জায়গাটা দেখিয়ে নিরুদ্বেগ আপ্যায়ন জানালো, বসুন—।

ম্যানেজারের গোল চোখ দুটো ওর মুখের ওপর থমকালো। সেই চোখে কালোর থেকে শাদার অংশ বেশি। ওদিকে কর্মচারীদেরও এক-একটা চকিত চাউনি।

সত্যিই ভদ্রলোক বসবেন আশা করে বসতে বলেনি ধীরাপদ। যে জন্যে বলেছে তা সরস। বেশ ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট করেই বলল, আমার কাজের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখানে বসে নাটক দেখব, কি হাওয়া খাব, কি আর কিছু করব তার দায়ও বোধহয় আপনার ঘাড়ে পড়বে না।

বলার ধরনে উষ্মা না, বিদ্রূপ না, বরং হালকা প্রীতির সুরই ছিল। তবু নির্বাক প্রতিক্রিয়াটুকু উপভোগ্য। ম্যানেজারের দুই চোখের শাদা অংশ আরো একটু বিস্ফারিত, কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই বিভ্রম আর সেই বিশ্লেষণ।

হুঁস ফিরতে ত্বরিত প্রস্থান। একেবারে ডিসপেনসিং রুমের ওধারে। ব্যাপারটা ঠিকমত ভেবে দেখার জন্য আড়াল দরকার বোধহয়। খানিক বাদে কাজে বেরিয়ে এলেন যখন তখনো গোটা মুখে আহত গাম্ভীর্য। কর্মনিয়ন্ত্রণের স্বর ও সুর থমথমে মৃদু। কাজ চলছে। লোক আসছে, যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও পরিবেশ আর জমজমাট নয় তেমন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একটা নীরবতা থিতিয়ে আছে, যার দরুন খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না কেউ।

ধীরাপদও না। ভদ্রলোককে আদৌ অপদস্থ করার ইচ্ছে ছিল না। লোকটি কাজ জানেন, নিজের কাজ ছাড়া অন্য সকলের কাজ আদায় করাও কাজ তাঁর। দরদ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেন বলেই মেজাজ বিগড়েছিল। অবশ্য মেজাজ এমনিতেই একটু চড়া। কিন্তু তাঁর দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধীরাপদর

অপরাধ স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়েই পড়ে বই কি। অথচ ওটুকু না বলে উপায়ও ছিল না, আত্মরক্ষার তাগিদে বলা।

ম্যানেজার আপাতত এখানকার কর্ত্রীটির আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন বোধ হয়। সে আসার আগে ধীরাপদ আজকের মত চাকরি-পর্ব শেষ করে সরে পড়বে কিনা ভাবছে। সেদিন রাতে লাবণ্য সরকার তাঁর হাতে ওকে সঁপে দিয়েছিল সে কথা মনে হতে আবারও না বোঝাপড়ায় এগিয়ে আসেন ভদ্রলোক।

আবারও এলেন বটে, তবে বোঝাপড়া করতে নয়। মুখভাব শুকনো আর বিব্রত। জানালেন, বড় সাহেব টেলিফোনে এক্ষুনি একবার ওকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।

বড় সাহেব মানে হিমাংশু মিত্র। দোকানসুদ্ধ কর্মচারীর কাছে এ-ধরনের আহ্বান অভিনব বিস্ময়। একটু আগেই ম্যানেজারের সঙ্গে যে বচন-বিনিময় হয়ে গেছে, তেমন চতুর হলে ধীরাপদর এরপর মুখে নিস্পৃহ গাম্ভীর্যের পালিশ চড়িয়ে উঠে আসার কথা। তার বদলে ও নিজেও হকচকিয়ে গেল।

একটা নীরব প্রহসনের মধ্যে নীরবে গাত্রোত্থান।

বড় সাহেব ডাকলে ট্যাক্সিতে ছোটার রীতি জানে না, ধীরাপদ ট্রামে উঠল।...এই ডাকের পিছনে চারুদির তাগিদ বোধহয়। অমিতাভ ঘোষও বলে থাকতে পারে। বলবে বলেছিল। ধীরাপদর হাসি পাচ্ছে। ভাত নাকি পেট খোঁজে না, ওর বেলায় তাই খুঁজছে যেন।

মানকে নিচেই ছিল। এক গাল হেসে জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে আনত হল। বাবু ভালো আছেন? চলুন, ওপরে চলুন, বড়সাহেব ঘরেই আছেন—আপনি এলে সটান নিয়ে যেতে বলেছেন।

ধীরাপদ সিঁড়ির দিকে এগোলো। মানকে সবিনয়ে অনুগামী। আপ্যায়নের বিনিময়ে একটা কুশল প্রশ্ন করা উচিত, ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, তুমি ভালো তো?

বিগলিত। ছিচরণের 'আশীব্বাদে' ভালই বাবু। গলার স্বর নামল একটু। আপনি চলে যেতে কেয়ার-টেক বাবু সেদিন আর আমাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, দোষ তো আসলে তেনারই আপনি এ-বাড়িতে থাকতে পারেন বলে তেনাকে সেদিন ঘাবড়ে দিতে বাসনা করে ছিলেন, তাই না বাবু? খুব জব্দ—

হি-হি শব্দে চাপা হাসি। বড়সাহেবের সামনে উপস্থিত হতে চলেছে মনে মনে সেই প্রস্তুতির একটু অবকাশও পেলনা ধীরাপদ। বাসনা করা শুনে হেসে ফেলল। মানকের এই স্ফূর্তিও খুব স্বতোৎসারিত মনে হল না। ও যথার্থ কি 'বাসনা করেছে' এই স্বল্প সুযোগেও মানকের সেটুকুই উপলব্ধির চেষ্টা হয়ত।

ওপরে উঠে আজ আর বাঁয়ে নয়, ডাইনের অন্দর মহলে এনে হাজির করা হল তাকে। একটা বড় ঘরের দোর গোড়ায় বিনয়-নম্র মূর্তিতে কেয়ার-টেক বাবু দাঁড়িয়ে। প্রথম তৎপর আহ্বান তারই। আসুন, সাহেব ভিতরে আছেন।

সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে এলো। অন্দর মহলের বসবার ঘর এটি। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আরো গোটাকতক ঘরের আভাস। এ-ঘরে দামী সোফা সেটি, ডেক-চেয়ার, পুরু গদীর সাময়িক বিশ্রাম শয্যা, দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং ছবি।

হিমাংশু মিত্র ইজিচেয়ারে পা ছেড়ে দিয়ে খবরের দেখছিলেন। কাগজ সরালেন। বোসো।

ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর থেকে পাইপটা নিয়ে চাপলেন। কেয়ার-টেক বাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অগ্নিসংযোগ করে দিল। পাইপ ধরতে একবার তিনি তার তাকালেন শুধু। সেটুকুই নির্দেশ কিছু, সঙ্গে সঙ্গে কেয়া বাবুর প্রস্থান।

ধীরাপদর অস্বস্তি এক ধরনের, এইটুকু থেকে মনোভা নিতে আর এ-রকম আনুগত্য রপ্ত হতে কতদিন লাগে?

তুমি কাজের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছ শুনলাম...

অমিতাভ ঘোষ নয়, চারুদি তাহলে চারুদি ঘুরিয়ে ধীরাপদ নিরুত্তর। নীরবতা নিরাপদ।

কাজের জন্যে চিন্তা নেই—হিমাংশু মিত্র অত্যুৎসাহের রাশ ট মত করে বললেন, একবার কাজে লাগলে কাজের শেষ আমাদের মেডিকাল হোম, ফ্যাক্টরী—সব দেখেছ?

ঘাড় নাড়ল, দেখেছে।

হিমাংশু মিত্র ভাবলেন একটু। ওর যোগ্যতার দিকটাই করার চেষ্টা সম্ভবত। এতদিন কি করেছে না করেছে আবারও প্রশ্ন দুই একটা। কবিরাজি ওষুধ আর বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখে শুনে হেসে মন্তব্য করলেন, ওই বিদ্যে এখানেও কাজে লাগতে পা তবে তার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা আর কিছু পড়াশুনা দরকার।

এটা সেটা দু'চার কথা আরো। কথা উপলক্ষ মাত্র। মো চশমার ওধার থেকে ঈষৎ কৌতুক প্রচ্ছন্ন একটা যাচাইয়ের দৃ সরাসরি ধীরাপদর মুখের ওপর পড়ে আছে সেই থেকে। শে জানালেন, মাসের এই বাকি বারো চৌদ্দদিন মেডিক্যাল হোমে বসতে হবে ওকে। সেখানে কিভাবে কাজ চলছে না চলছে স বুঝে নেওয়া—ব্যবসা আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশান দুইই। এই ব্যাপা মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা নির্দেশ। ওদিকটা মোটামুটি জানা হয়ে গেলে আগামী মাসে গোড়া থেকে ওকে ফ্যাক্টরীতে আনা হবে বলে আশ্বাস দিলেন আসল কাজ সেখানেই, তবু ব্যবসায়ের গোটা পরিস্থিতি চোখের ওপর থাকা দরকার।

লেবার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছ কখনো? আই মিন, পার্টি-টার্টি করেছ?

যেন প্রশ্ন নয় কিছু, হঠাৎ মনে এলো। ধীরাপদ মাথা নাড়ল, করেনি।

তাহলে কি আর করলে, কাজ না থাকলে ওটাই তো কাজ। পাইপ চাপা মুখে হাসির আভাস।—সব ফ্যাক্টরীতেই কিছু না কিছু লেবার প্রবলেম লেগে থাকে...বাই দি বাই, প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

কতবার ঘাড় নাড়বে ধীরাপদ? প্রেসের কথায় প্রথমেই গণুদার মুখখানা উকিঝুঁকি দিল। নতুন পুরনো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর প্রয়োজনে গণুদাই যথেষ্ট মুরুব্বি, কিন্তু এখানে তার উল্লেখও একেবারে নির্বোধের মত হবে। জবাব দিল, যোগাযোগ করে নিতে পারি।

কি করে? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন।

—কোম্পানীর নামের জোরে আর বিজ্ঞাপনের জোরে। ক্ষণিকের দ্বিধা, তাছাড়া গোড়ার দিকে অমিতবাবু যদি একটু সাহায্য করেন, তিনি প্রেস-রিলেশান মেনটেন করতেন শুনেছি···।

ধীরাপদর মনে হল, জবাবের প্রথম অংশটুকু যুৎসই হয়েছিল, শেষের কথায় দৃষ্টির স্পষ্ট পরিবর্তন।—তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে ?

কাল ক্যান্টিনে আলাপ হয়েছিল—

সে প্রেস-রিলেশান মেনটেন করত কে বলল তোমাকে ?

এবারে ? এবারে কোণঠাসা। ধীরাপদ মনে মনে নিজেকে রজক-পালিত জীব বলে গালাগাল করে নিল প্রথমে। ভদ্রলোকের এমন সুগভীর অভিব্যক্তির মুখোমুখি বসে কিছু বানিয়ে বলাও শক্ত। জবাব দিল, চারুদি গল্প করেছিলেন···

চারুদি কি গল্প করেছিলেন সেটা যেন ওর মুখে লেখা, আর হিমাংশু মিত্র নীরবে কয়েক মুহূর্ত তাই পাঠ করলেন। ধীরাপদর ফাঁড়া কাটল কি একটা ফাঁড়া তৈরি হয়ে থাকল বোঝা গেল না। পাইপটা হাতে নিয়ে হাসলেন তিনি। লঘু কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তার সাহায্য পাবে আশা করছ ?

অর্থাৎ, অমিত ঘোষ যদি সত্যি সাহায্য করে ওকে সেটা যথার্থ হাতযশ বলতে হবে। ধীরাপদর মুখ সেলাই এবারে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষাৎ-পর্ব শেষ। হাতের পাইপ দাঁতে গেল আবার।—আচ্ছা, এ-সব পরে ভাবা যাবে, এ-মাসটা মেডিক্যাল হোম অ্যাটেণ্ড করো। কোনো অসুবিধে হলে বা কিছু বলার থাকলে আমাকে জানিও, কাম স্ট্রেইট—গুড বাই।

লঘু পদক্ষেপে সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে গেলেন। সেদিকে চেয়ে ধীরাপদ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তাঁর শেষের এই আন্তরিকতায় কোনো ইঙ্গিতের আভাস নেই, তবু কথাগুলি বিদ্রূপের মত লাগল ধীরাপদর কানে।

মেডিক্যাল হোম।

আজ আর সেখানে না ফিরলেও চলত। কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হত না। তবু বাইরে এসে আবার সেখানেই ফেরার তাগিদ অনুভব করছিল ধীরাপদ। খোদ বড় সাহেবের পরোয়ানা জাহির করার জন্যে নয়। কিন্তু এই পরোয়ানার জোর ছিলই একটু। কাল আবার ম্যানেজার আর কর্মচারীদের নাকের ডগায় সংয়ের মত বসে থাকার চেয়ে আজই গিয়ে দাঁড়ানো ভালো। হিমাংশু মিত্র লাবণ্য সরকারের সঙ্গেই আলোচনা করতে বলেছেন।

রোগীর ভিড় এড়ানোর জন্যে বেশ খানিকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে একটু রাত করেই দোকানে এসে ঢুকল। দোকানের ভিড় কিছুটা হালকা তখন, বেঞ্চিতে রোগীর সংখ্যাও নামমাত্র। ম্যানেজার এক-নজরে যতটুকু দেখা সম্ভব দেখলেন, তার পর কাজে মন দিলেন। কর্মচারীরা কাজের ফাঁকে ফিরে ফিরে তাকালো। রমেন হালদার তার সামনের খদ্দের ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। প্রত্যাশার দৈন্য তেমন কিছু নেই বলে এদের এই দৃষ্টির সামনে ধীরাপদর অস্বস্তি।

রোগী ডাকতে এসে লাবণ্য সরকারও দেখল।

সেই দেখা থেকে ধীরাপদর অনুমান, ম্যানেজার তাঁর কাছে যতটুকু নিবেদন করার করেছেন।

শেষ রোগীটি বিদায় হবার পর আলোচনার জন্যে ধীরাপদকে এগোতে হল না, তারই ডাক পড়ল। বেয়ারা এসে মেমসাহেবের তলব জানালো। ধীরাপদর নিজে থেকে সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্কোচ গেল।

নিজের চেয়ারে লাবণ্য সরকার গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। একটু অবসন্ন। এতক্ষণের ধকলের পর এটুকু শ্রান্তি স্বাভাবিক। টেবিলের ওপর ষ্টেথসকোপটা সাপের মত কুণ্ডলী পাকানো। একধারে সেই মোটা ব্যাগটা।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে লাবণ্যর শিথিল দৃষ্টি ওর মুখের ওপর আটকালো। শিথিল বটে, আবার গভীরও। মুখ দেখে তার আজকের ব্যবহারের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা, লক্ষণ দেখে রোগ বোঝার চেষ্টার মত।

কি ব্যাপার বলুন তো, ম্যানেজারকে নাকি কি সব বলেছেন শুনলাম···

সামনে দুটো খালি চেয়ার, অথচ বসতে বলেনি। আগের দিনও বলেনি। ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা না-ও হতে পারে, অধস্তনদের এখানে এসে বসাটা রীতি নয় হয়ত। কিন্তু আজ ধীরাপদর চেয়ার দুটোর এই শূন্যতার বিদ্রূপ বরদাস্ত হল না। একটা চেয়ার টেনে বসল, আর একটা চেয়ারের কাঁধে একখানা বাহু ছড়িয়ে দিল। তারপর হাসিমুখে জবাব দিল, ম্যানেজারবাবু হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু আমি তাঁকে একটুও অসম্মান করতে চাইনি, আমার কাজের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে না এই শুধু বলেছি।

লাবণ্য সরকার তার বসাটা লক্ষ্য করেছে, অন্য চেয়ারে হাত ছড়ানো লক্ষ্য করেছে, আর জবাবের অকুণ্ঠ ভঙ্গীও লক্ষ্য করেছে। এরই সামনে সেদিন ফ্যাক্টরীর কণ্ট্রোল রুমে অমিতাভ ঘোষের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে নিজের বিড়ম্বিত পরিস্থিতিটাও এরই মধ্যে ভোলেনি বোধহয়।

আপনার কাজের দায়িত্ব কে নেবেন তাহলে?

তা তো জানি না। ধীরাপদকে যেন জব্দ করা হয়েছে, মুখে চোখে সেই রকমই সরল ব্যঞ্জনা। আপনিই নিন না?

প্রতিক্রিয়া যাই হোক, ওজন না বোঝা পর্যন্ত কর্ত্রীস্থানীয়া মহিলাটির সংযমের ওপর দখল আছে। হিমাংশু মিত্র টেলিফোনে ওকে বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন ম্যানেজার সেই খবরও জানিয়েছেন। কিন্তু প্রথমেই সে প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করলে পাছে মর্যাদা দেওয়া হয় তাই ম্যানেজারের অভিযোগটাই প্রথম উত্থাপন করেছিল।

মিঃ মিত্র আপনাকে ডেকেছিলেন কেন?

প্রশ্নটা চাপা আনন্দের কারণ। জবাব দিল, এখানে কিভাবে কাজ চলছে সব দেখে রাখতে বললেন, আর আপনার সঙ্গেও আলোচনা করতে বললেন—

কি আলোচনা?

কি দেখব, কি ভাবে কাজ শুরু করব সেই সম্বন্ধে, মাসের এই বাকি ক'টা দিন মাত্র সময় দিয়েছেন।

তারপর কী?

তারপর অন্য কাজ দেবেন বোধহয়।

হেঁয়ালীর মধ্যে পড়ে লাবণ্য সরকারের মুখে বিরক্তির কু স্পষ্ট হয়ে উঠল এবারে। বলল, কি জানি, কি ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।

সেটুকুই কাম্য ছিল ধীরাপদর। নিজের সহজতায় পরিতুষ্ট। মহিলার বিরক্তির জবাবে নিরীহ কুণ্ঠা প্রকাশেও নেই, বুঝতে না পারার অপরাধ যেন ওরই। তারপর খ একটা প্রস্তাব করল, টেলিফোনে মিঃ মিত্রর সঙ্গে একবা বলে নেবেন?

কথা এরপর বড়সাহেবের সঙ্গে বলবে কি করে তালই জানে। সে-কথা যে ওর দিক থেকে খুব হবে না সে-সম্বন্ধেও প্রায় নিঃসংশয়। কিন্তু প্রস্তাবনার অ প্রতিক্রিয়া রসোত্তীর্ণ। কি করবে না করবে সেটা এখ কারো মুখে শুনে অভ্যস্ত নয়, কয়েক মুহূর্তের নিষ্পলক গাম্ভীর্যে লাবণ্য সরকার সেটুকুই ওকে ভালো করে বুঝিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে ষ্টেথসকোপ ফাঁকে আবারও তাকালো।

সকলের চোখের ওপর দিয়ে সকলের আগেই ধীরাপদ দে ছেড়ে বাইরে চলে এলো। ফুটপাথ ঘেঁষে লাবণ্য সরকারের গাড়ি দাঁড়িয়ে, কোম্পানীর সেই ছোট স্পেশাল ওয়াগন। ধী পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। এভাবে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হ হয়ত, কিন্তু বসে থেকেই বা করত কি। লাবণ্য সরকার ছ আর যারা আছে সেখানে, এই নাটকের পর তাদের অন্য খানিকটা রিলিফ দরকার। কাল আবার আসতে হবে চিন্তাও অলক্ষ্য অস্বস্তির মত। এসে করবে কি···।

কালকের কথা কাল।

আজকের সমস্ত ব্যাপারটা রসিয়ে রোমন্থন করার ম্যানেজারের মুখ বন্ধ করা, হিমাংশু মিত্রর ডেকে পাঠানো, ল সরকারের কর্ত্রীত্বের মুখোমুখি দাঁড়ানো। পরে যাই হোক, অন্তত সকলকে ভাবিয়ে আসতে পেরেছে—এই ক'টা দিনের অব জবাব দিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু স্নায়ুর প্রগলভতা হবার সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টির বদলে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য উঁকিঝুঁকি দি কোথায়। মনে হচ্ছে, আগাগোড়াই ছেলেমানুষি করে এ আসলে মনের অগোচরের একটা সুপ্ত বাসনায় আঁচ লেগে সেই আঁচে পুরুষকারের ওপর প্রলোভনের রং ধরেছি তাই নিজেকে এভাবে জাহির করার তাগিদ। নইলে বা ওকে অবহেলা দেখাতে গেছে, আর কার সঙ্গেই বা রেষারিষি।

আগে পথ চলতে প্রায় প্রতিটি লোকের মুখের রেখা ওর চো পড়ত। সেই রেখা ধরে প্রবৃত্তি-বৈচিত্র্যের অনেক হিজিবিজি নব আঁকত। এঁকে নিরাসক্ত দ্রষ্টার মত দেখত চেয়ে চেয়ে। চারু সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এই দেখার আনন্দে ছেদ পড়েছে আজ নতুন সূচনার চতুষ্পথে এসে সকলকে ছেড়ে ধীরাপদর নিজে দিকেই চোখ গেল।

ধীরাপদ থমকালো একটু।

—আজও একটু জ্বর উঠেছে আবার! থার্মোমিটার লাগিয়েছিলেন বুঝি? আমি একটা ভালো প্রেসক্রপশান দিতে পারি, কলো করবেন? থার্মোমিটারটা রাস্তায় ফেলে দিন, তারপর যেমন খুশি সেই ভাবে চলুন, যা খুশি তাই খান, অসুখ বলে একটা কথা আছে তাই ভুলে যান। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা যা বললাম করে দেখুন, খারাপ কিছু হলে দায়িত্ব আমার। ডাঃ লাবণ্য সরকার রোগী সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত।

—ওষুধটা নিয়মমত খাননি? কেন? ঠেলে উঠে আসতে চায়! আসেই যদি সে ভাবনা তো আমার, আপনি খাবেন না কেন? দেখি হাত। সাড়া নেই কিছুক্ষণ, হাত দেখার পরে বোধহয় বুক দেখার নীরবতা। ওষুধ তো দেব, কিন্তু দিয়ে লাভ কি, গোলাপ জল আর লিমনস্কোয়াশ মিশিয়ে তো আর ওষুধ দিতে পারি না! বেল টিপে বেয়ারা তলব, একটা ইনজেকশান এনে দেওয়ার নির্দেশ।—ওষুধ বদলে দিচ্ছি, আর একটা ইনজেকশান দেব, কিছু লাগবে না, ভয় নেই। এই ওষুধটা ওঁকে দিনে তিনবার নিয়ম করে খাওয়াবেন, রোগিণীর স্বামীর প্রতি গম্ভীর নির্দেশ, আর দু'বেলা খাবার আগে এই টনিক দু'চামচ করে—ক্ষিদেও হবে, ওজনও বাড়বে। এবারে অনিয়ম হলে ভয়ানক রাগ করব কিন্তু, দিনের পর দিন এভাবে ভুগলে আমার বদনাম না? রোগিণীর কারণে ডাঃ লাবণ্য সরকারের দুশ্চিন্তাভরা অভিযোগ।

—ঘুম হয় না? ভালই তো, অনেক সময় পাচ্ছেন দিব্বি। আমি তো নিজের জন্যে ঘুম না হওয়ার ওষুধ খুঁজছি। অনিদ্রা প্রসঙ্গে লঘু বিশ্লেষণ।—ঘুম না হওয়ার জন্য ততো ক্ষতি হয় না, যত হয় ঘুম হল না সেই চিন্তা থেকে। সদয় প্রশ্ন, ঘুম হচ্ছে না কেন, খুব ভাবেন বুঝি? আপনার আবার ভাবনা চিন্তা কি! পেট কেমন? ক্ষিদে? পিঠের সেই ক্রনিক ব্যথাটা একেবারে গেছে তাহলে? যা ভাবিয়েছিলেন···আচ্ছা, ঘুমের ওষুধও দিচ্ছি, কিন্তু আপনি চেষ্টা না করলে শুধু ওষুধে কিছু হবে না। রোজ সকালে উঠে খোলা বাতাসে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটতে হবে। মনোযোগী রোগীর প্রতি ডাঃ লাবণ্য সরকারের মুক্ত-বাতাসে প্রাতর্ভ্রমণের উপযোগিতা বিশ্লেষণ।

—আপনি দিনকতক এখন ঘুমোন দেখি বেশ করে, সব অবসাদ কেটে যাবে, আপনার শরীর ঘুম চাইছে। প্রেসার দেখেছিলেন শিগগীর? আচ্ছা আমি দেখে দিচ্ছি, ওই বেডএ যান। প্রেসার তো লো, কত বয়েস? তাহলে তো খুবই লো। তা' বলে ভাববেন না যেন, এই একটা রোগই সব রোগী পছন্দ করেন। ওষুধ যাই দিই আসল চিকিৎসা খাওয়া আর ঘুমোনো। ওষুধ আর ইনজেকশানের উল্লেখসহ ডাঃ লাবণ্য সরকারের রসনা-উসকানো খাদ্য-তালিকা বিস্তার।

—কি খবর? যেতে হবে···এক্ষুণি যাব কি করে, কাল সকালে যাব'খন···তাহলে তো মুশকিল, আচ্ছা রাত ন'টার পর যাব। কিন্তু এরই মধ্যে এত ছটফট করার মত কি হল, এই তো কাল দেখে এলাম! ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে মনে হচ্ছে? কার মনে হচ্ছে, আপনার না আপনার স্ত্রীর? ডাক্তার না দেখলে উনি সুস্থ হবেন না যখন যাব, কিন্তু ওই যন্ত্রটার অস্তিত্ব আপনার স্ত্রীর মাথা থেকে না তাড়ালে রোগ ছাড়বে না। ওটাই ওঁকে পেয়ে বসেছে—সিসটলিক দশ-বিশ উঠতে বসতে কমে বাড়ে, ওটা গোটাগুটি মানসিক একেবারে। আপনার বা আপনার স্ত্রীর মত অত যারা লেখাপড়া জানে না তারা ব্লাড-প্রেসারও জানে না। রক্তচাপ প্রসঙ্গে ডাঃ লাবণ্য সরকারের মন্তব্য।

ক্যাশ কাউণ্টারের ওধারে ডাক্তারের চেম্বার পার্টিশনের ঠিক পিছনটিতে ধীরাপদর টেবিল-চেয়ার। কান পাতলে ভিতরের প্রতিটি কথা কানে আসে। ধীরাপদ কান পেতে' শোনে। শুধু তাই নয়, এই একজনের চিকিৎসা-পর্ব শোনার প্রতীক্ষায় বসে থাকে রোজই। বিকেল ছ'টার পরের দু'তিন ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায় না। যে লাবণ্য সরকার কর্মচারীদের কাছে এমন, সে-ই যে আবার নিজের পেশার ক্ষেত্রে কেমন—নিজের কানে না শুনলে ধীরাপদ ভাবতেও পারত না। এমন চিকিৎসকের পসার হবে না তো কার হবে! আর যে-ক'টি চিকিৎসক আসেন তাঁরা শুধু চিকিৎসাই করেন। তাঁদের ওষুধের মতই নীরস তাঁরা। কিন্তু ডক্টরিং ইজ অ্যান্ আর্ট···চিকিৎসা চিকিৎসা-কলাও বটে। পেশার ক্ষেত্রে সেই কলা লাবণ্য সরকার ভালোমত রপ্ত করেছে। অবশ্য এর পিছনে প্রকৃতিগত আনুকূল্য আছে কিছু। আছে যখন তার ফলও আছেই। প্রকৃতির বশ নয় কোন্ মানুষ? তার ওষুধে রোগ না ছাড়লে কথায় ছাড়ে, কথায় না ছাড়লে হাসিতে ছাড়ে। ছাড়ুক না ছাড়ুক এই চিকিৎসা-কলাকুশলিনীর হাতে রোগী হতে সাধ যায়।

ওইখানে বসে বসে আর একটা আবিষ্কার করেছে ধীরাপদ। বার বার অল্প স্বল্প রোগের প্রতি রোগীর বেশ একটু মমতা আছে। শোক লালন করতে দেখেছে, এখানে এসে রোগ লালন করা দেখল। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সদয় মর্যাদা-লাভে বঞ্চিত মনে হলে আল-গোছের ছোটখাট একটা রোগ সংগ্রহ করে দেখো, মর্যাদা পাবে। তুমি যে ঘটা করে বিরাজ করছ সেই তুষ্টি উপলব্ধি করানোর দোসর পাবে।

লাবণ্য সরকার সেদিক থেকে অন্তরঙ্গ দোসর। প্রত্যেককে সে বিভিন্ন ভাবে মর্যাদা দিতে জানে, প্রত্যেকের জন্য বিভিন্নভাবে উতলা হতে জানে। সাধারণ চিকিৎসাক্ষেত্রে এ-যে কম জানা নয় সেটা ধীরাপদ এরই মধ্যে উপলব্ধি করেছে।

এই দু'তিন ঘণ্টা বাদ দিলে সারাক্ষণের ক্লান্তি। কাজ নেই বললেই চলে। অলস সময় যাপনে অনভ্যস্ত নয় সে। কিন্তু ছকে-বাঁধা কর্মচঞ্চলতার মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় আলস্যের বোঝা আর কখনো টানেনি। না চলে চোখ, না মন। সেকেণ্ড গুণে মিনিট গুণে ঘণ্টা পার করার মত। এখন যা-ও করছে প্রথম দুদিন তাও জোটেনি। কাউণ্টারে দাঁড়ানো ছাড়া আর কি করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে যিনি হদিস দিতে পারতেন, তিনি বিমুখ। পুরো সাত ঘণ্টার মধ্যে ম্যানেজার সাত বারও ওর দিকে তাকিয়েছেন কি না সন্দেহ। দুপুরের নিরিবিলিতে সেই রমেন হালদারই শুধু কাছে এসেছিল, কিন্তু বিস্ময়ে নিজেই কাঠো-কাঠো, সে আর ওকে কাজের হদিস কি দেবে।

দাদা আপনি যে সাংঘাতিক লোক দেখি, এমনিতে কিচ্ছুটি বোঝা যায় না!

কেন, কি হল আবার···। প্রচ্ছন্ন কৌতুকে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা ধীরাপদর।

কি হল! রমেন হালদারের বিস্ময় উপচে ওঠার দাখিল, ম্যানেজার কুপোকাত, টেলিফোনে বড়-সাহেবের তলব, তারপর চেম্বার থেকে কাল আপনি বেরিয়ে যাবার পর মিস সরকারেরও দেখি পিসিমা-পিসিমা মুখ। বলুন না দাদা, শুনব বলে সেই কাল থেকে হাঁসফাঁস করছি আমি—

ওর কৌতূহল জিইয়ে রেখেই ধীরাপদ কাজের কথায় আসতে চেষ্টা করেছিল।—এখানকার সব কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্ম পাছে তোমাকে চেয়ে বসি সেই রাগে অমন মুখ করে ছিলেন বোধহয়।

ছেলেটার বড় বড় দুই চোখ ওর মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে শেষে থেমেছিল।—যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন। সলজ্জ হাসি, কিন্তু এখানে কাজ-কর্ম বোঝার কি আছে আবার!

বলো তো দেখি কি আছে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওষুধ বেচা ছাড়া আর কিছু নেই। নিজের দোকান হলে দেখিয়ে দিতাম কত রকম প্ল্যান করা যায়।

নিজের দোকান বলেই ভাবো না।

এই দোকানকে! এও ঠাট্টা কিনা বুঝে নিতে চেষ্টা করল। —হুঁঃ, এর দশ ভাগের এক ভাগের কথাই ভাবতে পারিনে···। তারপরেই সমস্ত মুখে আলগা উত্তেজনা একপ্রস্থ, বড় আলো যেমন ছোট আলো ঢেকে দেয়, তেমনি একটা বড় আগ্রহের ছটায় রমেনের ছোট কৌতূহল চাপা পড়ে গিয়েছিল।—একটা দোকান করবেন দাদা? আজ থেকে ভাবলে একদিন না একদিন ঠিক হবে, আসুন না আমাতে আপনাতে ভাবি—

ওর নিজস্ব একটা দোকানের আকাঙ্খার কথা ধীরাপদ আগেই শুনেছিল। মাত্র এই কটা দিনের পরিচয়ে তাকেই সেই আকাঙ্খার অংশীদার করে নেবার চেষ্টা দেখে হাসি চেপেছে।

ভাবা যাবে, কিন্তু এখন আপাতত—

এখনই কে বলছে, এখন টাকাই বা কোথায়। কিন্তু এখন থেকে একটা প্ল্যান তো মাথায় থাকা দরকার। ওর প্ল্যানে তাকেই যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনার কারণও ব্যক্ত করেছে। আপনাতে আমাতে ভাবলে দোকান হবেই একদিন, আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমার অন্তরকম মনে হয়েছে, আপনি ঠিক এখানকার সকলের মত ইয়ে—মানে চাকরি-সর্বস্ব ধরনের নন্।

প্রশংসার জাল ছাড়িয়ে ধীরাপদর নিজের সমস্তায় পৌঁছনোর অবকাশ মেলেনি। ম্যানেজারের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রমেন মুখের আশার আলো এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গোমড়ামুখে কাউণ্টারের ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন অপ্রিয় লোকটার সঙ্গে অপ্রিয় নিষ্পত্তির অভিলাষই ছিল কিছু একটা, ম্যানেজার এসে পড়ায় বাধা পড়েছে।

যা-হোক কিছু কাজের হদিস শেষে লাবণ্য সরকারই দিয়েছে ধীরাপদকে। দিন দুই একটা লোককে এমন গো-বেচারীর মত বসে থাকতে দেখে নিজেই আবার ডেকেছিল। ডেলি সেলস্ রিপোর্ট স্টাডি করতে বলেছে, পুরনো রিপোর্ট দেখে এক-একটা সিজনে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ওষুধের পড়-পরতা চাহিদার ওঠা-নামার চার্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। এ-ছাড়া, স্টক্ না রাখার ফলে যে-সব প্রেসক্রুপশান রোজ ফেরত যাচ্ছে এখান থেকে, ত খসড়া তৈরি করতে পরামর্শ দিয়েছে—এ-রকম খসড়া থাকলে স্টক্ সম্বন্ধে ভাবার অনেক সুবিধে হয় নাকি।

আগের দিনের মত সেদিন আর আত্মাভিমানী সুপ্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয়নি ধীরাপদ। পথ চলতে চ দিকে তাকিয়ে সেই তৃপ্তির মোহে রিক্ততার দাহ দেখেছি লাবণ্য বসতে বলেনি, সে-ও চেয়ার টেনে বসেনি আ মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে, হাই তুলে সাত ঘণ্টা চক্ষুলজ্জা কিছুটা কাটল ভেবে মনে মনে একটু কৃতজ্ঞ করেছে, আর ফিরে এসে নির্দেশ মতই কাজে মন দি করেছে।

কিন্তু কাজ করলে এই বা কতক্ষণের কাজ। দু'ঘণ্ট না। ধীরাপদ এই সঙ্গে আরও একটা কাজ আবিষ্কার ওষুধের লিটারেচার পড়া, কোন্ কোন্ অসুখে কোন্ ওষু সেই ফিরিস্তি। সূক্ষ্মবিচারে অম্বিকা কবিরাজের কবিরা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তফাৎ নেই খুব। সূক্ষ্মতাটুকুই তফাত লাগে পড়তে, এই দেহযন্ত্রটি যেন অগণিত রোগ-তৈরীর বিশেষ। এত রোগ থাকতে মানুষ আবার নিরে কেমন করে!

কিন্তু তবু হাই ওঠে। পাঁচটার পর থেকেই ঘড়ির দিকে চোখ ছোটে, ছ'টা বাজতে বাকি কত। ফুটপাথ ঘেঁষে ওয়াগনটা এসে দাঁড়ালেই টের পায় এখন। নড়ে চড়ে ঠিক বসে। যেন এতক্ষণের শ্রান্ত প্রতীক্ষার পর ওরই দিনের কা লাবণ্য সরকার চেম্বারে ঢুকে পড়লে এক-একদিন উঠে এসে প্রতীক্ষারত রোগীর ভিড় দেখে যায়। ভিড় যত বেশি ততো যাত্রা দেখতে এসে অপরিণত মন বড় প্রোগ্রাম দেখলে খুশি হয়।

সেদিন ধীরাপদর দিনের কাজেও অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যের দেখা গেল একটু।

সবে বিকেল চারটে তখন। ম্যানেজার এসেছেন। কা কর্মতৎপরতার আভাস জাগেনি তখনো। ঝিমুনি কাটানোর ধীরাপদ বাইরে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। চুপচাপ দেখছিল আর ভাবছিল একটু চা খেয়ে আসবে কিনা।

কোথা থেকে ভুঁইফোঁড়ের মত এসে ফুটপাথ ঘেঁষে দা কোম্পানীর সেই ষ্টেশান-ওয়াগন, লাবণ্য সরকার যার এক আরোহিনী। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতে একটা ফাইলসহ হাতে সে-ই নামল। ধীরাপদকে দেখল একবার, তার সুষ্ঠু গাম্ভীর্যে পাশ কাটিয়ে দোকানে প্রবেশ করল।

গাড়িটা চলে গেল।

অসময়ে এই কর্ত্রীটির আবির্ভাবে দোকানের আর সকলে অ কিনা ধীরাপদর জানা নেই। এ-সময়ে সে এই প্রথম দেখল তাকে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে কি বলল, অনুমান করা গেল না। স সঙ্গে ম্যানেজার এবং আর সকলেরও মুখে চকিত ভাবান্তর এক লাবণ্য সরকার কয়েকটা ওষুধ চেয়ে নিয়ে ব্যাগে পুরল, তার ভিতরে ঢুকে গেল। ম্যানেজার কাউণ্টার থেকে বেরিয়ে এ নিজে হাতে চেয়ার আর বেঞ্চিগুলি ঠিক করে রাখলেন।

রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।

RP. 164-X52 BG

রেক্সোনা প্রোপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী

ইঙ্গিতে বেয়ারা আর একপ্রস্থ ঝাড়ামোছা করে দিয়ে গেল সেগুলো।

এই প্রচ্ছন্ন ব্যস্ততার মধ্যে ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকাটা বিসদৃশ। ধীরাপদ এগিয়ে এসে দেখে তার টেবিল চেয়ার লাবণ্য সরকারের দখলে। গম্ভীরমুখে ফাইল ঘাঁটছে, জায়গায় জায়গায় কাগজের নিশানা আঁটছে। এই ফাইলটাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। অন্য অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ান এসে যেতে পারেন ভেবেই হয়ত ওখানে বসেছে।

ধীরাপদ সরে এলো।

দশ মিনিটের মধ্যে ফুটপাথ ঘেঁষে আর একখানা গাড়ি এসে থামল।

হিমাংশু মিত্রর সেই গাঢ়-লাল গাড়ি।

বাজনার মত হর্ন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ দোকানটার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ। ব্যাগ আর ফাইল হাতে লাবণ্য সরকার বেরিয়ে এলো। হাসি হাসি মুখ, লঘু চরণে তৎপর ছন্দ। ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিতে হিমাংশু মিত্রর পাশে উঠে বসল সে।

রীতি নীতি ভুলে ধীরাপদ সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির দিকে এগোলো। লাবণ্য সরকারের পাশ থেকে দোকানের দিকে ঝুঁকে বড় সাহেব ইশারায় ওকেই ডাকছেন।

ইঙ্গিতে ড্রাইভারের পাশটা দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ, ওঠো।

কোথায় চলেছে, কি ব্যাপার, ধীরাপদ ভাবতেও পারছে না। ওকে সঙ্গে নেওয়াটা পূর্বকল্পিত নয় নিশ্চয়, কিন্তু চলল কোথায়? পিছনের কথা-বার্তা থেকে মনে হল, ব্যবসায় সংক্রান্ত কোনো কাজেই চলেছে। একটা ওষুধ নিয়ে আলোচনা, কাগজ-পত্র কি রেডি আছে না আছে সেই কথা দু-চারটে। ধীরাপদর কিছুই বোধগম্য হল না।

বুঝতে চেষ্টাও করল না। প্রথমে সহজ হয়ে বসতেই সময় লেগেছে, তারপর চকিতে চারুদির কথা মনে পড়েছে তার। চারুদির সেদিনের সেই প্রগলভ কৌতুক। ধীরাপদর ঘুরে বসে দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু নিরুপায়। ড্রাইভারের সামনের ছোট আয়নার ওপর চোখ পড়ল, পাইপ মুখে বড় সাহেব গাড়ির কোণে গা এলিয়ে বসে আছেন। লাবণ্যর পরিপুষ্ট কণ্ঠস্বর কান পেতে শোনার মত, ধীরাপদ রোজ শোনে। কিন্তু এখন শোনার মত কিছু বলছে না, টুকরো টুকরো কথা আর সংক্ষিপ্ত জবাব দুই একটা। কিন্তু সেও কি একটু বেশি পরিপুষ্ট লাগছে কানে, একটু বেশি মিষ্টি লাগছে!

—ধীরাপদ কাজকর্ম দেখছে ভালো করে?

হঠাৎ বড় সাহেবের হালকা প্রশ্ন। সেই থেকে সামনের দিকে চেয়ে মূর্তির মত বসে আছে দেখেও হতে পারে। প্রশ্ন ওকে নয়, প্রশ্ন পার্শ্ববর্তিনীকে, তবু এরপর সেই একভাবে বসে থাকা চলে না।

ধীরাপদ বিনয়-নম্র হাসি হাসি মুখ করে ঘাড় ফেরাল। এ-রকম প্রসঙ্গ পরিবর্তন লাবণ্য সরকারও আশা করেনি, কিন্তু এ-ধরনের প্রশ্নের জবাব না দিলেও চলে। ধীরাপদর মুখের ওপর দু'চোখ স্থাপন করল একবার তারপর বড় সাহেবের দিকে চেয়ে হাসল একটু। ওইটুকু থেকে যতটুকু বোঝা যায়।

ধীরাপদর ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ল একটা। হাসির আঁচড়। বড় সাহেব পাঠিয়েছেন বলেই সে যেন তারও অনুগৃহীত শিক্ষানবিশ।

যেখানে আগমন সেটা একটা অফিস বাড়ি এবং যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তিনিও একজন পদস্থ ব্যক্তিই হবেন। কোন্ অফিসে এলো বা কার কাছে এলো ধীরাপদর অজ্ঞাত। ভদ্রলোক পরিচিত বোঝা গেল, সাদর আপ্যায়নে বসতে বললেন সকলকে। হিমাংশু মিত্র নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে মৃদু হেসে ভদ্রলোককে সতর্ক করলেন, আমার মেডিক্যাল অফিসার আজ আপনার সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

ঝগড়ার ত্রাসে অফিসারটিকে বেশ প্রসন্ন মনে হল ধীরাপদর। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, চকচকে চেহারা। ঝগড়া যে করবে তার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আপনাদের কোনো খবর পাননি বুঝি এখনো?

বেশ, সে খবরও রাখেন না! লাবণ্য সরকারের কণ্ঠস্বরে আহত বিস্ময়, তিন মাস ধরে অপেক্ষা করে করে না এসে পারা গেল না, স্যাম্পল পাঠিয়েছি তারও দু'মাস আগে—এভাবে আর কতকাল বসে থাকব?

ধীরাপদ রমণীমুখের সুষ্ঠু কারুকার্য দেখছে চেয়ে চেয়ে। হিমাংশু মিত্রর নিজের কিছু যেন বক্তব্য নেই, যোগাযোগ ঘটিয়ে খালাস। আলোচনা থেকে এখানে আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেছে। কোম্পানীর একটা নতুন ওষুধের সরকারী অনুমোদন মিলছে না, সরকারী পরীক্ষার রিপোর্টও কিছু আসছে না। ভদ্রলোকের মারফত ত্বরিত এবং অনুকূল নিষ্পত্তির সুপারিশ। অফিসারটি বিলম্বের কারণ জানালেন, ব্লাড প্রেসারের ওষুধ বাজারে হামেশা এত বেরুচ্ছে যে সতর্ক যাচাইয়ের পর মতামত প্রকাশে দেরি না হয়ে উপায় নেই।

জবাবে লাবণ্য সরকার হাতের ফাইল খুলেছে, মোটা ব্যাগ থেকে কতগুলি চালু ওষুধের স্যাম্পল বার করে সেগুলির উপকরণ তালিকার সঙ্গে নিজেদের ওষুধের উপকরণের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছে, ফাইল থেকে একে একে নিজেদের ল্যাবরেটারীর পরীক্ষার আশাতীত সাফল্যের রিপোর্টগুলো দাখিল করেছে। প্রথমে গিনিপিগের ওপর প্রয়োগের ফলাফল তারপর বেড়ালের ওপর, তারপর বাঁদরের ওপর, সব শেষে মানুষের ওপর। —জেনারাল বিহেভিয়ার, প্রেসার কাউণ্ট, ড্রাগ এফিক্যাসি, বায়লজিকাল অ্যাসপেক্ট, সেরেব্রম নারিশমেণ্ট, ব্লাড-অ্যাসিমিলেশান, সেনসরি সেণ্টার, মেণ্টাল আরমিসটিস—

ধীরাপদর কানের পরদায় দুর্বোধ্য শব্দতরঙ্গের ঠাসাঠাসি ভিড়। কিন্তু ধীরাপদ শুনছে না কিছুই, হাঁ করে দেখছে শুধু। ভাবে, ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে, বিশ্লেষণের আগ্রহে, বাহুর মৃদু চাঞ্চল্যে, আঙুলের সুতৎপর সংকেতে, লাবণ্য সরকারের ভেষজ বক্তব্যটুকু এক পশলা দুর্বোধ্য কাব্যের মত লাগল ধীরাপদর। যাঁর কাছে আবেদন, তিনি কে বা কতটা পারেন জানে না, কিন্তু এই সপ্রতিভ মাধুর্যের বন্যায় ধীরাপদ নিজে ঘায়েল হয়েছে। ধীরাপদর হাতে ক্ষমতা থাকলে এই লাবণ্য-দর্শন আর কণ্ঠশ্রুতির বিনিময়ে ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ ছেড়ে বিষের ওপর অমৃতের পরোয়ানা লিখে দিতেও বাধত না হয়ত।

বড় সাহেবের মুখে হালকা গাম্ভীর্য, নীরবে পাইপ টানছিলেন তিনি। উপসংহারে জানালেন, নিজে তিনি ক্রনিক ব্লাড-প্রেসারের রোগী, নির্দ্বিধায় নিজের ওপর এই ওষুধ যাচাই করেছেন এবং ফল পেয়েছেন।

অফিসার ভদ্রলোকটি আশ্বাস দিলেন, সরকারী বিবেচনার ফলাফল যাতে শিগগীরই বেরোয় সে-রকম আন্তরিক চেষ্টা তিনি করবেন এবার। হিমাংশু মিত্র ধীরাপদকে বললেন ভদ্রলোককে ভালো করে চিনে রাখতে, এই ব্যাপারে অতঃপর যোগাযোগ রক্ষা এবং তাগিদ দিয়ে কাজ আদায় করার দায়িত্ব তার।

বাইরে এসে ইশারায় তিনি একটা চলতি ট্যাক্সি আহ্বান করলেন। ওদের ট্যাক্সিতে যেতে বলে নিজে লাল গাড়ির দিকে দিকে এগোলেন। তিনি অন্যত্র যাবেন।

ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতে লাবণ্য উঠে বসল। ধীরাপদর দুই এক মুহূর্তের দ্বিধা, সামনে ড্রাইভারের সঙ্গে বসবে না পিছনে মহিলার পাশে। নিজে উঠে বসার পর লাবণ্যরই ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু ডাকবে না! জানা কথা। এক সঙ্গে এক গাড়িতে গেলেও সঙ্গিনী নয়, পদমর্যাদার সচেতন গাম্ভীর্যে সে নীরব এবং নির্বিকার।

দরজা খুলে ধীরাপদ পাশে বসল।

লাবণ্য সরকার ঘাড় ফিরিয়ে অলস চোখে শুধু তাকালো একবার। তারপর সামান্য সরে বসল। সামনেই বসবে ভেবেছিল বোধহয়। নির্দেশ নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ছুটিয়েছে। ধীরাপদর এই ক'দিনের বিনত সংযমের মুখটা আজ আবার আলগা হয়ে গেল কেন জানি। পুরুষকারের নামে সেই অদৃশ্য বিরোধের প্রতিক্রিয়া শুরু হল ভিতরে ভিতরে। আরো একটু সরে বসলে ওর সুবিধে হত, ওধারে জায়গা আছে। এও এক ধরনের অবজ্ঞাই ধীরাপদ এ-ধারের দরজার সঙ্গে মিশে আছে। খানিক আগে এই মেয়ে সুষমার জাল বিছিয়ে বসেছিল কে বলবে। নারীর তূণে অনেক বাণ, পণ্যের তাগিদে তারই গোটাকতক অকাতরে খরচ করে এসেছে। অমিতাভ ঘোষের বেলায়ও তাই করেছিল বোধহয়···। চারুদির ইঙ্গিতটা বিরূপতা-প্রসূ প্রেরণার মত কাজ করছে এখন। ওই দুজনের প্রতি তার যেন কর্তব্য আছে কিছু, আর সেই কর্তব্য-বোধেই যেন ভিতরটা উস্‌খুস করছে ধীরাপদর।

মাঝামাঝি পথে এসে লাবণ্য সরকার ব্যাগ সংলগ্ন ফাইলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু-গম্ভীর নির্দেশ দিল, এটা আপনার কাছে রাখুন, সাবধানে রাখবেন—সামনের সপ্তাহে এসে একবার তাগিদ দিয়ে যাবেন।

ফাইলটা হাতে নিয়ে ধীরাপদ তক্ষুনি নিজের সম্বন্ধে দ্বিধান্বিত সংশয় জ্ঞাপন করল, আমি কি আপনার মত অমন করে বলতে পারব···।

লাবণ্য সরকারের ঠাণ্ডা চোখ দুটো ওর মুখের ওপর এসে থমকালো। নিরীহ পশ্চাৎ অপসরণের চেষ্টা ধীরাপদর, মানে, আমার পক্ষে এ-সব টেকনিকাল ব্যাপার আপনার মত করে বোঝানো শক্ত—

আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না, কণ্ঠস্বর ঈষৎ রূঢ়, আপনি শুধু ফাইল নিয়ে গিয়ে মনে করিয়ে দিয়ে আসবেন, আর কি হল না হল খবর নেবেন।

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, দায়িত্ব লঘুকরণের ফলে প্রায় নিশ্চিন্ত যেন। মনে মনে হাসছিল, কিন্তু আর এক কথা মনে হতেই হাসি উবে গেল, পুরুষকারের স্ফূর্তির শুরুতেই হোঁচট খেল একদফা। পকেটে চার ছ' আনাও আছে কি না সন্দেহ, ট্যাক্সির মিটার উঠবে দেড় টাকা দু' টাকা। গাড়ি থেকে নেমে পুরুষের বদলে রমণীর মত সরে দাঁড়াতে হবে। পকেটে টাকা থাকলে পুরুষের মতই ভাড়াটা দিয়ে দিত সে। এ-রকম পরিস্থিতিতে টাকা না থাকার মানসিক বিড়ম্বনা কম নয়। টাকা থাকবে কোথা থেকে, টিউশন ছেড়েছে, নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের দে-বাবু আর অম্বিকা কবিরাজের কাছ থেকেও পা ঢাকা দিয়ে আছে। সোনা-বউদি কুকার কেনার জন্যে যে-কটা টাকা ফেরত দিয়েছিল তাই ভাঙিয়ে চলছে। কিন্তু কলসীর তোলা জল গড়িয়ে খেলে ক'দিন আর, ধীরাপদর পুরুষের উত্তাপে বিমর্ষ ছায়া পড়ল একটু।

না ভাবলেও চলত। চক্ষুলজ্জা এড়ানোর রাস্তা ওপরঅলাই ভেবে রেখেছিলেন।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝ বয়সী মেদবহুল গোলাকার এক বাবু ভদ্রলোক রমেন হালদারের সঙ্গে আলাপে মগ্ন। ট্যাক্সি থামার শব্দে তিনি ফিরে তাকালেন, তারপর চাঁছা-ছোলা ফরসা মুখখানা হাসির রসে ভিজিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। কোঁচানো কাঁচি ধুতি, গিলে-পাঞ্জাবীর নিচে ধপধপে জালি গেঞ্জি, পায়ে চকনাই ছোটানো

হলদে মিউকাট, হাতে সোনার ঘড়ি সোনার ব্যাণ্ড, বুক থেকে গলা পর্যন্ত মিনেকরা সোনার বোতাম, মাথার চুলে কলপ-ঠকানো শাদার কৌতুক। শৌখিনতার সচল বিজ্ঞাপনটি সামনে এসে দাঁড়ানোর পর ধীরাপদর গাড়ি থেকে নামার কথা মনে পড়ল।

অনেকক্ষণ না কি? ভদ্রলোকের উদ্দেশে লাবণ্য সরকার। মুখে তারও হাসির আভাস একটু।

এই কিছুক্ষণ, কখন আবার তোমার সময় হবে না হবে, ভাবলাম ঘুরে নিয়ে যাই—এখনই যাবে তো?

লাবণ্য সরকার ঘড়ি দেখল, আসুন—আবার দু'টার মধ্যে ফিরতে হবে।

ভদ্রলোক সশব্যস্তে উঠে গেলেন, ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, ধীরাপদ বোকার মত দাঁড়িয়েই রইল। ফিরে দেখে, রমেন তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। হাসি গিলে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছেন দাদা?

ভদ্রলোক কে?

সর্বেশ্বর বাবু—

ধীরাপদর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল কার সর্বেশ্বর। সামলে নিল, এমনিতেই ছেলেটার সমস্ত মুখে বাচালতা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। আর প্রশ্ন হল না দেখে রমেন নিজে থেকেই বলল, মিস্ সরকারের নিকট আত্মীয়, একেবারে নিজের ভগ্নিপতি—বেশ ভালো সম্পর্ক, না দাদা?

ধীরাপদ দোকানের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগই করল শুধু, এগোলো না। শোনার লোভ ষোল আনা, এই ভগ্নিপতিই তাহলে লাবণ্য সরকারের ডাক্তারী পড়ার খরচ যুগিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছেন। প্রত্যাশা সফল হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে ভ্রূ-ভঙ্গি করে চারুদি ওকে নীরেট বলেছিলেন, রমেন হালদার উপছে ওঠা হাসিটুকুর ওপর চট করে সহানুভূতির প্রলেপ চড়িয়ে জানালো, ভদ্রলোকের একটি ছেলে আর একটি মেয়ের অসুখ, ডবল—চিন্তা মিস সরকারের সাড়ে চারটের যাবার কথা ছিল, দেরি দেখে ফ্যাক্টরীতে টেলিফোন করেছিলেন, সেখানে না পেয়ে এখানে এসেছেন। সর্বেশ্বরবাবুর প্রশংসাও করল রমেন, খুব অমায়িক ভদ্রলোক আর, ওকে বেশ স্নেহ করেন। অনেকদিনের আলাপ রমেনের সঙ্গে, মাসের মধ্যে দুই একদিন অন্তত দোকানে আসতে হয় তাঁকে না এসে করবেন কি, ছেলেমেয়েগুলো বড় ভোগে যে! একটি দুটি তো নয়, পাঁচটা না ছ'টা—মাসির হাতের ওষুধ না পড়া পর্যন্ত একটাও এমনিতে সেরে উঠবে না। মাসিঅন্ত প্রাণ সব—দুধের শিশুরা মা হারালে যা হয় আর কি। কিন্তু মাসি তো আর সব সময়ে এখানে বসে থাকেন না, যখন অপেক্ষা করতে হয় ওর সঙ্গেই ভদ্রলোক গল্পসল্প করেন।

আর একটু দাঁড়ালে ভদ্রলোকের গল্পসল্পেরও কিছু নমুনা শোনা যেত হয়ত। কিন্তু ফাজিল ছেলেটার দরদ মাখানো মুখে দুষ্টুমি টাপুরটুপুর। অসুস্থ ছেলেমেয়ের বাপের মুখখানা মনে পড়তে ধীরাপদর নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দোকানে ঢুকে পড়ে অব্যাহতি।

কিন্তু ধীরাপদ সেদিন সত্যিই অবাক হয়েছিল।

অফিস সংক্রান্ত জরুরী কোনো কাজে না আটকালে লাবণ্য সরকারের দোকানের চেম্বারে আসতে দু'টার দু'দশ মিনিটের বেশি দেরি হয় না।

সেদিন সাড়ে সাতটা হয়েছিল।

বাইরে তখন বসার জায়গার অভাবে অনেক রোগী দাঁড়িয়ে। তাদের দেখতে গিয়ে ধীরাপদর নিজের নিস্তব্ধ প্রতীক্ষাটাই আগে চোখে পড়ে গিয়েছিল। নিজের উদ্দেশেই লঘু ভ্রূকুটি সেও কি রোগী হয়ে গেল নাকি।

সেই থেকে ধীরাপদ মনে মনে হাস কাবাবের প্রতীক্ষায় ছিল। মাসটা শেষ হলে তাকে ফ্যাক্টরীতে টেনে নেবার কথা। হাস কাবাবের পরেও দুমিন কাবার। ধীরাপদ ভাবছিল, হিমাংশু মিত্রর সঙ্গে একবার দেখা করে প্রতিশ্রুতিটা তাঁকে মনে করিয়ে দেবে কি না। কিন্তু ধীরাপদ ভাবলই শুধু, স্বভাবত সঙ্কোচে গিয়ে উঠতে পারল না। থাক আর দুটো দিন।

তার আগেই শনিবার উপস্থিত। সকলের মুখেই একটুখানি প্রসন্নতার আমেজ দেখা গেল সেদিন। ধীরাপদ জানতে পারল, মাসের প্রথম শনিবারে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইনে হয়। আজ সেই শনিবার। দু'টো আড়াইটের মধ্যে লাবণ্য সরকার টাকা নিয়ে আসবে—সেই মাইনে দিয়ে থাকে।

খবরটা শুনে একমাত্র ধীরাপদই খুশি হল না, উল্টে তাকে বিমর্ষ দেখা গেল একটু। মনে মনে আশা করতে লাগল, তার সম্বন্ধে হিমাংশু মিত্র ভুলে গিয়ে থাকলেই ভালো হয়, তার মাইনেটা না হলেই ভালো হয়। এখানকার মাইনেটা কি-রকম রমেনের মুখে শুনেছে। ভাঙা মাসে তারও সামান্যই প্রাপ্য হবে হয়ত। কিন্তু ধীরাপদর আপত্তি সেই কারণে নয়, তার আপত্তি আর সকলের মত মুখ বুজে ওই সামান্য ক'টি টাকা লাবণ্য সরকারের হাত থেকে নিতে হবে ভেবে। মনে মনে অন্তত যার সঙ্গে একটু আধটু পাল্লা দিয়েছে সেই যেন তাহলে বাস্তব ফাড়াকটা ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার সুযোগ পাবে। সেটাই অবাঞ্ছিত। অনুগৃহীত দলে নাম লেখাতে আপত্তি। নইলে টাকার দরকার খুব, গোটা মাস টাকা না পেলে নতুন-পুরানো বইয়ের দোকানের দে-বাবুর কাছেই গিয়ে হয়ত ধরনা দিতে হবে আবার।

প্রত্যাশিত সময়ে লাবণ্য সরকার এলো। ভিতর দিয়ে চেম্বারে ঢোকার আগে ধীরাপদর দিকে যেন বিশেষ মনোযোগেই তাকালো একবার। সেই দৃষ্টি সহানুভূতির কি অনুকম্পার কি আর কিছুর সঠিক বোঝা গেল না। ধীরাপদ মনে মনে আশান্বিত, হয়ত তার তবিলে ওর মাইনেটা নেই বলেই এভাবে দেখে গেল।

প্রথমে ম্যানেজার ঢুকলেন মাইনে নিতে। তাঁর বেরুতে সময় লাগল একটু। সকলের মাইনে-পত্র ঠিক আছে কি না দেখছিলেন বোধহয়। কিন্তু বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে চোখ পড়তে ধীরাপদই ভড়কে গেল। দুই চোখ-ভরা নির্বাক বিস্ময় তাঁর। ধীরাপদ ভেবে পায় না, এই দিনে কারো মাইনে না হওয়াটা এমনই অবাক ব্যাপার কিছু নাকি।

একে একে সকলের মাইনে হতে সময় মন্দ লাগল না। সব ব্যাচের সব কর্মচারী হাজির। দরোয়ান, বেয়ারা, সুইপার পর্যন্ত। কিন্তু শুধু ম্যানেজার নয়, কর্মচারীদেরও অনেকের বিভ্রান্ত দৃষ্টির

ষা এসে পড়ল ধীরাপদর মুখের ওপর। মানুষটাকে যেন আবার নতুন করে দেখছে তারা।

সকলের মিটে যেতে লাবণ্য সরকার নিজেই উঠে এসে সুইংডোর ঠেলে ডাকল, এবারে আপনি আসুন একটু।

এ আবার কি কণ্ঠস্বর! কর্ত্রীর কণ্ঠও নয় কর্তৃত্বের কণ্ঠও নয়। ধীরাপদ উঠে এলো।

লাবণ্য সরকার নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে ওকে বলল, বসুন—

ধীরাপদ স্বপ্ন দেখছে না দিনে দুপুরে কল্পনার ডানা মেলে দিয়েছে। নিজে উঠে ডেকে আনা, তার ওপর প্রায় মিষ্টি করে বসতে বলা।

বসল।

লাবণ্য সরকার দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, মুখে সঙ্কোচ-তাড়ানো হাসির আভাস। দেখুন, এখানকার কাণ্ডই আলাদা, আপনি কি পোস্টএ এসেছেন, কি ব্যাপার, কেউ কিছু বলেনি, আপনিও কিছু বলেন নি—আজ পে-অর্ডারএ দেখলাম···মিঃ মিত্রর সঙ্গেও অবশ্য তারপর কথা হয়েছে।

এরই মধ্যে ফাল্গুনের গা-জুড়ানো বাতাস দিয়েছে কোথায়। দূর, এটা শীতকাল। ধীরাপদ অপেক্ষা করছে আর নিজের মুখের ওপর সহজতার রেখা বুনতে চেষ্টা করছে।

সই করার জন্য লাবণ্য সরকার অ্যাকুইট্যান্স রোল বাড়িয়ে দিল তার দিকে; একটা আলাদা শীট-এ ধীরাপদর একার নাম। নাম আর পদমর্যাদা। কিন্তু লেখাগুলো যেন চোখের সামনে স্থির হয়ে বসছে না কিছুতে।

বোসো ধীরাপদ বোসো, এতবড় কোম্পানীর জেনারাল সুপারভাইজার তুমি, এমন হ্যাবাগ্যাকা খেয়ে বসে থেকো না—মাসে ছ'শ' টাকা মাইনে হিসেবে যোগ দিলে তিনশ কুড়ি টাকা প্রাপ্য তোমার, বুকের দাপাদাপি থামাও। চোখ তাকালেই দেখতে পাবে, কান পাতলেই শুনতে পাবে যে। এখানে নয়, এই মুহূর্তে নয়, এর সামনে নয়, সব বাইরে—বাইরে গিয়ে বিস্ময়ের ঘূর্ণীতে দিশেহারা হয়ো, আকাঙ্ক্ষার উল্লাসে হাবুডুবু খেও, সাঁতার দিয়ে সিন্ধু পার হয়ো। এখানে শুধু ওই টাকার অঙ্কের পাশে, ওই রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পটার ওপর বেশ সহজ শান্ত মুখে স্পষ্ট করে একটা নামের স্বাক্ষর বসিয়ে দাও।

কলমটা টেবিলেই ফেলে এসেছে। লাবণ্য নিজের কলম এগিয়ে দিল, আর টাকার খাম। স্বাক্ষরান্তে কলম আর অ্যাকুইট্যান্স রোল ফেরত নিয়ে আলাপের সুরে জিজ্ঞাসা করল, এর আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

অভিজ্ঞতা অনুযায় যোগ্যতা প্রসঙ্গে অম্বিকা কবিরাজের আখড়া আর দে-বাবুর নতুন পুরানো বই-এর দোকানের নাম করবে? ধীরাপদ সত্যি জবাব দিল, আগে কোথাও ছিলাম না, কাজ-কর্ম বলতে গেলে এই প্রথম—

কিছু না করেও এমন পদ-মর্যাদা লাভের রহস্যটা লাবণ্য সরকার ওর মুখ থেকেই আবিষ্কার করে নিতে চেষ্টা করল দুই এক মুহূর্ত। কৌতূহল স্বাভাবিক, অন্যদিকের রোজগার এখন যাই হোক, নিজে সে আড়াইশ টাকায় এসেছিল—তাও অমিতাভ ঘোষের খাতিরে। এতদিনে ছ'শ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মালিকদের বাদ দিলে তার সমান মাইনে আর কারো ছিল না।

এ-রকম পদ-গৌরবে অংশ্লিষ্ট হবার মত কোনো প্রতিশ্রুতি আগে তো চোখে পড়েই নি, আজও পড়ল না।—আপনি সোমবার থেকে ক্যান্টিনে আসুন, এখানে মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে এসে দেখাশুনা করে গেলেই হবে—মিঃ মিত্রই সব বলে দেবেন আপনাকে, সোমবার ক্যান্টিনে আসতে বলেছেন।

ধীরাপদ বাইরে এসে দাঁড়াতে বহুক্ষণের একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচল। দোকানে আর এক মুহূর্তও ভালো লাগছিল না। এমন কি বিকেলে লাবণ্য সরকারের পেসেন্ট-দেখার বৈচিত্র্যে মন ডোবানোর আগ্রহও নেই আজ। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে। ঘড়িতে সবে চারটে তখন।

বুক-পকেটে টাকার খামটা পকেট ছাড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। স্পর্শটা জামার ভিতর দিয়ে বুকের চামড়ায় লাগছে। মাসে ছ'শ... ষোল দিনে তিনশ কুড়ি। আশ্চর্য! খুলে দেখবে একবার? একবারও তো দেখল না। থাক, ঠিকই আছে। উদ্বেগ গেছে, উত্তেজনা গেছে, সেটুকুই শান্তি। বড় বড় পা ফেলে সেই শান্তিটুকু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে ধীরাপদ। জীবন বুঝি এক-একটা বৃত্তের মধ্যে আটকে থাকে এক-একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। যত ঘোরো আর যতই মাথা খোঁড়ো—ওরই মধ্যে। ধীরাপদ মাথা না খুঁড়ুক, তাই ঘুরছিল। হঠাৎই বৃত্তবদল হয়ে গেল। এই বৃত্তটা বড়ই বোধহয়।

চারুদির ওখানে যাবে কি না ভাবছে। যাওয়া উচিত, কিন্তু আজ অন্তত যেতে মন সরে না। এই বৃত্ত-বদল সহজ হোক আর একটু, চারুদি মনে মনে ভেবেতে পারেন প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই আনন্দে আটখানা হয়ে ছুটে এসেছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে আশার দারিদ্র্য আবিষ্কার করবেন হয়ত। সুলতান কুঠির দিকেই পা টানছে, অনেকগুলো দিন একটা মানসিক বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সোনাবউদি ঠাট্টা করেছিল, সাত মণ তেল পুড়ছে, রাধা শেষ পর্যন্ত নাচবে কি না। ধীরাপদ হাসছে আপন মনে, এমন নাচ সেও কল্পনা করেনি। নোটভরা খামটা বড় বেশি মাথা উঁচিয়ে আছে মনে হচ্ছে এখন। তুলে নিয়ে দু' ভাঁজ করে আবার পকেটে ফেলেই থমকে দাঁড়াল। মনের তারে ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি এভাবে বেজে ওঠে কি করে। এতদিন তো মনে পড়েনি।

...হাসিমুখে সোনাবউদি রণুর কাণ্ডর কথা গল্প করেছিল একদিন। ষাট টাকা মাইনের রণু কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিল একবার। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সোনাবউদিকে ভালো একখানা গরদের শাড়ি কিনে দেবে ঠিক করেছিল। সোনাবউদির একখানা গরদের শাড়ির সখ ছিল জানত। কিন্তু দশদিন কাজ করার পরই অসুখে পড়ে চাকরি শেষ। অসুখ হল চাকরি গেল সেটা কিছু না, শাড়ি কেনা হল না সেই দুঃখে রণু মনমরা। শেষে সোনাবউদির ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা, সোনাবউদি বলেছিল, গরদের শাড়ি পরে মেজেগুজে চিতায় উঠবে তাই শাড়িটা এক্ষুনি দরকার।

একটা অদৃশ্য তাগিদে ধীরাপদ মার্কেটের পথে পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু আবারও থামতে হল। নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। না ঠিকই দেখছে। ধীরাপদর দুই চোখে পলক পড়ে না।

ফুটপাথ ঘেঁষে আধুনিক কায়দার খোলা রেস্তরাঁ একটা। খোলা বলতে ক্যাবিন অথবা পরদার বালাই নেই। অবাঙালী অভিজাত নারী-পুরুষের ভিড় বেশি। বাইরে দরজার দিকের টেবিলে একটি মেয়ে দুটি ছেলে। ট্রাউজারের ওপর শার্ট ঝোলানো ছেলে দুটোকে পাড়ার অনেক রকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জটলা করতে দেখেছে ধীরাপদ। মেয়েটি রমণী পণ্ডিতের মেয়ে কুমু—বাপের জ্যোতিষী মতে হাতে যার বিদ্যাস্থান বড় শুভ। রমণী পণ্ডিতের চোদ্দ বছরের সেই প্রায়-বোবা ভোঁতা মেয়েটার এরই মধ্যে এতখানি বিদ্যালাভ! অবশ্য চোদ্দ বছর হয়ত সতেরয় ঠেকেছে এখন, আর ঋতুরাজের বিচারে ও-বয়েসটা ফেলনা নয় একটুও। তবু, সোনাবউদির জন্য ঘর খালি করার তাগিদে ধীরাপদ প্রায় মরিয়া হয়ে যে-মেয়েটাকে আকাশ বাতাস মেঘ জল গাছ পালা আর মজাপুকুরের শ্যাওলা-প্রসঙ্গে অকাতরে পাঠদান করেছে সেই কুমুর এরই মধ্যে এমন উন্নতি চমক-প্রদ। এই দু'বছর আড়াই বছর ধীরাপদ কি অন্ধ হয়ে বসেছিল?

ছেলে দুটোর একজনকে রমণী পণ্ডিতের কোণা-ঘরের বারান্দায়ও এক আধদিন দেখেছে মনে পড়ল। এদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় খুব সম্ভব। ফুটপাথে একটা লোককে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সেই প্রথম তাকিয়েছিল। তারপর চট করে মুখ নামিয়ে-নিয়ে না দেখার ভান করেছে। পরক্ষণে ওদের ছোট টেবিলে নিঃশব্দ আলোড়ন, দ্বিতীয় ছেলেটারও মুখ নিচু। আর কুমু? আচমকা আলোর ঘায়ে ভীত-ত্রস্ত শশকের বিড়ম্বনা।

ধীরাপদ এগিয়ে গেল। নিজের স্বভাবটার ওপরেই বিরক্ত, দিলে ওদের আনন্দটুকু পণ্ড করে।...সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে এই কলকাতা অনেক দূর বলে জানত। ভাবছে, প্রকৃতি নিরপেক্ষ কর্মকুশলিনী বটে, ওরা যতই তুচ্ছ করুক আর অবহেলা করুক, তার কাজে খুঁত নেই।

দূর থেকে কদমতলার শূন্য বেঞ্চি দেখে ধীরাপদ মনে মনে খুশি একটু। হাতের বস্তুটি নিয়ে কারো দৃষ্টি বিশ্লেষণে হোঁচট খেতে খেতে ঘরে পৌঁছুতে হবে না। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের অন্তরঙ্গতায় চিড় খেল নাকি, সন্ধ্যা না হতেই বেঞ্চি ফাঁকা কেন!

উঠোন পেরিয়ে আসার আগেই কচি-গলার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কানে আসতে ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল। গণুদার ন'বছরের মেয়ে উমারাণীর গলা, মেয়েটাকে যেন মেরেই ফেলছে কেউ। ঘরে ঢোকা হল না, পাশের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ভিতরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত।

মেয়ের এক হাত ধরে গণুদা টানাটানি করে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে আর শুকনো মুখে শাসাচ্ছে, ভালো হবে না—খবরদার—ছাড়ো বলছি! মেয়ের অপর হাতটি সোনাবউদির করায়ত্ত, অন্য হাতের ভাঙা-পাখার ডাঁট মেয়ের হাতে-পায়ে-গায়ে মাথায় ফটাফট পড়ছে

তো পড়ছেই। মেয়েটার সর্বাঙ্গ দাগরা-দাগরা হয়ে গেল বোধহয়। আর্ত আকুতিতে কানে তালা লাগার উপক্রম, আর করব না মাগো, আর কক্ষণো চাইব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর মেরো না, মরে গেলাম—

স্বামীর শাসানীতে ভ্রূক্ষেপ নেই, অস্ফুট গর্জনে মেরে পিটছে সোনাবউদি—আর চাইবি কি করে, যমের বাড়িই তো পাঠাবো তোকে আজ—

হাতের কাগজের বাক্সটা দরজার পাশের ছোট আলমারীটার মাথায় রেখে গায়ের জোরেই ধীরাপদ উমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সোনাবউদির হাত থেকে পাখাটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বারান্দায় ফেলে দিল। এইটুকু মেয়ের ওপর এমন অমানুষিক মার দেখে রাগ হয়ে গেছে তারও।

সোনাবউদি দাঁতে করে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকালো তার দিকে, হাঁপাচ্ছে রীতিমত। গণুদাও নির্বাক কয়েক মুহূর্ত, তার আহত পুরুষচিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল বুঝি। গম্ভীর মুখে বলে উঠল, এর মধ্যে তোমাকে কে আসতে বলেছে—

আমার বদলে পুলিস আসা উচিত ছিল। ঠাস করে মুখের ওপর কথা ক'টা বলে উমাকে দুহাতে আলতো করে তুলে নিয়ে ধীরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

মেয়েটার হেঁচকি থামতে আধঘণ্টা। অনেক তোয়াজের পর আর অনেকগুলো লোভনীয় প্রতিশ্রুতির পর উমারাণীর মুখে কথা ফুটল। ধীরাপদ অবাক, এত বড় মারটা কেন খেল মেয়েটা এখনো ভালো করে জানে না। দুপুরে মা-বাবাতে কি নিয়ে একটু ঝগড়ার মত হয়েছিল। বিকেল পর্যন্ত সে কি আর কারো মনে থাকে, উমারাণীরও মনে ছিল না। বাবার কাছে রিবন চেয়ে রেখেছিল, বাবা ওকে রিবন এনে দেবে কথা দিয়েছিল। সেই রিবন চেয়ে বসতে বাবা ঠাস করে ওর গালে এক চড়—মা তখন উনুনে পাখা দিয়ে বাতাস করছিল, উঠে এসে সপাসপ ওকে পিটতে আরম্ভ করে দিল। ধীরু-কা না এসে গেলে মা যে ওকে আজ মেরেই ফেলত সে-সম্বন্ধে উমারাণীর একটুও সন্দেহ নেই।

রাগটা আসলে কার ওপর ওই মার দেখেই ধীরাপদ অনুমান করেছে। তবু ক্ষমা করা শক্ত। ছেলেমেয়েগুলোকে একটুও ভালবাসে না সোনাবউদি, ভালবাসলে এত নির্দয় হতে পারত না। কিন্তু গণুদার ওপর আজ আবার এমন চণ্ডাল রাগের হেতুটা কী··· !

উমার তাগিদে একটা গল্প শুরু করতে হয়েছিল, দরজার কাছে সোনাবউদিকে দেখে থেমে গেল। তার হাতে ওর বিকেলের আনা সেই প্যাকেটটা। দরজার ওধার থেকে মেয়েকে একবার দেখে নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। নরম সুর করে বলল, একে তো পুলিসের ভয়, তার ওপর আবার এটা ঘরে ফেলে এসেছিলেন। দুই চোখে নীরবে ব্যঙ্গ ছড়ালো একটু, দেখে-চেখে রাখুন, আমি খুলিওনি—কি থেকে আবার কি ফ্যাসাদে পড়ব কে জানে!

শাড়ি ছাড়া ওতে যে আর কিছু থাকা সম্ভব নয় শৌখিন প্যাকেটের ছাপেই সেটুকু সুস্পষ্ট। শ্লেষ গায়ে না মাখলেও ধীরাপদ অবাক একটু, ও কার জন্যে শাড়ি এনে তার ঘরে ফেলে এসেছে বলে সোনাবউদির ধারণা! অবশ্য তারই জন্য যে তাই বা ভাববে কি করে।

কি ভাবে শাড়িটা এনে হাতে দেবে বা কি বলবে, এই পরিস্থিতিতে পড়ে সেই সমস্যাটা গেল। খুব সাদাসিধে ভাবে ধীরাপদ বলল, আমি ওটা ফেলে আসিনি।···আপনি ইচ্ছে করলে ফেলে দিতে পারেন।

সোনাবউদির মুখে পরিবর্তনের রেখা পড়তে লাগল। হঠাৎই থতমত খেয়ে গেল কেমন, তারপর নিজের অগোচরেই কাগজের বাক্সর ওপরকার ফিতের বাঁধন খুলে শাড়িটা হাতে তুলে নিল।

বাজারের সব থেকে সেরা গরদের শাড়িই এনেছিল ধীরাপদ।

দু'চোখে ভরা নিবিড় বিস্ময় সোনাবউদির। শাড়ি থেকে সেই বিহ্বল দৃষ্টি ধীরাপদর মুখের ওপর ওপর ফিরে এলো আবার। ধীরাপদও হঠাৎ স্থান কাল ভুলেছে, কোলের কাছে ছোট মেয়েটা হাঁ করে চেয়ে আছে, খেয়াল নেই। বিচারকের শেষ রায় শোনার মত তারও দুই চোখে নিষ্পলক প্রতীক্ষা।

সোনাবউদি দেখছে। দেখছে না, শুধু চেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে কোন্ এক স্মৃতি-দূতের পায়ের শব্দ শুনছে যেন। পরক্ষণে সর্বাঙ্গ-জোড়া একটা চকিত শিহরণের আভাস দেখল বুঝি ধীরাপদ—গরদের শাড়ি-ধরা দুই হাতে, বাহুতে, মুখের রেখায় রেখায়, চোখের পাতায়···।

কাগজের বাক্স আর গরদের শাড়ি হাতে সোনাবউদি ত্রস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গল্পের মাঝখানে অনেকক্ষণ মুখ বুজে বসেছিল উমারাণী। মা চলে যেতে নিশ্চিন্ত। তাগিদ দিল, ধীরুকা বলো—

গল্পে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টায় ধীরাপদ বার-দুই গলা খাঁকারি দিয়ে নিল।　　[ক্রমশঃ।

কাঠি ও কথা

সৈয়দ হোসেন হালিম

একটু বারুদ মুখ—মাজা পরিপাটি,
কতো ছোট একটি সে দেশলাই কাঠি।
তবু-ও কখনো সে যে ঘর করে আলো,
কখনো বারুদে তার ঘর জ্বালালো।

আমাদেরো ছোট কথা কাঠির মতন,
কখনো জুড়ায় বুক—জ্বালায় কখন।

হবিবুল্লার মেশিন

বিজ্ঞানভিক্ষু

চার

"With mournful wait from dusk to dawn
He gibbered at the taunting stars—
A hermit soul gone raving mad,
And beating at it sbars." —Lew Sarelt

হবিবুল্লার জন্ম হয়েছিল একত্রিশ বছর আগে লক্ষ্ণৌর এক বিত্তশালী পরিবারে।

'ট্রাডিশন' অনুযায়ী খানবংশের পুরুষদের চতুর্বিবাহ অথবা চতুরধিক বিবাহ চলে আসছিল বহুকাল ধরে। সরকারী আইনের অনুশাসনে কিম্বা অর্থনৈতিক নিষ্পেষণে সে ধারা বদল করবার কোনো কারণও ঘটেনি তখনও পর্যন্ত, হবিবুল্লার বাল্যকালটা তাই কেটেছে বহু মানুষের মধ্যে! মাতৃবিয়োগ হয় তার জ্ঞান হবার আগেই। এত বড়ো পরিবারে একজন নারী কম কি, বেশী হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কারো ছিল না—এমন কি হবিবুল্লার পিতারও না। খান-পরিবারে সবই ছিল প্রায় মাপ করা প্রত্যেকের জন্য—দুধ-ঘি, অশন-বসন খরচ-পত্র মায় স্নেহ-ভালবাসা পর্যন্ত। হবিবুল্লার পিতা এই পরিবারে এমন কিছু হর্তাকর্তা স্থানীয়ও ছিলেন না। কাজেই শিশু হবিবুল্লার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকারও কথা নয়।

তার হাতেখড়ি হোলো লক্ষ্ণৌর কোনো এক মাদ্রাসায়। প্রধান মৌলভি এখনও জীবিত আছেন—কিন্তু বালক হবিবুল্লার কথা তাঁর স্মরণেই ছিল না। তিন পুরুষ ধরে খানবংশের ছেলেদের প্রায় সকলকেই তিনি পার করে দিয়ে এসেছেন হাইস্কুলের দরজার কাছে। তিয়াত্তর বছরের ক্ষীয়মাণ স্মরণশক্তিতে গাঁথা আছে কেবল অতিরিক্ত মেধাবী ছেলেদের কথা অথবা অতিমাত্রায় দুরন্ত ছেলেদের কথা।

বহু পরিচয় দেবার পর মৌলভি সাহেবের আবছা মনে পড়ল, ছাব্বিশ বছর আগের এক নিতান্ত সাধারণ, গোবেচারা, অ্যাভারেজ ছাত্রের কথা। তাঁর মনে পড়ল, হবিবুল্লা খুব শান্ত-শিষ্ট ছিল, সম্ভবতঃ একটু বেশী মাত্রারই লাজুক। পড়াশুনা করত এক রকমের।

এর পরের অংকে হবিবুল্লার হাইস্কুলে প্রবেশ।

প্রথম কয়েক বছরের কাহিনী অস্পষ্ট—স্কুলের পুরানো নথি নাড়াচাড়া করে জানা যায়, কোনো বিষয়েই ছিল না হবিবুল্লার বিশেষ আগ্রহ বা ব্যুৎপত্তি। শতকরা পঞ্চাশের ঘরে নম্বর পেয়ে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠে যেতো। কেবল খেলাধূলায়ই সে হয়ে উঠেছিল অদ্বিতীয়। উচ্চতায় খাটো হলেও, স্কুলের ফুটবলের অথবা হকির 'বি' টীমে তাকে নিয়ে টানাটানি চলতো।

হঠাৎ একদিন ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। ঘুড়ী ওড়াতে গিয়ে একদিন হবিবুল্লা কোনো একতলা বাড়ীর ছাদ থেকে নীচে পড়ে গেল। পায়ের হাড় ভেঙে যায় বেশ গুরুতর ভাবেই। এই দুর্ঘটনার পর হবিবুল্লার খেলোয়াড় হবার সাধ চিরকালের মতো সাংগ হয়ে গেল। এই দুর্ঘটনার পর থেকেই তার জীবনের সহজ গতিটা সহসা মোড় ঘুরে গেল।

দুর্ঘটনাটা না ঘটলে সহজ সরল পথে, জনসমুদ্রের তরংগে তরংগে ভেসে হবিবুল্লার পরিণতি হয়ত হত অ্যাভারেজ ছেলেদের মতোই ছাপোষা কেরাণী, স্কুলমাষ্টারী কিম্বা ডাক্তারী ওকালতির পেশায়। বরাতে থাকলে হয়ত ভালো রকমের একটা সরকারী চাকরীও জুটে যেত। না হয় স্কুলের সীমানা অতিক্রম করে লেগে পড়ত খান কোম্পানীর ঔষধের ব্যবসায়ে। কিন্তু কালের প্রকোপে বহুদিন বাদে ভাঙা পা জোড়া লাগলেও, জীবনের বাঁকা গতিটা তার হল না সোজা।

এগারো বছরের ছেলে বছর খানেক স্কুল কামাই করে ক্লাসে ফিরে এল লাঠিতে ভর দিয়ে। দেখা গেল, এক বছর আগের লাজুক ছেলেই কী করে হয়ে উঠেছে দস্তুরমতো গোঁয়ার-গোবিন্দ। সতীর্থদের সংগে বিনা কারণে ঝগড়া করে কেবলমাত্র গায়ের জোর দেখাবার জন্যই। পুরানো বন্ধুদের সংগে বাক্যালাপ বন্ধ। পড়ার ছুটি হলে একলা লাঠিতে ভর করে বাড়ী ফেরে ঘুরপথে চেনা লোকালয় যথাসম্ভব এড়িয়ে। দেখা যেতো, ছুটির দিনে নির্জন পথের ধারে গাছতলায় বসে চুপ করে একমনে কী ভাবছে। মাঝে মাঝে বনে বাদাড়ে, গোমতীর ধারে ধারে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটা। হেমন্তের সন্ধ্যায় চক্রবাকের দল পাড়ি মারে এক দেশ থেকে আর এক দেশে—পঙ্গু হবিবুল্লা একদৃষ্টে তাদের অনুসরণ করে।

হয়তো বা সেদিনের কৈশোরের স্বপ্নের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল দুর্জয় মহাকর্ষকে জয় করবার কঠিন সংকল্প।
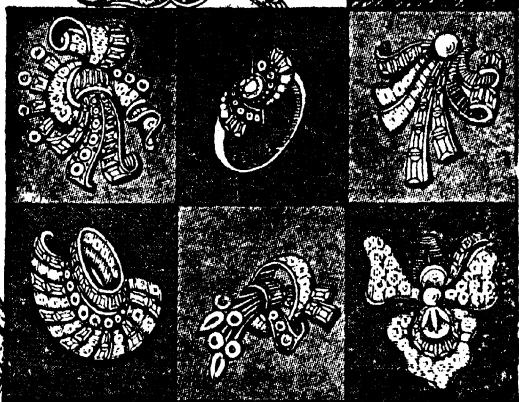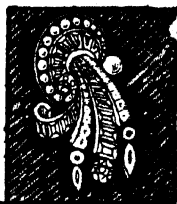
হবিবুল্লাদের স্কুলে তখন খেলাধূলা পরিচালনা আর প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান পড়ানোর ভার ছিল একজন শিক্ষকেরই ওপরে। হরিকিষণ গুপ্ত সামান্য স্কুলশিক্ষক হয়েও বিজ্ঞান-জগতের প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কারেরই সন্ধান রাখতেন। কলেজ-জীবনে গুপ্ত ছিলেন একজন সেরা ছেলে কিন্তু কংগ্রেস আন্দোলনে মাতামাতি করার জন্য তাঁর পড়াশুনায় মাঝে মাঝে পড়ে বড়ো বড়ো ছেদ। অন্য চাকরীর আশা থাকলেও হরিকিষণ গুপ্তের আদর্শবাদ ওঁকে টেনে নিয়ে এল শিক্ষকতার কাজে।

পঙ্গু হবিবুল্লার ওপরে গুপ্তসাহেবের কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। ভালো খেলোয়াড় হবার যখন আশা রইলই না ছেলেটার, তখন যত্ন নিয়ে তাকে করে তুলতে চাইলেন বিজ্ঞানসাধক। স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরী থেকে সহজ পপুলার সায়েন্সের বই এনে তুলে দিতেন হবিবুল্লার হাতে। ছুটির দিনে প্রায়ই গুরু-শিষ্যের অনাবিল আলোচনায় বেলা যেত গড়িয়ে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে লাঠি ঠুকে হবিবুল্লা ঘরে ফিরত আবিষ্কারের নেশায় স্বপ্নাতুর হয়ে।

এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল হবিবুল্লার ছাত্রজীবনে। কোনো রকমে পাশ করতে পারলে যে ছেলের খুশীর অন্ত থাকত না, সেই ছেলেই হয়ে উঠল ক্লাসের মধ্যে সেরা—কোন মন্ত্রবলে! হরিকিষণ গুপ্ত বলেছেন যে, হবিবুল্লার মতো স্মরণশক্তি তিনি আর কোনো ছাত্রের মধ্যে দেখেননি। যে বিষয়টা তার মনে ধরত সে বিষয় তাকে দু'বার শিখতে হয়নি।

এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—হবিবুল্লা একটা গ্রামোফোনের সাউণ্ডবক্স নিজের হাতে তৈরী করে। সে সাউণ্ডবক্স আজও সংরক্ষিত আছে স্কুলের মিউজিয়ামে। আর আছে টোন সুতো ও ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী হবিবুল্লার টেলিফোন—যার সাহায্যে কয়েক শত গজ ব্যবধানেও কথোপকথন করা চলত। হবিবুল্লার বাড়ীতে বেতারযন্ত্র বিকল হলে অনেক সময়েই সেটা দোকানে পাঠাবার প্রয়োজন হত না—হবিবুল্লাই তা মেরামত করে দিত। আর ছোটো আম্মার সেলাই-এর কল আটকে গেলেও হবিবুল্লার ডাক পড়ত সেটাকে আবার চালু করবার জন্য।

গুপ্তসাহেবের এক জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে যত্ন করে তৈরী করে দিয়েছিল একটা 'ক্রুষ্ট্যাল রেডিও-সেট'। গুপ্তসাহেব সেটা এখনও যত্ন করে রক্ষা করে এসেছেন—অতিথি অভ্যাগতদের মুগ্ধ করেছে সেই ছোট রেডিওসেটের গঠন আর কারুকর্ম।

ছাত্রজীবন এমনি ভাবে এগিয়ে চলল হবিবুল্লার—নাম হয়তো থাকত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় উজ্জ্বল হয়ে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার আগের বছরেই সুরু হয়ে গেল উনিশশো বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন। গুপ্তসাহেবকে গ্রেপ্তার করা হল কোন রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দেবার অপরাধে। দেশ সম্বন্ধে এর আগে হবিবুল্লার কোনো চেতনা ছিল না—যদিও খানবংশের অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসের আন্দোলনে জড়িয়ে। একমাত্র বন্ধু ও সংগী হরিকিষণ গুপ্তের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে অন্ধ আক্রোশে হবিবুল্লা ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনের মাঝখানে।

এর পরে কাহিনীতে ছেদ পড়েছে প্রায় দু' বছরের। সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকজন নেতার সংগে হবিবুল্লা নিরুদ্দেশ হয়। গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তর থেকে জানা যায় কেবল দু-একটা কথা। হবিবুল্লাকে এ সময়ে দেখা গেছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। কখনও পদব্রজে সে চলে গেছে নাগপুর থেকে বোম্বাই, কখনো বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে রেলে ঘুরেছে নানা জায়গায়। কী করে যে তার দিন চলত সরকারী নথি থেকে তা জানবার উপায় নেই। হবিবুল্লার বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের অভিযোগও তেমন জোরালো ছিল না, তাই কড়া পাহারাও বসানো হয় নি তার প্রত্যেক গতিবিধির ওপরে খবরদারী করবার জন্য।

কয়েক মাস ছদ্মনাম নিয়ে হবিবুল্লা নাকি হৃষীকেশের কোন যোগাশ্রমে হঠযোগ শিক্ষা করেছিল। অমৃতসরের পথে পথে এক বাজীকরের দলের সংগে যাদুর খেলা দেখাতেও লোকে নাকি তাকে দেখেছে। কখনো বা তার সন্ধান পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে লস্করদের আড্ডায়। পুলিশের মতে—এগুলো বেসরকারী রিপোর্ট। আজ এগুলোর সত্যতা নিরূপণের কোনো উপায়ই নেই। জেলে মাঝে মাঝে হরিকিষণ গুপ্তর কাছে হবিবুল্লার চিঠি আসত ভারতের বিভিন্ন জায়গার ডাকঘরের ছাপ নিয়ে।

গুরু-শিষ্যে এর পরে যখন মিলনও হয়েছিল তার, এ অজ্ঞাতবাসের কোন সংলগ্ন বিবরণী হরিকিষণ গুপ্তের কাছে হবিবুল্লা ব্যক্ত করেনি।

হবিবুল্লা ধরা পড়ল মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে শেষ দেখা দেখতে এসে। পিতার সাংঘাতিক অসুখের সংবাদ হবিবুল্লা জেনেছিল সদ্যোমুক্ত গুপ্তসাহেবের চিঠির মারফত। মাদ্রাজে কোন সওদাগরী গুদামে সে তখন চাকরী করছে।

পিতার মৃত্যুর পর বছরখানেক হবিবুল্লার কেটে গেছে সরকারের নজরবন্দী হয়ে। গ্রেপ্তার হল সে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সনের গোড়ার দিকে। ভারত ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ওয়াকিবহাল মহলে তখন জল্পনা-কল্পনা চলেছে ভারতে ইংরেজরাজত্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। এই কারণেই দু-তিন বছর পরে ধরা-পড়া আগষ্ট আন্দোলনের অপরাধীদের বিচার সম্পর্কে সরকার একটু নরমে-গরমে চলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই রেল-লাইন ধ্বংস করার অপরাধে উনিশ বছরের যুবক হবিবুল্লার জেল শেষ পর্যন্ত হল না—কিন্তু আত্রায় নজরবন্দী থাকার হুকুমটা চেষ্টা করেও রদ করানো গেল না।

হবিবুল্লার পিতার মৃত্যুতে খান-পরিবারে বিশেষ আলোড়ন হবার কথা নয়। উনিশ বছরের তরুণ কিছুটা অসহায় বোধ করলেও, হয়তো এ ঘটনায় একটা বন্ধন মুক্তির আস্বাদও পেয়ে গিয়েছিল। এদিকে একান্নবর্তী খান-পরিবারে তখন বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে। বনেদী পরিবারে অবশ্য ভেদটা এমন কিছু নূতন নয়—শরিকে শরিকে জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বেধেই থাকে বড়কর্তাদের অন্তর্ধান হলেই। এবারের বিরোধটা কিন্তু বেশ ঘোরালো হয়েই দাঁড়ালো কংগ্রেস-লীগ দলাদলির পটভূমিকায়। কংগ্রেসের সংগে খান-পরিবারের একটা বড়ো অংশ জড়িয়ে দিল প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ভাবে। কিন্তু কালের ধর্মে তার মধ্যেও ধরল বড়ো রকমের ফাটল। হবিবুল্লার এক বৈমাত্রেয় বড় ভাই আর তিন চাচা তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে আলাদা হয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

অন্তরীণ অবস্থা থেকে সুরু হবিবুল্লার বই পড়ার নেশা। গুপ্তসাহেবের সাহচর্যে ওর মনে অংকুরিত হয়েছিল বিজ্ঞান-সাধনার বীজ সেই কিশোর বয়সেই। কিন্তু অন্তরীণ অবস্থায় বহির্জগতটা যেমন হল সীমাবদ্ধ, অন্তর্জগতে জ্ঞানের নেশা তেমনি ব্যাপ্ত হল—বহুমুখী হয়ে। পিতার মৃত্যুর পর হবিবুল্লার হাতে আসতে লাগল কিছু কাঁচা পয়সা। তা থেকে সে বই আনাতে সুরু করল ডাক-ভেলিভারীতে। সে ডাকের মধ্যে বিজ্ঞান-ইতিহাস, প্রাণিতত্ত্ব, দর্শন-ধর্মশাস্ত্র আর আরবী-ফার্সি-উর্দ্দু ইংরেজি সংস্কৃতির মূল গ্রন্থগুলো তো থাকতই—উপরন্তু থাকত তন্ত্রশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র, হঠযোগ, ডাকিনী শাস্ত্র, হস্তরেখা বিচার ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের বই। দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞানের ধারা কী করে একই মগজে পরম নির্বিবাদে আশ্রয় গ্রহণ করত—হবিবুল্লার মনঃসমীক্ষণে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান সমস্যা।

এই নজরবন্দী অবস্থার মধ্যেই প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করে গিয়েছিল হবিবুল্লা প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে। পরীক্ষা পাশ নেহাত একটা করার দরকার, সেইজন্যই পরীক্ষায় বসল। নামকরা ছাত্র হবার স্পৃহা এর মধ্যে কোথায় সে হারিয়ে এসেছিল।

মুক্তি পাবার পর সে আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল জীবনের আবর্তে।

খান-পরিবারের আয়ের মূল ভিত্তি ছিল কতকগুলো ঔষধের কারখানার ওপরে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী ঔষধ প্রস্তুত করা। আর ভারতের বিভিন্ন সহরে বিদেশী ঔষধের আমদানী ও কেনাবেচার কাজে খান-পরিবারের বেকার ছেলেদের কাজে লাগানো হত। যাঁরা মান্যগণ্য হয়ে উঠতেন ডাক্তারী-ওকালতী বা চাকরীতে, তাঁরা অবশ্য থাকতেন ও কারখানাগুলো বেড়ে চলেছিল পরিবার বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে। এখন যুদ্ধের বাজারে কারবারটা ফাঁপিয়ে হয়ে উঠল—কয়েক লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয় রাতারাতি কয়েক কোটিতে দাঁড়াল। এ ছাড়া যুদ্ধের পরেই পশ্চিম দেশের দ্বার খুলে গেল ভারতীয় ব্যবসাদারদের জন্য।

খান কোম্পানীর ব্যবসায়ের যাঁরা ছিলেন কর্ণধার তাঁদের অনেককে যেতে হল বিদেশে—কারবার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দেখতে। দিল্লীর কারখানায় এই ভাবে একজন ম্যানেজারের ঘাটতি পড়ে গেল। যন্ত্রপাতি কলকারখানা সম্বন্ধে হবিবুল্লার বিশেষ জ্ঞানের কথা কারো অজানা ছিল না। তার ওপরে অন্তরীণ অবস্থায় হবিবুল্লার মর্য্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল খান-পরিবারে—যদিও কর্তাব্যক্তিরা তার বাউণ্ডুলে ভাবটার সমর্থন করতেন না। শেষ পর্য্যন্ত ঘাটতি পূরণ করবার জন্য হবিবুল্লাকেই ধরে আনা হল, তার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত রেখে। কর্তারা আশা করেছিলেন যে ইণ্ডাষ্ট্রীর ষ্টীমরোলারের নিষ্পেষণে ওর বেয়াড়া ভাবটা শুধরে যাবে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, এ ব্যবস্থার হবিবুল্লার তরফ থেকে কোনও ওজর আপত্তি তো উঠলই না, উপরন্তু পাকা ব্যবসাদারের মতোই সে কাজ শিখতে বসে গেল—বিজ্ঞানসাধনার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে।

এর পরের ক'বছরে ব্যবসায়ে হবিবুল্লার অসাধারণ সাফল্য আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তিন বছর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অর্থনীতির ছাত্র উত্তর-ভারতে ঔষধের ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ শীর্ষক এক থিসিস দাখিল করে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর জন্য। ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত খান কোম্পানীর ঔষধের কারবার কী ভাবে পরিবর্ধিত হয় তার একটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে সে থিসিসের একটা প্রধান অধ্যায়। তা থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে হবিবুল্লার জীবনীতে।

রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকচরিত্র, ইতিহাস, অর্থনীতি ও সাংখ্যের মহাপণ্ডিতরা মিলে যদি কোনও ব্যবসায় পরিচালনা করতেন, তাহলে সে ব্যবসায়ে যে রকমের বিপ্লব আশা করা যায়—খান কোম্পানীর ঔষধের ব্যবসায়ের পরিচালনাতেও সে রকম অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা যায় উনিশ শ ছেচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল পর্য্যন্ত। এ সময়কার বাজারদরের অপ্রত্যাশিত উত্থান-পতনের মধ্যে ঔষধের ক্রয়, বিক্রয় ও প্রভৃতি এমন নির্ভুল ভাবে চালানো হয়েছিল যে সত্যই সেটা বিস্ময় উৎপাদন করে। আরো বিস্ময়কর কথা—কোনো বিশেষজ্ঞকে খান কোম্পানী এ সময়ে নিয়োগ করেন নি। একজন অনভিজ্ঞ তরুণ ম্যানেজারই দিল্লী কেন্দ্রে ব্যবসায় পরিচালনা করেন এই চার বছর ধরে। হয়তো বলা যেতে পারে যে কল্পনাতীত সৌভাগ্যের ফলেই নূতন ম্যানেজারের নীতি ও আন্দাজ সর্বতোভাবে কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু চার বছর একাদিক্রমে একমাত্র আন্দাজের ওপরে নির্ভর করে প্রতিপদে এই আশাতীত সাফল্যলাভ হয়েছিল—এ কথাটা বিশ্বাস করাও শক্ত।

এই অধ্যায়ের উপসংহার—"এখানে দ্রষ্টব্য যে আজকের বাজারের পরিস্থিতিতে খান কোম্পানীর ১৯৪৬-৪৯এর প্রণালী কার্য্যকরী হত না উপরন্তু খুব সম্ভবতঃ কোম্পানীকে মোটা রকমের লোকসান দিতে হত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ১৯৫০ সাল থেকেই খান কোম্পানীর ব্যবসায়ের নীতি আবার ফিরে যায় গতানুগতিক পথে। সর্বশেষে বলতে হয়, ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসে এরকম অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।"

এই চার বছরেই হবিবুল্লা হয়ে উঠল প্রায় তিরাশী লক্ষ টাকার মালিক। এর মধ্যে রেডিও ইলেক্ট্রনিকসএর একটা বিরাট কারখানা আর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাও পত্তন হয় তার উদ্যোগে।

কিন্তু এতো কর্মব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ যেন নির্বাপিত হয়ে গেল ব্যবসা সম্বন্ধে তার উৎসাহ। লাভ-লোকসানের এত বড়ো নাটকটা যখন জমে 'ক্লাইম্যাক্স'এ উঠেছে, হবিবুল্লার নিরুৎসাহ হবার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো বা অতিবাস্তব দৈনন্দিন কেনা-বেচার কোলাহলে তার কল্পনাবিলাসী মনটা হাঁফিয়ে উঠেছিল। ব্যবসাকে সে হয়তো গ্রহণ করেছিল একটা চিত্তাকর্ষক গণিতের খেলা হিসাবেই। যখন উপলব্ধি করল যে অল্প আয়াসে সমস্যার সমাধান মিলে যাচ্ছে তখনই সে সম্বন্ধে তার উৎসাহ গেলো নিবে।

কারবারের মধ্যে ডুবে থাকলেও হবিবুল্লার পড়ার নেশা এতোটুকুও কমেনি। খান কোম্পানীর ম্যানেজারের ঘরের সব দেওয়ালগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বইয়ের আলমারীতে। সেখানে থাকে থাকে জমা তো ছিলই 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' ও 'মার্কেট

রিসার্চ'-এর নানা রকমের কেতাবে—আর তার সংগে মিশে থাকত পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ইঞ্জিনিয়ারীং-এর মোটা মোটা ভল্যুম ; এগুলো ছিল সব হবিবুল্লার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছোটো-বড়ো অবসরটুকু ভরিয়ে তোলার জন্য।

ইতিমধ্যে হবিবুল্লা 'করেসপণ্ডেনস' কোর্সের মাধ্যমে 'ডিপ্লোমা' যোগাড় করছে চারটে বিষয়ে—'ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং' গণিতশাস্ত্র, 'বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট' আর 'রেডিও ইলেক্ট্রনিক্‌স্'এ। ১৯৪১ সালের লক্ষ্ণৌর বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সে, প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে।

মানুষের সংগে কিন্তু তার ব্যবহারটা ছিল একেবারেই খাপছাড়া। সামান্য আলাপ ছাড়া কারো সংগেই ছিল না তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। তরুণ ম্যানেজারকে সকলেই করত ভয়—কিন্তু জনপ্রিয়তা হবিবুল্লার একেবারেই ছিল না। প্রথমেই সে খান কোম্পানীর দু-চারজন বহুবর্ষের পুরানো কর্মচারীকে সামান্য অপরাধে বরখাস্ত করে বসল। অথচ কখনো কখনো নিম্নতন কর্মচারী, মজুরদের দাবী সে মিটিয়ে দিত অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দেশের দৃশ্যপট ইতিমধ্যে গিয়েছে বদলে—ভারতবাসীর বহু আকাংক্ষিত স্বাধীনতা পাওয়া গেছে মর্মান্তিক বিভেদের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্ণৌতে খানবংশের ফাটলধরা একান্নবর্তী পরিবার এবার ভেঙে পড়ল ঐতিহাসিক তরংগের ধাক্কায়। পরিবারের একটা অংশ আশ্রয় নিল পাকিস্থানে। খান কোম্পানীর ব্যবসাও দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল ; 'খান ব্রাদার্স', 'পাকিস্তান ইনকরপোরেটেড' এর জন্মও এর মধ্য থেকেই।

হঠাৎ একদিন হবিবুল্লা ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদে ইস্তাফা দিয়ে বসল।

নিজের গড়া 'ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্' আর 'ইঞ্জিনিয়ারী' কারখানাগুলোর পরিচালনার ভারও সে ছেড়ে দিল একটি 'ট্রাষ্ট'এর ওপরে। ব্যাংক থেকে কিছু টাকা তুলে বেরিয়ে পড়ল হবিবুল্লা জগতটাকে চিনবার দ্বিতীয় অভিযানে।

প্রথম বছরটা কাটলো ইউরোপ ও আমেরিকায় 'টুরিষ্ট' বৃত্তিতে। তার গতিবিধির কোনো বাঁধাধরা নিয়মও ছিল না, কখনও বা পদার্থবিজ্ঞানের কংগ্রেসে তাকে দেখা গেছে দর্শক-বেশে, আবার কখনও ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে সে ভ্রাম্যমান 'জিপসি'দের দলের সংগে। হবিবুল্লাকে দেখা গেছে প্যারীতে বিত্তহীন 'আর্টিষ্ট-ইণ্টেলেক্‌চুয়াল'দের আড্ডায়, লণ্ডনের ব্যবসায়ী সম্মেলনে, লোহামজুরদের সমাবেশে, পেন্সিলভানিয়া, 'রিভাইভ্যালিষ্ট' মিটিংএ নিউইয়র্কে নিগ্রো স্পিরিচুয়ালিষ্ট সংগীতের আসরে, শিকাগোর নাইটক্লাবে, স্যানফ্রান্সিস্কোতে সায়েন্স ফিকসন কংগ্রেসে, লণ্ডনে 'ইণ্টারপ্লনেণ্টারি সোসাইটি'র বাৎসরিক অধিবেশনে, জার্মাণীতে ম্যাক্স প্লাংক ইনষ্টিটিউটে।

জগতের তথাকথিত উন্নততর দেশগুলোর সংগে এই ভাবে পরিচয় সমাধা করে হবিবুল্লা রওনা হল অপেক্ষাকৃত দুর্গম পথে। এবার তার যাত্রা সাহারা মরু অতিক্রম করে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত অবধি। তারপরে পশ্চিমতীর ঘেঁষে সমগ্র মহাদেশটার অর্ধেকটা পরিক্রমা করে নাইজেরিয়ার উপকূল থেকে সে উঠল দক্ষিণ আমেরিকাগামী এক মালবাহী জাহাজে—আট মাসের এ দীর্ঘ পর্যটন যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল সে কথা বলা যায় না। নাইরোবি থেকে তার আসে যে হবিবুল্লার জীবন-সংশয় হলদে জ্বরে। সে সময় খবর পেয়ে তার এক আত্মীয় কেপটাউন থেকে এসে তার সেবা করে। ট্যাংগানিকা অতিক্রম করবার সময় বন্যমহিষের আক্রমণে হবিবুল্লা জখম হয়ে পড়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয় একজন বাণ্টু সরদারের অতিথি হয়ে।

দক্ষিণ আমেরিকাতেও তার সফর সমাধা হতে লাগল আরো কয়েক মাস। এবারে কিন্তু সে দেশভ্রমণের সহজতর উপায় বেছে নিয়েছিল হাওয়াই জাহাজের যাত্রী হয়ে। হয়তো দুর্বল রোগজীর্ণ শরীরে পদব্রজে ভ্রমণ আর ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠছিল না। সম্পূর্ণ জানা গেলে এ ভ্রমণের বিবরণী থেকে একটা চিত্তাকর্ষক কাহিনী রচনা করা যেত। কিন্তু একমাত্র হরিকিষণ গুপ্তর কাছে লেখা দু'-একখানা আকস্মিক পত্র ছাড়া আর সমস্ত স্মৃতিই বিলুপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্কেও ধীরে ধীরে শৈথিল্য এসে যাচ্ছিল। হরিকিষণ গুপ্তর তখন অ্যাসেম্বলীর মেম্বর-মন্ত্রী হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রাক্তন ছাত্রের খবরাখবর নেবার সময়ই হত না তাঁর দৈনন্দিন কর্মতালিকার মধ্যে।

এই উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণের কোনো তাৎপর্য বোঝাও শক্ত। মনে হয় সারা দুনিয়াতে হবিবুল্লা দুর্লভ কিছু একটা খুঁজে বেড়াত। স্কুলজীবনে গোমতীর নির্জন তটে, অজ্ঞাতবাসে ভারতের কোণে কোণে, কারবারের হিসাব নিকাশের মধ্যে আর বাইরের জগতের দুর্গম গিরিকান্তারে যেন কোন দুরাকাংক্ষার সাধনায় তার এই নিরর্থক অন্বেষণ।

মানুষের সংগে সাধারণ ব্যবহারে ওর দানা বেঁধে গিয়েছিল একটা কায়দাদুরস্ত কাঠিন্য। পাঁচজনের মনে হবিবুল্লা জাগিয়ে তুলত ঈর্ষা, সহকর্মীদের কাছে কাজ আদায় করবার ভংগীতে ছিল কঠোর স্বার্থপরতা। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকাশ পেত তার অবহেলামিশ্রিত অবজ্ঞা। কাজেই হবিবুল্লাকে যে সকলে এড়িয়ে চলত, এটা এমন কিছু বিস্ময়ের কথা নয়। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই যে, অশিক্ষিত, দরিদ্র সমাজের নীচের তলার মানুষগুলোর জন্য মাঝে মাঝে দেখা যেত তার প্রাণভরা দরদ।

ওর পরিচিত এক টাংগাওয়ালা একবার চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। তার হয়ে আদালতে লড়াই করার জন্য হবিবুল্লা নিয়োগ করেছিল লক্ষ্ণৌর সব সেরা উকীলকে। খান পরিবারের এক পুরাতন ভৃত্যের ক্ষয়রোগ ধরল ; হবিবুল্লা নিজের খরচায় তাকে পাঠিয়েছিল সুইৎসারল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্য। দরকার হলে কোল, ভীল, সাঁওতাল, আদিবাসীদের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত পরম আনন্দে। অথচ ভদ্রলোকের আড্ডায়, নাচ-গান-সংস্কৃতির আসরে। সাহিত্য সম্মেলনে বা রাজনীতি সভায় এক মুহূর্ত থাকতেও তার অসহ্য লাগত।

এই পটভূমিকায় হবিবুল্লার জীবনে প্রথম নারী-সংস্পর্শ। রৌশনআরা—আলিগড়ের সোসাইটি-গার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কন্যা। প্রবীণ ছাত্রদের 'হার্টথব' আর নবীনদের মানসী। রেস্তোরাঁয় টেনিসে, সিনেমায়, জলসায় নাম শোনা যায়—রৌশনআরা। কোন খেয়ালে হবিবুল্লা একদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুর ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল।

সতীর্থদের আশ্চর্য করে দিয়ে রৌশন .কিন্তু বেছে নিল হবিবুল্লাকেই। ওই সিনেমা-পার্টিতে, মানুষের সমাবেশে কিছু দিনের মতো হবিবুল্লাকে দেখা যেতে লাগল। কানাকানি সুরু হল—এবার দুর্ভেদ্য দুর্গে ফাটল ধরেছে।

কিন্তু মাত্র কয়েক মাসই এই বিলম্বিত বসন্ত ফুল ফোটাল। লঘুচিত্ত প্রজাপতির সংগে ঐরাবতের সখ্যতা সম্ভব হলেও, সে মিতালিতে প্রয়োজন মেটে না কোন পক্ষেরই। লক্ষ্ণৌরই এক তরুণ ডাক্তার সুযোগ বুঝে একদিন রৌশনকে কেড়ে নিয়ে গেল হতবুদ্ধি হবিবুল্লার সামনে থেকেই। হরিকিষণ গুপ্তর কাছে হবিবুল্লার চিঠিতে জানা গেছে ওর সেদিনের প্রতিক্রিয়া—মর্মস্পর্শী ভাষায়।

প্রকৃতি আর জড়কে জয় করার জন্য ঘটা করে আজ চলেছে আয়োজন। দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে দুস্তর বাধা এই অভিযানে মানব হৃদয়—'বায়োলজি'র অমোঘ বিধান। জীবনে আজ আমার হল দ্বিতীয় পরাজয়। ছেলেবেলায় একদিন খেলোয়াড় হবার সাধনা ছিল—কিন্তু সে আশার পূরণ হল না দৈব দুর্বিপাকে। তখন ভাবতাম যে, এর চেয়ে অসহনীয় দুঃখ আর কিছুই নেই জগতে। আজ পেলাম তার চেয়ে বড়ো আঘাত।

যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাচ্ছি যে রৌশনের মত অপরিণত বুদ্ধি, অসারমস্তিষ্ক সংগিনীর প্রয়োজন সত্যই এমন কিছু ছিল না আমার জগতে। বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি—তার সংগে আমার মিলনটা কোনো দীর্ঘাকৃতি 'নরওয়েজিয়ান' জোয়ানের সংগে 'বুশম্যান' নারীর মিলনের চেয়ে বিসদৃশ হয়। কিন্তু হৃদয়ের ফাঁকটা ভরাবার জন্য আজ কোনো উপকরণেরই সন্ধান পাচ্ছি না।

হবিবুল্লার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রৌশনআরা বলেছে, হবিবুল্লার মধ্যে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে গিয়েছিল—ইঞ্জিনবিহীন জাহাজের খোলটার মতো। ব্যবহারে ছিল তার একটা দুর্বোধ্য আড়ষ্টতা। একটা প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতাও তার মধ্যে দেখেছি। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার দুঃখ এই যে, ওই বিরাট প্রতিভা জগতের কোনো কাজেই লাগল না।

সত্য কথা বলতে কি, আমায় সে কোনদিনই চায়নি—মানুষ যেমন করে মানুষকে চায়। আমার মধ্যে সে যেন কিসের সন্ধান করত।

এই বিপর্যয়ের পর হবিবুল্লার সখের কলেজ-জীবনেও পড়ল যবনিকা। আঘাত পেয়ে হবিবুল্লা সান্ত্বনার আশায় ডুবে গেল আবার তার বই-এর ভাঁড়ার মধ্যে। এমনি ভাবে কেটে গেল কিছুদিন। মাস ছয়েক বাদে সে উপস্থিত হল গুপ্ত সাহেবের দরবারে।

গুপ্তসাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন—ছেলেটা বদলিয়ে গিয়েছে। তার চোখে উদ্দীপনার আলো, কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। গুপ্তসাহেবের কাছে সে বললো, মাষ্টার সাহেব এবার একটা ল্যাবরেটরী গড়ে তুলব বলে স্থির করেছি। এমন ল্যাবরেটরী ভারতে কেউ কখনো দেখেনি।

হরিকিষণ গুপ্ত খুব উৎসাহের সংগে সে প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। ভাবলেন, ছেলেটার প্রতিভা ও অর্থবল যদি সত্যই কিছু কাজে লাগে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে গুপ্তসাহেবের সংগে চলল ল্যাবরেটরী সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা। গুরু-শিষ্যের মধ্যে আবার ফিরে এল ক্ষণিকের জন্য সেই পুরানো দিন—আবিষ্কারের স্বপ্নে বিহ্বল। তারপর হবিবুল্লা চলে এল দিল্লীতে।

এ সময়ে একজন আশ্রিত ভাইপো জুটে গেল ওর সংগে। পাঞ্জাবে দাংগার সময়ে সলিমুদ্দিনের চোখের সামনে ক্ষিপ্ত শিখের দল ওদের পরিবারের সমস্ত পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সলিম ও তার আম্মা এক হিন্দু পরিবারের মধ্যে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু ওর মা এ নিদারুণ অভিজ্ঞতার ফলে একেবারেই বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলেন। জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি বছর কয়েক বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হবিবুল্লা কিশোর সলিমকে পরম আদরে কাছে টেনে নিয়ে এল। দিল্লীতে কলেজে তাকে ভর্তি করে দিয়ে অতি যত্নে সলিমের পড়াশুনায় সাহায্য করতে লাগল।

সলিমও ছায়ার মত অনুসরণ করে হবিবুল্লার পোষমানা কুকুরের মতো—নানা রকমের ফাইফরমাস খেটে দেয়, সাহায্য করে যথাসম্ভব ল্যাবরেটরী সাজানোর কাজে। হবিবুল্লার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ও পেল একটা অবলম্বন। নিজের জীবনের নিয়মতান্ত্রিক কলেজ শিক্ষার যে অপূর্ণ সাধ তার কতকাংশ পূরণ করে নিতে লাগল সলিমের মাধ্যমে।

পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে সলিম যখন বি, এস সি পাশ করে, হবিবুল্লার তখন গৃহনির্মাণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এবার

সলিমকে সংগে নিয়ে আবার বিদেশে বেরিয়ে পড়ল হবিবুল্লা ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতির সন্ধানে। তার পর আসতে লাগল বিদেশ থেকে বড় বড় প্যাকিং বাক্স ক্রেট প্রায় বছর খানেক ধরে। ধীরে ধীরে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরী ভরে উঠতে লাগল। এ সময়ে ওরা ছিল নিজেদের মধ্যেই সমাহিত। বহির্জগতের কারুরই প্রবেশ ছিল না খুড়া-ভাইপোর মধ্যেকার অন্তর্জগতে—এমন কি গুপ্তসাহেবেরও নয়।

গুপ্তসাহেবের সংগে শেষ দেখা হয় হবিবুল্লার এগারো মাস আগে। ওদের গৃহপ্রবেশের উৎসবে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্ত জরুরী কাজ ফেলে রেখে। হবিবুল্লাকে তিনি দেখেছিলেন দারুণ অন্যমনস্ক। সে রাত্রে বিদায় নেবার সময় হবিবুল্লার শেষ কথাটা তাঁর মনে আছে। মাষ্টারসাহেব, মনে হচ্ছে একটা বিরাট কিছুর সন্ধান পেয়েছি। আমার পরিকল্পনা সম্ভব হলে ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার রূপ বোধ হয় বদলে দেওয়া যাবে। আজ তো আর সময় হল না—একদিন আপনার অবসর হলে সবই বলব।

বলা বাহুল্য, সে সুযোগ আর আসেনি।

এর পরে পড়েছে কাহিনীতে ছেদ। এ সময়ের মধ্যে ল্যাবরেটরীতে হবিবুল্লা আর সলিম কী নিয়ে যে সমাহিত থাকত, আজ আর তা জানার কোনো উপায় নেই। চাকরবাকরের সাক্ষ্যে জানা গেছে যে, প্রায়ই গভীর রাত্রি অবধি দুজনে গবেষণাগারে পড়ে থাকতে, কখনো বা আহার-নিদ্রাও পরিত্যাগ করে।

টিমারপুরের অগ্নিদগ্ধ বাড়ীতে শিশুপুত্র নিয়ে যে ভদ্রমহিলা বাস করতেন, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মিসেস আহমদ বলে তিনি ওখানে পরিচিত ছিলেন। ইতিবৃত্তে যতটুকু জানা গেছে, দুর্ঘটনার বছরখানেক আগে দু মাসের শিশুপুত্র নিয়ে ঐ বাড়ীর তিনতলার বড়ো 'ফ্ল্যাট'টা তিনি ভাড়া নেন। হবিবুল্লা মাঝে মাঝে আসত তাঁর সংগে আলাপ করবার জন্ত। নীচের তলার কয়েক জন দোকানদারের সংগে তার সামান্ত আলাপ ছিল; আর ওর ছোটো মোটর গাড়ীটাও ওই অঞ্চলে পরিচিত ছিল।

মিসেস আহমদের সংগে বিশেষ পরিচয় ওই বাড়ীর বাসিন্দাদের কারোই ছিল না। মাসে মাসে উচ্চহারে নিয়মিত বাড়ী ভাড়া পেয়ে বাড়ীওয়ালা সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন। দামী আসবাবপত্রের বহর দেখে সকলে অনুমান করে নিতেন যে, ভদ্রমহিলার অর্থের অভাব ছিল না। ওই ফ্ল্যাটে ওদের সংগে ছিল একজন পরিচারিকা—অগ্নিকাণ্ডের কয়েক দিন আগে থাকতে সে-ও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। মিসেস আহমদের সংগে হবিবুল্লার যে কী সম্পর্ক, তদন্ত করেও তা জানা সম্ভব হয়নি। কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে হয়তো বা দুজনের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় মিসেস আহমদ ও তাঁর শিশুপুত্রের তিনতলায় অবস্থিতির কথাটা কারো জানা ছিল না।

সবচেয়ে হতাশার কথা, হবিবুল্লার পূর্ব ইতিহাস অনেক সময়ে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হলেও জীবনের শেষ অধ্যায়টা তার রয়ে গেছে রহস্যজালে আবৃত। এ জীবনীর বেশীর ভাগ উপকরণই সংগ্রহ করা গেছে হরিকিরণ গুপ্তের সহযোগিতায়।

হবিবুল্লার মনের যে অংশ ছিল গুপ্তসাহেবের নাগালের বাইরে, সে অংশটা রইল হয়তো বা চিরকালের মতো বিস্মৃতির অতলসাগরে তলিয়ে।

* * * *

দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠার রিপোর্ট এখানে থেমে গেছে। শেষে একটা ছোটো প্যারাগ্রাফে যোগ করা হয়েছে,

এ বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীর মধ্যে অ্যান্টি গ্রাভিটি আবিষ্কারের মূল প্রেরণা কোথায় যে সমাহিত হয়ে আছে, আপাত দৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। পঙ্গু হয়ে পড়ার পর হতাশাস কিশোরের স্বপ্নে কি জেগে উঠেছিল মহাকর্ষ বিজয়ের সংকল্প? না, রোশন আরার নির্মম প্রত্যাখ্যানের পর একটা অদম্য প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল হবিবুল্লা—সাধারণ মানুষকে ছাড়িয়ে ওঠবার? ভবিষ্যতের তদন্ত এ সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করবে কি?

* * * *

শংকরের চোখে আজ ঘুম নেই।

দীর্ঘ ব্যারাকটা নিস্তব্ধ। দূরে আওয়াজ শোনা গেল কুকুরের পালের। কখনো বা নীরবতা ভেঙে যায় দূরপথে লরী বা মোটরের ঝন্ঝনায়। দূরাগত ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ শোনা যায় থেকে থেকে। সম্ভবতঃ কোনও যাত্রিবাহী ট্রেণকে আটক করে রাখা হয়েছে ডিসট্যাণ্ট সিগনালের লালচক্ষু দেখিয়ে।

কেমন মানুষ ছিল হবিবুল্লা?

তার ভাঙা যন্ত্রটার মতোই এ অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে কোথায় রয়ে গেছে একটা অসমতা, একটা প্রচ্ছন্ন অপূর্ণতা!

হবিবুল্লার কোন রূপটা সত্য? কল্পনাবিলাসী হবিবুল্লা? ব্যবসায়ী হবিবুল্লা? না ভবঘুরে হবিবুল্লা? কিসের সন্ধানে কেটেছিল তার নিষ্ফল জীবন? অ্যান্টি গ্রাভিটি?

এ জীবনকাহিনীতে কোথায় যেন থেকে গেছে এক বিরাট অসংগতি। তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করেও সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

চোখ বন্ধ করে শংকর মানস পটে ফোটাতে চেষ্টা করে হবিবুল্লার প্রতিকৃতি। একটা আবছায়া অনুভূতির বোঝায় ক্লান্ত মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে হবিবুল্লাকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না!

ঘরের বাতিটাকে সুইচ টিপে নিবিয়ে ফেলে শংকর রায়।

[ক্রমশঃ।

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমন্যু

অন্যায় ধ্বংস হোক

শেষের ক'টা দিন দার্শনিক চিন্তার জাল বুনে, বিষাদবিধুর নিঃসঙ্গতায় কাটিয়ে দেবেন, এই হয়তো ভেবেছিলেন ভলতেয়ার। পরিবেশও ছিল অনুকূল। তাঁর দার্শনিক মতবাদ মেনে নিয়েছিল অভিজাত-সমাজ। ধর্মযাজকরাও তাঁর ওপর বিরূপ হননি, বিশ্বাসের পথে যে অনেক কাঁটা এই ভেবে অনুকম্পার হাসি হেসেছিলেন। কেউ কেউ ভলতেয়ারকে ধর্মীয় কোনো সম্মানে ভূষিত করারকথাও ভাবছিলেন। কিন্তু তা আর হ'ল না। আচমকা এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উগ্রতেজে জ্বলে উঠলেন ভলতেয়ার, ওড়ালেন যাজক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা। সেই পতাকায় রক্তাক্ষরে লেখা হ'ল অন্যায় ধ্বংস হোক। কিন্তু কি সেই ঘটনা?

Ferney থেকে একটু দূরেই ফ্রান্সের সপ্তম সহর Toulouse। Touluse তে তখন চলেছে ক্যাথলিক যাজক-সম্প্রদায়ের নির্বাধ রাজত্ব। প্রোটেষ্টাণ্টদের উপর আরোপ হয়েছে অসংখ্য বাধা-নিষেধ। তাদের কেউ সহরে উকীল, ডাক্তার মুদী, পুস্তক-বিক্রেতা বা মুদ্রাকর হ'তে পারেনা। এমন কি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রেটেষ্টাণ্ট চাকর বা কেরাণী রাখাও নিষেধ। ১৭৪৮ সালেও প্রোটেষ্টাণ্ট ধাত্রীকে নিযুক্ত করার জন্ত এক ক্যাথলিক রমণীকে ৩০০০ ফ্রাঁ জরিমানা দিতে হ'য়েছিল।

এ সব কিছুই জানতেন না ভলতেয়ার। জানলেন যখন Toulouse থেকে সহরের প্রোটেষ্টাণ্ট বাসিন্দা Jaan calas এর অত্যাচারিত ও সর্বস্বান্ত আত্মীয়-স্বজন এসে আশ্রয় চাইল তাঁর কাছে। calas এর এক মেয়ে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে একমাত্র ছেলে করল আত্মহত্যা। সহরের আইনানুসারে আত্মহত্যাকারীর নগ্ন মৃতদেহ রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রাখা হ'ত। শোকার্ত পিতা চেয়েছিলেন মৃতদেহকে এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। তাই মৃত্যুটা স্বাভাবিক প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন তিনি। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ক্যাথলিকরা রটিয়ে দিল ব্যাপারটা মোটেই আত্মহত্যা নয়। ছেলের ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে বাধা দেবার জন্তে ষড়যন্ত্র ক'রে হত্যা করা হয়েছে তাকে। Calas ধৃত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু হ'ল। তারপর চ'ল্‌ল অবশিষ্ট আত্মীয়স্বজনের উপর অত্যাচার। সহর ছেড়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে তারা আশ্রয় নিল ভলতেয়ারের কাছে। এটা ১৭৬১ সালের ঘটনা।

১৭৬২ সালে Tonlouse সহরে মারা গেল Elizabeth Sirvens নামে প্রোটেষ্টাণ্ট মেয়ে। আবার গুজব রটলো যে ক্যাথলিক হবে এ প্রায় ঠিকই ক'রে ফেলেছিল এলিজাবেথ। [illegible]

ক'রেছে। আবার একবার সহরের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ওপর ব'য়ে গেল একটা অত্যাচারের তাণ্ডব। কেউ একবার ভেবেও দেখলে না যে সদাসন্ত্রস্ত মুষ্টিমেয় জনকয়েক প্রোটেষ্টাণ্টের পক্ষে এমন কিছু করা কল্পনার অতীত। ১৭৬৫ সালে ষোল বছরের প্রোটেষ্টাণ্ট কিশোর La Barre কে কেন্দ্র ক'রে প্রকাশিত হ'ল এই সাম্প্রদায়িকতার নব রূপ। ক্রশ ভেঙ্গে ফেলার অপরাধে ধৃত হ'ল এই কিশোর। পাশবিক অত্যাচারের পেষণে আদায় করা হ'ল তার স্বীকৃতি। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠল সারা সহরের ক্যাথলিক সম্প্রদায় নরহত্যার আনন্দে। অস্ত্রের আঘাতে এই কিশোরের মস্তক ছিন্ন ক'রে, মৃতদেহ নিয়ে ফেলা হ'ল জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। আর সেই লেলিহান অগ্নিশিখা ঘিরে উল্লাসে মেতে উঠলো এক উন্মত্ত জনতা। কিশোর বুকে একটি বই জড়িয়ে ধ'রে মৃত্যুকে বরণ করেছিল। বইও পুড়ল আগুনে। সেই বইয়ের নাম Philosophic Dictionary—লেখক ভলতেয়ার।

মনুষ্যত্বের এই অপমানে তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠলেন মানবদরদী ভলতেয়ার। যাজক-শাসনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে অত্যাচারের নিরসনকল্পে সুরু হ'ল তাঁর সংগ্রাম। d' Alembert ও চার্চ ও রাষ্ট্রের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে লিখেছিলেন—এর পর সবকিছু কৌতুকের চক্ষে দেখা হবে আমার কাজ। উত্তরে ভলতেয়ার এইবার লিখলেন এ কৌতুকের সময় নয়, হত্যার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসি-তামাসা চলেনা···। ড্রেফাসের মামলাকে কেন্দ্র ক'রে উদ্দীপ্ত হ'য়েছিলেন জোলা আর আনাতোল ফ্রাস্। হয়তো তাঁদের এই প্রেরণার উৎস ছিল ভলতেয়ারের জীবন; একদিন ফ্রান্সের মাটিতে ভলতেয়ারই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে অত্যাচারের সঙ্গে আপোষ সম্ভব নয়। দর্শনের শান্ত পরিবেশ ছেড়ে বৃদ্ধ ভলতেয়ার বার হলেন কর্মের আহ্বানে, নব-জীবনের শুদ্ধি-মন্ত্র তরল অগ্নির তেজে নির্গত হ'ল তাঁর লেখনীর মুখে। এই মন্ত্র হ'ল অত্যাচার ধ্বংস কর। এই মহান যজ্ঞে সকলকে ডাক দিলেন তিনি, Diderot, d'Alembert সকলকে, বললেন সকলে হাত মিলিয়ে ধ্বংস কর মুষ্টিমেয়ের এই অন্ধ উন্মত্ত অত্যাচার ও অন্যায়কে; যাতে আগামী দিনের বংশধরেরা স্বাধীন জীবন ও স্বাধীন ও চিন্তার আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে। এই আঘাতের প্রচণ্ডতায় ভেঙ্গে পড়লো ফরাসী যাজক-শাসনের প্রস্তর প্রাচীর, কেঁপে উঠলো রাজতন্ত্রের ভিত্তি।

প্রতিপক্ষও নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল না। রূপোর থালায় সম্মানের স্বর্ণমুকুট সাজিয়ে পাঠানো হল ভলতেয়ারের কাছে। সুন্দরী বিলাসিনী মাদাম পাম্পাদুরের ক্ষণিক সান্নিধ্য পাবার জন্ত পাগল তখন প্যারিসের অভিজাত-সমাজ। সেই মাদাম পাম্পাদুর পাঠালেন চার্চের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব; প্রস্তাবে সম্মত হলে চার্চ [illegible]

জনগণের অন্তরে যাঁর আসন পাতা, ইন্‌টেলেক্টের রাজ্যে যিনি একচ্ছত্র সম্রাট, সেই ভলতেয়ার প্রলুব্ধ হবেন জনবত্তক মূক যাজকের প্রভুত্ব করায়। প্রত্যুত্তরে ভলতেয়ার প্রকাশিত করলেন তাঁর Treatise on Toleration লিখলেন তিনি—কি আশ্চর্য যে যাঁরা আজ বলছেন আমি যা করছি তাই কর, অন্যথায় ঈশ্বর তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন; তাঁরাই আবার পরের দিন বলছেন—আমি যা করছি তাই কর, নতুবা আমি তোমায় হত্যা করবো। তারপর তুললেন তিনি সেই মৌলিক প্রশ্ন—স্বাধীনতার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার, অতএব কি অধিকার আছে একজনের অন্যকে তার মতে চলতে বাধ্য করার? মত শেষ করে উচ্চারণ করলেন পথের নির্দেশ মানুষ যতক্ষণ না পরস্পরের দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় মতদ্বৈধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে ততক্ষণ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির কোনো আশা নেই। ধর্মতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন না হলে পাওয়া যাবে না সামাজিক স্বাস্থ্য—কারণ গোঁড়ামিই হচ্ছে ধর্মীয় শাসনের মূলমন্ত্র।

ক্রমে ভলতেয়ারের কলম থেকে আগ্নেয়গিরির দুর্দান্ত গর্জনে অফুরন্ত উদ্দাম জলস্রোতের মতো উৎসারিত হল একের পর এক পুস্তিকা, ইতিহাস, চিঠি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রশ্নোত্তর, উপদেশ, উপাখ্যান, কাব্য, কাহিনী একাধারে সমালোচনা ও সাহিত্য। নিজের নামে এবং শতাধিক ছদ্মনামে নিক্ষিপ্ত হল এই অসংখ্য অগ্নিগোলক—সাহিত্যিক যুদ্ধে শত্রুর ব্যূহকে লক্ষ্য করে এমন মারণাস্ত্রের আতসবাজী আগে কখনও দেখা যায়নি, পরেও গিয়েছে কি না সন্দেহ! জীবন-দর্শনের এমন স্বচ্ছ অথচ প্রাণবন্ত ভাষ্য সাহিত্যের ইতিহাসেও দুর্লভ। দার্শনিকসুলভ বিনয়ে গলে গিয়ে ভলতেয়ার অবশ্য বললেন হ্যাঁ, সত্যিই আমার চিন্তাধারা ভারী সহজ আর সরল। পার্বত্য নির্ঝরিণী আর কি, জল যার গভীর নয় বলেই কাচের মতো স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ জলে মানুষের প্রচণ্ড মুক্তির তৃষ্ণা নিশ্চয়ই মিটছিল, তা না হলে তখনকার দিনে এক একটা পুস্তিকা ৩০০,০০০ কপি বিক্রী হওয়া সম্ভব হতনা। আজকের দিনেও শুধু এই বিপুল সংখ্যার কথা ভাবলেই আশ্চর্য লাগে। ভলতেয়ার জানতেন যে, বড় বই পড়বার ধৈর্য সাধারণ মানুষের নেই। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস রণাঙ্গনে পাঠালেন তাঁর এই ক্ষুদ্র কিন্তু সুসজ্জিত লক্ষ লক্ষ সৈন্যের দল। পরিকল্পনা থেকে সুরু ক'রে সৃষ্টির শেষ কাজটি পর্যন্ত করলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ নিজের হাতে। ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হ'য়ে আছে এই বিপুল সৃজনীশক্তির, এই অলৌকিক উদ্দীপনার স্বর্ণাক্ষর।

উচ্চ চিন্তার পর্যায়ে উপনীত হ'য়ে ভলতেয়ার প্রচণ্ড বিক্রমে বাইবেলের সমালোচনা করলেন। অবশ্য স্পিনোজা, ইংরাজ ...Deists এবং Bayle এর Critical Dictionary থেকে প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু নিজস্ব ভঙ্গীতে রসসিক্ত করে যা পরিবেশন করলেন তার রূপ ভিন্ন, আস্বাদও নূতন। এই সিরিজের একটি পুস্তিকার নাম "The questions of Zapata," জাপাটার বড় সাধ যাজক হবার। কিন্তু মনে তার সংশয়ও অনেক। তার একটা প্রশ্ন হ'ল ইহুদীদের আজ আমরা ধ'রে ধ'রে পুড়িয়ে মারছি। তা হ'লে কি ক'রে আমি প্রমাণ করবো যে দু হাজার বছর আগে এই ইহুদীরাই ছিল ঈশ্বরের একান্ত আপনার জন? এই প্রশ্নের মধ্যে হয়তো নিজের মনের একটু উত্তাপ মিশিয়ে দিয়েছিলেন ভলতেয়ার। অর্থের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক এই দার্শনিক বিরূপ ছিলেন অর্থব্যবসায়ী ইহুদীদের প্রতি। সেই মানসিক বিক্ষোভের আভাস আছে জাপাটার প্রশ্নের মধ্যে।

এই রকম অসংখ্য প্রশ্ন তুলে ভলতেয়ারের জাপাটা জর্জরিত করলে বাইবেলের মহিমাকে। শেষে উত্তর না পেয়ে বিরক্ত জাপাটা অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারে রত হ'ল। সে বললে, ঈশ্বর এক, তিনি সকলেরই পিতা, তিনি পাপীকে শাস্তি দেন, পুণ্যাত্মাকে পুরস্কৃত করেন এবং অন্যায় ক্ষমা করবার ক্ষমতা তাঁরই। এই ভাবে সে মিথ্যার জঞ্জাল সরিয়ে আবিষ্কার করলে সত্যের দ্যুতিমান হীরক এবং প্রমাণ করলে যে প্রকৃত ধর্ম আর আচরিত গোঁড়ামি এক নয়। সে সকলকে সৎ হবার শিক্ষা দিলে। স্নেহ, সহানুভূতি বিনয় ও প্রেম রূপায়িত হ'ল তার অভ্যাসে এবং আচরণে। ১৬৩১ সালে এই লোককেই Valladolid এ পুড়িয়ে মারা হ'ল।

ভলতেয়ার দেখাতে চাইলেন কেমন ক'রে ভারত, গ্রীস ও ইজিপ্টের অতি পুরাতন ধর্মীয় আচার-আচরণ খৃষ্টীয় ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এ-ও বললেন যে, এই পুরাতনের পুনরাবৃত্তিই সেকালের মানুষের কাছে খৃষ্টধর্মের সাফল্যের অন্যতম কারণ। তাঁর ধর্মনিবন্ধে লিখলেন, অত্যাচার ও অনাচারে লিপ্ত থেকেও দীর্ঘ ১৭০০ বৎসর খৃষ্টধর্ম যখন বেঁচে আছে তখন তার অপার মহিমা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে যে পুরোহিতদের বিন্দুমাত্র যোগ নেই এইটাই নানাভাবে প্রমাণ করতে চাইলেন ভলতেয়ার। শুধু গোঁড়ামি আর আচার-আচরণের কচকচি নিয়ে মেতে আছে এই মূর্খের দল। সাধারণ মানুষ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি এই সব তুচ্ছ হাস্যকর মতামত নিয়ে—সৃষ্টি করেনি ভয়াবহ পরিস্থিতি, ডেকে আনেনি অসংখ্য আত্মকলহ—বরঞ্চ সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরামে জীবন কাটাচ্ছে এই পুরোহিতের দল এবং ক্রমান্বয়ে এরাই চাইছে আরও আরাম, কামনা করছে আরও বেশি ক্রীতদাস। সাধারণ মানুষকে এরাই প্রবৃত্ত করছে আত্মকলহে—যাতে নিজেদের প্রভুত্ব অব্যাহত থাকে। গোঁড়ামির শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনকে আকর্ষণ করা ওদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য যাজক-সম্প্রদায় সম্বন্ধে মানুষের মনে আতঙ্ক অব্যাহত রাখা। অর্থাৎ 'পৃথিবীর দুষ্ট ব্যক্তিই ছিল পৃথিবীর প্রথম পুরোহিত এবং তার সঙ্গে যার প্রথম সাক্ষাৎ সেই ছিল পৃথিবীর প্রথম মূর্খ।' এই পুরাতন প্রবাদই উত্যক্ত ফরাসী জনগণের মনে নূতন করে গেঁথে দিতে চাইলেন ভলতেয়ার।

এর পর একটা প্রশ্ন থেকে যায়—তাহলে কি ভলতেয়ার নিজেই ছিলেন ঘোড়া নাস্তিক? জীবনের অনেক পথ সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে চলেছেন ভলতেয়ার, তাতে সন্দেহ নেই। এক সময়ে নাস্তিক্যবাদকে প্রবল আক্রমণ করেছিলেন তিনি। ফলে Encyclopedistsরা বিরূপ হয়েছিল তাঁর প্রতি, বলেছিল, 'ভলতেয়ার একজন গোঁড়া ঈশ্বরবিশ্বাসী।' কিন্তু ঠিক বলেনি তারা। কারণ তার পরেই ভলতেয়ার অনুরক্ত হয়েছিলেন স্পিনোজার pautheism এর প্রতি। Diderot কে লিখলেন অন্ধ হয়ে জন্মাবার ফলে Saunderson ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। 'আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। হয়তো ভুল আমারই।

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম;
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে।
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী
ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।
LIFEBUOY
SOAP
L.17-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

কিন্তু তবুও যিনি সৃষ্টির বদলে অন্ধকে একাধিক অন্যান্য শক্তি দিয়েছেন তাঁর অসীম করুণাকে অস্বীকার করতে পারিনা; অস্বীকার করতে পারিনা—যখন দৃশ্য-জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে সুশৃঙ্খল সম্বন্ধের অস্তিত্ব দেখি। অচিন্ত্যনীয় নিপুণতার অধিকারী একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন। তিনি কে বা কেন তিনি এই সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছেন তা জানিনা, কিন্তু জানিনা বলেই তিনি নেই, এমন কথাও মানতে পারিনা। সব মানুষই সেই অজ্ঞাত শক্তির অংশ।'

মন্ত্রের মায়াজালে বা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করবার লোক তা বলে ছিলেন না ভলতেয়ার। ছোট্ট একটা কৌতুক-কাহিনীতে তিনি বলেছেন তাঁর মনের কথা। কাহিনীটা দুই সন্ন্যাসিনীর সংলাপ: একজন বলছেন, 'বিধাতা যে আমার প্রতি প্রসন্ন তার অনেক প্রমাণ আছে। এইতো আমার পোষা পাখীটার মারাত্মক অসুখ করেছিল। দশ বার প্রার্থনা করবার পরই সেরে গেল তার অসুখ।'

কাছেই ছিলেন এক প্রাজ্ঞ দার্শনিক। তিনি বললেন, 'আমিও জানি যে প্রার্থনার মতো সুন্দর আর কিছু নেই—বিশেষতঃ তরুণীর কণ্ঠে শুদ্ধ ল্যাটিনে যখন তা উচ্চারিত হয়, কিন্তু বিধাতার সব কিছু ছেড়ে শুধু আপনার ওই সুন্দর পাখীকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন, আমি মানতে পারি না। আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে বিধাতার আরও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ থাকা স্বাভাবিক।'

অপর সন্ন্যাসিনী তখন চোখ কুঁচকে বললেন, 'আপনি গোটাকতক শোনা কথা বলছেন যেন.... অন্য কেউ শুনলে আপনাকে নাস্তিক ভাববে।'

দার্শনিক উত্তর দিলেন, 'মোটেই আমি নাস্তিক নই। আমি সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী সেই বিরাট শক্তিতে বিশ্বাস করি, যে শক্তি অনন্তকাল যোগে বেঁধে দিয়েছেন বিশ্বনিয়ন্ত্রণের নিয়ম, যে নিয়মের অন্যতম প্রতীক হচ্ছে সূর্য। কিন্তু আমি এমন কোনো বিশেষ বিধাতায় বিশ্বাস করি না, যে বিধাতা আপনার পোষা পাখীটার সুবিধা হবে ব'লে তাঁরই সৃষ্ট নিয়মকে পরিবর্তিত করবেন।'

অর্থাৎ ভলতেয়ারের মতে—বিধাতা বল যাই বল, সত্যিকারের প্রার্থনা বিশ্ব-নিয়মের ব্যতিক্রম চাইবে না, বরঞ্চ এই নিয়মকেই ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা ব'লে স্বীকার করে নেবে। "Free wik" সম্বন্ধে বড় বড় উক্তি শুনলে হেসে উড়িয়ে দিতেন ভলতেয়ার। আবার আত্মার অমরত্ব বা জন্মান্তরবাদেও তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। সোজা বলেছেন, পৃথিবীতে এত জীব থাকতে মানুষই কেন এই আত্মার অমরত্ব দাবী করেছে? সম্ভবতঃ ওটা মানুষের অদম্য আত্মগরিমার ফল। আমার মনে হয়, ময়ূর কথা বলতে পারলে সগর্বে ঘোষণা করতো যে তারও আত্মা আছে এবং সেই আত্মার আসন হচ্ছে তার মনোহর পুচ্ছের অন্তরে। মনের এই অবস্থায় ময়্যালিটির সংরক্ষণে অমরত্ববাদের প্রয়োজন, এ কথাও তিনি মানতেন না। হেসে বলতেন, প্রাচীন ময়্যালিটির বালাই ছিল না কিন্তু তাতে তাদের ঈশ্বরের প্রিয় হতে আটকায়নি।

আরও পরে অবশ্য তাঁর এই মত বদল হয়েছিল। Dayle-এর প্রশ্ন—'নাস্তিকদের নিজস্ব সমাজ থাকতে পারে কি না'—এর উত্তরে ভলতেয়ার বললেন, পারে, যদি নাস্তিক হয় দার্শনিক। কিন্তু যেহেতু দার্শনিক কোটিতে মাত্র গুটিকতক, অতএব সাধারণ মানুষের পাপের এ পথের পরস্তার দেবার জন্য একজন ঈশ্বর প্রয়োজন। আদর্শ গ্রাম গড়তে হলে তার অধিবাসীদের একটা ধর্ম থাকা কথা। এই সব ভেবে ভলতেয়ার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গের সুরে বললেন, আমি চাই যে আমার উকীল, দর্জি এবং স্ত্রী ঈশ্বরে বিশ্বাস করবে; তা'হলেই আমার ঠকবার বা অপদস্থ হবার আর ভাবনা থাকে না। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না-ও থাকে, তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে।

সন্দেহের শূন্যতা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাসের শক্ত মাটিতে পা রেখেছিলেন ভলতেয়ার। Holbach-কে লক্ষ্য ক'রে তাঁর অভিধানে 'ঈশ্বর' নিবন্ধে লিখলেন তুমি স্বীকার করেছো যে ঈশ্বর-বিশ্বাস অন্তত কিছু মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত ক'রেছে। তাই যদি হয় তো আমি ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি দশটা হত্যা, দশটা অত্যাচার নিবারণের কারণ হয় তা হ'লেই আমি সারা পৃথিবীর লোককে এই বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত হ'তে বলবো। তুমি অবশ্য এ-ও বলেছো যে, ধর্ম পৃথিবীতে অসংখ্য দুর্দশার বাহন হয়েছে; আমি বলবো ধর্ম নয় কুসংস্কার, যা আজও আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে আছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির পথে এই কুসংস্কারই প্রধান বাধা। মাতৃবক্ষ বিদীর্ণকারী এই দানবকে ধ্বংস করতেই হবে; যারা এর দমনে উদ্যোগী তারা মানবজাতির পরম বন্ধু। ধর্মের বক্ষে মরণকামড় বসিয়েছে এই কুসংস্কাররূপী সর্প; একে মারতেই হবে কিন্তু সাবধানে—যাতে মাতৃ-অঙ্গে আঘাত না লাগে।

ধর্ম ও কুসংস্কারের এই পার্থক্যই ভলতেয়ারের ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যীশুর দুঃখে কেঁদেছেন ভলতেয়ার। যীশুর প্রতি তাঁর বহু প্রশস্তি অনেক সাধু-সন্তেরও ঈর্ষার বস্তু। বার বার তিনি কল্পনা করেছেন সাধু-সন্তদের মধ্যে বসে কাঁদছেন মানবপুত্র যীশু, কাঁদছেন তাঁর নামে অনুষ্ঠিত অসংখ্য পাপের কথা স্মরণ করে। হয়তো মানুষের দুঃখে ভলতেয়ারও আড়ালে বসে ফেলেছিলেন অনেক চোখের জল। তারপর শেষে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর ঈশ্বরকে। এই পরমদর্শন রূপায়িত হয়েছে তাঁর Theist নিবন্ধে।

Theist সেই মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ এক মহান পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, যিনি মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান, যিনি বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা... যিনি নিষ্ঠুর না হয়ে পাপের শাস্তিবিধান করেন, এবং মঙ্গলময়রূপে পুণ্যকে করেন পুরস্কৃত—এই বিশ্বাস বুকে নিয়েই Theist বিশ্বের অধিবাসী। অন্যান্য বিভিন্ন মতাবলম্বী, যারা পরস্পরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত, তাদের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তার ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন এবং সর্বব্যাপী ধর্ম, কারণ ঈশ্বরের এই সহজ পূজাই পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আরাধনা। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের ভাষা বোঝেনা কিন্তু Theist এর ভাষা সকলেই বুঝবে। দক্ষিণ থেকে উত্তরমেরু সর্বত্র তার সমধর্মী আছে, সব সাধু-সন্তই তার আপনজন। সে বিশ্বাস করে যে ধর্ম মানে গোটাকতক অবোধ্য দার্শনিক মতামত নয়, বা অসার লোকদেখানো আচার-আচরণ নয়, ন্যায়ই ধর্মের দেহ, পূজাই তার প্রাণ। তার কাছে মঙ্গল কর্মই পূজা, ঈশ্বরে বিশ্বাসই তার মন্ত্র। এক ধর্ম তাকে চেঁচিয়ে বলে, সাবধান! মক্কায় তীর্থযাত্রা যেন বাদ না যায়। অন্য ধর্ম বলে, নোতরদামের গির্জায় না গেলে পাপ হবে। দু পক্ষের কথা শুনেই সে হাসে। কিন্তু আর্তের সেবা এবং নির্যাতিতকে আশ্রয়দানে বিরত হয়না।

ভলতেয়ার ও রুশো

শেষ বয়সে অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিলেন ভলতেয়ার। রাজনীতির ক্ষেত্রেও অত্যাচার ও দুর্নীতি কম ছিল না। সবই জানতেন বৃদ্ধ মনীষী। তবুও বলতেন, রাজনীতি আমার জন্যে নয়। আমি আমার জীবনে মানুষকে একটু বুদ্ধিমান করবার, তাকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু একেবারে মানুষের এই একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনধারা থেকে দূরে যে থাকতে পারতেন তা নয়। স্রোতের ধারায় যখনই ধরা পড়তেন তখনই বিরক্ত হয়ে বলতেন, বদ্ধ কামরায় ব'সে যারা রাজ্যশাসন করে তাদের কথা ভাবলেই কেমন ক্লান্তিবোধ হয়; ··ভাবতে অবাক লাগে যে যারা বাড়ীতে নিজের স্ত্রীকে আয়ত্তে রাখতে পারে না, তারাই কি না পরমানন্দে নিয়ন্ত্রণ করছে সারা পৃথিবীর ভাগ্য। অর্থাৎ ভলতেয়ারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যা সত্য তার ওপর তো আর পার্টির ছাপ নেই, অতএব রাজনীতি থেকে দূরে স'রে থাকাই শ্রেয়ঃ। এই পলায়নী মনোবৃত্তির পেছনে খুব সম্ভব ছিল তাঁর অর্থ-সম্পদের প্রতি অসাধারণ মোহ। ধনীর সংরক্ষণশীলতা আর নিরন্নের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা—এ দুই একই বাসনার এপিঠ আর ওপিঠ। একজন যা আছে আঁকড়ে রাখতে চায় একান্ত করে, অন্যজন যা নেই তাই পেতে চায় দু' হাত ভ'রে। প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন ভলতেয়ার। বৃদ্ধ বয়সে তাই দারিদ্র্যকে ছিল ভীষণ ভয়। তাঁর অভিধানে তাই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাখ্যায় লিখলেন, বিষয়-সম্পত্তি মানুষের শক্তিকে দ্বিগুণ করে। যার জমিদারী আছে সে ভালোভাবে নিজের বংশকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে।

রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি নিয়েও এই বয়সে আর মাথা ঘামাতে প্রস্তুত ছিলেন না ভলতেয়ার। প্রজাতন্ত্র তিনি পছন্দ করতেন কিন্তু এর ত্রুটিগুলোকে তুচ্ছ করে নয়। বলতেন যে, ব্যবস্থাটার মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষ আছে, যা থেকে পরে গৃহযুদ্ধ না হোক, জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা আছে, ধনতন্ত্রের পা যেখানে পড়েনি, এমন একটা দেশে এই ব্যবস্থা চলতে পারে। আর চলতে পারে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক পর্য্যায়ে। অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে আসে শ্রেণীভেদ আর ক্রমোন্নতির প্রতিযোগিতা; তখন এই ব্যবস্থার আদর্শ ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। অভিধানে "স্বদেশ" সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে নিজেই এই নিয়ে তর্কের অবতারণা করেছেন ভলতেয়ার। প্রশ্ন তুলেছেন,—কোনটা ভালো, রাজতন্ত্র না প্রজাতন্ত্র? উত্তরে বলেছেন, চার হাজার বছর ধ'রে এই একই প্রশ্ন বার বার শোনা গেছে। ধনীদের কাছে উত্তর চাও—তারাও ঝুঁকবে আভিজাত্যের দিকে। সাধারণ লোক চাইবে গণতন্ত্র। শুধু রাজারাই বলবে রাজতন্ত্র ভালো। অথচ আশ্চর্য এই যে, প্রায় সারা পৃথিবীতেই রাজতন্ত্রের অবাধ আধিপত্য চলে আসছে। কেন জানতে চাও? বিড়ালের গলায় যে ইঁদুরটা ঘণ্টা বাঁধতে চেয়েছিল তার কাছে এর উত্তর পাবে। এমন একটা মতের সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকেই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, রাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। উত্তরে তিনি হেসে বললেন, মার্কাস অরেলিয়ানের মতো সম্রাট হলে অবশ্য বলবার কিছুই নেই। অন্যথায়, সাধারণ মানুষের কাছে

জীবনে অনেক দেশ ঘুরে মানুষের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন ভলতেয়ার। ফলে জাতীয়তাবাদ, দেশভক্তি এই সব ধুয়োতে বিশেষ ভক্তি তাঁর ছিল না। সারা ইউরোপের আপনজন ভলতেয়ার তাই ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ড আর প্রাশিয়ার যুদ্ধ চলার সময়েও ইংরাজের সাহিত্য আর প্রাশিয়ার রাজাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যুদ্ধ? যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁর প্রকাশ পেত প্রতিটি কাজে আর কথায়। অভিধানেও 'যুদ্ধ' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যুদ্ধের মতো পাপ আর নেই; অথচ প্রত্যেক আক্রমণকারীই চেষ্টা করে তার এই অন্যায়কে ন্যায়ের রঙে রঙীন ক'রে সবার সামনে তুলে ধরবার। আইনে নরহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হত্যাকারীও শাস্তি পায় অবশ্য যদি না সে বেশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে অসংখ্য হত্যার ব্যবস্থা করতে পারে।

তা হ'লে কি বিপ্লবকেই এই সব অসঙ্গতির হাত থেকে মুক্তির পথ ব'লে ভাবতেন ভলতেয়ার? মোটেই না। এই বিরক্ততার প্রথম কারণ তাঁর সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস। তাঁর ধারণা ছিল যে, সাধারণ মানুষ সংস্কারের দাস, আর সেইজন্যেই রাজনীতিকদের স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র। দ্বিতীয়ত, ভলতেয়ার বিশ্বাস করতেন যে সমাজের কাঠামোর মধ্যেই অসাম্যের বীজ নিহিত আছে; যত দিন মানুষ মানুষ থাকবে এবং জীবনে তার থাকবে সংগ্রাম, তত দিন এই অসাম্য দূর করা যাবে না। এই চিন্তাই পরিণত রূপ লাভ করেছে তাঁর অভিধানের "সাম্য" নিবন্ধে। সেখানে তিনি লিখেছেন, যারা বলে সব মানুষই সমান তারা খাঁটি সত্যই বলে—যদি তাদের বক্তব্যের অর্থ এই হয় যে সব মানুষেরই স্বাধীনতায়, সম্পত্তির মালিকানায় এবং আইনের নিরাপত্তায় সমান অধিকার আছে। কিন্তু এই সাম্যবাদই পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজপ্রাপ্য আবার স্বপ্নের মতো সুদূরও। অধিকারের গণ্ডীতে যতক্ষণ আবদ্ধ, ততক্ষণ সহজপ্রাপ্য কিন্তু সম্পদ আর ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রকৃত টান পড়লেই এ হ'য়ে ওঠে স্বপ্নের মতো সুদূর। অভিধানের অন্যত্রও এই চিন্তারই জের টেনে তিনি বলেছেন, সব মানুষের পক্ষে সমান বলবান হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু সকলের সমান স্বাধীনতাভোগে বাধা নেই। ইংলণ্ড এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে···এই স্বাধীনতার অর্থ মানুষ একমাত্র আইনের অধীন হবে। ভলতেয়ারের এই সব কথায় ধ্বনিত হয়েছে বিপ্লব সম্বন্ধে নরমপন্থীদের ধারণা। এই চিন্তারই সূত্র ধরে মিরাবোঁ,

টুরগোঁ ইত্যাদি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। কিন্তু নির্যাতিত মানুষের দল ধরেনি এই নরম নীতির পথ। স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যের দাবী বড় হয়েছিল উগ্রপন্থীদের কাছে। সাম্য চাই, তাতে স্বাধীনতা যায় যাক্। সাধারণ মানুষের এই আকাঙ্খার অন্তরালে নির্যাতনের বেদনা, নিরন্নের হাহাকারটুকু চিনতে ভুল হয়নি রুশোর। তাদেরই একজন ছিনি; শ্রেণীবিভেদের বাধায় অনেক হোঁচট খেতে হয়েছে তাঁকে জীবনে। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল সাধারণ মানুষের দাবী, তাঁর সুরে এক নূতন রূপ পেল এই সাম্যের, সব সমান করার প্রেরণা। এই প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়েছিল মারাত, রোবস্পিয়ের ও আরও অনেকে। এঁদের হাতে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হল, কিন্তু বিপ্লবের অন্যতম বলি হল স্বাধীনতা।

সমসাময়িক শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোয় রাতারাতি স্বর্গরাজ্য সম্ভব, এ কথা বিশ্বাস করতেন না ভলতেয়ার। বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য ভুলতে পারেননি তিনি, তাই বলতেন, কালের গতিতেই সমাজের রূপ বদলায়, কল্পনার রঙে নয়। অতীতকে দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে সে জানালায় এসে উঁকি মারবেই মারবে। এই অবস্থায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কি করে এবং কতটুকু সমসাময়িক দুর্দশা ও অনাচার দূর করা সম্ভব। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ অপেক্ষা, একান্ত সাধনা। ইতিমধ্যে কালের অনিবার্য নিয়মে যতটুকু আসে, তাতেই খুশী হতে হয়। ঠিক এমনি খুশী হ'য়েছিলেন ভলতেয়ার Turgot ক্ষমতায় আসীন হ'তে।

এইবার আসবে সোনার দিন, সংস্কারের রথ এইবার হবে গতিশীল। জুরীর বিচার প্রবর্তিত হবে, ধর্মীয় প্রণামীর দাবী বন্ধ হবে, দরিদ্ররা মুক্তি পাবে করভার থেকে। এই আনন্দের উত্তেজনায় ভলতেয়ার লিখলেন তাঁর বিখ্যাত পত্র :—

. সবকিছুর মধ্যেই শুনতে পাচ্ছি বিপ্লবের পদধ্বনি—সে বিপ্লব অদূর ভবিষ্যতে আসবেই কিন্তু যা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়তো হবেনা। ফরাসীরা সব কিছুই একটু দেরীতে করে, তবে শেষ পর্যন্ত যে করে তাতে সন্দেহ নেই। এক থেকে অন্যে ছড়িয়ে পড়ছে এক বিদ্যুৎবারতা, বিস্ফোরণের আর বিলম্ব নেই, এলো বলে সেই বিপ্লবের পরম লগ্ন। আজকের তরুণরা সত্যিই ভাগ্যবান; তারা অভূতপূর্ব সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে।

ধ্যানস্থ ভলতেয়ার কিন্তু দেখতে পাননি কি ঘটছে তাঁর চার পাশে। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁর কল্পিত বিস্ফোরণের মাঝে জন্মাবে ফ্রান্সের জনগণের নূতন হৃদয়-দেবতা। রুশো তখন প্যারিস আর জেনিভা থেকে লিখে চলেছিলেন তাঁর ভাবাত্মক রোমান্স আর বিপ্লবাত্মক রচনা—একের পর এক। এই রুশোরই জন্য নূতন আসন পাতা হচ্ছিল জনগণের অন্তরে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের অন্তরের পূজা দু' ভাগ করে ঢেলে দিয়েছিল দুই মনীষীর উদ্দেশে—ভলতেয়ার আর রুশো, দুই বিপরীত প্রতিভার পায়ে। নীটশে ভলতেয়ারের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করেই তীক্ষ্ন বিদ্রূপ, দীপ্ত অগ্নির মহিমা, তপ্ত যুক্তি আর তীব্র বুদ্ধির আলো জ্বালিয়ে আসবে যে নবীন দার্শনিক, তারই স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু রুশো? আদর্শবাদী, ভাবরসে টলমল, কল্পনার আকাশে রঙীন পাখা মেলে উড়ে যায় বার বার মন, জনগণের আত্মার আত্মীয়, যে বলে যে চিত্তের একটা যুক্তি আছে যা যুক্তি দিয়ে কখনোই বোঝা যায় না। একই দেশের মাটিতে অল্প সময়ের ব্যবধানে ভলতেয়ার আর রুশোর আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসের এক আশ্চর্য বিস্ময়।

বিস্মিত হয়েই দেখতে হয়, এই দুই প্রতিভাকে কেন্দ্র করে সেই পুরাতন বুদ্ধি আর বোধির সংগ্রাম। যুক্তির পূজারী ভলতেয়ার বার বার বলেছেন,—লেখা এবং কথা দিয়ে মানুষকে অগ্রগতি এবং উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া সম্ভব। কথার ফুলঝুরিতে কিন্তু বিশ্বাস ছিল না রুশোর, যুক্তির ধার দিয়েও যান নি তিনি। কাজ, শুধু কাজ চাই রুশোর, তাতে যদি বিপ্লব আসে আসুক, মানুষের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্বের স্পৃহাই বিপ্লবের আঘাতে উৎপাটিত, পুরানো সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত, ছিন্নমূল জনগণকে আবার বেঁধে দেবে ঐক্যের বন্ধনে। আইন বিদূরিত হলেই মানুষের জীবনে আসবে সাম্য ও সুবিচারের সুদিন। এইসব চিন্তা রূপায়িত হল তাঁর Discourse on the origin of inequality গ্রন্থে। সভ্যতা, কলা, বিজ্ঞান সবকিছু তুচ্ছ করে আদিম অরণ্য-জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে যাবার ডাক দিলেন রুশো। এই বই এক খণ্ড পাঠালেন ভলতেয়ারের কাছে। উত্তরে ভলতেয়ার লিখলেন, মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে আপনার নূতন রচনা পেয়েছি এবং প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি··· আজ পর্যন্ত আপনার মতো এমন চমৎকার ভাবে আমাদের পশুতে পরিণত করবার চেষ্টা আর কেউ করেনি, আপনার বই পড়লেই চতুষ্পদ হবার সাধ যায়। আমি কিন্তু ষাট বছর আগে ওই অভ্যাসটা ত্যাগ করেছি, তাই এখন আবার নূতন করে আরম্ভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুশোর Social contract প্রকাশিত হবার পর তিনি M. Borduকে লিখলেন এইবার রুশোর সঙ্গে দার্শনিকের ততটুকু মিল প্রত্যক্ষ হচ্ছে, যতটুকু মিল আছে মানুষের সঙ্গে বাঁদরের। কিন্তু এই ভলতেয়ারই সুইস শাসনকর্তারা Social contract বই পুড়িয়ে দিতে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রুশোকে লিখলেন, আমি আপনার একটা কথাও মানতে রাজী নই কিন্তু তবুও আমৃত্যু আপনার কথা বলবার অধিকারকে আমি সমর্থন করবো। তারপর যখন অসংখ্য শত্রুর তাড়নায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন রুশো, ভলতেয়ার তখন বিনা দ্বিধায় তাঁকে পাঠালেন আতিথ্যের আমন্ত্রণ। এই দুই মনীষীর মিলন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য কিন্তু ইতিহাসের হয়নি।

সভ্যতার সৌধকে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না ভলতেয়ার। অরণ্য জীবন থেকে সভ্যতার আলোয় এসে লাভ হয়নি, এ কথা শুধু ছেলেমানুষেই বলতে পারে। রুশোকেও তিনি এই কথাই জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পশুর হিংস্রতা যে মানুষের স্বভাবে আছে এ কথা অস্বীকার করবার নয়। সমাজ ও সভ্যতা এই পশুর গলায় নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল পরিয়েছে, ফলে পাশবিক প্রবৃত্তি খর্ব হয়েছে, এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের মনীষা উৎকর্ষের এবং জীবনানন্দ উপভোগের সুযোগ পেয়েছে। চলিত সমাজ ব্যবস্থায় খারাপ কিছু নেই এমন নয়, অনেক খারাপ আছে। যে ব্যবস্থায় যারা খাটে তারাই কম পায়, আর অল্পদল খাটেনা বলে কর দিতেও চায়না—সেখানে হটেনটটদের শাসন-ব্যবস্থা চলছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবুও

অসংখ্য দুর্নীতির মধ্যেও ভুলতে পারিনা প্যারিসের নিজস্ব মহিমা। The world as it goes নিবন্ধে আছে তাঁর এই চিন্তারই প্রতিধ্বনি। রুষ্ট দেবতা দূত পাঠালেন খোঁজ আনতে যে এক সহর ধ্বংসের যোগ্য কি না। দূত সহরে গিয়ে দুর্নীতি আর অনাচারের অবিশ্রান্ত স্রোত দেখে চমকে উঠলো। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে সহর আর তার সাধারণ মানুষকে ভালো লেগে গেল দূতের। মানুষগুলো একটু বিলাসের ভক্ত বটে কিন্তু অন্যদিকে বেশ নম্র, সহাস্য আর পরোপকারী। এমন সহর ধ্বংস করার চিন্তা পছন্দ হল না তার। অথচ দেবতাকে মতামত দিতে হবে। দূত তখন একটা মতলব আঁটলে। সহরের শ্রেষ্ঠ ভাস্করকে দিয়ে অতি সুন্দর মূর্তি গড়ালে। মূর্তিটা তৈরী হল মাটি থেকে মার্বেল পাথর, হীরা থেকে কাচ এবং সোনা থেকে লোহা—অর্থাৎ সবকিছু মূল্যবান ও সস্তা শ্রেষ্ঠ তুচ্ছের সংমিশ্রণে। সেই মূর্তি নিয়ে দূত দাঁড়াল দেবতার সামনে। বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন দেবতা। দূত সবিনয়ে নিবেদন করলে শুধু হীরা আর সোনা দিয়ে তৈরী নয় বলেই কি এমন সুন্দর মূর্তিটা ভেঙে ফেলা উচিত হবে? দেবরোষ থেকে রক্ষা পেল সহর। অর্থাৎ পৃথিবী যেমন চলছে চলুক, কালের প্রকোপেই আসবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। মানুষের স্বভাব বদল না হলে তার পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার বদল সম্ভব নয়। এমন কোনো ব্যবস্থা ধ্বংস হলেও মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাই আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

তাই যদি হয়, মানুষ আর পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা এরই পাপচক্রে ঘুরে সবাই কি শেষ, কোনো সংস্কারই কি তাহলে আসবে না? ভলতেয়ারের মতো উদারপন্থীরা বলেছেন যে, ধীর-স্থির ভাবে শিক্ষার আলোয় মানুষের মনের অন্ধকার দূর করাই এই পাপচক্র ছেদনের একমাত্র উপায়। রুশো এবং সংস্কারপন্থীরা কিন্তু এই পাপচক্রের প্রতীক সবকিছু প্রতিষ্ঠান আর প্রথা উদ্দীপ্ত প্রেরণার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তারপর অন্তরের নির্দেশে গড়ে উঠবে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শধন্য নূতন জীবনব্যবস্থা।

মানুষের জীবন এত সহজ আর সামান্য নয় যে, এক কথায় তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হয়তো দুই মতের মধ্যপথে সত্যের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। অন্তরের উদ্দীপ্ত প্রেরণায় পুরাতন ধ্বংস হয় হোক, কিন্তু নূতনের প্রতিষ্ঠায় চাই বুদ্ধির ভাস্বর দীপ্তি। রুশোর উগ্রপন্থাতেও নিহিত ছিল এই সত্যের বীজ, প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি। অতীতই অন্তরের উদ্দীপ্ত প্রেরণার, কল্পনাশ্রয়ী ভাবাদর্শের উৎস। তাই বিপ্লবের কোলাহল স্তব্ধ হলে অন্তর অতিপ্রাকৃতের স্বপ্নে বিভোর হয়, ফিরে যেতে চায় ফেলে-আসা শতাব্দীর সুখ ও শান্তির আশ্রয়ে। তাই রুশোর পরেই শোনা যায় কান্টের আবির্ভাবের পদধ্বনি।

শেষের ফসল

এদিকে সভ্যতার কোলাহল থেকে দূরে "হাস্যমুখ দার্শনিকের" দিন কাটে Fermy তে বাগানের পরিচর্যায়। কলমের মুখে অনেক ফসল ফলিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ জীবনে, এবার বাগানের গাছে গাছে ফুল ফোটানোর পালা। দীর্ঘ জীবনের একান্ত বাসনা ছিল পূর্ণ হয়েছে, আশাতীতরূপে সফল হয়েছে সে আশা। এইবার অস্তগামী সূর্যের কি সুন্দর প্রশান্ত রূপ, পশ্চিম দিগন্ত ঘিরে কি কোমল-করুণ রক্তিমাভার রূপায়ণ। মানবদরদী দার্শনিকের হৃদয়ে কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সমস্ত বিলিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত তিনি। দান—তাঁর অসংখ্য দানের কথা লেখা আছে ইতিহাসে, হয়তো আরও কত লেখা নেই। আর্ত, পীড়িত মানুষের জন্য অবারিত তাঁর দ্বার—সাহায্য ও সান্ত্বনার আশায় লোক আসারও বিরাম নেই। দরিদ্র বিপথগামী কত মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়েছেন, অর্থ ও উপদেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুস্থ সুন্দর জীবনে। আর্ত মানুষের প্রয়োজন এই বিদায়বেলায় কলম ধরতেও কুণ্ঠিত হননি। অন্যায় করে কত মানুষ পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে। সস্নেহে তুলে ধরে তাদের বলেছেন, আমার ক্ষমা তো তোমাদের জন্য আছেই। মানুষের কাজ শুধু ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। এর পরেও বলেছেন, মানুষের যেটুকু উপকার করেছি, সেই আমার শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। আমায় আক্রমণ করলে আমি শয়তানের মতো সংগ্রাম করি; কারুর কাছে মাথা নীচু করা আমার স্বভাব নয়; কিন্তু শয়তান না হলেও প্রকৃতপক্ষে ভালো শয়তান আমি, হাসির মধ্যে সব কাজের পরিসমাপ্তিই আমার কাম্য।

১৭৭০ সালে ভলতেয়ারের বন্ধু ও অনুরাগীরা চাঁদা তুলে বৃদ্ধ দার্শনিকের একটা আবক্ষ প্রতিমূর্তি নির্মাণে উদ্যোগী হ'ল। হাজার

হাজার লোক এগিয়ে এল চাঁদা দেবার আগ্রহে। ধনীদের এমন কি স্বয়ং ফ্রেডরিককেও বলা হ'ল যৎসামান্য দেবার জন্য। এক কঙ্কালের প্রস্তরমূর্তির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য ভলতেয়ার ধন্যবাদ জানালেন ফ্রেডরিককে। উদ্যোক্তাদের মৃদু ভর্ৎসনা জানিয়ে বললেন, আমার মুখই নেই তো মূর্তি গড়বে কি! চোখ তিন ইঞ্চি গর্তে ঢুকে গেছে, গালের চামড়া ব্লটিং কাগজে পরিণত হয়েছে; যে কটা দাঁত ছিল তাও আর নেই। এর উত্তরে d' Alembert বলেছিলেন, প্রতিভার একটা বিশেষ প্রতিমূর্তি আছে যা অন্য একজন প্রতিভা ঠিকই চিনে নিতে পারবে।

তিরাশী বছর বয়সে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত দার্শনিকের মনে তখনও জ্বলছিল একটি আকাঙ্ক্ষার গোপন মৃদু আলো। প্যারিস দেখতে হবে, মরতে হবে প্যারিসের মাটিতে। ডাক্তাররা একবাক্যে নিষেধ করলেন—তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যে সহ্য হবে না এই দীর্ঘ পথযাত্রা। কিন্তু কারুর কথায় কান দেবার মানুষ নয় ভলতেয়ার। দীর্ঘ জীবন উপভোগ ক'রেছেন তিনি, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন কঠোর পরিশ্রমে—এর পর নিজের খুশীমতো মরবার, মোহিনী প্যারিসের কোলে মাথা রেখে মরবার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। কোন সুদূর অতীতে নির্বাসিত হয়েছেন, ছেড়ে এসেছেন প্যারিস। এবার ফিরে চললেন সেই নগরীর বুকে। মাইলের পর মাইল পার হ'য়ে, ফ্রান্সের পথ, ঘাট, মাঠ দিয়ে একদিন সত্যিই তাঁর গাড়ী এসে দাঁড়াল, রাজধানীর দরজায়। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন ভলতেয়ার তখনই ছুটলেন বাল্যবন্ধু d' Argental-এর সঙ্গে দেখা করতে, মরতে মরতেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বন্ধু! পরের দিন তিনশো দর্শনার্থী এল তাঁর বাড়ীতে। বৃদ্ধ দার্শনিকের এই রাজসম্মান দেখে সম্রাট ষোড়শ লুই ফেটে পড়লেন ঈর্ষায়। কিন্তু দর্শনার্থীর স্রোতে ভাঁটা পড়ল না। এলেন নাতিকে সঙ্গে নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ফ্র্যাঙ্কলিনের অনুরোধে ভলতেয়ার সেই তরুণের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, ঈশ্বরের ও স্বাধীনতার পূজারী হও।

মৃত্যুর ক্ষীণ পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন ভলতেয়ার। সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় প্রথা পালনে আপত্তি ছিল না তাঁর। পর পর দু'জন পুরোহিতও এলেন, কিন্তু তাঁদের আত্মম্ভরিতা, আচার-ব্যবহার পছন্দ হ'ল না বৃদ্ধ দার্শনিকের। শেষে বিরক্ত হয়ে লিখলেন, নিজের শেষ স্বীকৃতি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা, শত্রুর প্রতি ক্ষমা এবং কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা অন্তরে নিয়ে আমি মৃত্যুকে বরণ করছি। সই করে, তারিখ দিয়ে হাতে তুলে দিলেন সেক্রেটারীর; তারিখটা হচ্ছে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮ সাল।

শীর্ণ পত্রের মতো কাঁপছে জরাজীর্ণ দেহ, মৃত্যুর শীতল স্রোত ধীরে, অতি ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে শিরা-উপশিরায়। তবুও সব অগ্রাহ্য করে ভলতেয়ার সাড়া দিলেন ফরাসী আকাদেমীর সম্বর্ধনা সভায়। বাড়ী থেকে আকাদেমী যাত্রাকালে লক্ষ লক্ষ লোক পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে এই ফরাসী মনীষীর জয়ধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুললো আকাশ-বাতাস। গুণমুগ্ধ ভক্তের দল গাড়ীর দুপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে নিল ক্যাথারিণের দেওয়া বহুমূল্য আভরণের টুকরো টুকরো অংশ—ভলতেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন রেখে দেবে তাদের ঘরে। জীবনীকার লিখেছেন শতাব্দীর ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব জয়যাত্রা! কোনো বিখ্যাত সেনানী অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধে চমকপ্রদ জয়লাভ করে সহর প্রবেশের পথে, এমন অকৃত্রিম, অকুন্ঠ সম্বর্ধনা আশা করতে পারতেন না। আকাদেমীতে তারুণ্যের তেজে জ্বলে উঠে বক্তৃতা দিলেন ভলতেয়ার। ফরাসী অভিধান সংস্করণের প্রস্তাব করলেন এবং নিজে প্রথম বর্ণ 'A' সংক্রান্ত সব কাজ নিতে চাইলেন।

পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ছে সূর্য, দিগন্তে ছড়িয়ে আছে শেষ রঙের আভা। সেই ম্লান আলোর রেখা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে, চিকিৎসকদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভলতেয়ার গেলেন থিয়েটারে, তাঁর শেষ নাটক Irineর অভিনয় দেখতে। নাটক নিকৃষ্ট হোক, কিন্তু তিরাশী বছর বয়সে অভিনয়যোগ্য একটা নাটক লেখাই বিস্ময়কর আর তার চেয়ে বুঝি বিস্ময়কর তিরাশী বছর বয়সে মুমূর্ষু নাট্যকারের অভিনয়ে উপস্থিতি। দর্শকরা সেদিন অভিনয় দেখল না, আনন্দে উল্লসিত হয়ে নাট্যকারকে জানালো অন্তরের মুখর অভিনন্দন।

রাত্রে বাড়ী ফিরে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন ভলতেয়ার। আশাতীত অভূতপূর্ব জীবনীশক্তি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু তার ভাণ্ডারও বুঝি শূন্য হয়ে এল, চৈতন্য আচ্ছন্ন করে ছড়িয়ে পড়ছে নিদ্রার নেশা। এইবার যেতে হবে। তবু, তবু শেষ চেষ্টা করবেন অদম্য অপরাজিত ভলতেয়ার! কিন্তু মৃত্যুর কাছে ভলতেয়ারকেও হার মানতে হল। ৩০শে মে ১৭৭৮ সালে শেষ হল একটা শতাব্দীর।

খৃষ্টীয় মতে সমাধি দেওয়ায় বাধার সম্ভাবনা ছিল সহরে। বন্ধুদের তৎপরতায় মৃতদেহ সহরের বাইরে এক শান্ত পবিত্র পরিবেশে সমাধিস্থ করা হল, প্রয়োজনীয় আচারানুষ্ঠানেরও ত্রুটি হল না। ইতিহাসের চাকা কিন্তু ঘোরে। ১৭৯১ সালে বিপ্লবের পুরস্কার জাতীয় পরিষদ তাই সম্রাট ষোড়শ লুইকে বাধ্য করেছিল ভলতেয়ারের দেহাবশেষ সসম্মানে জাতীয় কবরশালায় Panthionএ ফিরিয়ে আনতে। এক লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল সেই শোভাযাত্রায়, ছয় লক্ষ লোক পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে দেখেছিল এই জয়যাত্রা। দেহাবশেষবাহী শকটে লেখা ছিল ইনি মানুষের মনে জাগিয়েছিলেন নূতন উদ্দীপনা, আমাদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রেরণা। তাঁর কবরে লেখা হল মাত্র তিনটি কথা—"এই ভলতেয়ারের শেষশয্যা।"

সমাপ্ত

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু

প্রকাশিত গ্রন্থাদি

কলকাতা সহরে দ্রুতগতিতে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপিত হল। এর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হতে লাগলো। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রগতিশীল অথবা পশ্চিমীঘেঁষা জনগণের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ মিশনারীরা অথবা সরকারী লোকেরা অথবা তাদের পশ্চিমীঘেঁষা বন্ধুরা শুধু নয়, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মত রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও শিক্ষাবিস্তারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে তৃতীয়াংশ পর্যন্ত শুধু ইংরাজী শিক্ষার অগ্রগতি হয়নি, সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার পক্ষেও নূতন উৎসাহ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

ডজনখানেক ইংরাজী সংবাদপত্র ছাড়াও ফারসী ভাষায় একটি সাপ্তাহিক পত্র ছিল, হরিহর দত্ত নামে একজন হিন্দু সেটি সম্পাদনা করতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ হতো। যথা—সংবাদ-প্রভাকর, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, সমাচার-চন্দ্রিকা, সম্বাদকৌমুদী, সংবাদ-তিমিরনাশক। শেষোক্ত পত্রগুলোর অধিকাংশ গোঁড়া মতবাদ প্রকাশ করতো, তবে এর মধ্যে প্রগতিশীল সমাচারদর্পণের প্রভাব ছিল অত্যধিক। পাঁচ বছরে প্রগতিশীল ও গোঁড়া পত্রিকাগুলোর মোট প্রচারসংখ্যায় তুলনামূলক ওঠানামা বিশ্লেষণ করলে আরও আগ্রহ-উদ্দীপক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

কোষগ্রন্থ ও অভিধান সম্পর্কে বলা যায়, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য রাধাকান্ত দেব ১৮২২—১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শব্দকল্পদ্রুম নামে সংস্কৃত কোষগ্রন্থ রচনা করেন। (দীনেশচন্দ্র সরকার—দি শাক্ত পীঠস, জে এ এস বি লেটার্স, ভল্যুম ১৪, ১৯৪৮) কলকাতার নিকট খড়দহে প্রাণকৃষ্ণশব্দাম্বুধি ছাপা হয়। রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত কোষগ্রন্থের মত তারানাথ বাচস্পতির (১৮১২—১৮৮৫) বাচস্পত্য-অভিধান নামে সংস্কৃত কোষগ্রন্থ সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাচস্পত্য অভিধানও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। সমাচারচন্দ্রিকা প্রেস বিজ্ঞাপন দেয় যে তারা শুধু ব্রাহ্মণ কম্পোজিটরদের সহায়তায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাপছেন। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮) বিভিন্ন প্রকাশক কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, আনন্দলহরী, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের আইন-সংহিতা, উত্তরাধিকার সম্পর্কে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা আইনের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপক্রমণিকা সমানভাবে লোকপ্রিয় হল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তার কয়েকটি তালিকা প্রকাশিত হল, তা থেকে পড়পড়তা পাঠকের জ্ঞানার্জনের আগ্রহের নমুনা পাওয়া যায়।

শ্রীরামপুর (মিশনারী) প্রেস, ১৮২২—

সংস্কৃত :

রামায়ণ ইংরাজী অনুবাদসহ, অমরকোষ (সংস্কৃত অভিধান) ইংরাজী অনুবাদসহ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, সাংখ্যসার।

বাংলা :

কেরি সাহেব কৃত ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, ইংরাজী-বাংলা চলিত ভাষা, বত্রিশ সিংহাসন ও হিতোপদেশ, রাজাবলী (ইতিহাস), দিগ্‌দর্শন, গোলাধ্যায় (ভূগোল) ইংরেজী সমেত কানারী ব্যাকরণ, পাঞ্জাবী ব্যাকরণ, তেলেগু ব্যাকরণ, বর্মী ব্যাকরণ গুরুদক্ষিণা (গল্পের বই), বিদ্বমঙ্গল) (সংস্কৃতে লিখিত বাংলা অনুবাদ সমেত, কর্মলোচন (সংস্কৃত বাংলা অনুবাদ সমেত)।

তিমিরনথা প্রেস—

চণ্ডী—বাংলা ভাষায় লিখিত। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুরবধ কাহিনী)

হরচন্দ্র রায়ের প্রেস—

চোরপঞ্চাশিকা (কবিতাকারে লিখিত প্রেম কাহিনী,), হিতোপদেশ, শৃঙ্গারতিলক সংস্কৃতে লিখিত বাংলা অনুবাদ সহ), মোহমুদ্গর (শঙ্করাচার্য লিখিত সংস্কৃত ধর্মস্তোত্র) অনুবাদ সমেত, দায়ভাগ অনুবাদ সহ।

মিঃ পিয়ার্সের প্রেস—

নীলগাছ সংক্রান্ত আইন, মনোরঞ্জন ইতিহাস (নাগরী হরফে), রীডার বা স্কুলস—কাশীর মিঃ এডাম লিখিত (নাগরীতে), মর‍্যাল টেলস্—কাশীর মিঃ এডাম লিখিত (নাগরীতে), এ্যাল্‌ফাবেট—ইয়ার্ট লিখিত গোলাধ্যায় (ভূগোল ?)—তারিণীচরণ মিত্র (নাগরী ও টমা কায়েথী হরফে), ব্যাকরণ—কীয়েট লিখিত।

পীতাম্বর সেনের প্রেস—

ব্যবহারার্ণব (আইন বই), মদনমঞ্জরী, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, চাণক্য, মহিমা (ধর্মীয় স্তব), কর্মবিপাক (নভেল ?), নিত্যকর্ম, বেতাল (গল্প) চন্দ্রবংশ (ইতিহাস), পঞ্জিকা।

বারাণসী আচার্যের প্রেস—

কালীর সহস্রনাম, বিষ্ণুর সহস্রনাম, রাধার সহস্রনাম, হনুমন্ত-চরিত্র—কাকচরিত্র, চক্ষুরাদি স্পন্দনের ফলাফল (জ্যোতিষ গ্রন্থ), ভাগবতী গীতা। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২, ১৩, ১৬, ৮২, ৮৩, ৯১)

এই সময়ে বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত বই ছাপা হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, উনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে বাংলা দেশে চিন্তার জগতে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল এবং এই সকল বইয়ের অধিকাংশ প্রাচীন ঐতিহ্য অথবা প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে।

বহুল পরিমাণে বাংলার প্রগতিশীল নেতাদের সৃষ্টি নয়। দীর্ঘকাল কু-শাসন ও নিরাপত্তাহীনতার পর শান্তি স্থাপিত হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পথ খুলে গেল। ছাপাখানার সম্প্রসারণ হওয়ায় তা গোঁড়া ও প্রগতিপন্থীদের নিজেদের পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করতে সহায়ক হল। এবং সর্বোপরি মিশনারীরা অথবা বন্ধুভাবাপন্ন ইউরোপীয়গণ সরকারী ও বেসরকারী নেতাদের প্রচেষ্টায় বালক-বালিকাদের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় যে পরিবর্তন ঘটলো তা সমাজ ও ধর্মসংস্কারকদের ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেল। দেখা গেল, জমি খুব উর্বর কিন্তু সে জমি তৈরী করেছে রাজনৈতিক নিরাপত্তা এবং মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান। এই মধ্যবিত্ত কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়নি।

রাজনৈতিক অশান্তি ও সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ

সহর ও পল্লীতে

চতুর্থ অধ্যায়ে উনবিংশ শতকে বাংলায় পরিবর্তনের যে ফল উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি হল সহর ও পল্লীর মধ্যে স্বার্থের উত্তরোত্তর ব্যবধান এবং গ্রামের প্রধান ও উৎসাহী নেতাদের গ্রাম ত্যাগ করে সহর অভিমুখে প্রস্থান। দেশের সর্বত্র তখন সহর কেন্দ্র গজিয়ে উঠছে। পুঁজিও স্থানান্তরে যেতে লাগলো, এবং অভিজাত ভূস্বামীদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল না। স্থিরীকৃত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মূলধন ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে ধাবিত হল। বিভিন্ন জাতি থেকে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে তখন। ব্যবসায় বাণিজ্য তখন ছিল ইংরেজদের হাতে অথবা ভারতীয়দের হাতে থাকলেও তা ছিল বৃটিশ-কর্তৃত্বের ছত্র-ছায়াতলে, এই বৃটিশ শক্তির তখন একমাত্র স্বার্থ ছিল ভারতে বৃটিশ উদ্যোগের উপযুক্ত পথ তৈরী করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজে তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং এই ভাবে কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

এই সময়ে ভারতের নানা স্থানে একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা দেখা গেল, যেটা সাধারণত উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। উনবিংশ শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া পীড়নমূলক আর্থিক উন্নয়নের বিরুদ্ধে এখানে সেখানে ছোটখাট ও স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা গেল। সমতল ভূমির কৃষকদের মধ্যে পাহাড় জঙ্গলের উপজাতিদের মধ্যে এটা ঘটেছিল, তন্মধ্যে ১৭৬৩—১৭৬৪ ও পুনরায় ১৭৭৩ ও ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অন্যতম। ১৭৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটে। (হিষ্ট্রী অফ বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা আণ্ডার বৃটিশ রুল—এল এস এস ও-ম্যালি, ১৯২৫, পৃঃ ২১০, ২৯৮)

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ছোটনাগপুরের মুণ্ডা উপজাতিরা দর্পনারায়ণ শোহী নামে একজন রাজা কর্তৃক শাসিত হত। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটকে ছয় হাজার টাকা রাজস্ব দিতেন। কিন্তু ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যখন রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হল তখন দর্পনারায়ণের দেয় রাজস্ব প্রথমে ১৪১০০।/৩ করা হল ও পরে ১৫৬৪১ টাকা করা হল। রাজাকেও প্রজাদের কর বাড়াতে হল, ফলে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘটে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। [illegible] খৃষ্টাব্দে আরও বিদ্রোহ হয় এবং ছোটনাগপুরকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ষ্ট্যাম্প ও আবগারী আইনের অধীনে আনা হয়। কর আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৮১২, ১৮১৯—১৮২০, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আরও বিদ্রোহ ঘটে। শেষ বার বিদ্রোহ ঘটে ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে।

তৎকালীন বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমে সুরগুজায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নীলকর হাঙ্গামা ঘটে; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। তারপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল, দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যিনি কার্য্যত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উনবিংশ শতকের আগাগোড়া মাঝে মাঝে থেমে জনপ্রিয় হাঙ্গামা ও আন্দোলন হলেও উচ্চ ও নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ এই সকল বিদ্রোহের সঙ্গে কখনও এক হয়নি। শেষোক্ত শ্রেণী শুধু দূরেই থাকেনি, সমসাময়িক সংবাদপত্র পাঠ করলে দেখা যায়, তারা এই সকল বিদ্রোহে বিরক্ত হয়েছে, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তারা এর মধ্যে শান্তি ও অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ দেখতে পেয়েছিল। দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য কে নিয়ন্ত্রিত করছিল সে প্রশ্ন অপেক্ষা এই ত্রুটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

কয়েক জন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন যাঁদের ব্যাপক দূরদৃষ্টি অথবা গভীর সহানুভূতি ছিল, তাঁরাই দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকদের দাবীদাওয়া ও অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের উদ্যোগী হয়েছিলেন ও তাদের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল চাষ সংক্রান্ত নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ করে রেভারেণ্ড লঙ-এর বিচার ও দণ্ড হয়েছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ সুরু করেন। তিনি ভারতে প্রথম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, এই কার্য্যে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অন্যান্য অনেকে তাঁকে সাহায্য করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামের চা-বাগানে প্রবেশ করেন এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে আসামে দাস ব্যবসায় নামে একটি বই রচনা করেন।

এই রকম কয়েকটি ঘটনা আছে যেগুলি কখনও গণ-আন্দোলনের পর্য্যায়ে উঠেনি, এই রকম দুর্লভ দৃষ্টান্তগুলিকে বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই, মোটের ওপর বাঙ্গালার শিক্ষিত ও সহুরে নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিজেদের সবিশেষ শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় ও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এইগুলি বিশেষ করে অভিজাত ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতিভূ ছিল; এর বিপরীত হিসাবে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে। (এনেশন ইন মেকিং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. ১৯২৫, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কলিকাতা, পৃঃ ৪০ ৪১) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতীয় বৃটিশ প্রজার মত সমান ব্যবহার লাভ

ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার সঙ্গে তায়তে কোন রকমের পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া ভূমি সংস্কার, শিক্ষা ও অন্যান্য দাবীও ছিল। শিক্ষিত লোকেরা যে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল সেটাই ছিল বড় প্রশ্ন। কৃষক ও কুটীরশিল্পীরা দেশের তিন-চতুর্থাংশ হলেও তাদের প্রশ্ন ততখানি গুরুত্ব পায়নি। এ ছাড়াও, উপরোক্ত সংস্থাগুলিতে শিক্ষামূলক প্রচারকার্যের সুযোগ ছিল, কিন্তু কোনরকম প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্য্যের সুযোগ ছিল না।

এই ভাবে ক্রমশঃ সহর ও গ্রামের ব্যবধান ঘটলো ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের শাসকশক্তির সঙ্গে ধীরে ধীরে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে উঠালো, ফলে গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইতস্তত যে নিষ্ফল বিদ্রোহ ঘটেছে তা নতুন শাসকদের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর বিপদ হয়ে ওঠেনি।

আগেই আমরা দেখিয়েছি, ধর্ম, সমাজ সংস্কার অথবা সাধারণভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্টভাবে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। কারুর কাছে সম্পূর্ণ বিলিতি ধরণের পাশ্চাত্য পদ্ধতি পছন্দ হত, কেউ বা প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এটা পাশ্চাত্যবাদ গ্রহণ অথবা ভারতীয়বাদ গ্রহণের ব্যাপার ছিল, অবশ্য যদি এটাকে ভারতীয়বাদ বলা যায়। এই আপোষহীন সঙ্ঘর্ষের সমাধানের প্রথম যে চেষ্টা হয়েছিল তা ছিল সকল মতের সার গ্রহণের প্রচেষ্টা। এই নতুন ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে হিন্দুসমাজে যে নতুন মূল্যায়ণ হল তাতে হিন্দুসভ্যতার প্রচলিত বিধি-বিধান বিশেষ কোন সম্মানলাভ করলো না। আত্মরক্ষার মনোভাব নিয়ে কোন লোক নিজেকে তার প্রভাবমুক্ত করে প্রকৃত সৃজনমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের পর্য্যায়ে উঠ্‌তে পারে না। মন যখন হীনমন্যতার কবলমুক্ত হয় তখনই সংস্কৃতির প্রকৃত সৃজনমূলক অধ্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।

ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকগণ ছাড়া বাংলার হিন্দু সমাজ নিজস্ব আভ্যন্তরীণ রক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ভবানীচরণ অথবা রাধাকান্ত দেবের মত হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল নেতারা হিন্দু সংস্কৃতির সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার শিক্ষিত লোকদের সামনে সহজে তুলে ধরেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থাংশে ব্রাহ্ম সমাজের পশ্চিমীঘেঁষা মনোভাবের বিরুদ্ধে এক নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রভাবশালী লেখকগণ এবং শশধর তর্কচূড়ামণির মত বক্তাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হলেন। জনপ্রিয় নাট্যকারগণ ব্রাহ্ম সমাজের বাড়াবাড়িকে উপহাস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও সংগ্রামশীল জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বীজ বপন করলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতে রাজনৈতিক সফর সুরু করেন এবং তাঁর অগ্নিবর্ষী বাগ্মিতা ও সংগঠন শক্তির দ্বারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যকার ব্যাপক অসন্তোষকে এক নতুন ও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দিতে সক্ষম হলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নতুন কার্যে সুরেন্দ্রনাথ যুবকদের সম্মুখে যে সংগঠন আদর্শ
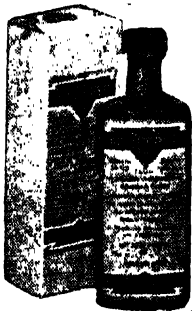
উপস্থাপিত করলেন তা পশ্চিমী সূত্র থেকে নেওয়া যেমন ম্যাজিনী, গ্যারিবল্ডী, অথবা আইরিশ ও রুশ বিপ্লবীদের আদর্শ। (মেমোরিজ অব মাই লাইফ এণ্ড টাইমস, বিপিন চন্দ্র পাল, ১৯৩২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬—২৬১ ও পৃঃ ৪২১-৪৪৩ এবং এ নেশন ইন মেকিং—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩)।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য যখন প্রথম গোপন সমিতি গঠিত হয় তখন এই সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে তরবারি দিয়ে নিজের বুক চিরে রক্ত বের করে তা দিয়ে সদস্যপদের প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করতে হত। (মেমরিজ অব মাই লাইফ এণ্ড টাইমস, ১ম খণ্ড, বিপিন পাল, ১৯৩২, পৃঃ ২৪৮)। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরূপ এক বিপ্লবি-সঙ্ঘের প্রস্তাব করেছিলেন যারা দেশের মুক্তি অর্জনে জীবন উৎসর্গ করবে। বিংশ শতকের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের আবির্ভাব হল এবং দুর্গা ও কালী নবজাগ্রত ভারতের মাতৃদেবী হলেন এবং যাঁরা রাজনৈতিক বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করলেন ভগবদ্গীতা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হল। বঙ্কিমের পূর্বে ভূদেব তাঁর স্বল্প-পরিচিত পুষ্পাঞ্জলি পুস্তকে এই ধরণের একটি পরিকল্পনার বীজ বপন করেছিলেন।

একটা গোটা শতাব্দী ধরে প্রগতিশীল নেতাগণ অপেক্ষা রক্ষণশীল নেতারা ছাপাখানার ব্যবহার করায় অন্ততঃ একটি সুফল হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালীরা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ভারতের সর্বোত্তম প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। ছাপাখানার পূর্ববর্তী সময়ে এইরূপ অবস্থা ছিল বলা যায় না। কারণ তখন সেই একই ঐতিহ্য ও সাহিত্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়।

ছাপাখানা এবং পূর্ব ও পশ্চিমী চিন্তাধারার অবাধ প্রচলন এখন পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, এইভাবে নতুন অগ্রগতির পথ প্রস্তুত হল। জাতীয়তাবাদের যে নতুন চেতনা ও আন্দোলন সেটা সর্ব সংস্কৃতির সার গ্রহণের আদর্শের দিকে না ঝুঁকে ভারতীয় সভ্যতার অতীত গৌরবের দিকে বেশী করে আকৃষ্ট হল। শেষোক্ত মত ও পথ ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয়তাবোধের পক্ষে সহায়ক হয়নি।

রামকৃষ্ণ আন্দোলন এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ায় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে এই নূতন প্রয়োজনের পূর্ণতা অজ্ঞাতসারে সম্ভব হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলার জাতীয় জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তার পিছনে এক ধর্মীয় ঐতিহ্যের ফল্গুধারা ছিল, এই ফল্গুধারা গ্রামের চারণকবি ও সাধুসন্তরা গ্রামের সরল ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিরকাল বাঁচিয়ে রেখেছিল। এটা বাংলা সম্পর্কেই শুধু সত্য নয়, ভারত সম্পর্কেও বটে, এবং একদিক থেকে এর মধ্যে ভারতের মূল সাংস্কৃতিক ঐক্য নিহিত আছে। বাউল ও সহজিয়াদের মতবাদ মরেনি; ভক্তিমূলক গান এবং যাত্রার মধ্য দিয়ে সেই ধর্মীয় সংস্কৃতির স্রোত দেশে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। বেশি শিক্ষিত লোক যারা—সহরের সমৃদ্ধির জন্য গ্রাম [illegible] জীবনযাত্রার সঙ্ঘর্ষের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লো। খুব সুদূর গ্রামগুলিতেও অর্থনৈতিক জীবন ইংরাজী শাসন ও বাণিজ্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল; কিন্তু উত্তরোত্তর দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটি ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক সংস্কৃতি দেশে অবিরাম বয়ে চল্‌ছিল।

রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের লোক। তাঁর সহজ-সরল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রতি অনন্ত ভক্তিজ্ঞাপক গান সাধারণ গ্রামবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। (কালী দি মাদার, ১৯০০-সিষ্টার নিবেদিতা।) তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর আধ্যাত্মিক অকৃত্রিমতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু এই গানগুলি সহরের শিক্ষিত, সংস্কৃত সম্প্রদায়ের কাছে আদৌ আমল পায়নি; কারণ তাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ ছিল, সংস্কারকগণ এই পৌত্তলিকতাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা করছিল। শিক্ষিত বাঙালী একটি যুক্তিসঙ্গত, পৌত্তলিকতাবর্জ্জিত ও মানবতাপূর্ণ মতবাদ গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছিল, যদিও প্রত্যক্ষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিবর্জিত সেই মতবাদ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল না।

কিন্তু গ্রাম-ভারতের প্রায় অশিক্ষিত মানুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬—১৮৮৬) যখন সহর থেকে শিক্ষিত যুবকদের প্রতি তাঁর খাঁটী, ব্যক্তিগত ধর্মীয় উপলব্ধি ব্যক্ত করতে লাগলেন, তখনই এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। রামকৃষ্ণের পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, তাঁর গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে সাধুসন্তরা দক্ষিণ-ভারতে তীর্থ করতে যেতেন, প্রথম জীবনে তিনি তাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন; ষোল বছর বয়স থেকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে তিনি বাস করেন। দেশীয় থিয়েটারে হিন্দুধর্মের পবিত্র কাহিনী এবং রামপ্রসাদ অথবা বৈষ্ণব-সন্তদের সঙ্গীত তাঁকে প্রাচীন সভ্যতার চিরন্তন মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছিল।

কঠোর এবং গভীর বীরত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। রামকৃষ্ণ অদম্য তীর্থযাত্রিরূপে এই পথ দিয়ে চলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, সিদ্ধিলাভের পর তিনি আরও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। এখানেও পূর্বসূরীদের মত শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন এই বীর তীর্থযাত্রী উপলব্ধি করেন যে, সকল মত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়ে শেষে এক সমুদ্রে পতিত হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, যত মত তত পথ। এই উক্তির দ্বারা তিনি হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত এক প্রাচীন সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন—যত মানুষ তত ধর্ম। কারণ দুটি মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এক রকম হতে পারে না। এক ধর্ম অপর ধর্মের চেয়ে ভাল বা খারাপ হতে পারে না। প্রয়োজন হচ্ছে মানুষ যে বিশ্বাসে পুষ্ট হচ্ছে তা আঁকড়ে ধরে অগ্রসর হবে এবং যেখানে এক মতবাদের সঙ্গে অপর মতবাদের কোন পার্থক্য নেই, সেখানে পৌঁছতে না পারা পর্যন্ত থামবে না। আসল কথা হচ্ছে, উপলব্ধির শীর্ষদেশে পৌঁছবার ছল না করে এবং অন্য ধর্মের বিশ্বাসের অধিকারকে অস্বীকার না করে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী বাধা-নিষেধ ছেড়ে অসীম সমুদ্রে গিয়ে পড়তে হবে। অহমিকা থেকেই এর উৎপত্তি, কারণ এই অহমিকাই [illegible]

নব হিন্দুত্ববাদ

এখানে হিন্দুধর্মে এমন কিছু আছে যা যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। আবার হিন্দুধর্মেও এমন এক অজ্ঞাত মূল্যবান ভাবধারা আছে সম্ভবতঃ পশ্চিমে যার উপলব্ধি ও স্বীকৃতি যৎসামান্যই হয়েছে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতীয়রা জীবনের এই আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে এবং যা নব অভ্যুদয়ের পথ দেখাতে পারে।

হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের মধ্যে ভারতের জাতীয়তামূলক মনোভাব সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবন গর্ব করবার জিনিষ। বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২) ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন ও পশ্চিমে কয়েকটি বেদান্ত সোসাইটি গড়ে তোলেন। দুর্দ্ধর্ষ নাইটের মত তিনি তাঁর আচার্যদেবের জীবনের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রাচ্যদেশের মূল্যবোধ ঘোষণা করলেন; কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না করে তিনি পশ্চিমের যা কিছু তা গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। পশ্চিমের বিজ্ঞান, মানবতাবাদ, সামাজিক বন্ধন থেকে নারী ও শ্রমিকের মুক্তি সব কিছু তিনি গ্রহণ করতে বললেন। বিবেকানন্দের ভাষায় ভারত এক ক্ষয়িষ্ণু দুর্গন্ধময় শবের মত হয়েছিল। অতীতকে ভস্মীভূত করতে হবে; সেই ভস্ম থেকে নবভারত জন্মলাভ করতে পারে, সেই নবভারত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী হবে ও আধুনিক বিশ্বের পক্ষে তা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। তাঁর আচার্যের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন জীব ও শিব এক, ব্যক্তি-আত্মা ও বিশ্ব-আত্মা এক; তাঁর কাছে ঈশ্বর নর-নারায়ণের রূপ ধরে দেখা দিয়েছিলেন, উৎপীড়িত ও অবহেলিতদের মাঝে তাঁর আসন ছিল পাতা।

বিবেকানন্দের সহযোগী হয়েছিলেন একজন সাহসী সৈনিক, নাম মার্গারেট নোবল, একজন আইরিশ রমণী। বিবেকানন্দ এঁর নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। একথা সুবিদিত নয় যে, তিনি একদল তরুণ বাঙ্গালীর সঙ্গে নানাক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিলেন ও তাদের কার্য্যকলাপে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, শিল্পী নন্দলাল বসু, সাহিত্যের ইতিহাস লেখক দীনেশচন্দ্র সেন, রাজনৈতিক নেতা অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য অনেকে কোন না কোন সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক সংস্পর্শে এসেছিলেন ও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নিবেদিতা প্রচুর লিখেছিলেন। তিনি তাঁর গুরু—স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাদি শুধু সম্পাদনাই করেননি, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রমণ ও শিক্ষা বিষয়ে বই লিখেছিলেন, কলকাতায় বালিকাদের জন্যে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন, তিনি যে এলাকায় থাকতেন তথায় মহামারী দেখা দিলে মিউনিসিপ্যাল কাজ সুরু করেন, তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত জনসাধারণকে ঘুম থেকে জাগানো এবং তাঁর নিজের দিক থেকে, কুহেলির আবরণ উন্মোচন করে ঐতিহাসিক অতিরঞ্জনমুক্ত হিন্দু সভ্যতার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা এবং ভারতের উত্তাল জাতীয় জীবনে এবং পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাকে প্রেরণার উৎসরূপে উপস্থাপিত করা। কারণ পরিবর্তন ও কর্মবাদকে একমাত্র সর্বাধিক মূল্যবান বলে অতিরিক্ত যে নির্ভরতা পশ্চিমীদের মধ্যে আছে তাকে শোধনের জন্যে উপলব্ধি সঞ্জাত ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তির প্রয়োজনীয়তা পশ্চিমীদের আছে।

ভারত ও পাশ্চাত্য জগৎ তাদের নিজ নিজ পৌত্তলিকতায় বাঁধা পড়েছিল; বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার উদ্দেশ্য ছিল উভয়ের কাছে আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রত্যক্ষ চেতনা নিয়ে আসা, তা হলে উভয়ে নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে মানবজাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারবে।

হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানকে বাংলা দেশে উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে দেখলে ভুল করা হবে। আসল কথা, ব্রাহ্ম সমাজ তখনও সক্রিয় শক্তিরূপে ছিল; হিন্দু সমাজের মধ্যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, উহা কোন বিশেষ ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টার কথা বলা যায়, তিনি বিধবা বিবাহের জন্য ও ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। সমগ্র সহরে সমাজে, ক্ষুদ্র সহরে ও গ্রামে বসবাসকারী শিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন না কোন ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক সমিতি ছিল, শিক্ষা অথবা সমাজ উন্নয়ন, ধর্মীয় চিন্তা ও কার্যকলাপ সব ক্ষেত্রে।

সমগ্র দেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোন না কোন সময়ে এই সব আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছিল। তবু একটি অপরটির সঙ্গে পরস্পর প্রতিযোগিতা করেনি। কার্যসূচী পৃথক ছিল, কখনও কখনও সমান্তরাল ভাবে চলছিল। কেবল জনগণের তৎকালীন মনোভাব একটিকে অপরটি অপেক্ষা সাময়িক ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। কোন শক্তিশালী বক্তা কর্তৃক কোন এক মুহূর্তে সৃষ্ট কোন চিন্তার ঝলকানিতে অথবা অন্যায়ের জন্য অন্তর্নিহিত যে সংস্কারের দাবী সাধারণত স্বীকৃত হত তা দিয়ে এই মনোভাব সৃষ্টি হত। কিন্তু যখন ব্রাহ্ম সমাজ অথবা রামকৃষ্ণ মিশনের মত কোন বিশেষ সংস্থা অথবা সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সংস্থা-সমূহ সৃষ্টি হত, তখন তারা তাদের টিঁকে থাকার জন্য সেই মনোভাবের ওপর নির্ভর করতো যে মনোভাব তারা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল অথবা সংগঠন করেছিল।

এই বিশেষ আলোকে উনবিংশ শতকের বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বিচার করে দেখতে হবে। এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জনগণ ক্রমশ নানা প্রকার নতুন জীবনধারা ও চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লো। তারা সকলে পৃথক ভাবে, এমন কি তাদের মিলিত প্রভাব দিয়ে জনগণের মননশীল ও নৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল, যতদিন না জনগণ দেশব্যাপী সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করতে প্রস্তুত হল। [ক্রমশঃ।

গোপন প্রেম

সাধন চৌধুরী

মুখ নীচু করে সূর্যমুখী মাটিরে ডাকিয়া কয়,
তব সাথে মোর শাশ্বত প্রেম ভুলিবার কভু নয়।

রক্ত কিরণে গগন প্লাবিয়া সূর্য মারিলে উঁকি,
মুখ তুলে কয়, 'সূর্যের তরে ফুটেছি সূর্যমুখী।'

মানুষ কি করে বড় হল!

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

আজ-কাল চারিদিকে তোমরা নানা রকমের সভ্য মানুষ দেখতে পাচ্ছ। পৃথিবীর মাটির ওপরে ঘর-বাড়ী তৈরী করে, চাষ-বাস করে, সুন্দর সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করে আজ মানুষ তার সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চলেছে। কিন্তু এই সব ব্যাপার দু'-একদিনে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। একটু একটু করে উন্নতি করতে করতে আজ মানুষ উন্নতির শীর্ষ স্থানে আরোহণ করতে চলেছে। কি-ভাবে একটু একটু করে উন্নতির পথে এগিয়ে এল সেই কথা শোনো এবার। লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর এই মাটির বুকে যে সব জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল জঙ্গলে এক জাতীয় বনমানুষ বাস করত। এরা জঙ্গলের গাছে ডালে ডালে এমন করে বেড়াত যে মনে হত সমস্ত বনে জঙ্গলে কে যেন তাদের জন্য গাছের সঙ্গে গাছের সেতু বেঁধে দিয়েছে। এখন হ'য়েছে কি, গাছের ফল-মূল পেড়ে খেতে বা ডাল-পালা ভেঙ্গে অনেক সময়ে নিজেদের আসা-যাওয়ার পথ পরিষ্কারের জন্য তারা হাতের ব্যবহার সুরু করেছিল। অনেক সময়ে এমন হ'ত যে, ফল ইত্যাদি গাছ হতে পাড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে যেত। পড়ে যাওয়া ফল মাটি হতে তোলবার জন্য তাদের বাধ্য হয়ে মাটিতে নামতে হ'ত। এই ভাবে ঐ জাতীয় বনমানুষ মাটিতে নামতে শিখল। এই ভাবে মাটিতে নামতে শেখা ও হাতের ব্যবহার করা এরা সুরু করল। মাটিতে নামতে শিখে তাদের নেশা বেড়ে গেল। তখন আর তাদের ফল-মূল খেয়ে তৃপ্তি হলনা। তারা অন্যান্য পশু-পাখীদের মেরে তাদের মাংস খেতে সুরু করল। ফলে আগের চেয়ে বেশী করে তাদের নীচে নামতে হল। গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে লাঠি তৈরী করে গর্ত খুঁড়ে পোকা-মাকড় খেতে সুরু করল। এই ভাবে তাদের যেমন খাবার জিনিষের তালিকা বেড়ে গেল, তেমনি আবার হাতের কাজও বেড়ে যেতে লাগল। (সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের হাত, পা, বা অন্যান্য অবয়ব আমরা সাধারণতঃ কাজে লাগাই শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য)। হাতের কাজ যখন বেড়ে গেল তখন পায়ের ওপর ভর দিয়েই তাদের চলতে হল। কেননা, একসঙ্গে দু'হাতে আর দু'পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চললে নিজের খুসীমত খাবার জিনিষ খাওয়া যাবেনা। এই কারণেই বোধ হয় ভগবান তাদের সাহায্য করলেন যাতে তাদের হাতের ওপর ভর দেওয়া কমে যায়।

এখন তোমরা যদি বল—এদের দেখতে ঠিক কি রকম ছিল এবং এদের আবির্ভাব কোথা হ'তে হল, তাহলে একটু বে-কায়দায় পড়তে হবে। কেননা, এদের নমুনা আজ-কাল পাওয়া যায়না। তবে খুঁজে পেতে তাদের হাড়গোড় থেকে এটাই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন বানর-মানুষ (Ape-Man) হচ্ছে বানর থেকে মানুষের রূপান্তরের মাঝখানের 'হারানো-সূত্র' বা (missing link)।

গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং, পিকা প্রভৃতি অনেকটা বাইরে থেকে দেখতে এক রকমের জন্তুগুলি এই 'বানর-মানুষ' পর্য্যায়ভুক্ত। প্রাণিতত্ত্ববিদরা এই দলটাকে Simaldie (সিমাইদাই) নামে অভিহিত করেন এবং এই সিমাইদাই দলটাকে প্রাইমেট (Primate) জাতিভুক্ত বলে গণ্য করেন। এই বানর-মানুষের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সিম্পাঞ্জী। কেন না, এদের মাথার খুলি, হাড়-গোড় ও দাঁতের সংখ্যা এবং হাত-পায়ের গঠন প্রভৃতিতে মানুষের সঙ্গে এত গভীরভাবে সাদৃশ্য আছে যে, প্রাণিতত্ত্ববিদরা এদের মানুষের সবচেয়ে নিকট-আত্মীয় বলে অভিনন্দন জানান। শুধু যে গঠন অনেকটা মানুষের মত তা নয়। আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র অনেকটা মানুষের মত। কেন না, মানুষের মতনই এরা অনেকটা। সোজাভাবে পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। হাতের গঠন মানুষেরই মত, পায়ের চেয়ে ছোট। এই হাত এরা কাজে লাগায় ফল, মূল ইত্যাদি গাছ হ'তে পেড়ে খাবার জন্য। মানুষের মত এরাও দল বেঁধে থাকে। মানুষেরই মত স্বামি-স্ত্রীরূপে সুখে ঘর-কন্না করা কিংবা কোনও আনন্দ-উৎসবে যোগদান করা এদের স্বভাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবার জন্য 'বাসা' প্রস্তুত মানুষেরই মত এরা করে। তবে এদের 'বাসা' প্রস্তুত হয় গাছের ওপরে। মানুষের মত চূণ, সুরকি, সিমেণ্ট দিয়ে নয়। স্ত্রী-সিম্পাঞ্জী রাত্রিবেলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গাছের ওপরে 'বাসা'য় থাকে এবং পুরুষ-শিম্পাঞ্জী গাছের তলায় বসে সারা রাত ধরে চৌকি দেয় আর গভীর রাতে মাঝে মাঝে চৌকিদারের মত এক রকম বিকট চীৎকার করে সবাইকে সজাগ করে দেয়।

শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে মানুষের গভীর সাদৃশ্য থাকলেও প্রভেদও আছে যথেষ্ট। সেটা কিন্তু মনে রেখ।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই বানর-মানুষকে 'পিথেক্যান্থপাস' (Pithecanthropas) বলা হয়। এর পর বৈজ্ঞানিকেরা আরও অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা যখন হাঁটতো তখন তাঁরা কুঁজো হয়ে হাঁটতো। হাঁটবার সময়ে পা বেঁকে যেত ও হাত দুটো ঝুলতে থাকত। দুবোয়া নামে এক নৃতত্ত্ববিদ এদের নূতন নাম দিলেন 'পিথেক্যানিথপাস ইরেকটাস' অর্থাৎ যে পিথেক্যান্থ্রপাস সোজা হ'য়ে হাঁটে। পরে এরা যখন একটু উন্নত ধরণের হয়ে উঠল তখন বৈজ্ঞানিকেরা এদের নাম দিলেন 'সিনান্থ্রপাস'। আরও বেশ কিছুদিন পরে অনেক অনুসন্ধানের পর পাহাড়ের গুহার মধ্য হতে হাড়-গোড়ের সন্ধান পেয়ে এঁরা এই

সিদ্ধান্তে আসেন যে, সিনানথ্রপাস গুহায় থাকত ও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। খুব সম্ভব পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র তারা জন্তু-জানোয়ার মেরে তাদের মাংস খাবার জন্ত ব্যবহার করত। এর পর এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখে নিজেদের কিছুটা উন্নত করে তুলল। বৈজ্ঞানিকের জানবার আগ্রহ কিন্তু এতেও মিটল না। আরও কিছু নূতন তত্ত্ব জানবার আগ্রহে তাঁরা মাটির তলায় হাড়-গোড়ের সন্ধানে রত হলেন। হাড়-গোড় সংগ্রহের পর পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারলেন যে, উত্তরযুগে যে সব মানুষ জন্মাচ্ছিল তারা কেহই পূর্ব্বপুরুষের মত হুবহু দেখতে ছিল না। এক একটা যুগে এক এক রকম দেখতে হচ্ছিল। তাঁরা করলেন কি. বিভিন্ন যুগের মানুষকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করলেন। সিনানথ্রপাসের পর হাইডেলবের্গ, তারপর এরিংস ডর্ক, তারপর নিয়ানডারথ্যাল আরও পরে ক্রোম্যাগনন প্রভৃতি বিভিন্নযুগে বিভিন্ন রকমের মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। অবশ্য তোমরা যেমন পর পর তাড়াতাড়ি নামগুলি পড়ে গেলে সেরকম তাড়াতাড়ি এদের আবির্ভাব ঘটেনি। অন্ততঃ হাজার হাজার বছর পরে পরে এদের আবির্ভাব ঘটেছে।

এই ভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশঃ এল অসভ্য আদিম অধিবাসীরা। বুনো স্বভাব যাদের মধ্যে গভীরভাবে দেখা যায়। তারপর প্রকৃতির কল্যাণে উন্নতশ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব হতে লাগল। (যদিও মাথার খুলি, হাড়-গোড়-এর সংখ্যা এবং আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে এক যুগের মানুষের সঙ্গে আর এক যুগের মানুষের বিশেষ কোনও সামঞ্জস্য ছিলনা। তাহলেও এই ভাবে মানুষ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল।) এই ভাবে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলতে চলতে অবশেষে এল বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। একদিকে যেমন সবদিক দিয়ে সুস্থ ও সবলরূপে বেঁচে থাকবার জন্ত মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আবিষ্কৃত হল নানারকম যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ইত্যাদি—অপর দিকে তেমনই সভ্যতার বিকট রূপ দেখা দিল ধ্বংসাত্মক কস্মিক-রে এটম বোমের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যেটা সুন্দর, যেটা শাশ্বত, তার বিনাশ নাই। Great and good do not die. তাই আবার আমরা সব রকম বাধা-বিঘ্ন দূরে ঠেলে দিয়ে বিজ্ঞানের প্রকৃত সাধনায় লিপ্ত হব। আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি কাজে লাগার মানুষের হিতার্থে মানুষের বিনাশের মধ্য দিয়ে নয়। তবেই হবে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা—হবে বৈজ্ঞানিকের পরম সার্থকতা। আর তাতেই আসবে প্রকৃত আত্মতৃপ্তি।

লেখা ও লিখনকলা

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেন

পৃথিবীতে বহু লোককেই অনেক কিছু লিখতে হয় অক্ষরের মালা সাজিয়ে, কিন্তু সেই লেখা কয়েকটি বিশেষ গুণযুক্ত হলে বলা হয় 'সাহিত্য'। যাঁরা শুধুই লেখেন না সাহিত্যসৃষ্টি করেন, তাঁদেরই বলব 'লেখক'।

যে কোনো ভাষার সাহিত্যকারদেরই অর্থাৎ লেখকদেরই দু'ভাগে ফেলা যায়—একদল প্রতিভাশালী এবং আর একদল নিপুণ লেখক। একদল লেখেন রামায়ণ জাতীয় লেখা, আর একদল লেখেন ভক্তিকাব্য। তবু, একটি ব্যাপারে এ দু' রকম লেখকদের মধ্যেই মিল আছে : থাকতেই হয়। সব লেখককেই লেখার 'কলা' (Art) শিখতেই হয়। Virginia Woolf লিখেছেন, he (the writer) has to be taught his art...is that strange? Nobody thinks it strange if you say that a painter has to be taught his art or a musician or an architect. Equally a writer has to be taught. For, the art of writing is at best as difficult as the other arts (A Leaving Tower).

প্রতিভাবান হলেই বা কিছু বলার থাকলেই কোনো লেখক Samuel Daniel এর ভাষায়—"Worthy the reading and the world's delight" কিছু রচনা করতে পারেন না, যথেষ্ট অবসর, মনের নির্ভর প্রশান্তি এবং লেখার পরিবেশ—এগুলো তো চাই-ই, তা ছাড়াও দরকার হৃদয়ের গভীর তল থেকে নিজেকে প্রকাশের জন্য ঠেলা এবং প্রধানতঃ লেখার আর্ট জানা থাকা। দুটি লোক একই ঘটনার প্রত্যক্ষ-সাক্ষী হলেও একজন যে ঘটনার ভিত্তিতে লিখতে পারেন এমন গল্প যা লেখককে বিখ্যাত করবে, অন্যজন কি করে ঐ গল্প লেখা হলো, তা ভেবেই অবাক হবেন।

বিষয়-বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তসীমা গত পঁচিশ বছরে অনেকখানিই বেড়েছে হঠাৎ। কিন্তু তবুও এ সময়টি বাংলার 'সাহিত্য সমারোহের যুগ' না বলে 'লেখক-যশঃ-প্রার্থীদের যুগ' বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ, একমাত্র কথাসাহিত্য ছাড়া গুণ ও উপযুক্ততার দিক দিয়ে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য দিক (জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, ইতিহাস, সংস্কৃতি, গবেষণা ইত্যাদি) খুব উৎকর্ষলাভ করেছে, তা বলা যায় না (পরিমল গোস্বামী)। নানা বিষয়ের ওপর নানা দিক থেকে ও মান অনুযায়ী যত বই ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় লেখা হয়েছে, সে তুলনায় বাংলা ভাষায় বই বৈচিত্র্য, নগণ্য। বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থার অন্যতম কারণ, আমার মনে হয়, বাঙালী লিখিয়েদের লিখন-কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং অজ্ঞতা। তাঁরা সত্য মূল্য নাহি দিয়া সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করিতে চান। ফরাসী, চৈনিক ও সাম্প্রতিক কালের মার্কিণ লিখিয়েদের লেখা পড়লেই দেখা যায়, লিখনকলায় তাঁরা কত পটু। সোভিয়েট দেশে নৃতত্ত্ব, পরমাণু-বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পকে সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য করে তোলা হচ্ছে লেখার কৌশলে। আজকের মার্কিণ মুলুকে পরিবার-পরিকল্পনা, ভাস্কর্য্য, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে সাহিত্য রচনার কথা সবারই জানা। স্বীকার করি, উপযুক্ত পাঠকের অভাব সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। বাংলা দেশের সমস্যাও অনেকাংশে তাই। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, লেখকরাই পাঠক তৈরী করেন এবং করতে পারেন। তার জন্যে লেখকের অকুণ্ঠ অধ্যবসায় ও নিজের লক্ষ্যের প্রতি অসামান্য নিষ্ঠা দরকার। রবি ঠাকুরের বাণী লেখকের প্রতি ভালো ভাবেই খাটে।

ওরে তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়ত বাতি জ্বলবে না।
ভাবলে ভাবনা করা চলবে না।

লেখক হ'তে হ'লে শুধু তার লেখা-বিষয়,-ভাষা, ভঙ্গি ব্যাকরণ জানা থাকলেই চলবে না, জগত ও জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয়

ও ব্যক্তিগত উপলব্ধিও এক্ষেত্রে প্রধান কথা হয় না। লেখকের পরিবেশ তাঁকে গড়ে তুললেও লেখার কারিকুরি তাঁকে শিখতেই হবে। কোনো বিষয়ে ভালোভাবে, পুরোপুরি না জেনেও সে সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব, কিন্তু লিখতে না জানলে বহুদর্শী প্রাজ্ঞের পক্ষেও লেখা সম্ভব নয়। লেখকের শিক্ষা অন্যান্য শিল্পীর মতো বাঁধাধরা নয় নিশ্চয়ই, তবু লেখার আর্ট শিক্ষা তাঁর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন।

প্রতিটি মানুষ অন্য সবার থেকে আলাদা, তাঁর দেহ ও মনের গঠনের মত জীবনায়নেও। জগতের অযুত কোটি বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজ শক্তি অনুযায়ী দেখা জানা বোঝা বিষয়গুলোকে লেখক একটি বিশেষ রূপ ও কাঠামোর মধ্যে ফেলে একটি বিশেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যান। তাঁর চোখে অন্য সবার থেকে আলাদা রকমভাবে সেই পরিণতি ফুটে ওঠে। সব কথাই লেখককে বলতে হয়না, যেমন তেমন করে বললেও তা লেখা হয়না অর্থাৎ তা সাহিত্যের পর্য্যায়ে ওঠে না। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে কোনো বিষয়কে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্ত দরকার লিখনকলার জ্ঞান।

লিখন-কলা বিদ্যার কোনো সাধারণ সহজ সূত্র (definition) দেওয়া এককথায় অসম্ভব, A. E. Hadsman-এর ভাষার একটু আদল বদল করে বলি···if I were obliged not to define art of writing but to name the class of things to which it belongs, I should call it a secretion—এই কথাটারই প্রতিধ্বনি শুনি আর একজন ইংরেজ লেখকের ভাষায়—Art lies in concealing art, কি বলতে হয়না, সেটা লেখাই হচ্ছে লিখন-কলার প্রধান কথা।

কি কঠোর সাধনার দরকার মনের উচ্ছ্বাস ও আবেগকে গোপন করার শিক্ষার জন্ত? কী ভীষণ কঠিন সত্যকে প্রকাশ করা? কী সে শক্তি যার ফলে একজন লোকের অক্ষরের আঁচড় বা তুলির আঁচড় (ছবি আঁকিয়েতো লেখকই) যুগ যুগ ধরে মানুষের বিস্ময় জাগায় এবং মানুষের মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হয়? তা বিশেষ রূপে ভঙ্গিতে কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা। লিখন-কলা জানা লেখক এমন করে শুরু করেন যাতে আমাদের সেই বিষয়টিতে আগ্রহ জন্মাবেই, তাঁর বলার ধারাবাহিকতা ও যুক্তি আমাদের মুগ্ধ করে, তাঁর মাঝে মাঝে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া আমাদের মনে আনে ছুটির হাওয়া আর ভেবে দেখার অবসর, তাঁর কখনো কখনো ব্যাকরণ ও অন্য নিয়ম না মানা নিজভঙ্গি (style) আমাদের দেয় সহজ তৃপ্তি। আর, তাঁর শেষ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে হয় আর কিছু শোনার নেই—সে কথাটির কোনো প্রতিবাদ করাই যায় না।

লিখন-কলাবিদ্যা is acquired by exercise and study এবং সেটি যার অধিগত ভাষা যে তাঁর কাছে কোনো বাধাই নয় Goldsmith তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার, মধুসূদন লিখেছেন:

শব্দগুলোকে খুঁজতে হয় না, তারা যেন স্রোতে ভেসে আসে। আমার প্রেরণার স্রোত বলতে পারি। ভাবনা কিংবা চিত্র-শব্দগুলোকে আকর্ষণ করে আনে, সে শব্দগুলো আমি জানতাম বলে আর মনে হয় না।

কোনো একটা বিষয়ের শেষ কথা বললেও প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলা সম্ভব নয় কারুর পক্ষেই। তবু যেটুকু বলা যায় সেইটুকুকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বলাতেই লিখন-শিল্পের প্রকাশ। লেখকদের অধীত বিদ্যা, তথ্য ও অনুসন্ধিৎসা, আদর্শ-বোধ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্তেই লেখকেরা মনোমত ঘটনা, পরিবেশ পরিমণ্ডল ও সীমা স্থির করে নেন। সেই স্থির করে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর যুক্তিবোধ ও কল্পনার প্রসারতা ফুটে উঠে। কিন্তু তাঁর এগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে ব্যবহার এবং ক্রমান্বয় এমনই হওয়া চাই যাতে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে পড়ে। সমস্ত মালমসলাকে যথাযথ ভাবে পরিচালনা করাই লেখকের দায়িত্ব, সেটা করার শিক্ষাই কোনো লোকের পক্ষে লেখক হবার প্রথম সিঁড়ি।

এ কথা না বললেও চলে যে, প্রথম সিঁড়ি সব লেখকের পক্ষেই এক নয়, এক রকম নয়। লেখক হতে হ'লে প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথে পরীক্ষা নিরীক্ষা, সফলতা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তাঁকে এই প্রথম সিঁড়িতে উঠতে হয়—না উঠা ছাড়া উপায় নেই। অথচ এই সিঁড়ির পথ, অর্থাৎ লিখন-কলা বিদ্যার পথ অন্য যে কোনো কলা-বিদ্যার পথের চেয়ে কম কঠিন ও কম রুক্ষ নয়।

মহাকবি গ্যেটের বাল্যকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

কবির বাল্যকাল গৃহশিক্ষক ও পিতার তত্ত্বাবধানে কেটেছিল। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন নিয়ম তাঁকে পালন করতে হত না। সমবয়সীদের সঙ্গে তিনি মেশবার সুযোগ পাননি। পিতার ব্যক্তিত্বের ছত্রছায়ায় থাকার জন্য বালকজনোচিত স্বভাব তার মধ্য থেকে সহজে দূর হয়নি। তাছাড়া তার মধ্যে মাঝে মাঝে এক উৎকট ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাব দেখা দিত।

গ্যেটের পিতা ছিলেন গ্রাজুয়েট। গ্যেটের জীবনে তাঁর পিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, স্থায়ী জীবিকা তাঁর ছিল না। তাই নিজেই তিনি ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইনি লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন এবং গিসেন বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েট হন। ইনি স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে নিয়োগের চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার পর অবশ্য রাজকীয় সভাসদ হন। কিছুদিন পর এ পদ হতেও তিনি বঞ্চিত হন।

ইনি ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তি। বিশ্বমন সম্ভবতঃ গ্যেটে তাঁর পিতার কাছ থেকে পান। গৃহে কতকগুলো রোমান শিল্পীদের আঁকা নিসর্গমূলক ছবি ছিল। গ্যেটেকে এই সব ছবি দেখিয়ে তার অর্থ ও তাৎপর্য্য তিনি বুঝিয়ে দিতেন। কবির পিতা ইটালী ভ্রমণ করেছিলেন। ইটালী দেশের কতকগুলো মার্বেল পাথরের সঞ্চয় ছিল তাঁর। এগুলো ছেলেকে দেখাতেন। গ্যেটের মা স্বামীর কাছ থেকে ইটালী সঙ্গীতের তালিম নিতেন। তাছাড়া তিনি ইটালী ভাষায় নিয়মিতভাবে রোজনামচা লিখতেন। বাল্যকালে গ্যেটে একটা ইটালী সঙ্গীতের কলি Solitario Bosco Om Brosa কণ্ঠস্থ করেছিলেন। গ্যেটের পিতার কাছে ছিল ল্যাটিন চিরায়ত সাহিত্যের একটা ওলন্দাজী সংস্করণ। এর ফলে গ্যেটে অতি বাল্য অবস্থায় কবি ট্যাসোর প্রতি ভক্ত হয়ে উঠেন। স্থাপত্য

র বিষয়েও গ্যেটের পিতার গভীর অনুরাগ ছিল। তা ছাড়া -পাঠাগারে ছিল বিশ্বকোষ ও অভিধান। এই দুই জাতীয় গ্রন্থ দানের দিকে গ্যেটের পিতার আকর্ষণ ছিল বেশী, সময় পেলে ইনি ারম ভ্রমণ কাহিনী পড়তেন, মাতৃভাষার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক কর্ষণ ছিল। তাছাড়া বিদেশী ভাষার প্রতি গ্যেটের পিতার রোগ ছিল। ইনি পত্নী এবং কন্যাকে ইটালী ভাষা ও সঙ্গীত খাতেন।

আত্মজীবনীতে গ্যেটে স্বীকার করেছেন, তাঁর বুদ্ধি ও প্রবণতাকে কাশ করবার জন্য তাঁর বাবা সুযোগ দিতেন। চিত্রাঙ্কন বিষয়ে বির অনুরাগ তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া। তদানীন্তন াণ চিত্রশিল্পীদের ইনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সব শিল্পীদের াকা কয়েকখানা ছবিও ছিল। ছেলেকে তিনি বলতেন, বিগত ীর চেয়ে জীবিত শিল্পীকে বেশী সম্মান দিতে। পুত্রকে কেন্দ্র করে তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল। গ্যেটে বাল্যকালে একটা বন্ধ লিখে পিতার কাছ থেকে উপহার পান। বংশের উজ্জ্বল রত্ন রে তোলবার জন্য গ্যেটের পিতার আগ্রহ ছিল অত্যধিক। ল্যকালে ওভিদের একখানা কাব্যগ্রন্থ গ্যেটের হাতে আসে। ত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্যেটে কাব্যগ্রন্থখানি পড়ে শেষ করেন। রায়ত গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শেও কবি আসেন। সম্পর্কের এক সে হোমারের রচনার সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দেন। হোমারের ই বই-এর মধ্যে একটা ছবি ছিল। এই ছবি দেখে কবি অভিভূত য়ে পড়েন। এই পিসের পত্নী অর্থাৎ পিসীমা গ্যেটেকে ভার্জিল পড়বার উপদেশ দেন। ছোট থেকেই গ্রীক ও রোমান মহাকবিদের সঙ্গে ার পরিচয় হয়। তবে তাঁর পিতার ধারণা ছিল, মিত্রাক্ষর ছাড়া ন্য ছন্দে অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লেখা যায় না। জার্মাণীর নগণের কবি ক্লোপস্টোক Hession নামক একখানি কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন। জার্ম্মাণ সাহিত্যে এটি প্রতিনিধিমূলক াগ। যেহেতু এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, সেহেতু গ্যেটের পিতা ার গৃহ-পাঠাগারে এই বইটির স্থান দেন নি।

গ্যেটের পিতার অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লেখা যায় না। উপরন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছন্দই নয়, বাইবেলের কাহিনীকে কবি ক্লোপস্টোক ভাবের যোজনা দিয়ে কাব্যখানি এত প্রাণবন্ত করেন যে সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে কাব্যখানি সমাদৃত হয়। স্বামীর পাঠাগারে এ কাব্যগ্রন্থখানি না থাকায় গ্যেটের মা এই কাব্যগ্রন্থটি জনৈক বন্ধুর মারফত এনে কাব্যরস আস্বাদন করেন। কবি লুকিয়ে বোন কর্ণেলিয়ার সঙ্গে বইটি পড়তেন। এ-কাব্য শয়তান প্রসঙ্গ ছিল। সন্ধ্যার আবছায়াতে গ্যেটেকে পড়াচ্ছিলেন, বোনকেও শোনাচ্ছিলেন। গ্যেটের পিতা ক্ষৌরকর্ম করছিলেন। বইখানি এত প্রাণবন্ত ছিল যে শয়তান প্রসঙ্গ শোনবার সময় বোন কর্ণেলিয়া ভয়ে আর্তনাদ করেন। ক্ষৌরকর্মরত নাপিতের হাত থেকে ক্ষুর পড়ে গেল। কারণ নির্ণয় করে তিনি জানলেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গ্রন্থটি তাঁর গৃহে যত অনিষ্ট সাধনের মূল। সুতরাং কাব্যগ্রন্থটি সরিয়ে ফেললেন বাড়ী থেকে।

কয়েকটা বংশের ধারা পান তিনি। গ্যেটের প্রপিতামহের [illegible] আহরণ করেন যে যার জন্য তাঁকে ভূতস্বভাব বলা হত। নারীর প্রতি অনুরাগ তাঁর শুরু হয় কৈশোরের সন্ধিক্ষণে। জীবনের সায়াহ্নে এক নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ জাগে। সূক্ষ্ম শিল্পের প্রতি অনুরাগ ও সামান্য বস্তুর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আহরণ করবার ক্ষমতা পান তিনি এক প্রপিতামহীর কাছ থেকে।

গ্যেটে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন সে অঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ-জার্মাণীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি ছিল জার্মাণ সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মুক্তনগর। তা ছাড়া এই নগরে জার্মাণ যুবরাজদের অভিষেক হত। আর নগরের টাউন হলে বহু সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের চিত্র অঙ্কিত থাকত। এ-সব ছবি কবি অবাক-বিস্ময়ে দেখতেন। মুক্তনগরের শাসনভার যাঁরা চালাতেন তাঁরা ভাবতেন যে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অভিজাতদের চেয়ে তাঁরা পদমর্য্যাদায় কম নন। কবিদের গৃহ ছিল যেখানে সেখানে বহুকাল পূর্বে ছিল হরিণের আস্তানা। সুতরাং সে-অঞ্চল হরিণের আস্তানা বলে পরিচিত হলেও সেখানে হরিণের সাড়া-শব্দ পাওয়া যেত না। কবিদের গৃহটা ছিল পুরানো। সংস্কারের অভাবে বাড়ীর ভিতরটা ছিল গুমোট ও অন্ধকার। বাড়ীর মধ্যে একা বিছানায় শুয়ে কবির ভয় লাগত। বাড়ীর গুমোট ভাব দেখে কবি রীতিমত ভয় পেতেন। পিতার কঠোর শাসনের ভয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পেতেন না। পিতার শাসন ও মনের ভয় দূর করে দিতেন তাঁর মা নানারকম পুরস্কার দিয়ে। তাঁর মা বলতেন, যে যত ভয় দূর করবে তাকে তত তিনি পুরস্কার দেবেন।

পিতার শাসন ছিল কঠোর। এই নির্মম শাসনের বেড়াজাল পেরিয়ে গ্যেটে মার কাছে এসে যতটা পারতেন ততটা স্নেহ ও ভালবাসা আদায় করে নিতেন। ছোটবেলায় জানালার ভিতর দিয়ে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য কবি সহ্য করতে পারতেন না। অস্তাচলগামী সূর্য্য দেখে কবির মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হত। কবি নির্জনপ্রিয় ছিলেন। এই নির্জনপ্রিয়তা হওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে চিন্তা করার প্রবণতা দেখা যেত। এইজন্য চিন্তাশীলতার ভাব তাঁর মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল। অবসর সময়ে কবির সময় কাটত ঠাকুরমার সঙ্গে। একটা প্রশস্ত ঘরে তাঁর ঠাকুরমা থাকতেন। ঠাকুরমার কাছে গিয়ে খেলা করতেন, এই বৃদ্ধা ঠাকুরমা পুতুলখেলার মাধ্যমে নাতী-নাতনীদের একদিন পুতুলদের মূক অভিনয় দেখান। গ্যেটের জীবনে নাট্যরচনার দিক হতে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্যেটের মনে এর ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পড়ে। এই থেকে নাট্যকার হওয়ার বাসনা তাঁর মনে অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নদীর তীরে ভ্রমণে যেতেন। বায়ু নির্দেশক ধাতুর মোরগ গৃহচূড়ায় দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। নৌকায় জলবিহার সব চেয়ে তাঁকে বেশী আনন্দ দিত। মদের দোকান ছিল নদীর ধারে। নদীতে বিরাট পণ্যবাহী জাহাজ নোঙর করত। এ-সব তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। নদীতীরে তাঁর ভয় লাগত কসাইখানার দোকান দেখে। কসাইখানা দেখে অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠতেন তিনি। আকাশচুম্বী মিনার দেখে তাঁর খুব আনন্দ হত। শহরে স্থাপত্যশিল্পের পুরানো বহু নিদর্শন ছিল। এ-গুলো তিনি দেখতেন। শহরের প্রাচীর-বেষ্টিত লম্বা দেওয়াল তিনি মনোযোগ সহকারে পরখ করতেন। [illegible] পারতেন না।

লেখাপড়ায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা ও শিক্ষক যা পাঠ দিতেন তা তিনি শেষ করে ছাড়িয়ে দিতেন। তবে ব্যাকরণ পড়বার সময় তাঁর খুব অসোয়াস্তি লাগত, কারণ ব্যাকরণের নিয়মগুলো তাঁর কাছে খুব স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হত, তাঁর মনে হত, ব্যাকরণ খেয়ালখুশি মত ভাষার কণ্ঠরোধ করে। ব্যাকরণের ব্যতিক্রমগুলো ব্যাকরণের নিয়মকে বেশী পরিমাণে খায়েল করে। মেধাবী ছাত্র হয়েও ব্যাকরণ-বিভীষিকার জন্য তাঁকে দুর্ভোগ সহ্য করতে হত। বিদ্যালয়ে যখন কিছুদিনের জন্য ছিলেন তখন পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখত তাঁকে। রচনা-রীতির দিক হতে তিনি ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। ছোটবেলাতেই কবিতার ছন্দ ও সুর তাঁর আয়ত্তে আসে। তাঁর পিতা তাঁর মা ও বোনকে ইটালী ভাষার তালিম দিলেন। সেই সময় গোটের মনে হয়েছিল ইটালী ভাষা ল্যাটিন ভাষার সংস্করণ।

জার্মাণ কবিতাও গোটের ভাল লাগত। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখেন, সমবয়সী বন্ধু কবিদের সঙ্গে লড়াই হত। অবশ্য এরা সকলেই ক্ষুদে কবি। ক্ষুদে কবিরা সকলেই আপনার রচনাকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করত। অধিকাংশ ক্ষুদে কবি অপরকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে এনে বেমালুম নিজের নামে চালিয়ে দিত। গোটে খুব অসুবিধায় পড়তেন। কারণ, কবিতা যে তিনি নিজে লিখতেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, তাঁর মৌলিক কবিতা অপরের চেয়ে ভাল হত। ছোটবেলায় কবির একবার হাম হয়। এর ফলে লেখা-পড়া বন্ধ থাকে কিছু দিনের জন্য। অসুখে চোখের পাতা তুলতে পারতেন না, সর্ব অঙ্গে ব্যথা থাকাতে কাতরোক্তি করতেন, আর হামের গুটী এত হয়েছিল যে তিলার্দ্ধ ধারণের স্থান ছিল না, সে সময় টীকার প্রচলন হয়েছিল। টীকা অবশ্য তখন সকলে নিত না। কবিকে বলা হত মুখ খুঁটে তিনি যেন ঘা না করেন। আর এই কাজ থেকে তিনি যাতে বিরত হন তার জন্য তাকে উপহার দেওয়ার লোভ দেখানো হত। তখন লোকের ধারণা ছিল, টীকা হলে রোগীর দেহে বেশী ঢাকা দিলে রোগের উপশম হয়। বেশী ঢাকা দেওয়ার ফলে রোগের উপসর্গ আরও তাঁর বাড়ল। অবশ্য অনেক রোগভোগের পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। হামের গুটী মুখে একটা মুখোসের মত আবরণ তৈরী করেছিল। মুখোস সরিয়ে দিলে যেমন সাধারণ মুখ দেখা যায় তেমন হামের দাগ সরে গেলে তাঁর মুখমণ্ডল স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর আকৃতির পরিবর্তন সামান্য হয়, তাই এক মাসি গোটেকে দেখে বলেছিলেন যে গোটে হচ্ছেন ভূতের ভাইপো। গোটে বুঝতে পেরেছিলেন যে রোগভোগের জন্য তিনি আগেকার চেয়ে অসুন্দর হয়ে উঠেছিলেন। এই হাম ও পানি-বসন্তের প্রকোপে তাঁর এক ছোট ভাই মারা যায়। অসুস্থ হয়েছিলেন বলে লেখাপড়া কিছুদিন বন্ধ থাকে। কবির পিতা ভাবলেন যে, ছেলে পিছিয়ে পড়েছে। তাই তিনি দ্বিগুণ পাঠের তালিম দেওয়া শুরু করলেন। ছেলের মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতার কথা ভাবেননি। গোটেও হাঁফিয়ে উঠতেন। পিতার কঠোরতা দেখে মধ্যে মধ্যে ঠাকুরমা ও মাতামহের কাছে পালিয়ে যেতেন।

এই মাতামহের বর্ণনা গোটে আত্মজীবনীতে দিয়েছেন। সারা বছর তিনি বাগান পরিচর্য্যা করতেন। হাতে দস্তানা পরে বাগানে কাজ করতেন গাউর্ন পরিধান করে। ভেলভেটের ভাঁজ করা টুপি তিনি মাথায় পরতেন, ইনি খুব কম কথা বলতেন, ঘোড়ায় চড়ে তিনি টাউন হলে যেতেন, ফিরে এসে আহারের পর ঘুমাতেন, দাদুকে গোটে কোনদিন বৃদ্ধ হতে দেখেননি। এই দাদুর পাঠাগারে ভ্রমণ-কাহিনী, মহাদেশ আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী ছিল। এসব কাহিনী পড়ে তিনি উদ্দীপ্ত হতেন। বই পড়া নেশা গোটের এত প্রবল ছিল যে তুলোট কাগজের ওপর ছবিওয়ালা পুস্তক কিনতেন। বইগুলো টেঁকসই নয়, তবু আগ্রহ সহকারে এই সব বই পড়তেন। অনেকে বলেন যে, ছবিওয়ালা এই বই আর ঠাকুরমার মূক পুতুল অভিনয় গোটেকে অমর কাব্য ফাউষ্ট রচনায় উদ্দীপ্ত করেছিল। সস্তা দামের বইগুলোতে সাধারণতঃ পরীদের কাহিনী থাকত। গোটের দাদুর বাড়ীতে ছিল নানা রকমের গাছ ও লতাপাতা। বাড়ীটার আকার ছিল দুর্গপ্রাকারের মতন, তুঁতে, গোলাপ প্রভৃতি নানা ধরণের গাছ ছিল। দাদুর বাগান পরিচর্য্যা করবার সখ ছিল। অফিসে লোক যেমন কাজ করে, সেই রকম নিয়মিত ভাবে তিনি বাগান পরিচর্য্যা করতেন। বাগানের লতাপাতা ও গাছগাছড়া বিষয়ে প্রত্যহ রোজনামচা লিখতেন। এই দাদু একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তাঁর চাকুরীর উন্নতি হবে, সে-স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়, সেই থেকে দাদু স্বপ্নে বিশ্বাস করতেন। গোটে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই দাদুর মধ্যে তিনি একটা আত্মতৃপ্ত ভাব দেখেছিলেন।

উৎসব পালনের জন্য তাঁদের গৃহে বহু চীনামাটির বাসন আনা হয়েছিল। এক নির্জন দুপুরে কৌতুকবশে বাড়ীর লোকের অজানতে এই সব বাসনপত্র রাস্তায় ফেলে ভেঙে তছনছ করেছিলেন। ভাঙার আওয়াজ শুনে উল্লসিত হয়েই এই কাজ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি শহরের টাউন হলে গিয়ে জার্মাণ সম্রাটদের আঁকা ছবি বিচিত্র দেওয়ালে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতেন। সেখানে একটা সোনার ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, এটাও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেন। অতীত রাজবংশের ছবি দেখে ইতিহাসপাঠের দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা দিল। গোটের ঠাকুরমা মারা গেলে, তাঁর বাবা বসতবাটীর সংস্কার করেন। গোটের বয়স যখন চার, তখন তাঁর বাবা বসতবাটীর সংস্কার করেন। সংস্কার করবার সময়েও তাঁর বাবা হয়ত অন্য কোথায় পাঠাতেন না। কিন্তু একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরের চাল সরে যায়। আলোর প্রবেশ হল বাড়ীতে আরও; আগে এত আলো ঘরে আসত না। এটি গোটে লক্ষ্য করলেন। এই সময় তাঁরা তাঁর বাপের বন্ধুদের বাড়ীতে ওঠেন। গোটের পড়ার পাছে ক্ষতি হয় এই ভেবে গোটেকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। কারণ গোটের বাবা জানতেন, বাড়ী সংস্কার কার্য্যে মন দিলে ছেলেকে পড়াতে পারবেন না। নিজের তত্ত্বাবধানে গৃহ সংস্কার তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর শুরু করবার বাসনা ছিল গোটের পিতার বহুদিন আগে থেকে।

[ক্রমশঃ।
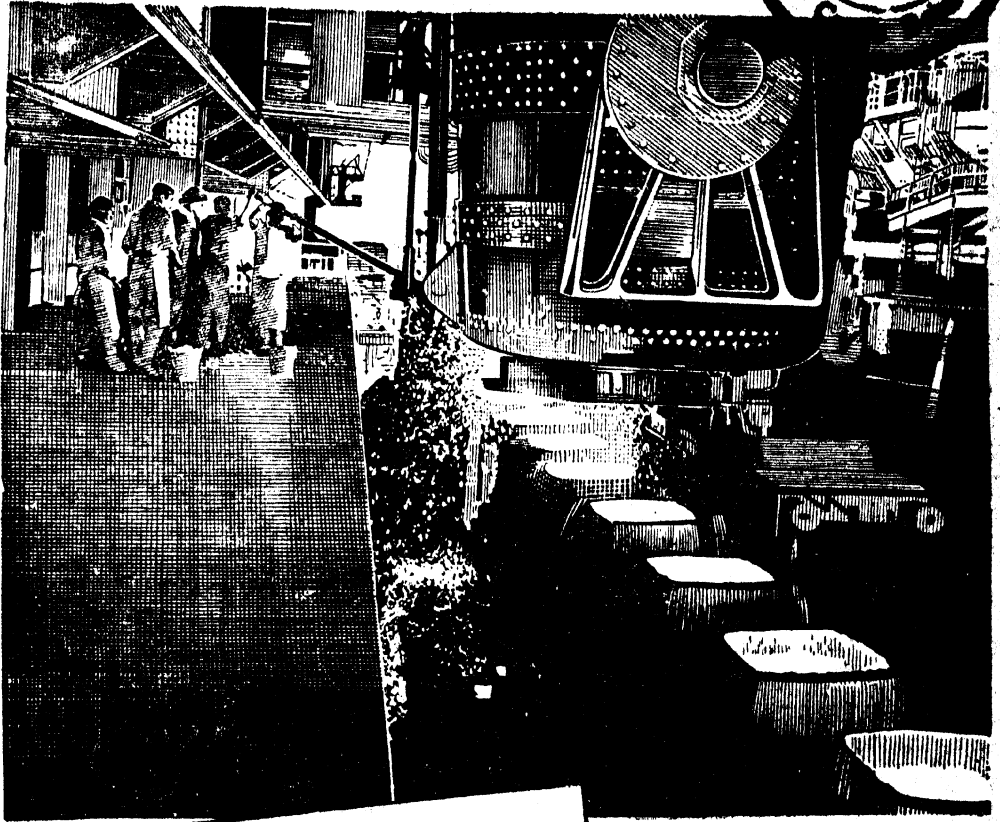
নির্ধারিত সময়ের আগেই

গত ২৫শে এপ্রিল মেল্টিং শপ বিভাগে প্রথম ওপেন হার্থ ফার্নেসটির নির্মাণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় নির্ধারিত সময়ের আগেই ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়েছে।

যেখানে ছিল একদিন গভীর অরণ্য সেখানে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট ইস্পাত কারখানা। দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের উপযোগী এই কারখানাটি সম্পূর্ণ করার জন্য ইংরেজ ও ভারতীয় কারিগরেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এখানে দিন রাত কাজ করে চলেছেন।

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ

দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস লিঃ দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ টম্‌সন্-হস্টন কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেকট্রিক্যাল এয়ারপোর্ট কোম্পানি লিঃ স্যার উইলিয়াম এরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেব্‌ল গ্রুপ (সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেব্‌ল ওয়ার্কস লিঃ)

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

সঙ্কটের বিহ্বলতায়

জুলফিকার

বি[illegible]মুখে আজ কয়েকটি বিহ্বলকারী প্রশ্ন জেগেছে—'এ আমরা কোথায় চলেছি? মানব-সভ্যতার পরিণতি কি, ক্লান্ত-কাতর মানুষ কি শান্তি ফিরে পাবে না?':

একটা দারুণ অস্থিরতা, একটা গভীর অসোয়াস্তি পৃথিবীর দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করেছে। চারিদিকে যেন আতঙ্কের বিবর্ণ প্রেতচ্ছায়া—

আজকের সঙ্কট শুধু রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট দৈত্যের মত সে আবির্ভূত হয়েছে। মানব-সভ্যতাকে সে গ্রাস করতে উদ্যত।

বর্ত্তমান যুগটা হচ্ছে কৃত্রিমতার যুগ, সব জিনিষই যেন বাঁধা-ধরা ছাঁচে ফেলা, একজন লোক এ সম্বন্ধে বেশ একটা সরস উক্তি করেছেন, 'It is an age of canned food, canned music and canned thought.' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রায় সকল দেশেই স্বাধীন চিন্তার সঙ্কোচ এবং রাষ্ট্রবিরোধী মতবাদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। একজন যুগান্তকারী শিল্পী বা সাহিত্যিক, একজন বিরাট দার্শনিক অথবা একজন মহামানবের অভ্যুত্থান এ যুগে সত্যই অপ্রত্যাশিত। আজ-কাল প্রতিভাবান ব্যক্তির সম্মুখে মাত্র চারিটি পথ উন্মুক্ত—হয়, সে একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হতে পারে, না হয়, একজন শিল্পপতি অথবা মস্ত বড় একজন বৈজ্ঞানিক আর না হয়, একজন দুর্দান্ত চোর, জুয়াচোর বা নরঘাতী দস্যু। এ কথা বলেছেন স্বয়ং বারট্রাণ্ড রাসেল। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে তাকে চলতে হয় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত, না হয়, অত্যাচারীর দম্ভ ও দাপট নিয়ে। রাসেলের কথায়, 'A man who now wishes to influence human affairs finds it difficult except as a slave or a tyrant.' সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তিনি উপমা দিয়েছেন আরব্য উপন্যাসের দৈত্য বা জিন্‌দের। রাজনৈতিক নেতার হাতে ক্ষমতার ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরী; তারই প্রভাবে বৈজ্ঞানিক জিন্ অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করে চলেছে। এই সব মিরাক্যল ঘটাচ্ছে সে আপনার অন্তরের প্রেরণায় নয়। আজ্ঞাদাসের মত সে প্রভুর হুকুমই তামিল করে চলেছে মাত্র।

যে বৈজ্ঞানিক (বৃন্দ) আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছেন (যে মারণাস্ত্রের বিশ্বধ্বংসী শক্তি হিরোসিমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, হাজার হাজার নর-নারীর দেহ ছিন্নভিন্ন করল, আরও কয়েক হাজারকে পঙ্গু, বিকল, অভিশপ্ত করে গেল) লক্ষ নরহত্যার পাপের বিষম গুরুভার কি তাঁদের অন্তরকে আতঙ্কিত, বিভীষিকাগ্রস্ত করে তুলছে না?

জ্ঞান আমাদের ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কিন্তু সেই তুলনায় কমে আসছে অনুভূতি, আবেগের প্রখরতা। মানুষের জীবনের যেন কোন মূল্যই নেই আজ, যদিও অন্যান্য সব দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার মত ব্যাপক নরহত্যা পূর্ব্বে আর কখনও হয়নি পৃথিবীর বুকে, বর্ব্বর চেঙ্গিস খাঁ বা হূন্ এ্যাটিলার আমলেও নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের রক্তস্নান থেকে উঠেও মানুষ এখনও যুদ্ধ ও হত্যার কথা বিস্মৃত হতে পারছে না। যে সক্রিয় অনুভূতি সৎ জীবন যাপনের প্রেরণা যোগায়, ন্যায় ও কল্যাণবোধ উদ্দীপ্ত করে, মানুষের হৃদয়ে তা আজ মৃত। মানসিক ও আত্মিক' পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য মানুষ তার সৃজনীশক্তি নিয়োজিত করছে। শীলবত্তা ও আধ্যাত্মিকতার (cultural and spiritual) মান উন্নত না করে কেবলমাত্র লৌকিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কার্য্যে সে ব্রতী। একজন কিম্ভূতকিমাকার লোক যার দেহের একদিক অতিমাত্রায় পুষ্ট, অন্যদিক অস্বাভাবিক রূপে শীর্ণ, সে যেমন আমাদের বিদ্রূপ ও জুগুপ্সার উদ্রেক করে, বর্ত্তমান সভ্যতার রূপটাও সেইরূপ অশোভনীয় খাপছাড়া এবং সত্যদর্শী ব্যক্তিদের মনে ঘৃণা ও অনুকম্পার ভাব জাগিয়ে তোলে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) গুলির মধ্যে সব চেয়ে জোরালো হচ্ছে নিজেকে প্রসারিত করবার ইচ্ছা—আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এ যুগের প্রলয়-মেঘের ঘনঘটা চারিদিকে যে কালো ছায়া ফেলেছে তারই অস্পষ্টতায় মানুষ আজ তার আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক হ'তে সংশয়, শঙ্কা, দুরাশা, ছলনা, দ্বেষ তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। বন্দী মানবাত্মার আকুতি বৃথাই হৃদয়পঞ্জরে ডানা ঝাপটে মরছে।

অবাধ স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলা আনতে পারে সত্য, একনায়কত্বের অভ্যুদয়ও ঘটাতে পারে কিন্তু মানবাত্মার প্রসার ও ঊর্দ্ধগতি রোধ করলে কিম্বা মানুষের প্রতিভাকে শুধু রাষ্ট্রের সংকীর্ণ স্বার্থে নিয়োজিত করলে শুধু যে জাতীয় জীবনের প্রকর্ষবত্তা ব্যাহত হবে তা নয়, সমগ্র মানব জাতির পক্ষে তা চরম অকল্যাণকর।

বর্ত্তমান যুগে মানুষের বিচারবুদ্ধি কোন দৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। অসত্য ও অন্যায়ের প্রবল স্রোতকে প্রতিহত করতে মানুষ অশক্ত। তার বুদ্ধি অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত; সার্থক সৃষ্টি-কার্য্যে মন তার বন্ধ্যা। ভেসে চলেছে সে সঙ্কটের নেপথ্য পানে।

অন্ধের মত মানুষ তার হারিয়ে যাওয়া শান্তিকে খুঁজে ফিরছে। অশান্তির দাবদাহে সে দগ্ধ। জীবনের সহজ ছন্দ সে ভুলে গেছে, মন তার বিভিন্ন complex-এ ভুগছে। মার্কিণ মুলুকের বড় বড় সহরে অসংখ্য সাইকো থেরাপীর ক্লিনিক খোলা হচ্ছে। বিকৃত-মস্তিষ্কের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আত্মহত্যার হার ঊর্দ্ধগামী।

দুইটি বিবদমান শক্তির মাঝে পড়ে পৃথিবী আজ ওষ্ঠাগত-প্রাণ। দুই দৈত্য—রুশ আর ইয়াঙ্কি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাল ঠুকছে আর রোষসন্দেহাকুল নেত্রে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করছে, (সম্প্রতি ওদের মারমূর্ত্তির উগ্রতা অনেক কমে এসেছে। তবে ওদের মধ্যে আপোষ যদি কিছু হয়, তবে তা কত দিন টিকবে, সেটা বলা কঠিন।)

জেদি, অনমনীয় আমেরিকা গণতন্ত্রের মুরুব্বি হিসাবে দুর্ব্বল ও দুঃস্থ রাষ্ট্রগুলিকে প্রচুর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছে; সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে (Collective security of nations) দৃঢ় করে তোলার অছিলায় এই সব দেশগুলির উপর আপন কর্ত্তৃত্ব বিস্তারে সে সচেষ্ট।

এই সব দেশের লোকেরা আমেরিকাকে দেখছে ডিমোক্র্যাসীর চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নয়, বিরাট এক মহাজনের ভূমিকায়। মহাজনকে খোসামোদ সবাই করে কিন্তু তাকে সত্যই ভালবাসে শ্রদ্ধা করে

কয় জন? শ্রদ্ধা দূরে থাক, অনেক সময় আমরা তাকে অভিশাপ দিই। আমেরিকান লেখক Andre Visson এর কিছুদিন আগে একখানা বই বেরিয়েছে 'As Others See Us' তাতে তিনি ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত যে সমস্ত দেশ মার্কিণ সাহায্য পাচ্ছে তাদের অধিবাসীদের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। এরা আমেরিকাকে মোটেই প্রীতির চক্ষে দেখে না। বাহিরে আনুগত্যের ভাণ দেখালেও ইয়াঙ্কিদের মনে মনে ঈর্ষা করে আড়ালে বিদ্রূপ করে। একদিকে মার্কিণ দেশ (U. S. A.) যেমন ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকায় তার আধিপত্য বিস্তার করতে উৎসুক, অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া (U. S. S. R.) বিরাট চীনকে আপনার দলে টেনে এনে, ইউরোপের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও এশিয়ার অন্যান্য দারিদ্র্য-পীড়িত অনুন্নত জাতিদের মনের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তার রাজনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তুলেছে। সোভিয়েট গুপ্ত পুলিশের (MUD) অমানুষিক কার্য্যকলাপের কাহিনী এ্যাংলো আমেরিকান কাগজগুলিতে ফলাও করে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও আজ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক রুশ-নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। কিন্তু কম্যুনিজম-নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সন্ধান দিতে গিয়ে নতুন দাসত্বের শৃঙ্খলে তাদের আবদ্ধ করেছে। কতকগুলি বাঁধা নীতির মায়াজালে তাদের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে: It has created a new serfdom by enslaving the human minds.

যদিও আদর্শের দিক দিয়ে রুশ ও মার্কিণ বিরুদ্ধবাদী তবু তাদের মূলগত ঐক্যের অভাব নাই। কথাটা বোঝাতে গিয়ে একজন লেখক বলেছেন, Americans are merely Russians with clean finger nails and pressed pants. জীবন সম্বন্ধে দু'জনেরই দৃষ্টিভঙ্গী এক—বস্তুতান্ত্রিক। দু'জনেই যন্ত্রসভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। শিল্পকলায়, সাহিত্যে, দর্শনে বা ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তায় ওদের কারোরই বিস্ময়কর কোন অবদান নেই।

রুশ-মার্কিণ দ্বন্দ্বে সম্প্রতি অনেকটা ভাঁটা পড়েছে বটে কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা এখনও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি। ঠাণ্ডা স্নায়ুযুদ্ধ যে শেষকালে খুনোখুনি লড়াইয়ে পরিণত হবে না, কে বলতে পারে? কে জানে চীন-ভারত সীমান্ত-সমস্যা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যাতে সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধদেবতার মত্ত পদাঘাতে কম্পিত হয়ে উঠবে?

এই যে এত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিশন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে, ওদের আপোষ আলোচনা, শান্তিবৈঠক দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে।

এই নিষ্ফল দৌত্য বা বৈঠকগুলি রাষ্ট্রনেতাদের আন্তরিকতার অভাবকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। অধিকাংশ নেতাদের কার্য্য বাক্যের অনুসরণ করে না। কপটতা ও চাতুর্য্যের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যে সাফল্যের আশা করা বৃথা। মহৎ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হলে অনুরূপ মহৎ ধর্ম্মপন্থারই প্রয়োজন। কর্ম্মপদ্ধতি ও লক্ষ্যের মধ্যে নৈতিক বৈষম্য দূর করতে না পারলে সিদ্ধি সুদূর-পরাহত। ভয়ের উপর শান্তির প্রতিষ্ঠার আশা তাই নিষ্ফল বাসনা। এ্যাটম যুক্তি দাঁড় করানো হচ্ছে, 'শত্রু যদি জানে যে আমার হাতে তীব্র মারাত্মক অস্ত্র আছে, নিশ্চয়ই তাহলে আমাকে সে আক্রমণ করতে সাহসী হবে না; আর যদি আক্রান্ত না হই তবে আমার দেশের শান্তিও বিঘ্নিত হবে না।' খাসা যুক্তি, বিষে বিষক্ষয় থিওরী।

দেখা যাচ্ছে, অনাক্রমণ চুক্তি (Non-agression Pact) যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, অর্থনৈতিক অবরোধের (Economic blockade) অবসান ঘটাতে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সাহায্য পরিকল্পনা ব্যর্থ। রাজনৈতিক কর্ত্তব্যে জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়ে এসে আপন দেশে স্বাধীন মতবাদের শ্বাসরোধ করছেন। 'শান্তি চাই, শান্তি চাই', বলে যাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁরাই আবার উপনিবেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উস্কানী দিচ্ছেন, অন্যদেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে সাবোটাশ (Sabotage) ঘটাচ্ছেন কিম্বা হয়ত ভবিষ্য যুদ্ধের জন্য আণবিক অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহে তৎপর।

পদার্থ বা শক্তির ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অবস্থাকে যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও, মানুষ ও তার মনের ক্রিয়া দ্বারা যে সব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো আয়ত্তে আনবার কোন কৌশল (mechanical contrivance) কোন দিনই আবিষ্কার হতে পারে না; কেননা, মানুষের মনগুলো সব এক ছাঁচে তৈরী নয়, এ ছাড়া কখন যে তাদের কাজ কি ভাবে হবে সেটাও ঠিক আগে থেকে অনুমান করা যায় না (unpredictable)। নিছক যুক্তি দিয়ে মনকে জানা যায় না। অন্তরকে বুঝতে হলে অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা একান্ত প্রয়োজন। আজ যদি কোন রাষ্ট্রনেতা তাঁর দেশের কোন লৌকিক ব্যাপারে (human affair) সাফল্য অর্জ্জন করতে চান, তবে তাঁর চাই দেশভাইদের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, নৈতিক আনুগত্য এবং সর্ব্বোপরি প্রশস্ত কল্পনা।

মানুষের মনে অসন্তোষ, হিংসা, শাঠ্য বা অহরহ শান্তির প্রতিকূল অবস্থা গড়ে তুলছে, শুধু কঠোর সমাজ-ব্যবস্থা বা আইন প্রণয়ণ দ্বারা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়া মূর্খতা। শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নববিজ্ঞানের প্রবর্ত্তনে মানব-কল্যাণের প্রত্যাশা করা বৃথা। এদিয়ে জগৎকে বিশ্বশান্তির পথে এগিয়ে দেওয়া চলে না। সামাজিক অনুশাসনগুলো অনেকটা চশমা, নকল দাঁত বা ক্রাচের (crutch) মত বৃদ্ধ পঙ্গু সমাজকে চালু রেখেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক চাপ কিম্বা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি, মানুষের মনকে কখনও কখনও তার স্বাভাবিক পথ থেকে টেনে এনে একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলতে বাধ্য বা প্রণোদিত করে। জার্ম্মাণীর হিটলারী আমলে যা হয়েছিল বা গত চল্লিশ বছর ধরে রুশ দেশে যা হচ্ছে।

মানুষের মনকে রাষ্ট্রের অনুমোদিত পথে চালিত করতে গিয়ে যে দেশকে তাঁরা একটা ভারী বিপদের মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, এ ধারণাটা রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতামদমত্ততা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মানুষের মনের পুঞ্জিত গ্লানি অসন্তোষ অভিযোগ একদিন না একদিন তাকে বাঁকানো ইস্পাতের পাতের মত ছিটকে বার করে দিবে

বিপ্লবের প্রচণ্ড তুফান বয়ে যাবে; অনেকে প্রাণ হারাবে, অনেক সম্পদ নষ্ট হবে।

শিশু যেমন কলের খেলনা পেয়ে তাকে ইচ্ছে মত নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বিকল করে দেয়, রাজনৈতিক নেতারা দেশবাসীর মন নিয়ে সেই রকম খেলা করতে গিয়ে (mishandle) তাদের মানসিক অবস্থাকে সঙ্গীন, জটিল করে তুলেছেন। এর ফলে ক্রমেই জগতে যা কিছু ভাল ও ন্যায় তার অবসান ঘটতে বসেছে। Prof. Collingwood তাই দুঃখ করে বলেছেন, 'Not only would any failure to control human affaiss result in more and more wide-spread destruction, as natural science added triumph to triumph, but the consequence would tend more and more to destruction of whatever was good and reasonable in the civilised world.'

সমাজের পরিপুষ্টি ও তার স্থৈর্য্য নির্ভর করছে মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপর নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক অভাব ও সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং ঐগুলির সমাধানের জন্য তার সক্রিয় সহানুভূতি আবশ্যক। সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ কখনও দুষ্টচেতা কুটিল লোকদের নিয়ে গঠিত হতে পারে না, আর যে সমাজে দুর্জ্জনের আধিপত্য, সেখানে শান্তির আশা অলীক। সমাজকে সুন্দর করে তুলতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সৎ জীবন যাপনে প্রয়াসী হতে হবে। হতে হবে শীলবান্, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, স্বচ্ছ-হৃদয় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। এর জন্য প্রয়োজন প্রেম, সেবা সৎ দৃষ্টা[illegible]নৈতিক ভিত্তিতে সর্ব্বতোমুখী উন্নয়ন ব্যবস্থা। এইটি হচ্ছে সর্ব্বোদয়ের গোড়ার কথা।

রুগ্ন, ক্লান্ত পৃথিবী আজ শান্তির জন্য ব্যাকুল। সে আরোগ্য চায়, চায় হিংসা-লোভ-প্রবঞ্চনা-সন্দেহ-শঙ্কাক্লিষ্ট বিষাক্ত আবহাওয়ার অপসারণ। এই বীভৎস পরিবেশ কাটিয়ে উঠতে হলে মানুষকে ধর্ম্মানুগ হতে হবে। ভণ্ডামী ও আত্মম্ভরিতার প্রভাবমুক্ত হতে হবে। মুমূর্ষু আত্মার গুণগুলিকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। কথাগুলি ধর্ম্মপ্রচারকের মত শোনাচ্ছে হয়ত কিন্তু ধর্ম্মের ব্যতিক্রম বা নৈতিক অবনতি যে সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খলা আনে এবং রাষ্ট্র-সংহতি নষ্ট করে দেয়। এটা শুধু মহাভারতের কথা নয়, হাল আমলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্রাউন, দার্শনিক প্রোফেসর কলিং উড, ঐতিহাসিক প্রোফেসর টয়েনবী প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এ মতের পোষকতা করেন।

ধর্ম্মীয় ও লৌকিক ব্যাপার যে সম্পূর্ণ পৃথক নয়, এ কথাটি উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। শান্তির রাজ্য ফিরিয়ে আনতে পারে বিশ্বমৈত্রী, বিভেদ ভুলিয়ে বিভিন্ন জাতির একাত্মীকরণ, কিন্তু এর জন্য অপরিহার্য্য চিত্তশৌচি, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা-দ্বেষের অবসান। মানব-মনের এই পরিশুদ্ধি বা সঞ্জীবন আদৌ সম্ভব নয়, যদি রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ গড়ে না ওঠে।

পৃথিবীতে আজ সাধুব্যক্তির প্রয়োজন—ন্যায় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন [illegible] সেই সব মানুষ—যাঁরা ভেঙে-পড়া পৃথিবীকে খাড়া রাখতে পারেন। can hold, like strong nails, the crumbling components of the world together. পৃথিবীর চরম ভাগ্য নির্ণীত হচ্ছে মানুষের আত্মিক পরিসীমার মধ্যে।

মানব-সভ্যতার ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কালকে তাদের ভাব ও লক্ষণ অনুযায়ী মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(ক) ব্রাহ্মণ্যযুগ বা ধর্ম্মতান্ত্রিক যুগ (Age of Ethics or Theocracy)

(খ) ক্ষাত্রযুগ বা রাজতন্ত্রের যুগ (Age of Militarism or Monarchy)

(গ) বৈশ্য বা ধনতান্ত্রিক যুগ (Age of Capitalism)

(ঘ) শূদ্র বা শ্রমিকযুগ বা সাম্যতন্ত্রের যুগ (Age of Communism)

এই কালবিন্যাস হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের অনুরূপ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এই যুগবিভাগ হয়ত অবাস্তব বা ঐতিহাসিক-ভিত্তিহীন বলে মনে হতে পারে। কেন না, একই সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধাঁচের রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। উপরোক্ত ক্রম, নিছক রাষ্ট্রীয় বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পৃথিবীর ঘটনাবলীর সাধারণ গতি, প্রকৃতি ও উন্মুখতা (tendency) সামগ্রিক বা অখণ্ড দৃষ্টিতে বিচার করলে সভ্যতার কালকে উপরোক্তরূপে চিহ্নিত করলে তা অযৌক্তিক বলে মনে হবে না।

প্রাচীন কালে রাষ্ট্রের ক্ষমতা মুখ্যতঃ পুরোহিত বা যাজক-সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এ যুগে ধর্ম্ম বা দার্শনিক জ্ঞানের প্রাধান্য ছিল। ধর্ম্মই প্রথমে বর্ব্বর ও যাযাবর মানুষকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নীতি শিক্ষা দিয়েছিল। এই সময় সামাজিক জীবনে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন হয়েছিল ও সংস্কৃতির মান অনেক উচ্চে ছিল। ধর্ম্ম-যুগে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হয় নাই, কারণ শান্তিকে লোকে তখন বাইরে খোঁজেনি, ভগবদ্‌ভক্তির মধ্যে তারা শান্তির উৎস খুঁজে পেয়েছিল। যাজকীয় স্বেচ্ছাচার ও ধর্ম্মীয় গোঁড়ামী অনেক রাষ্ট্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে হয়ত কিন্তু এই কাল মানুষের মনকে ঈশ্বরবিমুখী হতে দেয়নি।

রাজ্য পত্তন ও রাজ্য বিস্তারের সাথে এল ক্ষত্রিয়যুগ; সম্রাট ও সেনাপতির শাসন। রাজ্য রক্ষা ও দূর প্রদেশের বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রসম্ভার যাঁর কর্ত্তৃত্বে, তিনিই হলেন রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। সাহস ও শৌর্য্যের বলে লোক তখন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছে। এ যুগে অনুশীলন হয়েছে বীর্য্যবত্তার, ক্ষাত্রগুণের, ডিসিপ্লিনের, সিভ্যালরীর। সামাজিক জীবনে দেখা গেল কর্ম্মতৎপরতা, নির্ভীকতা, ন্যায়পরতা। বিক্রম ও ঔদার্য্যের সমাদর করতে শিখল লোকে। দেশের ও সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগে মানুষ তখন কুণ্ঠিত হত না, আর্ত্ত ও বিপন্নের জন্য লোকে আত্মবলি দিয়েছে। এটা হচ্ছে মহাকাব্য ও বীরগাথা রচনার যুগ। সম্রাট ও রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য, নাটক, চারণদিগের [illegible] এ যুগে।

পরবর্ত্তী কালে বাণিজ্য ও শিল্পের (industry) বিস্তৃতির সে সূচনা হল বৈশ্যযুগের। ক্ষমতা চলে গেল বণিকগোষ্ঠী, ধনপতি বা ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে, রাজদণ্ডের স্থান নিল মানদণ্ড। এ যুগে মানুষের কাম্য হল ধন বা ঋদ্ধি। প্রথম দিকে সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতি অব্যাহত থাকলেও মানুষের মনের জটিলতা ও বিকৃতির আধিক্যে এবং সংবেদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায়, পরবর্ত্তী সময়ে কাব্য ও আর্টের গতি মন্দীভূত হয়ে এল। কিউবিজম, ফিউচারইজম, ডাডাইজম্, সুররিয়ালিজম, সুপ্রিম্যাটিজম্ প্রভৃতি বিভিন্ন ও অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি হল।

প্রথম দুইটি কালকে কোন নির্দ্দিষ্ট সন-তারিখ দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তৃতীয় বা বৈশ্যযুগের কাল নির্দ্দেশ করা যেতে পারে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের পর থেকে—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে। দেশ-বিদেশে আমদানী-রপ্তানী যখন সহজসাধ্য হয়ে উঠল এবং কারখানায় যন্ত্রচালিত শিল্প উৎপাদন সুরু হল। এর একশ বছর পর যখন বিদ্যুৎ আবিষ্কার হল তখন এ যুগের সমৃদ্ধি আরও দ্রুত এগিয়ে চলল। বিজ্ঞানের উন্নতি আজ চরম পর্য্যায়ে উঠেছে। চন্দ্রলোকে যাবার পথ আজ মানুষকে সে চিনিয়ে দিয়েছে, আণবিক শক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করতে শিখিয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রযুগের অভিশাপ লেগেছে ধনিক ও বণিক-সমাজের উপরে। তাদের আধিপত্য ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাদের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিতপ্রায়।

পৃথিবী আজ বৈশ্য ও শূদ্রযুগের সন্ধিস্থলে উপনীত। চারিদিকে ক্ষুব্ধ ও শোষিত জনগণের মিছিল চলেছে। লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, স্বাধিকারবঞ্চিত মানব-সমাজই শূদ্রের প্রতীক। ধনতান্ত্রিক যুগে শ্রমিক সমস্যাই তার কাল হল। শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটাতে সে আজ নাজেহাল, বণিক ও ধনিকগোষ্ঠীর পক্ষে শূদ্রের অভ্যুত্থান রোধ করা সম্ভব নয়। শূদ্রযুগের আগমনী-ভেরী দিকে দিকে বেজে উঠেছে। বিবর্ত্তনের ধারা অনুযায়ী এই শূদ্রযুগই মানব-সভ্যতার শেষ যুগ। এই যুগে যান্ত্রিক কৌশল আরও উন্নততর হবে, মানুষের জীবনযাত্রা বৈশ্যযুগ অপেক্ষা অধিকতর mechanical হয়ে উঠবে। নাস্তিকতা আরও চরমে উঠবে। মানুষের চিন্তা কল্পনা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। কর্ম্মব্যস্ততা তার নিভৃত চিন্তার অন্তরায় হয়ে উঠবে। ফলে দর্শন, কাব্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে মৌলিকতার অভাব দেখা দেবে। মনের ও আত্মার চাহিদা মেটানর পক্ষে এ যুগের অবদান অতি নগণ্য। ব্যক্তিত্বশালী এ যুগের পরিবেশে জনচিত্তের ব্যবহারের পরিচয় দিতে গিয়ে আলডুস হাক্সলী বলেছেন, "As they do not know how to travel upwards and as they are unwilling even if they do know, to fulfil the ethical psychological and physiological conditions of self-trancendence they turn naturally to the descending road, the road that leads down from personality to the darkness of sub-human emotionalism and panic animality."

শূদ্রযুগ ক্রমেই পৃথিবীকে একটা মহাপ্রলয়ের পানে টেনে নিয়ে যাবে।

ধ্বংসের পথে প্রধাবিত এই বিশ্বের গতি রুদ্ধ করে তাকে ফিরে যেতে হবে ব্রাহ্মণ্যযুগে (back to the age of ethics) এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে বিভ্রান্ত জনচিত্ত যে নৈতিক চেতনার অভাবে আজ শুধু প্রতিহিংসার কথাই ভাবছে, তাকে সাম্য অবস্থায় আনতে হবে ও তার মাঝে কল্যাণ ও মৈত্রীবোধের সঞ্চার করতে হবে। পৃথিবীতে আজ যাঁরা ব্রাহ্মণ বা শ্রেষ্ঠ, Savants যাঁরা বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রবলে মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ স্তরের, যাঁরা বুদ্ধিসত্তম, যাঁদের ভাবনা সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত নিঃস্বার্থ ও স্বাধীন (free from the corrupting influence of the vested interests as also from the vagaries of the collective ego). (পৃথিবীতে এখনও এইরূপ শুভবুদ্ধি ও শুদ্ধপ্রচার মনীষীর অভাব ঘটে নাই) তাঁরা যদি পৃথিবী পরিচালনার ভার নিজ হাতে তুলে নেন তবেই এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই সব মনীষীদের সমবেত চিন্তা একটা বিরাট ভবিষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিকল্পনা দিতে পারে ((formula for One-world Government) যাতে অর্থনৈতিক সাম্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার দ্বন্দ্বের চির-অবসান ঘটে।

এই আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে বাধা দেবেন তাঁরা, যাঁরা ক্ষমতার আসনে আসীন, দেশের ভাগ্য নিয়ে যাঁরা জুয়া খেলছেন—সেই সব ক্ষমতা ত্যাগে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রনেতারা ও তাঁদের সঙ্গে স্বার্থজড়িত দুর্নীতিপরায়ণ সঙ্গীর দল। এঁরা বহুবিধ কূট-কৌশল অবলম্বন করে আপ্রাণ বাধা দেবেন, যাতে এই নবোদ্ভাবিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়। অবিশ্যি এ-ও খুবই অসম্ভব নয় যে, জনগনের উদ্বেলিত ঘৃণা ও অসন্তোষ, তাদের লীলা সাঙ্গ করে অচিরেই আসর থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করবে। তবে ক্ষমতার ভারকেন্দ্র এই মনীষীদের দিকে অপসারিত হবে কি না এবং কি ভাবে তা সম্ভব হবে, এর উত্তর একমাত্র ভবিষ্যৎই দিতে সক্ষম।

বিশ্বের বিপন্মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিকল্প সমাধান হতে পারে এক যুগাবতার মহামানবের আবির্ভাবে, যাঁর অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় অন্ধ কাতর মূকপ্রাণী উন্মুখ হয়ে আছে। বিধাতার ইচ্ছা—এঁরই মাধ্যমে জগতে শান্তি পাঠাবেন। ঈশ্বর 'প্রেরিত এই বিরাট প্রতিভাবান মানুষ, যিনি এই বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তার ভূমিকায় অবতরণ করবেন, আমাদের এই হতমান, দরিদ্র, অন্তরৈশ্বর্যশালী প্রাচ্য মহাদেশেই জন্ম নেবেন তার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগাবতারদের (Messiah) মত! প্রাচী ও প্রতীচীর বহু মনীষী এই একই ভবিষ্যবাণী করে গেছেন।

এ সম্পর্কে কবিগুরুর অশীতিতম জন্মদিনের বাণী বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—

জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ—অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকা সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই···মহাপ্রলয়ের পারে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরমা দে

আমি চাই মা সংসারে সং সাজতে। আশা হরণ-পূরণের সংসারের সার আর কি আছে? আকাঙ্ক্ষাই তো বাড়ছে। এখানকার বিয়েতে কা'কেই বা আপন কোরব? সবই তো মরণশীল। তাই 'গেরুয়া বসনে অঙ্গ আবরি করঙ্গ করে ধরি' দেশে দেশে বেড়াব। এই ভাল। চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম যতীই ভাল। হোক সে কঠিন সাধন-ভজন, হোক তা নির্বিকল্প সমাধি। দরজায় দরজায় কৌপিন পরে সন্ন্যাস নিয়ে নরদেবতার করুণা যাচাও ভাল। এতে হৃদয় গলে, ভগবান গলে গিয়ে হৃদয়-আসনে এসে বসবেন। সংসারের মায়ায় জড়িয়ে অভিনয় করাতে কোন লাভ নেই। যুগে যুগে মহাপুরুষ সাধক, যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ঐ মনোভাব নিয়ে সংসারকে উপেক্ষা করে ব্রত নিয়েছেন ভগবান পাওয়ার জন্ত কঠিন সাধনার।

আত্মার উন্নতি হয়েছে তাঁদের। কিন্তু জগৎ-সংসারের মঙ্গল কি হল? সকলেই তো সংসারে থেকে ঐ রসে ডুবতে জানল না? কে জানাল তুমি অমৃতের পুত্র? এমনি করে চললে সুখ-দুঃখে গড়া সংসারে থেকেও অমৃতরসে হবে রসিকজন! জীবন হবে সহজ। প্রকৃতির নিত্য হওয়ার লীলাখেলায় তোমার প্রাণের অমৃতরসের হবে বিস্তার। তবু তাঁরাও পরমপুরুষ যাঁরা আত্মদর্শনের জন্তে অধ্যাত্মসাধনায় হলেন পাগল ও আত্মহারা। কিন্তু এঁদেরই মত অধ্যাত্মসাধনায় পাগল হয়ে এলেন এক নির্লিপ্ত, আত্মভোলা—আর সহজিয়া সন্ন্যাসী, যার সংসার ত্যাগ হল না সন্ন্যাসের কঠোরতাকে নিয়ে, কৌপিন পরে আর হাতে দণ্ডী ধরে পথে পথে বেড়াতেন। শেষে এসে বসলেন একটা মন্দিরে। দেখলেন, প্রণাম করছেন মানুষেরই এক মৃন্ময়ী দেবীকে—যিনি তারা মা। তিনিই বললেন, তখন আমাকে রসে বশে রাখিস মা! আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে। প্রকৃতি যদি নিত্য সহজভাবে হয়ে উঠতে পারে তো সংসারে থেকে মানুষ কেন হবে শক্ত। এ ভাব নিয়েই বললেন তিনি ঐ কথা। আবার জানালেন মাকে, রস যেন বিরস না হয়, সে রসও আবার বশে থাকে। রসের প্রতি মতি থাকার প্রার্থনা। মনে মনে গভীর বিশ্বাসের সুরও উঠেছে বেজে। তিনি চাইলেন, মানুষের আরাধ্যা এই দেবী হোক সকলের কাছে বিশ্বাসের মূর্ত্তি। তাই নিজে প্রার্থনা করে করে এই মূর্ত্তিকে সজীব করতে গিয়ে তাঁকে 'মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী রূপ দিয়ে' প্রথমে নিজের মনে বিশ্বাস করলেন মানবের এই কত দিনের মূক দেবীকে। দেখালেন বিশ্বাসে মনের মাঝে জড়ও পায় প্রাণ! ব্যস, পাগলের সাধন হল শেষ। এবার চেয়ে দেখলেন এই সংসারে জটিল হয়ে থাকা মানুষের চেহারাকে। তখন ভাবলেন, বাসনা তো মায়েরই বাসনা। মন্দ বলে বাসনাকে ত্যাগ করে কি হবে? তাই দেখলেন, মানুষের মনে যে বাসনা আছে তা উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বাঁধা। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথ নয় সোজা। তবু তাকে চলবে না ছাড়া। সহজভাবে, রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে যেমন সুন্দর করে হবে তুলতে, মনের কষ্টিপাথরে ফেলে দেখতে হবে সে খাঁটি সোনা না চকচকে পাথর শুধু। পাথর হলেই জটিল! এখানে চাই সংযম, যত্ন, ত্যাগ খাদকে ফেলে দেওয়ার জন্তে। তখনই তিনি মায়ের পাদপদ্মে দৃষ্টি রেখে নামলেন এক নতুন পথে। সংসারীদের মাঝে সাজলেন এক সহজ সংসারী। তাই আবার মায়ের কাছে জানালেন প্রার্থনা, ঐজন্তে তুলে দে মা লোকচক্ষুর সামনে আমার বন্ধন সংযম শৃঙ্খল আবার শাসন দণ্ড। চাই না আমি বাঁধভাঙা বন্যা, হুতাশনের রঙ্গ। চাইলেন আমাদের সামাজিকতা।

তখন যারা শাস্ত্র জানেন তারা সাধকের কথার অর্থ বুঝলেন না। বুঝলেন না সাধকের শ্যামা মায়ের পুজো—কালীসাধকের পুজো। কেবল মা মা বলে পাগল হচ্ছেন, নাচছেন আর কাঁদছেন। ফুল মায়ের চরণপদ্মে দিতে গিয়ে দিচ্ছেন নিজের মাথায়। তখন তারা শাস্ত্রবচন, পূজাপদ্ধতি আওড়ালেন। পাগল শুনলেন না। পাগল দেখছি শাস্ত্রপাঠ, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সবই দেবে ধ্বংস করে। যে দেবী ভবতারিণী হলেও চণ্ডীরূপিণী তিনিও রুষ্ট হবেন, রসাতলে যাবে সব। কি হবে তাহলে? তখন পাগল বললেন, চাই না আমি শাস্ত্রের কচকচি, চাই প্রাণের রস। অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিমানের হোক অবসান—এত বড় কথা সহজেই জোর গলায় বললেন যেন।

তখন যারা দেবীর রুদ্রমূর্ত্তিকে করেছিল ভয়, এই রকম জোরের কথা শুনে নিজেদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাও ভাবছিল, তখন আবার সাধক বলেছিলেন মাকে, আমি তোর হাত ধরব না, তুই আমার হাত ধর। তাহ'লে তো পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। যারা ভয় করেছিল, মনে তাদের 'অহং' ছিল, তারা শুনল এই সহজ কথা। প্রাণে পেল অভয়বাণীকে। চিরদিনের মূক-দেবীর কাছে এমন জোরের কথা বলেও কি না দেবীর মুখের ভাষায় অভয়বাণী পেয়েছেন সেই পাগলও। শুনল সকলে, পাগল হলেও ঐশ্বরিক ক্ষমতায় শক্তিশালী তখন তিনি। একথা মুখে মুখে রটে গেছে। কিন্তু তিনি ঈশ্বর হলে কি করে চলবে? আবার এও কি সম্ভব! এসব ধারণা কম লোকের মনে জেগে

দ। তবু যে দেখে সেই চেয়ে রয়, বিশ্বাসের উজ্জ্বলতা পাগলের ধ-চোখে ফুটে উঠেছে। তাতেই সকলেই হয় মুগ্ধ।

তবু শাস্ত্রজ্ঞ যারা তাদের যেন বিশ্বাস হ'ত্তে চাইল না। পণ্ডিত ায়া শাস্ত্রকথা তখন জানাতে চায়। একদিন তাদেরই একজনের গীতার ব্যাখ্যা শুনে হেসে বললেন, 'ও আর শুনতে হবে না। াগী ত্যাগ করলেই গীতা জানা হল।' তখন মুখে কেউ কিছু বললেও মনে মনে ভাবছে, নিরক্ষরটা বলে কি? একটা কথায় লে কিনা গীতার মূল কথাকে। আবার এ-কথাও বললেন, দি মুখ দিয়ে কারও না বেরোয়, আধো-আধো ভাষায় বললেই বে।' যারা নিরক্ষর, যারা এতদিন তাঁর নামও শোনেনি তারা ন যেন শিক্ষা পেল। মুগ্ধ হল।

মুগ্ধ তো হতেই হবে। নিজে নিরক্ষর হয়ে অত বড় কথা লছেন তিনি সকলের জন্যে। গীতা পড়া সহজ করে দিয়েছেন। বার তাঁর বিশ্বাসঘন শ্যামামায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছেন দুর্বল, অশিক্ষিত লোকের জন্যে নিজের জীবনে তাদেরই সামাজিকতা।

তাই যেদিন কালীমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, দিন শ্রীকৃষ্ণের একখানা পা গেল ভেঙে। সঙ্গে সঙ্গে রাণী সমণির ভাবনা হল কত। এল নানা বিধান। ঠিক হল, নব ত্তিরই হবে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু, সাধক আর পারলেন না থাকতে। তনি জোর বিশ্বাসে বললেন, আমি সেরে দেব। ব্যস যেমন বলা, তমন কাজ। একেবারে বেমালুম করে সারিয়ে দিলেন। বড় স্ত্রীও নাকি হার মেনে যায়! সকলেই দেখে অবাক! তবু ভাঙা পা তো থাকল, এ ভাবনা রাসমণির মনে বেশ কষ্টই দিল। াধক তখন বললেন, রাসমণির জামাইয়ের যদি একখানা পা ভেঙে ত তাহ'লে কি নতুন জামাই আনতেন? এমন কথা তো কেউ াবোনি? শুনে সকলে চুপ। রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে াধককে করলেন প্রণাম। মনে মনে মুক্তি হল বুঝলেন।

তা তো হবেই। তিনি তো নেমেছেন আমাদের সমাজে। ত বিচার আর তর্ক নিয়ে জটিল হয়ে চলেছি, নিজেদের াহজবোধকে ফেলেছি হারিয়ে। তিনি তাই দিলেন অতি সহজেই াপ্রত করে।

আবার এই বোধ দিয়ে যখনই মনে করি 'ব্রহ্ম অমুচ্ছিষ্ট' তখনই াহজেই যেন বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপকে। দূরে সরে যায় তখন যুগান্তের ব্যাখ্যা। যেমন ব্রহ্ম নিরাকার, বিশাল বিরাট, বাক্যাতীত বা অবর্ণনীয়। আমাদেরই নিত্য ব্যবহারিক কথায় কি সুন্দর ভাবে জানান হল ব্রহ্ম সকলের এঁটোর বাইরে। এ বিশ্বের যা কিছু, তিনি তাই।

আর এমন সহজ সমাধান দিয়েছেন বলেই সংসারীকে মুক্তিপথের কত কথা শুনিয়েছেন। সংসারে মুখে ফেরা কথা দিয়ে এমন করে বলেছেন যে শুনলে যেমন বুঝতে কিছু কষ্ট হয় তা, তেমনি বিশ্বাসও আসে বৈজ্ঞানিকের মতই।

তিনি বলেছেন, হয়ো না বাঁদরের বাচ্চা, হয়ো বেড়ালের বাচ্চা। সংসারে নিজের নিজের কর না, ছুট না কুকুরের বাচ্চার মত কুকুর-মার পিছন পিছন। বেড়াল যেমন তার মার কাছে নিজেকে সঁপে দেয় আর বেড়ালও তার বাচ্চাকে মুখে করে নিয়ে বেড়ায়, যাবেন। এ কথায় ভগবানে বিশ্বাস যেমন আসে তেমনি সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলা যায়। আবার বলেছেন, ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থেকো। কথাটা শুনতে হয়তো লাগে খাপছাড়া কিন্তু, সব তাতে থেকেও, কোন বন্ধন নেই কিছুতেই, এমন ভাবের কথা ঐ বাণীতেই তো রয়েছে। ভগবান ধর্মের নানা ছাঁচে যখন পড়ে গেছেন তখন সব বিচার আর তর্ক ভাসিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, যত মত তত পথ। ভগবানের কৃপার রূপান্তর নেই, শুধু থেকে যায় মতবাদ। সত্যই তাই। ইসলাম, খৃষ্ট হিন্দু যে ধর্মই হোক না কেন, বিশ্বাস হলেই তাঁর কৃপা সব ধার্মিকের কাছেই যাবে। তবে ধর্মমত আলাদা, তাই কৃপাও আসে এক একজনের কাছে ঘুরপথে।

শুধু চাই বিশ্বাস। এই জন্যেই তিনি বলেছেন, আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি আমি দেখাতে পারি। নিজে বিশ্বাসঘন বলেই তো বলছেন ঐ কথা। তাইতো কি সুন্দর, কি প্রাণবন্ত অথচ কত জোরের কথা। শুধু তাই নয়, নিজে রসে বসে আছেন বলেই সংসারীর কাছে পরম বন্ধুরূপে দেখালেন ভক্তির শিল্পের পথ বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়। বনে গিয়ে কৌপিন পরে নির্জনে থেকে সংসারকে 'বিশালাক্ষীর দ' বলে উড়িয়ে দিতে হবে না। বরঞ্চ, সকলের মধ্যে থেকেও সব কাজে মন দিয়েও সংসারে 'নষ্টা স্ত্রীর মত' গোপনে উপপতির দিকে মনটা রাখবার কথা দিলেন বলে। তাই তো বলতে ইচ্ছে হয়, তিনি নিজে দিলেন পরম যোগী হয়ে চিনির রসে ডুব। চিনি হল বশ, তিনি হলেন চিনির বশ। শুধু তাই নয়, আমাদেরও চাইলেন চিনিতে ডোবাতে। তাইতো নামে তাঁর এখনও পাই অমৃত। তাই তাঁর আবির্ভাবের দিনে এমন সহজ মানব-প্রেমিককে করি শত-কোটি প্রণাম। ইনি আমাদের চিরদিনের দরদী, কবি আর শিল্পী দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। যিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। জয় হোক'। আমরা তাঁর দেওয়া সহজবোধের রসে আর বশে থাকি যেন চিরদিন।

আত্মাহুতি

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

ফাগুনের সকাল। ভীষণ কুয়াসায় চারদিক প্রায় অন্ধকার। শীতও আজ খুব তীব্র। কোন এক মধ্যবিত্ত পল্লীর একটি ঘরে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। বয়স আন্দাজে আট নয় বৎসর হবে। মেয়েটির নাম মার্গারেট। মার্গারেটের মা একটি কলের দোকানে কাজ করেন। ভোরবেলায় যান আর সেই রাত নয়টায় আসেন। কাজে যাবার আগে মার্গারেটের জন্য কিছু ফল ও রুটি রেখে যান। মার্গারেট ঘুম থেকে উঠে খাবার খেয়ে গৃহস্থালীর কাজে মন দেয়। এই ভাবেই চলে তাদের মা-মেয়ের দিন। কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। একদিন মার্গারেটের মা বাড়ী ফিরলেন গায়ে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। জ্বরের আঁচে মুখখানি লাল ও থস্‌থস্ করছে। এই ভাবে চার পাঁচ দিন কেটে গেল কিন্তু জ্বরের কোন উপশম হবার লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে সংসারও প্রায় অচল। যাই হোক, মার্গারেট তার মায়ের নির্দেশ মত যে ক'টি টাকা কলের দোকানে পাওনা ছিল টাকা ক'টি নিয়ে এল। ডাক্তারও ডেকে

টাকার। তার অর্ধেক টাকাও মার্গারেটের কাছে নেই। অথচ টাকা জোগাড় করতে না পারলে তার মাকে হয়ত বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে হবে। না, সে আর ভাবতে পারে না। অন্যমনা হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় ও এক সময় নিজের অজান্তেই পথ চলতে শুরু করে। কিছুদূর হাঁটবার পর হঠাৎ তার নজর পড়ে পথচারী এক ভদ্রলোকের পকেটের দিকে। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনিব্যাগ কোটের পকেট থেকে উঁকি মারছে। টাকার চিন্তা মার্গারেটকে এতই অস্থির করে তুলেছিল যে সে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হয়ে মনিব্যাগটি তুলে নিয়ে বাড়ীমুখো ছুটতে লাগল। পিছনে জনতার সোরগোল, কিন্তু মার্গারেট সব উপেক্ষা করে ব্যাগটি বুকে চেপে ধরে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় একটা গাড়ীর ধাক্কায় ছিটকে পড়ল। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল তখন মার্গারেট দেখল, সে একটি অচেনা পরিবেশে শুয়ে রয়েছে। গুরুতর জখমের জন্য হাত-পা বেডের সঙ্গে বাঁধা। মাথারও পট্টি বাঁধা। ক্রমে তার মার শীর্ণ যন্ত্রণাকাতর মুখখানি মনে পড়ল, সাথে সাথে টাকার কথাও। হঠাৎ সে প্রবল একটা ঝাঁকুনী দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করে কি একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু হায়! তার শেষ কথাটিও সে পৃথিবীকে জানিয়ে যেতে পারল না! অব্যক্ত গোঙানির সঙ্গে সে লুটিয়ে পড়ল। যে ঘুম আর কোন দিনই ভাঙল না।'

বিষণ্ণ বসন্ত

নমিতা রায়

সকালটা ভারী সুন্দর—আকাশে বাতাসে বসন্তের দুরন্ত মাতামাতি'কিন্তু এমন সুন্দর সকালও আনন্দ দিতে পারে না লীনাকে। কেমন যেন একটা বোবা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে; কাল রাত্তিরের স্মৃতিটা বুকের কাছে খচখচ করে বিঁধতে থাকে। তবু লীনা নিজের বিষণ্ণ ভাবটা ঢাকতে চেষ্টা করে, কারণ ও জানে, এবার একের পর এক জেরায় পড়তে হবে। প্রতিদিনের রুটিন ওর মুখস্থ। এক্ষুণি আসবে নার্স তার সকালের ডিউটি দিতে, তারপরে মা পুজোর শেষে ঠাকুরের ফুল নিয়ে, তারপর আসবেন বাবা বাইরে বের হবার আগে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু লীনার মনে হয়, আজ যদি কেউ না আসে তা হলে খুব ভাল হয়, কেউ আসবার আগেই কিন্তু ফোনটা বেজে উঠলো। বিছানার পাশে টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিতে কষ্ট হয় না, আধ-বসা অবস্থায় কানে তুলে ধরে ওটা।

ওদিক থেকে প্রশ্ন আসে, কে লীনা?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার বলতো, কাল রাত্তির থেকে অপেক্ষা করছি কিন্তু একটা খবর দিলে না কেন? কালকের উৎসব কেমন হলো?

বিচ্ছিরি, একদম বাজে।

বাজে কেন? আশ্চর্য্য হয়ে বললো তীর্থঙ্কর।

কেন ভাল হবে, কেন আমার ভালো লাগবে বলতে পার? ওরা এলো, হৈ-চৈ করলো, তারপর ওদের হাসি ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, ওরা দমকা হাওয়ার মতো এলো আবার মিলিয়ে গেল কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি ওদের মতো হাসতে পারি প্রাণ খুলে, না ঘুরে বেড়াতে পারি? শেষের দিকে লীনার গলা ধরে এলো আর কথা বলতে পারলো না।

লীনাকে আবেগের সুরে ডাকলো তীর্থঙ্কর, আমি কামনা করছি, আগামী বছর তোমার জন্মদিন সার্থক হয়ে উঠবে, দুঃখ করো না।

তীব্র কণ্ঠে লীনা বললো, না হবে না, আমি আগামী বছর আর উৎসব করতে দেব না। আমি আর ভালো হবো না।

শান্ত কণ্ঠে তীর্থঙ্কর বললো, তুমি বড় অধৈর্য্য হয়ে উঠেছ, মনে বিশ্বাস রাখো, নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমি আর পারছি না তীর্থঙ্কর, বিশ্বাস কর, এই ক'বছরে শুয়ে থেকে থেকে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি।

কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি লীনা, একদিন তুমি আমি দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবো।

তোমার অসুখ সামান্য কয়েক মাসের কিন্তু আমার অসুখ যে আরো অনেক দীর্ঘ, হতাশ কণ্ঠে উত্তর দিলো লীনা।

বুঝি লীনা, তবু আমার অনুরোধ তুমি বিশ্বাস হারিও না, আজ তোমার মন বিক্ষিপ্ত, তাই আমার কথা হয় তো তোমার ভাল লাগছে না তবু—

না না, তোমার কথা আমার অশান্ত মনে অনেকখানি শান্তি আনে, তোমার কথা বুঝি, তোমার কথা মেনে চলতে চেষ্টা করি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোথায় কি যে হয়ে যায় সব সূত্র হারিয়ে ফেলি। আমার চিন্তা ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে যায়। কালকের উৎসবে আমি তো সুখীই হতে চেয়েছিলাম, আমি তো হেসে উঠলাম, কিন্তু যখন ওরা সকলে চলে গেল তখন একলা ঘরে আমার চোখের সামনে আমার অন্ধকার ভবিষ্যৎ এতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে নিমেষে আমার সব আনন্দ সব হাসি মিলিয়ে গেল একটা অব্যক্ত বোবা ব্যথায়—আমি ছটফট করতে লাগলাম, তারপর একটা দুর্নিবার কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

এবার ওরা উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় চেয়ে ফোন ছেড়ে দেয়।

উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশ পানে চেয়ে থাকে লীনা, অতীতের অনেক কথাই আজ মনে পড়ছে। দুরন্ত আর চঞ্চল মেয়ে লীনা কিন্তু কলেজে ওর পরিচয় ছিলো ভাল গান আর আবৃত্তির জন্যে। ধনী ব্যারিষ্টার পিতার একমাত্র মেয়ে ও, লীনার বাবা সকল দিক থেকে মেয়েকে কৃতী করে তোলবার জন্যে চেষ্টা করেছেন, আর লীনাও বাবার প্রচেষ্টার অমর্য্যাদা করেনি। সকল দিক থেকে সার্থকই হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় কি যে হয়ে গেল, হঠাৎ লীনার জীবনে এলো এক বিপর্য্যয়—একটা অপারেশন ফেলিওর হওয়ায় দিনে দিনে লীনার দু পায়ে প্যারালিসিস হয়ে যায়। প্রথমে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে ছিলো কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে ওকে বাড়িতে এনে রাখা হয় এবং নার্স ও ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়। লীনা জানে, তার বাবা মা চেষ্টার ত্রুটি করছেন না, তাঁদের সম্পর্কে ওর কোন অভিযোগই নেই কিন্তু ডাক্তারে কি খুব আশ্বাস দেয়? বোধ হয় দেয় না। লীনার তো তাই ধারণা হবে, বাবা মাকে মুখ ফুটে কিছু বলে না, বললে ওরা দুঃখ পাবেন, তাঁরা তো চেষ্টা করেন কি করলে ও সুখী হয়, যেমন কালকের উৎসবটা। কিন্তু খুশী কি ও হতে পেরেছে? বরং অনেক দিন পরে ওর মন ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আর তীর্থঙ্কর তার অভিশপ্ত জীবনে পরম আশ্বাস, তার ভালোবাসা লীনার জীবনে এক তীব্র আনন্দানুভূতি। খেলোয়াড় তীর্থঙ্কর মিত্রের সঙ্গে লীনার অন্তরের যোগাযোগ এক আশ্চর্য্য ভাবে রচিত হয়েছে দু' জনের ভাগ্য, এক কেন্দ্রে এসে মিলেছে আর সেইখানেই তাদের ভালোবাসার যাত্রাপথের আরম্ভ।

মাস কয়েক আগে সকালবেলায় কাগজ পড়তে গিয়ে লীনার চোখ প্রথম পাতার আটকে গিয়েছিলো, এ কি অদ্ভুত খবর! খাওলো আজও মনে আছে তার—বিখ্যাত খেলোয়াড় তীর্থঙ্কর র পায়ে আঘাত লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার আশঙ্কা করছেন তাঁর পায়ে প্যারালিসিস হয়ে যেতে পারে। লীনার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তীর্থঙ্কর মিত্রের ছবিও কাগজে দেখেছিলো কিন্তু তখন ও অত খেয়াল করেনি কিন্তু এখন যেন সব স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার ছবি তার প্রতিটি খেলার খুঁটিনাটি ঘটনা। কাগজেই খবর পেল তীর্থঙ্কর বাড়িতে ফিরে এসেছে, পায়ের অবস্থা পূর্বের মতো।

একদিন কি খেয়াল হলো লীনার—ফোন করলো তীর্থঙ্করের বাড়িতে, ফোনটা ধরেছিলো তীর্থঙ্করই। এই প্রথম আলাপের সূত্রপাত, তারপর দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছে।

লীনা আবার চোখ তুললো আকাশের দিকে, কি করুণ পৃথিবীর ছবি! আজকের বসন্ত তার কাছে শুধু যৌবনভরা, বনে বনে আগুন জ্বালার বাণী বয়ে আনে না।

আরো কেটে গেছে অনেক দিন—সেদিন আকাশে চলেছে মেঘে মেঘে বর্ষার আয়োজন, লীনার চুলে দুরন্ত বাতাসের লুকোচুরি খেলা লীনার খুব ভাল লাগছিলো, তারপর আরম্ভ হলো বর্ষণ। কিন্তু বর্ষার এই ঘনঘোর মাতামাতির মধ্যে একলা থাকতে ইচ্ছে করে না, কাছে পেতে ইচ্ছে করে কাউকে—শ্রীমতীও তো সেই ইচ্ছেই ব্যক্ত করেছিলেন—"এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্যমন্দির মোর।"

মনে পড়ছিলো তীর্থঙ্করের কথা—একটা ফোন করলে কেমন হয়? অনেক ভেবে শেষ পর্য্যন্ত ফোনই করলো লীনা। তীর্থঙ্করকে ও বললো, কেমন সুন্দর বর্ষা নেমেছে, এখন কি মনে হচ্ছে বলতো?

তীর্থঙ্কর উত্তর দিলো, নিজেকে রামগিরি গুহার আবদ্ধ বিরহী যক্ষ বলে মনে হচ্ছে আর তোমাকে অলকাপুরীর অধিবাসিনী যক্ষপ্রিয়া, তোমার আবাসস্থানই তোমার কাছে চিরসৌন্দর্য্যের প্রতীক আমার ইউটোপিয়া, সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

হাসলো লীনা তীর্থঙ্করের উচ্ছ্বাস প্রকাশে—বসন্ত ঠিক বলেছ তবে বিষণ্ণ। তারপর কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো আচ্ছা, এমন দিনে কি করতে ইচ্ছে করে বলতো?

'এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘন ঘোর বরিষায়।' বর্ষার এই শ্যাম সমারোহে শিলং পাহাড়ে বসে লাবণ্যের ইচ্ছে করেছিলো অমিতের হাত ধরে বলে মিতা, জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার। লীনা—উঁ।

একটা কবিতা শোনাবে?

কি কবিতা শুনবে বলো?

তোমার যা ভাল লাগে।

লীনা শোনাল ভ্রষ্ট লগ্ন। যখন তার কবিতা শেষ হলো তখন মনে হলো আকাশের কোণে কোণে সঞ্চিত অনেক অশ্রুকণা ঝরে ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো, তারপর প্রথম কথা বললো তীর্থঙ্কর—এমন কবিতা কেন শোনালে লীনা?

লীনা হাসলো, হাসিটা বড় করুণ কিন্তু তীর্থঙ্কর দেখতে পেলো না। আমার লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে গেছে তীর্থঙ্কর।

কিন্তু আজ আমি তোমাকে খুশী দেখবো আশা করেছিলাম।

আমি তো খুশী হতেই চাই, তাই তো তোমায় বার বার ডাকি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমায় সুখ দেয় না।

সেদিনের কথা এইখানেই শেষ হয়।

ক'দিন বাদে লীনা সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখলো ও আর তীর্থঙ্কর বেড়াতে গেছে অনেক দূরে উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে, সেখানে উচ্ছ্বসিত লীনা কবিতা শোনাল সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে—'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' আর তীর্থঙ্কর জীবনে প্রথম কবিতা শোনাল লীনাকে—'শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান গাবে আজি প্রাণ' আজ ওরা দুজন যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। এই স্বপ্নের কথা লীনা জানালো তীর্থঙ্করকে কিন্তু তারপরেই লীনার কণ্ঠে সেই হতাশা ফুটে উঠলো ও বললো, জান তীর্থঙ্কর, তারপরে তুমি হারিয়ে গেলে অন্ধকারে আর আমি একা তোমায় খুঁজে ফিরতে লাগলাম, আমি জানি একদিন তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তখন আমার কাছ থেকে তুমি দূরে সরে যাবে।

বৃথা ভয় পেও না লীনা, আশ্বাস দিলো তীর্থঙ্কর—জীবনে এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা তোমার আমার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করতে পারে।

কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন ছেড়ে দিলো লীনা।

ক'দিন থেকেই লীনা একটা কথা চিন্তা করছে, কাগজে দেখেছে তীর্থঙ্কর মিত্রের অবস্থা উন্নতির পথে কিন্তু লীনা জানে, ও আর ভালো হবে না। আচ্ছা, তীর্থঙ্কর সুস্থ হয়ে গিয়ে যদি লীনাকে ভুলে যেতে চায় তখন ও কি করবে, সহ্য করতে পারবে? কিন্তু উপায় কি? তীর্থঙ্করই বা কি করবে লীনাকে নিয়ে? লীনা আর পারে না ভাবতে, সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, অসংখ্য চিন্তার জট ওর মাথার ভেতর দাপাদাপি করতে থাকে। দু' হাতে মাথা চেপে মড়ার মতো পড়ে থাকে বিছানায়। নার্স আসে, ডাক্তার আসে কিন্তু কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারে চুপচাপ বিছানায় পড়েছিল লীনা। ডাক্তার এসে ওর অনুমতি নিয়ে আলো জ্বালায়, তারপরে প্রশ্ন করে, আচ্ছা লীনা দেবি, আপনি কি কোন রকম অসুস্থতাবোধ করছেন?

নিস্পৃহ গলায় লীনা উত্তর দেয়, না।

তবে মানসিক কিছু?

না।

তা-ও না, তবে?

ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে লীনা হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি তো তীর্থঙ্কর মিত্রের কেসটা দেখছেন। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

তিনি অনেকখানি Improve করেছেন। তারপরে সামলে নিয়ে বলেন, আপনি অযথা হতাশ হবেন না।

হাসলো লীনা। বৃথা আশ্বাস দেবেন না, I know Dr. it is now out of control.

মাথা নীচু করেন ডাক্তার।

লীনা ডাকে, ডাক্তারবাবু!

বলুন।

আপনি আমাকে একটু বিষ দিতে পারেন?

ডাক্তার চমকে ওঠে, এ কি বলছেন আপনি?

আপনার কোন ভয় নেই, কেউ জানতেও পারবে না, শুধু আমার এ জীবনের শেষ হয়ে যাবে।

দেখুন লীনা দেবি, আপনি বড় অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন কিন্তু আপনি আপনার বাবা-মার কথা চিন্তা করুন—তীর্থঙ্কর বাবুর—

চুপ করুন, তীব্রকণ্ঠে বাধা দেয় ও। জানি আপনার সাহস নেই। আরো দু'দিন পরে লীনা ফোন করলো তীর্থঙ্করকে।

তীর্থঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে বললো কি ব্যাপার লীনা, আজ ক'দিন তোমায় ফোনে ডেকে ডেকে হয়রাণ হয়ে গেলাম। শরীর ভাল আছে তো?

আছে।

তবে?

একটা পরিকল্পনা করছিলাম।

কি এমন পরিকল্পনা, যার জন্যে তিন দিন সময় লেগে গেল?

পরশু আমার জন্মদিন মনে আছে? এবার কিছু নতুনত্ব করতে চাই।

যেমন—

অনেক দিন থেকে তুমি আমার ফটো চাইছো, এবার আমি আমার ফটো তোমায় দেব আর তুমি, একটু থামলো লীনা।

আর আমি কি?

তুমি দেবে ফুল, শুধু সাদা ফুল।

তার পরে ক'টা দিন কেটে গেছে, তীর্থঙ্কর অধীর প্রতীক্ষায় ছটফট করছে। কী হলো লীনার, ওর কথামতো ফুল পাঠিয়েছিলো কিন্তু লীনা কথা রাখেনি, ফটো দেয়নি।

ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই তীর্থঙ্কর প্রশ্ন করলো, আজ ক'দিন আসেননি কেন?

একটা দুর্ঘটনায় বিব্রত ছিলাম।

দুর্ঘটনা!

হ্যাঁ, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, লীনা বোস আত্মহত্যা করেছেন। ডাক্তারের কণ্ঠে বেদনা।

কি বললেন! লীনা মারা গেছে? প্রায় চীৎকার করে ওঠে ও, তারপর আপন মনে বলে, না না, তা হতে পারে না। আমি ওকে

যেতে দেব না, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়। ওর মা বাধা দিতে গেলে, ডাক্তার বারণ করেন। প্রচণ্ড উত্তেজনায় নীচে নেমে আসে তীর্থঙ্কর। কিন্তু তার পরেই কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তীর্থঙ্কর। ওর মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন। কোথায় যাবি খোকা, ও যে আজ দুদিন চলে গেছে।

আমায় বলনি কেন মা?

এ দুঃখ আমার রাখবার জায়গা নেই রে, মেয়েটা চলে গেল কিন্তু যাবার আগে কত বড় দান করে গেল ও জানতেও পারলো না, আমি তোকে ফিরে পেলাম কিন্তু কান্নায় মার গলা বুজে এলো।

মা আমার পা বড় কাঁপছে, আমি আর পারছি না দাঁড়াতে।

দোহাই খোকা, ধৈর্য্য ধর, ভেঙে পড়িস না, আতঙ্কিত গলায় বলেন তিনি।

এমন সময় পেছন থেকে ডাকে ডাক্তার।

তীর্থঙ্কর বাবু, এগুলো লীনা দেবী আপনাকে দিয়ে গেছেন। ফটোটা তুলে ধরে চোখের ওপর তীর্থঙ্কর। কি সুন্দর দুষ্টু মীভরা হাসি, তারপরেই চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে।

তার লীনার প্রথম এবং শেষ চিঠি—প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে যেন লীনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়।

তীর্থঙ্কর, পারলাম না, হেরে গেলাম জীবনের কাছে। আমার জন্যে দুঃখ করো না, আজ হয়তো আমার বিরহ তোমার কাছে অসহ্য মনে হবে কিন্তু এছাড়া আর উপায় ছিলো না। আমি জানি, আমার থেমে থাকা গতিহীন জীবন তোমার জীবনে শুধু বিড়ম্বনাই বাড়াতো, তার চেয়ে এই ভালো হলো। আমাদের ভালবাসার স্মৃতি অথবা বিস্মৃতি মধুর হয়ে থাক চিরকাল তোমার কাছে। আমার মৃত্যু আত্মহত্যা হলেও মহান্। কারণ এতে আমার প্রেম বাঁচবে কিন্তু দিনে দিনে তিলে তিলে যে মৃত্যু আসতো তাকে তোমরা স্বাভাবিক বললেও সেই হতো আমার অপমৃত্যু আর প্রেমও পেতো না তার মূল্য।

চিঠি পড়া শেষ করে তীর্থঙ্কর আকাশের দিকে চাইলো। চারিদিকে কি বিরাট শূন্যতা! পৃথিবীতে আবার এসেছে বসন্ত, কিন্তু কি বিষণ্ণ তার রূপ!

কাছে থাকা

কুমারী মধুছন্দা দাশগুপ্তা

এত কাছে আছ তবু দূরে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক
আকাশের ওই দু'টি তারা কত কাছে জলে সারা রাত।
তবু ওরা একজন অপরের পরশের লাগি হয় উন্মাদ,
মনের ভেতরে আছ তাই চোখে না থাকাই স্বাভাবিক।
গোলাপের কুঁড়ি দু'টি কত কাছে কাছে ফুটে রয়েছে,
তবু ছোঁওয়া পেয়েছে কি? ভ্রমরের পথ চেয়ে রয়েছে।
অনেক কাছেই আছ তাই দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক,
পাহাড়ের বুক থেকে ঝাঁপ দিয়ে চলে যাওয়া নদীটাও
পাহাড়েরই কাছে আছে, তবু দেখা নাহি হয় দু'জনায়
তুমিও নাই বা এলে আমার অনেক কাছে,

প্রতিশ্রুতি

শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ

প্রসন্ন প্রত্যূষের প্রতিশ্রুতি
সোনালী সূর্য্যের রশ্মিরাগে
বসন্ত বাতাসের শিহরণে,
আকাশের অনন্ত নীলিমায়
মঞ্জরিত সহকার-সৌগন্ধে,
পুষ্পিত নিকুঞ্জের লাবণ্য-বিলাসে
অসিত প্রাণের স্পন্দনে,
অযুত মানবের মৌন মিছিলে।

এ ধরণী কী বন্ধ্যা?
অভেদ দিন-রাত্রি নির্বিশেষ আলো-আঁধার,
হেথা শুধু কামনার সমাধি, চেতনার অবলুপ্তি,
পদে পদে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় সংঘাত আর।
কোথা পুষ্পাসব, ফেনিল যৌবন সুরাসার?
নিখিলের বক্ষে শুনি বীণার ঝঙ্কার,
সুরে সুরে গানে গানে অপূর্ব ঐক্যতান।
রূপাতীত আনন্দের অশ্রুঘন চারু নিবেদন।

সুদূর দিগন্তে জাগে ঐ প্রাণ,
মৃত্যু নাই যৌবন-মন্দ্রিত কলতান।
নিত্য নূতন জনম অভ্যুদয়,
আলোয় আলোয় জ্যোতির্ময়।

প্রথম বৃষ্টি

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত

আমার এই পুঁথির রাজ্যে
নতুন বৃষ্টির সৌজন্যে
সোঁদা মাটির সুবাস আসছে ভেসে
পুঁথির গন্ধ ছাপিয়ে
বৃষ্টি গেল থেমে
কিন্তু সোঁদা গন্ধ রইল মনে
ধূপের রেশটুকুর মত।

সবুজ ঘাসের রঙে
এই বৃষ্টির বিন্দুর মত
আমিও যাব মিশে মাটিতে
তবুও সেদিন আমার ভাললাগাটুকু
পুরোনো গানের কলির মত
হঠাৎ আসবে কাতর মনে
এই সোঁদামাটির
গন্ধের সঙ্গে
এই পুঁথির দেশের—

চিত্রময়ী

রত্না সেনগুপ্ত

আজ আবার এক বছর পরে,
এসে বসলাম সেই জানালার ধারে।
আজকে কিন্তু পরিনি বাসন্তী রঙের শাড়ী
দিইনি চুল এলো করে।
সে দিনের মতো শুধু আজ
হাতে রয়েছে সঞ্চয়িতা—
খুলে ছিলাম ক্যামেলিয়া কবিতা
একটা বর্ণও পড়িনি কিন্তু,
শুধু বইটা খুলে রেখেছিলাম,
আর আকাশের অনেক দূরে মনটাকে উড়িয়ে দিলাম।

—ভাবলাম সেদিনের কথা,
আজকের মত সেদিনও ছিল গোধূলির নীরবতা।
হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করে তুমি এলে,
তুমি আমার মুখের পানে চাইলে,
তারপর একটু হেসে ভেঙে দিলে আমার খোঁপা
বললে, দুষ্টু মেয়ে, এখন থেকে ডাকবো
তোমায় বন্যা,
এলো চুলে, বাসন্তী রঙের শাড়ীতে তুমি যে অনন্যা।

চাল-ডাল-নুনের কবিতা

সোনালী দত্ত

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ভিক্ষুক-দম্পতি গাছটার ছায়ে বসে লিখছে,
মৃত্যুর লক্ষ বেড়াজাল ছিঁড়ে জীবনের সুর সাধা শিখছে।
স্বর্গের মদিরামত্ত চিত্তে স্বপ্নের মায়া-নীড় বাঁধছে ;
সারাদিনে সঞ্চিত অশ্রু-সিক্ত ভিক্ষার চালগুলো রাঁধছে।
মৃত্যুঞ্জয়ী সুরে জীবনের মহাগান গাইছে।
দূর নীল-সাগরে স্বপ্নের পরীরা বাইছে ;
কল্প-মানসের ছন্দিত তরণী।
মঞ্জুল মেখলা মানুষের ধরণী
দেখা যায় ভিখারীর চুল্লির বিন্দু আগুনে,
সৌরভ সাড়া দেয় মধু-ঝরা হৃদয়ের ফাগুনে।
চলে চঞ্চল লাস্যে তরণী ভেসে থর থর ঘিরে বলা তাদের দেশে
পণ্য মর্ত্যের ধূলি।
ভিখারী-মিথুনের স্বপ্নে ছুলি,
শুনল মর্ত্য অমরণ মন্ত্র শিখছে।
চুল্লির আলোকেতে ভিক্ষুক-দম্পতি লিখছে—
চাল-ডাল-নুনের কবিতা
তরণীর বাণীর ছবি তা।
চকিত চাউনিতে ভিক্ষুক-প্রেয়সী হাসছে,
দূর নীল সাগরে আশা তার ভাসছে ;
পাল হাল গুণের ছবি তা।
চাল-ডাল-নুনের কবিতা।

নয়ন

রাণু রায়

দু'টি নয়ন নিয়ে আমি এলাম পৃথিবীতে
ধীরে ধীরে বড় হলাম মায়ের কোলেতে।
বুঝতে এখন পারছি আমি নয়ন বলে কারে
সকল জীবের মনের ভাব নয়নে ওঠে ভরে।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নয়ন আছে হায়
খুঁজে খুঁজে মনের মত নয়ন মেলা দায়।
এক নয়নে দেখি যে হায় হিংস্র অবতার
আর নয়নে দেখি যে গো সাধু ব্যবহার।
কেমন করে বুঝবো বলো অন্তর সবার
যুধিষ্ঠির কি বুঝেছিলেন দ্রৌপদীর আচার ?
কৃষ্ণ জেরা করে দেখান আম্রফলের ব্যাপার।
নয়ন দিয়েই পৃথিবীকে দেখতে শিখলাম
নয়ন হতেই সকল জীবে চিনতে শিখলাম।

খালপার হতে গ্রামের সীমানা

মঞ্জুলিকা দাশ

তুমি যদি কোন এক বিকেলবেলায় শহরের বাসে চড়ে বসো,
দেখবে,—দেখবে তুমি, শহর ফুরোলে পথে গ্রাম ফুরোবে না।
মস্ত আকাশ-ছোঁওয়া দিগন্তের দেশে মাঠ, অরণ্য সবুজ,
খাল, বিল, নদী, দীঘি, দীঘির সোপান বেয়ে কত শত কালো
কালি-দীঘির সোপান—
অভিমানী মেয়ের মতন এলোমেলো ঝোপঝাড় বড়ই অবুঝ।
তুমি যদি কোন দিন দুপুরবেলায় শহরের বাসে চড়ে বসো,
একটুকু রোসো,—শহর ফুরোলে গ্রামে পথ ফুরোবে না,—
দেখবে নিঃঝুম মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদ,—সবুজ ধানের গান,
মাটিতে আকাশ ছোঁয়া মুক্তির নব অভিধান!

তুমি যদি কোন দিন সন্ধ্যেবেলা শহরের বাসে চড়ে বসো,
গভীর রাত্রির বুকে মুখ ঢেকে চুপি চুপি চোরের মতন
গ্রামের কুটিরে এলে, শহরের কোলাহলে রাত্রিচর মন
নির্ঘাৎ বিষণ্ণ হবে,—
কী নীরব, অসহ্য শান্ত পাড়াপ্রতিবেশ,—
ছবিতে ভাসবে শুধু হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া হারানো স্বদেশ।

তুমি যদি কোন দিন দুপুরে, বিকেলে শহরের বাসে চড়ে বসো,
ইটিণ্ডাঘাটের দিকে যাও চলে কিম্বা হাসনাবাদ,
চলন্ত বাসের থেকে অফুরনো পথে শুধু ঝরাবে অসহ্য—
এক শ্রান্ত অবসাদ
যত পথ চলো এঁকেবেঁকে, ফুরোলে পথে গ্রাম ফুরোবে না,
সমুদ্রের জল তবু হাতড়িয়ে পাওয়া যায়,—শুধু এ—
পথের দিশা পাওয়া বড় দায়—
[illegible]

বিবাহ-সাধনা

৺শচীন্দ্র মজুমদার
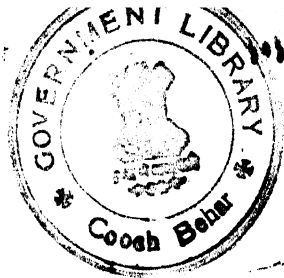
"সেই গোপন রাগের
রঙ যেনো মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে।"

—রবীন্দ্রনাথ

মুখবন্ধ

প্রাচীন কবি কমলানন্দ গুপ্তের গানে আছে—

"দিলেন দারা পুত্র
দিলেন সেই সে দয়াময়
ভালবাসার শিখবি বলে বর্ণপরিচয়।
(তুই কি) বর্ণমালা শেষ না করে
ডিঙিয়ে যাবি ভ্রান্ত রে॥"

বিবাহিত জীবন সেই ভালবাসার বর্ণপরিচয় শেখবার একমাত্র ক্ষেত্র। কিন্তু তার স্বরূপটি জানবার যে প্রয়োজন আছে, আধুনিক কালের বিবাহিতেরা তা অনুভব করেন বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি বিবাহের স্বরূপ ও তার পূর্ণ অভিব্যক্তির কথাটি বলতে চেয়েছি।

বিবাহ সম্বন্ধে পড়বার মতো পাশ্চাত্ত্য সব বই পড়ে আমার অসংখ্য বার মনে হয়েছে যে, সে সকল চিন্তাকে সার্বত্রিক বলে ধরে নেওয়া খুব বড় একটা ভ্রান্তি। বাঙালীর বিবাহ সাধনার সঙ্গে তাদের একটুও সুরসঙ্গতি নেই। আমাদের বিবাহ সাধনা ঐতিহ্যে সংস্কারে আদর্শে ও অভিব্যক্তিতে একান্ত বিশিষ্ট ও বিচিত্র।

আমাদের দেশে একটি প্রকৃষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ব থাকলেও ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমরা সেটা পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্ব গ্রহণ করেছি। তার ফলে আমরা মনে করি যে মানুষ সম্পূর্ণ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষার ও অন্য কিছু উপায়ের দ্বারা তার সামান্য একটু মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা গেলেও জীবনে তার আর কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের মনস্তত্ত্বের মতে মানুষ অসম্পূর্ণ হয়েই জন্মায়। নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য প্রকৃতি তাকে কিছু দূর পর্যন্ত নির্মাণ করে ত্যাগ করে। তার সকল শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং আত্মসাধনার দ্বারা সে সেই নিহিত শক্তিগুলিকে ফুটিয়ে তুলে নিজের অপরিমেয় উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, এই আত্মসাধনার একটি বহু-পরীক্ষিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আমাদের দেশে অক্ষয় হয়ে আছে। যদিও ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানীরা আজ নিজেদের ভুলটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন, তবু সে ভুলের দারুণ প্রভাব ইওরোপের মতো আমাদের দেশের ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই গভীর হয়ে আছে।

পাশ্চাত্ত্য যৌনবিজ্ঞানীদের বিপুল প্রচারের ফলে আমরাও এখন বিশ্বাস করি যে সকল দেশের ও জাতির নারীপ্রকৃতি হুবহু এক। তার ফলে আমাদের বিবাহিত জীবনে নানা বিদেশী বিপর্যয় জ্ঞানের গভীর প্রভাব এসে পড়েছে। তার ফল যে ভালো হয় নি এবং ভালো হবারও নয়, সে কথা বুঝতে বেশী ভাববার দরকার হয় না। চীনা, বাঙালী ও ইংরেজ মেয়ে মূর্তিতে অত্যন্ত ভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে যে এক হয়, এমন কথা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তাদের দৈহিক গঠনে, শারীরক্রিয়ায় এবং বিশেষ করে মানসিক প্রকাশে গভীর বিভিন্নতা বর্তমান। বিগত শতাব্দীর বিখ্যাত পর্যটক ও নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের আদিগুরু মেরী উলস্টোন্‌ক্রাফট, তাঁর পরে ম্যাজিনোল্ডি প্রভৃতি নারীপ্রকৃতির অত্যন্ত বিভিন্নতার কথা বলে গেলেও, অধিকাংশ ইওরোপীয় যৌনবিজ্ঞানীরা তা গ্রাহ্য করেন নি। বর্তমান যন্ত্রযুগের প্রয়োজনে মানুষকে এক-নিরিখের করে তোলার একটা গভীর চেষ্টা আছে। তাই এই বিজ্ঞানীরা একটি মাপকাঠি দিয়েই বিশ্বের নারীপ্রকৃতিকে মাপতে চেয়েছেন। এঁদের প্রচারের ফলটা অন্তত: আমাদের পক্ষে শুভ হয় নি। কোনো ভ্রান্ত ধারণার কখনো শুভফল হয় না। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অসংখ্য পাশ্চাত্ত্য সস্তা অসার বই এবং তাদের সস্তা বাংলা নকল বাঙালীর অপরিমেয় ক্ষতি করেছে। আমরা নিজেদের বিশিষ্ট বিবাহ সাধনা ত্যাগ করে ইওরোপীয় যে ধরণটা সার্বত্রিক বলে নিতে চেয়েছি তা অপকৃষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের নারীপ্রকৃতির সহিত কোনই সামঞ্জস্য রক্ষা করে না।

আমার জীবনে আমি তিন ধরণের বাঙালী-দম্পতি দেখেছি। (১) মিশ্রিত-দম্পতি অর্থাৎ বাঙালী-স্বামীর ইংরেজ বা অন্য ইওরোপীয় স্ত্রী। (২) বাঙালী সাহেব ও বাঙালী-মেমসাহেব-দম্পতি। (৩) খাঁটি সাদামাটা বাঙালী-দম্পতি।

আমার একটি পরমাত্মীয় ইংরেজ নারী বিয়ে করে আজ চল্লিশ বৎসরেরও ওপর ইংলণ্ডে বাস করছেন। সেখানেই তাঁর নিজের বাড়ী। আমার মা'র প্রশ্নে তিনি একদা বলেছিলেন, 'দেখো দিদি, ওদেশে বাস করি বলে এক রকমে চলে যায়, না হলে তেলে-জলে মিশ খায় না।' কথাটা গভীর অনুভবের ও অত্যন্ত সত্য। আমি অন্য যে মিশ্রিত-দম্পতি দেখেছি তাঁদের বিষয়েও ওই কথা বলা চলে। আমার জানা কয়েকজন ভারতীয়ের ইওরোপীয় স্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত

স্বামীদের ত্যাগ করে, স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন। কারণ, তাঁদের বিবাহ নিয়মসীমা ছাড়িয়ে, অনুরূপ হয়ে মন ও আত্মায় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় নি। আমার আত্মীয়টি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কার তাঁর আত্মাকে স্ত্রীর আত্মা থেকে বিযুক্ত করে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করছে। মিশ্র বিবাহে এমন আধ্যাত্মিক আলোড়ন ঘটা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

আমার এক উৎকট বাঙালী-মেমসাহেব বান্ধবী আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের বিবাহিত জীবনে কি যেন একটা নেই। সব থেকেও সেটা যেনো সারশূন্য, স্বাদহীন। বাঙালী দাম্পত্য-জীবনের আচার দেখি, লোভ হয়, কিন্তু সেটা গ্রহণ করতে আমার বিলিতি শিক্ষার সংস্কারে বাধে।' আর একটি বাঙালী ক্রিশ্চান বান্ধবীর মুখে আমি ঠিক ঐরূপ কথাই শুনেছি। হঠাৎ একদিন তাঁকে সী থিতে সিঁদুর ও মণিবন্ধে লৌহবলয় পরতে দেখে আমি প্রশ্ন করেছিলুম, 'এ কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন আমি হিন্দু-ক্রিশ্চান। আমার মাঝ-বয়সে হিন্দুত্ব আমাকে বেশী করে টানছে। তিনি যেমন গির্জায় যেতেন, কলকাতায় গেলেও তেমনি কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিতে ভুলতেন না।'

আমি নিজে ইস্কুল কলেজে ইংরেজ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের এবং পরবর্তীকালে ইওরোপীয় বন্ধুদের কাছে সব বিষয়ে পাঠ নিয়েছি। যৌবনে আমি ইংরিজি ভাবনাকে পরমার্থ বলে জানতুম। আমার বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকে তার গভীর প্রভাব হয়েছিলো। কিন্তু পদে পদে আমি ঘা খেয়েছি। পরে বুঝেছি যে কোন অনাত্ম আচার ও আচরণ পালন করে নিজের প্রকৃতি ও সত্তা বদল করে নেওয়া অসম্ভব কথা। কেবল ধর্মাচরণেই সত্তার আমূল পরিবর্তন হয়। হাজার হাজার বাঙালী ইংরিজিয়ানা পালন করে গেছেন কিন্তু একজনকেও আমি ইংরেজ হয়ে যেতে দেখিনি। বাঙালীর ইউরোপীয় পত্নীদেরও সত্তার একটুও বদল হয়নি। কিন্তু গভীর ধর্মাচরণের দ্বারা ইংরেজকন্যা মার্গারেট নোবল্ নিবেদিতা হয়েছিলেন। ইংরেজ পুরুষ নিক্সন্ নিয়ত কৃষ্ণভাবনার দ্বারা সত্তার পরিবর্তনে সর্বতোভাবে যে কৃষ্ণপ্রেম হয়েছেন, তা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

জীবনে "ভালোবাসা" বস্তুটা অত্যন্ত গুরুতর। এক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপে "Love" শব্দটার যে অর্থ ছিলো, এখন তা নেই। যৌনবিজ্ঞানীদের কৃপায় Love দেহজ ভালোবাসার পরিচায়ক হয়ে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। আমরাও সেই সঙ্কীর্ণ বস্তুটাকেই গ্রহণ করেছি। প্রাচীন গ্রীকদের শব্দ ছিলো: Eros, Phile ও Agape। আমাদের শব্দ: কাম প্রেম মুদিতা করুণা ভক্তি। Eros কাম। Phile প্রেম। Agape করুণা।

ইওরোপীয়েরা ভক্তি কথাটা জানেনা ও বুঝতেও পারেনা। Ecstasy ভক্তিবাচক শব্দ নয়। কারণ, ভক্তি সুখময় বোধপ্রবাহ এবং শান্তিময় বোধপ্রবাহ, যা অপরা ভক্তি এবং পরা ভক্তি বলে জ্ঞাত। বিখ্যাত জার্মাণ যৌনবিজ্ঞানী Iwan Bloch বৈষ্ণবদের ভক্তিকে "Religio-Sexual Phenomenon" বলে ব্যাখ্যা করে গেছেন, যা সর্বৈব ভুল।

আমাদের বিবাহ সাধনায় চারটি মূল তত্ত্ব আছে যা আজও ইওরোপীয় মনোবিজ্ঞানীদের জ্ঞানের অতীত। আমরা জানি যে কিশোরী মেয়েদের প্রীতি স্বতঃসঞ্জাত বস্তু সেটি তার সত্তার (Essence) মূল উপকরণ। বিবাহ এই প্রীতির উদ্বিপরিণাম (Evolution) সাধন করে। প্রীতির অনুরূপ ইংরাজি শব্দ নেই বলেই জানি। আমরা জানি যে কিশোর-কিশোরী ভাব বিবাহের প্রাণবস্তু। আমরা জানি যে সাধনার দ্বারা পতি-পত্নী দ্বৈতরূপ থেকে অদ্বৈত অবস্থায় উপনীত হতে পারে। আমরা জানি যে, সাধনার দ্বারা সন্তানসৃষ্টি নিবারিত হয়ে যৌনশক্তি উচ্চতম বিবাহ সাধনে নিয়োজিত হতে পারে।

ইওরোপীয়েরা বাঙালীর এ সাধনা বোঝেনা। ইংরেজ আমাদের অবজ্ঞা করে বুঝতে চায়নি। জর্মাণরা ভারতীয় দর্শনকে প্রকৃত সমাদর দিয়েছে, কিন্তু এ প্রেম সাধনা বুঝতে পারেনি। আমার কয়েকটি অন্তরঙ্গ ইওরোপীয় বান্ধবী আছেন (ইংরেজ নয়)। তাঁরা চিন্তাশীল সাধনাপরায়ণ। আমি তাঁদের যোগতত্ত্ব শিখিয়েছি। এই তত্ত্বটিও তাঁদের আমি বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু তাঁরা চেষ্টা করেও তাঁদের মনের গড়নের বাধায় বুঝতে পারেননি।

ইওরোপীয় মেয়েদের এই প্রশংসা আমি করবো যে তাঁরা যা বোঝেন না, যা তাঁদের প্রকৃতিসঙ্গত নয়, তা তাঁরা গ্রহণ করেন না। আমাদের শিক্ষিত পুরুষ ও মেয়েদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতুম। আমরা অন্ধ হয়ে অপরের আচার দেহ-মনের স্বাস্থ্যকর ও প্রগতিসাধক বলে গ্রহণ করি। পুরুষ যেমন চায় মেয়েরা তাই হয়। আজ ইওরোপে নারী ছিন্নমস্তা। ছিন্নমস্তা প্রাচীন হিন্দুভাবনার কথা। যে নারী নিজের দেহ ও মনের নারীত্বের উপাদান নিজেই গ্রাস করে তাকেই ছিন্নমস্তা বলে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা—যথা হ্যাভেলক এলিস, ডক্টর বাকল ও ডক্টর সার্জেন্ট এই ছিন্নমস্তার নাম দিয়েছেন Woman approximated to the male—the new or third sex. আমাদের এ শতাব্দীর প্রারম্ভে হ্যাভেলক এলিস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, In our century the sexes tend to approximate to each other, অর্থাৎ নারী নিজের নারীত্ব গ্রাস করে পুরুষভাবাপন্ন ও পুরুষ পৌরুষ বিসর্জন করে নারীভাবাপন্ন হয়ে যাবে। কথাটা আজ পরম সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইওরোপীয় পুরুষ এই ছিন্নমস্তাকে চেয়েছে। আমাদের যুবকেরাও ঠিক তাই চাইছেন বলে আমাদের দেশেও ছিন্নমস্তার উদয় হয়েছে। আগামী কালে ধূমাবতী হওয়া কি ইওরোপীয় নারীর ভাগ্যলেখা? তা হলে আমাদের অনুকরণপ্রিয়তার কারণে আমাদের দেশে ধূমাবতীর উদয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন হিন্দুধারণার ধূমাবতী সেই নারী যে পুরুষকেও গ্রাস করে। অর্দ্ধপক্ব রাজশাস্ত্রীয় ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের কল্যাণে সকল জ্ঞানধর্ম বিসর্জন দিয়ে পৃথিবী আজ একাকার হতে চলেছে। কিন্তু কারো কখনো পরধর্ম সয়না।

একটি মাত্র মূল বিষয়ে হিন্দু ও ইওরোপীয় চিন্তার ঐক্য দেখি। প্রেম ও ধর্ম যে নারীর জীবনের প্রধান দুটি রাজপথ তা স্বীকৃত মহাসত্য। ধর্ম অর্থে এখানে ভজন-পূজন নয়। তার অর্থ প্রেম সতীত্ব ও সেবা। এই ধর্মের গুণেই নারী মহাশক্তি। আমাদের যৌবনকাল পর্যন্ত "পতিদেবতা" কথাটার প্রচলন ছিলো। এখন সেটা উঠে গেছে, থাকলে হাস্যকর হোত। কিন্তু কেবল আমাদের দেশেই পতিদেবতার প্রতিষ্ঠা ছিলো না। Paston letter-এ দেখি যে একদা অভিজাত ইংরেজ রমণী পতিকে "Right Reverent

and worshipful husband" বলে সম্বোধন করতো। নিজেকে বলতো, "your Servant and Bedeswoman." সমসাময়িক ফ্রান্স দেশেও ঠিক তাই ছিলো। আমি আমাদের পাঁচটি নারী-বংশক্রম দেখলুম। একটির এখন শৈশবাবস্থা। তার মধ্যে প্রথম তিনটি বংশক্রম পতিকে দেবতা জ্ঞান করে গেছেন। কিন্তু আমি সংসারে তাঁদের প্রভুত্বই দেখেছি, পীড়িত দাসীর হীনতা দেখিনি। তাঁরা স্বেচ্ছায় দাসী হতেন, অর্থাৎ অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা তাঁদের ছিলো। কথাটা মনে রাখবার যোগ্য যে, আমাদের বিবাহ সাধনায় পত্নী স্বামীর জীবনমন্ত্রদাতা, পত্নীই প্রেমগুরু। পতি তার জন্মসত্তার ও পুরুষসত্তার কারণে দেবতা হয় না, পত্নীই স্বামীকে দেবতা ও পুত্রকে নরোত্তম করে তোলায় সাধনা করে। আমার রবীন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীর কথা জানতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। অন্তরালবর্তিনী ঘোষণাবিহীন মহীয়সী এই নারী পতিকে ঋষি ও পুত্রকে পুরুষোত্তম করে গড়েছিলেন। এমন উদাহরণ মানবেতিহাসে আর নেই। রামকৃষ্ণদেবের দেবমানবত্ব লাভের সহায় হয়েছিলেন তাঁর পত্নী সারদা দেবী। বাঙালী হিন্দুনারীর পত্নীত্ব সাধনার পরাকাষ্ঠা এ। এমন মহান আদর্শ আর কোন নারীসমাজে নেই।

আমাদের বিবাহ-সাধনাটি প্রধানতঃ বৈষ্ণবীয়। তার সাধন-পদ্ধতিটি গুরুমুখী ও অত্যন্ত সংগোপন হলেও এখনো বর্তমান। আমাদের পূর্বাচার্যেরা সেটাকে অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত মিলিত করে একটি নূতন বিচিত্র যোগাঙ্গ রচনা করে গেছেন। অনুমান করি যে, প্রায় হাজার বছর ধরে এ দেশে তার ব্যবহার হয়েছে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব এই গোপন সাধনাকে আরো গোপন করে দিলেও বিনষ্ট করতে পারেনি। যাঁরা 'বিবর্তবিলাস' এবং চণ্ডীদাসের 'রাগাত্মিকা পদ' বোঝবার সামর্থ্য রাখেন তাঁরা জানেন যে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন ভিন্ন এই উচ্চতম বিবাহ সাধনা হয় না। সকল দুঃখসাধ্য বিষয়ের মধ্যে যোগ সর্বপ্রথম। এই বঙ্গীয় রসযোগ যোগের চেয়েও দুঃখসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। এই বইটিতে আমি রসযোগের আভাস মাত্র দিয়েছি, প্রণালীটি বলে দেওয়া উচিত নয় বলে বলিনি। তাকে খুঁজে নিতে হয়, যেমন সারাজীবনের চেষ্টায় আমি খুঁজে নিয়েছি। যে সব সাধনা আমি করেছি তা আমারই খুঁজে নেওয়া। শুধু কৌতূহল মেটাতে গেলে সে সব জানা যায় না, তীব্রসংবেগের প্রয়োজন হয়। তারপর আশ্চর্য্য ঘটনা উপলব্ধি করা যায়, নিজের ঘরে বসে গুরু পাওয়া যায়। এইটি আমার জীবনের প্রকৃষ্টতম অভিজ্ঞতা। আমার বহুবিধ সাধনার গুরুরা যেন নিজের গরজে আমার বাড়ী এসেছেন। পহলবাণী থেকে যোগসাধনা, সর্ববিষয়ে আমি এমন কথা বলতে পারি। রসযোগ প্রত্যেকটি নর-নারীর অনুভবে বর্তমান, কেবল তাকে চিনে, ফুটিয়ে তুলে ধরে রাখতে হয়। একমাত্র ইওরোপীয়, বিবেকানন্দশিষ্যা নিবেদিতা সম্ভবত এ তত্ত্বের কথাটি জানতেন। বঙ্গনারীর বিষয়ে তাঁর লেখার ইঙ্গিত থেকে সেই অনুমানই হয়। ইওরোপীয় মনীষীদের মধ্যে তিনজনকে দেখি যাঁরা এই উচ্চতম নারীত্ব—ও বিবাহ সাধনার অনুমান করেছেন। তাঁদের নাম হ্যাভেলক এলিস, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার ও জেমস হিণ্টন।

ইওরোপীয় মনস্তত্ত্বে দেখি যে, জীবনের পটপরিবর্তনের কালে যৌনশক্তির বিনাশের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ইওরোপীয় রমণী অপরিসীম দুঃখ ভোগ করে। এ পরিবর্তন নারীমাত্রেরই বিধিলিপি। হিন্দুনারী কিন্তু প্রৌঢ় বয়স থেকেই যৌনশক্তিকে দমন করতে বা বিসর্জন দিতে ব্যগ্র হয়। এটি হিন্দু-ঐতিহ্য। এই অত্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে ইওরোপীয় প্রৌঢ়ার যে সমস্যা তা একেবারেই বাঙালী প্রৌঢ়ার সমস্যা হয়না। আমাদের সাধনায় স্বেচ্ছায় এই পটপরিবর্তন ঘটাবার পদ্ধতি আছে। আমি দুজন যোগিনীকে জানি। একজন সাতাশ বৎসর ও অন্যজন চব্বিশ বৎসর বয়সে সাধনার দ্বারা ঋতু বন্ধ করেছিলেন। তাঁদের প্রৌঢ় বয়সে পটপরিবর্তন জনিত বিন্দুমাত্র কোন আলোড়ন হয়নি। এ সাধনার দ্বারা ডিম্বকোষের শক্তি (Ovarian hormonic energy) উজান পথে প্রবাহিত করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে নিযুক্ত করা যায়। আমাদের দেশের এ যোগসাধনা বিচিত্র।

সুপ্রজননবিদ্যা ও ইউজেনিক্স্‌ হালে ইওরোপে উৎপত্তি। আমাদের দেশে সেটি সুপ্রাচীন। মনু তার যে আটঘাট বেঁধে দিয়ে গেছেন তার সত্য এখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তা তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। মানববংশ অবনতিশীল। সুপ্রজননবিদ্যার প্রয়োগ ভিন্ন তার উদ্ধার নেই।

বিবাহ সুখ ও শান্তিকামী। দুঃখকে দূর করবার এবং সুখ ও শান্তিসন্ধানের আমাদের সর্বজন এবং সর্বকালমান্য পদ্ধতি আছে। হাজার হাজার বছরের ক্রমাগত ব্যবহারে তা উজ্জ্বলই হয়ে আছে, মলিন হয় নি। সেটি কিন্তু কঠিন সাধনা, তপস্যা। ইওরোপীয় মনস্তত্ত্বে তেমন কিছুই নেই। না থাকার কারণ ইওরোপীয় মন বিজ্ঞানকেই মানে, যা বস্তুগত। সে এখনো ভালো করে এই আন্তর ইন্দ্রিয়টির সন্ধান করেনি। বিবাহ একান্ত ভাবে মনেরই সাধনা।

এই বইটিতে আমি এমন কিছু ইওরোপীয় জ্ঞানও গ্রহণ করেছি যা সার্বত্রিক। কিন্তু ইওরোপীয় বিজ্ঞান আমাদের কিছু গোপন সাধনাকে আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এই বইতে দুই দেশের জ্ঞানের সমন্বয় পাওয়া যাবে। ঋষিকল্প জ্ঞানী হ্যাভলক এলিসের কাছ থেকে আমি সব চেয়ে বেশি নিয়েছি। তবুও এই বইটিকে প্রাথমিক বলেই ধরতে হবে। এতে আমি এমন একটি কথাও লিখিনি যা আমার পর্যবেক্ষণ বা অনুভবের বাহিরে। যা আমি জানি না তা পরম সত্য হলেও কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের চল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে আমরা প্রত্যেকটি তত্ত্ব বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি যে তা অভ্রান্ত সত্য। ভ্রান্তিদর্শন সকল সাধনার অন্তরায়, তা আমরা এড়িয়েছি। যা চিরন্তন সত্য তাকে নিজে উপলব্ধি করলে তা নূতন করে সত্য বলে অনুমোদিত হয়। কাল ও কালমানস বদলায়, কিন্তু সত্য চিরদিনই অপরিবর্তনীয় ও অমলিন। যাকে "থিওরী" বলে তেমন কিছুই এই বইটিতে নেই।

বার বার পরীক্ষার দ্বারা পাঠক-পাঠিকারাও এই বই-এর সকল কথার সত্য নিরূপণ করতে পারবেন।

বিবাহের স্বরূপ

একটি নারী ও একজন পুরুষের সমগ্র জীবন স্থায়ী মিলন যখন ধর্ম বা রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত হয়, তাকে আমরা বিবাহ বলি। বিবাহ মানব-সমাজের অতিশয় প্রাচীন রীতি।

মানুষের মনে বিবাহের সংস্কারটি মজ্জাগত। তরুণ বয়সে,

অর্থাৎ তার দৈহিক উৎকর্ষের বিশিষ্ট একটি পর্যায়ে এই সংস্কারটি জাগ্রত হয় এবং ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে ওঠে। তারুণ্য শুধু যৌনচেতনার প্রতীক নয়। তারুণ্যের আগমনে বালক-বালিকার মনে অহংজ্ঞানের উদয় হয় এবং তারা আগামী কালেরও উপলব্ধি করে ও তাতে অগ্রসর হয়ে চলে। যৌনতা, অহংজ্ঞান এবং আগামী কালের অনুভব তারুণ্যের বৈশিষ্ট্য। এই বয়সে পুরুষের যৌনচেতনার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ হয়, যা নারীর হয় না। তীব্র যৌনপ্রেরণা পুরুষের নিজস্ব বিশিষ্ট প্রকাশ। সে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশটিও বিভিন্ন। তার তিনটি পরীক্ষামূলক রূপ: প্রাথমিক রূপ আত্মরতি, পরে পররতি, যার দুটি আকার। এ অবস্থার চরম উদ্দেশ্য—একটি প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন-সঙ্গিনীর অনুসন্ধান। স্বভাবসুলভ এই পরীক্ষামূলক বৃত্তিটিকে পুরুষ আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। আমাদের সকল ক্রিয়া একটি চরম ও পূর্ণ অবস্থাকে লক্ষ্য করে সাধিত হয়। পুরুষের কামচেতনাটি সেই চরম ও পূর্ণ অবস্থাটির অন্বেষণ করে। যাকে খোঁজে তার নাম পত্নী; যে অবস্থাটিকে খোঁজে সেটি বিবাহের আজীবনস্থায়ী অবস্থা।

নারী কিন্তু পরীক্ষামূলক অনুরূপ কোন স্বাভাবিক অবস্থার অধীন নয়। প্রেম ও সন্তুষ্টি তার জীবনের মূল দুটি পথ। তারুণ্যের উন্মেষে সে সোজাসুজি প্রীতির ক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে। জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কটি নিবিড়। সোজাসুজি চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া তার প্রকৃতিগত সংস্কার। স্বভাবগুণে পুরুষ জীবনের সব কিছুতে তর্ক বিচার অর্থাৎ বুদ্ধির আশ্রয় নেয়, নারীর আশ্রয় প্রীতি। জীবনের কেন্দ্র খুঁজে পেতে পুরুষের বিলম্ব হয়, সকলে খুঁজে পায়ও না। কিন্তু নারী শরবৎ সোজাসুজি সেই কেন্দ্রটিতে গিয়ে পৌঁছায়। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা যেই প্রীতি-সজাগ নারী একটি পুরুষের ঘর আলো করলো, সেই মুহূর্তে সেই ঘরে একটি নূতন কেন্দ্র, নবজীবনের একটি ধারার উৎস স্থাপিত হলো। তাকে দিয়েই নূতন সংসার, নূতন জীবনযাত্রা, নূতন একটি বংশক্রম, কর্মের নবীভূত উদ্দীপনা, নবতম আনন্দের সম্ভাবনা এলো। প্রীতি নারীর সহজ গুণ, আনন্দের উপলব্ধি তার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। নারী একদিকে প্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিতা, অন্য দিকে জীবনকে পরমার্থের সহিত যুক্ত করে দেবার সহায়। এই দুটি প্রান্তের মধ্যবর্তী পরিসরে তার বিচরণ। সে জীবনকে বহন করে, জীবনে উত্তাপ সঞ্চারিত করে, জীবনশিল্পী হয়ে এই দুটি প্রান্তের সম্বন্ধকে ঘন করে রাখে। জীবনশিল্পী হওয়া নারীর সহজভাগ্য, পুরুষের তা হতে হলে প্রকৃত সাধনা করতে হয়।

মূলতঃ, প্রথম সোপানে বিবাহ যৌবনরসের তীব্র প্রেরণার স্ফুটন অবস্থা। বিবাহের প্রকৃত পূর্ণতা ঘটে সোপানে সোপানে, সারাজীবন ধরে। এই আদিম সংস্কারের কারণে যে যৌনমিলন তা সভ্যতার উৎকর্ষ সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি। সংস্কারজ এই যৌন মিলনের পর্যায়ে মানুষ ও ইতর প্রাণী এক, সমান ভাবে প্রকৃতি-শাসিত। কিন্তু মানুষ সে অবস্থায় খুশি হয়ে থাকতে পারেনি।

নিজের উৎকর্ষ সাধন করবার জন্ম সে সমাজ গঠন করেছে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে সমাজের বন্ধনকেও স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু দশে মিলে কাজ করবার জন্য নয়, ব্যাপক ভাবে মঙ্গলাচরণ করবার এবং সেই মঙ্গলের অংশভাগী হওয়াও তার লক্ষ্য। তাই যৌবন-মদাহুমোদিত বিবাহকে সে মন খুলে মেনে নিতে পারেনি। কারণ, তার পরিধিতে স্বার্থের বেড়া দিয়ে ঘেরা, তার আয়তনটি সঙ্কীর্ণ, তাতে সারাজীবনের নির্ভরতার অভাব। অথচ সে পথটায় সে পাঁচিলও তুলে রাখেনি, যার খুশি সেই পথে যেতে পারে। সমাজকে জানতে গিয়ে সে ধর্মকে ভোলেনি। বিবাহের ভেতর দিয়ে সে যেমন সমাজের মঙ্গল-কামনা করেছে, তেমনি বিবাহিত জীবনকে মহাব্রত বলে জেনে নিজের হিত সাধনের জন্ম ধর্মকে, পরমার্থকে বিবাহের মাঝখানে ঠাকুর বলে স্থাপন করেছে। অর্থাৎ, আমার বলবার কথা এই যে, মানুষের হাতে পড়ে প্রাকৃতিক কামমূলক বিবাহ সংস্কৃতির শ্রীর দ্বারা মণ্ডিত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতিকে সংস্কৃতি দিয়ে জয় করেছে। আমাদের বিবাহ তাই সংস্কৃতিমূলক।

সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? সংস্কৃতির বিবিধ সংজ্ঞা আছে। নৃবিজ্ঞাগত অর্থে সংস্কৃতি ইচ্ছাপূরণ, কামনাকে রূপায়িত করা, আদর্শের পশ্চাদ্ধাবন করা। আদর্শবাদীকে অর্বাচীনেরা পাগল বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদর্শ মানুষের অন্তরের জ্যোতির্ময় সত্য, যাকে লাভ করতে সে সতত ব্যগ্র। তাই আবহমান কাল মানুষ নিছক কাম-মিলনে পরিতৃপ্ত না হতে পেরে, সেই প্রবল শক্তিটাকে একটি আদর্শে সমাহিত করে সমাজের এবং নিজের আত্মার উৎকর্ষ ও বিকাশের কাজে নিযুক্ত করেছে। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই জানে যে, পর-রতির সম্বন্ধটি ক্ষণস্থায়ী, তার জীবনকে পুষ্ট করার কোনই শক্তি নেই। তাই আমাদের চিরস্থায়ী মিলনের কামনা। নিছক যৌনমিলনের ফলে প্রকৃতি সন্তান দেয়, যা তার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানুষ কিন্তু শুধু সন্তান লাভ করেই খুশি হয়ে ইতর প্রাণীর মতো তাকে অন্ধ অদৃষ্টের হাতে ফেলে দেয় না। সন্তানের জন্ম সে এমন একটি পরিবেশ, এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে রত থাকে, যাতে সে সন্তান তার বংশের ও সমাজের পূর্বগামীদের চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। এটি সংস্কৃতিগত প্রয়াস, যা আমাদের বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের স্বভাব সুদূরের পানে চেয়ে থাকা, সুদূরকে লাভ করবার জন্ম আকুল হওয়া।

বিবাহের সঙ্গে যে সংস্কৃতি যুক্ত সেটি মানুষের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ জিনিষ। কন্যা বিবাহযোগ্যা হলেই আমরা তাকে যার তার হাতে তুলে দিইনে। সেই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে তাকে যোগ্য পাত্রের হাতে সম্প্রদান করি। যাচাই করার এই ক্ষেত্রটিতে সংস্কৃতিই একমাত্র মাপকাঠি। যে পরিবারে যেমন সংস্কৃতি সংস্কারের ধারা, সেই পরিবার সেই মানদণ্ড অনুসারে পাত্রের অনুসন্ধান করে। সুতরাং আমাদের চয়নের পরিসরটি ছোট, রক্তের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী দিয়ে বেষ্টিত। অজ্ঞাত-কুলশীলকে আমরা যে সন্দেহের চোখে দেখি, তার কারণ, তার সংস্কৃতি ও সংস্কারের পটভূমিকার সহিত আমরা পরিচিত নই। রক্তের বেড়া তাই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত ও শূদ্রকে শূদ্রোচিত সংস্কারের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ করে রাখে। ব্রাহ্মণত্ব ও শূদ্রত্ব জন্মগত কিছু নয়, সেটি সম্পূর্ণভাবে সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় অবস্থা, যা কোন শক্তিই বিনষ্ট করতে পারে না।

রাজা জমিদার বৈবাহিক সম্বন্ধ দিয়ে বৈষয়িক শক্তি বর্দ্ধনের উপায় খোঁজে। ধার্মিক যে জন সে ধর্মবন্ধন চায়। এ সমকক্ষতার অন্বেষণ তাই সমান-সমান ঘরের, উচ্চ ও নীচকুলের সমকক্ষতা স্থাপন করবার প্রয়াসশূন্য। এ বিভেদ সংস্কৃতিগত।

বিবাহ সংস্কারে আমরা জন্মের কুশলতাকে খুব বড়ো একটা মানদণ্ড বলে জানি। এই কুশলতার দুটি রূপ—একটি সুপ্রজনন, অন্যটি সুসংস্কার। মানবপরিবার সন্তানকেন্দ্রী; সন্তানের গুরুত্বের সীমা নেই। চাষী যেমন ভালো বীজ সংগ্রহ করে, সযত্নে জমির পাট করে উৎকৃষ্ট ফসলের কামনা করে; গৃহপালিত পশুর উৎকৃষ্ট শাবকের জন্ম যেমন উৎকৃষ্ট পিতৃবীজের বিষয়ে আমরা সতর্ক হই, মানুষের বেলাতেও সেই সতর্কতা তেমনি একই ধরণের। সন্তানের অদৃষ্টটি ভবিষ্যতে নয়, অতীতে বাঁধা। অতীত কালের পূর্বপুরুষ হতে সে তার নিজের জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে। সে উপাদান দেহগত ও সংস্কৃতিগত দুই-ই। তাই কন্যার বিবাহকালে আমরা এমন বংশের পাত্র অন্বেষণ করি যে বংশ কয়েকটি অধোগমনশীল রোগ হতে বংশপরম্পরায় মুক্ত। ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের ও জীবনের দৃঢ় বুনিয়াদের জন্ম এ অনুসন্ধান। কিন্তু এইটুকুই অর্থাৎ সন্তানের দেহটুকুই যথেষ্ট নয়তো? সন্তানের সম্যক উৎকর্ষের জন্ম তখন অন্য একটি উপাদানের গভীর প্রয়োজন হয়, সেটি সুসংস্কারের বংশানুক্রমিক আবহ। এ কথা নিগূঢ় সত্য যে, সন্তান পৈতৃক নানা মনোবৃত্তি লাভ করে থাকে। সেই অনুসারে তার সত্তা বা জীবনধারা শৈশবকালেই গড়ে ওঠে। সন্তানকে দেহ ও মন দিয়ে জীবনের পথে অনেকটা অগ্রসর করে স্থাপন করা এ চয়নের উদ্দেশ্য। প্রগতি স্বধর্মে গতিময়, অগ্রগমনশীল। তাই এ চয়নের ইচ্ছা রক্ষণশীলতার পরিচায়ক নয়, প্রগতিই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং পরিচিত ঘর ছাড়া স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পাত্র পাওয়া দুরূহ। তাই বিবাহ গোত্র বা পাল্টি ঘরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এখন তাতেও বহুকালের সঞ্চিত নানা কলুষ জমে উঠেছে। বিবাহকে সুষ্ঠু করতে গেলে গোত্রকে এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ের আরো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ করতে হয়।

প্রাচীন কালের মনুস্মৃতি থেকে এবং আধুনিক কালের বৈবস্বত মনু হ্যাভেলক এলিসের বিবাহে বর্জনীয় বংশের তালিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। মনুস্মৃতির ব্যাখ্যায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলছেন যে, গবাদি পশু ও ধনধান্যযুক্ত হলেও নিম্নলিখিত রোগের দ্বারা কলুষিত বংশের পাত্র ও পাত্রী বর্জনীয়। যথা—ভগন্দর, রাজযক্ষ্মা, আমাশয়, মৃগীরোগ, শ্বেতকুষ্ঠ ও গলিতকুষ্ঠ। হ্যাভেলক এলিসের মতে উন্মাদ রোগ, জড়প্রকৃতি, দুর্বলচিত্ততা, মৃগীরোগ, স্নায়ুবিকার ও যক্ষ্মারোগে দুষ্ট বংশ বর্জনীয়।

এ বিষয়ে মনুর অত্যাশ্চর্য্য দূরদর্শিতার কথাটা বলতে হয়। মনু রোমশ পাত্র ও পাত্রীকে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হ্যাভেলক এলিস ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের অনেক কারাগারে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রোমশ নরনারীদের যৌন পাপের প্রবণতা থাকে। রোমশ নারী যৌনপাপী হওয়া ছাড়া প্রায়ই ভ্রূণহত্যা অথবা সন্তানহত্যার পাতক হয়।

পুরুষের পরীক্ষামূলক যৌনতার কথা আমি উল্লেখ করেছি। যেখানে পুরুষ সুসংস্কার ও সুশিক্ষার দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখে

না সে অবস্থায় যৌনচেতনার এই সন্ধিক্ষণে তার যৌনবৃত্তির বিকৃতি ঘটাবার এবং যৌনরোগের সম্ভাবনা বিশেষভাবে থাকে। বর্তমান কালে যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এই বিকৃতি ও রোগ বিবাহের গোপন কিন্তু পরম শত্রু। অনূঢ়া অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের এ রোগ হওয়া সম্ভবপর নয়।

মনু সংস্কৃতিগত বাধার কথায় বলেছেন, যে কুল উত্তমক্রিয়াহীন যে কুলে উত্তমপুরুষ এবং বিদ্বান নেই, সে কুল বর্জনীয়। এখনকার প্রবল অর্থনৈতিক যুগে ধন বিবাহের একটি বড়ো মাপকাঠি; কিন্তু সেটি একান্ত বাহ্যিক বস্তু। পাত্র বা পাত্রীর দৈহিক, নৈতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তমতার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র কোন যোগ নেই। কাজেই মনুর বাক্য সুপ্রাচীন হলেও আজও তার মূল্য অব্যাহত আছে।

বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া খুব কঠিন কথা। সে সুখ অল্পকালে নির্মাণ করা যায় না, সেটি সারা জীবনের সাধনা-সাপেক্ষ। সুখ সদা পলায়নপর বস্তু। কেবল ব্রত নয়, সুখকে মহাব্রত বলে গ্রহণ না করলে তাকে ধরে রাখা অসম্ভব কথা। এ বিষয়ে মানব-প্রকৃতির কি বলবার আছে তা দেখা যাক। দেহের গঠন অনুসারে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; পিকনিক (Pyknic), লেপ্টোসম্ (Leptosome) এবং হাইপোপ্লাষ্টিক (Hypoplastic)।

পিকনিকের গোলাকার মুখ, মোটা হাড়, পেশল দেহ, রোগ-প্রবণতা খুব কম। পিকনিক স্বভাবে শান্ত, সংসার গঠনে ও শৃঙ্খলার অনুরাগী। লেপ্টোসমের ডিম্বাকৃতি মুখ, আয়তন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, পাতলা অস্থি। লেপ্টোসম্ রোগপ্রবণ, ভাবপ্রবণ, বহির্মুখ, শিল্পমনা ও চঞ্চলপ্রকৃতি। পিকনিকের মধ্যে সুন্দরী হয়না, লেপ্টোসমের দেহসৌন্দর্যে অধিকার আছে।

তৃতীয় শ্রেণী, হাইপোপ্লাষ্টিকের সূচালো মুখ, দীর্ঘ শরীর, কাঁটার মতো পাতলা অস্থি, দেহ প্রায় মেদশূন্য কঙ্কালসার, তার আভ্যন্তরিক দেহযন্ত্রগুলির অবস্থা বৃদ্ধি-উৎকর্ষহীন, শিশুসুলভ। এ শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষ অভিশপ্ত। তারা স্বল্পায়ু, তাদের ক্ষয় ও উন্মাদরোগের সম্ভাবনা অত্যধিক। খেলাধূলা ও রতিক্রিয়া তাদের সাক্ষাৎ যম।

হিন্দুর ভাষায় পিকনিক মেয়ে মাতৃরূপা এবং লেপ্টোসম্ মেয়ে নটীরূপা। বিবাহে নটীরূপা ত্যাজ্যা। এ বিষয়ে প্রাচীন তথ্য ত্যাগ করে আধুনিক কালের প্রখ্যাত দু'জন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। দৈহিক শ্রেণীবিভাগটির আবিষ্কারক বিখ্যাত জার্মাণ মনীষী, আর্ণেষ্ট ক্রেটশমর (Ernest Kretschmer)। তিনি বহুসংখ্যক পরিচিত দম্পতির পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শতকরা দশটি সুখী-দম্পতি পিকনিক-জাতীয় এবং চারটি লেপ্টোসম্-জাতীয়। শতকরা ছিয়াশীটি দম্পতি জীবনে সুখসামঞ্জস্যের সন্ধান পায় না। হ্যাভেলক এলিসের মতে শতকরা পাঁচটি মাত্র দম্পতি সুখসৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

আধুনিক রাশিয়ার বিখ্যাত মনীষী, অধ্যাপক ব্লন্‌স্কি (Blonsky) মানসিক গঠন অনুসারে মেয়েদের দু'টি ভাগ করেছেন। একটি মনানড্রিক (Monandric) অন্যটি পলি-অ্যানড্রিক (Polyandric)। মনানড্রিক মেয়ে একাত্মগা, স্নিগ্ধস্বভাবা, শুচি ও শৃঙ্খলানুসন্ধানী। এমন কন্যা বিবাহিত জীবনের অলঙ্কার-স্বরূপ। পলি-অ্যানড্রিক মেয়েরা বহির্মুখী ও একাধিক পুরুষে

আসল, গৃহস্থালীর তারা কেন্দ্র হয় না। তাদের বিষয়ে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। সৌভাগ্যক্রমে সংসারে মনানন্দিক নারীর সংখ্যাটাই বেশী।

এখনকার কালে ঘটকেরা যেমন পাত্রের বাড়ী, গাড়ী ও পদমর্যাদার সন্ধান দেয়, আমাদের যৌবনকাল পর্যন্ত তারা পাত্র-পাত্রীদের বংশের বিশুদ্ধতা ও সংস্কৃতিগত ক্রিয়ার সন্ধান নখদর্পণে রাখতো। বংশের বিশুদ্ধতা খুঁজে পাওয়া যে কতো কঠিন সে বিষয়ে দু'টি উদাহরণ দেওয়া যাক।

কুড়ি বছর হোল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যার অধ্যাপক, বেঞ্জ (Benz) সাহেব বিপুল অনুসন্ধানের দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বিশুদ্ধ বংশে সন্তানের সংখ্যা অল্প এবং কলুষিত বংশে অপরিমিত হয়ে থাকে। বেঞ্জের মতে একটি বিশুদ্ধ দম্পতি হতে পঞ্চাশ বছরে মাত্র ষোলটি সন্ততি জন্মায়। অন্য পক্ষে, কলুষিত দম্পতি হতে পঞ্চাশ বছরে ১৬০০ সন্ততি জন্মগ্রহণ করে থাকে। এই কারণে পৃথিবীতে আজ জন্মের আধিক্য এবং নানা রোগ ও পাপদুষ্ট মানুষ দিয়ে সংসার পূর্ণ।

আমার নিজের একটি শৌখিন ও সম্পূর্ণ ভাবে অবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কথা বলি। তিরিশ বছর পূর্বে আমার এ অনুসন্ধানের আরম্ভ এবং আজও সে বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ করা শেষ হয়নি। কলকাতার একটি সুপরিচিত বনেদী পরিবারের মানুষদের দেখে আমি এ অনুসন্ধানের আরম্ভ করেছিলুম। এই পরিবারে একটি দম্পতি থেকে প্রায় তিরিশ বছরে আদি-দম্পতির জীবনকালেই—১১৬ জন সন্ততি জন্মায়। আমার অনুসন্ধানের সময়ে তার মধ্যে কেবল ৫৬ জন জীবিত ছিল। যেখানে জন্ম অপরিমিত, সেখানে মৃত্যুর হারও অধিক হয়ে থাকে। সেই ৫৬ জন মেয়েপুরুষের মধ্যে কেবল ২২ জন দেহ ও মন দিয়ে স্বভাবী (normal) নিরিখের। বাকি ব্যক্তিগুলি নানা দোষে দুষ্ট। পাগল, যক্ষ্মারোগী, জড়প্রকৃতি, দুর্বলচিত্ত, অপরিণতবুদ্ধি, অপরিণত দেহ মানুষ দিয়ে সে বংশটি শাখা-প্রশাখায় ভরা। সেই বংশটির একজন পাগল ও কয়েকজন জড়বুদ্ধির বিবাহও হয়েছিলো এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও এখন যথেষ্ট। সে পরিবারটির মূল ও শাখার চতুর্থ বংশক্রমে সেই পুরাতন কলুষের প্রবাহ ও প্রভাব আমি আজও দেখে যাচ্ছি। শাখাগুলির শিরায় শিরায় এখন জড়বুদ্ধি, যক্ষ্মা, উন্মাদ রোগ, বিস্তার হয়ে চলেছে। মূল পরিবারটি একদা বংশগৌরবে বিশিষ্ট এবং অপরিমিত ধনী ছিলো, কিন্তু কোন সংস্কৃতিগত গুণ তাতে ছিলো না। এখন ধনের পরিবর্তে দারিদ্র্য এবং আধারের অপচয়ের কারণে পরিবারটির কোন সংস্কৃতিও আয়ত্ত হয়নি। এমন কলুষ কেবলমাত্র বিবাহের পথ দিয়েই ক্রমাগত ছড়াতে থাকে, আর কোনই উপায়ে ছড়ায় না।

মেয়েদের বিবাহের বয়সের নিরিখ নানা দেশে নানা ধরণের। দেশ, জাতি, জলবায়ু, পুষ্টি, সামাজিক শ্রেণী প্রভৃতি এই বিভিন্ন নিরিখ নিয়ন্ত্রণ করে। সেটি বাহ্যিক। মূলতঃ সকল দেশের বিবাহের কালের একটি ঐক্য আছে। মেয়েদের মনে প্রীতির জাগরণ ও উৎকর্ষ যৌবনোদ্‌গম ও যৌবনের উৎকর্ষের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক কারণে মেয়েদের যৌবনোদ্‌গমের কালের যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সকল দেশে প্রীতির উন্মেষের কালটি বিবাহের কাল নির্ণয় করে এসেছে।

গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই অন্তর্নিহিত সত্যটি পাওয়া যায়। মনুর ব্যবস্থার দুটি নিরিখ দেখা যায়। প্রথমটি তারুণ্যের পূর্বেই গৌরীদান। দয়ানন্দ সরস্বতী শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ ব্যবস্থাটার নিন্দা করে বলেছেন যে, সেই প্রাচীনকালেও কন্যা ঋতুমতী হবার পর চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ঋতুছন্দ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হলে বিবাহযোগ্যা বলে বিবেচিত হোত। তার অর্থ, তখন ১৬।১৭ বৎসরটা বিবাহের বয়স ছিল। দেহের নিরিখে এ দৃষ্টিভঙ্গীটি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক। দেহের এ পুষ্টিতে প্রীতির পুষ্টি ও বিস্তার নিহিত। আমাদের দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত তারুণ্য ও বিবাহ যুগপৎ ঘটনা ছিলো। বর্তমানকালে এ রীতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তারুণ্য ও বিবাহের মাঝে কালব্যবধান এখন বেশ বেড়ে চলেছে। বাঙালী মেয়েদের ঋতু আরম্ভের ঠিক বয়স আজও আমাদের জানা নেই। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে জুবার্ট (Joubert) নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার লিখে রেখে গেছেন যে, কলকাতাবাসী মধ্যশ্রেণীর বাঙালী মেয়েদের প্রথম ঋতুর বয়স ১২.৬ বৎসর। গড়পড়তা ১২।১৩ বছর বয়সটাকে আমাদের মেয়েদের প্রথম ঋতুর বয়স বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিঘ্নশূন্য হলে ঋতুর ছন্দের সম্যক প্রতিষ্ঠা হতে প্রায় দু' বছর লাগে এবং অঙ্গপূরণ হতে ঋতুর প্রথম প্রকাশের কাল থেকে প্রায় পাঁচ বছর লাগে। স্বাভাবিক অবস্থায় মেয়েদের দেহ পরিপক্ক হয় প্রায় কুড়ি বছর বয়সে। ওই বয়সে মনেরও পরিপক্বতা হতে আরম্ভ হয়।

বিবাহ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ অবস্থা। সে দায়িত্ব স্বীকার করতে গেলে শুধু দৈহিক উৎকর্ষটাই যথেষ্ট নয়, মানসিক উৎকর্ষও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। মানসিক উৎকর্ষ হতে বিলম্ব ঘটে, দৈহিক উৎকর্ষের সহিত তার বিশেষ কোনো যোগ নেই। আনুমানিক ১১।১২ বছর বয়সে ছেলেদের মানসিক উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। তত্ত্বজ্ঞানী হ্যাভেলক এলিস এবং বাক্‌ল্‌ সাহেবদের মতে ২২.২ বৎসর বয়সে মানসিক পরিণতির প্রথম সোপান আসে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের দেহ ও মনের অকালপক্বতা হয়। সে কারণে তাদের মানসিক উৎকর্ষের কালারম্ভ ১০।১১ এবং মানসিক পরিণতির প্রথম সোপান একুশ বৎসর বয়সে ধার্য্য করা যেতে পারে। ফলে, কুড়ি থেকে একুশ বছর বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলে মনে হবে। বিবাহের বয়সের বহিরঙ্গ এই, এখন তার অন্তরঙ্গ রূপটাও দেখা প্রয়োজন।

পুরুষ ও নারীর দেহের বিকাশ ও উৎকর্ষের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই যৌন বিভাগটির অনেক গুরুত্ব। প্রায় চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ উৎকর্ষলাভ করে চলে। কিন্তু বছর কুড়ি বয়সে পূর্ণ যৌবনের প্রথম সোপানটিতে পা দিলে স্বাস্থ্যবতী নারীর উৎকর্ষ রুদ্ধ হয়। এটি বাহ্যিক দৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধিক্ষণটির পরবর্তীকালে নারীদেহের ভিতরে ভিতরে উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। কারণ তাকে প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূরণ অর্থাৎ সন্তান ধারণ করবার জন্য সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে হয়। সৃষ্টির ভার একমাত্র সেই বহন করে। সুতরাং পুরুষ বাইরে থেকে উৎকর্ষ লাভ করে এবং নারীর উৎকর্ষ সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরিক ব্যাপার। বিবাহের জন্য দৈহিক উপাদানের এই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় গুরুতর উপাদানটির নাম প্রীতি। প্রীতি বীজশক্তি; তা থেকেই আনন্দ, ভালোবাসা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়। নারীদের

উষাকালেই সব মেয়ে তাদের স্বভাবধর্মে প্রীতিতে গিয়ে পড়ে। মনুষ্যমাত্রেরই একটি প্রাকৃতিক মূল শক্তি আছে, তার নাম সত্ত্বশক্তি। এ শক্তি জীবনের একমাত্র সার বস্তু। সেটির খানিকটা প্রাকৃতিক, খানিকটা নির্মিত। প্রাকৃতিক ভাগটা সূক্ষ্ম পূর্বসংস্কার দিয়ে গড়া। নির্মিত ভাগটা শৈশবকালে অধিকতর ভাবে মাতৃ সহবাসে গড়ে ওঠে। বাপ ও পরিবারের তাতে দান থাকলেও সেটা সামান্য। মা ভালো বা মন্দ হলে এই সত্ত্বটুকু ভালো বা মন্দ হয়। মাতৃসঙ্গ যত দিন ঘন থাকে তত দিন সত্ত্বের বৃদ্ধি। কিন্তু শিশুটি যেই বাইরের সমাজে যেতে আরম্ভ করে সে বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হয়। আমাদের প্রাচীন একটা বাক্য আছে যে মানুষের আয়তন তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মতো। তার মানে তার এই শিশুসুলভ স্বল্প সত্ত্বশক্তি।

শিশু সমাজে বিচরণ করতে আরম্ভ করলেই তার মনের ওপর বাহিরের ছাপ পড়তে আরম্ভ করে। ইস্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে সংসার, তার বিচরণের পরিধি ও মাত্রাটা যেমন বাড়ে, সেই বাহ্যিক ছাপটাও তেমনি পুরু হতে থাকে। তার সত্ত্বকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পুরু ব্যাহ্যিক ছাপটার নাম ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি। আমি দ্বিতীয় ইংরাজী শব্দটাই ব্যবহার করবো. কারণ প্রথম শব্দটা আমাদের জোর করে বানানো, ঠিক ও সুখকর নয়। পার্সোনালিটি শব্দটার মূল অর্থ মুখোস। সত্যই সেটা মুখোস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে আমরা এখন পার্সোনালিটিকে খুব বড়ো দাম দিয়ে থাকি। কিন্তু পার্সোনালিটি ভারি ঠুনকো জিনিষ। সঙ্কটকালে একটা টুসকিও সে সইতে পারে না, তৎক্ষণাৎ মুখোসের মতই খসে পড়ে। সুতরাং, আমাদের এই সঙ্কটবহুল জীবনে আমরা বার বার সত্ত্বে গিয়ে পড়ি। সত্ত্ব মন্দ হলে গুলিয়ে যাই, সেটি ভালো হলে সঙ্কটে উত্তীর্ণ হই। আমরা যাকে বিপদের হরি বলি সেটি এই শুদ্ধসত্ত্ব!

আমরা সমাজে থেকে যে আচার আচরণ গ্রহণ করি বা লেখাপড়া শিখি, তাতে এই পার্সোনালিটি বা মুখোস নির্মিত হয়। চেতনা সাধনা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন লেখাপড়ার পদ্ধতি নেই যা সত্ত্ব শক্তি নির্মাণ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। নিজে না গড়ে নিলে সত্ত্ব বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করে না। যা আমরা চেতনায় যুক্ত হয়ে শিখি সেটুকু সত্ত্বকে পুষ্ট করে। বস্তুত পক্ষে, পার্সোনালিটি রুদ্ধকর বিকৃতি। কিন্তু একটি প্রকৃত পার্সোনালিটি আছে, সেটি শুদ্ধসত্ত্ব সাধনার উপজাত জিনিষ। তার কখনো বিনষ্টি ঘটে না। কিন্তু কেবল মহাপুরুষেরা সেটি লাভ করেন, সাধারণ মানুষ করতে পারে না।

বলেছি যে, পুরুষের পথ বিতর্ক বিচারের, প্রীতি ও সত্ত্বশুদ্ধি মেয়েদের মূল জীবনপথ। মেয়েদের সত্ত্ব ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, প্রীতি তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেটি অপরিহার্যরূপে বেড়ে চলে। কুড়ি বছর বয়সের পরের নারী দেহের আভ্যন্তরিক উৎকর্ষের মতো প্রীতির উৎকর্ষও সম্যক ভাবে আভ্যন্তরিক। বিবাহের ক্ষেত্রে স্ফূর্তি পেয়ে এই প্রীতি-বীজ ক্রমশ আনন্দ ভালোবাসা ও ভক্তির ফুল ফোটায়, ফল দেয়। নারীর প্রীতি বিবাহের একটি শ্রেষ্ঠ উপকরণ।

বর্তমান কালের আবহাওয়ার প্রভাবে মেয়েরাও পুরুষের মতো নিজেদের পার্সোনালিটি গড়ে তুলতে তৎপর। তার নানা উপায়। তার ফলে মেয়েদের দেহ মেয়েলি নিরিখ থেকে সরে চলেছে। তাদের যৌবন আহত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রীতির হ্লাদিনী শক্তি সাংঘাতিক ভাবে ক্ষুণ্ণ। এ ঘোর পরিবর্তন একটু পর্যবেক্ষণ করলেই বেশ বোঝা যায়। এই হ্লাদিনী শক্তিটুকুই বিবাহের মূল ভিত্তি। প্রকৃতি প্রতিঘাতপরায়ণ, নির্মম। তার দরবারে আপিল বলে কোনো জিনিষ নেই। তার পথ থেকে বিচ্যুত হলে, বিকৃত হলে তার আদেশ হয় মৃত্যু না হয় উষরতা।

পার্সোনালিটি লাভ করতে গেলেই মেয়েদের স্বধর্মবিচ্যুত হতে হয়। তার ফলে প্রীতির স্থানে কাঠিন্য আসে। প্রীতি ভালোবাসা সংসারের শ্রেষ্ঠতম শক্তি। সে দুটি আত্যন্তিক ভাবে নারীশক্তি। সে শক্তি হারিয়ে গেলে সংসারে ঘৃণা, বিরোধ, নিষ্ঠুরতা, হিংসা ছাড়া আর কিছুই থাকে না; প্রীতির আধার না হলে বিবাহ কখনোই পূর্ণ নয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহের উদ্দেশ্য কি? আমাদের দেশের প্রাচীন মত বলে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' সন্তানের জন্মদান করা এবং যতদিন না সে-সন্তান আত্মনির্ভর হয় ততদিন তাকে লালন করা বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই স্তরে মানুষ সকল স্তন্যপায়ী জীব এবং অধিকাংশ পক্ষীর সঙ্গে সমান। এটিকে মানুষের জীবস্তর বলা যায়। কাম আদিম, মানুষের সঙ্গে তার জন্ম। আদিম কালে কামের উদ্‌গতিগত সূক্ষ্মতর প্রকাশের অর্থাৎ প্রেমের কোন উপলব্ধি ছিলো না। নিজের ঊর্দ্ধ গমনের প্রয়োজনে মানুষ বহুকাল পরে প্রেম ও নীতির সৃষ্টি করেছে। আদিম কালে যেমন ছিলো, আজও তেমনি অনেক মানুষ বিবাহের জৈব উদ্দেশ্যটাকে মুখ্য বলে জানে। কাম মানুষের উচ্চতম এবং সূক্ষ্মতম ভাবের ও ক্রিয়ার উৎস। কামের ঊর্দ্ধ পরিণামের (ঊর্দ্ধ পরিণাম বা পরিমান—Evolution) অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে এবং সেই শক্তির কারণেই চারুশিল্প সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। ভালোবাসা মহিমময় কামশিল্প। সে আনন্দ কেবল একটি জান্তব উপভোগ নয়, সেটি মানুষকে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছে দিয়ে তার আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে। "আধ্যাত্মিক" অর্থে আমি ধার্মিক কিছু বলছিনে, আমাদের সূক্ষ্মতম অনুভূতিরই ইঙ্গিত করছি। এ ঊর্দ্ধ পরিণামের কথা আমরা যথাস্থানে বিচার করবো।

কেবল দৈহিক মিলন বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য, দেহ, মন, আত্মা এই ত্রয়ীর নিবিড় সম্যক মিলন, দুটি বিরুদ্ধ যৌন ব্যক্তিকে একাত্ম করা। দৈহিক মিলন তার ভিত্তিস্বরূপ, কেননা রতিমিলনের মতো এমন প্রগাঢ় সম্বন্ধ মানুষের আর নেই। যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করেছে তার রতিমিলন শুধু দেহের মিলন নয়, আর একটি আত্মাতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। পাঠক-পাঠিকাকে এ কথা বেশ স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আমরা বস্তুগত পথ ছাড়া আধ্যাত্মিক সোপানে উঠতে পারি না। বিবাহের দুটি স্তর। একটি জীবস্তর, সেটি প্রকৃতির রাজ্য। অন্যটি মানবস্তর, সেটি সংস্কৃতির রূপে রূপায়িত। [ক্রমশঃ।
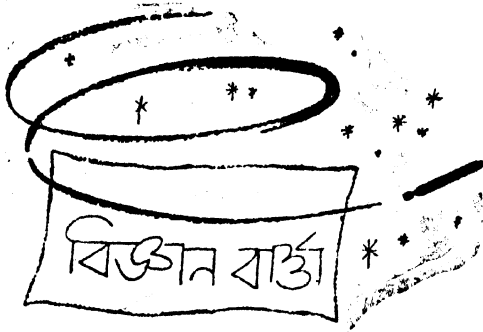
মুক্তির মুখে আফ্রিকা

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশ দখলের লড়াই থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর্ব যখন শেষ হোল, তখন দেখা গেল ইতিহাসের গতি সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যায়নি। সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করার লড়াই-এর পরিণাম হোল দুনিয়ার এক ষষ্ঠাংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তবু শিক্ষা হোলনা সাম্রাজ্যবাদীদের। উঠে-পড়ে লাগল তারা নতুন সমাজতন্ত্রকে নাবালক অবস্থায় গলাটিপে মারবার জন্য। তারা ফ্যাসিষ্ট কালসাপকে পুষতে লাগল দুধ কলা দিয়ে। কিন্তু সেই কালসাপ ছোবল মারল আগে তাদেরই। কাজেই আবার লড়াই না বেধে আর উপায় কি? দুটি সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরমপন্থী ফ্যাসিষ্ট জোট এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদের সঙ্গে হাত মেলানো সম্ভব ছিল না। তবে যুদ্ধের আগাগোড়া তারা যে নীতি অনুসরণ করেছিল, তার মূল কথা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শিবিরকে দাবিয়ে নিজেদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সেই সঙ্গে 'যাক শত্রু পরে পরে' এই প্রবাদবাক্য মেনে জার্মানী ও সোভিয়েতকে যতদিন পারা যায় লড়িয়ে রেখে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাম্রাজ্যবাদের শত্রু সমাজতন্ত্র এই দুই পাখীরই এক ঢিলে ডানা ভেঙ্গে দেওয়া।

বিশ্বের খনিজ ধাতু উৎপাদনে আফ্রিকার শতকরা অংশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হোল। জয় হল ইঙ্গ-মার্কিণ রুশ মিত্রপক্ষের। কিন্তু সাম্রাজ্যের জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল, তার পরিণাম এবারেও হোল ঠিক উল্টো। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ষোল আনা বার হয়ে গেল পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। তারপর ক্রমে ক্রমে এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের যে উপনিবেশগুলি বাকি ছিল, সেগুলিও গেল হাত-ছাড়া হয়ে,—ষোল আনা না হলেও, আট-দশ আনা তো বটেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন হোল কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ তারা এখনো ছিঁড়তে পারেনি।

সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসন থেকে এশিয়া আজ মুক্ত। বাকি আছে আফ্রিকা। আফ্রিকাই আজ ফরাসী, ব্রিটিশ, জার্মাণ ইতালীয় এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের আশা-ভরসা। তাই মরীয়া হয়ে তারা লড়ছে কাফ্রি জাতিগুলির মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ অ্যালজিরিয়ায় হিংস্র যুদ্ধ চালাচ্ছে ৫ বছর ধরে। শ্বেতাঙ্গ-প্রভুত্বকে আইনে মর্যাদা দিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় কুলীন ও বর্ণসংকর উপনিবেশভোগীরা কালো কাফ্রিদের তাজা রক্তে জমি লাল করে ফেলেছে। হীনজাতির মানুষকে হত্যা করা সেখানে পাপ নয়, পুণ্য, শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির কৌলীন্য অক্ষুণ্ণ রাখবার, নীলরক্ত নির্ভেজাল রাখবার মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ঊনবিংশ শতকে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী উঠতি বয়সে কালো মহাদেশে বেশ বড় একটি চাংড়া হাতিয়ে নিয়েছিল, কোথাও ছলে, কোথাও বলে, কোথাও বা কৌশলে। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হোল, তখন আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশের আয়তন ছিল ৭৬৬৬০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই জনবিরল কিন্তু রত্নগর্ভা এলাকায় বাস করত ২ কোটি ৮০ লক্ষ কাফ্রি এবং তাদের ১ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ প্রভু।

ফরাসী-কবলিত পশ্চিম ও বিষুবরৈখিক আফ্রিকার উত্তরাংশকে আফ্রিকানরা বলত 'মাগ্রেব'। মাগ্রেবকে ফরাসীরা তিন টুকরো করে যে তিনটি প্রশাসনিক এলাকা খাড়া করে, সেগুলিই আজ অ্যালজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কো। সমগ্র ঔপনিবেশিক অঞ্চলটি বিভক্ত হয় এই ভাবে:—মরিতানিয়া, সেনেগাল, সুদান, হয়তে-ভল্‌তা, গিনি, গজদন্ত উপকূল, দাহোমে, নাইগার, গার্ব, মধ্য কংগো, উবাঙ্গি—শারি ও চাদ।

তারপর কালো আফ্রিকায় ভূগর্ভে নিহিত যখের ধনের লোভে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পিছনে পিছনে এগিয়ে এল ব্রিটিশ, বেলজিয়ান, পর্তুগীজ ও স্পেনীয় উপনিবেশলিপ্সুরা। ব্রিটিশরা বুয়োর-যুদ্ধ করে আদিবাসীদের সবংশে বিনাশ করে জেঁকে বসল দক্ষিণ-আফ্রিকায়, মিশরে, সুদানে এবং অন্যান্য অঞ্চলে। বেলজিয়ানরা দখল করল কংগোর কিছুটা এবং রুয়ান্দা উরুন্দি; পর্তুগীজরা হাতিয়ে নিল অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক ইত্যাদি। স্পেনীয়দের ভাগে পড়ল মরক্কোর খানিকটা। এই ভাবে আফ্রিকার গোটা তিরিশেক দেশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত হোল, যাদের সম্মিলিত অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে প্রভু-দেশগুলির মোট এলাকার ১৪ গুণ।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার হীরক-সম্পদের শতকরা ৯৯ভাগ নিহিত রয়েছে আফ্রিকার ভূগর্ভে, স্বর্ণসম্পদের রয়েছে শতকরা ৫১ ভাগ, ক্রোমিয়ামের ৪০ ভাগ, তামার ২৭ ভাগ। সাহারার উত্তর অঞ্চলের

বুকে বইছে খনিজ তৈলের কলস্রধারা। সারা দুনিয়ার উৎপন্ন কোবল্টের দুই-তৃতীয়াংশ এবং বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম উৎপন্ন হয় বেলজিয়ান কংগোয়, যার শতকরা ১০ ভাগ চালান যায় আমেরিকায়। সেনেগ্যাল ও গ্যাম্বিয়ার অর্থনীতি নির্ভর করে চীনাবাদাম রপ্তানী করার ওপর। গজদন্ত উপকূলের অর্থনীতি কোকো গাছের ক্ষীণ বৃন্তে দোদুল্যমান, উগাণ্ডার অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে তুলা এবং কফি। ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমা সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর দেশের সব চেয়ে জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যা হচ্ছে একটি মাত্র রপ্তানীর সামগ্রী অর্থাৎ কোকোর উপর জাতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতা। ব্রিটিশ নাইজিরিয়া এক প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি ছিল। আরবী অভিযানে সেই 'সংঘে' সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। ষোড়শ শতকে ঠিক ভারতের মতই ব্রিটিশ বণিকরা সেখানে হানা দেয়। বণিকদের পিছনে পিছনে এল সবুট সঙ্গীনধারী সৈনিক। বণিকের মানদণ্ড সেখানেও রাজদণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আজ নাইজিরিয়ার খনিজ সম্পদের শতকরা ৭০ ভাগ ব্রিটেনে চালান যায়।

আফ্রিকায় জ্যান্ত মানুষ কেনা-বেচা আজও বন্ধ হয়নি। সেটা কোথাও চলে প্রত্যক্ষে, কোথাও পরোক্ষে। আদমসুমারীর হিসেব মত নাইজিরিয়ার লোক-সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি হলেও, আসল সংখ্যা আরো কিছু বেশি; কারণ লোকে 'পোলট্যাক্স' থেকে রেহাই পাবার জন্তে ছেলেপিলের সংখ্যা গোপন করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নাইজিরিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্ত দেশ থেকে দলে দলে লোক ধরে পশ্চিম গোলার্দ্ধে চালান দিয়েছে। আজ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে যে নিগ্রোদের নির্যাতনের খবর আমরা পাই, তাদের পূর্ব-পুরুষদের অধিকাংশই এসেছিল পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে, যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকা ও সিংহল-প্রবাসী ভারতীয় কুঠিমজুরদের পূর্ব-পুরুষদের চালান দেওয়া হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে। তারাও আজ কালা-আদমি হিসাবে কাফ্রিদের মতই দক্ষিণ-আফ্রিকায় পদদলিত। পর্তুগীজ উপনিবেশ আংগোলা ও মোজাম্বিকে করাসী চাদে, বেলজিয়ান রুয়ান্ডা-উরুন্দিতে সাম্রাজ্য-বাদীরা কাফ্রিদের জোর করে কুঠি ও খনিতে, সড়ক নির্মাণে কাজ করতে বাধ্য করে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজ কর্তারা অন্ত দেশের উপনিবেশের কলকারখানায়, খনিতে ও আবাদে কুলি বেচে দেয় এবং শিশু বিক্রয় ব্যবস্থা পর্যন্ত আজও চালু আছে। যে সব ক্ষেত্রে উপনিবেশ-ভোগীদের আবাদ বা কলকারখানা করবার পয়সা না থাকে, সেক্ষেত্রে তারা কুলি জোগাবার ঠিকা নিয়ে পয়সা কামায়।

পর্তুগীজ মালিকরা মোজাম্বিক থেকে প্রতি বছর লক্ষাধিক মজুর চালান দেয় রোডেসিয়া ও বেলজিয়ান কংগোতে এবং সেই ঠিকা থেকে কমিশন কামায়।

আফ্রিকার মানুষের রক্ত নিংড়ে নেবার আর একটি মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে, 'কনসেশন' বা বিশেষ সুবিধা। যেমন ধরুন বেলজিয়ান কংগোর সমস্ত জমি বেলজিয়ান রাজমুকুটের মুঠোয়ায় এনে (স্বাধীন কংগোর জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না) এই বনিক কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সাহারা মরুভূমিকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভাগাভাগি করে নিজ তেলের সন্ধানে লেগে পড়েছে। ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও কুয়ায়েতের মতই একচেটে ধনকুবেরের দল কংগো, নাইজিরিয়া, অ্যালজিরিয়া ও রোডেসিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করবার বিশেষ অধিকার আদায় করে নিয়েছে। বেলজিয়ান কংগোর মার্কিণ ইউরেনিয়াম কোম্পানীগুলি স্থানীয় আইনের আওতায় পড়ে না। পুলিশ, বরকন্দাজ, আদালত ও জেলখানা—সবই তাদের নিজেদের। অ্যালজিরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার শেষ হয়নি। অ্যালজিরিয়ার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ তারা মার্কিণ স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছে। লাভের বখরা সমান সমান এবং অ্যালজিরিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যে টাকা লাভ করছে, তাই দিয়ে তারা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যালজিরিয়ার মানুষের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক সংগ্রাম। নাইজিরিয়া থেকে ব্রিটিশ কোম্পানীরা একরকম বিনা পয়সায় দেশের শতকরা ৭০ ভাগ খনিজ সম্পদ স্বদেশে নিয়ে যায়। নাইজিরীয় শ্রমিকের মজুরী ব্রিটিশ শ্রমিকের মজুরীর ১০ ভাগের একভাগ এবং একজন ব্রিটিশ শ্রমিক এক সপ্তাহে যা কামায়, সম্বৎসরে একজন নাইজিরীয় শ্রমিক তার অর্দ্ধেকও কামাতে পারে না। ফরাসী অ্যালজিরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলি ১৯০০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে যে ২০০০ কোটি ফ্রাংক মূলধন বিনিয়োগ করে, তার অধিকাংশই এসেছিল অ্যালজিরিয়ার মানুষকে শোষণ করে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করার বিরুদ্ধে প্রথম আওয়াজ শোনা যায় সানইয়াৎ সেনের ত্রিনীতির (সান্‌-মিন্‌চু-আই) মধ্যে। সেই ত্রিনীতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বৈদেশিক কোম্পানীগুলির বিশেষ সুবিধা ভোগের বিরুদ্ধে। সানইয়াৎ সেনের সেই আদর্শ আজ পরাধীন দুনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলতে সাহায্য করছে। সেই আদর্শ বহন করে চীনের মানুষ যেমন চীনা জনগণের মুক্তিবাহিনী গঠন

ব্রিটেনে খনিজ দ্রব্য আমদানীতে আফ্রিকার শতকরা অংশ

৯৭	
৯৩	রবার
৬২	কয়লা
৭৬	খনিশিল্প
৯০	দেশলাই
৮৯	পাট
৮৬	চা

স্বাধীন ভারতের শিল্পে বিদেশী মূলধনের শতকরা অংশ

করে ৩০ বৎসর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল, ঠিক তেমনই আজ অ্যালজিরিয়ার নিপীড়িত মানুষ গঠন করেছে জাতীয় মুক্তি-বাহিনী—যে বাহিনী গত ৫ বছর ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন রোমের উপনিবেশভোগীরা বিজিত অঞ্চলে দাস কেনা-বেচা করে ও ভেট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। প্রাথমিক ধনসঞ্চয় ও শ্রমশিল্প—ধনতন্ত্রের যুগে উপনিবেশবাদীরা হোল আর এক কাঠি সরেশ। তারা দাস-ব্যবসা বজায় রাখল, কুলি চালান দেবার ঠিকা নিল এবং জলের দরে কাঁচামাল কিনে আগুনের দরে তৈরি মাল বেচতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী যুগে উপনিবেশবাদীরা তাদের পূর্বপুরুষদের ঘৃণ্য ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপর সবাই একজোট হয়ে খাড়া করেছে এমন এক সর্বগ্রাসী যৌথ উপনিবেশবাদ যা গোটা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মেহনতী জনতাকে সাম্রাজ্যবাদের যৌথদাসে পরিণত করেছে। কিন্তু কালো মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, বান্দুং সম্মেলন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দুর্বার অগ্রগতি এবং এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতা-বিজয়ী দেশগুলির সাফল্য আফ্রিকার জনগণকে সংঘবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা দান করছে। ঘানার স্বাধীনতা লাভ আফ্রিকার ঘটনা-প্রবাহকে দিয়েছে নির্দিষ্ট রাস্তার ইঙ্গিত। ১৯৫৭ সালে আফ্রিকায় ৪টি প্রধান রাজনৈতিক পার্টি গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক আফ্রিকা পার্টি বা আর, ডি, এ, 'আফ্রিক্যান কনভেনশন', 'আফ্রিক্যান সমাজতন্ত্রী আন্দোলন' এবং আফ্রিকান স্বাধীনতা পার্টি। এ ছাড়া সারা আফ্রিকার শ্রমিকশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেছে সারা আফ্রিকা শ্রমিকসংঘ। দ্য গল সরকার বেকায়দায় পড়ে শেষ পর্যন্ত অ্যালজিরিয়া বাদে অন্য উপনিবেশগুলিকে ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীন হবার সুযোগ দিতে চান এবং এই বলে সকলকে শাসান যে, কোন দেশ যদি ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে না থাকে, তাহলে ফ্রান্স আর কোন দিক দিয়েই তাকে সাহায্য করবে না। একমাত্র গিনি ছাড়া আর কোন দেশের জাতীয় নেতারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পাননি। সেকো তুরের নেতৃত্বে গিনির জাতীয় নেতৃত্ব সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি হালে সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে গিনি-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি পাকা করে এসেছেন। ওদিকে সম্মিলিত জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যামেরুন ও টোগোল্যাণ্ড আজ স্বাধীন। সেনেগাল, সুদান, দাহোমি, হয়ত্তে-ভোল্তা, নাইজার, গজদন্ত উপকূল ও বিষুবরৈখিক আফ্রিকার পরিস্থিতি অন্যরকম বলে এই সব দেশের জাতীয় নেতারা ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে রাজী হয়েছেন। অর্থাৎ এই দেশগুলি নাটোর বেড়াজালে ঘেরা ইউরাফ্রিকা পরিকল্পনার মধ্যেই থাকবে—যে ইউরাফ্রিকা মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি নিক্সনের মতে ২০।২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে নির্ণায়ক সংগ্রামের কেন্দ্র হবে। আফ্রিকাকে তাঁরা নাটোর অস্ত্রাগারে পরিণত করতে চান। সেই দিক থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং মরক্কো, লীবিয়া, ইরিট্রিয়া ও অন্যান্য জায়গায় মার্কিন ঘাঁটিগুলি অত্যন্ত জরুরী।

১৯৬০ সালে স্বাধীনতালাভ করবে পৃথিবীর বৃহত্তম উপনিবেশ নাইজিরিয়া (লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি) এবং ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড। পরাধীন আফ্রিকার মানচিত্রে আজ রেখারিত হয়েছে ১০টি স্বাধীন দেশ, যেগুলির মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭ কোটিরও বেশি অর্থাৎ আফ্রিকার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ শিখর সাম্রাজ্যবাদের দিগ্‌মণ্ডলে আজ গোধূলির কালো ছায়া নেমে এসেছে। —তরুণ চট্টোপাধ্যায়
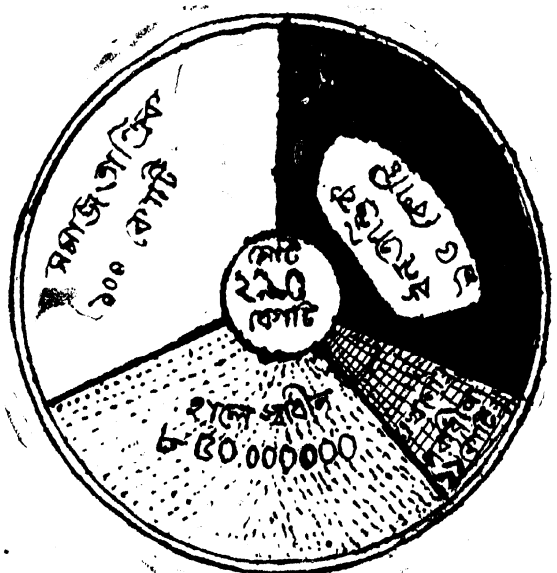
সারা দুনিয়ার ২৯০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১১ কোটি লোক এখনো সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আছে। ১০০ কোটি সমাজতন্ত্র রচনা করছে এবং ৮৫ কোটি লোক হালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মোট লোকসংখ্যা ৯৪ কোটি।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক-তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা। তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন। লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্যকরী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটী কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
SUNLIGHT SOAP

প্রদীপ ও পতঙ্গ

(শ্রীশশিশেখর বেদকের হিন্দী গল্প "বর্ফ ঔর বিজলী"র ছায়া অবলম্বনে)

তেজেন্দ্রলাল মজুমদার

সারা পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠলো ক্ষণিকের জন্ত। চারুর স্বপ্নভরা চোখের পেলব-মসৃণ পাপড়ি ছুটোকে ভিজিয়ে দিলেন রাজিন্দরনাথ। বহুদিনের নৈকট্য থেকে উদ্ভূত আবেগটুকু এতদিন বুঝি এই সুযোগটিরই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবেগ যখন কিছুটা শিথিল হয়ে এলো, তখন লজ্জায় অবনতা চারুর মত রাজিন্দরনাথও চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না। নিজের আটাশ বছরের জীবনে এত নিকট-সান্নিধ্য কোনও দিনই কোনও মেয়ের কাছ থেকে পেতে পারেননি তিনি। তাই এই একটু আগে যা আদায় করে নিলেন তিনি চারুর কাছ থেকে, তা তাঁর জীবনের প্রথম অনুভূতি—স্বপ্নময়, মোহময়, কাব্যময়! হৃৎপিণ্ডের দুরু-দুরু স্পন্দনেও যেন এই অনুভূতির আলোড়ন জেগে উঠেছে।

অখণ্ড স্তব্ধতায় কেটে গেল কয়টি মুহূর্ত। তারপর প্রথম নড়ে উঠলো চারুই, ক্ষিপ্রহাতে অবিন্যস্ত চুলের খোঁপা বেঁধে নিয়ে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলো সে হাই-হিলে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ তুলে, অনুকম্পা-মেশানো দৃষ্টিতে বেরিয়ে যেতে যেতে একবারটি তাকালোও সে ডাক্তার রাজিন্দরনাথের দিকে।

এ দৃষ্টির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হলো না ডাক্তার রাজিন্দরনাথের। অপরাধীর মত চারুর চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। চারু যেন এক জটিল সমস্যা তাঁর কাছে। আপত্তি সে করেনি, উৎসাহও সে দেয়নি—সব মিলিয়ে যেন বিরাট এক নির্বিকারতা চারুর মধ্যে। তার চেহারায় অনুরক্তির সামান্যতম আভাস তিনি যেমনি পাননি, তেমনি দেখেননি তিরস্কারের ক্ষীণতম ইঙ্গিতও। বুকভরা সংশয়ে একটি দিন কেটে গেল ডাক্তার রাজিন্দরনাথের।

ঘটনাটা কাশ্মীরের এক সামরিক হাসপাতালের। শ্রীনগর থেকে মাইল তিরিশেক দূরের গ্রাস গাঁও সামরিক কারণে গুরুত্ব পেয়েছে মাস কয়েক ধরে। পাকিস্তানী হানাদাররা ওপারের গুরিয়াস গাঁও পর্য্যন্ত নিজেদের করায়ত্তে এনে পঙ্গপালের মত এগিয়ে আসছে গ্রাস গাঁও হয়ে শ্রীনগরের দিকে। ভারতীয় সেনার ছাউনি নির্মিত হয়েছে গ্রামের উঁচুনীচু পাহাড়ী সানুদেশে আর অনতিদূরের নাম-না-জানা এক গ্রামে তৈরী হয়েছে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করার জন্ত সামরিক হাসপাতাল।

ডাক্তার রাজিন্দরনাথ এই হাসপাতালের মুখ্য সার্জেন। আটাশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক, চেহারায় ফুটে রয়েছে মেধা আর আভিজাত্যের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। বয়সে যুবক হলেও অপারেশন থিয়েটারে সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে যখন তিনি আহত সৈন্যের পাশে এসে দাঁড়ান, তখন কে তাঁকে অবজ্ঞা করবে কমবয়সী ডাক্তার বলে? কে অস্বীকার করবে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যতাকে?

নার্স থেকে কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত সবাই ভয়ে হিমসিম খেয়ে যায় ডাক্তার রাজিন্দরনাথের সামনে এসে। নার্সের হাতের ট্রে থেকে সার্জারির যন্ত্রপাতিগুলোকে এক এক করে তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করেন রাজিন্দরনাথ। কখনও কখনও খেঁকিয়ে ওঠেন, হোয়াট ইজ দ্যাট। কে ষ্টারালাইজ করেছে একে?

অপরাধীর মত জবাব দেয় নার্স, আজ্ঞে, আমি স্যর।

তুমি! রাশভারী স্বরে বলেন রাজিন্দরনাথ, রোগীকে মারবার ইচ্ছা নেই তো তোমার? যাও, নো এ্যাণ্ড ষ্টারালাইজ ইট এগেন।

কাজে একটুকু খুঁত থাকতে দেন না রাজিন্দরনাথ। তাই জটিলতম অস্ত্রচিকিৎসায়ও আজ পর্য্যন্ত অসফল হননি তিনি। রোগী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাজিন্দরনাথের হাতে এলে সামরিক মহলে বলাবলি হয়, যাদু জানে ডাক্তার রাজিন্দরনাথ। ওকে দেখলেই রোগ পালায় আপনা থেকে, ভাঙ্গা শরীরে জোড়া লাগে।

চারু এই হাসপাতালের ম্যাট্রন। আর ম্যাট্রন হিসাবে ডাক্তার রাজিন্দরনাথের কাছে সব চেয়ে বেশী কাজ পড়ে তারই। সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি আর প্রতিভার এক আশ্চর্য্য সমন্বয় চারুর মধ্যে। অকারণে সে হাসে না, নিষ্প্রয়োজনে সে কথা বলে না—গাম্ভীর্য্য যেন চার দিক থেকে ছেয়ে আছে এই যুবতী ম্যাট্রনটিকে। তবে এই গাম্ভীর্য্য আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে নয়, শীতের রৌদ্রের মতই ঝলমলো।

এই ম্যাট্রন চারুকে বড় ভাল লাগে ডাক্তার রাজিন্দরনাথের। আর লাগে রোগশয্যায় শায়িত যন্ত্রণাকাতর সৈন্যদেরও। সারা হৃদয় জুড়ে যেন মমতা ভরে আছে চারুর। মায়ের মতই সবাইর শিয়রে এসে বসে সে, কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, সুখ-দুঃখের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

* * * যা ভেবেছিল রাজিন্দরনাথ তা কিন্তু হলো না পরদিন থেকে। প্রতিদিনের মত সেদিনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজে এলো ম্যাট্রন চারু। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কাজের কথা নিয়ে আলোচনাও করে গেল। চেহারা কিংবা কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পেল না কোনও ভাবান্তর। শুধু লক্ষ্য করলো ডাক্তার রাজিন্দরনাথ, কাজের শেষে প্রতিদিনের মত সেদিন আর কনসালটিং রুমে গল্প জুড়তে এলো না চারু।

সপ্তাহে একটি দিন ছুটি থাকে হাসপাতালের কর্মচারীদের। সেদিন শ্রীনগরে গিয়ে সিনেমা দেখে, নৌকা বিহার করে অথবা বাজার করে কাটায় কর্মচারীরা। মুখ্য সার্জেন রাজিন্দরনাথের এই সপ্তাহান্তর ছুটিরও কোনও নির্দিষ্ট দিন থাকে না, যেদিন হাসপাতালে কোনও সার্জারির কেস থাকে না, শুধু সেদিনই ছুটি পেতে পারেন তিনি।

ভাগ্যক্রমে এবার একই দিনে ছুটি পেল চারু আর রাজিন্দরনাথ। ছুটির সকালে লনের বেতের চেয়ারে বসে এ মাসের মেডিক্যাল জার্ণালের পাতা নাড়াচাড়া করছিলেন রাজিন্দরনাথ, কিন্তু কিছুতেই যেন মন সংযোগ করতে পারছিলেন না তিনি।

মনে পড়ে গেল, চারুর কথা। আজ ভোরে ঘুম ভাঙতেই অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় ভাবছিলেন তিনি চারুকে [illegible] একটি ছুটির

দিনে চারুকে নিয়ে শ্রীনগরের কোনও হ্রদের ধারে বসে থাকা অথবা অন্ততঃ পক্ষে এক শো সিনেমাও কি দেখা যায় না ? সেদিনের পর থেকে চারুকে আর একান্তে পান নি, অথচ এখনও তাঁর কত কথা রয়ে গেছে চারুকে বলবার মত।

রাজিন্দরনাথের মনের আকাশে নিমেষেই যেন রং ধরিয়ে দেয় চারুর কল্পনা। গাত্রোত্থান করে উঠে পড়েন তিনি। আলনাতে ঝুলিয়ে রাখা ফ্ল্যানেলের সৌখিন স্যুট পরে নিয়ে এক সময় বেরিয়েও পড়েন চারুর উদ্দেশ্যে।

তাঁর অনুমান মিথ্যে হয় নি। ষ্টাফ লাইব্রেরীর এক কোণে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিল চারু। পায়ের শব্দ পেতেই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠলো সে, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, গুড মর্নিং ডক্টর ?

গুড মর্নিং চারু—বললেন রাজিন্দরনাথ, কি পড়ছ এত মন দিয়ে ?

বই-এর মলাটের দিকে এক বারটি চেয়ে নিয়ে বললে চারু, 'মানবতার বিড়ম্বনা'—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা একজন ইউরোপীয়ান নার্সের আত্মকথা।

তোমার ভালো লাগছে কি এই বই ? এই বইতে তো আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সারা দুনিয়া জুড়ে একটি রাষ্ট্র তৈরী করো, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা নিশ্চিহ্ন করে দাও। অন্ধ স্বদেশপ্রেমকে ক্ষমাহীন অপরাধ বলে গণ্য করো।

আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ডক্টর,—নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে নিয়ে বললে চারু—আমার দেশকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি আর ভালোবাসি বলেই মাদ্রাজে আত্মীয়-পরিজন সবাইকে ছেড়ে দেশের প্রয়োজনে কাশ্মীরের এই রণক্ষেত্রে আসতে আমি আপত্তি করি নি। তবু আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন, এই বইতে দেশভক্তি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে আমি তাকে মানি, শ্রদ্ধা করি। এই বইয়ের যিনি লেখিকা তিনি যে মানসিক অবস্থা থেকে দেশপ্রেম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন—তা যাঁরা বুঝেছেন, এই বই তাঁদের ভালো লাগবেই। কাশ্মীরের এই রণাঙ্গনে এসে আজ পর্য্যন্ত যে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা থেকে আমিও যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন মন-প্রাণ দিয়ে কামনা করি। মানুষ মানুষকে হত্যা করবে—এ যে কত বড় ক্রূরতা—কত বড় নীচতা—তা কি আপনি বোঝেন না ডক্টর ?

মৃদুভাষিণী চারুও যে অনর্গল এত কথা বলতে পারে তা কোনও দিনই ভাবতে পারেন নি রাজিন্দরনাথ। প্রত্যুত্তরে তাই কথা যোগালো না তাঁর মুখে।

কয়েক মুহূর্ত্তের অখণ্ড নীরবতার পর থমথমে ভাবকে হাল্কা করে দিতে আবার কথা বলল চারুই, মৃদু হেসে বললে সে, আপনার ছুটির সকালটাকেই আমি আজ মাটি করে দিলাম ডক্টর, তাই না ?

না, না, মোটেই কিছু নয় চারু। শুধু একটু বেশী হয়ে গেছে এই যা ;—প্রাণ খুলে হাসলেন রাজিন্দরনাথ, তোমারও তো আজকে ছুটি চারু ?

হাঁ।

তাহলে চলো না দুজনে মিলে শ্রীনগর ঘুরে আসি। বোটিং না হয় সিনেমা একটা কিছু দিয়ে বেশ সময় কাটানো যাবে ওখানে।

রাজিন্দরনাথের প্রস্তাব যেন অনভিপ্রেত ছিল চারুর কাছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে সে, যদি আমি না যাই, তাহলে কোনও ক্ষতি হবে কি ?

সে তোমার ইচ্ছা—বললেন রাজিন্দরনাথ।

এক্স্‌ট্রিম্‌লি সরি। আমি তা হলে যাবো না ডক্টর—এর মধ্যে নিজেকে যেন আয়ত্তে নিয়ে এসেছে চারু।

রাজিন্দরনাথ আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করলেন না। হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে এলেন তিনি লাইব্রেরীর দরজা পেরিয়ে।

এর পরের বার ছুটি এলো দীর্ঘ দশ দিন বাদে। পঙ্গপালের মত এগিয়ে আসা হানাদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে জীবন পণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হিন্দুস্থানের বীর সৈনিকেরা। আহত সৈন্যের ভীড়ে হাসপাতাল তাই ভরে উঠেছে আর হাসপাতালের নিয়মানুগ জীবনেও এসেছে বিরাট ব্যতিক্রম। ডাক্তার রাজিন্দরনাথ অপারেশন থিয়েটারে ঢোকেন সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আর তাঁর বেরিয়ে আসতে আসতে সূর্য্য ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে। কর্মবহুল দিন কাটছে রাজিন্দরনাথের, আর তাই ম্যাট্রন চারুর পাশাপাশি থেকেও এতদিন কেন জানি চারুর কথা ভাবতে পারেন নি তিনি।

কিন্তু আজ অবসর পেতে না পেতেই দশ দিনের না ভাবা ভাবনারা যেন বন্যাস্রোতের মত কলকলিয়ে উঠলো রাজিন্দরনাথের হৃদয়নদীতে, নিজেকে হঠাৎ কেন জানি বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো তাঁর। অকারণে ভাবতে লাগলেন তিনি, কোন ধাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন ওই চারুকে, হৃদয় ব'লে কি কিছু নেই ওর ?

আগের দিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল রাজিন্দরনাথের। ডোগরা রেজিমেণ্টের এক আহত সিপাহীর অপারেশন শেষ করে থিয়েটারের টেবিলে ক্লান্তির নিশ্বাস টানছিলেন তিনি, এমনি সময় হাই-হিলে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তুলে চারু এসে বললো, কনগ্র্যাচুলেশন্ ডক্টর !

থ্যাংক্ ইউ ম্যাট্রন ! কেমন আছে রোগী ?

খুব ভালো, বললে চারু, চলুন কোয়ার্টারে ফেরা যাক।

কোয়ার্টার ! হঠাৎ কেন জানি উদাস হয়ে পড়লেন রাজিন্দরনাথ, বললেন, কি হবে কোয়ার্টারে ফিরে, বেশ তো রয়েছি এখানে।

বিস্ময়ের সুরে বললে চারু, ডোণ্ট বি সো সিলি ডকটর, শরীর বাঁচিয়ে তো সব কিছু। আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি আপনার। চলুন, খাবেন চলুন।

এর পরে আর প্রতিবাদ করেননি রাজিন্দরনাথ। হাসপাতালের ব্যারাক পেরিয়ে কাঁকর-বিছানো সড়ক হয়ে দুজনে এগিয়ে এলেন তাঁরা কোয়ার্টারের দিকে। পথ চলতে চলতে বললেন রাজিন্দরনাথ, আজ আমি যেন অস্থির হয়ে উঠেছি ম্যাট্রন ! সেই আহত ডোগরা সিপাহীকে দেখবার পর থেকে আমার কেন জানি বার বার মনে হচ্ছে ছেড়ে ছুড়ে দিই এই সার্জেনের কাজ। এতদিন তো জীবন দিলাম মানুষকে, এবার জীবন ছিনিয়ে নিতে ক্ষতি কি ?

আপনি কি বলছেন ডক্টর ! প্রতিবাদের সুরে বললে চারু।

ঠিকই বলছি ম্যাট্রন ! এবার আর সার্জারির যন্ত্রপাতি নয়, রাইফেল তুলে নেবো নিজের হাতে। মানুষের বিরুদ্ধে যে মানুষ এত নির্মম হতে পারে তাদের মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো না করে দিলে শান্তি নেই আমার। অন্ধকারে যেন জোনাকীর মত দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলো রাজিন্দরনাথের এক জোড়া চোখ। কথার মোড় ফিরিয়ে দিতে শান্ত-প্রশান্ত কণ্ঠে বললে চারু, শেষ পর্য্যন্ত সেদিনের সেই 'মানবতার বিড়ম্বনা' বইটিতে ফিরে এলেন তো আপনি ?

নিমেষে যেন মনের সবটুকু উষ্ণতা হারিয়ে ফেললেন রাজিন্দরনাথ। সেদিনের সেই লাইব্রেরীর কথা মনে পড়তেই বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো তাঁর মন। কোনও রকমে চারুর পাশ কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি নিজের কোয়ার্টারে।

ক্লান্তিবিহীন দীর্ঘ দশটি দিনের পরে আজ আবার ছুটি পেয়েছেন রাজিন্দরনাথ। কিন্তু আজ কেন জানি না, বিছানা ছেড়ে উঠতেও মন চাইছে না তাঁর। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন তিনি চারুর কথা, আর ভাবছিলেন, কোন্ ধাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন ওই চারুকে, হৃদয় বলে কি কিছু নেই ওর ?

এমনি সময় মৃদু আর্তনাদ করে খুলে গেল ভেজানো দরজাটা। চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন রাজিন্দরনাথ, দরজার চৌকাঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে স্মিত হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারু। বললে, কি ব্যাপার, আজকের ছুটির দিনে ঘুমিয়েই কাটাবেন নাকি ?

না, ছুটি ক্যেন্সেলই করিয়ে নেব ভাবছি—বললেন রাজিন্দরনাথ।

কেন ?

কি হবে ছুটি নিয়ে ? হাসপাতালের কাজে থাকলে তবু যা হোক করে সময় গড়িয়ে যায়।

আমি ভাবছিলুম, আমরা দুজনে শ্রীনগরে গিয়ে আজ সিনেমা দেখে আসতাম। একটা ভালো ফিল্ম এসেছে, 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস'— স্থির শান্ত কণ্ঠে বললে চারু।

কি বলছ তুমি চারু ?

ঠিকই বলছি। আপত্তি না থাকে তো চলুন, বারোটার বাসে এখান থেকে শ্রীনগর যাওয়া যাবে।

রাজিন্দরনাথের মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্ন দেখছেন তিনি। যেন শুষ্ক বিবর্ণ লতায় লতায় আবার সবুজের সমারোহ জেগে উঠেছে। বললেন তিনি, বারোটায় বাস তো ? আমি তৈরী হয়ে নেব তার মধ্যে, তুমিই এখানে এসো চারু !

স্রোতের মত সময় গড়িয়ে গেল। মনে হচ্ছিল রাজিন্দরনাথের, যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন তিনি, যেন কোন্ এক সীমাহীন রহস্যের ছায়াপথ ধরে এগিয়ে চলেছেন তিনি আশ্চর্য্য সুন্দর এক অভীষ্টের দিকে। সামনের প্রকাণ্ড পর্দায় ছায়াছবিরা সুখ-দুঃখের অভিনয় করে যাচ্ছিল—কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ রয়েছে কি তাঁর ? চারুর নরম হাতখানাকে আলতো ভাবে নিজের কোলে তুলে নিয়ে খেলা করছিলেন তিনি আঙুলের সাথে। আশ্চর্য্য, বিন্দুমাত্র আপত্তি করছে না চারু অথবা সরিয়েও নিতে চাইছে না নিজের হাতখানাকে।

রাজিন্দরনাথ সম্বিৎ ফিরে পেলেন হলের সব কয়টি আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠতেই। দর্শকেরা সবাই উঠে পড়েছে নিজেদের আসন ছেড়ে। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ নিমিষেই যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে বহু কণ্ঠের মিলিত আওয়াজে।

চারু বললে, চলুন, বেরোনো যাক্।

বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এলেন রাজিন্দরনাথ চারুর সাথে সাথে।

লেক্ ভিউ রোডের এক বিলেতী হোটেলে ডিনার খেলেন ওঁরা দুজনে। ন্যাপকিন্ দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে ফ্যামিলী রুমের দিকে এগিয়ে এলো চারু। রাজিন্দরনাথ স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলেন চারুকে, দেখছিলেন চারুর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আর পায়ের গোড়ালীর কাছে শাড়ীর প্রান্তটুকুর অবাধ্য দোল খাওয়া পর্য্যন্ত। চকিতে এক উদ্দাম আলোড়ন যেন বয়ে গেল তাঁর ধমনীতে ধমনীতে, যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালাময়ী অগ্ন্যুৎপাতের মত হৃদয়ের অজস্র কামনা উৎক্ষিপ্ত হয়ে এলো লাভাস্রোত হয়ে।

নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না রাজিন্দরনাথ। ফ্যামিলী রুমের ভেজানো দরজা খুলে, ভিতরে এসে দাঁড়ালেন তিনি চারুর সামনে। উন্মত্তের মত চারুকে সজোরে টেনে এনে ডাকলেন তিনি, চারু, চারু !

চারু ! কে আপনার চারু ? আমি তো ম্যাট্রন, ডক্টর ! এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ঘৃণায় আর অবজ্ঞায় বললে চারু।

রাজিন্দরনাথ যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ক্ষিপ্র পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

শ্রীনগর থেকে দ্রাস পর্য্যন্ত আবার একই বাসে এলো ওরা দুজনে। কিন্তু কথা বললো না কেউই। যেন চেনে না ওরা একে অন্যকে—অপরিচিত, অত্যন্ত অপরিচিত ওরা পরস্পর পরস্পরের কাছে !

পরদিন অপারেশন কেস ছিল হাসপাতালে। ফ্রন্ট থেকে এক গুলীবিদ্ধ সৈনিককে নিয়ে আসা হয়েছে এ্যাম্বুলেন্স কারে চাপিয়ে। চকিতে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলো সমগ্র অপারেশন থিয়েটার। ডাক্তার রাজিন্দরনাথ এলেন, এলো ম্যাট্রন চারুও।

কিন্তু কি হয়েছে আজ রাজিন্দরনাথের ? কিছুতেই যেন আজ

কাজে মন লাগাতে পারছেন না তিনি। অসহায়ের মত হতাশায় ভরে আছে তাঁর চোখ দুটি—উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির—কাল সারা রাত তিনি ঘুমিয়েছেন কি না কে জানে!

অপারেশন হলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু রোগী আর বাঁচলো না। হাসপাতাল-জীবনে সার্জেন রাজিন্দরনাথের আজ প্রথম ব্যর্থতা—অথচ তেমন জটিলও তো ছিল না এই কেসটি। সামান্য একটা বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল রোগীর ডান দিকের জানুতে। আর একটু চেষ্টা করলে কি আর এই রোগীকে বাঁচানো যেত না?

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে এসে সটান শুয়ে পড়লেন রাজিন্দরনাথ। ব্যর্থতায় আজ যেন ভিজে কাঠের মত ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে তার মনের অজস্র আশা-আকাঙ্খা। কানের সামনে বার বার তাঁর বেজে উঠতে লাগলো শুধু একটি ঘৃণা আর অবজ্ঞা ভরা কণ্ঠস্বর, চারু! কে আপনার চারু? আমি তো ম্যাট্রন, ডক্টর!

আটাশ বছরের জীবনে আজ পর্যন্ত কোনও ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে নি রাজিন্দরনাথের। শুধু এইবার, এই প্রথম বার অদৃষ্ট তাঁকে পরিহাস করলো! তাঁর ভালোবাসাকে ঘৃণা আর অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলো চারু—ম্যাট্রন চারু!

কখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, কখন আলো জ্বললো, আবার নিবেও গেল, কখনই বা মধ্য রাত্রি ঘনিয়ে এলো—কিছুই টের পেলেন না রাজিন্দরনাথ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু তিনি ভেবেই চলছিলেন অজস্র হিজিবিজি।

কেন চারু তাঁকে ফিরিয়ে দিল? চারুকে কি তিনি ভালোবাসা দিতে পারতেন না? পারতেন না কি দিতে নারী-জীবনের যা কিছু কাম্য, তার সবটুকুই? তবে কি চারু তাঁকে অবিশ্বাস করেছে? বুকের মাঝে বিরাট এক শূন্যতা হঠাৎ যেন অনুভব করলেন রাজিন্দরনাথ। তাঁর মনে হলো, চারুকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবন অর্থহীন, অসম্পূর্ণও। ভালোবাসাকেই যদি ভুলে যেতে হলো, তাহলে কি লাভ বেঁচে থেকে?

কাঠঠোকরা পাখীর মত হঠাৎ ঠক্‌ঠক আওয়াজ হলো দরজার বুকে। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটি। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন রাজিন্দরনাথ। কিন্তু এ কি! স্বপ্ন তো দেখছেন না তিনি? নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রাজিন্দরনাথের। বিশ্বের সবটুকু কাব্যময় সৌন্দর্য্য যেন এই মুহূর্তটিতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে তাঁর শয়নগৃহের উন্মুক্ত দরজায়। টেবিল-ল্যাম্পের যে ক্ষীণ রশ্মিটুকু দরজার সীমানা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিল, তাতে তিনি স্পষ্ট চিনতে পারলেন চারুকে।

নিমেষেই সমস্ত গ্লানি আর যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে উদ্দাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন রাজিন্দরনাথ। দুহাতে চারুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, চারু, চারু, তুমি এসেছ প্রিয়তমে! আমি জানতেম তুমি আসবে।

অনেক হয়েছে ডক্টর! প্রথমে দরজা বন্ধ করুন আর আলো নিবিয়ে দিন—নির্বিকার কণ্ঠে বললে চারু।

সেতারের তার যেন ছিঁড়ে গেল। শরবিদ্ধ পশুর মত দূরে ছিটকে এলেন রাজিন্দরনাথ। ডক্টর! এখনও তাহলে ডক্টরই রয়ে গেছেন তিনি চারুর কাছে। নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললেন তিনি, আমাকে কি তুমি পশু ভেবেছ চারু?

পুরুষের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পশুত্বেরই নামান্তর ডক্টর! আর এর জন্যই আপনার কাছে আমি এসেছি। বাসনার তৃপ্তি হলেই আমার জন্য আপনার আর আকর্ষণ থাকবে না। তখন আপনি আবার মনুষ্যত্ব ফিরে পাবেন। নিন্‌, আর দেরী নয়, যা করবার হয় করুন শীগ্‌গির।

রাজিন্দরনাথ তাকালেন চারুর দিকে। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তির সুরভি মাখানো অপূর্ব সুন্দর একজোড়া চোখ! প্রণয়ের উন্মাদনা তাতে যেমনি নেই, তেমনি নেই অভিসারিকার উন্মাদ উত্তেজনাও। শুচিতার শান্ত প্রদীপের মতই যেন অচঞ্চল সে চোখের দৃষ্টি!

শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে চারু, ডক্টর, মায়ের ভালোবাসাকে অস্বীকার করে, নববধূর প্রণয়কে অবহেলা করে হিন্দুস্থানের শত শত বীর ছেলে এসে পৌঁছেছে কাশ্মীর ফ্রন্টে। তাদের জীবন আজ আপনার হাতে। আজকের মত যদি আপনার অপারেশন অসফল হতে থাকে, তাহলে কে সান্ত্বনা দেবে এই মায়ের দলকে? কে মুছিয়ে দেবে এই নববধূদের চোখের জল? আমায় ভুল বুঝবেন না ডক্টর, আমারও হৃদয় আছে। কিন্তু আজ যখন সর্বনাশের ঝড় বয়ে চলছে সারা দেশের বুকের উপর দিয়ে, তখন কর্ত্তব্যবিমুখ হয়ে প্রেম নিয়ে মগ্ন হওয়া কি পশুত্বেরই নামান্তর নয়? ডক্টর, আজ সন্ধ্যা থেকে খুনী আক্রমণ আরম্ভ করেছে পাকিস্তানী হানাদাররা। কাল বহু আহতকে জীবন দান করতে হবে আমাদের। এমনি সময় আপনার ভেঙ্গে পড়লে চলবে কি? আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পেলে যদি আপনার ভাঙ্গা মনে জোড়া লাগে, তবে তাই নিন। কিন্তু দোহাই আপনার, আপনি যেন ভেঙ্গে পড়বেন না।

ক্ষিপ্র হাতে ব্লাউজের বোতাম একে একে খুলতে আরম্ভ করলো চারু। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না রাজিন্দরনাথ। চারুর হাত দুখানাকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে এনে, শিশুর মত কেঁদে কেঁদে বললেন তিনি, 'আমায় ক্ষমা করো চারু, ক্ষমা করো।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর ভাবগতিক যুগান্তরের দাদাদের পছন্দ হচ্ছিল না,—এবং তাঁরা শরৎ চ্যাটার্জীকে নেতা খাড়া করার চেষ্টায় তোয়াজ সুরু করেছিলেন। বোধহয় রংপুরে, এক যুব-সম্মিলনীতে শরৎবাবুকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল,—এবং "স্বাধীনতায়" তাঁর সমগ্র ভাষণ ছাপা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ বাবুর এক বক্তৃতার সারাংশমাত্র ছাপা হয়েছিল। সুভাষ বাবু হঠাৎ এক ধমক দিয়ে দিলেন,—তিনি কংগ্রেস ছেড়ে ছাত্র ও যুব আন্দোলন নিয়ে থাকবেন। দাদাদের পিলে চমকে গিয়েছিল। তাঁর "ঘরের অবস্থার" এও আর একটা দিক।

স্বাধীনতা যখন লিখছে, বাইরে নেতার সর্বেসর্বা ক্ষমতা স্বীকৃত হলেও, ঘরের মধ্যে নেতার উচিত দলের কাজে মাথা নত করা,—ঠিক তখনই কুমিল্লায় যুবসম্মেলনে প্রতুল গাঙ্গুলী বক্তৃতা দিচ্ছেন, নেতার আদেশ সেনাপতির আদেশের মতন সর্বদা ও সর্বথা পালনীয়। এদের সকলেরই টার্গেট তখন সুভাষ বাবু। তিনি পেকেছেন এমনি করে অনেক পোড় খেয়ে।

১৯২৮:২৯ সাল সময়টা ছিল এমন, যখন বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থাটা হয়েছিল যেন একটা প্যান্ডিমোনিয়াম—যেন ইংরেজীতে যাকে বলে melting pot—অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী এবং স্ববিরোধী আদর্শ, কর্মপন্থা, সংগঠন প্রচেষ্টার এলোপাতাড়ি হুড়-হাঙ্গামা। ইংরেজ '৩০ সালে যে আর এক কিস্তি স্বরাজ দেবে, তার আগে একটা লড়াই দরকার, যাতে সে স্বরাজটা নেহাৎ ইংরেজের খুসীমত যাচ্ছেতাই না হয়,—কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের লক্ষ্য সেই দিকে—এবং মহাত্মার নেতৃত্বে তাঁরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস আদায়ের চেষ্টায় তদনুযায়ী এক লড়াইয়ের প্ল্যান আঁটছেন। সাধারণ কংগ্রেসীরা আছেন তাঁদের পিছনে। এই হল মূল কংগ্রেসী আন্দোলন।

বিপ্লবী-দাদারা কংগ্রেসের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার দাবীর চেষ্টায় ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বিরোধিতা করছেন,—বাংলায় তার বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে সুভাষ বাবুকে খাড়া করা, কিন্তু গান্ধীভক্তির কম্পিটিশনে হেরে গেলে যেহেতু কংগ্রেসের মধ্যেও অবস্থা কাহিল হবে,—অতএব গান্ধীভক্তি বাঁচিয়েই তাঁরা স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে কর্মীদের সচেতন করতে চাইছেন। তার [illegible] স্বাধীনতা এবং সুভাষ বাবুর নামে সর্বপ্রকার সংস্থা সংগঠন ক্যাপচার করা—ছাত্রসংস্থা—যুবসংস্থা থেকে মিউনিসিপ্যালিটি-জেলাবোর্ড-ইউনিয়নবোর্ড পর্যন্ত। এ নিয়ে সর্বত্র এমন দলাদলি সুরু হয়েছিল যে, একটা নতুন রাজনৈতিক শব্দ গজিয়েছিল,—ক্যাপচারিজম। আনন্দবাজার পত্রিকায় সুভাষ বাবুকে বলা হত খোকা-ভগবান,—শরৎ বাবুকে বলা হত কটকী হোঁৎকা। দাদাদের কাণ্ডে সুভাষ বাবুর জনপ্রিয়তা এমন মার খাচ্ছিল যে, কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে সুভাষ বাবু প্রার্থী হলেন দেখে সেনগুপ্ত যখন সরে দাঁড়ালেন, তখন সুভাষ বাবুকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হলেন বি, কে, বসু।

'২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের দুই বৃহৎ বিপ্লবীদলের অ্যামেলগ্যামেশন একটা বেলেল্লারীতে পর্যবসিত হওয়ার পর অনুশীলন দল গিয়েছিল সেনগুপ্তের শিবিরে,—সন্তোষ মিত্রের দল এবং অমুকূলদা, অমর বসু প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সেনগুপ্তের অর্থের অনটন ছিল,—সে অনটন ঘোচাতে এগিয়ে এসেছিলেন জে, সি, গুপ্ত। পরে তাঁর অর্থানুকূল্যেই Advance কাগজ বেরিয়েছিল।

বিপ্লবের খোঁজ নেই,—শুধু স্বাধীনতার নামে ইলেকশন আর ক্যাপচারের দলাদলিতে হাঁপিয়ে গিয়ে বিপ্লবী তরুণেরা ক্রমে দড়ি ছেঁড়ার উপক্রম করছিল। বছরের পর বছর দাদাদের হুকুমে যত বাজে লোকের জন্যে ভোট সাধা, এই করতে কি আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম? এই ছিল তাদের মনোভাব। দাদারা কিছু করবে না, সুতরাং আমাদের নিজেদেরই কিছু করতে হবে, এই মনোভাব থেকে তারা আবার বোমা-রিভলভার সংগ্রহের দিকে ঝুঁকছে। কংগ্রেসে যে হাজার হাজার ছেলে ভলান্টিয়ার হয়েছিল, কোন না কোন বিপ্লবী-দাদা তাদের অনেককেই ঠুকরে দেখেছেন—তারা স্বাধীনতা, বিপ্লব এবং মিলিটারী প্যারেডের লাইনে ভাবতে সুরু করেছে; কোন কোন বিপ্লবীদল জেলা-কংগ্রেস দখল করে, তারই মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সংগঠন করে, বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে নতুন এক একটা বিপ্লবীদল গড়ে তুলেছে—যেমন বি, ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল; চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এই ভাবে দলকে সুসংগঠিত করে বাছা বাছা ছেলেদের revolver practice-এর ব্যবস্থাও করেছিল; মুন্সীগঞ্জের জীবন চ্যাটার্জির তরুণ চেলারাও কিছু করার জন্যে ছটফট করছিল—দাদারা তাদের ঠাণ্ডা করেছিলেন একটা অকেজো রিভলভার দিয়ে; আবদালপুরে আশ্রম উঠে যাওয়ার

পর রসিক দাস কলকাতায় এসে একটা কিছু করার জন্তে ছটফট করছিলেন। তিনি ছিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (সিনিয়র ভূপেনদা) তখন ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেছেন এবং সোসিয়্যালিজম-কমিউনিজমের কথা বলতে সুরু করেছেন। সুতরাং একদিকে যেমন কমিউনিষ্টরা তাঁকে খাতির করে, আর একদিকে যুগান্তর দলের (ঘাঁটী সরস্বতী প্রেস) তিনি চক্ষুশূল। কারণ ভূপেনদা' যুগান্তরের আদি নেতাদের অন্যতম এবং তাঁর সম্মান প্রায় সার্বজনীন। তিনি কমিউনিজম প্রচার করলে দলের অনেক ছেলে "বিপথগামী" হতে পারে। সুতরাং তাঁর প্রভাব থেকে ছেলেদের মুক্ত রাখতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার কিছু পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাও দরকার।

কিন্তু জেলা কংগ্রেস-কমিটীও তো হাতে থাকা চাই—না হলে বি. পি. সি. সি-তে সেনগুপ্তের সঙ্গে লড়াইয়ে হারতে হবে যে! অনেক দাদাই নিজ নিজ জেলা-কংগ্রেসের নেতা,—কিন্তু ২৪ পরগণা জেলা-কংগ্রেস বেহাত হয়ে আছে গোড়া থেকেই। আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন মজিবর রহমান এবং তাঁর সঙ্গে খাদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত এবং কয়েকজন ননকোপারেটর উকীল। তারপর নেতৃত্ব গেছে একদিকে প্রফুল্ল ব্যানার্জি, হৃদয়ভূষণ চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং আর একদিকে বিপিন গাঙ্গুলীর হাতে। বিপিনদার বাড়ী হালিসহর, বারাকপুর সাবডিভিসনে তাঁর ঘাঁটী, সাধারণ কংগ্রেসী এবং প্রফুল্ল বাবুরা তাঁকে খাতির করেন। বিশেষত বারাকপুর সাবডিভিসনে একদিকে ভাটপাড়া, আর একদিকে আলমবাজার শ্রমিক আন্দোলনের ঘাঁটী এবং তার কর্মীদের মধ্যেও বিপিনদার চেলা আছে।

কিন্তু হরিদা (চক্রবর্তী) যুগান্তরের বিপ্লবী নেতা এবং ২৪ পরগণার লোক হলেও ২৪ পরগণা কংগ্রেসে তাঁর প্রতিষ্ঠা নেই। কথাটা ভাল নয়। ২৪ পরগণা কংগ্রেসটাও 'ক্যাপচার' করা দরকার। আমি বারাকপুর সাবডিভিসনে কাজ করেছি এবং বিপিনদার চেলা লেবার লীডারদেরও কাউকে কাউকে কংগ্রেসে ভিড়িয়েছি। দক্ষিণে সাতকড়ি ব্যানার্জি (সাতুদা) আছেন। সুতরাং হরিদা আমাকে এবং সাতুদাকে নিয়ে পরামর্শ আঁটলেন, ২৪ পরগণা কংগ্রেসের দিকে একটু বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্তে। সাতুদার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খেলুম—কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে আলাপও হল। আমি আবার আলমবাজার ভাটপাড়া যাতায়াত সুরু করলুম।

কিন্তু আমরা তখন কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি এতখানি যে, এই সব বাজে কর্মে উৎসাহ পাই না। তখন সন্তোষকুমারী গুপ্তা হয়েছেন একজন লেবার লীডার,—ভাটপাড়ার কালী ভটাচার্য, আলমবাজারের ধীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি সন্তোষকুমারীকে নিয়ে লেবার মিটিংয়ে লেকচার দেওয়ান। তিনিও বিপিনদার একজন ভক্ত। শুধু একজন বিপ্লবী-দাদাকে অন্তরঙ্গভাবে দাদা বলেই ইসারায় নিজেকে একজন প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী বলে চালিয়ে দেওয়া তখন ব্যাপক ভাবে চালু হয়ে গেছে।

একদিন জীবন বললে, বাইরে থেকে একটা চিঠি আসবে, এক সাহেবী নামে, এবং ঠিকানাটা হবে এমন, যাতে I B তার ধারেও না ঘেঁষতে পারে, এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমি আলমবাজারে গিয়ে ধীরেন চ্যাটার্জিকে বললুম। ঠিক হল, যে কোন এক সাহেবী নামে আলমবাজার জুট মিলের ঠিকানায় চিঠি আসবে, পোষ্ট মাষ্টার নজর রাখবেন, এবং চিঠিটা নিয়ে ধীরেন বাবুকে দেবেন। এই ভাবে একটা চিঠি এসেছিল, তারপরে আর দরকার হয়নি। এম এন রায় তখন ভারতে এসেছেন, এবং গা-ঢাকা দিয়ে আছেন—কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার ১নং আসামী।

কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা হয়েছিল এবং বোধ হয় দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে বম্বে থেকে কমিউনিষ্ট কর্মীর একটা বড় দল এসেছিল। তারা সভাটা দখল করে "আন্তর্জাতিক" সঙ্গীত গেয়ে রীতিমত নাটকীয়ভাবে কমিটী ক্যাপচার করেছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার নিয়ে গিয়েছিল বম্বেতে।

ঠিক মনে নেই,—বোধ হয় এই সময়েই সৌম্যেন ঠাকুরের "কমিউনিজম"—বাংলা ভাষায় কমিউনিজম সম্বন্ধে প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটার অনেক জায়গায় "কমিউনিষ্ট" কথাটা ছাপার ভুলে হয়েছিল "কর্মনিষ্ঠ"। কমিউনিষ্ট শব্দটা তখনও সাধারণ লোকের কাছে অপরিচিত। রুশিয়ার বই এদেশে আসা ছিল নিষিদ্ধ।

হাইকোর্টের জজ এ. চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরীটা নিলামে বিক্রী করেছিল ম্যাকেঞ্জি লায়াল। বিরাট বইয়ের পাহাড় এসেছিল নিলামে। উত্তরপাড়ার রমেন ভট্টাচার্য নিলামে চাকরী করতেন, এবং তিনি বইগুলো বাছাই করে "লট" করেছিলেন। তার মধ্যে একখানা বই ছিল কমিউনিজম ইন ইণ্ডিয়া,—এবং মলাটের ওপর ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল Issued (by the Director of Intelligence) to the officers of the department only and the officers are responsible for the safe custody of the book. রমেন বাবু বইখানা সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, আমি স্বদেশী হাঙ্গামা করে "জেল খেটেছি—" উত্তরপাড়ার অমরদা'র কাছে যাতায়াত আছে। তিনি আমাকে বললেন, একখানা ভাল বই রেখেছি আপনার জন্তে—কমিউন্যালিজম ইন ইণ্ডিয়া—হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধানোর সরকারী ষড়যন্ত্র। বইটা দেখে আমার তো চক্ষু স্থির। দরকারী বই বলে আমি বইটা নিয়ে এলুম। রমেন বাবু তখনও কমিউনিজম কথাটা শোনেননি কিন্তু কমিউন্যালিজমটা জানেন।

১৯২০ সালের "স্বরাজের" পর গোয়েন্দা বিভাগের এই একটা পৃথক শাখা খোলা হয়েছিল। '২৩ সাল পর্যন্ত প্রথম Triennial (৩ বছরের) রিপোর্ট বেরোয়। তারপর '২৬ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় (৩ বছরের) রিপোর্ট এই বইটা। এর সঙ্গে প্রথম ৩ বছরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও সন্নিবিষ্ট ছিল,—এবং তৃতীয় একটা অংশ ছিল Who is who in Communism in India. বইটা নিয়ে দিনকয়েক মেতে থাকলুম, অনেক গুপ্ত কথা জানতে পারলুম, যার কিছু কিছু '২৪ সালের কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলা সম্পর্কে আগে বলেছি। কমিউনিজমের ওপর বৃটিশ সরকার অসীম গুরুত্ব দিয়েছে—সুতরাং আমার পক্ষে সেটা হল একটা সার্টিফিকেট।

যুগান্তর পার্টির মধ্যে থেকেও জীবন কমিউনিজমের দিকেই চলেছিল, এবং তার সঙ্গে আমরাও। নিজেদের প্রয়োজনমত চালাকেরার

জন্তে কিছু অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন, অর্থের অভাব চূড়ান্ত, সুতরাং আমরা ঠিক করেছিলুম, আমরা অর্থের সংস্থানের জন্তে খাটবো এবং জীবনকে কাজ করার জন্তে "ফ্রী" করে দোব। ম্যাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানির একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল, উপর থেকে বড় সাহেব কিছু মোটা টাকা নিয়ে রিটায়ার করে, "ছোট সাহেব" "বড় সাহেব" হয়, এই দুই সাহেব কোম্পানির পার্টনার। নীচে থেকে একজন কর্মচারী সাহেব "ছোট সাহেব" হয়ে জুনিয়ার পার্টনার হয়। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করেছিলুম, আমরাও ঐ ভাবে প্রথমে জীবনকে "ফ্রী" করে দোব, তারপর সারদা যখন দোকান চালাতে পারবে, আমি কিছু মাসিক ভাতা নিয়ে রিটায়ার করে "ফ্রী" হয়ে কাজে নামবো, তারপরে উঠবে প্রভাস, এবং সারদা রিটায়ার করবে। প্ল্যানটা অবশ্য রীতিমত কার্যকরী হবার আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন হয়ে গিয়েছিল।

দোকানটাকে আরো ভাল করে গড়ে তোলবার জন্তে থোক কিছু টাকা দরকার। অমরদা'কে বললুম। তিনি জে, সি, গুপ্তের কাছ থেকে ১০০০।১২০০ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেম। আমি মনে করেছিলুম, হ্যাণ্ডনোটের মতন কিছু লিখে দিতে হবে, কিন্তু দেখা গেল এক বিরাট দলিল তৈরী হয়েছে—দোকান মর্টগেজ এবং আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন। সই করে দিলুম, কিন্তু মনটা খিচড়ে গেল। যাদের জ্ঞানের মাপ টাকায়, সেই রকম একজন বড় লোকের মুঠোয় বাঁধা পড়লুম—পদে পদে হস্তক্ষেপ করবে, নিজের প্ল্যান অনুসারে কিছুই হয়তো করতে পারবো না। হয়তো অবস্থা দাঁড়াবে, "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, আপদ করলো এঁড়ে গরু কিনে।"

সে রকম লক্ষণও দেখা গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দলিল সই করে দিলুম, কিন্তু টাকা পেলুম না। ২০০৲ মাত্র টাকা দিয়ে গুপ্ত সাহেব বললেন, এক সঙ্গে বেশী টাকা নিলে নষ্ট করে ফেলবেন—দরকার মত কিছু কিছু করে নেবেন। ঝগড়া না করে "কিল খেয়ে কিল চুরি" করে ঐ টাকাই নিয়ে এলুম। ভাবলুম, কি করে পান্তা খেয়ে শুধু দুটো মানুষের খাটুনির জোরে দোকানটা খাড়া করেছি, তা যদি জানতেন গুপ্ত সাহেব!—এই ভাবে ১২০০ টাকা ঋণ পেতে মাস ছয়েক লেগে গেল।

যাই হোক, উঠে পড়ে খাটতে লাগলুম সকলে মিলে। সাইন বোর্ডের নীচে লিখে দিলুম Secondhand Everything, গরু-চোরের মতন গিয়ে দাঁড়াই, কিছু কিছু করে টাকা আনি, আর নিলেমে সব রকমের জিনিস কিনে ঘর বোঝাই করি। ফার্নিচার, কিউরিও, সতরঞ্চি কার্পেট পরদা, ছবি-আয়না, ইলেকট্রিক গুডস, ফটো গুডস, টাইপরাইটার, সেলাইকল, হারমোনিয়ম, দূরবীন কিছুই বাদ রইলো না। বই তো আছেই। Upholsterd Suite, Sofa, Couchএর কাজও হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত রেডিও সেট তৈরীর ব্যবস্থা পর্যন্ত হল। ২ জন ছুতোর ও ২ জন পালিস-মিস্ত্রীও হল।

শান্তিপুরের জিতেন প্রামাণিক (?) ছিলেন ইলেকট্রিক এবং রেডিওর একজন expert mechanic, এবং তাঁর All Bengal Licenseও ছিল রেডিওর। তিনি তখন বেকার ছিলেন, এবং এক মেসে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা হল, তিনি দোকানে থাকবেন এবং খাবেন,—আমি পুরোনো রেডিও সেট কিনে দোব, দরকার মতন নতুন পার্টস কিনে দোব,—তাঁর নির্দেশ মত কাঠের বাক্স প্রভৃতি মিস্ত্রী তৈরী করে দেবে,—তিনি যদি সেট তৈরী করতে পারেন, তাহলে বিক্রী হলে আমি লাভের অংশ পাব,—যত দিন তা না হয়, তত দিন তাঁর খরচ আমি চালিয়ে যাব। তিনি এক নতুন বাক্স তৈরী করিয়ে নিয়ে নতুন এক রেডিও সেট তৈরীতে মন দিলেন।

আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না, কিন্তু একদিন সত্যই "পালে বাঘ পড়িল।" একদিন বাইরে থেকে এসে দেখি, দোকানের তৈরী নতুন রেডিও বাজছে, ওরা ভিড় করে বসে শুনছে। তখন নতুন বাস সিণ্ডিকেট বাসের মাসিক টিকিট চালিয়েছে—আমরা দুখানা মাসিক টিকিট রেখেছি—একখানা থাকে দোকানে, একখানা আমার কাছে—আমি সারাদিন বাইরে ঘুরি, মাঝে মাঝে দোকানে এসে দেখে-শুনে নির্দেশ দিয়ে যাই। এসব কথা অবান্তর মনে করে অধীর হবেন না—শীঘ্রই বুঝতে পারবেন, এ কথাগুলো কত প্রয়োজনীয়।

যাই হোক, ওদিকে ৩১শে ডিসেম্বর এগিয়ে আসছে, তার মধ্যে বৃটিশ সরকার যদি ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না দেয়, তাহলে মহাত্মাজি নিজেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা হয়ে যাবেন। একটা লড়াই আশা করে জনগণ তৈরী হচ্ছে। সুতরাং লর্ড আরুইন আগে শ্রমিকনেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট মামলার পত্তন করে, শ্রমিকদের বেকায়দা করে নিয়ে ভদ্রলোকদের সন্তুষ্ট করার জন্তে দিল্লীতে এক ঘোষণা করলেন, ভারতে বৈধ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির অঙ্গিয়ে তাকে ডোমিনিয়নের পর্যায়ে উন্নীত করাই বৃটেনের নীতি। মহাত্মাজি লড়াই এড়াবার ফাঁক খুঁজছিলেন,—সুতরাং তিনি তাঁর দলবল নিয়ে আরুইনের ঘোষণাটাকেই ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বলে ধরে নিয়ে এক বিবৃতি [বিখ্যাত (?) দিল্লী ম্যানিফেষ্টো] প্রচার করে তাতে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-এর স্কীম তৈরীর জন্তে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করলেন। তাতে জওহরলালও সই দিয়েছিলেন। সারা দেশের মধ্যে তাতে একটা অসন্তোষও প্রকাশ হয়ে পড়লো। কিন্তু মহাত্মাজি আরুইনের সঙ্গে দেখা করার জন্তে ছটফট করতে লাগলেন।

লোকের মনের অবস্থা যেমনই হোক, একটা লড়াই যে হবে এবং তার জন্তে মহাত্মার নেতৃত্বও প্রয়োজন, এই ভেবে তারা মহাত্মাকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করার প্রস্তাব করলে। কিন্তু নিরপেক্ষ প্রেসিডেণ্ট হয়ে তিনি কি শেষে সত্যি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালাদের খপ্পরে পড়তে রাজী হতে পারেন? তাছাড়া জহরলালের মতিগতি তো ভাল নয়। তাঁকে মতিলাল ও মহাত্মা দুদিক থেকে ঠেলে ধরে চালাচ্ছিলেন,—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিল্লী ম্যানিফেষ্টোতে সই করাতে হয়েছিল,—তাঁর ঘাড় মটকানোর কাজটা পাকাপাকি ভাবে জিনিস করাও দরকার। তাই তিনি বললেন, আমি নয়, জহরলালকে লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট কর।

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এবং সোসিয়্যালিজমের কথা বলে জহরলালের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল,—কাজেই সকলে সন্তুষ্ট মনে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করে খুসীই হল। মহাত্মাজি তখন সফরে বেরোলেন এবং ইউ, পিতে সফর করলেন ব্যাপক ভাবে, আর সকলকে বলে বেড়াতে লাগলেন, জহরলালের দিকে ভোট দিও। লোকে মনে করলে মহাত্মাজি দলে এসে গেছেন। কিন্তু মহাত্মার প্ল্যান ছি

এক ঢিলে দুই পাখী মারা। একদিকে খাঁটি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালাদের বেকারদা করার জন্তে তিনি জহরলালকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন,—আর একদিকে সরকারকে একটু ভয় দেখানোও হবে—কংগ্রেসের রাশ আর বুঝি তাঁর হাতে রইলো না, চিরপরিচিত রক্ষাপন্থী বেদের হাতে কংগ্রেসের রাশ না থাকাটায় ইংরেজ নিশ্চয়ই স্বস্তিবোধ করবে না।

বস্তুত, এই অবস্থায় আরুইন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হল,—দেখা হলে আগে থেকেই একটা রফার বন্দোবস্ত হতে পারবে। কিন্তু বিধাতাপুরুষ বাদ সাধলেন, আরুইনের ট্রেনের কামরার নীচে এক বোমা ফাটলো। কাজেই সাক্ষাৎকার হল না। মহাত্মা বোমার নিন্দা করলেন—কংগ্রেসের দিনও এসে পড়লো।

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যেও দর্শকদের গ্যালারী থেকে এক বোমা পড়লো, এবং ভগৎ সিং গ্রেপ্তার হল—রাজগুরু এবং শুকদেব নামক আর দুজন যুবকও ধরা পড়লো। ভগৎ সিং বললে,—আমি বোমা ফেলেছি কাউকে মারার জন্তে নয়, শুধু সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্তে। যাই হোক, কেউ না মরলেও বিচারে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির হুকুম হল, এবং সারাদেশের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে তাকে ফাঁসি দেওয়াও হল।

লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হয়েছে বলে এবং জহরলালের নেতৃত্বেই তা হয়েছে বলে কংগ্রেসের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং জহরলালের মহিমার ঢক্কা-নিনাদ সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

কিন্তু লাহোর কংগ্রেসের প্রকৃত চিত্র ঢাকা দিয়েই সেটা করা হয়। লাহোরে মহাত্মাজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্রস্তাব নিজে রচনা করেন, এবং তার মুখবন্ধে বড়লাটের সুখ্যাতি এবং হিংসাত্মক কাজের নিন্দা জুড়ে দেওয়া হয়। খাঁটি স্বাধীনতাকামীরা এই দুটো অহেতুক এবং অবান্তর কথা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে মহাত্মাজি চ্যালেঞ্জ করে বলেন,—আমার প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুচিন্তিত প্রস্তাব। এ প্রস্তাবের কোন সংশোধন চলবে না। হয় প্রস্তাব যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে হবে,—না হয় সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে either accept it in toto or reject it in toto যদি বর্জন করা হয়, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটি পদত্যাগ করবে, এবং তোমাদের নতুন ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করে কংগ্রেস চালাতে হবে। (অর্থাৎ অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাতে হবে)।

"নিরপেক্ষ" প্রেসিডেণ্ট জহরলাল চুপ করেই থাকলেন। আর সকলেও চুপ করেই থাকলো—কেউ কংগ্রেস চালাবার দায়িত্ব নিতে ভরসা পেলো না। শোনা যায়, বিঠলভাই প্যাটেল সুভাষ বাবুকে বলেছিলেন, তুমি যদি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—এস চেষ্টা করে দেখা যাক। সুভাষ বাবু পিছিয়ে গেলেন—বললেন, তাহলে বাংলাদেশে সেনগুপ্ত ও মহাত্মার দলের কাছে আমায় পরাজিত হতে হবে। সুভাষ বাবু মানে যে আমাদের বিপ্লবী দাদারাও,—সে কথা কি বলে দিতে হবে ?

লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাব ও সেটা পাশ হওয়ার ইতিহাস এই। খাঁটী স্বাধীনতা বোঝাতে ব্যবহৃত হত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শব্দটার পরিবর্তে হিন্দী তর্জমা হল পূর্ণ স্বরাজ্য। স্বরাজ্য ঠিকই রইলো,—শুধু বোঝা গেল,—এতদিনকার স্বরাজ্যটা ছিল অপূর্ণ,—এখন সেটা হল পূর্ণ। আজকের ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপও তাই ডোমিনিয়নের ওপর রিপাবলিকের ওড়না।

যাই হোক, পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্তে সংগ্রামের প্রস্তুতির কথাও রইলো—অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ওপর ভার দেওয়া হল, তাঁরা অহিংস আইন অমান্তের কর্মসূচী, খাজনা বন্ধ সমেত, রচনা করবেন,—এবং তাঁরা যখন বলবেন তখন সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে। এই ভাবে দ্বৈধতার কূটকৌশলের জোরে মহাত্মাজি দৃঢ় হস্তে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মত্ত তুরঙ্গের ঝুঁটি চেপে ধরলেন এবং সরকারকে বুঝিয়ে দিলেন, কংগ্রেসের রাশ এখনো আমার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মুষড়ে-পড়া মনকে চাঙ্গা করার জন্তে গান্ধী-কংগ্রেসের প্রচার হিসেবে '৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সারা দেশে "স্বাধীনতার শপথ" (Independence Judge) গ্রহণের ব্যবস্থা হল। অস্পষ্ট হলেও, একটা সংগ্রামের আশায় লোকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে সেনগুপ্তের দলের কাগজ Advance প্রকাশের তোড়জোড় চলছিল। হঠাৎ একদিন জে, সি, গুপ্ত দোকানে এসে বললেন, আজ আমাদের meeting-এ final decision হয়ে গেল,—অমুক দিন কাগজ বেরোবে—আপনাকে সমস্ত furniture দিয়ে অফিস সাজিয়ে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে গিয়ে ৩-৪ নম্বর হেয়ার ষ্ট্রীটের বিরাট বাড়ীটা দেখে এলুম—কোন ঘরে কি হবে কি কি চাই সব শুনলুম—মাত্র হপ্তা দুইয়ের মধ্যে সব চাই।

প্রায় অসম্ভব কথা। কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব ভাবার বালাই না রেখে অবিলম্বে কোমর বেঁধে লেগে গেলুম। দোকানে যা কিছু দরকারী মাল ছিল, রেডি করে ফেললুম এবং চালান করলুম। সবগুলো নিলেমে ঘুরে মাল সংগ্রহ করি,—রোজ দু তিন গাড়ী করে মাল যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিল করি,—গুপ্ত সাহেব কিছু টাকা বাকি রেখে টাকা দেন। হিসেব দেখা হবে পরে।

গুপ্ত সাহেবদের বসবার ঘর সাজিয়ে দেওয়া হল মেহগ্নি ফার্ণিচার দিয়ে—প্রকাণ্ড রাউণ্ড টেবিল, চেয়ার, সোফা প্রভৃতি দিয়ে; ঘরে ঘরে ছোট বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ফ্ল্যাট রাইটিং টেবিল, টাইপরাইটিং টেবিল এবং ডজন ডজন চেয়ার, রেকর্ডর‍্যাক, হোয়াটনট; ব্লক রাখার জন্তে একটা বিরাট চেষ্ট অফ ড্রয়ার, করিডরে দুখানা ১২ ফুট লম্বা আর্মর্ড বেঞ্চ, কতকগুলো আলমারী; মাপমতন নতুন ক্যাস কাউণ্টারও তৈরী করে দেওয়া হল; তা ছাড়া দুটো গ্লাসকেস আলমারীভর্তি বই—তার মধ্যে আছে একটা সেট নাইন্থ এডিসনের এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা,—একগাদা ইণ্ডিয়ান ইয়ারবুক, একগাদা ষ্টেটসম্যান ইয়ার বুক, ৫০ বছরের চেম্বার অফ কমার্সের রিপোর্ট ৫০ ভলুম প্রভৃতি। সর্বসাকুল্যে বিল হয়েছিল মাত্র ১৮০০ টাকার। অর্থাৎ আমার নিলেমের ব্যবসার সবটুকু কেরামতী খরচ করে যদি আমি নিজের কাগজ করতুম, তাহলে যেমনটি হতে পারতো।

কিন্তু ৫০ বার ঘুরে ঘুরে আদায় হল ১৫০০ টাকা,—তার পর "হিসেবটা একবার দেখতে হবে" বলে চললো দিনের পর দিন ঘোরানো। মনে করেছিলুম, গুপ্ত সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে তারিফ করবেন,—তা চুলোয় যাক, অসঙ্কোচে দিনের পর দিন ঘোরাতে একটু বাধে না, দেখে জীবনে ঘেন্না হয়ে গেল। তারও ওপর মগজ আছে—আমাকে বাইরে বসতে বলে গুপ্ত সাহেব ঘণ্টার পর ঘণ্টা

সন্তোষ মিত্রকে নিয়ে আপ্যায়ন এবং পলিটিক্স করেন,—বলেন, সন্তোষ মিত্রের মতন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা তাঁর সৌভাগ্য।

তখন দোকানে আমরা ১১জন লোক খাটি—বাড়ীর ভিতরের উঠানটাও নেওয়া হয়েছিল ৩০ টাকা ভাড়ায়। এই অবস্থায় কাজ এবং টাকা একসঙ্গে বন্ধ। গুপ্ত সাহেবের ভাবখানা,—ব্যবসাটা তাঁর,—আমি কর্মচারী,—দোকানের খরচটা আমার। মেজাজ খিঁচিয়ে হয়েছে,—গুপ্ত সাহেবের কিছু না করতে পেরে ঘরে এসে সকলকে বকাবকি করি। ওদিকে কংগ্রেস এবং তার সঙ্গে দাদাদের ওপরও মনটা বিষিয়ে উঠেছে। বড়লোক সম্বন্ধে নতুন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনটাকে কমিউনিজমের দিকে আরো জোরে টানছে।

একদিন প্রভাসকে খুব বকাবকি করলুম,—সে রাগ করে বাড়ী চলে গেল। সারদার ধৈর্য্যের বাঁধও ভাঙলো—সে বললে, আমারও আর এ বকমারির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করছে না। রাগ, দুঃখ, অপমান মনটাকে নিষ্পেষিত করছিল,—এখন অভিমানে চোখে জল এল। গুপ্ত সাহেবকে এক চিঠি লিখলুম একুশ পৃষ্ঠা—সকলকে বিদায় দিলুম,—দোকানে তালা দিয়ে চিঠি ও চাবি গুপ্ত সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একখানা কাপড় ও কয়েকখানা বই হাতে করে নিয়ে এসে উঠলুম কলেজ স্কোয়ারে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে।

কত কষ্টে গড়া ব্যবসা এমনি করে বিসর্জন দিলুম,—"বেনোজল এসে ঘ'রো জল বার করে নিয়ে গেল।" সারদা আমার মুখ চেয়ে যেমন মুখ বুজে খেটেছিল, এখনও তেমনি মুখ বুজে এই বিসর্জন পর্ব দেখলো—একটি কথা বললো না। মুক্তিও পেলুম এক সঙ্গে দুজনেই। পরে অমরদাকে বলে কর্পোরেশনে এক স্কুলমাষ্টারী জুটিয়ে নিয়ে সারদা সরে গেল। আমি দুবেলা মুড়ি খাই এবং আত্মশক্তি লাইব্রেরীর কাউন্টারের ওপর শুই। আর দুপুরবেলা ফরোয়ার্ড অফিসে উপেনদার কাছে গিয়ে আড্ডা মারি। আবার নতুন করে কিছু রোজগারের চিন্তা চলছে। লিখে খাওয়ার কথা ভাবছি।

শান্তিপুরে গিয়ে প্রভাসের কাছে সব বললুম,—তুমি গিয়ে গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা কর,—সাজানো দোকান,—কিন্তু গুপ্ত সাহেব তো ও ব্যবসা চালাতে পারবেন না,—তুমি গেলে হয়ত তোমার একটা ব্যবস্থা হতে পারবে। সে এসেছিল এবং তাকে দিয়ে গুপ্ত সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—কিন্তু আমি তখন মুক্তির আনন্দ ভোগ করছি—একুশ পাতা চিঠির পর, আবার!

দাদাদের কংগ্রেসী বিপ্লব প্রচেষ্টার বিশ্লেষণ করতে করতে একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখলুম। আনন্দবাজার অফিসে সুরেশ মজুমদারের কাছে আবার যাতায়াত সুরু করেছিলুম,—তাঁকে কবিতাটা দেখালুম। তিনি চক্ষু ছানাবড়া করে মাখন সেনকে ডেকে সেটা পড়তে দিলেন। তিনি পড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, এ আমি ছাপবো। বলে তিনি অমূল্য সেনকে ডেকে তাঁর হাতে সেটা দিলেন। সুরেশ মজুমদার বললেন, দোহাই তোমাদের, ও ছাপলে আনন্দবাজার অফিসে হামলা হবে। অমূল্য সেন ঘাড় নেড়ে বললেন, বেশ, আনন্দবাজারে নয়, আমি অন্য কাগজে ছাপবো। আমি বললুম, নামটা দেবেন না যেন!

তখন মির্জাপুর ষ্ট্রীটে এক কাঠগোলায় অনুশীলনের ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, এবং সেখান থেকে "হিন্দু" নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুতো। দেখা গেল, কয়েক দিন পরে সেই কাগজে কবিতাটা বেরিয়েছে—নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীশ্রীদাদা। কবিতাটা এই: (সবটা মনে নেই)

আমরা   নন্দলালের দাদা
আমরা   ঘোড়া পিটে গড়ি গাধা
আর   বাক্যের জোরে সাদা করি কালো
যত কালো করি সাদা
আমরা   ধনীর চরণ চাটি
আর   গরীবকে মারি চাটি
আর   লীডারে লীডারে বিবাদ বাধিলে
আমরাই ভাড়া খাটি।

* *

আর   ডাকাতি কি খুনে নয়
ওসব   শুধু ইতিহাসে কয়
এখন   খোসামুদী আর স্বদেশীর নামে
মন্দটা বা কি হয়!
আমরা   ঐক্য মহিমা গাই—
সেটা   নির্জলা ভাঁওতাই—
কারণ   সতীনের দলে সহিতে পারি না
ধনীর করুণা চাই।
আমরা   জেলায় জেলায় ঘুরি
সদা   দলাদলি করে ফিরি
আর   সতেরোটা দলে এক একটা ছেলে
টেনে   ছেঁড়াছিঁড়ি করি
আমরা   ছোট ছেলেদের চরাই
আর   বড়দের বড় ডরাই—
আর   আমাদের সুরে সুর না মেলালে
টিকটিকি নাম ছড়াই—
কিন্তু   যদি দিতে পারে গুঁতো
আমরা   ছেড়ে ছলা-কলা-ছুতো
নাকে খৎ দিয়ে শিরে তুলে নিই
তার ছেঁড়া চটি জুতো—
আমরা   নিজেরা বাজাই নিজেদের ঢোল
খাই ঝিঙে যদি, বলি পটোল
হাতে লয়ে ফিরি তৈলভাণ্ড
মুখে স্বাধীনতা-বোল।

* * *

হাগা   মুটে মজুর কি চাষা—
এদের   স্বদেশীতে কেন আসা!
এদের যে ব্যাটা আস্কারা দেয়
সে ব্যাটা কর্মনাশা
দেখ   ওদের ধর্মঘটে
শুধু   বড়লোকগুলো চটে—
আমরা   মোলায়েম করি তেল দিয়ে, তাই
ভারত উদ্ধারে পটে—

বাবা মুটে-মজুরের মার
সে যে সারা দুনিয়ার বার !
ছি ছি ভদ্রলোকের ভদ্রসমাজে
ঠাঁই দিতে আছে তার ?

* * *

যত স্বদেশীতে মরা ছেলে
তারা ছিল আমাদেরই দলে
শুধু দিনকয় আগে কুসঙ্গে মিশে
বিঘোরে প্রাণটা দিলে
নৈলে আমাদেরই মত সুখে
বসে' ভারতমাতার বুকে
উঠিতে বসিতে মরণ বরণ
করিত যে মুখে মুখে।

কিন্তু এক একটা যেই খসে
আমরা কাগজেতে কাঁদি কসে
লোকে চার গুণ দাম দেয়, আমাদের
পকেট ভরিয়া আসে।

আহা এমনটা যদি হ'ত
মাসে এক আধটা অন্তত
মোদের পরের মটরে ডেপুটী লীডারী
এক দিনে ঘুচে যেত।

যত মিছিলের পুরোভাগে
যেতাম আমরাই সব আগে
ডায়াস, চেয়ার, কাউন্সিল হল
সকলই পেতাম বাগে।

তারা মোদের বসানো ঘানি
তোমরা চোখে ঠুলি পরে টানি'
আরো কিছু দিন তৈল জোগাও
আমরা স্বরাজ আনি।

বুকের মাঝে তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের পুঞ্জীভূত বিষ-বাষ্পের এ যেন বিস্ফোরণ—চিন্তার দ্বিধা সঙ্কোচের বাঁধ যেন ভেঙে গেল।

এই সময়ে একদিন ট্রামে উপেনদার সঙ্গে দেখা অফিসের পথে। কথা কইতে কইতে যাচ্ছি,—হঠাৎ ট্রামে উঠলেন অরুণ গুহ। উপেনদার সঙ্গে তাঁর চাপা দুষ্টু হাসির বিনিময় হল। তিনি উপেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ হপ্তার "স্বাধীনতা" পড়েছেন ?

উপেনদা—না, কেন বল দেখি—

অরুণ বাবু—একটা আর্টিকেল আছে—ভাল—

উপেনদা—হ্যাঁ—কে যেন বলছিল বটে—তা দেখব অখন

অরুণ বাবু—আর একটা জবাবও লিখবেন (মুচকি হাসি)

উপেনদাও মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে জানালেন, লিখবেন। তার পরে অরুণ বাবু নেমে গেলেন এবং উপেনদা আমাকে বললেন,—কিছু বুঝলি ?

আমি—না, কি ব্যাপার ?

উপেনদা—ওরা আমার লেখা চায়, আমি লিখি না—এই জবাব উপলক্ষে একটা লেখা পাবার মৎলব।

আমি—তা বেশ তো! আপনিও একটা জোলাপ চালিয়ে দিন না।

উপেনদা—তুই লিখবি ?

আমি—আপনি বললেই লিখতে পারি।

তাই-ই ঠিক হল। আমি "স্বাধীনতাটা" সংগ্রহ করে প্রবন্ধটা পড়লুম—"শতকরা নিরানব্বই জন"। পড়ে একেবারে ক্ষেপে গেলুম—লেখকের নাম দুর্গাপ্রসাদ। কাঁচা লেখা, অপরিণত আইডিয়া এবং যারা সোস্যিয়ালিজম্-কমিউনিজম বা জনগণের বিপ্লবের কথা বলে, তাদের প্রতি অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ।

জবাব লিখলুম—"নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।" লেখাটা বেশ বড় হয়ে গেল বলে তিন অংশে ভাগ করে দিলুম। প্রথম অংশে থাকলো গালাগালের জবাবে পাল্টা গালাগাল; দ্বিতীয় অংশে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণ; আর তৃতীয় অংশে গণবিপ্লবের আদর্শ, কর্মপন্থা ও যৌক্তিকতা।

গেলুম লেখা নিয়ে উপেনদার কাছে ফরোয়ার্ড অফিসে। তিনি পড়ে "আত্মশক্তি"র সম্পাদক শচীন সেনগুপ্তকে (বর্তমান নাট্যকার) ডেকে পাঠিয়ে লেখাটা দিয়ে বললেন, ঘরে নিয়ে গিয়ে পড়। তিনি লেখাটা পড়ে ফিরে এসে বললেন,—এ তো আমায় ছাপতে হবে! কার লেখা ?

উপেনদা আমাকে দেখিয়ে দিলেন—নামটাও বলে দিলেন। আমি বললুম, নামটা ছাপবেন না। তার পর লেখা গেল নামসুদ্ধ লেখা ছাপা হয়েছে। আমার বিদ্রোহ প্রকাশ হয়ে পড়লো, একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অরুণ বাবু আমার ওপর হাড়ে চটা। উপেনদা বললেন,—কিসের "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" ? একেবারে কাটছিঁড় হয়ে যাওয়াই ভাল।

শচীন সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ আমার সেই প্রথম। বন্দোবস্ত হয়ে গেল, হপ্তায় হপ্তায় লিখবো এবং দশ টাকা করে পাব। উপেনদা খুসী হয়ে বললেন, কেমন হল ? [ক্রমশঃ।

. . . এ সংখ্যার প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে জয়পুরের শীষমহলের আভ্যন্তরীণ আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্রশিল্পী সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

যোগাযোগ

রমেন দীর্ঘকাল পরে বিলেত থেকে ফিরে এলো। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী নিয়ে। একে সুদর্শন সুপুরুষ, তায় বিরাট চাকুরে আর সবচেয়ে বড়কথা অবিবাহিত। পয়সাওয়ালা লোকদের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। এমন ছেলেকে হাতছাড়া করতে আছে? রীনা, শ্যামা, কেতকী অর্থাৎ যারা বিয়ের আগে রমেনকে চিনতো তারা পালা করে রমেনের সঙ্গে পার্টি, পিকনিক আর সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করল।

এইরকম একটি পার্টিতে কমলার সঙ্গে রমেনের প্রথম দেখা। পার্টি ছিল শ্যামার বাড়ীতে। কমলার এমন পার্টিতে থাকার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই ছিলনা। কমলার বাবা নিম্ন মধ্যবিত্ত স্কুলের শিক্ষক। শ্যামারা যেদিন পার্টির কথা আলোচনা করছিল কমলা কলেজের কমনরুমে সেই একই জায়গায় ছিল তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কমলাকে ডাকা।

কমলা পার্টিতে আলাদা একটা কোনে বসেছিল সাদাসিধে জামাকাপড় পরে। চারিদিকে দামী সাড়ী, সেট—ইংরিজী বুকনি আর বেশির ভাগই রমেনকে ঘিরে। রমেন একটা কিছু চাইতেই চার জন দৌড়ে যাচ্ছে এইরকম একটা ব্যাপার! হঠাৎ ঘটল একটা অঘটন। কমলা চা খাচ্ছিল।

হঠাৎ তার হাত থেকে পড়ে পেয়ালা প্লেট দুটোই চৌচির। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে কমলা নীচু হয়ে ভাঙ্গা কাঁচ তুলতে যাচ্ছিল—শ্যামার মা বাধা দিয়ে বললেন "থাক বেয়ারাই তুলবে। দামী সেটে চা খাওয়া অভ্যাস নেই তো!" কমলার মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে—বিশেষ কেউ লক্ষ্য করার আগেই। কমলা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। ওর চলে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করলনা কারণ ওরা তখন রমেনকে নিয়ে ব্যস্ত।

পরদিন সকালে। কমলাদের বাড়ীর দরজা খটখট করে নড়ে উঠল। দরজা খুলে কমলা অবাক।

সুদর্শন রমেন দাঁড়িয়ে আছে—পরনে ধুতী, পাঞ্জাবী চাদর। রমেন নমস্কার করে বলল—"আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। শ্যামার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিলাম। কাল পার্টিতে সবই আমি লক্ষ্য করেছিলাম কিন্তু আপনাকে কিছু বলার আগেই আপনি চলে গেলেন। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে।"

কমলা বলল—"না আমারই যাওয়া উচিৎ হয়নি। ওরা এত বড়লোক—" "হ্যাঁ, বড়লোক, কিন্তু অমানুষ—" রমেন বাধা দিয়ে বলল। কমলা রমেনকে ভেতরে নিয়ে এলো। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। তারপরে ভিতরে গেল চা আনতে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলো চা আর জলখাবার নিয়ে। রমেন বলল—"এ কি, এরমধ্যে এত খাবার? আপনি কি জাদু জানেন?" কমলা লজ্জিত হয়ে বলল "না না, কাল বাড়ীতে পুলিপিঠে আর গজা বানিয়েছিলাম।" রমেন এক কামড় খেয়ে—"আহা কি অপূর্ব পিঠে! প্রায় ছয় বছর বিলেতে, এই পিঠের স্বপ্ন দেখেছি। আরও কত রান্না খেতে ইচ্ছে করে—চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা! এখানে থাকি হোটেলে আর মিশি যাঁদের সঙ্গে তাঁরা খান বিলিতী খানা। আচ্ছা, এত ভাল পিঠে বানালেন কি করে?" কমলা—"কেন? নারকেল কুরে, ময়দায় পুর দিয়ে, ডালডায় ভেজে—" রমেন—"ডালডায় এত ভাল রান্না হয়?"

কমলা "হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই সেইজন্তে 'ডালডায়' হয়। আজ খেয়েই যাননা এখানে। চচ্চড়ি, শুক্তো, ডালনা—যা যা আপনি খেতে চান সবই রাঁধব আজ।" কমলার বাবাও সায় দিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা এসেছ যখন খেয়েই যাও।" রমেন উৎসাহভরে বলল "নিশ্চয়ই, আমি নিজে বলতে পারছিলাম না যা পিঠে খাওয়ালেন আজকে না খেয়ে আমি উঠি?"

খাওয়া দাওয়ার পরে রমেন আরও অবাক হোল। কমলা শুধু রান্না বান্নায় পারদর্শীই নয় ও খুব ভাল গায়িকাও বটে, ছবিও আঁকতে পারে। কমলার গান শুনতে শুনতে আনন্দে রমেনের চোখ বুজে গেলো………

DL. 23 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই
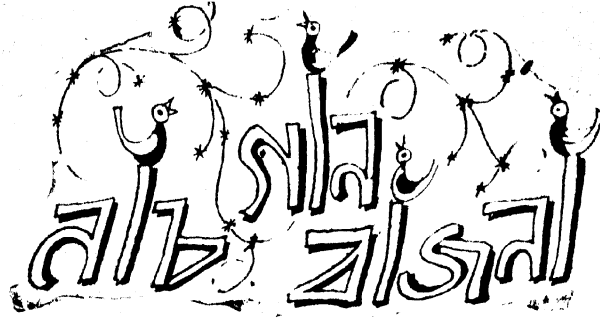
মার্গসঙ্গীত কেন জনপ্রিয় হচ্ছে না ?

আজ-কাল মার্গসংগীতের পুনরুজ্জীবনের জন্য কিছুটা চেষ্টা চলছে বটে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সেই চেষ্টা আশাপ্রদভাবে সফল হচ্ছে না। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সেই সব চেষ্টা কৃত্রিম উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিওতে ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়ালের প্রোগ্রাম কিছুটা বাড়ানো বা বৎসরে একটা-আধটা সঙ্গীত-সম্মিলনীর অধিবেশনের মধ্যেই এই প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি। মার্গ-সঙ্গীতকে জনসাধারণের কাছে পরিচিত এবং আকর্ষণীয় করবার পক্ষে এই চেষ্টা অতি অকিঞ্চিৎকর ; সুতরাং ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সঙ্গীত চারুকলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ একটি চারুকলা যদি জীবন্ত না থাকে তাহলে তার চর্চারই বা সার্থকতা কী ? শবদেহের সৌন্দর্যচর্চারই মত তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার্গসঙ্গীতের এই শবদেহ মোগল আমলের মাটি খুঁড়ে বের করে গোটাকতক মুষ্টিমেয় শিল্পী মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছে, সাধারণ লোক শিউরে উঠছে বিতৃষ্ণায়। কেন এমন হচ্ছে ? সাধারণ লোকের কান ও সৌন্দর্যবোধ, যা অবশ্য অভ্যাস ও শিক্ষাসাপেক্ষ, মার্গসঙ্গীতকে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত নয় এ কথা স্বীকার করতে পারি আংশিকভাবে, পুরোপুরি নয়। আমরা দেখেছি, একজন শ্রোতা বেহাগ রাগের একটি ধ্রুপদ আরম্ভ হতেই সরে পড়লেন, কিন্তু সেই রাগেরই সেতার বাজনা মুগ্ধ হয়েই শুনছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে তিনি জবাব দিলেন, বাজনাটা বেশ লাগে, বিশেষ করে প্রথম দিকের ওই জায়গাটা (অর্থাৎ বেহাগের গা-সা মীড়টুকু) অথচ কণ্ঠসঙ্গীতের ঠিক এই মীড়, গমকই প্রভৃতি তাঁর বিভীষিকার উদ্রেক করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজনের কথা উল্লেখ করলাম কিন্তু এইটেই সাধারণ অবস্থা। এর কারণ অনুসন্ধান করা মোটেই কঠিন নয়। প্রধান কারণগুলির মধ্যে গায়কের কণ্ঠস্বর, আবয়বিক ভঙ্গিমা, গায়ন প্রণালী ও গানের বাণী। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই কারণগুলি অনুপস্থিত।

কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন গায়নের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। কণ্ঠস্বরের মাধুর্য কণ্ঠসঙ্গীতকে রমণীয় করে তোলবার সর্বপ্রধান উপাদান, এ কথা কেউই অস্বীকার করবেন না হয়ত, কিন্তু আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণাও আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, কোন মানুষেরই,—বিশেষ করে স্বরসাধকের—কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ এমন কর্কশ নয়, কারণ হ'তে পারে না যে তা শ্রোতার বিভীষিকা উৎপাদন ক'রতে পারে, কারণ মনুষ্যকণ্ঠযন্ত্রে একমাত্র কোন অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ যান্ত্রিক বিকৃতি ছাড়া কখনই [illegible] চীৎকার, অশ্বের হ্রেষা প্রভৃতি অনুরূপ স্বর নির্গত হ'তে পারে না। আমরা এখানে কর্কশ স্বরের কথা বলছি, বেসুর স্বরের কথা বলছি না। পক্ষান্তরে, মধুর স্বরও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে শ্রুতিকটু হ'য়ে পড়ে। উচ্চ কণ্ঠসঙ্গীতে এই ত্রুটি অত্যন্ত সাধারণ বস্তু। উচ্চ সঙ্গীতশিল্পী এটার ওপর গুরুত্ব দেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কেউ তারাগ্রামে পঞ্চমে বা ধৈবতে গলা তুলতে গেলেন শরীরের সমস্ত পেশীগুলি আকুঞ্চন ও সঙ্কোচন ক'রে, যার ফলে ওই অতিকষ্ট-নির্গত স্বর সাধারণ লোকের কানে কর্কশ শোনাতে বাধ্য, অথচ ওই স্বরপ্রয়োগটুকু তিনি নিছক বাহাদুরীর বা ওস্তাদির খাতিরেই করলেন, না করলেই ভালো করতেন। য়ুরোপীয় কণ্ঠসঙ্গীতসাধকের মধ্যে কিন্তু এই সুষ্ঠু বোধটুকু দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাহাদুর সঙ্গীতসাধকের এই পার্থক্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

মোটের উপর স্বাচ্ছন্দ্য (এবং তার সঙ্গে দরদ) কর্কশ কণ্ঠস্বরকেও শ্রবণীয় করে তোলে আবার ওইগুলির অভাবে মধুর কণ্ঠস্বরও চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না। কারো নাম না করে, সাধারণ ভাবে বলতে পারি যে বর্তমানে ভারতবর্ষে এমন অনেক প্রথম শ্রেণীর সুগায়ক রয়েছেন, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানদত্ত সুকণ্ঠের অধিকারী নন। অথচ তাঁদের সঙ্গীত আমাদের মুগ্ধ করে—কেন ? শারীরিক ভঙ্গিমা এই কণ্ঠস্বর প্রয়োগের সহিত স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্কিত। মার্গসঙ্গীতশিল্পীর এই সাধারণ ত্রুটি, যাকে বলা হয় মুদ্রাদোষ, সাধারণের নিকট স্বভাবতই অত্যন্ত বিভীষিকা ও বিরক্তির কারণ। সঙ্গীত মুখ্যতঃ শ্রবণীয় ললিত কলা হলেও অংশত প্রেক্ষণীয়ও বটে। সঙ্গীতসৃষ্টি করতে হয় শুধু শিল্পীর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দতরঙ্গের দ্বারা নয়, শিল্পীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে, তবেই শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা আসে, আর যদি শিল্পী তৎপরিবর্তে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বৃত্র-সংহারই করতে রইলেন তখনই সেই সঙ্গীতে সার্থক কলাসৃষ্টি কখনই হলো না, তা সে উচ্চসঙ্গীতের অভিধানের দিক দিয়ে যতোই বিশুদ্ধ হোক্। এই "মুদ্রাদোষ" কতকটা অনিবার্য—তবে বেশীর ভাগটাই কু-অভ্যাসজাত, সুতরাং নিবার্য। সুর, লয় এবং উপপত্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিতে হয় বলে মার্গসঙ্গীতসাধককে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটু-আধটু শারীরিক সঞ্চালন করতে হয় কিন্তু সেটুকু কখনই চক্ষুপীড়াদায়ক হতে পারে না, কিন্তু কু-অভ্যাসজাত মুদ্রাদোষগুলো সত্যিই বিরক্তিকর। আমরা এমন গায়ক দেখেছি যে, প্রতিবার সোমে আসবার সময় আসরের মাঝখানে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে সটান্ দাঁড়িয়ে উঠেন, সাপাট তান দেবার সময় এমন ভাবে ছুঁড়লেন যে পার্শ্বে

উপবিষ্ট একজন শ্রোতার চশমা ঘুরে ছিটকে পড়লো, এমনি বহু দেখেছি। এই সব মুদ্রাদোষ শুধু শ্রোতারই ভয়োদ্রেক ও হাস্যোদ্রেক করে না, পরন্তু সঙ্গীতের ললিত পরিবেশটুকু নষ্ট করে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই এই দোষগুলো বর্জন করা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

—শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য।

আমার কথা (৬৪)

শ্রীসমরেশ চৌধুরী

অল্প বয়সে পিতৃহীন—অভিভাবকদের আপত্তি—জীবনারম্ভে অর্থ-সংস্থানের প্রচেষ্টা—তবুও সঙ্গীতচর্চ্চা করেছেন আপন মনে যিনি—নাম, যশঃ, খ্যাতি ও অর্থ-লালসায় অভিভূত হন নি যে শিল্পী—আজ তিনি স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবিকৃত গায়কী পরিবেশকরূপে জনসমাজে। বেদনাদায়ক অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক শিল্পি জীবনী সেদিন বসে শুনেছি প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীসমরেশ চৌধুরীর মুখ থেকে তন্ময় হয়ে—

"আমার শিল্পিজীবন একান্তই নিজের কাছে নিভৃতে স্মরণীয় ইতিহাস—বাহিরে ইহার কি কদর জানি না। যেটুকু এগিয়েছি তার হিসাব নিজের কাছে মূল্যবান। অন্যের কাছে এর মূল্যমান কতটুকু বলতে পারি না। নয় দশ বৎসরের কথা মনে আসে। বাবা স্বর্গীয় রায় কেদারনাথ চৌধুরী বাহাদুর তখন ময়মনসিংহে জেলা ও সেসনস্ জজ। সঙ্গীতও চিত্রকলার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ আমার শিশুমনকে ললিতকলার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে। খেলাধূলা ও পড়াশোনার সাথে গানও ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। বাড়ীতে বাবার এস্রাজ, হারমনোমিয়ম ও সংগৃহীত সঙ্গীত-বিষয়ক বইগুলির উপর ছিল আমার দুনিবার আকর্ষণ। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহে হোতো আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্বের গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্রনাথের গান। সেগুলির সুর ও কথা এখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। সুরুচি ও মার্জ্জিত-সম্পন্ন গানের সঙ্গে সখ্যতা হয় তখন থেকে। কচি বয়সে শুনে শুনে সুর ও ছন্দে সঠিক অনুকরণ করতে পারতাম—এ কথা বড়দের কাছে জেনেছি।

চতুর্থ শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন ছোড়দিকে রবীন্দ্রনাথের গান শেখাতেন একজন শিক্ষক। প্রথমে গান ছিল 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ-মধুর হাওয়া।' আমিও ছোড়দির সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে সঙ্গীত সুরু করি তাঁর কাছে। তিনি আমাকেই বেশী উৎসাহ দিতেন আর বলতেন, গানে এর জন্মগত অধিকার। মফঃস্বলের সঙ্গীতশিক্ষক—কিন্তু গুরুদেবের গানের গায়কী তাঁর কণ্ঠে ছিল অবিকৃত। পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে শেখা গানগুলির হুবহু গায়কী শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি। দু'বছরে অনেক গান তুলে নিলাম তাঁর শিক্ষায়। সেই সময়ে ৺রজনীকান্ত ঘোষ-দস্তিদারের "সরল হারমোনিয়ম শিক্ষা" থেকে স্বরলিপি পদ্ধতি, ছোট ছোট তাল, গৎ ইত্যাদি শিখি। 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' প্রভৃতি থেকে স্বরলিপি দেখে গান তোলার মধ্যে এক অনির্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি প্রথম। এর পর বাড়ীর এস্রাজটিতে হাত দেবার অধিকার হল। ৬/৭ মাস পরে ছোড়দির গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতাম। বাড়ীর বাহিরে মেলামেশা বা খেলাধূলার সুযোগ ছিল না—অফুরন্ত সময়—তাই অল্পসময়েই আমি বেশী এগিয়ে যাই। দুই বৎসরের মধ্যে ছোড়দির বিবাহ হয় আর গান শেখার ব্যবস্থা বন্ধ হল। এখন থেকে বাবার শরীর খুব খারাপ হয়—তজ্জন্য সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। ১১২৭ সালে বাবা চিরকালের মতন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সাধনোচিত ধামে—পড়ে রইল বিরাট বিষাদের ছায়া—সাংসারিক বন্ধন শিথিল হল ক্রমশঃ—আমার গানের চর্চাও বন্ধ রইল। কিন্তু অন্তরের তাগিদে বই থেকে গান, গৎ ও রাগ-রাগিণী তোলার কাজ সবার অলক্ষ্যে ফের শুরু করি।

আরও দুবছর কাটল বিনা সঙ্গীতশিক্ষকে। এক আত্মীয় ভ্রাতার অব্যবহৃত বেহালাটি চেয়ে নিই—৺উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর লেখা বেহালা শেখার বই কিনে গৎ বাজাতে থাকি—প্রচুর স্বরবোধ ও স্বরলিপি জানা থাকায় গান ও গৎগুলি এতে তোলায় বেশি দিন লাগেনি। বেহালায় সুরের বিশেষ আবেদন থাকায় আত্মীয় স্বজনেরা (আমার গান শেখায় আমল না দিলেও) উহা বাজানর তারিফ করেন খুব। অনেক অনুষ্ঠানে বেহালা বাজিয়েছি, সেই সময় সমাজে সঙ্গীতের আদর বিশেষ ছিল না—এতে লোক নষ্ট হয়ে যায়—এইরূপ ধারণার জন্য গুরুজনেরা পড়ুয়া আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু মনের অদম্য বাসনায় নিজেকে গানবাজনা থেকে তখন নিবৃত্ত করতে পারি নাই।

১১২১ সালে (দশম শ্রেণীর ছাত্র) আমার রাগসঙ্গীত শেখার সুযোগ আসে প্রখ্যাত ওস্তাদী হোসেনের সুযোগ্য শিষ্য ওস্তাদ মহম্মদ হোসেনকে আমার সঙ্গীত-গুরু হিসাবে পেয়ে। আই-এ

সেকেণ্ড ইয়ার পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে শিখি তাঁর কাছে। পড়াশোনার সাথে দিনেরাতে ৬।৭ ঘণ্টা অভ্যাস করে খেয়াল পদ্ধতির অনেক রাগরাগিণী আয়ত্ত করি, তিন বৎসরে তাঁর কাছে ও আসরে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন করার উপযুক্ত হই। তাঁহার স্নেহ ভালবাসা ও যত্নশীলতা কোন দিন ভুলব না এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর কণ্ঠের খেয়ালের গীত, আলাপ ও তানের স্বরলিপি করতুম বলে তিনি খুব বিস্মিত হতেন। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর যখন ওস্তাদজীর কাছ থেকে দূরে আসি—তখন গীতসূত্রসার, সঙ্গীত-মঞ্জরী, সঙ্গীত-চন্দ্রিকা, প্রাচীন ধ্রুপদমালা, রাগবিজ্ঞান, ক্রমিক পুস্তকমালিকা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি আমাকে পরিচয় করিয়েছে অফুরন্ত রাগরাগিণী ও গীতের সঙ্গে। তখন নানা আসরে খেয়াল গান পরিবেশন করতাম—কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতাম। রাগসঙ্গীতে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও কবিগুরুর গানের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মনে বাসা বেঁধেছিল। ওস্তাদজীর নিপুণ শিক্ষার গুণে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বর রাগসঙ্গীতের কঠোর চাপে লালিত্য হারাতে পারেনি। কবিগুরুর গানের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর তাই ব্যাঘাত পায়নি কখনও।

আই, এ, পাশ করার পর আমার জন্য চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন আমার মাতামহ। উপার্জ্জনের প্রতি বড়দাদার আগ্রহ ছিল না। সংসারের আয় নেই অথচ ব্যয় প্রচুর—ফলে জীবনযাত্রার উপর অভাবের চাপ আসতে লাগলো। দুই ভাই আশানুরূপ উপার্জ্জনক্ষম হলে পারিবারিক ধারা বজায় থাকবে—মা ও দাদামশাই তাই ভরসা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের দিকে আমার অদম্য আকর্ষণ তাঁদের বিচলিত করে তোলে। ঠিক হল গ্রাজুয়েট হয়ে আমায় 'আইনজীবীর' রাস্তা ধরতে হবে। জীবনে বড় রকম সমস্যা এই প্রথম দেখা দিল। আমি হব 'সঙ্গীতজ্ঞ' আর অভিভাবকেরা চান 'আইনজ্ঞ সমরেশ'কে—মনে দ্বিধা এল। মনঃস্থির করলাম—তাই ১১৩৩ সালে চুপি চুপি শান্তিনিকেতনে এসে 'থার্ড ইয়ারে' ভর্ত্তি হলাম। গুরুজনেরা খুবই রুষ্ট হলেন—বোলপুর ছেড়ে আসার আদেশ দিলেন। বি, এ, পাশের পর 'ল' পড়ব কথা দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করি। শান্তিনিকেতনে গানের দলে যোগ দিলাম। তখন 'সঙ্গীত ভবন' হয় নি। প্রধানতঃ ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গানের তালিম নিতাম। তাঁর যত্ন ও নিষ্ঠা ভুলবার নয়। উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি, নাটকের মহড়া, গুরুদেবের কণ্ঠনিঃসৃত গান তোলা ও নৃত্যনাট্যাদিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলাম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণতত্ত্ব জানবার—গুরুদেবের স্নেহলাভ—কবিগুরুর সান্নিধ্য—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে নেওয়ার দুর্লভ সুযোগ—'নবীন', 'শাপমোচন', 'তাসের দেশ', 'চণ্ডালিকা' ইত্যাদির ভারতব্যাপী পরিবেশনায় অংশগ্রহণ—এনে দিল আমার মনে এক নব-উন্মেষ। সে বৎসর শান্তিনিকেতনে যেন গানের বন্যা এসেছিল। শিশুর কাকলী, বাল্যের প্রবৃত্তি, কৈশোরের স্বপ্ন—যেন যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ মূর্ত্ত হল এই শান্তিনিকেতনে—শ্রদ্ধেয় দীনুদার স্নেহে ও জগৎকবির বাৎসল্যে। নিজেকে ধন্য মনে করি বারে বারে।

এই সময়ে অভিভাবকদের পত্র পাই—সংসারের ভার চাপিয়ে আমার মতি-গতি শোধরাবার জন্য খ্যাতনামা পরিব্রাজের একটি কন্যাকে বিবাহ করার জন্য। বিদ্রোহ ক্ষুধা মনে করে তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করি। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে নিবিড় ভাবে লিপ্ত হলাম সঙ্গীতরাজ্যে। ক্রমাগত গান আহরণ করতে থাকি গুরুদেব, ৺দীনেন্দ্রনাথ, নুটুদি, শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নিকট। কেন্দ্র বদলে ময়মনসিংহ থেকে বি, এ পরীক্ষা দিয়ে ১১৩৬ সালে গ্রাজুয়েট হই। কলিকাতায় এম এ, ও ল তে ভর্ত্তি হলুম। কিছুদিন গানের চর্চ্চা বন্ধ থাকলেও কলিকাতায় আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। বাংলা গানে প্রথম, খেয়ালে দ্বিতীয়, বাউলে তৃতীয় ও ভজনে চতুর্থ স্থান পাই। খ্যাতনামা ৺মুরারি মিশ্র সেবার একজন প্রতিযোগী ছিলেন। ১১৩৬ সালেই কলিকাতা বেতারে শিল্পী হিসেবে যোগ দিই। এখন থেকেই গুরুদেবের গানের অবিকৃত গায়কী পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। তাঁর গানের 'ঢঙ' কে আজ অবধি নষ্ট করিনি, এ আমার গর্বের বস্তু। তাঁর গানের ঢঙকে কিছুটা পরিবর্ত্তন করা হত—রেকর্ড বিক্রয় বাড়াবার জন্য। আমি প্রতিবাদস্বরূপ রেকর্ডে গান দেওয়া বন্ধ করেছি। তাতে আমার ক্ষতি হয়েছে অনেক—কিন্তু মানসিক তৃপ্তি পেয়েছি ঢের বেশী। এই সময় কলিকাতায় শ্রী অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে বহু রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখি। জীবনব্যাপী এঁদের সাধনার কথা কাহারওঅবিদিত নেই। ১১৩৭ সাল থেকে 'সংসারের ভার নিতে হল। পিতৃদত্ত অর্থের কোন সাহায্য অভিভাবকদের কাছ থেকে না নিয়ে জীবনযাত্রা চলল। পড়া ছেড়ে দিয়ে উপার্জ্জনে নামতে হল—গানশেখানোর মাধ্যমে। তখন কলিকাতায় শান্তিনিকেতনের ও ঠাকুরবাড়ীর সংশ্রবে যত সঙ্গীতানুষ্ঠান হত—তাতে যোগ দিতে হয়েছে। সমাদরও পেয়েছি প্রচুর। রবীন্দ্র—সঙ্গীত বিকৃতরূপ নিয়েছে বলে ১১৪০ সালে 'বিচিত্রা—ভবন এ' গীতালী নামে উহা ঠিকমত শেখানর জন্য একটি সঙ্গীতালয় খোলা হয়। ইহার উদ্বোধন করেন গুরুদেব স্বয়ং—আর আমাকে দায়িত্ব দেন গান শেখাবার। তিনি শান্তিনিকেতনে পুনরায় আমাকে লওয়ার কথা বলেন কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য যেতে পারিনি। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল তার জন্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে কলিকাতায় রোগশয্যায় আমি কবিগুরুকে গান শোনাতাম নিয়মিতভাবে। আমার শিল্পিজীবন তাঁহার এই আন্তরিক স্নেহ আমার নিভৃত অন্তরে মস্তবড় সম্পদ হয়ে আছে।

১১৪২ সালে শান্তিনিকেতনের 'সঙ্গীত'ভবন' এ অধ্যাপনার কাজ করেছি। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় এক বৎসর পরে ফিরে আসি কলিকাতায়। শিল্পিজীবনে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে আদর্শগত বাধা পেয়েছি অপরিসীম—রবীন্দ্র সঙ্গীতের রূপ অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে। আজও আমার এই লক্ষ্য। গুরুদেবের গান যে ভাবে চিনেছি, জেনেছি ও শুনেছি—সেভাবে গান গাওয়া, শেখা ও প্রচারের সাধনায় আমার শ্রমজীবন কেটেছে। আজ জীবন-অপরাহ্ণে দাঁড়িয়ে সমস্ত হিসাব মিলিয়ে দেখি যে জ্ঞানতঃ আমি আদর্শ থেকে চ্যুত হইনি।

সঙ্গীতের অন্যান্য দিকে আমি ঋণী হয়েছি শ্রীহরিদাস ব্রজবাসী, মহম্মদ জমীরুদ্দীন খাঁর শিষ্য আশু চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্ন শ্রী অমরনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খাঁর নিকট।

শ্রীচৌধুরী শেষ করেন এই কথা কয়টিতে। সঙ্গীতরাজ্যে ও শিল্পীদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ রাজনীতি (Politics) আমদানি যেন ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

আমেরিকায় আমায় খুব খাতির করেছিল। মিঃ আর মিসেস মিলেও আপনার লোকের মত করেছিলেন। মিসেস মিলে জন্মেছিলেন মাদ্রাজে তাই ভারতীয়দের ওপর তাঁর একটা মায়া ছিল।

ধনগোপালের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়নি, পরে এসে বললে—আগে জানলে আপনার সঙ্গে সময়মত দেখা করতুম।

মিসেস মিলে আসবার সময় একটা ছোট ডিনার দিয়েছিলেন। তাতে উইল ডুরান্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বিশেষ হয়নি, ভীষণ সিরিয়াস লোক।

ইনষ্টিটিউট অব সোসিয়োলজির ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন—দেখ, বাঙলা আমি জানিনা, সংস্কৃত কিছু কিছু পড়েছি। বলে এমন কতকগুলো সংস্কৃত নাটকের নাম করলেন যার অধিকাংশই আমি পড়িনি। ভদ্রলোক ছটা ভাষা জানতেন, তার মধ্যে তিনটে বেশ ভাল জানতেন, লিখতে পড়তে পারতেন। বাকীগুলো পড়তে পারতেন ঠিকই কিন্তু ভাল করে লিখতে পারতেন না—Can not express myself well!

হারভার্ডের সংস্কৃত প্রফেসার জ্যাকসনের সঙ্গেও চেনা হয়েছিল। তিনি সরাসরি আমায় প্রশ্ন করে বসলেন—তোমাদের বইটি দু'হাজার বছরের পুরোনো বলছ কিন্তু বাঙলা ভাষাত—

কথাটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললুম—ওটা পাবলিসিটি হ্যাণ্ড আউট! আসলে ওরিজিন্যাল গল্পটাও রামায়ণ থেকে নেওয়া। তারপর একথা সেকথা বলে কেটে পড়লুম।

আমাদের নাটকের অখ্যাতি বিশেষ কেউ করেনি এক নিউইয়র্ক টাইমস। ওরা বলেছিল—A mediaeval story with a slow tempo, নিউইয়র্ক সান খুব ভাল লিখেছিল।

মসেরা আমায় ইংরেজীতে অনুবাদ করে করতে বলেছিল। তাতে আমি বললুম—সবইত ঠিক বলছ, কিন্তু ওদের অ্যাকসেণ্ট যে খারাপ হবে।

তার উত্তরে বললে—Worse the accent the better, ওরাই বলেছিল—ব্রুকলিন, নিউ জার্সিতে যত ভারতীয় আছে সব পাগড়ী বেঁধে ষ্টেজে তুলে দেব। ষ্টেজে হাতী তুলতেও চেয়েছিল।

ওদের আসল মতলব ছিল—তোমরা যে জংলী সেইটাই সকলকে প্রমাণ করে দেব।

আমি রাজী হইনি, বলেছিলুম—বাঙলায় নাটক করাতে এনেছ, বাঙলাতেই করব।

১৭ই নভেম্বর এলেন মালিনীর প্রথম রিহার্স্যাল দিতে। কথা হচ্ছিল—অভিনয় করানোর জন্যে কিছু অল্প বয়েসী মেয়ে দরকার আর তাদের কিছু শিক্ষা থাকা দরকার। শুনে বললেন—অল্প বয়েসী মেয়ে ত আমাদেরও ছিল। এখানে চল্লিশ বছরে রঙের গোলা লাগিয়ে কি আর বয়েস বেঁধে রাখতে পারে?

আবার বললেন—বেশী শিক্ষিত মেয়ের ত দরকার নেই, শুধু বর্ণ-পরিচয় থাকলেই হবে। তবে উচ্চারণটা ভাল করে করতে জানা চাই, তাহলেই চলবে। বইএর শিক্ষাত শিক্ষা নয়, সারা জীবনের শিক্ষাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। একজন গ্র্যাজুয়েটের চেয়ে লেখাপড়া না জানা একজন দেখবে; কার্য্যক্ষেত্রে বুদ্ধিমান। কাজত দেয় বুদ্ধিটাই। বড় বড় অনেকে সব জানি বলে মাথা দোলায়, কিন্তু অন্তরে তারা কিছুই বোঝে না।
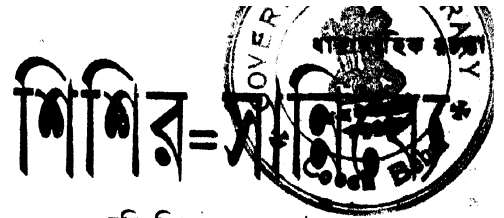
বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা তুললেন এবার—বিদ্যাসাগর মশায়ের তুলনা হয় না। ওঃ, কম কষ্ট পেয়েছেন তিনি! ন বছরের বালককে বাড়িশুদ্ধ লোকের রান্না করতে হয়েছে; অথচ তার ভেতর নিজের অন্তরের তাগিদে কিছু করতে পেরেছেন।

জীবনে সান্ত্বনা হচ্ছে কিছু করতে পারা। হ্যাঁ, সত্যিই তুমি কাজের কাজ করেছ একথাটা কেউ কোনদিন বলে না কাউকে। সবাই শুধু নিতেই চায়। বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে মাসোহারা পেলেই সবাই শান্ত। তাছাড়া আর কিছু তারা কেউ জানত না।

পাছে সব টাকা খরচ হয়ে যায়, তাই বাইরে যাবার আগে একজনের কাছে চোদ্দশ টাকা রেখে কয়েকজনের নাম বলে তাদের মাসিক আশী টাকা করে মাসোহারা দিতে বলে যান। ফিরে এসে শুনলেন যাদের প্রাপ্য তারা কেউ টাকাটা পায়নি। যার কাছে (টাকা) রেখে গিয়েছিলেন, তাকে জিগ্যেস করাতে, সে বললে—না, টাকাটা দেওয়া হয়নি, তাড়াতাড়িই দিয়ে দেব।

তারপর আর কোনদিন তাকে বিদ্যাসাগর মশায় তাগাদা দেননি। উনি একবার দুবার কি বড় জোর তিনবারের বেশী তাগাদা দিতেন না বা করতেন না।

এবার মালিনী নাটকটা ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন, অথচ কোথাও তার বিষয়ে কিছু লেখেননি পর্যন্ত।

এই সময়ে শ্যামলী চক্রবর্তী এসে ওঁকে প্রণাম করলেন। তারপর কি কথা বলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। উনি পরিচয় জানতে চাওয়ায় ওঁকে পরিচয় দেওয়া হল, শুনে বললেন—শ্যামলী কি দুর্গেশ নন্দিনীতে অভিনয় করেছিল? ও'ত সতীশ দাশগুপ্তের বই। লোকটা বোধ হয় কিছু করতে পারত কিন্তু নিজেকে নষ্ট করলে।

আকস্মিক ভাবেই বললেন—সীতা মঞ্চস্থ করতে আমার নব্বই হাজার টাকা খরচ হয়েছিল আর উঠেছিল কত জানো? মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকা। সে অনেক কিছু ব্যাপার! প্রত্যেকের সবচেয়ে বেশী গ্রেড একশ টাকা, তারপর তার চেয়ে কম, এমনি করে মাইনে ধরা হয়েছিল বা দেওয়া হ'ত। শেষ পর্যন্ত গোল বাধালে একশ টাকার হোমরা-চোমরারা। তারা বললে—অন্যদের একশ টাকা হলে আমাদের আরো বেশী হওয়া দরকার।

ওয়ান সাহেব বলতেন—তোমাদের সবচেয়ে বড় দোষ তোমাদের আতিশয্য।

আবার মালিনী ধরলেন, বললেন—মালিনীর প্রথমেই কাশ্যপ যে কথাগুলো বলছেন, বলার মধ্যে দিয়ে বোঝাতে হবে—ভবিষ্যতের কথা। মহাক্ষণ কথাটা খুব দরকারী। সেটা ঠিক করে প্রকাশ করতে হবে। চোখ দুটোকে বড় করতে হবে।

মালিনী অভিনয় করার পারমিশান সম্বন্ধে বললেন—মালিনী আর ঘরে-বাইরে আমার পারমিশান নেওয়া ছিল ৪৩এ। ভাবলুম কর্তা গত হলেন, কে আবার কি বলবে। তা চার বছরের মধ্যে করার কথা ছিল, করতে পারিনি। তারপর চাইলেই পারমিশন দিয়েছে। রেডিয়োতে ঘরে-বাইরে শুনলাম—বলবার মত নয়।

এবার কাঞ্চুকীর ভূমিকায় এক একজনকে ডেকে পড়াতে লাগলেন। দেবুদাকেও পড়ানো হ'ল, (মানে বিনয়দা জোর করে পড়ালেন)। দেবুদা খুব হাত-মাথা নেড়ে পড়ছিল, বললেন—দেবু তুমি হাতটাকে নেড়োনা। ঘাড়টাকেই বা ওরকম করছ কেন? তোমার দু'টাকা তেরো আনা বাদ রেখে দাও।

তারপর মালিনী আর রাণীর ভূমিকায় রিহার্স্যাল দিতে শ্যামলী চক্রবর্তী আর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকলেন, বললেন তোমাদের দুজনকে সুন্দর মানাবে। একজন মালিনী আর একজন রাণী।

করুণা বৌদি মৃদু আপত্তি তুললেন—আমার গলা ভাল নয়, গলার জোর নেই।

হেসে বললেন—তোমার গলা বেশ ভাল: তোমার গলায় যে কত জোর তা তুমি নিজেই জানোনা।

দুজনকার ভূমিকা পড়ানো সুরু হ'ল, কিছুটা পড়িয়ে বললেন—তোমার বাপের দৈন্য বলতেই রাণী চটে গেছেন, তাই রাগ করে পরের কথাগুলো বলে নিলেন। তারপরেই আবার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। রাজা এসে যেই বলছেন—নির্বাসন, অমনি চটে গেছেন রাণী, পরের কথাগুলো (তাই) ব্যঙ্গ করেই বলছেন।

সুপ্রিয়র ভূমিকা করা অনেক কঠিন। ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে একটা কাঠিন্য আছে, সেটা সহজেই ফোটে কিন্তু সুপ্রিয়র বোকা বোকা ভাবটা দেখানো অত সহজ নয়।

মালিনীর ভালবাসা কিন্তু মোটেই Personalized নয়, idealized.

রবীন্দ্রনাথের মব সত্যি মারাত্মক। অবশ্য মালিনীতে অতটা নয়, কিন্তু তপতী, বিসর্জন কি রাজারাণীতে মব করা রীতিমত শক্ত। তপতীতে একজনকে শেখাতেই একমাস লেগে গেল।

কে একজন বললেন—মহাজাতি সদনের হলে accoustics ভাল নয়। অভিনেতাদের ছোট দেখায়।

শুনে বললেন—তাই নাকি? আমি ত মেট্রোপলিটান গ্র্যাণ্ড অপেরায় ওপরে বসে অভিনয় দেখেছি, অভিনেতাদের একেবারে পুতুলের মত দেখায় কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার শোনা যায়। আমাদের এখানে ফাষ্ট এম্পায়ার হলও খুব ভাল, তখনকার accousticsও খুব ভাল—ডোমের নীচে হ'লত। ষ্টেজটা এখন কেমন আছে জানিনা তবে আগে কিন্তু খুবই ভাল ছিল। এখন কি যেন নাম হয়েছে? বলা হ'ল—রক্সি।

মালিনীতে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে সব উক্তি আছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—আগে আমাদের ব্রাহ্মণদের খাতির ছিল বেশী। ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন খাওয়া হলে তবে অন্যরা খেতে যেতে পারত। বাড়ির কর্তা এসে বলতেন—ব্রাহ্মণদের জায়গা হয়েছে।

আমার বিয়েতে শহীদ সুরাবর্দিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলুম, জামাকাপড় পরিয়ে একেবারে খাস হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলুম।

একবার এক বন্ধুর বিয়েতে ব্রাহ্মণদের ডাকতে এসেছে, আমরা বললুম—আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ট্রাহ্মণ নেই। আমরা সবাই ৭নং কলেজ স্কোয়ারের দল।

১৮ই নভেম্বর এলেন নাট্যোৎসবের নাটক রিহার্স্যাল দিতে। ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছে নাট্যোৎসবে মাইকেল, ষোড়শী আর বিজয়া হবে। পুরোণো স্মৃতির তাগিদে ওঁর ইচ্ছে ছিল আলমগীর করবার, আর অনেক দিন আগে শেষ অভিনীত নাটকের পুনরভিনয় দেখার লোভে আমরা চেয়েছিলাম দিগ্বিজয়ী নাটক অভিনয় করাতে। (এককালে যে নাটক যথেষ্ট সুনাম পেয়েছে, আমাদের মধ্যে বয়স্করা যে নাটকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অথচ আমাদের জ্ঞানতঃ যে নাটক অভিনীত হয়নি তার অভিনয় দেখার লোভ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৈ কি!) কিন্তু দু'পক্ষের কারো ইচ্ছাই পূর্ণ হলো না। রফা হ'ল মাইকেল, ষোড়শী, বিজয়া, এই হবে নাট্যোৎসবের নাটক।

এদিন এসে তাই ঐ নাটকগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করলেন। প্রথমে বললেন—বিজয়া নাটকে আর আছে কি? বেশ একটা মিষ্টি গল্প, তাতে Human element প্রচুর। নাটকটাকে ভাল করে ফোটানোর জন্যে একটা সিন লেখাতে চেয়েছিলুম, বিজয়া কেন সই করল। ও যে দয়ালকে বলছে—আমি যে নিজের হাতে সই করে দিয়েছি।

তাতে দয়াল বলছেন—নলিনী আমায় সব কথা বলেছে। তোমার হাতে সই করেছে, মন সই করেনি।

ওখানে বিলাসের অ্যাকটিং-এরও স্কোপ থাকত। বিলাসকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলুম—বাবার কি ইচ্ছে তা আমি জানি না। আমি কিন্তু তোমার সম্পত্তি চাইনা। আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমাকেই চাই। আমাদের আচার-ব্যবহার এক রকম, আমরা ছোট থেকে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, পরস্পরকে আমরা চিনি কাজেই পরস্পরকে পেয়ে আমরা সুখীই হ'ব।

তারপরেই বিজয়া সই করে দিলে।

এ দৃশ্যটা শরৎদাকে অনেকবার লিখতে বলেছি কিন্তু উনি বললেন—Not a line more. কিছুতেই লেখাতে পারলুম না। সব মানুষেরই idiosyncracy থাকে ত, ওঁরও ছিল। লেখা এক লাইনও উনি কাটতে দিলেন না। ঐ কাটা নিয়েই ত পল্লী-সমাজে গোলমাল বাধল, উনি তখন বললেন—আমি অন্য জায়গায় যাই।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ফিরে আসতে হ'ল, বললেন—তারা ওয়া রোঁদে করতে পারে, সন্দেশ করতে জানেনা।

পঙ্কজদা নাট্যোৎসবের সুভেনিরের অন্যতম সম্পাদক হয়েছেন, তাতে নাটকগুলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবেন ঠিক করেছেন, সেই প্রসঙ্গেই ষোড়শীর কথা তুললেন। বললেন—ষোড়শী সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে পারি, তবে এখানে নয়, বাড়ীতে বসে। এখানে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ষোড়শী নাটক আর দেনা পাওনা উপন্যাসে বিশেষ মিল নেই। জীবানন্দ ঐ যে বলছে না—আমি চাই, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ঘর বাড়ি সব কিছু চাই। জানি মরণ যখন আসবে, তাকে ঠেকাতে পারব না, কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের সামনে নিজের বাড়িতে মরতে চাই।—এই কথাগুলো উপন্যাসে ছিল না।

কিন্তু তার পরেই বলছে—ফাঁকি দিয়ে পেয়ে পেয়ে আমার লোভ বেড়ে গেছে। কিন্তু আর ফাঁকি দিয়ে পেতে চাইনে।

আবার আছে—জমি আর জমিদারের নয়, জমি এখন কৃষকের।

একেবারে ব্যক্তিগত জিনিষ সাধারণ হয়ে দাঁড়াল।

এবার বললেন মাইকেলের কথা—মাইকেলে ছুটি সিনে মাইকেলের জীবনের এক একটি বাঁক ফোটানো হয়েছে। মাইকেল লিখেছেন ত মোটে পাঁচ বছর—না, বোধ হয় তারও কম হবে; কিন্তু কি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। নাটক ওঁকে লিখতে দিলে না তাই। বিলেত থেকে ফিরে বোধ হয় লিখেছিলেন—না, না বিলাত যাবার আগেই লেখেন, মাদ্রাজ থেকে ফিরে।

তারপর বিলেত গেলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে, কেন না তখন মাথায় এসেছে টাকা রোজগার করতে হবে। ওঁকে বিস্তু বিপদে ফেললে গুরুদাস—যার হাতে বিষয়ের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আর কি! ওঁর পরিবারকে মাসে মাসে আড়াইশো টাকা করে দেবার কথা, কিন্তু এক পয়সাও দিলেনা। তারা বিপদে পড়ে টাকা ধার করে মধুর কাছে চলে গেল। সেখানে তিনি তখন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন, ছেলে-পুলেরা যেতে বেশী অসুবিধের পড়লেন। নানা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে মিশছেন, অথচ ল্যাণ্ড লেডি বলছে, ভাড়া না দিলে বার করে দেবে।

বিদ্যাসাগর মশায় ওঁর জন্তে কিন্তু অনেক করেছেন। প্রচুর ধার করে পাঠিয়েছিলেন, ওঁর জন্তে বাড়ি ভাড়া করে সাজিয়ে রেখেছিলেন: উনি না ওঠায় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু ক্ষুণ্ণ হন। তারপর সময়মত ধারশোধ না করাতে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভুল তাঁরই হয়েছিল। সুকিয়া ষ্ট্রীটে যে মাইকেল থাকতে পারেন না, এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবন নিয়ে, বিশেষকরে শেষ-জীবন নিয়ে, খুব ভাল একটা নাটক লেখা যায়। কেন উনি পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন; কেন মা দেশে থাকলেও বীরসিংহে গেলেন না; ভায়েরা কেন ছাপার অক্ষরে তাঁকে গালাগাল দিলেন তা জানা যায়না। সেইজন্তেই বোধহয় উনি বলেছিলেন—ও লোকটা আমায় গাল দিচ্ছে কেন? আমিত কখনো ওর উপকার করিনি!

বিদ্যাসাগর মশায়ই প্রথম দেখালেন যে, লিখেও সংসার চালানো যায়। প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা রোজগার করা সহজ কথা নয়। অথচ উনি তাই করেছেন।

১১

মাইকেল সম্বন্ধে শিশিরকুমার অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁর মতে, শুধু কবি হিসাবেই নন, নাট্যকার হিসাবেও মাইকেল খুবই বড় ছিলেন। নানা কারণে তাঁর নাটক লেখায় বাধা না পড়লে, তিনি বাঙলা নাট্যসাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করতে পারতেন। কর্মের দিক থেকে তাঁর নাটক একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

এতদিন পরে মাইকেলের নাটক পড়বার কথা হ'ল। ২০শে নভেম্বর মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা পড়তে এলেন। প্রথম কথা বললেন—মাইকেলের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা—১৮৫৮ সালে লেখা। ভাষাটা সেদিনকার দিনের পক্ষে মোটেই খারাপ নয়, একটু আধটু বদলে দিলে একেবারে আধুনিক ধরণের হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু নাটকের গঠন সংস্থান খুব সুন্দর। অথচ এই লোকটিকে নাটক লিখতে দেওয়া হ'ল না। কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করা হ'ল না বলেই উনি আর নাটক লিখলেন না। এতদিন পরেও বাঙলা নাটক কৃষ্ণকুমারী থেকে একপাও এগোয়নি। ইচ্ছে করে ওটা পড়বার আগে টডের রাজস্থানের কাহিনীটি পড়ে শোনাই। ওতে সবকিছুই ভাল এক তপস্বিনী নামটা ছাড়া। ওটা প্রায়োরেস বা অ্যাবেস গোছের কোন একটা চরিত্র কল্পনা করে লেখা। ওটার কোন একটা নাম দিলেই বোধ হয় পারতেন।

নাটক পড়তে সুরু করে বললেন—শর্মিষ্ঠার সুরুতে এই যে লম্বা বক্তৃতা আছে, এটা সম্বন্ধে নাট্যকার ওয়াকিবহাল তাই পরিক্রমণ লেখা। পরের প্রকৃতি বর্ণনা একেবারে সংস্কৃত থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সখীর কথাগুলো একটু বেশী দীর্ঘ। দেবযানীর সঙ্গে পূর্ণিকার কথাও এত বেশী বলবার কোন দরকার নেই, কিন্তু দর্শকরা পাছে বুঝতে না পারে তাই হয়ত বলা হয়েছে। এই অংশটা হ'ল যাত্রার প্যাঁচ। যাত্রার ধরণের সঙ্গে নাটকটির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

আবার কিছুটা পড়ে বললেন—এইখানে নাটকটি কতখানি এগিয়ে গেল। তাইত বলছি এর গঠন নৈপুণ্য চমৎকার। শুক্রাচার্য যে মেয়ের মনোভাব জানবার জন্তে পূর্ণিকাকে বলেছিলেন আর সে তা জেনে জানাচ্ছে—এই কথাটুকু জানার সঙ্গে সঙ্গে নাটক অনেকখানি এগিয়ে গেল।

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—আমি হলে শেষের স্বগতোক্তিটা দিতুম না। রাজার মনের ভাবটা এই দৃশ্যে চমৎকার ফুটেছে। বিদূষকের বলার কথা হ'ল—একটি নারীকে তোমার দরকার, তা যে কোন নারীই হোক না কেন!

পরের দৃশ্যটা পড়ে বললেন—এখানে মন্ত্রীর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলানোর অর্থ অনেকখানি টাইম ল্যাগ দেখানো। মানে পরবর্তী অঙ্কের আগেই যযাতির পাঁচটি ছেলে হবে। সাপ দিলে তাদেরই একজন বাপের জরা নেবে ও।

এই সময় চা এলো, পড়া বন্ধ করলেন। দেবুদার পিসীমা এসেছিলেন, তিনি তাঁর ভগ্নীপতির পরিচয় দিলেন। শুনে বললেন—পুরুলিয়ার শশধর গাঙ্গুলী ত! হ্যাঁ, তাকে খুব চিনতুম। কতদিন তার বাড়িতে গিয়ে থেকে এসেছি। সে ও কোলকাতায় এলেই আমার কাছে থাকত। একবার একটা কেসের ব্যাপারে ওর বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। শশধরের বিপক্ষে ছিল অনুজাক্ষ।

অন্য কথায় গেলেন—জোলার বই আমার ভাল লাগেনা, ওত বড্ড Pravient details থাকে।

চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য করবার কথা হচ্ছে নারকোল ডাঙ্গায়। আমি ওদের বলেছি without সেলুকাস—ওরা তাতেই রাজী হয়েছে। বাইরে একদল সীতা করতে ধরেছিল, বলেছিল—সাতেরোশো টাকা দেব, না হয় একশো টাকা বেশীই দেব। কিন্তু চোখের জন্তে রাজী হলুম না। কার কণ্ঠস্বর বলে ছুটে এসে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে

পারি না বলে তিনটে কেটে একটা করলুম, কিন্তু তাও হোঁচট খেতে খেতে রয়ে গেলুম। তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে হলো।

চন্দ্রগুপ্তে ছায়া কে করবে একজন জানতে চাওয়ায় বললেন—ছায়া ত গীতা করবে বলেছে। ও সাতটায় যাবে।

কে একজন বললেন—ওঁর ত পার্ট আছে, শেষ হতে দেরী হবে বোধ হয়।

বললেন ওর পার্ট যখনই শেষ হোক না কেন, যাবে যখন বলেছে, তখন ঠিক সময়েই যাবে। ও ত আজ পর্যন্ত আমাকে বিট্রে করেনি, একবার শুধু ভুল করেছিল। গীতা বেশ ভেবে চিন্তে বুঝে পার্ট করে, কাজেই পারবে।

আজকালকার দিনে দুটি মেয়ে মোটামুটি বেশ ভালই অভিনয় করে। একটি হ'ল গীতা, অন্যটি—

কে একজন ফস করে বলে বসলেন—কেতকী।

একটু অবাক হয়ে বললেন—কেতকী? সে কে?

ভদ্রলোক বললেন—প্রভার মেয়ে ছুটু।

বললেন—ছুটু? না তার অভিনয় দেখিনি। আমি বলছি নমিতার কথা। ওর মধ্যে বেশ সম্ভাবনা ছিল, হয়ত বল্লোবস্ত করা যেত, কিন্তু আজকাল ওর নিজেরই কেমন ফাঁকি দেবার ঝোঁক এসেছে।

নরেশ আজকাল কাত্যায়ন করে তাতে নাকি প্রাণ থাকে না। আচ্ছা, এতকাল ধরে করছে, এখনও প্রাণ থাকেনা; এটা কি রকম করে হয়? এক বলতে পার প্রথম থেকেই প্রাণ ছিল না, কিন্তু তাহলেও অন্যায় করা হয়। কাত্যায়ন ও খুবই ভাল করত।

ইনষ্টিটিউটের হল সম্বন্ধে বললেন—ওখানে মাইক দিতে হবে, নয়ত দোতলায় যারা বসবে তাদের ওপর অন্যায় করা হবে। হলটার accoustics খুবই খারাপ, ছাদটার জন্যে কথাগুলো ভাল করে শোনা যায়না। তাছাড়া মোটা মোটা থামগুলোর জন্যে দেখারও অসুবিধে হয়। কিন্তু ওটাত ইচ্ছে করে করা! পনেরো ইঞ্চি করে দেওয়াল করারও দরকার ছিলনা, আর অত মোটা থামেরই বা কি দরকার ছিল? যাতে থিয়েটার না করা যায় সেই জন্যেই ওভাবে তৈরী করা। যেভাবে হলটা তৈরী তাতে মিটিং হতে পারে, অভিনয় নয়। হ্যাঁ তবে অভিনয় আমরা করেছি। ওয়েল সাহেব বলেছিলেন—ওখানে যে ড্রামা হবে তা আমি জানতুমই না।

ড্যালহৌসি ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করেছিলুম ১৯১৩ সালে—

ওঁর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের যুগের বন্ধু কান্তিবাবু এসেছিলেন এদিন, তিনি বাধা দিয়ে বললেন—না ওটা ১৯১৪ সালে।

বললেন—কান্তি, তুমি বলছ ওটা ১৯১৪ সালে। ওর একটা প্রোগ্রাম আমার কাছে আছে দেখব এখন। ইনষ্টিটিউটে রত্নাবতী করবার কথা হ'ল; তা আমরা এখানে না করে ওখানে করলুম। কতকগুলো ফিরিঙ্গী মেয়ে এসেছিল। বিনা প্রচারেই এত লোক হোয়েছিল যে, টিকিট দিতে পারা যায়নি। ওখানকার প্রোগ্রামেই প্রথম বেরোয় Directed by Sisir Kumar Bhadury.

২২শে নভেম্বর এসে ইনষ্টিটিউটের এক মাতব্বরের নাম করে বললেন—অমুক বলছিল, আলমগীর করলে বিক্রী হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আলমগীর করতে আর ভাল লাগে না, হাঁ, আমি ওকে বলেছি যে, অত যদি ঝোঁক থাকেত অন্য এক সময় কোরো।

চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছিলো, সেই প্রসঙ্গেই বললেন—চন্দ্রগুপ্তে ছায়া করবে গীতা, এইরকম কথা হয়েছে। ছায়ার একটা দৃশ্য সবচেয়ে দরকারী। মানে শেষ দৃশ্যে গলায় মালা পরাতে গেলে যে হেলেন বলবে—আমায় নয় রাজাকে দাও।—সেটার কোন অর্থই হয় না, কারণ তার আগের দৃশ্যটা বছর কুড়ি করা হয়নি।

মগধ রাজদূত বিবাহের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে, মন্ত্রী বলছেন, আমাদের রাজকন্যার আর কোনোদিকে মন নেই, কুনো হয়ে গেছেন, যাবেন কিনা সন্দেহ।

তারপরেই এলেন ছায়া, শুনে বললেন—ভাল কথা! নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলুম, কিন্তু যেতে পারব কি না সন্দেহ। রাজদূত চলে যেতেই মনে হ'ল—এ দুর্বলতা জয় করতে হবে। তাই ডেকে বললেন মন্ত্রীকে—রাজভাণ্ডার থেকে রত্নভার নিয়ে গিয়ে শ্রেষ্ঠ আভরণ তৈরী করাও, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

এবার কোন নাটকে কে কি ভূমিকা করবে তাই নিয়ে আলোচনা সুরু হ'ল। মাইকেলে এক বিশেষ ভূমিকাভিনেতার নাম করে বললেন—ওত করত পার্টটা কিন্তু সে যখন আমাদের দল থাকতেই অন্য দলে চলে গেল, অভিমান করল, তখন তাকেত আর ডেকে আনতে পারি না। তবে সে যদি নিজে আসতে চায় ত না বলব না। আমার যা বয়েস তাতে পুরোনো কথা মনে করে রাগ করতে পারি না সেটা অন্যায়।

বলতে বলতে যাঁর সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল তিনি এসে হাজির। তাঁকে দেখে বললেন—আরে এসো এসো, তোমার কথাই হচ্ছিল। তারপর বিভিন্ন নাটকে তাঁর কি কি ভূমিকা থাকবে বুঝিয়ে দিলেন। এবার জানতে চাইলেন, ষোড়শীতে এককড়ি কে করবে? এক সৌখীন অভিনেতার নাম করাতে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে দিয়ে বলাব।

মাইকেলে দেবকী কে করবে সে প্রশ্ন তুললেন এবার। একজনের নাম করাতে বললেন—হ্যাঁ ও পারবে, কিন্তু ওকে ত মানাবেনা। বড্ড রোগা, তাছাড়া বয়েসের ছাপ পড়ে গেছে। তবে আমি যদি মহেন্দ্রকে করতে পারিত ও-ও দেবকী করতে পারে। গান ও ভালই গাইবে।

মেয়েটি সম্বন্ধে আরও বললেন—ওর মধ্যে একটা দৃঢ়তা আছে। ও যখন প্রথমে এসেছিল, তখন দেখতেও ভালছিল। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকলে সুখেই থাকত কিন্তু গোলমালের জন্যে যায়নি। মেয়েটা ভাল; পয়সা করতে চাইলে করতে পারত, কিন্তু সে ইচ্ছে ওর হয়নি। ওর বড় মেয়েও বেশ ভাল, তবে ছোট মেয়েটাকে সামলাতে পারলে না। এই লাইনের এইত সবচেয়ে বড় দোষ।

আবার চন্দ্রগুপ্তে আত্রেয়ীর ভূমিকা সম্বন্ধে ওঁর পরিচিত দুটি মেয়ের, মেয়েদের কথা তুলে জানতে চাইলেন, ওদের মধ্যে কে বড় রে? আত্রেয়ীর গলাটা শোনা চাইত, তবেত বলব কার কণ্ঠস্বর? মানে গলায় মিল চোখের ভাব বড় হলেও বদলাবে না ত।

কেউ যখন করত, তখন বলেছি—ওকে গাইতে দাও। তা বলত—ও গাইতে জানেনা যে বড়দা।

অন্য কথা তুললেন—আজকাল কি আর কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়েনা? আমার কিন্তু সেদিন পর্যন্ত প্রায় পুরো রামায়ণ মুখস্থ ছিল। মুরারির ত ছোটবেলায় পড়তে শেখার আগেই রামায়ণ মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল; যে কোন একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেই গড়গড় করে মুখস্থ বলে যেত। রামায়ণ বড় ভাল বই। অঙ্গদ রায়বারের মত অমন অপূর্ব বর্ণনা বড় একটা দেখা যায় না।

এলেনটেরীর শেষ অভিনয় যখন হয়, তখন তাঁর বয়েস ৭০ বছর। তাঁকে জিগ্যেস করা হয়, কি বই করবেন? বললেন—রোমিয়ো জুলিয়েট।

আলোটালো ডিম করে করানো হ'ল, কিন্তু তবু বয়েসের বলিরেখা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু কি সুন্দর হাত আর কি অপূর্ব গতিছন্দ।

প্রভা ছিল সত্যিকারের ভাল অভিনেত্রী, কিন্তু দেশের কাছে কি সম্মান পেয়েছিল? অন্য চরিত্রের কথা ছেড়ে দাও—বুধবারে আমাদের একটা হাসির বই হয়েছিল, তাতে ও করেছিল একটি গেঁয়ো মেয়ের পার্ট। সে কোলকাতায় নতুন এসেছে, স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। একগলা ঘোমটা, তার মধ্যে থেকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, অনভ্যস্ত পা থেকে চটি খুলে খুলে পড়ছে, থেকে থেকে পেছিয়ে পড়ছে, আবার স্বামী ধমকাতেই ছুটতে ছুটতে কাছে যাচ্ছে।—একেবারে পুরোপুরি গেঁয়ো মেয়ে। অথচ টুরে যাওয়া ছাড়া ও কখনো গ্রামই দেখেনি।

বার্ণপুর থেকে লোকেরা এসেছিল। ওদের ওখানে কে একজন আমার নাম করে গিয়েছিল। আমিত ওদের আগেই বলে দিয়েছিলাম—মধ্যস্থ রেখে কোন কাজ করব না। ওরা বলছিল ডিসেম্বরের শেষে যেতে। তা বললুম—এই চারদিনের পর আর পারবনা।

তাতে বললে—পরে কবে পারবেন?

বললুম—বলতে পারিনা। ভবিতব্য জানে।

ওরা বললে—মেজর জেনারেল চৌধুরী আপনার কথা বলছিলেন।

মেজর জেনারেল চৌধুরী খুবই যত্ন করেছিলেন আর ওঁর স্ত্রী সত্যি গৃহলক্ষ্মী। ছশো টাকা মাইনের অফিসারের বৌরা মুখে রঙ মেখে, বাঁদঘুট জুতো আর গা-খোলা ব্লাউজ পরে আসত আর এককুশো টাকা মাইনের অফিসারের বৌ একেবারে খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালী বৌ—বাড়িতে জুতো পরেন না, এক বাগানে বেড়ানোর সময় চটি পরেন। সকালে সাড়ে পাঁচটায় উঠে কুকুরকে নিয়ে বেড়িয়ে এসে, চান করে, পুজো সেরে, রান্নাঘরে ঢুকলেন।

আমি জেনারেল চৌধুরীকে বললুম—আপনার খুব সৌভাগ্য মশায়!

জেনারেল চৌধুরী হচ্ছেন সেকেলে ঢুঁদে আই, এম, এস—যুদ্ধের সময় সুরাবায়াতে আটকে গিয়েছিলেন। ওঁর কাছেই অস্ট্রেলিয়ার

আর বৃটিশদের খুব নিন্দে শুনি। বলেছিলেন—এরকম স্বার্থপর আর কাউয়ার্ড দেখিনি, নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত। সুরাবায়া থেকে এক জাহাজে গাদাগাদি করে কলোম্বো এসেছিলেন। বললেন—কলোম্বো এসেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল! সেখানেই প্রথম চান করা, দাড়ী কামানো ইত্যাদি সারলাম। ওদের গালাগাল দিয়ে সব চেয়ে আনন্দ পেয়েছি।

এবার নিজের কথা বললেন—এই নাটকগুলো শেষ করেই চোখ কাটাব। অন্য কোন কাজ আর নেই। তবে নার্সরা বড্ড জিনিষপত্র চায়—সিগারেট দাও, চকোলেট দাও। কিন্তু খাটেও ওরা খুব।

বলা হ'ল—সে সব নার্স আজকাল আর নেই।

বললে—ও: আজকাল তারা নেই বুঝি?

ওঁর আগের কথার জের টেনে কে একজন বললেন—আর্মির লোকেদের ঠকানো খুব শক্ত, যায় না বললেই হয়। হেসে বললেন—আর্মির লোকেদের ঠকানো যায় বলছ? তবে একটা গল্প বলি শোন। তখন আমি মদনে। সেখান থেকে কিসের সব ক্যানভাস সাপ্লাই দিয়েছে, তা মাপে ছোট হয়েছে। সে এক ঘুঁদে সাহেব মেজর এসে হাজির—গোলমাল হয়েছে, সব ফেরত নিতে হবে।

সবাই ভেবে অস্থির, কি করবে ঠিক করতে পারছে না। সামলালে বুড়ো মদন নিজে। বললে—নিশ্চয়, ছোট হলে ফেরত দেব বৈকি। কিন্তু তুমি নিজে যে কোন একটা বাক্স থেকে বার করে দেখ মাপ ঠিক আছে কিনা।

সাহেব তখনি ঘেঁটেঘুঁটে বার করে তিনটে বাক্স খুললে, দেখা গেল মাপ ঠিক আছে। ব্যস, গোলমাল মিটে গেল।

সাহেব চলে যেতে অন্যরা বললে—বাব্বা, খুব বরাত ভাল। আমাদের ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল।

২৪শে নভেম্বর মালিনীর রিহার্সালে এসে প্রথমেই বললেন—দেখ একটা দল খোলা ত দরকার। মিনিমাম খরচ নিয়ে সহরে সহরে অভিনয় করে বেড়াবে, তাতে অন্তত: নাটক সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্ট বাড়বে। এরকম দু-তিনটে গ্রুপ একসঙ্গে বের করা দরকার।

মালিনীর কথা তুললেন—মালিনী খুব ভাল বই, চরিত্রগুলোর ডেভোলপমেণ্ট খুব চাচাবাল। রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের বড় নাট্যকার হতে পারতেন কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে ত মিশলেন না—না, না, তাহলে কথাটা ভুল বলা হয়, মিলতে উনি চেষ্টা করেছিলেন পারেন নি।

প্রথম অবস্থায় পারেননি, কারণ তখন যারা থিয়েটারে ছিল, তারা ওঁকে আমল দেয়নি আর তাছাড়া ওঁর মত লোকের পক্ষে তাদের সঙ্গে মেশাও কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয় অবস্থায় ওঁর ভাবকরা মিশতে দেননি। যা উনি করেছেন, তাই খুব ভাল, খুব ভাল, করেছেন সবাই। আর শেষের দিকে উনি ত বিশ্বের হয়ে গেলেন।

ওঁর তপতীও খুব ভাল বই।

বিনয়দা বললেন—তপতীর শেষটা মোটেই লজিকাল নয়।

বললেন—বইএর শেষটা লজিকাল নয় বলছ কেন বিনয়? রাণী আর কি করতে পারতেন? ওঁর পক্ষেত আর ঘরে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া অভিনয় করলে খুব ভাল জমে যায়।

এবার একজনকে পড়তে ডাকলেন—দেখি পড়। হ্যাঁ, গলা ভাল, কিন্তু উচ্চারণে দোষ আছে। আচ্ছা ওখানে একটা অনাবশ্যক w দিলে কেন! ওই হাফ ভাওয়েলকে আমরা w বলি। ওতে কি লাভ হয়?

রিহার্সাল সুরু করবেন, বললেন—শ্যামলী এখনো এলো না কেন?

বিনয়দাই বোধ হয় বললেন—তারা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

বললেন—না, না ওকে সরাসরি আসতে বোলো। তারা নানা কাজের লোক, তার পক্ষে নিয়ম মেনে আসা কষ্টকর। তা আজ এলো না কেন?

কে বললে—W. B. P, C. C-র মিটিং আছে।

বললেন—সেটা আবার কি?

তারপর বুঝিয়ে দিতে বললেন—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। হ্যাঁ তার মিটিংএ যেতে পারে।

সকলে মিলে ওঁকে মালিনী নাটকটা পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন।

বললেন—পড়ে শোনাব! ভেবেছিলুম আজ ফাঁকি দেবো। আচ্ছা পড়া যাক।

কিন্তু পড়া আরম্ভ করার আগেই ওঁরা এসে পড়লেন, বেশ একটু নিশ্চিন্তভাবে বললেন—এসে গেছে, তবে সুরু হোক রিহার্সাল। প্রম্পট করবে কে? সবাইকে কিন্তু ভাল করে মুখস্ত করতে হবে। প্রম্পটার থাকবে, বইও থাকবে কিন্তু প্রম্পট করা হবেনা। নিতান্ত যখন একেবারে ভুলে যাবে তখন ধরিয়ে দেবে।

সুপ্রিয় কে করবে? ঐটাই সবচেয়ে কঠিন পার্ট। ক্ষেমঙ্করের পার্টে ত অথর ব্যাকিং আছে, একটু করতে পারলেই চলে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়র ঐ যে বোকা পার্ট, ঐ ভ্যাসিলেটিং মাইণ্ড—ওটা ফোটানো বেশ কঠিন।

কে ওঁকে লেখার কথা বলায় বললেন—দেখ, লেখা কিছুটা দরকার। কি ভাবে অভিনয় করতে হয়, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বড় দরকার—কতকগুলো নাটকের নাটকীয় চরিত্রগুলোকে অ্যানালাইজ করা। চরিত্রের ইণ্টারপ্রিটেশন কেমন হবে, তা নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, একটার বেশী ইণ্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে, তা নইলে কণ্টিনিউয়ার্স অভিনয় করতে করতে টেল হয়ে যেত, রাতের পর রাত একটা চরিত্র ফোটাতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের সবচেয়ে বড় দোষ ডাইরেক্ট নয়, তবে মানুষটি নিজেও ত ডাইরেক্ট কথা বলতেন না, ওঁদের ধারাই হল ইনডাইরেক্ট কথা বলা।

ওঁকে আমাদের থিয়েটারে এনেছিলুম, কিন্তু নাটক আর দেখা হয়নি। বললেন—আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমাদের নাটক দেখব।

তা উনি যখন ফিরে এলেন, অভিনয় আর তখন হচ্ছে না।

[ক্রমশঃ।
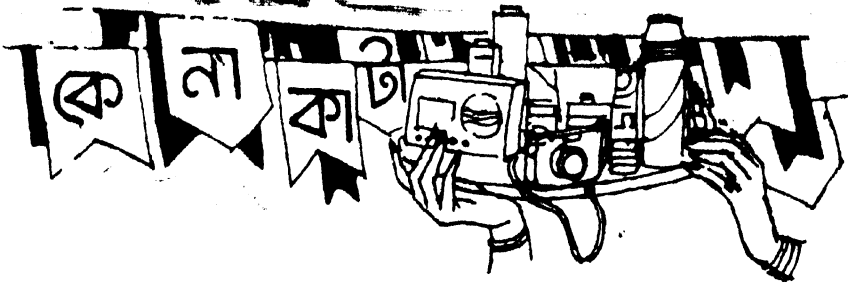
চশমার ব্যবহার

এ যুগে চশমার ব্যবহার সব দেশেই খুব বেশিরকম চালু। প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই এমনটি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

ভিটামিনের অভাব ও অপর নানা কারণে চোখ খারাপ হ'তে পারে। আর চোখ খারাপ হলেই অমনি চিকিৎসায় ফল না পেলে চশমার প্রয়োজন দেখা দেয়। দৃষ্টি সহায়ক এ মূল্যবান্ জিনিসটি আবিষ্কৃত হয়েছে অবশ্য ত্রয়োদশ শতকে। কিন্তু তখনকার অবস্থাধীনে এর ব্যবহার ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ বা নামমাত্র। পরিবর্তিত অবস্থাধীনে ক্রমে এইটি ব্যাপকতা লাভ করে চলে এবং তা বিশেষভাবে সহরাঞ্চলেই।

চশমা সত্যি না হলেই কি নয়, এমন প্রশ্নও কেউ কেউ তুলে থাকেন বা তুলতে পারেন। কিন্তু প্রশ্নটি বোধ করি নগর-সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে অর্থহীন হয়ে পড়ছে। পল্লী-অঞ্চলের স্বাভাবিক স্নিগ্ধ পরিবেশ ছেড়ে মানুষ এখন সহরমুখী। ভেজালময় সহরগুলিতে চোখ ভালো থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা কৈ? তাই দেখা যায়, অন্য সকল দেশের ন্যায় এদেশেও চশমার ব্যবহার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

চোখ খারাপ হলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে চশমা নিতে হবে, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ চক্ষু হলো অমূল্য ধন—দৃষ্টি না থাকলে জীবনই একরূপ বৃথা। চোখের দোষ কত কারণেই হতে পারে। সিনেমা, টেলিভিশন—এসবও লোকের চোখ খারাপ করছে কম নয় নিশ্চয়ই। অপুষ্টিজনিত কারণ থেকেই চোখের দোষ হয় অবশ্য বেশি। অথচ এ কারণটি এখনকার সমাজ থেকে নির্মূল করার সহজ উপায় নেই।

আজকাল দেখা যাচ্ছে—যে কোন বয়সের লোকই চশমা ব্যবহার করছে। বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোকের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, জীবন পথে সবে যে পা বাড়ালো, এমন কত ছেলেমেয়ে ও ছাত্র-ছাত্রীর চোখে দেখা যায় চশমা। ব্যাপার কি? চোখের দোষ ধরা পড়েছে ঐটুকু বয়সেই, তাই এই বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার ব্যবস্থা। হাসপাতালগুলির চোখের বিভাগে, বিভিন্ন চক্ষু-চিকিৎসা-কেন্দ্রে ও চশমার দোকানগুলিতে লোকের আসা-যাওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চশমার প্রয়োজন ও ব্যবহার কি পরিমাণ বাড়ছে, এই থেকে বেশ অনুমান করা যায়।

কিছুকাল আগে অবধি একটি চলতি ধারণা ছিল—চল্লিশ বছর বয়স যখন হয়ে যায়, সে সময়ই প্রথম চোখের দোষ দেখা দিতে পারে। চক্ষুর এ দৃষ্টিহীনতার বয়সকেই বাংলায় চালশা বা চালশে বলা হয়। এ সময় অনেককেই (স্ত্রী পুরুষ) চশমা নিতে হয় যেমন আগে ছিল, তেমনি এখনও। কিন্তু এখন যেটা বেশিভাবে লক্ষ্য পড়ে, সে হলো—চালশে ধরবার পূর্বেই চশমা ব্যবহারের ব্যাপকতা। চোখের দোষে মাথাব্যথা করছে, চোখ লাল হয়ে গেলো, যন্ত্রণা হলো, আলোর দিকে তাকানো যাচ্ছে না, চোখ হয়ত টেরা হয়ে পড়লো, পড়াশুনো ও কাজকর্ম চোখের কারণে আটকাচ্ছে—এসব অভিযোগ আজকাল অহরহ শুনতে পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সঠিক চশমা ব্যবহারে অভিযোগের প্রতিকারও হয়ে চলেছে, এও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, পশ্চিমী দেশগুলোতেও চশমার ব্যবহার এখন অতিমাত্রায় বেড়ে চলেছে। বৃটেনে ১৯৫০ সালে যত সংখ্যক চোখের রোগী ছিল, দশ বছর বাদে এখন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায়। দাবী করা হচ্ছে—এই দশ বছর সময় মধ্যে চশমাধারী বৃটিশ নর-নারীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়েছে অন্ততঃ তিনগুণ। মেয়েদের চোখেও চশমা দেখতে পাওয়া যায় এক্ষণে কম নয়, আর সে সর্বত্র। রৌদ্রতাপ থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে গগল্‌স-এর (চশমা বিশেষ) ব্যবহারও আজকাল সব যায়গায়ই বেশ চালু। বিশ্বময় এক্ষণে চশমার ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে হরদম। চশমার লেন্স, ফ্রেম এসকল কেন্দ্র করে প্রকাণ্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। আজ চশমার কাচ তৈরীর ব্যবস্থাও হচ্ছে এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে।

বিনা প্রয়োজনে সখ করে চশমা ব্যবহার করতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ, এতে ভালো চোখও খারাপ হয়ে পড়া বিচিত্র নয় এবং তেমনটি অনেকক্ষেত্রে হয়েও থাকে। অবশ্য সৌখিন চশমা পরা তরুণ-তরুণী কিছু সংখ্যায় সব দেশেই রয়েছে, এদেশেও। এই শ্রেণীর চশমাগুলি হয়ত 'পাওয়ার'-শূন্য; কিন্তু এ থেকেও 'পাওয়ার'-সমন্বিত চশমার প্রয়োজন হয়তো দেখা দিল—সত্যি এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেলো, যখন চশমা ছাড়া গত্যন্তর নেই। মোটের ওপর, চশমা নেবার প্রয়োজন বুঝলেই চক্ষু-চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। চোখ ভালো রকম পরীক্ষা না হওয়া অবধি চশমা নেওয়া-না-নেওয়া প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

ফলের রসের উপযোগিতা

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের অভাব থেকেই শরীরে অপুষ্টি দেখা দেয় এবং অপুষ্টি ক্রমে অবক্ষয় ও ব্যাধিকে ডেকে নিয়ে আসে। শাক-সব্জী ও ফলের ভেতর থাকে প্রচুর পরিমিত

ভিটামিন—যার জন্ত চিকিৎসকগণ শরীরের পুষ্টিসাধনে ফলের রস খাওয়ার কথা এতটা জোর দিয়ে বলেন।

ফলের রসের গুণ ও উপযোগিতা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। রোজ যারা এ খেতে পারছে বা খায়, তাদের স্বাস্থ্য-শ্রী দেখতে পাওয়া যাবেই। সাধারণ ঘরেও অসুখ-বিসুখ থেকে রোগী যখন সেরে উঠল, অন্ততঃ সে সময় বললাভের জন্তে তাকে ভালো খাবার-দাবারের সঙ্গে ফলের রসের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়ে থাকে। এতে যে দ্রুত সুফল পরিলক্ষিত হয়, এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। '

ফলের রসের সত্যি এতটা গুণ দেখা যায় কেন? এর ভেতর প্রচুর পরিমিত খাদ্যপ্রাণ তো আছেই, পরন্তু এইটি সহজপাচ্য। রুগ্ন ও দুর্বল মানুষ এ খেয়ে হজম করতে পারে অনায়াসে। দৈহিক দুর্বলতা দূরীকরণ ও মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে রোজ একটু করে ফলের রস খেতে পারলে যাদুর মতো কাজ করবে, এইটি সাধারণ দাবী। মোটের ওপর রান্না করা খাবারের চেয়ে এ অনেক ভালো বলে মেনে নিতেই হবে।

ভালো বলেই যে একদিনে অনেকটা ফলের রস খেলে বেশি ফল পাওয়া যাবে, তা আদৌ নয়। বরং মাত্রানুপাতিক না খেলে অর্থাৎ যে পেটে যেমনটি সইবে, সে বুঝে না খেলে ভালো না হয়ে খারাপ ফল হবার আশঙ্কাই বেশি। তাতেই দাঁড়াচ্ছে—শক্তি-সঞ্চারক ও রক্তবর্দ্ধক এই ফলের রসটি খেতেও পূর্ব্বাহ্নে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অনুচিত নয়। অনেক সময় ডাক্তাররা টাটকা ফলের রস অমনি সোজাসুজি খেতে ব্যবস্থাপত্র দেন না—জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেই রসটাই খেতে বলেন। শিশুদের মুখে কমলালেবুর রস দিতেও এমনি রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্ত সুষম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের যে দাবী করা হয়, সে নানা কারণে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে না। আজকের সমাজে ভেজালহীন টাট্‌কা খাদ্য খুঁজে পাওয়াই কঠিন বলা যায়। এই অবস্থায় কারো দেহের পুষ্টিই ঘটাতে গেলে ঠিকভাবে হওয়া সম্ভবপর নয়। কাঁচা সব্জীর স্থায় নিজ হাতে তৈরী ফলের রসের একটু ব্যবস্থা করতে পারলে আশু সুফল দর্শাবে। শিশুদের ফলের রস দৈহিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশের জন্ত একরূপ অপরিহার্য্য বলা যায়।

প্রশ্ন যেটি বড়, সে হ'ল—ক'টি পরিবারের পক্ষে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র বা স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব? ফলের রস ভালো হলেও আজকের দিনে কয়জনের ভাগ্যে এইটি জুটছে? কিন্তু এও ঠিক কথা—জুটছে না বলেই জিনিসটার উপযোগিতা বা দাম কমে গেলো না। স্বীকার করতেই হবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দক্ষতা একই সঙ্গে আহরণ করতে হলে কাঁচা শাক-সব্জীর পাশাপাশি রেখে ফলের রস খাওয়া উত্তম ব্যবস্থা।

চুলের যত্ন কেন চাই?

আমরা যে রূপ ও শ্রী দাবী করি, চুল বাদ দিয়ে তা হয় না। চুলের সৌন্দর্য্যে মানুষের সৌন্দর্য্য বাড়ে, এ নিয়ে বিতর্ক নিশ্চয়ই নিষ্প্রয়োজন। নারীদের বেলায় কথাটি বোধ হয় আরও জোর দিয়ে বলা চলে। সুন্দর বিন্যস্ত চুল থাকা তাদের একটি মস্ত সম্পদ বলেই গণ্য।

কিন্তু একটি কথা পরিষ্কার—পর্য্যাপ্ত যত্ন না নিলে চুলের সৌন্দর্য্যও ম্লান হতে বাধ্য। যেখানে চুল নষ্ট হয়ে গেলো, খুঁজলে দেখা যাবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যত্নের অভাব এর জন্ত দায়ী। চুলের গোড়াগুলি মজবুত ও সতেজ রাখার দিকে নজর না থাকলে মাথার ক্রমেই চুল কমে যেতে পারে, অকালপক্কতা দেখা দিতে পারে, টাক পড়তে পারে—এসব আরও কত কি।

আবার, প্রতিদিন যদি নিয়মিত চুলের যত্ন নেওয়া হয়, তা হলে সাধারণ অবস্থায় এর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর। মনে রাখা দরকার, চুলের মূলদেশে যে স্বাভাবিক তৈলাক্তভাব থাকে, তা শুকিয়ে গেলেই বিপদ। এমনটি হ'য়ে যদি যায়, সে ক্ষেত্রে চুলের সৌন্দর্য্যও বিদায় নিলো বুঝে নিতে হবে।

চুলের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের কয়েকটি সূত্র বা নিয়ম মেনে না চললে নয়। যেমন, দিনে অন্ততঃ বার দুই ভালো করে চুল আঁচড়ানো, চুল বেঁধে শোওয়া (মেয়েদের বেলায়), সপ্তা'হ কি পক্ষকাল পরপর মাথাঘসা বা চুল শ্যাম্পু করে নেওয়া, চুলের গোড়ায় ভালভাবে ভাল তেল মালিশ করা—এ সব চাই। দেখতে হবে চুলের মূলদেশে যেন কিছুতেই ধুলো, ময়লা বা খুসকী জমতে না পারে। কোন রকমে একটু তেল মেখে স্নানটা সেরে ফেললেই কাজ হবে, এমনটি আশা করাও ভুল।

মাথা ঘসা বা শ্যাম্পু করার যে কথা এইমাত্র বলা হ'ল, তা কিন্তু খুব ঘন ঘন করা ঠিক নয়। কারণ, এতে চুলের গোড়াকার তৈলাক্ত জিনিসটি নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে আর সত্যি এরূপ দাঁড়িয়ে গেলে চুল সতেজ থাকতে পারে না। দিনে কয়েকবার করে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়ানো খুবই ভালো জিনিস। এতে চুলের গোড়ায় গোড়ায় রক্ত চলাচলের সুযোগ বাড়ে—যেখান থেকে চুলগুলি সতেজ থাকবার রস পায়।

বাপ-মায়ের উভয়ের চুলই যদি ভালো থাকে, সন্তানের চুলও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। অপরদিকে মা-বাবার চুল খারাপ থাকলে ছেলে-মেয়ের চুলও তেমনি হওয়া বিচিত্র নয়। টাক পড়ার ব্যাপারটা কিন্তু সব সময় এই সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিশেষ করে টাক পড়ে সাধারণতঃ পুরুষদের মাথায়, মেয়েদের নয়। চুলের অকালপক্কতা কোন কোন ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কারণেই হতে পারে বা হয়ে থাকে।

সৌন্দর্য্যের জন্ত ছাড়াও চুল হলো সাধারণ স্বাস্থ্যের একটি 'ব্যারোমিটার' বা নিরূপণ যন্ত্রবিশেষ। স্বাস্থ্য খারাপ হলে, রক্তের জোর কমে গেলে, চুলের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। এ থেকেই দাঁড়িয়ে যায়, চুলের যত্নের সাথে সাথে সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকেও নজর না রাখলে নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকলো বলে চুল ভালো থাকবে, এই আশা রাখলেই শুধু হবে না। চুলের যত্ন নেওয়ার দাবীটা যেন কোন অবস্থাতেই উপেক্ষিত না হয়, সেদিকে সব সময় হুঁসিয়ার থাকতে হবে।
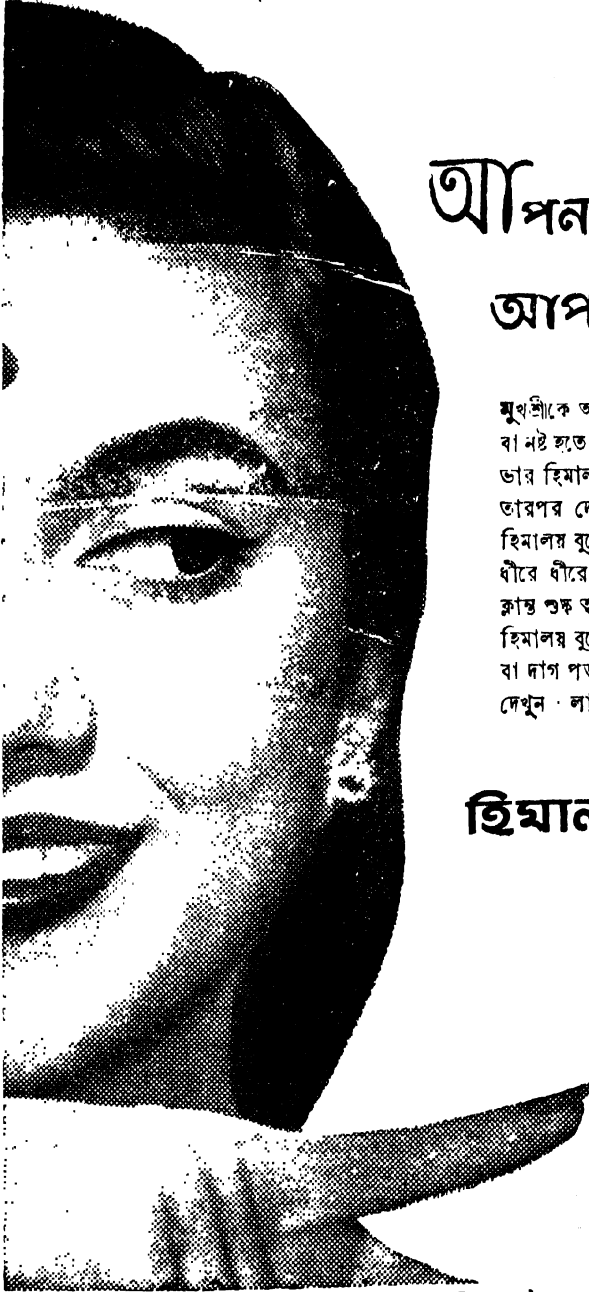
আপনার রূপ লাবন্য
আপনারই হাতে!
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধূলোয় কালো
বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার
ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—
তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি
হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি
ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে!
ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ
বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায়
দেখুন · লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো!
HIMALAYA BOUQUET SNOW

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

ভাগাচোরা মুখে সুদর্শনকে অভ্যর্থনা করতে করতে মঞ্জুর মনে পড়ে গেল রজতের কথাটা। সত্যি তো, রজত তো বলেছিলেন, দেখো ডাক্তার ঠিক আসবে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল সুদর্শন। মঞ্জুর দিকে আরো দু পা এগিয়ে এলো সে। যতীন বাবুর চিঠি পড়ে মৌরীর মৃত্যু খবরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্র সেই যে সে স্থির সংকল্প করেছিল একদিন এখানে আসবে সে, ব্যাপার কি জানতে—তার সেই সংকল্পের সঙ্গে আরো একটা দুর্দমনীয় কিছুর টান দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে আজ তাকে একেবারে যেন টেনে এনে এখানে হাজির করে দিয়েছিল। বাড়ীটা অচেনা নয় সুদর্শনের। এক তলার রামুর ঘর থেকে মৌরীর চিলে কোঠা পর্যন্ত সব চেনা তার। নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সরাসরি উপরের বসবার ঘরে চলে এসেছিল সে। কিন্তু বাড়ীটাতে ঢোকার পর থেকে ভেতরে যেন একটা হুলুস্থুলু কাণ্ডকারখানা চলছিল তার। যদি সংবাদটা সত্য হয়। যদি ওকে দেখে মৌরীর বৃদ্ধা পিসিমা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। বৌদি চোখে আঁচল চাপা দেন। রুদ্ধ কণ্ঠে মঞ্জু বেদনায় কথা বলতে না পারে। শোক মুহ্যমান পিতার আর্ত আক্ষেপ আছড়ে পড়তে থাকে তার কাছে। একটা পরিবারকে অনর্থক কাঁদিয়ে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হলো না তো সে?

কিংবা—কিংবা যদি একেবারে মৌরীর সঙ্গেই সব প্রথম সাক্ষাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় তার? নিতান্তই যে একটা ছেলেমানষি লাফালাফি শব্দ বুকের মধ্যে চলছিল, মঞ্জুর কথা শুনে সব গণ্ডগোল শান্ত হয়ে গেল এবং তার ঠোঁটের চিবুকের যে অননুকরণীয় অভিজাত ভাবটা এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল, ফের পুরো ওজনে প্রথিত হলো তারা। মঞ্জু ঠিক যতটা বিব্রত হয় ঠিক ততটাই আগ্রহান্বিত, আরে বসুন বসুন। কি ভাগ্য আমাদের। অভ্যর্থনার জবাবে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে একটু হাসল সে। বলল ভাগ্য?

আনন্দ বেদনা দু দিকেই যায় এমনি একটা সুরে ও ভঙ্গিতে মঞ্জু বললো—বাঃ, ভাগ্য নয় একেবারে অভাবিত ভাগ্য যে।

—কার?

দেখা গেল জবাবের জন্য মঞ্জুকেও ঠেকে যেতে হলো। হয়তো ঠেকতে হতো না, যদি এর ভেতর বড়রা জড়িত না থাকতেন। ছোট পিসি, ছোট পিসেমশাই-এর সঙ্গে হয়তো সুদর্শনের দেখা হয়েছে। [illegible]

ঘটনাটারই আরো বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন সুদর্শনের কাছে—এই অবস্থায় ঝট করে কিছু করে বসা সমুচিত হবে না।

জবাবের জন্য অপেক্ষাও করলো না সুদর্শন। বসতে বসতে ধীর কণ্ঠে বলল—তা আপনারা সব ভালো?

এ প্রশ্নেরই বা কি জবাব দেবে মঞ্জু? তাই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট বলে উঠল সে—আপনি বসুন। আমি বাড়ীর ভেতর খবর দিয়ে আসছি।

বেরিয়ে এসে মঞ্জুর মনে হলো গাছের পাতাটুকু পর্যন্ত না নড়া গ্রীষ্মের স্তব্ধ সন্ধ্যার মতো ওদের বাড়ীটা যেন নিস্পন্দ রূপ ধরে আছে। যে যেখানে আছে স্থির হয়ে আছে। হাত পাটুকুও যেন কেউ নাড়াচাড়া করছে না।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বারান্দার চোখ পেতে বসেছিল অমিতা। মঞ্জুকে দেখামাত্র তার হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে এলো তাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে চাপাকণ্ঠে বললো, রামু বলে গেল, জামাইবাবু এসেছেন?

হেসে ফেলল মঞ্জু—আর জামাইবাবু! তা তুমি এমন ঘরে বসে হাঁপাচ্ছ কেন?

—সত্যি নাকি বলোই না।

—তুমি চলো দেখবে।

—ওরে বাবা! অমিতা আরো ক'পা ভেতরে ঢুকে গেল। ভাগ্যিস আমি সামনে পড়ে যাইনি।

—কি হতো তুমি পড়লে?

—কেঁদেই ফেলতাম ভয়ে।

কপালে করাঘাত হানল মঞ্জু—একেবারে পারফেক্ট—ঐটুকু হলেই তো হয়ে যেত। ভদ্রলোকের অহংকৃত প্রথিত ঠোঁট দেখতাম বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে কি না।

অধৈর্য্য ব্যাকুলকণ্ঠে অমিতা বলল—কি করবে এখন তুমি তাই বলনা?

চিবুকে হাত বুলাতে লাগল মঞ্জু—তাই তো ভাবছি। বাবা অফিসে চলে গেছে?

—না। মাত্র বেরুচ্ছিলেন। রামুর মুখে শুনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

—দাদা?

—ঐ যে। হাত দিয়ে ঘরের কোণ দেখিয়ে দিল অমিতা।

মঞ্জু দেখল অফিসের জামা কাপড় পরা অবস্থায় ছাদের ঘরের কোণে করুণ মুখ করে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

অন্য কোন কারণে দাদাকে এইভাবে অফিসের জামা কাপড় পরে চোরের মতো ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখলে মঞ্জু হেসে লুটোপুটি খেত—এখনও ঠেলে হাসি হাসছিল কিন্তু হাসল না মঞ্জু। মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। অমিতা উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

মাথা তুলল মঞ্জু—ঠিক আছে।

—কি ঠিক করলে গো?

—ভদ্রলোকটিকে নিয়ে গিয়ে সোজা ভদ্রমহিলাটির ঘরে পৌঁছে দেবে। তারপর যা হয়—

শব্দ না করে ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল অমিতা। সেই বেশ হবে—চমৎকার হবে। মুখটা আহ্লাদে করে তুলে বলল, [illegible] করে—নিষ্পত্তি করে। আমরা

তো স্বর্গই হাতে পাবো—না গো? নিরুপায় হয়েই তো আমরা অমন মিথ্যে কথা বলেছি এঁ্যা? এই অবস্থায় সবাই তাই করতো না? আমাদের দোষ কি—এঁ্যা? ওঃ, কি মজা! মুখে একমুঠো কাপড় চাপা দিয়ে অস্মিতা হাসির শব্দ থামালো।

অস্মিতার ঘর থেকে মঞ্জুদের ঘরের ব্যবধান বিশ গজের বেশী নয়। এই পথটুকু আসতে আসতেই আশ্চর্য্য ভাবে তৈরী করে ফেলল মঞ্জু নিজেকে। একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদের খবর শুনে ছুটে আসবার মতো এসে মৌরীর টেবিলের দু কোণ ধরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে উঠল—একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ শুনে এলাম রে দিদি!

মঞ্জু খাতা আনতে গিয়ে আর ফিরে এলো না দেখে মৌরী ওর নিজের কাজে মন দিয়েছিল। টেবিলে মাথায় এক করে বসে যেন কি লিখছিল সে—উৎকণ্ঠার সঙ্গে মুখ তুলল—কি হয়েছে?

চঞ্চল গলায় বলে উঠল মঞ্জু—সুদর্শনবাবু তার বোনের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন তো। সেখানে কোন এক পাহাড়ী পথে নাকি তার গাড়ী একেবারে হাজার ফিট নীচে পড়ে—

মৌরীর মুখের লাল কণাগুলো যেন পলকে সাদা কণায় পরিণত হয়ে গেল। ঠোঁটটা কেঁপে উঠছিল বলেই কিনা কে জানে—হাতের কলমটা ঠোঁটে চেপে ধরল সে।

গাড়ী আর মানুষটার গুঁড়িয়ে যাওয়ায় কথাটা বলে উঠতে পারল না বলেই যেন সেখানটায় থেমে গিয়ে মঞ্জু বলল—কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য্য কথা হলো, যারা ঘটনাটা দেখেছে তারা নাকি জোর দিয়ে বলছে, লোকটি ইচ্ছে করে খাদের দিকে গাড়ী চালিয়ে দিয়েছিল। নইলে ও-পথে দুর্ঘটনা ঘটে না কখনোই। তার মানে তো আত্মহত্যা —এঁ্যা? কী সাংঘাতিক কথা মা গো! দু চোখ বন্ধ করল মঞ্জু।

এবার হেসে ফেলল মৌরী। তোর লাইব্রেরীর কাজ দেখতে চাওয়ার জন্য এমন গল্প তৈরী করে আনলি।

—গল্প তৈরী করে আনলাম? কি যে বলিস। এমন গল্প মাথায় আসে নাকি কারু। টেবিলের ধরা হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—যাই ঘটনাটা শুনি গিয়ে। আমি না শুনেই ছুটে এসেছি।

—আচ্ছা, এর মানেটা কি হচ্ছে মঞ্জু?

—কোন্‌টার? মারা যাওয়ার মানে জিজ্ঞাসা করছিস না দুর্ঘটনার মানে জিজ্ঞাসা করছিস? দু চোখ বিস্ফারিত করে জানতে চাইল মঞ্জু।

চুপ করে গেল মৌরী।

আর ওকে চুপ করে বসিয়ে রেখে এসে প্রবেশ করলো সে বসবার ঘরে।

টেবিলের উপর রক্ষিত ত্রিকোণ-কাটা কাচের কাগজ-চাপাটার ভেতর দিয়ে যে সূর্য্যচ্ছটাটা নানা বর্ণে এসে টেবিল-ঢাকনাটার উপর পড়ে রামধনু সৃষ্টি করেছিল, তারই দিকে তাকিয়ে বসেছিল সুদর্শন। তার চিন্তাধারাটা এখন একেবারেই অন্য ধারায় বইতে শুরু করেছিল। এতদিন তার সমস্ত মন একমুখী হয়েছিল। সংবাদটার সত্য-মিথ্যা যাচাইএর প্রতি। ওরা দু' পুরুষের লক্ষ্ণৌবাসী। আত্মিক যোগাযোগ যতই থাক, বাহ্যিক যোগাযোগটা এসেছিল বাংলার সঙ্গে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে। স্বজন-বন্ধু যাঁরা আছেন, তাঁরাও এতই উচ্চ মহলের

যে, মৌরীরা সে-সব সমাজে অপরিচিত তো বটেই, অপাঙ্‌ক্তেয়ও বটে। কানে কানে রাস্তা তৈরী করে ঠিক খবরটা ঘরে এসে পৌঁছবে তাই না ছিল তার সম্ভাবনা—না ছিল সুদর্শনের তত অপেক্ষার ধৈর্য্য। কিন্তু এখন চিন্তায় উজানটান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার। মৌরীর এই অস্বীকৃতির পেছনে যে অসম্মান ছিল, যে অসম্মানের কাঁটাটা সংবাদটার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাত্র তার মুখ কঠিন করে তুলেছিল, এতক্ষণে সে কাঁটাটা ফের বিঁধতে শুরু করেছিল তাকে। সে জানে এখন বাড়ীর ভেতর কি ঘটবে। মৌরীকে নিয়ে নব উদ্যমে আবার উঠে পড়ে লাগবে সবাই। কিন্তু তার জেদের কাছে হার মানতে হবে সবাইকে। লজ্জায় সংকোচে কেউ আর তার কাছে আসবে না। শেষ পর্যন্ত যে আসবে সে হলো মঞ্জু। বসে কথা খুঁজবে সে, কিংবা বিভ্রান্ত অপ্রতিভ মুখে বাড়ীর মুখপাত্র হয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ও পক্ষের আক্ষেপের কারণ থাকতে পারে—লজ্জা পাবার কিছু নেই—না কিছু নেই তাদের লজ্জা পাওয়ার। সব লজ্জা, সব অসম্মান তার। বসে থাকতে পারলো না বলেই সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল সুদর্শন। মঞ্জু এসে প্রবেশ করলো ঘরে। আর ওকে দেখেই হাত জোড় করে একটা নমস্কার জানাল সুদর্শন। বললো—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কিছু না বলে বাড়ীতে ঢুকলেও না বলে তো চলে যাওয়া যায় না। আচ্ছা আসি তবে।

—বাঃ সে কি! আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—আসুনই না আমার সঙ্গে। তারপর সুদর্শনকে নীরব দেখে বললো—কি হলো? আসবেন না?

দুই পাঞ্জাবীর পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে শরীর টান করল সুদর্শন। বলল—চলুন।

কি ভেবে মঞ্জু কি করেছিল তা জানে মঞ্জু। কিন্তু এতে করে একটা বড় কাজ হয়েছিল এই যে, মৌরীর দুর্বলতাটাকে মঞ্জু একেবারে উপর তলায় টেনে তুলে রেখে গিয়েছিল। টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নতনেত্রে নিশ্চলভাবে বসেছিল মৌরী। ঘরের ভেতর কারো ঢোকবার শব্দ পেয়ে মঞ্জু ভেবে মুখ তুলল সে। আর চোখ তুলতেই একেবারে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ানো সুদর্শনের দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলে গেল তার। চমকে উঠে দাঁড়ালো মৌরী। শরীরের ধাক্কায় চেয়ার গেল পড়ে। হাতের কলম পড়ল ছিটকে। কাঁধের আঁচল পড়ল খসে।

সুদর্শন ওর লুটিয়ে পড়া আঁচলটার দিকে একবার তাকালো বটে—কিন্তু সেটা তুলে দিতে গেল না।

এগিয়ে এসে চেয়ারটা তুলল। কলমটা তুলে নিয়ে নিবটা চোট খেয়েছে কিনা দেখল, পরীক্ষা করে তারপর সেটার মুখ বন্ধ করে রেখে দিল টেবিলের উপর। তারপর চেয়ারের পিঠে হাত রেখে মৌরীর দিকে একটা বিশেষ মনোযোগের দৃষ্টি ফেলে বলল—মনে হচ্ছে ভূত দেখেছেন আপনি। কিন্তু ভূত তো আপনার দেখবার কথা নয়। সে তো দেখবো আমি।

নিজেকে সামলাতে আর কতক্ষণ লাগে। সুদর্শনের কলম রাখা, চেয়ার তোলার মধ্যেই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল মৌরী। আর শুধু যে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল সে তাই নয়—যেন আরাম বোধ করতে লাগল। জবাব দিল সে—ভূত আমিও দেখতে পারি।

—কি করে? আমি মারা গেছি এমন সংবাদ তো আমি আপনাকে দেইনি?

—এইমাত্র মঞ্জু আমাকে সেই রকমেরই একটা খবর দিয়ে গিয়েছিল।

—তাই বলুন! বুদ্ধিমতী মেয়ে মঞ্জু। জানে জ্যান্ত এসেছি শুনলে দরজা সেঁটে দেবেন। ভূতকে তো আর দরজা বন্ধ করে—আটকানো যায় না—তাই দরজা খোলা পেয়েছি। তা আপনার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। জোর করে বিয়ে করবো বলে আসিনি—আর তা সম্ভবও নয়। একটু চুপ করে থেকে বলল—তা ঘর পর্যন্ত যখন এসে পৌঁছোনাই গেল তখন গৃহকর্ত্রীর অনুমতি পাই তো একটু বসে যাই।

নিজেকে আরো কিছুটা সহজ করে নিল মৌরী—এখানে আপনাকে বসাতে পারি তেমন কেন ব্যবস্থা নেই। চলুন বসবার ঘরে।

—তার মানে, আপনি রেহাই পেলেন। সবার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে চুপচাপ চলে আসবেন আর নয়তো নিতান্ত ভদ্রতার দায়ে চুপচাপ বসে থাকবেন—বা আমার প্রতি সেই দায়টাও আপনি পালন করতে অপরাগ হবেন। কিন্তু আমার দরকার আপনাকে। আপনার উপর আমার একটা নালিশ আছে। দেখা যখন হয়েই গেল, তখন সেটা জানিয়ে যাই। তার বঙ্কিম ঠোঁটে ভাঁজ ফেলল সুদর্শন—চেয়ারের কাঠ যত শক্তই হোক অপমানের কাঁটা হয়ে তা কখনই গায় বিঁধবে না। স্বচ্ছন্দে বসা যাবে। চেয়ারটা ওর দিকে পেছন ফেরানো ছিল। সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসল সে। দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে বসতে বলতে গিয়েও গেল থেমে। তারপর এতক্ষণে সিগারেটের টিন আর দেয়াশলাই বের করল সে। একটা সিগারেট দু আঙুলে টেনে বের করে হাতের টিনটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল—কাউকে ভালো লাগা না লাগার উপর কোন কথা চলে না। আর বিয়ে ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই জীবনের এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, একদিন আগে কেন, পাত্র অপাত্র হলে বিয়ের পিঁড়ি থেকেও কনে উঠে আসতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আপনি আমাকেই তো পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে পারতেন। তাতে আমার মানটা যা হোক কথঞ্চিত রক্ষা পেত—আপনার অভিভাবকদেরও এমন অহেতুক মিথ্যার ভেতর ঢুকতে হতো না। আপনার সংকল্পের কথা, কেন আপনি সেই রাতেই আমায় জানিয়ে দিলেন না—তেমন সময় যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল।

সে রাতের সংকল্প যে এটা নয় সে কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মৌরী। তবে সুদর্শনের ওকে সেই অকস্মাৎ বুকে টেনে নেওয়া, ওর ঠোঁটে ঠোঁট স্পর্শ করা—ও গ্রহণ করেছিল এ কথাই বলা হয়ে যায় না! হৃৎপিণ্ডটা চঞ্চল শব্দ করতে লাগল মৌরীর। কিন্তু সুদর্শন এমন ভাবে প্রতীক্ষা করে রইল জবাবের জন্য যে, চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। বাধ্য হয়েই জবাব দিতে হলো ওকে। দৃষ্টিটা দেয়ালের দিকে রেখে বললো—না, এ সংকল্প আমার সেদিনের নয়।

বিস্মিত সুদর্শনের সিগারেট-ধরা মুখের হাত নেমে এলো নীচে। বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সে—তবে?

—সে অন্য কারণ।

—অন্য কারণ! শুনি কারণটা?

পিসিমার সঙ্গে ঐ দিনের কথোপকথন মনে পড়ে গেল মৌরীর—না একে মনে পড়ে যাওয়া বলে না। ও যেন ছোটপিসিকে আর নিজেকে স্পষ্ট দেখতে লাগল—ক্রুদ্ধা পিসি ঠোঁটে বিষ ঢেলে বলছেন, ছাত্র আর ডাক্তারদের সঙ্গে নার্সদের কি সম্পর্ক, তারা তাদের নিয়ে কি করে না করে আমি তার কতটুকুই বা শুনেছি। দুদিন বাদে সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করলেই তুমি জানতে পারবে সব। বৌদি তিরস্কার করে উঠেছিল—'ছোট পিসি'! বলে। ওর মুখ কুঁকড়ে উঠেছিল বাসীফুলের মতো। চিবুকের কাঁপুনী থামাতে সমস্ত মুখটা কঠিন করে তুলতে হয়েছিল ওর। ও শুধু বলেছিল—সুযোগ পেলে সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে। হঠাৎ যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মৌরী। ওর ইচ্ছে হলো সুদর্শনকে আশ্চর্য্য করে ও চেয়ারে গিয়ে বসে সুদর্শনের মুখোমুখি হয়ে। সামনের চুলগুলো পেছনে ঠেলে সোজা তার মুখের দিকে তাকায়—যেমন তাকানো এর পূর্বে আর কোনদিনও সে সুদর্শনের দিকে তাকায়নি। তার পর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু ঐ যেমন হঠাৎ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ নিবে গেল। ওর দ্বারা সম্ভব হবে না—সম্ভব হবে না এই কারণে নয় যে, ও লজ্জাবোধ করছে। যত কথাই মনে উঠুক, ওর ধারণা কখনই বলে উঠতে পারবে না ও এত কথা।

মৌরীর চঞ্চল ভাব আর সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো সুদর্শন। বললো—কিচ্ছু দ্বিধা করবেন না, বলুন। আমিই যখন নায়ক, শাস্তিটাও যখন পুরো আমার উপরই এসে পড়েছে, তখন আমার কারণ জানতে চাওয়ার অধিকারও আছে—

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত শুধু এইটুকুই বললো মৌরী, আপনি মঞ্জুর কাছ থেকে শুনে নেবেন। কিছু না বলেও যেন বলার ঝড় ওর মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেছে এমনি ভাবে আঁচল তুলে মুখ মুছল সে। এতক্ষণ অন্তত এ স্বাচ্ছন্দ্যবোধটা সুদর্শনের ছিল যে, কেন কি হয়েছে সে জানে। এবার সেটুকুও গেল। তবু যে কারণে মৌরী সংকোচবোধ করছিল, এটা সে রাতের সংকল্প নয় বলতে, ঠিক সেই কারণেই সুদর্শনের চোখে, মুখে, ঠোঁটে যেন একটা আবেগ এসে থমকে দাঁড়ালো। ওকে আলিঙ্গনের, ওকে তার মুখচুম্বনের অধিকার মৌরী দিয়েছিল। সে গ্রহণ করেছিল ওর অসংযমকে। কথাটা মনে হতে মৌরীর হৃৎপিণ্ডটা যেমন চঞ্চলতা প্রকাশ করেছিল—সুদর্শনের হৃৎপিণ্ডটাও তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু দুর্নিবারকেও মানুষের রোধ করার শক্তি ধরতে হয়। সব আনন্দ কেবল ঝাঁপিয়ে পড়েই আহরণ করা যায় না—অপেক্ষা করতে জানতে হয়—সাধনা—হাঁ সাধনা করতে হয়।

প্রথমে দরজায় উঁকি দিয়ে মঞ্জু যেন একটু দেখে নিল ব্যাপার-সেপারটা কি। তার পর চা জলখাবারের ট্রে হাতে টিপে টিপে পা ফেলে এসে ঢুকল ঘরে। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো—এমন টিপে টিপে পা ফেলে এলাম বলে কিন্তু আপনারা আবার কিছু ভাববেন না। হাতের চা জলের জন্য এ সাবধানতা। বলে হাসিমুখে খাবার ডিস তুলে ধরল সুদর্শনের দিকে। ওবার এসে আগে চা তার পর মিষ্টি খেয়েছিলেন, দেখলাম বউনিটা ভালো হয়নি। এবার তাই আগে মিষ্টি তার পর চা—নিন ধরুন!

[ক্রমশঃ।
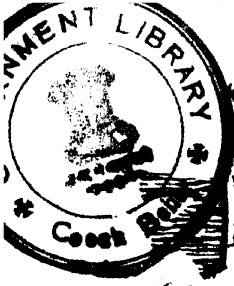
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেত্রিশ

জগন্নাথ আর পচা নৌকো নিয়ে বয়ারখোলা চলে গেছে। ছুতোর ধরে কাজকর্মগুলো সারবে, আলকাতরা দেবে। আর চারজনে এরা সাঁইতলায়। পাড়ায় এসে পা দিতেই একটা কলরব উঠল। অন্নদাসী চেঁচাচ্ছে। তার পরে কি কথায় রাধেশ্যাম ঠাণ্ডা করে দিল একেবারে। চুপচাপ আছে। স্ত্রী-পুরুষে এত নিঃসাড়ে আর কখনো ঘর করেনি।

চালাঘরে পড়ে ক্ষ্যাপা-মহেশ ক্ষণে ক্ষণে গাঁজা খায়, আর ভেবে ভেবে ফর্দ বলে। শশী গোয়ালা কাগজে অক্ষর কাঁদতে জানে। তাতে সুবিধা হল, লিখে রাখে ফর্দগুলো। মহেশ এক চিলতে কাগজ এনে দিয়েছে চারুবালার কাছ থেকে। ফর্দের মধ্যে পুজোর উপকরণ আছে; আর রসদ-সামগ্রী আছে জঙ্গলে থাকবার। হাটবাজারে যা মিলবে না, যেমন কুম্ভকার-সজ্জা—ঝাঁক মতন এক দিন বয়াপোতায় গিয়ে কেনে। কলা, শসা, নারকেল, বাতাসা—জগারা এসে পড়লে তারপরে ব্যবস্থা হবে। এ সমস্ত সেই একদিনে কুমিরমারি হাটে হয়ে যাবার কথা, কিন্তু নৌকোর অসুবিধার জন্ত অনেক বস্তু বাকি রয়ে গেল। ধীরে-সুস্থে এখন সব জোগাড় হচ্ছে। চাল অনেক লাগবে—খোরাকির চাল ও পুজোর নৈবেদ্য। বয়ারখোলার তৈলক্ষ মোড়লকে ধরে নিখরচায় চালটার জোগাড় হয় যদি। চাল ওরা নিয়ে আসবে। নুণ, তেল, ঝাল মোটামুটি একটা হিসাব করে সেদিন নিয়ে এসেছে। আর ডাল। ডাল এই সব অঞ্চলে বড় বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা। তবু কিছু ডাল সঙ্গে নেওয়া ভাল। জলের মাছের কথা তো—হয়তো জালে উঠল না কোন দিন। কিম্বা মাছ খেয়ে অরুচি হয়ে একদিন মুখ বদলাবার শখ হল। ডাল ঘুঁটে নেবে সেদিন।

কুম্ভকার-সজ্জা অর্থাৎ মেটে জিনিষ কতগুলো রে বাবা! ঝাঁকা ভরতি হয়ে যায়। সাতটা ঘট, সাতটা পিদ্দিম, সাতটা জলের ভাঁড়, একটা মুচি। তা ছাড়া ঘর-ব্যাভারি হাঁড়ি-কলসি মালসা-সরা কিছু আছে। রাত করে মাল নিয়ে আসতে হল, নয়তো লোকের নজরে পড়ে যায়। ছিটে-গরান কেটে চেঁচে-ছুলে লাঠি বানানো হল এগারখানা। এই লাঠির মাথায় নিশান টাঙানো হবে। দুই গজ লাল শালু কুমিরমারি থেকে সেদিন এসেছে এই নিশান ও পিদ্দিমের শলতের জন্ত। কাপড় কেটে এগার খণ্ড নিশান বানিয়ে রাখ, আর টুকরোগুলো নিয়ে শলতে পাকাও। বনে নেমে পুজোর গণ্ডির পাশে নিশান তুলতে হয়।

এই সমস্ত হচ্ছে। অত্যন্ত গোপনে, কেউ না টের পায়। তাড়া খেয়ে সাঁইতলা ছেড়ে পালাচ্ছে অপমানের কথা বটেই। তা ছাড়া চৌধুরিগঞ্জের শত্রুরা খবর পেয়ে দারোগা নিয়ে এসে জগাকে আটক করে ফেলতে পারে। দরকার কি জানান দিয়ে? চলে আসুক বয়ারখোলা থেকে নৌকো এদিকে সমস্ত ঠিকঠাক রইল। আশা-সুখে নতুন জায়গায় যাচ্ছে, ভাল দিনক্ষণ অবশ্য চাই। কিন্তু সে পাঁজির শুভদিন নয়। অন্তরীক্ষের পানে নিরিখ করে দেখে সুদূর বাদাবনের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা মহেশই বলে দেবেন। সময় ধরে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বে। পীর-দেবতাদের তুষ্ট না করে গুণীন-বাউলে সঙ্গে না নিয়ে হুট করে বাদায় নেমে কুড়ুলের কোপ দেওয়া যায় বটে গাছের গোড়ায়, গাছও পড়ে। পরিণাম কিন্তু শুভ হয় না। বাঘ-কুমিরে নাও যদি খায়, টিকে থাকতে পারবে না সে জায়গায়। বনবিবি, দক্ষিণরায়, গাজি, কালু, রণগাজি, ছাওয়ালপীর এঁরা কুপিত হয়ে থাকেন; ওদিকে দানো, ঝটো, দুখেঃাও সব কায়দায় পেয়ে যায়। দু-পক্ষ মিলে তাড়িয়ে তুলবে—প্রাণে রক্ষা পাবে নিতান্ত পিতৃপুরুষের পুণ্যবল থাকে যদি। দেখতে পাচ্ছ না, আশাসুখে ঘর তুলে সাঁইতলা থেকে কেমন সরে যেতে হচ্ছে। গোড়ায় কোন রীতকর্ম করনি, তার পরিণাম।

তিনদিনের দিন জগা-পচা এসে পড়ল। ত্বরিতে কাজ হয়েছে। কাজটা হয়েছেও খাসা। আলকাতরা মেখে নৌকো চকচক করছে। নতুন ছই। খোদ মালিক এসেও যদি এখন এই নৌকোয় চলাচল করে, নিজের বস্তু বলে চিনতে পারবে না।

পৌঁছেছে ঠিক দুপুরে। ভেবেচিন্তে নৌকো ও পায়ের পাশখালিতে নিয়ে গিলেলতার ঝোপের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। মানুষের নজরে না পড়ে। তাতে নানান ঝামেলা। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মুখ ব্যথা হবে জবাব দিতে দিতে। কোথা থেকে আনলে নৌকো, ভাড়া কত? রওনা হচ্ছ কবে? কোন মতলবে চলেছ, থাকবে কতদিন বনে গিয়ে? চটপট জবাব বানাতে হবে—মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে কাঁহাতক পারা যায়?

কিন্তু নৌকো লুকিয়ে রেখেই বা কাজ হল কই? চাউর হতে বাকি নেই কিছু। সাঁজের মুখে গগন এসে পাড়ার মুখটায় দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে কাকে যেন বলছে, জগন্নাথ ফিরেছে শুনতে পেলাম। ঘরে আছে? ডেকে দাও একবারটি। আমার নাম করে বল।

ডাকতে হল না। কানে দিয়ে জগা নিজেই বেরিয়ে এল। ভূমিকা না করে গগন বলে, ঠিকঠাক হয়ে গেল?

জগন্নাথ ন্যাকা সেজে বলে, কিসের ঠিকঠাক বড়দা?

বসত তুলে পাকাপাকি চলে যাবার।

কে বলল?

সন্দেহটা পচার উপর। চারুবালার সে বড় অনুগত। চলে যাবার কথা সে হয়তো বলেছে।

কিন্তু গগন বলে, বলে দিতে হয় না কারো। বাদা জায়গা—শহরবাজার নয় যে মানুষ কিলবিল করছে ঘরের মানুষ উঠোনের মানুষটাকে জানে না। এ জায়গায় মানুষ লাগে না, গাছগাছালি বলে দিতে পারে। ঝোপের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে রেখে এলে—মানুষে না দেখল তো পাখপাখালি দেখছে, তাইতে সকলের দেখা হয়ে যায়। সামাল করে দিতে এসেছি জগা। মহেশ তোমাদের ঘাড়ে লেগেছে, ক্ষেপিয়ে তুলছে। কোন অজঙ্গি জঙ্গলে নিয়ে তুলবে ঠিকঠিকানা নেই। ওর ঐ কাজ। কতবার কতজনাকে নিয়ে গেছে—হর ঘড়ুই অনেক জানে, তার কাছে শুনে দেখো। কাউকে বাঘে নিয়েছে, জিনপরীতে উড়িয়ে নিয়ে কাউকে সাগরে নিয়ে ফেলেছে। পাগল হয়ে কেউ আবার ফিরে আসে—ঐ শশী গোয়ালার হয়েছে যেমন।

জগা বলে, জেনে ফেলেছ তো খুলেই বলি বড়দা। চৌধুরিদের পেয়ারের লোক তুমি এখন। শালা আর বোনাই মিলে বড় করছ, জেলে পুরবে আমায়, ফাঁসি দেবে। জঙ্গলের বাঘ তোমাদের চেয়ে ভয়ের হল কিসে?

খুব হাসতে লাগল জগা। গগনের আষ্টেপিষ্টে যেন ঐ হাসির বেত মারছে। হতভম্বের মতো সে জগার দিকে চেয়ে থাকে। বলল, সেই কথাই তোকে বলতে এলাম। মেজ শালা বিস্তর প্যাঁচ খেলছে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। তোকে তাড়াল, আমাকেই কবে আবার বোঁচকাবিড়ে বাঁধতে হয়।

কিন্তু তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছে, এমন কথা জগন্নাথ কিছুতে মেনে নিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বলে, আমায় নতুন দেখছ না বড়দা। নেড়ি-কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক কি আমি? কিন্তু পাড়ার মধ্যে বোকা-শোকা আছে কতকগুলো—ঘরসংসারে জড়িয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। ঘেরিদার হয়ে তোমরা তো শুনলাম বাদার চিরকেলে নিয়ম বাতিল করে দিচ্ছ। ঘেরিতে জাল ফেললে নাকি সরকারি আইন মতে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালায় চালান করবে। তখন আর উপায় থাকবে না মাছ-মারাদের। সেইজন্যে ভাবছি একটা জায়গা করে নেওয়া যায় যদি আগেভাগে গিয়ে।

গগনের কথা হাহাকারের মতো শোনায়: আমার বাদার মধ্যে তো তুই এনে বসালি। একা ফেলে সত্যি সত্যি চললি তবে?

[illegible]—তখন কি চলে যাবে কেউ

ভেবেছিল? থাকতেই তো দিচ্ছ না, থাকা যাবে কেমন করে?—হাসল। বলে, তুমিও যাবে বড়দা। ভাবনা কিসের? দুটো দিন আগে আর পিছে। জায়গা করে রাখিগে, গিয়ে যাতে উঠতে পার। সে জায়গায় কিন্তু ঘেরিদার কেউ নয়। যাবে তো আর দশজনের মতন মাটি-কাটা মাছ-মারা হয়ে থাকতে হবে। পারবে তো? মানে মেজাজটা এখন উঁচুতে উঠে গেছে কিনা।

গগন একেবারে বেকবুল যায়: আমি কেন যেতে যাব? কাঁধে তোর মতন খুনেপেত্নী চেপে বসে নেই তো কোন একটা জায়গায় যে সোয়াস্তিতে থাকতে দেয় না।

নিজের ইচ্ছেয় না যাও তো তাড়িয়ে তুলবে। তোমার পরিবারের ভাই। চেপে যাচ্ছ কি জন্যে? তোমার কথাটাই ঘুরিয়ে বলছি—এ জায়গা শহরবাজার নয়, জানতে কিছু বাকি থাকে না। মানুষে না বললে গাছগাছালি বলে দেয়। নগেনশশী নতুন ঘেরি লিখে পড়ে নিচ্ছে। কুটুম্ব মানুষ বলে একেবারে না তাড়িয়ে গোমস্তা করেও রাখতে পারে। ঘাড় হেঁট করে রাতদিন তখন খাতা লেখার কাজ, ঘাড় তুলে তাকাতে দেবে না।

গগন উত্তেজিত হয়ে বলে, শোন তবে। তেমন কিছু করবার আগে আমিই তাড়াচ্ছি। বুদ্ধীশ্বরকে পাঠিয়েছি কুলতলায়। পরশু দিন দলিল রেজেষ্ট্রী হবার কথা। কিন্তু আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালবেলা দেখতে পাবি হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়েছে। কুলো বাজিয়ে বাদা অঞ্চলের সীমানা পার করে দিয়ে এসে আবার আমরা সেই আগেকার মতন থাকব।

জগন্নাথের হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, বাসনে তুই। সেই কথাটা বলতে এলাম। ওরাই যখন চলে যাবে, তোদের যাবার কোন দায় পড়েছে। নৌকো যেখান থেকে এনেছিস, ফেরত দিয়ে আয়।

বলতে বলতে জগাকে টেনে নিয়ে চলল খালের দিকে। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না, অনেক কথা। নিরিবিলি একটা জায়গায় বসিগে চল।

শেষ পর্যন্ত গগনই নগেনশশীকে তাড়াচ্ছে, এ খবরটা নতুন। অমন ধুরন্ধর মানুষটা কোন কায়দায় তাড়াচ্ছে, তারিয়ে তারিয়ে শোনার মতোই ব্যাপার বটে।

খালের ধারে বাঁধের আড়ালে বসল এসে দু-জনে। জোয়ারের জল আর একটু দূরে ছলছল করছে। নগেনশশীর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে চারুবালার সঙ্গে, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশে পাঠাবে। অনুকূল চৌধুরি নগেনের নামে নতুন ফেরির বন্দোবস্ত দিচ্ছে, খবরটা টৌনি চক্কোত্তি মুখে করে নিয়ে এলেন। কিন্তু লেখাপড়া যতই করে আসুক, গগন দাস কি জন্যে দখল ছাড়তে যাবে? চক্কোত্তি বুদ্ধি দেয়, কক্ষনো না, চেপে বসে থাক তুমি দাস মশায়। মামলা লড়ে তবে উচ্ছেদ করতে হবে বাছাধনের। সে এখন পাঁচ-সাত-দশ বছরের ধাক্কা। কত রকম অধারস্থির কথা উঠবে। করালীর চর-ওঠা ভুঁইয়ে কার মালিকানা—চৌধুরির না ভারত-সরকারের? যাবতীয় দলিলপত্তর হাকিমের রায়ে হয়তো বা চোতা-কাগজের শামিল হয়ে যাবে। মামলায় হেরে অঞ্চল ছেড়ে পালাতে তখন দিশা পাবে না?

টৌনি মানুষ—মামলা গড়ে পিটে বানানো পেশা হল চক্কোত্তির। কোমর বেঁধে তারপর কোন এক পক্ষের হয়ে লেগে যাবেন। ভাল রকমের একটা জুড়ে দিতে পারলে কিছু দিনের মতো নতুন রোজগারের পথ হল। ঠিক এই সময়টা আর এক পন্থা এসে গেল গগনের মনে। মামলার কৌশল বাতলে দিচ্ছেন চক্কোত্তি, কিন্তু আরও এক ভাল উপায় আছে নির্ঝোলে নগেনশশীকে অঞ্চল-ছাড়া করবার। চারুবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। যে লোভে ঘুরঘুর করছে বিস্তর দিন ধরে, সেই দেশে-ঘরে থাকবার সময়েও। যার জন্যে ওদের পিছন ধরে বাদা-অঞ্চল অবধি চলে এসেছে। টৌনি হওয়া সত্ত্বেও চক্কোত্তি মশায় জাত্যংশে ব্রাহ্মণ। অতএব বৃদ্ধেশ্বরকে কুলতলায় পাঠিয়ে চক্কোত্তিকেও বলেকয়ে ধরে রেখেছে এখানে। অং-বং দুটো বিয়ের মন্তর উনিই পড়ে দেবেন। বাদা-রাজ্যের বিয়েথাওয়ায় এমন খাঁটি ব্রাহ্মণ ক'টা ক্ষেত্রে মেলে? গদাধরের মতন অনেক লোক পৈতে ঝুলিয়ে হঠাৎ ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ভাগ্যবশে এত বড় যোগাযোগ। বুধবারটা ভাল দিন আছে—পাঁজির অভাবে স্মৃতি থেকে চক্কোত্তি বিধান দিয়েছেন। দলিল রেজেস্ট্রির কথা ছিল, তার বদলে নগেনশশী বর হয়ে বিয়ে করতে বসবে। চুক্তি থাকবে বউ নিয়ে বিদায় হয়ে যাবে বিয়ের তিন দিনের মধ্যে। সই করে নেওয়া হবে চক্কোত্তির মুকাবেলা। তবে বিয়ে।

আদ্যোপান্ত শুনে জগন্নাথ গুম হয়ে যায়। অপপরে বলে, শুনেছে তোমার বোন? সে রাজি হয়েছে?

গগন অবহেলার ভাবে বলে, ঘটা করে কে বলতে গেছে! কিন্তু আপত্তির কি আছে? আমি বড় ভাই, ভাল বুঝেই তো বিয়ে দিচ্ছি। জামাই শ্বশুরবাড়ির ভাল অবস্থা—তাতেই কষ্ট পাবে না কখনো।

জগা বলে, বোনটি তোমার সোজা নয় তো। ষষ্ঠীপূজার দিন সেই যে তোমার আলায় এসে পড়লাম বড়দা। চারুবালা ভেবেছে খোঁড়া-নগনা। যাচ্ছেতাই করে উঠল। যা কথার ধার—মোষ বলি-দেওয়া মেলতুকের ধার কোথায় লাগে তার কাছে।

গগন বলে, ও কিছু নয়। দুটো হাঁড়ি-মালসাও তো এক ঝাঁকায় রাখলে ঠনঠন করে। এত বাড়িতে এক সঙ্গে সব রয়েছি, ঝগড়া-ঝাটি হবে না—বলি, বোবা তো কেউ নয়। ঝগড়া বিয়ের আগে হচ্ছে, বিয়ের পরেও হবে। কিন্তু সেজন্য কোন কাজটা আটকে থাকে কার সংসারে?

একটু চুপ করে থেকে নিজের কাছেই যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: বলবি যে দোজবরে বর—কিন্তু সে বিয়ে শুধু তো নামেই হয়েছিল। বউ ঘর করল না। বিয়ের পরে এসেছিল, তারপরে একদিনের তরেও শ্বশুরবাড়ি আর আনা গেল না। নানান কেলেঙ্কারি শোনা যায়। সে বউ আসবে না কোনদিন, এলেও ঠাঁই পাবে না। বরের একটু পায়ে টান বলবি তো তাই? থাকল তো বয়েই গেল। খেটে খেতে হয় না, এমন সুসপশার যে দাওয়া থেকে উঠোনে পা না দিলেও দিব্যি রাজার হালে কেটে যায়। তবে? মায়ের পেটের বোনকে আমি কি খারাপ ঘরে দিচ্ছি?

জগন্নাথ বলে ওঠে, বলছ কাকে? যেখানে খুশি দাওগে। যার পাঁঠা সে লেজে কাটবে, অন্যের কি যায় আসে!

গগন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলল। বলে, দেখ, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। যার কপালে যেমন লেখা থাকে, মানুষের কিছু করবার নেই। নগনাটা কি আজকের থেকে লেগেছে। আমি টালবাহানা করে আসছি। পাত্তরের খোঁজখবর করছিলাম, আসছিল দু-একটা। সেই সময়টা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল। বউ পরের ঘরের মেয়ে, তার কথা ধরি নে। কিন্তু নিজের বোন হয়ে চারুও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে তুলল। হচ্ছেও তেমনি। আমি কি করব—জঙ্গলে পড়ে আছি, জঙ্গলে বরপাত্তর কোথায়? যে আছে, তার হাতেই তুলে দেব। আইবুড় নাম তো খণ্ডাক।

খরকণ্ঠে বলে, দোষটা শুধু নগনার দেখলেই হবে না। বোন বলে ছাড়ব না—বাদায় পা দিয়ে ও-ই তো সকলের আগে গণ্ডগোল পাকাল। তোর সঙ্গে ভাঙাভাঙি ওরই কারণে। মেয়েলোক আরও একজন তো এসেছে। চোখে দেখতে পাস তাকে কখনো? গলা শুনতে পাস? তা ভালই হল, জোড়া আপদ এদ্দিনে এক সঙ্গে বিদেয় হচ্ছে। ঘরে-বাইরে সোয়াস্তিতে থাকা যাবে।

অন্ধকার হয়েছে। আলাঘরে হ্যারিকেন-লণ্ঠন জেলে দিয়ে গেছে। গগন উঠে পড়ল। মাছের ডিঙি ফেরার সময় হল কুমিরমারি থেকে। অনেক কাজ। নগেনশশী নেই। একলাই আজ সমস্ত করবে। মাছের দাম হিসাবপত্র করে নেবে, খাতা লিখবে। জগার দল ডিঙির কাজ ছেড়েছে। কাজ তা বলে আটকে নেই। চৌধুরির আলা থেকে অনিরুদ্ধ নৌকো বাওয়ার পাকা লোক দিয়েছে। বৃদ্ধেশ্বর আছে—এই তরফের নতুন মাতব্বর। তা ছাড়া কথা আছে, দরকার মতন চৌধুরীগঞ্জের নৌকোতে মাছ বয়ে দিয়ে আসবে কুমিরমারি। পাকা লোক নগেনশশী, সে-ই করেছে সমস্ত।

আলস্য
—হিমাংশু রায়চৌধুরী

কারাগার —কমল (মেদিনীপুর)

পুষি —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়
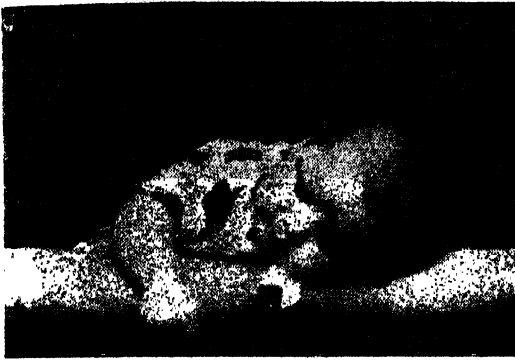
জীবন-যুদ্ধ —শঙ্করসেবক মিত্র
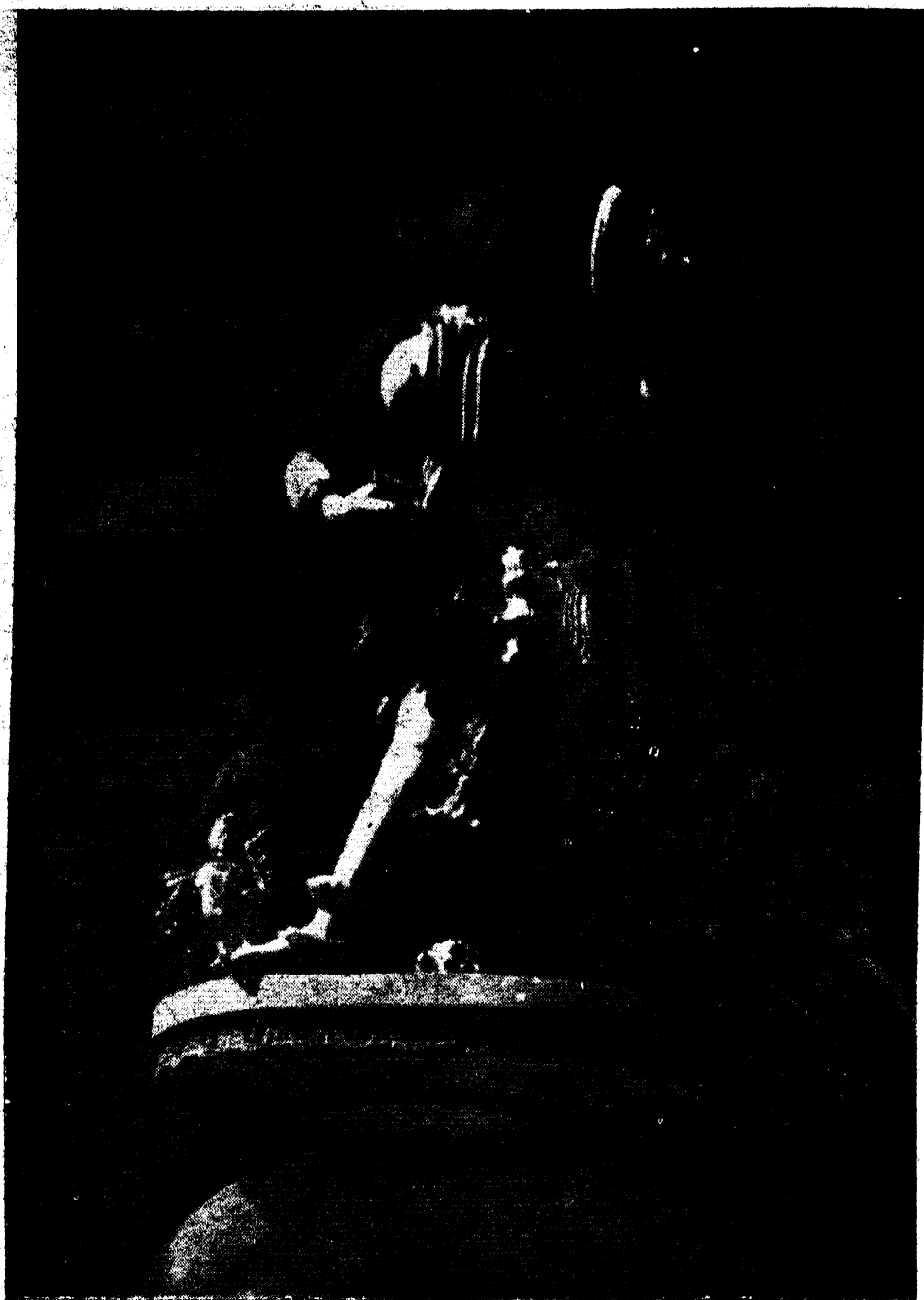
প্রসাধন (বেলুড়, দক্ষিণভারত) —কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতীক্ষা

—আশুতোষ সিনহা

—দীপালী চৌধুরী

মন্দিরশিল্প (বংশবাটী) —লালচাদ বর্মণ

অপত্যস্নেহ

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]
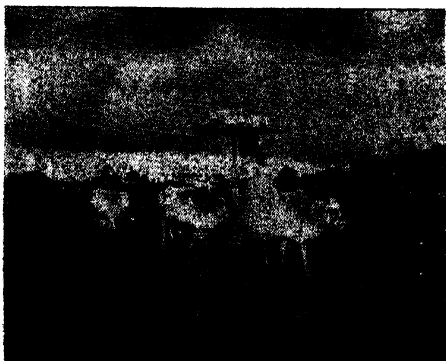
—মিস এস, বসু

চাষী ভাই

—দিব্যেন্দু গোস্বামী

ডোবার ধারে গিয়ে একবার গগন মুখ ফিরিয়ে দেখে। জগন্নাথ আছে তখনো—ঝিম্‌ঝিম্-পাওয়া লোকের মতন খাল কিনারে ছিটে-জঙ্গলের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চৌত্রিশ

গগন যা ভেবেছে, মিথ্যা নয়। খানিকটা পরেই নগেনশশী বুদ্ধীশ্বরের সঙ্গে এসে পড়ল। তখন পা ধুচ্ছে গগন ডোবার ঘাটে বসে। নগেনকে দেখল। বাঁদরকে কলা দেখাতে হয়, সেই কলা হল চারুবালা। একা একা গগন খুব হাসছে।

আর হাসছে চারুবালা রান্নাঘরে বিনি-বউয়ের সঙ্গে। বলে, দেখ বউদি কিসে কি হয়ে যায়। এত বড় শয়তান মানুষ, কিন্তু দাদার বুদ্ধির সঙ্গে পেরে উঠল না। দলিল করে সর্বস্ব নিতে যাচ্ছিল—দাদা এমনি চিরকুট লিখে পাঠাল, ছেড়েছুড়ে ছুটে এসে পড়ল।

বিনোদিনী বলে, কি লিখেছে জান না ঠাকুরঝি? তোমার যে বিয়ে।

হাসি আরও বেড়ে যায় চারুর: ওমা, তাই নাকি? কার সঙ্গে বিয়ে গো, বনের মধ্যে বর পেলে কোথা?

বিনোদিনী হেসে বলে, ভিজে বেরালটি—কিচ্ছু জানেন না। ঘর এই দুখানা মাত্তর—এত কথাবার্তা হচ্ছে, উনি যেন কানে তুলো দিয়ে থাকেন। কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুদিন বিয়ে মেজদার সঙ্গে। সেইজন্যে তো তাকে আনতে পাঠিয়েছিল।

এই? চারু কৃত্রিম হতাশার সুরে বলে, এ সম্বন্ধ তো কত বছর ধরে চলছে। বিয়ের তদ্বিরে বর আমাদের পিছন ধরে অজঙ্গি জঙ্গলে এসে উঠল। এদ্দিনে চাড় হল তোমাদের?

বিনোদিনী বলে, ফুল না ফুটলে কি জোর করে হয় ভাই? মানুষের হাত কিছু নেই, যা করবার বিধাতাপুরুষ করেন। যোগাযোগটা কী রকম! চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন—ভাল ব্রাহ্মণ, নৈকষ্য-কুলীন। মন্তোর পড়াবার জন্য বলে কয়ে রাখা হল তাঁকে।

চারু বলে, শুধু বলাকওয়ায় হয়নি। টৌনিমানুষ—মোটা দক্ষিণা কবুল করতে হয়েছে। বরকেও ছেড়ে কথা কইবে না, মোটা দালালি আদায় করবে তার কাছ থেকে।

নগেনশশী ইতিমধ্যে জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে পরিপাটি করে মুছে চক্কোত্তির কাছে বসেছে। নিচুগলায় কথাবার্তা হচ্ছে। চক্কোত্তি খবরাখবর নিচ্ছেন ফুলতলার। নগেনও শুনছে এদিককার খবরাখবর। তড়িঘড়ি এই বিয়ের আয়োজনের বিবরণ। গগনের মতলব যা আছে এর পিছনে। গগন না থাকায় দু-জনে খোলাখুলি কথাবার্তায় জুত হয়েছে।

বিনি-বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে চারুবালা ডোবার ঘাটে গেল গগন যেখানে পা ধুচ্ছে। জলে নামবার উপায় নেই, বিষম কাদা। নোনারাজ্যের সর্বত্র এমনি। কাদা লেপটে গিয়ে আঠার মতো এঁটে থাকে; কলসি কলসি জল ঢেলেও ছাড়ান যায় না। ঘাটের উপরে সেজন্য মাচা বানিয়ে নিয়েছে। জলের ভিতরে শক্ত দুটো খুঁটি পোঁতা, আড় বেঁধেছে ঐ খুঁটির সঙ্গে, লম্বালম্বি কতকগুলো কাঠ ফেলে নিয়েছে। ঐ মাচার উপরে বসে ঘটিতে করে গায়ে জল ঢালছে। চারু এল খান দুই থালা হাতে করে। থালা মুছে এসেছে। সেটা উপলক্ষ, গগন বুঝতে পারছে। মুখ খুলবে এইবারে চারু।

গগন কিছুমাত্র আমল না দিয়ে মুখের উপর লোমাস্তির ভাব টেনে এনে বলে, যাক, এসে গেছে তবে মেজবাবু। ঘর-বর পেয়ে এবারে তো দেশে চললি। পুরানো কুটুম্বিতে ঝালিয়ে নতুন কুটুম্বিতে।

চারু বলে, তোমার মেজো সম্পত্তিটা রক্ষে হল দাদা। যদি অবস্থা তোমার নতুন কুটুম্ব সত্যি সত্যি চলে যায় দেশে ঘরে।

গগন জাঁক করে বলে, বন কেটে জন্তুজানোয়ার তাড়িয়ে সম্পত্তি বানানো। হেঁ-হেঁ, এ সম্পত্তি নিয়ে কেউ জিরোতে পারবে না। চক্কোত্তি মশায়কে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখিস।

তারপরে একেবারে আলাদা সুরে বলে, তোকে নিয়ে কত উদ্বেগে যে দিন কেটেছে! সেয়ানা বোন চোখের উপর ঘুরঘুর করছে, বাদাবনে উপায়ও কিছু করা যায় না—

চারু বলে, উদ্বেগের কথা আমায় বল নি কেন দাদা? আমি উপায় করতাম।

কি উপায় করতিস? বর ধরে আনবি, কিন্তু জঙ্গলে মানুষ কোথা? হাটবার দেখে তাহলে কুমিরমারি যেতে হত। কিম্বা সেই ফুলতলা অবধি।

রসিকতা করে গগন খুব এক চোট হেসে নেবে, কিন্তু চারুবালার মুখে চেয়ে স্তম্ভিত হল। চারু বলে, কোথাও যেতে হত না দাদা। এইখানে করালী গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বোনের দায় মোচন হয়ে যেত তোমার।

গগন আহত কণ্ঠে বলে, শুভকর্মের আগে তুই জলে ঝাঁপ দেবার কথা বললি চারু ?

জল অনেক ঠাণ্ডা দাদা। রাতে ঘুমিয়ে থাকতাম—সেই সময় হাত-পা ধরে গাঙে ছুঁড়ে দাও নি কেন ? দায় চুকে যেত।

গগন চটে গিয়ে বলে, এখন এই বলছিস, কিন্তু নগেনকে তুই-ই তো নিয়ে এলি বিয়ের লোভ দেখিয়ে। দাদার মত ছাড়া হবে না—দাদার কাছে মত নিতে এসেছিস তোরা। তা ভেবেচিন্তে দিচ্ছি আমি মত। চক্কোত্তি মশায়কে ঐ জন্ত ধরে রেখেছি। এখন আবার উল্টে-পাল্টা বললে হবে কেন ?

কেন বলেছি সে-ও তো জান দাদা। নিজের গরজ বুঝে আজকে তুমি অবুঝ হচ্ছ। তুমি খবরবাদ দাও না, একলা ছুটো মেয়েমানুষ আসতে পারতি নে জঙ্গলরাজ্যে। কী করা যায়—বানিয়ে বলতে হল একটা কিছু। নয়তো খোঁড়া পা টানতে টানতে মানুষটা এদ্দূর অবধি আসতে যাবে কোন স্বার্থে ? কিন্তু পৌঁছবার পর থেকেই তো দূর-দূর করছি। তিতো কথাবার্তা দিনরাত। রাগ করে দেশ-ভুঁয়ে চলে যাবে—তা একেবারে জোঁকের মতন লেপটে রয়েছে।

গগন বলে, লেপটে থেকে প্যাঁচ কষে কষে এবারে সবসুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। আমার এত বছরের নোনা জল খাওয়া বরবাদ করে দেয়।

হঠাৎ সে চারুর দিকে খিঁচিয়ে ওঠে : তোদের জন্যেই তো। হাতে-গাঁটে মানবের সব সময় টাকাপয়সা থাকে না। চিঠি লিখেছিলি, আরও না হয় পাঁচ-দশখানা লিখতিস। হুট করে এসে পড়বার কোন দায় হল ? সব গণ্ডগোলের মূলে তোরা ? বলি, নগনাটা এসে না জুটলে এসব কিছুই তো হত না। উল্টে আবার টকটক কথা বলিস আমার উপরে।

দু-খানা থালা ধুতে আর কত সময় লাগে ! হয়ে গেছে। থালা হাতে নিয়ে অন্ধকার উঠানে চারুবালা ম্যাচ-ম্যাচ করে চলল। বাদারাজ্যে কত রকম সাপখোপের কথা শোনা যায়। একটা সাপ ফণা তুলে এসে ছোবল দিলেও তো পারে।

চিরকুট পেয়েই নগেনশশী আ-তুউ ডাকা কুকুরের মতন ছুটে এসেছে, মুখের তম্বি কিন্তু ষোলআনা। গগন পা ধুয়ে এসে দাওয়াতেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : কী কাণ্ড ! বুধবারটা ছাড়া দিন খুঁজে পেলে না ? কাজটায় বাধা পড়ে গেল।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে বাইরে নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হয়। সবাই বলে থাকে এমনি। হাসি চেপে নিয়ে গগন বলে, শুভকর্মটা অনেক দিন ধরে ঝুলছে। সেইজন্যে ভাবলাম—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নগেন বলে, এদ্দিন ঝুলেছে তো আরও না হয় দু-দশ দিন ঝুলত। লোক পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা—বিয়ের তারিখ ঐ বুধবারের পর আর যেন আসবে না !

গগন বলে, তারিখ কতই আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বাদার মধ্যে পুরুত মেলে কোথা ? ভাগ্যিভোগায় চক্কোত্তি মশায়কে পাওয়া যাচ্ছে। খাঁটি ব্রাহ্মণ—হোটেলওয়ালা গদাধরের মতো ভেজাল বামুন নন।

চক্কোত্তি মশায় বরাপোতায় থাকবেন এখন। দরকারে খবর দিলে কি আসতেন না ? নাঃ, কাজটা ঠিক হল না জামাইবাবু। পাকা দলিল হয়ে যাচ্ছিল। বড়লোকের ব্যাপার তো—কোন কোটনা কী মন্ত্রণা দেয়, মন ঘুরে না যায় অনুকূল বাবুর।

দলিল না-ই বা হল ! এদ্দিন বিনি-দলিলে চালিয়ে এসেছি, হঠাৎ দলিলের কোন গরজ পড়ল ? আসল মালিক কে, তারই তো সাকিন নেই।

নগেনশশী জাঁক করে বলে, দলিল হবে না মানে ? ইয়ার্কি ? ঠিকঠাক করে এসছি অনুকূল বাবুর সঙ্গে। এ বুধবারে হল না তো আসছে বুধবারে। স্ট্যাম্পের উপর লেখাপড়া হয়ে আছে, খালি এখন সই মেরে হাকিমের সামনে তুলে ধরা। কেন যে লোকে অনুকূল বাবুর নিন্দে করে—আমি তো কই খারাপ দেখলাম না। তিনি আরও ঠাট্টা করে বললেন, বিয়ে করতে যাচ্ছ, মিষ্টিমিঠাই নিয়ে আসবে। নয়তো কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দেব।

কী সব উল্টোপাল্টা কথা ! গগন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিয়ে হয়ে গেলেই বাদা থেকে বিদায় হবে—এমনি কথা কতদিন হয়েছে। শতমুখে বাদার নিন্দে করত নগেনশশী : শাপ-শুয়োর থাকতে পারে এখানে, মানুষের বসবাসের জায়গা নয়। মায়ের পেটের বোনটা ছাড়ল না কিছুতে—সেইজন্যে আসা। পালাতে পারলে বেঁচে যাই রে বাবা। বিনি-বউ আর এক রকম বলে : আসতে চাচ্ছিল না মেজদাদা। যে-ই বলেছি, আমায় একেবারে তাড়িয়ে তুলল। তখন চারি বলে, যাবে না কি রকম ? নাকে-দড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। চারির চক্কোরে পড়ে মেজদাদা এল, আমার কথায় নয়। চারিকে বিয়ে করবার লোভে। কিন্তু বিয়ের পরেও এখন তো নড়ে বসবার মতলব দেখা যাচ্ছে না সেই নগেনশশীর।

গগন বলে, এ কি রকম কথা। রীতকর্ম আছে তো একটা ! দলিল হোক না হোক সে আমি বুঝব। তার জন্য ফিরে বুধবার অবধি এখানে হাঁ করে থাকতে হবে না। বিয়ের পরদিনই বউ নিয়ে জোড়ে বাড়ি চলে যাও।

নগেনশশী বলে যেখানে থাকব সেই তো বাড়ি। বউ নিয়ে ভিন্ন জায়গায় যেতে বল, তার জন্যেও আটকাবে না। এখান থেকে গিয়ে ঐ চৌধুরিগঞ্জের আলায় পাঁচ-সাত দিন জোড়ে থেকে আসতে পারি। অনুকল চৌধুরির সঙ্গে দহরম-মহরম হয়ে গেছে। আমার গুণ বুঝেছেন। নতুন-ঘেরির একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে তার পরে চৌধুরিগঞ্জের ভারও আমায় নিতে হবে। অনিরুদ্ধকে দিয়ে হয় না, ফুলতলা থেকে এসেও সুবিধা করতে পারে না। ভালই হবে, কি বল জামাইবাবু ? একচ্ছত্র হয়ে বসা যাবে। অঞ্চল জুড়ে চেপে বসে তখন দেখা যাবে কত শক্তি ধরে পাড়ার ঐ হাঘরেগুলো। ভিটে-ছাড়া করে তাড়াব।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, না গো, দেশে ফিরে যাবে তোমরা। কথাও তো তাই। চারি পাগল হয়ে উঠেছে দেশে-ঘরে যাবার জন্যে। বিয়ে দিচ্ছি সেই কারণে।

কিন্তু নগেনশশী কিছুমাত্র আমল না দিয়ে চক্কোত্তির সঙ্গে পুনশ্চ কথাবার্তায় মগ্ন হল। কেমন ভাবে কি রকম সর্তে চৌধুরিগঞ্জের কাজটা নেওয়া যায়, কাজ নেবার পরে কোনখানে ঘাঁটি করা যাবে—সাঁইতলায় না চৌধুরিগঞ্জে, তারই সব জরুরি শলাপরামর্শ।

বেশ মজা ! বিয়ে করবে চারুবালাকে—এবং বিয়ের পরে নতুন ঘেরি ও চৌধুরিগঞ্জ উভয় জলকরের কর্তা হয়ে বাদারাজ্যে আধিপত্য করে বেড়াবে। ধান ছাড়াতে গিয়ে চাল বেধে আসে—উপায় কি এই বিপদে ?

[ক্রমশঃ।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বোম্বাইয়ে ফিরে গিয়ে আমি যোগ দিলুম জয়ন্ত ফিল্মস্ লিমিটেডে। এই প্রতিষ্ঠানটি তখন 'উর্বশী' ছবিখানির নির্মাণকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। উর্বশী ছবিতে এঁরা আমার নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচন করলেন। শুটিং শুরু হল, ছবির নির্মাণকার্য এগিয়ে চলতে লাগল যথারীতি, আর একথা মিথ্যে নয় যে উর্বশী চরিত্রটিতে আমায় মানিয়েছিলও সবদিক দিয়েই। উর্বশীতে অভিনয় করে আমি সব দিক দিয়েই যেন পরিপূর্ণা, কোথাও যেন এতটুকু ফাঁক নেই। পূর্ণতার সমারোহ। কিন্তু এইখানেই হঠাৎ ছন্দপতন। পরম রমণীয় সুললিত বর্ণঝঙ্কার-সমৃদ্ধ একটি কবিতার পঠন কানে যেন সুধা ঢালছে, হঠাৎ ছন্দপতন কানে লাগল ভীষণ, এও ঠিক তাই, কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লুম, রীতিমত শয্যা নিতে হল আমাকে, বেশ কিছুকালের জন্যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য আমি হারিয়ে ফেললুম, আর এই শয্যায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল বেশ কয়েকটি মাস, বাইরের কলকোলাহল শব্দমুখর জগতের সঙ্গে এই ক' মাস আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না বাইরের রূপ রস বর্ণ গন্ধের সুধাসৌরভ ক' মাস যেন আমার জন্যে ছিল না, স্বাভাবিক জগত থেকে এই অসুস্থতা যেন কয়েক মাসের জন্যে আমায় একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দিলে। আমার তিলে তিলে গড়া একেকটি স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, রূপ তা পেল না, আমার সাধের চিন্তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল, আমার কল্পনার প্রাসাদকে এই অসুস্থতারূপী ঝড়ের দমকা বেগ যেন ধূলিসাৎ করে দিল, সেই প্রাসাদের চূড়া যেন লুটিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড পথে। অসুস্থতা যখন আমার মধ্যে জাঁকিয়ে আপন অধিকার কায়েম করল তখন উপায়ান্তর না দেখে আমিই প্রযোজকদের আর আমার জন্যে সময় নষ্ট করে ক্ষতির সম্মুখীন হতে নিষেধ জানালুম। আমার জন্যে সময় নষ্ট করে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া মানে সেই অন্তর্বর্তী সময়টুকু প্রত্যেকটি কলাকুশলীকে মাসে মাসে পারিশ্রমিক দিয়ে যাওয়া অথচ তার বিনিময়ে ঐ সময় কোন কাজও তাঁরা পাচ্ছেন না, আমি ফ্লোরে যতক্ষণ না যাচ্ছি ততক্ষণ শুটিং বন্ধ অতএব কাজ হচ্ছে না অথচ তাঁরা প্রত্যেককে তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক যথারীতি দিয়ে যাচ্ছেন, তার উপর কলাকুশলীর সংখ্যা তাঁদের প্রতিষ্ঠানে ছিল বিরাট। আমার সারতে কতদিন লাগবে তা আমার একেবারেই অজানা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ বন্ধ করিয়ে রাখা আমার ভাল মনে হল না, এই সব ভেবে আমি নিজেই তাঁদের এ অভিপ্রায় জানালুম। এঁদের কাছে আমি আরও নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ, এঁদের সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতা কোনদিন ভোলবার নয়, আমার স্মৃতিতে এঁদের কথা চিরদিন বেঁচে থাকবে। যে সকল প্রযোজকদের সঙ্গে পরম আরামে কাজ করা যায় এঁরা সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সে বিষয় বিস্তারিত বলাই বাহুল্য, আমার যা যা চাহিদা ছিল অম্লানবদনে পরম আনন্দে বিনা বাক্যব্যয়ে এঁরা তা মেনে নিয়েছেন। এমন কি আমার ইচ্ছায় আমার নিজস্ব শিল্পনির্দেশক শ্রীসুশান্ত চৌধুরীকে এঁরা তাঁদের ছবির শিল্প নির্দেশনার ভার অর্পণ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। মঞ্চসজ্জা এবং সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যই সুশান্ত চৌধুরীর প্রয়োজন অনুভূত হয়, তার কারণ

একে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্যে এর নৃত্যশৈলীর উপযোগী মঞ্চসজ্জা এবং সাজসজ্জাও যথেষ্ট বিশেষত্বপূর্ণ হওয়ার দরকার ছিল তার উপর আমি নিজেও চেয়েছিলুম যে আমার পরিচ্ছদাদিতেও যেন যথেষ্ট পরিমাণে একটা নিজস্বতার স্পর্শ চিহ্ন পাওয়া যায়।

আজ আমার জীবনের একটি বিশেষ দিকের আলোকপাত করছি, পাঠক-সাধারণের কাছে আমার জীবনের একটি দিকের প্রতিকৃতি আজ সম্পূর্ণভাবে উন্মোচন করব। মানুষের জীবন সুখ এবং দুঃখের একটি সমষ্টি সুখ দুঃখের অভিনব সংমিশ্রণে মানুষের জীবনে পূর্ণতার স্পর্শ পড়ে সুখ আর দুঃখ উভয়েরই উভয়ের উপর প্রভাব ফেলে আর উভয়েই মানুষের জীবনে অপরিহার্য। সুখকে বাদ দিয়ে দুঃখের চিন্তা বা দুঃখকে বাদ দিয়ে সুখের চিন্তা অকল্পনীয়। ভাগ্যদেবতার আশীর্বাদে জীবনে সুখের যে স্পর্শ পেয়েছি তার তুলনা নেই, না চাইতেই কত সুখ যে আমায় ঘিরে ধরেছে তা হয়তো আজ পর্যন্ত আমার নিজেরই জানা নেই। সুখও পেয়েছি যেমনই, দুঃখ বেদনাও তেমনই পেয়েছি তাঁরই কাছ থেকে। সুখসম্ভারে তিনি আমায় ভরিয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাতে পরিপূর্ণতার লক্ষণ ছিল না, জীবনের একটি বিশেষ বৃত্তি হয়তো পূর্ণতা পেয়েছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তাতে জীবন পূর্ণতা পায়নি তাইতো তিনি আমার দুঃখ দিলেন, দিলেন বেদনা, দিলেন আঘাতের কণ্টকমাল্য—আমাকেই পূর্ণ করে তোলার জন্যে যে দুঃখ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্যে অমলিন স্বাক্ষর রেখে গেছে সেই স্বাক্ষরগুলোই আজ খালি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেই দুঃখের দিকটাই আজ তুলে ধরছি—আমার জীবনের স্বর্ণযুগ বলতে যে সময়টা বোঝায় অর্থাৎ যখন আমি সৃষ্টির সাধনায় বিভোর (অবশ্য আমার সৃষ্টিতে সার কতখানি আছে তা আমার বিচার্য নয়, সে বিচার করবেন পাঠক ও রসবোদ্ধার দল) যখন নতুন নতুন সৃষ্টির কল্পনায় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যখন সৃষ্টির চিন্তা ছাড়া জগতের অন্যান্য সহস্র চিন্তা আমার মন থেকে নির্বাসিত—সেই সময়ের কথা বলছি। যখন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পুণ্য ভারতভূমির প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে দর্শকদরবারে ভারতকন্যা হিসেবে আমার নৃত্যার্ঘ্য নিবেদন করে চলেছি দেশপুত্র ও দেশকন্যার সাদর আহ্বানে এবং প্রশংসায় নিজেকে যখন ধন্য মনে করছি তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাংঘাতিক। দুশো বছরের শোষণের যন্ত্রটি তখন শিথিল

হয়ে এসেছে। বণিক ইংরেজ বুঝেছে আর উপায় নেই, এবং জালগুটোতে হবে, রামমোহন থেকে যে জাগরণের সাধনার পরিচয় পাওয়া গেছে তারই অঙ্কুর আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে, ভারত-আত্মার কণ্ঠ আর রোধ করে রাখা চলবে না, অতএব যাবার আগে শেষ কামড় দিয়ে ইংরেজ তখন দেখাতে আরম্ভ করেছে যে নানাদিকে আমাদের পটুত্বের কথা তোমরা নানাভাবে উল্লেখ কর, এবার দেখে নাও নির্যাতনের দিক দিয়েও পৃথিবীর অনেক জাতকে আমরা টেক্কা মেরে যেতে পারি। আর সেই নির্যাতনের বলি হল ভারতের মুক্তিকামী সন্তানেরা, সারা ভারত তখন মুক্তির সংগ্রামে আত্মমগ্ন, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই এক কথা, ভারত ছাড়, মুক্তি চাই, ভারতের অন্তরে অন্তরে তখন স্বাধীনতার ক্ষুধা। পরাধীনতার জ্বালায় তখন বিষিয়ে উঠেছে সারা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ তখন প্রায় সকলেই কারাগারে। সেই সময় তাঁরা অনেকেই কেন, প্রায় সকলেই বলা যায়—লৌহকারার অন্তরালে। কখনও কখনও লোহার দরজার বাইরে তাঁরা বেরিয়ে আসতেন যেতেন বটে তবে তা অতি অল্প সময়ের জন্যে, অল্পকালের ব্যবধানেই আবার ফিরে যেতে হোত জেলে, তাই আমার Neo Classical Ballet যা গড়ে উঠেছিল আমাদের ঐতিহ্যাশ্রিত পটভূমির উপর ভিত্তি করে এবং যুগের সঙ্গে তাল রেখে সেই নৃত্য নিবেদন তাঁদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন ছাড়া অনেককেই দেখাবার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে পারিনি, আমার জীবনে এ ক্ষোভ চিরকালের। আমি অন্তর থেকে বলছি দেশের শৃঙ্খল মোচনে যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের দুশ্চর সাধনায় সমাহিত, শতসহস্র নির্যাতন যাঁরা হাসিমুখে বরণ করছেন সেই সার্থকজন্মা নেতৃবৃন্দকে যদি দেশের মেয়ে হিসেবে দেশীয় নৃত্যকলার একটি বিশেষ উদ্ভাবিত দিক দেখাতে পারতুম তা হলে আমার সুখের সীমা থাকত না।

সে সময়ে সুযোগই বলুন, প্রেরণাই বলুন, খ্যাতিই বলুন, বিধাতা আমার কোন কিছুরই অভাব রাখেননি, অথচ দেখুন এই একটি দিককে কেন্দ্র করে আমার মনে যে হতাশা, যে বেদনা, যে ক্ষোভ জন্ম নিল—তারা চিরকালের জন্যেই আমার মনে বেঁচে থাকবে। আমার পূর্ণ জীবনে এ যেন একটা বিশেষ ফাঁক রয়ে গেল। আর এই ফাঁক—বলতে পারেন আমি কোন মন্ত্রবলে ভরিয়ে তুলব।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মদনভস্ম ব্যালেতে শিব-পার্বতীর ভূমিকায়
মাধব মেনন ও সাধনা বসু

ক্ষুধিত পাষাণ

সরস্বতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভায় বাঙলাদেশের ছোট গল্প যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার তুলনা নেই। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির ঋণের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বাঙলা দেশের ছোট গল্প একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এক নব ধারাপাতের সৃষ্টি হয়েছে। গীতাঞ্জলিকে নিয়ে বাঙালী যতখানি গর্ববোধ করতে পারে গল্পগুচ্ছকে নিয়েও বাঙালী ঠিক ততখানিই গর্ববোধ করতে পারে। যে অবিস্মরণীয় ছোটগল্পগুলিকে একত্রে সংকলিত করে গল্পগুচ্ছের সৃষ্টি ক্ষুধিত পাষাণ তাদের মধ্যে অন্যতম। ক্ষুধিত পাষাণ শুধুমাত্র বাংলাদেশের গৌরব বর্ধনই করেনা বিশ্বের ছোটগল্প সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করার অধিকার বা শক্তি রাখে। বিশ্বসাহিত্যের যে ক'টি ছোট গল্প অমরত্ব অর্জন করার দাবী রাখে ক্ষুধিত পাষাণ তাদেরও অন্যতম। মাত্র কয়েক পাতায় একটি ছোট গল্প। চরিত্রসংখ্যা মুষ্টিমেয়। কিন্তু অপূর্ব্ব কল্পনারস সমন্বিত ও ভাবসমৃদ্ধ এই গল্পটি পড়ার সময় সব কিছু মন থেকে মুছে যায়, গল্পটির মধ্যে থেকেও তখন সব কিছু মিলিয়ে যায় সব কিছুকে ছাপিয়ে ফেলে বারংবার রবীন্দ্রনাথকেই সেখানে সর্বতোভাবে মনে পড়ে। মনে পড়ে এই অনবদ্য সৃষ্টির বিশ্বপূজ্য স্রষ্টাকে।

ক্ষুধিত পাষাণ বর্তমানে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। ছায়াচিত্রের উপযোগী নাট্যরূপ দিয়েছেন মন্মথ রায়। ছায়াচিত্রের জন্যে স্বভাবতঃই কাহিনীকে কিছুটা সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, এই কাহিনী সম্প্রসারণে মন্মথ রায় যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের মত ক্ষুধিত পাষাণের কাহিনী সম্প্রসারণ নিছক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের চিত্রগঠনে রবীন্দ্রনাথের মূল সুর ব্যাহত হয়েছে, তাল কেটে গেছে, ঘটেছে ছন্দপতন। ক্ষুধিত পাষাণ সে পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ। ছবিটির গল্পাংশ সর্বজনবিদিত, তাই সে সম্পর্কে নতুন আলোকপাতের কিছু নেই। ছবিটির মূল সম্পদ পরিচালকের ট্রিটমেণ্ট এবং ক্যামেরার কাজ। চিত্রকর যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা নেই। চিত্রগ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কল্পনা এবং কয়েকটি কোণ নির্বাচন যেমনই বিস্ময়কর তেমনই অভিনব। মরুভূমির এবং অশ্বচালনায় চিত্রগ্রহণ যেভাবে নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য, বিশেষ করে মরুভূমির বা বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমূহের চিত্রাবলী যেভাবে গৃহীত হয়েছে সেইভাবে

চিত্রগ্রহণ ইতঃপূর্বে অন্য কোন বাঙলা ছবিতে দেখা গেছে কি না আমাদের জানা নেই। চিত্রকরকে অভিনন্দন জানাই। ক্ষুধিত পাষাণ তপন সিংহের একটি অক্ষয় চলচ্চিত্র সৃষ্টি। তাঁর অসামান্য দক্ষতার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে এই ছবিখানিতে। তাঁর পরিচালিত এই ছবিটি আমরা অন্তরে দৃঢ় আশা পোষণ করি; জগতের চলচ্চিত্রের দরবারে যথেষ্ট মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে বাঙলা ছবির মানোন্নয়নে এবং গৌরববৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আলী আকবরের সুরযোজনা তাঁর সুনাম সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন করিমরূপী রাধামোহন ভট্টাচার্য। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় মুখের ভাষা কেড়ে নেয়। যে ধীর, স্থির, সংযত, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ব্যক্তিত্ববান অভিনয়—তিনি প্রদর্শন করলেন তা তাঁর বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভারই পরিচয় দেয়। তাঁর উর্দু উচ্চারণ অপূর্ব এবং বিশুদ্ধ। রাধামোহন ভট্টাচার্যের পরেই উল্লেখ করব মামুদশাহরূপী দিলীপ রায়ের নাম। বাদশাহ-সুলভ ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য তিনি নিখুঁৎভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁরও উচ্চারণ আড়ষ্টতামুক্ত এবং ভ্রান্তিহীন। ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী অবং অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ও যথোচিত অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

মেঘে ঢাকা তারা ও বাইশে শ্রাবণ

বর্তমানে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে যে সকল বাঙলা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে মেঘে ঢাকা তারা এবং বাইশে শ্রাবণের উল্লেখ বিশেষ ভাবে করণীয়। দুখানিই হৃদয়ধর্মী এবং বলিষ্ঠ বাস্তব আবেদনমূলক ছবি। মেঘে ঢাকা তারার কাহিনীকার সাহিত্যসেবী শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু, তাঁর "চেনামুখ" রচনাটিকে অবলম্বন করেই মেঘে ঢাকা তারার চিত্ররূপ গঠিত হয়েছে। আজকের দিনের জগতের আকাশে বাতাসে চতুর্দিকে যে সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—ছবি দুটির কাহিনীও সেই সুরেই গাঁথা। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি পরিবেশিত হয়েছে মেঘে ঢাকা তারায়। মধ্যবিত্ত সমাজে এখন বেঁচে থাকাটাই একটি বড় সমস্যা, জীবন ধারণের চেষ্টাটাই যেন একটা অপরাধ, মধ্যবিত্তদের যেন সৃষ্টিই হয়েছে বিরাম বিশ্রামহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্যে, মূলতঃ এই কথাগুলির উপর ভিত্তি করেই চেনামুখের গল্পাংশ রচিত। দুটি ভাই বোনকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী রূপ পেয়েছে, এবং এই ভাই বোনের মধ্যে দিয়ে যে ভাবে লেখক আপন বক্তব্যকে রূপ দিয়েছেন তা হৃদয়বান, অনুভূতিসম্পন্ন এবং দরদী দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করার যোগ্যতা রাখে। তবে এই সুন্দর ছবিখানির সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে শব্দযন্ত্রের জন্যে, ছবির শব্দগ্রহণ এত পীড়াদায়ক হয়েছে যে সে বিষয়ে আর বলার কিছু নেই, ছবিটির সমস্ত সৌন্দর্যকে হত্যা করেছে এই ব্যর্থ শব্দ গ্রহণ। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন কৃতী চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। পরিচালনা করেছেন শক্তিমান পরিচালক ঋত্বিক ঘটক।

অভিনয়ে দর্শক সাধারণকে স্তব্ধ হতবাক করে দিয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্যাংশে অবতীর্ণ হয়েছেন বিজন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিজু ভাওয়াল গীতা দে, আরতি রায় ও গীতা ঘটক প্রভৃতি।

বাইশে শ্রাবণ ছবিটি নিম্নমধ্যবিত্তদের কেন্দ্র করে। তাদের সুখ দুঃখ বেদনা আশা আনন্দই এই ছবির প্রধান উপজীব্য। তাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করার ক্ষেত্রে পরিচালক যথেষ্ট পরিমাণে সফলতা অর্জন করেছেন। ছবিটির কাহিনীর আবেদন হৃদয় স্পর্শ করে। বৃথা আড়ম্বরের ভারে ছবিটি জর্জরিত নয়, অযথা চাকচিক্যে একে বিভূষিত করার চেষ্টা করা হয়নি, কোন কিছুর অর্থহীন বাহুল্য ছবিটিতে আরোপিত হয়নি, অথচ ছবিটি যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, বক্তব্য সমন্বিত সর্বোপরি বৈশিষ্ট্যবান। সেইখানেই পরিচালকের কৃতিত্ব সহজ সরল ভাবে বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে কৃত্রিমতার অস্পষ্টতার, এবং দুর্বোধ্যতার আশ্রয় নেওয়া হয়নি—সেই জন্যেই ছবিখানি সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মৃণাল সেন। সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শিল্প সম্বন্ধীয় নির্দেশাদি দিয়েছেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, উমানাথ ভট্টাচার্য, হরিমোহন বসু, প্রীতি মজুমদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গিনী দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বর্ষীয়ান সাহিত্যস্রষ্টা শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কাঞ্চনমূল্য' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের রূপে দেখা যাবে। ভারতের কৃতী আলোকচিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী ছবিটির আলোকচিত্র এবং সুরযোজনার ভার যথাক্রমে গ্রহণ করেছেন। ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু-অঞ্জন, শ্রীমান গৌতম, বাসবী নন্দী এবং রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি শিল্পিগণকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে।......বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষের অপূর্ব কাহিনী 'শুন বরনারী'র চিত্রায়ণ সম্ভবপর হচ্ছে অজয় করের পরিচালনায়। উত্তমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুনন্দা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখ শিল্পীরা এতে অভিনয় করছেন।.....কুমারেশ ঘোষের 'বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস' গল্পটিকে ছায়াচিত্রে দর্শকসাধারণ দেখতে পাবেন "শেষ পর্যন্ত" শিরোনামায়। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজিত এই ছবিটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, জীবেন বসু, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, সুলতা চৌধুরী প্রভৃতি।......'কানামাছি' ছবিটি পরিচালনা করছেন ভবেন দাস। সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার নচিকেতা ঘোষ। রূপায়ণে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমান তিলক, পদ্মা দেবী, সুনন্দা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, প্রভৃতি।......'পাথেয়' নামক ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রভাত চক্রবর্তী। এই ছবিটির মাধ্যমে রূপালী পর্দার বুকে যেসব শিল্পীর অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে তাঁদের মধ্যে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, প্রশান্তকুমার, অনুপকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রণতি ঘোষ, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জার্মাণ শিল্পীদের চিত্রসমাবেশ

অশোক ভট্টাচার্য

গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতার যাদুঘরের প্রদর্শনীকক্ষে ললিতকলা একাডেমি ও একাডেমি অব ফাইন আর্টসের উদ্যোগে জার্মাণ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রাফিক চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়ে গেছে। গত কয়েক বছরের পূর্ব-জার্মাণীর এই বিভাগের বাছাই করা কাজ এগুলি, এবং এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, শিল্পীদের প্রদর্শিত নমুনাগুলি কেবলমাত্র উচ্চমানের পরিচায়কই নয়, সেগুলি জার্মাণ জাতির গ্রাফিক আর্টের যে গৌরবময় ঐতিহ্য—যা ডুরার-প্রমুখ শিল্পীর রচনার দ্বারা বিশ্বশিল্পের অন্তর্ভুক্ত—তারও বলিষ্ঠ উত্তরসাধক। সেই সঙ্গে একটি নতুন চিন্তাধারার যে ব্যাপক প্রসার পূর্ব-জার্মাণীতে ইদানীং ঘটেছে তারও শৈল্পিক অভিব্যক্তি হিসাবে বিশিষ্ট। অথচ রাজনৈতিক যান্ত্রিকতার প্রভাবে কোনো রচনাই আড়ষ্ট বা চিন্তার দিক থেকে দেউলিয়া নয়। অবশ্য এঁদের রচনায় কোথাও অহেতুক আঙ্গিকগত জটিলতা দৃষ্ট হয় না এবং এ্যাবষ্ট্র্যাক্ট আর্টের অবয়বগত অথবা আলোছায়া বিষয়ক নৈর্ব্যক্তিক অনুশীলনও লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলে শিল্পীদের সৃজনশক্তি যে কোনো নিগড়ে বাঁধা পড়েছে তাও নয়। তাঁরা প্রয়োজন মতো রচনার ভাবকে মূর্ত করবার উদ্দেশ্যে দৈহিক অবয়বের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন এবং রং-এর ব্যবহারে নিয়েছেন যথেচ্ছ স্বাধীনতা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সুস্থ শালীনতা সর্বত্র বিধৃত এবং কারুকর্মের অনুশীলনগত নিষ্ঠা সর্বত্র প্রতীয়মান। এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শিল্পীরা এক নতুন মূল্যবোধ অর্জন করেছেন এবং এক বৃহত্তর সমাজের সম্মুখে সেই মূল্যবোধকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশ্বব্যাপী মানসিক অস্থিরতার মধ্যেও তাঁরা যে অসাধারণ মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা অনুধাবনীয়।

এই প্রদর্শনী ভাল লেগেছে আরও এই দেখে যে, সংখ্যাগত আধিক্য এখানে গুণগত উৎকর্ষকে কোথাও লঘু করেনি। অধিকাংশ ছবিই বিশিষ্ট এবং কিছু ছবি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দক্ষতা ও রসবোধের

ঘুমপাড়ানি গান—গ্যাব্রিয়েল মেয়ার ডেনেউইৎস্

পরিচায়ক। সিগফ্রিড ফুমানের রঙিন 'উডকাটে উইন্টার ল্যাণ্ডস্কেপ' (১২৮) এই ধরণের একটি ছবি। অতিসাধারণ বিষয়বস্তুও যে বস্তুসংস্থাপক ও আলোছায়ার বিন্যাসে কতদূর রসঘন হয়ে উঠতে পারে এ ছবি না দেখলে তা উপলব্ধি করা যায় না। হেলেনা সিগালার 'ডাণ্ডেলিয়নস' (১৩৪), প্লেয়িং চিল্ড্রেন (১৩৫) এবং গার্ল এট দি বিচ, (১৩৭) ও উল্লেখযোগ্য রঙিন উডকাট।

অপর একটি মহৎ চিত্র হলো হানস-থিও রিচার এর লিথোগ্রাফি গার্ল উইথ ফ্লাওয়ার (১০৭)। যে সূক্ষ্ম রসানুভূতি এ ছবিতে সঞ্চারিত তা কোনো শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের পক্ষেও গৌরবজনক। অন্যান্য লিথোগ্রাফির মধ্যে আর্ণোমোর-এর 'চাইল্ড উইথ বাটারফ্লাইস' (৭১) ও রুডল্ফ বারগেন্ডারের 'অন সান ডে' (৭) বিশেষ ভাল লাগে। অটো জাংজল-এর প্যাস্টেল দুটি (১৭ ও ১৮) জেরা কোপেৎসের রঙিন স্ক্রিন প্রিন্ট 'টু বাইডার্স' (৫৬) ও টনি মাউ-এর 'রিডিং গার্লস' (৭১) লক্ষণীয়। ওয়ার্ণার ক্লেমকে ও ম্যাক্স শিউমারের পুস্তক-চিত্রায়ণগুলিও খুবই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে অনেকগুলিই বিভিন্ন কারণে ভাল লেগেছে। কোনো ছবিই প্রদর্শনীর অযোগ্য মনে হয়নি। হানফ্রিড ফুলসের আঁকা আইনষ্টাইন প্রমুখের প্রতিকৃতিগুলিও সুন্দর।

সব দিক থেকেই এ বছরের একটি তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে শিল্পরসিকদের কাছে জার্মাণশিল্পীদের এই প্রদর্শনী স্মরিত হবে। বিশেষত এটি হলো সেই ধরণের প্রদর্শনী যা শিল্পীদের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ।

কফি হাউসের প্রদর্শনী

কফি হাউসের ধীরাজ চৌধুরীর একক প্রদর্শনীটি ইদানীং শিল্প-রসিকদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক প্রদর্শনী কলকাতার বাইরে অনুষ্ঠিত হলেও কলকাতায় এই তাঁর প্রথম একক আত্মপ্রকাশ।

শিল্পীর স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করি। চিত্রকে জনজীবনের কাছাকাছি এনে দাঁড় করানোর সরাসরি প্রচেষ্টা কলকাতায় দুর্লভ না হলেও কফি হাউসে এই আয়োজনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কলেজ ষ্ট্রীটই যে কলকাতার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তথা বুদ্ধিজীবীর প্রাণকেন্দ্র, তাতে সন্দেহ নেই এবং কফিখানায় যে তাঁদের অনেকেরই পদার্পণ ঘটে তাও কারোই অজানা নয়। সুতরাং ধীরাজ বাবুর আয়োজন সেদিক থেকে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে।

শিল্পীর কাজে বলিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। বিশেষত তিনি নিছক মুখস্থ ছাত্রসুলভ রঙের মধ্যেই যে নিজেকে নিবদ্ধ রাখেননি, তাও স্পষ্ট। তাঁর কয়েকটি চিত্র, যেমন জলরঙে ইন দি মিড্‌ষ্ট অব ওয়ার্ক ষ্টীললাইফ ও এ মফঃসল রেষ্টুরেন্ট এবং তেলরঙে টি মেকার ও হিল-টপ শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। তেমনি অপরপক্ষে জলরঙের ছবি থ্রু এ উইণ্ডো ও আউটডোর রেষ্টুরেন্ট (২) ছাত্রসুলভ দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি। এ ধরণের ছবি যে কোনো প্রদর্শনীর পক্ষেই অনুপযুক্ত।

শিল্পীর রচনায় একটা বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়। বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিকের ব্যবহার দেখে ভয় হয়, তরুণ শিল্পী হঠাৎ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে না পড়েন। ছাত্রাবস্থায় হয়তো দু-একটি পদ্ধতিতেই বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করা হয়ে সব থেকে [illegible]।
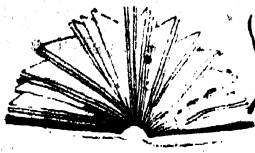
১৩৬৬ সালের উল্লেখযোগ্য বই

* কবিতা *

অচিরা ৪·০০ — প্রভাতমোহন বন্দ্যো: শান্তি লাইব্রেরী
এল ডোরাডো ২·০০ — বিমলচন্দ্র সিংহ — অভিজিৎ প্রকাশনী
কটি কবিতা ও একলব্য ২·০০ — মঙ্গলাচরণ চট্টো: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
কিংশুক বহ্নি ২·০০ — প্রমথনাথ বিশী — এ প
জানালা ২·০০ — অজিত দত্ত — এম সি সরকার
জুপিটার ২·০০ — বাণী রায় — মিত্রালয়
তেপান্তর ২·০০ — আনন্দ বাগচী — আর্ট ইউনিয়ন
নিঃসঙ্গ মেঘ ২·০০ — অচ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় — এম সি সরকার
প্রণয়ী পঙ্ক ৩·৫০ — সুশীল রায় — নতুন প্রকাশক
প্রথম প্রত্যয় ১·৫০ — নবনীতা দেব — এম সি সরকার
মুখের মেলা ১·৫০ — মণীন্দ্র রায় — পুস্তক
শতদল ২·০০ — নবগোপাল সিংহ — রামধনু
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ৩·০০ — হরপ্রসাদ মিত্র — সুরভি প্রকাশনী
হরিণ চিতা চিল ৩·০০ — প্রেমেন্দ্র মিত্র — ত্রিবেণী

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ ৭·০০ — সুশীলকুমার গুপ্ত — এ মুখার্জি
কবিতার কথা ৫·০০ — বিমলকৃষ্ণ সরকার — সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র ৫·০০ — যোগেশচন্দ্র বাগল — শ্রীগুরু
দুই কবি ৪·৭৫ — সুধাংশুমোহন বন্দ্যো: রীডার্স কর্নার
দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১২·০০ — রথীন্দ্রনাথ রায় — সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
নাটকের কথা ৪·০০ — অজিতকুমার ঘোষ — ঐ
প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন ৭·০০ — ক্ষেত্র গুপ্ত — গ্রন্থনিলয়
বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ৬·০০ — শ্যামলকুমার চট্টো: শতাব্দী গ্রন্থভবন
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২·২৫ — ভোলানাথ ঘোষ — এস ব্যানার্জি
বাংলা সাহিত্যের একদিক ৪·০০ — শশিভূষণ দাশগুপ্ত — শ্রীগুরু
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১২·৫০ — সুকুমার সেন — ইস্টার্ন পাবলিশার্স
বাংলার কবি ৪·০০ — প্রমথনাথ বিশী — শ্রীগুরু
মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার ৩·৫০ — সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — এ মুখার্জি
মধুসূদনের কবি মানস ২·৫০ — শিশির দাস — বুকল্যাণ্ড
রবিতীর্থে ৪·০০ — বিনায়ক সান্যাল — বেঙ্গল পাবলিশার্স
রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেম ৩·০০ — মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় — নাভানা
রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ ৬·০০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — এ মুখার্জি
রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে ৩·৫০ — শচীন্দ্রনাথ অধিকারী — আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
রবীন্দ্র সাহিত্যে সমালোচনার ধারা ৭·০০ — আদিত্য ওহদেদার — এভারেস্ট বুক হাউস
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪·০০ — মাখনলাল রায়চৌধুরী — শ্রীগুরু
শব্দতত্ত্ব ১৫·০০ — রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী — প্রবর্তক পাবলিশার্স
সমালোচনার কথা ৫·০০ — অসিতকুমার বন্দ্যো: সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ
সাহিত্যে ছোটগল্প ৮·০০ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — ডি এম
সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ ৮·০০ — জীবেন্দ্র সিংহরায় — ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
সাহিত্যের সত্য ২·০০ — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — জিপিপ্রা
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০ — হেমেন্দ্রকুমার রায় — আই এ পি

* জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ *

আমেরিকায় শিশিরচন্দ্র ৫·০০ — যোগেশচন্দ্র চৌধুরী — বুক এণ্ড বুক
কবি তরু দত্ত ২·৫০ — রাজকুমার মুখো: এশিয়া পাবলিশিং
কবি মোহিতলাল ৫·৫০ — হরনাথ পাল — এস ব্যানার্জি
ক্রিকেটের রাজকুমার ২·৫০ — খেলোয়াড় — আই এ পি
খৃষ্ট ২·৫০ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বিশ্বভারতী
ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর ৫·৫০ — ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় — আই এ পি
জর্জ বার্নার্ড শ ৮·৫০ — ভবানী মুখো: — বেঙ্গল পাবলিশার্স
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০·০০ — হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — শ্রীগুরু
বরণীয় ৫·০০ — যোগেশচন্দ্র বাগল — এ মুখার্জি
বিভূতিভূষণ ৫·০০ — চিত্তরঞ্জন ঘোষ — বিংশ শতাব্দী
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প ৩·০০ — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — বুকল্যাণ্ড
ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র ২·৫০ — যোগেন্দ্রনাথ সরকার — মিত্রালয়
ভগিনী নিবেদিতা ৭·৫০ — প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা — উদ্বোধন
ভারত পথিক রামমোহন ৩·০০ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বিশ্বভারতী
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৪·৫০ — মণি বাগচী — জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র-জীবনকথা ৬·০০ — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — বিশ্বভারতী
শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য ২·২৫ — সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাব্লিশিং
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ৮·০০ — স্বামী সারদেশানন্দ — মডেল পাবলিশিং
সোনার আলপনা ৮·০০ — চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — এভারেস্ট

* স্মৃতিকথা *

আমাদের শান্তিনিকেতন ৫·০০ — সুধীরঞ্জন দাস — বিশ্বভারতী
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ২·০০ — নির্মলকুমারী মহলানবিশ — ডি এম
কাকোরী ষড়যন্ত্রের স্মৃতি ৩·০০ — মন্মথনাথ গুপ্ত — শান্তি লাইব্রেরী

জীবনের ঝরাপাতা ৪'০০ সরলাদেবী চৌধুরাণী সাহিত্য সংসদ
শেষ বৈঠক ৩'৫০ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ডি এম
হে অতীত কথা কও ৪'০০ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীগুরু

*** ভ্রমণ ও অভিযান ***

এই ভারতের পুণ্য তীর্থে ৬'০০ দেবল এ মুখার্জি
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ২'৫০ বিশ্বদেব বিশ্বাস প্রজ্ঞা প্রকাশনী
কাশ্মীর পরিক্রমা ২'০০ নলিনীকিশোর গুহ এ মুখার্জি
কৈলাস মানসের পথে ৩'৫০ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী ডি এম
ডোভার পেরিয়ে ৪'৫০ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় এম সি সরকার
তারাপীঠের একতারা ৩'৭৫ চিত্তরঞ্জন দেব প্রজ্ঞা প্রকাশনী
তুহিন মেরু অঞ্চলে ৩'০০ বসুধারা গুপ্ত রঞ্জন পাবলিশিং
দুস্তর মরু ৩'০০ দরবেশ লিপিকা
পশ্চিম দিগন্তে ৫'০০ ধীরেন্দ্রলাল ধর ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
ভারত তীর্থ ২'০০ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বিচিত্রা
ভূস্বর্গের অভ্যন্তরে ৩'০০ জ্যোৎস্নাময় চৌধুরী স্বস্তিকা পাব্লিকেশন
লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় ৩'০০ হিমানীশ গোস্বামী আই এ পি

*** রম্যরচনা ***

ইঁকুটু ৬'৫০ লীলা মজুমদার ত্রিবেণী
চেনামুখ ৪'০০ সৌরীন সেন আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স
ডাক্তারের দুনিয়া ৬'০০ পশুপতি ভট্টাচার্য মিত্রালয়
দেখা অদেখা ৩'০০ পার্থ চট্টোপাধ্যায় এশিয়া পাব্লিশিং
ব্যজমা-ব্যজমীর বৈঠক ২'৫০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী শান্তি লাইব্রেরী
যদি পাদি পাই ২'০০ কুমারেশ ঘোষ রঞ্জন পাব্লিশিং
যান্ত্রিক ২'০০ অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বেনসনস
রূপব্যঙ্গ ৩'৭৫ রূপদর্শী ডি এম
লাবণ্যের এনাটমি ৩'০০ শিবতোষ মুখোপাধ্যায় আই এ পি
সান্নিধ্য ৪'০০ চিন্তামণি কর ত্রিবেণী
স্বগতোক্তি ৩'২৫ প্রশান্ত চৌধুরী আই এ পি

*** ধর্মগ্রন্থ ***

উপনিষদে সাধন রহস্য ৩'৫০ রাজমোহন নাথ প্রবর্তক
কথার কথা (৩য় ভাগ) ২'৫০ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শ্রীগুরু
ভাব রত্নাকর ২'৫০ স্বামী হরানন্দ গিরি ঐ
মন ও মানুষ ৭'৫০ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ৫'০০ গোপীনাথ কবিরাজ প্রাচী পাব্লিকেশন

*** সঙ্গীত ও নৃত্য ***

প্রাচীন নৃত্য ও নাট্য ৩'০০ শান্তিদেব ঘোষ আই এ পি
তবলা বিজ্ঞান ও বাণী
(২য় ভাগ) ২'২৫ রবীন্দ্রকুমার বসু ডি এম
ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রসাধক ৩'৫০ জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঐ

*** দর্শন ***

চার্বাক দর্শন ৫'০০ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী পুরোগামী প্রকাশনী
দর্শন প্রসঙ্গ ৮'০০ ইন্দুভূষণ মজুমদার আশুতোষ বুক ষ্টল

*** প্রাচীন সাহিত্য ***

অদ্ভুতের উপাখ্যান ৩'৫০ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রজ্ঞা প্রকাশনী
আলেখ্য দর্শন ২'৫০ সুশীল রায় রঞ্জন পাব্লিশিং

*** ইতিহাস ***

উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল ৩'০০ ভোলা চট্টোপাধ্যায় আই এ পি
ওম মনিপদ্মে হুম ৩'০০ খগেন দে সরকার অভিজিৎ
প্রাচীন মিশর ৫'৫০ শচীন্দ্রনাথ চট্টো: এম সি সরকার
রুশ দেশের ইতিহাস ১২'৫০ ঋষি দাস ক্যালকাটা পাব্লিশার্স

*** নানা নিবন্ধ ***

আজ ও আগামীকাল ২'৫০ সুব্রতেশ ঘোষ শান্তি লাইব্রেরী
উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে
বিদ্রোহের চিত্র ৩'০০ সুকুমার মিত্র এভারেষ্ট
কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে ২'২৫ নীহার চক্রবর্তী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
কৃষি ও সমবায় ৩'৫০ নিরঞ্জন হালদার রেনেশাঁস পাব্লিশার্স
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১০'০০ সুবোধ মুখোপাধ্যায় ডি এম
চিত্রদর্শন ২৫'০০ কানাই সামন্ত বিদ্যোদয়
নাটক লেখার মূলসূত্র ৫'০০ সাধনকুমার ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা
পশ্চিম দিগন্ত ২'০০ নির্মল চট্টোপাধ্যায় কল্লোল প্রকাশনী
বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান ৫'৫০ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
মনোবিজ্ঞান ১০'০০ ইন্দুভূষণ মজুমদার আশুতোষ বুক ষ্টল
মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন ২'৫০ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন জিজ্ঞাসা
মানব বিকাশের ধারা ১২'০০ প্রফুল্ল চক্রবর্তী বিদ্যোদয়
মানুষের ঠিকানা ৫'০০ অমল দাশগুপ্ত নতুন সাহিত্য
শিক্ষা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব ৫'০০ অরুণ ঘোষ এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজ
শিল্পদর্শনের ভূমিকা ২'০০ শুভেন্দু ঘোষ চিত্রালোক
স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা ৪'০০ মনোমোহন গঙ্গো: পুরোগামী প্রকাশনী
স্বাধীনতার পথে প্রাচ্য জগৎ ২'৫০ অনিলা দাশগুপ্ত বিদ্যোদয়

*** অনুবাদ ***

করুণা করো না
(ষ্টিফাইন জাইগ) ৬'০০ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নব ভারতী
জার্নি টু দি সেণ্টার অব দি আর্থ
(জুলে ভার্ন) ২'০০ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভ্যুদয়
ট্রেজার আইল্যাণ্ড
(ষ্টিভেনসন) ২'০০ মণীন্দ্র দত্ত তুলি-কলম
থেরেসা (এমিল জোলা) ৫'০০ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল রীডার্স কর্নার
দুশ্চিন্তাহীন নবীন জীবন
(ডেল কার্নেগি) ৫'৫০ হিমানীশ গোস্বামী প্রজ্ঞা প্রকাশনী
ধীর প্রবাহিনী ডন
(শলোখভ) ৯'০০ অবন্তী সান্যাল ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
নবম তরঙ্গ
(ইলিয়া এরেনবুর্গ) ৬'০০ সত্য গুপ্ত ঐ
নিগ্রো শওকত ওসমান ও
(পাবেল লুকনিৎস্কী) ৭'৫০ পার্থকুমার রায় র‍্যাডিক্যাল
নিবেদিতা (লিজেল রেমঁ) ৭'৫০ নারায়ণী দেবী উমাচল প্রকাশনী
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ (সংকলন)
(১ম ভাগ, ১ম খণ্ড) ৭'০০ এম সি সরকার
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ
(ডেল কার্নেগি) ৪'৫০ হিমানীশ গোস্বামী প্রজ্ঞা প্রকাশনী

শ্রীমতী আর্ডের (তরু দত্ত) পূর্ণেন্দ্রনাথ মুখো: মিত্র ও ঘোষ
সেই পুরাতন কথা (ইণ্ডিয়ান গণচারন্ত) (১ম খণ্ড) ৩'৫০ অশোক গুহ পপুলার লাইব্রেরী

*** সংকলন ***

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন ৪'০০ অভ্যুদয়
ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতা সংকলন ২'০০ শ্রীকুমার বন্দ্যো: ও অরুণকুমার মুখো: মডার্ন বুক এজেন্সী
প্রেমের গল্প ৪'০০ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা: লি:
প্রেমের গল্প ৪'০০ তারাশঙ্কর বন্দ্যো: ঐ
প্রেমের গল্প ৪'০০ শৈলজানন্দ মুখো: ঐ
প্রেমের গল্প ৪'০০ প্রতিভা বসু গ্রন্থম্
রমেশ রচনাবলী ৯'০০ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্য সংসদ
রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধ সংকলন ৫'০০ নিখিল সেন সম্পাদিত এভারেষ্ট বুক হাউস
সরস গল্প ৮'৫০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংকলিত নতুন সাহিত্য
সিন্ধুর স্বাদ ৭'০০ প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সুরভি প্রকাশনী
স্বনির্বাচিত গল্প ৪'০০ জগদীশ গুপ্ত আই এ পি
স্বনির্বাচিত গল্প ৫'০০ সজনীকান্ত দাস গ্রন্থম্
হাজার বছরের প্রেমের কবিতা ৮'০০ অবন্তী সান্যাল সম্পাদিত নতুন সাহিত্য
হাসির গল্প ৫'০০ অসমঞ্জ মুখো: ক্যালকাটা পাব্লিশার্স

*** নাটক ***

অঙ্গার ৩'২৫ উৎপল দত্ত পপুলার লাইব্রেরী
অসমাপ্ত ১'০০ বিমল রায় রাইটার্স কর্নার
এক মুঠো আকাশ ২'০০ ধনঞ্জয় বৈরাগী গ্রন্থম্
কান্নাহাসির পালা ২'৫০ বিধায়ক ভট্টাচার্য জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
গোত্রান্তর ২'৫০ বিজন ভট্টাচার্য ঐ
চোরাবালি ২'০০ কিরণ মৈত্র সিটি বুক এজেন্সী
জল ২'৫০ উমানাথ ভট্টাচার্য কথকতা
টোপ ও টোপর ২'০০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যো: এম সি সরকার
ডাকবাংলো (মনোজ বসু) ২'২৫ দেবনারায়ণ গুপ্ত বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দিশারী ২'০০ সলিল সেন ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
নতুন তারা ৬'২৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গ্রন্থম
ফকিরের পাথর ও নাট্যগুচ্ছ ২'৫০ মন্মথ রায় অটোপ্রিণ্ট এণ্ড পাব্লিসিটি
বারো ভূতে ১'৫০ নারায়ণ গঙ্গো: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
লিপিলিপি ২'০০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র মিত্র ও ঘোষ
রজনীগন্ধা ২'২৫ ধনঞ্জয় বৈরাগী আই এ পি
স্ট্রিট বেগার ২'২৫ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এম

*** গল্পগ্রন্থ ***

অনুসন্ধান ৩'০০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যো: বিভূতি প্রকাশন
অন্দরমহল ৩'০০ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ত্রিবেণী
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৩'০০ পরশুরাম এম সি সরকার
ত্রিযামা ৩'০০ সন্তোষকুমার ঘোষ নাভানা
দেওয়াল-লিপি ২'৫০ সমরেশ বসু বিশ্বাস পাব্লিশিং
নওরঙ্গী ৩'০০ প্রবোধকুমার সান্যাল বেঙ্গল পাব্লিশার্স
নায়ক-নায়িকা ২'৫০ বিমল দত্ত বিশ্বাস পাব্লিশিং
নীলাঞ্জন ছায়া ৩'০০ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী
পঞ্চীমহল ৪'০০ আশাপূর্ণা দেবী ত্রিবেণী
পত্রলেখার বাবা ৪'০০ সতীনাথ ভাদুড়ী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
পূর্বতনী ২'৫০ নরেন্দ্রনাথ মিত্র সরস্বতী গ্রন্থালয়
প্রথম পুরুষ ৩'০০ বিমল মিত্র ইষ্টলাইট বুক হাউস
প্রেমই ধন্বন্তরী ২'৫০ প্রেমেন্দ্র মিত্র নিউ স্ক্রিপ্ট
ফাগুন ৩'০০ ভাস্কর আই এ পি
বাঘের চোখ ২'৫০ লীলা মজুমদার গ্রন্থম্
ভালবাসার ইতিকথা ২'৫০ শিবরাম চক্রবর্তী গ্রন্থম
মন মানে না ৩'৭৫ গৌরকিশোর ঘোষ ত্রিবেণী
মনের মানুষ ৩'০০ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা: লি:
মুক্তবন্ধ ৩'০০ রমাপদ চৌধুরী বেঙ্গল পাব্লিশার্স
মুখোমুখি ২'৫০ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো: পুস্তক প্রকাশক
রূপতরঙ্গিমা ২'৫০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
রূপমতী ২'৫০ নারায়ণ গঙ্গো: বসু সাহিত্য সংসদ
রূপসীর মন ৩'০০ প্রফুল্ল রায় এভারেষ্ট বুক হাউস
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫'০০ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থম্
সায়ন্তনী ৩'০০ সুবোধ ঘোষ কারেণ্ট বুক শপ
সুধাময় ৩'০০ বিমল কর এভারেষ্ট
স্বাদু স্বাদু পদে পদে ২'৭৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ত্রিবেণী

*** উপন্যাস ***

অগ্নিসাক্ষী ৩'৫০ প্রবোধকুমার সান্যাল ত্রিবেণী
অগ্নীশ্বর ৪'৫০ বনফুল ডি এম
অজানিতার চিঠি ৩'০০ বিধায়ক ভট্টাচার্য গ্রন্থম্
অনিকেত ৫'০০ মিহির আচার্য ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
অনুবর্ষ ৬'৫০ নিরুপমা দেবী মিত্র ও ঘোষ
অন্য কোন খানে ৫'৫০ সৌরীন সেন রাইটার্স সিণ্ডিকেট
অবরোহণ ২'৫০ কণাদ গুপ্ত কথা সাহিত্য মন্দির
অভিষেক ৫'৭৫ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় আই এ পি
অগ্নি অবন্ধনে ৬'০০ সুবোধকুমার চক্রবর্তী ক্লাসিক প্রেস
অশনি সংকেত ৪'৫০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যো: বিভূতি প্রকাশন
আকাশ লিপি ৪'০০ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ত্রিবেণী
আঁখি বিহঙ্গ ৩'০০ উত্তম পুরুষ তুলি-কলম
আমি বড় হব ৩'৫০ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ডি এম
উত্তর মৌসুম ৩'০০ অগ্নি মিত্র ইণ্ডিয়ানা
উপকণ্ঠ ৪'০০ প্রবোধবন্ধু অধিকারী এভারেষ্ট বুক হাউস
এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫'০০ রমাপদ চৌধুরী ডি এম
এই প্রেম ৪'০০ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ডি এম
একান্ত আপন ৪'০০ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী
একটুকু আশা ৩'০০ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য করুণা প্রকাশনী

কনক দীপ ৩'০০	আশাপূর্ণা দেবী	রাইটার্স সিণ্ডিকেট
কলালয় ২'৫০	উষাদেবী সরস্বতী	আধুনিক সাহিত্য ভবন
খোয়াই ৩'০০	বিমল কর	মিত্র ও ঘোষ
গান্ধর্ব্য ৩'৫০	সত্যপ্রিয় ঘোষ	আই এ পি
গ্রহসারথি ৬'০০	সুশীলকুমার ঘোষ	শতাব্দী গ্রন্থ ভবন
গ্রীষ্মবাসর ২'৭৫	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	ত্রিবেণী
জলকমল ৩'০০	সুবোধ ঘোষ	বিশ্বাস পাব্লিশিং
জলতরঙ্গ ৭'০০	সুনীল ঘোষ	ন্যাশনাল পাব্লিশার্স
জলপ্রপাত ২'৭৫	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	আই এ পি
ড্রাগনের নিঃশ্বাস ২'৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	গ্রন্থম্
তরঙ্গ রোধিবে কে ৬'০০	দিলীপকুমার রায়	গ্রন্থম্
তিন প্রহর ৪'০০	সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	নিও লিট
তীরভূমি ৪'৫০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিবেণী
দুই পৃথিবীর মাঝের দেশ ৬'৫*	বিশ্ব বন্দ্যোঃ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
নাগিনী মুদ্রা ৩'৫০	অমরেন্দ্র ঘোষ	বিদ্যোদয়
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ২'৫০	রমেশচন্দ্র সেন	শতাব্দী গ্রন্থ ভবন
নির্বাস ৩'৫০	অমিয়ভূষণ মজুমদার	নিও লিট
নীলাঞ্জনের খাতা ৪'০০	বুদ্ধদেব বসু	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
নোনা জল মিঠে মাটি ৮'৫০	প্রফুল্ল রায়	গুরুদাস
পদ্মপাতায় জল ২'০০	শংকর	নিউ এজ
পরমলগনে ৪'৫০	আনন্দকিশোর মুন্সী	বর্তিক
পলিমাটি নোনাজল ২'২৫	যজ্ঞেশ্বর রায়	কারেন্ট বুক শপ
পূবের আকাশ ২'৫০	অবিনাশ সাহা	ভারতী লাইব্রেরী
প্রথম প্রণয় ৩'০০	বিক্রমাদিত্য	ত্রিবেণী
প্রাক্তন ৪'৫০	বরেন বসু	সাধারণ পাব্লিশার্স
পিয়াললতা ২'৫০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	নবভারতী
ফরিয়াদ ৪'০০	দীপক চৌধুরী	নাভানা
বসন্ত সঙ্গিনী ২'৫০	শচীন্দ্রনাথ মিত্র	পুস্তক
বিক'লের রঙ ২'৫০	আনন্দ বাগচী	বিহার সাহিত্য ভবন
বিদূষক ২'৫০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	লিপিকা
বেহুব গী মহানদী ৩'৫০	বিনয় চৌধুরী	এম সি সরকার
মধুরাই ২'৫০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	গ্রন্থম্
মনামী ৪'০০	নারায়ণ সান্যাল	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
মানুষ গড়ার কাহিনী ৫'৫০	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
মুখের রেখা ৫'০০	সন্তোষকুমার ঘোষ	ত্রিবেণী
মেঘে ঢাকা তারা ৪'৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	সাহিত্য জগৎ
রাজপুতানী ৩'৫০	বিমল মিত্র	ডি এম
রাজমহল ২'৭৫	নীলিমা দাশগুপ্ত	এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং
রাজা ও মালিনী ৩'০০	বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
রাণীবৌ ৪'০০	প্রাণতোষ ঘটক	ডি এম
রাণীর বাজার ৩'০০	সমরেশ বসু	বিংশ শতাব্দী
রিকশার গান ৫'০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	আই এ পি
রূপচাঁদ পক্ষী ৩'০০	পক্ষধর ভট্টাচার্য	পুরোগামী প্রকাশনী
লালদীঘির উপকথা ৩'০০	অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ানা
[illegible] ৫'০০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	ত্রিবেণী
সমুদ্র হৃদয় ৪'০০	প্রতিভা বসু	নাভানা
সসেমিরা ৩'০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	আই এ পি
সাগরনগর ৬'৫০	কুমারেশ ঘোষ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
সাত পাকে বাঁধা ৪'৫০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
সামান্য ক্ষতি ২'০০	অমূল্য চক্রবর্তী	দিশারী
সাড়া ৩'০০	বুদ্ধদেব বসু	গ্রন্থম্
সিন্ধু বারোয়াঁ ৩'০০	দিব্যেন্দু পালিত	আভেনির
স্মরণচিহ্ন ৫'০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	ডি এম

* ছোটদের সাহিত্য *

অদ্বিতীয় ঘনাদা ২·৭৫	প্রেমেন্দ্র মিত্র	আই এ পি
আজব টাকা '৫০	শ্যামাপদ আচার্য	কল্লোল প্রকাশনী
আমাদের নেহরু ২'৫০	নিখিল সেন	শিশুসাহিত্য সংঘ
এক যে ছিল রাজা ৩'৫০	অমিয়কুমার চক্রবর্তী ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত	অভ্যুদয়
গোয়েন্দা ভূত ও মানুষ ২'০০	হেমেন্দ্র রায়	আই এ পি
গ্রীক পুরাণের গল্প ৪'০০	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	অভ্যুদয়
চাঁইবুড়োর পুঁথি ৩'০০	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আই এ পি
চাঁদের দেশে ১'২৫	কার্তিক বন্দ্যোঃ	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
চুলচেরা শোধবোধ ২'০০	শিবরাম চক্রবর্তী	আই এ পি
ছবিতে মহাভারত ১'৭৫	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন ২'৫০	মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু সংকলিত	ঐ
ডাইনীর মায়া ১'৫০	অমলেন্দু ভট্টাচার্য	এ পি
পথ চলি আনন্দে ২'০০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	পুস্তক
পাতালপুরীর কাহিনী ৩'০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	বিদ্যোদয়
বাঘমামার গল্প ১'২৫	সুকুমার দে সরকার	অভ্যুদয়
বরোদীঘির রায় বাড়ি ২'৫০	ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	ঐ
বীরসিংহের সিংহশিশু ২'৫০	নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
বেলুন রাজার দেশে ১'০০	শৈল চক্রবর্তী	অভ্যুদয়
ভূতের পাঁচালী ২'৫০	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী	শান্তি লাইব্রেরী
মনের মত বই ২'২৫	ধীরেন্দ্রলাল ধর	ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প ১'৬০	যামিনীকান্ত সিংহ	শান্তি লাইব্রেরী
মাঝির ছেলে ২'৫০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	আই এ পি
মৌমাছির ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ২'০০	মৌমাছি	অভ্যুদয়
যাদুপুরী ৩'২৫	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
রাজা নয় রাণী নয় ১'৬০	আশাপূর্ণা দেবী	এ পি
রুশ দেশের উপকথা ২'২৫	অরুণ ঘোষ	ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
লাল নীল দেশলাই ৩'০০	লীলা মজুমদার	আর্ট ইউনিয়ন
শুধু হাসির গল্প (সংকলন) ৫'০০	বিশ্বনাথ দে	আই এ পি
শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে ২'৫০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	সাহিত্য সংসদ
স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী ৩'০০	স্বপনবুড়ো	বিদ্যোদয়
হাওয়া ৩'০০	[illegible] চৌধুরী	আই এ পি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবী—

শীর্ষ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না, এই আশঙ্কা বোধহয় প্রায় সকলেই করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ইউ—২-র ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া সূচনাতেই শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবী হইবে, ইহা বোধহয় কেহই কল্পনাও করিতে পারেন নাই। মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ইউ—২কে ভূপাতিত করার পঞ্চম দিবসে মঃ ক্রুশেভ যখন সর্ব্বপ্রথম ঐ ঘটনাটির কথা সুপ্রীম সোভিয়েটে ঘোষণা করেন তখন তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন যে, 'এইরূপ ঘটনার ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাধিতে পারে। এইরূপ ঘটনাকে শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তুতি বলিয়া গণ্য করা যায় না।' মঃ ক্রুশেভ সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট জনগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তি হইতে স্বস্তিবাচনেই শীর্ষ-সম্মেলনের বিসর্জ্জন হইবে, ইহা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের শান্তি প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই, রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ একথাও তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকামী শক্তিসমূহ শীর্ষ-সম্মেলনের বিঘ্নসৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই গোয়েন্দা বিমানটিকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার পাঠাইয়াছেন, মঃ ক্রুশেভ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। তবু শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভই হইতে পারিল না কেন?

শীর্ষ সম্মেলন সত্যই আরম্ভ হইয়াছিল কি না, তাহাও একটা তর্কের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হাওয়া সম্পর্কে যে সংবাদ আমরা পাইয়াছি তাহাতে প্রকাশ, নির্দ্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে বেলা ১১টার সময় (ভারতীয় সময় বৈকাল সাড়ে তিনটায়) উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ প্রেসিডেণ্ট দ্যগল এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের উপস্থিতিতেও মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত না হওয়ায় সম্মেলনের উদ্বোধন এক ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখা হয়। সম্মেলনের সূচনাতেই মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর গুপ্তচর বিমান প্রেরণ বন্ধ না করিলে শীর্ষ-সম্মেলন ছয় হইতে আট মাস স্থগিত রাখিতে হইবে। জুন মাসে রাশিয়া পরিদর্শনের জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল তাহাও তিনি প্রত্যাহার করেন। তিন ঘণ্টা চলার পর সম্মেলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী থাকে। মঃ ক্রুশেভ অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত করমর্দন না করিয়াই সম্মেলন ত্যাগ করেন। সুতরাং শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল একথা বলিতে বাধা নাই। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ মনে করেন যে, শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভই হয় নাই। ঐদিন প্রথম যে অধিবেশন হয় তাহাতে বহু উপদেষ্টা প্রতিনিধিদল এবং বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। মঃ ক্রুশেভের মতে শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে কিনা তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য উহা প্রাথমিক সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই নয়। শীর্ষ সম্মেলন সত্যই আরম্ভ হইয়াছিল কি না, এই প্রশ্নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্মেলন যদি আরম্ভ না হইয়া থাকে তবে কেন আরম্ভ হয় নাই, আর যদি সম্মেলন আরম্ভ হইয়াও থাকে তবে সূচনাতেই উহার ভরাডুবী হইল কেন, ইহা-ই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবী হওয়ার পরিণতি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, ইহা-ও বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়।

১৭ই মে (১৯৬০) রাত্রে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রনায়কত্রয় যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের মনোভাবকেই সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার কারণ কি? তিন বৎসর ধরিয়া যে শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য মঃ ক্রুশেভ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন সেই শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সুযোগ যখন উপস্থিত হইল তখন তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন কেন, তাহা সত্যই ভাবিয়া দেখার বিষয়। মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ইউ—২-র ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া মঃ ক্রুশেভ শীর্ষ-সম্মেলন বানচাল করিয়া দিলেন, এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন যে, মার্কিণ গুপ্তচর বিমানকে ভূপাতিত করিবার অনেক পূর্ব্বেই মঃ ক্রুশেভের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহারা গত এপ্রিল মাস (১৯৬০) বাকুতে প্রদত্ত মঃ ক্রুশেভের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ঐ বক্তৃতায় তিনি ১৯৫৮ সালের নবেম্বর মাসের চরমপত্রের নীতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মঃ ক্রুশেভ তাঁহার ঈপ্সিত শীর্ষ-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াও উহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন কেন, অনেকের কাছে তাহা দুর্ব্বোধ্য মনে হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হয় না। তাঁহার নিজের আকাঙ্ক্ষিত শীর্ষ-সম্মেলন তিনি নিজেই কেন ব্যর্থ করিয়া দিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে রাশিয়া মার্কিণ-গোয়েন্দা বিমানকে ভূপাতিত করার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান সম্পর্কে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং এডমিনিষ্ট্রেসন যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাদ দিয়া সূচনাতেই শীর্ষ-সম্মেলনের ভরাডুবী হওয়ার কারণের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়।

মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান প্রসঙ্গে—

পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুপ্তচর বৃত্তিটা যে নূতন নয়, ইহা আমরা যেমন জানি তেমনি রাশিয়াও জানে

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি, বিশেষ করিয়া সামরিক তথ্যাদি জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া থাকে। রাশিয়া যে ইহার ব্যতিক্রম তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। গুপ্তচর-বৃত্তিটাকে আমরা সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখি এ কথা সত্য হইলেও নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া যাহারা নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দাগিরি করে নিজের রাষ্ট্রে তাহারা দেশপ্রেমিক বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। অন্য রাষ্ট্রে গুপ্তচরের কাজ করিতে যাইয়া ধরাপড়ার দৃষ্টান্ত শুধু মার্কিণ ইউ-২ বিমানই প্রথম, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্রেই অন্যদেশে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ধরা পড়িলে সেই গুপ্তচরের কার্য্যাবলীকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে না। কিন্তু ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ব্যাপারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই, বরং সমর্থনই করিয়াছেন, যদিও প্রথমে উহার গুপ্তচর বৃত্তির কথা অস্বীকার করিবার চেষ্টাই করা হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণ সরকার চাপে পড়িয়া উহার গোয়েন্দাগিরির কথা স্বীকারই শুধু করেন নাই এই ধরণের গোয়েন্দাগিরির সমর্থন করিয়া যুক্তি ও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূপাতিত মার্কিণ ইউ ২ বিমান সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্যে যে ক্রমাভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মার্কিণ ইউ-২ বিমানখানি রাশিয়ায় ভূপাতিত করা হয় যে দিবসে অর্থাৎ ১লা মে তারিখে। কিন্তু চারি দিন পর্য্যন্ত রাশিয়া এ সম্পর্কে নীরব ছিল। পঞ্চম দিবসে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ সুপ্রীম সোভিয়েটে মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার কথা উল্লেখ করেন। যে দেশের গোয়েন্দা বিমান সে দেশকে না জানাইয়া নাটকীয় ভাবে সুপ্রীম সোভিয়েটে উহা প্রকাশ করায় আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির কোন বিধান থাকিলে তাহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে কি না, সে সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে-বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হইল তাহার পাইলট জীবিত আছে কি না সুপ্রীম সোভিয়েটে মঃ ক্রুশ্চেভের ৫ই মে তারিখের বিবৃতিতে সে সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এই নীরবতা যে রুশ প্রধান মন্ত্রীর একটা কূটনৈতিক চাল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই এক চালেই যে তিনি বাজীমাৎ করিয়াছেন ইহা মনে করিলে খুব বেশী ভুল বলা হইবে না। মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণার পর হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী জেমস হ্যাগার্টি যে ইস্তাহার প্রচার করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশে এ সম্পর্কে সকল দিক হইতে তদন্ত করা হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবৃতি বা ইস্তাহার যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হইতে ভিন্ন রূপ হয় নাই। কিন্তু ঐ ৫ই মে তারিখে প্রদত্ত মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস অফিসারের বিবৃতিটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিবৃতিতে রাশিয়ায় ভূপাতিত বিমানখানিকে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী নিরস্ত্র ইউ-২ বিমান বলিয়া চালাইবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ-সংস্থা মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরকে ৩রা মে তারিখে জানান যে, ১লা মে হইতে উক্ত বিমানখানির কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। উহার ঘাঁটি ছিল তুরস্কের আডানায়, উহার চালক ছিল একজন অসামরিক ব্যক্তি এবং উহাকে একটি উড্ডয়ন পরীক্ষণাগার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ইহা খুব সম্ভব যে, অক্সিজেন সরবরাহকারী যন্ত্রটি বিকল হইয়া যাওয়ার ফলে বিমান চালক অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইহার পর স্বয়ংক্রিয় পরিচালন যন্ত্রের সাহায্য উহা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয় এবং ঘটনাচক্রে আকস্মিক ভাবে সোভিয়েটের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে। মঃ ক্রুশ্চেভ তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় ভূপাতিত বিমানখানি সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ চাপিয়া যাওয়ায় মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর এবং জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা বোধ হয় এই ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন যে, বিমান চালক জীবিত নাই এবং বিমানখানি এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে যে উহার যন্ত্রপাতির কোন অস্তিত্ব নাই এবং থাকিলেও ঐগুলিকে চিনিবার বা বুঝিবার উপায় নাই। এইরূপ ধারণাই যে এই ধরণের বিবৃতির মূল তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ইহার পর ৭ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটে মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতাতেই হইল প্রথম আকস্মিক বজ্রাঘাত।

গত ৬ই মে (১৯৬০) সুপ্রীম সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে মার্শাল গ্রেচকো ঘোষণা করেন যে, একটি রকেট চালিত ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম আঘাতেই সোভিয়েটের আকাশ-সীমা লঙ্ঘনকারী মার্কিণ বিমান ভূপাতিত হয়। ইহার পরদিন অর্থাৎ ৭ই মে তারিখে মঃ ক্রুশ্চেভ সুপ্রীম সোভিয়েটে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গত ১লা মে রাশিয়ার আকাশে গুলী করিয়া যে মার্কিণ বিমান ভূপাতিত করা হয় তাহার চালক ফ্রান্সিস পাওয়ার্স জীবিত এবং সোভিয়েটের হাতে বন্দী। ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিবার যে নির্দ্দেশ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল সে নির্দ্দেশ প্রতিপালন না করিয়া সে প্যারাসুটযোগে নামিয়া পড়ে। আত্মহত্যা করিবার জন্য তাহার সঙ্গে বিষ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সে ব্যবহার করে নাই। সে যদি ইজেক্টর সীট (ejector seat) ব্যবহার করিত তাহা হইলে সমগ্র বিমান খানিই বিস্ফারিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সে তাহাও করে নাই। মঃ ক্রুশ্চেভ পাইলটের স্বীকারউক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বিমানখানি তুরস্ক হইতে পাকিস্তানের পেশোয়ারে যায়। সেখানে বিমান চালক তিন দিন ছিল এবং ঐস্থান হইতে আফগানিস্থানের উপর দিয়া যাইয়া স্ভার্দলভস্কে গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হয়। মারমানস্ক ও আর্কেঞ্জেল হইয়া নরওয়ের বুদে নামক স্থানে বিমানটির অবতরণ করার কথা ছিল। পাইলট ইজেক্টর যন্ত্র সাহায্যে অবতরণ না করিয়া প্যারাসুটে অবতরণ করায় প্রমাণিত হয় যে, তাহার অক্সিজেনের অভাব ঘটে নাই। পাইলটের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারী ভাবে তাহার কাজ ছিল আবহাওয়ার সংবাদ লওয়া, কিন্তু গুপ্তচরের কাজ করাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিমানখানিকে রাশিয়ার সাড়ে বার শত মাইল অভ্যন্তরে ভূপাতিত করা হয়। উহার পূর্ব্বে পাইলট বহু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফটো গ্রহণ করিয়াছিল। বিমানের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র ও রাডার প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা। মঃ ক্রুশ্চেভ আরও বলেন যে, বিমানখানি যন্ত্রপাতি সমন্বিত অত্যন্ত খাঁটি একটি পর্য্যবেক্ষক বিমান। এই বিমানের ধ্বংসাবশেষ সাংবাদিকদিগকেও দেখানো হইয়াছে।

মঃ ক্রুশ্চেভের দ্বিতীয় বক্তৃতা সমগ্র বিশ্বে শুধু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি

করে নাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকেও বেশ বেকায়দায় ফেলিয়াছিল। রাশিয়ায় ভূপাতিত মার্কিণ বিমানটি যে নিরীহ আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী বিমান নয় সে-সম্পর্কে মঃ ক্রুশেভের উপস্থাপিত অভ্রান্ত তথ্যাদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও আর অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। ৭ই মে তারিখেই মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে তদন্তের আদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, লৌহ যবনিকার অন্তরালে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকার একখানি বিমান 'সম্ভবতঃ' সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর উড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই বিষয়ের সহিত ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষ যতটা সংস্থষ্ট তাহাতে দেখা যায়, মিঃ ক্রুশেভের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশপথে এইরূপ ভ্রমণের জন্য কোন ক্ষমতা উহাকে দেওয়া হয় নাই। এই বিবৃতি হইতে দেখা যায়, ভূপাতিত বিমানখানি যে লৌহযবনিকার অন্তরালে তথ্য সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল তাহা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ তথ্য সংগ্রহের কোন ক্ষমতা বা নির্দ্দেশ ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষ দেন নাই। মঃ ক্রুশেভ সুপ্রীম সোভিয়েট বন্দী পাইলটের স্বীকার উক্তি উদ্ধৃত করার পর ১১ ঘণ্টা আলোচনার পর মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর এই বিবৃতি দিয়াছেন। অন্যদেশে গোপনে তথ্য সংগ্রহের কার্য্যকলাপ কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বীকার করা যেমন এই প্রথম তেমনি ওয়াশিংটন কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা না পাইয়া বিমানখানি রাশিয়ায় উড়িয়া গিয়াছিল একথাও বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। তবে কেন এই ধরণের বিবৃতি দেওয়া হইল? প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য স্থানীয় মার্কিণ সামরিক নেতৃবৃন্দ ওয়াশিংটন হইতে কোনরূপ নির্দ্দেশ ছাড়াই খোলাখুলী ভাবে রাশিয়ার আকাশে গুপ্তচর বৃত্তিতে রত হইবার জন্য ঐ বিমান প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিশ্ববাসীর মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করাই কি উহার উদ্দেশ্য ছিল? কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং হার্টারের বিবৃতি হইতে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

গত ৯ই মে (১৯৬০) মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হার্টার বলেন যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটের বিভিন্ন সীমান্তে আকাশ হইতে ব্যাপক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইতেছে এবং সময় সময় সোভিয়েট এলাকার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার উপর এইরূপ গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে মিঃ হার্টার যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা খুবই অদ্ভুত। তিনি বলিয়াছেন যে, আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য যে-কোন উপায়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নির্দ্দেশে নিয়ত অসামরিক বিমান সমূহ আকাশ পরিক্রমা করিয়া থাকে। এই সব অসামরিক বিমান সমূহের কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। মিঃ হার্টার গোয়েন্দাগিরির সমর্থনেই শুধু যুক্তি দেন নাই তিনি এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনার ফলে শীর্ষ-সম্মেলনের ক্ষতি হওয়া দূরের কথা বরং আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব্বসম্মত ও কার্য্যকরী রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতে উহা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট প্রতিভাত হইবে। অন্য রাষ্ট্রের সামরিক গোপন তথ্যাদি জানিবার চেষ্টা সকল রাষ্ট্রই করিয়া থাকে। কিন্তু উহার সমর্থনে প্রকাশ্যে এইরূপ যুক্তি ইতিপূর্ব্বে কোন গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অতঃপর ১১ই মে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারও সোভিয়েট রাশিয়ার উপর গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে অনুরূপ যুক্তিই দিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পার্ল হারবারের পুনরাবৃত্তি চায় না বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আকাশ হইতে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালান হইয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের গোপনতা এবং সেই গোপনতা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকেই তিনি উত্তেজনার প্রধান কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আকস্মিক আক্রমণজনিত বিপদের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে শীর্ষসম্মেলনে মঃ ক্রুশেভকে তাঁহার 'উন্মুক্ত আকাশ' প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করিবেন বলিয়া সাংবাদিকদিগকে জানান। সোভিয়েট রাশিয়ার আকাশে মার্কিণ বিমানের গোয়েন্দাগিরির সমর্থনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মিঃ হার্টার যে যুক্তি দিয়াছেন সোভিয়েট রাশিয়ার দিক হইতেও কি ঐরূপ যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে না? অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের যেমন আছে তেমনি আশঙ্কা আছে রাশিয়ারও। বরং অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা রাশিয়ারই বেশী। কারণ রাশিয়ার চারিদিকেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বলিতে পারে যে, আক্রান্ত না হইলে আমেরিকা কাহাকেও আক্রমণ করিবে না, অতর্কিতে আক্রমণ তো দূরের কথা। কিন্তু একথা তো সোভিয়েট
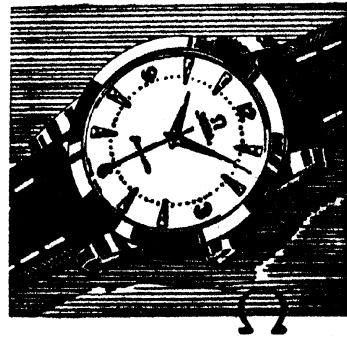
রাশিয়াও বলিতে পারে। রাশিয়ার গোপনতা 'লৌহযবনিকার অন্তরাল' এই প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কথাটার মধ্যে সত্য একেবারেই নাই, একথা হয়ত বলা যায় না। রুশ বিপ্লবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের আচরণ ইহার জন্য বড় কম দায়ী নয়। তাছাড়া প্রত্যেক দেশেই সামরিক তথ্যাদি অতি গোপনে রক্ষা করা হইয়া থাকে। দেশের লোককেও সে সম্বন্ধে জানিতে দেওয়া হয় না। এদিক দিয়া রাশিয়া নূতন কিছু করিয়াছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের 'উন্মুক্ত আকাশের' প্রস্তাব রাশিয়া গ্রহণ করে নাই। তাই বলিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জোর করিয়া রাশিয়ার আকাশ উন্মুক্ত করিতে পারে না। অপর দেশের গোয়েন্দা বিমান যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়িয়া গোয়েন্দাগিরি করে তবে আমেরিকা তাহা সহ্য করিবে কি? গোয়েন্দাগিরি যে সব সময়ই প্ররোচনামূলক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের মাত্র ১৬ দিন পূর্ব্বে রাশিয়ার আকাশে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ করা হইল কেন? ধরা পড়িবে না, এই আশাতেই কি? দৈবাৎ ধরা পড়িলে যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে একটা প্রবল বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ একথাটা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের সূচনাতেই বিস্ফোরণ ঘটিল এবং শীর্ষ সম্মেলনের ভরাডুবী হইল।

শীর্ষ-সম্মেলন না হওয়ার দায়িত্ব—

পরমাণু যুদ্ধাশঙ্কার ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যে পৃথিবীর চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রধানগণ প্যারীতে সম্মিলিত হইয়াছিলেন আন্তর্জ্জাতিক বিরোধগুলির আপোষ মীমাংসার জন্য পথের সন্ধান করিতে। এই সম্মেলনেই সকল বিরোধের অবসান হইবে, এতখানি দুরাশা কেহই করেন নাই। কিন্তু সকলেই আশা করিয়াছিলেন আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসার সূচনা হইবে প্যারীর শীর্ষ সম্মেলনে এবং তারপর আরও অনেক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া আন্তর্জ্জাতিক আকাশকে পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ আশঙ্কার ঘোর ঘনঘটা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে। তাহাদের আশা মিথ্যার ছলনা—মরুভূমির মরীচিকার মতই মর্মান্তিক বিভ্রান্তি ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। শুধু প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন হইল না কেন, না হওয়ার জন্য দায়িত্ব কাহার এবং উহার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, এই সকল জটিল প্রশ্ন বিশ্ববাসীর মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। অথচ, দৃষ্টতঃ অনেকের কাছেই সহজ বলিয়া মনে হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিত্রয় গত ১৭ই মে (১৯৬০) প্যারীতে যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে কঠোর ভাষায় না হইলেও ব্যর্থতার দায়িত্ব মঃ ক্রুশ্চেভের ঘাড়েই চাপানো হইয়াছে। পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলিও মঃ ক্রুশ্চেভের উপরেই সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়াছেন।

'ডেইলী হেরাল্ডের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধকে মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট খোলা চিঠি বলিয়াই অভিহিত করিতে পারা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে, "রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করা যায়, এই বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়া আপনি নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির স্বার্থের ক্ষতি করিয়াছেন। আপনি সকল প্রকার অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টির জন্য একদিন বিশ্বে বৃথা আশা জাগাইয়া ছিলেন।" বিলাতের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ইউ—২ বিমানই বর্ত্তমান সঙ্কটের মূল কারণ, একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। আমেরিকার গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি (মঃ ক্রুশ্চেভ) এ কাজ করিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। ক্রুশ্চেভ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।" মঃ ক্রুশ্চেভ কেন সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর কিন্তু কেহই দেন নাই। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, মঃ ক্রুশ্চেভকেই শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার অব্যবহিত কারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন সম্ভব করিতে হইলে প্ররোচনামূলক গুপ্তচরবৃত্তির নিন্দা করিতে হইবে, উহা বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে হইবে। এই দাবী পূরণ করা হইলে তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে রাজী ছিলেন। বস্তুতঃ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন আল্টিমেটাম (চরমপত্র) দেন নাই। কয়েকটি সর্ত্তে তিনি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে প্রস্তুত। বিমান পর্য্যবেক্ষণ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, মিঃ আইসেনহাওয়ার যতদিন প্রেসিডেণ্টপদে আসীন থাকিবেন, ততদিনের জন্য এই প্রতিশ্রুতি চাওয়া হইয়াছে। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রেস সেক্রেটারী মিঃ হ্যাগার্টির মারফত এক বিবৃতিতে বলেন যে, "ক্রুশ্চেভকে আমি জানাইয়া দিয়াছি যে, সাম্প্রতিক ঘটনার পর রাশিয়ার আকাশে আমেরিকার গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহা আর আরম্ভ করা হইবে না।" এই বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন যে, "কোন অবস্থাতেই আমেরিকা ক্রুশ্চেভের চরমপত্র স্বীকার করিবে না, এ কথাটি আমি ক্রুশ্চেভকে জানাইয়া দিয়াছি।" প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মঃ ক্রুশ্চেভকে সম্মেলন বানচাল করার জন্য দায়ী করিয়া উক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "ইহার পরেও তিনি সাম্প্রতিক ঘটনাটির কথা উল্লেখ করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শীর্ষ সম্মেলন বানচাল করিয়া দিতে তিনি বদ্ধপরিকর রহিয়াছেন।"

শীর্ষ-সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী, মঃ ক্রুশ্চেভ একথা অস্বীকার করিয়া লিখিত বিবৃতিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপরেই ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। ব্যর্থতার দায়িত্ব রাশিয়ার, না মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের, তাহা অবশ্যই বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়। গুপ্তচরবৃত্তির সময় ধরা পড়িলে বিব্রতবোধ করাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত, নীরব থাকাই উচিত, না গুপ্তচরবৃত্তি প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেরা ভাবিয়া দেখিবেন। মার্কিণ গুপ্তচর বিমান রাশিয়ার ভূপাতিত হওয়ায় প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মোটেই বিব্রতবোধ করেন নাই বরং উহা প্রয়োজনীয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। গত ১১ই মে তারিখের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এইরূপ গুপ্তচরবৃত্তি চলিতেই থাকিবে। সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর-বৃত্তি যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে উহা রাশিয়ার সার্ব্বভৌমত্বের উপর চ্যালেঞ্জ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কাজেই রাশিয়ার আকাশে

মার্কিণ গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনাকে মঃ ক্রুশেভ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। উপেক্ষা করিলে রাশিয়ার আকাশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচরবৃত্তির অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং উহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ অধিকার দাবীর নিকট রাশিয়ার আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই হয় না। কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কই রাজ্যের সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা রাশিয়ার সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করিবার অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আছে, একথা মঃ ক্রুশেভ স্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহাই যদি শীর্ষ সম্মেলন বানচাল হওয়ার জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে মঃ ক্রুশেভ নিশ্চয়ই দায়ী।

মার্কিণ গুপ্তচর বিমান ভূপাতিত করার পরও মঃ ক্রুশেভ চাহেন নাই যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হউক। প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সাধারণ নির্দ্দেশেই যে এইরূপ গোয়েন্দাগিরি চলিতেছে মঃ ক্রুশেভ তাহা জানেন না বা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবু উক্ত বিমান রুশিয়ার আকাশে উড়িবার জন্য প্রেঃ আইসেন হাওয়ার দায়ী, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। এই বিশ্বাস করিতে না চাওয়াটা সম্পূর্ণ কূটনৈতিক ব্যাপার। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যদি এই কূটনৈতিক অবিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করিতেন এবং ১৬ই মে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে বলিতেন তাহা হইলে শীর্ষসম্মেলনের ভরাডুবী হইত না। ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক চালে ভুল, না স্বেচ্ছাকৃত, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। রাশিয়ায় মার্কিণ গুপ্তচর বিমান ভূপাতিত করার পর লণ্ডন হইতে প্রেরিত ১ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বিমান বাহিনীর বিমানও সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির উপর পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে রত রহিয়াছে। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ উন্নত ধরণের 'ভি'-বোমারু বিমান ও ক্যানবেরা বিমান এই পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অবশ্য রাশিয়ার বিরুদ্ধেও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করা হইয়াছে। ডেইলী মেলের সংবাদে বলা হইয়াছে, রুশবিমান বৃটেন, কানাডা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে উড়িতে দেখা গিয়াছে। গুপ্তচর বৃত্তিতে নিযুক্ত বিমানগুলি দেখা, এমন কি উহাদের মধ্যে সংঘর্ষের কথাও সব পক্ষই গোপন রাখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রাশিয়ারও কম নয়, একথা বলিলে ভুল হইবে না। রাশিয়ার চারিদিকে বিভিন্ন দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটির বেষ্টনী গড়িয়া তুলিয়াছে। ১লা মে তারিখের ঘটনার পর রাশিয়া পাকিস্তান, জাপান ও নরওয়েকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে। সংযত ভাষায় হইলেও এই দেশগুলিও আমেরিকার নিকট প্রতিবাদ জানাইতে ত্রুটি করে নাই। মার্কিণ সরকারও এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, মঃ ক্রুশেভ যে সকল মিত্রশক্তিকে ভয় দেখাইয়াছেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের পাশে দাঁড়াইবে। রাশিয়ার চারিদিকে আমেরিকার যে সকল মিত্র রাষ্ট্র আছে তাহাদের প্রতি রাশিয়ার হুমকী এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাস ঐ দেশগুলিতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহা বলা অবশ্য সহজ নয়। কিন্তু এই দেশগুলিকে কতক পরিমাণে neutralise করিবার এই সুযোগ রাশিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার প্রতিক্রিয়া—

শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, এখনই সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলেও ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দিবে না। মঃ ক্রুশেভ ছয় হইতে আট মাস শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত রাখিবার কথা বলিয়াছেন। ছয় হইতে আট মাস পরে শীর্ষ সম্মেলন সত্যই হইবে কি না, এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। গত ২০শে মে (১৯৬০) কমন্সসভায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়াছেন, "প্যারীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা যে একটি গুরুতর ব্যাপার সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও কঠোর হইতে পারে বলিয়া আমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদিগকে হয়ত নূতন ভীতি ও নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।" নূতন ভীতি ও বিপদ রাশিয়ার দিক হইতে আসিবে বলিয়াই তিনি যে আশঙ্কা করেন তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। ঐদিনই অর্থাৎ ২০শে মে তারিখে পূর্ব্ব-বার্লিনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মঃ ক্রুশেভ ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, শান্তিচুক্তির জন্য পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীকে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি বলেন, ছয় হইতে আট পর্য্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। এই বক্তৃতায় মঃ ক্রুশেভ সহাবস্থান নীতিতে আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভাবী শীর্ষ সম্মেলন বাধা প্রাপ্ত হয় এমন কিছু না করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আবার শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার আশা উভয় পক্ষই সত্যই পোষণ করেন কি না, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কৃত্রিম মানবসহ কৃত্রিম উপগ্রহ—

প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলনের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখের প্রাক্কালে, ১৫ই মে তারিখে রাশিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিয়াছে। উহার একটি কক্ষে মহাকাশযাত্রী কৃত্রিম মানুষ রহিয়াছে। মহাকাশযাত্রায় মানুষকে যে সকল অবস্থার মধ্যে কাটাইতে হইবে তাহার প্রত্যেকটিই কৃত্রিম উপায়ে ঐ কক্ষে সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই মে তারিখে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি কেন আকাশে প্রেরণ করা হইল, সে কথা তাহা অনুমান করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু মহাকাশে মানুষের যাত্রার দিন যে আর দূরবর্ত্তী নয়, এই ব্যাপারে তাহাই বুঝা যাইতেছে। মহাকাশে মানুষ প্রেরণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও একটি পরিকল্পনা আছে। ইহার জন্য সাত জন লোককে শিক্ষা দান করা হইয়াছে। তাহারা সকলেই ভার্জ্জিয়ানাস্থিত হেডকোর্টাস ল্যাংলীতে আছে। তাহারা না কি এইরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন, কৃত্রিম মানুষ নয়, একজন প্রকৃত মানুষকেই রাশিয়া কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে পুরিয়া মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়াছে। নিজেদের ব্যর্থতার সংবাদ গোপন রাখার জন্য কিম্বা

লোকটি নিরাপদে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত সংবাদটি চাপিয়া যাইতেছে।

কমনওয়েলথ সম্মেলন—

গত ৩রা মে (১৯৬০) লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধান মন্ত্রীদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, গত ১৩ই মে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার উৎকট বর্ণবৈষম্য নীতি যে এই সম্মেলনের উপর গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মেলনে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই, আলোচনা হইয়াছে ঘরোয়াভাবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি কমনওয়েলথ সম্মেলনে আলোচনা হওয়ার রীতি' নাই, এই অজুহাতে শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীরা দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতি সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হইতে দেন নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বর্ণ বৈষম্য যদি নিছক প্রত্যেক রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপার হয় তাহা হইলে মানবিক অধিকারের ঘোষণা করার নেকামী করা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উচিত হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা দেশটা কাফ্রীদের। শ্বেতাঙ্গরা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। শ্বেতাঙ্গরা কাফ্রীদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া বলিতেছে, উহা তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার। কমনওয়েলথের শ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীরা সেই অজুহাত মানিয়া লইয়াছেন এবং অশ্বেতকায় প্রধানমন্ত্রীরা তাহাতে সায় দিয়াছেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলনের শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে বর্ণ বৈষম্য নীতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণবৈষম্য নীতি সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় নাই। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এরিক লো সম্মেলনে উপস্থিত থাকায় অন্যান্য প্রধানমন্ত্রিগণ দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে ঘরোয়াভাবে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল ঘরোয়া আলোচনার সময় মিঃ লো দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের নীতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণ দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য নীতি প্রসঙ্গে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রহমানই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ লোর স-দম্ভ উক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি আলোচনা বৈঠক ত্যাগ করেন। অন্যান্য অ-শ্বেতকায় মন্ত্রীরা তাঁহার ন্যায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মালয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এশীয়-আফ্রিকা দেশগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কমনওয়েলথের সমস্ত অ-শ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরা যদি মালয়ের প্রধানমন্ত্রীর মত দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারেন তবে বর্ণবৈষম্যের প্রতিকার হওয়া কঠিন হইবে না।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—

গত ২১শে মে হইতে তিন দিন ধরিয়া চিলিতে যে ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, জলপ্লাবন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চিলিরই শুধু ব্যাপক ক্ষতি হয় নাই, উহার ফলে ২০টি প্রবল জলোচ্ছ্বাস প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া এক গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ বৃহৎ প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় আর হয় নাই। উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা চিলি হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম উপকূলের জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, ফরমোসা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে আছড়াইয়া পড়িতেছে। জাপানের পূর্ব্ব উপকূলস্থ সেণ্ডাই বন্দর এলাকায় আট শত লোক নিহত এবং ২০ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। দক্ষিণ চিলিতে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলায় নয় শত জন নিহত, ১৫ হাজার আহত এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

গত ২৫শে মে বুয়েনস আয়ার্স হইতে ৮১৩ মাইল দূরে সান মার্টিন ড লস আণ্ডেজ অঞ্চলে একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে গলিত ধাতু ও ভস্মে আর্জ্জেণ্টিনার সান কার্লস ড বারিলোচের চারিদিকে সমগ্র অঞ্চলটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। চিলিতে মোট সাড়ে তিন হাজার লোকের মৃত্যু হয়।

—২৬শে মে ১৯৬০।

একটি আশ্চর্য কণ্ঠ

(শিশির ভাদুড়ী)

শ্রীকরুণাময় বসু

একটি আশ্চর্য কণ্ঠ সারা দিন মধুক্ষরা সুর ফিরি করে
ঝাঁপি তার বন্ধ করি সন্ধ্যেবেলা ফিরে গেল ঘরে:
সেই সুর স্মরণের কুঞ্জডালে ফুল হয়ে ফুটে থাকে
ক্লান্ত রাতে শেষের প্রহরে।
চাঁদ তার কথাগুলি
কানে কানে বলে গেছে পদ্মকলি-ভোরে।

একটি আশ্চর্য শিল্পী
রূপমূর্তি ব্যঞ্জনার বিচিত্র বিন্যাসে
[illegible]

অলৌকিক অস্ফুট আভাসে;
রঙ্গমঞ্চ মনে হত নব রূপলোক,
মহাজীবনের রূপদক্ষ তব জয় হোক।

একটি বিদ্রোহী আত্মা
হেলায় করেছে বন্দী মুঠিতলে নিষ্ঠুর সময়;
জীবনের শিল্পমূর্তি মৃত্যুঞ্জয়ী,
এই তার উদ্ধত প্রত্যয়।
অভ্রভেদী আত্ম-অভিমান
[illegible]

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[প্রবীণ সাহিত্যব্রতী ও জীবন-চরিতকার]

দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনে এ মানুষটি ছিলেন যতই চিন্তাশীল, ততই কর্ম্ম-তৎপর ও তেজস্বী। চোখে-মুখে তাঁর সে দৃঢ়তার ছাপ এখন অবধি বেশ স্পষ্ট। বার্দ্ধক্য ও জড়তা স্বাভাবিক নিয়মে দেহ-কাঠামোকে জুড়ে বসলেও মনের দিক থেকে আজও তিনি অনেকখানি সবল। প্রথিতযশা সাহিত্যব্রতী ও জীবন-চরিতকার শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর জীবনধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য বুঝি এইখানেই।

ময়মনসিংহ জেলার মুয়াজানী গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে গিরিজাশঙ্করের জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি ছেলেবেলাতেই তাঁর ভেতর লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত পড়াশুনো করে এণ্ট্রান্স পাশ করেন তিনি ১৯০৪ সালে মুয়াজানীর সন্নিহিত গ্রাম্য হাইস্কুল থেকে। এরপর যথারীতি কলেজে পড়াশুনো চলে তাঁর এবং সে কলকাতায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি এফ্-এ ও বি-এ (দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সালে অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞান—রাজনীতিতে এম্-এ পাশ করলেন তিনি। এম্-এর সাথে সাথে আইনশাস্ত্র ('ল') অধ্যয়নও তাঁর শেষ হয়ে যায়।

গিরিজাশঙ্করের সফল জীবনের ওপর বাংলার দুইজন মনীষীর প্রভাব রয়েছে খুব বেশি রকম—একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অপরজন ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ছাত্রাবস্থাতেই (কলেজ-জীবন) তিনি এঁদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। সমাজ ও জাতির বহু প্রশ্ন নিয়ে বহু সময় এঁদের সাথে নিবিড় আলোচনা হয়েছে তাঁর। সে সব পুরণো দিনের গৌরবময় স্মৃতিকথা শ্রীরায়চৌধুরীর মুখে শুনতে পাওয়া যায় আজও।

একজন সুবক্তা ও সার্থক সাংবাদিক হিসাবেও এ মানুষটি কম মর্য্যাদার দাবী রাখেন না। ১৯১২ সালে অর্থাৎ কলেজী শিক্ষা সমাপ্তির এক বছর পরই 'দেবালয়' মাসিকপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রেরও তিনি ছিলেন বলতে গেলে প্রাণস্বরূপ। তাঁর বহু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ পায় এই পত্রিকায় সেকালে—যেগুলি পরে গ্রন্থাকারে 'বাংলার রূপ' নাম নিয়ে বের হয়। নারায়ণের সম্পাদনা ব্যাপারে ১৯১৬-১৭ সাল থেকে ১৯২১-২২ সাল পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

বাংলার মননশীলতার ক্ষেত্রে গিরিজাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণ, দেবালয় ছাড়াও নব্যভারত, বীরভূমি, উদ্বোধন, ভারতবর্ষ, জয়শ্রী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এযাবৎ তাঁর বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রণীত 'বাংলার রূপ' গ্রন্থখানি পড়ে সেদিনে সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে তাই তিনি দাবী রেখেছিলেন—প্রত্যেক বাঙালী যুবকের এ অবশ্য পঠিতব্য। তাঁর অপরাপর বিশিষ্ট রচনা (জীবনী-সাহিত্য) 'স্বামী বিবেকানন্দ' ও 'বাংলার উনবিংশ শতাব্দী', 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ', 'রাজা রামমোহন রায়' সুধী সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে শ্রীচৈতন্য প্রসঙ্গে তিনি কয়েকবারই বক্তৃতা করেছেন। ঐ বক্তৃতাগুলি গ্রথিত করেই 'বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য' ও 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদগণ'—এ দুটি মূল্যবান সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। দু'খানি বই-ই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পেয়েছে।

প্রায় ৫০ বছর ধরে শ্রীগিরিজাশঙ্কর সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন—লেখনী তাঁর আজও কিন্তু একেবারে স্তব্ধ হয়নি। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ', 'কয়েকটি মহাপুরুষের জীবনকথা'—এ সকল অমূল্য গ্রন্থ এক্ষণে যন্ত্রস্থ রয়েছে। বলতে কি, তিনি শুধু একজন প্রখ্যাত জীবন-চরিতকারই নহেন, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-রাজনীতি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন নিপুণ সমালোচক। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি, সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—এঁরা ছিলেন বরাবর তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী।

গিরিজাশঙ্কর রাজনীতি বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কখনও প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেননি বটে কিন্তু একটা সতেজ বিপ্লবধর্মী মন সব সময়ই তাঁর ভেতর সজাগ ছিল বা আছে। যশোরা

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

আলাপ-আলোচনাতে একটুতেই এইটি স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারা যায়। দেশের বর্তমান অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি নিতান্ত প্রতিবাদমুখর। তাঁর দৃঢ় ধারণা—মানুষের সত্যিকার কল্যাণ যদি চাওয়া হয়, খেতে-পরতে সবাই কেন পাবে না, এ প্রশ্নের উত্তর যদি পেতে হয় ঠিক ঠিক—তা হলে বিপ্লবকে এড়িয়ে কিছুতেই চলবে না।

শ্রীবিজয় সিং নাহার

[বিশিষ্ট দেশসেবী ও বিধানসভা-সদস্য]

তখনও ইনি স্কুলের ছাত্র কিংবা সবে উদ্যোগ করছেন কলেজে পা বাড়াবার। দেশসেবার জন্যে ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে এঁর মন। জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন থাকতে দিলে না এঁকে সাধারণ জীবন-ধারা নিয়ে। সেদিনের এই চঞ্চল ও সাহসী তরুণই সার্থক কর্ম্মী ও নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহার।

মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ নাহার পরিবারে বিজয় সিং জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৬ সালে। এই নাহাররা (জৈন) বাংলা দেশে আসেন—সে প্রায় দুই শতাধিক বছর আগের কথা! তারপর ক্রমে বাঙালী সংস্কৃতির সাথে তাঁদের আত্মার সংযোগ স্থাপিত হয়, তাঁরা ষোল আনা বাঙালীই হয়ে পড়েন। বিজয় সিং-এর পিতা পূরণ চাঁদ নাহার ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষ। তিনি একাধারে ছিলেন আইনজ্ঞ, সাহিত্যব্রতী, বিদ্বৎবৎসল, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষক ও শিল্পানুরাগী। পূরণ চাঁদের আদর্শ ও গুণাবলীর প্রভাব বালক নাহারের ওপর স্বভাবতঃই পড়ে।

বিজয় সিং-এর ছাত্র-জীবন যখন শুরু হতে থাকে, সে সময় থেকেই তিনি কলকাতায়। পিতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও অনুশাসনাধীনে তাঁর পড়াশুনো চলতে থাকে। স্কুলের পড়াশুনো

শ্রীবিজয় সিং নাহার

তাঁর সবটাই সম্পন্ন হয় বউবাজার মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন-এ। ১৯২৩ সালে তিনি এখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯২৭ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি যথারীতি বি-এ পাশ করেন। এম-এ ও ল' ক্লাশের তিনি যখন ছাত্র, গান্ধীজীর আইন-অমান্য-আন্দোলনের ঢেউ তখন আসছে। দেশের কাজে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়েন তেজস্বী যুবক শ্রীনাহার।

মেট্রোপোলিটান ইনিষ্টিটিউশনে ছাত্র থাকাকালীনই বিজয় সিং-এর রাজনৈতিক দীক্ষা হয়ে যায়। তাঁর প্রকৃত দীক্ষাগুরু বলতে গেলে ঐ স্কুলেরই সেদিনকার প্রবীণতম শিক্ষক গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন নির্য্যাতিত রাজনৈতিক কর্ম্মী ছিলেন তিনি (গিরীন্দ্রনাথ)—বিপ্লবী নায়ক বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি-সমিতির সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আপন শিক্ষকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে শ্রীনাহারও ঐ গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার একজন সদস্য হন, বিপিনবিহারীর নিবিড় সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে যান তিনি সেই থেকেই। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বক্সিং লড়া, গুলী ছোঁড়া—এসবে পারদর্শী হয়ে নিতে হয় অন্তান্যদের সাথে তাঁকেও।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই বিজয় সিং কংগ্রেসের (বর্তমানে শাসক দল) সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসে প্রতিনিধি তিনি সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত হন ১৯২৮ সালে। ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলনে তাঁর ছিল বরাবরই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। ১৯১৭ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, সে সময় মেট্রোপোলিটান ইনিষ্টিটিউশনে তিনি পড়ছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন দূরে থাকা অসম্ভব হলো—বয়স কম থাকলেও স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব নিয়ে সেই কংগ্রেসে তিনি কাজ করেন। আগষ্ট-আন্দোলনের (১৯৪২) সময় প্রাদেশিক কংগ্রেস-নেতাদের সঙ্গে তিনিও ধৃত হন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন তিনি ১৯৫০ সালে। বর্তমানে তিনি প্রদেশ-কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ।

বাংলা ও ভারতের বড় বড় নেতাদের সাথে শ্রী নাহারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আসবার বহু কারণ ঘটেছে। সে দিনে নাহারদের ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটস্থ বাড়িটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রশস্ত কর্ম্মকেন্দ্র। অনেক সময় অনেক জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে এই বাড়িতে সর্ব্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোপন আলোচনা ও পরামর্শ হয়েছে—আজ সে সকল অবিস্মৃত ইতিহাসের সামগ্রী। শ্রীনেহরু (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ও মৌলানা আজাদ বহুবার এখানে এসেছেন বহু জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদে। আত্মগোপনকারী বিপ্লবী কর্ম্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ও ছিল এই নাহার-ভবন। জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত নাহারদের কুমার সিং হলটিও বিজয় সিং-এর খুল্লতাত কুমার সিং-এর স্মৃতিজড়িত রাজনৈতিক সভা-সমিতি ও জাতীয় আন্দোলন বিষয়ক কর্ম্মকাণ্ডের একটি প্রধান কেন্দ্র।

শ্রীবিজয় সিং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমানে একজন কর্ণধার। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে তিনি চৌরঙ্গী নির্ব্বাচন-কেন্দ্র থেকে রাজ্য বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কংগ্রেস টিকিটেই তৎকালীন প্রাদেশিক

পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সেটি ছিল কলকাতা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে। পরোক্ষ নির্বাচনে তিনি রাজ্যের অন্যতম এম, এল, সি (কংগ্রেস) হয়েছিলেন ১৯৫২ সালেও। কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হন তিনি প্রথম ১৯৩৩ সালে তালতলা ওয়ার্ড থেকে। আপন যোগ্যতাবলে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ আসনটি তিনি অধিকার করেন। বর্ত্তমানে তিনি কলকাতা পৌরসভার একজন নির্ব্বাচিত অল্ডারম্যান। রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে গোড়া থেকেই দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গে শ্রীনাহারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। পৌরসভাতেও এই জাতীয় মহানায়কের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি বহুদিন।

রাজনৈতিক সংস্থা (কংগ্রেস) ছাড়াও বহু সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে বিজয় সিং বরাবর নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্ত্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের তিনি একজন সদস্য। খেলাধূলা (ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি) বরাবরই তাঁর একটি বিশেষ 'হবি'। হেলসিঙ্কিতে যে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, ভারতীয় বক্সিং টীমের ব্যবস্থাপক হয়ে তিনি তাতে যোগদান করেছিলেন। শ্রী নাহার একজন দক্ষ ও নিরলস কর্ম্মী—দেশ ও জাতির সেবাই তাঁর সর্ব্বসময়ের লক্ষ্য।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী

ভারত মাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে অগ্রসর হওয়ায় অগ্নিযুগের যে সব বিপ্লবীরা ইংরাজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্য্যাতন ভোগ করেছেন, শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে একজন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত গাড়ুদহ গ্রামে এক অভিজাত ও নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে ১৮৯২ সালের ৩০শে জুন শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব হইতে তিনি ঈশ্বরানুরাগী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ২০৲ টাকা বৃত্তিপান। ১৯১৪ সালে তিনি কলিকাতা হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম, এ, পড়বার সময় তিনি রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের দরুণ গ্রেপ্তার হওয়ায় পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

আশুতোষ যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়িতেন তখন-ই নিজ দেহের রক্ত দ্বারা মা কালীর সম্মুখে নিজের নাম দস্তখত করে দেশের স্বাধীনতার জন্ত আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে বি, এ, পড়তে কলিকাতায় এসে তিনি বিপ্লববাদী ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়েন। এই সময়ে যে সব বিপ্লবী নেতার সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী (বাঘা যতীন) এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (ইনি মানবেন্দ্র রায় নামে খ্যাত) অন্যতম। ১৯১৫ সালের মে মাসে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সম্মুখে কৃষ্ণনগরে বিচারার্থে আনীত হলেন। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এই মামলা পরিচালনা করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন করে কলিকাতা থেকে জে, এন, রায় প্রমুখ দুইজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারকে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। এতৎসত্ত্বেও ১৯১৫ সনের আগষ্ট মাসে এঁরা দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসে দণ্ডিত হলেন।

আন্দামানে বন্দীদের যে সব কাজ করতে হয়, নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়ে আঁশ বার করা তার অন্যতম। আশুতোষ এই কাজ করতে অস্বীকার করেন। জেল কর্ত্তৃপক্ষ শাস্তি স্বরূপ ডাণ্ডাবেড়ী Cross Fetter (দুই পায়ের গোড়ালীর ওপর দু'টী কড়া লাগিয়ে তার মধ্যে প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা লোহার রড লাগানো থাকে) পরিহিত অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে উচ্চ স্থানে হাতে হাতকড়ি দিয়ে আটকিয়ে দাঁড়ান অবস্থায় প্রত্যেকদিন আট ঘণ্টা করে রেখে দিতো। তারপর একে একে খাদ্য হ্রাস (Penal Diet), উল্টাপিঠে—হাতকড়ি (Behind Hand Cuff), দাঁড়ানো হাতকড়ি (Standing Handcuff), খাড়াবেড়ী (Barfetter) ইত্যাদি জেলের সর্ব্বপ্রকারের দণ্ড দেওয়ার পরও যখন নারিকেলের ছোবড়া থেকে আঁশ বার করার কাজে স্বীকৃত করা গেল না তখন বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। নির্ব্বিকারচিত্তে আশুতোষ ১৫টি বেত্রাঘাত গ্রহণ করলেন। এই বেত্রাঘাতে নিতম্বস্থানে আধ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত হয়ে গেল এবং এক মাসের ওপর কষ্ট ভোগ করে সুস্থ হলেন।

এতেও কোন ফল হ'ল না দেখে কারা-কর্ত্তৃপক্ষ ডাণ্ডাবেড়ী সহ এক বৎসর কঠোর নির্জ্জনবাসের আদেশ দিলেন। এই নির্জ্জনবাসে সাধারণতঃ কয়েদীর মস্তিষ্কবিকৃতি হয়। আশুতোষ এই দণ্ডও নির্ব্বিচারে বহন করলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর এইসব অত্যাচারের কাহিনী বাংলায় পৌঁছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন করে তদন্তের দাবী করলেন। এর ফলে বন্দীদের হাল্কা কাজ দেওয়া হ'ল। এই সময় জেলের প্রেস-বিভাগে কাজ করতে গিয়ে আশুতোষ বীর সাভারকর ও তাঁহার ভাই গণেশ সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই সময়ে দেশে নির্ব্বাসিত বন্দিগণের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, ফলে বন্দিগণকে আলিপুর জেলে ফিরিয়ে আনা হ'ল। অসহযোগ
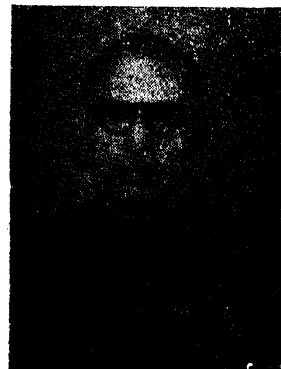
শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী

আন্দোলনে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইত্যাদি বাঙ্গালার নেতাগণও আলিপুর জেলে রাজবন্দি রূপে আনীত হয়েছেন। ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে আশুতোষ মুক্তিলাভ করেন।

এর পরও ১৯৩২ সালে সন্দেহক্রমে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করেন। কারামুক্তির পর আশুতোষ হিন্দুমহাসভায় যোগ দেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সন্দেহক্রমে দিল্লীতে গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৮ সালে তিন মাস এবং ১৯৫০ সালে চার মাস কারাবরণ করেন। প্রতিবারই প্রমাণাভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে সরকার বাধ্য হন।

ইহার কিছুদিন পরই তিনি কলিকাতা থেকে বাংলা ভাষায় এবং দিল্লী থেকে হিন্দী ভাষায় 'কেশরী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। হিন্দুমহাসভার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করিয়া তিনি তাঁর কর্ম্মকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে প্রযত্নশীল হয়েছেন। আশুতোষের সম্পর্কে দিল্লীতে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন—"শ্রীআশুতোষ লাহিড়ীর রাজনৈতিক মত ও আদর্শের সহিত একমত না হলেও, তাঁকে আমি একজন সদ্‌ব্যক্তি বলেই মনে করি।"

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর

[কলিকাতা ষ্টক-এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা]

মানুষ বরাবর সঞ্চয়প্রয়াসী। সঞ্চিত অর্থ সে আবার বিনিয়োগ করে আয়বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু অর্থলগ্নীর বিশেষ ক্ষেত্র হল ষ্টক-এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার-বাজার। ইহা বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ব্যবসায়ে মূলধন প্রয়োজন—আবার এই মূলধনই দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। শেয়ার-বাজারের মাধ্যমে বহুজনের সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত হয়ে (Stock) মূলধন গঠন করে। সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি (Securities) হল ক্রেতার কাছে ঋণবন্ধ আর
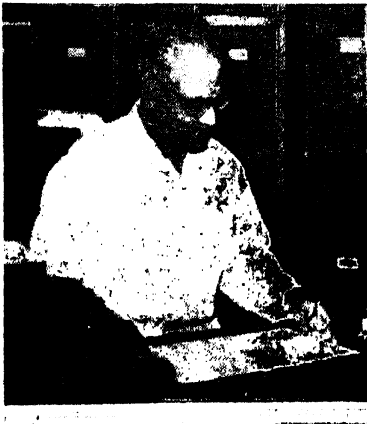
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর

ষ্টক-শেয়ার হল ক্রেতার নিজস্ব সম্পদ। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির বন্ধকের পরিবর্ত্তে অর্থসংগ্রহ করাই হল 'ডিবেঞ্চার'।

শেয়ার হয় অর্ডিনারী ও প্রেফারেন্স। প্রথমটির ক্রেতারা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভার ভোটার, উহার হিসাব অনুমোদন, উহার পরিচালক নির্ব্বাচন ও ডিভিডেণ্ট ঘোষণার অধিকারী। আর শেষেরটির ক্রেতারা কয়েক বৎসরের ডিভিডেণ্ট অনাদায়ী হলে ভোটদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু একটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী হলেন তাঁহারা—সেটি হল নির্দ্দিষ্ট রেটে ডিভিডেণ্ট পাওয়া আর প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে উহার Assets-র অধিকারী। ষ্টক ও শেয়ারে সাধারণ মধ্যবিত্তদের দাদনের সংখ্যা বেশী। এই সমস্ত ব্যাপারে 'ষ্টক-এক্সচেঞ্জ' মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

হাজারের উপর সদস্য সমন্বিত এশিয়ার বৃহত্তম কলিকাতা-ষ্টক-এক্সচেঞ্জের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুরের নিকট ইহার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ জানিতে চাহিলে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন।

ডাঃ ৺রাজেন্দ্রলাল সুর ও শ্রীমতী সত্যবালা সুরের পুত্র অতুলকৃষ্ণ ১৯০৪ সালের ৫ই আগষ্ট কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ২৪পরগণার গোপালপুর গ্রামে। দাদামহাশয় ছিলেন চন্দননগর নিবাসী ৺সিদ্ধেশ্বর নিয়োগী। অতুলকৃষ্ণ ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ নম্বর (৯৯) সহ ১৯২১ সালে শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে আই-এ, ও বি-এ, পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ইতিহাসে ও ১৯২৮ সালে এ্যানথ্‌পলজীতে (Anthropology) প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম-এ পাশ করেন। ১৯২৮ সালে তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ) স্যার জন মার্শালের নির্দ্দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক ডক্টর ডি, আর, ভাণ্ডারকর শ্রী সুরকে Indus Valley Cultureএর উপর গবেষণা করার জন্য আহ্বান জানান। এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-আবিষ্কৃত মহেনজাদোড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের সহিত পরবর্ত্তী সংস্কৃতির যোগাযোগ, আর থিসিস্‌ ছিল Pre-Aryan Elements in Indian Culture. "ক্যালকাটা রিভিউ" ও ডক্টর নরেন্দ্র লাহা সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান হিসটোরিকাল কোয়ার্টারলী"তে উহার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে Archeological Surveyতে তিনি উচ্চপদ পান কিন্তু ডক্টর রাধাকুমুদ ও ডক্টর ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত পদ গ্রহণে আপত্তি জানান। ফলে শ্রী সুর ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে তিনি থিসিস্‌ দাখিল না করিয়া উহার সহিত সংস্রব ছিন্ন করেন। তাঁহার গবেষণালব্ধ বিষয় হইতে আমরা সিন্ধু সভ্যতার বহু জিনিষ জানিতে পারি ও ডক্টর ভাণ্ডারকরের Outstanding works উহা প্রভূত সাহায্য করে।

১৯৩২ সালে তিনি অর্থবিষয়ক সাংবাদিকতা আরম্ভ করেন। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার রূপদাতা ক্যাপ্টেন পেটাভাল প্রতিষ্ঠিত Bread & Freedom ও Commercial India মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের সহকারী সম্পাদক হিসাবে শ্রী সুর যোগদান করেন। চারি বৎসর তিনি Commercial Gazette (সাপ্তাহিক)র

যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৬এর অক্টোবরে তিনি কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের আর্থিক উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া এখনও উহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৪৬ সালে পরলোকগত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে তিনি 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকার বাণিজ্য পৃষ্ঠা সম্পাদনা ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। ইহার রূপদান ও ইহার Economic Supplement প্রবর্ত্তন সারা ভারতে উচ্চপ্রশংসিত হয়।

১৯২১ সালে Prof. J, M, Keynes (পরে লর্ড কীনস্)-র উদ্যোগে শ্রীসুর লণ্ডন ইকনমিকস্ সোসাইটীর সদস্য (F. R. E. S.) নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর তাঁহাকে লণ্ডন রয়্যাল ষ্টাটিস্‌টিক্যাল সোসাইটীর ফেলো হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সাল হইতে তিনি ব্যুরো অফ ইণ্ডাসট্রিয়াল ষ্টাটিসটিকসের সদস্য রহিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত 'What Price the Ottowa Agreement' সরকারী ও বেসরকারী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বোম্বাইস্থ ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি উহার গুজরাটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে যমুনাদাস মেটা উহার হিন্দী সংস্করণ বাহির করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনসভায় উক্ত অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে বেসরকারী সদস্যদের প্রতিবাদ উত্তোলনে শ্রী সুরের পুস্তক প্রভূত সাহায্য করে। এছাড়া তাঁহার লেখা চল্লিশটি পুস্তক রহিয়াছে—তন্মধ্যে Savings & Investments in India, India's natural Resources, Contracts & Regulation Acts, Principle of Business Finance, টাকার বাজার প্রভৃতি সর্ব্বজনসমাদৃত। ১৯৫৫ সালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমন্ত্রণে তিনি Indian Institute of Social Welfare & Business Managementএ Applied Economics ও Business financeএর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসর হইতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Economicsএ প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক রহিয়াছেন।

অতুলকৃষ্ণ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। সর্টহ্যাণ্ডের তিনটি ধারায় (পিট্‌ম্যান, গ্রে ও স্লন-ডুপ্লোইয়ান) টিচার্স-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শ্রীসুর লণ্ডন চেম্বার অব কমার্সের পরীক্ষায় (একমিনিটে ১৫০ শব্দ লেখন) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এছাড়া তিনি বাংলা ও ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড সমভাবে লিখিতে সক্ষম।

গত দ্বিতীয় মহাসমরের সময় তিনি প্রধান এ, আর, পি উপদেষ্টা হিসাবে কলিকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জিলার কয়েক সহস্র লোককে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। এছাড়া সেণ্টজন এম্বুলেন্স ব্রিগেডের অ-চিকিৎসক সদস্য হিসাবে তিনি ফার্ষ্ট-এড, হোম-নার্সিং, হাইজিন ও স্যানিটেশনের 'Lay-Lecturer' এবং এইগুলির উপদেষ্টা-ডিপ্লোমা পান। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় তিনি প্রাথমিক সাহায্য সম্বন্ধে দুইটি পুস্তকের লেখক। বয়স্কাউটের সহিত তিনি বহুদিন সংযুক্ত ছিলেন, ভারতে 'ভারোত্তোলন' এর তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং 8 Stone classএ তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিমলা সুর হলেন একজন সুগৃহিণী।

'ষ্টক-এক্সচেঞ্জ ইয়ার বুক' শ্রী সুরের সম্পাদনায় দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। শ্রী সুর বলেন যে, ভারতের আর্থিক উন্নয়ন করিতে হইলে অবহেলিত জনতার দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ অবহেলিত গ্রামেরই বাসিন্দা তাহারা। বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার লেখা ধারাবাহিক ছাব্বিশটি প্রবন্ধ (Rural Planning) যাহা 'গ্রামীন আর্থিক পরিকল্পনা' আজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং কমিশনে গ্রাম-সম্বন্ধীয় কার্য্যধারার সঙ্গে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান জনসাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়ে খুবই আগ্রহবান হয়েছেন—ইহা আনন্দের কথা।

শ্রমিক

[বিখ্যাত রাশিয়ান কবি Vasily Kazin এর Brick-layer
নামক কবিতাটির অনুবাদ]

সন্ধ্যায় হাটি গৃহের পানেতে আমি,
সঙ্গে চলেছে শ্রমের ক্লান্তি সাথী
আঁধারে আমার লোহিত বহির্বাস
লাল টকটকে ইটের গাইছে গীতি।

গাইছে সে লাল-ইটের বোঝার গান,
যত বোঝা বেয়ে ওপরে উঠেছি আমি,
ওপরে উঠেছি, অনেক ওপরে ছাদে,
সেই ছাদে, যাকে আকাশ বলবে তুমি।

মদের আমেজে চোখেতে লালের আভা,
বাতাসেতে ছিল কুয়াশার আমেজ মাখা,
উষাকে দেখেছি শ্রমিকের মত যেন
লাল ইটখানা তুলতে ওপরে একা।

অনুবাদক—মল্লিনাথ
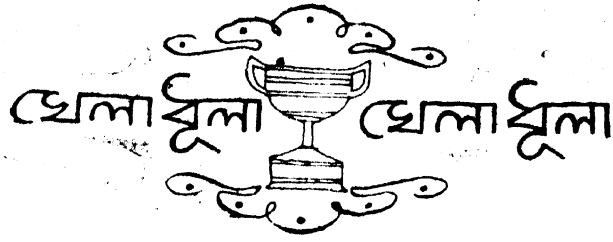
রোম অলিম্পিক ও ভারত

এবার রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের আসর বসবে। চারদিকেই একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ভারতও বসে নেই। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সংখ্যা নির্দ্ধারণে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। মনোনীত দলে ৬৫ জন ক্রীড়াবিদ ও ৬১ জন কর্ম্মকর্ত্তা থাকবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া-সংস্থা মনোনীত প্রতিনিধিদের খরচ বহন করতে রাজী থাকলে আরও বার জন প্রতিযোগী ও তিন জন কর্ম্মকর্ত্তার রোম যাত্রা মঞ্জুর করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এথেলেটিক দল গঠন সম্পর্কে ভারতীয় এমেচার এথেলেটিক ফেডারেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এক নির্দ্দিষ্ট মান স্থির করেন। যাঁরা এই নির্দ্দিষ্ট মানে পৌছাইয়াছেন তাঁহাদেরই চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। নিম্নে চূড়ান্তরূপে মনোনীত প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ও যে দল গঠিত হয়েছে তার নাম প্রদত্ত হলো :—

এথেলেটিক দল—নয় জন পুরুষ ও তিন জন মহিলা এবং তিন জন কর্ম্মকর্ত্তা (একজন কোচ এবং পুরুষ ও মহিলা দলের দু'জন ম্যানেজার)।

পুরুষ—টি আর যোশী-দিল্লী (১০০ মিটার), মিলখা সিং-সার্ভিসেস (অধিনায়ক) (২০০ ও ৪০০ মিটার), জগমোহন সিং-পাঞ্জাব (১০০ মিটার হার্ডল), গুরুবচন সিং-দিল্লী (উচ্চ লম্ফন), বি ভি সত্যনারায়ণ-মাদ্রাজ (দীর্ঘ লম্ফন), ভীরা সিং-সার্ভিসেস (দীর্ঘ লম্ফন)।

মহিলা—শীলু মিস্ত্রী-বোম্বাই (১০০ মিটার), ষ্টেফি ডি সুজা-বোম্বাই (২০০ মিটার,) এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট—রাজস্থান (বর্শা নিক্ষেপ)।

৫০ ও ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে জোরা সিং ও অজিত সিং দিল্লীতে বিগত জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানেই নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতা লাভ করেছেন। লাল চাঁদ ও ম্যারাথনে যোগ্যতা লাভ করেছেন। তবে দেরাদুনে চূড়ান্ত নির্ব্বাচনী ট্রায়ালের পর এই বিষয়ের প্রতিনিধি দলের নাম ঘোষণা করা হবে।

এথেলেটিকসে ভারতের মহিলাদের মান খুবই নিম্ন। এথেলেটিক ফেডারেশনের সম্পাদক বলেছেন যে আন্তর্জ্জাতিক অলিম্পিক ফেডারেশনের অনুরোধ ক্রমেই ভারতীয় মহিলা দল পাঠান হচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন যে, মহিলা এথেলিটদের উৎসাহ দেওয়ার জন্ত রোমে দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হয়। নির্ব্বাচনী ট্রায়ালে কিন্তু ভারতীয় মহিলা এথেলিটারা বেশ সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। দুটি বিভাগে মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড় ও বর্শা নিক্ষেপে এশীয় রেকর্ড অতিক্রান্ত হয়। ষ্টিফি ডি'সুজা ২৫'৩ সেঃ ২০০ মিটার দৌড়ান। ইহা এশীয় রেকর্ড অপেক্ষা ০'৫ সেঃ কম। এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট ১৫৫ ফুট ৮½ ইঞ্চি দূরত্বে বর্শা নিক্ষেপ করেন। ইহা এশীয় রেকর্ড অপেক্ষা (১৫৫ ফুট) ৪½ ইঞ্চি বেশী। সেদিক থেকে মহিলাদের উপর একেবারে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই।

পুরুষ এথেলিটদের মধ্যে ভারতের আশা ভরসা মিলখা সিং। সকলেই তাঁর ফলাফলের জন্ত অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। এবার নির্ব্বাচনী ট্রায়ালে মাদ্রাজের সত্যনারায়ণ দীর্ঘ লম্ফনে সকলকে বিস্মিত করেন এবং নিজ জাতীয় রেকর্ড (২৩ ফুট ৫½ ইঞ্চি) অতিক্রম করেন। ভারতের কোন এথেলিট দীর্ঘ লম্ফন এ পর্য্যন্ত এত বেশী লাফাতে পারেন নি। রাম মেহের যিনি ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এই দিন ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লাফিয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাম মেহের ইতিপূর্ব্বে ২৪ ফুট ১১ ইঞ্চি লাফিয়ে এক সময় রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। সত্যনারায়ণ সেই রেকর্ড ম্লান করে দেন। আরও উল্লেখ করার বিষয় যে মেলবোর্ণ অলিম্পিকের বিজেতা ২৫ ফুট ৮¼ ইঞ্চি লাফিয়েছিলেন এবং ষষ্ঠস্থানাধিকারী ২৩ ১১ ফুট ¼ ইঞ্চি অতিক্রম করেন। সেই দিক থেকে সত্যনারায়ণের সাফল্য সম্পর্কেও সকলেই আশাবাদী।

ফুটবল দল—১৯ জন খেলোয়াড় এবং দু'জন কর্ম্মকর্ত্তা (একজন কোচ ও একজন ম্যানেজার)।

ভারতীয় ফুটবল দল এখনও চূড়ান্তভাবে গঠন করা হয়নি। দার্জ্জিলিং-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় শক্তিশালী দল গঠনের উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কোলকাতা, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ ও দিল্লীতে তিন সপ্তাহ স্থায়ী চারটা শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করা হ'বে। এই শিবিরগুলো ৭ই জুন থেকে ২৮শে জুন পর্য্যন্ত চালু থাকবে এবং তারপরে ২৮ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হ'বে—যাঁদের ভেতর থেকে চূড়ান্তভাবে অলিম্পিক দল গঠন করা হ'বে। ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টাকে অনেকে হয়তো সাধুবাদ জানাবেন; কিন্তু চারটা শিবিরের জন্ত বেশ কয়েক হাজার টাকা এভাবে অপচয়ের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকতে পারে তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে না। কারণ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সেরা খেলোয়াড় নিয়েই ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছিল এবং এই দল চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই একটা শিক্ষাশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকেই সেরা খেলোয়াড়রা যোগদান করেছিলেন। তাঁদের অনুশীলনী দেখার পরেই চূড়ান্তভাবে দল নির্ব্বাচিত করা হয়। পুনরায় এই ভাবে শিক্ষাশিবির স্থাপনের প্রচেষ্টা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এতে কোনও নতুন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে না। যে সকল খেলোয়াড় ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে দু'টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের বাদ দেওয়ার

কোনও প্রশ্নই আসে না। এঁদের ভেতর থেকেই চূড়ান্তভাবে অলিম্পিক দল গঠন করতে হ'বে। তা হ'লে এই অপব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? এতে খেলোয়াড়দের কিছু উপকার হ'বে-না কি নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সদস্যগণের বিনা পয়সায় প্রমোদ ভ্রমণ এবং খরচ-খরচা বাবদ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলেই এ শিক্ষাশিবিরের আয়োজন?

হকি দল—কুড়ি জন খেলোয়াড় ও তিনজন কর্ম্মকর্ত্তা (ম্যানেজার, কোচ ও ব্যায়াম শিক্ষক)।

হকিতে ভারত আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। অন্যান্য দেশ বর্ত্তমানে বেশ উন্নত হলেও ভারতের হকির মান নিম্নগামী, সেই বিষয়ে দ্বিমত হবার উপায় নেই। ভারতের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই উদগ্রীব। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ বেশ জাঁকজমক করেই ট্রায়াল অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এবার ট্রায়ালের শেষ পর্ব্ব সুরু হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে দল এখনও গঠিত হয় নি। চূড়ান্ত দল গঠন হবার পূর্ব্বে একটা খবর প্রকাশ হয়েছে যে কোচ শ্রীহাবুল মুখার্জ্জীও নির্ব্বাচক কমিটির সদস্য শ্রী কে ডি সিং (বাবু) বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-শিবির চলছে তাতে উপস্থিত হন নি। এতে সকলেই উৎকণ্ঠা বোধ করছেন। মনে হচ্ছে এর পেছনে যেন কোথায় কি জানি একটা কিছু রয়ে গেছে। যাহা হউক, আশা করা যায় নির্ব্বাচকমণ্ডলী দল গঠনে রাজনীতির উর্দ্ধে থাকবেন এবং ভারতীয় দলটি ঠিকভাবে গঠিত হবে। সকলেই ভারতের সাফল্যের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন।

কুস্তিগীর দল—ছয়জন প্রতিযোগী এবং দু'জন কর্ম্মকর্ত্তা (ম্যানেজার ও কোচ)।

ভারতীয় কুস্তিগীর দল গঠনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বোম্বাইতে একটা ট্রায়াল অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। আর একটা ট্রায়ালের পর চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের কর্ম্মসচিব শ্রীদেওয়ান প্রতাপচাঁদ প্রথম ট্রায়ালের পর বলেছেন যে হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের কয়েক জন কুস্তিগীর প্রকৃত অপেশাদার নয়—এই অভিযোগে বোম্বাই রাজ্য অপেশাদার কুস্তি এসোসিয়েশন এই সকল প্রতিযোগীকে প্রথম ট্রায়ালে অংশ গ্রহণ করতে দেননি। অভিযোগটি সত্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত হওয়া দরকার। আশা করা যায়, ফেডারেশন এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হয়ে ভারতীয় দল গঠন করবেন।

রাইফেল স্যুটিং দল—প্রতিযোগী বিকানীরের মহারাজা।

নিখিল ভারত রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর ভারতের প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু ভারতের খ্যাতনাম্নী স্যুটার শ্রীমতী সবিতা চ্যাটার্জ্জী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিখিল ভারত রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির এক দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কয়েক জন রাইফেল স্যুটার ক্রীড়াক্ষেত্রের এই অঞ্চলের রাজনীতি, ছলনা ও কাপট্য আমদানী করে ফেলেন। বিগত নিখিল ভারত রাইফেল স্যুটিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এমন ভাবে করা হয়েছিল—যাতে জাতীয় চ্যাম্পিয়নদিগের সকল প্রতিযোগী স্যুটারবৃন্দ শ্রেষ্ঠ আসন না পান। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, এই নিদারুণ গ্রীষ্মে কোন বিবেচনায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল—তাহা বোঝা গেল না। এমন কি, প্রতিযোগীদের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও দেওয়া হয়নি। আসন্ন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের পূর্ব্বে এই বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত হওয়া দরকার বলে মনে হয়।

জিমন্যাষ্টিক দল—প্রতিযোগী শ্যামলাল ও অনন্তলাল।

মুষ্টিযোদ্ধা দল—প্রতিযোগী স্যামি ঘাটাউ।

সাঁতারু দল—প্রতিযোগী রামদেও সিং এবং কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (তবু ভাল, বাঙ্গালা থেকে একজন নির্ব্বাচিত হয়েছেন)।

ভারোত্তোলন দল—প্রতিযোগী ঈশ্বর রাও ও লক্ষ্মীকান্ত দাস এবং একজন ম্যানেজার।

সর্ত্তসাপেক্ষ মনোনয়ন

ব্যক্তিগত ব্যয় বহনের সর্ত্তে অলিম্পিকে যোগদানের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদের সাময়িক ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। রাইফেল-স্যুটার কেশব সেন, উদাচিন্নভাই, হেমচাঁদ, পি এস চিন্না ও ম্যানেজার সরদার জয়া সিং। একজন মুষ্টিযোদ্ধা ও একজন ম্যানেজার, একজন সাঁতারু ও একজন ম্যানেজার এবং চারজন ভারোত্তোলনকারী।

পশ্চিম জার্ম্মাণী সফরে ভারতীয় এথ্‌লীট দল

জুন মাসে ভারতীয় এথ্‌লীট দল পশ্চিম জার্ম্মাণী সফরে যাচ্ছে। তাঁরা একাধিক আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবেন বলে ঠিক হয়েছে। এগার জন প্রতিযোগী নিয়ে ভারতীয় দলটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ জন রোম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। অলিম্পিকের পূর্ব্বে এই সফরের গুরুত্ব কম নয়। ভারতীয় প্রতিযোগীরা সাফল্য অর্জ্জন করুন, এটাই সকলে আশা করেন। নিম্নে মনোনীত ভারতীয় এথলীটদের নাম প্রদত্ত হলো:—

মিলখা সিং, জগমোহন, জোরা সিং, অজিত সিং, লালচাঁদ, মাখন সিং, দলজিৎ সিং, প্যান সিং, মহিন্দর সিং, গুরুবচন সিং, বিক্রমা সিং ও কমাণ্ডার পেরিরা (ম্যানেজার)।

লীগের ভিত্তিতে অলিম্পিক ফুটবল খেলা

অলিম্পিকের মূল ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ষোলটি দল চারিটি বিভাগে প্রাথমিকভাবে অংশ গ্রহণ করবে। লীগের ভিত্তিতে এবং গ্রুপ বিজয়ীরা প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা লাভ করবে। তৃতীয় স্থান নির্ণয়কল্পে সেমিফাইন্যালে বিজিত দুই দলকে পরস্পরে খেলতে হবে। নিম্নে খেলার তালিকা দেওয়া হলো:—

প্রথম গ্রুপ—যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব

দ্বিতীয় গ্রুপ—ইতালী, বৃটেন, ব্রেজিল ও ফরমোসা।

তৃতীয় গ্রুপ—পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আর্জেণ্টিনা ও টিউনিসিয়া।

চতুর্থ গ্রুপ—ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, পেরু ও ভারত।

ফুটবলে বদলী খেলোয়াড় গ্রহণের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি দার্জ্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় ভারতীয় ফুটবলে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় আহত খেলোয়াড়ের বদলে নতুন খেলোয়াড় গ্রহণ করায় যে আন্তর্জাতিক নিয়ম আছে, উহা ভারতে শীঘ্রই চালু করা হবে। উক্ত নিয়মানুযায়ী গোলরক্ষক আহত হলে খেলার যে কোন সময় তাঁর পরিবর্তে নতুন গোলরক্ষক দলভুক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু গোলরক্ষক ছাড়া অন্য কোন খেলোয়াড় যদি আহত হন, তাঁর পরিবর্তে কেবলমাত্র প্রথমার্দ্ধে নতুন খেলোয়াড় খেলান যেতে পারে। তবে খেলোয়াড় যদি গুরুতরভাবে আহত হন এবং রেফারী যদি মনে করেন যে তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভবপর নয়, সেই ক্ষেত্রে নতুন খেলোয়াড় খেলান চলবে।

আই এফ এর লীগ সাব-কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনার পর স্থির করে যে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে নির্দেশ আসলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আই এফ এর গভর্ণিং বডির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হবে।

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সকলে সাধুবাদ জানাবেন বলে মনে হয়। কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনায় আর কোন দলকে অসুবিধায় পড়তে হবে না।

পরলোকে কুস্তিগীর গামা

সম্প্রতি বিশ্বের ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর গামা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। চিকিৎসার জন্য লাহোরের হাসপাতালে আনার সময় গামা লাহোরের নিকটে নদীর ধারে একটা ভগ্নকুটীরে বাস করতেন। শেষ জীবনে গামা অর্থাভাবে কষ্ট পান।

ভারত বিভাগের ফলে শেষ জীবনে গামা পাকিস্তানে বসবাস করলেও এককালে তাঁর খ্যাতি শুধু ভারতে নয় ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে তিনি একমাত্র ভারতীয় কুস্তিগীর যাঁর পক্ষে বিশ্ববিজয়ী আখ্যা লাভ সম্ভবপর হয়েছিল। পরিণত বয়সে মৃত্যু হলেও শেষ জীবন তাঁর যেরূপ অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাতে হয় তা খুবই দুঃখের বিষয়! আশা করা যায়, সকলেই তাঁর উর্দ্ধেশে শ্রদ্ধা জানাবেন।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রশংসনীয় উদ্যম

রবীন্দ্র সরোবরে (ঢাকুরিয়া লেক) কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ষ্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার ক্রীড়াক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় রচনা হয়েছে। ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কোলকাতায় এখনও পর্য্যন্ত কোন বৃহৎ ষ্টেডিয়াম কাজে রূপান্তরিত হয়নি। কিন্তু তার পরিবর্তে দক্ষিণ কোলকাতায় আঞ্চলিক ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলো এখানে অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে এই ষ্টেডিয়ামের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্থানীয় তরুণ ও কিশোর-কিশোরী খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা। ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানিয়েছেন :—

(১) ৭ একর জমি জুড়ে এই ষ্টেডিয়াম। এই স্থানের মধ্যে ৪-৫একর জমিতে স্পোর্টস ও খেলার মাঠ, ২—৫ একর জমিতে প্যাভেলিয়ন, দর্শকদের গ্যালারী ও রাস্তা।

(২) ষ্টেডিয়ামের মধ্যস্থলে অলিম্পিকের মাপের (১১৫-৭৫ গজ) ফুটবল ও হকি মাঠ থাকবে।

(৩) দৌড়ের জন্য ৩৫ ফুট চওড়া ৪০০ মিটারের সিণ্ডার ট্রাক থাকবে।

(৪) সাইক্লিং-এর জন্য (২৫ ফুট চওড়া ও ৪৫২ মিটার দীর্ঘ) বাঁধের ট্রাক থাকবে।

(৫) উচ্চ লম্ফন, দীর্ঘ লম্ফন, পোল ভল্ট, ডিসকাস নিক্ষেপ ও সটপাটের ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) ৮০×৪৬ ফুট আয়তন বিশিষ্ট ষ্টেডিয়ামে একটি বক্তৃতা থিয়েটার নির্ম্মিত হয়েছে। এই কক্ষে ৬৪৪ জন দর্শক বা শ্রোতা বসতে পারবেন। একতলা ও দোতালার বারাণ্ডায় যথাক্রমে ১২৫ ও ২৭৫ জন দর্শক বসার ব্যবস্থা আছে।

(৭) দর্শকদের জন্য ৫টি ব্লক থাকবে। এর মধ্যে ২টি ব্লকের নির্ম্মাণ কাজ হয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের ব্লকের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে। এর পর পুব দিকের ব্লক নির্ম্মাণের কাজ সুরু হবে।

(৮) প্যাভেলিয়ন বিল্ডিংয়ে দোতালায় ক্রীড়া-সমালোচকদের জন্য বিশেষ আসন নির্ম্মানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অবদানকে নিশ্চয়ই সকলে স্বাগত জানাবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হউক, এটাই সকলে চান।

ক্রীড়াক্ষেত্র বর্ত্তমানে 'রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে' পরিণত

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরে কোলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নির্ম্মিত ষ্টেডিয়ামের উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কোলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্র সম্পর্কে যে কটাক্ষ করেছেন সেটা নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, কোলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্র বর্ত্তমানে "রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে" পরিণত হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ডাঃ রায় ক্রীড়াক্ষেত্রে সকল দুর্নীতির কথা জানেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন এর প্রতীকার হয়নি, এটাই সকলের প্রশ্ন। ক্রীড়াক্ষেত্রের এই দুরবস্থার জন্য সরকারের কি কোন দায়িত্ব নেই?

মোহনবাগানের তৃতীয় বার বাইটন কাপ লাভ

ক্রীড়াজগতে বহু ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ১৯৬০ সালের বাইটন কাপ লাভ করে তাদের গৌরবময় ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। বাইটন কাপের ফাইন্যালে তারা বোম্বাই হইতে আগত ভারতীয় নৌ-বাহিনীকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। এই সাফল্য তাদের এ প্রথম নয়। এর পূর্ব্বে ১৯৫২ ও ১৯৫৮ সালে তারা বাইটন কাপ লাভ করেছিল। ১৯৫৬ সালে তারা ফাইন্যালে উঠেও সার্ভিসেস দলের নিকট পরাজয় বরণ করে। এবার মোহনবাগান অপরাজিত ভাবে হকি মরশুম শেষ করেছে। তারা লীগের 'রাণার্স-আপ' হয়। এবারকার সাফল্যের জন্য দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

বৈশাখ, ১৩৬৭ (এপ্রিল-মে, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল): 'ভারত উত্তর সীমান্তের উপর আপন দাবী কোনক্রমেই ছাড়িবে না'—পাটনায় জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দৃপ্ত ঘোষণা।

২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে (পশ্চিমবঙ্গ) যথার্থ গণতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত করার দাবী—মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের প্রস্তাব।

৩রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): গৌহাটির জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—ভারতের উত্তর সীমান্তের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪ঠা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রী সি, রাজাগোপালাচারীকে জনসভায় আক্রমণের চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাজে জনৈক সশস্ত্র যুবক গ্রেপ্তার।

৫ই বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): প্রতিরক্ষা অডিট রিপোর্ট সম্পর্কে লোকসভায় তুমুল হট্টগোল—স্পীকার ও শ্রীফিরোজ গান্ধীর মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা।

৬ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): সীমান্ত বৈঠক উদ্দেশ্যে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌএন-লাই-এর নয়াদিল্লী উপস্থিতি।

দিল্লীতে প্রায় ৬০ জন হিন্দু মহাসভা কর্মী গ্রেপ্তার—চৌ-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের জের।

৭ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা লইয়া নয়াদিল্লীতে প্রত্যাশিত নেহরু-চৌ বৈঠক আরম্ভ।

৮ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল): দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে সীমান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে নেহরু-চৌ চার ঘণ্টাব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সহিত চীনা প্রধান মন্ত্রীর (চৌ) পৃথক বৈঠক।

৯ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল): সমগ্র দেশে (ভারত) একটি খাদ্যাঞ্চল গঠনই খাদ্যসমস্যা সমাধানের উপায়—সাংবাদিকদের নিকট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

তৃতীয় দিনে চীন-ভারত সীমানা বিরোধ প্রসঙ্গে দিল্লীতে নেহরু-চৌ তিন ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

১০ বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): সীমান্ত প্রশ্নে নয়াদিল্লীতে চীন-ভারত প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের দীর্ঘতম আলোচনার অনুষ্ঠান।

১১ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): দিল্লীতে নেহরু-চৌ আলোচনার পঞ্চম দিনেও সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার সাধারণ পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা।

ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস্ পি ও বলশেভিক পার্টির উদ্যোগে বারাসতে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান—রাজ্যব্যাপী খাদ্য-আন্দোলন পরিচালনার জন্ত খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধ কমিটি গঠন।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সদলবলে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিতি।

১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে পাঁচ দিনব্যাপী নেহরু-চৌ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

১৩ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): 'সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আমরা পরস্পরের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারি নাই'—চীন-ভারত প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের সীমান্ত সম্পর্কে লোকসভায় শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

মণিপুরে তিন দিনের জন্ত কারফিউ জারী—সত্যাগ্রহীদের (রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন দাবীকারী) উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

১৪ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): স্বনামধন্য রস-সাহিত্যিক শ্রীরাজশেখর বসুর ('পরশুরাম') কলিকাতার বাসভবনে জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): প্রতিরক্ষা অডিট রিপোর্ট প্রণেতারা যথাযথ বিধি পালন করেন নাই—লোকসভায় বিবৃতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের মন্তব্য।

১৬ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): ভারতীয় অঞ্চলে চীনা সৈন্তের আক্রমণ প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এর উষ্মা—পিকিং ফিরিবার পথে দমদম বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের নিকট মন্তব্য।

১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): বোম্বাই রাজ্যের বিভাজনান্তে মধ্যরাত্রিতে নূতন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের অভ্যুদয়।

১৮ই বৈশাখ (১লা মে): নূতন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন—মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহতা।

১৯শে বৈশাখ (২রা মে) নাগপুরে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—পৃথক্ বিদর্ভ রাজ্য গঠন আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহত হাঙ্গামার জের।

২০শে বৈশাখ (৩রা মে): দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কমুনিষ্টপ্রার্থী শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্তের ১৩ সহস্রাধিক ভোটে জয়লাভ—কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তের পরাজয় বরণ এবং পি এস পি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত।

২১শে বৈশাখ (৪ঠা মে): জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান এবং দেশের প্রতি জনগণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ—বোম্বাই-এ নাগরিক সম্বর্দ্ধনার প্রতিভাষণে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের দাবী।

২২শে বৈশাখ (৫ই মে): 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ'—প্রাথমিক শিক্ষক প্রতিনিধি দলের দাবীর উত্তরে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উক্তি।

২৩শে বৈশাখ (৬ই মে): প্রবর্ত্তিত সার্ভিস কন্‌ডাক্ট রুলস্-এর প্রতিবাদে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বিরাট সমাবেশ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

২৪শে বৈশাখ (৭ই মে): [illegible]

বিরোধী দলের সহিত আসাম সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ—৮জন নাগা নিহত ও অপর কয়েকজন আহত হওয়ার সংবাদ।

২৫শে বৈশাখ (৮ই মে): কলিকাতা সহ ভারতের সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত।

২৬শে বৈশাখ (৯ই মে): পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের প্রতি অমর্য্যাদা—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী সদস্যদের অভিযোগ।

২৭শে বৈশাখ (১০ই মে): পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধান পরিষদের নয়টি আসনের নির্বাচন সম্পন্ন—কংগ্রেসের ৬টি, কমুনিষ্ট পার্টির ১টি, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ১টি এবং অন্যান্য বিরোধী দল সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১টি আসন অধিকার।

২৮শে বৈশাখ (১১ই মে): 'সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু প্রেরণ উচিত হইবে না'—পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সর্বসম্মত (সরকারী ও বিরোধী সদস্যবৃন্দ) অভিমত।

২৯শে বৈশাখ (১২ই মে): প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের (নেহরু-চৌ) বৈঠকে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ—কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের কলিকাতা বৈঠকের প্রস্তাব।

৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে): হায়দ্রাবাদে ভারতীয় রেল-ষ্টেশন মাষ্টার ও সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার সমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত—দাবীদাওয়ার পূরণ না হইলে ২৪শে আগষ্ট হইতে রেল ধর্মঘট।

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে): শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা পৌরসভার মেয়র পদে ইস্তফা।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল): থাই বিমানবাহিনীর অধিনায়ক সমেত ১৮জন নিহত—তাইপের (ফরমোসা) নিকট বিমান দুর্ঘটনার জের।

৩রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): এশীয় ও আফ্রিকায় জনগণ সামরিক চুক্তি ও আণবিক যুদ্ধের বিরোধী—গিনিতে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনের ঘোষণা।

৪ঠা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): লণ্ডনে একই দিনে দুইটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল—আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের দাবী ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যমূলক নির্য্যাতনের প্রতিবাদ।

৬ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): সিউল সহ দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫টি সহরে সামরিক আইন জারী—প্রেসিডেন্ট রী'র বাসভবনের সম্মুখে পুলিশের গুলীতে অসংখ্য ছাত্র হতাহত।

১০ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): সিংহলের গভর্ণর জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলক কর্ত্তৃক সিংহল পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ২০শে জুলাই নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ জারী।

১২ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): ইরাণে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রায় তিন হাজার নর-নারী ও শিশুর প্রাণহানি—দক্ষিণাঞ্চলের লার ও গাবাস সহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

১৩ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): জনতার চাপে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিংম্যান রী'র পদত্যাগ।

১৪ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): কাটমাণ্ডু-এ নেপালের প্রধান মন্ত্রী বি, পি, কৈরালার সহিত চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এর বৈঠক।

১৫ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা—তুরস্ক সরকার কর্ত্তৃক উভয় স্থানে সামরিক আইন জারী।

১৭ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের মার্কিণ জাহাজ বর্জন অভিযান সুরু—নিউইয়র্কে আরব প্রজাতন্ত্রের 'ক্লিওপেট্রা' জাহাজ বর্জনের পাল্টা কার্য্য ব্যবস্থা।

১৯শে বৈশাখ (২রা মে): ১২ বৎসর আইনের লড়াই-এর পর ক্যালিফোর্নিয়ায় সানকুয়েন্টিন কারাগারে গ্যাস চেম্বারে নারীহরণের দায়ে কয়েদী-লেখক ক্যারিল চেসম্যানের মৃত্যুবরণ।

২০শে বৈশাখ (৩রা মে): বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান কর্ত্তৃক লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন—ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রমুখের যোগদান।

২১শে বৈশাখ (৪ঠা মে): আগামী চার বৎসরে এক কোটি ৭০ লক্ষ ম্যাট্রিক টন মার্কিণ খাদ্যশস্য ভারতকে প্রদানের ব্যবস্থা—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (আমেরিকা) কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট চুক্তি স্বাক্ষরিত।

সীমান্ত নেতা খান আব্দুল গফুর খানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাক ট্রাইবুন্যালের পরোয়ানা জারী—উচ্ছেদমূলক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ দায়ের।

২২শে বৈশাখ (৫ই মে): ১লা মে (মে দিবস) সোভিয়েট আকাশ হইতে রকেটের সাহায্যে পাইলট সমেত মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার চাঞ্চল্যকর সংবাদ—সুপ্রীম সোভিয়েটে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

২৪শে বৈশাখ (৭ই মে): স্বাস্থ্যের কারণে মার্শাল ভরোশিলভের প্রেসিডেন্ট পদ হইতে অবসর গ্রহণ—মঃ লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁহার স্থলে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত।

২৫শে বৈশাখ (৮ই মে): প্যারিসে প্রেসিডেন্ট চার্লস দ্য গলের সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বৈঠক—শীর্ষ সম্মেলন, জার্মাণ প্রশ্ন, নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পর্য্যালোচনা।

২৭শে বৈশাখ (১০ই মে): 'মার্কিণ গোয়েন্দা বিমানের ব্যবহারের জন্য ঘাঁটি দেওয়া হইলে প্রতিশোধাত্মক কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে'—পাকিস্তান, তুরস্ক ও নরওয়েকে লক্ষ্য করিয়া সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

২৮শে বৈশাখ (১১ই মে): 'স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই রুশিয়ার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি চালাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে'—ওয়াশিংটনে সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা।

২৯শে বৈশাখ (১২ই মে): রুশিয়ায় ভূপাতিত মার্কিণ গোয়েন্দা বিমানের পাইলট ফ্রান্সিস পাওয়ার্স কর্ত্তৃক গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ স্বীকার—মস্কোয় পাওয়ার্সের যথোচিত বিচারের উদ্যোগ আয়োজন।

আমেরিকা কর্ত্তৃক সোভিয়েট অভিযোগ অস্বীকার—গোয়েন্দা বিমান প্রসঙ্গে রুশ সরকারের নিকট মার্কিণ নোট প্রেরণ।

৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে): দশ দিবসব্যাপী কমনওয়েলথ সম্মেলনের (লণ্ডন) সমাপ্তি—প্রধান মন্ত্রীদের যৌথ ইস্তাহারে শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণের পথ সুগম হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ।

৩১শে বৈশাখ (১৪ই মে): প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ সম্মেলনে (১৬ই মে) যোগদানের জন্য রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের প্যারিস উপস্থিতি।

বেকার-সমস্যা

"বর্তমান বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্ত এক দিকে সরকারী কর্তারা সমবায় ভিত্তিতে ছোট ছোট শিল্প গড়িবার জন্ত বাঙ্গালী যুবকদের উদ্যোগী হইতে বলিতেছেন, অন্ত দিকে আবার তাহাদের উদ্যোগের দফা-রফা করিতেও ছাড়িতেছেন না। কল্যাণীতে শিক্ষিত যুবকদের নানা বিষয়ে ট্রেণিং দিবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। কল্যাণী হইতে শিক্ষালাভের পর কয়েকজন যুবক সমবায় ভিত্তিতে একটি বালতি, ড্রাম ইত্যাদি তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। সরকার হইতে ইহাদের অর্থ সাহায্য করিবার কথা; কিন্তু এক বৎসরের উপর হইতে চলিল, সরকারী সাহায্য আর ইহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। এই ধরণের ঘটনা একটি নয়—আরও আছে বলিয়াই জানা যায়। সরকারী অর্থ সাহায্যের অভাবে এই ধরণের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে সরকারী দীর্ঘসূত্রতার অবসান হইতেছে না।"

—দৈনিক বসুমতী।

চোর-পুলিশ

"রেলের বৈদ্যুতিক তার এবং ডাক বিভাগের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার চুরির কথা প্রায়ই শুনা যায়। কিন্তু গত রবিবার শেষ রাত্রে মানকুণ্ডু ও ভদ্রেশ্বরের মাঝামাঝি স্থানে বৈদ্যুতিক রেলপথের তার চুরির ফলে যে বিভ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর! এই স্থানে তার চুরির ফলে দিল্লী এক্সপ্রেস ও দেরাদুন এক্সপ্রেসের হাওড়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়। এজন্য হাওড়া আগমনকারী পাঁচখানা সুবারবন ট্রেন বাতিল করিয়া দিতে হয়। অবশেষে তিন ঘণ্টা কালব্যাপী চেষ্টার পর নূতন বৈদ্যুতিক তার বসানো হয় এবং নিয়মিতভাবে ট্রেন চলাচল আরম্ভ হয়। এই ঘটনা হইতে রেলের বৈদ্যুতিক তার চুরি সম্বন্ধে রেল কর্তৃপক্ষের অধিকতর সতর্ক হওয়া কর্তব্য। সত্য বটে যে, রেলের সকল স্থানে দিবারাত্র তারের পাহারা বসানো সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধারণের ধারণা যে এক বিশেষ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীর দল এইরূপ অনাচারের নায়ক এবং তাহাদের সহিত রেলে নিয়োজিত ব্যক্তি ও পুলিশের যোগসাজশ রহিয়াছে। যাহারা তার বিক্রয়ের ব্যবসা চালায় দুষ্কৃতকারীদের সহিত তাহাদেরও যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়। রেল কর্তৃপক্ষ এই ধরণের চুরি বন্ধ করিবার জন্য যদি একটি নির্ভরযোগ্য বিশেষ ধরণের গোয়েন্দা দল গঠন করেন এবং এই ব্যাপারে সন্দেহজনক ব্যক্তিগণকে যদি বিনাবিচারে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সুফল হইতে পারে বলিয়া মনে করি। মোটের উপর, ব্যাপারটি একেবারেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। কারণ এই শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের কার্য-কলাপের ফলে যাত্রিসাধারণের জীবনও বিপন্ন হইতে পারে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

টেলিফোন বিভ্রাট

"কলিকাতায় টেলিফোনের জনৈক মুখপাত্র এখানে সর্বাপেক্ষা চড়া মাশুল ধার্য করার অনুকূলে যুক্তি দিয়াছেন যে,—বোম্বাই-এ লাইন প্রতি কলের সংখ্যা বেশী; সেজন্ত পড়তা খরচ কম পড়ে। আর কলিকাতায় লাইন প্রতি কলের সংখ্যা কম, প্রতি যন্ত্রে প্রত্যহ গড়ে সাতটি কল করা হয়। সেজন্ত বোম্বাই-এর তুলনায় এখানে টেলিফোন চালু রাখিবার খরচ বেশী পড়ে। এই কারণেই কর্তৃপক্ষ নাকি কলিকাতায় সর্বাপেক্ষা চড়া মাশুল ধার্য করিয়াছেন। এই যুক্তিটি সত্য হইলে মাদ্রাজে লাইন প্রতি কলের সংখ্যা নিশ্চয়ই বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ার কথা। নতুবা সেখানে আরও কম মাশুল ধার্য হইত না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তুলনামূলক অবস্থা আমাদের জানা নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহা যোগাড় করিতে পারিবেন। তবে সে তালিকা না দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, মাদ্রাজে কলের সংখ্যা কোন ক্রমেই বেশী হইতে পারে না, বরঞ্চ অনেক কম। অতএব তাঁহার যুক্তিটি সম্পূর্ণই উদ্ভট কল্পনার আতিশয্য। ব্যবসাবুদ্ধির দিক দিয়াও ইহা অচল। টেলিফোনের জন্ত কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৪৲ হিসাবে যে ভাড়া আদায় করিতেন তাহাতেই রক্ষণাবেক্ষণের মামুলি খরচ উশুল হইয়া থাকে। মাসে অনধিক নব্বইটি কল হইলে ভাড়ার মধ্যে বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। নতুবা সে সব ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়া হইতে দুই টাকা রিবেট দেওয়ায় পরেও প্রচুর মুনাফা হইত না। কলিকাতা টেলিফোনের একজন মুখপাত্র এরকম উদ্ভট যুক্তি দ্বারা নিজেকে হাস্যাস্পদ না করিলেই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন।" —যুগান্তর।

অন্ধ বিদ্বেষ

"শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমানে মার্কিন মুলুক সফর করিতেছেন। একবার কংগ্রেসী সভানেত্রী হইবার পর তাঁহার মুখ খুলিয়া গিয়াছে। সহজে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। আর মুখ খুলিলেই বেফাঁস বলিয়া ফেলেন। মার্কিন দেশে ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় তিনি বলিয়াছেন, চীন যে সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে তাহার দ্বিগুণ সময়েও যদি ভারত উন্নতি করিতে পারে তাহা হইলেও ভারতবাসী সন্তুষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাও না করিতে পারিলে ভারতবাসী নাকি চীনের প্রতি ঝুঁকিবে (ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায় অবশ্য চীনের একনায়কত্বের প্রতি ঝুঁকিবে।) খাস আমেরিকায় বসিয়া চীনের বিপুল অগ্রগতির স্বীকৃতি ভালো, কিন্তু প্রকারান্তরে ভারতের যে তুলনামূলক শোচনীয় চিত্র তাঁহার বক্তৃতায় উদ্ঘাটিত হইল সে জন্ত তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই বরং একই সঙ্গে চীনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। ক্রমে ইহাই পরিস্ফুট হইতেছে যে, চীনের অগ্রগতির প্রভাব হইতে ভারতের মানুষকে দূরে রাখার জন্তই যে কোনো উপলক্ষ্যে যে কোনো কংগ্রেস-নেতা আজকাল তাঁহাদের মনযোগ কেন্দ্রীভূত করিতেছেন। সম্প্রতি পণ্ডিত পন্থ ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরেড্ডির বক্তৃতাবলী হইতেও তাহা অনুমান করা যায়। আ পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং কমনওয়েলথ সম্মেলনে বসিয়া বলিলেন চীন, সমগ্র

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য সীমায়িত রাখিলে তবু শ্রীনেহরুর ক্রোধের কারণটা বোঝা যাইত।"

—স্বাধীনতা।

ঘড়ি তৈরি

"ঘড়ি তৈরির বড় কারখানার কথা খুব শোনা যাইতেছে, ১৫ টাকায় নাকি টেবিল ঘড়ি পাওয়া যাইবে। এই একটি জিনিষ কুটীরে খুব ভাল তৈরি হইতে পারে সুইজারল্যাণ্ড তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে। দিল্লী সরকারের শিল্প ও শ্রম ডিরেক্টর ঘড়ি তৈরিকে কুটীরশিল্প পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন এবং যাহারা উহার জন্ত টাকা ও সুযোগ চায় তাহাদের দরখাস্ত আহ্বান করিয়াছেন। যে মাসের মধ্যেই বোধ হয় টাকা দেওয়া সুরু হইয়া যাইবে। দেয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি এবং হাত ঘড়ি তিনটিই তাহারা তৈরি করিবে। এই তিনটি এবং সেই সঙ্গে ইলেকট্রিক মিটার নির্ম্মাণে বাঙ্গালী তরুণেরা প্রচুর দক্ষতা দেখাইতে পারিবে, ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে তাহা হইবার নহে। এখানে মন্ত্রীরা দুইটি জিনিষে শুধু বিশ্বাস করেন—বৃহৎ শিল্প এবং চোর-সমবায়। সৎপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের আস্থা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের মারফৎ ছাড়া টাকা দিবে না, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার টাকা চাহিবে না। বাঙ্গালী তরুণের সুযোগ মিলিয়াও মিলিবে না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

ভাগ্যের পরিহাস

"ব্যয়ের পরিমাণ দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। পুনর্ব্বাসনের জন্ত ১১৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে পার্টিশানের কালিমা এখনও মুছিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালী আজ ছারখার হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গালী স্বাধীনতার স্বাদ এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই, পারিয়াছে কেবল বেদনা ও অশ্রুর। যাঁহারা দিল্লীর মসনদে আছেন তাঁহারা আজ কোথায় থাকিতেন যদি এই অভিশপ্তের দল পার্টিশনের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিত? মানুষের বেদনাকে লইয়া এইভাবে উপহাস আর কতকাল চলিবে? যে অসন্তোষের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছে তাহার পরিব্যাপ্তি ঘটিলে বক্তৃতার সাহায্যে তাহাকে ঠেকানো কি সম্ভব হইবে? হে ভাগ্যবিধাতার দল! সতর্ক হও, লোকসভায় ব্রুট মেজরিটির উন্মত্ততায় বাস্তবকে উপেক্ষা করিও না, স্মরণ কর লৌহমানব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সেই সতর্কবাণী, "It will be folly to ignore realities; facts take their revenge if they are not faced squarely and well."

—সমাধান (হুগলী)

অসহনীয় পরিস্থিতি

"আবার সেই চিরন্তন সমস্যা—যা মানুষের মূল ও প্রধান সমস্যা। এই মূল সমস্যা মাথা চাড়া দিয়াই আছে—আলোচনা ও সমালোচনা ক্ষণিক বা সাময়িক স্তব্ধ হইলেও সমস্যা যেখানে সেখানেই আছে—সমাধানের পথ দূরের দিগন্তে, যার স্পর্শ অনুভূত হয় নাই, কবে হইবে কেহ জানে না—বলিতেও পারে না। যাহাদের বলিবার কথা বা যাহাদের কাছে জনসাধারণ এ সম্বন্ধে কিছু জানিবার প্রত্যাশা করে সেই কর্ত্তৃপক্ষও প্রকৃতপক্ষে নীরব। চাউলের দর আবার বাড়িতেছে—খুব যে একটা কমিয়াছিল তাহা নয়, তবে যাহা স্থিতাবস্থায় ছিল তাহা আবার ধীরে ধীরে আকাশচুম্বী হইবার পথ ধরিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। মিলওয়ালা বা আড়তদার বলিতেছে যে যেহেতু আমদানী কম সেইহেতু দর বাড়িতেছে, আমরা দেখিতেছি যে বহু অবস্থাপন্ন জোতদার দেশের আপামর মানুষের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আরও দর বা লাভের প্রত্যাশায় ধান আটকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা এবারের বর্ষণে বিলম্ব দেখিয়া আরও উৎফুল্ল হইতেছেন। এই ধরণের দেশ বা দেশের মানুষের সম্বন্ধে উদাসীন, বিত্তের প্রতি অতিলোভ যে কতদিন তাহাদের খেলা দেখাইতে থাকিবে কে জানে? কর্ত্তৃপক্ষ নীরব অথচ বেশীর ভাগ মানুষের জন্ত তাহাদের সরব হওয়া প্রয়োজন ছিল বা আছে। গ্রামাঞ্চলে চাউলের অভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে—অচিরেই হয়ত প্রকটতর হইয়া উঠিবে। অথচ গ্রামাঞ্চলে মডিফায়েড রেশনিং-এর বন্দোবস্তের এখনও অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। উপদেশ বক্তৃতা বাণী ও এ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তার মর্ম্ম উপলব্ধিতে অক্ষম। সহরাঞ্চলে অল্প-আয়ী নিম্ন-মধ্যবিত্তের দুর্দ্দশাও অসীম।"

—বীরভূমবার্ত্তা।

চাই সেচ

"অনাবৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র হাহাকার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রতিকার প্রার্থনা করছেন। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সুচিকিৎসক হলেও অনাবৃষ্টির কি চিকিৎসা তিনি করবেন? বৃষ্টি আনবার ক্ষমতা তো তাঁর নেই? তবে একেবারেই কি নেই? তেরো বৎসর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে। সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে বড় বড় সেচ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। অথচ আজ পর্য্যন্ত দেশের সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা হল না। বাবা ভৈরবের কৃপা, কিংবা বরুণ দেবের পূজা নয়, অনাবৃষ্টির একমাত্র ঔষধ সেচ।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

ব্যর্থ শীর্ষ-বৈঠক

"শান্তিসম্মেলন যে ব্যর্থ হইবে, এ আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছিলাম, কারণ, সরিষার মধ্যে ভূত থাকিলে তাহা দিয়া ভূত ছাড়ান যায় না। একটা বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ হইবেই। ধামা চাপা দিয়া দুনিয়ার অসুরের রাজত্বকে আর কতদিন সুরের রাজত্ব বলিয়া চালান যাইবে? জুয়াচুরি, চুরি, ধাপ্পাবাজি দিয়া এতদিন গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাতন্ত্র চলিয়াছে। একটা বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের পর পৃথিবী মুক্তিস্নান করিবে, মানুষে মানুষে নূতন সম্পর্কের সৃষ্টি হইবে। এ সম্পর্কে এ-দেশের মনীষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সাল যে পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক, ভারতের পক্ষেও, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শান্তিসম্মেলনের ব্যর্থতা, নূতন করিয়া উগ্র স্নায়ুযুদ্ধের সুরু—সেই অন্ধকার-ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিতেছে।"

—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি

"আর প্রত্যাহারই যখন করা হইল তবে আরও দুই দিন আগে করা হইল না কেন? তাহা হইলে হয়ত অসহায় সরল বিশ্বাসী একটি উদ্বাস্তুর জীবন শেষ হইত না। একটি উদ্বাস্তুর জীবন যখন নিশ্চিতরূপে শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন দাবী না মিটিতেই অনশন প্রত্যাহার করা হইল কেন? ইহা কি অনশনকারী উদ্বাস্তুদের দাবীর প্রতি আন্তরিকতার নিদর্শন? কমিউনিষ্ট পার্টি সভায় অনশন প্রত্যাহার দ্বারা প্রথম অনশনকারী উদ্বাস্তুদের অনশন ভঙ্গ করিতে বাধ্য করা হয় নাই কি? কমিউনিষ্ট পার্টির সভায় যে আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, সম্মিলিত উদ্বাস্তু সমিতির স্লোগানও কি তাহাই ছিল? সম্মিলিত উদ্বাস্তু সমিতির যত সভা হইয়াছে তথায় কোথাও তো আইন অমান্যের কথা পূর্ব্বে ঘোষণা করা হয় নাই? যাঁহারা প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তো কোথাও আইন অমান্যের কথা বলেন নাই? বরঞ্চ তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অগ্রসর হইবার কথাই বার বার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা হইলে হঠাৎ উদ্বাস্তুদের উপর কমিউনিষ্ট পার্টির আইন অমান্যের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন? তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্বাস্তু আন্দোলন উদ্বাস্তুদের দাবী আদায়ের জন্য নহে, তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল? সেই জন্যই অর্দ্ধপথে অনশন প্রত্যাহার করিয়া আইন অমান্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে? ত্রিপুরায় আবার একটা অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াসে উদ্বাস্তুদের দলে টানার জন্যই কি উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়াছিল? কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই কি উদ্বাস্তুদের ক্রীড়নক করা হইয়াছে? কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট ত্রিপুরার শান্তিকামী জনসাধারণ এই প্রশ্নগুলির জবাব দাবী করিতেছে। জানি না, তাঁহারা আদৌ জবাব দিবেন কি না, বহুবার বহু প্রশ্ন করা হইয়াছে, একটিরও জবাব তাঁহারা দেন নাই।"

—গণরাজ (আগরতলা)।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সার্থকতা

"গান, কবিতা, আবৃত্তি, অভিনয় কোনটাই অবাঞ্ছনীয় নয়। জানি, অফুরন্ত তাঁহার গান, প্রাণবন্ত তাঁহার কবিতা, আর বৈচিত্র্যময় তাঁহার অভিনয়,—সুরে সুরে তিনি যাদুমন্ত্র মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। গদ্যে পদ্যে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে সন্দর্ভে সরস্বতীর ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বলিব, শুধু আনুষ্ঠানিক আবেষ্টনীর মধ্যে আর তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না, জনতাকে তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কর্ম্মপ্রবণতায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। পুষ্পিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্য সাহিত্যের ঘোর ঘনঘটা বিকীর্ণ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে মানুষের মধ্যে মিলাইতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে কবির নিজের কথাই সামান্য কিছু (স্থানাভাবে) উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"তারা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণতঃ সে মিলন নিকটের ও প্রত্যহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের মুখোমুখি করবার কাজে। রবীন্দ্র-জয়ন্তী কমিটির সম্মুখে এই এক বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। মানুষের দরদী এই মানুষটিকে মানুষের মাঝখানে টানিয়া আনিতে পারার মধ্যেই রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সার্থকতা।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

বক দেশ-সেবক

"দেশের সেবক সাজিয়া দেশবাসীদের মঙ্গল করিবার ছলনা করিয়া সরলপ্রাণ ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে ও করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর একান্ত সচিব (সেক্রেটারী) শ্রীনির্ম্মল বসু ও স্বাধীন ভারতের স্বনামধন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মরহুম মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লিখিত পরম ধার্ম্মিকের সেবকত্বের মধ্যে সে বকত্ব দেখিয়া চমকিত ও চমৎকৃত হইবেন। মহারাজ দশরথের আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র যেমন হিংস্র জন্তু বকের পরম ধার্ম্মিকত্ব দেখিয়া ভুল করিয়াছিলেন, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা-প্রয়াসী স্বরাজ্য দলের স্বর্গত মোতীলাল নেহরুর আদরের একমাত্র পুত্র কত আন্তরিক স্বার্থপর বাহিক স্বার্থত্যাগী দেশসেবকরূপী বককে ধার্ম্মিক জ্ঞানে যে সব ভুল করিয়া ভুলকে বজায় রাখার জিদ ধরিয়া মোস্লেম শাস্ত্রে বর্ণিত এজিদ রাজার মত নিন্দনীয় হইতে চলিয়াছেন ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইয়াও যে শপথ ভুলিয়া ভুল স্বপথে চলায় ভারতকে যে অবস্থায় আনিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ দুই শত বৎসরে যে দুর্গতি দিতে পারে নাই, আজ ভারতবাসী পথে ফেলা পাত হইতে কুকুরের সঙ্গে ভাত কুড়াইয়া খাইতেছে। বহু বকরূপী সেবক এর জন্য দায়ী। সেবকবেশী বকগুলি থাকিতে দেশের মঙ্গল নাই।"

—জঙ্গীপুর সংবাদ।

খাদ্য-সমস্যা

"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় জনসাধারণ এমনিতেই পিষ্ট, তদুপরি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় জনসাধারণের দুর্দ্দশা একেবারে চরমে পৌঁছিয়াছে। এই অবস্থায় বর্ষার প্রারম্ভেই চাউলের বাজারের অনিশ্চিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা স্বভাবতঃই উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বহুনিন্দিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হইতেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকার ব্যর্থ হইতেছেন। ইহার পেছনে কোন দুষ্টচক্রের গোপন হাত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে বলিয়া প্রায়ই খবর পাওয়া যায়। এই সন্দেহ যে অন্ততঃ আংশিক পরিমাণেও সত্য, গত কয়েক সপ্তাহে চাউলের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে যুগশক্তিতে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। এই ধরণের ষড়যন্ত্রের সহিত যে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীর একাংশই জড়িত, তাহা নহে। বস্তুতঃপক্ষে

এবং ব্যবসায়ীদের একটি অংশও অধিক লাভের আশায় এই অপকর্মে সহায়তা করিয়া থাকে। ফলে অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থায়, যখন চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না, তখনও চাউলের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায়। পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন কিঞ্চিৎ বিলম্বে সক্রিয় হইয়া উঠেন, তখন মূল্য বৃদ্ধি কিছুটা রোধ হইলেও পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আর ফিরিয়া আসে না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হইতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ভাবে জনসাধারণের মুখের অন্ন লইয়া কোন কোন দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী এবং মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা এই ছিনিমিনি খেলিতেছেন।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

খেয়ালমাফিক পাঠ্যপরিবর্ত্তন

"সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন হাই ও জুনিয়ার হাই স্কুলের নির্দ্ধারিত পুস্তকতালিকা Book List বহির্ভূত পাঠ্যপুস্তক জোর পূর্ব্বক পড়ানো হইতেছে। ফলে যে সব ছাত্ররা পুস্তক-তালিকা অনুযায়ী বই কিনিয়াছিল তাহাদের আবার নূতন করিয়া আর একদফা বই কিনিতে হইতেছে। ইহার ফলে দরিদ্র অভিভাবকরা অহেতুক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। কাহার স্বার্থে এই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে ও দরিদ্র অভিভাবকদের এইভাবে অহেতুক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্ত দায়ী কে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ত আমরা দুর্নীতি দমন বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি। নিম্নে দুইটি উদাহরণ প্রকাশিত হইল। প্রয়োজন হইলে আরও তথ্য সরবরাহ করা হইবে। বড়শাল জুনিয়ার হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্ত সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক শ্রীমাধব দাস সাংখ্যতীর্থ প্রণীত সংস্কৃত-পরিচয় পুস্তক-তালিকায় (Book List) নির্দ্ধারিত করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত সংস্কৃত-পরিচয় বইটি পড়ানো হইতেছে। ফলে ছাত্রদের দুই দফা বই কিনিতে হইয়াছে। জয়কৃষ্ণপুর পাথ্‌ড়িয়ার জুনিয়ার হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর জন্ত শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রবেশিকা জ্যামিতি পুস্তক-তালিকায় (Book List) নির্দ্দেশিত হয় কিন্তু বিদ্যালয়ে শ্রীকে পি, বসু প্রণীত আধুনিক জ্যামিতি পড়ানো হইতেছে! ফলে অভিভাবকরা দুই দফা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।"

—বীরভূম (রামপুরহাট)।

শোক-সংবাদ

রাজশেখর বসু

বাঙলার সুপ্রবীণ রসসাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য রাজশেখর বসু মহাশয় গত ১৪ই বৈশাখ ৮১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১২৮৬ সালের ৪ঠা চৈত্র তাঁর জন্ম। এম-এ পাশ করার পর তিনি আইনের পাঠ নিতে থাকেন। জীবনের প্রথমাংশে বিজ্ঞানসাধনাকে ইনি জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করে রাসায়নিক হিসেবে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন ও পরে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। পরবর্ত্তীকালে ইনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯২২ সালে সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটির মাধ্যমে সাহিত্যের দরবারে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। তদবধি তাঁর সারবান লেখনী অক্লান্ত গতিতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহুবিধ উল্লেখযোগ্য ফসল ফলিয়েছে। "পরশুরাম" ছদ্মনামে স্যাটায়ার ও হিউমারের সংমিশ্রণে বাঙলার রসসাহিত্যে তিনি যে বৈশিষ্ট্য আরোপ করে গেলেন তার তুলনা নেই। কেবলমাত্র রসসাহিত্যিক হিসেবেই নয়, রাসায়নিক, ভাষাবিশেষজ্ঞ, প্রবন্ধকার, শাস্ত্রবিদ ও অনুবাদক হিসেবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। বাঙলা ভাষাচর্চায়ও তাঁর অবদান অতুলনীয়। ১৯৩৫ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির ইনি সদস্য ছিলেন। 'চলন্তিকা' রাজশেখর বসুর এক অক্ষয় সৃষ্টি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সালে এঁকে ডি, লিট উপাধিতে এবং ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' সম্মানে বিভূষিত করেন। ১৯৫৫ ও ৫৮ সালে ইনি যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদামী পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানকালে রসসাহিত্যিকদের মধ্যে ইনিই সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁর গ্রন্থাদির মধ্যে গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, গল্পকল্প, ধুস্তরীমায়া, কৃষ্ণকলি, নীলতারা, আনন্দীবাই, চমৎকুমারী, লঘুগুরু বিচিন্তা (প্রবন্ধ), কুটীরশিল্প (শিল্পগ্রন্থ) রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যতীর্থ

ভারতবরেণ্য সুধীবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য যোগেন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যতীর্থ গত ২২এ বৈশাখ ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতীরূপে এঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এঁর জীবনব্যাপী নীরব জ্ঞানসাধনা দেশ ও জাতিকে বহুভাবে উপকৃত করেছে। প্রাচ্যবাণী-মন্দির এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার ইনি সভাপতি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মানাত্মক ডি লিট উপাধিতে বিভূষিত করেন (১৯৫৭)। অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থ এঁর লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ভারতবর্ষ থেকে একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জ্ঞানসাধকের অভাব ঘটাল।

পান্নালাল ঘোষ

প্রখ্যাত বংশীশিল্পী পান্নালাল ঘোষ গত ৭ই বৈশাখ ৪৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ভারতবরেণ্য সুরসাধক আলাউদ্দীন খাঁর কাছে ইনি শিক্ষালাভ করেন ও পরবর্তী জীবনে বংশীশিল্পী হিসেবে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন, বাঁশীতে এঁর দক্ষতা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে এবং সেই কারণে সারা দেশে ইনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইনি আকাশবাণীর বাদ্যযন্ত্র সুররচয়িতা ও পরিচালক ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেশিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
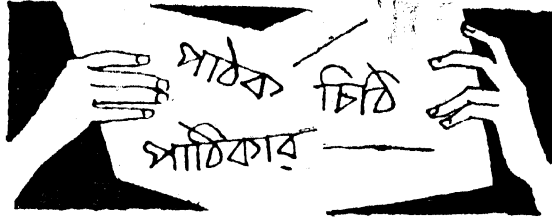
—সবিনয় নিবেদন—

[পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকা অনুগ্রাহক-অনুগ্রাহিকাদের পক্ষ থেকে সসম্মানে তাঁদের প্রিয়তমা পত্রিকা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত যাবতীয় লেখা ও রেখার সমালোচনা আহ্বান করা হচ্ছে। 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগটি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। এই বিভাগে প্রশ্ন ও উত্তর মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। যে কোন পার্থিব বিষয়ের অবতারণায় যে কেউ আলোচনা ও আলোকপাত করতে পারেন। বর্তমান সংখ্যা থেকে এই বিভাগে মূল্যবান আলোচনার জন্য কথঞ্চিৎ সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছে। আশা করি পাঠকগোষ্ঠীর নিকট থেকে পূর্ব্বের ন্যায় সহযোগিতা মাসিক বসুমতী লাভ করবে।

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]

পত্রিকা-সমালোচনা

মহাশয়, মাসিক বসুমতীর গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনন্যসাধারণ বিপ্লবী বীরদ্বয়ের স্মরণীয় আলেখ্য বিবৃত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে দু'-একটি তথ্যগত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ, সপ্তম প্যারাগ্রাফে সর্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন যে ছয়জন বিপ্লবী সহকর্মীকে বেছে "বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি" করে কাজ চালাবার ভার দিয়েছিলেন লিখিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে। অতঃপর, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও আনুষঙ্গিক শ্রেষ্ঠ বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর বর্ণনায় উপেন্দ্র বাবুর নামোল্লেখ নেই। আমি যতদূর জানতাম ও স্মরণে আছে এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার প্রথম স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সুদীর্ঘ রায়ে অথবা অন্যান্য বিবরণীতে উপেন্দ্র ভট্টাচার্য এ সকল মুখ্য ঘটনাবলীর অন্যতম নায়ক বা "সেনাপতি"রূপে দেখছি না। অবশ্য, এটা সত্য যে, নেতৃবর "মাষ্টার-দা"র (সূর্য্য সেনের) ২।১টি তালিকায় উপেন্দ্র বাবুর নাম ছিল এবং মোকদ্দমার সময় 'উপেন্দ্র' নাম শুনেছি ও পেয়েছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩০ ইং ১৮ই এপ্রিল রাত্রে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরদিন "চট্টগ্রাম আদালত, পুলিশ অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়তে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ আগমনের পর এই প্রথম ও শেষবারের জন্য চাটগাঁয়ের ওপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সামরিক ভাবে দেখা যায়।" এই তথ্য সঠিক নহে। ১৯শে এপ্রিল ও তারপর চট্টগ্রামে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। সহরে তখন এই বর্ণিত জাতীয় পতাকা দেখা যায়নি। ১৮ই এপ্রিল রাত্রির দুর্দ্ধর্ষ ঘটনাবলীর পরই রাতারাতি বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের বাহিরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ দলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এটা সত্য যে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ শৈলশিখরে বিপ্লবী যোদ্ধার দল এবং ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে কঠোর সংগ্রামের পর মাষ্টারদা' ও শ্রীলোকনাথ বলের নেতৃত্বে সাংঘাতিক আহত টেগরা (পরক্ষণেই ব্রিটিশ গুলীতে নিহত হরি বল, লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রমুখ মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ বিপ্লবীরা অল্পক্ষণের জন্য ত্রিবর্ণ পতাকা একটি আমলকী গাছের উপর উড্ডীন করেছিলেন। এবং ইহাই পরাধীন ভারতে রক্তাক্ত বিপ্লবী সৈনিকের হস্তে প্রথম স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন। দ্বিতীয়বার এই পতাকা উঠেছিল নেতাজীর আই-এন-এ বাহিনীর হাতে ইম্ফলের সমরাঙ্গনে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তৎসংক্রান্ত অভূতপূর্ব বিপ্লবী উত্থানের পর প্রায় তিন-চার দিন চট্টগ্রাম সহরে ব্রিটিশ শাসন ও সাধারণ জীবনযাত্রা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস-আদালত একরকম সব বন্ধ, সরকারী মহলে ঘোরতর চাঞ্চল্য, রেললাইন ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগও প্রায় সম্যক বিচ্ছিন্ন, বিশেষতঃ সরকারী বে-সরকারী ইউরোপীয়ান সকলেই প্রবল ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে ১৯শে এপ্রিল থেকে ৩ দিন কর্ণফুলী নদীর মোহনার অদূরে সমুদ্রে একখানি জার্মেণ জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২২শে এপ্রিল (রেললাইন ঠিক হওয়ার পর) শিলং থেকে কর্ণেল ডালাস স্মিথের নেতৃত্বে ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলস্ সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম আগমন করেন। এঁরাই শহরের অনতিদূরে জালালাবাদ পার্বত্য অঞ্চলে বিপ্লবী দলের সহিত সেদিন সারা বিকাল, সন্ধ্যা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৃতীয়তঃ, গত ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে পাঠক-পাঠিকার চিঠির পৃষ্ঠায় শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন উক্ত প্রবন্ধ লেখকের বর্ণিত পলাতক সূর্য সেনের সংবাদ বা গ্রেপ্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত "দশ হাজার" টাকা পুরস্কারের কথা শুদ্ধ করে লিখেছেন তা "পনর হাজার" ছিল। বস্তুতঃ, শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য সঠিক তথ্যই দিয়েছেন। প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্য্য সেনের পাত্তা না পেয়ে ধুরন্ধর ব্রিটিশ সরকার তা বাড়িয়ে পরে দশ হাজার টাকা ঘোষণা করেন। (আমি ১৯৩০-৩৪ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিপ্লবমূলক ঘটনাবলী এবং সকল স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল ও স্পেশ্যাল বিচারসমূহের তখন একমাত্র সংবাদদাতা ছিলাম।)—শ্রীশচীন দত্ত (সাংবাদিক), কটক।

আধুনিক বঙ্গদেশ

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আমি গত ১১৪২ সাল হতে আপনার জনপ্রিয় 'মাসিক বসুমতী'র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক—১৩৬৫ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যোপলক্ষে বাইরে থাকাকালীন আমার নির্দ্দিষ্ট হকারের নিকট হতেই কাগজ ও বসুমতী নিয়মিত পেয়েছি ও নিয়েছি। বর্ত্তমানে সে সুবিধা না থাকায় ১৩৬৭ সাল বৈশাখ সংখ্যা হতে মাসিক বসুমতী আমার বাড়ীর নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিচ্ছি। ১৩৬৬ পৌষ সংখ্যায় মাননীয় অধ্যাপক মহাশয় "আধুনিক বঙ্গদেশ" নামক প্রবন্ধে 'পরস্পর নির্ভরশীলতা' অংশে এক জায়গায় বৈরাগ্যতলার মেলা বীরভূম জেলায় বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু বীরভূম জেলার প্রায় সমস্তই আমার ঘোরা আছে, সেখানে 'বৈরাগ্যতলার মেলা' বলে কোন মেলা আছে আমার জানা নেই। তবে বর্দ্ধমান জেলায় আমার বাড়ী হতে মাত্র ২ মাইল তফাতে দধিয়া গ্রামে গোপালদাস ঠাকুরের পুন্তপীঠস্থানে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি হতে ৭ দিন খুবই জাঁকজমক সহকারে মেলা হয় এবং এই মেলাই 'বৈরাগ্যতলার মেলা নামেই প্রসিদ্ধ। এই মেলা A K Rly (আহমদপুর-কাটোয়া) এর মধ্যে মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে "রামজীবনপুর" হতেও ২।৩ মাইল মধ্যে। এই মেলাতেই অধ্যাপক মহাশয়ের লিখিত মত দরজা জানালা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়—বহু দূর দেশ হতে বহু রকমের বহু জিনিবের বহু দোকানদার তাদের পসরা নিয়ে আসেন। তন্মধ্যে পিতল কাঁসা পাথর ও লোহার জিনিষ ও মাদুর ইত্যাদির দোকানও প্রচুর আসে। মেলায় সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদির বিপুল আয়োজন হয়। আপনার পত্রিকায় এ তথ্যটা প্রকাশ করিলে বাধিত হব। যাক্, আপনার অমূল্য সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হওয়ায় ক্রটি নেবেন না। আমি যে যে বিষয় উল্লেখ করলাম সে সব বিষয়ে একটু অবহিত হলে বিশেষ বাধিত হবো।—হরিহর নাগ। নারেঙ্গা, বর্দ্ধমান।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমি আপনাদের বহুল-প্রচারিত 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহিকা হইতে চাই, নিয়মাদিসহ বাৎসরিক মূল্য ইত্যাদি পত্রপাঠ জানাইবেন। টাকার পরিমাণ জানিলেই টাকা পাঠাইয়া দিব।—শ্রীমায়ালতা গাঙ্গিত, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আপনাদের মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। দয়া করিয়া সমস্ত নিয়মাবলী জানাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী শ্যামলী দাস, গোপালপুর।

বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাসের চাঁদা ৭।।• টাকা পাঠাইলাম।—জ্যোৎস্না গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর।

নতুন বৎসরের জন্ত বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বিভাবতী চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠালাম।—শ্রীমতী রমা রায়, বোম্বাই।

I am too much interested to be a regular subscriber of your Masik Basumati from the month of Baisakh, 1367 B.S. Herewith I am remitting Rs. 7·50 towards my advance subscription. I shall be obliged if you kindly enlist me as your regular subscriber.—Mrs. Pratima Mukherjee, Dhanbad (Behar).

আগামী বৎসরের বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী রেণুকণা মুখার্জ্জী, এলাহাবাদ।

বাংলা ১৩৬৭ সালের (বৈশাখ হইতে চৈত্র) এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—নীলিমা বসু, কলিকাতা।

I am sending herewith Rs. 15/- being annual subscription for the year 1367 B.S. Kindly send the magazine regularly from Baisakh.—Anima Chakravorty, Cachar, Assam.

Remitting Rs. 7·50 being half yearly subscription of Monthly Basumati from Baisakh to Aswin 1367 B.S.—Bina Dey, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—গৌরী সেন, কটক।

Herewith remitting Rs. 15/- as the subscription of Monthly Basumati for another one year. —Secretary, Rabindra Sangha, Singhbhum.

Remitted Rs. 7·50. Please enlist me as a subscriber of your Monthly Basumati from Baisakh 1367 B.S.—Sujata Sircar, Dum Dum Airport, Calcutta.

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। বৈশাখ ১৩৬৭ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসের অগ্রিম ৭·৫০ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী মিনতি বিশ্বাস, ধানবাদ।

মাসিক বসুমতীর জন্ত ১৩৬৭ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sri Lata Ghose, Bombay.

১৩৬৭ সনের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। —Ashamukul Roy, Calcutta.

১৩৬৭ সালের বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। —শ্রীমতী অমিতা রায়, বর্দ্ধমান।

১৩৬৭ সনের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—অণিমা রায়, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭·৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন ১৩৬৭ পর্য্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।—Sm. Madhabika Chatterjee, Puri.
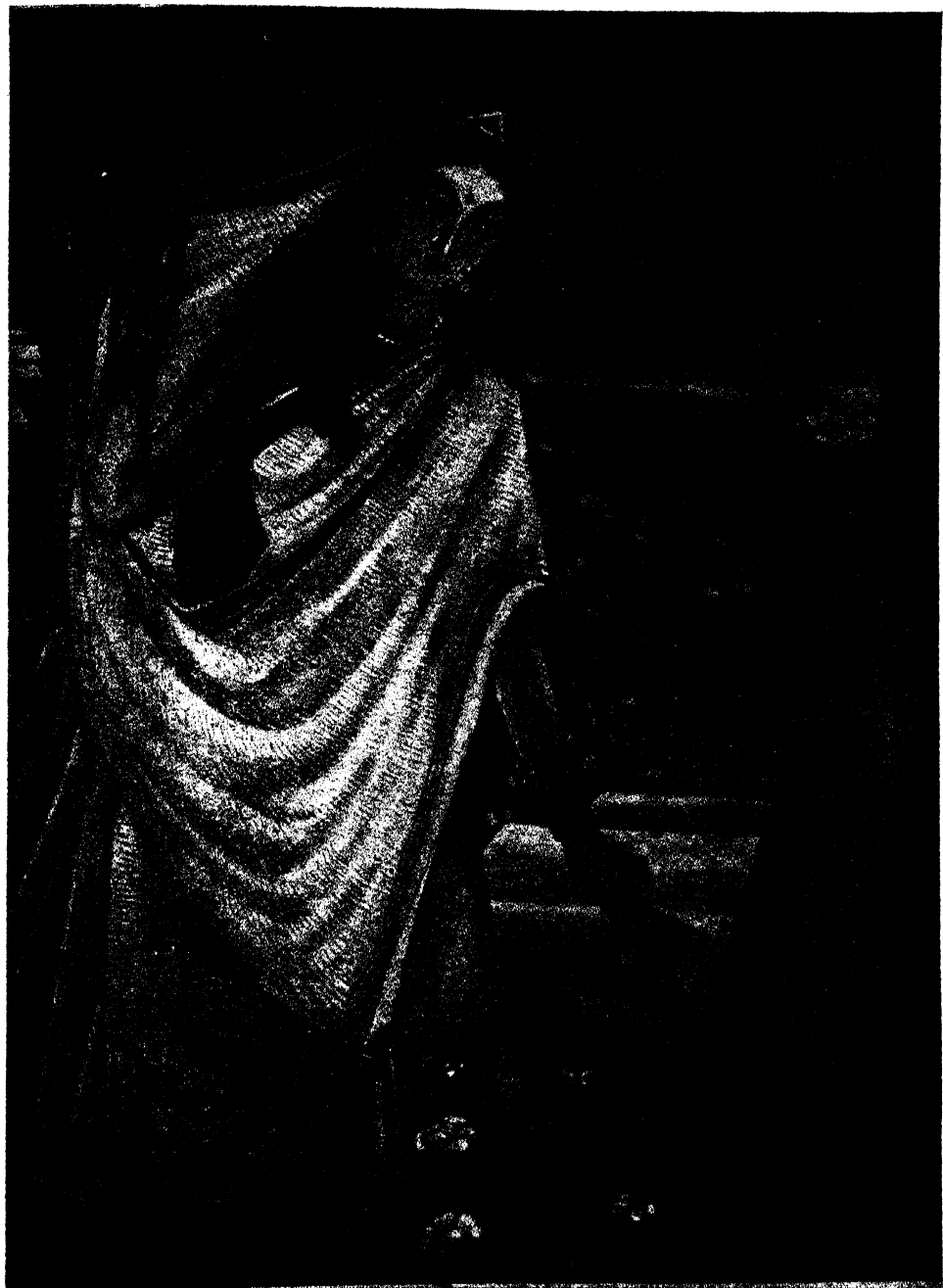
মাসিক বসুমতী
।। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ ।।

(জলরঙ)

গ্রাম-যমুনায়
—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত অঙ্কিত
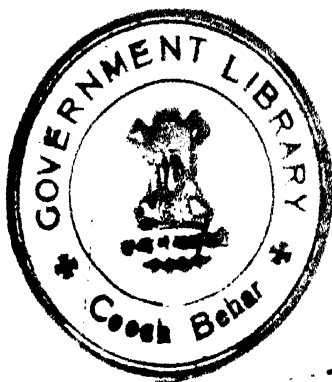
৩৯শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

হিন্দু

যে 'হিন্দু'নামের পরিচয় দেওয়া এখন আমাদের প্রথাস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার এখন কিন্তু আর সার্থকতা নাই ; কারণ এই শব্দের অর্থ এই—যাহারা সিন্ধুনদের পারে বাস করিত। প্রাচীন পারসীকদিগের উচ্চারণ-বৈকল্যে এই সিন্ধু শব্দ 'হিন্দু'রূপে পরিণত হইয়াছে ; তাঁহারা সিন্ধুনদের পরপারনিবাসী সকল লোককেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে ; মুসলমান শাসনকাল হইতে আমরা ঐ শব্দ নিজেদের উপর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

বর্তমান কালে সিন্ধুনদের এই তীরবর্তী সকলে আর প্রাচীন কালের মত এক ধর্ম মানেন না। সুতরাং ঐ শব্দে শুধু খাঁটি হিন্দুমাত্র বুঝায় না, উহাতে মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন এবং ভারতের অপরাপর অধিবাসিগণকেও বুঝাইয়া থাকে। অতএব আমি 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে আমরা কোন্ শব্দ ব্যবহার করিব? আমরা 'বৈদিক' (অর্থাৎ যাহারা বেদমতানুবর্তী) শব্দ ব্যবহার করিতে পারি, অথবা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।.. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেকেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক। কোন কোন স্থলে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে সকল স্থলেও উক্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির ক্রমসন্নিবেশ অধিকাংশ স্থলে বেদানুযায়ী নহে—তন্ত্র বা পুরাণানুযায়ী। অতএব বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুবর্তী এই অর্থে আমাদিগকে 'বৈদিক' নামে অভিহিত করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা যে সকলে বৈদান্তিক, ইহা নিশ্চিত। হিন্দুনামে যাহারা পরিচিত, তাহাদিগকে 'বৈদান্তিক' আখ্যা দিলে ভাল হয়।

হিন্দুগণ কেবলমাত্র মত বা শাস্ত্রবিচার লইয়া থাকিতে চান না। যদি অতীন্দ্রিয় সত্তা কিছু থাকে,

তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে চান। জড়ের সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মা যদি থাকেন, যদি দয়াময় সর্বব্যাপী পরমাত্মা থাকেন, তিনি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চান। কারণ তাঁহাকে দর্শন না করিলে কখনও সন্দেহ দূর হয় না।

হিন্দুরা অপরোক্ষানুভব-ধর্মকেই প্রধান ও চরম লক্ষ্যরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মানবকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং দেব-বিগ্রহই হউক, দেবালয়ই হউক বা ধর্ম-শাস্ত্রই হউক, এই সমুদয় তাঁহার ধর্মজীবনের বাল্যাবস্থার সহকারী মাত্র; এ সকল তাহার চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে।

সেই অতি প্রাচীন কালে ভারতে একজন অতি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, জগতে এইরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। এই মহাপুরুষ সেই প্রাচীন কালেই এই সত্য উপলব্ধি ও প্রচার করেন —"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"—বাস্তবিক, জগতে একমাত্র বস্তু আছেন, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন। এরূপ চিরস্মরণীয় বাণী আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এরূপ মহান সত্য আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আর এই সত্যই আমাদের হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এই তত্ত্ব—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে—যেন সর্বাংশে আমাদের জীবনের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে।

তুমি হয়ত দ্বৈতবাদী, আমি হয়ত অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়ত বিশ্বাস—তুমি ভগবানের নিত্যদাস, আবার আর একজন হয়ত বলিতে পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই ইহা কিরূপে হয় বুঝিবে—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"—একমাত্র সত্তাই আছেন, বিপ্রাঃ অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

এই একটিমাত্র বিষয়ে আমাদের সকল সম্প্রদায় একমত যে, আমরা সকলেই আমাদের শাস্ত্র—বেদে বিশ্বাসী। এইটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিবার অধিকার নাই।

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবে—তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে, পৃথিবীর অপর কোন ধর্মপুস্তকসমূহে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা এরূপভাবে আত্মার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোন পার্থিব সংস্পর্শই ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আত্মা অপার্থিব বস্তু এবং এই অর্থে উহাতে কখনও মানবীয়ভাব আরোপ করা যায় না। সেই একত্বের ধারণা—সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে।

হিন্দুরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক জাতি হইয়াও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। তাহাদের মতে ভগবান বা ধর্মসম্বন্ধে যে কোন ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাহাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে আর তাহারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধমধ্বজিতার প্রতি কোনপ্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বাহির হউক। বাহির হউক লাঙল ধরিয়া, চাষার কুটির ভেদ করিয়া, জেলে মালা মুচী মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে। বাহির হউক মুদির দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পার্শ্ব হইতে। বাহির হউক কারখানা হইতে, হাট হইতে, বাজার হইতে। বাহির হউক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত হইতে। ইহারা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহিয়াছে, নীরবে সহিয়াছে—তাহাতে লাভ করিয়াছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। —স্বামী বিবেকানন্দ।

নারীর বিবাহকাল

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম ভাগে ভারতের অরণ্যচারী ও গুহাবাসী যাযাবর আদিমানবেরা ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। আরণ্যক পরিবেষ্টনে উদরপূর্তির স্থূল প্রয়োজনে মৃগয়াবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রেই তাদের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। সূর্যোদয়ের সংগে সংগে পুরুষেরা শিকার অন্বেষণে বহির্গত হ'য়ে দিনান্তে তাদের অস্থায়ী বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করত। নারী ও শিশুরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাদের আগমন প্রতীক্ষায় থাকত। তারপর মৃগয়ালব্ধ মাংসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'লে গণনৃত্য ও সমবেত সংগীতে তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হ'ত। বিবাহ ও পরিবার তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের মনে কোন ধারণাই জন্মায়নি। তারা গণবিবাহে দলবদ্ধভাবে বাস ক'রত। মিথুন-বিহারে তাদের কোন রকম শালীনতা বা সম্বন্ধবোধ ছিল না। দৈহিক প্রয়োজনেই যৌন-সংসর্গকে তারা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল ব'লে ইচ্ছামত সহচর বা সহচরী পরিবর্তনে তাদের কোন রকম কুণ্ঠা দেখা যেত না। তারপর একদা কৃষিকর্মের আবিষ্কারে তাদের জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হ'ল। পরবর্তী কালের মানুষেরা খাদ্যান্বেষণের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে স্থিতিশীল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ও খাদ্য উৎপাদনে মন দিল। উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে তাদের মনে জাগল সঞ্চয়-স্পৃহা, প্রাচুর্য সৃষ্টি ক'রল ভোগের বাসনা, আর সেই বাসনা থেকেই সৃষ্টি হ'ল পরিবার। কৃষিপ্রধান সমাজে পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হ'ল। উদ্বৃত্ত খাদ্যের বিনিময়ে ভোগের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করা সহজ হওয়ায় মানুষ প্রথমেই নারীকে সংগ্রহ ক'রল। এই নারীই তার স্ত্রীরূপে পরিচিত হ'ল। অবশ্য আদিমযুগেও নারীক্রয় অপ্রচলিত ছিল না। ধৃতা নারী তখন দলীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হ'লেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বন্দীকারী এক বা একাধিক পশুর বিনিময়ে ভিন্ন আবাসে ঐ নারীর সংগে একক সহবাসের অধিকার পেত। তবে এই প্রথা তখন ছিল ব্যতিক্রম, পরে নিয়মে পরিণত হ'ল। মানুষ শুধুমাত্র তার স্ত্রীর অধিকারী হ'ল না, তার সন্তানদেরও অধিকারী হ'ল। মৃগয়া-জীবনে শিশু ছিল অপ্রয়োজনীয় বোঝা, ক্ষুধার্ত শিশুকে কষ্টার্জিত আহার্যের অংশ দিতে হ'ত। এখন যৌবনের সহকর্মী ও বার্দ্ধক্যের আশ্রয়রূপে সন্তান সম্পদে পরিণত হ'ল। এই সম্পদের সৃষ্টিকারিণী হওয়ায় মানুষ দৈহিক ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থে নারীকে স্ত্রীর অধিকার দিল, স্বেচ্ছায় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রল। কালে নর-নারীর এই মিলনই বিবাহরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি লাভ ক'রেছিল।

দৈহিক লালসার চরিতার্থতা ও সন্তানলাভের বাসনা এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রথম যখন নারীকে স্ত্রীরূপে পরিবারভুক্ত করা হ'ল, তখন সে নিশ্চয়ই নাবালিকা ছিল না। বরং যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান ধারণের উপযোগী দৈহিক পরিণতি সে লাভ ক'রেছিল। মনে রাখতে হবে, নারীর দাসত্ব-বন্ধন একদিনের সৃষ্টি নয়। দৈহিক পরাক্রম, সম্পত্তি-লিপ্সা ও জনশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে নারী ক্রমে পুরুষের সম্পত্তিরূপে পরিণত হ'লেও, হিন্দু-ভারতের [illegible] দিকে সাধারণ ভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্য ছিল, তার স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হ'ত।

ঋগ্বেদের যুগে তরুণীরা সাধারণতঃ ঋতুমতী হবার পরেই উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ত। ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, শ্রদ্ধা-কামায়নী, যমী, লোপামুদ্রা, জরিতা, গোপায়না, পৌলমী প্রভৃতি অবিবাহিতা তরুণীর পিতৃগৃহে বাস ও উচ্চ শিক্ষালাভ, উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রণয়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে প্রণয়কলাশীলা যুবতী তরুণীদের বিচিত্র আভরণ-সজ্জা, প্রেমিকার চিত্ত-বিজয়ে প্রেমিকের উপায়ন প্রদান, যৌবনবতী প্রণয়িনীর সংগে যুবক প্রণয়ীর পূর্বরাগ, প্রেমিকার নিভৃত সংগলাভের আকুলতায় নিশাগমে সমস্ত গৃহবাসীকে মন্ত্রবলে নিদ্রিত করার উদ্যোগ-আয়োজন, কন্যাকে তার স্বেচ্ছা-সম্মতিতেই পিতৃগৃহ থেকে হরণ—এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ থেকে বৈদিক যুগে প্রাপ্তযৌবনা অবিবাহিতা তরুণীদের অবস্থিতি প্রমাণিত হয়।

বৈদিক-বিবাহের বিস্তারিত আচার-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রগুলিও প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীর বিবাহ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই নববধূ পতিকে বরণ করে—

> বরেণ্যস্ত্বং, বৃণে ত্বাহন্ত বৃণে চিত্তং বৃণে মনঃ।
> বৃণে সৌমনসং হার্দিং আত্মানং ত্বাত্মনা বৃণে।

ওগো বরণীয়, আমার চিত্তে তোমার চিত্তকে আমি বরণ করি। আমার প্রীতি, আমার আত্মার অর্ঘ্য সাজিয়ে আমি তোমার প্রীতি ও আত্মাকে বরণ করি।

সপ্তপদী পরিক্রমায় পতি পত্নীকে সখারূপে আহ্বান জানায়—আমাদের যুক্ত-জীবন সুগভীর প্রণয়ে, নিত্য সহবাসে পরমানন্দে অতিবাহিত হোক। পরস্পরের কল্যাণ কামনা ক'রে আমরা একত্রে বিত্ত, বৈভব ও ঐশ্বর্য উপভোগ করি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তা-ভাবনা সংযুক্ত হোক।

অন্যত্র দেখা যায়—

> প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি
> মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

আমাদের প্রাণ, আমাদের শক্তি, আমাদের তনু পরস্পরের স্পর্শে একাত্ম হয়ে উঠুক।

আবার যুক্ত-প্রার্থনা কালে উভয়ে বলে—

> সং নৌ ভগাসো অগ্মত সং চিত্তানি সমুব্রতা।
> যথা সংমনসৌ ভূত্বা সখায়াবিব সচাবহৈ।।

আজ থেকে আমাদের দুজনের ভাগ্য, দুজনের চিত্ত, দুজনের ব্রত পরস্পর সংযুক্ত হয়ে চলুক। গভীর অনুরাগে আমাদের দুটি হিয়া পরস্পর প্রীতিযুক্ত হোক।

এই. সমস্ত মন্ত্রে স্বামি-স্ত্রীর বিবাহ মিলনের মধ্যে যে ঐকাত্ম্যানুভূতি, যে অভেদোপলব্ধি যে 'সহধর্মচারিণী সংযোগঃ' মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হ'য়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিবাহকালে বর-বধূ দুজনেরই বয়স এমন ছিল যে তারা পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে পরস্পরকে সখারূপে গ্রহণ করতে পারত। অপরিণতবয়স্ক

নরনারীর দ্বারা এ রকম বিবাহমন্ত্র উচ্চারণের কোনই সার্থকতা থাকতে পারে না।

পরের একটি ছত্রে আরও স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে—

তাবেহি সংভবাব সহরেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বৈত্তবৈ।

এস, আমরা সৃষ্টি করি। দুজনের রেত-মিলনে আমরা যেন পুত্রসন্তান লাভে সমর্থ হই।

সুতরাং সপ্ত-পদ গমন ক'রে যখন বিবাহ সম্পূর্ণ করা হ'ত, তখন পতি-পত্নী দুজনেই সন্তানের পিতামাতা হবার দৈহিক ও মানসিক উপযুক্ততা অর্জন ক'রেছে।

আবার ঋগ্বেদে বিবাহ শেষে পতিগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে বধূকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাঽসো
বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি।

এবং— সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবেষু।

পতিগৃহে গিয়ে গৃহস্বামিনী হও। সেখানে সকলের বশবর্তিনী হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালিত কর। গুণান্বিতা তুমি, নিজগুণে শ্বশুর শাশুড়ীর পাশে সম্রাজ্ঞীর মত শোভমানা হও। তুমি স্নেহশীলা দেবর ননদ তোমাকে যেন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা দান করে।

বিবাহের পরেই পতিগৃহে গিয়ে বধূকে সংসারের কর্ত্রী হয়ে যজ্ঞকার্য পরিচালনা ও আত্মীয়-পরিজনের প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য পালন ক'রতে হ'ত। সুতরাং বিবাহের পূর্বেই তার পরিপূর্ণ সাংসারিক জ্ঞান, লাভ করার প্রয়োজন ছিল। নাবালিকার পক্ষে এই শিক্ষা লাভ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই বৈদিক যুগে অপরিণীতা তরুণীরা বিবাহের পূর্বেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ ক'রে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করত এবং শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে সাগর-সলিলে অবলুপ্ত নদীধারার মত উপযুক্ত শিক্ষিত পতির সংগে বিবাহিত জীবনে মিলিত হ'ত। ঋক, যজু ও অথর্ব বেদে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ র'য়েছে।

পতিগৃহে প্রবেশ কালে নববধূকে শুভাশিস জানান হ'ত—

অষ্ট পুত্রা ভব ত্বং—সুভগা চ পতিব্রতা।

তুমি অষ্টতনয়ের মাতা হও, তুমি পতিব্রতা ও সৌভাগ্যশালিনী হও।

তারপর কালরাত্রির অবসানে বিবাহের চতুর্থ রাত্রে যৌন-মিলন ক্ষণে বধূ স্বামীর কাছে কামনা জানাত—ধীমান ও গুণধাম তুমি। তপশ্চর্যায় তোমার জন্ম, তপঃশক্তিতে তুমি প্রদীপ্ত। তুমি আমায় সন্তান ও সম্পদে পূর্ণ কর। পুত্রকাম তুমি, আমাদের অপত্যের মধ্যে তোমার পুনর্জন্ম হোক।

স্বামী উত্তর দিত—তুমি তোমার দেহে সন্তানদের উৎপত্তি কামনা ক'রছ। তুমি যুবতী, পুত্রকামা তুমি—আমার প্রেম-মধুর আশ্লেষ গ্রহণ কর। প্রজাবতী তুমি, আমাদের সন্তানের মধ্যে তোমারও পুনর্জন্ম হোক।

বিবাহ-অনুষ্ঠানের পরেই পতি এখানে যুবতী পত্নীকে পুত্রার্থে রমণে আহ্বান জানাচ্ছে। যুবতী পত্নীর মনেও বীর্যবান স্বামীর ঔরসে গর্ভবতী হবার সুস্পষ্ট কামনা রয়েছে।

সুতরাং বৈদিকযুগে বিবাহ যে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যেই সংঘটিত হ'ত এবং স্বেচ্ছা নির্বাচনই যে প্রাধান্য লাভ করত সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন বিবাহের পূর্বে পিতা অথবা ভ্রাতার সম্মতি গ্রহণকে বাধ্যতামূলক এবং আবশ্যিক ব'লে গণ্য করা হ'ত না। মিলনোৎসুক দুটি তরুণ-তরুণীর হৃদয় বিনিময়ের পরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে গুরুজনদের আবির্ভাব ঘটত এবং বিবাহের মাধ্যমে তাঁরা উভয়কে মিলিত ক'রে দিতেন।

ঋগ্বেদোত্তর সংহিতার যুগেও রজস্বলা নারীর বিবাহই প্রচলিত ছিল। এ যুগেও বিবাহকালে চিত্ত-বিনিময় ক্ষণে পতি পত্নীকে সম্বোধন ক'রে বলে—

যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।

এ ছাড়া কাঠক সংহিতার অগ্নিস্তুতিতে, অথর্ব বেদের লাজহোম মন্ত্র এবং কন্যার পিতৃকুলের আশীর্বাণী ও নববধূর কর্তব্য-নির্দেশে, সামমন্ত্র ব্রাহ্মণের গ্রন্থি-বন্ধন মন্ত্রে, ব্যাস-সংহিতার পতি ও পত্নীর ধর্ম নির্দেশে, বাজসনেয়ী সংহিতার বরবধূর যুগল-প্রার্থনায় যে সমস্ত উক্তি র'য়েছে, সেগুলি প্রাপ্তযৌবনা নারীর বিবাহেরই স্পষ্ট ইংগিত বহন করে।

গৃহ্যসূত্রগুলিতে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী নির্দেশ দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূত্রগ্রন্থগুলিতে বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রেই চতুর্থী কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামি-স্ত্রীর যৌন-মিলনের নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। এ ছাড়া হিরণ্যকেশীয় গৃহ্যসূত্র ও পারস্কর গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত বিবাহ অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলিতেও প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর মিলন সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ র'য়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালের গৃহ্য ও ধর্মসূত্রগুলিতে 'নগ্নিকা' বা অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহকে সমর্থন এবং ঋতুমতী ও উদ্গতস্তনা কন্যার বিবাহকে অননুমোদন করা হ'য়েছে। বিবাহের পূর্বেই যে কন্যা পিতৃগৃহে রজস্বলা হয়, সেই কন্যাকে 'বৃষলী' বলা হয় এবং তার পিতাকে ভ্রূণহত্যার পাপে অভিযুক্ত করা হ'য়েছে। অজ্ঞান বশতঃ কোন পুরুষ এই কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রলে, সেই 'বৃষলীপতির' সংগে একত্র ভোজন এবং সম্ভাষণ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হ'য়েছে। নারী প্রথম বয়সে সুরগণ, সোম, গন্ধর্ব এবং অগ্নি কর্তৃক ভুক্ত হ'য়ে পরে মানব কর্তৃক ভুক্ত হ'য়ে থাকে। অগ্নি রজঃকালে, চন্দ্র লোম নির্গমনে ও গন্ধর্বগণ স্তনোদ্গমে কন্যাকে উপভোগ ক'রে থাকেন। সুতরাং এই সমস্ত শারীরিক পরিবর্তন হবার আগেই কন্যার বিবাহ প্রদান বিধেয়। দৃষ্টরোমা কন্যা পুত্রঘাতিনী, উদ্গতস্তনা কন্যা কুলঘ্নী ও দৃষ্টরজা কন্যা পিতৃঘাতিনী হয়। যিনি কন্যাদানের পুণ্য ফল অভিলাষ করেন, তাঁর সোমাদি কর্তৃক অভুক্ত কন্যাকেই সম্প্রদান করা উচিত। অন্যথা দাতা ফলভোগী হন না, প্রতিগ্রহকারীও অধঃপতিত হয়ে থাকে।

ঋতুমতী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ধর্মগ্রন্থগুলির স্থানে স্থানে এরূপ কঠোর মনোভাব ব্যক্ত হ'লেও অন্যত্র গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বর্ণনা রয়েছে। বলা হ'য়েছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই বিবাহ-রীতির যথেষ্ট অনুরাগী ছিল। আবার স্ত্রীলক্ষণ বর্ণনায় আপাদমস্তক নারীদেহের যে সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে, অপ্রাপ্তযৌবনা কন্যার দেহে সে সমস্ত লক্ষণ কখনই পরিস্ফুট হতে পারে না। জংঘা, নিতম্ব, জঘন, বক্ষ, স্তন, স্তনাগ্রভাগ, কক্ষ প্রভৃতি স্ত্রীদেহের পরম গোপনীয় ও লজ্জাস্থানগুলি পরীক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিচক্ষণ

ব্যক্তিদের প্রথমেই নারীদেহের লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করে সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৌধায়নের মতানুসারে যদি কোন যুবতীকে বলপূর্বক হরণ করে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বিবাহ না করা হয়, তবে সেই যুবতীকে অনূঢ়া কন্যারূপে গণ্য করা চলে এবং অপর ব্যক্তির সংগে তার পুনরায় শাস্ত্রসম্মত বিবাহ দেওয়াও চলে। কোন প্রাপ্তযৌবনা কন্যাকে যদি তার অভিভাবক উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দিতে অক্ষম হয়, তবে সেই কন্যা তিন বছর অবস্থায় তিন মাস অপেক্ষার পর স্বাধীনভাবে স্বীয় পতি নির্বাচন করে নিতে পারে। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই নির্দেশকে সাধারণভাবে সমর্থন করা হয়েছে। বিপরীতধর্মী এই সমস্ত নির্দেশ থেকে মনে হয়, সূত্র ও উপনিষদের যুগের প্রথম ভাগে যৌবনবতী কন্যার বিবাহ-রীতিই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহরূপে সমর্থন করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে ঋতুমতী যুবতী কন্যার বিবাহকেও অস্বীকার করা হয়নি।

বিবাহকালে কন্যার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে মহাভারত ও রামায়ণের সাক্ষ্যপ্রমাণাদি প্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহকেই বিশেষভাবে সমর্থন করে। দ্রৌপদী, কুন্তী, সুভদ্রা, উত্তরা, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ও শূদ্ররমণী ও ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর বিবাহ এই অভিমতের যথেষ্ট অনুকূল। তাছাড়া বিবাহ-অনুষ্ঠানের অংশরূপে পুরাতন রীতিগুলির বিশদ অনুসরণও এই অভিমতকে সমর্থন করে। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে যে, বিবাহকালে রাম ও সীতার বয়স ছিল যথাক্রমে তের ও ছয়; কিন্তু অন্য বহু বর্ণনা থেকে মনে হয়, বিবাহকালে সীতা পূর্ণযুবতী ছিলেন। পতিগৃহে আগমনের পরে বিবাহোপযোগী মংগলাচরণ সমাপ্ত হলে সীতা নির্জনে স্বামি-সহবাস লাভ করে পরমসুখে ও হৃষ্টচিত্তে ভোগসুখ অনুভব করেছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে বর ও বধূর বয়স যথাক্রমে ত্রিশ ও দশ অথবা একুশ ও সাতরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অবশ্য এই নির্দেশ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, সাধারণ নিয়মানুসারে তৎকালীন সমাজে যুবতী নারীর বিবাহ-বিধিই প্রচলিত ছিল। এর সমর্থনে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করা চলে। রামায়ণের বালকাণ্ডে নৃপতি কুশনাভের যৌবনবতী চারু-সর্বাংগী এক শত অবিবাহিতা কন্যার উল্লেখ দেখা যায়। অপরিণীতা তরুণীদের সন্ধ্যাসমাগমে ক্রীড়ার্থ লতাকুঞ্জে গমন ও অরণ্য-বিহারে প্রবল আসক্তির কথাও রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে। অযোধ্যাকাণ্ড থেকে জানা যায় যে, প্রত্যহ প্রভাতে কুমারীকুল সাধ্বী সীমন্তিনী সহ নৃপতি দশরথের মংগলার্থ স্পর্শনীয়া ধেনু, পানীয়, গংগোদক, দর্পণ, পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ নিয়ে উপস্থিত থাকত। তপস্যারত ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যকে দর্শন ও তাঁর মুখনিঃসৃত বেদমন্ত্র শ্রবণ কালে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ঋষির অভিশাপে সহসা গর্ভবতী হন। সুযৌবনা ও অশেষ গুণশালিনী এই কন্যাকে পরে পুলস্ত্য পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি কুশধ্বজের কুমারী কন্যা বেদবতীর যৌবনাঢ্য রূপে উন্মত্ত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে পত্নীরূপে কামনা করেছিল।

উত্তরকাণ্ডে দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রমণীয় এক চৈত্রদিনে ইক্ষ্বাকুর অনুভক্তি ও কামাসক্ত কনিষ্ঠ-পুত্র দণ্ড পুরোহিত শুক্রাচার্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুপম রূপলাবণ্যময়ী অরজাকে দেখে মুগ্ধ হ'লেন। কন্যার অসম্মতি সত্ত্বেও দুরাচার দণ্ড সবলে অরজাকে ধর্ষণ করে রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি বহুল প্রচারিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও মহাভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচিত্র প্রেমোপাখ্যানগুলি যৌবনশালিনী নারীর বিবাহকেই প্রত্যক্ষ সমর্থন করে। কচ ও দেবযানী, রুরু ও প্রমদ্বরা, তপতী ও সংবরণ, অনল ও ভাস্বতী, উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী, চ্যবন ও সুকন্যা, অগ্নি ও স্বাহা প্রভৃতি উপাখ্যানে যুবক-যুবতীর বিচিত্র প্রণয়তত্ত্বের চমৎকার মনোবিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়। মহীপাল শান্তনুর সহিত বিবাহের পূর্বেই মৎস্যগন্ধা সত্যবতী মহর্ষি পরাশরের সহযোগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে এক পুত্রের জননী হয়েছিলেন। কুমারী অবস্থায় কুন্তীও সূর্যের ঔরসে কর্ণকে জন্ম দিয়েছিলেন। কাশিরাজদুহিতা কুমারী অম্বা সৌভপতি শাম্বরাজের প্রণয়াসক্তা ছিলেন এবং মনে মনে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। সুভদ্রাহরণে অর্জুনকে প্ররোচিত করার সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—দানস্বরূপ কন্যাগ্রহণ করা অপেক্ষা ধর্মানুসারে কন্যাহরণ মহাবীর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিক প্রশংসনীয়। যৌবনপ্রাপ্তা সাবিত্রীকে রাজা অশ্বপতি স্বীয় পতি নির্বাচনের জন্য রাজর্ষিগণের আশ্রমে প্রেরণ করেছিলেন এবং কন্যার মনোনয়নকেও অমর্যাদা করেননি। রামায়ণে কন্যার স্বেচ্ছা-স্বয়ংবরকে অনুমোদন করা হয়নি—পিতাকেই অনূঢ়া কন্যা সম্প্রদানের শ্রেষ্ঠ অধিকারিরূপে গণ্য করা হয়েছে। প্রণয়াভিলাষী বায়ুকে প্রত্যাখ্যান করে কুশনাভকন্যারা বলেছিলেন—

মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে।

শুক্রাচার্যের কন্যা অরজাও দণ্ডকে বলেছিলেন—আমি পিতার বশবর্তিনী। যদি আমাকে কামনা কর, পিতার নিকট প্রার্থনা জানাও।

কিন্তু মহাভারতে স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়কন্যাগণের শ্রেষ্ঠ বিবাহবিধিরূপে গণ্য করা হয়েছে। স্বয়ংবরসভায় প্রাপ্তযৌবনা কন্যার মনোনীত প্রার্থীর হস্তেই তাকে সম্প্রদান করা হয়েছে। পূর্বরাগ জনিত গান্ধর্ব বিবাহও তৎকালীন সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের মিলন গান্ধর্ব বিবাহের একটি চমৎকার উদাহরণ।

বৌদ্ধযুগেও প্রাপ্তযৌবনা নারী স্বয়ংবরা হত। সমাজে গান্ধর্ব বিবাহও অপ্রচলিত ছিল না। অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে যুবক-যুবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে সমাজ সেই বিবাহকে স্বীকার করে নিয়ে যথেষ্ট উদারতা দেখাত। স্বয়ংবর বিবাহে কন্যার নির্বাচনকেই চরম বলে গণ্য করা হত। মনোনীত পাত্রের কোন ত্রুটি থাকলেও সে মনোনয়নের কোন পরিবর্তন করা হত না। রাজকুলেই গান্ধর্ব-বিবাহ বিশেষভাবে আদৃত হত। এবিষয়ে বৌদ্ধসাহিত্যে বহু কাহিনী রয়েছে। সে যুগে বিবাহের পরেই পতিগৃহে যাত্রার সময়ে নববধূকে সংসারধর্ম সম্বন্ধে যে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হত, সেগুলি সাবালিকা বধূর পক্ষেই পালন করা সম্ভব ছিল। অনূঢ়া কন্যার বিবাহের কোন বয়স নির্ধারিত না

থাকলেও, ষোল বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহদান সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শাক্য ক্ষেমকের কন্যা সুন্দরী অভিরূপনন্দা, রাজগৃহবাসিনী চিত্তা, শাক্যরাজবংশীয়া নন্দা, সাগলরাজবংশীয়া ক্ষেমা ও ব্রাহ্মণকন্যা ভদ্রা কপিলানী, শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠিকন্যা উৎপলবর্ণা, অংগরাজ্যের ভদ্দিয় নগরবাসিনী শ্রেষ্ঠিদুহিতা বিশাখা বৈশালীর ব্রাহ্মণকন্যা রোহিণী প্রভৃতি বৌদ্ধনারী বিবাহের পূর্বেই যৌবনে উপনীতা হয়েছিলেন। পাণিপ্রার্থী প্রেমিকের অভাব না থাকলেও সম্ভ্রান্তবংশীয়া রূপবতী অনুপমা সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বিম্বিসারের পুরোহিতকন্যা সোমাও বয়োপ্রাপ্তা হয়ে বুদ্ধের গৃহী শিষ্যা হন। জাতক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিদেশাগত এক ব্রাহ্মণকুমার বারাণসীতে গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে একটি তরুণীর প্রেমাসক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিল। প্রচলিত রীতি অনুসারে একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে গুরু তাঁর শ্রেষ্ঠতম শিষ্যের হস্তে যৌবনবতী কন্যাকে সম্প্রদান করেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহযোগ্যা গুরুকন্যাকে বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যের হস্তেও সম্প্রদান করা হত।

সূত্রগ্রন্থগুলিতে কন্যার বিবাহের বয়স নিম্নগামী করার যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতেও তার বিশ্বস্ত অনুসরণ দেখা গিয়েছে। মনুর মতানুসারে ত্রিংশ ও চতুর্বিংশ বৎসর বয়স্ক যুবকদের যথাক্রমে দ্বাদশ ও অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকেই পত্নীত্বে বরণ করা শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু সংগে সংগে তিনি একথাও বলেছেন যে, নির্গুণের হস্তে সম্প্রদান অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আজীবন কুমারীরূপে পিতৃগৃহে স্থান দেওয়াও শ্রেয়ঃ। এর থেকে মনে হয় যে সমসাময়িক যুগে বাল্যবিবাহ ক্রমশঃ প্রচলিত হতে থাকলেও রজস্বলা কন্যার বিবাহও অপ্রচলিত বা অননুমোদনীয় ছিল না। প্রত্যক্ষ পাপে লিপ্ত হতে না হলেও কোন পিতাই বিবাহযোগ্যা কন্যাকে গৃহে রাখা কামনা করতেন না। ফলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে কন্যাদের পতি-সন্ধানের স্বাধীনতা দেওয়া সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রকারই একমত পোষণ করেছেন। অবশ্য পতি-নির্বাচনের পূর্বে কন্যাকে তিন মাস থেকে তিন বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যোগ্য পতি মনোনয়ন নাবালিকার পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। পরবর্তীকালে রচিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কন্যা ঋতুমতী হবার আগেই তাকে পাত্রস্থ করবার কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের এই নির্দেশ পরবর্তীকালে অনুসরণীয় রীতির পূর্বাভাস মাত্র, সমসাময়িক যুগের অনুসৃত পদ্ধতি নয়। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার পরে রচিত নারদ সংহিতায় রজস্বলা নারীর বিবাহকে অনুমোদন করা হয়েছে। মোট কথা, ধর্মশাস্ত্রের যুগে নাবালিকার বিবাহদানের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সূচিত হতে দেখা গিয়েছে এবং নারীর দৈহিক শুচিতা সংরক্ষণের প্রতি একটা নৈষ্ঠিক ঔৎসুক্য থেকেই সম্ভবতঃ এই নিয়মের প্রবর্তন হয়েছে।

Kane প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতানুসারে স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত বাল্যবিবাহ বিষয়ক নির্দেশগুলি প্রধানতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত, অপর তিন বর্ণের ক্ষেত্রে নয়। এই মতের সমর্থনে সমসাময়িক সংস্কৃত নাটকগুলির উল্লেখ করা চলে। এই নাটকগুলিতে নায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌবনবতী নারীরূপে চিত্রিত হয়েছে এবং কোনখানেই তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বাচনভংগীতে অবিবাহিতা বালিকাসুলভ মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয়নি। নাট্যকার ভাস রচিত অভিমারক, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকত্রয়ে বিবাহের পূর্বেই আরূঢ়যৌবনা নায়িকাদের প্রণয়লীলা বর্ণিত হয়েছে। কালকাচার্য বিরচিত কালকাচার্য-কথা নামক কাহিনীতে কালকাচার্যের অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী সরস্বতীর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সমসাময়িক তামিল সাহিত্যের বর্ণনাত্মক দশটি গ্রাম্য-গাথার অন্তর্গত কবি রুদ্রন কন্ননার বিরচিত পাটিনপ্পালাই ও কবি কপিলরের কুরিনচিপ্পাটু প্রেমোপাখ্যান দুটিতে এবং অষ্ট গীতি-কবিতামালায় গিরি ও মরুদেশ, শাদ্বল প্রান্তর ও আরণ্যস্থলী এবং সমুদ্র-সৈকতে মান-অভিমান, বিচ্ছেদ-বিলাপ ও বিরহ-মিলনের বিচিত্র বর্ণনায় কুমার-কুমারীর প্রেমরংগই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসংগে বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ করা চলে। জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন বহু স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হয়ে রাজকুমারীদের মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত সংস্কারপ্রকাশ নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন বর্ণের নারীরা ঋতুমতী হলেও তাঁদের বিবাহে কোন বাধার সৃষ্টি করা হত না, বরং সেই বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহের মর্যাদা দেওয়া হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে কঠোর বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে সেই সমস্ত বিধি-নিষেধ বিশ্বস্ততার সংগে পালন করা হত না।

নারীর বিবাহযোগ্য বয়স নিম্নগামী করে তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা নারীজাতিকে আনুগত্যের সুকঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পুরুষপ্রধান সমাজে এক শ্রেণীর প্রভুত্বলিপ্সা গ্রাস করতে চেয়েছিল অপর শ্রেণীর আত্মিক স্বাধীনতা। কঠোর বিধিনিষেধের পেষণ-যন্ত্রে নারীর আত্মোৎসর্গ আদায় করা হলেও, সে আত্মনিবেদনে বাধ্যতা ছিল, ছিল না স্বেচ্ছা-সম্মতি। নারীর দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার নামে মনু যাজ্ঞবল্ক্য-প্রমুখ নৈষ্ঠিক শাস্ত্রকারেরা নারীত্বের অভিধাকে সংকুচিত করে নতুন বিধান দিলেন—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' ফলে নারী তার স্বাতন্ত্র্য হারাল, হারাল শিক্ষার সুযোগ। বলা হল, সংসারে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি, পরম আশ্রয়। পতির পদসেবা এবং সন্তানের জন্মদান ও পালনই তার সতীধর্ম ও গৃহকর্ম। অবশ্য বাল্য-বিবাহ রীতি প্রবর্তনের ফলে প্রাক-গুপ্তযুগে নারীজাতির অধোগতির সূচনা হ'য়েছিল মাত্র, চরম পরিণতি লাভ করেনি।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য রচিত আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে সেগুলির মূলগত কোন পরিবর্তন না ঘটলেও সাধারণ্যে কুমারী-কন্যার বিবাহের বয়স নিম্নগামী করবার একটা বর্ধমান প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। কতকগুলি গ্রন্থে বাধ্যতামূলক ভাবে কন্যা ঋতুমতী হবার আগেই তাকে পাত্রস্থ করার জন্যে অভিভাবককে আদেশ দেওয়া হ'য়েছে। বিষ্ণুপুরাণের মতানুসারে পাত্রের বয়স পাত্রীর বয়সের তিন গুণ হওয়া উচিত। কিন্তু স্মৃতিযুক্তাকলে অংগিরস ব'লেছেন, বর-বধূ

উভয়ের বয়সের পার্থক্য দুই, তিন বা পাঁচ বৎসর হ'লেই যথেষ্ট। আপস্তম্বের গৃহ্যসূত্র অনুসরণ ক'রে বাৎস্যায়ন এক স্থলে রজস্বলা কন্যার পরিণয়কে অশাস্ত্রীয়রূপে নিষিদ্ধ ক'রেছেন। কিন্তু অন্যত্র প্রণয়ার্থী নর-নারীর পূর্বরাগ এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই পতি-পত্নীর যৌন-সংসর্গ সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তারিত নিয়মের উল্লেখ ক'রেছেন, সেগুলির দ্বারা তাঁর পূর্বোক্ত অভিমত যথেষ্ট পরিমাণে খণ্ডিত হ'য়েছে। কামসূত্রের এক স্থলে বাৎস্যায়ন স্পষ্ট ভাবেই পতি-পত্নীর বয়সের পার্থক্য তিন থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন।

পূর্ববর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা নারীর মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ উন্মেষিত হবার আগেই তাকে স্বামী তথা পুরুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনবার জন্যে ধর্মাচরণের ছদ্ম-আবরণে সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রথার প্রবর্তন ক'রেছিলেন। পরাধীনতার সহস্র অভিজ্ঞানে নারীজাতিকে শৃংখলিত ক'রে তাদের স্বাধীন শিক্ষালাভের সমস্ত পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য যুগে রাজকুমারী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীরা বিবাহের আগেই সাধারণ শিক্ষা ছাড়া নৃত্য, গীত, যন্ত্রবাদন, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ললিতকলায় পারংগমা হবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্র, ভবভূতির মালতীমাধব, শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দ, বাণের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী, বাৎস্যায়নের কামসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নারীর অপার কলাজ্ঞানের অজস্র উল্লেখ রয়েছে। বাৎস্যায়ন নারীকে চৌর্য টুকলা বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিয়দর্শিকায় নৃত্য, গীত ও বাদনকে কুমারী-কন্যার অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। থানেশ্বর-রাজকুমারী রাজ্যশ্রী বিবাহের পূর্বেই নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন ক'রেছিলেন। উপরোক্ত উদাহরণগুলি তৎকালীন সমাজে অপরিণীতা যুবতীর অবস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। কেন না, অষ্টম বা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার পক্ষে বিবাহের পূর্বে বিভিন্ন কলাবিদ্যায় গভীর প্রজ্ঞা ও প্রত্যক্ষ ব্যবহার-ক্ষমতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হ'তে পারে না।

কামসূত্রে ঈপ্সিতা নারীর চিত্ত-বিজয় মানসে প্রণয়াসক্ত যুবককে প্রয়োজনবোধে পূর্বরাগ, এমন কি কূট-কৌশল ও দৈহিক শক্তি-প্রয়োগেরও নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। প্রেম-নিবেদনে সাফল্যলাভের পর তাকে নারীর বিশ্বাস উৎপাদনে সচেষ্ট হ'তে বলা হ'য়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তরুণীদেরও মনোমত পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। এ বিষয়ে বাল্যের ক্রীড়া-সহচর অথবা প্রণয়পটু যুবকের প্রতিই তাদের আসক্তি দেখা যেত। তরুণ-তরুণীর প্রণয়-গুঞ্জনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও বাৎস্যায়ন বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বাৎস্যায়ন বিশ্বাস ক'রতেন, যে পুরুষ হবে তার চির-অনুরক্ত, যার মধ্যে পাবে সে অনন্ত সুখের সন্ধান, মিলনের তৃপ্তি, সেই পুরুষকেই নারী তার পতিত্বে বরণ ক'রবে। ঐশ্বর্যশালী ও গুণবন্ত পতির বহু বিভক্ত প্রেম সে কামনা করে না, সম্পদহীন ও নির্গুণের একাগ্র প্রেমেই তার পরিতৃপ্তি।

প্রত্যক্ষদর্শী বাৎস্যায়নের মতে গান্ধর্ব-বিবাহেই নর-নারীর মধুরতম মিলন সম্ভব। কারণ পারস্পরিক কামনা-সঞ্জাত এই মিলন প্রাক-বৈবাহিক বৈচিত্র্যহীন আলোচনা দ্বারা ভারাক্রান্ত হয় না, বিবাহোত্তর জীবনে পতি-পত্নীর মধ্যে মতদ্বৈধতার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়। এই প্রসংগে বাৎস্যায়ন আরও বলেছেন যে হৃদয় বিনিময়ের প্রাথমিক অধ্যায় সমাপ্ত হ'লে দূতীর সাহায্যে প্রণয়ী প্রেমিকার সংগে নিভৃত-মিলনের স্থান ও কাল নির্দিষ্ট ক'রে নেবে। তারপর যথানির্দিষ্ট স্থানে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে দুটি মিলনোন্মুখ হৃদয় পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হবে। কন্যার অভিভাবকও দ্বিধাহীন চিত্তে এই গুপ্ত-পরিণয়কে মেনে নিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু'জনকে মিলিত ক'রে দেবেন।

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, কলচুরি নৃপতি অনঙ্গহর্ষ মাত্ররাজের তাপস-বৎসরাজ প্রভৃতি সমকালিক গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার প্রাক-বিবাহকালীন প্রণয়-লীলা ও গান্ধর্ব-বিবাহের বর্ণনা দেখা যায়। তবে সেগুলি প্রধানতঃ প্রাচীন নৃপতি অথবা কাল্পনিক রাজকুমার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের নিয়েই রচিত হ'য়েছে। ভবভূতি রচিত মালতীমাধবে প্রণয়-বিমোহিতা নায়িকাকে সন্ন্যাসিনী কামন্দকী যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন, তা থেকেই গান্ধর্ব-বিবাহ সম্বন্ধে সে যুগের লৌকিক মনোভাবটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তিনি ব'লেছেন, শুধু মাত্র পিতা ও নিয়তিই কন্যাকে শুভংযু বিবাহিত-জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারেন। অবিবেকী-যৌবনের সাময়িক মত্ততা থেকেই গান্ধর্ব-বিবাহের সৃষ্টি। শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত, বাসবদত্তা ও উদয়নের গান্ধর্ব-মিলন অবিচ্ছেদ্য মিলনে পরিণত হ'তে পারেনি। ভবভূতির মালতীমাধব, বাণের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, গভীর প্রেমে আসক্তা হ'য়েও এ যুগের অভিজাত-সম্প্রদায়ের তরুণীরা স্বেচ্ছায় পতি নির্বাচনে দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রত। এই অনিচ্ছা প্রকাশের দ্বারা নারীর আত্মপ্রত্যয়ের ক্রম অবলুপ্তিই প্রকাশিত হ'য়েছে, প্রকাশিত হ'য়েছে তার ক্রমবর্ধমান পর-নির্ভরতা।

হিন্দুযুগের শেষ ভাগেও কন্যার বিবাহ বয়সকে নিম্নগামী করার ধারা অব্যাহত ছিল। মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি এ বিষয়ে পূর্বসূরিদের অভিমতকে বিশ্বস্ততার সংগে অনুসরণ ক'রেছেন। যে গান্ধর্ব-পরিণয় পূর্ববর্তী স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের কতকগুলিতে অনুমোদিত এবং কতকগুলিতে নিন্দিত হ'য়েছে, পূর্বরাগ-জনিত সেই গুপ্ত-বিবাহকে মেধাতিথি পরম দূষণীয়রূপে বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে অষ্টম বা ষষ্ঠ বর্ষই কন্যা-সম্প্রদানের প্রশস্ত কাল। বিশেষ ক'রে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাই বিবাহের পক্ষে সব থেকে সুলক্ষণা। মনু নির্দেশিত বর-বধূর বয়সের পার্থক্যকে কঠোর ভাবে অনুসরণের অনুকূলে মত না দিলেও, তাঁর মতে উভয়ের বয়সের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকাই রুচিসম্মত ও শাস্ত্রানুগ।

এ যুগের সাহিত্যেও নারীর বিবাহকাল সম্বন্ধে আলোকপাত ক'রেছে। অভিধানরত্নমালায় বর্যা এবং পতিংবরা শব্দের উল্লেখ থেকে নারীর স্বেচ্ছা মনোনয়নের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয়। রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা থেকে জানা যায় যে কুঞ্জরজনীতে তরুণীকুল কর্ণে শিখিপুচ্ছ শোভিত ক'রে, মৃণাল বাহুতে কনককেয়ূর বন্ধন ও অর্ধউন্মুক্ত স্ফীত বক্ষে মরকত কণ্ঠমালা দোলায়িত ক'রে পুষ্পমালিকা হস্তে প্রণয় অভিসারে বহির্গত হ'ত। উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথায় প্রণয়াত্মক বিবাহের বহু দৃষ্টান্ত র'য়েছে। স্বয়ংবরা প্রথার মাধ্যমে তরুণীরা মধ্যে মধ্যে মনোমত পতি নির্বাচন ক'রে নিত। কিন্তু উভয় মিলনেই নিয়মিত ভাবে অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়া হ'ত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পূর্ববর্তী যুগেই নারী তার যে আত্মবিশ্বাস হারায়ে

শুরু ক'রেছিল, আলোচ্য যুগে তার গতি আরও ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। নতুন শাস্ত্রকারেরা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর রচিত স্মৃতিগ্রন্থগুলিকে সনাতন বৈদিক সংহিতার মর্যাদা দিয়ে জনমনকে প্রভাবিত করতে চাইলেন। ফলে সাধারণ্যে বাল্য-বিবাহ আরও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হ'ল। বালিকাবধূও বিনা প্রতিবাদে পতির একাধিপত্য স্বীকার করে নেওয়ায় তার অনুগতা শিষ্যায় পরিণত হল। স্বাধীন শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সামান্যতম সুযোগটুকুও তার রইল না। মেধাতিথির সাক্ষ্য এবং সমসাময়িক শব্দকোষ গ্রন্থগুলিতে ব্রহ্মবাদিনী নারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অভিপ্রায়-সূচক অনুল্লেখ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদ্‌গামিতাই স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত করে। কাব্যমীমাংসা, উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথা ও পরবর্তীকালে রচিত সুক্তিমুক্তাবলীতে শাস্ত্র-অভিজ্ঞা কলানিপুণা নারীদের অবস্থিতি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ উল্লেখ থাকলেও, তা' মুষ্টিমেয় নারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সাধারণ নারীর শিক্ষা জীবনের চিত্র তা থেকে পরিস্ফুট হয় না।

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হিন্দু-ভারতের প্রথম যুগে প্রাপ্তযৌবনা তরুণীর বিবাহই সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। তৎকালীন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ-জীবনে মানুষের জীবন-নীতি ঐহিক ভোগ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রভাবিত হ'ত না। জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল—ত্যাগ, অনাসক্তি, আত্ম-বিলোপন ও আধ্যাত্মিক বর্ধণা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল, নর-নারীর একাত্ম-মিলনের দ্বারাই পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতি বিধৃত। পুরুষ ও নারী একে অপরের সম্পূরক, একের মধ্যে উভয়ের সম্পূর্ণতা সম্ভব নয়। ফলে, সে যুগের নর-নারী তথা পতি-পত্নীর ছিল অভেদ-মিলন। দাম্পত্য-জীবনে এই অভেদোপলব্ধির ফলে স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামীর সুরত-সহচরী ছিল না, সে ছিল একাধারে স্বামীর সখী ও সহধর্মিণী। উভয়ের পারস্পরিক সহানুভূতি, সহায়তা, সেবা, ত্যাগ ও মিলিত প্রচেষ্টায় পরম সুখদ পরিবারের সৃষ্টি হত। নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় সে-ও পুরুষের মত শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অধিকারিণী ছিল। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা তাকেও গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবেশের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হ'ত। বয়সোচিত দূরদর্শিতা অর্জনের ফলে পতি-নির্বাচনে তার স্বাধীন মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হত। পরিবারে পত্নীই ছিল নিয়ামিকা, পরিচালিকা ও সুখশান্তি-বিধায়িনী। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে স্বচ্ছন্দ সমাজ-জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হল। অর্থ নৈতিক স্থিতি ও সমৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় বিলাস-বৈভব ও সম্ভোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। পুরুষের মনে নারীকে ভোগ ও বিলাসের উপকরণে পরিণত করার একটা স্বার্থ-দুষ্ট প্রবৃত্তি দেখা দিল, দেখা দিল নারীর ওপর একাধিপত্য বিস্তারের উগ্র আকাঙ্ক্ষা। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থে এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনে অসবর্ণ বিবাহও সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করল।

এই সমস্ত কারণেই তদানীন্তন সমাজ-জীবনে যে সংক্ষোভের সৃষ্টি হ'ল, তাকে সংযত করবার জন্যে মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকার বিবাহাদি সংস্কারকে কঠোর বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়মিত ক'রতে চাইলেন। ব্রাহ্ম-দৈব-আর্ষ-প্রাজাপত্য এই চতুর্বিবাহ ধর্ম-বিবাহরূপে গৃহীত হ'ল, আর আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে অশাস্ত্রীয় অশুভ বিবাহরূপে বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হ'ল। হিন্দু-নারীর দৈহিক শুচিতা রক্ষার জন্যে তাঁরা বাল্য বিবাহকে অনুমোদন ক'রে পরোক্ষে স্বাধীন শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ক'রলেন। নাবালিকা পত্নীকে শেখান হ'ল, স্বামী ছাড়া স্ত্রীর কোন পৃথক সত্তা নেই। সে স্বামীর সখী নয়, সহধর্মিণী নয়, বশংবদা দাসীমাত্র। পুরুষ-প্রধান সমাজে তার নারী-জীবনের আদর্শ নির্দিষ্ট হ'ল একাগ্র পতিপ্রাণতা, পতির সংসারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা। স্বামীর প্রতি এই একান্ত নির্ভরতা থেকেই ক্রমশঃ স্ত্রীর মনে ধারণা জন্মাল যে স্বামিসহবাসেই তার সাংসারিক স্থিতি। ধর্ম-বিবাহের দ্বারা পতি-পত্নী যে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, পরলোকেও তা অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই বিশ্বাসের ফলেই বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিনিয়োগ অবস্থাকে শাস্ত্রকর্তারা অশুভ, অশাস্ত্রীয় বলে অভিহিত ক'রলেন। সৃষ্টি হ'ল সতীদাহ প্রথা—মৃত-পতির চিতায় পতিব্রতা নারীর আত্মাহুতি। প্রথমে এই নৃশংস প্রথা রাজকুলে সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ সতীত্বের পরাকাষ্ঠারূপে সাধারণ্যেও এর ব্যাপক অনুসরণ দেখা দিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, মনু-পরাশর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রে বাল্য-বিবাহের যে বিধান দেওয়া হ'য়েছে তা' অবিমিশ্র অশুভ নয়। পরিবারই সমাজের ভিত্তি। সেই পারিবারিক জীবনে সুশৃংখলা ও শান্তি সংরক্ষণ করতে হলে নারীর বাল্য-বিবাহ একদিক দিয়ে যথেষ্ট সুবিধাজনক। কারণ, স্বাধীন শিক্ষায় শিক্ষিতা যুবতী কন্যাকে বিবাহের ফলে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ জনিত যে বিশৃংখলা ঘটবার সম্ভাবনা থাকে, বাল্য-বিবাহের ফলে তা বহুলাংশে দূরীভূত হতে পারে। আর্য-বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হল ধর্মানুষ্ঠান ও অন্তে শুদ্ধ সংযত অধ্যাত্ম জীবন প্রাপ্তি। শাস্ত্রকারেরা তাই ব্যবস্থা করেছিলেন, পুরুষ বিধিবদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বিস্তারিত শিক্ষা লাভ করে কোন অরজা কন্যাকে স্ত্রী তথা শিষ্যারূপে গ্রহণ করবে। পরে নিজের আদর্শে যথোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তাকে সহধর্মিণী হবার যোগ্য করে নেবে। এই পরিকল্পনায় মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সত্য, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, নারীর বিবাহ-বয়স নিম্নগামী হওয়ায় পুরুষেরও বিবাহ-বয়স আপনা হতেই নিম্নগামী হয়ে পড়ল। পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের কাল হ্রস্বতা প্রাপ্ত হওয়ায় পুরুষের সুনিয়মিত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এল। পতিগৃহে বালিকা-বধূ উপযুক্ত শিক্ষার নামে সুকঠিন বিধি-নিষেধের ভারে নিপীড়িত হতে লাগল। সঙ্কীর্ণ নিরানন্দ পারিবারিক জীবনে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, তার স্বাধীন সত্তা অবলুপ্ত হয়ে গেল—রুদ্ধ হয়ে গেল তার জীবনের সুস্থ বিকাশ। নারীজীবনের পরবর্তীকালের ইতিহাস তাই হীনমন্যতা ও পরনির্ভরতার ইতিহাস, দাসত্বের ইতিহাস, উৎপীড়নের ইতিহাস।

এই প্রবন্ধ রচনায় নীচের বইগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(১) Sanskrit Literature—Macdonell
(২) The History & Culture of the Indian People. Vol. I, II, III & IV—Majumdar & Pusalker.
(৩) Sexual life in Ancient India—Meyer.
(৪) Social Life in Ancient India—Chakladar
(৫) Position of Women in Ancient India—Altekar.

সাধন—প্রাণায়াম

স্বামী শিবানন্দ

সাধন শব্দে ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় বুঝায়। ভক্তিপথের পথিকই হউন বা জ্ঞানপথের পথিকই হউন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। সাধন ব্যতীত কেহ ইষ্টলাভ করতে সক্ষম হন না। ভক্তিপথের পথিক, যাঁদের কেবল দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন, যাঁরা বিশ্বাস করেন ভগবান বিভিন্ন মূর্তিতে গোলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠলোকাদিতে বাস করেন, আর যাঁদের লক্ষ্য দেহান্তে ভগবৎকৃপায় নিজ নিজ ইষ্টলোকে গমন, তাঁদেরও সাধন অবশ্যই করতে হয়। তাঁদের অবশ্যই পূজা অর্চনা রূপধ্যান, ভগবৎকথা পাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই করতে হয়। তাঁরা একটু সাধনে অগ্রসর হলেই নির্জনবাসপ্রিয় হন এবং অনেক সময় ইন্দ্রিয়াদি রোধ করে আপনাপন ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন হন। তাঁরা কেবল একেবারে ভগবানে লয়প্রাপ্ত হতে চান না, সেব্য-সেবক-ভাব বজায় রাখতে চান। কিন্তু তাঁরা তাঁর ধ্যানে আনন্দ, তাঁর নামজপে আনন্দ, তাঁর নামগানে আনন্দ, অপর ভক্তের সহিত সংপ্রসঙ্গে আনন্দ ও সর্বভূতে ভগবান বিরাজ করছেন দর্শন করে সর্বভূতের সেবায় আনন্দ উপভোগ করেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, সাধনের পূর্বে ভগবান বিশেষ বিশেষ রূপে বিশেষ বিশেষ লোকে বাস করেন। এবং সে সমস্ত এজগৎ ছাড়া—এ ধারণা তাঁদের ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হয়ে শেষে এই মনুষ্য-হৃদয়ই যে তাঁর আবাসস্থান ও উহাই যে বাস্তবিক স্বর্গ, গোলোক, শিবলোক ইত্যাদি, ইহা উপলব্ধি হয়। সাধন দ্বারা চিত্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ হলে ভাগাবান সাধক হৃদয়েই ভগবানকে দর্শন করেন এবং তখনই দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর অপরিপক্কবুদ্ধি-প্রসূত সব বাদানুবাদ মিটে যায় এবং শান্তিলাভ হয়।

জ্ঞানপথের পথিক, যিনি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বা 'নেতি নেতি' বলে থাকেন, এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম) এই উপলব্ধি যাঁর উদ্দেশ্য, তিনি গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস, ইহলোকে বা পরলোকে জ্ঞানরূপ কর্মফলভোগেচ্ছা না রাখা এবং শম দম তিতিক্ষা উপরতি প্রভৃতি সাধন করেন। উপরি-উক্ত ভগবানের আবাসস্থান স্বর্গাদিতে গমন এবং সুখভোগ ইত্যাদি জ্ঞানীর অভিপ্রেত নয়। তাঁর মতে ঐ সকলও অনিত্য এবং মনোরাজ্যের অন্তর্গত। জ্ঞানী চান মনেরও বাহিরে যেতে, 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' (বাক্য-মনের অতীত) অবস্থা লাভ করতে। তিনি 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (পুণ্য ক্ষয় হ'লে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন)—এ অবস্থা চান না। তিনি জানেন 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' অর্থাৎ এই জন্মে এই শরীরে যিনি জীব ও ব্রহ্মের একত্ব দর্শন না করেন তিনি বার বার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জীবন্মুক্ত পুরুষ আবার আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন করে তাদের সেবাতেও রত হন। তাঁর দ্বারা জগতে মহা মহা কল্যাণকর কার্য্যও সাধিত হয়।

এখন বোঝা গেল, যিনি যে পথেই ভগবান লাভের জন্য যান না কেন, সাধন সকলেরই প্রয়োজন। শাস্ত্রেও নানাবিধ উপায় কথিত আছে। প্রাণায়াম এই উপায় সকলের মধ্যে অন্যতম। আমি ভগবান লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে প্রাণায়ামরূপ সাধন তাহাই বলিব। বর্তমান সময়ে অনেকে শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্যও প্রাণায়াম অভ্যাস করেন এবং শুনিতে পাই নাকি এরূপ উপদেষ্টা বা শিক্ষকও আছেন। আমার মতে ঐরূপ ভাবে প্রাণায়াম মহা অনিষ্টজনক এবং অনেকে 'অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ' (অন্ধগণ যেরূপ অন্ধ দ্বারা পরিচালিত হয় সেরূপ)

হয়ে প্রতারিত হয়েছেন এবং কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন।

প্রাণায়াম শব্দ বুঝা অতি সহজ—এত সহজ যে, বুঝাইয়া দিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা প্রত্যহ সকলেই অজ্ঞাতসারে প্রাণায়াম করিয়া থাকি আর ইহা অভ্যাস করাও অতি সহজ। যখন তুমি কোন অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ গল্পের পুস্তক পাঠ কর, বা আগ্রহের সহিত কোন নূতন দেশের ইতিহাস অধ্যয়নে নিযুক্ত হও, অথবা নিবিষ্টচিত্তে গণিতশাস্ত্রের কোন দুরূহ সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত থাক, তখন তুমি এমনি মেতে যাও যে, গল্পটা শেষ না হলে বা গণিত-সমস্যাটার মীমাংসা না হলে তোমার কোনমতে সেগুলি ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। এই সময় যদি তুমি তোমার শ্বাসের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখ, তুমি দেখবে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক বেগ অনেক কমে গেছে, উহা খুব আস্তে আস্তে চলছে, যেন হৃদয়ের ভিতর শ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা বন্ধ হয়েছে। দুঃখসূচক ঘটনা পাঠ করতে করতে দেখা যায়, দুঃখেতে হৃদয়টা যেন ভারি হয়ে উঠে আর আনন্দসূচক ঘটনায় হৃদয়টা যেন স্ফীত হয়ে উঠে। এই উভয় অবস্থাতেই শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হয়। যদি অধিক দুঃখজনক ব্যাপার পড়, তখন হয়ত কখন হৃদয়ের ভার অশ্রুপাতে অনেকটা লঘু করে দাও বা অত্যন্ত আনন্দের উদ্রেক হলে হাস্য বা আনন্দাশ্রু-মোচন দ্বারা উহা হাল্কা করে দাও। কিন্তু এইটি বিশেষ করে নজর কোরো যে, উভয় ব্যাপারেই শ্বাস-প্রশ্বাস (যাহা প্রাণবায়ুর কার্য্য) অনেকটা রুদ্ধভাবে থাকে। এই সকল উদাহরণ থেকে বেশ বুঝা গেল যে, কোন এক বিশেষ বিষয়ে মন সংযত হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য স্বভাবতঃই রুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয় বা প্রাণায়াম আপনা হইতেই হয়। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার,—যখন ঐরূপ নিবিষ্টচিত্তে পাঠের সময় বা গণিত-সমস্যা সমাধানের সময় শ্বাস 'ধীরে ধীরে বইছে কিনা' লক্ষ্য করতে যাবে, তখন সেই পাঠ বা অঙ্কের দিকে মন থাকবে না, শ্বাসের দিকে মন আসবে, এবং দেখবে উহা আবার ক্রমশঃ সহজভাব ধারণ করবে। কিন্তু তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে, শ্বাস রুদ্ধভাবে বইছিল, এখন সহজভাব ধারণ করল। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত এই তত্ত্বটির আলোচনা করলে এই দেখা যায় যে, মন কোন একটা ভাবে একেবারে মগ্ন হলে প্রাণবায়ু আপনা হতে কতকটা রুদ্ধভাব ধারণ করে; আর ভাবই মুখ্য, প্রাণনিরোধ গৌণ। এইরূপে প্রাণায়াম আমরা নিত্যই অজ্ঞাতসারে করে থাকি।

এখন দেখতে হবে, সাধনপথের প্রাণায়াম কি? এ-ও কি ঐরূপ স্বাভাবিক, না কৃত্রিম কোনরকম কিছু করতে হয় এবং সাধন নিজেও স্বাভাবিক কি?

ইহার উত্তর এই—সাধন স্বাভাবিক এবং যত প্রকার সাধনের উপায় শাস্ত্রে উক্ত আছে তৎসমুদয়ই স্বাভাবিক। যেমন ক্ষুৎপিপাসা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম, তাহাদের নিবারণের উপায়ও মানুষ যা করে থাকে, নানারূপ হলেও কিন্তু স্বাভাবিক।

সকলেরই সময়ানুসারে ক্ষুধা হয়ে থাকে। একজন আহার করছে দেখে যাঁর উদর পূর্ণ হয়, তাঁর কখনই ক্ষুধার উদ্রেক হতে পারে না। যদি কারও হয় তবে বুঝতে হবে তাঁরও উদর পূর্ণ নাই। তাঁরও আহারের সময় হয়েছে। অতএব তাঁর কর্ত্তব্য তিনি সাধ্যানুসারে আহারের চেষ্টা করেন ও আহার করেন। যদি কাহাকেও আহার করতে দেখে ক্ষুধা না থাকলেও কেউ খেতে চান, তাঁকে কৃত্রিম উপায়ে ক্ষুধার উদ্রেক করতে হয়। সুতরাং তিনি ক্রমে পীড়াগ্রস্ত হন। জোলাপ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে অবশ্য শেষে প্রায় তাই ঘটে। আবার কোন লোকের যদি ক্ষুধার উদ্রেক মোটেই না হয় তবে জানতে হবে যে, তাঁর কোন ঔষধ সেবনের দরকার। ঔষধ সেবনে তাঁর উপকারও হতে দেখা যায়।

দৈহিক রাজ্যে যেরূপ, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও ঠিক তদ্রূপ। মানবদেহ প্রাপ্ত হয়ে যাঁরা কেবল আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে অর্থাৎ কেবল নিজের সুখভোগে, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই রত, তাঁরা মনুষ্যদেহ মাত্র পেয়েছেন, কিন্তু ভিতরে তাঁদের পশুভাব এখনও বর্ত্তমান। যাঁদের ভগবৎচিন্তা বা ভজন, সাধন, সৎসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, দয়া, দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি নাই, তাঁরা এখনও মনুষ্যপদবাচ্য হন নাই। সুতরাং তাঁরা মনুষ্য-সমাজের নিয়মে নিয়মিত হতে কষ্টবোধ করেন এবং পারেনও না।

প্রাশন, মোচন, বিহার, পাঠাভ্যাস, পিতামাতা গুরুজনের সেবা, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার মনুষ্যপদবাচ্য মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং সকলে করেও থাকেন। তেমনি ধর্ম্মসাধনও মনুষ্যের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন এবং সকল মনুষ্যপদবাচ্য মানবই কোন-না কোনরূপে ধর্ম্মসাধন করে থাকেন। কেহ স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্ম সাধন করছেন, অপর কেহ তাঁর আচরণ দেখে নিজেও সময় উপস্থিত নিশ্চিত জেনে সরলভাবে সাধন আরম্ভ করেন। কেহ বা অপরের দেখাদেখি অসময়ে ধর্ম্মসাধনে ইচ্ছা করেন এবং শরীরে কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্রেকের চেষ্টার ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সাধন সম্বন্ধীয় নানা উপায়, যথা—সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, প্রাণায়ামাদি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাণের প্রকৃত ইচ্ছা না থাকা প্রযুক্ত অদৃষ্টক্রমে ভণ্ড গুরু জুটে। শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম জানতে না পেয়ে শুষ্ক প্রাণায়ামাদি করে শারীরিক রোগগ্রস্ত এবং ধর্ম্মের উপর সর্ব্বনাশক বিতৃষ্ণাযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এ জীবনটা বৃথা যায়। ধর্ম্মের উপর বিতৃষ্ণার ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যে কঠিন রোগ আর নাই। বিশেষরূপে, যাঁদের দেখে শুনে ঘেঁটে ঘুঁটে এ অবস্থা হয়, তাঁদের রোগ অসাধ্য চললেও চলা যায়। সর্বশেষে, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁদের এমনি আধ্যাত্মিক বদহজম যে, হাজার হাজার লোককে ধর্ম্ম সাধন করতে দেখলেও ধর্ম্মসাধনেচ্ছার নামগন্ধও হয় না। ভবরোগবৈদ্যস্বরূপ 'শান্তাঃ মহান্তো নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ। তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানপি জনান্ অহেতুনা তারয়ন্তঃ॥' অর্থাৎ, মহাপুরুষগণ বসন্তকালের মতো লোকের হিতসাধন করিতেই জীবন-ধারণ করেন। তাঁরা স্বয়ং ভীষণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য লোকদিগকেও নিষ্কাম ভাবে উদ্ধার করেন। কোন মহাত্মা যদি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে ধর্ম্মবিমুখদের আধ্যাত্মিক অজীর্ণতারূপ ভবরোগের ঔষধ সেবন করান, তবে তাহা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই কল্যাণকর হয়ে থাকে। তাদের তখন স্বাভাবিক ধর্ম্মক্ষুধার উদ্রেক হয়।

সাধনের অঙ্গ প্রধানতঃ গুরূপদিষ্ট নামজপ ও ধ্যান। গুরু বা আচার্য্য-সেবা, সৎসঙ্গ, সৎশাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি দ্বারা ঐ গুরূপদিষ্ট নাম জপ ধ্যানাদিতে অধিক প্রেম হয়, সুতরাং মনঃসংযমও অধিক হয়ে থাকে। কি জ্ঞানপথ কি ভক্তিপথ, জপ ধ্যান সকল মার্গের সাধকেরই অবলম্বনীয়। জ্ঞানীর প্রণবরূপ, ভক্তের শিব তারা হরি ইত্যাদি বহুবিধ নামের জপ। ভগবানের স্মরণ-মনন প্রত্যেক সাধক সর্ব্বদাই করেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ-মননের প্রধান উপায় নাম জপ প্রেমের সহিত।

এখন সাধনপথের প্রাণায়াম কি? প্রাণায়াম করলেই কি ভগবান লাভ বা আত্মানুভূতি হয়? না, কখনই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, মায়ের শিশুসন্তানের উপর যেমন টান, সতী স্ত্রীর পতির উপর যেরূপ টান, কৃপণের ধনের উপর যেরূপ টান, ঐরূপ টান ভগবানের জন্য যখন কাহারো ভাগ্যক্রমে ঘটে, তখন তার অতি অল্প সময়ের মধ্যে বস্তু লাভ হয়। যখনই কাহারো হৃদয়ে ঐ ব্যগ্রতা উপস্থিত হয়, তখনই তাঁর প্রাণবায়ুর অবস্থা রুদ্ধভাব ধারণ করে। ঐ অবস্থাতে সাধক জপ, ধ্যান, গান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি যা করেন, তাই অতি সংযম ও বিশেষ অনুরাগ ও প্রেমের সহিত সাধিত হয় এবং প্রাণবায়ুর ঐরূপ অবস্থাকেই প্রাণায়াম বলে। নতুবা অনুরাগ নাই, টান নাই, প্রেম নাই, শুষ্ক শ্বাসরোধ এবং অতি ধীরে ধীরে তাহা ত্যাগ করলে জ্ঞান ভক্তি লাভের কোন সুবিধা হয় না। যোগদর্শনে 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' এবং 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' সূত্রে চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ এবং সেই নিরোধ সময়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ আত্মার স্বীয় রূপে অর্থাৎ পরমাত্মায় অবস্থান হয় বলা হয়েছে এবং এই অবস্থা লাভ করবার নানা উপায় ক্রমে ক্রমে বলা হয়েছে। যাঁরা স্বস্বরূপ অনুসন্ধানে অনুরাগী, কেবল তাঁদের জন্যই ঐ সকল উপায় বলা হয়েছে। যাঁরা সদ্‌গুরু সেবা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ ও মনন দ্বারা চিত্তের শুদ্ধাবস্থা লাভ করেছেন। তাঁদের স্বরূপের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তাঁরা তখন ক্রমশঃ ধ্যানে নিমগ্ন হতে থাকেন এবং তাঁদের প্রাণায়াম আপনা হতে হয়। নতুবা অশুদ্ধ চিত্তে স্বরূপ কি পদার্থ ও স্বরূপের জ্ঞানই বা কিরূপ? ইত্যাকার সংশয় সদাকাল থাকে। স্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সমাধি হয়—উহা প্রাণায়ামের পরাকাষ্ঠা—তখন ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা—এ তিনের পার্থক্যবোধ থাকে না।

এখন সার কথা এই যে, হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত ভগবানের নামজপ ও স্মরণ-মনন করলে প্রাণায়াম আপনা হ'তেই হয়। ফল আধ্যাত্মিক জীবনে অপরিমেয়। ব্যবহারিক জীবনে মনঃশক্তিবৃদ্ধি, চরিত্রের শুদ্ধতা, চিত্তের প্রসার, দয়া, দৃঢ়ব্রততা অর্থাৎ ঈশ্বর-কৃপায় তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তাঁর ভক্তে সঞ্চারিত হয়। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সহজ উপায়—এ পথে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ পাওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সৎসঙ্গ পাওয়া ভগবানের বিশেষ কৃপা। শ্রুতিও বলছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' ভগবানকে বিশেষরূপে জানবার জন্য সমিৎ অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠহস্তে বেদপারদর্শী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্যেটের প্রেমপত্র ঃ কবির তৃতীয় মানসী

গত বৈশাখ সংখ্যায় কেটহেন সনকফের নিকট কবিগুরু গ্যেটের পত্রাবলী পড়েছেন, প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লাইপজিগে কবির এই প্রেম ব্যর্থ হয়। অসুস্থ কবি ফ্রাঙ্কফার্টে মা এবং বোনের সেবা ও যত্নে সুস্থ হন। তারপর তিনি ষ্ট্রাসবার্গে পুনরায় আইন পড়তে যান। সেই সময় একদা তিনি সেসিনহিমে ভ্রমণে যান। এই সেসিনহিমে কবির জীবনকে এক নারী সুরভিত করেছিল। এই মহীয়সী রমণীর নাম ফ্রেডারিকা। কবি কর্তৃক লিখিত বহু পত্রাবলী ফ্রেডারিকার সহোদরা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ফলে খুব অল্প পত্র আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। ফ্রেডারিকার প্রতি কবির প্রেম দীপাম্বিতরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল! সত্যিই তিনি এই রমণীকে ভালবেসেছিলেন। ফ্রেডারিকাও কবিকে ভালবেসেছিলেন। গ্যেটে বলেছিলেন, পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর নারী আছে। এক শ্রেণীর নারীদের ঘরে রাখা যায়; আর এক শ্রেণীর নারীদের মুক্ত আকাশের নীচে ছাড়া কল্পনা করা যায় না—ফ্রেডারিকা হলেন সেই মুক্ত আকাশের নীচের নারী; এই শ্রেণীর নারী চলার ঠিকরণে পৃথিবীর ফুলের পেলবতাকে হার মানায়। ফ্রেডারিকার মুখের রঙ উজ্জ্বল নীল আকাশের মত বলে কবির মনে হত; বাইরের, রূপ, রস এই সব নারী ঘরে এনে জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে; জীবনের দুঃখ ও বিপদকে মেয়েরা সহজেই কাটিয়ে উঠে এই কারণে যে তাঁরা নিপুণ নারী—এই ছিল গ্যেটের মত। তবু গ্যেটের জীবনসঙ্গিনী এই রমণী হতে পারেন নি সম্ভবতঃ এই যে marriage is not the bond of the souls. এই মহীয়সী রমণী আজীবন কুমারী ছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব শুনে ব'লতেন, যে হৃদয় তিনি গ্যেটেকে দিয়েছেন তা আর কাউকে তিনি সমর্পণ করতে পারবেন না। গ্যেটে যখন তাঁর আত্মজীবনী লিখছিলেন তখনও ফ্রেডারিকা জীবিত ছিলেন; ফ্রেডারিকার কথা কবির মনে প্রায় জাগত। এই ফ্রেডারিকাকে তিনি হেলানা চরিত্রে রূপ দিয়ে অমর করে রেখেছেন ফাউষ্ট নাটকে। ফাউষ্ট নাটকে মার্গারেট চরিত্রটি হল গ্রেচেনের রূপ—যে গ্রেচেনকে তিনি বয়ঃসন্ধিকালে প্রথমে ভালবেসেছিলেন। ফ্রেডারিকাকে লিখিত একখানি পত্রের অনুবাদ নীচে তুলে ধরা হল।

ষ্ট্রাসবার্গ : ১৫।১০।৭০

আমার নতুন বান্ধবী,

তোমাকে এই নামে ডাকতে আমি আর দ্বিধা করি না। আমি যদি তোমার চোখের সামান্য ভাষা বুঝে থাকি তবে প্রথম দৃষ্টিতে তোমার চোখের ভাষা দেখে বন্ধুত্বের আশা করতে পারি—আর আমাদের হৃদয়ের তরফ থেকে প্রতিজ্ঞা করতে পারি। তোমার হাবেভাবে যতটা বুঝতে পেরেছি তা থেকে আমি কী ভাবতে পারি না যে তার বিনিময়ে তুমি আমার প্রতি একটু বেশী প্রবণতা দেখাবে। তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে, সম্ভবতঃ সেটা খুব বড় বেশী কথা না। আর কোন বিশেষ বিষয়ে তোমাকে কেন লিখছি, এবং লেখার হেতু কী তার উদ্দেশ্য অবশ্য অন্য। হয়ত ভিতরের চঞ্চলতার জন্য আমি এই কথা লিখছি আর সানন্দে জানাচ্ছি যে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে উপস্থিত হব। এ-জন্য একটা সাদা কাগজ আমাকে সান্ত্বনা জোগাবে। আর আমার মনে হয় তোমার শান্তির জন্য কর্মমুখর শহরে একটি পক্ষিরাজ ঘোড়া হাজির হবে—অবশ্য তা সম্ভব হবে যদি তুমি তোমার বন্ধুর বিচ্ছেদের কথা ভাব।

আমি যখন বিদায় নেই তখন সে-বিদায় কত কষ্টকর হয়েছিল তা তুমি বুঝতে পার। ওয়েল্যাণ্ড বাড়ী ফিরবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। আমাদের অবস্থা বুঝতে পারলে সে-বুড়ো হয়ত থেকে যেত। সে ফেরবার জন্য উদগ্রীব—আমার ফেরবার মন নাই এমন অবস্থায় আমাদের কথাবার্ত্তা খুব প্রীতিপ্রদ বলে মনে হত না। কম পথ ঘুরে আমি আসবার চেষ্টা করেছিলাম। তার ফলে বিস্তৃত জলার ধারে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রাত নেমে এল। বৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন দুর্যোগের অভাব হয়নি।

…যা হোক অনেক ঘুরে বাড়ী পৌঁছালাম। তবে তোমাকে দেখবার বাসনায় আমি আবার সান্ত্বনা ফিরে পেয়েছিলাম। আবার দেখার মধ্যে বেশ একটা হার্দ্যভাব আছে। আমাদের ভাব-উচ্ছ্বসিত হৃদয় যদি সামান্য কিছুতে বিপর্য্যস্ত হয় তবে তার সরাসরি উপশম হবে এই বলে। প্রিয় মন, শান্ত হও। যাদের তুমি ভালবাস তাদের কাছ থেকে তোমার আর বিচ্ছেদ হবে না—শান্ত হও প্রিয় মন। তারপর হয়ত তার ওপর আমরা প্রলেপ বুলাব।

…তোমাদের গ্রাম্য পরিবেশ থেকে ফিরে এসে শহরের এই কোলাহল আমার খারাপ লাগছে।

সত্যিই কুমারী! এ-শহর আমার কাছে খারাপ লাগছে। মনে হয় সময় একদিন সব কিছু ম্লান করে দেবে। যে আনন্দ, সুখ আমরা উপভোগ করছি তখন হয়ত দয়ালু বান্ধবীর সজীবতা

আমার মনে থাকবে না। তবু এ কী ভুলে যেতে পারি? সুতরাং চিন্তাই এখন কমাই। তোমাকে প্রায়ই আমি লিখব—ইতি।

ইটালী ভ্রমণ-অন্তে গ্যেটে যখন ভাইমারে এসে পৌছান তখন গ্যেটের জীবনে আর এক নারীর আবির্ভাব হয়। এই রমণীর নাম ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াস। এই রমণী বেরটুশ নামক ভদ্রলোকের অধীনে নকল ফুল তুলে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কথিত আছে যে গ্যেটে একবার এই রমণীর রূপের প্রশংসাও করেছিলেন। তাঁর ভাই একটি পদের জন্ত দরখাস্ত করে বোনকে বলেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াস রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্যেটের হাতে যেন দরখাস্তটি দিয়ে দেন। গ্যেটে এই রমণীর রূপ দেখে অভিভূত হন। অনতিবিলম্বে তিনি ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াসকে বাড়ীর কর্ত্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। এখানে বলা যেতে পারে, তাঁর ভাই উত্তরকালে Rinaldo Rinaldini নামক উপন্তাস লিখে প্রখ্যাত হন। ইটালী-ভ্রমণ অন্তে গ্যেটের চারিত্রিক প্রবণতা বেশ উন্নত পর্য্যায়ে উঠেছিল। তাঁর এই জীবনাদর্শের সঙ্গে কেউ সমান তালে চলতে পারছিল না—এই ছিল গ্যেটের মত। শ্রীমতী স্তায়েনের সঙ্গে গ্যেটের বিরোধ চলছিল। শ্রীমতী স্তায়েন গ্যেটের মধ্যে ইন্দ্রিয়ধর্মিতা ও প্যাগান প্রেমিকের অভিব্যক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি। গ্যেটে বোঝাতে চাইতেন ইন্দ্রিয়ধর্মিতার মধ্যে মুক্তি রয়েছে এবং এইটিই হল ধর্ম। শ্রীমতী স্তায়েন এতে তুপ্ত হননি। মৃতাহুতি পড়ল যখন স্তায়েনের শিশু পুত্র ফ্রিৎজ এসে জননীকে বলেন গ্যেটের উত্তানগৃহে এক রমণীকে সে দেখেছে। শ্রীমতী স্তায়েন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পরিশেষে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। গ্যেটে ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াসকে প্রথমে পরিচারিকার পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে বিবাহিত পত্নী বলে দাবী জানান। বিবাহ খৃষ্টধর্মমতে হয়নি। এর জন্ত পত্নীর মর্য্যাদা অনেকে দিতে চাইতেন না। অভিজাত সমাজ এ-বিবাহ অনুমোদন করেন নি। অবশ্য গ্যেটের জননী এই বিবাহকে মেনে নেন। বিবাহের পর গ্যেটের পুত্রসন্তান জন্মায়। ছেলেকে ও পত্নীকে তিনি ভালবাসতেন। বিবাহের বহুদিন পরে তিনি খৃষ্টধর্মমতে বিবাহকে পবিত্র করেছিলেন। গ্যেটের জীবন কবি-পত্নী বাঁচান একবার। এই ঘটনার পরেই তিনি বিবাহ পবিত্রকরণ করেছিলেন। কবির জীবনের অভিব্যক্ত হল Roman Elegies। কাব্যের প্রেয়সী কবিপত্নী। সে-সৃষ্টি ৭.৭র পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি।

যদি ভালবাসার ধনকে প্রকৃত ভালবাসা যায় তবে তাকে ছেড়ে এলেও কিছু হয় না। সময় চলেছে। তার স্থানে কোন কিছু মূল্যাভিষিক্ত করা যায় না। ছেলেকে স্নেহ দিও। মদ্যপান বেশী করে ফেলেছি। তবে আর কারও প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। ছেলের কথা ভাবছি, তার সঙ্গে তোমার কথা ভাবছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। ইতি—

শ্যাম্পেনের কাছে এসে পড়েছি, তবুও মদের অভাব। 'ননীর মত কোমল শয্যা' পাতা আছে, সুতরাং তোমার চিন্তা নাই, বাড়ীর মতনই বিছানা। আমার চেয়ে অনেক সুন্দর লোক থাকতে আমাকে গ্রহণ করলে কেন? এতে অসূয়া আসে। আমাকে তুমি ভালবেস। আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো, তোমাকে অধীর ভাবে ভালবাসি। এর চেয়ে অন্ত কিছুতে আমি সন্তোষ পাই না। মা তোমাকে বধূ হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন, তোমার ওপর তাঁর ধারণা ভাল। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিও অন্ততঃ সন্তানের জন্য। তোমাকে ছাড়া আর কারও প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। ইতি—

সেরা মদ আর তোমাকে পাঠাতে পারছি না। আমাকে ভালবাসতে ভুল না। বাড়ী ঝকঝকে তকতকে যেন থাকে। মাদুর, মিষ্টি আর রান্নাঘরের কথা মনে পড়ছে। তোমাকে স্বপ্ন দেখি।···শ্রীমতী স্তায়েনের কাছে ছেলেকে পাঠিয়ে দিও।

আবহাওয়া খুব খারাপ। কুয়াশায় দ্রাক্ষাক্ষেত মরে গেছে। আবহাওয়া সুন্দর। রাত্রি আরও রমণীয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে পথ ঘাট মন্দিরের চুড়ো সব দগ্ধ হয়ে গেছে। ইতি—

Carlsbad—19. 7. 95.

এখানকার আবহাওয়া ভাল নয়। কয়েকটা চকিত মধুর নারীদের চাহনি দেখা যায়, তবে ভয় নাই। আমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে ভুলিনি; তাকে আমি ভালবাসব। ছেলের প্রতি আর তোমার প্রতি আমার মন পড়ে আছে। গৃহের দিকে মন টানে। আমার জীবন যে তোমার মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছে। ইতি—

Illmenan—29. 8. 95.

কাজের চাপে আটকা পড়ে গেছি। দ্রুত ফিরতে পারব না। তাই আমার সঙ্গে ছেলেকে আরও কিছুদিন থাকতে হবে। সে কত শান্ত হয়েছে জান। ছেলে আমার সকলের সঙ্গে কথা বলে। সব কিছু দেখে। সকলে তাকে চেনে। মধু দিয়ে তৈরী কেক তোমার কাছে সে পাঠাচ্ছে। এ-গুলো খেতে সে বেশ ভালবাসে। তার কত কষ্ট হয় এ-গুলো পাঠাতে। কিছু মোজা পাঠিয়ে দিও। এখানকার আবহাওয়া খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি সব ভিজে যায়। ইতি—

তোমার জন্ত মসলিনের পোষাক বানাতে দেব। তার পর ফ্রাঙ্কফার্টে মার কাছে যাব। এ-কথা কাউকে বল না। তোমার কাছে ফিরে গেলে আশ্বস্ত হব। খরচের জন্ত ভেব না। ইতি—

তোমার বিয়ে মাদাম দি স্তায়েনের কাছে লোকে যা বলেছে তার জন্ত দুঃখ কর না। পৃথিবীর এই নিয়ম। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া করলেই হল। ইতি—

1810

ছেলে তোমার কাছে গ্রীষ্মে ছুটি কাটাতে আসছে। তার গ্রীষ্মাবকাশকে আমি ম্লান করতে চাই না। তবে পড়াশোনা ছুটিতে সে দূর থেকে করলেই পারত। অবকাশ কাটাবার অনেক দিন তার জীবনে পড়ে আছে। সব জিনিষ না বলে থাকা যায় না তাই বললাম। ইতি—

অনুবাদক :—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত।

ডাক্তার শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক]

এখনও নিজেকে করে রেখেছেন শিক্ষাধীন—যিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। বিনা প্রয়োজনে বিনা দ্বিধায় চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করেন যিনি—আর নিজদেশের বয়স্ক অভিজ্ঞ অথবা সমসাময়িক স্বব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সহিত কথা বলেন যিনি—সেই সরল, আড়ম্বরবিহীন ও দরদী চিকিৎসক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জানিতে পারি।

১৯১৩ সালের ২৫শে আগষ্ট পিতার কর্ম্মস্থল শিলং সহরে অর্দ্ধেন্দুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺ সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকায় অর্দ্ধেন্দুকুমার ভারতের বহু স্থানে গমন করেন। মা চিন্ময়ী দেবী ছিলেন শান্তিপুরের তনয়া। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জিলার মুড়াগাছা গ্রাম। ঠাকুরদাদা ৺ গোকুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অর্থসংগ্রহ করিয়া নিজ জিলায় কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বড়দাদা শ্রীসুধাংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আয়কর কমিশনার পদ হইতে সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুকুমার ১৯৩১ সালে বগুড়া জিলা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা ও ১৯৩৩ সালে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে ১৯৩৭ সালে এল, এম, এফ পাশ করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে চক্ষুচিকিৎসায় ডিপ্লোমা পান। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি নিজ কলেজে (বর্ত্তমানে চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল) ১৯৪০ সালে জুনিয়ার ভিজিটিং সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তিনি বিশিষ্ট চক্ষুচিকিৎসক পরলোকগত এস. কে. গাঙ্গুলীর অধীনে কার্য্য করিয়া প্রভূত উপকৃত হন। আট বৎসর পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের মুরফিল্ড আইইন্ফারমারীতে যোগদান করেন—কিন্তু তথায় নূতন কিছু শিখিবার না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়া অধ্যাপক রেমণ্ড এমিরী মীকের অধীনে নিউইয়র্ক চক্ষুচিকিৎসালয়ে কাজ করিতে থাকেন। সেই সঙ্গে অধ্যাপক ওয়ানডেল হিউজের নিকট Plastic Surgery on Eye এবং জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক কাষ্ট্রোভিওর তত্ত্বাবধানে Keratoplasty (অক্ষিগোলকের স্বচ্ছাবরণ বসান) শিক্ষা করেন। এ ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম মেয়ো হাসপাতাল ও আমেরিকার প্রখ্যাত চিকিৎসালয়গুলির চক্ষু বিভাগের কাজ লক্ষ্য করেন। ১৯৪৯ সালে ভারতে ফিরিয়া কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন। ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯৫১ সালে প্রথম Keratoplasty অপেরেশন করেন। শোনা যায়, কলিকাতায় কর্ণেল কেরওয়ানি ও মাদ্রাজে কর্ণেল রাইট এইরূপ পরীক্ষাকার্য্য করেন কিন্তু নথীভুক্ত ফলাফল পাওয়া যায় নাই। ১৯৫৩ সালে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে বিশ্বখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক অধ্যাপক ফ্রান্সিস্ চেট্টীর নিকট বিশেষ ভাবে Method of Corneagrafting, Detachment of Vetina ইত্যাদির সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া ভিয়েনা, ফ্রান্স (ডাঃ রোজানে), ইটালী ও বার্সিলোনাস্থ চক্ষুচিকিৎসালয় সমূহ পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত স্থানে ডাঃ বরাকর (Barakar) প্রতিষ্ঠিত (সরকারী সাহায্য বিনা) ক্লিনিকের কার্য্যকলাপে তিনি মুগ্ধ হন। ডাঃ বরাকর একটি সুন্দর শাস্ত্রের আবিষ্কারক।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি পুনরায় সুইজারল্যাণ্ডে অধ্যাপক চেট্টীর নিকট সর্ব্বাধুনিক চক্ষুচিকিৎসার প্রয়োগ পদ্ধতি শিখিয়া আসেন। বর্ত্তমান বৎসরের শেষে অথবা আগামী বৎসর তিনি জার্ম্মাণীর কলোন্ এ অক্ষিগোলকে Photo-Quagglation প্রক্রিয়া শিখিবার জন্য যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন চক্ষুঃ-পীড়িতকে অধ্যাপক মীক্ অথবা অধ্যাপক চেট্টীর নিকট পাঠাইয়াছেন—ফিরে এসে সুস্থদেহী তাঁহারা জানিয়েছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা এই দুইজন প্রখ্যাত চিকিৎসকদের উদ্দেশে—বিশেষতঃ তাঁদের সেবা, যত্ন, আদর ও আতিথেয়তার শৃঙ্খলার।

মাড়োয়ারী সেবা সমিতির আহ্বানে ডাঃ গাঙ্গুলী বড়বাজারের ঘাসীরাম বুবনা চক্ষুহাসপাতালে পরিদর্শক-চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করিয়া উহাকে সুসজ্জিত করেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি তথায় পর পর দুইটি Corneagrafting করেন। একটিতে বাঙ্গালী এক বৃদ্ধের চক্ষুগোলকের তেজী আবরণ, সৌরাষ্ট্রের এক কিশোরীর অকেজো আবরণের পরিবর্ত্তে বসান হয়। এই দুইটি ঘটনায় তিনি সাফল্যলাভ করেছেন বলে জানা যায়।

১৯৩৬ সালে গোবরডাঙ্গার স্বর্গগত সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীকে অর্দ্ধেন্দুকুমার বিবাহ করেন। নানারূপ খেলাধূলার অনুরাগী তিনি এবং আমেরিকায় 'স্কি' (ski) আয়ত্ত

ডাঃ অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

করেন। এছাড়া ফটোগ্রাফীতে তিনি পারদর্শী এবং Fundus অর্থাৎ চক্ষু ভিতরের ছবি তোলায় আগ্রহী।

দারিদ্র্য, দুধের অভাব, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য কর্মবৃদ্ধি, সহরে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিপাত, মেয়েদের সাংসারিক কাজে অবহেলার জন্য কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম না হওয়া, গ্রামে হাতুড়ের চক্ষুচিকিৎসা ও গ্রামে চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ না থাকায়—বাঙ্গালাদেশে চক্ষুরোগ বিস্তার করেছে বলে তাঁহার ধারণা।

যতই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক হউন না কেন, সর্বাধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে—চিকিৎসকেরা অনেক পিছিয়ে পড়েন। এই জন্য আমেরিকায় প্রতি পাঁচ বৎসরে গ্রামের চিকিৎসকেরা সহরের হাসপাতাল অথবা ক্লিনিকে যুক্ত হয়ে Refresher Course সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু করা যায় কি না, তাহা সরকার বিবেচনা করিতে পারেন—ইহা ডাক্তার গাঙ্গুলী অনুভব করেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মৈত্র

[প্রবীণ বৈমানিক ও বিমান-কারিগরী শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ]

শত অসুবিধা সত্ত্বেও একক প্রচেষ্টা ও দুর্নিবার আকাঙ্খার সদুদ্দেশ্যমূলক একটি প্রতিষ্ঠানকে যে সুফলপ্রসূ করা যায়, তাহা দমদমে অবস্থিত ভারতের আদি ও অদ্বিতীয় বিমান কারিগরী শিক্ষালয়ের কার্য্যধারা অনুসরণে উপলব্ধি হয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হল গুরুত্বপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ—সেজন্য ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট মাত্র ৩০।৩৫ জনকে লওয়া হয় প্রতি বৎসর—কিন্তু সারা দেশ থেকে আসে বহু আবেদন। ইহার স্থাপয়িতা হলেন প্রবীণ বৈমানিক ও বিমান-শিল্প-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুবোধচন্দ্র মৈত্র।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের প্রথম ভারতীয় সুপারিনটেনডেণ্ট শান্তিপুরের ৺জগদীশচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীমতী মনোবালা দেবীর প্রথম পুত্র সুবোধচন্দ্র ১৯১১ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৭ সালে সেণ্ট জোসেফ বিদ্যালয় হইতে সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করিয়া C. E. S. C.তে শিক্ষানবিশী হন এবং গৃহে শিল্পবিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতে থাকেন। ইহার পর ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানীতে দেড় বৎসর থাকিয়া ১৯১৩ সালে লণ্ডনস্থ সিটিগিল্ড হইতে 'অটোমোবাইল' সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি করাচী এরো-ক্লাবে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারীং পড়িতে যান। পর বৎসর বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে আসিয়া ১৯৩৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'এ' ও 'সি' লাইসেন্স পান। কয়েক মাস পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত Phillips & Powis Aircraft Ltdএ যোগদান করিয়া হাল্কা বিমান তৈয়ারী সম্বন্ধে শিক্ষা নেন। সেখান হইতে তিনি বৃটিশ সরকারের 'এ' ও 'সি' লাইসেন্স গ্রহণ করেন। তখন সুবোধচন্দ্র Armstrong Ltdএ আসিয়া 'হুইটলী' (বৃহৎ বম্বার) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন ও রাত্রে কভেন্ট্রী শিল্পকলেজে পড়িতে থাকেন।
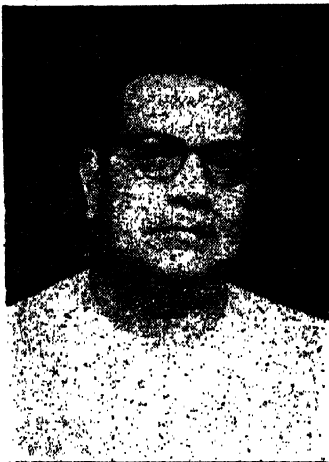
১৯৩৫ সালে 'বি' ও 'ডি' লাইসেন্স লইয়া তিনি উক্ত কোম্পানীর সাউদাম্পটন শাখায় 'ফাইনাল ইনস্পেকটার' হিসাবে ১৯৩৬ সালে Ensign বিমান নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান করেন। সেই সময় তিনি Design & Construction বিষয়ে 'বি' লাইসেন্স লইয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। পরে De-Harilland এ 'ফাইনাল ইনস্পেক্টার' হন ও 'এলবাট্রাস' নামে কাঠের বিমান নির্ম্মাণের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। ১৯৩৮ সালে ছয় মাসের ছুটিতে ভারতে আসিয়া বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব ও এয়ার সার্ভের চীফ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কার্য্য করেন; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার পরলোকগত ডি, আর, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে নিজ কর্মস্থলে ফিরিয়া যান। ১৯৩৯ সালের মধ্যভাগে শ্রীমৈত্র সিংহলের এরো-ক্লাবে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যোগদান করেন। তথাকার বেসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থাকে তিনি উন্নত করিয়া তোলেন। ১৯৪২ সালে তিনি সহকারী বিমান পরিদর্শকরূপে দিল্লী ও পরে করাচীর ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে বাঙ্গালোর হিন্দুস্থান কারখানায় প্রধান সরকারী পরিদর্শক হিসাবে Harlow ও Hawk বিমান নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধান করেন। পরে দমদমে A. I. D. হিসাবে ভার গ্রহণ করেন। এ কয়টি স্থানে তিনি বৃটিশ পরিচালকদের পরিবর্ত্তে আসেন। সরকারী কার্য্য ভাল না লাগায় ১৯৪৫ সালে পদত্যাগ করিয়া তিনি 'মৈত্র কোম্পানী' গঠন করিয়া বিমান-কারিগরী শিক্ষার জন্য স্বপ্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র কোচিং-এর ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৬ সালে 'এয়ারওয়েজ'তে প্রধান ইঞ্জিনীয়াররূপে উহাকে সংগঠন করেন ও ১৯৪৮ সালে কলিকাতা-বাঙ্গালোর বিমানপথ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বিমান পরিবহন প্রসারের সঙ্গে প্রয়োজন বিমান-কারিগর, বিমান-ইঞ্জিনীয়ার, বিমান নির্ম্মাণকারী, বিমান পরিকল্পনাকারী—বিমান পরিদর্শক। তাই অভিজ্ঞ বৈমানিক ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমৈত্র চাকুরী ত্যাগ করিয়া ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে প্রথম বেসরকারী Air Technical

শ্রীসুবোধচন্দ্র মৈত্র

Training Institute খোলেন দমদমে। ক্রমশঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে উঁহার উদ্দেশ্য—কয়েক বৎসরে সেখান থেকে বেরিয়েছে কিছু ইঞ্জিনীয়ার—পেয়েছে বেসরকারী ও সরকারী সমর্থন কিছুটা। কিন্তু একক প্রচেষ্টার এই বিরাট কর্মশালাকে ভারতের অন্যতম গৌরবের বস্তু করে তুলতে হলে প্রয়োজন অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা সর্বস্তরে। শ্রীমৈত্র নিঃস্বার্থভাবে নিজের অভিজ্ঞতা ও সামান্য পুঁজি অর্পণ করেছেন ইহার পিছনে—বার বৎসরের কিশোর হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমার মনে হল যে উঁহার পূর্ণ যৌবন আনতে হলে চাই সারা দেশের পূর্ণ আন্তরিকতা। নিভৃতে যে কর্মের সাধনা সুরু হয়েছিল আজ লোকসমক্ষে তাহা প্রকটিত হয়ে উঠুক ইহাই কাম্য।

১৯৩৭ সালে শ্রীমৈত্র পাইলট নির্বাচিত হন। তিনি লণ্ডন এরোনটিক্যাল সোসাইটীর এসোসিয়েটেড ফেলো, লণ্ডন ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ার্স ইনঃ র সদস্য, এবং ভারতে এরোনটিক্যাল সোসাইটির পূর্ণ সদস্য, উহার কার্য্যকরী সমিতির (ছয় বৎসর) ভূতপূর্ব সদস্য, ভারতীয় কারিগরী শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষদের সভার অন্যতম সদস্য ও লাইসেন্স পরীক্ষা বোর্ডের ভূতপূর্ব পরীক্ষক ছিলেন বা আছেন। লণ্ডনস্থ এরো-ক্লাব শ্রীমৈত্রকে International Aviators সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

এই শিক্ষাসদে বিমান সংক্রান্ত পঠিত বিষয় ব্যতীত অটোমোবাইল, ডিজেল, ট্রাক্টর, রেডিও সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ারীং প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষাদান প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

শ্রীমৈত্রের দুই তনয়া বিবাহিতা—তন্মধ্যে কনিষ্ঠা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হয়েছেন উদীয়মান মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা শ্রীমান বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত।

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও সুবোধচন্দ্র হলেন মনে-প্রাণে ভারতীয়। স্বদেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারে তাঁর গভীর আস্থা আর আধ্যাত্মিক রূপময় ভারতের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা। তাই তিনি প্রায়শঃ যান ঠাকুর পরমহংসদেবের আশীর্ব্বাদপূত পীঠস্থানে—আর তাঁর নিজস্ব ঘরে শোভিত রয়েছে একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি—'ঠাকুর দেহরক্ষা করেছেন শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত অবস্থায়।'

শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

[বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও লোকসভার সদস্য]

স্বাভাবিক অবস্থায় এঁকে হয়ত আমরা দেখতে পেতাম একজন বাঘা আই-সি-এস রূপে কিংবা একজন নামকরা পেশাদার ব্যারিষ্টার। যোগ্যতা সত্বেও আত্মপ্রতিষ্ঠার এ নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে রাজনীতিবিদের কণ্টকিত ভূমিকা বরণ করে নেওয়া নিশ্চয়ই এক অসাধারণ পদক্ষেপ। অন্ততঃ এটুকু অসঙ্কোচে বলা যায়, প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও লোকসভার সদস্য শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত আপন পারিবারিক ধারায় একটি মস্ত ছেদ বা ব্যতিক্রম।

২৪ পরগণা জেলার গরিফা গ্রামের বিশিষ্ট গুপ্ত-পরিবারে এই মানুষটির জন্ম হয় ১৯১৯ সালে। তাঁর পূজ্যপাদ পিতামহ ছিলেন স্বনামধন্য বিহারীলাল গুপ্ত। প্রায় এক শতাব্দী আগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল—এই ত্রয়ীবিলেত থেকে আই-সি-এস হয়ে আসেন একযোগে। ইন্দ্রজিতের পিতা ব্যারিষ্টার শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত একজন কৃতী পুরুষ। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় সেক্রেটারী পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন দীর্ঘকাল। ওদিকে তাঁর পূজনীয় মাতামহ ও তিন মামাও ছিলেন আই-সি-এস। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরণজিৎ গুপ্ত একজন আই-সি-এস এবং সরকারী দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত।

ইন্দ্রজিৎ যখন ছাত্র, সামনে স্বভাবতঃই লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল বড় হবার। পারিবারিক ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে তিনিও পিছপা হবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে ছিল। স্কুল-জীবনে তিনি অধ্যয়ন করেন সিমলার সেণ্ট এডওয়ার্ড স্কুলে আর দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজে চলে তাঁর কলেজীয় পড়াশুনো। ছাত্রাবস্থায় প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইতিহাসে অনার্স সহ ১৯৩৭ সালে তিনি বি-এ পাশ করেন—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন সে বারে তিনিই।

এর পরই ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠনের জন্য এবং উচ্চ শিক্ষালাভের তাগিদে শ্রীগুপ্ত চলে যান ইংল্যাণ্ডে। আই-সি-এস হবার লক্ষ্য যাত্রার মুহূর্তেও তাঁর ছিল কিন্তু শেষ অবধি মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই হয়ত সে পথে তিনি পা বাড়ালেন না। কেমব্রিজের ট্রাইপস পরীক্ষায় কৃতিত্ব সহকারে পাশ করে তিনি স্বদেশমুখী হন।

কিন্তু ইত্যবসরে ইন্দ্রজিতের ভেতর এক নতুন মানুষের জন্ম হয়ে যায়, তাঁর চোখে দেখা দেয় নতুন দৃষ্টি। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার আগে অবধি পারিবারিক প্রভাবই ছিল তাঁর ওপর বেশি—রাজনৈতিক আলোচনা কিংবা ক্রিয়াকলাপ থেকে তিনি থাকতেন অনেক দূরে। কিন্তু বিলেতে থাকা অবস্থায় তাঁর চিন্তাধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে—আই-সি-এস্ হতে যেয়েও আই-সি-এস্ হওয়া এরই জন্যে হল না।

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রমহল সে সময় রাজনৈতিক চর্চ্চা ও আলোচনায় খুব বেশি রকম মত্ত। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানাতে তাঁরা ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে এর ভেতর তাঁদের যোগাযোগ ঘটে—ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার ব্যাপারে পরস্পর নিবিড় আলোচনা হয়। এই অনুকূল পরিবেশেই জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ইন্দ্রজিতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়—কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মতবাদের দিকে তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নতুন পথে স্বদেশসেবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ফিরে আসেন ভারতে ১৯৪০ সালে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি তখন বে-আইনী—নেতা ও কর্মীদের অনেকেই তখন

শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত

কারান্তরালে। যাঁরা বাইরে থাকতে পারলেন, আত্মগোপন অবস্থায় পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁরা। পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে ইন্দ্রজিৎ আত্মগোপন করেই নির্ধারিত কাজ করে চলেন সেদিনে। যুদ্ধ চুকে যাবার পর পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি দেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই ক্ষেত্রটিতে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, এ নিশ্চয়। আজ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক ও বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্যপদে অধিষ্ঠিত। শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় দেশ সফর করেছেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সে সকল দেশে।

যতদূর দেখতে পাওয়া যায়, কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে আজ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত একাত্ম হয়ে গেছেন—ব্যক্তিজীবন বলতে একালে তাঁর আলাদা সত্তা নেই। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে তিনি সেই থেকেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। সাধারণ শোষিত মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেই আজ তাঁর প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহ। সম্প্রতি কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি জয়লাভ করেছেন—দেশকর্মী ও নেতা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা যে কতখানি, এই থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী

[রাজনৈতিক নেতা ও লোকসভার সদস্য]

মিষ্টভাষী, সদালাপী, চিরকুমার, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ও লোকসভার সদস্য শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরীর আসন আজ আইনসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে থাকে গঠনমূলক সমালোচনা ও দৃঢ় মনোভাব।

৺গণগোবিন্দ চৌধুরীর চারি পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ত্রিদিবকুমার পিতার কর্মস্থল ঢাকা শহরে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মান। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে মা ৺তরুবালা দেবীকে হারান কিন্তু বিমাতা ৺অন্নপূর্ণা দেবীর স্নেহ-ভালবাসা আজও তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। স্বগ্রাম হল পাবনা জিলার চাটমোহর হরিপুর। এই স্থানের চৌধুরী বংশোদ্ভূত হলেন ৺স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার এ. এন. চৌধুরী, ব্যারিষ্টার জে. চৌধুরী, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার কৃতী সন্তানগণ। গণগোবিন্দ বাবু ছিলেন পুলিশবিভাগীয় কর্মচারী—সেজন্য বাংলার বহুস্থানে তাঁহাকে থাকিতে হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জিলার বিভিন্ন জায়গায় প্রথম চাকুরীকালে থাকার জন্য তিনি বহরমপুর শহরে স্থায়ী বাসিন্দা হন। ত্রিদিবকুমার স্থানীয় M. E. বিদ্যালয়ে পড়িয়া তথাকার কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩০ সালে স্থানীয় কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করেন।

কৃষ্ণনাথ স্কুলে পড়ার সময় তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী-আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েন এবং তের বৎসর বয়সে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সেই সময় তিনি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন সান্যাল, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ফলে গোয়েন্দা পুলিশ তাঁহার উপর খুব লক্ষ্য রাখে এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৩১ সালে ওয়ারেণ্ট বলে ধৃত হইয়া হিজলী বন্দিশালায় তিনি অবস্থান করেন এবং তথা হইতে ১৯৩৩ সালে বি. এ পাশ করেন। ইহার পর রাজপুতানায় দেউলীক্যাম্পে বন্দী হইয়া ১৯৩৬ সালে ইকনমিক্সে এম. এ পাশ করেন। জেলে সেই সময় সরকার পক্ষ রাজবন্দীদের প্রচুর সাম্যবাদ সম্বন্ধীয় পত্র-পত্রিকা পড়িতে অথবা উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ দিতেন—যদি তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের সময় তিনি যুবনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। ইহার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের মুর্শিদাবাদ জিলা পরিভ্রমণের সময় ত্রিদিবকুমার সঙ্গী হিসাবে অবস্থান করেন। জঙ্গীপুর ষ্টেশনে সুভাষচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ ধরিতে পারিবেন না বলিয়া কিশোর ত্রিদিবকুমার চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিয়া গাড়ীর গতিরোধ করেন। ইউরোপীয় গার্ড সুভাষচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া ত্রিদিবকুমারকে কিছু বলেন নাই। ১৯৩৭ সালে রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলনের ফলে অন্যান্যের সহিত শ্রীচৌধুরীও মুক্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের অফিস সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। উক্ত দলের নেতা ছিলেন ৺শরৎচন্দ্র বসু, সহঃ-নেতা ৺তুলসী গোস্বামী, সম্পাদক ৺কিরণশঙ্কর রায় ও চীফ হুইপ শ্রীজে. সি. গুপ্ত। এই সব দিক্‌পালদের সহিত কাজ করিয়া পরিষদীয় আইন-কানুন ও কার্য্যকলাপ তিনি ভালভাবে আয়ত্ত করেন। একদিকে তিনি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নিয়মিত সদস্য হিসাবে জাতীয় কার্য্যে লিপ্ত হন। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেস ও পরে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনদ্বয়ে তিনি সমাজতন্ত্রীদলের কার্য্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১৯৪০ সালে [illegible] যোগেশ চ্যাটার্জি প্রভৃতির সহিত R. S. P. (বিপ্লবী

শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী

সমাজতন্ত্রী দল) গঠন করেন। হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনের পূর্ব্বে অন্যান্য প্রবীণ বিপ্লবী-নেতাদের সহিত ১৯৪০ সালে শ্রীচৌধুরী পুনরায় ধৃত হইয়া হিজলী জেলে থাকেন ও ডিসেম্বর মাসে ঢাকা জেলে যাইয়া ১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে দমদম জেলে বদলী হন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে তিনি জেলখানা হইতে ছাড়া পান। এক বৎসর তিনি দলীয় সংগঠন লইয়া ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর R. S. P. জাতীয় কংগ্রেস হইতে (১৯৪৭ সালে) বাহির হইয়া আসেন। বর্ত্তমানে ইহা উত্তর ও দক্ষিণভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্র হইতে সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থীসহ কয়েকজনকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পুনরায় ১৯৫৭ সালে উক্ত কেন্দ্র হইতে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৯৪৮ সালে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীচৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় "ক্রান্তি" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া শ্রীচৌধুরী সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ত্রিদিবকুমারের রাজনৈতিক জীবনে ৫২ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ ১৯৫৫ সালের ১০ই জুলাই পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত গোয়ায় ভারতীয় পতাকা লইয়া প্রবেশ এবং অত্যাচার ও নির্য্যাতনের মধ্যে উনিশ মাস তথাকার পুলিশ ও সামরিক জেলে জীবন যাপন—এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে পরিগণিত হয়। ইহার পিছনে আছে এক অদ্ভুত ক্ষুদ্র ঘটনা। ১৯৫৫ সালের মে মাসে পুণায় R. S. P.র দলীয় সভা হয়। শ্রীচৌধুরী তথায় লোকসভার সদস্য শ্রীখাদিলকরের গৃহে ছিলেন। কতকগুলি গোয়ানিবাসী যুবক তাঁহাদের সহিত পরামর্শের জন্য আসে। ত্রিদিবকুমার তাহাদের বলেন যে, আইনসভার সদস্যরা যদি স্বেচ্ছাসেবক সহ গোয়ায় অনুপ্রবেশ করেন তবে কাজের সুবিধা হইবে। হঠাৎ তাহারা শ্রীচৌধুরীকে প্রথম দলের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানায়। চিরবিপ্লবী ত্রিদিবকুমার চার সপ্তাহের সময় চাহেন। দিল্লীর কাজ শেষে তিনি বাংলায় আসেন। গোয়া যাওয়ার কয়েক দিন পূর্ব্বে জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় পুণা হয়ে তিনি গোয়ায় প্রবেশ করেন। স্থানীয় পুলিশ একটি ক্ষুদ্র ঘরে তাঁহাদের একত্রে তেত্রিশ জনকে রাখে। অসহ্য কষ্টভোগ—সপ্তাহে একদিন স্নান—আহার্য্য অখাদ্য—তদুপরি পুলিশের অত্যাচার ত আছেই। ছয় মাস পরে সামরিক জেলখানায় বদলী হন। কিন্তু এখানে কষ্টের কিছুটা লাঘব হয় ও অত্যাচার কম ছিল। এই সময় তিনি পর্ত্তুগীজ ভাষা শেখেন। মহামান্য পোপের হস্তক্ষেপের ফলে অন্যান্যের সাথে শ্রীচৌধুরী ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তথা হইতে মুক্ত হন।

উনিশ মাস গোয়া জেলে থাকার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, পর্ত্তুগীজরা খুব ভদ্র অবশ্য স্পেশ্যাল পুলিশ ছাড়া। ১৭৮৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত প্রতি দশ বৎসরে তথায় একটি করে বিপ্লব হয়েছে। সর্ব্বপ্রথম হয়েছিল "ধর্ম্মযাজকদের বিদ্রোহ" ও সর্ব্বশেষ হয় "রাণেদের"। তথাকার হিন্দু সারস্বত ব্রাহ্মণরা অবস্থাপন্ন বাসিন্দা—তারা চায় পর্ত্তুগীজ শাসন—নিজেদের স্বার্থে। বহু শিক্ষিত পর্ত্তুগীজ প্রধান মন্ত্রী সালাজারের শাসনে সন্তুষ্ট নয়। গোয়াবাসীর সংখ্যা হল ছয় লক্ষ। শতকরা ৪০ জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার গোয়া-অভিযানের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তৎলিখিত পুস্তকে 'সালাজারের জেলে উনিশ মাস।' সারা ভারতে শ্রীচৌধুরীর মুক্তির জন্য প্রচুর আন্দোলন হয়। বাংলা দেশের প্রতিটি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র তাঁহার মুক্তির দাবী ঘোষণা করে। কলিকাতা পৌরসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'পর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীটের নাম ত্রিদিব চৌধুরী ষ্ট্রীট'এ পরিবর্ত্তিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বহু নির্দলীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার মুক্তি দাবীর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীচৌধুরীর পূর্ব্বে শ্রীদেশপাণ্ডে এম-পি গোয়ায় প্রবেশ করেন—তিনি প্রহৃত হন—কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

শ্রীচৌধুরী বলেন, 'আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবার খুবই উচ্চাশা ছিল—আমার জন্য প্রচুর বই কিনেছেন—আমি যখনই যাহা চেয়েছি তাই দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারিনি। বহু বিপ্লব-আন্দোলনে আমি নিজেকে যুক্ত করায়, তাঁর চাকুরীক্ষেত্রে খুবই অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কোন দিন তাঁর কাছ থেকে উঠেনি কোন অনুযোগ অভিযোগ বা হতাশা। আর আমার বিমাতা আমায় প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের পক্ষে।'

অন্তরে ব্যথা

মাধবী সেনগুপ্ত

অপরাহ্ণ কেটে গেলে হবো হবো সন্ধ্যার আলো
সন্ধ্যার যে আবেশটুকু ভরে তোলে বিকেলের মন,
সেই মন কেঁপে ওঠে বিকেলের ব্যাকুল বাতাসে
মৃদু ছোঁয়া, আলাপন, ক্রমে প্রেম গাঢ়তর হ'ল।

মুগ্ধ হয়ে দেখি মন, মন দেখি মুক্তার মত
পড়েছিল কোন দূর সাগরের অতল তলায়,
এক বিন্দু ছোঁয়া পেয়ে, গর্ব নয় খুলেছে কপাট
পড়শীরা তাকে নিয়ে তাই আজ গুঞ্জনরত।

ব্যাকুল বাতাস আজ ক্ষণে ক্ষণে আনে শিহরণ
আঘাতে আঘাতে জাগে কাজ-শেষ ভেঙে পড়া জেটি,
চলে যাব বহু দূরে যেখানে মানুষ নেই কোন
অনুরাগ প্রেম যেথা ভরে থাকে লোকের মজ্জায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

পঁয়ত্রিশ

বলাই-পচার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর নতুন-আলায় বুদ্ধীশ্বর গিয়ে জুটেছে। ওঠাবসা আগেও ছিল, সে হল আর দশটা মাছ-মারার মতন। এবারে চাকরি দিয়েছে নগেনশশী—মাস মাস নগদ তঙ্কার মাইনে। নতুন ঘেরির বেলদার। বেলদার বুদ্ধীশ্বর। এয়ার-বন্ধুদের মাঝে বুদ্ধীশ্বর চাকরীর কথা তুলে জাঁক করে। সকলের থেকে স্বতন্ত্র—তুচ্ছ মাছ-মারা আর নয়, চাকুরে মানুষ।

বেলদারের প্রধান কাজ দিবারাত্রি ভেড়ি পাহারা দিয়ে বেড়ানো। ঘোগ হল কিনা ঠাহর করে দেখা। গাঙ-খালের নোনা জল ঝিরঝিরিয়ে ঘেরির ভিতর আসে, সেই ছিদ্রপথের নাম হল ঘোগ। ঘেরির তলদেশে সূক্ষ্ম একটি ছিদ্র—সেই পথে জল এসে ঢুকছে, খুব নজর না করলে বোঝা যাবে না। কিন্তু অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে পড়ে এই ব্যাপারটা। সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনো—বাদাবনে এই সামান্য ঘোগের ব্যাপারে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জল চুইয়ে এসে মাটি ধুয়ে আস্তে আস্তে পথ বড় হয়ে ওঠে। তার পরে কোটালের সময় প্রচণ্ড স্রোত সেই পথে মাথা ঢুকিয়ে বাঁধ ভেঙে ফেলে চারিদিক একাকার করে দেয়। দীর্ঘ দিনের তৈরি করা মাছ বেরিয়ে চলে যায়, মালিকের মাথায় ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। আবার তখন নতুন করে ভেড়ি বেঁধে নতুন ডিম ও চারামাছের মরশুম অবধি বসে থাক চুপচাপ হাত-পা কোলে করে। এতদিন যা-কিছু করেছিলে সমস্ত বরবাদ। বেলদার তাই সতর্ক চোখে ঘোগ পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তিলেক সন্দেহ ঘটলে সেই দুষ্ট জায়গাটুকু খুঁড়ে নতুন মাটি শক্ত করে চাপান দেবে। ভেড়ির কোনখানে যদি দৈবাৎ ভেঙে গেল, লোকজন জুটিয়ে এনে ত্বরিতে সেটা মেরামত করে ফেলবে। তার আগে বাঁশের পাটা পুঁতে ঘিরে দেবে ছেঁড়া জায়গাটা। কিছু পরিমাণ বাইরের জল আসে আসুক, কিন্তু ভেড়ির খোলের একটি কুচো-চিংড়ি বেরিয়ে যেতে না পারে।

বেলদারের কাজ অতএব সামান্য নয়। কঠিন দায়িত্ব। এর উপরে ফাইফরমাস আছে তো হরবখত। আলায় রান্নার জন্য কাঠ কেটে আন বন থেকে। কাঠ চেলা করে দাও। কলসি ভরে মিঠা জল নিয়ে এস—নৌকোর সুবিধা হল না তো কাঁধে বয়ে আন। পথ কতই বা—দু-চার ক্রোশ বই তো নয়! বেলদারের কাজের কোন লেখাজোখা নেই। যেমন এই বিয়ের পাত্র নগেনশশীকে খবর দিয়ে আনতে হল ফুলতলা অবধি ছুটে গিয়ে।

তাই নিয়ে বুদ্ধীশ্বর জাঁক করছিল বলাইয়ের সঙ্গে : যায় যেখানে আটকায়, অমনি বুদ্ধীশ্বর। চারখানা হাত আমার, আর চারটে চোখ। এই কোদাল ধরে ভেড়ির মাটি কাটছি এই আবার শিলনোড়া নিয়ে ঝাল বাটতে রান্নাঘরে বসে গেলাম। রটন্তীপুজোর পাঁঠা কিনে এনেছি বড়দলের হাটে গিয়ে, আবার এই দেখ ফুলতলা গিয়ে বরও এনে হাজির করে দিয়ে খালাস। তোমাদের কী-ই বা কাজ ছিল—কুমিরমারি মাছের ডিঙি পৌঁছে দিয়ে চললাম। যেতে তা-ও তিনজনে মিলে।

বুদ্ধীশ্বর নাম খুব জাঁকালো, কিন্তু মানুষটা হাবাগবা। খাঁটিয়ে খাঁটিয়ে তার কাছ থেকে লোকে মজার কথা শোনে।

বাদাবনে বিয়ে—কী কাণ্ড হচ্ছে বল তো বুদ্ধীশ্বর! মানযেলা থেকে তফাৎটা তবে কি রইল? দুটো-পাঁচটা যা মেয়েমানুষ আছে—হয় তারা বিয়েথাওয়া চুকিয়ে এসেছে, না হয় তো আর ঐ পথে যাবে না।

কিন্তু হচ্ছে তো এবারে। না হয়ে আর রক্ষে নেই। কনে মজুত, চক্কোত্তি পুরুতমশায় মজুত। বরকে আমি হাজির করে দিলাম। ফুলতলা থেকে ঐ সঙ্গে বিয়ের বাজারও সেরে এসেছি বড্ড ঘড়েল বর—হিসেবপত্তর করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কেনাকাটা করল, একটা পয়সা যাতে এদিকওদিক না হয়। টোপর পছন্দ করে মাথায় বসিয়ে মাপ দেখে নিল। সমস্ত হয়ে গেছে, বাকি এখন শুধু মন্তোর পড়ে কনের পিঁড়ি সাতটা পাক ঘুরিয়ে নেওয়া।

জগন্নাথ শুনছিল বলাই আর বুদ্ধীশ্বরের কথাবার্তা। এবারে কাছে চলে এসে বলে, কনে যা দজ্জাল, পিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়বে না তো সাতপাকের সময়? খোঁড়া-বর ছুটে গিয়ে কনে জাপটে ধরবে, সে ক্ষমতা নেই।

বুদ্ধীশ্বর বলে, বর না পারুক—অত বড় চৌধুরি-আলায় সবশুদ্ধ নেমন্তন্ন—বাছা বাছা মরদ জোয়ানরা থাকবে। তারা গিয়ে ধরবে।

বলাই বলে, নেমন্তন্ন আমাদের হবে না ?

হাত ঘুরিয়ে বৃন্দাবন বলে, সব সব। বরমশায় বলে দিয়েছে সাঁইতলা আর চৌধুরিগঞ্জ মিলে কতই বা মানুষ। কেউ বাদ থাকবে না।

জগা হেসে বলে, চালাও হুকুম। বাপরে বাপ, বেসামাল হয়ে পড়েছে স্ফূর্তিতে। মজা টের পাবে। ঐ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা আর জাত-গোখরো ঘর করা একই কথা। যেমন শয়তান নগনাটা, তেমনি তার উচিত শাস্তি। এর চেয়ে অন্য কিছুতে শাস্তি হত না। দেখিস বলাই, বিয়ের যেন কোনরকম বাগড়া না পড়ে। নির্বিঘ্নে যেন হয়ে যায়।

হেসে হেসে চলে গেল জগন্নাথ। দিনটা কাটল। সন্ধ্যার দিকে শশী ঘোষকে ডেকে নিয়ে খালের ধারে গেল, জঙ্গলের পাশে। বলাইও আছে।

শশীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো ডাকাত ?

শশী ঘাড় নেড়ে না না করে ওঠে : না জগা, হিংসুটে লোকে বদনাম রটায়। দেখতে পাবে, থাকব তো বরাবর একসঙ্গে। গরু-চুরির মামলায় মিথ্যেমিথ্যি জড়িয়ে ফাটকে পুরেছিল একবার।

জগন্নাথ গম্ভীর হয়ে বলে, একজন খুনে-ডাকাত দরকার আমার। বনে গুচ্ছের ভালমানুষ নিয়ে কি হবে ? তবে তো তোমায় দিয়ে হয় না। দেখি কাকে পাওয়া যায়।

শশী তাড়াতাড়ি বলে, ফাটকে একবার খানি ঘুরিয়ে এলে আর তো ভালমানুষ থাকবার জো নেই। খুন যদি হয়ে থাকে ইচ্ছে করে তো করিনি। কাজে-কারবারে আপনি খুন হয়ে গেছে।

তেমনি কাজ আবার একটা করতে হবে। আজকেই।

জিভ কাটে শশী : পাপের ফল কক্ষণো ভাল হয় না জগন্নাথ। খারাপ পথে যেও না। কাঁচা বয়স বলে মনে ধরবে না আজ, কিন্তু আমায় দিয়ে দেখ। আমার পরিণাম দেখ। টাকাকড়ি যা-হোক কিছু করেছিলাম আজকে একেবারে ঢনঢন। পরের ভাতে থাকি। ছেলে নেই, বউ নেই, নির্বংশ মানুষ। রোগপীড়ের পড়ে থাকলে এক ঝিনুক জল এগিয়ে দেবার মানুষ নেই। নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে বসে যেলাম্ভ ঘাস বাছলে তবে তারা এক মুঠো ভাত দিত।

জগা বলে, খুন করতে হবে না। মালপত্তর লুঠেরও দরকার নেই। একটা মানুষ চুরি করতে হবে শুধু। অল্পবিস্তর মারধোর দিয়ে জঙ্গলে দিয়ে আসবে।

বলাই অবাক হয়ে যায়। মতলব সমস্ত একলা জগার, বলাই কিছু জানে না। তাকে বলেনি। প্রশ্ন করে, কোন মানুষ—কোথায় সে ?

নগনা খোঁড়া।

বলাই আন্দাজ করেছিল তাই। শশী বলে, খোঁড়ামানুষের উপর আক্রোশ কেন গো ?

জগা বলে, ও খোঁড়া একগুণ বাড়া। পুরো দুই ঠ্যাংওয়ালাদের কান কেটে দেয়। বড়দাকে উৎখাত করে নিজে মালিক হবে। সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বড়দা ভাব জমাচ্ছে। কিন্তু ভবী ভোলে না—পাশাপাশি দুই ঘেরির মাতব্বর হয়ে আরও জাঁকিয়ে বসবে। সর্বনাশ যা হবার হবে মাঝে থেকে মারা পড়বে মেয়েটা।

বলাইয়েরও খুব রাগ নগেনশশীর উপর। বলে, জঙ্গলে বওয়াবয়ির কি দরকার জগা ? ও-লোকের উপর মায়া কিসের ? পারে তো শশী-দা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তায় পুরে মাঝগাঙে ছেড়ে দিয়ে আসুক। জ্বালাতন করতে আর যাতে না ফেরে আসে।

শশী ঘোষের স্ফূর্তি লাগছে। অনেক দিন পরে মজাদার কাজ একখানা এসে পড়ল বটে। হাত নিশপিশ করে তার। একগাল হেসে বলে, একই তো কথা দাঁড়াল বলাই ভাই। জঙ্গলে ছেড়ে এলেও ফেরার ভয় নেই। বাঘে ধরবে। এক দিক দিয়ে বরঞ্চ ভালই—আমাদের উপর নরহত্যার পাপ অর্শাবে না। বাঘে খেলে আমরা কি করতে পারি ?

বলাই ঘাড় নেড়ে বলে, ওকথা মনেও ঠাঁই দিও না শশী-দা। খোঁড়া নগনার মাথা-ভরা শয়তানির বিষ। হাড়-মাস বিষে তিতো। বাঘ যদি আসে, এক কামড় দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।

জগা বলে, শোন শশী-দা বড়দা'র উপরে বড্ড অত্যাচার হচ্ছে। বাদাবন এটা। সমাজ নেই যে পঞ্চায়েতে মাতব্বররা মিলে একটা ফয়শালা করে দেবে। সরকারি উপরওয়ালার কথা যদি বল, তিন জোয়ার মেরে উঠে তবে থানা। থানার গাছতলায় তোমায় বসিয়ে রাখল। দারোগাবাবুকে একটা খবর পৌঁছে দেবে, তার জন্যেও শাগার সিপাহি হাত পেতে আছে। পুরো বাক্স কাঁচি সিগারেট—বিড়ি কিম্বা সস্তার মাণিক-সিগারেটে হবে না। তবে বোঝ, যা-কিছু করতে হবে নিজেদেরই। বয়সকালে নিজের মুনাফার জন্যে তো বিস্তর করেছে—বুড়ো বয়সে পরের জন্য কিছু কর, পুণ্যি হবে। আমরা সাথে সঙ্গে আছি। বুদ্ধি বাতলে দাও, হাতে-নাতে আমরাই সব করব।

শশী ঘোষ কিছু চিন্তিত হল।

বিয়েটা কবে ?

বুধবারে।

যা করবার, আজকেই তবে করে ফেলতে হবে। একটা রাত্তির হাতে রাখতে হয়। যদি ধর কোন গতিকে পয়লা মুখে বাগড়া পড়ে গেল।

চুপচাপ আরও একটুখানি ভেবে নেয় শশী। বলে, মক্কেল শোয় কোনখানে ? ভাল করে দেখা আছে জায়গাটা ?

বাঁধের উপরে উঠে এল তিনজনে। নতুন আলার কাছাকাছি এল। শশী বলে, আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না। এমনি বল, আমি আন্দাজ করে নেব।

বলাই বলে, পুবের পাশে খোলা জায়গা—ঐখানটা আমরা আড্ডা জমাতাম। বড়দা আর নগনা ওখানে শোয়। ক'দিন আবার চক্কোত্তি মশায় জুটেছে ওদের সঙ্গে। মেয়েলোক দু জন কামরার ভিতর থাকে।

শশী প্রণিধান করে বলে, সেটা ভাল। দুয়োরে শিকল তুলে দিলে বেরিয়ে আসতে পারবে না। মেয়েমানষে বড্ড চেঁচায়।

আবার বলে, তিন জনের বেশি তো নয় বাইরে—ঠিক জান ? বাইরের অন্য কেউ এসে থাকে না—ব্যাপারি-মহাজন মাঝিমাল্লারা কেউ ?

বলাই নিশ্বাস ফেলে বলে, থাকতাম তো কতজনে আমরা।

কিন্তু ধাঁড়া নগনা মানবের ধৈর্য সইতে পারে না। একে একে সব তাড়িয়েছে। মজা বুঝুক এই বারে। গুণতিতেই ঐ তিন জন। ওর মধ্যে চৌর্নি চক্কোত্তি যা মানুষ, সেদিনের নগর-কীর্তনে টের পাওয়া গেছে। হাঁক শুনলেই আপাপাস্তলা কাঁথা চাপা দিয়ে মড়ার মতন পড়বে।

জগা বলে, বড়দাও তাই। পয়সা হয়ে ভয় ঢুকেছে মনে। প্রাণের বড্ড মায়া।

শশী ঘোষ বলে, তোমাদের নগেনশশীও ঠিক অমনিধারা হবে। এদিক ওদিক চরে বেড়িয়েছি তো এক কালে—অনেক রকম মানুষ দেখা আছে। যে মানুষ যত শয়তান সে তত ভীতু। জঙ্গল অবধি যেতে হবে না, হাত-পা বেঁধে গাঙপারে ফেলে দিয়ে এলে আর পার হয়ে আসবে না। দেশ-ঘরের পানে হাঁটবে।

অনেক রাত্রি। কী ভয়ানক অন্ধকার! জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। বেরুল তারা। আগে শশী ঘোষ, পিছনে বলাই আর জগন্নাথ। মহেশ ঠাকুর এসব কিছু জানেন না, অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। পচাকেও খুলে বলেনি। একটা কিছু হবে এই মাত্র সে বুঝেছে, জগা নিজে থেকে না বললে সাহস হয় না কিছু জিজ্ঞাসা করবার। নৌকো এপারে আঘাটায় এনে চুপচাপ আছে বসে সে প্রতীক্ষায়।

পাকা লোক শশী। দেহ একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে, কিন্তু রাত্রিবেলা কাজের মুখে এখন সে দেবদারুর মতন খাড়া। চোখের মণি দুটো জ্বলছে। বিড়ালের চোখ যেমন জ্বলে, বাঘের চোখ যেমন। নতুন-আলার কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, দেখ এস। আজকেও তিন জন, না বাইরের কেউ ওর উপরে এসে জুটেছে। নগেন কোন পাশে সেটাও দেখে এস ঠাহর করে।

জগা বলে, বলাই চলে যাক টিপিটিপি। এসব ব্যাপার পাঁচ কান না হয়। আমরা এই তিন জন। আর পচা জানবে একটু পরে। যা বলাই, আমরা এইখানে রইলাম। রাধেটাকে ডেকে নিলে হত না ঘোষ মশায়? হবে তিন জনে?

শশী ঘোষ অবহেলার ভাবে বলে, তিনই তো অনেক। কাজ দেখনি আমার হাতের। পচার মতন তোমাদেরও নৌকোয় বসিয়ে রেখে একলা চলে যেতাম। কিন্তু আনকোরা নতুন জায়গা, ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেবার একটা দিনও তো ফুরসৎ দিলে না। তার উপর বয়সও খানিকটা হয়ে গেছে। ডান-হাতে বাঁ-হাতে সেজন্য তোমাদের দুটিকে নিয়ে যাচ্ছি।

বলাই সাঁ করে চলে গেছে আলা-ঘরের কানাচের দিকে। ছায়ার মতন একটা মানুষ বাঁধ ধরে এদিকে আসছে। মাছ-মারাদের ফেরবার অনেক দেরি। ঘেরির কাছাকাছি এই জলাটে জাল ফেলতেও কেউ আসবে না। কে তবে মানুষটা? শশী আগে দেখেছে; দেখতে পেয়ে জগার হাত ধরে টানে। একটু খানি সরে গিয়ে দুজনে গেঁয়োবনের আড়ালে দাঁড়াল। হাঁটনা দেখেই জগা আন্দাজ করেছে। অন্য কেউ নয়, বুদ্ধীশ্বর। কাছাকাছি হল মানুষটা—বুদ্ধীশ্বরই বটে। বেরিয়ে এসে জগা বলে, বিয়ের কাজে তোর বড্ড খাটনি। হয়ে গেল সব জোগাড়যন্ত্র?

বুদ্ধীশ্বর বলে, গনের আনা তো ফুলতলা থেকে এসে গেছে। চক্কোত্তি মশায় দেখেশুনে যা দুটো-একটা এখন বলছেন, চৌধুরিগঞ্জের ওরা কুমিরমারি থেকে কেনাকাটা করে এনে দেবে।

ফিক করে হেসে বলে, বরের বাড়ি তো চৌধুরিগঞ্জ হয়ে গেল। সাঁইতলা কনের বাড়ি। চৌধুরি-আলা থেকে সেজেগুজে ঢোল-কাঁশি বাজিয়ে বরযাত্রী-পুরুত সঙ্গে করে বিয়ে করতে আসবে। বরপাত্তর সেইখানে গিয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে বলে, নগনা এখানে নেই?

এই তো রেখে এলাম চৌধুরি-আলায়। মেজবাবু আর চক্কোত্তি মশায় দু-জনকে। কম হাঙ্গামা! আমাদের সালতি নেই, হেঁটে যাবে কেমন করে—চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে সেখানকার সালতি নিয়ে আসতে হল। ফিরে আসছি, অনিরুদ্ধ আটকে ফেলল। কুটুম্ববাড়ির লোক হলাম আমি। না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না।

জ্বালা-ভরা সুরে জগা বলে, এইটুকু হাঁটতে পারে না, সালতি নিয়ে আসতে হয়—পা তো একখানা খোঁড়া ছিল, আর একখানা খোঁড়া করে দিয়েছে নাকি রে কেউ?

এক গাল হেসে বুদ্ধীশ্বর বলে, বিয়ের বর হয়েছে যে! তোমরাও হবে একদিন জগা। বরপাত্তর পায়ে হাঁটলে লোকে কি বলবে? চক্কোত্তি মশায়ও সেই ব্যবস্থা দিল: হেঁটে যাওয়া চলবে না। হোঁচট খেয়ে পড়লে চিত্তির। বিয়ের ভণ্ডুল পড়ে যাবে। এই দুটো দিন সামাল-সামাল—মন্তোর ক'টা পড়া হয়ে গেলে তার পরে আর চিন্তা নেই।

আলায় ঢুকে গেল বুদ্ধীশ্বর। বর ও পুরুতের নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর খবর দেবে। এবং গগন একলা আছে বলে বুদ্ধীশ্বরও থাকবে হয়তো আলায় কিন্তু বলাই যে ফেরেনা—কোনখানে ডুব দিয়ে আছে বুদ্ধীশ্বরকে দেখতে পেয়ে।

শশী বলে, বলাই এসে নতুন কি বলবে? সবই তো জানা হয়ে গেল!

ফিরে চলল দু-জনে। জগন্নাথ গুম হয়ে আছে। তারপর বলে ওঠে, আচ্ছা, ঠিক আছে—

কি বলছ?

মেয়েটাই চুরি হবে। ঐ চারুবালা। কনে না পেলে বিয়ে করবে কাকে?

এক মুহূর্ত থেমে বলে, মেয়েটা আরও বিচ্ছু। নগনা খোঁড়াকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। এখন ভাবছে, দু-দুটো ঘেরি নগনার হাতে এসে গেলে মুলুকের মালিক হয়ে মাতব্বরি করে বেড়াবে। সেই লোভে চুপ করে গেছে। নইলে রণচণ্ডী একবার হুঙ্কার ছাড়লে বড়দার তাগত হত এই কাজে এগোবার?

শশী ঘোষের দোমনা ভাব: কাজটা বড় গণ্ডগোলের হয়ে দাঁড়াচ্ছে জগন্নাথ। বেটাছেলে চুরি আর মেয়েছেলে চুরি একরকম কথা নয়। সোমত্ত মেয়ে ঐ রকম ভাবে জঙ্গলে ছেড়ে আসা যাবে না।

জঙ্গলে না হয়, মানবেলায় নিয়ে ছাড়ব। ফুলতলায়, না হয় সেই মাতলা শহর অবধি গিয়ে।

শশী বলে, মানবেলা তো বেশি ভয়ের জায়গা জঙ্গলের চেয়ে।

দর জন্তু-জানোয়ারের থাবা তবু হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু দা সোমত্ত মেয়ে মাঝবেলায় মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে।

জগা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, জান না ঘোষ মশায়, সেই জন্যে খা বলছি। মেয়েই তো হামলা দিয়ে বেড়ায় যত পুরুষের উপর। তলায় নিয়ে গিয়ে কিছু পয়সা কড়ি হাতে গুঁজে দেব। রেলগাড়ি তারপরে যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক।

শশী ভেবে নেয় একটু : সিঁদকাঠি চাই তবে একটা। কামরায় দিয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে হবে তো? ঢুকে পড়ে দুয়োর দ দেব। দেয়াল খুঁড়ে পথ করে দাও, তার পরে তোমাদের র-কিছু দেখতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, খোঁড়াখুঁড়ির কাজও পারবে তোমরা। পোক্ত হাত ছাড়া হয় না, আওয়াজ করে ফেলবে। দকাঠি জোগাড় করে দাও, আমি সব করব। আমার নিজের টা ভাল জিনিষ ছিল, পয়লা নম্বরের পোলাদে গড়ানো। রোগার ভয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিলাম। সে কি আজকের থা? দারোগার অত্যাচারেই তো দেশভুঁই ছেড়ে জঙ্গলে আসতে দ।

বলাই এসে পিছন ধরল। আলায় উল্টো দিকে গগার র হয়ে জল ভেঙে এসে বাঁধে উঠেছে। জগা বলে, সিঁদকাঠির করা যায় বলাই? মুশকিল হল, ওদের কামরার দেয়াল টো করতে হবে।

বলাই বলে, সিঁদকাঠি না-ই হল, খন্তার গর্তে হয়ে যাবে। টির দেয়াল। হবে না ঘোষ মশায়?

কাঁচা-বাদায় বন কাটতে চলেছে। ঘরও বাঁধবে সেখানে। খন্তা াছে, হেঁসো-দা আছে, কুড়াল আছে। তা ছাড়া শিকার ও ত্মরক্ষার জন্য আছে লেজা কোচ ছোরা। আর ঠারেঠোরে শশী ঘোষ ভরসা দিয়েছে, দেশি বন্দুকও মিলতে পারে একটা ; বন্দুক সরে সামলে রাখা আছে কোথায়। অস্ত্রের ভয়া যাচ্ছে তবে তো, নৌকোয় খোলে রয়েছে সব।

বলাই বলে, সিঁদ কেন কাটতে যাবে ঘোষমশায়? জানলা আছে কামরায় কানাচে। জানলায় কাঠের গরাদে, ধারালো কিছু দিয়ে গরাদে কাটা যাবে। তুমি একবার নৌকোয় চল দিকি, যা দরকার নিজে বেছেগুছে নিয়ে এস।

তাই উচিত বটে। ওস্তাদ মানুষ শশী ঘোষ অনেকদিন বাদে কাজে নামছে। পুরানো সাকরেদ কেউ নেই, একলা হাতে সমস্ত করতে হবে। স্বচক্ষে দেখে নেওয়া ভাল। কিন্তু জগা যাবে না নৌকোয়। তার যাবার কি প্রয়োজন? এখন তার অন্য কাজ। ঐ যে কথা হল কিছু টাকাপয়সা দিতে হবে চারুবালার হাতে—সেই ব্যবস্থায় যাচ্ছে। সেদিন কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে কেওড়াতলার গোপন ভাণ্ডারে আমার সব পুঁতে রেখেছে। মাটি খুঁড়ে বের করে আনবে কিছু এখন।

বলে, চলে যাও তবে তোমরা। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। দেরি হবে একটু। দেয়াল খোঁড়া জানলা কাটা—ঐ কাজগুলো করতে লাগ, আমি তার মধ্যে এসে পড়ব। আমায় বাদ দিয়ে যদি না করতে চাও, নৌকোয় বসে থেকো তা হলে। তোমায় কোন কর্মে লাগবে? কর্তা তো আমিই। শুধু কাছে থাকলে হবে, হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। মুখ বেঁধে মাল নৌকোয় এনে ফেলবার সময়টা তোমাদের লাগবে। জোয়ান-যুবার কাজ। তার মধ্যে চলে এসো।

শশী আর বলাই নৌকোয় চলল। শেষ এইবারে চারুবালার ছলকলা। বাদাবন থেকে জন্মের মতন বিদায়। ফুলতলার ঘাটে সেই দেখা। কোন লগ্নের প্রথম দেখা গো—সাপে-নেউলে লেগে গেল একেবারে। সর্বনাশী মেয়ে জগাকে দেশান্তরী করে ছাড়ল। বন কেটে মাটি তুলে ঘেরি বানানো এমন সাধের জায়গা ছেড়ে বয়ারখোলায় যাত্রার দলে চলে যেতে হল তাকে। শোধ এত দিনে। জগারা না-ই বা থাকল, কিন্তু তাদের নতুন-ঘেরিতে চারুবালাও নগেনশশীর সঙ্গে জাঁকিয়ে সংসারধর্ম করবে না। এই ভাবনায় বড় আরাম পাচ্ছে।

হন-হন করে জগা চলেছে। ক্ষিধে পেয়েছে বড্ড। পা টলছে ক্ষিধের। সাঁজবেলায় ওরা সবাই খেয়ে নিল, জগা খায় নি। খেতে ইচ্ছে হল না কিছুতে। আসন্ন শুভকর্মের একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি ক্ষিধে-তেষ্টা উপে গিয়েছিল। এখন সেই ব্যাপারের খানিকটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষিধে চাড় দিয়ে উঠল। অনেক হাঙ্গামা তো এইবারে—নৌকো নিয়ে কি ভাবে কত পথ যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। খালি পেটে বোঠে বাওয়া যাবে না।

ভাতে জল ঢেলে পান্তা করা আছে। ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢুকে কলাইয়ের থালায় পান্তা নিল ঢেলে, আর খানিকটা গুড়। খেতে খেতে শান্ত হয়ে এখন ভাবছে, কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে কোন জায়গায়? টাকা-পয়সা কি পরিমাণ দেওয়া হবে তাকে? যেমন রাগি মেয়ে, পয়সা যদি ছুঁড়ে মারে তার গায়ের উপর? ঝাঁপিয়ে পড়ে গাঙের জলে? সকল বন্দোবস্ত শেষ, কাজে লেগে গেছে দু-দুটো মানুষ, হয়তো বা সিঁদ খোঁড়া হয়ে গেল এতক্ষণে। এখন জগা এমনি সমস্ত আবার ভাবছে।

মেঘে থমথম করছে আকাশ। বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটাও নড়ে না। মহেশ ঠাকুর বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন মানুষের উপর। টেমি জ্বালিয়ে রেখেই ঘুম, নিভোবার কথা মনে নেই। গাঁজাটা আজ বড় বেশি মাত্রায় টেনেছেন। কেরোসিন ফুরিয়ে দপদপ করে উঠে টেমি নিভে গেল। চুলোয় যাকগে—মাছ বেছে খেতে হবে না, আলোর কি দরকার? ভালই বরঞ্চ। আলো দেখে পাড়ার কেউ হয়তো ঢুকে পড়ল। মাঝেমাঝে হয়তো—ক্ষ্যাপা মহেশের কল্কের প্রসাদ পাবার লোভে। এসেই বকর-বকর জুড়ে দেবে, মুশকিল তখন সামাল দিয়ে বেরুনো। ওরা এতক্ষণে কাজ অনেক দূর এগিয়ে ফেলেছে। পাকা লোক শশী ঘোষ—বয়সে বুড়ো হলে কি হবে, জোয়ান যুবাদের হার মানিয়ে দেয়। বাইরের কাজকর্ম সেরে কামরায় ঢুকতে পারছে না হয়তো তারা, জগন্নাথের পথ তাকাচ্ছে। জগা গোগ্রাসে গিলছে, পান্তা ক'টা শেষ করে লহমার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

চমকে যায়। মানুষ যেন বাইরে। খুটখাট আওয়াজ। ঝাঁপ একটু ফাঁক করল। দেখবে কি, বিষম অন্ধকার। এমন অন্ধকার

কিন্তু ছায়ার মতো মানুষ একজন, সেটা বোঝা যাচ্ছে। বলাই চলে এল নাকি দেরি দেখে? গণ্ডগোল ঘটল কোনরকম? হয়তো বা ধরে ফেলেছে শশী ঘোষকে, খবর নিয়ে বলাই ছুটেছে।

ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢোকে মানুষটি—কী আশ্চর্য, ঝাঁপ খুলতে চুড়ি বাজে ঝিনঝিন করে। ভাতসুদ্ধ হাত থেমে যায় জগার—নিজেদের ঘরে নিঃসাড় হয়ে একেবারে চোর হয়ে রইল।

ঘরে এসে চারুবালা বলে, আলো জ্বালনি কেন?

বিরক্তস্বরে জগা বলেছিল নিবে গেছে, তেল নেই।

ও—

এ কি, চেপে বসে পড়ল চারুবালা সামনে। বসে প্রশ্ন করে, খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

হয়ে গেছে খাওয়া।

তাহলে উঠে পড়।

সে যখন হয় উঠব। কিন্তু ঘুরঘুট্টি আঁধারে এদ্দূর এসে তুমি একেবারে পুরুষমানুষের ঘরে উঠে পড়লে, কেমন মেয়েছেলে তুমি?

বোঝ তবে কেমন! চারুবালা খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন হাসি হাসতে পারে সে তো জানা ছিল না। হাসি এমন মিষ্টি লাগে অন্ধকারে!

হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে আবার বলল, গরজে পড়ে আসতে হল। নৌকো নিয়ে এসেছ, কি শলাপরামর্শ হচ্ছে তোমাদের শুনি?

জগা ঢোক গিলে বলে, না তো। নৌকো আবার কোথায় দেখলে?

চকচকে ঝকঝকে নৌকো, ওপারের গোলবনে ঢুকিয়ে রেখেছিলে। খবর জানতে কিছু বাকি নেই।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে যায়। গোপনতা সত্ত্বেও নৌকো লোকের নজরে পড়েছে, স্ত্রীলোক চারুবালা অবধি জানাজানি হয়ে গেছে।

চারুবালা বলে, রাত দুপুরে এখন নৌকা এপারে নিয়ে এল। বড় গাঙ পাড়ি দিয়ে দূর-দেশে কোথায় যাবে। আমি সমস্ত জানি।

থমথমে আকাশ। আসন্ন ভাঁটায় অদূরে খালের জলও থমথমে হয়ে আছে। কী সর্বনাশ! এই রাত্রে চুপিসাড়ে পচা নৌকো বেয়ে এপারে নিয়ে এল, সেটা পর্যন্ত জেনে বসে আছে। হাত গুণতে পারে নাকি মেয়েটা? কিম্বা ডাকিনী-হাকিনী কেউ খালপারের বাদাবন থেকে চারুবালার মূর্তি ধরে এল?

চারু বলে, আমি জানি সাঁইতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছ তোমরা আজ রাত্রে। মহেশ ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছেন। চিরকালের মতো যাচ্ছ, আর আসবে না। কেন যাবে, তাই জিজ্ঞাসা করি। নিজের হাতে কুড়ুল মেরে গাছ কেটেছ, কোদাল মেরে ভেড়ি বেঁধেছ—গোছগাছ করে সমস্ত পরের হাতে তুলে দেবে, সেই জন্যেই কি অত খেটেছিলে?

সর্বরক্ষে রে বাবা! পচা ফাঁস করেছে মেয়েটার কাছে, নিঃসংশয়ে এবারে বোঝা গেল। পচা ছাড়া কেউ নয়। চারুবালাকে তোয়াজ করে সে এখনো। কোন এক দূরের জায়গায় যাওয়া হবে, ভাঁটার মুখে নৌকো এনে এপারে রাখবে—এই অবধি জানে শুধু পচা, ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। জানে না ভাগ্যিস।

জগাও এবারে খানিক জো পেয়ে যায়। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি তো একটা একজন নই। যত এই মাছ-মারা দেখ, কত স্ফূর্তিতে সবাই মিলে খাটাখাটনি করল। কিন্তু থাকবার মতন রইল কি এ জায়গা? মানবেলা থেকে তোমরা এক দল এসে পড়লে সুখের গন্ধ পেয়ে। পিছন পিছন চৌধুরিদের নায়েব-ম্যানেজার এল। আদালতের পেয়াদা এল। টৌনি চক্কোত্তি এসে আড্ডা গাড়ল মাথা-ভরা শয়তানি বুদ্ধি নিয়ে। পাকা রাস্তা হচ্ছে, গাড়ি মোটর আসতে লাগবে। গাড়ি চড়ে কত কত দরের মানুষ এসে পড়বে। দু'বছর পরে আর কেউ ছাতা ছাড়া বেরুবে না এ-জায়গায়, জুতো ছাড়া হাঁটবে না। রক্ষে কর বাপু, আমাদের পোষাবে না। আমরা চললাম—দেখি পিরথিমের মুড়ো আর কত দূরে।

চারুবালা সহসা কাতর হয়ে বলে, আমিও থাকব না। আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে। তুমি একটা মানুষ তবু একটু মাথা খাড়া করে চলতে। তুমিও শেষ করে দিয়ে যাচ্ছ, তবে আর কোন ভরসায় থাকা এখানে?

জগা অবাক হয়ে বলে, সে কি গো! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—আমাদের খেদিয়ে দিয়ে তোমাদেরই তো দিনকাল। কিন্তু যা মানুষ নগেনশশী, বড়দাকে অবধি রেহাই দেবে না। খেদাবে—দুটো দিন আগে আর পরে।

চারুবালা বলে, দাদা বুঝেছে সেটা। বিয়েথাওয়া সেই আপদ-বিদায় হবে বলেই তো। আমিও সংসারের ভারবোঝা এখন। দাদা ভেবেছিল, এক ঢিলে দুই পাখি নিকেশ করবে। কিন্তু খোঁড়া মানুষ অনেক বেশি সেয়ানা—গাছের খাবে তলারও কুড়োবে সেই মানুষ। বুঝেছে দাদা এখন। বুঝেসমঝে হাত কামড়াচ্ছে। পিছোবার আর উপায় নেই—

কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে। বলে, ভেবেচিন্তে তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি উপায় করে দাও। দাদা দেশ ছেড়ে এল। নগেনের জ্বালাতন সইতে না পেরে ছলেছুতোয় শেষটা আমরাও বাদাবনে পাড়ি দিলাম। সে পিছন ধরে এল। তারপরে দেখতে পাচ্ছ তো সব। সহোদর বড় ভাই মাথার উপরে থেকেও নেই—দাদা আর বউ দু-জনেই আজ শত্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চারুবালার কথাবার্তায় জগা অবাক। মনে মনে কষ্টও হচ্ছে। কায়দায় পেয়ে তবু একটা লাগসই জবাব না দিয়ে পারে না: তুমিই তো সকলের মাথায় চড়ে বেড়াও। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে তোমার মাথার উপরে থাকতে যাবে?

ব্যঙ্গবিদ্রূপ চারুবালা কানে নেয় না। বলে, যত খুশি গালি-গালাজ কর, আমি ছাড়ব না। তক্কে তক্কে থাকব, নৌকো ছাড়বার সময় জোর করে উঠে পড়ব। এই যে রাত দুপুরে ম্যাচম্যাচ করে এসে তোমার ঘরে উঠে পড়লাম, ঝাঁপ চেপে ধরে পারলে ঠেকিয়ে রাখতে?

জগা বলে, যাব তো আমরা অজজি জঙ্গলে। আমাদের নৌকোয় তুমি কোথা যাবে?

মানবেলার মধ্যে নিয়ে যে জায়গায় হোক আমায় ছেড়ে দিও। যেমন করে পারি আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠব। এমনি ভাত না জোটে, দশ দুয়োরে ভাড়া ভেনে বাসন মেজে খাব। সে অনেক ভাল

এখানে এসে পড়ে কয়েদখানায় আটকে গেছি। তুমিই এক উদ্ধার করতে পার। তোমার সঙ্গে যাব।

যেন আলাদা এক মানুষ—এত দিনের দেখা চারুবালা থেকে একেবারে ভিন্ন। ভিতরে কোন মতলব আছে কিনা কে জানে? প্যাঁচে ফেলার কৌশল? সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে জগা সাফ জবাব দিল, নৌকোয় বাইরের কাউকে নেওয়া যাবে না। মানবেলার দিকে যাচ্ছিইনে মোটে, যাব উল্টো মুখো।

তবে কি হবে?

হেঁটে চলে যাও, সাঁতার কেটে যাও। রাত্তবিরেত মান না, গাড-খালই বা মানবে কিসের তরে? সাপে কাটুক, কুমিরে নিক—আমি কিছু জানিনে।

তড়াক করে জগা উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাবে। ভ্যানর-ভ্যানর করে সময় যাচ্ছে, আর অকারণে দেয়াল খুঁড়ে মরছে শশী-বলাই ওদিকে। গিয়ে তাদের সরিয়ে আনবে।

কিন্তু ঝাঁপের দুয়োর আগলে বসে চারুবালা। বলে, যাও কেমন করে দেখি। যেখানে যাবে, আমি পিছন পিছন চলব।

বিষম মুশকিল, কাঁঠালের আঠার মতন লেপটে রইল। জগা কঠিন হয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে: আমি লোক খারাপ। বদনাম শোন নি আমার?

খুন করবে? তাই কর তুমি। জ্যান্ত আমায় খোঁড়া নগনার হাতে ফেলে কিছুতে এখান থেকে যেতে দিচ্ছি নে।

সেই অন্ধকারে চারুবালা জগন্নাথের পা এঁটে ধরেছে। পায়ের উপর মাথা খোঁড়ে। বিনুনি বাঁধেনি কেন কে জানে, গোছায় গেরো দিয়ে ঝুঁটি করে রেখেছিল। গেরো খুলে আলুল চুল ছড়িয়ে পড়েছে দুই পায়ে। পা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে জগা, কিন্তু বড্ড জোরে ধরেছে যে! বলিষ্ঠ পুরুষ—কিন্তু ঢংচলে একটা মেয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কথায় ও কলহে যেমন পারে নি কখনো তার সঙ্গে। ডাকাতি করে মুখ বেঁধে আনতে যাচ্ছিল, সে-ই এখন হামলা দিয়ে পড়েছে তার ঘরে তার পায়ের উপর।

কতক্ষণ রইল এমনি। তারপর জগন্নাথ বলে, চল তোমায় আলায় রেখে আসি।

সে কণ্ঠে কি ছিল, দ্বিরুক্তি না করে চারুবালা আগে আগে উঠানে নামল। উঠানের আঁধার গাঢ় নয়, নজর চলে একরকম। ঝাপসা আঁধারে, মরি মরি, কী অপরূপ দেখায় চারুবালাকে!

জগা বলে, চল, দাঁড়িয়ে থেক না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আজকে যাচ্ছিনে কোথাও। কাল রাত্রে—ঠিক এমনি সময়।

চারুবালা কথা বিশ্বাস করেছে। চলল নতুন-আলায়। জগন্নাথ তার পাশে। মাটির নিচের ভাণ্ডার থেকে টাকাপয়সা তোলার আজ কোন দরকার নেই। শশী আর বলাইকে এখন ফিরিয়ে আনতে যাবে চুপিসাড়ে। চারুবালা টের না পায়। সিঁধ কাটা শেষ করে ফেলেছে হয়তো বা এতক্ষণ। কামরায় ঢুকেই গর্ত দেখে চারুবালা চেঁচামেচি করবে। কালের কাজ, বুঝতে না পারে যেন কোন ক্রমে। কোন দিন না টের পায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চারুবালা বলে, তোমরা যেখানে যাচ্ছ সেইখানে যাব আমি চল। মানবেলায় একা একা থেকে কি হবে?

জগন্নাথ বলে, আমিও ভাবছি তাই। মানবেলার উল্টো দিকে যাত্রা আমাদের। নৌকো ঘুরিয়ে অতদূর নিয়ে যেতে হালামাও অনেক। কাজে দেরি পড়ে যাবে, অন্যেরা যাচ্ছে, তারা সবাই রাগারাগি করবে।

দৃঢ় কণ্ঠে চারুবালা বলে, তাই কথা রইল কিন্তু। আর কোথাও আমি যাচ্ছি নে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

জগা প্রীত হয়ে বলে, কেশোডাঙার চরে এবারের নতুন বসত। ভাল হবে। সুন্দর করে তুমি ঘরের ডোয়া নিকাও, ফুল-বেলপাতা দিয়ে লক্ষ্মীপুজো কর, গোয়াল তুলে গরুর সেবা কর।

একটুখানি হেসে বলে, কিন্তু একটা মুশকিল চারুবালা, বাঘ এসে পড়ে তোমার গরু মুখে করে নিয়ে যাবে। নিকানো ডোয়ার মাটি নোনা লেগে ঝুরঝুর করে পড়বে। তোমার পুজোআচ্চায় বামুনপুরুত মিলবে না

হেসে উঠে চঞ্চল সুরে চারুবালাও তেমনি জবাব দেয়, পুরুত না হলেও লক্ষ্মীপুজো হয়, বউ-মেয়েরা করে। ঘরের ডোয়া আমি রোজ লেপাপোঁছা করব। বাঘও কি আর থাকতে দেবে তোমরা? বন কেটে ফেলে কোন মুলুকে তাড়িয়ে তুলবে।

ঘাড় নেড়ে জগা বলে, উঁহু। বন রেখে দেব, বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শির চেয়ে বাঘ পড়শি ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে—আবার কোনদিন খোঁড়া-নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ ম্যানেজার, আদালতের চাপরাশি আর অনুকূল চৌধুরিরা ঢুকে পড়তে না পারে।

[ক্রমশঃ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৩

'কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' বাহ্যে বিষজ্বালা কিন্তু অন্তরে আনন্দস্রোত। তপ্ত ইক্ষুচর্বণের মত। মুখ জ্বলে যাচ্ছে তবু 'না যায় ত্যজন'। 'সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন।'

প্রৌঢ় সাপের চেয়ে শিশু সাপের বিষ বেশি। তার কটুতা অর্থাৎ তীব্রতাও বেশি। আর এই কটুতার জন্যে সর্পশাবকের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা সেই নবকালকূটের গর্বকেও নির্বাসনে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে সুধারও অহঙ্কার কম নয়। আমার মতন কার এমন মধুরিমা এই তার অহঙ্কার। কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ সেই অহঙ্কারেরও সঙ্কোচ ঘটিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম একাধারে বক্র ও মধুর।

নিমাই নাচছে আর আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে মাটিতে। শচী বলছে, 'বাছার আমার হাড়গোড় ভেঙে গেল। তোমরা আর কীর্তন কোরো না। ক্ষান্ত দাও এবার।'

কে কার কথা শোনে। নিমাই আবার উঠেছে। না, হাড়গোড় ভাঙেনি। আবার নাচছে নিমাই। আবার হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ বলে নামগান করছে। তখন শচী নিমাইয়ের সঙ্গী-ভক্তদের বললে, 'ওগো তোমরা নিমাইকে ঘিরে থাকো, যদি ঢলে পড়ে ধরে ফেলো। তার কোমল অঙ্গ যেন মাটিতে না পড়ে।'

কিন্তু বারণ করছ কাকে? দেখ কাকে বলে কৃষ্ণপ্রেম।

শচী নিমাইকে বললে, 'তুমি যেখানে যা পাও তা আমাকে দাও। শুনছি তুমি কৃষ্ণপ্রেম এনেছ তবে তা আমাকে দিচ্ছ না কেন?'

নিমাই বললে, 'মা, তোমার অপরাধ আছে।'

'কী অপরাধ?'

'বৈষ্ণব-অপরাধ।'

অদ্বৈতের প্রতি অপ্রসন্ন ছিল শচী। বড় ছেলে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের কাছে যাতায়াত করত, বলত ঈশ্বরকথা। যখন সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্বরূপ ঘর ছাড়লে, শচী মনে করল অদ্বৈতই এর হেতু। মন বেঁকে রইল অদ্বৈতের উপর। তারপর নিমাই যখন আশ্বাস দিল যে সংসারে থাকবে তখন শচী ভুলে গেল অদ্বৈতকে। কিন্তু এখন, গয়া থেকে আসবার পর, এ সব কী হচ্ছে? নিমাই ঘন ঘন যাচ্ছে অদ্বৈতের কাছে। এমন কি লক্ষ্মীপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছেড়ে অদ্বৈতের ঘরে রাত কাটাচ্ছে। নিমাই না আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। অদ্বৈত না আবার বৈরাগ্যের মন্ত্র দেয় কানে কানে। শচীর সমস্ত চিত্ত অদ্বৈতের উপর বিমুখ হয়ে রইল।

আর তার এই বৈমুখ্য এই অপ্রসন্নতাই বৈষ্ণব-অপরাধ।

কোনো বৈষ্ণবকে প্রহার করলে, নিন্দা করলে, দ্বেষ করলে, অভিনন্দন না করলে, অর্থাৎ অনাদর করলে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলে বা বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ না দেখালে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শচী বৈষ্ণবপ্রধান অদ্বৈতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেছে। সুতরাং সে অপরাধী।

'সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া প্রেম না দেন গোসাঞি ॥'

শাস্তি দিল নিমাই। মা বলেও পক্ষপাতিত্ব

করল না। এ তো দণ্ড নয়, প্রসাদ। অদ্বৈতের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল শচী। সে ক্ষমায় অপরাধ ধুয়ে গেল। তারপরে মাকে নিমাই কৃষ্ণপ্রেম দিলে।

'যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ?'

ভক্ত অম্বরীষের কাছে অপরাধ করে দুর্বাসারও দণ্ড হয়েছে, বিষ্ণুচক্রের তেজ তাকে দগ্ধ করছে। ছুটতে ছুটতে অম্বরীষ বৈকুণ্ঠে এসে শ্রীহরির শরণ নিয়েছে, হে অচ্যুত, হে বিশ্বভাবন, আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীহরি বললে, আমার করার কিছু সাধ্য নেই। আমি অস্বতন্ত্র, আমি ভক্তপরাধীন। ভক্তরা আমার হৃদয় গ্রাস করে রেখেছে। তাদের মত প্রিয় আর আমার কেউ নেই। আমি তাদের কথাই শুনি, তাদের কথায়ই উঠি-বসি।

তবে আমার উপায় ? দুর্বাসা চোখে অন্ধকার দেখল।

তুমি গিয়ে অম্বরীষের কাছে ক্ষমা চাও। তা হলেই তুমি শান্তি পাবে। চক্র আর পিছু নেবে না। ফিরে যাবে।

ব্রাহ্মণ দুর্বাসা ক্ষত্রিয় রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। প্রশান্ত হল বিষ্ণুচক্র।

মুকুন্দ দত্ত সম্পর্কেও সেই দণ্ড-প্রসাদ।

এক সঙ্গে পড়ত নিমাইয়ের সঙ্গে। ব্যাকরণের ফাঁকির লড়াই হত দু জনে। অন্তরঙ্গ সঙ্গী মুকুন্দ আর গানে সুধাকণ্ঠ।

সেই মুকুন্দের প্রতি নিমাই বিরূপ। আর সকলকে ডেকে কৃপা করছে, প্রেম দিচ্ছে কিন্তু মুকুন্দকে ডাকছে না। নামও করছে না মুকুন্দের।

কী যেন অপরাধ করেছি। সরাসরি নিমাইকে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না। শুধু অন্তরে বসে কাঁদে। ম্লানমুখে ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীবাস এসে নিমাইকে ধরল, 'তুমি সকলকে ডাকছ মুকুন্দকে ডাকছ না কেন ? তোমার কাছে ও কী অপরাধ করেছে ? ও তোমার বন্ধু। ওর গানে প্রস্তর পর্যন্ত দ্রবীভূত। তুমি কেন ওর প্রতি উদাসীন ? ওকে দেখা পর্যন্ত দিচ্ছ না।'

'বোলো না, ওর কথা বোলো না।' নিমাই বললে বিরক্ত স্বরে, 'ওর ভক্তিস্থানে অপরাধ।'

'ভক্তিস্থানে ?'

'হ্যাঁ, ও যখন যেখানে যায় তখন সেখানের মত কথা বলে। যখন জ্ঞানমার্গীদের কাছে যায় তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, আবার যখন ভক্তের কাছে যায় তখন ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করে।' নিমাই বললে, 'ভক্তিস্থানে তাই ও অপরাধী। ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ। এতেকে উহার হৈল দরশনে বাধ।'

ঘরের বাইরে থেকে শুনল সব মুকুন্দ। ঠিক করল এ অপরাধী দেহ আর রাখবে না। কাঁদতে কাঁদতে শ্রীবাসকে বললে, 'প্রভুকে জিগগেস করো আর কোনোদিন তাঁর দর্শন পাব কি না'—

নিমাই বললে, 'পাবে। কোটি জন্ম পরে পাবে।'

'পাব ? পাব ? আমার অপরাধ ক্ষয় হয়ে যাবে ?' নিশ্চয় প্রাপ্তির কথা জেনে মহানন্দে নাচতে লাগল মুকুন্দ।

মুকুন্দের কাণ্ড দেখে নিমাই হাসতে লাগল। বললে, 'শিগগির আমার কাছে নিয়ে এস মুকুন্দকে। ওর আর অপরাধ নেই।'

মুকুন্দ কাছে এসে দাঁড়াতেই নিমাই বললে, 'মুকুন্দ, প্রসাদ নাও।'

'প্রভু বোলে মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥'

মুকুন্দ নিমাইয়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই বললে, 'ওঠ। আর তোমার তিলার্ধ অপরাধ নেই। তুমি আমার বাক্য অব্যর্থ জেনে আনন্দ করছ তাতেই তোমার শরীরে ভক্তি এসে গিয়েছে।'

'ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥'

অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ। 'এই ছার মুখে আমি ভক্তি মানলাম না, আমার মত হীনমতি আর কে আছে ? কীট হই না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি। আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি ? দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখল কিন্তু ভক্তিশূন্য বলে কিছুই দেখল না। পেল না আনন্দলেশ। 'না পাইল সুখ—ভক্তিশূন্যের কারণে।' বেদ-মহাভারত বহু শাস্ত্র লিখেও ব্যাসের শান্তি হল না। শান্তি হল ভক্তির বিস্তারে। 'নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তার। তবে মনো দুঃখ গেল তারিল সংসার।' আর আমি কিনা সেই ভক্তি মানলাম না, তবু তুমি—তুমি আমাকে কৃপা করলে।'

গত চরিত্রের জন্যে অনুতাপ করতে লাগল মুকুন্দ। নিমাই বললে, 'না, তোমার কণ্ঠস্বরেই তো প্রেমভক্তি

ঢেলে দিয়েছি। তোমার সর্বদেহে এখন প্রিয়ঙ্করী ভক্তি এসেছে। তুমি ঠিকই বলেছ, যদি ভক্তি না থাকে আমাকে দেখেও কিছু হয় না, ভক্তি ছাড়া সমস্ত কর্ম অর্থহীন। কিন্তু তোমার আর ভয় নেই। তুমি ভক্তি-বিশ্বাসের গান হয়ে উঠেছ। যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার। 'যথা গাও তুমি তথা আমি অবতরি।'

মুকুন্দকে বরদান করল নিমাই আর সকলে জয়ধ্বনি, হরিধ্বনি করে উঠল।

মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥

গদাধরও কাঁদছে। নিমাইয়ের নিত্যসঙ্গী গদাধর। যত গৃহকাজ সব গদাধর করে দেয়। নিমাইয়ের বিছানা করে, পান সাজে, পাখা করে, পায়ের নিচে শুয়ে থাকে যদি কিছু আদেশ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। তার সকল কাজ বুঝি হরণ করেছে গদাধর।

গদাধরেরও গোপন সাধ একদিন কৃষ্ণপ্রেম চেয়ে নেয় নিমাইয়ের কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাতেও কেমন তার ভয় করে।

একদিন রাত্রে দুজনে শুয়েছে কীর্তনান্তে। নিমাইয়ের পায়ের নিচে গদাধর।

হঠাৎ গদাধর নিমাইয়ের দু পা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

'এ কি, কাঁদ কেন?' নিমাই চঞ্চল হয়ে উঠল।

গদাধর সভয়ে বললে, 'আমার কৃষ্ণপ্রেম কই?'

'তোমারও চাই না কি ও বস্তু?'

'সকলে প্রসাদ পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেল, আর আমি তোমার সঙ্গী, তোমার সেবক, শুধু আমিই বঞ্চিত হয়ে থাকব? এ কেমন কথা?'

সহাস্যে নিমাই বললে, 'আচ্ছা, তুমিও পাবে।'

'পাব?'

'হ্যাঁ, দেখো, কাল ভোরে যখন তুমি গঙ্গাস্নান করবে দেখবে তোমাতে কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হয়েছে।'

'সত্যি?'

বাকি রাত গদাধর আর ঘুমুল না। পারল না ঘুমুতে। পূবের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণে ফোটে তার আনন্দের স্বপ্ন।

ভোর হতেই ছুটল গঙ্গার দিকে। ডুবের পর ডুব দিতে লাগল। কই কোথায় কৃষ্ণপ্রেম!

স্নান সেরে পারে উঠতেই এ কী আবেশ এল সর্বাঙ্গে! এ কী আনন্দ! এ কী অশ্রু! পা কেন স্থির রাখতে পারছি না মাটিতে? কেন টলে-টলে পড়ছি?

ভক্তগণ নিয়ে বসে আছে নিমাই, দেখল অবশ শরীরে টলমল করতে-করতে গদাধর এগিয়ে আসছে। কাঁদছে অঝোরে, চোখ লাল হয়েছে কাঁদতে-কাঁদতে। গলবস্ত্র হয়ে নিমাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

'গদাধর, কী খবর?' নিমাই তাকে তুলল হাতে ধরে।

গদাধর বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

'কী, পেলে?' স্মিতহাস্যে জিগগেস করল গৌরহরি।

গদাধরের মুখে কথা নেই, শুধু অশ্রু ঝরছে অবিশ্রাম।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নিমাইয়ের প্রতিবেশী। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে ভিক্ষে করে বেড়ায় এবং তারই বলে অনেক তীর্থ ঘুরতে পেরেছে। তপস্যাও অনেক করেছে শোনা যায়। একদিন তার মনে হল, প্রেমই পরম পদার্থ আর প্রেম না পেলে কী পেলাম জীবনে। আর, প্রেম আমি পাব না তো পাবে কে? কে অত তীর্থ পর্যটন করেছে, কে করেছে এত ব্রত এত কৃচ্ছ্র, এত কাঠিন্য।

প্রেমভিক্ষা চাইল শুক্লাম্বর। তার ভিক্ষার পিছনে দম্ভ ছিল। বললে, 'দ্বারকা মথুরা বেড়িয়েছি, করেছি অনেক তপঃক্লেশ, সুতরাং আমিই প্রেমভক্তি পাবার উপযুক্ত। দাও আমার প্রাপ্যধন।'

নিমাই বললে, 'দ্বারকা মথুরায় কি শেয়াল কুকুর ছিল না?'

মুহূর্তে শুক্লাম্বর বুঝতে পারল তার অপরাধ। আর তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। লোকদেখানো কান্না নয়, কৃষ্ণবিরহের আর্তি।

অনুগতের আর্তি নিমাই সইতে পারল না। প্রেম-প্রসাদ দিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে। তখুনি শরীরে পুলককম্প শুরু হল, নয়নে বইতে লাগল অশ্রুর ভরাস্রোত।

করুণায় অবতীর্ণ গৌরহরি! অস্ত্র ধারণ করেনি, কারু প্রাণসংহার করেনি, হরিনাম কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে সকলের চিত্ত শুদ্ধ করে দিল। অসুর নাশ করল না,

অসুরত্বকে নাশ করল। পাপীকে শাস্তি দিল না, তার পাপ হরণ করে তাকে ভক্ত করে তুলল।

রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল
চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার।

আর যে এত করুণা দিচ্ছে সে কৃষ্ণ ছাড়া আর কে? কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি? কৃষ্ণ ছাড়া এমন আর কে আছে যে লতাকে পর্যন্ত প্রেম দেয়? প্রেমে বৃক্ষ-লতাও কাঁদে, সর্বাঙ্গে পুলক শিহর ধরে থাকে। মধুক্ষরণ করে।

সেই কৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের উপায় কী? উপায় প্রেম। 'প্রৌঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥' যার যতটুকু প্রেম তার ততটুকু আস্বাদন। 'আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। স্ব-স্ব-প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥' একমাত্র রাধিকাতেই ভাবের অবধি, প্রেমের পূর্ণতম সর্বোত্তম প্রকাশ। তাই এক মাত্র শ্রীমতীরই পূর্ণতম সর্বোত্তম আস্বাদন।

প্রেম পেয়ে শুক্লাম্বর নাচতে লাগল; তার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, তা নামিয়ে রাখল না। কার সাধ্য সেই নাচ দেখে না হাসে। নিমাই উঠে তার ভিক্ষার ঝুলিতে হাত ঢুকিয়ে দিল। দেখল তাতে কিছু চাল পড়ে আছে। সেই চাল এক মুঠো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে লাগল নিমাই।

'করো কী, করো কী। শুধু শুধু কাঁচা চাল কি কেউ খায়?'

নিমাই বললে, 'বেশ, ঘরে গিয়ে রান্না করে কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর। মধ্যাহ্নে আমি খাব।'

শুক্লাম্বর ফাঁপরে পড়ল। পরামর্শ নিল ভক্তদের। ভাত আর গর্ভথোড় রান্না করল। গঙ্গাস্নান করে এসে কৃষ্ণে নিবেদন করে খেল তাই নিমাই।

শ্রীবাসের আঙিনায় নিত্য কীর্তন হচ্ছে রাত্রিতে। শত শত ভক্ত নিয়ে নৃত্য করছে গৌরহরি। কখনো বাজাচ্ছে মৃদঙ্গ, কখনো বাজাচ্ছে করতাল। কখনো বা হরিবোল বলছে, কখনো বা হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। কখনো বা দুই বাহু তুলে দিচ্ছে ঊর্ধ্বে। হরিবোলের আর হরি নেই, শুধু বলছে বোল-বোল। উত্তাল হয়েছে ভক্তির সুধা-সাগর।

'আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥'

নদীয়ার রাজপথে দিনে কীর্তন তো হচ্ছেই, রাত্রে আবার দরজা এঁটে, শ্রীবাসের বাড়ির ভিতরের উঠোনে। এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি, দেখেনি শহরে-গ্রামে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইতর-ভদ্র সকলে মিলে একসঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করে নাচবে আর চেঁচাবে। শুধু খোল করতাল বাজাচ্ছে না, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিয়েছে। কী কেলেঙ্কার! নগরবাসীদের কারু ঘুমুবার জো নেই, রাত্রির শান্তি চলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে। এর বিহিত কী।

নগরের সঙ্কীর্তন বহির্মুখদের জন্যে, যদি প্রচারে কেউ অন্তর্মুখ হয়ে ওঠে। যদি পাষণ্ডীরা জাগে, যদি ফেরে তাদের মতিগতি। তাদের আর কাজ কী। তাদের কাজই হচ্ছে বিদ্রূপ করা, বিরুদ্ধতা করা, তিরস্কারে অপদস্থ করা। করুক, তবু কেউ যদি আকৃষ্ট হয়, কারু চোখে-কানে যদি অপূর্বের স্পর্শ লাগে।

কিন্তু শ্রীবাস-আঙিনার সঙ্কীর্তন অন্তর্মুখদের জন্যে, যারা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাদের আস্বাদনের জন্যে। প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে বহির্মুখেরা, বিরুদ্ধবাদীরা না উৎপাত করতে পারে। ঠাট্টা-বিদ্রূপে না ব্যাহত করতে পারে তন্ময়তা। তারা তো সম্ভোগের দলে নয় তারা ভণ্ডুলের দলে। সুতরাং এ কথা বলতে পারো না তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বলতে পারো কীর্তনের পবিত্রতাকে নিবিঘ্ন করা হচ্ছে।

'কবাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥'

বহির্মুখের দল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নানা জটলা করে। এগুলোর এ কী বাই হল। এত নাচন-কুঁদন তো কোথাও দেখিনি। তার উপর দরজা বন্ধ কেন? ভিতরে কীর্তনের নামে কী হচ্ছে কে জানে।

নানা রকম কুৎসা রটাতে লাগল শত্রুরা। ভগবানকে ডাকবার জন্যে এত ঘটা-ছটার কী দরকার। তিনি হৃদয়ে আছেন তাঁকে মনে মনে ডাকলেই তো চলে যায়। ওরকম চেঁচালে তিনিই তো সর্বাগ্রে রুষ্ট হবেন।

তিনি রুষ্ট হলে দেশে দেশে বৃষ্টি হবে না, শস্য হবে না, সকলে না খেয়ে মারা যাব। ওঠো, একত্র হও, প্রতিকারের পথ দেখ।

এ সমস্তই নিমাইয়ের কাণ্ড। নিমাই পণ্ডিত আগে ভালো ছিল, গয়া থেকে ফিরে এসে শুরু করেছে পাগলামি। এ নবদ্বীপ, এখানে তোমার ঐ নব্য মত চলবে না। রাজা মুসলমান, এ কথা শুনলে, রক্ষে রাখবে না, ধরে নিয়ে তো যাবেই, শহর-গ্রাম লুঠতরাজ করবে।

অনাচারে নষ্ট হল হিন্দু ধর্ম। চলো যাই কাজীর দরবারে গিয়ে নালিশ করি। রাজা লুটপাট করবে কেন? শরণাগত বিপন্ন প্রজাদের রক্ষে করবে। ধরে নিয়ে যাবে নিমাইকে আর যার ঐ অঙ্গন সেই শ্রীবাসকে।

এত হাঙ্গামার দরকার কী! আমরা নিজেরাই দরজা ভাঙি চলো। মারপিট করে ঘায়েল করি পাগলগুলোকে। শ্রীবাসের ঘর-দোর ভেঙে ফেলে ভাসিয়ে দিই গঙ্গায়।

খোলো, দরজা খোলো।

দরজায় ঘন ঘন করাঘাত করে পাষণ্ডীরা। ভিতরে অন্তর্মুখের দল তা গ্রাহ্যও করে না। উদ্দাম কীর্তন করে। তাদের শব্দে ঢাকা পড়ে বাইরের কোলাহল।

দ্বাররক্ষী গঙ্গাদাস। তার দৃঢ়তা অটুট-অটল। কারু সাধ্য নেই সামান্যতম ছিদ্র করে দরজায়।

প্রতিহত হয়ে ফিরে যায় বিমুখেরা ষড়যন্ত্র করে। কী করে জব্দ করা যায় শ্রীবাসকে।

কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে।

শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।

যুক্তি রাখো। সোজাসুজি কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করো। কাজী যদি কিছু প্রতিকার না করে তখন দেখা যাবে কূটকৌশল।

দল বেঁধে সবাই হাজির হল কাজীর কাছে।

আর্জি কী?

নিমাই পণ্ডিত দল খাড়া করে হিন্দুধর্মের নিপাত করছে। খোল-কর্তাল বাজিয়ে নিশি দিসি বেসুরো চিৎকার করছে। লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ করছে। কাউকে ঘুমুতে দিচ্ছে না।

চেঁচিয়ে বলছে কী? কি বলে চেঁচাচ্ছে?

হরি-হরি বলে। এ ভাবের তাণ্ডব ভজন হিন্দুধর্মে বিধেয় নয়। দেশের ঘোর অকল্যাণ হচ্ছে তাতে। সারা দেশে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ, দেখা দেবে মহামারী। ঈশ্বরের রোষে উচ্ছন্নে যাব সকলে।

আরো নালিশ আছে। বললে দলের আর আর কেউ।

দিনে কীর্তন রাস্তায়, রাত্রে কীর্তন রুদ্ধঘরে। দরজা যখন বন্ধ তখন ভিতরে নিশ্চয়ই পাপের প্রস্রবণ। মদ-মাংস তো আছেই, আছে হয়তো বা প্রাসঙ্গিক আসঙ্গ। আমাদের কি কেউ রাজা নেই? আমরা কি অবিধির দেশে আছি?

কাজী বললে, যাও, শায়েস্তা করছি। কীর্তন বন্ধ করে দিচ্ছি অচিরে।

অভিযোক্তারা ফিরল খুশি হয়ে। রাষ্ট্র করে দিল গৌড়ের বাদশা হোসেন সা নিমাই আর তার পার্ষদদের ধরবার জন্য সৈন্য-পাঠাচ্ছে।

বৈষ্ণবদের কেউ-কেউ ঘাবড়ে বললে, 'ঘরে বসে একাকী কীর্তন করাই ভালো। শয়ে-শয়ে লোক জুটিয়ে লোকের বিরক্তি ঘটিয়ে কীর্তন করার দরকার কি।'

কেউ-কেউ বললে, 'আমাদের কী দায়! ধরতে আসে শ্রীবাসকে বেঁধে নিয়ে যাবে। ওই তো নাচিয়েছে আমাদের।'

কিন্তু বেশির ভাগ বৈষ্ণবই নির্ভয়। আমাদের প্রভু আছেন, আমাদের ভয় কী। 'যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র—সেই সত্য হয়। সে প্রভু থাকিতে কোন অধমেরে ভয়?'

আর নিমাই? নিমাইয়ের কী ভাব? এ কী, গঙ্গাতীরে একা-একা বেড়াচ্ছ কী! রাজার সৈন্য যে ধরতে আসছে।

আসুক। চলে যাব রাজার কাছে। এ তো ভাগ্যের কথা। রাজা সম্মান করলে সকলে সম্মান করবে।

পালাও। সময় থাকতে দেশ ছাড়ো।

সমস্ত দেশই তো রাজার। পালিয়ে যাব কোথায়?

'এত ভয় শুনিঞাও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়॥'

[ক্রমশঃ।

বঙ্গবাসী : কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

১৮৮৫ সাল। এই বৎসরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হ'ল। বঙ্গবাসী এই কংগ্রেসের আদৌ পক্ষপাতী ছিল না। একালের কংগ্রেসীরা অধিকাংশই বিদেশীভাবাপন্ন ছিলেন—সাহেবিয়ানা ও উৎকট অনুকরণ এঁদের মধ্যে প্রবল আকারে দেখা দেয়—ইংরেজের কাছে আবেদন নিবেদনের দ্বারা সামান্য কিছু সুখ-সুবিধা আদায় করাই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' এই কংগ্রেসের কার্যাবলীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিরোধিতা করতে লাগল। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন উঠল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসীতে, ধারাবাহিক প্রকাশিত 'পঞ্চানন্দে' দেশ ও সমাজের নিপুণ চিত্র আঁকতে লাগলেন। সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি এড়াল না। ব্যক্তিগত জীবনের অসঙ্গতি থেকে সমসাময়িক সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনা ও পাঁচুঠাকুরের রূপকাত্মক রচনাগুলিতে প্রকাশ পেতে লাগল। এছাড়া যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'বঙ্গবাসী' হিতৈষিগণও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। এই বিরোধিতার অন্যতম কারণ বঙ্গবাসী হিতৈষিগণের অধিকাংশই সংরক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন। অতিরিক্ত' বিজাতীয় মনোভাব ও অনুকরণকে তাঁরা অসঙ্গতি বলেই মনে করতেন। সেকালে এইরূপ আন্দোলনের কিছুটা প্রয়োজন ছিল না এমন নয়। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এই অসঙ্গতি সেকালের বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যেও নানাপ্রকার মতবৈষম্যের কারণ হয়েছিল। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত একস্থলে লিখেছেন—রাজনারায়ণ বসু "সেকাল ও একাল" বইতে বাঙালীর অনুকরণপ্রিয়তার নিন্দা করেছিলেন। তারই সমালোচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'অনুকরণ' প্রবন্ধটি (১২৮১)। এতে তিনি অনুকরণকে প্রয়োজনীয়.বলে স্বীকার করেছিলেন।

অবনত জাতিকে উন্নততর সভ্যতার অনুকরণ করতেই হয়। তা না হলে উন্নতির সম্ভাবনা নেই. বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনায় হীন, অতএব অনুকরণই সেই যুগের স্বাভাবিক ও আশাপ্রদ লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতবাদ রচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন।[১৮] হিন্দুধর্মের সমর্থক এই বঙ্কিমের সংগে বঙ্গবাসীর হিন্দুনেতাদের পার্থক্য ছিল আমূল। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মচর্চা করেছিলেন—সে ধর্মের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষ। বঙ্গবাসীর ধর্মচর্চার লক্ষ্য নিছক ধর্ম। বঙ্গবাসীর অন্যতম নায়ক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সাধনার কথা বলতে গিয়ে ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন—ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে ভারতে রাজনৈতিক ও বাংলার সামাজিক জীবনে যে অসঙ্গতি অসামঞ্জস্যের প্রচুর সমাবেশ হইয়াছিল, পঞ্চানন্দের কোন দৃষ্টি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বাদ দেয় নাই। ইংরেজ শাসনের বিচার বিভ্রাট ও অসাধুতা—সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ও ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন, দেশহিতৈষিতার বাহ্যাড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা, সামাজিক দুর্নীতি ও ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ, ব্রাহ্মধর্মের শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ ও কেশব সেনের সর্বধর্ম সমন্বয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বিধবা বিবাহ ও নারী-প্রগতির প্রভাবে সমাজধর্মের বিপর্যয়—এ সমস্ত বিষয়ই পঞ্চানন্দের পরিহাস প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইয়াছিল। যেখানেই মেকী ও ভণ্ডামী সাধু উদ্দেশ্যের মুখোস পরিয়া ও আত্মপ্রসাদস্ফীত হইয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে রাজকর দাবী করিয়াছে, সেখানেই পঞ্চানন্দ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাস্ত্রে তাহার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার কৃত্রিম গৌরবস্ফীতির বুদ্‌বুদ নিষ্কাশন করিয়া, তাহাকে পদমর্যাদার উচ্চ রাজসিংহাসন হইতে উপহাস্যতার ধূলিশয্যায় পাতিত করিয়াছেন।[১১] এইগুলিই সমগ্র বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য আদর্শের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গবাসীর এই ছিল ধ্রুবপদ। সে যা হোক, বঙ্গবাসী কংগ্রেসের সমর্থন না করলেও এবং সেযুগের অতিরিক্ত বিজাতীয়তা ও অনুকরণকে মনে-প্রাণে সমর্থন করতে না পারলেও বঙ্গবাসী তদানীন্তন শাসননীতির নির্ভীক সমালোচনা করতে ক্ষান্ত হয়নি। বঙ্গবাসী এই সময় উগ্র স্বাদেশিকদের সমর্থন করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নায়ক' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন—এই যে ন্যাশালিজমের কথাটা এখন মুখে মুখে শুনিতে পাই, ইহার মূলতত্ত্ব বঙ্গবাসীই প্রথমে প্রকাশ করেন। আমাদের ধর্ম আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—অনন্ত অজ্ঞাত কাল হইতে, ঋষি মুনির সময় হইতে যে ভাবের ধারা, আচারনিষ্ঠার ধারা এদেশে প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমাদের পৈতামহ সামগ্রী। একথা ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীকে প্রথমে বঙ্গবাসীই শিখাইয়াছিলেন। সে শিক্ষার মূলে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সমাজতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আজ সেই মনীষিবর্গের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন।[২০] তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের ঐ জাতীয়তাবাদ—হিন্দুজাতীয়তাবাদ ঐতিহ্যপ্রীতির দ্বারা খণ্ডিত। রাজনীতি ও জাতীয় আন্দোলনেও কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসী নির্মোহ হতে পারে নি। সেখানেও সেই অতীত মোহ—যুক্তি অপেক্ষা ভক্তি—বিচার অপেক্ষা বিশ্বাসই বড় ছিল। যুক্তি ও বিচারের প্রবণতা নিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখাই ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই আসল রেনেসাঁস যুগের দৃষ্টিভঙ্গী—স্বাধীন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। তদানীন্তন জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গবাসীর মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১৮। বঙ্কিমমনীষা—সমকালীন (আশ্বিন ১৩৬৬)।

১১। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(সমালোচনা সাহিত্য)।

২০। নায়ক—২রা ফাল্গুন—১৩১৭।

বঙ্গবাসী বহু পূর্বেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিবৈরের ভাবটি প্রসারিত করার চেষ্টা করে আসছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী এই ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হোল। প্রকাশ্যে সরকার-বিরোধী নানাপ্রকার রচনা বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে লাগল। ১২৯৭-৯৮ সালের দিকে ইংরেজী ১৮৯১ সালে বঙ্গবাসীতে এইরূপ অসংখ্য সরকারবিরোধী রচনা মুদ্রিত হ'ল। কৃষ্ণচন্দ্র-লিখিত কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ ইংরেজ শাসকদের নজরে আসে। ইহার ফলে বঙ্গবাসী রাজরোষের কবলে পড়ে। এই সময় স্যার চার্লস ইলিয়ট বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন। ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ করে ইলিয়ট বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ দায়ের করিতে হুকুম দেন। ফলে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রিণ্টার-প্রকাশকের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। বঙ্গবাসীই রাজরোষে অভিযুক্ত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অভিযুক্ত সম্পাদক। প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এক স্থলে লিখেছেন—

The first 'attempt to prosecute a newspaper on a charge of sedition was the case instituted against the Bangabasi, (Calcutta) in 1891, when the officiating standing Counsel applied for warrants against the Proprietor, the Editor, the Manager and the Printer and the Publisher of the paper under section 124A and 500 of the Indian Penal Code. The Jury brought in a divided verdict and the Chief-Justice ordered the case to remain as remanet at the next session Court-Board. In the mean time the accused were prevailed upon to tender an apology and the case was withdrawn.[২১]

বঙ্গবাসীর উপর ঐ রাজরোষ সেকালের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। তখন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নয়—একেবারে হাইকোর্টের দায়রায় জুরি সমন্বিত জজের এজলাসে রাজদ্রোহীর বিচার হত। চীফ জাষ্টিস স্যার পেথারণ বিচারে বসেছিলেন। রাজদ্রোহ কি গুরুতর অপরাধ তা বোঝাবার জন্য বিজ্ঞ বিচারপতি আইনের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন এখনও তা নজীর হয়ে আছে। আসামীদের পক্ষে তখনকার শ্রেষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টার স্বনামখ্যাত জ্যাকসন সাহেব যে বক্তৃতা দান করেন তাও উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের 'বঙ্গবাসী' এই ঘটনার পর অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগের ফলে কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ চারিজন কর্ণধারের কারাবাস হয়। এই কারাবাসের অভিজ্ঞতা সরস ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে যোগেন্দ্রচন্দ্র লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। প্রকাশিত কোন্ কোন্ নিবন্ধের জন্য বঙ্গবাসী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছিল উক্ত কাহিনীতে তারও উল্লেখ আছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন—আমাকে অর্থাৎ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক বলিয়া, শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া এবং শ্রীযুক্ত অরুণোদয়কে প্রিণ্টার ও প্রকাশক বলিয়া, স্বয়ং ইংরেজ রাজ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে এবং উক্ত আইনের ৫০০ ধারা অনুসারে আমাদের চারিজনের উপর অভিযোগ আনয়ন করেন। এই অভিযোগের মর্ম বড়ই গুরুতর। অর্থাৎ বঙ্গবাসীর লেখার দ্বারা গভর্ণমেন্টের প্রতি লোকের অভক্তির উদ্রেক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক কথায় রাজবিদ্রোহ সূচনা হইতেছে। এই অপরাধের দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

১৫ই চৈত্রের বঙ্গবাসীতে, 'আমাদের অবস্থা', ৩রা জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসীতে, 'ইংরেজ রাজত্বের প্রকটমূর্তি', 'অসভ্য হিন্দুর প্রথম ও প্রধান ধারণা', ২৪শে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গবাসীতে 'পরিণাম কি' 'অসভ্যের পক্ষে 'অকপট নীতিই ভাল' এই পাঁচ প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের নামে ঐ অভিযোগ উপস্থিত হয়।

সে যাহাই হউক, ২৩শে শ্রাবণের শুক্রবারে গভর্ণমেন্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পিউ সাহেব, ব্যারিষ্টার ডন সাহেব এবং পুলিশ আদালতের সহকারী উকিল কাউই সাহেব এই তিনজন একত্রে মিলিত হইয়া বেলা ১১টার সময় আমাদের নামে পুলিশ আদালতের প্রধান ম্যাজিষ্টর মিঃ হাওলী সাহেবের নিকট উক্তরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন। অমনি আমাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়া না বাহির হইল।[২২] যোগেন্দ্রচন্দ্রের এই ধারাবাহিক রচনা জন্মভূমিতে আশ্বিন (১২৯৮) হতে ফাল্গুন (১২৯৮) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের যে চিত্র অঙ্কিত আছে তা রুচি ও শুচিবায়ুগ্রস্ত রক্ষণশীল হিন্দুব্রাহ্মণের চরিত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের কালে বঙ্গবাসীর কত সংখ্যা মুদ্রিত হত যোগেন্দ্রচন্দ্রের ঐ রচনা হতে তা জানা যায়। জেল-নায়েব ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গবাসী ২০ হাজার করে ছাপা হত এবং তার ১৪ হাজার কাগজ মফঃস্বলে যেত। এক স্থলের কথোপকথন এইরূপ—

জেলনায়েব—আপনাদের প্রতি সপ্তাহেই কি বিশ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপিতে হয়?

কৃষ্ণ বাবু—কখনও কম কখনও বেশী। যেবার ভারতেশ্বরীর পৌত্র এলবার্ট ভিক্টর কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেবার প্রায় ২৫ হাজার বঙ্গবাসী ছাপিতে হইয়াছিল। সহবাস সম্মতি বিষয়ক আইনের যখন আন্দোলন হয়, তখন প্রতি সপ্তাহেই ২৩।২৪ হাজার করিয়া বঙ্গবাসী ছাপা হইত। সাধারণত ১৯।২০।২১ হাজার, কখনও বা ১৮ হাজার বঙ্গবাসী প্রতি সপ্তাহে ছাপা হইয়া থাকে।

—আমাদের হাজত

এ সম্বন্ধে সরকারী অভিযোগপত্রে দেখা যায়—The Bengali weekly Journal Bangabasi is reported to have a circulation of about 30,000 copies and is printed in Bengali.

বঙ্গবাসীর মামলায় যে সমস্ত আইনজ্ঞ বঙ্গবাসীকে সমর্থন

২১। The Newspaper in India (c. u.) 1952—P. 59.

২২। আমাদের হাজত—জন্মভূমি (আশ্বিন ১২৯৮)।

করেছিল তাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার মিঃ হিল, মিঃ লালমোহন ঘোষ, এটর্ণি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, এটর্ণি শ্রীযুক্ত কালিনাথ মিত্র এবং উকিল শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসীর প্রতি ইংরেজ সরকারের রুদ্রক্ষেপের কারণ তাদের অভিযোগপত্রেই দেখা যায় for sedition and defamation by having published certain articles in the issue of that paper of the 20th March. 16th May and 6th June, in which certain statements are made against the Government and there by attempting to excite popular feeling and discontent and disaffection towards the Government among the people বঙ্গবাসী ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা এই রাজ অভিযোগ হতে মুক্তিলাভ করে। The State prosecution of Bangabasi Newspaper, The Queen Empress versus Jogendra Chandra Bose and others এই মামলা সেকালের বাংলা দেশের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মামলার পূর্ণ বিবরণ তৎকালেই একটি গ্রন্থে ২৩ সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের ১৬৫—২৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত মামলার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি রাজসমীপে ক্ষমা প্রার্থনামূলক যে আবেদন জানিয়েছিলেন তাহা 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও 'নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনে'র দ্বারা সমর্থিত হয়। ১৮৯১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী স্যার জন এডগার কে সি, আই-ই, সি, এস, আই ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তার খানিকটা উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে—

In continuation of my letter No 33757 dated 28th of August last I am directed to forward copy of petition to the Lieutenant Governor of Bengal from J. C. Bose. K. C. Banerjee, B. Banerjee and A. Ray respectively Proprietor, Editor, Manager and Printer of the Bengali Newspaper Bangabasi, in which they express their deep and heartfelt sorrow for having allowed the articles which were the subject of the recent Prosecution, to appear in the column of the Bangabasi, and throw themselves unreservedly on the mercy of the Lieutenant Governor, In a seperate communication they undertake to publish this petition in the Bangabasi Newspaper when required by the Government.

I am also directed to forward a copy of a letter from the President of a newly formed native Press Association, in which the members, who are the Proprietor and Editors of merely all important native Newspapers published in Bengal, express their regret at the use of the language of the articles, but support the Prayer of the Petitioners which is also supported by the British Indian Association in a letter, copy of which is also submitted in which they express their strong condemnation of the language and the tone of the incriminated articles.২৪ এই সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী। আর নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনের অন্যতম সভ্য ছিলেন বঙ্গবাসী সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎকালের বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রপত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকগণকে নিয়ে এই নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান হেরাল্ড, ইউনিটি এ্যাণ্ড মিনিষ্টার, হোপ, ন্যাশানাল পেপার, ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, বঙ্গবাসী, দৈনিক সঞ্জীবনী, সাম্য, সোমপ্রকাশ, সংবাদ-প্রভাকর, হিতবাদী, সহচর, বেদব্যাস, ভারতমিত্র, হিন্দী বঙ্গবাসী, বিশেষ করে এই সমস্ত পত্রপত্রিকাগুলির সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারিগণকে নিয়ে নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশন তৈরী হয়। বঙ্গবাসীর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আবেদন ও তৎসহ ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ও নেটিভ প্রেস এসোসিয়েশনের আবেদন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মঞ্জুর হয় এবং হাইকোর্ট হতে এই মামলা তুলে নেওয়ার আদেশ দেয়। C. E. Buckland ও Prosecution of the Bangabasi সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের ৯১৬-৯১৯ পৃষ্ঠার মধ্যে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন, তিনি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—The Proprietor, Editor, Manager and Publisher of the Bangabasi then presented a petition to the Lieutenant Governor in which they expressed contrition for having allowed the articles which formed the subject of the prosecution to appear in that paper, promised henceforth to conduct it in a spirit of loyalty to Her Majesty the Queen Empress and the Government of India and throw themselves unreservedly on the mercy of the Lieutenant Governor. Representation were also made by the British Indian Association and by the native Press Association a body which was formed after the proceedings against the Bangabasi had been instituted. with the object, among others, of improving the tone of the native Press and preserving moderation in discussions of all public questions...২৫ সমসাময়িক অজ্ঞাত সংবাদ ও তথ্যে

২৩। Celebrated Trials is India (1902) vol I Compiled by J. Ghosal

২৪। Do Page—228

২৫। Bengal under Lieutenant Governor—Vol II P. 919.

প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গবাসী সে যাত্রা ক্ষমা প্রার্থনা করায় রাজদ্রোহ হতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

বঙ্গবাসী, রাজদ্রোহ হতে মুক্তি লাভ করল। এর পরেও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গবাসী আরও ৩ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত চলেছিল। ১৮৯৫ সালের দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হয়ে এলেন এবং ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজারীর পদ ত্যাগ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ম্যানেজারীর ভার গ্রহণ করেন। বিংশ শতকের প্রত্যুষলগ্ন পর্য্যন্ত তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসী সম্পাদনা কালে এদেশে যে সমস্ত ভাবতরঙ্গ ও আন্দোলনের অগ্নিবাণী বাঙালীর চিত্ত শিখাকে উজ্জ্বলতর করেছিল এবং বঙ্গবাসী কোন মুক্তিমন্ত্রে ঐ ভাবতরঙ্গের সম্মুখীন হয়েছিল তা যতদূর সম্ভব এখানকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। নবযুগের চিন্তার সংগে বঙ্গবাসীর ধ্যান-ধারণার অনেক পার্থক্য ছিল। সেকালের ভিন্নমুখী চিন্তাধারার জন্যই বাংলার নবচেতনা খানিকটা হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। বঙ্গবাসীর ধর্ম আন্দোলন পশ্চাৎমুখী ঐতিহ্য-প্রীতির নববাতায়ন-পথ উন্মুক্ত করে দেয়। গোঁড়ামির পোষকতায় শশধর তর্কচূড়ামণির শিখাধ্বজদের ইংরেজী বিদ্যা মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐরূপ পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও শক্তির প্রয়োজন। বঙ্গবাসী, যদি পুরাতন ধর্মঐতিহ্যে দেশকে জাগরিত করার বিন্দুমাত্র প্রেরণা যুগিয়ে থাকে—সেজন্য সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র অবশ্য স্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মজীবনের আরও দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। ১৮৯০ সালে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হতে হিন্দী বঙ্গবাসী প্রকাশিত হয়। এই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নামই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কেহ কেহ এই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দী বঙ্গবাসী (১৮৯০) বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আন্দোলন পড়ে গেল। সরস্বতীর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর মত জনপ্রিয় আর কোন পত্রিকা হয়নি। এর বৃহদায়তন, অল্পমূল্য, চমৎকার ছাপাছবি ও বিষয়বস্তু, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে উপহার বিতরণ, বঙ্গবাসীকে হিন্দীর পাঠক-পাঠিকার এত প্রিয় করে তুললে যে হিন্দীতে 'বঙ্গবাসী' শব্দ সংবাদপত্রের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেল। উঠে গেল হিন্দীর একাধিক পত্রিকা, যে কয়েকটি খাড়া রইল তাদেরও মাজা গেল ভেঙ্গে (কমর টুটগই)। এর একমাত্র দোষ ছিল বাংলাঘেঁষা ভাষা। সে ভাষা-দোষও বিদূরিত হল বালমুকুন্দ গুপ্তের কল্যাণে। তিনি হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন। হিন্দী লেখক অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী, বালমুকুন্দ গুপ্ত, প্রভুদয়াল পাণ্ডে, হিন্দীতে ত্রয়ী নামে পরিচিত। এই ত্রয়ীর পরিচালনায় 'বঙ্গবাসী' উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করল। ২৬ ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় শর্মা সম্পাদিত 'হিন্দী কি পত্র পত্রিকাএঁ' গ্রন্থ হতে পাদটীকায় খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন—উপরের উদ্ধৃত বাংলা অংশটুকু ঐ হিন্দী উদ্ধৃতির হুবহু অনুবাদ মাত্র। উক্ত হিন্দী গ্রন্থখানিই তাঁর তথ্যের একমাত্র অবলম্বন।

সে যা হোক, ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ঐ অংশটুকু পাঠ করলে কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে সন্দেহের অবসান হয় না। বালমুকুন্দ গুপ্ত সম্পাদক হয়ে আসার পূর্বে হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদক কে ছিলেন—ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তা উল্লেখ করেননি। বরং তাঁর লেখা পাঠ করতে গেলে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্রই 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র সম্পাদক ও প্রকাশক। এ সম্বন্ধে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর এক ব্যক্তিগত পত্রে আমার সন্দেহ নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন 'কাগজের মালিকানা (স্বামিত্ব) কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর, সম্পাদনা ত বলিনি।' ২৭ বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় তা হতে প্রতীয়মান হয়, যোগেন্দ্রচন্দ্রই সমগ্র বঙ্গবাসী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদক হিসাবেই খ্যাত। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর, 'বিয়োগব্যাখ্যা' শীর্ষক যে সম্পাদকীয় নিবন্ধ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার এক স্থলে দেখা যায়—'বঙ্গবাসীর সম্পাদনার সঙ্গে তাঁহার স্বত্বাধিকার ঘটিয়াছিল। শেষে সে স্বত্বাধিকার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।' ২৮ এখন দেখা দরকার—১৮৯০ সালে কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর অন্যতম মালিক ছিলেন কিনা। কৃষ্ণচন্দ্রকে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বলবার পূর্বে এই বিষয়টি যুক্তি সহকারে দেখা প্রয়োজন। সম্প্রতি সুসাহিত্যিক 'বনফুল' ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে একটি বিবৃতিতে বলেছেন—'কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাহির করেন 'হিন্দী বঙ্গবাসী.' পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল।' ২৯ কৃষ্ণচন্দ্র যে হিন্দী বঙ্গবাসীর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি হিন্দী বঙ্গবাসীর সম্পাদক বা মালিক ছিলেন কি না—তা আরও যুক্তি সহকারে বিচারের অপেক্ষা রাখে। [ক্রমশঃ।

২৬। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান। পৃঃ ২৮-২৯

২৭। বর্তমান লেখককে লিখিত ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের ১৪।৪।৫৯ তারিখের পত্র।

২৮। বঙ্গবাসী, ৬ই ফাল্গুন—১৩১৭।

২৯। হেলায় লঙ্কা করিল জয়—যুগান্তর, ১৫ই চৈত্র ১৩৬৫।

...এ মাসের প্রচ্ছদপট...

এ মাসের প্রচ্ছদে মৃত্তিকায় নির্মিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিমূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশ করা হইল। মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন শ্রীমহেন্দ্র পাল এবং

শিলালিপি

—দিলীপ চাকলাদার

পথ বেঁধে দিল
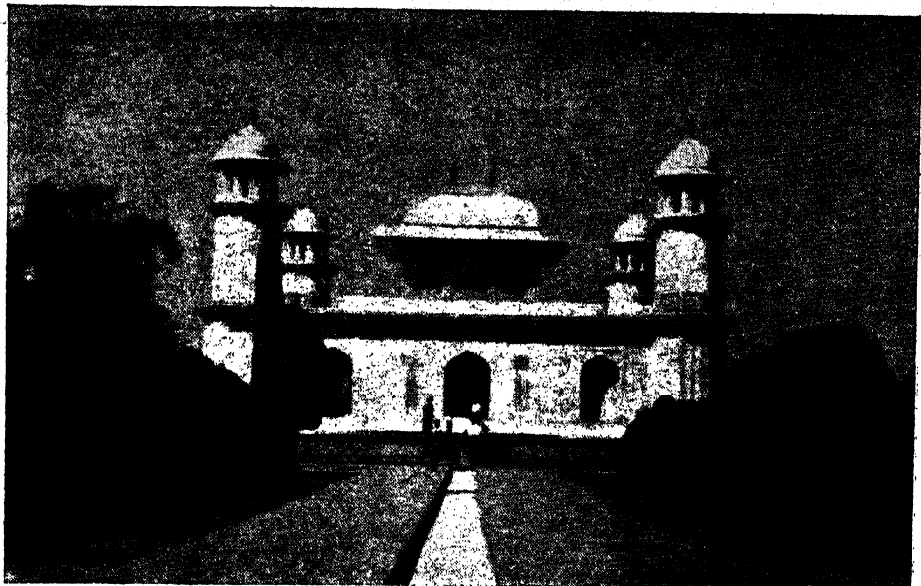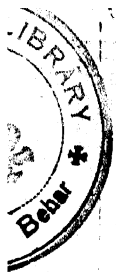
সবার চেনা তুমি —শিবদাস হাজরা

খণ্ডগিরি দর্শন —রঞ্জিৎ বল
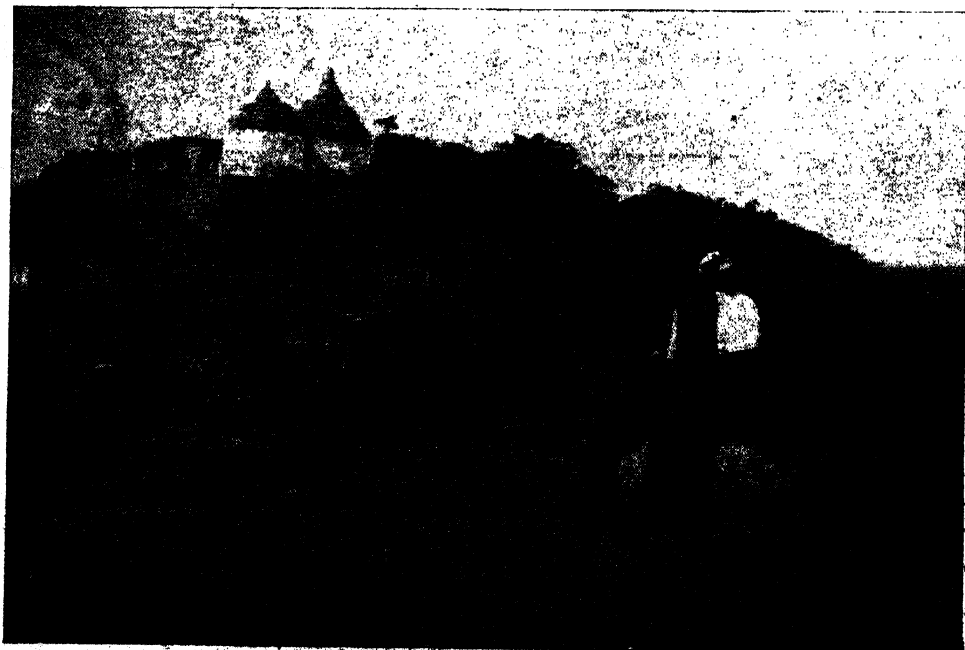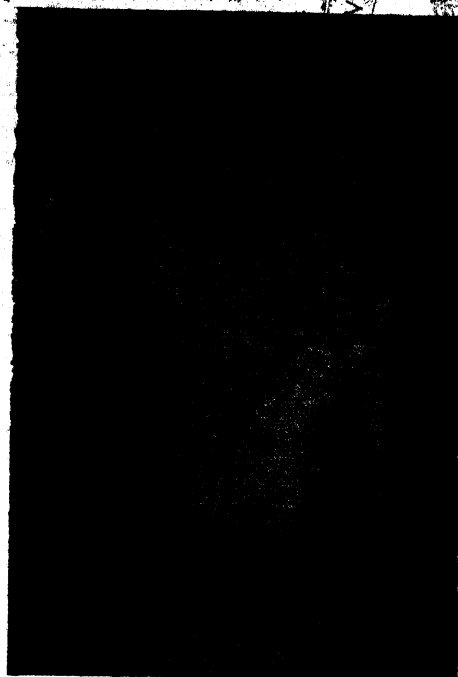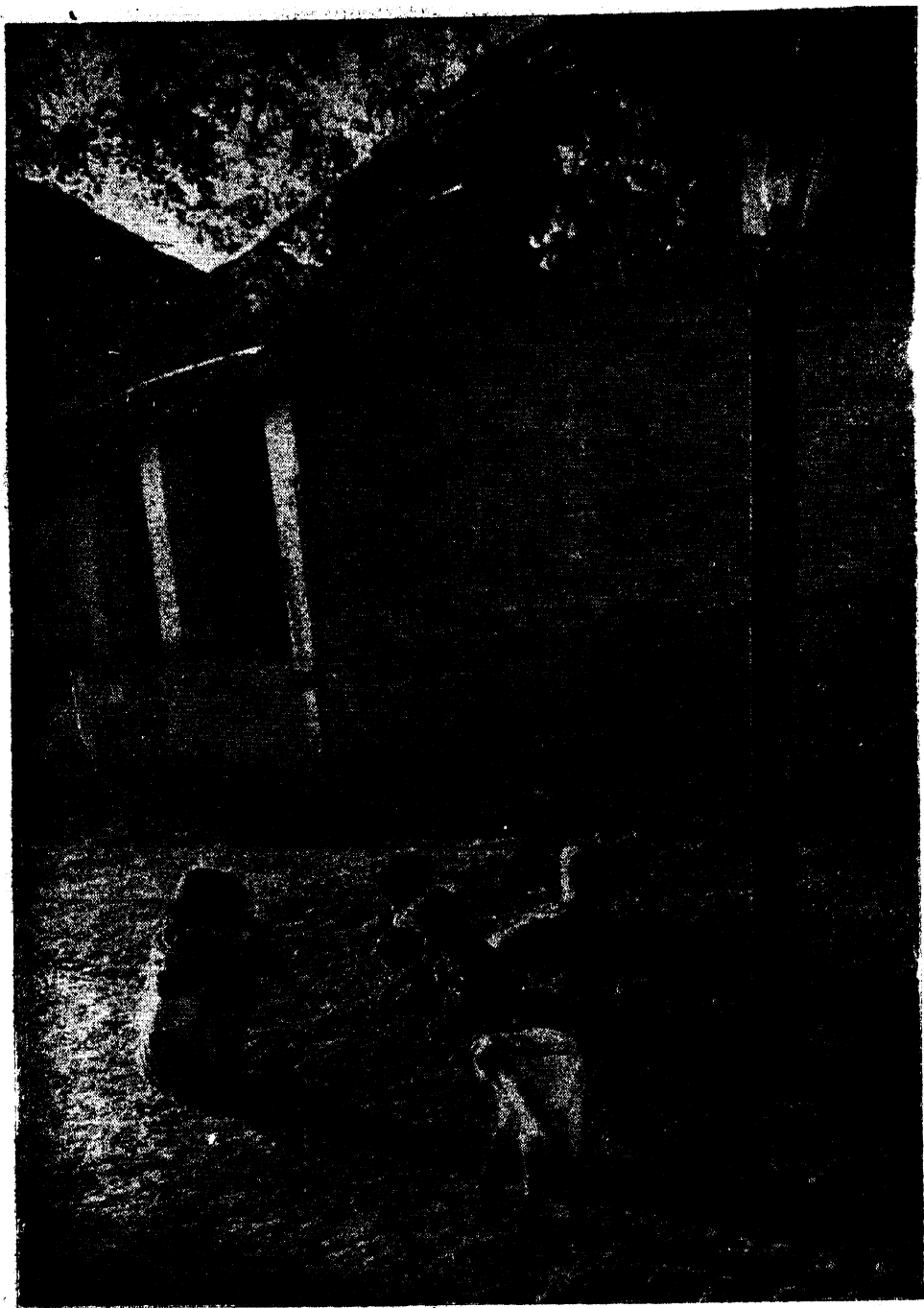
কামাক্ষ্যা-মন্দির

—ডি. সি. বণিক

নববধূ

—সুশীল মিত্র

আলু-কাবলিওলা

—নিমাইরঞ্জন গুপ্ত

পথের শেষে —আশুতোষ সিংহ

অনুরূপা দেবী স্মরণে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সন ১৩৫০-এর শ্রাবণ মাস।

দুর্ভিক্ষের হাহাকারে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত, টাকা দিয়েও খাদ্য মেলে না। ঘরের টাকা বের করে কালো-বাজারীদের পেছনে চোরের মত ঘুরে পাঁচ টাকার জিনিষ পঞ্চাশ টাকায় কিনতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও,—বলে মর্মান্তিক চীৎকারে কেঁদে বেড়াচ্ছে অগণিত নরনারী মহানগরীর পথে পথে।

এমনি দিনে পূর্বকালের জনৈক জমিদারের একমাত্র কন্যার বিবাহ। মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাসাদোপম বাড়ী ভাড়া করে রচিত হয়েছে বিবাহ-মণ্ডপ···বিবাহের ব্যয় বরাদ্দ চল্লিশ হাজার টাকা।

দান সামগ্রী যৌতুকাদি দিয়ে বিবাহ মণ্ডপ এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যেন কোন প্রদর্শনীতে ষ্টল খোলা হয়েছে। হীরে জহরতের অলংকার থেকে সুরু করে পিতল কাঁসার বাসন কোনটারই প্রাচুর্য কম নেই।

এই উৎসবে যোগদান করবার জন্য এলেন বাংলার সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী। গাড়ী থেকে নেমে যখন তিনি বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তখন বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারলেন না। সংগীটিকে বল্লেন: এ যে দেখছি, রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব।

অনুরূপা দেবীর মন প্রাণ এমন বেদনায় ভরে উঠলো যে, তিনি ভাল করে কিছুই খেলেন না কিংবা প্রাণখুলে কারো সাথে আলাপ করতে পারলেন না।

ফিরবার পথে সংগীটিকে বল্লেন: এই দুর্দিনে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে এগিয়ে চলেছে তিলে তিলে মৃত্যুর করাল গ্রাসে, সেই সময়ে এমন বিলাসিতা, ঐশ্বর্যের এত আড়ম্বর সত্যি আমার মনকে বড্ড পীড়িত করে তুলেছে। অবশ্য জমিদার বাবুর একই মেয়ে এবং দেবার সামর্থ্যও তাঁর আছে, কাজেই তিনি তো দেবেনই। এর সংগে একটা দরিদ্র ভোজনের আইটেম থাকলে এ উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হতো। বুঝলে বাবা, জমিদারদের এ বিলাসিতার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবিগুরুর 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটি একবার মনে করে দেখো, আমার মনে হয়, এর অভিশাপ একদিন সত্য হবে।

অভিশাপ সত্যি লেগেছে। কবিগুরুর ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে—

> 'বিধাতার রুদ্র রোষে
> দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
> ভাগ করে খেতে হবে সাথে অন্নপান।'

অনুরূপা দেবী যদিও সম্পন্ন এবং বনেদী ঘরের মেয়ে ছিলেন কিন্তু সমাজের অবজ্ঞাত নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁহার অসামান্য সহানুভূতির পরিচয় আমরা আরো একবার পেয়েছিলাম।

এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে একটি সাহিত্য সভায় যোগ দেবার জন্য অনুরূপা দেবী আমাদের সাজাদপুরে গিয়েছিলেন। ট্রেন থেকে নেমে আট মাইল পথ যেতে হতো পাল্কীতে। পাল্কী থেকে নেমেই আমাদের কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বল্লাম: আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

: হ্যাঁ একটু ক্লান্তই হয়েছি বাবা, তবে পথ শ্রমে ততটা নয়, যতটা তোমাদের এই পাল্কীবাহকদের কথা ভেবে।

আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালুম তাঁর দিকে। অনুরূপা দেবী বল্লেন; দেখো, না খেয়ে খেয়ে এই বাগ্‌দীগুলোর কি হাল হয়েছে। আমাকে নিয়ে আসতে যেন এদের কত কষ্ট হল। অথচ বাগ্‌দীরাই ছিল এক দিন বাংলার রক্ষক। বাংলার শাসন কর্তাদের বাগ্‌দী লেঠেল বিদেশের ভয়ের বস্তু ছিল। বাগ্‌দী ডাকাতের নামে সমস্ত দেশ একদিন থর থর করে কাঁপতো। আজ পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, ভাবলে বড় কষ্ট হয়।

আমার একটি কবিতা পড়ে অনুরূপা দেবী বল্লেন: এবারকার দুর্ভিক্ষের রূপ তুমি দেখেছো নরেশ, তাই লিখতে পেরেছো অমন কবিতা। কত লোক মরেছে অনাহারে আর কত লোক লাখ লাখ টাকা করেছে কালো বাজারীতে। একটু ফ্যানের জন্য কত লোক যে আসতো তার ইয়ত্তা নেই। পরাধীন দেশে বাস করে, এমনি বিড়াল কুকুরের মতই মরতে হবে আমাদের··তবু ইংরেজের মতে এটা দুর্ভিক্ষ নয়।

আমি বল্লাম: ইংরেজই তো এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, কাজেই স্বীকার করায়—না করায় কিই বা এসে যায়।

এবার বললেন সাহিত্য সম্রাজ্ঞী: অথচ মজা দেখো, এই যে লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে দিনরাত্রি যাপন করেও হয়তো কিছুই পাচ্ছে না। মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অথচ একটি দোকান লুটের সংবাদও তো শোনা যাচ্ছে না। এমন নিষ্ক্রিয় ভাবে কোন দেশের লোক মরেছে শুনেছ? আরে বাবা মরতে যখন হবেই তবে একটা মরণ কামড় দেবো না কেন?··বলতে বলতে তাঁর স্বর উত্তেজনায় ভরে উঠলো।

খানিক নীরব থেকে বললেন: তোমরা সাহিত্য-সভা কর আর যাই কর, এই সব অজ্ঞ, অসহায় পল্লীবাসীদের নিরক্ষরতা দূর করবার ব্যবস্থা কর, এদের প্রাণে জাগিয়ে তোল সৎ সাহসের আলোক। নৈশ বিদ্যালয় করে দেশের অজ্ঞ, চাষাভুষো মজুর শ্রেণীর ভেতর নিরক্ষরতা দূরী করণের অভিযান চালাও। অন্ধজনে দাও আলো, মৃত জনে দাও প্রাণ।

আমরা মাতৃসমা এই মহীয়সী মহিলার আদেশ শিরোধার্য করে কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে কর্মীদের মধ্যে কে কোথায় ছিটকে পড়লো। নিজেরাই হলাম সর্বহারা উদ্বাস্তু।

আজ এতদিন পরে সাহিত্যসম্রাজ্ঞীর কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে সাহিত্য-ই শুধু তাঁর সাধনার বস্তু ছিল না, সমাজের নির্যাতিত অবহেলিত অসহায় নরনারীর সর্বাংগীণ কল্যাণ প্রচেষ্টাও ছিল তাঁর সাধনার প্রধান অঙ্গ। তাই বাংলা সাহিত্য হারিয়েছে সম্রাজ্ঞী আর দরিদ্র অসহায় নরনারী হারিয়েছে তাদের দরদী জননী।

আইভান তুর্গেনিভ

খুশীতে উজ্জ্বল মধুর
আনন্দময় দিন ও বছর—
বসন্তে এক পশলা বৃষ্টির মত
হায়, কবেই হয়েছে গত।

পুরানো গান

রাত একটার পর তিনি পড়ার ঘরে ঢুকলেন। চাকর এসেছিলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিতে, তাকে চলে যেতে বললেন, দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে চিম্নীর কাছে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তার মনে হচ্ছিলো জীবনে কখনো এর আগে মানসিক বা শারীরিক এত ক্লান্তি তিনি বোধ করেন নি। সারা সন্ধ্যে তার কেটেছে শিক্ষিত, সুসভ্য, মধুর স্বভাবের নরনারীর সঙ্গে। মেয়েদের অধিকাংশই ছিলেন সুন্দরী, ছেলেদের প্রায় সবাই ছিলেন প্রতিভাবান বা বিদ্বান। কথাবার্তা তিনিই প্রায় চালাচ্ছিলেন, সকলেই খুসী হয়েছিলো। তবু তার মনে হলো, তিনি ক্লান্ত—প্রাচীন যুগের রোমানরা যাকে বলতো জীবনের গ্লানি, জীবনের প্রতি ঘৃণা তার মনকে এর আগে কখনও এত বিষিয়ে তুলতে পারেনি। যদি তার বয়স অল্প হতো, তাহলে তিনি হয়ত দুঃখে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন, তাঁর অন্তর তখন তিক্ততায় ভরে গিয়েছিলো, তাঁকে যেন চারদিক থেকে দুঃখ ও ক্ষোভ ঘিরে ধরছিলো। এই তিক্ততা, এই ঘৃণার হাত থেকে কি করে তিনি মুক্তি পাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঘুম তার আজ আসবে এমন আশা আর ছিলো না।

অলস তিক্ত চিন্তায় তার মন ভরে গেলো। সকল বয়সের মানুষের কথা তিনি ভেবে দেখছিলেন। সম্প্রতি তিনি বাহান্ন বছর অতিক্রম করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি মানব-চরিত্রে অহঙ্কার, অসারতা ও নিরর্থকতা ছাড়া কিছু দেখতে পেলেন না। সর্বত্র সর্বকালে সেই অর্থহীন ব্যস্ততা, শক্তির অপব্যয়, আত্মপ্রতারণার লুকোচুরি খেলা কোনোরকমে ভুলে থাকার চেষ্টা। তারপর অকস্মাৎ একদিন বার্দ্ধক্য এসে দেখা দেয়, সব কিছুর অন্তরালে থাকে মৃত্যু-ভয় তারপর? তারপর সব কিছুর ঘটে অবসান। তবু ভালো যদি এই হয় শেষের ইতিহাস। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে দেখা দেয় দুর্বলতা ও যন্ত্রণা, ইস্পাতে মরচে পড়ার মত। জীবন-সমুদ্র তার কাছে কবিবর্ণিত চঞ্চল ঢেউ-এর রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। তার শান্ত ও স্বচ্ছরূপই তার চোখে ধরা পড়েছে। তিনি যেন মোচার মত ছোট একটি নৌকোয় বসে আছেন ও সমুদ্রের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে দানবরূপী দুঃখ জীবনকে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে রোগ, দুর্ভাগ্য, মত্ততা, দারিদ্র্য, অন্ধত্বরূপে। তিনি আরো গভীরভাবে চেয়ে দেখলেন —সব দুঃখ-কষ্টকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করছে এক দানব—ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ঘৃণ্য চেহারা। আর এক মুহূর্ত, এবারে নৌকো দিলো বুঝি ডুবিয়ে। না, আবার তলিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর তো ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় একদিন আসবে এখন নৌকোটা উল্টে দিতে ওর দেরী হবে না।

তিনি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন। সারা ঘরে দু'বার পায়চারি করলেন। টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ারে হাতড়াতে লাগলেন কাগজপত্র ও পুরানো চিঠির তাড়া, অধিকাংশ চিঠিই মেয়েদের লেখা। কি যে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তা তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো না। শুধু যন্ত্রণাদায়ক এই চিন্তাগুলোর হাত থেকে মুক্তি চাইছিলেন তিনি। এদিক ওদিক কতকগুলো চিঠি দেখে তিনি শুধু কাঁধ ঝাকুনি দিলেন, চিমনির আগুনের দিকে চাইলেন, একপাশে রেখে দিলেন, এসব অসার আবর্জনাগুলো পুড়িয়ে দেবেন এই কথাই হয়ত তাঁর মনে উদয় হয়েছিলো। এগুলোর মধ্যে ছিলো একটি শুকনো ফুল, এক বিবর্ণ ফিতে দিয়ে বাঁধা। এক ড্রয়ার থেকে অন্য ড্রয়ার হাতড়াতে লাগলেন, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখতে পেলেন একটা সেকেলে ধরণের আটকানো বাক্স। তার ঢাকনিটা আস্তে আস্তে খুললেন। হলদে হয়ে যাওয়া তুলোর নীচে দেখতে পেলেন গার্নেট পাথরে তৈরী ছোট একটি ক্রস।

নির্বাক-বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন ক্রশটির দিকে, মৃদু আর্তনাদ করে উঠলেন। আনন্দ বিষাদের ঢেউ খেলে গেলো তাঁর চেহারায়। মনে হলো তিনি যেন বহুদিন হারিয়ে যাওয়া এক প্রিয়জনের দেখা পেয়েছেন, যাকে তিনি ভালোবাসতেন বহু বহু দিন পূর্বে। সে যেন আগেকার রূপ নিয়ে দেখা দিলো—তবু অনেক বছরের ছাপ রয়েছে তার চেহারায়।

তিনি উঠে আবার আগুনের কাছে গিয়ে সেই চেয়ারটিতে বসলেন, আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। আজ কেন, কেন আজই? তিনি যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন। বহু দিন আগেকার স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠলো।

যা তার মনে হলো তা হচ্ছে এই—কিন্তু প্রথমে তার নাম ও পৈতৃক নাম জানা দরকার—দমিত্রি পাভলোভিচ। তার পদবী ছিলো সানিন। যা তার মনে এলো—

১

১৮৪০ সালের গ্রীষ্মকাল। সানিনের সবে বাইশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইটালী থেকে রাশিয়াতে ফিরে যাওয়ার পথে মাইন নদীর তীরে ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে এসে উঠেছিলো সে। তার ধন-সম্পত্তি সামান্যই ছিলো, মুক্ত ও স্বাধীন ছিলো সে, নিকট-আত্মীয় তার প্রায় কেউ ছিলো না। একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মৃত্যুতে কয়েক

হাজার রুবলের মালিক হয়ে সে ঠিক করলো, সরকারী চাকরীতে ঢোকার আগে বিদেশ বেরিয়ে আসবে। চাকরী তাকে করতেই হবে, যদি সে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়। সে তার ইচ্ছা পূর্ণ করলো এত হিসেব করে যে যেদিন ফ্রাঙ্কফোর্ট পৌঁছালো তার কাছে অবশিষ্ট রইলো আর মাত্র পিটার্সবুর্গ ফিরে যাওয়ার ভাড়া। ১৮৪০ সালে ইউরোপে কোথাও রেলগাড়ী ছিলো না বললেই হয়।

সবাই দেশ ভ্রমণ করতো ঘোড়ার গাড়ীতে। সানিনও গাড়ীতে একটি সিট ভাড়া করলো কিন্তু রাত দশটার আগে গাড়ী ছাড়বে না অর্থাৎ তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ভাগ্যক্রমে দিন ভালো করেছিলো। তখনকার প্রসিদ্ধ শ্বেতরাজহংসী হোটেলে দুপুরবেলা খেয়ে নিয়ে সানিন শহর দেখতে বেরুলো। ডানেকারের আরিয়ানে দেখতে গেলো, বেশী ভালো লাগলো না, গ্যেটের বাড়ী দেখতে গেলো। গ্যেটের লেখাগুলোর মধ্যে একমাত্র 'ভের্টারের দুঃখ' বলে বই-এর ফরাসী অনুবাদটি তার পড়া ছিলো। মাইন নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিলো সে, সব মার্জিত রুচি ভ্রমণকারীদের মতই তার মুখে ছিলো বিরক্তির ছায়া, অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা প্রায় ছ'টার সময় ক্লান্ত শরীর ও ধূলিলিপ্ত জুতো নিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের এক নগণ্য পাড়ার তদধিক নগণ্য গলিতে এসে হাজির হলো সে। এই গলিটি পরে তার স্মৃতিতে অমর হয়েছিলো। এই গলিরই একটি বাড়ীর সামনে সাইনবোর্ড ঘোষণা করছিলো—জিয়োভানি রচসলি—ইটালীয়ান খাবার বিক্রেতা। সানিন এক গ্লাস লেমোনেড খাবে বলে ঢুকলো। সামনের ঘরটিতে একটি ছোট কাউন্টারের পেছনে রং-করা তাকের উপরে কেমিষ্টের দোকানের মত হলদে লেবেল লাগানো। সামান্য কতকগুলো বোতল ছিলো আর কতকগুলো কাচের জারে ছিলো র‍্যাস্ক, চকোলেট ও লজেঞ্জ। ঘরেতে কোনো লোক ছিলো না। জানলার পাশে বেতের চেয়ারে একটা ধোঁয়াটে রং-এর বেড়াল বসে পিট-পিট করে চাইছিলো। মেঝেতে একটা উল্টানো খোদাই করা কাঠের শেলাইয়ের বাক্স থেকে গড়িয়ে পড়েছিলো একটা লাল উলের বল। তাতে সায়াহ্নের রোদ পড়াতে চুণীর মত চকচক করছিলো বলটি। পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ আসছিলো। সানিন দরজার উপরে ঘণ্টাটি বাজিয়ে থেমে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলো। বলতে যাচ্ছিলো, কেউ আছো? সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেলো। সানিন যা দেখলো তাতে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো।

২

একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে, অনাবৃত কাঁধের উপর তার কালো চুলের গুচ্ছ দুলছিলো, হাত বাড়িয়ে দৌড়ে এসে সামনের ঘরে ঢুকলো। সানিনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে তার হাত ধরে টেনে শ্বাসরোধ করা কণ্ঠে বললো শীগ্‌গির বাঁচাও ওকে। সানিন এতো আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো যে নড়তে পারছিলো না। জীবনে এর আগে কখনও সে এত রূপ কারুর দেখে নি। মেয়েটি ফিরে চাইলো ও আবার বললো, আসুন, দয়া করে আসুন, তার কণ্ঠস্বরে, আর চাহনিতে তার গালের উপরে রাখা হাতটিতে এত দুশ্চিন্তা, মাখানো ছিলো যে সানিন আর এক মুহূর্ত না ভেবে খোলা দরজার ভেতরে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো।

যে ঘরে ওরা গেলো সেখানে একটা পুরানো সোফার উপরে শুয়েছিলো একটি বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে, অনেকটা মেয়েটির মত দেখতে, সম্ভবতঃ মেয়েটির ভাই। তার মুখটা দেখাচ্ছিলো মৃতের মত ফ্যাকাশে, হলদে আভাযুক্ত সাদা-মোম বা পুরানো মর্মর পাথরের মত। চোখ বন্ধ ছিলো, ভুরুর উপর তার ঘন কালোচুলের ছায়া পড়েছিলো। তার স্থির ভুরুগুলো যেন দেখাচ্ছিলো পাথরে খোদাই করা। নীলচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো তার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। মনে হচ্ছিলো তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। একটি হাত মেঝেতে ঝুলছিলো, অন্যটি মাথার উপরে ফেলে রাখা ছিলো। ছেলেটি পুরো পোষাক পরেছিলো—কোটের সব বোতাম লাগানো ছিলো আর গলায় ছিলো আঁট করে বাঁধা একটি টাই।

মেয়েটি জোরে কেঁদে উঠে ওর কাছে গেলো। সে চিৎকার করছিলো—সে মারা গেছে, সে মারা গেছে। মিনিটখানেক আগে মাত্র সে ওখানে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলো। হঠাৎ পড়ে গেলো আর নড়তেও পারলো না। হায় ভগবান! আমরা কি আর ওর জন্য কিছুই করতে পারি না? মা-ও বেরিয়ে গেছেন। এবারে মেয়েটি ইটালীয়ান ভাষায় বললো—পান্টালেওন, পান্টালেওন, ডাক্তার কোথায়? তুমি কি ডাক্তার আনতে গেছো?

ভাঙাগলায় উত্তর এলো দরজার দিক থেকে, আমি নিজে যাইনি, সিনোরিনা—লুইসাকে পাঠিয়েছি। কালো বোতাম লাগানো বেগুনি রং এর ফ্রককোট, খুব চওড়া সাদা গলাবন্ধ, ছোট জুতোর ব্রীচেস ও নীলরংএর পশমের মোজা পরে এক বৃদ্ধ বেঁকানো পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে এলো। তার ছোট্ট মুখটি কালো ধূসর রং-এর চুলের ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। উস্কোখুস্কো চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে কাঁধের উপরেও পড়েছিলো। মাথার উপরে এই একরাশ চুলের বোঝা থাকার দরুণ তাকে দেখাচ্ছিলো একটা ঝুঁটিওলা মোরগের মত। তার চেহারায় একটি তীক্ষ্ণ নাক ও একজোড়া হলদে গোল চোখই ছিলো চোখে পড়ার মত, সেজন্য সাদৃশ্যটি আরো কাছাকাছি হয়েছিলো।

ফাঁস দেওয়া ফিতেতে বাঁধা বুট জুতো পরা, মোটা বেতো পা দুটো নাড়তে নাড়তে বুড়ো বললো, ইটালীয়ানে, আমি তো দৌড়াতে পারি না, লুইসা অনেক তাড়াতাড়ি যাবে। আমি একটু জল এনেছি।

তার সরু হাড় বের করা আঙুলগুলো দিয়ে একটা জলের বোতলের গলা ধরেছিলো।

কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই যে এমিল মরে যাবে। মেয়েটি সানিনের দিকে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, আপনি কি ওর জন্য কিছু করতে পারেন না?

মেয়েটি পান্টালেওন বলে যাকে ডাকছিলো, সেই বুড়ো বললো ওর মাথায় রক্ত চড়েছে, রক্ত ঝরিয়ে দিতে হবে।

যদিও সানিন ডাক্তারীর কিছুই জানতো না তবু এইটে জানতো চোদ্দ বছরের ছেলের রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে কখনো এরকম হয় না

সানিন পাণ্টালেওনকে বললো: সে মূর্ছা গেছে, আর কিছু হয় নি। একটা ব্রাশ দাও তো।

বুড়ো মুখ তুলে বললো, কি জিনিষ?

সানিন প্রথমে জার্মাণ পরে ফরাসীতে বললো—ব্রাশ ব্রাশ নিজের কোটটি ব্রাশ দিয়ে ঝাড়ার অভিনয় করে বললো, ব্রাশ।

এতক্ষণে বুড়ো বুঝতে পারলো সানিন কি বলছে। ব্রাশ, স্পাজেটে? নিশ্চয়ই আছে।

নিয়ে এসো। তার কোটটা খুলে ফেলে ব্রাশ দিয়ে শরীরটা ঘষতে হবে।

আচ্ছা—ওর মাথায় জল ঢাললে হয় না?

না পরে হবে। তাড়াতাড়ি ব্রাশগুলো নিয়ে এসো। পাণ্টালেওন বোতলটা মেঝেতে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে ও নিয়ে এলো একটা চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ ও আরেকটা কাপড় ঝাড়ার ব্রাশ, জোরে লেজ নাড়তে নাড়তে ও কি জন্ম এত হৈ চৈ হচ্ছে জানার উৎসুক্য পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বুড়ো, মেয়েটি ও সানিনের দিকে চাইতে চাইতে একটি ছোট ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো লোমওলা কুকুর ঢুকলো বুড়োর পেছন পেছন।

সানিন তাড়াতাড়ি করে শোয়ানো ছেলেটির কোটটি খুললো, কলার ঢিলে করে দিলো, সার্টের হাতা গুটিয়ে দিলো, তারপর নিজের গায়ে যত শক্তি আছে, তা'দিয়ে ছেলেটির বুক ও হাত ঘষতে লাগলো ব্রাশ দিয়ে।

পাণ্টালেওন চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ দিয়ে সে রকম জোরেই ছেলেটির প্যাণ্ট ও বুটের ওপর ঘষতে লাগলো। মেয়েটি হাটু গেড়ে সোফার পাশে বসে নিজের মাথাটি দু'হাতে ধরে অনিমেষ নয়নে তার ভাই-এর দিকে চেয়ে রইলো। সানিন ব্রাশ চালাতে চালাতে আড়চোখে মেয়েটিকে দেখছিলো। হে ভগবান, কি সুন্দর দেখতে মেয়েটিকে!

৩

মেয়েটির সুন্দর উঁচু নাকটি ছিলো একটু লম্বাটে, তার ঠোঁটের ওপরে অস্পষ্ট সরু গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছিলো কিন্তু তার অনিন্দ্য গায়ের রং ছিলো মসৃণ ও নির্মল—যার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে হস্তি-দন্তের বা ঈষৎ হলদে এম্বারের। পালাজো পিটিতে এলোরির জুডিথের মত ছিলো তার চকচকে ঢেউখেলানো চুলগুলো। বিশেষ করে তার ঘন ধূসর রংএর চোখ, চোখের তারা চার পাশে বেষ্টন করে ছিলো একটি কালো রেখা—ছিলো অপূর্ব সুন্দর বিজয়িনীর চোখ। এমন কি এখনও যে ভয়ে ও দুঃখে কাতর হয়েছে তাদের চাহনি তবু কি সুন্দরই দেখাচ্ছিলো। সানিন যে দেশ সত্ত বেড়িয়ে এসেছে সেই গৌরবময় দেশে তার মন চলে গেলো। কিন্তু ইটালিতেও কই এত রূপ কোথাও তার নজরে পড়েনি। মেয়েটি থেমে থেমে অনিয়মিত নিশ্বাস নিচ্ছিলো, যেন অপেক্ষা করছিলো তার প্রত্যেক নিশ্বাসে তার ভাই এবার শ্বাস নিতে আরম্ভ করবে।

সানিন ঘষে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার চোখ মেয়েটিকে ছাড়াও অন্য আরেক দিকে পড়ছিলো। পাণ্টালেওনের অদ্ভুত চেহারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। বুড়ো পরিশ্রম করে হাঁপাচ্ছিলো, প্রত্যেকবার ঘষার সঙ্গে লাফাচ্ছিলো ও করুণ স্বরে কাতরাচ্ছিলো। একটি বড় গাছের শেকড়গুলোর ওপরের মাটি জলে ধুয়ে গেলে যে রকম দেখায় সে রকম দেখাচ্ছিলো তার ঘামে ভেজা চুলের গোছা। তার চুলগুলো একবার মাথার এপাশে পড়ছিলো, একবার ওপাশে।

সানিন বলতে যাচ্ছিলো, তার জুতোগুলো, অন্ততঃ খুলে নাও। কুকুরটি নিঃসন্দেহ এতগুলো অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখে সামনের পা দু'টোর ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে ডাকছিলো।

বুড়ো ফিস-ফিস করে বললো, টার্টাগ্লিয়া, চুপ। কিন্তু তখনই মেয়েটির চেহারা পরিবর্তন হলো। তার ভুরু জোড়া ওপরে উঠে গেলো, চোখগুলো যেন আরো বড় হয়ে গেলো, তার মুখে পড়লো আনন্দের ছাপ।

সানিন চেয়ে দেখলো ছেলেটির গালে লাল আভা ফিরে আসছিলো চোখের পাতা পড়ছিলো। নাকটা কেঁপে উঠছিলো। তার দাঁতে দাঁত লাগানো ছিলো কিন্তু তার ভেতর দিয়ে সে শ্বাস নিলো ও নিশ্বাস ফেললো। এমিল, মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো—আমার এমিলিও।

কালো বড় বড় চোখগুলো আস্তে আস্তে খুলে গেলো, শূন্য দৃষ্টিতে অল্প একটু হাসি দেখা দিলো একটু পর। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটেতেও হাসি নেমে এলো। তার ঝুলানো হাতটিও এবারে বুকের ওপর টেনে নিলো।

মেয়েটি আবার এমিলিও বলে ডেকে উঠে দাঁড়ালো। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো সে হয় ত এক্ষুণি কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে কিংবা হাসিতে ফেটে পড়বে।

দরজার ওপাশ থেকে এবার আওয়াজ এলো—এমিল, এমিল, কি হয়েছে? ছিমছাম পোষাক-পরা, রূপোলী চুল ও শ্যামবর্ণ গায়ের রং একজন ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি হেঁটে ঘরে এসে ঢুকলেন। তার পেছনে আসছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, তার পেছনে দেখা গেলো বাড়ীর ঝিকে।

মেয়েটি দৌড়ে গেলো তাদের কাছে। ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো—মা, সে বেঁচে আছে, সে প্রাণে বেঁচে আছে, মা।

কিন্তু হয়েছিলো কি? ভদ্রমহিলা আবার বললেন। আমি এসে দেখি হঠাৎ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে লুইসা ঢুকছে।

মেয়েটি কি কি ঘটেছে তার মাকে বলতে লাগলো। ডাক্তার রুগীর দিকে গেলেন, রুগীর জ্ঞান ফিরে আসছিলো, মৃদু হাসছিলো সে। এত হৈ-চৈ ও শঙ্কার কারণ নিজেকে মনে করে সে যেন লজ্জিত বোধ করছিলো।

সানিন ও পাণ্টালেওনকে ডাক্তার বললেন, দেখছি, আপনারা ওকে ব্রাশ দিয়ে ঘষছিলেন। খুব ভালো করেছেন, ভালো, আচ্ছা, দেখি, ওর জন্ম আর কি করা যায়।

তিনি রুগীর নাড়ী দেখছিলেন। হুঁ। দেখি তোমার জিভ। ভদ্রমহিলা ছেলেটির ওপর চিন্তান্বিত ভাবে ঝুঁকে পড়লেন। সে তখন আরো বেশী হাসছিলো, ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো।

সানিনের মনে হলো ওর জন্ম হয়ত সবাই সঙ্কোচ বোধ করছে। সে দোকান ঘরে আবার ফিরে এলো। কিন্তু দরজা

খুলে রাস্তায় পা দেওয়ার আগেই মেয়েটি এসে তাকে যেতে বাধা দিলো।

স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে মেয়েটি বললো—চলে যাচ্ছেন, আপনাকে আটকে রাখতে চাইনে, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে সন্ধ্যেবেলা আবার আসবেন। আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আপনি না থাকলে আমার ভাই হয়ত মারা যেতো। আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার মা চান, আপনার সম্বন্ধেও আমরা জানতে চাই, আমাদের সঙ্গে আপনাকেও আনন্দে যোগ দিতে হবে।

সানিন থেমে থেমে কোনো রকমে বললো, কিন্তু আমি যে আজ রাত্রেই বার্লিন চলে যাচ্ছি।

মেয়েটি জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। যাওয়ার আগে অনেক সময় হবে আপনার। এক ঘণ্টার ভেতর ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে এক পেয়ালা চকোলেট খাবেন কথা দিন। আমাকে এখন ওর কাছে ফিরে যেতে হবে। আসবেন আপনি, না।

সানিন আর কি করতে পারে? বললো—আচ্ছা, আসবো। অসামান্যা সুন্দরী মেয়েটি তার হাতে একটু চাপ দিয়ে চলে গেলো। সানিনও রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

৪

সানিন দেড় ঘণ্টা পর যখন খাবার বিক্রেতার বাড়ীতে ফিরে এলো, ঠিক পরিবারেরই একজনের মত আদর পেলো সে। যে সোফায় এমিলকে মালিশ করা হয়েছিলো তার উপরেই বসেছিলো সে। ডাক্তার তার জন্ম ওষুধ লিখে গেছেন ও বলে গেছেন মানসিক চাঞ্চল্য যেন তার কখনও না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে। কারণ রুগীর স্নায়ু দুর্বল, হৃদরোগও তার সহজেই হতে পারে। আগেও তার অনেকবার ফিট হয়েছে, কিন্তু এত দীর্ঘস্থায়ী ও ভীষণ রকমের মূর্ছা এর আগে কখনও হয়নি। অবশ্য ডাক্তার বলে গেছেন এখন আর ভয়ের কারণ নেই। এমিল রুগীদের মতই একটি ঢিলে ড্রেসিং গাউন পরে ছিলো। তার মা তার গলায় নীলরং এর পশমের স্কার্ফ জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে দেখাচ্ছিলো খুব খুসী, যেন উৎসবে যেতে গেছে—সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াই ছিলো উৎসবের। সোফার পাশে, একটা পরিষ্কার টেবিলক্লথ দিয়ে ঢাকা গোল টেবিলের ওপরে ছিলো সুগন্ধ চকোলেট ভর্তি একটা প্রকাণ্ড বড় কফিপট, সিরাপের বোতল, বিস্কুট ও রুটি। এমনকি ফুল পর্য্যন্ত। একজোড়া পুরানো ধরণের রূপোর মোমবাতিদানে জ্বলছিলো ছটি সরু মোমবাতি। সোফার একপাশে উঁচুপিঠ ও হাতলওলা একটা অতি আরামদায়ক চেয়ারে সানিনকে বসানো হলো। বাড়ীর সবাই যাদের সঙ্গে সানিনের সেদিন আগেই দেখা হয়েছে, উপস্থিত ছিলো, ছোট্ট কুকুর টার্টালিয়া ও বেড়ালটি সমেত। সবাইকে মনে হচ্ছিলো অত্যন্ত আনন্দিত, কুকুরটি আনন্দে হাঁচছিলো, কেবলমাত্র বেড়ালটিরই কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিলো না, পিট পিট করে চাইছিলো ও ঘরঘর করে আওয়াজ করছিলো। সানিনকে বলতে হলো তার নামধাম ও কি করে সে। যখন মেয়েরা শুনলেন ও রাশিয়ান ওরা একটু হকচকিয়ে গেলেনও আশ্চর্য্য হওয়ার ভাব দেখালেন। দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, সে জার্মাণ খুব ভালো জানে কিন্তু যদি ইচ্ছে করে তবে ফরাসীতে কথা বলতে পারে কারণ তারা ফরাসীও খুব ভালো জানেন ও বুঝতে পারেন। এই সুযোগে সানিন ফরাসীতে কথাবার্তা চালালো। সানিন! সানিন! তারা কখনও জানতেন না কোনো রাশিয়ান নামের এত সহজ উচ্চারণ হতে পারে। তার ক্রিশ্চিয়ান নাম দিমিত্রিও ভারী সুন্দর। বয়স্কা মহিলাটি বললেন যৌবনে তিনি দেমেত্রিও ও পলিবিও বলে একখানি গীতিনাট্য শুনেছিলেন, কিন্তু দিমিত্রি নামটি দেমেত্রিও নামের থেকে অনেক বেশী সুন্দর। এসব কথাবার্তা বলতে বলতেই সানিন একঘণ্টা কাটিয়ে দিলো। আর মেয়েরাও তাদের নিজেদের জীবনের সব কিছু ওকে খুলে বললেন। মা অর্থাৎ রূপোলীচুল সেই ভদ্রমহিলাই প্রায় একচেটিয়া কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। সানিন জানতে পারলো তার নাম হচ্ছে লেওনোরা রসেলী, তিনি তার স্বামী জিয়োভানি বাটিষ্টা রসেলীর মৃত্যুর পর আর বিয়ে করেন নি। তার স্বামী মাইন নদীর তীরে এই ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে পঁচিশ বছর আগে খাবার বিক্রেতা হিসাবে আসেন। জিয়োভানি বাটিষ্টার দেশ ছিলো ভিসেনজাতে; যদিও রাগী ও যোদ্ধা স্বভাবের ছিলেন তবু খুব ভালো ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ঘোর সাধারণতন্ত্রী। এই কথা বলে দেওয়ালে টাঙানো সোফার উপরে তার তৈলচিত্রটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। মেডেম রসেলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন চিত্রকরও একজন সাধারণতন্ত্রী—সে ছবিটিতে তার স্বামীর সঙ্গে সাদৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ছবিটা দেখে মনে হয় যেন ভয়াবহ চেহারার এক দস্যু, রিনাল্ডো রিনাল্ডির মত। মেডেম রসেলীর নিজের দেশ ছিলো প্রাচীন ও সুন্দর পার্মা সহরে এই সহরে অমর চিত্রকর করেজীয়োর আঁকা ফ্রেস্কো আছে একটি সুন্দর গম্বুজওলা চার্চে। অবশ্য দীর্ঘদিন জার্মাণীতে বাস করার ফলে তিনি পুরো টিউটন হয়ে গেছেন। দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে তিনি আঙুল দিয়ে দেখালেন তার ছেলে ও মেয়েকে বললেন, এরা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। মেয়েটির নাম জেমা, ছেলেটির নাম এমিল, ওরা খুব ভালো ও বাধ্য বিশেষ করে এমিল। মেয়েটি বলে উঠলো আমি বুঝি বাধ্য নই? ওর মা উত্তর দিলেন—তুমিও একজন সাধারণতন্ত্রী। তার স্বামী জীবিতকালে ব্যবসা যেরকম ভালো চলছিলো সেরকম ভালো অবশ্য এখন চলে না, তার স্বামী ছিলেন সত্যিকারের গুণী, খাবার তৈরীর হাত ছিলো তার চমৎকার। এবারে পাণ্টালেওন কঠোর ভাবে বলল, অতি উঁচুদরের গুণী। সবশেষে ভদ্রমহিলা বললেন—ভগবানকে ধন্যবাদ, নালিশ জানাবার মত কিছু তার নেই।

৫

জেমা শুনছিলো ও তার মার কাঁধে মাঝে মাঝে হাত রাখছিলো, হাসছিলো দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো, আঙুল নেড়ে মাঝে মাঝে মার কথার প্রতিবাদ করছিলো ও সানিনের দিকে দেখছিলো একটু পর পর। খানিকক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে সে দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো ও চিবুকের নীচে গলায় চুমু খেলো। তার মার সুড়সুড়ি লাগাতে হেসে গড়িয়ে পড়লেন। সানিনের সঙ্গে পাণ্টালেওনেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। জানা গেলো সে একদা অপেরাতে মাঝারি গভীর গলায় গান গাইতো কিন্তু বহুদিন পূর্বেই রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে দিয়ে

রসেলী পরিবারের সঙ্গে আছে—এখানে তার স্থান ছিলো ভৃত্য ও পরিবারের বন্ধুর মাঝামাঝি। যদিও সে জার্মাণীতে অনেকদিন আছে তবু সে জার্মাণ খুব খারাপ বলতো, শুধু শিখেছিলো কতকগুলো শপথ করার গালাগাল তারও উচ্চারণ ঠিক হতো না। সে সব জার্মাণকেই বলতো অতি পাজী। অতি চমৎকার ইটালীয়ান বলতো সে কারণ তার দেশ ছিলো সিজিগালিয়াতে যেখানে এখনও শুনতে পাওয়া যায় রোমানদের মুখের টাসকেনির ভাষা।

এমিলিও খুব খুশী হয়েছিলো, সন্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে বা সুস্থ হচ্ছে এরকম একটা ভাব তার মনকে পূর্ণ করেছিলো, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো সে হচ্ছে বাড়ীর সকলের আদুরে। সলজ্জভাবে সে সানিনকে ধন্যবাদ জানালো, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই সে মিষ্টি ও সিরাপ খাচ্ছিলো। সানিনকে দু'কাপ চমৎকার চকোলেট খেতে হলো ও অপর্য্যাপ্ত বিস্কুটের সদ্গতি করতে হলো। যেই সে একটা শেষ করছিলো অমনি জেমা আর একটা এগিয়ে দিচ্ছিলো, সানিন না বলতে পারছিলো না। তার মনে হলো সে যেন বাড়ীতে বসে আছে। সময় অবিশ্বাস্যরকম দ্রুততালে চলে যাচ্ছিলো। ওদের কতকিছু যে ওকে বলতে হলো। রাশিয়া সম্বন্ধে, রাশিয়ার জলবায়ু, রাশিয়ার সমাজ, রাশিয়ার কৃষক এবং বিশেষ করে কসাকদের সম্বন্ধে, তার পর, ১৮১২ সালের যুদ্ধ, পিটার দি গ্রেট, ক্রেমলিন রাশিয়ার গান, গির্জার ঘণ্টা। দু'জন মহিলাই রাশিয়া এক সীমাহীন ও সুদূর বিস্তৃত দেশ এ ছাড়া আর কিছু জানতেন না। মেডেম রসেলী—তাকে লোকে সাধারণতঃ ফ্রাউ লেনোর বলে ডাকতো—সানিনকে অবাক করে দিলেন জিজ্ঞেস করে—বিগত শতাব্দীতে পিটার্সবুর্গে যে বিখ্যাত বরফের বাড়ীটি তৈরী হয়েছিলো সেটা কি এখনও আছে। তার স্বামীর একটি বই 'শিল্পকলায় সৌন্দর্য্য'তে একটি প্রবন্ধ তিনি সম্প্রতি পড়েছেন তাতে এর এক অতি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। সানিন যখন আশ্চর্য্য স্বরে বললো—আপনি কি ভাবেন রাশিয়াতে গ্রীষ্মকাল হয় না? তখন ফ্রাউ লেনোর স্বীকার করলেন তিনি রাশিয়াকে চির তুষারের দেশ বলে চিরকাল মনে করে এসেছেন। সেখানে সবাই সারা বছর ফারকোট পরে, সব পুরুষ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সবাই খুব অতিথিপরায়ণ আর কৃষকরা খুব শান্ত প্রকৃতির। সানিন যথাসাধ্য খাঁটি খবর দিতে চেষ্টা করলো মা ও মেয়েকে। যখন রাশিয়ান গানের কথা উঠলো, তখন তাকে একটি রাশিয়ান গান গাইতে বলা হলো। তখন তার নজরে পড়লো, ঘরের এক কোণে একটা ছোট পিয়ানো আছে, তার সাদা চাবিগুলো কালো আর কালোগুলো সাদা। বেশী জোরাজুরি করার আগেই সে গাইতে লাগলো পিয়ানো বাজিয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল ও বাঁ হাতের তিনটে আঙুল দিয়ে (বৃদ্ধা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দিয়ে)। উঁচু দরাজ গলায় গাইলো প্রথমে সে 'লাল সারাফান' ও তার পর 'বাঁধানো পথের ওপর দিয়ে।' মেয়েরা তার স্বরের ও গানের প্রশংসা করলেন, তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করলেন অতি কোমল ও ছন্দোময় রাশিয়ান ভাষার, কথাগুলোর অর্থ জানতে চাইলেন। সানিন তাদের ইচ্ছে পূর্ণ করলো, কিন্তু 'লাল সারাফান' ও তার চেয়ে বেশী 'বাঁধানো পথের উপর দিয়ে' এর কথাগুলো এতই সামান্য কবিত্বপূর্ণ ছিলো যে তার মনে হলো রাশিয়ান কবিতার প্রতি সুবিচার হয়নি। তাই সে প্রথমে আবৃত্তি, পরে অনুবাদ ও শেষে গাইলো পুশকিনের গ্লিংকোক্ত স্বরলিপি 'স্বর্গীয় আনন্দের চিরস্মরণীয় মুহূর্তটি'। এবারে মহিলারা গানটি উপভোগ করলেন সত্যি সত্যিই—ফ্রাউ লেনোর আবিষ্কারই করে ফেললেন রাশিয়ান ও ইটালীয়ান ভাষার মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্য। পুশকিন (তিনি এই নামটি উচ্চারণ করলেন পুসেকিন) ও গ্লিংকা এই দু'টো নাম তার অতি পরিচিত বলে বোধ হলো। এবারে সানিনকে ও অনুরোধ করতে হলো মেয়েদের গাইবার জন্য ও তারাও আর কথা না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেলেন। ফ্রাউ লেনোর পিয়ানো বাজালেন ও তিনি ও জেমা কয়েকটি গান গাইলেন, মা এককালে খুব সুন্দর নীচু পর্দায় গাইতেন মনে হলো ও মেয়েটির গলা যদিও খুব জোরালো ছিলো না তবু বেশ মিষ্টি লাগলো সানিনের।

৬

কিন্তু সানিনের যত না জেমার কণ্ঠস্বর ভালো লাগলো, তার চেয়ে ঢের বেশী ভালো লাগলো জেমাকে। ওদের একটু পেছনে একপাশে বসেছিলো সানিন, নিজের মনে বলছিলো কোনো পাম গাছ এমনকি তখনকার দিনের নামী কবি বেনে দিকতত্ত লিখিত কবিতাতেও মেয়েটির লালিত্যময় তন্বী চেহারার তুলনা মেলে না। যখন সে গানের কোনো করুণ জায়গা গাইতে গাইতে ছাদের দিকে চাইছিলো তার মনে হচ্ছিলো স্বর্গ পর্য্যন্ত এই দৃষ্টিতে বিচলিতে বোধ না করে পারে না। বুড়ো পান্টালেওন দরজার পাল্লায় ঠেসান দিয়ে বসেছিলো। তার চিবুক ও মুখের প্রায় সবটাই চওড়া গলা বন্ধে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো, গানের সমঝদারের মত গম্ভীর হয়ে শুনছিলো, এমনকি সে পর্য্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলো যখন সে মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলো যদিও নিশ্চয়ই সে এই দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত ছিলো, ফ্রাউ লেনোর যখন গান শেষ করলেন বললেন এমিলের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর, খাঁটি রূপোর, কিন্তু এখন তার বয়ঃসন্ধিতে স্বর পরিবর্তন হচ্ছে (সত্যিই সে ভাঙ্গা গলায় কথা বলছিলো) ও তার গান গাওয়া বারণ। কিন্তু অতিথির সম্মানার্থে পান্টালেওন অতীতের কথা স্মরণ করে যদি এখন গান গায় তো কেমন হয়? তখনই পান্টালেওনের মুখে দেখা দিলো অসন্তোষের ছায়া, সে ভুরু কোঁচকালো, চুলের ভেতর আঙুল চালালো, বললো সে অনেকদিন এসব ছেড়ে দিয়েছে যদিও তরুণ বয়সে সে বেশ নাম করেছিলো, তা ছাড়া সে হচ্ছে সেই মহৎ যুগের লোক যখন সত্যিকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যমান ছিলো, এই যুগের চেঁচামেচির সঙ্গে যার তুলনাই চলে না, সে হচ্ছে সে যুগের লোক যখন সত্যিকারের গানের চর্চা ছিলো। মডেনাতে একবার তাকে, ভারিসির পান্টালেওন সিপ্পাটোলাকে ফুলের মালা উপহার দেওয়া হয়েছিলো যে সময় থিয়েটার থেকে শ্বেত জাত পাখী ছাড়া হয়েছিলো। টারবুসকির রাজকুমার সেও একজন রাশিয়ান, তার খুব বড় বন্ধু ছিলো, সে তাকে অনেকবার সায়াহ্ন ভোজনের সময় রাশিয়াতে যেতে নেমন্তন্ন করেছে বলেছে সোনার পাহাড় দেবে তাকে, পাহাড়। কিন্তু ইটালীকে ছেড়ে যেতে হবে, দান্তের দেশকে ছেড়ে যেতে হবে, এ চিন্তাটা তার অসহ্য ছিলো। পরে অবশ্য অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে যথেষ্ট সাবধানী ছিলো না। বুড়ো এই বলে আর বলতে পারলো না। চোখের পাতা নীচে নামিয়ে নিলো, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো জোরে জোরে। আবার সে প্রাচীন যুগের গানের কথা

বলতে লাগলো, উঁচু দরাজ কণ্ঠের অধিকারী পার্শিয়ার কথা যার প্রতি তার ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা।

সে বলে উঠলো এই একটি লোক ছিলো বটে। মহামানব পার্শিয়া কখনও আজকালকার বাজে উঁচু গলার গাইয়েদের মত নিকৃষ্ট গান গায়নি। বুড়ো তার শিথিল মুষ্টি দিয়ে জামার হাতায় ঘুষি দিয়ে বললো কি অভিনেতা ছিলো সে। একটা আগ্নেয়গিরি, একটা আগ্নেয়গিরি ছিলো সে, সে ছিলো ভিসুবিয়াস। ওথেলোতে আমার তার সঙ্গে গাইবার সুখ ও সম্মান হয়েছিলো, মহাগুরু রসিনির লেখা গীতি নাট্য ওথেলো। পার্শিয়া গাইছিলো ওথেলোর গান, আমি ইয়াগোর, যখন সে এই কথাগুলোর এলো এই বলে পান্টালেওন নাটকীয় ভঙ্গীতে ভাঙা ও কাঁপা কিন্তু তবু মর্মস্পর্শী গলায় গাইতে লাগলো

'যদি ভাগ্যে থাকে তবে তাই হোক
ভীত হইনি আমি।'

সমস্ত বাড়ী কাঁপতে লাগলো। কিন্তু আমি স্থির রইলাম ও তার পরে গাইলাম

'যদি ভাগ্যে থাকে তবে তাই হোক—
ভয় করি না।'

হঠাৎ সে বাঘ বা বিদ্যুতের মত ফেটে পড়লো
—'মূর—কিন্তু আমার প্রতিহিংসা'—

কিম্বা যখন সে বিখ্যাত ছোট গানটি 'বিবাহ রহস্য পূর্বরাগ' গাইছিলো, যখন সে এই কথাগুলি গাইছিলো 'ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে' তখন যদি তোমরা শুনতে, মহামানব পার্শিয়াকে অবিশ্রান্ত একটানা অনুসরণ' গাইতে—কি অদ্ভুত সুন্দর, কি চমৎকার, কি বিস্ময়কর—সে—ভীষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক প্রশংসা করে গান গেয়ে গেলো তার কিন্তু ন'টা কি দশটা পদ গাওয়ার পর সে গলা পরিষ্কার করে হাত নেড়ে একপাশ হয়ে বসলো ও মৃদুস্বরে বললো, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? জেম্মা তক্ষুনি হাততালি দিয়ে, চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেলো 'সাবাস, সাবাস' বলতে বলতে। সস্নেহে অনেক দিন আগেই অবসরপ্রাপ্ত ইয়াগোর কাঁধে হাত চাপড়াতে লাগলো দু' হাতে। কেবল এমিল নিষ্ঠুরের মত হাসছিলো। কিন্তু অনেক দিন আগেই যে দা কঁটে লিখে গেছেন: এই বয়স করুণা করতে জানে না।

সানিন এই বৃদ্ধ গায়ককে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো। ইটালীয়ান ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলো (ভ্রমণকালে সে একটু আধটু শিখেছিলো) বলতে লাগলো—দান্তের দেশ যেখানে আছে সত্যিকারের গান' এই পদটি ও 'সব আশা পরিত্যাগ করে' এই কথাটি—ইটালীয় কবিতার জ্ঞান এই নবীন দেশভ্রমণকারীর এইটুকুই ছিলো। কিন্তু পান্টালেওন তার উৎসাহে উৎসাহ পেলো না। চিবুকটি আরো বেশী গলাবন্ধে ঢুকিয়ে দিয়ে করুণ নয়নে চেয়ে থাকাতে আরো বেশী পাখীর মত দেখাচ্ছিলো, দেখাচ্ছিলো একটা রাগী পাখী একটা দাঁড়কাক বা চিল। এবারে এমিল আদুরে ছেলের মত লজ্জায় আরক্তমুখে বললো তার বোনের দিকে চেয়ে—যদি সে অতিথিকে খুশী করতে চায় তবে সে মাল্‌ৎস্‌এর হাস্য-কৌতুকগুলো যদি পড়ে তাহলে খুব ভালো হয়, সে ওগুলো এত ভালো পড়ে। জেম্মা হেসে তার ভাইএর হাত চাপড়ালো, বললো, 'তুমি হচ্ছো একটা ভাঁড়।' যদিও তখনই সে তার ঘরে গিয়ে একটি ছোট বই নিয়ে এলো, আলোর পাশে টেবিলে বসলো, সকলের দিকে তর্জনী উঁচু করে চাইলো যেন বলতে চাইলো: 'দয়া করে সবাই চুপ করো।' এটা হচ্ছে একটা ইটালীয়ান কায়দা। সে পড়তে শুরু করলো।

৭

মাল্‌ৎস ছিলেন একজন লেখক। ফ্রাঙ্কফোর্টে ১৮শ শতকের ৩০ দশকে বাস করতেন। স্থানীয় উপভাষায়, স্থানীয় লোকদের নিয়ে কৌতুকপূর্ণ মজার নক্সা লিখতেন। সেগুলো হয়ত খুব উঁচু দরের ছিলো না কিন্তু বেশ ঝরঝরে ও হাসির ছিলো। দেখা গেলো জেম্মা সত্যিই খুব ভালো পড়তে পারে, পেশাদার অভিনেত্রীর মত। সে প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুললো চমৎকার ভাবে, ইটালীয়ান রক্তের সঙ্গে সে যে অনুকরণ করার ক্ষমতাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলো তা কাজে লাগালো নিখুঁত ভাবে। যখন আধপাগলী কুৎসিত বুড়ী কিংবা হাঁদা মেয়েদের কথায় আসতো, সে তার মিষ্টি স্বর ও সুন্দর চেহারাকে বিকৃত করে, হাস্যকর করে, চোখ উপরে তুলে নাক কুঁচকে, আটকে আটকে আড়ষ্ট হয়ে কথা বলে, তারস্বরে গান গেয়ে তাদের নকল করতো। যখন পড়তো সে নিজে কখনো হাসতো না। কিন্তু যখন তার সব শ্রোতারাই (বলতে গেলে সবাই এক পান্টালেওন ছাড়া, কারণ যখনই সেই পাজী জার্মানটার কথা উঠেছে তখনই সে আসর ছেড়ে উঠে গেছে) অট্টহাস্যে তার পড়ায় বাধা দিতো, তখন সে বইটা হাঁটুর ওপরে ফেলে দিয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে, বসে হাসতে থাকতো। তার কালো চুলগুলো ছোট ছোট আংটির মত পাকিয়ে পাকিয়ে তার গলা ও কম্পমান ঘাড়ের উপর নাচতো। যখন হাসির হুল্লোড় থেমে যেতে, সে আবার বইটি নিয়ে যথাযথ মুখের ভাব করে গম্ভীর ভাবে পড়ে যেতো। সানিন জেম্মাকে দেখে, জেম্মার প্রশংসায় সব ভুলে গেলো তার বিস্ময় বোধ হলো কি করে এই অপূর্ব সুন্দর চেহারা এত হাস্যকর ও মাঝে মাঝে এত সাধারণ চেহারা এত সহজে নিতে পারে। যেখানে তরুণী মেয়েদের কথা ছিলো তথাকথিত তন্বী কিশোরীদের জেম্মা সেখানে অতটা ভালো করতে পারছিলো না। আর একেবারেই পারছিলো না প্রণয়দৃশ্যগুলো। সে নিজেও তা বুঝতে পারছিলো ও সেজন্য এই দৃশ্যগুলো একটু ব্যঙ্গের ছায়া নিয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, যেন মনে হচ্ছিলো এই সব গম্ভীর প্রতিজ্ঞাগুলো ও বড় বড় কথাগুলো সে বিশ্বাস করছিলো না, উপরন্তু লেখকও এ সব দৃশ্য খুব অল্পই লিখেছিলেন।

কি করে যে সারা সন্ধ্যা কেটে যাচ্ছিলো সানিন লক্ষ্যই করে নি। ঘড়িতে যখন দশটা বাজলো তখন তার যাত্রার কথা মনে পড়লো। যেন কোনো কিছু কামড়েছে এরকম ভাবে সে লাফিয়ে উঠলো।

ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

আমাকে আজ বার্লিন যেতে হবে—গাড়ীতে সিটের জন্য আগেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

গাড়ী কখন ছাড়বে?

সাড়ে দশটায়

জেম্মা বললো—তাহলে আপনার দেরী হয়ে গেছে। থেকে যান না, আমি আরো পড়ব।

ফ্রাউ লেনোর জানতে চাইলেন—তাদের সব টাকা দেওয়া হয়েছে না কেবলমাত্র ডিপোজিট?

সানিন জোরের সঙ্গে কাতর ভাবে বললো—সব। জেম্মা তার চোখ ছোট ছোট করে সানিনের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো। তার মা বকলেন তাকে।

ভদ্রলোক মিছিমিছি এতগুলো টাকা নষ্ট করলেন আর তুমি হাসছো!

জেম্মা বললো—কুছ পরোয়া নেই। এতে তিনি সর্বস্বান্ত হবেন না আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবো। আরো একটু লেমোনেড নিন।

সানিন এক গ্লাস লেমোনেড পান করলো ও জেম্মা মাল্‌ৎস পড়তে লাগলো। সব কিছুই আগের মত স্ফূর্তিতে চললো।

ঘড়িতে বারোটা বাজলো। সানিন বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালে জেম্মা বললো, ফ্রাঙ্কফোর্টে আপনাকে আরো কয়েকদিন থাকতে হবে। আপনাকে এতো তাড়াহুড়ো করতে হবে না। অন্য কোনো সহরে আপনার এত ভালো লাগবে না। সে থেমে আবার বললো—সত্যি আর কোথাও নয়।

সানিন উত্তর দিলো না। সে জানতো ভালো লাগুক বা না লাগুক তার শূন্য পকেটই তাকে ফ্রাঙ্কফোর্টে আটকে রাখবে। তার বন্ধুর কাছে ধার চেয়ে চিঠি লিখে উত্তর আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ফ্রাউ লেনোর বললেন, হ্যাঁ, থেকে যান। জেম্মার ভাবী স্বামী হের কার্ল ক্লুবারের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ফ্রাঙ্কফোর্টের বড় রাস্তা সাইলে সহরের সবচেয়ে বড় কাপড় চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদ ও সিল্কের দোকান। ও হচ্ছে তার কর্তা। সে কিন্তু খুব খুশী হবে আপনার সঙ্গে পরিচয় করে। ভগবান জানেন কেন এই খবরটি সানিনকে খুশী করতে পারলো না। তার মনে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। ভাগ্যবান পুরুষ। জেম্মার দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো সে যেন তার চোখে বিদ্রূপের হাসি দেখতে পেলো। সে বিদায় নিলো এবারে।

কাল পর্যন্ত? কাল আসছেন তো, না? ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন।

জেম্মা প্রশ্নবোধক স্বরে নয়, সোজাসুজি বললো, আচ্ছা, কাল দেখা হবে। যেন এর অন্যথা হতে পারে না।

সানিনও উত্তর দিলো হ্যাঁ, কাল।

এমিল, পান্টালেওন ও টার্টাগ্লিয়া হলে কুকুরটি মোড় পর্যন্ত দিয়ে গেলো। পান্টালেওন জেম্মার বইগুলো পড়ার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ না করে থাকতে পারলো না।

তার লজ্জা বোধ করা উচিত। মুখ ভেংচানো আর চেঁচানো সব ভাঁড়ামি। মেরোপ বা ক্লিটেমনেষ্ট্রা অভিনয় করা উচিত তার—যা সত্যিই মহৎ ও করুণ, তার জায়গায় অতি বাজে জার্মাণের অনুকরণ করে আনন্দ পায় সে। আঙুলগুলো ছড়িয়ে চিবুক বের করে ভাঙ্গা গলায় বললো, আমি পর্যন্ত করতে পারি এসব মের্ডস, কের্ডস, শোর্ডস।

টার্টাগ্লিয়া এই অদ্ভুত শব্দগুলো শুনে ডেকে উঠলো ও এমিল জোরে জোরে হাসতে লাগলো। বুড়ো হঠাৎ ঘুরে ফিরে গেলো সানিন 'শ্বেত রাজহংসী'তে ফিরে এলো (সে তার জিনিষগুলো ওখানে ফেলে গিয়েছিলো)। সে পরিষ্কার কিছু ভাবতে পারছিলো না। তার কানে বাজছিলো জার্মাণ-ফরাসী-ইটালীয়ানে সব আলোচনা।

হোটেলের একটা সস্তা ঘরে শুয়ে সে নিজেকে বললো 'ভাবীস্বামী!' কিন্তু কি রূপসী। আচ্ছা, আমি কেন রয়ে গেলাম?

যাই হোক, পরদিন সে তার বার্লিনের বন্ধুকে একখানা চিঠি লিখে দিলো। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস

এসো মৃত্যু এসো

(সেক্সপীয়রের Come away Come away Death কবিতার অনুবাদ)

এসো মৃত্যু এসো তুমি
আমারে করো আলিঙ্গন
তোমার কঠিন হাতে
ত্বরান্বিত হোক তবে বিদায়ের ক্ষণ।

আমার এ সমাধি স্তূপে দিয়ো নাকো ফুল
ব্যথাহত নয়নের জল নাহি চাই,
শুভ্র চাদরে ঢাকা এ জীর্ণদেহে
গেয়ে যেতে দাও শুধু জীবনের ভুল।

খোলা এই আকাশের তলে মুক্তির আস্বাদ,
জীবনের স্বপ্ন শেষে
এই শুধু মোর মনসাধ।

অনুবাদ ঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

মিখাইল শোলোকভ

যুদ্ধের ঘা শুকোতে না শুকোতেই আবার ডন নদীর দু'কূল ছাপিয়ে প্রথম বসন্তের আভাস ফুটে উঠলো ধীরে ধীরে। মার্চ মাস এর শেষদিকেই আজভ সাগরের গরম বাতাস উঠলো, বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসছে নদীর বালিকণা। বরফে ঢাকা পাহাড়ী নদী-নালা, পথ-ঘাট সব একাকার হয়ে গেছে—যেন ঝকঝকে রূপোর পাতে মোড়া বিরাট এক প্রান্তর। গরমে বরফ গলতে আরম্ভ করেছে, স্রোত ছুটছে। যাতায়াতের পথ প্রায় বন্ধ।

বছরের এই বিশ্রী সময়টাতেই আমায় সেবার একটা বিশেষ কাজে বুকানোভস্কায় জেলা শহরে যেতে হলো। খুব বেশীদূরের পথ নয় মাত্র ষাট কিলোমিটার। কিন্তু এই ষাট কিলোমিটার পথ পার হওয়া বিশেষ করে এইসময় ভয়ানক কষ্টসাধ্য। আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সূর্য উঠবার আগেই আমরা রওনা হলাম। তাগড়া তাগড়া দুটো ঘোড়াও রীতিমত কাহিল হয়ে পড়লো আমাদের গাড়ীখানা টানতে টানতে। গাড়ীর চাকা কেবল বসে যাচ্ছে বালি আর নরম বরফে ঢাকা রাস্তায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখা গেলো ঘোড়া দুটোর মুখ দিয়ে সাদা সাদা গাঁজলা উঠছে ক্লান্তিতে। লাগামের চামড়া দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে গাঁজলা। ভোরের নির্মল বাতাস ঘোড়ার ঘাম আর চামড়ার ভ্যাপসা গন্ধে ভারী হয়ে উঠলো।

আমাদের গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত ঘোড়াগুলো আর কোন মতেই যেতে পারবে না বুঝতে পেরে আমরা গাড়ী ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। ভারী বুট কেবল বসে যাচ্ছে কাদায়। পা টেনে তুলতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। পাশেই পড়ে আছে রূপোর পাতে মোড়া রাস্তা। কিন্তু সে পথ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। ছোটো একটা নদী ইলাস্কা, মাত্র ত্রিরিশ কিলোমিটার, পার হতেই আমাদের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় চলে গেল।

মকোভস্কিগ্রামের এই ক্ষীণ নদী গরমকালে শুকনোই থাকে কিন্তু এখন এর রূপ ভয়াবহ। দু কানায় সমান হয়ে বইছে। মাঝে মাঝে ভাসিয়ে দিচ্ছে দু তীরকে। ঘাসগুলো সব কাদায় লেপ্‌টে আছে। একখানা চ্যাপ্‌টা মত ফুটো নৌকায় আমাদের নদীটা পার হতে হবে। নৌকাটায় আবার একসঙ্গে তিনজনের বেশী লোক পার হওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে আমরা ঘোড়া দুটোকে ফেরৎ পাঠালাম। শুনলাম শীত কাল থেকেই একখানা পুরাণো ঝরঝরে জীপগাড়ী ওপারে যৌথ খামারে পড়ে আছে। আমরা সেটা নিয়ে যেতে পারবো। নৌকার মাঝিটার সঙ্গে দুচারটে কথা কথান্তর করে সেই ভাঙা নৌকায় উঠে বসলাম। বন্ধুটি নদীর ধারে আমাদের মালপত্রের পাহারায় রইলো। নৌকার ফুটো দিয়ে হরদম জল ঢুকছে আমরা সেই জল তুলে ফেলতে ফেলতে অগ্রসর হলাম। কোনরকমে জল কেটে কেটে নৌকাখানা এপারে এসে ভিড়লো ঘণ্টা খানেক পর। মাঝি খামার থেকে জীপখানা নিয়ে এলো। নৌকার দাঁড়খানা হাতে তুলতে তুলতে আমায় বললো: ফুটো দিয়ে জল ঢুকে নৌকাখানা যদি না ডুবে যায় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হলেও আপনার বন্ধুকে নিয়ে ফিরতে ঘণ্টা দুয়েক হবে।

এপারের গ্রামখানা নদীর ধার থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সমস্তটাই জলমগ্ন কোন প্রান্তর যেন। শরৎকাল কিংবা প্রথম বসন্তকালের মতই তার অবস্থা। ঘাস লতা পাতার পচা গন্ধে বাতাসটা পর্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে।

জলের ধারে একটা কঞ্চির বেড়া। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় আমি সেই বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই মনটা আমার হতাশায় ভরে উঠলো। সিগারেটের প্যাকেটটা জলে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। রাস্তা পার হওয়ার সময় আমার গায়ে জলের ঢেউ লেগেছে তখনও তার দাগ জামা প্যান্টে স্পষ্ট। সে সময় সিগারেটের কথাটা খেয়াল হলে হয়তো ওগুলো বাঁচাতে পারতাম কিন্তু নৌকার হাল নিয়ে আমি রীতিমত হিমসিম খাচ্ছি—অন্ত কোন দিকে মন দেবার মত অবস্থা ছিল না। যত তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায় সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত যে কোন সময় জল উঠে নৌকাটা উল্টে যেতে পারে। এখন কিন্তু নিজের অসাবধানতার জন্তে নিজের উপরই ভয়ানক বিরক্তি এলো। ভেজা প্যাকেটটাই পকেট থেকে টেনে বের করলাম। খয়েরী রংএর সিগারেটগুলো একটা একটা করে মেলে দিলাম বেড়ার গায়ে।

বেলা প্রায় দুপুর হতে চললো। সূর্যের তেজ যে মাসের মতই প্রখর। ভাবলাম, সিগারেটগুলো তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে নিশ্চয়। গরম লাগছে খুব। এই মিলিটারী ভারী পোষাক আর জ্যাকেটগুলোতে আরও অস্বস্তি লাগছে। মনে হলো আজই বুঝি এ বছরের সবচেয়ে গরম দিন। এই নির্জন স্থানে একাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগছে আমার। পুরানো ওসাকা সৈন্তবাহিনী পিছনে পড়ে আছে। আমি দাঁড় টেনে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছি এখানে। ভিজে যাওয়া চুলগুলো শুকোচ্ছে হাওয়ায়। উদাসভাবে চেয়ে আছি ফিকে নীল আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া হাল্‌কা মেঘের টুকরোগুলোর দিকে।

হঠাৎ নজরে পড়লো গ্রামের শেষ প্রান্তের একটা কুঁড়ে থেকে একজন লোক বের হয়ে রাস্তায় নামলো। মনে হলো লোকটার পিছনে বছর পাঁচ ছয়েকের একটা শিশু আছে। অন্ত কিছু বোঝা গেল না এত দূর থেকে। ওরা ক্লান্তভাবে পার ঘাটার দিকে যেতে যেতে জীপগাড়ীটার কাছ থেকে আমার দিকেই এগোতে আরম্ভ করলো। দেখলাম লোকটা অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ার ফলে সামনের দিকে ঝুঁকে চলে। সোজা আমার কাছে এসে ঘড়ঘড়ে গলায় সম্ভাষণ জানালো—স্বাগতম্ বন্ধু।

—স্বাগতম্। আমি ওর প্রসারিত শির ওঠা শক্ত হাতটা ধরে ঝাঁকি দিলাম। সঙ্গের বাচ্চাটাকে নীচু হয়ে আদেশ দিল—কাকাকে নমস্কার কর। দেখছো না ও ঠিক তোমার বাপের মতই একজন ড্রাইভার। তোমাতে আমাতে লরী চালাই আর ও চালায় ওই দেখ ওই ছোট্ট গাড়ীখানা।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের মত বিশাল একজোড়া চোখ মেলে শিশুটি সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। ছোট একখানা লাল নরম হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমিও খুব যত্ন করে ওর হাতটি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে একটু ঝাঁকি দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর তোমার কি রকম ঠাণ্ডা লাগছে হে বুড়ো কত্তা? আজকের মত এত গরমেও তোমার হাত এরকম ঠাণ্ডা কেন বলতো?

শিশুটি আমার প্রশ্নে তার শিশুসুলভ সরল বিশ্বাসে আমার কোলের কাছে এগিয়ে এসে তার ঈষৎ হলদে ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর বললো :—কাকা, আমি তো বুড়ো নই—ছেলেমানুষ। আমার হাতে ঠাণ্ডা লাগেনি মোটেই। আমি এতক্ষণ বরফের গোলা পাকাচ্ছিলাম বলেই এত ঠাণ্ডা লাগছে হাতটা।

পিঠ থেকে একটা আধখালি বস্তা নামিয়ে লোকটি আমার পাশে চেপে বসলো। বললে—বুঝলেন দোস্ত, আমার এই বাচ্চা সঙ্গীটি একটি ছোটখাট ঝঞ্ঝাট বলতে পারেন। ও নিজে তো ক্লান্ত হবেই আর সেই সঙ্গে আমাকেও ক্লান্ত করে ছাড়বে। যদি একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করবো অমনি ছোঁড়াটা একেবারে আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করে দেবে। তখন ওর তালে তাল দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় থাকে বলুন? যেখানে আমি এক পদক্ষেপে যেতে পারি ওর জন্তেই শুধু সেইটুকু যেতেই দশ বারো পদক্ষেপ লাগে। এই ভাবে সেই গল্পে পড়া ঘোড়া আর কাছিমের মত চলতে হয় আমাদের দুজনকে। এর পরেও ওকে সামলাবার জন্তে পিছন দিকে দুটো চোখ থাকা দরকার। পিছন ফিরেছেন কি অমনি হয় কোন নালার ধারে বসে তাস নিয়ে খেলা আরম্ভ করবে না হয় বরফ কুড়িয়ে বাতাসার মত চুষতে থাকবে। ওর মত ছেলেকে সঙ্গে করে কারোও কোথাও যাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে পদব্রজে তো কখনই না। কিছুক্ষণের জন্তে লোকটা থামলো। তারপর আমায় প্রশ্ন করলো আপনার কি খবর বলুন দোস্ত, আপনার অধিনায়কের জন্তে অপেক্ষা করছেন বুঝি?

আমি যে মোটেই ড্রাইভার নই সেকথা ওকে এখন বলতে ইচ্ছা হলো না। তাই বললাম—দেখছেই তো পাচ্ছেন।

: উনি কি অন্ত রাস্তা দিয়ে আসছেন?

: তাই হয়তো হবে।

: নৌকোটা কতক্ষণে এপারে ফিরবে বলতে পারেন?

: ঘণ্টা দুয়েক হবে।

: ওহো—তা হলে তো অনেক দেরী আছে। তবে এখন বেশ খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমারও এমন বিশেষ কোন তাড়া নেই। রাস্তায় নেমে দূর থেকে আপনাকে দেখে ভাবলাম হয়তো আমাদেরই মত কোন ড্রাইভার এখানে বসে বসে রোদ পোয়াচ্ছে। যাই একসঙ্গে বসে একটু ধূমপান করে আসি। বুঝলেন, একা একা ধূমপান করতে আমার মোটেই ভালো লাগে না। কোন আনন্দ পাই না। একলা কিছু করতে। তবে মৃত্যুর আনন্দটা একা ছাড়া আর কে ভোগ করবে? তা, আপনি তো দেখছি বেশ ভালোই আছেন। ধূমপান করছেন? আহা-হা! সব যে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ইস! ডাক্তারদের ঘোড়া আর ভিজে সিগারেট সমান অকেজো। আচ্ছা ভাই, দেখি আমার এই ছেঁড়া জামাটার পকেটগুলো খুঁজে যদি কিছু পাওয়া যায়।

লোকটা ওর মোটা খাকী প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিল্কের জীর্ণ তামাক রাখা থলে বের করলো। দেখলাম থলেটার এক কোণে এমব্রয়ডারী করে লেখা রয়েছে, একজন প্রিয় সৈনিককে লেবোয়াস্কা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের প্রীতি উপহার। আমরা তারপর নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম ওকে জিজ্ঞাসা করবো যে এই দুর্গম পথে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কেন বেরিয়েছে? কিন্তু তার আগেই ও আমায় প্রশ্ন করে বসলো।
—আপনি কি এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই কাজ করছেন?

: প্রায় গোড়ার থেকেই বলতে পারেন

: সীমান্তে?

: হ্যাঁ। সীমান্তে।

: আমি কিন্তু এখানে ভয়ানক কষ্ট পেয়েছি।

লোকটি ওর কালো কালো বিশাল হাত দুখানাকে হাঁটুর ওপর রেখে কাঁধটা নামিয়ে ক্লান্ত ভাবে বসলো। আমি একবার আড়চোখে ওর দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। আচ্ছা, আপনি কি কখনও এমন কোন চোখ দেখেছেন যে চোখ দেখে মনে হবে কেউ যেন চোখ দুটোর ওপর একমুঠো ছাই ছড়িয়ে দিয়েছে? দারুণ উৎকণ্ঠা আর নৈরাশ্যে ছেয়ে আছে দুটো চোখ। জীবনে এই প্রথম আমি ওই রকম এক জোড়া চোখ দেখলাম।

বেড়ার থেকে একটা শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে ও কিছুক্ষণ সেটা দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটতে লাগলো। একসময় হঠাৎ বলে উঠলো, বুঝলেন দোস্ত, অনেকদিন আমি রাত্রে একদম ঘুমোতে পারতাম না। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কেবল ভাবতাম, এ জীবন দিয়ে দিয়ে আর কি হবে? কেন এভাবে আমি পঙ্গু হয়ে গেলাম? আমার নাড়ি ভুঁড়ি পর্যন্ত কেন এ ভাবে টেনে ছিঁড়ে দিল। আমার এসব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি কোন সময়েই পেতামনা। না রাতের অন্ধকারে না সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়। পরমুহূর্তেই ও আত্মস্থ হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে বললো—যাও বাচ্চু, জলের ধারে গিয়ে খেলা করগে। কিন্তু খবরদার পা ভিজিও না—মনে থাকে যেন।

যে সময় আমরা চুপচাপ তামাক টানছিলাম তখনই আমি বেশ খুঁটিয়ে ভালোভাবে ওদের বাপবেটাকে লক্ষ্য করেছি। একটা ব্যাপার আমার খুবই আশ্চর্য্য লেগেছে। দেখলাম ছেলেটির গায়ের পোষাকগুলো খুবই সাধারণ তবু বেশ দামী কাপড়ে মজবুত ভাবে তৈরী। ছোট ছোট ছেঁড়া কাটা যায়গাগুলোর সেলাই মনে হলো সে সব যায়গায় মায়ের স্নেহ পরশ লেগে রয়েছে। কিন্তু বাপটির অবস্থা একেবারে উল্টো। ওর গায়ের তুলোভরা জামাটার যায়গায় যায়গায় পোড়াগুলো মোটা মোটা তালিমারা, খাকি প্যান্টের ছেঁড়াগুলো সব এলোমেলোভাবে সেলাই করা সবটাতেই কেমন যেন পুরুষালী

হং। লোকটার পায়ের বুটের জুতোজোড়া অবশ্য প্রায় নোতুনই বলা চলে কিন্তু মোজাজোড়া একেবারে শতছিন্ন, ওগুলোর ওপর কোনদিন কোন স্ত্রীলোকের ছোঁয়া লেগেছে বলে বলে আমার মনে হয় না। ভাবলাম, লোকটা হয় বিপত্নীক না হয় ওদের স্বামিস্ত্রীর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা গণ্ডগোল ঘটেছে—তা নাহলে কিছুতেই এমন অবস্থা হতে পারে না।

লোকটা মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে জলের ধারে ছেলেটিকে দেখে এলো। তারপর একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো। আমি ওর প্রতিটি কথায় রীতিমত মনোযোগ দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করলাম।

বুঝলেন দোস্ত, আমার জীবনের আরম্ভটা খুবই সাধারণ। ১১০০ খৃষ্টাব্দে ভোরোনেজ প্রদেশে আমার জন্ম হয়। সিভিল ওয়ারের সময় আমি লাল ফৌজের কিকভিজ বিভাগে কাজ করতাম। বাইশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় আমি কুবানদের হয়ে ষাঁড়ের মত লড়েছি। আর সে সময় ও ভাবে লড়াই না করলে আজ আর আমার বেঁচে থাকতে হতো না। কিন্তু সেই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষে আমার দেশের বাড়ীর সকলে মানে আমার মা, বাবা, বোন সবাই না খেয়ে শুকিয়ে মরলো। পৃথিবীতে আমার আপনার জন বলতে আর কেউ রইল না। নিঃসম্বল অবস্থায় আমি একা পড়ে রইলাম। প্রায় বছর খানেক পরে কুবান থেকে ফিরে দেশের ঘরবাড়ী বিক্রী করে ভোরোনেজ চলে গেলাম। সেখানে প্রথমে কিছুদিন ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করলাম। তারপর একটা কারখানায় মিস্ত্রির কাজ শিখতে আরম্ভ করলাম। কিছুদিন পর শিশুসদনের একটি অনাথা মেয়েকে বিয়ে করলাম। মেয়েটি সত্যিই খুব ভালো। আমায় কি ভাবে সুখী করবে সেই চিন্তাতেই সব সময় ব্যস্ত থাকতো। মেয়েটি এত চটপটে যে আমার সঙ্গে তার কোন তুলনা-ই চলে না। মনে হয়, ছোট থেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে ওর মনটাকে ওইভাবে গড়ে তুলেছে। পাশ থেকে দেখে মেয়েটির সৌন্দর্য্য ঠিক বোঝা যেতোনা বলেই আমি কোন দিনই ওকে পাশ থেকে দেখিনি। সময় পেলেই আমি ওর গোটা মুখখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম। আমার মতে ওর মত সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না—আজো নেই।

মাঝে মাঝে কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, মেজাজটাও রুক্ষ হয়ে থাকতো। কিন্তু আমার স্ত্রী কোন দিনই আমার ওপর কোন রকম রুক্ষ ব্যবহার করেনি। সব সময় শান্তি মধুর ব্যবহারে আমার সমস্ত ক্লান্তি-দূর করে দিত। আমাকে সুস্থ করে তুলতে ও প্রাণপণ চেষ্টা করতো। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়তাম। তার পর এক সময়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বলতাম—প্রিয়তমা ইরিণা, সমস্ত দিন কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনিতে সত্যিই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ও অনেকটা সহজ হয়ে উঠতো তার পর। কারখানায় কাজে কি রকম সাংঘাতিক পরিশ্রম হয় জানেন তো? ওই পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে যদি স্ত্রীর সেবা যত্ন বা স্নেহপরশ না পাওয়া যায় তাহলে মনের কি অবস্থা হয় বুঝতেই পারছেন?

বেতন পাওয়ার দিন মাঝে মাঝে ছেলে-ছোকরাদের দলে পড়ে পানশালায় গিয়ে মদ খেতাম প্রচুর। চলতে গেলে পা টলতো পাশের সরু রাস্তা ধরে একলা চলতাম। বড় রাস্তা ধরে চলতে লজ্জা লাগতো। কখনও বা কাপড় জামার ঠিক থাকতো না। সব খুলে জড়িয়ে বুকে হেঁটে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতাম। তখন অবশ্য আমার কোন রকম চীৎকার গালাগাল বা শব্দ করার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকতো না। ইরিণা আমার এই রকম অবস্থা দেখে হেসে ফেলতো। এমন ভাব দেখাতো যে আমি মদ খেয়ে এ রকম মাতলামী করে কোন অন্যায় করিনি। আমার পা থেকে জুতো খুলে নেবার সময় ধীরে ধীরে বলতো—এন্দ্রি, আজকের রাতটা তুমি বরং ওপাশের ঘরে গিয়ে শোও, তা না হলে ঘুমের ঘোরে হয়তো বিছানা থেকে পড়ে যাবে।

আমি যবের বস্তার মত ধপাস করে মাটিতে পড়তাম আর মনে হতো আমার চোখের সামনে সব কিছু সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পর যখন আমার একটু তন্দ্রা আসতো তখনই আমি বুঝতে পারতাম, ইরিণার স্নেহ-কোমল স্পর্শ আমার মাথায়, আর শুনতে পেতাম ওর সান্ত্বনাবাণী। আমি জানতাম, আমার এই অবস্থার জন্যে মেয়েটা বড় আঘাত পেয়েছে।

সকালেই ও আমাকে ঘণ্টা দুই আগে বিছানা থেকে উঠিয়ে দিতো বাইরে একটু ঘুরে আসার জন্যে। ও জানতো, মদ খাওয়ার পর আমি কিছুই মুখে দিইনা। আমার জন্যে শসা কিংবা অন্য কোন ফল আর এক গ্লাস ভদকা নিয়ে আসতো আগের দিনের অবসাদ দূর করতে। এই নাও এন্ডি, ও রকম আর কোরো না প্রিয়তম। একজন যদি এতখানি বিশ্বাস করতে পারে তাহলে সে বিশ্বাস কি করে ভাঙা যায়? আমি নিঃশব্দে ভদকার গ্লাস শেষ করতাম আর মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতাম ওকে। তার পর ওকে টেনে নিয়ে একটু আদর করে চলে যেতাম শান্ত মেষশাবকের মত নিজের কাজে। ভেবে দেখুন দোস্ত, ও যদি আমায় মাতাল হতে দেখে গালাগাল

করতো কিংবা চেঁচামেচি করতো তাহলে তো আমি হলফ করে বলতে পারি রোজই আমি মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরতাম ঠিক। আমি ওরকম অনেক লোককে জানি, তাদের স্ত্রীরা অত্যন্ত বেয়াকুব। ও আমার জানা আছে অনেক দেখেছি।

তারপর বেশ তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে ছেলেমেয়ে আসতে আরম্ভ করলো। প্রথমে একটি ছেলে তারপর দুটি মেয়ে। আর সে সময় থেকেই আমি বন্ধুবান্ধবদের দল ছাড়লাম। সমস্ত টাকা পয়সা স্ত্রীর হাতে তুলে দিতাম। তখন থেকেই আমরা সত্যিকারের সুখী সংসারী হলাম। মদ খাওয়ার সময়ই পেতাম না। সমস্ত দিনের পর বড় জোর এক গ্লাস বীয়ার হয় তো খেতাম কোন কোন দিন। এই ভাবেই আমাদের জীবন বেশ চলছিল। ২১ সালে মোটরের কাজ শিখবার খেয়াল হলো। আমি মোটর চালানো শিখতে লাগলাম—আর একটা লরীতে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। এ কাজটা যখন আমি শিখে ফেললাম তখন আর কারখানার কাজে ফিরে যেতে মন চাইল না। আমি এইটাকেই আমার জীবিকা হিসাবে বেছে নিলাম। দশটা বছর যে আমাদের কোন দিক দিয়ে কি ভাবে পার হয়ে গেল, টেরও পেলাম না। যেন একটা বিরাট সুখস্বপ্ন। কিন্তু ফেলে-আসা সেই দশটা বছরে আমি কি পেয়েছি? যে কোন চল্লিশ বছর পার হয়ে যাওয়া প্রৌঢ়কে প্রশ্ন করলে দেখা যাবে এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন না। কারণ কেউ কোনদিন চলার কালের হিসাব রাখতে চায় না। অতীত যেন সকলের কাছেই পিছনে পড়ে থাকা একটা আবছা সবুজ প্রান্তর। আজ সকালেই ওই সবুজ প্রান্তরটুকু পার হয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি। আসবার সময় ভালোভাবে দেখে আসা হয়নি মাঠটা। অথচ এতদূর থেকে আর বুঝতে পারা যাচ্ছে না, মাঠটা ঠিকমত লাঙল দেওয়া হয়েছে কিনা। দূরে ওটা কি গাছ!

ওই দশটা বছর আমি দিন-রাত যন্ত্রের মত কাজ করেছি। রোজগার করছি ভালই। সাধারণের অপেক্ষা আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। ছেলেমেয়েরা ছিল আমাদের দুজনের আনন্দের উৎস। লেখাপড়াতেও ওরা ভালো। বড়টি তো অঙ্কশাস্ত্রে রীতিমত সুনাম পেলো। এমন কি, মস্কোর কাগজে পর্যন্ত ওর প্রশংসা ছাপা হলো। আমার ছেলের এতখানি বুদ্ধি কি করে হলো সে কথাটা আমিই আপনাকে বলতে পারবো না দোস্ত! তবে একথা সত্যি যে, অ্যানাটলির এই অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভার জন্যে আমি ভয়ানক গর্ব অনুভব করতাম। দশ বছরের মধ্যে আমরা কিছু জমিয়ে যুদ্ধের আগেই নিজেদের মনের মত ছোট একটা ঘর তৈরী করলাম। ইরিণা একজোড়া ছাগল কিনলো। এর বেশী আমাদের মত লোকের আর কি চাই বলুন? ছেলেদের জন্যে দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের মাথা গুঁজবার মত একখানা ঘর হয়েছে, খাওয়া-পরার একটা মোটামুটি বন্দোবস্তও আছে। তবে বাড়ীখানা ঠিক আমার পছন্দমত জায়গায় হয়নি। ওরা আমায় একটা এরোপ্লেনের কারখানার পাশে বাড়ী করার জায়গা দিল। এই জমিটা যদি অন্য কোনখানে আমি পেতাম তা হলে হয়তো আমার জীবনের গতি অন্য রকম হতো বন্ধু!

এর পর এলো সর্বনাশা যুদ্ধ। একদিন কাগজপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার ডাক এলো আমারও। খবর পেলাম পরদিনই আমায় ষ্টেশনে তৈরী থাকতে হবে। আমার স্ত্রী ইরিণা, অ্যানাটলি আর মেয়ে দুটো নাসতেঙ্কা ওলিউষ্কা ওরা চার জনেই হতভম্ব হয়ে গেল এই মর্মান্তিক সংবাদে। বাচ্চাগুলো অবশ্য এটাকে একটা খেলা বলেই ধরে নিল। অ্যানাটলি প্রথমে চমকে উঠলো একবার তারপরেই কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছেলেটার বয়স তখন হয়তো গোটা সতেরো হবে। সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে তো! কিন্তু আমার প্রাণের ইরিণা—বিবাহিত জীবনের সতেরোটা বছরের একটা দিনও আমরা পরস্পরকে ছেড়ে দূরে থাকিনি। রাত্রে আমার বুকখানা চোখের জলে ধুইয়ে দিল। পরদিন সকাল পর্যন্ত একই ভাবে কাটলো। তারপর এলো আমার যাত্রার সময়। আমি ইরিণার দিকে ভালো ভাবে তাকাতে পারলাম না। কান্নার দমকে ঠোঁট দুখানা তখনও ফুলে রয়েছে। মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো শালের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মুখে-চোখে। নিষ্প্রাণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে, বুঝি ওর মনটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অফিসার সকলকে গাড়ীতে ওঠার আদেশ দিলেন কিন্তু ইরিণা হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর নরম হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। ওর সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে বিরাট এক ঝড়ের দোলায়। ছেলেমেয়েরা ওর কাছে এসে কথা বলতে চেষ্টা করলো, আমিও সান্ত্বনা দিতে গেলাম কিন্তু আমার গলা দিয়ে স্বর বের হলো না। একটা কথাও বলতে পারলাম না ওকে। অন্যান্য মেয়েরা দেখলাম নিজের স্বামিপুত্রদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কইছে কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে আছে নিশ্চল ভাবে যেন শাখার সঙ্গে একটি পাতা লেগে রয়েছে। পাতার মতই কাঁপছে, একটি কথাও বলতে পারছে না। একটু শান্ত হও লক্ষ্মীটি, যাওয়ার সময় দু'-একটা কথা বলে আমায় সান্ত্বনা দাও প্রিয়তমা ইরিণা আমার!

ইরিণা কথা বললো। প্রতিটি শব্দের ওপর অজস্র চোখের জল ঢেলে অনেক কষ্টে আমার প্রিয়তমা ইরিণা কথা বললো—প্রিয়—প্রিয়তম আমার আমরা—আমরা হয়তো ইহজীবনে আর কোনদিন পরস্পরকে দেখতে পাবো না।

আমার মন যে সময় ওর সঙ্গে বিচ্ছেদের ব্যথায় কাঁদছে সেই মুহূর্তে ইরিণা আমায় ওই কথা শোনালো! ওর বোঝা উচিৎ ওকে ছেড়ে যেতে আমারও হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। আমি কোন উৎসবে আনন্দ করতে যাচ্ছি না নিশ্চয়ই। ইরিণার হাতের বাঁধন খুলে ওকে সরিয়ে দিলাম আমার কাছ থেকে। আমার কাছে তখন ইরিণাকে ও ভাবে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াটা কিছুই নয়। কারণ আমার মনটা সে সময় গোঁয়ার ষাঁড়ের মতই দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। আমার ধাক্কায় সে বেচারা তিন চার পা পিছিয়ে গেছিল কিন্তু পর মুহূর্তেই ও আবার আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলাম—এই কি তোমার বিদায় সম্ভাষণ? তুমি তাহলে এখুনিই আমার মৃত্যু কামনা করছো? কিন্তু আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলাম, কারণ বুঝতে পারলাম ওর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

সহসা লোকটা ভেঙে পড়লো। নিস্তব্ধতার মধ্যেই অনুভব করলাম ওর গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে। ওর এই আবেগ হয়তো আমাকেও সংক্রামিত করে ফেলেছে। আমি একবার

ওর দিকে চাইলাম আড়চোখে কিন্তু ওর ওই প্রাণহীন সাদা চোখের কোণে এক ফোঁটাও জল দেখতে পেলাম না। মাথাটা নামিয়ে বসে আছে ও। লম্বা লম্বা হাত দুখানা ঝুলে আছে দুপাশে, মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে একটু; থুতনীটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট দুখানাও। আমি ওকে বেশ শান্ত ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম—দেখো, এসব কথা চিন্তা করে আর মন খারাপ করো না। আমার কথা ওর কানে ঢুকলো বলে তো মনে হোলো না। সমস্ত আবেগকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ খড়খড়ে গলায় বলে উঠলো: আমার জীবনের শেষ দিনে শেষ মুহূর্তেও ইরিণাকে ওই ভাবে ঠেলে দিয়েছিলাম বলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।

আবার কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। একটা সিগারেট তৈরী করার চেষ্টা করলো খবরের কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে কিন্তু তামাকটা ছড়িয়ে গেল ওর আশে পাশে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কোন রকমে তামাক আর কাগজে জড়িয়ে বাঁকাচোরা ভাবে পাকিয়ে বিরক্ত ভাবে কয়েকটা টান দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করলো—

ইরিণার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ওর মুখখানা ধরে বিদায়-চুম্বন দিলাম। ঠোঁটগুলো যেন ঠাণ্ডা বরফ। বাচ্চাদের বিদায় জানিয়ে চলন্ত গাড়ীতে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেণ চলছে খুব আস্তে আস্তে। আমি গাড়ী থেকে আবার বাইরে তাকালাম। দেখলাম, আমার অনাথ ছেলেরা তাদের ছোট ছোট হাতগুলো হাওয়ায় দোলাচ্ছে—মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আর আমার প্রাণের ইরিণা ওর হাতখানাকে জোর করে বুকের সঙ্গে আটকে রেখেছে। ঠোঁটগুলো চকখড়ির মত সাদা। কি যেন বলছে ফিস্‌-ফিস্‌ করে, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গাড়ীখানার দিকে। সামনের দিকে ঝুয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করার পর। আর ঠিক এই ভাবেই ইরিণার ছবিখানা আমার বাকী জীবনে বেঁচে আছে। হাত দুখানা বুকের ওপর সংবদ্ধ, ঠোঁটগুলো চকখড়ির সাদা, বড় বড় চোখ দুটো জলভারে টলটল করছে; এই মূর্তিতেই সে আমার স্বপ্নের মধ্যে জেগে থাকে। কিন্তু আমি ওকে সেদিন এমন হিংস্রভাবে কেন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম আমার কাছ থেকে? এখনও কথাটা মনে হতেই ভাবি, আমি সে সময় বোকার মত নিজের হৃৎপিণ্ডটাকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নষ্ট করে ফেলেছি।

আমাদের সকলকে প্রথমে ইউক্রেনের বেলাইয়া সেরকভ-এ নিয়ে এলো। এর পরের যুদ্ধের বিবরণ আশা করি আর আপনাকে দিতে হবে না। কারণ আপনি স্বচক্ষে সবই দেখেছেন—সবই জানেন। বাড়ী থেকে গাদা গাদা চিঠিপত্র আসে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা লিখবার অধিকার নেই। সামান্য দু'-একটা মামুলী কুশল সংবাদ আদান-প্রদান আর যুদ্ধের সুখবর ছাড়া আর কিছুই লেখা চলবে না। হয়তো কোথাও আমাদের পরাজিত হয়ে পিছু হঠে আসতে হচ্ছে কিন্তু চিঠিতে সে কথা চলবে না, লিখতে হবে আমরা সুসংবদ্ধ হওয়ার জন্যে, আরও বিপুল সৈন্য সমাবেশের জন্যেই কিছুটা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এছাড়া আর কি-ই বা লেখার থাকে আমাদের? সেই ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে আর চিঠিপত্র লেখার মত অবস্থা কারও থাকে না। আমি অবশ্য আর সবার মত কোনদিনই সেই একঘে দুঃখের কাঁদুনী গাইনি। প্রত্যেক দিন অকারণ চোখের জলে নাে জলে ভিজিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের চিঠি দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করত না। উঃ! কি দুর্বিষহ জীবন! আমার মৃত্যু সমাসন্ন! এ আবোল-তাবোল লেখার কোন মানে হয় না। এই সব শয়তানে দল জোর করে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় কর চায় কিন্তু হতভাগারা একবারও চিন্তা করে না যে আমরা আমাদ স্ত্রী-পুত্রদের কি রকম অসহায় অবস্থায় দুঃখের বোঝা মাথায় চাপি ফেলে এসেছি। দেশের সমস্ত দায়িত্ব তাদেরই ঘাড়ে। ওই বিরা দায়িত্বের বোঝাতেই কি ওরা চাপা পড়ে যাবে না? কতটুকু ওদে ক্ষমতা যে এত বড় গুরুভার ওরা বইবে? আর এই অবস্থায় য আমাদের কাছ থেকে এই ধরণের চিঠি ওরা পায় তাহলে ওদের কি পরিণতি হবে সে কথা যদি না আমরা চিন্তা করি তবে কে করবে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে এ ধরণের চিঠি গেলেই তারা দিশাহারা হয়ে পড়বে ওদের সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড হয়ে যাবে। এই জন্যেই কি মানুষ হ মাটিতে জন্ম নিয়েছি? সৈনিকের বৃত্তি নিয়েছি? না, সব কি সহ্য করে সমস্ত ভার বহন করার জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছি সৈনিকের বৃত্তি নিয়েছি। অবশ্য যদি আমাদের মধ্যে কারও ভিত পুরুষের প্রকৃতির পরিবর্তে নারীপ্রকৃতির প্রভাব বেশী থাকে তাহে তার সৈনিকের পোষাক খুলে ফেলে ফ্রিল দেওয়া ঘাগরা পরা উচিত পিছন থেকে মেয়েছেলের মত খানিকটা দেখাবে। তারপর ঘরে কাজকর্ম নিয়ে থাকতে পারবে, দুধ দোয়াতে পারবে বেশ, কার ওদের দিয়ে যুদ্ধের কোন কাজই হবে না, ঘর গৃহস্থালীতেই তাদে মানাবে।

আমার কিন্তু এক বছরের মধ্যে দুবার আহত হতে হলো প্রথম বারে বাঁ হাতে সামান্য আঘাত দ্বিতীয় বারে পায়ে লাগলো জার্মাণ সৈন্য চারিদিক থেকে আমার লরীখানা ঘিরে ফেললো। অব প্রথম দিকটায় বরাবর আমার ভাগ্যটা ভালোই চলছিল বলা চ কিন্তু এই প্রথম আমি দুর্ভাগ্যের সামনাসামনি দাঁড়ালাম বিয়াল্লিশের মে মাসে আমি লোজোভেস্কিতে বন্দী হলাম। একট বিশ্রী রকম ওলোট-পালট হয়ে গেল। জার্মাণরা আমাদের বাহিনী ওপর প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে সমানে। আমাদের একটা ছো কামান উঠিয়ে আনতে ভুল হয়ে গেছে দেখে আমার লরীখানা গুলী-গোলা বোঝাই করে চললাম কামানটা উঠিয়ে আনতে আমাদিগকে একটু তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে এখান থেকে, কার শত্রুরা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে এই দিকে। বাঁদিক থেকে [ট্যাঙ্ক-এ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডাইনে সামনে সমানে গুলী চলছে কাজেই আমাদের অবস্থাটা যে মোটেই আশাপ্রদ নয়, সেটুক বুঝবার ক্ষমতা তখনও ছিল।

আমাদের কমাণ্ডার আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন—সোকোলভ তুমি সোজা যেতে পারবে?

—আমার অন্যান্য সাথীরা যখন মৃত্যুমুখে তখন কি আমি বসে বসে বুড়ো আঙুল নিয়ে খেলা করতে পারি? আপনি কি বলতে চাইছেন কম্যাণ্ডার? আমিও সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম। তারপর বললাম —দরকার হলে আমি নিশ্চয়ই গাড়ী নিয়ে সোজা যেতে পারবো।

তখন কম্যাণ্ডার হুকুম দিলেন—সব ভেঙে দিয়ে এগিয়ে চল।

আমি সত্যিই এগিয়ে চললাম। জীবনে এ ভাবে আর কোন দিন আমি গাড়ী চালাইনি। আমি যে কোদাল-খোঁড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছি না, সে খেয়াল আমার আছে কিন্তু গাড়ীতে যা বোঝাই করা আছে, সেগুলো কি ভাবে যে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবো বুঝতে পারছি না। চারিদিকে শত্রুসৈন্যরা হাতাহাতি যুদ্ধ করছে, গোলাগুলীর আগুন ধোঁয়ায় পথ-ঘাট সব আচ্ছন্ন। আমি নির্দিষ্ট জায়গার দিকে প্রায় দু' কিলোমিটার রাস্তা এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি কামানটা আছে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কি দেখলাম জানি? ভাবলাম, যদি আমাদের পদাতিকবাহিনী রাস্তার দুদিক থেকেই পিছু হটে আসে, তাহলে তো শত্রুর গোলাগুলো সব ওদের পিঠের ওপরেই পড়বে। কামানটার কাছে পৌঁছতে আর মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা বাকী। আমি তাড়াতাড়ি করলাম কিন্তু দোস্ত, গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলাম না। আমার লরীর সামনেই একটা বিস্ফোরণ হলো। মনে হলো, গোলাটা বুঝি বা আমার মাথাতেই পড়েছে। তারপর আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। কি ভাবে আমি বেঁচে গেলাম খালের মধ্যে কতক্ষণই বা পড়েছিলাম, সে-সব আমি কিছুই জানি না। তারপর একসময় চোখ খুললাম, উঠতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। মাথাটা অস্বাভাবিক রকম ভারী, মনে হোলো জ্বরে গোটা গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। সব কিছু অন্ধকার। আমার বাঁ কাঁধটায় কেউ যেন ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে কুরে কুরে দিচ্ছে। সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা। অনেকক্ষণ থেকেই পেটটায় খুব মোচড় দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে উঠে বসলাম আমি। কিন্তু বর্তমানে আমি কোথায় কি অবস্থায় আছি, কিছুই বোধগম্য হলো না আমার। বুঝলাম, আমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পেয়েছে। আমি বুঝি ভয় পেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম—ভয় পেয়ে শুয়ে পড়লে পরে আর হয়তো একেবারেই উঠতে পারবো না ভেবে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু প্রবল ঝড়ে গাছগুলো যেমন টলে, আমিও ঠিক সেই ভাবে টলছি তখন।

যখন আমার সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন একবার চারিদিকে ভালো করে তাকালাম। মনে হলো, আমার হৃৎপিণ্ডটাকে কেউ বুঝি দাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরেছে। আমার গাড়ীতে যেসব গোলা ছিল সেগুলো কি আমার চারপাশে ছড়িয়ে গেছে! লরীখানা হয়তো টুকরো টুকরো হয়ে চাকা ওপর দিকে করে উল্টে পড়ে আছে কাছাকাছি কোথাও। আর লড়াই!···আমার পিছনেই লড়াই চলছে। হ্যাঁ, ঠিক আমারই পিছনে।

যখন বুঝলাম যে আমি ফ্যাসিস্তদের হাতে বন্দী হয়েছি তখন আমার একটুও লজ্জা বা দুঃখ হলো না। কারণ, এই তো আমাদের যুদ্ধের রীতি।

না, না দোস্ত, আপনি যা ভাবছেন, ব্যাপারটা ততখানি সোজা নয়। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সৈনিক যে শত্রুর হাতে বন্দী হতে পারে, একথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। আর যাদের এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাদের তো কোনমতেই এর সত্যাসত্য বোঝানো যাবে না?

আবার একটা ট্যাঙ্কের আওয়াজ শুনে আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। চারটে মাঝারীগোছের জার্মাণ ট্যাঙ্ক আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, আমি যেদিক থেকে এসেছি সেই দিক দিয়ে। আমার সে সময়ের অবস্থাটা আশা করি উপলব্ধি করতে পারছেন। তারপরেই দেখলাম, একঝাঁক ট্রাকটার গুলী চালাতে চালাতে পার হলো। পিছনে একটা ভ্রাম্যমান রন্ধনশালা তার পিছনে একটা ছোটখাট পদাতিক বাহিনী। আমি আড়চোখে ওদের প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করছি—তারপর কি মনে হলো, আস্তে আস্তে মাথাটা আবার একটু তুললাম আর এই দুর্বলতাই আমার কাল হোলো। ওরা সব পার হয়ে গেছে ভেবেই মাথাটা যেমনি উঠিয়েছি, অমনি দেখি, দু'জন মেশিনগানচালক আমার কাছ থেকে মাত্র শতখানেক কদম দূরে মার্চ করে আসছে। আমাকে দেখেই ওরা কোন কথা না বলে রাস্তা ছেড়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলো। বুঝলাম, ইহলীলা এখুনি শেষ হবে। মরতেই যখন হবে তখন আর মেহাৎ শুয়ে শুয়ে কেন মরি, উঠে বসাই যাক। বসতে গিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলাম। ওদের মধ্যে একজন আমার সামনে এসে কাঁধ থেকে বন্দুক তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু, কি আশ্চর্য! সেই চরম মুহূর্তে, যার ভয়ে মানুষমাত্রেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় সেই ভয়াবহ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটুও ভয় হলো না আমার! এমন কি হৃৎস্পন্দনের কোন তারতম্যও বুঝতে পারলাম না আমি। আমি শত্রুসৈন্যটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম—এখুনি ওর হাতের বন্দুকটা গর্জে উঠবে। কিন্তু গুলীটা আমার কোথায় লাগবে? মাথায় না ঠিক বুকের মাঝখানে? অবশ্য ওটা এমন কোন বিশেষ ভাবনা নয়। আমার শরীরের যে কোন জায়গা ফুটো করে দিতে পারে।

লোকটির বয়স কিন্তু অল্প আর স্বাস্থ্যটাও বেশ চমৎকার! চুলগুলো সব কালো কুচকুচে কিন্তু ঠোঁট দুটো বড় বেশী পাতলা আর চোখের দৃষ্টিতে এত বেশী বর্বরতা ফুটে উঠেছে যে শয়তানটা কেন আমায় গুলী করতে এত চিন্তা করছে বুঝতে পারছি না। ওর লক্ষ্য সম্বন্ধে ও যে স্থির, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমিও স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম অন্য একজন, হয়তো দলের করপোর‍্যাল হবে—সামনের সৈন্যটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমার সামনে এলো। নিজেদের ভাষায় কি সব চেঁচামেচি করলো কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ আমার ডান কাঁধটা টিপে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলো। বললে,—ওহো! তারপর অস্তাচলগামী সূর্য যেখানে এসে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠলো:—যা রে ছুঁচো, দূর হয়ে যা এখান থেকে। যা আমাদের রাইখের কাজ করগে। বুঝলাম এই মোটা লোকটি একটি আস্ত শয়তান।

ওদের মধ্যে একজনের নজর পড়লো আমার শক্ত বুট-জোড়ার ওপর। বলে উঠলো: ওরে হতভাগা, ওটা খুলে দে। আমি মাটিতে বসে জুতোটা পায়ের থেকে খুলে লোকটির হাতে তুলে দিলাম। বলতে গেলে একরকম আমার হাত থেকে ছিনিয়েই নিল ওটা। তারপর পায়ের পটিটা খুলে ওর দিকে তাকালাম কিন্তু লোকটা চীৎকার করে আমাকে ধমকে উঠলো, হাতের বন্দুকটা আবার আমার মাথা লক্ষ্য করে তুললো। ওর অন্যান্য সাথীরা হাসিতে ফেটে পড়লো। তারপরেই ওরা আবার চলতে আরম্ভ করলো। শুধু প্রথমকার লোকটা রাস্তায় নামবার আগে আমার দিকে কেবল ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। তার চাউনিতে ক্ষুধার্ত নেকড়ের হিংস্রতা চক-চক করছে।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে আমি বুঝি ওই লোকটার জুতোর পরিবর্তে আমার জুতো জোড়াটা ওকে দিলাম। কিন্তু ওসবের কোন বালাই নেই দোস্ত। তারপর সেই প্রচণ্ড গরমে আমি খালি পায়ে পথ চলতে লাগলাম, পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে উপায়হীন বন্দী আমি। পথ হাঁটার মত দৈহিক অবস্থা সে সময় আমার আদৌ ছিল না, ঘণ্টায় খুব জোর হয়তো এক কিলোমিটার পথ চলতে পারি। মাতালদের মত আমার শরীরের অবস্থা। সোজাভাবে চলবার হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই পারছি না। কে যেন পিছন থেকে আমায় রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর হাঁটতেই দেখলাম আমাদের দলের আরও অনেকে বন্দী হয়ে চলেছে—আমিও ওদের সঙ্গ ধরলাম। জন দশেক জার্মাণ সৈন্য ছুটে এসে আচমকা আমার মাথায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলো। আর সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে যদি মাটিতে পড়ে যাই—তাহলে পশুটা আমাকে মাটির সঙ্গে থেঁতলে দেবে নির্ঘাৎ, কাজেই দলের একজন আমায় সাহায্য করলো। আমাকে ওদের মাঝখানে নিয়ে এলো, কিছুক্ষণ তো আমাকে টেনেই নিয়ে চললো ওরা। আমি একটু ধাতস্থ হলে একজন আমার কানে কানে বললো ভগবানের দোহাই, তুমি যেন কিছুতেই মাটিতে পড়ে যেও না। যতক্ষণ তোমার শক্তি থাকবে আপ্রাণ চেষ্টা করো সোজা থাকতে। পড়ে গেলেই ওরা কিন্তু একেবারে শেষ করে দেবে। আমার সর্বশেষ শক্তি দিয়ে কোন রকমে নিজেকে খাড়া রেখে এগিয়ে চললাম ওদের সঙ্গে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মাণরা আমাদের ওপর আরও কড়া পাহারা বসালো। আরও বিশ জন সৈন্য আনিয়ে নিল লরীতে। আমাদের আরও জোরে টেনে নিয়ে চললো। আমাদের মধ্যে যে সব হতভাগ্য আহত সৈনিক নিজেদের কোনমতেই আর সোজা রাখতে পারলো না, বর্বর জার্মাণ-সৈন্যরা তাদের কুকুরের মত গুলী করে মারলো। দু একজন হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই জনহীন প্রান্তরে চাঁদের আলোয় পলাতকদের গুলী করতে জার্মাণদের একটুও কষ্ট হলো না। মাঝ-রাতে আমরা ভস্মীভূত এক গাঁয়ে এসে পৌঁছালাম। ওরা আমাদের একটা গির্জার ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে এলো। সেই পাথরের মেঝেতে এক গাছা খড় বা শুকনো ঘাসেই আমরা রাত্রিটা কাটালাম। আমাদের মধ্যে কারও গায়ে সামান্য আবরণ ছাড়া একটা লম্বা কোটও নেই যে সেগুলো বিছিয়ে শোয়া যাবে। অনেকের গায়ে একটা পাতলা সার্ট ছাড়া অন্য কোন আবরণও নেই। ওরা হয়তো এন, সি, ও, দলের লোক। ওদের সমস্ত পোষাক খুলে নেওয়া হয়েছে বলেই ওরা নিজেদের দল অথবা র‍্যাঙ্কের পরিচয় দিতে পারছে না। আর একদল মিস্ত্রী যারা বিনা পোষাকেই কাজ করার অবস্থাতে বন্দী হয়েছে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ওরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই আছে বলা চলে।

রাত্রে আবার মুষলধারে বৃষ্টি এলো। আমরা অসহায় জানোয়ারের মত গোটা রাতটা ভিজলাম। আমাদের আশ্রয়স্থলের ছাতের খানিকটা কামানের গোলা কিংবা বোমার আঘাতে ভেঙ্গে গেছে, বাকী অংশটুকুও গোলন্দাজদের কৃপায় জরাজীর্ণ। কাজেই আমাদের বসা বা দাঁড়াবার মত শুকনো জায়গা কোথাও নেই। সমস্ত রাত্রি আমাদের গির্জাতে কাটাতে হলো অন্ধকার খোঁয়াড়ে একপাল ভেড়ার মত।

রাতের অন্ধকারে কে যেন আমার হাতটা ধরে ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করলো—বন্ধু, তুমি কি আহত? আমিও পাল্টা প্রশ্ন করলাম এ প্রশ্ন কেন দোস্ত?

: আমি একজন ডাক্তার, দরকার হলে তোমায় আমি সাহায্য করতে পারবো।

আমি ওকে বললাম, আমার বাঁ কাঁধের ভিতরটা কেমন করছে। রীতিমত ফুলে উঠেছে জায়গাটা; আর সমানে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। সব শুনে লোকটা আমার জামা খুলে ফেলতে বললো ওর কথা মত জামা খুললাম, তারপর ও আমার কণ্ঠা লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। আমার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে বললাম—তুমি মোটেই ডাক্তার নও—গোবদ্যি। যেখানে আমার অসহ্য ব্যথা সেখানে অমন ভাবে চাপ দিচ্ছ কেন শয়তান?

আমার কথায় কর্ণপাত না করেও যেমন পরীক্ষা করছিল তেমনি করতে লাগল। একসময় একটু রাগত স্বরে বললো তোমার কাজ মুখ বন্ধ করে থাকা। বেশী কথা বললে তোমার ব্যথা আরও বাড়বে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই হাতটা এমন মোচড় দিল যে আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম জ্ঞান লোপ পেল।

আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি ওকে প্রশ্ন করলাম: শয়তান ফ্যাসিস্ত, তুমি কি করছিলে কি? মারের চোটে আমার যে হাতটা ভেঙ্গে গেছে সেই ভাঙা হাতটাই অমন ভাবে টেনে দিলে তুমি। আমার কথায় ডাক্তার মুখে একটা শব্দ করে বললো—তোমার পরীক্ষা করার সময় আমার মনে হলো যে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তুমি হয়তো আমায় আঘাত করে বসতে পারো। কিন্তু তুমি বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। যাই হোক তোমার হাত ভাঙেনি, জোড় ছেড়ে গেছিল কিন্তু আমি আবার ঠিক বসিয়ে দিয়েছি। এখন একটু আরাম লাগছে? সত্যি কথা বলতে কি আমার যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। আমি ডাক্তারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম। ও ততক্ষণে আবার অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে শান্ত গলায় প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে চলেছে: বন্দীদের মধ্যে কে আহত আছে? আমি সাহায্য করতে পারি। লোকটা একজন সত্যিকারের চিকিৎসক। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারেও ও তার ব্রতপালন করে চলেছে নিঃশব্দে।

ভয়ানক রাত্রিটা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। আমাদের যখন ওরা গির্জার মধ্যে ঢোকাচ্ছিল তখনি একজন জমাদার জানিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের বসতে পর্য্যন্ত দেওয়া হবে না। এই দুর্যোগের মধ্যেই একজন খৃষ্টানের আবার পায়খানার বেগ দেখা দিল। বেচারা অনেকক্ষণ সামলাবার চেষ্টা করে শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে ফেললো। বললো: আমি এই পবিত্র গির্জা কোনমতেই অপবিত্র করতে পারবো না। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। এ কাজ এখানে কেমন করে করি বলো? সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমাদের ভেতরেও নানা জাত নানা মতের লোক আছে। কেউ কেউ ওর এই কাণ্ড দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো. কেউ গাল্‌গাল

দিল আবার কেউ ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলো। আমাদের কথা অগ্রাহ্য করে লোকটা উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ফল হলো অত্যন্ত মর্মান্তিক। বন্ধ দরজায় বার বার ধাক্কা দিয়ে বাইরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলো পাহারাওয়ালাদের কাছে। আর তার প্রার্থনার জবাব আসতেও বেশী দেরী হলো না। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক গুলী ঢুকলো। খৃষ্টানটি তো মারা গেলই সেই সঙ্গে আমাদের আরও তিন জন শেষ হলো আর একজন এমন গুরুতর আহত হলো যে, যে বেচারাও সকাল হবার আগেই শেষ হয়ে গেল।

মৃতদেহগুলোকে একটা কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, আরগুটা খুব সুবিধার নয় মোটেই। তারপর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করে নেবার আশায় আমরা ফিসফিসিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলাম, আমরা কে কোথায় থেকে কি ভাবে বন্দী হলাম।

আমার ঠিক পাশেই দুটো কণ্ঠস্বর শুনলাম। একজন বলছে: কাল আমাদের এখান থেকে অন্ত কোথাও নিয়ে যাবার আগে ওরা যদি আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে কে কমিউনিষ্ট, কে ইহুদী আর কে খাদ্যসরবরাহ বিভাগের কর্মচারী বাছতে আরম্ভ করে তাহলে আর তোমার পল্টন কম্যাণ্ডার বলে লুকিয়ে থাকা চলবে না। কোনমতেই ওরা রেহাই দেবে না। তোমার পোষাক পরিচ্ছদ না থাকলে ওরা পদমর্যাদার কথা বুঝতে পারবে না মনে কর? সে তুমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না হে। তোমার জন্যে আমি দুর্ভোগ ভোগ করতে যাবো কেন? প্রথমেই আমি তোমায় ধরিয়ে দেবো। তুমি যে একজন কমিউনিষ্ট সেকথা আমি জানি। আমাকে তোমাদের পার্টিতে যোগ দেওয়াবার জন্য তুমি অনেক চেষ্টা করেছিলে। সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। এখন তার জবাবদিহি কর। লোকটা আমার বাঁ পাশে বসে আছে। ওর ওপাশ থেকে আর একটি তরুণের কণ্ঠস্বর শুনলাম: আমার বরাবর সন্দেহ ছিল অত্যন্ত বাজে প্রকৃতির লোক ক্রিজনেভ। বিশেষ ভাবে যখন তুমি অশিক্ষিতের অজুহাত দেখিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে অসম্মত হলে তখনি আমি সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু, তুমি যে এত বড় বিশ্বাসঘাতক সে কথা কল্পনা করতে পারিনি। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তুমি স্কুলে গিয়েছিলে কিনা বলতো?

অপরজন অত্যন্ত ধীরে ধীরে উত্তর দিল: হ্যাঁ গিয়েছিলাম। তাতে কি হয়েছে?

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ কাটলো। তারপর আবার সেই পল্টন কমাণ্ডার আস্তে আস্তে বললো: কমরেড ক্রিজনেভ, আমায় ধরিয়ে দিও না। অপরজনের মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল। এখানে তোমার কোন কমরেড নেই। তাদের সকলকেই লাইনের ওপারে ফেলে এসেছ। আমি তোমার কমরেড নই। আমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আর তর্ক করতে এসো না। যে কোন উপায়ে আমি তোমায় ধরিয়ে দেবই। আমার নিজের প্রাণটাকে তো আগে বাঁচাতে হবে।

ওদের কথাবার্তা বন্ধ হলো। আমার শরীর এই অবস্থায় থরথর করে কেঁপে উঠলো। আমি ভাবলাম, না না, শয়তান, আমি তোকে তোর কমাণ্ডারের সঙ্গে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেবোনা। তুই আর কোনদিন নিজের পায়ে হেঁটে এই চার্চের বাইরে যেতে পারবি না। ওরা তোর পা দুটো ধরে টেনে বাইরে ফেলে দেবে। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছিল। দেখলাম একজন বেশ মোটা-সোটা লোক হাতটা মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে আছে আর ঠিক তার পাশেই একজন যুবক গায়ে কেবল একটি সার্ট দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে ফ্যাকাশে মুখে। ভাবলাম, ওই বাচ্চাটা তো জানোয়ারটাকে ঠিক কাবুতে আনতে পারবে না কিছুতেই। আমাকেই হাত লাগাতে হবে দেখছি।

আমি যুবকটাকে ছুঁয়ে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলাম: তুমিই কি পল্টন কমাণ্ডার? মুখে কোন জবাব না দিয়ে ও মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ সেই। আবার আমি পাশে শুয়ে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম ও তোমায় ধরিয়ে দিতে চায়? এবারেও সে মাথা নাড়লো শুধু। বললাম ঠিক আছে, তুমি ওর পা দুটোকে চেপে ধর যেন লাথি ছুঁড়তে না পারে—একটু তাড়াতাড়ি কর। তারপর আমি লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলাটা টিপে ধরলাম। লোকটা চীৎকার করারও সময় পেল না। কয়েকটা মুহূর্ত আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে চেপে রাখলাম। তারপর একসময় ওর জিভ বের হয়ে এলো।

তারপরই আমার ভয়ানক বিশ্রী লাগলো। হাত দুটোকে ভালো ভাবে ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছা হোলো। যাকে এই ভাবে হত্যা করলাম সে যেন কোন মানুষ নয়। একটা বিষাক্ত সাপ। আমার জীবনে এই প্রথম আমি মানুষকে হত্যা করলাম। তাও আবার নিজেদেরই একজনকে। আমাদের নিজের লোক? কিন্তু কোনরকম ভাবেই ক্ষমা পাবার যোগ্যতা তার ছিল না। শত্রুর অপেক্ষাও ভয়ানক। সে বিশ্বাসঘাতক। আমি সেখান থেকে উঠে পল্টন কমাণ্ডারকে বললাম—চল, এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও যাই; চার্চটা বেশ বড়।

শয়তান ক্রিজনেভের ধারণা অনুযায়ী পরদিন সকালে আমাদের চার্চের বাইরে নিয়ে এসে লাইনে দাঁড় করলো। পাহারাওয়ালারা আমাদের চারদিকে গোল করে ঘিরে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে কোন বিপজ্জনক ব্যক্তি আছে কিনা খুঁজতে লাগলো তিনজন এস, এস, অফিসার। ওরা একে একে সকলকেই প্রশ্ন করতে লাগলো আমাদের মধ্যে কে অফিসার, কে কমিউনিষ্ট, কে খাদ্য সরবরাহকারী কিন্তু কেউ কোন কথা স্বীকার করলো না। এমন কোন শয়তানও এগিয়ে এলো না যে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আমাদের দলের মধ্যে অর্দ্ধেকের ওপর কমিউনিষ্ট। বাকী লোকের মধ্যে প্রচুর অফিসার আছেন, খাদ্যসরবরাহকারীও আছেন। আমাদের মোট দু'শ জন বন্দীদের মধ্যে ওরা মাত্র চারজনকে সন্দেহ করে বের করলো। একজন ইহুদী আর তিনজন রাশিয়ান। রাশিয়ানদের বিপদের কারণ হলো ওদের মাথার কালো কোঁচকানো চুল। এস, এসগুলো ওদের কাছে এসে প্রশ্ন করলো—ইহুদী? উত্তরে ওরা কি বললো সে কথা শোনার ধৈর্য ওদের রইল না। গর্জন করে উঠলো—লাইন থেকে বাইরে এসো। ব্যস, এই যথেষ্ট।

ওই চারজনকে গুলী করে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলো। যার সাহায্যে আমি সেই শয়তান বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা

করেছিলাম সেই যুবকটি আমাদের যাত্রার সময় থেকে বৈরাবর পোজনান পর্যন্ত আমার হাত ধরে পাশে পাশে ছিল। পোজনানে এসে আমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।

আমি বন্দী হওয়ার পর থেকেই পালাবার কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিলাম না। পোজনান পর্যন্ত আসার সময় রাস্তায় ওরা আমাদের যে সব ক্যাম্পে রেখেছিল সেখান থেকে পালাবার তেমন কোন উপায় ছিলনা। কিন্তু পোজনান্ ক্যাম্পে এসে মনে হলো এতদিন আমি যা চাইছিলাম এবার হয়তো সেই সুযোগটা পাওয়া যাবে। যে মাসের শেষের দিকে একদিন ওরা ক্যাম্পের পাশেই একটা ছোটখত জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল মৃত বন্দীদের কবর খুঁড়বার জন্যে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সে সময় আমাশয় রোগে মরে গেল। পোজনানের মাটি কাটতে কাটতে আমি একসময় চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমাদের পাহারাওয়ালাদের দুজন খেলতে বসেছে আর একজন রৌদ্রে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। আমি হাতের কোদালটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। তারপর উদীয়মান সূর্য লক্ষ্য করে সোজা দৌড়তে আরম্ভ করলাম।

পাহারাওয়ালারা প্রথমটায় আমায় দেখতে পায়নি বোধ হয়। আমার মত একজন দুর্বল লোক সে সময় একদিনে চল্লিশ কিলোমিটারে রাস্তা দৌড়ে পার হয়েছিলাম সে কথা ভাবতেই পারিনা, সেদিন অবশ্য রাস্তায় কোন অঘটন ঘটলো না। কিন্তু চতুর্থ দিনে আমি যখন সেই অভিশপ্ত ক্যাম্প থেকে বহুদূরে চলে এসেছি তখনই ওরা আবার আমায় ধরে ফেললো। আমায় ধরবার জন্য ওরা ব্লাড হাউণ্ড ছেড়ে দিয়েছিল। একটা জইক্ষেতের মধ্যে ওরা আমায় ধরলো।

ভোরবেলাতেই আমি একটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়লাম। দিনের আলোয় এই মাঠটা পার হতে আমার বেশ ভয় হলো। বন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার হবে জমিটা। কাজেই সমস্ত দিনটা জই-ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দেওয়াই স্থির করলাম! দূর থেকে কুকুরের চীৎকার আর মোটর সাইকেলের শব্দ শুনে আমার প্রাণ ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো। জই-ফল তুলে তুলে আমার পকেটগুলো ভর্তি করতে লাগলাম। কুকুরের চীৎকার যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার হৃৎস্পন্দনও বুঝি একেবারে থেমে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে কোন রকমে মুখ ঢেকে রাখার চেষ্টা করলাম। কুকুরগুলো যাতে না আমার মুখটায় কামড়াতে পারে। ওরা এসে গেল। আমার জামা-কাপড়গুলো ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে কুকুরগুলোর এক মুহূর্তও লাগলো না। যা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছি তাই ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। [illegible]দের খেয়াল-খুশীমত ওরা আমায় নিয়ে জমিতে টানাটানি করলো। [illegible]রে একটা বিরাট কুকুর তার থাবাটা আমার বুকে বসিয়ে [illegible]লা লক্ষ্য করে এগিয়ে এলো কিন্তু ঠিক সোজাসুজি কামড়াতে [illegible]ারলো না।

মোটর সাইকেলে দুজন জার্মাণসৈন্য এসে আমায় রীতিমত [illegible]রধোর করলো। তারপর আবার কুকুর লেলিয়ে দিল। আমার [illegible]ায়ের মাংস খাবলা খাবলা করে তুলে নেওয়ার পর ওরা আমায় [illegible]বার ক্যাম্পে নিয়ে এলো। উলঙ্গ অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে নির্জন বাস করতে হলো আমায় পালানোর অপরাধে। তবু আমি [illegible] রইলাম। বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

দোস্ত, আমার সেই বন্দিজীবনের মর্মান্তিক অবস্থার কথা মনে হলেও কষ্ট হয়। তবু আপনাকে সব কথাই আমি বলছি। জার্মাণীতে যে বীভৎস অত্যাচার আমাদের ওপর করা হয়েছে, ওই সব ক্যাম্পে আমার আপনজনদের অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে, সে কথা যখনই মনে পড়ে তখনই গলা বন্ধ হয়ে আসে; নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

বন্দী অবস্থায় ওরা সমানে দু'বছর ধরে আমাদের পশুপালের মত চরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আমার মনে হয়, অর্দ্ধেক জার্মাণীর ক্যাম্পে ক্যাম্পে আমরা ঘুরেছি। আমি স্তাক্সনির সিলিকেট কারখানায় কাজ করছি। রুড়-এর কয়লাখনিতে কয়লা কাটতে হয়েছে। ব্যাভেরিয়ার জমিতে কোদাল নিয়ে খেটেছি, থাবিনজোন-এ বন্দি হয়েছি। কে জানে জার্মাণীর আর কোথাকার মাটি হেঁটেছি। সব জায়গায় বিভিন্ন দৃশ্য আছে বটে কিন্তু আমাদের বন্দী করে রেখে আর আমাদের ওপর অত্যাচার করার দৃশ্য সব জায়গায় একই। কোন প্রভেদ নেই। শয়তানগুলো আমাদের এমনভাবে প্রহার করতো যে কোন মানুষ জানোয়ারকেও সে ভাবে প্রহার করতে পারে না। ধাক্কা, লাথি, রবারের লাঠি, বড় বড় লোহার চাংড়া, এসব ওদের অত্যাচারের অস্ত্র। রাইফেলের কুঁদো আর হাণ্টারের কথা তো বাদই দিলাম।

যেহেতু তুমি একজন রাশিয়ান, যেহেতু এখনও পৃথিবীর আলো-বাতাস তুমি পাচ্ছ, যেহেতু তুমি ওদের বন্দী হয়ে কাজ করছো, সেই হেতুই ওরা তোমার ওপর নির্মম অত্যাচার অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা তোমায় বিকৃত ভাবে দেখবার জন্যই ওরা তোমায় মারছে, তোমার চোখের এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়ে তোমার প্রাণটুকুকে বের করে দেওয়ার জন্য তোমায় মারবে। আমার মনে হয়, গোটা জার্মাণীতে আমাদের সকলকে ঠেলে দেওয়ার মত চুল্লী নেই।

আমরা যেখানেই গেছি সেখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। কোথাও আবার শুধু গরমজল দিয়েই সেরেছে, কোথাও আবার তাও জোটেনি। এসব কথা না বললেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। যুদ্ধের আগে আমার ওজন ছিল ছিয়াশী কিলোগ্রাম কিন্তু সে বছর শরৎকালে দেখা গেল পঞ্চাশ কিলোগ্রামও হলো না। কেবল, হাড় আর চামড়া। আর সেইগুলো বয়ে নিয়ে বেড়াবার মত যেটুকু শক্তির দরকার সেটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই অবস্থাতেই কিন্তু আমাদের বিনা প্রতিবাদে সমানে কাজ করতে হয়েছে আর সে এমন কাজ যে, গাড়ীটানা ঘোড়াতেও বোধ হয় অতখানি খাটতে পারে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেই এক শ' বিয়াল্লিশ জন সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীকে ওরা কাষ্ট্রিনের কাছাকাছি ক্যাম্প থেকে ড্রেসডেনের ১৪ বি নম্বর ক্যাম্পে পাঠালো। সে সময় ওই ক্যাম্পটায় আমরা হাজার দুয়েক লোক ছিলাম। ওখানে আমাদের সকলকে একটা পাথরের খাদে হাত দিয়ে পাথর কাটতে আর সেই পাথর গুঁড়ো করতে হতো। প্রত্যেকের জন্য চার কিউবিক মিটার কাজ বাঁধা। ভেবে দেখুন, যারা কোন রকমে প্রাণটুকুকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের

পক্ষে এতখানি পাথর কাটা মানে কি অমানুষিক ব্যাপার! লোকগুলোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে মেরে ফেলা ছাড়া আর কি? আর সত্যি সত্যি হলোও তাই। আমাদের দলের একশ' বিয়াল্লিশ জনের মধ্যে ছ' মাস পরে দেখা গেল মাত্র সাতার জন জীবিত আছে। কি করে হলো বলুন তো দোস্ত! বুঝতে পারছেন কি ভাবে হত্যাকাণ্ড চলতো অবাধে। আমরা কচিৎ আমাদের মৃত বন্ধুদের কবর দেবার সময় পেতাম। ওই সময় ক্যাম্পে একটা গুজব শোনা গেল। জার্মাণরা ষ্টালিনগ্রাদ দখল করে সাইবেরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এইভাবে একটার পর একটা আঘাতে আমরা এত ভেঙে পড়েছিলাম যে মাটি থেকে ওপরে চোখ তুলতে পারতাম না। এই জার্মাণীর মাটিতেই হয়তো আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন ওদের পাহারাওয়ালাগুলো প্রচুর মদ খেয়ে নিজেদের ভাষায় বিকট চীৎকার করে গান গাইতো, সব সময় হৈ-হল্লা করে বেড়াত।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে কুঁড়েতে ফিরে এসে দেখি, বৃষ্টিতে আমাদের কম্বলগুলো সব ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। সমস্ত দিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডায় আমরা রীতিমত কাঁপছি। দাঁতের কাঁপুনি কিছুতেই বন্ধ হতে চাইছে না। কোথাও এতটুকু শুকনো বা গরম জায়গা নেই যেখানে একটু দাঁড়াতে পারা যায়। তার ওপর খিদের জ্বালায় শরীরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অথচ সন্ধ্যায় আমাদের কোন দিন খাবার দেওয়া হয় না।

আমি কম্বলটা খাটিয়ায় ছড়িয়ে দিতে দিতেই বললাম: ওরা আমাদের দিয়ে দৈনিক চার কিউবিক মিটার করে মাটি পাথর কাটাচ্ছে কিন্তু এক কিউবিক মিটারই আমাদের পক্ষে কবর দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া অন্য কোন কথা আমি বলিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন জঘন্য কুকুরের মত ক্যাম্প-কমাণ্ডারের কাছে আমার নামে লাগিয়ে এলো। আমাদের ক্যাম্প-কমাণ্ডার জার্মাণ—নাম মুলার। লোকটা বিশেষ লম্বা নয় কিন্তু বেশ মোটা। মাথায় শনের মত এক গোছা সাদা সাদা চুল। মাথার চুল, চোখের পাতা, এমন কি চোখটা পর্যন্ত ফ্যাকাশে। চোখটা আবার পিটপিট করে। আমার আপনার মতই অনর্গল রাশিয়ান ভাষায় কথা বলে যেতে পারে। এমন কি ওর কথার মধ্যে আমাদের ভল্‌গা অঞ্চলের টানটাও শোনা যায়। লোকটা যেন ওই সব অঞ্চলের কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে কিম্বা বড় হয়েছে। দিব্যি দিতে লোকটা ওস্তাদ। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম হতভাগাটা এ বিদ্যা কোথা থেকে শিখলো? লোকটা থাকতো আমাদের কুঁড়েগুলোর সামনে। ডান হাতটা পিছন দিকে দিয়ে একগাদা এস, এস, অফিসার সঙ্গে নিয়ে আমাদের সামনে ঘুরতো। হাতে থাকতো চামড়ার দস্তানা। আঙুলগুলো ঠিক রাখার জন্যে চামড়ার নীচে আবার সীসে দেওয়া। ও যখন ঘুরতো তখন সবাই ওর ওপর নজর রাখতো। সব সময়েই বলতো—তোমরা ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা নাও। ওর কথামত রোজই টিকা দেওয়া চলতো। আমাদের ক্যাম্পে মোট চারটি ব্লক।

প্রথম দিন ১নং ব্লকে টিকা দেওয়া হতো, তার পরদিন দ্বিতীয় নম্বর ব্লক, তারপর তৃতীয় এইভাবে একের পর এক চলতো। লোকটা মহা শয়তান! একদিনও কামাই দেওয়া চলতো না। কিন্তু একটা জিনিষ কিছুতেই গর্দভটার মাথায় ঢুকতো না। ওর পরিক্রমা আরম্ভ করার আগে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই একচোট গালাগাল দিয়ে নিত। যা ওর মনে আসতো তাই বলে অভিশাপ দিত আর তাতে আমরা একটু শান্তি পেতাম। বুঝতেই পারছেন, ওই অবস্থায় শত্রুপক্ষের মুখে মাতৃভাষা শোনা মানেই খানিকটা প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়া। আর ওই কথাটাই ও যদি বুঝতে পারতো যে ওর এই অভিশাপ আর গালাগালি শুনে আমরা আনন্দ পাই, তাহলে আর কিছুতেই শয়তানটা রুশভাষা ব্যবহার করত না। ওদের জার্মাণ ভাষাতেই চেঁচাতো। আমাদের মধ্যে একজন যে বরাবর মস্কো থেকেই আমার সঙ্গে আছে, সেই শুধু কমাণ্ডারের গালাগালে ক্ষেপে উঠতো। ও যখন গালাগালি করতো আমার সঙ্গীটি বলতো—ওর কথা শুনে আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকি, আমি যেন মস্কোতেই আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক গ্লাস বীয়ার পান করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

অনুবাদক—অলক সিংহ-চৌধুরী

সেই সূর্যের দেশে

Oh ! The days are gone, when beauty bright
My heart's chain wove. (Tomas Moore)

হারায়েছে সে রূপকথার দিন পোড়ামাটির পুতুলে—
হঠাৎ কখন চমকে উঠে মন, স্মৃতি খুঁড়লে পাইনা কোন হীরে:
সেদিন ছিলো অবনীন্দ্রনাথ, দিনের এবং রাতের উপকূলে
পট-পট সে ছবি লিখতো, গালগল্পে, হাজার লোকের ভীড়ে।
এখন শুধু শবসাধনা, লক্ষ কীট সমস্ত শরীরে।

হে প্রিয় মোর বাঙলা দেশ, রবি ঠাকুর, রবীন্দ্র-সঙ্গীত—
অরণ্যের নির্বাসনে বুকে জ্বলছে যৌবনের লোকদৃশ্য-আলো
কালিন্দীর গহীন জলে কেঁপে উঠছে দুঃখের প্রতীত:
"আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে," সে আনন্দ সকালও
শূন্য বালুচরের সন্ধ্যায়, হায়, নটে গাছটি মুড়ালো।

আমার প্রিয় বাঙলা দেশ, রবি ঠাকুর, রবীন্দ্র-সঙ্গীত—
ব্যঙ্গ করে সুরের আকাশ, গুলির মোড়ে ব্যর্থ বিলাপ-গীত।
হারায়েছে সে রূপকথার দিন পোড়ামাটির পুতুলে—
হঠাৎ কখন চমকে উঠে মন, গোলাপকাঁটায় বেঁধা মন, কাঁদছে
ফুলে-ফুলে।

অনুবাদ: অবিনাশ রায়।

লক্ষ্মীবিলাস
তেল
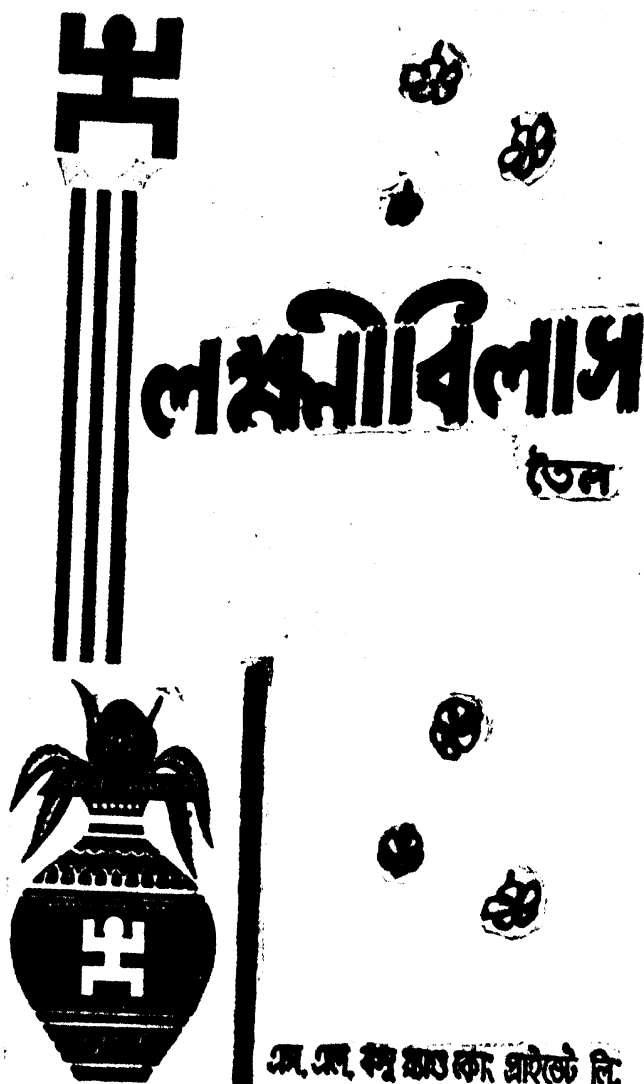
শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়

পথিক আমি, জগৎ জুড়ে আমার ঘর আছে। বদ্ধ ঘরের চেয়ে পথই আমার আপন, তাই জীবনের একমাত্র আকাঙ্খাকে সত্যে পরিণত করলাম ১লা নভেম্বর ১৯৫৮ সালে।

সামান্ত আসবাব নিয়ে আমি হলাম সুদূরের অভিযাত্রী। বিশেষ কিছু প্রমাণ-পত্র না নিয়ে খেয়ালের বশে বেরিয়ে পড়েছিলাম বলে নানান বাধা এসে ভীড় জমাল, কিন্তু বাধা যেমন এসেছিল, প্রবল ইচ্ছার কাছে সে সব কোন দিকে চলে গেল। ছাড়পত্র জোগাড় করতে বেশী দেরী হয়নি। বুঝলাম ইচ্ছা থাকলে উপায় সত্যিই হয়।

আর একটা কথা বলা দরকার, নইলে বলার কোন সার্থকতা হয় না। বঙ্গ শিশু বিত্যালয়ের (বালী) ৫ম শ্রেণীতে ভূগোল মাষ্টার মশাইয়ের কাছে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের দুঃসাহসিক ভ্রমণের গল্প শুনি। আফ্রিকার গহন অরণ্যে এই বাঙ্গালী পর্য্যটক যেভাবে পর্য্যটন করেন, তাই থেকে আমি প্রেরণা পাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে পর্য্যটক বিশ্বাসের ভ্রমণের কিছু আলোচনা করতে বসিনি, নানান্ বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাহিনীতে যে সব উল্লেখ করে গেছেন সেটুকু যে কত উপকারে এসেছে যা বলার শেষ নাই।

একটি পয়সা না নিয়ে সাইকেল যোগে তিনি সারা বিশ্ব টহল দিয়ে অজানাকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন,—তাই প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে তিনি নমস্য।

তাঁর নির্দ্দেশিত কয়েকটি কথা আমি সর্ব্বদা স্মরণ করে চলতাম। প্রতি স্কুলে, সংস্থায়, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট আমার বক্তব্য পেশ করতাম। পারতপক্ষে যতটুকু সাহায্য তাঁরা করতেন, তাতেই আমি এগিয়ে যেতাম। কারণ আমিও ছিলাম কপর্দ্দকশূন্য পর্য্যটক।

যাত্রা সুরু করেছিলাম শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে। মুখর শহরতলী পার হয়ে নিঝুম পল্লী-বাংলার শ্যামাঞ্চলের ছায়াঘন পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চললাম।

বর্ষা ধুয়ে মুছে সাফ করে গেছে, শরৎ দিয়ে গেছে সবুজ শস্যরাশি; হৈমন্তিক আমেজ-স্পর্শ লেগে সেগুলি গেরুয়া রং-এ রাঙ্গা হয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। আগমনীর সুর আর বাজছিল না, নবান্নের নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিল বাংলার ঘরে ঘরে। ক্রমে পৌঁছালাম শিল্প-নগরীর কর্ম্মশালায়, ক'বছর আগে দিনের আলোতেই শেয়াল ডেকে উঠত, আর আজ ষ্টীল প্রোজেক্টের চিমনীকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে উঠেছে পল্লীপ্রকৃতি।

কয়লার দেশ তার পাশেই—সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত হাজার হাজার মজুর দিনরাত মরণ-গহ্বরে নামছে—আর উঠছে।

তারপর বাংলা-মায়ের শ্যামল সৌন্দর্য্যের দিকে শেষ চাউনি মেলে বিহারে ঢুকলাম। গোবিন্দপুর থেকে রাস্তাগুলির দূরত্ব লিখে নিয়ে দক্ষিণ বিহারের পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাড়ি জমালাম।

ধানবাদ, ঝরিয়া তারপর পুরুলিয়া পার হয়ে যে রাস্তাগুলি আমাকে চলতে হয়েছে এবং চলতে গিয়ে যে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার কয়েকটি বিবরণ আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করব। তার আগে দূরত্বটা একটু জানান দরকার—নইলে বলার কোন অর্থ হয় না। কোলকাতা থেকে দিল্লী জি, টি, রোড ধরে দূরত্ব ৮৮৫ মাইল। গোবিন্দপুর থেকে ঝরিয়া সিন্দ্রী পুরুলিয়া রাঁচি ও হাজারীবাগ হয়ে পুনরায় জি, টি, রোডে আসতে দু শ' মাইল আরও বেশী হাঁটতে হয়েছিল। রাঁচি থেকে রামগড় পৌঁছানোর সময় প্রথম বাধার সম্মুখীন হলাম। জংগলে ভর্ত্তি পাহাড়ের পাঁচিলঘেরা এক কালি পীচের রাস্তা, দুটি জেলার সদরকে এক করেছে। রাঁচি আর হাজারীবাগ যেখানটায় মিলেছে সেখানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪১১ ফুট উঁচু এবং ক্রমশঃ উঁচু হয়েই এগিয়েছে।

এ পথে নরখাদকের মুখে পড়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ শ্রীঅতুল ঘোষ মশাই এ কথা বলে বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন। যতটা সম্ভব সতর্ক হয়েই চলতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদ একদিন এলোই। রাস্তার পাশে একটা বাছুরের ঠ্যাং নিয়ে দুটো নেকড়ে দিব্যি চিবুচ্ছিল। হাত পঞ্চাশেক ব্যবধান তাদের থেকে। ভয়ে বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। ব্যাগগুলো একটা গাছের ডালে ঝোলালাম—হাতের লাঠিটা আঁট করে ধরে পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে চেষ্টা করলাম—নীচে সাঁওতালদের বস্তি দিব্যি লক্ষ্য করা যায়—তখনও তারা (নেকড়েরা) আমায় লক্ষ্য করে নাই। যখন লক্ষ্য করল তখন আমার অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে এসেছে। দু'টো নেকড়ের সঙ্গে লাঠি নিয়ে পেরে উঠা কখনও সম্ভব নয়, তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে গড়-গড় করে গড়িয়ে গিয়ে একটা গাছের গোড়ায় আটকে গেলাম। বিকট চিৎকার সুরু করেছি তখন, হাত পা ছিঁড়ে রক্তারক্তি হয়েছে। চিৎকার শুনে ছুটে এল বস্তির লোকেরা, দৈবক্রমে রাঁচিগামী একটি লরীও ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে। উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম।

এর পর কানপুর পর্য্যন্ত আর কোন বিপদের মুখে পড়িনি, কিন্তু কানপুরের বাবলাবনে জনকয়েক দুর্বৃত্তের হাতে পড়লাম, টর্চ্চ নিয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়াল—ফেরীওলা ঠাউরে ব্যাগগুলো তছনছ করে যখন কিছু পেল না, পকেট হাতড়াতে সুরু করলো। এক টাকা সাড়ে ন' আনা তাও কেড়ে নিল তারা। অগত্যা কানপুরে

উপবাসে কাটল সে রাতটা। সকালে গেলাম মতিমহল সিনামায়, ম্যানেজার শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার পরিচিত, হঠাৎ আমায় এ ভাবে দেখে তিনি প্রথমে বিস্মিত হলেন—পরে যতদূর সাহায্য করা যায় করলেন তিনি। এদেশের উপযোগী কিছু শীতবস্ত্র তিনি দিয়েছিলেন। আমি যে দিন কানপুরে পৌঁছাই, এলাহাবাদ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা খবর ছাপল "কানপুর ভারতের সব থেকে বেশী ঠাণ্ডা নগর" (৩।১২।৫৮)।

কাজেই তখন শীতবস্ত্রের যে কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া কিছু অর্থসাহায্য দিয়ে তিনি এগিয়ে দিলেন দিল্লীর দিকে।

কানপুর থেকে ৫৪ মাইল দূরে সৌন্দর্য্যময়ী লাখনৌ। উত্তর-প্রদেশের প্যারিস লাখনৌ শহর দেখে মনে আবার উৎসাহের বন্যা বইল। ফিরে এলাম আবার কানপুরের দিকে। কানপুর থেকে ১৪ মাইল দূরে এসে একটা গ্রামে জি, টি, রোডের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেলাম কনৌজ।

ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় নিয়ে কনৌজ আজও বেঁচে আছে। পৃথ্বিরাজ-সংযুক্তার পালা কবে শেষ হয়ে গেছে,—কিন্তু কনৌজে এসে ইতিহাসের সেই দুটি মুখ মনে পড়ে গেল।

কেল্লার উপর এখন কপির চাষ হচ্ছে—আর সেই সুড়ঙ্গ রাস্তা দিয়ে হু হু করে মোটর ট্রাকের লাল ধূলো উড়ান দেখে সেদিনকার কথাগুলি মনে পড়ছে; ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে কত বীর ঘোড়া ছুটিয়ে লাল ধূলো উড়িয়ে মুখরিত করত, কত সৈনিকের কুচকাওয়াজ ধ্বনিত হত, আজ কেবল বাদুড় চামচিকা ছাড়া কিছুই নাই!

কনৌজের পরে এলাম ভুনগাঁওতে, এখান থেকে আগ্রা মথুরা রোড ধরে যমুনা-ব্রীজ পার হয়ে আগ্রায় এসে পৌঁছলাম। বহু প্রত্যাশিত তাজমহলের সৌন্দর্য্য চোখ মেলে দেখে খেদ মেটালাম। তাজমহলের মিনারগুলি তখন কাটা হচ্ছিল—তারই গোটা দু'এক টুকরো ব্যাগের মধ্যে কুড়িয়ে নিলাম—তারপর ফতেপুর সিক্রী সেকেন্দ্রা, ইদ-মদ উল্লা দেখে গেলাম মথুরা, বৃন্দাবন ও কোশী, ওখান থেকে আবার দিল্লী অভিমুখে রওনা হলাম। ২৬শে জানুয়ারী প্রায় তিনটের সময় রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছালাম। দু মাস পঁচিশ দিন অক্লান্তভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রজাতন্ত্র দিবসের বৈকালীন মেলা দেখবার সৌভাগ্য হল। তা'ছাড়া পার্লামেন্ট ঘরের ভিতরও ঢুকবার সৌভাগ্য হয়েছিল—অন্যদিন পার্লামেন্ট দেখতে হ'লে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়—কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পার্লামেন্ট অবারিত-দ্বার। রাজধানীতে পৌঁছে আবার বিপদের সম্মুখীন হলাম। সারা শহরের আনাচে কানাচে ভরে গেছে নানান প্রদেশের লোকে, কোথাও তিল ধারণের জায়গা নাই। কালীবাড়ীতে পত্রপাঠ জবাব, বিড়লা মন্দিরেও তথৈব চ। কাজেই ফুটপাত, কিন্তু বিধি বাম। বর্ষণ সুরু হল—জানুয়ারীর ঠাণ্ডা এ দিকের যে কি ভীষণ তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝান কঠিন—তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়া আর মুষলধারে বৃষ্টি। কষ্টের কাহিনী লিখে জানাতে পারছি না। বহু সাধ্য সাধনার পর বিড়লা মন্দিরে চাতালে কোন রকমে একটু স্থান হল। রাত কাটালাম। পরের দিন কর্পোরেশনে গিয়ে মেয়র শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির সঙ্গে দেখা করলাম এবং তিনি সব দিক দিয়ে আমার সাহায্য করলেন। তাঁরই সৌজন্যে দিল্লীতে প্রায় ১৫ দিন কাটালাম। দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে, স্কুলে পাঠশালে আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়ে আবার কোলকাতায় ফিরে এলাম।

কোলকাতায় পৌঁছানোর আগেই শুনলাম, চ্যানেল সাঁতারু শ্রীমিহির সেন পর্য্যটকদের জন্য একটা সংস্থা খুলবেন বলে ঠিক করেছেন। যোগাযোগ করলাম পর্য্যটক সংস্থার সঙ্গে। তখন সংস্থার নামকরণ হয়েছে "সংযম অভিযাত্রী" "সংযম" খোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসেন আমার জন্য একটা চাকরীও ঠিক করে দিলেন।

আবার দু'মাস কোলকাতার কলরবে মিলিয়ে গেলাম। নভেম্বর এলো। শীতের হাওয়া ক্রমশঃ বইতে সুরু করলো। আবার কে যেন ডাক দিল সুদূরের পানে। ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৯ সালে আবার পাড়ি জমালাম—উত্তরবঙ্গের দিকে। এবারে যাত্রা সুরু করলাম বালী বিবেকানন্দ ব্রীজ থেকে। প্রথম দিনেই এক লোমহর্ষক দুর্ঘটনা দেখে ভয় পেল, কিন্তু অভিযাত্রীদের ভয়ে পেছনো উচিত নয়, এগিয়েই ছিলাম।

ব্যারাকপুর ছাড়িয়ে N. H. W 34 এর উপর পৌঁছাতেই একজন মারওয়াড়ী উল্কা গতিতে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। মনে হল এই বুঝি কোথায় কোন বিপদ বাধিয়ে বসে। হলও তাই, দু'পাশে লাল ধূলো উড়িয়ে একটা কংক্রীটের ব্রীজের উপর মারলো এক ধাক্কা। সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল দামী গাড়ীটা। ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে গাড়ীর মালিক নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। কাজেই ষ্টিয়ারীং-এর সঙ্গে ধাক্কা লেগে মুখটা বিকৃতি হয়ে গেছে। সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা বইতে লাগল। এরই মধ্যে একটা ছেলে কেমন করে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। গাড়ীটা যখন ব্রীজটার কাছে এলোমেলো ভাবে তীব্রগতিতে এসে ধাক্কা মারল ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রীজটার উপর উঠে এক লাফ মারলো, পড়লো একটা এঁদো পুকুরে, কাঁটায় ভর্ত্তি ছিল পুকুরটা। রক্তারক্তি হয়ে উঠে এলো কিন্তু মরণের হাত থেকে বাঁচল। মারওয়াড়ী ভদ্রলোক জীবন ফিরে পেলেন কি না সন্দেহ। ইতিমধ্যে গাড়ীর ভীড় জমে গেল। গাড়ীর মালিককে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল পাঠান হল। জানি না ভদ্রলোক বেঁচে আছে কি না! এই ঘটনাটি কিন্তু আমার চিরদিন মনে থাকবে—কারণ মৃত্যুদূতের মত আমাকেও ধাওয়া করেছিল, একটুর জন্য আমি বেঁচে গিয়েছিলাম।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে লরী ট্রাক বা প্রাইভেট মোটর গাড়ীগুলি যে বিশৃঙ্খল ভাবে ছোটে তা দেখে মনে হয় দুর্ঘটনা ওরা ইচ্ছা করে ডেকে আনে।

N. H. W. 34 ধরে যতই এগিয়েছি, প্রত্যেক দিন অন্ততঃ দু' চারটে দুর্ঘটনা নজরে পড়েছে। হয় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে না হয় ওভার টেক করতে গিয়ে পরস্পর ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে পড়েছে। তা ছাড়া গরু, বাছুর কুকুর ছাগল প্রতিদিন মোটর গাড়ীর চাকায় পিষ্ট হয়ে ম্যাষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখেছি অসংখ্য সাপ ও জোঁক চাকায় পিষে পিচের সঙ্গে এঁটে গেছে।

ডুয়ার্সের চা-বাগান দিয়ে চলতে চলতে রাস্তার ধারে যে সুন্দরী গাছগুলি দেখা যায়, ঐ গাছের ডালে পাক খেয়ে কাল মত সাপগুলি গাছের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে ঐ গাছের ডাল থেকে

রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ে এবং ঐগুলিই লরীর চাকায় পিষ্ট হয়ে যায়।

এবারের ভ্রমণে আরও কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। তা না বলে থাকতে পারছি না, গত বছরের বন্যা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও যা দেখেছি সে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। বানের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু প্রলয় নাচনের তখনও শেষ হয় নাই। ধানক্ষেতের কোন চিহ্নই ছিল না। বড় বড় গাছগুলো নেড়া হয়ে সাদা হয়ে মড়ার মত সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ে গেল বঙ্কিমের আনন্দমঠের কথা। সর্ব্বগ্রাসী বন্যার ফলে আনন্দমঠের চেহারাটা আবার ফুটে উঠেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। মারী আর মহামারী তার পিঠে পিঠে এসেছে। এ সাজান কথা নয় চোখের দেখা, যা দেখেছি একটুখানি বলে এ প্রসংগের পূর্ণচ্ছেদ টানবো।

সেদিন আমি কৃষ্ণনগর থেকে মাইল ১৫ দূরে বাদকুল্লা গ্রামে রাত কাটাই। গ্রামবাসীদের কাছে আমার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাকে তাদের গ্রামের ক্লাবঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দেয়, প্রচুর উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা আমাকে আপ্যায়ন করলে, ক্লাবঘরের বাইরে একটা চাপা কান্না শুনতে পেয়ে টর্চ্চটা জেলে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম: মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে এক হতভাগ্য দম্পতি। শেষ সম্বলটুকুও বানের জলে ভেসে গেছে তাদের, এই রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে ক্লাবঘরের রকে আশ্রয় নিয়েছে। ক'দিনই পর পর ভিজে ছেলেটির অবস্থা ক্রমশ: খারাপের দিকে চলেছে, যতদূর সম্ভব তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সর্ব্বস্বহারা বাপ-মা। শেষ রক্ষা করতে হয়তো পারবে না—সেই দুশ্চিন্তায় তারা ভেঙে পড়েছে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেলাম না আমি তাদের দেখে।

পাশের একটা ভাঙা স্কুলঘরে কতকগুলি হতভাগা সর্ব্বহারা কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। কে কার খোঁজ রাখে। এরা অধিকাংশ উদ্বাস্তু, এদের থাকবার যে কলোনী তৈরী করা হয়েছিল, বানের দাপটে সেগুলির চিহ্ন বড় একটা নাই বললেই চলে। ঝড়ের মুখে আর বানের স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে, যার কোন চিহ্নই নাই। যেগুলি তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নাই, সেগুলি শুয়োরকুঁড়ের পরিণত। পাঁক পচে দুর্গন্ধে বাতাসকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। মানুষকে বিষ খাইয়ে মরতে বলতে পারা যায় কিন্তু ওখানে মানুষকে বাস করতে বলা যায় না।

মানুষের এই দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে একদল দুর্বৃত্ত এই ফাঁকে বেশ কিছু লুঠে নিচ্ছে। চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে এমন কি কুমারী মেয়েদেরও সর্ব্বনাশ করছে। এ কথা চাকদার মোড়ে একজন সর্ব্বহারার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে জানতে পারলাম। ভদ্রলোক আরও বললেন, শিয়ালদহ ষ্টেশনে বড় কারবার আছে বলে একজন ভদ্রলোক তাঁকে প্রলোভিত করেন। তাঁর ভগিনীকে সেলসম্যানের কাজ দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। দরিদ্র লোককে এই ভাবে প্রলোভিত করা খুব অসম্ভব নয়—কাজেই নারকীয় পরিণাম হল এই ঘটনায়। দু'দিন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করার পর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। শেষ সংবাদ বললেন: নিষিদ্ধ পল্লিতে নারকীয় কর্ম্মে লিপ্ত তার ভগিনী। দুঃখে, দারিদ্র্যে ও প্রকৃতির পীড়নে আজ আমরা কোথায় নেমেছি—রাস্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

ক্রমে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পার হয়ে পৌঁছালাম ধুলিয়ান ঘাটে। জলঙ্গী ও পাগলাচণ্ডী ইতিমধ্যে পার হয়েছি—এসব নদী পার হতে কোন বাধা নাই, কারণ ওগুলির উপর ব্রীজ আছে। কিন্তু ধুলিয়ানে বার মাইল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গা বা পদ্মা। ধুলিয়ানে লঞ্চে চড়ে বসলাম, ঘণ্টা আড়াইয়েক পরে খেজুরীয়া ঘাটে পৌঁছালাম। ফরাক্কা ব্রীজ এখানে হবার কথা হচ্ছে—শুনলাম। তা ছাড়া ব্রডগেজ লাইন বসাবার তোড়জোড় হচ্ছে, তাহলে অন্যান্য জেলার সঙ্গে মালদহ জেলার যোগাযোগের জন্য এ রাস্তার বিশেষ প্রয়োজন। তা ছাড়া এখানের ব্রীজটির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, কলকাতা বন্দরকে রক্ষা করা। গঙ্গার উপরের স্রোত ক্রমশ: ক্ষীণ হয়ে গেছে। মোকামার ব্রীজ হবার পর আরও স্রোত কমে আসছে। এদিকে বঙ্গোপসাগরের নোণাজল ঢুকে ক্রমশ: চড়া পড়ে যাচ্ছে, কাজেই ফরাক্কা বাঁধ অবিলম্বে প্রয়োজন—এটির জন্য এ এলাকার লোকে ব্যাকুল ভাবে চেয়ে আছে। এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাট যে কি প্রয়োজন দেখলেই বোঝা যায়। রেশম, আম এ জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, এ কথা না বললে মালদহ জেলার কিছুই বলা হয় না। চার দিকে আমবাগান মালদহ জেলার অমূল্য সম্পদ তা ছাড়া গুটি পোকার চাষ এ জেলার উল্লেখযোগ্য শিল্প। এ চাষ করার সুন্দর কৌশল দেখলাম গৌড়ের এক ফার্ম্মে। তুঁত গাছের পাতা খেয়ে এই পোকাগুলি বেশ বড় হয়। যার যত বেশী তুঁত ক্ষেত আছে সে তত বেশী রেশম প্রস্তুত করতে পারে এবং এ নিয়ে আরও গবেষণা চলছে।

গৌড় ও পাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষ দেখলেই সে পুরানো স্মৃতিগুলি আমাদের মানুষ পটে ভেসে ওঠে। সরকারী ব্যবস্থায় এগুলি সুন্দর রাখা হয়েছে।

এর পর দিনাজপুর জেলা পার হয়ে পড়লাম ডুয়ার্সে। এ সব অঞ্চল আগে ভুটানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পরে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে ভুটানের এক চুক্তি বলে বৃটিশ সরকার এ অঞ্চলের শাসন ভার গ্রহণ করে এবং প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ভুটান সরকারকে দিতে স্বীকৃত হয়। স্বাধীনতা পাবার পর ভারত সরকার আরও চার লাখ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ অঞ্চলে কয়েকটি পাহাড়ী নদী আছে, সেগুলির দাপটে উত্তরবঙ্গ কেঁপে উঠে। অল্প সময় এর উপর দিয়ে মাটি ফেলে কাঁচা পুল তৈরী করে অনায়াসে মোটর ট্রাকে চলাচল করে। বর্ষাকালে দু'কুল ছাপিয়ে যায়, টানের চোটে গাছপালা বাড়ী ঘর কোথায় যে যায় তার পাত্তা থাকে না। পাহাড়ী নদীগুলির কি ভীষণ টান তা তোরষা, তিস্তায় চান করে দেখেছি। বর্ষার মূর্ত্তি কল্পনা করা কঠিন।

ডুয়ার্স, তরাই ভারতের মধ্যে ভয়ঙ্কর জঙ্গল এ জঙ্গলে বাঘ, গণ্ডার, হাতী ও অজগর মৃত্যুদূতের মত ঘোরাফেরা করে, কত শিকারীদের যে ঘায়েল করে তার ইয়ত্তা নাই।

এখনও বহু দুর্ঘটনা অনবরত ঘটে। এক ডুয়ার্সবাসীর কাছে শুনলাম যে সে কমলালেবুর সিজিনের সময় পাগলা হাতীর কবলে পড়েছিল তার কাছে শোনা গল্প থেকে একটু উদ্ধৃত করে যদি শোনাই তা হলে বুঝতে পারা যায় এদের আক্রমণ কি ভীষণ। এ'দের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গাছে চড়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যেমন তেমন গাছে উঠে পরিত্রাণ পাওয়া

যায় না ; গাছের গুঁড়ি যদি শক্ত ও মোটা হয় ডাল-পালা যদি ওদের নাগালের বাইরে থাকে, হাতীর আক্রমণ থেকে তবেই রেহাই পাওয়া যায়। তা ছাড়া ওরা ভীষণ একগুঁয়ে, শত্রুকে ঘায়েল করবার জন্ত ওরা সপ্তাহকাল অপেক্ষা করে। এবং ওদের স্মরণ থাকে যে গাছের উপরে শত্রু আছে। এর ব্যতিক্রম হলে হাতীর পাল্লায় পড়ে ফিরে আসার সৌভাগ্য কদাচ দেখা গেছে বলে মনে হয় না। হস্তী সম্বন্ধে ডুয়ার্সবাসী আরও বলে চললেন যে এদের যৌন সংগম আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখেছে বলে তিনি বলতে পারেন না, ঘোর অমাবস্তার রাত্রে গভীর জঙ্গলে এদের যৌন সংগম হয়। কেও অপেক্ষা করলে হস্তিনী তা বুঝতে পারে। পুরুষ হস্তী শত্রুর সন্ধান করে হয় তাকে বিতাড়িত করে না হয় বধ করে পুনরায় তাদের কাজে লিপ্ত হয়। যদি সন্ধান করতে না পারে তাহলে স্ত্রী-হস্তী উন্মাদিনী হয়ে সারা জঙ্গলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। লজ্জাশীলা হস্তিনী তখন দিক-বিদিকজ্ঞানশূন্ত হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলের গণ্ডার আমি নিজে চোখে দেখেছি। সোনাপুর হাটে এক হোমিওপ্যাথী ডাক্তার বাবু থাকেন। দিনের বেলায় ঔষধ দেন রাত্রে ছাত্র পড়ান, তাছাড়া সুন্দর শিকারী তিনি। চামর চি পাহাড়ের নীচে এক গভীর জঙ্গলে গণ্ডার দেখালেন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হুজনে গেলাম ডুয়ার্সের ভয়ংকর জঙ্গলে। যে কোন সময় মরণের জন্ত তৈরী থাকতে হয়েছিল কিন্তু। তাহলেও আত্মরক্ষার জন্ত ছিল ছুটো ধারালো ছোরা। একটা মোটা শাল গাছে ছুজনে উঠে পড়ে হাতের টর্চ্চ ছুটো খুব জোরে নাড়া দিলাম, বিছ্যুতের মত ছুটে এল একটা পাহাড়ের মত জীব। এসেই ঢোঁ মারলো একটা গাছে, তারপর শরীরের যত শক্তি ছিল জাহির করে সারা জমিটাকে তোলপাড় করলো। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল। শুনলাম ওরা শিকার ধরতে না পারলে তাড়াতাড়ি পালায়। হাতীর মত একরোখা নয়। প্রায় ঘণ্টা ছুয়েক পরে আমরা ফের নেমে সন্তর্পণে ফিরে এলাম। গণ্ডারের মূর্ত্তি চাক্ষুষ টর্চ্চের আলোয় দেখে আশ মিটলো। আরও গভীর জংলা পাহাড়ী পথ ধরে চলেছি কিন্তু কোন হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ পাই নাই।

যোগী হপা গোয়াল পাড়ার ঘোর জঙ্গল দিয়ে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমায় চলতে হয়েছে। মাঝে মাঝে জংলী পাহাড়ীদের তাড়া খেয়েছি,—কিন্তু বন্ত জন্তুর দাঁতখেঁচানি সহ্য করতে হয় নেই। দৃঢ় মনোবল প্রচুর সাহস নিয়ে এগিয়েছি, কোথায়ও অযথা ঘাবড়ে যাইনি। ভয় যেখানেই লেগেছে তার কিনারা করেছি—দেখেছি সত্যিই কিছু ভয়ের আছে কিনা। ঐসব যুক্তির কিছুই চলল না যখন গৌহাটি থেকে শিলং যাচ্ছিলাম। শিলং শহর গৌহাটি থেকে ৬৩ মাইল দূরে, সমুদ্রতল থেকে ৪৯০৮ ফুট উঁচুতে। পাক খেতে খেতে কেবলই উপর দিয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। এ রাস্তাটি একমুখো, কারণ প্রায়ই তুর্ঘটনা ঘটতো এ রাস্তায়, তাই শিলং আর গৌহাটি শহরকে যোগাযোগ করতে কর্ত্তাদের দিন রাত পরিশ্রম করতে হয়। শিলং থেকে বাস ট্রাক প্রাইভেট গাড়ী এক সঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা ছাড়া হয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সময় বাতলে টেলিফোন করে নংপোতে, অনুরূপ গৌহাটি থেকে টেলিফোন করে জানায় নংপো পুলিসকে ; গাড়ীগুলি পরস্পর সম্মুখীন হলে তবে ছাড়া হয়। দিনে হু'বার, রাত্রে হু'বার এ ভাবে ছাড়া হয়। গাড়ীগুলি চলে যাবার পর পাহাড়ঘেরা জংলা রাস্তায় নিজেকে যে কি অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়েছে তা জানাবার ভাষা আমার নাই। তবুও প্রথম দিনের ঘটনাকে যতদূর মনে পড়ছে তা বলে যাই।

গৌহাটি থেকে সকাল সাতটায় যাত্রা করলাম শিলং উদ্দেশে, গৌহাটি থেকে মাইল আষ্টেক দূরে এগিয়ে যাবার পর পড়ে একটা গেট। রাস্তাটা তু'ভাগ হয়েছে এখানে, বাঁদিকে নওগাঁ হয়ে ডিব্রুগড় দিকে গেছে। আর এক দিকে গেছে শিলং—জোয়াই চেরাপুঞ্জি হয়ে একবারে মণিপুর। গৌহাটি থেকে নংপো প্রায় ৩৩ মাইল। মাঝে পড়ে জোড়াবাত "ফ্রুট কন্‌ট্রোল সেণ্টার" কয়েক মাইল জুড়ে আছে কমলা লেবুর বাগান, লেবু তুলে এই ঘরে জমা রাখা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। আরও কিছু দূরে পড়ে "অনটু প্রোজেক্ট" এখানে এসে অনটু নদীতে স্নান সেরে একটা দোকানে কিছু খাবার খেয়ে নংপোর দিকে এগিয়ে গেলাম। নংপো পৌঁছাতে যখন ৭ মাইল বাকী তখন সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যা হবার পরই অন্ধকার এত ঘনিয়ে এল যে রাস্তার উপর কিছু দেখা যায় না, একসেল টর্চ্চটায় রাস্তা দেখতে দেখতে ক্রমশঃ এগুচ্ছি। রাস্তার বাঁ পাশে উঁচু পাহাড়, ডান পাশে গভীর খাদ ; মাঝে-মাঝে ঝর্ণার ঝরঝর শব্দ। ভাল তো লাগছিল, সেই সঙ্গে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ থরথর কাঁপছিল। যখন "হাড় গিল্লে কংখল" গুলো বিকট আওয়াজ করে উঠছে ; সর্ব্বাঙ্গ ঘামে নেয়ে যাচ্ছি উত্তেজনায় ; এই বুঝি লাফিয়ে পড়ল হালুম করে। পর মুহূর্ত্তে আবার চিন্তার গতি অন্তদিকে ঘুরে যাচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ ডাকছে আবার ভয়ে সারা শরীরটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

অন্ধকারে সর্ব্বদা পাহাড়ের কোণ ঘেঁষেই চলবার চেষ্টা করছিলাম। রাস্তার উপর কাঁকর ছড়ান আছে পাছে গাড়ীর চাকা পিছলে পড়ে যায় বলে কিন্তু মানুষের পা এতবেশী পিছলায়, আমিও একবার পিছলে পড়লাম ধড়াস করে। যদি বাঁদিকে খাদের দিকে গড়িয়ে পড়তাম তাহলে হয়তো আমার কোন হদিশ কেউ কোনদিন বার করতে পারত না। কিন্তু আগেই আমি বলেছি রাস্তার ডান দিকে চলছিলাম। জোরে আছড়ে পড়লাম কাঁকরের উপরে, কাঁধের উপর প্রায় ১৬ পাউণ্ডের বোঝা, তার উপর নিজের একটা ওজন আছে ; কাজেই আর একবার সর্ব্বাঙ্গ রক্তারক্তি হয়ে গেল। খিদের নাড়ী ভুঁড়ি চুঁই চুঁই করছে, ধিক্কার হয়ে গেল জীবনের উপর। এসময় জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী রাস্তায় সকলের অজান্তে কেঁদে ফেললাম, এর আগে যখন আরও বড় বড় সমস্তায় পড়েছিলাম কিন্তু চোখে কোনদিন জল পড়ে নাই, রাত তখন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে ভয় আরও বাড়ছে, অপরিচিত জায়গা তা ছাড়া পাহাড় আর জঙ্গলের সঙ্গ পরিচয় কতটুকু ? কিই বা জানা আছে এ অঞ্চলের সম্পর্কে। কোলকাতার মত কলরব মুখরিত সহরের সঙ্গে কল্যকাল থেকে যাদের পরিচয়, নিঝুম পল্লী অঞ্চলে যাদের বনবাস বলে মনে হয় ; তাদের কাছে এ অরণ্য কত তুর্গম তা বোধ হয় লিখে জানাতে হবে না। এততে এততে কেমন যেন একটা উন্মাদনা এসে সারা শরীরটা নাড়া দিল। চাঁদের

ফ্লাস্কটা থেকে কতকটা চা ঢেলে খেলাম, সিগারেট ধরালাম একটা, এর পর মা ভৈঃ বলে এগিয়ে গেলাম। ভয় পেলাম না আর।

প্রায় নটার সময় নংপোতে পৌঁছলাম। পাহাড়ের উপর নংপো জায়গাটি একটি চটির মত। এখানে থানা আছে। সংযুক্ত খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়ের থানা নংপো। এর পর শিলং যেতে আর রাত না হলেও কষ্ট যথেষ্ট হয়েছিল। কারণ তার আগের দিনেই শরীরের উপর দিয়ে যে অত্যাচার হয়েছে এবং হাঁটুকাটু ছড়ে যে ভীষণ ব্যথা হয়েছিল সেইজন্য আরও কষ্ট হচ্ছিল তার পরদিন নয়া বাংলোর এক খাসিয়া বস্তীতে ডেরা গাড়লাম। খাসিয়াদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল। এদের পুরুষেরা অধিকাংশ খাঁকির হাফপ্যান্ট আর কালো ফতুয়া পরে, মাথায় কালো ফেজের মত টুপী একটা আঁটে, কতকটা নেপালীর মত কিন্তু লম্বা টিকি এদের মাথায় নাই। এ রকম পোষাক গারো, লুসাই, খাসিয়া জয়ন্তিয়া, মণিপুরী ও নাগাদের মধ্যে চলন আছে। যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের সাধারণতঃ কোর্ট প্যান্ট পরতে দেখেছি। মেয়েদের পরিচ্ছদ তাজ্জব ধরণের। আমি যে কয়টি জায়গার নাম আগে উল্লেখ করছি ওদের কথাই বলছি। কালোর উপর লাল ডোরা কাটা ব্লাউজ পরে আর কোমরে একটা মোটা রকমের লম্বা উড়নার মতন জড়িয়ে যায়, যারা একটু শিক্ষিতা তারা ঐ ওড়না একটু দামী গোছের ব্যবহার করে আর তার সঙ্গে পেট কাটা ব্লাউজ ও বডিস ব্যবহার করে। এদের হাতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটি ব্যাগ দেখা যায়।

মিশনারীদের দৌলতে এরা বেশীর ভাগ খৃষ্টান হয়েছে, লেখাপড়াও এরা বেশ শিখেছে, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের অধিবাসীদের পল্লীতে এ সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তারই ঐ বিবরণ লিখে গেলাম। কারণ দু'এক দিনের মধ্যে সবকিছু জানা সম্ভব নয়। এ দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি ও বলবান এদের সকলের হাতে বঁটির মত—অদ্ভুত ধারাল একটা অস্ত্র থাকে, তাই দিয়ে এরা কাঠ কাটে, হিংস্র বন্য জন্তুর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে। আক্রমণকারীকে দু'খানি করে ছাড়ে। এরা বলে বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে জবাই করা হয়। এদের সমাজ বড় অদ্ভুত রকমের। মেয়েরা সম্পত্তির অংশ পায়। পাহাড়ে কাঠ কাটা আর রান্না করা ছাড়া পুরুষদের আর কোন কাজ নাই। মেয়েরা স্কুলে যায় অফিসে যায় চায়ের দোকানে কাজ করে। এসব কাজ তারা সবাই করে। এদের ভারী সুন্দর গালগুলো, ফুলো ফুলো আপেলের মত রং। খাসিয়া সুন্দরীরা নিজেদের ইচ্ছানুসারে সব কিছু করে, তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় পুরুষেরা অযথা হাত লাগায় না। পরদেশীর সঙ্গে ওরা অবাধ মিলেমিশে। এ মেলা মেশাটা ওদের ইচ্ছানুসারে হয়। এরা অত্যন্ত গরীব তাই অবাধ স্বাধীনতাটা এদের। পাঁচ বছর বয়স থেকে বাপ মা এদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেড়ে দেয়। পাহাড়ে উঠে কাঠ-কেটে বোঝা বহে পেট চালায়। কাজেই এদের উপরওয়ালা কেউ নাই। শিলং-এর এক অফিসের সামনে এক খাসিয়া যুবতী এক হিন্দুস্থানী চানাচুরওয়ালাকে বলেছে, 'দু আনা মে মজা লুটে গা' বুঝতে পারা যায় উ.দ্দ্ধ তার।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শিলং পৌঁছে ৭ দিন ঘুরে এদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতে চেষ্টা করি। শিলং সহরের বর্ণনা আমি করব না শিলং পৌঁছাতে যে কত কষ্ট হয়েছিল তারই কিছু বাতলে দিলাম। শিলং থেকে বাসে করে যারা নামে, বাসের ভিতর থেকে তারা বমি করতে করতে আসে। এর কারণ পাহাড়ের পাক খাওয়া রাস্তায় গাড়ী চড়া অভ্যাস না থাকায় এরকম হয়। সেই জন্য আগে থেকে অনেকে মুখে লজেন্স নেয় শুনেছি। আমার জামায় ও ব্যাগে এরকম দু'তিন দিন বার বমি লেগেছে। নয়া বাংলো থেকে শিলং-এ যেতে একদিন গোটা সময় লেগেছিল নয়া বাংলোর পর রাস্তাটা আবার পাক খেতে খেতে উঠেছে। বস্তি এ রাস্তার উপর আর দেখা গেল না রাস্তায় খাবার দাবার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি চা আর লাঠি বিস্কুট খেতে খেতে চলেছি। এগুলি একটা বস্তির দোকান থেকে পাওয়া গিয়েছিল খাবার বলতে এই বোঝায় এ ছাড়া যে খাবার পাওয়া যায় সেগুলি খাবার বলে মানা যায় না সেদ্ধ ছোলাকে নানা রকম মশলা মিশিয়ে রান্না করে তার উপর ধনে গাছের পাতা ছড়িয়ে এগুলি বাসী করে রাখে অজস্র মাছি ওতে ভন্ ভন্ করছো দেখা যায় খিদের চোটে তখন আর সে বিচার করবার ধৈর্য্য ওদের থাকে না। চার পয়সায় দেয় অনেকটা। তার সঙ্গে এক রকম রুটি তৈরী করে ওরা চাটনীর সঙ্গে ওগুলো খায় ওদের নাকি খুব ভাল লাগে! ময়দার তালটাকে জলে নেয় পরে জিলপীর মত প্যাঁচ দিয়ে তেলে ভেজে নেয়, এরা এদের ভাষায় রুটি বলে। চা তৈরির ধরণও তাজ্জব রকমের। এক গেলাস ফুটন্ত জলে, কয়েক চামচে চিনি দেয় পরে নুনও দেয় একটু তারপর একটুখানি চা পাতার রস দেয় দুধও একটু দেয়, এই চায়ের গেলাস একটু ঠাণ্ডা করে খেতে ভালবাসে কিন্তু বরফ পড়ার সময় গরম গরমই খায়।

শিলং-এ পৌঁছাবার তখনও ঘণ্টাখানেক বাকী, খিদের চোটে ঐ উপাদেয় খাদ্য আমাকে খেতে হয়েছিল—নইলে এক পা'ও চলার শক্তি আমার ছিল না। ২৫ মাইল ঘূর্ণিপাক খাওয়া রাস্তা ধরে উঠে যদি খাওয়া না হয়—তবে যে কি অবস্থা হয় এ আমি বেশ ভাল করে বুঝেছি।

এ রাস্তায় চলতে চলতে যখনই পিপাসা পেয়েছে, তখন ঝরণার জল খেতে বাধ্য হয়েছি। ঝরণার পাশে লেখা আছে "জলপান নিষিদ্ধ" পাহাড়ের ময়লা জল সর্ব্বদা বেরুচ্ছে একটু জল হাতে নিয়ে যদি ধরা যায় ময়লায় ভর্ত্তি হয়ে যায় হাতটা।

তারপর ঐ ঠাণ্ডায় ঝরণার জলে স্নান করতে হয়েছে। কিন্তু বলতে কি এক দিনের জন্য কোন রকম শরীর খারাপ হয়নি। পা'টা রক্তারক্তি হয়ে ঘা হয়ে যায় ফলে রাস্তা হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তাতে পথ চলা বন্ধ হয় নাই। শিলং-এ পৌঁছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করেন, এবং তাঁর বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের গল্প শোনাবার জন্য আমায় বলেন, তারপর শ্রীমতী চালিহা এই অভিযানের জন্য উৎসাহিত করেন। তাছাড়া তিনি আমার পাথের বাবদ কিছু অর্থ সাহায্যও করেন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম "প্রকাশ হোটেলে" এখানেই উঠেছিলাম। সারা

দিন পরে বোয়ায়ের রাস্তা ধরলাম কিন্তু বোম্বাই যাওয়া হয়ে উঠল না। গেলাম মণিপুরের দিকে। সোজা মণিপুর যাওয়ার কোন পাকা রাস্তা নাই, সেই নওগাঁও ঘুরে লমডিং হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ রাস্তায় চলা নিষিদ্ধ। গাড়ী চলায় আরম পুলিশ গার্ড দিয়ে। নাগাহিলের ভিতর দিয়ে গাড়ী চলে। যে কোন মুহূর্ত্তে দলবদ্ধ ভাবে এসে নাগারা আক্রমণ করে, লুণ্ঠন করে এবং শেষে মেরে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয়। ও রাস্তায় যেতে চাইলেও পুলিশ ওদিকে যেতে দেয় না। সেইজন্ম নেফা আর নাগাহিলের ব্যাপার কিছু জানতে পারলাম না। কিন্তু জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া পাহাড়ের ভিতর দিয়া মণিপুরে যাবার কাঁচা রাস্তা আছে। এ রাস্তা ধরে মাঝে মাঝে দু একটা জীপ গাড়ী যাতায়াত করে, তবে পথ বড় দুর্গম চারিদিকে গভীর জঙ্গল, মানে কষ্টের আবার পুনরাবৃত্তি হল, তবে দুর্গম হলেও রাস্তাটা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড় থেকে নামতে কোন কষ্ট হয় না, মাঝে মাঝে লোক বসতি যথেষ্ট আছে।

খাসিয়া পাহাড়ের এ অঞ্চলটা দক্ষিণ দিক। মনের দিক থেকে এরা একেবারে চার পাঁচ শতক পিছে পড়ে আছে। সামাজিক আদব কায়দা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এক রাতের ঘটনা উল্লেখ করা বোধ হয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আমার ভ্রমণ কাহিনী। অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে কিন্তু লেখকের কল্পিত কাহিনী বলে যদি কেহ ধারণা করেন তবে তিনি খুব ভুল করবেন। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে মণিপুরের কাছে পৌঁছেছিলাম শিলং থেকে শ' আড়াই মাইল দূরত্ব ইম্ফলের। ইম্ফলে পৌঁছানোর দুদিন আগে যোয়ায় বনে আলোচ্য ঘটনাটি ঘটে।

মণিপুরীদের অতিথি হলাম। গ্রামসেবক আমায় আশ্রয় দিল। আমার আসার খবর দিল সারা মহল্লায়। দুন্দুভি বেজে উঠল, বাজল মাদল। লোকনৃত্যের মহড়া চলল কিছুক্ষণ। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের অভিনয় হল। কেঁদো সেদ্ধ মদ খাইয়ে ঘণ্টা দুই ধরে আনন্দের বন্যা বহে গেল যোয়ার বনে। পরেরদিন সকালে এ রহস্যের তথ্য আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্য্যার রীতি এদের এই রকম কুমারী মেয়ের ভাগ্যে যদি একশটি অতিথি বরণ করবার সৌভাগ্য ঘটে তবে তিনি সতী পুণ্যবতী।

এর পর উল্লেখ করবার মত কোন ঘটনা আর বিশেষ কিছু ঘটে নাই। মামুলী ঘটনা জুড়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

ইম্ফল দেখে গৌহাটির দিকে রওনা হলাম। আগেই বলেছি এ রাস্তা ধরে হাঁটা একেবারে অসম্ভব। ট্রাক ধরে লামডিং এলাম ওখান থেকে নওগাঁ হয়ে আবার ফিরে এলাম গৌহাটিতে তারপর ট্রেন ধরে মুরকী এলাম। মিটার গেজ লাইনে কি ভীষণ ভীড় হয়। দেখে তাজ্জব লাগল। কামরাগুলি আগেই বন্ধ করে দেয় ভিতরের লোকেরা। হিন্দুস্থানী যোয়ানেরা লাঠি চালিয়ে লোকের মাথা ফাটিয়ে রক্তপাত করে। পুলিশ কিন্তু মোটামুটি দর্শকের ভূমিকায় নামে, কারণ এ ঘটনা নিত্য।

আবার আলিপুর দোয়ার হয়ে চামরচি পাহাড় হয়ে সিকিমের দিকে এগুলাম।

তিস্তাব্রীজ পার হয়ে সেবক পাহাড়ে পৌঁছালাম, সে দিন ছিল দোলের দিন—কাজেই পাহাড়ী রাস্তা ধরে চলছিলাম নীচে থাকলে রংএ ভাসিয়ে দিত। জামা কাপড় ও কাগজ পত্র বাঁচাতে গিয়ে সেদিন আমার অবস্থা শোচনীয় হল। ৪২ মাইল রাস্তা আমাকে একদিনে পার হতে হয়েছিল। তিস্তার ২নং ব্রীজে এসে শুনলাম কালিম্পং দশ মাইল দূরত্ব। মাঝে কোন জায়গা নাই যে সেখানে একদিন রাত কাটাই। তিস্তা ব্রীজ যেখান থেকে গাংটক, কালিমপং—আর অন্যদিকে দার্জ্জিলিং-এর রাস্তা বের হয়েছে—এ জায়গাটা সমুদ্রতল থেকে ১৩শ ফুট উঁচু—আর দশ মাইল ব্যবধানে কালিম্পং প্রায় ৫ হাজার ফুট উঁচু—কাজেই সহজে বোঝাযায় দশ মাইল রাস্তা ঘূর্ণিপাক খাওয়া পাহাড়ের রাস্তা ধরে উপরে উঠতে হয়েছে। সারা দিন উপবাসে কেটেছে। পয়সা তখন সব ফুরিয়ে গিয়েছিল—পাহাড়ে কার কাছে সাহায্য পাব? কোন উপায় না দেখে এগুতে গিয়ে কালিম্পংএর প্রবেশ পথে অচৈতন্ত হয়ে পড়লাম—যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম কালিম্পং টেলিফোন মেসের বিছানায় শুয়ে আছি।

কালিম্পং থেকে আবার কিছু সাহায্য পেলাম এবং গাংটকের দিকে এগুলাম। মাঝে পড়ে রংপো চেক পোষ্ট। জোর পরীক্ষা হচ্ছে—কেন না চীনা গুপ্তচরেরা হামেশাই এ-দিকে বে-আইনী ভাবে ভারতে প্রবেশ করে। রংপো থেকে আবার পাহাড়ী রাস্তা ধরে ঘুরে ঘুরে গাংটকে গিয়েছিলাম আর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। গাংটকে রেশিডেন্সিতে উঠে পলেটিক্যাল অফিসার্শ আপ্পা বিঃ পন্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ তিনিও আমার অভিযানকে সমর্থন করেন।

অবশেষে গাংটকে আমার অভিযান শেষ করলাম। প্রায় সাত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে কোলকাতায় ফিরে এলাম।

ফিরলাম যানবাহনযোগে। কারণ আমার উদ্দেশ্য হেঁটে যাওয়া—ফিরে আসা নয়। আগামী নভেম্বরে দক্ষিণ-ভারত রওনা হব। আশা করছি আবার আপনাদের আমায় কাহিনী শোনাব।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺শচীন্দ্র মজুমদার

হিন্দু বিবাহ

বাঙালীর অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ পৃথিবীর সকল বিবাহ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন আদর্শের। রবীন্দ্রনাথ তার যে ব্যাখ্যা করেছেন তা প্রত্যেক বাঙালীর জানা ও মনে রাখা কর্তব্য। হিন্দু সমাজের গঠন আমাদের বিবাহের ভিত্তি। সমাজের মঙ্গলে ব্যক্তির মঙ্গলও নিহিত। সুতরাং হিন্দু বিবাহের আদর্শে ব্যক্তিগত রুচি বা অভিপ্রায়ের কোন স্থান নেই। সে আদর্শ ঐ দুটি জিনিষকেই ভয়ের চক্ষুতে দেখে। দুটি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ফলে যে গান্ধর্ব বিবাহ, মনু তাকে যেমন কামজ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেছেন যে সে বিবাহে কামনার মশালই পথ দেখায়; তাতে ব্যক্তিগত তৃপ্তির অন্বেষণ ছাড়া সামাজিক মঙ্গল সাধনের কোনো শক্তি নেই। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রেমঘটিত বিবাহের বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান। তাঁদের মতে এ ধরণের বিবাহের স্বভাব—বিবাহিতদের ব্যক্তিগত কামনা ছাড়া আর সব কিছুকে বহিষ্কার করা। নির্বাচন বিবাহের ধর্ম—বাহিরকেও বিবাহিত-জীবনের সীমাভুক্ত করা। গান্ধর্ব বিবাহের রতিপ্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য ভাবে স্থায়ী হয় না।

ব্রাহ্ম বিবাহের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে আমাদের শাস্ত্রমতে এই বিবাহ পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠ। এ বিবাহে এমন পাত্রকে কন্যাদান করা হয় যে কন্যাকে যাচ্ঞা করেনি। সমাজই এ বিবাহের কর্তা, তাতে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোনো স্থান নেই। ইওরোপের সকল রাজবংশে এইরূপই একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো। ইংলণ্ডের রাজবংশ ১৭৭৫ সালের Royal Marriage Act দ্বারা সুরক্ষিত, যার জন্য স্বেচ্ছাবিবাহের কারণে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডকে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে হয়েছিলো।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিবাহ অদৃষ্ট নির্ভর ব্যাপার, দুটি মানুষ তাতে অন্ধকার সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফল সম্পূর্ণরূপে বিধাতাপুরুষের হাতে। তাই মনীষীরা তার আট-ঘাট বাঁধতে গিয়ে কামনার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মানুষের এমন একটা বয়স আছে যখন তার যৌন প্রেরণা সুতীব্র হয়ে উঠে। যদি সমাজের মতে বিবাহকে নির্দ্ধারিত করতে হয়, তাহলে সেই প্রেরণাটির নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। হিন্দুর বাল্যবিবাহ সেই কারণে। আমরা আধুনিক কালের মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই প্রাচীন প্রথার বেশ একটি অর্থ নির্ণয় করতে পারি। গোড়াতেই বলা হয়েছে যে পুরুষের তারুণ্যগত যৌনচেতনার তিনটি বিশিষ্ট রূপ ও পর্যায় আছে। উদয়ের প্রথম অবস্থায় সেটি আত্মরতি। উৎকর্ষের প্রথম অবস্থায় সেটি পররতি। দ্বিতীয় অবস্থাটি ব্যক্তির পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, সমাজ ও পরিবারের পক্ষেও তেমনি গভীর ভাবে অমঙ্গলকর। প্রাচীনেরা তাই এই অস্থির উৎকর্ষশীল কামচেতনাকে বিবাহের স্থায়ী গণ্ডীর ভেতর বাঁধতে চেয়েছিলেন। আরো চেয়েছিলেন যে এই প্রচণ্ড আবেগ ন্যায্য ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ লাভ করুক। তাতে সমাজের এই মঙ্গল নিহিত ছিলো যে এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যৌন রোগ এবং গণিকাবৃত্তি উৎসাহ পেতো না। সেকালের সামাজিক অবস্থার নিরিখে যে প্রাচীনেরা ভুল করেছিলেন, এখন আমরা এমন কথা বলতে পারি না।

বিবাহের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম নির্ভরযোগ্য কিছু নয়। হিন্দুরা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বিবাহকে শুভ ফলদায়ক করতে গেলে বিবাহের পূর্বাহ্নেই তার জন্য অনুশীলন করার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে সেই জন্য খুব কম বয়স থেকে আমাদের মেয়েদের কাছে শ্লোকে গাথায়, ব্রতপূজায়, নানা অনুষ্ঠানে স্বামীর আদর্শটি তুলে ধরা হয়েছে। যথাকালে মেয়েরা যখন স্বামী লাভ করে, তখন স্বামী কোনো ব্যক্তি নয়, সে একটি প্রকৃষ্ট তত্ত্ববিশেষ যা অনুরক্তির মতো, স্বদেশকে ভালোবাসার মতো, মেয়েদেরই অন্তরে সৃষ্ট হয়ে পুষ্ট হয়ে আত্মার অঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের বাংলাদেশে তাই শিবপূজা, হিন্দুস্থানী মেয়েদের তুলসীদাসের নির্দেশে পার্বতী-পূজা। আমাদের দেশে তাই সতী, অর্থাৎ আদর্শ পত্নীর সমাদর আছে, যে পত্নী গার্হস্থ্য ধর্মের প্রতীক। এই উপায়ে যৌন আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে বিবাহিত প্রেমের অনুশীলন করবার চেষ্টা আমাদের দেশে যুগ-যুগান্তর ধরে হয়েছে। পত্নীর কাছে পতি একটি আদর্শ মাত্র। এ অবস্থায় সে কারো কাছে পাশবিক বলে বাধ্য হয়ে আত্মদান করেনি, বরং স্বেচ্ছায় একটি আদর্শের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছে। স্বামী যদি হৃদয়বান হয় তাহলে প্রেমের এ শিখা তার জীবনকেও আলোকিত করে। "সহধর্মিণী" কথাটি আমাদের নিজস্ব। কোনো দেশের বিবাহের বর্ণনায় অনুরূপ একটি শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। শব্দটির ইঙ্গিতেই জীবতত্ত্ব অতিক্রম করে মানবতত্ত্বের সাধনার কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ আরো মন্তব্য করেছেন: নারীর দুটি রূপ। একটি রূপে সে মাতা, অন্য রূপে প্রিয়া। আধ্যাত্মিক প্রয়াস মাতার ধর্ম। কেবল সন্তানের জন্মদান করেই সে কান্ত হয় না।

তাকে নরোত্তম করার জন্ত মাতার অক্লান্ত চেষ্টা যাতে সন্তান শুধু মানব-সংখ্যাটারই বৃদ্ধি না করে। অন্যায়ের সঙ্গে, আবেষ্টনের সঙ্গে অবিরাম ও অনিবার্য যুদ্ধে এবং তার সামাজিক জীবনে জয়ী হয়। প্রিয়ার রূপে নারীর কাজ, সকল উচ্চাশায়, সকল সঙ্কল্পে তার পতিকে অনুপ্রাণিত করা। আত্মার যে বল দিয়ে নারী এই কর্মটি সম্পাদন করে, তাকে হিন্দুরা শক্তি বলেছেন, নারী তাই শক্তিরূপা। সে শক্তির পরিচয় দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী "চার্ম" Charm শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আমি সেটিকে হ্লাদিনীশক্তি বলবো। কবিগুরুর এ উক্তিটি মনে রাখবার মতো যে "গৃহের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই নারী মুক্ত হয় না। তার মুক্তি তখনই সম্ভব যখন তার শক্তি, তার আনন্দ সংসারের মুক্ত ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।"

নূতন আকাশ

বিবাহের নামে সকল যুবক-যুবতী মধুর স্বপ্ন দেখে, মনে মনে স্বর্গ রচনা করে। কিন্তু বিবাহ কঠিন মাটির জিনিষ, তার শিকড় মাটিতে, সেটি স্বর্গের কিছু নয়। সেক্সপীয়রের একটি বাক্য উদ্ধৃতি করার আমি লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, Maids are May when they are maids, But the sky changes when they are wives. এর চেয়ে পরম সত্য কথা আর নেই।

বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবদম্পতির যৌন, প্রজনন সম্বন্ধীয়, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির নূতন ও বিশিষ্ট রূপ হতে আরম্ভ করে। প্রথমে যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহ হয় সে সব কোথায় হারিয়ে যায়। কারণ, উভয়ের মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হয়, নূতন একটি শক্তি তাদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। সব চেয়ে বড়ো কথা, ভালোবাসা যতোই প্রগাঢ় বা স্থায়ী হোক না কেন, তার রতির অংশটুকু আর মুখ্য না থেকে একটি গৌণ স্থান অধিকার করে। তার স্থানে একটি নূতন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জেগে ওঠে, দুজনের ভাগ্য যে একান্ত ভাবে এক, দম্পতির সেই উপলব্ধিটি হয়। পতিপত্নীর গভীর ঐক্যের চেতনা বিবাহের অব্যবহিত পরের অমোঘ ফল। প্রাকৃতিক সংস্কারগুলি দম্পতির আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে লীন হয়ে গিয়ে তাদের একাত্ম করে একটি বিচিত্র জীবনে উন্নীত করে দেয়। কথাগুলি আমার নয়, সুবিখ্যাত মনীষী হার্মান্ কেসরলিঙের। সকল অভিজ্ঞ দম্পতি আত্মপর্যবেক্ষণের দ্বারা কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

আমাদের বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের সময়ে বরকে কয়েক বার "প্রতিগৃহ্লামি" কথাটা বলতে হয়। প্রীতিসজাগ কন্যাটিও নীরবে গ্রহণ করে। গ্রহণ করা মানে, জীবনের সকল দায়িত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। এ স্বীকৃতির অর্থ, জীবনের নানা দুঃখ-বেদনাকে মেনে নেওয়া। যে নারী বা পুরুষ বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই দুঃখ-বেদনাকে স্বীকার করে নেয়, সে তৎক্ষণাৎ জীবনের সকল অভিব্যক্তির কেন্দ্রস্থলটি অধিকার করে। তখন দুঃখ আর তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিজের প্রকৃতি দিয়ে বিবাহ সহজ নয়, সুখের অবস্থা নয়। সুখকে নির্মাণ করে নিতে হয়। এইখানেই দম্পতির কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হতে পারে না, তাই অধিকাংশ বিবাহ ব্যর্থ হয়। কোন মেয়ে বা পুরুষ বিবাহিত জীবনের বৃহত্তর সকল সম্ভাবনাকে মনে রেখে বিয়ে করতে বসে না, অজানা অবস্থাতেই শুধু মিলনের উৎসাহ নিয়েই বিবাহ করে। তাই যখন কোন ঝড় ওঠে তখন আর তারা কূল খুঁজে পায় না। বিবাহিত জীবনের সকল সমস্যা প্রত্যেক দম্পতির ব্যক্তিগত সমস্যা, কোন সাধারণ বাঁধাধরা উপায়ের দ্বারা সে সকলের সমাধান ঘটানো অসম্ভব কথা। একমাত্র ভালোবাসার সামঞ্জস্য দিয়ে সে সমস্যার নিরসন হয়। ভালোবাসা মানে পরস্পরে মজে যাওয়া। কিন্তু মনে রাখতে হয় যে মজে যাওয়ার ক্ষেত্রটি বিরাট বিস্তৃত। দেহের সম্যক মিলন থেকে আরম্ভ করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুরসঙ্গতি পর্যন্ত তার বিস্তার।

বিবাহে সফল হবার জন্য, সুখ অর্জন করবার জন্য পতি-পত্নী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। বিবাহে নারীর দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। বিবাহের ক্ষণে তারই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যে সকল বিঘ্নবিপদকে অতিক্রম করে জীবনকে আমি ঐক্যের, সামঞ্জস্যের, ভালোবাসার আবাস করে তুলবো। নিজের প্রেমশক্তি ও শুদ্ধসত্বের পথটি ধরে থাকলেই এ সাধনা সহজ হয়। এই প্রতিজ্ঞাই মেয়েদের হ্লাদিনী শক্তির উৎস। যে সকল দাম্পত্য দৃষ্টান্ত আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তাতে একটি মুখ্য কথাই আছে—হাসিমুখে আনন্দ দিয়ে অদৃষ্টের রুক্ষতাকে বরণ করা। যে সকল বরেণ্যা নারীর আজও আমরা মহিমা ঘোষণা করি তাঁরা সকলেই হাসিমুখে অদৃষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর কথা কোন বাঙালী মেয়ে না জানে? তাঁদের কাহিনীতে ভোগ ঐশ্বর্যের কথা নেই। দুঃখের মাঝেই তাঁরা দীপ্ত। এ বিপুল মহিমায় আমি পুরুষকে খুঁজে পাই না। সীতার কাছে তাঁর জীবন ও তাঁর নিষ্ঠুর অদৃষ্ট যা দাবী করেছিলো তা তিনি পূর্ণ করেছিলেন। বিরাট মহিমা তাঁর সেই জন্যই। এ শক্তি কেবল নারীতে নিহিত। আমাদের অনেক ঘরে আজও যে সীতার মতো রমণীরা বিরাজ করছেন তা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। তাঁরা দুন্দুভিঘোষণার অপেক্ষা রাখেন না বলে আমরা তাঁদের পরিচয় পাইনে।

জীবন একাধারে মহাযজ্ঞ ও যোগানুশীলন। আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেলো। বিবেকানন্দ একবার একটি মহিলাকে বলেছিলেন, "মা, আপনার যোগে অধিকার হয়েছে, আপনি দীক্ষাগ্রহণ করুন।"

মহিলাটি হেসে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর, উদয়-অস্ত এই সংসার-যজ্ঞই আমার যোগানুশীলন, আমার অন্য যোগ নেই।" বিবেকানন্দ সে কথা সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন।

বিবাহের মতো জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে এমন প্রেমকামী শক্তিকামী মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করবার অবসর নেই। সেই জন্যই আমাদের সংসার করাকে গার্হস্থ্যধর্ম বলে। আর কোন দেশে অমন একটি কথা নেই বলেই মনে হয়।

ভাবুক কেসরলিঙ বলছেন যে, দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত না হলে দাম্পত্যসুখের কোন সংজ্ঞা নেই। দুঃখকে জয় করাই সুখকে আকার দেয়, সেটিকে পরিমার্জিত করে। একাত্ম হতে গেলে দুজনে এক সঙ্গে দুঃখভোগ করা ছাড়া অন্য পথ নেই। উৎসবে আত্মার

মিলন হয় না। নিম্নস্তরে, পতি-পত্নীর সাংসারিক ক্রিয়ার উচিত অংশগুলি যথাযথ বণ্টন করে নেওয়া দাম্পত্যসুখকে স্থায়ী করবার উপায়। নিম্নস্তরে বিবাহ যেখানে তৃপ্তির অবস্থায় এসে পড়ে জীবন তাতে একটা গতানুগতিক রুটিনে বাঁধা পড়ে যায়। এ অবস্থাটা উৎকর্ষশীল পতি ও পত্নী, উভয়ের পক্ষেই সুখকর নয়। ভালো করে গভীরভাবে বুঝতে গেলে এই কথাটাই পাওয়া যায় যে বিবাহ মূলতঃ যৌনমিলন নয়। বিবাহের সন্তানার্থী জৈব সীমাটি উত্তীর্ণ হবার পর দম্পতির প্রকৃত মানবজীবনের আরম্ভ। আত্মার উপলব্ধি তার চরম উদ্দেশ্য। বিবাহ এই স্তরেই সার্থকতা লাভ করে, নিম্নস্তরে নয়। বন্ধ্যা নারীর জীবনও সেই কারণে ব্যর্থ না হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

জীবন যেমন বিবাহও তেমনি একটি অচর অবস্থা নয়। সেটি গতিময় ও পরিবর্তনধর্মী। নদী যেমন আকারে স্থায়ী কিন্তু তার অন্তরে সদা-নূতন জলরাশির প্রবাহ, বিবাহিত জীবনও তাই, তার অন্তরে সদা-নূতনের রাজত্ব। যে দম্পতির জীবন ঘটনাচক্রে একটি অচর অবস্থায় এসে পড়ে তাদের বিবাহ ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু যারা এই পরিবর্তনশীলতার রূপটি বোঝে, তার প্রত্যেকটি সমস্যার উপলব্ধি করে, তারা তার সমাধানও ঘটাতে পারে। অচরতা যেখানে বস্তুগত, সেখানে অনন্ত ঘাত-প্রতিঘাত। এই জটিল মনটিতে বিবাহিত জীবনে সংস্কৃতির ক্রিয়ার অবসর আসে; সেই ক্রিয়া ভিন্ন আত্মোপলব্ধি নেই, সমস্যার বিধানও হয় না। বিবাহ পতিপত্নীর বিচ্ছেদবিহীন সম্বন্ধ। পত্নীর কর্মক্ষেত্র এইখানে। নারী সংসারের সাম্রাজ্ঞী। আজ যতোই তার অধিকার এবং দাবী নিয়ে আন্দোলন হোক না কেন, তার প্রভাব ও প্রভুত্ব যে কোনদিন ক্ষুণ্ণ নয় তা আমি চারটি বংশক্রমের নারীদের দেখে একটু জোর করে বলতে পারি। এ আন্দোলন বিরোধ জীবস্তরে আবদ্ধ, মানবস্তরে তা প্রবেশ করতে পারে না। মেয়েরা গায়ের জোরে অপরকে শাসন করে না, শাসন করে তাদের মাধুর্য ও হ্লাদিনীশক্তি, তাদের সঙ্কেতময় মন্ত্রণাবুদ্ধি, তাদের মাতৃত্বের অনুভবশক্তির দ্বারা অপরকে সহজে বুঝে নেবার ক্ষমতা দিয়ে। মেয়েদের এ শক্তির তুলনা নেই। বিবাহ নারীর একান্ত নিজস্ব ধর্ম ও আর্ট। বিবাহ তার জীবন্ত, তার প্রাণের প্রয়োজন। আমার এ কথা গভীরতম উপলব্ধির যে স্বামীকে যে সংস্কৃতির সোপানে সোপানে আরোহণ করতে অনুপ্রাণিত করে তার নাম প্রিয়া। যে স্বামীর জীবনে মানবধর্মের বীজ বপন করে সেটিকে প্রাণবন্ত করে, তার নাম সহধর্মিণী। কিন্তু জীবন বড়ো শ্লথগতি; তার ক্রমিক বিকাশ অত্যন্ত মন্থর। এই মন্থর গঠনশীল কালে একটু সচেতন ক্রিয়ার প্রয়োজন। সে ক্রিয়া পরম আস্থা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের দৃষ্টি, পরস্পরকে গুরু বলে মেনে নেওয়া। বর্দ্ধমানা প্রীতিকে শ্রদ্ধা বলে। এ সবই প্রীতি নিয়ে খেলা। বিবাহ যোগানুশীলন। দীর্ঘকাল, নিরন্তর এবং সমাদরের দ্বারা সেবা না করলে কোন সাধনায় দৃঢ়ভূমিক হওয়া সম্ভব নয়। দৃঢ়ভূমিক না হলে কোন সাধনা হয় না। সেই উপায়ে বিবাহ সাধনাতেও দৃঢ়ভূমিক হতে হয়। স্বামী যেমন সর্বাংশে পূর্ণ হয় না, স্ত্রীও তেমনি সর্বাংশে পূর্ণ নয়। পরস্পরের অভাব যখন পরস্পরে পূর্ণ করে তোলে তখনই বিবাহের মিলন সত্য, সার্থক, পরমানন্দের—জীবনব্যাপী প্রার্থনার সিদ্ধি।

পতি-পত্নী

বিবাহ অদৃষ্টশাসিত বিধি। তার জন্য মেয়েদের যা প্রস্তুতি তার অর্ধেক রূপ। কটি অদৃষ্টপূর্ব অজ্ঞাত আর একটি আধখানার সহযোগে সেটি পূর্ণ হয়। এই অন্য আধখানাটি স্বামী। কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য যে যুবকটি ছাদনাতলায় এসে দাঁড়ায় তার দুটি রূপ। তখন পর্যন্ত তার মৌলিক রূপটি ব্যক্তির; অন্য সম্ভাবিত রূপটিতে সে স্বামী। একই মানুষের দুটি বিভিন্ন সত্তা। পাণিগ্রহণের মুহূর্ত থেকে তার স্বামিসত্তাটির আরম্ভ। সেই শুভক্ষণ থেকে কন্যাটিরও ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে পত্নীরূপের আরম্ভ। যে প্রাকৃতিক উপকরণটি দুজনের সমানভাবে থাকে সেটি যৌনতা, যা তাদের প্রথম মিলনের ভিত্তি। স্বামিত্বের ও পত্নীত্বের বাকি বৃহত্তর অংশটির খানিকটা ঐতিহ্যগত ও খানিকটা সংস্কৃতিগত। সংস্কৃতিগত যেটি তা বিবাহোত্তর কালে সারা জীবনের প্রয়াসে পরস্পরের সাহচর্য ও সহায় দিয়ে গড়ে নিতে হয়। অন্য কোন পথ নেই। বিবাহের অনুষ্ঠানের ক্ষণটি পর্যন্ত দুজনেরই অপরিণত অবস্থা। বর-বধূ দুজনেই নূতনের পথে সমান অনভিজ্ঞ নবীন যাত্রী। বিবাহোত্তর কালটি জীবনব্যাপী, একান্ত নিভৃত, তাতেই বিবাহের প্রকৃত উন্মেষ। সফলতা বা বিফলতা তাতেই নিহিত। দুটি অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতী তাতে পরস্পরের সাথী ও সহায়। ভাঙা-গড়া কেবল তাদেরই হাতে। সে কালটি পূর্ণ করে যাপন না করলে বিবাহকে জানা ও আয়ত্ত করা অসম্ভব কথা। জীবন, বিশেষ করে বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ চারুকলা। আমাদের শাস্ত্রমতে হাত শিল্পেন্দ্রিয়। বই পড়ে যেমন কোন শিল্প শেখা যায় না, হাতে-কলমে নিরন্তর সাধনায় শিখতে হয়, বিবাহও তেমনি হাতে-কলমে নিরন্তর সাধনার দ্বারা করণীয়। বিবাহের রস ও রহস্য বিচিত্র, সাধনা না করলে তাদের আস্বাদন করা সম্ভব হয় না।

যুবকটি একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দ্বারা লালিত। তার পুরুষালি ঐতিহ্য বলে, সংসার তার রাজ্য; সেখানে সে প্রভু, সিংহাসনাধিকারী রাজা। সংসারকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখা, তার উন্নতিসাধন করা, পত্নী ও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করা তার পুরুষধর্মের অঙ্গ। মেয়েটির মেয়েলি ঐতিহ্য বলে পত্নীরূপে স্বামীর সংসারে তার বিশিষ্ট একটি স্থান থাকলেও সেটি গৌণ, প্রভুত্বের নয়। তার প্রভুত্বের যেটুকু অধিকার সেটুকু সন্তান ও দাসদাসীর ওপর, স্বামীর ওপর নয়। কিন্তু স্বামী মাত্রেই একটু আনাড়ি জীব। সে অর্থোপার্জন করে, সংসারের ভার বয়, কিন্তু গৃহস্থালী পাতা ও তাতে শৃঙ্খলা স্থাপন করা তার কাজ নয়। সেটি সম্পূর্ণ ভাবে পত্নীর দায়িত্ব। তাই সংসারের বিরাট কর্মক্ষেত্রে মেয়েরাই রাণী। এমন স্বামী ভূপৃষ্ঠে বিরল যার ব্যক্তিসত্তা ও স্বামিসত্তা সমান ভাবে পূর্ণ ও শক্তিমান। বাহিরের কর্মক্ষেত্রে যে পুরুষ কৃতী, গৃহস্থালীতেও তার অনুরূপ কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তার সকল শক্তি নিযুক্ত। প্রত্যেক পুরুষের তাই একটি অপরিস্ফুট রূপ আছে, সেটি তার স্বামিরূপ।

বিবাহের দ্বার দিয়ে ইওরোপীয় কন্যা কেবল মাত্র স্বামীর ঘরে যায়। আমাদের মেয়েরা শ্বশুরগৃহের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ দুটির বিভেদ অনেক এবং আমাদের মেয়েদের পরিবেষ্টনও তাই ভিন্নতর।

শ্বশুরালয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী দেবর-ননদ স্বামির ব্যক্তিসত্তাটির বিস্তৃত রূপ। স্বামীর মাধ্যমে সেই রূপটির সহিত বধূর সোজাসুজি কোন সম্পর্ক নেই। বধূর ওপর তাদেরও যা তার স্বামীর মাধ্যমে, সোজাসুজি কোন দাবী করার হেতু বা অবকাশ নেই। ইওরোপীয় বধূর ভার অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু, কারণ স্বামীর বিস্তৃত ব্যক্তিসত্তার সহিত তার সামাজিক ছাড়া দায়িত্বমূলক কোন আদান প্রদান নেই। সৌজন্য দিয়ে সে সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা করা চলে। আমাদের মেয়েদের স্বামীর এই বিস্তৃত ব্যক্তিসত্তার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়, যা তাদের প্রীতির ওপর নির্ভর করে। মেয়েদের মধ্যেও ব্যক্তিত্ব ও পত্নীত্বের বিভেদ থাকলেও সে বিভেদটি পুরুষের দুটি ভিন্ন সত্তার মতো উচ্চারিত নয়। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল থেকে ভাবী পত্নীদের শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষালয় হয়েছে। বাঙালী গৃহস্থালী অগণিত শতাব্দী ধরে বিরাট একটা গৃহ-বিদ্যালয়ের কাজ করে আসছে।

ঐতিহ্য ও সংস্কারের গুণে নববধূ সংসারের কেন্দ্রটাকেই চেনে এবং সেই কেন্দ্রটিতে গিয়ে পড়ে। এই আসল অভিজ্ঞ শিক্ষা-নিকেতনেই তার সংসারের কলাকৌশল শিক্ষা হয়। ঘর করায় ঘরণীর জন্ম। আমাদের দেশে আজও যে প্রথাটি প্রচলিত, কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সেও তাই ছিলো। সেটি ছিলো ও দুটি দেশে নারী-শিক্ষালয় গড়ে ওঠার পূর্বকাল। সে দুটি দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তখন অন্য সম্ভ্রান্ত ঘরে বাস করে জীবনযাত্রার কলাকৌশল শিক্ষা করতো। এই শিক্ষার পর আমাদের মেয়েদের সংসারকে জয় করা লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সে বিজয় সেবা আনন্দ ও ভালোবাসা দিয়ে, আর কোন উপায় নেই। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সার্থক সফল হ'তে গেলে আর অন্য কোন পথ নেই।

যে বধূ নিজের ব্যক্তিত্বের দাবী আঁকড়ে ধরে থাকে, সে সংসারে বিফল হয়। ব্যক্তিত্বটি যে কি বস্তু তা আমি আগেই বলেছি। বাঙালীর সংসার পতিপত্নীর শুদ্ধসত্ত্বাকে দাবী করে ব্যক্তিত্বকে ঠাঁই দেয় না। গভীরভাবে দেখতে গেলে পতিপত্নীর শুদ্ধসত্ত্বেরই সম্বন্ধ, দুটি ব্যক্তিত্বে কখনো জোড়া লাগে না। পত্নীসত্তার দায়িত্বটি বিরাট। সীতার পত্নীত্বের যে দায়িত্ব ছিলো, বহু সহস্র বৎসর অতীত হয়ে গেলেও আমাদের মেয়েদের অনুরূপ দায়িত্বের এখনো অবসান হয়নি। সীতাম দায় ছিলো, স্নেহে মাতা, সেবায় ভগিনী, ক্ষমায় ধরিত্রী, শয্যায় শৃঙ্গারনিপুণা ইত্যাদি হবার। এখনকার মেয়েদেরও সেই সকল দায় পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। পত্নীসত্তার সরব কোন ঘোষণা নেই। সেটি নিজের প্রেরণায় নীরবে আপন মাধুর্য দিয়ে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলে। এই উপায়েই সেই অনভিজ্ঞ অক্লান্তকর্মী নববধূটি পরিণত বয়সে তার সংসারের কর্ণধার হয়ে ওঠে। বাঙালীর ঘরে ঘরে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বামী এমন সংসারের সুবিধাটুকু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে বটে, কিন্তু সে নিজে সে সুখ-সুবিধার একটি কণাও সৃষ্টি করতে পারে না। পত্নীত্ব বিস্ময়কর শক্তি। সেটি দিয়ে মেয়েরা পুরুষদের অসহায় করে রেখেছে। সেজন্য পুরুষ কোনদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, বরং বিচিত্র একটি সুখ ও নিরাপত্তা অনুভব করে ছেলেমানুষের মতো নারীনির্ভর হয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে মাতা, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ তার ইহজীবনের বিরাট বিস্তৃত বটচ্ছায়া। গৃহস্থালীতে পত্নীই সব, স্বামীর স্থানটি ক্রমশ গৌণ হয়ে ওঠে। আমাদের সংসার একান্ত ভাবে নারীর ভালোবাসার শাসনাধীন।

বিবাহের অনুষ্ঠানের ক্ষণটির পর দম্পতির জীবন দ্রুতগতিতে বদলায়, পূর্বেকার কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের অস্তিত্ব থাকেনা। সে পরিবর্তনের সব চেয়ে লক্ষ্য করবার মতো ঘটনা—বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত বর ও বধূর "আমি" জ্ঞান থাকে, যা তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয়। কিন্তু অচিরে দাম্পত্যের নিত্য সহবাস নবপ্রভাতের মতো একটি নূতন যুগ্ম-সত্তার উদয় হয়, সেটি "আমরা" জ্ঞান। এই "আমরা"-র পরম অনুভবটি উভয়ের দেহের কোষে কোষে, ভাবময় জীবনে ও আত্মায় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়াও যুগ্ম-সত্তার গভীরতর আর একটি অনুভব আছে, সেটির কথা যথাস্থানে বলবো! যে সংসারে "আমরা"-র সম্যক উপলব্ধি জীবনের পথ আলোকিত করে, সে-পথ যতোই বন্ধুর হোক না কেনো, কখনো বিষম হয় না। মেয়েরা শুধু নিজেদের পত্নীসত্তাটুকু গড়ে নেয় না, সেই সঙ্গে স্বামীর পতিসত্তাটিও গঠন করে তোলে। কোন পুরুষই নিজের পতিসত্তাটি গড়তে সক্ষম হয় না, তার জন্য পরশমণিটির প্রয়োজন আছেই। দাম্পত্যজীবনে দুটি বস্তুর কোনই স্থান নেই, একটি স্বামী বা স্ত্রীর অহমিকা। অন্যটি, আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর হওয়া। থাকলে বিবাহ দু দিনও টেঁকে না।

নিজেদের সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃতি দিয়ে, প্রতিদিনের প্রতিটি ঘণ্টায় আত্মত্যাগের, স্বার্থবলির ডাকে সাড়া দিয়ে পতি-পত্নী তাদের সংসারকে সুন্দর করে তুলতে পারে। আর কোন উপায়ে তা হয় না। সংসার অনুক্ষণ এই স্বার্থবলির দাবী করে চলেছে। সেইটাই সংসারের দৃঢ়তম ভিত্তি। নারী যেমন প্রকৃতির পরম সুহৃদ, তেমনি আত্মার উৎকর্ষ ও প্রকাশের সহিতও সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমি মেয়েদের দুটি সত্তার উল্লেখ করেছি। তাদের আর একটি মহিমময় সত্তা আছে। এ বিপুল সম্ভাবনা প্রত্যেকটি নারীর মধ্যে নিহিত। হিন্দুঘরের ধর্মাচরণ নিত্য-নৈমিত্তিক। সেটি আনুষ্ঠানিকই হোক অথবা যাই তার মূল্য হোক বা না হোক, এ কথাটা ঐতিহাসিক সত্য যে মেয়েরা ধর্মের ধারক ও প্রতিপোষক। তাদের আত্মা ঊর্দ্ধলোকে কোন শক্তির সহিত, বা ঊর্দ্ধলোকস্থিত কোন আদর্শের সহিত যুক্ত। এই যোগস্থাপনায় নারী কল্যাণময়ী, কল্যাণশ্রী তার। একমাত্র এই কল্যাণমূর্তিতে তার জয়শ্রী রূপের—পরমতম রূপবিকাশের সম্ভাবনা। আমাদের এ গতানুগতিক নানা অভাব পীড়ার সংসার থেকেই সেই কল্যাণী রূপের অভ্যুদয় হয়। মেয়েরা নিজের নারীসত্তা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের রূপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পত্নীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ঘরে ঘরে নারী আছে, প্রকৃত পত্নীও আছে অনেক ঘরে। কিন্তু কল্যাণী বিরল। কল্যাণী শুদ্ধসত্ত্ব ঊর্দ্ধলোকের সহিত যুক্ত হয়ে সংসারব্রত পূর্ণ না হলে কল্যাণীর উদয় হয় না।

যারা ভাবীকালের স্বামী তাদের এ কথাটা মনে রাখতে বলা যেতে পারে যে স্বামী হলেই গুণনিধি হয় না। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বিবাহের ফলে বরটি কন্যার চেয়ে মানসিকতায় শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কন্যাটিও যে কর্মবুদ্ধিতে বরটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এ কথাও তেমনি সত্য। আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করে জীবনোপায়ের জন্য উপযুক্ত হতে হয়। কিন্তু দুটি বিশিষ্ট ও গুরুতর পেশার জন্য

কোন শিক্ষা করার রীতি নেই। এক পলিটিক্‌স্ অন্যটি স্বামিত্ব। যে কোন ব্যক্তি পলিটিশিয়ান বা স্বামী হতে পারে; বস্তুতপক্ষে হয়-ও। মেয়েরা কার্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে বরং কিছু পত্নীধর্ম—Wifecraft শেখে, কিন্তু পুরুষ বিবাহিত হয়েও, সংসারের আবর্তে পড়েও স্বামিধর্ম বা Husbandcraft শেখার বালাই রাখে না। সহজ একটা অপটুতার কারণে পুরুষ সে কলাটা শিখতেও পারে না। যে স্বামীর সুবেদী বুদ্ধি যে নিজের অপটুতাকে স্বীকার করে তার সংসারকে পত্নীর হাতে ন্যস্ত করে।

সুপত্নী সংসারকে রক্ষা করে। কিন্তু যে কল্যাণী সে স্বামীর ভাবময় ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল অভাব পূর্ণ করে দেয়! সে ধর্মহীনকে ধর্মের পথে রাখে। মানবভাগ্য বা ঐশ্বর্য্য, তার সঙ্গে সে স্বামীকে, পুত্রকে, কন্যাকে যুক্ত করে। সত্বশুদ্ধি, ভালোবাসা, শান্তি কল্যাণীর সংসার পালনের উপকরণ। এই প্রভাব তার নিজের সংসারটিকে ছাপিয়ে বাহিরেও ছড়িয়ে যায়। এই প্রেমসর্বস্বস্বভাবা কল্যাণরূপ মাতৃরূপের চরমতম বিকাশ। সে যেমন নিজের পুত্রকন্যার মাতা, তেমনি স্বামী আত্মীয়-পরিজন এবং তার সমাজমণ্ডলীরও মাতৃরূপা। সেই কল্যাণীরূপে নারীর জীবস্তরের চরম উদ্‌গতি কোন কোন ইওরোপীয় লেখক বলেন যে, স্বামিপত্নীকে গঠন করার ছাঁচ। জীবস্তরে সে কথা অবশ্য সত্য। যেমন করে সে শেখায় পত্নী সেই রকম শেখে। কিন্তু মানবস্তরে পত্নীই স্বামীকে জীবনমন্ত্র দিয়ে উন্নীত করে দেয়। পরধর্ম সর্বদা ভয়াবহ। পরধর্মাচরণে কল্যাণশ্রীর উদয় নেই, তাতে পত্নীত্বেরও বিলুপ্তি ঘটে। নিজের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সুসঙ্গত না হলে ধর্ম, ধর্ম হয় না, মুক্তি প্রকৃত মুক্তি হয় না।

কর্তব্য ও সহবাস বিবাহিত জীবনের অতিশয় গুরুতর কথা। নবজীবন আরম্ভ হলেই নববধূকে দুটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। নারী বা পুরুষের এমন কোন কর্মক্ষেত্র নেই যাতে স্বাদবিহীন গতানুগতিক শুষ্ক না থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থালীতে রুটিনে বাঁধা কিছু কর্ম আছে। যা না হলে সংসার চলে না। এ কর্তব্যের দায় কেনো, তার উপলব্ধি থাকলে সে কাজ কটু হয় না। স্বামী যদি কেবল কর্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়ে স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, স্ত্রীর সেবাও যদি অনুরূপ একটা শুষ্ক কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহলে সে দম্পতির বিবাহ বালির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে জানতে হবে। বিবাহের প্রকৃতি থেকে যে কর্তব্যজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাতে বাধ্যতাজনিত কোন পীড়ার বোধ নেই। সে কর্তব্য আনন্দেরই অঙ্গ। কোন মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বাধ্যতামূলক কর্তব্য করতে পারে না এবং কর্তব্যের বিষয়ে সদাসর্বদা সচেতন হয়ে থাকতেও পারে না। যে দম্পতি বিবাহে আনন্দ আস্বাদন করে সেই আনন্দই তাদের সকল কর্তব্যের উৎস হয়। সে কর্তব্যে দায়ের কুণ্ঠা নেই বরং সেটি আনন্দের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

অনেকে পতি-পত্নীর রতি-প্রয়োজন পূর্ণ করাকেও দাম্পত্য কর্তব্যের তালিকাভুক্ত করে। যে দম্পতির রতিজীবন কর্তব্যজ্ঞানের দ্বারা শাসিত হয় তাদের বিবাহ বিফল হয়ে গেছে বলে মানতে হবে। এ প্রয়োজনটিকে কোন হিসাব-নিকাশ বা রুটিনের দ্বারা বাধ্য করা অত্যন্ত জঘন্য ও বিড়ম্বনার কথা। সেটি সম্পূর্ণ দাবী-দাওয়াশূন্য প্রাণপ্রাচুর্যের কারণে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। প্রতিদিনের পরিবেশ এ ক্রিয়াটির প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত করে।

"সহবাস" শব্দটিতে রতির ইঙ্গিত কেন, তার কারণ আমার জানা নেই। সহবাসের সঙ্গে রতির কোন সংস্রব নেই। পতি-পত্নীর—স্বামি-স্ত্রী ও সন্তান এ ত্রয়ীর একত্র বাসকেই সহবাস বলে জানা উচিত। একসঙ্গে বাস করা এবং পরস্পরের জীবনের অংশভাগী হওয়াই প্রকৃত সহবাস। বর্ষা ও বসন্ত প্রত্যেক দম্পতির জীবনের অবশ্যম্ভাবী দু'টি ঋতু, একসঙ্গে তাদের সম্মুখীন হওয়াই সহবাস। অভিজ্ঞ দম্পতিমাত্রেই জানে যে সুখের চেয়ে দুঃখের মিলন ঐক্যই গাঢ়তর, গভীরতর। দুঃখ হচ্ছেই গতানুগতিকতার ভেতর দিয়েই জীবনের অমিলন উদ্ভব। দুঃখ জীবনছন্দের অঙ্গ। দুঃখের বেদনায় অগ্নিসেবন না করলে দম্পতি একাত্ম হয় না। ইংরাজি একটা সর্বনেশে বাক্য আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে Familiarity breeds contempt—নিকট পরিচয় থেকে ঘৃণার উৎপত্তি হয়। এমন সর্বৈব মিথ্যা কথা আর নেই। এ কথাটা সত্য হলে জগতে বন্ধুত্ব, দাম্পত্য, মানুষে মানুষে আত্মীয়তার যোগ সম্ভব হোত না। সত্য কথা এই যে, পরিচয়ে আকর্ষণ ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, পরস্পরের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার উদয় হয়। নিত্যমিলনের বর্দ্ধমানা প্রীতিকে আমরা শ্রদ্ধা বলি।

ঘনিষ্ঠতা মানে পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে জানা। দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতার অর্থ, পরস্পরের দেহকে, মনকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া, পরস্পরের ভাবময় জীবনে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া। বিবাহ সর্বদাই প্রেমের ভিত্তির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমুৎসুক। স্ফটিক মণি জবাকুসুমের সংস্পর্শে এলে তার রঙে উপরঞ্জিত হয়। পতিপত্নীও তেমনি পরস্পরের উপরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। একখণ্ড কাঠকে যদি চিনির রসে বার বার ডুবিয়ে নেওয়া যায়, তাতে রসের নানা পরত পড়ে। শেষ পর্যন্ত কাষ্ঠখণ্ডটিকে আর দেখা যায় না, তার রসাক্ত রূপটিকেই দেখা যায়। এই রাসায়নিক রূপান্তরকে কেলাসন বলে। তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার দেহমনের ওপরও নিত্যনব রূপের কেলাসন পড়ে, যার কারণে মানুষ প্রেমাস্পদের গুণের অতিরঞ্জন করে, যে গুণ তার নেই তাতে সে গুণটিও দেখে। প্রতিক্ষণে তাকে নূতন করে দেখে, রূপের আর ইয়ত্তা খুঁজে পায় না। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে কেলাসনের গুণে, প্রেমাস্পদের মুখের কোন রেখা, দৃষ্টির কোন ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের কোন ধরণ, পলাতক একটি অলকগুচ্ছ বা অনুক্ষণ নূতন আকর্ষণ নূতন উত্তাপ, নূতন মাধুর্য বিকীর্ণ করে। বিবাহিত জীবনকে স্থায়ী করবার, মধুর করবার জন্য অনুক্ষণ উত্তাপের প্রয়োজন। সহবাস এ সকলের ক্ষয়হীন উৎস। সহবাস না থাকলে দম্পতি নব নব রূপে প্রতীয়মান হয় না। পরস্পরের আত্মায় প্রাণের হিল্লোল খেলে না।

বিবাহে যেমন দুটি জীবন এক হয়, তেমনি দুটি দেহও এক হয়ে যায়। সহবাসের চেয়েও যদি বড়ো কিছু থাকে সেটি একত্র শয়ন। এ বিষয়ে আমি নানা মুনির নানা মত দেখেছি। কিন্তু এ কথা খুবই সত্য যে, একত্রে নিদ্রা যাওয়ার মতো পতিপত্নীর ঐক্যের আর উচ্চতর কোন প্রকাশ নেই। যে দম্পতি একত্র শয়নের মাধুর্য জানে না তাদের মিলন ক্ষুণ্ণ, তাদের বিবাহ সার্থক হয়নি। এ কথাটি পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ যে, নিদ্রাকালে দুজনের শ্বাস-প্রশ্বাস সমছন্দ হয়। একজনের ঘুমের শান্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে অন্যের ঘুম আসে। এই প্রাণবায়ুর ঐক্য থেকে দম্পতির জীবনীশক্তিরও

ছন্দমিলন হয়। সহবাসটুকুই দম্পতির জীবনের সার কথা, তাতে কোন ক্রিয়ার কথা ওঠে না। একত্র শয়নের মতো একাত্ম হবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। এই এমন একটি ঘনিষ্ঠ অবস্থা ভালোবাসা বা রতি যার কোন আঙ্গিক নয়।

বিবাহের দুস্তর সাগরটিতে অনেকগুলি দৃষ্টির অগোচর নিমজ্জিত মৈনাক পর্বত আছে যার সংঘাতে বিবাহ-তরণীটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর্থিক অভাব ভয়াবহ মৈনাক। ধর্মমতের বিরোধ, সংস্কারও রুচিগত গভীর মতভেদ, শ্রেণীগত পার্থক্য খুব বড়ো বড়ো মৈনাক। জাতিবৈষম্য বিবাহকে সম্পূর্ণ হতে দেয় না। আমার মতে শান্তি ও নির্জনতাপ্রিয় স্বামীর পত্নী যদি উৎসাহী সঙ্গীতসাধিকা বা বেহালাবাদিকা হয়, তাহলে বিবাহ নিশ্চয়ই ভেঙে যায়। কথাটা আমি ঠিক পরিহাস করে বলছিনা। বিবাহের আরো একটি বড়ো শত্রু আছে, আমাদের সমাজে যার হালে উদয় হয়েছে। ইওরোপীয় সমাজের কথায় বারট্রাণ্ড রাসেল, হাইনরিখ কিস, কেনেথওয়কর প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধেরা এই বিষম শত্রুটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অবাধ মেলামেশা পুরুষের যেমন মেয়েদেরও তেমনি বিবাহের ভিত্তিটাকে শিথিল করে। ধর্ম ও নীতি এখন কোন দেশেই সবল নয়, তাই সে দুটি আর মানুষের রক্ষাকবচ হয় না। ধর্ম ও নীতির কথাটা প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী কেনেথওয়কারের, সেটা মনে রাখা মন্দ হবে না।

এ সমস্যাটা আধুনিক হলেও কথাটা আমাদের দেশে বেশ পুরাতন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে 'কামসূত্র' রচয়িতা এখনকার মনোবিজ্ঞানীদের আদিগুরু বাৎস্যায়ন লিখেছিলেন যে, 'পরপুরুষেষু গোষ্ঠীশীলাসু' মেয়েরা গৃহধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ ও মনোবিজ্ঞানী হাইনরিখ কিশ বলেছেন যে পরপুরুষে ও পরস্ত্রীকে গোষ্ঠীশীল মেয়ে ও পুরুষের গার্হস্থ ও দাম্পত্য জীবন সদাসর্বদা বিপদাকীর্ণ। অভিধানকার রাজশেখর বসু গোষ্ঠীর অর্থ দিয়েছেন, আড্ডা, Club গোষ্ঠীশীলদের যৌনচেতনা সতত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সে উত্তেজনা দম্পতির ও সমাজের মঙ্গলকর হয় না।

কিন্তু বিবাহের পরমতম শত্রু প্রত্যেক স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সদাসর্বদা আছে। তাকে ভালো করে চিনিয়ে দিই। মানুষ মাত্রেরই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়টির ডবল কাজ, অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করতে হয় তার নাম জিভ। কর্মেন্দ্রিয়রূপে জিভ কথা কয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে সে রসনা রস গ্রহণ করে। জিভের মতো আর কোন ইন্দ্রিয় সদাসর্বদা অসংযত উৎকট কাজ করে না। বাগিন্দ্রিয় হিসেবে সে কটু ও নিষ্ঠুর ভাষণের দ্বারা সর্বনাশ ঘটায়। রসনা হিসেবে লোভের দ্বারাও সর্বনাশ করে, অবশেষে মৃত্যু আনে। দাম্পত্যজীবনে এই ভয়ানক ইন্দ্রিয়টি পতিপত্নীর বসে না থাকলে বিবাহ নরক হয়ে যায়। মুখরা লোভী স্ত্রীর মতো কটুভাষী লোভী বাচাল স্বামীও ভয়ানক লোক। বাচালতা মিথ্যাভাষণের পরমতম সহায়। আমাদের দেশে কথাই আছে "সে কহে বিস্তর মিথ্যা যে কহে বিস্তর।"

আধুনিক কালে উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি দাম্পত্যজীবনের একটি বড়ো শত্রু। আমি উপন্যাস ও গল্প লিখি, কাজেই এ কথাটা বেশ জোর করে বলতে পারছি। সংঘর্ষণের চিত্র না থাকলে উপন্যাস গল্প, নাটক পাঠকের মনোরঞ্জন করে না; তাই সংঘর্ষণ লেখকদের একটি বহুপ্রচলিত করণ ও কৌশল। এই ধাঁধায় পড়ে উপন্যাসকে জীবনের প্রকৃত আলেখ্য মনে করে পাঠক-পাঠিকা সংঘর্ষণকেই দাম্পত্যজীবনে অবশ্যম্ভাবী বলে শুধু মনে করে না, অভ্যাসবশে সংঘর্ষণকে মননও করে; সামঞ্জস্য ও শান্তিকে খোঁজে না। ডাক দিলেই সংঘর্ষণ তখনি আসে। এ কথা ভাল করে মনে রাখা মন্দ হবে না।

যারা কল্পলোকে বিচরণ করে, অর্থাৎ চিত্রকর কবি ও লেখক জাতীয় স্বামীদের শৃঙ্গারের দাবী বেশী। অন্যপক্ষে দার্শনিক বিজ্ঞানী ডাক্তার এঞ্জিনীয়র উকিল ব্যবসায়ী জাতীয় স্বামীদের সে দাবী সহজ নিরিখেরও কম হওয়া সম্ভব।

বিবাহিত-জীবন জীবনের শ্রেষ্ঠতম মহিমময় অংশ। মানুষের যা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য—যৌবন—তার সমগ্র শক্তি দিয়ে সে এই জীবনটির পূজা করে। সেটিকে অক্ষুণ্ণ সুন্দর পরমোৎকর্ষের অবস্থা করে রাখতে গেলে বধূকে তার নিজের অন্তরাত্মাকে মৃদু গোপন বাণীটির দিকে নিরন্তর কান পেতে থাকতে হয়। সে ঐশ-বাণীটি সকলেরই বুকের ভেতর আছে। কিন্তু উৎকট কোলাহল, অসংখ্য অর্বাচীনের নানা আস্ফালনের এ যুগে সাধনা না করলে বাণীটি শুনতে পাওয়া সম্ভব হয় না। বিবাহ নিভৃত সাধনার বস্তু, হাটের জিনিষ নয়। কোন দেশে, কোন কালে হাটের মাঝে কারো বিবাহ সার্থক হয় নি। যুধিষ্ঠিরের অভিশাপে অভিশপ্ত কুকুর ও নির্লজ্জ ছাগল ছাড়া কীটপতঙ্গেরও বিবাহ নিভৃত সাধনা। পত্নীর ভার খুবই গুরুতর। সে সৃষ্টির কেন্দ্র অধিকার করে আছে, নিজে সে স্রষ্টা। তার একটি পরমতম কাজ আছে বলে আমি মনে করি। সেটি ভালো হওয়া। কিন্তু ভালো হবার মতো এমন কঠিন তপস্যা পৃথিবীতে আর নেই।

মানুষ মাত্রেরই জীবনে পরম আগ্রহ। স্বাস্থ্য, ধন, নিরাপত্তা, চিন্তা, অনুরাগ, হিংসা, দ্বেষ, নৈরাশ্য, অভিমান, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নানা বস্তু জীবন থেকেই উত্থিত হয়। এ সকলের অধিকাংশই জীবনবিরুদ্ধ। মানুষ সেই বিরুদ্ধ-চিন্তার দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে। ভালো হ'তে গেলে সকল বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে উৎপাটিত করে তার স্থানে সৌন্দর্য, ভালোবাসা, দাক্ষিণ্য ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই অবস্থাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাই ভালো হওয়া। সকল অবস্থায় হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরে ছোট দুটি কাঁধে ভালোর বিষম গুরুভার বহন করাই কল্যাণীর, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর বিধিলিপি। হিন্দুত্ব জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট ধরণ। এই হিন্দুত্বই বাঙালীর মেয়ের ধ্যান-ধারণাকে আলাদা করে রেখেছে, যার কারণে পৃথিবীর কোন দাম্পত্য সমস্যা তার নিজের সমস্যা নয়। এ পরম সত্যটির উপলব্ধি করেছিলেন বিবেকানন্দের শিষ্যা মার্গারেট নোব্‌ল্‌, বাংলা দেশ আজও যাঁকে ভগিনী নিবেদিতা নামে স্মরণ রেখেছে। তিনি হিন্দুনারীর পত্নীত্বের গুণগান করে গেছেন। তার ভালোবাসাকে "love strong as death" বলে জগতে প্রচার করে গেছেন। পৃথিবীর আর কোন নারী জাতির বিষয়ে অনুরূপ কিছু পড়ার আজও আমার সৌভাগ্য হয়নি।

[ক্রমশঃ।
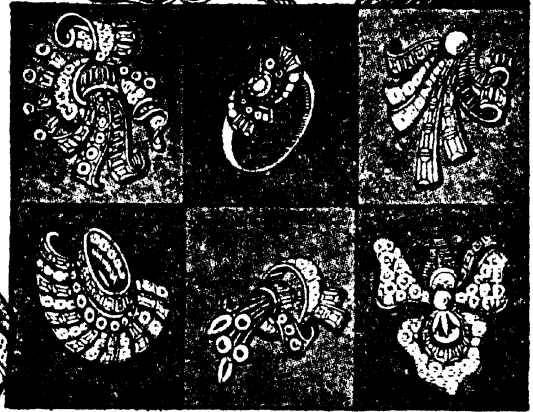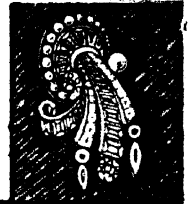
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৩
B.B.

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

মার্লিনকে ভায়লেটের জীবনের কাহিনী বললাম—সেই দিন রাত্রেই ডিনার খাওয়ার পরে। মার্লিন চুপ করে শুনল। আমার কথা শেষ হলে বলল—মেয়েটির জন্ত আমি দুঃখিত। কিন্তু—

শুধালাম, কি ?

বলল, তোমাকে এত বিস্তারিত করে জীবনের কাহিনী বলার কি প্রয়োজন হল তার ?

হেসে বললাম, আমি যে ওকে একটু খোঁচা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—জীবনে ওর দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত।

গম্ভীর ভাবে শুধাল, কেন ?

মিসেস প্যানের কথাও বিস্তারিত বলতে হল। ইদানিং মার্লিনকে আর কিছু বলিনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ওর সঙ্গে এসব কথাবার্ত্তা না বলাই ভাল।

বললাম, যা বলেছ। আমারও আর ইচ্ছে নেই। ওর বিকৃত মনোভাবের ছোঁয়া মনে না লাগানই ভাল।

সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বলল, শুধু তাই নয়। ওর লীলা শুধু খেয়ালেই চলে না—তার একটা সুনির্দ্দিষ্ট গতি আছে দেখছি।

• • • •

দু-তিন দিন পরে একদিন বিকেলে মিঃ ও মিসেস লালকাকা এলেন আমাদের বাড়ীতে। মার্লিন টেলিফোনে 'চা' এ আসতে বলেছিল। তার কারণ—মিসেস লালকাকাই টেলিফোন করে একদিন আসতে চেয়েছিলেন। সেদিন বুধবার ছিল, তাই বিকেলটা আর সাঞ্জারীতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মিঃ ও মিসেস লালকাকা এলেন। মিসেস লালকাকা মার্লিনকে জড়িয়ে ধরে চমো খেলেন—মার্লিনকে দেখে যেন অত্যন্ত খুসী। তারপর মার্লিনের মুখের দিকে একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে বললেন মার্লিন! এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ?

আমি অভ্যর্থনার জন্ত পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম।

আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, মার্লিন কি অসুস্থ ? কৈ কিছু খবর পাইনি ত ?

বললাম, না ভালই ত আছে।

মার্লিনও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি ভালই আছি।

কথা বলতে বলতে আমরা বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। মিসেস লালকাকা যেন কথাটা ছাড়লেন না। আমাকেই বললেন দেখছেন না—কি চেহারা হয়ে গেছে! চোখের কোলে কালী ভেঙ্গে দিয়েছে। অমন মুখ—কেমন যেন শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে।

মিঃ লালকাকা বললেন, সত্যি, মিসেস চৌধুরীর চেহারা খারাপ দেখছি ?

বললাম, আমি ত রোজই দেখি, তাই হয়ত ঠিক বুঝতে পারি না—হয়ত আপনাদের কথাই ঠিক।

মার্লিন মিসেস লালকাকাকে বলল, কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ। আমি ভালই আছি—ও আমার ঠিক হয়ে যাবে।

মার্লিনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই ত, মার্লিনের চেহারা অনেক খারাপ হয়ে গেছে! বড় বড় সেই বিষণ্ণ চোখ দুটির নীচে যেন ঘন কালি জমা হয়েছে। মুখখানি রোগাও দেখাচ্ছে অনেক। তাই ত! এতদিন কি ভাল করে চেয়ে দেখিনি ?

মিসেস লালকাকা আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, আপনার চেহারাও ত বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না। ব্যাপার কি ?

হেসে বললাম, কিছুই না। বোধ হয় স্বামিস্ত্রীতে চেহারা খারাপ করার পাল্লা দিচ্ছি। সব দিকেই ত মার্লিনের কাছে আমার হার। তাই এদিকেও যাচ্ছি হেরে।

সবাই হেসে উঠল। কথা অন্ত দিকে গেল ঘুরে। একথা—ওকথা—সেকথা—পাঁচ কথায় জলযোগের সঙ্গে খানিকক্ষণ সময় গেল কেটে। মিঃ লালকাকা অবশ্য 'চা' খাননি। হুইস্কি খেয়েছিলেন।

ওরা বিদায় হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার্লিনের শরীরের কথা ভেবে মার্লিনের প্রতি একটা সহানুভূতিতে মনটা উঠল ভরে।

কাছে টেনে নিয়ে শুধালাম, লীনা! সত্যিই কি তুমি শরীর কিছু খারাপ বোধ কর ?

মুখখানি এলিয়ে পড়ল আমার বুকের মধ্যে। একটা

মতীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, শুধু বুকটার মধ্যে মাঝে মাঝে কেমন যেন করে—

মনে পড়ে গেল সেই ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে মার্গিনের রিউম্যাটিক ফিবারের কথা। তার দরুণ হার্টটি কি রকম জখম হয়েছিল—সবই ত আমার জানা। একটা অভূতপূর্ব দরদে মনটা দুলে উঠল।

মুখে বললাম, কালই আমি তোমাকে ভাল করে পরীক্ষা করব। ছিঃ ছিঃ, এতদিন দেখিনি কেন?

আমার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল বিকো। তুমি ভেব না। যতদিন তোমার বুকে ঠাঁই ততদিন আমার বুকে কোনও আঘাত লাগবে না।

ধূলা। মনটা সহসা শুধু হালকা নয়, এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল—জীবনে কোনদিন এমন হয়েছিল কিনা জানিনা। মনে হল—আমাদের দুজনার বুকের মধ্যে কোনও বিরোধের স্থান নাই-ই, কোনও বিরোধ হতে পারেনা। তা যেন অসম্ভব।

• • • •

কিন্তু Providence is nothing if not Coquettish ধূলা। মনে আছে ত লণ্ডনে প্রথম এসে চন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস্ হার্ডির খানকয়েক উপন্যাস পড়েছিলাম। এবং পড়ে বিশেষ অভিভূত হয়েছিলাম। তাঁরই, কোন উপন্যাসে মনে নাই, ঐ কথাটি পড়েছিলাম। কথাটা যে কি নিদারুণ সত্য—পরের দিনই টের পেলাম।

পরের দিন সকাল থেকেই শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছিল না—কেমন যেন সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ছে এইরকম একটা ভাব। যাই হোক, পাছে মার্গিন কিছু ভাবে, তাই মার্গিনকে কিছু না বলে যথারীতি সার্জারীর কাজ এলাম সেরে এবং দুপুরবেলা বসবার ঘরে বিশ্রাম করতে করতে একটু যেন ঘুমিয়েও পড়লাম। সন্ধ্যাবেলা সার্জারীতে যাওয়ার সময় শরীরটা যেন আরও ভারী মনে হতে লাগল—যেন শুয়ে পড়তে চায়। দুপুরবেলা ঘুমোনটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। নিজের নাড়ী পরীক্ষা করলাম—কিছুই না, বেশ স্বাভাবিক। একবার ভাবলাম—গাড়ী নিয়ে সার্জারীতে যাই, তারপর ভাবলাম—না বেশ দ্রুতপদে হেঁটে সার্জারীতে গেলেই এ ভাবটা যাবে কেটে। তাই গেলাম।

কিন্তু সার্জারীতে গিয়ে আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সহজেই বুঝতে পারলাম—প্রবল জ্বর এল, সমস্ত হাত-পা যেন ভেঙে নিয়ে আসছে, মাথার যন্ত্রণা একটু একটু করে ক্রমেই প্রখর হতে লাগলো।

ভায়লেটকে ডেকে শুধালাম, আর কতগুলি রোগী আছে?

বলল, আর পাঁচটি।

টেবিলের 'পরে মাথাটা কাত করে রেখে বললাম, আজ আর রোগী দেখতে পারবনা, আমার জ্বর এসেছে।

ভায়লেট তৎক্ষণাৎ আমার কপালে একবার হাত দিয়ে থার্মোমিটারে জ্বর পরীক্ষা করল—১০২°এর উপরে।

বলল, আপনি চলুন—আমার শোবার ঘরে একটু শুয়ে পড়বেন।

কিন্তু তখন আমার মন মার্গিনের কাছে যাওয়ার জন্য আকুল

হয়ে উঠেছে—মার্লিনের মধ্যেই চাইছে বিশ্রাম। আর কোথাও না।

বললাম, না না। আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি।

ভায়লেট বলল, কিন্তু এ অবস্থায় হেঁটে যাবেন কি করে? গাড়ী ত আনেননি। সেলে ত ট্যাক্সী পাওয়া যায় না। টেলিফোন করে ম্যানচেষ্টার থেকে ট্যাক্সী আনতে অন্ততঃ দু ঘণ্টা লাগবে। তাই বলছিলাম—ততক্ষণ শুয়ে থাকুন—আমি টেলিফোনে ট্যাক্সীর ব্যবস্থা করি।

বললাম, না—না। মাইলখানেক ত রাস্তা। কোনরকমে হেঁটে চলে যাব।

এই বলে উঠলাম। কিন্তু মাথাটা যে ফেটে যাচ্ছে। আবার বসলাম।

বললাম, এক কাজ কর ভায়লেট! আমাকে ব্রাণ্ডীর সঙ্গে এসপ্রিন মিশিয়ে একটা ডোজ করে দাও ত?

ভায়লেট দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেল এবং একটু পরে ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে আমাকে দিল।

বলল, আমি রোগীদের বিদায় করে দিয়ে এসেছি। ওষুধটা খেয়ে ক্রমে একটু সুস্থ মনে হল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি এইবার যাই।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। ভায়লেট তাড়াতাড়ি আমার ওভারকোট নিয়ে এসে পরিয়ে দিয়ে, গলা পর্য্যন্ত তুলে দিল বন্ধ করে। টুপীটা মাথায় চেপে পরিয়ে দিল।

বলল, একটু দাঁড়ান—এক সেকেণ্ড।

প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই এল ফিরে, গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় একটা টুপী পরে নিয়েছে, হাতে একটা মোটা উলের স্কার্ফ।

চলতে চলতে শুধালাম, একি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বলল, আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।

বললাম, কেন? কি দরকার?

দৃঢ়স্বরে বলল, আপনাকে এ অবস্থায় একলা যেতে দেব না, এটা ঠিক।

বেশী কথা বলার শক্তি তখন ছিল না। তাই আর বিশেষ প্রতিবাদ করলাম না। কিন্তু তারপর বাইরে দুর্জ্জয় ঠাণ্ডায় বেরিয়েই মনে হল—ভাগ্যিস ভায়লেট আছে নইলে আমি সত্যই এতটা রাস্তা যেতাম কি করে! নিজের দেহের উপর যে কোনও জোরই নাই, কোনও আস্থা নাই যেন, যে কোনও মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভায়লেটের কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম।

রাস্তা যেন আর ফুরোয় না—কতক্ষণে মার্লিনের কাছে যাব। তখন বোধ হয় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি—ভাগ্যিস বরফ পড়তে সুরু হয়নি। রাতটাও পরিষ্কার ছিল—বাইরে ছিল চাঁদের আলো। তাই কোনও রকমে ভায়লেটকে ভর করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যেন সম্ভব হল। মাথা যে ফেটে যাচ্ছে তার ভার কোথায় রাখি?

শেষ পর্য্যন্ত বিকোলীনার ফটকের কাছে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ালাম। ভায়লেটের কাঁধের ভর তখনও ছাড়িনি। ঢুকলাম ফটকের মধ্যে। হাঁফ ছাড়বার জন্য মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম কি? কেন জানি না, চোখ পড়ল অন্য ফটকের দিকে। একটা তীব্র তড়িৎশিখায় চমকে উঠল প্রাণ। কি দেখলাম জান? চাঁদের আলোতে দেখলাম ফটকের পাশে একটা স্প্রুস (Spruce) গাছ-তলায় দু জন দাঁড়িয়ে আছে।

একজন—সেই রোলাণ্ড, সেই গলা পর্য্যন্ত ওভারকোট ঢাকা, মুখটা ঢাকা মাথার টুপীতে, দাঁড়িয়ে আছে গাছের ছায়ায়—তাই পরিষ্কার তাকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আর একজনকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম মার্লিন! শুধু তাই নয় বুলা! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পেলাম মার্লিন তার গলা জড়িয়ে তাকে চুমো খেল এবং সে অন্য ফটক দিয়ে দ্রুত পদে গেল বেরিয়ে।

আমি কি সেইখানেই পড়ে যাচ্ছিলাম, মাথাটা কি ঘুরে গিয়েছিল, সহসা অনুভব করলাম ভায়লেট আমাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে টেনে ধরে রেখেছে।

চাপাগলায় বলল, চলুন। চলুন। আমরা ফিরে যাই। এ পাপ পুরীতে এ অবস্থায় গেলে আপনি বাঁচবেন না। এই বলে আমাকে প্রায় টেনে ফটকের বাইরে নিয়ে গেল।

শুধাল, পারবেন না?

শুধু বললাম, হ্যাঁ পারব। চল ফিরে।

ভায়লেট আমাকে সেই ভাবেই প্রায় টেনে নিয়ে চলল। তার অঙ্গের কোমল স্পর্শে তখনকার মত যেন একটা আশ্রয়ও পেলাম।

সমস্ত রাত জ্বরে প্রায় বেহুঁস হয়ে রইলাম। কোনও রকমে সার্জ্জারীতে ফিরে এসে ভায়লেট আমাকে সযত্নে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল, সেইটুকু মনে আছে এবং তারপর আর সে রাত্রের কথা বিশেষ কিছু মনে নাই। তবে ভায়লেট, আমি শুয়ে পড়ার পরে খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে, একটা কি ওষুধ লাগিয়ে আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল সেটুকুও যেন মনে পড়ে।

তবে, সমস্ত রাত জ্বরের ঘোরে নানা রকম ভীষণ ভীষণ স্বপ্ন দেখেছিলাম—তার কিছু কিছু আজও মনে আছে, যতটুকু যা মনে আছে বলি।

—একটা যেন ভয়ঙ্কর কালো সাপ আমাকে তাড়া করেছে, আমি যেন ছুটছি, চারিদিকে জঙ্গল, কিছুতেই যেন তার হাত থেকে নিস্তার নাই। হঠাৎ যেন আমি পড়ে গেলাম, একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায়। ভীষণ যেন লাগলো। কোন রকমে মাথা তুলে সাপটা কতদূরে দেখবার জন্য চাইতেই দেখি, সাপ নয়, সুধা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, আমার অবস্থা দেখে হাসছে। ভীষণ যেন রাগ হল।

বললাম, তুমি হাসছ? তোমার লজ্জা করে না।

যেন কাছে এল, হাসতে হাসতেই আমার হাত ধরে আমাকে তুলতে তুলতে বলল, চল এইবার বাড়ী চল। তারপর কি যেন কি সব হল ঠিক মনে নাই।

আবার যেন দেখলাম আমি ও সুধা চলেছি, কিন্তু এবার জঙ্গল নয় বাগান, কি সুন্দর বাগান, চারিদিকে ফুল ফুটে আছে। ছোট-বড় নানান গাছ পরিপাটী করে সাজান।

চলতে চলতে শুধালাম, বাড়ী কতদূর? আমি আর হাঁটতে পারছি না। পাশে চেয়ে দেখলাম—কই সুধা কই? এ ত মার্লিন চলেছে আমার সঙ্গে, সেই বিষণ্ণ-গম্ভীর বদন।

বলল, আর বেশী দূরে নয়। আমার হাত ধরে চল। আমি মার্লিনের হাত ধরলাম। জ্বরের ঘোরেই মনে হল—কত মায়া, কত সহানুভূতি মার্লিনের হাতখানিতে মাখান। সত্যিই আমি যেন চলতে পারছিলাম না, শরীর যেন ভেঙ্গে আসছে। মার্লিনের হাত ধরে যেন বাঁচলাম।

ক্রমে এলাম এমন জায়গায়, যেখান থেকে পায়ের তলার জমি যেন ভেঙ্গে অনেক নীচুতে চলে গিয়েছে। দূরে একটা বিরাট নদীর ধারে যেন দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী। নদীটা এত বড় যে নদীর ওপারের দিকের জল যাকে যাকে ফুলে যেন আকাশ ছুঁয়ে আসছে। নীচু দিয়ে চেয়ে যেন মাথা ঘুরে গেল—অনেক নীচু। কি করে নামব ?

মার্লিন যেন বলল, লাফ দিতে হবে। ভয়ে যেন চমকে উঠলাম।

বললাম, পারব না। পারব না। মার্লিন যেন বলল, উপায় নাই। এই বলে আমার দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে আমার হাত ধরে টেনে লাফিয়ে পড়ল। লাফ দিয়েই মার্লিনের সঙ্গে আমার হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি।—চীৎকার করে ডাকলাম লীনা! আমাকে ধর ধর। কোনও দিকে সাড়া শব্দ নাই—শূন্য শূন্য। আমি খালি পড়েই যাচ্ছি।

চমকে বোধ হয় ঘুমের ঘোরটা গেল কেটে। তখন কত রাত জানি না—সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে। কাতর স্বরে চাইলাম, জল, একটু খাবার জল। আমার পাশেই চেয়ারে বসেছিল—কে? জ্যানেট না মার্লিন? জল নিয়ে এসে সযত্নে আমাকে খাইয়ে দিল। একটু পরেই জ্বরের ঘোরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আবার এলো নানা রকমের স্বপ্ন। বিস্তারিত ঠিক মনে নাই। তবে বোধ হয় আগের মতন তত ভীষণ নয়। রাত্রের শেষের দিকের একটা স্বপ্ন কতকটা মনে আছে—সেটাও খারাপ স্বপ্ন। সেইটে বলি।

আমি ও মার্লিন যেন পিকনিক করতে গিয়েছি, সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে, মার্জ্জী নদীর ধারে অনেক দূরে। আমি বসে আছি, মার্লিন আমার পাশে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে—পা দুটি ভিজিয়ে রেখেছে জলের স্রোতে। হঠাৎ কাল মতন কি যেন একটা জলে ভেসে এল—মানুষ না কুমীর? না সাপ?—কালো তার দুটো চোখ খালি জলের উপর ভাসছে। হঠাৎ মার্লিনের পা দুটি ধরে মার্লিনকে টেনে নিয়ে গেল জলের মধ্যে। চীৎকার করে উঠলাম—লীনা! লীনা! জলে লাফিয়ে পড়তে গেলাম—শরীর যেন বড় দুর্ব্বল। পা দুটি যেন একেবারে অবশ হয়ে গেছে—নাড়াতে পারছি না গুঃ, বুকের মধ্যে কি অসহ্য যন্ত্রণা! খালি চীৎকার করছি—লীনা! লীনা! লীনা!

এই যে আমি তোমার পাশেই রয়েছি। চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে ভোরের আভাস এসে পড়েছে ঘরে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম—মার্লিন মুখখানি নীচু করে আমার গালের উপর গালখানি রেখে খাটের পাশে চেয়ারে আছে বসে।

কাতরভাবে বললাম, লীনা! লীনা! তুমি আছ?

আমার কানের কাছে মুখ দিয়ে আদর করে বলল, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব? তোমার পাশেই যে আমার ঠাঁই।

দুঃস্বপ্নের ঘোরটা কেটে বুকটা যেন ঠাণ্ডা হল। ভোরের আলোর দিকে চেয়ে মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল।

শুধালাম, আমি কোথায়?

মার্লিন আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার মার্জ্জারীতে। কাল রাত্রে যে তোমার ভীষণ জ্বর এসেছিল—তাই বাড়ী ফিরে যেতে পারনি।

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, জ্যানেট কোথায়?

বলল, তোমার বসবার ঘরে বিশ্রাম করছে।

আমি কাল রাত্রে এসেই তাকে ঐ ঘরে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শুধালাম, তুমি কি করে খবর পেলে?

বলল, তুমি ফিরছ না দেখে—টেলিফোন করেছিলাম।

যাক—তুমি আর এখন এত বেশী কথা বল না। এখনও তোমার শরীরে বেশ জ্বর আছে।

চুপ করে রইলাম। বুঝতে দেরী হল না—মার্লিন সমস্ত রাত আমার পাশে চেয়ারে বসে আমাকে সেবা করেছে। জ্বরের ঘোরে দুর্ব্বল মনে এই কথাটা ভাবতেই কেন জানি না নিজেকে যেন আর সামলাতে পারলাম না। চোখ ছাপিয়ে জল এল। [ক্রমশঃ।

বিজ্ঞানভিক্ষু

পাঁচ

বহ্নি-বিহংগ

'পর্বত চাহিল হ'তে
বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'
—রবীন্দ্রনাথ

পরদিন সকালে সামনের বাগানে দেখা সুমিত্রার সংগে। প্রাথমিক চা-এর পর্ব শেষ করে সামনের 'কম্পাউণ্ড'টা প্রদক্ষিণ করে এলো শংকর—বাকী ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে ফেলার জন্ত। দেখা গেল, কোণের বেঞ্চের ওপরে বসে আছে সুমিত্রা। চিন্তার গভীরতায় কপালে পড়েছে তার কুঞ্চনরেখা। সন্ত-ঘুমভাঙা অবস্থায় বেণীটাকে ভালো করে সংবৃত করবার অবকাশ হয় নি—আরক্ত চোখে তার স্বপ্নাতুর দৃষ্টি।

শংকর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।

কোনো সম্ভাষণ না করেই শংকর এসে সন্তর্পণে বসে সুমিত্রার পাশে। পকেট থেকে একটা নয়া পয়সা বের করে বলে, এই নাও, তোমার ভাবনার মজুরী।

মুহূর্তে শিথিল ভাবনাগুলোকে সংহত করে নেয় সুমিত্রা।

এই যে স্বপ্নচারি, জেগে আছ না ঘুমিয়ে?

ঘুমিয়ে থাকলে মন্দ ছিল না, এই ভোরের আলোয় তোমার স্বপ্নসম্ভবা মূর্তিটা স্বপ্ন বলেই চালিয়ে দেওয়া যেত। তোমার কোলে মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়তাম।

জেগে আছি বলেই তো লোকলজ্জার ভয় আছে, তোমার পায়ের চটির ভয় আছে—অগত্যা স্থির হয়ে একটা ভদ্র দূরত্ব রেখেই বসতে হল।

হাতের তালু ছড়িয়ে এক বিঘৎ দূরত্বের মাপ করে দেখায় শংকর।

সুমিত্রা এবারে অপ্রতিভ হয়—কিন্তু সেটা এক পলকের জন্তই। হেসে বলে, বেশ, তোমার অবচেতন মনের স্বরূপটা জানা গেল—এবার থেকে সাবধান হয়ে চলতে হবে যথাসম্ভব।

সুমিত্রাকে অন্ততঃ পলকের জন্ত অপ্রস্তুত করতে পেরেছে, তাই শংকরের আত্মপ্রসাদের সীমা নেই। অভয় দিয়ে সে বলে—এই দেখ, ভয় পাইয়ে দিলাম তো। তবে ভালোই তো—চেতন মনটার বেজায় কড়া পাহারা আছে—অমন দু-একটা জেলভাঙা 'ইম্পাল্স্'কে পাকড়াও করবার জন্ত।

ততক্ষণে সুমিত্রা পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, এবার আবার কথায় শাণ দিয়ে নেয়।

শংকর রায়ের যে চেতন মনের বালাই আছে—সে খবরটা আমার কাছে নতুন। অবচেতন, অর্ধচেতন আর অচেতন মনের সমষ্টিতেই ভরে আছে তোমার মগজ। সেখানে চেতনার স্থানটা কোথায় আমায় হিসাব করে বুঝিয়ে দাও তো।

শংকর মনে মনে হার মানে—কিন্তু কথায় তা প্রকাশ করে না—এক ভালো মনস্তাত্ত্বিকের পাল্লায় পড়েছি। হাঁচি-কাশির মতো নিতান্ত সাধারণ উপসর্গগুলোকেই বিশ্লেষণ করতে সুরু করে দেবে—এর মধ্যে নিরুদ্ধ 'ঈডিপাস কম্প্লেক্স' কতটা আছে।

সুমিত্রা বলে, তোমার কথাবার্তাগুলো এখনও বিপজ্জনক, সেই জেলপালানো অবচেতন ইম্পাল্স্ এর কাছ ঘেঁসে চলেছে। চলো আমার সংগে, এককাপ কফি খাইয়ে বাকী ঘুমটা তাড়িয়ে দিচ্ছি।

শংকর বলে, যথালাভ। অন্ততঃ তোমাকে অপ্রস্তুত করে বিনা পয়সায় এক কাপ কফি তো মিলে গেল।

* * * *

দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তে সুমিত্রার ঘর। শংকর দেখে, বাসস্থানের ব্যবস্থা সকলেরই এক রকমের, কিন্তু সুমিত্রার ঘরের আবহাওয়ায় রয়েছে একটা সৌন্দর্য। টিপয়টার ওপর পড়েছে একটা ফিকে সবুজ রঙের ঢাকা, চেয়ারে রয়েছে হাতে-তৈরী কুশন, জানলায় পড়েছে পর্দা রঙ মিলিয়ে আর ফুলদানীতে রয়েছে একগুচ্ছ সীজন্-ফ্লাওয়ার। হাওয়াতে কোন প্রসাধন সামগ্রীর অশরীরী মৃদু সুবাস।

* * *

কফি ঢালতে ঢালতে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, হবিবুল্লার সম্বন্ধে রিপোর্টটা পড়বার সময় হয়েছে তোমার?

নিরাশার সুরে শংকর বলে, পড়লাম তো কিন্তু কই, সমস্তা সমাধানের সূত্র তো কিছু মিলল না?

সবচেয়ে নিরাশার কথা—তোমার এমন চমৎকার রিপোর্ট কোনো

আভিজাত্য নেই, বক্তমাংসের মানুষটার কেবল দেখা যায় একটা কাঠামো।

সুমিত্রা ম্লান হেসে বলে, উপকরণ কোথায় শংকর, আজ মানুষটাকে গড়ে তোলার? আমার মালমশলা যা কিছু সবই পেয়েছি পুলিশের রিপোর্ট থেকে, আর রবিকিরণ গুপ্তর কাছ থেকে।

শংকর সান্ত্বনা দেয়, তা সত্ত্বেও বলতে হবে অসাধ্য সাধন করেছ। কিন্তু কী জানো সুমিত্রা, আমার মনটা হচ্ছে ক্যামেরার মতো, নূতন কোনো তথ্য সেখানে সাড়া তোলে তখনই—যখন তা ফোকাসে ধরা পড়ে। হবিবুল্লার ছবিটা রয়ে গেছে ধোঁয়াটে—একটা অংশ ফোকাসে আনতে গেলে অপর অংশগুলো যায় অস্পষ্ট হয়ে। আচ্ছা, সুমিত্রা, হবিবুল্লার অনুরূপে গড়া কোনো লোকের দেখা তুমি কোনো দিন কি পেয়েছ? তোমার জানা মনোবিজ্ঞানে কি এরকম চরিত্রের নজীর মেলে?

সুমিত্রা নীরবে কিছুক্ষণ কফির পেয়ালায় চামচে ঘোরাতে থাকে। তার পর বলে—

না। এই কারণেই কাল আমি তোমায় বলেছিলাম যে হবিবুল্লাকে সাধারণ ভেবো না। অবশ্য তার চরিত্রের এক একটা দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূল উপাদানগুলোর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই।

ধর না কেন, তার প্রতিভার আকস্মিক বিকাশের কথাও দেশ-বিদেশে অনেক বড়ো বড়ো লোকের ক্ষেত্রে এ ধরণের ঘটনা কি দেখা যায় না? উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তোমাদের আইনষ্টাইনের কথা। পঙ্গু হবার আঘাতে হয়তো বা হবিবুল্লার মনের দরজা খুলে গিয়েছিল।

এ ছাড়া তার অহেতুক কাঠিন্য, সৃষ্টিছাড়া নির্লিপ্ততা, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি, গুরুভক্তি, দম্ভ, প্রেম—আলাদা ভাবে দেখলে এর মধ্যে কোনোটাই অসম্ভব নয়। এ ধরণের কোনো না কোনো মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একত্র করলে সমষ্টিটা হয়ে দাঁড়ায় একেবারেই খাপছাড়া।

হঠাৎ একজনকে দেখে মনে হয় লোকটা সুশ্রী। বিশ্লেষণ করে দেখলে সে সৌন্দর্য কোনো অবয়বের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। সব কিছুর সমষ্টি কিন্তু আশ্চর্য ভাবে মানিয়ে যায়। তেমন আবার অনেক সময়ে চোখে পড়ে সুন্দর মুখ-চোখ-নাক-কান, সুঠাম হাত-পা, কিন্তু সবটা মিলিয়ে মনে হয় কী কুশ্রী মানুষটা!

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দুই আর দুই যোগ করলে প্রায় চার মেলে না উত্তরে। পাওয়া যায় শূন্য আর অসীমের মধ্যে যে কোনো সংখ্যা। আমাদের কোনো থিয়োরিই সবক্ষেত্রে খাটে না—সব মানুষকে বুঝতে হলে চাই তোমাদের থিয়োরি অব রিলেটিভিটির মতোই কোনো শক্ত বনিয়াদ।

শংকর পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুমিত্রার কথাগুলো ভাবে। সত্যিই তো, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হবিবুল্লা সৃষ্টিছাড়া, উন্মাদ। কিন্তু হবিবুল্লার চোখ নিয়ে জগতের মানুষগুলোকে দেখায় কেমন? মানুষের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে কি?

হঠাৎ সে প্রশ্ন করে সুমিত্রা, একটা কাজ করতে পারো। আমার জন্য? তোমার বা পসার প্রতিপত্তি সরকারী মহলে—তাই ভরসা করে অনুরোধটা করছি।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসুনেত্রে ওর দিকে চায়।

দেখ, আজ বিকালে ব্যবস্থা করেছে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরী সকলকে দেখাবার। ওদের দল গিয়ে সেখানে জুটলে অবস্থাটা অনেকটা হবে একপাল বুভুক্ষু গরুর সবজীর বাগানে প্রবেশ করার মতো। সব কিছুই লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে।

চলো না, আমরা দুজনে সকালেই ও কাজটা সেরে আসি।

সুমিত্রা আপত্তি তোলে—কিন্তু প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী কি রাজী হবেন? তাছাড়া ছাড়পত্রও তো চাই একখানা—আজ সকালের মধ্যে তা সম্ভব হবে কী করে?

শংকর মুখ অন্ধকার করে বলে, তোমার যতো জারিজুরি নিরীহ শংকর রায়ের ওপরে। কাজের বেলা সুন্দর মুখ বড়ো বড়ো চোখ সবই অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা থাক, দরকার নেই।

পেঁচার মত মুখ করে শংকর বসে থাকে।

সুমিত্রা হেসে ফেলে। রাগ করতে হবে না তোমায়। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাক কিছু করতে পারা যায় কিনা। কোনো প্রতিশ্রুতি কিন্তু দিতে পারব না।

শংকর বলে, পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে কি না হয়?

সুমিত্রার এবার রাগ করবার পালা—বড্ডো বাজে কথা। কেন যে তোমায় প্রশ্রয় দিই ভেবে পাই না।

সুমিত্রা চলে যায় কৃষ্ণস্বামীকে ফোন করতে। পরম নিশ্চিন্তে পেয়ালার কফিটুকু শেষ করে শংকর সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সমস্ত সোজা উঠে সিলিং-এর কাছে এসে মিলিয়ে যায়। এমনি করেই মানুষ মিলিয়ে যায় মৃত্যুর পর। জড় পদার্থ—পঞ্চভূতে মিলে যায় প্রাণী—'কারবন ডাইঅক্সাইড' বাষ্প আর নাইট্রোজেনের অণুর সমষ্টিতে। মাটিতে পড়ে থাকে 'ক্যালসিয়াম কার্বনেট,' ক্যালসিয়াম ফস্ফেট বিভিন্ন ধরণের লবণ আর যৎসামান্য ধাতুর সমন্বয়। বৃষ্টির জলে, নদীর স্রোতে ধৌত হয়ে বেরিয়ে যায় মহাসাগরের দিকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর ধরে সে সব অণু-পরমাণুর সমষ্টি।

অন্যদিকে চলেছে প্রাণসৃষ্টির সমারোহ ধরণীরই আর এক অবজ্ঞাত কোণে। সূর্যালোকের শক্তিতে আকাশ-বাতাস সাগর আর ক্ষিতির থেকে সংগৃহীত হচ্ছে মালমশলা—কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু আর বাষ্প, কার্বন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন-সালফার-ফস্ফোরাস আর ধাতু মিলিয়ে তৈরী হচ্ছে কাঠামো, উদ্ভিদকোষ থেকে প্রাণিকোষ, প্রোটিন-নিউক্লীয়িক অ্যাসিড থেকে বীজাণু-ভাইরাস, অ্যামিবা থেকে কুকুর-বেড়াল-মানুষ। এ প্রক্রিয়ার আদি নেই, অন্তও নেই। এইজন্যেই বোধ হয় বলা হয়েছে—আত্মা অবিনশ্বর।

এ ঘরের মধ্যে যে অণুগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে কোনোটা কি স্থান পেয়েছিল হবিবুল্লার নশ্বর দেহে?

এ হেন দার্শনিক চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে সুমিত্রার পুনঃ প্রবেশ।

কী খাওয়াবে বলো? ব্যবস্থা মঞ্জুর হয়েছে। এখন একখানা গাড়ীর যোগাড় করতে পারলেই বেরিয়ে পড়া যেতে পারে।

শংকর উল্লসিত হয়ে বলে, দেখলে তো। তোমরা 'সাইকলজিষ্ট' বলে নিজেদের পরিচয় দাও—অথচ ফলিত মনোবিজ্ঞানের প্রথম সূত্রটারই খবর রাখো না। সুন্দর মুখের উপরোধে কী না সম্ভব?

সুমিত্রা ভ্রূকুঞ্চিত করে, ফের আজে বাজে কথায় সময় নষ্ট

করছ! আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি দেখি তুমি তৈরী হওনি, তা হলে কৃষ্ণস্বামীকে বলে পাশ বাতিল করিয়ে দেব।

শংকর হাসতে থাকে।

ও • • •

আধ ঘণ্টা নয়, ঠিক বিশ মিনিটের মধ্যেই শংকরকে বেরিয়ে পড়তে হল ঘন ঘন ইলেকট্রিক হর্ণ-এর অস্থির তাগাদায়। দেখে সুমিত্রা বসে আছে একটা ছোটো মিলিটারি ট্রাক্-এর চালকের আসনে। অনুমানে বুঝে নিল—যে পদ্ম-আঁখির মিনতিতে কেবল কৃষ্ণস্বামীই অভিভূত হন না, কোনো তরুণ মিলিটারি অফিসারও তাড়াতাড়ি 'ট্রাক'এর যোগাড় করে দিয়ে ধন্য হয়ে যান।

এরই মধ্যে কোন ফাঁকে প্রসাধন সেরে নিয়েছে সুমিত্রা। অবিন্যস্ত কেশদাম শান্তবেণী সংবদ্ধ, কপালে উঠেছে একটা ছোটো টিপ, আর ফিকে নীল রং-এর শাড়ী বরতনু করেছে উজ্জ্বল।

সুমিত্রাকে আর একটু জ্বালাবার প্রলোভন সংবরণ করে নিতে হল তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে। নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এ আপদটা জুটলো কোথা থেকে?

সুমিত্রা বলে, বা রে, সিকিউরিটির ব্যবস্থার কথাটা এর মধ্যেই ভুলে গেছ!

সুমিত্রার সাহচর্যে সকালবেলাটা নিরিবিলিতে কাটাবার আশায় ছিল শংকর। মনটা তার দমে যায়। হয়তো বা ওকে কিছুটা আশ্বাস দেবার জন্যই সিকিউরিটির ভদ্রলোক আশ্রয় নিলেন ট্রাকএর পেছন দিকে।

• • • •

সকালের কাঁচা রৌদ্রে ঝলমল করছে দিল্লীর রাজপথ। রাস্তায় জনতার ভীড় তখনও সুরু হয়নি। স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ছেলেমেয়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়। শংকরের মনে পড়ে নিজের স্কুলজীবনের কথা—সেদিন আর এদিনে কতখানি ব্যবধান!

তাদের স্কুলে বাস ছিল না, ছিল না ইউনিফর্মের বালাই। মফঃস্বলের ছোটো স্কুল—মাত্র তিন টাকা ফী দিয়ে দশম শ্রেণী অবধি পড়া যেত। গ্রাম থেকে স্কুলে যাবার পথে পড়ত বিরাট এক নালা। বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে সে নালা পার হতে কী ভয়টাই না করত। বর্ষাকালে ধানক্ষেত আর নালা সবই জলে একাকার হয়ে যেত, স্কুলে যাবার একমাত্র উপায় ছিল হারাণ মণ্ডলের নৌকা। মাত্র এক মাইল পথ অতিক্রম করতে লাগত প্রায় একটি ঘণ্টা—হেমন্তে আবার ধানের ক্ষেত সজিয়ে উঠত, সবুজ চাদরে ভরে যেত দিগন্ত—সেও আর এক রকমের বন্যা। সন্ধ্যাবেলা মাটির প্রদীপ জলে উঠত ঘরে। দুটি মাত্র ছিল পেতলের লণ্ঠন, তার একটি থাকত বারান্দায় আর একটা পড়ার ঘরে। সন্ধ্যাবেলা মাদুরে বসে সে ছোটো বোন বিলুর সংগে পড়াশুনা করত। বিলুটা কেমন আছে এখন? বড় ঘরের গিন্নি তার ফুরসৎ নেই ভাই-এর খবর নেওয়া!

বাবা এসে বসতেন তাকিয়ায় ভর দিয়ে, হাতে তুলে নিতেন গড়গড়ার নল। সারাদিনের ছটোপাটিতে শংকরের ক্লান্ত দেহ তখন ঘুমে লুটিয়ে পড়তে চাইত। বাবা মাঝে মাঝে আদেশ করতেন চোখ মুখ জল করে ধুয়ে আসবার জন্য। শাসন ছিল কড়া, শংকর আর বিলুকে নিয়মিত একটি ঘণ্টা পড়াশোনা করতে হবে, তারপর ছুটি!

সময় হলে বাবা পড়ার ঘর থেকে চলে যেতেন অংকের মাষ্টার পুলিন চৌধুরীর বাড়ী দাবা খেলতে। ওরা ভাই-বোনে কোনোরকমে আহারাদি সমাপ্ত করে ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে জুটত গল্প শুনতে। লালকমল নীলকমলের গল্প, মহাভারতের গল্প। পক্ষিরাজের গল্প। তখন কিন্তু এত রাজ্যের ঘুম কোথায় পালিয়ে যেত! মা এসে ওদের শাসন করে গল্পের আসর উঠিয়ে দিতেন। বাবা ছিলেন স্কুলের হেডমাষ্টার। হেডমাষ্টারের ছেলেকে ক্লাশের শীর্ষস্থানে থাকতেই হবে, না হোলে বিশ্বজগৎটাই উল্টে যাবে!

• • • •

সুমিত্রা গাড়ী থামালো—সামনে রয়েছে লালবাতির নিষেধাজ্ঞা। চিন্তামগ্ন শংকরের দিকে তার চোখ পড়ে। হাতব্যাগ খুলে একটা নয়া পয়সা বের করে বলে এই যে, কেমন মাও্‌জোয়ার ভাবনার মজুরী।

উভয়ের সম্মিলিত উচ্চহাস্যে রাস্তার দু-একজন পথিক সচকিত হয়ে ওঠে।

শংকর বলে, হঠাৎ ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েছিলাম, সুমিত্রা। কী ভাবছিলাম জানো? তখনকার দিনের রুটিন বাঁধা জীবন অসহ্য বলে হোতো। এক দিকে ছিল বাবার কড়া শাসন, অন্যদিকে পরীক্ষার ভয়। এই দুই ভয়ের মাঝখানে ফাঁক প্রায় মিলতই না। প্রাণ ভরে সেদিন কামনা করে গেছি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠবার জন্য—ভাবতাম বড়ো হওয়ার কী সুবিধা। পকেটে থাকবে অঢেল পয়সা, ঘুগনিদানা চানাচুর, ঘুগনীদানা কিনে খাওয়ার জন্য। রোজ সন্ধ্যা সাতটায় সময় পড়াশুনায় বসতে হবে না আর ব্যাকরণের ক্লাশ থেকেও চিরকালের মত রেহাই পাওয়া যাবে।

আজ আবার মনে হচ্ছে ছেলেবেলায় নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলো যদি আর একবার ফিরে পাওয়া যেত। হবিবুল্লার সমস্যার জট ছাড়ানোর চেয়ে সেদিনের ব্যাকরণের ক্লাশও শ্রেয়: বলে মনে হয়। বাবা-মায়ের শাসনের কড়া ব্যবস্থার মধ্যেও কতখানি স্নেহপ্রবণতার প্রশ্রয় আর আশ্রয় থাকত সেটা বুঝেছি তাঁদের হারিয়ে।

ওই যে ছেলে-মেয়েদের দল স্কুলের পথে চলেছে—ওদের কঠিনতম সমস্যাও কতো সহজ, কতো সরল। আজ যদি আমরা মহাবিকর্ষের মূল আবিষ্কার করি ওদের মনোজগতে তার জন্য কোনও আলোড়নই উঠবে না। যদি নিষ্ফল হয় আমাদের চেষ্টা, তার জন্যও ওদের মনে জাগবে না কোনও ক্ষতিবোধ।

আচ্ছা সুমিত্রা, বলতে পারো, মাঝে মাঝে অতীত ফেরার জন্য এই ইচ্ছাগুলো আসে কোথা থেকে?

সুমিত্রা বলে, এরকম ইচ্ছাগুলো আমাদের শিশুমনেরই অভিব্যক্তি শংকর! বয়সে প্রবীণ হলেও মনের একটা অংশ শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে যায় কাঁচা, ভেবে দেখ না কেন, তা নাহ'লে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য যে তৃষ্ণা সেটা তো আসছে অবচেতনি হিত শিশুচেতনার থেকে। ফুটবল খেলার মাঠে প্রবীণ দর্শকদের যে উন্মত্ততা সেটাও শিশুমনের বিকাশ—বয়সের পাকা রঙের আবরণ ভেদ করে অসতর্ক মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে। আবার যুদ্ধ বা দাংগার সময়ে যে পৈশাচিক উন্মাদ দেখা যায় সেটার পেছনে রয়েছে শিশুর দায়িত্বহীন নিষ্ঠুর সত্তা।

কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করবার আগ্রহটা জোগাচ্ছে মনের এই কাঁচা অংশটুকু। প্রবীণতর অংশের অ্যাডভেঞ্চার দারুণ আপত্তি—বেচাল আগ্রহগুলো অবদমিত করে রাখে দৈনন্দিন অভ্যাসের শাসনে। সত্যি করে বল তো, তুমি যে আজ-এ প্রজেক্টে এগিয়ে এসেছো এর মধ্যে একটা ছেলেমানুষী খেয়ালের আভাস পাও কি না?

শংকর স্বীকার করে, কতকটা তাই বৈ কি—অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আরেকটা কারণও আছে। মনের মধ্যে এ বোধটা জন্মাল যে অ্যান্টিগ্রাভিটি একটা চ্যালেঞ্জ—পৌরুষকে লক্ষ্য করে। ইউরোপে এই একশো বছর আগেও যেমন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এলে পশ্চাদপদ হবার উপায় ছিল না। সে আহ্বানে যে সাড়া না দিত, তার বদনাম রটে যেত ভদ্রসমাজে চিরকালের মতো। এমন কি, তার সন্তান সন্ততিদেরও রেহাই দিত না সমাজ। সে সংস্কারের জেরটা রয়ে গেছে আজকের দিনেও নিতান্ত অসহায় শংকর রায়েদের মনে। দ্বন্দ্বযোদ্ধাদের মৃত্যুভয়টাও খাটো হয়ে যেত এই কল্পিত আত্মসম্মান-বোধের কাছে। তাই পরাজয়ের বেশ জোরালো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আহ্বান উপেক্ষা করতে আমারও আত্মসম্মানে বেধে গেল।

সুমিত্রা বলে, জানি না এ কথাটা তুমি ভেবে দেখেছ কি না, শংকর, যে এই তথাকথিত আত্মসম্মান-বোধটাও মানুষের ছেলেমানুষী। নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি—

ছেলেবেলায় বাড়ীতে ছিলাম আমরা তিন বোন আর এক ভাই। মধ্যবিত্ত আধাপ্রগতিশীল মহারাষ্ট্র-পরিবারে ছেলের স্বাধীনতা মেয়ের তুলনায় অগাধ। এমন দিন যায়নি, যেদিন কোনো না কোনো কারণে এ অবিচারের বিরুদ্ধে অন্তরাত্মা বিদ্রোহ না করেছে। স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার সময় বাড়ীতে নিজের কিছুটা প্রতিষ্ঠা অবশ্য সম্ভব হলো, কিন্তু সেটা নেহাতই পরীক্ষার ফলাফলের কল্যাণে।

বিধি-নিষেধের বেড়া থেকে আংশিক মুক্তি যখন মিলল, সংকল্প নিলাম—এ অবিচারের শোধ তুলতে হবে। বম্বের কলেজে কী মাতামাতিই না করেছি নারীর অধিকার নিয়ে। কলেজের মেয়েদের মুখপাত্র হয়ে উঠতে বিশেষ দেরী হয় নি। মেয়েদের সমর্থনের আওতায়, শিক্ষক সমাজের প্রশ্রয়ে আর পুরুষ সতীর্থদের স্তুতিবাদে অহমিকাবোধটা হয়ে উঠল রীতিমতো পুষ্ট। কেউ কেউ বলতেন—এ মেয়ে সরোজিনী নাইডু না হয়ে ছাড়বে না।

অহঙ্কারের পুঁজি যখন বেশ স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে, বীরাংগনা বলে আমার জয়জয়কার চারদিকে—এমনি সময়ে ঘটে গেল একটা ছোটোখাটো বিপর্যয়।

একজন সহপাঠী ছেলের কী করে নজরে পড়ে গেলাম। সহসা চোখে পড়ল, ছেলেটি ছায়ার মতো আমার অনুসরণ করে যায়। কলেজের ছুটি হবার পর একই বাসে দেখা হয়ে যায় রোজ। সিনেমা দেখতে গেলেও দেখি, অদূরেই ছেলেটি বসে আছে। অথচ প্রকাশ্যে আমাদের মধ্যে দু'-একটির বেশী কথাবার্তা হয় নি।

একদিন ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠিনীর সংগে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলেছি—দেখি ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে অনুগত হনুমানের মতো—আমারই একখানা বই হাতে করে। কাছে আসতেই বইখানা সে এগিয়ে দিয়ে বললে—ক্লাশে ফেলে এসেছিলেন।

অতি সাধারণ কথা—অতি সামান্য ঘটনা। শুধু একটা ধন্যবাদ দিলে ঘটনার এইখানেই হয়তো পরিসমাপ্তি হত। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল বান্ধবীবর্গের মধ্যে চাপা হাসির উজ্জ্বলতা। আমার আর সহ্য হোলো না।

সকলের সামনে ছেলেটিকে অপমানের পর অপমান করে গেলাম। কী সব কথা বলেছিলাম—আজ স্মরণে নেই, তবে মনে আছে—শেষে পায়ের চটি খুলে তাকে শাসিয়েছিলাম।

লঘুপাপে এতটা চরম শাস্তির ব্যবস্থা ছেলেটি প্রত্যাশা করে নি। প্রথমে তার মুখ লাল হয়ে উঠল—তারপর বিবর্ণ হয়ে গেল। পরের দিন থেকে তাকে আর কলেজে দেখিনি। কিছুদিন পরে শুনলাম সে কোথায় সামান্য চাকরী নিয়ে জনসমুদ্রে মিলিয়ে গেছে। আরো জানলাম—ছেলেটি পড়াশুনায় ভালো ছিল—দরিদ্র পরিবারের অনেক স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল পরীক্ষায় তার ভবিষ্যৎ সাফল্যের মুখ চেয়ে।

বীরাংগনা সুমিত্রার সেদিন থেকে ক্ষয় শুরু হল। হঠাৎ যেন বড়ো হয়ে উঠলাম।

শংকর একটা মন্তব্য করবার লোভ সামলাতে পারে না।

আজকের সুমিত্রা দেশপাণ্ডে যদি ক্ষয়প্রাপ্ত বীরাংগনা হন, তবে সেদিনকার সেই পূর্ণশশী বীরাংগনার রূপটা অংক কষে বার করবার চেষ্টা করছি। উত্তরটা প্রায় অসীমের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছচ্ছে। এখনো ত দেখি হাতের চটিটা বেশ উদ্যতই আছে।

সুমিত্রা বলে, বা রে, আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে ত! তোমার তথাকথিত সচেতন মনের পাহারায় যে ঘটা দেখছি তাতে নিরাপত্তা সম্বন্ধে তো আর নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না।

একটু হেসে আবার যোগ করে। তবে কারণে অকারণে ঘা কতক বসিয়ে দিতে ইচ্ছা যে করে না এমন কথাও বলা যায় না।

শংকর উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুমিত্রা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, থাক, তর্ক বাড়িও না। এই দেখ এসে গেছি আমরা।

* * * *

দিল্লীর জনবিরল উপকণ্ঠ। এখানে ওখানে গৃহনির্মাণের পর্ব চলেছে—রাজধানী সম্প্রসারণের চিহ্ন। সাধারণ রাজপথ থেকে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে নির্মীয়মান সৌধের দেওয়ালের শ্রেণীর মধ্যে। ইট-বওয়া লরীর চাকার পীড়নে সে লাল-পথ ক্ষতবিক্ষত। সেই পথের ওপরে সাদা 'গেট'।

ফটক থেকে বাড়ী পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত রাস্তার পাশে ফুলের 'টব' সাজানো। রাস্তার দুধারে আর মাঝখানে প্রশস্ত সবুজ লন চোখ জুড়িয়ে দেয়। চারদিকে শ্রেণীবদ্ধ ইস্পাতের গোল বেড়ার মধ্যে সযত্নে লালিত চারাগাছ—অশোক, দেবদারু, গোল্ডমোহর। দূরে দূরে বিস্তৃত বড়ো বড়ো 'প্লট'এ মরশুমী ফুলের বিচিত্র রঙের সমারোহ! অগ্রসর সর্বগ্রাসী মরুর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই—অর্থবল, লোকবল, বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে।

যুগ্মী ভদ্রলোক এগিয়ে যান সরকারের প্রতিনিধির সন্ধানে—ফটক থেকে বেশ কিছু দূরে অতি-আধুনিক বাড়ীটা ছবির মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় উড়ন্ত বিশালকায় এক লাল পাখীর কথা। মাঝের গাড়ীবারান্দা থেকে 'রিইন্‌ফোর্স'ড কংক্রীট'এর দুখানা লম্বা ত্রিকোণ চাতাল ক্রমোচ্চ হয়ে দুপাশে শেষ হয়েছে ত্রিভুজের স্থুল

কোণে। দুই পাখার মাঝখানে গাড়ীবারান্দার ঠিক ওপরেই দেখা যায় বিরাট একটা শ্বেত গম্বুজ। গম্বুজের তুষার-শুভ্রতা সমগ্র বাড়ীটার লাল রং যেন আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছে। শংকর হবিবুল্লার রুচির প্রশংসা না করে পারে না।

সুমিত্রার চোখও তার সপ্রশংস দৃষ্টির অনুসরণ করে। বলে—বাড়ীটার নাম দিয়েছিল কী হবিবুল্লা আন্দাজ করো তো? কারারবার্ড! বেলজিয়াম থেকে আর্কিটেক্ট এসেছিলেন এটাকে গড়ে তুলতে।

শংকর ভাবে—কারারবার্ড! হয়তো কল্পিত বহ্নিবিহংগ ছিল হবিবুল্লার প্রেরণার মূলে। বহ্নিতেই শেষে সমর্পিত হল তার প্রেরণা আর কল্পনা।

সুমিত্রাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রলোকের 'অ্যাষ্ট্রনমি'রও বাতিক ছিল না কি?

সুমিত্রা বলে, হাঁ। হবিবুল্লা সত্যিই একটা বিস্ময়! কোথা থেকে বিরাট একটা দূরবীণ সংগ্রহ করে এনেছিল। কৃষ্ণস্বামী বলেন, যে এতো বড়ো 'টেলিস্কোপ' নাকি গোটা ভারতে নেই। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

শংকর হেসে বলে, এলিমেন্টারি ওয়াটসন। গম্বুজটা দেখেই বুঝলাম ওটা অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটরী না হয়ে যায় না।

রক্ষী ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন চাবির তাড়া নিয়ে। দেরী করার জন্ত মার্জনা চাইলেন—বললেন, যে বাড়ীর প্রধান রক্ষী বাইরে কোথাও গেছেন তাই এই দেরী। এখন ত কারো আসার কথা ছিল না।

গাড়ীবারান্দা থেকে ওঠা যায় এক বিরাট 'হল' ঘরে, সে-ঘরের দুপাশে দেওয়াল ঘেঁসে উঠে গেছে সোপানশ্রেণী একটা চাতাল পর্যন্ত। ঘরের মাঝখানে গোল করে সাজানো পিতলের 'টব'এ 'পাম', 'অরিকেরিয়া,' 'ক্যাকটাস' আর পাতাবাহারের চারা। দু-কোণে দু-খানা কালো মার্বেল পাথরের গোল টেবল আর পুরু গদীজোড়া আরাম কেদারা। জানালা ও 'স্কাইলাইট' ঘরে এমনভাবে সাজানো যে আলোর প্রাচুর্য আছে সর্বত্র কিন্তু আতিশয্য কোথাও নেই। ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলে ইউরোপের বড়ো কোনো হোটেলের 'লবী'র কথা মনে পড়ে যায়।

সুমিত্রা বলে—এই হলঘরের একদিকে হচ্ছে দুখানা ঘর-জুড়ে লাইব্রেরী আর একদিকে ল্যাবরেটরী তিনখানা ঘর জুড়ে। ওপরের তলাটাতেও রয়েছে ল্যাবরেটরী—সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ঘর। দোতালার এক কোণে ছিল হবিবুল্লার নিজের শোবার ঘর—আর ঠিক তার বিপরীত কোণে থাকত সলিম। রান্নাঘর, ডাইনিং রুম, চাকরবাকরদের ঘর সবই পেছনের উইংটায়। এই হলঘরের ছাদের ওপরেই অবজারভেটরি। নীচের তলায় আছে কারখানা আর ভারী যন্ত্রপাতি।

শংকর জিজ্ঞাসা করে—চাকর-বাকর ছিল না হবিবুল্লার?

সুমিত্রা বলে, হাঁ, তারা সম্ভবতঃ এখনও এ বাড়ীতেই আছে।

বাবুর্চি আর তাদের দুই ছেলেমেয়ে। রান্নাঘরের কাজ ছাড়া এরা শুধু লাইব্রেরী আর শোবার ঘরের তদারক করত। কখনো বা ল্যাবরেটরীর ঘরগুলো পরিষ্কার করত মালিকের তাগাদায়। অন্য সময়ে এদের ওপর কড়া নির্দেশ ছিল যন্ত্রপাতির ঘরে না প্রবেশ করার জন্য। নূতন যন্ত্রপাতি এলে খান কোম্পানীর কারখানা থেকে লোক আসত সেটা যথাস্থানে সন্নিবেশ করার জন্য।

হলঘর অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়া যায় একটা লম্বা বারান্দায়। সে বারান্দার ঠিক মাঝখান থেকে সুরু পেছনের উইংটা। বারান্দার এক প্রান্তে সিঁড়ির সারি—একদিকে তা নেমে চলে গেছে ভূগর্ভস্থ একটানা গলিতে। গলিটা সমান্তরালভাবে মাটির নীচে সমস্ত বাড়ীটা অতিক্রম করে ক্রমশঃ উঠে গেছে রাস্তার 'লেভেল'এ। এই প্রবেশপথটা বন্ধ 'কোলাপসিবল' দরজা দিয়ে। গলির দুপাশেই কামরার সারি।

দরজার তালা খুলে ওরা প্রবেশ করল প্রথম কামরাটাতে। আলো জ্বালতেই দেখা গেল—বেশ বড় আকারের একটা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র। এগার শত অশ্বশক্তির একটা 'পাওয়ার প্ল্যাণ্ট'। প্রকাণ্ড ঘরটার এক পাশে রয়েছে ট্রান্সফরমার'এর সারি। চারদিকের দেওয়ালে ঘড়ির মতো নানা রকমের মিটার, বড়ো বড়ো মাষ্টার সুইচ ডিষ্ট্রীবিউশন বোর্ড আর ভারবাহী মোটা মোটা পাইপ। পাওয়ার প্ল্যাণ্টটা খুবই আধুনিক—স্বনিয়ন্ত্রিত কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা ত আছেই, তা ছাড়া রয়েছে দূর থেকে সেটাকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা—একটা সার্ভো-মেকানিজম। মিটারগুলো পরীক্ষা করে শংকর রায় দিলে, সুমিত্রা, হবিবুল্লা এ পাওয়ার প্ল্যাণ্টটা বেশী ব্যবহার করেনি হয়তো অতিরিক্ত শক্তির দরকার হলেই এটাকে চালু করা হত।

পাশের ঘরে রয়েছে একটা বড়ো আকারের এয়ার কণ্ডিশনার—সমস্ত বাড়ীটার আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য। আর আছে একটা পাম্প, ওপরে জল তোলার জন্য। এ ছাড়া একটা বড়ো এয়ার কম্প্রেসর শংকরের নজরে পড়ল বাতাসকে টেনে নিয়ে কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট জায়গায় তা বইয়ে দেবার জন্য।

সুড়ংগপথের অপর দিকটায় প্রথম ঘরে প্রবেশ করেই শংকর থমকে দাঁড়ায়। এ ঘরটা একটা বড়ো রকমের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা বললেও চলে। নূতন মডেলের জার্মাণ লেদমেশিন কতকগুলো ছ্যাঁদা করবার ড্রিল, যন্ত্রচালিত করাত, ধাতু গলাবার একটা বৈদ্যুতিক চুল্লী। ওয়েল্ডিংএর যন্ত্রপাতি। ইলেকট্রোপ্লেটিংএর বড়ো কাচের চৌবাচ্চা। দেওয়াল জুড়ে ইস্পাতের আলমারীর থাকে থাকে সাজানো ছোটোখাটো যন্ত্র, বড়ো যন্ত্রগুলোর নানা রকমের উপকরণ, বাড়তি অংশ, নাটবোল্ট, স্ক্রু পেরেকের বাক্স নানা রকমের খুঁটিনাটির অপর্য্যাপ্ত সমাবেশ।

ঘরের মাঝখানে এক বড়ো ওয়ার্ক বেঞ্চ। তার ওপরে একটা ইস্পাতের ফ্রেম-এর অসমাপ্ত কাঠামো অ্যালুমিনিয়মের দেওয়াল তাতে লাগান হচ্ছিল। সমস্তটা দেখলে মনে পড়ে যায় স্পিমেট পিরামোর কথা। শংকর সুমিত্রার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

সুমিত্রা বলে, ওটা যে কী তৈরী হচ্ছিল, এখনও পর্যন্ত বোঝা যায়নি। তবে পুরো ফ্রেমটার একটা নক্সা পাওয়া গেছে। সেটা এ ঘরেই কোথাও আছে একটা ড্রয়ারের মধ্যে সম্ভবতঃ ওপাশের ওই ড্রয়ারটায়।

শংকরের নজরে পড়ে এক কোণে একটা ঢালু ডেস্ক নক্সা তৈরী করবার জন্য—তার নীচে থাকে থাকে দেরাজের সারি। ওপরের 'ড্রয়ার' খুলে সুমিত্রা টেনে বের করে একটা ফেরো প্রিন্ট' ওপরে শিরোনামা "৪৪নং ফ্রেম"। নক্সায় আছে 'প্ল্যান' 'এলিভেশন' 'সাইডভিউ' 'এণ্ড' ইত্যাদি। শংকর নক্সাটা মিলিয়ে দেখে ফ্রেমটার সংগে। একটা ফুটরুল বের করে মাপ করে দেখে ফ্রেমটার। তার পর আপন মনেই বিড়বিড় করে বলে, ওপরের অংশটা তৈরী হয়নি এখনও—ফ্রেমটা কিন্তু কিসের? আবার একবার চিন্তিত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকায়।

সুমিত্রা ওর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে হেসে ফেলে।

তুমিই যদি না বলতে পার আমি কি করে বলব বল? আশ্চর্যের কথা—সমস্ত বাড়ীটা খানাতল্লাসী করেও এরকম দু-চারখানা নক্সা ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করা যায় নি। হয়তো বা সলিমের সংগে সংগে আর সবই উধাও হয়ে গেছে।

শংকর মাথার চুলের মধ্যে অস্থিরভাবে অঙুলি চালনা করে, নক্সা দেখে মনে হচ্ছে যে কোথাও দেখেছি এমনি একটা যন্ত্র। স্মরণে কিন্তু ঠিক আসছে না সুমিত্রা!

কর্মশালার পাশে হচ্ছে হবিবুল্লার ভাণ্ডার 'ষ্টোরুম।' শংকর অবাক হয়ে যায় তার সঞ্চয় দেখে। নানা রকমের বৈদ্যুতিক তার, রেডিওর 'ভাল্ব,' ট্রানজিসটর', 'রীলে,' রকমারি সুইচ-এর সমষ্টিতে কয়েকটা বড়ো বড়ো কাচের আলমারী ভর্তি।

মন্তব্য করে, এতো জিনিষপত্র দিয়ে হবিবুল্লা করত কী? এসব দিয়ে দেখছি একটা বড়ো রকমের ইলেকট্রনিক্স-এর কারখানা গড়ে তোলা যায়। আর এই ডলার পারমিট, বৈদেশিক এক্সচেঞ্জ, আমদানীর কড়া কনট্রোলের মধ্যে হবিবুল্লা এতগুলো উপকরণ আনালোই বা কেমন করে?

সুমিত্রা বলে, আমরা যতোদূর জেনেছি এর মধ্যে বেশীর ভাগ উপকরণই এসেছিল, এতো কড়াকড়ি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হবার আগেই। এ সম্বন্ধে হয়তো বা হবিবুল্লার একটা নির্ভুল আন্দাজও ছিল, তাই আমদানী নিয়ন্ত্রণের আগেই মালপত্র সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করেছিল।

ভূগর্ভস্থ অংশটুকু শেষ করে ওরা উঠে এল আবার একতলায় ওদের পথে প্রথমেই পড়লো গ্রন্থাগার। দুখানা বিরাট ঘরে কাচ আর ইস্পাতের আলমারীর সমারোহ। রাশি রাশি বই সারি সারি সাজানো থাকে থাকে। বইএর সংখ্যা দেখে শংকর বিস্মিত হল।

সুমিত্রা বলে, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যা কতো, জানো? সাত হাজারেরও বেশী।

অবশ্য অনেক ধনী লোকের হয়তো এর চেয়েও বড়ো লাইব্রেরী আছে। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে বই সংগ্রহে হবিবুল্লার রুচি। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে প্রজেক্টে আপততঃ বইগুলোর একটা বর্ণানুক্রমিক, আর বিষয়ানুক্রমিক তালিকা তৈরী করা। এ ছাড়া ল্যাবরেটরীরও একটা ইনভেন্টরী নেওয়া হচ্ছে তোমাদের জন্য।

ততক্ষণে শংকর আলমারী খুলে বইগুলো নাড়াচাড়া সুরু করে

দিয়েছে। প্রথমেই হাতে উঠল তন্ত্রসারের ইংরেজি অনুবাদ। মধ্যে মধ্যে প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ। মাঝের পাতাগুলো বহুবারের অঙ্গুলিস্পর্শে মলিন।

পরের বইখানা হচ্ছে পরমাণবিক রি-অ্যাক্টরের ডিজাইন্ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রিপোর্ট। সে বইটার মধ্যেও রয়েছে ব্যবহারের চিহ্ন—লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর খুদে অক্ষরে পেন্সিলে লেখা ফুটনোট কোনে কোনো পাতায়।

তারপর রয়েছে গ্রে'র অ্যানাটমি, রোসিক্রুসিয়ান মেটাফিজিক্স, আইনষ্টাইন প্রভৃতির প্রিন্সিপল অফ রিলেটিভিটি বাহাই ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বার্নার্ড শ'র গ্রন্থাবলী প্লেটোর রিপাবলিক। এর পরের থাকেও একই অবস্থা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কোকশাস্ত্র ভেনারের সাইবারনেটিক্স্. আরব্যোপন্যাস, দি সিক্রেট অফ লাইফ, ব্রেন ফিজিওলজি, রবীন্দ্ররচনাবলী, পার্টিংটনের ইনরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি, আর অন্ধকারযুগের ডাকিনী শাস্ত্র।

অন্য একটা আলমারীতেও অবস্থাটা প্রায় একই রকমের। গ্রীক ভাস্কর্য, ব্ল্যাক-ম্যাজিক, কোয়াণ্টাম মেকানিক্স্ সচিত্র মারণ-উচাটন বশীকরণ—রেসেস্ অফ ম্যান, ইন্দ্রজাল বিদ্যা, হ্যাভলক এলিসের যৌন সাইকলজি—আটটি খণ্ডে সম্পূর্ণ—ইত্যাদি।

যেন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে লাইব্রেরীটার ওপর দিয়ে। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং মিশেছে মহাভারতের সংগে; 'পরলোক-কি-বার্তা' মিলে গেছে জিওফিজিক্স'এর সংগে; হঠযোগসাধনা-এর 'স্যাণ্ডউইচ' তৈরী হয়েছে 'ইনফরমেশন থিয়োরি' আর 'মিনাক্সলজি'র মধ্যে! ফেরদৌসীর কাব্যের চচ্চড়ি তৈরী হয়েছে, 'অ্যাবনর্মাল সাইকলজি' 'হস্তরেখা বিচার' 'ইণ্টিগ্রাল ক্যাল্কুলাস' আর 'ম্যাগ্নেটোহাইড্রোডাইনামিকস'এর সংগে!

দুটো ঘরেই বই সাজানোর প্রণালীতে অভাবনীয় অরাজকতা! যে কখানা বই শংকর খুলে দেখল, সবতাতেই রয়েছে অনবিস্তর ব্যবহারের চিহ্ন—লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর ফুটনোট্। অল্পক্ষণের পর্যবেক্ষণেই শংকর হিসাব করে ফেলল যে অন্ততঃ বারোটি বিভিন্ন ভাষায় বই গ্রন্থাগারে রয়েছে।

শংকরের বিমূঢ় ভাবে ইন্ধন যোগায় সুমিত্রা। দেখলে তো। হয়তো এই বইগুলোর মধ্যেই কোনো না কোনো জায়গায় লুকানো রয়েছে 'অ্যাণ্টিগ্রাভিটি'র প্রেরণা। কেবল সেটাকে সন্ধান করে বার করতে হবে—এই আর কি?

শংকর বলে, তার চেয়ে বল না কেন এক বিঘা আগাছার মধ্যে একটা হারানো আলপিন খুঁজে বের করতে! বোধ হয়, সে কাজটা আরো সহজ।

হলঘরের বিপরীত দিকটায় ল্যাবরেটরীর সুরু। প্রথম ঘরটা রসায়নাগার। অ্যাসিড ও নানা রকম রাসায়নিক 'রিএজেণ্ট-এর বোতল সাজানো আছে থাকে থাকে, স্তরে স্তরে, কোনো কোনো বোতল ভর্তি, আবার কতকগুলো অল্পবিস্তর খালি। দেয়ালের সংগে লাগানো বিরাট একটা পোর্সিলেনের 'সিঙ্ক' তার পাশে জল পরিস্রবণ করবার একটা ম্যাগনেষ্টি 'ষ্টিল'। টেবলের ওপরে সাজানো 'টেষ্টটিউব' 'বীকার' 'ফ্লাস্ক'এর সারি। কোণ বরাবর মেঝে থেকে উঠেছে কাচের একটা 'ডিষ্টিলেশন্ কলাম' এক কোণে 'হীটার'-এর ওপর বসানো একটা বড়ো 'ফ্লাস্কে' একটা কালো তরল পদার্থ ওপরে ভাসছে একটা বাদামী রঙের সর। দূরে একটা ছোটো টেবল একটা 'অ্যানালিটিক্যাল' ব্যালান্স আর একটা 'পীঘ্রি ব্যালান্স'। পাশে বর্মাশেল-এর 'বারশেন' গ্যাসের দুটো বড়ো বড়ো আধার।

রসায়নাগারের পাশের দুটো ঘর নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী। প্রথম ঘরটাতে বিরাটাকার কতকগুলো যন্ত্র। মাস স্পেকট্রোমিটার, ইলেক্ট্রন, ডিফ্রাক্শন ক্যামেরা, এক্সরে-ডিফ্রাকশানের যন্ত্র। সুপারসনিকস জেনারেটর, শ্রবণাতীত শব্দতরংগ তৈরী করবার জন্য। একটা বড়ো ভ্রাম্যমান হাই ভ্যাকুয়াম ইউনিট। মাঝারী সাইজের একটা ক্লাইষ্ট্রন বিভিন্ন মাপের সূক্ষ্ম রেডিওতরংগ সৃষ্টি করবার জন্য। একটা ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর, উইলসন ক্লাউড চেম্বার, আয়ন ফিল্ড মাইক্রোস্কোপ যাতে অণু পর্যন্ত দেখা যায়। একটা 'মাইক্রোটোম।'

পাশের ঘরে 'অপ্‌টিক্স'এর নানা রকমের যন্ত্র, একধারে সাজানো বিভিন্ন রকমের রীলে আর সার্কিট, মোটর ব্যাটারীর সারি; পাঁচ-ছটা অসিলোস্কোপ দেওয়ালে দু ঘরেই খড়ির সারির মতো নানা রকমের মিটারের সমাবেশ আর তিন-ফেজ তড়িৎ প্রবাহের বড়ো বড়ো মাষ্টার সুইচ।

নীচের তালা শেষ করে উঠে যায় ওপরের তালাতে। প্রথম ঘরটায় প্রবেশ করেই শংকর অভিভূত হয়ে যায়।

সমস্ত ঘর জুড়ে নানা রকমের কম্পিউটার!

এক পাশে একটা বিরাট ডিজিট্যাল কম্পিউটার আর বিপরীত দিকে রয়েছে অ্যানালগ কম্পিউটার। চারদিকে ছড়ানো নানা রকমের সহকারী ইউনিট।

সুমিত্রা বলে, সারপ্রাইজ, সারপ্রাইজ! কী শংকর, ভূত দেখলে না কি?

শংকর বলে, স্বর্গ সম্বন্ধে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রের যে ধারণা হরিবুল্লা দেখছি সেটা সম্ভব করেছিল দিল্লীরই এক অজ্ঞাত কোণে।

জানো সুমিত্রা, গোটা ভারতবর্ষে এমন যন্ত্র আর একটাও নেই। এম. আই, টিতে বড়ো কম্পিউটারের কথাটা তোমার মনে আছে? গণিতের যে সমস্যা সমাধান করতে রীতিমতো মেধাবী ছাত্রের বছর ঘুরে যাবে—এই মেসিনে উত্তর পাওয়া যাবে সে সমস্যার কয়েক মিনিটে। অবশ্য সমস্যাটা মেসিনের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে দিতে কিছুটা সময় যাবে আরো। মনে আছে সুমিত্রা, জন নিউম্যানের সেদিনকার বক্তৃতা তিনি বলেছিলেন—এ যন্ত্রের বোধ হয় একটা আত্মা আছে।

শংকরের প্রশংসাবিহ্বল দৃষ্টিতে বড়ো সম্ভ্রম যন্ত্রটার প্রতি।

যন্ত্রগুলোর পরীক্ষায় সে তন্ময় হয়ে যায়, মাঝে মাঝে তার মুখ থেকে শোনা যায় প্রায় অস্ফুট অভিব্যক্তি কী চমৎকার! গ্র্যাণ্ড!

মাঝে মাঝে আগ্রহের আতিশয্যে সুমিত্রাকে ডাকে, সুমিত্রা, দেখে যাও এটাকে হরিবুল্লা নিজের হাতেই গড়ে তুলেছে আই, বি, এম-এর ক্যাটালগে কিন্তু এ রকম ডিফারেন্সিয়াল অ্যানালাইজার এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই! ওই যে বড়ো অ্যালুমিনিয়মের আলমারীর মতো অংশটুকু দেখছ, ওটাও হরিবুল্লার তৈরী। বলতে গেলে, পুরো অ্যানালগ কম্পিউটারটাও সে গড়ে তুলেছিল।

সুমিত্রা, এখন মনে পড়েছে কোথায় দেখেছি নীচের তলার ফ্রেমটা। ওটা এই কম্পিউটারগুলোরই অংশ একটা অতিরিক্ত মেমোরী ব্যাংক মেশিনটার স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা। এই মাত্র ক'মাস আগে একটা সাময়িক পত্রে ওই নক্সাটা দেখেছিলাম।

একটা স্ক্রু ড্রাইভার যোগাড় করে দেরাজের সামনের প্যানেলটা খুলে ফেলে শংকর। হঠাৎ বলে ওঠে দেখ কী চমৎকার হাতের কাজ ছিল ভদ্রলোকের। এখানে আটাশটা তার একসংগে হবিবুল্লা কী করে সন্নিবেশ করেছে এতো স্বল্প পরিসর জায়গায়? কতকগুলো গেছে ফ্লোরএর দিকে আর কতকগুলো মেমোরী ব্যাংকের দিকে। অথচ প্রতি তারেরই স্বতন্ত্রতা বজায় রয়েছে। কী অদ্ভুত বিন্যাস সুমিত্রা!

এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে এ সমস্ত জটিল যন্ত্র যে এমন নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে পারে তার পক্ষে হয়তো অ্যান্টিগ্র্যাভিটি মেশিন তৈরী করাও অসম্ভব নয়।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চেষ্টা করে শংকরের উৎসাহে যোগান দিতে। কিন্তু মাইলের পর মাইল লম্বা লাল নীল তারের জটিল সমাবেশ আর হাজার হাজার ভ্যাল্ভ ট্রানজিষ্টার এর অরণ্যের মধ্যে তার অনুধাবন শক্তি পথ হারিয়ে যায়।

শংকরের সময়ের জ্ঞান লোপ পেয়েছে এত বড়ো চমকপ্রদ খেলনা পেয়ে। এক একবার তার একটু খটকা লাগে। সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে।

ভাবছি, ভদ্রলোক এতো পয়সা যোগাড় করলেন কী করে? এই ঘরের যন্ত্রপাতির দামই হবে কমপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। আর অন্য ঘরের সব যন্ত্রের হিসাব করলে প্রায় এক কোটি টাকার মত হয়ে দাঁড়ায়।

সুমিত্রা হাই চেপে বলে, তার চেয়েও বেশী, শংকর! প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী সেদিন একটা মোটামুটি হিসেব করছিলেন। এ বাড়ী আর ল্যাবরেটরী তৈরী করতে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা লেগেছিল। কিন্তু ইনকমট্যাক্স বাদ দিয়ে হবিবুল্লার বাৎসরিক আয় ছিল কতো, আন্দাজ করো দেখি? চল্লিশ লক্ষ টাকা!

শংকরের চক্ষু বিস্ফারিত হয়—চল্লিশ লক্ষ টাকা!

মনে মনে একবার হিসেব করে নেয় ক'শো শংকর রায়কে এ টাকায় পোষা যায়। তারপর আবার সে মগ্ন হয়ে যায় কম্পিউটারের মধ্যে।

অসীম ধৈর্য নিয়ে সুমিত্রা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বলেই ফেলে, আজ আর থাক, শংকর। তোমার না হয় 'কম্পিউটার' পেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ঘুচে গেছে, কিন্তু তার জন্য এই রক্ষী ভদ্রলোককে উপোস করিয়ে মারবে? আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কত বেলা হল তোমার খেয়াল আছে?

শংকর অপ্রতিভ হয়ে যায়, তাই তো মাপ করো আমায় এ বারের মতো। বেলা গড়িয়ে দুপুরে পৌঁছেছে আমার স্মরণেই ছিল না। চলো, এবার তাড়াতাড়ি অন্য ঘরগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

অন্য ঘরগুলোয় রয়েছে নানা রকমের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, মাপজোপ করবার জন্য। 'ট্যাকোমিটার' 'ইন্টারফেরোমিটার' 'বোলোমিটার' 'ম্যাগ্নেটোমিটার' টরশান্ ব্যালান্স' ইত্যাদি। শংকরের দৃষ্টি খেয়ে যায় একটা 'গ্রাভিমিটার' মাধ্যাকর্ষণ পরিমাপ করার যন্ত্র, দেখে। পরম কৌতূহলে সেটাকে যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। তার পর অন্য সব নানা রকমের যন্ত্রপাতির ওপরে চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে।

এখন সব ভালো করে দেখাই হোলো না, সুমিত্রা। বিকালে না হয় ওদের সংগে আর একবার আসা যাবে।

সবশেষে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে যায় হলঘরের ওপরের অবজারভেটরিতে।

বিরাট দূরবীণটা অন্ধকার ঘরে মঞ্চের ওপরে হেলানো ভাবে দাঁড় করানো—একটা প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো। আবছা আলোয় কালো ছায়া তার বিস্তৃত—গোলাকার ছাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে। ঘরের মধ্যে একটা দুঃসহ নীরবতা! মানুষের অবর্তমানে মাকড়সার দল পরম নিশ্চিন্তে জাল বুনে চলেছে। ম্লান আলোয় হঠাৎ সে জাল চিক্‌মিক্ করে ওঠে। মনে পড়ে যায় কেমন করে তাজমহলের ভূগর্ভস্থ কবরখানার কঠিন নীরবতা!

একটা গভীর সমবেদনা সহসা শংকরের মনের তন্ত্রীতে সাড়া দিয়ে ওঠে।

বহ্নিবিহংগ!

সর্বগ্রাসী হুতাশনের লেলিহান শিখার মধ্যে সহসা রূপ নেয় 'ফায়ারবার্ড'। দিগন্তপারের সূর্যের দাবানলের আকাশ-রাঙানো আভার মধ্যে অন্তর্হিত হয় সে রূপ চোখের নিমেষে। আবার অন্য কোথাও তখন অগ্ন্যুৎপাতের প্রলয় তাণ্ডবে নেচে উঠেছে বহ্নিবিহংগ-ফিনিক্স! টিমারপুরের অগ্নি-উৎসবে হবিবুল্লাকে ডেকে নিলো বহ্নিবিহংগ নিয়তির রূপে!

নিয়তি আছে কি?

হবিবুল্লার অকাল মৃত্যু কি মহাকর্ষের অমোঘ বিধানকে উপেক্ষা করার চরম শাস্তি?

কে জানে?

শংকর ভারী গলায় বলে, এবার ফিরে চলো সুমিত্রা!

* * *

বাগান পেরিয়ে গাড়ীতে উঠবার সময়ে একবার পেছনে ফিরে চায় শংকর। হঠাৎ প্রান্তর জনহীন বলে মনে হয়। সেই বিরাট প্রান্তরের মাঝখানে উন্মুখ ডানা মেলে দিয়েছে—বহ্নিবিহংগ। তার মাথার ঝুঁটি থেকে ঠিকরে পড়ে শতসূর্যের আলো! দূরের সদ্য নির্মীয়মান সৌধের ভিতগুলোকে মনে হয়—যেন বহু শতাব্দীর কোন বিস্মৃত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ!

[ক্রমশঃ।
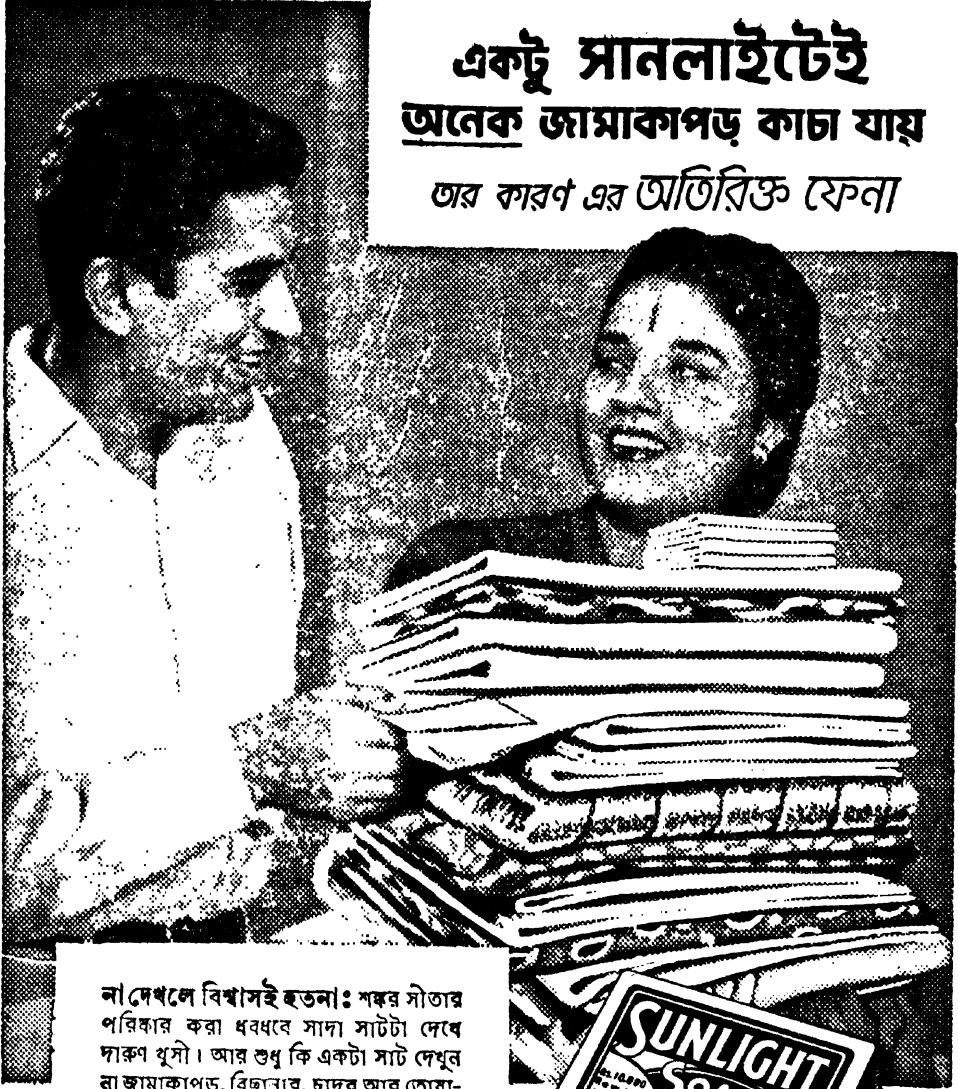
একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গমার্গ

আশা রায়

সাধারণত ধর্ম্ম এই বাক্যের সংজ্ঞা ঈশ্বরভিত্তিক। বুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণই নীতিভিত্তিক—মহত্তর জীবন লাভে দৈনন্দিন অভ্যাস-যোগ, যাহা অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নহে, যেহেতু ভগবদালোচনার প্রয়োজন হয় নাই।

তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ সর্ব্বসাধারণেরই সুগম্য—তিনি কোনও গুহ্য তত্ত্ব কতিপয়ের অধিকারভুক্ত করিয়া যান নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁর মতবাদ বৌদ্ধধর্ম্ম নামে আখ্যাত হইলেও তাঁহার জীবিত কালে ইহা পৃথক একটি ধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম নামে অভিহিত ছিল না। বৌদ্ধসম্রাট অশোকের গিরিলিপি ও শিলালেখ সমূহের নীতিবচনে কোথাও বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ নাই।

বুদ্ধের আবির্ভাব কালে (খৃঃ পূঃ ৫৬৩) ধর্ম্মচর্য্যায় সাধারণত দুই আতিশয্যের প্রাবল্য ছিল—ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক যাগ-যজ্ঞ, পূজা, বলি ইত্যাদি সাড়ম্বর বাহ্যিক অনুষ্ঠান, অপর দিকে জীবগণ ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়, একারণ ইন্দ্রিয় দমনার্থে কঠোর আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছসাধন।

জীবন-দার্শনিক বুদ্ধ মানবকে একান্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আত্মসমীক্ষণ আত্মসংযম ও আত্মশক্তির''উদ্বোধনে বিমুক্তিলাভে প্রেরণা দিয়াছিলেন। প্রাক্‌বুদ্ধ ভারতীয় মোক্ষ শাস্ত্রের (মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদের যুগ খৃঃ পূঃ ১১০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫৫০) লক্ষ্য ছিল অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ, এবং ইহার মর্ম্মার্থ সীমাবদ্ধ ছিল পণ্ডিতদের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম চালিত লৌকিক জীবনে জনসাধারণের জন্য পথ নির্দ্দেশের প্রয়াস উহাতে সামান্য মাত্র। বুদ্ধ সেই ইঙ্গিতকে স্বীয় প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানদৃষ্টিতে বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপদান করিয়া এক যুক্তিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী সাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। দুঃখার্ত্ত মানবকে মুক্তির উপায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি ধর্ম্মগুরু পয়গম্বর বা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া নিজেকে কখনও দাবী করেন নাই—"তুম্‌হে হি কিচ্চং আতপ্পং অক্‌খাতারো তথাগতো" তথাগত পথ প্রদর্শক মাত্র, পথ অতিক্রমের প্রচেষ্টা তোমাদেরই করিতে হইবে—ইহাই তিনি বলিয়াছেন।

মানব রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ সমূহ হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ইহার অনুসন্ধানে এক আষাঢ় পূর্ণিমা রজনীতে কপিলবাস্তুর রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাক্যরাজপুত্র ভিখারী-ব্রত ধারণ করিলেন। দেশে দেশে পর্য্যটন, বহু প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, কঠোর কৃচ্ছসাধন ও বিভিন্ন যোগ সাধনা অভ্যাস করিলেন কিন্তু প্রকৃত সত্যের সন্ধান মিলিল না। এইরূপে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিক্রম হইতে চলিল কিন্তু সর্ব্বত্যাগীর মনোরথ পূর্ণ হইল না। অবশেষে নিরঞ্জনাতটে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই আসনে তপশ্চর্য্যায় আমার শরীর ধ্বংস ও বিলীন হইয়া গেলেও সত্যলাভ না হইলে উত্থান করিব না। তিনি নিমীলিত নেত্রে ধ্যানের গভীর হইতে গভীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ধীরে ধীরে মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। মানবের সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রতিভাত হইল এবং তিনি সুমহান সর্ব্বাতিক্রমী বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া সম্বুদ্ধ হইলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি চিন্তা করিলেন যে, সুগভীর জ্ঞান ও নিগূঢ় সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা কাহার নিকট ব্যক্ত করিবেন? এরূপ চিন্তা করিতে তাঁর পূর্ব্বতন পঞ্চ শিষ্যের স্মৃতি উদিত হইল—যাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তিনি অপর এক আষাঢ় পূর্ণিমায় বারাণসীর মৃগকাননে (সারনাথ) উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দ্বে মে ভিক্‌খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা···মজ্‌ঝিম পটিপদা নিব্বানায় সংবত্তি"—হে ভিক্ষুগণ! দুইটি আতিশয্য অর্থাৎ ভোগ ও আত্মনিগ্রহ এই উভয়কে বর্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলে নির্ব্বাণের পথ জানা যায়।

তিনি বলিলেন, চারিটি মূল সত্যের অজ্ঞতার জন্য আমরা সংসার-দুঃখচক্রে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়-বিচ্ছেদ, অপ্রিয়-সংযোগ, ঈপ্সিত অলাভ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছি—সেই চারিটি সত্য চতুরার্য্য সত্য—যথা জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন—'দুক্‌খ নিরোধ গামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং, অযমেব অরিযো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো, সেয্যথীদং সম্মা দিট্‌ঠি সম্মা সংকপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীব, সম্মা বাযামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি।' দুঃখ নিরোধগামী মার্গরূপ আর্য্য সত্য এই ইহা আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ যথাসম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তন ও দুঃখনিরোধকারী এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে দুঃখ-মুক্তি ও নির্ব্বাণ লাভ হয়, শিষ্যগণ। ইহাই আজ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি।

বুদ্ধবাণীর মূলকথা—শীল, সমাধি প্রজ্ঞা। অষ্টাঙ্গ মুক্তিমার্গের তিনটি বিভাগ। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম ও সম্যক জীবিকা

শীল-সম্বন্ধী, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক সমাধি, সম্যক স্মৃতি সমাধি সম্বন্ধী, সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞা-সম্বন্ধী, বস্তুত বুদ্ধের শিক্ষা জ্ঞানও ধ্যানমূলক। আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হইলেও প্রত্যেকটির সহিত অপরগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, এ কারণ একে অন্যের পরিপোষক।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, দুঃখের হেতু তিনটি অকুশল—লোভ, দ্বেষ মোহ এবং এই তিন অকুশল সম্ভূত তৃষ্ণা বা বাসনা জন্ম-জন্মান্তরের হেতু তথা দুঃখের মূল।

সম্যক দৃষ্টি (প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি)

মোহ বা অবিদ্যাজনিত দৃষ্টিদ্বারা জীবন ও জগৎপ্রবাহকে বিচার করিয়া মানব কুসংস্কার আপাত সুখকর ভোগলিপ্সা, ধর্ম্মবোধে অধর্ম্মাচরণ, পরের অহিত সাধনে ধনলাভ ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হইবে—দুঃখ, অনিত্য অনাত্ম। এ জগতে দুঃখেরই আধিক্য, যথা জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, ঈপ্সিত অলাভ, প্রিয়-বিচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ। কোনও সুখই স্থায়ী নহে বরং পরিণামে দুঃখ উৎপাদন করে। সুতরাং সেই সুখ-বাসনায় পশ্চাদ্ধাবন নিরর্থক ও বিড়ম্বনামাত্র।

এ জগতের সব কিছুই অনিত্য, জীবন যৌবন ধন-মান প্রিয়জন প্রিয়বস্তু সকলই কালপ্রবাহে বিনষ্টশীল। এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে লোভ দ্বেষ ও মোহের বিনাশ হয়। অনাত্ম শব্দের অর্থ আত্মার অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টিপ্রবাহের সকল কিছুই যখন বিনাশশীল তখন একই সত্তা বা আত্মা জন্ম-জন্মান্তরে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, এই ধারণা অযৌক্তিক। (ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, পুনর্জন্ম মোক্ষ প্রভৃতির সহিত বৌদ্ধমতের বিশেষ পার্থক্য নাই কিন্তু হিন্দু দর্শনের ষড় দর্শনের কাল খৃ: পূ: ৪৫০ হইতে খৃ: পূ: ২০০) সহিত বৌদ্ধদর্শনের (খৃ: পূ: ৪৮৩ হইতে খৃষ্টোত্তর ১৭৫) প্রভেদ যথাক্রমে আত্মার অস্তিত্ব ও অনাত্মবাদে। ঋকবেদে (বৈদিকযুগ খৃ: পূ: ১৫০০ হইতে খৃ: পূ: ৫০০) জন্মান্তরবাদ ও জাতিভেদের উল্লেখ নাই (ম্যাকডনেলের মুইর) সম্ভবত: বেদোত্তরকালে আর্য্যরা অনার্য্যদের জন্মান্তরবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সুসভ্য আর্য্যরা তথাকথিত অসভ্য অনার্য্যদের ধারণা সমর্থন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা সমীচীন কিনা। মহেনজোদেরো, চানহুদেরো ও হারাপ্পার ভূমিবক্ষে প্রাক-আর্য্য সিন্ধু সভ্যতার (খৃ: পূ: ৩০০০-১৫০০) যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কানিংহাম, বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শাল মজুমদার, হুইলার, কৃষ্ণ স্বামী, পিগট, নাগ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অনার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে আর্য্যগণ হইতে অনেক উন্নততর সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধজন্মের হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃ: পূ: ১৫০০ শতকে আর্য্যগণ এদেশে আসেন। সিন্ধু উপত্যকার এই অনার্য্যগণ আর্য্যদের বহু পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম এসিয়া হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। দৈহিক শক্তিতে হীনতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রার মান আর্য্যগণ অপেক্ষা উচ্চতর ছিল। এই পূর্ব্বোক্ত Dravido-Sumerian-দের ভারতের আদিম অধিবাসীদের সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া আর্য্যগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে ইতরার্থে অনার্য্য এই আখ্যা প্রদান করিলেন। অনার্য্যদের Animism and totemism—জীবাত্মা, মানবেতর অর্থাৎ ইতর প্রাণী বা কোনও পদার্থ হইতে জন্মবিবর্ত্তন জন্মান্তরবাদ আর্য্যরা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা বর্ত্তমানকালের প্রখ্যাত গীতা-বেদান্ত-ভাষ্যকার ডক্টর বেলভালকরের মত।

সম্যক সংকল্প (উত্তম সংকল্প)

মূল অর্থে ইহা চিত্তশক্তির দৃঢ় অভিনিবেশ। ইহার তিনটি বিভাগ (১) নৈষ্কাম্য সংকল্প—ভোগসুখ অনিত্য ও পরিণামে দুঃখ সৃষ্টি করে এই চিন্তা সদা জাগ্রত রাখিলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদিজনিত তৃষ্ণা অশুভ জ্ঞানে বিদূরিত হয় এবং চারি ধাতু সমন্বিত দেহ—(ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে জীবদেহ পঞ্চভূত সমন্বিত কিন্তু বৌদ্ধমতে ইহা চারি ধাতু (eliment) যথা পৃথিবী (Solid) অপ (fluid) তেজ (heat) বায়ু (Vibration, wind) সমন্বিত এই চারি ধাতুকে পৃথক করিলে দেহের স্বকীয় কোনও অস্তিত্ব থাকে না—এই প্রত্যয়ে অশুভ তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ হয়। (২) অব্যাপাদ সংকল্প অর্থাৎ অহিত চিন্তা বর্জ্জন ও সর্ব্বজীবে মৈত্রী ভাবনায় দৃঢ় উদ্যম। (৩) অবিহিংসা সংকল্প সর্ব্বপ্রকার হিংসা বিরতি ও করুণাচিত্ত উৎপাদন চেষ্টা।

সম্যক বাক্য (সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য)

ইহা চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপের পরিহার—যথা (১) প্রবঞ্চনা চিত্তে আত্মহেতু বা পরহেতু জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা না বলা, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস্ত ও অ-বিষমবাদী হওয়া। মিথ্যা ভাষণ লোভচিত্তজাত। (২) পিশুন অর্থাৎ অপর যে কোন দুই ব্যক্তির ভিতর পরস্পরের প্রতি প্রিয়তাশূন্য করে (মন ভাঙ্গান) এইরূপ বাক্য হইতে বিরত থাকা। পিশুন বাক্য দ্বেষ, চিত্তজনিত অকুশল কর্ম্ম। (৩) পরুষ বাক্য পরিহার—যে বাক্য নিজেকে ও অপরকে পরুষ ব্যবহারে নিযুক্ত করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণসুখকর নির্দ্দোষ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ। পরুষ বাক্যও দ্বেষচিত্তজাত। (৪) সম্প্রলাপ বাক্য হইতে বিরতি—শূন্যগর্ভ, অসৎ, বিদ্রূপাত্মক, অসার বাক্য পরিহার করিয়া ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী, কালবাদী, অর্থযুক্ত পরিমিত বাক্য বলা। সম্প্রলাপ বাক্য মোহচিত্তজাত।

সম্যক কর্ম্ম (সৎ বা কুশল কর্ম্ম)

এই কায়িক সংযম ও কুশল কর্ম্মের অনুশীলনের উদ্দেশ্যেই শীল পালনের নির্দ্দেশ* প্রাণিহিংসা হইতে বিরত থাকিয়া সর্ব্বভূতে হিতানুকম্পী হওয়া, (১) স্বেচ্ছায় দেওয়া হয় নাই এরূপ বস্তু গ্রহণ বা অপহরণ না করা, (২) কামসম্ভোগে মিথ্যাচারী না হওয়া—এ ত্রিবিধ কায়িক পাপ পরিহার করিয়া সুকর্ম্ম দ্বারা কায়-পবিত্রতা অর্জ্জনই সম্যক কর্ম্ম।

সম্যক জীবিকা (সৎজীবিকা)

অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হয় না। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন দরদী ও বাস্তববাদী, তিনি কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই শিক্ষা দেন নাই, আপামর সকলে দুঃখমুক্ত হউক,

---

* শীল পালন সম্বন্ধে এই পত্রিকায় পূর্ব্বতন এক সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

বাসনাবিহীন বুদ্ধের ইহাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। যেহেতু অষ্টাঙ্গ মার্গের নির্দ্দেশ সন্ন্যাসী গৃহস্থ সকলের জন্যই। কায়িক বাচনিক মানসিক অকুশল যাহাতে উৎপন্ন না হয় এইরূপ জীবিকার্জ্জনেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। লোভ, হিংসা, পরপীড়ন, কপটতা, মিথ্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি যে যে জীবিকায় সঞ্জাত হইতে পারে, তাহাই তিনি নিষেধ করিয়াছেন। যথা—মৎস্য, মাংস, মদ্য, বিষ, শস্ত্র, নর ও নারীঘটিত ব্যবসায়।

সম্যক প্রচেষ্টা (দৃঢ় উদ্যম)

ইহা চতুর্ব্বিধ (১) অনুৎপন্ন অকুশল উৎপন্ন হইতে না পারে তজ্জন্য বলবতী চেষ্টা, (২) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশ ও পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ কায়িক বাচনিক মানসিক ব্যবহার হইতে বিরতির উদ্দেশ্যে দৃঢ় উদ্যোগ ও স্থির প্রতিজ্ঞা, (৩) অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদনের জন্য চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করা, (৪) উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য অভিনিবেশ। বীর্য্যবান ব্যক্তিই ধর্ম্মলাভ করে, পরিপূর্ণ অভিনিবেশ ও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই তাহার বন্ধু।

সম্যক স্মৃতি (স্মৃতি সাধনা)

সম্যক স্মৃতি অষ্টাঙ্গ মার্গের একটি উচ্চতর সাধনা। ইহা ধ্যানমূলক। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মমনের যথার্থ রূপ সংজ্ঞা ও অনুভূতির বিবর্ত্তন সম্বন্ধে সর্ব্বদা স্মৃতিমান থাকাই স্মৃতি অনুশীলন। ইহার চারিটি বিভাগ—যথা (১) কায়ে কায়ানুদর্শন—কুৎসিত কেশ লোম নখ দন্ত অস্থি মাংস অন্ত্র মজ্জার সমন্বয়ে এই দেহ এবং এই দেহের পরিণতি জ্ঞানদৃষ্টিতে পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দুঃখ, অনাত্ম, অনিত্যবোধে আত্ম-সংস্কার ও আসক্তিসমূহের ক্রমে নিরসন হয়। (২) বেদনায় বেদনানুদর্শন পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে সুখ দুঃখ উপেক্ষা শীতোষ্ণ সমস্ত দৈহিক ও মানসিক অনুভূতিই বেদনা। কি কারণে কোন বেদনা বা অনুভূতির উদয় হইল এবং উদয় হইয়া কোন মনস্কামের সৃষ্টি করিল বা কোন বিরতির কারণ হইল, তাহা স্মৃতি দ্বারা অবলম্বন করিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করা। অনুভূতিই দেহের সহিত জগতের যোগসূত্র। উদয় স্থিতি ও বিলয়শীল অনুভূতি সমূহের অনুধাবনে ক্রমে অনাত্মবোধ প্রতিভাত হইবে কাহার অনুভূতি হইতেছে, কে অনুভব করিতেছে? (৩) চিত্তে চিত্তানুদর্শন—কায় ও অনুভূতির সমবায়েই চিত্তের উৎপত্তি। কায়ের ও অনুভূতির বিভিন্নতায় বিভিন্ন চিত্তের উৎপত্তি অহরহ হইতেছে। কোন সময়ে কোন চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল তাহা সংরাগ চিত্ত না স-দ্বেষচিত্ত না স-মোহচিত্ত অথবা রাগ-দ্বেষ-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত বীর্য্যসহকারে স্মৃতি দ্বারা অবলম্বন ও প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করিলে দুঃখ অনাত্ম, অনিত্য বোধে নিত্য সুখ আত্মসংজ্ঞা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়, চিত্ত নির্ব্বেদযুক্ত হয়। (৪) ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শন—ধর্ম্ম এই শব্দের যৌগিক অর্থ হইল যে বিষয়ের যে স্বভাব। তুষারের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ। বীর্য্যাধিষ্ঠান ও প্রজ্ঞা দ্বারা স্বীয় কায়-চিত্ত-স্বভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধর্ম্মের স্বলক্ষণ, অনিত্যাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাত্মাদি শূন্যতা লক্ষণ দৃষ্টে দেহমনের অস্তিত্ব বোধ ক্রমশঃ লুপ্ত হয়।

সম্যক সমাধি (পরিপূর্ণ একাগ্রতা)

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক প্রচেষ্টা সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি এই সপ্ত অঙ্গসমন্বিত চিত্তের পরিপূর্ণ একাগ্রতাই সম্যক সমাধি। যদিও সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক স্মৃতিলাভ দুইটিই উচ্চতর অবস্থা কিন্তু চিত্তের অবিকল্প স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি আসে যোগে অর্থাৎ নিদিধ্যাসনে। ধ্যানের গভীরতায় আসে সম্বোধি বা কৈবল্য, যে অবস্থায় চিত্ত নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল ও অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করে। ধ্যানলোকের চারিটি অবস্থা বুদ্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন—(প্রথম) কায়িক, বাচনিক, চৈতসিক নির্ম্মলতা, স্থৈর্য্য প্রশান্তিই ধ্যানযোগের প্রথম ভূমি। ভোগ তৃষ্ণা অকুশলাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিচার বিবেক প্রীতি সুখ ও একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত হইয়া বিহার করাই এই প্রথম সমাধিভূমি লাভ। (দ্বিতীয়) আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তে সমাধিজাত প্রীতি সুখের ক্রমবর্দ্ধনে দ্বিতীয় ভূমি লাভ। (তৃতীয়) প্রীতি বিরাগ উপেক্ষা একাগ্রতার সহিত স্মৃতিশীল হইয়া বিহার করিলে যে কায়িক সুখবোধ ও প্রজ্ঞার উন্মেষ হয় তাহা তৃতীয় ভূমি। (চতুর্থ) ক্রমে কায়িক ও মানসিক সুখ-দুঃখবোধ সর্ব্বথা রহিত হইয়া যে নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বিকল্প শান্তি ও শাশ্বত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তাহাই চতুর্থ ধ্যানভূমি অর্থাৎ নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ উপলব্ধির বিষয় ইহা অনির্ব্বচনীয় অকল্পনীয়।

বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট ধ্যানের বিষয়বস্তুগুলি অতীব যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধ্যানের বিষয়বস্তু ঈশ্বর এবং লক্ষ্য হইল তাহার সহিত সাযুজ্য সালোক্যলাভে আত্যন্তিক সুখ। এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যে নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল মুনিকে উদ্দেশ্য করিয়া গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ' ১০।২৬ অর্থাৎ সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধ যেমন নীরব ছিলেন, নির্ব্বাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ তিনি ইঙ্গিত মাত্র করিয়া তাহার ব্যাখ্যা বা আলোচনায় ক্ষান্ত ছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় এরূপ নীরবতা অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়, উপনিষদে আছে 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো' ইত্যাদি অর্থাৎ সেখানে চক্ষু যায় না বাক্য যায় না মনও যায় না তাহা বিদিত অবিদিত সকল বস্তু হইতে পৃথক—তাহা অবাঙ্মনসগোচরম্। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই দর্শনের চরম লক্ষ্য যথাক্রমে ব্রহ্ম ও নির্ব্বাণ, উভয়েই অনির্ব্বচনীয় অকল্পনীয় এ সম্বন্ধে বলিতে শূন্যতা বা নঞর্থক (নেতি নেতি) বর্ণনা আসিয়া পড়ে অর্থাৎ ন-দুঃখ ন-সুখ ন-জর ন-মর ন-অমর ন-জাত ন-অন্ত ন-অনন্ত অচ্যুত অমৃত। ব্রহ্মোপলব্ধি ও নির্ব্বাণ, সাধন মার্গের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধির বিষয়, সে উপলব্ধি ভাষাতীত।

মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভই মানবের চরম কাম্য চরম লক্ষ্য। তাই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধ পঞ্চ শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'অপারুতা তেসং অমতস্স দ্বারা, যে সোতাবন্তো। পমুঞ্চন্তু সদ্ধা' আমি তোমাদের জন্য অমৃতের দুয়ার খুলিয়া দিলাম, হে শ্রবমান। তোমরা শ্রদ্ধার দুয়ার খুলিয়া প্রাণপাত্রখানি পূর্ণ করিয়া লও।

বুদ্ধের উপদেশাবলী পর্য্যালোচনায় আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোনও কালের যে কোনও ব্যক্তিরই ইহা অনুশীলনসাধ্য এবং এই মার্গ সম্পর্ণই

মানসিক শুদ্ধি ও পূর্ণ পরিণতি লাভের সুনিয়ন্ত্রিত, যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী, ইহার সার্বজনীনতা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। মানুষ এই মার্গ অবলম্বনে নিজের মুক্তি নিজেই অর্জন করিতে পারে। যাগ, যজ্ঞ, বলি দৈবকৃপা বা কাহারও সাহায্য বা নির্ভরতার প্রয়োজন নাই ইহাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন 'অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরোসিয়া ? অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং' নিজেই নিজের নাথ (ত্রাণকর্ত্তা) তদ্ভিন্ন অপর কে ত্রাণ করিতে পারে ? সুদান্ত ব্যক্তি আপনার মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করে। 'অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা সো অত্তগুত্তো সতিমা সুখং বিহাহীসি' নিজেই নিজেকে প্রেরণা দাও, নিজেই নিজেকে পরীক্ষা কর, যিনি আত্মগুপ্ত (আত্মস্থ) ও স্মৃতিমান তিনি সুখে বিহার করেন।

গণমানসে আত্মশক্তির এরূপ শ্রেষ্ঠ আসন এরূপ প্রেরণা কেহ দেন নাই—তাই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন দিবস আষাঢ় পূর্ণিমা বিশ্বমানবের আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় অন্তরশক্তি উদ্বোধনের স্মরণীয় দিবস।

দিন যায় রাত্রি আসে, এক ঋতু অন্তে অন্য ঋতু—বর্ষ শেষে নববর্ষ দুর্ব্বার দুর্লঙ্ঘ্য দুরন্ত দুর্দ্দম কালচক্র জগৎ ও জীবনপ্রবাহ চালিত করে। কাল গতিশীল চক্র তার গতিবেগ। কাল সম্ভূত জীব কালচক্রের প্রচণ্ড নিষ্পেষণ হইতে পরিত্রাণ কিরূপে পাইবে ? কোন শক্তিমান হইতে শক্তিমান কালোত্তর কালবিজয়ী কালাতীত ? ধর্ম্মই কাল বিজয়ী কালাতীত সর্ব্বশক্তিমান ইহাই ভগবান বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রের আহ্বান। চক্রের সর্ব্বাংশ সমতা, চক্রের ব্যাস পরিধি ও ব্যাসার্দ্ধ সর্ব্বদৃষ্টিভঙ্গীতেই সুসম।

ধর্ম্মচক্র তাই জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ঘোষণা করিতেছে সর্ব্বকালের সকল মানবের মুক্তিলাভের জন্মগত অধিকার —এ স্মরণীয় দিন ভারতবাসীর ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হইয়া আছে।

একদা বুদ্ধবাণীর আদর্শে মৈত্রীর আহ্বানে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে কল্যাণপ্রদ নৈতিক ধর্ম্ম সমগ্র এসিয়া এবং সুদূর মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই ঐতিহ্য স্মরণে আজ স্বাধীন ভারত বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রের প্রতীক ধর্ম্মবিজয়ী বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাষ্ট্রচক্রকে জাতীয় পতাকায় কেন্দ্রস্থলে স্থান দিয়াছে।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের পুণ্যতিথি অতীতের ও বর্ত্তমানেও কল্যাণদায়ী মহিমায় মহিমান্বিত, তাই বর্ষে বর্ষে আষাঢ় পূর্ণিমার পবিত্রদিনে অর্থাৎ গুরু পূর্ণিমায় ভারতীয় হিন্দুগণ ভক্তিচিত্তে আপন আপন ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুকে পূজা-নৈবেদ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

স্বীকারোক্তি

শ্রীপদ্মা কুণ্ডু

তোমাকে দেখার পর,
প্রতিজ্ঞা করেছিলুম,
আর কারো প্রেমে পড়বো না।
কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আজ
মুলতুবী রাখতে হল,
এক সৈনিকের প্রেমে পড়েছি।
রাগ করো না।
প্রেমে পড়েছি আমি
শুধু একজনেরই।
তোমার বা সৈনিকের নয়।
সে হল, আমার কল্পনায় গড়া
এক অনন্ত পুরুষ।
সেই আমার অপূর্ব সৃষ্টির,
অণুপরমাণু
প্রত্যক্ষ করি যার মধ্যে
তারই প্রেমে পড়ি আমি।
—আমার প্রেমবারি
শুধু তোমাকে আর সৈনিককেই
সিক্ত করবে না—
কেননা
আমি কল্পনা-বিলাসী।

সাথীহারা

শ্রীমতী মঞ্জু চক্রবর্ত্তী

সে একা—
তাকে দেখি প্রত্যহ শূন্য স্মৃতিস্তম্ভে
দীপ জেলে দিতে নিরালা রাতে।
কুয়াশায় যখন সমস্ত অস্পষ্ট
সে আসে ; শিশিরের সাথে
দুটি মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়ে আঁখি হ'তে
তারই উদ্দেশে—
যে সাথী চলে গেছে নিরুদ্দেশে।
শীতের পর এলো বসন্ত
কিন্তু যে সাথী চলে গেছে অনেক দূরে
সে তো আর ফিরবে না
ক্লান্ত হাতে শুধু প্রদীপ জেলে দেবে
সে একা একা।
আরও অজস্র মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়বে
সিক্ত হবে স্মৃতির বেদীতল,
আর মিট-মিট ক'রে জলবে সারারাত
সমব্যথী তারা-দল।

মৃত-সঞ্জীবন

গীতা ঘোষ

পাখীদের কথা বলা শেষ হয় না কো,
কী যে কথা বলে তারা গান গেয়ে গেয়ে।
কী যে ছবি আঁকে তারা মেঘের কিনারে,
বুঝি নাই তুমি আমি, চিনি নাই তারে।

পাখীদের ডানা আর পালকের ঘ্রাণে,
তাদের উজ্জ্বল চোখে ছোট ছোট প্রাণে।
কখন যে ধরা দেয় আকাশের নীল,
হেসে ওঠে রোদ্দুর আলো দুঃসাহসী ডাকে
খোঁজ তার রাখে নাই মানুষের মন।

তবু যদি কোন দিন শালিকের ডাকে,
চিলের কান্নায় সুরে বলাকার উদাত্ত আহ্বানে।
কাজের ফাঁসিতে বাঁধা আমাদের মন
সাড়া দেয়, ভেঙ্গে ফেলে জানালার সংকীর্ণ বন্ধন।
উড়ে চলে যেতে চায় ওপারের রোদে ঝলোমল
কচি কচি ঘাসে ঢাকা সবুজ প্রান্তরে—
যেতে দিও। ঘাসের পাতায় নাচা
ফড়িংয়ের ডানায় ডানায় মনটা বিছিয়ে
একবার নেচে নিও। রোদের পরাগ মেখে
চেতনার নরম পালকে, হয়ে যেও বাবুই চড়াই।
সূর্য্যের সোনালী তাপ পান করে, স্বাদ নিও জীবনের।
তারপর, দুহাতে ছড়িয়ে দিও শ্রান্ত ক্লান্ত জনে
প্রাণের উচ্ছল মন্ত্র,—মৃত-সঞ্জীবন।

কেরাণী

কুমারী শিখারাণী সিংহ রায়

পৃথিবী বৃদ্ধ স্থবির।
বারো ঘণ্টার দিনে
চারশো আশি মিনিট ঢাকা জীবন কফিনে
মোহধ্ রানো আত্মগ-ব্যঙ্গ অমিত তৃপ্তির।

কীটস্, সংজ্যন, রবিঠাকুর বায়রণ
মৃত আমার জীবিকার কাছে
কাঠের 'ক্রাচে' ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
সফেন সমুদ্রে ভাসমান আমার জীবন।

জীবাশ্ম হয়েছে জীবনের সকল প্রকিট।
তাই চেয়ে আছি জীবনের অন্তহীন অস্তিমে
বয়ঙ্ক বাগানে
গোলাপের ঘ্রাণে
যে হেমন্ত তমসাচ্ছন্ন হিমে।
আমি আজ মগ্ন ;
লেজার, ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্সশীট।

মেঘ

[Shelly'র Cloud কবিতার ভাব অবলম্বনে]

কুমারী অপর্ণা সরকার

নীল আকাশের মাঝ দিয়ে যাও কে গো তুমি ওগো মেয়ে ?
নব সমাজ সেজে চলেছ কোথায় ! যাও পরিচয় দিয়ে।
জন্ম দিয়েছে জল মাটি মোরে, মানুষ করেনি কেহ,
আকাশই আমারে নিল কোলে তুলে দিল বুকভরা স্নেহ।
এখন চলেছি বারিদল লয়ে বাঁচাইতে ফুলদলে
দিতে মোর ছায়া রৌদ্রকিরণে যারা পড়িয়াছে ঢলে।
আমার সৃষ্ট মুক্তার ন্যায় শিশির কণার জল
বাঁচাবে তাদের, জাগাবে সবায় যত আছে কুঁড়িদল।
অসাধ্য মোর হেন কাজ নেই এই পৃথিবীর পরে
সবুজ মাঠকে করে দিই সাদা শুভ্র শিলার স্তরে।
বৃষ্টিরূপেতে পুনরায় আসি মুছে দিই সব ক্লেদ
অনুর্বরারে করি উর্বর মেটে কৃষকের খেদ।
আমি নেই ভেবে বায়ু ও কিরণ রচে মোর স্মৃতিস্তম্ভ
আমি হেসে উঠি মুছে দিই স্মৃতি করে দিই হতভম্ব।
অন্নায়ুধারী আমি নই কভু আমি যে চির অমর
ক্ষণে ক্ষণে শুধু রূপ বদলাই আমি এক যাদুকর।

সালিমা সুলতান বেগম

শিবানী ঘোষ

জানালা হতে দেখা যায় সুলেমান পর্বতমালা। কিশোরী সালিমা সুলতান স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিক পানে। ঐ বোবা পর্বতগুলো কি যে বলতে চায়। অনেক গোপন রহস্য, অনেক না-বলা কথা জমে আছে ওদের বুকে। কিন্তু কি সেই কথা ? জানবার জন্যে আকুলিবিকুলি করে ওঠে সালিমার অন্তর।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সালিমা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কিন্তু বোবা পাহাড়ের ভাষা কিছু না বুঝতে পেরে সে ব্যথা-ভরা হৃদয়ে ছুটে যায় তার মাসীমা গুলবদনের কাছে।

গুলবদন বেগম তখন লিখে চলেছেন 'হুমায়ুন-নামা'। পিতা বাবর বাদশা নিজের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন নিজেই কিন্তু ভ্রাতা হুমায়ুন বাদশার সে সুযোগ সুবিধে কোনদিনই এল না। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে করতেই কেটে গেল তাঁর জীবন। তাই তাঁরই অসমাপ্ত কাজ শেষ করে চলেছেন গুলবদন বেগম।

সালিমা সুলতান কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই গুলবদন বেগম বলেন—কি রে সালিমা ?

সালিমা বলে—আচ্ছা মাসীমা তুমি কি এত লিখছো ?

গুলবদন বেগম বলেন—লিখছি তোর মামা হুমায়ুন বাদশার কাহিনী।

সালিমা বলে—তাঁর কাহিনী লিখে লাভ কি মাসীমা ?

গুলবদন হেসে বলেন—ওরে বোকা মেয়ে এখন তাঁর কাহিনী লিখে না রাখলে এদেশের ভাবীকালের অধিবাসীরা যখন তাদের রাজা বাদশাদের কাহিনী সংগ্রহ করতে বসবে তখন তারা হুমায়ুন বাদশার সঠিক সংবাদ কি করে পাবে বল ?

সালিমা বলে—তোমার এই ইতিহাস লেখা কাজ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না মাসীমা।

গুলবদন বেগম মৃদু হেসে বলেন—কি করবো বল তোর মর্জি! তো আমি কবি নই যে বসে বসে কবিতা লিখবো।

সালিমা সুলতান বলে—ইস্ তুমি বুঝি কবিতা লিখতে পার না। আচ্ছা মাসীমা—

—উঁ ?

—ঐ যে বোবা সুলেমান পর্বতমালা তাদের ভাষা তুমি বুঝতে পারো ? মানে ওদের সুখ দুঃখ হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি—

তার কথার মাঝখানেই গুলবদন বেগম খিলখিল করে হেসে উঠে বলেন—নারে তোর মাসীমা অত বড় কবি নয় যে বোবা পাহাড়ের ভাষা শুনতে পাবে।

সালিমা সুলতান বলে—কিন্তু মাসীমা আগে তুমিও তো কবিতা লিখতে। দাও না আমার খাতায় একটা লিখে।

—কই দেখি তোর খাতা।

সালিমা এগিয়ে দিল তার কাব্য-লিপিকা। গুলবদন বেগম তার কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে কবিতাগুলো দেখে একটা সাদা পাতায় লিখে দিলেন—

হর পরি কি আঙ বা আসাক খুদ ইয়ার নিস্ত।
তু ইয়াকিন্ মিদন্ কি হেচ অজ উমর বার-খুর-দার-নিস্ত।

কবিতার লাইন দুটি বার বার পড়ে সালিমা বলে—কিন্তু এর কি মানে মাসীমা ?

গুলবদন বেগম পুনরায় 'হুমায়ুন-নামা' লিখতে লিখতে জবাব দেন—মানে ভালবাসা নেই, জীবনের কোন দাম নেই।

কথাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সালিমা সুলতান। এ জগতে ভালবাসা নেই। এ জীবনের কোন দাম নেই ? মনটা তার মুহূর্তেই হয়ে ওঠে ব্যথাতুর।

এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হামিদাবানু বেগম।

গুলবদন তাঁকে দেখে লেখা থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন—কিছু বলবে বৌদি ?

হামিদাবানু বলেন—আমাদের হিন্দুস্থানে যাওয়ার দিন কালকেই স্থির হয়েছে। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

গুলবদন বিস্মিত হয়ে বলেন—কালকেই যাওয়া হবে ?

—হ্যাঁ আর তো বিলম্ব করা ঠিক নয়। পুত্র আকবর এক বৎসর হল হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছে। সে চৌদ্দ বৎসরের অর্বাচীন বালক। অবশ্য বৈরাম খাঁ আছেন তার অভিভাবক হিসেবে। তবু আমরা না গেলে পুত্র আকবর মেহে মনে বল পাবে কেমন করে ?

গুলবদন বেগম বলেন—আমার সব কিছুই প্রস্তুত আছে বৌদি, তুমি অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলো।

তখন সালিমা সুলতান নিচু গলায় বলে—মাসীমা, আমি তোমাদের সাথে যাব।

—কোথায় রে ?

—হিন্দুস্থানে।

গুলবদন বেগম বলেন—কিন্তু তোর মা বাবা এতে মত দেবেন কেন ?

সালিমা বলে—তাঁদের অনুমতি আমি ঠিক আদায় করে নিতে পারবো।

গুলবদন বেগম তখন হামিদাবানুকে ডেকে বলেন—শুনছো বৌদি, সালিমা আমাদের সাথে হিন্দুস্থানে যেতে চায়।

হামিদাবানু বলেন—তা ওর মা বাবা যদি মত দেয় তা হলে যেতে আপত্তি কি ?

সালিমা সুলতান তখুনি ছুটে যায় তার পিতা মির্জা নুরুদ্দিন মহম্মদ এবং তার মাতা গুলরুখ বেগমের কাছে।

সালিমা সুলতান সরাসরি পিতার কাছে গিয়ে জানায় তার আবেদন। মির্জা নুরুদ্দিন মেয়ের কথায় তখুনি দিলেন তাঁর অনুমতি। কিন্তু আপত্তি জানালেন গুলরুখ বেগম। তিনি বললেন উপস্থিত হিন্দুস্থানের অবস্থা মোটেই শান্তিপূর্ণ নয় কাজেই সেখানে এখন যাওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

মির্জা নুরুদ্দিন বললেন—না এখন হিন্দুস্থানের অবস্থা আর খারাপ বলা চলে না। যতদিন পাঠান-রাজ শের খাঁ জীবিত ছিলেন ততদিন এ কথা বলা চলতো।

গুলরুখ বলেন—এখনও তো শের খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আদিল শাহ রয়েছেন। তাঁর সেনাপতি হিমুই বা কম কিসের ?

—ও একটা হিমুতে কিছু হবে না। বলেই মির্জা নুরুদ্দিন ডাক দিলেন—সালিমা।

—বাবা ?

—তুমি তোমার মাসীমাদের সাথে হিন্দুস্থানে অনায়াসেই যেতে যেতে পার। আমি সম্পূর্ণ মত দিলাম।

সালিমা সুলতান প্রস্তুত হয়ে নিলেন হিন্দুস্থানে যাওয়ার জন্য। পরদিনই সুরু হল যাত্রা।

হিন্দুস্থানে জলন্ধর সহরে যেদিন হামিদাবানু, গুলবদন বেগম এবং সালিমা সুলতান এসে পৌঁছলেন সেদিন বৈরাম খাঁ নিজে এসে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে।

সেখানে তাঁদের দেখা হল চোদ্দ বৎসরের ভারত-সম্রাট আকবরের সাথে। তাকে করলেন আশীর্বাদ। গুলবদন বেগমও অত্যন্ত খুশী হলেন আকবরকে দেখে। তিনিও ভ্রাতুষ্পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের নিকট।

এদিকে মুস্কিল হল সালিমা সুলতানের। যদিও আকবর বয়সে তার চেয়ে চার বৎসরের ছোট তবু সালিমার মনে হল ঐ কিশোরের কাছে যদি নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া যায় তবে যেন ধন্য হয় জীবনটা।

কিন্তু সালিমার এ বাসনা তখনকার মত রয়ে গেল অপ্রকাশিত। ওদিকে প্রৌঢ় বৈরাম খাঁ মুগ্ধ হয়ে গেলেন সালিমা সুলতানের রূপ দেখে। তিনি প্রার্থনা করে করলেন ঐ কিশোরীর পাণি।

এতে মত দেন সকলেই। কারণ বৈরাম খাঁর সাথে সালিমার বিবাহ হওয়া মানে আলি-সুকর বেগ এবং তৈমুর বংশের রক্ত একত্রিত হওয়া। এ তো অত্যন্ত সুসংবাদ। এতে অমত করবার আছে কি ?

এ সংবাদ শীঘ্রই প্রচারিত হয়ে গেল সর্বত্র। বৈরাম খাঁর সাথে সালিমার বিবাহ-বার্তা শুনে সকলেই কাবুল, সমরখন্দ থেকে ছুটে এলেন জলন্ধরে।

ওদিকে সালিমা সুলতানের অন্তর তখন তোলপাড় হচ্ছে। ঐ বিগত যৌবন বৈরাম খাঁ হবে তার স্বামী ? ইস্ এ কথা ভাবতেও যেন তার কেমন লাগে। কিশোর আকবর যেখানে রয়েছে তার হৃদয় জুড়ে সেখানে আসবে বৃদ্ধ বৈরাম খাঁ ? সালিমার মনে পড়ে গুলবদন মাসীমার কবিতার পদ দুটি 'ভালবাসা নেই, জীবনের কোন দাম নেই।'

এর পর একদিন খুব ঘটা করে বিবাহ হল বৈরাম খাঁ এবং সালিমা সুলতানের।

বৈরাম খাঁ অত্যন্ত প্রীত হলেন সালিমাকে পেয়ে। কিন্তু তাঁর সে সুখ স্থায়ী হল না খুব বেশীদিন। আকবর একদিন তাঁকে পদচ্যুত করে নিজেই গ্রহণ করলেন দেশের শাসন ভার। তখন বৈরাম খাঁ স্থির করলেন তিনি যাত্রা করবেন মক্কায়।

সাথী হিসেবে বৈরাম খাঁ সালিমাকে বললেন মক্কায় যাবার জন্যে। কিন্তু সালিমা রাজী হয় না। অন্তরের এক ভিন্ন আকর্ষণ তাকে ধরে রাখে সেখানেই।

অগত্যা মক্কার পথে একাকী যাত্রা করেন বৈরাম খাঁ। কিন্তু মক্কায় যাওয়া তাঁর ভাগ্যে আর হয়ে উঠলো না। পথিমধ্যে তিনি নিহত হলেন এক আফগানের ছুরিকাঘাতে।

এ সংবাদ এসে পৌঁছলো সালিমা সুলতানের কাছে। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ঘটনাতে সে বিচলিত হয় না বিন্দুমাত্র। বরং মনটা তার দুলে ওঠে এক অজানা আনন্দে।

বৈরাম খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে গুলবদন বেগম ছুটে আসেন সালিমাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু তাকে দেখে অবাক হয়ে যান গুলবদন বেগম। একি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ কি এতটুকু স্পর্শ করেনি মেয়েটির হৃদয় ?

গুলবদন বেগম তার কাছে এগিয়ে এসে বলেন—তোর কি হয়েছে বলতো সালিমা ?

সালিমা সুলতান বলে—কি আবার হবে মাসীমা !

গুলবদন বেগম বলেন—উঁহু আমার কাছে কিছু গোপন করিসনে সালিমা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যাকে বিচলিত করতে পারেনি তার মন নিশ্চয়ই অন্য কেউ অধিকার করে আছে। বল সালিমা কে সে ?

তাঁর কথায় ফুঁপিয়ে ওঠে সালিমা সুলতান। সে গুলবদনের বুকে মাথা রেখে বলে—মাসীমা আমি পাপিনী আমাকে তোমরা শাস্তি দাও।

গুলবদন বেগম সালিমার মাথায় হাত রেখে বলেন—না না সালিমা তুই পাপিনী নস। বৈরাম খাঁর সাথে তোর বিবাহ জোর করে দেওয়া হয়েছিল। এ কথা আমি তখনই বুঝেছিলাম। কাজেই তাকে যদি তুই না ভালবেসে থাকিস্ তবে সে-পাপ তোর নয়, যারা জোর করে তোর বিয়ে দিয়েছিল এ অপরাধ তাদের। তা বল সালিমা কে তোর মন হরণ করে রেখেছে ? যদি সম্ভব হয় আমি তার সাথে তোর পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

সালিমা গুলবদন বেগমের বুকে মাথা রেখে বলে—মাসীমা যে

আমার মন হরণ করে রেখেছে সে বর্ত্তমান ভারতের সম্রাট আকবর।

তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গুলবদন বলেন—বলিস কি সালিমা, সেই কিশোর বালক করেছে তোর মন চুরি ?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠে সালিমা বলে—হ্যাঁ মাসীমা !

এমন সময় সম্রাট আকবর এসে দাঁড়ান সেই কক্ষের দ্বারে। বৈরাম খাঁর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত দু:খিত হয়েছেন এবং তাঁর বিধবা পত্নী সালিমার যাতে কোনরূপ অযত্ন না হয় তার ব্যবস্থা করতে তিনি ছুটে এসেছেন নিজেই।

এসেই গুলবদনকে দেখে আকবর বলেন—পিসিমা, সালিমার জন্তে আমি এলাম এখানে। তাঁর জন্তে আমি মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করেছি এবং তিনি এই প্রাসাদে যাতে রাজরাণীর মত থাকতে পান তার সব সুব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গুলবদন বেগম বলেন—মাসোহারা বা রাজরাণীর মত থাকতে পাওয়া কোনটাই চায় না সালিমা। সে চায় তার চেয়েও মূল্যবান জিনিষ এবং একমাত্র তুমিই তাকে সে জিনিষ দিতে পার।

আকবর বলেন—কি সেই জিনিষ পিসিমা ? যদি আমার সাধ্যাতীত না হয় তা হ'লে আমি তাঁকে তাও দেবো। কারণ বৈরাম খাঁ ছিলেন আমার অভিভাবক এবং বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁরই জন্তে আজ আমি হ'তে পেরেছি ভারতের সম্রাট। কাজেই তাঁর স্ত্রীর কথা অবহেলা আমি কখনই করবো না।

গুলবদন বলেন—আকবর, সালিমা চায় তোমাকে।

—আমাকে ? বিস্মিত হ'য়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আকবর। তারপর সালিমার মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—বেশ তাই হবে। এতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আকবরের কথা শুনে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় সালিমার অন্তরে। সে গুলবদনের বুকে মাথা গুঁজে লুকোবার চেষ্টা করে নিজের লজ্জা।

গুলবদন তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় বোলাতে থাকেন তাঁর সুকোমল হাত।

চেনা

মাধবী ভট্টাচার্য

সূর্যকে সাত ঘোড়ার রথেতে যেদিন ছুটিয়েছিলে,
চাঁদ-মা বুড়িকে চরকা কাটায় যেদিন জুটিয়েছিলে—
সেদিন তোমাকে সঠিক চিনেছি আমার বিধাতা বলেই,
সেদিন তোমাকে সালাম করেছি ভক্তিরসেতে গলেই।
আজকে তোমার সূর্যের রথ জ্ঞানের পংকে পড়ে
দাঁড়িয়ে গিয়েছে থাণুর মতো হাজার বছর ধরে।
চাঁদ-মা বুড়ির চরকা হারালো খানা-খোন্দল মাঝে,
আধখানা চাঁদ প্রদীপ জ্বালালো পূর্ব-অস্ত সাঁঝে।
আজ তুমি আর নয়কো আমার অবিনশ্বর ধাতা
সারা দুনিয়ায় দেখেছি তোমার ফাঁকির আসন পাতা।

বর্ত্তমান পারিবারিক জীবনে উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

নন্দিতা দাশগুপ্তা

আদিম মানব যখন অরণ্যচারী ছিলো তখন উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতাই তাকে একক জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিলো। স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক মানুষ তখন নিজের বাঁচবার প্রয়োজনকেই বড় করে দেখে দরকার মতো শিশুসন্তানদেরও আহার্য্য তালিকাভুক্ত করে ফেলতো। সভ্যতার পথে কয়েক পা হাঁটার পরে তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটলো। কোনও রকমে বাঁচতে চাওয়া, একা বাঁচতে চাওয়ার প্রচেষ্টার মাঝে সে আর নতুনত্ব খুঁজে পেলো না। ক্রমশ: সঙ্গিনীর জন্ত যুদ্ধ করল, প্রেমে, ভালোবাসায়, স্বার্থত্যাগের নূতন মন্ত্রে সাথীকে অভিষিক্ত করে নিলো। দুটি একটি সন্তানের আগমনের সাথে সাথে পারিবারিক চেতনা আরও বিস্তৃত হয়ে দায়িত্ববোধকে সংজ্ঞাকে আরও ব্যাপক করল।

মানব সভ্যতার ইতিহাস উল্টালে দেখা যাবে যে আদিম মানব-মানবীর যুগ্ম ও সম্মিলিত পথ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে, ততই তার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে ক্ষুদ্র হতে বৃহতে ; দ্বায় হতে বহুতে ; ব্যক্তি হতে সমষ্টির পরিণতিতে।

বর্ত্তমান জীবনের যে রূপ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি তাতে এই প্রশ্নই মনে জাগে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সীমা কত দূর আর কখনই বা সমষ্টির জন্ত ব্যক্তির বিলোপ প্রয়োজন সে সামঞ্জস্যবোধ আমাদের আদৌ আছে কিনা। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা কি, তা বোঝবার পূর্ব্বেই এখনকার ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মতবিরোধ ঘটলেই স্ত্রী সতর্ক হয়ে ওঠেন পাছে কোনও সুযোগে স্বামী-দেবতাটি তাঁর স্বাধীনতার হস্তারক হয়ে পড়েন। আবার ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিতে গেলে তারাও ব্যক্তিস্বাধীনতার খড়্গ উঁচিয়ে অভিভাবকদের তাড়া করছে। বহু আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে সংসার করার পাট তো উঠেই গেছে ; কারণ যেখানে বহু মতের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান যুগের মানুষ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, পাছে সাংসারিক-জীবনের আদান-প্রদানের মাঝে কোথাও আত্মবিলুপ্তি ঘটে, আত্মস্বাতন্ত্র্যের হানি হয়, আত্মস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

সাংসারিক-জীবনের পরিক্রমা আজ কেবল আত্মপরিক্রমাতেই পর্য্যবসিত হয়ে গেছে। নিয়ত আত্মরক্ষা করতে করতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কত অনুদার হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়েও সচেতনতার অভাব ঘটেছে। সমষ্টির মঙ্গলেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। একটি লাঠিতে যুদ্ধ জয় হয় না, একখানি ইটের সাহায্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা ব্যর্থতাতেই পর্য্যবসিত হবে।

বিরুদ্ধবাদীরা এই কথাই হয়তো বলবেন যে, পৃথিবীতে এসে সুখ ও স্বাধীনতার আস্বাদ যদি প্রাণভরে না ভোগ করা যায়, চিরজীবন যদি পরের জন্ত সব আকাঙ্খাকে অপূর্ণ রেখে এই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে হয় তবে পৃথিবীতে আসার সার্থকতা কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি জন্ম হতেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন এবং কারও জন্ত বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত নন তিনিও কি বাসনা পরিপূর্ণতার চরম পরিতৃপ্তি হৃদয়ে নিয়ে এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে পেরেছেন ?

বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব-কলহপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখলে মনে হয়, পূর্ব্বে যে সহজ

আত্মবিলোপের সাধনায় প্রত্যেক মানুষ অভ্যস্ত ছিলো, তার বিনিময়ে সে ক্ষুদ্রত্বকে অতিক্রম করে বৃহত্তের সংগঠন করতে পেরেছিলো কিন্তু এখনকার সংসারযাত্রা দোকানদারীর ক্ষুদ্রতার রূপ নিয়েছে। এখন প্রথমেই মনে হয় লেনদেনের মাঝে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না—যদি বিনিময় লাভসূচক হয় তবেই আমরা কিছু বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত, নচেৎ নয়।

স্বার্থবুদ্ধি মানুষের মনে চিরকালই ছিলো এবং থাকবে। সিংহাসনের লোভে আরংজেব ভ্রাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যা করেছিলেন। সে আজকের কথা নয় কিন্তু সেই হত্যার আয়োজনের মাঝেও তাঁর বিবেক হয়তো সজাগ ছিল, তাই দিল্লীর বাদশাহ হয়েও তাঁকে ছলের আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। কিন্তু এখনকার দিনে জাগ্রত বিবেকের তাড়নাও লুপ্ত হতে বসেছে। অথর্ব পিতামাতা বা অক্ষম ভ্রাতাকে প্রতিপালনের দায় সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায়, ছলের প্রয়োজন হয় না।

অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। যে উপার্জনে একজন লোকেরই ভদ্রভাবে চলে না, সেখানে পরগ্রহ প্রতিপালনের প্রশ্নই ওঠে না। চল্লিশ বৎসর আগেও ভদ্রভাবে বাঁচার যে সংজ্ঞা ছিলো ইতিমধ্যে তার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মধ্যবিত্তের জীবনের আদর্শ ছিলো মোটামুটি পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সংস্কৃতিপূর্ণ জীবন যাপন করা। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বহু অপরিহার্য্য বিলাস সামগ্রী। ছেলে বা মেয়েকে শিক্ষিত করলেই চলবে না, তাদের উপযুক্ত পোষাক, সাইকেল ও ঘড়িও সরবরাহ করতে হবে। বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস সাড়ম্বরে প্রতিপালন করলেও তাঁর মতন গ্যাসপোষ্টের নীচে বসে লেখাপড়া করা তাদের আদর্শ নয়। কাজেই দুঃস্থ ভাইপো বা ভায়ের স্থান হওয়া চিন্তারও অতীত।

যদি কোনও সংসারে পরগ্রহ বা বৃদ্ধ পিতামাতা বেশ সম্মানের সঙ্গে স্থান পেয়ে থাকেন, তবে লোকে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে থাকেন—এরকম ছেলে-বৌ আজকাল দেখা যায় না। যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁরাও মনে মনে নিজেদের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেন। কারণ দাবীর দিন ফুরিয়েছে এটাই সর্বতোভাবে মেনে নেওয়ার দিন এসেছে।

ত্যাগের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার ফলেই বিশ্বপ্রেমের বুলি কানে অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হয়। যে হৃদয় অথর্ব মা-বাপের দুঃখে কাঁদে না, সে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের ধারণা জন্মাবার চেষ্টা বৃথা। তাই আজ বিশ্বজনীন ভালোবাসার ফাঁকা বুলি প্রাদেশিকতার গর্জনের তলায় ডুবে যাচ্ছে। প্রদেশের মাঝেও বিভিন্ন ভেদাভেদ গড়ে তুলে তাকে আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে। তার পরেও আছে দলীয় ও উপদলীয় স্বার্থবুদ্ধি। এই ভাবে যতই দেশটাকে টুকরো টুকরো করে লোককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চল্‌ছে, ততই মানুষ স্বাতন্ত্র্যের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠে আরও স্বাতন্ত্র্য দাবী করে বস্‌ছে। ফলে বর্ত্তমান জীবনে মানুষ একেবারে অসহায় ও একা। স্বার্থের গুহায় নির্ব্বাসিত মানুষ তাই নিজের হৃদয় বেদনার অংশীদার পায়না—তার অশ্রু মুছিয়ে দিতে স্থবির মা-বাপের কাঁপা কাঁপা হাত এগিয়ে আস্‌বে না। অবশ্য হৃদয়কে আমরা একেবারেই প্রাধান্য দিই না, কাজেই আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরদের মধ্যে অশ্রুর অস্তিত্ব আদপে থাকবে কিনা, সেও এক বিতর্কের বিষয়। ব্যথা-বেদনার অর্থহীন প্রলাপ তাদের অনুভূতিহীন হৃদয়ে কোনও আলোড়ন জাগাবে না বলেই মনে হয়।

বাস্তহারা

শ্রীপদ্মা গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশের গায়ে,
এক দোয়াত কালি যেন গিয়েছে ছড়িয়ে।
কিন্তু তার বুক থেকে নামলো যে জল,
ঠাণ্ডা টলটল্‌।
সর্ব্বাঙ্গ অসাড় করা সেই অনুভূতি,
ঊর্দ্ধ মুখে করে পান
তাপদগ্ধ তৃষিত প্রকৃতি,
সহসা সঘন ঘোর গুরু গর্জ্জনে
ধেয়ে আসে ক্ষিপ্ত ঝড়
মদমত্ত উদ্ধত চরণে।
সে যেন কি প্রলয়ের ইঙ্গিত করাল,
ভ্রুকুটি ভয়াল।
তার তাণ্ডব নৃত্য পদক্ষেপে,
পৃথ্বী ওঠে কেঁপে,
ছিন্নভিন্ন পৃথিবী বেদনায় মূক,
কোন অপরাধে তার
নেচে ওঠে সর্পিল শাস্তির চাবুক।
আকুলি বিকুলি গাছগুলো
মার মমতার,
অসহায় ভঙ্গীতে মাটিতে লুটোয়।
ফুলের ফানুসগুলো,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কোথা ভেসে গেল।
শুধু ক্ষ্যাপা ঝড় মত্ত আক্রোশে
দাপাদাপি করে ফেরে বিস্তীর্ণ আকাশে,
ক্লান্ত হয়ে অবশেষে,
বিক্ষুব্ধ চিত্ত তার শান্ত হয়ে আসে।
আবার হাসে সূর্য্য, হাসে দিন
আলো ঝলমল্‌।
জেগে ওঠে ব্যস্ত জীবনের
কর্ম্মকোলাহল।
শুধু, ঝড়ে ভাঙা বাসা পানে চেয়ে,
ভাঙা ডালে বসে থাকে,
ছোট একটা পাখী,
নির্ব্বাক, একাকী।

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা-১০

কান্নার পর

শরিতোষ মুখোপাধ্যায়

বসন্তে যেমন ঝুরঝুর ঝুরঝুর পাতা ঝরা, শীতের রাত্রে যেমন টুপটাপ টুপটাপ শিশিরের কান্না, আজ তেমনি শরতরাণীর হাসি-ফুরিয়ে-যাওয়া পাহাড়-কোলা চোখের অবিরল অশ্রু।

শরতরাণীর আঙিনায় শাদা শিউলির নৈবেদ্য সাজিয়ে কুমকুম-রাঙা সূর্যকে কেউ হেসে অভিনন্দন জানালো না, সোনার রবি ঢেউ-জাগা ধানের মাথায় সোনার আস্তর বিছিয়ে দিল না : আজ শুধু কান্না, দুঃখের দিনের কান্না; কোলের মাণিককে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার দিনে মায়ের বুকের কান্না।

ন'দিন দশ রাত শুধু কান্না। সমুদ্রের ওপার থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ারা বুকের দীর্ঘনিশ্বাস। এই কান্না এই বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসের বুঝি শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।

পৃথিবীর শিশুমহলে কথা-হাসি-নাচ-গানের হাট ভেঙে গেছে, জীবনের স্রোত কান্নার স্রোতের ঘূর্ণিতে একটি বিন্দুতে ঘুরপাক খাচ্ছে; নেই আনন্দ, নেই আশা, নেই আলো। আর—

আর বুঝি ভেস্তে যায় কুসুমকুমারের বিয়ের উৎসব!

রাণীমা বিরলে বসে কাঁদেন, বুকের ওপর দিয়ে দু কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা জরির-পাড় ওড়নাটা ভিজে সপসপ করে, সোনার পালংকে চোখের জল সোনালী চুমকি ফোটায়। আদুরে দুলাল কুসুমকুমারের বিয়ের দিন বুঝি আকাশের কান্নায় লগ্ন হারিয়ে ফেলে!

প্রাসাদের চিলেকোঠায় উঠে রাজা করুণ চোখে আকাশ দেখেন, দুঃখ-ভরা অশ্রুমতী পৃথিবীকে দেখে তাঁর বুকের পাঁজরের ভাঁজ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস ঝোড়ো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় দিগন্তে। ব্যথা আর ব্যথা—বুঝি এই নিয়েই পৃথিবী।

তবে? কুসুমকুমারের বিয়ের লগ্ন বয়ে যাবে?

রাণীমা বলেন অশ্রুচাপা কণ্ঠে : কী উপায় মহারাজ? এই প্রলয়ের দিনে কে-ই বা আসতে পারবে আমার বাছাকে আশীর্বাদ করতে?

বুঝি আমি সব। দিগনগরের রাজার মেয়ে—ত্রিভুবনের অপ্সরা; আমি কথা দিয়েছি রাজাকে। বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে যদি বিয়ে না হয়—

না হয়—উঃ, ভাবতে পারছি না রাণী।

রাণীমা কঁকিয়ে ওঠেন।

আগামী বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে যদি কুসুমকুমারের সংগে দিগনগরের রাজকুমারী ফুলকুমারীর বিয়ে না হয় তো—

কী?

ত্রিভুবনের অপ্সরা বাবার অপরাধের বলি হবে, ফুলকুমারী অনূঢ়া থেকে যাবে পৃথিবীতে। আর তার বিয়ে হবে না কোন দিন।

দিগনগরের রাজাও ছাড়বার পাত্র নন। পরাক্রান্ত শক্তি তাঁর। দেবরাজকে দু আঙুলের তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারেন নাকি। এই দুর্দান্ত তেজ আর শক্তিই তো এই বিপদের গোড়া।

ইন্দ্র দূত পাঠিয়েছিলেন।

দিগনগরের রাজা তাঁকে আপ্যায়িত করে রাজসভায় বসিয়েছিলেন। দেশের জ্ঞানী-গুণীরা তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, আর রাজা জিজ্ঞেস করেছিলেন : কোন আর্জি আছে?

: আজ্ঞে মহারাজ! দূত মাথা নোয়ালেন। এই নিন দেবরাজের চিঠি। সভাসদরা উৎসুক হয়ে উঠলেন। দেবরাজ চিঠি দিয়েছেন মর্ত্যের একজন রাজার কাছে? মুহূর্তে পৃথিবীতে রাষ্ট্র হয়ে গেল : চিঠি—চিঠি, দেবরাজের চিঠি।

কী চিঠি?

'মহামহিম মহারাজ, আপনার শক্তির কথা আমি অবগত আছি। আপনার কন্যা ফুলকুমারীর খ্যাতির কথাও অমরলোককে মুগ্ধ করেছে। আমি তাঁর পাণিপ্রার্থী। আপনার কন্যাকে মর্ত্যের নরকধাম হতে অমরাবতীর তীর্থে উত্তীর্ণ করে দিতে আশা করি আপনার দ্বিধা বা সংকোচ হবে না। শুভেচ্ছা রইল। ইতি—'

সভা হল নিস্তব্ধ। এমনতর চিঠি পৃথিবীতে কোন রাজা কবে পেয়েছে? কেউ কেউ পরামর্শ দিল; মহারাজ এ তো আপনার গৌরবের কথা।

: হুঁ—মহারাজ বিস্মিত হয়ে মাথা নত করে থাকেন।

: জানি। সুরলোক সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভাল নয়, ভক্তি আপনার শ্রদ্ধাও নেই। কিন্তু কি জানেন মহারাজ! আদিকাল থেকে মহাকবিরা সুরলোকেরই বন্দনা গেয়ে এসেছেন।

তবুও উত্তর নেই। হুঁ-হ্যাঁ করে রাজা সভার কাজ মুলতবী রেখে রাজপুরীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দিগনগরের পাশের রাজ্য সিংহপুরীর রাজা কুসুমকুমারের বাবা ত্রিদিব সিংহকে তলব করা হল। দুই রাজ্যের দুই বন্ধু। এঁর বিপদে উনি এসে পাশে দাঁড়ান, ওঁর সম্পদে এঁর ভাগ আছে। ছোটবেলাকার বন্ধুত্ব যে এতটা গভীর, এতটা স্থায়ী হতে পারে, খাস সুরলোকেও বুঝি তার নজির মেলে না।

ত্রিদিব সিংহ দেবরাজের অনুগৃহীত। কিন্তু তাই বলে ত্রিদিব সিংহের মুখের সত্য কথাটি কখনো বিকৃত হতে পারেনি।

তিনি বললেন : দেখ হিমালয়নির্ঝর, তোমার মত আমিও সুরলোকের সংগে সম্পর্ক পাতাবার বিরোধী। আমাদের পৃথিবীর মেয়ে আমাদের পৃথিবীতেই থাকবে। পৃথিবীটা তো কম সুন্দর নয়।

বেশ, তাই হবে। হোক না দেবরাজ ইন্দ্র, তবু প্রতি মানুষেরই

আছে মনের ইচ্ছা, আত্মবল, আত্মচেতনা। ইন্দ্রের দূতকে পাঠিয়ে দেওয়া হল, 'না' করে চিঠি লেখা হল দেবরাজের ঠিকানায়।

দেবরাজ লিখলেন : ভেবে দেখুন আরেক বার।

দিগনগরের রাজা লিখলেন : ত্রিভুবনের মালিক, আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমি খুব ভাল করেই ভেবেছি। আমার মেয়েকে আমি এই সুন্দর পৃথিবীর এই ভরা সৌন্দর্য থেকে দূরে সরাতে পারি না। সেজন্ত আমি দুঃখিত।

ইন্দ্র রেগে গেলেন। যুদ্ধের হুমকী দিয়ে কড়া চিঠি লিখছেন : পৃথিবীর সীমান্তে আমি দেবসেনা পাঠিয়েছি। দেখব আপনার দৌড় কতটা!

তবুও ঘাবড়ালেন না হিমালয়নির্ঝর। ত্রিদিব সিংহ ঠাণ্ডা করলেন ইন্দ্রকে। আপনি একজনের ওপর ক্রোধ করে পৃথিবীকে রসাতলে দেবেন না। এটা আর যাই হোক, জ্ঞানী লোকের কাজ নয়।

দেবরাজ বললেন : কিন্তু দেখুন, ও রাজার এতটা স্পর্ধা হল কেমন করে যে ত্রিভুবনের রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে?

: সে ঠিকই দেবরাজ! এটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আপনি ও ভাবে ওকে শাস্তি দিতে যাবেন না। আপনার মত সর্বশক্তিশালী পৃথিবীর রাজার সংগে কী যুদ্ধ করবে শুনি? তার চেয়ে অন্ত উপায় ভাবুন তো?

ইন্দ্র ভাবলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি ভাবলেন। এই মেয়েটার একটা পথ করতেই হবে। অনেক দিন পর তিনি ত্রিদিব সিংহের কাছে চিঠি পাঠালেন : ধন্তবাদ! আপনার মত একজন বুদ্ধিমান বন্ধু পেয়েছি বলেই আজ এত বড় একটা সমস্তার সমাধান সম্ভব হল। আপনার ছেলে কুসুমকুমারের সংগে ফুলকুমারীর বিয়ের প্রস্তাব করুন। আমার বিরুদ্ধে মহাদেব দাঁড়িয়ে হিমালয়-নির্ঝরকে অভয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেবকে আমি রাজি করিয়েছি, তিনি আমায় [illegible] মত দিয়েছেন। আমার কথা হল, আসছে বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে ওদের বিয়ে না হলে ফুলকুমারী অনূঢ়া থেকে যাবে। আমার অবশ্য ফুলকুমারীর জন্ত অন্ত ব্যবস্থা করার মতলব ছিল। মহাদেবের জন্তই অনেকটা সহজ হতে হয়েছে আমাকে। ফুলকুমারীর পরিচয় আমার খুবই জানা আছে। তাই কুসুমকুমারের কাছেই ওকে দেওয়া উচিত। ত্রিদিব সিংহ জীবনে এর চেয়ে বুঝি আর আশ্চর্য হন নি। তাঁর বন্ধুর বিপদ ঘুচল, অথচ ত্রিভুবনের অপ্সরাও তাঁর ঘরে এল। কী সৌভাগ্য!

এই সৌভাগ্যের দিন ফুরিয়ে যায় বুঝি। কোথায় রাত্রি কোথায় দিন—শরতে বর্ষা নেমেছে। সব একাকার। এখন উপায়?

ত্রিদিব সিংহ উপায় খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা হলেন।

রাণী ভয়ে কেঁপে ওঠেন, মাথার খুলি ভেদ করে চিন্তার ধোঁয়াগুলো উড়ে যায় আকাশে-বাতাসে। অনেক ভেবে বললেন : কেন এমন বৃষ্টি নামল, এই শরৎকালের এ বৃষ্টি বন্ধ করা যায় না?

রাজা কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন : রাণি, পৃথিবীর একজন রাজা একটা সাধারণ মানুষ বৈ ত নয়! নিশ্চয়ই কোন দেবতার কোন মতলব আছে।

হাহাকার ওঠে বাড়ীতে। আকাশছোঁয়া রাজপ্রাসাদের ইট-কাঠ-কড়ি-বরগা—পোষা পাখিগুলো—মানুষ, সব বুঝি কেঁদে ওঠে। নিরুপায়, নিরুপায়! রাতবিরেতে ভয়ার্ত পেঁচার কান্না যেন!

বৌদ্ধপূর্ণিমার আগের দিন। দিগনগরের রাজা জলে ভিজে নৌকোয় করে এ রাজবাড়ির দরজায় এসে টোকা দিলেন কাক-ভোরে। বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল। দুই বন্ধু মিলেছে। দুই রাজা এক হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে।

হিমালয়নির্ঝর বললেন : কেন অত ভাবছ বন্ধু! আমরা দুই রাজা। এ বৃষ্টি তো দেবতাদের চক্রান্ত। আমরা লড়বো বুঝব।

: চলো।

: আমাদের যতটুকু শক্তি আছে ততটুকুই আমরা ঢালব এর পেছনে। রাজপ্রাসাদে এবং কাছাকাছি সরকারদের কাছে যত ইস্পাত আছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যোগাড় করতে বলো। তোমার ছাদে সামিয়ানা খাটাও। দু'হাজার লোকের উৎসব ওখানেই হতে পারবে।

অসম্ভব কাজ! রাজারা বললেন : তবু সম্ভব করতে হবে। একটা মেয়ের জীবন ওভাবে নষ্ট করা চলবে না। দেবতাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতেই হবে।

কুসুমকুমারকে পাঠানো হল দিগনগরে। আর ফুলকুমারীকে এনে রাখা হল সিংহপুরীতে। দিগনগরের রাজপ্রাসাদ ছোট, বর্ষা ওখানেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ও বাড়ীতে এতবড় একটা উৎসব হতে পারে না।

এদিকে সামিয়ানা খাটানো আর আর সব যোগাড়যন্ত্র সব চলতে লাগল প্রকৃতির খামখেয়ালীপনাকে উপহাস করে।

রাণীমা তবুও ভাবেন। এতবড় অসম্ভব কাজ কী করে এরা সম্ভব করবে? তাছাড়া যদি দেবতাদেরই কোন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে তো এত সব পরিশ্রমের মানে কি? তাঁর চোখের পাতা শুকোয় না। চোখ দুটো আকাশের মেঘের মতই ফোলা।

চিলেকোঠার জানলায় দাঁড়িয়ে তিনি বুকের নিঃশ্বাস পাঠাতে থাকেন দেবতার দরবারে—তোমরা প্রসন্ন হও ঠাকুর!

কেউ প্রসন্ন হয় না। বর্ষা যে-কে সেই পড়তে লাগল। ঝমঝম রিমঝিম রিমঝিমঝিম বর্ষা।

রাজপ্রাসাদের পাঁচিলটা পেরিয়ে এ সময় তাঁর নজর পৌঁছে গেল। একটা মেয়ে—অপরূপ সুন্দরী—কুসুমকুমারের মতই বয়সে হবে—একবার এদিকে আসছে, ঘুরে আবার ওদিকে যাচ্ছে। আজকের আকাশটার মতই ওর চোখে কান্না। মেয়েটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তাকায় চিলে কোঠার দিকে।

রাণীমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। ঐ দুঃখিনী মেয়েটার জন্ত এই মুহূর্তে বুঝি তাঁর পাগল হয়ে যাওয়ার কথা।

রাণীমা হুকুম করলেন দাসীকে : যাও, এক্ষুণি নিয়ে এস ওকে আমার কাছে। আমি জানতে চাই ও কেন কাঁদছে।

দাসী ছুটে গেল হুকুম তামিল করতে। কিন্তু মেয়েকে কি আনা যায়? কী তার শক্তি অতটুকু শরীরে! এতবড় জোয়ান যে দাসীটা সেও মুখ হাঁড়ি করে ফিরে এল।

: কী রে, কী বললাম তোকে ?

: ও আসবে না মায়জী। বলে কি, আমি যাবো না ওই বাড়িতে।

: সে কী। ধরে নিয়ে আয়।

: ধরলে কি হবে মায়জী। আমি পারছি না।

রাণীমা ওর হাত ধরে আকুতি করে বললেন : ছাখ, এই বৃষ্টিতে ভিজছে। কী যেন দুঃখ ওর, ওকে নিয়ে আয় আমার কাছে। ওকে কোলে করে নিয়ে আয়। যা!

দাসী জোর করে কাঁধে চাপিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এল চিলে কোঠায়।

রাণীমা ওর চোখের জল মুছিয়ে কোলে তুলে নিলেন। মেঘমালা ওর নাম। ও ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। কান্নায় ওর বিরতি নেই। বলে, আমাকে যেতে দাও। এ বাড়ীতে আমায় আনলে কেন ? রাণীমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে বলেন : কেন কাঁদছ মা ?

তা ও বলবে না।

অনেক সাধ্যসাধনার পর বললে : আমার ভাইটার কাল বিয়ে কি না তাই কাঁদছি।

রাণী থমকে ওঠেন। হেসে বলেন : ভালই ত! বিয়েতে কত আনন্দ। তা তোমার চোখের জল যে পড়ছেই ?

হ্যাঁ, ওর চোখের জল পড়তে থাকবে। ও থামাবে না ওর কান্না। ওর ভাইটার বিয়ে যদি না মুলতবী রাখা হয় তো ওর কান্নাও থামবে না।

: তুমি বৃষ্টিতে ভিজছিলে যে, পাগলী মেয়ে ?

: এমনি। কান্নার মতই শোনাল কথাটা।

: তোমাদের বাড়ী কোথায় ? একলাটি বেরিয়েছ এই জলে ?

মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবু গোপন করল না ও কিছু। বলল : আমার বাবা মেঘবৃষ্টির রাজা। আমি চলে এসেছি, বাবাই আমাকে আসতে বলেছে।

রাণীমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। মেঘ-বৃষ্টির রাজা ? বরুণের কন্যা মেঘমালা এমনি করে কাঁদছে পথে পথে ? কেন ?

কেন আবার কি ?

মেঘমালার দুঃখ তো কম নয়। তার ভাইটা বারো বছর আগে মাঘীপূর্ণিমার দিনে পৃথিবীর ঘরে এসেছে। সেই ভাইটার কাল বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে বিয়ে। হোক না বৌদ্ধপূর্ণিমা। তবু তার ভাইয়ের জীবনটা একটা রাক্ষসী গিলতে চলেছে। সে হবে ওর বউ। বউ তো নয়। ত্রিভুবন জানে খুব ভাল মেয়ে—কিন্তু ও ভালোর আড়ালে ও রাক্ষসী। মায়াবিনী। হায় হায়!

মেঘমালার কান্না আরো ছেয়ে এল দু'চোখ। আর রাণীমা ? রাণীমার বুকটা ধকধক করে উঠতে পড়তে লাগল। তাঁর ছেলেটা মাঘীপূর্ণিমার দিনে তাঁর ঘরে এসেছিল বারো বছর আগে, কাল বৌদ্ধপূর্ণিমার দিনে তার বিয়ে। ফুলকুমারী ত্রিভুবনের অপ্সরা, তার সুন্দর দেহের আড়ালে—

ভয়ে দু'চোখের পাতা উল্টে তিনি চীৎকার করে উঠলেন। [illegible] গেল রাজপ্রাসাদে। রাজা ছুটে এলেন।

ভুয়ো রাণী। তুমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়ো না। সব ঠাকুরের চক্রান্ত। মেয়েটা একটা মায়াবিনী। ফুলকুমারীর জীবনটা নষ্ট করতে চায়।

এই বলে কারুর কোন কথার অপেক্ষা না করেই দারীকে দিয়ে মেয়েটাকে বিদায় করে দিলেন ফটকের বাইরে। মেয়েটা সেই যে কাঁদছিল, তার চোখের ধারা আর থামে নি। যাবার সময় যন্ত্রণায় ছটফট করে মেঘমালা বলে গেল : আমি কাঁদব। আমার ভাইটা মরতে চলেছে, আমি কাঁদব।

রাণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার-বদ্যি ডাকিয়ে তাকে সুস্থ করা হল।

বৌদ্ধপূর্ণিমা।

তেমনি ঝমঝম ঝিমঝিম রিমঝিমঝিম বৃষ্টি। তেমনি দীর্ঘশ্বাস আকাশে বাতাসে।

কুসুমকুমার আর ফুলকুমারীর বিয়ে হয়ে গেল। অতিথি-সজ্জন খুব বেশী এল না। নেহাৎ গরীবানা মতে দুই রাজার দুই বুকের নিধির বিয়ের উৎসব শেষ হল। শেষ হল কান্নাকাটির পালা : বিয়েটা তো শেষ হয়ে গেছে। আর—

আর কি ?

আকাশের কান্না থেমেছে। শরৎরাণীর মুখে হাসি ফুটেছে। উপায় না দেখে যেমন চিরদুঃখী ভাবে—আর কাঁদি কেন, অনেকটা যেন সেই রকম। নিরুপায় হয়ে যেন হাসল শরৎরাণী।

তারপর দিন যায়, মাস যায়। ত্রিভুবনের অপ্সরা হাসি গানে মুখর হয়ে ওঠে। তবু—

মেঘমালার কথাগুলি যেন কানের পর্দায় বেজে ওঠে সব সময়। মন কিছুতেই মানে না। আর দু বছর বাদে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাজা ত্রিদিব সিংহ এতটা অপদস্থ জীবনে আর হননি। কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। একটা ঘটনা ঘটছে আর তিনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন, ভাবেন কি ঘটল, কেন ঘটল ? কিছুই কিনারা পান না।

কুসুমকুমারের আর একটি ফুটফুটে বোন হয়েছিল। ত্রিদিব সিংহের ঘরে এই একমাত্র মেয়ে। কি সুন্দর, কি টুকটুকে তার মুখখানা! দেখতে ত্রিভুবনের অপ্সরাকে হার মানায়। বড় হলে এ মেয়ে—

হায় ঠাকুর, বড় তুমি হতে দিলে কই ?

রাণীমা বলেন, তুমি ঠাকুরকে দোষ দিও না রাজা! সেই মেয়েটি, সেই মেঘমালার কথা ভুলতে পারিনি আমি। তোমার ঘরেই আছে সব খাওয়ার রাক্ষসী। সে তোমার ছেলের বউ।

রাজা ভয়ে পিছে সরে যান। সেদিন আর সভায় যাওয়ার শক্তি থাকে না তাঁর। জীবনীশক্তি কে যেন নিংড়ে চুষে খায়। কি ব্যাপার ?

জন্মের ছ'দিনের দিন দুপুরবেলা ঘরে ঢুকে রাণী দেখেন কচি মেয়েটার মাথার খুলিটা পড়ে আছে মেঝেয়। রাজা ডাকেন ঠাকুরকে। রাণী বলেন, সর্বোনাশা তুমি ঘরে পুষেছ। জান না।

এমনি করে সব যায়। জীবনের ধুকধুকানীটুকু থেমে আসে। [illegible] সেই যে সিং দরোজায় পাহারা দেবে। দাস-দাসী,

চাকর-বাকরদের মাথার খুলি, কোমরের হাড়, পায়ের গোড়ালি ছড়িয়ে থাকে ঘরে ঘরে। সারা রাজবাড়ীটা একটা ভূতের মত থমথমে হয়ে মুখ গোমড়া করে চোখে বিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, ভিজে বেয়ালের মত।

ত্রিদিব সিংহের অত বড় দেহটা ভাবনায় এতটুকু হয়ে গেছে চুপসে। কুসুমকুমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি জমেছে। অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে সে পায়নি ফুলকুমারীকে, কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। ভয়ে এতটুকু হয়ে যায় কুসুমকুমার। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে মায়ের বুকে লেগে।

বাড়ীতে চারটি প্রাণী বেঁচে। রাজা, রাণী, কুসুমকুমার আর ত্রিভুবনের অপ্সরা ফুলকুমারী। আর আছে একটা থমথমে বিভীষিকা।

হিমালয়নির্ঝরকে ডাকিয়ে পরামর্শ ভিক্ষা করেন ত্রিদিব সিংহ। দিগনগরের রাজা বলেন: বন্ধু, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। না জানি শত-সহস্র বছর ধরে তোমার বংশে কি পাপ জমা আছে।

ত্রিদিব সিংহ আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

এমনি সময় একদিন দুপুর রাত্রে তিনি কান্না শুনতে পেলেন। শিকারীর বন্দুকের মুখে ভয়ার্ত হরিণীর মত কান্না। তিনি কান পাতলেন। আঁা, এ যে কুসুমকুমারের ঘর থেকে আসছে এ কান্নার শব্দ। তিনি উঠে বসলেন। শুনতে পেলেন মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। রাণীকে ডাকলেন। চটপট উঠে পড়লেন। তলোয়ারের খাপটা কোমরে গুঁজে হাতে বন্দুকটা নিয়ে তিনি নিজেই গেলেন ছুটে, আর রাণী ভয়ে দুঃখে রাগে কেঁদে ফেললেন। রাজা ছুটে গিয়ে ভাঙলেন কুসুমকুমারের ঘরের দরজা। খুলে দেখলেন—

রাণীমা অস্থির হয়ে শুয়ে পড়লেন। মাথায় ঝিম ধরে এল। আর রাজা মুহূর্ত থামলেন। কুসুমকুমারের বুকে চেপে বসেছে রাক্ষসীটা। কুসুমকুমার পা দিয়ে ওকে লাথি মারছে। উঠতে চেষ্টা করছে, পারছে না। রাজা সব বুঝলেন এবার। আর এক মুহূর্ত দেরী করলে ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তিনি ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফুলকুমারীর ওপর। গুলী ছুঁড়লেন তার মাথায়। তারপর খাপ থেকে ঝকঝকে তলোয়ার খুলে ওর মুণ্ডটা আলাদা করে ফেললেন সুন্দর দেহ থেকে।

কুসুমকুমার উঠে এসে ভয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রাজা সান্ত্বনা দিয়ে নিজের ঘরে পালংকে শুইয়ে দিলেন। বিয়ের পর ছেলেটার জীবন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মারাই তো যেত।

রাণীমা হাঁপিয়ে উঠে বললেন: কতবার বলেছি, মেঘমালার কথা তো শোননি। আমার ছেলেটাকে তুমি এমন বিপদে ফেলেছ, এমনি করে ও শেষ হতে চলেছিল।

রাজা মাথা নীচু করে থাকেন।

সেই রাত্রেই আবার ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা। আলো নিবিয়ে বাড়িটা যখন ঘুমের যোগাড় করছিল, ঠিক সেই সময় রাজার ঘরটা হঠাৎ আলোয় আলো হয়ে উঠল। ঝক ঝক করে দু'চোখ ধাঁধিয়ে এক পুরুষ এসে দাঁড়ালেন রাজার পাশে। রাজা উঠে বসলেন। প্রথমে অবাক হলেও ভয় পেলেও শেষকালে বললেন: বসুন। দেবরাজ ইন্দ্র।

: আজ থেকে আপনি সুখী।

: কিন্তু দেবরাজ, এতটা খেলা খেললেন আপনি?

দেবরাজ হেসে বললেন: দরকার ছিল বন্ধু। ফুলকুমারীকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম কেন জানেন না? আমি বলেছিলুম, ফুলকুমারীকে আমি চিনি। পৃথিবীতে ও অশান্তি বাড়াক তা আমি চাইনি; সুরলোকে নিয়ে নির্জনাটে ওকে কায়দা করব, এই ছিল মতলব। আজ মহাদেবকে সব আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। মেঘপুরীর রাজা বরুণের কন্যা মেঘমালাকে তো আমিই পাঠিয়েছিলাম, তুমি মানলে না কিছু।

রাজা বললেন: দেবরাজ, আপনি সেদিনই কেন আমাকে শাস্তি দিলেন না?

: না, না। আপনার বিশ্বাস ছিল যে ফুলকুমারীর ওপর। ভাল করে বোঝাবার জন্যই—

রাণীমা কেঁদে উঠে বললেন: দেবরাজ, আমার বুকের বাছাটা খেয়েছে ওই রাক্ষসী। কত ধ্যানধারণার পর ও এসেছিল আমার ঘরে।—বলে রাণী লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে লাগলেন।

ইন্দ্র হেসে উঠলেন। বললেন: সব আমার জানা আছে। সে কে? সেই যে মেয়েটাকে ওই ত্রিভুবনের অপ্সরা চুষে খেয়েছে? সে ওই—

: কে, কে মহারাজ?—রাজা আর রাণী আকুতি জানিয়ে ওঁর পায়ে পড়লেন। সেই অপূর্ব রূপসী মেয়েটা—যে নাকি বড় হলে অপ্সরাকে হার মানাত—তার কথাটি জানবার জন্য।

দেবরাজ শান্ত সুন্দর হেসে বললেন: সে ওই মেঘমালা।

: মেঘমালা? চমকে উঠলেন রাজা-রাণী। দুজনে দুজনের চোখের মণি দেখেন। এ দেখেন ওঁরটা, ও দেখেন এঁরটা। কারুর মুখে কথা নেই।

: ভয় নেই, তাকে ফিরে পাবেন। আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম এই জন্যে যে, ঐ ঘটনায় হয়ত চেতনা আসতে পারে আপনাদের। ফুলকুমারীর এ-হেন ব্যবস্থা করার জন্যই আমি তা করেছিলাম। আজই তা সফল হল।

ওঁরা দেবরাজের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

তিনি আবার বললেন: ওরা দুজন পৃথিবীর পাপের বোঝা দূর করবে।

রাজা-রাণীর চোখের কোলে জল টলমলিয়ে উঠল। ঠোঁটে হাসি।

আর?

আর তার পরের বছর মাঘীপূর্ণিমার দিনে রাজার ঘরে আরেকটি মেয়ে এল। কুসুমকুমারের বোন। তার নাম রাখা হল মেঘমালা।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি

বিজনকুমার ঘোষ

শিলাইদহের কথা মনে হলেই আমার সর্বাগ্রে কুঠিবাড়ির কথা মনে হয়। যদিও শিলাইদহ বলতে শুধু মাত্র কুঠিবাড়িকেই বোঝায় না, বোঝায় আরো অনেক কিছু, যেমন বিরাহিমপুর পরগণার সদর, এর কাছারি বাড়ি, পথঘাট, ডাকঘর, ধানক্ষেতের ওপর নীল আকাশ, পদ্মানদীর বাতাস—তবু, শিলাইদহ বলতে চোখের ওপর

কুঠিবাড়ির ছবিই ভাসতে থাকে। কেননা, এক কুঠিবাড়ির ভিতরেই সমস্ত শিলাইদহ পোরা রয়েছে। তাই শিলাইদহ দেখতে আর কোথাও যেতে হয় না। এ ছাড়া আরো অনেক কিছু মনে হয়। একদিন এই বাড়িতেই বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য মনীষীর হৃদয়-স্পন্দন শোনা যেত। এই তো সেদিনের কথা, দুপুরবেলায় কুঠিবাড়ির তেতলার নির্জন ঘরখানা ভরে পদশব্দ উঠত যখন তখন সেই আশ্চর্য মনীষীর। জ্যোৎস্না রাতে দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দার দোলান ইজিচেয়ারে এসে বসতেন। ঝড় উঠলে চলে যেতেন উৎরের ছাদে। পদ্মা তখন এক লক্ষীছাড়া মেয়ের রূপ ধরেছে। পায়চারী করতেন তিনি গুন গুন সুরে। মাতালের মত ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার চুল-দাড়ির জঙ্গল তোলপাড় করত। খুব ভোরে, পাখিদেরও তখন ঘুম ভাঙেনি, তিনি বেরিয়ে পড়তেন কুঠিবাড়ির সম্মুখে শিশুবনের ভিতর। সবুজ ধানক্ষেত ফুঁড়ে আগুনের মত সূর্য উঠত। অথবা এক সময় সব কিছু ছেড়ে মাসের পর মাস পদ্মার ঢেউএ ঢেউএ ভেসে বেড়াতেন। আর কিছু মনে থাকত না তখন। শুধু বাতাসে ঝাউ পাতার শব্দের মত একটানা অচিন রাগিণী গুমরে উঠত তাঁর মনে।

শিলাইদহ কিন্তু খুবই ছোট্ট জায়গা। লম্বায় আধ মাইলের কিছু বেশী হবে বোধ হয়। কুঠিবাড়ি থেকে মহর্ষি চেরীটেবল ডিসপেনসারী হয়ে কাছারি ও ডাকঘর পর্যন্ত রাস্তাটাই হল শিলাইদহ। শিলাইদহ বলে কোন বিশেষ গ্রাম নেই। রাস্তার এপাশে ওপাশে আরো অনেক গ্রাম আছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রচুর লোকসংখ্যা। কিন্তু শিলাইদহ বলতে বোঝায় কুঠিবাড়ি, ডাকঘর, কাছারি, আর কয়েকটি মাত্র সরকারী কোয়ার্টার।

বর্তমান কুঠিবাড়ি কিন্তু খুব বেশী পুরোনো নয়। আগে এখানে কুঠিয়াল সাহেবদের আস্তানা ছিল। কুঠিবাড়ির চার পাশে তখন প্রচুর নীলের চাষ হত। কুঠিয়াল শেলী সাহেব এখানেই তার কুঠি বানিয়েছিলেন। পরে তাঁর নামানুসারেই জায়গাটার নাম হয় শিলাইদহ। আমাদের ছেলেবেলায় শেলী সাহেবের কবর দেখতে যেতুম পদ্মার পারে। এখন তার চিহ্নও নেই। বহু দিন আগেই অত্যাচারী সাহেবের কবর পদ্মার অতল গহ্বরে পৌঁছে গেছে।

শিলাইদহ জমিদারী রাণী ভবানীর হাত থেকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে আসে বাংলা ১২০৭ সালে। সাহেবদের কুঠি তখন সামরিক ভাবে সদর কাছাড়িতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমান বাড়িটি তৈরী হয় আরো অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের আমলে। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে কুঠিবাড়ি অবস্থিত। চারপাশে পাখি-ডাকা আম-জামের গহীন বন। উত্তরে ধীর প্রবাহিনী পদ্মা। রঙীন পালের নৌকো নিয়ে গোয়ালন্দের পথে ছুটে চলেছে। আর বাকী তিন দিকেই, যত দূর চোখ যায় সীমাহীন সবুজ সমুদ্র আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কুঠিবাড়ির গেটের দু' পাশে বিশাল শিশু গাছ আর বাবলা গাছের সারি। আগে এখানে সামান্য একটু জঙ্গল ছিল। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ একদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই জঙ্গলে বাঘ শিকারে এসেছিলেন। কুঠিবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে দুটো বড় বড় পুকুর আছে। বাঁধানো ঘাটের পাশে আকাশছোঁয়া বকুল গাছ। আন্তরজাতিক সাহেবের আবার মাছ ধরার সখ ছিল। মাঝে মাঝে হুইল ফেলে বসতেন। সারা দিন মাছেরা ধর্মঘট করে থাকলেও পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিতেন। কুঠিবাড়ির পুব ও উত্তর দিক ঘিরে রয়েছে বিশাল বাগান। আম-জাম থেকে আরম্ভ করে বাংলা দেশে হেন ফলের গাছ নেই যা কুঠিবাড়িতে নেই। সেই সঙ্গে শাল-সেগুন অর্জুন-ঝাউ-এর সুন্দর সমাবেশ। সারাদিন পদ্মা থেকে উড়ে আসা বাতাস আছড়ে পড়তে শিশুবনে, ঝাউ-এর পাতায় আর কি রকম যেন কুঠিবাড়ি ঘিরে উদাস করা সুর উঠত সারারাত। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলে তিন তলার ঘরখানা তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট হত। কেন না, সারা পৃথিবী তার অসম্ভব রূপসম্ভার নিয়ে এই ঘরের জানালায় ঝুঁকে পড়ত। আকাশ-বাতাস, পদ্মানদী আর শিশুবনের মর্মর ধ্বনি তাকে নিমেষের ভিতর ভাবরাজ্যে নিয়ে যেত।

শিলাইদহে আমি শেষ বার যাই ১৩৫২ সালে। তখন পর্যন্ত কুঠিবাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। বহু দিন পর দরজা-জানালায় রং করা হয়েছে, কুঠিবাড়িতে নতুন চুণকাম পড়েছে, যে সব জায়গা ভেঙে গিয়েছিল অথবা আস্তর খসে পড়েছিল, তা সারানো হয়েছে। কিন্তু ওই বছরেই পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট এক নতুন আইন বলে পূর্ববঙ্গের সতেরোটি বড় হিন্দু জমিদারী দখল করে নেন। তার ভিতর শিলাইদহ এষ্টেট একটি। তখন জমিদারীর সঙ্গে কুঠিবাড়িটিও চলে যায় সরকারের হাতে। কিন্তু জমিদার ফিরিয়ে নেন এই যুক্তি বলে যে ওটি নিজস্ব বাসভবন মাত্র, জমিদারীর অন্তর্গত নয়। সুতরাং সরকার তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। জমিদার তখন কুঠিবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্থানীয় এমন একজন লোকের হাতে দেন যে তার ছিল কাঠের ব্যবসা, সুতরাং সে এক মাসের ভিতরেই কুঠিবাড়ির সৌন্দর্যের আকর বিশাল শিশুবন নির্মূল করে এ ব্যাপারে তার যোগ্যতা প্রমাণ করে। এখানেই সে ক্ষান্ত থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চেয়ার-টেবিল-খাট-সোফা-কৌচ ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্র নীলামে বিক্রী করে। এমন কি একবার শেষ স্বর্ণডিম্বের আশায় কুঠিবাড়ি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের সম্বিৎ কিছুটা ফিরে আসায় সে বিফলমনোরথ হয়। যাক, এর ফলে একটা উপকার হয় যে কুঠিবাড়ি তখন পাক-ভারত উপ মহাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্লামেণ্টে নবাব সিং চৌহানের প্রশ্নের উত্তরে জহরলাল বলেন, এ ব্যাপারে ভারত একক ভাবে কিছু করতে অক্ষম, পাকিস্থানের সহযোগিতা করতে পারে মাত্র। এর কিছুদিন পর ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার কুঠিবাড়ি পরিদর্শনে আসেন। পূর্বপাকিস্থানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমান বিশেষ আইন বলে কুঠিবাড়ির ভার পুনরায় সরকারের হাতে তুলে দেন এবং চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে দু'জন পুলিশ পাহারা বসান তিনি আরো ঘোষণা করেন যে কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র মিউজিয়মে পরিণত করা হবে। এর জন্যে যে সমস্ত আসবাবপত্র বিক্রী হয়ে গিয়েছিল তা পুলিশের সাহায্যে ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি নিজেও এ ব্যাপারেও ক'বার শিলাইদহে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্থানের অনেক সাধু সঙ্কল্পের মত এই ইচ্ছাটিও হাওয়ায় হারিয়ে যায়। কেননা, আচম্বিতে মিলিটারী শাসনের আবির্ভাবে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হয়; সেই থেকে একই অবস্থা চলছে। কুঠিবাড়ি যেন জনমানবহীন দ্বীপ, সভ্য জগতের বাইরে। পঁচিশে বৈশাখে দিকে দিকে এত যে

কলকণ্ঠ-আনন্দ-উচ্ছ্বাস, কুঠি-বাড়ি নিস্তব্ধ। সারা দিন সারা রাত শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার সুর, পাখিদের গুঞ্জন আর হাওয়ার মর্মর ধ্বনি। মাঝে মাঝে দরজা-জানালার বুককাটা খট-খট শব্দ।

পৃথিবীর প্রথম নাট্যকার

শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পৃথিবীর প্রথম নাটক গ্রীসের এথেন্স সহরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯০ অব্দে অভিনীত হয়। নাট্যকারের নাম এইস্কাইলাস। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৫ অব্দে নাট্যকারের জন্ম হয়। তাঁর লিখিত নব্বইখানা নাটকের মধ্যে মাত্র সাতখানি পাওয়া গেছে। কিন্তু নাটক ক'খানিতে যে অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য দেখা গেছে তা কালের গতিকে অস্বীকার করে আজও অম্লান। প্রথম অভিনীত নাটকখানির নাম হচ্ছে 'অনুগতগণ' বা (Suppliants)।

গ্রীসে তখন বাৎসরিক নাটক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এইস্কাইলাস বহু বার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তখন নাট্যকারদের নাটক লিখেই মুক্তি ছিল না, একাধারে পরিচালক, সঙ্গীত-শিক্ষক, মঞ্চসজ্জাকর প্রভৃতি হতে হত। অভিনয়ের শেষে নাট্যকারকে দর্শকদের সামনে এসে তাদের অভিবাদন করার ছিল রীতি। সে সময় জনসাধারণ সাধুবাদ দিয়ে অথবা পচা তরকারি ছুঁড়ে নিজেদের মতামত ঘোষণা করতেন। এই সময়ে নাটকে কোন দৃশ্যসজ্জা ছিল না। পেছনে একটি একরঙা পরদা টাঙানো থাকতো। কথা বলবার নিয়ম ছিল দুজনায়। কোন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তাকে চুপ করে থাকতে হোত।

এইস্কাইলাস খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫৬ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

পুরস্কার

শ্রীবিকাশ ভাদুড়ী

বিশ্বাস করো, ছোট্ট ছেলে হ'লে কি হবে, ঠিক যেন হীরের টুকরো। আপন মনে গান করে, আর খুশীর ভাবে কবিতা লেখে। হ্যাঁ, এতটুকু বাচ্চা তা কি, ও কবিতাও লিখতে পারে, আর এতো সুন্দর গান গায় সে—যে শুনলে সব্বাই অবাক হ'য়ে যায়!

সেদিন যেন কি দিন ছিল, বাবার হঠাৎ কানে গেল কে যেন খুব মিষ্টি গলায় গান গাইছে, ওঁর শুনতে না বড্ড ইচ্ছে হ'ল! তা ছাড়া, রাজারাজড়ার ব্যাপার তো, ইচ্ছে হ'লে তো আর ইচ্ছে চেপে রাখা যায় না, তাই হুকুম হ'ল তাকে ওঁর কাছে ডেকে আনার।

এসেই গানের কথা শুনে তো ওর ফর্সা টুকটুকে মুখখানা লজ্জায় একেবারে রাঙা গোধূলি হ'য়ে উঠলো। বেচারি একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো। কিন্তু বাবার হুকুম, ওকে ওঁর কাছে গান গাইতেই হবে।

কি আর করে, গান শেষ পর্য্যন্ত একটা ধরলে, 'নয়নে তোমারে পাইনে দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে, হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।' আঃ, কি সুন্দর ভাষা, আর গানের গলাটাও কি অপূর্ব, ঠিক যেন সদ্য ভেঙে আনা তাজা মৌচাক! মধু যেন টুপটুপ্ করে ওর মুখ দিয়ে ঝরছে।

বাবা ওর নিজের লেখা গান নিজের দেওয়া সুর শুনে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ওর রাঙা মুখে চুমু খেলেন অনেকগুলো। লজ্জায় ও আরো জড়সড় হ'য়ে পড়লো। বাবা দৌড়ে ঘরে গিয়ে একটা চেক এনে পাঁচশ' টাকা লিখে দিয়ে বললেন, 'আগের দিনে নবাব-বাদশারা কবিকে পুরস্কার দিতেন, কিন্তু এখন তো আর ওঁরা নেই, তাই কবির আদর কে করবে? তোমাকে আমি এই পুরস্কার দিলাম, কেমন?'

বাবার হাতের পুরস্কার নিয়ে ছোট্ট খোকার সে কি আনন্দ! বাড়ীর কাকে যে ডেকে ও এই কথা জানাবে তা ভেবেই পায় না, চাকর-বাকররাই যেন ওর আপন, তাদের ঘরে গিয়েই ও ওর পুরস্কারের কথা বলে বেড়ায়। তারাও ওকে কোলে ক'রে ধেই-ধেই নাচে। বেচারি গায়ক কবি হাঁপিয়ে ওঠে ওদের আদরেতে। চাকররাও কি কম ভালোবাসে নাকি ওকে। বিশ্বেস হয় না, না? হ্যাঁ-এঁ্যা ওকে সবাই ভালোবাসে, মায় পৃথিবীর সব্বাই। উনি যে রবি ঠাকুর!

গুবরে পোকার জন্মকথা

(একটি গারো রূপকথা)

অনিলকুমার মজুমদার

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে দেবতা উপদেবতা আর মানুষ পরস্পরে করতো নানা কাজে সাহায্য। দেবতারাও নানা কাজে পোকা-মাকড়দের কাছে সাহায্য চাইতো। একবার বামনদের দেবতা ঘর তৈরী করবার জন্ত জোনাকী পোকা আর গুবরে পোকার সাহায্য চাইলো। সে সময় জোনাকী পোকা দেখতে ছিলো সবচেয়ে কুৎসিত। তার শরীরে এমন আলোর রোশনাই ছিলো না। গুবরে পোকা কিন্তু ছিলো খুবই সুন্দর! প্রজাপতির চাইতেও বেশী সুন্দর ছিলো তার পাখা।

বামনদের দেবতার ঘর তৈরী হতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বামনদের দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে গুবরে আর জোনাকী পোকাকে বেশ করে খাইয়ে দিলেন। পেট ঠেসে খেয়ে বাড়ী ফিরবার সময় বেশী রাত হয়ে গেলো। সে রাতটা ছিলো খুবই অন্ধকার, খুবই দুর্য্যোগপূর্ণ। ঘোর আঁধারে পৃথিবীটা তলিয়ে গিয়েছিলো।

বামনদের দেবতা বিদায় দেবার সময় ওদের বললেন, যাবার সময় ওরা যেন আলো নিয়ে বাড়ী যায়। জোনাকী পোকা বাড়ীর ভিতর থেকে একটা আলো নিয়ে পথে নামলো। আর গুবরে পোকা গর্বিত ভাবে বামনদের দেবতাকে বললো—আমার বাতির দরকার হবে না প্রভু, আমার গায়ে যে আলো আছে তাতেই পথ দেখে চলতে পারবো।

দু'জনেই পথে চলছে। খানিক দূর এসে জোনাকী পোকা তার বাড়ীর দিকের রাস্তায় চললো আর গুবরে পোকা আপন পথে। কিছু দূর গিয়ে গুবরে পোকা বুঝতে পারলো তার গায়ের রোশনাই যথেষ্ট নয়···অন্ধকারে পথ চলতে তার বেশ কষ্ট হতে লাগলো। পথের পাশেই ছিলো গোবরের স্তূপ। সে গিয়ে হঠাৎ পড়লো সেই গোবরের মাঝে, ভোরবেলার আলোতে সে যখন বেরিয়ে এলো তখন তার পাখের রং সবটাই গেছে নষ্ট হয়ে। তার বাড়ীর লোকেরাও

তাকে চিনতে না পেরে বাড়ী থেকে দিলো তাড়িয়ে—চিরদিনের মতো।

সেই দিন থেকে জোনাকী পোকা অন্ধকার রাত্তিরে আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—আর গুবরে পোকা আলো দেখলে সেখানে এসে ভীড় জমায়।

মহাকবি গ্যেটের বাল্যকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

বিদ্যালয় গ্যেটের ভাল লাগে নি। বিদ্যালয়ে দুরন্ত ছেলের সংস্পর্শে এসে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গ্যেটে ছোটবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাড়ীর নির্মল পরিবেশ বিদ্যালয়ে থাকে না। স্নেহ ও ভালবাসার স্থান বিদ্যালয় নয়। দুরন্ত ছেলের বিপক্ষে আত্মরক্ষা করতে ভাল ও নিরীহ ছেলেরা পারে না। গৃহসংস্কার শেষ হলে নিজেদের বসতবাটীতে আবার তাঁরা ফিরে আসেন। গ্যেটের বাবার বাঁধাধরা কোন জীবিকা ছিল না। হাতে তাঁর প্রচুর সময় ছিল। সব সময়টা তিনি ছেলের পিছনে ব্যয় করতেন। ছেলের জন্ত নিজেই তিনি পাঠ্যতালিকা ঠিক করেছিলেন। ভাষা শিক্ষার ওপর তিনি কতখানি জোর দিয়েছিলেন তা গ্যেটের পাঠ্যতালিকা থেকে বোঝা যায়। জার্মাণ মাতৃভাষা গ্যেটেকে শিক্ষা করতে হত। তারপর ইউরোপীয় ভাষার আদিজননী গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার অনুশীলন চলত। অভিজাত মহলে তখন ফরাসী ভাষার কদর ছিল। সুতরাং অভিজাত মহলে পরিচিত হবার জন্ত ফরাসী ভাষারও তালিম গ্যেটেকে নিতে হত। প্রারম্ভিক শিক্ষার্থীরা যে-হারে পাঠ নিত তার চেয়ে গ্যেটেকে বেশী পাঠ নিতে হত। ভাষা শিক্ষার পর সুরু হত দেহচর্চা। দেহের বিকাশ যাতে মানসিক পুষ্টির সহায়তা করে সে-জন্ত দেহচর্চা করতে হত। অভিজাত সমাজে যাতে মিশতে পারেন সে-জন্ত তাঁকে নাচের তালিম নিতে হত। অসিযুদ্ধের নিয়মিত অনুশীলন চলত। তারপর সুরু হত তাঁর সঙ্গীতচর্চা। অঙ্কনবিদ্যার পাঠ স্বহস্তে তাঁর পিতা দিতেন। জ্যামিতিও তাঁকে পাঠ করতে হত সে-সময়, অঙ্কনবিদ্যার সব খুঁটিনাটি তাঁর পিতা বুঝিয়ে দিতেন, ছেলে যাতে ভাব ও ভাষাকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারে তার জন্ত তিনি বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ পুত্রকে করতে দিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে প্রথিতযশা লেখক হয়েও গ্যেটে অনুবাদ করেছেন। তাঁর পিতা শুধু শ্রুতিলিখন নিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। কোন ঘটনা, নগরের উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠান বা পুরাতন কাহিনী—যা গ্যেটে শুনেছেন বা দেখেছেন তা বর্ণনা করতে দিতেন গ্যেটেকে। কবিতা, প্রসঙ্গ, নীতি কাহিনী বা দৈনন্দিন সংলাপের বিষয়বস্তু গ্যেটেকে লিখতে দিতেন। এ-সব কিছু গ্যেটের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্রাঙ্কফার্টে কিছু সংখ্যক ইহুদী ছিল। এঁরা জার্মাণ ভাষায় কথা বললেও মাতৃভাষা ভোলে নি। পবিত্র বাইবেল হিব্রু ভাষায় লিখিত। কবি পিতাকে জানালেন, তিনি হিব্রু ভাষা শিক্ষা করবেন। জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট তিনি হিব্রু ভাষায় তালিম নিলেন। ইংরেজী ভাষাও তিনি এ-সময়ে শিক্ষা করেন।

বহু ভাষাভাষী এক পরিবারের কাহিনী গ্যেটে তাঁর সহোদরাকে বলেছিলেন। গল্পটি এইরূপ—এক ভাই বোনকে জার্মাণ ভাষায় চিঠি লিখত। দ্বিতীয় ভাই ধর্মতত্ত্ব পাঠ করত। সুতরাং ল্যাটিন ভাষায় পরিবারবর্গের কাছে সে চিঠি লিখল। আর দু ভাই হামবার্গ ও মার্সেলিসে থাকত। তারা কেরাণী। এক ভাই লিখল ফরাসী ভাষায় চিঠি। আর ছোট ভাই লিখল আর এক নতুন মিশ্র ভাষা। সে ভাষা হচ্ছে ইহুদী-জার্মাণ ভাষা। এ-কাহিনী শুনে কবির মা ও বাবা বেশ উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।

গ্যেটের জীবনে আর একটা ঘটনার প্রভাব না বললে নয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবনে একবার প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়, অনেক ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছিল। সাগরের ঢেউ-এ নোঙর করা অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। প্রকৃতির বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে তিনি অভিভূত হন। জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ রূপ তাঁর মনে এক ছাপ রেখেছিল। তিনি ঘরে একটা বেদী নির্মাণ করেন। নানারকম জিনিষ সংগ্রহ করে বেদীর ওপর রাখতেন। আর বেদীতে একটা ডিসের ওপর দাহ্য পদার্থ রাখতেন। তারপর আতসী কাচে সূর্য্যের কিরণকে আহরণ করে আগুন জ্বালাতেন। ধূপ ও ধুনোর মত সুন্দর গন্ধ বার হত তা থেকে। এ রকম কাজ করে ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করতেন নৈবেদ্য দেখে। তিনি ভাবতেন এইভাবে ভগবানকে শান্ত করা যায়। নিয়মিতভাবে তিনি চার্চে যেতেন। তবে ধর্মীয় প্রভাব তখনও তাঁর জীবনে পড়েনি। ধর্মকে ভাবতেন: শুষ্ক নীতি। ঈশ্বর করুণাময় ও পিতার মত স্নেহময়, এ কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। ভগবানের ক্রুদ্ধ রূপ তিনি পুনরায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পরখ করেন। সেই সময় তাঁর পিতার গৃহ-পাঠাগারের বহু বই নষ্ট হয়। বাড়ীরও কিছু ক্ষতি হয়। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্মমত তাঁর কাছে নীরস বলে মনে হয়েছিল। অনেকে বলেন, বাইবেলের সুরের সঙ্গে তাঁর জীবন-সঙ্গীতের সুর মেলেনি, কারণ তিনি বলতেন, সন্ত হবার জন্ত তিনি জন্মাননি, তবে পৃথিবী যে সুন্দর ভগবানের রাজত্ব তা প্রকৃতিরহস্য দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

১৭৫১ খৃঃ গ্যেটের মাতামহ ও পিতার মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এই সময় ফরাসীরা ফ্রাঙ্কফার্ট শহর দখল করে—দুই পরিবারের মধ্যে শান্তি তাই ব্যাহত হয়। এই সময় প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। গ্যেটের মাতামহ প্রথম ফ্রান্সিসের অভিষেকের সময় কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এই প্রথম ফ্রান্সিস সাম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরসার স্বামী ছিলেন। গ্যেটের দাদু সাম্রাজ্ঞীর সমর্থক ছিলেন। গ্যেটের পিতাকে রাজকীয় সভাসদ করেন সপ্তম চার্লস। ইনি অষ্ট্রীয়ানদের হাতে নিগৃহীত হন। তা ছাড়া প্রাশিয়ান যুবরাজের চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে জঙ্গীবাদ দেখা দিল। গ্যেটে পিতার পক্ষ সমর্থন করেন। ছুটির দিনে আহার করতেন তাঁর মাতামহের গৃহে। তা ছাড়া যাতায়াতও তাঁর ছিল। রাজা ফ্রেডারিকের ধ্যান-ধারণা ও স্বাধীন মনোভাব শিশুমনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরিণত বয়সে ইটালীতে এই সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন : এই রকম মহৎ লোক যখন মৃত্যুর কোলে শান্তিলাভ করে তখন কী আমরা নীরবে থাকতে পারি ? সেই শিশুকাল থেকে জনমতের প্রতি তাঁর একটা তাচ্ছিল্য ভাব জন্মে। কারণ নাগরিকদের শৈথিল্যের জন্য সে নগর ফরাসীরা সহজেই অধিকার করে। এ-থেকে আরও বোঝা যায় যে বীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে তিনি জানতেন। এই সময় থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তবে বীরপূজার মনোভাব তিনি বাল্যকাল হতে দেখিয়েছিলেন একথা অনেক সমালোচক বলেন। তবে একথা ঠিক—ছোটবেলা থেকে তিনি ঠিক করেছিলেন তিনি মহৎ হবেন। মহৎ রাজাকে সাধারণ লোক বুঝতে পারেনি। তাই তিনি ভেবেছিলেন তিনি মহৎ হলে সাধারণ লোকও তাঁকে বুঝতে পারবে না। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল—জনগণ উচ্চ গ্রামের কিছু বুঝতে পারে না। গ্যেটেও পরিণত বয়সে বলেছিলেন এই কারণে জনতার বিরাট অংশের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে যোগসূত্র রাখতে পারেন নি। এই কারণে তাকে অনেকে এই বলে অভিহিত করেছিলেন যে ভাইমার সভার তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি; তিনি মানববিরোধী।

জামাই ও শ্বশুরের মধ্যে তিক্ততা আরও সৃষ্টি হল যখন ঠিক হল বিজয়ী ফরাসী কাহিনীর অধ্যক্ষ গ্যেটে-পরিবারের গৃহে অবস্থান করবে। ফরাসী রাজশক্তির বিরোধী গ্যেটের বাবা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে বহু অর্থ ব্যয় করে গৃহসংস্কার করেছিলেন। এই প্রতিবাদে অবশ্য ফল কিছু হয় নি। কাউণ্ট থেরনে নামক জনৈক ফরাসী সচিব এ-গৃহে বসবাস সুরু করলেন। ইনি ছিলেন সুভদ্র ও কলারসিক।

গৃহস্বামীর শান্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার প্রতি এই সমরসচিবের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি কলারসিক ছিলেন। কবিদের গৃহে বহু অয়েল পেণ্টিং ছবি ছিল। সে-ছবিগুলো জীবিত জার্মাণ শিল্পীদের আঁকা। কাউণ্ট থেরনে গৃহস্বামীর গুণগ্রাহিতা স্বীকার করবার জন্য আরও অনেক কলারসিকদের আহ্বান করতেন। কাউণ্ট থেরনে শিল্পীদের ডেকে আরও ছবি আঁকবার বরাত দিলেন সেই গৃহতেই। গ্যেটের বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গ্যেটে কিন্তু মহা উৎসাহে ছবি আঁকা দেখতে লাগলেন। আর শিল্পীদের সঙ্গে মহা উৎসাহে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। ভবিষ্যৎ জীবনে অঙ্কন-প্রতিভার স্ফূরণ আরও তাই ব্যাপক হয়েছিল। সেই সমরসচিবের কাছে রাজকীয় কাজের জন্য বহু লোক আসত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বার্তা নিয়ে। ফরাসীদের সংস্পর্শে এসে ফরাসী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ল্যাটিন ভাষা জানতেন। তাই অনায়াসে ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে মিশে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন। ফরাসী ভাষা গ্যেটের মা শিক্ষা করতেন। উদ্দেশ্য ছিল গৃহস্বামী ও অতিথির মধ্যে যাতে বোঝাপড়া হয়। কিন্তু গৃহস্বামী গ্যেটের পিতা অনমনীয় ছিলেন এ-সব ব্যাপারে। বিদেশী শাসনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই সময় নাটকের প্রতি গ্যেটের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শহরে ফরাসীরা নাটক মঞ্চস্থ করত, গ্যেটে ছিলেন জেলাশাসকের নাতি। তাই তাঁর দ্বার অবারিত ছিল।

ফরাসীরা সমীহ ভাব দেখাত জেলাশাসকের নাতিকে। গ্যেটের দাদু নিয়মিত ভাবে টিকিট দিতেন। গ্যেটেও অভিনয় দেখতেন মহা উৎসাহে। তবে তাঁর বাবা নাটক দেখা পছন্দ করতেন না। তবে পাঠাভ্যাস তাঁর ঠিক চলত। জ্যামিতি পাঠ করে তিনি কিছু উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়েছিলেন। কাঠের বাক্স দিয়ে তিনি ছোট ছোট বাড়ীর মডেল নির্মাণ করতেন। সবচেয়ে উপভোগ্য হল যখন তিনি কৃত্রিম বর্ম তৈরী করতে শিখলেন। এই বর্ম পরে সব বন্ধুবান্ধব খেলা সুরু করত। সমাপ্তি হত এক ভীষণ যুদ্ধ-মহড়ার মধ্যে। বর্ম পরে সকলে বাস্তু সমরনায়কদের মত যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখাত। গ্যেটে হতেন এক দলের পাণ্ডা। অন্য দলেও পাণ্ডা থাকত। পরস্পর প্রতিযোগিতার ফলে প্রথমে হত বচসা। বচসা রূপান্তরিত হত কলহে। তারপর তা রূপান্তরিত হত যুদ্ধ-মহড়ায়। কিল, চড়, লাথি ও ঘুঁসি সমান ভাবে চলত বিভিন্ন দলের মধ্যে। অনেক সময় দু-একজন আহত না হওয়া পর্য্যন্ত এ মহড়া চলত। এ শেষ হত শেষে শান্তির সর্তে। তারপর তিনি অবশ্য গালগল্প বলে ও বন্ধুদের খাইয়ে বন্ধুদের সন্তুষ্ট করতেন। ক্রুদ্ধ হলে আদিম মানুষের মত গ্যেটে হিংস্র হয়ে উঠতেন। অভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়। গ্রীণরুমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অবাধ মেলামেশা করে। অভিনেত্রীরা শালীনতা বজায় রাখতেন না; কারণ শিথিল অঙ্গবাস খসে পড়ত। বাইরে থেকে মঞ্চকে দেখে তাঁর ভাল লেগেছিল। মঞ্চের নেপথ্যে এই দৃশ্য দেখে অবাক হতেন। নট ও নটীরা গ্রীণরুমে পোষাক পরিবর্ত্তনকালে কারও উপস্থিতি গ্রাহ্য করত না। তাদের যে লজ্জা কম এ কথাও কবি বুঝতে পেরেছিলেন। অবশ্য মঞ্চের লোকদের কাছে এগুলো যে স্বাভাবিক তা তার মনে হয়েছিল। [ক্রমশঃ।

চড়ক-মেলায়

শ্রীসুশীলকুমার মণ্ডল

ময়নামতি পয়না পায়ে চড়কতলায় যায়
পাল্লা দিয়ে পয়সা নিয়ে পাঁপড় কিনে খায়।

ময়নামতি এদিক-ওদিক ঘুরছে চারিদিক
চানাচুর আর বাদাম ভাজা কোনটি খাবে ঠিক।
ময়নামতির যেই না সবে ফুচকি চোখে পড়ে—
ফুচকি হাসি অধরে তার আপনি খেলা করে।

আমড়া লেবু আর যে আমের আচার থরে থরে,
ময়নামতির রসনা দিয়ে ঠিক যেন জল ঝরে!
হরেক রকম হাজার জিনিস দেখে মেলায় দিনে
ময়নামতির লোভ হল তাই রাখবে ওসব কিনে।

সাহিত্যিক কৌতুকী

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(২)

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান রচনা করেন। রাজসভায় ভারতচন্দ্র উপাখ্যানটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখাইলে তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করে এক স্থানে কাৎ করে রাখলেন। তাই দেখে ভারতচন্দ্র বললেন—কাৎ করে রাখবেন না, মহারাজা, কাৎ করে রাখবেন না, সব রস ঝরে যাবে।

মহারাজা তাড়াতাড়ি পুঁথিখানি শুইয়ে রেখে হাসতে লাগলেন।

[ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১১১৯-১১৬৭ বঙ্গ) সুকবি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১১১৬—১১৮১ বঙ্গ নবদ্বীপাধিপতি বিদ্যোৎসাহী ও রসজ্ঞ]

বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামগুলিতে যখন প্রথম বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করবার নিয়ম হয়, তখন নর্মাল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। ইন্সপেক্টর ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁকেই শিক্ষকদের পরীক্ষা করে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হত। টোলের অনেক ভট্টাচার্য পরীক্ষা দিতে বিদ্যাসাগর মশাই-এর কাছে উপস্থিত হন।

একদিন এক টুলো ভট্টাচার্যের পরীক্ষা লওয়া হচ্ছে। বিদ্যাসাগর মশাই নীতিবোধের একটা জায়গা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন,—'আমাদের আজীব, আরাম ও কার্যসৌকর্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক' এইটুকুর মধ্যে আজীব 'আর' 'আরাম' শব্দের মানে কি ?

ভট্টাচার্য বললেন—জীবনম্ পর্যন্তম্ আজীবম্ আর আরামঃ স্যাৎ উপবনম্ অর্থাৎ আরাম শব্দে উপবন বোঝায়। তার উদাহরণ হচ্ছে 'হা হা রামো হতো হতঃ'।

উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর মশাই হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন অভিপ্রায় শব্দের অর্থ কি ? বাংলায় উত্তর দেবে সংস্কৃতে নয়। ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন,—এই তোমার অভিপ্রায়, আমার অভিপ্রায়, তাহার অভিপ্রায়।

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলতে হলে কিরকম করে বলা উচিত ?

পণ্ডিত বললেন—যেমন আমি স্কুলের পণ্ডিত হব, এই অভিপ্রায়ে আপনার কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছি।

তারপর আর একটা জায়গা পড়তে দেওয়া হল। তিনি পড়তে লাগলেন,—কাউণ্ট পভন্ধি নামক এক সম্ভ্রান্ত লোক, সস্ত্রীক শকটারোহণে বিয়ে না (বিয়েনা – ভিয়েনা) হইতে ক্রাকো গমন করিতেছিলেন।

পড়ার ব্যতিক্রম দেখে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন,—কি পড়লেন ? বিয়ে না হতে ক্রাকো গমন করিতেছিলেন ?

তিনি বললেন—আজ্ঞে, হ্যাঁ, তা বই কি, বিয়ে না হতে অর্থাৎ তখনও তার বিয়ে হয়নি।

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন—এর আগে যে সস্ত্রীক শব্দ আছে, বিয়ে না হলে সস্ত্রীক কি রকম করে হয় ?

পণ্ডিত অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন—সাহেবদের ওরূপ হয়।

অফিসের কাজের ছুটির পর মধুসূদন প্রায়ই পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে যেতেন। একদিন অপরাহ্ণে কিছু লিখতে লিখতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন—আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হল, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।

রাজারা ভাবলেন, এ আবার কি ? খৃষ্টানের আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কি ? জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি ?

মাইকেল হাসিমুখে বললেন—গেলাসরূপ কোষায় দু' আউন্স পেগরূপ গঙ্গাজলে আচমন কার্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করতে হবে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুর হাস্যে মধুসূদনের অপরূপ সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র মধুসূদনের পরম বন্ধু। একদিন দু'জনে বেরিয়ে যখন প্রাসাদে প্রবেশ করছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎবর্তী মধুসূদন হেসে বললেন—I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra.

মহারাজা বললেন—একদিন ভারতচন্দ্র বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রধান আসন গ্রহণ করেছিলেন, এখন আপনি সে আসন কেড়ে নিয়েছেন।

মধুসূদন তাই শুনে হাসতে হাসতে বললেন—ভারতচন্দ্রকে আপনারা তিন শ' টাকার গাঁতি দিয়েছিলেন, আমাকে কি দেবেন ?

মহারাজ তখন দুঃখের সঙ্গে বললেন—আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকতো, আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকার জমিদারী দিতুম।

কোন এক সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মহতী সভা হয়। ঐ সময়ে বহু সোনার ও রূপোর হুঁকো বার করা হয়। মাইকেলের জন্যও একটা সোনার হুঁকো এল। মাইকেল পণ্ডিতদের রহস্য করে বললেন—ঠাকুর মশায়েরা, এ দাসের হুঁকাটি মারবেন না, আমার জাত গেলে আর জাত পাব না।

পুলিশ-আদালতে কার্যকালে কোন কোন সময় মধুসূদন চোগা-চাপকান পরতেন। একবার শালের পাগড়ী ও চোগা-চাপকান পরে শালের রুমাল হাতে নিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করছেন—এমন সময় দীননাথ ধর এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই হাসতে হাসতে বললেন—Dinoo, do I look like the Maharaja of Burdwan.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 'কিছু কিছু বুঝি' নামে এক প্রহসনের অভিনয় হয়। মধুসূদন অভিনয় দেখতে আসেন। অভিনয় শেষে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার ক'রে বললেন—'মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে।' অর্থাৎ এই অভিনয় আগেকার সব অভিনয়কে মাটি করে দিল।

একদিন কাঁঠালপাড়ায় দীনবন্ধু গেছেন বঙ্কিমের বাড়ী। প্রায়ই যেতেন। বৈঠকখানায় দেখেন বঙ্কিম বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে বেশ বৈঠক বসিয়েছেন। দীনবন্ধুর আগমনে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কেবল বঙ্কিম অভ্যর্থনা করলেন না।

খাবার সময় হল তখনও বঙ্কিম তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। ব্যাপার কি। কি হল। দীনবন্ধু বঙ্কিমের পড়বার ঘরে গিয়ে এক টুকরো কাগজে একটা ছবি এঁকে তার তলায় একটা কবিতা লিখে দিলেন।

ছবি দেখে সকলেই হাসাহাসি করতে লাগলেন—কেবল বঙ্কিম বাদে। বঙ্কিম বুঝলেন এ ছবি তাঁরই।

তিনিও তখন পড়ার ঘরে ঢুকে একটা কাগজে কি লিখলেন—তারপর গঁদ দিয়ে দীনবন্ধুর অজান্তে তাঁর পিঠে সেটা সেঁটে দিলেন। তাই দেখে সকলেই হাসতে লাগলেন।

দীনবন্ধু তখন অপ্রতিভ না হয়ে বলতে লাগলেন—তোমরা কেউ আমায় বলে দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ, তাই তার পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বসেছে—তা সে দেখতে পায় না।

বঙ্কিম বললেন—দেখতে পায় না বলেই তো তাকে আমরা হস্তীমূর্খ বলি।

একবার বঙ্কিমচন্দ্র সস্ত্রীক ট্রেণে ভ্রমণ করছিলেন। একজন কোঁকড়ানো চুল ও কাল রঙের যুবক লোক ষ্টেশনে তাঁর কামরার দিকে ঘুরে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দেখছিল।

এবার যখন সেই যুবক তার কামরার দিকে এসেছে—বঙ্কিম তাঁর স্ত্রীকে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—দেখেছ, ঠিক যেন চিড়িতনের টেক্কা।

তাই শুনে যুবকটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে—আপনার কাছে তো রঙের বিবি আছে, তুরুপ করে নিন না।

তার উপস্থিত জবাবে বঙ্কিম খুসী হয়ে তাকে ডেকে কিছুক্ষণ রসালাপ করলেন।

আর একবার সস্ত্রীক ট্রেণে করে যাচ্ছেন। সেবারেও একটি যুবক ষ্টেশনে ঘুরে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দেখছিল।

বার বার ওরূপ হওয়াতে বঙ্কিম তাকে গাড়ীর ভেতর ডেকে তার কাছে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি কর?

—চাকরি করি।

—কত টাকা মাইনে পাও?

—মাত্র ত্রিশ টাকা।

—বেশ, তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখবার জন্য ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ—আমি ঘোমটা খুলে দিচ্ছি ভাল করে দেখ। আর শোন—আমি ডেপুটিগিরি করি—তাতে পাই আট'শ টাকা—নাম আমার বঙ্কিম চাটুজ্যে, বই লিখি তাতে বেশ হয়, সর্বসাকুল্যে আমার আয় হাজার দেড় দুই। সে সবই এঁর শ্রীচরণে দিয়েও এঁর মন পাই নে, আর তুমি বাপু ত্রিশ টাকার কেরাণী—একবার চেষ্টা করে দেখ—মন পাও কি না।

যুবকটি লজ্জায় মাথা হেঁট করে চলে গেল।

নানা লোকে বলত বঙ্কিমচন্দ্র দেমাকী। অক্ষয় সরকারও তাকে দেমাকী বলে টিটকারী দিতেন। তাই শুনে একদিন বঙ্কিম বললেন, এক গুলির আড্ডায় আমার বইয়ের সমালোচনা হচ্ছিল। তাদের ধারণা, বঙ্কিমটা নিশ্চয়ই গুলি খায়—তা না হলে এমন রসিকতা কি তাঁর কলম থেকে বেরোয়?

অক্ষয়চন্দ্র বুঝলেন তাঁকেই উদ্দেশ করে বলা। তাই না হেসেই বললেন—আমি গুলিখোর হই আর যাই হই—কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশের মাটি কম্পমান।

বঙ্কিম নবীন সেনকে বললেন—কথাটা ঠিক। বহরমপুরে বদলি হয়ে গেছি—সেখানে অফিসের কাজের পর বাড়ীতে এসে লেখাপড়ার সুযোগ পেতুম না। বাড়ীতে সব সময় দর্শকদের জালায় অস্থির। যে আসে সে হুঁকো নিয়ে বসে লেখার দফাটি মাটি করে দেয়। কাজেই বাড়ীর দরজায় এক নোটিশ টাঙিয়ে দিলুম কেউ আমার সাক্ষাৎ পাবে না।

তার পরদিন থেকে সমস্ত বহরমপুরে আমার দেমাকী নাম রটে গেল। কেউ আর বাড়ীতে আসত না।

[অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১২৫৩-১৩২৪ বঙ্গ) সুপ্রসিদ্ধ লেখক, সম্পাদক ও সমালোচক। নবীনচন্দ্র সেন (১২৫৩-১৩১৬ বঙ্গ) সুকবি। বহু কাব্যের রচয়িতা]

অক্ষয় সরকার সাধারণী নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাই বঙ্কিম অক্ষয়-গৃহিণীর নাম দেন 'অসাধারণী।

একদিন অক্ষয় সরকার আর হাইকোর্টের জজ দ্বারকা মিত্তির

চুঁচুড়ার গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ করতে করতে ওপারে নৈহাটির ঘাটের কাছে এসে পড়েছেন। তখন নদীর মাঝ থেকে একটা দুপ, দুপ আওয়াজ শোনা গেল। সম্ভবতঃ অন্য কোন নৌকোয় শক্ত জিনিষের ওপর লোহার ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। অনেকেই এদিক ওদিক চেয়ে ভাবছিল এই দুপ, দুপ, আওয়াজ কোত্থেকে আসে।

দ্বারকানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন—এ শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না—এপারে কাঁঠালপাড়া, নদীর ধার দিয়ে চার ডেপুটি এক সঙ্গে গট মট করে চলছে তারই আওয়াজ।

[বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাই-ই ডেপুটি ছিলেন।]

বঙ্কিমের বেয়াই দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি' উপন্যাস প্রকাশ হলে বঙ্কিমচন্দ্র উপহার পেয়ে লেখেন—

'প্রিয়তমেষু,

'শান্তি' প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম, পরলোকেও ভরসা করি দামোদর তাহাতে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি তাং ২২শে আশ্বিন।' শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার দামোদর বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের উপসংহার লেখেন—উপসংহারগুলি তেমন সুবিধের হয় নি। তাই তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'আপনি আমার উপন্যাসের উপসংহার লিখে আমাকে সংহার করেছেন।'

দ্বিজেন্দ্রলাল একবার বন্ধুবান্ধবদের বিরাট ভোজ দেন। ভোজটা হয় তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে। এই উপলক্ষে তিনি যে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিলেন তা এই—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ। এ হেন আপনি আপনার ভবনের মনোরম কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশনয়না ভামিনী সমভিব্যাহারে, আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া এই দীন অকিঞ্চিৎকর অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি শ্রীসুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"

নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে অনেকেই হাস্যকর উত্তর দিয়েছিলেন, তন্মধ্যে দুখানি পত্রের উল্লেখ করছি—

একখানি প্রসিদ্ধ শিকারী ও ব্যারিষ্টার কুমুদ চৌধুরী মশায়ের—

"ডানা কাটা পরী
গাঁজাগুলি আবকরী,
হোমা-পেথী ধন্বন্তরি
ত্রয়ে নমস্কারি।
এত কহে পায়ে ধরি
শ্রীকুমুদ চৌধুরী।"

দ্বিতীয়টি প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি, যমঃ প্রতাপ চ
নাহিক মে।
ন চ নন্দন কানন, স্বর্ণ-সুবাহন, পদ্মবিনিন্দিত
পদযুগ মে।
আছে সত্যি পদ-রজ রত্তি,—তাও পবিত্র কি জানিত নে।
চৌদ্দ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।

কিন্তু—

মেঘাচ্ছন্ন শনি অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা ঘটে মে।
কিম্বা যত্তপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে।"

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১২৭০—১৩২০ বঙ্গ) কবি ও নাট্যকার। আবগারী বিভাগের উচ্চ পদস্থ এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি ডি, এল, রায় নামে বিখ্যাত। সুরবালা দেবী—(১৮৭৩—১৯০৩)। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা। জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালক। ইনিও হোমিওপ্যাথ। কুমুদ চৌধুরী—(? —১৩৩০) শিকারী ও ব্যবহারজীবী এবং ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অন্যতম জামাতা। বীরবল প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৪৬—১৩৩২ বঙ্গ) কবি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন হ্যাটকোট পরে পাঁচকড়ি বাবুর বাড়ীতে এসে হাজির। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঘরে ঢুকেই একবার পাঁচকড়ি বাবু ও একবার ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার এখানে আসতে ভয় করে। তুমি 'বঙ্গবাসী'র এডিটর। গোঁড়াদের সর্দার।

ইন্দ্রনাথ অমনি মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু, পান্ডিদের সর্দার। কমলা সিলেটে জন্মায়, সেই কমলার চাষ বাঙলার মাটিতে করলে গোঁড়ায় পরিণত হয়। পাঁচু এদেশেরই, সুতরাং 'পাণ্ডি'—বড় জোর শ্রদ্ধা করে 'কাগজী' বলতে পার।

দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসতে হাসতে বললেন—আপনার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, কেমন—কারণ এমন উপহাস রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর নেই।

ইন্দ্রনাথও হেসে বললেন—তোমাকেও চিনেছি—তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গবাসীতে 'Reformed Hindoos, বিলেত ফের্তা ক'ভাই—কেমন—

রসিকে রসিকে পরিচয় হয়ে গেল।

[পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৭৩—১৩৩০) সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার]

একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল 'রিজেন্ট পার্কের' ভেতর দিয়ে আসছেন—এমন সময় দেখলেন এক পাদরী মহা চিৎকারে বক্তৃতা দিচ্ছেন—চারদিকে তাঁর লোক ঘিরে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য যেমন দাঁড়িয়েছেন—অমনি পাদরী গম্ভীর হয়ে বললেন—And you, the Devil is staring you in the face (শয়তান তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে)।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন "Yes, you are (হাঁ, সে তুমিই)।

মুখের মত জবাব শুনে লোকেদের মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গেল।

আমার পিতৃদেব অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবিতকালে আমাদের বাড়ীতে বহু সম্মানিত সাহিত্যিকদের সকাল-সন্ধ্যায় সমাগম

হত। নানারূপ আলোচনা হত তার মধ্যে মাঝে মাঝে রসালাপও হত। পিতৃদেবের মুখে শোনা কয়েকটি গল্প এখানে দিচ্ছি—

বাদশাহের ইচ্ছে হল বাগানবাড়ীতে বেড়াতে যাবেন। নিজের ছেলে আর বীরবল উজীরকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। সেখানে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করবার পর ভারবোধ হওয়ায় বাদশাহ আপনার অঙ্গবস্ত্র বীরবলের হাতে দিলেন। বীরবল বস্ত্রখানি নিজের কাঁধে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে বাদশাহের ছেলেও নিজের গাত্রবস্ত্র বীরবলের কাঁধে দিলেন। পরে বীরবলের দিকে নজর পড়ায় বাদশাহ তাঁর কাঁধে অনেকগুলি বস্ত্র দেখে রহস্য করে বললেন—কেঁওজী বীরবল, বড়া অচ্ছা হয়া।

বীরবল—ক্যা বাদশাহ, নমদার।

বাদশাহ—দেখতে হৈ কি তুম্‌নে এক গধেকা বোঝ লিয়া।

বীরবল—বাদশাহ নমদার, আপ জো কহতে হৈ, মৈঁ গধেকা বোঝ লিয়া, বহ সচ্চী বাত, লেকিন এক গধেকা নহী—দো গধেকা।

অনেক বড়লোকের বাড়ীতে পূজোর সময় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ধনীর গৃহে গিয়ে বার্ষিক নিয়ে আসেন। যাঁরা প্রতি বছর বার্ষিক পেতেন, তাঁদের নাম খাতায় লেখা থাকত। যদি কেউ ২।৩ বছর বার্ষিক না নিতে আসতেন, তাঁদের নাম কেটে দেওয়া হত।

এক ব্রাহ্মণের কিছু বার্ষিক ছিল। তিনি কোন কারণে দু' বছর বার্ষিক নিতে আসতে পারেন নি। তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর ব্রাহ্মণ এসে শুনলেন, তাঁর নাম কাটা গেছে। এই সর্বনেশে কথা শুনে ব্রাহ্মণ তো বাবুর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন।

বাবু দেওয়ানজীর ওপর আদেশ দিলেন, ব্রাহ্মণের নাম খাতায় লিখে নিতে। দেওয়ানজী খাতা এনে লেখার জন্ত ভট্টাচার্যির নাম জিজ্ঞাসা করলেন—

ব্রাহ্মণ বললেন—লেখ, আমার নাম গরু ভট্টাচার্য।

নাম শুনে লেখক তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন—লেখ না হে, সত্যি সত্যিই আমার নাম গরু ভট্টাচার্য।

পরে বাবু এসে স্বয়ং এ রকম নামের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—মশাই, আমি বড় বিপন্ন পড়ে দু'বছর বার্ষিকী নিতে আসতে পারি নি। এই সামান্য দোষে আমার নাম কাটা যায়। যদি ফের কোন বিপদে পড়ে না আসতে পারি, তা হলে এখন হিন্দু হয়ে কে এবার আমার নাম (গরু) কাটতে পারে।

কোন এক বিদ্যোৎসাহী রাজার কাছে অনেক বড় বড় পণ্ডিত এসে নতুন কবিতা শুনিয়ে পুরস্কার নিয়ে যেতেন।

একদিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ মত এক পণ্ডিত রাজসভায় এসে হাজির। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, নতুন কবিতা আছে।

তৎক্ষণাৎ রাজ আদেশে তাঁকে সমাদর করে আসনে বসান হল।

বিশ্রামের পর রাজা তাঁকে বললেন—এবার আপনার কবিতা পড়ুন।

ব্রাহ্মণ গম্ভীর হয়ে বললেন—

'দুগ্ধং পিবতি বিড়াল:'।

সভাপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর ?

ব্রাহ্মণ বললেন, আজ্ঞে এই পর্যন্ত।

এই শুনে সভাপণ্ডিত বললেন, কবিতার চারি চরণ থাকার নিয়ম। এতে তা কই ?

ব্রাহ্মণ—কেন মশাই, বেড়ালের কি চারি চরণ নেই ? সভাস্থ সকলে হেসে উঠলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কবি ঠাকুর, কবিতার যে একটা রস থাকে। তাতে কেমন মাধুর্য থাকে, তা আপনার কবিতার কই ?

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—সে কি মশাই, দুধের কি রস নেই, খাঁটি দুধে কি মাধুর্য কম ?

আবার হাসি

তখন রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা কবিতা মাত্রেরই একটা বিশেষ অর্থ থাকে—তা আপনার কবিতার তা কই ?

অমনি ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—ধর্মাবতার, বিশেষ অর্থ থাকা দূরের কথা, আমার কিছুই অর্থ নেই।

[অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৭-১৯৪০) বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক]

দস্যি দামাল হাওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

দস্যি দামাল হাওয়া
ঘরে ঢুকেই ক্যালেণ্ডারটা উলটো মুখো ক'রলো।
হু-হু-গলায় বলল :
'তোল সম্বরের লেনা
কৃপণের কড়ি গোণা।'

দস্যি দামাল হাওয়া
তারপরে কী ধরল ?
আমার মনের মতন করে
তোমার মুখের চারিধারে
চুলগুলো সব এলোমেলো সে করল ?

আমার গুছিয়ে রাখা সমস্ত করমূলা
[illegible] ॥

(ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প)
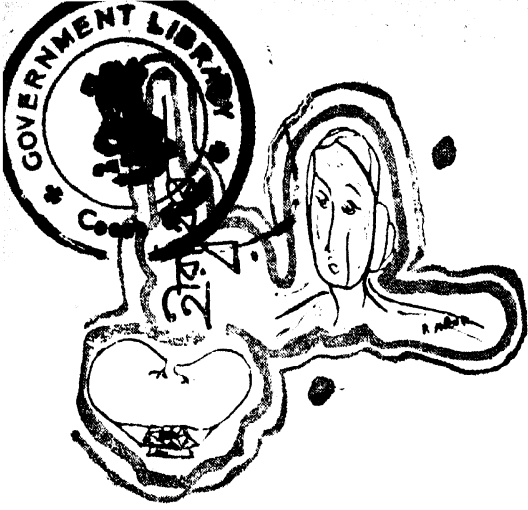
পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

অনেক দিন পরে মণিকা এসেছিল কৃষ্ণপুরের রাজবাড়ীতে বেড়াতে। রাজা বসন্ত রায়ের স্ত্রী মণিকার মাসতুতো দিদি অনীতা বাইরের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল।

মণিকা রাজবাড়ীর মস্তবড় 'কার' থেকে নামতেই সে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মণি, খুব সময়ে এসেছিস তুই, নিজেই না এলে আমরাই কাল তোকে আসবার জন্য 'তার' করতাম!

দিদির হাত ছাড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করতে করতে মণিকা বলল, শুনলাম তোমাদের ড্রাইভারের কাছে। সেই বিখ্যাত হীরার হারটি নাকি চুরি গিয়েছে?

শুধু বিখ্যাতই নয় ভাই, সেই হীরাটা একজন সাধুর দান। এ বংশের কল্যাণ নির্ভর করছে ঐ হীরার উপর। প্রবাদ আছে, ঐ হীরা হারালে এ বংশের অকল্যাণ হয়। অনীতা কেঁদে ফেলে।

তুই যা করে হোক হীরাটা খুঁজে দে ভাই! সে বার দাদামশায়ের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ হারিয়ে গেলে পুলিশও যা পারেনি তুই তাই করেছিলি। তাঁদের ঠাকুর উদ্ধার করে দিয়েছিলি তুই। এবার আমার দায় উদ্ধার কর ভাই!

আরে করছ কি অনু? ও বেচারা সবে ট্রেন থেকে নামল। একটু বিশ্রাম তো করতে দাও মণিকে। পেছন থেকে বললেন রাজাবাহাদুর বসন্ত রায়।

অপ্রস্তুত অনীতা বোনকে সঙ্গে করে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। সে রাত্রে আর তারা চুরির সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার সুযোগ পেল না।

বিখ্যাত মেয়ে-ডিটেকটিভ মণিকার পরিচয় বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই যে খ্যাতনামা গোয়েন্দা পুলিশ-ইন্সপেক্টার হরেনবাবুর ভাগনী, যে একবার একটা রহস্যময় খুনের তদারকে আমাকে সাহায্য করে প্রকৃত অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছিল? মনে পড়েছে? হ্যাঁ, সেই মণিকার কথাই বলছি। সেই ঘটনার পর থেকেই তো আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী কোন চুরি কি দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই তারা মণিকাকে ডেকে পাঠায়।

ঐ ক্ষেত্রে অবশ্য মণিকা চুরির খবর পেয়ে আসেনি। সে এসেছিল দিদির বাড়ী বেড়াতে। কিন্তু ঢেঁকীকে স্বর্গে গিয়েও ধানই ভানতে হয় তো?

পরদিন সকালে চা খাবার পর মণিকা বলল, যে ঘর থেকে হার চুরি হয়েছে সে ঘরটা একবার দেখব।

অনীতারা তাকে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে এল। এই ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে একটা বেশ মজবুত লোহার দরজায় তালা ঝুলছিল। সেই তালা খুলে অনীতা ডাকল, এস।

ভেতরে গিয়ে মণিকা দেখল, ঘরটি একটি মাঝারী সাইজের ড্রেসিং রুম। ঘরের দুয়ার ঐ একটি মাত্র। ঘরে আলো আর বাতাস আসবার জন্য খুব উঁচুতে বাইরের দিকের দেওয়ালে প্রায় ছাদের কাছাকাছি দুটি স্কাইলাইট আছে। দুটিই দামী পুরু কাচ আর তারের জালি দিয়ে ঢাকা। তার উপর দুটো স্কাইলাইটই এত ছোট যে একটি চার পাঁচ বছরের রোগা ছেলে ছাড়া কেউই সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর আসতে পারবে না। সব চেয়ে বড় কথা, রাণী অনীতা কিংবা রাজাবাহাদুর এ ঘরে না থাকলে স্কাইলাইট দুটি কখনও খোলা হয় না।

অনীতা বলল, এ ঘরের ভেতর সিলিংফ্যান আর বিজলী বাতি লাগাবার পর এদিকে প্রায় বছর খানেক স্কাইলাইট দুটিকে একবারও খোলা হয়নি।

কাপড় ছাড়বার সময়ে এই বন্ধ ঘরে কষ্ট হয় না গরমে?

মণিকার প্রশ্নের উত্তর দিলেন রাজাবাহাদুর। আমরা এ ঘরে আসবার সময়ে শোবার ঘরের বাইরের দিকের দরজাগুলি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিই। তাই এ ঘরে ঢোকবার একমাত্র দরজাটা খোলাই রাখি সে সময়ে। ঐ দরজাটা দিয়েই মুক্ত বাতাস চলাফেরা করে এ ঘরে।

মণিকা মাঝের এই দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখল, এর ঠিক উল্টোদিকে শোবার ঘরের দক্ষিণের দেওয়ালে বেশ বড় একটা জানালা। ঐ জানালার দরজা বন্ধ থাকলেও কাচের ভেতর দিয়ে শোবার ঘর আর এই ছোট ঘরটারও খানিকটা বেশ দেখা যায় বাইরের বাগান থেকে। জানালার দরজা খোলা থাকলে ঘরের লোকের কথাও বাইরে থেকে শোনা যায়।

মণিকার প্রশ্নের উত্তরে অনীতা বলল, সে রাত্রে একটা ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। তাই ঐ বড় জানালাটি খোলাই ছিল। কিন্তু ঐখান দিয়ে চোর আসা সম্ভব ছিল না। কেন না, আমি আর মানদাদি' ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়েই এ ঘরের দরজায় তালা দিয়েছিলাম।

চাবী কার কাছে থাকে?

আমার কাছে। শুধু ঘর পরিষ্কার করার সময়ে মানদাদি' চাবী নেয়। অনীতা উত্তর দেয়।

মানদাদি' কি একাই ঐ ঘরে যেত?

সব সময়ে নয়। কখন-সখন আমি কাজে ব্যস্ত থাকলে সে একাই আসত।

যে রাত্রে হার চুরি হয়, সে রাত্রে মানদাদি' এ ঘরে একলা ছিল?

না, আমার কাপড় ছাড়ার সাহায্য করেই সে বাইরে চলে গিয়েছিল আমার জন্য এক গেলাস জল আনতে। তবে আমি যখন দরজায় তালা দিই তখন মানদাদি' শোবার ঘরে ছিল।

এ ঘরের ডুপ্লিকেট চাবীটা কার কাছে থাকে?

আমার কাছে। রাজাবাহাদুর বললেন, কিন্তু সে চাবী আমি বহুদিন ব্যবহার করিনি। আমার ক্যাশবাক্সে যেমন রেখেছিলাম তেমনিই পেয়েছি পুলিশ এনকোয়ারীর সময়ে।

খানিকক্ষণ কি ভেবে মণিকা আবার প্রশ্ন করল, হারটা সাধারণতঃ কোথায় রাখা হয়? অত দামী জিনিষ যখন, তার রাখবার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই উপযোগী?

রাজাবাহাদুর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী দেখালেন। আলমারীটির অনেকগুলি দরজা নানা কৌশলে খুলতে হয়। সবগুলি দরজা খুলে তিনি একটা মজবুত লোহার বাক্স দেখালেন। এরই ভেতর হীরার হার ও অন্যান্য সব দামী অলঙ্কার রাখা হয়। সব জিনিষ রাখবার পর আলমারী বন্ধ করে দরকার মত সেটাকে ইলেকট্রিফাই করার ব্যবস্থাও আছে। তবে আজ পর্য্যন্ত কখনও রাজাবাহাদুর আলমারীটাকে ইলেকট্রিফাই করেননি।

যা দেখছি তাতে—আশ্চর্য্য হয়ে মণিকা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিল অনীতা। সে রাত্রে কিন্তু আমি হীরার হার বা অন্য কোন গহনাই লোহার আলমারীতে তুলিনি। আগেই বলেছি, সে রাত্রে একটা ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। তার উপর এঁর জ্ঞাতির মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে সারাটা দিন তাদের বাড়ী হৈ চৈ করে কাটিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই রাত্রে বাড়ী ফিরে সব গহনা খুলে বাক্সে ভরে সেটা কাপড়ের আলমারীতেই রেখে দিয়েছিলাম। মানদাদি' অবশ্য বলেছিল, কাজটা ভাল হচ্ছে না রাণী-দিদি। তুমি বাক্সটা লোহার আলমারীতেই তুলে রাখ।

আমি বললাম ঘরের চাবি তো থাকবে আমার কাছে। আর আমরা থাকব শোবার ঘরে। কাজেই আজ রাত্রে আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

পরদিন কখন হার চুরির কথা জানতে পারলে?

মণিকার প্রশ্নের উত্তরে অনীতা যা বলল তা সংক্ষেপে এই—আগের রাত্রের গরমে ও নিমন্ত্রণ-বাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার গোলমালে অনীতার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। পরদিন সে তাই বেশ বেলাতেই বিছানা ছেড়ে ওঠে। তারপর সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের ভার পিসীমাকে বুঝিয়ে দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ে। আহারে অনিচ্ছা থাকায় সকালে অনীতা কিছুই খায়নি। দুপুরে পিসীমা আর মানদার আগ্রহাতিশয্যে সে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

রাজাবাহাদুর কি কাজে সহরে গিয়েছিলেন। ভাইয়ের বউয়ের শরীর খারাপের খবর পেয়ে মানদা ছুটী নিয়ে দুপুরে বাড়ী গেল। তাই পিসীমা অনীতার দেখা-শোনার জন্য তার শোবার ঘরে এসে বসলেন।

পিসীমার খুব বেশী পান-দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস। সব সময়েই তাঁর সঙ্গে একটা পানের বাটা থাকে। সেদিনও পিসীমা গল্প করতে করতে পান সেজে খাচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ বললেন, একটা পান খাও বউমা, তাহলে তোমার গা-বমি ভাব কমে যাবে।

রাজামশায় পান খাওয়া পছন্দ করেন না। তাই অনীতা অন্যদিন পিসীমা বললেও কখনও পান খায় না। কিন্তু সেদিন একে

তো রাজাবাহাদুর বাড়ী ছিলেন না, তার উপর শরীরটাও বেশ খারাপ বোধ হচ্ছিল, তাই অনীতা সাগ্রহেই পিসীমার কথামত একটা পান খেল। প্রথমে ঘোলের সরবৎ তারপর পান খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর অনেক হালকা বোধ হওয়ায় অনীতা ঘুমিয়ে পড়ে।

রাজাবাহাদুর হেসে বললেন, সে কি ঘুম। সন্ধ্যা পাঁচটায় বাড়ী ফিরে দেখি তখনও ঘুমোচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না। ভয় হল শরীরের কষ্টে অজ্ঞান হয়ে যায়নি তো? মানদাকে ডেকে মুখে মাথায় ভিজে তোয়ালে বুলাতে বললাম। তারপর নাকের কাছে স্মেলিংসল্টের শিশি ধরতে ধড়মড় করে উঠে বসল।

অনীতা বলল, সত্যিই অতক্ষণ ধরে অমন গভীর ঘুম আমি কখনও ঘুমইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে শরীর বেশ সুস্থ বোধ হল। চা খাওয়া শেষ হতেই মানদা বলল, রাণীদিদি, কাল রাত্রে গহনার বাক্স সিন্দুকে তোলনি আজ এইবেলা তুলে ফেল। নইলে ভুলে যাবে। আজ গাঁয়ে শুনে এলাম বিরাটপুরের জমীদারবাড়ীতে একটা মস্ত বড় চুরি হয়ে গিয়েছে।

রাজা মশায়ও বললেন, হ্যাঁ সহরেও শুনলাম বটে বিখ্যাত অলঙ্কার চোর সিন্থু এ অঞ্চলের কয়েকজন ধনীর বাড়ী চুরি করেছে। কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছে না। অবশ্য আমার এই ষ্ট্রংরুমে ঢুকে চুরি করার সাধ্য চোরের বাবারও হবে না। তবু সাবধানের মার নেই। গহনাগুলো সব ভাল করে আলমারীতে তুলে সেটা ইলেকট্রিফাই করে দিও।

ওঁদের দুজনের কথা শুনে আমার ভয় হল। তাড়াতাড়ি ও ঘরের দরজা খুলে গহনাগুলো লোহার আলমারীতে সাজিয়ে তুলে রাখতে গিয়ে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। আর সব গহনাই আছে শুধু সেই বিখ্যাত হীরার পেণ্ডেণ্ট দেওয়া হারটাই নেই। ভাবলাম হয়তো কাপড়ের আলমারীর ভেতর দিকে কোথাও সরিয়ে রেখে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু আমাতে আর মানদাদি'তে সমস্ত আলমারী ঘরের প্রত্যেকটি কোণ খুঁজেও সেটা পেলাম না। অনীতা একটু থেমে চোখের জল মুছে আবার বলতে লাগল।

জানিস তো হারটা এ বংশের উন্নতির মূলে। তাই খবর পেয়ে তোর জামাইবাবু এসে খুব রাগারাগি করতে লাগলেন। উনি নিজেও সব জায়গা ভাল করে খুঁজে দেখলেন। তারপর পুলিশে খবর দিলেন।

পুলিশ প্রথমে সিন্থু চোরকে সন্দেহ করলেও পরে সব দেখে শুনে বলল, সিন্থু যদি আসত তাহলে একটা মাত্র হার নিয়ে ক্ষান্ত হত না সে। গোটা বাক্স, সব অলঙ্কার সুদ্ধই সরাত সে। যেমন অন্য জায়গা থেকে সরিয়েছে। এ নিশ্চয় বাড়ীর খুব জানাশোনা কোন লোকের কাজ। খুব সম্ভব এ বাড়ীর কোন চাকর-বাকরই সরিয়েছে হারটা।

বাড়ীর সকলের জবানবন্দী নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ মানদাদি'কে গ্রেপ্তার করেছে। মানদা ঝি রাণী অনীতার মামার বাড়ীর ঝি। সে অনীতা আর মণিকার ছেলেবেলায় তাদের মানুষ করেছিল। রাণী অনীতা শ্বশুরবাড়ী এসে একলা থাকতে হবে বলে দিদিমার কাছ থেকে মানদাকে চেয়ে এনেছিলেন। এই গ্রামেই মানদার ভাই থাকে, তাই মানদাও একদিকে তার স্নেহপাত্রী অনীতা অন্যদিকে ছোট ভাইটিকে কাছে পাবে এই আশায় সহর ছেড়ে আসতে আপত্তি করেনি। অনীতাদের অনেক পুরানো বিশ্বাসী ঝি সে। তাই অনীতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার মানদাদি' চোর।

সেই কথাই সে বলল মণিকাকে, মানদাদি' যে হার চুরি করেছে একথা নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না মণি! তুই তো জানিস দিদিমার সমস্ত গহনাগাঁটি টাকাকড়ি মানদাই রাখা ঢাকা করতো। কখনও একটা পয়সাও তার হাত থেকে হারায় নি।

মণিকা একটু দুঃখিত সুরে বলল, বলা যায় না দিদি। কথায় বলে মানুষের মন না মতিভ্রম। যে মানুষ লক্ষ টাকার দিকে চেয়েও দেখে না সেই আবার অনেক সময়ে সামান্য একটা হার কি কানের দুল চুরি করে ধরা পড়ে। কিন্তু মানদাদি'কে কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করে ধরল পুলিশ?

অনীতা বলল, এক তো মানদাদি' ছাড়া আর কোন চাকর কখনও ষ্ট্রংরুমে ঢুকত না। একমাত্র সেই জানত যে শোবার সময়ে আমি বরাবর আমার আঁচল থেকে চাবী খুলে মাথার বালিসের নীচে রেখে শুই। কোন চাবীটা ঐ ঘরের দরজার, কোনটাই বা কোন আলমারীর এসবও জানত মানদাদি'। আগের রাত্রে যে আমি গহনার বাক্স লোহার আলমারীতে রাখিনি তাও মানদাদি'র জানা ছিল।

পিসীমাও সাক্ষ্য দিলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময়ে দেখেন মানদা আমার ঘরের দরজায় বসে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ী যাওনি মানদা?

মানদা উত্তর দিল, গিয়েছিলাম পিসীমা। দেখলাম বউ ভাল আছে। তাই ফিরে এলাম।

মানদার ভাই মদ খায়। একবার চুরি করে জেলেও গিয়েছিল। তাই এ বাড়ীর সকলে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। চাকরেরা খবর দিল আগের রাত্রে ও পরদিন দুপুরে মানদার ভাইকে বাগানে আর শোবার ঘরের কাছে বড় জানলাটার বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘুরতে দেখেছে। চাকররা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, দিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। বড় দরকার আছে।

আগের রাত্রে অনীতার সঙ্গে মানদাও বিয়েবাড়ী গিয়েছিল তাই ভাইয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। পরদিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবার পরই মানদা ছুটি নিয়ে বাড়ী যায়। কিন্তু ঘণ্টা কয়েক পরেই ফিরে আসে। পুলিশের লোক খোঁজ নিয়ে জানতে পারে মানদার সঙ্গে দেখা করেই তার ভাই বাড়ী ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। মানদাও সেদিন বাড়ী গিয়ে তার ভাজকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সব কারণে পুলিশের দৃঢ় ধারণা, মানদা হার চুরি করে তার ভাইকে দিয়েছে। ভাই বোধহয় বোম্বাই কিংবা পুণায় গিয়েছে। হার বিক্রী করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই হার বিক্রী করে খবর দিলেই মানদাও চলে যাবে তার কাছে।

পিসীমা একথায় সায় দিয়ে বললেন যে, আগের দিন যখন মানদার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয় তখন সে রাগ করে বলেছিল, এত অপমান সয়ে আর এ বাড়ীতে থাকব না আমি। রাণীদিদিকে বলে ক'লকাতায় মণিদিদির কাছে চলে যাব।

মণিকা প্রশ্ন করল মানদাদি'র সঙ্গে কি পিসীমার বনত না ?

অনীতা বলল, শুধু মানদাদি' কেন, এ বাড়ীর ঝি-চাকর কারুর সঙ্গেই পিসীমার বনত না। রাগী মেজাজের মানুষ তিনি। কোন কাজ করতে একটু দেরী হলেই চাকরবাকরকে বড় গালমন্দ করতেন।

একটু হেসে বলল অনীতা, আমিও পিসীমার খোঁটার হাত থেকে রেহাই পাইনি। এই দেখ না, কথায় কথায় বলেছিলাম, কি কুক্ষণেই না পিসীমার দেওয়া পান খেয়েছিলাম। পাশের ঘর থেকে হার চুরি হয়ে গেল তবু জানতে পারলাম না। তাইতেই তি'নি রেগে উঠে যা নয় তাই বলে গাল দিলেন আমায়। বললেন, আমি নাকি সন্দেহ করছি যে তিনি পানের সঙ্গে আমাকে কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে আমার হার চুরি করেছেন।

কত করে পায়ে ধরে বোঝালাম আমি ঘুণাক্ষরেও ও ধরণের কোন কথা বলিনি কিন্তু তিনি রাগারাগি কান্নাকাটি করে কাল রাত্রেই চলে গেলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শেষের কথাগুলি বলে অনীতা চোখ মুছল।

যথারীতি বাড়ীর ঝি-চাকরদের জেরা করার পর মণিকা রাজা-বাহাদুরকে বলল, আমি জেলে মানদাদি'র সঙ্গে দেখা করতে চাই। ব্যবস্থা করে দিন।

রাজাবাহাদুর ফোন করে পুলিশের অনুমতি আনিয়ে দিলে বাড়ীর গাড়ীতে একাই গেল মণিকা মানদার সঙ্গে দেখা করতে।

কয়েক ঘণ্টা পরে খালি গাড়ী নিয়ে সোফার ফিরে এসে জানাল, সন্ধ্যার ট্রেনে মণিকা ক'লকাতায় চলে গিয়েছে। বলেছে দিদি, জামাইবাবুকে বোলো, কাল রাত্রে ফিরব। বিশেষ দরকারে ক'লকাতায় যাচ্ছি।

পরদিন রাত্রে ও মণিকা ফিরল ঠিকই কিন্তু দিদি, জামাইবাবুর সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে বলল, সারাদিন ঘোরাঘুরি করে আজ আমি বড় ক্লান্ত, কাল সকালে সব'কথা বলব। সকলকে আরও বিস্মিত করে সে জানাল তার এখানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেজন্য পরদিন বিকালেই সে ক'লকাতায় ফিরে যাবে একটা জটিল মামলায় মামাবাবুকে সাহায্য করতে।

সে কি ? মানদাদি'কে জেলে ফেলে রেখেই চলে যাবি ?

অনীতার প্রশ্নে মণিকা উত্তর দেয়—যার ভাগ্যে যা আছে তাই তো হবে। আমি তো আর কারো ভাগ্য পাল্টাতে পারি না ?

আর আমাদের হীরাটা ? রাজাবাহাদুর সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, সেটা পাওয়া যাবে তো ?

তেমনি রহস্যভরে মণিকা উত্তর দিল আপনাদের ভাগ্যে থাকে তো চোর নিজেই এসে হীরার হার ফিরিয়ে দেবে। না থাকে তো পাবেন না ফিরে।

দারুণ কৌতুহলে অনীতা রাত্রে ঘুমাতে পারল না। অন্যদিনের চেয়ে সকালেই চায়ের টেবিলে বসে রাজাবাহাদুর মণি॰াকে ডাকতে পাঠালেন। মণিকা আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সদরে। তারপরেই পিসীমা পাগলের মত ছুটে এসে রাজাবাহাদুরের পা জড়িয়ে ধরলেন। বাবা বসন্ত, আমার সুবোধকে বাঁচাও। সে কিছুই জানে না সব দোষ আমার।

কি হয়েছে পিসীমা ? সুবোধের কি হয়েছে ?

অনীতা আর রাজাবাহাদুর দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পিসীমাকে তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলেন।

হার চুরির দোষে পুলিশ সুবোধকে অ্যারেষ্ট করেছে।

সে কি ? সুবোধ কি করে হার চুরি করবে ?

আমার দোষ বাবা! বউমাকে পানের সঙ্গে একটা অজ্ঞান হবার ওষুধ খাইয়ে আমিই আলমারী থেকে হার বার করে নিই। তারপর কলিকাতায় গিয়ে সুবোধকে হার দিয়ে বলেছিলাম, এ হারছড়া আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। এতদিন বসন্তর কাছে রাখা ছিল। তুই এ হার বিক্রী করে তোর ব্যবসায়ের ঋণ শোধ করে দে। পিসীমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মণিকা ঘরে এল। পিসীমাকে কাঁদতে দেখে বলল, আপনি যদি পুলিসে সব দোষ স্বীকার করে মানদাকে খালাস করে আনেন আর তার কাছে ক্ষমা চান তাহলে আমি জামাইবাবুকে বলে আপনার ছেলের নামে মামলা তুলে নেব।

রাজাবাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেস তো তুলে নিতেই হবে মণি, ঘরের কলঙ্ক কখনও বাইরে যেতে দিতে নেই। কিন্তু পিসীমা, এরপর থেকে আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রইল না। ছিঃ ছিঃ। লোভের বশে হার চুরি তো করলেনই, আবার মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে অন্যায় করে একটা নির্দ্দোষ বুড়ো মেয়েমানুষকে জেলে পাঠালেন ?

মণিকার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে নিরুপায় পিসীমা তার সর্ত্ত মেনে নিলেন। সারাদিন ছুটোছুটি করে মানদাকে জেল থেকে মুক্ত করে, সুবোধের আর পিসীমার বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে দিয়ে মণিকা ও

রাজাবাহাদুর যখন বাড়ী ফিরলেন তখন কলিকাতার শেষ ট্রেন চলে গিয়েছে। অগত্যা মণিকাকে সে রাত্রে দিদির কাছেই থাকতে হল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনীতা জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করে বুঝলি যে পিসীমাই চুরি করেছেন? মণিকা উত্তর দিল, প্রথম থেকেই আমার পিসীমাকেই সন্দেহ হয়েছিল। তবে তিনি নিজে যে চুরি করেছেন তা ভাবিনি। যে চুরি করেছে পিসীমা তাকে জানেন আর তার কাছ থেকে মোটা টাকা পাবার আশা করেন এই কথাই ভেবেছিলাম। আমার সন্দেহ ছিল যে মানদার ভাই-ই চুরি করেছে পিসীমার সাহায্যে। মানদার সঙ্গে তার ভাইয়ের ও যেমন বনত না, তেমনি পিসীমাও মানদাকে শত্রু ভাবেন। মানদা না থাকলে তিনিই এ বাড়ীতে রাণীর রক্ষয়িত্রী হয়ে থাকতে পারতেন। তাছাড়া রাণীকে কিছু বললে মানদাদি' সইতে পারত না, তাঁকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিত। এই সব কারণে ইদানীং পিসীমা মানদাদি'কে এবাড়ী থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলেন।

সেদিন জেলে গিয়ে মানদাদি'র কাছে শুনলাম হার চুরির দিন দুপুরে সে বাড়ী গিয়ে দেখে তার ভাজের অসুখের খবর পেয়ে বউয়ের ভাই আর মা এসেছে। পাশের গ্রামেই ওদের বাড়ী। তাই মানদা তাদের সঙ্গে তার ভাজকে বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করেই ফিরে আসে। কারণ রাজবাড়ীতে রাণী দিদির অসুখ। কখন কি দরকার হয় তাঁর বলা যায় না।

বাড়ীর সব ব্যবস্থা করতে মানদার ঘণ্টা দুইয়ের বেশী লাগেনি। সে যখন বাড়ী ফিরে রাণীদিদির ঘরের বারান্দায় পৌঁচেছে তখন দেখল পিসীমা সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলে এদিক ওদিক চেয়ে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চললেন।

তাঁকে ওভাবে যেতে দেখে মানদার ভয় হল হয়তো রাণীদিদির শরীর বেশী খারাপ হয়েছে। সে পেছন থেকে ডাকল, পিসীমা, পিসীমা, রাণীদিদি কেমন আছে এখন?

মানদার ডাক শুনে পিসীমা কেমন যেন থতমত খেয়ে কি একটা জিনিষ কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেললেন। তাঁর মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনই সামলে নিয়ে বললেন, ও তুই মানদা?

আমি ভাবলাম ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ ডাকে কে? এ বাড়ীর আবার ভূতুড়ে বদনাম আছে তো?

মানদাদি' অবাক হয়ে গেল। কই, এত বছর সে রয়েছে কখনও তো কারুর কাছে এ বাড়ীর ভূতুড়ে বদনাম সে শোনেনি। কিন্তু সে কথার উল্লেখ না করে সে আবার অনীতার কথাই জিজ্ঞাসা করল। পিসীমা জানালেন সে এখন ভালই আছে আর ঘুমোচ্ছে।

মানদাদি'ও ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, অনীতা ঘুমে আচ্ছন্ন। সে তখন দরজার কাছেই মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। কি জানি কখন অনীতার ঘুম ভেঙ্গে কিছু দরকার পড়ে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও অনীতার ঘুম ভাঙেনি। শেষে রাজাবাহাদুরের আদেশে জোর করেই মানদাদি' তার ঘুম ভাঙায়।

মানদাদি' পুলিশকে পিসীমার এ আচরণের কথা জানায়নি ভয়ে। তিনি রাজা বাহাদুরের আত্মীয়া আর মানদাদি' একজন সাধারণ ঝি মাত্র। তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। বরং তাঁর আত্মীয়ের নামে দোষ দেওয়ায় রাজাবাহাদুর চটে যাবেন।

মানদাদি'র কাছে সব কথা শুনে মণিকা কলিকাতায় চলে যায়। সেখানে বড় বড় জুয়েলার্সের দোকানে সে খোঁজ করে দুই একদিনের মধ্যে কোন বড়ঘরের বউ কোন দামী অলঙ্কার বিক্রী করেছেন কি না?

কিন্তু পিসীমা তো হারটা বিক্রী না করে নিজের কাছেও রাখতে পারতেন? অনীতা বলল।

তা পারতেন। কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল টাকার দরকার বলেই পিসীমা চুরি করেছিলেন। মানদাদি'র কাছেই শুনেছিলাম পিসীমার ছেলে সুবোধ বাবুর ব্যবসায়ের অবস্থা ভাল নয়, তাই তিনি রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। রাজাবাহাদুর বলেন এখন খাজনা জমা দেবার সময়। এখন টাকা দিতে পারব না, পরে দেব।

পিসীমা বলেন, বউয়ের গহনা থেকে কিছু বাঁধা রেখে টাকা দাও। বড় দরকার সুবোধের। এ বিপদটা কেটে গেলেই সে তোমার ঋণ শোধ করে দেবে।

রাজামশায় বলেন তার চেয়ে সুবোধ ক'লকাতারই কোন ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসায় বাঁধা রেখে টাকা নিক।

পিসীমা এ কথায় খুব রাগ করেন। শেষে তাঁর রাগ গিয়ে পড়ে অনীতার উপর। তাঁর ধারণা হয় রাণী গহনা দিতে অস্বীকার করাতেই তিনি টাকা পেলেন না।

একটু চুপচাপ গেল। তারপর মণিকা আবার বলল, কয়েকটা প্রসিদ্ধ জুয়েলার্সের দোকানে খোঁজ করেও হারের কোন সন্ধান পেলাম না। তখন মামাবাবুর পরামর্শ মত ওখানকার সবচেয়ে বড় মণিকার ও জুয়েলার্স মিষ্টার গুহাইয়ের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলাম গতকাল বা আজ কেউ তাঁর কাছে কোন হীরা বা হীরার হার বাঁধা দিয়েছে কিনা? হীরাটার আর হারের বর্ণনা দিতে তিনি সেটা বের করে দেখালেন। কিন্তু কে দিয়েছে তা বলতে ইতস্তত করতে লাগলেন। কারণ বড়ঘরের গোপন কথা বলার তাঁর অধিকার নেই।

তারপর যখন মামাবাবুর কাছে শুনলেন যে হারটা চোরাই হার, তখন বললেন সুবোধ বাবুই সেটি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার নিয়েছেন। হারটি নাকি তাঁর মায়ের।

মণিকা থামতে রাজাবাহাদুর বললেন, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সুবোধকে অ্যারেষ্ট করান ভাল হয়নি। খবরটা জানাজানি হলে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি হবে।

মণিকা উত্তর দিল, খবর জানাজানি হবে না। সুবোধ বাবু যে অ্যারেষ্ট হয়েছিলেন, সে খবর মামাবাবু আর তাঁর সহকারী ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু সুবোধ বাবুকে অ্যারেষ্ট না করলে পিসীমাকে দিয়ে কিছুতেই স্বীকারোক্তি করান যেত না। ফলে নির্দোষী মানদা জেল খাটত।

অনেকক্ষণ সকলে চুপ করে রইল। তারপর মণিকা নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, কাল ভোরের গাড়ীতেই আমি ক'লকাতায় ফিরব। মানদাদি' আমার সঙ্গে যাবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৮

প্রতিবেশী বলল, তুমি জাহান্নমে যাও।
দোষ তো করিনি, এ কথা কেন?
প্রতিবেশীর চোখ গরম, তোমার নেই কেন।

আবার এক দিন।

প্রতিবেশী বলল, সেলাম সেলাম, অনেক সেলাম।

সেলাম কেন ভাই?

প্রতিবেশীর চোখ নরম, তোমার যে অনেক আছে···তাই।

এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রতিবেশীতত্ত্বের এদিকটা দেখে ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ে গেল। ওর জীবনে যেন হঠাৎই জোরালো রকমের সৌভাগ্যের আলো জ্বলে উঠেছে একটা। সেই আলোয় সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের চোখে ধাঁধাঁ লেগেছে প্রথম। তারপর নড়েচড়ে সজাগ হয়ে একে একে কাছে এগিয়ে এসেছে তারা। আলো আর তাপের বিচিত্র মহিমা।

সুলতান কুঠিতে মাসে ছ'শ টাকা অনেক টাকা।

এই নতুন প্রীতি-বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে মনে মনে ধীরাপদ সোনাবউদিকেই দায়ী করেছে সব কিছুর জন্য। ওর সৌভাগ্যের কথা ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালেও তার কাছ থেকেই খবরটা ছড়িয়েছে।

সোনাবউদি পরদিনই এসেছিল। পরদিন দুপুরে।

অনেকদিন বাদে এই এক ছুটির দুপুরে ধীরাপদ ঘরেই ছিল। মেডিক্যাল হোম রবিবারেও খোলা, কিন্তু ফ্যাক্টরী বন্ধ। সোমবারে তার ওপর ফ্যাক্টরীতে হাজিরার নির্দেশ। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে এলোমেলো পাঁচ কথা ভাবছিল। একটা বড় কাজ সারা হওয়ার শ্রান্তি আর তৃপ্তি।

আধ-ভেজানো দরজা ঠেলে সোনাবউদি উপস্থিত। এক-মুখ পানে টসটসে ঠোঁট, হাতেও পানের খিলি গোটাকতক। সোনাবউদি পান বেশি খায় না, খায় যখন অমনি একগাদা খায়। দিব্বি সহজ, প্রসন্ন মূর্তি, যেন রোজই গল্পগুজব করতে এ-ঘরে এসে থাকে।

আসব, না ঘুমুচ্ছেন?

আসবেও জানে, ঘুমুচ্ছে না তাও জানে। ধীরাপদ আগেই বড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল। জবাব দেওয়ার দরকার হয়নি, অভ্যর্থনার হাসিটুকু জবাবের থেকে বেশি।

দেখে নিয়ে ঘরের দরজা দুটো টান করে খুলে দিয়েছে। ওপাশের বন্ধ জানালা দুটোর দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে তাও ঠেলে খুলে দিয়ে এসেছে। তারপর হেসে ফেলে কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিয়েছে, এরপর যার যা খুশি ভাবুক—।

সকাল থেকেই সোনাবউদিকে অনেকবার আশা করেছিল ধীরাপদ। সুসময়েই এসেছে।—আপনার এখনো ভাবাভাবির ভয়টা আছে নাকি?

থাকবে না কেন? ছদ্মকোপে প্রায় চোখ রাঙিয়েছে সোনাবউদি, এরই মধ্যে এমন কি বুড়ী হয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করে আসুন ওই বিটলে গণৎকারকে—

কৌতুকটুকু জিইয়ে রাখার জন্যে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি নিরীহ মুখে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। সে কথা নয়, আমি ভেবেছিলাম সেই এক ব্রত সাঙ্গ করেই একসঙ্গে সকলকে ঘায়েল করে ফেলেছেন।

অসহায় ভ্রূ-ভঙ্গি সোনাবউদির। দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়েছেন। দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও ফেলেছেন।—যতই করি শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না। হাসি চাপার চেষ্টা, খবর বলুন শুনি—

কাল এই সোনাবউদি ও-ভাবে মেয়ে ঠেঙিয়েছে ভাবাও শক্ত। খবর শুনতেই আসবে এবং এসেছে তা যেন জানাই ছিল ধীরাপদর।

খবর তো আপনার···

আমার? আমার আবার কী?

আনন্দ করে পান খাচ্ছেন···

ও, আয়েশ করে বার দুই-তিন পান চিবিয়ে মেনেই নিয়েছেন, কাল অমন একখানা ভালো গরদ পেলাম, আনন্দ হল। তাই খেলাম। আপনিও খান দুটো···

দু'টো পান ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, বাকি দুটো নিজের মুখে পুরেছে। পান হস্তগত করে ধীরাপদ বলেছে, আমি কেন, আমার তো আনন্দের কিছু হয়নি।

সোনাবউদির কৌতুকভরা দুই চোখ ওর মুখের ওপর থেমে ছিল খানিক, বাড়তি পানে নিচের ঠোঁট সিক্ত।—আপনারও হয়েছে, আয়নায় দেখে আসুন।

খবর শুনেছে তারপর। কোথায় চাকরি, কি চাকরি, কেমন চাকরি। অসহিষ্ণু আগ্রহ, অত বুঝিনা, কত মাইনে হল?

টাকা-পয়সার ব্যাপারে সোনাবউদির এ-ধরনের খাপা-খাপটা

কৌতূহল যা দিনেম-দিনেশ ধীরাপদ বহদিন দেখে আসছে। এখন আর খারাপ তো লাগেই না বরং ভালো লাগে। খারাপ লাগাতে গিয়ে অনেকবার ঘা খেয়েছে। রণুর অসুখে সেই গোট-হার বিক্রি করা, যা অনটনের সময়েও মাসের বরাদ্দ থেকে ওর দেওয়া বাড়তি টাকা সরিয়ে রেখে কুকার কেনার জন্ত একসঙ্গে দেড়-বছরের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ধীরাপদ জীবনে ভুলবে না বোধ হয়। আসক্তি আর নিস্পৃহতার এমন গায়ে গায়ে মিতালি আর দেখেনি।

ছ'শ টাকা! মাসে? সোনাবউদির পান চিবুনো থেমে গিয়েছিল, বিস্ফারিত চোখে সংশয় আর বিস্ময়।—চাল দিচ্ছেন না তো?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল। সোনাবউদিও। আনন্দ ধরে না।

সোনাবউদির মুখ থেকে গণুদা শুনেছে।

গণুদা বিকেলে এসেছিল। ভদ্রলোক কথাও বেশি বলতে পারে না, উচ্ছ্বাসও তেমন প্রকাশ করতে পারে না। তবু সুখবর শুনে যতটা সম্ভব অন্তরঙ্গ আনন্দ জ্ঞাপন করেছে। আপনজনের ভালো শুনলে কত ভালো লাগে তাও বলেছে। বিনিময়ে ধীরাপদও আপনজনের মতই তারও চাকরির খোঁজখবর করেছে, উন্নতির কতটা কি হল না হল জিজ্ঞাসা করেছে।

একেবারে মরমের কথা গণুদার। আশার উৎসে নাড়া পড়েছে। হবে হয়ত একটা কিছু, হওয়া উচিত, চেষ্টা-চরিত্র চলছে। কিন্তু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই, ধর-পাকড়ের জোর তো নেই বরং উল্টে মন্দ করার লোক আছে। লোকের ভালো ক'জন দেখতে পারে, সাব-এডিটারদের অনুবাদের বহর তো দেখছে বছরের পর বছর ধরে, গণুদা চেষ্টা করলেও অত ভুল করতে পারবে না। মালিকদের বিচার বিবেচনা থাকলে অনেক আগেই হয়ে যেত। রমণী পণ্ডিত অবশ্য বলেছেন, সময়টা ভালো এখন, একটু আধটু ভালো নয়— যাতে হাত দেবে তাই সোনা হওয়ার কথা···। একটা অসহিষ্ণু খেদে উদ্দীপনা ম্লান হতেও দেখেছে ধীরাপদ—ঘরে এমন দজ্জাল মেয়েমানুষ থাকলে বরাত ভালো হলেও কত আর হবে—তিন পা এগোলে দু'পা পেছন টানবে। নিরুপায় ক্ষোভে গণুদার ফর্সা মুখ লাল।—নিজের চোখেই তো দেখলে কাল, নির্বোধের মত গোঁ ধরে লাভের মুখে ছাই ঢেলে ছাড়ল—কড়কড়ে আড়াই শ' টাকা লোকসান, তার ওপর শুধুমুদু মেয়েটাকে ঠেঙিয়ে আধমরা করল, রাগের মাথায় তোমাকেও কি না কি বলে ফেললাম···

রাগের মাথায় ওকে কি বলা হয়েছে না হয়েছে ধীরাপদর মনেও নেই। কিন্তু চিত্তদাহের কারণ শুনে হতভম্ব। আড়াই শ' টাকা লোকসান কেন?

সেটা আর বলেনি বুঝি? বলবে কেন, আর কেউ আড়াই টাকা লোকসান করলে ঢাক পিটিয়ে বলত। ঢোঁক গিলে গণুদা গৃহিণীর হঠকারিতা ফাঁস করে দিয়েছে। তার অফিসের এক ভদ্রলোক নিয়মিত রেস্ খেলে, অনেক সময় অনেক খবর দেয়, গণুদা কানও দেয় না কোনদিন, ঘোড়দৌড়ের মাঠও আজ পর্যন্ত ভালো করে দেখেছে কি না সন্দেহ। সেদিন সেই ভদ্রলোক অব্যর্থ খবর পেয়ে গেছল একটা, ছুঁয়ে ছুঁয়ে চাব করার মত নির্ভুল খবর—একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের শুধু দিয়েছিল খবরটা। গণুদা তাও কান দিত না হয়ত, কিন্তু রমণীপণ্ডিত বলেছিলেন ধনস্থানে রাহু তুঙ্গী এখন, চন্দ্র-সূর্য মিলে বসাও অসম্ভব নয়। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সোনাবউদির কাছ থেকে গণুদা মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চেয়েছিল। টাকা দেওয়া দূরে থাক একেবারে বুকে পা দিয়ে কালীর নাচ নেচেছে! ওদিকে সেই ঘোড়া ঠিক প্রথম এসেছে। শুধু প্রথম? টাকায় আণ্ডিল মুখে নিয়ে প্রথম—এক টাকায় পাঁচ টাকা, পঞ্চাশ টাকায় আড়াই শ' হত।

ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে গণুদা। সন্তর্পণে ধীরাপদও। যাবার আগে গণুদা ওর আশাতীত খুশির খবরে আবারও আনন্দ জ্ঞাপন করে গেছে।

গণুদার কাছ থেকে রমণী পণ্ডিত শুনেছেন।

কালো মুখে উদ্দীপনার জলুস বার করে সকালেই হন্তদন্ত হয়ে একেবারে ঘরে এসে হাজির। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের টিপ্পনীর পরোয়া করেননি, ধীরাপদর ছ'শ টাকার জোরে তাঁরও জোর বেড়ে গেছে।—কি মশাই, সকলের আগে কোথায় আমি খবরটা পাব, না আমাকেই ফাঁকি! বলেছিলাম কিনা আপনার অনেক হবে, আমার কথা, মিলিয়ে নেবেন একদিন—বলেছিলাম কিনা বলুন?

না বললেও অস্বীকার করা শক্ত, তবে রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন ঠিকই। সোনাবউদির ব্রতভঙ্গের নেমন্তন্নে বাদ পড়ার দুঃখে রাস্তে কদম-তলার বেঞ্চিতে বসে আর পাঁচ কথার সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন। হাজার বলে দিয়েও ও নেমন্তন্ন এড়িয়েছিল সেই

আমাকে বলেছিলেন। উত্তাসিত মুখে আজ জোর করেই ওর ডান হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ দেখলেই তিনি হাত। দেখেছেন আর পক্ব মুখে ভেঙে পড়েছেন ধীরাপদ। ভাগ্যের সিঁড়িতে সবে পা পড়ল, এখনো অনেক, অনেক বাকী।—একাদশ বৃহস্পতি মশাই, একাদশ বৃহস্পতি। শুধু তাই? তুঙ্গ বক্তা, রবি চন্দ্র দোর্দ বীর্যে হাত ভরা। উচ্ছ্বাসের তোড়ে ধীরাপদ সরে বসতে চেষ্টা করেছে।

—হাত তো সবে আজ দেখলেন তিনি, এই দিন যে আসবে তাঁর জানাই ছিল। হাত না দেখেই তো বলেছিলেন সে কথা। চলন দেখলেই তিনি বুঝতে পারেন কার পিছনে লক্ষ্মী ঘুরছে, কপাল দেখেই বলে দিতে পারেন কার কপালে ভাগ্য নাচছে। খেয়ে ওর ভাগ্য থেকে নিজের দুর্ভাগ্য প্রসঙ্গে এসে স্তিমিত হয়েছেন আর মানুষের একটা আবেদন ব্যক্ত করেছেন। গত এক মাসে নতুন খুলেছে বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু ধীরাপদর খোঁজে দু'তিন দিন দিয়ে এই সুলতান কুঠিতে এসেছিলেন, পণ্ডিতের সঙ্গে তখন তাঁর আলাপ হয়েছে। আর একটা ওষুধ কিনতে গিয়ে পাকেচক্রে একটু আধটু আলাপ পরিচয় হয়েছে কবিরাজী দোকানের অধিকা কবিরাজের সঙ্গেও। এখন এই দু'জনের কাছে তাঁর হয়ে একটু সুপারিশ করতে হবে, ধীরাপদ যে কাজ করত সে কাজ উনি স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। বিজ্ঞাপন লেখা ছাড়াও দে-বাবুর জন্য ভালো ভালো বইও লিখে দিতে পারবেন তিনি, তাঁর জ্যোতিষীর বইয়ের কদর কম হবে না। ঘরের অচল অবস্থা প্রায়, এটুকু সাহায্য ধীরাপদকে করতেই হবে, এই সুযোগটুকু পেলে হয়ত একদিন ঘর ভাড়া নিয়ে জ্যোতিষীর দপ্তরও খুলে বসতে পারবেন তিনি।

মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের স্বপ্ন ওষুধের দোকান করবে, পণ্ডিতের স্বপ্ন জ্যোতিষীর দোকান। ধীরাপদ রমণী পণ্ডিতকেও সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে হাঁপ ফেলে বেঁচেছে।

সকালে কদম তলার হুঁকোর আসরে তাঁর কাছ থেকে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারও এই ভাগ্যোদয়ের সমাচার শুনবেন জানা কথাই।

সেদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙতে ধীরাপদর মনে হয়েছিল কল-পাড়ে শকুনি ভটচাযের উথা-কাশির ঠন ঠনে শব্দটা যেন আগের থেকে স্তিমিত। আর অনেক বেশি কষ্টক্লিষ্ট। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে শেষে ধীরাপদ বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কদমতলার বেঞ্চির সামনে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার দাঁড়িয়ে। বসতে পারছিলেন না বলে দাঁড়িয়ে। জানালা বন্ধ দেখে কাগজওয়ালা বন্ধ দরজার গায়ে কাগজ ফেলে গেছে। কাউকে কিছু না বলে শিকদার মশাই দোরগোড়া থেকে কাগজ নিয়েও যেতে পারছেন না, আবার চোখের সামনে কাগজ পড়ে আছে দেখে শান্তি মত বসতেও পারছেন না। ধীরাপদ বাইরে আসতে সতৃষ্ণ চোখ জোড়া কাগজের ওপর থেকে ওর দিকে ঘুরেছে। উদগ্রীব প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষার যাতনা।

—বেঁচে থাকো বাবা, দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হোক। বাঁ হাতে হুঁকো, শিরা বার-করা শীর্ণ ডান হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর হাত থেকে কাগজ নিয়েছেন। ব্যগ্র চোখ দু'টো কাগজের ওপর থেকে ছিঁড়ে এনে ওর দিকে তুলেছেন।—রমণীর মুখে শুনেছি বাবা, বড় আনন্দ হয়েছে শুনে—যার ভিতরে কি আছে এক আর বাইরে থেকে বোঝা যায়, কত সময় কত অবহেলাই না করেছি—

আশীর্বচনে নয়, আনন্দ হয়েছে শুনেও নয়, শেষের কথাটায় ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করেছে। বেঞ্চিতে বসেও একাদশী শিকদার কাগজ পড়া একটু স্থগিত রেখেছেন। বর্মাদেশীয় ছিটছিটে মুখখানা ওর দিকে তুলে ধরেছেন, তা তুমি বাবা নিজের গুণেই কারো ত্রুটি ধরো না জানি, এখন তো বড় লোক, মস্ত আশা-ভরসা। মুখে হঠাৎই যেন আশা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে উঠেছিল একটু, আগ্রহে গলার স্বর নেমেছিল।—তুমি তো বাবা নিজেই আর একখানা কাগজ রাখতে পারো এখন, বাংলা কাগজ,—পারো না?

কাগজ। অস্ফুট বিস্ময় ধীরাপদর।

একখানা কাগজ পড়ে ঠিক সুখ হয় না, আরো তো বড় কাগজ আছে—তাছাড়া এক কাগজে সব খবর থাকেও না বোধহয়। থাকে?

বড় খবর সবই মোটামুটি থাকে। ধীরাপদ না ভেবেই বলেছিল।

মনঃপূত হয়নি।—তবু সব তো থাকে না, কোন্ খবরটা কার কাছে বড় তার কি ঠিক আছে।

সত্যি কথা। জবাব নেই।

ইত্যবসরে গঙ্গাজলের বাটি হাতে শকুনি ভটচায উপস্থিত। ধীরাপদকে দেখে অবাক হলেও আগে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। উপবীত স্পর্শ করে একখানি শীর্ণ হাত তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুটস্বরে আশীর্বাদ করেছেন। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত মিশিয়ে আশীর্বাদটুকু দীর্ঘতর করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হাঁপের-ঠেলায় ক্যাপফেশে কাশির দমকে পেরে ওঠেননি, কাশতে কাশতে বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন।

শিকদার মশাই কাগজে ডুবেছেন। সোনাবউদির মত ধীরাপদও দু'জনের পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলবে কিনা ভাবছিল। অতটা পেরে ওঠেনি। ভটচায মশাইয়ের কাশির যাতনা দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল, ভদ্রলোক এরই মধ্যে এত কাহিল হয়েছেন লক্ষ্য করেনি।

—আপনার কাশিটা কি আগের থেকে বেড়েছে নাকি?

আর বাবা কাশি··· কাশির দমকে আটকে গিয়ে হাত তুলে আকাশ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এবারে গেলেই হয়। চোখে জল এসে গিয়েছিল। সেটা দমবন্ধ কাশির যাতনায়ও হতে পারে, আবার মাটির টান ঢিলে হয়ে আসছে বলেও হতে পারে। সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে খেদপ্রকাশ করেছেন, সব শীতেই মনে হয় হয়ে গেল, এবারে আরো বেশি—একটু আধটু খাঁটি চ্যবনপ্রাস পেলে হয়ত কমত, অগ্নিমূল্যের বাজারে খেয়ে-পরে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত, ওষুধ জুটবে কোথা থেকে।

পাছে এরপর রমণী পণ্ডিত এসে হাজির হন সেই ভয়ে ধীরাপদ তাড়াতাড়ি সরে এসেছে। এই দুই বৃদ্ধের জন্য ধীরাপদ মমতা বোধ করেছিল কিনা জানে না। মানুষের এই অসহায় দিকটাও পীড়ার কারণ হতে পারে।

রমণী পণ্ডিতকে এড়ানো সম্ভব হয়নি। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর প্রবুদ্ধ দলিলে সই করার মধ্যে তফাত নেই খুব।

গিয়ে হাজির হয়েছে দে-বাবুর কাছে আর অম্বিকা কবিরাজের কাছে।

প্রথম দর্শনে আসল উঠতে গিয়েও আসলে উঠতে পারেননি নতুন-পুরনো বই-এর দোকানের দে-বাবু। গোল গোল চোখ দুটো ধীরাপদর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিচরণ করেছে একদফা।—ছিন বদলেছে মনে হচ্ছে যেন মশায়ের।

দিন কতটা বদলেছে তা রমণী পণ্ডিতই বলে দিয়েছেন। যেই বলার ঝোঁকে বাবে দু'শ টাকা আটশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। দিন আরো কত বদলাবে তারও একটা নিখুঁত ছবি এঁকে দিয়েছেন দে-বাবুর চোখের সামনে—দু'চার হাজার টাকা হামেশাই ডান-পকেট বাঁ-পকেট করতে হবে। এই দিন বদলের শুভ-যোগগুলি যে অনেক আগেই তিনি ছকে দিয়েছিলেন সে-কথাও জানাতে ভোলেন নি।

রমণী পণ্ডিতের উদ্দেশ্য সফল। তাঁর অভ্রান্ত গণনার ফল চোখের সামনে দেখেও দে-বাবু অবিশ্বাস করেন কি করে। ধীরাপদ না হয়ে আর কেউ হলেও কথা ছিল। টাকার জোরে আর কাজের তাগিদে যতই চোখ রাঙান, তলায় তলায় শ্রদ্ধাও করতেন একটু। ভালো কাজ করত, বিনিময়ে ঠকালেও বুঝে-শুনেই ঠকত—এক এক সময় মনে হত সেই যেন উল্টে অনুকম্পা দেখিয়ে গেল তাঁকে। অমন মাথাওয়ালা নির্বিকার কাজের লোক দে-বাবু বেশি দেখেননি। প্রস্তাবমাত্রে কাজ হল। রমণী পণ্ডিতকে কাজ দেবেন তিনি, আর, ভূত-ভবিষ্যত চোখের সামনে নাচে এমন একখানা সহজ-সরল জ্যোতিষীর বই লিখতে পারলে ছাপতেও আপত্তি নেই তাঁর। তবে পুরনো বন্ধুকে একেবারে ভোলা চলবে না ধীরাপদর, দরকার হলে একটু সাহায্য করতে হবে।

দে-বাবু এখন আর মনিব নন, বন্ধু। হাসি চেপে ধীরাপদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অম্বিকা কবিরাজের দোকানেও সেই একই প্রহসন আর একই উপসংহার। ধীরাপদ দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে রমণী পণ্ডিতকে কাজ দিতে আপত্তি নেই তাঁরও। যেখান থেকে যেকথার আগে কি ভেবে ধীরাপদ চ্যবনপ্রাশ কিনেছে এক কৌটো। নিজের দরকার শুনে অম্বিকা কবিরাজ ভিতর থেকে খাঁটি জিনিস বার করে দিয়েছেন বাকি, আর লাভ ছেড়ে দাম নিয়েছেন।

ফিরতি পথে বাসের ভিড়ে রমণী পণ্ডিত উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ পাননি। বাস থেকে নেমে তাঁর খুশির অবক্তব্যবিকার মুখেই ধীরাপদ চ্যবনপ্রাশের কৌটোটা এগিয়ে দিয়েছে।—ভটচায মশাইকে দিয়ে দেবেন, ভদ্রলোক বড় কষ্ট পাচ্ছেন। কিনেছি বলবেন না।

রাতের অন্ধকারেও পণ্ডিতের বিস্ময় উপলব্ধি করা গেছে। উচ্ছ্বাস এবার মহানুভবতার খাতে গড়াতে দেখে ধীরাপদ বাধা দিয়েছে, বিজ্ঞাপন লিখতে হলে একটা ডিকশিনারি যোগাড় করে ভালো ভালো বিশেষণ মুখস্থ করুন—

রমণী পণ্ডিত হেসেছেন, জ্যোতিষীর ডিকশিনারি হাতড়ে অলঙ্কার খুঁজতে হয় না মশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা বলে আপনার সম্বন্ধে যা বলেছি একটুও বাড়ানো নয়, ও নিশ্চিত ফলবে দেখবেন।

আর পপুদার সম্বন্ধে যা বলেছেন ?

যেখানা প্রায় শুনে রমণীপণ্ডিত থতমত খেয়ে গেছেন। কোন্ অভাবে তুষ্ট হবে গলার স্বরে স্পষ্ট নয় তেমন।—তাঁরও ভালই, তবে এক একজনের ভালো এক একরকম। আপনার ভালোর সঙ্গে তাঁর ভালোর তুলনা হবে কেমন করে। তাঁর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী তাঁরও ভালো, বেশ ভালো—

ওই ভালোটা আর একটু কম কাঁপালে ভালো হয়, ভদ্রলোক বিপদে যেতে পারেন।

ভদ্রলোক বিপড়োন আর না বিপড়োন, পণ্ডিত একটু বিপড়েছেন। পায়ে-চলা পথ ধরে মজাপুকুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গুম হয়ে থেকে বলেছেন, শুধু ভালোর খবরটাই বুঝি আপনাকে সাতখানা করে শুনিয়েছেন উনি, খারাপও তো কম বলিনি, সে-কথা বলেছেন ?

ধীরাপদর প্রথম মনে হয়েছে খারাপের ইঙ্গিতটা সোনাবউদিকে নিয়ে।···সম্ভব নয়। ওরই কাছে সে-রকম ইঙ্গিত করবেন রমণী পণ্ডিত অতটাই নির্বোধ নন্। সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে ধীরাপদ খুব শান্তমুখে আবার বলেছে, অন্যের খারাপ ভালোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকটাও একটু দেখা দরকার বোধহয়··· আপনার মেয়েটা এখনো ছেলেমানুষ একেবারে, একটু নজর রাখবেন।

রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে গেছেন। সুলতান কুঠির অন্ধকার আঙিনায় কালো মুখের থমকানি ভালো করে দেখা না গেলেও অনুমান করা গেছে। আর একটি কথাও বলেন নি, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। ফলে ধীরাপদর ধারণা, ভদ্রলোক সব জেনেই চোখ বুজে ছিলেন আর চোখ বুজে আছেন। মেয়ের চাল-চলন যে আরো কারো চোখে পড়েছে, চুপ করে থেকে সেই ধাক্কাই সামলেছেন শুধু।

নিজের ঘরে ঢুকে ধীরপদর মনে হয়েছে, না বললেই হত। রেস্তঁরায় যাদের সঙ্গে দেখেছিল মেয়েটাকে তাদের একজন তো আত্মীয়ই বটে। ছেলেমানুষদের নির্দোষ আনন্দ নিজের চোখের দোষে হলদে লেগেছে কি না কে জানে। মন বলছে তা নয়, তবু সঙ্কোচ।

অফিসের জন্যে তৈরি হয়ে বেশ সকাল সকালই বেরুতে হয় রোজ। হোটেলের 'কিউ'তে আটকালে খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি। কিন্তু বেরুবার মুখে বাধা, রমণীপণ্ডিতের দশ বছরের ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে এসে শেখানো বুলির মত বলে গেল, বাবা আপনাকে দয়া করে এক্ষুনি একবারটি আমাদের ঘরে আসতে বলেছেন—

ভালো করে শোনার আগেই বার্তাবহ অদৃশ্য।

পায়ে পায়ে কোণা-ঘরের প্রথম ঘরটিতে ঢুকেই ধীরাপদ হতভম্ব। দরজার কাছে কালো পাথরের মূর্তির মত রমণী পণ্ডিত দাঁড়িয়ে, অন্দরের জানালায় মুখ গুঁজে কুমু কান্নায় ভেঙে পড়ছে, পাশের ঘরের দরজার নিচ দিয়ে রমণী পণ্ডিতের রমণীটির পা দেখা যাচ্ছে।

ধীরাপদ নির্বাক।

এই, এদিকে আয় !

বাপের কঠোর আদেশে মুখে আঁচল গুঁজে মেয়েটাকে জানালা থেকে সরে আসতে হয়েছে। শাসন আর নির্যাতন যতটা হবার ধীরাপদর হুঁস ছিল না যেন। তারই দুই পায়ের ওপর মুখ গুঁজে মেয়েটা ফুলে ফুলে কাঁদছে। রমণী পণ্ডিতের দুই চোখে শাসনের তৃপ্তি এবং প্রতীক্ষা। যেন ধীরাপদর কাছেই মেয়ের সমস্ত অপরাধ, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত ক্ষমা নেই।

হাত বাড়িয়ে ধীরাপদ কুমুকে তুলতে চেষ্টা করেছে, মেয়েটা ওর পা দুটো আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে।

ওঠো—।

কণ্ঠস্বরে কাজ হয়েছে। কুমু উঠেছে।

যাও, ভিতরে যাও।

এই আদেশও পালন না করে পারেনি। চলে গেছে।

রাগে বিতৃষ্ণায় আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ধীরাপদ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। হনহনিয়ে সুলতান কুঠিও পেরিয়ে এসেছে। হোটেলের পথে না গিয়ে ক্যান্টিনের বাস ধরেছে। সারা পথ অনুশোচনা আর অস্বস্তি। মেয়েটার ওই অত কান্নার ফাঁকে ফাঁকেও যা চোখে পড়ছিল সেটা কী ? কুমু কাঁদছিল, কিন্তু আর কিছু যেন ব্যঙ্গ করছিল ওকে।

নীতির মুঠোয় যৌবন ধরে কোনদিন ?

সুলতান কুঠির বাইরে ছ'শ টাকা মাইনেটাই সবথেকে বড় ব্যাপার নয়, মর্যাদার দিকটা আরো বড়। সব শুনে চারুদি সাদাসিধে মন্তব্য করেছেন, মাইনে আরো কিছু বেশি হবে ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু মাইনের জন্যে ভাবনা নেই, মাইনে অনেক বাড়বে—দায়িত্বটাই আসল, সেটা যেন ও ভালোমত দেখেশুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

ধীরাপদ অবাক হয়েছিল, চারুদির স্বার্থের উৎসটা আজও ঠিকমত ধরা গেল না।

মর্যাদার আসন লাভ করা আর সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কিছু তফাত আছে। সেই তফাতটুকু ঘোচানো তেমন সহজ হচ্ছিল না ধীরাপদর।

ধুতি-পাঞ্জাবী পরে অফিস করবে না আর পাঁচজনের মত কোটপ্যাণ্ট চড়াবে, সেটাই এক সমস্যা ছিল। এ নিয়ে কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। শেষে ধুতি-পাঞ্জাবীই বহাল রেখেছে। মুখে কেউ কিছু না বললেও গোড়ায় গোড়ায় সেটা লক্ষণীয় হয়েছে। অবশ্য এই ধুতি-পাঞ্জাবী আগের ধুতি-পাঞ্জাবী নয়। সোনাবউদি মুখটিপে ঠাট্টাও করেছিল, ঘষলে-মাজলে চেহারাখানা খুব মন্দ নয়তো দেখি···।

ছোট সাহেবের ঘরের পাশেই আলাদা ছোট ঘর তার। ঘরের ভিতরে হাল-ফ্যাশানের অফিস-সরঞ্জাম, বাইরে নেম-প্লেট, দোরগোড়ায় টুলে সাদা উর্দির ওপর কোম্পানীর লাল ছাপ-মারা বেয়ারা।

প্রথম দিন স্বয়ং বড় সাহেব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন তাকে। বলা বাহুল্য, ধীরাপদ শুধু শুনেছে, বোঝেনি। ছোট সাহেবের নির্দেশ মতই কাজ করতে হবে তাকে। সাধারণ প্রচার-চাকচিক্য বাড়ানো, বিজ্ঞাপন দেখা, খবরের কাগজ সরকারী দপ্তর আর ড্রাগ হাউসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, কর্মচারীদের

হোমের বিধি-ব্যবস্থা তদারক করা—এক কথায় ছোট সাহেবের পরেই কোম্পানীর যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার তার।

ভারটা ধীরাপদর বুকের ওপর অনেকদিন পর্যন্ত গুরুভারের মত চেপে বসেছিল।

এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের কর্ণধার সিতাংশু মিত্র, প্রোডাকশানের অমিতাভ ঘোষ। কেউ কারো থেকে কম নয়। তবু মাইনে বা প্রাধান্ত বিচার করতে গেলে ফ্যাক্টরীর প্রধান ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ। তার মাইনে চোদ্দশ' টাকা, দাপট ফ্যাক্টরী জোড়া। সেই দাপটের কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশান আর প্রোডাকশনের সীমারেখা অবলুপ্ত। ফলে চিফ কেমিস্টের মেজাজের আওতায় কোনো কর্মচারীই নিরাপদ বোধ করে না খুব। ধীরাপদ শুধু এই একজনের অধীনে কাজ পেলে সব থেকে খুশি হত, নিশ্চিন্ত হত।

কিন্তু কাজের দিক থেকে তার সঙ্গে সামান্যতম যোগের সম্ভাবনাও দেখল না।

অর্গ্যানিজেশান চীফের সচেতন গাম্ভীর্যে সিতাংশু মিত্র ওকে সঙ্গে করে সমস্ত বিভাগগুলো ঘুরে দেখিয়েছে, অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারপর একে একে ফাইল চিনিয়েছে। প্রচারের ফাইল, বিজ্ঞাপনের ফাইল, খবরের কাগজের মন্তব্য সংগ্রহের ফাইল, সরকারী দপ্তর আর ড্রাগ হাউসের ফাইল, কর্মচারীদের ফাইল, মেডিক্যাল হোমের ফাইল। এত দ্রুত তালে, যে ধীরাপদর চোখের সামনে সবই ঘোরালো। কিন্তু ছোট সাহেবের ধারণা, সুপারভাইজারকে সব শেখানো হয়ে গেছে। সরাসরি কাজ চালান করেছে তারপর। এটা করুন, ওটা দেখুন, সেখানে যান, এই ঝামেলা মেটান, ওই রিপোর্ট দিন—।

ধীরাপদর হিমসিম অবস্থা। এক ঘণ্টার কাজ তিন ঘণ্টায় হয়ে ওঠে না, এক ব্যাপার তিন বার করে জিজ্ঞাসা করে আসতে হয়। ছোট সাহেব অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু গোপনও থাকে না খুব। নিজে ব্যস্ত থাকলে লাবণ্য সরকারকে দেখিয়ে দেয়, ওঁর কাছে যান, বুঝিয়ে দেবেন—

সে ঘরে না থাকলে লাবণ্য নিজেই ডাকে, কি আটকালো আবার, আসুন বলে দিচ্ছি—

বলে দেয়, বুঝিয়েও দেয়। আর ধীরাপদর মনে হয় তলায় তলায় হাসেও। নিজে সে কোনো কাজের ফাই ফরমাশ করে না, ঘরে ডেকেও পাঠায় না। তেমন দরকার পড়লে লাবণ্য নিজেই উঠে আসে, আলোচনার ছলে বক্তব্য জানিয়ে যায়।

তবু ধীরাপদর মনে মনে ধারণা, এখানকার যত সব নীরস ঝামেলার কাজগুলো ছোট সাহেবের নির্দেশে ওর ঘাড়ে এসে চাপলেও তার পিছনে এই রমণীটির হাত আছে। ধারণাটা একেবারে অহেতুক নয়। মেডিক্যাল হোমের রমেন হালদারের মুখে লাবণ্য সরকারের কর্তৃত্বের কথা শোনা ছিল। এখানে এই কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় কর্মচারীদের হাবভাবেও তার পরোক্ষ কর্তৃত্ব-প্রসঙ্গে এক-ধরনের বিদ্রূপাত্মক বিশ্বাসের আভাস দেখা গেছে।

পুরুষ রূপারসিক বলেই হয়ত জীবিকার স্থূল-বাস্তবে নারীর প্রভাব তেমন প্রীতির চোখে দেখে না।

—ছোট সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে আপনি যদি মিস সরকারকে একটু বুঝিয়ে বলেন ভালো হয়, তিনি বাধি [illegible] আটকাবে না।

বিনা নোটিসে দিন কতক কামাই করার ঝামেলায় পড়ে আবেদন জানাতে এসে একজন কর্মচারী নবাগত মুরুব্বিটিকে সাহায্যের রাস্তাও দেখিয়ে দিয়েছিল। ধীরাপদ বলেছিল, ছোট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করবে। জবাবে ওই উক্তি।

নতুন বয়লার চালানো নিয়ে অমিতাভ ঘোষের সেই টিপ্পনীও ধীরাপদ ভোলেনি।—তুমি বললে এখানে সব হবে, এভরিথিং ইজ, পসিবল।

কিন্তু বাহ্যতঃ তার প্রতি লাবণ্য সরকারের ব্যবহারে কর্তৃত্বের সামান্য আভাসও দেখা যায়নি এ-পর্যন্ত। বরং নিস্পৃহ গোছের প্রীতিভাবই লক্ষ্য করেছে একটু। ধীরাপদর বিশ্বাস, সেটা শুধু সমান মাইনের এই অপ্রত্যাশিত উঁচু আসনে ওকে এনে বসানো হয়েছে বলেই নয়। শুধু ছোট সাহেবের ওপর আধিপত্যের ফলেই তার ক্ষমতার ওজন এখনো অনেক বেশি। কিন্তু ওর বেলায় সেই ওজনটুকুও যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন, তার সম্ভবত অন্য কারণ।

কারণটা স্পষ্ট।

গত তিন সপ্তাহের মধ্যে চারুদি বার তিনেক ওকে টেলিফোনে ডেকেছেন। ধীরাপদর টেবিলে টেলিফোন আসেনি তখনো। এ ঘরে দুজনের টেবিলে দুটো টেলিফোন। ডাকটা প্রত্যেকবার লাবণ্যর টেবিল থেকেই এসেছে। বাইরের কল এলে ফ্যাক্টরীর অপারেটারই হয়ত ছোট সাহেবকে বিরক্ত না করে এই টেবিলে কানেকশান দিয়ে দেয়। চারুদির টেলিফোনের ফলেই ধীরাপদর সুপারিশের জোরটা লাবণ্য সরকার আঁচ করতে পেরেছিল বোধহয়। অন্তত সেই রকমই মনে হয় ধীরাপদর।

তাছাড়া মেজাজ পত্র ভালো থাকলে যখন তখন নিজের টেবিল থেকে টেলিফোন করে অমিতাভ ঘোষও। কখনো বলে, ফ্রী থাকলে চলে আসুন, কখনো বা টেলিফোনেই গল্প জুড়ে দেয়। ধীরাপদর ঘরেও এসে বসে মাঝে মধ্যে। ধীরাপদর টেবিলে তার প্রিয় সিগারেট মজুত থাকে এক টিন, সেই লোভেও আসে। লাবণ্যর চোখে সুপারভাইজারের পদমর্যাদার সঙ্গে এই মর্যাদাটুকুও যোগ হয়েছে। মুখ ফুটে একদিন জিজ্ঞাসাও

কবে ফেলেছিল, মিঃ ঘোষের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ছ'মাসের। ছ'মাসেরও নয় শুনে মনে মনে অবাক হয়েছে।

তাকে নিয়েও যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলে টেলিফোনে, টের পায় কিনা কে জানে। এরই মধ্যে একদিন টেলিফোন ধরে নাজেহাল অবস্থা ধীরাপদর। ওদিক থেকে চীফ কেমিস্টের হাল্কা প্রশ্ন, আপনার সামনে যে মহিলাটি বসে তার মুখখানা ভার-ভার কিনা দেখুন তো—

লাবণ্য সরকার মাথা নিচু করে লিখছিল কিছু. ধীরাপদ একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না। কেন ?

গলাটা ভার-ভার লাগল, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন। লঘু তাগিদ।

...দেখা শক্ত। না তাকিয়েও ধীরাপদ টের পেল, কলম রেখে লাবণ্য সরকার মুখ তুলেছে।

এদিকের লোকটা বিব্রত বোধ করছে অনুমান করেই যেন অমিতাভ ঘোষের ভারী আনন্দ।—শক্ত আবার কি। কি রঙের শাড়ি পরেছে, শাদা না রঙিন ?

টেলিফোন রাখতে পারলে বাঁচে ধীরাপদ। দিয়ে বলছি, কি কথা আছে বলুন।

কি-চ্ছু কথা নেই, বেজায় ফুর্তি, আপনি মশাই কোনো কাজের নন, দিন ওকেই দিন দেখি—

ধীরাপদ প্রমাদ গুণেছে। আপনা থেকেই সম্মুখবর্তিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে একবার। লাবণ্য সরকার তার দিকেই চেয়েছিল।

—এখন নয়, পরে করবেন। ওদিকের হাসির ওপরেই ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসেছে, ভরসা করে সামনের দিকে তাকাতেও পারেনি আর। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায়নি।

চারুদির সুপারিশ আর অমিতাভ ঘোষের হৃদ্যতার জোর যত বড়ই হোক, কাজ পাবার পর ধীরাপদ কাজের জোরের ওপরেই নির্ভর করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত মনটাকে দিবারাত্র ফাইলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেও সেই জোরটা তেমন পেয়ে উঠছিল না। যার ইঙ্গিতেই কাজ আসুক, ধীরাপদ মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে, মন দিয়ে করতে চেষ্টা করেছে। এখানে আসার পর একবার মেডিক্যাল হোমে হাজিরা দেবারও ফুরসত মেলেনি।

কিন্তু এত করেও ধীরাপদর নিজেরই এক একসময় মনে হত, সোনার দাঁড়ে কাক বসানো হয়েছে। মাসে ছ'শ টাকা মাইনে নেবার মত এখানে কি তার করার আছে বা কি সে করতে পারে, নিজে থেকে ঠাওর পেয়ে উঠত না।

এই অস্বস্তিটা দিনে দিনে বাড়ছিল।

কোম্পানীর কাজে না হোক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিমাংশু মিত্রর ব্যক্তিগত কাজে কিছুটা যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ ঘটল একদিন।

বড়-সাহেবের তলবে সেদিন সকালে তাঁর বাড়ি আসতে হয়েছিল। সামনে কোম্পানীর ছোট স্টেশন-ওয়াগন দাঁড়িয়ে। মনে যাকে আশা করেছিল ভিতরে ঢুকে তাকেও দেখল। অন্দর-মহলের দিকের সেই বসার ঘরের গদি-আঁটা বিশ্রাম-শয্যায় হিমাংশু মিত্র অর্ধ-শয়ান। বাহুতে ফেটি বেঁধে কানে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে লাবণ্য সরকার গম্ভীর মুখে তাঁর ব্লাড-প্রেসার দেখছে।

হিমাংশু বাবু ইশারায় বসতে বললেন ওকে। লাবণ্যর ছ' চোখ যন্ত্রের দাগগুলোর ওপর। তাঁর পাশেই একটা চেয়ারে ঝুঁকে বসে আছে, পাম্প করে পারা তুলছে, ছেড়ে দিচ্ছে।

হঠাৎই ধীরাপদ অস্বস্তিবোধ করতে লাগল কেমন। এই বাড়ির এই ঘরে, এক প্রবল পুরুষের এত কাছে ওইভাবে ঝুঁকে বসাটুকুর মধ্যে, এমন কি রক্ত-চাপ পরীক্ষার ওই নিবিষ্টতার মধ্যেও কিছু যেন আছে, যা দেখলে ছ' চোখে আকাঙ্খায় তাপ লাগে। হৃদপিণ্ড অশান্ত হয়। স্নায়ুতে স্নায়ুতে কানাকানি হতে থাকে।

পরীক্ষা করলে সেই মুহূর্তে ধীরাপদরও রক্তচাপ খুব কম হত না হয়ত।

প্রেসার দেখা শেষ করে লাবণ্য ওর দিকে একবার তাকালো শুধু। চেনে কি চেনে না। হিমাংশুবাবু উঠে বসে জামার গোটানো হাতটা টেনে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত ?

লাবণ্য ধীরেসুস্থে যন্ত্র গোটাচ্ছে, সামান্য হেসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, ঠিক আছে। ব্লাড-প্রেসার নিয়ে মেডিক্যাল হোমের পেসেন্টদের সঙ্গে তার অনেক হাল্কা মন্তব্য শুনেছে ধীরাপদ। যেখানে যেমন দরকার।

হিমাংশুবাবু ধীরাপদর দিকে চেয়ে হাসলেন ;—ও আবার আমাকে প্রেসার সব সময় বলে না, বললেও কমিয়ে বলে হয়ত, যদি নার্ভাস হয়ে পড়ি।

ভিতর থেকে সহজ হওয়ার তাগিদ, ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, আপনার শরীর অসুস্থ নাকি ?

ঝুঁকে সামনের সেণ্টার টেবিল থেকে পাইপটা হাতে নিলেন হিমাংশুবাবু। বললেন, অসুস্থ হতে কতক্ষণ, পাছে অসুস্থ হয়ে পড়ি সেই ভয়ে সপ্তাহে তিন দিন প্রেসার চেক করাটা ওরা দরকার মনে করে। মৃদু হেসে লাবণ্যর ডাক্তারী গাম্ভীর্যটুকু লক্ষ্য করলেন। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন।—যে জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম, তোমার লেখা-টেখায় বেশ হাত আছে শুনলাম ?

ধীরাপদ অবাক। বাড়িতে ডেকে পাঠানোর ফলে অনেক এলোমেলো সম্ভাবনার কথা ভেবেছে, এ প্রশ্ন কল্পনা করেনি।

যাই শুনে থাকুন, চারুদির কাছ থেকে শুনেছেন। ধীরাপদ হয়ত ফিরে জিজ্ঞাসাই করে বসত কোথা থেকে শুনেছেন। হিমাংশুবাবুর পরের কথা থেকে তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। ইংরেজি-বাংলা দুটো খবরের কাগজ শিল্প-বাণিজ্যের ওপর বিশেষ সংখ্যা বার করছে, এ দেশের ভেষজ-শিল্প প্রসঙ্গে লেখার জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে। সামনের টেবিলের টাইপ-করা কাগজ কটা এগিয়ে দিলেন তার দিকে—রচনার জন্য এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, আরো কিছু তথ্য লাবণ্য এবং সিতাংশু তাকে দেবে। সব নিয়ে বেশ ভেবে চিন্তে লিখতে হবে কিছু, বাংলাটা লেখা হয়ে গেলে ইংরেজি কাগজের জন্য কাউকে দিয়ে সেটা অনুবাদ করিয়ে নিলেই হবে।

আলোচনা শেষ। লাবণ্যকে নির্দেশ দিলেন, তাকে নার্সিং হোমে ছেড়ে ড্রাইভার যেন ধীরাপদকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

দোতালার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কেয়ার-টেক বাবু বিনম্র-নম্র

বসে নিজের চকচকে টাক-মাথায় হাত বোলাচ্ছিল। চকিত তৎপরতায় এগিয়ে এসে লাবণ্যর উদ্দেশে নিবেদন করল, অফিস-ঘরে ছোট-সাহেব একবার দেখা করে যেতে বলেছেন।

লাবণ্যর মুখ দেখে মনে হল, ছোট-সাহেব বাড়ি আছে তাই জানত না। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার মুখেও থেমে গেল।

আপনি গাড়িতে গিয়ে বসুন, আমি আসছি—।

ওদিকের হল-ঘরে ঢুকে গেল। নামতে গিয়ে সিঁড়িটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মনে হতে ধীরাপদর হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু নিচে সিঁড়ির ওধারে সবিনয়ে মানকে দাঁড়িয়ে। আসার সময় আবখানা ঝুঁকে ভক্তি জ্ঞাপন করেছিল, এখনও তাই করল। এই ক'দিনের আনাগোনায় বড় সাহেবের শুনজরের লোক ঠাউরেছে, তাই ভক্তিশ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে। ফিসফিস করে আরজি পেশ করল, কারখানার চাপরাশির কাজের কথাটা একটু বলে কয়ে দেবেন বাবু? সেই যে পেথম দিন আপনার সঙ্গে কথা হল—

মনে আছে। কিন্তু বলে কয়ে দেওয়াটা সম্ভব কিনা সেটা মানুকেকে বলা না বলা সমান।

বাঁধানো উঠোনে কোম্পানীর ষ্টেশান ওয়াগনের পাশে হিমাংশু-বাবুর লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেরুবেন হয়ত। ধীরাপদ বাইরেই চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। সপ্তাহে তিন দিন লাবণ্যর এখানে ব্লাড-প্রেসার চেক করতে আসার খবরটা জানত না।··চারুদি জানে?

মনের ওপর এই অশোভন আঁচড়টাই ফেলতে চায়নি। আপনি পড়ল। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালো, চারুদির চর নয় ও, হবেও না কোনকালে। কিন্তু চারুদি উপলক্ষ মাত্র, অন্তস্তলের নিভৃতে আকাঙ্ক্ষার জাল বুনছে কেউ। ভ্রূকুটি করে সরাসরি তার মুখের ওপর এক ঝলক আলো ফেলে তাকালো ধীরাপদ। রক্তচাপ-পরীক্ষারত নারীত্বের-রহস্যটি তখনো রেখায়-রেখায় সংগোপনে লালন করছে সেই অগোচরের ব্যক্তিটি। এই সামান্য প্রতীক্ষার অসহিষ্ণুতাও সেই কারণে। মনে মনে ধীরাপদ হিসেব করে ফেলল একটা, নিভৃতচারীর এই গোপন তন্ময়তা অনেক দিনের।

নিজেকে দেখো, নিজের বশে থাকো। ধীরাপদ স্বস্থ বোধ করল অনেকটা, নিজের বশে এলো। দশ মিনিট অপেক্ষা করছে, এবারে দুঘণ্টা অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই।

লাবণ্য সরকার নয়, হিমাংশু মিত্র বেরিয়ে এলেন।

ড্রাইভার অভ্যস্ত তৎপরতায় লাল গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।

তোমরা যাওনি এখনো? ষ্টেশান ওয়াগনের দিকে তাকালেন একবার, লাবণ্য কোথায়?

সিতাংশুবাবু ডেকেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন···

ঈষৎ বিস্ময়ে হিমাংশুবাবু বাড়িটার দিকে ঘুরে তাকালেন একবার, ছেলে বাড়িতেই আছে তিনিও জানতেন না বোধহয়। ভদ্রলোকের প্রসন্ন গাম্ভীর্যে এই প্রথম সম্ভবত বিরক্তির ছায়া লক্ষ্য করল ধীরাপদ। নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন তিনি, উঠতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন।

দুই এক মুহূর্তের নীরব দৃষ্টি বিনিময়। তুমি থাকো কোন দিকে?
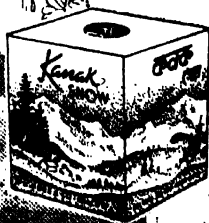
বলল।

এসো—

গাড়িতে উঠে বসলেন। বিব্রতমুখে ধীরাপদও। ড্রাইভার সশব্দে দরজা বন্ধ করল। গাড়িটা দু পাঁচ হাত ব্যাক করিয়ে স্টেশান ওয়াগনের পাশ কাটাতে হবে।

নিচের দরজার ওপর পাশাপাশি থমকে দাঁড়িয়ে গেল সিতাংশু আর লাবণ্য সরকার। হকচকিয়ে গেছে দুজনেই। হিমাংশুবাবু নির্লিপ্তমুখে তাদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন শুধু।

গাড়ি বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তায় পড়তে তিনি জানালেন, ওকে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি ছেড়ে দেবেন, সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সে যেন বাড়ি চলে যায়। এভাবে যখন যা ট্যাক্সিভাড়া লাগে মাসকাবারে বিল করে দেয় যেন, সকলেই তাই করে।

ধীরাপদর কেমন মনে হল, ওই দুটিকে একটু জব্দ করার জন্যেই বড়সাহেব এই ব্যাপারটা করলেন। পাইপ টানছেন, বিরক্তির ছায়াটা গেছে। আগের মতই সুশ্রী গাম্ভীর্য।

এক সময় বললেন, তোমার ওই আর্টিকল লেখা নিয়ে অমিতের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারো, দুই একটা ইন্টারেস্টিং অ্যানিকডোট হয়ত সেও বলতে পারবে, আগে তার এসবে খুব উৎসাহ ছিল, এখন অবশ্য—

কথাটা শেষ না করে সকৌতুকে ওর দিকে চেয়ে পাইপ টানলেন বার দুই, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখানকার কাজে ওর সাহায্য পাবে আশা করেছিলে, পাচ্ছ?

এই একজনের প্রসঙ্গে ওজন না করে কোনো কথা বলা নিরাপদ নয়, আগের বারের সাক্ষাতে সেটুকু উপলব্ধি করতে হয়েছিল। কাজের হদিস না পেয়ে এ পর্যন্ত ধীরাপদ অনেক দিনই অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব সময়েই আর পাঁচটা বাজে কথায় কাজের কথা ডুবে গেছে। বেশি বলতে গেলে সে বিরক্তিতে ধমকে উঠেছে, এখানে কাজ কেউ চায় না, ডোন্ট বদার—যা করতে বলে করে যান।

কিন্তু বড়সাহেবকে সেটা বলা যায় না। কুণ্ঠিত জবাব দিল, তাঁর সঙ্গে সে-রকম কথাবার্তা কিছু হয়নি এখনো।

হয়নি কেন, মুখ থেকে পাইপ নামালেন, কন্‌ট্রাকটিভ কিছু যদি করতে চাও, হি ক্যান্ হেল্প ইউ এ লট—করানো শক্ত অবশ্য, ব্যাট ওন্‌লি হি ক্যান—

প্রশংসাটুকু অকৃত্রিম। ধীরাপদর ভালো লাগল। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, সেও তোমাকে পছন্দ করে শুনলাম, বি ইন টাচ, হি রিকোয়ার্স কম্প্যানী···

খানিকক্ষণের নীরবতায় ধীরাপদর উৎকণ্ঠা গেল, জটিলতার সূচনা নয় কিছু। ভাগ্নের প্রসঙ্গে আর কিছুই বললেন না, চুপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। কিন্তু পাইপ টানার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার দেখছেন ওকে, কিছু ভাবছেনও হয়ত। চোখোচোখি হতে ঘুরেই বসলেন একটু, পাইপ হাতে নিলেন।—অনেক কাল আগে কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে, জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম··· দেখেছি?

হঠাৎ বিপাকে পড়ে গেল ধীরাপদ। এ-রকম একটা প্রশ্নের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না, বিব্রতমুখে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ, দেখেছেন বটে।

কোথায়? ঈষৎ উৎসুক।

চারুদির শ্বশুরবাড়িতে।

জবাবটা নিজের কানেই বড় বেশি স্পষ্ট ঠেকল ধীরাপদর। মোটা ফ্রেম-আঁটা গোটা মুখে বিস্ময় আর বিড়ম্বনার ব্যঞ্জনা। হাসি মুখে ভুরু কুঁচকে সরাসরি চেয়েই রইলেন ওর দিকে। স্মরণের প্রয়াস। স্মরণ হল বোধহয়। চারুদির শ্বশুরবাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ প্রেমিকের আনাগোনা নিয়ে দু'জনের মধ্যে তখন হাসাহাসিও হত কিনা কে জানে। হিমাংশুবাবু সামনের দিকে ঘুরে বসে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন, শেষে পাইপ দাঁতে চেপে বললেন, তাহলে ধরে নেওয়া যাক আগে আর দেখিনি।

অর্থাৎ এ নিয়ে ঘাঁটাঘুঁটি না করাই নিরাপদ ছিল। যতই বিব্রতভাব দেখাক, মনে মনে খুশি ধীরাপদও। ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়াল না। ধরে যা-ই নিন, আর যত বড় সাহেবই হোন, ওর সামনে আঠের বছর আগের অধ্যায়টি আর একেবারে বিস্মৃত হতে পারবেন বলে মনে হয় না। সেদিক থেকে ধীরাপদ অনেকটাই দূরত্ব লঙ্ঘন করে বসেছে।

নেমে যাওয়ার সময়ও তাঁর মুখের হাসির আভাসটুকু একেবারে মিলায়নি।

অফিসে সেদিন লাবণ্য সরকারকে বেশ একটু গম্ভীরই দেখাচ্ছিল। সকালে বড় সাহেবের বাড়িতে ওভাবে বিব্রত হওয়ার অপরাধটা যেন ধীরাপদরই। সমস্ত দিন চুপচাপ থেকে বিকেলের দিকে নিজেই ঘরে এলো। হাতে দু'তিন শিট টাইপ-করা কাগজ।

ধীরাপদ সকালের পাওয়া রচনা-সংক্রান্ত তথ্যগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল আর ভাবছিল কি-ভাবে কি লেখা যায়। লাবণ্য সরকার সামনের চেয়ারে না বসে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। কাগজকটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এগুলো আপনার কাজে লাগবে কি না দেখুন।

আপনি দিচ্ছেন যখন, কাজে লাগবে জেনেই দিচ্ছেন। সহজ বিনয়ে ত্রুটি নেই ধীরাপদর, বসুন—

লাবণ্য বসল না, দুই এক পলক চেয়ে থেকে বলল, সকালে এগুলোই ঠিকঠাক করে আনতে গিয়ে দেরি হয়েছিল, আপনি চলে গেলেন কেন?

ড'কলে না গিয়ে করি কি, কিন্তু এরই জন্যে দেরি নাকি! কণ্ঠস্বরে সহজ বিস্ময়, এই ব্যাপারে আটকে ছিলেন কি করে জানব, জানলে এড়ানো যেত—

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, আর্টিকল লিখব আমি, এই ব্যাপারের জন্যে হলে তোমার বদলে আমাকেই ডাকা উচিত ছিল ছোটসাহেবটির, অথচ আমিই রইলুম বাইরে দাঁড়িয়ে—।

এটুকুও উপলব্ধি না করার কথা নয় লাবণ্য সরকারের। আগে সামান্য কর্মচারী ভাবত যখন তখন যে-চোখে তাকাতো, দৃষ্টিটা প্রায় তেমনি। নির্লিপ্ত চোখে ধৃষ্টতার বহর দেখছে যেন। নিস্পৃহ শুভার্থিনীর মত ঠাণ্ডা পরামর্শ দিল, ভালো করে লিখুন, ভালো হলে আপনারও ভালো।

বিদ্রূপ গায়ে না মেখে ধীরাপদ ফিরে আগ্রহ প্রকাশ করল, ভালোর আশা দেখিনে, বলুন না···

নিস্পৃহতায় কাটল দেখা গেল একটু, টিপ্পনী কাটল, বললে ভালো হবে আশা করেন ?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, খুব করি।

আসবেন তাহলে এক সময়, দেখব···। কাজ আছে।

শিথিল চরণে দরজার দিকে এগোলো। এই মূর্তিতে সহকর্মিনীর থেকেও আর কিছুর জোরটুকুই যেন অনেক বেশি। নারীর প্রাধান্য বেশি। সেটুকুই দেখিয়ে গেল। যেতে যেতেও ওর অনুসন্ধানরত চোখ দুটোকে সেই প্রাধান্য বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন। চেয়ে থাকো, আমার জোরটা কোথায় চেয়ে চেয়ে দেখো।

ধীরাপদ চেয়ে ছিল, দেখছিল।

সকালে ছেলে লাবণ্য সরকারকে আটকে রেখেছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশু মিত্রর মুখের চকিত বিরক্তি ধীরাপদর দৃষ্টি এড়ায়নি। গাড়ি ছাড়ার মুখে দোরগোড়ায় এসে লাবণ্যও সেটুকু অনুভব করেছে হয়ত। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে এমন হবে ধীরাপদ কল্পনা করেনি।

ভাবছে। মহিলা হঠাৎ ওর ওপর এত বিরূপ কেন। ও কি করল ?

যতটা সম্ভব ভালো করেই খবরের কাগজের রচনা সরবরাহ করল ধীরাপদ। শুধু বাংলা নয়, ইংরেজিটাও সেই করে দিল। হিমাংশুবাবু এতটা আশা করেননি। ফলে এরপর এ ধরনের ব্যাপার মাঝেসাজে ধীরাপদর ঘাড়ে এসে চাপতে লাগল। এক-আধটা ভাষণ লিখে দেওয়া, ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সভা-সমিতিতে বিবৃতি পাঠানো। সেই প্রথমদিন ছাড়া সামনাসামনি আর প্রশংসা করেননি হিমাংশুবাবু। ধরেই নিয়েছেন ভালো হবে।

চারুদি সেদিন প্রশংসার ছলে একটু ব্যঙ্গই করলেন যেন। একথা সে কথার পর বললেন, তোমাদের বড়-সাহেব তো খুব খুশি দেখি তোমার ওপর, পাঁচ জায়গায় লিখেটিখে তাঁর খ্যাতি বাড়াচ্ছ···

খানিক আগেও আজকাল আর বেশি আসে-টাসে না বলে বক্রোক্তি শুনতে হয়েছে। অনুযোগের মুখে থেমে গিয়ে টিপ্পনী কেটেছেন চারুদি, অত সময়ই বা পাবে কি করে, কোম্পানীর কাজ, বড়-সাহেবের কাজ—ছোট-সাহেব আর মেম-ডাক্তারের কাজও কিছু কিছু জুটছে নাকি ?

ধীরাপদ পাল্টা ঠাট্টা করেছিল, এখনো জোটেনি, তবে জোটাতে চেষ্টা করছে বটে। লিখে বড়-সাহেবের খ্যাতি বাড়ানোর প্রসঙ্গে হাসিমুখেই ফিরে অনুযোগ করল, ঝামেলাটি তো তুমি বাধিয়েছ—আমি লিখতে পারি এ কথা তাঁকে কে বলেছে ?

আমিই বলেছি, চারুদির নিরীহ স্বীকার-উক্তি, তোমার সুবিধে-টুবিধে যদি হয়। তা ঝামেলা কিসের, বেশ তো সুনজরে এসে গেছ।

ধীরাপদ স্পষ্ট করেই বলে ফেলল, সুনজরে আসাটা তুমি তেমন সুনজরে দেখছ বলে তো মনে হয় না।

কলে পড়ে হেসে ফেললেন চারুদি, তা কি করব, একধার থেকে তুমি যদি এখন বক্তৃতা আর ভাষণ লেখো বসে বসে—এই সঙ্গে সেক্রেটারীর মাইনেটাও তাহলে তোমাকে দিতে বলো।

একটু থেমে ধীরাপদ বলল, এ-সব লেখা-টেখা আর আমার দ্বারা হবে না তাই বরং জানিয়ে দেব।

এ কথা বলবে নাকি তাঁকে ? চারুদির গলায় শঙ্কার রেশ।

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, বলবে। জানালো, লিখতে তো আর সত্যিই পারে না, রীতিমত পরিশ্রম হয়, আর কাজেরও ক্ষতি।

চারুদি বিব্রত বোধ করছেন বোঝা গেল। বিদ্রূপ প্রত্যাহারের চেষ্টা।—গোঁয়ারতুমি করে কাজ নেই, পরিশ্রম গোড়ায় গোড়ায়ই করতেই হয়। কিছু বলতে হলে অমিতের সঙ্গে কথা কয়ে নিও, সেই বলছিল···

অর্থাৎ আগের ওই অভিযোগ চারুদির নয়, অমিতাভ ঘোষের। ধীরাপদ ধাক্কা খেল একটু, কিছুদিন যাবত অমিতাভ ঘোষ ওর ঘরে আর আড্ডা দিতে আসছে না বা টেলিফোনে ডাকছে না মনে পড়ল। অথচ মনে মনে ধীরাপদ যাহোক করে তাকে ধরে বেঁধে কাজের আলোচনায় বসবে স্থির করেছিল। সেদিন মোটরে হিমাংশু বাবুর কথা ভোলেনি, এই কোম্পানীতে কাজ কিছু করার ইচ্ছে থাকলে সাহায্য একমাত্র সেই করতে পারে। ধীরাপদ বিশ্বাস করেছে, আর সাহায্যটা যেমন করে হোক আদায় করে নেবে ভেবেছে। কিন্তু এর মধ্যে তেমন অবকাশ পেয়ে ওঠেনি।

চারুদির বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে ছোট যোগাযোগ একটা। ফলটা সুবাঞ্ছিত মনে হল ধীরাপদর।

বাইরের ঘরের বইএর আলমারির পাশে ছোট টেবিলটার কাছে পার্বতী দাঁড়িয়ে। তার কানে টেলিফোন। কথা বলছে না, চুপচাপ কথা শুনছে।

এক নজরে মুখের ঋজু গাম্ভীর্যটুকু লক্ষ্য করেই ধীরাপদ অনুমান করেছে কার কথা।

পায়ের শব্দে পার্বতী ফিরে তাকালো। রিসিভারে একটা হাত চাপা দিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট অনুরোধ করল, একটু দাঁড়াবেন। রিসিভার মুখের কাছে এনে শুধু বলল, ছেড়ে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

ধীরাপদর মনে হল, অপর প্রান্তে যে আছে, এভাবে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে তার প্রস্তুত থাকার কথা নয়। একেবারে গল্পকারের সমাপ্তি। সামনাসামনি তার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল পার্বতী। টেলিফোন রেখে নীরবে একবার চোখ তুলে তাকালো শুধু, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল।

দু'-দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফিরে এলো। হাতে ক্যামেরা।

অমিতাভ ঘোষের সেই ক্যামেরা।

এটা দিয়ে দেবেন—

কাকে দিতে হবে বলল না, জানাই আছে যেন। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, অমিত বাবু বাড়িতেই আছেন এখন ?

ঘাড় নাড়ল। তারপর মৃদুগলায় জানালো, কাল অফিসে দিলেও হবে।

কাল নয়, অফিসেও নয়, চারুদির বাড়ি থেকে ধীরাপদ সরাসরি হিমাংশু মিত্রর বাড়িতে উপস্থিত। আসার উপলক্ষ যোগানোর জন্যে পার্বতীর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ভুলে থেকে থেকে ওই মেয়েটার কথাই ভেবেছে। ওকে দেখলেই আকাশের একরাশ মেঘের কথা মনে হয় ধীরাপদর। যে-মেঘ ত্রাসের কারণ সেই মেঘ নয়, যে-মেঘ আশ্বাস যোগায় সেই মেঘ। আর ভেবেছে, ক্যামেরাটা নিয়ে গিয়ে বার বার এ ভাবে ফেলেই বা আসে কেন অমিতাভ ঘোষ।

মানুকে জানালো, ভাগ্নেবাবু খানিক আগে গাড়ি নিয়ে বেরুলেন, বোধহয় খেতেটেতে গেছেন, এক্ষুনি ফিরবেন মনে হয়, কারণ তাঁর ঘর খোলা।

অর্থাৎ ফিরবার সম্ভাবনা না থাকলে ঘর তালা-বন্ধ থাকত। ধীরাপদ বলল, তাঁর ঘরেই তাহলে বসি একটু—

অমিতাভ ঘোষ নিচে থাকে জানত না। সিঁড়ির ডান দিকের বড় হল্ পেরিয়ে অমিতাভ ঘোষের ঘর। দরজা দুটো ভেজানো ছিল, মানুকে খুলে দিল।

আগোছালো ঘর। কোণের টেবিলে এক গাদা বিলিতি ডিটেকটিভ বই। টেবিলের পিছনের তাকে কতগুলো বিজ্ঞানের বই আর একটা ফোটো অ্যালবাম। ধীরাপদ চেয়ার টেনে বসল।

সামনের অবিন্যস্ত শয্যার ওপরেও আর একখানা অ্যালবাম। ঘরটা ওকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখে মানকে দোষ-স্খালনের চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি। বলল, ভাগ্নেবাবুর ঘর বারোমাসই এমনি থাকে—মেজাজ ভালো না থাকলে যে পরিষ্কার করতে আসবে তাকেই খেঁটিয়ে তাড়াবেন।

হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে অ্যালবামটা তুলে নিল ধীরাপদ। কিন্তু খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করতে হল আবার। না, মানকে লক্ষ্য করেনি, ভাগ্নেবাবুর মেজাজের কথা সবে শেষ করেছে।

চাঞ্চল্য গোপন করে ধীরাপদ বলল, তোমার কাজ থাকে তো যাও না, আমি বসছি।

তার দিকে চেয়ে মানকে বুঝে নিল গল্প জমবে না। বলল, যাই যাই, ফেরার-টেক বাবু সন্ধ্যে নিজে ভেজে হাতের কাছে খাবারটি না দেখলে আবার তো আমাকেই ধরে চটকাবেন। দরকার হলে ওই বেল টিপবেন—

সব ঘরেই বৈদ্যুতিক যোগ-ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছে ধীরাপদ। মানকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবাম খুলে বসল। পর পর লাবণ্য সরকারের ছবি কতগুলো। লাবণ্যর এ-মূর্তি ধীরাপদ দেখেনি। হাসি-খুশি-আনন্দ ভরা ছবি, এই লাবণ্য পদস্থ কর্মচারী নয়, বচন-কুশলিনী ডাক্তারও নয়। এই লাবণ্য একটি মেয়ে শুধু, ভর-ভরতি মেয়ে।

আবারও থামতে হল এক জায়গায়। চকিতে দরজার দিকে তাকালো একবার।

…লাবণ্যর ছবি শেষ হয়েছে।

এবারে পার্বতীর ছবি। গোটা অ্যালবামের চার ভাগের তিন ভাগই তাই।

কানের কাছটা গরম ঠেকছে ধীরাপদর। আর দেখা উচিত নয় ভাবছে, অথচ পাতা না উল্টেও পারছে না। দেখার অনমুভূত আকর্ষণ একটা, অজ্ঞাত তাগিদ। নানা ছাঁদে বন্দিনী ধীর গম্ভীর একখানি পার্বত্য যৌবন। কোনো কোনো ছবিতে রোদ-দাগানো মেঘের মত গাম্ভীর্যের ফাটলে ঈষৎ হাসির আভাস, প্রশ্রয়ের আভাস, কোনটিতে যৌবনের নির্বিকার প্রসারিত দাক্ষিণ্য শুধু। বেশির ভাগ ছবির পরিচ্ছদ-স্বল্পতা চোখে বেঁধার মত, আবার গোপন তৃপ্তিতে চেয়ে চেয়ে দেখার মতও। শেষের ক'টাতে সমুদ্র বেলায় আঁট কষ্টিউম পরা—কোনোটায় স্নান সেরে উঠে আসছে, কোনোটায় স্নানে নামছে।

অ্যালবাম যথাস্থানে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ধীরাপদ। অব্যক্ত অস্বাচ্ছন্দ্য একটা, অথচ অনাকাঙ্খিত নয়। বুকের কাছটা ধকধক করছে, কান দু'টো গরম ঠেকছে আরো, ঠোঁট শুকনো, খরখরে জিব।

অদূরে প্যাঁ-ক্ করে একটা শব্দ হতে ধীরাপদ নিজেই চমকে উঠলো। বেল সে-ই টিপেছে। দরজার বোতাম টিপে মানুকেকে ডেকেছে। মানুকে আসার আগে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

আর বসব না, যাই এখন…এলে বোলো, ক্যামেরাটা রেখে গেলাম।

মানুকেকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ধীরাপদ চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় এসে থামল।

[ক্রমশঃ।

শেষ সাধ

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

বজ্র যদি আলোই চোখে, আলো ;
শুধু হাসব, গান গাইব, তোমায় বাসব ভালো।
ঘৃণা করবে, চরম ঘৃণা করো,
হানবে আঘাত, হানো কঠিনতর—
অন্ধকারে তোমার পথে ধরবো শুধু আলো।

ঝড়ের রাতে না দিলে দ্বার খুলে,—
বাইরে একা দাঁড়িয়ে রব সকল দুঃখ ভুলে।
নাই বা পেলাম তোমার ভালোবাসা,
জ্বলছে বুকে একটি শুধু আশা ;
শয্যাখানটি আপন হাতে সাজিয়ে দিও ফুলে।

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু

পরবর্তী ঘটনাবলী

উনবিংশ শতক শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার নানাভাবে দেখা দিতে লাগল, সেই সময় রাজনৈতিক দিগন্তেও ডমরু নিনাদ শোনা গেল এবং তাতে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সবই স্থাপিত হয়ে গেছে। এগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের জন্য সমান ব্যবহার অর্জন অথবা বড় জোর ভারতে কোনপ্রকার পার্লামেণ্টারী সরকার স্থাপন। দরিদ্র কৃষককুলের পক্ষ থেকে পর্য্যাপ্ত সাহায্যও দাবী করা হয়। কিন্তু কার্যপদ্ধতি ছিল ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য তদ্বির করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে প্রতিনিধিদল প্রেরণ অথবা ভারতের জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। কিন্তু এই আন্দোলনও কমবেশী নরমপন্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৭০ অথবা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অথবা রুশীয় বিপ্লবী দলের আদর্শে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সকল যুবসংস্থা গঠন করেছিলেন তাদের কোন কর্মপন্থা ছিল না, যদিও দেশপ্রেমের আবেগের ব্যাপারে তারা উপরোক্ত রাজনৈতিক সংস্থাগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে যুবকদের মধ্যে এক নতুন ধরণের সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল, যার উদ্দেশ্য হল সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য ষড়যন্ত্র করা। বাংলায় প্রথম সংগঠনের সঙ্গে যাঁদের নাম জড়িত ছিল তাঁরা হচ্ছেন পি মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অন্যান্য অনেকে।

ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রে একই ধরণের ঘটনা সুরু হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলার বিপ্লব আন্দোলন প্রথম অবস্থায় মহারাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, যাদুগোপাল মুখার্জি, ১৩৬৩।) দুই প্রদেশের চরমপন্থীরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করেন এবং তাঁরা যুক্তভাবে প্রতিষ্ঠান থেকে 'মধ্যপন্থী' অথবা উদারনৈতিকদের কর্তৃত্ব দূর করতে সফল হলেন। বাংলা দেশ ২টি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল এবং বাংলা দেশের ঐক্যে এই ভাজন ধরায় ১৯০৫—৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে ব্যাপক আকারে জাতীয় আন্দোলন সূচিত হল। এর পূর্বে উপজাতি অথবা কৃষকদের অসংখ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তা কখনও ঐক্যবদ্ধভাবে হয়নি অথবা এমন খাতে প্রবাহিত হয়নি যাতে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মুক্তি দেখা দিতে পারে। বঙ্গবিভাগ-বিরোধী অথবা স্বদেশী আন্দোলনে বাংলায় এক নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন স্বল্পস্থায়ী হলেও তা থেকে স্থায়ী সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দেখা দিয়েছিল।

ভাষা

উনবিংশ শতকের সুরুতে বাংলায় প্রকাশিত বই-এর ভাষা কথ্যভাষা অপেক্ষা পৃথক ও অত্যন্ত সংস্কৃত শব্দবহুল ছিল। প্যারীচাদ মিত্র অথবা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও দীনবন্ধু মিত্র সহজ ভাষায় বিদ্রূপাত্মক রচনা অথবা বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখে সময় সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন।

জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে আর একটি চমৎকার ঘটনা বাংলাদেশে সুরু হল। রাজনারায়ণ বসু (১৮৭১), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৭৪) অথবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯২) ন্যায় নেতারা ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে হিন্দী ব্যবহারের প্রস্তাব করলেন। (স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা, সজনীকান্ত দাস, ১৯৪৯, পৃঃ ৫-৬)। স্বদেশী আন্দোলনের পর এই দিকে আরও এক বাস্তব চেষ্টা সুরু হল। শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি নিজস্ব পত্রিকা ডন ম্যাগাজিনে হিন্দী অথবা দেবনাগরী হরফে বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এই সময় একলিপি বিস্তার পরিষদ স্থাপন করলেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে পরিষদের নিজস্ব পত্রিকা দেবনাগর প্রকাশ হতে থাকল। এই দু'টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা লোকে একেবারে বিস্মৃত হয়েছে, কারণ সেগুলি তাদের সময়ের বহু পূর্বেই জন্মলাভ করেছিল।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনের বাহনরূপে সাহিত্যের প্রতি বাংলার আগ্রহের ফলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হল। শীঘ্রই চতুর্দিকে এর কার্যকলাপ প্রসারিত হল। বাংলা হস্তলিখিত পুঁথিপত্র সংগৃহীত হল, ঐতিহাসিক স্থান ও স্থানীয় প্রাদেশিক ভাষার সমীক্ষা সুরু হল। প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হল, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরিভাষা সৃষ্টি হল, সাহিত্যিকদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে লাগল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই এর বেশির ভাগ কাজ হতে লাগল। সুতরাং মোটের ওপর বলা যায়, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঠিক পরেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ দেখা গেল।

ব্রাহ্মসমাজ তার কার্যকলাপের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে আসামে উপজাতিদের কল্যাণ ও চাবাগিচার শ্রমিকদের (আসাম) অবস্থার উন্নতির কাজে লেগে গেল। কিন্তু তার প্রধান কার্যকলাপ ছিল নারীজাতির উন্নতি এবং শিক্ষাপ্রচার অথবা সমাজ সংস্কার। রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা ও কল্যাণজনক কাজ, যেমন, বন্যা অথবা দুর্ভিক্ষের পর সেবাকার্য, চিকিৎসা সাহায্য প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিতে লাগলেন।

পরে যে ক'জন বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা এইরূপ স্বেচ্ছামূলক সেবার দ্বারা দেশের উত্তরোত্তর আর্থিক অভাব অনটনের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করেছিলেন। একথা সত্য যে, স্বদেশী যুগের কয়েকজন বিপ্লবী নেতা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার ভাসা-ভাসা রকমে হতে পারে না। সুতরাং তাঁরা মনে করলেন, লোকের ধর্মীয় মনোভাব পুনরায় জাগ্রত করার মধ্যে এটা নিহিত আছে। এই চিন্তাধারার প্রকৃত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ। যখন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আশু ব্যর্থ হল

অথবা হতাশা দেখা দিল, যেমন স্বভাবত হয়ে থাকে, তখন বহু লোক গভীরতর সার্থকতা লাভের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন অথবা অনুরূপ সঙ্ঘের দিকে আকৃষ্ট হল।

জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুদের ধর্মীয় ঐতিহ্য কার্যত কিরূপ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল তা দেখাবার জন্য এখানে শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। অরবিন্দ লিখেছেন :

"পরাধীন জাতির পক্ষে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই প্রধান ও প্রথম কর্তব্য, তা যে কোন উপায়ে ও যে কোন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে হোক না কেন। এবং এই কর্তব্যের কাছে অন্য সব রকম কারণ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় মুক্তির কাজ এক বিরাট ও পবিত্র যজ্ঞ, এতে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও অন্যান্য প্রত্যেকটি ছোটবড় কাজ বড় অথবা সামান্য অংশ। আত্মত্যাগ থেকে আমরা স্বাধীনতার ফল চাই এবং দেশমাতৃকাকে আমরা তা উৎসর্গ করবো। যজ্ঞের লেলিহান অগ্নিশিখায় আমরা আমাদের যা কিছু আছে সব উৎসর্গ করবো এবং আমাদের রক্ত ও জীবন এবং প্রিয়জনদের সুখ দিয়ে তার তৃষ্ণা মেটাবো। দেবী দেশমাতৃকা বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ বলিতে তুষ্ট নহেন, যার দানের মধ্যে কুণ্ঠা আছে সে কখনও দেবতার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। প্রত্যেক বিরাট যজ্ঞেই রাক্ষস আছে, যারা যজ্ঞ ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করে, চারিদিকে ময়লা ছিটাতে চায়, শঠতা অথবা হিংসার দ্বারা হোমাগ্নি নিবিয়ে দিতে চায়। শান্তিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রহ্মতেজ দ্বারা এরূপ উপদ্রবকারীদের সম্মুখীন হওয়ার প্রচেষ্টাই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ; প্রাচীনকালে যখন রাক্ষসরা ভয়ংকর ও বদ্ধপরিকর হয়ে এগিয়ে আসতো, তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিরাও ক্ষত্রিয়দের ধনুর্বাণের সাহায্য না নিয়ে সেই হোমের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারেন নি। আমাদিগকে নেপথ্যে হলেও, ক্ষত্রিয়ের তীরধনু ব্যবহারের উপযোগী করে রাখতে হবে। রাজনীতি ক্ষত্রিয়দের পেশা এবং ক্ষাত্রশক্তি পিছনে না থাকলে সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রাম নিষ্ফল।

কোন ধর্ম সত্য আর কোন ধর্ম মিথ্যা, বৈদান্তিক মতবাদ তার ধার ধারে না। তবে যা সুনিশ্চিতরূপে ও কমবেশী দ্রুতগতিতে মোক্ষ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অন্তরের দিব্যানুভূতির দিকে নিয়ে যাবে তা বৈদান্তিক ধর্মের বিবেচ্য। আমাদের মনোভাব হবে রাজনৈতিক বেদান্তধর্ম। (দি ডকট্রিন অফ প্যাসিভ রেজিসট্যান্স, শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৪৮, পৃ: ৭৭-৭৯)।"

এই মনোভাব ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ যে রূপই হোক না কেন, সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও রাজনৈতিক কার্যকলাপে ধীরে ধীরে লোকের আগ্রহ বেড়েছে। এর ফলে সামাজিক সংস্কারের দিকে লোকের আগ্রহ কমে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জীবনধারার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক সমস্যাগুলির মূলেও দেখা গেল রাজনৈতিক পরাধীনতা। এই যুক্তি দেখান হয় যে ভারতবর্ষ পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে না পেলে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হবে না। এই ভাবে কালক্রমে লোকের আগ্রহের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন দেখা গেল, পরবর্তীকালের সীমিত লক্ষ্যের পথে না গিয়ে সেই সময়কার যা লক্ষ্য তা সাধনের জন্য ধর্মীয় আবেগকে নতুন দেশাত্মবোধের ফলে কাজে লাগানো সম্ভব হল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী

গান্ধীপন্থী আন্দোলনের গোড়ার দিকে ভারতে ডিউক অফ কনটের আগমন উপলক্ষে যে বয়কট আন্দোলন করা হয়, কলিকাতা সহর তাতে অভূতপূর্বরূপে সাড়া দেয়। অসহযোগ আন্দোলন অন্যত্র জোরদার হওয়ায় প্রথমে তা বাংলাদেশে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়নি। বাংলাদেশ তখন আর্থিক বয়কট এবং নিয়মতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ভারত সরকারের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের রাউলাট আইন রচিত হয় বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যে। যখন গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগিতার কার্যসূচী দেশের নিকট ঘোষণা করা হল তখন বাংলা দেশ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। কার্যসূচীটি অত্যন্ত নেতিবাচক ও নৈতিক উদ্দেশ্যপরায়ণ বলে প্রতিভাত হল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবী দলগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যে চেষ্টা করেছিল তারপর এই কার্যসূচী অনেকের নিকট যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ বলে মনে হল না।

বাংলা দেশকে যেরূপ অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশের মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। শুধু তাই নয়, বঙ্গবিভাগের পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। (ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড—রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৯৪৬) এবং তারপর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কারের সময় পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হয়। ভারতে জাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করাই এইগুলির লক্ষ্য।

প্যান-ইসলামীয় মনোভাব বৃদ্ধির ফলে বাংলা দেশের বিপিনচন্দ্র পালের মত রাজনৈতিক নেতারা খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে যুক্ত করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিপিন পালের মতে কয়েকজন মুসলমান নেতা প্যান-ইসলামইজম মতবাদ বিস্তারের জন্য খিলাফত আন্দোলনকে ব্যবহার করতেন এবং ইহা ভারতে জাতীয়তাবাদের শ্রীবৃদ্ধিতে অন্তরায় হতে বাধ্য।

প্রথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা দেশ অর্থাৎ তার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নতুন নতুন নেতার আবির্ভাব হল, কিছু সংখ্যক বিপ্লবী কর্মী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে গান্ধীপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের অসন্তোষকে রূপ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। এ পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলন ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের মত বাংলার মনকে উজ্জীবিত করতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাহিত্যে ও চারুকলায় যেমন সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে তা দেখা যায়নি। মেদিনীপুর জেলায় সরকার চৌকিদারী প্রথার স্থলে ইউনিয়নবোর্ড প্রথা চালু করবার প্রস্তাব করলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন হয়। মেদিনীপুর আপত্তি করেছিল।

কারণ প্রথম ব্যবস্থায় অবস্থার কোন উন্নতি হবে না, অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ়ভাবে চেপে বসবে। এই বর্জন আন্দোলন জয়লাভ করে এবং জেলায় সত্যাগ্রহ সংস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, এজন্তে এই জেলাটি এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে। দ্বিতীয় আন্দোলন হয় তারকেশ্বরে। পশ্চিমবঙ্গের এটি তীর্থস্থান, সেখানে মন্দির ও উহার সম্পত্তি নিকটবর্তী এক মঠের মোহন্তের অধীন ছিল। সংস্থাটি জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্ত এই আন্দোলন হয়।

পরবর্তীকালে ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজসাহী জেলার বুকুংসায়, যশোহরের বন্দবিলায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে, বরিশালের পটুয়াখালিতে প্রথম স্থানীয় কর ধার্যের বিরুদ্ধে অথবা মেদিনীপুরের স্তায় ইউনিয়নবোর্ড প্রথা চালু করার বিরুদ্ধে অথবা কয়েকটি বহুদিনের নাগরিক অধিকার পুনঃ প্রবর্তনের জন্ত স্থানীয় ভাবে সত্যাগ্রহ হয়। সুতরাং বলা যায়, এই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলোতে বাংলাদেশ এক ধরণের কুচকাওয়াজ ও অহিংস অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন কর্মীর আবির্ভাবের ফলে উপরোক্ত কয়েকটি আন্দোলন ঘটেছিল। যদিও এর কয়েকটি আন্দোলনে কিছু লোক এসেছিল বিপ্লবী দলগুলি থেকে, সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার জন্তে।

বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রতি পুরাতন ভালবাসা এবং নির্ভীক ও প্রকাশ্ত যুদ্ধ তখনও চলতে থাকলেও গান্ধীপন্থী সংগ্রাম ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবী কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে আপোস করলেও এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখায় অধিক আসন দখল করলেও তাদের দল যথাযথ রইল এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিয়মিত কার্যসূচীর বাইরে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে নতুন এক দল অহিংস রাজনৈতিক কর্মী হুগলী, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও অন্তান্ত স্থানের সুদূর গ্রামে গিয়ে গান্ধী-পরিকল্পিত গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তবে কংগ্রেস কমিটিসমূহের সংগঠন কাজ অপরের হাতে রইল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ রকম বিভিন্ন প্রবণতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্ত পরবর্তী ঘটনাবলীর পটভূমিকা তৈরী করা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যে শক্তি খোলাখুলি বামপন্থী অথবা শুধু কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্ত দায়ী, এখানে আমরা তার বিচার করতে পারি, পরবর্তীকালে শেষোক্ত মনোভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

যাই হোক, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন গান্ধীজী আইন অমান্ত আন্দোলন সুরু করলেন তখন এপ্রিল মাসের প্রথম কয়েক সপ্তাহে বাংলার সরকারী কংগ্রেস হেডকোয়ার্টার থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যায়নি। মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমান জেলা থেকে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেল, গত দশ বছর এগুলি গান্ধীবাদী গঠনকাজের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস শীঘ্র অনুরূপ কাজ আরম্ভ করলো এবং ২৪পরগণা জেলা ও মেদিনীপুরের কয়েকটি অংশে অনুরূপ কাজ সুরু হলো। আইন অমান্ত আন্দোলন সম্পর্কে দুইদলের

কার্যপদ্ধতি ও কর্মকৌশলের মধ্যে পার্থক্য ছিল. এটা সহজেই বোঝা গেল এবং কর্মীরা নিজেরাও স্পষ্টভাবে তা স্বীকার করলো।

শীঘ্র সরকারী নির্যাতন আরম্ভ হল এবং নির্বিচারে পাইকারীভাবে শাস্তি দেওয়া হতে লাগল। বিপ্লবী দল হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হল। চট্টগ্রামে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকারী অস্ত্রাগার আক্রান্ত হল এবং সহর ও নিকটবর্তী অঞ্চল এক সপ্তাহ অথবা আরো কিছু বেশী সময় বিপ্লবীদের অধীনে রইল। সরকারও হিংস্রভাবে পাল্টা আঘাত করলেন, কিন্তু ছাদাদার বিপ্লবীদের বীরত্ব বাংলার সব জায়গা থেকে সহানুভূতিসূচক সাড়া পেল। একমাত্র স্বদেশী যুগেই এইরকম দেখা গিয়েছিল।

সাহিত্য ও চারুকলা

রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসি তাহলে চারুকলা ও সাহিত্যের জগতেও আমরা সমান্তরাল ভাবে উন্নয়ন লক্ষ্য করতে পারবো। স্বদেশী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে বাংলার নতুন চারুকলার ধারা জাপান ও চীনের চারুকলা থেকে কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত বিস্মৃত ভারতের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে চারুকলা বলবৎ রয়েছে সেই সম্পর্কে এখন এক নতুন আগ্রহ দেখা গেল।

এমন কি, স্বদেশীযুগেও লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহ একটি ক্ষীণ নদীস্রোতের মত বয়ে চলেছিল। পণ্ডিতগণ রংপুর, রাজসাহী, বীরভূম, মালদহ ও বাংলার অন্যান্য জেলার গ্রাম্য উপভাষা অনুশীলন করেন, উহার ফল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা উহার রংপুর শাখার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লোকে কেমন ভাবে কথাবার্তা বলে, বসবাস করে, কি ভাবে দেবদেবীর আরাধনা করে সে সম্পর্কে লোকের মধ্যে ক্রমশ আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র একদল ভাবপ্রবণ পণ্ডিত, শিল্পী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং জনগণও এই ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহশীল হয়ে উঠলো।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে এমন চরিত্র আমদানী করা হল যাদের এ পর্যন্ত সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার ছিল না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথাকথিত পতিতাদের জীবন সম্পর্কে কাহিনী লিখলেন, তাঁর এই সময়ের একখানি বহু বিতর্কমূলক উপন্যাসে একজন পতিতাকে নায়িকারূপে চিত্রিত করলেন। তাঁর প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো অবশ্য পশ্চিম বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে নেওয়া। সমাজের শঠতা ও তার আনুষ্ঠানিক নৈতিকতার ভুয়া আদর্শবাদ অর্থাৎ সমাজের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের ফলে, প্রেম ও জীবনের প্রতি যাদের মমতা ছিল তাদের জীবন কি ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তার মর্মস্পর্শী কাহিনী তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিংশ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার সক্রিয় ভাবে যোগদানের পর এই দিকে নতুন কতকগুলি সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। স্বদেশী যুগে অথবা তার কিছু পরে সাহিত্যের ভাষায়ও সমান্তরাল ভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। কথ্য ভাষা থেকে এত কাল এটা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যে ও নাটকে কথ্য ভাষা অথবা কথিত ভাষায় লিখিত ভাষাকে সহজ করে লিখবার ঝোঁক প্রকট হয়ে উঠল এবং এটাই একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। স্বদেশীর পর প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যাপকক্ষেত্রে নতুন করে পরীক্ষা সুরু করলেন। মোটের ওপর সাহিত্যের ভাষাই নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকল। ১৯২১ ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গণ-রাজনৈতিক আন্দোলনের পর ক্রমশ কথ্য ভাষার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়ল।

সম্প্রতি পল্লীজীবন থেকে উৎখাত হয়ে বস্তিতে বাসা বেঁধে যাদের জীবন হয়ে উঠল একটানা দুঃখকষ্ট এবং বিয়োগ-ব্যথায় ভরপুর, কয়লাখনির সেই বাসিন্দাদের জীবন থেকে নতুন বিষয় নিয়ে কাহিনী লেখা হল। দাঁড়িমাঝি ও ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত নরনারীদের জীবনের কাহিনী অনুসন্ধানের দৃষ্টি নিয়ে উদ্ঘাটন করা হতে লাগল। (এ্যান একার অফ গ্রীণ গ্রাস—বুদ্ধদেব বসু ১৯৪৮) এভাবে পড়ুয়া বাঙালী পাঠক এমন এক শ্রেণীর লোকের জীবন সম্পর্কে পরিচিত হয়ে উঠলো, নিষ্ঠুর আর্থিক ও সামাজিক প্রথা যাদের জীবনে শোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা যেন প্রায় তাদের নিজেদের জীবন কাহিনী, সুতরাং তা তাদের মনে সহানুভূতির সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো।

মোটের ওপর এভাবে ভাষা ও সাহিত্য জীবনের দাবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হল, পূর্বে এরকম ছিল না। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সাহিত্য কয়েকজনের একচেটিয়া জিনিষ ছিল। সংস্কৃতি ছিল বটে কিন্তু সেই সংস্কৃতির বাহন ছিল মুখে মুখে, পেশাদার চারণ-কবি, গল্প-কথক ও নটেরা পুরুষানুক্রমে তা পরিবেশন করে আসছিল। কিন্তু ছাপাখানা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করে তোলায় সাহিত্যিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্বেকার যে ব্যবধান ছিল তা ক্রমশ ভেঙ্গে যেতে লাগল। সাহিত্য শুধু মানুষকে নৈতিক পর্যায়ের পথই দেখিয়ে দেবে না, অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীদের মনে যে ভাবে প্রতিফলিত হয় সেভাবেই সাহিত্য জীবনচিত্র হয়ে দাঁড়াল। এই চিত্রশিল্পীর মন সহানুভূতি আর আদর্শে আলোকিত হল। জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে লোকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল সাহিত্যে সেই একই ধরণের বস্তুর প্রতিফলন হল।

একই সময়ে সাহিত্যে ও অন্যান্য চারুকলায় একটি বিদ্রোহ, ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দেখা যেতে লাগলো। স্বচ্ছ, সুসংবদ্ধ রচনার পরিবর্তে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন ধরণের পরস্পরবিরোধী আলেখ্য দেখা দিল। বাংলার বিগত দু'দশক সম্পর্কে শুধু নয়, বর্তমান সময় সম্পর্কেও এটা সমানরূপে সত্য। টি এস এলিয়ট অথবা আরও সাম্প্রতিককালের অডেন, স্পেণ্ডার ও জয়েসের অনুরাগী পাঠক বাংলা দেশে মেলে; এর আগের সময়ে টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কি, ইবসেন, মোপাসাঁ ও ন্যুট হামসুনের সমাদর ছিল। অতীতের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এটা প্রতিবাদ শুধু নয়, সাধারণ মানুষের উদ্দীপনার উচ্ছ্বাস এবং তার প্রবৃত্তির আবেগও বটে।

অধিকতর সন্তোষজনক কিছু গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ অপেক্ষাও অতীত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার আকাঙ্খা তীব্রতর হল। এর ফলে যারা সমাজজীবনকে অতীতের আবর্জনামুক্ত করতে চাইলেন এবং আবিষ্কার করলেন যে, এই আবর্জনাস্তূপ এত বেশী যে শেষ পর্যন্ত তাদের নৈরাশ্য ও নিষ্ফল বিদ্রোহ ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হবে, সাহিত্য ক্ষেত্রেও আন্দোলনে তাদের সেই মনোভাব স্থান পেল।

উপরোক্ত মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কলাবিদ্যার ক্ল্যাসিসিজম-এর দিকে প্রতিকূল আন্দোলন দেখতে পাই। ভারতনাট্যম্ অথবা কথাকলি, কাজরী অথবা মণিপুরী রাস প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল নৃত্য সম্পর্কেও লোকের নতুন আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে মনে হয়। যামিনী রায় অথবা নন্দলাল বসুর মত শিল্পীরা দ্বি-মাত্রিক পট চিত্রনশিল্পকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত আগের চেয়ে অনেক বেশী সমাদৃত হয়েছে। বোধ হয় ছাপাখানা এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে রেডিও ও এমপ্লিফায়ারের প্রবর্তনের ফলে অধিক সংখ্যক শ্রোতার যোগদান সম্ভব হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন একটা অধ্যায় গিয়েছে যখন ভারতীয় সংস্কৃতিকে মসীলিপ্ত করে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে লোকে অতীতের একটা মনোরম চিত্র তুলে ধরেছে। অতীতের দিকে এই প্রত্যাবর্তন কেবল আত্মরক্ষার উপায় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। পশ্চিমের উৎকর্ষতার যে মূল্যবোধ আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতকে দেখান হয়েছিল তারই ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এই আত্মরক্ষার চেষ্টা। যাতে করে মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ভারতীয় সভ্যতার রক্ষকগণ অন্তরে অন্তরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী দলের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

পুরাতন কৃষ্টি অথবা লোক-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের তৎকালীন পুনরুজ্জীবনের ভিতর চারুকলার কাঠামোরূপে এগুলোর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রতি একটা প্রকৃত আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পুরাতন টেকনিক অথবা নৃত্য, নাটক অথবা চিত্রকলার অধিকতর সরল কাঠামোর মাধ্যমে প্রদর্শিত মানুষের সাধারণ আনন্দ, দুঃখ, ভয়, ভালবাসা প্রত্যক্ষ করা যায়। যাতে করে চারুকলার দু'টি কাঠামো—ক্ল্যাসিকাল ও সাধারণ জীবনের আবেগগুলোর প্রকাশের মাধ্যমরূপে তাদের যোগ্য আসন লাভ করেছে।

সাধারণ মন্তব্য

এই সকল বিরোধও কখনও কখনও সাহিত্য ও চারুকলায় এবং সামাজিক অথবা রাজনৈতিক জীবনে সমান্তরাল অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবন এক নতুন মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছে, অতীতের আচার অনুষ্ঠান, অথবা সাম্প্রতিক কালের শোষণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চাপে পড়ে এই মর্যাদা মানুষকে কোনদিন দেওয়া হয়নি। মানুষের মনে আজ যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মনিরপেক্ষ আগ্রহের উদয় হয়েছে এবং যে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সময়ে লোকে একটা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতো এখন সেগুলো জনসংগঠনের এবং প্রমোদ অনুষ্ঠানের বাহন হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে ইতিপূর্বে তাদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু আজ তাদের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। চারুকলার উদ্দেশ্য আজ প্রাধান্য লাভ করেছে, আগে যেখানে ছিল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য। সার্বজনীন পূজা নামে যে সামাজিক ধর্মীয় উৎসবগুলো আধুনিককালে নতুন রূপ পেয়েছে সেই সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বহুবিধ বন্ধনের শৃঙ্খল থেকে জীবন আজ মুক্তিলাভ করেছে, একথা সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা আজ প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছেনি সত্য, পুরুষের তুলনায় নারীর জীবনের ক্ষেত্রে একথা আজ বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য এবং যেহেতু সেই বন্ধন আজও বাংলার জীবনধারাকে অংশত জর্জরিত করছে। সেই কারণেই রাজনীতিতে, সামাজিক চিন্তাধারা এবং চারুকলায় নতুনভাবে গড়ে তোলার মনোভাবের পরিবর্তে একটা বিদ্রোহের ভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। তথাপি আজ দেখা যায়, এখানে জীবন তার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পুরানো থেকে গৃহীত কাঠামো ও নতুন সৃষ্টির দ্বারা নতুন প্রকাশের জন্য সংগ্রাম করছে এবং ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এরকম কতকগুলো প্রবণতাও পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে।

সমাপ্ত

অশ্রুমতী

জগন্নাথ ঘোষ

নিভাতেই নষ্ট হল যে মেয়েটি ইচ্ছার আগুনে,
সর্বাঙ্গে অঙ্কিত তার মূর্তিমতী বিষাদ যৌবন।
দর্পণে দেখেছে মুখ। স্বপ্নের কুহকে ভরা মন
এঁকেছে অপূর্ব ছবি প্রতীক্ষার মায়াজাল বুনে।

আঁধারে আবৃত হল। পেল না সে প্রণয়ের স্বাদ।
অরূপ লাবণ্যে মাখা কুমারীর মুগ্ধ নীল চোখে
নিটোল মুক্তার বিন্দু। নিত্যবহা বন্যার শোকে
অশ্রুমতী রূপ নিল। জলকন্যা হবে তার সাধ।

অধোমুখী আকাঙ্ক্ষার পদ্মপাতা ছিঁড়েছে গোপনে।
অধরে বিম্বিত রেখা। শুনেছে সে-প্রেমিকের নাম।
প্রতিধ্বনি হৃৎপিণ্ডে। রক্তে তার বয়ে অবিরাম
করুণ কান্নার কলি। কোন্ ব্যথা বাজে তার মনে।
সে জানে না ইচ্ছা তার। প্রেমিকের নিভৃত আশ্রয়
পেল না সে এক মুঠো। প্রেম তার হল না অক্ষয়।

ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

অভিনয়ের সময় কথা বলবার কৌশল শেখালেন—কথা যখন বলবে তখন ঠোঁট বা গলা থেকে নয়, বলবে বুক থেকে। আর যখন আরো গভীর কথা বলতে চাও তখন বলবে পেট থেকে। আমি ত ঠোঁট থেকে কথাই বলতে পারি না।

চাণক্যর কথাগুলো—'নর্দমার পচা-পাঁক' কি 'বদ্ধ জলার ওপর ধোঁয়া উঠছে' ওগুলো পেট থেকে বললে খুব ভাল শোনায়। এদিক থেকে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দানী বাবুর।

দেখ, আমি যখন এই সব নাম বলি, তখন ধরে রাখবে গিরিশ বাবু অলওয়েজ একসেপ্‌জাইড। ওঁর সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। অমৃতলাল বোসের কাছে শুনেছি যৌবনে কণ্ঠ ছিল নাকি অতুলনীয়। তারপর এক সময়ে কি জন্যে জানি না উনি নাকি গলা দিয়ে দেন।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আমার মনে হয় অপরিমিত মদ্য পানের ফলে ওঁর গলা নষ্ট হয়ে যায়। ওঁর মদ খাওয়া কি সাধারণ খাওয়া!

একবার ছোটবেলায়—তখন আমার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ—গিরিশ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিলেন একজন বয়স্ক লোক। আমাদের সামনেই গেলাস এলো, চেহারা দেখে তখন মনে হয়েছিল বুঝি লাইমেড খাচ্ছেন, এখন বুঝি। সঙ্গের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করাতে তিনি ইনডাইরেক্টলি বললেন—মদ-টদ হবে। তিনি বলেছিলেন—ব্র্যাণ্ডি, এখন বুঝি ওটা ব্র্যাণ্ডি নয় হুইস্কি।

তা এই রকম এক ঘণ্টায় তিনবার খেলেন, মানে মোট পরিমাণ সাড়ে আট আউন্স হবেই। এক ঘণ্টায় সাড়ে আট আউন্স, তাহলে সারাদিনের পরিমাণটা ভাবো একবার! অমৃতলাল বোসের লেখায় চার ছিলিম গাঁজা, দু' বোতল হুইস্কি আর এক ডজন বিয়ার খাবার কথা আছে।

গিরিশ বাবুর উচ্চারণ মোটামুটি ভালই ছিল। দু'একটা উচ্চারণের ভুল এখনো মনে আছে। একটা হ'ল মুন্ত্রী—মন্ত্রী উনি কিছুতেই বলতে পারতেন না, বলতেন মুন্ত্রী। আর একটা হ'ল—কুহক। ওটাতে আমারই গোলমাল হয় কুহকীর কুহকে পড়ে গেছি আর কি।

উচ্চারণ ভাল করতেন অমৃত মিত্তির আর অর্ধেন্দু বাবু। অর্ধেন্দু বাবুর ত কোন দোষই ছিল না।

থিয়েটারের সঙ্গে পানদোষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অমন যে হেনরী আরভিন, যিনি আয়রণ ডিসিপ্লিন মেনটেন করতেন, তিনি পর্যন্ত প্রচুর মদ্যপান করতেন। শোনা যায়, একবার এমন অবস্থা যে দাঁড়াতে পারছেন না, অভিনয় কিন্তু ঠিকই করছেন। অভিনয়ের পরে কার্টেন কলে ঠিকমত যেতে পারবেন কিনা সবাই ভাবছে, কিন্তু ঠিকমত গেলেন, একই ভাবে হাঁটু মুড়ে বাউ করলেন। একবার দু'বার করে পাঁচবার গেলেন। শেষবার ফিরে আসতেই দু'পাশ থেকে দু'জন ধরে ফেললে, কারণ আর চলবার অবস্থা ছিল না।

আরভিনের চেহারা ভাল ছিল না, গলা ছিল শ্রিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকেই পার্সনালিটি কেমন প্রোজেক্ট করতেন।

ভগবান সব বড় অভিনেতাকেই বড় বড় চোখ দিয়েছেন, কেবল আমাকেই বঞ্চিত করেছেন! তবে তা নিয়ে দুঃখ করলে চলবে না, যা আছে তাকেই ফোটাতে হবে।

আলো সম্বন্ধে বললেন—আলো সাধারণ আলোই ভাল। স্পট দিলে এক জনের মুখে আলো পড়ে বটে অন্যজনের মুখে অন্ধকার হয় আর তাহলে তার মুখের রি-অ্যাকশানটা বোঝা যায় না। তার চেয়ে ওয়াইড ফ্লাডলাইট ব্যবহার করা অনেক ভাল।

ডিমারের কথা বলায় বললেন—ডিমার ত আমারও ছিল। ডিমার করতে আর কত খরচ পড়ে? একশো সাতাশী, দুশো সাতাশী, তিনশো সাতাশী টাকার মত হবে! তবে পয়েন্টের ডিমারের চেয়ে জলের মধ্যে দিয়ে ডিমার ইউজ করার ফল অনেক ভাল হয়।

২৫শে এলেন সাধারণ রিহার্স্যাল দিতে। প্রথমেই বললেন, মালিনী নাটক আমাদের ভালই হবে, তবে অনেক দিন রিহার্স্যাল দিতে হবে। মেয়েদের পার্ট দুটোয় খুব সুন্দর মানাবে তারকী আর কঙ্কাকে। ছেলেদের নিয়েই ভাবনা। সে রকম ভাল ছেলে কই? রবীন্দ্রনাথের লেখাতে ছোট ছোট চরিত্রগুলোও বেশ কঠিন। সুপ্রিয় চরিত্র কে করবে? ক্ষেমঙ্করের চরিত্রে ত লেখক নিজেই জোর দিয়ে গেছেন।

সীতাতে আমার লাভ হল না। অথচ মাসের পর মাস ৫৲ ৭৲ টাকা টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। এমন অন্য কোনো বইয়েতে দেখিনি। লাভ না হবার কারণ লোকে প্রচুর ঠকিয়েছিল। তাছাড়া মিসম্যানেজমেন্ট আর চুরিও ছিল।

আবার বলব—ঐ যে মনোমোহনে ছিল, গলাবন্ধ কোট পরত, সীতার সিনের জন্যে পুরোনো কাঠ আমাকে এনে দিলেন, চাইলেন দশ হাজার টাকা। আমি দিয়ে দিলুম। তখন কি জানি, মনোমোহন থিয়েটারের পুরোনো সিনগুলো আমায় বেচে দিয়েছেন।

আমি যখন মনোমোহন থিয়েটার থেকে চলে আসছি তখন মনোমোহন বাবু বললেন—ওগুলো তোমায় ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল।

আমি বললুম—সে কি? ওগুলো ত আমি কিনেছি।

উনি বললেন—কিনলে কি রকম? কাঠগুলো দেখো ত?

দেখি, সত্যি সত্যি সব পুরোন কাঠ, মানে পুরোনো সিন কেটে করে দেওয়া।

মনোমোহন থিয়েটার থেকে আমাকে উঠিয়ে দেবার জন্যে কত রকম চেষ্টা হ'ল। কর্পোরেশন থেকে বাড়িটা কনডেম করা হ'ল। অত বছর ধরে অত লোক যেখানে বসে থিয়েটার দেখেছে, সেটার মধ্যে অনেক রকম দোষ দেখানো হ'ল। দাশ সাহেব থাকতে অবশ্য পারেনি, কিন্তু যা চেঞ্জ করতে বললে, তা কনডেমনেশানেরও বেশী।

হরিপ্রিয় আমাকে বললে—ওবাড়ি লোক বসিয়ে ভাঙা যায় নাকি? শাবল দিয়ে ভাঙতে পারে কিনা দ্যাখো ত! তুমি কেস কর, আমরা তোমার হয়ে সাক্ষী দেব।

শাশুড়ীর শিক্ষা

ভাই বকুলফুল,

বউ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করেছ। কথাটার সোজাসুজি উত্তর আমি দেবো না। একটা ঘটনা লিখছি তার থেকেই বিচার করো বউ ভাল না মন্দ।

তপুতো কি কাণ্ড করে বিয়ে করলো তা শুনেইছো। কাউকে জানানো নেই কিছু না, হঠাৎ সাদাসিধে বিয়ে করে বসলো আমার উপর রাগ করে। আমার কত সাধ ছিল ব্যাকপাইপ বাজিয়ে তপু ঘোড়ায় চড়ে বৌ আনবে। উনিতো আমায় জুড়িগাড়ী চেপে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছিল শুনি? ছেলে বেঁকে বসলো ও ভাবে বিয়ে সে করবে না—আমরা নাকি সেকেলে। সেকেলে বৈকি! আটান্ন বছর বয়সে কি একেলে থাকবো নাকি?

যাই হোক, বউ দেখে আমি সেকেলে মানুষ, কি রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। দেখলুম বউ আমার ওপর এক বিঘৎ ঢ্যাঙা (আজকাল ঢ্যাঙা হওয়া নাকি সুন্দরের লক্ষণ), ময়লা রঙ (এটাও আজকাল চলে), একটু রোগাটে—যাকে আধুনিকারা 'সিলিন' মা কি বলে ইংরিজিতে—তাই। গলার স্বর অবশ্যি বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ মিষ্টি। গানটানগুলো বাপমা খুব চর্চ্চা করিয়েছে নিশ্চয়ই।

উনি অসুখ থেকে তখন সবে সেরে উঠছিলেন। খাওয়া নিয়ে সারাক্ষণ খিটমিট করেন। সব খাবার দাবারই ওঁর পানসে লাগে! আমি একবারে তিতো বিরক্ত হয়ে ঝালের ঝোল রেঁধেছিলুম—আজ খান খাবেন নয়তো এবার থেকে রান্না করাই ছেড়ে দেবো।

বউমা প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ওর খাবার থালাটা ধরে দিলুম বিছানার পাশের টেবিলে। উনি ঝোল মুখে দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছি, ছি, কি লজ্জা বলতো ভাই বকুলফুল নতুন বউমার সামনে। উনি আরও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'পঁয়ত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও রুগীর পথ্য রাঁধতে শিখলে না?'

আমি চোখের জল ফেললুম। পাশের ঘরে গিয়ে বউমাকে বললুম—'কি রকম খিটখিটে মানুষটি দেখেছো তো? পারবেতো ঘর করতে মা?' বউমা হাসল। তারপর কাচু মাচু মুখ করে বললো। 'একটা কথা বলবো?'

'বলো'

'কাল আমি রাঁধবো বাবার তরকারী?'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম—

'বলো কি বউমা, রান্নাবান্না জানো কিছু?'

'হুঁ, আমার মা'তো অনেক রকম রান্না আমায় শিখিয়েছেন।'

পরদিন আমি গেলুম কালীঘাটে পুজো দিতে আর বউমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসলো। তপুকে লিষ্টি করে দিল বাজার থেকে কি সব আনতে। বাড়ি ফিরে দেখি এলাহি কাণ্ড, রান্না ঘরের ভোলই পালটে গেছে—সব সাজানো গুছানো। উনুনের পাশে একটা নতুন কেরোসিন ষ্টোভ। এর মধ্যেই পাঁচখানা তরকারী সাড়া, উনুনে ভাত ফুটছে। তরকারীর রং দেখে জিজ্ঞেস করলুম—'বাঃ এমন রং বার করলে কি করে বউমা?' বউমা কিছুটি না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। বুঝলুম মার কাছে শেখা গুপ্ত মন্তর আছে বলবে না।

ওঁকে প্রথমে ঝোল ভাত দেওয়া হ'ল কি বলেন দেখার জন্য। প্রথম গ্রাসেই মুখে হাসি ফুটলো—'বাঃ, আজ রান্নাটা যেন অন্য রকম লাগছে।' বউমা একে একে পাঁচটা তরকারী ধরে দিল। উনি চেঁছে-পুঁছে সব খেয়ে আরামের ঢেকুর তুলে বললেন 'এত খেয়ে ফেললাম—একটু জোয়ানের আরক দাওতো গো।'

বউমা বাধা দিল—'না না ও সব খাওয়ার দরকার নেই। আমার বাবাতো আপনার চাইতেও বড়, কিন্তু বাবাকে ও সব খেতে হয় না। আমার মা বাবার সব রান্নাই একটু হাল্‌কা করে 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধেন। আমাদের বাড়ীর সব রান্নাই 'ডাল্‌ডা'য় হয়।

'কি বললে বাছা?' আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'ডাল্‌ডা' বনস্পতি? তা' আমাদের লুচি-টুচিতো বনস্পতিতে ভাজি আজকাল। ডিমের আমলেটও ওতেই হয়। আর কি বলে—সুজির হালুয়াও।'

'শুধু জল খাবার কেন মা, আজকালতো অনেক বাড়িতেই সব কিছু 'ডাল্‌ডা'য় রান্না হয়। আজ যে পাঁচটা তরকারীই 'ডাল্‌ডা'য় রেঁধেছি, তাতে কি স্বাদ খারাপ হয়েছে?'

উনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'না, না, বরং খুব ভাল হয়েছে। বউমার কাছে থেকে 'ডাল্‌ডা'র তাক্‌বাগ্‌-গুলো জেনে নাওতো গো।'

বউমার গুপ্ত মন্তরটি জেনে নিয়ে খাসা রান্না করছি আজকাল উনি সেরে উঠেছেন। খেতেও পারছেন প্রচুর। বউমা যে শুধু শ্বশুরকে বশ করছে তা-ই নয়, চিরকেলে খুঁৎ কাড়া শাশুড়ীও বশ মেনেছে! কি বল ভাই, বউ মন্দ না ভাল?

হ্যাঁ, আর মাথা খাও ভাই বকুলফুল, তোমার ঐ খিটখিটে বুড়োকে আমার বউমার 'ডাল্‌ডা' বনস্পতিতে রাঁধা রান্না খাইয়ে দেখ একবার—হাতে নাতে ফল পাবে।

তোমার বকুলফুল সই

কিন্তু তার আগেই আমাকে বাড়ি ছাড়তে হল ; আর আমি ছাড়া মাত্র কনডেমনেশান উইথড্রন হ'ল।

মহেন্দ্র বাবু আমার গ্যারান্টর ছিলেন, ওঁর সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট লেখা ছিল, উনি বললেই আমি বাড়ি ছেড়ে দেব।

আমার সঙ্গে মনোমোহন পাঁড়ের যখন গোলমাল আছে, তখন মনোমোহন বাবু হঠাৎ ওঁর ছেলেদের গিয়ে কি বোঝালেন, তারাও আমায় এসে বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন। আমিও ছেড়ে দিলুম।

থিয়েটারটা কিন্তু ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ভাঙত না। পার্ণার মা বমপাস—ওদের চিফ আর্কিটেক্ট—আমায় বললেন—ও বাড়ি আমরা ভাঙতে চাই না। আমাকে ইকুইভ্যালেণ্ট জায়গা দাও, আমি বাড়ীটাকে আইল্যাণ্ডের মত রেখে দু'পাশ দিয়ে রাস্তা বার করে নিয়ে যাব।

তাড়াতাড়ি মনোমোহন বাবুকে খবরটা দিতে গেলুম, ভেবেছিলুম খবরটা পেয়ে খুব খুশী হবেন। তা নয়, বললেন—না ভায়া, ও বাড়িতে আমার লক (luck) গেছে, ও বাড়ি ভেঙেই ফেলুক।

আমাদের এখন অনেক নাট্যকার দরকার। নাটক লিখুক না, অন্ততঃ খান তিনেক বই নিয়ে আমরা অভিনয় করতে পারি। আমি কিন্তু ৫০ রাত্তিরের বেশী কোন নাটক করতে দেব না।

২৭শে এলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে, আগের দিন পড়ার চশমার ডাঁটিটা ভেঙে গেছে, বললেন—এখন কি করে পড়ব বলত ?

একজন চশমাটা তাড়াতাড়ি সারাতে নিয়ে গেল। তখন বললেন—চুপচাপ বসে থেকে কি করব ? তার চেয়ে দু-একটা কবিতা আবৃত্তি করি। তোমরা শোনো, যদি কোথাও আটকায় বা ভুল করি ত আঙুল তুলে দেখিও।

এর পর মিনিট পনেরো কুড়ি একটানা আবৃত্তি করে গেলেন, দু' তিনটে কবিতা বললেন, একবারও আঙুল তুলতে হ'ল না। আবৃত্তি শেষ করে বললেন—তাহলে শিশির ভাদুড়ি এখনো মরেনি।

হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—চশমাটা এখনও নিয়ে এলো না !

সেবুদা সান্ত্বনা দিলে—ব্যস্ত হবেন না, পাকা লোক গেছে, সারিয়েই নিয়ে আসবে। তাছাড়া সারাতেও ত সময় লাগবে।

থিয়েটারে কে প্রম্পট করবে, সে সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন, ভাখো কম বয়েসে অনেক কিছু করেছি, যা এখন ভাবলে, বুঝি অন্যায় করেছিলুম। প্রথম প্রথম প্রম্পটারদের কি কম কষ্ট দিয়েছি। বলতে বলতে কথা ভুলে গেছি, ভাবলুম কি আমি শিশির ভাদুড়ি, আমি আর নিজে তৈরী করে বলতে পারব না। বলতুমও, লোকের তা ভালও লাগত, হাততালি দিত। কিন্তু হতভাগ্য প্রম্পটারের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। এ পাতা ও পাতা সে পাতা খুঁজে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমার বলার পর ধরিয়ে দিতে কি কষ্ট তাকে পেতে হ'ত বল দেখি ?

উনি কথাও শেষ করেছেন আর চশমাও সারিয়ে নিয়ে ফিরে এল। খুসী মনে চশমাটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে বললেন—এই সব সংস্কৃতি-টংস্কৃতির প্রচলন কবে বন্ধ হবে বলতে পার ? এই যে সভায় গিয়ে দু-চার কথা বলা এতে কার লাভ হবে ?

শর্মিষ্ঠা পড়তে শুরু করলেন। একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই দৃশ্যটার কোন প্রয়োজন নেই, একেই বোধ হয় বলে বিষ্কম্ভক। লোকেরা বলেছে হাস্যরস দিতে হবে, তাই হাস্যরস দিতে চেষ্টা করেছেন। বইটা আমার কেটে পড়াই উচিত ছিল। এতে যেসব অবান্তর কথা আছে, কেষ্টকুমারীতে সেসব কিছুই নেই। এ বইটার ওপর সংস্কৃতের প্রভাব প্রচুর। জায়গায় জায়গায় আবার সেক্সপীয়ারের ছাপও আছে।

শর্মিষ্ঠাতে উনি তবু ভয়ে ভয়ে বিশ্বনাথের অনুশাসন মেনেছেন, কিন্তু কেষ্টকুমারীতে একেবারে সব কনভেনশন লোপ করেছেন। কেষ্টকুমারীর মত নাটক বাঙলায় কমই আছে, এমন কি তার থেকে নাটক আর এগোয়নি।

আবার একটা দৃশ্য পড়ে বললেন—এই যে দু'জনে দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না, এটা মিড সামারনাইটস্ ড্রিমের মত।

মাইকেল অনেকগুলো ভাষা জানতেন। ইংরেজী ছাড়া ল্যাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর সংস্কৃত—এই ছ'টা হ'ল সুতরাং টার্ণারের মতানুযায়ী উনি কালচার্ড। উইলিয়াম টার্ণার বলেছেন—যে ছ'টা ভাষা জানে না, সে কালচার্ড নয়।

ঈশ্বর সিং আর প্রতাপ সিং-এর ছবি কোথাও আছে ? নাচঘরে বুঝি বেরিয়েছিল, জাতীয় নাট্যশালা করলে সেখানে ওদের দুটো বড় বড় ছবি টাঙিয়ে রাখা উচিত, বেলগেছেতে ওরা না করলে বাঙলা নাটক কোথায় থাকত ?

মাইকেলের গান হ'ল গিরিশ বাবুর আদর্শ, অবশ্য উনি অনেক ভাল লিখেছেন।

১লা ডিসেম্বর মালিনীর রিহার্স্যাল দিতে এসে প্রথমেই বললেন, —ব্রাহ্মণগুলো বেশ ভাল লোক চাই—পাঁচ জন কথা বলার আছে, চার জনে করা যেতে পারে, দেবদত্তর মোটে দু'-তিনটে কথা আছে। চারুদত্তের কথাগুলো একটু বাঁকা ধরণের। সোমাচার্য খুব হড়বড় করে কথা বলে এবং একটু বেশী ইমোশানাল।

সুপ্রিয়র চরিত্রটা খুব শক্ত, ওটা করার জন্যে ভাল লোক চাই। একজন এসেছিল বাড়িতে, কাত্তিক এনেছিল, গলাটা বড় ভাল ; ঘরে ত ঠিক বোঝা যায় না, এখানে আসতে বলেছিলুম কিন্তু এলো না কেন বুঝতে পারছি না।

এর পর কিছুক্ষণ রিহার্স্যাল হ'ল। আমাদের আগ্রহাতিশয্যে রাজার ভূমিকা নিতে রাজী হয়েছিলেন। কাশ্যপ, মালিনী, রাজা আর রাণীর ভূমিকারই রিহার্স্যাল হ'ল। একসময়ে চা এল, চা খেতে খেতে গল্প জুড়লেন—পুলিশ আজকাল যেখানে-সেখানে ঢোকে, কলেজের কর্তারা নিজেরাই ডেকে আনেন। অথচ এদিক দিয়ে সাহেবরা অনেক ভাল ছিলেন।

এণ্ড্রু ফ্রেজার আসছেন স্কটিশ কলেজে—উনি নিজেও স্কচম্যান। তা খুব জোর অ্যারেঞ্জমেণ্ট হয়েছে। এণ্ড্রু ফ্রেজারকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল, আবার মারতে গিয়েছিল স্কটিশেরই ছেলে জীবনলাল।

বাইরে চারদিকে পুলিশ দেবার পর এক অত্যুৎসাহী পুলিশ-কর্মচারী কোয়াড্রাঙ্গেলের ভেতর, সিঁড়ির আশেপাশে লোক দাঁড় করাতে শুরু করলেন, ওয়ান সাহেব তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন, পুলিশ দেখে এসে বললেন—Who has allowed you to come in ?

অফিসারটি আমতা আমতা করতে আরম্ভ করলেন। ওয়ান সাহেব তখন বললেন—You get out of my compound,

গেটের ধারে দাঁড়াতে বললেন—No, out of my compound. He is my guest, I know how to receive him.

জেমস সাহেবও ঐরকম ছিলেন। ইডেন হিন্দু হোস্টেল সার্চ করতে দিলেন না, আর তার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে চাকরী ছাড়তে হ'ল। প্রথমে বললেন—দেবো না। তার পর রাত্তিরবেলা নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, বললেন—আমার ছেলেদের তোমরা অসুবিধেয় ফেলবে, তা চলবে না।

কিছুই অবশ্য পাওয়া গেল না। একটি ছেলে একটা তালা তোরঙ্গ চাবি বন্ধ করে একগাছা ঝাঁটা রেখে দিয়েছিল। তারপর বলছে, চাবি পাওয়া যাচ্ছে না, তালা ভাঙুন। একটা লোহার কি দিয়ে টানতেই খুলে গেল—দেখে ঝাঁটা।

জেমস সাহেবের ওপর সেই থেকে গভর্ণমেণ্ট চটে গেল, তারপর বিপদে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। উনি শেষ পর্যন্ত চাকরী ছেড়ে দিলেন।

যখন তখন পুলিশ যেখানে সেখানে এসে হাজির হয়। একদিন দেখি প্রেসিডেন্সী কলেজ ঘিরে দাঁড়িয়েছে, সঙ্গে টেগার্ট নিজে। আমার অ্যাকাউন্টাণ্টের সঙ্গে একটু দরকার ছিল। গিয়ে বলতে মিষ্টি হেসে টেগার্ট বললে—You can not go through this road to day. Go by the side door.

বেকার ল্যাবরেটরীর পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রশ্ন করলুম—কি ব্যাপার ?

ভদ্রলোক বললেন—কে জানে!

সাহেবদের মধ্যে উলটো ধরণের লোকও ছিল।

ভাখো, প্রথম যখন অভিনয় করতে আরম্ভ করি তখন আমার সময় খুব ভাল ছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আমার কোন বই-ই ফেল করেনি। প্রথম ফেল করল রবীন্দ্রনাথের তপতী।

একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, আমার পরিচয় লোকে নিল না কেন ?

বিনয়দা বললেন—ওর নায়ক মুসলমান।

বাধা দিয়ে বললেন—ওর নায়ক ত মুসলমান নয়, হিন্দু। আমাদের সমাজ তাকে মুসলমান করে দিল।

বিনয়দা বললেন—রায়টের ঠিক পরেই এ কাহিনী মেনে নিতে দেশের লোক প্রস্তুত ছিল না।

একটু সময় ভাবলেন, তার পর বললেন—রায়টের পরে বলেই গোলমাল হ'ল বলছ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তখত এ-তাউস ত প্রোডাকশান হিসেবে বেশ ভাল হয়েছিল; অভিনয়ও কিছু খারাপ হয়নি, তবে ৯৯০ টাকার বেশী বিক্রী হল না কেন ?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর কেউ দিতে পারলেন না। চুপচাপ বসে রইলাম সবাই, এক সময়ে আবার রিহার্স্যাল শুরু হল—এবার ব্রাহ্মণদের বললেন।

রিহার্স্যাল শেষ হয়ে গেল, শুরু হ'ল গল্প। নিজের পাবলিক থিয়েটারে প্রথম নাবার সময়কার কথায় বললেন—আমি যখন প্রথম থিয়েটারে আসি, থিয়েটারের তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা!

তখনকার দিনে দেখেছি বাবা আসরে রিহার্স্যাল দিচ্ছেন আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছেন সঙ্গে বিয়ারের বোতল হাতে, থেয়েটেয়ে গিয়ে আবার বসলেন রিহার্স্যালে। গিরিশ বাবুর রিহার্স্যালের সময়েও হুইস্কি সোডা বসানো থাকত। জিনিষটা কিন্তু বড় দৃষ্টিকটু লাগত, নয় কি ? সবাই ত আর গিরিশ বাবু নয়! উনিও বলতেন—আমি মদ খেলে মাতাল, স্টেজে নাবলে গিরিশ ঘোষ, তু বেটা কে রে ? তবু বলব ওঁরা প্রিসিডেণ্ট ভাল রাখেননি।

থিয়েটারে এসে ভালই করেছিলেন বলায়, বললেন—এসে আর কি করলুম। কিন্তু তবু বলব, এই একটা জিনিষই কিছুটা করতে পারি আমি। এ কাজে নেবে আমার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তখন পড়াতে হত কম, বাকী সময়টা জমি কেনা-বেচা, বন্ধক ইত্যাদির দালালী করে অনেক রোজগার করতুম। থিয়েটারে নাবায় সেগুলো সব বন্ধ হল ত।

২রা ডিসেম্বর রিহার্স্যালই হল, অবশ্য তারই ফাঁকে ফাঁকে দু-চার কথা বললেন। প্রথমে আগের হপ্তায় কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বললেন—কেষ্টনগরে গিয়ে খুব একচোট বলে নিয়েছি। সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরণের ছেলেমানুষী আমার ভাল লাগে না। আমি বোধ হয় বেশীই বকি; আর বকব না। এই সব সংস্কৃতির ব্যাপারে আমি থাকবই না।

কেষ্টনগরে গিয়ে অমিয় সান্যালের সঙ্গে দু-একবার ছিলুম। ও ফিফথ ইয়ার কমপ্লিট করে আর পরীক্ষা দিলে না। বাবা দীননাথ সান্যাল অনেক পয়সা রেখে গিয়েছিলেন তাই, তা নাহলে কষ্ট পেতে হত।

গুরুদাস বাবু আর বিনয় বাবু বেঁচে থাকলে আমার পক্ষে থিয়েটারে নাবা কষ্টকর হত। সিণ্ডিকেটের মেম্বার হলেও আমি থিয়েটারে নাবতে পারতুম না। গুরুদাস বাবু বলেছিলেন—থিয়েটারই তোমার রিয়েল ভোকেশন, কিন্তু আমাদের দেশে থিয়েটারের সামাজিক মূল্য জান ত ?

থিয়েটারের একজন লিবারেল প্যাট্রন দরকার মিস্ হর্নিম্যানের মত। ঝগড়া করছে, কিন্তু কখনও টাকা দেওয়া বন্ধ করছে না। বিলেতে সরকার দেয়; ওল্ড ভিক ২৮০০০ পাউণ্ড পায়; আগে পেত ৩৫০০০ পাউণ্ড। স্যাডলার ওয়েলস পায় লক্ষাধিক পাউণ্ড। ওদেশে অপেরায় খুব দাম দেয়। ইউরোপ ত অপেরার জন্যে পাগল। অপেরার সিঙ্গার বা অভিনেতাদের মাইনে অনেক বেশী।

মেট্রোপলিটান (গ্র্যাণ্ড অপেরা) এর পুরোনো বাড়িটা কি বদলেছে। সে বাড়িটা মোটেই কিছু ভাল ছিল না।

আগেকার দিনের অভিনেতারা আমাদের সময়ের অভিনেতাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিলেন। আমরা যতই হৈ-চৈ করি না কেন, এক প্রোডাকশানে কিছু উন্নতি করা ছাড়া ইণ্ডিভিজুয়াল আর্টিষ্টিক ব্রিলিয়ান্স পুরোনোদের কাছেই লাগি না আমরা। অর্দ্ধেন্দু বাবুর কথাই ধর। ঐ যে পেটুক বামুন গজপতি বিদ্যাদিগগজ করলেন, দেখলে একেবারে পিলে চমকে যায়! একটা কমপ্লিট ক্যারেক্টারাইজেশন।

গিরিশ বাবুর ত কথাই নেই। কিন্তু উনি বড্ড ফাঁকি দিতেন। ছত্রপতি শিবাজীর চতুর্থ দিনে দেখলেন, লোকজন বিশেষ হয়নি, অমনি—চল মন্ত্রী, মন্ত্রণার প্রয়োজন বোলে বেরিয়ে গেলেন। আমি

কিন্তু কখনও অমন করিনি, ২৪৲ টাকা যেদিন বিক্রী সেদিনও সব কথা বলেছি, ৪৮৲ টাকা বিক্রীতেও প্রাণপণ চেঁচিয়েছি।

গিরিশ বাবুর 'পাণ্ডবগৌরব' মোটেই ভাল বই নয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি—ঐ হাত দিয়ে ঐ জিনিষ বেরোল কি করে! ফরমাসী লেখা অবশ্য সেকসপীয়ারও লিখেছেন, কিন্তু তবু কেমন ভাল লাগে না।

গিরিশ বাবুর সঙ্গে দ্বিজু বাবুর সদ্ভাব ছিল না, দ্বিজু বাবুর বইএতে কখনও নাবেননি। দ্বিজু বাবুও ওঁর লেখাকে ভাল বলতেন না। একবার মহেন্দ্র মিত্র গোলমাল মেটানোর জন্তে দ্বিজু বাবুর কাছে গিরিশ বাবুকে নিয়ে যেতে চাইলেন। গিরিশ বাবু বললেন—তুমি বলছ যখন, যাক মনিব, চল দেখা করে আসি, কিন্তু লাভ কিছু হাব না।

দ্বিজু বাবু তখন সুরধামে থাকতেন। পুরোনো সুরধাম দেখেছ ত? সাজানো বাগান, বারান্দা ইত্যাদি ছিল। বাগানে মহেন্দ্র বাবু আর গিরিশ বাবু বসলেন; দ্বিজু বাবু তখন ভেতরে। সেখানে তখন গুজব-সম্রাট ছিল—সে ছিল আবার দ্বিজু বাবুর খুব ভক্ত—তার কাছ থেকেই শোনা, কি দু-একটা কথার পর মহেন্দ্র বাবু বললেন, চলুন, এবার যাওয়া যাক।

অপরেশ বাবুর কর্ণার্জুন লেখার মতলবটা ত আমার সামনেই খাড়া হয়। ওঁরা বললেন—পার্শী থিয়েটার মহাভারত করে এত পয়সা করলে আর আমরা কিছু করতে পারি না?

অপরেশ বাবু বললেন—আমার কর্ণার্জুন লেখা হচ্ছে?

তার আগে ক্ষীরোদ বাবু কর্ণ লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেটা কিন্তু চাপা পড়ে গেল। আমাকে দেখতে যেতে বলেছিলেন, দেখি একেবারে হুবহু পার্সী মহাভারতের মত। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ একেবারে গহবের যেভাবে বস্ত্রহরণ করেছিল সেই ভাবে। রক্ত দেখাতে হলে ব্লাডারে লালরঙের জল পুরে কায়দা করে রক্তপড়া দেখাত। তিলুয়া ভীম করত, সে দুঃশাসনের বুকে বসে জামার ভেতরে রাখা ব্লাডারের লাল রঙের জল খেত।

অভিনয় দেখার পর আমায় যখন জিগ্যেস করলেন, কেমন দেখলে? তখন কি বলি! নরেন বোসের বৈঠকখানার কথা নরেন বোস বললে—বাজে।

আমার ওপর কিন্তু খুব চটেছিল।

সীতায় আমার লোকসান হবার কথা নয়, শুধু চুরিই নয় ঠকানোও হয়েছিল আমাকে। আজ দুশো টাকার কাঠ এল, কাল তিনশো টাকার কাঠ—এমনি কত নিলে। অথচ মাসের পর মাস পাঁচটার টিকিট ফুল।

আলিবাবাতেও খুব বিক্রী হয়েছিল, পাঁচ রাতে একুশশো, বাইশশো, তেইশশো টাকা পর্যন্ত। আমি কিন্তু নাবিনি।

আজকালকার দিনে মহৎ নাট্য সৃষ্টি আর হচ্ছে কোথা? তিনশো, চারশো কি পাঁচশো রাত্তির চললেই কি মহৎ নাটক হয়? লোকের মনে তেমন নাড়া দেয় কৈ? লোকে তার ডায়ালগ বলে কোথা? রাস্তায় তার গান গাওয়া হয় কৈ? রঘুবীর ত মোটে দু' নাইট হয়েছিল আর তার পরেই আমি ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ঐ দুদিনেই গ্রামে ছড়িয়ে গেল। তার কারণ গুরুহত্যা।

থিয়েটারের আগে বক্তৃতায় আমিও ত বলেছি—স্বাধীনতা আসা দরকার, তা সে অহিংস উপায়েই হোক আর সহিংস উপায়েই হোক।

তাতে পুলিশের হীরালাল মুখুয্যে বললে—দাদু, আমাদের চাকরী কি আর আপনি রাখবেন না?

আমি বললুম—বেশ ত, আমায় না হয় ধরেই নিয়ে যাবে। দু' মাস আটকে রাখলে আমার বিক্রী বেড়ে যাবে।

একবার আমায় অম্বালাল সারাভাই বম্বে যেতে বলেছিল, বলেছিল—যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়ার খরচ দেব আর বিক্রী যা হবে তুমি নেবে।

তাতে আমি বললুম—ডিসেম্বর হল আমার বিক্রি সিজন। সীতা ভাল চলছে তা বন্ধ করে যাব, কিন্তু কত টাকা লাভ হবে? হাজার তিরিশ টাকা! কিন্তু তাতে ত চিরকাল চলবে না।

দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ—এই সব জায়গায় একবার যাওয়া দরকার। মালিনী নিয়ে যাওয়া যায়: কিন্তু শুধু মালিনী নয়, তিন-চারখানা বই—মানে একটা রেপোটারি থিয়েটারের মত আর কি? ওদের দেখানো—ভাল থিয়েটার কা'কে বলে। আর তার জন্তে একটা ভাল লোক দরকার, যে এসব বন্দোবস্ত করবে।

সবাইকে বলেছিলুম—স্বাধীন হোক দেশ, তাহলে থিয়েটারের উন্নতি একটা হবে। দেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু থিয়েটারের উন্নতি কৈ? কেমন যেন সব তাল-গোল পাকিয়ে গেল। সরকারের ত এখন থিয়েটারের উন্নতির জন্তে চেষ্টা করা দরকার। তা সরকার করছেও, কিন্তু তাতে কি কাজ হচ্ছে?

গলা ভাল রাখার সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল মিছরীর পানা খাওয়া। অনেকে ভয়েস পিল খায়, কিন্তু তাতে লাভ কি? গলা ঠাণ্ডা রাখার দরকার নয়, ঠাণ্ডা রাখা দরকার পেট। আগে অভিনয় করতে গিয়ে প্রায়ই গলা শুকিয়ে যেত। একজন বন্ধু বললে অত চা খাস কেন? মিছরীর পানা খেয়ে দেখ, অনেক ভাল থাকবি।

সেই থেকে মিছরীর পানা খাই। খেয়ে ত ভালই থাকি। মাইকেলে যত জায়গায় মদ খাওয়ার কথা আছে, মিছরীর পানা আর চায়ের লিকার মিশিয়ে খাই।

ওরা ডিসেম্বরে এসে একজনকে শেখানোর সময় বললেন আচ্ছা, কথা বলতে গিয়ে একটা জায়গায় ঝোঁক দাও কেন? জার্ক দেয় কারা জান? যাদের দম কম। জার্কি স্পীচ যে সুরু করে তার আর নাম করব কেন?

আমরা অনেক অনুরোধ করায় বললেন—অ্যার্টিস্ট গোনাসের সৃষ্টিকর্তা রাধিকানন্দই জার্কি স্পীচেরও সৃষ্টিকর্তা। ওর থেকে নিল ভূমেন, আর এখন ত সব দিকে জড়িয়ে গেছে।

পুরোনো স্মৃতিচারণ করলেন—আমরা যখন ইন্‌ষ্টিটিউটে চাণক্য করি, তখন সেলুকাসের পোষাক দেখে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক প্রফেসার বললেন এটা কি ননসেন্স হয়েছে?

বিনয় বাবুও বাদ দিতে বললেন, সেই থেকে আমরা বাদ দিয়েই করি।

ইন্‌ষ্টিটিউটে আমরা খুব ভাল চালিয়েছিলুম, স্যার গুরুদাস যত দিন বেঁচেছিলেন, না না বিনয় বাবু যত দিন বেঁচেছিলেন। তারপরেও আমি ছিলুম, কিন্তু সে সবের কোন খবর পাবে না, কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমায় বলেছিল যে, ১১৯০৬

পর আর কোন কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমি বললুম, সে ত যাবেই না।

আচ্ছা, ঠাকুরবাড়ির আর কি আছে এখন? একটা বাড়ি থেকে অমন চার-পাঁচ জন বড়লোক বেরোন অবশ্যই গর্বের কিন্তু তাতে ত আর এখন কিছু লাভ হবে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ছাড়া অবন বাবুও মস্ত বড়লোক ছিলেন। আর্টিষ্ট, লেখক, এমন কি অভিনেতা হিসেবেও তিনি বড় ছিলেন।

ইনষ্টিটিউটে ষ্টেজের করা বইই চিরকাল করা হয়েছে; এমন কি আমাদের সময়েও। আমি আর অঘোর জোর করে কুরুক্ষেত্র ড্রামাটাইজ করে করালুম। নরেনকে দুর্বাসা করতে দেওয়া হ'ল। ও বললে তুই হিরো আর আমার দু'সিন? (আমি অভিমন্যু করছিলুম।)

কিন্তু পার্টটা পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হ'ল। ওতে দুর্বাসাকে কর্ণের বাবা করা হয়েছিল ত।

ডি, এল, রায়ের সীতা করার একটা ইতিহাস আছে। বইটা ইনষ্টিটিউটে করার কথা বলি। যাদের নিজের হাতে শিখিয়েছিলুম, তারাই আপত্তি করলে, বললে—ওতে কিছু নেই। ভার্স খারাপ।

আমরা ঠিক করলুম, বইটা করা হবে। পার্ট সিলেকশনের দিন, আমরা চার পাঁচ জন বড় এসে বসলুম, কিন্তু যারা করবে তাদের কোন পাত্তা নেই। কিছু পরে ছোট ছোট পার্টের দু'চার জন ছেলে এল; অন্যদের কথায় বললে—এই আসছে। কাজ আছে। এসেছে ত, বোধ হয় নীচে বসে আছে।

আধ ঘণ্টা বসে চলে এলুম। সবই বুঝেছিলুম, ভেবেছিলুম আর কোনদিন ঢুকব না, কিন্তু সেই ঢুকতে হ'ল।

এই এলেন কৃষ্ণকুমারী নাটক পড়তে। প্রথমেই নেশা করার কথা তুললেন—নেশা করলে কিছু লাভ হয় না। শ্যাম্পেনে লোকে বলে নেশা হয় না, কিন্তু বেশী শ্যাম্পেন খেলে নেশা হয় বৈ কি! ওয়াইনের নিয়ম হ'ল, খেলে একটা rosy langarousness (glamarousness বলতে যাচ্ছিলুম, malapropism হয়ে যাচ্ছিল আর কি?) হয় আর স্পিরিটস খেলে হয় joyousness। অবশ্য পরে একটু রিঅ্যাকশন হয়। নেশা করলে গলা ভাল হয়, এ কথা অনেকে বলে; কিন্তু পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, মিছরীর পানা ছাড়া আর কিছুতেই সুবিধে হয় না।

আমি সব কিছু খেয়েছি। একদিন গাঁজা খেয়েছিলুম। সেদিন ইনষ্টিটিউটে বুদ্ধদেব; গলাটা খুব ভাল নয়, শুরুদেবের আদেশে গাঁজা খেয়েছিলুম। মন্মথ বাবু ইনভাইরেক্টলি বললেন—গাঁজা খেলে গলা ভাল হত।

অমূল্য চক্রবর্তী তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, সে বললে—ভাবনা নেই, আমার ওখানে চল।

সেখানে গিয়ে হাত-কড়ে সেজে দিল, কিন্তু একটান দিতেই হুড়হুড় করে বমি করে ফেললুম, মাথা ঘুরতে লাগল। বললুম—আমি এখন শোবো।

বুদ্ধদেব থিয়েটার করার আগেই বুদ্ধ বনে গেলুম। অবশ্য গলার কিছুই উন্নতি হ'ল না।

আর একবার এক বন্ধু বললে—সবাই খায়, একটু ব্র্যাণ্ডি খা।

তা খেলুম, কিন্তু খেতে না খেতেই গলা বসে গেল। আর একবার মেদিনীপুরে থিয়েটার করতে গেছি, একজন আমার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে। বললেন—ওপন এয়ার বুঝছ না ভায়া, একটু ব্রাণ্ডি খাও। (জজ সাহেবের হাতায় পাল টাঙিয়ে হচ্ছিল)।

আমারও নো প্রেজুডিস খেয়ে নিলুম, কিন্তু কিছু লাভ হোলো না, গলা বসে গেল।

যারা ভাবে মদ খেয়ে ভাল অভিনয় করা যায়, তারা বোকা। মদ খেলে অনভ্যস্ত লোকের অসুবিধেই হয়। যারা অবশ্য নিয়মিত খেতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে ২।৩ আউন্স খেলে বরং সুবিধেই হয়। অনেকে নিয়মিত খান বলে অনেক বয়েস পর্যন্ত খেলে কিছু অসুবিধে হয় না।

আমার এক মামা আছেন, তিনি যে পরিমাণ আর্সেনিক খান, তা ভয়াবহ! অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিধে হয়ে হাঁটতেন। মাঝে অল্প অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে শরীর একটু খারাপ হয়েছে। আমায় লিখেছিলেন—তোমার হার্টের অসুখ বলেছ, প্রেসার বেশী কিনা জানি না, কিন্তু প্রেসার কম থাকলে আর্সেনিক খুব ভাল ওষুধ হ'ত।

হাক্সলী মেস্কালিনের কথা লিখেছেন, ওটা হ'ল সিদ্ধি। সিদ্ধি খেলে একটু boisterousness হয়; হাসি পায়, খিদে বাড়ে।

আফিং খেয়ে সাধারণতঃ ঝিম লাগে কিন্তু শরৎদাকে কখনো ঝিমোতে দেখিনি। ওঁর আফিং খাওয়া সাধারণ লোকের মত ত ছিল না। উনি বড় এক ঢেলা আফিং ঐ হুইস্কিতে ভিজিয়ে দিতেন, হুইস্কির রং কালো হয়ে যেত। গ্লাসে দাগ দেওয়া থাকত। সারাদিনে বেশ অনেকখানি খেতেন। শেষ ওঁর যে আটকে গিয়েছিল সে ত ঐজন্যেই।

একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, অনেকক্ষণ পরে উনি এলেন, এসে বললেন—কতক্ষণ এসে বসে আছ?

বললুম—ঘণ্টা আড়াই হবে।

বললেন—কি সর্বনাশ করেছি নিজের! তুমি আসবে বলে কাল রাত্তে এতখানি পেট্রোলিয়াম খেয়েছিলুম। আজ সকাল থেকে বসে বসে কিছুই হ'ল না।

দেখলুম, মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে। বললুম—এখনও ত আবার খেয়ে এসেছেন।

বললেন—কি অবস্থা হয়েছে এখন বুঝছ ত?

বললুম—এখনও সে কালো জিনিষটা খান ত?

তাতে বললেন—হ্যাঁ।

কৃষ্ণকুমারী পড়তে শুরু করি। তার আগে চিঠিগুলো পড়া দরকার।

একটা চিঠি পড়ে বললেন—কেশব গাঙ্গুলীকে এটা যা বলেছেন তা মনের কথা নয়, একটু তোয়াজ করা মাত্র। কৃষ্ণকুমারীর আগে বিজিয়া লিখেছিলেন, বইটা নিশ্চয় ভাল ছিল।

বাঙলা দেশের নাটক কৃষ্ণকুমারী থেকে এক পাও এগোয়নি বরং পেছিয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের যে বাঁধন দেখা যায়, পরের (সব) নাটকের মধ্যে তার চেয়ে আলগাই দেখা যায়। ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, ইতিহাসকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেও এত সুন্দর নাটক আর হয়নি। সারারাত টডের অ্যানালস অব রাজস্থান পড়ে কাহিনীটি তাঁর সবচেয়ে ড্রামাটিক বলে মনে হ'ল। আর দু'-চার দিনেই তার সিনপসিস তৈরী করে ফেললেন। কিন্তু বইটা আর অভিনয় হ'ল না, ছোট রাজা মারা গেলেন আর সেই অজুহাতে অভিনয় করা বন্ধ হয়ে গেল, মাইকেলও রাগ করে নাটক লেখা বন্ধ করলেন।

আবার একটা চিঠি পড়ে বললেন—চিঠিটার এই অংশ থেকে জানা যায়, টডের ছিল বোধ হয় কর্পূরবতী, সেই চরিত্রই নাটকে হয়েছে বিলাসবতী।

নাটকের প্রথমটা পড়ে বললেন—রাজার একটি অবিদ্যা আছে, তার কাছে যাবেন, এখন মন্ত্রীর কথা তাঁর ভাল লাগবে কেন? ধনদাস হ'ল রাজার পিশে, সেই জন্যেই এইভাবে কথা বলছেন।

মাইকেলের মত পড়াশোনা ক'জনের ছিল? সত্যিকারের পণ্ডিত লোক ছিলেন, গিরিশ বাবুর পড়াশোনাও খুব কম ছিল না। ওঁর মৃত্যুর পর স্যার গুরুদাস যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটা পড়লে ওঁর পড়াশোনার পরিমাণ জানতে পারবে। স্যার গুরুদাস আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন হেয়ার স্কুলে সহপাঠী এক সঙ্গে চার বছর পড়েছেন দু'জনে। গুরুদাস বড় ছিলেন। উনিও ঠিক পঞ্চান্ন বছর বয়েসে রিটায়ার করেন। ষ্টেটসম্যান উনি রিটায়ার করার পর একটা এডিটোরিয়াল লেখে। আজ-কালও কত লোকেই রিটায়ার করছে, কই কারো জন্যও এডিটোরিয়াল লেখে না?

লোকে না পড়েই বলে, গিরিশচন্দ্রের লেখা ভাল নয়। অথচ মাইকেলকে বাদ দিলে বাঙলাদেশের প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। এক পণ্ডিত ব্যক্তি আমায় বোঝাচ্ছিলেন—গিরিশচন্দ্রের লেখায় কিছু নেই। তাকে প্রশ্ন করলুম পড়েছ? তা আমতা-আমতা করতে লাগল।

হঠাৎ যা হোক একটা কিছু বলে দিলে অনেক সময় কাজ দেয়। আশু বাবুর ঐ স্বভাব ছিল, খুব জোর ডিসকাসান হচ্ছে, হঠাৎ বলে বসলেন—আর্টিকেল টোয়েণ্টি সেকশন সি অনুসারে এ চলে না।

কেউ যদি খুঁজে বের করলেন, আর্টিকেল টোয়েণ্টির সেকশন সি-ই নেই, ত বললেন—তাই নাকি! তাহলে ভুল বলেছিলুম।

ততক্ষণে কিন্তু কাজ হয়ে গেছে।

আশু বাবুর স্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব বেশী ছিল, তবে ইচ্ছে করে ভুল করতেন। আশু বাবুর কর্মশক্তি যদি স্যার গুরুদাসের চরিত্রবলের সঙ্গে মিশতে পারত, তাহলে দেশের কত কাজই না করতে পারত।

ওঁরও বেশীর ভাগ সময়েই রিহার্স্যাল হল, তাই কাঁকে কাঁকে বললেন—ইনষ্টিটিউটের বাড়ি তৈরী হবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে, তখন হ্যালিডে সাহেব ছোটলাট, তিনি একবার ইনষ্টিটিউটের ফাংশনে এসেছিলেন। বিনয় বাবু তাতে আমাকে থ্যাঙ্কস দিতে বললেন। বলে দিলেন বোলো, আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি যদি করে দেন ত খুব ভাল হয়।

সেইটাই গুছিয়ে আমার নিজের ভাষায় বললুম। তারপরেই বাড়ি তৈরী হল।

বাড়িটা ত আমায় দুঃখ দেবার জন্যেই ঐভাবে তৈরী করেছে। ওয়ালেস সাহেব বললেন—এখানে যে থিয়েটার হবে তাই আমি জানতুম না।
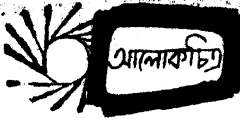
ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

একটি স্মৃতি

—বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্ম-পলাশ

—তপনকুমার বর্মন

পারের যাত্রী
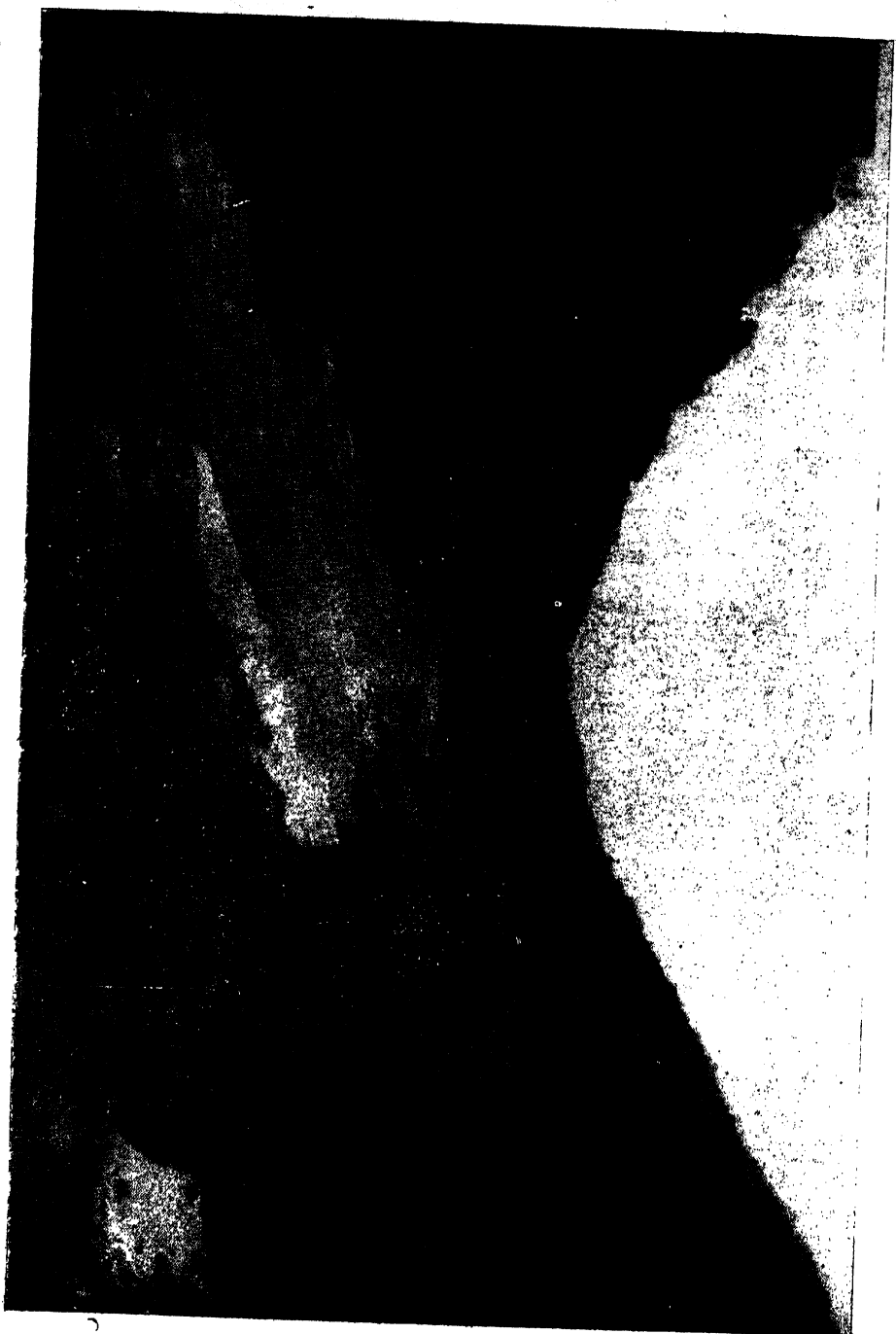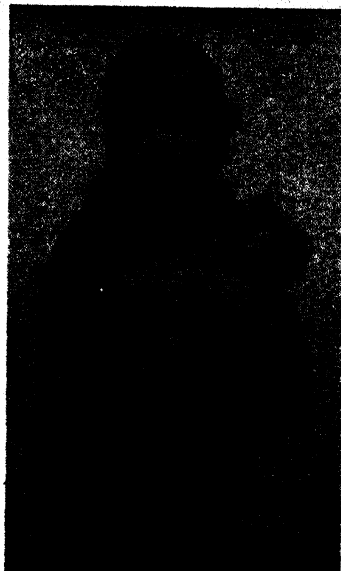
কালিম্পঙের পথে

—ধ্রুবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—রমেশচন্দ্র পাল (শিল্পী)

জীবন সংগ্রাম

তৃষিতা —রঞ্জিৎ বস

স্নেহময়ী —শ্রীমতী বিজলী মুখোপাধ্যায়

দুই বোন —চিত্ত নন্দী

ভবিষ্যৎ —অনিল কর্মকার

তা তাতেও আমাদের থামাতে পারেনি, ওখানেই থিয়েটার করেছি।

বয়সা ধরে মানুষের তিনবার—প্রথম কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে, দ্বিতীয়বার ৪০-৪২ বছরে আর তৃতীয়বার ৬০-৬২ বছরে। তবে শেষ বয়েসের বয়সা আর ধরে না বিশেষ।

৭ই-ও ৬ তারিখের পুনরাবৃত্তি ঘটল। রিহার্স্যালের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে কথা বললেন। বললেন—দেবপ্রসাদ বাবু একবার ইউনির্ভাসিটিতে থিয়েটার করা বন্ধ করে দিয়ে নিয়ম করলেন। সেই সূত্র ধরে ইনষ্টিটিউটে প্রোপোজাল দিলেন যে, সেখানেও থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হবে। ওঁকে একমাত্র সাপোর্ট করলেন হেরম্ব মৈত্র। তিনি বললেন—A boy has confessed to me that he did not know what he was going into when he joined in a dramatic performance and he was ruined.

আমাদের মধ্যে একজন বললেন—In any case he would have been ruined. ওঁদের কথার জবাব দিলেন স্যার যদুনাথ: বললেন—যারা থিয়েটার করে তারাও কেউ খারাপ ছেলে নয়। আজ যারা আণ্ডার গ্রাজুয়েট কাল তারা গ্রাজুয়েট, তারপর এম, এ, তারপর এম, এ, বি, এল। (কান্তি আর নরেশ ঠিক তাই করেছিল।) তাছাড়া সমস্ত কাজের বেলায় ওরাই এগিয়ে আসে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ১২০ জন ভলাণ্টিয়ার পেয়েছিলে কাদের কাছ থেকে?

বাকী সকলেই স্যার যদুনাথকে সমর্থন করলেন, কাজেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নাট্যোৎসবের নানা কাজের চাপ আমাদের ওপর এসে গিয়েছিল, কাজেই ওঁর কথা শোনার আর অবকাশ হয়নি। একদিন কেবল বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় কিছু কথা বলেছিলেন। কথাগুলো বোধ হয় বলেন ১৪ই ডিসেম্বর।

বললেন—মদ আমি রোজ খাইনি, বছরে ৩০০ দিন খেয়েছি এমন বছরও খুব কম আছে। সন্ধ্যাবেলা ফুরসুৎ আর পেতুম কই। কোন কোন দিন রিহার্স্যাল দিতে দিতে রাত এগারোটা বেজে যেতো, তখন আর খাওয়া হত না।

তখন আমার গাড়ী ছিল; মাঝে মাঝে থিয়েটারের পর সোজা আসানসোল চলে যেতুম। ওখানকার রেলের রেস্তোঁরার বড় ভাল কফি করত।

অনিদ্রা আমার অনেক কালের রোগ। থিয়েটারে থাকতে ভোর রাতে পাইচারী করে বেড়াতুম। এক ভদ্রলোক ডেকে বলেছিলেন, মশায়, অমন করে সারা রাত হাঁটেন কেন?

চোখ কাটাবো মঙ্গল ষষ্ঠে গেলে—৩০শে জানুয়ারীর পর। মঙ্গল আমার চিরকালের বৈরী। শনি আর মঙ্গল এক ঘরে থেকে শুধু খেয়োখেয়ি করেই গেল। খনার বচনেও আছে—

> মঙ্গল সপ্তমে যার, চতুর্থেতে শনি।
> কে দেয় অনলে হাত, কে ধরিবে ফণী॥

আমার এক আত্মীয় আমায় বলেছিলেন—তোমার সবই হবে: নাম, সম্মান, অর্থ, কিন্তু কিছুই রাখতে পারবে না।

ইতিমধ্যে ১১ই থেকে ১৪ই ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ওঁর অভিনয় দেখতে অসম্ভব জনসমাগম ঘটল। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে উপস্থিত, তাদের একমাত্র প্রার্থনা—একখানা টিকিট।

অনেক দিন পরে সাধারণের পক্ষে সহজগম্য জায়গায় অভিনয় করছেন বলেও বটে, আবার হয়ত এই তাঁকে দেখবার শেষ সুযোগ এভেবেও লোক একেবারে ভেঙে পড়ল। দু-চার জন স্পষ্টাস্পষ্টি বলেও দিল—বয়েস ত হয়েছে, কবে আছেন নেই; দেখেও নিই এইবেলা।

দর্শক-আগমন দেখে উনি নিঃসন্দেহে খুশী হলেন, কিন্তু সত্তর বছর বয়সে ঐ প্রচণ্ড জনসমাবেশের সামনে পর পর চারি রাত্রি অভিনয় করবার ধকল তাঁর ভাঙা শরীরে সইল না। এর্কেইত একটানা প্রায় মাসখানেক রিহার্স্যালেই তাঁর দেহে-মনে রীতিমত ছাপ পড়েছিল, তার ওপর বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত অভিনয়।

এক একদিন অভিনয় শেষ হ'ত আর দেখতাম অসহ্য ক্লান্তিতে দেহ-মন তাঁর ভরে উঠেছে। প্রায় কোন কথা বলবার মত অবস্থাই তাঁর থাকত না। ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ত, উনি চলে যেতেন আর আমরা ফিরে আসতাম পরিত্যক্ত মঞ্চ থেকে, জিনিষপত্র কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে।

১৪ই ডিসেম্বর ওকে যখন গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ল, তখন বললেন—শরীর আর বইছে না। এখন ক'দিন বিশ্রাম করব।

ওঁর শারীরিক অবস্থা বুঝে আগেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, কাজেই বললাম—নিশ্চয়, নিশ্চয়। অন্ততঃ মাসখানেক বিশ্রাম নিন আপনি।

একটুখানি করুণ হাসলেন—মাসখানেক। অত দিন কি পারব, আচ্ছা দেখি।

ওঁর গাড়ী সামনের পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল আর ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে আমরা বাকী কাজ সারতে গেলাম, কানের মধ্যে তখনও মাইকেল অভিনয়ের রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে—মরণাপন্ন মাইকেল মনোমোহন ঘোষকে নিজের সমাধির ওপর কি লেখা হবে তাই বলছেন—

> দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
> বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এ সমাধিস্থলে।

তখনও বুঝতে পারিনি মাইকেলের পরবর্তী তিরোধান দিবসে শিশিরকুমার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলতে হবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিমধ্যে আরো কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল যা হয়নি। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছিল—এবং ্যানেজিং ডিরেক্টর বি, কে, লাহিড়ী এবং ম্যানেজার ভূপেন াকুরের ামে তহবিল তছরূপের মামলা হয়ে তাঁদের ৮ বছর রে জে হয়েছিল। বি, কে লাহিড়ী ছিলেন ব্যোমকেশ ক্রবর্তীর জামাতা, এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ ব্যাঙ্কের ার্ড অফ ডিরেকটর্স-এর প্রেসিডেণ্ট। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে য়েছিল, এবং সেই পাগল অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

ওঁরা ছিলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলেরও কর্তৃপক্ষ। সেখানেও ানাবিধ চুরি-দুর্নীতি ধরা পড়েছিল, এবং মামলাও হয়েছিল। রেশ ভট্টাচার্য ছিলেন সেক্রেটারী—তাঁকেও মামলায় জড়াবার চেষ্টা য়েছিল, কিন্তু তিনি বেকসুর খালাস হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। িনি ছিলেন যুগান্তর দলের লোক।

এদিকে ডাক্তার জে এম দাশগুপ্তদের বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স অ্যাণ্ড য়্যাল প্রপার্টি ভাল চলছিল না। ডাক্তার দাশগুপ্তেরও যুগান্তর লের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাঁর ভাই মৃন্ময় বাবু ছিলেন দলের াক। সেই সূত্রে বন্দোবস্ত করে ঐ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ্যানেজিং এজেন্সী নিয়েছিলেন অমর ঘোষ, মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), রিদা' (চক্রবর্তী) এবং কোম্পানীর সেক্রেটারী এক প্রফুল্ল বাবু।

'২৭-'২৮ সালে মনোরঞ্জনদা' মাদ্রাজের জেলে রাজবন্দী থাকা লে সরকারী বেসরকারী অনেক হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তাঁর লাপ পরিচয় হয়েছিল,—অনেক বন্দী কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গেও লাপ হয়েছিল। সেই সূত্রে বোধহয় ৩০ সালের গোড়ার দিকেই িনি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন ঐ বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের ব্রাঞ্চ খুলতে।

আমি তখন আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে থাকি। তাঁরা সুভাষ বুকে বাগাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করেন,—আমি সমালোচনা করি। কথা আগেই বলেছি। মাদ্রাজ যাওয়ার আগে মনোরঞ্জনদা' পর দুটো রাত আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে গোপনে এসে আমার কাছে রছিলেন এবং সারা রাত ধরে নানা আলোচনা চলেছিল। আমি সুভাষ বাবুর সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা করি—এটা জেনে উপেক্ষা লেও তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না, কারণ তিনি আমাকে বাসতেন,—নিজের লোক মনে করতেন।

সেই সময়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনারা কি এখন বলতে পারেন, সুভাষ বাবু আপনাদের লোক? তিনি বললেন, তা এক রকম বলতে পারি। আমি বলেছিলুম, সুভাষ বাবুকে "একরকম" নিজেদের লোক বলতে যদি আট বছর লাগে, তা হলে স্বরাজ হবে কত বছরে?—একটা রুল অফ থ্রির অঙ্ক। যাই হোক, মনোরঞ্জনদা' মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যার চেষ্টার আগে। তার আগেই আমি "নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা" লিখে দাদাদের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ করেছি।

এর কিছুদিন পরে ডক্টর ভূপেন দত্ত একদিন বললেন,—ওহে, তোমার "নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা" লেখাটা অনেক ছেলে খুঁজছে—কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি ওটা একটা ছোট পুস্তিকার আকারে ছেপে বার করে দাও না।—আমি শুনে বললুম, বেশ কথা, কিন্তু যদি ওদের "শতকরা নিরেনব্বুই জন" লেখাটার সঙ্গে ওটা পাশাপাশি ছাপি,—ছেলেরা দুটো আইডিয়ার বিচার করে দেখতে পারবে,—তাহলে কেমন হয়? তিনি বললেন, খুব ভাল, তাই কর।

আমি তাই করলুম—"স্বাধীনতা" এবং "নবশক্তি" ("আত্মশক্তি" তখন "নবশক্তি" হয়েছিল) হইতে উদ্ধৃত বলে, এবং প্রভাসচন্দ্র মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত বলে, "নিরেনব্বই বনাম এক" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করলুম। দু ফর্মার বই, দু আনা দাম—মোটা কাগজের কভার। পাইকারী হারে দু টাকায় ২৫ খানা বিক্রীর বন্দোবস্ত করে টাকা তুলে ফেললুম। তখন জিনিষপত্রের দাম ছাপার খরচ, সবই ছিল সস্তা। ১৭"×১২" সাইজের ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ "নবশক্তি"র দাম ছিল চার পয়সা। বাংলা ছাপার দর ছিল ৮।১০ টাকা ফর্মা। হোটেলে পেটভরা মাছের ঝোল-ভাত খাওয়া হত দু' পয়সায়।—২০০০ বই-এর অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল, বাকিটা পুলিশের খপ্পরে গিয়েছিল,—যখন একবার পুলিস সমগ্র আত্মশক্তি লাইব্রেরীটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

পুস্তিকায় "প্রকাশকের নিবেদনে" লিখলুম,—বাঙ্গলার গত ২৫ বছরের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের আদর্শ এবং কর্মপ্রচেষ্টা ২৫ বছরে শত-সহস্র বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে আশাতীত ভাবে অগ্রসর হয়েছে। ...আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রথম যুগে...প্রথম বিপ্লবী-দলের কাজ ছিল 'টেররিজম।' তখন দেশের লোকে ধারণা করতো

পারতো না যে, ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে বোমা বন্দুক নিয়ে লড়তে পারে,—বা মারতে এবং মরতে পারে। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল দেশের লোকের এ ধারণা বদলে দিয়েছিল।

"দ্বিতীয় যুগ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়টা। এই সময়ে বিপ্লবীদের দৃষ্টি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। জার্মাণ ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার সঙ্গে সে যুগ শেষ হয়।

"তৃতীয় যুগ ১৯২০ সালের পর। বর্তমানে (১৯২৯।৩০) এ যুগ শেষ হচ্ছে।

"ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত রুশ-বিপ্লব সারা পৃথিবীর নিপীড়িত জনসাধারণের মনে একটা আশার বাণী বয়ে এনেছে। আমাদের দেশেও সে বাণী এসে পৌছেছে, জনসাধারণের শত্রুদলের অবিরাম মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও।

"তারপর কঠোর নির্যাতনে নিষ্পেষিত ভারত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু মহাত্মার অহিংসা নীতি নিয়ে একটু গোল বাধলো।

বিপ্লবীরা অহিংসায় বিশ্বাস করে না, আর অহিংসা-নীতির প্রতিবাদ করতে গেলে মানুষের মনটা স্বভাবতই, মনেরই অজ্ঞাতে, একটু টেররিজমের দিকে ঝোঁকে।

"সুতরাং ব্যাপার দাড়ালো এই যে, মহাত্মার কর্মপদ্ধতির সুযোগ নিয়ে যতটা কাজ করা সম্ভব, তাও হল না, আর বিপ্লবীরা উগ্রতর গণবিপ্লবের আদর্শও মেনে নিতে পারলেন না। ফলে জাতীয়তার আদর্শমূলক স্বাধীনতাবাদ, এবং ধনসাম্যমূলক গণবিপ্লববাদ, এই দুই আদর্শের বিরোধ বাধলো।

"এ বিরোধ বেড়েই চলবে—একে চাপা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সুতরাং এ বিরোধটাকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য এই।"

এখন ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ Veteran বিপ্লবীদের idea ও আক্কেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "স্বাধীনতার" "শতকরা নিরানব্বুই জন" নামক প্রবন্ধ থেকে শুনুন:

"রক্তটা যতদিন সবল সতেজ থাকে, ততদিন বুঝি সহজ বুদ্ধিতে; আর রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে, তখন সব জিনিসই দেখতে থাকি হিসেবের এঁধো গলির আঁধারপথে, কারণ মুক্তদৃষ্টির আলো তখন চোখ থেকে নিবে গেছে। বয়স যখন উঠতিমুখে তখন বুঝি, স্বাধীনতা পাবার পথ, যে পথ দিয়ে ওটাকে হারিয়েছিলাম সেই পথ।···

"কিন্তু বয়সের ধর্মে রক্ত যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল, অমনি বুদ্ধির জড়তা এসে দেখা দিল। প্রথম বয়সে কেউ ভাবে না স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের শতকরা নিরানব্বুই জনকে টেনে না আনলে স্বাধীনতা লাভের আর উপায় নাই।···

"দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা,—এইটিই মুক্তিপ্রয়াসী জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কথা—শতকরা নিরানব্বুই জন নয়। আঘাত করব, আঘাত খাব,—মরব,—আবার আঘাত করব—প্রথমবারের চেয়ে এবারের শক্তি ও সাফল্য দ্বিগুণ হবে,—তার পরের বার চতুর্গুণ হবে,—এমনি করে পুরুষের পর পুরুষও চলতে পারে, এমনি করে নিরানব্বইজন আসলেও আসতে পারে,—না আসলেও ক্ষতি নাই···

"এককালে মোহ ছিল শিক্ষাবিস্তার, এককালে মোহ ছিল সমাজ সংস্কার, দুদিন আগে মোহ জুটেছিল তাঁত-চরকা আর হিন্দু-মোসলেম মিলন সাধন আর আজ মোহ জুটেছে শ্রেণীসংঘর্ষ। ···শ্রমিক আর চাষীই যখন শতকরা নিরানব্বই জন, তখন তাদের পাওয়ার পথ দেখতে হবে। তাদের পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখা,—তাদের ঘরোয়া স্বার্থ দেখতে গেলেই তাদের স্বার্থের বিরোধী যারা, অর্থাৎ মহাজন আর জমিদার, তাদের সাথে দ্বন্দ্ব লাগাতে হবে। অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতালাভের প্রথম সোপান শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব লাগানো।···

"এই শ্রেণীসংঘর্ষ আজ জগতের অনেক জাতের ভিতর চলছে, দু একটা দেশে তাতে এক রকমের সাফল্যও এনে দিয়েছে। মুস্কিল হয়েছে নামে···চিন্তার জড়তা এই নামের সূত্র ধরে পুঁথি-পোড়ো বৈপ্লবিকের মাথায় ঢুকেছে। পুঁথি-পোড়োর গোড়াতেই ভুল হয়ে যায় যে, এদেশে অপর একটা দেশ আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে, যা অপর দেশে নেই।···

"তবে কি কৃষক শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন নেই? আছে বই কি! কৃষকসংঘের চেয়ে বরং শ্রমিকসংঘের প্রয়োজন বেশী করে আছে—শ্রমিকের পরোয়া নেই, আজ এখানে বারো আনা মাইনের চাকরী গেলে শহর ঘাটিয়ে কাল আর এক জায়গায় দানাপানি জুটিয়ে নেবে। একটা ওলট-পালটের সময় এই রকম বেপরোয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রভৃতি করিয়ে স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে অনেকটা জোর দেওয়া চলতে পারবে। তাই শ্রমিকসংঘের বিশেষ প্রয়োজনই আছে, এবং কৃষকসংঘেরও কিছু কিছু আছে। কি রকম? যথা আশ্রয় দিতে—

"কিন্তু তাই বলে স্পর্দ্ধিত চিন্তার সাহস যাদের আছে, প্রতি মুহূর্তে মরণ বরণ করতে যারা প্রস্তুত, তাদের এর ভিতর টেনে এনে বিভ্রান্ত কোরো না। জাতির ও স্বাধীনতার শত্রুতা কোরো না।—

"বুলির আর অন্ত নেই! শতকরা নিরানব্বইয়ের জন্য যে স্বরাজ হল না, সে স্বরাজ দিয়ে কি হবে?···যারা দেশের স্বাধীনতা আনবে তারাই অপরের জন্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র, ভোগের ক্ষেত্র খুলে দিয়ে যাবে, একথাটি আজ শ্রেণীসংঘর্ষের পাণ্ডাদের কাছে ঠাট্টার কথা হয়েছে। এই যে বুর্জোয়া ক্যাপাক্যালিষ্টের দল, এরা আবার অপরের সুখ-সুবিধা করে দেবে? এই প্রশ্ন যারা তোলে হয় তাদের ইতিহাসের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর, অথবা তারা বুর্জোয়া ক্যাপাক্যালিষ্ট বলে যাদের ঠাট্টা করে, তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ—নিজেরা নেতৃত্বকামী। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে দেখি, ক্রমবিস্তারশীল বৈপ্লবিক আদর্শের সাধনায় বিপ্লবের পরে বিপ্লব হয়েছে, রুশিয়াতেও মাত্র সাত মাস পরেই কেরেনেস্কির গভর্ণমেন্টের পতন হয়েছে।··· বিপ্লব একবার সুরু হলে বিপ্লবের পরে বিপ্লব এসে নূতন নূতন স্বেচ্ছাচারীকে ধ্বসে ভেঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

* * * *

"দুর্গাপ্রসাদ"—এই ছদ্ম নামে ওঁরা প্রবন্ধটা লিখেছিলেন, যেন এক জুনিয়ার এক সিনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখছে—বস্তুতঃ লক্ষ্য ছিলেন ডক্টর ভূপেন দত্ত, যিনি বুর্জোয়া ক্যাপালিষ্ট কথাটা বলতেন এবং লিখতেন। [illegible] আমি জবাবটা লিখলুম, যেন

এক সিনিয়র এক জুনিয়রকে লক্ষ্য করে লিখছে। তার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করলুম :

"নিরেনব্বই ইয়ের ধাক্কা"—বড় কঠিন ধাক্কা।···"স্বাধীনতার" পৃষ্ঠপোষকেরা যেদিন থেকে শতকরা একেদের সামীপ্য লাভ করেছেন, এবং সাযুজ্যলাভের মহৎ চেষ্টা আরম্ভ করেছেন, সেদিন থেকে···এঁদের চিরকেলে জনসাধারণ ধামাচাপা পড়েছে, আর তার ওপর উঠেছে শতকরা একেদের দল—লক্ষ্মীমন্ত ধনী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং ভদ্রশ্রেণীর সুবোধ বালকেরা।

শ্রীমান লিখেছেন,—"আমাদের দেশে বয়সে ভাঁটা পড়ে একটু তাড়াতাড়ি, আর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলে লোকে সহজবুদ্ধিতে না বুঝে সব জিনিসই হিসেবের এঁধোগলির আঁধার পথে দেখতে থাকে। শ্রীমানকে বলি, খোকা···হিসেববোধটা শুধু ব্যক্তির বয়েস বাড়ার সঙ্গে নয়,—স্বার্থের বয়েস বাড়ার সঙ্গেও পাকতে থাকে।··· এই হিসেববোধ যাদের বেশী, সৈন্যদলের মধ্যে তারা হয় অফিসার—সমাজের মধ্যে তারাই হয় মাথা, রাষ্ট্রীয় জগতেও তারাই হয় শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতা।···স্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যেও, হিসেববোধ যাদের কম, তারা হয় বন্দী, আর যাদের বেশী, তারা হয় রাজবন্দী।··· হিসেববোধকে গাল দিতে হলেও সাড়ে তিনপৃষ্ঠাব্যাপী হিসেব লিখতে হয়। আর রসগোল্লা ভক্ষণের চেয়ে যে ইংরেজ রাজত্ব ভক্ষণের জন্যে একটু বেশী হিসেববোধ দরকার, এটাও আমাদের সত্যি বলেই সন্দেহ হয়।···

"তারপর বয়সের কথা।···পুরোনো, পচা সমাজব্যবস্থার শেকলে যে কেবল বুড়োরাই বাঁধা, তাও নয়,—ছোঁড়ারাও হাজারে হাজারে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে,—আবার, সেই পচা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে অনেক বুড়ো তন্‌-মন-ধন উৎসৃষ্ট করেছেন। অধিকাংশ "স্বাধীনতা" সেবীরই Sweet homeএ এখনো অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরঙ্কুশ রাজত্ব চলছে,—আবার, "স্বাধীনতার" ব্যবসা যাঁরা করেন না, তাঁদের মধ্যেও হাজার হাজার এমন লোক রয়েছেন, যাঁরা মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ আধুনিক।···

"তারপর সহজ বুদ্ধির কথা। সহজবুদ্ধির আদর্শ হচ্ছে পশুরা। ···মানুষের বুদ্ধিটা বিচার-বিতর্ক একেবারে বাদ দিয়ে চলতে পারেনা। সে চেষ্টা করতে গেলে আইডিয়াগুলো হয় অসম্পূর্ণ, কথাগুলো হয় অসংলগ্ন, আর কাজগুলো অকাজ হয়েই দাঁড়ায়। ভক্তিভাজনদের টুকরো-টাকরা শেখানো বুলির খিচুড়ীই তখন একমাত্র সম্বল হয়। সব কাজেই আক্কেল দরকার, আর স্বাধীনতা অর্জনটাই বে-আক্কেল দরের কাজ, একথা মনে করা তখনই সম্ভব হয়।···

"শ্রীমানের আকাঙ্ক্ষা, ভদ্রলোকেরা পালা করে করে আঘাত করতে যাবেন, আর মরবেন। কৃষক ও শ্রমিকেরা এরই মধ্যে,—অর্থাৎ তাঁদের আগেই সে কাজ শুরু করে দিয়েছে।···শ্রীমান তাদের সংঘ গড়ার অনুমতি দিয়েও উদারতা দেখিয়েছেন—সেটা তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে ধর্মঘট করার জন্যে আর আশ্রয় দেওয়ার জন্যে। Secret Society করে ২৫ জন করে দাদার দিলে এক একটি সোনার চাঁদকে ১৫ বছর ধরে ভাঁওতা মেরে মেরে সম্ভ করে তুলতে হবে [illegible] তাতে ওয়ারেণ্ট বেরুবেই। কিন্তু ওয়ারেণ্টকে ভয় করলে ত [illegible] না। কাজেই গা ঢাকা দেওয়ার জায়গাও দরকার। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এসব দুর্দ্ধর্ষ স্পর্দ্ধা চাইই চাই।

"শ্রীমানের অসংলগ্ন শুঁতুনির একটু বিশ্লেষণ করা গেল।··· কৃষক-শ্রমিক সংঘ বা শ্রেণী সংঘর্ষ সম্বন্ধে শ্রীমানের আইডিয়াটা বেজায় অস্পষ্ট।···

"মানব জীবনের তার কেন্দ্র অন্নবস্ত্র। এই অন্নবস্ত্রের সংস্থানের উপরই অন্য সর্ববিধ সুখশান্তি এবং উন্নতি নির্ভর করে ···আমাদের দেশে উৎপাদনের অর্থ কাঁচা মাল উৎপাদন, বণ্টনের অর্থ শতকরা নিরেনব্বই জনের অর্দ্ধাহার···এ সব সমস্যা অন্যদেশেও আছে,—কিন্তু সে সব দেশের সঙ্গে আমাদের একটা তফাৎ আছে। সে সব দেশে দল হচ্ছে দুটো, এবং দুটো দলই দেশী—একদল লুণ্ঠনকারী, আর এক দল লুণ্ঠিত কিন্তু আমাদের দেশে তিনটি দল। একদল লুণ্ঠনকারী, একদল লুণ্ঠিত, দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন,—আর তৃতীয় একটি দল আছেন, যারা বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী—দেশের "শতকরা একজনের" দল।

"দেশের কাঁচা মাল বিদেশে পাঠানো, বিদেশী শিল্পজাত পণ্য দেশে আমদানী করা, এই সব উপায়ে বিদেশীদের লুণ্ঠনে সাহায্য করে, লুণ্ঠনের একটা ছোট বখরা হিসাবে এঁরা বেশ দু পয়সা পেয়ে থাকেন। এঁদের স্বার্থ বিদেশীদের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো।···

"এই শতকরা একেদের নিম্নস্তরের লোকেরা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে এ দেশে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন।···চাকরী-বাকরী এবং শিক্ষা সংস্কারই ছিল সে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধুয়ো।···আন্দোলনের ফলে, এবং সরকারের উপেক্ষার ফলেও বটে,—এঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা যখন চাকরী-বাকরীর গণ্ডী ছেড়ে শাসন ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার চেষ্টায় গিয়ে দাঁড়ালো···তখনও আন্দোলনটার প্রধান অস্ত্র রইলো দরখাস্তই, আর বিদেশী সেঁইয়ার সঙ্গে ভাগ বাঁটোয়ারার রফাই রইলো তার মূল মন্ত্র।

"কিন্তু ঐ শতকরা একেদের নিম্ন স্তরেরই একদল যুবক এই ভাগ বাঁটোয়ারার মোহ কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলে, আর তাদের নজর পড়লো দেশের সর্ববিধ স্বার্থের বিরোধী উদ্ধত দণ্ড বিদেশীদের ওপর। মুষ্টিমেয় হলেও তাদের শিরায় শিরায় তাজা রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠলো, আর উন্মত্ত আবেগে তারা স্বাধীনতার বেদীর সামনে উল্কার মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে' সে রক্তের অর্গল মুক্ত করে দিলে।

"ভাগ বাঁটোয়ারা পন্থীর দল হাতের কাছে কতকগুলো Raw material for victory দেখে তাদের বললে বাহবা, সরকারকে বললে, দেখচো ত? বেশী চালাকী করো না তাড়াতাড়ি রফা কর। সরকার বললে দাঁড়াও, এক ডোজ ওষুধ দিই, কতবড় রোগ, বোঝা যাবে। বলে' একটু নাড়ী টাড়ী দেখে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-রৌলট মিকশ্চার এক ডোজ দিতেই রোগীর ধাত ফিরে এল। ভাগ বাঁটোয়ারা পন্থীর বড় দল "আশার অর্দ্ধেক ফল" পেয়ে সহকর্মীদের কলা দেখিয়ে বড় বড় চাকরীর মহড়া দিতে ছুটলেন।

"সরকারও তাঁদের দিকে কলা দেখিয়ে মুচকে হাসলেন। দু দিক থেকে কলা দেখে তারা বললেন, বটে? দাঁড়াও। দেশ শুদ্ধ

লোককে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোমাদের শাসন শোষণ অচল করে তুলবো ; দেখি আমরা Non co-operation করলে তোমাদের পেটে-পকেটে হাত পড়ে কি না।

"স্বাধীনতা কামীর দল নিজেদের শক্তির দীনতায় ক্ষুন্নমনে সুযোগের প্রতীক্ষায় কিছুদিন ইতস্তত করে অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতির মধ্যে একটা সুযোগের ক্ষীণ আশা নিয়ে আস্তে আস্তে তারই মধ্যে একটু কাজের ক্ষেত্র করে নিলে।

"প্রথম বছরটা একটু চকচকে ভাবে কাটলো, কিন্তু দ্বিতীয় বছরেই তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়লো। স্বাধীনতাকামীরা আর একবার নিজেদের মধ্যে ফিরে এল। তাদের ভাবগতিক দেখে সরকার Regulation আর ordinance দিয়ে তাদের কর্ম্ম ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিলে।·····

"৪।৫ বছর নিরুপায় গবেষণার পর জেল থেকে যখন কর্মীরা বেরিয়ে এল, তখন ঐ "শতকরা একেদের" নিম্নস্তরের আন্দোলনকারীরা তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। এক দল কর্মী তাতেই গলে' গিয়ে পুরানো মোহে তাঁদের আঁকড়ে ধরলেন। আর এক দল দূরে সরে গিয়ে তাঁদের নমস্কার করে বললে,—তোমাদের স্বার্থ যখন শতকরা নিরেনব্বইয়ের বিরোধী এবং বিদেশীদের সঙ্গে এক, তখন তোমাদের চিরকাল বিশ্বাস করা অসম্ভব। আজ তোমরা যা বলছ, তার সরলার্থ—"দশ-আনা-ছ-আনা ভাগ, আমরা জানি কি।" যেদিন ওরা বলবে, "আজ হতে ভাগ হল সমানে সমান"—সেই দিনই তোমাদের মানভঞ্জন হবে।—

দেশটাকে স্বাধীন করতে পারলে তোমরা এক একজন যে বাকি শতকরা নিরেনব্বই জনের দুঃখ দয়া করে ঘুচিয়ে দেবে, আজ পর্যন্ত তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হওয়ার কোন অবসরই তো তোমরা দাওনি।—সুতরাং তোমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন নিয়ে তোমরাই থাক,—শতকরা নিরেনব্বই জনের স্বাধীনতা আনবার ভারটা তাদের হাতেই ছেড়ে দাও।—

"এই হচ্ছে বর্ত্তমান শ্রেণী সংঘর্ষের—আন্দোলনের মূল কথা। চাকরীর আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন স্বাধীনতার আন্দোলন ;—স্বাধীনতার আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি এই শ্রেণী সংঘর্ষ। এক গাল দেওয়া ছাড়া তোমরা যে আর কিছু করতে পার না, এটা আজ-কাল আর শতকরা নিরেনব্বই জনের বুঝতে বাকি নেই।

• • • •

চাষা-মজুরদের চায় সকলেই। মহাত্মার দল চান সরকারের সঙ্গে রফার উদ্দেশ্যে নিজেদের মত-প্রাধান্য দেখাবার জন্য।—স্বাধীনতার অবতারও তাদের চান—এই জন্য যে, তাঁরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ পরাকাষ্ঠা সাধন করবেন,—তখন তারা আশ্রয় দেবে,—আর বেগতিক দেখে যখন Signal দেবেন, তখন তারা ধর্মঘট করবে।—কিন্তু কি মহাত্মার দল, আর কি স্বাধীনতার অবতারগণ,—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের কথা উঠলে প্রজাদের পিছনে তাঁদের দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্বা বা প্রেমের বুলি নিয়ে না দাঁড়িয়ে জমিদারদের পিছনেই তৈলভাণ্ড নিয়ে হাজির থাকেন। তখন এই শ্রেণী-সংঘর্ষের দল কৃষক-শ্রমিক সংঘই তাদের বল-ভরসা জোগায়। কারণ তারা কৃষক-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে, কৃষক শ্রমিকদের স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়,—যারা দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন, আর যাদের স্বাধীনতাই প্রকৃত পক্ষে দেশের স্বাধীনতা।

"বৈজ্ঞানিক কলকারখানা সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির সৃষ্টি ও ব্যবহার যাদের হাত দিয়ে হয়,—তারা কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর লোক। যেগুলো অপরে তাদেরই বিরুদ্ধে এতদিন ব্যবহার করে এসেছে। যেদিন তারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেগুলোকে নিজেদের স্বপক্ষে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করবে, সেদিন··শ্রীমানদের শ্রেণীর নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।

"কৃষক শ্রমিক সংঘ, বা যাদের তোমরা শ্রেণী সংঘর্ষের দল বা শতকরা নিরেনব্বইয়ের দল বল,—তাদের war cry হচ্ছে, Down with Imperialism—Down with Capitalism নয়। Imperialism কে ঠেঙ্গাতে গেলে যদি Capitalism এর গায়ে হাত লাগে,—তার কারণ ও দুটো এক বস্তুরই দুপিঠ।

"শ্রেণী সংঘর্ষের আতঙ্কে তোমরা বিপ্লবটাকে হেঁটেছুঁটে বিদ্রোহ বানাতেই চাও, আর Dominion Status টাকে বাগাড়ম্বরে ঢেকে স্বাধীনতা বলেই চালাতে চাও,—যদি প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে এদেশে কিছু থাকে, বা কখনো ঘটে, তাহলে তার সঙ্গে শ্রেণী বিরোধও থাকবেই।

"প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ বরণ করতে যারা প্রস্তুত, তাদের বিদ্রোহ না করতে শ্রীমান উপদেশ দিয়েছেন। তারা·কারা তারা ? নাম কটা বলে দিতে পারো ? কৃষক শ্রমিক সংঘ সম্ভবত তাদের নাম কেটে দেবে। প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ বরণ করতে যারা প্রস্তুত, তাদের চেয়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে মরতে যারা বাধ্য হচ্ছে, তাদের ওপরই তোদের ভরসা বেশী।

"শত প্রকারের দুঃখ, অভাব, অত্যাচারে জর্জরিত চিরপ্রপীড়িত কৃষকের অন্ধ, বিদ্রোহী আত্মার রুদ্ধ আক্রোশের স্ফুলিঙ্গ কখনো কখনো এক আধটা জমিদার দারোগাকে ভস্মীভূত করে থাকে,—কিম্বা সে শক্তিটুকুরও অভাবে মরিয়া হয়ে খাজনা বন্ধ করে কিছুদিন পড়ে থাকে। একে আজকালকার দুনিয়া আর প্রজা বিদ্রোহ বলে না। আজকালকার প্রজাবিদ্রোহের প্রথম আয়োজন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত কৃষক সংঘ। সংঘবদ্ধ কৃষক প্রথমে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, একদিকে জমিদার মহাজনের সঙ্গে সমবেত "কাজিয়ায়"—আর একদিকে আইন-কানুন পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় সরকারের সঙ্গে সমবেত "কাজিয়ায়"—এই রকম "কাজিয়া" ততদিন চলে, যতদিন না সহরে সহরে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ধনিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সহরে শ্রমিক এবং গ্রামে কৃষক একসঙ্গে বিদ্রোহী হলে, তখন আর সে বিদ্রোহ "কাজিয়া" মাত্র থাকে না। তখন তার শক্তিতে সর্ববিধ ধনিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে।

শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের মনোভাব, স্বাধীনতার আদর্শ এবং সংঘশক্তি গড়ে না উঠলে যে শ্রীমানদের কেরেনেস্কির গভর্ণমেন্টের পতন হবেনা, এই কথাটা যারা বোঝে, তারা শ্রমিক আন্দোলনকেই চাঙ্গা করে তুলতে থাকবে··"

• • • •

দেখা যাচ্ছে, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের বড় দল যুগান্তর পার্টির তাত্ত্বিক আদর্শ ১৯০৫ সালেও যা, ১৯৩০ সালেও সালেও তাই—

ভদ্রলোকের এক কথা। তাদেরই দলের মধ্যে থেকেও যাদের বৈপ্লবিক আদর্শের বিকাশ পারিপার্শ্বিক ও বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রভাবে নতুন পথে চলতে শুরু করেছিল,—আমি তাদেরই একজন,—এবং পার্টি ও নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে আমার মন ও মুখের আগল অকস্মাৎ একেবারে খুলে গিয়েছিল। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমের জ্ঞান যে আমার তখনও খুব বেশীদূর এগোয়নি, একথা বলা বাহুল্য। বস্তুত ষ্টেলিন প্রণীত লেনিনিজম বইটার প্রথম ভল্যুমের ইংরাজী সংস্করণটা এদেশে প্রচার হওয়ার আগে পর্যন্ত কোনো কমিউনিষ্ট কর্মীরও জ্ঞান আমার চেয়ে খুব বেশী এগোয়নি। কিন্তু একদিকে তাদের কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, আর একদিকে কংগ্রেস, গান্ধী ও বিপ্লবী দাদাদের মতিগতি লক্ষ্য ও বিচার করতে করতে আমার বিপ্লবের সন্ধানী মন শুধু যে ঐ দিকেই ঝুঁকেছিল, তাই নয়,—সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এযুগে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডী বা সান-ইয়াট-সেনের বিপ্লবের আদর্শ কার্যকরীই হতে পারেনা। এযুগের বিপ্লবে একদিকে থাকবে ইম্পিরিয়্যালিষ্টদের সঙ্গে দেশী ক্যাপিট্যালিষ্টদল, আর একদিকে সংঘবদ্ধ চাষা-মজুর—বিপ্লবের প্রকৃতিটা হবে দেশী-বিদেশীর সংগ্রাম নয়, পরন্তু শোষক শোষিতের সংগ্রাম। আধুনিক শিল্প ও যান-বাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশী-বিদেশী ধনিক-মালিকেরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার-রূপে ব্যবহার করবে,—সুতরাং সে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিতে না পারলে বিপ্লব সফল হতে পারেনা,—আর শুধু বিপ্লবী শ্রমিকই সেটা ছিনিয়ে নিতে পারে, এবং সারা দেশের শোষিত বিদ্রোহী কৃষকের সমর্থন ও সাহায্যে বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। এই বিশ্লেষণের জন্যেই আমার পুস্তিকা তখন তরুণদের মনে একটা সাড়া জাগিয়েছিল।

• • • •

এখন আবার কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথায় ফিরে আসা যাক। লাহোর কংগ্রেসে একটা বামপন্থী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল, একটা প্যারাল্যাল গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার ব্যবস্থা হোক। সে প্রস্তাব অবশ্য ভোটে পরাজিতই হয়েছিল।

জানুয়ারীর গোড়াতেই মহাত্মাজী এক আমেরিকান পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়ে বললেন,—"লাহোরের স্বাধীনতার প্রস্তাবে কারো ভয় করার কিছু নেই।" ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যবস্থা হল। তার আগেই সুভাষ বাবুকে গ্রেপ্তার করা হল, এবং ২১ সালের শেষ দিকে এক প্রোশেশনের নেতৃত্ব করার অজুহাতে তাঁর নামে মামলা করা হল, যে প্রোশেশনে একটা গান গাওয়া হয়েছিল,—"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়া চরণে নম্র শির,—ডরিনা রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্ত বীর" ইত্যাদি। মামলায় সুভাষ বাবুর বোধহয় ৯ মাস জেল হয়েছিল।

৩০শে জানুয়ারী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে মহাত্মাজী ১১ দফা দাবীর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। আগে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজ না দিলে আইন অমান্য করা হবে। কিন্তু কর্মসূচী কিছুই ঠিক করা হয়নি এবং প্রথমেই বলে দেওয়া হল, কোন সত্যাগ্রহী পুলিসের গায়ে হাত দিলে আইন অমান্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ইঙ্গিতে সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছল,—রফার রাজী হলেই বারদোলীর পুনরভিনয় করা হবে।

কিন্তু আইন অমান্য আরম্ভ করার আগেই ঐ ১১ দফা সর্ত দিয়ে বলা হল, এই সব দাবী মেনে নিলে আইন অমান্য শুরু করা হবে না। মহাত্মার কর্মসূচীর কোন হদিস না পেয়ে সবরমতীতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁর তখনও কোন পরিষ্কার কর্মসূচী ছিল না। তিনি বলেছিলেন, ভোরের কুয়াসার মধ্যে দ্রুতগামী মোটরের সামনের পথ যেমন ক্রমশঃ দেখা যায়, তেমনি ভাবে আমাদের কর্মসূচী ক্রমশঃ আপনি দেখা দেবে। সত্যাগ্রহীদের কপালে যেন একটা সার্চলাইট বাঁধা থাকে,—সেইটাই কর্মসূচীর পরবর্তী ধাপ দেখিয়ে দেয়!

ফেব্রুয়ারীতে তিনি লিখলেন, "আমি প্রথমে সবরমতীর আশ্রমবাসীদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করবো, যারা আশ্রমের আদর্শ ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত।" তারপর তিনি স্থির করলেন প্রথমে লবণ আইন অমান্য করা হবে, এবং মার্চ মাসে তাঁর ৭৮ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে সবরমতী আশ্রম থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন, ৬ই এপ্রিল তারিখে ডাণ্ডীতে বেআইনী ভাবে নুন তৈরী করবেন বলে।

নুনের ট্যাক্স তুলে দেওয়ার দাবীই ছিল ঐ ১১ দফার প্রথম দাবী। অন্যান্য দাবীও এমন; যাতে সবগুলো মিলিয়ে সব রকম লোককে ঠাণ্ডা করা যায়, সকলেই বলে বাহবা।

নুনের ট্যাকস রদ করা, মদ্যবর্জন আইন করা, খাজনা কমানোর দাবীতে গরীব, সাধারণ লোক ও চাষারা সন্তুষ্ট হল, উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বিলাতী কাপড় আমদানী বন্ধ, টাকার বিনিময় হার কমানোর দাবীতে বড়লোকেরা সন্তুষ্ট হল, গোয়েন্দা বিভাগ ও অস্ত্র আইন তুলে দেওয়া এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে তরুণ স্বাধীনতাবাদীর দল সন্তুষ্ট হল,—সিভিলিয়ানদের মাইনে কমানোর দাবীতে সকলেই সন্তুষ্ট হল।

এই রকম অদ্ভুত দাবীর অসম্ভাব্যতার দিকে যেন কারো নজরই পড়লো না। এসব সর্ত মানার অর্থ যে ইংরেজের বাড়ী চলে যাও, এটাই সকলের আনন্দের কারণ। এমন দাবী ইংরেজ মানতে পারে না, সুতরাং স্বাধীনতার সংগ্রামই জোরদার হবে, এও হয়ত কিছু লোক ভাবছিল। আর এরই তলায় মহাত্মা আগে থেকেই রফার আলোচনার একটা ভিত্ত গেড়ে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরকারকে বলে দিলেন, এগুলোর একটা সন্তোষজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হলে "the Congress will heartily participate in any conference, where there is a perfect freedom of expression and demand"!

"দাবী"র সন্তোষজনক মীমাংসার ব্যবস্থা হবে এবং "demand"এর freedom থাকবে—এ হলেই কংগ্রেস প্রেমানন্দে সম্মেলনে যাবে। অর্থাৎ higher politicsএর দোহাই দিয়ে যে-কোন রকমের রফার জন্যে একটা রাউণ্ড বা অখণ্ডিত টেবিল বৈঠক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব কায়দা লক্ষ্য করছিলুম এবং যখন মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গের জন্য একটা বিরাট প্রচার ব্যবস্থাকল্পে

ডাণ্ডীতে পদযাত্রা সুরু করেছিলেন—যখন সারা দেশ আকুল আগ্রহে প্রত্যহ সকালে সংবাদপত্রের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে, কবে মহাত্মা কোথায় পৌঁছালেন,—কে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন "নবশক্তিতে" আমি এক প্রবন্ধ লিখলুম "শ্রীভাঁওতা।"

লিখলুম, friendly game সুরু হল—আপোষের ব্যবস্থা হবে এবং তার জন্তে দূতীরূপে আসবে মালব্য-জিন্নার মতন নেতা, যারা মডারেটদের মধ্যে এক্সট্রিমিষ্ট এবং এক্সট্রিমিষ্টদের মধ্যে মডারেট। হয়েছিলও ঠিক তাই এবং দূতীরূপে এসেছিলেন জয়াকর ও সাপ্রু। তার বিবরণ পরে বলছি।

৯ই এপ্রিল মহাত্মাজী এক নির্দেশ দিলেন, গ্রামে গ্রামে বেআইনী নুন তৈরী করতে হবে, মদের এবং বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালাতে হবে, সর্বত্র চরকা চালাতে হবে, বিলাতী কাপড় পোড়াতে হবে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান মিলন করতে হবে, স্কুল-কলেজ ছাড়তে হবে, সরকারী চাকরী ছাড়তে হবে।—১৯২১ সালের অপূর্ণ স্বরাজের আন্দোলনের বোটকা গন্ধ!

একটা লড়াইয়ের জন্তে লোকে উদগ্র আগ্রহে অধীর হয়েছিল,—এখন এই পচা কর্মসূচী নিয়েই তারা কাজে নেমে পড়লো। সরকারও তৈরী হয়েই ছিল—লাঠি, গুলি, জেল প্রভৃতি সর্বহিংস্র নির্যাতনের বন্যায় তারা অহিংস আন্দোলনকে ডুবিয়ে দিলে।

ঠিক এই সময়েই চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতের এক নতুন ডিজাইনের পতাকা উড়িয়ে দিলে। এ হল এপ্রিলের শেষে। এবং এ হল যেন একটা সিগ্‌ন্যাল, সর্বত্র বিপ্লবীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রামের ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার পুলিস প্রথমেই হানা দিলে সন্তোষ মিত্রের আড্ডায়, অক্রূর দত্ত লেনে, এবং সেখান থেকে তাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। "স্বাধীনতার" তখন উঠে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল, সে অবস্থায় "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" বলে ওরা "ধন্য চট্টগ্রাম" শীর্ষক এক প্রকাণ্ড অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধ লিখে কাগজ তুলে দিলেন।

এদিকে পেশোয়ারে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ দমন করার জন্য সরকার সাঁজোয়া গাড়ী পাঠায়, এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ তার একখানা গাড়ী আক্রমণ করে, গাড়ীর লোকজনদের বার করে দিয়ে গাড়ীটাকে পুড়িয়ে দেয়। ফলে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে বহু লোক হতাহত করা হয়। এই সময়ে ১৮ নম্বর রয়েল গাড়োয়ালী রাইফেল এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের দুই প্ল্যাটুন সৈনকে জনতার ওপর গুলি চালাবার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই গাড়োয়ালী সৈন্যেরা সে আদেশ অমান্য করে, এবং মুসলমান জনতার সঙ্গে ভিড়ে যায়। ফলে ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ারে সরকারী শাসনের চিহ্ন মাত্রও লুপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও এরোপ্লেনের সাহায্যে সহর পুনরুদ্ধার করা হয়। সমগ্র ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সকল দাবী অগ্রাহ্য করে সরকার ঐ গাড়োয়ালী সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার করে ১৭ জনকে কারাদণ্ড দেয়—৩ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর এবং একজনের যাবজ্জীবন।

অহিংসা ও সত্যের অবতার এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা মহাত্মাজী কিন্তু ঐ গাড়োয়ালী সৈন্যদের এই বলে নিন্দা করেন যে, কোন সৈন্য যদি গুলি চালাবার আদেশ অমান্য করে, তাহলে তার শপথ ভঙ্গের পাতক হয়।

"যুদ্ধের" শেষে আরুইনের সঙ্গে যে "সন্ধি" হয়, তাতেও এই গাড়োয়ালী সৈন্যদের মুক্তির কথা ছিল না।

আর শ্রীপট্টভি সীতারামাইয়ার লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসেও এই এতবড় ঘটনার উল্লেখ নেই।

যাই হোক, এই ঘটনার পরে ৫ই মে সরকার বাহাদুর মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করলেন। কারণ হল,—"যদিও মহাত্মা গান্ধী এই সব হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করেন, তবু তাঁর শিষ্যদের এই সব কাজের প্রতিবাদে তাঁর আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে—এবং বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি এদের কায়দা করতে পারছেন না।"

যাই হোক, মহাত্মার গ্রেপ্তারে আবার যথাশাস্ত্র একটা প্রবল বিক্ষোভ সারাদেশকে উদ্বেলিত করে তুললে। শোলাপুরে তার এক নতুন রূপ দেখা গেল। বোম্বাই প্রদেশের এই সহরটার ১৪০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০০০ই হল বস্ত্রশিল্প শ্রমিক। মহাত্মার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরটার সমগ্র শ্রমিক সাধারণ ধর্মঘট থেকে সুরু করে সহরটা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করে ফেললে। এক হপ্তা এই অবস্থা চলার পর ১২ই মে সরকার মার্শাল ল' জারী করে সৈন্যদের সাহায্যে সহর পুনর্দখল করে, এবং তার পরে যথাশাস্ত্র নির্যাতনের চূড়ান্ত করে।

তার পর জুন মাসে সরকার কংগ্রেস এবং তার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

মার্চ মাসে মহাত্মাজী বড়লাট আরুইনের কাছে পত্রে লিখেছিলেন আমি যে আন্দোলন করতে যাচ্ছি, তাতে অহিংসার শক্তি প্রযুক্ত হবে সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ হিংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে।

১৪ই জুলাই সরকারী মুখপাত্র ব্যবস্থা পরিষদে হিসাব দিলেন,—"১লা এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত ২১ বার জনতার ওপর গুলি চালানো হয়েছে, এবং তাতে ১০৩ জন নিহত ও ৪২০ জন আহত হয়েছে।"

পরে ৩১ সালের মে মাসে মহাত্মাজী এক প্রবন্ধে লেখেন, "অহিংসা অক্ষুণ্ণ রেখে আমি চূড়ান্ত ব্যর্থতা বরণ করতেও প্রস্তুত, কিন্তু অনিশ্চিত সাফল্যের লোভে অহিংসা নীতি থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হতেও রাজী নই।"

আমি পার্টি ও দাদাদের প্রভাব মুক্ত বিপ্লবীর চোখে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই সব অপূর্ব ঘটনা ও বাকচাতুরী লক্ষ্য করে যাচ্ছি, আর অবাক হয়ে ভাবছি,—বিপ্লব কোথায়, কতদূরে? কংগ্রেস ও গান্ধী বেঁচে থাকতে কি তার কোন আশা আছে! মনকে প্রবোধ দিই, কৃষক-শ্রমিকদের নিজেদের সংগঠন, নিজেদের বৈপ্লবিক আদর্শ যদি কোনদিন কংগ্রেস ও গান্ধীর প্রভাব কাটিয়ে গড়ে উঠতে পারে!

ফলত গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে আমার যেন চোখ খুলে গেছে, আমি সকলের থেকে এক পৃথক দৃষ্টিতে তাকে দেখি, আর তার বিপ্লববিরোধী ধনিকশ্রেণী আপোষপন্থী রূপ দেখে শিউরে উঠি। তারই ফলে জন্ম হয় "শ্রীভাঁওতা" নামক বইয়ের।

[ক্রমশঃ

বাঙ্গালী গীতি-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

কবি তাঁর সেই—"নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্ম বাঁশিখানি" হাতে নিয়ে, তাতে এক এক রকমের সুর সাধনা করে কোন এক অসীম অনন্ত গীতিরাজ্যের চতুঃসীমা পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। নানা রসে রঙে ভরা এই বিশাল বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি জগতের অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগের যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তা থেকে হলো কবির গান, এবং বিশ্ব সৌন্দর্য্যানুভূতির যে রসাক্ত চাপ সমগ্র কবিমনটিকে গীতি-মুখর করে তুলেছিল তা দিনের পর দিন গানের আকারে মধুর সুরের সংযোজনায় কবিতার রূপ নিয়ে বাইরের জগতে একটির পর একটি বেরিয়ে আসে। তাই বলি যে গান গাইবার জন্যে কবিকে কখনো প্রস্তুত হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসতে হয়নি পেশাদারী গায়কগোষ্ঠীর মত। কারণ সমস্ত গানই যে কবির অন্তরের গান, মহান্ সৌন্দর্য্যোপলব্ধির গান, রূপ জগতের গান, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বলেই আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রতিটি ছোট বড় গীতি-কবিতায় গান ও কবিতার কি চমৎকার সংমিশ্রণ, সুরের সকল লক্ষণই এখানে সুপরিস্ফুট ভাবে রয়ে গেছে। কবিতার দিক দিয়ে তার ভাষা ও ছন্দও যেমন আবার গানের দিক দিয়ে সুর ও ছবির সঙ্গতিও লক্ষ্য করার বিষয়। দেখে মনে হয় ঠিক যেন চূড়ামণি যোগ ঘটেছে।

কিন্তু সব থেকে বড় জিনিষ যেটি অর্থাৎ তাঁর গীতি-কবিতায় যা নাকি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে সুর ও ছবির সুষ্ঠু মিলনের ফলেই কবিতাগুলি এক অদ্ভুত রসমাধুর্য্য লাভ করেছে। রসই হল গীতি-কবিতার প্রাণ এবং যেখানে রসের মাধুর্য্য নেই সেখানে সে কবিতার প্রাণ নেই বলেই বুঝতে হবে। সুতরাং এ রসের সৃষ্টি তখনই হতে পারে যখন সুর ও ছবি অতিমাত্রায় উৎকর্ষতা লাভ করবে। অতএব এ দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলির সঙ্গে আর অন্য কারো তুলনা করা চলে না। সব কিছুর সমাবেশ একই সঙ্গে এখানে এমন ভাবে ঘটেছে যার ফলে এগুলি যে সত্য সত্যই অতুলনীয় তাও নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। কবির গীতি-কবিতাগুলি যে শুধুমাত্র চিত্রধর্মী তা নয় বরং মনে হয় যেন সবগুলি একত্রে একটি চিত্র-প্রদর্শনী বিশেষ। কবিতা পড়ে গানের সুরও যেমন প্রাণে লাগে তেমন আবার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবিও চোখের সামনে ফুটে উঠে, যেটি নাকি কবিতা পাঠের পর সহৃদয় পাঠকের মনের মণিকোঠায় টাঙানো থেকে যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত। 'ছবি' নামক কবিতাটির কথাই ধরা উদাহরণস্বরূপ দেখলেই এখানে তা বুঝতে পারি, যার মধ্যে কবি কি চমৎকারভাবেই না সুর ও ছবির এক অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে রেখেছেন, যথা,—

"তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা ক'রে আছে ভিড়
আকাশের নীড়
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।"

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতা সম্পর্কে অন্যতম বক্তব্য বিষয় হলো এই যে এগুলি কবির অতিশয় গভীর অন্তর জগতে সৃষ্ট হয়ে গভীরতম ভাবানুভূতির মধ্যে দিয়ে পরিপুষ্টতা লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্যথিত কবি-হৃদয়ের ব্যথার দ্রাবক রসে রস-সিক্ত, আপ্লুত, অভিষিক্ত। যেমন কবি গেয়েছেন—

"তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘদান
প্রাণ-জাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্ত্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহ
কার সাথে আমার কলহ?"

এখানে কবির গহন অন্তর-নিচয়ের গভীরতম প্রদেশ হতে যে করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে তা আমাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত না করে পারে না, সমস্ত মনটাকে যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এর মধ্যে এমন একটি স্পন্দন রয়ে গেছে যার ফলে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যে কবির হৃদয়টি অনিবার্য ভাবেই স্পন্দমান হয়ে উঠে; গানের মধ্যে দিয়ে কবি-হৃদয়ের এক অদ্ভুত আকুতি পটে লেখা ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। যে এর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছে সেই কেবল বলতে পারে যে এটি নিছক কোন ভাবের কবিতা নয়, 'কুসুম-অঞ্জলি অর্ঘদানের' করুণ রসাত্মক গীতিকা নয়, কল্পনাপ্রসারী মনের তুলিকায় আঁকা একখানি ছবি নয়, পরন্তু ব্যথিত কবি-হৃদয়ের গাওয়া গানের ছন্দে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির বুকে মিশে থাকতে চায় এই গানের সুর চিরন্তন কালের জন্য। এবং তা যদি হয় তবেই এ গান গাওয়া কবির সার্থক।

এখানে আরো একটু বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক ভাবের দিক থেকে এত উন্নত বা অবশ্যই সর্বজনসম্মত ভাবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে চলেছে। যেমন আমাদের বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রতিটি পদাবলী গান সু-মহান আধ্যাত্মিক ভাবে ও রসে সর্বকালের ভক্ত অভিষিক্ত ও প্রগাঢ় বিস্ময়ের এক অনন্তকালের সম্পদ হয়ে রয়েছে, কবির শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতাগুলিও ঠিক তেমনি। গীতি-কবিতার মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুভবের ব্যঞ্জনা এবং এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও এইখানেই। কবি তাঁর গানের ভেতর দিয়ে যে ধরণের আধ্যাত্মিক ভাবের বিচিত্র প্রকাশ-রূপ দেখিয়েছেন তা শান্ত মস্তিষ্কে বিচার করে দেখলে সহজেই বুঝতে পারি যে তিনি এক অনাদি, অনন্ত সত্যের সন্ধানই আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। সেই একক মহাসত্যের ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য ও গভীর আধ্যাত্মিক রসোপলব্ধির জন্য তিনি আমাদের স্থূল চেতনাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করে কল্পনাকে রীতিমত সক্রিয় করে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর ঐ সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে যে সকল ছবি আমাদের এই দুর্বল মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসিয়ে এনেছেন তা সেই চিরন্তন সৌন্দর্যের এক মর্মবাণীই বহন করে নিয়ে চলেছে অধুনা বাঙালীর বৈচিত্র্যবিহীন চলার পথে। বাহ্য জগতের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সুদূর পিয়াসী কল্পনার আতিশয্যে কবি যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তা সেই ইন্দ্রিয়াতীত এক একটি নতুন জগৎ ও জীবনেরই আলেখ্য বিশেষ, এই জন্যই আমরা দেখি যে, তাঁর গীতি-কবিতাগুলি অধিকাংশই 'রোমান্টিসিজম' ও 'মিষ্টিসিজমের' ওপর নির্ভরশীল এবং এদের মূল সুর ও mystic হয়ে পড়েছে। অনেকে হয়ত মনে করে থাকেন যে কবি নিজেকে একটা জটিল আবরণের মধ্যে রাখার জন্য বোধ হয় mysticism-এর অবতারণা করেছেন এবং এর মূল কারণ আর অন্য কিছুই নয়, ইয়োরোপের রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের প্রভাবে কবি একেবারে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন এবং এই দুঃসহ বিদেশী প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারেন নি। এই রকম ভাবান্তর বা অমূলক ধারণার বিপক্ষে আমি কেবল এইটুকুই বলতে ইচ্ছা করি যে কবি কোনোকালেও নিজেকে জটিলতার জালে আবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে mysticism-এর পথ অবলম্বন করেন নি, বরং ভাবজগতের অনুভূতি যতই সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে চলেছে ততই সহজ ভাবের transformation ঘটেছে এবং এই gradual transformation-এর মধ্য দিয়ে কবিমানস আপনা থেকেই mystic হয়ে গেছে, এজন্য কবিকে দায়ী করা মূঢ়তার পরিচয় মাত্র। আর বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে বলা যায় যে কবির প্রথম জীবনের দিকে হয়ত এ প্রভাব কিছুটা ছিল কিন্তু ক্রমেই তা কাটিয়ে উঠে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ভাবের অবতারণা করেছেন, যা সকল প্রভাব হতে মুক্ত।

তবে এ কথা ঠিক যে, আমাদের আধুনিক বাঙলা গীতিকাব্যের যুগের ওপর কবিপ্রভাব যে যথেষ্ট পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকারই কথা এবং অনেকেই তাঁর গীতি-কবিতার ভাব ও ধারা অনুসরণ করে কাব্য রচনার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু অকৃতকার্য্যজনিত হতাশাই তাঁদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে বলেই মনে হয়। অবশ্য আর এক শ্রেণীর আধুনিক কবি আছেন যাঁরা যথাসাধ্য রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক বাস্তববাদের রীতিই অনুসরণ করতে ব্যস্ত অর্থাৎ রোমান্টিসিজম ও মিষ্টিসিজম-কে একেবারে দূরে সরিয়ে দিয়ে রিয়েলিজমের ওপর গীতিকাব্যের প্রকৃত ভিত্তি সুদৃঢ় করাই এ দলের মূল উদ্দেশ্য ও একান্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তবে এঁরা পাইকারী হারে মোটেই যে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি তা নিশ্চিত, আর যদি কেউ কেউ কোনোগতিকে সফলতা অর্জন করেও থাকেন তবে তা বংসামান্যই; জানি না, এ বিষয়ে বিজ্ঞ সমালোচকেরা একমত কি না। অবশ্য এ কথাও বলতে হয় যে আজ বাঙালী জীবনে যে চরম দুর্দশার মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে তাতে আর কল্পনাবিলাসী মনের যে কোনো সুদূর প্রসার থাকতে পারে না তা হয়ত কতকটা সত্য বলেই মানি, এবং বাস্তববাদ ছাড়া যে আর অন্য কিছুই সত্য বলে মনে হতে পারে না তাও স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, আধুনিক কবিদের উর্বর মানস জগতে কঠিন বাস্তববাদ ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করতে পারে না, যেহেতু যেখানে কল্পনাশক্তির সত্যিকারের কোনোরূপ প্রেরণা নেই সেখানে ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো একটি সুন্দর কাল্পনিক জগতকে বাস্তবরূপ দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালন করার ক্ষমতা এই সমস্ত কবিদের নেই বলেই তাঁরা বাস্তববাদকেই অগত্যা চরম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, রোমান্টিসিজম ও মেষ্টিসিজম-কে এড়িয়ে গিয়ে এবং এঁরা কোনক্রমে কেউই born-poet নন, সকলেই made-poet-এর পর্যায়ভুক্ত। তাই বাস্তববাদের নামে যে সব গীতি-কবিতা রচিত হচ্ছে তা কেবল

অনাসৃষ্টি হয়েই চলেছে বলে অনেক বিজ্ঞজনের ধারণাও মিথ্যে নয়। কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের সাধনা যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন তেমন করার ক্ষমতা বর্ত্তমান বাঙ্গালা গীতিকাব্যে কোথাও পাই না, বরং এখানে আছে শুধু বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার আভাষ ও ইঙ্গিত; যার ফলে আধুনিক গীতিকাব্য ও কবিদের অক্ষমতার পরিচয়ই মেলে। সুতরাং সব শেষে আশা করি এটুকু নিশ্চয় সৎসাহসের সঙ্গে বলতে পারি যে কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী গীতি-কাব্যের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। —দেবব্রত ভট্টাচার্য।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন ৮২৮৭৩—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রাগপ্রধান ছ'খানি বাংলা গান—"পথ চেয়ে রাধিকা রয়েছে" (ঠুংরী) ও "কেন জানি না বাজে।"

এন ৮২৮৭৪—শ্রীমতী বাসবী নন্দীর মায়াবী কণ্ঠের আবেদনশীল ছ'খানি আধুনিক গান—"এ শুধু তোমার আমারে লয়ে" ও "তোমার স্বপ্ন নিয়ে রাত্রি এলো।"

এন ৮২৮৭৫—"ঐ ঠমকী ঠমকী চালে" ও "আমি কি খুঁজিলাম" —দরদ-মাখানো পল্লীসংগীত, গেয়েছেন সনৎ সিংহ।

এন ৮২৮৭৬—বৈশিষ্ট্যময় ছ'খানি আধুনিক গান—"ঐ আকাশে পূর্ণ চাঁদ" ও "নতুন নতুন রঙ"—কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে অপূর্ব ক'রে তুলেছেন শ্রীমতী ইলা বসু।

এন ৮২৮৭০ হইতে এন ৮২৮৭২—তিনখানি রেকর্ডে ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ গীতিনাট্য "সতী বেহুলা"—পল্লী বাংলার অমূল্য সম্পদ।

কলম্বিয়া

জীই ২৪১১৪—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুকণ্ঠের আধুনিক গান—"তোমার দীপের আলোতে নয়" ও "এই সুরঝরা খেলাতে।"

জীই ২৪১১৫—নবাগতা শিল্পী লক্ষ্মীশঙ্করের "মায়াভরা রাতি" ও "এ মধু নিশীথে"—গান ছ'খানি তাঁর প্রথম রেকর্ড। পণ্ডিত রবিশঙ্করের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এই শিল্পী সেতারঝঙ্কারের মতই কণ্ঠ-ঝঙ্কারে সবাইকে মুগ্ধ করবেন।

জীই ২৪১১৬—"অচেনা বনের অচেনা ফুল" ও "নূপুর দিয়ে বাঁধলে চরণ"—আধুনিক গান ছ'খানি পরিবেশন করেছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জীই ২৪১১৭—গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ছ'খানি কীর্ত্তন গান—"আজু রঙে হোরী" ও "বাঁশী বাজান জান না।"

জীই ২৪১১৩—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "সাগর থেকে ফেরা" —কাব্যকীর্তির অনবদ্য সংগীত রূপ।

জীই ৩০৪৪১—"হাত বাড়ালেই বন্ধু" বাণীচিত্রের ছ'খানা জনপ্রিয় গান—"শরীরখানা গড়ো" ও "শহরে সবই বিকায়"—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জীই ৩০৪৫০ এবং জীই ৩০৪৫১ রেকর্ড ছ'খানিতে "ইন্দ্রধনু" বাণী চিত্রের জনপ্রিয় গানগুলি গেয়েছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৬৫)

শ্রীসুনীলকুমার রায়

রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে বৈঠকখানার বিলাস-ব্যসন নয়—নিষ্ঠা ও সাধনার সাথে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়া শিক্ষা করিতে হয়—ইহা শিল্পী শ্রীসুনীলকুমার রায়ের কণ্ঠে গুরুদেব রচিত গান শুনিলে উপলব্ধি করা যায়। পরিচয়ের পর জেনেছি তাঁর শিল্পি-জীবনী—

দুই ভাই ও পাঁচ ভগিনীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান আমার ১৯২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মীরাট সহরে জন্ম। পিতা পরলোকগত ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় তথাকার অন্যতম বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। স্বগ্রাম বরিশাল জিলার কুলকাঠি। আমার আট বৎসর বয়সের সময় তিনি নিজ পেশা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন ও জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁহার সম্পাদনায় Insurance & Finance Review ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট নামে দুইটি ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার ডোভার লেনের গৃহে সাহিত্যসভা ও সাংবাদিকদের আসর বসিত এবং ব্যবসায়ী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁহার সুহৃৎ।

আমি ১৯৩৬ সালে জগবন্ধু ইনষ্টিটিউসন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৯৪১ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররূপে বি, এস, সি পাশ করিয়া কিছুকাল জীবনবীমার কার্য্য করি। পরে আমার পিসেমহাশয় কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে ধানবাদ মাইনিং কলেজের ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় একটি কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। ১৯৪৪ সাল হইতে আমি রবারশিল্পে স্থায়িভাবে লিপ্ত হই ও বর্ত্তমানে একটি সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানে যুক্ত রহিয়াছি।

আমাদের পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীত সমাদৃত ছিল। আমার মধ্যেও সঙ্গীতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে উঠে। আমার কনিষ্ঠা ভগিনী যখন গৃহে শিক্ষকের নিকট গান শিখিত তখন অন্তরাল হইতে নিবিষ্টমনে শুনিয়া সেগুলি আয়ত্ত করিতাম। গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিও সঙ্গীতের সহায়তা নিতাম অনেক সময়। ১৯৩৮-৩৯ সালে কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট সংস্থার উদ্যোগে কবিগুরুর "নটীর পূজা" অভিনীত হয়। ইহার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন শ্রীসমরেশ চৌধুরী। এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং নিয়মিতভাবে তাঁহার নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা করি। ১৯৪৩ সালে তাঁহার সহযোগিতায় "গীতভারতী" নামে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় আরম্ভ করি। ১৯৪৫-৪৬ সালে এক বৎসরের জন্য "গীতবিতান" এ শিক্ষকতা করি। ১৯৪৭ সালে শ্রীযুত শুভঠাকুরতা ও আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন 'দক্ষিণী' প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত সচিব ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বর্ত্তমানে নিজগৃহে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করি। শ্রীযুত সমরেশ চৌধুরী ব্যতীত বিশ্বভারতী সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট কিছুদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা করি। উঁহার গায়কী আয়ত্ত করিতে গিয়া বুঝিতে পারি

যে ইহার ভিত্তি হইল ভারতীয় মার্গসঙ্গীত। অথচ যথাযথ ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে হইলে মার্গসঙ্গীতে অধিকার থাকা প্রয়োজন। তজ্জন্য আমি শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট মার্গসঙ্গীত অনুশীলন করি।

১৯৩৯ সালে এক বন্ধুর তাগিদে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে 'অডিসন্' দিই এবং কেন্দ্রের শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস ও শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের উৎসাহে আমি নিয়মিত ভাবে বেতার কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে থাকি। ১৯৪১ সালে কবিগুরুর তিরোধানের পর শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট "সমুখে শান্তি পারাবার" গানটির স্বরলিপি প্রেরণ করেন এবং উক্ত বৎসরের ১১ই আগষ্ট আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে উহা পরিবেশন করি। পর বৎসর শৈলজাবাবুর পরিচালনায় আমার গীত প্রথম রেকর্ড হল 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি' ও 'উদাসী হাওয়ায় পথে পথে'। ১৯৪৬ সালে বাহির হয় "শ্রাবণের পবনে" ও "মুখখানি কর মলিন বিধুর"। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে অনেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। এই সম্পর্কে আজ বিশেষ ভাবে মনে আসে সত্তলোকান্তরিত আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের আমার প্রতি অসীম স্নেহের কথা। কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় শ্রীসুবোধ রায়ের গৃহে তাঁহার সংখ্যাতীত 'কথকতা' সভায় আমি সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। মীরা, কবীর, দাদু ও অন্যান্য সন্তবাণী যখন তিনি শ্রোতাদের শুনাইতেন তখন তৎভাব ও ভাবনাযুক্ত তাঁহার নির্ব্বাচিত অনুরূপ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাহিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইত।

১৯৪৫ সালে স্বর্গত হেমশঙ্কর রায়ের কন্যা ও পরলোকগত দেশনেতা কিরণশঙ্কর রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দুনিভাকে আমি বিবাহ করি। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে আমার উপরে। অনেকে আমাকে ইতিপূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছেন যে সঙ্গীতকে কেন একান্ত ভাবে আমার জীবিকার একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করি নাই। তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে,

শ্রীসুনীলকুমার রায়

বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতকে আমার জীবনের আনন্দলোকের প্রধান উপায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ব্যবহারিক জগতে সেই সঙ্গীতকে একমাত্র বৃত্তি করিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জনমনের চাহিদার সঙ্গে আমাকে কেবলই আপোষ করিতে হইবে। ইহাতে সঙ্গীতের আদর্শচ্যুতি ঘটিতে পারে। কিন্তু আমার অন্তরের চিরতৃষ্ণা আমাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধনার অনুগামী করে রাখে।

শেষে শ্রীরায় বলেন, সুষ্ঠু ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করিতে হইলে বাণী ও সুরের বিশুদ্ধতা, বিশিষ্ট ভাবময় ভঙ্গী ও জড়তা বিহীন উচ্চারণ প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে আধুনিক গানের সুর-স্পর্শ একবারেই অচল। বিশেষতঃ বিদেশী সুরের অনুসরণে ও অনুরণনে কম্পন (Tremolo) অতিশয় অবাঞ্ছনীয়।

কলমের কালিমা

চিত্তরঞ্জন পাল

আকাশ লোপাট হোক সমুদ্র শুকায়ে যাক, তবু
এ জীবন ধন্য হবে মুছে যাবে দুঃখশোক, প্রভু
প্রসন্ন নয়ন তুলে বারেক বচন-সুধা যদি
কখনও করান পান। তা না হলে সান্ত্বনার নদী
হারায় বিশীর্ণ ধারা অন্তহীন হতাশার পারে।

হরতালী দিবসেও হাজিরা দেবার অধিকারে
যেটুকু সম্মান তাতে শিরোধার্য প্রভুপদধূলি।
কর্মের বহর বাড়ে। নিয়মিত দাসত্বের তুলি
দিনান্তের শেষ আলো মুছে নেয়; অকরুণ রাত
হানা দেয় প্রতিদিন—রবিবারে ঘটে অপঘাত।

মাসান্তিক মাইনে তবু প্রয়োজনে তুচ্ছতার কেন;
অভাবের যন্ত্রে রুদ্ধ জীবনের চলে লেনদেন।
বাণিজ্যিক বেড়াজালে উন্নতি তো আলেয়ার সিঁড়ি—
সংবৎসরে বৃদ্ধি; কানে-গোঁজা অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি।

মাসিক বসুমতীর এজেণ্ট-তালিকা

ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে

বর্ত্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেণ্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেণ্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

॥ বাঙলা দেশ ॥

দঃ কলিকাতা (বৃহত্তর)

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য —টালিগঞ্জ
শ্রীফটিকচন্দ্র পাল —টালিগঞ্জ
শ্রী এ, বি, দাস —লেক রোড মার্কেট
শ্রীজগৎ সিং —বালিগঞ্জ
শ্রীভগীরথ মাইতি —গড়িয়াহাট
শ্রীতুলসীরাম —বালিগঞ্জ
মেঃ দামোদর লাইব্রেরী —বেহালা
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মোদক —টালিগঞ্জ
শ্রীরাজবল্লভ সিং —বালিগঞ্জ
শ্রীসুকুমার ব্যানার্জ্জী —বালিগঞ্জ
শ্রীশম্ভুচন্দ্র দত্ত —চেতলা
শ্রীসুভাষচন্দ্র উকিল —বালিগঞ্জ
শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত —আলিপুর
শ্রীমাখনলাল নাথ —টালিগঞ্জ
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সুর —টালিগঞ্জ

পূঃ কলিকাতা (বৃহত্তর)

শ্রীভগবৎ বারিক —বেলিয়াঘাটা
শ্রীবিমল সরকার —বেলিয়াঘাটা
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ব্যানার্জ্জী —বেলিয়াঘাটা

হাওড়া

শ্রীকাশীনাথ সাহা —আমতা
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জ্জী —বেলুড়
শ্রী এস, বি, সিং —ফুলেশ্বর
শ্রীরামপৎ সিং —চেঙ্গাইল
শ্রীরামহরি নাথ —সাঁতরাগাছি
শ্রী পি, কে, সিংহ —বেলিলিয়াস রোড
শ্রী পি, জি, ঘোষ —জয়নারায়ণ সরকার লেন
শ্রী এম, দাস —পঞ্চাননতলা রোড
শ্রীমাতাদিন পাণ্ডে —চিন্তামণি দে রোড
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস —নরসিং দত্ত রোড
মেঃ কৃষ্ণ বুক ষ্টল —মুন্সিগ্রাম
মেঃ জ্ঞানের সাথী —ক্ষেত্র মিত্র লেন
শ্রী জি, ব্যানার্জ্জী —অমৃত পাইন লেন
শ্রী বি, ভট্টাচার্য্য —সারকুলার রোড
শ্রী বি, সি, শেঠ —রামগোপাল স্মৃতিরত্ন লেন
শ্রী বি, সি, পাল —জি· টি· রোড
শ্রী এ, এন, মল্লিক —শিবপুর

হুগলী

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া —শেওড়াফুলি
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী —মগরা ও ত্রিবেণী
শ্রীগঙ্গাধর দে —শ্রীরামপুর
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য —ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী
শ্রীললিতমোহন দত্ত —হুগলীঘাট
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার —সিঙ্গুর
শ্রীমণিভূষণ সিংহ —আরামবাগ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী —নবগ্রাম, কোন্নগর
শ্রী বি, ভূষণ চ্যাটার্জ্জী —হরিপাল
শ্রীমুরারীমোহন মুখার্জ্জী —কোন্নগর
শ্রী পি, মুখার্জ্জী —শ্রীরামপুর
শ্রী পি, চন্দ্র —বালী
শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী —শ্রীরামপুর
শ্রী বি, সি, ভড়পাত্র —উত্তরপাড়া
ডি, পি, ব্যানার্জ্জী —চন্দননগর

মুর্শিদাবাদ

শ্রীঅহিভূষণ মালাকার —বেলডাঙ্গা
শ্রীবিশ্বনাথ দাস —ধুলিয়ান
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত —মুর্শিদাবাদ
শ্রীহরিপদ সাহা —জিয়াগঞ্জ
মেঃ ঘোষ লাইব্রেরী —বহরমপুর ও খাগড়া

মালদহ

শ্রী এম, এম, চক্রবর্ত্তী —হরিশ্চন্দ্রপুর
শ্রীসুনীলকুমার শেঠ —মালদা কোর্ট

বর্দ্ধমান

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত —চিত্তরঞ্জন
শ্রী এ, এস, চ্যাটার্জ্জী —কুলটী
শ্রীভূতনাথ দাস —কাইহাট
শ্রীকৃষ্ণসাধন সরকার —খাত্রীগ্রাম
শ্রী এস, প্যাণ্ডে —বর্দ্ধমান
শ্রীতারাপদ রায় —বরবণি
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জ্জী —সীতারামপুর
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে —রাণীগঞ্জ
শ্রী বি, কে, আইচ —বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চানন মোদক —কালনা
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ —বার্ণপুর ও আসানসোল
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন —গলসি
শ্রীসুশীলকুমার রায়চৌধুরী —জামুরিয়া

নদীয়া

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন —শান্তিপুর
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক —নবদ্বীপ
শ্রী এ, বি, মুখার্জ্জী —বনগাঁ
শ্রী এস, কে, চৌধুরী —রাণাঘাট
শ্রী এন, এন, ঘোষ —রাণাঘাট
শ্রী বি, কে, সাহা —আড়ংঘাটা
মেঃ চাকদহ বুক ডিপো —চাকদহ
শ্রী বি, চন্দ্র দাস —রাণাঘাট

মেদিনীপুর

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী —ঝাড়গ্রাম
মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী —কলাইকুণ্ডা
শ্রী জে, এন, আচার্য্য —মহিষাদল
শ্রী আই, বি, ঘোষ —চন্দ্রকোণা রোড
শ্রীহরিসাধন পাইন —ঘাটাল
শ্রীমতী কনকলতা দেবী —খড়্গপুর
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী —মেদিনীপুর

পঃ দিনাজপুর

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী —বালুরঘাট

চব্বিশ পরগণা

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য —ইছাপুর
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস —কাকদ্বীপ
মে: বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স —ব্যারাকপুর
শ্রী রায় নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী —টাকী
মে: এ. বি ষ্টল —দক্ষিণ-বারাসত
শ্রী বি, চৌধুরী —যাদবপুর
শ্রী বি, সি, ঘোষ —যাদবপুর
শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য —বি, ডি, কলোনি
মে: বি এন, লাইব্রেরী —কাশীপুর
শ্রীকমলেন্দু দাশগুপ্ত —কল্যাণী
শ্রী ডি, এন, ভট্টাচার্য্য —যাদবপুর
শ্রী ডি, সি, পণ্ডিত —যাদবপুর
মে: ডি, জি, লাইব্রেরী —মধ্যমগ্রাম
শ্রী জি, সি, রায় —শ্যামনগর
মে: গ্রন্থ-কুটীর —বজবজ
মে: গুহ ষ্টোর —ব্যারাকপুর
শ্রীহরিপদ ঘোষ —ব্যারাকপুর
শ্রীইন্দ্রপাল সিং —দমদম
শ্রী জে, এন, দাস —কল্যাণী
শ্রী জে, রায় —কসবা
শ্রী কে, সি, ব্যানার্জ্জী —বরাহনগর
শ্রী কে, জি, দত্ত —দমদম (নাগের বাজার)
শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা —হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীলোকনাথ চন্দ্র —বজবজ
শ্রীমাখনলাল নাগ —বারাসাত
শ্রী এস, চক্রবর্ত্তী —বেলঘরিয়া
শ্রী এন, পি, সাউ —শ্যামনগর
শ্রী এন, চ্যাটার্জ্জী —ব্যারাকপুর
শ্রী এন, সি, মুখার্জ্জী —চাকুরিয়া
শ্রী এন, কে, কুণ্ডু —বরাহনগর
মে: নবাবগঞ্জ নিউজ এজেন্সী —ইছাপুর
শ্রীনিমাইচন্দ্র দাস —দমদম
শ্রী এন, জি, দাস —যাদবপুর
শ্রী এন, এন, ঘোষ —ব্যারাকপুর
শ্রীরামনারায়ণ দীক্ষিত —খাটানগর
শ্রীরঞ্জিৎকুমার রক্ষিত —বরাহনগর
শ্রী এস, বি, রায়চৌধুরী —বেলঘরিয়া
শ্রী এস, সি, রায়চৌধুরী —খড়দাহ
শ্রীসন্তোষ ঘোষ —ভাটপাড়া
শ্রী এস, ডি, প্রসাদ সিং —ব্যারাকপুর
শ্রীসতীশচন্দ্র ভৌমিক —যাদবপুর
শ্রীসুধীর বিশ্বাস —হাবড়া
শ্রীসত্যপ্রসাদ দাস —দমদম
শ্রীসন্তু ভৌমিক —যাদবপুর
শ্রী এস, তালুকদার —খড়দাহ
শ্রীসুকুমার অধিকারী —বরাহনগর

চব্বিশ পরগণা

শ্রীতারাপদ পাল —পানিহাটি
শ্রীতাপস ব্যানার্জ্জী —কাঁচড়াপাড়া
শ্রীবুধুনরাম —দমদম

বীরভূম

শ্রীমাণিকচন্দ্র সাহা —রামপুরহাট
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র —নলহাটী
শ্রীমন্মথকুমার ব্যানার্জ্জী —শিউড়ি

মানভূম

শ্রীবিমলকান্ত রায় —কুমারধুবি ও বরাকর

বাঁকুড়া

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র কর্ম্মকার —বিষ্ণুপুর
শ্রী এন, এন, হালদার —সোনামুখী
শ্রী বি, পাল —সোনামুখী
শ্রীভিক্ষাপদ দাস —বাঁকুড়া

জলপাইগুড়ি

শ্রী এ, ধর চৌধুরী —আলিপুরদুয়ার
শ্রী বি, বি, রায়চৌধুরী —মল-জংশন
শ্রীমতিলাল সরকার —কালচিনি

দার্জিলিং

শ্রী ডি, এন, বড়াল —কালিম্পং
রামপ্রসাদ সেন —দার্জিলিং

কুচবিহার

শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত —দিনহাটা
শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী —কুচবিহার

সাঁওতাল পরগণা

শ্রী জে, এন, সাহা —পাকুড়
শ্রীমন্মথনাথ দাস —বৈদ্যনাথধাম
শ্রী কে, ডি, চক্রবর্ত্তী —মধুপুর

ত্রিপুরা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য —আগরতলা

উড়িষ্যা

শ্রী বি. দত্ত —রৌরকেল্লা
মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ব্রজরাজনগর

বোম্বাই

শ্রী জি, এম, ঘোষ চৌধুরী —বাইকুল্লা, বোম্বে

মধ্য প্রদেশ

মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ভিলাই ও দ্রাগ

আসাম

মেসার্স শিলং স্পোর্টস —শিলং
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লোধ —কমলপুর
শ্রী বি, কে, চৌধুরী —শিলচর
শ্রীমতী কনকরাণী গাঙ্গুলী —তিনসুকিয়া
শ্রী এম. আর. ভট্টাচার্য্য —মাকুমজংশন
মে: পি, এস, জৈন এণ্ড কোং —ইম্ফল
শ্রী জে, চক্রবর্ত্তী —গোয়ালপাড়া
মে: ভাশাভাল লাইব্রেরী —ডিব্রুগড়
শ্রী বি, চক্রবর্ত্তী —মোহনবাড়ী
শ্রীকালাচাঁদ বণিক —করিমগঞ্জ
শ্রীত্রিলোচন রায় —ধুবড়ী
শ্রীআশুতোষ মিত্র —চবুয়া

বিহার

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী —রঘুনাথপুর
শ্রীপরিতোষ মুখার্জ্জী —ধানবাদ
শ্রীসুজিতকুমার সরকার —কাতরাসগড়
শ্রীমনোমোহন চ্যাটার্জ্জী —মজঃফরপুর
মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো —রাঁচী
মে: গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোরস —গয়া
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার —কাটিহার
শ্রীরাধারমণ মিত্র —মুঙ্গের
মে: অমৃতলাল থ্যাকার এণ্ড কোং —ঝরিয়া
শ্রীরামত্রিচপ্রসাদ —লোহারদাগা
শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জী —ধানবাদ
মে: চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং —হাজারীবাগ টাউন
শ্রীদেবনারায়ণলাল —দিনাপুর
শ্রীবাচ্চু সিং —পাটনা
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ —সিন্দ্রি ও পাথারডিহি
শ্রীকরুণাসিন্ধু রায় —বেরমো
শ্রী এইচ, বি, গাঙ্গুলী —জামালপুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস —বড়জামদা
মে: ইউনাইটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্স —টাটানগর

উত্তর প্রদেশ

মেসার্স মিকাডোস বেনারস নিউজ পেপার এজেন্সী —বেনারস
শ্রী এস, বি, মৈত্র —লক্ষ্ণৌ
শ্রীসুচারুমোহন গোস্বামী —নিউ দিল্লী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস —নিউ দিল্লী
মে: সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী —নিউ দিল্লী
মে: কিতাব ঘর —নিউ দিল্লী
মে: ইন্টারন্যাশনাল ষ্টোর্স —এলাহাবাদ
মে: শ্রীকৃষ্ণ বুক হাউস —লক্ষ্ণৌ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মঞ্জুর এই সকৌতুক সহাস্যভঙ্গির খাবার ডিশ বাড়িয়ে ধরা প্রথমবারের বউনি বদল করে নেবার পরিহাস-তরলতায়, মনটা পাতলা হয়ে বড় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল সুদর্শন—মানে এই অস্বস্তিজনক অবস্থায় মধ্যেও যতটুকু স্বচ্ছন্দবোধ করা যায়। নইলে যদিও মৌরীর মুখে আপন অভিযোগের উত্তর শুনে প্রথম ধাক্কায় হৃদয়টা তার ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তালতা প্রকাশ করে ফেলেছিল, কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য মাত্র। তার পরমুহূর্তেই একটা নিদারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যের আবর্ত যেন তার ভেতর থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে এসেছিল—মঞ্জুর কাছে শুনতে হবে? কেন? এ কথার অর্থ কি? মৌরী নিশ্চয়ই তার বলবার কথা শুনে নিতে বলছে না মঞ্জুর কাছ থেকে। তবে? তবে কি তার বোঝার ভেতর মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে? কেবল মৌরীর আপত্তি আর মৌরীর অনমনীয় জেদের ব্যাপার নয় এটা? তার এই আসা দিয়ে সে বাড়ীর লোকদের অপ্রস্তুত করে তুলেছে।

তা কারণটা সম্বন্ধে সে যখন একেবারেই অজ্ঞ বনে গেছে, তখন তার মনে এটা ওটা সেটা ওঠা সম্ভব এবং তারই ভেতর যখন এই বাড়ীর দিককার প্রশ্নটা মনে উঠেছিল তখন সত্যি সুদর্শনের মনে অসোয়াস্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু মঞ্জুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলো সে। না, তার বোঝায় কোন ভুল ঘটেনি। কারণ যাই হোক, যজ্ঞ পণ্ডের পুরোহিত একা মৌরীই। সব সঙ্কোচ, অস্বস্তি-অশান্তি তখুনি অন্তর্হিত হয়ে গেল সুদর্শনের মন থেকে। মৌরীর কাছে তার অহংকার আভূমি নত হতে পারে। তাকে জয় করে নিয়ে যাবার জন্য সে বারংবার আসতে পারে। প্রিয়কে জয় করা চলে, এমন কি—হাঁ, হরণ করা পর্যন্ত চলে। মঞ্জুর পরিহাসের জবাবে সুদর্শনও একটু পরিহাস-তরলকণ্ঠেই জবাব দিল—সাহসটা গতবার বড্ড মার খেয়ে গেছে। আর বাবের কোন কিছুই আর এবার নয়।

কথাটার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে কতক্ষণ হেসে নিল মঞ্জু। তারপর হাসি থামিয়ে যেন সুদর্শনের কথায় সম্মতি জানাচ্ছে সে, এমনি ভাবে মাথাটা ডান দিকে অল্প একটু কাত করল।

সুদর্শন মঞ্জুর হাতের মিষ্টির ডিশটা দেখিয়ে বলল—এই খাওয়াটাওয়াও এবার বাদ।

এবার আপত্তি জানালো মঞ্জু—উঁহু, তা হয় না।।

—তবে শুধু এক কাপ কফি দিন।

—কফি।

কফি উচ্চারণটির সঙ্গে মঞ্জুর কণ্ঠের দ্বিধাগ্রস্ত লম্বাটানটা শুনে খেয়াল হলো সুদর্শনের, কফির আয়োজন এবাড়ীতে না থাকাই সম্ভব। তাড়াতাড়ি চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে—আচ্ছা, চা দিন। কিন্তু আর কিছু নয়।

মঞ্জু চায়ের কাপ সুদর্শনের হাতে দিল না। হাতের খাবারের ডিশটা ট্রের উপর নামিয়ে ট্রেটা নিজের দিকে একটু টেনে নিল সুদর্শনের কাছ থেকে। তারপর একেবারে ছেলেমানুষের মতো মাথাটা এ কাতে সে কাতে দোলাতে দোলাতে বলল—না। চা আপনি ভালোবাসেন না সে কারণ তো আছেই। তা ছাড়াও বউনি বদল করবো যখন স্থির করেছি তো করেছিই। তারপর মাথা দোলান বন্ধ করে মুখে চোখে স্বরবিন্যাসে রহস্যময় বিশ্ব প্রকৃতির দুর্জ্ঞের চাল-চলন পদ্ধতির প্রতি না বোঝার হতাশা ফুটিয়ে তুলে বললো—কোন অঘটন যে কখন কিসের জন্য ঘটে, কে জানে! কেউ দোষ চাপান সময়ের ঘাড়ে। বলেন, দিনটা নিশ্চয়ই শুভ ছিল না। কেউ চাপান মানুষের ঘাড়ে। বলেন, যাত্রাকালে যেন কার মুখ দেখেছিলো। কেউ চাপান খাদ্যে। বলেন, যাত্রাকালে নির্বিচারে যা-তা সব খেলে আর দেখলে অযাত্রা হবেই। তাই আমি স্থির করেছি এবার সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং এই অশুভ পরিণতির জন্য এবার ওবারের সমস্ত—সমস্তকিছু বিনা বিচারে, স্রেফ বাদ দেব। তারপর চায়ের ট্রেটার দুদিকের হাতল ধরে সেটা তুলে নেবার মতো করে ধরে দাঁড়ালো—যেন এক্ষুনি সেটা নিয়ে সে রওনা হবে। কিন্তু একেবারে না তুলে বলল, কী বিতিকিচ্ছি কাণ্ড এ্যাঁ—একজন বিশিষ্ট ভদ্রজনের আসার সংবাদ শুনে বাড়ীর আপামর ভদ্রজন সব ছুটে গিয়ে কেউ শোবার ঘরে, কেউ ঠাকুরঘরে, কেউ ছাদে। কেউ আলমারীর আড়ালে ঢুকছেন!

মঞ্জুর কথা শেষ হবার আগেই তার বড় বড় বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সুদর্শন। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের পাশটা চেপে ধরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীও তার মুখটা আরো কিছুটা ঘুরিয়ে নিল বাইরের দিকে।

বড় বড় ব্যক্তিদের ছোটাছুটি করে ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বার পেছনে যে লজ্জা ছিল সব যেন ধুয়ে মুছে গেল। মঞ্জু ট্রে-টা দু হাতে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো—কফি করতে কতক্ষণ লাগবে। এই তো সোজা চলে যাবো বাবার কাছে। বলবো, শীগ্‌গির—শীগগির টাকা বের করো। আকুল ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে চঞ্চল হাতে ব্যাগ খুলে টাকা বের করে দেবেন বাবা। এক দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ধরবো একটা ট্যাক্সি। চলে যাবো মার্কেটে। ধুমধাম হাতে বাছাই করে কিনব এই তুজনার মতো একটা ডেণ্টি কফি-সেট। তারপর ফের সোজা কোয়ালিটি। বাস্—গরম মিল্ক কফিতে পট ভর্তি করে ট্রে-শুদ্ধ কোলে চাপিয়ে নিয়ে ছুটবো বাসামুখে। কতক্ষণ আর লাগবে? বড় জোর এক ঘণ্টা? আপনাদের তো মনে হবে আমি বুঝি গেলাম আর এলাম! আপনারা ততক্ষণ কথা—না, কথা বলে লাভ নেই। ও কথা বলতেও জানে না—বোঝেও বড্ড কম। তার চাইতে আপনি বরং—চোখের ইশারায় টেবিলের উপর পড়ে থাকা সঞ্চয়িতাটা দেখালো মঞ্জু—ঐ সঞ্চয়িতাখানা নিয়ে বসুন। আমি দেখেছি সাধারণতঃ ডাক্তারদের ভেতর বেশ একটা সাহিত্যিক মন থাকে। ঘরের একটা

কাপের দিকে চোখ রেখে চোখ দু'টো পিট-পিট করতে করতে একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলল—

অনন্তের সমুদ্র মন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
উঠিয়াছ অতলের অস্পষ্টতাখানি
আপনার চারিদিকে টানি—

আঃ, একেবারে লাগসই! দেখুন তো, বোধ হয় সানাইতে—

প্রথমতঃ মঞ্জুর কথায় বাধা দিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত মঞ্জুর থাকাটাই চাচ্ছিল বলে চুপ করেই ছিল মৌরী। কিন্তু আর পারলো না। বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এসে তাকালো মঞ্জুর দিকে। একটু ক্লান্ত একটু রুষ্টস্বরে বলে উঠল সে—উঃ মঞ্জু!

হাতের ট্রের ভারটা ফের টেবিলের কোণের উপর রেখে সুদর্শনকে সম্বোধন করলো মঞ্জু—ঐ দেখুন, বললাম না—কথাও বোঝে না। কি করে বুঝবে? কেবল কবিতা। কবিতা পড়লে কি জ্ঞান-বুদ্ধির ওজন বাড়ে?

ছাদে বেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়, সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা—স্বপন সব হবে বিলীন।
তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ও ধারের ছোট গলিটারে দেখি—

বাস হলো তো? পড়ো কবিতা। বললাম, চার্চিলের 'ওয়ার স্পীচেজ' পড়। পড়লিনে। পড়লে বুঝতিস কথার শক্তি কা'কে বলে। একটানা একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল মঞ্জু। যদি আমাদের রাজন্যবর্গের শুধু মাত্র এই একটা শক্তিও থাকত! পত্রিকাগুলোর বুক ভর্তি থাকে কেবল তাঁদের মুখ-ভর্তি কথায়। কিন্তু হা, ঈশ্বর! গতি নেই, বেগ নেই, স্পন্দন নেই—স্পর্শ নেই—এগুলো কি কথা। শুধু পারিভাষিক শব্দের মৃত সারি। প্রাণ যাদের ভেতর নেই—কথাও তাদের প্রাণ পায় না। পড়ি আর আমার কান্না পায় মৃত কথার সঙ্গেই মৃত মানুষগুলোর কথা ভেবে। হঠাৎ সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত শিশুর মতো চোখ-মুখ কুঁচকে মুচকে হেসে ফেলল মঞ্জু। বলল—কথাটা হলো কি জানেন, গাছের পাতায় যদি জমা জল থাকে তবে যেমন নাড়া পড়লো তো টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল—তা গায়, মাথায় মাটিতে যেখানেই হোক। মনের মধ্যকার জমা কথারও সেই এক অবস্থা। ছোঁয়া পড়ল কি বাস—সমস্ত শরীর একদিকে হেলিয়ে দিয়ে 'বাস' শব্দটি উচ্চারণ করলো সে। তারপর ট্রেটা একটানে তুলে নিয়ে বুকের কাছে ধরে, মৌরীর মুখটা তেড়ছা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে ঠোঁটে-মুখে হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ঘরঠাসা রুদ্ধ নিশ্চল ভাবটাকে উজ্জীবিত করে তুলবার জন্য যেন কিছুক্ষণ ওলট-পালট হাওয়া বইয়ে তারপর হাওয়া তাড়িত মেঘখণ্ডের মতোই ঘর ছেড়ে চলে গেল মঞ্জু।

কিন্তু মঞ্জুর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়ে পূর্ব নিস্তব্ধতাটা ফের এসে চেপে বসল ওদের মাঝখানে। আর এই হঠাৎ নীরবতা হচ্ছে বেশী নিথর করে তুলল ঘরের আবহাওয়াকে। কিন্তু নিরুপায় তো সুদর্শনও। সেই কি বেশী কথা বলে? ওর স্বভাবটাও তো রোল করা কাগজের মতো। মেলে ধরলেও ঝোঁকটা থাকে গুটানোর দিকে। আর মেলে রাখতে হলে রাখতে হয় চাপ। তার জানা কারণটা গেছে বেঠিক হয়ে, অন্য কারণটা এখনও জানা হয়নি, ভেতরে একটা ভাবনার চাপ তার ছিল। সেই চাপ তার চিবুকের দৃঢ়তাকে কিছুটা ঢিলে করেও রেখেছিল কিন্তু ঐ কথা নিয়ে মৌরীকে কিছু এক্ষুনি ফের জিজ্ঞাসা করতে মোটেই ইচ্ছে করল না তার। মঞ্জু থাকতে যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। ছাইদানের খোঁজে টেবিলের দিকে তাকালো সে। কিন্তু ঘরটা মৌরী-মঞ্জুদের। ছাইদান এখানে থাকার কথা নয়, ছিলও না। জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল, কে জানে কোথায় গিয়ে পড়বে। বাধ্য হয়েই মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নিবালো সেটাকে। ঘরটা সুদর্শনের অপরিচিত নয়। এই দু বোনের বিছানা—টেবিল চেয়ার বই-পত্তর, আলনার শাড়ী কাপড় জামা—সবই সে সেই রাতে মঞ্জু অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে এসে দেখেছে। টেবিলের উপর ফাইলে বাঁধানো স্তূপীকৃত পত্রিকার কাটিং। সেদিনও ছিল। আজ আছে। সেগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দেখল সুদর্শন। ইংরেজী বাংলা সাপ্তাহিক দৈনিক বাদ নেই। এই কাগজের কাটিংগুলোর মালিক নিঃসন্দেহে মঞ্জু। টেবিলের ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়িতাখানাই তুলে নিতে নিতে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মৌরীকে অনুরোধের সুরে বললে,—আপনার এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার পক্ষে খুবই যে অস্বস্তির কারণ হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন?

বসল মৌরী।

কিন্তু তার পর? সুদর্শন যে মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে না লাগল আর—মৌরী তার জবাব না দিল তা নয়। কিন্তু আসলে মৌরী বসে বসে কখনো শাড়ীর আঁচল কোলের ওপর ফেলে ভাঁজ করতে আর ভাঙতে লাগল। কখনো নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের কিটেক্সের লাল রংটার দিকে তাকালো। তিন চার দিন আগে পরিয়ে দিয়েছিল আলতা। মাঝে মাঝে উঠে গেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। শাড়ীটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে পা ঢাকল। সুদর্শনের লুটানো কোচা, ঝকঝকে পাম্পসুর উপর গিয়ে চোখ পড়তে লাগল তার মাঝে মাঝে। আর সুদর্শন উলটে পালটে চলল সঞ্চয়িতার পাতা। সে বইটাকে নয়, বইটার অধিকারিণীকেই যেন বইটার ভেতর দিয়ে

দেখছিল। বইটির একটি পাতাও যে পড়া শুধু তাই নয়—প্রতিটি পাতা যে বহু বার পড়া তার চিহ্ন বিদ্যমান প্রতি ছত্রে ছত্রে। হাতের আঙুলের ধূসর দাগ পাতায় পাতায়—পাতায় পাতায় খাদ্য-বস্তুর নিক্ষিপ্ত কণার হলদে ছিটে। কোথায় দুটি পাতার মাঝখানে চেপ্টে আছে কপালের ঝরা কুমকুম। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দিনের বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে হয় মালিকের হাতে নয় কোলে। বইটির মধ্যে যেন মৌরীর কোলের উত্তাপ, হাতের স্পর্শ, চুলের গন্ধ মাখানো রয়েছে। এই যে মঞ্জু বললো, ভেতরে প্রাণ থাকলে তবে কথা প্রাণ পায়। যদিও মঞ্জু যে অর্থে কথাটা বলেছে তা একেবারেই ভিন্ন—তবু অন্য অর্থে সুদর্শনের মনে হলো মৌরীর প্রাণের উত্তাপে যেন কবিতাগুলো সব প্রাণ পেয়ে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঘুরছে, দাঁড়াচ্ছে, বসছে। এই যেমন মৌরী বসে আছে ঠিক তেমনি ভাবে এসে বসছে। এই একটু আগে যেমন দেয়ালে পিঠ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল মৌরী, ঠিক তেমনি ভাবে দেয়ালে পিঠ রেখে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে তাকাচ্ছে। ছায়াছবির নামতালিকার পঙ্‌ক্তিগুলোকে যেমন অনেক সময় স্রোতে ভাসমান বস্তুর মতো ভেসে ভেসে পর্দার গায়ে মিশে যেতে দেখা যায়, ঠিক যেন তেমনি করে সুদর্শনের মেলে ধরা পাতা থেকে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো উঠে এসে ভাসতে ভাসতে মিশিয়ে যেতে লাগল মৌরীর মধ্যে।

সুদর্শন চলে গেলে ঘরের মাঝখানে ঠিক পাখার নীচে চেয়ার টেনে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে বসে কিছুক্ষণ হাওয়া খেল মঞ্জু। তারপর উঠে বসে বলল—উঃ, এক একটা দিন কি—হাঙ্গামাটাই যায়। বাজে হাঙ্গামার কথা বলছিনে, আনন্দেরও তো হাঙ্গামা আছে। তা দিলাম তো তোর—খুড়ি, আমাদের সুদর্শন বাবুকে কফি খাইয়ে। তারপর গলার স্বরটাকে একটু নীচু করে এনে কৌতুক চোখে জিজ্ঞাসা করল—ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন?

—ডাক্তার কবিতা পড়েছিলেন! দেখ মঞ্জু, যাকে বলে প্রগল্‌ভ—বাচাল, দিনকে দিন তুই তাই হয়ে উঠছিস। আমি সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু তোকে।

—ডাক্তার তাই বললেন?

—না। ডাক্তার বললেন তোর মাথার ভালো রকম চিকিৎসার দরকার।

—তোর মাথার চিকিৎসার কথা কিছু বলেন নি?

—না।

—তবেই ঠিক আছে। বাড়ীতে ডাক্তার এলেই আমার দেখাতে অষুধ খেতে ইচ্ছে করে। আর ঘরের ডাক্তার হলে তো কথাই নেই। করা যাবে মাথার চিকিৎসা। কিন্তু ডাক্তার আজ সন্ধ্যায় কখন আসছেন?

—কেন, সন্ধ্যায় আবার আসতে যাবেন কেন?

—কেন আসতে যাবেন?

—হাঁ, কেন আসতে যাবেন।

—আজ সকালে এসেছিলেন কেন?

—বোকা বলে।

—বোকা বলে?

—হাঁ, বোকা বলে।

—এই সময়ের ভেতর তাঁকে তুই তবে বুদ্ধিমান বানিয়ে ছেড়েছিস বল?

—বোকাকে কি আর বুদ্ধিমান বানান যায়?

—তাই যদি না যাবে, তবে বলছিস কেন সন্ধ্যায় আসতে যাবেন কেন? আসবেন ঐ তোর কথায় বোকা বলে।

—না মঞ্জু, আমি সত্যি তোকে বলছি। সব কিছুরই একটা সীমা আছে—

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল মঞ্জু। বললো—না ভদ্রে, সীমা বলে কোথাও কিছু নেই—আকাশ-বাতাস জল-মাটি আলো গ্রহ-নক্ষত্র কোথাও না। পৃথিবীর প্রকৃতিতে সীমা বলে কোন শব্দ নেই, মানুষের প্রকৃতিতেও না। বেরুনো তো হলো না। ঘুমোই বাপু একটু। বিছানায় শুয়ে পড়ে পাশ বালিশ জড়িয়ে মড়িয়ে ধরে চোখ বুজল সে। বসে রইল মৌরী।

সকালের যে রোদটা পুবের জানালা দিয়ে এতক্ষণ শিকের ছায়া বুকে নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে ছিল, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দক্ষিণের দরজা দিয়ে এসে সে রোদটা এবার ঘরে ঢুকেছে। সুদর্শনের জুতোর তলায় পেষা সিগারেটটার পাশ কাটিয়ে তেরছা ভাবে চলে গেছে টেবিলের তলা পর্যন্ত। সেখানে মিনি বেড়ালটা অনবরত সুদর্শনের কফিকাপটা শুঁকছে। যেন বাস উঠতে পারছে না দুধ না আর কিছু। চলে যাচ্ছে—ফের ঘুরে আসছে।

অমিতা ঝুপ করে একবার ঢুকেই মৌরীকে স্নানের তাড়া দিয়ে অমনি বেরিয়ে গেল। বলতে বলতে গেল, কি অসময়ে শুয়েছ। ওঠো না মঞ্জু! খেয়েছ বলে কি হয়েছে। আমাদের সঙ্গে খাবে তো চাট্টি।

মৌরী উঠে স্নানের ঘর থেকে তেলের শিশি নিয়ে এলো। ডান হাতে শিশি নিয়ে বাঁ হাতে চুলের গোড়ায় অল্প অল্প তেল দিতে দিতে লাগল পায়চারী করতে। গন্ধতেলের সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে উঠল ঘরের হাওয়া।

কিন্তু মঞ্জু শুয়ে থাকবে কতক্ষণ? চোখ-মুখ কচলে উঠে বসল বিছানার উপর। বললো, বৌদিটা ঠিক বলেছে। সত্যি ভীষণ খিদে পেয়েছে তো? কেক পেস্ট্রির প্লেটটাতে তো ভদ্রলোক একবারের বেশী দুবার হাত ছোঁয়াননি—প্রচুর রয়ে গেছে—

মৌরী মঞ্জুর একটা কথাও শুনেছে বলে মনে হলো না। শোনেওনি। মঞ্জুকে উঠতে দেখে সে পায়ের হাঁটা আর হাতের তেল দেওয়া বন্ধ করে বলল—দেখ মঞ্জু, আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি তোকে—বাড়ীর কেউ যেন—

তোকে কিছু না বলতে আসেন। খাটের ঝুলানো পা মেঝেতে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বলতে হবে না। তাঁরা কেউ কিছু বলতে আসবেন না তোকে। তোর স্নান-খাওয়া যখন বাকী আছে, তখন ঘর ছেড়ে অবশ্যই একবার বেরুতে হবে তোকে আর বাবাদের যখন অফিসে যাওয়া হয়নি, বাড়ীতে রয়েছেন তখন উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ ঘটছেই—দেখবি, মুখের ভাবসাব সবার জমাট। শুধু মুখ নয় চেহারাটাও সবাই বোবা করে রেখেছেন। অর্থাৎ—তারা কিছুর মধ্যে নেই। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছিলাম কি—না থাক। বলতে গিয়েও থেমে গেল মঞ্জু। ঐ বৌদি যা বলেছেন, দিন সুদর্শন বাবু নিজে বোঝা-পড়া করে—না গো? আমরা তো তাই চাই—এঁ্যা? আমরা কি করতে পারি—না? আমরা আর এর মধ্যে নেই হাঁ? হাঁ, তাই ঠিক। আমরা এর মধ্যে নেই—একেবারেই না। যেন মৌরীকে নয় নিজেকেই মঞ্জু জোর দিয়ে বোঝাল কথাটা। অর্থাৎ ও নিজেও আর কথা বলবে না এবিষয়ে মৌরীর সঙ্গে একটি—একটিও না। [আগামী বারে সমাপ্য।

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে!
ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো,
ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার
পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন!

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L. 16-X52 BG
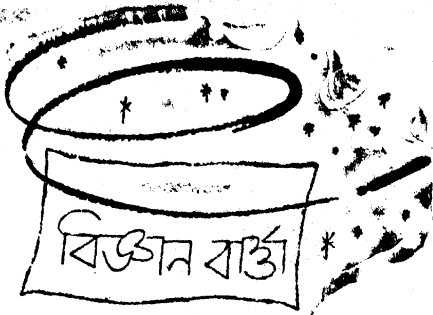
ভারতে পরিবার পরিকল্পনা

১৯৫১ সালের লোক-গণনা তখনও হয়ে যায় নি। ভারতবাসীর মনে এ প্রশ্নটি সবে উঠছে—জমির অনুপাতে ভারতে লোকসংখ্যা সত্যি অনেক বেশি কি না।

লোক-গণনার বিবরণ যখন বের হ'ল, দেখা গেলো ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫০,০০০,০০০। এই হিসাবের ভেতর স্বভাবতঃই পাকিস্তানকে ধরা হয় নি। আলোচ্য বিবরণে এও প্রকাশ পায় যে, বছরে ভারতে শতকরা ১½ হারে লোক বেড়ে চলেছে। ভারত-সরকার তখনই এই সমস্যা ব্যাপারে কিছু করবেন বলে সচেষ্ট হন।

পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনা (জন্ম নিয়ন্ত্রণ) কর্ম্মসূচীর জন্যে প্রারম্ভে বরাদ্দ করেন প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। ভারতের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই এই বরাদ্দটি করা হয়।

সূচনায় দু'টি কেন্দ্রে একই সঙ্গে পরীক্ষা চালানো হয়—একটি নয়াদিল্লীর মধ্যবিত্ত (সহরবাসী) মহল্লায়, অপরটি মহীশূর রাজ্যের রামনগরমে। একটি ছোট মফঃস্বল সহর এই রামনগরম—যেখানে সাধারণ ভারতীয় জীবনযাত্রা চালু, যার আওতায় রয়েছে ১৫টি পল্লী। বিশেষ কারণে প্রস্তাবিত কাজের জন্য অঞ্চলটি বেছে নেওয়া হয়।

জনসংখ্যার পর্য্যালোচনা বিষয় পর্ব্বটি সমাধা করা হয় প্রথম দফাতেই। বাইরের লোক দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা যাতে বাধা দানে ব্যস্ত না হয়, সেভাবেই এগিয়ে যাওয়া হতে থাকে। রকফেলার ফাউণ্ডেশন-এর সাহায্যে ১৯৩৬ সালেই রামনগরমে অবশ্য একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়। ডাক্তার ও ধাত্রীদের সাথে পল্লীবাসী যাতে পরিচিত হয়ে, এই কার্য্য ব্যবস্থার মূলে ছিল সেই লক্ষ্য।

রামনগরমে এক্ষণে গেলেই বহু জিনিস চোখে পড়বে—পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতিও সহজেই লক্ষ্য করে আসা যায়। পল্লীর সংস্কারাচ্ছন্ন নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষদের সহযোগিতা পেতে কী কষ্ট বা অসুবিধা, তাও জানবার সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে।

তিনটি পল্লীর মোড়লদের এক সময় ডেকে জিজ্ঞেস করা হয়—স্বাধীনতার আগেকার দশ বছরের তিনটি বড় ঘটনা তাঁদের মতে কি? উত্তর করেন তাঁরা সমস্বরে—প্রথমে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হল, আমাদের মেয়েরা বাঁচল, ছেলেমেয়েরা বড় হতে থাকল। এর পরই বাধল লড়াই—আমাদের কম্বল বিক্রী হয়ে চললো ভালরকম, আমরা বৈঠা পোঁৎ করলাম। এল শান্তি—কম্বলের বিক্রী দাম নেমে পড়ে। এখন সরকার তাঁতীদের বাঁচতেও সাহায্য করবেন না, মরতেও দেবেন না।

লোকসংখ্যা কি হারে কতটা বেড়েছে মোড়লরা সে পরিসংখ্যান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তবে তাঁদের মুখে এ অভিযোগ শোনা যায়—'আমাদের সকলের ঘরই লোকে ভর্ত্তি, ছেলে মেয়েরা আর মরছে না, বুড়োর দলও দীর্ঘায়ু হয়ে চলেছে'—

পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মীরা প্রথমে যেয়ে পল্লীবাসীদের সাথে ভাব জমিয়ে নেন। কাজটি স্বভাবতঃ খুব সহজ ছিল না—স্ত্রী পুরুষ সকল কর্ম্মীকেই কাজ এগোবার নানা ফিকির খুঁজে পেতে নিতে হয়। পল্লীর নারীদের সাথে নারী কর্ম্মীরা কাজ করে চলেন, পুরুষকর্ম্মীরা পুরুষদের সাথে। দু' বছরের ভেতর ছেলে হোক, এমনটি যে স্বামী স্ত্রীরা চান না, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং 'রিদম পদ্ধতি' শিখিয়ে দেওয়া হয় তাদের। এই পদ্ধতির মূল কথা হলো—নারীর স্বজন কোষের মাসিক উর্ব্বরতার সময় স্থির করে ঐ সময়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পৃথকভাবে অবস্থান।

১৪১টি দম্পতির ভেতর ৭১২টি ক্ষেত্রেই স্বামী ও স্ত্রী যৌথভাবে পরিবার পরিকল্পনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও শতকরা পাঁচটি ক্ষেত্রে স্বামীরা এর জন্যে ব্যাকুলতা দেখান একটু বেশি রকম।

প্রারম্ভিক কর্ম্মসূচীর লক্ষ্যই ছিল পরিবার পরিকল্পনার জন্য গণ চাহিদা সত্যি আছে কিনা এবং সেই সাথে 'রিদম পদ্ধতিটি' কতটা চালু করা সম্ভব সেইটি যাচাই করা। এই পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া হয় এই জন্যে যে, এতে টাকা পয়সা খরচের প্রশ্ন নেই, ধর্ম্মীয় বোধ ক্ষুন্ন হওয়ার কারণ নেই, কলা কৌশলের প্রয়োজন নেই, পরন্তু হিন্দুদের সামাজিক ধাঁচের সাথে এর বেশ মিল রয়েছে একটা। এ অনুসরণ করা খুবই সহজ, যে দিনগুলিতে গর্ভ সঞ্চারের অতিমাত্র সম্ভাবনা থাকে, সে সময় সহবাস বর্জ্জন করতে পারলেই নিরাপদ।

দিল্লীর শিক্ষিত ও অগ্রসর পরিবারগুলির ভেতর এ কর্ম্মসূচী নিয়ে কাজ করতে ততটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু রামনগরমে এই পদ্ধতি চালু করতেও নানা সঙ্কট দেখা দেয়। সেখানে সকলের ঘরে তারিখ চিহ্নিতকরণের জন্যে ক্যালেণ্ডারই খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যালেণ্ডার যদি বা সংগ্রহ করা গেলো, নিরক্ষর পল্লীবাসীর পক্ষে এর ব্যবহার স্বভাবতঃই কঠিন বোধ হয়। কোন পর্ব্বের দিন, ফসল কাটার দিন, বৃষ্টির দিন—এ সব মনে রেখে বেশিরভাগ লোক পরীক্ষা চালাতে থাকেন। কিন্তু কর্ম্মসূচীতে সফলতার দাবী যেখানে রাখা হবে, সেখানে তারিখ ঠিক রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

আমেরিকার ডাঃ আব্রাহাম ষ্টোন পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ভারতীয় পরিবারে কি ভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্যে ভারত সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন এখানে নিরক্ষর ও অনগ্রসর পল্লী অঞ্চলে রিদম পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে তিনি মাথা থেকে একটা উপায় বের করেন। নারীরা যাতে প্রত্যেক দিন একটি করে গুটি এবং বিভিন্ন মাসের জন্যে বিভিন্ন রঙের গুটি মালার আকারে সাজিয়ে রাখবার অভ্যাস করেন, সেইভাবে প্রচার করা হয়। সহবাস ঠিক কোন্ সময়টিতে বর্জ্জন করতে হবে, হিসাবে সে-টি মোটামুটি মিলে যায়।

গোড়ার দিকে এই জাতীয় গুটি-মালা ব্যবহারেও অনেক নারী অবশ্য আপত্তি জানাতে থাকেন। সারা বিশ্বের লোক তাঁরা কি

কাজে বিরাম ও বিশ্রাম

সুস্থভাবে বাঁচবার তাগিদেই কাজ যেমন না করলে নয়, তেমনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিরাম-বিশ্রামও কিছুটা চাই। একটানা কাজ করে গেলে শরীর ও মন উভয়ের ওপরই এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। চলতি একটি ইংরেজী প্রবাদের মর্ম্ম যেমন—খেলাধূলো বাদ দিয়ে দিনের পর দিন যদি কেবল কাজ নিয়ে থাকা হয়, পরিণতিতে চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতায় দেখা দেয় জড়ত্ব।

সাধারণ অবস্থায় মানুষ কাজ করতেই চায়, জীবিকার্জ্জন করতে চায় শ্রম দিয়ে। অলস জীবন ক'জনার কাম্য, পরনির্ভরশীল হওয়ার ভেতর সত্যি গৌরব কোথায়? বেকার থাকলে অমনি খাওয়া-পরা জুটবে না, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়, এ আশঙ্কা বেশির ভাগ লোকের সামনেই রয়েছে। সেজন্তেই চারদিকেই দেখা যায় কাজ—কাজ, কত বিচিত্র ধরণের, সঠিক বলা অসম্ভব। কাজ করে করে মানুষ যেন ক্রমেই একটা যন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়ছে।

শরীর-বিজ্ঞানী বা চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এইখানেই আপত্তি তুলছেন বড়রকম। তাঁদের বরাবর এই দাবী—কাজ যেমন মানুষকে করতে হবে, প্রয়োজনীয় বিরাম ও বিশ্রামের ব্যবস্থাও চাই তার। পাশাপাশি এ দুটো না হয়ে চললে সহসা স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে, মনের স্ফূর্ত্তিও স্বাভাবিক নিয়মে আসতে পারে না। অফিস-আদালতে বিশেষ ভাবে শিল্প-সংস্থা বা কারখানা সমূহে কর্ম্মীদের ছুটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই কারণেই।

অবশ্যি বাঁধাধরা কাজ থেকে সাময়িক বিরতি খুঁজে নিলেও কাজ হয়ে চলবেই কোন না কোন। বিরাম-বিশ্রামের অবস্থাটাও একটা কাজই বটে; তবে শরীর ও মনকে এ অবসন্ন করবার জন্তে নয় পরন্তু অবসন্ন দেহ ও মনে নতুন সামর্থ্য ও স্ফূর্ত্তি জোগানই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া, একই ধরণের কাজ দীর্ঘ সময় ধরে না করে, কাজের রূপান্তর শরীর ও মন দু'-এর পক্ষেই ভালো। একঘেয়ে জীবনের ভেতর আনন্দ থাকে না, অথচ এই আনন্দই আসল জীবন—প্রাণ খুলে হাসতে না পারলে সবই বৃথা।

বেশ বুঝতে পারা যায়, খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদ—জীবনে এ সকল মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং বলা চলে, দেহ ও মনের দিক থেকে দীর্ঘ দিন সবল ও সক্রিয় থাকার জন্তে এগুলি অপরিহার্য্য ভাবে চাই। দৈনন্দিন কাজের চাপে শরীরে যে গ্লানি ও ক্লান্তি আসে, মনও যার পরিণতিতে পীড়িত ও স্ফূর্ত্তিহীন হয়ে পড়ে, তা দূর করতেই হবে। কাজেই বিরাম ও বিশ্রামের জরুরী প্রশ্নটি এসেছে সেই থেকেই। আবার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটালেই যে আবশ্যক বিরাম বিশ্রাম সম্পূর্ণ হয়ে গেলো, সব সময় এমনটি হয় না। শরীর ও মন উভয়ের অবসরটা কাটাতে ঠিক ঠাক কোন না কোন রকমের আমোদের উপভোগ প্রয়োজন।

সহজ কথায়, যে-ভাবেই হোক দেহ-কাঠামোর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে বিশ্রাম দিতে হবে, বিরামে মস্তিষ্ককে যতদূর সম্ভব রাখতে হবে ফাঁকা। গাঢ় ঘুমের মাধ্যমে অবশ্য তার অনেকটা লাভ হয় বটে, কিন্তু তারও বেশি কিছু চাই। বিরাম বিশ্রামকালে নির্দোষ খেলাধূলো বা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে নিলে উপকার কম হওয়ার কথা নয়। সহজ ধরণের বই পড়া, গল্প-গুজব করা, গান-বাজনা বা উৎসব-আনন্দে থাকা, অভিনয়াদি দেখা, আপন মনে বেড়ানো, শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে তুলতে এ সকলের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। কাজ করতে যখনই অনিচ্ছাভাব আসবে, তখনই বুঝতে হবে বিরাম ও বিশ্রাম আবশ্যক। বিরাম বিশ্রাম ব্যতিরিকে কোন যন্ত্রই কাজ করে যেতে পারে না দীর্ঘদিন ঠিক ভাবে।

আজকাল সকল দেশেই কাজ বেড়েছে প্রচুর, কর্মীর সংখ্যাও বাড়ছে সেই অনুপাতেই, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কল কারখানা গড়ে উঠেছে বহু রকমের। শ্রমিকদের চাকরির ব্যাপারে আইন কানুন তৈরী হয়েছে সর্ব্বত্র—যার ভেতর বিরাম বিশ্রাম বা ছুটির প্রশ্নটিও বিশেষ ভাবে সংযোজিত আছে। সপ্তাহে কত ঘণ্টার বেশী কাজ করা চলবে না, বার্ষিক কতো দিন ছুটি পাওনা হবে, এ সকলই একণে নিয়মাধীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে মালিক বা সরকারকে এদিকটায় নজর দিতে হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি। দৈনন্দিন কাজের পর কর্ম্মীরা কি ভাবে শরীর ও মনকে সবল রাখতে পারে বা, সে প্রশ্নকে আজ উপেক্ষা করা চলছে না। এ ব্যাপারে রুশিয়া অবশ্যি বহু দূর এগিয়ে যাবার দাবী রেখেছে। সেখানকার সমাজতন্ত্রী সরকার বিরাম ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন বেশিরকম—শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেবার নীতিও ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও শ্রমিক কল্যাণের এদিকটায় পর্য্যাপ্ত নজর দেওয়া হবে—এ দাবী নিশ্চয়ই রাখা যায়।

খাওয়ার সময়ের রকমফের

শরীর সুস্থ ও সক্রিয় রাখবার জন্তে সুষম আহার যেমন চাই, তেমনি চাই প্রতিদিন ঠিক সময়মতো খাওয়া। অসময়ে খেলে খাওয়ায় তৃপ্তি হয় না, হজমেরও ব্যাঘাত ঘটে, এ পরীক্ষিত ব্যাপার। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যি—খিদে পাওয়ামাত্র খেতে হবে, আবার ভরাপেটে খেতে নেই কখনই। অধিক রাত্রিতে খাওয়াও নিষেধ করে দেওয়া আছে।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশম স্তবক

১। দিন যায়। আর প্রতিদিন গোপ যুবতীদের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে এক অদ্ভুত বিকার। সেই বিকার আসন হতে পাতায় [illegible] কামচিন্তার। শূন্যমনা হয়ে যান তাঁরা। তিনি হৃদয়ের অভিলাষ, তাঁর অঙ্গ সঙ্গের সম্ভাবনার উপায়গুলি ভাবতে বসে যান তাঁরা, তারপরে ভাবতে বসেন [illegible] কথা, ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে চড়ে বসে মনস্কামনার [illegible]। পূর্বরাগের স্পর্শ লেগেছে শ্রীকৃষ্ণের মনে, এ কথা বুঝতে পেরেও তাঁদের পক্ষে দুরবগাহ বলে মনে হয় সেই মন ও সমুদ্রে ডুবতে গেলে বুদ্ধিবলে গাহন করা যাবে না, নিতেই হবে মনসিজের সাহায্য, এই কথাটি জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না সে কথায়। বিশ্বাস হারিয়েও তাঁরা ঢাকতে চেষ্টা করেন নিজের নিজের সুখী অভিপ্রায়। কিন্তু ঢাকলে কি হবে, সহচরীদের সঙ্গে বসলেই বাহির হয়ে ওঠে তাঁদের ঔৎকণ্ঠা।

২। সেদিন চন্দ্রাবলী···গাঢ় রঙ লেগেছিল তাঁর মনে···বসে ছিলেন সখী পদ্মার সঙ্গে নিভৃতে, পদ্মা ও অতি সুন্দরী তাঁরও পঙ্কজরী মুখ। উদ্বেগে অধীরা হয়ে চন্দ্রাবলী তাঁকে বললেন—বলি, গৌরি, [illegible] এত গৌরব বয়ে আর তো পারা যায় না। ননদিনীর নিন্দা তো কোন ছার, খলেদের কূট কথায় এখন আর কান পোড়ে না, বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি। তোদের ঐ শ্যাম, একেবারে টুকটুকে রাঙা করে দিয়েছে আমার এই হলদে হৃদয়।

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—বলি ও আমার কমল আঁখি সখী, এই আমি বলে রাখছি, বৃষভানু রাজার তিনি নন্দিনী হতে পারেন, নবীন প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রথম থেকেই থাকতেও পারে তাঁর ভালবাসা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঙ্গ পাননি তিনি কৃষ্ণের, ফল ধরেনি অনুরাগের। নিশ্চিন্ত থাকো সই, এমন যোগাযোগ ঘটাব যাতে করে দেখবে, শীঘ্রই তিনি তোমারি হয়েছেন, নিজেই এসেছেন তোমার কাছে দৌড়ে।

৪। কিন্তু আমি দেখছি, ব্রজরাজের পুত্রটির প্রেমভাব বড় মঙ্গলময়। নিজের আলোয় নিজেই উজ্জ্বল সেই প্রেম। হ্রদের তীরে তাঁর উপর তাঁর ভালবাসা একরাত্রের বই ত আর নয়।

তখনকার মত আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন পদ্মাদেবী এবং চেষ্টায় রইলেন মিলন ঘটাবার। এই হেন কর্মই তাঁর মনের মত ছিল ; এবং এই হেন কর্মেই ছিল তাঁর প্রবীণতা।

৫। এদিকে, সেদিন বিজনে বসেছিলেন রাধিকা। উৎকণ্ঠাভারাধিকা, অবশ্য, তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁর ললিতাদি সখীরা যাঁরা তার অতি বিশুদ্ধ সৌহার্দ্যের অধিকারিণী। সইদের [illegible]

সময় অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন "শ্যামা" [illegible] থাকতে যেন তিনি এলেন। হাতে বকুল ফুলের একগাছি মালা, মনে সই···"বকুল মালা।" বললেন—

৬। অয়ি বৃষভানুনন্দিনী, আশ্চর্য্য, এই গোকুলে, ব্রজের কুলে এক কুলকামিনী রয়েছেন, এক একটি যেন তিলকধারী···কিন্তু পঞ্চভূতের সমস্ত সৌভাগ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই কি আপনার উপরেই ঢালল।

৭। তখনই বুঝেছি···যখন দেখলুম মূর্তিমান একটি উৎসবের মত—একটি চাহনি—যেন অঙ্কুশ দিয়েই রসবতীর হৃদয়খানি টানল, ভেঙে ফেলল, গোপীদের মিছে তর্ক, দোহন করল রস। ব্রজরাজ কুমারের হৃদয়খানিও আশ্চর্য্য উদ্ধত হয়ে উঠল লোভী কন্দর্পের কৃপায়। চাঁদের থালার মত হয়ে গেল আপনার মুখ, আর চকোরের মত কে যেন পান করতে চাইল সেই মুখের জ্যোৎস্না।

৮। আজ আমি সই জানতে পেরেছি, তাঁর অনুরাগের কটোরাটি সন্দেহাতীত ভাবে আপনি। আমার দুঃখ দূর হয়ে গেছে, বেঁচেছি ফিরে পেয়েছি আমার মানসিক সরসতা।

৯। রাধিকা বললেন—তোর তো বড় সাহস বেড়ে গেছে শ্যামা। এসব কি প্রলাপ বকছিস ?

কোন ললনাটি যে কালিয়রিপুর অনুরাগের পাত্রী। গোকুলের কুলবালাদের সেটি অনুমান করবার ক্ষমতা আছে। শুধু জেনে রাখিস সই, কুমুদিনী ছাড়াও চাঁদ ওঠেন আকাশে, কিন্তু চাঁদ ছাড়া ফুটতে পারে না কুমুদিনী।

১০। জগতের মেয়েদের তিনি যে অনুরাগের পাত্র তা আমি জানি, কিন্তু তাঁর যে কেউ অনুরাগের পাত্রী নেই, সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। শ্যামা বললেন—সন্দেহ করবেন না আমার কথায়, তার চেয়ে বরং নিজের দেহের প্রতি যত্ন নিন, নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন। আর মনস্থির করে ভাবতে থাকুন···তিনি আমারি, তিনি আমারি।

১১। ললিতা প্রশ্ন করলেন—এ আশ্বাসটি বাচনিক, না যথার্থ ?

উত্তর দিলেন শ্যামা—ললিতা দেবী, প্রশ্ন করুন আমার সহচরী বকুলমালাকে।

১২। ললিতা তখন বললেন—বলি, ও সই বকুলমালিকে কেবল আমাদের অনুরোধে পড়েই যেন বলবার যা সেটি বলে ফেল না।

তখন বকুলমালা বললেন—এই বকুলমালাটিই নিশ্চিত দূর করে দেবে আপনাদের সন্দেহ। তাহলে ও যেটুকু কানে এসেছে যা কানে কানে কিছু তা বলছি শুনুন। পরম সুখবর্দ্ধন গোবর্দ্ধন [illegible]

দুলাল। চৈত্রিকী পাপীরা চরছে, অনুপমী ফিরছেন সহচরের নর্মদা নদীর মত বয়ে চলেছে সহচরদের নর্মদ রসিকতা। তাদের মধ্যের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ নির্ভর অথচ গম্ভীর। দক্ষিণে বাতাস। কাননে, বকুল গাছের বীথি, ফুল ফুটেছে অজস্র, বীথির বীথি, ফুল তুলছেন, ফুল কুড়িয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ বনবনে ফুল গন্ধ, মিঠে গন্ধ। আর বলবি কি সই, আশ্চর্য, সেই বকুলের দিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে মোহন মালা গাঁথছেন তিনি। হঠাৎ আমায় এই ভাবে দেখা। দেখেই কেমন যেন ভয় হল, কুঞ্জে নিজেকে লুকিয়ে ফেললুম। কিন্তু ধৈর্য্য ধরি কেমন? চেয়ে রইলুম। দেখি, তাঁর কাছে বসে রয়েছেন মাসব। আর আমাদের দেবীর শুক পাখীটিও। বিদূষকের উপর বসে আছে। বিদূষক কণ্ঠে বাজছেন বৃষভানুনন্দিনীর অনুরাগের কথা, বন শয়নের সময়ে, জন্মদিনের উৎসবে, দিন দহনের রাত্রে যেমন ভাবে বার বার তিন বার দেবী ছেন শ্রীকৃষ্ণকে। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে যেতে লাগলেন দুলাল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলুম। কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল তাঁর রূপ। আমাকে কিন্তু কেউ দেখতে নি।

১৩। তারপর কুসুমাসব, হঠাৎ যেন কণ্ঠে ফুলের মধু ঢেলে ভাব করে বললেন,—

বয়স্য! নিজের হাতে করে এই যে বকুলমালাটি গাঁথছেন, দেখবেন যেন সেটি আবার ছোট হয়ে না যায়। তাঁকে উপহার দেওয়া চলে এমন মনোহারী করে গাঁথুন। যেন গলার হার হয়।

এক টিপ হাসি খেলে গেল শ্রীকৃষ্ণের ঠোঁটে। বললেন—বয়স্য! কেমন করে তা হয়, আকাশখানকে কেমন করে সাজাই বলো ...আকাশ কুসুমের মালা দিয়ে।

নিজের বচন ব্যর্থ হবে, অসম্ভব! তাই কী যেন বলতে গেলেন কুসুমাসব, কিন্তু বাক্‌চাতুর্য্য নিজের বুদ্ধির অধীন থাকা সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য তিনি চিত্রলিখিতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

১৪। আর ঠিক সেই সময়টিতে সেখানে অকাল বর্ষার মত উপস্থিত হয়ে গেলেন...পদ্মা। নতুন করে তীব্রতর হয়ে উঠল আমার উৎকণ্ঠা। কাছেই ছিলুম। শুনতে পেলুম কুসুমাসবের বাণী।

১৫। তিনি বললেন—বলি, কে আপনি? চাতুর্যের কলসানিতে দেখাচ্ছে যেন মণি-মণি। বিজন বিপিন, এখানে চরতে এসেছেন কোন্ প্রয়োজনে? রসিকশেখর...শান্তমচরিত—আমার বয়স্য রয়েছেন এখানে। তাঁর সামনে লজ্জা নেই, ভয় নেই, বড় যে চরণ নাচিয়ে চলছেন। বচনও শেষ হল, আর পদ্মনাভের সামনেই পদ্মাও আরম্ভ করে দিলেন সাত কাহন স্তব। কত ছলই না সে জানে। শেষে জানালেন—

১৬। দেবী চন্দ্রাবলীর নিতান্ত আমোদিনী সহচরীদের আমি সাথী। আমার নাম পদ্মা। গুণবতী গৌরী তিনি গৌরীপূজা করবেন। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন ফুল তুলতে। কিন্তু তিনি যেমনটি চান তেমন ফুল, পূজার ফুল...অন্য কোথাও মেলে না। আপনার এই কাননেই ফোটে, তাই বকুল ফুল তুলতে এখানে আমার আসবেই আসা।

১৭। কুসুমাসব বললেন—তিনি যে আসিয়া বিদুষী গৌরী, সে কথা সকলেই জানে। তাঁর গৌরীপূজনও বিখ্যাত। কিন্তু দেবতারা তুষ্ট হন শ্রদ্ধায় গৌরবে। তিনি নিজে এলেন না কেন?

পদ্মা।—আপনি দেখছি বড্ড সাহসী। তবু ভাল প্রশ্নই তুলেছেন। কিন্তু কি জানেন, তুলের তটে দাঁড়িয়ে যে মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে কৃষ্ণকুঞ্জ, সেই মুহূর্ত থেকে এখনও পর্যন্ত ব্যথায় ভর্ ভর্ করছে তাঁর হৃদয়। বিষের বাধাই বোধ হয় তার কারণ।

১৮। কুসুমাসব।—মন থেকে সমাজেই বাধার শান্তি হয়। যদি হয় তবেই হবে।

পদ্মা।—আমরাও খুঁজছি, মন থেকে শান্তি দেবার কারণটিকেই।

কুসুমাসব। অতি দুর্লভ সেটি।

পদ্মা। তুলী উৎকণ্ঠার কাছে কিছুই দুর্লভ নয়।

কুসুমাসব। শুধালি বাধে যখনি মনের মধ্যে জাগে উৎকণ্ঠার ভাব। কিন্তু উৎকণ্ঠার ভাবখানি দিয়ে কেমন করে বন্ধু, মন থেকে সমাজের কাজটি হবে?

পদ্মা। ও কাজটি তাঁর হয়েই গেছে, যেহেতু মনের হরণ হয়ে গেছে এক মনোহরণের কৃপায়। তবু কেন যে এই উৎকণ্ঠার ভাব... এইটিই বিচিত্র!

কুসুমাসব। তাহলে, অনুসন্ধান করুন মনোহরকে।

পদ্মা। সম্প্রতি একগাছি বকুলমাল্যের সন্ধানে ফিরছি। তাই দিয়েই বাজিত করতে হবে গৌরীকণ্ঠ।

১৯। কৃষ্ণ বললেন—বয়স্য! সন্দেহাতীত ভাবে ইনি চতুরা। এই বকুল-মালাখানি দিয়ে গৌরী পূজাও করতে চান, আবার গাঁথবার পরিশ্রম থেকেও বিশ্রাম পেতে চান।

২০। কুসুমাসব। বলি, ও সাহসিনি, প্রিয়বয়স্যটির নিজের গলায় দোলাবার জন্যে গাঁথা হয়েছে এই মালা। অন্য মহিলা সেটির অধিকারিণী হন কেমন করে? আর শাখা ফুল ফুটে রয়েছে অনেক, সেগুলি তুলে নিয়ে যান।

পদ্মা। সাহস দেখালুম আবার কোথায়? আমাকে ঠকাচ্ছেনই বা কেন আপনি...এই ভাবে? কুমার যদি খুসী হয়ে দিতে চান নিজেই দেবেন।

২১। কৃষ্ণ। বয়স্য, ইনি ঠিকই বলছেন। ওঁকে আমার নিজেরই দেওয়া উচিত এই ফুলগুলি। এতে ওঁর সখীরও সন্তোষ হবে, গৌরীপূজনের ব্যবস্থাও হবে।

বাক্যালাপ শেষ হল। পদ্মার মনখানিও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। দেওয়া ফুল নেওয়া হল। এক রাশ বকুল ফুল নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

২২। এবার দেবী আমায় বলতেই হবে আপনার তপস্যার জোর আছে। তা না হলে এমনটি হয়?

কুসুমাসব বললেন—বয়স্য, হতেও তো পারে, এই এঁরি মত কেউ, অর্থাৎ বৃষভানুনন্দিনীর নব্য সখীদের মধ্যে কেউ, অধুনা... আপনার হৃদয়ের অগ্নিতাপটিকে উজ্‌রোতে উজ্‌রোতে এখানে উপস্থিত হয়ে যাবেন। তখন দাম বাড়বে এই মালার। শুনেই জল তেজে গেল আমার। যেন কিছুই শুনিনি এই অভিনয় করতে করতে, ঝরা ফুল কুড়িয়ে তোলার ছল করে, আকস্মিকীর মতন উপস্থিত হয়ে গেলুম সেখানে। হেন অবস্থায় আমাকে দেখতে

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশম স্তবক

১। দিন যায়। আর প্রতিদিন গোপ যুবতীদের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে এক অদ্ভুত বিকার। সেই বিকার [illegible] হচ্ছে [illegible] রূপ-স্মরকারিণী কামচিন্তার। পুলকিতা হয়ে যান তাঁরা। যিনি হৃদয়ের অধিনাথ, তাঁর অঙ্গ সঙ্গের সম্ভাবনার উপায়গুলি ভাবতে বসে যান তাঁরা, তারপরে ভাবতে বসেন প্রতিবন্ধকের কথা, ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে চড়ে বসে মনস্কামনার [illegible]। পূর্বরাগের স্পর্শ লেগেছে শ্রীকৃষ্ণের মনে, এ কথা বুঝতে পেরেও তাঁদের পক্ষে দুরবগাহ বলে মনে হয় সেই মন ও সমুদ্রে ডুবতে গেলে বুদ্ধিবলে গাহন করা যাবে না, নিতেই হবে মনসিজের সাহায্য, এই কথাটি জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস হয় না সে কথায়। বিশ্বাস হারিয়েও তাঁরা ঢাকতে চেষ্টা করেন নিজের নিজের সুখী অভিপ্রায়। কিন্তু ঢাকলে কি হবে, সহচরীদের সঙ্গে বসলেই বাহির হয়ে ওঠে তাঁদের উৎকণ্ঠা।

২। সেদিন চন্দ্রাবলী···গাঢ় রঙ লেগেছিল তাঁর মনে···বসে ছিলেন সখী পদ্মার সঙ্গে নিভৃতে, পদ্মা ও অতি সুন্দরী তাঁরও পদ্মজয়ী মুখ। উদ্বেগে অধীরা হয়ে চন্দ্রাবলী তাঁকে বললেন—বলি, গৌরি, [illegible]তার এত গৌরব বয়ে আর তো পারা যায় না। ননদিনীর নিন্দা তো কোন ছার, খলেদের কূট কথায় এখন আর কান পোড়ে না, বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি। তোদের ঐ শ্যাম, একেবারে টুকটুকে [illegible] করে দিয়েছে আমার এই হলদে হৃদয়।

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—বলি ও আমার কমল আঁখি [illegible]ী, এই আমি বলে রাখছি, বৃষভানু রাজার তিনি নন্দিনী হতে [illegible]রেন, নবীন প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রথম থেকেই থাকতেও [illegible]রে তাঁর ভালবাসা, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সঙ্গ পাননি তিনি [illegible], ফল ধরেনি অনুরাগের। নিশ্চিন্ত থাকো সই, এমন সুযোগ ঘটাব যাতে করে দেখবে, শীঘ্রই তিনি তোমারি হয়েছেন, [illegible]ই এসেছেন তোমার কাছে দৌড়ে।

৪। কিন্তু আমি দেখছি, ব্রজরাজের পুত্রটির প্রেমভাব বড় [illegible]দময়। নিজের আলোয় নিজেই উজ্জ্বল সেই প্রেম। কৃষ্ণের [illegible]তাঁর উপর তাঁর ভালবাসা একরাত্রের বই ত আর নয়।

তখনকার মত আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন পদ্মাদেবী এবং চেষ্টায় রইলেন মিলন ঘটাবার। এই হেন কর্ম্মই তাঁর মনের মত ছিল ; এবং এই হেন কর্ম্মেই ছিল তাঁর প্রবীণতা।

৫। এদিকে, সেদিন বিজনে বসেছিলেন রাধিকা। উৎকণ্ঠাভারাধিকা, অবশ্য, তাঁর কাছে বসেছিলেন তাঁর ললিতাদি সখীরা যাঁরা তাঁর অতি বিশুদ্ধ সৌহার্দ্দ্যের অধিকারিণী। সইদের [illegible] সইছিলেন [illegible] অনুরাগের [illegible], আর [illegible]। এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন "শ্যামা" [illegible] যেন তিনি এলেন। হাতে বকুল ফুলের একগাছি মালা। [illegible] সই···"বকুল মালা।" বললেন—

৬। অয়ি বৃষভানুনন্দিনী, আশ্চর্য্য, এই গোকুলে, ব্রজের [illegible] এত কুলললনা রয়েছেন, এক একটি যেন [illegible]···কিন্তু [illegible] সমস্ত সৌভাগ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই কি আপনার উপরেই [illegible]।

৭। তখনই বুঝেছি···যখন দেখলুম মূর্ত্তিমান একটি উৎসবের মত—একটি চাহনি—যেন অঙ্কুশ দিয়েই রসবতীর হৃদয়খানি টানল, ভেঙে ফেলল, গোপীদের মিছে তর্ক, দোহন করল রস। ব্রজরাজ কুমারের হৃদয়খানিও আশ্চর্য্য উদ্ধত হয়ে উঠল লোভী কন্দর্পের কৃপায়। চাঁদের থালার মত হয়ে গেল আপনার মুখ, আর চকোরের মত কে যেন পান করতে চাইল সেই মুখের জ্যোৎস্না।

৮। আজ আমি সই জানতে পেরেছি, তাঁর অনুরাগের কটোরাটি সন্দেহাতীত ভাবে আপনি। আমার দুঃখ দূর হয়ে গেছে, বেঁচেছি ফিরে পেয়েছি আমার মানসিক সরসতা।

৯। রাধিকা বললেন—তোর তো বড় সাহস বেড়ে গেছে শ্যামা। এসব কি প্রলাপ বকছিস ?

কোন ললনাটি যে কালিয়রিপুর অনুরাগের পাত্রী। গোকুলের কুলবালাদের সেটি অনুমান করবার ক্ষমতা আছে। শুধু জেনে রাখিস সই,· কুমুদিনী ছাড়াও চাঁদ ওঠেন আকাশে, কিন্তু চাঁদ ছাড়া ফুটতে পারে না কুমুদিনী।

১০। জগতের মেয়েদের তিনি যে অনুরাগের পাত্র তা আমি জানি, কিন্তু তাঁর যে কেউ অনুরাগের পাত্রী নেই, সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। শ্যামা বললেন—সন্দেহ করবেন না আমার কথায়, তার চেয়ে বরং নিজের দেহের প্রতি যত্ন নিন, নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন। আর মনস্থির করে ভাবতে থাকুন···তিনি আমারি, তিনি আমারি।

১১। ললিতা প্রশ্ন করলেন—এ আশ্বাসটি বাচনিক, না যথার্থ ?

উত্তর দিলেন শ্যামা—ললিতা দেবী, প্রশ্ন করুন আমার সহচরী বকুলমালাকে।

১২। ললিতা তখন বললেন—বলি, ও সই বকুলমালিকে কেবল আমাদের অনুরোধে পড়েই যেন বলবার যা সেটি বলে ফেল না।

তখন বকুলমালা বললেন—এই বকুলমালাটিই নিশ্চিত দূর করে দেবে আপনাদের সন্দেহ। তাহলে ও যেটুকু কানে এসেছে বা কানে কানে [illegible] তা বলছি শুনুন। পরম সুখবর্দ্ধন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে একদিন দেখেছি, এমন সময় আমার চোখে [illegible]

শ্রীনন্দদুলাল। বৈদিকী গাভীরা চরছে, অনুপমী ফিরছেন সহচরের দল, মর্মদা নদীর মত বয়ে চলেছে সহচরদের মর্মদ রসিকতা। তাদের মধ্যে রসের সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয় অথচ গম্ভীর। দক্ষিণে বাতাস বইছে কাননে, বকুল গাছের বীথি, ফুল ফুটেছে অজস্র, বীথির পর বীথি, ফুল তুলছেন, ফুল কুড়িয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ঝলমলে ফুল ঘন গন্ধ, মিঠে গন্ধ। আর বলবি কি সই, আশ্চর্য, সেই বকুলের ফুল দিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে মোহন মালা গাঁথছেন তিনি। হঠাৎ তাঁকে আমার এই ভাবে দেখা। দেখেই কেমন যেন ভয় হল, লতাকুঞ্জে নিজেকে লুকিয়ে ফেললুম। কিন্তু ধৈর্য্য ধরি কেমন করে? চেয়ে রইলুম। দেখি, তাঁর কাছে বসে রয়েছেন "কুসুমাসব"। আর আমাদের দেবীর শুক পাখীটিও। বিদূষকের হাতের উপর বসে আছে। বিদূষক কণ্ঠে বাজছেন বৃষভানুনন্দিনীর নবীন অনুরাগের কথা, বন সমনের সময়ে, জন্মদিনের উৎসবে, কালিয় দমনের রাত্রে কেমন ভাবে বার বার তিন বার দেবী দেখছেন শ্রীকৃষ্ণকে। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে যেতে লাগলেন নন্দদুলাল। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলুম। কেমন যেন শীর্ণ হয়ে যেতে লাগল তাঁর রূপ। আমাকে কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি।

১৩। তারপর কুসুমাসব, হঠাৎ যেন কণ্ঠে ফুলের মধু ঢেলে প্রস্তাব করে বসলেন,—

বয়স্য! নিজের হাতে করে এই যে বকুলমালাটি গাঁথছেন, দেখবেন যেন সেটি আবার ছোট হয়ে না যায়। তাঁকে উপহার দেওয়া চলে এমন মনোহারী করে গাঁথুন। যেন গলার হার হয়।

এক ফিক হাসি খেলে গেল শ্রীকৃষ্ণের ঠোঁটে। বললেন—বয়স্য! কেমন করে তা হয়, আকাশখানকে কেমন করে সাজাই বলো ···আকাশ কুসুমের মালা দিয়ে।

নিজের বচন ব্যর্থ হবে, অসম্ভব! তাই কী যেন বলতে গেলেন কুসুমাসব, কিন্তু বাক্‌চাতুর্য্য নিজের বুদ্ধির অধীন থাকা সত্ত্বেও ক্ষণকালের জন্য তিনি চিত্রলিখিতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

১৪। আর ঠিক সেই সময়টিতে সেখানে অকাল বর্ষার মত উপস্থিত হয়ে গেলেন···পদ্মা। নতুন করে তীব্রতর হয়ে উঠল আমার উৎকণ্ঠা। কাছেই ছিলুম। শুনতে পেলুম কুসুমাসবের বাণী।

১৫। তিনি বললেন—বলি, কে আপনি? চাতুর্যের ঝলসানিতে দেখাচ্ছে যেন মণি-মণি। বিজন বিপিন, এখানে চরতে এসেছেন কোন্ প্রয়োজনে? রসিকশেখর··পুরুষোত্তমচরিত—আমার বয়স্য রয়েছেন এখানে। তাঁর সামনে লজ্জা নেই, ভয় নেই, বড় যে চরণ নাচিয়ে চলছেন। বচনও শেষ হল, আর পদ্মনাভের সামনেই পদ্মাও আরম্ভ করে দিলেন সাত কাহন স্তব। কত ছলই না সে জানে। শেষে জানালেন—

১৬। দেবী চন্দ্রাবলীর নিতান্ত আমোদিনী সহচরীদের আমি সাথী। আমার নাম পদ্মা। গুণবতী গৌরী তিনি গৌরীপূজা করবেন। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন ফুল তুলতে। কিন্তু তিনি যেমনটি চান তেমন ফুল, পূজার ফুল···অন্য কোথাও মেলে না। আপনার এই কাননেই ফোটে, তাই বকুল ফুল তুলতে এখানে আমার আসাই আসা।

১৭। কুসুমাসব বললেন—তিনি যে আসলে বিত্তবা গৌরী, সে কথা সকলেই জানে। তাঁর গৌরীপূজনও বিখ্যাত। কিন্তু দেবতারা তুষ্ট হন শ্রদ্ধায় পৌঁছবে। তিনি নিজে এলেন না কেন?

পদ্মা।—আপনি দেখছি বড্ড সাহসী। তবু ভাল প্রশ্নই তুলেছেন। কিন্তু কি জানেন, কুন্দের তটে দাঁড়িয়ে যে মুহূর্ত্তে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছে কৃষ্ণভুজঙ্গ, সেই মুহূর্ত্ত থেকে এখনও পর্যন্ত ব্যথায় ভয় ভয় করছে তাঁর হৃদয়। বিষের বাধাই বোধ হয় তার কারণ।

১৮। কুসুমাসব।—বন থেকে সকলেই বাধায় শান্তি হয়। যদি হয় তবেই হবে।

পদ্মা।—আমরাও খুঁজছি, বন থেকে সাধিত দেবীর কারণটিকেই।

কুসুমাসব। অতি দুর্লভ সেটি।

পদ্মা। তুমী উৎকণ্ঠার কাছে কিছুই দুর্লভ নয়।

কুসুমাসব। তথাপি বাধে যখনি মনের মধ্যে জাগে উৎকণ্ঠার ভাব। কিন্তু উৎকণ্ঠার ভাবধ্বনি দিয়ে কেমন করে বন্ধু মন থেকে সর্বাঙ্গের কাজটি হবে?

পদ্মা। ও কাজটি তাঁর হয়েই গেছে, যেহেতু মনের হরণ হয়ে গেছে এক মনোহরণের কৃপায়। তবু কেন যে এই উৎকণ্ঠার ভাব··· এইটিই বিচিত্র!

কুসুমাসব। তাহলে, অনুসন্ধান করুন মনোহরকে।

পদ্মা। সম্প্রতি একগাছি বকুলমাল্যের সন্ধানে ফিরছি। তাই দিয়েই বাঞ্ছিত করতে হবে গৌরীকণ্ঠ।

১৯। কৃষ্ণ বললেন—বয়স্য! সন্দেহাতীত ভাবে ইনি চতুরা। এই বকুল-মালাখানি দিয়ে গৌরী পূজাও করতে চান, আবার গাঁথবার পরিশ্রম থেকেও বিশ্রাম পেতে চান।

২০। কুসুমাসব। বলি, ও সাহসিনি, প্রিয়বয়স্যটির নিজের গলায় দোলাবার জন্যে গাঁথা হয়েছে এই মালা। অন্য মহিলা সেটির অধিকারিণী হন কেমন করে? আর শাখা ফুল ফুটে রয়েছে অনেক, সেগুলি তুলে নিয়ে যান।

পদ্মা। সাহস দেখালুম আবার কোথায়? আমাকে ঠকাচ্ছেনই বা কেন আপনি···এই ভাবে? কুমার যদি খুশী হয়ে দিতে চান নিজেই দেবেন।

২১। কৃষ্ণ। বয়স্য, ইনি ঠিকই বলছেন। ওঁকে আমার নিজেরই দেওয়া উচিত এই ফুলগুলি। এতে ওঁর সখীরও সন্তোষ হবে, গৌরীপূজনের ব্যবস্থাও হবে।

বাক্যালাপ শেষ হল। পদ্মার মনখানিও যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। দেওয়া ফুল নেওয়া হল। এক রাশ বকুল ফুল নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

২২। এবার দেবী আমায় বলতেই হবে আপনার তপস্যার জোর আছে। তা না হলে এমনটি হয়?

কুসুমাসব বললেন—বয়স্য, হতেও তো পারে, এই এঁরি মত কেউ, অর্থাৎ বৃষভানুনন্দিনীর নব্য সখীদের মধ্যে কেউ, অধুনা··· আপনার হৃদয়ের অগ্নিতাপটিকে উজ্জ্বলোতে উজ্জ্বলোতে এখানে উপস্থিত হয়ে যাবেন। তখন দাম বাড়বে এই মালার। শুনেই ভয় ভেঙে গেল আমার। যেন কিছুই শুনিনি এই অভিনয় করতে করতে, ঝরা ফুল কুড়িয়ে তোলার ছল করে, আকস্মিকীর মতন উপস্থিত হয়ে গেলুম সেখানে। হেন অবস্থায় আমাকে দেখতে

পেয়ে যেই কুসুমাসব বলে উঠেছেন, তুমি কে ? অমনি হাতের শুকটি বলে উঠলেন, আরে আরে এ যে দেখছি রাধার সই শ্যামার সখী···বকুলমালা ? ফুল তুলছে, বকুলমালা গাঁথবে বলে।

কুসুমাসব বললেন—মালায় এর কিসের প্রয়োজন ? বকুলের ফুল পেলেই তো মন গলে যায় গোকুলের কুলবালাদের সঙ্কোচও ঘোচে।

২৩। শুক বললেন—ইনি বকুলমালা। বকুলমালা রচনা করে নিজের গুণ শ্যামাসখী শ্যামাকে ইনি দেবেন। তিনি আবার দেবেন আমার দেবী শ্রীরাধাকে। এই হল তার মর্যাদা।

২৪। কৃষ্ণের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুসুমাসব তখন হাসতে হাসতে বললেন—বয়স্ক, আমার উক্তিগুলি যেন এক একটি কল্পলতিকা, ফলোন্মুখী মনে হচ্ছে।

শুকও বলে উঠলেন—ব্রাহ্মণ-বাণী অমোঘ, ওকে ডেকে হাতে তুলে নিন বকুলমালা, উনিই পৌঁছিয়ে দেবেন ওটিকে তার কাছে। একখানি হারের মত চমকে উঠল মধুমঙ্গলের দন্তপংক্তির কিরণাবলী, যা বলা উচিত তাই বললেন,—

হাস্যপটু আমার এই বয়স্ক বটুটির কথায় উনি কেন ডাকলেই আসতে যাবেন ? জানেনই তো গোকুলের কুলবালারা সহজেই গরবিনী। অতএব, হে প্রিয় বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ, আপনিই নিজের দেবীর পক্ষপাতিত্ব করুন। পাখা নাড়তে নাড়তেই, ওর কাছে স্বয়ং উপসর্পণ করুন। 'বকুলমালা' অমলা, স্বভাব-কল-কোমলা। আশা করি আপনার কথায় তুষ্টা হয়ে তিনি নিয়ে যাবেন বকুল-মালাটিকে।

২৫। বিহঙ্গরাজ শুক তখন আমার কাছে এসে বললেন—বকুলমালা, আমায় তুমি চেনো, তবে মিছে কেন চয়ন করছ বকুল-ফুল ? ব্রজরাজকুমারের কাছে এস। তাঁর হাতের গাঁথা মালা আমি তোমাকে দেওয়াবো। ফুল কুড়িয়ে এতটা পরিশ্রম করে লাভ কি ?

আমি বললুম, হে শুকবংশাবতংস ! কথায় বলে···সংসর্গজাঃ। দোষগুণাঃ সত্যিই তাই। যিনি পীতবাস পরে প্রেমের ভণিতা করে বেড়ান, যিনি মধু-রস খেয়ে মত্ত হন, তার মত সঙ্গী না হলে কি আর এমন বুদ্ধি হয় ? বলি, কোথায় আপনি দেখেছেন, কুলকুমারীরা বুকে দুলিয়েছেন পরপুরুষের দেওয়া মালা ?

২৬। শুক বললেন—আ-হা-হা, পরমপুরুষ ইনি নিশ্চয়ই পরপুরুষ নন।

আমি বললুম—যিনি পুরুষ, তাঁকে পরমপুরুষ বলছেন কেন ?

শুক বললেন—এ ক্ষেত্রে কি সন্ধির অনুসন্ধান করা চলে ? একেবারেই চলে না। বাচালতার লতা বিস্তারে কাজ নেই। কর্ম ধারণ করুন। এই পদটি অতি দুর্লভ।

কথার চাতুর্যে শ্রীশুক যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে কর্ম করতে এসেছ, সেটিকে দয়া করে কর, অর্থাৎ বাচালতা না করে মালাটি হাতে তুলে নাও। সত্যিই কথার চাতুর্যেই যেন আমাকে জয় করে নিলেন শুক। তারপরে মা, আর কি আমার মা বলা চলে ? মকরধ্বজের কুণ্ডলের দিকে আমাকে এগিয়ে আসতেই হল।

২৭। কুসুমাসব এবং শুক···দুজনেই বিজয়া, দুজনেই প্রিয় সুহৃৎ। কৃষ্ণ এবং আমি···আমাদের দুজনের মনেও তখন অতি স্নিগ্ধভাব। যেন সকলের মধ্যেই উপস্থিত বিগ্রহ ঘটেছে বিরোধের, যেন রুষ্টি হয়ে গেছে উপরোধ অনুরোধের এক সংহিতা।

কুসুমাসব বললেন—দেখ শুক, বকুলের মালাখানি আমদে ভুর ভুর করছে গন্ধে। বন্ধুর করকমলের লক্ষ্মীরও এটি দুষ্প্রাপ্য। অতএব আমাদের কর্তব্য বকুলমালাকে দিয়ে এই বকুলমালাখানি পৌঁছিয়ে দেওয়া···চিরানুরাগিণী তোমার দেবীর কাছে। তাতে সফলও হবে বন্ধুর শিল্পকৌশল। এই মালাখানিকে তখন আদর করে উঠিয়ে নিলেন দামোদর, একটু যেন কেঁপে উঠল করকমল ; একটু কেমন যেন মেদুর হয়ে গেল উদীর্ণ ঘর্ম জলের কণিকায় ; চাঁদমুখে একটু যেন উথলে উঠল মুচকি হাসির অমৃত। মনের ভাব গোপন করে মুখ ফেরালেন আমার মুখে। হ্যাঁ কবিতকর্মা বটে তিনি, আমার এই হাতখানিতে পরশ দিয়ে সমর্পণ করলেন বকুলমালা, মাল্যখানি হাতের পাতায় ধরে রইলুম, যেন ধরে রইলুম সুরভিতম মূর্তিমান একখানি হৃদয়। ধন্য হয়ে গেলুম। তারপরে আমি ছুটে আসি আমার দেবীর কাছে, সব কথা বলে তাঁকে দিই মালা। তিনি···এই আমার দেবীটি···সেই মালা নিয়ে ধেয়ে এসেছেন আপনার কাছে।

বকুলমালার বিবৃতির ইতি হতে না হতেই শ্রীশ্যামাদেবী বকুল-মালাখানি দুলিয়ে দিলেন শ্রীরাধিকার কণ্ঠে···মালার স্পর্শ।

[ক্রমশঃ।

একাকিনী

শ্রীমতী রায়

আর কত দিন আছে বাকি তোমার কাছে যাওয়া।
কেমন করে আঁধার রাতে চলবে তরী বাওয়া ?
একলা আমি আছি বসে
আজ কেহ নাই আমার পাশে,
কাঁপছি ত্রাসে আসছে ধেয়ে বিষম ঝোড়ো হাওয়া
কেমন করে চলবে বল একলা তরী বাওয়া ?
নিঝুম যখন রাতের তারা
তাকাই আমি সঙ্গীহারা,
বিফল মানি যাত্রা ওগো হয়নি তোমায় পাওয়া
আঁধার রাতে কেমন করে চলবে তরী বাওয়া ?

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

তুরস্কে সামরিক শাসন—

গত ২৩শে-২৭শে মে (১৯৬০) মধ্যরাত্রে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তুরস্কের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করার ঘটনাটি আকস্মিক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সকল সামরিক অভ্যুত্থানই আকস্মিক বলিয়াই মনে হয়, যদিও তাহার প্রস্তুতি পূর্ব্ব হইতে চলিতে থাকে। তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান আকস্মিক হইলেও একেবারেই অপ্রত্যাশিত একথা বোধ হয় স্বীকার করা যায় না। এই সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্ববর্ত্তী কিঞ্চিদধিক এক মাসের ঘটনাবলীর কথা বিবেচনা করিলে ঘটনাটি একেবারেই আকস্মিক একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ গত এপ্রিল মাসের (১৯৬০) প্রথমদিকে যে ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং পরে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যে ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া ছাত্র-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাহারই পরিণতিতে সেনাবাহিনী তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল কামাল গুর্‌সেল বাষট্টি বৎসরের পক্ককেশ বৃদ্ধ। তুরস্কের সামরিক বাহিনীতে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলিয়া কথিত। তুরস্কের জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলের নেতা ইসমেৎ ইনোন্নুকে জাতীয় পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা এবং উহার বারটি অধিবেশনে তাঁহার যোগদান নিষিদ্ধ করার পর যে-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় তাহার অব্যবহিত পর জেনারেল গুর্‌সেলকে দুই মাসের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। ঐ সময় তিনি তুরস্কের স্থলসৈন্যের কমাণ্ডার ছিলেন। ছুটি গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি তরুণ সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তাঁহারই নেতৃত্বে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিল। তুরস্কের সামরিক মহলের যেটুকু সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি তিন মাস ধরিয়া সামরিক এই অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং এই সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজন যে পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সামরিক বিভাগ কেন এই অভ্যুত্থানের জন্য আয়োজন করিতেছিল, দলীয় বিরোধের ফলে তুরস্কে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কাই উহার কারণ কি না, তুরস্কের বিমানঘাঁটি হইতে প্রেরিত মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান রাশিয়া কর্তৃক ভূপাতিত করার ঘটনার সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে কি না, এ সকল প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তুরস্কের এই সামরিক অভ্যুত্থান রিপাবলিকান পার্টির অনুকূলে হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নও উপেক্ষার বিষয় নয়। বরং ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিপাবলিকান দলের নেতা ইস্‌মেৎ ইনোন্নু গ্রীসের যুদ্ধে কামাল আতাতুর্কের বিশ্বস্ত সাথীই শুধু ছিলেন না, তিনি তুরস্কের সেনাবাহিনীর জেনারেল-ও ছিলেন এবং প্রেসিডেণ্টও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তবে মেণ্ডেরিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর বহু অফিসারের মনে যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই।

গত এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে রিপাবলিকান দলের নেতা মিঃ ইস্‌মেৎ ইনোন্নু যখন পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেণ্ডেরিসের নির্দ্দেশে সৈন্যদল তাঁহাকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে দেয় নাই। এই ঘটনার প্রতিবাদে কয়েক জন সামরিক কর্ম্মচারী পদত্যাগ করেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রিপাবলিকান দলের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিকে কতকগুলি ক্ষমতা দিবার জন্য তুর্কী জাতীয় পরিষদ একটি বিল উত্থাপিত হয়। এই বিলের আলোচনার সময় মি, ইনোন্নুর বক্তৃতা নাকি সরকারের কাছে খুব আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহাকে পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, জাতীয় পরিষদের বারটি অধিবেশনে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না। আরও বার জন সদস্যকে টেবিল চাপড়াইবার এবং আপত্তিকর ধ্বনি করিবার অভিযোগে পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। ছাত্রবিক্ষোভ দেখা দেয় উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে। ২১শে এপ্রিল ইস্তাম্বুলে এবং আঙ্কারায় সামরিক আইনজারী করা হয়। সামরিক আইনজারী করার অর্থ সামরিক বাহিনীর হাতেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব চলিয়া যাওয়া। ছাত্রবিক্ষোভ দমনের জন্য রাইফেল ও মেশিনগান ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১লা মে তারিখে আঙ্কারা সহরে কারফিউ জারী করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এক মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২রা মে তারিখে ইস্তাম্বুলে আটলাণ্টিক মন্ত্রণা পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইলে দুই সহস্রাধিক লোকের এক জনতা স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া সভাকক্ষের বাহিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গত ১৮ই মে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী শীঘ্রই সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। মেণ্ডেরিস-সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক বিভাগের গভীর অসন্তোষের একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ ভাবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কমনওয়েলথ সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তুরস্কে গিয়াছিলেন। ২১শে মে পণ্ডিত নেহরু যখন আঙ্কারায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন সেই সময় সেনাপতি ও অফিসারগণের পরিচালনায় আর্ম্মি ক্যাডেটরা তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। সেনাবাহিনীর ইহাই প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং উহা যে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত স্বরূপ ছিল, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থান এবং ক্ষমতা দখল বিনা রক্তপাতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ক্ষমতা দখল করিতে সময়ও সামান্যই লাগিয়াছিল। সৈন্যবাহিনী তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আদনান মেণ্ডেরিস এবং তুরস্কের প্রেসিডেণ্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আর যে সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন জাতীয় পরিষদের সভাপতি, দেশরক্ষা মন্ত্রী, চীফ্ অব্ জেনারেল ষ্টাফ, অর্থমন্ত্রী এবং স্থলসৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। শাসন-পরিচালনার জন্য জেনারেল কামাল গুরসেলের সভাপতিত্বে জাতীয় ঐক্য কমিটি (National Unity Committee) গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং রাজনৈতিক সভাসমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করা প্রয়োজন তাহার কিছুই বাকী রাখা হয় নাই। জেনারেল কামাল গুর্সেল ২৭শে মে রাত্রে এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি এক-নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিব না। প্রত্যহ অবস্থার অবনতি ঘটিতেছিল বলিয়া আমি আমার দেশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছি।" তিনি শীঘ্রই নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। নাটো ও সেণ্টোর প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, তুরস্ক উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদ এবং বাগদাদ চুক্তির সদস্য। ইরাক বাগদাদ চুক্তির বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এই চুক্তির নূতন নামকরণ হইয়াছে 'সেণ্ট্রাল ট্রিটি অরগ্যানিজেশন', সংক্ষেপে 'সেণ্টো।' সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক সাধারণতঃ যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহার সমস্তই দেওয়া হইয়াছে, এমন কি, শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি পর্য্যন্ত। এই ধরণের প্রতিশ্রুতি কোন সময়েই রক্ষিত হয় না। কাজেই নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হইবে কিম্বা আদৌ হইবে কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষ করিয়া মিঃ মেণ্ডেরিসের ডিমোক্রেটিক দলটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইলেও বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। সেনাবাহিনী একবার ক্ষমতা দখল করিলে আর সে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে চাহে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তুরস্কের এই সামরিক অভ্যু-থান মিঃ ইনোনুর রিপাবলিকান পার্টির অনুকূলে হইয়াছে, এইরূপ মনে হওয়াও স্বাভাবিক। রিপাবলিকান দলকে ক্ষমতায় আসীন করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। সামরিক অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল কামাল গুর্সেল প্রধান মন্ত্রী ও দেশরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৮শে মে (১৯৬০) রাত্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, মিঃ মেণ্ডেরিসকে সম্ভবতঃ নূতন নির্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিতে হইবে। তিনি ইহাও জানান যে, আইন-বিশেষজ্ঞগণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ শেষ হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক তুরস্কের শাসনভার গ্রহণের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। নাটো ও সেণ্টোর প্রতি মেণ্ডেরিস সরকারের আনুগত্যের কোন অভাব ছিল না। তুরস্কের বিমান-ঘাঁটি হইতে মার্কিণ-গোয়েন্দা বিমান রাশিয়ার আকাশে গোয়েন্দাগিরির জন্য গিয়াছিল। রাশিয়ার হুমকীসত্ত্বেও মেণ্ডেরিস সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট কোন প্রতিবাদ জানায় নাই। ব্রহ্মদেশে সাময়িকভাবে যেরূপ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার সহিত তুরস্কে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠার কোন তুলনাই চলিতে পারে না। ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থান এবং তুরস্কের সামরিক অভ্যুত্থান পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মী। সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে তুরস্ক যেরূপ পশ্চিমী-শক্তিবর্গের নির্ভরযোগ্য ঘাঁটি ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের পরেও সেইরূপ নির্ভরযোগ্য ঘাঁটিই রহিয়াছে। পাকিস্তানে এবং সুদানে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠা যে-পর্য্যায়ভুক্ত তুরস্কে সামরিক শাসন-প্রতিষ্ঠা সেই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার ডাঃ সীংম্যান রীর পতন এবং তুরস্কে মিঃ মেণ্ডেরিসের পতন একই পর্য্যায়ভুক্ত কি না তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। মিঃ ইনোনু এবং তাঁহার রিপাবলিকান দল ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তুরস্ক শাসন করিয়াছেন। তাঁহার শাসনও কম পীড়ন-মূলক ছিল না। বস্তুতঃ পীড়নমূলক ছিল বলিয়াই ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নবগঠিত ডেমোক্রাটিক দল রিপাবলিকান দলকে বিপুলভাবে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই হইতে এই দলটিই এতদিন পর্য্যন্ত ক্ষমতার আসনে আসীন ছিল। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও এই দলটি-ই জয়লাভ করে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দলটির বিরুদ্ধে রিপাবলিকান পার্টিকে দমন করিবার অভিযোগ শোনা যাইতেছিল। মেণ্ডেরিস সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র বিরোধী বহু কার্য্যকলাপের অভিযোগও উঠিয়াছে। সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণতন্ত্র রক্ষা পাইল, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বিলাতের 'দি পিপল' পত্রিকার গত ৫ই জুন (১৯৬০) তারিখের সংখ্যায় জনৈক ভাষ্যকার তুরস্কে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বিবেচনার যোগ্য। উক্ত ভাষ্যকার বলেন যে, মেণ্ডেরিস সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকিলেও মার্কিন গোয়েন্দাবিমান সংক্রান্ত ঘটনার পূর্ব্বপর্য্যন্ত সৈন্যবাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনার পর তুরস্ক সরকার পুনরায় মার্কিণ গোয়েন্দাবিমান কর্তৃক তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যে, সমগ্র সামরিক বাহিনীই হয়ত আমেরিকার প্রভাবাধীনে চলিয়া যাইবে। উক্ত ভাষ্যকার ইহা-ই মনে করেন যে, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পশ্চাতে মার্কিন ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সতর্কবাণী নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার এই ভাষ্যের সহিত একমত হওয়া কঠিন বলিয়াই আমরা মনে করি। সিয়াটো জোটে পাকিস্তানের এবং সেণ্টো ও সিয়াটো জোটের সহিত নাটোর সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে তুরস্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানে ইতিপূর্ব্বে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তুরস্কেও সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাতে মার্কিন প্রভাব আরও সুদৃঢ় হইল বলিয়াই আমরা মনে করি।

জাপানে তীব্র বিক্ষোভ—

জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত দশ বৎসরের নিরাপত্তা চুক্তি লইয়া জাপানে যে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিণতি কি হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যে মার্কিণ ঘাঁটি সম্পর্কে রাশিয়া জাপানকে সতর্ক করিয়া দেওয়ায় জাপানীদের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফরের প্রাক্কালে ইহা-ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯শে জুন তারিখে তিনি জাপানে পৌঁছিবেন। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জাপান সফর শেষ হইয়া যাইবে। উল্লিখিত নূতন নিরাপত্তা চুক্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের ঘাঁটি ব্যবহার করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই চুক্তি হইয়াছে যে, এই দুই দেশের কোনও একটি দেশ আক্রান্ত হইলেই উভয় দেশ মিলিত ভাবে যুদ্ধ করিবে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রবল হইয়া উঠিলেও জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশি মোটেই বিচলিত হন নাই। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার জাপানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এই চুক্তি যাহাতে আইনসিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। জাপানের সোস্যালিষ্ট পার্টি এইরূপ চুক্তির বিরোধী। ইহার উপর মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান সম্পর্কে জাপানের প্রতি রাশিয়ার সতর্কবাণী যদি জাপানীদের মনে হিরোসিমা ও নাগাসিকির ভীতি জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। সোস্যালিষ্ট পার্টি পার্লামেণ্ট বয়কট করা সত্ত্বেও মিঃ কিশি তাঁহার লিবারেল পার্টির ভোটের জোরে জাপ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদে এই চুক্তি অনুমোদন করাইয়া লইয়াছেন। জাপ পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ এই চুক্তি অনুমোদন করুক আর নাই করুক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। নিম্ন পরিষদ উহা অনুমোদন করায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপানে পৌঁছিবার পূর্ব্বদিবস ১৮ই জুন (১৯৬০) তারিখে উহা আইনসিদ্ধ হইয়া যাইবে।

জাপ মার্কিণ নিরাপত্তাচুক্তির বিরুদ্ধে গত ২৩ মে টোকিওতে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সহিত পুলিশের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সোস্যালিষ্ট পার্টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জাপ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জনপরিষদ (People's Council) গঠিত হইয়াছে। জাপ-মার্কিণ চুক্তি বাতিল করিবার, পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার এবং মিঃ কিশির পদত্যাগ দাবী করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফর বাতিল করিবার দাবীও করা হইয়াছে। কিন্তু জাপ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কিশি এই সকল দাবী সম্পর্কে অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি পদত্যাগও করিবেন না, পার্লামেণ্টও ভাঙ্গিয়া দিবেন না। জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদন করাইতে এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার সঙ্কল্প অচল ও অটল। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান পরিদর্শন সংক্রান্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ জেম্‌স হ্যাগার্টি গত ১০ই জুন টোকিও বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাপানস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ ডগলাস ম্যাকআর্থারও বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন হাজার বিক্ষোভকারী ছাত্র বিমানবন্দরের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে মিঃ হ্যাগার্টি ও মিঃ ম্যাকআর্থারকে একঘণ্টারও বেশী সময় বিমানবন্দরে বন্দীর মত অপেক্ষা করিতে হয়। একটি মার্কিণ হেলিকপ্টার তাঁহাদিগকে টোকিও বিমানবন্দর হইতে উদ্ধার করিয়া মার্কিণ দূতাবাস হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী এক সেনাবাহিকে নামাইয়া দেয়। সেখান হইতে মোটরযোগে তাঁহারা গন্তব্যস্থলে উপনীত হন। মিঃ হ্যাগার্টি এক সাংবাদিক বৈঠকে টোকিও বিমানবন্দরে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিক্ষোভকারীগণ তাঁহার মোটর গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার এবং উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার ধারণা এই বিক্ষোভ প্রদর্শন একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের কার্য্য। জাপান সরকার এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ হ্যাগার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে অবিচলিত আছেন বলিয়া হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশিও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই সফর স্থগিত রাখার বিরোধী। তিনি নাকি মার্কিণ সরকারকে জানাইয়াছেন যে এই সফর স্থগিত রাখিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনটা তিনি কম্যুনিষ্টদের কারসাজি বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিশি সরকার এবং বিরোধী পক্ষ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের অভ্যর্থনার জন্য যে আয়োজন করিতেছেন তাহাতে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবে। কিশি সরকার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সম্বর্দ্ধনার জন্য ছয় লক্ষ লোক টোকিওতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার পরিণামে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের চোখের সামনেই সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিরাপত্তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। বিমানঘাঁটি হইতে এগার মাইল পথে প্রতি ছয় ফুট অন্তর এক জন করিয়া পুলিশ পাহারা দিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন হইবে প্রায় সত্তর হাজার পুলিশ। এই পুলিশ পাহারার মধ্য দিয়া বুলেট প্রুফ সিডান গাড়ীতে প্রেসিডেণ্ট গমন করিবেন।

জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাহা কম্যুনিষ্টদের উস্কানীর ফল—ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। ১৬ই মে শীর্ষসম্মেলন সূচনাতেই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর ২০শে মে তারিখে জাপ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদে জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই একই দিনে রাশিয়া জাপ সরকারের নিকট দুইখানি কড়া প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। জাপানে যে মার্কিণ ইউ-২ বিমানঘাঁটি আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকী দেওয়া হইয়াছে প্রথম প্রতিবাদ লিপিতে। জাপানে দুইখানি ইউ-২ মার্কিণ বিমানের উপস্থিতি, নূতন জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি এবং জাপান সাগরে একখানি সোভিয়েট জাহাজের ঊর্দ্ধাকাশে জাপানী বিমানের আনাগোনার বিরুদ্ধে সোভিয়েট সরকার

তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে গত ৩০শে মে সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল মেলিনোভস্কী যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, সোভিয়েট রকেট বাহিনীর সেনাপতিকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন বিমান যদি বিদেশের কোন ঘাঁটি হইতে আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে তবে সে-ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। সে ঘাঁটিটি কোন্ দেশে অবস্থিত তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা হুমকী নয়, ইহা সতর্কবাণী। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শুধু রাশিয়ার আকাশ সীমা নয়, অন্য কোন সোস্তালিষ্ট দেশের আকাশ-সীমা লঙ্ঘিত হইলেও ঘাঁটি ধ্বংস করিবার নির্দেশ কার্য্যকরী হইবে। রাশিয়ার প্রতিবাদ লিপি এবং উল্লিখিত সতর্কবাণীতে জাপানের জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। উহা ফাঁকা আওয়াজ হইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষার বিষয় নয়। বিশেষতঃ জাপানে যে সকল মার্কিণ ঘাঁটি আছে সেগুলির উপর জাপ সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। এই সকল ঘাঁটিতে কি হইতেছে তাহাও জানিবার অধিকার জাপ সরকারের নাই, একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

নিরাপত্তা পরিষদ ও মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান—

রাশিয়ায় ইউ—২ মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল গত ২৬শে মে (১১৬০) তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র দুইটি সদস্য রাষ্ট্র—রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। টিউনিশিয়া ও সিংহল ভোটদানে বিরত ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, আর্জেণ্টিনা, ইকুয়াডর, ইটালী এবং কুয়োমিণ্টাং চীন অর্থাৎ ফরমোসা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া অপ্রত্যাশিত ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর আক্রান্ত হওয়া স্বীকার করেন নাই, একথা আমরা ভাল করিয়াই জানি। গুয়াতেমালার আবেদনও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিতে পারিত। প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্যের ভোট পাইল না কেন, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। কিন্তু রাশিয়ার নিন্দা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ার তাৎপর্য্য কি, উহা অগ্রাহ্য হওয়ায় কি প্রমাণিত হইতেছে তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, লবীতে মার্কিণ প্রতিনিধিগণ সুস্পষ্ট ভাবেই একথা জানান যে, সমস্ত দেশকে পরস্পরের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সাধারণ ভাবেও যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহাতে আপত্তি জানাইবে। ইহার পর নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই তিরোহিত হয় ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ হেনরী কেবট লজ রাশিয়ার অভিযোগগুলির যে উত্তর নিরাপত্তা পরিষদে দিয়াছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মিঃ লজ বলেন যে, এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট নিরস্ত্র এবং একজন মাত্র লোক সমন্বিত বিমানের রাশিয়ার আকাশে বিচরণকে আক্রমণ বলা যায় না। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের 'উন্মুক্ত আকাশ' পরিকল্পনা রাশিয়া অগ্রাহ্য করায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। যদি স্বীকার করা যায় যে, একটি নিরস্ত্র বিমানের রাশিয়ার উপর গোয়েন্দাগিরি আক্রমণাত্মক কার্য্য না হয়, তাহা হইলেও একদেশ কর্তৃক আর এক দেশের উপর গোয়েন্দাগিরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ প্রকাশ্যে নিন্দনীয় কি না। নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিয়া কি রাশিয়ার উপর মার্কিণ বিমানের গোয়েন্দাগিরিই সমর্থন করেন নাই? এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইরূপ গোয়েন্দাগিরিকেই কি স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই? রাশিয়ার প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হওয়ায় অন্য দেশের আকাশে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ করিয়া ঐ দেশের সামরিক গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার অধিকার আর এক দেশের আছে, ইহা-ই কি স্বীকার করা হয় নাই? প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাঁহারা ভোট দিয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকারের দিক হইতে উহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বিবেচনা করেন নাই, ইহা-ই কি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মনসুর কাদের মার্কিণ গোয়েন্দা বিমানের কার্য্যকলাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Activities of this kind increase risk and we certainly will not be a party to military intelligence being gathered" অর্থাৎ এই ধরণের কার্য্যকলাপ বিপদ বৃদ্ধি করে এবং সামরিক সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা অংশীদার হইতে পারি না। বৃটেনেও মিঃ গেইটস্কেল বলিয়াছেন যে, বৃটেনের সম্পর্ক ছাড়া বৃটেনের ঘাঁটি হইতে গোয়েন্দা বিমান উড়িবে না, এই মর্ম্মে সরকারের আশ্বাস দেওয়া প্রয়োজন এবং ঐরূপ সম্মতি দেওয়া সরকারের উচিত হইবে না। বৃটেন রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানও গোয়েন্দা বিমানের কার্য্যকলাপ দ্বারা যে জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা হয় তাহা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। বিশ্বের শান্তিকামীদের বলিষ্ঠ দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া শীর্ষসম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। শান্তির বিরোধী শক্তি সূচনাতেই উহা বানচাল করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তিকামীদের শক্তি এখনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। তাই শীর্ষসম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছে ভাবী শীর্ষ সম্মেলনের দাবী। নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত নিন্দা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিয়াছে বটে, ভাবী শীর্ষ সম্মেলনের দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু মিঃ ম্যাকমিলান মনে করেন যে, বর্ত্তমান বিশ্বে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গুপ্তচর বৃত্তি বজায় না রাখিয়া উপায় নাই।

ভাবী শীর্ষ সম্মেলন—

শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে রাশিয়ার আনীত মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের নিন্দা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার প

বিশ্ব পরিস্থিতি অধিকতর উত্তপ্ত হওয়ায় যে আশঙ্কা দেখা গিয়াছিল তাহা নিরোধের জন্য ভাবী শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পরই যথা সম্ভব শীঘ্র পুনরায় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য বৃহৎ চতুঃশক্তিকে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত হইয়াছে। শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার শীর্ষ-সম্মেলন হইবে, একথা শোনা যাইতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে দূতীয়ালী করিবে কে, ইহা যে একটা প্রধান সমস্যা একথা অস্বীকার করা যায় না। নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত এই প্রস্তাবটি দূতীয়ালীর কাজ আরম্ভ করিয়াছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। সিংহল, আর্জেণ্টিনা, টিউনিশিয়া এবং ইকোয়াডর এই চারিটি রাষ্ট্র মিলিত ভাবে এই প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। এই চারিটি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য। তন্মধ্যে আর্জেণ্টিনা এবং ইকুয়াডর রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল এবং সিংহল ও টিউনিশিয়া ভোট দানে বিরত ছিল। প্রস্তাবটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়েরই গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে। রাশিয়া গোয়েন্দা বিমানের প্রসঙ্গ এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া। এই চেষ্টা ২-৬ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আকাশে অনধিকার প্রসঙ্গ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরোধিতা করিয়াছিল, ইহা উল্লেখযোগ্য।

আপোষ-রফা হিসাবে প্রস্তাবটি সংশোধন করা হইয়াছিল। তথাপি সংশোধিত প্রস্তাবটি সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু রাশিয়া উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে ভেটোও প্রদান করে নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই প্রস্তাব সমর্থন করে। প্যারীতে মঃ ক্রুশ্চভ বলিয়াছিলেন যে শীর্ষ-সম্মেলন ছয় হইতে আট মাস স্থগিত রহিল। শীর্ষ-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর প্যারী হইতে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের রাষ্ট্রনায়কগণ যে ইস্তাহার প্রচার করেন তাহাতেও তাঁহারা এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সমস্ত বিরোধ হুমকী বা শক্তি দ্বারা নয়, আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে এইরূপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেও এই ইস্তাহারে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু আবার কবে শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইবে, আগামী ৬ হইতে ৮ মাসের মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলন আরম্ভ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটনে সিয়াটো বৈঠকের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ নিক্সন বলিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে কোন শীর্ষ-সম্মেলন হইবে বলিয়া আমেরিকা মনে করে না। তবে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক হইবে এইরূপ কোন বৈঠকই হইবে না, ইহাও তিনি মনে করেন না। বৃটিশ কমন্স সভায় পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিতর্কের উপসংহারে মিঃ সেলুইন লয়েডও এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তিনি ইহাও মনে করেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য শীর্ষ-সম্মেলনই একমাত্র পথ নয়। তাঁহার মতে স্বাভাবিক কূটনৈতিক পন্থা, পররাষ্ট্র মন্ত্রি-সম্মেলন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও নিরাপত্তা পরিষদে সংযোগ স্থাপন দ্বারা শান্তির জন্য আলোচনা চালানো যাইতে পারে। গত ২৮শে মে রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চভ পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্যারীতে শীর্ষ-সম্মেলন বানচাল হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া ছয় মাসের মধ্যে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার পথ সুগম করিয়াছে। তিনি অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হইলেও প্রতীক্ষা করিয়া থাকার মত যথেষ্ট ধৈর্য্য রাশিয়ার আছে। মঃ ক্রুশ্চভ এই বক্তৃতায় ইহাও ঘোষণা করেন যে, বৃহৎ চতুঃশক্তির পরবর্ত্তী শীর্ষ-সম্মেলনে কমুনিষ্ট চীন, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত। ভাবী শীর্ষ-সম্মেলনে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি এশীয় রাষ্ট্রের যোগদানের প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার কোন ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায় নাই। শীর্ষ-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় ঘোরালো হইয়া উঠে নাই, ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতার মধ্যেও কিছু সংযত ভাব দেখা যায়। কিন্তু শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে একটা আশাপূর্ণ মনোভাব দেখা গিয়াছিল তাহার অস্তিত্ব আজ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, অবস্থা মন্দের ভাল।

ইহা উল্লেখযোগ্য শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালেও মার্কিণ দেশরক্ষা মন্ত্রী পৃথিবীর সর্ব্বত্র মার্কিণ সামরিক ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। রাশিয়ার আকাশে মার্কিন-গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ ইহারও পূর্ব্বের ঘটনা। শীর্ষ-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন, ফরমোসা ও থাইল্যাণ্ড এলাকায় বিরাট নৌ ও বিমান মহড়ার অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দিয়াছে। এই পরিকল্পনা নাকি ছয় মাস পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। রাশিয়ার দেশরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনোভস্কী গত ৩০শে মে (১৯৬০) ঘোষণা করিয়াছেন যে, "সোভিয়েট রকেট বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে এই মর্ম্মে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন বিদেশী বিমান যে কোন বিদেশী ঘাঁটি হইতে উড়িয়া আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করুক না কেন, সেই ঘাঁটি ধ্বংস করিতে হইবে। সেই ঘাঁটি কোন্ দেশে অবস্থিত তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।" তিনি অবশ্য একথাও জানাইয়াছেন যে, "This is not a threat, but a warning." অর্থাৎ ইহা হুমকী নয়, "সতর্কীকরণ। এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়ার পর যদি কোন দেশের ঘাঁটি হইতে মার্কিণ গোয়েন্দা-বিমান উড়িয়া আসিয়া রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে তবে সে দেশের ঘাঁটি সম্পর্কে রাশিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, এই কথা ভাবিয়া যে সকল দেশে মার্কিণ বিমান-ঘাঁটি আছে সেই সকল দেশে নিশ্চিন্ত থাকিবে, ইহা মনে করা কঠিন। যে মার্কিণ বিমানখানি পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা লইয়া রাশিয়া খুব সোরগোল সৃষ্টি করে নাই, শুধু মামুলি প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে সে-কথাও উল্লেখযোগ্য।

আগামী ছয় হইতে আট মাসের মধ্যে আবার শীর্ষ-সম্মেলন

হইবে, এতখানি আশা করার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে মঃ ক্রুশ্চেভ ছয় হইতে আট মাস শীর্ষ-সম্মেলন স্থগিত রাখার কথা কেন বলিয়াছেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকই মনে জাগিতে পারে। আগামী নবেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারই যে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন না সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এই নির্ব্বাচনের প্রচারকার্য্যে ডেমোক্রাটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা বিশেষ ভাবেই মার্কিণ জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিবেন, এইরূপ আশা করা হয়ত একেবারে অসঙ্গত নয়। কারণ, ডেমোক্রাটিক দলের একটি প্রগতিশীল অংশ মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান সংক্রান্ত নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। মঃ ক্রুশ্চেভ হয়ত উহার উপরেই অনেকখানি ভরসা স্থাপন করিয়াছেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। যে-সকল দেশে মার্কিন বিমান-ঘাঁটি আছে সে সকল দেশের জনমতও যে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মার্কিণ জনসাধারণ এই বিষয়টিও বিবেচনা না করিয়া পারিবেন না। ডেমোক্রাটিক দলের মনোনীত প্রার্থীই যদি আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলেই যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা আশা করা কঠিন। তবে পরমাণু-যুদ্ধকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবে না, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

রাশিয়ার নূতন নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব—

শীর্ষ-সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর গত ৭ই জুন (১৯৬০) জেনেভায় পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই দিন রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যালেরিয়ান জোরিন সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের জন্ম একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। যদি শীর্ষ-সম্মেলন হইত তাহা হইলে মঃ ক্রুশ্চেভ নিরস্ত্রীকরণের এই প্রস্তাবটিই হয়ত সম্মেলনে উত্থাপন করিতেন। শীর্ষ-সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর গত ২রা জুন সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো ভারত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ফ্রান্স এবং নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের হাতে পৃথক পৃথক ভাবে এই নূতন পরিকল্পনার বিবরণ অর্পণ করেন। অতঃপর ৩রা জুন মঃ ক্রুশ্চেভ সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট সাধারণ ও সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রেরণ করেন। এই বিবৃতির সঙ্গে রাশিয়ার নূতন প্রস্তাবটির বিবরণও প্রেরণ করা হয়। ঐ দিনই তিনি ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। 'টাসের' প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৫৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মঃ ক্রুশ্চেভ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন চারি হাজার শব্দসম্বলিত রাশিয়ার নূতন পরিকল্পনাটি তাহারই বিস্তৃত ভাষ্য রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। উহাতে আণবিক অস্ত্রসজ্জার সমস্ত ব্যবস্থা লোপ করা, অপর রাষ্ট্রের এলাকা হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ এবং বৈদেশিক ঘাঁটি সমূহের বিলুপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দশটি রাষ্ট্র লইয়া গঠিত পূর্ব্ব-পশ্চিম নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়ার পরিকল্পনা উত্থাপন করিবার সময় মঃ জোরিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের 'উন্মুক্ত আকাশ' পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, ইহা আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, আকাশ হইতে এই ধরণের চিত্রগ্রহণ একমাত্র আক্রমণকারীরই কাজে আসে। কোন কোন রাষ্ট্র বিদেশে যে সকল ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐগুলির প্রত্যেকটি নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। তিনি বলেন, যাহাদের উদ্দেশ্য অসাধু কিম্বা আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিবার দুরভিসন্ধি যাহাদের আছে তাহারাই শুধু ইহাতে আপত্তি করিতে পারে।

পরমাণু অস্ত্র প্রেরণের সমস্ত যান ধ্বংস করিতে হইবে এবং ঐগুলি প্রেরণের নূতন যানাদি অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র, পাইলট শূন্য বিমান, পরমাণু-অস্ত্র বহনের উপযোগী সামরিক বিমান, যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিণ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করা বন্ধ করিতে হইবে। অন্তরাজ্যে যে সকল বিদেশী সৈন্য আছে তাহা নিজরাজ্যে ফিরাইয়া নিতে হইবে এবং বিদেশে যে সকল সামরিক ঘাঁটি আছে তাহাও ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই প্রথম স্তর। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পরমাণু অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র এবং নরহত্যার অন্যান্য অস্ত্রাদি নিষিদ্ধ করিতে হইবে, ঐ সকল মজুত অস্ত্র ধ্বংস করিতে হইবে এবং ঐগুলি নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয় পর্য্যায়ে সমস্ত রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর বিলোপের কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং অল্পসংখ্যক পুলিশ বাহিনী থাকিবে। সমস্ত কারখানায় সামরিক উৎপাদন বন্ধ করিতে হইবে এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র এবং উহাদের ডিপো ধ্বংস করিতে হইবে। এই পর্য্যায়ে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক পুলিশবাহিনী হিসাবে কাজ করিবার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করিবেন। রাশিয়ার এই নূতন পরিকল্পনার ভাগ্যে কি ঘটিবে সে সম্পর্কে কোন অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার যদি সমাধান হয়, অন্যান্য সমস্যার সমাধান কঠিন হইবে না। ১৪ই জুন, ১৯৬০।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ

উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, বহুবৎসরের দাসত্বের দৈন্যে বাঙ্গালার জাতিমানস যখন প্রায় পঙ্গু, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন জাতির অন্তরাত্মা, যখন আকুল চিত্তে সন্ধান করছে মুক্তিপথ ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই ঘটেছিল উনিশ শতকের বাঙ্গলার নব যুগ-জাগরণ। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম মনীষার একত্র সমাবেশে সাধিত হয়েছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ সেই যুগ বিপ্লবেরই ইতিহাস। আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা প্রভূত শ্রমের সহিত এই ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বাঙ্গলার মৃতপ্রায় ঐতিহ্য কি করে সামগ্রিক ও প্রাণধর্মী হয়ে উঠেছিল তার একটি একান্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই গ্রন্থে যা সম্পূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ ও কালানুক্রমিক। অলীক কল্পনার আশ্রয় নেন নি লেখক কোথাও এবং সেজন্যই পুস্তকখানি উনিশ শতকের বাঙ্গলার নব যুগ জাগরণের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকটি সুশোভন প্রচ্ছদে সজ্জিত ও এর অন্যান্য আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নব জাগরণ, ডক্টর সুশীলকুমার দত্ত, এম-এসসি, এম-এ, ডি-ফিল, প্রকাশক—শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৭ টাকা মাত্র।

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস

বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত দুনিয়া আজ এই বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের রীতি নীতি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক, সেই ঔৎসুক্য অনেকাংশেই মিটোবে আলোচ্য গ্রন্থটি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই বিপুল কলেবর পুস্তকে রুশ জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তার শৈশবাবস্থা থেকেই, সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে রুশ জাতিই যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী একথা অনস্বীকার্য্য আর সেজন্যই সোভিয়েত দেশের ইতিহাস প্রধানতঃ রুশ জাতিরই ইতিহাস। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে সুপ্রচুর শ্রম ও নিষ্ঠার সহিত এই ইতিহাস রচনা করেছেন লেখক, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উত্থান ও পতন বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে তার আধুনিকতম রূপ গ্রহণ সবই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের পর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঘটেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন বার বার; লেনিনের রীতি পরিবর্ত্তিত হয়েছিল তাঁর মানসপুত্রের হাতে আবার তারও অনেক বদল ঘটেছে বর্ত্তমানে, এই সমস্ত রদবদলের কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সহিত উপস্থাপিত করা হয়েছে আলোচ্য পুস্তকে। মোট কথা, সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্র ও সমাজনীতির অতীত ও বর্ত্তমান রূপের একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে আলোচ্য বইটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দাবী করতে পারে; এরূপ একটি মূল্যবান রচনা উপহার দেওয়ার জন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। নয়টি ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে বইটিতে, যা এর ঐতিহাসিক আকর্ষণ বাড়ায়। আমরা আলোচ্য পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। "সোভিয়েত দেশের ইতিহাস"—ঋষি দাস। ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (বোর্ড বাঁধাই), পনেরো টাকা রেক্সিনে বাঁধাই।

গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য

যে কোন জাতির মূল সংস্কৃতির উদ্ভব তার লোকসংস্কৃতি থেকেই, গণমানসের যথার্থ রূপটি পরিস্ফুটিত হয় তাই গ্রামীন নৃত্যে, নাট্যে সঙ্গীতে ও সাহিত্যেই; শান্তিদেব ঘোষ বহুদিন যাবৎ গ্রামীন নৃত্য-নাট্য, ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে চলেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা যে সম্পূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। পশ্চিম বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ত্রিপুরা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি সকল প্রদেশের লোকনৃত্য ও নাট্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থটিতে। নৃত্য ও নাট্যোৎসাহী বিদগ্ধ পাঠক তার রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন এ আশা আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি। নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটি এঁকেছেন বিখ্যাত প্রচ্ছদকার অজিত গুপ্ত; অপরাপর আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। লোকনৃত্যের কয়েকটি ছবিও বইটির শোভা বর্দ্ধন করেছে। গ্রামীন নৃত্য ও নাট্য—শান্তিদেব ঘোষ, প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ দাম—তিন টাকা মাত্র।

সজনীকান্ত দাসের স্বনির্ব্বাচিত গল্প

প্রধানতঃ সাংবাদিক হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন একদা সজনীকান্ত দাস, বর্ত্তমান সাহিত্যরথীদের মধ্যে এমন জনের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। শনিবারের চিঠির নির্মম নির্ভীক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি যাঁকে কোনদিনও; কঠোর সমালোচক ছিলেন সেদিন সজনীকান্ত কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়, আসলে তিনি জাতসাহিত্যিক, গল্প কবিতা ব্যঙ্গরচনা প্রবন্ধ, প্রভৃতি সাহিত্যের নানা পথে বিচরণ করেছেন তিনি সহজ স্বচ্ছন্দতায়,

তার মধ্যে গল্পের সংখ্যাই সর্বাধিক। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি থেকে মোট চব্বিশটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে আলোচ্য সংকলনটিতে ; সজনীকান্তের লেখার মেজাজ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা করা যায় রচনাগুলি থেকে, মানবিক আবেদনে প্রতিটি কাহিনী সমৃদ্ধ, ভাষারীতি সম্পূর্ণ আধুনিক না হলেও রসোপভোগে তা কোন বাধার সৃষ্টি না করে বরং সহায়কই হয়ে উঠেছে। সামগ্রিক ভাবে সংকলনটি যে সুখপাঠ্য, একথা অনস্বীকার্য। আমরা সংকলনটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছদ সুশোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম—পাঁচ টাকা।

পরাশর

প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য-জগতের এক বিস্ময়কর নাম, সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই যে ফসল ফলায় তাঁর সমৃদ্ধ লেখনী, এই সত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে এনেছে তাঁর নবতম গল্পগ্রন্থটি। এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নতুন, বস্তুতঃ এগুলি রহস্য-গল্পেরই পর্য্যায়ভুক্ত, শক্তিমান সাহিত্যিকের কলমে রহস্য কাহিনী বা ডিটেক্‌টিভ গল্প যে কতটা রসোত্তীর্ণ হতে পারে, তার পরিচয় আমরা এর আগেও পেয়েছি শ্রদ্ধেয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ব্যোমকেশের গল্পগুলির মাধ্যমে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট 'পরাশর' চরিত্রটি একমাত্র তার সঙ্গেই তুলনীয়। কাহিনী বিন্যাসে ভাষাসম্পদে গল্পগুলি যে কেবল সুখপাঠ্য তাই নয়, সাহিত্যরসেও পরিপূর্ণ। সাহিত্যের অঙ্গনে ডিটেকটিভ বা রহস্য কাহিনীর যে দৈন্য দেখা যায় আজও, শক্তিমান লেখকের কুশল লেখনী তা অনেকাংশে দূর করবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদটি শোভন, অপরাপর আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। "পরাশর" —প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কালিদাসের কাব্যে ফুল

মহাকবি কালিদাসের নাম কালের অনতিক্রম্য প্রভাবকেও করেছে পরাভূত, আজও বিদগ্ধ রসিক জনের চিত্তে যখন জেগে ওঠে সৌন্দর্য্যের রসানুভূতি তখন তা প্রকাশিত হয় কালিদাসের অমর কাব্য রসাস্বাদনে, গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে অপরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কাব্য শ্লোকগুলি, কণ্ঠে, একান্ত অন্তরঙ্গতায়। কালিদাসের কাব্যে ফুল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, পুষ্প-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রতি কাব্যেই, কবির মানসী নায়িকাগণ কদম, বকুল, কেতকীর মালা জড়ান কুন্তলে, রক্ত অশোক প্রতীক্ষায় থাকে সুন্দরীর চরণ স্পর্শের, কুরুবকের কর্ণিকা দোলে তন্বী শ্যামা শিখরিদশনাদের কর্ণমূলে, কৃত্রিম অলঙ্কারকে লজ্জা দেয় ফোটা ফুলের অমলিন গরিমা। বিভিন্ন কাব্যের ভিতর থেকে কবির এই পুষ্পানুরাগসূচক শ্লোকাংশগুলি চয়ন করেছেন লেখক বর্তমান গ্রন্থে, শুধু যে চয়ন করেছেন তাই নয়, সুন্দর বাংলা অনুবাদ করেছেন সেগুলির। সাধারণ পাঠকের পক্ষেও তাই এই রসক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকে সোজাই। লেখকের ভাষা সুন্দর কাব্যগন্ধী, ফুলের রাজ্যে অনুকরণ যত্নই বহুগুণ বিস্তৃত তাঁর, আমরা আশা করি কাব্যানুরাগী পাঠক আলোচ্য গ্রন্থটি সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। বইটির অঙ্গসজ্জাও সুন্দর। কালিদাসের কাব্যে ফুল—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—জানকীনাথ বসু, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৲ মাত্র।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকের পাঠক চেনেন না, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এই সাহিত্য-সাধকের রচনা আজ বিস্মৃতির কোলে লুপ্তপ্রায়, তাঁর সেই রচনা সমূহের পুনরুদ্ধারের কার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্ত আলোচ্য সংকলনখানির প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ। সাহিত্যিক সাংবাদিক চারুচন্দ্রের রচনা তাঁর সমকালীন সাহিত্যের বাঁধা পথে পদচারণ করেনি, বস্তুত তিনি ছিলেন সময়ের চলার অগ্রদূত, আধুনিক সংস্কার-বর্জিত মুক্ত মনের পরিচয় মেলে তাঁর রচনার প্রতি পদে, সমসাময়িক সাহিত্যসমালোচকের হাতে তাই বরণের পুষ্পমালার পরিবর্তে অখ্যাতির কণ্টক-মুকুটই জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে সেদিন, আজ আমরা আধুনিক পাঠকরা অনেক বেশী বস্তুবাদী রচনার সাথে পরিচিত, তাই মনে হয় চারুচন্দ্রের সাহিত্য বিচারের আজই প্রকৃষ্ট দিন। আলোচ্য সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে মোট কুড়িটি গল্প, বিভিন্ন সুরের বিভিন্ন মেজাজের এই গল্পগুলি যেন একই সাজিতে চয়িত নানা রঙের ফুল, রূপ রস গন্ধে ভরে তোলে রসিকচিত্ত। "চুড়িওয়ালা", "একটি মেহেদির পাতা", "খেলা" প্রভৃতি গল্পগুলি সত্যই অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, বিশেষতঃ "চুড়ি-ওয়ালা" গল্পটির ভিতর বাঙালীর একান্ত ঘরোয়া যে রূপটি ফুটে উঠেছে তা সত্যই অতুলনীয়, হিন্দুর ঘরের বালবৈধব্যের নিদারুণ অভিশাপ অতি সুন্দর ভাবে আঁকা হয়েছে ; বৃদ্ধ দরিদ্র চুড়ি-ওয়ালার কন্যাপ্রতিম স্নেহপাত্রীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসার বেদনাও ব্যথাতুর করে তোলে পাঠকের চিত্ত। আমরা এই সুন্দর সংকলন গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদ শোভন, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থম্‌ ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

প্রতিভা বসুর প্রেমের গল্প

মিষ্টি সুরে মিষ্টি প্রেমের গল্প বলেন প্রতিভা বসু। আলোচ্য গ্রন্থে এই রকম কয়েকটি গল্পই সংকলিত হয়েছে। মোট আটটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিই কোন না কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। প্রতিভা বসু প্রধানতঃ রূপদর্শী শিল্পী, তাঁর প্রেমের গল্পে প্রেমই প্রধান, কোন রকম মতবাদ প্রচারের বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই বলেই সহজ সরস স্বচ্ছন্দ গতিতে বলা গল্পগুলি স্নিগ্ধ ও সুখপাঠ্য। সরস মধুর গল্পগুলি আমাদের মনকে খুশী করে তোলে, অপাপবিদ্ধা সদ্য কিশোরীর কাজল-কালো চোখে যখন প্রথম প্রেমের আলো জলে ওঠে তার ছোঁয়া যেন আমরাও উপভোগ করি মনে-প্রাণে। 'সুমিত্রার অপমৃত্যু'তে সংস্কার কেমন করে প্রেমের গলা টিপে ধরে তাই বর্ণিত হয়েছে অতি করুণ একটি বিয়োগান্ত কাহিনীর মাধ্যমে। নিপুণ হাতে লেখিকা এঁকেছেন প্রেমের নানা রঙের ছবিগুলি। কোথাও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, কোথাও বা বিরহের অমলিন শুভ্রতা ; গল্পগুলি পড়ার পর মন ভরে ওঠে আনন্দে

ও বেদনায় আর সেই আনন্দ-বেদনাতেই নিহিত রয়েছে এগুলির সার্থক পরিচয়। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি ভাল। 'প্রেমের গল্প' —প্রতিভা বসু। প্রকাশক—প্রকাশচন্দ্র সাহা, গ্রন্থম্, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪৲ মাত্র।

জলপ্রপাত

জনপ্রিয় কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সন্ত প্রকাশিত উপন্যাস 'জলপ্রপাত'; মানুষের মনের সমস্ত অলিগলির উপরেই লেখকের সতর্ক দৃষ্টি; কিছুই যেন তাঁর সন্ধানী নজর এড়িয়ে যায় না, অতি নিপুণ ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন তিনি মানব-মনের নানা বৈচিত্র্যকে এই গ্রন্থে। সেই ইটারন্যাল ত্রিভুজ, দুটি পুরুষ ও একটি নারী, অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত বিক্ষত মানুষগুলির হৃদয়ের সঙ্গে যে সংগ্রাম চলেছিল অবিরাম, তারই উপসংহার ঘটলো এক জলপ্রপাতের ধারে কোন একদিন আকস্মিক ভাবে; নায়িকা শ্রীলেখার এই পরিণতি কাহিনীটিকে বিয়োগান্ত করে তুলেছে আর ছড়িয়ে দিয়েছে এক স্নিগ্ধ মাধুর্য্য যা গোধূলির ম্লানায়মান আভার মতোই আকর্ষণীয়। আলোচ্য পুস্তকটি যশস্বী লেখকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে বলেই আমাদের ধারণা। প্রখ্যাত প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদটি অতি মনোরম। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। 'জলপ্রপাত'—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

বাইশে শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ মহলে যাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল লেখিকা তাঁদের অন্যতম। তিনি কবিকে দেখেছেন অতি নিকট থেকে, তারই পরিচয় আঁকা হয়ে গিয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে, যদিও রবীন্দ্রনাথের শেষ শয্যাই এর বর্ণিত বিষয়। কবির রোগশয্যার দিনগুলির করুণ মধুর এক ইতিহাস আলোচ্য পুস্তকটি। শেষের দিনগুলি এই জগৎবরেণ্য মহাপুরুষের কেমন করে কেটেছিলো সহজ সরল ভাষায় তাই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখিকা। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকেও যে ভোগ করতে হয়েছিল অপরিসীম রোগযাতনা দিনের পর দিন, তার কাহিনী বেদনায় বিধুর করে তোলে অন্তরকে, আবার যখন দেখি, শারীরিক যন্ত্রণা কাতর করলেও আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাঁকে, রোগশয্যায়ই বয়ে চলেছে প্রসন্ন সরসতার প্রাণোচ্ছলতা তখন বিস্ময় জাগে মনে, প্রণাম জানাই এই স্থিতধী মহামানবকে সহস্রবার। গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে মানব রবীন্দ্রনাথের তাঁর এই কালজয়ী রূপটিই গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে। অনাড়ম্বর সুরুচিসম্পন্ন প্রচ্ছদে গ্রন্থটি শোভিত, অঙ্গসজ্জাও যথাযথ। বাইশে শ্রাবণ—নির্মলকুমারী মহলানবিশ। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৫৲ টাকা মাত্র।

রজনীগন্ধা

মঞ্চসফল এই নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর অধুনাতম রচনা, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে কয়েকজন সাহিত্যিক মনোযোগী হয়ে উঠেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী তাঁদেরই অন্যতম; বাংলা নাটককে মঞ্চোপযোগী করে তোলায় সাফল্য তিনি লাভ করেছেন; এ পর্যন্ত যেসব কয়েকটি উৎকৃষ্ট নাটক তিনি রচনা করেছেন, সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার নাট্য-সাহিত্য আর জনপ্রিয়তায় চিহ্নিত হয়েছেন নাট্যকার। আলোচ্য এই নাটকখানিও যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর পূর্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে এ আশা আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি। রজনীগন্ধার চরিত্র মাত্র চারটি একটি নারী ও তিনটি পুরুষ, তিন অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকটির গতিবেগ কোথাও শিথিল হয়ে পড়েনি, স্বচ্ছন্দ সহজ এর ডায়লগ চরিত্রগুলির মুখে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে। কোথাও ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ছাপ পড়েনি আর সেজন্যই সামগ্রিক ভাবে নাটকটি সুপাঠ্য হয়ে উঠেছে। শিল্প-সুষম প্রচ্ছদ এঁকেছেন অজিত গুপ্ত। অপরাপর আঙ্গিক প্রশংসনীয়। আমরা নাটকটির বহুল প্রচার কামনা করি। রজনীগন্ধা—ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য—২.২৫ নঃ পঃ মাত্র।

উত্তর বসন্তে

বর্তমান বাঙলার সার্থকনামা সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইনি নানাভাবে সহায়তা করে আসছেন। বর্তমানে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি উত্তর বসন্তে। গল্পগুলি যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রতিটি গল্পে লেখকের সৃজনীশক্তির স্বাক্ষর বিদ্যমান। সর্বোপরি লেখক জীবনশিল্পী—জীবনকে ইনি নানা কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার ফলে জীবনের এক অপূর্ব অর্থ এঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে—তাঁর গল্পগুলি আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করছে। প্রতিটি গল্পে লেখক আপন রসপিপাসু মনের সমস্ত অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রকাশক—করুণা প্রকাশনী ১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গোত্রান্তর

নাট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের নাম তাঁর ময়াল নাটক নবান্নের সঙ্গে এমনই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে তাঁর নতুন কোন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গোত্রান্তর তাঁরই নতুন প্রকাশিত নাটক এবং মঞ্চাভিনয়ে সাফল্যের গৌরব সে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিখণ্ডিত বাংলার রক্তস্রোতে ভেসে-আসা একটি রিক্ত পরিবারের কাহিনী নিয়ে এই নাটক গড়ে উঠেছে। তারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মালিকের নৃশংসতার চাকায় পিষ্ট চিরকালের সেই অমর শ্রমিকের দল। তথাকথিত ভদ্রলোক হয়ে থেকে নিরুপায় ভাবে সমাজের উচ্চলোকের জীবনের মার না খেয়ে এই শ্রমিকদলের সঙ্গে সংস্কারের ব্যবধানটুকু ঘুচিয়ে ফেলে নিজের জোরে দাঁড়ানোর আদর্শ তুলে ধরেছেন নাট্যকার, দিয়েছেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান। প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় রচিত ডায়লগগুলি নাটকটিতে নতুনত্ব এনেছে। ভূমিকায় নাট্যকারের বহু মূল্যবান বক্তব্য স্থান লাভ করেছে। তবে নাটকটির পরিণতি একাধারে আকস্মিক ও অনিশ্চিত। জীবনের যে জয়গানের কথা বলেছেন নাট্যকার, ঘটনার মাধ্যমে তাকে আরও একটু প্রকাশিত করে বলা হলে যেন ভালো হ'ত—দৃষ্টি পেতো পরিষ্কার ও নির্ভর। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্র

অভাববোধ করেন সকলেই, এ নিয়ে আলোচনাও হয় বিস্তর। তবু উন্নতি যতটা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, সর্বদাই অনুভব আমরা করছি যে আরও উন্নতি হওয়া উচিত, আরও সমৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্য এই পথের পথিক—ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বাংলা নাটক নিয়ে কালচার করে চলেছেন, তাঁর এই প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনীয়। প্রকাশক—জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ

সাহিত্যের আসরে নীলকণ্ঠ অপরিচিত নন, আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ, এতে মোট এগারটি গল্প সংকলিত হয়েছে, সাধারণতঃ হাল্কা রম্য-রচনা পারদর্শী হিসাবেই তাঁকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, সেই নীলকণ্ঠ যে একজন সুদক্ষ গাল্পিক তারই স্বাক্ষর বহন করে এনেছে তাঁর এই নবতম রচনা।—গল্পগুলির আঙ্গিক নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লেখক অতি সতর্কতার সঙ্গে কলম চালিয়েছেন যার ফলে গল্পগুলি কোথাও এতটুকু বোরিং হয়ে ওঠেনি, আপন আপন সীমাকে করেনি লঙ্ঘন। বস্তুত এই পরিমিতি জ্ঞানই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় যা অনেক সময়ই থাকে অনুপস্থিত, বর্তমান লেখক সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আর সেজন্যই তাঁর গল্পগুলির পক্ষে প্রকৃত গল্প হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ রুচিসম্মত, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।—একটি অশ্রু দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ নীলকণ্ঠ, প্রকাশক—কল্পনা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲ মাত্র।

যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

আলোচ্য পুস্তকটি একটি কাহিনী প্রধান কাব্য; একটি ছেলে ও একটি মেয়ের চিরন্তন ভালবাসাবাসির খেলাকে মধুর সাবলীল ছন্দে গেঁথেছেন লেখিকা। নবাগত লেখিকা ছদ্মনামের আড়ালে আত্ম-প্রকাশ করেছেন, তাঁর ভাষা সহজ ও সরল হালকা একখানি কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বইটি সাধারণের মনে ধরবে বলেই আমরা আশা করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই কাহিনী কাব্য কিছুদিন পূর্বে 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিসঙ্গত, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল—বিবি, প্রকাশক—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম· সি· সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট-কলিকাতা-১২। দাম—২˚৫০ নঃ পঃ।

পান্থব

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি উপন্যাস, সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত লেখকের মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি আছে তার পরিচয় মেলে তাঁর এই রচনায়, লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল, কোন বড় সমস্যার অবতারণা না করে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটি পাঠকদের খুশী করবে বলেই মনে হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে জটিলতা কম, আমাদের চারপাশে যে মানুষ তাদেরই এক অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন লেখক সহজ ভাবে, ফলে একটি কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে স্বাভাবিক রীতিতেই, আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক সম্বন্ধেও অনুযোগ করার কিছু নাই। পান্থব—সত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ মূল্য—৩˚৫০ নঃ পঃ মাত্র।

জলতরঙ্গ

সাহিত্যিক সাংবাদিক সুনীল ঘোষের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'জলতরঙ্গ,' একটি সাধারণ মেয়ে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ব্যথা বেদনাকে অতিক্রম করে কেমন করে বাঁচবার অবলম্বন খুঁজে পেল কুশলী কলমে লেখক তা বিবৃত করেছেন। প্রথম যৌবনের নিদারুণ আশাভঙ্গের মর্মান্তিক বেদনায় নায়িকা কাজলের ঘটেছিল রুচিবিকার, সর্বনাশা অভিমানে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছিল সে, প্রথম মাতৃত্বের সূচনায় ঘটলো তার অবসান, উচ্ছৃঙ্খল অশান্ত জীবনে নেমে এল সার্থকতার মোহন পরশ, কাজল বেঁচে উঠল নতুন জীবনে আপন মহিমায়, সব অতীত মুছে ফেলে উঠে এল অগ্নিশুদ্ধা চিরন্তনী জননী। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন লেখক গভীর জীবনবোধের অধিকারী আর তারই পরিচয়ে প্রোজ্জ্বল তাঁর এই নবতম সৃষ্টি যে সাহিত্য রসিক পাঠক সমাজে আদৃত হবে, এ আশা করা অসঙ্গত নয়, আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। শোভন প্রচ্ছদ ও অপরাপর আঙ্গিক বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। জলতরঙ্গ—সুনীল ঘোষ, প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৭৲ মাত্র।

মধুচক্র

বহুদিন হতেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মেস-জীবনে অভ্যস্ত, সাহিত্যেও ঘটেছে তার প্রতিফলন স্বাভাবিক রীতিতেই। শরৎচন্দ্রের অমর উপন্যাস চরিত্রহীনের নায়িকারূপে দেখা দিয়ে মেসের ঝি সাবিত্রী চমক লাগিয়েছিল একদিন পাঠক-মানসে, প্রথিতযশা লেখক শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস "মধুচক্র" এই অতি পরিচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনেই লিখিত। সাধারণ একটি মেস, তাতে বাস করেন সাধারণ কয়েকটি মানুষ, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সরসোজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থে। সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি লেখকের স্নিগ্ধ সহৃদয় লেখনীর মাধ্যমে যেন প্রাণ পেয়েছে; সর্বাপেক্ষা যা বিস্ময়কর তা হল, বইটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীভূমিকা বর্জিত, প্রেম বা ভাবাবেগের বিন্দুমাত্র অবতারণা না করেও যে কোন বিষয়বস্তুকে এতটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, একথা আলোচ্য পুস্তকটি পাঠ না করলে বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। গ্রন্থকারকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই; একটি সুপাঠ্য মনোরম রচনা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন, আমরা আশা করি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের প্রতিষ্ঠা ও যশ তাঁর এই নবতম রচনার মাধ্যমে আরও বর্দ্ধিত হবে। অঙ্গসজ্জা যথাযথ, "মধুচক্র" —শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শবরীর প্রতীক্ষা

আইভি রাহা

সেই মেয়েটি বাসষ্টপেজে এসে দাঁড়ালো। বাঁ হাতে বুকের কাছে ক'খানা বই খাতা আর ডান হাতে কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগটা চেপে ধরে।

আয়ত চঞ্চল চোখ দুটি কা'কে যেন খুঁজে ফিরলো। একবার বাঁ হাতে কালো ফিতের বাঁধা ছোট্ট হাতঘড়িটার দিকে তাকালো। কালো সরু ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ দুটি একবার যেন কুঁচকে উঠলো। দাঁত দিয়ে বাঁ দিকের নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে চলতে সুরু করলো।

দু পাও যেতে হোল না, পেছন থেকে একখানা বলিষ্ঠ হাত মেয়েটির কাঁধে এসে পড়লো। মেয়েটি চমকে ফিরে তাকালো। সুন্দর রক্তিম দুটি ঠোঁটে খেলে গেল মিষ্টি হাসির ঝিলিক। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো তা সারা মুখে।

ঘন আর কালো চুলগুলো পেছনে ওল্টানো, কয়েক গোছা এসে পড়েছে প্রশস্ত কপালের ওপর। চোখ দুটিতে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি। সব মিলিয়ে বেশ লাগে দেখতে ছেলেটিকেও।

প্রায় প্রতিদিনই ওদের এমনি সময় এখানে দেখা হয়। তারপর দুজনে কোথায় যেন যায়। কোনদিন দেখি মেয়েটি অপেক্ষা করছে, আবার কোনদিন দেখি ছেলেটি গুণে চলেছে প্রতীক্ষার প্রহর। বহুদূর থেকে ছুটে এসে থেমে পড়া বাসগুলোর দিকে তাকাচ্ছে সতৃষ্ণ নয়নে।

ওরা হয়তো কেউই জানে না, আমি একজন নীরব দর্শক ও সাক্ষী ওদের এই যাত্রায় ও সাক্ষাতের।

আস্তে আস্তে আমাকেও যেন পেয়ে বসলো এক অদ্ভুত নেশায়। বাসষ্টপেজের ঠিক উল্টোদিকে আমার বাড়ী। সামনের ঝুল বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে কাটে আমার প্রতিদিনের বিকাল ও সন্ধ্যার সামান্য অবসরটুকু। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির থেকে এই সময়টুকু আমি চুরি করি। তাই মনে মনে কোথাও আমার হারিয়ে যেতে থাকে না মানা। মুছে যায় বাস্তব, ভুলে যাই নিজের অস্তিত্ব। পাশের টিপয়টার ওপর চায়ের পেয়ালা ধূম উদগীরণ করে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে হতাশ হয়ে হয় নীরব। আনমনে তাকিয়ে থাকি বাইরের দিকে, কি যে দেখি তা আমি নিজেই জানি না।

সামনের বাসষ্টপেজে অনেক লোকের ওঠানামা, আনাগোনা দেখতে দেখতেই একদিন চোখে পড়লো ওদের। প্রথম যেদিন ওদের লক্ষ্য করি সেদিন দেখেছিলাম অপূর্ব এক ছন্দ। যেন দুটি নদীর উচ্ছল ধারা। দুদিক থেকে এসে মেশে।

দুজনে পাশাপাশি চলতে সুরু করে সামনের চওড়া রাস্তাটা ধরে। জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় যায় ওরা এমনি করে। আমার এলোমেলো দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠে ওদের একজনকে দেখতে পেলেই। ওদের জন্ত আমিও এখন প্রতীক্ষা করি, ওদের থেকে সামান্য দূরে বসে নিজের মনে বুনে চলি কল্পনার জাল।

সেদিন বন্ধুর অসুখ শুনে, আরামের বিশ্রামটুকু ত্যাগ করে দাঁড়ালাম এসে বাসষ্টপেজে। আমার বাস আসতে এগিয়ে গেলাম।

—দাঁড়ান, মেয়েছেলে আগে নামতে দিন—

সরে দাঁড়ালাম বাস কণ্ডাক্টরের গম্ভীর কণ্ঠে। বাসে উঠতে গিয়ে থমকে গেলাম। সেই মেয়েটি। বই আর ব্যাগ হাতে।

আমার আর বাসে ওঠা হোল না। ওকে এত কাছে দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। দূর থেকে যা দেখি কাছে এসে দেখলাম এ তার চেয়েও সুন্দর।

সাদা একখানা মাদ্রাজী শাড়ী আর গায়ে সাদা ব্লাউজ। দীর্ঘ রুক্ষ বেণী কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে আরো নীচে। দীঘল সুন্দর চোখ দুটির ওপর এসে পড়েছে একগোছা রুক্ষ চুল। ওর যেন সরিয়ে দেবার কোন আগ্রহই নেই।

মেয়েটির সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করতে লাগলাম ছেলেটির জন্ত। ও এল একটু পরেই। আজ ও পরেছে ধুতি আর ফিকে পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর গলার কাছের দুটি বোতাম খোলা; জানি না সেটা ইচ্ছাকৃত কি না। কিন্তু এতেই যেন ওর পৌরুষ সৌন্দর্য্যটুকু বেশী করে ফুটে উঠেছে। প্রশস্ত বক্ষের সামান্য উন্মুক্ত অংশটুকু পরিচয় দিচ্ছে ওর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের।

চমক ভাঙলো আমার ওদের একটা পার্কের মধ্যে ঢুকতে দেখে। আমিও কখন চলে এসেছি ওদের সঙ্গে খেয়ালই করিনি। একবার মনে হোল ফিরে যাই এবার। কিন্তু পারলাম না। কিসের নেশা যেন জোর করে টেনে নিয়ে চললো আমাকে ওদের পিছনে।

মস্তবড় পার্কটার একটা নির্জন অন্ধকার জায়গা দেখে বসলো দু জনে। ঠিক পাশাপাশি নয়, একটু ঘুরে মুখোমুখি।

আমিও বসলাম সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছন দিকে। সেখান থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম মেয়েটির গলা।

—এমনি করে আমাকে আসতে বলে তোমার কি লাভ হয় বলতো ?

মেয়েটির একটি নরম হাত তুলে নিল নিজের হাতের মুঠোয় ছেলেটি, তারপর থেমে থেমে বললো—তা কি তুমি আজও বোঝনি শবরী ? এতদিনে বুঝলাম মেয়েটির নাম শবরী। ভারি মিষ্টি নাম।

মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় শবরী উত্তর দিল—কি তুমি বুঝতে বল সুব্রত ? এমনি করে দিনের পর দিন সকলের চোখ এড়িয়ে, সকলকে ফাঁকি দিয়ে, দু' ঘণ্টার জন্ত একটু দেখা করা, দুটো কথা বলা; কি প্রয়োজন এর বলতে পার ? কি সুখ পাও তুমি এতে ?

মনে মনে ভাবলাম সকলের চোখই কি এড়াতে পার তোমরা ?

—এ ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে সত্যি কি তোমার ভাল লাগে না শবরী ? এ ছাড়া কি চাও তুমি আমাকে বল।

—কি চাই ? তুমি জান না সুব্রত, কত বিনিদ্র রজনী কাটে আমার দুঃসহ একাকীত্বের যাতনায়। কি গভীর এক অভাব বোধ দিন-রাত আমাকে কুরে কুরে খায়। যে অভাব চোখে দেখা যায় না অথচ বুকে বোঝা যায়। কাঁটার মত বিঁধে থাকে মনে, ফুলের অঙ্কুরের মত ক্ষুদ্র, দৃষ্টির অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম। বই নিয়ে বসলে বইয়ের পাতায় ভেসে ওঠে তোমার মুখ। সব আমার এলোমেলো হয়ে যায়। কিছু ভাল লাগে না আমার সুব্রত ? ইচ্ছে করে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই।

—কিন্তু তুমি তো জান শবরী, তোমাকে নিয়ে কোথাও চলে গিয়ে ঘর বাঁধতে আমি পারবো না। দেখ, বাস কোন উপায়

করতে আমি পারবো না; তার কোন ক্ষতিও করব না।

আমি বুঝলাম না কা'কে সুব্রত ক্ষতি বলছে। এই অন্ধকারে বসেও আমার মনে হোল, সুব্রতর এ ধরণের কথায় শবরীর সুন্দর মুখখানা বোধ হয় লাল হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ ও দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চুপ করে বসে রইলো। কোন কথা বললো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুব্রত শবরীর কাঁধের ওপর একটা আলতো হাত ছুঁইয়ে খুব আস্তে প্রশ্ন করলো—কি হোল শবরী? কথা বলবে না?

এতক্ষণে শবরী মুখ তুললো। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘশ্বাস। কান্না-ভেজা ভারী গলায় বললো—কি বলবো বল? অনেক রাত হোল, চল এবার ফিরি।

—রাগ কোর না লক্ষ্মীটি। আবার দেখা কোর। বল আসবে?

শবরী উঠে দাঁড়ালো। চলতে চলতে যেন অতি কষ্টে বললো—আসবো…।

আমার মনে হোল এই তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করতে শবরীর যেন অনেক পরিশ্রম হোল।

ওরা চলে গেল। কিন্তু উঠতে পারলাম না আমি। অনেক কথা আর কল্পনা উঁকি দিতে লাগলো মনের এদিক-ওদিক থেকে। ওদের ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সব কথা জানবার জন্য মনটা হয়ে রইলো উৎসুক।

ওদের একজনকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়ালাম, বাসষ্টপেজে। সঙ্গে গিয়ে বসলাম পার্কের নির্জ্জন কোণে। ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

আজ যেন মেয়েটিকে বড় বেশী বিমর্ষ মনে হোল। একটু পরেই শুনতে পেলাম মেয়েটির কথা। যেন পাতালের গভীরতম তলদেশ থেকে উঠে এল এ গলার স্বর।

—আজ তোমাকে একটা কথা বলবো সুব্রত! জানি হয়তো শুনে তুমি আঘাত পাবে। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমাকে বলতেই হবে।

মুখটা ফিরিয়ে নিল শবরী। দূরে জলের ধারের আলোটার চার দিকে ঘুরে মরা কালো পোকাটার কাছে পাঠিয়ে দিল ওর সুন্দর চোখের উদাস দৃষ্টি।

আকরানী বিকেল পেরিয়ে তখন নেমেছে ধূসর সন্ধ্যা। ঐ দিকে চেয়ে থেকেই বললো—দেখ এমনি করে তোমার সঙ্গে দেখা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

—শবরী!

সুগভীর আর্ত্তনাদের মত শোনালো সুব্রতর গলা।

—আমাকে ক্ষমা কর সুব্রত! এমনি করে বেশি দিন চলতে পারে না তা তো তোমাকে আগেই বলেছি। আমার মনের চাহিদা আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। এটা হয়তো দু জনের পক্ষেই ক্ষতিকর। এমনি করে বেশী দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব সুব্রত!

—শবরী, তুমি শুধু নিজের দিকটাই ভাবছো। কখনো কি ভেবেছো আমার কি হবে? কেমন করে কাটবে আমার সমস্ত জীবনটা? তুমি হয়তো বলবে—কেন বিয়ে করবো, সংসার হবে, [illegible] দিন কাটবে। কিন্তু তুমি তো জান না শবরী, আমার সুখ, শান্তি আনন্দ সব তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমি কোন দিন আর সুখী হতে পারবো না।

—কেড়ে নেব কেন? বল তুমি কিসে সুখী হবে? আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় নিশ্চয় সুখী করবো তোমাকে।

—তা আর সম্ভব নয় শবরী!

—কেন? কেন সম্ভব নয়?

—আমি তোমাকে একান্ত ভাবে চাই শবরী! তোমাকে পেলে আমি সুখী হই। কিন্তু তা আর হবার নয়। আমাদের মিলনে তোমার বাবা মা দুঃখ পাবেন। জানতো, তোমার বা আমার কারো বাড়ীরই মত নেই আমাদের মিলনে? তাই আমাদের মিলন কেউ ভাল চোখে দেখবে না। আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ ক্ষমা কোরবে না কোনদিন। তারপর আমাদের ভালবাসার সাক্ষী হয়ে যে আসবে, সেই কি আমাদের ক্ষমা কোরবে কোনদিন? বল শবরী, এতে কি তুমি সুখী হবে? শুধু দুজনের জন্ত দুজনের বাঁচা সে তো মরারই নামান্তর।

—আমায় সম্পূর্ণ তুমি পেলে না, মনে করে কোনদিনই আমায় তুমি গ্রহণ করতে পারবে না তা আমি জানি; কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-স্বজনের দোহাই পেড় না। দোষ দিও না অন্যের—

শবরী! আমাকে কি ভাব তুমি? আচ্ছা আজ তোমার কি হয়েছে বলতো? এখন দেখছি আজ না আসলেই তুমি ভাল করতে।

শবরী কিন্তু সুব্রতর কোন কথা শুনেছে বলে মনে হোল না। ও মুখ নীচু করে বলে যেতে লাগলো—আমাকে গ্রহণ করলে তুমি ঠকতে না সুব্রত! তোমাকে আপন করে পেলে তোমার দুটি হাত আমি ভরিয়ে দিতাম আমার ভালবাসায়। রূপ ছিল দেহে, তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যেতে তাই আটকালো না। কত দিনই বা? ফিরতে হোল কুমারীর বেশে। ঢুকলাম কলেজে। সমস্ত রূপ রঙ রস আমার সামনে থেকে মুছে গেল। আগে মা বাবা বলতেন—মেয়ে বড় হচ্ছে বিয়ে দিতে হবে। তারপর সুর পাল্টে বলতে সুরু করলেন এখন এর কি হবে। নিঃশব্দে মেনে নিলাম সবই। কিন্তু সমস্ত সংসারের ওপর মন যেন আমার আস্তে আস্তে বিষিয়ে উঠতে লাগলো। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালে তুমি। হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। সহানুভূতির প্রলেপ পড়লো মনে। জয় করলে বুঝি আমায়। রাতের অন্ধকারে দেখলাম তোমার ছায়া; ঘিরে আছে আমার সমস্ত সত্তা। ভয় পেলাম। পালিয়ে বেড়ালাম। পালিয়ে বেড়ালাম তোমার কাছ থেকে। কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। তোমার ভাবগম্ভীর কথাগুলো সহজ হাসির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম বলে, তুমি একদিন বললে—কেবল উচ্ছল তুমি, কোন গভীরতা নেই। সেদিন কোন জবাব দিতে পারিনি। আজ আমার গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তোমার গভীরতার তল খুঁজতে গিয়ে আমি ঠকে গেছি সুব্রত! তোমার মত স্বর্গীয় প্রেম আমার নয়। আমি মানুষ। আমার মধ্যে কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা সব আছে। তাই হয়তো তোমার মত নিস্পৃহ থাকতে পারি না।…

সুব্রত কথা বললো না। মুখ নীচু করে ঢেলে ঢেলে ঘাসের

ভরা ছিঁড়ছিলো। ওর সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গভীর এক দীর্ঘশ্বাস। শবরীর বুঝি আজ কোন দিকে লক্ষ্য নেই। ও যেন আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে।

একদিন তোমাকে বলেছিলাম সুব্রত! আমি বড় দুর্বল; আমার কাছ থেকে তুমি কখনও সরে থেক না। তাহলে তোমাকে হয়তো হারিয়ে ফেলবো। তোমাকে আমায় ভুলতে দিও না: আপনার করে রেখ, তোমারই থাকবো চিরদিন। তা তুমি পারলে না সুব্রত।

—তোমার সব কথার জবাব দেব আর একদিন শুধু এস শবরী।

আবার আমার আসতে হোল। চেয়ে চেয়ে দেখলাম শবরীর অপরূপ রূপ। শুভ্র বেশ যেন ওর দেহের সঙ্গে মিশে গেছে! এতদিনে আমার মনে হোল ওকে সাদা ছাড়া কখনও কিছু পরতে দেখিনি। অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে বসে রইলো। ফাগুন-শেষের শিশুসন্ধ্যা নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলো রাত্রির অতল অন্ধকারে। নির্জন হয়ে এল চারিদিক।

দুই হাতের তলায় তুলে ধরলো সুব্রত শবরীর সুন্দর মুখখানা। চেয়ে রইলো অপলকে।···একটু সময় এর মৃত্যু।··· হঠাৎ যেন বড় ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো সুব্রত।······শবরী স্তব্ধ, নির্বাক।

—আমাকে ক্ষমা কর শবরী। ভুল করতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে আপনার করে ধরে রাখবার মনের জোর যখন আমার নেই তখন তোমার কোন ক্ষতি করবার অধিকারও আমার নেই।······

তুমি চলে যাও শবরী। তোমাকে ভুলতে আমি কোনদিন পারবো না। কিন্তু অনুরোধ রইলো আমাকে তুমি ভুলে যেও।

অসহ্য বেদনায় কুঞ্চিত হোল শবরীর ঠোঁটের প্রান্ত। পাতলা ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠলো, কি যেন বললো। কিছুই শোনা গেল না। আগতপ্রায় চোখের জল গোপন করতে বুঝি দাঁত দিয়ে সজোরে চেপে ধরলো নীচের ঠোঁটটা। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। ধীরে ধীরে চলতে সুরু করলো। রাস্তার ভীড়ে মিশে গেল ওর দেহটা।

* * * *

একটা 'ডবল ডেকার' বাসের সামনে অনেক ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিসের যেন গোলমাল চারদিকে। ভীড় সরিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভ্যানিটি ব্যাগটা একদিকে ছিটকে পড়েছে·····সাদা শাড়ীখানা আর সাদা নেই।······বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। ফিরতে গিয়ে চোখে পড়লো এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুব্রতর বিহ্বল মূর্ত্তি। ও যেন এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। হয়তো সাহস নেই, এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিল শবরী ওর পরিচিত কেউ বলে। একবার মনে হোল সুব্রতর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সান্ত্বনা দিই ওকে। কিন্তু কি পরিচয় দেব নিজের? ও তো জানে না আমি ওদের অনেক পরিচয় জানি।

অপরিসীম বেদনা মনটাকে পঙ্গু করে দিল কিছুক্ষণের জন্যে। শবরী শুধু চলে গেল না; কেড়ে নিয়ে গেল আমার সন্ধ্যার সামান্য অবসরের সুন্দর মুহূর্ত্তগুলি।

বের্গামোর দুর্গদ্বারে

আলভাত্তর কোয়াসিমদো

ক্লান্ত মোরগের চিৎকার ভেসে আসে
দূর-দূরান্তর হতে প্রাচীরের পাশ বেয়ে
বরফাচ্ছন্ন দুর্গশিখর নিস্তব্ধ।

ছন্দময় জীবনের সেই ধ্বনি
কানে এসে বেজেছিল
হাওয়ায় হাওয়ায় শুনেছ তার
ক্রন্দন, আর ধোঁয়াটে আলোর গায়ে
ঘুমভাঙ্গা পাখীদের কলগান।

নিজের সঙ্গে কথা বলে তুমি আজ
বীতরাগ, নীরব তোমার বাণী তাই আজ
ঘোরে ফেরে সূর্যের চাকার।
ধরা পড়েছে ম্রিয়মাণ হরিণশাবক
ঘুম ভেঙেছে সারসের, নয়া দুনিয়ার প্রতীক
নীরব নিস্পন্দ সারস।

শীতের রাতের চাঁদ ডুবে যায়
পৃথিবীর আদিম চাঁদ;
স্বপ্নস্মৃতি মায়া দিয়ে ঘেরা
নীচে জাগে সনাতন পৃথিবী।

তোমার পরিক্রমার নেই শেষ
তোরণের শিখর হতে
সাইপ্রাস ঝাউবনের পথ আগলে
বিরামহীন তোমার পথ চলা।

সবুজের আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে
জীবনের অনল জ্বালা—
আর সেই শতমান শোক?
সে তো আনন্দেরই আংশিকা
ভিন্ন ভংগিমা।

অনুবাদক—অমলেন্দুপ্রবোধ ঘটক

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভালভ—২ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন ; ম্যাজিক আই ; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের জন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ; টেপ রেকর্ডারের জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারাণ্টি।

৪১৫৲ নীট

স্থানীয় ট্যাক্স স্বতন্ত্র

সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চকচকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দরাবাদ

JWT. GRA 122

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কিন্তু উর্বশীর চিত্রগ্রহণও কোনদিন শেষ হল না। রূপালী পর্দায় বুকে দর্শক সাধারণ উর্বশীর চিত্ররূপ কোনদিন দেখতে পেলেন না, উর্বশীর চিত্ররূপ চিরকালের মতই অসমাপ্ত রয়ে গেল, উর্বশীকে কেন্দ্র করে চিত্র-নির্মাতাদের যত কিছু কল্পনা তা কল্পনাই রয়ে গেল, তা হল না কোনদিন বাস্তবে পরিণত। চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে স্পষ্টই বলছি, আমার একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল যার ফলে উভয় দিকেই এক তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে কে ঠিক আর কে বেঠিক, কে নির্দোষী আর কে দোষী, কার ন্যায় আর কার অন্যায় আমি তার বিচার করতে চাই না, তা ছাড়া সে বিচারের ভারও আমার উপর ন্যস্ত নয়, সে বিচারের আমি বিচারিকা নই।

অন্য প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তখনকার দিনে এ কথা অনেকেরই এখনও স্পষ্টই মনে থাকা উচিত যে চলচ্চিত্র প্রযোজনার অধিকার আরও অনেক বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকানো ছিল। ইচ্ছামত হাতে অর্থ থাকলেই ছবি তোলার উপায় ছিল না। তার বিধি-নিষেধগুলি সন্তোষজনক ভাবে অতিক্রম করতে পারলে তবেই ছবি প্রযোজনার অধিকার পাওয়া যেত। ফিল্ম তখন 'ও, জি, এল' ছিল না, 'ও, জি, এল' কথাটির সঙ্গে অনেকেরই অপরিচয় থাকতে পারে তাঁদের হয়তো জানা নেই এই কথাটির অর্থ বা ফিল্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়; ও, জি, এল কথাটির অর্থ ওপেন জেনারেল লাইসেন্স, এই লাইসেন্স না হলে ফিল্ম পাওয়া যেত না, অর্থের বিনিময়েই ফিল্ম মিলত না। এই লাইসেন্সটিই ছিল ফিল্ম পাবার অধিকারপত্র। সুতরাং এইখানেই একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ইচ্ছে বা অর্থ থাকলেই ছবি তোলা তখন সম্ভবপর ছিল না। তদানীন্তন ভারত সরকার কেবলমাত্র ষ্টুডিও স্বত্বাধিকারীদের এই লাইসেন্স দিয়ে থাকতেন, দেখা যাচ্ছে ষ্টুডিও মালিকরাই কেবল এই লাইসেন্স পাবার অধিকারী ছিলেন তাও পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম; খুব যে একটা প্রচুর পরিমাণের পেতেন তাও তো নয়। ষ্টুডিওর মালিক যাঁরা নন সেই সব প্রযোজকদের পক্ষে ফিল্মের কোটা সংগ্রহ করা সত্যি সেদিন ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, সে এক অত্যন্ত আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা। সে খুব দুরূহ প্রয়াস।

আমার প্রযোজকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি চালালুম আলাপ-আলোচনা, ছবি তুলব বললেই তো তোলা যায় না। অর্থবলই সেখানে সমস্যার একমাত্র পরিপূরক নয়। ঐ তো পরিস্থিতি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় স্থির করা গেল যে আমি মেরিট লাইসেন্স-এর জন্যে আবেদন করব, মেরিট লাইসেন্স পাবার জন্যে আমি যে চেষ্টা করব এবং সেই চেষ্টা যদি ফলবতী হয় তা হ'লে আমার পরবর্তী কার্যসূচী কি হবে, কি করব, আমি সেই লাইসেন্স নিয়ে সেই লাইসেন্সকে আমি কি ভাবে কাজে লাগাব—এ সব প্রশ্নও তখন একে একে মনের মধ্যে জাগতে লাগল। আমি তাঁদের আশ্বাস দিলুম যে আমার চেষ্টা যদি সফল হয় তা হলে আমি নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেই কাজ করব। আমরা একসঙ্গে ছবির প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব, প্রধান কথা যে তাঁদের আমি হতাশ করব না কোন দিক দিয়েই। কারণ তাঁদের নিরাশ করা আমার কোন দিক দিয়েই অভিপ্রেত নয় তবে যদি সত্যি আমি ঐ কোটা পাই তাহলে আমি স্থির করে নিলুম যে সেই কোটায় আমি দৃঢ়ভাবে আসক্ত থাকব, তার প্রতি কোন কারণে কোন দিক দিয়ে যেন আমার অনাসক্তি প্রকাশ না হয়, স্থির করলুম তার কোন বিধান কোন আইনকানুনের কোনদিক দিয়ে অমর্যাদা করব না, সঙ্কল্প করলুম যে এই অভাবনীয় সুযোগকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েই কাজে লাগাব। মনে মনে শপথ করলুম যে এই লাইসেন্স কিছুতেই অন্যকে পয়সার লোভে বিক্রী করব না, কোন প্রলোভনেই পা দেব না সমস্ত প্রলোভনকে আমি যেন হেলায় জয় করতে পারি, ন্যায়ের পথে থাকব, আইন মেনে চলব। অভাবনীয় এই সুযোগকে সৎপথে কাজে লাগাব।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমার সমস্ত কল্পনা রূপ নিল বাস্তবে। আমার সমস্ত স্বপ্ন সফলতার মুখ দেখল, আমার প্রাণপণ প্রচেষ্টা পর্যবসিত হল সার্থকতায়। যে আবেদন করেছিলুম তা গৃহীত হল। আমার আবেদন মঞ্জুর করলেন ভারত সরকার। একটা পরীক্ষা যেন শেষ হল কিন্তু তাতেই অনিশ্চয়তার অবসান হল না, তখন উদ্বিগ্নতা আরও বেড়ে গেল সামনে আরও বিরাট পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আরও প্রচুর শক্তি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। ভারত সরকার আমার দুখানি স্ক্রীপ্টই মঞ্জুর করলেন। এ যথেষ্ট সৌভাগ্যেরই নামান্তর বলে আমি মনে করি। আমার প্রথম স্ক্রীপ্ট 'রিদম্ অফ ভিক্টি'—মহিষাসুর বধকে কেন্দ্র করে রচিত, অর্থাৎ এই স্ক্রীপ্ট গঠিত হয়েছিল পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে, দুষ্টের দমনের কাহিনী, দেবীশক্তির কাছে দৈত্যশক্তির পরাভবের ইতিবৃত্ত, মহাচণ্ডিকার অস্ত্রে মহিষাসুরের বিনষ্টির ইতিকথা। আমাদের দেশে এই কাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পরিচিত, ছেলেবেলা থেকেই এ দেশের ছেলেমেয়েরা এই গল্প শুনে আসেন, গল্পে কথকতায় পুরাণব্যাখ্যায় এই কাহিনী যুগের পর যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে নব নব রূপে ব্যাখ্যাত হয়ে আসে। এই গল্প কখনও পুরানো হয় না,—এ কাহিনী চিরনতুন, এ কাহিনীর সজীবতাকে কালের গ্রাসধর্মী বাহুযুগলে কখনও পারে না স্পর্শ করতে। বাঙালীর পরম আনন্দের পরম আশার পরম আকাঙ্খার মহাপূজার মধ্যেও তো এই কাহিনী মিশে আছে। এ বিষয়েও আশা করি এ দেশে কেউ অবিদিত নন যে বর্তমান দুর্গাপূজোই এই মহাপূজা

অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহিষাসুরের সঙ্গে মহীশূর শক্তির কল্পিতগত বিরাট সাদৃশ্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষণীয়।

অজন্তাকে কেন্দ্র করেও আমার কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল, একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য বিবরণ চিত্র করার জন্যে আমি খুব উৎসাহিতা হয়ে উঠেছিলুম অজন্তাকে অবলম্বন করে বৌদ্ধগল্প পরিবেশন করাই ছিল আমার মূল অভিপ্রায়। এই প্রসঙ্গে আমার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে স্বীকার করি যে এর প্রেরণা আমি পেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। তাঁর অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি 'অভিসারে'র কাহিনী থেকে। অভিসার রবীন্দ্রনাথের একটি বহুল-প্রচারিত কবিতা। শিক্ষিত সমাজে এর সম্বন্ধে অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অধিক বলা বাহুল্য মাত্র যে, আমি শুধু লাইসেন্সই পাইনি সেই সঙ্গে কোডাকও পেয়েছিলুম সেদিন বহু জনের স্নেহে আমি ধন্যা পরিপূর্ণা, আমার দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতিতে আমার শিল্পিজীবন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মধ্যে আমি যেখানে গেছি জনতা আমায় সাদরে গ্রহণ করে আমার প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম করুণার পরিচয় দিয়েছেন হয় তো সেই জন্যেই কোটা এবং কোডাক এই দুটি জিনিষই পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

এভারেষ্টের চিত্রায়ণ

বিস্ময়ের যেন শেষ নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে পুঞ্জীভূত তুষারের স্তূপ। শুভ্রতার অপূর্ব সমারোহ। দিক থেকে দিগন্তরে শুধু যেন বরফের মিছিল। চোখের সামনে রাশি রাশি তুষারকণা। পৃথিবী যে কত নীচে তা যেন কল্পনায় আনা যায় না; মনে হয় পৃথিবীর মাথার উপরের পাঁচিলটা ছুঁয়ে ফেলেছি। একে ঘিরে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই অথচ এর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিধিও খুব বেশী নয়। কল্পনার মধ্যে দিয়ে এই গিরিশৃঙ্গ নানাজনের সামনে নিজেকে নানারূপে মেলে ধরেছে। পুরাণের নানা আখ্যানে আমরা একে পেয়েছি, এর দর্শন মিলেছে অসংখ্য কবির কাব্যে।

এভারেষ্টকে মানুষও চাইল মুঠোর মধ্যে আনতে। পৃথিবীর মধ্যে থেকেও কেন সে মানুষের আওতার বাইরে থাকবে? কেন সে চিরকাল মানুষের কাছে অপরাজেয় থেকে যাবে? মানবশক্তির প্রচেষ্টা নানা ভাবে রূপ নিতে থাকে, কত মানুষ এগিয়ে এল, কত দল এল, কত অভিযাত্রী-সঙ্ঘ এল, কেউই হল না সফলকাম, কেউ ফিরে এল ব্যর্থতার চিহ্ন ললাটে লেপন করে, কেউ বা আর কোনও দিনই ফিরে এল না, পাহাড়ের বুকে তারা যে কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তার হদিশ খুঁজে বার করতে পারল না কেউ।

কত কাল ধরে এই প্রচেষ্টা চলতে থাকে, এত বাধা, এত বিপত্তি, এত বিপর্যয় মানুষের অদম্য আকাঙ্খাকে কিন্তু টলাতে পারল না। অবশেষে ১৯৫৩ সালের জুন মাসে সারা পৃথিবী একদিন অত্যন্ত আনন্দোদ্ভূত বিস্ময়ে শুনল, এভারেষ্ট আর মানুষের নাগালের বাইরে নেই, শুনল এত আত্মত্যাগের, দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার, যুগ-যুগব্যাপী প্রস্তুতির ফল ফলেছে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরের বুকের উপর পা দিয়ে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে।

তেনজিং, হিলারী, হান্ট-এর নাম এই উপলক্ষে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি, ঘোষিত হল তাদের নাম, ইতিহাসের পাতায় অমরত্বের দাবী তাদের স্বীকৃত হল। এই তিনজনকে নিয়ে সারা জগতে আলোড়ন উঠল, ঠিক এই প্রসঙ্গেই আজ মনে পড়ছে আর একজনের কথা—এই উপলক্ষে তাঁর নামও চিরকাল অমর হয়ে থাকবে, এ ব্যাপারে তাঁর অবদানও কম নয়—তিনি চিত্রকর টম ষ্টোবার্ট। হান্ট, হিলারী, তেনজিং বিবৃতি দিতে লাগলেন কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল, এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস, চির-অজানার বুকের উপর লুকিয়ে রয়েছে, কোন্ সাত রাজার ধন মাণিক তার চমকপ্রদ বিবরণ পৃথিবীর মানুষ শুনতে পেল ভাষণে, বিবৃতিতে, লিপিবদ্ধ দেখল কাগজে-কলমে, কিন্তু চোখের সামনের ছবি জিনিষটিকে যে ভাবে জীবন্ত করে তুলতে পারে বিবৃতি বা বেতার ভাষণ তেমনটি কখনো পারে না—মানুষের সেই কৌতূহল মেটালেন ষ্টোবার্ট। সমগ্র হিমশীর্ষকে জগতের পুরুষ জগতের নারী, জগতের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, জগতের বালক-বালিকা চোখের

নতুন নিমাই ছবির নায়িকা সবিতা বসু। আলোকচিত্র—দেবেন মিত্র

সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পেল ষ্টোবার্টের কল্যাণে। এঁরা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্তোলন করে এলেন পতাকা, ষ্টোবার্ট সমগ্র অভিযানটিকে ধরে রাখলেন তাঁর ক্যামেরায়।

১৯৫১ সালের কথা। প্রখ্যাত পর্বতারোহী এরিক শিপটন ব্রিটেনে ফিরে এসে জানালেন যে এভারেষ্টে যাওয়ার একটি সহজ পথ খুঁজে পাওয়া গেছে, দক্ষিণ দিক ধরে যাত্রা শুরু করলে স্বপ্ন সফল হতে পারে। শিপটনের প্রস্তাব লুফে নেওয়া হল, ঠিক হল ১৯৫৩ সালে যাত্রা শুরু হবে। কার্ন্ ট্রিম্যান ফিল্মসও চুপ করে বসে থাকার পাত্র নন, অভিযানটির চিত্রায়ণের ভার নিলেন তাঁরা, সব তো হল, চিত্রকর কে হবেন, এই দুরূহ অধ্যায়টিকে চিত্রে রূপ দেবেন কোন শক্তিধর, জীবনমরণকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে দ্বিধাহীন চিত্তে এগিয়ে যেতে পারেন কোন্ অসমসাহসী? নির্বাচিত হলেন টম ষ্টোবার্ট। সেদিন তাঁর বয়স চল্লিশ। ডার্লিংটনে এঁর জন্ম। বাবাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট পর্বতারোহী। ষ্টোবার্টের মনে পড়ে তাঁর যখন আট বছর বয়স তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে একবার পাহাড়ে টেনে তোলা হয়েছিল, জীবনে সেই তাঁর প্রথম পর্বতারোহণ। পরবর্তীকালে অবশ্য বহুবার তিনি পর্বতারোহণে অংশ নিয়েছেন (মধ্য-আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়) হিমালয়ের চলচ্চিত্রও তিনি গ্রহণ করেছেন ১৯৪৬ সালে।

যাত্রার দিন এগিয়ে আসছে। ষ্টোবার্ট অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হল তাঁকে, বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা শঙ্কা প্রকাশ করলেন। রোগীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তাই তাঁরা পোষণ করলেন। অনেক সেবা-শুশ্রূষা পরিচর্যার পর অভিযাত্রীদলের নিযুক্ত চিকিৎসক ... হঠাৎ হর্ষজনক একটি সংবাদ ঘোষণা করলেন। ষ্টোবার্টের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ নেই, তিনি সেরে উঠছেন এবং নির্দ্ধারিত দিনেই তিনি অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। হাতে যেন স্বর্গ পেল সবাই।

অসুস্থ অবস্থাতেও ষ্টোবার্ট নানাভাবে চিন্তা করেছেন এই ব্যাপারে, তাঁর ওয়ার্ডে এই সম্পর্কে লোকের আনাগোনার বিরতি ছিল না। সময়ে সময়ে বড় বড় জরুরী অধিবেশনও বসিয়েছেন তিনি, নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন, একাধিক নির্দ্দেশাদি দিয়েছেন। ছটি ক্যামেরাও সঙ্গে নেবার জন্যে ঠিক করা হল।

যাত্রা শুরু হল।

দিনে এবং রাতে নানাভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, এই তাপমাত্রার ক্রমপরিবর্তন অনেকখানি অস্থির করে তোলে যাত্রীদের, কখন কোথায় কি ভাবে তাপমাত্রা দেখা দেবে, এই চিন্তাতেই যাত্রীদল অস্থির-চিত্ত। অভিযানের পূর্বে ক্যামেরাগুলিকে কার্ণবারার একটি কোল্ড চেম্বারে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। তাপমাত্রার সঙ্গে তাল রেখে ওজনের প্রশ্ন দেখা দেয় হাল্কাধাতে বিশেষ ধরণের ত্রিপায়া তৈরী করানো হল, বরফের চাই অনেক সময়ে এই কাজে লাগত। ওজন এক সময়ে বিরাট সমস্যার রূপ নিল, এঁদের সমস্ত মালপত্রের সমষ্টিগত ওজন ছিল তিরিশ পাউণ্ড। পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে কেবলমাত্র সাড়ে চার পাউণ্ড ওজনের সিনি ক্যামেরা বহন করা এঁদের পক্ষে প্রাণান্তকর অধ্যায়ে পরিণত হল। ষ্টোবার্ট কেবলমাত্র একটি জায়গায় ক্যামেরার হাতল ঘোরান নি, একেবারে চূড়ান্ত পর্যটির। চূড়ান্ত পর্বতারোহণের সাক্ষ্য রেখে একমাত্র হিলারীর তোলা তেনজিং-এর স্থিরচিত্রটি।

ছবি তোলার সময়ে ষ্টোবার্টকে দুহাতে মোটা মোটা দস্তানা পরতে হোত ক্যামেরার ধাতব অংশগুলি আষ্টেপৃষ্ঠে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হোত। না হলে যে কোন সময়ে বরফের আক্রমণে তাদের বিনষ্টির সম্ভাবনা ছিল।

এর পর রঙের প্রশ্ন। পাহাড়ে রঙ সম্বন্ধেও সমস্যার অন্ত নেই। দলের প্রত্যেকে পরিধানে ঘন নীল রঙ ব্যবহার করতেন। জনৈক সাংবাদিককে ষ্টোবার্ট বলেছেন—when filming in the snow, your exposures have to be considerably reduced. পর্বতে চিত্রায়ণ সম্পর্কে ষ্টোবার্টের এই অভিমত বিশেষ মূল্যই বহন করে।

কুড়ি দিনের অভিযানে ছবি তোলার কাজ গোড়ার দিকে সন্তোষজনক ভাবেই এগিয়ে চলছিল। আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুটের মধ্যে যখন তাঁরা সেই সময় গভীর বিপদের তাঁরা সম্মুখীন পথসন্ধান, বাতাস, ওজন সব দিক দিয়েই তাঁরা তখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, পরে যত উঁচুতে তাঁরা উঠছেন চিত্রায়ণ তত সমস্যার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, শেষে এমন দাঁড়াল যে সারা দিনে মাত্র একশো ফুটের বেশী ছবি তোলা যেত না।

সবচেয়ে মুস্কিলে ষ্টোবার্টকে পড়তে হয়েছিল একবার চিত্রায়ণের সময়ে হঠাৎ কি কারণে যেন চোখের কালো চশমা তিনি খুলে ফেলেছিলেন। ব্যস্ এক কথায় যাকে বলে "বরকান্ড" শুধু শাদা। ষ্টোবার্টের প্রায় অন্ধ হবার উপক্রম, সমগ্র ইন্দ্রিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি সে কষ্টের তীব্রতার ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। ভাবলেন হয়তো এরই নাম মৃত্যু, বেশ খানিকক্ষণ পরে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ফিরে এলেন ষ্টোবার্ট।

তেনজিং হিলারী হান্ট-এর প্রশংসায় পৃথিবী পঞ্চমুখ। এ ব্যাপারে ষ্টোবার্ট, তোমার অবদানও সমউল্লেখ্য। আপন জীবনকে তুষিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়ে সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হয়েছ, বীর ষ্টোবার্ট, তোমার সাহসের, তোমার নির্ভীকতার, তোমার কুশলতার তুলনা নেই। ভারতবর্ষ তোমাকে তার প্রীতির অর্ঘ নিবেদন করছে।

জিনা লোলোব্রিজিডার প্রসঙ্গে

বিশ্বসভ্যতার অন্যতম জন্মভূমি রোম। সেদিন রোমের শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব প্রায় সারা জগতকে তার ছত্রতলে উপনীত করেছিল। দু হাজার বছর আগে রোমের প্রভাব সারা ইয়োরোপকে সেদিন নতুন রূপ দিয়েছিল, নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, দিয়েছিল নতুন জীবন। সেই রোম ইতালির রাজধানী। রোম, নেপলস্, ভিনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতিকে নিয়ে ইতালি। সেই ইতালির মেয়ে জিনা লোলোব্রিজিডা। বিংশ শতাব্দীর মেয়ে। পৃথিবীর মধ্যে অভিনেত্রী হিসেবে বিরাট জনপ্রিয়তার অধিকারিণী। রোমীয় সৌন্দর্যের একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে জিনার জন্ম। ১৯২৮ সালের ৪ঠা জুলাই এই মেয়েটি পৃথিবীর আলোক প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

মেয়ে তো নয় যেন একটি বিদ্যুদ্দীপ্তি, যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যেন একটি বহ্নিশিখা। সৌন্দর্য সেইখানেই সার্থক, যেখানে রূপশিল্পী

মধ্যে সমান পরিমাণে মিশে থাকে ব্যক্তিত্ব—জিনার সৌন্দর্য সেই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় সম্পূর্ণ সার্থক। জিনার মধ্যে শুধু রূপের গরিমাই দেখতে পাবেন না, দেখবেন তার মধ্যে মিশে আছে এক অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। ঘন চুল, বড় বড় টানা টানা চোখ প্রশান্ত গাম্ভীর্যে ভরা অবয়ব, জিনাকে করে তুলেছে অপরূপ রূপসী।

রোমের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে জিনা। পথরোধ করল একজন। এক অপরিচিত। স্পষ্ট ভাষায় বিনা ভূমিকায় জিনাকে বললে—ছবির জগতে তোমায় আসতেই হবে, ক্যামেরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, বল তুমি আসবে। কে এই অপরিচিত? এক সুপরিচিত প্রযোজক। ছায়াছবির জগতে জিনার আবির্ভাবের এই প্রথম ইতিহাস। "লাভ অফ এ ক্লাউন" ছবিটি জিনার নাম ছড়িয়ে দিল দিক থেকে দিগন্তরে। সলোমন য্যাণ্ড সেবা, নেভার সো ফিউ, লেডি এল, গো নেকেড ইন দি ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি ছবিগুলি জিনার অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

মুস্কিল কোথায় জানেন, মুস্কিল তার সঙ্গে কথা বলায়। ইংরিজী সে জানে না বললেই চলে, অতি সামান্ত অধিকার তার ইংরিজী ভাষায়—বড় জোর—হাও ডু ইউ ডু, কিংবা গুড বাই অবধি—বাস, তার বেশী নয়। অভিনয় করতে জিনা কেন ভালবাসে—এই প্রশ্ন তার সামনে তুলে ধরলেন জনৈক সাংবাদিক—জিনার উত্তর এল ফরাসী ভাষায়—অভিনয়ের মধ্যেই আমি জীবনের আনন্দকে খুঁজে পাই, আমি ভ্রমণ করতে ভালবাসি, ভালবাসি মানুষের সঙ্গে মিশতে, আমার এই দুটি প্রধান বাসনা পূর্ণ হয়েছে এ জগতে যোগ দিয়ে। সাংবাদিকের পরবর্তী প্রশ্ন—তুমি আর কি করতে চাও···জিনার উত্তর—খুব তাড়াতাড়ি অবসর নিতে চাই—আর চাই এমন একটি বাড়ীতে থাকি যেখান থেকে পাহাড় আর সমুদ্র দুই-ই আমি একসঙ্গে দেখতে পাই।

কিন্তু অভিনেত্রী হবার সখ জিনার ছিল না, সখ ছিল শিল্পী হবার, রোমে থেকে কিছুদিন সে ছবি আঁকা শিক্ষাও করল তারপর হঠাৎ এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সে মিস্ রোমে পরিণত হল ১৯৪৬ সালে। রেজি ফ্রেয়ার, ব্লাসেত্তি, ক্রিশ্চীয়ান জ্যাক, ভাসারোত্তি প্রমুখ বিখ্যাত পরিচালকের অধীনে কাজ করার সৌভাগ্য জিনার হয়েছে! জিনার মনে এখন যে ইচ্ছাটি সব চেয়ে প্রবল সেটি হল স্যার লরেন্স অলিভিয়ারের সঙ্গে অভিনয় করার।

ইতালির মেয়ে জিনা, বিয়ে করল যুগোশ্লাভের ছেলেকে—পেশায় চিকিৎসক, নাম—মিলকো স্কফিক। বেশ আমুদে ভদ্রলোক; হাস্যপরিহাসপ্রিয়, তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে এখন মিলকো ও জিনা দুজনেই বিভোর।

মিকি মুষিকের গল্প

মিকি মাউসকে চেনেন না, মিকি মাউসের কথা শোনেননি, মিকি মাউসের ছবি দেখেননি ছায়াছবির জগতে এমন দর্শক বিরল। নেই বললেই চলে। কোন একটি বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমায় মিকি আজ আবদ্ধ নয়। সারা পৃথিবীতে আজ তার সমান গতিবিধি বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার অপ্রতিহত আনাগোনা, জনপ্রিয়তায় প্রতিটি মানুষের কাছে প্রতিটি শিশুর কাছে তার কল্পনাতীত সমান সমাদর। মিকি মাউসের কথা আজ নতুন করে কিছু বলার নেই তবে তার উৎপত্তির ইতিহাসও কখনও পুরোনো হবার নয়। সেই ইতিবৃত্তে নতুনত্বের স্পর্শ কখনও মুছবে না, সে কাহিনী বিস্ময়ে ভরা, অভিনবত্বে ভরপুর।

এই বিস্ময়ের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিসনী, আর বিস্ময়ের সৃষ্টি আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে। ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মের সময়ে ডিসনী নিউ ইয়র্কে এলেন তাঁর অসওয়াল্ড কার্টুনের জন্যে একটা পাকা এবং উন্নততর ব্যবস্থা করতে। নিরাশ হলেন ডিসনী, স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে—হলেন বঞ্চিত। কপিরাইট তাঁর ছিল না, তাই অসওয়াল্ডকে হারালেন তিনি, ট্রেণে ফিরছেন ডিসনী। ফিরে আসছেন লস এ্যাঞ্জেলসে। তখনকার দিনে নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ট্রেণে পৌঁছতে চার দিন সময় লাগত। ভাববার, চিন্তা করবার, কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ মিলত। কিছুদিন ড্রাফটসম্যান হিসেবে শিক্ষানবীশি করেছেন ডিসনী। সেই সময় একবার ইঁদুরের এক জনতার দৃশ্য তাঁকে আঁকতে হয়। চকিতে মনে পড়ে যায় সেই কথা, দেখতে দেখতে সেই গণেশ বাহনের চিন্তা তাঁর সমস্ত মস্তিষ্কে অধিকার বিস্তার করল, সেই চিন্তায় তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন সঙ্কল্প করলেন এই মুষিককেই অবলম্বন করে নির্মিত হবে তাঁর ভবিষ্যতের জীবনযাত্রার চলার পথ। একটি নাম চাই। স্ত্রী লিলিয়ানকে দিলেন নামকরণের ভার। নিজেও একটি ঠিক করলেন—মর্টিমার, মাউসের আত্মাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখাই ছিল ডিসনীর অভিপ্রায়। কিন্তু মর্টিমার নামে বাদ সাধলেন লিলিয়ান। স্ত্রীর কাছে এগিয়ে ডিসনী কি যেন বলতে চান আরও একটি

"হাসপাতাল"-এর একটি ভূমিকায় কমলা মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র—হেমেন মিত্র
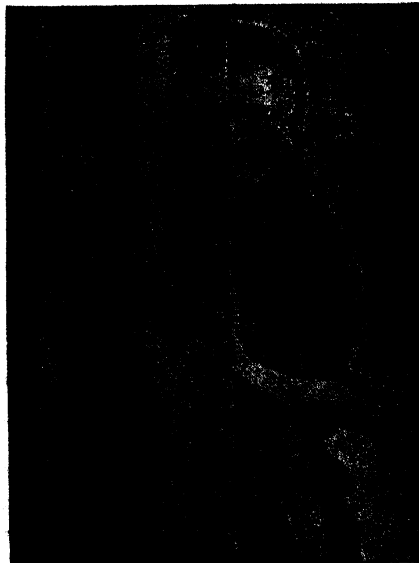
নাম তাঁর মনে এসেছে ভয় হয় লিলিয়ান যদি এটিও বাতিল করে দেয় তবু বলে ফেলেন—আচ্ছা মিকি নামটা কি রকম হয়—অপূর্ব চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লিলিয়ানের। পরিতৃপ্তির চিহ্ন তখন লিলিয়ানের সারা অবয়বে, ডিসনীরও। মিকি মাউসের জন্ম হল।

মিকি মাউসকে নিয়ে প্রথম যে ছবি ডিসনী তুললেন তার নাম দিলেন—প্লেন ক্রেজি। দশজন কর্মীকে নিয়ে ও ডিসনী এই রকম আরও তিনখানি ছবি তুললেন। বাড়ী বাঁধা পড়ল ডিসনীর বিকিয়ে গেল তাঁর মোটরযান। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ডিসনীর পক্ষে আর একটি মোটরযান অধিকারভুক্ত করা সম্ভবপর হয়নি। পরিবেশকদের কাছে বিক্রী করতে গেলেন ডিসনী তাঁর ছবি। ডিসনীর ভাগ্যলক্ষ্মী তখনও করুণা-প্রসন্ন হাসিটি নিক্ষেপ করেন নি ডিসনীর প্রতি। মিকি মাউস যে একদিন সারা জগতকে টলিয়ে দেবে এ চিন্তা করতে পারেন নি সেদিনকার চিত্রব্যবসায়ীর দল। ছায়াছবিতে তখন শব্দযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণ্যে ডিসনীর প্রথম যে ছবিটি প্রদর্শিত হল তার নাম ষ্টিমবোট উইলি, চিত্রব্যবসায়ীরা সর্বস্ব গ্রাস করতে চাইলেন—ডিসনী জবাব দিলেন—আমার ছবিকেই বেচতে চাই আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে, আমার কল্পনাকে আমার চিন্তাধারাকে নয়। মিকি মাউসের গোড়ার দিকের এই ইতিহাস আর এই বাধার মধ্যে দিয়েই এইভাবে সেদিন চলতে হয়েছে ডিসনীকে।

ডিসনীর প্রথম চারখানি ছবির নির্মাণ করায় খরচ পড়েছিল একেকখানি ছবিতে দু' হাজার ডলার করে। তাঁর শেষ পূর্ণ দৈর্ঘ্য কার্টুনটির তৈরী করায় খরচ হয়েছে সাড়ে তিন মিলিয়ান ডলার।

মিকি মাউসের কণ্ঠকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছে এক অপূর্ব কাহিনী। নিখুঁৎ গলাটি আনবার জন্যে ডিসনীর চেষ্টার অন্ত নেই। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অসংখ্য শিল্পীরা আসছেন, পরীক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু কোনটিই মনোমত হয় না ডিসনীর, তিনি যেমন গলাটি দিচ্ছেন সেই গলা আর কারোর মধ্যে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘরে প্রায়ই বসে থাকে ডিসনীর ভাই রয় ডিসনী। তিনিই বলে উঠলেন—অন্য লোকের গলায় প্রয়োজন কি তুমি নিজেই গলা দাও না, বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল ঘরের মধ্যে ডিসনী ভাবলেন সত্যিই তো প্রস্তাবটি তো গ্রহণযোগ্য। তথাস্তু। সেই থেকে ডিসনী নিজেই গলা দিতে থাকেন। হাজার হাজার অনুরাগী মিকি মাউসের আছে সারা বিশ্ব জুড়ে। "মিকি মাউস য্যামেরিকা" বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে এই ঠিকানায় চিঠি দিলে তা ঠিক যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবে। শৈশবে এবং বাল্যকালে মিকি মাউস নিয়ে যাঁরা খেলা করতেন, মিকি মাউস প্লেটে যারা সাপার খেতেন তাঁদের অনেকের মধ্যে দুটি নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটি বোন এঁরা। দু'বোনেই বিশ্বব্যক্তিত্বের অধিকারিণী রাণী এলিজাবেথ এবং যুবরাজ্ঞী মার্গারেট। ব্যবসাদার হিসেবে এ জগতে ডিসনীর আগমন। হঠাৎ কোন পুণ্য প্রভাতে ব্যবসাদারের খোলস থেকে শিল্পী সত্তার প্রকাশ ঘটল ডিসনী নিজেও বোধহয় তা বুঝতে পারেন নি। আজকের পৃথিবীর নরনারী প্রয়োজনবোধ করেনা ব্যবসাদার ডিসনীর খবর রাখতে কিন্তু শিল্পী ডিসনীর সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। ভবিষ্যতের নরনারীর মুখে মুখে শিল্পী ডিসনীই বেঁচে থাকবেন। অনিত্য পৃথিবীর বুক থেকে ডিসনী একদিন বিদায় নেবেন ঠিকই কিন্তু থেকে যাবে তাঁর মিকি মাউস, থেকে যাবে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি, থেকে যাবে তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠ, যেগুলি তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শন।

ক্ষুধা ও ইন্দ্রধনু

বর্তমানে যে ক'খানি বাঙলা ছবি শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে তার মধ্যে নতুন মুক্তি লাভ করেছে দুখানি ছবি—ক্ষুধা ও ইন্দ্রধনু।

ক্ষুধার গল্পাংশের সঙ্গে অপরিচয় দর্শকসাধারণের নেই, দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটি যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। নাটকটির রচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্য। ছবিতে সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। পঞ্চমিত্রের পরিচালনায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বসন্ত চৌধুরী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ, গোপাল মজুমদার, তুলসী চক্রবর্তী, ডাঃ হরেন, শ্রীমান দীপক, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এর একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা দিয়েছেন বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র।

ইন্দ্রধনুর ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন দীপক বসু। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, জীবেন বসু, অমর মল্লিক, জহর রায়, ডাঃ হরেন, চন্দ্রা দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, গীতা সিংহ প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ-বিচিত্রা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বন করে পাঁচ হাজার ফুট দীর্ঘ একটি প্রামাণ্য চিত্রনির্মাণে শ্রীসত্যজিৎ রায় বর্তমানে ব্যস্ত। এর সুরসৃষ্টির দায়িত্ব শ্রীরায় নিজেই গ্রহণ করেছেন। ছবিটিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতও শোনা যাবে।

বাঙলার শক্তিময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার্স য্যাসোসিয়েশান কর্তৃক সম্বর্ধিতা হয়েছেন। এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীবলরাজ সাহনী তাঁর বক্তৃতায় শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিপূর্ণ প্রীতি নিবেদন করে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে একটি উপভোগ্য আলোচনা করেন। মালায়ালাম ছবি 'উম্মা'র প্রদর্শনীর পঞ্চাশ রজনী পূর্ণ হওয়ায় চিত্রনির্মাতাদের দল দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে দিনটি উদযাপিত করেন। সৌন্দর্যময়ী ইতালিয় অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ষ্টার্লিংস অলংকারাদি অপহৃত হয়েছে। তাঁর প্রযোজক স্বামীর সঙ্গে লণ্ডন বিমানঘাটিতে তিনি যখন দেখা করতে যান তখন এই কাণ্ড ঘটে। আটাশ বছর বয়স্কা সোফিয়াকে স্বভাবতঃই এই ঘটনা বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছে।

উনিশ বছর দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর স্যার লরেন্স অলিভিয়ার (৫২) ও ভিভিয়ান লিঘ (৪৭) বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়েছে। শোনা যাচ্ছে যে স্যার লরেন্স বর্তমানে অভিনেত্রী জোন প্লোরাইট (৩২) এর পাণিপ্রার্থী আর সেই জন্যেই নাকি এই বিচ্ছেদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভিভিয়েন ভারতবর্ষের দার্জিলিংএ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সমগ্র বাল্যকাল কলকাতায় অতিবাহিত করেন।
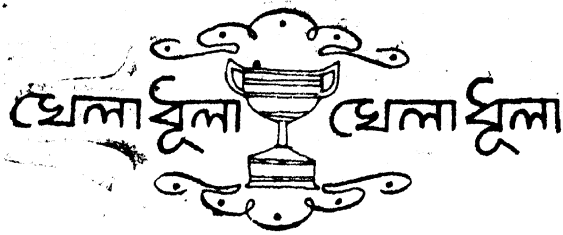
কলিকাতার ফুটবল ইতিহাসে নূতন নজীর সৃষ্টি

কত বিচিত্র এই কলকাতার ফুটবল মাঠ। এখানে কত ঘটনাই যে ঘটে তার ইয়ত্তা নেই। এবার কিন্তু ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন নজীর সৃষ্টি হয়েছে। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাকে কেন্দ্র করে মহমেডান দলের সভ্য ও সমর্থক মহলে যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তার চরম প্রকাশ পায় মহমেডান ও উয়াড়ীর খেলায়। এইদিন ক্যালকাটা মাঠে মহমেডান দলের সভ্য ও সমর্থকরা একযোগে খেলাটিকে সম্পূর্ণ "বয়কট" করেন। তাঁদের কিছু সংখ্যক সভ্য ও সমর্থক ক্যালকাটা মাঠের বিভিন্ন প্রবেশপথে "সত্যাগ্রহ" শুরু করেন। পুলিশ বাহিনী এসে হটাইয়া দিলে তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবে খেলাটিকে বর্জন করেন। সভ্যদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শূন্য থাকে। কিন্তু দৈনিক টিকিটের আসনগুলিতে সামান্য কিছু দর্শক উপস্থিত থাকলেও তার ভেতর কোন মহমেডান দলের সমর্থক ছিল কিনা বলা শক্ত। "সত্যাগ্রহ" এরূপ সুসংগঠিত ভাবে সাফল্য লাভ করে যে পুলিশ বাহিনীকে শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি নিষ্ক্রিয় অবস্থায়ই সময় অতিবাহিত করতে হয়। কলকাতার দীর্ঘ ফুটবল ইতিহাসে সভ্য ও সমর্থকদের খেলা বর্জনের এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। মহমেডান দলের সভ্য ও সমর্থকরা নাকি তাঁদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। দেখা যাক এই পরিস্থিতির শেষ কোথায়।

কলিকাতায় "বদলী খেলোয়াড়" প্রথা প্রবর্ত্তন

শনিবার ১১ই জুন কলিকাতার ফুটবল ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। এই দিন থেকে আই, এফ, এ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় 'বদলী খেলোয়াড়' প্রথা প্রবর্ত্তন হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত কেবল অন্তর্জাতিক খেলায় এই নিয়মটি প্রযোজ্য আছে। তবে সম্প্রতি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এই নিয়মটি ভারতে চালু করার সিদ্ধান্ত করে।

প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুযায়ী খেলার সময় প্রতিযোগী দলের গোলরক্ষক আহত হ'য়ে রেফারীর অনুমোদন সাপেক্ষ যে কোন সময়ে নতুন গোলরক্ষক তাঁর স্থানে খেলতে পারবেন। ইহা ব্যতীত প্রতিযোগী কোন দলের অপর কোন খেলোয়াড় যদি আহত হন—তাঁর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র প্রথমার্দ্ধেই নতুন খেলোয়াড় যোগদান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্দ্ধে কোন "বদলী খেলোয়াড়" নওয়া চলবে না।

আবার কলিকাতায় ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

গত কয়েক বছর ধরে ফুটবল মরশুম শুরু হলেই কলকাতায় ফুটবল ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। প্রতিবারই আলাপ-আলোচনার অন্ত থাকে না। সব দেখে-শুনে মনে হয় যে কলকাতায় ফুটবল ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গের উপর যবনিকাপাত হ'ল। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এই বিষটি যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে গেছে। এবার অবশ্য ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ সম্পর্কে একটা মুখরোচক খবর প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতার ময়দানে ফুটবল ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ সম্পর্কে পরামর্শ ও নক্সা রচনা করার জন্যই ইতালিয়ান স্থপতি সিনর আনিবেল ভিট্টোলজি কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ষ্টেডিয়ামের জন্য নির্দ্দিষ্ট "এলেনবরো কোর্স" পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত ষ্টেডিয়ামের নক্সা ও উহা কিসের অনুকরণে নির্ম্মিত হবে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশ্য এই আলোচনা একেবারে প্রাথমিক পর্য্যায়ে হয়।

প্রস্তাবিত ষ্টেডিয়ামে ষাট হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে এইরূপ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে নব্বুই হাজার দর্শকের সংকুলনও যাতে হয় তারও ব্যবস্থা হতে পারে। গাড়ী রাখার জায়গা, দর্শকদের তাড়াতাড়ি আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা ও আরও কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও আলোচনা চলে।

জানা গিয়েছে যে, ডাঃ রায়ের মনে আরও একটা ষ্টেডিয়ামের পরিকল্পনা আছে। ক্যালকাটা মাঠ অথবা মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল মাঠে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শক সঙ্কুলান হতে পারে এইরূপ একটা নকশা তিনি আই, এফ, এর সম্পাদককে পেশ করতে বলেছেন।

ইতালিয়ান স্থপতি সিনর আনিবেল ভিট্টোলজি সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন। এই নক্সা রচনা নিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে প্রকাশ। ভিট্টোলজি আবার কলকাতায় আসবেন। খবরটা বেশ গালভরা। দেখা যাক, আর কতদিন কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের ষ্টেডিয়ামের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

ইংলণ্ড প্রথম টেষ্টে জয়ী

ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম টেষ্ট খেলাটি সম্প্রতি এজবাষ্টন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই খেলায় ইংলণ্ড ১০০ রাণে জয়ী হয়। খেলার শেষের দিকটা বেশ জমে উঠেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড দলের টুয়্যান, ষ্ট্যাথাম ও ইন্সিংওয়ার্থ প্রশংসনীয়ভাবে বোলিং করেন।

রাণ সংখ্যা

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ২১২ (মুরা রাও ৫৩, পিথ ৫৪, তেজটার ৪২; এ্যাডকক ৬২ রাণে ৬ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১ম ইনিংস ১৮৬ (ওয়েট ৫৮, ওমীল ৫২; টুয়্যান ৫৮ রাণে ৪ উইঃ, ইন্সিংওয়ার্থ ১৫ রাণে ৩ উইঃ ও ষ্ট্যাথাম ৩১ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২০৩ (ওয়াকার ৩৭, স্বরো রাও ৩২, শিখ ২৮, ভেঙ্কটার ২৬, টুয়্যান ২৫ ; টেফিল্ড ৬২ রানে ৪ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২য় ইনিংস ২০১ (ম্যাকলীন ৬৮, ওয়েট নট আউট ৫৩ ; টুয়্যান ৫৮ রানে ৩ উইঃ, ষ্ট্যাথাম ৪১ রানে ৩ উইঃ ও ইনিংওয়ার্থ ৫৭ রানে ৩ উইঃ)।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠিত

রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক বিশ্ব বিজয়ী হকি দলের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রীড়া-জগতে যে জল্পনা-কল্পনা চলছিল তার অবসান হয়েছে। ভারতীয় দলটি চূড়ান্তভাবে গঠিত হয়েছে। তবে ২১জন খেলোয়াড় মনোনয়ন করা হয়। শিক্ষা শিবিরে যোগদানের পর একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়ার কথা ছিল। কারণ ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ২০জন হকি খেলোয়াড় অনুমোদন করে। কিন্তু বাঙলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় কেশব দত্ত ব্যক্তিগত কারণে রোম অলিম্পিকে যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন, ফলে একজন খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়ার সমস্যা থেকে ফেডারেশন কর্ত্তৃপক্ষরা বেঁচে গেছেন। বাঙলার এল ক্লাডিয়াস ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। এর পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন, হেলসিঙ্কি ও মেলবোর্ণ অলিম্পিকেও ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জ্জন করেছেন।

গত অলিম্পিকের সেমি-ফাইনালে উন্নীত চারটি দলকে (ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী ও পাকিস্তান) এবারকার অলিম্পিকে চারটি গ্রুপে রাখা হবে। মোট ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। চারটি গ্রুপের খেলা লীগ প্রথায় হবে। এই গ্রুপের বিজয়ী চারটি দল সেমি-ফাইনালে নক-আউট প্রথায় খেলবে। এইবারকার প্রতিযোগিতায় ভারত, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জাপান, কেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মাণী ও পাকিস্তান। অংশ গ্রহণ করবে।

ভারতীয় দলের সঙ্গে একজন ম্যানেজার ও একজন কোচ ছাড়া এবার একজন শরীর শিক্ষার উপদেষ্টা পাঠানর ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয় কর্ম্মকর্ত্তা-শরীর শিক্ষার উপদেষ্টা নির্ব্বাচন করে ভারতীয় হকি ফেডারেশন এবার নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থ ব্যয় করে এরূপ একজন কর্ম্মকর্ত্তা পাঠানর কেন প্রয়োজন হ'লো—তা ফেডারেশনের কর্ম্মকর্ত্তারাই বলতে পারেন। নিম্নে ভারতীয় হকি দলের মনোনীত খেলোয়াড়ের নাম প্রদত্ত হ'লো :—

গোল—লক্ষ্মণ (সার্ভিসেস) ও দেশমুখ (মহীশূর)

ব্যাক—পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব)। রমনলাল শর্ম্মা (উত্তর প্রদেশ)। শান্তারাম (সার্ভিসেস) ও বালকিষেণ (রেলওয়ে)।

হাফ-ব্যাক—এল ক্লডিয়াস (বাঙলা)—অধিনায়ক, এ্যান্টিক (রেলওয়ে), চরণজিৎ সিং (পাঞ্জাব), শাবন্ত (মহারাষ্ট্র) ও মহীন্দার সিং (রেলওয়ে)।

ফরওয়ার্ড—উধম সিং (পাঞ্জাব), যশবন্ত সিং (সার্ভিসেস), পাতিল (মহারাষ্ট্র), ভোলা, (সার্ভিসেস), যোগীন্দার সিং (রেলওয়ে) পিটার (সার্ভিসেস), জারম্যান (রেলওয়ে), অরোরা (রেলওয়ে) ও ম্যাস ক্রেস্তার (বোম্বাই)।

ষ্ট্যাণ্ডবাই—গোল—এস, মেন্ডিস (বোম্বাই)। ব্যাক—আলেকজাণ্ডার (মহারাষ্ট্র)। হাফ-ব্যাক—দেশমুখ (সার্ভিসেস) ফরওয়ার্ড—হরিপাল (সার্ভিসেস) ও নাগরাজ (মহীশূর)।

ম্যানেজার—শ্রী বি, এল, গুপ্ত।

কোচ—শ্রীকিষেণলাল।

শারীর শিক্ষার উপদেষ্টা—কমাণ্ডার বি, এস, মিধি।

ডেভিস কাপ হইতে ভারতের বিদায় গ্রহণ

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চল ফাইনালে ফিলিপাইন ৫-০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে ফিলিপাইন আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ইউরোপীয় অঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ফিলিপাইন ভারতের কাছে দু'টি সিঙ্গলস এবং একটা ডাবলসে জয়ী হয়ে ৩-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। এই ভাবে জয়-পরাজয়ের নিস্পত্তি পূর্ব্বেই হয়ে যাওয়ায় অবশিষ্ট দুটি সিঙ্গলসের খেলার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও বৃষ্টির জন্য রমানাথ কৃষ্ণাণ (ভারত) বনাম জুয়ান জোস (ফিলিপাইন) এবং নরেশকুমার (ভারত) বনাম এম্পনের (ফিলিপাইন) সিঙ্গলসের খেলা হওয়া সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় দল অবশিষ্ট দুটি সিঙ্গলসে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়ায় ফিলিপাইন ৫-০ খেলায় জয়লাভ করে।

এশীয় চ্যাম্পিয়ন রমানাথ কৃষ্ণাণের কাছে এম্পনের এইবারকার অপ্রত্যাশিত জয়লাভে বিশ্বের টেনিস মহলে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। খর্ব্বাকৃতি এম্পনকে দেখলে মনে হয় না যে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। কৃষ্ণাণের ন্যায় চৌখস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য সত্যিই কৃতিত্বের পরিচায়ক। এইদিন খেলা দেখার জন্য প্রায় দু সহস্র দর্শক সমাবেশ হয়। কিন্তু দর্শকরা এম্পনের পক্ষ অবলম্বন করায় কৃষ্ণাণ খুবই উত্যক্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। দর্শকদের চীৎকারে তিনি বিরক্ত বোধ করেন। অনেক সময় তিনি ইচ্ছা করেই পয়েণ্ট দিয়েছেন। ১০ মিনিট খেলার মধ্যে কৃষ্ণাণ খুব কম সময়ই স্বাভাবিক ভাবে খেলতে পেরেছেন। কৃষ্ণাণের ন্যায় খেলোয়াড়ের পক্ষে দর্শকদের আচরণে উত্যক্ত বোধ করা সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হ'ল :—

সিঙ্গলস—ফেলিসিস যো এম্পন (ফিলিপাইন) ৬-৩, ৮-৬ ও ৬-১ সেটে রমানাথ কৃষ্ণাণকে (ভারত) পরাজিত করেন।

রেমেণ্ডো ডেরো (ফিলিপাইন) ৬-০, ৬-১ ও ৬-১ সেটে নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—এডুয়ার্ডো ডুলো ও জুয়ান জোস (ফিলিপাইন) ৬-২, ৬-২ ও ৬-২ সেটে রমানাথ কৃষ্ণাণ ও নরেশকুমারকে (ভারত) পরাজিত করেন।

অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের ক্রীড়াসূচী

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল এসোসিয়েশন-এর অলিম্পিক কমিটি রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ফুটবল প্রতিযোগিতায় চতুর্থ গ্রুপের

যে ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত করেছেন তাতে ভারতকে প্রথম খেলায় শক্তিশালী হাঙ্গেরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এই খেলা হবে ২৩শে আগষ্ট অ্যাকুইলায়। সেমি-ফাইন্যাল খেলাগুলি ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর নেপলস ও রোমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১০ই সেপ্টেম্বর রোমে ফাইন্যাল খেলা হবে। ৯ই সেপ্টেম্বর রোমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারী নির্ণয়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। নিম্নে চতুর্থ গ্রুপের ক্রীড়াসূচী প্রদত্ত হ'ল :—

ভারত : হাঙ্গেরী—২৩শে আগষ্ট (অ্যাকুইলায়)।

ভারত : ফ্রান্স—২১শে আগষ্ট (গ্রসেটোতে)।

ভারত : পেরু—১লা সেপ্টেম্বর (পেসকারায়)।

টমাস কাপে ভারতীয় দলের খেলা

এশীয় ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে টমাস কাপের এশীয় অঞ্চলের বিভিন্ন খেলা একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন সে সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের কর্ম্মসচিব এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ জারী করায় এশীয় কনফেডারেশনের কর্ম্মসচিব দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী টমাস কাপ প্রতিযোগিতার এশীয় অঞ্চলের খেলাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হবে।

ভারত, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, হংকং, সিংহল ও মালয় টমাস কাপের এশীয় অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বর্ত্তমান কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ভারত ও থাইল্যাণ্ডের খেলা ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে এবং এই খেলা ব্যাঙ্ককে হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই খেলায় বিজয়ী দলের ইচ্ছানুসারে কোন এক অঞ্চলে সেমি-ফাইন্যালে মালয়ের সঙ্গে তাদের খেলতে হবে। এই খেলা অক্টোবর মাসের মধ্যে শেষ করাতে হবে।

পাকিস্তান ও সিংহলের খেলা পাকিস্তানে হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই খেলা ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। এই খেলায় বিজয়ী দল পরবর্ত্তী রাউণ্ডে হংকং-এর সঙ্গে খেলবে। এই খেলাও অক্টোবর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ভারত সফর

আগামী ১৬ই অক্টোবর থেকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের তিন মাসব্যাপী ভারত সফর শুরু হবে। সফরকারী দল পাঁচটি টেষ্ট খেলাসহ ভারতে মোট ১৪টি খেলায় যোগদান করবে। পুণায় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে তাদের প্রথম খেলা হবে। তবে পাকিস্তান দলের যে সফরসূচী প্রস্তুত হয়েছে তাহা জুলাই মাসে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরবর্ত্তী কার্য্যকরী সমিতির সভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে বলে ঠিক হয়েছে। নিম্নে ভারত ও পাকিস্তানের পাঁচটি টেষ্ট খেলার সাম্ভাব্য তারিখ ও স্থানের তালিকা প্রদত্ত হল :—

প্রথম টেষ্ট—২রা, ৩রা, ৪ঠা, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর (বোম্বাই)।

দ্বিতীয় টেষ্ট—১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর (কানপুর)।

তৃতীয় টেষ্ট—৩০শে, ৩১শে, ১লা, ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬১ সাল (কলকাতা)।

চতুর্থ টেষ্ট—১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী (মাদ্রাজ)।

পঞ্চম টেষ্ট—৮ই, ৯ই, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী (দিল্লী)।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সাল পাকিস্তান দল স্বদেশ অভিমুখে রওনা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা সফরে গুজরাট ক্রিকেট দল

গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় শুভেচ্ছা সফরে একটি ক্রিকেট দল পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ৩রা আগষ্ট থেকে আরম্ভ হয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর সফর শেষ হবে। গুজরাট দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্যে ১২ জন ভারতের পক্ষে টেষ্ট ম্যাচে খেলেছেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই সফরের জন্য মনোনীত হয়েছেন :—লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), জে৯ প্যাটেল, পলি উম্রীগড়, আর, বি, কেনী, এস, এল, জয়সিমা, আর, জি, নাদকারণি, এ, জি, মিলখা সিং, দীপক সোধন, এক এম, ইঞ্জিনীয়ার, নরি কন্‌ট্রাক্টর, এস, ত্রিবেদী, আর, বি, দেশাই, আর, দিজেতা, জেনডু ওয়াদিয়া, সুধাকর প্যাটেল, অরুণ নায়েক, ডি, দেশাই ও সুরেন্দ্রনাথ।

তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়রা এই সফরে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাবেন। এই সফরের অনুমোদন দেওয়ার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

তাঁরা কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতীয় ষ্টারলেটস" দলকে পাকিস্তান সফরের যে অনুমোদন দিয়েছিলেন তাতে ফল বেশ ভালভাবেই হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সাফল্যের সঙ্গে পাকিস্তান সফর করে এসেছেন। গুজরাট ক্রিকেট দলের সফর শুভ হউক, এটাই সকলে আশা করেন।

সমুদ্র সন্দর্শনে

[Moore-এর A thought of sea-র অনুসরণ]

নীলাম্বুর 'পরে ওঠে জ্যোছনার হাসি
দূরে দূরে ঊর্মির বুকে ওঠে ভাসি।
উচ্ছলিত ফেনরাশি বারিধির বুকে
মিশেযে হারায় সব সুশীতল সুখে।

মানব মানসে খেলে সুখ আর দুখ
কালের প্রবাহ (ধারা) বহে প্রকৃতির বুক
নিমেষের মাঝে পুনঃ সে প্রবাহধারা
কালের করাল স্পর্শে হয় সর্বহারা

[illegible]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ (মে-জুন, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ঢাকুরিয়া লেকের ধারে নব নির্ম্মিত ষ্টেডিয়ামের (কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট পরিকল্পিত) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) : 'নাগরিক প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে ইস্কুল ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালনা—কতিপয় নারী সহ কয়েকজন আহত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘোষণা—সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ বন্ধ থাকিবে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে) : কলিকাতা কর্পোরেশনের অচলাবস্থা অবসানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত—বিবদমান দুইটি দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা না ঘটিলে কর্পোরেশন বাতিল করা হইবে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) : উড়িষ্যার চরবেতিয়ায় পুনর্ব্বাসনপ্রাপ্ত পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের চরম দুরবস্থা—অবস্থার পর্য্যালোচনা ও প্রতীকারের দাবীতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত উদ্বাস্তু প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে) : প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতে ৪টি বন্দরের (টিউটিকোরিণ, ম্যাঙ্গালোর, পারাদ্বীপ ও পোরবন্দর) পর্য্যাপ্ত উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত অনুন্নত বন্দর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে) : বনগাঁ মহকুমায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা—তিন শত পরিবার নিরাশ্রয় : তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে) : পশ্চিমবঙ্গের কর্মকেন্দ্রগুলিতে বাঙ্গালী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করার দাবী—কর্ম্ম-সংস্থান সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রস্তাব।

দিল্লীতে মহারাণা প্রতাপ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের দাবী—উত্তর সীমান্তের (ভারত-চীন) পরিস্থিতিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ না থাকিলেই নয়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে) : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন সভা আইনতঃ অসিদ্ধ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা বিধিসম্মত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের রায়।

প্রখ্যাত মল্লবীর গামার (৮০) লাহোর হাসপাতালে পরলোকগমন।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে) : পশ্চিমবঙ্গে বিদেশীদের ভূসম্পত্তি সংগ্রহে বাধা-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অর্ডিন্যান্সের খসড়া অনুমোদন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে) : পাঞ্জাবে দুই শতাধিক আকালী নেতা ও কর্ম্মী গ্রেপ্তার—'পাঞ্জাবী সুবা' দাবীর পরিণতিতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সরকার কর্তৃক সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন।

কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ ও উহার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ—'দাবী দিবস' উপলক্ষে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীদের বিরাট সভা ও মিছিল।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে) : উপদ্রুত অঞ্চলে গুণ্ডামী দমনের জন্য নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ—রাইটার্স বিল্ডিং-এ পুলিশের ডি, আই, জি, ও এ, আই, জি, সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে) : কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনের জন্য রাজ্যপাল কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী—কমিশনারের উপর মেয়র নির্ব্বাচনের জন্য সভা আহ্বানের ক্ষমতা অর্পণ।

আসামের সর্ব্বত্র প্রবল ভূমিকম্প—৪০ সেকেণ্ডব্যাপী কম্পন অনুভূত।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে) : পশ্চিমবঙ্গের সাগরতীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রবল ঝড়ের ধ্বংসলীলা—ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, হলদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিপর্য্যস্ত।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) : কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা—নিমোগায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীভি, জি, দেশপাণ্ডের ভাষণ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে) : মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হউন—সিমলায় সম্বর্দ্ধনা সভায় জাতির প্রতি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের আহ্বান।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে) : ক্যানিং কেন্দ্রের বিধান সভা উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর (শ্রীমতী সাকিলা খাতুন) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ—কম্যুনিষ্ট প্রার্থীসহ অপর পাঁচ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় বরণ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন) : কালীঘাট ব্রীজের উপর মালগাড়ীর সহিত বজবজ লোক্যাল ট্রেনের সংঘর্ষ—দুই ব্যক্তি নিহত।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন) : পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ এবং পুনর্ব্বাসন বাবদ এ যাবৎ ১১৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয়—কলিকাতায় রোটারি ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে তথ্য প্রকাশ।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন) : কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীকেশবচন্দ্র বসু ও ডাঃ ইসমাইল ইব্রাহিম ১৯৬০ সালের জন্য যথাক্রমে কর্পোরেশন (কলিকাতা) মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত—কর্পোরেশনের দেড় মাসব্যাপী অচলাবস্থার অবসান।

১৯৬২ সাল হইতে পুনরায় জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সেশন আরম্ভ—মধ্য শিক্ষা পর্ষদের (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সিদ্ধান্ত।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন) : কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মৌলিক পরিবর্ত্তনের দাবী অগ্রাহ্য—পুণায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রারম্ভেই ওয়ার্কিং কমিটি ও সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন) : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে (পুণা) ৭৮-১৪৮ ভোটে অগ্রাহ্য।

সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন ইউ-২ বিমান (গোয়েন্দা কার্য্যে লিপ্ত সামরিক বিমান) প্রেরণ আন্তর্জ্জাতিক আইন বিরোধী—পুণায় এ. আই. সি. সি'র বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন) : সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা—রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের একদল অফিসারের পিকিং যাত্রা।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) দেশে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পূরণ ও মূল্যবৃদ্ধি রোধের ব্যবস্থা—আমেরিকা সফরান্তে দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব শ্রী এস. কে. পাতিল কর্ত্তৃক নূতন ভারত-মার্কিণ চুক্তির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন) : খাঁটি পাঞ্জাবী ভাষাভাষী রাজ্য গঠনের জন্য গণ-প্রচার আন্দোলন চালানো সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টির পাঞ্জাব রাজ্য পরিষদ সম্মেলনের (জলন্ধর) সিদ্ধান্ত।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন) নাগা পাহাড় অঞ্চলে রেলপথ বরাবর আসাম সরকারের প্রয়োজনে সৈন্য মোতায়েন—বিদ্রোহী নাগাদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধির জের।

সরকারী কর্ম্মচারী (পশ্চিমবঙ্গ) নেতাদের সাসপেণ্ড করার প্রতিবাদে কলিকাতা ও মফঃস্বলে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) : কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়—কর্পোরেশন (কলিকাতা) ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির নির্ব্বাচনী সভায় চাঞ্চল্য।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তর স্থায়ী দপ্তরে পরিণত—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন) : দিল্লীতে বিক্ষোভকারী আকালী জনতার ('পাঞ্জাবী সুবা' দাবীর সমর্থক) সহিত পুলিশের সংঘর্ষ—একজন আকালী নিহত ও উভয়পক্ষে দুইশত জন আহত।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন) : জুলাই মাসে নৈনিতালে (উত্তর প্রদেশ) শিবিরবাসী ছয় শত উদ্বাস্তকে প্রেরণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত—দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্ত প্রেরণ আপাততঃ স্থগিত।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন) : যথাযথ পুনর্ব্বাসন না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বাস্ত শিবির বন্ধ করা চলিবে না—রাইটার্স বিল্ডিংসএ কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত বৈঠককালে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সাজসরঞ্জাম সহিত মহাশূন্যে মানুষ বাহী কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) : প্যারিসে বহু প্রতীক্ষিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ—সম্মেলনের সূচনাতেই সোভিয়েট আকাশে মার্কিণ গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ প্রসঙ্গ লইয়া তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রতি রুশিয়া সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার—শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) : পূর্ব্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন সূচনাতেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে) : পিকিং-এ ত্রিশ লক্ষাধিক চীনার মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ ও শীর্ষ সম্মেলনে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ভূমিকা সমর্থন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে) : পূর্ব জার্ম্মাণীতে একখানি মার্কিণ সামরিক বিমান আটক—বৈমানিক সহ নয় জন আরোহীকে জিজ্ঞাসাবাদকল্পে রুশ দপ্তরে প্রেরণ।

জাপানে কিশি মন্ত্রিসভা চরমতম সঙ্কটের সম্মুখীন—জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানীদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে) : রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিমান প্রেরণ প্রসঙ্গে রুশিয়ার নিন্দাসূচক প্রস্তাব পেশ।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে) : রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার বিরুদ্ধে সোভিয়েট নিন্দা প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

অপরাজিত ধবলগিরি শৃঙ্গ বিজয়—সুইস অভিযাত্রীদলের অসামান্য কৃতিত্ব।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে) : তুরস্কে সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ—প্রেসিডেন্ট প্রধান মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার।

চীনা অভিযাত্রী দলের এভারেষ্ট বিজয়—দুর্লঙ্ঘ্য উত্তর পার্শ্ব দিয়া তিনজন পর্ব্বতারোহীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে) : যশস্বী রুশ সাহিত্যিক বোরিশ প্যাষ্টারনাকের (৭০) মস্কোএ জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন) : রুশ পররাষ্ট্র সচিব আঁদ্রে গ্রোমিকো কর্ত্তৃক আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও ভারত সমেত নয়টি রাষ্ট্রের নিকট সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রুশিয়ার নূতন পরিকল্পনা পেশ।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন) : নেপালের সীমান্ত বরাবর চীনা সৈন্য বাহিনীর বিপুল সমাবেশ—পশ্চিম তিব্বতে রকেট ও সাঁজোয়া গাড়ী আমদানীর সংবাদ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক দশ জাতি পূর্ব্ব-পশ্চিম নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে তিন পর্য্যায় বিশিষ্ট নূতন নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা উপস্থাপিত।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন) : টোকিও বিমানঘাঁটিতে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ জেমস্ হ্যাগার্টি ও জাপানস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ ডগলাস ম্যাকআর্থারের গাড়ীকে বিক্ষুব্ধ জাপ-ছাত্রদের কবল হইতে হেলিকপ্টারযোগে উদ্ধার।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন) : রুশিয়া ও রুশ গোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকদের জর্ডন প্রবেশে বাধা—কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য জর্ডন সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন) : দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি-সংগ্রামীদের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হউন—আদিস-আবাবায় স্বাধীন আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসীর আহ্বান।

পুনর্ব্বাসন প্রহসন

"পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন-সচিব প্রফুল্লচন্দ্রের কথা অধিক না বলাই ভাল। প্রথমেই যদি তিনি মেহেরচাঁদের মতলব বুঝিয়া বাঙ্গালীর প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া কাজ করিতেন, তবে চল্লিশটি মাত্র পরিবারের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করিয়া এক হাজার পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইবার সাহস মেহেরচাঁদের হইত না। তাঁহার চেষ্টাতেই মেহেরচাঁদকে উল্টা গাধায় দিল্লীতে পাঠানো হইত। তিনি তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই, সে কৈফিয়ৎ তাঁহাকে আগামী নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকদিগকে দিতে হইবে। মেহেরচাঁদ যাহা বলিয়াছেন এবং বিধান বাবু যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, উভয়ের অসামঞ্জস্য যে কোন লোক সহজে দেখিতে পাইবেন। এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী কে? মেহেরচাঁদের কার্য্যকালে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অপব্যয়িত হইয়াছে কিনা স্থির করিবার জন্ত নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন। কংগ্রেসের নূতন সভাপতি রেড্ডী মহাশয় যে তদন্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা মেহেরচাঁদকে দিয়া আরম্ভ করিলেই ভাল হয় না? মেহেরচাঁদ আত্মরক্ষার জন্ত মরণ কামড় দিতেছেন। এখন দেখা যাউক, কি হয়। এদিকে মেহেরচাঁদের বহিষ্কার একরূপ নিশ্চিত বুঝিয়া চাকরীতে কালনেমীর লঙ্কাভাগের ব্যাপার ঘটিতেছে। কেহ বলিতেছেন—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়কে দেওয়া হউক। উনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকুরীয়া ছিলেন—সুতরাং 'সর্ব্বজ্ঞ'। সুকুমার সেন যদি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হইতে পারেন, তবে সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণ করিতে পারিবেন না কেন? যাঁহারা বহু দিন চাকরী করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারিবেন না কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

কলিকাতা কর্পোরেশন

"কাউন্সিলার-অল্ডারম্যান, এবং সেই কমিটিগুলি—যাহারা নামেই ষ্ট্যাণ্ডিং, আসলে শয়ান বা ঘুমন্ত—মিলিয়া যে বারোয়ারী মণ্ডপ খাড়া করিয়াছে সেখানে বলি দিবার জন্ত নাগরিক স্বার্থ ছাড়া নিরীহতর কোন জীব আজ অবধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জোড়া মেয়র নির্বাচন পৌরসভার আর একটি অপরূপ কীর্ত্তি এবং মাত্র সেদিনের ঘটনা। পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিতে চাই না। আজ সরকারী হস্তক্ষেপে একটা জট অন্ততঃ খুলিয়াছে, এবং পৌর নির্বাচনের ভোটারের তালিকা তৈয়ার করার ভার রাজ্য সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করার কথাও ভাবিতেছেন। এই অবসরে নাগরিকেরাও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন, পৌরসমস্যা সম্পর্কিত মুশকিলের সত্যকার আসান কী। টোটকা কোনও মুষ্টিযোগ নয়, সাময়িক একটা সুরাহাও নয়, একটা চিরস্থায়ী কয়শালার উপায় খুঁজিবার সময় আসিয়াছে। নানা মহলে গুঞ্জন চলিতেছে—"অতঃ কিম?" কোন্ রাজনৈতিক দল পৌরসভায় প্রভুত্ব করিবে, কোন্ মান্যবর মেয়রের মুকুট পরিবেন এ সবের সমাধান রহিয়া-সহিয়া করা সম্ভব, কিন্তু সময় ও স্রোতের মত জল-কল বা প্লাবনের সমস্যা ত কাহারও মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করে না, একটা আশু মীমাংসার দাবী ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কাউন্সিলাররা যতদিন মেয়াদ ততদিন টেবিল চাপড়াইয়া আসর মাত করিতে থাকুন, ততদিনে একটা সুস্থ জনমত দানা বাঁধিয়া আপনা-আপনি একটা উপায় স্থির করিয়া লইবে। তাঁহারা প্রশ্ন করিবে, কলিকাতার বড় বড় নলকূপ খননের পুরোনো স্কীমটার উপর চাপা দেওয়া ধামাটা সরিতে আর কত বাকী? বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধিদল যে মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাকে রূপদানের দিনটিই বা কতদূর? টালার ওই আকাশ-চাটা চৌবাচ্চা আজও খাড়া আছে বটে, কিন্তু শূন্তের সৌধে যেমন বসবাস করে চলে না, ওই চৌবাচ্চাটার দিকে চাহিয়া থাকিলেও ত তেমনই তৃষ্ণা মিটিবে না। পয়ঃপ্রণালীগুলি আজও আকণ্ঠ বুজিয়া আছে, বাড়ী তৈয়ারীর মঞ্জুরী ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক অনাচার এবং গাফিলতি আবর্জনার মত জমা হইয়া রহিয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

আমাদের লেখাপড়া

"বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অবাধ অধিকার দানই কি একজন দায়ী? বলা বাহুল্য, তা নয়। অনুচ্চ মানসিকতা-সম্পন্ন শিক্ষাদাতাদের দায়িত্বও কম নয়! যাঁহারা নিজেরা বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, বহু বিচিত্র ভাবসম্পদের মধ্য দিয়া যাঁহাদের মহৎ মানসিকতার প্রকাশ হইয়াছে, এমন শিক্ষকরা যদি আজ আমাদের দেশে দুর্লভ না হইতেন, তা হইলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের এই দ্যুতিই তাঁহাদের শিষ্যদের কীর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইত। শিক্ষকরা কেউ রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষিতায়, কেউ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত কেউ বা অন্ত ভাবে কড়ি কামানো লইয়া ব্যস্ত। সরস্বতীর মুক্তকের সঙ্গে ছাত্র-জীবনের পথ অনেকেই সংস্রবশূন্য। আর তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভা ও মনস্বিতা সম্পন্নের সংখ্যাও দুষ্প্রাপ্য। কাজেই তাঁহার ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করিতে পারেন না। সুতরাং বাছাই করিয়া শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র কলেজে নিলেই হইবে না, বাছাই করিয়া গুণী শিক্ষকও নিতে হইবে। ডাঃ দেশমুখ ঠিকই বলিয়াছেন যে, নূতন যুগের চ্যালেঞ্জকে পুরানো প্রথার জীর্ণ অস্ত্র দিয়া আমরা রুখিতে পারিব না। আমাদের পাঠ্য-তালিকা আমূল বদলাইতে হইবে। পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা আমূল বদলাইতে হইবে এবং একজন শিক্ষা দান ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হইতে বকেয়া মাতুব্বরদেরও দৃঢ় হাতে বিদায় দিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের কর্তৃত্বের দুনিয়ায় যৌবনের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। জরাজীর্ণ উপরওয়ালারা আর সকলেরই ত্রুটি ও অসঙ্গতি দেখেন, কিন্তু নিজেদের দিকে তাকাইতে ভুলিয়া যান। আসল গলদের মূলীভূত কারণই তাঁহারা এবং তাঁহারাই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার পুঁজি

নিয়া তাঁহারা এ যুগের উচ্চ শিক্ষা পরিচালনা করিতে আসিয়াছেন বলিয়াই শিক্ষা ও শিক্ষার্থী, কাহারো হিতই তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং আর সব দিকগুলির মতো এই দিকটির কথাও যদি অকপট আত্মসমালোচনার মনোভাব নিয়া যাচাইয়া দেখা হয়, তবেই হয়ত কিছু কাজ হইবে।"

—যুগান্তর।

কলিকাতার দুঃখ

"সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হইয়াছে—কলিকাতার কর্মসংস্থান কিছুটা বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে গৃহপরিচর্য্যা ও দোকান ব্যবসার ক্ষেত্রেই মাত্র। কাজের বাজারে বিপুল সংখ্যায় কিশোররাও যোগ দিয়াছে—ইহাদের অর্দ্ধেক দোকান, হোটেল ও রেস্তোরাঁয়। তাহা ছাড়া নারীদের মধ্যে বেকারীর অবস্থা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হইল, যে-অল্পসংখ্যক মানুষের কোন প্রকারে একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সকল উপার্জনকারীদের শতকরা ৮৭ জনই এক শত টাকার কম আয় করেন (ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে)। ইহাদের গড় মাসিক আয় মাত্র ৭৩ টাকা। মহানগরীর উপার্জনকারীদের শতকরা মাত্র ২৩ জনের আয় এক শত টাকার উপর। এত অল্প আয়ে মানুষের পরিবার প্রতিপালন একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিপর্য্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার মানুষকে জীবন যাপন করিতে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কলিকাতার এই অর্থনৈতিক চিত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষার রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে, বিরোধী দলের মুখপাত্রদের বক্তব্য নহে। ইহার পরেও কি কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস-নেতারা বলিবেন যে, তাঁহাদের শাসনে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে? কলিকাতার ন্যায় সহরে যেখানে কর্মসংস্থানের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে সেখানে মানুষের জীবনের এই দশা! কংগ্রেসী শাসনে দেশের জনজীবনের ইহাই দুর্গতিময় পরিণতি!"

—স্বাধীনতা।

বিধান পরিষদ নির্ব্বাচন

"বিধান পরিষদ নির্ব্বাচনে এবার কংগ্রেস একটিও গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষক আসন অধিকার করিতে পারে নাই, সব কটিতেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের জয় হইয়াছে। বিদেশীরা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদের পুণ্যভূমি বাঙলাদেশ এখন আন্তর্জ্জাতিকতাবাদের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে, দুয়ারে শত্রু আসিয়া হানা দিলে এবং দেশের মাটি দখল করিলেও আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী তাদেরই সমর্থন করে। তবে এটুকু বলা যায় যে, রেবতী রায় মাত্র ১২৮ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। তার কারণ নির্ব্বাচনের আগে হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ এবং বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় তাঁর ভোট বাক্সে ফেলিবার আয়োজনের কংগ্রেসের সাংগঠনিক ব্যর্থতা। কলিকাতা কেন্দ্রে শতকরা ৭০টি ভোট প্রদত্ত হয় নাই, অর্থাৎ এখানে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট ছাড়া গ্রহণযোগ্য অন্ত প্রার্থী ছিলেন না বলিয়া প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভোটদাতা ভোটই দেন নাই। ভোট না দেওয়া বিক্ষোভ প্রকাশের একটি উপায় বটে, কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তার চেয়ে ভাল উপায় এঁদের পক্ষে অগ্রণী হইয়া উপযুক্ত প্রার্থী দাঁড় করানো। ক্যানিং উপনির্ব্বাচনের জয়ে কংগ্রেস পক্ষ খুব নৃত্য করিতেছেন। কংগ্রেসের নীতি বা কর্ম্মপদ্ধতি সেখানে জয়যুক্ত হয় নাই, জিতিয়াছে সাম্প্রদায়িকতাবাদ।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

শ্রেষ্ঠতম সমস্যা

"ভারতের ভিতরে ও বাহিরে নিত্য নূতন যে কত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তাহা কে না দেখিতেছেন? একটার পর একটার সমাধান করিতে না করিতেই অভাবনীয় নূতনতর সমস্যা বিপন্ন করিতেছে। সমস্যায় সমস্যায় এখন এমন জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, ঝাঁ করিয়া ইহার যে কোন একটা সমাধান বাহির করিতে পাক খাইবে এমন কথা তো আর মনে করাই যায় না। কোন একটি সমস্যাকেই লঘু বলিতে চাহি না, বরং প্রত্যেকটিরই আশু সমাধান হইলে খুবই সুখের হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতির যেরূপ দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে ভারতে আত্মরক্ষা করার সমস্যাটাই যে এখন সব চাইতে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এই কথাটাই আজ সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসগৃহ, মজুরী, পুনর্ব্বাসন, শিল্পোন্নতি, কৃষি-সমবায়, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি—নানা বিষয়ে আজ আমাদের দৃষ্টি যেভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতাই যে কতখানি বিপন্ন সে পক্ষে তাদৃশ লক্ষ্যই পড়িতেছে না। সংবাদপত্রে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দু-একটা সংবাদ হইতে কচিৎ কখন এরূপ সংশয় হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাইবে, বিশ্বযুদ্ধের ঝক্কি কইতে সহসা কেহই সাহস করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও উচিত নয়। রাষ্ট্রনায়কেরা ঢাকে ঢোলে সোরগোল তুলিতেছেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কথার ফাঁকে ফাঁকে বেশ বুঝা যাইতেছে—স্বাধীনতা খুবই বিপন্ন।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

সম্মেলনের শেষে

"রামপুরহাট মহকুমার অবহেলিত রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কারে দাবী সম্মেলনে মুখরিত হইয়াছে। রামপুরহাট কংগ্রেসের তরফ হইতে বহুবার বহুভাবে এই দাবী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুধু উপেক্ষার জন্ম উত্থাপিত হইয়াছে। আজ সম্মেলনে সে দাবী মুখরিত হইয়া জোরদার হইয়াছে। বীরভূম জেলা কংগ্রেসকে এই দাবীকে কার্য্যকরী করিবার জন্ম অবিলম্বে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ইহাতে মহকুমার কংগ্রেসের শক্তি এবং সংগঠন অধিকতর কার্য্যকরীভাবে বৃদ্ধি পাইবে। বীরভূমের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের দাবী সম্মেলনে ধ্বনিত হইয়াছে। বীরভূমের কুটিরশিল্প এককালের সম্পদ ও গৌরব ছিল। কেন সেগুলি লুপ্ত হইতে চলিতেছে, কি

ভাবে সে দিকে বাঁচান যায় ইহা পরিকল্পনা গ্রহণের দ্বারা বীরভূম কংগ্রেসকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রচেষ্টায় জনকল্যাণ, কংগ্রেস কল্যাণ—উভয়ই সাধিত হইবে। আমরা আশা করি প্রস্তাবের খাতিরে শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বীরভূম কংগ্রেস ক্ষান্ত হইবেন না। সমস্ত শক্তিকে সুসংহত করিয়া গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবও যাহাতে এই বৎসরেই বাস্তবে রূপায়িত হইবার রং ও বর্ণ গ্রহণ করে—তাহার জন্ত জেলা কংগ্রেসকে অবিলম্বে কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সম্মেলনের সার্থকতা হইবে এইখানেই এবং এই প্রচেষ্টায়।"

—বীরভূমের ডাক।

খাদ্যপরিস্থিতি সঙ্কটজনক

"এই মহকুমায় গত বৎসর ধান্তের ফলন অত্যন্ত কম হইয়াছিল। অতিরিক্ত জলের চাপে বারচৌকা, ভুরদা, কাঁথি, মগরা, আওরাই ও ভগবানপুর থানায় বিরাট অঞ্চলে ফসল প্রায়ই নষ্ট হইয়াছিল এবং অন্তান্ত বহু অঞ্চলে স্বাভাবিক ফসলের চার ভাগের এক ভাগ ফলন হইয়াছিল। এই গুরুতর ফসল হানি হওয়া এবং বহু ধান্ত বাহিরে রপ্তানী হইয়া যাওয়ায় ফলে ধান্তের মূল্য ১৫।০-১৬।০ টাকা ও চাউলের মূল্য ২৫ ২৬ টাকা পর্য্যন্ত মণ দর চলিয়াছে। এই উচ্চমূল্যে ধান চাউল ক্রয় করিতে না পারিয়া বহু গৃহস্থের অনশন ও অর্দ্ধাশন আরম্ভ হইয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে লোকে ধান্ত ক্রয় করিতেই পাইতেছে না। গত মাঘ মাস হইতে বৃষ্টি হয় নাই, অধিকন্তু প্রখর রৌদ্রের তাপে শুধুই যে ধান চাষের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে তাহা নহে। তরিতরকারী এবং পশুখাদ্য ঘাস প্রভৃতিরও অভাব ভীষণ করিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় পাওয়াই কষ্টকর হইয়াছে। তরকারি যাহা পাওয়া যায় তাহা অগ্নিমূল্য, সচ্ছল গৃহস্থের জন্ত, সাধারণকেও ঐ উৎকট মূল্য দিতে হয় প্রয়োজনবোধে, মজুরা শুধু নয়নের তৃপ্তিতে যাহা হয়। এই ত অবস্থা! ন্যায্যমূল্যের দোকানের নামে সরকারী প্রহসনে সাধারণ মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত। শুধু প্রত্যাখ্যান, হবে না, নাই, পরে পাবেন ইত্যাদি নেতিবাচক কথার মারপ্যাঁচের গোলকধাঁধায় ফেলিয়া নিজ অর্থাগমের পথ করিয়া লওয়া। নানা অভাব অনটনে প্রতিটি মানুষের মন বিষাক্ত হইয়া আছে তাহার উপর প্রাত্যহিক জীবনের এই বিড়ম্বনা ভোগ, দৈবী নহে, মনুষ্যসৃষ্ট সৃষ্টিছাড়া প্রকৃত ঐচ্ছিক ব্যবস্থা। তাই ইহা জনসাধারণের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধনী নির্ব্বিশেষে সকলেরই অতীব মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়া পীড়া দিতেছে।" —নারায়ণ (কাঁথি)

ভারত কোন্ পথে?

"ভারত বিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং দুর্নীতি ও নানাবিধ অপরাধের জন্মের সৃষ্টি করিয়াছে। শাসন পরিচালনার মধ্যে দুর্নীতি গভীরভাবে প্রবেশ করিয়াছে। মুনাফাখোরী ধনী সম্প্রদায় রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রতিদিন নানা কুৎসিত ও অচিন্তনীয় অপরাধের সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, এই ঋণমুক্ত হওয়া কোনদিন সম্ভবপর হবে বলিয়া ধারণা হয় না। ঋণ সত্ত্বেও অপব্যয় এবং অপচয় বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রস্তরে উৎসব ও আমোদ আহ্লাদের ব্যয়বাহুল্য বহু বৃদ্ধি পাইতেছে। পয়োজন [illegible] দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হইতে কঠিনতর পথে চলিতেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতি জনগণ আস্থা হারাইলেও শিক্ষার অভাবে এবং নানা কারণে মুক্তির পথ বাহির করিতে পারিতেছে না। জাতির নৈতিক চরিত্র দ্রুত নিম্নগামী হইতেছে। মুসলিমলীগের পুনরুত্থান হইতেছে। ভোটের জন্য কংগ্রেস মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহস করিতেছে না। এই অবস্থা কোন বৈদেশিক শক্তি দ্বারা ভারত আক্রান্ত হইলে কি অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেরই চিন্তা করা ও মুক্তির পথ দেখানর জন্ত সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা একান্ত কর্তব্য। ফাঁকা কথায় দেশকে শক্তিশালী করা অথবা দেশ রক্ষা করা যায় না। ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

—বীরভূমবাণী

বাঙ্গালীর অধঃপতন

"শুধু সমর বিভাগে কেন, পুলিশ বিভাগেও দেখিবেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ও বিহার যখন একই প্রদেশ ছিল, তখন কেবলমাত্র ছাপরা জিলা হইতে এত অধিক সংখ্যক লোক পুলিশের কাজ করিত যে (সধারাম দেউস্করের মতে) কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর মণিঅর্ডার যোগে ২৬ লক্ষ টাকা ছাপরায় প্রেরিত হইত। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বহু প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—ফলে বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। তথাপি আজিও বঙ্গদেশ ও কলিকাতায় পুলিশের অধিকাংশ সশস্ত্র সামরিক পুলিশের প্রায় সকলই বাঙ্গালার বাহির হইতে সংগৃহীত হয়। ফলে বাঙ্গালা দেশের কোটি কোটি টাকা সেই সকল প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। অবশ্য একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সকল অবাঙ্গালীগণ আমাদের দেশে বলপূর্ব্বক আপন আপন স্থান সংগ্রহ করেন নাই। বরং তাঁহাদের সাহায্যে যে আমাদের প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষায় কতকগুলি অত্যাবশুক কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে, ইহাতে আমাদের কৃতজ্ঞ ও সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের এই অক্ষমতার ফলে বাঙ্গালীর শুধু আর্থিক ক্ষতিই হইতেছে না, ভারত সরকারের নিকট বাঙ্গালী আজ হেয় ও অপদার্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। বাঙ্গালীর উদাসীনতায় বাঙ্গালার অপরিমেয় আর্থিক ক্ষতির কাহিনী যে শুধু বিচিত্র তাহা নহে, বিস্ময়ও বটে। উড়িষ্যাদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশে জীবিকা অর্জ্জনের জন্ত বসবাস করিতেছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের এক সম্মেলনে তাঁহারা বলেন যে, প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে তাঁহারা ৩ কোটি টাকা উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। তাঁহাদের এই হিসাব নির্ভুল কিনা, তাহা সঠিক বলিতে পারি না। তবে বাঙ্গালীর ঘরগৃহস্থালীর কাজ, নলমিস্ত্রীর কাজ, ঠেলাওয়ালা প্রভৃতির কাজে আজ উড়িষ্যাবাসীদের "সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত" একথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। একবারও কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কেন এমনটি হয়? বাঙ্গালী শ্রমজীবিগণ কি এতই ধনী অথবা এমনই কর্ম্মব্যস্ত যে উপার্জ্জনের এই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই উঠে না?"—মল্লভূম।

অসমীয়াভাষী ও আসামবাসী

"আসামে শুধুমাত্র অসমীয়া-ভাষীরাই [illegible]

লোকের বাস এবং অন্যান্য ভাষাভাষীদের দাবাইয়া রাখিয়া শুধু মাত্র অসমীয়াভাষীরা নিজেদের কোন বিশেষ সুবিধার জন্য দাবী জানাইতে পারেন না ; কারণ আইনতঃ এবং ন্যায়তঃ রাজ্যের অন্য ভাষাভাষী অধিবাসীদের অধিকার তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। কিন্তু ন্যায়নীতি আজকাল বিসর্জন দেওয়া হইতেছে বলিয়াই যেমন আসাম রাজ্য সরকারের চাকুরিতে, তেমনি আসাম অয়েল কোম্পানী, কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ, রেলওয়ে, চা-বাগান ইত্যাদিতে চাকুরী যোগাড় করা আসামবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখন এই ধারণাই পোষণ করেন যে, আসামবাসী বঙ্গভাষীদের চাকুরী লাভের অধিকার লোপ পাইয়াছে। শুধু চাকুরীর ক্ষেত্রে নয়, সরকারী পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদিতেও (কটন কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ ও স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিতে) সীট যোগাড় করা বঙ্গভাষী ছাত্রদের পক্ষে দুরূহ ; আর উদ্বাস্তু হইলে তো কথাই নাই ; এই সব ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পত্রপাঠ বিদায় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে বঙ্গভাষী তরুণদের পক্ষে আসামে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকুরী দুই-ই লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আসামে রাজ্যভাষা আন্দোলন গড়িয়া তোলা হইয়াছে, চাকুরীর ক্ষেত্রে অসমীয়াভাষীদের অগ্রাধিকারের আন্দোলনটিকে সম্ভবতঃ তাহার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। কার্য্যতঃ যেভাবে এই আন্দোলন দুইটিকে পরিচালনা করা হইতেছে, তাহাতে অসমীয়াভাষী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই প্রকাশ পাইতেছে। বহুবিধ সমস্যাপীড়িত আসামরাজ্যে কৃত্রিম উপায়ে নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ তাহাদের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির তৃপ্তি সাধন ব্যতীত আর কি লাভ করিতেছেন তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এক শ্রেণীর অসমীয়া-নেতৃবৃন্দের সঙ্কীর্ণচিন্ততা হইতে যে আন্দোলনের জন্ম হইয়াছে, তাহার সংক্রামক বিষ অন্য ভাষাভাষীদের সুপ্ত সঙ্কীর্ণ চিন্তাকে জাগাইয়া তুলিতেই সাহায্য করিতেছে এবং আসাম রাজ্যকে বিভক্ত করিবার প্রবণতা ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

বাস্তবোচিত দূরদর্শিতা

"কার্য্য-কারণে দেখা যায়, সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী রাস্তাটি আদৌ সর্ব্ব ঋতুতে যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হয় নাই। ঘোষণার পর প্রতি বছরেই বর্ষার সময় রাস্তায় একটা না একটা বিপর্য্যয় দেখা দেয় এবং বেশ কয় দিনের জন্য সার্ভিস বাস এবং মালবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকে। এক একবার বিপর্য্যয় ঘটে আর একটি একটি করিয়া বিপর্য্যয়ের কারণ আবিষ্কার হয় এবং সেই অনুপাতে নূতন করিয়া পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমে আবিষ্কার হইল কালভার্ট অপর্য্যাপ্ত, সরু এবং নীচু ; দ্বিতীয় বারে আবিষ্কার হইল পর্ব্বতগাত্রে রাস্তার পাশে ড্রেন না থাকায় পাহাড়ের জল গড়াইয়া রাস্তাকে দুর্বল করিয়া দেয় ; তাহারই ফলে রাস্তার সোলিং অতলে ঢুকাইয়া গিয়া রাস্তার উপরে গভীর খাদ সৃষ্টি হয়—যান-বাহন চলাচল করিতে পারে না, মেদিনী রথচক্র গ্রাস করে।' তদনুযায়ী নূতন ভাবে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে এবং কালভার্ট ও সোলিং সম্পর্কে নূতন ভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি সংকট সমাধানে যে বাজেট বরাদ্দ হইয়াছে তাহাতে এমন আর একটি নূতন রাস্তাই তৈয়ার হইতে পারে। এই কাজ সবেমাত্র সুরু ; সম্পন্ন হইতে আরও দুই-তিন বছর সময় লাগিবে। এরই মধ্যে তৃতীয় সংকট দেখা দিয়াছে গত ১৪ই জুন। প্রবল বারিস্রোতে পেচারথলের নিকট একটি সেতু প্লাবিত হইয়াছে এবং সেতুর দুই পারস্থিত রাস্তার অনেক দূর পর্য্যন্ত খরস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সমতলভূমিতে আসাম আগরতলা সড়কের উপর দিয়া প্রবলবেগে জলস্রোত বহিতেছে এবং তাহাতে রাস্তা ভাসিয়া গিয়া যান-বাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহা তৃতীয় সমস্যা ; বর্ষণ বেশী হইলে রাস্তার উপর দিয়া জল যায় এবং রাস্তা ভাঙ্গে অতএব এই তৃতীয় সমস্যার জন্য নূতন সমাধান হয় রাস্তা উচ্চ করা, না হয় জল নিকাশের পথ বৃদ্ধি করা জাতীয় একটা কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে।"

—গণরাজ (আগরতলা)।

শোক-সংবাদ

নিতাইচরণ পাল

প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর এবং বাঙলার মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়ের গৌরব নিতাইচরণ পাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ৬৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাঙলাদেশের মৃৎশিল্পকে গতানুগতিকার কবল থেকে মুক্ত করে নিতাইচরণ তাকে এক নতুন রূপ দিলেন। মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নিতাইচরণের অবদান অবিস্মরণীয়। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং শিক্ষাদানের ফলে বাঙলার মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে নিতাইচরণের মাধ্যমে এক নবযুগের অবতারণা হ'ল। মৃৎশিল্পী সমাজে নিতাইচরণের পরলোক গমন এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করল।

শৈলেশ দত্তগুপ্ত

বিশিষ্ট সুরশিল্পী এবং সুখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শৈলেশ দত্তগুপ্ত ১০ই জ্যৈষ্ঠ ৫৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বাঙলাদেশে অসংখ্য ছায়াছবিতে কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনা করে যথেষ্ট সুনামের ইনি অধিকারী হন। ছায়াছবিতে সুরযোজনা ছাড়াও বহুল প্রচারিত অজস্র আধুনিক গানের তিনি সুরকার ছিলেন। বন্ধু, অভিযোগ, মায়ে-না-মায়ে মা ও ছেলে, রাজলক্ষ্মী ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, রত্নদীপ, কথা কও রাজপথ, নীলাকাশ প্রভৃতি ছায়াছবিগুলি সুরস্রষ্টা হিসেবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, 'বসুমতী রোটারী মেশিনে' শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পত্রিকা সমালোচনা

পত্রগুচ্ছ প্রসঙ্গে

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত দেশ ও বিদেশের বিখ্যাত মনীষীদের পত্রগুচ্ছ সমূহ শুধু বঙ্গসাহিত্যের কেন, বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। অগ্রহায়ণ মাসে (১৩৬৬) বসুমতীতে প্রকাশিত মধুসূদনের ইংরাজী পত্রাবলী হইতে আমরা বঙ্গভাষার এই মহাকবির অন্তর্লোক ও মানস গঠন বৈচিত্র্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। এই পত্রগুলির অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় অন্তরঙ্গ সুহৃদ গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত। অন্যান্য সাহিত্য অপেক্ষা পত্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহাতে পত্রলেখক কবি মনের নিরাবরণ, নিরাভরণ সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ধরা পড়ে। ইহা অকৃত্রিম, অকপটও অনাবৃত। আমরা যখন কোন প্রবন্ধ বা রচনা লিখি তখন নিজেকে আবৃত রাখিয়া, যথাসম্ভব পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করি কারণ তাহা বহুর উদ্দেশ্যে লিখিত। আর পত্র রচনার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্য একটি মাত্র দরদী হৃদয়বান পরম সুহৃদ সুতরাং তাহার কাছে যে পত্রধারার প্রবাহ বহিয়া চলে, তাহাতে বকুনির কূলহারা ঝরণার জলধারায় মনের অনেক গোপন কথাই, আশা ও আকাঙ্খা, বাহির হইয়া পড়ে।

কয়েকটি পত্রে বহুভাষাবিদ, বিদগ্ধ মধুসূদনের পরিচয়টি ধরা পড়িয়াছে। পৃথিবীতে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যাহারা মাতৃভাষার ভাণ্ডারে অক্ষয় অমর কিছু রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন তাহারা সকলেই বহুভাষাবিদ। পাশ্চাত্য জগতের দান্তে, মিল্টন, সেক্সপীয়ারের ন্যায় প্রাচ্যখণ্ডের মহাকবি কালিদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্রের ন্যায় মাইকেলও ছিলেন বহুভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম। তিনি গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজী ছাড়াও সংস্কৃত, তেলেগু, সাধু ও প্রাকৃত বাংলা জানিতেন। তাঁহার প্রহসন দুইটি বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ও একেই কি বলে সভ্যতার পাত্রপাত্রীসমূহের অপূর্ব্ব মধুর সংলাপে এই সত্যটি সহজেই ধরা পড়িবে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় মহাদেশের মহাকাব্যের মহারসিক শ্রীমধুসূদন প্রকৃত পক্ষে মহাকবিই ছিলেন। মহৎ চরিত্র, মহান কল্পনা ও মহনীয় আদর্শ তাঁহার চরিত্রকে উদ্বুদ্ধ করিত। তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, দীনতা, নীচতা, কপটতা তাঁহার বিশাল বিরাট চরিত্রে স্থান পাইত না। যাহাতে অন্তর্দাহ হয় হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, কল্পনারূপ মহা-সমুদ্রের উচ্ছসিত তরঙ্গবেগে, বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিদ্যোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটায় হৃদয় মুগ্ধ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয় সেই মহাকাব্যের মহাকবি হইলেন শ্রীমধুসূদন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়—যাহাতে দেব দানব মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী প্রতাপশালী সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়; যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয় তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আছে।

সেই অমর মহাকাব্য মেঘনাদবধের কল্পনা, রচনা ও পরিণতি সতীর্থ রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। প্রচলিত মত এই যে, তিনি ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ রাক্ষসগণকে মহিমময় ও শক্তিশালী করিয়া প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের হানি করিয়াছেন ইহা যথার্থ নহে—বাল্মীকির রামায়ণে রাক্ষসকুলের চিত্র অতিশয় উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত আছে। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, টাসো, মিল্টন—বাল্মীকি, বেদব্যাস, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস প্রভৃতির আদর্শের ও কবিকর্মের অনুসরণ করিয়া তিনি যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন—তাহার অনুকরণ নহে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বাংলার নব জাগরণের (রেনেসাঁস) যুগে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত সংঘাতে ও সংস্পর্শে যে নব সভ্যতার উন্মেষ হইতেছিল তাহাতে সেই অসাধ্য সাধন করিলেন মধুসূদন দত্ত। সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে মূঢ় বর্ব্বর কপিসেনার সহিত সংগ্রামে রক্ষোরাজ রাবণের এতদিনের সজ্জিত কনকলঙ্কা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র মেঘনাদ, বীরবাহু ও পৌত্রেরা অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের জননী ও জায়া রাবণকে অভিসম্পাত করিয়া যাইতেছে—বর্ত্তমান ইউরোপের সৌধকিরীটিনী নগরী সমূহের সহিত, রাবণের পুষ্পকরথ যাহা বর্ত্তমান ব্যোমযানে রূপায়িত—সেই মহাযুদ্ধে ধ্বংসপ্রায়, হৃতরাজ্য সমান-সাম্রাজ্য মহীপতি ধরণীপতি রাবণের মত্ত সমুদ্রতীরের মহাশ্মশানে বসিয়া বিলাপের সাথে মহাকাব্য শেষ হইয়াছে। ইহা কোন কালের কথা? বাল্মীকির যুগের না আমাদের কালের?

দুষ্ট বিভীষণ ও অসভ্য বানরসৈন্যের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র একাকী মহান মেঘনাদের লক্ষ্মণহস্তে অকালমৃত্যুতে, প্রমীলা ও মন্দোদরীর করুণ ক্রন্দন, রাক্ষসরাজ রাবণের মর্মভেদী আত্মবিলাপ, হোমারের ইলিয়াডের মত মাইকেল মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদনের ব্যবহৃত ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ; প্রাচীন বাংলা ছন্দের [illegible] ইহা তাঁহার নিজস্ব নূতন সৃষ্টি। যে

মহাকাব্যের শব্দশ্রুতিঘাতে দুন্দুভি নিনাদ শ্রুত হয়, ঘনঘটা গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়, রণতরঙ্গ বিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য তুরী, ভেরী ও দুন্দুভির ধ্বনি, এবং ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হয় তাহা সেই মহাকাব্যে মাইকেল সৃষ্ট নব অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যেই শ্রুত হইয়াছে। সেই ছন্দ নির্মাণের কথা ও উহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিকথা রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত কয়েকটি পত্রাবলীতে ধৃত হইয়াছে।

সর্বশেষ এই পত্রগুচ্ছ সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে মাইকেলের নাটকপ্রীতি। 'অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে' ইহা নিরখিয়া তাহার কবিপ্রাণে ব্যথা সহিল না বরং দ্বিগুণতর হইল। প্রাক-মধুসূদন বাংলা নাটক উল্লেখযোগ্য নহে। মধুসূদনই প্রকৃত বাংলা নাটকের স্রষ্টা।

কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ইত্যাদি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ বিষাদান্ত নাটক—ট্র্যাজেডি সমূহের স্রষ্টা শ্রীমধুসূদন। মানব-মনের বেদনা, তাহার নিঃসহায়তা ও ভীত নিয়তির সহিত মানুষের অসম দ্বন্দ্বে পৌরুষের লাঞ্ছনা, অলঙ্ঘ্য দৈবরোষ ইত্যাদি ট্র্যাজেডির উপজীব্য। পাশ্চাত্য দার্শনিক, সোপেনহাওয়ার, হেগেল ও অ্যারিষ্টটলের মতবাদ অনুসারে ইহা আত্মার আনন্দ, ন্যায় ও অন্যায়ের সঙ্ঘাত, চিত্তবিক্ষোভকারী বস্তু করুণা ও ভয় সাহায্যে আমাদের ন্যায় অসহায় জীবের অবাঞ্ছিত দুরদৃষ্ট ও ক্লেশের উৎপন্ন করা। ট্র্যাজেডির নায়ক নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বে আমরা আত্মোপলব্ধি করিয়া রসাস্বাদন করি। সেক্সপীয়ারের নাটক সমূহের ন্যায় মধুসূদনের নাটকে দেখিতে পাই নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা। আকাশপথে, মৃত্যুরূপা পদ্মিনীর আহ্বান, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। যোদ্ধা মানসিংহ ও জগৎসিংহ একদিকে পিতা ও পিতৃব্যের মানরক্ষা অপর দিকে পিতৃরাজ্যকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ, এই অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়তির বিধানে করুণা ও বেদনাময় নিষ্ঠুর পরিণামেই নাটকের পরিসমাপ্তি। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে মাইকেলের নাটক-ভাবনা, নাট্যাদর্শ, চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বোপরি তাহার পত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে মধুসূদনের অতুলনীয় বঙ্গভাষাপ্রীতি, ভাবাঙ্গননীকে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যিক অলঙ্কারে রোমান্টিক ও বিষাদান্ত নাটকে, প্রহসনে, কাব্যকবিতায় ভূষিত করার আকাঙ্খা এই পত্র সমূহে অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে। নদীস্রোত যেরূপ তটপ্রান্তে আঘাত করিয়া করিয়া উচ্ছলিত হইয়া কলতান সৃষ্টি করে সেইরূপ মধুসূদনের চিন্তাস্রোতে পত্রধারার প্রবাহে প্রবাহে তরঙ্গিত হইয়া বন্ধুহৃদয়ে আঘাত করিয়া সমস্ত মানস আকাঙ্খা সমূহ ব্যক্ত করিয়াছে। এই লুপ্তপ্রায় পত্রগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ মহৎ সাহিত্যিক কর্ম সন্দেহ নাই।—শ্রীরবিলোচন দে, চকবাজার, পোঃ ও জেলা বাঁকুড়া।

সূর্য্য সেন ও নেতাজী

মাসিক বসুমতীর মাঘ সংখ্যার শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে পরবর্ত্তী মাস সমূহের বসুমতী পত্রিকায় কয়েকজনের সমালোচনা বের হয়েছে। আমি যতদূর জানি, শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্য। তবে এক স্থলে লেখক লিখতে গিয়ে মনে হয় ভাবাবেগে একটা ঘটনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। যেমন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামের কতেক অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতীয় পতাকা উত্তোলন। শোনা যায় চট্টগ্রাম সহরের কোথাও ভারতীয় পতাকা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর উত্তোলন করা হয়নি, তবে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর চট্টগ্রামের অনেক হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে সূর্য্য সেনের সমর্থক লোকেরা এবং জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধের দিনে বৃটিশের গুলিতে আহত এবং মৃত্যুপথযাত্রী কয়েকজন তরুণ বিপ্লবীরা সামরিক ভাবে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইংরেজদের ভারতে আগমনের পর চট্টগ্রামে উহাই প্রথম ও শেষ বারের জন্য ভারতীয় পতাকা উত্তোলন।

মাসিক বসুমতীর ফাল্গুন মাসের সংখ্যায় "সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধটির সমালোচনা করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন সেন নামে একজন লিখেছেন যে সূর্য্য সেনকে ধরবার জন্য বৃটিশ সরকার পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। ইহা সত্য নয়। বৃটিশ সরকার সূর্য্য সেনকে ধরবার জন্য কোনদিন পনেরো হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেননি। হৃদয় বাবু যে লিখেছেন বৃটিশ সরকার সূর্য্য সেনকে ধরবার জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, ইহাই সত্য।

চিত্তরঞ্জন সেন সমালোচনা করতে গিয়ে আরো লিখেছেন যে "সূর্য্য সেন ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধে কালোর পোল নামে যে গ্রামটির উল্লেখ আছে, উহার প্রকৃত নাম "কালার পোল" এবং প্রবন্ধে লেখকের উল্লিখিত নামটি ঠিক নয়। এই সম্পর্কে বলতে ইচ্ছা করি যে কলিকাতাকে কেহ কলকাতা, কেহ কোলকাতা, কেহ কলিকাত্তা বলেন। এইরূপ বলার মধ্যে কোন মারাত্মক ভুল নেই, যেরূপ "কালার পোলকে" যদি "কালোর পোল" বলা হয়, কোনরূপ মারাত্মক ভুল হয় না। এইরূপ তুচ্ছ বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অর্থ হয় না।

শ্রীশচীন দত্ত নামে কটকের এক সাংবাদিক "সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হৃদয় বাবুর বর্ণনা মতে সূর্য্য সেন যে ছয় জন বিপ্লবী সহকর্মী বেছে "বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি" করে কাজ চালাবার ভার দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম রয়েছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী বর্ণনায় উপেন বাবুর নাম নেই।

যাঁহারা ইতিহাস পড়েন তাঁহারা জানেন যে, দুই পক্ষে যখন যুদ্ধ হয়, তখন উভয় পক্ষেই বড় ছোট অনেক সেনাপতি সৈন্য চালনা করেন এবং যুদ্ধে যাদের কৃতিত্ব বেশী, তাদের নাম ইতিহাসে থাকে। যেরূপ বৃটিশের বিরুদ্ধে যে ছয় জন সেনাপতি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সেনাদের পরিচালনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়জন বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁদের নামই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বিপ্লবী সকলের নাম উল্লেখ করতে হলে প্রবন্ধের আকার আরও বড় করতে হয়। অবশ্য এইটি আমার নিজস্ব মত, প্রবন্ধলেখক কেন উপেন বাবুর নাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর বর্ণনায় উল্লেখ করেন নি তিনিই ভালভাবে জানেন। মাসিক বসুমতীর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লেখা "বন্দুক" আলোচ

প্রবন্ধটি পাঠে বুঝা যায় যে তিনি বাংলাদেশ ভাগের বিরোধী, উক্ত লেখকের মতে, বঙ্গবিভাগই বাঙালীদের দুঃখ-দুর্দশার একমাত্র কারণ এবং দুই বঙ্গ পুনরায় মিলিত হলে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনে সুখশান্তি ফিরে আসবে। তিনি আরও লিখেছেন, পূর্ববঙ্গ ভারতের বুকের ভিতর এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মত কোন মুসলমানরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই ভারতের নিরাপত্তার জন্য এবং বাঙালী জাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতের অধীনে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলন একান্ত প্রয়োজন। লেখকের উক্ত মতের সঙ্গে আমিও একমত এবং মনে হয় শুধু বাঙালী হিন্দু নয়, মুসলমানেরাও এই বিষয়ে একমত হইবেন। বর্তমানে যদি বাঙালী হিন্দু মুসলমানদের এই ব্যাপারে মত নেওয়া হয়, তবে মনে হয় শতকরা ১০ জন বয়স্ক ভারতের অধীনে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলনের জন্য মত দিবে। সুধীর বাবুর মত আমিও মনে করি দুই বঙ্গ মিলন ব্যতীত বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনে কোনদিন সুখশান্তি ফিরে আসবে না।

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন" প্রবন্ধটির শেষভাগে লেখক সুধীর বাবুর নিম্ন লিখিত প্রশ্নটির প্রতি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

উপসংহারে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের নিকট একান্ত অনুরোধ যে, তাঁরা একবার চিন্তা করে দেখুন, বঙ্গ বিভাগের ফলে তাদের কত রকম দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাদের সামাজিক জীবনে কত বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্ত বিবেচনা করে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যে ভাবে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানরা মিলিত হয়ে দুই বঙ্গ মিলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টার সফল হয়েছিলেন, সে ভাবে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আবার বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের দুই বঙ্গ মিলনের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন কি না?

বঙ্গ বিভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা আশা করি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন এবং তাই উপরিউক্ত প্রশ্নটির উত্তর বাঙালীদের দিতে কোন অসুবিধা হবে না মনে করি।

শ্রীঅনিলবন্ধু চক্রবর্ত্তী, অবধায়ক বিল ক্লার্ক, এইচ, আই, ডিভিসন (উপরতলা), ১১-এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। যথারীতি পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—বকুলরাণী দেবী, বোম্বাই।

১৩৬৭ সালের বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সুরমা দেবী, সিউড়ী, বীরভূম।

১৩৬৭ সালের প্রথম ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ পাঠালাম।
—Sj. J. B. Dutta, Balasore.

Remitting herewith Rs. 15/- being the annual subscription of Monthly Basumati from 'Baisakh' 1367 B. S. Kindly continue the magazine & oblige—Sm. A. R. Sinha, Dist. Chanda.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন অবধি ছয় মাসের।—উমা মুখার্জী, প্রতাপগড়।

মাসিক বসুমতীর আগামী ছয় মাসের চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম।—অপর্ণা সান্যাল, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা (১৫৲) পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বর্ণা মিত্র, পাটনা।

Herewith my annual subscription for your Masik Basumati for the next year—Sm. Nita Chakraborty, Bhandara, Maharastra State.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—Miss Aneeta Das, Patna.

Sending subscription for the year 1367 B. S.—Baisakh to Aswin. Sm. Bhakti Lata Biswas, Vill, Harankura, 24 Parganas.

Please enlist me as a Member of your Masik Basumati for 6 months from "Baisakh" 1357 B. S. I am remitting herewith Rs. 7·50 nP. for the purpose, Miss Krishna Choudhury, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম।
—মমতা বক্সী, দেরাদুন।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭'৫০ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বীণা ঘোষ, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। গ্রাহিকা করিয়া লইয়া অনুগৃহীত করিবেন।—শ্রীমতী ছবি মৈত্র, দেওরিয়া, ইউ, পি।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সুপ্রিয়া চ্যাটার্জ্জী, Darbhanga.

Sending the yearly subscription for Masik Basumati for the year 1367 B. S. Please send the copies from Baisakh—Mrs. Uma Goswami. Poona.

Annual subscription of Rs. 15/- is sent herewith for monthly Basumati.—Dr. N. Ghatak D. S. C., Agra.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম।
Mrs. Uma Mazumder, Goalpara, Assam.

Remitting Rs. 15/- being annual subscription of Masik Basumati for the Bengali year 1367.
—Sm. Latika Guha, Balasore.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম।
—Sm. Geeta Basu, Tezpur, Assam.

আমি মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা। বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—অপর্ণা ভট্টাচার্য্য, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—লীলা মুখার্জী, আমেদাবাদ।

আপনাদের সহিত আমার সুদীর্ঘকালের সংযোগ আরও ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধির প্রয়াসে টাকা পাঠালাম।—শ্রীমতী মাধবী ঘোষ, কলিকাতা।

জলদান

—শিবশঙ্কর কুণ্ডু অঙ্কিত

(জলরঙ)
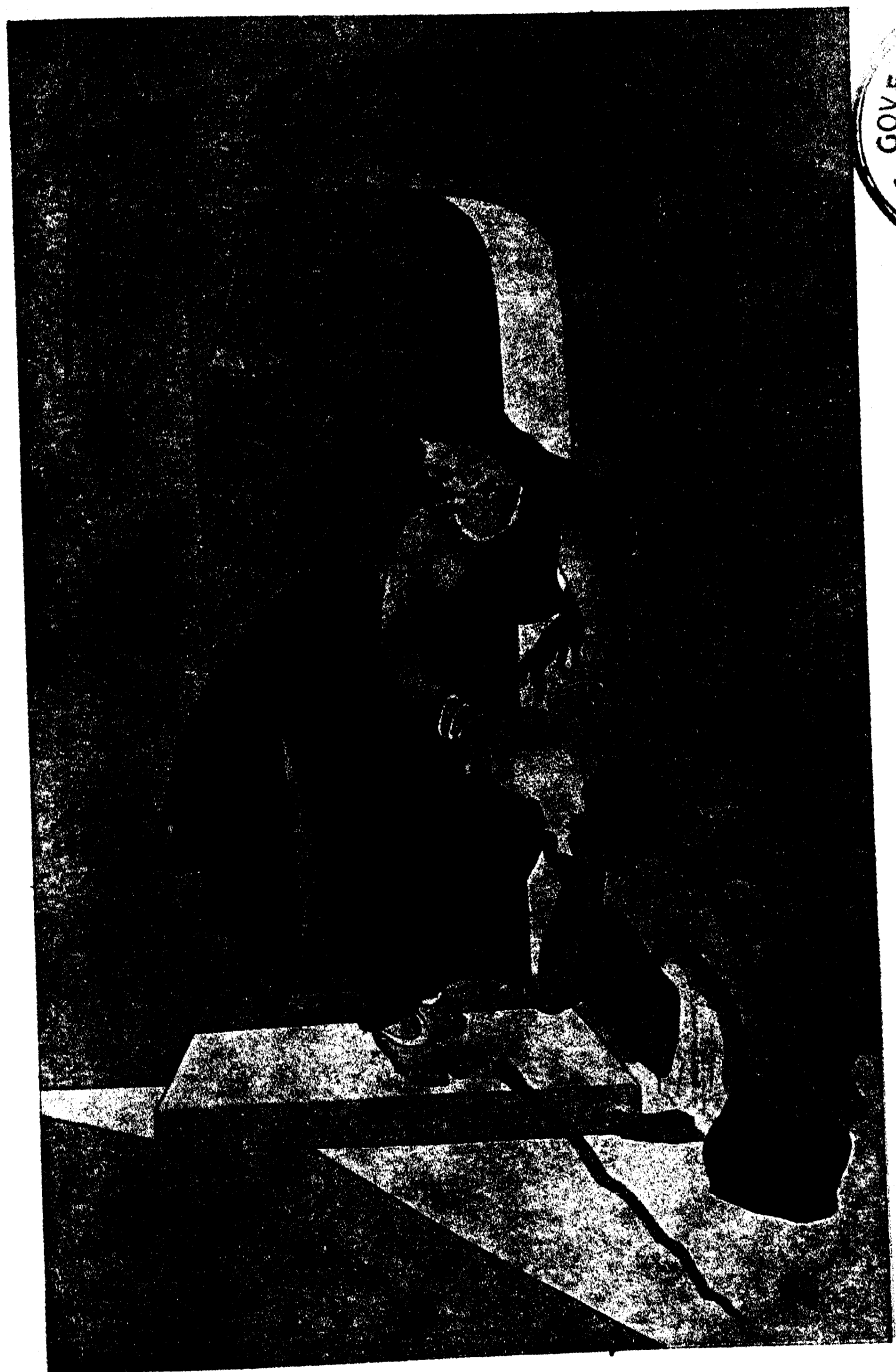
৩৯শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৭] । স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ । [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

বিবাহ

একদিকে নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত ; কারণ যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এদেশের ধারণা। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

আমাদের স্মৃতিকার ভগবান মনু 'আর্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, "সৎসন্তান-কামনার ফলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্য।" ভগবানের নিকট সন্তানোদ্দেশ্যে প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহাদের জন্ম হয় স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনার্য। সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট কামনা করিতে হইবে। অভিশাপ, অসন্তোষের মধ্যে যাহাদের জন্ম, সংযমের অসামর্থ্য হেতু উত্তেজনার অতর্কিত সুযোগে যাহারা জগতে আবির্ভূত হয়, সেই সব সন্তানের কাছে কী আশা করা যাইতে পারে ?

যে অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহা ভগবানের প্রতীকস্বরূপ। একটি নূতন জীব কোনও এক প্রবল শুভ বা অশুভ সংস্কার লইয়া জগতে আসিতেছে। একটি পবিত্র নূতন জীবকে জগতে আনিবার জন্য স্বামী ও স্ত্রীর মিলন—সুতরাং ভগবানের নিকট উহা তাহাদের এক সর্বোচ্চ মিলিত প্রার্থনা। এ কি কৌতুক ? এ কি শুধু ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি, না পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা ? হিন্দু বলে, 'না না, কখনই না।'

মাকে কেন এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিব? কারণ আমাদের শাস্ত্র বলে জন্মগত শুভাশুভ সংস্কারই শিশুর জীবনে ভালমন্দের প্রভাব বিস্তার করে। শত সহস্র কলেজেই যান, লক্ষ লক্ষ বই-ই পড়ুন, আর জগতের বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গেই মিশুন, পরিণামে দেখিবেন যে জন্মগত শুভ সংস্কারই আপনার সাফল্যের যথার্থ কারণ। জন্ম হইতে আপনার সদসৎ অদৃষ্ট নিদিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—জন্ম হইতেই শিশু হয় দেব, না হয় দানব—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম। শিক্ষা এবং অপরাপর জিনিস সব পরে আসে এবং তাহাদের প্রভাব অতি সামান্য। আপনি যেমন জন্ম পাইয়াছেন, তেমনই থাকিবেন। খারাপ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মিয়াছেন, এখন সমগ্র ঔষধালয় সেবন করিলেই কি আপনি সারা জীবনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন? দুর্বল, রুগ্ন দূষিত-রক্ত পিতামাতা হইতে সুস্থ সবল কয়জন সন্তান জন্মাইতে পারে? শাস্ত্রের বিধান—জন্মের প্রাক্কালীন প্রাভাবসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, কোন জাতিকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তাহাকে সর্বপ্রথমে বিবাহের পবিত্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়া মাতৃত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব অর্জন করিতে হইবে। রোমান ক্যাথলিক এবং হিন্দুগণ বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য মনে করায় ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাশক্তিমান ও পবিত্র বহু নরনারীর জন্মদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। আরবগণের দৃষ্টিতে বিবাহ একটা চুক্তি অথবা বলপূর্বক অধিকারের ব্যাপারমাত্র; ইচ্ছামাত্র সে বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে। ফলে কুমারী কিংবা ব্রহ্মচারীর কোন আদর্শ তাহাদের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এমন সব জাতির হাতে গিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথার পূর্ণ অভিব্যক্তি না হওয়ায় তাহারা সন্ন্যাস-আশ্রমকে একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং যতদিন না জাপানীদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ ও ভালবাসা ছাড়াও বিবাহের উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে, ততদিন তাহাদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আপনি যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সতীত্বেই জীবনের একমাত্র গৌরব, তেমনি আমার দৃষ্টিও এবিষয়ে খুলিয়া গিয়াছে যে, আমরণ সাধুচরিত্র জনকয়েক মহাশক্তিশালী ব্যক্তির জন্ম দিতে হইলে জনসাধারণের একটি বৃহত্তম অংশকেও এই সুমহান পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।

হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম উৎপাদনার্থ তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু একথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে সতীত্বধর্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রীপুরুষকে শরীর সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজপক্ষে বিপদশূন্য? কখনই না। কারণ সতীত্বই জাতির জীবনীশক্তি। তুমি কি ইতিহাস দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—যখন ইহা কোনও জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তখনই উহার বিনাশ আসন্ন হইয়া থাকে। এই সকল দুঃখজনক প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতামাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমের দোষ নিবারিত হয়। ভারতের দুহিতৃগণ ভাবপ্রবণ অপেক্ষা অধিক কার্যকুশল। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। কিন্তু যদি লোকে আপনারা স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই।...ইহা কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জিত হয় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

"বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড়শ বৎসর আগে, গদ্য রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময় * * * গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।" (বাংলা ভাষার গতি—বিচিন্তা পৃঃ ১০০)

বাংলা গদ্য সাহিত্য এই দেড় শ বৎসরে মোটামুটি তিনটি যুগ অতিক্রম করেছে—রামমোহন রায়ের যুগ, বিদ্যাসাগরের যুগ, আর রবীন্দ্রনাথের যুগ।

'বাংলা ভাষার গতি' প্রবন্ধে রাজশেখর বসু লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয় নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্ত্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। * * * * রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হানি হয় নি। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে।"

এই ভাব ও ভাষাগত পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ রবীন্দ্রনাথ নিজেই লক্ষ্য করেছেন। 'পরিশেষ'-এর "আগন্তুক" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।

ঋতুর বদল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উলটো পালটা ঘ'টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।"

রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগের কবি বিষ্ণু দে তো রবীন্দ্র রচনা-শৈলীকে অস্বীকারই করেছেন :

"রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি।"

পরিবর্ত্তনে দোষ নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন কি প্রবর্ত্তন ক'রল সেইটি বিবেচ্য। 'বাংলা ভাষার গতি' প্রবন্ধে রাজশেখর বসু পরিবর্ত্তিত আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় কয়েকটি দুর্গতি লক্ষ্য করেছেন। ছয়টি উদাহরণও দিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ দিয়েছেন বাংলা লেখায় চলতি ভাষার প্রসার। লেখায় চলিত ভাষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথও করেছেন, প্রমথ চৌধুরীও করেছেন। সেই ধরণের প্রয়োগে একটা শালীনতা ছিল। রবীন্দ্রোত্তর যুগে চলিত ভাষার নামে সাহিত্যে যে ভাষা আমদানি হ'ল তাতে চলিত ভাষার উপর যথেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও গ্রাম্যতার প্রলেপ মাখান হ'ল। "বলল, দিলে, কর্চ্ছে" প্রভৃতি অদ্ভুত বানান আর "কাক্করকে, তাদেরকে" প্রভৃতি অচল শব্দজাল সাহিত্যের ভাষায় ভেজাল চ'লল।

দ্বিতীয় উদাহরণ দিয়েছেন বানানের অসাম্য। এক এক লেখকের এক এক রকম বানানের ঢঙ। কেউ লিখবেন 'বঙ্গ', কেউ বা লিখবেন 'বংগ'। 'আকাঙ্ক্ষা' স্থলে 'আকাংখা', 'উচিত' লিখতে 'উচিৎ', 'করিল' না লিখে 'কোরিল', 'বিশেষতঃ'র জায়গায় 'বিশেষতো'—যাঁর যা ইচ্ছা বানান লিখছেন। নিয়ম কানুনের বালাই নেই।

"বানানের সমতা ও সরলতা" প্রবন্ধে ('চলচ্চিন্তা' পৃঃ ৫৩) রাজশেখর বসু অদ্ভুত বানানের আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন,— "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিযুক্ত বানান-সমিতির নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে ণ বাদ দিয়ে শুধু ন লেখার বিধান আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও অসংস্কৃত শব্দে ণ নেই, রানী, বরন (বর্ণ), মন (চল্লিশ সের) লেখা হয়। বাঙলায় 'পিণি সোণা' মূর্দ্ধন্য ণ দিয়ে কেন লেখা হয় জানি না, হয়তো সোনার গৌরব-বৃদ্ধির জন্য।

* * * *

আর একটি বিষয় বিচারের যোগ্য। অনেক শব্দে অনর্থক apostrophe বা ঊর্ধ্ব-কমা দেখতে পাই। বার্ণার্ড শ', পাঁচ শ' ইত্যাদিতে ঊর্ধ্ব কমার সার্থকতা কি? না দিলেও লোকে শ-এর ঠিক উচ্চারণ করবে, কেউ শ্ বলবে না। দু'দিন, ন'টাকা ইত্যাদি বানানে ঊর্ধ্ব কমার কিছু মাত্র প্রয়োজন দেখি না।

* * * *

লখনউ-এর যারা বাসিন্দা তারা সরল বানান লেখে লখনউ, কিন্তু বাঙালী অনর্থক লক্ষ্ণৌ লেখে কেন? 'দরভাঙ্গা'র দ্বার নেই, বঙ্গের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, তবু দ্বারবঙ্গ লেখা হয় কেন? আর একটা উৎকট বানান Sir স্থানে স্যার। যেমন ক্যাট হ্যাট ব্যাট, তেমনি স্যার। শুধু সার লিখলেই চলে, সেকেলে বানান সর আরও ভাল মনে করি।

অনেকে মনে করেন, বিদেশী শব্দের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবার জন্ত শেষে হস্‌চিহ্ন দিতেই হবে। এঁরা লেখেন—কাট্‌লেট্‌, টি-পট্‌, প্লেট্‌, ডিশ্‌। হস্‌চিহ্ন না দিয়ে যদি শুধু ডিশ লেখা হয় তবে লোকে ডিশঅ পড়বে এমন ভয় আছে কি? অনর্থক হস্‌চিহ্ন দিয়ে লেখা কণ্টকিত করায় লাভ নেই।"

বানানের সমতা রক্ষা সম্বন্ধে রাজশেখর বসু নিজস্ব কয়েকটি মতামত "বাংলা বানান" ('লঘুগুরু' পৃঃ ১২৭) প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন:

(ক) "সাধুভাষায় লেখা হয় 'করিতেছে, বসিবে', পড়া হয় 'কোরিতেছে, বোসিবে'। চলিত ভাষায় অতিরিক্ত ও-কার, যুক্তাক্ষর এবং হস্‌চিহ্ন দিয়ে 'কোর্চ্ছে, বোস্‌বে' ইত্যাদি লেখবার কোনও দরকার দেখি না, 'করছে, বসবে' লিখলেই কাজ চলে। সুপ্রচলিত শব্দের বানানে অনর্থক অক্ষরবৃদ্ধি করলে জটিলতা বাড়ে, সুবিধা কিছুই হয় না।"

(খ) "আজকাল ও-কারের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সাধুভাষাতেও 'কোরিলো' লিখছেন। এতে বিদেশী পাঠকের কিছু সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু বাঙালীর জন্ত এরকম বানান একেবারে অনাবশ্যক। * * * 'গীত'এর উচ্চারণ হসন্ত কিন্তু 'ভীত' অকারান্ত, 'অভিধেয়' আর 'অবিধেয়' শব্দের প্রথমটির অ ও-তুল্য কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়, সেই রকমেই লিখব—'কপিল' আর 'কপিল'এর বানান একজাতীয় হ'লেও উচ্চারণ আলাদা। যাঁরা পত্তে অক্ষর-সংখ্যা সমান রাখতে চান, তাঁদের 'আজো, আরো' প্রভৃতি বানান দরকার হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে 'আজও, আরও' হবে না কেন? ও-কারের চিহ্ন লিখতে যে সময় আর জায়গা লাগে, আস্ত 'ও' লিখতে তার চেয়ে বেশী লাগে না।"

(গ) "'কারুর' শব্দটি আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। এটিকে slang মনে করি। সাধু 'কাহারও' থেকে চলিত 'কারও', কথার টানে তা 'কারু' হ'তে পারে। কিন্তু আবার একটা র যোগ হবে কেন?"

(ঘ) "য় অক্ষরটির দুরকম প্রয়োগ হয়। 'হয়, নয়' প্রভৃতি শব্দে y-তুল্য আদিম উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' প্রভৃতি শব্দে য় স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র, তার নিজের উচ্চারণ নেই, আমরা বলি 'হালুআ, খাওআ'। 'খাওয়া, যাওয়া, ওয়ালা' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দের বর্তমান বানান আমাদের এতই অভ্যস্ত যে বদলাবার সম্ভাবনা দেখি না * * *। কিন্তু নবাগত বিদেশী শব্দের বানান এখনও স্থিরতা পায়নি, সেজন্ত সতর্ক হবার সময় আছে। Wavell, Boer, Swan, Drawer প্রভৃতি শব্দ বাংলায় 'ওআভেল, বোআর, সোআন, ড্রআর' লিখলে য়-এর অপপ্রয়োগ হয় না। War এবং ware দুই এরই বানান 'ওয়ার' করা অনুচিত, প্রথমটি 'ওঅর', দ্বিতীয়টি 'ওয়ার'। 'মেয়র, চেয়ার, সোয়েটার' লিখলে দোষ হয় না, কারণ 'য়, য়া, য়ে' স্থানে 'অ, আ, এ' লিখলেও উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

'ভাইএর, বউএর, বোম্বাইএ' প্রভৃতিতে যে স্থানে এ'লিখলে উচ্চারণ বদলায় না, কিন্তু লেখা আর বানান সহজ হয়, ব্যাকরণেও নিষেধ নেই।" glideএর অজুহাতে 'য়' প্রয়োগের যুক্তি তিনি

(ঙ) চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সম্বন্ধে বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকা প্রস্তুতের প্রয়োজন বোধ করে তিনি লিখেছেন:

"পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়। অনেকে 'একবেঁয়ে, পায়ে কোঁড়া, খান ইঁট' লেখেন, যদিও চন্দ্রবিন্দুহীন বানানই বেশী চলে। 'কাঁচ, হাঁসি, হাঁসপাতাল' অনেকে বলেন, কিন্তু লেখবার সময় প্রায় চন্দ্রবিন্দু দেন না। পূর্ববঙ্গী অনুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নন, সেজন্য বানানের সময় মুশকিলে পড়েন, যথাস্থানে ঁ দেন না; আবার অস্থানে দিয়ে ফেলেন।"

একজন নাকি 'ঘাড়ে কোঁড়া' স্থলে 'ঘাঁড়ে কোঁড়া' লিখেছিলেন।

অনুরূপ তালিকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন 'ড়'এর ব্যবহারে। "পূর্ববঙ্গে ড় আর র প্রায় অভিন্ন, সেজন্ত লেখার বিপর্যয় ঘটে।" যেমন দেখা যায় 'ঘর ভাড়া' লিখিতে 'ঘড় ভারা'।

তৃতীয় দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন সাহিত্যের ভাষায় পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিকতার প্রভাব। খাস পূর্ববঙ্গের চলতিভাষায় যদি একটা সাহিত্য সৃষ্টি হ'ত তাহ'লে বলার কিছু ছিল না। প্রাদেশিকতারও একটা নিজস্ব মাধুর্য্য আছে। যেমন সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য মাসিক সবুজ পত্রে 'হৈমা' গল্পটি লিখেছিলেন মানিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায়:

"মা-বাপ মরা ছোট ছাওয়ালটারে যেদিন গায়ের একজন পিরস্ত লোক মাসির বাড়ীতে আইন্যা দিয়া গেল, সেইদিন থিকা তার মাসি সেই হাভাইগার ছোট্ট ছাওয়ালটার ক্যাবল যে আশ্রয়স্বরূপ হৈল তা না,—বেওয়া বিধবা মা'র সব অপায়া সংসারটাও য্যান একটা কিছু হাতের সামনে পাইয়া আস্তে ধীরে গুছাইয়া উঠব্যার লাইগল।

(সবুজপত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৬৪০)

বিপদ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার কাঠামোয় পূর্ববঙ্গীয় ভাষার জোড়ন দেওয়াতে। উদাহরণস্বরূপ লিখেছেন, "পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত—গুলি আর টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে রা যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ঝরে পড়ছে'), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সোয়া' (১¼) স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন।"

আরও উদাহরণ দিয়েছেন 'বানানের সমতা ও সরলতা' (চলচ্চিন্তা, পৃঃ ৫০) প্রবন্ধে ই-কারের অনাবশ্যক প্রয়োগ ব্যাপারে। যেমন লিখেছেন, "অনেকে মেইন, চেইন, টেইলার' লেখেন। এঁদের যুক্তি—ইংরেজী শব্দে i অক্ষর আছে, উচ্চারণেও তার প্রভাব পড়ে। এই যুক্তি অযথা। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, কাছাকাছি বানান হলেই যথেষ্ট। 'মেইন, চেইন' ইত্যাদি লিখলে লোকে ই-কারের উপর অতিরিক্ত জোর দেয়। আর একটি ভয়ংকর বানান মাঝে মাঝে দেখি—'কেইক' অর্থাৎ কেক। ই-কার না দিলে কি 'ক্যাক' পড়বার ভয় আছে?"

চতুর্থ দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। যথা 'চলন্ত' বা 'পাহারা'র স্থলে 'চলমান' বা 'প্রহরা' রূপ অপশব্দের ব্যবহার। আরও লিখেছেন, "কার্যকরী স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় শ্রুতিমিষ্ট, তাই 'কার্যকরী উপায়, কার্যকরী প্রস্তাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়। 'কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্ম-[illegible]', '[illegible]' স্থানে 'জঞ্জাল', 'পবিত্র বা পরাণ' স্থানে

'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', কৌশল বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', প্রামাণিক অর্থে 'প্রামাণ্য', ক্ষীণ বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়।"

"ভাষার বিশুদ্ধি" ('লঘুগুরু', পৃঃ ১১) প্রবন্ধে অশুদ্ধ প্রয়োগের আরও বিচিত্র উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। লিখেছেন, "উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, প্রসারতা, সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচিৎ প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ চলছে। 'আধুনিকী' স্থানে 'আধুনিকা', প্রচুর অর্থে 'যথেষ্ট', সংজ্ঞার্থ বা definition অর্থে 'সংজ্ঞা' প্রায় কায়েম হয়ে গেছে।"

বড় দুঃখেই লিখেছেন বাকী কথাটির সংস্কৃত প্রয়োগ বক্রী নয়, পাঁঠার সংস্কৃত পণ্টক নয়, পাহারার সংস্কৃত প্রহরা নয়।

পঞ্চম দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন ইংরেজীর প্রভাব। যথা, medium এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'-এর অহেতুক ব্যবহার। লিখেছেন, "ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে লেখা হয়—'বাংলা ভাষার মাধ্যমে 'বিজ্ঞানশিক্ষা'। 'বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা' লিখলে হানি কি? • • • promise আর signature-এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'-এর অপপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়।—'নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন'। 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখায় দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এই রকম অন্ধ অনুকরণ যদি চলতে থাকে, তবে বাংলা ভাষা শীঘ্রই একটা উৎকট সংকর ভাষায় পরিণত হবে।"

ষষ্ঠ দুর্গতির উদাহরণ দিয়েছেন ভাষায় অনর্থক উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বরের আমদানি। যথা, বাংলা খবরের কাগজে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদে 'বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা' ব্যবহার, অথবা জলে ডুবির খবর দিতে 'সলিল সমাধি' লেখা। বাংলাভাষী না লিখে লেখা হয় 'বাংলাভাষাভাষী'।

উপরোক্ত ছয়টি দুর্গতি রাজশেখর বসুর চোখে পড়েছিল। তিনি নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গীতে সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এতদতিরিক্ত দুইটি দুর্গতি তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সে দুটির দিকে শ্রীকবিভূষণ চক্রবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছেন:

"বিদ্যাসাগরই প্রথমে বাংলাকে সংস্কৃতরূপী হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে তার স্বকীয় একটা রূপ দিয়েছিলেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সালঙ্কারা বাংলা, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছোট ছোট শব্দ দিয়ে গড়া বাংলা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাচীন কথাভঙ্গীর ছাঁচে ঢালা বাংলা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অতি পরিচ্ছন্ন বাংলা, ইত্যাদি বিবিধ পদ্ধতির রচনায় আবির্ভাব হ'লেও বাক্যের মূল কাঠামো ও গঠনপ্রণালীর কোন পরিবর্তন হয়নি। বাক্যের পর বাক্য সাজাবারও একটা সুনির্দিষ্ট ধারা অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। নিজের বিশিষ্ট রূপটি রক্ষা ক'রে ঐসব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে অবশেষে বাংলা এমন একটা অপরূপ ভাষা হ'য়ে উঠেছিল যে পৃথিবীর কোন ভাষাই বোধ হয় সৌন্দর্যে, শক্তিতে ও প্রকাশক্ষমতায়, ব্যঞ্জনায় ও তীক্ষ্ণতায় তাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারতো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'জীবনস্মৃতি', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার ইয়ারী কথা'র ভাষার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আজ আমরা ঐ অপূর্ব সম্পদটাকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করতে বসেছি কেন? কর্তৃপদ, কর্মপদ এবং সম্বন্ধ পদকে সবলে বাক্যের শেষ প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছি, অন্যান্য পদগুলিও যথেচ্ছা ওলট পালট করছি এবং বাক্যের গঠনের ঋজু মূর্তিটাকে অষ্টাবক্র মূর্তিতে পরিণত ক'রে ও তার গতির তালটাতে বেতাল ঢুকিয়ে লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়ে পরম আনন্দ অনুভব করছি। যে স্থলে আগের কালের ভাষা বলতো, "শশাঙ্কের বাল্যকালেই তার কবি-প্রতিভা বিচক্ষণ পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তাই তিনি পুত্রকে কারিগরী বিদ্যা শিখতে পাঠাননি"—যে স্থানে আজকের ভাষা বলছে, "শশাঙ্কের বাল্যকালেই তার কবি-প্রতিভা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিচক্ষণ পিতার। তাই পুত্রকে কারিগরী বিদ্যা শিখতে পাঠাননি তিনি।" যে স্থলে আগেকার ভাষা বলতো, "অত ধন থাকলেও প্রথম দর্শনে তাঁর ব্যক্তিত্ব মোটেই আমাকে অভিভূত করতে পারেনি," সে স্থলে আজকের ভাষা বলছে, "অত ধন থাকলেও প্রথম দর্শনে তাঁর ব্যক্তিত্ব মোটেই অভিভূত করতে পারেনি আমাকে।" যে স্থলে আগেকার ভাষা বলতো, "রঞ্জন বললে, 'মিঠে কলও মাঝে মাঝে তেতো লাগে', সে স্থলে আজকের ভাষা বলছে, 'মিঠে কলও মাঝে মাঝে তেতো লাগে' বললে রঞ্জন।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ যেন ভাষাটা দুই পা ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে দুই হাতের উপর ভর ক'রে এদিক ওদিক বেঁকে বেঁকে টলমল গতিতে চলছে অথবা কোমরে তাড দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গটাকে পেছনের দিকে বেঁকিয়ে মাথা দিয়ে মাটি ছোঁবার চেষ্টা করছে। আমার দৃষ্টিতে ভাষার এই ভঙ্গীটা সুন্দর তো নয়ই, উদ্ভট।

•　　•　　•　　•

বাংলায় নূতন সাহিত্যে আর একটা ভাষা-রীতিও দেখা দিয়েছে। বিশেষ্য বিশেষণের ছোট ছোট সমষ্টি, তার উপাদান, ক্রিয়াপদ প্রায় সম্পূর্ণ বর্জ্জিত। সমস্ত রচনাটাই যেন একটা তারবার্তা।

বাংলা ভাষার যে আধুনিক রূপ রাজশেখর বসু কল্পনা করেছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য "সাধু ও চলিত ভাষা" ('লঘুগুরু', পৃঃ ৬৭) প্রবন্ধে দেখতে পাই। সেই প্রবন্ধ থেকে একটি চুম্বক উদ্ধৃত করলাম।

"আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয় পদ্ধতি বা Syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হ'ক।

(৩) অন্যান্য অসংস্কৃত ও অসংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হ'ক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হ'ক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ অল্প অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, যথা— 'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওয়া হোক, যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরাতন' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিত ভাষার অঙ্গ এবং—অর্থাৎ বিদ্যাভ

লেখকগণ যা চলিত ভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবস্থ' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধু ভাষার একচেটে অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '···হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দুদিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে—চলিত ভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছুড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিষ নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিত ভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।"

২

"ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার" ('বিচিন্তা', পৃঃ ৫৩) প্রবন্ধে রাজশেখর বসু বাংলা ভাষার লেখকদের চারটি মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করেছেন। যথা—(১) শব্দদ্বৈত বাহুল্য, (২) শব্দবাহুল্য, (৩) শব্দের অপচয়, এবং (৪) শব্দবিশেষের প্রতি ঝোঁক বা আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশী অন্য আর্য ভাষায় তত নহে"। যথা—কাঠে কাঠে, সঙ্গে সঙ্গে, চলিতে চলিতে, ঝুড়ি ঝুড়ি, গরম গরম, যাব যাব, বোঁচকা বুঁচকি, কাপড় চোপড়, ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দোষ বিচার চলে না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যকেও অপপ্রয়োগ করা যায় এবং করাও হচ্ছে। রাজশেখর বসু এমনি অপপ্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত 'খেলাধূলা' শব্দের ব্যবহারে দিয়েছেন। যেমন—

"সংবাদপত্রে sports অর্থে খেলাধূলা চলছে। শিশুর খেলাকে এই নাম দিলে বেমানান হয় না, কিন্তু ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতিকে খেলাধূলা বললে খেলোয়াড়ের পৌরুষ ধূলিসাৎ হয়। লোকে বলে—মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছি। খেলাধূলা দেখতে যাচ্ছি বলে না। শুধু খেলা শব্দে যখন কাজ চলে তখন অনুপ্রাসের মোহে খেলার সঙ্গে অনর্থক ধূলা যোগ করবার দরকার কি?"

শব্দবাহুল্য দোষের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দেশনেতাদের নামের পূর্বে বিশেষণ সংযোগ। যথা, 'নেতাজী সুভাষ রোড'। এ বিশেষণের বহুল ব্যবহারকে উপসর্গ ব্যবহার বলেছেন, যেমন ব্যবহার আছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রে বা অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রে। কথাটা ঠিক।

"অনামা ভূষণং ধত্তে ন কনিষ্ঠা ন মধ্যমা
নিজনাম প্রসিদ্ধস্য ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্।"

পাঁচ আঙুলের মধ্যে একটির নাম অনামিকা। আংটী পরা হয় সেই আঙুলেই। সেটি যে অনামিকা অর্থাৎ নামগোত্রহীন। অন্য আঙুলের নিজ নাম প্রসিদ্ধি আছে—কনিষ্ঠা, মধ্যমা, তর্জনী, অঙ্গুষ্ঠ। সেগুলিতে ভূষণ ধারণের প্রয়োজন নেই।

'সন্দেহ নাই' কথাটা উঠে গেল। লিখেছেন তার বদলে চলছে 'সন্দেহের অবকাশ নাই'। তেমনি চলছে 'দিলেন' স্থানে 'প্রদান করিলেন', যোগ দিলেন স্থানে 'অংশ গ্রহণ করিলেন', 'গেলেন' স্থানে 'গমন করিলেন'। এগুলিকে বলেছেন শব্দের অপচয়।

কোন কোন লেখকের বিশেষ কোন শব্দের উপর ঝোঁক বা আকর্ষণ আছে। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন কোন লেখক কিছুতেই 'যুবক-যুবতী' লিখবেন না, লিখবেন 'তরুণ-তরুণী'। ভাবেন বোধ হয় এরকম লিখলে পাত্রপাত্রীর 'বয়স কম দেখায় এবং লালিত্য বাড়ে'। অনাবশ্যক হসচিহ্ন ব্যবহার এমনি আর একটি মুদ্রা দোষ। উদাহরণ দিয়েছেন, 'তিন্‌টি ডিম্ ভেঙ্গে নিন্, তাতে একটু নুন্ দিন্'।

একটি বিকারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অবিবাহিতা মেয়েদের নামের পূর্বে প্রাচীন রীতির শ্রীমতী বর্জন করে ইংরেজী 'মিস্' লেখার ঢঙে 'কুমারী' লেখা হয়। এ ঢঙের দরকার নেই বলেছেন কেননা 'পুরুষের কৌমার্য তো ঘোষণা করা হয় না'। একটা দিক ভেবে দেখেননি মনে হয়। নামের আগে কৌমার্য চিহ্ন কুমারী লেখার ফলে কেহ তো মেয়েটিকে রাজকুমারী ব'লেও ভুল করতে পারেন।

লিঙ্গ বিপর্যয়ের কয়েকটি রসিক উদাহরণ দিয়েছেন "গ্রহণীয় শব্দ" ('চলচ্চিন্তা', পৃঃ ১৭) প্রবন্ধে। লিখেছেন: "স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত দেখা যায়। জীবনচরিত বা চরিত স্থানে জীবনী, জন্মবার্ষিক বা জন্মদিন স্থানে জন্মবার্ষিকী, পরিক্রম বা পরিক্রমণ স্থানে পরিক্রমা, শতাব্দ স্থানে শতাব্দী, প্রকাশ স্থানে প্রকাশনা ইত্যাদি চলছে। এতে আপত্তির কারণ নেই, কিন্তু স্থানে অস্থানে কার্যকরী শব্দটির এত চলন হল কেন? শুধু খবরের কাগজে নয়, অনেক জনপ্রিয় লেখক আর অধ্যাপকের লেখাতেও দেখতে পাই—কার্যকরী উপায়, কার্যকরী সমাধান, প্রস্তাব কার্যকরী করা ইত্যাদি। কার্যকর বা কার্যকারী লিখতে বাধে কেন?

আর একটি অদ্ভুত ফ্যাশন সম্প্রতি দেখা দিয়েছে ক্লীবলিঙ্গ-প্রীতি। পত্রিকা বা পুস্তকের নাম রূপম্, সুন্দরম্, অরবীন্দ্রচরিতম্ ইত্যাদি রাখলে আপত্তি করা যায় না। বোধ হয় গৌরব বৃদ্ধির জন্যই সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত নাম দেওয়া হয়। ভরতনাট্যম্‌ও এই রকম হতে পারে। অনেক দ্রাবিড়ী নামের শেষে ম্ আছে, যেমন—পায়সম্ রসম্ পপড়ম্ শ্রীরঙ্গম্ চিদম্বরম্। ভরতনাট্যম্‌ও হয়তো সেইরকম। সেদিন রাস্তায় একটি কবিরাজী দোকানে সাইন বোর্ড দেখেছি—শ্রীআয়ুর্বেদম্। সংস্কৃত ভাল করে না শিখলে কবিরাজ হওয়া যায় না। আয়ুর্বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ। দোকানের মালিক শেষে ম্ যোগ করে আয়ুর্বেদকে নপুংসক করলেন কেন? আর একটি শোচনীয় নাম মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। একজন লেখক তাঁর রচনায় শেষে নাম লেখেন—ভারত পুত্রম্। এই ভারত সন্তান ক্লীবত্ব বরণ করলেন কোন্ দুঃখে?"

৩

"বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। তার এক কারণ, বাঙালীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, অর্থাৎ নূতন বস্তু নূতন রুচি আর নূতন আচারের প্রচলন। অন্য কারণ, অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছাপূর্বক ইংরেজী ভাষার অনুকরণ।" ("গ্রহণীয় শব্দ", চলচ্চিন্তা, পৃঃ ১৭)।

তৃতীয় কারণও আছে, যথা—বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় পারিভাষিক শব্দের প্রচলন। নূতন রুচির কথায় "গ্রহণীয় শব্দ" প্রবন্ধে বলেছেন :

(১) "কথায় কথায় thanks, please, kindly ইত্যাদি বলা ইংরেজী শিষ্টাচার। আমরা তা মেনে নিয়েছি। একবার একটি মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় আমি নাম সহি করলে সে বলেছিল, ধন্যবাদ। আমি প্রশ্ন করলাম, কে ধন্য, তুমি না আমি। মেয়েটি প্রথমে একটু থাবড়ে গিয়েছিল, তারপর উত্তর দিল—আমি, আমি। ধন্য শব্দের এক অর্থ কৃতার্থ, আর এক অর্থ খুব বাহাদুর, যেমন ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী। মেয়েটি প্রথম অর্থে নিজেকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে আমাকে দেয় নি। Thanks-এর বাঙলা চাই, ঠিক সমার্থক না হলেও ধন্যবাদ মেনে নেওয়া যেতে পারে। Please, Kindly স্থানে অনুগ্রহপূর্বক, দয়া করে ইত্যাদি বলা হয়। হিন্দীতে 'কৃপয়া' এই ছোট সংস্কৃত পদটি চলছে, বাঙলাতেও মেনে নেওয়া যেতে পারে।"

(২) "ইংরেজীতে অনেক লোকের নাম একত্র লিখতে হলে আগে Messrs বসানো হয়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই Mister। হিন্দীতে তার নকল চলছে সর্বশ্রী, বাঙলাতেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। সর্বশ্রী শুনলেই মনে আসে হাওড়াশ্রী ব্যাটরাশ্রী। লোকে যদি এতই শ্রীর কাঙাল হয় তবে উৎকট সর্বশ্রী না লিখে শ্রীর পর কোলন বা ড্যাশ দিয়ে সমস্ত নাম লেখা যেতে পারে।"

ইংরেজী ভাষা অনুকরণপ্রীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আরও উদাহরণ দিয়েছেন "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান" প্রবন্ধে ('বিচিন্তা', পৃঃ ৭৬) লিখেছেন :

"অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য ইংরেজীতে ভাবেন এবং যথাযথ বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। এতে রচনা উৎকট হয়। The atomic engine has not even reached the blue print stage,—'পরমাণু এঞ্জিন নীল চিত্রের অবস্থাতেও পৌঁছায় নি।' এ রকম বর্ণনা বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একটু ঘুরিয়ে লিখলে অর্থ সরল হয়—পরমাণু অঞ্জিনের নকশা পর্যন্ত এখনও প্রস্তুত হয়নি। When sulphur burns in air the nitrogen does not take part in the reaction—'যখন গন্ধক হাওয়ায় পোড়ে তখন নাইট্রোজেন প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না'। এরকম মাছিমারা নকল না করে 'নাইট্রোজেনের কোনও পরিবর্তন হয় না' লিখলে বাংলা ভাষা বজায় থাকে।"

পরিভাষা সম্বন্ধে উক্তি করেছেন "বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সংকলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে"।

পরিভাষা ব্যবহার না করে লিখিলে বাংলার কি বিকট রূপ হয় তার একটি উদাহরণ "বাংলা পরিভাষা" ('লঘুগুরু,' পৃঃ ১৫) প্রবন্ধে দিয়েছেন :

"(গ্রামোফোন রেকর্ড)। Masterটি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক groove-এর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে Electroplate করিয়া ইহার উপর Copper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাণ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। master-এর music lines তখন এই copyর উপর উঠিয়া আসে। এই copyকে Original বলা হয়।"

আবার বে-আক্কেল পরিভাষা ব্যবহারের একটি উদাহরণও দিয়েছেন :

"নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতৌলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া"।

মানে বোঝা দায়—আন্দাজ করা যাচ্ছে নেত্রজন মানে নাইট্রোজেন, অসিতৌলিন মানে এসিটিলিন, আর কুলহরিণ কোন আশ্রমমৃগ নয়, বোধ হয় ক্লোরিণ।

এ সম্বন্ধে মতামত রাজশেখর বসুর ভাষায় উদ্ধৃত করছি :

"রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্যশালিনী আর্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান-প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল আহাম্মুকতাই প্রকাশ পাইবে।' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০১)।

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক, ফারসী, আরবী, পোর্তুগিজ, ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন ক'রে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেটফুল হয়েছে' তবে ভাষা-জননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্নেটোটা বেশ ফিন্‌কি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একেবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে-বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত ক'রে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর-ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজি প'ড়ে আমাদের জিভের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ ক'রে 'বাচ্‌ঞা'কে 'বাচিঞা', 'জৈনিক'কে 'জৈনিক', 'মোটর'কে 'মটোর', 'গ্লিসারিন'কে 'গিল্‌ছেরিন' বলে, তাতে ক্ষতি হবে না—যদি বানান ঠিক থাকে।"

৪

রাজশেখর বসু বঙ্গভাষার উপাসক ছিলেন। মাতৃভাষা তাঁর উপাস্যা দেবী ছিলেন। সেই দেবীর অঙ্গসজ্জায় বিভিন্ন দেশের পুষ্পসজ্জার প্রয়োগে তাঁর চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। আপত্তি ছিল অমেধ্য, অখাদ্যীয় দ্রব্যে উপচার ব্যবহারে। তাই তাঁর বাংলা ভাষার ত্রুটী বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা এত তিক্ত।

"ভাষার কথা" প্রবন্ধে, অধুনালুপ্ত 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা প্রচলন চেষ্টাকে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থ টি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে, 'পয়লা সামলনা মুস্কিল হায়।' স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।"

('সবুজ পত্র', ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৬)

মনুষ্য সৃষ্টি প্রচেষ্টায় বানর সৃষ্টির যে আদিম অভ্যাস তাহারই বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর সমালোচনা। বাংলা ভাষা সংস্কারের অজুহাতে "অপভাষা" সৃষ্টি প্রচেষ্টার চিরবিরোধিতা তিনি ক'রে গিয়েছেন

বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি-বিবর্তন

ডক্টর শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের লক্ষ্য হ'ল রসসৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে হাস্যরস বা করুণরস সৃষ্টি করেন তা প্রাচীন কালের মত নয়। তাঁর হাস্যরস বিদূষকের ঔদরিকতা ও গ্রাম্যহাস্যের থেকে মুক্ত, তাঁর করুণ রস গভীর ও গম্ভীর। আর সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান, আদিম ও আদিরস শৃঙ্গাররসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের শালীনতাবোধের কথাও আলোচনা করেছেন কবিগুরু। এক সেকেলে পণ্ডিতের প্রাচীন ধরণের আদিরসের অবতারণায় লজ্জিত হয়ে সেই আলোচনাক্ষেত্র হ'তে দ্রুত পলায়নকারী বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই তিনি আদিরস, হাস্যরস, করুণরস ইত্যাদির ক্ষেত্রে বররুচি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করবার সময় মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা তাঁর বিশ্লেষণের মধ্যে পাই তাঁর কিঞ্চিৎ বয়স হয়েছে···চুলে এবং মনে তাঁর পরিপক্কতা। সামনে তাঁর প্রসিদ্ধি, সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু না জীবনে না সাহিত্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পরিপক্কতা নিয়ে মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিও প্রথম থেকে পরিপূর্ণ বিকশিত ছিল না। অবশ্য শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম থেকেই পূর্ণ বিকশিত। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ তথ্য আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। বঙ্কিমের প্রতিভা প্রথম থেকে পূর্ণ বিকশিত ছিল না। তাঁর রুচিও প্রথম থেকেই বররুচি ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পাই, তিনি প্রাচীন সাহিত্যধারা-জলে স্নান ক'রে হাস্যরস ও শৃঙ্গাররস পরিবেশন করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিদ্যাদিগ্গজ সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকের বিদূষকের নিকট-আত্মীয়। এ হাস্যরস খুব শুচিশুভ্র নয়। আদিরসের ক্ষেত্রেও এখানে তিনি প্রাচীন আদর্শকে বেশ কিছুটা অনুসরণ —————".

বিশদ আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকে হাস্যরস অনেক পরিমাণে বিদূষক-নির্ভর। এ বিদূষক ব্রাহ্মণ, উদরপরায়ণ, স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন। কখনও নামেন তিনি দাসীর সঙ্গে কোন্দলের প্রতিযোগিতায়। কিন্তু প্রতি প্রতিযোগিতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যাভিমানী রসিকম্মন্য বিদূষকের ঔদরিকতা আর দাসীর বিচক্ষণতা। ফলে দাসীকে গালি দেন বিদূষক। দাসীর প্রত্যুত্তর পান তিনি। দাসীর শাস্তিবিধানের হুমকি আসে তারপর। 'শকুন্তলা'র বিদূষক বয়স্য ব্রাহ্মণ, ঔদরিক। রাজাকে প্রেমের 'হিতোপদেশ' দেন তিনি, আর আমাদের শোনান প্রেমের 'পঞ্চতন্ত্র' কথা, "পিণ্ডখর্জুরে অরুচি জন্মালে মানুষের যেমন তিন্তিড়ী ভক্ষণের সাধ জাগে সেইরূপ পুরনারী-ভোগক্লান্ত রাজা এখন মুখ বদলাবার জন্য আশ্রমকন্যার দিকে নজর দিচ্ছেন।" বিদূষকের মাথায় কেবল খাবার চিন্তা। তাই রাজা যখন তাঁকে একটা শক্ত কাজ করতে বলেন তখন চট ক'রে প্রশ্ন করেন বিদূষক, "কি কাজ? মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপার?" "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্"-এ বিদূষক চাঁদ দেখে মিষ্টির টুকরোর কথা স্মরণ করে ("খণ্ড মোদক সস্সিরো")। রাজার সঙ্গে রাজক্রিয়া ঘটিত আলোচনায় তিনি মন্ত্রী। 'দুর্গেশনন্দিনী'র হাস্যরস অনেক পরিমাণে 'বিদ্যাদিগ্গজ'-নির্ভর। ঔদরিক ব্রাহ্মণ বিদ্যাদিগ্গজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তাঁর নামেতেই। আবার বন্দী জগৎসিংহ তাঁর কাছ থেকে প্রিয়া তিলোত্তমার সমাচার সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। "কর্পূরমঞ্জরী"তে বিদূষক বসন্তবর্ণনা করেছেন। বসন্তের সাদা ফুল তাঁর কাছে ভাতের মত আর হলদে ফুল তাঁর কাছে "মহিষ-দধি"র স্মৃতি বহন ক'রে এনেছে।

পেটুক বিদূষকের পরাজয় ঘটায় দাসী বসন্তবর্ণনার বৈদগ্ধ্যে। তারপর কথাকাটাকাটির সূত্রে সে-দাসী নূপুরপরা পায়ের লাথিমারার হুমকি দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্গজ আশমানী ও বিমলার রূপজালে ঐরাবতের মত নাকানি-চুবানি খেয়ে যে-হাস্যরস সৃষ্টি করেছে তাও

করা যাক। এখানে আশমানী দাসী এবং বিমলা দাসীরূপে পরিচিত। বিদ্যাদিগ্‌গজ পেটুক ব্রাহ্মণ···নির্ব্বোধ রসিক। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে (যখন বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি পরবর্ত্তী বঙ্কিমের রুচির মত শুচিশুভ্র হয়ে ওঠেনি) আশমানী কেবল পরিহাস-রসিকতা করেনি, দিগ্‌গজের মুখের ভিতর পানের পিক ঢেলে দিয়েছে। প্রথম সংস্করণে দিগ্‌গজ গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থতু কেমন করিয়াই বা গেলেন? নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল। প্রথম সংস্করণে আশমানী দিগ্‌গজের গাল কামড়ে রক্ত বার ক'রে পরিহাসের চূড়ান্ত করেছে। এই ধরণের হাস্যরসকে নিশ্চয়ই শুচি-শুভ্র হাস্যরস বলা চলে না। এ হচ্ছে প্রাচীন ধারার হাস্যরস। এখানে হাস্যরস বর্ত্তমান কালের পাঠকের কাছে বীভৎস রসের উদাহরণ বলে বোধ হবে।

আদিরসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে প্রাচীন কাব্যধারা-জলে অবগাহন স্নান করেছেন, তা দেখানো যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যে-বঙ্কিমচন্দ্রকে পণ্ডিতী আদিরসের অবতারণায় লজ্জিত হয়ে পলায়ন করতে দেখেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালের সাতাশ বছরের যুবক বঙ্কিমচন্দ্র নন। সকলেই জানেন যে সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যে নারীদেহের 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্' (vital statistics) বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় লজ্জার স্থান ছিল না। এখন যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর প্রতিযোগিতায় ওপরের ঘের, মাঝের ঘের, আর নিচের ঘের মাপবার জন্য দুই ইঞ্চির দরকার হয়, তখন সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতায় নারীদেহের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় স্তনের কাঠিন্য ও পীনত্ব; কটির ক্ষীণত্ব; আর নিতম্ব-উরুর গুরুত্ব বর্ণনা না হ'লে কবিতাই হোত না। প্রাকৃতের কবিগুরু রাজশেখর বালকমুষ্টিতে ধরা যায় এমন নারী-কটির, আর দুই বাহু দিয়েও ঘেরা যায় না এমন নিতম্বঘেরের বর্ণনা করেছেন (মণণে মজঝং তিবলিবলিদং ডিম্ভ মুট্‌ঠিগেজ্ঝং। ণো বাহুহিং রমণ ফলঅং বেট্‌ঠিদুং জাদি দোহিং॥)। সংস্কৃত-প্রাকৃতের পদাঙ্কানুসারী প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকেরা নারীদেহের ঐ সকল অঙ্গের খোলাখুলি আলোচনা করতে দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করেন নি। ইংরাজী সাহিত্যের নব-ধারাজলে স্নাত ভিক্টোরিয়-রুচিবিশিষ্টরা এবম্বিধ বর্ণনায় "শক্‌ড" (shocked) হয়েছিলেন। যে-বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে দিয়ে প্রাচীনপন্থীর স্থূল রসিকতার পালিয়ে গিয়েছিলেন সলজ্জ-সঙ্কোচে, তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র। আর যে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কলম ধরেছিলেন তিনি বয়সে নবীন আর ইংরাজী-শিক্ষিত হ'লেও ভাটপাড়া এবং সংস্কৃত-সংস্কৃতি হ'তে খুব দূরে ছিলেন না। সেই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিনি স্তন-উরু-নিতম্ব বর্ণনায় রসাবিষ্ট। পরবর্ত্তীকালে তিনি যে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনীর 'ভাইট্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স' দেননি তার কারণ তাঁর মধ্যে নব্য রুচির ক্রমবিকাশ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে তিনি প্রাচীন সাহিত্যাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক অংশ বাদ দিয়েছেন। আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

"কুচযুগ দেখিয়া দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা-অঞ্চলে পলাইয়া [illegible]···আছি ছিলেন ধবলগিরি, তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ আড়াই ক্রোশ বই ত নয়, ইহার পরিমাণ (পরবর্ত্তী সংস্করণে "এ চূড়া") অন্যূন তিন ক্রোশ হইবেক।··· নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বৃহৎ তাহাতে বিস্তর গাছপালা, গো-মনুষ্যাদি থাকিতে পারে, কিন্তু নিকটে উরুস্বরূপ দুইটি কদলী গাছ; কদলীগাছের আওতায় অন্য গাছ গজায় না; আর পাছে কলাগাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া বিধাতা তথায় গো-মনুষ্যের সৃষ্টি করেন নাই।"

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণে বেশবিন্যস্ত বিমলার অনাবৃত বক্ষের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে লিখেছেন, কাঁচুলি-শূন্য বক্ষস্থল কালজয়ী কি না দেখ?"

পরবর্ত্তী সংস্করণে বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিদায় নিয়ে (দশম পরিচ্ছেদ) বিদ্যাদিগ্‌গজের কাছে যাবার প্রাক্কালে কেবল দৃষ্টিপাতে বীরেন্দ্র সিংহকে নন্দিত ক'রে গেছেন কিন্তু প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র আদিরস সৃষ্টির এই সুযোগ ছাড়েন নি। সেখানে "বীরেন্দ্রের হৃদয়ে (বিমলার) কাঁচলিযুক্তা স্পর্শ হইল। একবার দ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া (বিমলা) নিজ রসাল ওষ্ঠাধর বীরেন্দ্রের ওষ্ঠে সংক্ষিপ্ত করিলেন।"

পরবর্ত্তী সংস্করণে মার্জ্জিতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, তিলোত্তমা গীতগোবিন্দ পড়ে লজ্জিত হলেন। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ছিল তিলোত্তমা গীতগোবিন্দের কোন্ অংশ পাঠ করে লজ্জিত হয়েছিলেন, ("রিপুমিব কেলিষু লোলম্)।

কৎলু খাঁর হত্যা দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে বিমলা ও নর্ত্তকীদের আদিরসের যে ফোয়ারা ছুটিয়েছেন তা পরবর্ত্তী সংস্করণে কিছু বাদ দিয়েছেন (প্রথম সংস্করণের পাঠান্তর 'দুর্গেশনন্দিনী'র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে দ্রষ্টব্য)।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ যে 'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে অনেক বদলেছে তা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে। ভারতচন্দ্রও কবি, মধুসূদনও কবি। ভারতচন্দ্র প্রাচীন কাব্যধারার কবি, আদিরসের কবি। মধুসূদন আধুনিক কাব্যধারার কবি, বীররস বা করুণরসের কবি। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনাকালে ভারতচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণ করেছেন দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। তিনি আশমানীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বিদ্যার রূপবর্ণনার আদর্শও অনুসরণ করেছেন। যথা:—

"আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়; ফণিনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটি কি? আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতরে গেলেন।"

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপবর্ণনা ক'রে লিখেছেন:—

বিননিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিতা যে এই সময় গভীর ভাবে পড়েছিলেন তার পরিচয় "মৃণালিনীর" (১৮৬৯) মধ্যেও রেখেছেন। ভারতচন্দ্রের বিপরীত বিহার বর্ণনা আদিরস-রসিকের পরম উপভোগ্য সামগ্রী। তার মধ্যে ভারতচন্দ্রের—

'আজি দিন দ্বিপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বাড়িয়াছে করী।'

প্রভৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত 'মৃণালিনী'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার নিম্নোদ্ধৃত গানটি—

দেখিলাম সরোবরে কাঁপিছে পবন-ভরে
মৃণাল উপরে মৃণালিনী।

'মৃণালিনী'র প্রথম সংস্করণে গিরিজায়ার মুখে আদিরসের যে গীতিটি ছিল সে হ'ল—

কটি-বাস কসিয়ে রাস-রসে রসিয়ে
মাতিল রস-কামিনী।

এই গীতটি পরবর্ত্তী সংস্করণে মার্জ্জিতরুচি বঙ্কিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' হ'তে 'কপালকুণ্ডলা'র মাত্র এক বছরের কালানুক্রমিক ব্যবধান ও প্রায় এক শতাব্দীর রুচি-পার্থক্য। পরবর্ত্তী কালে 'মৃণালিনী' একটি প্রতিভাহীনতার অধ্যায়। সে অধ্যায় অতিক্রম ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি প্রাচীন কাব্যধারার দিকে এগিয়ে চলেছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আপন পথ খুঁজে নিল। সেখানে অনেক কবির উদ্ধৃতির সাথে পরিচ্ছেদের শিরোদেশে মধুসূদন হ'তে উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যেন হঠাৎ প্রাক্-'কপালকুণ্ডলা' যুগে ফিরে (সত্যই আমার সন্দেহ হয় 'মৃণালিনী' 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্তী না পূর্ব্ববর্ত্তী? 'কপালকুণ্ডলা'র পরে এর প্রকাশকাল বটে কিন্তু রচনা-কালও কি পরবর্ত্তী? কেন না, রচনারীতি বিচারে কিছুতেই 'মৃণালিনী'কে 'কপালকুণ্ডলা'র পরবর্ত্তী বলে মনে হয় না)। মৃণালিনীতে ভারতচন্দ্র আবার স্থান পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। পরবর্ত্তী কালে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ভারতচন্দ্রের স্থলে মধুসূদন অদ্বৈত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে তিনি অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনীতে ভারতচন্দ্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচ্ছেদে মধুসূদনকে শিরোধার্য্য করেছেন কিন্তু উদ্ধৃতি ছাড়া আপন বর্ণনায় অনুসরণ নেই। বিষবৃক্ষে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেকে বিস্তৃত করেছেন। বিষবৃক্ষের মধ্যে বর্ণনায় মধুসূদনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

যেমন বহু দীপ-সমুজ্জ্বল বহু লোক-সমাকীর্ণ গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়, এই মহাপুরী সূর্য্যমুখী-নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেইরূপ আঁধার হইল।

উপরি-লিখিত অংশটি মধুসূদনের নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রভাবপুষ্ট:

কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?

বঙ্কিম-প্রতিভা বিকাশের ইতিহাসে এই আদর্শ পরিবর্ত্তন বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে নবীন আদর্শে প্রাচীন। পরবর্ত্তী কালে বিশেষতঃ 'বিষবৃক্ষ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বয়সে খুব নবীন (৩৫ বৎসর) না হ'লেও আদর্শে নবীন। তিনি সেখানে একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা ও বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার স্বীকৃতিদানের মধ্যে প্রাচীন সংস্কার-ব্যাধিটি আবার রিল্যাপ্‌স ক'রে সে বিবাহের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

ROLLAND AND TAGORE

(Conversation—1930)

Rolland : ..I hear that you have suddenly taken to painting.

Tagore : I must confess that this unexcepted event has indeed happened. At first I did not take it seriously, but I find that your people have seen more in it than I could ever expected..it is the genuine appreciation of the artists and literary people of Europe which has given me such deep pleasure..I wonder what made me take to painting..

Rolland : Your inner dreams want expression and poetry need not necessarily be the only vehicle for expressing your visions.

Tagore : Words are too conscious and while lines are not..Ideas have their form and colour which wait for their incarnation in pictorial art. It is true that I experience a new kind of satisfaction in doing my pictures—something distinct and apart from the ecstasy which the creation of a poem or the composing of a melody could give me..

Rolland : The German poet Hermann Hesse left poetry after his 40th year and took to painting. There is a parallel case to yours. I am glad that you have taken up the brush and go on giving expression to your thoughts and dreams. But at the same time you must go on composing new melodies, and also get your songs together in collected form with, if possible, European notation of the songs. After all, music is as universal as the language painting.

Tagore : Just now painting has become a mania with me. My morning began with songs and poems, now in the evening of my life my mind is filled with forms and colours. My songs and poems, locked up in my native language, I have given to my country; my pictures I have brought as a gift to the West.

পশ্চিম বাংলার বস্ত্রশিল্প ও শ্রমিক-সমস্যা

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

[ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ]

বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প ও শ্রমিক সমস্যার বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্ব্বে এদেশে বস্ত্রশিল্পের সূচনা, উদ্ভব ও অগ্রগতির ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেওয়া অসমীচীন হবে না।

অতীত ইতিহাস

অধ্যাপক ও:য়বার ইম্পিরিয়াল গেজেটারারে ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫। বলেছেন—সূক্ষ্ম বয়নের কাজে রংয়ের মিশ্রণে, মূল্যবান পাথরের উপর খোদাই-এর কাজে, গন্ধদ্রব্য উৎপাদনে এবং অন্যান্য কারিগরী শিল্পে ভারতীয়দের দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রথমাবধি সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় অর্জ্জন করেছে।

খৃষ্ট-পূর্ব ৩০০০ সালেও যে ব্যাবিলনের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্ট-পূর্ব ২০০০ সালেও যে মিশরের মমি অত্যুত্তম ভারতীয় মসলিনের দ্বারা আবৃত হত, সে কথা আজ আর কারো অবিদিত নেই। সেকালে রোমে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের বিশেষ সমাদর ছিল এবং প্রচুর সূতীবস্ত্র ভারতবর্ষ থেকে রোমে রপ্তানী হত। এই রপ্তানী-বাণিজ্য এক সময় এমন বিপুলায়তন হয়ে দাঁড়ায় যে এলডার প্লিনি এই বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর রোমের প্রচুর অর্থদণ্ড হচ্ছে। জানা যায়, প্রাচীন গ্রীকদের নিকট ঢাকাই মসলিন 'গঙ্গোটিকা' নামে পরিচিত ছিল।

উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ থেকে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দু হাজার বছর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সূতী এবং বয়নশিল্প এক অভাবনীয় নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। ইংল্যাণ্ড এ বিষয়ে নিতান্ত অর্বাচীন; সেখানে সূতীবস্ত্র বয়নের সূত্রপাত হয় এই সেদিন—সপ্তদশ শতকে।

অতঃপর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতি এবং সর্ব্বশেষে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রণী হয় এবং উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেন-দেন চলতে থাকে। ভারতবর্ষের সহিত সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গঠিত এই কোম্পানী মারফতেই পরবর্ত্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

আঠারো শতকের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে মিলিকি বলেছেন, সতেরো শতকের শেষ দিকে প্রচুর পরিমাণে সস্তা অথচ সুন্দর কেলিকো, মস্‌লিন ও অন্যান্য ধরণের সূতীবস্ত্র ইংল্যাণ্ডে আমদানী হত। এই জিনিষগুলো এত বেশী জনসমাদৃত হয়েছিল যে, পশম ও সিল্ক উৎপাদকরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ১৭০০ ও ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট আইন করে গুটিকয় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পোষাক ও আসবাব তৈরীতে ছাপানো বা রঙীন কেলিকোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। এমন কি, রঙীন ছাপানো বস্ত্রের সামান্যতম অংশও কার্পাসজাত হলে তার উপর বাধা-নিষেধ প্রযুক্ত হয়।

মিঃ এইচ, এইচ উইলসনও তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় যে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে প্রস্তুত সূতী ও রেশম বস্ত্র ইংলণ্ডে তৈরী অনুরূপ বস্ত্র অপেক্ষা শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম দামে বিক্রয় করেও যথেষ্ট লাভ করা যেত। ফলে প্রথমতঃ আমদানীকৃত বস্ত্রের উপর ইংলণ্ডে উৎপন্ন বস্ত্রের দামের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ শুল্ক ধার্য্য করে এবং অবশেষে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়। যদি এইরূপ অন্যায় শুল্ক ধার্য্য এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ না করা হত, তাহলে পেইসলে ম্যানচেষ্টার-এর মিলগুলি সূচনায়ই বন্ধ হয়ে যেত এবং বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগেও তা আর কোন দিন চালু হত না। বলা যায়, ভারতীয় উৎপাদকদের স্বার্থহানি দ্বারাই এই সকল মিলের সৃষ্টি। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হত, তাহলে সেও সেদিন পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করত, বৃটিশ পণ্যের উপর সে-ও পাল্টা শুল্ক ধার্য্য করে নিজের উৎপাদনশীল শিল্পটিকে রক্ষা করত। কিন্তু সেই আত্মরক্ষার অধিকার ভারতের ছিল না, সে তখন পরাধীন—বিদেশী শক্তির মর্জির উপর নির্ভর। তাই কোন শুল্ক না দিয়েই বৃটিশ পণ্যের বোঝা ভারতবর্ষের উপর উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় চাপিয়ে যেতে লাগল। এমনি করে বিদেশী উৎপাদকেরা রাজনৈতিক শক্তির অন্যায় প্রশ্রয়ে ভারতীয় প্রতিযোগীদের প্রথমে দাবিয়ে রাখতে এবং পরে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে সমর্থ হয়েছিল। কারণ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতীয় উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই বিপুলায়তন বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতীয় নাবিকদের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় বাণিজ্যপোতের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হত। টেলরের ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে (পৃঃ ২১৬) এ সম্পর্কে তদানীন্তন ইংরেজ জাহাজ নির্মাতাদের মনোভাব বর্ণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন:—ভারতীয় জাহাজে করে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য যখন লণ্ডন বন্দরে এসে পৌঁছাল, তখন একচ্ছত্র ইংরেজ জাহাজ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন চাঞ্চল্যের সূচনা হল যেন টেমসের বুকে কোন শত্রুপক্ষের নৌবাহিনী হাজির হয়েছে। এই নিয়ে যে আতঙ্কিত সোরগোলের সূত্রপাত হল, তাতে লণ্ডন বন্দরের জাহাজ-নির্মাতারা হলেন অগ্রণী। তাঁরা এই বলে চেঁচামেচি সুরু করলেন যে তাঁদের এতদিনের ব্যবসায় এবারে ধ্বংস হবে এবং জাহাজীদের পরিবার-পরিজন অতঃপর অনাহারে মারা পড়বে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের এই বিপুলায়তন বৈদেশিক-বাণিজ্যের মুখ্য ও প্রধানতম উপকরণ ছিল হাতে-কাটা এবং হাতে

বোনা সূতীবস্ত্র। এবং এই সূতীবস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবজনক ভূমিকা ছিল।

আধুনিক যুগ

এমন একদিন ছিল—যেদিন বাংলা দেশে বহুল পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হত এবং সে তুলায় অধিকাংশ বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ম্যাঞ্চেষ্টারে চালান দিতেন—সেই তুলায় উৎপন্ন বস্ত্রই আবার এদেশে আমদানী হত। এই আমদানী-রপ্তানীর খরচ বাঁচাবার জন্যই শেষে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষের প্রথম কাপড়ের কল "বাউড়িয়া কটন মিলস্" প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন বাঙলায়—এই শিল্পের আর কোন প্রসার ঘটেনি। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ে, ১৮৫৮ সালে—জনৈক পার্শী ভদ্রলোক শ্রীকাওয়ানজী দাভারের প্রচেষ্টায়। ১৮৬১ সালে তৃতীয় মিল প্রতিষ্ঠা করেন আমেদাবাদের শ্রীরণছোড়লাল ছোটলাল। তাঁর পৌত্র, স্বর্গত স্যার চুনীভাই পিতামহের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে আমেদাবাদে রণছোড়লাল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বস্ত্রশিল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে এবং বর্ত্তমানে তা সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত।

তৎপরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমে ক্রমে আরো কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এমনি করেই আমাদের বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে।

বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব

একথা সম্ভবতঃ সকলেই জানেন যে, বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের বৃহত্তম শিল্প এবং মূল্যের দিক থেকে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগই উৎপন্ন হয় কাপড়ের মিলগুলি দ্বারা। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ৪৭০ (তার মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে ৩৫টি এখন বন্ধ করা রয়েছে) টাকুর সংখ্যা ১৩°৫ লক্ষ, এবং তাঁতের সংখ্যা ২ লক্ষ। বস্ত্রশিল্পে মোট ৮ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছে এবং মজুরী মাহিনা বাবদ তাহারা বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা উপার্জ্জন করে। তাছাড়া, বস্ত্রশিল্প—শুল্ক ও বিভিন্ন কর বাবদ কেন্দ্রীয় শুল্ক ও রাজ্য সরকারকে বাৎসরিক প্রায় ১০০ কোটি টাকা দিয়ে থাকে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে একে জাতীয় শিল্প আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্পের দিকে নজর ফেরালে আমরা দেখব, এখানে সূতা উৎপাদন ও বয়ন এই বিবিধ কর্মরত মিলের সংখ্যা ১৭, শুধুমাত্র সূতা উৎপাদনরত মিলের সংখ্যা ৮ এবং পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ১১। বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত সর্বমোট টাকুর সংখ্যা ৫,৮০,৪৬৮ এবং তাঁতের সংখ্যা ১০,১৬২। পশ্চিমবঙ্গের মিলগুলিতে বার্ষিক ১,৮৫,৪০৩ বেল সূতা এবং ১,৭৩,৫৬১ বেল কাপড় উৎপন্ন হয়। গড়পড়তা হিসাব বিবেচনা করলে উৎপাদনের পরিমাণ মাসিক মাত্র ১৪,৪৬৩ বেল (১৫০০ গজের) কাপড়। পশ্চিমবাংলার মিলগুলিতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৪৬,০০০ এবং তাদের বার্ষিক উপার্জন-মজুরী মাহিনা ও মাগ্‌গীভাতা সমেত প্রায় ৭ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনের তুলনায় এখানকার সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন অতি সামান্য, তাই ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য হতে বার্ষিক ২৫ কোটি টাকার উপর সূতা ও বস্ত্র আমদানী করতে হয়। আমদানীকৃত বস্ত্রের অধিকাংশই অবশ্য মিহি এবং অতিমিহি ধরণের কাপড়। পশ্চিমবাংলায় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়ে এই বিপুল সম্পদ রাজ্যমধ্যে রক্ষা করা সম্ভব এবং তার ফলে আমাদের বেকার সমস্যার আংশিক সমাধানও হতে পারে। কিন্তু বাঙালী ক্রেতাদের এ বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে, কেন না, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের রীতি

হাতে-কাটা সূতা এবং হাতে-বোনা তাঁতকে উৎসাহ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫১ সালে একটি সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করেন। এই আদেশে প্রত্যেক মিলকে উৎপন্ন সূতার ½ অংশ হাতে বুনবার জন্য তাঁতীদের প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট করে রাখতে বলা হয়। এর ফলে মিলগুলির প্রায় শতকরা ২৫টি তাঁত কর্ম্মহীন হয়ে পড়ে। নূতন প্রতিষ্ঠিত মিলগুলির প্রতি প্রদত্ত আর একটি কড়া নির্দ্দেশে বলা হয়, ভারত সরকারের পূর্ব্ব-অনুমতি ছাড়া নতুন বসানো একটি তাঁতও কাজে লাগানো চলবে না। এই দুইটি আদেশের ফলে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের বয়ন-ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়। হাতে-কাটা সূতা এবং হাতে-বোনা তাঁতের উপর সরকার যে অত্যধিক আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা সত্য প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অম্বর চরকা ও তাঁতীদের সাহায্যে তাহাদের পরিকল্পনামত দেশের প্রয়োজন মিটানো অসম্ভব হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে সরকার ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগে সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশটি প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু এর ফলেও যে সমস্যার বিশেষ কিছু সুরাহা হয়নি তা বুঝা যাবে যদি আমরা বস্ত্রশিল্পের টাকু ও তাঁতের বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে বিবেচনা করি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, গত ২০ বছরে ভারতের কাপড়ের কলগুলির টাকুর সংখ্যা ১০০ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৩৫ লক্ষ হয়েছে, কিন্তু তাঁতের সংখ্যা এই দীর্ঘ সময় যাবৎ ২ লক্ষে বা তার কাছাকাছি সংখ্যায় সীমাবদ্ধ আছে। ফলে সূতী-বস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহারের কোন বৃদ্ধি বা উন্নতি ঘটেনি। সূতীবস্ত্রের সরবরাহ যে স্বাধীনতালাভের পর দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু বাড়েনি, তার প্রমাণ প্রাক্‌যুদ্ধ ১৯৩১ সালে যেখানে ভারতবর্ষে মাথাপিছু সূতীবস্ত্র ব্যবহারের হার ছিল ১৫°৭৫ গজ, আজ ২০ বছর পরও তা সে কোঠাকে বেশিদূর ছাড়াতে পারেনি।

সুতরাং বস্ত্রশিল্পের বয়ন-ক্ষমতাকে (weaving capacity) সীমাবদ্ধ করে রাখার নীতি কোন দিক থেকে সুফলপ্রসূ হয়নি। এর ফলে কাপড়ের মিলগুলি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি হস্তচালিত তাঁতশিল্পও উপকৃত হয়নি। সরকারও এর ফলে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি পরিধেয় বস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়ে জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাপড়ের কলগুলির বয়ন-ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ায় সুযোগাম্বেষী লোকদের পক্ষে কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টির এই অপবাদ যদিও সচরাচর মিলগুলির ঘাড়ে চাপানো হয়ে থাকে, তথাপি সহজেই বুঝা যায় যে এতে তাদের কোন হাত নেই, থাকা সম্ভব নয়।

সমানুপাতে আনয়নের জন্ত কাপড়ের কলগুলির বয়ন-ক্ষমতার যথাযথ বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই কারণেই ভারতীয় কাপড়ের মিল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীকস্তুরভাই লালাভাই গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় ভারতবর্ষের কাপড়ের মিলগুলির বয়ন-ক্ষমতা তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সময় অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াবার জন্ত সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

সরকারী নীতির বিরোধিতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে আবগারীশুল্ক সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কর দিয়ে থাকে। এই টাকার সামান্ত একটি ভগ্নাংশ যদি সরকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের (যারা আবার মিলজাত সূতার অন্ততম ক্রেতা) উন্নয়নকল্পে নিয়োগ করেন, তাহলে আমাদের অভিযোগ করার কিছু নেই কিন্তু হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উপর সরকার যে দায়িত্ব ন্যস্ত এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় সরকার অধুনা সমবায় ভিত্তিতে পাওয়ারলুম ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এই প্রচেষ্টার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই :—

১। সমবায় সমিতির সভ্যরা যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেন, সরকার তার নয় গুণ টাকা মূলধনরূপে ঋণ দিয়ে থাকেন।

২। পাওয়ারলুমে উৎপন্ন কাপড়ের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য করা হয় না।

৩। পাওয়ারলুম কর্তৃক উৎপন্ন এই সব কাপড় হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনরূপে মিলের কাপড় অপেক্ষা অনেক কম দামে বাজারে বিক্রী হয়।

সরকারী নীতির স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্তরূপে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কাপড়ের কলগুলিতে সরকারী অর্থের বিন্দুমাত্র নিয়োগ নেই বলেই তারা এর বয়ন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বিপক্ষে অথচ বিপরীত দিকে সরকারী অর্থ খাটিয়ে সমবায় সমিতির ধূয়া তুলে তারা সেই বয়ন-ক্ষমতাকেই পশ্চাদ্‌দ্বার দিয়ে বাড়িয়ে তুলতে দ্বিধা করছেন না। সরকারী আচরণ ও মনোভাবের এবম্বিধ স্ব-বিরোধিতার কারণ অনুমান করা দুষ্কর।

বোম্বাই-বাঙলার শ্রমিক-মজুরীর তুলনা।

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল (যে সব শ্রমিক নেতৃবৃন্দ) থেকে প্রচার করা হয়ে থাকে যে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়-কল শ্রমিকেরা বাঙালী শ্রমিকের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মজুরী পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ, প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, নীট উৎপাদন ব্যয়ে মজুরীর শতকরা হার বাংলা দেশে বোম্বাই ও আমেদাবাদ অপেক্ষা অনেক বেশী। তার কারণ, বাংলা দেশে প্রতি মেশিন-পিছু নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা বোম্বাই ও আমেদাবাদের বহু গুণ বেশি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, একটি রিং স্পিনিং মেশিনের দুই ধারের মধ্যে বাংলা দেশের একজন শ্রমিক মাত্র একটি ধার দেখে থাকেন, অথচ বোম্বাই ও আমেদাবাদে একজন শ্রমিক দুটি মেশিনের চারটি ধার দেখেন। সুতরাং বোম্বাই ও আমেদাবাদের একজন শ্রমিক একই ধরণের মেশিন চালিয়ে বাংলা দেশের শ্রমিক অপেক্ষা ৪ গুণ বেশি সূতা উৎপন্ন করে থাকেন।

সহজেই বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে বোম্বাই-এর উৎপাদন-ব্যয় বাংলা দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বয়ন ক্ষেত্রে বাংলা দেশে একজন তাঁতী সচরাচর দুটি মাত্র সাধারণ ধরণের তাঁত চালিয়ে থাকেন, অথচ বোম্বাই ও আমেদাবাদে একজন শ্রমিক কমপক্ষে ৪টি তাঁত চালান। সুতরাং এক্ষেত্রেও বাংলা দেশে উৎপাদন-ব্যয় বোম্বাই আমেদাবাদ অপেক্ষা দ্বিগুণ। স্বয়ংচালিত তাঁতের বেলায় এই পার্থক্যটা আরো দৃষ্টিকটুরূপে বেশি। বোম্বাই আমেদাবাদে একজন শ্রমিকের পক্ষে যেখানে ১২ থেকে ৩০টি পর্য্যন্ত স্বয়ংচালিত তাঁত চালানো রেওয়াজ, সেখানে বাংলা দেশের শ্রমিক ৪ থেকে চব্বিশ বেশী তাঁত চালাতে পারেন না। এ ছাড়া অন্যান্ত দিকেও বাংলা দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বোম্বাই আমেদাবাদের প্রচলিত দক্ষতার মান অপেক্ষা অনেক কম। তদুপরি পশ্চিমবাংলার মিলগুলিতে বোম্বাই-আমেদাবাদ অপেক্ষা বছরে ২৫ দিন বেশী ছুটি দেওয়া হয়ে থাকে, তার মতন বাংলার শ্রমিকেরা শতকরা অন্ততঃ ৮ ভাগ বেশি মজুরী পেয়ে থাকে। সুতরাং বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না যে, ন্যূনতর দক্ষতা ও স্বল্পতর শ্রমমজুরীর দরুণ সূতা উৎপাদন এবং বয়ন—দুই ক্ষেত্রেই বাংলা দেশে উৎপাদনে ব্যয় বোম্বাই আমেদাবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি। এই কারণেই বাংলা দেশের শ্রমিকদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মজুরী দিয়েও বোম্বাই আমেদাবাদে মিলগুলির যথেষ্ট মুনাফা থাকে, অথচ স্বল্প মজুরী দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মিলগুলির মুনাফার অঙ্ক প্রায় শূন্য, কখনও বা তা লোকসানে পর্য্যবসিত।

স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, শুধু মাত্র নিজেদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে স্ব স্ব উপার্জন বাড়াবার জন্তই নয়, পরন্তু এই জাতীয় শিল্পের পুনর্গঠন ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কথা চিন্তা করেও বাঙালী শ্রমিকদের দক্ষতা ও শ্রম বৃদ্ধির জন্ত তৎপর হওয়া উচিত।

শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ

মজুরী সম্পর্কে উপরে যে মন্তব্য করেছি তাতে কেউ যেন মনে না করেন, আমি তাদের উপার্জন হ্রাসে উৎসুক। প্রকৃত পক্ষে অপ্রত্যক্ষ উপায়ে শ্রমিকদের উপার্জন এবং সুখ সুবিধা বৃদ্ধিই আমার কাম্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনাধীন ঢাকেশ্বরী কটন মিলে আমি কি ধরণের অপ্রত্যক্ষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করেছি তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের যে সুযোগটি সরকার কয়েক বছর পূর্বে মাত্র চালু করেছেন, ঢাকেশ্বরীতে আমরা তার প্রবর্তন করেছিলাম ২৫ বছর আগে। বর্তমানে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে কোম্পানীর দেয় অংশের পরিমাণই বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকার উপর।

২। গ্রাচুইটি প্রথা ঢাকেশ্বরীতে প্রবর্তিত হয়েছিল ২০ বছর পূর্বে।

৩। প্রতি বছর কোম্পানীর নীট মুনাফার শতকরা ১৲ এক টাকা শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে দেওয়া হয়। মাসিক ২০০৲ টাকার নিম্ন আয়সম্পন্ন কর্মীদের জরুরী পারিবারিক প্রয়োজনে এই ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। কোম্পানী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্ত কয়েকটি প্রাইমারী ও হাইস্কুল পরিচালনা করে থাকেন। এই খাতে কোম্পানীর বার্ষিক ২৫০০০৲ টাকা খরচ হয়।

৫। কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবার পরিজনদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্ত বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল পরিচালনা করেন।

৬। ১৯৪৩ সালে চাউলের মূল্য যখন মণ-প্রতি ৭০৲-৯০৲ ছিল এবং অন্নাভাবে যখন দেশের ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তখন কোম্পানী চড়া দামে চাউল ক্রয় করে ১০৲ টাকা মণ দরে মিলের শ্রমিক ও কর্মীদের সরবরাহ করেছেন। এতে কোম্পানীর ১৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

টাকার অঙ্কে পরিণত করলে এই সকল সুযোগ সুবিধার জন্ত জন-প্রতি মাসিক ২৫৲ টাকারও বেশী খরচ পড়েছে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত এই অতিরিক্ত ব্যয় ট্রাইবুনালের কোন বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এবং তাঁদের রোয়েদাদের সময় তাঁরা এর প্রতি কোন গুরুত্বও আরোপ করেননি।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্ম-ভারের তুলনামূলক বিচার

বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্ম-ভারের তুলনামূলক বিচারের জন্ত আমি রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, পশ্চিম-জার্মাণী ইত্যাদি দেশ হতে আমার ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালের ভ্রমণকালে সংগৃহীত কিছু তথ্য উল্লেখ করব। প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, কাপড়ের মিলে আমাদের দেশের মত পুরুষ-শ্রমিক আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তত: উল্লিখিত দেশগুলিতে তো নেই। জেনারেল ম্যানেজার, স্পিনিং মাষ্টার, উইভিং মাষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রী (আমাদের দেশে যাদের 'জবার' বলা হয়) ইত্যাদি যে সকল পদে কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন আছে, সে সকল পদ ছাড়া কাপড়ের মিলে কোথাও আমি পুরুষ-শ্রমিক দেখিনি। আমাদের দেশে আজ অবধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরনো ধরণের ৫″ লিফট সম্বলিত বিলিতী রিং স্পিনিং মেশিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ইয়োরোপে এই ধরণের মেসিন কবে বাতিল হয়ে গেছে। সে সকল দেশে অন্তত: ১০″ লিফ্‌ট ববিন সম্বলিত ৪০০ টাকুর রিং স্পিনিং মেসিন ব্যবহার করা হয়। জার্মাণীতে এই লিফ্‌টের আরো উন্নতি সাধন করে তাতে ১১½″ পর্য্যন্ত করতে দেখেছি। বলা বাহুল্য, ১০″ লিফ্‌ট সমন্বিত ববিনে আমাদের ৫″ লিফ্‌ট ববিনের তুলনায় অনেক গুণ বেশি সূতা ধরে। ঐ সকল দেশে একটি মেয়ে শ্রমিক অনুরূপ ৫ থেকে ৬টি রিং স্পিনিং মেশিন চালায়।

এই সকল দেশে সাধারণ তাঁত কদাচিৎ নজরে পড়ে, যে দুই-একটি ক্ষেত্রে সাধারণ তাঁত চালু রয়েছে দেখেছি, সেখানে প্রত্যেক তাঁতী অন্তত: ১৬টি তাঁত চালায়। যেখানে পশ্চিম-বাংলার শ্রমিকরা চালায় মাত্র ২টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে সকল উন্নত ধরণের স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসানো হয়েছে, তাতে নক্সা তোলার জ্যাকার্ড এবং অন্যান্য কৌশল থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক তাঁতী ন্যূনপক্ষে ৪০টি এবং সর্বাধিক ৫৮টি স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায়। ১৯৫৫ সালে জাপানের কয়েকটি কাপড়ের কল দেখতে গিয়ে আরো বিস্মিত হয়েছি। জাপানেও কাপড়ের কলের শ্রমিক মাত্রেই মেয়ে। অথচ, এই মেয়ে শ্রমিকরাই ৮ থেকে ১৩টির স্পিনিং মেশিনের দুই ধার দেখাশোনা করে এবং প্রত্যেকটি মেয়ে তাঁতী ৬০ থেকে ৮০ পর্য্যন্ত স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালায়। ফলে জাপানে তাঁতী-প্রতি তাঁতের সংখ্যা হচ্ছে ৭০।

এতে প্রমাণ হয় যে ঐ সকল দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্মভার আমাদের দেশ অপেক্ষা দশ থেকে বিশ গুণ বেশি। সেই কারণেই তাদের উৎপাদন-ব্যয় অবিশ্বাস্য রকমের কম এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তাদের সাফল্যের প্রধান কারণও তাই।

স্বভাবত:ই প্রশ্ন জাগে :—মানুষে মানুষে দক্ষতা ও সামর্থ্যের এই আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয় কেন এবং হয় কি করে! উল্লিখিত দেশগুলির প্রত্যেকটিতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে এবং চতুর্দশ পঞ্চদশ এবং ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালক-বালিকারা (আমাদের দেশের ম্যাট্রিকুলেশান বা স্কুল ফাইন্যালের জন্ত নির্দ্দিষ্ট বয়:সীমা) রাষ্ট্রের খরচে শিক্ষালাভ করে থাকে। তাই নিরক্ষরতার বালাই কোথাও নেই। এই কারণে, তাদের কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান এবং জাতীয় স্বার্থচেতনা অত্যন্ত উন্নত। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের শ্রমিকরা জনকতক ছাড়া প্রায় সকলেই নিরক্ষর, এবং উপরোক্ত গুণগুলির বিন্দুমাত্রও তাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রমিকদের যথাযথ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে এবং জাতীয় স্বার্থচেতনা তাদের মধ্যে প্রখরতর না হলে মূলধন সংগঠন, আধুনিক অত্যুন্নত কারখানা স্থাপন উন্নততর ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানী ইত্যাদি কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না। ভারতবর্ষের উৎপাদকরা যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারেন তার জন্ত শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে এবং তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারেরই অগ্রণী হওয়া উচিত। নতুবা আমরা চিরদিন অনুন্নত দেশ এই আখ্যায়ই ভূষিত হব। আমার বিশ্বাস শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে শুধু মাত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সুফল ফলবে না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার মঙ্গলকর প্রভাব অনুভূত হবে।

রপ্তানী সম্পর্কে সরকারী নীতি

আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে যে, ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের কল্টনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সূতীবস্ত্র উৎপাদক দেশগুলির রপ্তানীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষের বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ১০,০০০ লক্ষ, গজ। গত কয়েক বছরের মধ্যে একমাত্র ১৯৫৭ সালেই আমাদের বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ কোটার কাছাকাছি অর্থাৎ, ৮,৩১০ লক্ষ গজে পৌঁছেছিল। তারপর ১৯৫৮ সালে তা ৫,৮১০ লক্ষ গজে নেমে গিয়ে ১৯৫৯ সালে পুনরায় ৭,৫০০ লক্ষ, গজে পৌঁছেছে। এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের প্রাণপাত পরিশ্রম এবং অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্ত রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে সরকারের সর্বপ্রযত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থা তো এই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন রাজ্যে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্ত বহু কোম্পানী গঠিত হয়েছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদেশ

হতে যন্ত্রপাতি আমদানী পর্য্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্য এই সকল মিলগুলির কোনটাই তাদের একটি তাঁতও চালু করতে পারেননি। ফলে বাজারে কাপড়ের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় এবং দাম একটু বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে, ধুতি উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়ায় ধুতির দাম শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আজ পর্য্যন্ত বস্ত্র ব্যবহারকারী জনসাধারণ হয়তো জানে না যে কাপড়ের এই মূল্য বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ৪টি কারণ ১। সরকার কর্ত্তৃক মিলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। ২। মজুরী বৃদ্ধি। ৩। চড়া হারে শুল্ক নির্ধারণ। ৪। বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপর কর আরোপ। এই প্রসঙ্গে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, দেশ বিভাগের পূর্বে বৃটিশ শাসকরা কোনদিন কাপড়ের মিলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেননি, কাপড়ের উপর কোন আবগারী শুল্ক বসাননি এবং মজুরীর খাতে খরচের মাত্রাও তারা কম রাখতেই সহায়তা করেছিলেন। ফলে জনসাধারণ তখন সুলভে কাপড় পেত। আমার বিশ্বাস, আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্রেতাদের একশ জনের মধ্যে নিরানব্বুই জনই জানেন না যে এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রেও তারা প্রতি-জোড়া মাঝারি ও মিহি বা অতি মিহি ধুতিতে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা শুধু আবগারী-করই দিয়ে থাকেন। হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন দ্বারা দেশবাসীর চাহিদা মিটাবার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় সরকার অগত্যা ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগে সূতানিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার করেন। উৎপাদন ও রপ্তানী হ্রাসের কিছুটা কারণ এই সরকারী নীতির মধ্যেই পাওয়া যাবে। এর কারণ আর কিছু নয়, দীর্ঘ দিন পর সম্প্রতি মাত্র আমাদের দায়িত্বশীল শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রীরা উপলব্ধি করেছেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় কাপড় গুণে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট, কিন্তু দামে সকলের চেয়ে চড়া। এই কারণেই সম্ভবতঃ সরকারী উদ্যোগে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল বিভিন্ন দেশের কাপড়ের কল পর্যবেক্ষণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উন্নতি সাধনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে একটি বিশেষজ্ঞ দল বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তার ফলাফল কি হয়েছে, আমরা জানি না।

শ্রমিক-সমস্যা :—আপনারা জানেন, ১৯৫৬'৫৭ সালে ৫।৬টি মিল ছাড়া পশ্চিম-বাংলার প্রত্যেকটি কাপড়ের মিলের লোকসান হয়েছিল। তা সত্ত্বেও শ্রম ট্রাইবুনাল তার রোয়েদাদে ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই থেকে এই মিলগুলির উপর বর্দ্ধিত মজুরী, মাগ্‌গীভাতা ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকার বোঝা চাপিয়ে দেন। মজুরী ইত্যাদির এই বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ট্রাইবুনাল কিন্তু শ্রমিকদের দক্ষতার মান বা কার্য্য মাত্রা নির্দ্দিষ্ট করে দেননি। এতদবস্থায় পশ্চিমবাংলার কাপড়ের মিলগুলির আর্থিক অবস্থা কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই শ্রমিক-প্রতি কর্ম্মের মাত্রা নিরূপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল তা বিবেচনা না করায় ন্যূনতম দক্ষতার নিকৃষ্টতম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের উচ্চতম মজুরী ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ মিলের পক্ষে লোকসান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তদুপরি শ্রমিকদের একটি অংশ অসংযত এবং উচ্ছৃঙ্খল এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থহানি সত্ত্বেও তারা ধর্মঘট, লক আউট ইত্যাদির উস্কানি দিয়ে থাকে। এমনও দেখা গেছে যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণতিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন কি প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটেছে, কিন্তু অভিযুক্তরা আদালতের বিচারে মুক্তিলাভ করেছে। ফলে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত করা আজ শুধু দুরূহই নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত

শ্রমিক উচ্ছৃঙ্খলতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার নিদর্শনস্বরূপে আমি পশ্চিম-বাংলার কেশোরাম কটন মিলের অবস্থা উল্লেখ করতে চাই। কেশোরাম পশ্চিম-বাংলার বৃহত্তম কাপড়ের মিল, মিলটিতে ৮০,০০০ টাকু ও ১,৯১০টি তাঁত রয়েছে। ভারতের শিল্পপতিগোষ্ঠীর অন্যতম অগ্রণী নায়ক শ্রী জি ডি বিড়লা এই মিলের ম্যানেজিং এজেন্ট।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মিলের ম্যানেজার শ্রী এস এন হাদার যে উক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। শ্রী হাদা কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেন যে গত তিন বছর ধরে মিলের শ্রমিকদের একাংশের আন্দোলনে ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ দুই-ই হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের কার্যকলাপে বাজারে মিলের সুনামও যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই সময়ে উৎপন্ন কাপড়ের একটি বৃহৎ অংশ শ্রমিকদের ইচ্ছাকৃত গাফিলতিতে এত খারাপ এবং ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে যে প্রকৃত পক্ষে তা বিক্রয়ের অযোগ্য ছিল।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে কোম্পানীর বিক্রয়লব্ধ আয় ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্বের তুলনায় ১২১ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে কোম্পানীর লাভ (গ্রস) ছিল ১৮·৭৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৪৬·৭৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে লাভের বদলে ১২·১০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়।

শ্রী হাদা বলেছেন, উৎপন্ন বস্ত্রে অতিরিক্ত ত্রুটি ও গলদের জন্য এই কয়েক বছরে বিদেশের রপ্তানী-বাজার প্রায় সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর হাতছাড়া হয়েছে এবং ভারতবর্ষ ন্যূনপক্ষে ১২০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উৎপাদনের গলদ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন অর্থাৎ তাঁতীদের জরিমানা ও অর্থনৈতিক শাস্তি দেবার অধিকার পূর্বে মিল-কর্ত্তৃপক্ষের ছিল। কিন্তু সরকারী চাপে এবং শ্রমিকদের আন্দোলনে সে ব্যবস্থা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম কী ভয়াবহ কেশোরামের ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। স্বভাবতঃই, ছোটখাটো মিল গুলি এর ফলে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বস্তুতঃ, এখনও সরকার যদি শ্রমিকদের কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত না করেন তাহলে বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পুনর্বাসন, আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শ্রমসাশ্রয় রেশনালাইজেশন

এদেশের অধিকাংশ কাপড়ের মিলের যন্ত্রপাতি যে নিতান্ত পুরনো ধরণের তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতি না বসালে যে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পকে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ করে তোলা অসম্ভব তা বলাই বাহুল্য। স্বল্পতম উৎপাদন খরচে সর্বাধিক উৎপাদন যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে যত শীঘ্র পুরানো যন্ত্রপাতির বদলে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো যায় ততই মঙ্গল। আর এ কাজে কিছু সংখ্যক কর্মীকে ছাঁটাই করা অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। কিন্তু ওয়েজ বোর্ড-এর রিপোর্টে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শ্রম সাশ্রয় নীতি প্রবর্তনের অন্যতম প্রাথমিক সর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, এর ফলে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা বা বর্তমান শ্রমিকদের উপার্জনের কোন হ্রাস ঘটানো চলবে না। একই সঙ্গে এই দুইটি বিপরীত এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ কাজ কি করে করা সম্ভব তা আমার বুদ্ধির অন্তত অগম্য। শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্মের মাত্রা না বাড়িয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যবহার্য্য বস্ত্রের উৎপাদন-খরচ কমানো বা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রপ্তানী বাড়ানোর বুলি গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মতই নিষ্ফল হতে বাধ্য। অথচ বস্ত্রশিল্পের বাস্তব অবস্থা প্রকৃত পক্ষে তাই। উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণের সত্যিকার আগ্রহ যদি আমাদের থাকে, তাহলে মেনে নেওয়া উচিত যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং শ্রমসাশ্রয় নীতি প্রবর্তনের ফলে কিছু সংখ্যক কর্মীর ছাঁটাই অপরিহার্য্য। তবে মিলের সম্প্রসারিত নূতন কোন বিভাগে বা একই পরিচালনাধীন অন্য মিলে অথবা ভিন্ন কোন শিল্পে এই সকল ছাঁটাই কর্মীদের কর্ম সংস্থানের চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং সে কাজে সরকারের সহযোগিতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পুরানো বাতিল ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং মান্ধাতার আমলের কর্মনীতি অনুসরণের ফলে ভারতবর্ষের অনুরূপ গোলযোগ ইংল্যাণ্ডেও গত কয়েক বছর ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। ইদানীং সঙ্কট এমন চরমে উঠেছিল যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে লেইসজে ও ম্যানচেষ্টারের কাপড়ের কলগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার কলগুলিতে উন্নততর আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কাজে যে মূলধন প্রয়োজন তার ব্যয়ভারের দুই-তৃতীয়াংশ সরকার নিজে এবং এক-তৃতীয়াংশ মিল-কর্তৃপক্ষ বহন করছেন। সিদ্ধান্তটিকে অধুনা সেখানে বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এখানে কাপড়ের মিলগুলির সঙ্কট আরো গুরুতর। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে যেমন সরকার স্বেচ্ছায় মিলগুলির পুনর্বাসন দায়িত্ব বহুলাংশে আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তেমনি এখানেও কাপড়ের কলগুলি সম্পর্কে পুরানো নীতি পরিবর্তন করে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে এই জাতীয় শিল্পটির রক্ষাকল্পে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান করা সরকারের উচিত।

ওয়েজ বোর্ড-এর সুপারিশ

ভারত সরকার বস্ত্রশিল্পের জন্য সম্প্রতি যে ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছিলেন, তাতে সকল রাজ্যেরই প্রতিনিধি ছিল, ছিল না শুধু পশ্চিম-বাংলার। বোর্ড ভারতবর্ষের কাপড়ের মিলগুলিকে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে একটি নীতি স্থির করেছেন। কিন্তু সে নীতি শ্রমিকদের দক্ষতা বা কাজের মাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তার উপর নির্ভরশীল নয়। তা ছাড়া, অঞ্চল ভেদে কর্মদক্ষতা ও দক্ষতার মাত্রানুযায়ী মজুরীর কিছুটা পার্থক্য যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের মিলগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে এমনিতেই নিতান্ত দুর্বল, সুতরাং ওয়েজ বোর্ড অঞ্চলনিরপেক্ষ ভাবে যে মজুরীর হার সুপারিশ করেছেন, তার বাড়তি ভার বহন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সেই কারণে বোর্ডের সুপারিশ এখানে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়নি। গত ৭।৪।৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় মিলমালিক সমিতির সভাপতি শ্রীডি এন ভট্টাচার্য্য বলেছেন :—এই অতিরিক্ত বেতন-ভার জোর করে পশ্চিমবাংলার মিলগুলির উপর চাপানো হলে অর্থনৈতিক অক্ষমতার দরুণ অনেক মিলকে বাধ্য হয়েই তালা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ভারত সরকার যেখানে নীতিগত ভাবে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণকে সঙ্কুচিত করে রাখছেন, সেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণ করছে। ফলে, দেশ বিভাগের সময় যেখানে পাকিস্তানে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০টি, আজ তার সংখ্যা ১৪০কেও ছাড়িয়ে গেছে। এই সকল মিলের অধিকাংশ ৩ সিফ্‌টে কাজ চলছে এবং ফলে উৎপাদন দিন দিনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতঃ পাকিস্তান আজ স্বীয় উৎপাদনের সাহায্যে শুধুমাত্র তার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনই মিটায় না, রপ্তানী-বাণিজ্যেও সে আজ অধিকতর মাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে। আর শ্রমিকসমস্যার কথা যদি বলি, তাহলে ভারতবর্ষে যেখানে শ্রমিক গোলযোগের জন্য উৎপাদন-ক্ষতি বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে, সেখানে পাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত কোন শ্রমিক গোলযোগ না থাকায় উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মিলগুলির লাভের অঙ্ক যেমন বেড়েছে তেমনি শ্রমিকদের মজুরীও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই দুইয়ের সমতালে সরকারী রাজস্বের পরিমাণও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এ হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, কেন না পাকিস্তানের ৩টি কাপড়ের মিল পরিচালনার সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট।

সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থেই সমভাবে প্রয়োজনীয়। যে সকল শ্রমিক নিরক্ষর, নিজেদের স্বার্থ যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করার বিচারশক্তি যাদের নেই—তাদের সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজকাল প্রায় সকল ট্রেড ইউনিয়নই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয় এবং ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার সহায়ক হয় না—শিল্পের অগ্রগতিও সেই কারণে ব্যাহত হয়। এতে করে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি শুধু বেড়েই চলে। আমার মনে হয়, সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি রাজনীতি নির্ভর বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয় তাহলেই যথার্থ ভাবে শ্রমিকদের শিল্পের ও দেশের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে।

পরিশেষে, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, সরকার যদি সহৃদয়তা ও সহানুভূতির সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেন,

তাহলেই মাত্র পশ্চিম-বাংলার বস্ত্রশিল্প আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে :—

১। মিলগুলির বয়ন বিভাগ সম্প্রসারণ সম্পর্কে উদারতর নীতি অবলম্বন, মিলজাত বস্ত্রের উপর বর্তমানে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে তার ক্রমিক প্রত্যাহার।

২। পুরানো ধরণের বাতিল যন্ত্রপাতির পরিবর্তে অবিলম্বে আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতি স্থাপনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন।

৩। বস্ত্রশিল্পের উপর ধার্য্য বিভিন্ন কর—যার মাত্রা এখন ভারতবর্ষে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক—তা হ্রাস করে স্বাভাবিক মাত্রায় আনয়ন।

৪। দক্ষতা, কর্মের মাত্রা ও উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ।

৫। শ্রমিকদের সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[কবির সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে]

রবীন্দ্রনাথ ও আমি যখন সর্বপ্রথম সৌহার্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে পরস্পর আকৃষ্ট হই তাহার পর সুদীর্ঘ পরত্রিশ বৎসর কাল কাটিয়া গেল। জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম। সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য দান করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের মৌনতা বাণীহীন তরুলতা অবশেষে একদিন যেন কথা কহিয়া উঠিল, আপন অন্তরজীবন সুখ-দুঃখ পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনী সে আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া চলিল। এই স্বরচিত ইতিহাসের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, একই প্রাণধারা সর্বত্রই বহমান। যাহা একদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহা সত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর-নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অবিনির্ণীত দিক্ মহাসমুদ্রকে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ততরণী ভাসাইয়া দিল এ কি কম আশ্চর্যের কথা? যে অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচরে ছিল, এই অভিযানপথে অকস্মাৎ এক দিন সে রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে আত্মসর্বস্বতা এতকাল তাহাকে বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখ চিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা তাঁহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।

বিশ্ব জগতের এই ঐক্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির নিকটে ধরা দিয়াছে এবং তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় এই ঐক্যধারাই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রতিদিন তাঁহার দৃষ্টি উদার থেকে উদারতর হোক এবং তাঁহার বাণী নিখিলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হোক, এই কামনা করি।

সোভিয়েত শিল্পীর চোখে ভারত

অশোক ভট্টাচার্য

গত ৩০শে মে '৬০ তারিখে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম সংলগ্ন প্রদর্শনীকক্ষে মিনিস্ট্রি অফ কালচার, ইউ-এস-এস-আর ও মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ এণ্ড কালচারাল এফেয়ার্স, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া-র যুগ্ম প্রযোজনায় এবং ললিতকলা আকাডেমির তত্ত্বাবধানে ভারতীয় জীবন ও নিসর্গ সম্পর্কিত সোভিয়েত শিল্পীদের চিত্রাবলীর এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এই শিল্পকর্মগুলি হলো সেই সব শিল্পীদের রচনা যাঁরা ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত গত সাত বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। অধিকাংশ চিত্রই তেল রঙের। তবে জল রং ও গ্রাফিক মাধ্যমের কিছু কাজও রয়েছে। একটি শ্বেত পাথরের মূর্তি প্রদর্শনীর বৈচিত্র্য এনেছে।

বিষয়ের দিক থেকে সব কটি শিল্পকর্মই ভারতীয়। এবং জীবনযাত্রার বাস্তবানুগ অনুলেখনকে ভিত্তি করেই এগুলি গড়ে উঠেছে। শিল্পী কোথাও বাস্তবকে পরিহার বা অতিক্রম করার দিকে যাননি। বরং তাঁরা মায়াত্মক ভাবেই তাঁদের একমাত্র চোখের দেখাকেই ছবিতে প্রতিফলিত করেছেন।

প্রায় দশ বছর আগে একটি বিশাল সোভিয়েত চিত্রকলার প্রদর্শনী কলকাতায় হয়েছিল। শিল্পরসিকেরা তখন ব্যাপক ভাবে সোভিয়েত চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই প্রদর্শনী সম্পর্কে এদেশে সমালোচক ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল। এক পক্ষ সেই শিল্পসমূহে নতুন শিল্প-দিগন্ত উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন এবং বাস্তববাদী চিত্রের আদর্শ রূপায়ণ বলে সেগুলিকে মেনেছিলেন। অপরপক্ষ সোভিয়েত শিল্পীদের বিপুল প্রয়াসের মধ্যে বিরাট পরিপ্রেক্ষিত ও সমাজ-জীবনের গঠনতান্ত্রিক কর্মোন্মাদনার সাক্ষাৎ পেলেও মহৎ কোনো শিল্পের সন্ধান পাননি। আজকের এই অপেক্ষাকৃত ছোটো প্রদর্শনীর প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করার হেতু এই যে, মনের দিক থেকে গত দশ বছরে সোভিয়েত শিল্পীদের কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হলো না।

বিশেষত মনে হয়, বাস্তববাদী চিত্র ও প্রকৃতিবাদী চিত্রের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে এ দলের অধিকাংশ শিল্পীই সচেতন নন। ফলে দু'-এক জন শিল্পীর কাজ ছাড়া—যেমন কোকোরিন কিংবা চুইকভ অধিকাংশ শিল্পীর ছবি দেখে মনে তৃপ্তি আসে না। মনে হয় যেন তেল রঙে আঁকা ফটোগ্রাফ দেখছি। শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগ, সহানুভূতি ও নির্বাচন খুব অল্পসংখ্যক ছবির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য যে যে ছবিতে শিল্পীর বিশিষ্ট মানসিকতার ছাপ পড়েছে সেগুলি সত্যিই উৎকৃষ্ট শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে আমরা যারা ভারতের জলবায়ু ও প্রকৃতিকে চিনি জানি, তাদের কাছে এ ছবিগুলির মূল্য শিল্প হিসাবে অধিক বলে মনে হয় না। অবশ্য একথা ভাবতে সকলেরই ভালো লাগবে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পুরোধা এবং বিশ্বের অন্যতম বৈজ্ঞানিক জাতি আমাদের মানুষ ও নিসর্গের মধ্যে এতো শিল্প উপাদান খুঁজে পেয়েছে। সামগ্রিক ভাবে তবু একথা না বলে পারা যায় না যে সোভিয়েত শিল্পীদের অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ পার হয়ে তবেই পৌঁছতে হবে শিল্পজগতের সামনের সারিতে। বিশেষত যে বাস্তববাদী চিত্রের দিকে তাঁদের লক্ষ্য সে পথে এগোতে হলে অনেক মানসিক দ্বন্দ্ব এবং জটিলতার পথ অতিক্রম করতে হবে। এ পথে পূর্ব-জার্মানীর শিল্পীদের আপেক্ষিক অগ্রগতি অবশ্যই লক্ষণীয়।

এই তত্ত্বের দিক পরিহার করে সোভিয়েত শিল্পীদের দক্ষতার প্রসঙ্গে এলে কিন্তু অনেকের ছবিরই প্রশংসা না করে পারা যায় না। যেহেতু তাঁরা বস্তুর রূপ বা আকৃতিকে যথাযথ ভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তাই তাঁদের অনেকের রচনাতেই রূপভেদের জ্ঞান উচ্চস্তরের। রঙের ব্যবহারে অবশ্য কখনও কখনও একটু চড়া রঙের আধিক্যের দিকে এঁদের ঝোঁক দেখা যায়। তবু নৈপুণ্যের দিক থেকে চুইকভ, কোকোরিন, এফানভ ও জেরাসিমভের চিত্রকর্মগুলির প্রশংসা করতেই হয়। এঁরা যে প্রত্যেকেই সোভিয়েত জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী তা এঁদের ছবি দেখলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। চুইকভের তৈলচিত্র বুট পালিশ, জয়পুররমণী, জয়পুরের গলি পথ, কর্মরতা যুবতী প্রমুখ চিত্রে আমরা সেই দুর্লভ রচনার সাক্ষাৎ পাই যা যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই গৌরবজনক। প্রতিটি ছবিতেই শিল্পীর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

আর এক শিল্পী হলেন কোকোরিন। একমাত্র তাঁর ছবিতেই এমন কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল যা প্রচলিত সোভিয়েত চিত্রধারার মধ্যে পড়ে না। তাঁর জল রঙের ছবিগুলি এমন এক সুষমায় মণ্ডিত যা প্রত্যেক শিল্পরসিককেই মুগ্ধ করবে। রঙের ব্যবহারে এবং বস্তুসংস্থাপনে তিনি অনেক বেশী স্বাধীন মনের পরিচয় দিয়েছেন। দিল্লীর পথ, মধ্যাহ্ন, রাতের বেনারস, গোয়ালিয়র, বেনারসের প্রাচীন মন্দির ও দিল্লীর বাণিজ্যপথ ছাড়া কুলিরা, নয়া দিল্লী ও বেনারসের প্রাসাদ ও মন্দির নামক লিথোগ্রাফ কটিও উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী এফানভের আঁকা তেলরঙের মিনিয়েচার প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মেলে। বিভিন্ন মানুষের স্বতন্ত্র মনোভাব ও চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে তিনি যে নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে শিক্ষণীয়। কাল পাগড়ির ভারতীয়, লাল পাগড়িতে বৃদ্ধ শিখ, শিখ সন্ন্যাসী, পাহাড়ে মেয়ে-মজুর, শিখ ও শিল্পী নামক প্রতিকৃতি কটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

জেরাসিমভের মহীশূরের পথে ও উট প্যারেড ছবি দুটি ভালো লাগলো, যদিও পরবর্তী ছবিটিতে লাল রঙের আধিক্য চোখে লাগে। তরুণ শিল্পী বুলেটভের দুটি জলরঙা ছবি কলকাতা ও পথও উল্লেখ্য।

তবে বিশেষভাবে প্রশংসা করতে হয় সালিম-এর সমুদ্রতীর, মালখানভিয়ানের পুরোনো যোদ্ধা ও আগ্রার বাজার এবং খবর কাগজ বিক্রেতা বালক ছবি কটিকে। বিষয় নির্বাচনে এবং প্রকাশের চাতুর্যে ও নৈপুণ্যে এই ছবিগুলি অসাধারণ।

পাশাপাশি কিন্তু প্রদর্শনীতে এমন বহু ছবিও আছে যা নিতান্ত ছাত্রসুলভ, ফলে প্রদর্শনীর মান তাতে কিঞ্চিৎ ব্যাহতও হয়েছে। ভাস্কর্যের যে একটিমাত্র নমুনা তাও উল্লেখযোগ্য নয়।

বার্ধক্যে বারানসী

নীলকণ্ঠ
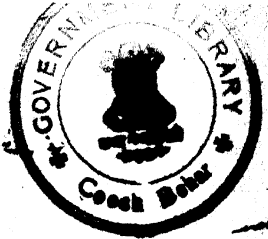
একাশী বছরে পা দেবার আগে কাশীতে পদার্পণ করব না যারা বলে তারাই পাথরের অক্ষরে খোদিত মানুষের মহত্তম প্রেমের কবিতা তাজমহল দেখবার জন্যে পূর্ণিমার প্রতীক্ষা করে। এই সব লোকেদেরই ধারণা তীর্থ করবার বয়স, ধর্ম করবার বয়স, পরকালের কথা চিন্তা করবার বয়স যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে হবে কারুর হয় না। এদেরই কেউ কেউ দাঁত পড়ে গেলে নিদারুণ ভক্ত হয় নিরামিষের ; অহিংসাই যে পরম ধর্ম বুঝতে সক্ষম হয় অচিরাৎ। অনেক লোকের তো বটেই ; আরও অনেক বেশী অনেক স্ত্রীলোকেরও এই ভ্রান্তি আইডিয়া কিছুতেই যাবার নয় যে, অল্প বয়স হচ্ছে শাড়ি, গাড়ি আর গয়নার ; কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছনর অব্যবহিত পরই অতঃপর সকলেরই পরকাল সম্পর্কে দরকার অবহিত হবার। এই মহৎ ইচ্ছার তলা দিয়ে যে পাঁকের আর ময়লার আর অস্বাস্থ্যের স্রোতস্বতী বয়ে যায় তা হচ্ছে যৌবনে ফুর্তি করার দাম দাও বয়স হলে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়ে। অর্থাৎ কালোবাজার, ভেজাল অথবা অপকর্ম হোক যত গুরুভার তীর্থে তীর্থে তৈরী করো ধর্মশালা যাতে মরবার আগেই যুধিষ্ঠিরের পর দ্বিতীয় বার সশরীরে স্বর্গে যাবার পথ আটকাতে না পারে নিজের কিম্বা অপরের বড় অথবা ছোট সম্বন্ধী ; মোদ্দা কোনও শালাই আর কি !

কিন্তু অধর্মেরই বয়স হয় ; ধর্মের কোনও বয়স নেই। ইহকালের কথা না ভাবলেও চলে ; পরকালের কথা না ভাবলেই মানুষ অচল। আগামীকালের কথা সে ভাবতে পারেনি গতকাল সেই কেবল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে মানুষের স্বখাত সলিলে ডুবে মরার আণবিক অস্ত্র ; দানবিক অহঙ্কার। নরলোকে যা করবে পরলোকে তার জবাব দিতে হবে একথা ভাবতে না পারলেই আর ইহকাল নেই ; পরকালও গেছে। পরলোক বলে যদি কিছু নাও থাকে, ইহলোক বলেও তবে যার কিছু থাকে না আর তারই নাম মানুষ। এবং এই একমাত্র বিশ্বাস ; এই একমাত্র ধর্ম ; এই সেই একমাত্র সত্য যা মানুষকে দানবের চেয়ে নরম এবং দেবতার চেয়ে কঠিন করে গড়েছে ; তাকে দিয়েছে মনুষ্যত্ব। আগামীকালও সূর্য উঠবে,—একথা আজ নিশ্চিত বলা তর্কের দৃষ্টিতে বেঠিক ; তবু এর চেয়ে সঠিক, এর চেয়ে সুনিশ্চিত প্রত্যয় আর কিছু মানুষের আছে। যদি এ বিশ্বাসের সূর্য-মুখ মুহূর্তের জন্যে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা না দিত আবার দিগন্তের দীপ্তিতে তাহলে কে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারত বর্ষিষণ মুখরিত শ্রাবণ-রাত্রে ? যদি মেঘই সত্য হতো আর সূর্য হতো অসত্য ; যদি অবিশ্বাস না হতো অলীক আর প্রত্যয় দুর্দ্ধ ; যদি মানুষের পায়ের তলার কঠিন মৃত্তিকা মুহূর্তে না সরে যেত মাথার ওপর অভাব হলে নিরুপম নীলের ; যদি আজকের 'কাল'-টাই কেবল একমাত্র কাল হতো,—গত এবং আগামীকালের সঙ্গে তার যোগ হতো বিচ্ছিন্ন তাহলে হয়, হত্যায় নয় আত্মহত্যায় উজাড় হত বিশ্বলোক। অবিশ্বাসে নয় ; আশ্বাসে। প্রমাণে নয় ; প্রত্যয়ে। মৃত্যুতে নয় মৃত্যুঞ্জয়েই জীবনের জয়। অবিশ্বাসে যা হতো বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে ত্রিভুবনের বিস্ময়লোক,—মানুষের আবাসভূমি এই বিশ্বলোক অবিশ্বাসে যা হতে পারত বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে চিরকালে ত্রিভুবনের বিস্ময়লোক।

উজীরবাদ ; পুঁজিবাদ ; গণবাদ ; সাম্যবাদ নয় ; বাদ দিতে দিতে বরবাদ কোর না মানুষকেই। বাদ দেবে কেন ? যোগ কর। কর্মযোগ ; জ্ঞানযোগ ; রাজযোগ ; ভক্তিযোগ। যোগ করো ; তবেই যোগ্য হবে। ইহকালের বস্তুতে পরকালের যোগ কর শব ; মানবীয় তনুতে সংযোগ কর ঈশ্বর। এবং উদ্‌যোগ করো বয়স থাকতে থাকতেই। সকাল থেকেই সলতে পাকাও সন্ধ্যাকালের আলো জ্বালাতে। 'নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকা' তেল থাকতে থাকতেই দীপ্ত হত ; উদ্দীপ্ত করো।

খুব অল্পবয়সে হাত দেখে বলেছিলো এক জাতকের এক গণৎকার, জাতকের ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু হবে কাশীতে ; এবং মৃত্যুর পর সেই হেতু 'কুপে' মিলবে শিবলোকের ট্রেণে ; বার বার জন্মের অন্ধকূপে মরতে হবে না পচে। শুনে পরম নিশ্চিন্ত সেই জাতক অনুতাপহীন পাপের পর পাপ করতে করতে ভ্রূণহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর বাসরে ডেকে পাঠাল সেই গণককে শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগে ; গণকঠাকুর জাতকের মেসোমশাই ছিলেন সম্পর্কে। তাকে দেখে স্বাগত জানালো ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গানে উদ্যত সেই বজ্জাতক : মেসো, তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ ! তুমি বলেছিলে আমার মৃত্যু কাশীতে ;—সেই ভরসায় যা ইচ্ছে তাই করতে করতে যা ইচ্ছে ছিল না আমার কখনও তাই করে ফেলে এখন লটকাতে চলেছি ফাঁসীতে ;—তুমি কি এখনও আমার মৃত্যু কাশীতেই বলতে চাও ?

মেসো ঠাকুর বলেন : বাবা, ত্রিভুবন,—তোমার হাত ঠিকই দেখেছিলাম ; তোমার মৃত্যু কাশীতেই ছিলো। কিন্তু এত কুকর্ম করলে বাপ আমার ইতিমধ্যে যে 'ক' এর মুখ ফাঁক হয়ে 'ফ' হয়ে যাওয়ায় কাশীর বদলে ফাঁসীতে মারা যেতে হচ্ছে তোমায় ; আমি কি করব বলো ?

আমরাই বা কি করতে পারি তাদের জন্যে—যারা একাশী বছর বয়স হলে তবেই কাশী যায় মরতে। কাশীতে মৃত্যু হলেও তারা যে কাশীতে মারা যাবার আগেই, অনেক আগেই মারা যায় যদি,

কাশী, বাড, পিছু, আগপুলে,—একথা বোঝাবে কে? এই কাশীতে যে মরতে চেয়েছে চিরকাল; একবার মরে বেঁচে যেতে চিরকালের মতো সেই হচ্ছে হিন্দু; কিন্তু কাশীতেই বেঁচে আছে যা কেবল—জগতের সব চেয়ে বড়ো, সব চেয়ে উদার, মানুষের সব চেয়ে মহৎ সেই গুণের নাম হিন্দুধর্ম।

এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে; কিন্তু আর থাকবে না। হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে; এবং তার শবের ওপর বসে যার উৎসব হবে তা হচ্ছে হিন্দীর অধর্ম। কাশীর চতুষ্পাঠীতে হিন্দুর ছেলে সংস্কৃত পড়বে না আর; বাবারবে বসে তার বদলে হাই তুলে, তপবনের চার কেলের হিন্দী কলরব; ককারথ কি চৌবাচ্চা। হিন্দু বলতেই এখন আমরা লজ্জা পাই; হিন্দী বলতে নয়। হিন্দুস্থান হিন্দীস্থান হবার আগেই, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জগত মানুষ হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কাশীর নাম নাই; একাশীর কোঠায় পা দেবার আগেই জবানার করি এ কাশীর বন্দনা:

'আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনীয়মী মানুষ মিলিবে; নহে এ স্বপ্নকথা।'

আত্মার সাথে আত্মার মিলন অবশ্য যেখানেই হোক ভারতবর্ষে আর তা হবার আশা তামাশা মাত্র; কারণ সিকুলার স্টেট স্বাধীন ভারত মাত্র মুখে; ভেতরে তার পিকুল্যার স্টেট। স্বাধীন ভারতে যেখানে হিন্দু বললেই জাত যায়; হিন্দী বললেই বজ্জাত পায় অর্ধেক রাজত্ব পায় রাজকন্যা সেখানে হিন্দুর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার আগেই দেখে যাই কাশী খণ্ড নয়; অখণ্ড।

কাশীর ইতিবৃত্ত। কাশীর যৎকিঞ্চিৎ নয়; কাশীর যথাসর্বস্ব। বরুণা থেকে অসিগঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেই বারাণসী যৌবনের। বরুণা থেকে জীবনের অসি পর্যন্ত মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরবাহী যেখানে প্রাণগঙ্গা সেই পুণ্যভূমি কাশী পৃথিবীর প্রণতি গ্রহণ করে আজ।

দুই

কাশী কেবল বিশ্বনাথের নয়; বিশ্বের যতেক অনাথ দুনিয়ায় কোথাও যাদের জায়গা নেই তারাও স্থান পেয়েছে বিশ্বনাথের বিশ্ববহির্ভূত এই আবাসভূমিতে। কাশী কেবল ধর্মের নয়, অধর্মেরও। এখানে যত ধর্মের ষণ্ড তত অধর্মের পাষণ্ড: এখানে যত সাধু তত অসাধু। যত পাণ্ডা তত দালাল। কাশীর অসংখ্য গলিতে পাপের সঙ্গে পুণ্যের অনাদিকাল থেকে আশ্চর্য গলাগলি নয় ভিন্ন হবার; কিছুতেই নয় বিচ্ছিন্ন হবার। কিন্তু গঙ্গার ঘাট নয়; নয় বিশ্বনাথের মন্দির। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি নয়; নয় মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান। ত্রৈলঙ্গের সাড়ে চার হাত বিশালকায় মূর্তি নয়: নয় বেনারাস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি। সারনাথের শান্ত পরিবেশ নয়: নয় ক্যান্টনমেন্টের মেক-আপ করা মুখ। কাশীর প্রাণের পরিচয় লক্ষকোটি মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে পায়ে চলার এই গলিতেই শুধু সম্ভব। রূপকথার কাহিনীতে রাক্ষসের প্রাণ রক্ষিত হয় দুর্গম অরণ্যের দুর্লভ বৃক্ষকোটরে; সিন্ধুর অতলে আত্মগোপন করে আছে যে অদৃশ্য মাছ তারই পেটে থাকে রাক্ষসের প্রাণপাখি; আর নয় জনশূন্য পাহাড়ের চূড়ায় বহু যুগের ওপার থেকে কচিৎ উড়ে আসে যে নীলপাখী সুদীর্ঘ ব্যবধানে মাত্র একবার তারই বুকের পাঁজরে ধুকপুক করে দৈত্যের হৃৎপিণ্ড। কাশীর অপরূপ কথাও আর কোথাও নেই; তাও আছে যদি কোথাও থাকে, কাশীর এই গলিতেই। গলির শেষ নেই; বিশ্বনাথের ভুক্তির বিস্ময়ও অশেষ।

বিশ্বনাথের গলিতেই নয় কাশীর চরম বিস্ময়। তার চেয়েও অন্ধকার, তার চেয়েও দীর্ঘকায় এক গলিতে দেখেছি সেই পরমাশ্চর্যকে। তাঁকে দেখতেই আমার বার বার কাশী যাওয়া। বিশ্বনাথকে প্রণাম করলে অক্ষয় পুণ্য হয় কি না জানি না; গঙ্গার জলে একবার অবগাহন করলেই অচ্যুত হয় কিনা পাপের স্পর্শ বলা শক্ত; কিন্তু কাশীর গলিতে যাঁকে দেখা মাত্রই পবিত্র হয় দেহমন তিনিই কাশীর দিদিমা। সকলের কাছে নাম মাত্র কাশীর এই একমাত্র দিদিমার। ধনুকের মতো বেঁকে গেছে পিঠ, চোখ প্রায় অন্ধ। অর্থই যদি মানুষের একমাত্র সহায় হয় তাহলে নিরাশ্রয় নিঃসহায় আমার এই কাশীর দিদিমা, প্রতিপত্তি যদি সামাজিক সম্বল হয় আজ মানুষের তাহলেও কাশীর দিদিমা নিঃসম্বল ছাড়া নয় কিছু। তবু অর্থের ওপরে নিশ্চয়ই আছে আরও কিছু নির্ভর, নাহলে কেন এত নিশ্চিন্ত সন্ধ্যাকাশের মতো শান্ত প্রশান্ত সেই আনন? কেন হবে সেই দুই চোখে ধ্রুবতারার মতো দীপ্তি হাসিতে কেন মানুষের প্রতি অর্থহীন বিশ্বাস বিচ্ছুরিত।

লোকে যখন বলে বুড়ো বয়সে অর্থ-সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কারুর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, তখনই আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। বলতে ইচ্ছে করে, দেখে আয় একবার আমার কাশীর দিদিমাকে। অর্থ, সম্বল, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, লোকমান কত ছোট কত কেঁচো হয়ে যায় চরিত্রের, হৃদয়ের, ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যের কাছে। যৌবনের গ্ল্যামার আর ম্যাক ফ্যাক্টরের মেক-আপ; নাইলনের শাড়ি, হ্যামিলটনের গয়না, লেটেষ্ট মডেল ট্রি মলাইও বাতাস-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কেমন লজ্জায় মুখ ঢাকে সেই কোমর পড়ে যাওয়া, কাশীর দরজায় উপস্থিত, দরিদ্র হৃতসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ মানুষটার সামনে; তাদের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর। লোকে যখন বলে যৌবনের মতো কাল নেই তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। সন্ধ্যেবেলায় আকাশের পাটে বসা সূর্যের শান্ত রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেছে স্বর্গীয় আননে। মোহমুক্তির পরমাশ্চর্য উজ্জ্বল চোখের নীলমণি; আর সেই সঙ্গেই, একসঙ্গেই আবার, ভুল করেছে সারা জীবনে, গিঁট পাকিয়ে ফেলেছে চলার গ্রন্থিতে, পায়ে পায়ে আটকে পড়ে গেছে পেছনে, ছিটকে গেছে যে দলছাড়া গোত্রছেঁড়া, নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারের অতলে, সেই পতিত জীবনযাত্রীদের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতিতে সজল দুচোখের কোণে চিকচিক করছে সব ভোলার সমস্ত ক্ষমা করার অপার করুণা।

যৌবন যে মানুষের একমাত্র সুসময় তার মতো হতভাগ্য আর কে? প্রথম দিনের সূর্য, প্রভাতের প্রথম সূর্য, মধ্যদিনের প্রজ্বলন্ত দিবাকরে উত্তর নেই সত্তার প্রথম আবির্ভাবে সেই প্রশ্নের, কে তুমি? দিবসের শেষ সূর্যেও হয়ত তার জবাব নেই; কিন্তু সেখানে আছে:

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।'

কিন্তু এ প্রার্থনা পৌঁছেছে কখনও মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে ? হলে ভালো ; না হলে আরও ভালো ।

হলে ভালো ; এ পর্যন্ত শোনা অথবা না শোনা দাতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু না হলেও যার সমান ভালো তার মত করে এমন কে আছে ত্রিভুবনে ?

এই কাশীতে গেছি যতবার ততবার কাশীনাথের আগে ; সর্বাগ্রে দৌড়েছি কাশীর দিদিমার কাছে। আর প্রত্যেকবার শুনেছি তাঁর মুখে তাঁর একটি মাত্র বলবার, বার বার বলে না ফুরোবার সেই অর্ধকালীর কাহিনী। কাশীর দিদিমারই বংশে একাদশ পুরুষ আগে এসেছিলেন অর্ধেক মানবী অর্ধেক ঈশ্বরী অসামান্য এক নারী। তাঁর কথা বলতে কাশীর দিদিমার ক্লান্তি নেই। তাঁর কথা বলতে বলতেই কাশীর দিদিমা আর প্রায় অশীতিবর্ষের বৃদ্ধা থাকতেন না ; অন্ধ দুচোখ তাঁর জ্বলে উঠতে দেখেছি আলোয়। দেহের গঙ্গায় দেখেছি দুকূল ছাপিয়ে ডাকছে জীবনের বন্যা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি রোমাঞ্চিত হতে। তাঁর নয় আমারও গায়ে কাঁটা দিয়েছে প্রত্যেকবার যতবার শুনেছি অর্ধ-কালীর কাহিনী। ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে মানুষের কি হয় পুঁথির পাতায় তা লেখা নেই কোথাও ; ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে সংসারের সার ত্যাগ করে যারা সং সেজে আনন্দ পায় সেই বকোমধ্যে হংস হয় মানুষ ; ঈশ্বর প্রসঙ্গ করলে বকোমধ্যে হংস হয় ; ঈশ্বরসঙ্গ করলে হয় পরমহংস। ঈশ্বরসঙ্গ করেছেন অল্পকালের জন্যেও এমন অপর্ণমার মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে থাকে যদি কেউ তবে কেবল সে-ই অনুভবে আনতে সক্ষম হবে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর কাহিনী শুনতে কেন এমন হয় ; সূর্যের শেষ আলো মুখে এসে পড়লে কাশীর সেই অন্ধকার গলির একফালি আরও অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায় কখন্ ; কখন ভরে যায় রজনীগন্ধার সৌরভে ; বয়ে যায় কখন্ সেই ঘরের ওপর দিয়ে সুরের সুরধুনী ; আর কাশীর দিদিমার কণ্ঠে অর্ধকালী আবির্ভূত হন যখন তখন, মনে হয় ফিরে গেছি অন্ধকারে অরণ্য আলো করা আনন্দানন বাল্মীকির মুখে, সেখানে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রামায়ণগান সেই সংখ্যা গণনার অতীত এক না-প্রত্যূষ, না-প্রদোষে।

তিনশো বছর আগেকার কথা। ঢাকায় মানিকগঞ্জ মহকুমায় মিতরা গ্রামের পদ্মনাভ বংশোদ্ভব শ্রীগোবিন্দরাম ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীরাঘবরাম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষাগুরু মৈমনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার প্রতিবেশী গ্রাম পণ্ডিতবাড়ীর সাধক দ্বিজদেবের টোল থেকে শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাগমন করছেন নিজের গ্রামে নৌকায়। নদীর জল সন্ধ্যার অন্ধকারেও আলো হয়ে আছে ; সহস্র পদ্মের গন্ধকে হার মানানো এ কোন্ আশ্চর্য সৌরভ আসছে নৌকার অভ্যন্তর থেকে ? স্বগ্রামীনরা অপেক্ষা করছে শুদ্ধ বিস্ময়ে সঙ্গে করে কী এনেছে রাঘবরাম ? পুঁথির পাতায় তো এত আলো নেই ; নৌকার দেহ তো নয় চন্দনকাঠের ; তবে ? রাঘবরামও নেমে আসতে পারছে না নৌকা ছেড়ে সহসা। রহস্যনিবিড় হয়ে এলো মিতরা বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতীরে রাঘবরাম আর তাঁর গ্রামবাসীদের ঘিরে। তারপর কোন্ সময়ে যে উঠে গেছে যবনিকা সেই পরমের চরমনাট্যের ; নিজেই আবির্ভূত হয়েছেন রাঘবরামের পরমরমণী জয়দুর্গা ; কেউ জানে না। এ কি অপরূপ আবির্ভাব ? ঘোমটায় মুখ ঢাকা ; যেন মেঘে ঢাকা পূর্ণশশী ফেটে পড়তে চাইছে আলোয় তার বইতে না পেরে ! কিন্তু সেই অঙ্গের যেটুকু হয়েছে দৃশ্যমান তার বর্ণ নয় বর্ণনীয় বিষয়। অর্ধেক তার ঘনশ্যাম আর অপরার্ধ অপরিসীম গৌর। নৌকায় উঠে দাঁড়াতেই জয়দুর্গা যেন দুলে উঠল ত্রিভুবন ; সিংহের ওপর যেন আরূঢ়া হলেন জগদ্ধাত্রী। রাঘবরামের মুখে নিঃসরণ হলো না একটি বাক্যও ; গ্রামবাসীরাও নির্বাক। ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে যেতে গিয়ে কেবল মিতরা গ্রামের নামহীন সেই নদী, থেমে গেছে বুঝি মুহূর্তের জন্যে ; তারপর বয়ে চলেছে আবার দ্বিগুণ বেগে যেমন বয়ে চলেছে সে চিরকাল।

রাঘবরমণী জয়দুর্গা সাধক দ্বিজদেবের কন্যা। জয়দুর্গার আবির্ভাবের আগে দ্বিজদেব দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাধনায় বহুতর আরাধনায় দেবী যোগমায়াকে ডেকেছিলেন দেখা দেবার জন্যে একবার। আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী যোগমায়া ; বলেছিলেন ; বর চাও। বর চেয়েছিলেন সাধক দ্বিজদেব। অর্থ নয় ; সামর্থ্য নয়, নয় তুচ্ছ লোকমান। চেয়েছিলেন যোগমায়া আসুন তাঁর ঘরে। অমূর্ত থেকে নয় ; অন্তরালে থেকে নয়। নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল যে ভুবনমনোমোহিনীরূপে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিজদেবের প্রাণের ওপারে সেই বিচিত্র রূপে আসুন দ্বিজের কুটীরে।

দেবী যোগমায়া পূরণ করেছিলেন ভক্তের প্রার্থনা এই বলে ; তাই হবে তবে। আমি কলির চার হাজার সাত শত বর্ষ পর অর্ধ-কালী মূর্তিতে প্রমূর্ত হবো তোমারই ঘরে ; আমার অঙ্গ একাংশ হবে কৃষ্ণ এবং অপরাংশ গৌরবর্ণ হবে। পদ্মনাভ বংশের বিশুদ্ধচেতা গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরামের সঙ্গে আমার বিবাহ উদ্‌যাপিত হবে যথাসময়ে।

দেবী অন্তর্হিতা হবার আগেই তাঁর দৈববাণীর সমর্থনে জয়ধ্বনি করলেন দেবলোক। সিদ্ধকাম দ্বিজদেব শুনতে পেলেন গান উঠেছে দিকে দিকে : ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

স্বপ্ন দেখলেন দ্বিজদেবের ভার্যাও ; ত্রিনয়নে তাকিয়ে আছেন নগেন্দ্রবালা বিশ্ববিমোহিনী দৃষ্টিতে নিমেষহারা যেমন তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে মায়ের কোলে শুয়ে শিশুকন্যা।

স্বপ্ন সত্য হলো। যথাসময়ে আবির্ভূতা হলেন জগজ্জননী সাধক দ্বিজদেবের ঘর আলো করে। বিচিত্ররূপিণীর নাম রাখলেন তাঁর বাপ-মা ; জয়দুর্গা। অর্ধেক অঙ্গ যাঁর কালো আর অর্ধেক যাঁর আলো, সেই অপরূপ বালিকা যখন ছোট্ট হাত বাড়ালো নাগালের অনেক বাইরের ফুল পাড়তে তখন সকলে দেখলো অবাক-বিস্ময়ে পুষ্পভারনম্র বৃক্ষ নত হলো যেন আরও ; যেন প্রণত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলো জয়দুর্গার পায়ে।

যথাসময়ে দ্বিজদেবের টোলে নিজে এসে দেখা দিলো দেবী নির্দিষ্ট বর স্বয়ং রাঘবরাম ছাত্র হয়ে। শিক্ষা সমাপন হলে গুরুদক্ষিণার সময় আসে। গুরুপ্রাণ শিষ্য রাঘবরাম নিবেদন করেন দ্বিজদেবকে ; কি দক্ষিণা, আদেশ করুন ; দ্বিজদেব বলেন ; তোমাকেই চাই রাঘবরাম। আমাকে ? হতবাক রাঘবরামের নিমেষহারা নয়ন জানতে চায় তার মতো অকিঞ্চিৎকরকে দিয়ে

কি কাজ হবে ঈশ্বরের প্রতীক মর্ত্যলোকে, শ্রীগুরু। তোমাকে চাই তোমার জন্তে নয়; আমার একমাত্র কন্তা জয়দুর্গাকে দিতে চাই তোমার হাতে। না, না, তীব্র প্রতিবাদে মুখর হলেন শিষ্য শ্রীগুরুবাক্যের; এ কখনও হয়নি; এ কখনও হয় না, গুরুকন্তা ভগিনীতুল্যা, তাকে বিয়ে করতে পারবেন না রাঘব, স্বয়ং দ্বিজদেব আদেশ দিলেও। হয়; নিশ্চয়ই হয়। আগেও হয়েছে, এখনও হয়, পরেও হবে। দ্বিজদেব নাছোড়বান্দা। অনেক তর্ক; অনেকতর বিতর্ক। বিচার বিশ্লেষণ, শাস্ত্রের নজীরের শেষে শেষ পর্যন্ত দ্বিজদেবই জয়ী হন। অবশ্য সেদিন রাঘবরামের তাই বোঝবারই কথা; কারণ তিনি গুরুকন্তাকে বিবাহ করতে চাননি কিন্তু বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কাজেই তাঁর বিচারে সেদিন তাঁরই হার। কিন্তু জয়দুর্গাকে বিবাহ করার জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন তিনি সেকথা উপলব্ধি করার সময় তখনও তাঁর হয়নি। এবং সময় না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়; দুর্গার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মহিষাসুরকেই মনে হয় সর্ব্বশক্তিমান। পুরাণের এই প্রমাণ পুরানো হলেও মিথ্যে প্রমাণ হয় না আজও। আজও জগৎ সংসারে যারা অন্যায় করে আরামে আছে সেই রাবণকে যে শেষ পর্যন্ত দুঃসময় হলে রামে মারবে, সময় হয়নি বলেই আমরা তাতে আস্থা রাখতে পারছি না।

জয়দুর্গা,—যাঁর অঙ্গে শ্যাম ও গৌরবর্ণের সমান সমারোহ সেই বিচিত্ররূপিণী যখন মৃদু হেসে নিজে এসে জীবনের সিংহদ্বার খুলে দেখা দিলেন তখন রাঘবরামের সংসার অন্ধকার করে এলো নিদারুণ সামাজিক সমস্যা। একে রাঘবরাম বিবাহ করবার সময় পাননি স্বগ্রামীন কাউকে জানাবার; তার নতুন বউয়ের অপূর্ব রূপও কিছুটা বিরূপ করেছে তাদের। তারা নতুন বউয়ের হাতে প্রথমান্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করল। অনেক অনুনয়ে, অনেক বিনয়ে এক সময়ে গ্রামের সমাজের শুকনো হৃদয় করুণাধারায় গললো। তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল রাঘবরামের গৃহে 'নববধূ-ভাতে'-র অনুষ্ঠানে পাত পাড়বার।

বিধাতার মনে কি ছিলো কে জানে, দমকা হাওয়ার উড়ে গেলো মাথার ঘোমটা অন্ন পরিবেষণরত নববধূ জয়দুর্গার। মাথা নীচু করে অন্ন মুখে তুলছেন সার সার নিমন্ত্রিতেরা; সকলের অলক্ষ্যে জয়দুর্গার অঙ্গে আবির্ভূত হলো যোগমায়ার আরও দুই হস্ত। নিমেষে মাথার ঘোমটা মাথায় টেনে দিয়ে চতুর্ভুজা হলেন আবার দ্বিভুজা; যোগমায়া আবার জয়দুর্গা।

সকলের অন্নগ্রহণ সমাপ্ত হলে, চলে গেলে সবাই ঠাকুরঘরে ক্লান্ত জয়দুর্গা যখন একা, তখন ফিরে এসেছে একজন নিমন্ত্রিত; সঙ্গে এনেছে এক জোড়া নয়, দু জোড়া শাঁখা। এসে বলেছে জয়দুর্গাকে সেই শাঁখা পরতে। দুটি শাঁখা দু হাতে পরে জয়দুর্গা জিজ্ঞেস করেছেন; দু হাতের জন্তে চারখানা শাঁখা কেন?

কেন?—পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছে ভক্ত: তুমি দ্বিভুজা নও যে মা: তুমি চতুর্ভুজা—

দেখে ফেলেছিস?

একবার দেখেছি মা। আরেক বার দেখতে চাই। তুমি দাঁড়াও তোমার ভুবনমনোমোহিনী মূর্তিতে—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, সম্পূর্ণ করতে বিধাতার অভিলাষ, জয়দুর্গা দাঁড়াল চতুর্দিক আলো করে চার হাতে পরিধান করে চার শাঁখা। ভক্ত অনিমেষ লোচনে দেখে অর্ধশ্যাম অর্ধগৌর জয়দুর্গাকে নয়; ঁঅর্ধ-কালীকে।

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে সে। রূপসম্বরণ করেন যোগমায়া। গ্রামের সকলের সমবেত চেষ্টাতেও কিন্তু মূর্ছা ভাঙে না ভক্তের; জয়দুর্গা হাসেন: এ মূর্ছা ভাঙবার নয় যে, মর্ত্যবাসীর কানে গেছে যে অমর্ত্যলোকের মূর্ছনা!

দিনের অন্তিম আলো আকাশের আঙিনায় মিলিয়ে গেলে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর এই কাহিনী শুনতে শুনতে হোন আপনি যত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত আপনার মনে হবে আপনি কাশীর দিদিমার মুখে রূপকথা শুনছেন না; শুনছেন মানবজীবনের অপরূপ কথা।

[ক্রমশঃ।

"আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা, আমাদের ধর্মের সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ জাজ্বল্যমান হইয়া আমাদিগকে সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায়, তাহাই নির্দেশ করিয়া দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষে নানা অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য সমাগত হইবে, তখন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই অখ্যাত বাংলা দেশের মহাকবির মহান আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ধ্রুবতারার দীপ্তির ন্যায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিগন্তব্যাপী রশ্মিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের চিঠি—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে লেখা

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হ'য়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হাতে দাঁড়ে তাদের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর-বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাতপরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখই এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র-দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "যদি", কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখবার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে, সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন ক'রে আনবে—সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পর-বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত, ও দীনতা বিদূরিত

হোক তোমার আদর্শে, জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে ছিদ্র সন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য, ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা মাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছার! বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, এই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি ক'রে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলা দেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গ-রোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বর্ধিবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আজ নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্বিতাকে?

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি।

বলতে পার, এত বড় কাজ কোনও একজনের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হ'তে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলা দেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে এক দিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণী দূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে লেখা সম্রাট নেপোলিয়ানের পত্র

পত্র-পরিচয়:—১৮১৫ সাল, ওয়াটারলুর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। নেপোলিয়ান পরাজিত। পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা নেই। নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ২২শে জুন, ১৮১৫। শত্রুসৈন্য বিনা বাধায় প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফরাসী সাময়িক গবর্ণমেন্টের নেতা জেনারল ফুসে ডিউক অব ওয়েলিংটনের উৎকোচে বশীভূত, কিন্তু প্যারিসের জনসাধারণ নেপোলিয়ানের পুনরাগমন প্রতীক্ষা ক'রে তাঁর প্রাসাদে সমবেত হয়েছে। প্রজাবর্গ তাঁকে অনুরোধ করেছে—নেপোলিয়ান সে অনুরোধ দেশের কল্যাণে প্রত্যাখ্যান করলেন। ছদ্মবেশে তিনি 'মেলেমিসন' প্রাসাদে বাস পরিবর্তন করলেন। এই প্রাসাদ তিনি নিজের অর্জিত অর্থে ক্রয় করেছিলেন। তাঁর এই রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রিয়তমা বিবাহ-বিচ্যুতা পত্নী জোসেফাইন শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন।

নেপোলিয়ান ফরাসী দেশ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন—তিনি আমেরিকায় চলে যেতে চান। জেনারেল ফুসের দূত

নেপোলিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন :—"সম্রাট কোথায় তাঁর বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন ?" নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, "আমি এখনো ভেবে স্থির করিনি। কিন্তু এখানে ফরাসী দেশে থাকব না কেন ? পলায়ন করা আমি অপমানজনক মনে করি। সম্মিলিত শক্তি একজন নিরস্ত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি করবে ? আমি এখানে কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে দূরে, সহরে থেকে দূরে বাস করব। আমাকে আমার শত্রুগণ কোথায় পাঠাতে চায়—ইংলণ্ডে ? সেখানে আমার জীবন নিরাপদে কাটবে না। কেউ ভাববে না যে, আমি সেখানে নিশ্চেষ্ট থাকব। আমার বন্ধুগণ ইংলণ্ডে যাওয়া পছন্দ করবে না।···আমি আমেরিকা যেতে চাই, সেখানে আমি সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারব।"

নেপোলিয়ান আমেরিকা যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফরাসী দেশ পরিত্যাগের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন, এবং ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিকট সমুদ্রপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু ডিউক অব ওয়েলিংটন সে ব্যবস্থা ত' করলেন না, বরং সমুদ্রপথ আরও বেশী ক'রে অবরুদ্ধ করলেন।

শত্রুসৈন্য মেলেমিসন প্রাসাদ অবরোধ করবার জন্য সমবেত হচ্ছে, ব্যারণ গ্রোরীকে নেপোলিয়ান বললেন, "আমি আমেরিকা যাবো। সেখানে তারা আমাকে কিছু জমি দেবে, অথবা আমি কিনে নেব এবং জমি চাষ করবো।" গ্রোরী উত্তর করলেন, "আপনি ইংরেজ জাতিকে ভীত ও কম্পিত করেছিলেন, এই দুঃসময়ে কি আপনাকে শান্তিতে জমি চাষ করতে দেবে ? আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন অথবা স্বাধীন থাকবেন, ইংলণ্ড আপনার শক্তিকে ভয় করবে। তারা আমেরিকাকে বাধ্য করবে, আপনাকে নির্ব্বাসন দিতে অথবা তাদের নিকট সমর্পণ করতে।" নেপোলিয়ান গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "তবে মেক্সিকো যাবো, অথবা কারাকাসে কিংবা বোনোআইরেসে অথবা ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমি সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে যাবো, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ছুটে বেড়াবো, মানুষের ক্রোধ ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে আমি আশ্রয় খুঁজে বেড়াবো।" গ্রোরি বললেন, "আপনি কি ইংলণ্ডের সমুদ্রজাল থেকে নিষ্কৃতি পাবেন ?" নেপোলিয়ান উত্তর দিলেন, "অবশ্য ইংলণ্ডের ক্ষমতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যদি আমি আমেরিকায় না পৌঁছিতে পারি। বৃটিশ রাষ্ট্রের কোনো [illegible] নেই আমি জানি, কিন্তু বৃটিশ জাতি বিরাট, মহৎ ও উদার। বৃটিশ জাতি আমাকে আমার মর্য্যাদা উপযোগী ব্যবহার করবে। আমি ইংলণ্ডের রাজশক্তির বিরুদ্ধে কি করতে পারি ?"

সেই দিন বার্লিনে সেনাপতি ব্লুচার ধ্বংস, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহের মধ্য দিয়ে প্যারিসের অদূরে শিবির সংস্থাপন করেছেন এবং শপথ গ্রহণ করেছেন যে নেপোলিয়ানকে শত্রু ও মিত্রের সম্মুখে ফাঁসীমঞ্চে উত্তোলন করা হবে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্যারিস থেকে কয়েকজন বন্ধু নেপোলিয়ানকে খবর দিলেন সম্মিলিত শক্তি তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছেন এবং নেপোলিয়ানের সময় অত্যন্ত অল্পই অবশিষ্ট আছে। রাত্রিতে নেপোলিয়ান ছদ্মবেশে প্যারিসের তিন শ' মাইল দূরে আটলান্টিক নদীতীরে রসেফোর্ট-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে সমুদ্রপথে ইউরোপ ত্যাগ করবেন, অন্যদিকে জেনারেল ফুসে [illegible] ক'রে নেপোলিয়ানের ইউরোপ পরিত্যাগের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করার চেষ্টা করলেন। ৩রা জুলাই তিনি রসেফোর্ট-এ উপস্থিত হলেন। তাঁর ধারণা ছিল, ছোট্ট একখানা জাহাজে ক'রে তিনি শত্রুর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সমুদ্রযাত্রা করবেন। জেনারেল ফুসের প্রদত্ত সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ড সমুদ্রপথ বহুগুণ সুসংবদ্ধ করে তুললো। কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র সমুদ্রযান বন্দর ত্যাগ করার অনুমতি পায়নি। ১১ই জুলাই, কাপ্তেন মেইট্‌ল্যাণ্ডের অধীন "বেলারোফন" যুদ্ধ জাহাজ তীরে এসে ঘোষণা করলো যে তাকে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আদেশ দিয়েছেন তিনি কোন জাহাজ বন্দর ত্যাগ করতে দেবেন না। তিন দিন পরে, মেইটল্যাণ্ড নেপোলিয়ানকে জানালেন, যদি তিনি ইংলণ্ডে যেতে চান তবে তাঁকে বেলারোফোন জাহাজে আরোহণ করতে দেওয়া হবে এবং জাহাজটি নেপোলিয়ানের আদেশ অনুযায়ী কাজ করবে। নেপোলিয়ান বন্ধুদের সাথে পরামর্শ ক'রে ইংলণ্ডের আতিথ্য স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর কয়েক জন বন্ধু সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। তাঁরা বল্লেন যে ইংলণ্ডের শাসকবর্গের উপর জনসাধারণের প্রভাব অতি অল্প। কিন্তু তারা শাসকবর্গের প্রতিহিংসা রোধ করতে পারবে না। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি জর্জের নিকট ইংলণ্ডে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে পত্র লিখলেন। "আমার ফরাসীদেশ বহুধা বিভক্ত ; চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত। আমার রাষ্ট্র জীবনের অবসান হয়েছে। আমি আজ গ্রীকবীর থেমিসটোক্লিসের মত প্রাক্তন শত্রুর আশ্রয়কামনা করি, আমি বৃটিশ রাষ্ট্রবিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমি মনে করি যে, আপনি আমার সমস্ত শত্রুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান মহত্তম এবং স্থিরমতি।"

রাত্রিতে কয়েকজন ফরাসী নৌ-সেনাপতি নেপোলিয়ানকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি ইংলণ্ডকে কখনও বিশ্বাস না করেন। কিন্তু নেপোলিয়ান তাঁর সংকল্পচ্যুত হলেন না। সেদিনই বেলারোফোন জাহাজের অধ্যক্ষ মেইটল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নেপোলিয়ান জাহাজে পদার্পণ ক'রে বললেন, "আমি এই মুহূর্তে বৃটিশ বিধানের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বেলারোফোন জাহাজে আরোহণ করলাম।" নেপোলিয়ানকে ক্যাপ্টেন মেইটলাণ্ড সম্রাট উপযোগী সম্মান জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

২৫শে জুলাই রাত্রিতে বেলারোফোন জাহাজ প্লিমাথ বন্দরে প্রবেশ করল এবং সেই মুহূর্তে নেপোলিয়ান তাঁর প্রতি ব্যবহারে বিরাট পরিবর্ত্তন অনুভব করলেন। জাহাজের চারিদিকে প্রহরীর ব্যবস্থা করা হলো এবং কোন লোক বিনা অনুমতিতে নেপোলিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলনা। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক নেপোলিয়ানকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের অভ্যর্থনা যতই মুখর হয়ে উঠলো, রাজশক্তির কড়তা ততই পরিবর্দ্ধিত হলো। ৩০শে জুলাই নেপোলিয়ানকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে জেনারেল বোনাপার্টের হস্তে যদি কোন উপায় থাকে তবে তিনি ইংলণ্ডের এবং ইউরোপীয় মিত্রশক্তির শান্তি বিনষ্ট করবেন। এই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রয়োজন অনুসারে সংকীর্ণ করা হবে। সুতরাং সেন্টহেলেনা দ্বীপে তাঁর বাসস্থান নির্ণয় করা হলো।

এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে নেপোলিয়ান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং বৃটিশ সরকারের নিকট [illegible]

সমুদ্রপথ
বেলারোফোন্ জাহাজ, অগাষ্ট, ৪, ১৮১৫

"বৃটিশ মন্ত্রিসভা !

স্বর্গের ঈশ্বর এবং মর্ত্তের মানুষ সাক্ষী ক'রে, আমার বিরুদ্ধে অত্যাচার এবং আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে আমি গভীর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি স্বেচ্ছায় বেলারোফোন্ জাহাজে আরোহণ করেছিলাম। আমি ইংলণ্ডের বন্দী নই; আমি ইংলণ্ডের অতিথি। জাহাজের অধ্যক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি জাহাজে এসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, আমাকে আমার অনুচরবর্গ সমেত ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার আদেশ তিনি পেয়েছেন। বেলারোফোন জাহাজে অধিরোহণের মুহূর্ত্তে আমি বৃটিশ জাতির আতিথ্যের অধিকার পেয়েছিলাম। যদি বেলারোফোন জাহাজের অধ্যক্ষকে আদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য একটি ষড়যন্ত্র মাত্র হয়ে থাকে, তবে বৃটিশ জাতি তার সম্মান নষ্ট করেছে এবং তার জাতীয় পতাকাকে অবনমিত করেছে। যদি তারা আমায় সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে, তবে বৃটিশ জাতির পক্ষে তাদের সদিচ্ছা, তাদের রাষ্ট্রবিধি ও তাদের স্বাধীনতার কথা বলা পরিহাসে পর্য্যবসিত হবে। বৃটিশ জাতির আত্মসম্মান, বেলারোফোন জাহাজে আমার আতিথ্যের অবসানের সহিত অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমি ইতিহাসের নিকট আমার অভিযোগ জানাচ্ছি—যে শত্রু বিশ বছর ধরে বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সে স্বেচ্ছায় তার দুর্ভাগ্যের দিনে বৃটিশ জাতির আশ্রয় যাচ্ঞা করেছিল। শত্রুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আর কি জাজ্বল্য প্রমাণ সে দিতে পারে? কিন্তু ইংলণ্ড সে মহানুভব কার্য্যের কি উত্তর দিয়েছিল? বৃটিশ জাতি শত্রুর প্রতি আতিথ্য-হস্ত প্রসারিত করেছিল, কিন্তু শত্রু-আতিথ্য স্বীকার করার পরমুহূর্ত্তেই বৃটিশ জাতি তার শত্রুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে।"

ইতি—নেপোলিয়ান,

পত্র পরিণাম :—বৃটিশ সরকার তাদের কার্য্যের অবৈধতা সম্বন্ধে অচেতন ছিল না—কারণ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসনের আদেশপত্রে কোন কর্ম্মচারী বা মন্ত্রীর স্বাক্ষর ছিল না। তারা নেপোলিয়ানের প্রতিবাদপত্র পড়ে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিল—সন্দেহ নেই। বেলারোফোন জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ এই নির্ব্বাসনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিল, কারণ অধ্যক্ষের প্রতিশ্রুতির উপরে নেপোলিয়ান নির্ভর করেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ নেপোলিয়ানের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে একটি বহু পুরাতন জাহাজে ক'রে তাঁকে সেণ্ট হেলেনায় পাঠিয়ে দিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন যেন নেপোলিয়ানকে "সম্রাট" বলে স্বীকার না করা হয়—নেপোলিয়ানকে "জেনারেল" আখ্যা দেওয়া হবে। ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের মনের প্রসারতা নেই। নেপোলিয়ান বলেছিলেন—"সমস্ত ইউরোপ আমাকে সম্রাট বলে সম্বোধন করে। যে নামে ইচ্ছা ইংলণ্ড আমাকে সম্বোধন করুক—তারা আমাকে আমার নেপোলিয়ানত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।"

ইংলণ্ড নেপোলিয়ানকে এক গ্রীষ্মপ্রধান দ্বীপে নির্ব্বাসন [illegible] অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে। সেই দ্বীপে নেপোলিয়ান নির্ব্বাসনে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করলেন। ইংলণ্ড অনুরূপ ব্যবহার করেছিল স্কটিশ রাণী মেরীর সঙ্গে; রাণী মেরী এলিজাবেথের সঙ্গে বিরোধ সত্ত্বেও তাঁর আতিথ্য স্বীকার ক'রে বথওয়েলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম ইংলণ্ডের মধ্য দিয়ে পথ চেয়েছিলেন। এলিজাবেথ তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ ক'রে প্রায় ১১ বৎসর "না বন্দী না মুক্ত" অবস্থায় রেখেছিলেন। তারপর অসমর্থিত অপরাধে হত্যা করলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতা ইংলণ্ডের ইতিহাসে নতুন নয়। তবু কারা-জীবনে তিনি মেরীকে ইংলণ্ডে রেখেছিলেন—কিন্তু নেপোলিয়ানকে প্রেরণ করা হল—"কংস-কারাগারে।" শেষে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন—

"ইংলণ্ড, আমাকে একখানি লাঙল দেও—আমি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ চাষ করব।"

তাঁর শেষ বাণী :—"England Thy Name is Perfidy."
"ইংলণ্ড ও বিশ্বাসঘাতকতা" সম অর্থবোধক।"

ভ্রাতা মিহাইলকে লেখা সাহিত্যসম্রাট ডস্টয়েভস্কির পত্র

পত্র-পরিচয় :—১৮৪৯ খৃঃ অব্দ, ডস্টয়েভস্কি মাত্র ২৮ বৎসরের যুবক। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত; অপরাধ—রাজদ্রোহ। ডস্টয়েভস্কির খ্যাতি তখন সমস্ত রাশিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে, নবীনদল ক্রমশঃ ডস্টয়েভস্কির ভক্ত হয়ে পড়েছে। তৃতীয় ফরাসী বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। অষ্ট্রিয়ার একচ্ছত্র নায়ক মেটারনিক পলাতক, ফরাসী রাজা লুই ফিলিপি রাজ্যহীন, প্রাশিয়া বিধ্বস্ত, জারের পদনিম্নে পোলাণ্ড কম্পমান। এমন সময় রাশিয়ান সাহিত্যিকগণের লেখনীর আঘাতে রাশিয়ান জনগণ চঞ্চল। রাজপুরুষগণ বেশ সন্ত্রস্ত। ডস্টয়েভস্কির পুস্তক "পুওর পিপল" (দরিদ্র জনগণ) এর মধ্যে জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল; তিনি সবন্ধু কারারুদ্ধ হলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে—সঙ্গে আরও পাঁচজন বন্ধু। তাঁদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুইবারে তাঁদের গুলী করে হত্যা করা হবে—এক এক বার তিনজন, ডস্টয়েভস্কি শেষ বারে। আর [illegible] মিনিট মাত্র অবশিষ্ট—তাঁর মনে কত চিন্তা। প্রাণঘাতী গুলীর [illegible] অপেক্ষায় আছেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্রাটের আদেশ [illegible] প্রাণদণ্ড স্থগিত; অপরাধীদের নির্ব্বাসন। জীবনমৃত্যুর মাঝখানে ডস্টয়েভস্কি অপূর্ব্ব জীবনোপলব্ধি করেছিলেন। চারদিন মাত্র [illegible] তাঁকে দেওয়া হয়েছে—তারপর তাঁরা সাইবেরিয়ার দিকে [illegible] হবেন। তিনি ভ্রাতা মিহাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সাক্ষাতের পরিবর্ত্তে পত্র লেখার অনুমতি পেলেন। [illegible] লিখলেন এই পত্র, মৃত্যুদণ্ড রহিতের ঠিক পরের দিন। ঠিক [illegible] কারাগারে অপেক্ষা করছেন—মৃত্যু আসন্ন; হঠাৎ যেন পুনর্জীবন [illegible] করেছেন। এই পত্র রাশিয়া, তথা বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য [illegible]

পিটার পল দুর্গ, ২২শে ডিসেম্বর, ১৮১৫

"মিহাইল ডস্টয়েভস্কি !

ভাই মিহাইল, আমার প্রিয়তম বন্ধু। সব স্থির হয়েছে। [illegible]
২২শে ডিসেম্বর, আমাদিগকে সেমিয়োনভ কুচকাওয়াজের ময়দানে

নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমাদের নিকট মৃত্যুদণ্ড পাঠ করা হল, আমাদের ক্রুশ চুম্বন করতে আদেশ করল, আমাদের মাথার উপরে আমাদের তরবারি বিচূর্ণ করা হল। তারপর আমাদের ফাঁসীর সাদা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রথম তিনজনকে স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাদের গুলী করা হবে। আমি ছিলাম ষষ্ঠ। এক একবারে তিনজন সুতরাং আমাকে দ্বিতীয় বারে। এক মিনিট মাত্র সময় অবশিষ্ট—তারপর আমাকে গুলী করা হবে। ভাই তুমি আমার মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তোমার বিষয় কত কথা আমার মনে এল, আমার সেই চরম মুহূর্ত্তে তুমি একাই আমার সমস্ত মন অধিকার ক'রে নিলে, তখন আমি বুঝলাম যে আমার প্রিয় ভ্রাতাকে আমি কত ভালবাসি। আমি কোনমতে আমার বন্দী-বন্ধু প্লেসচিয়েভ এবং ডুরোভকে চুম্বন করলাম। তাদের নিকট শেষ বিদায় নিলাম। হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের ঘণ্টা বেজে উঠল; আমরা ঘোষণা শুনলাম, সম্রাট জার আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন, তৎপরিবর্ত্তে বিধান করেছেন, নির্ব্বাসনদণ্ড; পদমকে ক্ষমা করা হয়েছে, সে তার সেনা বিভাগে ফিরে যাবে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আজ কিংবা কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমার সাক্ষাতের আবেদন করলাম, কিন্তু উত্তর এসেছে, "অসম্ভব"! আমি তোমাকে পত্র লেখার অনুমতি পেলাম, তুমি খুব তাড়াতাড়ি ক'রে উত্তর দিয়ো, যত শীঘ্র পারো উত্তর দিয়ো। আমার জন্যে ওরেনবর্গ দুর্গে চার বৎসর সশ্রম কারাবাসের বিধান করা হয়েছে, তারপর আমাকে সাধারণ পদাতিক সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হবে।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধ হয় আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছ। আমাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বন্দীর শকট থেকে অসংখ্য জনতা দেখেছিলাম। বোধ হয়, তাদের নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেচে—এবং তার জন্য তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ; এবার তুমি আমার সম্বন্ধে নতুন সংবাদ পেয়ে আশ্বস্ত হবে।

ভাই, আমি নিরুৎসাহ হইনি, আমার মনের তেজ নষ্ট হয়নি। জীবনের স্পন্দন সর্ব্বত্র অনুভব করা যায়, জীবন মানুষের অন্তরের মধ্যেই, মানুষের বাইরে নয়। আমাদের চারদিকে সর্ব্বদা মানুষ বাস করবে; মানুষের মাঝে মানুষ হতে হবে, চিরকাল মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, দুর্ভাগ্যের আগমনে আমরা ভেঙ্গে পড়বো না, ভগ্নচিত্ত হবো না,—এই ত' হবে জীবন। এই ত' জীবনের কাজ, এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। এই সত্য আমার অস্থি-মাংসের মধ্যে প্রবেশ করেছে—আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমার যে মস্তিষ্ক প্রতিদিন নব নব সৃষ্টি করত, শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সাহচর্য্য অনুভব করত, আমার যে মস্তিষ্ক আত্মার সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন উপলব্ধি করত—সেই মস্তিষ্ক আমার স্কন্ধচ্যুত হয়ে গেছে। আজ স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তার সৃষ্ট কয়েকটি প্রতিচ্ছবি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেগুলি এখনো আমার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেনি, সেগুলি আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলবে সন্দেহ নাই। এখনো আমার মধ্যে রয়েছে আমার অন্তর, সেই রক্তমাংস যা এখনো ভাল বাসতে পারে, দুঃখ ভোগ করতে পারে, কামনা করতে পারে, স্মরণ মনন করতে পারে; মোটের উপর এইত' জীবন। এবার বিদায় ভাই মিকাইল, বিদায়, আমার জন্য অনুতাপ করোনা।

এবার জাগতিক বাস্তব ব্যাপারে আসব। বাইবেল ব্যতীত আমার সমস্ত পুস্তক, আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, আমার নাটকের পরিকল্পনা, আমার সমাপ্ত উপন্যাস "একটি শিশুর খেলা" (A child's play) আমার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় এগুলি তুমি ফিরে পাবে। আমার ওভারকোট এবং কিছু পুরাতন বস্ত্র রেখে গেলাম। যদি তুমি লোক পাঠাও তবে সেগুলিও পাবে। ভাই মিহাইল, এবার আমাকে অনেক পথ পদব্রজে যেতে হবে, আমার অর্থের প্রয়োজন। যখন তুমি আমার পত্র পাবে, যদি তোমার কাছে থাকে আমার জন্য কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিয়ো। বিশেষ কাজের জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু অপেক্ষাও আমার পক্ষে অর্থের প্রয়োজন বেশী। অবশ্য আমার নিকট কয়েকছত্র লিখো। যদি মস্কো থেকে কোন অর্থ আসে, তবে আমার কথা স্মরণ করো, আমাকে পরিত্যাগ করো না, এই মাত্রই আমার বক্তব্য। আমার কিছু ঋণ আছে কিন্তু আমি নিরুপায়!

তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের আমার স্নেহচুম্বন দিয়ো। সর্ব্বদাই তাদের যত্ন করো, আমার কথা বলো, তারা যেন আমার কথা ভুলে না যায়। বোধ হয় আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে! তোমার পরিবারের সকলের সহিত শান্তিতে থেকো, সাবধানে থেকো, তোমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো।

প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে থেকো, আজকের মতন এমন ক'রে জীবনে আর কখনো আত্মোপলব্ধির প্রাচুর্য্য অনুভব করিনি। কিন্তু আমার দেহ কি সে ভার বইতে পারবে? আমি জানি, আমি আজ কিরূপ পীড়িত অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করছি। কিন্তু তার জন্য ভেবো না, ভাই! আমি জীবন এত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছি যে, কিছুতেই ভয় পাই না। যা' আসে আসুক!

প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে আমার বিষয় জানাবো। বন্ধু মাইকভ পরিবারকে আমার বিদায় সম্ভাষণ জানাবে। তাদের বলো, তাদের সতত সযত্ন বৃত্তির জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি চিরকাল তাদের মনে ক'রে রাখব, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে রাখব।..যারা আমাকে এখনো ভুলে যায়নি তাদের সকলকে আমার কথা বলো। আর যারা ভুলে গেছে তাদেরও আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আমাদের ভাই কুলিয়াকে আমার স্নেহচুম্বন জানিয়ো। ভাই এণ্ড্রিকে পত্র দিয়ো, আমার কথা জানিয়ো। আমার খুল্লতাত ও খুড়িমাকে আমার সংবাদ দিয়ো, ভগ্নীদের কাছেও পত্র দিয়ো। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি।

ভাই! হয়ত আবার কোনদিন আমাদের দেখা হবে। নিজের বিষয়ে সচেতন হয়ে থেকো। ভগবানকে ভালবেসো। প্রার্থনা করি, তুমি বেঁচে থেকো, যতদিন না আমাদের দেখা হয়। হয়ত কোন একদিন আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পাবো; আবার আমাদের বিগত তরুণ দিনের কথা আলোচনা করব, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলব—সেগুলি আজ রক্ত দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে দিলাম, তাদের আজ সমাধি দিয়ে গেলাম।

আমি আর কখনো লেখনী স্পর্শ করবো না, একি কখনো সম্ভব? আমার বিশ্বাস, চার বৎসর পরে আবার আমি লেখা আরম্ভ করব। ইতিমধ্যে যদি আমি কিছু লিখতে পারি তবে

কতই তোমাকে পাঠাব। প্রতিনিয়তই কত কল্পনা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে; মনের মধ্যে আমি কত নূতন জিনিষ সৃষ্টি করছি—তা কি সব ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার মস্তিষ্কে সব বিলীন হয়ে যাবে? তারা সব যে আমার রক্তের মধ্যে বিষ হয়ে সঞ্চারিত হবে। আমাকে যদি লিখতে না দেওয়া হয়, তবে সে যে হবে আমার মৃত্যুতুল্য। এর চেয়ে দীর্ঘ পনর বৎসর আমি কারাগারে থাকাও শ্রেয়ঃ মনে করব, অবশ্য যদি আমার হস্তে একটি লেখনী দেওয়া হয়।

আমার নিকট সর্বদা লিখো। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংবাদ দিতেও ভুলো না। সমস্ত বাস্তব কথা লিখো, প্রতি পত্রে আমাদের পরিবার পরিজনের ক্ষুদ্রতম সংবাদ দিতে ভুলে যেয়ো না। এই সংবাদগুলিই আমার মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, জীবন সঞ্চার করবে। এই কারাদুর্গের অন্তরালে তোমার চিঠি পেয়ে যে কী রকম তৃপ্তি অনুভব ক'রছি, তা যদি তুমি জানতে! গত আড়াই মাস যাবৎ আমার কোন পত্র পাওয়া বা লেখা নিষিদ্ধ ছিল। আমি রুগ্নশয্যায় ছিলাম, তোমার প্রেরিত অর্থ পাইনি ব'লে তোমার জন্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সেজন্ত আমার ধারণা হয়েছিল তুমি অত্যন্ত অভাবে আছ।

তোমার সন্তানদের আমার হয়ে চুম্বন দিয়ো। তাদের সুন্দর কমনীয় মুখগুলি আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। তারা সুখী হউক, তুমি নিজে সুখী হও, ভাই, তুমি সুখী হও।

দুঃখ করো না, ভগবানের ভালবাসা স্মরণ ক'রে আমার জন্ত দুঃখ করো না। তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি হতাশ হইনি; মনে রেখো আমি এখনো নিরাশ হইনি। চার বৎসরের মধ্যেই আমার অদৃষ্টের পরিবর্তন হবে। আমি তখন একজন পদাতিক সৈন্ত হবো—আর আমাকে বন্দিজীবন যাপন করতে হবে না। মনে রেখো, সে দিন তোমাকে আলিঙ্গন করব। আজ প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা আমি মৃত্যুর কবলে ছিলাম; সেই সময়টুকু মৃত্যুর চিন্তা নিয়েই কাটিয়েছিলাম। যখন আমি জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছালাম, তখনই আবার আমি নবজীবন লাভ করেছি।

আমার সম্বন্ধে যদি কোন ব্যক্তির কোন তিক্ত স্মৃতি থাকে, যদি আমি কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ ক'রে থাকি, যদি কারো সঙ্গে আমার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘ'টে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলো, তারা যেন সে সব কথা ভুলে যায়। আমার অন্তরে কোন ঘৃণা বা ঈর্ষা নেই। এই মুহূর্তে আমার যে কোন পুরাতন শত্রুকে আমি নিবিড় আলিঙ্গন করতে পারি; ও, সে কী অসীম তৃপ্তি! আমি আজ মৃত্যুর পূর্বে মনে মনে যখন প্রিয়জনকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম, তখন আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মনে হলো, আমার মৃত্যুসংবাদ তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে, এবার শান্ত হও, ভাই! আমি এখনো বেঁচে আছি এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকব, তোমাকে আলিঙ্গনের আশায়। একণে আমার মনে কেবল এই একমাত্র চিন্তা।

তুমি এখন কি করছ? আজ সমস্ত দিন ধরে কি করেছ? আমার সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনেছ? আজ কেমন শীত ছিল?

যদি এই পত্রখানি তোমার কাছে অতি শীঘ্র পৌঁছায়। নচেৎ চার মাস আর তোমার কোন সংবাদ পাব না। তুমি যে খামে করে গত দুই মাস টাকা পাঠিয়েছ, সেই খাম আমি দেখেছি—তোমার নিজের হাতে লেখা ছিল আমার ঠিকানা। তাতে খুশী হয়েছিলাম যে, তুমি সুস্থ আছ।

যখন আমি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার মনে হয়, কত সময় বৃথা নষ্ট করেছি, ভুলের মধ্য দিয়ে, আলস্যের মধ্য দিয়ে। জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে কত অনভিজ্ঞ ছিলাম, আমি সময়ের মূল্য বুঝি নি, আমি আমার অন্তর-দেবতা ও আত্মার প্রতি কত অবিচার করেছি। আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবন ভগবানের একটি অমূল্য দান, জীবন আনন্দময়, প্রতি মুহূর্তকে এক একটি আনন্দের যুগে পর্য্যবসিত করা যায়। বর্তমানে জীবনের ধারা পরিবর্তন ক'রে আমি আবার নবজন্ম লাভ করলাম। ভাই মিহাইল! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আশাহীন হবো না, আমার আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখব। আমার চিত্তকে পবিত্র রাখব। সেই আমার একমাত্র আশা, আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

কারা-জীবনের প্রভাব আমার মধ্যে দেহের আবেদনের ক্ষুধাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমি অতীতে আমার সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলাম না। আমার দারিদ্র্য আমাকে আজ কোন আঘাত দিতে পারে না। সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই, শারীরিক কোন কষ্ট আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। এটা অসম্ভব! তবে এই অবস্থায় স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

বিদায়, ভাই বিদায়! আবার কবে যে তোমাকে লিখতে পাব? তুমি আমার নিকট থেকে এই পথভ্রমণের ক্ষুদ্রতম সংবাদ পর্য্যন্ত পাবে। যদি আমার স্বাস্থ্য অটুট থাকে তবে সমস্তই ঠিক থাকবে।

এবার শেষ বিদায় ভাই, শেষ বিদায়। তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছি, তোমাকে চুম্বন দিচ্ছি। হৃদয়ে কোন ব্যথা না রেখে আমার কথা স্মরণ করো। শোক করোনা, তোমাকে মিনতি ক'রে বলছি, আমার জন্ত শোক করোনা। আগামী পত্রে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমাকে জানাব; তখন মনে করো, আমি তোমাকে কি বলেছি। জীবনের পরিকল্পনা ক'রে নিয়ো; জীবন নষ্ট করোনা। ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ো, তোমার সন্তানদের কথা ভেবো। তোমার সঙ্গে দেখা ক'বে হবে? আবার কবে দেখা হবে? যাহা কিছু আমার প্রিয়, আজ সমস্ত থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি; এটা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। নিজকে বিচূর্ণ করা যে কত বেদনাদায়ক! হৃদয়কে বিখণ্ডিত করা কী দুঃখজনক! বিদায়, ভাই আবার বিদায়। আমি নিশ্চিন্ত যে, আবার আমাদের দেখা হবে। ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসো। তোমার স্মৃতি যেন শিথিল হয়ে না যায়; তোমার ভালবাসার স্মৃতিই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার, আবার বিদায়, ভাই বিদায়—সর্বজনের কাছে বিদায় জানাচ্ছি।

তোমার ভাই—ফিওডর ডস্টয়েভস্কি।"

পত্র পরিণাম :—এই বিদ্রোহী কবিচিত্তে কত সুন্দর অনাবিল ভ্রাতৃপ্রেমধারা নিরন্তর প্রবাহিত ছিল—কী প্রগাঢ় সেই প্রেমের অভিব্যক্তি! অবশ্য ডস্টয়েভস্কির এই কারাজীবন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বহু লেখার মধ্যে এই সুদীর্ঘ কারাজীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে, কারাজীবনই বহু মানুষের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের সূচনা করেছে—আত্মোপলব্ধির সন্ধান দিয়েছে। ১৮৬১ সালে তিনি

নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমাদের নিকট মৃত্যুদণ্ড পাঠ করা হল, আমাদের ক্রুশ চুম্বন করতে আদেশ করল, আমাদের মাথার উপরে আমাদের তরবারি বিচূর্ণ করা হল। তারপর আমাদের ফাঁসীর সাদা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হল। আমাদের প্রথম তিনজনকে স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাদের গুলী করা হবে। আমি ছিলাম ষষ্ঠ। এক একবারে তিনজন সুতরাং আমাকে দ্বিতীয় বারে। এক মিনিট মাত্র সময় অবশিষ্ট—তারপর আমাকে গুলী করা হবে। ভাই তুমি আমার মধ্যে এসে দাঁড়ালে। তোমার বিষয় কত কথা আমার মনে এল, আমার সেই চরম মুহূর্ত্তে তুমি একাই আমার সমস্ত মন অধিকার ক'রে নিলে, তখন আমি বুঝলাম যে আমার প্রিয় ভ্রাতাকে আমি কত ভালবাসি। আমি কোনমতে আমার বন্দী-বন্ধু প্লেসচিয়েভ এবং ডুরোভকে চুম্বন করলাম। তাদের নিকট শেষ বিদায় নিলাম। হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের ঘণ্টা বেজে উঠল; আমরা ঘোষণা শুনলাম, সম্রাট জার আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন, তৎপরিবর্ত্তে বিধান করেছেন, নির্ব্বাসনদণ্ড; পামকে ক্ষমা করা হয়েছে, সে তার সেনা বিভাগে ফিরে যাবে। আমাকে বলা হয়েছে যে, আজ কিংবা কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমি তোমার সাক্ষাতের আবেদন করলাম, কিন্তু উত্তর এসেছে, "অসম্ভব"! আমি তোমাকে পত্র লেখার অনুমতি পেলাম, তুমি খুব তাড়াতাড়ি ক'রে উত্তর দিয়ো, যত শীঘ্র পারো উত্তর দিয়ো। আমার জন্যে ওরেনবর্গ দুর্গে চার বৎসর সশ্রম কারাবাসের বিধান করা হয়েছে, তারপর আমাকে সামান্য পদাতিক সৈন্য বিভাগে যোগ দিতে হবে।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধ হয় আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছ। আমাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন বন্দীর শকট থেকে অসংখ্য জনতা দেখেছিলাম। বোধ হয়, তাদের নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছেচে—এবং তার জন্য তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ; এবার তুমি আমার সম্বন্ধে নতুন সংবাদ পেয়ে আশ্বস্ত হবে।

ভাই, আমি নিরুৎসাহ হইনি, আমার মনের তেজ নষ্ট হয়নি। জীবনের স্পন্দন সর্ব্বত্র অনুভব করা যায়, জীবন মানুষের অন্তরের মধ্যেই, মানুষের বাইরে নয়। আমাদের চারদিকে সর্ব্বদা মানুষ বাস করবে; মানুষের মাঝে মানুষ হতে হবে, চিরকাল মানুষ হয়ে বাঁচতে হবে, দুর্ভাগ্যের আগমনে আমরা ভেঙ্গে পড়বো না, ভগ্নচিত্ত হবো না,—এই ত' হবে জীবন। এই ত' জীবনের কাজ, এই সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। এই সত্য আমার অস্থি-মাংসের মধ্যে প্রবেশ করেছে—আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

আমার যে মস্তিষ্ক প্রতিদিন নব নব সৃষ্টি করত, শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সাহচর্য্য অনুভব করত, আমার যে মস্তিষ্ক আত্মার সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন উপলব্ধি করত—সেই মস্তিষ্ক আমার স্কন্ধচ্যুত হয়ে গেছে। আজ স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে, তার সৃষ্ট কয়েকটি প্রতিচ্ছবি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সেগুলি এখনো আমার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেনি, সেগুলি আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলবে সন্দেহ নাই। এখনো আমার মধ্যে রয়েছে আমার অন্তর, সেই রক্তমাংস যা এখনো ভাল বাসতে পারে, দুঃখ ভোগ করতে পারে, কামনা করতে পারে, স্মরণ মনন করতে পারে; মোটের উপর এইত' জীবন। এবার বিদায় ভাই মিকাইল, বিদায়, আমার জন্য অনুতাপ করোনা।

এবার জাগতিক বাস্তব ব্যাপারে আসব। বাইবেল ব্যতীত আমার সমস্ত পুস্তক, আমার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি, আমার নাটকের পরিকল্পনা, আমার সমাপ্ত উপন্যাস "একটি শিশুর খেলা" (A child's play) আমার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। বোধ হয় এগুলি তুমি ফিরে পাবে। আমার ওভারকোট এবং কিছু পুরাতন বস্ত্র রেখে গেলাম। যদি তুমি লোক পাঠাও তবে সেগুলিও পাবে। ভাই মিহাইল, এবার আমাকে অনেক পথ পদব্রজে যেতে হবে, আমার অর্থের প্রয়োজন। যখন তুমি আমার পত্র পাবে, যদি তোমার কাছে থাকে আমার জন্য কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিয়ো। বিশেষ কাজের জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু অপেক্ষাও আমার পক্ষে অর্থের প্রয়োজন বেশী। অবশ্য আমার নিকট কয়েকছত্র লিখো। যদি মস্কো থেকে কোন অর্থ আসে, তবে আমার কথা স্মরণ করো, আমাকে পরিত্যাগ করো না, এই মাত্রই আমার বক্তব্য। আমার কিছু ঋণ আছে কিন্তু আমি নিরুপায়।

তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের আমার স্নেহচুম্বন দিয়ো। সর্ব্বদাই তাদের যত্ন করো, আমার কথা বলো, তারা যেন আমার কথা ভুলে না যায়। বোধ হয় আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে। তোমার পরিবারের সকলের সহিত শান্তিতে থেকো, সাবধানে থেকো, তোমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করো।

প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে থেকো, আজকের মতন এমন ক'রে জীবনে আর কখনো আত্মোপলব্ধির প্রাচুর্য্য অনুভব করিনি। কিন্তু আমার দেহ কি সে ভার বইতে পারবে? আমি জানি, আমি আজ কিরূপ পীড়িত অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করছি। কিন্তু তার জন্য ভেবো না, ভাই! আমি জীবন এত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করেছি যে, কিছুতেই ভয় পাই না। যা' আসে আসুক।

প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে আমার বিষয় জানাবো। বন্ধু মাইকভ পরিবারকে আমার বিদায় সম্ভাষণ জানাবে। তাদের বলো, তাদের সতত সহৃদ্ বৃত্তির জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি চিরকাল তাদের মনে ক'রে রাখব, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে রাখব।...যারা আমাকে এখনো ভুলে যায়নি তাদের সকলকে আমার কথা বলো। আর যারা ভুলে গেছে তাদেরও আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। আমাদের ভাই কুলিয়াকে আমার স্নেহচুম্বন জানিয়ো। ভাই এণ্ড্রিকে পত্র দিয়ো, আমার কথা জানিয়ো। আমার খুল্লতাত ও খুড়িমাকে আমার সংবাদ দিয়ো, ভগ্নীদের কাছেও পত্র দিয়ো। আমি তাদের মঙ্গল কামনা করি।

ভাই! হয়ত আবার কোনদিন আমাদের দেখা হবে। নিজের বিষয়ে সচেতন হয়ে থেকো। ভগবানকে ভালবেসো। প্রার্থনা করি, তুমি বেঁচে থেকো, যতদিন না আমাদের দেখা হয়। হয়ত কোন একদিন আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পাবো; আবার আমাদের বিগত তরুণ দিনের কথা আলোচনা করব, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলব—সেগুলি আজ রক্ত দিয়ে হৃদয় থেকে মুছে দিলাম, তাদের আজ সমাধি দিয়ে গেলাম।

আমি আর কখনো লেখনী স্পর্শ করবো না, একি কখনো সম্ভব? আমার বিশ্বাস, চার বৎসর পরে আবার আমি লেখা আরম্ভ করব। ইতিমধ্যে যদি আমি কিছু লিখতে পারি তবে

অবশ্যই তোমাকে পাঠাব। প্রতিনিয়ত কত কল্পনা আমার মধ্যে জন্মলাভ করেছে; মনের মধ্যে আমি কত নূতন জিনিষ সৃষ্টি করছি—তা কি সব ধ্বংস হয়ে যাবে? আমার মস্তিষ্কে সব বিলীন হয়ে যাবে? তারা সব যে আমার রক্তের মধ্যে বিষ হয়ে সঞ্চারিত হবে। আমাকে যদি লিখতে না দেওয়া হয়, তবে সে যে হবে আমার মৃত্যুতুল্য। এর চেয়ে দীর্ঘ পনর বৎসর আমি কারাগারে থাকাও শ্রেয়ঃ মনে করব, অবশ্য যদি আমার হস্তে একটি লেখনী দেওয়া হয়।

আমার নিকট সর্ব্বদা লিখো। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংবাদ দিতেও ভুলো না। সমস্ত বাস্তব কথা লিখো, প্রতি পত্রে আমাদের পরিবার পরিজনের ক্ষুদ্রতম সংবাদ দিতে ভুলে যেয়ো না। এই সংবাদগুলিই আমার মধ্যে আশার সঞ্চার করবে, জীবন সঞ্চার করবে। এই কারাদুর্গের অন্তরালে তোমার চিঠি পেয়ে যে কী রকম তৃপ্তি অনুভব ক'রছি, তা যদি তুমি জানতে! গত আড়াই মাস যাবৎ আমার কোন পত্র পাওয়া বা লেখা নিষিদ্ধ ছিল। আমি রুগ্নশয্যায় ছিলাম, তোমার প্রেরিত অর্থ পাইনি ব'লে তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সেজন্য আমার ধারণা হয়েছিল তুমি অত্যন্ত অভাবে আছ।

তোমার সন্তানদের আমার হয়ে চুম্বন দিয়ো। তাদের সুন্দর কমনীয় মুখগুলি আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না। তারা সুখী হউক, তুমি নিজে সুখী হও, ভাই, তুমি সুখী হও।

দুঃখ করো না, ভগবানের ভালবাসা স্মরণ ক'রে আমার জন্য দুঃখ করো না। তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি হতাশ হইনি; মনে রেখো আমি এখনো নিরাশ হইনি। চার বৎসরের মধ্যেই আমার অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হবে। আমি তখন একজন পদাতিক সৈন্য হবো—আর আমাকে বন্দিজীবন যাপন করতে হবে না। মনে রেখো, সে দিন তোমাকে আলিঙ্গন করব। আজ প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা আমি মৃত্যুর কবলে ছিলাম; সেই সময়টুকু মৃত্যুর চিন্তা নিয়েই কাটিয়েছিলাম। যখন আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এসে পৌঁছালাম, তখনই আবার আমি নবজীবন লাভ করেছি।

আমার সম্বন্ধে যদি কোন ব্যক্তির কোন তিক্ত স্মৃতি থাকে, যদি আমি কারো সঙ্গে কখনো বিবাদ ক'রে থাকি, যদি কারো সঙ্গে আমার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘ'টে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হলে বলো, তারা যেন সে সব কথা ভুলে যায়। আমার অন্তরে কোন ঘৃণা বা ঈর্ষা নেই। এই মুহূর্ত্তে আমার যে কোন পুরাতন শত্রুকে আমি নিবিড় আলিঙ্গন করতে পারি; ও, সে কী অসীম তৃপ্তি! আমি আজ মৃত্যুর পূর্ব্বে মনে মনে যখন প্রিয়জনকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম, তখন আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমার মনে হলো, আমার মৃত্যুসংবাদ তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে, এবার শান্ত হও, ভাই! আমি এখনো বেঁচে আছি এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকব, তোমাকে আলিঙ্গনের আশায়। এক্ষণে আমার মনে কেবল এই একমাত্র চিন্তা।

তুমি এখন কি করছ? আজ সমস্ত দিন ধরে কি করেছ? আমার সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনেছ? আজ কেমন শীত ছিল?

যদি এই পত্রখানি তোমার কাছে অতি শীঘ্র পৌঁছায়। নচেৎ চার মাস আর তোমার কোন সংবাদ পাব না। তুমি যে খামে করে গত দুই মাস টাকা পাঠিয়েছ, সেই খাম আমি দেখেছি—তোমার নিজের হাতে লেখা ছিল আমার ঠিকানা। তাতে খুশী হয়েছিলাম যে, তুমি সুস্থ আছ।

যখন আমি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, আমার মনে হয়, কত সময় বৃথা নষ্ট করেছি, ভুলের মধ্য দিয়ে, আলস্যের মধ্য দিয়ে। জীবনযাত্রার রীতিনীতি সম্বন্ধে কত অনভিজ্ঞ ছিলাম, আমি সময়ের মূল্য বুঝি নি, আমি আমার অন্তর-দেবতা ও আত্মার প্রতি কত অবিচার করেছি। আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জীবন ভগবানের একটি অমূল্য দান, জীবন আনন্দময়, প্রতি মুহূর্ত্তকে এক একটি আনন্দের যুগে পর্য্যবসিত করা যায়। বর্ত্তমানে জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন ক'রে আমি আবার নবজন্ম লাভ করলাম। ভাই মিহাইল! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আশাহীন হবো না, আমার আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখব। আমার চিত্তকে পবিত্র রাখব। সেই আমার একমাত্র আশা, আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

কারা-জীবনের প্রভাব আমার মধ্যে দেহের আবেদনের ক্ষুধাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমি অতীতে আমার সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলাম না। আমার দারিদ্র্য আমাকে আজ কোন আঘাত দিতে পারে না। সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই, শারীরিক কোন কষ্ট আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। এটা অসম্ভব! তবে এই অবস্থায় স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া কষ্টসাধ্য।

বিদায়, ভাই বিদায়! আবার কবে যে তোমাকে লিখতে পাব? তুমি আমার নিকট থেকে এই পথভ্রমণের ক্ষুদ্রতম সংবাদ পর্য্যন্ত পাবে। যদি আমার স্বাস্থ্য অটুট থাকে তবে সমস্তই ঠিক থাকবে।

এবার শেষ বিদায় ভাই, শেষ বিদায়। তোমাকে আমি নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করছি, তোমাকে চুম্বন দিচ্ছি। হৃদয়ে কোন ব্যথা না রেখে আমার কথা স্মরণ করো। শোক করোনা, তোমাকে মিনতি ক'রে বলছি, আমার জন্য শোক করোনা। আগামী পত্রে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমাকে জানাব; তখন মনে করো, আমি তোমাকে কি বলেছি। জীবনের পরিকল্পনা ক'রে নিয়ো; জীবন নষ্ট করোনা। ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ো, তোমার সন্তানদের কথা ভেবো। তোমার সঙ্গে দেখা ক'বে হবে? আবার কবে দেখা হবে? যাহা কিছু আমার প্রিয়, আজ সমস্ত থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি; এটা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। নিজকে বিচূর্ণ করা যে কত বেদনাদায়ক! হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করা কী দুঃখজনক! বিদায়, ভাই আবার বিদায়। আমি নিশ্চিন্ত যে, আবার আমাদের দেখা হবে। ভুলে যেওনা, আমাকে ভালবেসো। তোমার স্মৃতি যেন শিথিল হয়ে না যায়; তোমার ভালবাসার স্মৃতিই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আবার, আবার বিদায়, ভাই বিদায়—সর্ব্বজনের কাছে বিদায় জানাচ্ছি।

তোমার ভাই—ফিওডর ডস্টয়েভস্কি."

পত্র পরিণাম:—এই বিদ্রোহী কবিচিত্তে কত সুন্দর অনাবিল ভ্রাতৃপ্রেমধারা নিরন্তর প্রবাহিত ছিল—কী প্রগাঢ় সেই প্রেমের অভিব্যক্তি! অবশ্য ডস্টয়েভস্কির এই কারাজীবন ব্যর্থ হয়নি। তাঁর বহু লেখার মধ্যে এই সুদীর্ঘ কারাজীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে, কারাজীবনই বহু মানুষের ভবিষ্যৎ মহত্বের সূচনা করেছে—আত্মোপলব্ধির সন্ধান দিয়েছে। ১৮৩১ সালে তিনি

লিখলেন "মৃত্যু-ভবন" (House of Death), ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে লিখলেন "ভূগর্ভের পত্রাবলী" (Letters from the under world) ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে "পাপ ও শাস্তি" (Crime and Punishment)—সবগুলিই তাঁর সাইবেরিয়ার বন্দিজীবনের অপূর্ব অভিব্যক্তি।

ডস্টয়েভস্কির অনুভূতির মূল কেন্দ্র ছিল মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিশ্বসৃষ্টির মূলে ঈশ্বর বিশ্বাস। সেই অনুভূতির পরিচয় এই পত্র মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সর্ববাদিসম্মত। ১৮৯৫-১৯১৫ পর্য্যন্ত, ফরাসী, জার্মাণ এবং ইংরাজী সাহিত্যকে তিনি অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত করেছেন, প্রভাবান্বিত করেছেন।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জনষ্টোনকে লেখা রাষ্ট্রনায়ক আব্রাহাম লিন্‌কনের পত্র

পত্র পরিচয় :—এই পত্রখানি অত্যন্ত বাস্তব। আপাত দৃষ্টিতে এই পত্রখানির মধ্যে লিন্‌কনের হৃদয়হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, সামান্য ৮০ ডলার দিয়ে তাঁর পরম আত্মীয়কে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। অথচ এই আব্রাহামই দাসপ্রথা রহিত করার জন্য পণ করেছিলেন, গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, আদর্শের প্রতি প্রবল নিষ্ঠার আগ্রহে তিনি আমেরিকার ভিত্তি পর্য্যন্ত আন্দোলিত করেছিলেন। সেই আব্রাহাম নিজের বিমাতাকে, বিমাতাপুত্রকে মাত্র ৮০ ডলার ধার দিতে অস্বীকার করলেন, অর্থের পরিবর্ত্তে দিলেন উপদেশ। ভ্রাতা চাইল রুটি, তিনি দিলেন পাথরকুচি। তাঁর বৈমাত্র ভাই তখন ইলিনয় প্রদেশে খানের ক্ষেতে ধান ভেঙ্গে খাচ্ছে। তাঁর মাও সেখানে। সামান্য অর্থে, সংসার চলা ভার। তবু আব্রাহাম সাহায্য করলেন না; আব্রাহাম দিলেন ঋণ প্রত্যাখ্যানের যুক্তি। সেদিন ছিল খৃষ্টের জন্মদিন। খৃষ্টানের নিকট বড়দিন পুণ্যদিবস, মানুষ আত্মীয়-স্বজনকে দান করে, উপহার দেয়। অথচ পুণ্যবান, পুণ্যাত্মা আব্রাহাম দান করতে অস্বীকার করলেন। আপাত দৃষ্টিতে হৃদয়হীনতার পরিচয় বৈ কি।

"প্রিয় জনষ্টোন, ডিসেম্বর ২৪-১৮৪৮

তুমি ৮০ ডলার ধারের জন্য অনুরোধ করেছ, আমি তোমাকে এই অর্থ দেওয়া সমীচীন মনে করিনা। আমি অনেকবার তোমাকে যখনই সামান্য ধার দিয়েছি, তুমি বলেছিলে—এবার আমাদের চলে যাবে ভালভাবে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার তোমাকে অর্থকৃচ্ছতার অসুবিধার মধ্যে দেখলাম। তোমার স্বভাবের মধ্যে কোন বিশেষ ত্রুটির জন্যই এইরূপ হয়। আমার মনে হয়, আমি তোমার সেই ত্রুটির সন্ধান পেয়েছি। তুমি অলস নও, কিন্তু তুমি কর্মবিমুখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার পর তুমি একটি দিনও সম্পূর্ণ দিনভরে পরিশ্রম করেছ কিনা সন্দেহ। তুমি যে কাজ করতে খুব বেশী অনিচ্ছুক তাহাও নয়, তথাপি তুমি খুব বেশী কাজ করনা। তার কারণ এই যে, তোমার বিশ্বাস পরিশ্রম দ্বারা তোমার যথেষ্ট উপার্জন হয় না।

বৃথা সময় নষ্ট করার অভ্যাসই তোমার সমস্ত অভাবের মূল কারণ। তোমার নিজের হিতার্থে, বিশেষ করে তোমার সন্তানদের কল্যাণের জন্য তোমাকে এই বদ অভ্যাস পরিহার করতে হবে। তোমার সন্তানদের পক্ষে ইহার প্রয়োজন আরও বেশী; কারণ তাদের স্বভাবে এই মন্দ অভ্যাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হবার পূর্বেই এই দোষমুক্ত হওয়া সহজ হবে। একবার অলস হয়ে পড়লে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন হবে।

তোমার এখন নগদ টাকার প্রয়োজন, আমি তোমাকে বলছি তুমি যে কোন লোকের অধীনে দিবারাত্র পরিশ্রম করে কিছু নগদ অর্থ উপার্জন কর। আমাদের পিতা ও তোমার পুত্রগণ মিলিত ভাবে তোমার সংসারযাত্রার ভার গ্রহণ করুন। তোমাদের জমি চাষ করুন, ফসল জন্মান, আর তুমি নগদ অর্থের জন্য অন্য কাহারো ক্ষেত্রে কাজ কর। সেই অর্থ দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ কর। তোমার শ্রমের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক তুমি পাবে। বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আজ থেকে ১লা মে পর্য্যন্ত তোমার পরিশ্রমের জন্য যত ডলার তুমি পাবে, তার সমান ডলার আমি তোমায় দেব। যদি তুমি এই পরিশ্রমের জন্য মাসে দশ ডলার পাও, আমি তোমাকে দশ ডলার দেব, অর্থাৎ তুমি মাসে দশ ডলার বেশী পাবে। এই উপার্জনের জন্য আমি তোমাকে সীসার খনিতে কাজ করতে বলছি না, অথবা ক্যালিফোর্নিয়াতে গিয়ে সোনার খনিতেও কাজ করতে বলি না। তুমি এই ইলিনয়ে থেকে যত বেশী সম্ভব হয় তাই উপার্জন করো।

যদি তুমি এইভাবে চল, তবে শীঘ্রই তুমি ঋণমুক্ত হবে। এর চেয়ে আরও একটি ভাল ফল হবে যে, ভবিষ্যতে ঋণ করা অভ্যাস থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু আমি যদি এ বৎসর তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিই, তুমি আবার আগামী বৎসর এমনি ঋণভারে জর্জরিত হবে। তুমি বলছ যে, ৭০।৮০ ডলারের জন্য তুমি স্বর্গে তোমার স্থান বিনিময় করতে পার, সুতরাং মনে হয় তোমার স্বর্গের মূল্য অতিশয় অল্প। তোমাকে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা নিয়ে তুমি ৪।৫ মাসের মধ্যেই ৭০।৮০ ডলার উপার্জন করতে পার। তুমি লিখেছ যে আমি তোমাকে উক্ত ধার দিলে তুমি তোমার জমি লিখে দেবে, আর যদি ধার শোধ না দেও, তবে জমি তুমি ফেরত নিবে না।

তুমি একটি অকাট মূর্খ। তোমার জমি থাকতেই যদি তুমি অঋণী হয়ে থাকতে না পার, তবে জমি বাদ দিয়ে কি করে বাঁচবে? তুমি আমার পরামর্শ অনুসরণ কর। তুমি শীঘ্রই দেখবে যে, তোমার মূল্য ৮০ ডলারের বহুগুণ বেশী। ইতি—

তোমার স্নেহের ভ্রাতা
এ. লিনকন্"

পত্র পরিণাম :—পত্র পাঠ ক'রে জনষ্টোন লিনকন্ এই পত্রের উপদেশ অনুযায়ী চলেছেন কিনা জানি না। তবে এই পত্রে আব্রাহাম লিনকনের বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।

তৃতীয় নেপোলিয়ানকে লেখা কবিকুলরাজ্ঞী এলিজাবেথ ব্রাউনিঙ-এর পত্র

পত্র-পরিচয় :—বীর নেপোলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র লুইনাপোলিয়ন সাম-মাহাত্ম্যে ফরাসী দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছেন; অথচ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, চরিত্রে কোন দিক দিয়েই তৃতীয় নেপোলিয়ান তাঁর খুল্লতাতের সমকক্ষ নন। নামসামঞ্জস্য ভাবপ্রবণ ফরাসী জাতিকে

মুহূর্তেই বিব্রত করেছিল। কিন্তু ভিক্টর হিউগোর ন্যায় তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচলিত করা সহজ নয়। ভিক্টর হিউগো লিখলেন এক অপরূপ ব্যঙ্গচিত্র Les Chatiments "লাসাটিমেন্ট" —তৃতীয় নেপোলিয়ানকে আক্রমণ ক'রে এবং প্রমাণ করলেন যে তরবারি অপেক্ষা লেখনীর শক্তি অনেক বেশী। তীক্ষ্ণ তরবারিকে স্তব্ধ করা যায়, লেখনী দুর্ব্বল হলেও অতি বলবানকেও স্তব্ধ ক'রে দিতে পারে। বাক্যবাণে জর্জ্জরিত তৃতীয় নেপোলিয়ান দুঃসাহসী সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগোকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলেন।

পৃথিবীর চিন্তাশীল সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকেই এই কার্য্যের প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছা করলেন কিন্তু নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাতে সাহস করলেন না। ইংরেজ-মহিলার মধ্যে এলিজাবেথ ব্যরেট ব্রাউনিঙ নিস্পৃহ হয়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানকে লিখলেন একখানি পত্র, ব্যক্তিগত ভাবে। সাক্ষাৎ ভাবে তিনি ভিক্টর হিউগোকে জানতেন না, নেপোলিয়ানকেও জানতেন না। সমব্যবসায়ী শিল্পী, সাধক ভিক্টরের জন্ত সহানুভূতি প্রণোদিত হয়ে অচেনা বন্ধুর জন্ত তিনি এই অপূর্ব্ব পত্র রচনা করলেন :—

"মহানুভব সম্রাট,

আমি সামান্ত নারীমাত্র। সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন আমার কোন ঐশ্বর্য্য নাই। আপনার উপর আমার দাবী একমাত্র সবলের উপর দুর্ব্বলের দাবী। সম্ভবতঃ আমি যে একজন ইংরেজ-কবির পত্নী এবং ইংরেজ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে যে আমি পরিচিত তাহাও হয়ত সম্রাটের জানা নেই। আমি আমার দেশে রাজার নিকট কখনো কোনো আবেদন নিয়ে উপস্থিত হই নাই, এবং রাজপুরুষকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় তাও জানি না ; তবু আমি পুস্তকের মধ্য দিয়ে এবং সাধনার মধ্য দিয়ে অনেক বিখ্যাত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। সেই ভরসায়ই সম্রাট নেপোলিয়ানকে আমার মনোভাব জ্ঞাপন করতে সম্পূর্ণ অপারগ বলে মনে করি না।

আমি সম্রাটকে একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আমার আবেদন পাঠ করবার জন্ত অনুরোধ জানাচ্ছি। এ আবেদন আমার জন্ত নয় এবং আবেদন আমার নিজেরও নয়। Contemplation নামে একখানি পুস্তক ভাববিহ্বল চিত্তে, অশ্রুসিক্ত নেত্রে এবং উদার হৃদয় নিয়ে আমি পাঠ করেছি। এই পুস্তকের লেখক··তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আপনার প্রতি গভীর অন্যায় করেছেন, তিনি এখন জারসী দ্বীপে তাঁর অর্ব্বাচীন এবং অন্যায় মন্তব্যের জন্ত নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করছেন। এই লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচয় নাই, আমি কখনো তাঁর মুখও দেখি নাই, আমি অবশ্য এখন তাঁর জন্ত কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করতেও আসি নাই, সত্যই ত এই লোক ক্ষমা পেতে পারে না। ক্ষমা চাওয়ার উপযুক্ত পাত্র তিনি নন। তবে একটি কথা বলব, এই ব্যক্তি আর যাই হউন না কেন, তিনি ফরাসী দেশের কবি। আপনি সম্রাট, দেশের সমস্ত মহত্ব ও গৌরবের সর্ব্বাধিনায়ক, আমার অনুরোধ, আপনি সেই কবিকে স্মরণ রাখবেন এবং তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

সম্রাট, Napolean la petit (ক্ষুদ্র নেপোলিয়ান) সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, প্রকৃত তাহা সম্রাটের মর্য্যাদাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যাহা আপনাকে স্পর্শ করবে তা' ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণের লেখনী ; তারা লিখবে, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ানের রাজ্যকালে ফরাসী কবি ভিক্টর হিউগো নির্ব্বাসনে জীবন যাপন করেছেন, যখন আপনার দেশের লোক আপনার অনুগৃহীত বণিক, সৈনিক, বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যা গণনা করবে, তখন হয়ত কেউ জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের দেশের জাতীয় কবির নাম কোথায় ? হয়ত ভিক্টর হিউগোর নির্ব্বাসন রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ সমর্থন করবে, হয়ত বা ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাসী প্রজারা তাঁর জন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করবে না। কিন্তু আমার মতন নারীরা ? আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর যখন তাঁর কবিতা পড়বেন, তখন তিনি গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করবেন যে, তাঁর সম্রাট পিতার মহত্ব একদিন এই মহান কবির দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে বিচার করেছিলেন।

হে বিরাটপুরুষ, আপনি অতিশয় মহান্, কবিচিত্তের বৈচিত্র্য, বিচার মেধার প্রাচুর্য্য, কবি-মনের ক্রোধ, চাঞ্চল্য এবং লোকাতীত তীব্র অনুভূতিকে আপনি উদার দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। আপনি মনে করতে পারেন, যে মুহূর্ত্তে কবিরা অকারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁরা অন্ত কোন স্বর্গীয় প্রেমে ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, হয়ত কবির দৃষ্টি তখন অন্ত কোথায়ও মায়াচ্ছন্ন অপূর্ব্ব আলোর সন্ধান পেয়েছেন। এইরূপ শত্রুকে, দোষীকে, পাপীকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমা ঔদার্য্যে তার কার্য্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করুন। হিউগোর কাব্যামোদীদের অশ্রুকণা যেন আপনার রাজমুকুটকে অভিষিক্ত না করে। ঈশ্বর যেমন তাঁকে প্রতিভা দান ক'রে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করেছেন, আপনিও মার্জ্জনা দেখিয়ে তাঁর প্রতি পক্ষপাত করুন। তাঁকে আপনি বিনা সর্ত্তে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন , সেখানে যে তাঁর কন্তার সমাধি রয়েছে।

আমি কাউকে না জানিয়ে এই কয়েকটি কথা লিখলাম। ... নারী হয়ে দয়াময়ী সম্রাজ্ঞী ইউজেনের মধ্যবর্ত্তিতায় এই প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করা উচিত ছিল ; কিন্তু আমি যে পত্নী, পত্নী ... আমি কি ক'রে ধারণা করব যে, সম্রাট-মহিষীর পক্ষে স্বামী অবমাননাকারীকে ক্ষমা করা সম্ভব ? বরং সম্রাটের পক্ষে ... অপরাধীকে ক্ষমা করা অধিকতর সহজ।

এক অনমনীয় উচ্ছ্বাস-প্রণোদিত হয়েই আমি সম্রাটের ... এই করুণার জন্ত আবেদন জানাচ্ছি। মনে করবেন, হিউগো ... অনুরূপ বহু ব্যক্তি নীরবে মনের মধ্যে এইরূপ আবেদন পে... করছেন, সে আবেদনকে এক নারী ভাষা দিয়ে প্রকাশ করে... তৃতীয় নেপোলিয়ানের উপর আমার বিশ্বাস আছে। ... লোকায়ত্ত রাজ্য শাসনকে ভালবাসি, তাই প্রথম থেকেই ... বুঝেছি যে, লোকায়ত্ত শাসনধারা আপনার দ্বারাই আপনার ... দিয়ে সমস্ত ইউরোপে সফলতা লাভ করবে। আপনি মহৎ ... করবেন, সেই বিশ্বাস আমার আছে। আপনি উদারতার সঙ্গে ... করবেন, এই বিষয়ে আপনি নেপোলিয়ানের অনুবর্ত্তী হবেন।"

পত্র পরিণাম :—অবশ্য এই পত্রখানি (১৮৫৭) তীব্র আ... সঙ্গে লেখা হলেও নানা কারণে শেষ পর্য্যন্ত তাকে দেওয়া হয় ... নেপোলিয়ানের হাতে পৌঁছায়নি। কারণ, তাঁর ভয় ছিল এই পত্রের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মনোমালিন্ত সৃষ্টি হবে। নেপোলিয়ান একটু উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবু ইউ... তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলেন। তিনা জানুয়ার...

পরেও নেপোলিয়ানের প্রতি এলিজাবেথের শ্রদ্ধা হ্রাস পায় নি। তাঁর A Tail of Vilafranca পত্রে নেপোলিয়ানের প্রশস্তি আছে যথেষ্ট (১৮৬০)

নেপোলিয়ানের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ভিক্টর হিউগো নির্ব্বাসনে জীবন যাপন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে নেপোলিয়ান সিদানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজেই ফরাসী দেশে ফিরে এসেছিলেন।

বিখ্যাত নাট্যকার ভিক্টোরিয়ান সার্ডকে লেখা অবিস্মরণীয়া অভিনেত্রী সারাহ বারনহার্ড-এর পত্র

পত্র পরিচয়:—৭০ বৎসর বয়সেও খঞ্জপাদ বৃদ্ধা ফরাসী অভিনেত্রী আমেরিকার রঙ্গমঞ্চকে স্তম্ভিত ক'রে দিলেন। নৃত্যে গীতে, অভিনয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় চটুল সমাজে সারাহ বারনহার্ড অপরূপ মোহজাল বিস্তার করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অলৌকিক স্মৃতিশক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করত। সুধী সমাজের সঙ্গে তিনি মিশেছেন অকুণ্ঠভাবে; তাঁর কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা খুব সরস। তিনি যদিও ধর্ম্মযাজকের অভিভাবকত্বে শৈশবের শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যৌবনের প্রথমপাদেই কিন্তু তিনি অভিনেত্রীর জীবন আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাব্যচর্চ্চা ক'রেও তিনি আনন্দ পেতেন এবং আনন্দ পরিবেশন করতেন। পত্র লেখার মধ্যে তিনি প্রচুর তৃপ্তি লাভ করতেন। পত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনের কামনা বাসনা বহুধা ব্যক্ত করেছেন। তিনি জীবনকে কখনো সংযত করতে চেষ্টা করেন নি, করার প্রয়োজনও মনে করেন নি। যা' পাবার আকাঙ্খা করেছেন তাকে পেতে তিনি চেষ্টার কার্পণ্য করেন নি—সে মানুষ হউক কিংবা বস্তুই হউক। প্রেমের ব্যাপারে সারাহ সম্রাজ্ঞী, খুব কম মানুষেরই শক্তি ছিল সারাহের আকর্ষণকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া।

একদিন প্যারিসের এক কাফেতে তিনি দেখলেন, ভিক্টোরিয়ান সার্ড বসে আছেন। এই সেই বিখ্যাত নাট্যকার? তাকে পেতেই হবে। তৎক্ষণাৎ সারাহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে লিখলেন পত্র। তারপর অবিরাম পত্রধারা চলেছে, বৎসরের পর বৎসর; কোন ক্লান্তি নেই—অবসর নেই। প্রথম দিন যেমন উদ্দাম পত্র লিখেছেন, প্রথম প্রেমের উচ্ছ্বাস—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের পত্রেও সেই উদ্দামতা। তাঁদের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুর পর। অপরূপ এই পত্রগুচ্ছ।

"হে আমার অপরূপ তরুণ বন্ধু। আজ রজনীতে তুমি কোথায়? তোমার পত্র এসেছে মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে। সেই একটি ঘণ্টা কী নিষ্ঠুর, কি ভীষণ নিষ্ঠুর। আমি আশা করেছিলাম, সেই এক ঘণ্টা আমার সঙ্গে তুমি অতিবাহিত করবে আমার এখানে।

তোমার বিহনে প্যারিস আমার কাছে মৃত্যুপুরী। তোমার সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বে, প্যারিস ছিল প্যারিস; প্যারিসকে স্বর্গ বলে কল্পনা করতাম, আর আজ প্যারিস আমার কাছে নির্জ্জন, ঊষর, বিরাট মরুপ্রান্তর; প্যারিস একটি বিরাট ঘটিকাযন্ত্র—যে ঘটিকাযন্ত্রের হস্ত নেই, বিরামহীন তার গতি।

তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে আমার স্মৃতিকে যে সমস্ত চিত্র দোলা দিত সে সমস্ত আজ সব মুছে গেছে, তাদের পরিবর্ত্তে দেখছি আমাদের সেই মিলন-মুহূর্ত্তগুলি মূর্ত্ত হয়ে উঠছে।

এখন আর আমি তোমার নিকট থেকে দূরে সরে থাকতে পারছি না। তোমার ভাষা যদিও মাঝে মাঝে তিক্ত, তবু আমার মন থেকে সমস্ত পার্থিব চিন্তা দূর করে দেয়। আমাকে আনন্দ দেয়, আমার অভিনয়কলা তোমার ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠে, মৃদুগতিতে এসে আমার অভিনয় তোমার ভাষার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আজ আমার পক্ষে তোমার ভাষা আলো-বাতাসের মত অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

তোমার একটি শব্দের জন্ত আমি ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসিত। তৃষ্ণা আমাকে বিহ্বল করে দিয়েছে, তোমার ভাষা আমার খাদ্য, তোমার নিশ্বাস আমার সুরাসার। তুমি আমার সর্ব্বস্ব।

তোমার সারাহ।"

পত্র পরিণাম:—এই পত্রগুচ্ছ পৃথিবীর প্রকাশিত পত্রাবলীর অন্যতম রত্ন। সারাহ নেই, রয়েছে তার অনবদ্য দান—জীবনের গতির সঙ্গে ভাবের সামঞ্জস্য, ভাষার সামঞ্জস্য। *

---

* উপরোক্ত পত্রগুলি অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রীর অনূদিত "বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী" নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। আমরা তাঁর সৌজন্য স্বীকার করি।—স

নিজের আঁকা ছবি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

(শ্রীযামিনী রায়কে লিখিত চিঠি থেকে)

"...আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। যখন প্যারিসের আর্টিষ্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে কুণ্ঠাভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেক দিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতিলাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।"

যুগের স্মৃতি

—বিজয়কুমার মণ্ডল

ঐ জানালার কাছে ব'সে আছে—

—দীপক চাকলাদার

পুকুরঘাটে

—বিমল মিত্র

—প্রভাতকুমার মল্লিক

—মেঘরাণী চট্টোপাধ্যায়

—গৌর চক্রবর্তী

শিশু-মহল

—হিমাংশু মুখোপাধ্যায়

—ছায়া রায়

—তরুণ দাস

জলকে চল্ —অশোক ধর
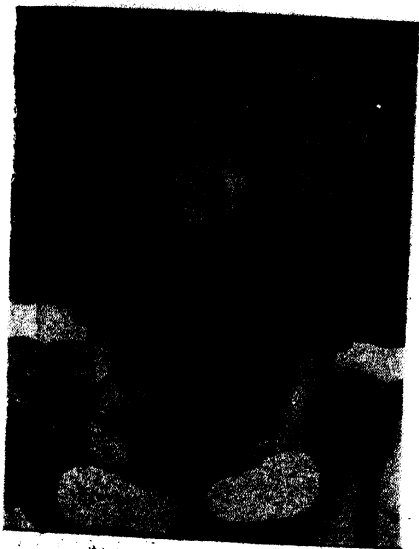
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

ছত্রিশ

চারুবালার তর সয় না। আলার মানুষ শুয়ে পড়ল। বিনিবউকে বার দুই ডেকে দেখে সাড়াশব্দ নেই। অমনি সে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। চোরের বেহদ্দ।

নৌকো কাল এপারে এনে কোন জায়গায় রেখেছিল, তা সে জানে। চর হল পচা, চারুবালার সে বড় অনুগত। জগার অনুমান মিথ্যা নয়, কেশেডাঙায় যাবার গোপন খবর সে-ই দিয়েছিল চারুবালাকে।

বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। হরগোজা-ঝাড়ের পাশে ওপারের দিকে চোখ রেখে বসে আছে—কখন পচা নৌকো নিয়ে আসে। বড় জন্তু-জানোয়ার এদিকে না-ই এল, কিন্তু সাপ তো পায়ে পায়ে দেখা যায়। কিন্তু এখন কেবল পালানোর চিন্তা, অন্য কথা মনে আসছে না।

নৌকো ডাঙার কাছাকাছি এলে পুঁটুলি হাতে নিয়ে জলকাদা ভেঙে গলুইয়ে উঠে বসল। জলে পা ঝলিয়ে দিয়ে কাদা ধুচ্ছে। একলা পচা। পচা হেসে বলল, ভাবলে বুঝি তোমায় ফেলে চলে যাব।

চারু বলে, হচ্ছিল তো তাই।

যাচ্ছ—টের পাবে মজা। আছ হাসিল-করা জায়গায়। এর সঙ্গে কিছু মেলে না। সে হল কাঁচা-বাদা—বাঘ বুনো-শুয়োর বুনো-মোষ—

এখানে তেমনি নগেনশশী। আমার ভাই-ভাজও বড় কম যায় না।

ছইয়ের ভিতরে ঢুকে চারুবালা চুপচাপ বসল। তার পরে আর সবাই এসে যায়। প্রবীন মহেশ আগে আগে, পিছনে শশী গোয়ালা বলাই আর জগা।

চারুবালাকে দেখে শশী ঘোষ বড্ড খুশি: দিব্যি বয়েছে। দেখ, আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েমানুষ হল রক্ষাচণ্ডী। জঙ্গলের যত পীর-ঠাকুর বেশির ভাগ হলেন মেয়ে। বউকে যদি সঙ্গে নিতাম, ছেলে ক'টা অমন বেঘোরে যেত না। কাঠুরে মউলে বাদায় যায়, তারা নিয়ে চলে আসে, তাদের কথা আলাদা। বসত ঘর কিন্তু মেয়েমানুষ ছাড়া হয় না।

তা বেশ হল, রাধেশ্যামটা বড্ড দেরি করছে। কি হল তার? বউ মাগি ধরে ফেলেছে না কি বেরুনোর মুখে? যা দজ্জাল বউ! ভাঁটা অবশ্য হয়নি এখনো, জোয়ার চলছে। কিন্তু চারুবালা আগেভাগে এসে পড়েই মুশকিল করল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিনি-বউ দেখবে, চারুবালা বিছানায় নেই। খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে। গগন তো অনেক খবরই রাখে—বোনের খোঁজে তক্কে তক্কে এই অবধি এসে পড়বে হয়তো। হামলা দেবে নৌকোয়। আর কিছু না হোক, চেঁচামেচি হৈ-হল্লার ব্যাপার তো বটে। রাধেশ্যাম এসে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছাড়বে, ভাঁটা অবধি দেরি করবে না। গুণ টেনে উজান বেয়ে যাবে খালের এই পথটুকু। করালীতে পড়ে জোয়ার মেরে উঠবে। তার পরে দোয়ানিতে ঢুকে ভিন্ন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ধানের পালার নিচে ইঁদুরের গর্তের যেমন নানান মুখ থাকে—এক মুখে খোঁড়াখুঁড়ি লাগালে অন্য মুখে ইঁদুর ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালায়। বাদাবনের গাঙ-খালেও ঠিক সেই গতিক।

আসে কই রাধেশ্যাম? বলাই খানিকটা এগিয়ে দেখে আসবি নাকি?

বলতে বলতে হরখোজা-ঝাড় বেড় দিয়ে উদয় হল রাধেশ্যামের ছায়ামূর্তি। পচা তাকিয়ে দেখে বলে, জাল আনিস নি? জালের ব্যবস্থা করা হয়নি যে তোর ভরসায়।

রাধেশ্যাম বলে, আছে জাল। আরও সব আছে।

রাধেশ্যামের পিছন ধরে আসে বাচ্চা ছেলেটা। আরও কতক দূর পিছনে ফুটকাট করে কাদার আওয়াজ তুলে আসে—কী আশ্চর্য, অন্নদাসী। অন্নদাসীই তো। জালও আছে। রাধেশ্যাম একরাশ পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে নিয়েছে, জাল বয়ে আনছে অন্নদাসী।

জগা অবাক হয়ে বলে, আস্ত সংসার নিয়ে চললি যে একেবারে।

রাধেশ্যাম আমতা-আমতা করে বলে, বড্ড ন্যাওটা ছেলেটা। ছেড়ে যেতে পারিনে, মন হু-হু করে। আবার মা না হলে বাচ্চারই বা সামাল দেয় কে? ঝাঁরে কেচে কাপড় ফর্সা করে বসে আছে, ছেড়ে গেলে বউ রক্ষে রাখত না।

জগা বলে, নিয়ে তো কোন্দল বাধাবি সেই জায়গায়?

না নিলে এখনই যে লেগে যায়। পাড়া তোলপাড় হবে—জানতে কারো কিছু বাকি থাকবে না।

ঘাড় নেড়ে শশী ঘোষ খুব তারিফ করে : ভালই তো, ভালই তো। কথা-কথান্তর কি ঝগড়াঝাটি না হল তবে আর বসত কিসের ? সে হল বনবাস। ভাল করেছে রাধে।

জোয়ারে নৌকা ছাড়ল। যাবে কিন্তু দক্ষিণে—বিস্তর দক্ষিণে। ভাঁটির শেষ যেখানে। কালাপানির মুখে। হালে বসেছে জগন্নাথ, উজান কেটে এগুচ্ছে। রাত্রিবেলা কাদাজলে জঙ্গলের মধ্যে গুণ টেনে কাজ নেই। দাঁড় রয়েছে চারখানা—বলাই আর রাধেশ্যাম—তিন জোয়ান লেগে গেছে। বুড়ো শশী স্ফূর্তির চোটে বসে গেছে বাকি দাঁড়খানায়। সে-ও টানছে—কয়েক টানে কাতর হয়ে বসে বসে হাঁপায়। রাধেশ্যাম হেসে বলে, তোমার এ কাজ নয়। কল্কেটা নিয়ে এক ছিলিম জুত করে সাজ দিকি। সারা পথ তুমি তামাক খাইয়ে যাবে মুরুব্বি মশায়।

করালীতে পড়ে এইবার। হাত শক্ত করেছে জগা। হালের মুঠোয় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ ওঠে, দড়ি কড়কড় করে। ফালুকফুলুক কেন করে সে ছইয়ের দিকে—ছইয়ের তলে কি ? দাঁড় তুলে ধরে সকৌতুকে বলাই তাকায় একনজর জগার দিকে, কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হয়। কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই। মরদমানুষের এলো-মুখের কথাবার্তা এ জায়গায় চলে না। মেয়েলোক রয়েছে। শুধু অন্নদাসী থাকলেও হত—চারুবালা রয়েছে। মানমেলার ভাল ঘরের মেয়ে—আজেবাজে কথা শুনে কি ভাববে ? হয়তো বা ফয়ফয় করে উঠবে এই মাঝ-গাঙের উপরেই।

দোয়ানির মধ্যে ঢুকে পড়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। আর কেউ নিশানা পাবে না। যে খালের ছটো মুখই বড়-গাঙে পড়েছে সেই হল দোয়ানি—ছই মুখে একই সময় জোয়ার ওঠে, একই সঙ্গে ভাঁটা নামে। দোয়ানি বনের মধ্যে শাখা প্রশাখা ছেড়ে যায়। কেউ তাড়া করলে কোন একটা শাখার ভিতর ঢুকে পড়, নৌকো ঠেলে দাও ঝোপঝাড়ের মধ্যে। দিয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে থাক যতক্ষণ না বিপদ কেটে যাচ্ছে।

দোয়ানির অলিসন্ধি ঘুরে এইবারে আবার বড়-গাঙে পড়বে। সকাল হল। খাল বড় হচ্ছে ক্রমশ। আর সুবিধা, জোয়ার শেষ হয়ে ভাঁটার টান ধরেছে। উজান বেয়ে মরতে হবে না আর। আবাদ এখন দু-ধারে। মানুষজন। খালে বেড়-জাল পেতেছে। দু-নৌকোয় জুড়ে দেওয়া—জালের মানুষ নৌকোয় বসে গল্পগুজব করছে, তামাক খাচ্ছে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে খেপলা জাল ফেলছে কেউ কেউ। জলের সন্তান—কালো কালো চেহারা, বাবরি চুল। রূপোর গলার কারো গলায়, হাতে তামার কড়। সাদা মাটির বাঁধ চলে গেছে এদিক ওদিক অজগর-সাপের মতন। মরদমানুষ মেয়েমানুষ চলেছে বাঁধের উপর দিয়ে। নেটে দেয়ালের ঘর একটা—দেয়ালে নুন ফুটে ভাঁজো-ভাঁজো হয়ে পড়ছে। তাল গাছের গোড়া—জলের নোনা খেয়ে খেয়ে কয়লার মতন কাল হয়ে গেছে। সাদা সাদা দু একটা এখানে, একটা উই ওখানে—ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের দুর দুরো মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে।

চলেছে নৌকো। পিঠেন বাতাস পেয়ে বাদাম তুলে দিল। [illegible] করে ছুটে চলেছে—জল ছোঁয় কি না ছোঁয়। দাঁড় তুলে [illegible]। এই বেগের মুখে দাঁড় পড়তে পায় না। পার হবার জন্য ঘাটে বসে জন কয়েক। খেয়ানৌকো ডাকছে চিৎকার করে একজনে ওপারে আনমনে দড়ি পাকাচ্ছে বাবলাগাছের গুঁড়ির অন্য প্রান্ত বেঁধে। খেয়ার মাঝি বোধ হয় ঐ লোকটাই। ডাকছে ডাকুক না—ভাবখানা এই। আরও মানুষ জমুক, এক খেয়ায় সকলকে তুলে আনবে।

চরের কাদা অনেকটা ভেঙে এসে তবে জল। যাত্রীরা ক-জনে সেই কাদার মধ্যে জলের ধারে এসে চেঁচাচ্ছে। ভাল কথায় হচ্ছিল এতক্ষণ, এইবারের সুর বাঁকা। দড়ি পাকানো বন্ধ করে বোঠে নিয়ে মাঝি তড়াক করে নৌকোয় উঠে কাছি খুলে দিল। অজস্র আলকাতরার টিন ভাসছে জলে, তাদের মাথা তার সঙ্গে বেঁধে ভাসিয়ে রেখেছে। বাইনগাছের সারি এইধারে জলের কিনারা ধরে। চলেছে, নৌকো চলেছে। উঁচু বাঁধের ওদিকে বসতি—খোড়ো চালের মাথা অল্পসল্প দেখা যায়। টিনের ঘরও আছে যেন—টিনে আর খড়ে একত্র ছাওয়া। টিনের গরমে গা জ্বালা করে, কোন শৌখিন জোতদার টিনের উপরে খড় বিছিয়ে নিয়েছে।

নৌকো বড়-গাঙে পড়ল। বেলা হয়েছে বেশ খানিক। খেরে-মাঠ ; মাঠ ভরতি খেরে-ওল্প। মাঠের রং সবুজ নয়, সাদা নয়—গোলাপি। গাঙ ক্রমেই বড় হচ্ছে। এপার ঘেঁসে চলেছে, ওপার ধোঁয়া ধোঁয়া। ঠাহর করে দেখলে অস্পষ্ট সবুজ টানা-রেখা নজরে পড়বে। ওপারের বন। মানমেলার একেবারে শেষ—কাঁচা-বাজার শুরু এখন থেকে।

অন্নদাসীর বাচ্চা ছেলে আর চারুবালা ছইয়ের ধারে উবু হয়ে বসে জল দেখছে। কুমির গা ভাসান দিয়েছে ঐ দেখ পুরানো গাছের গুড়ির মতন। বকবক করছে মৃদুকণ্ঠে দু-জনে। বাচ্চার সঙ্গে চারুবালার ভাব জমেছে। আর ওদিকে উনুন ধরাচ্ছে অন্নদাসী। পোড়া মাটির তিন দিকের উনুন। নৌকো দুলে দুলে যাচ্ছে দাঁড়ের টানে। হাওয়ার জন্য উনুন ধরে না—চোঙার মুখে ফুঁ দিতে দিতে দপ করে একবার বা জলে উঠল, আবার ধোঁয়ায়। গোটা দুই বস্তা ঝলিয়ে দিল তখন ওদিককার হাওয়া ঠেকাবার জন্য। এমনি করে কোন গতিকে চালে-ডালে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারলে যে হয়। গরজ বেশি বাচ্চাটার জন্য। এখন বেশ কুমির দেখছে, চেঁচানি জুড়বে হয়তো একটু পরে। মেয়েমানুষ চারুবালাও তো—ভাত নামলে হাপুসহুপুস করে সে-ও চাট্টি খেয়ে নেবে। অন্য কেউ এখন খাচ্ছে না। টানের গাঙ, পিঠেন বাতাস। বন্দুকের তীরের মতো নৌকো ছুটেছে। জলে ভাসছে না বাতাসে উড়ছে, ঠাহর হয় না। এই জল থমথমে হবে, বাতাস পড়ে যাবে—খাওয়ার কথা তার আগে নয়। তখন কোন খালখালিতে নৌকো ঢুকিয়ে গাছগাছালির সঙ্গে কাছি করে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসবে।

দাঁড়ের মচমচানি, ছলাৎছলাৎ করে জল বা দিচ্ছে নৌকোর তলিতে। এই রকম চলল একটানা বিকাল অবধি। বড় একঝাঁক পাখি বনের উপর কিচিমিচি করছে। [illegible] কেওড়াগাছে বাঁদরের হুটোপাটি—ডাল ভেঙে ভেঙে নিচে ফেলছে। হরিণের সঙ্গে বাঁদরের বড় ভাব—হরিণের দল তাকে এমনিভাবে, কেওড়াপাতা খাওয়ায় নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু আসে না কেন একটা হরিণ ? নৌকো নজরে পড়ে গেল নাকি ?

আনাগোনা—গন্ধ পাচ্ছে। বাঘের গন্ধ অনেক দূর থেকে হরিণ নাকে পায়।

মানুষের এলাকা পিছে বাঘের এলাকায় তারা এখন। মহেশ তাই বলছিল, মানুষ এবারে বড় আর চোখে দেখবে না।

তিক্তকণ্ঠে জগা বলে, সেই তো ভাল। বাঘের চেয়ে বেশি সাংঘাতিক হল মানুষ। মানুষ তো ঐ খোঁড়া-নগনা, গোপাল জমাদার, প্রমথ ম্যানেজার। কাঁটা মারি মানুষের মুখে—যে ক-জন এই আমরা যাচ্ছি, মানুষে আর কাজ নেই এর উপর।

বহুদর্শী শশী ঘোষ হেসে বলে খানিকটা গোছগাছ করে নাও, কত মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে দেখো। পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি গন্ধ পেয়ে আসে। মানুষও তেমনি ঠেকাতে পারবে না।

জোয়ার আসন্ন। শেষরাত্রে আবার ভাঁটি মিলবে, সেই অবধি নৌকো বেঁধে থাকা কোন এক জায়গায়। নৌকো বেঁধে তারপরে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার পরে গা গড়িয়ে পড়া। কিন্তু যত্র তত্র নৌকো বাঁধা যাবে না রাত্রিবেলা। জায়গাটা গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল কিনা জেনে বুঝে নেবে ভাল করে। একা না বোকা—যেখানে আর পাঁচখানা নৌকো, তুমিও গিয়ে চাপান দেবে সেই পাধরে। একসঙ্গে অনেক নৌকো থাকার নাম পাধর। কিন্তু পাধর পেয়েই নিশ্চিন্ত হোয়ো না—নৌকোর মানুষগুলো কেমন, কাজকর্ম দেখে কথাবার্তা বলে আন্দাজ করে নাও। নিরীহ মাঝিমাল্লা হয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছে, আসলে তারা হয়তো ঠগ-ডাকাত। সামাল, খুব সামাল ভাই। সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে মানুষ ক'টাকে চরের উপর নামিয়ে নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে সরে পড়বে। এমন অনেক হয়েছে। দক্ষিণে, একেবারে দক্ষিণে যাচ্ছে—ভাঁটির প্রায় শেষ যেখানে, দরিয়ার মুখ। সেদিকে মানুষজন কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়, শুধু জন্তুজানোয়ার। রীতপ্রকৃতি চেনাজানা হয়ে গেছে, মানুষেরই মনের তল আজ অবধি পাওয়া গেল না।

কত খাল-দোখালা ছেড়ে যাচ্ছে। জগা বারবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মহেশ ঠাকুরের দিকে। ঘাড় নেড়ে মহেশ 'উঁহু' বলে দেয়। বাদাবন তার নখদর্পণে—এসব খালে ঢোকা যাবে না: বিপদ আছে। ধৈর্য ধরে বেয়ে চলে যাও, ঠিক জায়গায় এসে সে বাতলে দেবে। সেই পাশখালিতে ঢুকে তিনখানা বাঁক গিয়ে বনকরের বাবুদের ছোটখাট আস্তানা। খালের কিকি আন্দাজ জুড়ে মাচান, তার উপরে ঘর। ঐ মাচানের খুঁটির সঙ্গে নৌকো বাঁধা চলে। বন্দুক আছে বাবুদের। নিশ্চিন্ত নিরাপদ এমন একটা জায়গা রয়েছে, তখন সেইখানে গিয়ে ওঠ। কাল কিন্তু এমন জায়গা পাবে না। জায়গায় জঙ্গ কাল থেকে হিসাব-কিতাব ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন হবে; কড়া নজোর পড়ে নৌকোয় চাপান দিতে হবে। আজকে কোন হাঙ্গামা নেই।

পাশখালি ঢুকে হঠাৎ যা দেখা যায় দাঁড় পোঁতা রয়েছে। দাঁড়ের মুঠো মাটিতে, চওড়া মাথা উপর দিকে। মাঝে মাঝে এমনিধারা দেখা যায় জঙ্গলে। পোঁতা-দাঁড়ের মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা, কাপড়ের এক প্রান্তে চাট্টি চাল বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে, অপর প্রান্ত বাতাসে উড়ছে নিশানের মতন। নৌকোর কোন দাঁড়ি বা মাঝি পড়েছিল এই জায়গায়। বাদাবনে মরাহাজার বলতে নেই, বলবে পড়েছে অমুক মাঝি কিম্বা জাল হয়েছে অমুক কাঠুরে। বাঘের নামও নয়—বলবে বড়-শিয়াল বড়-মিঞা ভোঁদড় বা অমনি একটা-কিছু। নৌকো বেয়ে মানুষ কাঁচা-বাদার গাঙে-খালে ঘোরে, আর আচমকা ঐরকম পোঁতা দাঁড় দেখে হায়-হায় করে মনে মনে। গাছের ডালে মানুষ-কাপড়-হাফপ্যান্টও দেখা যায়। খেয়েদেয়ে বাঘ হয়তো মুণ্ডটা কি আধখানা হাত উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছে, তাই সব খুঁজেপেতে কবর দিয়ে গেছে ঐ গাছের গোড়ায়। কাদের ঘর খালি করে বাদায় এসেছিল গো, সে মানুষ আর ফিরল না।

বাইতে বাইতে তোমার হাতের দাঁড় ভেঙে গেল হয়তো বা মচাৎ করে। কিম্বা বেসামাল হওয়ার দরুন দাঁড় জলে পড়ে স্রোতে ভেসে গেল। বিপদের মুখে তখন কি করবে—পাড়ে নৌকো ধরে নিয়ে নাও ঐ পোঁতা-দাঁড়। কিন্তু একটানে উপড়ানো চাই—দাঁড় হাতে নিয়েই চক্ষের পলকে নৌকোয় উঠে পড়বে। একটানের বেশি লাগলে কিম্বা ডাঙার উপরে তিলেক দেরি হলে রক্ষে নেই। বাঘের পেটে যাবে নির্ঘাৎ। বনবিবি স্বয়ং যদি মূর্তি ধরে আগলে দাঁড়ান, তবু ঠেকাতে পারবেন না।

দক্ষিণে, আর দক্ষিণে। দরিয়ার মুখ—ডাঙা যে অবধি গিয়ে শেষ। ছুটো দিন ছুই রাত্রে পুরো চার ভাঁটি নৌকো বেয়েছে। তিলেক জিরোয় নি। কেশেডাঙার চর দেখা যায় অবশেষে বাঁকের মাথায়। সন্ধ্যার অল্প বাকি। শশী ঘোষ যথারীতি দাঁড়ে বসে কিন্তু একটা টানও দেয় নি আজ সমস্ত দিন। তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। চেনা জায়গা তার, বড় আপন জায়গা। এ পথে কতকাল আসেনি! দু-চোখ দিয়ে যেন পান করতে করতে এসেছে এই অকূল জল আর সীমাহীন জঙ্গল। কেশেডাঙার চর দেখা দিতেই উত্তেজিত হয়ে সে আঙুল দেখায়: ঐ, ঐযে আমার কেশেডাঙা। বন্দুক পুঁতে রেখে গিয়েছি চলে যাবার দিন। বিষখালির বস্থ কর্মকারের গড়া। বিশ্বম্ভর কর্মকার ঈশ্বরীপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বন্দুক গড়ত, বস্থ হল সেই বংশের মানুষ। বিলাতি বন্দুক দাঁড়াতে পারে না দেশি লোহার গড়া বস্থর হাতের জিনিসের কাছে। বস্থ মরে গেলে, কিন্তু ছেলেপুলেরা কেউ বিদ্যেটা শিখে নিল না। আর ও-জিনিস হবে না।

আবার বলে, শিখেই বা কি হত? এ সব বন্দুক মানবেলায় রাখতে নিতে দেবে না। বাদাবনে চোরাগোপ্তা নিয়ে বেড়ানো। গোড়া মানবেলায় শতেক বায়নাক্কা, হাজার রকমের আইন। ধরতে পারলে কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে কাছারি নিয়ে পুরবে। কেশেডাঙা ছেড়ে যাবার সময় মাটির নিচে পুঁততে হল আমার এমন বন্দুকটা। সে কি আর আছে এদ্দিন? নোনা মাটিতে খেয়ে লোহা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জায়গাই খুঁজে পাব না। নতুন গাছপালা জন্মে জঙ্গল ঢেকে উঠেছে। কিম্বা জোয়ার নিয়ে ভেঙেই পড়েছে হয়তো বা গাঙের খোলে।

কৌতুক করে শশী নিখাদ ফেলে। বারবার খালি বন্দুকের কথা বলছে? বন্দুকের জন্যই শোক। আরও যে কত কি ফেলে গিয়েছিল—টাকাপয়সা, দৈত্যের মতন তিন তিনটে ছেলে—এ সব কথা একটিবার মুখে আনে না।

চর জায়গা, বড় গাছপালা নেই। সাদা কাশফুল ফুটে আছে

অনেক দূরের নীল বনের রেখা অবধি। কাশবন নয়, দুধসাগর, দরিয়ার বাতাস এসে এই নির্জনে ঝড় তুলেছে।' রাত হল, আকাশে চাঁদ নেই। তবু জ্যোৎস্না হয়ে চরভূমিতে কাশের ফুল লুটিয়ে আছে। গাছগাছালির যে বন, তার তলদেশ ফাঁকা—নজর করে বসে থাকলে জীবজন্তুর চলাচল বোঝা যায়। কাশবনে ভয় অনেক বেশি। জলের নিচের কুমির-কামটের মতন একেবারে নিকটে অলক্ষ্যে ওৎ পেতে থাকে। কোন দিক দিয়ে কখন যে কোন প্রভু লম্ফ দিয়ে ঘাড় মুচড়ে ভাঙবেন, তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

ডাঙায় নৌকো ধরতে যাচ্ছে, ক্ষ্যাপা মহেশ মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে: ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই কারো তোমাদের? এ তোমার কুমিরমারির হাটখোলা পেয়েছ, নৌকো বেঁধে নেমে পড়লেই হল! অষ্টবন্ধন না সেরে নাম দেখি কত বড় বাপের বেটা। টপ করে গালের মধ্যে কামড়ে ধরে ঘাসবনে ডুব দেবে। বুঝতেই পারবে না। বুঝবে যখন দুখানা ঠ্যাং এক সঙ্গে সজনের ডাঁটার মতো কচরমচর চিবাতে লেগেছে।

কাঁচা-বাদার উপর প্রথম পা ছোঁয়ানো চাট্টি কথা নয়। রীতকর্ম বিস্তর। স্নান করতে হবে সকলের আগে। গাঙের জলে ঝুপ করে পড়ে ডুব দিয়ে নাও গোটা কতক। কুমির-কামটের ভয় থাকলে ডালির উপর বসে ঘটি ভরে মাথায় জল ঢাল। অস্নাত অশুচি অবস্থায় বাদায় পা দিলে রক্ষা নেই।

দেহবন্ধন করে নাও। গুণীন মন্তোর পড়ে ফুঁ দিয়ে দেবেন, তোমার দেহ কেউ ছুঁতে পারবে না। জন্তুজানোয়ারে পারবে না, দানো-অপদেবতারাও নয়। বড় বড় গুণীন মাটি গরম করে দেন মন্ত্র বলে। ঐহিক মানুষ তুমি-আমি কিছু টের পাচ্ছিনে—মাটি কিন্তু আগুনের মতন তপ্ত হয়ে গেছে, বাঘে পা রাখতে পারছে না, বন ছেড়ে পালাচ্ছে। এমনি কত আছে। যথানিয়ম আটঘাট বেঁধে এগোয় না বলেই এত লোক তাল হয় ফি-বছর, লোকের এত ক্ষতি-লোকসান। নইলে তিল পরিমাণ অনিষ্ট হবার কথা নয়। বাদাবন মানবেলার চেয়েও নিরাপদ।

রাত-বিরেতে অতএব ডাঙায় নামা চলবে না। জলে থাকবে নৌকো। জলের মধ্যে খুঁজি পুঁতে কাছি করে রাখ। সকালবেলা ডাঙার উপর পীর-দেবতাদের বিস্তর পুজোআচ্ছা। উপকরণ সব এসেছে। আগ-নৌকোয় বের করে এনে মহেশ ঠাকুর সেইসব আবার জিল্ করে দেখছেন। কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে—মিলিয়ে দেখে তবে নিশ্চিন্ত। পাঁচ সের বাতাসা আর আড়াই সের চিনি—এই দুটো পোঁটলায় তো? শসা হলগে এক দুই তিন চার—হ্যাঁ দশটাই হয়েছে। দুটো নারকেল, নৈবেদ্যের পাঁচ সের আতপ-চাল। পাকা কলা দু-কুড়ি—ইস, কলা যে পেকে উঠেছে। ডাঁসো দেখে কিনতে হয়, এত পথ আসতে আসতে পেকে ওঠে। সিঁদুর পুরো দু-বাণ্ডিল তো? অনেক কাজ সিঁদুরের, কাল দেখতে পাবে। সাতটা ঘট, সাতটা পিদিম, সাতটা জলের ভাঁড়—ঠিক আছে। ধুনুচি আছে, ধুনো এসেছে তো? বেশ, বেশ। পাঁচ গজ সাদা থান—নতুন এই থান কাপড় পরে আমি পুজোয় বসব।

আয়োজন নিখুঁত। মহেশ ভারি খুশি। যেখানটা নৌকো [illegible] জলের ধারে শরবন হঠাৎ খড়খড় করে উঠল। পুজোর জিনিসপত্র নিয়ে মহেশ ব্যস্ত ছিলেন, চমকে ওঠেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়লেন। না, সে সব কিছু নয়। বাতাস কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল—এক ঝাপটা হঠাৎ এসে পড়ায় শব্দ হল অমনি। কিন্তু শরবন এত কাছাকাছি থাকবেই বা কেন? বেহুঁশ হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তো এক্ষুণি—বন্দোবস্ত পাকে চাপান দেওয়া থাকবে অবশ্য নৌকো—তা হলেও অজানা জায়গায় সতর্ক বেশি থাকাই উচিত।

গলুয়ে চলে গিয়ে মহেশ গাঙ থেকে এক ঘটি জল তুলে মাথায় ঢেলে দিলেন। জগাকে ডাকেন: ওরে বাপ জগন্নাথ, তুই আর বলাই এক এক ঘটি ঢেলে নে। মুরগিটা কোনখানে রেখেছিস, বের কর।

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি ঠাকুর, এখনই নামবে নাকি?

হ্যাঁ বাবা। ভেবে দেখলাম, নামা উচিত একটিবার। লণ্ঠন আর ম্যাচবাক্স নিয়ে নে। চট করে সামনের ওখানটায় আগুন দিয়ে আসি। চল্।

মুরগি লাগে বনবিবির পুজোয়। মা কালী পাঁঠায় তুষ্ট, মা বনবিবি তেমনি মুরগিতে। বনরাজ্যে সকলের বড় ঠাকরুন—বনে পা দিয়েই তাঁর পূজা। এ পূজায় হাঙ্গামা কিছু নেই। পুরুত-বামুন মন্তোরতন্তোর পাঁজির দিনক্ষণ কিছুই লাগে না। দুটো ফুল জোটাতে পার ভালই, নয় তো গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পুজো দাও। তাতেই চলবে। একটা গাছ বেছে নিয়ে খানিকটা সিঁদুর মাখাও ডালের উপর। গাছ ঘিরে দাঁড়িয়ে বল, হেই মা বনবিবি, দোয়া লাগে, দোয়া লাগে। মুরগি জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দাও বনবিবির নামে। ব্যস, হয়ে গেল পূজা।

মুরগি ছেড়ে তারপরে তারা শরবনে আগুন দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে প্রবল আগুন। সারারাত ধরে জ্বলবে। আগুন দেখে জন্তু-জানোয়ার শতেক হাত দূরে চলে যাবে। একেবারে নিশ্চিন্ত। বাতাসে বিষম জোর দিয়েছে, কাঁচা ঘাসবনও উত্তাপে শুকিয়ে পুড়তে পুড়তে যাচ্ছে। ফুলকি উড়ছে এদিক-সেদিক। এখন একটা ভয়, এই আগুন ধেয়ে এসে নৌকোর উপরে ছিটকে না পড়ে। গুঁড়োয় ধরে গেলে সর্বনাশ। রাত্রি জেগে নজর রাখার প্রয়োজন। আগুন পড়লে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। তা রাত্রি জাগবার মানুষও রয়েছে—কী ভাবনা! শশী ঘোষ নিষ্পলক চোখ মেলে নৌকোর কাড়ালে একভাবে বসে রয়েছে। ভাত খেয়ে নিল, তা-ও ঐ এক জায়গায় বসে। ঐখানে ভাত এনে দিতে হল। আর জেগে রইল ক্ষ্যাপা মহেশ। গাঁজায় দম দিয়ে কলকের মাথায় লকলকে আগুনের শিখা তুলে বম-বম রব তুলছে প্রহরে প্রহরে। সে আছে গলুয়ে। গলুয়ে আর কাড়ালে নৌকোর দু-মাথায় দুই পাহারাদার। মিস্ত্রিখানায় ঘুমিয়ে আর বাকি যারা রয়েছে।

আটত্রিশ

রাত পোহাল। পোহাতে কি চায়! শশী ঘোষ কতবার তাগিদ দিয়েছে: ঝিম মেরে আছ ক্ষ্যাপা ঠাকুর—[illegible] ডাকছে, শুনতে পাও না? বনের দিক থেকে পাখির কলরব আসে বটে অজস্র। শেষরাত্রের তরল জ্যোৎস্না [illegible]

পাঁচীর শশী ঘোষেরই সমগোত্র আর কি। দেবীর তাড়নায় মহেশকে স্নান করতে হল পোহাতিতায় থাকতেই। নতুন থান কাপড় পরেছে, ডগমগে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে কপালে জবকালুতে বুকে দু-বাহুতে। নৌকোর অন্য সকলেও স্নান করে পবিত্র হয়ে নিল।

শরবন সারারাত পুড়েছে। ধিকি-ধিকি জ্বলছে এখনো দূরের দিকে। ছাই ছড়ানো সমস্ত জায়গায়, ছাইয়ের নিচে আগুনও থাকতে পারে। ছাইয়ের উপর দিয়ে যাওয়া হবে না। পা পুড়ে যেতে পারে, সে এক কথা। তা ছাড়া আশাসুখে বসত বাঁধতে যাচ্ছি, ছাই মাড়িয়ে কেন যেতে যাব?

জগন্নাথ হাল ধরেছে; পাশে দাঁড়িয়ে মহেশ নির্দেশ দিচ্ছে ঠিক কোন জায়গায় লাগাতে হবে নৌকোর মাথা। দৃষ্টি তার কেশেডাঙার চরেই বটে, কিন্তু মহেশ দূরবিস্তীর্ণ কাশবন দেখছে না, সকলের অলক্ষ্য আর কোন বস্তু ঠাহর করে করে দেখছে। ঘাড় নেড়ে এক একবার সে আপত্তি করে ওঠে: না, এখানেও নয়। হুকুম হল না। এগিয়ে চল জগন্নাথ, হরগোজা-ঝাড় ছাড়িয়ে ঐ ওঁর এলাকায় গিয়ে যদি হুকুম মেলে।

হরগোজা-ঝাড় পার হয়ে নতুন কার এলাকা, সদয় হয়ে যিনি নৌকো বাঁধতে দেবেন—কেউ এসব প্রশ্ন করেনা। সাধারণের বোঝবার বস্তুও নয়। গুণীন-বাউলেদের ব্যাপার। বাদাবনের যাঁরা কাণ্ডারী। হুকুমহাকাম যার কাছে যা নেবার তাঁরাই নিয়ে নেবেন। বিনা তর্কে কাজ করে যাবে তোমরা শুধু।

কিন্তু খোদ গুণীনকেও বাঘে নিয়ে যায়, এমন হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। মূঢ় লোকে এই নিয়ে সংশয় তোলে। বাঘে নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু খবর নিয়ে দেখ, সেখানে গুণীনেরই দোষ। বড় রকমের গোনাহ্ ছিল। রোজার উপর অপদেবতার রাগ মন্তর পড়ে ধুলোবাণ সর্ষেবাণ নিক্ষেপ করে সর্বক্ষণ তাদের শাসন করে বেড়ায় বলে। বেকায়দায় ফেলবার জন্য সর্বক্ষণ তক্কে তক্কে থাকে। রোজাও তাই বুঝে অষ্টবন্ধন সেরে তাগাতাবিজ নিয়ে তবে বাড়ির গণ্ডির বাইরে যায়। বন্ধনের কোন অঙ্গে দৈবাৎ ভুল হয়ে গেলে নির্ঘাৎ রোজার ঘাড় মটকাবে। বাদার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। বনের বাঘ জলের কুমির কিম্বা বায়ুবিহারী দানো-ঝটোরা ধুঁকিয়ে থাকে। পীর-ঠাকুরদের যথানিয়ম দোয়া করে আসেনি হয়তো, কিম্বা মন্তোরে কিছু ছুট হয়ে গেছে—আর তখন রক্ষে রাখবে? বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ।

ঝুঁয়ের গায়ে নৌকো বেঁধে নৌকোবন্ধন সকলের গোড়ায়। মা কালীর দোহাই পেড়ে গলা কাটিয়ে চড়বড় করে মন্ত্র পড়ছে: বাঘ তাড়িয়ে দাও মা, নৌকোর ত্রিসীমানার মধ্যে না আসে। বাঘ এসে পড়ে যদি কোন রকম ক্ষতির কারণ হয়, কালী তুমি কামরূপ-কামিখ্যের মাথা খাবে।

মা কালীর এর পরে বাঘ না খেদিয়ে উপায় কি?

এদিক-সেদিক কাছাকাছি বাঘ আছে কিনা, তাও মহেশ ঠাকুর বলে দেবেন মন্ত্রের জোরে: বাঘ আমার ডাইনে যদি থাক, ডান দিকে হাঁক ছাড়; বাঁ দিকে থাকলে বাঁয়ে হাঁক দাও।

মন্ত্রপাঠের পর বাঘের সাধ্য নেই মাথা গুঁজে বোবা হয়ে থাকবে। ঠিক হাঁক ছাড়তে হবে।

দেহবন্ধন হবে প্রতি জনার—দেহ ছুঁয়ে ওরা মন্দ করতে পারবে না। উল্টো রকমে বাঘের চোখ বন্ধ করার কায়দাও আছে। ধুলো-পড়া। ধুলো পড়ে বাঘের মাথায় ছুঁড়ে মার। বাঘ দৃষ্টি হারাবে, অন্ধ হয়ে গিয়ে পালাতে দিশা পাবে না। আবার নিদ্রাবতীর দোহাই পেড়ে ঘুম পাড়ানো যায় বাঘকে: বাঘের চোখে নিদ এনে দাও মা নিদ্রাবতী। কালী আমার ডাইনে, দুর্গা আমার বাঁয়ে। কালীর সন্তান আমি হেলা করলে টের পাবে মজা।

বনের যেখানে বাঘ থাকুক মন্ত্রের সম্মোহনে ঢলে পড়বে।

বাঘের হামলায় বুক কাঁপে যদি তারও ব্যবস্থা আছে। মুখবন্ধনের মন্ত্র। মাড়ি এঁটে যাবে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না বাছাধনের।

চালাক বাঘ থাকে, তারা মন্ত্র কাটান দিতে জানে। ডাইনে বন্ধ করলে তো বাঁয়ে ঘুরল। বাঁয়ে বন্ধ করলে তো ডাইনে। এদের নিয়েই বিপদ। মাটি গরমের মন্ত্র ছেড়ে দেবে তখন। যেখানে যেখানে বাঘ পা ফেলছে—মাটি নয় যেন অগ্নিকুণ্ড। বিপন্ন বাঘ গাঙে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের জ্বালা জুড়োবে।

মন্ত্র পড়ছে ক্ষ্যাপা মহেশ। একেবারে ভিন্ন মানুষ এখন। ভয় করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। মন্ত্রের কথা জ্বলন্ত তুবড়ির মতো মুখগহ্বর থেকে যেন ছিটকে বেরোয়। অশ্লীল আর অসভ্য। মানবেলার ভদ্র মানুষ কানে আঙুল দেবে। কিন্তু মিনমিনে ভদ্র ব্যাক্যের কতটুকু জোর। মন্ত্রের কথায় আগুন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন চোখের উপরে।

নৌকোর কাজ শেষ হয়ে গিয়ে এইবারে ডাঙায় নামছে। মহেশ প্রথম পা ঠেকাল। পীর-দেবতার পুজো—একটি দুটি নন, অগুন্তিতে গনের। চলল সকলে গুণীন মহেশের পিছন ধরে। কোন ভয় নেই। কি গো শশী ঘোষ, তুমি করেছিলে এ সব? কক্ষনো না। করনি বলেই তো ওঁদের কোপ-নজরে পড়লে। যথাসর্বস্ব গেল।

পুজোর জায়গা পছন্দ কর। গাঙ থেকে অনেক খানি দূরে, জোয়ার নিয়ে ধ্বসে না পড়ে যেন গাঙের গর্ভে। যতদিন মানুষের বসবাস, ঐ পুজাস্থানও থাকবে ততদিন। একটা গাছ চাই সেখানে, পুজোর মধ্যে গাছের ব্যবহার আছে। অন্য গাছপালা কেটে ঘাসবন তুলে জায়গা সাফসাফাই করো। মহেশ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জায়গাটুকু বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ কেটে নিল। গণ্ডি। দাগের উপর দিয়ে মহেশ ঠাকুর সবেগে চক্কোর দিচ্ছেন, আর মন্ত্র পড়ছেন তড়বড় করে:

গণ্ডি আঁকলাম ভুঁয়ে। মৌচাকের মতন। যোনো দুখ কেও পরী আছ তোমরা তের হাজার। সবাই গণ্ডির বাইরে থাকবে। বাঘ যদি গণ্ডিতে ঢুকে উৎপাত কর তো কামরূপ-কামিখ্যের মাথা খাও।

উপরে আকাশের মেঘ, আর নিচে মাটির গণ্ডি—এই হল আমার সীমানা। আশি হাজার বাঘ ভয়োর জিনপরী আছ, সবাই সীমানার বাইরে থাকবে। ভিতরে এসো তো দেবীর রক্ত খাও।

কালী কপালিনী, আমি তোমার ছেলে। এই গণ্ডি আঁকলাম। অন্ধকারে তুমি ঘিরে থাকবে আমায়। আর আমার এই লোকজনদের (বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মহেশ দেখিয়ে দেয় সকলকে।) রামের মুখের এই বাক্য।

রামের ধনুক ওপারে। এপারে রামের গণ্ডি। মন্তোর না খাটে তো মহাদেবের শির যাবে।

গণ্ডি দেয়া হল তো গণ্ডির ভিতরে পুজোর ব্যবস্থা এবারে। মেয়েরা ভোগ সাজাও। মরদেরা ঘর বাঁধ, নিশান পোঁত। বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখ অন্নদাসী। নির্ভাবনায় কাজ করে যাও, এই গণ্ডি পার হয়ে আসবে হেন সাধ্য বনের বাসিন্দা কারো নেই। লতাপাতা ডালপালা দিয়ে ঘর বানিয়ে ফেল ছোট ছোট। গুনতিতে সাতটা। বাঁধা ধরা নিয়ম রয়েছে। এই ডান দিক দিয়েই ঘর—পয়লা ঘরে জগন্নাথের। পাশে মহাদেবের। ঘরের চার কোণে নিশান পুঁতে দাও চারটে করে। সেই যে গরানের লাঠির মাথায় লাল-কাপড়ের নিশান বেঁধে রেখেছ। ঘরের সুমুখে পিদিম জ্বাল, বাতাসা শশা আর চাল-কলা দিয়ে ঠাকুরের ভোগ সাজিয়ে রাখ।

হয়ে গেল। পরের ঘরে মনসাঠাকরুন। ভোগ সাজাবে আগেকার মতো। কিন্তু মাটির পাত্রে নয়, কলাপাতার উপর। বিধি এই রকম। বাড়তি এখানে চাই পূর্ণকুম্ভ ও আম্রপল্লব। আর নারকেল একটা। পূর্ণকুম্ভের উপর সিঁদুর দিয়ে মা মনসার ছাঁদ এঁকে দেবে।

এর পরে ঘর নয়—মাটি তুলে একটু ভিটের মতন গাঁথা। রূপপরীর থান। রূপ বলসে ঘুরঘুর করেন তিনি, ঘরের মধ্যে ঢুকে সুস্থির হয়ে পুজো নেবার ধৈর্য নেই। মুক্ত আকাশের নিচে বড় জোর এক লহমা থমকে দাঁড়াবেন। ফাঁকায় তাই পুজোর ব্যবস্থা। এখানেও মাটির পাত্র নয়, কলাপাতায় ভোগ।

ভিটের বাঁয়ে আবার ঘর। দুই দেবী এক ঘরে তাই—ঘর একটু বড়-সড় করতে হবে। মা কালী আর কালীমায়া। কালীমায়া হলেন মা কালীর বেটি। ঘরের চার কোণে লাল নিশান—ভিতরে দু-দিকে দুই দেবীর ঠাঁই। পূর্ণকুম্ভ বসাবে মুখে আম্রপল্লব দিয়ে। কালীমায়ার ঘটে সিঁদুরের নারীমূর্তি, হাতে লাঠি। মহাদেবের যে ভোগ, এঁদেরও ঠিক ঠিক তাই। কর্তার যা ভোগ, মা-মেয়ের তার চেয়ে কোন অঙ্গে কমতি হবে না। বরঞ্চ বাতাসার পরিমাণ বেশি দেবে কালীর ভোগে। মিষ্টিটা পছন্দ করেন বোধ হয় কবি মা-জননী।

আবার ভিটে—ওড়পরীর থান। বাদাবন ব্যেপে ওড়পরী উড়ে উড়ে বেড়ান। ভোগের বিধান অবিকল রূপপরীর মতন।

তার পরে লম্বাটে বড় আকারের ঘর। দুই দেবীর ঠাঁই একসঙ্গে এখানেও। কামাখ্যা আর বুড়িঠাকরুন। এই বুড়ি-ঠাকরুনটি কে, শাস্ত্র-পুরাণে হদিস মেলে না। তবু পুজো পেয়ে আসছেন।

গাছ এইবারে। মহেশ ঠাকুর সেই যে গাছ দেখে দিতে বলেছিলেন। সিঁদুর লেপেছে গাছের গুঁড়িতে। গাছ আর মন ... বাস্তুদেবতা। ... ভোগ দিতে হয় না, তাঁর নামে ... নেই।

পর পর দুটো ঘর এবারে। ঘরের চার কোণে লাল নিশান উড়ছে। প্রতি ঘর দুই কামরায় ভাগ করা। গাজি কালু দুই ভাই—দুই পীরের আসন পড়েছে প্রথম ঘরে। পরের ঘর হাওয়ালপীর ও রূপগাজির। হাওয়ালপীর হলেন গাজির ছেলে, আর রূপগাজি ভাইপো। গাজি-কালুর বিবরণ বেবাক বাদাবনে। বাঘ তাঁদের হুকুমের গোলাম, বাঘের সওয়ার হয়ে এ-বনে সে-বনে ছুটে বেড়ান। জঙ্গলে ঢুকে আর হিন্দু-মুসলমান নেই। যেই হও, গাজির দোহাই দেবে, পীরদের তুষ্ট করবে। পাঁচটা করে মাটির ঢেলা লাগে পীরের পুজোয়। পিদিম জ্বলবে। চিনি-বাতাসা-নারকেলের ভোগ তো আছেই।

সর্বশেষ বাস্তদেবতা। ঘর লাগবে না, ফাঁকা জায়গায় তাঁর থান। ভোগ কলাপাতায়।

দেবতা-পীর এতগুলি পাশাপাশি—এক পুরুত বা এক ফকিরে পুজো করে যাচ্ছেন। পুজো করলেন ক্ষ্যাপা মহেশ। মন্ত্র সংস্কৃত কিম্বা আরবি নয়, গ্রাম্য ছড়া। ফুল জোটাতে পার ভাল—নইলে বনবিবির বেলা যেমন হল, পাতালতা ছিঁড়েই পুজো হবে। মানবেলায় দেবতাগোঁসাইর মতন এঁদের অত বায়নাক্কা নেই। পুজো সেরে নির্ভাবনায় চলে বেড়াও জঙ্গলে। গাছ কাট, মৌচাক ভাঙ, আবাদ কর, ঘর বাঁধ। পুজোয় যদি ভুলচুক না হয়ে থাকে। আর মনে ভক্তিভাব থাকে, কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। যেখানেই থাক সাতটা দিন অন্তর কেবল এই পুজাস্থানে এসে গড় করে যেও। পীর-দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে যেও।

সাজ হতে বেলা দুপুর। নিখুঁত পুজো হয়েছে। কোন রকম বাগড়া আসে নি বনের দিক থেকে। পীর-দেবতা অতএব প্রসন্ন। মনের স্ফূর্তিতে আবার সবাই নৌকোর উপর উঠল। মিঠাজলের জায়গা দেখে এসেছে, বালি সরিয়ে জল নিয়ে এসেছে এক কলসি। নৌকোর উপর রাঁধাবাড়া এখন, নৌকোয় খাওয়া। শশী ঘোষের আমলের ভিটে আছে, তার উপরে একখানা ঘর তুলে নেবে। সেই ক'দিন নৌকোয় বাস। খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে আরও লোকজন আনতে যাবে। কত লোক মুকিয়ে আছে, খবর পেলে হুড়মুড় করে এসে পড়বে। বসতি জমজমাট হবে।

খাওয়াদাওয়া হতে হতে বেলা ডুবে গেল। ভালই হল—দিনের খাওয়া রাতের খাওয়া একপাকে। বারবার ঝামেলা করতে হবে না। অধিক রাত্রে কারো যদি খিদে পায়, পুজোর প্রসাদ রয়েছে। ভাবনা নেই।

আকাশে একটু চাঁদ দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা জ্বালল চারুবালা। ছইয়ের বাইরে এসে প্রদীপ হাতে তালির উপর দাঁড়িয়ে বনের দিকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সন্ধ্যা দেখায়। অন্নদাসী মুখ ফুলিয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে তখন। শাঁখ অবধি নিয়ে এসেছে চারুবালা। আচ্ছা গোছালি মেয়ে!

শশী ঘোষ বলে ওঠে, আমরাও কত কাল কাটিয়ে গেছি। এসব কখনো করিনি। খেয়ালই হয়নি।

মহেশ বলে, মেয়েলোক নইলে হয় না। ঘিরে এসেছিলে তুমি ছটকো জোয়ান কতকগুলো। গৃহস্থবাড়ির শ্রীসৌন্দর্য কী

তারা জানে, আর কী করবে। এসেও ছিলে ঘরবসত করতে নয়, বনের ধন লুঠপাট করতে। বন তাই তাড়িয়ে তুলল।

সমুদ্র নতুন ছেড়েছে এই জায়গাজমি। বালু আর বালু। আর কাশবন। গাছগাছালি দু-চারটে মাঝে মাঝে। কাঁচা বাদাবন অনতিদূরে—থাবার পর থাবা ফেলে ধীরে ধীরে সেই বন এগিয়ে আসছে। গ্রাস করবে চরের জায়গা। সে বনের জীবজন্তুরা নির্ভাবনায় বেরিয়ে এসে এখানে চরে ফিরে বেড়ায়। সমুদ্রের হাওয়া নিশিদিন ছুটোপাটি করে, কাশবনে ঢেউ ওঠে সমুদ্র-জলে ঢেউ ওঠার মতন। এবারে মানুষ এসে চাপল—বন কেটে বসত গড়বে যেসব মানুষ। পায়ের নিচে বালুমাটি, যে মাটি এক মুঠো ফসল দেয় না। সুমুখপানে বনের গাছগাছালি, যে গাছ একটা খাদ্য ফল দেয় না। পিছনে দিগ ব্যাপ্ত নোনা জল, যে জল মুখে ঠেকানো চলবে না।

মজা জমে আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে। বালির নিচে অমৃতের ধারা। বালি খানিকটা সরিয়ে ফেল, মিঠা জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে তুলে খাও। খাও যত খুশি, গায়ে ছিটাও। দেহ শীতল হবে, মন আরামে ভরবে। অরণ্য নিষ্ফলা, কিন্তু বনলক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার ঐ অরণ্যে। খালপথের দু'ধারে গোলঝাড়। গোলপাতা কেটে কেটে গাদা কর, লোকে ঘর ছাইবে। দিকচিহ্নহীন পাতিবন কোন এক মোহানার উপর—পাতি কেটে চরের উপর শুকাতে দাও, লোকে মাদুর বুনবে। কাঠ কত রকমের—সুন্দরী, বাইন, পশুর, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, গেঁয়ো, গর্জন, হেঁতাল, সিঙড়, গড়ে, কাঁকড়া, খলসি, ভাঁড়ার, করঞ্জ, ছিক্কে—গাছের কি অন্ত আছে। গাছ কেটে কেটে বোঝাই কর নৌকো। বড়দলে নিয়ে তোল পুরো দিবারাত্রে দুই জোয়ার ও সিকি ভাঁটি বেয়ে। অথবা চোত-বোশেখে মউল হয়ে মৌমাছির পিছন ধরে ছোট। চাক বেঁধেছে গাছের ডালে ডালে—মধুতে টলটল করছে, কাচের মতন রং। ধামা ভরে চাক কেটে আন, নৌকো বেয়ে হাটে নিয়ে তোল। অভাব কি তোমার? চাল-ডাল, পান-তামাক, কাপড়-চোপড় কেন। শান্তির বন, আরামের বন। দায়ে পড়েই বনের বাইরে আসা; যেইমাত্র দায় চুকল, বনের ভিতর ঢুকে পড় আবার। মাছ যেমন ছুটো-পাঁচটা আকালি করে পলকের ভিতর জল-তলে চলে যায়; মাছের আর নিশানা মেলে না।

বনের বাঘ, জলের কুমির, গাছের পাখপাখালি, অগুন্তি আরও কত রকমের বনের বাসিন্দা—এরাই এবারে নতুন পড়শি। চেনা-জানা করে নাও পড়শিদের সঙ্গে। মানুষ পড়শি তো জেনে এলে এতকাল, এদের সঙ্গে বোঝ এইবারে। ডালে জড়িয়ে কোথায় সাপে দোল খাচ্ছে, সবুজের এক-নিশান—সবুজ লতাই দুলছে যেন হাওয়ায়। কাছে গিয়েছ কি টুক করে আদর করে দেবে। ছটফটিয়ে মর সেই চুমনের জ্বালায়।

হরিণ কাছে ডাকবে তো নিজে তুমি গাছের মাথায় চড়, গাছে চড়ে বানর হও। কু-উঁ-উঁ—বানরের ডাক ডাকবে, মানুষের গলা না বেরোয়। মানুষ বুঝলে হরিণ পালাবে। বনে এসে পড়েছ তো বনের জীব তুমি, যানবেলায় ফিরলে তখন মানুষ।

নিরিখ করে দেখ, হেঁতাল-ঝোঁপের আড়ালে বুঝি চকচক দুটো চোখ। মানুষের এলাকা ছেড়ে এদেরই এলাকায় তুমি এখন। এক নজরে তাকিয়ে আছে। তাব বুঝে নিচ্ছে। বাঘ বলে ভয়ের কি আছে? কাপুরুষের যম হল বাঘ, শক্তসমর্থকে রীতিমত ডরায়। পিঠ ফিরিও না খবরদার—মুখোমুখি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। ঝোপের বাইরে এসে সামনের পা জোড়ে তখন বাঘ মুখোমুখি বসল। ডোরাকাটা হলদে দেহ—কী সুন্দর, কী সুন্দর—বিজলী-ঝুরে পরে যেন সাজ করে এসেছে। অর্-র্-র আওয়াজ করছে, লালা ঝরছে গালের কষ বেয়ে। চোখে চোখ রেখে হাতের লাঠি ঘন ঘন জঙ্গলে পেটাও। বাঘও ঠিক অমনি লেজের ঝাপটা দিচ্ছে মাটিতে। চেঁচাও জোরে—টগবগ করে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মতো গালি দিয়ে যাও অবিশ্রান্ত। ছেদ না পড়ে। তার যে আওয়াজ তার দুনো তেদুনো গর্জন তোল। বাঘের মুখে পড়ে তুমিও আর এক বাঘ হয়ে গেছ। বাঘ তখন অবহেলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে শরবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, ফিরেও তাকাবে না আর তোমার পানে।

বনবিবির আদরের দুলাল বাঘ—গাজি-কালু যার পিঠে সওয়ার হয়ে বন-বনান্তরে ঘোরেন। বাঘ নইলে আবাদ বাদা কিসের? বাঘ মেরে সদরের কর্তাদের দেখালে মোটা বখশিস। কিন্তু পুরোপুরি বাঘটা সেই সদর অবধি নিয়ে হাজির করাই তো মুশকিল। মানুষে নিতে দেবে না। বাঘের যে বিস্তর গুণ। মরা বাঘের জিভটা টেনে উপড়ে নেবে সকলের আগে। পেট-জোড়া প্লীহা ফুলে ধামার মতো হয়েছে—কণিকাপ্রমাণ জিভ কলার মধ্যে পুরে খাইয়ে দাও। আর নয়তো জিভের টুকরা শিলে বেটে হুঁকোর জলে মিশিয়ে খাওয়াও সাতটা দিন। প্লীহা শুকিয়ে মোটা পেট চিটে হয়ে যাবে। বাঘের গোঁফও অব্যর্থ অষুধ—মানুষের নয়, গরু-ছাগলের। কয়েকগাছি গোঁফ ন্যাকড়ায় বেঁধে গায়ে বলিয়ে দাও, গায়ের ও মুখের ঘা সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাবে। বাতে শয্যাশায়ী তো বাঘের চর্বি মালিশ কর, খোঁড়া মানুষ তড়াক করে শয্যা ছেড়ে উঠবে। বাঘের চামড়া চোখ ওঠার ওষুধ। চামড়া পুড়িয়ে হুঁকোর জলে মিশিয়ে কাদা-কাদা করে প্রলেপ দাও, চোখ সেরে যাবে। বাঘের নখ রুপোয় বাঁধিয়ে ছেলেপুলের কোমরে ধারণ করাও, আপদ-বিপদের দায় নিশ্চিন্ত। কোন রকম দোষদৃষ্টি পাবে না। বাঘও যদি লাফ দিয়ে ঘাড়ের উপর পড়ে, দাঁত বসাতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে ময়দ ক'জন গাছ-নৌকোয় গোল হয়ে বসেছে। পান-তামাক চলছে। বন হাসিলের কথা উঠল। সেই একবার বন নিয়ে শশী ঘোষ চৌচাকলি করেছিল। বনই জিতে গেল। শেষ পর্যন্ত যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বন ছেড়ে পালাল শশী। সেই কাহিনী সে সবিস্তারে বলছিল। সেবারের ত্রুটি আর না ঘটে।

জগায় কানে যেতে সে রে-রে করে ওঠে: তোমার মতন ঝগড়া করব না তো বনের সঙ্গে। বন থাকবে। সুন্দর বাঘ থাকবে। বাঘ না থাকলে বাবুরা সব এসে জুটবে। নগনা আসবে, চৌধুরি-চক্কোত্তি আর প্রমথ ম্যানেজার আসবে। হাতামাতি চড়ে অনুকূল চৌধুরি আসবে পিছনে ধরে।

আজকে প্রথম দিনেই সেই ভাবনা মনে ঢুকেছে। বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে এসেছে কিনা জগন্নাথ। কেশেডাঙার চরে মানুষ আসে না একটি। জনমজুর মেলে না। টাকার লোভ দেখিয়ে এনেছিল বটে শশী। কিন্তু টেঁকে না, পালিয়ে যায়। পশুপক্ষীর জায়গা—মানুষ থাকবে তো অর্ধেক পশু হয়ে থাকতে হবে। বিনি-খাজনার বন্দোবস্ত সেইজন্য। কাশবনের চর আর চরের কিনারার জঙ্গল উত্তরের একটা সরু খাল অবধি। সেই খাল হল ওদিকের সীমানা। জমি সাফসাফাই করবে, বাঁধ বাঁধবে, সাদা বালির নিচে উর্বর কালো মাটি আবিষ্কার করবে—এত শ্রমের পর আবার নগদ খাজনা গণতে হলে পারবে কেন? ধরাপাড়া করলে দয়াবান মালিকই বরঞ্চ সামান্য সুদে দু-দশ টাকানগদ ছাড়তে পারেন এই মানুষগুলোর খোরাকির জন্য।

পাঁচ বছর না হোক, দশ বছর পরে একদিন তো মানুষ এসে পড়বে। ঐ যে কথা বলল—দলে দলে আসবে ভাল ভাল বড় বড় মানুষ। তখন তো আবার পথ দেখব আমরা—এই যারা গোড়ার মানুষ এসেছি। ভাবে জগা, আর হাসে খলখলিয়ে। মানুষই তো এক রকমের বাঘ। গোবাঘা আছে, তেমনি মানুষবাঘা। সেই কোন মুলুকে জন্মেছিল, মানুষবাঘা তাড়াতে তাড়াতে কোথায় তাদের নিয়ে এসেছে। একেবারে দরিয়ার কিনারে।

বনের বাঘ মানবেলায় যায় না, মানুষবাঘাও তেমনি সহজে আসতে চায় না এমনি দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেইজন্য বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে বসত বানিয়ে দেয়, হুড়মুড় করে তারপরে দলকে দল এসে পড়ে। ভাল ভাল দালানকোঠা হয়। ভারি ভারি মহাজনি নৌকো—এবং ক্রমশ ধোঁয়াবল-ষ্টিমার দেখা দেয় জলে। ঝনাঝন টাকা-পয়সা বাজে। ভাল রাস্তাঘাট হয় জুতা-পায়ে বাবুদের চলাচলের জন্য। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে-আস্তাকুড়ে। হেজেমজে মরে কতক। গগন দাসেরা ভিড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। যারা জগাদের মতন, নতুন জায়গার তল্লাসে তারা আবার বেরিয়ে পড়ে।

অথই কালাপানি সামনে—একবেলার পথও নয়। জগা ভাবে: এখান থেকে তাড়া খেয়ে—আর তো ডাঙাজমি নেই, তখন কি হবে? জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে? কালাপানির পারেও নাকি ডাঙা আছে, শোনা যায়। কিন্তু সাঁতরে যাওয়া যায় না। ডিঙি-নৌকোও ডুবে যায়। জাহাজ লাগে। সে হল যবলগ টাকার ব্যাপার—কেওড়া গাছতলার ঐ ঘটির সম্পদে কুলায় না। ভারি ভারি ডাকাতি আর খুন-খারাবি করলে সরকার নিজ খরচায় জাহাজে করে নিয়ে যেত সেই কালাপানির পার। এখন নাকি নেয় না। দিনকে-দিন কী অবস্থা—সব পথে কাঁটা পড়ে গেল। ক্ষ্যাপা মহেশের ধরায় তো কেশেডাঙায় এসে পড়ল, কালাপানি পারের জন্য আবার একদিন কোন কায়দা ধরতে হবে, কে জানে?

শেষ

"দেশের জন্য আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন ক'রে ছিল ছন্দোবন্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায়নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্ব্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় ক'রে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয়নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা ক'রে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।···আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্য্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসারচেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তার, কুটীরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্যনির্ম্মাণ—আমরা করিনি কি?"

—রবীন্দ্রনাথ
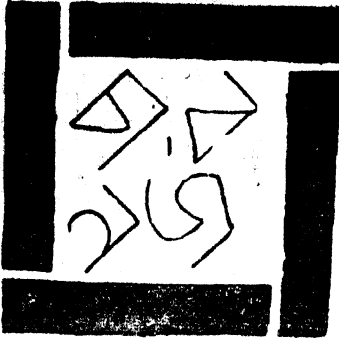
অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

আজ থেকে ৬১ বছর আগে মুর্শিদাবাদে অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বংশের সন্তান তিনি। তখনকার দিনে তাঁর অভিভাবকরা কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁকে ইংরাজী লেখা-পড়া শেখানোর কথা! তাই কুলপ্রথা অনুসারে প্রথমে হোল বাংলা অক্ষর পরিচয়, তারপর ৬ বছর বয়সেই সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে হোল সংস্কৃতশিক্ষার সূত্রপাত।

অতি অল্প বয়সেই ধীরে ধীরে একটার পর একটা পরীক্ষায় পাশ ক'রে চ'ললেন দুর্গামোহন। কাব্য, সাঙ্খ্য, পুরাণ, বেদ যখন শেষ হোল তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। বললে বিশ্বাস করবার মত নয়, আজকে যিনি এত বড় আবিষ্কারের গৌরবের ভাগী হয়েছেন। সেই বয়স পর্যন্ত ইংরেজী বর্ণমালার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে ওঠেনি। তা না হোক, তার চাইতেও আরও এক বড় সম্পদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাঙ্গ-বেদ-বিদ্যালয়ে গুরুগৃহে প্রাচীন

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য

ভারতের আদর্শ অনুযায়ী একেবারে গুরুর অন্তেবাসী হয়ে তাঁকে অবস্থান করতে হয়েছিল অনেক দিন। গুরুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান, বেদমন্ত্র ও স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ফিরে আসা, স্বপাকে খাওয়া ও ব্রহ্মচর্যের বিধি-নিষেধগুলি যথাযথ পালনের ফলে এক অপূর্ব চারিত্রিক সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। অধ্যাপকের জীবনে আজকের দিনে সেই সম্পদই দুর্লভ, আর তাই তাঁর এখনও আছে।

একেবারে ষোল আনা সংস্কৃতের ছাত্র দুর্গামোহন একজন মনীষীর একটা কথাতেই ইংরাজী শেখায় উদ্বুদ্ধ হলেন। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে —আচার্য্য শীলের লেখার কিছু অংশ দেবনাগরী হরফে লিখে দেবার জন্যে। সেই কাজে কিছুদিন দুজনে দুজনের সান্নিধ্যে আসেন। একদিন হঠাৎ আচার্য্য শীল বললেন, 'তুমি সংস্কৃত এত সুন্দর জান, একটু ইংরাজী শেখ না কেন?' এই একটা কথাই যথেষ্ট। দুর্গামোহনের অন্তরে ইংরাজী শেখার এই প্রথম আগ্রহ হোল।

চতুষ্পাঠী ছাড়লেন। বিদায় নিলেন সাঙ্গ-বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাছে। পুরোনো ছাত্রকে হারাতে হবে ভেবে গুরুর সেদিন গভীর দুঃখ হয়েছিল। মৃদু বাধাও তিনি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক দুর্গামোহন সে সব কথা দুঃখের সঙ্গেই আজ স্মরণ করেন। নিজের মনের গোপন কোণেও কোথাও যেন তাঁর একটা বেদনার কাঁটা আজও বিঁধে আছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বলেন, 'যদি সেদিন ইংরেজী পড়তে না আসতাম তা হলে আমি গভীর শাস্ত্রজ্ঞ হতে পারতাম। ভুল করেছি কী ঠিক করেছি জানিনে, তবে একটা দিক আমাকে হারাতে হয়েছে।'

সেটা ১৯১৬ সাল। সবে ১৭ বছরের ছেলে তখন দুর্গামোহন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সংস্কৃত ছাড়া কিছুর সঙ্গেই তাঁর পরিচয় নেই। গেলেন শ্যামবাজার টাউন স্কুলে। হাত বোঝাই মানপত্র ও সোনারূপার পদক। জানালেন ম্যাট্রিক পাশ করবার ইচ্ছা। ইংরেজী, অঙ্ক কিছুই জানেন না বটে, তবে খুব খেটে তৈরী করে নেবেন বললেন। হেডমাষ্টার মহাশয়ের সহানুভূতি হয়েছিল। কে জানে প্রধান শিক্ষাব্রতী হয়তো সম্ভাবনার পরিচয়ও পেয়েছিলেন। ঠিক হোল দশম শ্রেণীতে ভর্তি হবেন। অযোগ্য পাত্রে পড়েনি হেডমাষ্টার মহাশয়ের নির্বাচন। চিন্তা ও দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে দিবারাত্র খেটে ঐ স্কুল থেকেই ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন দুর্গামোহন। সেদিন হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁকে একেবারে দশম শ্রেণীতে ভর্তি করে নিয়ে যে করুণা দেখিয়েছিলেন, তার বোঝা এখনও অধ্যাপক বইছেন। দেখলাম, তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েন তিনি।

১৯২১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে বি, এ এবং ১৯২৩ সালে বেদবিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতেই এম, এ পাশ করলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের সূত্রপাত। তখনই কিছুদিন স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯২৮ সাল থেক ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একটানা ঐ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে কাজ করে আসেন।

১৯৫২ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট রিসার্চ বিভাগে বৈদিক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হয়ে যোগ দেন। এখনও তিনি সেখানেই। কলেজের সুন্দর পরিবেশে

কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য তাঁকে তাঁর যোগ্য স্থানে পরিপূর্ণভাবেই কাজে লাগাতে পেরেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সঙ্গে কিছুদিন তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদের সদস্য হিসাবেও তিনি ১৯৪৮-১৯৫১ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। পারিভাষিক শব্দচয়নে তাঁর দান অসামান্য। এ বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখাও বেরিয়েছে। তাঁর দেওয়া অনেক শব্দ আজও আমরা ব্যবহার করছি। সরকার এই ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

প্রাচীন ভারতের আদর্শকে অবলম্বন করে গুরুগৃহে একদিন যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, ভাবীকালেও সে জীবন পথভ্রষ্ট হয়নি। অনাড়ম্বর জীবন ও নিরভিমান হৃদয় নিয়ে চিরকাল তিনি শুধুই অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা করে এসেছেন। এর সঙ্গে আরও দুটি গুণ সমবেত হয়েছে তাঁর চরিত্রে। একটা হচ্ছে যে কোন সমস্যার গভীরে প্রবেশ করবার একটা শক্তি, আর একটা হোল পুরানো পুঁথিপত্র সংগ্রহ করবার উদগ্র নেশা। আজকের এই আবিষ্কারের মূলে এই দুটো গুণ বড় বেশী কাজে লেগেছে তাঁর। যেখানে সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে, মনীষীর দৃষ্টিকে তা প্রতারণা করতে পারে না। আমি দেশ-বিদেশের অনেক মনীষীর কথা জানি, যাঁরা অধ্যাপকের চরিত্র ও বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাঁদের লেখা চিঠি-পত্র আমি দেখেছি বলেই এটুকু না লিখে পারলাম না।

অথর্ববেদের বিপুলায়তন শাখার উদ্ধার অধ্যাপকের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটেই সব নয়। আজ অবশ্য এইটেই পুরোভাগে এসে প্রাচী-প্রতীচ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর জীবনের আর সব কিছু অবদানকে খানিকটা রাহুগ্রস্ত করে ফেলেছে। কিন্তু এর চেয়ে বড় কী না জানি নে, তবে এর চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এমন আবিষ্কার তিনি এর অনেক আগেই করেছেন। প্রচারকামী মন তাঁর নয় বলেই সাধারণ্যে তার প্রচার হয় নি। বাংলা দেশে বেদচর্চা ছিল না, এই চিরপ্রসিদ্ধি। বেদশাস্ত্রে বৈমুখ্যের শাশ্বত কলঙ্কের যে ছাপ বাঙালী এতদিন বহন করে এসেছে, তার স্খালন তিনিই প্রথম করেন। গুণবিষ্ণু বাঙালী ও বেদজ্ঞ ছিলেন, একথা ভারতবর্ষকে তিনিই শুনিয়েছেন। গুণবিষ্ণুর ভাষ্যও তিনিই প্রকাশ করেছেন। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামে একখানি গ্রন্থ কতকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। সুদূর পাঞ্জাবে বসে পণ্ডিত শঙ্কর মিশ্রও হলায়ুধের মন্ত্রভাষ্য তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন হলায়ুধ। এই হলায়ুধের কথা তাঁর মত এমন জোরে কেউ আর বলেন নি। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হতে অধ্যাপকের সম্পাদনায় শীঘ্রই 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বেরোবে। বাঙালী বেদজ্ঞ রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি তো অধ্যাপকের একেবারে নূতন আবিষ্কার। তাঁর ২২ খানা গ্রন্থ আছে এ কথা তিনি বলার আগে কেউ জানতো না। কয়েকখানা তো অধ্যাপকের ঘরেই আছে। রামনাথের 'সামগমন্ত্রব্যাখ্যান' অমূল্য গ্রন্থ। এখনও অধ্যাপকের ঘরে বাংলা হরফে লেখা সামবেদের একখানা প্রাচীন সময় পুঁথি রয়েছে। বাঙালী যে বেদচর্চা করতো এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর আর কী হতে পারে? 'চিন্ময় বঙ্গ' গ্রন্থে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন বিশেষভাবে অধ্যাপকের এই অবদানের কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। এ ছাড়াও 'ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ', 'মুক্তাফল', 'ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেছেন।

অথর্ববেদের পুঁথি আবিষ্কার করতে গিয়ে আরও কতকগুলি বিপুলায়তন গ্রন্থের তালপাতার পুঁথি অধ্যাপকের হাতে এসে পড়েছে। 'আঙ্গিরসকল্প', 'কর্মপঞ্জিক', 'অথর্বণরহস্য' প্রভৃতি এই পুঁথিগুলি অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে জানবার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। সম্পদ তিনি আহরণ করেছেন, আর তা আমাদের জন্যেই করেছেন। কিন্তু তা বণ্টন করবার দায়িত্ব একজন স্বল্পবিত্ত অধ্যাপকের পক্ষে পালন করা একান্ত অসম্ভব। কয় পুরুষ লাগবে তাই বা কে জানে? তবু জাতি যদি সজাগ হয়, তাঁর উত্তরসাধকরা যদি এ কাজে আগ্রহ ও অধ্যবসায় নিয়ে এখন থেকেই উদ্যোগী হন, সেই হবে অধ্যাপকের জীবনে পরমা শান্তি। তাঁকে সে শান্তি আমাদেরই দেওয়া উচিত।

ডক্টর বি, এন, দে

[কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার]

ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং জগতে ডক্টর বি, এন, দে (বীরেন্দ্রনাথ দে) মর্যাদার আসন পেয়েছেন বহুদিন। দীর্ঘ বোল বছর কলকাতা পৌরসভার চীফ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্বভার তিনি বহন করেন এবং সে নিতান্ত যোগ্যতার সঙ্গে। কলকাতার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর মৌলিক অবদান রয়েছে অনেক, যার জন্যে গর্ব করার তিনি সত্যি অধিকারী।
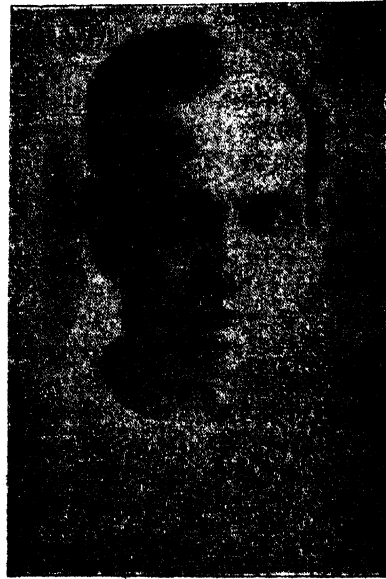
ডক্টর বি, এন, দে

ডক্টর দে ২৪-পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুরের সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশোদ্ভূত। অবশ্য তাঁর জন্ম হয় কলকাতার ইটালীতে ১৮৯২ সালে। ইটালীর বনেদি দে'রা আর জয়নগর-মজিলপুরের জমিদারগণ একই পরিবারভুক্ত মানুষ। ছেলেবেলাতেই বীরেন্দ্রনাথের ওপর পূজ্যপাদ পিতা ভোলানাথ দে ও স্নেহময়ী জননী মনোমোহিনী দেবীর প্রভাব পড়ে বেশিরকম। সকলেরই বিশ্বাস জাগে—বড় হয়ে দে-বংশের মুখোজ্জ্বল করবে এই নবজাতক।

ছাত্রজীবনে বীরেন্দ্রনাথ প্রতিটি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর প্রারম্ভিক পড়াশুনো সম্পন্ন হয় কলকাতাতেই, কিন্তু পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন বিলেতে যেয়ে। ১৯১৫ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ অনার্স বি, এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে প্রচুর দক্ষতা ও অধিকার অর্জনের জন্য গোড়া থেকেই তাঁর ভেতর একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে ইংলণ্ডের বহু জায়গায় তাঁর প্রতিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে—সেদিনে লণ্ডনে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার (কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার)। ১৯২৪ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং শাস্ত্রেই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রীতে তিনি ভূষিত হন।

বিলেতে যখন ডক্টর দে'র ইঞ্জিনীয়াররূপে (পরামর্শদাতা) বিপুল পসার হয়ে চলেছে, সে মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে ডাক পৌঁছল মাতৃভূমির—পিছিয়ে পড়া এই কলকাতার। তখন মহানগরীর নালা-নর্দমাগুলির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়—ময়লা নোংরা জলের মাঝে থেকে নাগরিকদের জীবন বুঝি বাঁচে না। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (মেয়র), পঞ্চ প্রধানের অন্যতম শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বীরেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহায়তা দাবী করলেন এর প্রতীকার চেষ্টায়। অর্থ ও মর্য্যাদার দারুণ লোভ ত্যাগ করে চলে আসেন অমনি তিনি স্বদেশের মাটিতে, এসে যোগ দেন কলকাতা পৌরসভার গোড়া থেকেই চীফ ইঞ্জিনীয়াররূপে। সে ১৯২১ সাল অর্থাৎ আজ থেকে সোজাসুজি একত্রিশ বছর আগেকার কথা। বলতে কি, ডক্টর দে-ই কলকাতা পৌরসভার প্রথম ভারতীয় চীফ ইঞ্জিনীয়ার।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অবধি যোলটি বছর এই কর্মনায়ক মহানগরীর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপৃত থাকেন। কি চীফ ইঞ্জিনীয়ার, কি স্পেশাল অফিসার (ড্রেনেজ), কি ইঞ্জিনীয়ারিং উপদেষ্টা—এ সকল দায়িত্ববহন পদে তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে দেখা যায়। উন্নততর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা দ্বারকত এবং বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তিনি বিপুল পরিমিত অর্থ বাঁচিয়ে দেন পৌরসভার। কলকাতায় আজ যে তুলনায় অল্প মূল্যে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে, বলতে গেলে বরাবর ডক্টর দে'রই এ কৃতিত্ব। মহানগরীর উন্নয়ন ব্রতে লিপ্ত থাকার কালে তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) দক্ষিণ হস্তস্বরূপ, এ গৌরব স্বভাবতঃই তাঁর রয়েছে।

পৌরসভার দায়িত্ব ভার ছেড়ে ডক্টর দে পুনরায় পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়ারের পেশায় আত্মনিয়োগ করেন ১৯৪৫ সালে। কিন্তু কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন চিন্তা তখনও থেকেই যায় তাঁর। পরামর্শদাতা ইঞ্জিনীয়াররূপে তিনি এখানকার নাগরিকদের সেবা করতে থাকেন—জাতি গঠনাত্মক আরও বহু কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত হয়ে পড়েন তিনি ক্রমেই। উপদেষ্টা হিসাবে আহূত হয়ে কিংবা নতুন করে জানবার বুঝবার আগ্রহ থেকে তিনি এর ভেতর বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি সফর করেছেন। ১৯৩১ সালে তিনি এমন কি পৃথিবী পরিক্রমায় বাহির হন এবং ভারতের বাজক ইঞ্জিনীয়াররূপে প্রশংসা লাভ করেন যখন যেখানে গেছেন, সেখানেই। নিখিল চীন-বিজ্ঞানী সমিতি ফেডারেশনের আমন্ত্রণক্রমে ১৯৫৫ সালে তিনি নয়া চীন সফরে যান।

প্রথম জীবনে বিলেতে থাকা অবস্থাতেই উপদেষ্টা ইঞ্জিনীয়ার ডক্টর বীরেন্দ্রনাথের খ্যাতি ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল—ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতি বিভাগেই তাঁর পর্য্যাপ্ত অধিকার রয়েছে। 'ফেরো কংক্রীট' জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে তিনি একজন অগ্রণী এবং 'গ্যাস টাইট ফেরো কংক্রীটে'র তিনিই আবিষ্কর্ত্তা। এ সকল নানা কারণেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজও তাঁর নাম ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার না করলে নয়।

কলকাতা পৌরসভা তথা কলকাতা মহানগরীর সাথে ডক্টর দে'র হৃদয়ের এতখানি নিবিড় যোগ ঘটেছে, যেন একে বাদ দিয়ে কোন চিন্তাই তাঁর চলে না। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল অবধি তিনি পৌরসভার কারিগরী পরামর্শদাতা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টার আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সময় মধ্যেই ১৯৫৬ সালে পৌরসভার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি (৪৬ কোটি টাকার) প্রণয়ন করা হয়। মহানগরীর জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানে আলোচ্য পরিকল্পনায় যে যে কাজের সুপারিশ রয়েছে, সে সব অবশ্য সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হতে এখনও বাকী। এ কারণে বীরেন্দ্রনাথের মনে স্বতঃই একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

ডক্টর দে'র কথা—আজকের দিনে একটি মুখ্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার বিকল্প জল সরবরাহ ব্যবস্থা। মহানগরীর বুকে কোন্ পরিকল্পনায় এতটুকু জল দাঁড়িয়ে থাকবে না এবং নাগরিকদের গৃহস্থালীর কাজে অপরিস্রুত জল ব্যবহার না করলেও চলতে পারবে—এ সকল প্রশ্নের ওপরও প্রবাহৎ কম ভাবনা দেন নি তিনি। এখানে বিকল্প জল সরবরাহ ব্যাপারে ইঞ্জিনীয়ার দে'র একটি নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে, যেটি তিনি সাহসের সঙ্গে পেশ করেন ১৯৩১ সালেই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী) তখন পৌরসভার অল্ডারম্যান—ডক্টর দে'র নতুন পরিকল্পনাটি সম্পর্কে গভীর উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে।

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথের সোজা দাবী—মহানগরীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে-টি, সে হচ্ছে জনসংখ্যার সাথে তাল রেখে পর্য্যাপ্ত পরিস্রুত জল সরবরাহ। কতকগুলি অগভীর নলকূপ বসিয়ে এদের দীর্ঘস্থায়ী মীমাংসা হবে না, এর জন্য চাই অতি বৃহদাকার নলকূপ—যা মাটির গভীর অন্তর্দেশ বা পাতালপুরীর অফুরন্ত জল টেনে তুলতে পারবে। টাকার তথাকথিত অভাব দেখিয়ে এ অত্যাবশ্যক পরিকল্পনার রূপায়ণে বিলম্ব ঘটানো তাঁর কাছে অসহনীয়।

বনামধন্য ইঞ্জিনীয়ার (স্থপতি) ডক্টর বি, এন, দে আজও অবধি বেশ কর্মক্ষম ও ক্রিয়াশীল। ভারত ও ভারতের বাইরের বহু

ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি সভাপতি কিংবা অপর কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। বাঙালীর পক্ষে এ গৌরবের যে, আমেরিকার ডেট্রয়েটে ১৯৫১ সালে যে প্রথম বিশ্ব-ধাতু কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তিনি ছিলেন উহাতে সরকার মনোনীত অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি। রুশিয়ার কারিগরী বিজ্ঞান সমিতির নিখিল সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ১৯৫৭ সালে তিনি সোভিয়েট ভূমি সফরে আমন্ত্রিত হন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাস্তনির্মাণ বোর্ডের নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। দেশ ও জাতি তাঁর কাছ থেকে এখনও অনেক অবদান পাবে, এ বিশ্বাস রাখা কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়।

আবদুল মোমিন

[কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা]

নিম্নমধ্যবিত্তঘরে জন্মগ্রহণ—প্রথমাবধি অর্থাভাব ও অন্নাভাব —বাল্যে বিপ্লবী দলের সহিত সংযোগ—কৈশোরে মেহনতী জনতার সংগঠন-প্রয়াসী—আর যৌবনের অধিকাংশ সময় কারাগারে অতিবাহিত—এই হল প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন ও সাম্যবাদী নেতা আবদুল মোমিনের জীবনেতিহাসের সংক্ষিপ্তসার।

রাজসাহী জিলার বিহুরপুর গ্রামের মুন্সী কফিলুদ্দীন ও সবেরা বেগমের একমাত্র পুত্র আবদুল মোমিন মাতুলালয় কেচুয়াডাঙ্গায় ১৯০৮ সালের ২৪শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে স্বগ্রামে ও পরে কেচুয়াডাঙ্গায় লেখাপড়া আরম্ভ হয়। তখন প্রথম মহাসমর আরম্ভ হয়েছে—বালক মোমিন ক্ষুদ খেয়ে, অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটিয়েছে—পিতা রাজমিস্ত্রী হিসাবে সামান্ত আয় করতেন। জমিদারের বেগার প্রথা খাটার জন্ত পিতাকে প্রস্তুত হতে দেখেছে বালক মোমিন। পয়সা অভাবে লেখাপড়া বন্ধ ছিল কিছুদিন। বাবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট মেধাবী পুত্রের পড়ার ভার নিতে অনুরোধ করেছেন—শেষে এগিয়ে এসেছেন নিজে থেকে 'বাঘা যতীন'এর প্রত্যক্ষ শিষ্যস্থানীয় ছাত্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট বিপ্লবী ব্রজেন্দ্রনাথ পাল। এঁর প্রভাব মোমিনের পরবর্তী জীবনে প্রকট হয় আর তাঁর নিকট বালক মোমিন জানতে পারে (১) ভয় বলে দুনিয়ায় কিছু নাই (২) মানুষ সব কিছু সৃষ্টি করে (৩) বড় হয়ে দেশের জন্ত নিজস্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এইগুলি মূলধন করে মোমিন ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপ্লবী দলের কার্য্যে। পিতা বিরক্ত কিন্তু না উৎসাহ দিতেন। শিকারপুর হাই স্কুলে পড়ার সময় তিনি ১৯২০ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন দেখেন—অধ্যাপক জে, এল, ব্যানার্জি ও সরস্বতী দেবীর 'ইংরাজ বিতাড়ন' কথা দুটি মনে গেঁথে রইল কিন্তু আর কিছু বুঝলেন না। পর বৎসর কংগ্রেসের সদস্য হন ও কলিকাতার জাতীয় বিস্তালয়ে ভর্তি হলেন। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মিরূপে ধৃত হইয়া খিদিরপুর ডক জেলে থাকেন ও হেমন্ত বসু, দেবেন দে প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয়। পূর্ব্বেই বিপিন গাঙ্গুলী, সতীশ চক্রবর্তী ও পরে ব্রজেন বাবুর শিবপুর গৃহে অন্যান্ত বিপ্লবী নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হন। পুলিশ তখন থেকেই তাঁহার উপর নজর রাখে। সাঁত্রাগাছি-সালকিয়া অঞ্চলে থাকার সময় তিনি বহু ছেলেকে ড্রিল ও প্যারেড শিখাইতেন এবং বিপ্লবী সংগঠনের জন্ত কর্মী যোগাড় করিতেন। এই সময় একদিন সরোজ ঘোষ লিখিত 'বলশেভিকবাদ' পুস্তিকাটি দেখেন কিন্তু উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া ১৯২৫ সালে তিনি এক টাকা দিয়া কানপুর কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হন। কিন্তু উহার ক্রিয়াকলাপ কিছুই জানিতেন না। অনেক প্রবীণ বিপ্লবীনেতা তাঁহাকে উক্ত দলে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। ১৯২৮ সালে সুধাংশু চৌধুরীর সহিত তিনি কয়েকটি সভা-সমিতিতে যোগদান করেন কিন্তু দলাদলির প্রকট ছিল সর্বত্র। এই সময় দুর্গাদাস শেঠ সম্পাদিত "স্বদেশীবাজার" দপ্তরে ও "ধূমকেতু" অফিসে বিশিষ্ট নেতাদের ও কাজী নজরুল ইসলামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সত্ত প্রতিষ্ঠিত Works & Peasants Party অফিসে তিনি পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও সাম্যবাদী নেতা মুজাফ্ফর আমেদের সহিত সাক্ষাতের জন্ত গমন করিলে আবদুল হালিমের মাধ্যমে ফিলিপস্ প্র্যাটের সহিত পরিচিত হন ও কিছু সাম্যবাদ বিষয়ক পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া হয়। পরে অতুল গুপ্ত, হেমন্ত সরকার ও ভারতের অন্যান্ত নেতাদের উপস্থিতিতে উক্ত পার্টির অধিবেশনে শ্রীমোমিন নব-প্রতিষ্ঠিত Young Comrade League-এর সহিত সংশ্লিষ্ট হন।

১৯২৮ সালে হিদারাম ব্যানার্জি জেলে বিপ্লবী সন্তোষ মিত্রের দল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গঠনে তৎপর হইলে শ্রীমোমিন উহাতে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি রাজগঞ্জ শাঁখরাইল পাটকল শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় বাংলাদেশে সমস্ত পাটকল-শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছিল। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁদের দাবীদাওয়া উত্থাপনে (বিদেশী মিলমালিকদের প্রতি তৎকালীন শাসকদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকায়) বিস্তর অসুবিধা ছিল। শ্রীমোমিনের সংগঠন প্রতিভায় বঙ্গীয় জুটকর্মী ইউনিয়ন গঠিত হয় ও ১৯২৯ সালে ছয় সপ্তাহ সর্বাত্মক ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী ও অন্যান্ত কয়েকজন নেতা তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন। সরকারের উদ্যোগে মিলমালিকেরা শ্রমিকদের প্রথায়

আবদুল মোমিন

দাবীগুলি মানিয়া নেন। ইহার অসামান্য সাফল্যে অন্যান্য শ্রমশিল্প কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায় এবং Manager, Strike Company নামে শ্রীমোমিনের নিকট হ্যারিসন রোডস্থিত ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে বহু চিঠি আসিত। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আবদুল মোমিন অনেকগুলি ছোট শিল্পসংস্থার মালিকদের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবী আদায়ে সমর্থ হন। কিন্তু শ্রীমোমিন ও অন্যান্যেরা অর্দ্ধাশনে ও অনাহারে বহুদিন কাটাইতে বাধ্য হন। অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামী বিশ্বানন্দ এই সময় প্রচুর সাহায্য করেন। স্বামীজীর মাধ্যমে ঠেলাগাড়ীর চৌধুরীরা পুলিশের বাধা-নিষেধ অপসারণে শ্রীমোমিন ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সহায়তা চাহেন। ইহার ফলে Calcutta Carters' Union গড়ে উঠে—'৩০ সালের ১লা এপ্রিল বিরাট ধর্মঘট হয়—পুলিশের আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে—কিন্তু সমস্ত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত না হওয়ায় চালকেরা পথিমধ্যে ঠেলাগাড়ীগুলিকে রাখিয়া দেয়—যানবাহন চলাচলে প্রচুর অসুবিধা হয়—পুলিশের হস্তক্ষেপে বহু লোক হতাহত ও ধৃত হয়। শ্রীমোমিন ধৃত হন ও চারি বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দমদম জেলে স্থানাভাবের জন্য শ্রীমোমিন অন্যান্যের সহিত প্রতিবাদস্বরূপ একদিন অনশন ধর্মঘট করেন। এক বৎসর পরে আপীলে তিনি মুক্ত হন। এত কথা সত্ত্বেও প্রকৃত সাম্যবাদ কি, এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ধারণা হয় নাই। কিন্তু দমদম জেলে শ্রীবঙ্কিম মুখার্জী Communist Manifesto র ক্লাস আরম্ভ করেন ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিশদভাবে শিক্ষা দিতেন। আবদুল মোমিন উহাতে নিয়মিত যোগদান করিতে থাকেন।

১৯৩১ সালে বহরমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে মোমিন সাহেব যোগদান করেন ও ইহার পর এগার দিন তাঁহাকে পুলিশ আটক রাখে। উক্ত বৎসর তিনি বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পৌরোহিত্য করেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন অনুমোদন লইয়া উক্ত সভায় গোলমাল হয়—ফলে উহার সাধারণ সভা মুলতুবী থাকে। কিন্তু মোমিন, বঙ্কিম মুখার্জি ও অন্যেরা মেটিয়াবুরুজে উক্ত সভা আহ্বান করেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে দ্বিমত দেখা দেয়। তিনি ১৯৩১ সালের মধ্যভাগে ধৃত হইয়া ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত আটক থাকেন এবং পরে জলপাইগুড়ি হইতে মুক্ত হন। কিন্তু কয়েকটি জেলায় তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৮ সালে সাম্যবাদী দলের সদস্য থাকাকালীন তিনি পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন উপসমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। উক্ত বৎসর তিনি প্রায় প্রতি কারখানার ইউনিয়নগুলি নূতনরূপে রূপায়িত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের জন্য বাধা উপস্থিত হয় এবং ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে 'সিকিউরিটি' বন্দী হিসাবে ধৃত হইয়া ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে মুক্তি পান। তন্মধ্যে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪৩ সালে প্রাদেশিক ট্রেড-ইউনিয়নের সহঃসম্পাদক, অস্থায়ী সম্পাদক ও পরে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ১৯৪৪-৪৯ সাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলার মধ্যবিত্তসমাজের আন্দোলনের নেতৃত্ব নেন ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে থাকেন। সেই সময় তিনি কলিকাতার নবগঠিত ৭০টি ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন ও ট্রাইব্যুনাল. ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্ঘবদ্ধ ফ্রন্ট প্রভৃতি ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। পর বৎসর নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন এবং উহার কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালের প্রথমে কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইলে তিনি এপ্রিল মাসে ধৃত হইয়া পরবৎসর জানুয়ারীতে মুক্তি পান কিন্তু কলিকাতা সহ পাঁচটি জেলা হইতে বহিষ্কৃত হন। ময়ূরভঞ্জে ১৮ দিন থাকার পর উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ফলে তিনি অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যান। এই সময় শ্রীস্নেহাংশু আচার্য্য তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হাসিনা মোমিন পাঁচ মাস বারিপদা জেলে আটক থাকেন। অর্থাভাব—তাঁহার ময়ূরভঞ্জস্থিত ব্যবসায় অচলাবস্থা—শিশুসহ পত্নীর কারাবাস—মানসিক অশান্তি—আর নিজেকে নেপথ্যে রাখার প্রয়োজনীয়তা না থাকায় তিনি পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং উড়িষ্যা সরকারের কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে—উহার সম্মুখীন হইতে মোমিন সাহেব বদ্ধপরিকর হন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তাঁহার উপর হইতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু এক বৎসরের জন্য তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে মতদ্বৈধতা দেখা দেওয়ায় তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু ১৯৫২ সালে উড়িষ্যা কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁহাকে পুনরায় প্রাদেশিক সংস্থায় গ্রহণ করেন। মোমিন সাহেবের বর্ত্তমানে রাজনৈতিক কর্ম্মকেন্দ্র হল উড়িষ্যা রাজ্য। তথাকার 'ভাগচাষ' আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সাল হইতে তিনি উড়িষ্যা রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি পদে রহিয়াছেন এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় তিনি কর্ম্মিসঙ্ঘ গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯৪৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসংস্থার সপ্তবিংশতি অধিবেশনে শ্রীমোমিন A. I. T. U. C.র অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

সরকারী, বেসরকারী ও জনসাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ভাবে—অবসর সময়ে পড়াশুনা করেন তিনি—আর অনাদৃতদের যথাসাধ্য সহায়তা করে থাকেন তিনি।

শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম উপমন্ত্রী]

মুখ্যতঃ এই নারী একজন দরদী সমাজসেবী ও গঠন-কর্মী। কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন ইনি এই মহৎ পরিচয়। মন্ত্রীর সু-উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়েও নিজের 'মিশন' ইনি ভুলে যান নি, এ কম কথা নয়। শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবী অনুসারে বরং বলা যায় যে, সমাজসেবা বা জনসেবায় অধিকতর সুযোগ মিলবে ভরসাতেই তাঁর এই মন্ত্রিত্বের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ইছাপুরা গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুযোগ্যা মেয়ে শ্রীমতী মায়া। ১৯২৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্য পরিবেশে। কিন্তু তাঁর পড়াশুনো

হয়—কি স্কুল কি কলেজে, সবটাই এই কলকাতায়। পিতা ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দেশবন্ধুর একজন সহকর্মী—তাঁর কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা কর্পোরেশন। বাপ-মায়ের প্রত্যক্ষ অনুশাসনে শ্রীমতী মায়ার ছাত্রী-জীবন অতিবাহিত হয়।

বিক্রমপুরের এই বিশিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটির বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সাথে যোগাযোগ ছিল সেদিনে। তার জন্যে পরিবারের অনেককেই ইংরেজ সরকারের হাতে ভোগ করতে হয়েছে নানা লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন। শ্রীমতী মায়ার একটা রাজনৈতিক মন গড়ে ওঠে ছাত্রী অবস্থাতেই। তিনি তখনও ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রী—দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) গড়ে তুলছেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কোর। সুযোগ খুঁজে নিয়ে তিনি যোগ দিলেন এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। কলেজ-জীবনেও ছাত্র-আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আশুতোষ কলেজ থেকে তিনি ১৯৪১ সালে বি-এ পাশ করেন।

স্নাতক হবার পর শ্রীমতী মায়ার মনে ছিল বি-টি পাশ করে শিক্ষকতার লাইন ধরবেন—যেখানে থেকে সমাজসেবার তাঁর সুযোগ মিলবে যথেষ্ট। সেভাবে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে পড়াশুনোও করলেন। কিন্তু বি-টি পরীক্ষার পর তিনি আর চাকরিতে আবদ্ধ হলেন না। এককালের সুদক্ষ ছাত্রকর্মী সমাজসেবী হবার পথ খুঁজে নিলেন অন্যভাবে। ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ এলাকায় তিনি জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় কংগ্রেস সংগঠনে শ্রীমতী মায়া ছিলেন একজন খাঁটি সুভাষপন্থী। তারপর অবস্থাধীনে তাঁর মতবাদের পরিবর্ত্তন ঘটতে দেখা যায়। ক্রমে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আই. এন্. টি, ইউ, সি) গঠিত হলে তিনি এর সাধারণ পরিষদের সদস্য হন পর পর তিন বছর। প্রথম দিকে তিনি মজদুর ফ্রন্টে কাজ করেন, এক্ষণে যেমন রাজ্যের কিষাণ ফ্রন্টে। উভয় ফ্রন্টেই কর্মী হিসাবে তিনি বিশিষ্টতার ছাপ রাখতে পেরেছেন এরই ভেতর।

বাংলায় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ যখন চলেছিল, শ্রীমতী মায়া তখনও ছিলেন ছাত্রী। কিন্তু দুর্গত মানুষের সেবায় তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে সেদিনেও। ২৪-পরগণা বিশেষ ভাবে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে জনসেবামূলক বহু কর্মানুষ্ঠানে তিনি এখনও ব্যাপৃত রয়েছেন। ২৪-পরগণা জেলা কংগ্রেস ও

শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কংগ্রেসের তিনি সেদিন অবধি সেক্রেটারী ছিলেন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং এ-আই-সি-সি'রও তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা। ২৪-পরগণা রেডক্রশ সোসাইটির সাথে তিনি বহুদিন থেকে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। নারী ও শিশুকল্যাণ কাজেও তিনি এক্ষণে ব্রতী আছেন এবং শেষ অবধি এই মহৎ কাজ নিয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর রয়েছে। সমবায় প্রচেষ্টায় কী করা চলে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষাও তিনি কয়েকটি চালিয়েছেন।

দেশের বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা ও ক্রিয়াকলাপের সাথে শ্রীমতী মায়ার যোগাযোগ বিদ্যমান। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিজিক্যাল টিচার্স এসোসিয়েশনের তিনি সভানেত্রী। ২৪-পরগণার বিভিন্ন স্থানে তিনি কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনে কাকদ্বীপ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তিনি কংগ্রেস প্রার্থিরূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা নির্বাচিত হন। তারপরই নতুন সরকার গঠিত হলে তাতে তিনি একজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের গুরুত্ববহুল দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। আজ অবধি সেই দায়িত্বই পালন করতে চেষ্টা করছেন তিনি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে। তিনি দাবী রাখেন—কেন্দ্রীয় সহযোগিতা ঠিকভাবে পেলে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য এই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

—রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্য অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২৪

পূজার ঘরের দরজা বন্ধ করে নৃসিংহের ধ্যান করছে শ্রীবাস, হঠাৎ কে হুঙ্কার করে উঠল বাইরে থেকে। 'দরজা খোলো।'

লক্ষ্য করল না শ্রীবাস। যেমন তন্ময় হয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল।

'কী, খুললে না? খোলো বলছি শিগ্‌গির।' বাইরে থেকে দরজায় লাথি পড়ল এবার।

ভীষণ বিরক্ত হল শ্রীবাস। রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'কে তুমি?'

'কে আমি?' বাইরে থেকে বললে আগন্তুক: 'যার তুমি ধ্যান করছ সেই আমি। দরজা খুলে দেখ আমাকে।'

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বললে, 'তুই মন্দবুদ্ধি। নিশ্চয়ই তুই মরণেচ্ছু। আর মুমূর্ষুদেরই বাক্যবিপ্লব হয়ে থাকে। নইলে কী সাহস তুই বলিস আমি ছাড়া আরেক জগদীশ্বর আছে। যদি থাকে, সে কোথায়? যদি বলিস সে সর্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে তাকে দেখছি না কেন? 'ক্বাসৌ যদি স সর্বত্র, কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে?'

প্রহ্লাদ প্রণত হয়ে বললে, 'বা, ঐ তো দেখা যাচ্ছে।'

হিরণ্যকশিপু বলছে, 'ক্বাসৌ যদি স', অর্থাৎ সে ঈশ্বর যদি আছে সে কোথায়? প্রহ্লাদ বলছে, 'সর্বত্র', অর্থাৎ সর্বভূতে। হিরণ্যকশিপু বলছে, 'কস্মাৎ স্তম্ভে ন', অর্থাৎ, তা হলে ঐ স্ফটিকস্তম্ভে নেই কেন? প্রহ্লাদ বললে, 'দৃশ্যতে', অর্থাৎ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি।

তুমি যাকে শূন্যময় দেখছ, আমি তাকে কৃষ্ণময় দেখছি।

'তোর শরীর থেকে তোর শির আমি হরণ করব', হিরণ্যকশিপু খড়গ কুড়িয়ে নিল, বললে, 'আমাকে ছেড়ে যার তুই আশ্রয় নিয়েছিস সেই হরি আজ তোকে রক্ষা করুক।' সিংহাসন থেকে লাফ দিল হিরণ্যকশিপু আর অতিবলে স্তম্ভে মুষ্টিপ্রহার করল।

তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ উঠল স্তম্ভে, যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধ্বনির পর প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনির লহরী উঠল চারদিকে। হিরণ্যকশিপু চকিতনেত্রে পাগলের মত চারদিকে তাকাতে লাগল, এই ধ্বনির কারণ কী, নির্ণয় করতে পারল না।

ভক্ত প্রহ্লাদের কথা সত্য করবার জন্যে শ্রীহরি স্তম্ভের থেকে নির্গত হলেন। কিন্তু এ কী অদ্ভুতমূর্তি। অমৃগ, অমানুষ, অথচ সিংহ আর মানুষ একসঙ্গে, নৃসিংহমূর্তিতে দেখা দিলেন। প্রতপ্ত সুবর্ণের মত চোখ, স্ফীতদীপ্ত কেশর, করালদংষ্ট্র, ক্ষুরান্তজিহ্ব, ভ্রূকুটিভীষণ মুখাবয়ব। কর্ণদ্বয় নিশ্চল ও ঊর্ধ্বমুখ, নাসিকা পর্বতগুহার মত বিস্ফারিত। দেহ আকাশ-স্পর্শী, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, বক্ষস্থল বিশাল ও উদর অতিশয় কৃশ। নখরনিকরে দুর্ধর্ষদর্শন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে বর পেয়েছিল হিরণ্যকশিপু যে তার সৃষ্ট কোনো জীব, দেবতা বা দানবের হাত থেকে তার মৃত্যু হবে না। তাই এই "ন মৃগঃ ন মানুষঃ" অদ্ভুত নৃসিংহমূর্তি ধরতে হল ভগবানকে।

'যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারছি মহামায়াবী হরি এইভাবেই আমার মৃত্যু চিন্তা করে রেখেছেন, তবুও এ উদ্যমে আমার আর কী হতে পারে?' এই বলে গদা তুলে নিয়ে সিংহনাদ করতে করতে নৃসিংহের দিকে ধাবিত হল হিরণ্যকশিপু।

গরুড় যেমন মহাসর্পকে ধরে, তেমনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে ধরে ফেললেন। নিজের ঊরুদ্বয়ের উপর রেখে শাণিত নখরে তার উদর বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করলেন। দেবাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। স্তবে মুখর হয়ে উঠল দিঙ্মণ্ডল।

কিন্তু এ কী ভয়ঙ্কর মূর্তি নৃসিংহের। ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং—কিছুতেই এর নিবৃত্তি নেই। দেবতাদের কারু সাহস নেই কাছে যায়, তাকে শান্ত হতে বলে। লক্ষ্মীকে পাঠানো হল যদি তাকে দেখে করুণাপরবশ হন। কিন্তু লক্ষ্মীও এগুতে সাহস পেল না।

একমাত্র দুঃসাহস ভক্তের। যেখানে দেবতারা

অক্ষম, স্বয়ং লক্ষ্মী সশঙ্ক, সেখানে ভক্তই অধিকারী, ভক্তই সম্মানিত।

নারদ বললে,—বৎস, তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ নৃসিংহদেবকে শান্ত করো।

পরম ভাগবত বালক প্রহ্লাদ নৃসিংহের কাছে গিয়ে ভূতলে শরীর লুন্ঠিত করে প্রণাম করল। কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করতে লাগল; হে সত্ত্বমূর্তে, ক্রোধ সংবরণ করুন। সর্পবৃশ্চিকাদি হিংস্র হত্যায় সাধুও আনন্দিত হয়। অসুরকে আপনি বধ করেছেন, আপনিও আনন্দিত হোন। আপনার রূপ লোকে ভয়শান্তির জন্যে স্মরণ করে, তবে কেন আপনি এই কোপমূর্তি ধরে আছেন? আমি কিন্তু আপনার শত্রুবিদারী নখাগ্রে ভীত নই, যেমন আমার ত্রাস সংসারচক্রপেষণে। দুঃখের যা ওষুধ তাও দুঃখ। আমি এই সংসারচক্রে ইক্ষুদণ্ডের মত নিষ্পীড়িত হচ্ছি, আপনি এ বিপন্নকে রক্ষা করুন। করদ্বয়ের কণ্ডূয়নের মত দুঃখের পর সুখের ছদ্মবেশে দুঃখই বারে বারে দেখা দেয়। হে আর্তবন্ধু, মথনে যেমন কাঠে অগ্নির অনুভব হয়, তেমনি ভক্তিতে আমার হৃদয়ে আপনার মঙ্গলকোমল দর্শন ঘটুক। এই করাল মূর্তি প্রত্যাহার করুন। হে সর্বকল্যাণের অধীশ্বর, আমাকে লোকপ্রলোভনে আকৃষ্ট করবেন না, আমাকে নিরুপাধিক ভক্তি দিন।'

প্রহ্লাদের স্তবে দ্রবীভূত হলেন নৃসিংহ। মাটি থেকে তাকে তুলে তার মাথায় অভয়ঙ্কর হাত রাখলেন। বজ্রসার মূর্তি কুসুমসুকুমার হয়ে উঠল।

শ্রীবাস দরজা খুলে দিল। কিন্তু এ কী! এ সে কাকে দেখছে!

এ যে নিমাই পণ্ডিত। তীব্রতেজ সূর্য্যের বীর্যজ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

'আমি এসেছি।'

হতচেতনের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল শ্রীবাস। তুমি যে এসেছ! তবে যে আমার পরম কামনার ধন, যাকে জড়ে চেতনে নিত্য খুঁজছি, তুমিই কি সেই নরসিংহ? তোমার পাদপদ্মই কি সংসারমোচক? তুমিই কি সেই বিচিত্রবীর্য পরম পুরুষ?

'তাকিয়ে দেখছ কী!' বললে নিমাই, 'আমাকে অভিষেক করো।'

এতক্ষণে বুঝি চেতনা হল শ্রীবাসের। উচ্চ কণ্ঠে সকলকে ডাকতে লাগল। ওরে কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়, ভগবান আমাদের ঘরে এসেছেন, তাঁর অভিষেক করতে হবে। নতুন কলসী কিনে আন, একশো ঘটে জল নিয়ে আয় গঙ্গা থেকে।

পূজার ঘরে বিষ্ণুর খাটে শালগ্রাম শুয়ে। তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে নিমাই সেই বিষ্ণুখাটে বসে পড়ল।

কে আপত্তি করবে! 'আমিই সেই!' শুধু মুখের কথায় নয়, সর্বাঙ্গের অলোকসম্ভব রূপে, দিব্যদীপ্ত কান্তির সুধা প্লাবনে।

গদাধর ছুটে এল, যে যেখানে ছিল শ্রীবাসের সমস্ত আত্মীয়মণ্ডলী। নিমাইকে উঠোনের মাঝখানে প্রশস্ত পিঁড়ির উপর বসানো হল, আর শত শত গঙ্গাজলের ঘট উপুড় করা হল তার উপর। যারা স্নান করাচ্ছে আর যে স্নাত হচ্ছে, কারুই বাহ্যজ্ঞান নেই। এত জল তবু গায়ের আভা শীতল হয় না। সোনার কান্তি সোনার চেয়েও তেজস্বী হয়ে ওঠে।

স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুষ্ক কাপড় পরিয়ে নিমাইকে ফের পূজার ঘরে আনা হল। আর বলা-কওয়া নেই, নিমাই ফের বসে পড়ল বিষ্ণুখাটে। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল, সকলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পেল ঘরের মধ্যে বাঁশি বাজছে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরুচ্ছে তেজঃপ্রভা। এমন কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি, কেউ কল্পনাও করেনি।

'শ্রীবাস!' ঘরের মধ্য থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল নিমাই।

নাম ধরে শ্রীবাসকে এর আগে ডাকেনি কোনো দিন। আর এ অনুরোধের সম্ভাষণ নয়, আদেশের নির্ঘোষ!

ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল শ্রীবাস।

'প্রভু!' দাঁড়াল করজোড়ে।

'তোমার ঘরে আমার জায়গা করে দাও।' বললে নিমাই, 'আমি তোমার ঘরের বাসিন্দে হব।'

খাট থেকে নেমে নিমাই অন্য আসনে বসল। আর সেই খাট নিয়ে যাওয়া হল শ্রীবাসের শয়ন-ঘরে। খাটানো হল চাঁদোয়া আর পরদা, খাটে পাতা হল বিছানা। তারপর তার উপরে নিমাই বসল।

গদাধর তাকে সাজাতে বসল ফুল দিয়ে। গায়ে লেপে দিল চন্দন, মাখিয়ে দিল কেশর-কর্পূর। নিমাইয়ের যেন রক্তমাংসের শরীর নয়, শুধু জ্যোতি-স্রোত। শুধু তেজঃপুঞ্জ।

'আমি কে বুঝতে পেরেছ ?'

কেউ চামর দিয়ে ব্যজন করছিল, কেউ বা স্তব করছিল তন্ময় হয়ে, আর কেউ শুধু তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষে। নিমাইয়ের প্রশ্ন শুনে কাঁদতে লাগল।

নিমাই বললে, 'আমিই সেই অন্তরবাসী অন্তরতম। যিনি তোমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন আমিই সেই পরম পুরুষ। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্যে আমি এসেছি। কিন্তু সঙ্গে আমার দণ্ড-অস্ত্র নেই, সৈন্য-সামন্ত নেই, শুধু প্রেম নিয়ে, ভক্তি নিয়ে এসেছি। শুধু প্রেম-ভক্তিতেই এবার সকলের পাপক্ষয় করব, করব দুঃখ জয়।'

'কিন্তু প্রভু, রাজা আসছে আমাদের সকলকে ধরে নিয়ে যেতে।' কে একজন বললে ভয়ের কথা।

নিমাই হাসল। বললে, 'কোনো ভয় নেই। প্রেম দিয়ে রাজার হৃদয়ও জয় করব দেখো।'

অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥

অঙ্গ কী ? নিমাইয়ের হাত-পা, নিমাইয়ের কৃপাকটাক্ষ। বাহুর উত্তোলন আর পদনৃত্যন্যাস। আর উপাঙ্গ কী ? নামকীর্তন। বাহু তুলে হরি বলে প্রেম-দৃষ্টিতে তাকালেই জগত বশীভূত নিমাইয়ের। শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যে দেখবে সেই প্রেমধন পেয়ে যাবে। রাজা যাবে কোথায় ?

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥

তবু যেন কারু সন্দেহ যায় না। রাজা যে বিধর্মী, রাজা যে দুর্ধর্ষ।

নিমাই বললে, 'বেশ, আসুক রাজা। নিয়ে আসুক তার হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত। সকলকে আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদাব। প্রেমে বিকল বিহ্বল করে দেব সকলকে।'

হস্তী ঘোড়া মৃগ পাখী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভাল মতে ॥

'কী, বিশ্বাস হয় না ?' নিমাই সহসা উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠল,—'নারায়ণী ! নারায়ণী।' নারায়ণী শ্রীবাসের ভাইঝি, বয়েস মোটে চার বছর। ডাক শুনে কাছে এসে দাঁড়াল।

নিমাই বললে, 'নারায়ণী, কৃষ্ণ বলে কাঁদো।'

হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! বলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করল নারায়ণী। ছোট শিশু, তার চোখের জলে পৃথিবী ভেসে যেতে লাগল।

'দেখলে, দেখলে আমার কৃষ্ণনামের মহিমা।' নিমাই বললে গদগদ কণ্ঠে, 'তোমাদের রাজা আসুক, ধরুক আমাকে, তাকেও এমনি কৃষ্ণনামে বিগলিত করব।'

কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম ॥

হরি নামই কলির একমাত্র সাধন। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্যা। কলিতে ধ্যান নয়, যজ্ঞ নয়, পরিচর্যা নয়, কেবল হরিনাম। সাধন ভক্তির পঞ্চ অঙ্গ। সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি সেবন। 'এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।' কিন্তু যে অঙ্গেরই সাধন করো, নামের আশ্রয় ছাড়া ফল নেই।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥

সুতরাং আত্মহারা হবেই কৃষ্ণনামে। হাসবে কাঁদবে নাচবে গাইবে। মান-অপমানের জ্ঞান থাকবেনা, লজ্জা-জুগুপ্সা থাকবে না, থাকবে না লোকাপেক্ষা। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। চার পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, তৃণতুল্য মনে হবে। ব্রহ্মানন্দকেও মনে হবে অকিঞ্চিৎ। ভক্তিই প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ।

শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী। সে আর তার তিন জা দাঁড়াল এসে দরজায়। শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভাই শ্রীকান্তকে বললে, 'আমাদের ঠাকুর দর্শন করাও।'

'সে কি, তোমরা কুলবধূ, কোনোদিন দাঁড়াওনি অপরিচিতের সামনে।' শ্রীকান্ত প্রতিবাদ করল। 'তোমরা দেখবে কী !'

'যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করছেন, তিনি কি আমাদের অনাত্মীয়, অপরিচিত ? তাঁকে গিয়ে নিবেদন করো আমাদের কথা।' মালিনী অনুনয় করতে লাগল।

শ্রীকান্তর সাহস হল না এই আবেদন নিয়ে দাঁড়ায় নিমাইয়ের সামনে।

নিমাই শুনতে পেয়েছে কাতরতা। বললে সস্নেহে, 'আসতে দাও। যারা আমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে এসে দরজায়, তাদের আসতে দাও স্বচ্ছন্দে।'

মালিনী ও তার জায়েরা সামনে এসে প্রত্যক্ষে দেখতে লাগল নিমাইকে। অভিভূত হয়ে পড়ল পদতলে। তাদের মাথায় পা রাখল নিমাই।

'মৎপ্রাণা মৎপরায়ণা হও।' বরদ হাতে নিমাই আশীর্বাদ করল।

হে প্রভু, যতদিন তোমার হতে না পারি ততদিনই এ গৃহ কারাগৃহ, মোহপাশ পদশৃঙ্খলস্বরূপ। তুমি নিষ্প্রপঞ্চ হয়েও আমাদের আনন্দের জন্যে পৃথিবীতে প্রপঞ্চের অনুকরণ করছ। অতএব মমতার আস্পদ এই জগৎ ও দেহ তোমাকেই অর্পণ করলাম। যতদিন কল্প থাকবে ততদিন তোমাকে নমস্কার।

হঠাৎ নিমাই বিষ্ণুখট্টা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'এবার আমি যাই। সময় হলে আবার আসব।'

হুঙ্কার ছেড়ে মাটীতে পড়ল মূর্ছিত হয়ে।

এ কি, জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই! কে ছিল, কে চলে গেল দেহ ছেড়ে?

সবাই ব্যাকুল হয়ে সেবা করতে লাগল নিমাইকে। বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসতেই নিমাই ধীরে ধীরে চোখ মেলল। এ কী, নিমাই আবার রক্তমাংসের মানুষ হয়ে গিয়েছে। তাকে ঘিরে যে জ্যোতিঃসমুদ্র উচ্ছ্বসিত ছিল এতক্ষণ, তা স্তিমিত হতে-হতে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

নিমাই শ্রীবাসকে ডাকল: 'পণ্ডিত।'

শ্রীবাস উৎসুক হয়ে কাছে এল। শ্রীবাসও আর তুচ্ছ ভৃত্য নয়, সম্মানার্হ পণ্ডিত।

'পণ্ডিত, আমি এখানে কী করে এলাম?' বিস্ময়াবেশে চারদিকে তাকাতে লাগল নিমাই। 'কে আমাকে এখানে নিয়ে এল? এ কী, আমার গায়ে এত চন্দন কেন? কী, কথা নেই কেন মুখে? আমি কি ঘুমুচ্ছিলাম এতক্ষণ? স্বপ্ন দেখছিলাম?'

সবাই নির্বাক হয়ে রইল।

'তবে কি কৃষ্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে চলে এসেছি?' নিমাই ব্যাকুল হয়ে উঠল। 'কৃপা করে বলো কোনো চাপল্য প্রকাশ করিনি তো?'

'না, কোনো চাপল্য প্রকাশ করনি।' সকলে আশ্বস্ত করল নিমাইকে।

নিমাই বাড়ি চলে গেল।

পরদিন ভোরে আবার নিমাইকে সকলে দেখল। একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর সে কী! বড়-জোর মধুরস্বভাব বিনম্র এক ভক্তমাত্র। কেমন আর্ত হয়ে প্রার্থনা করছে দেখ। বলছে, হে কৃষ্ণ করুণাময়, আমাকে বিষয়বাসনা থেকে উদ্ধার করো। নিজে ঈশ্বর হলে কি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে?

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা॥
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥

যদি ভববন্ধন থেকে মুক্তি চাও, যদি কৃষ্ণভক্তি পেতে চাও, বিষয়ের সংস্রব থেকে দূরে থাকো। আর যার বিষয়সম্পত্তি আছে আগে থেকে? সে কী করবে? বিষয়সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কররূপে আমি তাঁরই বিষয়ের অবধায়কমাত্র—এই বিনয় নিয়ে সে বাস করবে। যতটুকু না করলে জীবনধারণ করা যায় না, ঠিক ততটুকুই ভোগ করবে। অতিরিক্ততাই বন্ধন।

হে প্রভু, তোমার কাছে শুধু আমার এক নিবেদন, এক বিজ্ঞাপন। শোনো, অবধান করো। যা বলছি তা মিথ্যে নয়, তা পরমার্থ, তা যথার্থ সত্য। যদি আমাকে তুমি না দয়া করো, তা হলে কোথাও আর কৃপাপাত্র পাবেনা। একমাত্র পতিতই তো দয়ার পাত্র। তাকিয়ে দেখ আমার মত পতিত আর কে আছে? আমার মত দীনহীন, অধন-অধম?

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকাগ্রতঃ
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥

সত্য এক বার্তা কহোঁ—শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥

লোক শিক্ষার জন্যে যাই কেন না কর, তোমাকে আর ভুলছি না, দেখছিনা ভুল করে। তুমিই স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃতির অগোচর সর্বনিয়ন্তা আদি পুরুষ, তুমিই অন্তরহিত সর্বহন্তা কালস্বরূপ। যতই উদ্ধার করো বলে না কাঁদো তুমিই মৃত্যু-সংসারসাগরে সমুদ্ধর্তা। দৃষ্টি-দোষ ঘটলে যেমন নাট্যধর নটকে

চেনা যায়না, তেমনি দেহাভিমানে জীব তোমার নির্ণয় করতে অসমর্থ। তুমিই বাসুদেব, তুমিই নন্দগোপ-কুমার গোবিন্দ। পদ্মনাভ কমলমালী পঙ্কজনয়ন হৃষীকেশ। সম্পদে মঙ্গল নেই, কৌলীন্যে ঐশ্বর্যে বিদ্যাবত্তায় বা সৌভাগ্যমদে মত্ত হয়ে মানুষ তোমার নামোচ্চারণ করতে ভুলে যায়। তুমি অকিঞ্চনের ধন, যার কিছু নেই, কেউ নেই, তাকেই তুমি দর্শন দাও, তাকেই কৃপা কর। হে করুণাবলোকন, আমাদের দিকে তাকাও।

আর কেউ ভুল করলনা। নরদেহে ভগবান এসেছেন। তাই তো চিত্ত সুখময়, জগৎ সুখময়।

মুসলমান-সৈন্যের ভয়ে মুরারি গুপ্ত ম্লান হয়ে আছে। তাকে আশ্বস্ত করা দরকার।

শ্রীবাসের ঘরে নিমাইয়ের সামনে স্তবপাঠ হচ্ছে। বরাহ-অবতারের স্তব যেই পড়া হল অমনি নিমাই হুঙ্কার করে উঠল। দ্রুতবেগে ছুটল মুরারির বাড়ির দিকে। মুরারির বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, শূকর, শূকর! মুরারি বাড়িতে ছিল, গর্জন শুনে সচকিত হল। কোথায় শূকর, ত্রস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। মুরারিকে পিছনে ফেলে নিমাই তার পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখল সেখানে এক বৃহৎ জলপাত্র। নিমাই বরাহরূপ ধারণ করল, দাঁতে করে তুলল সেই জলপাত্র, গর্জন করতে লাগল। সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল রূপ দেখে। নিমাইয়ের হাতে পায়ে চার খুর প্রকাশিত হয়েছে আর সেই চার পায়ে হাঁটছে মাটিতে।

নিমাই বললে, 'মুরারি, কোনো ভয় নেই। আমার স্তব করো।'

মুরারি স্তব করতে লাগল।

'তুমি খুব বেদ মানো, কিন্তু বেদ অন্ধ, সে আমার তত্ত্ব কী জানে?'

'তোমার তত্ত্ব শুধু তুমিই।' বললে মুরারি, 'অনন্ত ভুবন তোমার রোমকূপে। বেদ তোমার কী করে অন্ত পাবে? অন্ত পায় না বলেই তো অন্ধ।'

'কাশীতে বেদাচার্য প্রকাশানন্দ আমার অঙ্গ খণ্ড-খণ্ড করছে। তার শুধু বেদব্যাখ্যা, সে ভক্তি মানে না, বিগ্রহ মানে না। মানে না ভক্তিই সমস্ত বেদসার।'

'তুমি তাকে জানাও।'

'জানাব। তুমিও জানো আর নির্ভয় হও। কার সৈন্য, কে বিধর্মী?' নিমাই তাকাল অভয়নেত্রে। বললে, 'আমি এবার শুবে যাই।'

বলতে বলতেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বললে, 'মুরারি, আমি এখানে কী করে এলাম?'

মুরারি স্তব্ধ।

মনে পড়ল নিমাইয়ের। 'শ্রীবাসের বাড়িতে আমি অবতারের স্তোত্র শুনছিলাম। শুনতে-শুনতে এখানে চলে এসেছি বুঝি? কোনো চাপল্য করিনি তো?'

'না, কোনো চাপল্য করোনি।' গম্ভীরস্বরে বললে শ্রীবাস।

নিমাই আবার ঘরে-ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল। 'তোমরা তো সবাই কৃষ্ণের দাস, বলে দাও আমার কিসে কৃষ্ণে মতি হবে।'

আর ভুলছি না। তোমার দুই ভাব। কখনো ভক্ত-ভাব, কখনো ভগবান-ভাব। ভক্ত-ভগবান দুইই তুমি।

হে প্রভু, আমার সমস্ত স্নেহ খণ্ডন করো যাতে আমার চিত্ত কেবল তোমাতেই নিবিষ্ট থাকে। তোমাতেই ধাবমান থাকে। নিয়ত বিপদে রাখো, তাহলেই থাকব তোমার শ্রীপদে। অবিদ্যার বশে বিষয়াভিলাষী হয়ে অনর্থক কাম্যকর্ম করে অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি, সেই যন্ত্রণা দূর করবার জন্যেই তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। তোমার চরিত্র শুনতে দাও, গান করতে দাও, নিরন্তর উচ্চারণ করতে দাও, চিন্তা করতে দাও, অন্তত অন্যের থেকে শুনে আনন্দিত হতে দাও।

যে ব্রহ্মতেজ চায় সে বেদপতি ব্রহ্মার উপাসনা করে, যে ইন্দ্রিয়ের পটুতা চায় সে ইন্দ্রের, যে সন্তান চায় সে প্রজাপতি দক্ষের, যে সৌভাগ্য চায় সে দুর্গার। যে ধনকামী সে বসুর উপাসক, যে বীর্যকামী সে রুদ্রের, যে রূপকামী সে গন্ধর্বের, যে স্বর্গকামী সে দ্বাদশ আদিত্যের। যে শত্রুর উচ্ছেদ চায় সে রাক্ষসকে ভজনা করবে, যে পদভ্রংশের নিবারণ চায় সে করবে অন্তরীক্ষকে, যে বিঘ্ননাশ চায় সে যক্ষকে, যে রাজকার্য চায় সে মনুকে, যে শুধু আয়ু চায় সে অশ্বিনীতনয়দ্বয়কে। আর যে ভক্তি চায়, ভগবদনুরাগ চায় তার অর্চনীয় শুধু বিষ্ণু।

তার অর্চনীয় তুমি। [ক্রমশঃ।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এই ভাবে মূল হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করার পক্ষে আমরা প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মূলে ছিল এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামী কেষ্টো বাবুর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি। এদেশের আইনে পুলিশের নিকট কোনও আসামীর স্বীকৃতি আদালতে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা এই মামলার প্রধান আসামীত্রয় খোকা গোপী ও কেষ্টোর ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত করে দিলে, প্রকৃত পক্ষে এই আসামী কেষ্টো বাবুর বিবৃতি অনুযায়ী আমি এই মামলার অন্যতম সাক্ষী সত্য গোয়ালা, হারু গোঁসাই, গৌরী, রুণী এবং সাধু বাবাকে খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম, এ ছাড়া কেষ্টোর বিবৃতি অনুযায়ী মেথরগলির ধোঁদল থেকে খোকার রক্তরঞ্জিত জুতা জোড়াটিও উদ্ধার করতে পেরেছি। মলিনা ও তার চালক ভৃত্যকে ঐ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র তারা বলে দিতে পেরেছিল যে ঐ জুতা জোড়ার মালিক খোকা বাবু। তাদের বিবৃতি অনুযায়ী জানা গেলো যে গত বৎসর খোকা তাদের নিয়ে পুরীধামে বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানকার একটি দোকান হতে খোকা তাদের সম্মুখেই ঐ জুতা জোড়াটি ক্রয় করেছিল। এ ছাড়া গৌরী তার বন্ধু রুণী সেওড়াফুলির ঘটনাটিও সমর্থন করে। তারা তাদের বিবৃতিতে বলে যে গৌরী গঙ্গার ধার হতে পালিয়ে সেওড়াফুলির একটি কুলটা নারীর বাড়ীতে এসে বসবাস করছিল। খোকা বাবু তাদের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে ঐখানে এসে গৌরীকে তার অবাধ্যতার জন্যে মারধর করে যায়। গৌরীর বন্ধু রুণী তাকে রক্ষা করতে এলে সে-ও খোকা কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়েছিল।

এই ভাবে সাক্ষী-সাবুত সংগ্রহ করার পর সাক্ষীদের দ্বারা আসামীদের মিছিল সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়। এই জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে পাটনা হাইকোর্টের মাধ্যমে আমরা বিহার প্রদেশের জেল হতে খোকা বাবুকে সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় কোলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আনিয়ে নিই। খোকাকে বাঙলা দেশে এনে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মত প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়েছিল। তদন্তের কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা পুলিশ হেপাজতীতে নিতে সাহসী হইনি। এর পর আসামীদের জন্য মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে আসামীদের অনুরূপ চেহারার ও বেশভূষার কয়েকজন বাহিরের ব্যক্তির সহিত একত্রে মিশিয়ে দিয়ে সাক্ষীদের একে একে সেখানে এনে তাদের সনাক্ত করতে বলা হয়ে থাকে। এইরূপ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা জেলের মধ্যে জনৈক হাকিম কর্ত্তৃক সমাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের অজ্ঞাতেই করা হয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে এই সনাক্তকরণ মিছিলের ব্যবস্থা করা হলে হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীদের একে একে এনে আসামীদের সনাক্ত করতে বলা হয়। সাক্ষী সত্য গোয়ালা এবং হারু গোঁসাই প্রতিটি আসামীকেই সনাক্ত করে বলে যে, তারা এদের সকলকেই পাগলাকে ট্যাক্সি করে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু সাক্ষী গৌরীরা কেবলমাত্র গোপী কেষ্টো ও খোকাকে সনাক্ত করে বলে যে, সে এদের অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে পাগলাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছিল। অপর দিকে সাক্ষী সাধু বাবা কেবল মাত্র খোকাকে সনাক্ত করে বলেছিল যে, সে তাকে একটি পুঁটলী ঐ রাত্রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে দেখেছে। তবে সে এ কথাও বলে যে, খোকার সঙ্গে সে একজন কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তিকে ঐ সময় দেখেছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি এদের মধ্যে এখানে আছে কি না তা সে বলতে পারবে না। অন্যান্য সাক্ষীরা আসামীদের বিশেষ পরিচিত থাকায় আমরা এইরূপ মিছিল সনাক্তকরণের জন্য তাদের হাকিমের নিকট পেশ করার কোনও প্রয়োজন মনে করিনি। এই ভাবে মূল খুনের মামলায় তদন্ত-কার্য্য শেষ করে আমরা অপর একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করলাম।

খোকার কৃপানাথ লেনের বাড়ীতে এবং তার দেওঘরের আস্তানায় আমরা প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার হীরা জহরত ও অলঙ্কার উদ্ধার করতে পেরেছিলাম, বলা বাহুল্য, এইগুলি কলিকাতা শহর ও উহার শিল্পাঞ্চলের গৃহস্থবাড়ীগুলিতে সিঁদ কেটে বা তালা ভেঙ্গে চুরি করে আনা হয়েছিল। আমরা গত পাঁচ বৎসরের চুরির মামলার নথীপত্র ঘেঁটে উহাদের ফরিয়াদীদের একে একে থানায় ডাকিয়ে এনেছিলাম। এই সময় আমরা ব্যাক্তি মিছিল সনাক্তকরণের অনুরূপ দ্রব্য মিছিল সনাক্তকরণেরও ব্যবস্থা করি। এক একটি চোরাই গহনা অনুরূপ কয়েকটি গহনার সহিত একত্রে বা পর পর টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে ফরিয়াদীদের তাদের আপন আপন অপহৃত দ্রব্য বেছে নিতে বলা হয়। কোনও একটি বহু বৎসর কেহ ব্যবহার করলে উহাতে কোনও চিহ্ন বা মার্কা না থাকলেও মালিকরা উহাকে আপন দ্রব্যরূপে সহজেই চিনে নিতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ অলঙ্কারের ওজন মেরামতি দাগ, খিঁচ খাঁচ, ভগ্নাংশ ও আকস্মিক চিহ্ন হতে ফরিয়াদীরা আপন আপন অপহৃত দ্রব্যগুলি চিনে নিতে পেরেছিল। অপহৃত দ্রব্যাদির এইরূপ সনাক্তকরণের পর আমরা খোকা বাবুর বিরুদ্ধে ১৫টি সিঁদেল চুরির মামলা নিম্ন আদালতে রুজু করতে পেরেছিলাম। কলিকাতার জনৈক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই. এস মুখার্জির আদালতে এই মামলাগুলির বিচার হয়। এই সকল মামলা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত কর্ত্তৃক খোকার এক এক বৎসর করে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বলা বাহুল্য,

যে এতোগুলি চুরির মামলা তার বিরুদ্ধে পূর্ব্বাহ্নে রুজু করার প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের ছিল তাকে বেশ কিছুকাল জেলের মধ্যে আটকা রাখা। আমরা জানতাম যে, দৈবক্রমে খুনের মামলা ফেইল করলে আমাদের জীবন সংশয় হয়ে উঠবে। এই জন্যই পূর্ব্বাহ্নে আমাদের এইরূপ এক বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে হয়েছিল। এই ভাবে খোকা বাবুকে কিছুকালের জন্য জেলে আবদ্ধ করে আমরা ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়? এমন সময় কুমরটুলীর বরেন বাবু নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিয়ে গেলো। বরেন বাবুর বিবৃতিটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

"আমি এই রকের উপর বসে পাড়ার লোকেদের খবরের কাগজ পড়ে শুনাচ্ছিলাম। এইদিন খোকা বাবুর গ্রেপ্তারের খবরটি বেশ ফলাও করে কাগজে বার হয়েছিল। হঠাৎ পাড়ার বিধু বাবু বলে উঠলো ও কি শুধু পাগলাকে খুন করেছে! গত বছর খোকা শিউচরণকেও খুন করেছিল। প্রাণের ভয়ে এতোদিন কাউকে আমি বলি নি। আমি ঐ সময় কুমরটুলীর ঐ মিষ্টির দোকানে বসে পুরী খাচ্ছিলাম। শিউচরণও আমার পাশে বসে জিলিপী খাচ্ছিল। হঠাৎ খোকা এসে শিউচরণকে ধরে তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিলে। দোকানে তখন শিউচরণ দোকানী দুজনা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। রাত তখন দশটা হবে। এই দোকানীরা দু'জন আমার ও খোকার সঙ্গে সমভাবেই পরিচিত ছিল। তাই না সে যাত্রা আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। খোকার নির্দ্দেশে দোকানী দু'জনা শিউচরণের দেহটা ধরাধরি করে তুলে রাস্তার ওপারে একটা রোয়াকের উপর রেখে দিলে। এর পর খোকা চলে গেলে তারা দোকানের মেঝের উপর বালতী বালতী জল ঢেলে রক্ত ধুয়ে ফেলতে সুরু করলে। এই অবসরে আমিও দোকান হতে সরে পড়েছিলাম।"

এই শিউচরণ হত্যার মামলাটির সময়ও আমি এই থানাতে বহাল ছিলাম। খুনের সংবাদ পেয়ে উর্দ্ধতন অফসারদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ দোকানের নীচে ড্রেণের মধ্যে আমি লাল রক্তের জল দেখতে পাই। উহা কাচের গ্লাসে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠাবার জন্য আমি প্রস্তাবও করি। কিন্তু ঐ দোকানের দোকানীরা উহা পানের পিচ বলে প্রমাণ করায় উর্দ্ধতন অফসাররা উহাই বিশ্বাস করে গেল। ইন্সেপেক্টার সুনীল রায় এইবার বিশেষ সূত্রটির সাহায্যে সাক্ষীসাবুত সংগ্রহ করে এই মামলাটিরও কিনারা করতে সক্ষম হন। এই মামলায় ঐ সংবাদপত্রটি একটি বিশেষ প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। এর পর আমরা তদন্তকার্য্য সমাধা করে এই দুইটি খুনের মামলাতেই খোকা বাবু ও অন্যান্য আসামীদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে সোপর্দ্দ করি। কিন্তু ইন্সেপেক্টার সুনীল বাবু তদন্তকার্য্যে এইখানেই ক্ষান্ত দেননি। তিনি এই মামলার ব্যাপারে খোকা বাবুর ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও অনেক খোঁজ খবর করেন। এই সকল তদন্তে জানা যায় যে খোকা বাবু বহু অনাথা বিধবাদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছে। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যার বিবাহে অর্থসাহায্যও করেছে। এই সময় একটি চমকপ্রদ ঘটনাও আমাদের গোচরে আসে, কোনও একটি ব্যারিষ্টারপত্নীকে সে প্রস্তাব করে যে, তিনি তাঁর হাতের সম্মুখ ভাগে উল্কি দ্বারা 'প্রাণের খোকা' বাক্য দুইটি লিখে রাখতে রাজী হলে সে তাদের নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যারিষ্টার-দম্পতি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে ঐ টাকা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ বহু বাহাদুরী বা ব্রাভাডো সূচক কার্য্য তার দ্বারা হামেসাই সমাধা হয়েছে। খোকা বাবু তার সাকরেদদের নগরীর বেশ্যানারীদের উপর কখনও অত্যাচার করতে দেয় নি। এই ব্যাপারে সে তার লোকেদের নিবৃত্তি করে উপদেশ দিয়ে বলতো 'ওরে তোরা ওদের উপর উৎপীড়ন করিস নি। এক স্থান হতে অপর স্থানে পুলিশের লোক যখন আমাদের হন্তে কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তখন ওরাই আমাদের আশ্রয় দেয়, আহার্য্য দেয় আর সেই সঙ্গে দেয় একজন সাময়িক স্ত্রী। এরা না থাকলে আমাদের অপরাধী জীবনের কোনও মূল্যই যে থাকবে না।' কিন্তু এদের উপর খোকা সহৃদয়তা প্রকাশ করলেও যে এদের ধনী নাগরদের উৎপীড়ন করে অপ্রত্যক্ষ ভাবে এদের যে ক্ষতি করেছে এই জন্য খোকা বাবুর ধরা পড়ার সংবাদ খবরের কাগজে বার হওয়ার পর এই সকল হতভাগিনী রূপজীবিনীরা দলে দলে তাদের এই উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এগিয়ে এসেছিল।

এর পর আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হলো সাক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদালতে সুষ্ঠু ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পরিবেশন করা, এজন্য দিবা-রাত্র আমাদের সকলকেই বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শিউচরণ হত্যা মামলায় তবু একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে খোকা বাবুর সহকারী হিসাবে দোকানী দুজনাকেও চালান দেওয়ায় আমাদের মাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর দিকে পাগলা হত্যার মামলায় খুন সম্পর্কে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শীও আমরা উপস্থিত করতে পারিনি। এই বিখ্যাত দুরূহ খুনের মামলাটি প্রমাণ করার জন্যে আমাদের একান্ত ভাবে পরিবৈশিক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। খুন কেহ কাহাকেও করতে দেখেনি অথচ আদালতে এই সকল ধৃত আসামীরাই যে পাগলাকে খুন করেছে, তা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করতে হবে। এমন বহু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে, যার একক অবস্থিতির কোনও মূল্য নেই। কিন্তু উহারা একত্রে পরিবেশিত হলে উহার মূল্য হয়ে উঠে অসাধারণ। কোনও ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু ঘটনাসম্ভূত পরিবেশ মিথ্যা বলে না, এই পরিবৈশিক প্রমাণের সঙ্গে একটি তারের জালের সহিত তুলনা করা চলে। এই তারের জাল কারও উপর নিক্ষেপ করলে যদি উহার ফোকরগুলি বৃহদাকার হয়, তাহলে সে ঐ ফোকরের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঐ ফোকরগুলি ক্ষুদ্রায়তন হলে সে উহার মধ্য হতে বার হতে পারবে না। তখন তাকে ঐ জালের কোনও এক দুর্ব্বল অংশ ছিঁড়ে বার হতে হবে। কিন্তু যখন সে-জাল ছিঁড়তে পারে না কিংবা উহার ফোকর দিয়েও বার হতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় বেড়াজাল।

এইরূপ এক বেড়াজালের সঙ্গে পরিবৈশিক প্রমাণের তুলনা করা হয়ে থাকে। কয়েকটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্রিত করলে উহার সাহায্যে বহু সিদ্ধান্তে আসা যায়।

কিন্তু উহাদের সমাবেশ দ্বারা একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে উহাকে প্রমাণ বলা যায় না। এই অবস্থায় অপরাধীর অপরাধে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং এই জন্য তারা অতি সহজেই মুক্তি পেতে পারে। তবে যদি এই সকল ঘটনার সমাবেশ দ্বারা মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়, তাহা হলে উহা অকাট্য প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এইরূপ অকাট্য প্রমাণসমূহ আদালতে সুষ্ঠুরূপে পরিবেশন করতে পেরেছিলাম। এর ফলে এই দুইটি মামলাতেই আসামীরা হাইকোর্টের দায়রার বিচারের জন্য নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। হাইকোর্টে বিচারের সময় আমাদের খোকা বাবুর দয়িতা মলিনাকে নিয়ে এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মলিনা খোকার বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সহিত সাক্ষী দিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে থাকে। তা ছাড়া আমরা সংবাদ পাই যে খোকাকে আদালতে ডিফেণ্ড করার জন্যে সে নিজব্যয়ে অতিরিক্ত আইনজীবী নিয়োগ করার জন্য গোপনে চেষ্টা করছে। মলিনাসুন্দরীর এইরূপ বিপরীতমুখী দুই প্রকার ব্যবহার আমাকে কম আশ্চর্য্যান্বিত করে নি। আমি এই ব্যাপারে মলিনাকে একবার চ্যালেঞ্জ করবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সুনীল বাবু আমাকে তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপারে নিরস্ত করে বলেছিলেন —ভুলেও এমন কাজ তুমি করো না। নারীর মন হচ্ছে আজও পর্য্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। এখোনও পর্য্যন্ত এই মামলার শুনানী শেষ হয় নি। তুমি এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তখুনি হিষ্টিরিক হয়ে উঠে আমাদের এই মামলা মাটি করে দেবে।

এই মামলা বাংলাদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল ষ্ট্যান্ডিং কাউনসিল শ্রী এস, এম, বাসু সলিসিটার শ্রী এস, চৌধুরীর সহায়তায় অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছিলেন। এই জন্য তাঁদের প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাইকোর্টে এই মামলার শুনানীর সময় আমাদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

খোকা বাবু আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও আইনজীবীকে নিয়োগ করে নি। কিন্তু এ দেশে দায়রার বিচারে আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে অপারগ হলে সরকার বাহাদুরই নিজ ব্যয়ে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য যে, খোকা বাবু এবং অন্যান্য আসামীদের সমর্থনের জন্য সরকার বাহাদুর কয়েকজন সুদক্ষ ব্যারিষ্টারদের নিয়োগ করেছিলেন। এরা বারে বারে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে সন্তু গোয়ালা, হারু গোঁসাই ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিল পুলিশের না কি সাজানো সাক্ষী। কিন্তু সকলেই জানে যে ভারতীয় পুলিশ খুনের মামলায় এইরূপ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় কখনও নেয় নি। খুন সম্পর্কে মূল ধারার সহিত খুনের জন্য ষড়যন্ত্রের ধারাটিও সংযুক্ত ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে আসামী ভূপেন, কালী, সুবল ও নিতাই এই ষড়যন্ত্রের ধারায় অভিযুক্ত হবে। কিন্তু জজ সাহেব জুরীদের চার্জ বুঝাবার সময় একটি বিশেষ প্রশ্ন তুললেন। প্রকৃতপক্ষে কোনখানে খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গার ধারে এসে গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে খোকা বলেছিল—পাগলাকে আমরা ট্র্যাপ করবার

জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। ট্রাপ অর্থ যে ছুরী মারা তা প্রমাণিত হয়েছে। জজসাহেবের মতে এইখান হতেই খুনের জন্য ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এই সময় পর্য্যন্ত সুবল, কালী, নিতাই, ও ভূপেন উপস্থিত না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ টেকে নি। ডিফেন্স কাউন্সিলারের মতে এর আগে পর্য্যন্ত পাগলাকে যে গোপী কেষ্টো ও খোকা খুন করবে তা তাদের জানবার কথা নয়।

যাই হোক, পাগলা হত্যার মামলায় বিচারে খালাস পাওয়ার সম্ভাবনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। এইজন্য অবশ্য আমাদের কোনও দুঃখিত হওয়ার কারণ ছিল না, এর কারণ সাক্ষাৎভাবে এই খুনের জন্য তারা দায়ী ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা মূল হত্যাকাণ্ড এবং উহার জন্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধ মূল হত্যাকারী খোকা, কেষ্টো ও গোপীর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ রূপেই প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। তবে শিউচরণ হত্যার মামলাটি আমরা সম্যকরূপে প্রমাণ করতে বোধ হয় পারিনি। জজ ও জুরীর বিচারে খোকা বাবুসহ শিউচরণ হত্যার মামলায় সকলে আসামী সন্দেহাবকাশে খালাস পেয়েছিল। অপর দিকে অনুরূপ কারণে পাগলা হত্যার মামলায় সুবল কালী, ভূপেন ও নিতাইকেও আদালত মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু পাগলা হত্যার মামলায় জজ ও জুরীর বিচারে খোকা, গোপী ও কেষ্টো খুনের জন্য এবং ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। আসামী গোপী ও কেষ্টোকে জজ সাহেবের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তাঁরা খোকাকে মূল হত্যাকারিরূপে বিবেচনা করে তার ফাঁসীর জন্য আদেশ প্রদান করেন। ফাঁসীর দণ্ডাদেশ খোকা বাবুকে শুনানো হলে সে স্থির ভাবে উক্ত দণ্ডাদেশ শ্রবণ করে বারেক জজ সাহেব [মিঃ খোন্দকার] এবং বারেক জুরী মহোদয়দের দিকে চেয়ে তাদের অভিবাদন জানিয়ে নীচের হাজতঘরে সার্জ্জেণ্টদের প্রহরায় প্রফুল্লচিত্তে নেমে আসে। এই সময় একজন ডিফেন্স কাউন্সিলার তার সঙ্গে দেখা করলে খোকা তাকে আমাকে সেখানে ডেকে আনবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ঐ আইনজীবী মহোদয় মারফৎ তাকে এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানালে সে বলে উঠেছিল—ঘোষাল মশাইকে বলবেন যে চিরদিন আমি কারাগারের চারিটি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবো না। তাঁকে বলবেন, শীঘ্রই আমার ফাঁসীকাষ্ঠে আমার জীবন অবসান হবে। তিনি তাহলে যেন আমার আত্মার সঙ্গে মুলাকাৎ করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এর পর স্বভাবতঃই ভীত হয়ে আমি মাত্র একবার তার সঙ্গে হাজতঘরে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখে খোকা বাবু অট্টহাস্য করে বলে উঠেছিল—ওঃ আপনি এতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীত ? ছিঃ! আমি আপনাকে আমার মত একজন বীর পুরুষ ভেবেছিলাম। আজকে আমার মন প্রকৃতিস্থ নয়। দয়া করে কাল পরশু একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি কথা আছে।

আমি কিন্তু নানা কারণে খোকার এই বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করে তার সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। এর পর ৩১ তারিখ জুলাই মাসে ১১৩৭ সালে সকাল ছয়টার সময় স্নানাহার সেরে খোকা পরিষ্কার কাপড় জামা পরে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সেন্ট ও কিছু ফুল তার শেষ ইচ্ছাস্বরূপ যাচ্ঞা করে। এই ফুল দিয়ে নিজে হাতে মালা গেঁথে সে তা পরে সারা গায়ে পুরানো অভ্যাস মত সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে বলে উঠে—'এইবার নিয়ে চলো আমাকে। আমি প্রস্তুত।' তৎকালীন আলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফসার শ্রীহেমন্ত গুপ্ত (পরে ইনি এসিসটেণ্ট কমিশনার হয়েছিলেন) এই সময় ফাঁসীমঞ্চের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এঁর কাছে খোকা বাবু আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবরও করেছিল। এর একটু পরে সহাস্য মুখে খোকা বাবু ফাঁসীকাষ্ঠে উঠে তার শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই বিখ্যাত মামলায় ডাইরীর ওজন ছিল সাত সের। এই মামলায় আদালতে ৬১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে এবং ১৩২টি প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibits) প্রদর্শিত হয়। একত্রিশ দিন ধরে এই মামলার শুনানী হাইকোর্টে হয়েছিল। খোকা বাবু আজ আর নেই। সুন্দরী মলিনাও কিছুকাল হলো গত হয়েছে। যে গলিটাতে পাগলাকে হত্যা করা হয়েছিল জনসাধারণ আজ আদর করে তার নাম দিয়েছে গলাকাটা গলি।

এর বহু বৎসর পরে দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের পর আমি ক্রিমিন্যাল হেরিডিটি সম্বন্ধে গবেষণা করার ছুটি নিয়ে কিছুদিন আন্দামানে অবস্থান করেছিলাম। এই সময় আমি দ্বীপান্তরিত আসামীদ্বয়ের খোঁজখবর করি। এদের একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। জাপানী অধিকারের সময় হতে সে নিখোঁজ আছে। কিন্তু অপর জনের আমি সন্ধান পেয়েছিলাম। সে সেখানে বিবাহাদি করে একটি দোকানের মালিক হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে একটি খুনের মামলায় তার দ্বীপান্তর হয়েছিল এবং তদবধি সে এখানে সুখেই আছে। আমিও শুনলাম যে এখানে এসে সে আর কোনও অপরাধ করে নি। কিন্তু ১৪ বৎসর পর আমাকে দেখে সে একেবারেই চিনতে পারে নি। আমিও যে তার এখানে আসার জন্য দায়ী, তা তাকে আমি না বলেই তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু খোকা বাবুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তার চোখ দিয়ে অলক্ষ্যে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই জল কেন সে ফেললো, কার জন্যে সে ফেললো, তা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হই নি।

[ক্রমশঃ।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি মুখের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হইল।
আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
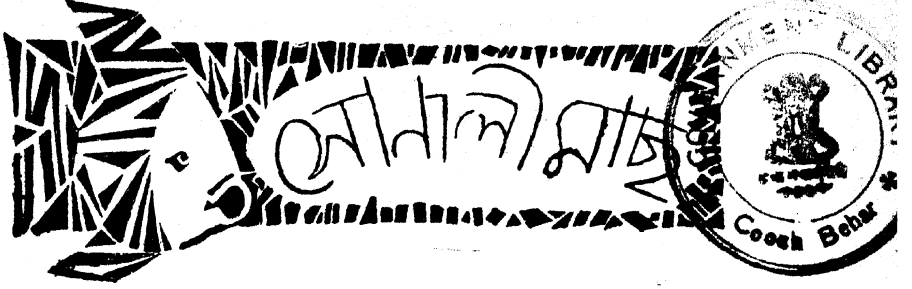
বিজন ভট্টাচার্য

শুক্লা মাঘী পূর্ণিমার রা ত। আকাশে চন্দ্রসভা। স্বর্গ সে দিন মর্ত্তে নেমেছিল।

আকাশে যে তারারা কোনদিন ফোটে না, সেই তারারাও বুঝি সেদিন ছুটোপাটি ভিড় ক'রে এসেছিল শাঁখ আর খেলকুঁড়ির মালা হাতে ক'রে, ছোটখাটো সাজাগোজা ফুটফুটে মেয়েরা যেমন। সে রাত্রি ছিল অনন্যাসুন্দরী এক রাত্রি, যে রাত্রিতে বিয়ে হ'য়েছিল সতীর সত্যব্রতর সঙ্গে।

শুভলগ্নের সময় সত্যব্রতকে মনে হয়েছিল সতীর রূপকথার এক রাজপুত্রের মত, বিপক্ষ অন্য সব প্রতিযোগী রাজকুমারদের পরাহত ক'রে তাকে জয় ক'রে নিতে এসেছে। তাই মালা বদলের সময় একটুও হাত কাঁপেনি সতীর। শুভদৃষ্টির সময় একটি নম্রনেত্রপাতেও আড়াল করেনি নিজেকে প্রিয় চোখ থেকে। নিলাজ হাসি হাসি মুখ করে শুধু নিরীক্ষণ করেছে সত্যব্রতকে। কিন্তু বিদেহী সে রাজার কুমার ছিল প্রেমময়ী সুকুমারী সতীর একান্তই মানস কল্পনা। কল্পলোকের ক্ষীরসমুদ্রে জন্ম নিয়েছিল সে। রক্তমাংসের সত্যব্রতর সঙ্গে তার কিছু মাত্র মিল ছিল না। সতীর চোখে তখন পৃথিবী সুন্দর। তুচ্ছ খড়কুটোকাটাতেও সোনা-দানার ব্যঞ্জনা। তাই সত্যব্রত হ'লো কৃষ্ণসমান। পতঙ্গ পুড়ে মরেছিল আগুনে সেই দিন।

বিয়ে হয়েছিল আট বছর আগে। যাত্রাকলস, যৌছত্র আর পথলতার আলপনার ওপর চিত্তির করা পিঁড়িতে মুখোমুখি বসে। অগ্নিসাক্ষী আছে। অশান্ত হৃদয় সতীর ফুলে ফুলে উঠেছিল সেদিন সমুদ্রের মত, চাঁদ পাবে ব'লে। সুনিবিড় সোয়াস্তির সুখকর এক প্রশান্তিতে টৈটম্বুর হ'য়েছিল মন-প্রাণ। সারারাত চোখ খুলে সতী দেখেছিল সত্যব্রতকে বিমুগ্ধা হরিণীর মত। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারার ঝলকানি দেখেছিল সতী সেই দিন সেই প্রিয় মুখে। সত্যি মিথ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেদিন সতীর মনে।

এ তো গেল পরম লগ্নের সেই রূপকথার রাতের কথা। সেই রাত সতীর জীবনে দুবার আসবে না। কিন্তু তারও আগে, পূর্ব্বরাগের অনুরাগে রাঙা দু দুটি বছর কেটে গিয়েছে সতীর জীবনে। দীর্ঘ সেই অবকাশেও সতী ঠিক চিনে নিতে পারেনি সত্যব্রতকে।

পিপাসিত প্রাণ-মন আর বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস নিয়ে কোন কিছুরই সত্যি-মিথ্যে যাচাই হয় না চোখে। প্রত্যাশা করে বসে আছে যে জন, তার চোখে আকাঙ্খিত বস্তু তখন দোষ-ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েই নয়নাভিরাম। ফাঁদ পেতে যে পাখীটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে ফেলা হয়েছে খাঁচায়, তার অনেক আগেই সেই খাঁচার [illegible] কয়বার ছলে বন্দিজীবন যাপান ক'রছে আর একটা পাখী। সতীরও যেন হলো তাই। কি মানুষ, কেমন মানুষ সত্যব্রত, একথা ভুলতে তার মনে হলো না একটিবার। কৃষ্ণ কালো তো সত্যব্রতও কালো। ভালবাসা তখন নীলাঞ্জন পরিয়েছে সতীর চোখে। কোন দোষ নেই সত্যব্রতর। চরিত্রের ব্যতিক্রমগুলোকে পর্য্যন্ত অসাধারণ কোন কিছু বলে মনে হলো তার। বিচ্যুতিগুলোকে দেখালো যেন আলোছায়ার বিপরীত সম্পাত। মানুষ হিসেবে সত্যব্রতর গৌরব বাড়াবার জন্যেই ছবিতে যেমন মাঝে মাঝে কালোর ছোপ। আশ্চর্য্য!

আসলে এই ছিল শুভক্ষণ। জীবনের যে সন্ধিক্ষণে পৃথিবী সুন্দর, সব সুন্দর, সতীর জীবনে সত্যব্রত এসেছিল সেই মহাক্ষণে। এসেছিল ঢেউতোলা জলে চলকানো চাঁদের মত ভাঙতে ভাঙতে, রসমাধুরী ছড়িয়ে। তা ছাড়া আরও কারণ ছিল খুশী হয়ে সুখী হবার সতীর।

* * *

সতীর বাবা শিল্পপতি অন্নদা বাবুর সংসারে লক্ষ্মীর কৃপা ছিল অবচ্ছল। মাস গেলে প্রভূত অর্থের উপার্জ্জন ছিল অন্নদা বাবুর। সওদাগরের সব ক'খানা নৌকোই মনে হয় ভেসে উঠেছিল তাঁর ব্যবসায়িক কল্যাণে। জিনিষপত্রে ছড়াছড়ি সংসার। চালো আর খাও। কোন অভাব নেই।

স্বজনবর্গ বন্ধুজনের আনাগোনা আর অতিথি আপ্যায়নে অন্নদা বাবুর মনোহরপুকুরের বাড়ী ছিল সর্ব্বদা কলহাস্যমুখর। চেনা-অচেনার বালাই নেই। গেট পেরিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেই দুটি রাজভোগ সন্দেশের বাঁধা বরাদ্দ। অন্নদা বাবুর চালাও অর্ডার। নেপথ্যে ছিল কমলকামিনী দেবীর সদাজাগ্রত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি, কে এলো, কে গেলো ; কে খেলো, কে না খেলো ;—নিজের চোখে সব দেখাশুনো করতেন অন্নদা বাবুর স্ত্রী।

নৈষ্ঠিক বারব্রত আচার-অনুষ্ঠানের ঘটা ছিল না বাড়ীতে একেবারেই। কিন্তু মাসের মধ্যে চার ছ' বার সামাজিক বৈঠক আর মজলিসের রেওয়াজ ছিল বরাবরই।

পাতিয়ালা থেকে এসেছেন ওস্তাদ আমীর আলি খাঁ সাহেব, আজ সরোদ বাজিয়ে শোনাবেন ; এক্সপ্রেশনিষ্ট স্কুলের চিত্রী নগেন পাল, ভাল ছবি এঁকেও খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে, কাল তার ছবির এক্সিবিশন ;—ফরাসী টুরিষ্ট পল আঁদ্রে কলকাতায় থাকবেন দু-তিন দিন, পরশু সে তার পায়দলে আফ্রিকা পরিক্রমার কাহিনী বর্ণনা করবে,—সর্ব্বভারতীয় কবি-সম্মেলনের দুজন বিখ্যাত উর্দ্দু কবি ডেলিগেট হয়ে এসেছেন, মুশায়েরা গেয়ে শোনাবেন সামনের সপ্তাহে,

এ লেগেই থাকতো। তাছাড়া ছোটখাটো জলসা, সামাজিক ও রাজনীতিক বৈঠক, ইলেকশন মিটিং, এ তো ছিল প্রাত্যহিক কর্মসূচী। অন্নদা বাবু কিন্তু দল ও মতের অনেক ঊর্দ্ধে। সবার ওপর তাঁর সমান দৃষ্টি। আমীর ওমরাহী মেজাজের মানুষ অন্নদা বাবু তাঁর নিজস্ব মতামতটি জিজ্ঞেসা করলে হেসে বলতেন, প্রত্যেক ভাল, সব ভাল। এখন বাড়বার সময়। বেড়ে যাও। কাজ করে যাও, কাজ।

অন্নদা বাবুর এক ছেলে, এক মেয়ে। বড় শুভময়, বিলেত থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে প্রসিদ্ধি পেয়ে মেম বিয়ে করে সবে দেশে ফিরেছে। বেলঘরিয়া বাগানবাড়ীতে সে আলাদা থাকে। মাঝখানে আট বছরের ব্যবধানে শেষ সন্তান এই সতী। মেয়েকে অন্নদা বাবু প্রাণাধিক ভালবাসেন।

ছেলের সম্পর্কে বলা চলে, খানিকটা নিরাশ হয়েছেন অন্নদা বাবু। উদারপন্থী ঠিকই, কিন্তু তার খেয়ালেতে যে তাঁকে একদিন এক মেমসাহেবকে পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করে নিতে হবে, এ কথা তিনি কল্পনাও করেন নি। স্ত্রী কমলকামিনী তো প্রথমটা একটু ভেঙেই পড়েছিলেন। খাবেন না, ছোঁবেন না। কিন্তু পরে শুভময়ের স্ত্রী বারবারার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সে মনোবেদনার অনেকখানি উপশম হয় তাঁর। বারবারা বলে, শুভময়কে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি। অর্থের লোভে আকৃষ্ট হয়ে যে সব মেয়েরা অর্থবান পিতার একমাত্র সন্তানকে দু'দিনের জন্যে বিয়ে করে ঘরসংসারী হয়, অথচ পরে তার সর্ব্বস্ব হরণ করে আগেকার ভালবাসার জনের কাছে ফিরে চলে যায়, বারবারা আদৌ তাদের দলে নয়। জন্মভূমি ল্যাঙ্কাশায়ার হলেও কলকাতার ওপর তার ভালবাসা অপরিসীম। শুভময়ের কাছে গল্প শুনে শুনে সে এই মনোহরপুকুরের বাড়ীটাকে যে কতদিন স্বপ্নে দেখেছে! শুভময়ের বিয়ে করে সুখী হবার প্রতিশ্রুতি হিসেবে বারবারা আরও বলে যে, সে তার পৈতৃকসূত্রে পাওয়া দশ হাজার পাউণ্ড-এর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ইতিমধ্যেই শুভময়ের নামে হস্তান্তর করেছে। এবং সেই অর্থ অন্নদা বাবু যে কোন সময় তাঁর বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অন্নদা বাবু যেন জানেন, শুভময় ছাড়া অন্য গতি নেই বারবারার।

দেখে শুনে পরখ করে অন্নদা বাবুর অপ্রসন্ন মন পরে অনেকটা প্রসন্ন হয়েছিল শুভময় সম্পর্কে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মেয়ে সতীর সম্পর্কে বেশ খানিকটা সতর্কও হয়ে যান। তাই সতী যখন এই ঘটনার অনেক পরে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাশ করলো, তখন অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও মেয়েকে তিনি কিছুতেই বিলেত যেতে দিলেন না। তার বিনিময়ে মেয়েকে দিলেন যথেচ্ছ প্রশ্রয় আর অবাধ অধিকার। যা খুশী তাই পড়, যেখানে খুশী সেখানে যাও। নিজে প্রেম করে বিয়ে করে সুখী হতে চাও তো তাই হও। তাতেও আপত্তি করবেন না অন্নদা বাবু। কিন্তু দেশ-ঘর ছেড়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভূঁইএ যেতে পারবে না কখনও। অন্নদা বাবুর কঠিন শাসনে প্রথমটা খুবই দুঃখিত হয়েছিল সতী। কিন্তু দাদা শুভময়ের হঠকারিতার দরুণ তার যুক্তির ধার তখন ভোঁতা হয়ে গেছে। খুব একটা পীড়াপীড়ি করতে চাইলো না মন। বিলেত যাবার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল এইভাবে একেবারেই।

আলীপুরের বাড়ী অন্ধকার করে বান্ধবী নন্দিতা চলে গেল জার্ণালিজম পড়তে লণ্ডন। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে আর্টিষ্ট হাউসে মাত্র একটা একজিবিশান করেই রাণু গুপ্ত চললো ফ্রান্স। লণ্ডনের আর্ট গ্যালারী ফ্রান্সের লুভর ইতালীর সিষ্টাইন চ্যাপেল, সব দেখে শুনে কথা দিয়ে গেল, চিঠি লিখবে সে সতীকে প্যারী থেকে। ফরাসী কনস্যুলেটে ধরাধরি করে কেমন সুন্দর একটি চাকরীও নিয়ে চলে গেল অনিন্দিতা গুহ। এরোড্রোমে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে গিয়ে ছল-ছল করে উঠেছিল সতীর চোখ জং-ভীর বেলাতেও। সবাই চলে গেল যার যেথা ঠাঁই। পড়ে রইল শুধু সতী একা।

অশান্ত দিন। আরও অশান্ত মন। পিপাসা আছে অথচ নিবৃত্তি নেই এক ফোঁটা। মনোহরপুকুরের বাড়ীর চৌহদ্দির ভেতরে পড়ে ছটফট করতে লাগলো সতী সর্ব্বরিক্তের মতো।

এ দিকে অন্নদা বাবুর মনোহরপুকুরের বাড়ীতে আর্ট একজিবিশান হয়, জলসা গানের মুসায়েরা বসে, বিদেশী প্রাণিতত্ত্ববিদ এসে স্লাইড লেকচার দিয়ে যান সুধী জনসভায়। সতীর ভাল লাগে না কিছুতেই।

কোন কিছুতে মন বসে না, ভাল লাগে না সতীর একেবারেই। এ বাড়ীর অনেক কিছুই তার কাছে বিসদৃশ মনে হয়। মনে হয়, সবটাই কেমন যেন সাজানো-গুছোনো। বৈচিত্র্য হয়তো আছে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্য এখানে কোনদিনই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে ওঠে না। পূর্ব্বকল্পিত নির্ঘণ্টের ধরাবাঁধা ছাঁচে ঢালাই হয়ে ঘুরে ঘুরে আসে। আকাশের নীলিমায় সপ্তডিঙ্গার মত ভাসমান খণ্ড মেঘের হঠাৎ পিঙ্গল থেকে রাগরক্ত রূপান্তরের চমক নেই এখানে কোনখানে। আছে শুধু প্রাণান্তিক একটা ব্যালান্সের বাহাদুরী,—দেওয়ালের রংএ ক্যালেণ্ডারের রং মিলিয়ে; কাঠের একটা অসংস্কৃত গুঁড়ির ওপর টেরাকোটা ছাঁদের কতকগুলো বাঁকুড়ার বেনেপুতুল সাজিয়ে।

দেখে-শুনে এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে সতীর মন। মনে হয়, বেতালা বেসুরো হঠাৎ একটা চীৎকার করে খান্ খান্ করে ভেঙে দেয় মনোহরপুকুরের বাড়ীর জমাট প্রশান্তি। প্রচলিত নিয়ম-কানুনের বাইরে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে পর পর কয়েকটা বিসদৃশ আচরণ করে চিন্তায় ফেলে দেয় সবাইকে।

কিন্তু এসব কথা সতী মনে মনেই ভাবে। কার্য্যত কিছুই করতে পারে না। কারণ, ব্যতিক্রম কোন কিছু হলে সতী নিশ্চিত জানে, হাজারটা চোখ শুধু তার দিকে অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে। গর্হিত কিছু একটা যেন করে ফেলেছে সতী। সে আরও অসহ্য।

দিন চলে গড়িয়ে গড়িয়ে। সময়ের কোন বহতা নেই যেন।

মেয়ের ভাবসাব দেখে মা কমলকামিনী বলেন, হ্যাঁ রে, কষ্ট করে পিয়ানোটা শিখলি, বাজালেও তো পারিস মাঝে মাঝে।

ভাল কথা মনে করিয়ে দেন যেন কমলকামিনী। সত্যি পিয়ানো সে অনেক দিন বাজায়নি। সেদিন ঝড় তোলে সতী পিয়ানোতে। সাদা-কালো রীডগুলোর ওপর দিয়ে সতীর আঙুলগুলো পাহাড়ী ঝর্ণার মত লাফিয়ে চলে সুরবন্যায় তুলে। গোটা স্বরলিপিটাকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো করে সে ছড়িয়ে দেয় জড়োয়ার দানার মত।

একটানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি এক ঘণ্টা বাজাবার পর যখন

ক্লান্ত হয়ে পড়ে সতী, তখন শান্তি আসে মনে তার কিছুটা। ইতিমধ্যে বিশ্বতোষ এসে যে কখন বসেছে ঘরে, তারপর বাজনা শেষ হতে উঠে চলে গেছে চুপিসাড়ে, সতী তা টেরও পায় না এতটুকু।

একটু পরেই ঘরে ঢোকেন কমলকামিনী। বলেন, বিশ্বতোষ এসেছিল, হঠাৎ বাজনা থামতেই উঠে চলে গেল তাড়াতাড়ি, কিছু বলে গেছে তোকে যাবার সময়?

হতবাক হয় সতী। হেসে বলে, বাজনা শোনবার শুনে গেলেন একটুখানি। আমাকে আর কি বলে যাবেন মা!

কমলকামিনী খুশী হন না মেয়ের কথায়। একটু অনুযোগের সুরে বলেন, বললেও তো পারতিস দুটো কথা। অত-বড় একটা মানী লোকের ছেলে। বাবু পর্যন্ত কত খাতির করে কথা বলেন।

মা যে কোন সূত্রে কি কথা বলতে চান, সতী তার খানিকটা আন্দাজ করেই চুপ করে থাকে। যেন কিছুই শোনে নি, কিছুই বোঝে নি, এমনি ভাব দেখিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বাবার কারখানার ছ'আনার অংশীদার বিশ্বতোষকে পরিতুষ্ট করবার মধ্যে তার যে কি জাগতিক মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি আছে, সতী তা কিছুতেই বুঝতে চায় না। কমলকামিনীকে সে খুশী করবে কি করে? খুশী করতে হলে কমলকামিনীর মনের ছাঁচে নিজের মনটাকে ঢালাই করে পানীয়ের মত করে বিশ্বতোষকে পান করাতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব সতীর পক্ষে।

সেদিনের অনুষ্ঠানটা ছিল একটু বিশেষ ধরণের। দাক্ষিণাত্যের দুই কিন্নর, গোপালকৃষ্ণণ আর মারুতি সুব্রহ্মণ্যম নাচবেন কথাকলি। শুরুতে বীণ বাজিয়ে শোনাবেন শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার।

পূর্বাহ্ণেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সুধীজনে। কার্ড ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে খানদানী বংশের বিত্তশালী রাজরাজড়া ছাড়াও আছেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার হরিদাস ঠাকুর। বড় কমলাপুরের সেনী ঘরাণার শেষ উত্তরাধিকার ওস্তাদ আবদুলগণি সাহেব। আর মণিপুরের মুকুটমণি নৃত্যবিশারদ শ্রীগিরিধারীলাল।

বারবারাও সেদিন বাঙ্গালীমতে খুব সাজগোজ করে এসেছে। দামী লাল সিল্ক শাড়ী আর কালো ব্লাউজে মানিয়েছে তাকে স্বপ্নে দেখা এক রাজকন্যার মত। দিশীমতে সামাজিক হবার প্রচেষ্টায় টুকটুকে দুখানা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে চেনা অচেনা যাকে তাকে নির্বিচারে নমস্কার করছে। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভে অতিমাত্রিক এই আপ্যায়নের ব্যাপারটাও কারো চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকছে না।

সব চেয়ে নজরে পড়ছে বিশ্বতোষকে। ঢিলে পাঞ্জাবী আর চিপা যোধপুরীতে তাকে দেখাচ্ছে এক জোয়ান পাঠানের মত। আসছে যাচ্ছে, খবরদারী করছে, এমন একটা স্বচ্ছন্দ নিয়ে—যেন এটা তার নিজের বাড়ী, নিজেরই দায়। সব চাইতে ভাল লাগছে তাকে যখন ঐ পরুষ দেহটাকে সৌজন্যের খাতিরে আভূমি নুইয়ে ভিড়ের ভেতর চলতে চলতে সে একটু পথ চাইছে হাত বাড়িয়ে। যেন কোন দিগ্বিজয়ী রাজা অভ্যাস নেই, তবু হাত পেতে ভিক্ষে চাইছেন। সবার নজর বিশ্বতোষের ওপর। নজর নেই শুধু সতীর একার। সে দেখছে সত্যব্রতকে। পোষাক-পরিচ্ছদে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। শুধু খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী। অথচ মানিয়েছে যেন পূর্ণেন্দুর সজ্জায়। শুভময়ই আলাপ করিয়ে দেয় সতীকে ডেকে।

: তোমার সঙ্গে আলাপ নেই সতী? আমাদের বন্ধু, সত্যব্রত সেন। আর…

শুভময়ের মুখের কথা কেড়ে নেয় সত্যব্রত। বলে, জানি, সতী।

অবাক হয় সতী। বলে, আপনি আমাকে চেনেন?

সত্যব্রত হাসে। বলে, ঠিক চিনি বললে ভুল বলা হবে। তবে নাম জানাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তারপর বলুন আপনার বাজনা কেমন হচ্ছে?

সতীর চোখে বিস্ময়। যে মানুষটাকে সে কখনও দেখে নি, কখনও চেনে নি, সে তার এত কথা জানলে কি করে?

শুভময়ই রহস্যটাকে ভেঙে দেয় এতক্ষণে। সতীকে বলে, সেই যে তুমি মিউজিক করেসপণ্ডেন্ট 'স্পার্ক'কে চিঠি লিখেছিলে ক'খানা আমি বিলেতে থাকতে, ইনিই হচ্ছেন সেই স্পার্ক।

আপনিই সেই স্পার্ক? সতীর চোখে ততোধিক বিস্ময়।

সত্যব্রত হেসে বলে, হ্যাঁ মানুষটা অবিশ্যি একই, তবে মাইনাস দি স্পার্ক। চমকটা নামেই ছিল। আপনার সে চিঠিগুলি কিন্তু আমি এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছি। নোটেশনগুলো যা পাঠিয়েছিলাম আপনার কাজে লেগেছিল?

সতী গদগদ হয়ে বলে, খুব কাজে লেগেছিল। নইলে খুবই মুস্কিলে পড়তাম।

হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সত্যব্রত। একটু পরে বলে, তবে কি জানেন, দেখলাম পিয়ানোটা ঠিক আমাদের নয়। স্ট্রোক-এর সঙ্গে মানসের কোথায় যেন একটা বিরোধ আছে। ঠিক ঠিক…

সতীর চোখে তখনও বিস্ময়। হঠাৎ টঙ্কার লাগে তারে। বীণা বাজাচ্ছেন কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। প্রশান্ত উদাত্ত চেহারা। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক। ব্রহ্মলোক যেন পাঁজাকোলা করে ধরেছেন কোলের ওপর। গমকে গমকে সুরতরঙ্গের সৃষ্টি করছেন। সুর কায়েম হয়ে আসছে বীণে।

বীণ শুনুন, ব'লে চুপ করে সত্যব্রত।

সুর উঠছে, জ্যোতি ফুটছে। তারার উত্তরি গান্ধার থেকে মুদারা গান্ধার,—মুহূর্তের বিদ্যুৎ অনুশাসনের পরই যেন অশনিপাত হ'লো কোথাও। তারপর সুর ফিরে গেল সুরে। যারা শুনল, বুকগুলো তাদের ধড়াস ধড়াস করে উঠল। উৎকর্ণ সবাই।

ঝঙ্কার কানে আসছে কিন্তু ঝঙ্কারীকে দেখা যাচ্ছে না। পেছনে যাঁরা বসেছেন তাঁরা মৃদু আপত্তি করছেন। আড়াল করে দাঁড়িয়েছে সতী।

সত্যব্রত টের পেয়ে সতীর কানে কানে বলে, একটু সরে আসুন। পেছনে যাঁরা বসেছেন অসুবিধে হচ্ছে তাঁদের।

ব্যথায় হাত লেগেছে যেন। কুণ্ঠিত হেসে সতী সরে দাঁড়ায় সত্যব্রতর পাশে।

সত্যব্রত বলে, কেমন লাগছে?

জবাব দেই,—বলে উত্তর খোঁজে সতী সত্যব্রতর মুখে।

বীণ বেজে চলেছে। গমকে টানা দ্রুত মীড়ের মূর্ছনাগুলি যেন

সোনার ওপর জড়োয়ার কাজ। সুন্দরী কোন নাগরী যেন রাগ-শৃঙ্গারের ঠমক তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে হাতের বলয়কঙ্কণ।

চমক ভেঙে সত্যব্রত বলে, আমাকে কিছু বলছিলেন ?

কৈ না তো—অস্বীকার করবার মাঝখানে তার একটা স্বীকারোক্তি করল সতী, যেন অনেক কথা তার সত্যব্রতকে বলবার ছিল। তাকিয়ে রইল সত্যব্রত সতীর দিকে।

মেঘের মাঝখানে বিদ্যুৎ-এর চমক দিনের আলোতেও দেখতে পেলো বিশ্বতোষ। ঈগলের মত উড়ে এসে পড়ে সে ধরে নিয়ে গেল সত্যব্রতকে, একেবারে সামনের দিকে, বিশিষ্ট অতিথিরা যেখানে বসেছেন। সতীকে মৃদু ভৎ´সনা করে বললো, কি আশ্চর্য্য, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, এঁদের বসাতে হয় ডেকে! আসুন আসুন, শুভময় বাবু আসুন। আপনাদেরও যদি ডেকে ডুকে বসাতে হয়···। সতীকে বললো, আপনি মাদ্‌মোয়াজেল একটু মেয়েদের দিকটা তদারক করুন। একেবারে গায়ে জল দিয়ে বেড়াবেন না। মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

কপট হেসে সতী বলে, তাই দেখে বুঝি হামলা করতে এলেন ভায়াস থেকে ?

: নিশ্চয়ই। পেষ্ট হয়ে খেটে মরবো আমরা আর হোস্টেস হয়ে···। হঠাৎ হেসে ফেলে। বলে, আসুন আসুন আপনিও বসবেন আসুন।

: থাক, ধন্যবাদ!

সত্যব্রত আর শুভময় ততক্ষণে খানিকটা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। বিশ্বতোষ এক রকম জোর করেই ধরে নিয়ে যায় সতীকে। বলে, অত বেরসিক ঠাওরান কেন আমাকে? আসুন, দেখবেন ঠিক পাশাপাশি বসিয়ে দেবো।

বীণ আর কথাকলির মাঝখানে সামান্য একটু বিশ্রাম। একটু চা, একটু পানীয়। পাশের লাউঞ্জ আর লন জুড়ে ঢালাও বন্দোবস্ত। বীণের শেষ রেশ তখনও বাসা বেঁধে আছে হলের আনাচে কানাচে। এমন সময় সবগুলো আলো এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে ভেতরে বাইরে। বিরাম।

দশ মিনিটের সামান্য অবকাশ। অথচ প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন এখানে অতি মূল্যবান।

সংসারে কাল কি হবে, না হবে, বাজার উঠবে না পড়বে, মরবে না বাঁচবে মানুষ, তার কিছুটা আন্দাজ এখানেই সাব্যস্ত হবে কথায় কথায়।

অন্নদা বাবু সুপ্রসন্ন মুখ করে এর ভেতরেই ঘুরবেন ফিরবেন, আর অল্প কথায় বিহিত করে দেবেন সব সমস্যার,—কতটুকু ধরতে হবে না ছাড়তে হবে লোহা সোনা চাঁদির শেয়ার।

লোহালক্কড়ের কারবারী ইন্দ্রজিৎ সিং-এর হাতে বিশ্বতোষ নিজের হাতে ভেঙে একটি কোকাকোলা তুলে দেয়। বোতলের মুখে স্ট্র লাগিয়ে দেন অন্নদা।

বাচ্চুভাই যে ঘোলের সরবৎ খাবেন, সে গেলাস আনে হাতে করে বারবারা। শুভময় ততক্ষণ বাচ্চুভাই-এর স্ত্রী দামিনীর চপ্পলের হীরেটার তারিফ করে কথা বলে। হেঁদো কথা, তবু কাজও হয় তারই ফাঁকে।

কাজই জীবন। তবু তার মাঝখানেই আনন্দ চাই। একটু বীণ। একটু গান।

এখন কথাকলি। মৃদঙ্গের ডাকে সাড়া দিয়ে ওঠে আবার সবাই। একটি একটি করে বাতি নিবে যায়।

একটু পরেই কলগুঞ্জন থেমে যায়। বীণের সময় সিলিংএ যে সানটা জ্বলছিল, এখন সেটিও নিবিয়ে দেওয়া হয় নাচের খাতিরে। হল একেবারে অন্ধকার।

কঠিন একটা দৃপ্ত ঠমকে শুরু হয় কথাকলি। মাক্কতি সুব্রহ্মণ্যম সেজেছেন হিরণ্যকশিপু। কৃষ্ণনাম অসহ্য তাঁর কাছে। অথচ পুত্র প্রহ্লাদ কৃষ্ণ বই কিছু জানে না। কৃষ্ণ বই নাম নেই তার মুখে। নিদারুণ রোষে অধীর হয়ে উঠেছেন দৈত্যকুলাধিপতি। মর্ত্তলোকে ত্রাস সঞ্চার হচ্ছে। মহা দুর্দ্দিন সমাসন্ন। হিরণ্যকশিপুর হুঙ্কার উঠছে থেকে থেকে।

সতী বুঝি খুঁজছিল কাউকে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে না পেরে এসে পড়ে সামনাসামনি। হাত ধরে টেনে পাশে দাঁড় করিয়ে দেয় বিশ্বতোষ।

একটু আচমকা লাগে সতীর ব্যাপারটা। বলে: কে?

: স্-স্-স্. নাচ দেখুন

: আপনি?—আমি ভাবলাম······

: আর কেউ হবে।

: মানে?

: উঠে এলেন যে?

: বসলাম কখন?

: ভাল লাগল না বুঝি?

: অর্থাৎ?

হাতটা ঘেমে উঠছে সতীর বিশ্বতোষের হাতের মধ্যে।

ওদিকে হস্তমুদ্রা আর আঁখিঠারে হুলুস্থুল পড়ে গেছে পৃথিবীতে। সৃষ্টি বিপন্ন হয় আর কি! একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন হিরণ্যকশিপু।

মর্ত্তলোকে যদি কৃষ্ণনাম ঘুচে যায়, ধ্বংস হয়ে যাবে ব্রহ্মাণ্ড। মহাপাপে অবলুপ্ত হবে সমাজ-সংসার। হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে বিলাপ করছেন প্রহ্লাদ। কিন্তু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর দেখা নেই এখনও।

সতী!—কঠিন আশ্লেষে কাছে টানে বিশ্বতোষ সতীকে। পিছু হটে যায় কয়েক পা। একেবারে পিছনের দিকে।

: কৈ বললেন না তো কেন উঠে এলেন?

বিশ্বতোষ বলে: বা রে, ভয় করে না বুঝি?

: ভয়! কাকে ভয়?

বিশ্বতোষের গরম শ্বাস-প্রশ্বাস ঘাড়ের আলগা জায়গাটায় অনুভব করে সতী। পেশল হাতটা জড়িয়েছে যেন ভুজঙ্গের মত কটি বেড়ে। হাঁপিয়ে ওঠে সতী।

: জড়াবেন না তো?

: চান না বুঝি?

: না, কোনদিন না।

স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতলে যাচ্ছে। দৈত্যরাজের গগনবিদারী চীৎকারে আচ্ছন্ন করেছে দিঙ্মণ্ডল। কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে

রোহন করছেন। এমন সময় দুন্দুভি বেজে ওঠে চতুর্দিকে। রথচক্র ঘর্ঘরের সঙ্গে ঝাঁঝর-ঘণ্টা শঙ্খ বাজে দেবলোকে। কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের স্পর্শমাত্র ভেঙ্গে পড়ে শিলাস্তম্ভ। আবির্ভূত হন শ্রীকৃষ্ণ।

নৃসিংহ-অবতাররূপে স্বয়ং নারায়ণ হিরণ্যকশিপুকে না উর্দ্ধে না অধে, অন্ধাবশেষে শায়িত করে দৈত্যকুলাধিপতির নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য। সরোষ হুঙ্কার আর বিদ্যুৎপ্রভ নয়নের চকিত কটাক্ষে জলে-পুড়ে মরসে যায় হিরণ্যকশিপু।

বিশ্বতোষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ছিটকে সরে যায় সতী। হল থেকে একেবারে বাইরে। লাউঞ্জের দিকে। বিশ্বতোষ ডাকে, সতী। সতী ফিরেও তাকায় না আর বার।

ওদিকে জয়কার উঠছে। বন্দনা শোনা যাচ্ছে কৃষ্ণনামের। কৃষ্ণপ্রেম বই সত্য কিছু নাই।

মাথাটা ঘুরছে। চক্কর লাগছে থেকে থেকে। দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দেওয়াল ধরে ধরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই লাউঞ্জের সোফায় টলে পড়ে যায় সতী। তারপর আস্তে আস্তে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

একেবারে দাঁত লেগে গেছে। দূর থেকে যারা দেখলো তারা ছুটে এলো কাছে। অন্নদা বাবু এলেন খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি। হাতে পায়ে হাত দিয়ে দেখলেন। না গরমই আছে। মাথাটাই ঘুরে গেছে হঠাৎ। ডাক্তারকে খবর করে বরফ দিতে বললেন ইতিমধ্যে। বললেন, পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। গণ্ডগোল করো না। ডাক্তার এসে পড়বেন এক্ষুণি।

দামিনী দেবী বলছিলেন, ভুতিকা চাস, উসিকা ব্যু লেনেসে ভি কভি কভি আরাম হো যাতা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার এসে পড়েন। সুতরাং চামড়ার গন্ধ শোঁকাবার আর দরকার হয় না। নাড়ী টিপে বলেন, নার্ভটা হয়তো দুর্বল ছিল ইমোশনাল মেয়ে। এতখানি দেবরোষ আর কি সহ্য হয় থাকে। চুপ করে শুয়ে থাকতে দিন। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবেন।

ডাক্তার চলে গেলে বাবুবাবা আর শুভময়ের বন্ধু সত্যব্রত বসে রইলো সতীর পাশে।

ইতিমধ্যে অন্নদা বাবু আর একবার ঘুরে গেছেন। ডাক্তারের রিপোর্ট শুনে আশ্বস্ত হয়ে গেছেন তিনি। নেহাৎই একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন। অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হবে। তাই খবরটা তিনি একেবারেই চাউর হতে দেননি।

অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত হয়। আনন্দের আতিশয্যে রসজ্ঞজন অন্নদা বাবুর হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান যাবার সময়ে। কলিয়ারী মার্চে'ন্ট জেঠুভাই চমনভাই অন্নদা বাবুর হাত ধরে বলেন—শরীকি আদমী আপ। আপকা খানদান্ বহুৎ আচ্ছা।

বিদেশী চটকল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এডোয়ার্ড উলফ্ শেষ্টার 'বন্দে মাতরম্' গান শুনে চোখের জল ফেলে যায়। চোখ পিটপিট করে অন্নদা বাবুকে নিচু গলায় বলে,—As though I was listening to my own National anthem যাবার সময়ে বাবুবাবার খাতিরে শুভময়কে-ও ডিনারে নেমন্তন্ন করে যায় গদগদ হয়ে যান অন্নদা বাবু। উলফ সাহেবকে লক্ষ্য করে পার্টনার বিশ্বতোষকে বলেন,—স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক।

এদের প্রাণটাই এত বড় যে···। ভাষাটাতে না পেরে হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন অন্নদা বাবু। একটু পরে বলেন, সতীর ব্যাপারটা বলিনি তোমাকে? কথাকলির শেষটায় কি হলো হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সতী। অবিশ্যি তেমন কিছু নয়। ডাক্তার বলে গেলেন, নার্ভাস ব্রেকডাউন। পাশের ঘরে শুয়ে আছে। যাবার সময় একবারটি দেখা করে যেও।

সে কি!—প্রত্যক্ষ ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে বিশ্বতোষ।

খুশী হন অন্নদা বাবু বিশ্বতোষের উৎকণ্ঠায়। দাঁতে পাইপ চেপে কোন মুখচ্ছবির কি লাস্তে যে খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি, মুখ দেখে তা বুঝতে পারে না বিশ্বতোষ।

কোথায় সতী। সতী!—ডাকতে ডাকতে সতীর সন্ধানে এগিয়ে যায় বিশ্বতোষ তাড়াতাড়ি।

সামনের লাউঞ্জে তখন ছোট্ট একটি ককটেল পার্টি জমে উঠেছে। কোণের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে বাবুবাবা গল্প করছে শুভময়ের সঙ্গে। হঠাৎ বিশ্বতোষকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে সম্ভাষণ জানায় শুভময়। হাত ধরে আপ্যায়ন করে বলে,—আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি, বিশ্বতোষ এসো এসো।

না, মানে সতী,—সতীর সঙ্গে একটু দেখা করবার দরকার ছিল। আছে কেমন এখন সতী! প্রতি কথায় উৎকণ্ঠা বিশ্বতোষের সতীর জন্যে।

সতী! দু পা এগিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেয় শুভময় বিশ্বতোষকে সতীর ঘর। বলে—There she lies চলে যাও সোজা। এখন সে সম্পূর্ণ normal কিছু নেই চিন্তা করবার। আচ্ছা তা হলে দেখা করে আসছো কিন্তু। আমরা অপেক্ষা করবো তোমার জন্যে।

Oh! Sure, Sure: উচ্ছ্বসিত আশ্বাস দিয়ে সতীর কাছে চলে যায় বিশ্বতোষ। কোন কিছু না খেয়েই একটু মাতাল হয়ে আছে যেন।

মাথা ঘোরাটা বন্ধ হয়েছে। হাতে পায়ের জড়তাটাও এখন আর তেমন বোধ করা যাচ্ছে না। তবু কেমন যেন একটা অবসন্নতার ভাব, তখনও ঝিম ধরে আছে সর্বাঙ্গে সতীর।

: এখন কেমন?

: খুব ভাল।

উপুড় হয়ে বিছানে শুয়ে সতী জবাব দেয় সত্যব্রতর কথায়। তারপর আবার চুপচাপ। ঘরে নীলচে একটা আলো। কেউ কোন কথা না বললেও কথা শেষের মৌনতা যেন ঘিরে রাখে ওদের।

সত্যব্রতর চোখে স্তিমিত কৌতুকের একটা চাপা হাসি।

সতী একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কৈ আপনি কিন্তু শেষ করলেন না গল্প?

সত্যব্রত বলে—শুনবেন, আর একদিন শুনবেন। আজ থাক। তা ছাড়া আপনার শরীরটাও তো তেমন ভাল নেই আজ।

বেশ, কিন্তু পিয়ানো করে শোনাচ্ছেন। বলুন!—শিশুর মত অতি কুতূহলে সত্যব্রতর মুখের ওপর দোল খেয়ে ঝুঁকে

সত্যব্রত তখনও কিছু কবুল করেনি সতীর কাছে। শব্দ ও উৎকর্ণ প্রতীক্ষার মাঝামাঝি, এমনই একটা উৎকণ্ঠিত মুহূর্তে হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢোকে বিশ্বতোষ।

শুধু বিভ্রান্ত নয়, বিস্মিত হয় বিশ্বতোষ ওদের এই ঘনসান্নিধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরক্তি আর ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে মনের গভীরে। ভাবে, সত্যব্রতর সঙ্গে সতী এতটা ঘনিষ্ঠ হলো কি করে? সবে তো ওদের পরিচয়! আর অসুস্থ বলেই না অন্নদা বাবুর কথা মত ছুটে এলো সতীকে দেখতে?

বিব্রত বোধ করে বিশ্বতোষ। খেই হারিয়েও কথা বলে বিশ্বতোষ, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না,—মানে, অন্নদা বাবুই বলছিলেন আপনার শরীরটা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ক্লান্ত একটা নির্লিপ্তির হাসি মুখে টেনে সতী বিশ্বতোষের কথাই সমর্থন করে। বলে, হ্যাঁ মানে শরীরটা হঠাৎ—আপনার কথাটা কালকে কি অন্য কোন দিন শুনলে হয় না বিশ্বতোষ বাবু?

অদ্ভুত সৌজন্য সতীর। এত বড় অপমান যে সতী তাকে করে বসবে অতর্কিতে, সে কথা বিশ্বতোষ ভুলেও ভাবতে পারেনি। আর কথাটা ঠিক সত্যব্রতর সামনে হলো বলেই হয় তো নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হলো বিশ্বতোষের।

তবু ভাঙতে হয়, মচকাতে নেই কখনও। সতীর কথার জবাবে বিশ্বতোষ পাল্টা উত্তর করে, না না, সে কিছু নয়। আর আপনি শুনতে চাইলেই যে বক্তব্য থাকবে আমার তাই বা আপনি ধরছেন কেন? আমি এলাম...

: বলুন।

বাকি কথাটা মুখে করেই অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায় বিশ্বতোষ ঘর থেকে ছিটকে। ধাক্কাটা সত্যিই এবার আর বুকে নয়, একেবারে ঘাড়ে এসে লেগেছে।

ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে করিডর ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় বিশ্বতোষ।

[ক্রমশঃ।

একটি সোনালি সকাল

[বোরিস পাস্তেরনাকের 'Daybreak' কবিতা অবলম্বনে]

একদিন তুমি ছিলে আমার জীবনে যথাসর্বস্ব, অন্তরের অন্তরতম
তারপর এল যুদ্ধ, এল বিপর্যয়
বহুদিন ধরে তোমার কোন খোঁজই পেলাম না।

অনেক দিন পর আজ আবার সারাটি রাত ধরে তোমার অশরীরী কণ্ঠস্বর
গম্ভীর হয়ে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল কেবলি আমার কাছে;
অবুঝ স্মৃতির উত্তাল ঢেউগুলো
আঘাতে আঘাতে ক্রমশ শিথিল করে দিল
আমার চেতনার ভিত্তিটাকে।

সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম পথে:
সাদা বরফে ঢাকা পথ; তার উপর রঙীন আলোর ঝিলিমিলি
ঘরে ঘরে চা করার ঠুং-ঠাং শব্দ; ট্রাম-বাসে কর্মব্যস্ত মানুষের ভীড়।
সব মিলিয়ে কেমন যেন নতুন মনে হলো সমস্ত সহরটাকে।

তখন আমার মনে হতে লাগল,
আমি যেন পথের ওই তুষারের সংগে গলে গিয়েছি;
সকালের ঐ দুরন্ত আলো ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে আমার প্রতিটি শিরায়।
আমার রক্তের মধ্যে অজস্র নাম-না-জানা মানুষের অশান্ত গুঞ্জন।
প্রতিটি গাছের অগাধ অফুরন্ত সবুজের মধ্যে ডুব দিয়ে
আমার পাণ্ডুর প্রাণ হয়ে উঠেছে যেন চিরসবুজ।

আজ আমি জনতার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে।
বিশাল গণ-জীবনের বিপুল প্রাণের এক সোনালি উত্তাপ
হিমশীতল নিঃসংগতার জমাট বেঁধে যাওয়া
জমা কালো আমার সত্তাটাকে গ্রাস করেছে নিঃশেষে।
আজ আমি আর তোমার নই, আমি সকলের।

অনুবাদ—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

বিলম্বিতা

অনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছলনা করনি তুমি ম্লান হেসে শুধু বলেছিলে,
"পাঁচটি বছর আগে আমায় নিখিলে
কেন যে এলে না হায়
জাগালে না কেন এসে সেদিন আমায়?"
আমি মূক মুখে শেষে
ম্লান হেসে
ক্ষমা চেয়ে ফিরেই এলাম।

কি পেলাম
এই কথা নিজেকেই লিখে যায় বার বার
পাখির বুকের মত ছোঁয়া পাই কথায় তোমার।
ফিরে পাই সেদিনের অলস দুপুর
কানে বাজে ক্ষীণতনু মেয়েটির চুড়ির নূপুর।

চোখে ভাসে
হৃদয়ের নীলিম আভাসে
তোমার হরিণ-চোখ, লাল টিপ তারার মতই,
এ হৃদয় হয়েছিল সেই দিন ঢেউ-ওঠা সাগর অথৈ।
কিছুই নিলে না তুমি দিলে মুঠো ভরি
চৈতালী আশাটুকু হায় যাযাবরী।

তারপর আর
ভেড়েনি আমার খেয়া, পাইনি তো সাগরের পার।
আজো আমি তাই,
দিনের কাজের শেষে এ ঘর সাজাই;—
যদি ফিরে আসে সেই পাখি।

যে আমায়
বলেছিল কথায় কথায়
"পাঁচটি বছর আগে এলে কোন ক্ষতি হোত নাকি?"

অসিত গুপ্ত

হৃদয়, আজ বাসবীর কাছ থেকে ফিরে এসেই কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বাসবীর কথা তোমাকে আগে সব বলেছি। ওর ধারণা আমি ওকে ভালোবাসি। একদিন বাসবীকে খুব হাল্কা মেয়ে বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু আজ ওর কতকগুলো কথায় মনে হচ্ছে—না, আমি বোধহয় ভুল করেছিলাম। আসলে ওর বাইরেটায় যত আলোড়ন, ভেতরটা তত স্থির। ঝড়ের বেগে যায়-আসে ও, যতক্ষণ থাকে অনর্গল কথা বলে, অকারণ হাসে আর কতরকম যে অঙ্গভঙ্গী করে সে তোমাকে কি বলব! মাঝে মাঝে ভীষণ একটা দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে বসে।

সেই বাসবীর কাছ থেকে আজ সন্ধ্যার পর ফিরে এসে আমার মধ্যে বিরাট একটা ঝড় বইল। কারণ ও হঠাৎ কতকগুলো কথা বলেছিল আমায়। আমি প্রথমটায় আমল দিতে চাইনি। কারণ বাসবীকে তো আমি জানি। ওবে কোন গুরুতর কথা বলবে এ আমার ভাবনার বাইরে। তবু শেষ পর্যন্ত ও-ই আমাকে ভাবাল। অবুঝ বলে অবশ্য তোমার কাছে চিরকালই একটা বদনাম পেয়ে এসেছি। ইদানীং তুমি আশংকা প্রকাশ করেছিলে যে আমি নাকি ক্রমশঃ সিনিক হয়ে উঠছি এবং অদূর ভবিষ্যতে পুরোপুরি নিউরটিক হয়ে যাব। শোন, একটা বড়দরের কথা বলে ফেলি। নিজগুণে মাফ কোর। পৃথিবীর সব বেয়াড়া মানুষ-ই অল্পবিস্তর নিউরটিক। আমিও যে একটু বেয়াড়া, তোমাদের ছাড়া একথা মানো তো! আর নিউরটিক হবার একটা কি সুবিধে জান? মনোজগতের অনেক বন্ধ দরজা একদিন হঠাৎ চোখের সামনে খুলতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর বুকে যে রঙ দেখবার জন্যে তোমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে নিজেকে ধুইয়ে, নিজেকে ডুবিয়ে সেই নানা বৈচিত্র্যময় রঙে তুমি অহর্নিশি হোলি খেলতে পার। নিউরটিক হবার মজা-ই এই। যাকগে ওসব কথা। বাসবীর কথা বলি।

আজ বিকেলে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ও অমন কথাগুলো দুম্ করে বলে ফেলল কি করে? মন্দির বলেই কি? বাড়ী ফেরা ইস্তক সেগুলোকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না মন থেকে। ক্ষতের ওপর মাছি বসলে লোক হাত দিয়ে যেমন করে তাড়ায় কিন্তু মাছি বার বার এসে বসে—তেমনি করে চিন্তা-মাছিকে আমি নানা প্রবোধ দিয়ে তাড়িয়েছি কিন্তু তারা বার বার এসে বসেছে, আমাকে উৎপীড়ন করেছে। হয়ত কোন কোন কথায় এমনি জোর, এমনি জাদু থাকে—বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে সেগুলো ধ্বনিত হয়ে মানুষের মনে বিশেষ একটা অবস্থার সৃষ্টি করে।

বালি ব্রীজের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আজ বাসবী আর আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। ও প্রায়ই বলছিল, তোমার সংগে রোজ চৌরঙ্গী পাড়ায় হেঁটে হেঁটে আমি বাপু মার্কামারা হয়ে গেছি। রেষ্টুরেন্টে যে গিয়ে বসব তার অবধি জো নেই। বয়-বেয়ারাগুলো পর্যন্ত চিনে ফেলেছে—তাই গিয়েছিলাম।

ঘরের আলোটা জালিয়েই রেখেছি। তুমি তো আমার ঘর দেখেছ। ঘর নয়, ঘর নয়—আমি একে বলি ঘর্ঘর। শুধু আওয়াজ। আমার সারা জীবনটাই শুধু একটা পুঞ্জীভূত আওয়াজ। শুধু কতকগুলো কর্কশ, বেয়াড়া শব্দের ও নিঃশব্দের লম্বা-লম্বা প্রহর। তোমাকে এসব কথা নতুন করে আর কি বলব, তুমি তো সবই জান। অনেক রাত হয়েছে।

তবু আলো নিবোই নি। আলো জেলে চিন্তা করেছ তুমি কোনদিন? করে দেখো, বেশ লাগবে। কেমন যেন একটা উত্তাপ, উত্তেজনা অনুভব করা যায়। মদ কোনদিন খাই নি আমি। তাই তার স্বাদ কেমন জানি না। তবে চিন্তা করতে করতে শরীরটা যখন ঝিম্ মেরে আসে, শিরাগুলো দপ দপ করে জলতে থাকে তখন মনে হয় মদের নেশায় কি এর চেয়েও বেশী জ্বালা আছে, এর চেয়েও বেশী শান্তি?

বাসবীর ওই কয়েকটা কথা ভাবতে গিয়ে আজ আমার মধ্যে অনেক কথাই ভীড় করে আসছে। আশ্চর্য, এমন করে তো' কোনদিন ভাবি নি। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, আজ যেন

অনেক কাজের, অনেক কথার মানে বুঝতে পারছি আমি। নতুন করে নিজেকে চিনছি। দোহাই তোমার, হেসো না। বিদ্রূপ কোর না। তুমি হয়ত ভাবছ কথা কি কখনো মানুষকে এমনিধারা উতলা করে, পাগল করে? করে, করে। খুব সামান্য জিনিষও মানুষের মনে কখনো-কখনো এমন দাগ কেটে যায় যে শত চেষ্টাতেও কোনদিন তা আর ওঠে না। মনস্তত্ত্ববিদরা একথা আমার চেয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমি তো মনস্তত্ত্ববিদ নই। তবু কথা যখন উঠলই তখন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, শোন।

এক ভদ্রলোক রাস্তায় কুকুর দেখলেই ভয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। ওইটাই তাঁর রোগ। এমনিতে ভদ্রলোকের আর কোন অসুস্থতা ছিল না শরীরে। নামী লোক, প্রচণ্ড পসার। সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিপত্তি আছে। শুধু ওইটুকু যা খুঁত। মনোবিজ্ঞানীরা কিছুতেই আর রোগের কার্যকারণ সূত্র খুঁজে পান না। শেষকালে জানা গেল যে, বহুদিন আগে ভদ্রলোক যখন নেহাতই কিশোর তখন একদিন নস্যি নিয়ে তিনি ক্লাসের ভেতর নাক ঝেড়েছিলেন। আর সেটা রোদ্দুরে পড়ে একটা কুকুরের আকার নিয়েছিল। অনেক সময় দেওয়ালের চূণবালি খসেও এরকমটা হয় তুমি বোধহয় দেখেছ। সেইরকম হয়েছিল আর কি! ছাত্রের এই বেচালপনা দেখে শিক্ষকমশাই মহা খাপ্পা হয়ে ভীষণ প্রহার করেছিলেন সেদিন। তারই ফল দেখা দিয়েছিল অনেককাল পরে। এখন ভদ্রলোকের সব ভালো, শুধু কুকুর দেখলেই তিনি মনে মনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুতরাং কারো কয়েকটা কথা আজ যদি আমাকে ভাবায়, নিজেকে নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খোঁজায় আর খুঁজতে খুঁজতে কিছু যদি আমি পেয়েই যাই তাহলে সেটা কি তোমাদের কাছে খুব একটা খেলো, খুব একটা হাসির বস্তু বলে মনে হবে? মন বলে কথা। জান, মন আর বন—এ দুইয়ে খুব বিশেষ একটা তফাৎ নেই। দুটোই জটিল, দুটোই গহন। যাক্ ওসব।

ঘরের আলো জ্বালিয়েই রেখেছি।

এই কিছুক্ষণ আগেও একটা পোকা তার চারধারে ঘুরঘুর করছিল একবার করে কাছে যাবার চেষ্টা করে আর ফিরে ফিরে আসে। পারে না। মশারির চালে গোটাকয়েক রক্তের ছোপ আবিষ্কার করলাম। দেওয়ালে টাঙানো মৃত গুরুজনদের ছবিগুলো আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি এদিক-ওদিক সরবার চেষ্টা করে দেখেছি তবু ওদের চাহনি আমার ওপর থেকে একচুলও নড়ে চড়ে নি। ওরা বোধ হয় আমার ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আচ্ছা, সত্যিই ভেতর বলে কি কিছু আছে? মনের মধ্যে মন? যেমন ঘরের মধ্যে ঘর। কি জানি, মাঝে মাঝে সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

বাসবীর সংগে আমার সম্পর্কটা তোমার জানা আছে। আমিও সব বলছি। কিন্তু তার আগের ইতিহাস তুমি বোধ হয় বিস্তারিতভাবে জান না। ভাসা-ভাসা শুনে থাকবে আমার কাছে। উঃ কি গেছো মেয়ে, কি গেছো মেয়ে! বাব্বাঃ। আমার সংগে যা করে আলাপ। প্রথমটায় ও যেন বর্শার মতো এসে বিঁধল, তারপর বর্ষার মতো কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়!

তুমি দেখেছ, আমি রোজই, ইউসিস লাইব্রেরীতে যেছি, বই নিয়ে এসেছি। এমনিতে তো পড়াশুনা বিশেষ হোল না। তাই আজ অসময়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি নানাভাবে। হায় রে দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

সেদিন ইউসিস লাইব্রেরী থেকে বোঝার মতো বই নিয়ে বেরিয়ে আসছি। সন্ধ্যাবেলা; রাস্তায় যথারীতি মানুষের মিছিল। ধাক্কাধাক্কি করতে করতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। বাসের হাতল ধরবার জন্যে জীবন পণ করছে। আরেক দিকে রাতের কোলকাতায় সবেমাত্র সাজ-সাজ রব উঠেছে। সেই সময় হঠাৎ দেখি ফুটপাথ থেকে একটি মেয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। শুধু মেয়ে বলে নয়, অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিতদের সম্পর্কে আমার একটা স্বাভাবিক জড়তা আছে। আমি কিছুতেই যেন তাদের সামনে নিজেকে খুলতে পারি না, মেলতে পারি না। আমি কঠিন কথা হয়ত সহজে বুঝি কিন্তু সহজ কথা সহজভাবে বোঝাতে পারি না। অনাবশ্যক কঠিন হয়ে পড়ে। কি করব বল, চরিত্রটা তো আর জামাকাপড় নয় যে, ইচ্ছে মাফিক বদলে ফেলব।

যাই হোক্, মেয়েটির ওই অন্তর্ভেদী চাহনিতে আমি বলাই বাহুল্য অস্বস্তি বোধ করলাম। মুখটা নীচু করে যেই পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছি অমনি একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বহু বিচিত্র কলরবে মুখর চৌরঙ্গীর সব কণ্ঠ, সব শব্দ সত্ত্বেও বুঝতে একটুকু দেরি হোল না যে, ওই বিশেষ কণ্ঠটির মালিক জনৈকা মহিলা এবং সেই মহিলা যিনি এক্ষুণি আমায় তাঁর নয়নবাণে বিদ্ধ করছিলেন।

—চন্দ্রগুপ্ত।

আমি আহ্বানাহত হয়ে থামলাম। কিন্তু এ কি নামে ডাকা? এ তো আমার নাম নয়? আমি তো অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ ভটচায। পোর্ট কমিশনার্সের টিপেন ক্লার্ক যতীন ভটচাযের সুযোগ্য কেরাণী-পুত্র। তবে? পিছন পানে তাকালাম। বোধ হোল, মেয়েটির ঠোঁটে এবার হাসি জেগেছে। কারণ অন্ধকারে তার সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখলাম।

—আমাকে বলছেন? জিজ্ঞাসা করলাম কাছে এসে।

—হ্যাঁ গো মশাই। বলেই সেই সন্ধ্যাবেলায়, চৌরঙ্গীর সেই বিপুল ভীড়ে সে আমার বাঁ কানের লতিটি ধরে নেড়ে দিল। আমি তো 'থ'। মেয়েমানুষের সহজ হবার এমন সাহস দেখে আমি বাক্‌হারা হলাম। রাস্তার লোক আমাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

—কোনদিন হাজারীবাগে ছিলে?

হ্যাঁ ছিলাম তো। সে অনেক দিন আগে। বাবা তখন নতুন একটা কাজ পেয়েছিলেন। স্বীকার করলাম।

—কিন্তু কেন বলুন তো?

—চন্দ্রগুপ্ত নাটকে প্লে করেছিলে মনে আছে?

এবার ভালো করে দেখলাম মেয়েটিকে। শ্যামলা রঙের শ্রী মেয়ে। চোখের তারায় কৌতূহল নাচছে। তেমন পুরুষ্টু শরীর নয় তবু—কাছে এসে সব চোখকেই পথ হারাতে হয়।

—তুমি বাসবী?

—চিনতে পেরেছ তাহলে। সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাসির ছোট ছোট ঢেউ তুলল বাসবী।

আমি ততক্ষণে অনেকখানি আড়ষ্টতা কাটাতে পেরেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই বাসবী আজ এতবড় হয়েছে, এত বৈচিত্র্যময় হয়েছে। আমরা বাস ষ্টপেজের দিকে হাঁটছিলাম। হাঁটতে-হাঁটতে হাজারীবাগের স্মৃতিগুলো হাতড়ে-হাতড়ে দেখেছি। বাসবী মাঝে মাঝে খেই ধরিয়ে দিয়েছে।

—মনে আছে আমার জামার বোতাম লাগাতে গিয়ে একবার তুমি কি করেছিলে?

মনে আছে বৈ কি! মনে থাকবারই যে কথা। বাসবীর ফ্রকের একদিন পিঠের বোতাম খুলে গিয়েছিল। আমাকে বলল, লাগিয়ে দেবে। আমি সেই বোতাম লাগাতে গিয়ে ওর খোলা পিঠের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

রোজ বিকেলে ওর বিধবা দিদির সংগে আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসত। ওর দিদি করুণাদি' খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর সেই ফর্সা মুখ আর ভরা শরীরটার কথা মনে পড়ে গেল। অনেকটা আমার এই শাদা, ফোলা ফাঁপা মশারির এখনকার অবস্থার মতো।

আমরা যে জায়গাটায় থাকতাম তার নাম ওকুনী। কিছু দূরেই বাসবীরা থাকত। ওর তখন কতই বা বয়স, বছর দশেক হবে বোধহয়। ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে আসত। করুণাদি' যেতেন মা'র সংগে রান্নাঘরে গল্প করতে। আর ও আমার সংগে পেয়ারাগাছ-তলায় দাঁড়াত। বাড়ীটায় বেশ একটা বাগান ছিল।

একদিন করুণাদি' আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। এত কাছে এর আগে আর কোনদিন আসেন নি। ওঁর ভরা শরীরটা থান আর শাদা জামায় ভালো করে ঢাকা। করুণাদি'র গায়ের গন্ধ পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন আমার তেমন কিছু বোধহয় নি। অথচ, কি লজ্জার কথা দেখ, আজকে ভাবতে গিয়ে যেন সব কিছুই শিরশিরিয়ে উঠছে। দৃশ্যটা কল্পনার চক্ষে বানিয়ে নিজেই যেন বেশী মাদকতা পাচ্ছি। এমনকি করুণাদি'র সেদিনকার সেই গরম নিশ্বাসটা পর্যন্ত আজ যেন আমার মুখে এসে লাগছে। করুণাদি' বললেন, অনু নাটক করবে? আমরা 'চন্দ্রগুপ্ত' প্লে করছি। তোমার অমন সুন্দর চেহারা, তুমি 'চন্দ্রগুপ্ত'র পার্টটা কর।

সেই 'চন্দ্রগুপ্ত' প্লে'র কথা বলেছে বাসবী। করেছিলাম। আমি চন্দ্রগুপ্ত, বাসবী ছায়া। করুণাদি' আমাদের সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। রাংতা দিয়ে মুকুট তৈরি হয়েছিল। বিছানার চাদর টাঙিয়ে স্ক্রীণ আর চৌকি জড়ো করে প্লাটফর্ম।

সেই বাসবী। আজ আর ছায়া নেই। সেদিন যার আভাষ ছিল শুধু আজ বয়সের গুণে তা' কায়া হয়েছে।

ওদের সব খবরাখবর নিলাম। এর মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাসবীর বাবা মারা গেছেন। মা তো অনেক আগেই গিয়েছিলেন। হাজারীবাগের বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে। ওরা প্রথমে এসে মামার বাড়ীতে উঠেছিল তারপর বাসবীর ওপরের ভাই টুনু একটা চাকরী পাওয়াতে বেলেঘাটায় বাসা-বাড়ী নিয়েছে। এমন কিছু চাকরী নয়, এক সরকারী অফিসের এল· ডি· ক্লার্ক। শুধু ওর আয়ে তো আর সংসার চলে না। তাই করুণাদিকেও

বেলেঘাটায় মহাকালী পাঠশালায় মাষ্টারী নিতে হয়েছে। তাছাড়া বাসবী বি. এ. পড়ছে। তারও একটা আলাদা খরচ আছে।

পরে একদিন গিয়েছিলাম করুণাদি'র সংগে দেখা করতে।

আহা! কি চেহারা-ই হয়েছে, দেখলে দুঃখ হয়। ফর্সা মুখটা প্রায় রক্তশূন্য। শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। আবার একটা চশমাও নিয়েছেন আজকাল। এই মানুষ যে একদিন কত আনন্দ করতেন আজ দেখলে তা' বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে দেখে ওঁর নির্জীব চাহনিতে একটু যেন চাঞ্চল্য জাগল। সামনে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সব জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আবার বিষাদের মূর্তি হয়ে গেলেন।

এর পর পুরনো সম্বন্ধটা আবার খানিক খানিক ফিরে এল। সুরু হোল, দু' বাড়ীতে যাতায়াত। কিন্তু হাজারীবাগের সেই প্রাণ এখানে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ইট-কাঠ-পাথরের চেয়ে অবস্থার চাপায় পড়া আরও অসহনীয়, আরও যন্ত্রণাদায়ক। সেটাতে মানুষের প্রাণটাকে দণ্ডে দণ্ডে বার করে নেয় কিনা, একবারে তো' শেষ করে না। করুণাদি'র তাই হয়েছে।

তুমি জান, আগে অফিস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরীতে আসতাম। একটু পড়াশুনা করে, যেতাম সেই হাজরা লেনে। কেন, তাও তুমি জান। কোন-কোনদিন হয়ত বা দল বেঁধে সিনেমা দেখতেও গেছি। কিন্তু কোলকাতায় বাসবীদের সংগে নতুন করে দেখা হবার পরই আমার রুটিন বদলাল। অফিস ছুটির পর আর লাইব্রেরী না গিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিনই করুণাদি'দের বাড়ীতে যেতে লাগলাম। অবশ্যই বাসবীর টানে। কখনো কখনো বাসবীকে আসতে বলেছি মেট্রো সিনেমার সামনে, নয়তো ভিক্টোরিয়ায়।

বাসবী বুঝেছিল, স্থান পরিবর্তনের আগেই বয়স আর মনটার মধ্যে প্রচুর অদলবদল হয়ে গেছে আমাদের। আমি কেন যাই, আকারে ইঙ্গিতে কি বলতে চাই, বুঝতে ওর এতটুকু দেরি হয়নি। একদিন হঠাৎ বাসবী আমাকে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা শেষ অবধি আমার সম্বন্ধে তুমি কি ইচ্ছে কর বল তো'?

প্রথমটায় আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বেশ করে তাকালাম ওর দিকে। মুখে যেন একটু কৌতুকের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। কিন্তু এমন বিশ্রীভাবে পা ফেলছে, দেখে আমার কেমন ঘেন্না-ঘেন্না করতে লাগল।

আমি নিজের ঘেন্না-ভাবকে গলায় এবং চোখে তিলমাত্র প্রকাশ করতে না দিয়ে যথেষ্ট মোলায়েম স্বরে বললাম,—'কি আবার, ইচ্ছের কি কিছু শেষ আছে? তবে আমার বিশেষ ইচ্ছে তোমাকে যেন আরও বেশী করে ভালোবাসতে পাই, আর খুব শীগগির-ই দুজনে মিলে যেন একটা ছোট করে সংসার পাততে পাই। যেখানে কেউ থাকবে না, কিছু থাক না—শুধু তুমি, আমি আর আমাদের ভালোবাসা'।

খুব জোরে জোরে হেসে উঠেছিল বাসবী। তারপর লান্সডাউনের অন্ধকারে মুখ নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল,—'এ সব কথা কি অত সহজে বলা যায়, অত সহজে বলবার কথা এগুলো?'

আমি চমকে উঠলাম। সেই আমার প্রথম মনে হোল যে, বাসবী যেন খুব কাছের মানুষ নয়। আমি যেন ওকে ঠিক ধরতে পারছি না। বাসবী অন্ধকারের দেহ। অন্ধকারের জমাট রূপটাই শুধু আঁচ করা যায়, কিন্তু তার দেহ? তাকে তো' ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। বাসবী বোধহয় তাই।

পরক্ষণেই অবশ্য আমার সে মনোভাব কেটে গেছে। কারণ আমি তো' ওকে জানি। কথাগুলো ও নিশ্চয় হাল্কা করেই বলেছিল। ও যে হাল্কা তা আমি জানতাম। গুরুতর কথা মোটেই বলতে পারে না। আর সব ব্যাপারে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে হাসে। ওর রকম-সকম এক এক সময় আমার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকেছে। আর বা গায়ে পড়া! ভয়-ডর বলে কিছু নেই।

আমি বরং মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভেবেছি যে, এমন লজ্জাহীনতা, এমন বিলিয়ে দেওয়া বাসবী কেন—ইত্যাদি (তখন কি বুঝেছিলাম, আমার রঙ সাদা হলে কি হবে, বাসবী মনে মনে আমার চেয়ে অনেক সাদা, অনেক সিধে, তাই তো পারে অমন করে—ইত্যাদি)।

এই বাসবী।

এই বাসবী কিন্তু আজ আমায় ভাবিয়েছে। আমার সব ভাবনাগুলো আজ যেন গঙ্গাজল হয়ে যেতে চাইছে। আর বাসবী যেন শঙ্খিনী। সাদা ধবধবে এক নায়িকা। যেন শাঁখ গলে-গলে পড়ছে ওর সব তাতে।

বেড়াতে বেড়াতে আজ বিকেলে আমরা দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলাম। অফিসে মন টিকছিল না। সকাল থেকেই প্রচণ্ড একটা নিস্পৃহতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে খানিকক্ষণ ফুটপাথ মেপেছি তারপর আর থাকতে না পেরে সটাং চলে গিয়েছিলাম বেলেঘাটায়। বাসবী বাড়ীতেই ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল। আমাকে দেখে ফিক্ করে একটু হাসল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আবার চুল বাঁধতে লাগল।

করুণাদি'ও বাসায় ছিলেন। রান্নাঘরের সামনেটায় বসে চালুনি দিয়ে আটা ছাঁকছিলেন। আমাকে দেখে একটু যেন অন্ধকার করে হাসলেন, মুখে বললেন—এসো।

আমি বসে রইলাম। বাড়ীটা একটু ঘুপ্সী-মতো। বিকেলেই সন্ধ্যা নামে। ঠিক পাশে একটা নালা আছে বোধ হয়, তা থেকে আবার মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ আসে। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, এখনকার পৃথিবীটা এমন ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হয়ে গেল কেন? করুণাদি'রা সব এত তাড়াতাড়ি প্রাণ হারালেন কি করে?

আরেকবার দেখলাম করুণাদি'কে। মুখটা নীচু করে একমনে আটা ছেঁকে চলেছেন। শব্দ হচ্ছে একটা আর তার সংগে সংগে ওঁর রোগা পাণ্ডুর শরীরের ওপর দিকটা দুলছে। আটাগুলো ঝুর ঝুর করে পড়ছে—নীচে একটা খবরের কাগজ পাতা। একটা কার্টুন আঁকা রয়েছে কাগজে। মুখটা মানুষের আর বাকী দেহটা জন্তুর। তলায় কি যেন লেখা রয়েছে। আমি বাসবীর দিকে তাকালাম। ও তখন চিরুণী দিয়ে ঘাড়ের কাছের খুচরো চুলগুলোকে ওপরের দিকে তুলে দিচ্ছে। আমার সংগে চোখাচোখি হতেই বলল—চল আমার সংগে, বেরোবে বোধ হয়। আমি তখনও বাসবীকেই দেখছিলাম। আজ যেন ওকে একটু অন্যরকম লাগছে (হয়ত আজ আমি নিজেই একটু অন্যরকম)। এমনিতে তো খুব সুন্দরী নয়। মাঝারী গোছের চেহারায় একখানি শ্রীময়ী মুখ বসানো।

রোজই বেরোই। লোভে বেরোই আকর্ষণে বেরোই আশায় বেরোই। কিন্তু আজ? আজ আমার অস্তিত্বের সবটুকুতে যেন গেরুয়া। কেমন একটা অবসাদ, কেমন একটা শূন্যতা আমাকে ঘিরে। তাই আজও বেরোলাম, তবে যন্ত্রচালিতের মতো, যন্ত্রচালিতের মতো নিয়ে যাচ্ছ তাই যাচ্ছি।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা দক্ষিণেশ্বরে চলে গিয়েছিলাম। এটা অবশ্য বাসবীরই মতলব। ভিক্টোরিয়া, চৌরঙ্গী আর লেক ঘুরে ঘুরে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোলকাতাটা সত্যিই কি এত ছোট? এত ক্লান্তিকর?

পথে যেতে যেত বাসবী আজ কতবার খিলখিল করে হেসেছে, কতবার শরীরটাকে বিশ্রীভাবে দুলিয়েছে তা আমি হিসেব করিনি। অর্দ্ধেক কথা কানে গেছে, অর্দ্ধেক শুধুই হাওয়ায় ভেসেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল।

আমরা চারদিক ঘুরে মন্দিরের ভেতরে গেলাম। আজও একটু অন্যরকম। ওর প্রণামের ভঙ্গীটি ভালো লাগল। সাদা শাড়ী পরেছিল বলে কিনা জানিনা, ওর সবটুকুই আজ শাঁখের মতো ধবধবে। আমাকে বলল, প্রণাম কর। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে প্রণাম করলাম মা কালীকে। তারপর দুজনেই ফিরে আসছিলাম। আমি আগে বাসবী পিছনে। হঠাৎ বাসবী বলল, আচ্ছা সেদিন কি যে সব কথা বলছিলে আজ এখানে দাঁড়িয়ে সেগুলো আবার বলতে পার? আমি হাঁটা থামিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে।

—কি কথা?

—আহা, সেই যে সেদিন গলার বেশ ট্রিমেলো করে কি সব বলছিলে না। মনে নেই? সেই যে ভালোবাসতে চাই, দুজনে মিলে ছোট একটা সংসার পাততে চাই। আরও কি সব যেন বলেছিলে না! বলেই মুখ নীচু করল বাসবী। আমি ওর লজ্জাবনত ভঙ্গীটার দিকে একটু তাকিয়ে হেসে ফেললাম।

—ও, এই কথা! তা একবার কেন কতবার আমাকে দিয়ে সে কথা বলাতে চাও বাসবী? আমি হাজারবার বলেও ধন্য হব (তখনও জানিনা কি পরিমাণ ছলনার আশ্রয় নিচ্ছি)।

নেমে এসেছিলাম খানিকটা। আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি এমন সময় বাসবী পিছন থেকে বলে উঠল,—'দাঁড়াও'।

আমি মুখ ফিরিয়ে বাসবীর দিকে তাকাতেই ওর চোখ দু'টো নজরে এল। একি, চোখে সেই কৌতুক আর কৌতুহলের নাচ কই? বাইরেটা অমন গভীর, গম্ভীর, স্তম্ভিত কেন? এ বাসবীকে তো আমি চিনি না! ওর গলা শুনে মনে হোল যেন অনেকদূর থেকে, অনেককাল পেরিয়ে, কথাগুলো ভেসে আসছে! বাসবী বলল, 'বরং তোমার বলে কাজ নেই'।

আমি নীরব। বাসবী আমাকে সম্মোহিত করেছে। আমি যেন মঞ্চে উঠে আমার পার্ট ভুলেছি। বাসবী বলতে লাগল, 'কি দরকার অপরাধ বাড়িয়ে। দেখ, মানুষের মন আজকাল বড্ড ব্যভিচারী হয়েছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, কতভাবে কতকিছুর বিনিময়ে যে বিকিয়ে যাচ্ছে—একটুকু লোভের বা লাভের কিছু পেলেই তার পেছনে ছুটছে সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তাই তোমাকে আর সে পাপের মধ্যে টানি কেন? তুমি তো মানুষ এবং আজকালকারই মানুষ! তুমিও রঙে ভোল, ঢঙে ভোল। প্রলোভনের হাতছানিকে তোমার তো উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই, সব খুইয়ে একটা বিশেষ শক্তির কাছে তুমিও নিজেকে বিলিয়ে দাও—তাই কাজ কি। তার চেয়ে এই তো ভালো। বলেই আবার সেই হাসি হাসল, তার পর আমার হাত ধরে হাল্কা স্বরে বলল—চল।

বেড়ানোর নেশা কেটে গিয়েছিল। আমি মরমে মরে যাচ্ছিলাম। বাড়ী ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম। আমার সব ভাবনা ধীরে ধীরে গঙ্গাজল হয়ে গেল। কেন বলল? বাসবী ওই বেয়াড়া কথাগুলো কেন বলল (তবে কি ও আমাকে কড়ায়-গণ্ডায় চিনে ফেলেছিল, আমি কি সত্যিই তাই?) এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে মনের ভেতরটা হাতড়াতে হাতড়াতে এক সময় বুঝলাম,—না, বাসবী ঠিকই বলেছিল। কিছু অন্যায় বলে নি। আমিই ওকে চিনতে ভুল করেছি। বরং ওর জন্যে নিজেকে চিনলাম আজ। আমার মুখ থেকে থেকে একটা মুখোস সরে গেল।

ছোটবেলায় একরকম ছিলাম বটে। কিন্তু এখন? সত্যিই তো বয়স বাড়ার সঙ্গে কত রকমের লোভ ও লালসার হাতছানিতে যে নিজেকে বিকিয়েছি তার কি কোন হিসেব আছে? সত্যিই তো, আত্মরক্ষা করতে পারি নি আমি, বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করতে পারিনি। জোয়ারের মুখে কুটোর মতই ভেসে গেছি। সব সত্যি। সব সব। আর সেই বিকোতে বিকোতে, বিলোতে বিলোতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আপোষ করতে করতে আমার আসল রূপটা কবে হারিয়ে গেছে, মরে গেছে। আমি ঘোরতর রূপবিলাসী হয়ে উঠেছি। নিজেই জানতে পারিনি কখন আমার পণ্য, বস্তু প্রগল্ভ রূপটাই আজকের আমির সংগে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে। তা না হলে আমি কি বাসবীকে বলতে পেরেছি যে, একদিন তোমার সংগে যা করেছি তা সব মিথ্যে, তার সবটুকুই ছলাকলা? তোমারও যৌবনোদ্ধত দেহকে ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাইনি তোমার মধ্যে? বলতে পেরেছি কি যে, তোমাকে আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসতে পারি না? কারণ, তুমি আমার জীবনে আসার অনেক আগেই আরেকজনকে আমি ভালোবেসেছি, তাকেও অমনি করে বলেছি, কথা দিয়েছি। অন্ধকারের শরীর মাড়িয়ে ভিক্টোরিয়া দিয়ে যেতে যেতে সে-ও আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছে,—'আচ্ছা তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাসো?'

আমি প্রথমটায় মিষ্টি করে হেসেছি তারপর অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো গলায় যেখানে যতটুকু জোর দেওয়া দরকার, কাঁপানো দরকার ঠিক ততটুকু করে বলেছি—'সেকথা আমি হাজার বার বলেও ধন্য হব'।

এখন তুমি-ই বল হৃদয়, আমি সেই উদ্দালকের বৌ হয়েছি গেছি কিনা! আমরা!

ভাগ্যচক্র

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মিখাইল শোলোকভ

হ্যাঁ, আগের দিন আমি যে সেই কিউবিক মিটারের কথা বলেছিলাম তার জন্যে আমার তলব পড়লো ক্যাম্প কমাণ্ডারের শিবিরে। সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে একজন দোভাষী সঙ্গে দুজন পাহারাওলা নিয়ে এলো। শোকোলভ এণ্ড্রী কার নাম? আমি সাড়া দিলাম। আমাদের সঙ্গে চল। হের কমাণ্ডার তোমার সঙ্গে নিজে দেখা করতে চান। আমি বুঝলাম আমার ডাক কি কারণ পড়েছে। আমাকে শেষ করে দেবে এখুনি।

আমার সঙ্গীদের কাছে বিদায় চাইলাম। ওরাও বুঝলো এ আমার মৃত্যুযাত্রা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চললাম। ক্যাম্পের প্রান্তসীমায় এসে একবার আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকালাম। ওদের কাছেও বিদায় চাইলাম। মনে মনে ভাবলাম—এণ্ড্রী শোকোলভ, ১নং কয়েদী এইবার তুমি অত্যাচারের শেষধাপের মুখোমুখি হতে চলেছ। ইরিণা আর ছেলেমেয়েগুলোর কথা মনে এলো একবার। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভয়ানক। তবু আমার শরীরে সমস্ত সাহস ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। পিস্তলের চকচকে নলের সামনে দাঁড়িয়ে যেন একটুও ভয় না পাই। একজন সত্যিকারের বীর সেনানীর মত যেন মরতে পারি। আমার জীবনের প্রতি মায়ার কথা যেন শত্রুরা কোন মতে টের না পায়। তার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম মনে মনে।

কমাণ্ডারের ঘরের জানলায় ফুল সাজানো রয়েছে। মনে হলো ঘরটা যেন আমাদের একটা ক্লাবের মত সুন্দর আর পরিষ্কার। টেবিলের চার পাশে ক্যাম্পের সমস্ত অফিসাররা বসে আছে। ওরা সবাই মদে চুর হয়ে বসে বসে শূয়োরের চর্বি চুষছে। টেবিলের ওপর একটা বোতল খোলা আছে, রুটি, শূয়োরের চর্বি, আপেলের রস; আরও নানারকম সব খাবারের টিন সাজানো রয়েছে। আমি একবার সেই খাবারের দিকে তাকালাম, বললে হয়তো বিশ্বাস হবে না দোস্ত, আমি কিন্তু এগুলো দেখেই ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার মনে হলো হয়তো বা এখুনি বমি হয়ে যাবে। আমি সে সময় নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। মানুষকে কি ভাবে খাবারের দিকে তাকাতে হয় তাও আমি প্রায় ভুলতে বসেছি। আমার সামনে এই সব ভালো ভালো খাবারের রাশি। বহু কষ্টে আমি নিজেকে সংযত করলাম। খাবারগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আনতে চোখে জল এসে গেল।

আধামত্ত অবস্থায় আমার ডানদিকে মুলার বসে আছে। পিস্তলটা নিয়ে এ হাত থেকে ওহাতে লোফালুফি করছে। আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে সাপের মত। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা গোড়ালিটা এক জায়গা করে তার পর বেশ জোর দিয়ে ঘোষণা করলাম: হের কমাণ্ডার, যুদ্ধবন্দী এণ্ড্রী শোকোলভ আপনার সামনে হাজির। ও আমার দিকে চেয়ে বললো—আচ্ছা ঠিক আছে। তুমিই সেই রুশ শয়তান। তোমার পক্ষে চার কিউবিক মিটার পাথর কাটা খুব বেশী মনে হচ্ছে কেমন? আমি উত্তর দিলাম—ঠিক কথা কমাণ্ডার। হুঁ আর এক কিউবিক মিটার তোমার কবরের জন্যে যথেষ্ট কেমন? হ্যাঁ, হের কমাণ্ডার। যথেষ্ট। এমন কি বেশীই বলা চলে।

লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো: এই কথা বলার জন্য আমি তোমায় প্রচুর সম্মান দেবো, এখুনি তোমায় গুলী করে মারা হবে। এখানে এখন গুলী করলে গোলমাল হতে পারে, মাঠে চল সেখানেই তোমায় খতম করে আসি। আপনার যা অভিরুচি। আমি ওকে জবাব দিলাম। এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে নিয়ে কমাণ্ডার হাতের পিস্তলটা টেবিলে রেখে একটা গ্লাসে মদ ঢাললে, এক টুকরো রুটিতে খানিকটা শূয়োরের চর্বি দিয়ে আমার সামনে এনে বললো—ওহে রুশ শয়তান, মরবার আগে জার্মাণ বাহিনীর জয়লাভ উপলক্ষে এই ভোজ খেয়ে নাও।

আমি ওর হাত থেকে মদের গ্লাস আর রুটির টুকরোটা নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই শুনলাম ওই কথা অমনি আমার অন্তরটা দপ করে জ্বলে উঠলো যেন। ভাবলাম, একজন রুশ সৈনিক হয়ে আমি জার্মাণদের বিজয়োৎসবের ভোজের অংশ নেব? আমাকে নিয়ে আর কি করাতে চান হের কমাণ্ডার? আপনার মদ আপনি নিয়ে যান।

আমি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম—আপনার এই আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি পান করতে পারবো না। ওর মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠলো। ওঃ তাহলে তুমি আমাদের বিজয়োৎসবের ভোজ নেবে না? ভালো কথা। তাহলে তোমার মৃত্যু উপলক্ষে এই খাবার নাও।

এর পর আর প্রত্যাখ্যান করার কিছুই নেই। মৃত্যুতেই যখন আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হবে তখন এটুকু নিতে ক্ষতি কি? গ্লাসটা তুলে নিয়ে সমস্ত মদটা দু ঢোকে গলায় ঢেলে দিলাম। কিন্তু রুটির টুকরো ছুঁলাম না। হাত দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বললাম—আপনার এই সৌজন্যতার জন্য ধন্যবাদ। আমি প্রস্তুত হের কমাণ্ডার। এবার আমায় আপনি হত্যা করতে পারেন।

লোকটা কিন্তু আমার দিকে তীব্রদৃষ্টি হেনে বললো: মরবার আগে একটু খেয়ে নাও। এক গ্লাস মদ খাওয়ার পর আমি কিছুই খাই না। ওকে জবাব দিলাম আমি। ও তখন দ্বিতীয়বার গ্লাস ভর্তি করে দিল। আমি আবার সেটা পান করলাম কিন্তু এবারেও খাবার নিলাম না। আমি এ সব যা কিছু করছিলাম খুব সাহসের সঙ্গেই করছিলাম। ভাবলাম, মরতে যাবার আগে না হয় খানিকটা মদ খেয়েই যাই। কমাণ্ডার আমার

দিকে তাকিয়ে বললো—ওহে রুশ সৈনিক, কেন খাবে না বলতো! না না, বিষ-টিষ কিছু নেই এতে। আমি বন্দুকটা ঠুকে বললাম—ক্ষমা করবেন হের কমাণ্ডার! আমি দ্বিতীয় গ্লাসের পরও খাবার ছুঁই না। লোকটা হঠাৎ মুখটা ফাঁক করে নাকের মধ্যে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে বিকট হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই খুব তাড়াতাড়ি জার্মাণ ভাষাতে কি সব বলে গেল গড়গড় করে। মনে হলো যেন আমার কথাগুলোই ওর বন্ধুদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে শোনালো। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো হো-হো করে। চেয়ারগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিল। মগগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা আমার দিকে চেয়ে রইলো ওরা সবাই। ওদের সেই চাউনিতে আমি যেন অন্য কিছু দেখলাম। মনে হলো চাউনিটা যেন কিছুটা নরম।

কমাণ্ডার যখন আবার তৃতীয় বার আমার গ্লাসটা ভর্তি করছিল তখনও ওর হাত হাসির গমকে রীতিমত কাঁপছিল। আমি আস্তে আস্তে সে গ্লাসটা শেষ করে রুটির টুকরো থেকে সামান্য তুলে নিয়ে বাকীটা টেবিলে রেখে দিলাম। আমি শয়তানগুলোকে দেখিয়ে দিতে চাই যদিও আমি ক্ষিধের চোটে মৃতপ্রায় আর সেই সময় ওরা এই সংকটজনক অবস্থায় ফেলে আমার রুশীয় মর্যাদা আর গর্বকে পদদলিত করে পশুতে পরিণত করতে চেয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হতে হলো ওদের।

এর পর আবার কমাণ্ডারের মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠলো। বুকের সঙ্গে কুটোর লোহার ক্রশ এঁটে টেবিলের পিছন থেকে বেরিয়ে এলো সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে। বললো: দেখ শোকোলভ, তুমি প্রকৃত রুশ সৈনিক। একজন আসল যোদ্ধা। আমিও সৈনিক এবং উপযুক্ত শত্রুকে আমি শ্রদ্ধা করি। শোনো—আমি তোমায় গুলী করবো না। আমাদের ফৌজ ভল্গা পৌঁছে গেছে। স্তালিনগ্রাদ পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে। এটা আমাদের বিরাট সাফল্যের সংবাদ। আর সেই বিজয়োৎসবে আমি তোমার প্রাণভিক্ষা দিলাম। যাও, তোমার ক্যাম্পে ফিরে যাও। আর এই খাবারগুলো নিয়ে যাও। তোমার সাহসিকতার পুরস্কার। টেবিলের ওপর থেকে একটা পাঁউরুটি আর খানিকটা শূয়োরের চর্বি তুলে আমার হাতে দিল। যতটা জোরে পারলাম রুটিটা আমার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম। বাঁ হাতে চর্বিটা তুলে নিলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি এতখানি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে দরজার দিকে ফিরবার সময় কমাণ্ডারকে ধন্যবাদ জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। তখনও ভাবছিলাম যে কোন মুহূর্তেই আমার মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এত খাবার আমি আমার সাথীদের জন্যে নিয়ে যেতে পারবো না কিছুতেই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কিছুই হলো না আমার। মৃত্যু আবার আমার পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল। আমি তার শীতল নিঃশ্বাসের আভাসটুকু মাত্র অনুভব করলাম।

আমি কমাণ্ডারের ঘর থেকে অবিচলিত অবস্থায় বাইরে এলাম বটে কিন্তু বাকী পথটুকু আমি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলাম। কাৎ হয়ে কোন রকমে ক্যাম্পে ঢুকেই সিমেন্টবাঁধানো মেঝেতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সাথীদের সহযোগিতায় যখন আমার চেতনা হলো তখনও চারিদিকে বেশ অন্ধকার। ওরা আমায় প্রশ্ন করলো কি ব্যাপার ভাই? আবার মনে পড়লো কমাণ্ডারের সব কথা। ওদের কাছে ঘটনাটা খুলে বললাম। আমার ঠিক পাশের মাচার লোকটা প্রশ্ন করলো—খাবারগুলো কি ভাবে ভাগ করবো? সকলেরই সমান ভাগ। আমি উত্তর দিলাম ওকে। সকলেই আমরা একটা দেশলাই বাক্সের সমান রুটির টুকরো ভাগে পেলাম। সামান্য গুঁড়ো পর্যন্ত নষ্ট হলো না। আর চর্বি যা ভাগে পেলাম তাতে কোন রকমে ঠোঁটটুকু চক্‌চকে করা চলতে পারে মাত্র। তবু আমরা এই ভাগ-বাঁটোয়ারাতেই খুশী হলাম খুব।

ওরা আমাদের মধ্যে থেকে বলিষ্ঠ দেখে প্রায় শ' তিনেক বন্দীকে একটা জলার জল নিকাশের কাজে পাঠালো। সেখান থেকে গেলাম রুঢ়-এর কয়লাখনিতে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আমি ওখানে রইলাম। এই সময়ে আমাদের আরও অনেকে জার্মাণীর মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর থেকে দেখলাম ফ্যাসিস্তরা বন্দীদের ওপর আর আগের মত কড়া পাহারা রাখলো না। একদিন ওরা সমস্ত দিন আমাদের সকলকে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখলো, কয়েকজন অফিসার বন্দীদের পরিদর্শন করতে এসে ঘোষণা করলেন—যারা যুদ্ধের সময় সৈন্য-বিভাগে কিংবা যুদ্ধের আগেও যারা মোটর ড্রাইভারের কাজ করেছ তারা লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এস। মাত্র এগারো জন আমরা লাইন থেকে এগিয়ে এলাম। ওরা আমাদের ক'জনকে গোটা কয়েক ঢিলা পায়জামা দিয়ে পাহারাওয়ালার সঙ্গে পোট্‌সডাম নিয়ে চললো। সেই সময়টায় জার্মাণরা রাস্তাঘাট তৈরী আর নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ওপেল অ্যাডমিরাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক জার্মাণ মেজরের কাছে আমি বহাল হলাম। লোকটা আস্ত ফ্যাসিস্ত শূয়োর। বেঁটে লোকটার জালার মত পেট। লম্বা-চওড়াতে একেবারে সমান। পেছন থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি কোন গর্ভবতী যুবতী। ব্যাচারাকে বোধ হয় বেশ কয়েক হন্দর চর্বি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন হেঁটে চলে মনে হয় একটা ষ্টিম ইঞ্জিন গড়িয়ে চলেছে বুঝি। আর যখন খাওয়ার জন্য চেপে বসে তখন পুরো একটা দিন ধরে সমানে চিবোবে আর বোতলের পর বোতল মদ গিলে যাবে। হামেশাই আমাকে এরকম পরিস্থিতির সামনে পড়তে হতো। মাঝ রাস্তাতেই হয়তো আমায় গাড়ী থামাতে বলে শশা আর সসেজ কেটে মদ গিলতে আরম্ভ করে দিল। আর মেজাজ ভালো থাকলে মাঝে মাঝে আমার দিকে এক আধ টুকরো ছুঁড়ে দিতো কুকুরকে দেওয়ার মতো।

লোকটা কোন দিনও আমায় নিজের হাতে তুলে কিছু দেয়নি। একদিনও না। হয়তো ওটা ওর বিবেচনার বাইরে। তবু ক্যাম্পের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না কোন মতেই। এখানে আমি আবার আস্তে আস্তে মানুষের মত হতে লাগলাম। আমার ওজন বেড়ে গেল।

প্রায় হপ্তা দুয়েক ধরে প্রায় প্রতিদিনই আমায় মেজরকে নিয়ে পোটসডাম আর বার্লিন যাতায়াত করতে হতো। সেই সময়টাই মেজরকে আমাদের রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলো। আমি তখন রাত্রে ঘুম কা'কে বলে একেবারে ভুলে গেলাম। আমি কেবল চিন্তা করতাম কি ভাবে ফ্যাসিস্তদের হাত থেকে আমাদের বাহিনীকে রক্ষা করা যায়, কি উপায়ে আমার দেশকে বাঁচানো যায়। একদিন আমার গাড়ী নিয়ে যেতে হোলো পোলোতস্ক শহরে। গত দু'বছরের মধ্যে এই প্রথম

আমি আমার নিজের দেশের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার শব্দ শুনতে পেলাম। আশা করি বুঝতে পারছেন আমার সেই মুহূর্তের মানসিক চাঞ্চল্যটা। এমন কি আমার প্রাণের ইরিণার সঙ্গে প্রথম মিলনের সময়ও আমার মনে অতখানি উত্তেজনা আসেনি। আমার দেশের বাহিনী আমার কাছ থেকে তখন মাত্র আঠারো কিলোমিটার দূরে ইষ্ট পোলোস্ককে যুদ্ধ করছে। শহরের যে দিকটায় জার্মাণরা আছে সেখানটাকে আস্ত নরকে পরিণত করে রেখেছে। সব সময় হৈ হল্লা গোলমাল চেঁচামেচি। আমার জালাটি দিন-রাত মদ গিলতে আরম্ভ করলো। দিনের বেলায় কোন রকমে ঘুরে ঘুরে কোথায় কি ভাবে সৈন্য সামন্ত সাজানো হবে, কোথায় শিবির হবে এই সব নির্দেশ দিয়ে বেড়াতো আর রাত্রে আরম্ভ করতো মদ গিলতে। ভোগের সমস্ত উপকরণ সর্বদাই ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। অসুবিধা ছিল না কিছুই।

ভাবলাম আর অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। এই সুবর্ণ সুযোগ। আমি অবশ্য তখুনি একলা পালালাম না, কারণ আমার সঙ্গের বৃদ্ধ জালাটি আমাদের অনেক কাজে আসবে।

ঘুরতে ঘুরতে ধ্বংসাবশেষের ভেতর একটা লোহার ডাণ্ডা পেলাম আর সেটাকে একটা ছেঁড়া কম্বলে জড়িয়ে রেখে দিলাম। এটা দিয়ে কাউকে আঘাত করলে একটুও রক্তপাত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। খানিকটা লম্বা টেলিফোনের তার জোগাড় করলাম। আমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই সংগ্রহ করে গাড়ীর সামনের সীটের নীচে লুকিয়ে রাখলাম। দু'দিন পর এক সন্ধ্যায় জার্মাণদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার গন্তব্য স্থান থেকে ফিরবার পথে দেখলাম একজন জার্মাণ সৈন্য মাতাল হয়ে দেওয়াল ধরে ধরে কোন রকমে টলতে টলতে চলছে। আমি হতভাগাটাকে একটা পোড়ো বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর গা থেকে সমস্ত পোষাকগুলো খুলে নিলাম। মাথার টুপিটাও বাদ দিলাম না। সবগুলোকে আমার সীটের নীচে রেখে প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

২১শে জুন সকালে আমার মেজর আমায় ডেকে ওঁকে শহরের বাইরে ট্রাসনিৎসার দিকে নিয়ে যাবার হুকুম করলেন। ওখানে কতকগুলো বাড়ী তৈরী করার দায়িত্ব ছিল মেজরের ওপর। আমরা গাড়ী নিয়ে বের হলাম। মেজর গাড়ীর পিছনের সীটে নিশ্চিন্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বসে আছেন আর সামনের সীটে প্রবল উত্তেজনায় আমি গাড়ী চলাচ্ছি। উত্তেজনায় বুঝি আমার হৃৎপিণ্ডটা পর্যন্ত মুখের কাছে ঠেলে ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। প্রথমটা খুব জোরে গাড়ী চালাচ্ছিলাম, তারপর শহরের বাইরে এসে গতি কম করে আস্তে আস্তে একেবারে থামিয়ে দিলাম। গাড়ী থেকে নেমে এসে বাইরের চারিদিক বেশ ভালো করে দেখে নিলাম একবার। অনেক দূরে খান দুয়েক লরী এগিয়ে আসছে। লোহার ডাণ্ডাটা বের করে নিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে ফেললাম। দেখলাম আমার সেই বুড়ো জালাটা দিব্বি আরামে নাক ডাকাচ্ছে, ব্যাটা যেন পাশে বৌ নিয়ে শুয়েছে! আমি ডাণ্ডা দিয়ে ওর বাঁদিককার রগে আঘাত করলাম। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। আরও নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য ওকে আর এক ঘা বসালাম। ওকে একেবারে মেরে ফেলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ওকে আমি জীবিতাবস্থায় নিয়ে যেতে চাই। ওর কাছ থেকে আমাদের লোকেরা অনেক সংবাদ আদায় করে নিতে পারবে। ওর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিজের পকেটে ঢোকালাম। তারপর সিটের পিছনে একটা ব্র্যাকেট বসিয়ে তার সঙ্গে টেলিফোনের তার দিয়ে বেশ শক্ত করে ওকে বাঁধলাম। জোরে গাড়ী চালাবার সময় যেন কাত হয়ে না পড়ে যায়। জার্মান সৈন্যের পোষাকটা বের করে পরে নিলাম। সোজা গাড়ী চালিয়ে দিলাম যেখানে মাটি কাঁপছে, যুদ্ধ হচ্ছে।

আমি যেই জার্মাণদের সীমান্তরেখা পার হতে উদ্যত হয়েছি অমনি ওদের একদল সৈন্য গর্ত থেকে বের হয়ে ছুটে এলো আমার দিকে। আমি ইচ্ছা করে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলাম—কারণ ওরা আমার গাড়ীতে ওদের একজন মেজরকে দেখুক এটাই আমি চাই। ওরা আমায় অস্ত্র তুলে চীৎকার করে সীমান্ত পার হতে নিষেধ করলো কিন্তু আমি ওদের সংকেত না বোঝার ভাণ করে হঠাৎ আশী মাইল গতিতে পার হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা আসলে কি ঘটছে বুঝে ওরা গুলী চালাবার আগেই নো-ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড'-এ পৌঁছে আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

পিছনে জার্মাণদের গুলী আর সামনে থেকে আমার দিকে তেড়ে আসছে। গাড়ীর রেডিয়েটারে চারটে গুলী লাগলো। আমি কোন রকমে কাছেই একটা লেকের পাশে ঝোপ লক্ষ্য করে চললাম। আমাদের কয়েকজন সৈন্য আমার গাড়ীর দিকে দৌড়ে এলো। আমি ঝোপের ভেতর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। দরজাটা খুলে নেমে পড়লাম মাটিতে। দেশের মাটিকে চুম্বন করলাম বার বার। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে।

একজন যুবক পোষাকে একটা নোতুন ধরণের খাকী ফিতে এঁটে আমার কাছে এগিয়ে এসে দাঁত বের করে বললো—কি রে শয়তান! রাস্তা ভুল করেছিস বুঝি? আমি আমার জার্মাণ সৈনিকের পোষাক ছিঁড়ে টুপিটা পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে বললাম—ওহে ছোকরা! আমি যেদিন ভোরোনেজ-এ জন্মেছি, ওখানকার জল-হাওয়ায় বড় হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমি শয়তান। আমি একজন যুদ্ধবন্দী, বুঝলে? গাড়ীতে এক ব্যাটা ভোঁদা শূয়োর আছে। ওটাকে টেনে নামিয়ে ওর সমস্ত কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তোমাদের কমাণ্ডারের কাছে নিয়ে যাও। আমার পিস্তলটা ওর হাতে তুলে দিয়ে সন্ধ্যের সময় আমাদের বাহিনীর কর্ণেলের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলার আগে পর্যন্ত সকলের সঙ্গে একে একে দেখা করতে লাগলাম। ওরা আমায় খেতে দিল, স্নানের ঘরে পাঠালো, নানা প্রশ্ন করলো। তারপর কর্ণেলের আদেশ অনুযায়ী আমি দেহে এবং মনে পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠিকমত পোষাক পরিচ্ছদ পরে কর্ণেলের সামনে হাজির হলাম। কর্ণেল টেবিল থেকে আমার কাছে উঠে এসে অন্যান্য অফিসারদের সামনে আমার হাত ধরে অভিনন্দন জানালেন। বললেন—সৈনিক, তুমি আমাদের যা উপহার দিয়েছ তার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ! তোমার জার্মাণ মেজর আর তার কাগজপত্র থেকে আমরা যা পেয়েছি সে জিনিষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুড়ি জন সৈনিককে ধরে আনলেও পাওয়া যেত না। আমি তোমাকে উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করবার জন্য ওপরে সুপারিশ করবো। কর্ণেলের সহৃদয় ব্যবহারে এতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুতেই আর ঠোঁটের কাঁপুনি বন্ধ

করতে পারছিলাম না। শেষে বললাম—কমরেড কর্ণেল, আপনি আমায় পদাতিক বাহিনীতে ভর্তি করে নিন।

কর্ণেল হেসে উঠে আমার কাঁধে একটা সস্নেহ চাপড় মেরে বললেন—যখন তোমার নিজের পায়ে ভর দিয়ে ভালো ভাবে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই, তখন তুমি কি করে যুদ্ধ করবে বলতো? আমি তোমাকে এখন সোজা হাসপাতালে পাঠাবো। ওরা তোমার ঠিকমত চিকিৎসা করে—তোমার শরীরে কিছু খাবার ঢোকাবে। তারপর এক মাসের ছুটিতে বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আমাদের কাছে ফিরে এলে তখন আমরা বিবেচনা করে দেখবো কোথায় তোমায় দেওয়া যাবে।

কর্ণেল আর অন্যান্য অফিসারেরা আমায় করমর্দন করে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। আমি বেরিয়ে এলাম। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। কারণ গত দু'বছর ধরে আমি প্রায় ভুলেই গেছি যে এ দুনিয়ায় কেউ আমার সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতে পারে। বুঝলেন দোস্ত, পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার সময় মার খাওয়ার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকাটা অনেক দিনের অভ্যাস হয়ে গেছে। এতকাল এই রকম শিক্ষাই আমরা ফ্যাসিস্ত ক্যাম্পে পেয়ে এসেছি।

হাসপাতালে পৌঁছেই ইরিণাকে চিঠি লিখলাম। কয়েকটা কথা ওকে জানালাম। কেমন করে যুদ্ধে বন্দী হলাম আর কি ভাবে মেজরকে নিয়ে পালিয়ে এলাম সে সব কথা লিখলাম। ছেলেরা কোথায় কি ভাবে আমায় প্রশংসা করলো সে সব কথা বললাম না, আর কর্ণেল কেন আমায় পুরস্কৃত করার জন্য সুপারিশ করবেন সে কথাও লিখলাম না।

সম্পূর্ণ দুটো হপ্তা আমি শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটালাম। ওরা আমায় খাবার দিত পরিমাণে অল্প কিন্তু বারে বেশী। ডাক্তার বলতো আমি যা খেতে চাই তা যদি এক সঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু ওই প্রথম দুটো হপ্তা পরে আর আমি একেবারে খাবারের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারতাম না। বাড়ীর থেকে চিঠির কোন জবাব নেই। আমি মদ খেতে আরম্ভ করলাম। খাওয়াদাওয়ার কথা আমি ভুলে গেলাম। ঘুম আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না। সমস্ত রকম অসৎ চিন্তায় সব সময় আমার মাথা বোঝাই হয়ে থাকতো। তৃতীয় সপ্তাহে ভোরোনেজ থেকে চিঠি এলো। ইরিণার কাছ থেকে নয়, আমার এক প্রতিবেশী বন্ধু ছুতোর মিস্ত্রীর কাছ থেকে। আমি প্রার্থনা করি আর কেউ যেন কোনদিন কারও কাছ থেকে ওরকম চিঠি না পায়। লিখেছে, আমাদের বাড়ীর পাশে এরোপ্লেন কারখানায় জার্মাণরা বোমা ফেলেছে। একটা বোমা আমার বাড়ীর ওপর পড়েছে। ইরিণা সে সময় মেয়েদের নিয়ে বাড়ীতেই ছিল। পরে আর ওদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। আমার বাড়ীটা যেখানে ছিল সেখানে বর্তমানে বিরাট আগ্নেয়গিরির মুখের মত গর্ত হয়ে গেছে। প্রথমে আমি আর চিঠিটা কিছুতেই শেষ করতে পারলাম না। চোখের সামনে সব অন্ধকার। আমার বুকটা কেউ যেন ভারী কিছু দিয়ে চেপে দিয়েছে—আর বুঝি কোনদিন খুলবে না। বিছানায় কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর একটু শক্তি যেন ফিরে এলো। চিঠির শেষটুকু পড়লাম। আমার প্রতিবেশীটি জানিয়েছে যে বোমা পড়ার সময় এ্যানাটলি ছিল না বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে বাড়ীর বদলে ওই বিরাট কুয়োটা দেখে সেই রাত্রেই চলে গেছে। আর আসেনি। যাবার সময় বলে গেছে যে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যুদ্ধে চলে যাবে। ব্যস। এইখানেই শেষ।

যখন মনটা একটু স্থির হলো অনুভব করলাম যে আমার সমস্ত রক্ত যেন কানের কাছে জমা হয়েছে। মনে পড়লো আমার যুদ্ধযাত্রার সময় বিদায় জানাতে এসে ষ্টেশনে ইরিণা আমায় কি ভাবে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিল। মেয়েটার মন প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিল এ দুনিয়ায় আর আমরা পরস্পরে কোনদিন মিলিত হতে পারবো না। অথচ আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

একদিন আমার পরিপূর্ণ সংসার ছিল। নিজের বাড়ী ছিল। বছরের পর বছর কেটে গেছে ওগুলো তৈরী করতে আর একটা মাত্র ঝলকে সব শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীতে আজ আমি একা পড়ে রইলাম, একা নিঃসম্বল অবস্থায়। জীবনের দুর্ভাগ্য যেন একটা স্বপ্ন বলে মনে হলো। আমার অধিকাংশ রাত্রি আমি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ইরিণার সঙ্গে কথা বলেছি। ছেলেদের কত সান্ত্বনা দিয়েছি। আমি আবার ফিরে আসছি, তোমাদের হতাশ হবার বা দুঃখ করার কিছু নেই। আমি এখনও রীতিমত শক্ত আছি। একদিন নিশ্চয়ই আমরা একসঙ্গে মিলিত হবোই। তাহলে আমি গত দু বছর ধরে কি শুধু ওই মৃত মানুষগুলোর কথাই চিন্তা করে এসেছি? ওদের মৃত আত্মার সঙ্গেই স্বপ্নে জাগরণে কথা বলেছি?

বিরাট মানুষটা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করলো। তারপর হঠাৎ এক সময় বেশ ঝাঁকি দিয়ে জোরের সঙ্গে বলে উঠলো—আসুন দোস্ত, খানিকটা ধূমপান করা যাক। আমার যেন গলটা বন্ধ হয়ে আসছে।

আমরা সিগারেট ধরালাম। জলমগ্ন বনভূমি থেকে কাঠুরেদের কাঠ কাটার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; উষ্ণ বাতাসে অলডার গাছের পাতার খসখসানি শোনা যাচ্ছে; নীল আকাশের বুকে তখনও টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, কেউ বুঝি আকাশের বুকে সাদা সাদা পাল তুলে নৌকা নিয়ে ভেসে চলেছে। কিন্তু এই পবিত্র নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়েই সীমাহীন পৃথিবী বসন্তের আগমনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে, জীবনকে সেই সনাতন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ রাখতে। কিন্তু আজ এসব আমার চোখে অন্য একটা রূপ নিয়ে ধরা দিল।

আমার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠায় আমি ওকে প্রশ্ন করলাম: তারপর কি হোলো কমরেড?

তারপর কি হলো? গল্পকার যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও সাড়া দিল। তারপর আমি কর্ণেলের কাছ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ভোরোনেজ গেলাম। আমি যেখানে আমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করতাম পায়ে হেঁটে সেখানে গেলাম। দেখলাম বিরাট একটা কুয়ো ময়লা জলে ভর্তি। সব শোকে মুহ্যমান। চারিদিক শূন্য। কবরখানার মত নিস্তব্ধ নিষ্প্রাণ। আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। মনে হলো হয়তো আমি এখনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ফিরলাম। একটা ঘণ্টাও আমি সেখানে থাকতে পারলাম না। সেই দিনই আমার সৈন্যবাহিনীতে ফিরে এলাম।

মাস তিনেক পর আমি আবার একটা আকস্মিক আনন্দ-সংবাদ পেলাম। মেঘের ফাঁকে ক্ষণিক রৌদ্রের ঝলকের মত। আমি

আমার এ্যানাটলির সংবাদ পেলাম। অন্ত একটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ও আমায় চিঠি দিয়েছে। আমার সেই প্রতিবেশী বন্ধুটির কাছ থেকেই আমার এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। মনে হয় ছেলেটা সৈন্যবিভাগের কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল আর অল্পদিনের ভালো ফল করার জন্যেই হয়তো সেখানে ভালো সুযোগ পেয়ে গেছে। এক বছর পর সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। ও লিখেছে বর্তমানে ওকে ক্যাপ্টেনের পদে বহাল করা হয়েছে। এখনও পঁয়তাল্লিশ নম্বর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক, তাছাড়া এর মধ্যেই ছ'টা পদক পুরস্কার পেয়েছে। এক কথায় ওর সব পুরোনো বন্ধুদের পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সত্যিই ওই ছেলেটার জন্য আমি রীতিমত গর্ব অনুভব করেছি। আমার ছেলে একটা সৈন্যবিভাগের অধিনায়ক—এ কি যা-তা কথা! তার ওপর সব কটা পুরস্কারও পেয়ে গেছে। বাপ গোলা বোঝাই গাড়ী টানুক আর অন্যেরা সব আরামে বসে থাকবে এটা কোন কাজের কথা নয়। ওর বাপের দিনতো আর শেষ হয়ে এলো কিন্তু সে একজন ক্যাপ্টেন, তারই মাথার ওপর এখন সব কিছুই।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলাম। বৃদ্ধ বয়সের স্বপ্ন। যুদ্ধ শেষ হলে আমি ছেলের বিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে সুখে আবার সংসার পাতবো। আমি ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করবো আর ওদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করবো। যে সব চিন্তা বুড়োরা সাধারণত করে সে সবই ভাবতাম আর কি! কিন্তু দোস্ত, তাও আমার বিফলে গেল। শীতের সময় আমরা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিলাম। পরস্পরের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদানের কদাচিৎ সময় মিলতো আমাদের। যুদ্ধের শেষের দিকে বার্লিনের কাছাকাছি একটা যায়গা থেকে এ্যানাটলিকে চিঠি লিখলাম একটা। তারপর দিনই ওর কাছ থেকে উত্তর পেলাম। বোঝা গেল আমি আর সে জার্মাণ রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পথে। বর্তমানে আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি বাস করছি। আমি ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। দেখা করার লগ্ন এলো। হ্যাঁ, ৯ই মে, আমাদের জয়লাভের দিন সকালে জার্মাণ স্নাইপারদের গুলীতে আমার এ্যানাটলি নিহত হলো।

বিকেলের দিকে আমাদের বিভাগীয় কমাণ্ডার আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম একজন নবাগত অফিসার ওঁর পাশে বসে আছেন। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উনি উঠে দাঁড়ালেন। যেন কোন ওপরওয়ালা অফিসারের সঙ্গে দেখা করছেন। আমার কমাণ্ডার বললেন—ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শোকোলভ! কথাটা বলেই জানালার দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। আমার শরীরের মধ্যে তখন যেন শিরশির করে বিদ্যুৎ-স্রোত বয়ে চলেছে, এগিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। আগন্তুক লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল আমার সামনে এগিয়ে এসে বললেন—আপনি ভেঙ্গে পড়বেন না। আপনার ছেলে আমাদের ক্যাপ্টেন শোকোলভ আজ সকালে তাঁর কামানশ্রেণীর মধ্যেই নিহত হয়েছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।
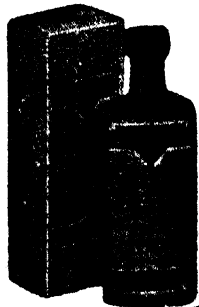
আমি কেঁপে উঠলাম কিন্তু পা ফেললাম ঠিক। লেফটন্যান্ট কর্ণেলের সঙ্গে তার গাড়ীতে চেপে পাথর ছড়ানো পথ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো যেন একটা স্বপ্ন। আমার কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি পথে ভেসে উঠলো সৈনিকরা সার বেঁধে লাল ভেলভেট ঢাকা একটা কফিন বয়ে নিয়ে চলেছে। আপনাকে এখন যেমন পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছি ঠিক তেমনি ভাবেই এ্যানাটলি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। আমি কফিনের কাছে গেলাম। আমার ছেলে শুয়ে ছিল এখানে, এখন আর তাকে দেখলাম না। আমি যে এ্যানাটলিকে চিনতাম তার মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি লেগে থাকতো। কাঁধটা ছিল সরু মত। কিন্তু এখানে দেখলাম একজন পরিপূর্ণ যুবক। কাঁধগুলো বেশ চওড়া। আধখোলা চোখ দিয়ে যেন কোন এক অচেনা জগত থেকে আমায় দেখছে। কেবল ওর ঠোঁটের কোণে আমার বাচ্চার মত মিষ্টি হাসিটুকু লেগে আছে তখনও। এই সেই এ্যানাটলি—যাকে আমি এক কালে চিনতাম কিন্তু আজ আর চিনি না। আমি ওকে শেষবারের মত চুমু খেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। লেফটন্যান্ট কর্ণেল বক্তৃতা করলেন। আমার এ্যানাটলির বন্ধু বান্ধবেরা চোখের জল মুছলো। আমি কিন্তু কাঁদতে পারলাম। আমার সব কিছু জমে যেন পাথর হয়ে গেছে। হয়তো বা এটাই গভীর দুঃখের একটা অনুভূতি।

আমি আমার শেষ সম্বল, আশা-ভরসা-আনন্দটুকুকেও বিদেশী জার্মাণীর মাটিতে কবর দিলাম—কামানগুলো গর্জে ওঠে ওদের ক্যাপ্টেনের অন্তিমযাত্রাকে অভিনন্দিত করলো। আমার হৃদয়টাকে যেন মুচড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। আমি যখন আবার নিজের বাহিনীতে ফিরে এলাম তখন আর আমাতে আমি ছিলাম না। এই ঘটনার পরেই আমি যুদ্ধক্ষেত্র নিবন্ধ হয়ে বিদায় নিলাম। কিন্তু যাবো কোথায়? ভোরোনেজ। না না, সে আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না কোন দিন। মনে পড়লো আমার এক বন্ধু একেবারে অকর্মণ্য হয়ে শীতকালে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বর্তমানে ইউরিপিনস্ক-এ বাস করছে। একবার অবশ্য সেই বন্ধুটি আমায় ওর সঙ্গে বাস করার কথা বলেছিল। ওর কাছেই গেলাম আমি।

ওদের সংসারে কেবল ওরা দুজন। কোন ছেলেপিলে ওদের নেই। শহরের এক প্রান্তে নিজেরা একটা বাড়ী তৈরী করে সেখানেই থাকে। সরকার থেকে অক্ষম ভাতা পায় আর একটা মোটর লরী ডিপোতে ড্রাইভারের কাজ করে। আমিও একটা কাজ পেয়ে গেলাম। বন্ধু আমায় একটা বাড়ী দিল। আমি ওদের সঙ্গেই বাস করতে লাগলাম। আমাদের কাজ ছিলো মফঃস্বলে নানা রকম জিনিষ আদান প্রদান করা আর শরৎকালে কেবল শস্য সরবরাহ করতে হতো। আর এই সময়েই ওই যে ছেলেটি বালিতে খেলা করছে, ওকে পেয়ে গেলাম।

দূর-দূরান্ত থেকে মাল বয়ে এনে আমরা একটা কাফেতে বসে জিরিয়ে নিতাম, এক আধ গ্লাস ভোদকা পান করতাম। সে সময় খারাপ নেশা আমার ভালো লাগতো সে কথা আমি অস্বীকার করি না দোস্ত। একদিন ওই ছেলেটাকে দেখলাম কাফেটার কাছে। পরদিনও দেখলাম আবার। কি ইতর ছেলেটা! গোটা মুখটা তরমুজের রস আর ধুলোতে বোঝাই। অত্যন্ত নোংরা। সমস্ত দেহটা চুলে ভর্তি। কিন্তু আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। যেন বৃষ্টির নির্মল আকাশের বুকে দুটো উজ্জ্বল নীল তারা। ব্যাপারটা হয়তো খুবই হাস্যকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু সত্যিই আমি ওর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়লাম। না দেখে থাকতে পারতাম না। গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি কাফেতে ফিরবার জন্যে সব সময় ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। লোকে যা দয়া করে দিতো তাই ও ওই কাফেতেই বসে খেতো।

চতুর্থ দিনে আমি সরকারী গোলা থেকে লরীতে শস্য বোঝাই করে সোজা কাফেতে চলে এলাম। দেখলাম ছেলেটা সিঁড়িতে বসে পা দোলাচ্ছে। মনে হলো ওর যেন খুব খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আমি লরীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওকে ডাকলাম—এই ভানিয়া, আয়, লাফিয়ে উঠে পড়। মালগুলো নামিয়ে দিয়ে এসে এখানে খাওয়া যাবে। ও আমার ডাকে সিঁড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে চলন্ত গাড়ীর পাদানীতে উঠলো তারপর জানলা দিয়ে ওপরে উঠে এলো। আমার নাম যে ভানিয়া আপনি কেমন করে জানলেন? ছেলেটা তার ওই উজ্জ্বল চোখগুলো বিস্ফারিত করে উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি উত্তর দিলাম—যারা সব কিছু জানতে পারে সেই সব লোকদের মধ্যে আমিও একজন, বুঝলি?

ও ঘুরে আমার ডান পাশে এলো। আমার পাশে বসিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলাম। এমনিতে বেশ প্রাণচঞ্চল ছেলেটা কিন্তু হঠাৎ ভয়ানক শান্ত হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে ওর কোঁকড়ানো চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে লজ্জায় চুপ করে চেয়ে থাকে। আবার এরই মধ্যে লজ্জা পেতে শিখেছে। ওর বয়সের শিশুরা আবার লজ্জা পায় না কি? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম—তোর বাবা কোথায় থাকে রে ভানিয়া? ফিসফিস করে ছেলেটা জবাব দিলে—তিনি তো যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছেন। তোর মা? আমরা যখন ট্রেণে করে যাচ্ছিলাম তখন ট্রেণের ওপর বোমা পড়ায় মা-ও মারা গেছেন। ট্রেণে কোথায় যাচ্ছিলি? তা আমি জানিনা আমার মনে নাই। তাহলে তোর আপনার লোক বলতে আর এ সংসারে কেউ নাই? না। কেউ নাই। আচ্ছা রাত্রে ঘুমোস কোথায়? যেখানে সুবিধা পাই।

আমার গাল বেয়ে গলা পর্যন্ত গরম অশ্রু গড়িয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম। আর তখনিই স্থির করে নিলাম আমার কর্তব্য। কেন আমরা একা-একা আর দুঃখ ভোগ করি? আমি ওকে আমার নিজের ছেলে করে নেবো। আমার মনটা বেশ সহজ হয়ে উঠলো বহুও হোলো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, ভানিয়া জানিস আমি কে? একটা নিশ্বাস ছেড়ে প্রশ্ন করলো কে? জবাব দিলাম, ওরে আমি যে তোর বাবা।

ভগবান জানেন তারপর কি হলো! ও ছোট ছোট হাতদুখানা দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে, গালে, ঠোঁটে, কপালে অজস্র চুমো খেলো। তারপর ছোট্ট পাখীর মত কিচমিচ করে বলতে লাগলো আমি জানতাম বাবা তুমি নিশ্চয়ই আমায় খুঁজে পাবে একদিন। তোমার যাই হোক তবু আমার সঙ্গে দেখা হবেই একথা জানতাম। আমিও তো এতদিন তবু তোমারই জন্য এখানে অপেক্ষা করেছিলাম। সারাক্ষণ ও আমার জাপটে ধরেছিল।

ঘাসের পাতার মত থরথর করে কাঁপছিল ওর সর্বাঙ্গ। আমারও চোখ ঝাপসা। আমি কাঁপছি। আমার হাত কাঁপছে। কি ভাবে গাড়ি চালিয়েছি তা আমি নিজেই জানি না। এমন অবস্থা হচ্ছে যে আমি একটা খালের ধারে এসে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলাম। দৃষ্টি এত ঝাপসা হয়ে এলো যে আমার খুব ভয় হলো হয়তো বা কাউকে চাপা দিয়ে ফেলবো। আমরা দুজনে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলাম সেখানে। ছেলেটা তখনও আমায় জাপটে ধরে রীতিমত কাঁপছে। ডান হাত দিয়ে ওকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে গাড়ীতে উঠে বাঁ হাত দিয়ে কোন রকমে গাড়ী চালিয়ে আমি যেখানে থাকি সেখানেই ফিরে এলাম। মাল নামাতে যাওয়ার কথা আর ভাবতেই পারলাম না।

গাড়ীখানা গেটের কাছে রেখে আমার নোতুন ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে এলাম। ও তখনও ওর ছোট ছোট হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ঝুলছে। নিজের নরম গালটা আমার দাড়ি-ভর্তি মুখে চেপে আছে—মাঝে মাঝে ঘষছে। আর ওই অবস্থায় আমি ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। আমার বন্ধুটি আর ওর স্ত্রী ঘরেই ছিল। আমি ওদের দিকে মিটমিট করে চেয়ে বেশ আনন্দের সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম—ওহে ভদ্রমহোদয় এবং মহিলা, এই দেখে শেষ পর্যন্ত আমি আমার—খুঁজে পেলাম। ওদেরও ছেলেমেয়ে না থাকায় মনেও এরাও এইরকম একটা শিশু চাইছিল। ওরা ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আমিও আর ছেলেটাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। নিজের হাতেই ওকে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম। সাবান দিয়ে বেশ ভাল করে হাত-পা ধুইয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর বসালাম। বন্ধুপত্নী ওকে চামচে দিয়ে খাবার প্লেটে তুলে তুলে দিচ্ছিলেন আর চোখের জল মুছছিলেন। ওর গোগ্রাসে খাওয়া দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। আমার ভানিয়া ওঁর কান্না দেখে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কাঁদছেন কেন ভাবী? বাবা আমার কাকের কাছে খুঁজে পাওয়াতে সবাই খুশী হলো আর আপনি কাঁদছেন? উনি আরও জোরে কেঁদে উঠলেন। চোখের জলে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আমি ওকে নাপিতের কাছে নিয়ে গিয়ে চুল কাটালাম। বাড়ীতে আমি নিজে ওকে টবে বসিয়ে স্নান করলাম। তারপর একটা পরিষ্কার চাদর জড়িয়ে দিলাম ওর গায়ে। ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার হাতের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আস্তে আস্তে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে লরীর মাল খালাস করে গ্যারেজে লরী রেখে তাড়াতাড়ি একটা দোকানে ঢুকলাম। একজোড়া সার্জের ট্রাউজার, একটা ছোট সার্ট, এক জোড়া স্যাণ্ডাল আর একটা খড়ের টুপি কিনলাম ওর জন্যে। অবশ্য জিনিষগুলো সব ঠিক মাপ অনুযায়ী হলো না আর এমন কিছু উঁচু দরেরও নয়। ট্রাউজারগুলো নিয়ে আমার বন্ধুপত্নী খানিকটা ঠাট্টা করলেন। আপনি কি পাগল হলেন নাকি? এত গরমে কখনও কেউ ছেলেকে সার্জের ট্রাউজার পরায়? পর মুহূর্তেই উনি বাক্স পেটরা ঘেঁটে টেবিলের ওপর সেলাই কল নিয়ে বসে পড়লেন আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ভানিয়ার জন্যে একজোড়া সুতোর ট্রাউজার আর একটা ছোট সাদা সার্ট তৈরী করে ফেললেন। আমার বিছানায় ওকে নিয়ে শুলাম। বহুদিন পর আবার আমি আজ গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। তবুও রাত্রের মধ্যে চারবার আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার হাতের ওপর ছেলেটা পাখির ছানার মত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। ঠিক যেন ঘরের চালের নীচে একটা ছোট্ট চড়ুই পাখি আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস টানছে। সে যে কি আনন্দ তা আমি আপনাকে কথায় বোঝাতে পারবো না দোস্ত! নড়াচড়া করে ওকে বিরক্ত করতে চাইলাম না—আমি পারলাম না। দেশলাই জ্বালিয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে দেখতে লাগলাম।

সকাল হতে না হতেই উঠে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত দিনটা কেন যে অত গুমোট লাগলো কিছুই বুঝলাম না। আর আমার ছোট্ট ছেলেটা ওর সাদা চাদর ছেড়ে উঠে আমার কোলের ওপর শুয়ে পড়লো। স্থির হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমোবার ছেলে সে নয় কিন্তু আমি তাকে সে অভ্যাস করাতে লাগলাম। কারণ ওকে চোখের আড়াল করে আমি আর একদণ্ডও থাকতে পারবো না। রাত্রে অপলক দৃষ্টিতে ওর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে আদর করে চুলে হাত বুলিয়ে দিতাম। হৃদয়ের দুঃখের বোঝাটা যেন তখন একটু হালকা হতো।

প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে লরীতেই ও থাকতো। কিন্তু বুঝলাম এটা করা ঠিক হচ্ছে না। আমার নিজের আর কতটুকু প্রয়োজন? এক টুকরো রুটি, একটা পেঁয়াজ আর খানিকটা নুন হলেই সৈনিকের একটা গোটা দিন চলে যায়। কিন্তু এখন ওর জন্যে একটু দুধ চাই, একটা ডিম সেদ্ধ চাই, আবার গরম না থাকলে খেতে পারবে না। কিন্তু আমার তো অন্য কাজ আছে! কাজেই আমাকে একটু শক্ত হতে হলো। বন্ধুপত্নীর তত্ত্বাবধানে ছেলেটাকে রাখলাম। সারাদিন কাঁদতো আর সন্ধ্যে হলেই মালগুদামে ছুটতো আমার সঙ্গে দেখা করতে। আর রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতো।

ওকে নিয়ে আমার বেশ অসুবিধায় পড়তে হলো। এক একদিন দিনের আলো থাকতে থাকতেই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম। সারাদিন ছেলেটা চড়ুই পাখির মত কিচমিচ করতো আর এই সময় একেবারে চুপ করে যেতো। আমি হয়তো প্রশ্ন করতাম—কি রে ভানিয়া, কি এত ভাবছিস? ও ছাদের দিকে তাকিয়ে

প্রশ্ন করতো আমায়—তোমার সেই চামড়ার কোটটা কি করলে বাবা ?

জীবনে কোনদিনই আমার চামড়ার কোট ছিল না। আমাকে কোন মতে কথাটা ঘোরাতে হতো। বলতাম—সেটা আসার সময় ভোরোনেজে ফেলে এসেছি রে। আচ্ছা বাবা, এতদিন ধরে তুমি আমায় কোথায় কোথায় খুঁজেছ বলতো ? আমি তোর জন্তে জার্মাণী, পোল্যাণ্ড, বিয়ালো রাশিয়ার সব জায়গা ঘুরেছি আর শেষে কি না তোকে পেলাম এই ইউরিপিনস্ক-এ। আচ্ছা ইউরিপিনস্ক বুঝি জার্মাণীর খুব কাছে আর আমাদের দেশ পোল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে ? আমরা না ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত এই ধরণের কথাবার্তা চলতো সমানে।

ওর ওই চামড়ার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করার কোন অর্থ নেই মনে করেন ? না, ওর পেছনে একটা সঠিক যুক্তি আছে ? মানে ওর আসল বাবা একটা চামড়ার কোট ছিঁড়ে ফেলেছিল কি করে। আর সেই কথাটাই ছেলেটার আজও মনে আছে। জানেন তো শিশুদের স্মরণ শক্তি ঠিক গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ ঝলকের মত। যে কোন জিনিষের ওপর একবার হঠাৎ ঝলসে উঠে আবার তখুনি মিলিয়ে যায়। ভানিয়ার স্মৃতিও ঠিক গ্রীষ্মকালের বিদ্যুৎ ঝলক যেন।

আমরা দু জনে হয়তো আরও বছর খানেক ইউপিরিনস্ক-এ থাকতাম। কিন্তু নভেম্বর মাসে আমি একটা দুর্ঘটনা করে বসলাম। একদিন একটা গাঁয়ের কাদাভর্তি রাস্তায় লরী নিয়ে যেতে যেতে একটা গরু চাপা পড়ে যায়। মেয়েরা হৈ-হৈ করে উঠলো, লোকজন দৌড়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে আমায় ঘিরে ফেললো, একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টারও এসে গেলো ঘটনাস্থলে। আমি ওর কাছে চলে যাবার অনুমতি চাইলাম কিন্তু ও আমার লাইসেন্স কেড়ে নিলো। গরুটা তখুনি উঠে বাতাসে লেজ নেড়ে রাস্তা থেকে নেমে টগ বগ করে ছুটে পালালো আর আমি লাইসেন্স খুইয়ে ঘরে ফিরলাম। সমস্ত শীতকালটা ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে কাটালাম আর এই সময়েই আমার একজন পুরোনো সৈনিক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। আমাদের জেলাতেই মোটর ড্রাইভারের কাজ করে। ওর কাছে গিয়ে থাকার জন্ত আমন্ত্রণ জানালো। আর লিখলো যে আমি ওখানে গিয়ে বছর খানেক যদি ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করে কাটাই তারপর ও অঞ্চলের জন্ত আবার নোতুন লাইসেন্স পেয়ে যাব। তাই আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ক্যাশারি চলেছি।

আমি যদি গরু চাপা না-ও দিতাম তাহলেও আমায় ইউপিরিনস্ক ছাড়তে হতো। কারণ আমি জানি আমার নিয়তি কিছুতেই আমায় এক জায়গায় থাকতে দেবে না। যখন আমার ভানিয়া বড় হবে, স্কুলে পড়তে যাবে তখন হয়তো আমি স্থির হয়ে বসবাস করতে পারবো। কিন্তু তার আগে আমরা বাপ-বেটায় মিলে সমস্ত রুশের মাটিতে ফুর্তি দিয়ে ঘুরে বেড়াবো।

আচ্ছা, ছেলেটা তো এতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে ? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

পায়ে হেঁটে বেশীক্ষণ ঘুরতে পারে না। বেশীর ভাগ সময় আমার কাঁধে চেপে থাকে। আর যদি মাঝে মাঝে ওর হাঁটার ইচ্ছা হয় তাহলে লাফিয়ে কাঁধ থেকে নেমে রাস্তার পাশে পাশে ছাগলের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকবে। ওসব কিছু নয় দোস্ত, সে সব দিকে আমরা ঠিকই আছি। তবে একটা ব্যাপারে আমার মনটা কোথায় যেন ধাক্কা খাচ্ছে। বুঝতে পারছি একটা পিস্টন বদল করা দরকার। থেকে থেকে ওটা আমায় এমন আঘাত করে যে আমি সে সময় বুঝতেই পারি না যে কি করছি। ভয় হয় হয়তো কোনদিন ঘুমের মধ্যেই মরে পড়ে থাকবো। ছোট ছেলেটা ভয় পেয়ে যাবে। আরও একটা কষ্ট আছে। প্রায় প্রতিরাত্রেই আমি স্বপ্নের মধ্যে এক এক প্রিয়জনকে হারাই। আমি যেন কোন একটা কাঁটাতারের বেড়ার এপারে পড়ে আছি আর ওরা ওপারে বেশ সুখে আছে। আমি ইরিণা আর ছেলেদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলি কিন্তু যেই বেড়াটা ছিঁড়তে যাই অমনি ওরা সবাই এক সঙ্গে আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। সমস্ত দিন নিজেকে খুব শক্ত করে রাখি। গোটাদিনের মধ্যে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি না কিংবা গম্ভীর হয়ে চুপচাপ থাকি না কিন্তু আশ্চর্য, রাত্রে মাঝে মাঝে জেগে উঠে দেখি চোখের জলে আমার বালিশ ভিজে যায়।

নদীতে আমার বন্ধুর গলার স্বর আর জলে দাঁড় পড়ার আওয়াজ পেলাম। যাকে এতক্ষণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল সেই অপরিচিত এবার তার কাঠের মত শক্ত বিরাট হাতখান। এগিয়ে দিল আমার দিকে। বিদায় দোস্ত! আপনার মঙ্গল হোক।

—মঙ্গল হোক তোমাদের, ক্যাশারী যাত্রা শুভ হোক।

—অসংখ্য ধন্যবাদ! আয় বেটা, আমরা এবার নৌকোয় চাপিগে। ছেলেটা ছুটে এসে বাপের শতছিন্ন জামাটার একটা কোণ চেপে ধরে ছোট ছোট পা ফেলে বিশালকায় বাপের সঙ্গে চলতে থাকলো।

দুটি অনাথ, দুটি মরুভূমির কণা যুদ্ধের ভয়াবহ ঘূর্ণাবর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু ভবিষ্যৎ এদের জন্ত কি করবে ? আমি বিশ্বাস করি রাশিয়ান লোকটি তার বলিষ্ঠ মন নিয়ে হয়তো ঠিকই সোজা থাকবে আর ওই শিশু ওর বাপের পাশে পাশে বড় হবে, নিজের রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় তা হলে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সব কিছু ওকে সহ্য করতে হবে।

ওরা চলে যাওয়াতে আমার একটু কষ্ট হলো। হয়তো আমরা যখন থাকবো না তখন ভানিয়ার মত সকলের সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিছু দূর গিয়েই ও ওর ছোট ছোট পা বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে গোলাপী হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালো। আমার হঠাৎ মনে হলো, খুব নরম অথচ শিকারী পাখির থাবা যেন হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসেছে আমার। ব্যথায় টন টন করছে হৃৎপিণ্ডটা। আমি ব্যস্ত ভাবে ফিরলাম। ওই সব বুড়োগুলো যাদের চুলগুলো সব বছরের পর বছর সংগ্রাম করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তারা শুধু ঘুমের মাঝেই কাঁদে না চলতে চলতেও কাঁদে। কিন্তু আসল জিনিসটা ও ভোলেনি। শিশুর মনে আঘাত সে দিতে চায় না, মানুষের গালের ওপর শুকনো গরম অশ্রু সে ওকে দেখতে দিতে চায় না। ভানিয়া যেন ব্যথা না পায়।

অনুবাদক—অলক সিংহচৌধুরী

শেষ

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
—আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!
মিনু তার পুতুলের জন্য সর্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিনু তার দিদির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় ওর একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা! আর কত রঙীন।
জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত
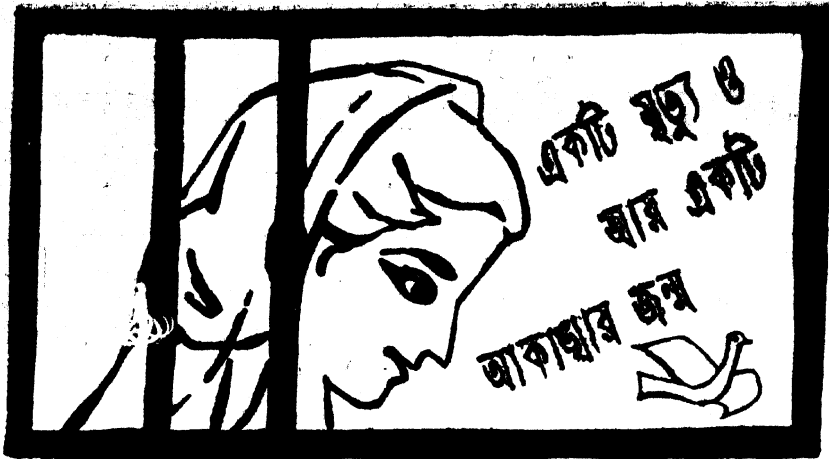
শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত

সুলতাদির জন্য কষ্ট হয়। মেজদির বড়-জা সুলতাদি।

সুলতাদির বয়স যখন ছত্রিশ, মেজদির ছাব্বিশ। আমার আরও কম। বোধ হয় বাইশ। এই বাইশ বছর বয়সেই সুলতাদির সঙ্গে আমার পরিচয়।

বেনেটোলা বাই লেনে মেজদিরা তখন থাকতো। কিলবিল একটা কেঁচোর মত গলিটা। ওপাশের নরসিংহ দত্ত রায় লেন থেকে বেরিয়ে এপাশে বাবুরাম হালদার লেন-এ এসে মিশেছে। ঠিক রাস্তার উপরেই বাড়ীটা। ভাড়া বাড়ী নয় অথচ ভাঙা বাড়ী। সামনে একটা ল্যাম্পপোষ্ট আর তার তলায় একটা ডাষ্টবিন।

সন্ধ্যা লেগেছে সবে। গ্যাসের মিটমিটে আলোয় দেখে নিলাম বাড়ীর নম্বরটা। কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলে সমুখে এসে দাঁড়ালো মেজদিই। দেখে তো অবাক! খুব খুশীও।

দোতলা বাড়ী। এক তলায় থাকে মেজদিরা। চারদিকে ঘোরানো বারান্দা। মোট ছ-টা ঘর। মধ্যে পাকা উঠোন। উত্তর দিকের ঘর দুটো মেজদির। অন্যগুলো আর দুই জায়ের।

ঘরে ঢুকেই মেজদি বললো, বস্। খুব ভাল সময়েই এসেছিস ভাই। বিয়ের পর আর তোকে কৌটো দিইনি, না?

খাটের এক কোণে বসে পড়ে বললাম, আর সেইজন্যেই তো সাহেবের সঙ্গে না এসে একদিন আগেই চলে এলাম।

শুনে খুব খুশী হল মেজদি। মুখোমুখি বসে খুশী ভরা চোখে চাইলো।

এতক্ষণে ভালো করে দেখলাম মেজদিকে। খুব স্পষ্ট করে। চিনতে বেশ একটু কষ্টই হচ্ছিল। আমার মত বিয়ের আগে মেজদিকে যারা দেখেছে, তাদেরও হবে।

আগের সেই ধবধবে উজ্জ্বল গায়ের রং আর নেই। চোখের কোলে কালি পড়েছে। বড় ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে যেন। কেমন যেন এক টুকরো ক্লান্ত বিষণ্ণ ছায়া মেজদির সমস্ত মুখে-চোখে। চুলগুলো বড় এলোমেলো। শ্রীহীন শৈথিল্য সমস্ত শরীরে। চুড়িগুলো ঢিল ঢিল করছে হাতে। বিয়ের সময় বেশ একটু বড় করেই বানিয়ে দিয়েছিল বাবা। বিয়ের পর মা'র মত মেজদিও হয়তো বেশ একটু মোটাসোটা হয়ে যাবে, এই সম্ভাবনায়।

চোখে চোখ পড়তেই নিষ্প্রভ হাসি হাসলো মেজদি। দেখতে খুব বিশ্রী হয়ে গেছি, না রে? কী করবো বল?

সত্যি, মেজদি আর কি করবে? নূতন একটা প্রাণের স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে মেজদির ভেতরে ভেতরে। এবারও।

—বাচ্চারা সব কোথায় মেজদি? বাচ্চু, বুলু, সোনা?

—আছে কোথাও। মরুক্ গে ওরা। ওদের কথা বাদ দে। তোর কথা বল।

সব শুনে মেজদি রাগ করলো খুব। একটু থেমে বললো, ভালই করেছিস এখানে না উঠে। হোটেলে উঠেছিস, ভাল থাকবি, ভাল খাবি—এখানকার কষ্ট তোর সহ্য হবে কেন?

মেজদির এটা অভিমানের কথা। দারিদ্র্য মানুষের আছে, থাকবেও। কিন্তু কি করে বোঝাই মেজদিকে যে কষ্ট আমার কিছুতেই হতো না। মেজদির কাছে যা পেতাম, হোটেলে তা কিছুতেই পাব না। বললাম, ভুল করছো মেজদি। সে সব কিছু নয়।

—থাক, ভুল আর শোধরাতে হবে না তোকে। একটু ধমকে দিয়ে মেজদি বললো, যে কয়েক দিন আছিস, আসবি তো প্রতিদিন?

—বাঃ, আসবো না কেন?

—কাল কিন্তু খুব ভোরে উঠেই চলে আসবি। খাবি নে কিছু, বুঝলি?

মেজদি যদি শিক্ষয়িত্রী হতো বেশ হতো তাহলে। শাসনের ভঙ্গিটা ভারী সুন্দর মেজদির। আগের মত এখনও। একটু হাসলাম।

মেজদি বললো, হাসছিস যে?

আর সেই মুহূর্তেই সব হাসিকে ছাপিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারার শব্দ এল কানে। তার পর প্রচণ্ড একটা শব্দ। পর পর আরও কয়েকটা শব্দ। ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়ার শব্দ।

মেজদির মুখের দিকে তাকালাম। আরও ফ্যাকাসে দেখালো মেজদির মুখটা। খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মেজদি।

আর পর আরও দু-একজন বারান্দা দিয়ে ছুটে চলে গেল। একটা চাপা উত্তেজনা সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়ায় থমকিয়ে রইল। হুড়োহুড়ি আর ছুটোছুটির শব্দ লেগে রইল আরও কিছুক্ষণ। তার পর এক সময় হঠাৎ সব শান্ত হয়ে গেল। উত্তেজনাটা আর রইল না। শুধু একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল থেকে থেকে। মেয়েলী কান্না। ফুলে ফুলে কান্না।

মেজদি এল তার একটু পরেই। মেজদির হাত বাচ্চুর কানে। একটু যেন হাঁপাচ্ছে মেজদি। বেশ একটু উত্তেজিতও।

—কে কাঁদছে মেজদি?

—বড়দি। সেদিন আর কিছুই বললো না মেজদি।

বাচ্চু এখনও কাঁদছিল। আরও দুটো চড় লাগিয়ে চীৎকার করে উঠলো মেজদি। তোকে না বলেছি এই তিন চার দিন বড়দির কাছে যাবি না। গিয়েছিলি যে?

বাচ্চু কাঁদলো। আরও জোরেই কাঁদলো। আর মাঝে মাঝে পিট পিট করে আমার দিকে তাকালো।

একটু হেসে কাছে টেনে নিলাম। লজেন্স বিস্কুট দিলাম হাতে। কান্না থেমে গেল ওর। ইতস্তত করলো একটু থেকে। ওকে কোলের উপর বসিয়ে বললাম, কী হয়েছে রে বাচ্চু?

—বড় মা মেরেছে।

—দুষ্টুমি করেছিলি বুঝি?

—সত্যি বলছি, একটুও না। কাছে যেতেই শুধু শুধু মারলো আমাকে। তারপর টেবিল চেয়ার ছুঁড়ে•••

—খুব হয়েছে সাধুপুরুষ। এবার চুপ কর। আবার যদি বড়দির ঘরে গেছ তো পা ভেঙ্গে দেবো।

—আর কোন দিনই যাব না?

—না, কোন দিনই যাবে না।

ধমকিয়ে বাচ্চুকে তো থামিয়ে দিল মেজদি কিন্তু আমার বাইশ বছরের কৌতূহল কতবার যে হোঁচট খেল তার ঠিকই নেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম, সোনা কেঁদে উঠলো। উঠে গেল মেজদি। এল না আরও অনেকক্ষণ।

বাচ্চুকে বললাম, বুলু কোথায়?

—মা-মণির ওখানে।

—ডেকে নিয়ে এস, যাও। বাচ্চু ছুটলো। বুলুর হাত ধরে একটু পরেই ফিরে এল। বেনেটোলা বাই লেনে মেজদির বাড়ীতে এতক্ষণে মুখর হলো সেদিনের সন্ধ্যাটা। থেকে থেকে কলহাস্যে মধুর মনে হল প্রতিটি ক্ষণ।

ঝপ ঝুপ করে আরও কিছুটা অন্ধকার নেমে পড়লো বাই লেনে। নিস্তব্ধ আর নির্জন হয়ে এল গলিটা আরও একটু।

এগিয়ে দিতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার মেজদি বললো কথাটা। ঘুম থেকে উঠেই চলে আসবি কিন্তু, বুঝলি?

যেতে যেতে সেদিন সমস্ত রাস্তা শুধু একজনের কথাই ভাবলাম। মেজদি বা জামাইবাবুর কথা নয়, মেজদির বড়-জা সুলতাদির কথা। অথচ সুলতাদিকে তখন দেখিওনি চোখে, জানিও না ওর সব কথা। যাকে ভাবলাম, যার কথা এত ভাবলাম সেই সুলতাদির সঙ্গে পরিচয় হলো কিন্তু পরদিন ভোরেই।

আমি আর মেজদি গল্প করছিলাম খাটে বসে। ঘরের মধ্যে উঁকি দিল মেজদির বড়-জা সুলতাদি। এত হাসাহাসি কেন রে মিলু? এত হাসি তো তোর মুখে দেখিনি অনেক দিন?

চোখের দৃষ্টিটা একটু যেন চঞ্চল। উদ্‌ভ্রান্ত। আলু-থালু বেশ। বড় এলোমেলো চুলগুলো। তবু সুন্দর, সুলতাদির মুখটা, চেহারার বাঁধুনি, টানা-টানা ভ্রূর নীচে বড় বড় দুটো চোখ—টিকোলো নাকটা। আর সুন্দর গোলাপী গায়ের রংটা।

থেমে গেল হাসি। হঠাৎ একটু গম্ভীর দেখালো মেজদিকে।

—হাস্, হেসে নে। সুযোগ পেলে না হেসে কিছুতেই থাকবি নে। দরজা ছেড়ে আমাদের মাঝখানে এসে বসলো সুলতাদি। খুব ভোরে উঠেই বোধ হয় স্নান করেছে। ভিজে এক রাশ চুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিঠে। জোড়া ভ্রূর উপরেই খুব বড় করে দেয়া একটা সিঁদূরের কোঁটা।

সীঁথির সীমন্তেও সিঁদুরের সুস্পষ্ট ছোঁয়া। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে সুলতাদিকে।

বড় বড় চোখে আমার দিকে একবার চেয়েই মেজদির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সুলতাদি। কে হয় রে তোর?

—আমার ছোট ভাই অরুণ। অফিসের কাজে এসেছে কোলকাতায়।

—বলিস কি? এই বয়সে চাকরি করছে? ওর তো আমার হাঁটুর সমান বয়সরে। খিল খিল করে দুবার হাসলো সুলতাদি।

উত্তর দিল না মেজদি কথাটার। খাট থেকে নেমে মেঝেতে পাতলো আসন। থালায় করে দূর্ব্বা, ধান আর ঘিয়ের প্রদীপ এনে সাজিয়ে রাখলো। চন্দন ঘষতে লাগলো বসে বসে।

পা দোলাতে দোলাতে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মেজদির বড়-জা সুলতাদি। জিজ্ঞেস করলো, কী হবে রে মিলু?

আজ ভাইফোঁটা, তোমার মনে নেই বড়দি?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো সুলতাদি। চোখের তারাটা কয়েক বার চঞ্চল হয়ে উঠলো। শেষ বললো, মনে নেই আবার, খুব মনে আছে। আমিও তো দেব ফোঁটা।

খাট থেকে হঠাৎ ঝপ করে নেমে পড়লো সুলতাদি। মেজদির পাশে গিয়ে বসলো। একটা সাদা বক ঝুপ করে যেন নেমে পড়লো মাটিতে। মুখপুড়ি, লজ্জা করে না তোর? একটু সেজেগুজে থাকবি, তাও কি পারিস না?

সত্যি, বিয়ের পর কেমন যেন নোংরা হয়ে গেছে মেজদি। স্নান করেছে, চুলগুলো আঁচড়ায়নি। মাথায় দেয়নি সিঁদুর। কাপড়টাও পরেছে বড় নোংরা। কেমন যেন একটা ভাব।

সাজাগোজার সময় কোথায়? পেটে তো ধরনি কোনদিন, বুঝবে কি?

খিল খিল করে হাসলো সুলতাদি তা যা বলেছিস। এবার ওঠ তো পোড়ামুখি। সজোরে মেজদির চুলগুলো টেনে ধরলো সুলতাদি।

—আঃ, ছাড়। বড় লাগছে।

—লাগুক, তোর লাগাই উচিত। হাসলো সুলতাদি। উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত নিবারিত হাসি। কোন এক পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী হঠাৎ যেন মুখ থাবড়িয়ে পাথরের বুকে লুটোপুটি খেল।

মেজদি উঠে দাঁড়ালো। না, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।

মেজদি চলে যেতেই সুলতাদি এসে বসলো আমার পাশে। ফিক ফিক করে দুবার হাসলো। তারপর আবার একটা সাদা বক যেন ঝুপ করে নেমে পড়লো মাটিতে। চন্দনের বাটি হাতে নিয়ে সম্মুখ এসে দাঁড়ালো সুলতাদি। বলল, চুপটি করে বোস, একটুও নড়ো না কিন্তু!

একটু পরেই মেজদি এসে দাঁড়ালো কাছে। বেশ দেখাচ্ছে মেজদিকে এখন। বলল, ওর ঘাড়েও চেপেছো বড়দি!

—তুই থামতো মিলি!

মেজদি চুপ করে গেল। চোখের ইসারায় যেন বলতে চাইলো, তুইও কিছু বলিস না যেন। ওকে কিছু বলা যাবে না, বললেও ও শুনবে না।

একটু পরে মেজদি এসে আবার তাড়া লাগালো।

চন্দনের বাটিটা মাটিতে নামিয়ে সুলতাদি বলল, নে মুখপুড়ি, হয়েছে আমার। এবার ফোঁটা দে যত পারিস।

ভাইদের দীর্ঘজীবন কামনায় বোনদের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের সত্যি কোন তুলনা নেই। পাশে দাঁড়িয়ে শঙ্খ বাজাল আর উলু দিল সুলতাদি। খুব মিষ্টি সুলতাদির গলার সুরটা। শুধু সুলতাদি কেন, উলু যাদের দিতে দেখেছি সবাই যেন সুকণ্ঠী। ধ্বনিটিরই যেন নিজস্ব একটা মিষ্টত্ব আছে।

উলু মেজদিও দিল। শঙ্খও বাজাল। ফোঁটা দিল সুলতাদি আমার কপালে। প্রণাম করতে যেতেই পিছিয়ে গেল তিন পা। না, না প্রণাম করবে না। কিছুতেই না।

চোখের ইসারায় মেজদিও মানা করলো আমাকে।

থেকে থেকে সুলতাদির দিকে চেয়ে দেখলাম। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। এতক্ষণ যে দৃষ্টিতে শুধু ছিল বিহ্বলতা, বিতৃষ্ণা এসে বাসা বেঁধেছে সেখানে।

মেজদিও লক্ষ্য করলো। সুলতাদির কাঁধে হাত রেখে বললো, বড়দি, চল আমরা যাই।

চার দিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ যেমন এসেছিল সুলতাদি, বেরিয়ে গেল তেমনি হঠাৎই। তারপর সারাদিন আর দেখা পেলাম না।

দুপুরের শেষে বিকেলের একটু আগে বাচ্চু হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে এল। কান দুটো ওর জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে।

কে মেরেছে তা আর জিজ্ঞেস করলাম না। জানি কে মেরেছে। সুলতাদি ছাড়া সে আর কেউ নয়।

সত্যি, সে আর কেউ নয়—সুলতাদিই।

পরদিন মেজদির বাড়ী গিয়ে কড়া নাড়লাম যখন একবারও ভাবিনি সুলতাদিই খুলে দেবে দরজা।

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো সুলতাদি। বললো, বাইরে থেকেও দরজাটা খোলা যায়, জানো? উপরের শিকগুলো দিয়ে হাত গলিয়ে দিলেই এপাশে ছিটকানিটা।

প্রায় চারটা তখন। বাইরে বেশ রোদ। বাড়ীর ভেতরটা কিন্তু ছায়া-ছায়া। দুপুর এখানে বিকেলের মত।

দরজা বন্ধ করতে করতে সুলতাদি বললো, কিরণমালার কাছে এসেছো? ও তো এখন ঘুমুচ্ছে। ভীষণ ঘুম ওর এখন। শুধুই ঘুময়। কথা শেষ করে একটু হাসলো সুলতাদি। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, চল, আমরা গল্প করি গিয়ে।

ভারি সুন্দর সাজানো-গোছানো সুলতাদির ঘর। সুরুচির পরিচায়ক সব-কিছু। রাশি রাশি বই সাজানো রয়েছে আলমারীতে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বার্ণার্ড শ', গোটে, শেলী, কীটস, হেমিংওয়ে থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউ বাদ পড়েনি। সুলতাদি যে শান্তিনিকেতনের গ্রাজুয়েট আর বই-এর পোকা, পরে শুনেছিলাম।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। সুলতাদি একটা কথাও বললো না। আমিও না। একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠলো সুলতাদি। উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত, কেমন এক অদ্ভুত ধরণের হাসি। সুস্থ সহজ মানুষ এমন হাসি হাসে না।

চমকে ফিরে তাকালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজা দিয়ে উড়ে এল দুটো পায়রা। হুড়োহুড়ি আর পাখা ঝাড়ার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। পাখা ঝটপটানির ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা শিরশির করে উঠলো।

ভয়ে ভয়ে সুলতাদির দিকে একবার তাকালাম। চোখের তারা দুটো থেকে থেকে কাঁপছে সুলতাদির। একরাশ জ্বালাময় বিতৃষ্ণা আর ঈর্ষা যেন উপচিয়ে পড়ছে চোখে। ভেণ্টিলেটরের খোপের দিকে দৃষ্টি রেখে নিশ্চল মূর্তির মত বসে আছে সুলতাদি। বন্ধ খোপ। কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে মুখটা।

একবার, দুবার, তিনবার। ভেণ্টিলেটরের আশে-পাশে ঘুরে এল পায়রা দুটো। উদাস-করা হু হু করা ডাক ডাকলো কয়েকবার। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার হাসলো সুলতাদি। নিরাবিল, নির্ঝরিত হাসি। তারপর থেমে থেমে বললো, বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

কেমন জানি একটু অস্বস্তি ছেয়ে গেল মনে। আস্তে আস্তে মেজদির ঘরে উঠে এলাম।

তারপরই শুনলাম প্রচণ্ড একটা শব্দ। পর পর কয়েকটা শব্দ। ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়ার শব্দ। ঠিক যেমন এসে শুনেছিলাম প্রথম দিন এসে।

মেজদির চোখে চোখ রাখলাম। বললাম, সুলতাদির এমন কেন হয় মেজদি?

—সে তুই বুঝবিনে। মেয়েদের ব্যাপার এসব। মাসের তিন চার দিনই ও এমন। কাল বা পরশু এসে দেখিস ও একেবারে অন্যরকম।
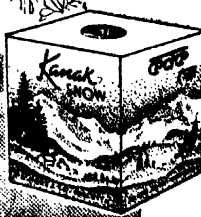
সত্যি কথাই বলেছিল মেজদি।

মধ্যে শুধু দু-দিন যাইনি মেজদির ওখানে। পরদিন যখন গেলাম, বাড়ীটা খুব চুপচাপ মনে হল। যেন কেউ নেই। দুবার কড়া নেড়ে সাড়া পেলাম না। সুলতাদির কথা মনে পড়লো। হাত বাড়িয়ে ছিটকানিটা খুলে ফেললাম।

মেজদির ঘরে এসে দেখলাম শিকল তোলা। কোথাও গেছে বোধ হয়। উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। আকাশটা খুব ঘোলা ঘোলা দেখালো। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে ঝাপটা দিয়ে গেল।

প্রথমে আস্তে আস্তে তার পর একটু জোরে একবার ডাকলাম। সুলতাদি!

সাড়া পেলাম না। ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম।

হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর বসে আছে সুলতাদি। সামনে পড়ে রয়েছে একটা মরা পায়রার বাচ্চা আর ভেণ্টিলেটরের খোপ থেকে ছিটকে পড়া কাপড়ের পুঁটলিটা।

সুলতাদি কাঁদছে। বড় বড় চোখ থেকে জল পড়ছে সুলতাদির।

পায়রা দুটোও আবার উড়ে এসে ছুটোছুটি করে মনের অস্থির যন্ত্রণা প্রকাশ করছে। উদাস করা হু হু করা ডাক ডাকছে।

কাঁদছে। পায়রা দুটোও কাঁদছে।

—সুলতাদি!

একটু চমকে বড় বড় জলভরা চোখ তুলে তাকাল সুলতাদি। মেজদির বড়-জা। উঠে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। বললো, বস! কিরণ ডাক্তারের কাছে গেছে। কিরণ মানে মিলু, মিলি। আমার মেজদি।

আজ কত ধীর, স্থির, শান্ত সুলতাদি। এ দু'দিন যেমন দেখেছি, যাকে দেখেছি, সে যেন এ নয়—অন্য মন, একেবারে অন্য মানুষ।

মরা পায়রার বাচ্চাটাকে নিবিড় স্নেহে কাগজের উপর তুলে নিল সুলতাদি। বলল, যাই ফেলে দিয়ে আসি জলে।

সুলতাদি ফিরে এলে, মেজদিও এসে গেল। ঘরে ঢুকে বলল, কখন এসেছিস?

—এই তো, কিছুক্ষণ।

—বাচ্চু কোথায় রে, মিলু? সুলতাদি জিজ্ঞেস করলো।

—ঐ তো বাইরে দাঁড়িয়ে। ছেলের রাগ হয়েছে।

করুণ হাসি হাসলো সুলতাদি। কোলে তুলে নিয়ে চল ওকে। মাথার চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলল, কি হয়েছে সোনা?

ঠোঁট ফুললো বাচ্চুর। তোমার কাছে আর আমি আসবো না।

—কেন রে, কী করেছি আমি?

—তুমি মার। ভীষণ বক।

—না, না, তোকে আর কোনদিন মারবো না। কখনও না। নিবিড় স্নেহে বাচ্চুর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিল সুলতাদি। চোখ দিয়ে মুক্তোর মত দু'-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

হাসলো মেজদি।

আবার পাখা ঝটপটানির শব্দ এল কানে। পায়রা দুটো এসে ঢুকলো ভেণ্টিলেটারের খোপে। ডাকল, বক·· বক···বকুম।

চেঁচিয়ে উঠলো মেজদি। তাড়াও বড়দি, তাড়াও। না হলে মরবে।

—না, না ওরা থাক। ভেণ্টিলেটারের খোপের দিকে চেয়ে শান্ত হাসি হাসলো সুলতাদি।

ওরা থাকবে। ডাকবে। একটি মৃত্যু আর একটি আকাঙ্খার জন্ম দিয়ে যাবে ওদের মনে।

কিন্তু সুলতাদির জীবনে এ আকাঙ্খার মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য বার। এ আকাঙ্খা আর রূপ পাবে না কোন দিন।

সুলতাদির জন্ম কষ্ট হবে না তো কি?

সাহস

(D. H. Lawrence-এর Courage কবিতাটির অনুবাদ)

মানুষের অতৃপ্তির কারণ,
তারা গ্রহণ করে মিথ্যাকে।

মানুষের থাকতো যদি সাহস, পারতো যদি মিথ্যাকে হার মানাতে
জানতোও যদি কী তাদের প্রকৃত ভাবনা, কী তাদের সংকল্প
আর কাজে যদি মাততো সেই মত,

তবে তারা প্রতিটি অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসরণ ক'রে উদ্যমী নির্যাস,
অবশেষে শরৎকালের বাদামের মত, হত
মধুর ও দৃঢ়।

নবীনতর যারা প্রবীণদের ভিড়ে
সেপ্টেম্বরের বাদাম-বাগানে যেন,
তারা সংগ্রহ করতো বাদাম, পরিণত অভিজ্ঞতার ফল।

এখন, প্রবীণেরা দিতে পারে মাত্র
অম্ল, তিক্ত, মিথ্যাশ্রিত ফল।

অনুবাদক—সুভাষ ভট্টাচার্য্য।

পাখি

সুশান্ত ঘোষ

দূরের বাঁশিতে সুর বাজে ঐ জলভার মেঘের মতন।
শ্বাপদের চোখ জ্বলে অন্ধকারে আকস্মিক প্রলয়ের আগে,
তারো কাছে কান পাতি, চোখ বুঝি অরূপ রতন
আশা করে ডুব দেয় সরোবরে, সমুদ্রে, সোহাগে।
ক্রমে এক পারিজাত আশা তবু কাছে ডাকে তাকে—
দর্পণের ছায়া নয়, অর্পিত স্পন্দিত দেহ দেহে পাবে বলে
অসতর্কে, পাশে আর কেউ নেই, ঢেউ চলে
ছুঁয়ে শুধু মুখ-চোখ বুক। আর বিস্মৃত প্রতীকে
স্পন্দনের চোরা আলো জ্বালি। একা অন্তর শহরে
ফিরে চাই তন্দ্রা ভেঙে, বাতায়নে; মমতার ঘরে।

পরিকীর্ণ মনও বুঝি জ্বলে যায়! কবেকার এমন প্রত্যয়ে
ফিরে আসি ধরচিত্ত পদচিহ্নে, সুতীক্ষ্ণ নখরে
কাঁপাই পশমী-শাড়ি। যেন নিমীলিত পাখি, ভয়ে
রুদ্ধকণ্ঠ কাঁপে বার বাতায়নে, মমতার ঘরে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আইভান তুর্গেনিভ

৮

সে তখনও পোষাক পরেনি। ওয়েটার এসে খবর দিলো, দু'জন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখা গেলো তাদের একজন হচ্ছে এমিল, অন্ত জন—সুদর্শন ও মনে রাখার মতো চেহারা এক যুবক—সেই হচ্ছে হের কার্ল ক্লুয়বার, রূপসী জেমার প্রণয়ী।

খুব সম্ভবতঃ সারা ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে হের ক্লুয়বারের মত ভদ্র, শিষ্ট, মার্জিত ও গম্ভীর প্রকৃতির আর কোনো দোকানী ছিলো না। তার নিখুঁত পরিচ্ছদ ছিলো তার পারিপাট্য ও মর্য্যাদারই উপযুক্ত। তার পারিপাট্য অবশ্য ছিলো খানিকটা ইংরেজদের মত রক্ষণশীল ও গোঁড়া, ইংল্যাণ্ডে সে দু'বছর কাটিয়ে এসেছে। তাকে একবার দেখেই যে কেউ বুঝতে পারতো এই সুদর্শন, একটু উগ্রপ্রকৃতির, অতি ভদ্র ও অতি ফিটফাট যুবকটি বড়দের কাছে অতি সহজেই নত হতে পারতো ও ছোটদের হুকুম করতে ছিলো অভ্যস্ত ও দোকানের কাউণ্টারের বাইরে ক্রেতাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতো। তার অসাধারণ সাধুতা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ করতে পারতো না। একবার মাত্র তার কড়া ইস্ত্রিকরা শক্ত কলারটির দিকে চাইলেই পরিষ্কার বোঝা যেতো। তার কণ্ঠস্বর ছিলো ঠিক যেমনটি আশা করা যায় কোমল অথচ দৃঢ়, জোর নয় কিন্তু তাতে স্নিগ্ধতার ছোঁয়াচ লাগানো। এই কণ্ঠস্বর ছিলো দোকান-কর্মচারীদের হুকুম করার যথার্থ উপযুক্ত। লাল লায়ন্স্ ভেলভেট খুলে দেখাও তো দয়া করে কিম্বা ভদ্রমহিলার জন্ত একটা চেয়ার নিয়ে এসো।

হের ক্লুয়বার কথাবার্তা সুরু করলো আত্মপরিচয় দিয়ে। তার শরীরটা নোয়ালো অতি শিষ্ট ভাবে, তার পায়ের পাতাগুলো সরালো অতি ভদ্রভাবে, তার গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকালো অতি সভ্য ভাবে যে, যে দেখতো সেই ভাবতো এই লোকটির পরিচ্ছদ ও মানসিক গুণগুলি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর। তার খোলা ডান করতল (বাম করতল ঢাকা ছিলো একটা সুয়েড দস্তানায়, ধরেছিলো আর্শির মত চকচকে একটা টুপী, তার ওপরে ছিলো অন্ত দস্তানাটি।) সানিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলো বিনীত ভাবে—অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর ছিলো তার হাতটি—প্রতিটি নখ ছিলো যেন নিপুণ শিল্পীর তৈরী। অতি মার্জিত জার্মাণে সে বললো—সে তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চায় বিদেশী ভদ্রলোকটিকে, যিনি তার ভাবী আত্মীয়ের, তার প্রেমিকার ভাই-এর এতখানি উপকার করেছেন। এই কথা বলে টুপীসুদ্ধ বাঁহাতটা দিয়ে এমিলকে দেখালো। এমিল অপ্রতিভ হয়ে মুখে আঙুল দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলো। হের ক্লুয়বার আরো বললো, সে যদি বিদেশী ভদ্রলোকটির কোনো কাজে আসতে পারে তবে খুসী হবে। সানিন থেমে থেমে জার্মাণে উত্তর দিলো সে-ও ওদের দেখে খুসী হয়েছে। ওদের জন্ত সে সামান্তই করেছে। ওদের বসতে বললো সে। হের ক্লুয়বার ধন্যবাদ দিয়ে চকিতে কোটের তলার দিকটা ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে বসলো। তবে বসলো সে এমন হাল্কাভাবে যে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে সে বসেছে। যে কোনো মুহূর্তেই চলে যাবে। সত্যিই বিনয়নম্র নাচের তালে উঠে দাঁড়ালো ও বললো সে দুঃখিত যে, আর বেশীক্ষণ বসতে পারলো না। কারণ তাকে দোকানে যেতে হবে, জীবিকা চেষ্টাই প্রথম—কিন্তু পরের দিনটি হচ্ছে রবিবার, ফ্রাউ লেনোর ও ফ্রয়লাইন জেম্মার সম্মতি নিয়ে সে ঠিক করেছে সোডেনে বেড়াতে যাবে। বিদেশী ভদ্রলোককে তাতে নিমন্ত্রণ করে সম্মানিত বোধ করছে ও আশা করছে তিনি উপস্থিত হয়ে এই দিনটিকে সফল করতে নিরাশ করবেন না। সানিন তার উপস্থিতি দ্বারা এই দিনটিকে সফল করতে অসম্মত নয় শুনে হের ক্লুয়বার বিদায় নিলো। সেই রকম শিষ্টতা দেখিয়ে, অতি সুন্দর ভাবে তার কড়াইশুঁটি রংয়ের সবুজ প্যাণ্ট দুলিয়ে ও ঝকঝকে নতুন বুটের মিষ্টি আওয়াজ করে।

৯

সানিন বসতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও এমিল জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলো যখন তার ভাবী আত্মীয়টি বিদায় নিলো, তখন সলজ্জ ভাবে শিশুসুলভ মুখভঙ্গী করে জিজ্ঞেস করলো সে একটু বসতে পারে কি না। আরো বললো আজ আমি খুব ভালো আছি। কিন্তু ডাক্তার বাবু আমাকে কাজ করতে বারণ করেছেন।

খাঁটি রাশিয়ান যে কোনো ছুতোয় কাজ বন্ধ রাখতে ভালোবাসে। সানিনও খুশী হয়ে বললো, নিশ্চয়ই, বসবে বৈ কি। তোমার কোনো কাজই নেই।

এমিল ধন্যবাদ দিলো ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একেবারে আপন হয়ে গেলো, ঘরের সব জিনিষ দেখতে লাগলো। সানিনের সব জিনিষপত্র কোনটা কি কাজে লাগে, কোথা থেকে কেনা হয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেলো। তাকে দাড়ি কামাতে সাহায্য করলো ও বললো তার গোঁফ রাখা উচিত। তার মা বোন, পান্টালেওন এমন কি টার্টালিয়া বলে কুকুরটির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যা কিছু ছিলো সব বললো, কি করে তাদের দিন কাটে। আগেকার লাজুক ভাবটি সে কাটিয়ে উঠলো। সানিনকে তার ক্রমশঃই ভীষণ ভালো লেগে যেতে লাগলো, আগের দিন সানিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে

মত, সে খুব ভালো লোক হবে। নিজের গোপন কথা যা ছিলো তা সবই সানিনকে বলা হয়ে গেলো। তার মা চান সে দোকানদার হবে। কিন্তু সে জানে ও মনে করে সে গায়ক হবেই জন্মেছে। সে হচ্ছে প্রকৃত গুণী। মঞ্চালয়ই তার জীবিকা উপার্জনের শ্রেষ্ঠ স্থান। এমন কি, পান্টালেওন পর্যন্ত তাই চায়। কিন্তু হের ক্লুবার যার পক্ষে, যার ওপর তার প্রভাব খুব বেশী, হের ক্লুবারের মাথাতেই আশয় এসেছে যে তাকে ব্যবসায়ী হতে হবে। হের ক্লুবারের ধারণা, ব্যবসায়ী হতে পারার মত আর কোনো সম্মানজনক কাজ নেই। কাপড় আর মখমল বিক্রী করা, খদ্দেরদের ঠকানো, তাদের কাছ থেকে বোকার দর বা বাণিজ্যের দর (প্রতি বছর যে যাবে যখন ফ্রাঙ্কফোর্টে বাণিজ্যের প্রবর্তকেরা আসতো তখন সব জিনিসের দাম বেড়ে যেতো ও তাকে বলা হতো বাণিজ্যের দর বা বোকার দর।) আদায় করা—এই হচ্ছে তার আদর্শ।

সানিনের যখন পোষাক পরা ও বার্লিনে চিঠি লেখা হয়ে গেলো, চেঁচিয়ে উঠলো এমিল, চলুন এবারে আমার সঙ্গে, বাড়ী যাওয়ার সময় হয়েছে।

সানিন বললো—এত তাড়াতাড়ি যায় না।

এবারে এমিল ওর গা ঘেঁষে বললো, তাতে কিছু হবে না। চলুন যাওয়া যাক। প্রথমে পোষ্টাপিসে যাবো, সেখান থেকে আমাদের ওখানে। জেম্মা আপনাকে দেখে বেজায় খুসী হবে। প্রাতরাশ আমাদের ওখানেই সেরে নেবেন। তাছাড়া মাকে আমার সম্বন্ধে, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

সানিন বললো, আচ্ছা তাহলে চলি। তারা বেরিয়ে পড়লো।

১০

মনে হলো, জেম্মা তাকে দেখে সত্যিই খুসী হয়েছে ও ফ্রাউ লেনোর সস্নেহে তাকে স্বাগত জানালেন। বোধ হলো কাল ওঁরা তার সম্বন্ধে ভালো ধারণাই করেছেন। এমিল সানিনের কানে কানে বললো, ভুলে যাবেন না। সানিন বললো মনে আছে। এমিল প্রাতরাশ অর্ডার দিতে গেলো।

ফ্রাউ লেনোর খুব সুস্থ ছিলেন না। তাঁর মাথা ধরেছিলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ স্থির হয়ে শুয়েছিলেন তিনি। জেম্মা পরেছিলো একটা হলদে রং-এর ঢিলে জামা, কোমরে কালো চামড়ার বেল্ট জড়ানো। তাকেও শ্রান্ত ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো, চোখের নীচে কালি পড়েছিলো। তাতে চোখ দুটির সৌন্দর্যের কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। পাণ্ডুরং-এ তার দেবদুর্লভ চেহারা আরো অপরূপ, আরো মনোহর মনে হচ্ছিলো। আজ সানিনের চোখ পড়লো তার অপরূপ লাবণ্যময় হাত দুটি। যখন সে তার রেশমের মত কালো চুলের গোছা হাত দিয়ে ঠিক করছিলো, সানিন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না, তার দীর্ঘ নরম, সুন্দর গড়নের আঙুলগুলো থেকে, র‍্যাফেলের আঁকা ছবি ফর নারিনার মত।

সেদিন খুব গরম পড়েছিলো। প্রাতরাশের পর সানিন বিদায় নিতে উঠলো। কিন্তু তাকে যখন বলা হলো এরকম দিনে যে যেখানে আছে, সেখানেই বসে থাকা ভালো। তখন সে সম্মত হলো ও থেকে গেলো। মহিলাদের সঙ্গে পেছনের একটি ঠাণ্ডা ও সুন্দর ঘরে সে বসেছিলো। জানলা দিয়ে ঘরের গাছের ঝোপে ভরা একটা ছোট্ট বাগান দেখা যাচ্ছিলো। অসংখ্য মৌমাছি ও বোলতা পাতার ঝোপে ও লোমানো ফুলের ওপরে গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছিলো। জানলার পর্দা টানা ছিলো কিন্তু আধভেজানো পাখিগুলো দিয়ে তাদের অবিরাম গুঞ্জনের আওয়াজ আসছিলো। তাতে মনে হচ্ছিলো বাইরে গুমোট গরম পড়েছে, ঘরের স্নিগ্ধ আঁধার যেন আরো বেশী ভালো লাগছিলো।

গতকাল যেমন অনেক কথা বলতে হয়েছিলো তেমনি আজও সানিন খুব কথা বলছিলো। কিন্তু রাশিয়া বা রুশ-জীবনের কথা নয়। তার ছোট্ট বন্ধুটি হিসেব রাখা শিখতে প্রাতরাশ খেয়েই সোজা হের ক্লুবারের কাছে চলে গিয়েছিলো। তাকে খুসী করার উদ্দেশ্যেই সানিন শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলো। ফ্রাউ লেনোর যখন ব্যবসার পক্ষ নিলেন তখন সে আশ্চর্য হলো না, সে ঠিক এইটেই আশা করেছিলো। কিন্তু জেম্মাও তার পক্ষ নিলো।

জোরের সঙ্গে হাতটা নামিয়ে সে বললো, যদি কেউ শিল্পী হতে চায়, বিশেষ করে গায়ক, তবে তার শীর্ষস্থানে ওঠা চাই। এর কমে কিছু হয় না, আর কে জানে কে সেখানে উঠতে পারবে?

পান্টালেওনও এই আলোচনায় যোগ দিলো। (দীর্ঘদিনের চাকরী ও বৃদ্ধবয়সের দৌলতে সে তার মনিবদের সঙ্গে বসতে পারতো, তাছাড়া ইটালীয়ানরা কায়দা কানুনের ধার ধারে না।) স্বভাবতঃই পান্টালেওন ছিলো সম্পূর্ণ শিল্পকলার দিকে। অবশ্য তার যুক্তিগুলো সত্যি কথা বলতে কি, খুব জোরালো ছিলো না। সে আরম্ভ করলো—সবচেয়ে আগে দরকার হচ্ছে ভেতর থেকে প্রেরণা আসবে—সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জাগবে আকাঙ্ক্ষা।

ফ্রাউ লেনোর উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহ পান্টালেওনের সেই আকাঙ্ক্ষার অভাব ছিলো না।

পান্টালেওন চটে গিয়ে বললো, আমার যে অনেক শত্রু ছিলো।

ফ্রাউ লেনোর বললেন—তুমি কি করে জানলে এমিলেরও শত্রু জুটবে না, যদিই বা তার সে আকাঙ্ক্ষা থাকে?

রাগ করে পান্টালেওন বললো, আচ্ছা বেশ, তাকে দোকানদারই বানান কিন্তু জিয়োভান বাটিষ্টা নিজে খাবার বিক্রেতা হলেও এরকম করতেন না।

আমার স্বামী জিয়োভান বাটিষ্টা বিবেচক ছিলেন এবং যৌবনে যদি তিনি একটু রাগী না হতেন—

কিন্তু বুড়ো আর শুনতে চাইলো না, রাগ করে বললো—জিয়োভান বাটিষ্টা! ও বেরিয়ে গেলো। জেম্মা বললো, এমিল যদি দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ইটালীর মুক্তির জন্য সব শক্তি নিয়োগ করতে চায় তবে এই পবিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎকে ত্যাগ করার সার্থকতা আছে, কিন্তু রঙ্গালয়ের জন্য নয়। এ কথাতে ফ্রাউ লেনোর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তার মেয়েকে কাতরকণ্ঠে বললেন সে যেন তার ভাই-এর সর্বনাশ না ডেকে আনে। সে নিজে ঘোর সাধারণতন্ত্রী তাতেই যেন সে সন্তুষ্ট থাকে। এই কথা বলেই ফ্রাউ লেনোর কাঁদতে লাগলেন ও বললেন আর মাথায় এত ব্যথা করছে যেন মনে হচ্ছে এক্ষুণি ফেটে যাবে। তিনি সানিন সামনে থাকাতে মেয়ের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বলছিলেন।

জেম্মা তখনই মার সেবায় লেগে গেল। প্রথমে তার মার কপাল

অডিকোলন দিয়ে ভিজিয়ে বললো, তারপর হাওয়া করলো, গালে চুমু খেলো, মাথার নীচে বালিশ দিলো, কথা বলতে বারণ করলো আবার চুমু খেলো। তারপর সানিনের দিকে ফিরে আবেগ জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলতে লাগলো, তার মা কি চমৎকার আর কি রূপসীই ছিলেন একদা! কিন্তু আমি কেন বলছি এককালে—এখনও কি সুন্দর চোখ দুটি!

জেম্মা তার পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে তার মার মুখ ঢেকে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে রুমালের তলায় দিকটা ধরে নীচের দিকে টেনে দিলো, প্রথমে কপাল, তারপর ভুরু ও তারপরে চোখ দুটি দেখা গেলো, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে মাকে চোখ খুলতে বললো। ফ্রাউ লেনোরের চোখগুলো ছিলো সত্যিই ভারী সুন্দর! চোখ খুলতেই জেম্মা প্রশংসাসূচক আওয়াজ করে রুমালটা তার মুখের ওপর থেকে টেনে নিয়ে মাকে আদর করতে লাগলো। ফ্রাউ লেনোর হাসলেন, মাথাটা সরিয়ে মেয়েকে জোরে ঠেলে দিলেন। জেম্মাও মিছিমিছি জোর করে আদর করতে লাগলো। মার্জারসুলভ ফরাসী ধরণে নয়, সুন্দর ইটালীয়ান ভঙ্গীতে, যাতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

অবশেষে ফ্রাউ লেনোর জানালেন, তিনি শ্রান্ত বোধ করছেন। জেম্মা তখনই মাকে চেয়ারে বসেই এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে বললো। রাশিয়ান ভদ্রলোক ও আমি ছোট ইঁদুরের মত শান্ত চুপ করে থাকবো।

ফ্রাউ লেনোর উত্তরে হাসলেন, চোখ বুজে দু'-একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন। জেম্মা তার মার কাছে লঘুপদে গিয়ে চুপ করে বসে রইলো, তার ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে; একটা হাত মার বালিশের তলায় রেখে। সানিন যেই নড়ে উঠছিলো অমনি সে সানিনের দিকে আড়চোখে চেয়ে শ' করে আওয়াজ করছিলো। শেষে সানিনেরও চুপ করে বসে থেকে ঝিমুনি এসে গেলো। সে যেন একটা ছবির সামনে বসে ছিলো। আধো অন্ধকার ঘরটি, সবুজ ফুলদানিগুলোতে রাখা সদ্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের লাল আভায় এখানে ওখানে আলোকিত হয়েছিলো। নিদ্রারতা মহিলাটি হাত জোড় করে শুয়েছিলেন, তুষারশুভ্র বালিশে তার ক্লান্ত সদয় চেহারা, তরুণীটির সদা ব্যস্ততা, তার বুদ্ধি, করুণা ও পবিত্রতা, তার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যরাশি, গভীর, ঘন কালো চোখ দুটি, ছায়াচ্ছন্ন অথচ জলজলে সব কিছু মিলে যেন একটি ছবি। সানিন ভাবে ও প্রশংসায় বিভোর হয়ে গেলো যেন। এসব কি? স্বপ্ন না রূপকথা? আর সব কিছুতে সেই বা কি করে হঠাৎ জড়িয়ে গেলো?

১১

সদর দরজার ওপর ঘণ্টাটি বেজে উঠলো। ফার টুপী ও লাল ওয়েষ্টকোট পরে একটি চাষী ছেলে ঢুকলো এসে দোকানে। সকাল থেকে একজনও খদ্দের আসেনি। প্রাতরাশের সময় ফ্রাউ লেনোর দুঃখ করে সানিনকে বলেছিলেন দেখুন, আমাদের ব্যবসার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? এখন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, জেম্মার হাত বালিশের তলায় ছিলো, সানিনকে চুপি চুপি বললো, দোকানে গিয়ে আমার হয়ে দেখে আসুন না।

সানিন পা টিপে টিপে দোকানে গেলো। ছেলেটি তিন আউন্স পেপারমিন্ট লজেন্স চাইলো।

সানিন ফিসফিস করে দরজা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওর কাছ থেকে কত নেবো?

উত্তর এলো ছয় ক্রয়েৎসার।

সানিন তিন আউন্স মেপে, এদিক ওদিক খুঁজে একটা কাগজকে গোল করে তাতে লজেন্সগুলো জড়ালো, একবার সব খুলে পড়ে গেলো, আবার জড়ালো, আবার খুলে গেলো। শেষে কোনো রকমে জড়িয়ে দিলো ও খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা নিলো। ছেলেটি তার পেটের ওপরে টুপিটা চেপে ধরে অবাক হয়ে সানিনের কাণ্ড দেখছিলো ও পেছনের ঘর থেকে জেম্মা কোনোরকমে মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপছিলো। প্রথম খদ্দেরটি চলে যেতে না যেতেই একজন ও তারপর আর একজন খদ্দের এলো। সানিনের মনে হলো দেখা যাচ্ছে, আমার খুব পয় আছে। দ্বিতীয় খদ্দেরটি এক গ্লাস সিরাপ চাইলো, তৃতীয়টি দু' আউন্স লজেন্স। চামচ আর ডিশের শব্দ করে, বাক্স ও জারগুলিতে হাত ঢুকিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সানিন তাদের চাহিদা মিটালো। অবশ্য পরে হিসেব করে দেখা গেলো সিরাপটা সে কম দামে বিক্রী করেছে আর লজেন্সের জন্য ক্রয়েৎসার বেশী নিয়েছে। জেম্মা তার হাসি চেপে রাখতে পারছিলো না। সানিনেরও মন ভরে গেলো অবর্ণনীয় আনন্দে ও খুসীতে। তার মনে হলো বন্ধুসুলভ ঠাট্টার হাসিতে মুখ ভরে এই সুন্দর মেয়েটি যদি খোলা দরজা দিয়ে চেয়ে থাকে, তাহলে সে অনন্তকাল ধরে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সিরাপ ও লজেন্স বিক্রী করে যেতে পারে। গ্রীষ্মের রোদ এসে পড়েছিলো পাতায় ভরা সামনে চেষ্টনাট গাছের সারিতে, তার ছলকে সবুজ আভা এসে পড়েছিলো ঘরের মধ্যে, তার মন ভরেছিলো মধুর আলস্যে, মুক্ত আনন্দে, প্রথম যৌবনের খুসীর জোয়ারে।

চতুর্থ খদ্দেরটি এককাপ কফি চাইলো, তাতে পান্টালেওনকে ডাকতে হলো। হের ক্লুবারের দোকান থেকে এমিল তখনও ফেরে নি। সানিন ভিতরে গিয়ে আবার জেম্মার পাশে বসলো। ফ্রাউ লেনোর তখনও ঘুমোচ্ছিলেন বলে তার মেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলো। সে বললো মার মাথা ধরা ঘুমের মধ্যে সেরে যায়। সানিন ফিসফিস করে তার লেনদেনের খবর দিলো। সে দোকানের খাবারগুলোর নাম বলে যেতে লাগলো ও জেম্মা খুব গম্ভীর হয়ে তাদের দাম বলে যেতে লাগলো। তারা যেন একটা হাসির নাটকে অভিনয় করছে মনে করে দুজনেই নিজেদের মনে হাসছিলো। রাস্তায় হঠাৎ তারযন্ত্রে ভের ফ্রাইস্যুৎসের গানের এক কলি বেজে উঠলো প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে। এই করুণ গানটি স্তব্ধ দুপুরের বাতাসকে কাঁপিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছিলো। জেম্মা বললো ও মাকে জাগিয়ে দেবে। সানিন তখনই দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকটির হাতে কয়েকটি পয়সা দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দিলো। সানিন ফিরে এলে জেম্মা মাথা নেড়ে তাকে ধন্যবাদ জানালো। গুনগুন করে আপনমনে মৃদু হেসে ওয়েবারের মনোমুগ্ধকর সুরটি গাইতে লাগলো, যেখানে ম্যাক্স প্রথম প্রেমের আনন্দ ও বিস্ময়ের বর্ণনা করেছেন। এবারে সে সানিনকে জিজ্ঞেস করলো সে ভের ফ্রাইস্যুৎস জানে কিনা ও ওয়েবার তার কেমন লাগে। ওয়েবার

থেকে কবিতা ও আধুনিক সাহিত্য, তারপর হকমানে আসা গেলো। তখনকার দিনে লোকে হকমান খুব পড়তো।

ফ্রাউ লেনোর তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, এমন কি তার আস্তে নাক ডাকছিলো ; পাখিগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্য্যরশ্মি এসে পড়েছিলো। সূর্য্যরশ্মি ক্রমশঃ সরে সরে যাচ্ছিলো মেঝের ওপরে, ফার্নিচারের ওপরে, জেমার জামায়, ফুলের পাপড়িতে ও পাতাগুলোর ওপরে।

১২

দেখা গেলো, জেমা হকমানকে বেশী পছন্দ করে না, সত্যি বলতে সে হকমান পড়ে বিরক্তই বোধ করে। তার দক্ষিণ দেশের উজ্জ্বল স্বভাবের একেবারে বিপরীত ছিলো অতীন্দ্রিয় কল্পনাময় উত্তর দেশের এই কাহিনীগুলি। সে বিরক্তির সঙ্গে বললো, রূপকথা গল্প গুলো—শিশুদের জন্ত লেখা। তাছাড়া হকমানের লেখা কবিত্বময় নয়। অবশ্য একটি গল্প, তার নাম ভুলে গেছে, সে গল্পটা তার খুব ভালো লাগে গল্পটার আরম্ভ ভারী সুন্দর, শেষের দিকটা সে পড়েনি বা ভুলে গেছে। গল্পটা ছিলো এরকম একটি তরুণের সঙ্গে দেখা হলো একটি অসামান্যা সুন্দরী গ্রীক মেয়ের, সেও এক খাবারবিক্রেতার দোকানে। সেই মেয়েটির সঙ্গে সব সময় থাকতো এক রহস্যময় পাজী বুড়ো। তরুণটি প্রথম দর্শনেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো। আর মেয়েটিও তার দিকে করুণ নয়নে দেখছিলো চেয়ে, যেন তাকে মুক্ত করতে প্রার্থনা করছিলো। ছেলেটি এক মুহূর্তের জন্ত বাইরে গিয়েছিলো। যখন ফিরে এলো তখন দোকানে সেই মেয়েটি বা বুড়ো কেউ ছিলো না, ও তাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। খোঁজ পেয়ে ওদের অনুসরণ করলো কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওদের ধরতে পারলো না। সুন্দরী মেয়েটি চিরকালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সে মেয়েটির মিনতিভরা চাহনি ভুলতে পারছিলো না। সে সব সময়ই এ কথা ভেবে কষ্ট পেয়েছে, তার সারা জীবনের সুখ সে আঙুলের ভেতর দিয়ে গলে যেতে দিয়েছে।

হয়ত হকমান লিখিত গল্পটির শেষ এরকম ছিলো না কিন্তু জেমার স্মৃতিতে এই ছিলো।

জেমা বললো, আমার মনে হয় এরকম দেখা হওয়া ও বিচ্ছেদ হওয়া আমরা যত কম মনে করি তার চেয়ে বেশী ঘটে থাকে।

সানিন চুপ করে শুনছিলো। দু-এক মিনিট পর সে হের ক্লুবারের প্রসঙ্গ তুললো। এই প্রথম সে ওর নাম করছিলো, এতক্ষণ ওর মনেই ছিলোনা ওর কথা।

এবারে জেমা চুপ হয়ে গেলো। অন্তদিকে চেয়ে তর্জনী খুঁটতে লাগলো। তারপর তার প্রেমিকের প্রশংসা করে বললো, আগামী কাল সকালে পিকনিকে যাওয়ার কথা। সানিনের দিকে একবার চেয়ে দেখে একেবারে চুপ হয়ে গেলো।

সানিন ভাবছিলো এবারে কি বলা যায়।

এমন সময় আওয়াজ করে ফ্রাউ লেনোরকে জাগিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলো এমিল। সানিন এমিলকে দেখে যেন নিষ্কৃতি পেলো।

ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পান্টালেওন এসে বললো, দুপুরের খাবার তৈরী। পরিবারের বন্ধু, একদা অপেরা গায়ক ভৃত্যটি রাঁধুনীর কাজও করতো।

১৩

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরও সানিন বসে রইলো। অসহ্য গরমের অজুহাতে তাকে যেতে দেওয়া হলো না। যখন গরম কমে গেলো, বাগানে খয়ের গাছের তলায় বসে তাকে কফি খেতে নেমন্তন্ন করলো ওরা। স্থির-নির্দিষ্ট গতানুগতিক জীবনের গন্ডির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অন্তর্নিহিত আনন্দ, সেই আনন্দ ও তৃপ্তিতে তার মন ভরে গেলো। যেন বর্তমানের কাছ থেকে কিছুই তার আর পাওনা নেই। জেমার মত তরুণীর মহামূল্য সংস্পর্শে এসে তার আগামী দিন ও গতকালের হিসেবে ভুল হয়ে গেলো। শিগ্গীরই তার কাছ থেকে হয়ত চিরতরেই বিদায় নিতে হবে। কিন্তু উলাণ্ডের গীতি-কবিতার মত যত দিন জীবনের শান্ত নদীতে বায় নৌকোতে বসে আছো তত দিন—যাত্রী, প্রাণ ভরে পান করে নাও আনন্দের পেয়ালা, স্ফূর্তিতে সুখে থাকো। সুখী পথিকটির মনে হলো সব কিছুই মনোহর ও আনন্দদায়ক। ফ্রাউ লেনোর ট্রেসেট খেলতে ডাকলেন তাকে, পান্টালেওন তাকে তাদের সহজ ইটালীয়ান খেলাটি শিখিয়ে দিলো, কয়েকটি ক্রয়েৎসার জিতে নিয়ে ভারী খুসী হলো পান্টালেওন। এমিলের অনুরোধে এবারে পান্টালেওন টার্টালিয়াকে নিয়ে খেলা দেখাতে সুরু করলো। টার্টালিয়া একটা লাঠির উপরে লাফালো, কথা বললো (অর্থাৎ ডাকলো), হাঁচলো, নাক দিয়ে দরজা বন্ধ করলো। মনিবের কাছে একটা ছেঁড়া চটি নিয়ে এলো, সবশেষে একটা সৈনিকের টুপি মাথায় পরে সেনানায়ক বার্ণাদোত্তের পাঠ অভিনয় করলো, সম্রাট নেপোলিয়ানের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত কটূকথা শুনলো। বলা বাহুল্য, নেপোলিয়ানের পাঠটি অভিনয় করলো পান্টালেওন। তার হাত দুটো বুকের ওপর রাখলো, টুপিটা চোখের ওপরে টেনে নিলো। অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশভাবে ফরাসীতে কিন্তু হায় ভগবান, কি সে ভাষা—বকতে লাগলো। টার্টালিয়া পায়ের ভেতর লেজটা ঢুকিয়ে গুটিশুটি মেরে প্রভুর পায়ের তলায় বসে অপরাধীর মত পিটপিট করে, টুপির তলা থেকে আড়চোখে চাইছিলো। টুপিটা তার মাথায় একপাশ করে বসানো ছিলো। নেপোলিয়ানের গলার স্বর যখনই উঁচু পর্দায় উঠছিলো, বার্ণাদোত্ত পেছনের পা দু'টোর ওপর ভর করে দাঁড়াচ্ছিলো। অবশেষে নেপোলিয়ান যখন অতিরিক্ত উত্তেজনার দরুণ তার ফরাসীত্ব ভুলে গিয়ে ইটালীয়ানে চেঁচিয়ে উঠলো 'দূর হও, বিশ্বাসঘাতক,' তখন বার্ণাদোত্ত সোজা গিয়ে সোফার পিছনে লুকিয়ে পড়লো। অবশ্য তার পরেই আনন্দে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো যেন দেখাতে যে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। দর্শকরা সবাই প্রাণভরে হাসলো—সবচেয়ে বেশী সানিন। জেমাও অবিরত হাসছিলো, জোরে আওয়াজ করে। আহা, ওর হাসি—কেবল ওর হাসির জন্ত সানিন ওকে আদর করতে পারতো।

রাত্রি এলো অবশেষে, এলো তার বিদায় নেবার পালা। বার বার কাল আসবো বলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলো ফিরে তার হোটেলে। এমিল তো সানিনকে জড়িয়ে চুমুই খেয়ে দিলো। সানিন সঙ্গে নিয়ে গেলো মেয়েটির ছবি, হাস্যময়ী, ভাবুক, শান্ত এমন কি মাঝে মাঝে উদাসীন—প্রতিটি ভাবের ছবি কি সুন্দর, কি মনোহর। তার চোখ কখনও সম্পূর্ণ খোলা ও ঝলমলে পুলকে ভরা, কখনও চোখের পালকে আধঢাকা, রাত্রির মত গভীর ও

অন্ধকার ; তার সামনে ফুটে উঠতে লাগলো সব চিন্তা, সব ছবি ছাপিয়ে তার মন ভরে দিলো অভিনব-মাধুর্য্যে।

হের ক্লুরবার ও তার ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে যাওয়ার কারণ—এক কথায় কাল রাত্রিতে যে সব কথা সে চিন্তা করছিলো আজ একবারও তা সানিনের মনে এলো না।

১৪

কিন্তু এতক্ষণে সানিনের সম্বন্ধেও দু'-একটি কথা আমাদের জানা দরকার। প্রথমেই বলতে হয় অতি প্রিয়দর্শন ছিলো সে। দীর্ঘায়ত দেহ, সুন্দর যদিও একটু ভোঁতা চেহারা, করুণা মাখানো নীল চোখ, সোনালী চুল, গোলাপী গায়ের রং, তার চেয়েও ভালো লাগতো তার মুখের সরল ও শান্ত ভাব, অকপট ও নির্ভরযোগ্য, তার ভালোমানুষী ভাব দেখে প্রথমে হয়ত তাকে একটু নির্বোধ বলেই মনে হতো, আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেদের মুখের যে ভাব থেকে স্পষ্টতঃই চেনা যেতো 'বাবার আদুরে ছেলে, শান্ত শিষ্ট ভদ্র, আমাদের সীমাহীন বৃক্ষবিরল স্তেপভূমির পল্লীঅঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে ও বড় হয়েছে। অনির্দিষ্ট চলা, আধো-আধো কথা, শিশুর মত হাসি যদি কারো চোখে চোখ পড়ে। সর্বোপরি সতেজ স্বাস্থ্য, তার উপর অন্তরের কোমলতা, এই হচ্ছে সানিন—সব মিলিয়ে সানিনের ছবি। দ্বিতীয়তঃ সে নির্বোধ ছিলো না। অনেক বিষয়ে বিদ্যার্জন করেছিলো। বিদেশ ভ্রমণ সত্বেও সে তার চরিত্রের মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলেনি। সেকালের শ্রেষ্ঠ যুবকদের মাঝে মাঝে যে সব যন্ত্রণাময় অশান্তি ও চিন্তার মধ্যে দিন কাটতো সানিন তার কিছুই জানতো না। সে জগৎ তার কাছে ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আমাদের লেখকরা 'নূতন ধরণের চরিত্রে'র বৃথা সন্ধান করে ইদানীং যা সৃষ্টি করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যুবকরা সব ক্ষেত্রেই চরিত্রের সৌকুমার্য্য বজায় রাখছে যে করেই হোক। তারা যেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে সদ্য-আমদানী-করা টাটকা ফ্লেন্সবুর্গ ঝিনুকের মতই নির্দোষ ও নিখুঁত। তুলনার কথাই যখন উঠলো তখন সানিনের তুলনা চলতে পারে একটি ছোট আপেল গাছের সঙ্গে, যাকে সদ্য উপড়ে এনে আমাদের কালোমাটি ফলের বাগানে লাগানো হয়েছে। একটু বড়ই হয়ে গেছে উপড়ে আনার পক্ষে, কিম্বা বছর তিনেকের, ঝকঝকে, সুন্দর, যত্নে লালিত মোটা গোড়ালিওলা তেজী বাচ্চা ঘোড়া, আগেকার দিনের কোনো অবস্থাপন্ন লোকের অশ্বশালায় লালিত, সবেমাত্র আরোহণযোগ্য হয়েছে। উত্তর-জীবনে যারা সানিনকে দেখেছে তারা কিন্তু দেখেছে তাকে একেবারে ভিন্নরূপে ; তখন সানিন তার যৌবনসুলভ তারুণ্য ও লালিত্য হারিয়েছে, জীবন তার প্রতি অবিচার করেছে, অত্যাচারের ছাপ রেখে গেছে তার চেহারায়।

পরের দিন সানিন তখনও শুয়েছিলো, এমিল হাতে ছড়ি নিয়ে, পমেটমমাখা সুন্দর আঁচড়ানো চুল—সেজেগুজে এসে ঘরে ঢুকলো। বললো, হের ক্লুরবার গাড়ী নিয়ে এক্ষুণি আসছেন, দিন খুব চমৎকার করবে মনে হচ্ছে, তারা সকলেই যাওয়ার জন্য তৈরী কিন্তু আবার মাথা ধরাতে মা যেতে পারবেন না। সানিনকে তাড়া দিলো। বললো আর একটুও সময় নেই। সত্যিই হের ক্লুরবার এসে দেখলো সানিনের তখনও প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়নি। দরজায় টোকা মারলো, ঘরে ঢুকলো, নত হয়ে অভিবাদন করলো, বললো, সানিন যতক্ষণ না প্রস্তুত হয় সে অপেক্ষা করবে, টুপিটা হাল্কাভাবে হাঁটুর উপর রেখে বসলো। পূর্ণ পোষাক পরিহিত কৃতী ব্যবসায়ীটি আতর মেখে এসেছিলো, একটু নড়লেই অতি মৃদু আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা ঘরে। ল্যাণ্ডো নামে গৌরবান্বিত একটি খোলা ও প্রশস্ত গাড়ীতে এসেছিলো সে, একজোড়া প্রকাণ্ড বড় তেজী যদিও তেমন সুন্দর নয়, ঘোড়া জোতা ছিলো গাড়ীতে। মিনিট পনেরোর মধ্যে সানিন ও এমিল সহ হের ক্লুরবার সগর্বে এই গাড়ীতে করেই খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ফ্রাউ লেনোর দৃঢ়কণ্ঠে এই ভ্রমণে যেতে আপত্তি জানালেন, জেম্মাও তার সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো, কিন্তু তার মা তাকে প্রায় বাড়ী থেকে বের করে দিলেন।

সবাইকে আশ্বাস দিলেন তিনি, আমি কাউকেই চাইনে। আমি ঘুমিয়ে পড়বো। পান্টালেওনকেও পাঠাতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু তাহলে দোকান দেখার কেউ থাকে না।

এমিল বললো—টার্টালিয়াকে নিয়ে যাই মা ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

টার্টালিয়া তখনই গাড়োয়ানের পাশের সিটে গিয়ে বসলো ও ঠোঁট চাটতে লাগলো। বোঝা গেলো, সে এরকম বাইরে যাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলো। জেম্মা বাদামী ফিতে লাগানো একটা খড়ের টুপি পরলো। সামনের দিকে নামিয়ে দিলো টুপিটি যাতে রোদ তার মুখে না পড়ে। টুপির ছায়া শেষ হয়েছিল তার ঠোঁটে এসে, গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত হালকা ও গোলাপী ছিলো তার ঠোঁট দুটো, শিশুর মত তার দাঁতগুলো সলজ্জ হাসিতে দেখা যাচ্ছিলো। জেম্মা সানিনের পাশে পেছনের সিটে বসেছিলো হের ক্লুরবার ও এমিল তাদের মুখোমুখি বসেছিলো। শ্বেত বেশপরিহিতা ফ্রাউ লেনোরকে জানলায় দেখা গেলো, জেম্মা রুমাল নাড়লো তার দিকে চেয়ে, ঘোড়াগুলো দুলকি চালে রওয়ানা হলো।

১৫

ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে প্রায় আধ ঘণ্টার রাস্তা ছবির মত সুন্দর ছোট সহর সোডেন টাউনুস পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত ছিলো। খনিজ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত ছিলো এই সহরটি রাশিয়ায়, সবাই বলতো দুর্বল-হৃদয় বা শ্বাসযন্ত্রের উপকারী ছিলো এই প্রস্রবণগুলি। ফ্রাঙ্কফোর্টের লোকেরা অবশ্য সেখানে যেতো ফূর্তি করবে বলে। কারণ, সোডেনে একটি সুদৃশ্য পার্ক ও কয়েকটি সরাইখানা ছিলো যেখানে, উঁচু লাইম ও ম্যাপল্ গাছের ছাওয়ায় বসে বিয়ার ও কফি পান করা যেতো। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে সোডেন যাওয়ার রাস্তা ছিলো মাইন নদীর ডান তীর ধরে আর তার দু'পাশে ছিলো ফলগাছের সারি। চমৎকার রাজপথ ধরে যখন গাড়ীটি মসৃণ গতিতে চলছিলো তখন সানিন আড়চোখে জেম্মা ও তার প্রণয়ীর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিলো। এই প্রথম সে দু'জনকে একসঙ্গে দেখলো। খুব শান্ত ও স্থির হয়ে বসেছিলো জেম্মা, বোধ করি একটু বেশী গম্ভীর ও সমাহিত দেখাচ্ছিলো তাকে। সদাশয় শিক্ষকের ভাব করে বসেছিলো ক্লুরবার। যেন ছাত্রদের সঙ্গে

মিসে'স ভদ্রজনোচিত ফূর্তি'তে তার আপত্তি ছিলো না। জেম্মার প্রতি তার কিছুমাত্র আসক্তি আছে, সানিনের নজরে এলো না এমন কোনো হাবভাব। হের ক্লুবার স্বভাবতঃ এই ছোট ব্যাপারটিকে স্থির নিশ্চিত বলেই জেনেছিলো, সে জন্ত এই সম্বন্ধে কোনো রকম উচ্ছ্বাস বা অনুরাগ প্রকাশের কোনো সার্থকতা আর ছিলো না তার কাছে। কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলো সে। খাবার আগে সোডেনের চার পাশে বনময় বন্ধুর উপত্যকাতে তারা যখন বেড়াচ্ছিলো, যখন সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলো পূর্ণ মাত্রায়। তখনও তার এই অহমিকার ভাব ফুটে উঠছিলো। সময় সময় কর্তৃত্ব করার ভাব ফুটে উঠছিলো। যথা, একটি ছোট পাহাড়ী নদীর সম্বন্ধে মন্তব্য করলো; অধিত্যকার উপর দিয়ে বড্ডই ঋজুরেখায় বয়ে গেছে—কয়েকটি সুন্দর সর্পিল বাঁকে বয়ে যাওয়া উচিত ছিলো নদীটির। একটি ফিঞ্চ পাখীর ব্যবহারও তার মনঃপূত হলো না, বললো তার ডাক বড্ডই একঘেয়ে। জেম্মার চেহারার অবসাদ বা বিরক্তির চিহ্ন ছিলো না বরং মনে হচ্ছিলো সে সব কিছুই উপভোগ করছিলো। কিন্তু সানিনের মনে হলো এ জেম্মার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তার চেহারায় যে ক্লান্তির ছাপ পড়েছিলো তা নয়। তার হাস্যোজ্জ্বল রূপ ভারী সুন্দর লাগছিলো, কিন্তু মনে হচ্ছিলো সে যেন আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে আছে। ছোট ছাতাটি খুলে গম্ভীর ভাবে নিতান্তই ভদ্রঘরের তরুণীর মত আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো এমিলও যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না আর সানিন তো নয়ই। কথাবার্তা সব সময়ই চলছিলো জার্মাণে, সেজন্তও সে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলো না কেবল টার্টাগ্লিয়া। ডাকছিলো, ছুটছিলো, শালিক পাখীকে তাড়া করছিলো, গাছের গুঁড়ি, ছোট নালা, কাটাগাছ লাফিয়ে ডিঙিয়ে যাচ্ছিলো। জলে লাফিয়ে পড়ছিলো, গা ঝেড়ে নিয়ে আবার তীরবেগে ছুটে যাচ্ছিলো, তার লাল লম্বা জিভ বেরিয়ে পড়েছিলো। অতিথিদের চিত্ত বিনোদনের জন্ত যা যা করা দরকার মনে করছিলো, হের ক্লুবার তার ত্রুটি করছিলো না। একটি বড় ওক গাছের ছায়াতে সবাইকে বসতে বললো সে, পকেট থেকে 'হাস্যকৌতুক বা হাসতেই হবে তোমাকে' নামে একটি ছোট বই বের করলো এবারে, পড়তে আরম্ভ করলো ভীষণ হাসির ছোট ছোট কাহিনী। প্রায় বারোটি কাহিনী পড়লো সে, কিন্তু কেউই বেশী মজা পেলো না তাতে। কেবলমাত্র সানিনই ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসতে চেষ্টা করলো। হের ক্লুবার নিজে অবশ্য প্রত্যেকটি হাসির গল্প শেষ করে সগর্বে একটুখানি পরিমিত হাসি হাসছিলো। বারোটার সময় সবাই সহরের সেরা হোটেলে ফিরে গেলো।

খাবার সময় হয়েছিলো। হের ক্লুবার ঠিক করলো সবাই গার্ডেন সালোনে অর্থাৎ সবদিকে ঢাকা গ্রীষ্মকালীন ঘরে বসে খাবে। কিন্তু জেম্মা হঠাৎ আপত্তি জানালো, বললো সে খোলা জায়গায় হোটেলের সামনে বাগানে যে ছোট ছোট টেবিল রাখা আছে সেখানে বসে খাবে। চেনামুখ দেখে তার আর ভালো লাগছিলো না, এবারে নতুন মুখ দেখতে চায়। কয়েকটি টেবিলে ইতিমধ্যে সত্ত-আগত কয়েক জন লোক বসেছিলো।

হের ক্লুবার খুশীমনে তার 'প্রেমিকার খেয়াল' চরিতার্থ করতে হেডওয়েটারের সঙ্গে কথা বলতে গেলো। জেম্মা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, চোখ নীচু করে ঠোঁট চেপে। সে অনুভব করতে পারছিলো, সানিন তার দিকে কৌতুহলের সঙ্গে চেয়ে আছে। বিব্রত বোধ করছিলো সে। হের ক্লুবার এসে বললো আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার তৈরী হবে, ইতিমধ্যে একটু স্কিটল্ খেলা যাক, এই এই তাতে খিদেরও উদ্রেক হবে। খুব ভালো বল ছুড়তে পারতো সে, কাঠের বলটি ছোড়ার আগে বীরগর্বে হাত ছড়িয়ে, পেশী ফুলিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কায়দা দেখালো সে। তার খেলোয়াড়সুলভ দৈহিক গঠন ছিলো সত্যিই প্রশংসনীয়। তার হাত দুটো ছিলো ভারী ভর্সা ও সুন্দর। অতি সুন্দর কারুকরা একটা রুমাল দিয়ে হাত মুছছিলো সে।

খাবার সময় এলে সবাই গিয়ে টেবিলে বসলো। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।

"বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়াই যেন বরণ না করি। আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বেও পারে। কিন্তু, আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটু বেলায় জ্বরটা একটু কমলে মার্লিন ট্যাক্সী আনিয়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেল। ঘরে নিয়ে সযত্নে শুইয়ে দিল আমাকে খাটে। নিজের ঘরে নিজের খাটে শুয়ে যেন অনেকটা আরাম পেলাম। দুপুরের দিকে একজন বন্ধু ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—বুকে-পিঠে কোথাও কোন দোষ নাই, এমনি জ্বর। মার্লিন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—ডাক্তারের কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা মার্লিনকে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

যাই হোক, জ্বরটার দরুণ আমাকে প্রায় সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হল এবং তারপর উঠেও আরও প্রায় ৭।৮ দিন বাড়ী থেকে বেরুতে পারিনি—এত দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিলাম।

এই সময় সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে মার্লিনের এমন একটা মধুর রূপ আমার চোখে ভেসে উঠল যে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, একথা সরল ভাবেই স্বীকার করি। সমস্ত দিন সমস্ত রাত প্রাণ-মন দিয়ে সে যেন আকুল ভাবে সজাগ হয়ে থাকত—পাছে আমার গায়ে কোনও দিক দিয়ে একটুকুও আঁচড় লাগে। শুধু তাই নয়, তার সেই গম্ভীর-বিষণ্ণ ধরণটিও যেন গেল চলে। সহজ হাসিখুশী ভাবের মধ্য দিয়ে একটা স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছড়িয়ে দিল সমস্ত বাড়ীতে—অসুস্থ অবস্থায় আমি সহজেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সেদিন সন্ধ্যাবেলার সেই কথা ভুলে গেলাম কি? না—ভুলিনি। যত দিন অসুস্থ ছিলাম মন ছিল দুর্ব্বল, তাই মাঝে মাঝে যখনই কথাটা মনে হত, দুর্ব্বল মনে তার প্রতিক্রিয়াও হত ক্ষীণ, তাই সহজেই চাপা পড়ে যেত। কিন্তু ক্রমে শরীর সুস্থ হতে লাগল, মনও হতে লাগল সবল, কথাটাও ক্রমেই মনটাকে জুড়ে বসতে লাগল—আর চাপা দেওয়া যায় না। ফলে, যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সার্জ্জারীতে যাওয়া-আসা সুরু করলাম, ঐ কথাটা মনটাকে সর্ব্বক্ষণ এমন ভাবে চেপে বসল যে তার ভারে আমার যেন সময় সময় দম বন্ধ হয়ে আসত। কিন্তু কি করা যায়?

মার্লিনের সেবা-যত্নের মধ্য দিয়ে তার মধুর রূপটি কল্পনা করে মনকে যে শান্ত করার চেষ্টা করিনি এমন নয়। কিন্তু হলে কি হবে—আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। মন কি শান্ত হয়? মনে পড়ে যায় ভায়লেটের কথা—ভালবাসার ত এক রূপ নয়, সেবাযত্নের মধ্য দিয়ে তার একটা দরদের রূপ প্রকাশ পায় বটে কিন্তু অন্য রূপও ত আছে?

ক্রমে এমন হল—আমি যেন মার্লিনের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। বাড়ীতে যতক্ষণ নেহাত না থাকলে নয়। বাইরে, বিশেষ করে সার্জ্জারীতে, বেশীর ভাগ সময় কাটাতে সুরু করলাম। মার্লিন, যদিও তার ব্যবহারে বেশ সহজই ছিল, কিন্তু আমার দিক দিয়ে ব্যবহার এমন কি কথাবার্ত্তাও ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে এমনও যে মনে হয়নি তা নয় যে, কেন এত ভেবে মরছি, মার্লিনকে সমস্ত কথা বলে সোজা প্রশ্ন করি, যা হয় পরিষ্কার হয়ে যাক—তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়। সেদিন জ্বর না হলে হয়ত ঝোঁকের মাথায় তাই করতাম—আমি সোজাই প্রশ্ন করতাম। তারপর যা হয় হত। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, এখন যেন আর প্রবৃত্তি হয় না, বলতে গেলে বাধে। আমি যে পরিষ্কার দেখেছি, সন্দেহ ত নয়—কি করে কি বলি!

কিন্তু একটা কিছু ত করা দরকার? মনে হল—এ রকম চুপ করে সহ্য করার মধ্যে দৈন্য আছে। সত্যটাকে কেনই বা এমন করে এড়িয়ে চলব? কি করি—পথ খুঁজে পাই না। নানারকম ভাবি। ভেবে ভেবে ঠিক করলাম—ভায়লেটের সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। সে ত সবই জানে। তার কাছে ত লুকাবার কিছু নাই। সে-ও ত বুদ্ধিমতী মেয়ে।

• • •

সার্জ্জারীতে যাওয়া-আসা সুরু করার পর ভায়লেটের সঙ্গে এ বিষয়ে অবশ্য কোনও কথা হয়নি। আমি সার্জ্জারীতে কাজকর্ম করা ছাড়া বেশীর ভাগই চুপচাপ বসে থাকতাম, এবং ভায়লেটও ওদিক দিকে কোনও কথা তোলেনি। ভায়লেট ত সবই জানে, তাই এদিক-ওদিক পাঁচ রকম বাজে কথা বলে আমার মানসিক অশান্তিটা ভায়লেটের কাছে চাপা দেওয়ারও কোনও চেষ্টা আমি করিনি। বরং ভায়লেটের কাছে একটা লজ্জাই বোধ করতাম—এত বড় ব্যাপার ভায়লেট স্বচক্ষে দেখল অথচ আমি চুপচাপ করে বেশ নির্বিবাদে ঘর-সংসার করে যাচ্ছি, ভায়লেট আমাকে ভাবে কি! তাই যখন ঠিক করলাম—ভায়লেটের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাক—কথাটা

আপনার রূপ-লাবন্য আপনারই হাতে !
মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধূলোয় কালো বা নষ্ট হতে
দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই
ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয়
বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন
ফিরে আসছে! ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে!
হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে
দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···
হিমালয় বুকে স্নো!
Erasmic
হিমালয় বুকে স্নো
HIMALAYA BOUQUET SNOW
ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী
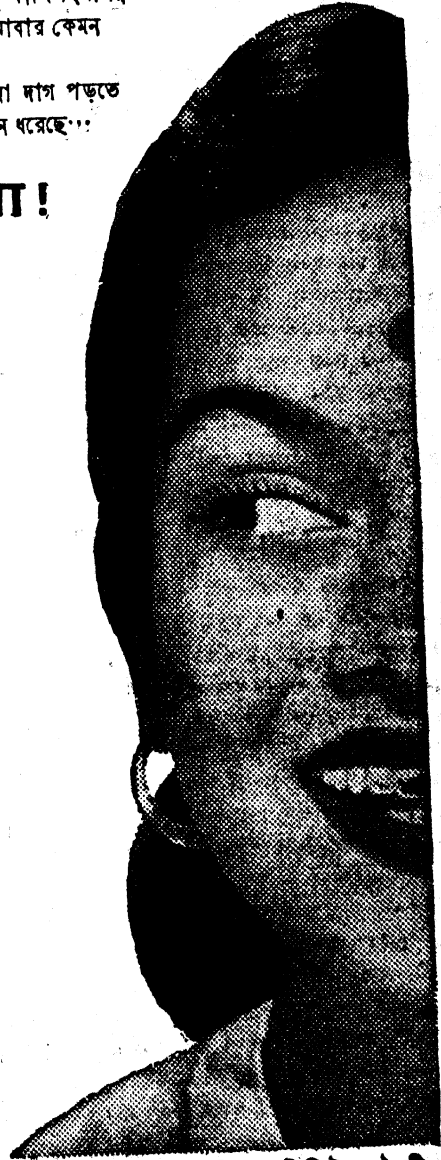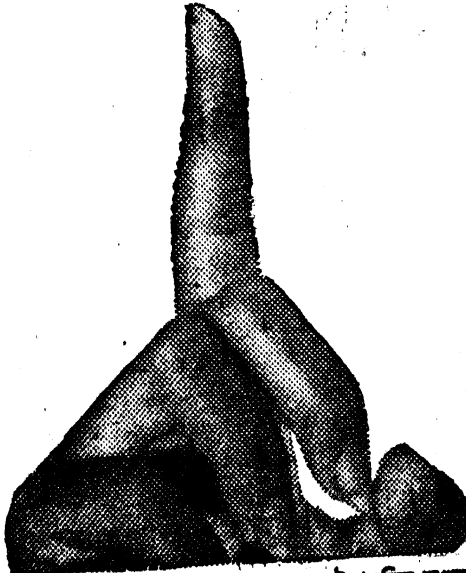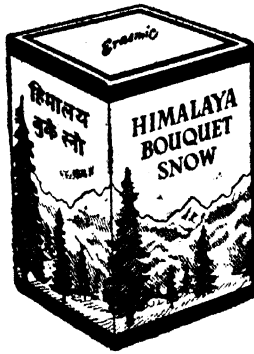
চারিদিক থেকে বেশ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল এবং মনও বোল আনা সায় দিল।

ভায়লেটের কাছে কথাটা তুললাম, আমার নিয়মিত সার্জ্জারী যাতায়াত শুরু করার দিন ২০।২৫ পরে একদিন সকালবেলা বারোটা আন্দাজ। রোগী দেখার পর্ব্ব তখন শেষ হয়েছে। ভায়লেট চা'য়ের সঙ্গে কিছু হ্যাম স্যানডুইচ সাজিয়ে আমার টেবিলে বসল।

বললাম, ভায়লেট! তোমার সঙ্গে একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই।

বলল, বলুন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তুমিই ত সবই জান—কি বিষয় আলোচনা করতে চাই, সহজেই বুঝতে পারছ?

ভায়লেট একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, হ্যাঁ।

শুধালাম, বলত—এখন আমার কি করা উচিত?

আবার একটু চুপ করে রইল। তারপর একটু যেন ঠোঁট চেপে বলল, আমি ভেবেছিলাম—আপনার অসুখের মধ্য দিয়ে আপনাদের দু'জনার মিলন হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে মনটা বিরক্ত হল। বললাম, কিসের মিলন? যা স্বচক্ষে দেখেছি তারপর কি স্বামিস্ত্রীর মধ্যে মিলন হওয়া সম্ভব?

সহজ ভাবেই বলল, কেন হবে না? স্ত্রী যদি অনুতপ্ত হয়ে স্বামীর কাছে ক্ষমা চায়, স্বামীর মন যদি উদার হয়—কেন হবে না?

ভায়লেটের কথায় হঠাৎ লালকাকাদের কথা মনে হল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কিন্তু মনে হল—সেখানে ত লুকোচুরির ব্যাপার ছিল না, সবই ছিল স্পষ্ট, সোজা। তাই শেষ পর্য্যন্ত ওদের মিলনও হল সহজ। কিন্তু এখানে—ভাবতে মনটা ঘৃণায় উঠল ভরে।

মুখে বললাম, ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমার স্ত্রী আমার কাছে ক্ষমাও চায়নি এবং আমি তত উদারও নই।

সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে উত্তর দিল, তাহলে—ডিভোর্স?'

বললাম, ডিভোর্স করা কি অত সোজা নাকি?

বলল, তার রাস্তা তৈরী করতে হয়।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, প্রথমতঃ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এর পরে একসঙ্গে বাস করা বন্ধ করতে হয়। ক্ষমা করবেন—যা ঘটেছে এর পরে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস আপনারই আত্মসম্মানের সঙ্গেও খাপ খায় না।

সত্যিই—কথাটায় মন সায় দিল।

শুধালাম, কি করতে বল?

বলল, ডিভোর্স করার দুটো রাস্তা আছে। হয় এমন কিছু করতে হয়, যাতে আপনার স্ত্রী আপনাকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হন কিংবা আপনিও অন্যত্র থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিভোর্স আনতে পারেন। প্রথম পথটাই পুরুষোচিত বলে আমার মনে হয়।

শুধালাম, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বলল, আমার কথাটা হচ্ছে—ডিভোর্স নেওয়া ছাড়া যখন অন্য উপায় নাই, তখন স্ত্রীকে সাধারণের মধ্যে কলঙ্কিনী না সাজিয়ে পুরুষের উচিত নিজের মাথায়ই কলঙ্কের বোঝা নেওয়া।

একটু ভেবে বললাম, তাহলে ত স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট কথা বলে নিতে হয়।

বলল, বলতে পারলে ত ভালই হয়। কিন্তু সব সময় ত তা সম্ভব হয় না?

শুধালাম, সেখানে কি করা উচিত?

বলল, অনেক কথা যা মুখে বলা যায় না—চিঠিতে বলা যায়।

চিঠিতে বলা যায়—একটু চুপ করে রইলাম। কিন্তু—

শুধালাম, এখন তোমার মতে আমার কি করা উচিৎ—সহজ ভাবে বল।

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে আমার দিকে চাইল। তারপর বলল, আপনার কি করা উচিত—সোজা পথ। বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে থাকলে, অনেক সময় একটু মুস্কিল হয়। আপনার উচিত, বাইরে সকলের কাছে শরীরের দোহাই দিয়ে এক মাসের ছুটী নেওয়া। এবং বর্ত্তমানে আপনার শরীর ও মনের দিক দিয়ে সেটার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে বলে আমার মনে হয়। তারপর ব্ল্যাকপুল কি দূরে কোনও সমুদ্রের ধারে হোটেলে গিয়ে থাকা—(একটু চুপ করে থেকে) একা নয়, অন্য একটি মেয়ে নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর মতন। এবং সেখান থেকে চিঠিতে স্ত্রীকে সমস্ত কথা জানিয়ে দেওয়া এবং তাকে অনুরোধ করা ডিভোর্স নেওয়ার জন্য।

শুধালাম, তিনি যদি না নেন?

বলল, সহজেই নেবেন। কেন না, তিনিও ত'চান মুক্তি! আর এমন অবস্থা করে তোলা যায় যে, ডিভোর্স তাকে নিতেই হবে।

চুপ করে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না।

ভায়লেট একটু জোরের সঙ্গে আমায় বলল, আপনার এখুনিই এটা করা উচিত। নইলে যা ঘটেছে এবং তারপর যে ভাবে আপনি আছেন—পুরুষোচিত একেবারেই নয়।

কিছু না বলে ভায়লেটের কথাটা নিয়ে ভাবছি—হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠলাম।

বললাম, ভায়লেট! এখন আমি একটা মেয়ে কোথায় পাই?

আমার মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গ্রীবা ঈষৎ বেঁকিয়ে মৃদু হেসে বেশ মিষ্টি করে বলল, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

মনটা যেন চমকে উঠল। শুধালাম, তুমি?

সেই অবস্থায়ই মাথা দুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

দুজনেই চুপচাপ। আমি ভায়লেটের দিকে একদৃষ্টে আছি চেয়ে। মনটায় যে ভায়লেটের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব একেবারেই আসেনি, এমন কথা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। আমার দৃষ্টিতে সে ভাবটা একটু ফুটে উঠেছিল কি? হঠাৎ দেখি—ভায়লেট ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর—যেন একটু তিক্তস্বরে বলল—যদি মনে করে থাকেন আমি আপনার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি ত ভুল করবেন। প্রেম আমার মনে নাই। তবে—আগেও বলেছি—আপনাকে আমি করুণা করি।

এই বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে ঘর থেকে চলে গেল।

• • • •

ডিসেম্বর মাস—সার্জ্জারী থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, বেজায় ঠাণ্ডা। বাইরে সূর্য্যের আলো মোটেই ছিল না—মেঘলা এবং

সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা কনকনে হাওয়া। আমার গায়ে অবশ্য ডিসেম্বরের উপযোগী খুব মোটা ওভারকোট ছিল, গলায় ছিল উলের গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা এবং মাথায় ছিল টুপী। তবুও রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা খুব দ্রুতপদে হেঁটে শরীরটাকে গরম করতে হল।

নরদেনডেন রোডটি বেশ শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি রাস্তা। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ এবং রাস্তার দুপাশে বাগানঘেরা বেশ ভাল বাড়ী। মাঝে মাঝে দু'-চারখানা মোটর গাড়ী ছাড়া হেঁটে খুব কম লোকই এ রাস্তায় যাতায়াত করে—বড় গাছের নীচে দিয়ে চুপচাপ আবহাওয়ায় এই রাস্তাটি ধরে হেঁটে যেতে আমার বরাবরই বেশ ভাল লাগে। আমার সার্জ্জারী থেকে ওল্ড-হল লেনে যেতে বরাবরই এই রকম। তবে আমার সার্জ্জারী থেকে উল্টো দিকে যদি যাই, অর্থাৎ সেল রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে, তা হলে রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি গেলেই দোকান পসার সুরু হয়, লোকজন দেখা যায় এবং ক্রমে রাস্তাটির চেহারা যায় একেবারে বদলে।

যাই হোক, দ্রুতপদে বেশ খানিকটা গিয়ে ধীরে চলতে লাগলাম। তখন আমি আমার বাড়ী ফেরার প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তায় এসে গেছি। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি প্রায় দেড়টা। ভায়লেটের তৈরী হ্যাম স্যানডুইচ খেয়ে খিদে ছিল না—তাই বোধ হয় এখনই সোজা বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে হল না। মার্লিন আমার জন্য না খেয়ে বসে থাকবে? মনে হল—তা থাকুক, তেমন খিদে পায় নিশ্চয়ই খেয়ে নেবে।

কিন্তু কি করি? রাস্তায় রাস্তায় ত আর ঘুরে বেড়ান চলে না? হঠাৎ চোখে পড়ল—বাঁ পাশে সেই চার্চের গেটটি। ঢুকলাম তার মধ্যে।

চার্চটির কথা একটু বলি। সার্জ্জারী থেকে বাড়ী যাতায়াত করতে প্রায় রোজই এই চার্চটিকে দেখি এবং রোজই মুগ্ধ হই। এত সুন্দর শান্তিপূর্ণ এই চার্চটি! রাস্তার ফটক থেকে অনেকটা পেছিয়ে লালরংয়ের এই চার্চের বাড়ীখানি—চারিদিকে লম্বা লম্বা পপলার গাছে ঢাকা। এখন শীতকাল, তাই গাছে পাতা নাই বললেই হয় এবং রিক্ত ডালগুলির বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে সবজ-রঞ্জিত চার্চের লালবাড়ীখানি একটা ছবির মতন সহজেই চোখে পড়ল।

ঢুকলাম। বেশ লাল কাঁকর-বাঁধান একটা রাস্তা চার্চটিকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে এবং তার পাশে পাশে প্রাঙ্গণে অনেক দূর পর্য্যন্ত পপলার গাছ ছড়ান—মনে হল, এককালে সাজিয়ে এগুলিকে লাগান হয়েছিল। তারই তলায় পরিষ্কার সবুজ ঘাসের উপর চারিদিকে ছড়ান কবর বাঁধান, শুভ্র পাথরে নানা নাম লেখা।

ঘুরে চার্চটির পিছন দিকে গেলাম—চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। পিছনে ধূ-ধূ করছে ফাঁকা, কোনও বসতি নেই। চার্চের সীমানা ছাড়িয়ে ঘন সবুজ মাঠ, তরঙ্গায়িত হয়ে নেমে গিয়েছে অনেক দূরে। চার্চের পিছনের সীমানায় এক কোণে একটা উইলো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছটির দিকে খানিকক্ষণ রইলাম চেয়ে। দুলা! এদেশের গাছগুলির মধ্যে উইলো গাছ চিরকালই আমাকে মুগ্ধ করেছে। যদিও এখন গাছে পাতা নাই—তবু দাঁড়িয়ে থাকার কি ভঙ্গি! ক্রমে এগিয়ে গিয়ে বসলাম—উইলো গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপর, তখনও ততদূর পর্য্যন্ত কবরগুলি এসে পৌঁছয়নি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে চুপচাপ নিস্তব্ধ চারিধার, জনমানব নাই।

মনটাকে সহজেই পেয়ে বসল ভায়লেটের কথাগুলি। কিন্তু মন ত ভায়লেটের কথায় একেবারেই সায় দিল না। এই দূর বিদেশে মার্লিনের সঙ্গে একটা ডিভোর্স ব্যাপারে জড়াতে মন আপনা থেকেই সঙ্কুচিত হল। তারপর ভায়লেটের প্রস্তাবিত পথ—ছিঃ ছিঃ বড়ই কুৎসিত। ভায়লেট মেয়েটা কি রকম! সুন্দর কুৎসিতের সীমানা যেন হারিয়ে ফেলেছে। ভায়লেটের প্রতি একটা ঘৃণা যে ইতিমধ্যে মনে জমে উঠেছে—টের পেতে দেরী হল না। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে হল—এদেশের মেয়েরা সবই ঐ ধরণের। মনে হল—হাজার হলেও এরা বিদেশিনী, এদের মনের গঠন আলাদা, আমরা চিনি না, চিনতে পারি না। এই সত্যটি চার্চে বসে সেদিন যেন হঠাৎ নতুন করে আবিষ্কার করলাম।

কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা—সহজেই মন সেই দিকে গেল ঘুরে। সুধা! সমস্ত প্রাণ জুড়ে বসল সুধা; হায় হায়! তার প্রতি কি অবিচারই না করেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত আজ আমাকে করতে হচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলাম—এ প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণাহুতি হবে কবে? আর যে আমি সহ্য করতে পারছি না।

বুলা! বহুদিন আগে তুমি একটা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলে—আমি বিলেত চলে আসার পর সুধা খাটের বিছানায় আর শোয়নি, সাজিয়ে রেখেছিল আমার ফিরে যাওয়ার জন্য, মেঝেয় শুয়ে শুয়েই বিসর্জন দিল প্রাণ। কথাটা আমি কোনও দিনই ভুলিনি—চিরকাল আমার মর্মে লেগে আছে। হঠাৎ মনে হল—সেই বিছানায় শুলে কি হবে আমার প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণাহুতি? কথাটায় যেন মন ষোল আনা সায় দিল—দেশে ফিরে যাই, সেই ভাল, এখন দেশে ফিরে যাই। যা কিছু টাকাকড়ি আছে গুছিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। সেখানে সুধার স্মৃতির মধ্যে বাকী জীবনটা দিই বিলিয়ে—সুধা-নার্সিং-হোম। ভাবতে ভাবতে প্রায় শুয়ে পড়েছিলাম। উঠে বসলাম।

আমার ভবিষ্যৎ যেন পরিষ্কার হয়ে গেল—সেই কলকাতায় সুধা-নার্সিং-হোম। কোনও দিকে মনে কোনও দ্বিধা নাই দ্বন্দ্ব নাই।

হঠাৎ যেন মনে হল—দারুণ শীতে আমি প্রায় জমে উঠেছি। ঘড়ির দিকে চাইলাম—এ কি! আড়াইটে বেজে গেছে! আর ত বসে থাকা চলে না—এ শীতে বসে থাকা সম্ভবও নয়। উঠে দাঁড়ালাম। এই শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দ্রুতপদে বাড়ী যাওয়া দরকার।

মার্লিন!—হঠাৎ মনে এল। বুলা! অস্বীকার করব না, তার কথা ভাবতেই মনটা কাতর হল—তাকে ফেলে চিরদিনের জন্য দেশে চলে যাব। মনকে বোঝালাম—এ কি তোমার দুর্ব্বলতা, যে অবিশ্বাসিনী তার জন্য এখনও এত দরদ! বোঝালাম—আমি চলে গেলে সে ত ভালই থাকবে। তার টাকাকড়ির অভাব নাই। ব্ল্যাকপুলে ওদের যা কিছু ছিল, সে সব বিক্রী করার দরুণ এবং পরে লণ্ডনের বাড়ীখানি বেচে মার্লিনের হাতে প্রায় ৭ হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা আছে। তবে? আর আমি চলে গেলে, ডিভোর্সও তার সহজ হবে এবং পরে রোল্যাণ্ড—আর দাঁড়িয়ে থাকা চললনা। প্রায় ছুটে বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে কুয়াশা জমা হতে সুরু করেছিল। বুলা! এদেশের শীতকালের কুয়াশা—সে যে কি ব্যাপার বোধ হয় ঠিক ধারণা নাই। যখন খুব গাঢ় হয় পাশের মানুষ পর্য্যন্ত চেনা যায় না। আমি চার্চের গেটের কাছে এসে বেশ বুঝতে পারলাম—কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। নরমেনডেন রোডের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম—বেশীদূর দেখা যাচ্ছে না। একেই এ রাস্তায় বেশী লোকজন থাকে না, বিশেষত এ অবস্থায় কেউ কোথাও নেই। বাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলতে লাগলাম।

দু'পা এগিয়েই পিছনে খটখট পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম—ক্রমে মনে হল কে যেন ছুটে আসছে। দাঁড়িয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখি একটি মহিলা—দ্রুত আসছে আমার দিকে। চাইলাম—একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলাম—মার্লিন।

আমার কাছে এসে, আমার বাহুখানি ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে শুধাল, কোথায় ছিলে? আমি দুটি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বললাম, এই ত বাড়ী যাচ্ছি।

দাঁড়িয়ে একটু যেন দম নিয়ে বলল, তোমার দেরী দেখে টেলিফোন করেছিলাম। শুনলাম—অনেকক্ষণ চলে গেছ। আর কেউ এল না।

বললাম, দুঃখিত। একটু দেরী হয়ে গেল।

বলল, তোমার শরীর যে ভাল নয়। ক্রমে অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আবার চুপ করল—বেশী কথা যেন একসঙ্গে বলতে পারে না।

শুধালাম, তা এদিকে কোথা থেকে আসছিলে?

বলল, সার্জ্জারী থেকে—যদি ফিরে গিয়ে থাক।

বললাম, এই একটু বেড়াচ্ছিলাম—চল এইবার বাড়ী।

একটু চুপ করে থেকে বলল, একটু কোথাও বসি—বুকটার মধ্যে কেমন করছে।

মার্লিনকে নিয়ে গিয়ে বসলাম—চার্চ্চের গেটের একটা স্তম্ভের নীচে বাঁধান জায়গায়।

* * * *

সুধা-নার্সিং-হোম—মনটাকে যেন পেয়ে বসল। মনে হল—তার মধ্যেই পাব মুক্তি। কথাটা নিয়ে ক'দিন অনবরত ভাবতে লাগলাম। কথাটার মধ্যে আমার বর্ত্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে আমি যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেলাম।

কিন্তু মার্লিন! না—না, তার কাছ থেকে কাপুরুষের মতন লুকিয়ে পালাব না। তাকে পরিষ্কার সব বলে যাব এবং যদি চায় তারও ব্যবস্থা কিছু কিছু করে দিয়ে যাব। কি ভাবে কি বলব—ভাবলাম, আগে নিজের দিকটা সব গুছিয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখা যাবে। সেদিন চার্চ্চ থেকে ফিরে এসে মার্লিনের হার্টটি আবার পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—বাইরের পরীক্ষায় বিশেষ কিছু দোষ না পেলেও, খুব সবল বলে মনে হয়নি।

ভায়লেটের কাছে আমার দেশে ফিরে যাওয়ার সংকল্পের কথা অবশ্য কিছুই বলিনি। গম্ভীর ভাবে ভায়লেটের সঙ্গে ব্যবহার করতাম এবং এইটেই তাকে বুঝতে দিতে চেয়েছিলাম—মার্লিনের ব্যাপারটা আমি ভুলিনি এবং সে বিষয় যা ব্যবস্থা করার আমি একাই করব, কারো পরামর্শ আমি চাই না। ভায়লেট কি বুঝেছিল আমি জানি না, সেও চুপ করে গিয়েছিল, ওদিক দিয়ে আর কোনও কথা তোলেনি।

এই ভাবে দিন দশ বারো কাটার পর ভায়লেট একদিন আমাকে বলল, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। কথাটা বলল সকাল বেলায়ই রোগী দেখার পর।

শুধালাম, কি?

বলল, অবশ্য এসব কথা আমার বলা উচিত কি না জানি না। তবে আপনার নুন খাই, আপনার ভাল-মন্দ না ভেবে পারি না।

শুধালাম, কথাটা কি?

একটু চুপ করে থেকে বলল, মিসেস চাউডুরী আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

যদিও এসব নিয়ে ভায়লেটের সঙ্গে আর আলোচনা করব না ঠিক করেছিলাম, তবুও কৌতূহল হল।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, মিসেস চাউডুরীর ত ব্যাঙ্কে নিজের নামে প্রায় ৭ হাজার পাউণ্ড আছে। তার মধ্যে পাঁচ হাজার পাউণ্ড তিনি ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ইতিমধ্যেই সরিয়ে দিয়েছেন।

অবাক হলাম!

শুধালাম, তা তুমি কি করে জানলে ?

বলল, অবশ্য এ সব ব্যাঙ্কের গোপন কথা—তারা বাইরে প্রকাশ করে না। তবুও—

একটু জোরের সঙ্গে বললাম, বল সব।

একটু চুপ করে থেকে বলল—ব্যাঙ্কে আমার একটি বন্ধু কাজ করে, তার কাছ থেকে শুনেছি।

শুধালাম, কে বন্ধু ?

তৎক্ষণাৎ বলল, ক্ষমা করবেন—নাম আমি করব না।

বললাম, সব বাজে কথা।

আবার একটু ঘাড় বেঁকিয়ে চাপাহাসি মাখান চোখ তুলে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, বাজে কথা যে নয়, নিজেকে প্রশ্ন করলেই টের পাবেন।

শুধালাম, তার মানে ?

বলল, ব্যাঙ্কে যে তাঁর সাত হাজার পাউণ্ড আছে আমি জানলাম কি করে—আপনি ত কোনও দিন আমাকে বলেন নি ?

একটু চুপ করে রইলাম। এবার সোজা আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি মাখিয়ে বলল, আর তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

হঠাৎ রাগ হল। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, তাঁকে কি জিজ্ঞাসা করব না করব সে আমি জানি, সে বিষয়ে কারও পরামর্শ আমি চাইনি।

উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। আপনারই ভালর জন্য বলেছিলাম—আমার কি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

• • • •

সোজা বাড়ী ফিরে এলাম। আজই মার্লিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে—মানসিক এ অবস্থা অসহ্য।

গম্ভীর ভাবে লাঞ্চ খেতে খেতে কোনও কথা হয়নি। মার্লিনও চুপচাপই ছিল—বিশেষ কিছু বলেনি। ইদানীং আমার এই গম্ভীর ধরণে মার্লিন নিজেকে প্রায় গুটিয়েই রাখত—যেন এড়িয়ে চলত, পাছে কোনও সংঘাত হয়।

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হল। গম্ভীর ভাবে উঠে গিয়ে বসলাম বসবার ঘরে।

মার্লিন এসে আগুনটা ঠিক করে দিতে লাগল। বললাম, লীনা। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল এখনই বলবে ? এখন একটু বিশ্রাম করে নাও না ?

বললাম, না—এখুনই।

মার্লিন বসল পাশের একটা কৌচে। বলল, বল।

বললাম, ব্যাঙ্কে তোমার সাত হাজার পাউণ্ড আছে ?

চুপ করে রইল।

শুধালাম, সে টাকাটা কি ঠিক আছে ?

চুপ করেই রইল।

শুধালাম, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

বলল, ওসব কথা আর একদিন হবে—আজ থাক।

একটু উত্তেজিত ভাবে বললাম, না—আজই—আর আমি চেপে রাখতে চাই না।

আবার চুপ করে গেল।

বললাম, চুপ করে আছ কেন? কথার জবাব দাও।

শুধাল, কি জানতে চাও?

বললাম, তোমার টাকা কি ঠিক আছে—না তার মধ্যে কিছু টাকা তুলে নিয়েছ?

গম্ভীরভাবে বলল, তুলে নিয়েছি।

প্রশ্ন করলাম, কত?

বলল, পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

শুধালাম, কেন?

একটু চুপ করে থেকে কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, বিকো! আমার একান্ত অনুরোধ—

—ও-সব কথা এখন শুনতে চেও না। একটু চীৎকার করে বললাম, কেন শুনতে চাইব না?

স্ত্রী হয়ে আমার সংসারে থাকবে আর ভিতরে ভিতরে তোমার অন্য একটা জীবন চলবে—স্বামী হয়ে আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব বলতে চাও?

ভারি গলায় বলল, বিকো! দোহাই তোমার—আমাকে অবিশ্বাস করো না।

আমি যেন ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছিলাম। বললাম, তোমার ওসব কথায় আর আমি ভুলব না। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।

আমি কি দেখিনি?

হঠাৎ চুপ করে গেলাম। একটু পরে গম্ভীর ভাবে বললাম, অনেক সহ্য করেছি। আর আমি সহ্য করতে রাজী নই—কোনও স্বামী করে না।

মার্লিন চুপ করে রইল—একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। দেখলাম—সেই বিষণ্ণ চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। একটু চুপ করে থেকে শান্ত গলায়ই বললাম, আমার কথার জবাব দাও লীনা!

চুপ করেই রইল।

আবার প্রশ্ন করলাম, পাঁচ হাজার পাউণ্ড কেন তুলে নিয়েছ, কি করেছ সে টাকা?

গম্ভীর ভাবে বলল, সে কথা আমি তোমাকে বলতে পারি না।

রাগ হল। বললাম, কেন? কেন? কেন বলতে পার না?

চুপ করে রইল।

একটু চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম, কথার জবাব দাও।

উত্তর দিল, এ কথার জবাব নাই।

রাগ বাড়ল। একটু ব্যঙ্গস্বরে বললাম, বুঝেছি—নিজের গোপন লীলার কুৎসিত কাহিনী আমাকে বলতে লজ্জা পাও—না?

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ধীর পদক্ষেপে চলতে লাগল—ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার রাগ আরও বাড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললাম, দাঁড়াও।

দ্রুতপদে কাছে গিয়ে দুটো কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, বলতেই [illegible] তোমাকে। না বললে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

চোখ দুটো যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল।

বলল, বলব না।

রাগ ভীষণ বাড়ল—মার্লিনের এরকম স্পষ্ট বিদ্রোহী রূপ এর পূর্ব্বে ত কখনও দেখিনি! দুটো কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, বলবে না কেন শুনি? অবিশ্বাসিনী!

বাকি কথা যেন গলায় আটকে গেল। ওঃ, বলে একটা নিদারুণ কাতরোক্তি করে মার্লিন যেন ভেঙে পড়ে গেল সেইখানেই মেঝেয়। তারপর সে কি কান্না, সমস্ত শরীর যেন কান্নার আবেগে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম নিচের দিকে—ভেঙে-পড়া মার্লিনের দেহখানির পানে। কি মনে হল জানি না, হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে টুপী নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলাম দ্রুতপদে।

• • • •

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—চার্চের কাছাকাছি আসতেই টের পেলাম মনটা একটা গ্লানিতে উঠেছে ভরে। রেগে কি কাণ্ডই না করলাম, এ ত কখনও ভাবিনি! সহজ ভাবে মার্লিনকে সমস্ত কথা বলে, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে মার্লিনের কাছ থেকে নেব বিদায়—এই ত ছিল সংকল্প। কিন্তু একি হল—

অন্যমনস্ক ভাবে চার্চের গেটের মধ্যে ঢুকলাম—গিয়ে বসলাম একটা বাঁধান কবরের উপরে। মনটা মার্লিনকে নিয়ে ভরে উঠল। মেঝের পড়ে থাকা তার আকুল কান্নার ছবিটা মনটাকে পেয়ে বসল। ঘৃণা! বলতে দ্বিধা করব না, তার প্রতি একটা অভূতপূর্ব করুণায় মনটা হল আকুল—বেচারা! যাই করে থাকুক, তবুও সে মার্লিন। সেই আমার কত দিনের কত স্মৃতি-জড়ানো মার্লিন! সেই আমার বিদেশিনী—যার জন্য সিন্ধুপারে এসেছিলাম। সহজেই বুঝতে পারলাম—এখনও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাকে কতখানি ভালবাসি।

বেশীক্ষণ বসা চলল না—দারুণ শীত, বরফ পড়তে সুরু হয়েছে। ঘড়িতে দেখলাম—৪টে বাজে, অন্ধকার হয়ে এলো। বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য যেন মন অস্থির হল। ভাবলাম—এত দূর এসেছি, একবার সার্জ্জারীটা ঘুরে কাজ সেরেই যাই।

গেলাম সার্জ্জারীতে। ভায়লেটের সঙ্গে দেখা হওয়াতে শুভ অভিবাদনের পর মুখ ঘুরিয়ে নিলাম—ভায়লেটের মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করল না।

ভায়লেট শুধু শুধাল, দারুণ ঠাণ্ডা! আপনাকে এক পেয়ালা চা দিই?

শুধু বললাম, দাও।

চা খেতে খেতে শুধালাম, জরুরী রোগী কেউ আছে কি?

আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই। রোগী দেখতে ইচ্ছে করছে না।

ভায়লেট বলল, এখন পর্য্যন্ত রোগী বিশেষ কেউ আসেনি। দুজন এসেছে—দুটিই জরুরী বলে মনে হয়।

বললাম, ডাক।

রোগী দেখা শেষ করে যখন বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম—তখন ঘড়িতে দেখি প্রায় সাড়ে [illegible]।

অন্ধকার রাত্রি—দারুণ শীত, চারিদিকে বরফ পড়ছে। থেকে থেকে এক একটা শনশনে হাওয়া অন্তস্তল পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। সার্জ্জারী ছেড়ে দ্রুতপদে ছুটলাম বাড়ীর দিকে—কোন রকমে বাড়ী গিয়ে দরজা বন্ধ করতে পারলে যেন বাঁচি। চলতে চলতে আমার গায়ের ওভারকোট, মাথার টুপী ক্রমে ঝরে-পড়া সাদা সাদা বরফে ঢেকে যেতে লাগল।

এলাম বাড়ী। সদর খুলে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এমন রাতে বাইরেটাকে জীবন থেকে যত শীঘ্র দূর করা যায়, ততই মঙ্গল—বাইরে যেন একটা অমঙ্গলের আবহাওয়া। তাড়াতাড়ি টুপী ও ওভারকোটটা খুলে ঝেড়ে সিঁড়ির কাছে টাঙিয়ে রেখে ছুটলাম বসবার ঘরে—আগুনের ধারে বসে শরীরটাকে একটু তাজা করার জন্ত। এমন রাতে মার্লিনও নিশ্চয়ই আগুনের ধারে আছে বসে—আগুনটাকে খুঁচিয়ে প্রখর করে রাখছে আমারই জন্ত।

সার্জ্জারীতে এবং পথে আসতে আসতে অনেক কথা ভেবেছি। ফিরে গিয়ে মার্লিনের হাত দু'টি ধরে মার্লিনের কাছে ক্ষমা চাইব। বলব—লীনা! দুপুরে যা ঘটেছে তার জন্ত আমি দুঃখিত। বলব—বেশ! তুমি যদি তোমার জীবনের একটা দিক গোপন রাখতে চাও, তাই রেখ, কিন্তু এভাবে স্বামি-স্ত্রীর ঘরকন্না চলে না। বলব—তাই আমি ঠিক করেছি আমাদের আলাদা থাকাই ভাল, আমি দেশে ফিরে যাব, তারপর তুমি তোমার জীবনটা মনের মতন করে গুছিয়ে নিও, আমি বাধা হব না, ইত্যাদি ইত্যাদি—কত কথাই না ভেবেছি।

বসবার ঘরে ঢুকলাম—কিন্তু কই মার্লিন ত নাই? এ কি—আগুনটা জলে জলে নিবে গেছে। মার্লিন কোথায়! উপরে শোবার ঘরে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে—শরীর বোধ হয় খারাপ বোধ করছে।

ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরে শোবার ঘরে গেলাম—কিন্তু কই. মার্লিন ত নাই। বিছানা যেমন পাতা ছিল তেমনি আছে—বিছানায় ত শোয় নি। শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে ডাকলাম লীনা! লীনা! কোন জবাব নাই।

হঠাৎ মনটা চমকে উঠল—তবে কি? ছুটে সমস্ত ঘর দেখলাম—কোথাও মার্লিন নাই। নীচে গিয়ে খাবার ঘর রান্নাঘর সমস্ত খুঁজলাম—মার্লিন নাই!

বাড়ীর মাঝখানে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকলাম লীনা! লীনা! লীনা! কোনও উত্তর নাই।

কেন জানি না, ছুটে সদর দরজা খুলে বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে ডাকলাম—লীনা! লীনা! একটা শনশনে হাওয়া তীব্র কশাঘাতে আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺শচীন্দ্র মজুমদার

সতীত্ব

দেহের, ভাবময় জীবনের ও আত্মার প্রগাঢ় সম্বন্ধ দিয়ে পতি-পত্নী পরস্পরে যুক্ত। এই পরম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটির কথা বিচার করতে গেলেই দুটি কথা আপনা-আপনি মনে উদয় হয়। সে কথা দুটি পবিত্রতা ও সতীত্ব। এ দুটি শব্দকে একই সংজ্ঞার দুটি রূপ বলে আমার মনে হয়। পবিত্রতার অর্থটি ব্যাপক। সতীত্ব শব্দটা উচ্চারণ করলেই রতি-সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ মনে ইঙ্গিত দিয়ে যায়। পবিত্রতা ও সতীত্ব পরস্পরের অঙ্গ। প্রীতি মেয়েদের স্বাভাবিক গুণ।

প্রীতির পুষ্টিতে আনন্দ। আনন্দ সত্ত্বশুদ্ধিকর। শুদ্ধসত্ত্বের ফল পবিত্রতা। কামের ক্ষেত্রে যে পবিত্রতার ব্যবহার তাকেই আমরা সতীত্ব বলে জানি। সতীত্ব ভিন্ন যৌনপ্রেমের মহত্ত্ব রক্ষা করা অসম্ভব কথা। যে মানবসমাজে সতীত্বের উচিত মূল্যবোধ নেই সে-সমাজে আপজাত্যের নিম্নতম সোপানে নেমে গেছে। শুদ্ধসত্ত্বই সতীত্বের ভূমি। যৌনপ্রেমে সতীত্বের মতো আর কোন গুরু উপাদান নেই। এ কথা ধ্রুব সত্য যে, পবিত্রতা প্রেমের একমাত্র ভিত্তি। পবিত্র না হলে প্রেমিক হওয়া অসম্ভব কথা।

সতীত্ব ও কঠোরব্রতী সন্ন্যাসিনীর যৌননিরোধ কি একই বস্তু? চর্যাশীলতা অর্থাৎ সংযম দুটিরই সমান অঙ্গ। বৈরাগীর নিরোধ উদ্দেশ্যমূলক। তার পক্ষে তার লক্ষ্যসাধন করার নানা উপায়ের মধ্যে নিরোধ একটি ভিত্তিগত উপায়। সে লক্ষ্যটি তার চর্যার পরিধির বাহিরে অবস্থিত। সতীর সতীত্ব চর্যার অঙ্গ, লক্ষ্য সেই অঙ্গটিতেই নিহিত। সতীত্ব তাই একাধারে ভোগ এবং সংযম দিয়ে গঠিত। সতীত্ব একটা রাজ্যের মতো, যা সংযত পরিমিত ভোগ দিয়ে জয় করতে হয়। এই পরিমিতি দিয়েই সতীর মহিমা। এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের কথাটি চমৎকার যে সেই মানুষই জীবনের প্রভু যে তার দেহের সকল স্থূল কামনাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের অত্যন্ত দুষ্পাপ্য ও গন্ধবর্ণাঢ্য কুসুমে পরিণত করতে পারে। প্রকৃত সতীর কামনায় সেই বিকশিত, ভাবময় কুসুম। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর বচন আছে যে ভালোবাসা গাছের মতো; শিকড় তার মাটিতে, কিন্তু ফুলগুলি তার সূর্যমুখীন হয়ে থাকে। সতীর ভালোবাসা সেই সূর্যমুখী ফুল। দেহে তার মূল, সেটি দেহ থেকেই প্রাণরস সঞ্চয় করে, কিন্তু ফুল হয়ে বিকশিত হয় ঊর্ধ্ব এক লোকে। সতীত্ব সত্ত্বশুদ্ধির অঙ্গ কিন্তু বৈরাগ্যের অংশ নয়। সেটি কামের দাবীর মতো সুস্থতর জীবনের অন্য সকল দাবীকেও স্বীকার করে নেয়। সতীত্ব তাকেই বলি যা ভালোবাসার গ্রন্থি দিয়ে, দেহ ও আত্মাকে একসঙ্গে যুক্ত করে রাখে।

পবিত্রতা নারীচরিত্রের মূল কথা। যে নারী নিজের এই শুদ্ধসত্ত্বটি উপলব্ধি করতে পেরেছে সে কখনো এমন অবস্থায় পড়ে না, যাতে তার এই গুণটিকে বলি দিতে হয়। মূল বস্তু প্রীতির বিকৃতি অপবিত্রতার কারণ। পবিত্র যে সে অপবিত্রতাকে গ্রহণ করতে একান্ত অসমর্থ। এমন নারীর কাম বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ কাম তাই যাকে দমন করবার অথবা তা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন হয় না। সৌন্দর্য ও আনন্দের অনুভবে সেটিকে তুষ্ট করা উচিত। কিন্তু দেহের ক্ষুধার তাড়নায়, ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য, বিকৃত কোন রসোপভোগের জন্য বা সাংসারিক কোন লাভ বা সুবিধার জন্য তুষ্ট করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ কাম তাই যার ভালোবাসায় জন্ম প্রগাঢ় মিলন উদ্দেশ্য।

কামের ভূমিতেই সতীত্বের লীলা। তাতে কোন দ্বন্দ্ব নেই; কোন প্রয়াসের সহিতও তার সম্বন্ধ নেই। রতিজীবনে আদর্শবাদী না হলে সতীত্বের উৎসাহ জাগে না। কামকে স্বীকার করে না নিলে তাকে জয় করাও যায় না। পত্নীর সাহচর্য না থাকলে পতি কামজয়ী হতে পারে না। সতীত্ব শুধু নারীরই ভূষণ নয়, পুরুষেরও ভূষণ। নারীই কেবল পুরুষকে এ ঐশ্বর্যে ভূষিত করতে পারে। এ গুরুতর কথাগুলির অর্থ আমরা পরে ভালো করে বুঝতে পারবো।

রতির দ্বারাই সতীত্ব ক্রিয়াশীল হয়। সতীত্ব একাধারে মিতাচার ও গৌরবের সহজ সংস্কার। সতীত্ব তাই যা রতিতে লিপ্ত থেকেও জীবনের আর সকল পূজাতে রত থাকে। সতীত্ব সেই মহান রতিজীবনের সহায়, যাতে বিশুদ্ধসত্ত্ব না হলে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না।

মাতৃত্ব

মাতৃত্ব নারীর স্বভাবী সংস্কার। এ সংস্কারটি কেবল তার দেহের নয়, ভাবময় জীবনেরও অঙ্গ। পুরুষের অনুরূপ কোন সংস্কার নেই। আমরা যাকে পিতৃত্ব বলি সেটি মাতৃত্বের মতো নাড়ীর টানের কিছু নয়, সন্তানসহবাস জনিত একটি বিশিষ্ট প্রগাঢ় অনুভূতিমাত্র। সকল মানুষ নিজের নাভিতে মাতৃচিহ্ন বহন করে, সন্তানের অঙ্গে পিতার কোন চিহ্নই থাকে না। নাভি দিয়ে সন্তান নিজের দেহে মায়ের শিকড় বহন করে, সেই শিকড় দিয়ে সে মায়ের অঙ্গ থেকে

নিজের সকল উপাদান ও প্রাণশক্তি আহরণ করে। জন্মগ্রহণ করবার পরবর্তী কালে মানুষের নাভির আর কোন ক্রিয়া নেই।

পুরুষ ও রমণীর জননযন্ত্রের গঠনের ও রতিপ্রকৃতি দিয়ে উভয়ের জ্ঞান-চেতনার পার্থক্যটি বোঝা যায়। বিশিষ্ট এক ধরণের গ্রন্থি ও সেই গ্রন্থি সম্পর্কিত অঙ্গ দিয়ে জননযন্ত্রটি গঠিত। পুরুষের সে যন্ত্রের অবস্থানটি বাহ্যিক, রমণীর সম্পূর্ণ ভাবে আভ্যন্তরিক। পুরুষের রতিপ্রকৃতিটিও বাহ্যিক এবং একটি কেন্দ্রগত; রমণীর অন্তর্গূঢ়, সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত কিন্তু যথাকালে কেন্দ্রাভিমুখী। পুরুষের কাজ দেওয়া, রমণীর কাজ গ্রহণ করা, সংরক্ষণ করা এবং দীর্ঘকাল ধরে ফলের পুষ্টিসাধন করা। পুরুষের বীজবপনের ক্রিয়াটি ক্ষণিক। রমণীর বীজগ্রহণ ও তার পরিণাম-সাধনের ক্রিয়াটি দীর্ঘকালব্যাপী। কেবলমাত্র রতিমিলনে পুরুষের যৌন-উদ্দেশ্যের অবসান, রমণী সেই মিলনের ফলকামী। পুরুষ যেখানে ক্ষণিক সুখে পরিতৃপ্ত, রমণী তথায় জাতির পুষ্টিসাধনে তৎপর। সন্তানক্ষুধা রমণীর গভীরতম প্রকৃতি।

সন্তানের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎকালে নয়, অতীতে বাঁধা। তার জনক-জননীতে যতোই নূতন ধরণের সমন্বয় হোক না কেন, সে অতীত কালের পূর্বপুরুষ হতে নিজের জীবনের উপাদান সংগ্রহ করে। হ্যাভেলক এলিসের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেকটি শিশুর নিজের পূর্বপুরুষ নির্বাচন করে নেবার অখণ্ডনীয় অধিকার আছে। তার জনক-জননীর মাধ্যম দিয়েই সে এই নির্বাচনটি করে। সুতরাং ভাবী সন্তানের কুশলতার জন্য তার অর্ধেকটি পৈতৃক প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে দেওয়া জনকের গুরুতম ও পবিত্রতম কর্তব্য। তেমনি অন্য অর্ধেকটি নির্দ্ধারণ করে দেওয়া একান্ত ভাবে জননীর ওপর নির্ভর করে। বিবাহের দ্বারা জনক-জননী সন্তানের পিতৃভাগ্যটি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করে দেয়। উত্তরকালে যে গ্রহটি সন্তানের অদৃষ্টকে শাসন করবে, সেটি কোষ্ঠিবিচারলব্ধ কোন গ্রহ নয়, জনক-জননীই সে-গ্রহটিকে নিরূপিত করে থাকে।

জননী মহত্তম জন্মদাত্রী, জনক গৌণ। জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী বলে ঘোষণা করলেও মর্ত্যধামে আমরা জন্মাবধি শুনি যে, পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা তুষ্ট হলে সকল দেবতা তুষ্ট হন। অর্থাৎ পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের ঘোষণাটাই বেশি। এখনকার কালে এ প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীটি পাল্টে দিয়ে সন্তানের প্রতি জনক-জননীর গুরুতর কর্তব্যের কথাটা আরো বেশি জোর করে প্রচার করবার প্রয়োজন হয়েছে। গভীর ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে যে, সন্তান একটুতেই সন্তাপের কারণ হয়। যারা জড়প্রকৃতি, বিকলাঙ্গ ও দুরারোগ্য রোগপ্রবণ সন্তানের জন্মের কারণ হয়, তারা সন্তানের প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ করে। প্রাচীন কালে এই বিষম ভয়াবহ অনাচারকে প্রকৃতি অযোগ্যের মৃত্যু ঘটিয়ে শোধন করে নিতো। এখন আমরা সংরক্ষণ-মূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবনের অযোগ্য মানুষকেও জীবিত রেখে সমাজের পুষ্টি ও হিতসাধন (?) করতে চাইছি। ইতিহাসে লেখা আছে যে, পূর্বকালে রাজারা ঐশ অধিকারের দাবী করতো। সে অধিকারটা মিথ্যা বলে কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই যে প্রজনন করবার অখণ্ড ঐশ অধিকারটি আজও মহাপ্রবল হয়ে আছে তার লুপ্তিসাধন করা বর্তমান কালে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্তান ধারণের জন্য সুস্থ সবল ও পূর্ণভাবে পরিণত জননযন্ত্রের যেমন, সন্তানের লালনের জন্যও তেমনি পূর্ণ উৎকর্ষপ্রাপ্ত স্তনেরও প্রয়োজন। শরীরশাস্ত্র এ অঙ্গটির শোভার বিন্দুমাত্র কোন মূল্য দেয় না। সন্তানকে স্তন্যদান করাই এ অঙ্গটির মূল ক্রিয়া। যে রমণীর স্তনের উন্নতি নেই তাকে স্বাস্থ্যবতী, পূর্ণাঙ্গ ও বিবাহের উপযুক্ত বলা যায় না। মাতৃত্বের উদ্দেশ্যপূরণে স্তন অপরিহার্য অঙ্গ। প্রায় সকল সভ্যদেশের মানুষ আজ বলতে বাধ্য হয়েছে এবং আমাদের দেশের বেলাতেও ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আধুনিক কালের যুবক পত্নীবরণ করতে গিয়ে একটি অঙ্গহীন রমণীকে বিবাহ করে। তার বিশিষ্ট একটি অঙ্গ এখন দোকানের জানলায় কাচের দুধের বোতলরূপে শোভা পায়। সন্তানের নিগূঢ় প্রয়োজনের, তার জীবনের একটি প্রধান উপকরণ এখন আর তার মাতৃদেহে পাওয়া যায় না। মেয়েদের এই সাংঘাতিক অঙ্গহীনতার দুটি কারণ আমি দেখি। তরুণ বয়সে বিক্ষেপের কারণে ও উপযুক্ত যত্নের অভাবে দেহের উৎকর্ষ রোধ এবং রমণী-প্রকৃতি বিরুদ্ধ খেলাধূলার প্রভাব। আপত্তিকর প্রভাবের ফলে পুরুষালি খেলা রমণীর নানা নিজস্ব প্রকৃতির সহিত স্তনেরও বিলোপ সাধন করে।

প্রত্যেক স্বভাবী (Normal) রমণীর রতিজীবন, অর্থাৎ সন্তানবহন ও পালন করবার কাল গড়পড়তা বত্রিশ বছর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নানা বিক্ষেপ ও উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত হলেও গর্ভ কোন ব্যাধিত অবস্থা নয়, সেটি শরীরধর্মজাত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, থাইরয়েড ও ওভেরী গ্রন্থিগুলির বর্দ্ধিত ক্রিয়ার কারণে গর্ভাবস্থায় রমণীর দেহধর্মের প্রকৃষ্টতম বিকাশ হয়। রমণীর রূপের বিকাশ সোপানে সোপানে কিন্তু বিভিন্ন। গর্ভবতীর প্রাক-মাতৃত্বের রূপটি বিশিষ্ট। ইওরোপের রেনেসাঁস যুগের ও পরবর্তী কালের চিত্রকলায় যে আদর্শ আজও আমরা দেখি, সেটি এই গর্ভবতীর প্রাক-মাতৃত্ব রূপ। সন্তানের জন্মের পর মাতৃত্বের রূপটি তেমনি বিশিষ্ট মহিমময়। আজও স্তন্যদানরতা মায়ের রূপ সকল দেশের চিত্রকলায় একটি বিশিষ্ট আদর্শ হয়ে আছে। নারীসৌন্দর্যের মতো পুরুষের যৌবনে অনুরূপ কোন ঘন পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের বিকাশ নেই।

সন্তানের গর্ভবাসের কাল সাধারণত ২৭৪ থেকে ২৮০ দিন। শেষ ঋতুটির দিন থেকে গণনায় ২৮০ থেকে ২৯০ দিন। কখনো কখনো এ কালটি দীর্ঘতর হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে সে দীর্ঘদিনের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩২০। সন্তান যত দীর্ঘকাল গর্ভবাস করে তার পক্ষে ততই মঙ্গল। অন্যপক্ষে গর্ভবাসের কালটি কম হলে সন্তান অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থায় জননীর বিশ্রাম সন্তানের যথোচিত পুষ্টির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। যে সকল রমণী এই কালে যথেষ্ট বিশ্রাম করতে পায় না তাদের সন্তানদের দেহের ওজন কম ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। জন্মকালে ও প্রথম বৎসরে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের মৃত্যুর হার বেশি।

একটি সন্তান প্রসব করবার পর জননীর দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে আঠার থেকে তিন বৎসর সময় লাগে। এই সময়ের ভেতর

যদি পুনরায় সন্তান-সম্ভাবনা হয় তাহলে জননীর দেহ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি সুস্থ রমণী তার সমগ্র রতিজীবনে সাধারণত পনেরোটি সন্তান ধারণ করতে পারে। উপরের গণনা হিসাবে তিন বৎসর যদি নিষ্ক্রিয় কাল হয় তাহালে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যবতী রমণী তার সমগ্র জীবনে দশটি সন্তান ধারণ করতে সক্ষম। এ প্রত্যাশাটি ভয়াবহ। একটি সন্তান গর্ভে ধারণ করার কাল ন'মাস দশ দিন। এই সন্তানকে আত্মনির্ভর করে তুলতে ন্যূনপক্ষে দশ বৎসর সময় লাগে। অর্থাৎ দশটি সন্তানকে যথোচিত ভাবে লালন করতে গেলে জননীর একুনে ১১১ বছর ছয় মাসের অবসর দরকার। এ অবস্থার বিশদ বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই। সন্তানের জন্ম সাধারণত আকস্মিক ঘটনা। আগেকার কালে তাই জননীর স্বাস্থ্য ও সন্তানের জীবন নিয়ন্ত্রিত করা অসম্ভব ছিলো। এ আকস্মিকতার ওপর হাত নেই বলেই তখন আমাদের দেশের গৃহিণীরা হতাশ হয়ে বলতেন, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। বিধাতাকে জীব সৃষ্টি করার জন্য দায়ী করা অন্যায়। কেন না, জীব যিনি দেন তিনি বিধাতা নন, তিনি প্রকৃতি। প্রকৃতি অত্যন্ত গোলমেলে নিষ্ঠুর একটি শক্তি। সে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মোহের চার ফেলে এবং পতি-পত্নীর হাতে হাতে বিচিত্র বিচিত্র এক উন্মাদনাজনিত ইন্দ্রিয় সুখের অগ্রিম পারিতোষিক দিয়ে তাদের বুদ্ধি ভ্রংশ করে নিজের লক্ষ্য সাধন করে। আগেকার কালে প্রকৃতি গান্ধারীর শত পুত্রের, রাবণের পুত্রবাহিনীর এবং অনাহূত জীবেরও আহার যোগাতো, এখন তার কিছুই পারে না।

কাজেই এই বিষম আকস্মিকতার বন্ধন থেকে মেয়েদের মুক্তির দরকার। বিজ্ঞান যে মুক্তির উপায় তাদের হাতে এনে দিয়েছে তার নাম গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ। মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের এত বড় মুক্তি আর কিছুতে নেই। মাতৃত্ব এখন অদৃষ্টাধীন নয়, তাদের নিজেদের হাতে। আমার বিবেচনায়, মাতৃত্ব এখন মুক্তি পেয়ে পরম সুন্দর হয়েছে এবং পতি-পত্নীর ভালোবাসাও নিরঙ্কুশ হয়ে প্রকৃত মর্যাদাসম্পন্ন হয়েছে। সন্তান সৃষ্টি শ্রেষ্ঠতম আর্ট, তাই জননী শ্রেষ্ঠতম শিল্পী। আয়ত্তগত হয়ে এই শিল্পের পরম সৌন্দর্যের সম্ভাবনা হয়েছে এখন। অপরপক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে এখনো অনেকে তর্ক করেন। বহু সন্তানের জন্ম হলে তাদের মধ্যে জড় প্রকৃতি, দুর্বলচিত্ত, পাগল, যক্ষ্মারোগী ইত্যাদি ভয়াবহ কলুষিত সন্তানের জন্ম হবার প্রভূত সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মন্দেরও ভালো আছে। বৃহৎ পরিবার না হ'লে প্রতিভার জন্ম হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের বহু সন্তানের একজন। তবুও উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন হলেও প্রতিভার জন্ম বিরল ঘটনা। কলুষিত সন্তান কিন্তু একটুও বিরল নয়। তারা পরিবার ও সমাজকে দুঃস্থ, পঙ্গু করে। তা ছাড়াও, সহজ ভাবে দেখতে গেলে সন্তানের অকালমৃত্যু, বেঁচে থাকলে উপযুক্ত ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার অভাব এবং চরম অপচয়ের সম্ভাবনার চেয়ে সে ধর্মবিরোধিতা অনেক পুণ্যের। নদীতে বাঁধ দিয়ে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করে মানুষের কল্যাণ-সাধনা করা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কর্ম হলেও যদি শুভকর হয়, তাহলে ভাবী সন্তানের অযোগ্যকে নিবারণ করে সুযোগ্যকে আহ্বান করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও অত্যন্ত উচিত কর্ম। বিজ্ঞান পরম হিতকর দুটি জিনিষ আমাদের দিয়েছে, একটি চশমা এবং অন্যটি জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। চশমা যেমন দৃষ্টিহীনকে পৃথিবীর কোলে ফিরিয়ে দেয়, তেমনি অস্ত্রটিও তেমনি জননী, সন্তান, তাদের সংসার সমাজ ইত্যাদির অসীম মঙ্গলসাধন করে। এই অস্ত্রের দ্বারা জনক-জননী নিজেদের পূর্ণ স্বাস্থ্য, আনন্দ, পরিবেশগত ও ভাবময় জীবনের সামঞ্জস্য, অর্থাৎ সুখের ক্ষণে সন্তানকে অজ্ঞাত লোক থেকে চয়ন করে আনতে পারে এবং তার জীবন যতদূর সম্ভব নিরাপদ ও শুভ সম্ভাবনাপূর্ণ করে গঠন করতে পারে।

কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিটি ভালো করে বুঝে নেওয়া কর্তব্য। অধুনা হালে পানি না পেয়ে আমাদের রাজনীতিক কীর্তনীয়ারা জন্মনিয়ন্ত্রণের গান আখরে ভূষিত করে গাইতে আরম্ভ করেছেন, যেন আজ জন্মনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করলেই দু' বছরেই দেশের জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান হয়ে খাদ্য উদ্বৃত্ত হয়ে যাবে। আমি জন্মনিয়ন্ত্রণকে গঠনমূলক বলেছি। যে দম্পতি নিজেদের ইন্দ্রিয় সুখের ও সাংসারিক সুবিধার জন্য সন্তানের জন্মনিরোধ করে, তাদের চেয়ে সমাজ-বিরোধী পাপীর কল্পনা করা যায় না। সম্যক জন্মনিরোধে পুরুষ আঘাত পায় না, পায় মেয়েরা। শরীরের দিক দিয়ে তাদের প্রণালীবিহীন গ্রন্থিনিচয় অবনতি পেয়ে দেহকে ক্ষুণ্ণ করে। অন্যপক্ষে, তাদের ভাবময় ও আধ্যাত্মিক জীবনের স্ফুরণ হয় না। গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের একটিমাত্র মূল কথা আছে: যে স্বামী তার পত্নীকে সত্য করে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে এবং পত্নীর পূর্ণ উৎকর্ষ ঘটাবার জন্য তৎপর সে, এবং যে দম্পতি সন্তানকে শ্রদ্ধা করতে পারে, একমাত্র তারাই প্রকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী। গঠনমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ মানে আমি এই বুঝি। শ্রদ্ধার ও বীর্যের ভিত্তি না হলে এ উচ্চতর জন্মনিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের সাংসারিক দিকটা অপেক্ষাকৃত গৌণ হলেও গুরুত্ববিহীন নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে ইংলণ্ডের লোকের গড়পড়তা আয়ের হিসাবে হ্যাভেলক এলিস নির্ণয় করেছিলেন যে, সাধারণ ইংরেজদম্পতি ২'৬টি, অর্থাৎ দুটি থেকে তিনটি সন্তানের ভার বহন করতে পারে। আমি এলাহাবাদের মধ্যশ্রেণীর বাঙালীর একটি দলের আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক লক্ষ্যের নিরিখে অনুরূপ একটি হিসাব করে দেখেছি, তার একজনও একটিও সন্তান পালন করবার যোগ্য নয়। অথচ প্রত্যেকের গড়পড়তা পাঁচটি করে সন্তান আছে। ভয়াবহ কথা! এখন টাকার মূল্যকে অত্যন্ত লয়োদয়শীল বলা যায়, লয়ের দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই, এ বিষয়ে আমি কোন মানদণ্ড নিরূপণ করতে অক্ষম। কেবল সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে, সন্তানের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের জন্য দুটি সন্তানের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ যে শিশু একাকী তার সম্যক উৎকর্ষ হয় না। যত কম সন্তান হয়, তাদের মৃত্যুর সম্ভাবনাও তেমনি কম হয়ে থাকে। যতো বেশি হয়, মৃত্যুও ততো অবধারিত হয়। পাঁচটি সন্তানের একজনের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাবাহুল্য থেকে সংখ্যাল্পতা জীব-জগতের প্রগতির মানদণ্ড। আমাদের সমাজে সন্তানের অপচয় বর্তমান কালে যেন অনিবার্য ঘটনা হয়ে উঠেছে। অধিক সন্তান হলে পুত্রশোক, কঠোর দারিদ্র্য, পরিবারের অপচয় ও অবনতি হয়। গভীর ভাবে সংসারের গতি পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১

চোখের সামনে ধীরাপদ সেদিন নিয়তির ছোটখাট একটা খেলা দেখে উঠল।

সেই মর্মান্তিক দেখার সঙ্গেও নিজের একটু গুপ্ত যোগ ছিল বোধহয়।

ধীরাপদ নিচে নেমেছিল অমিতাভ ঘোষের খোঁজে। তাকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তার পাশে পাশে ভ্যাট ঝোলানো ঠেলটা হড়হড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটা। পাশে পাশে ঠিক নয়, একটু আগে আগে। লোকটাকে চেনে ধীরাপদ। তানিস সর্দার—হৈ-চৈ করে কথা বলে, হড়বড়িয়ে কাজ করে।

ভ্যাট ভরতি লিভার একস্ট্রাক্ট। আলকাতরার মত ঘন গাঢ় ফুটন্ত লিভার একস্ট্রাক্ট। কারনেস থেকে নামিয়ে মেন্ বিলডিংস-এর এক তলায় সিন্‌থেটিক-ষ্টোরেজে রাখতে চলেছে। ওয়ার্কশপ থেকে এই পথটুকু কিছুটা এবড়োখেবড়ো। অতবড় এক ফুটন্ত ভ্যাট আর একটু সাবধানে ঠেলে নিয়ে যাওয়া উচিত লোকটার। ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করেছিল। দু'দিকের কড়ায় ঝোলানো ভ্যাটটা ওর চলার ঠমকে বড় বেশি নড়ছিল, দুলছিল। ধীরাপদ অঘটন ঘটবে জানত না, অথচ অঘটনের একটা ছায়া আশ্চর্যভাবে মনে আসছিল।

অঘটন ঘটল। লোকটার নিজের দোষেই হয়ত ঘটল।

মেন-বিলডিংএর প্রবেশ-পথের এমাথা-ওমাথা জুড়ে আধ-হাতের মত উঁচু একটাই মাত্র বাঁধানো ধাপ। তারপর লম্বা করিডোর। তরতরিয়ে সেই ধাপের মুখে এসে এক মুহূর্তও না থেমে লোকটা দু'হাত-ধরা বড় দুটোতে সজোরে নিচের দিকে চাপ দিল একটা। উদ্দেশ্য, সামনের চাকা দুটো সিঁড়ির ওপর তুলে দিয়ে ঠেললেই পিছনের চাকাটা আপনি উঠে যাবে। উচিত হোক, অনুচিত হোক, পরিশ্রম বাঁচানোর জন্যে হয়ত এভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত।

চিৎকার চেঁচামেচি, গেল-গেল রব।

ফ্যাক্টরী ভেঙে লোক দৌড়ে এলো।

ধীরাপদ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। কোথা দিয়ে কি-ভাবে কি ঘটে গেল ঠিক বুঝে ওঠেনি। লোকটাকে দু'হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠতে দেখেছে, তারপরেই গড়াগড়ি খেতে দেখেছে—মাটিতে ভ্যাটের ফুটন্ত পদার্থের কুটিল স্রোত।

লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় ধীরাপদ ভালো করে দেখল। নিচের অঙ্গ ঝলসে গেছে, ওপরের অঙ্গও দগদগে। মুমূর্ষু, অজ্ঞান।

গতির যুগ। শান-বাঁধানো জায়গার দাগ মুছে ফেলা হয়েছে। তার এধারের মাটিতে অনেকটা জায়গা জুড়ে মস্ত একটা কালচে ছাপটা পড়ে আছে। তানিস সর্দার বাঁচবে কি না যে ভাবছে ভাবুক, তার দেহের দাগ দেখে যে শিউরে উঠছে উঠুক। এরকম ছোটখাট অঘটন নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওই কালো দাগটা কোম্পানীর সুনিশ্চিত লোকসানের দাগ। সেই দাগটা একেবারে ছোট নয়। ছোট হলেও এই অকারণ ক্ষতি নীরব সহিষ্ণুতায় বরদাস্ত করার মত ছোট নয়।

ওপরে এসে লাবণ্য সরকারের উদ্দেশে গম্ভীর মুখে সিতাংশু মিত্র বলল, কম করে বারো-চোদ্দ হাজার টাকা লোকসান।

পাশাপাশি নিজেদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তারা। ধীরাপদ পিছনে।

লাবণ্য সরকারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, তার বেশিই হবে।

নিজের ঘরে বসে ধীরাপদ চুপচাপ একটা অস্বস্তি ভোগ করল খানিকক্ষণ। কোম্পানীর ক্ষতি বটে। ক্ষতিটা কর্মচারীর অনবধানের ফলেই। কিন্তু এই ক্ষতি ছেড়ে একটা লোকের ওই ক্ষতটাই বিভীষিকার মত বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। হাসপাতালে কি ব্যবস্থা হল না হল একবার দেখে আসা উচিত কি না ভাবছে।···কেউ তো কিছু বলল না।

চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হল না শেষ পর্যন্ত। খানিক বাদে কোম্পানীর গাড়ি নিয়ে ফ্যাক্টরী থেকে বেরিয়ে এলো সে। হাসপাতালে এসে মনে হল, না এলেই ভালো হত। ফ্রী-বেড খালি নেই, সাধারণ পে-ইং বেড ও না। ইমারজেন্সি কেস্ বলে রোগী ফেরত দেওয়া হয়নি বটে, বাইরের বারান্দায় এক্সট্রা বেড ফেলে জায়গা দেওয়া হয়েছে তানিস সর্দারকে। সেখানে এ-রকম এক্সট্রা বেড-এর সংখ্যা এই একটিই নয়। অনেক। দেখলে অনভ্যস্ত চোখে ধাক্কা লাগে হঠাৎ। রোগী যেখানেই থাক, হয়ত চিকিৎসায় ত্রুটি হয় না, হবার কথা নয় অন্তত, তবু বেডগুলোর দিকে চেয়ে অনুগ্রহের রোগশয্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না ধীরাপদ।

ফ্যাক্টরীর দুজন কর্মচারী ছিল, সেলাম জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তারা অন্তত দরকার মত চিকিৎসা হচ্ছে বলে ভাবতে পারছে না। অদূরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিম্নশ্রেণীর একজন

স্ত্রীলোক বসেছিল, সামনে পাঁচ সাত বছরের ছুটো নোঙরা ছেলে। কর্মচারী ছু'জন কিছু ইশারা করেছে কিনা বোঝা গেল না। স্ত্রীলোকটি দিশেহারার মত উঠে এসে ধীরাপদর ছু'পা জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল।

বচা দে বাবু, বচা দে!

সে হাসপাতালের নিয়ম-কানুন বোঝে না, সম্ভব-অসম্ভব বোঝে না, ভব্যতা-অভব্যতা বোঝে না। নিজের লোকসান বোঝে। তাই বুঝেছে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রমিক-বধূর কান্না দেখল ধীরাপদ।

খোঁজ নিয়ে জানল, ক্যাবিন খালি আছে এবং দিনে তিন-চার টাকার বিনিময়ে তা পাওয়া যেতে পারে। আর ওষুধপত্রের খরচও লাগবে। সব ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এলো যখন, শ্রমিক-রমণীর কান্নাটা কানে বাজছে তখনো। ভাবছে, এত কান্নার সবটাই কি শুধু নিরাশ্রয় হবার ভয়ে···।

ফ্যাক্টরীতে হিমাংশু মিত্র সপ্তাহে সাধারণতঃ ছু'-তিন দিনের বেশি আসেন না। এলেও ছু'-এক ঘণ্টার বেশি থাকেন না। অঘটনের পরদিন এই প্রথম তাঁর ঘরে ডাক পড়ল ধীরাপদর।

সাজানো গোছানো মস্ত বড় ঝকঝকে তকতকে ঘর। বড় সাহেবের সামনে সিতাংশু আর লাবণ্য বসে। পাশের হেলান দেওয়া চেয়ারে অমিতাভ ঘোষ—নির্বিকার মুখে সিগারেট টানছে। মামার সামনেও এমন সহজ মুখে সিগারেট টানে, ধীরাপদ জানত না।

আলোচনা গত কালের অঘটন প্রসঙ্গে। কোম্পানীর লোকসান প্রসঙ্গেও। ধীরাপদর প্রতি নির্দেশ, তার চাক্ষুষ দেখার একটা ষ্টেটমেণ্ট দিতে হবে, তানিস সর্দারের গাফিলতির কথা লিখতে হবে, কোম্পানীর লোকসানের অঙ্কটাও বসাতে হবে। এদিকটা এক্ষুনি ঠিক করে না রাখলে পরে গোলযোগের সম্ভাবনা।

অতঃপর চিকিৎসার প্রশ্ন। ব্যবস্থার কথা শুনে বড় সাহেব কিছু মন্তব্য করার আগেই সিতাংশু বিরক্ত মুখে বলে উঠল, আপনি কাউকে না জিজ্ঞেস করে সাত তাড়াতাড়ি এ-ব্যবস্থা করতে গেলেন কেন? নিজের কেয়ারলেসনেসএ অ্যাকসিডেণ্ট, এই লোকসানের ওপর আবার আমরা তার ক্যাবিন ভাড়া আর চিকিৎসার খরচা জোগাতে যাব? যেখানেই হোক, ফ্রী-বেড পেয়েছিল যখন আপনার ইণ্টারফিয়ার করার দরকার কি ছিল?

ধীরাপদ জবাব দিল না।

হিমাংশু মিত্র আঙুল দিয়ে টেবিলে দাগ কাটছেন, লাবণ্য সরকার গম্ভীর, অমিতাভ ঘোষ চেয়ারে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে।

একটু বাদে হিমাংশু বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যাবিন ভাড়া কত?

অঙ্ক শুনে একটু আশ্বস্ত হতে যাচ্ছিলেন বোধহয়, সিতাংশু তেমনি অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠল আবার, টাকার জন্তে তো কথা নয়, আমরা এ ভাবে আদর-যত্ন করে চিকিৎসা করালে সকলে ধরেই নেবে যে ওর কিছু গাফিলতি নেই, ক্ষতিপূরণ নিয়ে একটা ঝকাঝকি লাগবে হয়ত, এঁর তো কাউকে না জিজ্ঞেস করে এসব করার দরকার ছিল না কিছু!

—দরকার ছিল। ঠাণ্ডা বিনীত ভাবেই ধীরাপদ জবাব দিল এবার।—যেভাবে ছিল লোকটা, সেভাবে থাকলে বাঁচবে বলে মনে হয়নি। হয়ত এখনো বাঁচবে না, যা করেছি নিজের দায়িত্বে করেছি, কোম্পানীর অসুবিধে হলে কোম্পানী দিতে যাবে কেন? একটু থেমে আবার বলল, লোকটার গাফিলতির কথাও সবাই জানে, তবু দরকার হলে কোম্পানী নিজে থেকেই যদি ক্ষতিপূরণ কিছু দেয়, তাহলেও যে-ক্ষতি হয়ে গেছে এর ওপর সেটুকু আর তেমন কিছু বড় ক্ষতির ব্যাপার হবে বলে আমার মনে হয় না, বরং ফলটা ভালো হবে বলেই বিশ্বাস।

হিমাংশু মিত্রর মুখে হাল্কা বিস্ময়, লাবণ্য সরকার ঘাড় ফিরিয়েছে, অমিতাভ ঘোষ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে আর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে—কৌতুক দৃষ্টিটা ধীরাপদর মুখের ওপর।

যত নরম করেই বলুক, চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা নয় ছোট সাহেবের। করলও না। রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, আপনার বিশ্বাসের কথা কেউ শুনতে চায়নি। যা হয়েছে লোকটার নিজের দোষে হয়েছে, আমরা তার জন্তে এতসব করতে যাব কেন?

তার দিকে চেয়েই ধীরাপদ তেমনি শান্ত অথচ স্পষ্ট জবাব দিয়ে ফেলল আবারও একটা। বলল, নিজের দোষে কেউ মরে গেলেও তাকে কেউ ফেলে দেয় না, তারও সংকারটা হয়ে থাকে।

সিতাংশু নির্বাক হঠাৎ। নির্বাক কয়েক মুহূর্ত সামনের ছুজনও। চীফ কেমিষ্ট কড়কড়িয়ে সিগারেট টানছে।

হিমাংশু মিত্রই মধ্যস্থতায় এগোলেন। ছেলেকে বললেন, অকারণ বাদানুবাদ করে লাভ নেই, চিকিৎসার সব ব্যয়ভার কোম্পানীর নেওয়া উচিত, কোম্পানীই নেবে। আর ধীরাপদকে বললেন, লোকটা সেরে উঠবে কি উঠবে না তাই যখন ঠিক নেই, পরের কথা পরে—সময় নষ্ট না করে আপাতত অফিসিয়াল ষ্টেটমেনটাই রেডি রাখা দরকার।

ধীরাপদ চুপচাপ উঠে এলো।

সেদিনও বিকেলে হাসপাতালে এসেছিল। শক্‌-পিরিয়ড না কাটা পর্যন্ত তানিস সর্দারের ভালোমন্দ কিছু বলা যায় না। তবে চিকিৎসা যে হচ্ছে সেটা বোঝা যায় এখন। ওর বউকেও দেখল। আজ আর কাঁদছে না। ধীরাপদকে দেখে কালো মুখে আশা আর কৃতজ্ঞতা উপচে উঠছিল।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ক্যাবিনে ঢুকল অমিতাভ ঘোষ। ধীরাপদ তাকে এখানে আশা করেনি, দেখে মনে মনে খুশি। অমিতাভ দাঁড়িয়ে রোগী দেখল ছু'-চার মিনিট।

বাইরে এসেই হাসিখুশি মুখে বলল, ফ্যাক্টরী থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে দেখেই বুঝেছি আপনি এখানে, লোকটা আছে কেমন, বাঁচবে?

জবাব শুনল কি শুনল না। আনন্দে গোটা মুখ ডগমগ, এখানে রোগী দেখতে এসেছে কি ধীরাপদর খোঁজে এসেছে বোঝা শক্ত। নিজের পুরনো ছোটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডের বাইরে এসেই বলল, আপনি মশাই এমন সাঙ্ঘাতিক লোক জানতুম না।

কেন, কি হল।

যা হল বাবুরা বুঝছেন, ছোটসাহেবের মাথা ঘুরে গেছে, তার মুখের ওপর এ-রকম কথা কেউ কখনো বলে না।

ধীরাপদ হেসে ফেলল, চীফ কেমিষ্টও না ?

আমার কথা ছেড়ে দিন, ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে হাসছে অমিতাভ, এখানে এই লোকটার জন্যে আপনি যা করলেন চীফ কেমিষ্ট হিসেবে সেটা আমারই করার কথা, কিন্তু আমি বললে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করত, এখন জোড়া পাগলের পাল্লায় পড়ল কি না ভাবছে বোধহয়।

তার আনন্দ দেখে ধীরাপদর ভয় হল হাতের ষ্টিয়ারিং ঠিক থাকলে হয়। হেসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি চলেছেন কোথায় ?

চারুদির ওখানে। যাবেন ?

চকিতে ধীরাপদ গাড়ির ভিতরটা একবার দেখে নিল। না ক্যামেরা নেই। বলল, আমি আজ আর না, বাড়ি যাব এখন, আমাকে এদিকেই নামিয়ে দিন কোথাও।

চলুন, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি—

মেজাজ যথার্থই প্রসন্ন আজ। ক'দিন ধরে এমন একটা সুযোগই খুঁজছিল ধীরাপদ। সুলতান কুঠি পাঁচ সাত মাইল পথ এখান থেকে, এই অন্তরঙ্গতার ফাঁকে কাজের কথা তোলাটা অসম্ভব হবে না হয়ত। পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে বলল, আর যে যাই ভাবুক, আপনার মামা যে আপনাকে স্নেহ করেন খুব সেটা নিজেই আমি সেদিন টের পেয়েছি।

ভেবেছিল কি করে টের পেল সেটাই শুনতে চাইবে, ফলে কাজের কথাটা আপনি উঠবে। কিন্তু সে তার ধার দিয়েও গেল না, সিগারেটটা ফেলে হেসে উঠে মন্তব্য করল, খুব স্নেহ করেন, কংসমামার স্নেহ !

ধীরাপদ ধাক্কা খেল একটা। ঘোরানো পথে গিয়ে ফল হবে না বুঝে একটু বাদে সমস্তটা সোজাসুজি ব্যক্ত করে ফেলল। বলল, আপনাদের ব্যাপার আপনারাই জানেন, কিন্তু এদিকে আমার যে চাকরি থাকে না—

কিছু না বলে অমিতাভ শুধু ফিরে তাকালো একবার, বক্তব্য বুঝতে চেষ্টা করল।

—বসে বসে শুধু ফাইলই ঘাঁটছি, আর যে-যা বলছেন করছি নিজে থেকে কিছু বুঝছিও না করছিও না, একটু আধটু কাজ না দেখাতে পারলে চাকরি থাকবে কেন।

সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের টিপ্পনী, কাজও তো বেশ দেখাচ্ছেন, প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছেন, ভাষণ লিখে দিচ্ছেন, বাণী লিখে দিচ্ছেন—

বক্রোক্তি গায়ে না মেখে ধীরাপদ জবাব দিল, সে-কাজের জন্য ছ'শ টাকা মাইনে দিয়ে সুপারভাইজার রাখা দরকার নেই সেটা তাঁরা শিগগীরই বুঝবেন।

অমিতাভর মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। শাদাসাপটা যা বলে বসল, শুনতে ভালো লাগার কথা নয় খুব, ভালো লাগলও না। তার গুণ দেখে এখানে আনা হয়নি তাকে, তার কাছ থেকে কাজও কেউ আশা করে না। চারুদি চেয়েছেন বলেই তাকে এখানে এনে বসানো হয়েছে।

ধীরাপদ জানে। শুধু চারুদির এরকম চাওয়ার হেতুটাই দুর্বোধ্য। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, চারুদির সঙ্গে ব্যবসার কি সম্পর্ক ?

সম্পর্কটা সে জানে না শুনে অমিতাভ যেমন অবাক, সম্পর্কটা জানার পর ধীরাপদও অবাক তেমনি। সমস্ত ব্যবসায়ের চার আনার মালিক চারুদি। বলতে গেলে চারুদির টাকাতেই ব্যবসা শুরু, মামার জিম্মায় অমিতাভর মায়েরও কিছু টাকা ছিল। মামার নিজস্ব কত ছিল জানে না। তবে মামা মোটা টাকা ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন আর সেই ঋণের দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। চারুদির ডাক্তার-স্বামী বেঁচে থাকতেই এই ব্যবসার জল্পনা-কল্পনা চলছিল। মামার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল খুব। তিনি মারা যেতে তাঁর জমানো টাকা, বিষয়ের অংশ, আর লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকা—সবই চারুদি মামার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এই ব্যবসার জন্য।

অমিতাভ ঘোষ আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। ধীরাপদ একেবারে চুপ। কিন্তু ভিতরটা খুব চুপ করে নেই। চারুদির বাড়ি-গাড়ি বিষয়-আশয়ের ওপর থেকে একজনের অনুগ্রহের ছায়াটা মন থেকে সরে গেল বলে খুশি হবার কথা। কিন্তু ধীরাপদ সেদিকটা ভাবছেই না। একরকম জোর করেই চারুদি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাকে। ধরেবেঁধে উপকার করা নিয়ে ধীরাপদ ঠাট্টা করতে জবাব দিয়েছিলেন, উপকারটা তাঁর একার নাও হতে পারে। পাকাপাকি ভাবে কাজে লাগার পরেও দায়িত্বের কথা বলেছেন চারুদি, বলেছেন সেটা যেন সে ঠিকমত দেখেশুনে বুঝে নিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু ধীরাপদ কি করতে পারে ? ওর কাছ থেকে কি প্রত্যাশা চারুদির ?

বিশ্বাস করে একদিন যাঁর হাতে যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছিলেন, আজ আর তাঁকে অতটা বিশ্বাস করেন না হয়ত। সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন কারণ আর একটা জোর ছিল সেদিন। অনেক বড় জোর। নারীর যে জোরের কাছে অতিবড় প্রবল পুরুষেরও অমোঘ সমর্পণ। সেই জোরটা আজ আর তেমন নেই ভাবছেন চারুদি ? সেই জন্যেই কথায় কথায় বয়েসের কথা তোলেন ? সেই জন্যেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে-মুখে জল দিতে হয় ? আর সেই জন্যেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওকে যুক্ত করার আগ্রহ ?

সবই হতে পারে। কিন্তু ধীরাপদর কেন জানি তা মনে হয় না। এখনও চারুদির বাড়ির দরজায় হিমাংশু মিত্রর লাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর চারুদির স্নেহভাজন বলেই ওর প্রতি অমন রাশভারী বড়সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রীতিভাব একটু।

থেকে থেকে ধীরাপদর কেবলই মনে হল, চারুদির মনের তলায় আরো কিছু আছে···।

অনেকক্ষণ বাদে সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমি এখানে এসে চারুদির কোন্ কাজে লাগতে পারি ?

সামনের দিকে চোখ রেখে অমিতাভ ভুরু কুঁচকে জবাব দিল, কাজে লাগার দরকার নেই, চারুমাসির লোক এখানে একজন থাকা দরকার, আপনি আছেন।

তাঁর লোক একজন থাকা দরকার কেন ?

তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

আপনি জানেন না ?

না। হাল্কা শিস দিতে দিতে স্পীড কমালো, সামনে জোড়া লরী।

ধীরাপদ হাসছে অল্প অল্প। কিন্তু মনে মনে সত্যি খাঁটছে কিছু।···হিতে বিপরীত হবে কিনা কে জানে। হবে না বোধহয়, মেজাজপত্র অন্য রকম দেখছে আজ।

এখানে আসার আগে আমি কি করতাম আপনার জানা নেই, না?

লরীর পাশ কাটিয়ে ঘাড় ফেরালো, ঠোঁটের ফাঁকে হাল্কা শিসটা থেমে গেল।

ছেলে পড়াতাম আর কবিরাজী ওষুধ আর পুরনো বইএর দোকানের বিজ্ঞাপন লিখতাম···মাসে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে জান-ঘাম ছুটে যেত। হাসতে লাগল।

সামনের ফাঁকা রাস্তাটা দেখে নিয়ে অমিতাভ আবারও ফিরে তাকালো। শিস থেমে গেছে।

ধীরাপদ বলল, আবারও তাহলে সেই অবস্থাতেই ফিরে যেতে বলছেন আমাকে···।

সশঙ্ক প্রতীক্ষা। কিন্তু কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে। ষ্টিয়ারিং হাতে লোকটা ফিরে ফিরে বারকতক দেখল।—ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন না, কে যেতে বলেছে আপনাকে?

যা বললেন সেই রকমই দাঁড়ায়, ধীরাপদ নির্বিকার, কারো তাঁবেদারের লোক হয়ে বসতে রাজি নই, আপনার ভরসায় কাজের ওপর দাঁড়াব আশা করেছিলাম।

রাগতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হেসেই ফেলল অমিতাভ ঘোষ। আচ্ছা, আশা বার করছি আপনার। স্পীডের কাঁটা তিরিশ থেকে এক লাফে পঞ্চান্নর দাগে। উৎফুল্ল বিস্ময়ে বলে উঠল, অদ্ভুত লোক মশাই আপনি!

হাসছে ধীরাপদও। স্বস্তি।

চারুদির সঙ্গে যেদিন এসেছিল সেদিনও নাকি সুলতান কুঠির এই পরিবেশটা ভালো লেগেছিল অমিতাভ ঘোষের। পৌঁছে দিতে এসে আজ ধীরাপদর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অর্থাৎ এক্ষুনি যাবার বাসনা নেই। অগত্যা আমন্ত্রণ না জানিয়ে ধীরাপদ করে কি।

আসুন, বাইরেটা ভালো লাগলেও ভিতরটা লাগবে না।

সুলতান কুঠিতে গাড়ি আসা আর সেই গাড়িতে ধীরাপদর আসা এখন আর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার মত নয় খুব। কিন্তু তার ঘরের সামনের বারান্দায় যে মানুষটি দাঁড়িয়ে তার বিস্ফারিত চোখে রাজ্যের বিস্ময়। গণুদা। গণুদার এমন চিত্রার্পিত মূর্তি ধীরাপদ আগে কখনো দেখেনি।

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে আসতে গণুদার দিশা ফিরল যেন। শশব্যস্তে দু'হাত জুড়ে আধখানা ঝুঁকে বিনয়ে ভেঙে পড়ে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উঠল একটা। জবাবে একখানা হাত কপালে তুলে অমিতাভ জিজ্ঞাসু নেত্রে ধীরাপদর দিকে তাকালো।

—গণেশবাবু, গণুদা···এই পাশের ঘরে থাকেন। ঘরের দরজা খোলার ফাঁকে ধীরাপদ পরিচয়ের বাকি আধখানা এড়িয়ে গেল, কাকে নিয়ে এসেছে সেটা আর বলল না। গণুদার শ্রদ্ধার বহর দেখেই ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু যে-কারণেই হোক ওটুকু পরিচয় গণুদার পছন্দ নয়। যেটুকু পাদ-পূরণ করে দিল সেটাই যেন বড় পরিচয়। বিনয়ের আঁচে মাখন-গলানো মুখখানি করে বলল, ধীরু আমার ছোট ভাইয়ের মত···।

অমিতাভর চোখে নীরব কৌতুক। ধীরাপদর কানেও বেখাপ্পা লাগল, ফিরে দেখে গণুদার দুই চোখ চাপা আনন্দে চকচকিয়ে উঠেছে। ধীরাপদ অবাক, মতলবখানা কি গণুদার!

ঘরে ঢুকে ছড়ানো বিছানায় অমিতাভ আয়েশ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আধ-ময়লা বালিশ, আধ-ময়লা চাদর, ঘরেও এ-পর্যন্ত ঝাঁট পড়েনি। কিন্তু যে এসেছে এ-সব দিকে তার চোখ নেই। ঘুরে ফিরে দুপুরের সেই মজার ব্যাপারটাই রোমন্থনের বস্তু হল আবার। বড়সাহেবের ঘর থেকে ধীরাপদ বেরিয়ে আসার পর ছোটসাহেব একেবারে গুম নাকি। কিন্তু আসল দেখার মত হয়েছিল লাবণ্য সরকারের মুখখানা। লাভলি···। মামার কাজেও সায় দিতে পারে না, সত্যুর কথায়ও না, সী ইজ মোষ্ট চার্মিং হোয়েন সী ইজ অন্ টু বোটস্—মামা ছিল বলে কোনরকমে লোভ সামলে বসেছিল অমিতাভ ঘোষ, নইলে কিছু একটা করেই বসত হয়ত।

দেখলে কে বলবে অতবড় কোম্পানীর দোর্দণ্ড প্রতাপ চীফ কেমিষ্ট এই মানুষ। হাসছে ধীরাপদও, আর ভাবছে দিনটা শুভ বটে। এমন অপ্রত্যাশিত অতিথিকে এক পেয়ালা চা দিয়েও অভ্যর্থনার ব্যবস্থা নেই ঘরে। সঙ্গে গাড়ি আছে যখন, নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলে তাকে নিয়ে আবার ভালো কোনো

চায়ের দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল। এরই মধ্যে আর এক কাণ্ড।

গণুদা ঘরে ঢুকল, তার হাতে ট্রে একটা। ট্রেতে দুপেয়ালা চা। পিছনে মেয়ে উমা। তার দুই হাতে দুটো খাবারের ডিশ।

অমিতাভ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল, আসুন—আমি তো তাই ভাবছিলাম, ধীরুবাবু এখনো চায়ের কথা বলছেন না কেন! ধীরাপদর দিকে তাকালো, চারুমাসির মুখে শুনে শুনে আপনার ধীরু নাম বেশ মিষ্টি লাগে, ধীরাপদ নামটা বিচ্ছিরি।

ট্রে রেখে গণুদা মেয়ের হাত থেকে খাবারের ডিশ দুটো নিয়ে সামনে ধরল। নাম নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে নেই, প্রথম কথাটার সূত্রো ধরে সবিনয়ে বলল, আপনি এসেছেন কত ভাগ্য, ওকে বলতে হবে কেন—ঘরের তৈরি সামান্য জিনিস, সাহস করে আনতেই পারছিলাম না···

ধীরাপদ হাঁ করে গণুদাকে দেখছে, আতিথ্যের দায় উদ্ধার হল সে-কথাটা মনেও আসছে না। অমিতাভ ঘোষ ওদিকে ডিশের শাদা-রসবাটি গোটাগুটি মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে গণুদার বিনয় বচন শুনল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, ঘরে থাকলে নারকেলের সন্দেশ সাহস করে আর দু'-চারটে নিয়ে আসুন তো।

গণুদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটল আবার। অমিতাভ ধীরাপদকে চোখ রাঙালো, আপনি বেশ আছেন দেখি মশাই, অ্যাঁ? এই জন্যেই এখানে ডেরা বাঁধা হয়েছে!

গণুদার কথা ভুলে কোম্পানীর দু' আনার অংশীদার, চৌদ্দ শ' টাকা মাইনের বিলেত-ফেরত চীফ কেমিষ্টকে দেখছিল ধীরাপদ। বিধাতা খেয়ালী বটে।

সন্ধ্যার পর কুঠির আঙিনা থেকে গাড়ির শব্দটা মেলাবার আগেই গণুদা হাজির। নাইট-ডিউটি আছে বোধহয়, পরনে পাট-ভাঙা জামা কাপড়। অতিথি-বিদায়ের অপেক্ষায় ছিল হয়ত। আগ্রহে আর চাপা আনন্দে এই মুখের চেহারাই অন্যরকম। গলার স্বরে অন্তরঙ্গ বিস্ময়।—এঁর সঙ্গে তোমার এত খাতির জানতুম না তো! এঁদেরই কারখানায় চাকরি বুঝি তোমার? আশ্চর্য···

ধীরাপদ চেয়ে আছে। স্বার্থের উদ্দীপনা অনেকটা গিল্টিকরা গয়নার মত, নজর করে দেখলে চোখে পড়ে। স্বার্থটা কি সেটাই এখন পর্যন্ত ঠাওর করে উঠতে পারেনি।—আপনি এঁকে চেনেন কি করে?

আমি? শুধু আমি কেন, আমাদের কাগজের অফিসে কে আর না চেনে ওঁকে! ফর্সা মুখ হাসিতে ভিজিয়ে বিছানার একধারে বসে পড়ল গণুদা।

অতঃপর কাগজের অফিসে কতখানি পরিচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তি অমিতাভ ঘোষ, সেই বৃত্তান্ত। খাতিরটা বছরান্তে মোটা টাকার বিজ্ঞাপন আসে বলে নয়, গণুদাদের বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের অন্তরঙ্গ বন্ধু সে। একসঙ্গে বিলেত গেছে, একসঙ্গে ফিরেছে। আগে মাসের মধ্যে দু' তিন দিন অমিতাভ ঘোষ কাগজের অফিসে আসত, এলে দেড় ঘণ্টার আগে উঠত না। এখন অবশ্য কমই আসে, যাবার সময় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিজে সঙ্গে করে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। ওই ওষুধের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে একটুকু ভুলচুক হলে মালিকের তলবের ভয়ে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের পর্যন্ত মুখ শুকোয়। আরো আছে, শহরের সব থেকে নামজাদা বিলিতি ক্লাবের মেম্বার দু'জনেই, কালচারাল অ্যাসোসিয়েশানের—

ছেদ পড়ল। গণুদার দৃষ্টি অনুসরণ করে ধীরাপদ দেখল দরজার কাছে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে। হারিকেনের আলোয় ঠিক ঠাওর হল না, তবু মনে হল মুখখানা হাসি-হাসি।

কাগজের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সঙ্গে অমিতাভ ঘোষের হৃদ্যতার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গণুদার এত উদ্দীপনার কারণ বোঝা গেছে। শেষ আবেদনের প্রতীক্ষায় ধীরাপদ সশঙ্কে মুখ বুজে বসে ছিল।

প্রস্তুতির মধ্যপথে ছন্দপতন।

সোনাবউদি ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াতে গোটা মুখের প্রত্যাশার আলোটা টুপ করে নিবিয়ে দিয়ে গণুদা বলল, অফিসের সময় হয়ে গেল, কাল কথা হবে'খন।

কাল কেন, আজই হোক না—সোনাবউদির গলায় কৃত্রিম আগ্রহ, একদিন না হয় দু' ঘণ্টা দেরিতেই গেলে, না-হয় না-ই গেলে অফিসে একদিন—এ-সব কথা কি ফেলে রাখার কথা নাকি!

গণুদা সরোষে তাকালো তার দিকে, কিছু একটা কটূক্তি করে ওঠার মুখে থেমে গিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এখানে বকা-ঝকা করলে যার কাছে সুপারিশের প্রত্যাশা সে-ই বিগড়তে পারে ভেবে সামলে নিল বোধহয়। উল্টে হাসতেই চেষ্টা করল গণুদা, বলল, অফিসটাতো আর শ্বশুরবাড়ি নয়, অফিস কি জায়গা তোমার এই দেওরটিকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো—

সামনা-সামনি তোমামোদের ব্যাপারে তেমন সুপটু নয় গণুদা, ফলে আরো বিসদৃশ শোনালো। ভদ্রলোক চলে যেতে সোনাবউদির নির্বাক দৃষ্টিবাণ সরাসরি ধীরাপদর মুখে এসে বিদ্ধ হল। দ্রষ্টব্য কিছু দেখছে যেন।

বসুন না। ধীরাপদ খুব স্বস্তি বোধ করছে না।

বসতে হবে? বিনীত প্রশ্ন। ধীরাপদর মুখে বিব্রত হাসি। সোনাবউদির মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। মুখখানা অপরাধী অপরাধী করে ফেলে বলল,' বিছানার চাদরটাতো ময়লা দেখি, বালিশের ওয়াড়গুলোও তাই—আমার কাছে সব ধোয়া আছে একপ্রস্থ, এনে পেতে দেব?

ধীরাপদ থতমত খেয়ে গেল কেমন।

ঘরের দিকে চেয়ে সোনাবউদি আরো সঙ্কুচিতা। ঘরটায়ও একটু ঝাঁট পড়েনি পর্যন্ত, আপনি দয়া করে একটু উঠলে ঝেড়েমুছে দিতাম।

ধীরাপদ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

কুঁজোটায় জল ভরা আছে তো? হারিকেনে তেল?

ধীরাপদই আগে হেসে ফেলল, কি ব্যাপার?

সোনাবউদির আয়ত চোখ দুটো ওর মুখের ওপর এসে থামল আবার। ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রূপের আভাস। দেখল একটু। কি ব্যাপার আপনি জানেন না?

জানুক আর না জানুক ধীরাপদ মাথা নাড়ল, জানে না।

শুনুন তাহলে, সোনাবউদি , বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা,

পুরুষের দশ দশা, কখনো হাতী কখনো মশা—মশার দশা গিয়ে এখন আপনার হাতীর দশা চলছে।

এক পশলা ব্যঙ্গ ছড়িয়ে নিজেই গজেন্দ্রগমনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ধীরাপদর দুচোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করেছে। তার পরেও বসেই আছে তেমনি।

ধীরাপদ গণুদার কথা ভাবছে।

গণুদার প্রত্যাশার কথা বা আবেদনের কথা নয়।

গণুদা ঈর্ষার পাত্র, সেই কথা।

গণুদার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াটাই শেষে ভাগিদের মত হয়ে দাঁড়াল। পাশাপাশি ঘরে বাস করে ধীরাপদ তাকে এড়াবে কেমন করে। যার একটু ইঙ্গিতে গণুদার জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে, একটা মাসের মধ্যে তাকে একবার অনুরোধও করা হল না দেখে গণুদা মর্মাহত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার ওকে বলেছে, সুপারিশের জোর না থাকলে আজকাল কারো কিছু হয় না ভাই, এটা সুপারিশের যুগ।

ধীরাপদ জানে। জেনেও কিছু করে উঠতে পারে না। কেন পারে না সেটা গণুদাকে বোঝানো শক্ত। এই একটা মাসের মধ্যে সোনাবউদির সঙ্গে কমই দেখা হয়েছে। ধীরাপদর অনুমান, তার ওপরেও একটু-আধটু গঞ্জনা চলছে। গণুদা ভাবে, স্ত্রীটি একবার মুখ ফুটে বললে অনুরোধ করা দূরে থাক, ধীরাপদ অমিতাভ ঘোষের কাঁধে চেপে বসত।

গণুদার চাকরির উন্নতি ধীরাপদর কাম্য। গণুদার জন্যে নয়, উন্নতি হলে সোনাবউদি আর একটু ভালো থাকবে, ছেলেমেয়েগুলো ভালো থাকবে। শুধু তাদের কথা ভেবেই অমিতাভ ঘোষকে অনুরোধ করার ইচ্ছে আছে। ফাঁক পেলে করবেও। কিন্তু ফ্যাক্টরীর পরিবেশে অমিতাভ ঘোষ ভিন্ন মানুষ। শুধু একটা ভ্রূকুটিতে অনুরোধটা উড়িয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। অনেক ভেবেচিন্তে ধীরাপদ গণুদাকে আশ্বাস দিয়েছিল, সুবিধেমত আর একদিন তাকে সুলতান কুঠিতে ধরে নিয়ে আসবে। খামখেয়ালী লোক, একবার পারব না বলে বসলে আর তাকে দিয়ে কিছু করানো যাবে না।

কিন্তু সেই আশায়ও সম্প্রতি ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছে গণুদার।

ইতিমধ্যে ফ্যাক্টরীতে ধীরাপদর প্রতিপত্তি বেড়েছে কিছু। বাড়ছেও। তারও মূলে চীফ কেমিষ্ট। তানিস সর্দার আরোগ্য-পথে। এখনো বেশ কিছুকাল হাসপাতালে থাকতে হবে বটে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নেই। তার চিকিৎসার অপ্রত্যাশিত সুব্যবস্থার ফলে কর্মচারীরা দল বেঁধে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল অমিতাভ ঘোষকে। তানিস সর্দার সর্দারগোছেরই একজন। সে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলে তাকে বসা-কাজে লাগানো হবে, এমন কথাও শোনা গেছে।

অমিতাভ ঘোষ সরাসরি ধীরাপদকে দেখিয়ে দিয়েছে। যা কিছু হয়েছে তার জন্যেই হয়েছে, আর যেটুকু হবার আশা তার জন্যেই হবে। অতএব সব কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। কর্তাদের সঙ্গে কি ভাবে বকাবকি করে সুব্যবস্থাটুকু আদায় করেছে ধীরাপদ, মনের আনন্দে অমিতাভ ঘোষ তাও নিঃসংকোচে বলে দিয়েছে।

ফলে কর্মচারীরা নতুন চোখে দেখেছে ধীরাপদকে। নিস্পৃহতার দরুন ছোটসাহেবের প্রতি অশ্রদ্ধার লাবণ্যর প্রতিও অনেকদিনের ক্ষোভ তাদের। অভিযোগ নিয়ে অথবা সুব্যবস্থার আরজি নিয়ে এ পর্যন্ত বহুবার তারা দল বেঁধে চড়াও হয়েছে। সব অভিযোগ আর সব আরজিই যে যুক্তিসঙ্গত তা নয়। টানা-হেঁচড়ায় কখনো কিছুটা আদায় হয়েছে কখনো বা হয়নি। কিন্তু হোক না হোক, তাদের অস্তিত্বের লাগামটি যে শেষ পর্যন্ত মালিকের হাতেই, সেটা তাদের উপলব্ধি করতে হত। এরই মধ্যে মালিকের সঙ্গে যুঝে তাদের জন্যে সুবিধে আদায় করেছে একজন, সেটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি আনন্দের। তানিস সর্দারের এই প্রাপ্তিটুকু অসময়ে নিজেদেরও একটা প্রাপ্য দক্ষিণা হিসেবে দেখেছে তারা।

তাদের সোজাসুজি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেখে ধীরাপদ অপ্রস্তুতের একশেষ। জনতার কৃতজ্ঞতায় ভেজাল নেই।

অতঃপর ছোটসাহেবের বিরূপতার আঁচ লাগবে গায়ে এটা ধীরাপদ ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু তার আভাস মাত্র না পেয়ে মনে মনে অবাক হয়েছে। অবশ্য পরে এর একটা কারণ অনুমান করেছে। ছেলেটার বয়স তো মাত্র আটাশ উনত্রিশ, তার ওপর অলস গোছের একটু, একটু বিলাসীও। ভিতরে ভিতরে সবল নয় খুব। যা কিছু জোর আর প্রতিপত্তি সব বাপের জোরে, তাঁর প্রবল-সত্তার নিরাপদ ছায়ায় বসে। সেই বাপই যখন প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার তিক্ততা বাড়িয়ে কাজ কি। অন্যের দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে নিজের আধিপত্যের ঠাটটুকু বজায় থাকলেই সে খুশি। সেদিক থেকে বাপের সেদিনের ফয়সলার ফলে লোকটাকে উল্টে আরো একটু বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে হয়ত। ধীরাপদর খানিকটা দায়িত্ব বেড়েছে আর ছোটসাহেবের কিছুটা অবকাশ বেড়েছে।

কিন্তু বাপের প্রভাব যত বড়ই হোক, ছেলের যা কিছু উদ্দীপনার উৎস লাবণ্য সরকার। সেই লাবণ্য সরকারও ছোটসাহেবের মনে বিরূপতার ইন্ধন জোগানো দূরে থাক, ধীরাপদর সঙ্গে তারও ব্যবহার ক্রমশ যেন সহজ হয়ে উঠতে লাগল। এক আধ সময়

খোঁচা দিয়ে কথা বলতে ছাড়ে না অবশ্য, কিন্তু যাই বলুক স্বচ্ছতার ছলে বলে, হাসিমুখে বলে।

বড়সাহেবের ঘরে তানিস সর্দারের কেস্ নিয়ে কথা কাটাকাটির দিন দুই পরে লাবণ্য ওর ঘরে এসে বসেছিল। কাজের কথা নিয়েই এসেছিল বটে, কিন্তু ধীরাপদর ধারণা এমনিই এসেছিল। সর্দারের প্রসঙ্গ নিজেই উত্থাপন করেছে। মন্তব্য, লোকটার বরাত ভালো, ওদের জন্যে কে আর এতটা করে।

প্রকারান্তরে সমর্থনের সুরই।

ধীরাপদ বলেছিল, হাসপাতালে ওর বউটার সেই কান্না দেখলে আপনিও না করে পারতেন না—

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর ছদ্মবিস্ময় মেশানো কৌতুক-বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে একটা।—তাই নাকি! আপনি আসলে সেদিন ওর বউটার সেই কান্না দেখেই অমন ক্ষেপে গিয়েছিলেন তাহলে—

ধীরাপদ হালকা প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি। আমি ক্ষেপতে যাব কেন, আপনাদেরই বরং মেজাজ বিগড়েছিল।

আমারও? নিরীহ বিস্ময়, আমার বিগড়তে যাবে কেন, আমার কী?

ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল ধীরাপদ। আমিও তাই ভাবি, আপনার সঙ্গে অন্তত আমার কোনো বিরোধ থাকার তো কথা নয়।

ইঙ্গিতটুকু গায়ে না মেখে লাবণ্য সরাসরি চেয়েছিল মুখের দিকে, অবলার প্রতিমূর্তিটি।—অথচ বিরোধ দেখছেন?

ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল, আমি দেখি না দেখি আপনি যে আমাকে ভালো চোখে দেখেন না সেটা তো ঠিক।

সঙ্গে সঙ্গে নারী-মুখের এক বিচিত্র মাধুর্য-তরঙ্গ দেখেছিল ধীরাপদ। লোভ সামলে দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি অনেকক্ষণ। চাপা হাসিতে দুই ঠোঁট টসটসিয়ে উঠতে দেখেছিল। মুখে সঙ্কট-রেখা। চোখের পাতায় কৌতুক কাঁপছিল।—আপনাকেও ভালো চোখে দেখতে হবে?

অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস। অর্থাৎ, কত আর পারি।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে তারপর। আচ্ছা, দেখব চেষ্টা করে।

ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হলে লাবণ্য সরকার কতটা পারে সে-সম্বন্ধে ধীরাপদর মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। সিতাংশু মিত্রর মোটরে তাকে এক-রকম দেখেছে, হিমাংশু মিত্রর মোটরে আর এক-রকম। মেডিকেল হোমের নিস্পৃহ কর্ত্রীর গাম্ভীর্যে তাকে এক-রকম দেখেছে, চিকিৎসার পসারে আর এক-রকম। ওষুধের লাইসেন্স বার ক'রে আনার সুপারিশে গিয়ে তাকে একরকম দেখেছে, অমিতাভ ঘোষের ছবির অ্যালবামে আর এক-রকম।

আর, এই আরো এক-রকম দেখল।

ধীরাপদর ইচ্ছে হচ্ছিল, তাকে ধরে চেয়ারে এনে বসিয়ে দেয় আবার। দিয়ে বলে, চেষ্টাটা আজ থেকেই সুরু হোক।

লাবণ্য সরকারের সঙ্গে আপসের সূত্রপাত সেই। তারপর এ পর্যন্ত ওতে বড় রকমের কোনো ঘা পড়েনি বটে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে চিড় খেত। তার কারণ, লাবণ্য সরকারের হাল্কা ঠাট্টা বা টিপ্পনীর জবাবে ধীরাপদও একেবারে চুপ করে থাকত না। আর বলত যখন কিছু, একেবারে ইঙ্গিতশূন্য হত না সেটা। কিন্তু তা বলে লাবণ্য সরকারের হাসিমুখের ব্যতিক্রম দেখেনি খুব। কখনো সহাস্যে হজম করেছে, কখনো বা ছদ্মরাগে চোখ রাঙিয়েছে, আপনি লোক সহজ নয় অনেকদিনই জানি, লাগতে আসাই ভুল।

কিন্তু সেদিন এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখে ধীরাপদ অবাক।

উপলক্ষ অমিতাভ ঘোষ।

তারই উদ্যমে এদিককার কাজের ধারারও একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। সেদিন মোটরে ধীরাপদর অনুযোগ, আবেদন, আর নিজের প্রতিশ্রুতি ভোলেনি সে। ধীরাপদ কাজ দেখাতে চেয়েছিল, তাকে দিয়ে কাজ দেখিয়েই ছাড়ছিল। দুপুরের মধ্যে নিজের কাজ সেরে রাত নটা-দশটা পর্যন্তও ধীরাপদর ঘরে কাটাতে দেখা গেছে তাকে। এর পর ক্রমশ চিত্রচরিত বিজ্ঞাপন-সজ্জায় তফাত লক্ষ্য করেছে সকলে, প্রচার-বিবৃতির উন্নতি দেখেছে, আর সব থেকে বেশি দেখেছে কার্টনিং আর লেভেলিং-এর বিশেষ আকর্ষণ-বিন্যাস। নিজের হাতে কাঁচি ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একটা লেভেল মগ্ন করেছে অমিতাভ ঘোষ, কাগজের রঙ নিয়ে আর পেন্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, এমন কি কোন্ প্যাকিং-এ বাটার-পেপার বদলে সেলোফেন দেবে তাই নিয়েও অনেক ভেবেছে। এমন সমাহিত তন্ময়তা ধীরাপদ আর বড় দেখেনি। হিমাংশু বাবুর ইঙ্গিতে অত্যুক্তি ছিল না। ইচ্ছে করলে সে-ই করতে পারে কিছু, পারলে সে-ই পারে বটে। উন্নতির জন্য কি ভাবে ভাবতে হবে আর কোন্ পথে মাথা খাটাতে হবে সেই হদিস অন্তত ধীরাপদ পেয়েছে।

তাদের এই নতুন উদ্দীপনার ফলাফল বোঝা গেছে মাস দেড়েকের মধ্যেই। মনে মনে একটু ভয়ই ছিল ধীরাপদর, পরিবর্তনের ফলে খরচ কিছু বাড়ছিল, সেটা উশুল হবে কি না। সেল-গ্রাফের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত, সেটা মাথা উঁচিয়েছে। পরিচিত ডাক্তারদের মন্তব্য অনুকূল, লেভেলিং কার্টনিং সুন্দর হচ্ছে, ফোলডার ভালো হচ্ছে। অন্যদিকে 'জি-আর' কমেছে। অর্থাৎ প্যাকিং-সৌষ্ঠবের দরুন গুডস্ রিটার্নড বা মাল ফেরত কম আসছে।

ফ্যাক্টরীতে সেদিন হিমাংশু মিত্র নিজেই ধীরাপদর ঘরে এলেন। সঙ্গে লাবণ্য। বড়সাহেব ফ্যাক্টরীতে এলে সাধারণত সে-ই সঙ্গে থাকে। ধীরাপদর পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন হিমাংশু মিত্র, তার সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ নিলেন, নতুন প্ল্যান ভাবতে বললেন, টাকার জন্যে ভাবনা নেই সে-কথাও জানিয়ে দিলেন। এমন কি কিছু একটা অন্তরঙ্গ রসিকতার মুখে লাবণ্যকে দেখেই যে থেমে গেলেন তাও বোঝা গেল।

দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এলেন আবার। ভালো কথা, ওই সর্দার লোকটি কেমন আছে?

ভালো।

গুড! চলে গেলেন।

একটু বাদেই লাবণ্য সরকার ফিরে এসে তার সামনের চেয়ারটায় বসল। কোনো একটা দরকারী কথা নিয়েই এসেছে যেন।—আপনার মুখখানা একবার দেখতে এলাম।

ধীরাপদ তেমনি জবাব দিল, এমন অবিচার কেন, সেটা কি দেখার মত?

আজ বেশ দেখার মত, হিংসের আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

ধীরাপদ হেসে ফেলল। লাবণ্যও। ধীরাপদ বলল, সাহেব তো নতুন প্ল্যান ভাবতে বলে গেলেন, এরই কোনো ওষুধ বার করা যায় কিনা ভাবা যাক আসুন তা হলে।

নিছক ঠাট্টাই করতে গিয়েছিল, আর কোনো অর্থ হয় কিনা ভেবে বলেনি। লাবণ্যকে মুখ টিপে হাসতে দেখে লজ্জা পেল একটু। তবু ভালো লাগছিল।

গত দেড় মাসে এখানকার কাজে সুফল যা কিছু হয়েছে অমিতাভ ঘোষের জন্যেই হয়েছে, সেটা হিমাংশু মিত্র যেমন জানেন লাবণ্যও তেমনি জানে। তাকে যে এর মধ্যে টেনে আনতে পেরেছে সেটাই ধীরাপদর সব থেকে বড় কেরামতি। লাবণ্যও সেটা মনে মনে অস্বীকার করে না। তবু একটা টিপ্পনীর লোভ সংবরণ করে উঠতে পারল না।—বসে বসে বড়-সাহেবের প্রশংসা তো খুব শুনলেন, আপনার গুরুর নাম তো কই করলেন না একবারও?

যত হাল্কা করেই বলুক, কথাটা খচ করে লাগার মতই স্থুল। এই খোঁচাটা দেবার জন্যেই আবার ফিরে আসা কিনা বুঝতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। হাসিমুখে সেও পাল্টা লঘু প্রশ্ন ছুঁড়ে বসল একটা, কাজ ফুরোলে গুরুর নাম কে আর করে। আপনি করেন?

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল লাবণ্য সরকার। থমকালো। শাদা আলোর ওপর মেঘের ঘন ছায়া পড়লে যেমন ঘোলাটে দেখায় তেমনি দেখতে হল মুখখানা। মেডিক্যাল হোমের সামান্য কর্মচারী ভ্রমে তার ধৃষ্টতা দেখে যে-চোখে তাকাতো সেই চোখে তাকালো। তারপর একটি কথাও না বলে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

ধীরাপদ যতই অপ্রস্তুত হোক, মনে মনে অবাক হয়েছে অনেক বেশি। এতটাই লাগবে ভাবেনি। লাগলেও সেটা প্রকাশ করার মেয়ে নয় লাবণ্য সরকার। কিন্তু কতটা বিঁধেছে স্ব-চক্ষেই দেখল।

অপরাধ-চেতন অসহিষ্ণুতা? নাকি ও সব জানে টের পেল বলে?

এর পর তিন-চার দিন একেবারে অন্যরকম। লাবণ্য সরকার যেন চেনেও না ভালো করে।

এ ভাবেই কাটত হয়ত আরো কিছুদিন। কাটল না যে-জন্যে সে-ও এক মন্দ ব্যাপার নয়।

গণুদার ধৈর্য গেছে তার আঁচ পাচ্ছিল। তা'বলে বে-পরোয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত সে ফ্যাক্টরীতে হানা দেবে ভাবেনি। তাকে সঙ্গে করে ঘরে এনে হাজির অমিতাভ ঘোষ নিজেই। তার বাক্যছটা থেকে বোঝা গেল, বাইরে গেট-কিপারের জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল গণুদাকে। তারা ধীরুবাবুও চেনে না, ধীরাপদও চেনে না। চক্রবর্তী সাহেব বা সুপারভাইজার সাহেবকে চেনে। নিরুপায় গণুদা শেষে অমিতাভ ঘোষের নাম করতে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে এখানে।

গণুদা বিব্রত মুখে হাসতে চেষ্টা করছিল, ফর্সা মুখ লাল। ধীরাপদ বড় চাকরি করে এটুকুই জানা ছিল, এমন পরিবেশে আর এমন ঘরে বসে চাকরি করে ভাবতে পারেনি।

কিছু বলতে হলে এই অনুকূল মুহূর্ত। ধীরাপদ সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, বসুন, গণুদা কিন্তু আসলে আপনার কাছেই এসেছেন—

আমার কাছে! সিগারেট ধরিয়ে ফিরে তাকালো, আমার কাছে কী?

গণুদার দিকে চেয়ে হাসি পাচ্ছিল, লজ্জায় একেবারে অধোবদন। কি, সেটা ধীরাপদই ব্যক্ত করল। আর করল যখন জোর দিয়েই করল। গণুদার মত এমন যোগ্য লোকের প্রতি এই দীর্ঘকালের অবিচার শুধু মাত্র তাঁর সুপারিশের জোর নেই বলে। উপসংহার, অমিত ঘোষের সঙ্গে আলাপের পর এখন আর জোর নেই বলা চলে না।

অমিতাভ সিগারেট টানল আর গম্ভীর মুখে শুনল। গাম্ভীর্যটুকু একজনের সঙ্কোচ এবং আর একজনের শঙ্কার কারণ। ধীরাপদর বক্তব্য শেষ হতেই বলে উঠল, আমার দ্বারা কি-স্-সু হবে না। গণুদার দিকে ফিরল, চারটে-ছ'টা নারকেলের সন্দেশে এত হয় না, এক কুড়ি চাই। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল, আসুন—

ধীরাপদ ইশারা না করলে গণুদা বোকার মত বসেই থাকত হয়ত। উঠে শশব্যস্তে অনুসরণ করল। তার মতি-গতি গণুদার বোঝার কথা নয়, ধীরাপদ বুঝেছে। পাশের ঘরের টেলিফোনে সুপারিশ-পর্বটি এক্ষুনি সমাধা করে ফেলতে চলল।

শেষ পর্যন্ত এত সহজে দায় উদ্ধার হবে ভাবেনি। আরো নিশ্চিন্ত, কারণ, অমিতাভ ঘোষকে ওভাবে উঠতে দেখেই ধরে নিয়েছে, সুপারিশ ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু এক মিনিটও হয়নি বোধহয়, ধীরাপদ হকচকিয়ে গেল একেবারে। গণুদা ফিরে এসেছে। সমস্ত মুখ শুকনো আমসি।

কি হল?

জবাবে গণুদা পাংশু মুখে শুধু মাথা নাড়ল একটু। অর্থাৎ, হল না কিছু। তারপর চেয়ারে এসে বসে বিড়বিড় করে বলল, কি আর হবে, কপালই মন্দ।

মন্দ কপালের বিবরণ শুনে ধীরাপদও নির্বাক। বেশ হাসিখুশি

মুখেই ভদ্রলোক গণুদাকে সঙ্গে করে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। ঘরের মধ্যে ফিটফাট সাহেবী পোষাক-পরা একজন লোক একটি মেয়ের সঙ্গে খুব গল্প করছিল। মেয়েটি চেয়ারে বসে ছিল, আর লোকটি মেয়েটির টেবিলের ধারে বসে তার দিকে ঝুঁকে কথা কইছিল আর হাসছিল। মেয়েটিও হাসছিল। তারা ওভাবে ঢুকে পড়তে লোকটি বিরক্ত মুখে ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর একটু অবাক হয়েছিল হয়ত। গণুদার মুরুব্বিটি তক্ষুনি চিড়বিড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাকে বলেছে পরে আর একদিন দেখা যাবে। তারপর গনগনিয়ে বারান্দা পেরিয়ে তর-তরিয়ে নিচে নেমে চলে গেছে।

ধীরাপদ শুধু একটাই কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, ঘরে মেম-টাইপিষ্ট ছিল কি না। কি ভেবে সেটা আর জিজ্ঞাসা করল না। আশ্বাস দিয়ে মন্দ-কপাল গণুদাকে বিদায় করল আগে। তারপর হাতের কাজ একদিকে সরিয়ে রেখে কলম বন্ধ করল। কাজ আর আজ হবে না।

চীফ কেমিষ্টের হঠাৎ অমন মেজাজ বিগড়েছে নীতির কারণে নয়। প্রগলভ অন্তরঙ্গতাটুকুই বরদাস্ত হয়নি। কিছু যেন ভাবার আছে ধীরাপদর। ভাবনাটা অমিত ঘোষকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর লাবণ্য সরকারকে নিয়ে। অমিত ঘোষকে নিয়ে আর ফোটো অ্যালবামের পার্বতীকে নিয়ে।

কুয়াশার ওপর ভাবনার আলোটা জমে উঠতে না উঠতে সুবাঞ্ছিত বিঘ্ন আবার। অবশ্য ঘড়ির দিকে চোখ পড়লে ধীরাপদ দেখত, কোথা দিয়ে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

দু'খানা চিঠি হাতে লাবণ্য সরকার ঘরে ঢুকল। তিন-চার দিন আগে সেই উঠে গিয়েছিল, আর এই এলো। সেদিনের সেই রূঢ় বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নেই। লঘু, রমণীয় ছন্দে আবির্ভাব।

চিঠি দুটো তার সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিল।—আপনার জন্যে চাকরি-বাকরি শেষ পর্যন্ত থাকলে হয়, আপনি আসার আগে এখানে যেন কাজই হত না কিছু।

হাল্কা বিস্ময়ে ধীরাপদ চিঠি দুটোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। মামুলী প্রশংসার চিঠি দু'-পাঁচ লাইন করে। নানা জায়গা থেকে এ-রকম ভালো-মন্দ চিঠি দিনে এক-আধ ডজন এসে থাকে। তা ছাড়া এই চিঠির প্রশংসাও আলাদা করে ধীরাপদরই প্রাপ্য নয়।···চিঠি দুটো উপলক্ষ মাত্র, চিঠি হাতের কাছে না থাকলেও এই আগমন ঘটতই। ধীরাপদ হেসে তাকালো, বসুন—

বসব না, বেরুব এক্ষুনি—খুশি তো?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, তারপর মন্তব্য যোগ করল।—এই চিঠির জন্যে নয়, আপনাকে খুশি দেখে।

উৎফুল্ল বিস্ময়, আমাকে আবার অখুশি দেখলেন কবে?

ধীরাপদর মনে হল কিছু একটা আনন্দের উৎসে নাড়া পড়েছে। সেই প্রসন্নতার উঁকিঝুঁকি। বিগত ক'টা দিনের বিরূপতা সত্ত্বেও এখন এ-ঘরে একবার আসার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। এসেছে দেখতে। দর্পণে দেখতে।

ওকে দেখার ভিতর দিয়ে আর কাউকে দেখার তুষ্টি।

জবাব শুনবে বলেই যেন টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধীরাপদ যা খুশি বলতে পারে এখন, একটুও বিঁধবে না।

কিন্তু কিছু বলার আগে সিতাংশু মিত্রকে দরজার এধারে দেখা গেল।

লাবণ্য সরকার সোজা হয়ে দাঁড়াল।—রেডি? চলুন। হাসতে হাসতে বলে গেল, খুশিতত্ত্ব নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

চেয়ার ছেড়ে পায়ে পায়ে ধীরাপদ জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। নিচটা দেখা যায়। গাড়ি-বারান্দা থেকে সিতাংশু মিত্রর সাদা গাড়ি বেরুলো। সিতাংশু চালকের আসনে, পাশে লাবণ্য। সেই প্রথম দিনের যোগাযোগে এই গাড়িতে দুজনকে একসঙ্গে দেখেছিল। ঠিক এক রকম নয়। আজ লাবণ্য হাসছে। ঘাড় ফিরিয়ে যে-দিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে চীফ কেমিষ্টের অবস্থান। দোতলার জানালা থেকে ও-দিকটা চোখে পড়ে না।

অমিত ঘোষ কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? দেখছে?

বোধহয় না।

কিন্তু লাবণ্য সকৌতুকে ঘাড় ফিরিয়ে আছে। চাইছে, দেখুক।

[ক্রমশঃ।

বাংলার তাঁতশিল্প

বাংলার তাঁত থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে যথাসম্ভব একান্তভাবেই সেই কাপড়ই বাঙালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা। উপবাসক্লিষ্ট বাঙালীর অন্নপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে অনায়াসে বইতে থাকে তবে মোটের উপর তাতে সমস্ত ভারতেরই ক্ষতি।

বাঙালীর ঔদাসীন্যকে ধাক্কা দিয়ে দূর করা চাই। কলিকাতার ও অন্যান্য প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যালিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ নিয়ত প্রচার করা এবং বাঙালী যুবকদের মনে সেই উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ করে তারা বাঙালীর হাতের ও কলের জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

—রবীন্দ্রনাথ
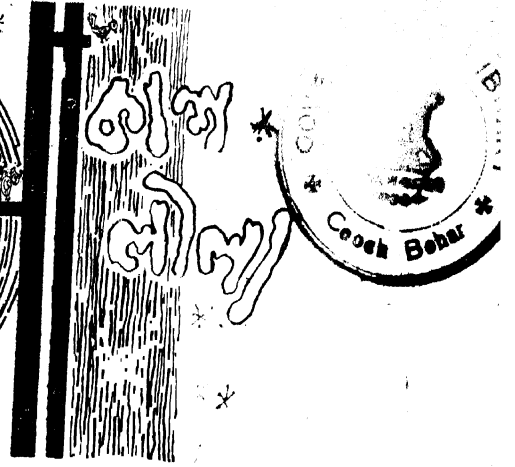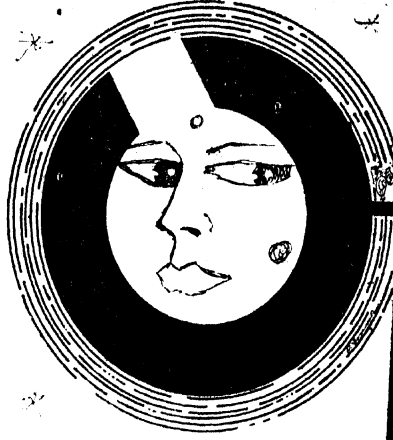
শ্রীমঞ্জুলিকা দাশ

তুমি আমায় চিনতে পারবে না সুপ্রিয়! বিস্মিত হয়ে ভাববে,—হাজার সমুদ্রের স্তব্ধতা কেমন করে মরা-নদীতে এসে ঠেকেছে! অসহায় এক ভীরু-জিজ্ঞাসা ছোপধরা ছিপির মত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে! এমন একদিন ছিল যখন দুর্দান্ত হৃদয়াবেগ আমাকে অপ্রত্যাশিত ঠকানো ঠকিয়ে গিয়েছিলো, যার প্রথম ধাক্কায় মনে হয়েছিল এর তুল্য আঘাত বুঝি পৃথিবীর কোন বড় বেদনাতেই নেই। যে হৃদয়াবেগ একদিন আমায় মৃত্যুতুল্য বঞ্চনা দিয়েছিলো সেই আবেগের অভাবই আমাকে আজ হৃদয়হীন করে তুলেছে—যার ফলে আমি এমন বুদ্ধিমতী আর অনেক পরিমাণে দূরদর্শী হয়ে উঠেছি। রাতারাতি এমন পরিবর্তন অবিশ্বাস্য মনে হলেও পুরোপুরি বিশ্বাস্য! দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাতে স্নিগ্ধ অনুভূতিতে ধীরে-সুস্থে একটা প্রীতি রূপ নিচ্ছিলো আমাদের সৌহার্দ্যের মধ্যে। বাইরের আদান-প্রদানটা তখনও অনেক দূরে দূরেই ছিল—বিনিময়টা তখন পর্যন্ত মনের সীমাতেই বদ্ধ ছিল বলা যেতে পারে। চোখের আলোকেই দুজনকে আমরা অন্তরে চিনে নিয়েছিলাম। দেখা পাওয়ার জগতে দুজনে দুজনার কাছে দুর্লভ ছিলাম না বললেই চলে। তাই চোখে হারাবার কথা কোন মতেই ভাবতে পারতাম না,—ভাবতাম না। সত্যি কথা বলতে কি,—বিচ্ছেদের ভাবনা তখন পর্যন্ত মনকে বিভ্রান্ত করেনি। মেণ্টাল ইলেকট্রিসিটি বলে একটা কথা আছে—তুমি বিশ্বাস কর কি না জানি না। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি,—যখন বিচ্ছেদের কথা ভাবতাম না তখনও করতাম,—আজ বিচ্ছেদের দিনে সেই একই কথা ভাবি। বিশ্বাস করে আর কিছু না হোক—মনে মনে অগাধ তৃপ্তি পাই। মনকে নির্বিচারী করি, আর একমনে স্মৃতি রোমন্থন করি।

মনে হয়—মেণ্টাল ইলেকট্রিসিটি বলে যদি কোন শক্তি থাকে এবং সেই শক্তির অস্তিত্বে যদি আমি সম্পূর্ণ আস্থাবান হই, তাহলে আমি যে মুহূর্তে তোমার কথা ভাবছি কিম্বা তুমি আমার কথা ভাবছ—আর ভাবছ বলেই আমিও এমন আকুল ভাবে তোমাকে ডাকছি। দুজনের অগোচরে দুজনের গহনে সেই মেণ্টাল ইলেকট্রিসিটিটা সরাসরি কাজ করে যায়। তুমি হয়ত মনে মনে হাসতে পার। কিন্তু তুমি কি এ কথা বিশ্বাস করো না, যখন একজনের শুধু কোন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় মনের ভেতরে কেমন এক ধরণের এলোপাথাড়ি হাহাকার জেগে উঠলো? তখন সেই অদৃশ্য বৈদ্যুতিক টানটা দুজনের মনের ভেতরে একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। তাই যদি না হবে, তাহলে মাঝে মাঝে এমন কেন হয়? ধরো ক'দিন থেকে বিশেষ কারও জন্য মন কেমন করছে, ঠিক ক'দিন বাদেই সে নিজে এসে দেখা দিয়ে গেল কিম্বা তার ভারাক্রান্ত মনের নিদর্শনস্বরূপ একটা চিঠি এসে উপস্থিত হল তোমার কাছে।

প্রথম প্রথম এই বিশ্বাস এবং সান্ত্বনার জোরেই সকাল, বিকেল, সন্ধ্যারাত্রি স্মৃতিপূজা করেই কেটে যেত মর্মভেদী যন্ত্রণার করুণ প্রহর! তুমি যেমন ভাবে আমায় অবহেলা করেছিলে তেমনি দয়াহীন নির্মমতায় আমি তোমার স্মৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখলাম। কিন্তু জীবনের বেদনা ভোলা সম্ভব হলেও স্মৃতির বেদনা ভোলা একান্তই অসম্ভব বুঝি বা! স্মৃতিপূজা করে অহর্নিশি জীবনের পথে আমরণ চলা, এমন অর্থহীন শপথে জীবন চলে না। এমন অনিশ্চিত উত্তরকাল নিয়ে জীবন অন্ধকার করে বসে থাকা যায় না। এমন সাহচর্যহীন জীবন নীরস, ভয়াল আর বিষাক্ত। ক্রমশঃ বুঝতে শিখলাম—নিষ্ঠা আর ভালবাসা, এ দুটো শব্দ পরস্পর মনঃপূত নয়। ভালবাসলেই যে নিষ্ঠা দিয়ে ভালবাসতে হবে—এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। আর মনোনীত জনকেই যে জীবনে জীবন যোগ করে পেতে হবে এমন কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই। আর মধুস্মৃতি চিরকাল মধুময় হয়ে থাকে না। যে স্মৃতির ভারে জীবনটাকে একদিন হাল্কা পাখির পাখার মত লঘু বলে মনে হয়, সেই স্মৃতিই সমস্ত প্রত্যাশাকে দুর্বহ করে তোলে। সেই প্রথম তোমার সঙ্গে আমার অদর্শনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুপ্রিয়! সেই রোগশয্যা অপারেশনের সাদা টেবিল, চকচকে ধারালো ছুরি, গরম জল, ব্যাণ্ডেজের গজ-কাপড়, তুলো রাশি রাশি! অপারেশনের টেবিলে শুইয়ে দেওয়ার আগে আমার বুকের সমস্ত হাড়গুলো কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল একটা উত্তেজিত আশঙ্কা। আমাকে

অ্যানালসিয়া করে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার আগে ডাক্তার আর নার্সদের সান্তনাদাত্রী চোখ দুটোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছিলাম। কতক্ষণ জ্ঞানহারা হয়ে সাদা টেবিলটার ওপর শুয়েছিলাম মনে ছিলো না—জ্ঞান হতেই দেখি, হাসপাতালের বেডে বুকে আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজবাঁধা হয়ে শুয়ে আছি। জ্ঞান হারাবার আগে নির্ভয় হবার জন্য মনে মনে শুধু তোমাকে স্মরণ করেছিলাম। আর মস্ত-বড় হলঘরটায় রোগীদের সঙ্গে পাশাপাশি বেডে শুয়ে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার কথা মনে করেছিলাম সুপ্রিয়! অদূরের কোন্ এক রোগী বলছে: এ নতুন পেসেন্ট বুঝি?—

—হ্যাঁ। অপারেশন হ'লো!

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। নার্সের গোটা অ্যাপরনটা একেবারে রক্তে ভিজে থই-থই করছিলো। ভয়ে আমি শিউরে উঠে অতিকষ্টে ঘুমজড়ানো চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। চোখ টেনে মেলা যায় না, দু' চোখে যেন রাজ্যের ঘুম এসে জড়ো হয়েছে। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ! সেখানে যেন গ্রীষ্মের পিপাসা এসে ভিড় জমিয়েছে। সেই জ্ঞানহারা নিশি—ঘুমের থেকে প্রথম জেগে উঠে তোমার কথাই মনে হয়েছিল সুপ্রিয়! তোমাকেই বার বার দেখতে ইচ্ছা হয়েছিলো, কেন যেন মনে হয়েছিল এই আমার শেষ শয্যা। আমি যেন মুমূর্ষু! আর তুমি আমার শিয়রে এসে শেষ দেখা দিয়ে যাবে। কপালে শীতল হাতের স্পর্শ রাখবে। দু' চোখের স্নিগ্ধ আলোতে সমস্ত কালিমা মুছে দেবে। ব্যাণ্ডেজটা এমন শক্তভাবে বাঁধা আছে যে, এপাশ ওপাশ করতে কষ্ট হয়, এপাশ ওপাশ করা যায় না। কষ্টের আরও একটা কারণ ভালো করে লক্ষ্য করলাম, মাথায় বালিশ নেই। ক্ষীণ স্বরে আবেদন জানালাম: 'একটা বালিশ।'

একজন শ্বেতবসনা নার্স আমার নাড়ী ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বোঝা গেল, আমার জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাড়ী দেখার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। সে আমার হাতটা আস্তে করে ছেড়ে দিল। স্নিগ্ধ স্বরে বললো: অপারেশনের পর এমনি ভাবেই শুয়ে থাকা নিয়ম।

হাসপাতালের এই রীতির ওপর আমি আর দ্বিতীয় অভিযোগ করলাম না। তোমার স্মৃতি আমার সারা অস্তিত্বে তখন সর সর করে বেড়াচ্ছিল সুপ্রিয়! জ্ঞান ফিরে পেলেও কেমন ঘুম-ঘুম নেশা নিবিড় করে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল—যেন কত কাল ঘুমোই না। স্নায়ুগুলো দুর্বল বলেই নাকি চোখের পাতা দুটো আপনা থেকেই বুজে বুজে আসছিল। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ রোগীদের বেডে এসে লুটিয়ে পড়ছে! আন্দাজ করলাম—তন্দ্রার অতল হতে প্রথম জেগে উঠে মনে হয়েছিল—এমন অলক্ষ্য অবসাদের ভারে কে আমাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে! মনে হয়েছিল,—আমার দু'চোখে কে যেন দুর্বহ পাথর বেঁধে রন্ধ্রহীন অন্ধকারে নির্বাসন দিয়েছে। মনে হয়েছিল,—দু'চোখের পাতা যখন আপনা হতে ভারী হয়ে আসছে তখন সুনিশ্চিত মরণ ছাড়া এমন অন্ধকার নীরব রাজ্য পৃথিবীর কোথায় থাকতে পারে! মৃত্যুর মত এমন মহাসুখ মৃত্যু ছাড়া আর কি? এ মরণের আগে চিরতরে ঘুম পাড়াবার জন্য কে আমাকে কোলে নিয়ে মহাদরে দোল দিয়েছিল? তার পরে সব দোল যেন নিঃসাড় খুনের রাজ্যে এসে নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল। অপারেশনের টেবিলের ওপর কতক্ষণ ধরে মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল,—কিছুই টের পাইনি। মহাঘুমের পর আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণের মাঝে চমকে গিয়েছিলাম। কানের পাশে সেই ভয়াল অর্দ্ধস্ফুট কথা! নার্সের গোটা অ্যাপরণটা একেবারে রক্তে ভিজে থই-থই করছিল।

ভয়ে চমকে গেলেও আশ্বস্ত হয়েছিলাম: যাক্ অপারেশনটা তাহলে চুকে গেছে। আর ঐ সাদা ভয়াল টেবিলটার উপরে তো শুয়ে থাকতে হবে না? নার্স তাহলে এতক্ষণ ধরে আমার জ্ঞান ফিরে আসার জন্য ক্ষয়িষ্ণু দীপশিখার মত দাঁড়িয়েছিল শিয়রে এসে। তন্দ্রার ঘোরের সঙ্গে একটা অতিসাধের স্বপ্ন ছেয়ে রয়েছিল। মনে আছে সুপ্রিয়! পঞ্চাশ-ষাট লাখ পেনিসিলিন—জর্জরিত হাতে, কম্পিত বক্ররেখায় তোমাকে কাতর মিনতি করে লিখেছিলাম: আমার এখন মানসিক এবং শারীরিক বিপর্যয়ের দিনে তুমি নিশ্চয় আসবে!···জীবনের অস্থির মুহূর্তে এমন অনেক প্রগলভ অস্থিরতা প্রকাশ করেছিলাম যা অর্থহীন এলোমেলো প্রলাপের তুল্য। অনেক দিন ধরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি,—ডাক্তার আমাকে কানের কোঁকুনি লাগাতে নিষেধ করেছিল—তবু অনেক কষ্ট করে ডাক্তারের নিষেধ ডিঙিয়েই চুরি করে ঠিক কলুটোলার মোড়ে গিয়ে নেমে পড়েছিলাম। একটু জ্বর হয়েছিল! ঝিরি-ঝিরি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে য়ুনিভার্সিটির করিডোরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তুমি ভীরু পাখির মত ভয়ে ভয়ে বলেছিলে: ইস্ ভিজে গিয়েছ যে দেখছি! বলে পকেট থেকে রুমালটা বের করে সোহাগভরে আমার খোলামেলা ভিজে চুল মুছিয়ে দিয়েছিলে। আমি নীরব থেকে তোমার সমস্ত আদর হৃদয়ভরে নিয়েছিলাম। তুমি ঈষৎ ভর্ৎসনা করে বললে: ভিজে না এলে চলত না? বাসে চলা-ফেরা করা ডাক্তারের বারণ, তবু আমি তোমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম: তবু আসতে হলো। কত দিন আমাদের দেখা হয় না,—আরও কত দিন হবে না। জানো, বিশে আগষ্ট আমার অপারেশন—খুব ভয় করছে। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হবে না।

তুমি ভিজে চুলের স্পর্শ নিতে নিতে বলেছিলে: বনশ্রী, অত ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও।

তুমি নিজ হাতে লিখে দিয়েছিলে, বলেছিলে: দুদিনে কিন্তু চিঠি যায়—দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর করিডোরটা নির্জ্জন এবং নিভৃত ছিল। তাই বুঝি আমরা দুজনে অকুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি স্বভাবতই মিতভাষী এবং বেশ কিছুটা সংযত প্রকৃতির ছেলে ছিলে! সেদিন প্রাণ-মন খুলবার ইচ্ছা থাকলেও আমি ভেতরে ভেতরে কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত হয়েছি। সেদিন হয়ত দুজনেই জানতাম, ভালবাসাই নীরব স্বীকৃতি! চোখের নীরব ভাষাই মৌন অন্তরের নিবেদন! সেজন্যই কি আমরা দুজনে দুজনের দিকে নীরব হয়ে তাকিয়েছিলাম? তোমার বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলার কোন এক নিরিবিলি গ্রামের আশে-পাশে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: নম্বর নেই তোমার বাড়ীর? শুধু তোমার নাম দিলেই চলবে, অবধায়ক?

তুমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলে। আমরা দুজনেই কি তখন খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম? মনে আছে সুপ্রিয়!
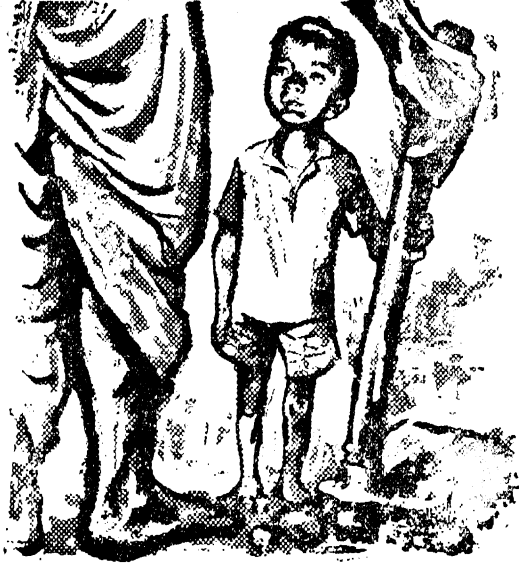
তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইস্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিস্ময়, আরও বিস্ময় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু···

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্ত্তব্য আর কর্ম্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কর্ম্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টাএগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও ... দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR.3-X52 BG

কিছুক্ষণ বাদেই তুমি দূরে সরে গিয়েছিলে। আমি দূরে এসেছিলাম। কিন্তু নিবিড় এবং গভীর চোখ দুটো সকাতরে তুলে দুজনে দুজনের দিকে জীবনের কি এক রহস্যময় অনির্বচনীয় জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরেছিলাম! সে চোখের সঙ্গে তুলনা করি, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই বুঝি বা! সেই ইশারাময় চোখ দুটোর সুগভীর ব্যঞ্জনা কতদিন ধরে দেখি না সুপ্রিয়! তারই অন্বেষণে আমার নয়নতারা অনেক দূরে তোমার নয়নতারা দেশে চলে যাচ্ছে। অমনি বিশ্বাসী এবং নির্ভরশীল চোখ দুটিকে সারা জীবন ধরে খুঁজলেও হয়ত পাওয়া যাবে না। সে সব কথা এখন থাক্। মুমূর্ষু অবসাদে আমি এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। বিকেল-বেলাকার গতায়ু রৌদ্রের রেখা এঁকে-বেঁকে জানালা দিয়ে গলে গলে পড়ছে। আমার পাশে যে রোগীটি শুয়ে আছে পৃথিবীতে তার আলো দেখবার মেয়াদ বড় জোর আজকের এই বিকেল পর্যন্ত। তার কাতরানি আমার বুকের যন্ত্রণাকে আরও দুর্বিসহ করে তুললো। গলাটা অসহ্য রকমের তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে গিয়েছে। আমি অর্ধস্ফুট স্বরে বললাম: জল। নার্স মধুর হেসে বললো: অপারেশনের পর তো জল দিতে নেই? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবার মত অবস্থা আমার, তাই বলতে হল: গলা শুকিয়ে কাঠ-কাঠ। সইতে পারছিনে।

নার্স মৃদুস্বরে বললো: আচ্ছা খবর পাঠাচ্ছি। যদি গরম দুধ মেলে। হা হতোঽস্মি। এ যেন গভীর বনের অন্ধকারে একটি মাত্র জোনাকী আলো জ্বালাবার আশা দেওয়া। জল পেলাম না। কিন্তু অভিমানে, বেদনায় আমার চোখে জল আসার উপক্রম হল। আর কিছু না হোক এ সময়ে অন্ততপক্ষে তুমি যদি শিয়রের কাছে এসে আমার ভীরু, অস্থির হাত দুটোকে তোমার শীতল হাতের বরাভয়ে তুলে নিতে। কিছুক্ষণ বাদেই নার্স আমার মুখের কাছে দুধভরা ফিডিং কাপটা এগিয়ে দিল। আমি আস্তে আস্তে তৃপ্তি ভরে দুধটুকু চুমুক দিলাম। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে অভিযোগ করলাম: আমার ব্যাণ্ডেজটা দারুণ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। কষ্ট হচ্ছে।

টাইট করে বাঁধা না হ'লে যে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিমির হ'ল মন। মুহূর্তে মাথাটা কেমন ঘুরপাক খেলো। কেমন ভয়-ভয় লাগলো। নার্সের অ্যাপরনটা রক্তে ভিজে থই-থই করছে। এত রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে ছুটছিলো। মূর্ছিত শরীরটার ওপর ওরা যথেচ্ছা মত ছুরি চালিয়েছে বুঝি? আধতন্দ্রা আর আধ-জাগরণের স্পর্শে যখন দোল খাচ্ছিলাম তখন বুজে-আসা চোখের পাতা দুটি অতি কষ্টে ঠেলে খুলে তাকিয়ে দেখছিলাম আমার ক্ষীণ হাতের মণিবন্ধে কে যেন স্নেহমাখা দুটি হাত ধরে আছে। তখন স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল, বুঝি বা তুমি এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে থেকে সোহাগ ভরে হাত ধরেছ। বিকেলের আলো নিবে যাওয়ার পর নার্স চলে গেল। হা পিত্যেশে তাকিয়ে আছি, একে একে সব রোগীদের ভিজিটাররাই এসে গেল।

শুধু মাত্র আমার মামার বাড়ীর কেউ এল না—রাঙামামী, দিদিমা, দাদু, রাঙামামা কেউ না! এমন কি তুমিও না! অভিমানে নীথর হয়েছিল মনের হ্রদটা! পাশের বেডের বউটির সঙ্গে মনের সুখে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলাম। দেখতে দেখতে বউটি কোন এক সময়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো। পরিপাটি করে চুল বাঁধলো, হিমানী মাখলো মুখে। চিরুনীতে সিঁদুর মাখিয়ে নিখুঁত ভাবে সীঁথিতে সিঁদুর পরে নিলো। কৌটো খুলে এক খিলি পান পুরে দিলো মুখে। আমাকে অস্থির আর কাতর হতে দেখে বললো: তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন চঞ্চল হয়ে পড়েছ আর আমি হাসপাতালের এই একই বিছানায় দু'বছর একই ভাবে শুয়ে আছি!

বৌটির ধৈর্যকে মনে মনে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করতে করতে কিছু বলতে যাব—এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। বৌটি পান-খাওয়া ঠোঁটে লাজহাসি হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল। বোঝা গেল, ভদ্রলোকটি কে! আমি নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। রাঙামামী এল না, দাদু, দিদিমা কেউ না! দিনের আলো নিবে এল দেখতে দেখতে। একটা পরিচিত ছায়াও আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল না! বিষণ্ণ অনুভূতির মত পরিচিত সন্ধ্যার নাম নিয়ে অন্ধকার নেমে এল বড় হলঘরটায়। অভিমানে নীথর হয়ে রইলো মনের ভেতরটা। তুমিই শুধু এলে না। আলো জ্বলে উঠলো অন্ধকার ঘরে। বৌটির লাল টুকটুকে ঠোঁটের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভেতরে ভীরু এবং লোভী বাসনাটা উপছে উপছে পড়ছে। ভদ্রলোক বৌটির হাতে বাসন্তী রঙের রেশমীচুড়ি পরিয়ে দিল। সোহাগস্পর্শে বৌটির সুখী নরম ইচ্ছাটুকু গলে গলে পড়তে লাগলো। তার রঞ্জিত ঠোঁট অনুরক্ত আবেগে উথলে উঠতে চাইল।

আমি মরমী অভিমানে মরে যেতে লাগলাম। সুপ্রিয়! আমার পাশের বেডের সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটি তার বাঞ্ছিতার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন কথাবার্তা বলছিল তার কিছুই কানে আসছে না, কিন্তু প্রাণে এসে ঝঙ্কার তুলছে। তার মধুর আবেশ মনে-প্রাণে যতই নিবিড় হয়ে উঠছে ততই তোমার ওপর তীব্র অভিমানবোধটা জ্যামিতিক হারে বেড়ে উঠছে। মাইনর অপারেশন বলে তার পরদিনই হাসপাতাল থেকে আমি যথারীতি ছাড়া গেলাম। ঘুম-ঘুম অবসাদের ভেতরে ঝিমিয়ে থেকে মনে হ'ল,—একেবারে মহাঘুম এলেই যেন ভালো হ'ত। তোমার ওপর শোধ নেওয়া যেত ভালো করে। চ্যাংদোলা করে সেই চারতলা হ'তে একতলায় নামিয়ে আনা হ'ল আমাকে। ব্যাণ্ডেজটার এমন শক্ত বাঁধুনি যে—শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। রাণীশংকর লেনে ফিরে এসেও হাসপাতালের সঙ্গে কোন যোগই ঘুচে যায় নি, একদিন অন্তর একদিন ড্রেস করবার জন্য। রাণীশংকর লেন থেকে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন এমন কিছু দূরে নয়, সেজন্য এ পথটুকু হেঁটেই চলে যেতাম। এমনি এক সকালবেলায় আসা-যাওয়ার পথের ধারে উত্তেজিত ব্লিডিং ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়ে দিয়েছিল। সে সব কথা এখন থাক্—সুপ্রিয়! পথচারী বাসগুলোর দিকে উৎসুক আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে ছিলাম। য়ুনিভার্সিটির সময় হয়েছে বুঝি বা। টু-বি বাসের জানালা দিয়ে হঠাৎ যদি সেই চেনা চোখ দুটির দেখা মেলে! এক মঙ্গলবারের সকালে চিত্তরঞ্জন থেকে পথে টু-বি বাসের দিকে অপেক্ষমান যাত্রীর মত উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মঙ্গলবারের পরের দিন বুধবার। আর বুধবারের পরের দিন বৃহস্পতিবার। বুধবারের রাতে চুপি চুপি ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে অভিমান অভিযোগ মিশিয়ে অর্থহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেললাম। তার পরদিন ভীরু ভালবাসার পবিত্রতাকে বুকে করে সেই রাণীশংকর লেন থেকে ভবানীপুরের পোষ্ট অফিসে নীলখাম

পোষ্ট করেছিলাম। কম্পিত বুকে নগ্ন পায়ে অনেকখানি পথ হেঁটে এলাম। আকাশের রং নীল বলে হয়ত ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোমার নীল খামের প্রত্যাশা করতাম। এক [দুপুরবেলায় শীতলপাটিতে শুয়ে শুয়ে রাঙামামীর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে দুপুরের রেডিও-প্রোগ্রাম শুনছিলাম, এমন সময় দাদু একটা চিঠি এনে দিলেন আমার হাতে। চিঠিটা আমার হাতে দিতে না দিতেই দিদিমণি শুধালেন : কার চিঠি ? ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম অর্থাৎ এ চিঠি তোমার। একটা মিথ্যে মনগড়া কথা বলে দিলাম : সম্পাদকের চিঠি। লেখা ফেরৎ এসেছে। দাদু দিদিমণি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ফিরে গেলেন। আমি আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু রাঙামামী দু'চোখে সন্দেহ ভরে বললো : কার চিঠি ?

বললাম : বলেছি তো সম্পাদকের।

রাঙামামী দু'চোখে সন্দেহের বাঁধন ঘনীভূত করে বললো : উঁহু তা নয়। মন বলছে অন্যরকম !

রাঙামামী খুব কমবয়সী। তার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা। অতএব কিছুক্ষণ ধরে আমাদের দুজনের মধ্যে চিঠি নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রাঙামামী যেন শিকারী। আমি এমনি ভাবে ভীরু হরিণীর মত তার আক্রমণ বাঁচিয়ে তোমার চিঠিখানি পড়ে ফেললাম। নিমেষেই সমস্ত প্রত্যাশা আকাশকুসুম হয়ে গেল। আমার হাতের কাছে রাঙামামীর শিকারী হাত দুটো নেমে আসতে দেখে চমকে গেলাম। কুটিপাটি করে ছিঁড়ে ফেললাম নীল খামে-পোরা অভিসাধের ইশারাটুকু ! এই প্রথম বুঝলাম—কী কঠিন আর কী কঠোর তুমি ! ব্যাণ্ডেজের নীচে যে নরম বাসনাটুকু নীরব প্রহরী হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে সেখানে অজস্র জিজ্ঞাসা আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় টনটনিয়ে উঠলো। সে গোপন ব্যথার চকিত আভাসটুকু বুঝতে পারলো না রাঙামামী। সে রাঙা অনুরাগটুকু ঐকান্তিক আগ্রহে ফুটি ফুটি করেও ফুটে উঠতে পারলো না,—তুমি সে বেদনার পরিচয় পাবে কেমন করে ? অপারেশনের ভয়াল টেবিলে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে থাকবার মত মুমূর্ষু অবস্থা ঘনিয়ে এল বলে মনে হয় ! হৃদয়ের দাক্ষিণ্য তোমার পাইনি, এই বুঝি দক্ষিণের খোলা দুয়োর দিয়ে বিছানার নীলচাদর যেখানে রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করছে সেখানে ফিরে এসে দারুণ হতাশায় শুয়ে পড়লাম।

যেখান দিয়ে জানালা দেখা যায়—আর জানালা দিয়ে পথচারী বাসের ইসারা। পথ আর অগণিত পথিক ! উৎসুক যাত্রীর চোখের আলোকে কেবল অন্ধকার। সূর্য সেদিন বিকেলে শুধু গাঢ় অন্ধকার, সন্ধ্যেরাতে ঘরে শুধু প্রদীপ জ্বালা ! বাইরে নিকষ-কালো রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরী। আজ তুমি যে আসতেছিলে আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলে উঠবে সেই নিশি-যন্ত্রণার নিভৃতি প্রদীপ ! রাঙামামী এসে ডাকলো। কপালে শাঁখাপরা ঠাণ্ডা হাত ছোঁয়াল ! শঙ্খের সুর বেজে উঠল দিদিমণির পুজোর ঘরে। আমার মনে হ'ল,—মহাজীবনের খেয়া পেরোতে হবে। দীর্ঘ নদী। ক্লান্ত মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে। খেয়া আপন মনে ভাসতে ভাসতে ডুববে বুঝি। গাঢ় তমিস্রার থেকে মহাসমুদ্রের ডাক এসে পৌছল। বুকের ভেতর হাঁসফাঁসকরা অসহ্য যন্ত্রণা। শত নার্সের সহস্র অ্যাপ্রণ ভিজিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা বুঝি ছিঁড়ে গেল ! রাঙামামী বললো : ঘুমিয়েছ কেন বনশ্রী ?

আর্তনাদের ভেতর হতে চমকে উঠে বললাম : আমি ঘুমাইনি রাঙামামী, আমি মরে আছি।

রাঙামামী কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললো : অসুখ কি কারও হয় না ? না, অসুখ করলেই মরতে হবে ?

মনে মনে বললাম : তুমি জান না রাঙামামী, আমি বেঁচেও মরে আছি—আমার যন্ত্রণা জীবন্মৃত-যন্ত্রণা। বেঁচেও আমি মরে আছি, মরেও আমি বাঁচিনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। বললাম : আমি মরে যাব রাঙামামী।

রাঙামামীর সস্নেহ ভর্ৎসনা দেওয়ালের গায়ে ভেঙ্গে পড়লো : চলো। মুখ ধোবে এস। তারপর ব্যালকনি ধরে দাঁড়াই। আলো আর লোকজন দেখি।

আমাকে আরও বেশী করে ফোঁপাতে দেখে রাঙামামী গলায় হাত দিয়ে ফের বললো : কেঁদে কেঁদে আবার টেম্পারেচার ওঠাবে দেখছি।

আমি অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলাম : পৃথিবীর সব আলোই আজ আমার কাছে অন্ধকার, জ্বর হোক্—থার্মোমিটারের সব চাইতে উঁচু পর্দায় যত ডিগ্রী খুশী জ্বর উঠুক না কেন, তাতে ক্ষতি কিসের ? রাঙামামী আমার চোখে-মুখে জল দিয়ে দিল। সেই চিরকালের সান্ধ্য-প্রহর যেমন করে লোকজন, আলো আর রাজপথ দেখতাম ঠিক তেমনি করে রাঙামামীর পাশে এসে দ্রষ্টার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আত্মধিক্কারে আর লজ্জার বেদনায় একজন যে তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরমে মরে যেতে লাগলো, সেকথা রাঙামামী জানতেও পারলো না। তবুও আমার নিশ্চিত ভাগ্যের অনুকূলে তোমার চিঠিটা তার চোখে পড়েনি সুপ্রিয় ! সত্যিই আমি নির্বোধ, আবেগের টানে ভেসে চলা, আমার ভালবাসা বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। অতখানি উচ্ছ্বলতা হয়ত আমার প্রকাশ করা উচিত ছিল না। কোন কড়া শাসকের চোখে কি আমার চিঠিখানি ধরা পড়েছিল সুপ্রিয় ? তবু বলব, বিশ্বাস আর ব্যক্তিত্ব কি বিজয়ী হয়ে উঠতে পারল না সবার ওপর ?

রাঙামামী বললো : এত চুপচাপ যে বনশ্রী ?

আমি মনে মনে বললাম, আমি আর দু'দিন বাদে শ্রীহীন হব বলে—আমার নামের পাশে ঈশ্বরী লেখা হবে বলে। সুপ্রিয় আমাকে নীরব থাকতে বলেছে বলে। আমি মৃত্যুর মত চিরনীরব থাকব। আমি চির নীরবতার দেশে গিয়ে শীতল অন্ধকার হয়ে থাকব। অশ্রুহীন অভিমানে চোখের নিষ্কম্প তারা দুটো স্থির হয়ে রইলো, অশ্রু ঝরলো না। আমি সে রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জান সুপ্রিয় ! আমি মরে গিয়েছি। হাসপাতালের অপারেশনের টেবিলে কেউ যেন আমাকে শুইয়ে দিয়েছে। ছুরি, পেঁজা তুলো, এমন কি গরম জল পর্যন্ত রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। আর আমি মুখ থবড়ে মরে আছি সে রক্তের মধ্যে। আমি আকাশলীনা হতে চলেছি। হাসপাতালের সেই চারতলার ঘর থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে আকাশচুম্বী প্রাসাদের চেয়ে অনেক ওপরতলার আকাশে আমাকে মিশিয়ে দিয়েছে। আমি মেঘ হয়ে মিশে গিয়েছি ! রাত্রি ভোর হ'লে খাটিয়াতে করে আমাকে সবাই শ্মশানে নিয়ে যাবে। রাঙামামী কাঁদবে, রাঙামামা, দাদু, দিদিমা সবাই। হয়ত তোমার শ্মশান-বৈরাগ্য জাগতে পারে আমি শ্মশানে চলে গেলে। তুমি নির্মম, কঠোর—তুমি শুধু কাঁদবে না সুপ্রিয় !
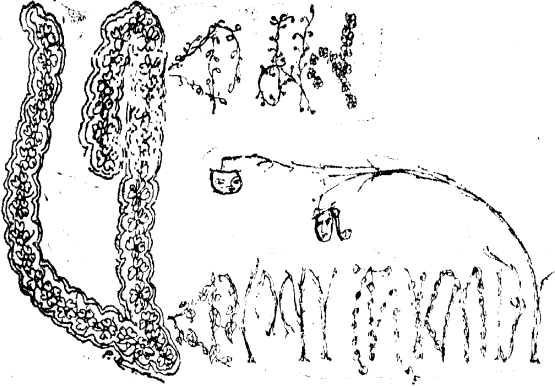
আর্য দেব

প্রায় সবই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। হোল্ড-অল, সুটকেশ, বেতের ঝাঁপি সমস্তই জড়ো করা হয়েছিল দরজার পাশে। আর ঘরের মধ্যে প্রজাপতি-রঙের শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছিল। সবিতার কেমন ছুটি-ছুটি হাল্কা-হাল্কা মনে হচ্ছিল সব-কিছু। ওর গুছোনো আর শেষ হচ্ছিল না—কী নিয়ে যাবে, আর কী নেবে না তার ফিরিস্তি ও যেন কিছুতেই তৈরি করতে পারছিল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি বেজে উঠলো : টেলিগ্রাম. টেলিগ্রাম!

বিভাস তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে টেলিগ্রামখানা নিয়ে নিল ডাকপিয়নের হাত থেকে। তারপর ঘরে এসে ফ্যাঁস করে খামটা ছিঁড়েই দ্রুত পড়ে ফেলে সেটা বাড়িয়ে দিল সবিতার দিকে : নাও, ছুটি নাকচ হয়ে গেছে—ছুটি দেবে না এবার, যদি কোন গোলমাল হয়··· বলেই হো-হো করে হেসে উঠলো বিভাস। আর সবিতার মনে হল শরতের রোদটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সেই প্রজাপতি রঙটা যেন একটা কালো মেঘে ঢেকে গেছে।

বিভাস ততক্ষণে হোল্ড-অলটা খুলে একটা বালিস আর চাদর বার করে শুয়ে পড়েছে—ওর মুখে লেগে আছে মিটিমিটি কৌতুকের হাসি! সবিতা চেঁচিয়ে উঠলো : আবার হাসছো! বেশ হয়েছে—যেমন কাজের মানুষ তুমি, ঠিক হয়েছে—নাও, ছুটির দিনগুলোয় যত পারো কাজ করো। আর অফিসও বটে বাবা—যে যত কাজ করবে তার ঘাড়েই তত চাপাবে, তার বেলাতেই ছুটি নেই, ছুটি দিলে চলবে কী করে—

বিভাস বললো : তুমি ভুল করছো—ছুটি বন্ধ মানে শুধুমাত্র হেডকোয়ার্টার্সে থাকো। যদি গোলমাল কিছু হয় অর্থাৎ যদি কোন কাজ আসে তাহলেই কাজ কোরো, তা না হলে দরজা বন্ধ করে ঘুমোও। কিন্তু শোনো, তুমি যাও; তোমার বাবা-মাকে লিখে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ভাববেন—তোমাকে পাঠিয়ে দিই।

সবিতা বললো : তা হয় না—তুমি যাবে না, আমি একলা গিয়ে কী করবো! সবিতার মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। সারাবছরে পুজোর এই ক'টি দিনই মাত্র ছুটি—তা নিয়েও ছেঁড়াছেঁড়ি, কাটাকাটি। অথচ সকলেরই যে ছুটি বন্ধ হয়েছে তা নয়। এপাশে-ওপাশে চারদিকের কোয়ার্টার্সই ত ফাঁকা! ওদিকে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের বাড়িটা বন্ধ। ওপাশে ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টররাও ছুটিতে বেড়াতে গেছে। ডাক্তারবাবুর বউ-মেয়েরাও পুরী গেছে! চারদিক এখন ফাঁকা একেই ত মফঃস্বল বড় নির্জন, নির্বান্ধব—তার ওপর এই ছুটির দিনে নির্জনতা ত আরো বেড়ে গেছে—এই নির্জনতাটাই কেমন যেন চাপা-চাপা গুমোটের মত—কেমন ক্লান্তি আসে সবিতার।

চারদিক যেন ঝিমঝিম করছে। সবিতার মনে হল ওর বাড়ির সামনের ঐ ধানগাছগুলো কেমন ক্লান্তভাবে কাঁপছে, আকাশের টুকরো টুকরো মেঘও যেন কত ক্লান্ত, কত বিষণ্ণ! ওদিকে কার কোয়ার্টার্স খালি দেখে একটা গরু নির্বিবাদে ফুলগাছগুলো মুড়িয়ে খাচ্ছে—এত আস্তে আস্তে খাচ্ছে দেখে মনে হয় ও-ও খুব ক্লান্ত। আর মফঃস্বলের বাসগুলোর ত কথাই নেই—ছুটির দিন বলে যখন খুশী আসছে যখন খুশী যাচ্ছে। কোন তাড়া নেই, মন্থরগতিতে চলছে ত চলছেই।

হঠাৎ সবিতার মনটা হু-হু করে উঠলো। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করলো। ইচ্ছে করলো মাথার চুল ছিঁড়তে, মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে। এর নাম চাকরি! এই এক বছর ওর বিয়ে হয়েছে—কিন্তু একদিনের জন্যেও ও যেন বিভাসকে সম্পূর্ণরূপে পায়নি। বিভাস শুধু চাকরি করেছে, আর এই ছুটির দিনগুলোতেও সে চাকরির বিরাম নেই। অথচ বাড়িতে নিশ্চয়ই বড়দি, মেজদি এসেছে। দাদা-বৌদিরা দিন-রাত কাজের বাড়ির লোকদের মত ঘুর ঘুর করছে। তা ছাড়া পাড়ার বন্ধুরাও নিশ্চয় বাপের বাড়ি এসেছে। অমিতার ত লক্ষ্ণৌয়ে বিয়ে হয়েছিল সে এসেছে। দীপালি ত কোন এক স্কুলে মাষ্টারী করে, ও নিশ্চয় আগেই এসেছে। কারণ ওদের ছুটির ত অন্ত নেই। চৌধুরীবাড়ির নমিতা এসেছে, পুরুতবাড়ির কল্যাণীও এসেছে বোধ হয়।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সয়ে গেল সবিতার। সংসারের যথারীতি কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ও দেখতে লাগলো বিভাসকে। বিভাসকে আজ কেমন যেন অন্যরকম-অন্যরকম লাগছে। এক পাশে হেলে শুয়ে আছে। ওরও আজ যেন কাজের তাড়া নেই। অন্য অন্য দিন যেমন সব তাতেই ওর ব্যস্ততা থাকতো ওর চলায়, বলায়, দাড়ি কামানোতে, চুল আঁচড়ানোতে আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। সব লক্ষ্য করছিল সবিতা। এতদিন ত বিভাস যখন-তখন অফিসের ফাইল ঘাঁটতে বসতো ছুটির দিনেও তার ব্যতিক্রম হত না। আজ এতদিনের ছুটি হাতে পেয়ে বিভাস কিছুই করছে না, কেমন আলগা ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে আছে, উঠছে, বসছে, পায়চারী করছে। আশ্চর্য, বিভাস আবার মাসিক পত্রিকাগুলোর পাতাও উল্টোচ্ছে, ছবি দেখছে, মাঝে মাঝে একটু পড়ছে, আবার পাতা উল্টে যাচ্ছে। র‍্যাক থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে নিজের চার পাশে পাহাড় গড়ছে বিভাস। আবার মাঝে মাঝে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে বিভাস। সবিতাকে যেন এক মজার খেলায় পেয়ে বসলো। সে ভাবলো দেখতে হবে বিভাস কোন দিকে তাকাচ্ছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সবিতা বাইরের দিকে তাকালো না, বিশেষ কিছু না। দুটো ঘুঘু ওদিকের মাঠটায় বসে খুঁটে খুঁটে কী যেন খাচ্ছে, এদিক ওদিক

তাকাচ্ছে, আবার উড়ে উড়ে এদিক সেদিক বসছে—আর ওরা উড়লে লাট্টু ঘোরানোর মত কেমন বন্ বন্ শব্দ হয়। আচ্ছা, বিভাস কি ঠিক ঐদিকেই তাকিয়ে আছে? না ভাবছে, ঐ বুঝি বড়সাহেব এল জিপের শব্দ শোনার অপেক্ষায় কান পেতে আছে। নাঃ। এবারও সবিতা, চুরি করে ওর দৃষ্টির অনুসরণ করলো হ্যাঁ হ্যাঁ, দূরে ঐ যে বন্ধ কোয়ার্টার্স ঐ দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিভাস। কী দেখছে বিভাস? ওবাড়িতে ত কেউ নেই? ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টরের সেই সুন্দরী শালীটিও ত ওদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে। আর একটু ভাল করে দেখতেই লজ্জা পেল সবিতা—ছিঃ ছিঃ, এ কী ভাবছিল সে! ওদের বাগানে ত একগাদা বড় বড় সূর্যমুখী ফুটেছে। বিভাস নিশ্চয়ই ঐ ফুলগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, বিভাস কোটা ফুলের দিকেও তাকাতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই বিভাস যে শুধু দিনরাত অফিসের ফাইল পড়ে আর অফিসের কাজে এখানে ওখানে কেবল ঘোরাঘুরি করে, ঘরের কোণে একটু স্থির হয়ে বসার সময় পায় না।

আজ শুধু বিভাস শুধু ঘাঁটি আগলে আছে। অফিস নেই, কাজের তাড়া নেই, শুধু সারাক্ষণ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বিভাসের কথাটাই বোধ হয় ঠিক! বিভাস একদিন বলেছিল: চাকরিতে ঢুকে চেয়ার খালি রাখার উপায় নেই। আজকালকার দিনে চেয়ার খালি রাখলেই অন্য লোকে এসে বসে পড়বে।

সবিতা বলেছিল: যাও আর বেশি ফাজলামি করতে হবে না—

বিভাস হেসেছিল: না, না, সত্যি কথাই বলছি। আর শুধু আজকালকার দিনই বা বলি কেন, এ-ব্যাপারটা চিরকালের সত্য। আগেকার দিনের বাবু চাকরেবাবুরা সেইজন্তে চেয়ারে একটা চাদর বেঁধে রেখে তারপর হয় হুক এক্সচেঞ্জে না হয় টিউশনি করতে বেরোত।

কথাটা শুনে সবিতাও হেসেছিল। আর আজও সবিতার মনে হল এবারের ছুটি না-পাওয়াটাও কতকটা যেন সেই রকমের। প্রয়োজন না হলে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, কোন কাজ করার দরকার নেই—শুধু হেড কোয়ার্টার্সে থাকলেই চলবে।

কাজের ফাঁকে কখন যেন সবিতা খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরের দিকে তাকাতেই একটা দৃশ্য চোখে পড়লো সবিতার। খানিকটা দূর দিয়ে মাঠের আল ভেঙে রঙিন জামা-কাপড়পরা এখানকার স্থানীয় অনেক ছেলে-মেয়ে-বউ বোধ হয় গ্রামে গ্রামে ঠাকুর দেখতে চলেছে। ওদের চলার বেগ আর টুকরো টুকরো কথা শুনে সবিতার হাসি পেল, আবার ভালও লাগলো। আশ্চর্য, এ-দৃশ্য ত কোন দিন ওর চোখে পড়েনি! এবার চলে গেলে দেখতেও পেত না।

এদিক-ওদিক মুখ ফিরোতেই সবিতার চমক লাগলো! আচ্ছা, ওপাশটায় যে দোপাটির বন হয়ে রয়েছে কোন দিন তা চোখে পড়েনি ত! একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো সবিতা। কত রকমের কত রঙের দোপাটি—লাল, বেগুনী, সাদা, গোলাপী, কোনটার পাপড়ি থোকা-থোকা, কোনটার পাতলা-পাতলা। আবার কয়েকটা দোপাটি আশ্চর্য ধরণের—এগুলোকেই বোধ হয় হরগৌরী বলে—এদের অর্ধেক পাপড়ি এক রঙের, আর অর্ধেক অন্য রঙের। কয়েকটা দোপাটি আঁচলে তুলে চলে আসছিল সবিতা—সাঁ করে একটা শব্দ হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল বঁড়শিতে-লাগানো একটা রুপোলী মাছ ছটফট করছে খানিকটা দূরে। ওপাশে যে একটা পুকুর আছে আজই যেন খেয়াল হল সবিতার। দেখলো একটি লোক তাড়াতাড়ি এসে মাছটাকে খুলে একটা ব্যাগের ভেতর পুরে ফেললো। এইবার যেন ভাল করে দেখতে পেল সবিতা—শুধু কি ঐ একটি লোক—ঐ পুকুরটার পাড়ে পাড়ে অনেক লোক বসে গেছে মাছ ধরতে। ছিপগুলো উঠছে আবার নিঃশব্দে জলের দিকে নেমে আসছে। কেমন যেন ছুটির আবেশ চারিদিকে।

বাড়িতে ঢুকে কখন অজান্তেই বুঝি গুন্‌গুন্ গান ধরেছিল সবিতা। হঠাৎ বুঝি ওর সব কিছু ভাল লাগতে আরম্ভ করেছিল। এ-ও যেন এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা। বাড়ি গেলে ত সেই রঙ-করা মুখগুলোই দেখতো, সেই একঘেয়ে কথাই শুনে আসতো।

বড়দি বলতো: দেখি, দেখি, তোর শাশুড়ী কী দিল···

মেজদি বলতো: হ্যাঁ রে সবি, তোর দেওররা ত বড় বড় চাকরি করে সব—বৌদি বলে একটা শাড়িও দিতে পারে নি—অথচ আমার ভাই···

নীতার হালে বিয়ে হয়েছে। তার ওখানে গেলে সে-ও বোধ হয় কাগজের বাক্সগুলো খুলতে বসতো। নামী দোকানের দামী বাক্স খুলতে খুলতে বলতো: এটা দিয়েছে শাশুড়ী, আর এই যে নীল জমি রুপোলী পাড়—এটা দিয়েছে সেজ ননদ—ওরা খুব বড়লোক কি না, ওদের তিনটে মোটর গাড়ি—

ওদিকে অণিমার বাড়িতে গেলে বলতো: সবি, এবারে পুজোয় গান শুনেছিস! বলেই গ্রামোফোন খুলে নতুন রেকর্ড বাজাতে বসতো।

সাত কথা ভাবতে ভাবতে কখন সবিতার যেন এখানটাই ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। সেই প্রজাপতি-রঙ রোদ্দুরটা যেন আবার দেখা দিয়েছে, গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পায়ে-পায়ে যখন ঘরে ঢুকলো সবিতা তখন দেখলো—বিভাস সেই আগের মতই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে রয়েছে। কেমন আলগা-আলগা হাল্কা-হাল্কা ভাব ওর।

বিভাসের পাশে গিয়ে বসে পড়লো সবিতা: ওঠো আর কত শুয়ে থাকবে—বেলা কত হল খেয়াল আছে?

বিভাস হাসলো: এই উঠি—বলেই আর এক পাশে ফিরে শুলো।

সবিতার কেমন যেন নতুন-নতুন মনে হতে লাগলো বিভাসকে।

বিভাসই মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো: কেমন লাগছে সবি?

: কী?

: এই নির্বান্ধব নির্জন জায়গাটা? চারিদিকের কোয়ার্টার্সই ত খালি, কেবল আমরাই পড়ে আছি।

সবিতা হাসলো: মন্দ কি!

সবিতার মনে পড়ে গেল—এই এক বছর বিয়ে হওয়ার পর আজই যেন ও প্রথম বিভাসকে একান্ত ভাবে পেল! এখানে চার দিকে কেউ নেই, কেবল নির্জন নিরালা, বিভাসেরও অফিস নেই—আজ ওরা যেন দুজন দুজনের কাছাকাছি। বাড়ি গেলেও সেই রঙ-করা মুখগুলির মধ্যে, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে বিভাসকে ঠিক এমন ভাবে একান্ত করে পাওয়া যেত না।

সবিতার মনটা ক্রমশ হাল্কা হয়ে গেল, আর ওদিকে প্রজাপতি-রঙের রোদটা ঘরে-বাইরে গাছে-পাতায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সুদর্শন সম্বন্ধে মৌরী যে কেবল বাড়ীর লোকদেরই সতর্ক করে দিলে তাই নয়, নিজেকেও অসাবধান হতে দিলে না। এ অভিজ্ঞতাটা তার এমন দীর্ঘ দিন আগের নয় যে সে বিস্মৃত হবে—অনেক চিন্তা আছে যার রাশ একবার আলগা করে দিলে শেষে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুদিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে তার ভাবনার রাশ ঢিলে করে দেয় না কে? মৌরীও দিয়েছিল। বরবেশী সুদর্শনের পাশে বধূবেশে নিজেকে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়েছিল সে একবার নয়, বহু বার। সানাই-এর সুরের সঙ্গে মিলিত পুরোহিতের কণ্ঠের ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ স্বস্তির সেই মন্ত্রধ্বনি, সেই পরস্পরকে আরো নিকট করার, আরো প্রেমে অনুরাগে যুক্ত হবার, প্রিয় বলেই প্রীতি করবার মন্ত্র, বাইরের সাতপাক ঘোরা বাকি থাকলেও, মনের ঘোরায় চৌদ্দপাকে জড়িয়ে ফেলেছিল তাকে। আজ যদিও ওর বিশ্বাস সেই মনের পাকখাওয়া সে খুলে ফেলেছে, কাঁচা কল্পনার রং ধুয়ে ফেলেছে—কিন্তু তাই বলে মনকে মৌরী আর মনে পড়িয়ে দিতে পারে না সে সব কথা। পারে না বাসরশয্যায় সুদর্শনের পাশে নিজেকে কল্পনা করে যে ঢেউ-এর স্রোত বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল, সেই ঢেউ উঠবার মতো অসতর্ক মুহূর্ত আনতে দিতে। একবারের তরে চিন্তায়ও সুদর্শনকে সম্মুখে এসে দাঁড়াতে দিলে না সে। এমন কি দুপুরে বিছানায় গিয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ পর্যন্ত বন্ধ করতে সাহস করলে না। বই নিয়ে বসল সে। গোটা চারেকের সময় বই বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, ঝাড়া তিনশ পাতার বই একটানে শেষ করলাম, তুই পারবি?

ছোটপিসী যে সুদর্শনের এই আসার খবরটা মোটেই খুশীর সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবেন না তা যতীন বাবু জানতেন। বোনের কালো হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে যতীন বাবুর সাহস হলো না যে সংবাদ বোন খুশীর সঙ্গে নিতে পারছে না, সে সংবাদে মনের আনন্দ প্রকাশ করেন। শুষ্ক মুখে হাতের লাঠির উপর থুতনী চেপে বসে রইলেন তিনিও।

তা অন্তরে সুখ হোক আর নাই হোক, বাইরে সুখের খবর করে তুলতে হয় এমন সংবাদের সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে বহু। তাই কিছুক্ষণ মুখ কালো করে বসে থাকলেও ছোটপিসী যে কথাটা বললেন, সে কথাটা ভালো কথাই। এর পরও সুদর্শন এসেছে বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারপর শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু তোমার মেয়ে কি বলছে? আবার ত তাড়াবে না তো তাকে? ভাই-এর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটালেন তিনি—তা যে মান্ত মেয়েরা তোমায় করে, তুমি জানবে কি, বলবে কি—তাড়ালেই বা করবে কি। যা করবার তারা করবে। তোমার ইচ্ছারও হবে না, আমার ইচ্ছায়ও না। ওদের ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার নেই। কিন্তু সুদর্শনকে আমাদের তো সব কথা খুলে বলতে হবে? সে জানুক কি ঘটেছিল। তুমি বলেছ তো তাকে সব বৃত্তান্ত? বলোনি? কেন? বাড়ী ছিলে না তুমি সুদর্শন যখন এসেছিল?

যতীন বাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল বলেন, না, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। হয়তো তাই বলতেনও যদি না কথাটা প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত। স্বীকার করতে হলো তাকে, সবাই-ই বাড়ীতে ছিলেন, তবে কেউ তারা ঘর থেকে বেরুননি।

মানে? বাড়ীশুদ্ধ তোমরা সবাই ঘরের ভেতর পালিয়েছিলে! কথাটা ছোটপিসী যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। ঠোঁট দুটো হয়ে উঠল তার যেন ঘৃণা-ব্যঞ্জনার ছবি। বললেন, তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। আমাকেই সুদর্শনকে ডেকে সব কথা বলতে হবে। এত বড় মিথ্যে কথা আমরা কেন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম, এটা তাকে জানানো আমাদের কর্তব্য। নইলে সে ভাববে কি—আমাদের মান থাকবে তার কাছে? উঠে-পড়ে অনর্থক এটা-ওটা করতে করতে আরো কত কী বলে যেতে লাগলেন—যেটা উচিত মনে করছেন, সেটা তিনি করবেন—তার পর আর এই ব্যাপারের ভেতর তিনি নেই। যা খুসী করুক তার মেয়েরা। তাড়াতে হয় তাড়াক। খাতির করতে হয় খাতির করুক। কিন্তু যতীন বাবুর কানে কোন কথাই প্রবেশ করছিল না। তিনি ভাবছিলেন একেবারে অন্য কথা। মেয়ে কি করবে তা তিনি জানেন না কিন্তু তিনি কি করবেন তা স্থির করে ফেলেছিলেন যতীন বাবু।

তার একেবারেই অভিপ্রায় ছিল না সুদর্শনকে কিছু বলার। মৌরী ডাক্তার এবং নার্সকে মিলিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছে, বিয়ে ভেঙে দেবার কারণ হিসাবে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করেছে, সে সমস্ত তাদের পক্ষে সুদর্শনের কাছে উচ্চারণ করতে যাওয়ার মধ্যেও সঙ্কোচ ছিল অপরিসীম। কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে যখন সুদর্শন তাদের কাছে আসছে না, তখন সেই তো সসম্মানে মুক্তি দিয়েছে তাদের। তবে আর কেন তার ভেতর তারা ঢুকতে যাবেন? কিন্তু তার মতামতের স্বীকৃতি বা সম্মান যেমন মেয়েদের কাছে নেই, তেমনি বোনের কাছেও তো নেই। বিরস মুখে বসে রইলেন যতীন বাবু দু হাতের মুঠোয় লাঠির মাথা চেপে ধরে।

যদিও পরের দিনই ছোটপিসী চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠালেন সুদর্শনকে। কিন্তু সে বিনীত জবাব পাঠালো, নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো সুদর্শন। কিন্তু হঠাৎ তাকে এক আত্মীয়ার অপারেশন কেস নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে বলে তার সব কিছুই উলটে-পালটে গেছে। তিনি যেন কিছু মনে না করেন, সময় পাওয়া মাত্র সে আসবে।

কিন্তু এসব কথা মঞ্জুরা কিছুই জানলে না। কারণ, যতীন বাবু বাড়ীতে কোন কথাই বললেন না। মঞ্জু ভাবলে, হলো কি? কোথায় সেই সন্ধ্যারই ফের সুদর্শন আসবে, এই তার ধারণা ছিল,

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে!

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম!
আর স্নানেরপর শরীরটা কত ঝর ঝরে লাগে!

ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্য্যকারী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগবীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
আজ থেকে পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন!

L.17-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

তা সেদিন সন্ধ্যায় তো দূরের কথা তারপরও পুরো পাঁচ দিন কেটে গেল সুদর্শনের দেখা নেই। চলতে ফিরতে কথাটা সর্বক্ষণ মনের ভেতর ঘোরাফেরা করতে লাগল মঞ্জুর। চিন্তিত ভাবে এসে জিজ্ঞাসা করলে অমিতা, মৌরী নিশ্চয়ই এমন কিছু বলেছে যে, সুদর্শন বাবু আর আসবেন না—তাই মনে হয় না তোমার, এঁ্যা ?

না, মঞ্জুর তা মনে হয় না। প্রতিটি চরিত্রকে পরিণত সামঞ্জস্যের সমাপ্তিতে টেনে নিয়ে পাঠক-মন তৃপ্ত করতে হবে, বিশ্ব-গল্পকার তেমন দায়িত্ব স্বীকার করেন না। যেখানে সেখানে যথেচ্ছ সমাপ্তি টানাই তাঁর স্বভাব—তবু সুদর্শনকে যখন আর একবার এনে হাজির ক'রেছেন তখন এ আসাতেই এ গল্পের শেষ নিশ্চয়ই হতে পারে না।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলছিল। ঝাঁক-ঝাঁক বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটা যেমন একবার ঝরঝর করে নেবে আসছিল তেমনি আবার হঠাৎ করেই থেমে যাচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে রোদে ভরে ওঠছিল। পিসীমা মুখপোড়া বৃষ্টিকে গালাগাল করতে করতে কতবার যে তাঁর রোদের জিনিষ ঘরে ঢোকালেন আর বার করলেন তার ঠিক নেই। মঞ্জু আজ ঘরেই ছিল। তার ঘরে থাকবার কারণ অবিশ্যি যে বৃষ্টি নয় সে তো বলাই বাহুল্য। ক'দিন যাবৎ নীলকে সে উদ্বিগ্ন এবং চিন্তাকুল দেখছে। আজ দুদিন হল সে ক্লাশানেলেও আসছে না। এই দুদিন নোট নেওয়া আর নীলের জন্য প্রতীক্ষা করা দুটোই একসঙ্গে করে গেছে মঞ্জু। কিন্তু ওর লাইব্রেরী কাজের উৎসাহে কেমন যেন ক্রমশই ভাটা পড়ে আসছিল। একবার নীলের খোঁজে তার ওখানেই যাওয়ার দিকে ঝুঁকেছিল মনটা। কিন্তু গেল না। এ দুদিন জয়াকে দেখতে গিয়ে মমতার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, গল্প হয়েছে। কিন্তু দু দিন দেখা না হওয়ার জন্য তার খবর জানতে চাইতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেছে মঞ্জু। বলার মত কারণ কিছু থাকলে বা ঘটলে মমতা তাকে বলত।

এই সঙ্কোচবোধটা মঞ্জুর ভেতরের দুর্বলতা কি ? হয়তো। নইলে মঞ্জুর মতো মেয়ে ভীরু হয়ে উঠবে কেন ?

ঘড়ির কাটা নয়ের ঘরে যেতে না যেতে স্নানের ঘরে ছোটা, ফিঁতে দাঁতে চেপে ভিজে চুল বাঁধা, তোষকের তলা থেকে আর আলনার উপর থেকে শাড়ী এনে খাটের ওপর ফেলে খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, লাট শাড়ী মনঃপূত না হওয়ায় আলমারী থেকে ধোয়া শাড়ী বের করা, তাও না থাকলে দু পাট খোলা আলমারীর শাড়ীশূন্য গহ্বরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমিতার কাছে শাড়ীর জন্য ধাওয়া করা আর সর্ব শেষে ভাতের জন্য রান্নাঘরের দরজায় চেঁচামেচি শুরু করা—কোন কিছুই করতে না দেখে মৌরী যেন স্মরণ করিয়ে দিল মঞ্জুকে—ন'টা বেজে গেছে কিন্তু অনেকক্ষণ।

আগের দিনের দৈনিক পত্রের একটা লেখা নিবিষ্ট মনে বসে কাটছিল মঞ্জু। বলল—কি হয়েছে তাতে।

—তোর বেরোনোর সময় চলে গেছে।

—এখন বেরুব না।

—বলিস কি! তোকে না দেখলে নাকি রাস্তা-ঘাট কাঁদে, পিসীমা বলেন।

—ঠিকই বলেন। বাহিরের বড় বড় টপটপে বৃষ্টির ফোঁটার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু বলল—কাঁদছে তো তারা। দেখছিস নে।

বেলা চারটার সময় জয়াকে দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল মঞ্জু। ঘরে এসে প্রবেশ করল অমিতা। বাড়ী ঢোকার পথটুকুর মধ্যেই এক পশলা বৃষ্টি এসে ওর শাড়ী-জামা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। শাড়ীটা ভিজে দ্বিতীয়বার পরার অযোগ্য হয়ে গেছে বলেই বোধহয় একেবারে মেঝের ওপরই বসে পড়ল সে। আঁচল দিয়ে ভিজে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বললো—আর আপত্তি-টাপত্তির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

—কি বিষয়ে ? জিজ্ঞাসা করতে করতে মঞ্জু অমিতার ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে বাইরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল কেমন বৃষ্টি পড়ছে দেখবার জন্য।

—আরে বৃষ্টি দেখা রাখো। এখন তোমার বেরুনো হচ্ছে না। অনেক কথা আছে।

—কি বিষয়ে ? বাড়িয়ে দেওয়া হাতের তালু ভিজে গিয়েছিল মঞ্জুর। ভিজে হাতটা মুখে বুলোতে বুলোতে অমিতার সামনে এসে দাঁড়ালো সে—কি বিষয়ে এত কথা ?

—এই মেয়েটির বিয়ের বিষয়ে। মৌরীকে দেখালো অমিতা।

কোলের ওপর এক রাশ ব্লাউজ নিয়ে বসে মৌরী কোনটার টুকিটাকি ছেঁড়া সেলাই করছিল, কোনটার টিপ-বোতাম লাগাচ্ছিল। সে চোখও ফেরালো না ওদের দিকে। সে জানে, ছোটপিসী আজ হঠাৎ বাবা, দাদা, বৌদিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তবে এই জন্যই হয়ত।

জানতো মঞ্জুও। এবং মৌরীর মতই সেও জানত না কারণটা কি। এবার ঔৎসুক্যে আরো এগিয়ে এলো মঞ্জু—ওখানে সুদর্শন বাবু আজ এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—তার পর ?

—তার পর সব সমস্যা জলের মতো সমাধান হয়ে গেল নিজে নিজে। আর এতেও যদি না হয় তবে বুঝতে হবে, নিছক ছেলেমানষী জেদের ব্যাপার এটা।

—বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করো এবং মন্তব্য বাদ দাও। আমরা নিরপেক্ষ দর্শকজন মাত্র, সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

হাতের ছুঁচ-সুতো থেকে মুখটা পুরোও তুলল না মৌরী, শুধু যেন পাগলের কাণ্ড দেখছে এমনি ভাবের একটা তির্যক দৃষ্টি, একবারের জন্য ফেলল অমিতার মুখের উপর। তারপরই ফের হাতের কাজে মন দিল।

বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত অমিতা করতে পারলে না, সে চেষ্টাও সে করলে না। সে বললো—ছোটপিসী সুদর্শন বাবুর আসবার কথা শুনেই নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—মানে, চায়ের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এক আত্মীয়ের অপারেশনের জন্য তখন সুদর্শন বাবু এসে উঠতে পারেনি। বাবা আমাদের এসব কথা কিছু বলেননি তো—আর আমরা অযথা কত কি ভেবেছি—না গো ?

—এতো কত কী ভেবেছ কেন ? চোখ দুটো দুরন্ত রোদের দিকে তাকানোর মতো করে কুঁচকে তুলে মৌরী তাকালো অমিতার দিকে।

প্রাহ্যই করলে না অমিতা মৌরীকে। মনের পেছনে খুশী থাকলে যেমনটা হয়। ঠাট্টা-বিদ্রূপ পরিহাস সব পিছলে পড়ে। গুরুদায়িত্ব-সম্পন্ন গৃহিণীর মতো ভারিক্কে চালে জবাব দিল—কত কি ভেবেছি তাই নিজের গরজে। মা নেই ঘরে। ছুটো মেয়েকে ঘরে-বরে পাত্রস্থ করতে হবে—এ কি সহজ কথা! এমন পাত্র পেয়েও কপাল দোষে হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখলে মাথা ঠিক থাকে কখনো? তবু আমি বৌদি বলে, মা হলে পাগলা হয়ে উঠতেন, না—না মঞ্জু?

—ঠিক।

ওদের দুজনার চালে রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল মৌরী।

রামু বৈকালিক চা পরিবেশন করে গেল।

অমিতা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো—আজ সুদর্শন বাবু এসেছিলেন। কথাবার্তা আমাদের সামনে হোক ছোটপিসীর এই ইচ্ছে—নইলে শেষে না তিনি আবার কোন দোষের তলায় পড়েন। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছু জানিনে ছোটপিসী ডেকেছেন শুনেই সে কি বুককাঁপুনি। ভেবেছিলাম শরীর খারাপ বলে পাঠাবো। কিন্তু তোমার দাদা এমন চোখ লাল করে উঠলেন না, যেতেই হলো। তারপর ওখানে গিয়ে—হলঘরে ঢুকে—যেই না দেখলাম সুদর্শন বাবু শুকনো মুখে বসে আছেন—তখন বুকখানার যা অবস্থা হলো না—, বুকে হাত চেপে ধরে অমিতা যেন বোঝাতে চাইলে, সে চেপে ধরে কেঁপে ভেঙ্গে পড়া থেকে বুককে বাঁচিয়েছে।

—সংক্ষেপ—

হাতের কাপে চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল অমিতা। তারপর বললো—বাবা কিছুতেই সেখানে থাকলেন না। আমি আর তোমার দাদা বসলাম। কথা আরম্ভের ভূমিকাই বল আর ভণিতাই বল, ছোটপিসী অনেকক্ষণই করে নিলেন কিন্তু আমি শুনিনি—

—বেশ করেছে। কিছু সংক্ষেপ হলো?

—না বাপু, এতো তাড়া করো না। কথা কি একটা, অনেক যে। তুমি বোস।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে কথা বলছিল মঞ্জু। কিন্তু এবার জয়াকে দেখতে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো তার। সে ভালো আছে। চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু দরজায় চোখ পেতে বসে থাকবে জয়া ওর জন্য। শেষে ভাবিত হবে। এমন তো একদিনও হয়নি। কিন্তু কি করা যায়! ঘণ্টাখানেক পর আর হাসপাতালে ঢোকার উপায় থাকবে না। সাক্ষাৎ-সময় পার হয়ে যাবে। অমিতার মতোই মেঝের উপর বসে পড়ল সে। তারপর পা দুটো মৌরীর ইজিচেয়ার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে তার কোলের উপর তুলে দিয়ে বলল—আঙুলগুলো একটু টেনে দে তো দিদি। আর অমিতাকে বলল—আচ্ছা, তাড়া করবো না। কিন্তু তোমার উপর ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো বাদ দিয়ে—এঁ্যা?

অমিতা বললো—জানো, ছোটপিসী এমন করে মমতার বাবা মার চাতুরী করে নার্স মেয়ে গছানোর চেষ্টার কথা বললেন যে, আমিই অবাক হয়ে শুনেছিলাম। আমরা তো দূরের কথা, মমতার বাবা-মাও হয়তো এ ভাবে ভাবেননি। বললে বিয়ে হবে না, তাই বলেননি—এই তো। আমার খুব খারাপ লাগছিল—

—তারপর?

—আবার!

—কি আবার?

—তাড়া দিচ্ছ।

—কোথায় তাড়া দিচ্ছি। জিজ্ঞাসা করছি, তারপর কি হলো?

এর পর মনে হলো, অমিতা সংক্ষেপের দিকেই চলে গেল। বললো, ছোটপিসী বললেন, মেয়ে-নার্স জেনে সে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে তারা বাধ্য হলেন। কিন্তু এদিকে যেকথা তারা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, তাদের মেয়ে তাই বলে বসল—দুটো বিয়েকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলল। বললো—একটা ভাঙলে নাকি আর একটাও ভাঙবে। কেন, কি জন্য? একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক কি? আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু মেয়ে কাঁদিয়ে ছাড়লে আমাদের। তার সেই এক কথা—বলে মৌরীর সেদিনের কথাগুলোকে যথেষ্ট রেখে-ঢেকে, ছেঁটে-কেটেই যদিও ছোটপিসী উপস্থিত করলেন সুদর্শন বাবুর কাছে, তবু তার ভেতর এ কথাটা তো স্পষ্ট হয়েই উঠল মৌরীর বক্তব্যটা কি।

নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়, এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এই সেবার কাজ নারীর জাত যাওয়া, তবে যারা বাধ্য হয়ে দেয় তাদের চাইতে অনেক বেশী অপরাধ, তারা যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় নেয়। এই যদি সত্য 'মেয়েরা নার্স' হলে ভদ্রঘরের বৌ হয়ে আসবার যোগ্যতা হারায়, তবে যাদের জন্য হারায় তারা আরো বেশী অযোগ্য ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে—তাই যদি ভাঙ্গে তবে একটা যে কারণে ভাঙবে, অপরটাও সেই কারণেই ভাঙবে—

—ঠিক।

—কে বললেন জানো? সুদর্শন বাবু। স্তব্ধ হয়ে, একেবারে পাথরের মতো জমে বসে কথা শুনছিলেন, ছোটপিসীর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে 'ঠিক' শব্দটা বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট শুনেছি। শুনব না কেন বল—এই তো চার হাতের লম্বা সোফা, এই সুদর্শন বাবু বসেছেন আর এই তো আমি বসেছি। মাঝে তো মাত্র হাত দেড়েকের তফাৎ।

—তারপর?

—তারপর আর কি? সুদর্শন বাবুর মন্তব্য শুনে আমার এমন আনন্দ হলো যে আর কোন কথা আমি শুনিনি ছোটপিসীর।

—সুদর্শন বাবু আর কি বললেন?

—তিনি একটা কথাও বলেননি। চায়ের আয়োজন করেছিলেন ছোটপিসী প্রচুর। কেউ কিছু বুঝলে না তোমার দাদা বাবা। তারা খেতে পারলেন না। আমি আনন্দে এতো খেয়েছি যে ছোট-পিসী নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন। নিজের প্লেটটা খেয়ে তোমার দাদার প্লেটটা থেকে তুলে নিয়েছি। বলে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

অমিতা যেন খেয়ে ছোটপিসীকে ভীষণ জব্দ করে এসেছে সে। ওর অবস্থা দেখে হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো—কিন্তু তোমার প্রথম কথাগুলোর মানে কি হয় তবে? আর আপত্তির কারণ নেই। সব সমাধান হয়ে গেছে?

—বাঃ, হলো না?

—কি ভাবে হলো?

—ঐ যে বললাম, আমি স্পষ্ট শুনেছি, ছোটপিসীর মুখের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন বাবু বলে উঠলেন, ঠিক।

—তাতেই সমাধান হয়ে গেল?

—কেন, হবে না? মৌরীর যা মত তাই যদি সুদর্শন বাবুরও মত হলো, তবে বিরোধ রইল কোথায় শুনি?

দুচোখ বড় বড় করে ওরই দিকে জবাবের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকা অমিতার দিকে তাকিয়ে মঞ্জু এবার বলে উঠল—ঠিক। তারপর মৌরীকে জিজ্ঞাসা করল—শুনেছিস সব কথা?

—নিশ্চয়।

—বৌদির অভিমত, যদি মতের সঙ্গে মত মিলে গেল, তবে আর বিরোধ রইল কোথায়—তাই কি?

—নিশ্চয়।

—খুসী মনে ধন্যবাদ জানাতে পারি তোকে?

—বাধা কোথায়।

—বাধা কোথাও নেই, তোর মধ্যেও না—তাই দুঃখ হয়।

মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছিল অমিতা। ক্লান্ত হলো সে। বললো, বাঃ, ওর ভেতরে বাধা না থাক, থাকলেও দূর হয়ে যাক, তাই তো আমরা চাচ্ছি। ওর মধ্যে বাধা না থাকলে দুঃখ হতে যাবে কেন?

—সেই জন্যই দুঃখ হবে। কাউকে ভূতে পেয়েছে শুনলে আমরা দুঃখ বোধ করি। কেন করি, কারণ, আমরা মনে করি ভূত বলে কিছু নেই। যা নেই তাতে পেয়ে বসেছে দেখলে তাতেই দুঃখ পাচ্ছে দেখলে সব ক্ষেত্রেই দুঃখ হয়। তারপর, যদি এই সত্য হয়, তবে এই, যদি ঐ সত্য হয়, তবে সেই, যদি সেই সত্য হয় তবে এই। বুঝলাম মহিলাটির 'যদি' গুলো 'যদি' ঠিক হয় তবে কথাগুলো তার সব ঠিক—সুদর্শন বাবুর ঠিকটাও ঠিক। কিন্তু আসলে দাঁড়াচ্ছেটা কি? সব গিয়ে দাঁড়াচ্ছে 'যদির' উপর—যার নিজের পায়ের তলায় দাঁড়াবার মতো এক রত্তি মাটি নেই। ভদ্রলোকটিকে মহাশয়া হারিয়ে দিয়ে বসে আছেন যে 'যদির' ব্রিফে, তাতে কেস জেতা তো দূরের কথা কেস ফাইল অবধি করা যায় না।

কতক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কি যেন ভাবলে অমিতা। তারপর উঠে বসে ভাবতে ভাবতেই বললো—দেখো, আমি ভেবে দেখলাম, বলে আবার যেন কি চিন্তা করতে লাগলো।

টিপ-বোতাম সুচ-সুতো সেলাই-এর বাক্সে ভরে গুছিয়ে গাছিয়ে, কোলের উপরের জামাগুলো হাতে তুলে উঠে পড়ল মৌরী।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কোথায় চললেন আপনি?

—ছাদে।

—হাঁ, যাও বাছা, ঐ তোমার উপযুক্ত জায়গা। ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকো গিয়ে।

পূর্বদিনের রোদ গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির খেলা আজ আর আকাশে ছিল না। সমস্ত দিন'ধরেই বৃষ্টি ঝরছিল; বাতাস বইছিল। এখন সন্ধ্যায় আকাশটা কেমনধারা যেন একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল পৃথিবীর দিকে। পিসীমা বলছিলেন, আশ্বিনের বাদল-বাতাসকে বিশ্বাস নেই। আকাশের চেহারাটা নাকি ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার স্মৃতিতে জেগে উঠছিল সেই ছাব্বিশ সনের ঝড়ের ছবি। পদ্মা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষার জল যে ঝড়ে মানুষের মৃতদেহে ভরাট হয়ে উঠেছিল। বিকেলে যেই বাড়ী থেকে বেরুতে যায়, তাকেই বাধা দেন পিসীমা। কিন্তু কে শোনে? প্রায় একে একে বেরিয়ে গেছে সবাই। অমিতা যাও বা বাড়ী ছিল, এই একটু আগে তার বাবা গাড়া পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন তাকে। যে আকাশের দিকে তাকিয়ে পিসীমার চোখ বড় দেখাচ্ছিল, সেই আকাশের দিকে তাকিয়েই কিন্তু আবার রামু শিব-পার্বতীর ঝগড়া দেখছিল। ঐ যে আকাশটা অমন লালচে—ও হলো শিবের রক্ত-নেত্রের ছটা। দুর্গা মা বায়না ধরেছেন বাপের ঘরে আসবার, তাই ধমকাচ্ছেন মহাদেব। সেই ধমকের তো শব্দ ঐ মেঘ-গর্জন। মা দুর্গা কাঁদছেন, আর পৃথিবীতে জল ঝরছে। আবার যাবার বেলা, বিজয়ার দিন যে কাঁদাটা কাঁদবেন মা এক ফোঁটা মাটিও থাকবে না।

চুপচাপ বসেছিল মৌরী। হঠাৎ রামু ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বললো—দিদিমণি জামাই বাবু।

—জামাই বাবু আবার কে? মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল মৌরী। সে ভাবলে রামু কাউকে বাইরের ঘরে বসিয়ে সংবাদ দিতে এসেছে।

দরজার বাইরে ওরই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শনকে দেখিয়ে রামু বললো—এই যে।

এই যে মানে? রামু কা'কে সঙ্গে করে একেবারে এখানে নিয়ে এলো! বিরক্তির টানে ভ্রূকে বাঁকিয়ে তুলল মৌরীর। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে আর ওঠা মাত্র চোখ পড়ল গিয়ে সুদর্শনের উপর। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল তার। রামুর এই সম্বোধনের কথা সে জানত না। তাকে কেউ বলেনি।

মৌরীর মুখের চেহারা দেখে পালালো রামু।

ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এসে অপরাধীর মতো হাত জোড় করে দাঁড়ালো সুদর্শন। বললো—অপরাধটা সম্পূর্ণ আমার। এর জন্য ওকে ধমকালে আমার গায়ে বড্ড লাগবে। ও দেখেছে এই ভদ্রলোকটিকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার এই একমাত্র উপায়। কিন্তু আমি তো বুঝছিলাম ফলাফলটা মধুর হবে না রামুর পক্ষে। তবে বিশ্বাস করুন, জামাই বাবু ডাকটা আমার শেখানো নয়। বজেন তো ওটার জন্য ডেকে আমি ধমকে দিতে পারি রামুকে।

সে দিন এসে যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটাই টেনে নিয়ে নিজেই বসল সুদর্শন। আজ সে তার স্বভাব-বিপরীত ভাবে একটু চঞ্চল, একটু উচ্ছল। আর সে অন্ধকারে নেই। এখন সে আলোতে। সে কি ঘটেছিল তা জেনেছে, নিজে কি করবে তা ঠিক করে ফেলেছে। তার আহত আত্মমর্যাদা নিরাময় বোধ করছে। মৌরী তার কাছে এই ঘটনার ভেতর দিয়ে যেমন আরো বড় হয়ে উঠেছে, তেমনি আরো ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। জানে না মৌরী তার কথার পেছনে যে সত্য রয়েছে, তত বড় সত্য একটা বিশেষ ক্ষেত্রের একটা বিশেষ গোষ্ঠীর গোণা কয়টা মাথার জন্য নয়। তার ব্যাপ্তি যাবে গোটা সমাজের মাথা ছুঁয়ে।

বসে পকেটে হাত ঢোকালো সুদর্শন সিগারেট বের করবার জন্য। তারপর শূন্য হাতটা পকেট থেকে বের করে এনে বললো—মাথায় যখন কেবল এক চিন্তা এক কথা জায়গা জুড়ে বসে থাকে তখন যে মানুষের কি দুরবস্থা হয়—দেখুন, ফেলে এসেছি সিগারেট।

মৌরীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে যতই মনস্থির থাক, মুহূর্তে মুখের সব ঔজ্জ্বল্য যেন দপ্ করে নিবে গেল সুদর্শনের। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল সে-ও।

তার অন্ধকার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে পড়ল মৌরী। ধীরকণ্ঠে বললো—আপনার সিগারেট চাই তো ?

কথাটা প্রশ্নবাক্য নয়! কিন্তু সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সুদর্শনের। সিগারেট চাই তো! মৌরী যেন তার লখ্‌নউ-এর বাড়ীতে, তার ঘরে। সিগারেট ফুরিয়ে যাওয়ার কথা শুনে চাকরকে সিগারেট আনার আদেশ দিতে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে তাদের বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতাগুলো ওরই মতো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করছে। বলছে, মৌরী আমিই তোমার শাড়ীর রংটা আমার পাতার রঙে রাঙিয়ে রেখে এসেছি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারব বলে। বুকের উপরের টেনে দেওয়া প্রান্ত পাড়টা ফুলের রঙে রাঙিয়ে রেখে এসেছি তোমার বুকের পাহাড়-রাস্তা বেয়ে তোমার কাঁধে ঠোঁট ছোঁয়াতে পারবো বলে।

বাইরে মেঘ বৃষ্টি বাতাস, ঘরে সায়াহ্নের অস্পষ্টতার এটুকু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মৌরী—ভেতরটা উদ্দামতা প্রকাশ করতে লাগল সুদর্শনের। কোন মতে বললো—দরকার নেই।

দরকার নেইটা নিতান্ত বাজে কথা। কিন্তু সুদর্শনই যদি বলে প্রয়োজন নেই, তবে ওর জোর করার কি আছে ? কিন্তু নিরস্ত হতে গিয়েও আবার হলো না। বললো, মঞ্জুর মতো কফির ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। কিন্তু সিগারেট আনিয়ে দিচ্ছি।

মৌরী চলে গেল। সুদর্শনের মনে হলো, নদ-নদী-গিরি-সমুদ্রের মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত কতকগুলো বাধা আছে, মৌরীর মধ্যেও যেন তেমনি কতকগুলো প্রকৃতিগত বাধা আছে ? সেগুলোকে জয় করে চললে জীবনেও তার কাছে যাওয়া যাবে না।

মঞ্জু আর রামু একেবারে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে 'উঃ' করে নেমে পড়ল। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রাগতকণ্ঠে মঞ্জু বললো—এমন ছুটে কোথায় চলেছিস ?

—সিগারেট আনতে।

—সিগারেট কার জন্য ?

—জামাই বাবুর জন্য।

ধমকাতে গিয়েও হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো, সুদর্শন বাবু বলতে পারিস নে ?

মাথা চুলকোতে লাগল রামু। বললো—লজ্জা করে।

পত্রিকার কাগজ মাথায় চাপিয়ে রামু চলে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল মঞ্জু। কোন বান্ধবীর বাড়ী গিয়ে বসে আড্ডা দেওয়া আর ডালমুট ভাজা খাওয়া যাক। বৃষ্টি। তাতে কি হয়েছে ? যেমন বাদলা পথ দিয়ে বাইর থেকে বাড়ী ফিরল, ঠিক তেমনি করে আবার আর একজনের বাড়ীতে অনায়াসে চলে যাওয়া যাবে। চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে ট্রামে চেপে বসল মঞ্জু। ট্রামের শার্সি দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পিঠের জামা-কাপড় ভিজিয়ে তুলল তার। একটু সরে বসে শার্সির নীল কাচের পিঠে বৃষ্টির জল পড়া দেখতে লাগল সে। কিছুক্ষণ বাদে একজন যাত্রীকে জানালা তুলে দিতে দেখে, সে-ও তুলে দিল জানালা। বৃষ্টির জোর নেই। প্রায় থেমে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো মঞ্জু। আকাশের চেহারাটায় এমন একটা মত্ত ভাব ছিল যে তার দিকে তাকিয়ে মনও মাতাল হয়ে উঠতে চায়। আকাশটা দেখতে দেখতে দুটো ষ্টপেজ চলে গিয়ে হঠাৎ তৃতীয় ষ্টপেজে নেমে পড়ল মঞ্জু। নীলের ওখানে গিয়ে তাকে বিস্মিত করে দেবে সে। নাঃ, বৃষ্টিটা একেবারে থামেনি। গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে। একটা দোকানে উঠে দাঁড়ালো সে। নীল তাকে দেখে আশ্চর্য্য হবে, আর রজত ? যদি সে এখন গিয়ে রজতের ঘরে উপস্থিত হয়—তার হাতের গ্লাস ছিটকে পড়ে মেঝেয় চৌচির হবে ? [ক্রমশঃ।

"নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাতপরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই ; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে।" —রবীন্দ্রনাথ

ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

একদা নরকে পাপীদের দুরবস্থা দেখে লঙ্কেশ্বর রাবণের মনে দুঃখ হয়েছিল, তিনি স্থির করেছিলেন মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটানা সিঁড়ি বানিয়ে দেবেন। তাতে অন্ততঃ নরক-যন্ত্রণা আর মানুষকে সহ্য করতে হবে না। কিন্তু নানা কারণে তাঁর ইচ্ছা আর পূর্ণ হ'ল না, রামরূপী মৃত্যু এসে তাঁকে পরমধামে পাঠিয়ে দিলেন।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের জীবনের শেষ ছ মাস কাল নানা বাধার দরুণ আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে পাইনি। ফলে অনেক কথা পুরো জানা হয়নি, অনেক প্রশ্ন জিগ্যেসই করা হয়নি তাঁকে। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—ভালো ভালো নাটকের চরিত্রগুলো অ্যানালাইজ করা প্রয়োজন। আমরা মনে করেছিলাম বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এলে, ওঁকে দিয়ে এ কাজটা করাবো ; যে ক'টি নাটক তিনি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাছাড়া আরো অনেক নাটক তিনি আমাদের পড়ে শোনাবেন ; মালিনী নাটক রিহার্স্যাল দিতে সুরু করেছিলেন, যথাসময়ে সেটা মঞ্চস্থ করাবো ; নতুন কোন নাটক রিহার্স্যাল দেওয়া সুরু করাব। ওঁর সাহায্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা নাটক লিখতে পারেন তাঁদের দিয়ে নতুন নাটক লেখাবার ব্যবস্থা করব।

রাবণের অপূর্ণ ইচ্ছার মত আমাদের ইচ্ছাও অপূর্ণ রয়ে গেল। আমাদেরই পরিচিত এক বন্ধু যখন ১১৫১এর ৮ই ও ১০ই মে মহাজাতি সদনে ওঁর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখনও ভাবতে পারিনি এই তাঁর শেষ অভিনয়! (দীর্ঘ ৩৮ বছর আগে যে আলমগীর নিয়ে তিনি পেশাদারী মঞ্চে অবতরণ করেন ৮ই মে সেই আলমগীরেরই শেষ অভিনয় হ'ল।) অবশ্য পরিচিত মহলের কেউ কেউ শঙ্কাপ্রকাশ করেছিলেন, ওঁর স্বাস্থ্য বড় খারাপ হয়ে গেছে।

ওঁর মনে মনে একটা ভয় ছিল, চোখ কাটালেই একটা কিছু বিপর্যয় ঘটবে ; তাই অনেক দিন চোখ কাটাতে চান নি, কিন্তু মে'র শেষ দিকে শেষ অবধি চোখ কাটালেন। জুন মাসে ওঁর শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালই, যদিও মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা ধরছিল, কচিৎ কদাচিৎ অতি সামান্য শ্বাসকষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছিল। তার মারাত্মক কিছু এমন মনে করবার কারণ ঘটেনি। তাই ৩০শে জুনের কাগজে ২১শে জুন শেষ রাত্রে তাঁর মহাপ্রয়াণের খবর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই মনে হয়েছিল।

১২

শিশিরকুমারের জীবনের অতি সামান্য এক ভগ্নাংশ কাল আমরা তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম এবং তারও অতি ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় এত দিন আমরা সর্বজন-সমক্ষে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি।

আগেই বলেছি, শিশিরকুমারের জীবনী লেখবার প্রয়াসী আমরা নই আর সে অধিকারও আমাদের আছে বলে মনে করি না। এ কেবল মানুষ শিশিরকুমার, আলাপচারী শিশিরকুমারকে ফুটিয়ে তোলবার সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

এ কাহিনীর নায়ক ও বক্তা শিশিরকুমার স্বয়ং, আমরা এখানে অবান্তর। যদি কোথাও আমাদের ব্যক্তিত্ব বক্তব্যকে ব্যাহত করে থাকে তবে আমাদের লেখা কারো মনে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু সে ত্রুটি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয় বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তবু ব্যথা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক দুঃখ জানাচ্ছি।

শিশিরকুমারের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সামান্য প্রমাণই আমাদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার-বিমুখ। নিজের সম্বন্ধে কথা খুব কমই বলতেন, সামান্য যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনিচ্ছাসত্বে বলা।

তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বহু জনে বহু কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক কথাই বলা হবে। সে সব কথার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মতামত আর বহু মত তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন না। এমন বহু জনের। এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবার ফলে আমাদের যা মনে হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত সার ব্যক্ত করছি।

প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে তাঁকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশও দেখেছি আমরা। পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়েছে তখন দেখেছি অত্যন্ত রসিক সজ্জন তিনি। আমাদের সঙ্গে বয়সের তাঁর অশেষ পার্থক্য সত্বেও আমরা ছিলাম যেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। যেখানে তাঁর পরিচয় দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত আর আমরা অতি নগণ্য : যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন বা আসতেন তাঁর কথা শুনতে, তাঁদের অনেকেই আমাদের চিনতেন না—অথচ তিনি আমাদের কথা সব সময়ে স্মরণে রাখতেন, ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমাদের (এখানে আমাদের অর্থে যে সব অল্পবয়সী ছেলের দল ঘরে আসর গুলজার করতাম তাদের সকলের কথাই বলছি) খোঁজ নিতেন, কেউ হাজির না থাকলে, তার কুশল জানতে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর এ স্নেহ শুধু যে আমাদের ওপরই বর্ষিত তা নয়, দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা তাঁর থিয়েটারে কাজ করেছে তাঁদের সকলকার সম্বন্ধেই তাঁকে সমান স্নেহশীল দেখেছি। এমন কি যাঁরা একদিন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধেও তাঁর স্নেহ অব্যাহত ছিল।

কোন বিশেষ এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সাধারণতঃ অন্য বিষয়ে একান্ত অজ্ঞ হ'ন। শিশিরকুমার পড়তেন এর ব্যতিক্রমের দলে। নাটক ও অভিনয় সম্পর্কীয় অজস্র বই ত মনোযোগ দিয়ে পড়তেনই, তাছাড়াও ইংরাজী বহু পত্র-পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়তেন। ইংরাজী সাহিত্যের আধুনিকতম গতি-প্রকৃতির বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে তিনি অইংরাজ নাট্যকারদের নাটকও পড়তেন, জীবনের শেষ দুটি বছরে তিনি জার্মাণ নাট্যকার ও জার্মাণীর নব নাট্য আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা বার্টোল্ট ব্রেক্টের নাটক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে পড়েছিলেন। আমাদের কাছে তাঁর লেখা নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলতেন—এসব

—সমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

শিশু-মেলা

—অধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
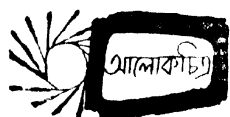
—প্রভাস দাস
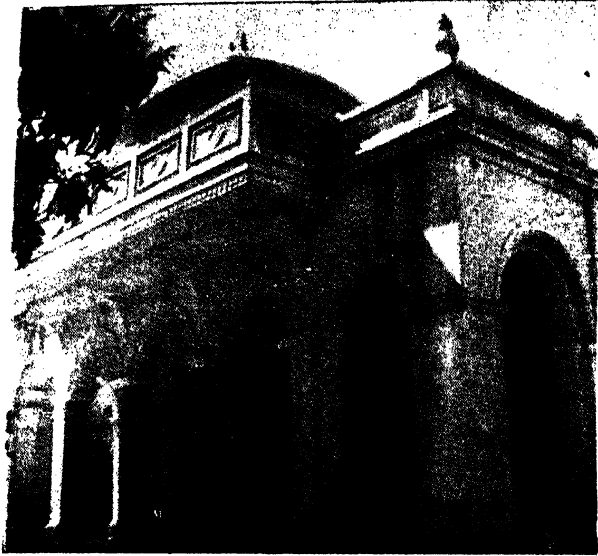
সারদা-মন্দির
(জয়রামবাটী)

—সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পুরীর মন্দির
—দ.শরধি দাস

পবননন্দন —প্রকাশচন্দ্র বসু

হাতেখড়ি —রঞ্জিৎ বল

মার্জারশাবক

—চিত্ত নন্দী

নন্দরাজ (মহাবলীপুরম্) —কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও
ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

নাটক পড়, পড়লে জ্ঞান বাড়বে। তবে বিদেশী নাটক হলেই প্রশংসা করতে হবে এমন একটা মতের অন্ধ পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। তাই স্বচ্ছন্দে বলেছেন—ইবসেন ডেটেড হয়ে গেছে। ডলস হাউসের নোরার চেয়ে শক্তিমতী নায়িকার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে।

শিশিরকুমারের আর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর স্বদেশপ্রেম। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। নিজের থিয়েটারে তিনি চিরকালই বাঙালী কেতায় টিকিট ছাপিয়ে, বাঙালী ধরণে নহবৎ বসিয়ে খাঁটি বাঙালী পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর বাঙালীয়ানার এখানেই শেষ নয়—অবশ্য বাঙালীয়ানা বলতে শুধু প্রাদেশিকতা নয়, সত্যকারের বাঙালীত্ব সম্বন্ধে গর্ব আর সেই সঙ্গে নিজেদের দোষ-ত্রুটি দূর করে যতদূর সম্ভব নিখুঁত হবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই বুঝেছি—জগতের যে কোন জাতির সঙ্গে তুলনায় বাঙালী যাতে হীন প্রতিপন্ন না হয় সে জন্য নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বিদেশীর অনুকরণে গড়া বাঙলার ফ্রেমে আঁটা থিয়েটারে বাঙালী বুদ্ধিবৃত্তি তথা প্রতিভার পূর্ণ বা সম্যক বিকাশ কোনমতেই সম্ভবপর নয়, একথা তিনি একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন আর সেই জন্যই বার বার তিনি আমাদের কাছে বলেছেন যে, বাঙলার নিজস্ব বস্তু যাত্রার উন্নতি ঘটিয়ে তাকে বর্তমান থিয়েটারের জায়গায় বসাতে হবে। নচেৎ বাঙালী জিনিয়াস কোন দিনই তার সম্পূর্ণ মহিমায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারবে না।

অভিনেতা শিশিরকুমার সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমরা বাহুল্য মনে করি। বাঙলা থিয়েটারের স্বর্ণপ্রসূ যুগের পরে যাঁর নাম একক ও অনন্য মহিমায় দীপ্যমান তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্যের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না; দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের ইতিহাসে সে পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নাট্যপ্রযোজক পরিচালক শিশিরকুমার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে কোন কথা আমরা বলতে পারব না, কারণ আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত, তখন তিনি ভাঙ্গা হাটের সম্রাট। সন্ধ্যার ম্লান আভা থেকে মধ্যাহ্নের দীপ্তি কল্পনা করতে পারলেও তাকে সম্বল করে মন্তব্য করা চলে না। বরং প্রসঙ্গক্রমে নাট্যশিক্ষক শিশিরকুমার সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলতে চাই।

আমাদের একটা ধারণা ছিল, উনি কাউকে শেখান না কিন্তু প্রথম পরিচয়ের ক্ষণ থেকেই সে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটেছিল। দেখেছি, শেখাতে পেলে উনি আর কিছু চাইতেন না। অর্ধেন্দুশেখর প্রসঙ্গে একদিন বলেও ছিলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অর্ধেন্দুবাবুর মত আমিও রিহার্স্যাল দিয়েছি। রিহার্স্যাল দিতে দিতে নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছি।

তাঁর রিহার্স্যাল দেবার প্রণালী ছিল রীতিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণত শিক্ষার্থীকে শিক্ষক তাঁর নিজের ভঙ্গীর অনুকরণ বা বড়জোর অনুসরণ করতে শেখান। হুবহু হাবভাব অঙ্গভঙ্গী বাচন-প্রণালী অনুসরণ করে শিষ্যরা সাধারণতঃ গুরুদেবের কার্বন কপি হয়ে দাঁড়ান। শিশিরকুমার কিন্তু নাটকীয় চরিত্রটি ভাল করে পড়ে বুঝিয়ে বিশ্লেষণ করে দিতেন। তিনি আশা করতেন, ভূমিকাভিনেতা চরিত্রটি অনুধাবন করে তাতে নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারবেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর আশা সফল হ'ত না। কিন্তু তিনি তাতে কখনো ধৈর্য হারাতেন না বরং ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরলস পরিশ্রম করে চলতেন ঈপ্সিত ফললাভের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁর আশা ফলবতী হত না, তখন বাধ্য হয়েই বলতেন ঠিক হয়েছে বাবা! সময় মাফিক এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলিস।

এই ধরণের রিহার্স্যাল দেওয়ায় যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হচ্ছে একটা সংবেদনশীল মন। যে কথা তিনি বলতে চাইতেন সে কথা বুঝতে পারার জন্য মনের কিছুটা প্রস্তুতি থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অন্ততঃ শেষের দিকে প্রস্তুতি তাঁর শিষ্যদের কারোরই ছিল না। ফলে বার বার তাঁর প্রচেষ্টা ব্যাহতই হয়েছে। অবশ্য চরিত্রবিশ্লেষণ বুঝতে না পারলে বার বার প্রশ্ন করে অপরিজ্ঞাত অংশকে উজ্জ্বল করার সুযোগ ছিল তার প্রখর ব্যক্তিত্বের। আসলে অন্যরা এতদূর নিষ্প্রভ হয়ে থাকতেন যে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করবার দুঃসাহস কারো হ'ত না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলই তাঁর শেষদিককার নাটকে সুপ্রকাশিত ছিল।

শিশিরকুমারের নট ও নাট্য শিক্ষক-জীবনের গোড়ার দিকে বোধ হয় তাঁকে এতটা মনোভঙ্গের বেদনা অনুভব করতে হয়নি। কারণ, সেই সময়ে তাঁর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, শৈলেন চৌধুরী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা রবি রায় প্রমুখ এতগুলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম পাওয়া যায় যে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সেই সময় শিক্ষক হিসাবে তিনি চরম সাফল্যই অর্জন করেছিলেন।

নাট্যবোদ্ধা হিসাবে শিশিরকুমার ছিলেন অতুলনীয়। যে কোন নাটক পাঠমাত্রেই তার দোষ-গুণ তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন; এমন কি কোন্ কোন্ অংশের পরিবর্তন ঘটালে নাটকের নাটকীয়ত্ব পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা যায়, একথাও অতি সহজেই বলতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় শ্রদ্ধেয় ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর মুখে শোনা একটি কাহিনী যথেষ্ট আলোকপাত করবে বলেই মনে হয়। ডাঃ অধিকারী বলেছিলেন—আমেরিকায় যাবার আগেই যোগেশ বাবু (চৌধুরী) বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকটি লেখেন। তাঁর বাড়ীতে নিশ্চিন্তে লেখার সুবিধা ছিল না বলে, তিনি আমার বাড়িতে বসে বসেই নাটকটি লেখেন। এক একটি দৃশ্য শেষ হ'ত আর আমাকে পড়ে শোনাতেন, তারপর বিশাল গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে লেখার কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে, এ নিয়ে আলোচনা করতাম আমরা।

শিশির বাবু আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর নাটকটির কথা তাঁকে বলা হয়, তা তিনি বলেন—লেখাটা একবার পড়ে শোনাতে পারেন? তাঁর বিডন স্ট্রীটের বাসায় লেখাটা নিয়ে গিয়ে পড়ে শোনালেন যোগেশ বাবু। সবটা শুনে শিশির বাবু এক এক করে কোথায় কি দোষ-ত্রুটি আছে বলতে সুরু করলেন: ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্যটা বদলানো দরকার। ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য এভাবে থাকা উচিত নয়; ৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা দুজনে দুজনের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। উনি হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—আপনারা আমার সঙ্গে রহস্য করছেন বলে মনে হচ্ছে।

তখন যোগেশ বাবু বললেন—না, রহস্য করিনি, তবে আমরা

দুজনে ছ' মাস ধরে আলোচনা করে যে-সব দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করেছিলাম, আপনি একবার শুনেই তা ধরতে পারলেন কি করে?

একটু হেসে তিনি বললেন—আমি যে মাতাল।

শিশিরকুমার সবচেয়ে শেষে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলোকে বাদ দিলে, সমস্ত কাহিনীটি থেকে একটা কথাই মনে হয়—কি অসাধারণ সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল তাঁর! যিনি একবার মাত্র শুনে একটি নাটকের সম্পূর্ণ দোষ-গুণ নখদর্পণে দেখতে পান, নাট্যবোদ্ধা হিসাবে তাঁর নামের আগে কোন বিশেষণই তাঁর গুণের পরিমাপ করতে সক্ষম হবে না।

এই সূক্ষ্ম রসবোধই তাঁকে যে নাটক লোকে অসম্ভব বলেছে তাকেই অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল। সকল রসিকব্যক্তিই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সংলাপসত্ত্বেও দেনা পাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ ষোড়শী শিশিরকুমারের অভিনয় ব্যতিরেকে কোনদিনই নাটক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারত না। জীবানন্দের মত অসম্ভব চরিত্রও যিনি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ করে তুলতে পারেন; তাঁর রসবোধ যে কত সূক্ষ্ম আর কত তীক্ষ্ণ, তা বলে বোঝান বাতুলতার নামান্তর।

শিশিরকুমারের এই সূক্ষ্মদৃষ্টি শুধুমাত্র নাটক-বিচারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উপরন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা প্রখরভাবে প্রকট হ'ত। একটা দৃষ্টান্ত দিই. একবার সারনাথের সংগ্রহশালায় বেড়াতে গিয়েছিলেন শিশিরকুমার, সঙ্গী ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, (কাহিনীটি তাঁর কাছ থেকেই আমাদের শোনা)। সংগ্রহশালার কিউরেটার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃবন্ধুকে সযত্নে সমস্ত কিছু দেখাচ্ছিলেন. এই সময়ে ওখানে একটি মূর্তি ছিল, সেটি যে কিসের মূর্তি বিশ হাজার নানান ধরণের দর্শকের কেউই তা ধরতে পারেন নি। অদ্রীশ বাবু শিশিরকুমারকে মূর্তিটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন, সেটি কিসের মূর্তি। শিশিরকুমার একটু লক্ষ্য করে বললেন—এ ত মঙ্গোলিয়ান ধরণের দ্বারপাল গোছের মূর্তি দেখছি। অদ্রীশ বাবুর খ, বিস্ময়ের প্রাবল্য কমতে তিনি স্বীকার করলেন, তিব্বতী ধরণের মূর্তিটির সারনাথে উপস্থিতি তাঁদের বিভ্রান্তই করেছে, অথচ বিশেষজ্ঞ বিদগ্ধ দর্শকরাও এর ধরণ ধরতে পারেন নি।

বিশ হাজার লোক যা দেখতে পায়নি শিশিরকুমারের চোখে তা পড়ল কি করে? তিনি নিজে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন—আমি যে বাবা মাতাল। কিন্তু মাতাল হলেই কি এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি পাওয়া যায়? তাহলে ত দেশের তাবত মাতাল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি হতে পারত। তা হওয়া সম্ভব নয় আর নয় বলেই মাতাল হ'ল বা না হ'ল শিশিরকুমার শিশিরকুমার, আর অন্যরা কিছু নয়। রাজরাণী মীরার একটি ভজনে এ পার্থক্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:—

দুধ পিনেসে হরি মিলে ত বহুত ব্যসবালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

নন্দলালকে পেতে হলে প্রয়োজন যে প্রেমের এই কথাই সার। অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যকে লাভ করতে হলে প্রয়োজন সাধনায় আর প্রয়োজন সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত বিধিদত্ত ক্ষমতা।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত—তিনি নাকি অত্যন্ত দাম্ভিক। প্রতিভার নিজস্ব একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় থাকে, তাকে অহমিকা বলে ভুল করা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু এ ধরণের ভুল করা অন্যায়, কারণ আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দাম্ভিক বললে তাঁর প্রতিভাকে অসম্মান করা হয়। প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, সে আপনার মাঝে আপনি হারায়ে কোন সুদূর দিগন্তে কল্পনার রঙীন পাখনায় ভর করে ভেসে বেড়ায়, দৈনন্দিনের রূঢ় বাস্তব তাকে স্পর্শ করে কিন্তু মনের মধ্যে তা স্থায়ী হয় না। এই আত্মনিমগ্নতাকে গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা দেবার চেষ্টা করলে তাকে কি দম্ভ বলা যায়?

শিশিরকুমারের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে বলতে পারি, তিনি মোটেই দাম্ভিক ছিলেন না। প্রথম দর্শনে অবশ্য এ ভুল হওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর চারদিকে একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যের বর্ম পরিয়ে রেখেছিল। পরিচয় কিছু ঘনিষ্ঠ হলেই বোঝা যেত, অত্যন্ত সদালাপী, হাস্যময় রসিক পুরুষ তিনি। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে তিনি প্রায় আমাদেরই সমবয়সী হয়ে পড়তেন। তাঁর সরস বাচনভঙ্গী ও নির্মল রসিকতায় প্রায়ই আমাদের দলে হাসির রোল উঠত।

অর্থের প্রতি শিশিরকুমারের অত্যন্ত মোহ ছিল, এমন একটা কথাও শোনা যায়। আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন পরিচয় হয় তখন তিনি অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও সিনেমায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, সে দিকে যাননি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সিনেমা তাঁর সৃষ্টির উপযুক্ত মাধ্যম নয়। আমাদেরও সেই কথাই বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পুরোনো নাটক পড়ে শোনানোর জন্য যখন কথা বলা হয়, তখন তাঁকে দর্শনী নিয়ে নাটক পড়ার কথা আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল। তিনি কিন্তু রাজী হননি, বলেছিলেন—না, বহুলোক এলে ঠিকমত ভাবে তারা পড়ার রস হয়ত পাবে না আর তাতে আমার মনও ভরবে না। তার চেয়ে তোমরা যদি আমার কাছে পড়া শুনে কোন লাভ হবে মনে কর ত তোমাদের কাছে গিয়ে পড়তে পারি। নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদ সৃষ্টির গোড়ার কথা এই।

এমন অনেক মানুষ থাকেন—যাঁরা আত্মসম্মানের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে চান না। আজকের বস্তুতান্ত্রিক যুগে আমরা তাঁদের ব্যবসা-বুদ্ধিহীন বা বোকা বলতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারি না। সেইজন্যই শিশিরকুমার যখন নিজের বিবেকের সঙ্গে আপোষ-রফা না করে বহু লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে চলে যান, তখন তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত আমাদের হতেই হয়।

শিশিরকুমারের যে অর্থের প্রতি অপরিমেয় মোহ ছিল না তার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। দীর্ঘকাল ধরে যখন থিয়েটার বন্ধ ছিল তখনও তিনি দলের কোন লোককেই বরখাস্ত করেননি, বরং প্রত্যেককেই নিয়মিত ভাবে কিছু কিছু অর্থ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া নিতান্ত অক্ষম হলেও পারত পক্ষে তিনি কোন লোককেই ছাড়াতে চাইতেন না। এমন কি, অনেকে তাঁর দল ছেড়ে চলে যাবার পর আবার যখনই ফিরে আসতে চেয়েছে তখনই তিনি তাদের সাদরে

অভ্যর্থনা করে নিতেন। এ প্রসঙ্গে কেউ কিছু বলতে গেলে, বলতেন—ভাখো, আমার যা বয়েস, তাতে পুরোনো কথা মনে করে মাথাটা অস্থায়। যারা আসতে চায় তাদের আসতে বাধা দেব না, আর কাউকে সেধে আসতেও বলব না।

ঊনবিংশ শতকে বাঙলা দেশে যে নবজাগরণের তরঙ্গ উঠেছিল, যার সাড়া জীবনের প্রতি কোষে নাড়া দিয়েছিল, যার পরিচয় বাঙলা সাহিত্য, বাঙলার কৃষ্টি, বাঙালী মনীষা, বাঙালীর চিন্তাধারা তথা বাঙালী সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে মূর্ত হয়ে উঠেছিল, শিশিরকুমার তারই অন্যতম শেষ ধারক ও বাহক। থিয়েটারে যোগ না দিলে চিন্তাজগতের অন্যত্রও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ সুস্পষ্ট হয়ে উঠত, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। তবুও তিনি কেন সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে স্বীকার করে নিয়ে থিয়েটারের বন্ধুর পথে এলেন?

প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্য থিয়েটারপ্রীতি, না শুধু প্রীতিই নয় প্রেম। থিয়েটারকে তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসতেন, তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই থিয়েটারের উন্নতির কথাই ভেবেছেন।

তা ছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন অভিনয়ই তাঁর true vocation, বলেওছেন—এটাই যা কিছু করতে পারি। A nation is known by its stage—এ কথাটা তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন, তাই প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দেশকে জাতিকে কিছু না কিছু ভাববার কথা তিনি শুনিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কথা শুধুমাত্র অরণ্যে রোদন সার হয়েছে কি না সে-খবর আমাদের চেয়ে অধিকতর ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলতে পারেন, আমরা শুধু এইটুকুই বলব যে, চিন্তার যদি সামান্য মূল্যও সমাজ দেয় ত শিশিরকুমারের চিন্তাধারা অমূল্য বলে বিবেচিত হবে।

আজকের সমাজ আর গত শতকের সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাই আজকের দিনে ঊনবিংশ শতকের ধারায় শিক্ষিত ভদ্র মার্জিত রুচির সঙ্গে আমাদের রুচিকে খাপ খাওয়ানো রীতিমত কষ্টসাধ্য। সমাজের যখন একমাত্র মন্ত্র—Dog eats dog. Everything is fair and devil take the hindmost; তখন শিশিরকুমার যে নিতান্তই বেমানান হতেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যতই রুচিবান আর যতই হৃদয়বান হোক, মাষ্টার মশায়ের হাতের বেতের কথা স্কুল-পালানো পড়ুয়ারা ভোলে কি করে? সুতরাং মাষ্টার মশায়ের অন্তর্ধানে সকলেই নিশ্চিন্ত।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের অবদান আজকে বিচার করা সম্ভব নয়, তবু এইটুকু বলা চলে যে, বাঙলা নাট্যজগতের অবিসম্বাদী সম্রাট গিরিশচন্দ্রের কাছাকাছি যিনি পৌছবার দাবী করতে পারেন, তিনি শিশিরকুমার। চাণক্য ক্ষত্রিয়ের দেহে ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক চেয়েছিলেন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সফল করবার জন্য, শিশিরকুমার সেই শক্তির অধিকারী হয়েও ব্যর্থ হলেন কেন, সে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

সহজাত কবচ-কুণ্ডলের অধিকারী কর্ণ অপরিমেয় পৌরুষ সত্ত্বেও কেন নিয়তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে রইলেন, কেন বার বার বিরূপ-ভাগ্যের তাড়নায় করায়ত্ত সাফল্যলাভ করতে পারলেন না, তার রহস্য ছিল তাঁর জন্মমুহূর্তের মধ্যেই। শিশিরকুমারের ক্ষেত্রেও এমনি একটা কিছু ঘটেছিল কি না তা বলতে পারি না, তবে দাতাকর্ণের দানের ছিদ্রপথের মত কোন এক কোমলতার ছিদ্রপথেই যে নিয়মিত অমোঘ' সন্ধান তাঁর মর্মচ্ছেদ করেছিল এ সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত।

যে মানুষ দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের কর্মজীবনে সর্বদাই নাটকের আবেদন হৃদয়াবেগের দিকে চালিত না করে মস্তিষ্কের দিকে চালিত করেছিলেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনে হৃদয়াবেগের দ্বারা এত বেশী ভাবে পরিচালিত হলেন কেন, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন! অনেক বিচার বিবেচনা করেও এ সমস্যার সমাধান করতে পারিনি।

নট, নাট্য-পরিচালক প্রযোজক শিশিরকুমার আর ব্যক্তি শিশিরকুমার যেন দুটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। নাটক সম্বন্ধীয় সব বিষয়ে যে ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় সেই ব্যক্তিত্বই ব্যক্তিগত হাসি-কান্নার দোলায় সম্পূর্ণ সাধারণ—এই দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের জন্যই তাঁর প্রতিভার মহত্তর প্রকাশের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে পড়েছিল। যদি তা না হত তাহলে নাট্যাচার্যের যে অত্যুজ্জ্বল ভাতি আমরা দেখতে পেতাম তা যা আমরা পেয়েছি তাকে বহু নীচে ফেলে রেখে যেত। কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!

শিশিরকুমার সম্বন্ধে যা কিছু বলার ছিল তা এবার শেষ হল। পাঠকদের কাছে ব্যক্তি শিশিরকুমারের কিছু মাত্র প্রকাশ যদি দেখাতে পেয়ে থাকি ত তাই আমাদের চরম সার্থকতা। বহুদিন ধরে পাঠকরা যে আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

মানুষ শিশিরকুমার গত হয়েছেন কিন্তু স্রষ্টা শিশিরকুমার রইলেন চিরজীবী, সেই মৃত্যুঞ্জয়ীর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করেই এই জীবনী শেষ করছি।

সমাপ্ত

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

৩

সুন্দরবনের দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়ীতে এক সময়ে তাঁর স্ত্রীর সাবিত্রী ব্রতোপলক্ষে বঙ্কিমবাবু ও তাঁর ভাইদের ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়। বঙ্কিমবাবু ও তাঁর দু'ভাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। ভোজনান্তে দক্ষিণা নেবার সময় তিনি দু'হাত বাড়ালেন। দিগম্বর বাবু বললেন—কি, তুমি দু'হাতে দক্ষিণা নেবে না কি ?

বঙ্কিমবাবু বললেন—না নিলে চলবে কেন ভাই ? গাড়ী ভাড়া এক টাকা দরকার। তিন ভাই-এর রোজগার দেখছি মাত্র বারো আনা, বাকী চার আনা কি আমি পকেট থেকে দেবো না কি ?

উপস্থিতের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। সেই খবর পেয়ে ভূদেব বাবু তাঁর ছেলে মুকুন্দদেবকে তাঁদের উভয়কেই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আসতে পাঠালেন।

মুকুন্দদেব গিয়ে দেখেন—হেমচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বোতলে মদ খাচ্ছেন বসবার আর ধৈর্য হয়নি।

তাই দেখে বঙ্কিম মুকুন্দদেবকে বললেন—দেখ, দেখ, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কাণ্ডকারখানা একবার দেখ।

সেই কথা শুনেই হেম বাঁড়ুজ্যে উত্তর দিলেন—আর দেখ তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আদর আপ্যায়নের ধরণ ধারণ, অভ্যাগতকে আসন গ্রহণের আহ্বান নেই।

মুকুন্দদেব উভয়ের কীর্তি দেখে থ'।

দীনবন্ধু ছিলেন বঙ্কিমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তিনি যখন সুপারনিউমারি ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাষ্টার ছিলেন তখন একবার কাছাড়ে গিয়ে ডাকের বন্দোবস্ত করে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন কয়েক জোড়া সেখানকার কাপড়ের তৈরী জুতো। দীনবন্ধু লোক মারফৎ এক জোড়া জুতো বঙ্কিমকে পাঠিয়ে দেন—সঙ্গে একখানা কাগজ, তাতে লেখা—কেমন জুতো ?

বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধুর লেখা পড়ে হাসলেন ও সেই লোক মারফৎ লিখে পাঠালেন—"তোমার মুখের মত"।

আদালতে বঙ্কিমের এজলাসে এক ব্যক্তি নালিশ করে যে সামনের বাড়ীর একটি লোক জানলা খুলে তার স্ত্রীকে রোজ দেখে।

বঙ্কিমবাবু রসিকতা করে বলেন—হাওয়া আর চোখ কি কারও মানা মানে গা ?

মামলা মিটিয়ে দেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য এক ভদ্রলোক থিয়েটারে গিয়ে তাঁর ঠিকানা চান। কোন অভিনেতা তাঁকে ঠিকানা দেন—১নং মৈত্র লেন।

তিনি ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে শ্যামবাজারের অলিগলি ঘোরেন। হদিশ পান না। অবশেষে অমৃতলালের নাম বলায় পল্লীর ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর হদিশ দেন। অমৃতলালের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলেন—আপনার ঠিকানা খুঁজতে বড় হয়রান হয়েছি, মৈত্র লেন আর খুঁজে পাই না এসে দেখছি রামচন্দ্র মৈত্র লেন তাও ১।২।

তাতে অমৃতলাল বললেন—কে ঠিকানা দিয়েছে ?

—থিয়েটারের কোনও এক অভিনেতা।

—ঠিকই হয়েছে জানেন তো অভিনেতারা আদ্ধেক মুখস্থ করেন আর আদ্ধেক থাকে প্রমটারের হাতে।

একদিন চুঁচড়ায় ভূদেব বাবুর বাড়ীতে বঙ্কিম ও ভূদেব উভয়েই কথায় ব্যস্ত, এমন সময় বাঁশবেড়ের জমিদার রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ ও মহেশ ন্যায়রত্ন এসে হাজির। বঙ্কিমের সঙ্গে ন্যায়রত্নের আলাপ ছিল না। ভূদেবের সঙ্গে ছিল। ভূদেব তাঁকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও বুঝি শ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছ ? তাই বুঝি বিদেয় মাজতে এসেছ ?

উত্তরে ন্যায়রত্ন বললেন না—না, ললিত বাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে এসেছি।

যদিও কথাটা সত্যি, কিন্তু ললিত বাবু তামাসা করবার জন্য বললেন—বটে, এখনি বামাল ধরিয়ে দেব, গাড়ীতে কলসী এখনও মজুত আছে।

বাস্তবিক ন্যায়রত্ন মশায়ের গাড়ীতে তখন একটা নতুন পেতলের কলসী ছিল। বঙ্কিমবাবু আর থাকতে পারলেন না, বললেন—অধ্যাপক মশাই, আপনি এখনও যদি শ্রাদ্ধে বিদেয়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়িও নেবেন। এই দড়ি কলসী নিয়েই তাঁদের সঙ্গে আলাপের সূচনা হয়।

সন্ধ্যায়া দিগম্বর বিশ্বাস যখন বর্ধমানে তখন প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, সঞ্জীব, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সাহিত্যের আসর বসত। একদিন সেইরূপ আসর বসেছে, সেদিন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যাসাগর সেদিন স্বহস্তে রেঁধেছিলেন। খাদ্যতালিকা ছিল—ভাত, মাংস ও আমআদা সহযোগে পাঁঠার মিটুলির অম্বল। বিদ্যাসাগর নিজে পরিবেশন করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খেতে খেতে বললেন—এমন সুস্বাদু অম্বল তো কখন খাইনি ?

সঞ্জীববাবু বললেন—হবে না কেন ? রান্না কার জান ত, বিদ্যাসাগরের।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।

একদিন কৈকালায় চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বসে বঙ্কিমচন্দ্র গল্প করছিলেন। এমন সময়ে সেখানে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এসে হাজির। ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে চন্দ্রশেখর বাবুর আলাপ ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্রশেখর বাবুকে দেখিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন—ওঁকে চেন না ?

চন্দ্রনাথ—না।

বঙ্কিম—উনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'।

প্যারীচাঁদ একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভায় এক প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রস্তাবের বিপরীত এক প্রস্তাবও সমর্থন করেন। তখন তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আর্থার উইলসন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এ কেমন ব্যাপার ?

তাতে প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠিত ভাবে বললেন—Am I not capable of amendment, Sir.

কোন এক সময়ে বাঙলার লেফটন্যান্ট গভর্ণর স্যর এসলির কাছে প্যারীচাঁদ কোন এক ব্যক্তির হয়ে সুপারিশ করেন। স্যর এসলি সেই সুপারিশপত্র সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেন। তবুও সেই ব্যক্তিকে বিফল হতে হয়। সেই ব্যক্তি প্যারীচাঁদকে আবার ধরেন। এবার প্যারীচাঁদ স্বয়ং এসলির কাছে সাক্ষাৎ করেন। প্যারীচাঁদের স্বয়ং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্যারীচাঁদ বলেন—আগে আপনি যে পত্র দিয়েছেন তাতে 'শ্রীযুক্ত' ছিল না—এবারে একখানি 'শ্রীযুক্ত' পত্র দিতে হবে, এই কারণেই আমার আসা। এসলি রহস্য বুঝতে না পারায় প্যারীচাঁদ তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন—কোন জমীদার তার কোন প্রজা আবেদনপত্র আনলে—তাতে স্বাক্ষর করে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নায়েবের প্রতি নির্দেশ ছিল "শ্রীযুক্ত" স্বাক্ষর ব্যতীত কোন আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তাই আবেদনে 'শ্রীহীন' থাকলে তা গ্রাহ্য হত না। তাই সেইজন্যে যাতে আপনি 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর দেন, তার জন্য আমি স্বয়ং এসেছি।

একথা শুনে এসলিও হাসতে হাসতে আদেশপত্র দেন। বলা বাহুল্য, সেবারে প্যারীচাঁদের মুখরক্ষা হয়।

যখন শোভাবাজারের নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজা' উপাধি পান তখন তাঁর অগ্রজ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 'মহারাজা' হননি। একদিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে দু' ভাইকে একত্রে দেখে প্যারীচাঁদ হাসতে হাসতে কমলকৃষ্ণকে বলেন—"রাজা বাহাদুর এবার ছোট ভাই 'মহারাজা'কে প্রণাম কর।"

রাজা বাহাদুর হাসতে লাগলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের কৌতুক শুনে দীনবন্ধু লিখেছিলেন—

"রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা"

কালীপ্রসন্নের প্রতিবেশী পাল মশাই গরীবের ছেলে। লেখাপড়া শিখে সভা-সমিতিতে গিয়ে বেশ গণ্যমান্য হন। কিন্তু তাঁর বাপের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি খালি গায়ে সংসারের কাজ, হাটবাজার করেন। কালীপ্রসন্নের এই সব দেখে বড় বিসদৃশ লাগল। একদিন পাল মশাই সোনার চেন, চাপকান পরে যাচ্ছেন এমন সময় তাঁর বাপ খালি গায়ে বাজার নিয়ে ফিরছেন। তাই দেখে কালীপ্রসন্ন গম্ভীর ভাবে বললেন—পাল মশাই, পাল মশাই, আপনি কোথা থেকে এমন চাকর পান ? আমাদের চাকর ব্যাটারা তো দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোয়—আপনার চাকরটি তো বেশ দেখছি রোদ্দুরে বার বার দোকান বাজারে যায়।

বলা বাহুল্য, পাল মশাই লজ্জিত হলেন আর জানালেন তিনি চাকর নন, তাঁর পিতা।

এক সময় প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) বাড়ীতে ব্রাহ্মণ-বিদায় হচ্ছিল। ছাতু বাবু স্বয়ং উপস্থিত থেকে দক্ষিণা দিচ্ছিলেন। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ছাতু বাবু তিন টাকা দক্ষিণা দেন। তারপর তরুণ বয়স্ক রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাইকে দুই টাকা দিলেন। তর্করত্ন দু' টাকা পেয়ে ছাতু বাবুকে বললেন—মশাই, আপনি পূর্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত (তিনে নেত্র) আর আমার প্রতি পক্ষপাত (দুয়ে পক্ষ) করলেন। আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন।

ছাতু বাবু তর্করত্নের বাক্‌চাতুর্যে প্রীত হয়ে আমোদ করবার জন্য বললেন—তর্করত্ন মশাই, ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেরই সম্ভব, মানুষের তো ত্রিনেত্র নেই ?

তর্করত্ন—আপনাকে তো আমরা আশুতোষ বলেই জানি, ত্রিনেত্র কই ? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য আছে শুনেছি।

তর্করত্নের কথায় প্রীত হয়ে ছাতুবাবু তাঁকে পঞ্চদশ মুদ্রা দক্ষিণা দেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও সঙ্গে তর্করত্ন রসিকতা করতে ছাড়তেন না। ছাত্র যাদবকিশোর গোস্বামীকে ডাকতেন—যাদব কি-শোর (শূকর) আর পড়ায় অমনোযোগী হলে উমেশকে বলতেন—"উ-ভো-মেষ।"

একদিন ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'র কার্যালয়ে বসে আছেন। আরও অনেকে আছেন। এমন সময় এক যুবক এসে ইন্দ্রনাথের কাছে বসলেন। আর কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

ইন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, পারি বৈ কি?

যুবক—বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানি আপনার মতে শ্রেষ্ঠ?

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—'কৃষ্ণচরিত্র' নামে সম্প্রতি বঙ্কিম বাবু যে উপন্যাসখানি লিখেছেন—সেখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই উত্তর শুনে সকলে হেসে উঠলেন—যুবকটি অপ্রতিভ হলো।

একদিন কথা উঠল—বঙ্কিম বাবু লিখেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর লেকচার দিয়েছিলেন, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

ইন্দ্রনাথ বললেন—একথা ঠিক, কারণ তখন গীতার ইংরেজি অনুবাদ হয়নি, এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন তাড়াতাড়ি উহা বুঝবেন কি উপায়ে?

ইন্দ্রনাথ আদালতে মোকদ্দমা করতে করতে রসিকতার সুযোগ কখনও নষ্ট করতেন না।

কোন এক মোকদ্দমায় পদ্মমণি নামে এক বারাঙ্গনা সাক্ষ্য দেবার পরে এক পুরুষ সাক্ষী দিতে আসলে সে পক্ষের উকীল তার নাম, পেশা জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রনাথ এ পক্ষ থেকে বলে ওঠেন—উনি পদ্মমণির অলি (ওলি)।

এক তন্তুবায় হাকিমের এজলাসে বিষম গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বললেন—এ যে একেবারে সুতোহাটার গোল দেখছি।

রায় বেরোলে—ইন্দ্রনাথ তা শুনে বললেন—বোনা হয়েছে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না। বলা বাহুল্য সে রায় টেকেনি।

এক সময়ে হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ উকীল তাঁর পিতার কাছে টাকা পাওনা বলে নালিশ করে। প্রতিপক্ষের উকীল হন ইন্দ্রনাথ। একে হাইকোর্টের উকীল তায় বাপের নামে পাওনা টাকার নালিশ! আদালতে লোকে লোকারণ্য।

এমন সময় 'পুত্র' উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে ইন্দ্রনাথ অতি সমাদরে তাঁকে বললেন—আসুন, আসুন, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, শাস্ত্রে বলে পিতৃঋণ কেউ শেষ করতে পারে না—আপনি তো ঋণ শোধ করেছেন—উপরন্তু আপনার পাওনা—আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ তাই আজ আপনাকে দেখবার জন্য লোকে লোকারণ্য।

কোন এক সাহিত্য-আসরে দা'ঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) এলেন। দা'ঠাকুর তখন 'বিদূষক' কাগজের সম্পাদক। সেই আসরে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্র—দা'ঠাকুরকে আসতে দেখেই সাদরে বললেন—এস, এস হে বিদূষক শরৎচন্দ্র।

দা'ঠাকুরও কম যান না। প্রত্যুত্তর দিলেন—'কেমন আছ ভাই, 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র।

এক্সপার্ট অ্যাডভার্টাইজিং-এর কানাইবাবুর ঘরে বসে আছি। এমন সময় দা'ঠাকুর এসে হাজির। দা'ঠাকুর আর কানাইদার সঙ্গে কবিতার লড়াই লেগে গেল। ক্রমে তা আদিরসাত্মক হয়ে উঠল।

আমি বলে উঠলুম—দা'ঠাকুর, আপনার মুখখানা যেন পায়খানা। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

দা'ঠাকুর হাত নেড়ে জবাব দিলেন—ঠিকই বলেছিস, আমার মুখ পায়খানা অর্থাৎ খানা (খাবার) পায়।

শরৎবাবু কাশীতে গিয়েছেন—খেয়াল হল, কাশীর গঙ্গার ওপারে রামনগরে যাবেন। সকালবেলায় নৌকা ভাড়া করে গঙ্গার ওপর দিয়ে রামনগরের কাছে এসে পৌঁছেছেন—এমন সময় দেখেন রামনগরের তীরে একটি মড়া পড়ে আছে—আর তার কিছু দূরে একটা গাধা চরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে শরৎ বাবু সঙ্গীদের বললেন—কাশীর মাহাত্ম্যের চেয়ে রামনগরের মাহাত্ম্য বেশী। কারণ এখানে মরলে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় দেখছি।

সকলে উৎসুক হয়ে বললে—কি রকম?

—কেন, জানেন না—কাশীতে মরলে স্বর্গবাস আর ব্যাসকাশীতে (রামনগরে) মরলে গাধা হয়। তা ঐ দেখুন, লোকটা সদ্য সদ্য মরেছে আর মরেই সদ্য সদ্য গাধা হয়ে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে।

তাই দেখে সকলে হাসতে লাগল।

দা'ঠাকুর পথে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—

রামু কোথায় হে?

বললুম—আশ্রমে আছেন।

বললেন—বেশ আছে। জেনে রাখ—যারা শ্রম করে খায় তারা শ্রমিক। আর যারা বিনাশ্রমে খায় তারা আশ্রমিক। বুঝলি, রামুকে কথাটা জানিয়ে দিস্।

অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বৈঠকে প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন চারুচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। নানা আলোচনা চলত।

একদিন গীতারত্ন জিতেন বাবু এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বিদ্যাভূষণ মশাই বললেন—এস হে গীতারত্ন, গীতার এই শ্লোকটার একটু ব্যাখ্যা করে দাও তো। এই বলে তিনি শ্লোকটি বললেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

গীতারত্ন সঠিক ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন—

তাই শুনে তিনি বললেন—না, না, ঠিক হল না, নতুন ব্যাখ্যা। তবে শোন—

এক গুরু আর শিষ্য, উভয়েই মদ্যপায়ী।

শিষ্য—গুরুদেব, শাস্ত্র যে মদের পক্ষপাতী নয়।

গুরু—কে বললে? শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝে ক'জন। আচ্ছা গীতা অর্থাৎ হিন্দুর Bibleএর চেয়ে তো আর বড় শাস্ত্র নেই। তাতেও মদের প্রশংসা আছে—মদের মাহাত্ম্য আছে।

শিষ্য—সে কি গুরুদেব! আমি যদিও সংস্কৃত জানি না। তবুও বাংলা গীতা পড়েছি—তাতে তো মদের কোন প্রশংসা নেই?

গুরু—চোখ দিয়ে পড়লে দেখতে পেতে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, তবে থাকি কোথা? 'মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি—'মদ্‌ভক্তা' অর্থাৎ মদের ভক্তরা যেখানে থাকেন তত্র তিষ্ঠামি—সেখানেই আমি থাকি—নারদ, কিনা—না—রদ; এ কথার রদ নাই। তবেই বোঝ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কারা। মদ বড় ভাল জিনিষ, অতি বলকারক।

গীতার আর একটা উপদেশ আবার শোন—সকল উপদেশের সার হচ্ছে গীতা তার আর এক কথা শোন—

"অত্র শূরা মহেষাসা ভীমার্জুনসমা যুধি"—

এর মানে কি? অত্র শূরা মহেষাসা অর্থাৎ মহেশ সা সা। অর্থাৎ এখানে শূরা কিনা মদ্য পান করলে কি হয়? না ভীমার্জুন সমা যুধি যুদ্ধে যেমন ভীমার্জুনের শক্তি, তেমনই শক্তি হয়। কিন্তু তখন যা তা মদ খেলে হ'ত না। তখনকার সময়ে ভাল মদ করত মহেশ সা। সুতরাং সা সুরা কীদৃশী না মহেশ সা সা, মহেশ সার দোকানের সুরা।

শিষ্য—আগে জানলে, গুরুদেব, এতটা সময় নষ্ট করতুম না। এই বলে একটা কাচের গেলাস সামনে ধরলে।

গুরুদেব আহ্লাদের সঙ্গে বললেন—কবিকথা মিথ্যে হবার জো নেই। কবি বলেছেন—

বোতল আর গেলাস
একটু যদি মেলাস,
মিকস্‌চার যে তৈরী হয়
অতি ফার্ষ্ট ক্লাস।

নাও, একটু পরীক্ষা করে দেখ।

চারুবাবু—গীতারত্ন, তোমার বইএ এই নতুন ব্যাখ্যাটা সংযোগ করো।

এক ন্যায়শাস্ত্র পড়া ছাত্র কলুর বাড়ী এসেছে। কলুর বাড়ীতে গরুতে ঘানি টানছে। গরুর চোখে ঠুলি গলায় ঘণ্টা। ন্যায়বাগীশ ছাত্র গরুর গলায় ঘণ্টা দেখে কলুকে জিজ্ঞাসা করল—ওহে বাপু, গরুর গলায় আবার একটা ঘণ্টা লাগিয়েছ কেন?

কলু—আমাকে বাড়ীর অনেক কাজ করতে হয়। সব সময় গরুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই গরু যখন ঘুরবে না, ঘণ্টাও বাজবে না তখন আমি বুঝব ঘানি ঘুরছে না।

তখন নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁর টনটনে বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে বলল—ঘণ্টা নাড়া নিয়ে কথা, তা যদি গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে তা হলে কি করে বুঝবে? তখন কলু বলল; গরু তো আপনার মত ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, এই যা সুবিধে।

তোমার পাঠক নেই

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীকরুণাময় বসু

হে অস্থির জীবন যন্ত্রণাকামী
মহাশিল্পী, কার লাগি লেখ উপন্যাস?
মূঢ়চিত্ত ক্ষীণবুদ্ধি সিনেমা-দর্শক যারা
কি বুঝিবে তোমার আশ্চর্য জীবন-শিল্প,—
তির্যক্ সুতীব্র বেগবান:
অর্থবহ জীবনসংজ্ঞায় কঠিন কর্কশ সাহিত্যরীতি
অকুণ্ঠিত দৃঢ়হাতে করেছে গ্রহণ।
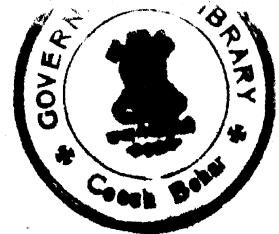
নির্ভয়ে করেছ বিচরণ কেন্দ্রাতিগ ব্যক্তিত্বের পথে
অবিন্যস্ত সমাজ-সংস্কার রূপ অসাধু-পঙ্কিল যেথা।
অন্ধকার রোমান্টিক সাহিত্যের মর্মভেদ করি
তুমি হলে তীক্ষ্ণ সূর্য-আগ্নেয় উন্মেষ।
অগ্নিস্রাবী বেদনার ক্ষুরধার ভাষা
নির্মম সত্যের মতো উলঙ্গ উজ্জ্বল স্পষ্ট শাণিত লেখনীমুখে।

ভণ্ডামি মুখোশ-পরা সৌখীন এ ধনতন্ত্রবাদ
স্বীকার করোনি তুমি, তাই বুঝি আত্মবিসর্জন?
ক্রুর ব্যঙ্গ বাঁকানো অস্ত্রের মুখে
খণ্ড খণ্ড বিশ্লেষণে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ
সাধুতার ধূর্ততাকে: ছিন্নভিন্ন করেছ কি তোমার জীবন?

তোমার নির্ভুল সাহিত্য-দর্পণে
বিপর্যস্ত সমাজ-দর্শন, সমাজের দেবতারা দেখে ভয়ে
নিজেদের অকৃত্রিম ভণ্ডামির রূপ।

তোমার পাঠক নেই,
এ তোমার স্পর্ধিত অহঙ্কার:
স্থূল রুচি বিকৃত যৌনবুদ্ধিবাদী সিনেমা-সাহিত্য-পাঠক যারা,
মহোল্লাসে সিনেমার লারেলাপ্পা গান যারা শোনে,
কি বুঝিবে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-দর্শনবাদ,
আত্মসমীক্ষার নির্ভুল বিচারবুদ্ধি,
তোমার সাহিত্যের তীক্ষ্ণ সত্য-সূর্যের প্রকাশ।
তুমি এক মহাশিল্পী কঠিন দুঃসহ আত্মযন্ত্রণার।
মর্মান্তিক প্রেরণায় উদ্‌বোধিত করিয়াছ
আত্মার চরম অভীপ্সা, জীবনের অস্থির সুতীব্র ব্যথা।
তুমি নেই, তোমার পাঠক নেই,
কে জানে অনতিদূর অনাগতকালে
রাষ্ট্র দেবে সর্বোচ্চ সাহিত্যসম্মান খ্যাতি,
জনগণ নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা দেবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পীকে।
সেই দিন আর কতো দূর?

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম

শ্রীমতী আশালতা দেবী

ভারতে দীর্ঘ বৃটিশ শাসনের অবসান হয় ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করে ভারত ত্যাগ করেন নাই। বৃটিশের বন্ধনমুক্ত হওয়ার জন্য ভারতের স্থানে স্থানে যে সমস্ত সশস্ত্র বিপ্লব হতো, তাই শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে, চট্টগ্রামের সংগ্রাম তাদের অন্যতম। যাঁর নেতৃত্বে ভারতের এক কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়মণ্ডিত চট্টগ্রামে বিপ্লবের প্রলয়-বহ্নি দেখা দিয়েছিল, তাঁর নাম সূর্য্য সেন। আজ তিনি সারা বাংলায়, তথা সারা ভারতে মাষ্টারদা' নামে পরিচিত।

কংগ্রেস-সেবক হিসাবে চট্টগ্রামে তখন মাষ্টারদা'র অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু কংগ্রেস-সেবক হইলেও অহিংসপথে স্বাধীনতালাভ হতে পারে, এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই তিনি গোপনে গোপনে বিপ্লবীসংস্থা গড়ে তোলায় মন দিলেন। তাঁর চেষ্টায় চট্টগ্রামের সর্ব্বত্র দ্রুত বিপ্লবীসংস্থা গড়ে উঠতে লাগল। বাংলার তদানীন্তন বিখ্যাত অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বহু স্থানীয় কর্ম্মী মাষ্টারদা'র গঠিত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে, দেশের অন্তস্তলে ইংরেজ-বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত, বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়মান, ইংরেজকে আঘাত হানবার এইটাই উত্তম সুযোগ মনে করলেন মাষ্টারদা'। তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল ভারতের মুক্তির জন্য মৃত্যুপণ করে। "যুগান্তরের" প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংগীত তাদের শক্তি যোগায় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে :—

আয় আজি মরিবি কে?
জরার মত না লভি মরণ
সাধকের মত মরিবি কে?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির,
নিশীথ শ্মশানে পিশাচ অধীর।
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?
অসুর নিধনে কিসের তরাস? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর, হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?
মাতি সৌরভে যশগৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?

বিপ্লবী দলের সকলের সম্মতি নিয়ে মাষ্টারদা' স্থির করলেন নিম্নলিখিত কর্মতালিকা :—

১। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

২। রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস আক্রমণ ও ধ্বংসসাধন।

৪। রেলওয়ে পথ তুলে দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া।

৫। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

৬। সরকারী ট্রেজারী আক্রমণ।

৭। জেলখানা আক্রমণ, কয়েদীদের মুক্তিদান এবং তাদের কাজে লাগানো।

৮। সহরের বন্দুকের দোকানগুলি লুণ্ঠন।

৯। ইংরেজ সমর্থকদের শাস্তিবিধান।

১০। লুণ্ঠিত অস্ত্রে বিপ্লবীদলকে শক্তিশালী করে এবং বাংলার অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের সহায়তায় ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়ন।

শত শত বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে থেকে মাষ্টারদা' বাছাই করে ৬২ জনের একটি তালিকা তৈরী করলেন। এদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এই ছয়জনের উপর ভার দিলেন কার্য্যসূচী অনুসারে কাজ চালাবার জন্য, এক কথায় সর্ব্বাধিনায়কের অধীনে এই ছয়জন নির্ব্বাচিত হলেন বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি, সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন তাঁর এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দিলেন ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাতের বেলায় ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী কার্য্যসূচী হিসাবে কাজ আরম্ভ করে সেদিনের বৃটিশের বিরুদ্ধে চটলার বীর যুবকদের সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে বর্ণনা করা গেল।

"মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশেতে চার দল হয়ে,
অন্ধকারে বিপ্লবীরা চলিল এগিয়ে।
আটজন সেনা নিয়ে বীর লোকনাথ বল।
পাহাড়তলী অস্ত্রাগার করিল দখল।
অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ অন্যদল নিয়ে,
পুলিশের অস্ত্রাগার আক্রমিল গিয়ে।

পাঁচশো পুলিশ ঘেরা ঐ অস্ত্রাগার,
নিমেষে দখলে এলো বিপ্লবী সেনার।
সে সময়ে অম্বিকাবাবু নিয়ে একদল,
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ করিল দখল।
রাতারাতি এক দল গিয়ে লাংগলকোটে,
যোগাযোগ ছিন্ন করতে রেললাইন কাটে।
প্রতিদল নিজকাজ করি সমাপন,
পুলিশ অস্ত্রাগারে গিয়ে সমবেত হন।
"ইনক্লাব জিন্দাবাদ" আর "বন্দে মাতরম্,"
মুহুর্মুহু করে ধ্বনি বীর সেনাগণ।
গঠিত হইল সেথা বিপ্লবী সরকার,
সর্ব্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ হল মাষ্টারদা'র।
সমগ্র চাটগাঁয় উড়ে তিনবর্ণে আঁকা,
ভারতের আশাস্থল জাতীয় পতাকা।"

(শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম" কবিতা হইতে)

রাতারাতি চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁদের পরিজনদের নিয়ে নদীর মাঝখানে নোঙ্গর ফেলে রইলেন। তিনদিন সারা চট্টগ্রামে ইংরেজদের কোন সাড়া-শব্দই পাওয়া গেল না।

রণক্লান্ত বিপ্লবীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। ২২শে এপ্রিল গোরা সৈন্য এসে আক্রমণ করে সেই পাহাড়টি চতুর্দ্দিক থেকে। মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশে আবার লড়াই সুরু হল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলল। বিপ্লবীদের ১২জন নিহত হলেন, কিন্তু তাদের তুলনায় অনেক বেশী ইংরেজ সৈন্য আহত ও নিহত হল। জালালাবাদে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী যুবক যে বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল দেখিয়েছিলেন, তা সত্যই অতুলনীয়। রাত্রির অন্ধকারে ইংরেজ সেনাদের বেষ্টনী ভেদ করে বিপ্লবীরা জালালাবাদ থেকে বেরিয়ে আত্মগোপন করেন। একটানা তিন দিন তিন রাত বিপ্লবীদের মুখে এক কণা খাদ্য পড়েনি, মুখে পড়েনি এক ফোঁটা জল। বিশ্রাম ও ঘুম তো তারা ভুলেই গেছেন, কী দুঃসহ দুঃখকষ্ট ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যে তাদের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুধু এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, কিসের প্রেরণায় এবং কাদের কল্যাণের জন্য বিপ্লবীদের এই তিলে তিলে আত্মাহুতি ?

মাষ্টারদা' আত্মগোপন করলেন, কিন্তু আত্মগোপন করেও দলের ছিন্ন সূত্রের যোগসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন কয়েক জন বিপ্লবী নায়ককে সঙ্গে নিয়ে। ইংরেজ এবার বিপ্লবীদের ধরবার জন্য সর্ব্বত্র ফাঁদ পাতল।

৫ই মে ১৯৩০ সাল, রজতকুমার সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী, এই ছয় জন পলাতক বিপ্লবী চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্ত্তী শ্বেতাঙ্গ মহল আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কিন্তু সেখানে প্রচুর ইংরেজসৈন্য থাকায় আক্রমণ করা সম্ভব হল না। তাঁরা ফিরে আসবেন স্থির করলেন, এমন সময় দেখেন সুসজ্জিত ইংরেজসৈন্য তাদের আক্রমণ করেছে আর কালারপোলবাসী দলে দলে মুসলমান ইংরেজের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল গুলী-বিনিময়, একদিকে ছয়জন স্বদেশপ্রেমিক যুবক, অন্যদিকে বিরাট ইংরেজবাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারী হাজারের উপর মুসলমান। সুবোধ চৌধুরী ও মণীন্দ্র নন্দী আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। বাকী চারজন যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত অবস্থায় তিন শত পুলিশ ও অসংখ্য মুসলমানের চোখে ধুলি দিয়ে নিকটবর্ত্তী শনবনে আত্মগোপন করেন।

রাত শেষ হলে পর অসংখ্য পুলিশ এসে শনবন ঘিরে ফেলে, আর সাহায্যকারীর দলও তাদের সঙ্গে আসে. একদিকে চারজন যুবক আর অন্যদিকে বিরাট ইংরেজবাহিনী ও গ্রামের অসংখ্য মুসলমান, পুলিশের কর্ত্তা বিপ্লবী যুবকদের আত্মসমর্পণ করতে আদেশ করলেন। বিদ্রোহীরা জবাব দিলেন গুলী চালিয়ে। আবার লড়াই সুরু হল, যেমন একদিন হয়েছিল বুড়ীবালামের তীরে—বাঘা যতীনের সঙ্গীদের লড়াই টেগার্টের বাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধ করতে করতে রজত সেন, স্বদেশ রায়, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন প্রাণত্যাগ করলেন।

এর পর পুলিশ আর মিলিটারীর অত্যাচার চট্টগ্রামের বুকে অবাধ গতিতে চলতে লাগল। অত্যাচার কতদূর চরমে উঠেছিল, তা নিম্নলিখিত কবিতা হতে বুঝা যায়।

"ধরিবারে বিপ্লবীদের পাতা হল ফাঁদ,
হিন্দুপর অত্যাচার চলে দিনরাত।
গুণ্ডাদল সঙ্গে করে পুলিশের দল,
নারীর সতীত্ব কাড়ে গৃহস্থের সম্বল।
হিন্দু ব্যবসায়ী যত শহর এলেকার,
প্রত্যেকের লুঠে ঘর দিনের বেলায়।
অকথ্য অত্যাচার চলে হিন্দুর উপরে,
ভাষাতে না পাই খুঁজে ইহা বর্ণিবারে।
জর্জ্জরিত জেলাবাসী আসাহুল্লার অত্যাচারে,
পথে ঘাটে হিন্দুদের মারে নির্বিচারে।
চৌদ্দ বৎসরের বালক এক হরিপদ নাম,
গুলী করে আসাহুল্লায় পাঠায় স্বর্গধাম।
সূঁচ ফোটা ব্যাটারী চার্জ্জ আর বেত্রাঘাত,
সঙ্গীনের খোঁচাতে তার করায় রক্তপাত।
এ ভাবেতে অত্যাচার চলে বালক উপর,
ভাষায় প্রকাশে না ইংরেজ কতই বর্ব্বর।
প্রতিবার অত্যাচারে বালক উচ্চ স্বরে কয়,
বৃটিশের ক্ষয় হোক্ মাষ্টারদা'র জয়।
জেলাময় অবিরাম চলে অত্যাচার,
অত্যাচারে প্রতি ঘরে উঠে হাহাকার।"

(শ্রীসুদর্শনরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম" কবিতা হইতে)

ইংরেজরা মনে করল যে, নরনারী নির্ব্বিচারে সকলের উপর অত্যাচার করলে বিপ্লবীরা ধরা দেবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাদের ধারণাই ঠিক হল। অনন্ত সিংহ হাজার হাজার পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে কোলকাতায় গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ধরা দেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবীও কিছুদিন পর ইংরেজের অতর্কিত আক্রমণে ধরা পড়েন। এবার ইংরেজরা সূর্য্য সেন, নির্মল সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে সমস্ত বিপ্লবী তখনও ধরা পড়েন নাই, তাঁরা কিন্তু চুপ করে ছিলেন না। তাঁরা স্থানে স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ করে অস্থির করে তুলছেন, সুযোগ পেলে ইংরেজদের হত্যা করছেন। একদিন প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবী দলের কয়েকজন চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। আক্রমণ সফল হল কিন্তু প্রীতিলতা আত্মহত্যা করলেন সেখানেই।

বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা ধরা পড়লেন, তাঁদের বিচার আরম্ভ হল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, সহায়রাম দাস, ফকির সেন, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রণধীর দাশগুপ্ত এই বার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। কয়েক দিনের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ও সরোজ গুহের বিচার হল, তাঁদেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল।

মাষ্টারদা', এতেও হতাশ হলেন না। তিনি আবার নতুন ভাবে বিপ্লবীদল গঠনে মন দিলেন, তাঁর প্রতিজ্ঞা যে কোন ভাবে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মাষ্টারদা'র এক নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তি ইংরেজদের নিকট হতে পুরস্কারের লোভে তাঁকে (মাষ্টারদা'কে) ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেয়। মাষ্টারদা' গ্রেপ্তার হওয়ার পরও বিপ্লবীদের কাজ চলতে থাকে। এইবার নেতৃত্বের ভার পড়লো বিপ্লবীবীর তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর, গোপনে খবর পেয়ে একদিন বিরাট ইংরেজ বাহিনী অতর্কিতে বিপ্লবীদের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র আক্রমণ করে। দুই পক্ষে যুদ্ধ চলল। যুদ্ধে দুইজন বিপ্লবীবীর নিহত হল এবং তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দী হল। তারকেশ্বর দস্তিদার বন্দী হওয়ার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবের অগ্নিশিখা নিভে গেল।

এইবার মাষ্টারদা,' তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার আরম্ভ হল। বিচারে মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হল এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির দৃশ্যটি 'বৃটিশ জাতির চরম বর্ব্বরতার নিদর্শন, তা নিম্নলিখিত কবিতা হতে বুঝা যায়।

"মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বর দুই বিপ্লবী নেতার,
বিচারক রায় দেন ফাঁসি দুই জনার।
গভীর নিশীথে পুলিশ চুপি চুপি আসি,
দুই বীরে জানাইল দিতে হবে ফাঁসি।
কিল ঘুসি মারে পিঠে বিপ্লবী নেতার,
ফাঁসির পূর্ব্বেতে করে নির্ম্মম প্রহার।
প্রহারেতে দুই বীর জর্জ্জরিত কায়,
মাতৃমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে ফাঁসি-মঞ্চে যায়।

একই সঙ্গে ফাঁসি-মঞ্চে উঠে দুইজন,
জাগ্রত পাষাণপুরী হাঁকে বন্দে মাতরম্ ॥"
(শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লিখিত "মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম" কবিতা হইতে)

মাষ্টারদা' ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির পর চট্টগ্রামের বিপ্লবের বহ্নি নিবে গেল সত্য, কিন্তু এই বিপ্লব দমন করতে গিয়ে ইংরেজদের যে বেগ পেতে হয়েছিল, তাতে তারা বুঝতে পারে যে ভারতীয়দের আর বেশী দিন অধীন রাখা সম্ভব হবে না এবং চট্টগ্রামের মত যুগপৎ আর কয়েকটি জেলায় বিপ্লব দেখা দিলে তারা পলায়নের সুযোগও পাবে না। তাই ভারতের অমঙ্গলকামী ইংরেজরা আপোষে ভারতের শাসন-ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে যাবে স্থির করল, যাতে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয়েরা অধীন যুগের চেয়ে বেশী অস্বস্তি বোধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে।"

কবিগুরুর উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে গেল। কিন্তু পশ্চাতে যে জঞ্জাল রেখে গেল, তার জন্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ইংরেজকে ক্ষমা করবে না।

আর যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য বৃটিশের গুলীতে প্রাণ হারালো, তাদের আত্মত্যাগের মূল্য কি কেহ দিয়েছেন? কিসের জন্য এবং কাদের দোষে ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত চট্টগ্রামবাসীরা ভারতে জন্মগ্রহণ করেও আজ অভারতীয়? কোন রাজনৈতিক নেতা বা ঐতিহাসিকের নিকট এই প্রশ্নের জবাব কি কোন দিন পাওয়া যাবে?

এসো না আমরা

গীতা মুখোপাধ্যায়

এসো না আমরা অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
যেখানে কোথাও কোনো বাধা, কোনো বারণ নাই।
যেখানে আকাশ মাটিতে মিশেছে প্রান্ত দেশ;
একা তালগাছ দাঁড়ায়ে রয়েছে নির্নিমেষ।
যেখানে কোথাও কাহারো চোখের ভ্রূকুটি নাই।
এসো না আমরা সেইখানে প্রিয় হারিয়ে যাই॥
হেথা কোলাহল, এখানে অনেক লোকের ভিড়;
দুটো কথা বলি, নাহিক এমন শান্তিনীড়।
তোমার আমার দুজনার হেথা হবে না ঠাঁই।
এসো না আমরা, অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
যেথা শালবন শিমুল পিয়াল রঙের ঢেউ;
আমাদের খুঁজে পাবে নাকো আর কখনো কেউ।
সেথা দুজনার গুঞ্জনভরা জীবনটাই।
এসো প্রিয় এসো, অনেক দূরেতে হারিয়ে যাই।
তোমার বুকেতে মাথা রেখে মোর কাটিবে দিন।
উদয় হইতে সূর্য্য যখন হইবে বিলীন।
চাঁদের আলোর নিবিড় করিয়া তোমাকে চাই।
এসো সখা এসো আমরা দুজনে হারিয়ে যাই।

মেঘে ঢাকা তারা

"ঝরাফুল"

'মেঘে ঢাকা তারা' নয় মেঘে ঢাকা জাতির জীবন।
রসাতল পানে ছুটে যেতে চেয়ে অন্ধ তমিস্রায়।
শিহরিয়া উঠে: দেখে সম্মুখেতে অতল গহ্বর
আর্ত্তনাদে হাহাকারে বলে—বাঁচিতে চাই গো বাঁচিতে চাই।
কলির কল্কি—কোথা তুমি বলো আজও কি গোপন রবে?
কালোবাজারের পীড়নে মানুষ কাটায় অর্দ্ধাহারে
শিক্ষায়তনে তচনচ করে দস্যুতা করে কারা—
কোন অবুঝ ব্যথায় ভেঙ্গেছে পরাণ হয়েছে পশুর সম।

হে শুভ সুন্দর সত্য নির্ম্মল আর কি দেবে না দেখা—
চির কালিমায় ঢাকা রয়ে যাবে আমাদের পরিচয়?
কেমনে ঘুমাও—শোন না কি ওই কি রোদন দিকে দিকে?
বাঁচিতে চেয়েছি বাঁচিতে যে চাই বাঁচাবে কে, বাঁচাবে কে?

স্মৃতি

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের আকাশে জ্বল-জ্বল করে তারার টিপ,
আঁধারের ছবি রাতের ফ্রেমের বুক জুড়ে
কুহেলির বুকে জোনাকিরা জ্বালে সাঁঝ-প্রদীপ
সরযূ আজ স্বরলিপি খোঁজে ঐ দূরে।

তারার মিছিল চাঁদের সভায় দেয় সাড়া
পাতা ঝির-ঝির সরযূ আজ তন্দ্রাতুর—
মেহেদি গন্ধ বনান্তরেতে সুরহারা
মনে হ'লো আজ তুমি চলে গেছ কতদূর।

সেদিনও এমনি মেদুর-নরম সন্ধ্যাতে
এক হয়ে ছিনু তুমি আমি দু'টো ফোটাফুল;
তোমার চুলের পেলব রজনী-গন্ধাতে
ভুলেছিনু আমি জীবনের যত অ-প্রতুল।

সেদিনও তোমার কাজল চোখের দুইটি তীর
দেখেছি যে আমি অতনু চাওয়ার জলছবি;
ভালবাসা-জলে টইটম্বুর হৃদয় নীর
পূর্ব্বরাগের রঙ মুছে গেছে আজ সবই।

এখন আকাশ অশ্রু ঝরায়: বৃষ্টি-জল
আমার হৃদয় হারিয়েছে তোমা' সবলি...
স্বপ্ন আমার হারানো ব্যথায় হয় উছল
কূলের সে দিশা হারিয়েছে মোর তরণী।

এস না আমার ব্যর্থ-প্রেমের ভগ্নচুর
মনে হ'লো আজ তুমি চলে গেছ কতদূর।

জাহাজ্ঞেবরবানু ও শাহারবানু বেগম

শিবানী ঘোষ

দারা শুকোর কন্যা জাহাজ্ঞেবরবানু অত্যন্ত উন্মনা হয়ে বসে থাকে আপন কক্ষে। অদূরে বসে রয়েছে তার নিত্যসহচরী মাসুমা।

দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। কয়েক গোছা চুল উড়ে এসে পড়েছে জাহাজ্ঞেবরবানুর মুখের ওপর। তার মনটা বড় বেশী ভারাক্রান্ত।

এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করলেন জাহানারা।

দারা শুকো আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হলে তাঁর নাবালিকা কন্যা জাহাজ্ঞেবরবানুকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন শাজাহান-তনয়া জাহানারা। সেদিন থেকে তিনিই তাকে মানুষ করে এসেছেন অত্যন্ত আদর-যত্নে। তাকে আদর করে নাম দিয়েছেন জানী বেগম। ঐ জানী বেগমও তার পিসিমার আওতায় থেকে শিক্ষায় দীক্ষায় হয়ে উঠেছে বিশেষ পারদর্শিনী।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে জাহাজ্ঞেবরবানুকে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকতে দেখে জাহানারা বলেন—কি হয়েছে রে জানী? এমন চুপ করে বসে রয়েছিস যে?

পিসিমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায় জাহাজ্ঞেবরবানু। তবে তখুনি সে ভাব কাটিয়ে উঠে সে বলে—কি আবার হবে পিসিমা!

জাহানারা বলেন—উঁহু। চোখ-মুখ ভার-ভার দেখছি। চুলটাও বাঁধা হয়নি। সত্যি করে বলতো কি হয়েছে?

ওড়নার প্রান্তভাগটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে মুখ নিচু করে জাহাজ্ঞেবরবানু বলে—কিছু হয়নি বলছি পিসিমা!

তখন সহচরী মাসুমা বলে—একেবারে কিছু হয়নি একথা বলা চলে না বেগম সাহেবা!

জাহানারা জিজ্ঞেস করেন—ওর কি হয়েছে রে মাসুমা?

মাসুমা বলে—আসলে শাহজাদীর হয়েছে কি—

তার কথার মাঝখানেই জাহাজ্ঞেবরবানু মাসুমার পানে তীব্র কটাক্ষপাত করে বলে—আমার কি হয়েছে তা তুই কেমন করে জানবি?

মাসুমা হেসে বলে—আমি সব সময় তোমার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াই আর তোমার মনের কথা আমি বুঝি না? আসলে কি হয়েছে জানো বেগম সাহেবা, শাহজাদা মহম্মদ আজম যখন আপনার কাছে এসেছিলেন তখন শাহজাদী একবার গিয়েছিলেন এ বারান্দায়। তা তখনই মহম্মদ আজমের দৃষ্টিবাণ এসে আহত করে দিয়েছে কুমারীকে। সেই সময় থেকেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে শাহজাদীর মন।

মাসুমার কথা শুনে জাহানারা জাহাজ্ঞেবরবানুর কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলেন—এ কথা সত্যি নাকি রে জানী?

জাহাজ্ঞেবরবানু একটু নীচু করে নেয় মুখটা।

জাহানারা বলেন—তা এতে লজ্জা পাবার কি আছে? আমাকে এতক্ষণ এ কথা বলিস নি কেন? তা হ্যাঁ রে জানী—

জাহাজ্ঞেবরবানু একবার মুখ তুলে তাকায় তার পিসিমার পানে। জাহানারা বলেন—আজমকে তুই কি সত্যি ভালবেসেছিস?

কোন কথা না বলে পুনরায় মুখ ফিরিয়ে নেয় জাহাজ্ঞেবরবানু। জাহানারা বলেন—কিন্তু ভেবে দেখ জানী, আজম বড় উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। সে তোর স্বামী হওয়ার মোটেই উপযুক্ত নয়। তুই যত বিভিন্ন গুণের অধিকারিণী। তোর স্বামী হবে শৌর্যে-বীর্যে অদ্বিতীয়। তবে আজমকে যদি তোর সত্যি ভাল লেগে থাকে তবে আমি বারণ করবো না। তা ঠিক করে বলতো, তাকেই চাই তোর?

জাহাজ্ঞেবরবানু বলে—হ্যাঁ পিসিমা, তাকে না পেলে আমি সুখ পাব না।

সেই দিনই জাহানারা বেগম তাঁর ভ্রাতা আওরঙ্গজেবকে পত্র লিখে ঠিক করে ফেললেন আজমের সাথে জাহাজ্ঞেবরবানুর বিবাহ।

এই বিবাহ মোগল রাজপরিবারে আনলো এক আনন্দের জোয়ার। বিশেষ করে জাহাজ্ঞেবরবানুর পরশমণিতে উদ্ধত প্রকৃতি আজম শান্ত হয়ে গেল অনেকখানি। পুত্রের এই পরিবর্তন দেখে অত্যন্ত তুষ্ট হলেন আওরঙ্গজেব। পুত্রবধূ জানী বেগম তাই দুদিনেই প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠলেন সম্রাটের।

জাহাজ্ঞেবরবানুও এতে গর্ববোধ করে বিশেষ করে। স্বামী যে একান্তই তার বশ এই ভেবে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার এই অহঙ্কারে আঘাত পড়লো বিজাপুর যুদ্ধের সময়।

সে বার আওরঙ্গজেব পুত্র আজমকে পাঠাতে মনস্থ করলেন বিজাপুর অবরোধের জন্যে। কিন্তু পতিপ্রাণা জাহাজ্ঞেবরবানু স্বামীকে একলা যেতে দিতে রাজী হয় না। ফলে সে-ও আজমের সাথে যাত্রা করে বিজাপুর অভিমুখে।

কিন্তু বিজাপুর অবরোধের সময় চঞ্চলমতি আজমের পক্ষে সুষ্ঠু-ভাবে সৈন্য পরিচালনা করা হয়ে ওঠে অসম্ভব। ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তার সেনাদল। যুদ্ধে জয়ের আশা হয়ে ওঠে সুদূরপরাহত।

সেই অবস্থায় যুদ্ধে অবতীর্ণা হল জাহাজ্ঞেবরবানু। সে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে থাকে তার সেনাদলকে। তারই প্রচেষ্টায় সে বার সম্ভব হল মোগলের পক্ষে বিজাপুর জয় করা।

যখন বিজাপুর জয় সম্পূর্ণ হল তখন জানী বেগম ফিরে আসে আপন শিবিরে। সেখানে সে অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকে স্বামীর জন্যে। এখুনি হয়ত সে ছুটে এসে নিজের গলা থেকে মালা খুলে পরিয়ে দেবে তার গলায়। কিন্তু তার ফিরতে দেরী দেখে চিন্তিত হয়ে ওঠে জাহাজ্ঞেবরবানু।

কি হল, আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? সে তখুনি লোক পাঠিয়ে দেয় স্বামীর খোঁজে। কিন্তু খবর পাওয়া গেল মহম্মদ আজমের ফিরতে বিলম্ব হবে। সন্ধির শর্ত সম্পূর্ণ মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসতে পারবেন না।

এ কথা শুনে অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পায় জানী বেগম। তার সাথে একবার দেখা করে যাওয়ার চেয়ে সন্ধির শর্ত মিটমাট করার প্রয়োজন হল বেশী? বেশ তবে সে এখুনি ফিরে যাবে দিল্লীতে। তার কোন প্রয়োজন নেই স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে থাকা।

সেই দিনই অভিমান করে দিল্লীর প্রাসাদে ফিরে যায় জাহাজ্ঞেবরবানু। সে অনুমান করে এতে অন্তরে আঘাত পাবে তার স্বামী। তখন সে তার কাছে এসে চাইবে ক্ষমা-ভিক্ষা।

কিন্তু তা তো হলই না, উপরন্তু আজম দিল্লী ফিরে এসে একটিবারের জন্যেও সাক্ষাৎ করে না তার [illegible] সাথে।

স্বামীর এই আচরণে হতবাক হয়ে যায় জাহাঙ্গেববানু। হঠাৎ তার এমন পরিবর্তন হল কেন? এরকম ব্যবহার তার সাথে ইতিপূর্বে তো কখনও করেনি?

সেই দিনই সহচরীকে ডেকে জাহাঙ্গেববানু জিজ্ঞেস করে—মাসুমা, ওর কি হল বল তো? আমার সাথে আর দেখা করছে না কেন? আমি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলাম বলেই কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে? না, তার সাথে দেখা না করে দিল্লীতে ফিরে এসেছি বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

মাসুমা বলে—ও দুটোর কোনটাই নয় শাহজাদী।

—তবে?

—এর কারণ হচ্ছে শাহজাদা এখন আকৃষ্ট হয়েছেন অন্য ললনার প্রতি।

জাহাঙ্গেববানু বিস্মিত হয়ে বলে—অন্য ললনা? কে সে?

মাসুমা বলে—সে হল বিজাপুর-সুলতানের ভগিনী শাহারবানু। সন্ধির সর্ত অনুসারে শাহজাদা চেয়ে পাঠিয়েছেন তাকে।

—কি আশ্চর্য! এ-সব কি সত্যি?

মাসুমা বলে—মিথ্যে বলে আমার লাভ কি শাহজাদী?

সেই শুনে জাহাঙ্গেববানু তখুনি ছুটে যায় আজমের মন্ত্রণাকক্ষে। তখন শাহজাদা একাকী পায়চারী করছে সেখানে। জাহাঙ্গেববানু দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করে হাঁপাতে থাকে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে। আজম বলে—এ কি, তুমি এখানে এলে কেন জানী?

জাহাঙ্গেববানু বলে—বাধ্য হয়ে আসতে হল। শুনলাম, তুমি নাকি আবার বিয়ে করবে?

একটু ইতস্ততঃ করে আজম বলে—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

জাহাঙ্গেববানু দৃঢ়কণ্ঠে বলে—যেমন করেই জানি। কথাটা সত্যি কি না বলো?

—হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু তুমি এত উতলা হচ্ছো কেন জানী?

জানী বেগম ফুঁপিয়ে উঠে বলে—কি বলছো, এ সংবাদে আমি বিচলিত হব না? কিন্তু কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আবার বিয়ে করবে?

আজম বলে—তোমার অপরাধ কেন হবে? আসলে বিজাপুর জয় করে ওদের গর্ব খর্ব করে দিতেই আমি দাবী জানিয়েছি ওদের মেয়েকে।

—বিজাপুর জয়?—জাহাঙ্গেববানু চীৎকার করে ওঠে—কিন্তু সে-জয় কার দ্বারা সম্ভব হল? কার জন্যে আজ তোমরা ফিরে আসতে পারলে প্রাণ নিয়ে?

আজম বলে—সে কথা স্বীকার করছি। তুমি না থাকলে বিজাপুর জয় করা সম্ভব হত না আমার পক্ষে। কিন্তু তা বলে এই বিবাহ ব্যাপারে তোমার আপত্তি রয়েছে কেন বুঝতে পারছি না। মোগল সাম্রাজ্যে কোন্ সম্রাট বা কোন্ শাহজাদা একটা মাত্র সহধর্মিণী নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন বলতে পার?

—না না বলতে আর আমি কিছু চাই না। উঃ, তোমরা সব এমন নিষ্ঠুর! বলেই কান্নার আবেগ নিয়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায় জাহাঙ্গেববানু।

ওদিকে শাহারবানুর চিন্তায় চিন্তিত হয়ে ওঠে বিজাপুর সুলতান। কুলবর্গায় মোগলদের সাথে তাঁর যে সন্ধি হল তাতে তাঁর একমাত্র ভগিনীকে সঁপে দিতে হয় তাদের হাতে। ওরা হল সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত, এ অবস্থায় শিয়া সম্প্রদায়ের কন্যা সম্প্রদান করাই অপমানজনক। তার ওপর শাহারবানুর মত একজন ধর্মপরায়ণা মেয়েকে ওদের হাতে সঁপে দিতেই যেন কেমন লাগে।

তবু অন্তরে ধৈর্য নিয়ে সুলতান গিয়ে কথাটা জানালেন তাঁর ভগিনীকে। শাহারবানু প্রথমে শুনে ঠিক বুঝতে পারেন না তাঁর কথা। পরে হতচকিত হয়ে বলেন—সে কি দাদা, আমাকে যেতে হবে দিল্লীতে? সেখানে মোগল হারেমে আমার বিয়ে হবে সুন্নী সম্প্রদায়ের এক শাহজাদার সাথে?

সুলতান বলেন—সত্যি বোন, এ কথা বলতে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। কিন্তু উপায় নেই। কারণ আমরা পরাজিত হয়েছি মোগলদের হাতে। কাজেই তাদের ক্রীড়নক ছাড়া আমরা এখন কিছুই নই।

এ কথা শুনে ছুটে আসে তাউসমা। তাউসমা ঐ বিজাপুর রাজপরিবারের এক ধাত্রী। শাহারবানুকে সে-ই মানুষ করেছে কোলে-পিঠে করে। সে এসে বিস্ফারিত নেত্রে বলে—কি বললেন? বাছাকে আমার পাঠিয়ে দেবে মোগল হারেমে?

সুলতান বলেন—কোন উপায় নেই ধাইমা।

শাহারবানু তখন তাউসমার বুকে মাথা রেখে বলে—তোমাদের ছেড়ে আমি কেমন করে থাকবো ধাইমা?

তাউসমা তাকে বুকে জড়িয়ে তখন কাঁদে হা-হুতাশ করে।

কিন্তু তখন কাঁদবারও আর অবসর ছিল না খুব বেশী। শীঘ্রই প্রস্তুত হয়ে গেল শিবিকা। কাজেই সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শাহারবানুকে গিয়ে উঠতে হল ঐ শিবিকায়। পরে দিন কয়েকের মধ্যেই তা এসে পড়ল দিল্লীর রাজপ্রাসাদে। সেখানে জাহাঙ্গেববানুর কক্ষের পাশের ঘরটিতেই হল শাহারবানুর থাকার ব্যবস্থা।

সে রাতে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে জাহাঙ্গেববানু। সত্যিই তবে একজন এসে পড়লো তার আপন অধিকারে ভাগ বসাতে? আর দুদিন পরেই হয়ে যাবে ওদের বিয়ে। তখন ঐ শাহারবানুই হয়ে পড়বে তার স্বামীর সর্বস্ব।

আর যেন ভাবতে পারে না জাহাঙ্গেববানু। সতীন নিয়ে ঘর সে কিছুতেই করতে পারবে না। কাল সকালেই সে চলে যাবে তার পিসিমার কাছে। তবে যাবার আগে একবার দেখে যেতে হবে ঐ মেয়েটাকে, যে এসেছে তার সব কিছু কেড়ে নিতে। দেখতে হবে তার মধ্যে এমন কি আকর্ষণীয় বস্তু আছে যা কেড়ে নিতে পেরেছে তার স্বামীর মন।

পরদিন অতি প্রত্যূষেই জাহাঙ্গেববানু প্রবেশ করে শাহারবানুর কক্ষে। কিন্তু সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে যায় জানী বেগম। এ কি, এ সারা রাত বসে কেঁদেছে নাকি?

কিন্তু তবু তার কাছে গিয়ে কিছুটা বিদ্রূপের সুরেই জাহাঙ্গেববানু প্রশ্ন করে—আপনার বিবাহ অনুষ্ঠান কবে হচ্ছে জানতে পারি?

তার কথা শুনে শাহারবানু একবার চেয়ে দেখে জানী বেগমের মুখের পানে। তারপর ক্রন্দিতকণ্ঠে বলে—আপনারা আমার প্রতি কেন এ অবিচার করছেন?

তার কান্না এবং কথা শুনে অবাক হয়ে যায় জাহাঙ্গেববানু। তবে এই বিবাহ কি মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন হচ্ছে? সে বিস্মিত হয়ে বলে—একে অবিচার বলছেন কেন? এতে আপনার মত নেই?

শাহারবানু বলে—শুধু আমার কেন, বিজাপুরের কোন নাগরিকের এতে মত নেই। এই কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হয় জাহাঙ্গেববানু। মেয়েটির এই বিবাহে কোন স্পৃহাই নেই। শাহারবানুর প্রতি তার জেগে ওঠে খানিকটা অনুকম্পা।

জাহাঙ্গেববানু বলে—আপনি ফিরে যেতে চান বিজাপুরে?

সজল চোখে তার পানে তাকিয়ে শাহারবানু বলে—তা কি সম্ভব হবে? কিন্তু আপনি কে?

জাহাঙ্গেববানু বলে—আমার পরিচয় শুনে বিশেষ আনন্দ পাবেন না। কারণ যাঁর সাথে আপনার বিবাহ হতে চলেছে আমি তাঁরই সহধর্মিণী।

—সহধর্মিণী! বিস্মিত হয়ে শাহারবানু বলে, তবে তিনি আমাকে বিবাহ করে কি আপনাকে পরিত্যাগ করতে চান?

জাহাঙ্গেববানু বলে—না, তিনি ঠিক আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, তবে আমিই স্থির করেছি এখান থেকে চলে যাব।

শাহারবানু বলে—দেখুন একটি কথা আমি বলছিলাম। যদি আপনি না গিয়ে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন তা হলে আমার মনে হয় এটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল হবে।

তার কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে জাহাঙ্গেববানু। তারপর বলে—দেখো বোন, আমি তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা এখুনি করে দিতে পারি। কিন্তু আমি বলছিলাম কি—

—কি দিদি?

—বলছিলাম কি তোমার গিয়ে আর কাজ নেই। তোমার মত একটি সঙ্গী আমি অনেক দিন খুঁজছিলাম। তা যখন হাতের কাছে পেয়ে গেছি তখন আর ছাড়ছি না। আমার স্বামীকে বিবাহ করতে তুমি মন ঠিক করে ফেলো। তারপর আমরা দুই সতীনে নিত্য ঝগড়া করে কাটাবো আমাদের সময়। কেমন, তুমি পারবে না আমার সাথে ঝগড়া করতে?

তার কথা শুনে হেসে ওঠে শাহারবানু।

এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করে মহম্মদ আজম। হঠাৎ সেখানে তাদের দুজনকে দেখে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরপদে এগিয়ে এসে আজম ডাক দেয়—জানী!

জাহাঙ্গেববানু সাড়া দেয়—বলো।

—এঁর পরিচয় তুমি পেয়েছো কি?

—পেয়েছি।

আজম বলে—তা এ সম্বন্ধে তোমার কি মতামত?

জাহাঙ্গেববানু একবার স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে নিয়ে বলে—শাহারবানুকে বিবাহ তোমার করতেই হবে। তবে আজ নয়। আমি দু'বছর একে আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো। তারপর হবে তোমাদের বিবাহ। বুঝলে?

তার কথা শুনে আজম হেসে উঠে বলে—বেশ তাই হবে।

প্রশ্নোত্তর

শতভিষা

বন্ধু আমাকে করিছে আজিকে প্রশ্ন।
কোনও দিন প্রেম জেগেছিলো কি না অন্তরে,
কোনও দিন কারো কালো নয়নের
কাজলের আস্তাষণে,
উতলা হৃদয় নেচেছে কি মধু-মন্তরে?
যদি বলি আজ সগর্বে মাথা তুলিয়া
চিরদিনই কিছু ছিলাম না হেন সুপ্রবীণ,
আমারো লাগিয়া বাতায়নতলবর্তিনী
ছলনা করিয়া বাজাত কাঁকন রিণ ঝিন্।
বল মেনে নেবে নিঃসংশয়ে মোর লাগি পথ চাহিয়া,
আঁখির কাজল ধুয়ে গেছে কারো বিরহ-রজনী জাগিয়া;
অধরের কোণে হাসি করে লুকোচুরি,
ভাবিতেছ করি ভাবের ঘরেতে চুরি,
শোনালাম রূপকথা।
মোদের কালেতে ছিল না মাধবী রাত্রি,
মিলন-পিয়াসী কারে বলে,
কেউ জানিত না সে বারতা।
যত ফুল ফোটে তোমাদেরি কালে বকুল-চাঁপার বনে,
আনত আঁখির বিজলী ঝলক তোমরাই বোঝ মানে,
আঁচল দুলায়ে চলে গেলে হাসি ভাব কিছু বুঝি নাই।
সঙ্কেতময় নিমন্ত্রণের ভাষা প্রয়োজন নাই।
তাই ভালো, ভালো, কিছুই বুঝি না,
প্রেম কারে বলে কিছুই জানি না।
ঠোঁটের হাসি ও চোখের চাওয়ার অর্থ নিরর্থক,
শুকানো বকুলও গন্ধ বিলায় একথা লুকানো র'ক।।

শাওন এলো

কুমারী ঝর্ণা বোস

শাওন এলো ওই, থই থই শাওন এলো ওই,
পথ খোঁজা বৈরাগী তোর একতারাটি কই?
ফুলভরা কোন ভুল আঙিনায় করলি ওরে ভুল;
ভিখ মাগতে গিয়েছিলি কোন ভাঙনের কূল?
বৈরাগী তোর অঙ্গ বেয়ে অশ্রু ঝর-ঝর,
বকুল ফুলের ছোঁয়ায় কি বুক কাঁপছে থর-থর?

শাওন সাজের ভাজন বেয়ে ঘট ভরে কাঁখে,
কোন বিজুলী-কলসে গেল, ঘোমটারই ফাঁকে?
কোন কালো চোখের বাদলে ভিজলো গেরুবাস,
কোন শেফালীর ডালে বেঁধে, শুকিয়ে নিতে চাস?
শাওন এলো ওই, থই থই শাওন এলো ওই;
পথহারা বৈরাগী তোর মনপাখীটা কই?

মহাকবি গ্যেটের বাল্যকাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

ফরাসী নাট্যকারদের নাটক দেখে ঠিক করলেন যে তিনি নাটক লিখবেন। একখানা নাটক লিখে বন্ধুকে দেখালেন। এই বন্ধুটি কবিকে আশ্বাস দেন যে যাতে কবির নাটক মঞ্চস্থ হয় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কবির আশা বৃথা হল। কাঁচা হাতের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হল না। এ রচনাটি বোধ হয় তাঁর পিতার হাতে পড়ে এবং কবি পিতা কর্তৃক ভর্ৎসিত হন। কবি নাটকের unity বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য ফরাসী নাট্যকার Racene প্রবন্ধ পাঠ করতে লাগলেন, প্রবন্ধ পড়ে কবির তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। গ্যেটের মনে হতে লাগল যে প্রবন্ধকার Unity বিষয়ে পূর্ণভাবে অবহিত নন। উক্ত নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পুরাণ-কাহিনী। নাটকের পাত্র ও পাত্রী ছিল দেব ও দেবী। আর ঈশ্বর, রাজকুমার ও রাজকুমারী ছিল নাটকের পাত্র-পাত্রী। তাঁর মনে হত নাটকের দেব-দেবী তাঁর সামনে সশরীরে হাজির হয়েছে। এই প্রভাব পড়েছিল, কারণ এক পুরাণ-কাহিনী সমন্বিত অভিনয় তিনি দেখেছিলেন।

এই সময় ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শেষ হয়। তাঁর বাবা শান্তির চিহ্নস্বরূপ একটি আংটি তৈরী করতে দেন, উদ্দেশ্য ছিল গ্যেটের মাকে এ-টি উপহার দেবেন। আংটিটা ক্রত তৈরী হল কি না—এজন্য স্বর্ণকারের কাছে মধ্যে মধ্যে গ্যেটে তাগাদায় যেতেন। গ্যেটে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। সব বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল হতে চাইতেন না। অবশ্য বেশী পড়াশোনা তিনি করতে চাইতেন না। স্বর্ণকারের সঙ্গে ভাব জমালেন তিনি। অলঙ্কারে নক্সা কী ভাবে করতে হয় তার প্রয়োগ তিনি নিরীক্ষণ করতেন। সেই স্বর্ণকারের কাজে সহায়তা করবার জন্য উৎসাহ দেখাতেন। দামী পাথরের পার্থক্য বিষয়ে সেই শিল্পীর কাছ থেকে অনেক কিছু জানলেন। সব বিষয়ে গ্যেটের প্রবণতা ছিল বলে গ্যেটেকে সকলেই ভালবাসত।

Klopslock পাঠ করে বাইবেল বিষয়ে তাঁর বেশ জ্ঞান হয়েছিল। এই ইতিহাস পড়ে কবি বেশ উদ্দীপ্ত হন, তাই এক নকলনবীশ যুবকের সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েকটা ভাষ্য কবিতায় সংযোজন করলেন। এই যুবক গ্যেটে পরিবারের কর্মচারী ছিলেন। তারপর বইখানা পুস্তক আকারে বাঁধিয়ে গ্যেটে পিতাকে উপহার দিলেন। এই সময় নির্বাচন এসে গেল। গ্যেটের বাবা রাজকীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। উৎসাহও তাঁর ছিল না। নির্বাচন বিষয়ে ছেলেকে ওয়াকিবহাল করবার জন্য গ্যেটেকে নির্বাচনী পুস্তক ও নানা ইস্তাহার পাঠ করান। জোসেফের অভিষেকের সময় খুব ধূমধাম হয়, সম্রাজ্ঞীর আগমনে অভিষেকের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়, সহরে মেলা বসত, মালপত্র বাঁধা ও খোলার তৎপরতা লক্ষ্য করতেন তিনি। মুক্ত আকাশের নীচে ছেলেরা খেলত। অনেক বংশীবাদক এসেছিল সেই মেলায়, অভিষেকের সময় দেশ-বিদেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি এসেছিল। বিচিত্র সাজ-পোষকের জৌলুষ দেখে গ্যেটে অভিভূত হন।

মাত্র পনের বছর বয়সে কবির জীবনে নারীর অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল। অভিষেকের সময় গ্রেচেন নামক এক তরুণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। একদল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে তাঁর কবিতায় উৎসাহী ছিল। এদের সঙ্গে কবির সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। একদিন এই বন্ধুরা এক স্থানে নিমন্ত্রণ আছে বলে কবিকে গ্রেচেনদের বাড়ী নিয়ে যায়। প্রথমে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সময় কাটলেও কিছুক্ষণ পর সব হাসি ঠাট্টা কবির কাছে ভাল লাগছিল না। সব কিছু একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছিল, মদও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মদ আনবার জন্য অনুরোধ করা হল, সকলে ভেবেছিল চাকরাণী মদ আনবে। চাকরাণীর পরিবর্তে এল এক কিশোরী। এই কিশোরী-ই গ্রেচেন, বাড়ীতে অসুস্থ রোগী আছে, এই কথাগুলো বলে নিঃশেষ পানপাত্রগুলো নিয়ে বর্ষাবিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হল। এতক্ষণ পর গ্যেটে উৎসাহী হয়ে বন্ধুদের ভর্ৎসনা করে বললেন যে, বন্ধুদের অনুরোধে বাড়ীর বাইরে গ্রেচেনকে মদ আনতে যেতে হয়েছে। বন্ধুরা জানল যে ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ বাড়ীর সামনেই মদের দোকান, কিশোরী গ্রেচেন ইতিমধ্যে মদ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, অনেক অতিথির অনুরোধে গ্রেচেন সকলের শুভ কামনায় স্বাস্থ্য পান করলেন। তারপর বললেন, সকলকে বিদায় নিতে ; কারণ বাড়ীতে রোগী আছে। এই অভিষেকের সময় গ্রেচেনকে নিয়ে ভ্রমণে বার হতেন। গ্রেচেনকে অভিষেকের ইতিহাস ও তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিতেন, একদিন আলাপ আলোচনায় রত হয়ে পড়াতে রাত গড়িয়ে গিয়েছিল অনেক। খিড়কী দরজার চাবি আনতে গ্যেটে ভুলে গিয়েছিলেন, গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সেদিন আর বাড়ী ফিরলেন না। কফি পান করা হল। বক্তব্য ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসতে লাগল। গ্রেচেন-পরিবারের অন্য লোকজনও ছিল সেই ঘরে। গ্রেচেনের অঙ্গে অঙ্গ রেখে গ্যেটে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোরে জেগে দেখলেন তার মানসী আয়নার সামনে বসন-ভূষণ ঠিক করছে। সেই কিশোরী গ্যেটের কপালে চুম্বন দিয়েছিল সেদিন।

এর পর গ্যেটে ভয়াবহ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। একদিন ভোরে মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, এর কিছুদিন পূর্বে এক বন্ধুর চাকরী গ্যেটে নিজে তদ্বির তদারক করে পাইয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধু জালিয়াতি ও অনান্য চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়ে। তাই তদন্ত সুরু হয়েছিল। আর সেই তদন্তে গ্যেটেকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

গ্যেটে হাজিরা দিয়ে জবানবন্দী দিলেন। বন্ধুও যে মুক্তি পাবে এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল। গ্রেচেনকে সেই তদন্তে সাক্ষী দিতে হবে বলে তিনি শিউরে উঠে ভাবলেন: গ্রেচেনের পরিণাম যদি খারাপ হয়, গ্রেচেন সপ্রতিভ ভাবে তদন্তে সাক্ষী দিয়ে বার হয়ে এলেন। গ্যেটে আনন্দিত হন এ-তে। তারপর ভয়ঙ্কর ভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তদন্তে জেরার সময় গ্রেচেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গ্যেটের সঙ্গে তাঁর মত রমণীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলেছিলেন তাঁর মত কিশোরীর কাছে গ্যেটে নাবালক ছোট ছেলে। তাই গ্যেটেকে তিনি বোনের মত স্নেহ করেন।

নাবালক ছোট ছেলে!

ভাই!

গ্যেটে যে গ্রেচেনকে মানসী ভাবতেন, এই ঘটনার পর গ্রেচেন সংযত হন। কথাবার্তায় গ্যেটের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতেন। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানাতে গিয়ে গ্যেটে ব্যর্থ হন। এর পর গ্যেটে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গ্রেচেন যে তাঁকে ভাই হিসাবে দেখে এই চিন্তা তাঁকে ভীষণ আঘাত দেয়। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সময় এক দর্শনের শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ইনি গ্যেটের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ আনাবার প্রয়াস করেন। নিজেকে পরিণত মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য কাব্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন গ্যেটে। নির্জন প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যেতেন তিনি, দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হলেও দর্শনের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর মনে তখনও সঞ্চারিত হয় নি। স্কেচ করতেন তিনি এই সময়। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ দেখে গ্যেটের পিতা আশ্বস্ত হন। ছেলে যাতে নিসর্গমূলক ছবি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে এই জন্য হামবার্গ প্রভৃতি রাইনবিধৌত অববাহিকায় পাঠালেন, বোন কর্ণেলিয়া ভাইকে উৎফুল্ল রাখবার চেষ্টা করত। নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে কবি নিজেকে মগ্ন রাখলেন। কবি বুঝলেন, নির্জনপ্রিয় তিনি হতে পারবেন না। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে প্রকৃতির রহস্য ও ভাবা তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল। মানসী গ্রেচেনও চিত্তপট হতে দূরে সরে গেল।

গ্যেটেকে এই সময় গ্যেটের পিতা আইনের তালিম যথাযথ ভাবে দিলেন। Wetzlarএ যাবার প্রস্তাব করলেন গ্যেটেকে তিনি। কারণ নিজে সেখানকার ছাত্র ছিলেন। গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার প্রস্তাব নাকচ হল। পিতা জানালেন তাঁকে ইটালী ভ্রমণের কথা। ইটালীতে গেলে আর কোথাও যাবার দরকার নাই। অবশেষে লাইপজিগে যাবার সিদ্ধান্ত হল। পিতার শাসন তাঁর অসহ্য লাগছিল। পিতাকে এড়াবার জন্য তিনিও প্রস্তুত হলেন। পথে কষ্ট হয়েছিল। পথ-ঘাট ভাল ছিল না। এই সময় লাইপজিগে পুস্তকের বাৎসরিক প্রদর্শনী চলছিল। লাইপজিগে যাবার আগে এক বিক্ষিপ্ত নাটক লেখেন। এই নাটকটির নাম বেলশহাজার।

শেষ

ছুটীর বাঁশী

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাজ-কাজ-কাজ। অন্তহীন কাজের মাঝে একটুখানি বিরাম ওই ছোট্ট শব্দটিতে গ্রথিত হয়ে আছে—'ছুটী'। বর্ষার দিনে একটুখানি সূর্যের আলোকের মত, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ফোটা দু-একটি ফুলের মত, নিস্তরঙ্গ নদীতে একখানি নৌকার মত। তুচ্ছ, তবু তুচ্ছ নয়।

কাজ ও ছুটী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাজ না থাকলে ছুটী যে অসহ্য হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেক্সপীয়রের রাজপুত্র বলেছেন, যদি সারা বছরই ছুটী থাকত তা হলে খেলা কাজ করার মতই একঘেয়ে হয়ে উঠত। বার্ণার্ড শ' আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছেন। কোথায় যেন তিনি লিখেছেন, A perpetual holiday is a good working definition of hell. শোনা যায়, নেপোলিয়ন বলতেন, তাঁর অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোন কথা নেই। এডগার ওয়ালেসের নায়ক মিষ্টার জে, জী, রীডারের উজ্জ্বল অভিধানে ছুটী বলে কোন কথা ছিল না। তিনি অতিমানব ছিলেন কি না সে বিচারের ভার অবশ্য নৃতত্ত্ববিদদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারণ, একেবারে ছুটী না থাকলে কাজ অত্যন্ত বিরক্তিকর ত হয়ই, মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক কাজের পরিশ্রমে আমাদের যে ক্ষতি হয় একটু ছুটীর বিশ্রামে তার অনেকখানির পূরণ হয়। তাই স্যাবাথের প্রয়োজন। ইহুদীদের সপ্তাহের শেষ দিনে ও খৃষ্টধর্মীদের সপ্তাহের প্রথম দিনে ছুটীর আয়োজন।

আর ব্যবহারিক জীবনে ছুটী আমাদের কতই না কাজে লাগে। যা কিছু আমাদের অকাজ সে সবই ত এই ছুটীর সময়। যান্ত্রিক যুগের রুক্ষতা ও অনিশ্চয়তা জীবনকে যখন একান্তই গদ্যময় করে তোলে, তখন সেই উষরতর কবিতার একটু সরসতা আনবার যে প্রচেষ্টা আমরা করি সে ত এই ছুটীর পরম ক্ষণটিতেই। এই ক্ষণেই আমরা প্রিয়াকে প্রিয় করে দেখি, উপলব্ধি করি প্রেমের মূল্য। এই ক্ষণেই আমাদের দেবপূজা, বন্ধুপ্রীতি, সমাজসেবা। এইক্ষণেই কাব্যচর্চ্চা, ছবি আঁকা, সুর সাধনা। কাজ আমাদের এই সব অন্য জীবনের অনুরাগের কথা বার বার ভুলিয়ে দেয়। দ্বার দেয় রুদ্ধ করে। ছুটী কখন চুপে চুপে আসে অভিসারিকার মত, তার পর তার কঙ্কণ-নিক্কণে আমাদের চঞ্চল করে তোলে। দ্বার বার বার খুলে যায়।

ছুটীর দিনের একটি বিশেষ রূপ আছে। এ দিনটি অন্য দিনগুলি হতে স্বতন্ত্র। এ দিনটির একটিমাত্র নিয়ম আছে—সেটি কোন নিয়ম না থাকা। নিয়ম থেকে, বাঁধাধরা ছক থেকে, রুটিনের রাজনীতি থেকে আজ পূর্ণ বিশ্রাম। অনিয়মের রাজত্বে খেয়ালখুশীর মন্ত্রিত্ব। এমন দিনেই মনকে নিরঙ্কুশ করা চলে। ছুটীর দিনে সে নিশ্চিন্ত ভাবে ছোটাছুটি করতে পারে। কোথাও বাধা পাওয়ার ভয় নেই। এমন কি হারিয়ে যাওয়ারও কোন মানা নেই।

ছুটীর দিন তাই উৎসবের দিন। মানস-বন্ধন-মুক্তির উৎসব। সে-আনন্দের কাছে অন্য সব আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। চিত্তের স্বাধীনতা মানুষকে হর্ষের নতুন লোকে উন্নীত করে। সেখানে ছোট নেই, বড় নেই, সকলের সমান পরিতৃপ্তি। সম্রাট ও শ্রমিক সমভাবে আনন্দিত। সাম্যবাদের জয়জয়কার।

অনেকে আছেন, যাঁরা ছুটি নিছক আলস্যে কাটিয়ে দেন, তাঁরা জানেন না কি সম্পদ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়। তাঁদের কথা বলছি, যারা তাস-দাবা-পাশা খেলে এবং অবসরের সব সময়টা এ ভাবেই কাটায়। ইহজীবনের বিবিধ বিভীষিকা বা কিস্তিমাতের

আশঙ্কায় যাদের জাগরণ বিড়ম্বিত। আবার অনেকে আছে, যারা জাগরণের চেয়ে নিদ্রা বেশী পছন্দ করেন। তারা বোধ হয় আরও বেশী প্রবঞ্চিত হয়। এসব প্রবঞ্চনা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। এতে অবকাশরঞ্জন হয় না, অবকাশের খণ্ডন হয় মাত্র। ছুটিতে ঘরে বসে খেলে বা খাটে শুয়ে ঘুমোয় একেবারে অর্থহীন নয়। তবে সেইটুকু এর অর্থ যেটুকু অর্থ আছে সূর্যকে দিয়াশলাইয়ের কাজে ব্যবহার করায়।

নীল গগনে যখন ছুটির বাঁশী বেজে ওঠে, তখন সেই বাজনায় বিশেষ একটি সুর থাকে। শ্যামের বাঁশীর সুরের মতই উন্মাদক সে সুর। সেই সুরে সাড়া দেওয়ার মত যার মন আছে, সেই প্রকৃত সহৃদয়। সে কখনও শুয়ে বসে, শুধু হেলাফেলায় সময় কাটাতে পারবে না। সেই পারবে ছুটীর মূল্য দিতে।

ছুটির পরিধি যখন দীর্ঘ হয়, তখন অনেক সময় তার বংশীধ্বনির মধ্যে সুদূরের সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তখন মন কিছুতেই ঘরে রয় না। অচেনা দেশ, অজানা জায়গা কি অপ্রতিরোধ ভাবে আমাদের আকর্ষণ করে। বিপুল সুদূর কি ব্যাকুল ভাবে আহ্বান জানায়। সাগর-পর্বত কি রহস্যময় রূপে হাতছানি দেয়। নতুন পৃথিবীর নতুন লোক কি গভীর বন্ধুত্বের বাণী পাঠায়। প্রকৃতিকে নতুন ভাবে দেখার জন্ম মানুষের কামনা সীমাহীন হয়ে ওঠে।

কাজ শুধু মানুষের নয়, প্রকৃতিরও রয়েছে। প্রকৃতির ভিতরে কাজের চাকা অবিরাম ঘুরে চলেছে। তাই কবিগুরু বলেছেন, প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ঐ ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্ম এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়—বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে, এমন এক পলকও তার সময় নেই। কিন্তু, এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন তার কিছু মাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মূর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পূর্ণ অবকাশ।

মানুষ প্রকৃতির পুত্র। মৃত্তিকার সন্তান সে। মৃত্তিকা থেকে তার জন্ম, আর মৃত্যুতে সে ওই মৃত্তিকাতেই মিশে যায়। তাই মৃত্যুকে সে ভয় যতই করুক না কেন, তার জীবনব্যাপী কাজের অবসান ঘোষণা করে যখন শেষবারের মত ছুটির বাঁশী সত্য সত্যই বাজে, তখন সে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারে, যায় সকলকে প্রণতি জানিয়ে। দ্বারের চাবি সে ফিরিয়ে দেয়, ঘরের দাবি আর সে রাখে না। ডাক পড়েছে। তাকে যে যেতে হবে।

সাহসে দুর্জয়

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আগুন···আগুন···বুকফাটা আর্তনাদে রাত্রির আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। রেঙ্গুন সহরের একটি বিরাট কাঠের বাড়ীতে আগুন ধরেছে। দেখতে দেখতে লেলিহান বহ্নিশিখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আশে-পাশের বাড়ীগুলি থেকে দলে দলে নরনারী এসে সমবেত হল। ঘরের জিনিষপত্র ও লোক-জন সবই বেরলো কিন্তু বেরোতে পারলো না এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার বাইরে আসার শক্তি ছিল না। দর্শকজন দাঁড়িয়ে থেকে শুধু আহা উহু করতে লাগলো, কোন সক্রিয় সহানুভূতি এলো না কোনদিক থেকেই। মৃত্যুপথযাত্রী এই অশীতির বৃদ্ধার জীবনের জন্ম হয়তো কারো প্রাণই কাঁদলো না।

সহসা এক বাঙালী যুবক সাহসে বুক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই অগ্নিপ্রবাহের মধ্যে।

সমবেত নরনারী ত্রাসে চিৎকার করে উঠলো। রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কেটে গেল কয়েকটি অশান্ত মুহূর্ত। যুবক বেরিয়ে এলো বৃদ্ধাকে কাঁধে নিয়ে অগ্নিব্যূহ ভেদ করে। চারিদিক থেকে উঠলো প্রশংসার গুঞ্জন। যুবক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো সংগে সংগে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো যুবকের শুশ্রূষার জন্ম। বহু পরিচর্যার পর আবার ফিরে পেল সে বাহ্যজ্ঞান, ডাকলো 'মা' বলে। অশীতিপর বৃদ্ধার জন্ম জীবন বিপন্ন করায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো যুবকের অকুণ্ঠ প্রশংসা ফুলসৌরভের মত। আত্মত্যাগের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাঙালী তরুণের অমৃতময় জীবন।

এই নির্ভীক বাঙালী যুবক কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। শিশুকাল থেকেই সুরেশচন্দ্র ছিলেন ভয়শূন্য ও ডানপিটে। কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে ছিল সুরেশচন্দ্রের বাড়ী। তখন গ্রামে ছিল বন্যশূকরের উৎপাত। একদিন সুরেশচন্দ্র মাছ ধরে ফিরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এক জংগলের কাছ দিয়ে যেতে তাড়া করলো এক বন্যশূকর। সুরেশচন্দ্র ভয় না পেয়ে বঁড়শির ছিপ দিয়ে বেপরোয়া ভাবে মারতে লাগলো শূকরটাকে। শূকরও প্রাণ ভয়ে শিকার ছেড়ে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। তাঁর এই সাহসে খৃষ্টান মিশনারীরা অবাক হয়ে গেল।

পড়াশুনা কিন্তু সুরেশচন্দ্রের মোটেই ভাল লাগতো না। কিন্তু দুঃসাহসের কাছে ছিল তার অদ্ভুত আনন্দ।

রেঙ্গুনে থাকবার সময় এক কাপ্তেনের সংগে ভাব করে জাহাজের ষ্টুয়ার্ড হয়ে সুরেশচন্দ্র আমেরিকায় উপনীত হলেন এবং বুদ্ধিবলে সৈন্ম বিভাগে ভর্তি হয়ে কর্মশক্তির গুণে লেফটন্যাণ্ট পর্যন্ত হলেন।

এই সময়ে সুরেশচন্দ্রের সম্মুখে দেখা দিল এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা। শত্রুপক্ষ ত্থাথারয়সহর অবরোধ করে অগ্নিসংযোগ করলো। প্রধান সেনাপতি যুদ্ধজয়ের সকল আশাই ছেড়ে ছিলেন। কেউ সাহস করলো না শত্রুর সম্মুখীন হতে। সুরেশচন্দ্র মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্ম নিয়ে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুব্যূহের ওপর। অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসৈন্ম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সুরেশচন্দ্র যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলো। সুরেশচন্দ্র ব্রেজিল সরকারের কর্ণেল পদে নিযুক্ত হলেন।

যে সমস্ত বাঙালী বিভিন্ন সময়ে বিদেশে গিয়ে জাতীয় মর্যাদা রক্ষা করেছেন, তাঁদের নামের সংগে সুরেশ বিশ্বাসের নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দেশী রং

শ্রীইন্দুবিকাশ দাশ

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, দিদি 'তার পুতুলের কাপড় রাঙানর জন্ত শিউলী-ফুলের বোঁটার রস ব্যবহার করত। আমার উপর ভার পড়ত পাড়ার কোন বাড়ী থেকে ফুল কুড়িয়ে আনতে। ফুল কুড়াতে গিয়ে গালি-গালাজ কিংবা প্রহার যে মাঝে মাঝে কুড়াতে হোতো না তা নয়। আবার দিদির সঙ্গে ঝগড়া হলে, তার খেলাঘর লণ্ডভণ্ড করে দিতাম, পুতুলের কাপড় নিয়ে দিদির বন্ধুকে দিয়ে তাকে আমার দলে আনতাম, পরের দৃশ্য জানা—দিদির কেঁদে কেটে গিয়ে মার কাছে নালিশ ও মার হাতে আমার প্রহার। দিদি ও তার বন্ধুরা ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দিত, শিউলী ফুলের বোঁটার রং দিয়ে নিজেরা আলতা পরত, পুতুলকে পরাত, হাতে, নখে রং মাখত। বিয়ে-বাড়ীতে আমার উপর ভার থাকত, ফুল যোগান দেওয়া।

টুকটুকে রংগীন বোঁটা ও সাদা পাপড়ি—তার সঙ্গে আবার দেখা, অবশ্য অন্য রূপ ও পরিবেশে,

রং তৈরী

তাজা ফুলের বোঁটাগুলিকে কেটে বেছে ফেলতে হবে। পোকা বা অন্য কোন জিনিস যেন না থাকে। ঔষধ মাড়ায়ের চিনামাটির বাটিতে পাথরের ছোট নোড়া দিয়ে বোঁটাগুলি অল্প থেঁতো করে নিতে হবে। ঐগুলিকে জলে সেদ্ধ করতে হবে প্রায় আধ ঘণ্টা। মাঝে মাঝে অল্প ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে জলের পরিমাণ সমান রাখতে হবে। সেদ্ধ করার জন্ত মাটির পাত্র ব্যবহার করা ভাল। পাত্রটি নামিয়ে রেখে, রংটি ঠাণ্ডা হলে, তা পরিষ্কার মোটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

অনেক ফুল একসঙ্গে পাওয়া গেলে, বোঁটাগুলি কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শুকনো বোঁটা শিশিতে বা জারে অনেক দিন রেখে দেওয়া যায়। শুকনো বোঁটা মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া দরকার। বোঁটা অল্প গুঁড়িয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে একদিন ভিজিয়ে রাখলে রং হবে। গুঁড়ো বোঁটা মিনিট পাঁচেক জলে সেদ্ধ করলেও রং পাওয়া যাবে। পরে তা ছেঁকে নিতে হবে।

কাঁচা বোঁটাকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখলে, তা পচতে শুরু করবে। সেই অবস্থায় বোঁটাগুলি পরিমাণমত জলের সঙ্গে ভাল করে মেখে ছেঁকে নিতে হবে। সবক্ষেত্রেই ছেঁকে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর বাটির নীচে কিছু তলানি পড়বে। তলানি বাদ দিয়ে উপরের রংগীন জলটুকু সাবধানে গড়িয়ে নিতে হবে অন্ত বাটিতে।

রং

ছবি আঁকার জন্য সন্ত তৈরী অথবা সংরক্ষিত রং-এর সঙ্গে পরিমাণমত গঁদের আঠা মেশাতে হবে। অন্য কোন আঠা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয় নাই।

দেখা যাচ্ছে কাঁচা বোঁটা, অল্প পচা বোঁটা বা শুকনো বোঁটা থেকে তৈরী রং প্রায় কাছাকাছি হলেও এক নয়। কাঁচা বোঁটা থেকে তৈরী রং হয় হলুদে, পরে তা শুকিয়ে আর একটু ঘন হলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ঘন হলুদে রং হবে। শেষ পর্য্যায়ে রংটি মধুর মত ঘন ও আঠাল হয়ে যায়। রং হবে Vandyke brown। শুকনো বোঁটা থেকে তৈরী রং, Yellow ochre-এর সঙ্গে অল্প Vandyke brown মেশালে যেমন দেখায় অনেকটা সেই রকম। অল্প পচা বোঁটা থেকে তৈরী রং, শুকনো বোঁটা থেকে তৈরী রংএর সঙ্গে অল্প Burnt umber মেশালে যেমন হয়, প্রায় সেই রকম। শুকিয়ে যাওয়ার পর রংগুলি ঘষাঘষিতে ওঠে না বা আঙুলে কোন দাগ লাগে না। একটু ঘন অবস্থায় রংগুলি খুব মোটা পর্দায় কাগজে লেগে থাকে ও শুকোতে কয়েক দিন সময় লেগে যায়। ঘন অবস্থায় এ রং ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে মনে হয়।

এ রং দিয়ে স্কেচ, জলরঙা ছবি ভালভাবেই আঁকা হয়েছে। মণ্ডনশিল্পের নক্সা এ রং দিয়ে কাগজে আঁকা হয়েছে। রংটি কাগজে লাগাতে কোন অসুবিধা হয় না। অন্য রকমের ছবি এ রং দিয়ে পরীক্ষা করা হয় নাই।

শুকিয়ে গেলে রং শিশিতে ভরে রাখা যায়। তাতে পরিমাণ মত জল মিশিয়ে রং করে নেওয়া চলবে। তৈরী রং পরিষ্কার তুলোয় শুষে নিয়ে, শুকিয়ে রেখে দেওয়া চলে। পরে দরকার মত তুলো কেটে নিয়ে জলে রগড়ে নিলে রং হবে। তুলোয় শুষে নেওয়া রংকে মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া দরকার।

এই উদ্ভিজ্জ রংটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। গত অক্টোবর মাসে তৈরী রং বা তা দিয়ে আঁকা ছবি আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। এ রং খেলায় আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। রং-এর প্রকাশভঙ্গিমা, বিভিন্ন ধরণের ছবিতে ব্যবহারের উপযোগিতা, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য গুণাগুণ নিয়ে আরও বিশদ গবেষণা করা যেতে পারে। এ নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের দেশজ রং সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ পেলে অথবা মহকুমা কৃষি আধিকারিক, ঘাটাল, মেদিনীপুর এই ঠিকানায় আমার কাছে দয়া করে জানালে বাধিত হব।

"সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক ভালো-মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত মানুষের শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্দ্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, যোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যিক শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত ক'রে তোলে।" —রবীন্দ্রনাথ
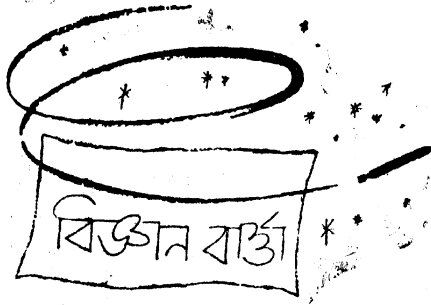
যুদ্ধ-বিজ্ঞানে ঠাণ্ডাযুদ্ধ

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বছর দেড়েক আগে ঝানু ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ্ অ্যান্থনি নাটিং সোভিয়েতের প্রথম স্পুৎনিকের ধাক্কায় মন্তব্য করেন :—

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কূটনীতি আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

হালে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থী মিঃ আডলন 'ফরেন অ্যাফেয়াস' পত্রিকায় লিখেছেন :

সোভিয়েত সমাজের নিজের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা আছে কিন্তু আমাদের সমাজের কাছে তার ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। অনেকে মনে করেন যে আমরা জাতীয় লক্ষ্য উপলব্ধি করার মত জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ মার্কিণ সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান আক্ষেপ করেছেন যে আমেরিকার মানুষের সামনে আজ এমন কোন মহৎ লক্ষ্য নেই যা উত্তীর্ণ হবার জন্ত তারা এক যোগে কাজ করতে পারে।

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা ব্যাপারটা আরো খোলসা করে দিয়ে ১৯৫৯ সালের ক্রীসমাস্ দিবসের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করে :

আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের সামনে ১৯৬০ সাল ঠিক দক্ষিণ মেরুমহাদেশের মতই নিরানন্দ এক অনাবিষ্কৃত অহল্যা ভূমি। ক্রুশ্চেভের রকেটের আওয়াজে মার্কিণ আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ। আজ মধ্যরাত্রে যে একটি মাত্র গানের সুর ভেসে আসছে তা হচ্ছে আমেরিকানদের এই কথা বলাবলি করা যে তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য তারা দেখতে পাচ্ছে না।

মার্কিণ সাংবাদিক সাল্জবার্গার অনেক দুঃখ করে বলছেন :

এই ১৫ বছর আগেও আমরা ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। কিন্তু আজ? আজ আমরা এক অন্ধকার বনের মধ্যে থেকে বার হবার সোজা পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

এই উদ্দেশ্যবিহীন জীবনকে গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার ধারা এই ট্রেড মার্ক মেরে তাকে রক্ষা করার অজুহাতে যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর কূটনীতি আমেরিকা নিজে চালাচ্ছে এবং তার দ্বারস্থ ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে চালাতে বাধ্য করছে তার পক্ষাঘাত যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে মার্কিণ গুপ্তচর বিমান ধ্বংস ও আইকের জাপান সফর বাতিলের মধ্যে রয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ। কূটনীতি কিরকম অবস্থায় পড়লে কোন দেশ অন্ত দেশের মধ্যে সামরিক গুপ্তচর বিমান পাঠানো আন্তর্জাতিক বিধান উপেক্ষা করে প্রকাশ্যে সমর্থন করে তার উল্লেখ করে ব্রিটিশ ডেইলি হেরাল্ড মন্তব্য করেছেন :

সারা পৃথিবীকে সামরিক ঘাঁটির বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলার নীতির ভরাডুবি আরম্ভ হোল। আমেরিকার আজ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তব দাবী শোনা দরকার, নিজের মর্জির দাবী শুনলে আর চলবে না।

নিউজ ক্রনিক্‌ল্ পত্রিকার মতে :

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলেই মার্কিণ পররাষ্ট্র বিভাগ সব দোষ কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে চাপান। এই ভুল ধারণা দূর করা দরকার।

এমন কি ইউসিস-এর (USIS) অধ্যক্ষ জর্জ অ্যালেনের মত ঝানু সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকও চুপ করে থাকতে না পেরে এই বলে মার্কিণ কূটনীতির কর্ণধারদের নিন্দা করেছেন :

বাঁধ নির্মাণ না করলে আমরা সোভিয়েতকে দোষ দিই, আবার বাঁধ নির্মাণ করলেও দোষ দিই। এই দোষ দেওয়াটা নেহাতই এক ঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

সেনেটের ফুলব্রাইট যুদ্ধোত্তর মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিকে সর্বনাশের পথ বলে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন :

এই পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবের সম্মুখীন হতে কেন যে চায় না তা দুর্বোধ্য। আমরা আজ যে দুনিয়ায় বাস করছি তার চরিত্র বিচার করার ক্ষমতা এর নেই।

এই মার্কিণ রাজনীতিজ্ঞের মতে শীর্ষ সম্মেলন ব্যাপারটা রাজনীতির ইতিহাসে এক গৌরীশৃংগ না হয়ে স্বাভাবিক কূটনীতির নিয়মিত অংশ হওয়া উচিত।

কিন্তু এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করবার যে আয়োজন হোল আইসেনহাওয়ার অ্যালেন ডালেস নেতৃত্ব তা বানচাল করে দিয়ে সেনেটার ফুলব্রাইটের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

পয়লা নম্বর ডালেস মার্কিণ কূটনীতির এবং ইহ জগতের দিঙ্মণ্ডল ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু ডালেসের ভূত আমেরিকার কাঁধ থেকে নামেনি। দোসরা নম্বর ডালেস মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা। সোভিয়েত দেশের সীমানা ডিঙিয়ে সামরিক বিমান পাঠানোর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁর, এটা স্বীকৃত। এই অ্যালেন ডালেস মহাজনটি কে?

১৯৪২ সালে নাৎসী বাহিনী যখন স্তালিনগ্রাদে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে তখন জার্মাণ ঝটিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিমলার ও জার্মাণ গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ শেলেনবার্গ হিটলারের সঙ্গে মিলে ইঙ্গমার্কিণ-রুশ মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাঙন ধরাবার এক চক্রান্ত করেন। মতলব ছিল ইঙ্গ-মার্কিণদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নিয়ে সোভিয়েতকে আলাদা করে ফেলা। সেই চক্রান্তের ফলে জার্মাণ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা গোপনে সুইজারল্যাণ্ডে যে আমেরিক্যান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেন তিনি হচ্ছেন যুধ্যমান ইউরোপে মার্কিণ প্রধান গুপ্তচর এবং ইঙ্গ-মার্কিণ-জার্মাণ 'শ্রোডার' ব্যাংকের অন্ততম ডিরেক্টার অ্যালেন ডালেস। সেই আলোচনায় মিঃ ডালেস মন্তব্য করেন যে মৌলিক কূটনীতির ব্যাপারে তিনি নাৎসী আদর্শের সঙ্গে একমত। যাই হোক সেই চক্রান্ত সফল হয়নি। ১৯৪৫ সালে হিমলার তাঁর সহকারী কাল উলফেস মারথ যখন ইতালীতে আবার ঐ চক্রান্ত ঝালিয়ে তোলেন তখনও অ্যালেন ডালেসকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। সেই দেশদ্রোহী ডালেস আজ মার্কিণ

গুপ্তচর বিভাগের বড়কর্তা হিসাবে বছরে মার্কিণ বাজেটের ২০০ কোটি ডলার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তাঁরই পরামর্শে আইসেনহাওয়ার সোভিয়েতের শক্তিপরীক্ষা ও শীর্ষসম্মেলন ভণ্ডুল করার উদ্দেশ্যে 'ইউ-২' বিমান পাঠানো সমর্থন করেন। এই অ্যালেন ডালেসের—খয়রাতির টাকা দিয়েই চিয়াং কাইশেকের দস্যুরা বার্মায় আজও অরাজকতা বজায় রেখেছে।

ডালেস-গোষ্ঠী চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতার সুযোগ নিয়ে আজ ১৫ বছর ধরে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ চালিয়ে আসছে তার প্রধান অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

'ঠাণ্ডাযুদ্ধ' কথাটি রাজনীতির শব্দকোষে প্রথম লিখে দেন মার্কিণ ধনকুবের ও প্রথম পারমাণবিক শক্তিকমিশনের চেয়ারম্যান বার্ণার্ড বারুচ। তার আগে ঠাণ্ডাযুদ্ধ শব্দটি চালু না হলেও কার্যত ঠাণ্ডাযুদ্ধ যে চালু হয়েছিল হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা মারার সময় থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্রিটিশ পরমাণু বৈজ্ঞানিক পি এম এস ব্ল্যাকেটের মন্তব্য থেকে। 'পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বইখানিতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—

জাপানের বিরুদ্ধে অ্যাটম বোমা ব্যবহারটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ঘটনা ততটা নয় যতটা যুদ্ধোত্তর কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রথম ঘটনা।

এর পর সোভিয়েতে মার্কিণ দূত মিঃ জর্জ কেনান ১৯৪৬ সালে মস্কো থেকে ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠান যে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত জোর করে কমিউনিজম চাপিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নকে বেড়াজালে ঘিরে রাখা দরকার।

সেই রিপোর্ট অনুসারে মার্কিণ সরকার অ্যাটম বোমার একচেটিয়া অধিকারের ওপর ভরসা করে ঠাণ্ডাযুদ্ধে নেমে পড়েন। মার্কিণ ধনকুবের-গোষ্ঠীও দেশের কারখানা শিল্পকে শান্তিকালীন ভিত্তিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে অস্ত্রসজ্জার রথচক্রে বেঁধে রাখাই লাভজনক মনে করল। সামরিক কন্ট্রাক্টে কেঁপে ফুলে উঠে টাকার লোভ তাদের বেড়ে গেল বহু গুণ। তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক যুদ্ধের আওয়াজ তুলল। কিন্তু যুদ্ধ বাধানো সম্ভব হোলনা, কারণ প্রথমত ইউরোপে আমেরিকার প্রয়োজন মত সশস্ত্র শক্তি ছিলনা, দ্বিতীয়ত যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপের জনগণকে নতুন যুদ্ধে নামানোও সম্ভব ছিলনা।

ঠাণ্ডাযুদ্ধের ২য় অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে। আমেরিকা পূর্ব-ইউরোপকে মুক্ত করার সংকল্প ঘোষণা করে এই সময় নাটো জোট খাড়া করে এবং অ্যালেন ডালেসের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম জার্মানীতে এক জঙ্গীবাদী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। এই ২য় অধ্যায়ের শেষ পাতা হচ্ছে কোরিয়ার যুদ্ধ। কিন্তু সেই ঘোর দুর্দিনেও আমেরিকার পক্ষে বিশ্বযুদ্ধ বাধানো সম্ভব হয়নি, কারণ প্রথমত মহাচীনে মার্কিণ দালাল চিয়াং কাইশেকের পরাজয় ঘটে এবং দ্বিতীয়ত সোভিয়েত ইউনিয়নও অ্যাটম বোমার অধিকারী হয়। চলে গেল ১৯৫২ সাল।

ঠাণ্ডাযুদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের মেয়াদ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭। সোভিয়েত দেশ এই সময় পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় আমেরিকায় ডালেসপন্থীদের হঠকারিতার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করে। তারই পরিণতি ১৯৫৫ সালের জেনেভা সম্মেলন।

কিন্তু জন ফষ্টার ডালেস 'যুদ্ধের কিনারা ঘেঁষা' নীতি ঘোষণা করে জেনেভা সম্মেলনের সুফল নষ্ট করে দেন।

১৯৫৭ সালে এমন এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যা যুদ্ধের কিনারা ঘেঁষা ঠাণ্ডাযুদ্ধের রাস্তা কাটিয়ে চৌচির করে দেয়। সেই ঘটনা হচ্ছে সোভিয়েতের প্রথম স্পুৎনিকের সাফল্য। সোভিয়েতের কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহগুলি, কলম্বিয়া বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক রাইট মিলস-এর ভাষায় প্রচণ্ড আক্রমণের ডালেসীয় নীতিকে প্রচণ্ড মৃত্যুতায় রূপান্তরিত করে। তারপর শুরু হয় ডালেসপন্থার নতুন করে মূল্য বিচার। মার্কিণ ধনকুবেরগোষ্ঠীর সভা ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর সভাপতি মিঃ লাইটনার সভার এক অধিবেশনে বলতে বাধ্য হয়েছেন—আমাদের শান্তি ও সঙ্গতিপূর্ণ দুনিয়া সৃষ্টি করতে হবে। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির শুভমীমাংসা হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সুবিধা হবে। সভার প্রাক্তন সভাপতি হ্যারল্ড ম্যাককেলান অস্ত্রসজ্জার দৌড়কে মানুষের ঘাড়ে এক বোঝা বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। মার্কিণ ধনপতি সাইরাস ইটন "শিকাগো ডেইলী নিউজ" পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে বলেছেন :—আমি নিশ্চিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষপাতী, কারণ নান্যঃ পন্থা। মুষ্টিমেয় হলেও প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির শুভলক্ষণ নষ্ট করে দিতে না পারে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ও চীনের সঙ্গে আমরা বন্ধুভাবে চলতে পারব।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আইসেনহাওয়ার-হার্টার সরকার শেষ পর্যন্ত সেই মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর হুকুম তামিল করছেন। নিউইয়র্কের ন্যাশন্যাল প্রেস ক্লাবে মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হার্টার সেই গোষ্ঠীর বিশ্বস্ত বান্দার মত মন্তব্য করেছেন যে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করা, বৈদেশিক ঘাঁটি তুলে নেওয়া বা সৈন্যবাহিনী ছাঁটাই করা, এসব দাবী শূন্যগর্ভ। তাঁর মতে আগে নিয়ন্ত্রণ, পরে অস্ত্রহ্রাস অর্থাৎ নিজের অস্ত্রসজ্জা অক্ষুণ্ণ রেখে সোভিয়েতের সশস্ত্রশক্তির সমস্ত গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু মার্কিণ জেনারেল হিউ হেষ্টার বলছেন যে, অস্ত্রের খবর জোগাড় করাটা আসল প্রশ্ন নয়, অস্ত্রত্যাগটাই আসল কথা। আজ রাস্তা দুটি : অস্ত্রসজ্জার অর্থাৎ উন্মত্ততার রাস্তা এবং অস্ত্রবর্জনের অর্থাৎ শুভবুদ্ধির রাস্তা। কিন্তু হার্টার বা আইসেনহাওয়ার সেই শুভবুদ্ধির বালাই না রেখে সাইরাস ইটনের ভাষায় তাদের দলে নাম লিখিয়েছেন, যারা যে মুখে বলে কমিউনিজম-এর পতন অনিবার্য সেই মুখেই বলে কমিউনিজমকে এখনই ধ্বংস না করলে কমিউনিজম আমাদের ধ্বংস করবে। মার্কিণ জাপান নিরাপত্তা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং সেই চুক্তির এক্তিয়ার সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য ও চীনের উপকূল (অর্থাৎ ফর্মোজা) পর্যন্ত এই কথা দম্ভ করে জাহির করে মিঃ হার্টার যেমন সারা দুনিয়ার সামনে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তেমনি করেছেন আইসেনহাওয়ার ইউ-২, বিমানের ঘটনাকে মার্কিণ রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ বলে ঘোষণা করে। সেই একই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে ১০টি জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে।

নিরস্ত্রীকরণের যে সোভিয়েত প্রস্তাব মিঃ ক্রুশ্চভ আমেরিকা সফরের সময় জাতিসংঘে পেশ করেছিলেন সেটি সমস্ত দেশ সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১০টি জাতির নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পাশ্চাত্য শক্তিরা সেগুলি তো মানলেনই না, এমন কি তাঁদের ইচ্ছামত মূল প্রস্তাবে যে সব অদল বদল করা হয়েছিল (শীর্ষ সম্মেলনে পেশ করার জন্ত) সেগুলিও তাঁরা গ্রহণ করতে নারাজ হলেন। তাঁদের বিশেষ করে ফ্রান্সের ইচ্ছা মত পারমাণবিক অস্ত্রের সমস্ত রকমের বাহক (বোমারু, রকেট ইত্যাদি) নষ্ট করে ফেলার কথাটি প্রস্তাবের মধ্যে স্থান পায়—যার ফলে ক্ষতি সোভিয়েতেরই বেশি হোত, কারণ রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে সে অনেক এগিয়ে আছে। তবু নিরস্ত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করার জন্তে সে এই কনসেশন দিতে রাজী হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিরা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে কেবল ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিতে থাকেন অর্থাৎ সোভিয়েত রকেটের নাড়িনক্ষত্র জেনে নেওয়াটাই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় কোন নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা সফল হতে পারেনা বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈঠক ত্যাগ করে। মিঃ ক্রুশ্চভ পাশ্চাত্য জোটের এই চালচলনের উদ্দেশ্যকে বলেছেন 'আইনাশ্রিত সামরিক গুপ্তচরবৃত্তি।'

প্রথম স্তরে এই আইনাশ্রিত গুপ্তচরবৃত্তি এবং তারপরে আক্রমণ এই হচ্ছে মার্কিণ বৈদেশিক ঘাঁটিগুলির লক্ষ্য। একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে কোন দেশকে সামরিক ঘাঁটির বেড়াজালে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষামূলক নয়, আক্রমণমূলক। মার্কিণ বিমান বহরের মুখপত্র 'এয়ার ফোর্স'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুসারে মার্কিণ বিমানঘাঁটির সংখ্যা ২৭৪। তার মধ্যে ১৩০টি আছে বিদেশে। সেগুলিকে ক্ষেপণাস্ত্রের উপযোগী করা হচ্ছে এবং মার্কিণ বিমান বহরের অধিনায়ক জেনারেল হোয়াইট মার্কিণ সেনেটকে জানিয়েছেন যে কমিউনিজমকে ঘিরে রাখার নীতির মূলভিত্তি হচ্ছে হাইড্রোজেন বোমা ও বিমান বাহিনী। তুর্কী পত্রিকা হেবার-এ প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে সেখানকার মার্কিণ-ঘাঁটিতে যে রকেট বসানো হয়েছে সেগুলির পাল্লা দেড় হাজার মাইল।

কিন্তু মার্কিণ জঙ্গীবাদীরা এতেও সন্তুষ্ট নন। পৃথিবীর রাজ্যে এত সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেও তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এবার তাঁরা চাঁদে হাত দিতে চান। মার্কিণ বিমান বহরের উপাধিনায়ক লেফটেনান্ট জেনারেল ডোনাল্ড পুট এক বক্তৃতায় জানাচ্ছেন :—চাঁদে ঘাঁটি গাড়তে পারলে পৃথিবীতে পাল্টা আঘাত হানবার খুবই সুবিধা হবে।

কিন্তু রাশিয়ানরাও যদি চাঁদে ঘাঁটি গাড়ে তাহলে? তখন তাহলে জেনারেল মহাশয়কে চাঁদে পাল্টা আঘাত হানবার জন্তে মঙ্গল গ্রহে ঘাঁটি গাড়বার জন্ত উঠে-পড়ে লাগতে হবে। অর্থাৎ মার্কিণ সেনাপতি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের জঙ্গীবাদকে মহাজগতের গ্রহ-উপগ্রহে ছড়িয়ে দিতে চান। মার্কিণ পারমাণবিক কূটনীতির সামনে এ ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। মার্কিণ সশস্ত্রবাহিনীর পাওয়া যখন পৃথিবীর গণ্ডীর বাইরে সৌরজগতের অন্ত

গ্রহ-উপগ্রহে মার্কিণ-মার্কা গণতন্ত্রের তথা পৃথিবীর নিরাপত্তার সন্ধান করেন, তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁদের তল্পিবাহকরা সম্ভবত একটু অস্বস্তিবোধ না করে পারেন না। কারণ এই ব্যাপার আমেরিকার পারমাণবিক রণনীতির পরাজয়েরই পরিচায়ক, ঠাণ্ডাযুদ্ধের কূটনীতির দেউলিয়াপনার সাক্ষ্য। এই নীতিতে লাভবান হচ্ছে একমাত্র অস্ত্রশিল্পপতিরা। আমেরিকার এ বছরের মোট বাজেটের শতকরা ৪৪ ভাগ মঞ্জুর করা হয়েছে সামরিক বিমান বহরের জন্ম যার বেশির ভাগ টাকা যাবে ক্ষেপণাস্ত্রের পিছনে। গত ১০ বছরে ক্ষেপণাস্ত্র কেনার বহর বেড়ে গিয়েছে ৪০০ গুণ। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের পিছনে খরচ হয়েছে ২৪৪০ কোটি ডলার। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ হিউ ড্রাইডেন সম্প্রতি আক্ষেপ করে বলেছেন :—

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মহাজাগতিক গবেষণার যদি সামরিক মূল্য না থাকে, তাহলে সরকারী তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এই বিপুল অর্থ রকেফেলার, ডুপন্ট, ক্রাইজলার, লকহীড ইত্যাদি যে-সব কাতলাজাতীয় কোম্পানীর পেটে যাচ্ছে, সেগুলির ডিরেক্টর বোর্ডের মধ্যে দেখা যাবে মার্কিণ মন্ত্রী-উপমন্ত্রী, সেনাপতি-উপসেনাপতিদের (যেমন প্রাক্তন দেশরক্ষামন্ত্রী জনসন, জেনারেল ম্যাক্‌লেরয় ইত্যাদি)।

কূটনীতি জিনিষটা যুদ্ধের মতই পররাষ্ট্রনীতির এক উপায় বিশেষ। ইতিহাসে এমন অনেক যুদ্ধের নজির আছে যার পরিণাম সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েছে যে সেই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। তার কারণ সেই যুদ্ধের পিছনে যে পররাষ্ট্র-নৈতিক লক্ষ্যছিল তা অন্যায় ও অনুসরণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিটলারের যুদ্ধের কথা বলা যায়। কূটনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। তাই বিসমার্ক কূটনীতির সংজ্ঞা দেন, "যা সম্ভাব্য তা করবার কৌশল।" কিন্তু হিটলারের দার্শনিক রোজেনবার্গ বিস্‌মার্কের সেই জ্ঞানগর্ভ উক্তি উল্টে দিয়ে বলেন যে "অসম্ভাব্যকে সম্ভাব্য করার কৌশলই কূটনীতি।" মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আজ রোজেনবার্গের বক্তব্যই মেনে নিয়েছে। মার্কিণ কূটনীতির রকমসকম দেখে ১৫১৩ সালে অর্থাৎ সাড়ে চারশো বছর আগে মেকিয়াভেলির উক্তির কথা মনে পড়ে। 'রাজকুমার' নামে বইখানিতে মেকিয়াভেলি এক জায়গায় লিখছেন :—

সংগ্রাম করার উপায় দুটি: একটি হচ্ছে আইনের দ্বারা অন্যটি বলের দ্বারা। প্রথমটি মানুষের বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি পশুর।

বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু সেই পাশবিক উপায়টিই গ্রহণ করেছে। আপোষ আলোচনা, আইন-কানুনের ধার সে ধারে না। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করাই তার মূলমন্ত্র। সেই ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য সাধনের উত্তোগপর্ব হচ্ছে ঠাণ্ডাযুদ্ধ। এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়ে দিয়ে তাঁদের বাস্তববর্জিত কল্পনা জগতে বিচরণ করতে বাধ্য করেছে এবং তাঁদের কূটনীতিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। অসম্ভাব্যকে সম্ভব করার দুরাশাকে প্রশ্রয় দেবার জন্তে তাঁরা নিত্য-নতুন নীতি ও কৌশল ভাঁজছেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে বসে সামরিক দিক ছাড়া অন্য কোন দিক তাঁরা চিন্তা করতে পারেন না। পশ্চিম-জার্মাণ লেখক পল সেথের ভাষায় মহান কূটনীতির ঐতিহ্যবাদীরা আজ জেনারেলদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। তাই ঠাণ্ডাযুদ্ধের কুহকে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা সোভিয়েত সরকারের প্রত্যেকটি সদুদ্দেশ্যমূলক কূটনৈতিক চালে বাধা দিচ্ছেন, সব কিছুতেই আগে থাকতে 'না' বলে বসে আছেন, এমন কি আজ যাতে 'হাঁ' বলছেন, কাল তাতেই 'না' বলছেন নির্লজ্জের মত। 'এই প্রস্তাবে নতুন আর কি আছে' —এই হচ্ছে তাঁদের কথার মাত্রা।

১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের সময় নিজের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত বংশের মায়া কাটিয়ে যে কূটনীতি-বিশারদ ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছেন তিনি হচ্ছেন তালেরাঁ। তারপর দুনিয়ার ইতিহাসে আমরা দেখেছি মেটার্নিককে, জর্জ ওয়াশিংটন ও জেফার্সনকে। তাঁরা কালের দাবী অনুসারে পররাষ্ট্রনীতির মূলবস্তু বদলে নিতে পেরেছিলেন। আজকের উদীয়মান সমাজতন্ত্রের যুগে, পরমাণু শক্তি ও রকেটের যুগে যুদ্ধের পথ পরিত্যাজ্য—একথা উপলব্ধি না করে যে কূটনীতি যুদ্ধের উপাসনা করে, সে কূটনীতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

দাবী

শ্রীমতী যূথিকা ঘোষ

পুষ্পপরাগপেলব এই মধুযামিনীতে
কল্পনার আলপনায় কে তুমি এলে
আমার মনের সব দিগন্তকে রাঙিয়ে,
ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে হৃদয়সমুদ্রে?
এই মন-দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়া যত,
আশা নিরাশায় দোলানো মিথ্যা ছলনা কত,
কাঞ্চনমূল্যে কেনা হল জীবনের পসরা,
পূজিত প্রণয়ের চারু চয়নিকা, অয়ি নিপুণিকা!

অঞ্জলি ভরে আজি দিয়ে যাব আমি
শেষে নিবেদনের পরিপূর্ণ পূজাডালি,
আসব-চঞ্চল যৌবনের মর্মবাণী
সেদিন যা পারিনি দিতে তারি সবখানি।
নিষ্ফল প্রেমের নিষ্করুণ রণক্ষেত্র হতে দূরে
সকল ভাবনা বাসনা বিরহবেদনার অন্তরালে
পরাভব প্রত্যাখ্যানের প্রাচীর পেরিয়ে
নিষ্কাম চৈতন্তের উদার মোক্ষভূমে

তোমার দাক্ষিণ্যে ভরা এতটুকু শান্তি শুধু চাই,
হে অন্তর্যামী! এই মাত্র দাবী মোর, অন্য কিছু নাই।

ঘুম ও ঘুমের ওষুধ
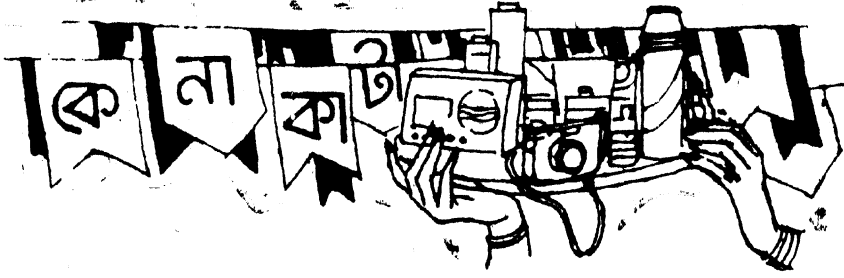
দেহের শ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করা এবং ক্ষয়পূরণ—এর জন্যে বিশ্রাম প্রয়োজন। আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম অর্থই ঘুম বা নিদ্রা। বেঁচে থাকবার জন্যে এবং সুস্থভাবে বাঁচবার জন্যে এ না হলেই নয়। ঘুম যতটা ভালো হবে, নিদ্রা যে পরিমাণে হবে গাঢ়, শরীরের উপকার হয় সাধারণতঃ সেই অনুপাতে। এ অজানা নয় কারো, মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘুমের প্রশ্নটি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।

চিকিৎসকরা রোগীদের ঘুমের ওপর যে জোর দেন, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। বলা হয়, রোগী যদি ঘুমাতে পারলো, ওষুধ ছাড়াই রোগ নিরাময় হয়ে যাবে অনেকটা। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টাও একই কারণে হয়ে থাকে। যথোচিত ঘুম না হলে শরীর যেমন সুস্থ রাখা যায় না, তেমনি মাথার কাজ চালিয়ে যাওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্ককেও সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম চাই।

সোজাসুজি অনিদ্রা বা রাতে ভাল ঘুম না হওয়ার অবস্থা একটি ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। যাদের চিন্তা ভাবনায় দিনাতিপাত করতে হয়, তাদেরই অনিদ্রায় ভুগতে দেখা যায়। এ সবের প্রতিকারকল্পে ওষুধপত্র ব্যবহারের প্রয়োজন অস্বীকার করা চলে না। উন্মাদরোগীদের ইন্‌জেকশন প্রভৃতি চালিয়েও ঘুম আসে কি না দেখা হয়। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে কাটানো হবে, এমনটি হতে পারবেনা কখনই।

ঘুম ভালো হওয়া না হওয়া শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের কতকগুলি অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক নিজের বিছানাটি বা নিজের ঘরটি না হলে যাদের ঘুম হলো না। আবার এ ধরণের লোকও রয়েছে, সারাদিন পরিশ্রমের পর যেখানেই মাথা রাখা, অমনি ঘুমের আবির্ভাব। শ্রমিক শ্রেণীর নারী-পুরুষদের ভেতরই এইটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আবার যারা মেদবহুল বা স্ফীতকায় সুনিদ্রার জন্যে তাদের অনেককে রীতিমতো আরাধনা করতে হয়।

মোটের ওপর, এটা ঠিক স্বচ্ছন্দ-আরামে ঘুমোতে হলে রুচি অনুযায়ী শয্যা ও পরিবেশ চাই-ই। ঘুমের জন্যে সহসা যেন ওষুধ-পত্র সেবনের প্রয়োজন না পড়ে, সেদিকেও সতর্কতা থাকতে হবে। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মে ঘুম যেখানে হয়, শরীরের পক্ষে তা-ই সমধিক কল্যাণকর। দিনের বেলা ঘুম সাধ্যমত বর্জন করতে পারলেই ভালো—অবশ্য, অসুস্থ বা দুর্বল লোকদের আর বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রশ্ন আলাদা। দিনের বেলা না ঘুমালে রাতের ঘুম গাঢ় হয়ে থাকে, সাধারণ অবস্থায় এই দাবী রাখা হয়। এমন কি, বিশেষজ্ঞদের একটি সতর্কবাণীও রয়েছে—দিবানিদ্রা 'স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর।

শারীরিক খাতিরেই যেখানে ঘুম, সে স্থলে ঘুমটি কি করে ভালভাবে হতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতেই হবে। খাওয়া-দাওয়ার মতো এ প্রশ্নটিকেও আদৌ উপেক্ষা করা চলতে পারে না। দিনের বেলায় যেমন ঘুমানো একরূপ নিষেধ, অধিক রাত্রি অবধি জেগে থাকাটাও অনুচিত। দেহ-যন্ত্রকে মজবুত রাখার তাগিদে সকাল সকাল ঘুমাতে হবে, উঠতেও হবে সকাল সকাল। খাওয়া-দাওয়া এমন করা চলবে না, বিশেষতঃ রাত্রিবেলা, যাতে করে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া সম্ভবপর।

সুনিদ্রার জন্যে কতকগুলি প্রক্রিয়া অনুসরণের কথাও বলে থাকেন শরীর-বিজ্ঞানীরা। যেখানে ঘুমাতে হবে, স্থানটি যতটা সম্ভব নির্জন হওয়া চাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। শয়নকক্ষে হাওয়া যদি ভালোরকম খেলে, তা হলেও নিদ্রা সহজেই চোখ জুড়ে বসতে পারে। সর্বোপরি অবশ্যি দরকার—যেমন করেই হোক্ মনকে চিন্তামুক্ত করা। দুশ্চিন্তা যদি মাথায় চেপে থাকে, ঘুম তা হলে সহসা আসতে চাইবে না। যদিও বা এলো, সে ঘুম তেমন গাঢ় হবে না, শরীরের প্রত্যাশিত ক্লান্তি দূর করবে না। অস্বস্তি, উদ্বেগ ও ক্রোধ—মনের ওপর এ সকলের দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ঘুমানোর আগে মনকে এ সকল অবস্থা থেকে দূরে রাখতে পারলেই উত্তম। বিছানায় শুয়েও যদি দেখা গেল, ঘুম আসছে না কিছুতেই —এক মনে একটা বিষয় ভাবতে থাকলে সে অবস্থায় সুফল লাভ হয় অনেক ক্ষেত্রে। মনের এই একনিবিষ্টতা ঘুমের একটা চমৎকার ওষুধ বা ব্যবস্থা-পত্র বলে দাবী রাখা হয়।

ভালো খাওয়ার পাশাপাশি ভালো ঘুম—স্বাস্থ্যের পক্ষে দুই-ই একান্ত অপরিহার্য্য, এও বলার অপেক্ষা রাখে না। শরীরে ব্যথা-বেদনা থাকলে বেদনা-নাশক পিল খেলে অনেক সময় নিদ্রা এসে যায়। যাদের রক্তের চাপ আছে বা রাতের দিকে বায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় বেশিরকম, ইচ্ছামাত্র তাদের চোখে ঘুম আসে না। মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে এসব ক্ষেত্রে কবিরাজী তেল ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখা যায় অনেককে। পেট অতিরিক্ত গরম হলেও ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া স্বাভাবিক। সে কারণে লক্ষ্য রাখতে হবে—পাকস্থলীর যেন সুস্থাবস্থা থাকে, পেটে যেন বেশি সময় ধরে মল থেকে না যায়। প্রয়োজনবোধে পায়খানা পরিষ্কারের জন্যে কোন বেড পিল বা রেচক ওষুধ-পত্র সেবন কিংবা অপর কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ সকলেরই লক্ষ্য ভালোভাবে নিদ্রা যাওয়া, শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখা।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হলো এবং এ এমনি স্বীকার্য্যও যে স্বাভাবিক

নিদ্রাই সবচেয়ে শ্রেয়ঃ ও সর্বসময় কাম্য। ঘুমঘোরে অনেকেরই স্বপ্ন দেখার অভ্যাস আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের মতে এ ঠিক ভালো নয়। বেশিরকম ভরা পেট থাকলে যেমন ঘুমের পক্ষে অসুবিধা, তেমনি আবার একদম খালি পেট থাকলেও ঘুম আসতে চাইবে না কিংবা ক্লান্তির দরুণ ঘুমালেও জেগে জেগে উঠতে হবে। রাত্রে যে কারণেই হোক, বার বার নিদ্রা ভেঙে যাওয়াটাও শরীরের ক্ষতিকারক। দীর্ঘদিন এভাবে চললে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে, দেহ-কাঠামোর ক্রমে দেখা দিবে বৈকল্য।

শরীরবিজ্ঞানীদের একটি অভিমত—দেহ শ্রান্ত হলেই ঘুম আসবে। কিন্তু তার জন্যে মাত্রাতিরিক্ত শ্রম গ্রাহ্য নয়। শ্রান্ত হওয়া সত্বেও চোখে ঘুম আসতে চায় না, এমনও বহু ক্ষেত্রে ঘটে। কেউ কেউ বলেন, নিদ্রা একটা অভ্যাসের জিনিস। সকলে ঠিক ভাবে নিদ্রামুখী করে তুলতে পারলেই নিদ্রাদেবী না এসে থাকতে পারে না। একটানা ঘুম যাতে হয়, সেই লক্ষ্য থেকে রাতের খাওয়ার পর কয়েক মিনিট খোলা যায়গায় হেঁটে আসা, বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয়-পরিজনের সাথে একটু হাল্কা গল্প-গুজব করা, এসব অভ্যাস মন্দ নয়।

মজবুদ স্বাস্থ্যের তাগিদেই সুনিদ্রার দাবী রাখা হয়েছে। অনিদ্রা ব্যাধি যদি সত্যি হয়েছে বলে বোঝা গেলো, চিকিৎসা করাতেই হবে, ওষুধপত্র ব্যবহার করতেই হবে। শিশুদের ঘুম যত বেশি সময়ব্যাপী হবে, ততই শ্রেয়ঃ—শোওয়ার সাথে সাথে ঘুমটা যদি ভালোরকম হয়, সে-ই তাদের শরীর পুষ্টি ও বর্দ্ধনের পক্ষে সহায়ক। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরও দিনে অন্তত: ছয় সাত ঘণ্টা ঘুমাবার অভ্যাস থাকতে হবে। অতিরিক্ত নিদ্রা অবশ্যি বেশী বয়সে খারাপ, কিন্তু একেবারে নামমাত্র ঘুমালেও শরীর টিকবে না, মনও স্বভাবতঃই হয়ে পড়বে অবসন্ন স্ফূর্তিবিহীন। এসব নানা দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রীতিমতো ঘুম যাতে হয়, সেই লক্ষ্য থেকে যা কিছু করা প্রয়োজন না করলে চলবে না। ঘুমের ওষুধ যদি সত্যি দরকার হয়, গ্রহণ করতেই হবে। সুস্থ জীবনের জন্যে সুনিদ্রা—বিশেষজ্ঞদের এ নির্দেশ যেন আমরা ভুলে না যাই।

দৈহিক ওজন হ্রাসের প্রশ্ন

অতিরিক্ত রোগা হয়ে থাকা যেমন ঠিক নয়, তেমনি মাত্রাতিরিক্ত শরীরের ওজনও অবাঞ্ছনীয়। দীর্ঘদিন অবধি সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে হলে দৈহিক কাঠামোটি মজবুদ করে গড়ে তোলা চাই। সেক্ষেত্রে ওজনের প্রশ্নটিও একটি বড় প্রশ্ন, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

দেহের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা ওজনবৃদ্ধি (মাত্রা ছাড়িয়ে) একটি রোগ, সন্দেহ নেই। যারা ধনিক, নিশ্চিন্ত জীবন যাদের, তাদের ক্ষেত্রই এর আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। মেদ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হতে পারে, এমন খাত্ত-খাবার সাধারণ লোকের ভাগ্যে জুটে না বলেই ওজন হ্রাসের প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর। স্ফীতোদর বা মেদবহুল মানুষের স্বস্তি নেই কোন অবস্থাতেই, এমন কি ঘুমিয়েও নয়। তাই বাড়তি ওজনটা কমিয়ে ফেলার জন্য তাগিদ তাদের আসতেই হবে।

ওজন হ্রাসের চেষ্টার আগে ওজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সত্যি বেড়ে গেছে কিনা; সে সম্পর্কে কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া চাই। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে শখ করে ওজন বা মেদ কমাবার প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যায়। বিলেতে মেয়েদের ভেতর এই ধরণের উদ্যম তুলনায় বেশি। পাতলা ছিপছিপে হলে সৌন্দর্য্য বাড়বে, এরূপ ধারণা থেকেও ওজন কমবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অথচ কালক্রমে বিপদকে ডেকে আনে—মারাত্মক ব্যাধি সুযোগ পেয়ে দেহযন্ত্রকে করে দেয় বিকল।

অতিরিক্ত মাত্রায় ওজন বেড়ে গেছে কি না অর্থাৎ ওজন কমাবার প্রশ্নটি উঠছে কিনা, এ বুঝতে হবে নিজেকেই। বাইরে থেকে স্ফীতকায় দেখা গেলেই সব সময় শঙ্কিত হওয়া চলে না। কারণ, সকল মানুষের দেহভার একই রকম নয়, উচ্চতা ভেদে ওজন কম-বেশি হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজনের ক্ষেত্রে যা খাটবে, অপরের ক্ষেত্রেও সেই সূত্র হুবহু চলতে পারে না। নিজের স্বাস্থ্যাবস্থা বুঝে ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে বাড়তি ওজন কমাবার যার প্রয়োজন হবে, তারই শুধু সতর্কতা চাই, অন্যের নয়।

কয়েকটি লক্ষণ থেকে ওজন মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়েছে কি না, বোঝবার চেষ্টা নিতে হবে। শরীরবিজ্ঞানীরা বলেন—জুতোর ফিতে পরাতে গিয়ে যদি হাঁফিয়ে ওঠতে হয়, এমনি যদি তখন মনে হয় যে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে হবে আলোচ্য ক্ষেত্রে ওজন হ্রাস প্রয়োজন। যে-বয়সে যতটুকু কর্মশক্তি থাকার দাবী রাখা হয়, শরীর স্ফীতির দরুণ সেটি হ্রাস পেয়ে চলেছে মনে হলে, সেখানে ওজন কমাবার প্রশ্ন ওঠতে পারে।

কি করে ইচ্ছানুরূপ কৃশ বা রোগা হওয়া যায়, এর কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। বাড়তি মেদ বা ওজন কমাবার জন্যে সাধারণ নিয়ম যে-টি বলা হয় সে হলো খাওয়া কমানো, বিশেষ করে চর্বিযুক্ত খাদ্য এড়িয়ে চলা। কিন্তু এমনও বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, না খেয়েও শরীর বাড়ছে, ওজন কমতে চাইছে না। এরূপ অবস্থায় সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে নয়। নিজের বুদ্ধিতে কোন ওষুধাদি খেয়ে ওজন হ্রাসের চেষ্টাও সমর্থনযোগ্য নহে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শকেই সকলের ওপর স্থান দিলে দ্রুত সুফল দেখা দিবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানভিক্ষু

ছয়

উড়ন্ত গালিচা

"The riddle does not exist. If a question can be put at all it can also be answered."

—L. Wittgenstein

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শংকর প্রশ্ন করে, এবার কী প্রোগ্রাম, সুমিত্রা?

কনট সার্কাসের একটা রেস্তঁরায় ওদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর্ব সবে মাত্র শেষ হয়েছে। সুমিত্রা মাথা এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারের পেছনে; ক্ষুন্নিবৃত্তির আমেজভরা সন্তোষ ওর অর্ধনিমীলিত চোখে। বলে, প্রোগ্রাম তো তোমার ওপরে। তোমার 'স্বর্গে' আবার ফিরে যাবে বলছিলে না?

আলস্যভরা কণ্ঠে শংকর বলে, নাঃ। থাকগে যাক্ আজকের মতো। অন্তত এই আমেজভরা দুপুরে ভুলে যাওয়া যাক্ হবিবুল্লার কথা। অ্যান্টিগ্রাভিটি—একটা দুঃস্বপ্ন। বাস্তব হচ্ছে ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির শংকর রায় আর হার্ভার্ডের ছাত্রী সুমিত্রা—এদেরই নিয়ে। তোমার সংগে গত সাড়ে তিন বছরের হিসেব নিকেশ মেলানো হোলো না এখনও পর্যন্ত। সময়ই বা পেলাম কোথায়?

সুমিত্রা রসভংগ করে, আমার কিন্তু আজ বিকেলে চা-এর নিমন্ত্রণ আছে কৃষ্ণস্বামীর বাড়ীতে। মিসেস কৃষ্ণস্বামীকে পশম বোনার একটা নতুন প্যাটার্ন দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি অনেক দিন। ভদ্রমহিলা রাগ করেছেন আমার ওপরে।

কাটিয়ে দিতে পারো না তুমি? শংকরের গলার স্বরে অসহায় ভাব।

সুমিত্রা হেসে ফেলে, তা না হয় দিলাম। কিন্তু তোমার অবচেতন মনের কথাগুলো সরকারী ফাইলে জমা হলে কি ভাল হবে?

তার মানে?

সুমিত্রা ইসারায় সিকিউরিটির ভদ্রলোককে দেখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক কিছুদূরে একটা কফির পেয়ালা নিয়ে বসে খবরের কাগজে নিমগ্ন।

শংকর বলে, তাইতো! এ আপদের কথা মনেই ছিল না। মহা ঝঞ্ঝাট!

কিছুক্ষণ বিমর্ষ থেকে হঠাৎ সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, চাপাগলায় সুমিত্রাকে বলে, এই সুমিত্রা, চলো পালানো যাক।

সুমিত্রা বলে, যাঃ, কী করে পালাব?

শংকর বলে, খুবই সোজা। তুমি এখান থেকে সোজা মেয়েদের পাউডার রুমে চলে যাও। ফিরবার পথে রান্নাঘরের ওই পাশের সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে যেয়ো। খুব সম্ভব উঠবে গিয়ে একটা টানা বারান্দায়। আমার অনুমান, সে বারান্দার অন্য প্রান্তে একটা নামবার সিঁড়িও পাওয়া যাবে। রাস্তায় নেমে প্রথম বই-এর ষ্টলটার ভেতরে ঢুকে বই-এর দরদস্তুর শুরু কর গিয়ে। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।

সুমিত্রা বলে, মতলবের মধ্যে তোমার অনেক অনুমান আছে, যদি কোনো জায়গায় দেখি রাস্তা বন্ধ, তাহলে?

তাহলে ফিরে আসবে।

সুমিত্রার চোখেও ষড়যন্ত্রের চাপা উত্তেজনার ছোঁয়াচটা লাগে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলে, ও সব পারবো না বাপু! ধরা পড়লে মাথা কাটা যাবে যে।

শংকর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে—তা না হয় গেল। তাছাড়া তোমাকে এ ষড়যন্ত্রের অংশীদার করছি কেন? দরকার পড়লে কৃষ্ণস্বামীর কাছে তোমাকেই খাড়া করে দেব। তোমার তো ওখানে সাতখুন মাপ।

সুমিত্রার চোখ কপালে ওঠে। কী সর্বনেশে ছেলে রে বাবা! নিজের খেয়ালের জন্য একজন মেয়ের মানসম্ভ্রম বলিদান করতে বাধে না?

দৃঢ়কণ্ঠে অনু যোগ করে নাঃ, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

শংকর কাঁপরে পড়ে, বহু অনুনয় করে কিন্তু সুমিত্রাকে টলানো যায় না। শেষে পাল্টা অনুযোগ করে সে—কী ব্যবসাদার তুমি! আচ্ছা তাহলে রেখে দাও তোমার কাছে আমার স্বীকারোক্তি—

পকেট থেকে নোটবুক বের করে শংকর একটা পাতা ছিঁড়ে নেয়, তাতে খস্‌খস্ করে লিখে যায়—

এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাপন করানো হচ্ছে যে আজ (তারিখ) বেলা দুটো পঁচিশ মিনিটে সিকিউরিটির ব্যবস্থা লংঘন করবার জন্ত একমাত্র আমিই দায়ী। অনিচ্ছুক ডাঃ সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে বাধ্য করানো হয়েছিল এ অপকাজের সহযোগিতা করার জন্য। আমি সজ্ঞানে ইত্যাদি, ইত্যাদি (স্বাঃ) শংকর রায়।

এবার রাজী আছ তো ?

সুমিত্রা চিরকুটখানা পড়ে দেখে বলে, উঁহু, এইখানে সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে বাধ্য করানো হয়েছিল, এর পর যোগ কর বলপ্রয়োগে।

শংকর কাঁচু-মাচু মুখে বলে, আমাকে শেষে নারীহরণের মামলায় ফেলতে চাও তুমি ? থাক দরকার নেই।

সুমিত্রা বলে—বাঁচা গেল।

শংকর বলে—বয়েই গেল আমার। তোমার সুন্দর বলে কোনও জিনিসের বালাই নেই, জানলে ?

সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হয়ে যায় বেশ।

কিছুক্ষণ কাটলো নিঃশব্দে। শংকর উসখুস করতে থাকে। শেষে মরীয়া হয়ে যোগ করে বলপ্রয়োগ।

সুমিত্রা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোনোরকমে হাসি সামলায়। তারপরে কাগজখানা হাতব্যাগের মধ্যে ভরে পরিকল্পনা মতো চলে যায় পাউডারক্রমের দিকে।

রাস্তায় নেমে সুমিত্রা শংকরের স্বীকারোক্তি ব্যাগ থেকে বের করে আর একবার পড়ে নেয়। মুখে তখনও তার কৌতুকের হাসি। তারপর রওনা দেয় বুকষ্টলের দিকে।

* * * *

শংকরের সামনে পরিচারক এসে বিল রেখে যায়। প্রাপ্যের সব কিছুই মিটিয়ে দেয় সে। তার পরেই তাকে আবার ডেকে বিল সম্বন্ধে তর্ক জুড়ে দেয় উচ্চরবে। পরিচারক তাকে বিনীত ভাবেই জানায় যে বিল সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে ম্যানেজারের সংগেই দেখা করা উচিত। শংকর জিজ্ঞাসা করে—কোথায় ম্যানেজারের ঘর ? পরিচারক তাকে দেখিয়ে দেয় রান্নাঘরের পাশের সিঁড়ি। শংকর সদর্পে সেদিকে এগিয়ে যায়—তারপর দেওয়ালের আড়ালে পৌঁছে ম্যানেজারের ঘরের পাশ দিয়ে সোজা গলিপথে নেমে পড়ে।

বাঁকটা ঘুরে সন্তর্পণে একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে। নাঃ, রক্ষী ভদ্রলোক এখনও টের পাননি ওদের ষড়যন্ত্রের কথাটা। নিজের কৃতিত্বে উল্লসিত হয়ে ওঠে শংকর।

সুমিত্রাকে দেখা যায় নিবিষ্টমনে একখানা বই-এর পাতা ওল্টাতে।

হাঁফাতে হাঁফাতে শংকর বলে, চলো, এক্ষুণি এ জায়গা ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাওয়া যাক। এতক্ষণে বোধ হয় দিল্লীর সমগ্র পুলিশ বাহিনী আমাদের গ্রেপ্তার করতে মোতায়েন হয়ে গেছে। ট্যাক্সি,—এ ট্যাক্সি।

সুমিত্রা বলে, দূর্ বোকা, ট্যাক্সি ডাকা মানে আত্মসমর্পণ করা। তার চেয়ে চলো, ঐ সিনেমা-হলটার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যাক আপাতত।

* * * *

সিনেমার অন্ধকার ঘরের আশ্রয়ে দু'জনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ম্যাটিনী শো আরম্ভ হয়ে গেছে। নিউজরীল শেষ করে কার্টুন, তারপর পরবর্তী আকর্ষণের খণ্ডবিশেষ দেখানো হয় কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বিরতি জ্ঞাপন করে আলো জ্বলে ওঠে।

কানের কাছে একটা চাপা কাশির শব্দে দু'জনেই পেছন ফিরে তাকায়।

রক্ষী ভদ্রলোক ওদের দিকে পেছনের সীটে বসে আছেন নির্বিকার ভাবে।

শংকরের কান দুটো অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে। সুমিত্রা আরক্তমুখে রুমাল চাপা দিয়ে ক্যাচ-ক্যাচ করে হাসতে থাকে।

রক্ষী ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করেন, আপনারা যদি নিরিবিলিতে সিনেমা দেখতে চান—আমাকে বলতেই পারতেন। ভেবে দেখেছেন কি, যদি এখন আপনাদের ধরে ফেলতে না পারতাম, তাহলে আমার চাকরী নিয়েই টানাটানি পড়ত ?

মনে রাখবেন, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা ; আপনাদের চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করার এখনও কোনো প্রয়োজন হয়নি। দরকার হলে তাও করতে হবে।

আমার সংগ এড়াবার জন্ত আপনাদের মতো পণ্ডিত লোকেরাও এ সস্তা চালটা চালবেন, এটা আশা করতে পারিনি। এ সমস্ত ব্যাপারে আমরা অনভিজ্ঞ নই, ভবিষ্যতে এ কথাটা মনে রাখবেন।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু ইংগিতটা জোরালো।

শংকর অপ্রতিভ হয়ে বলে, মাপ করবেন, যদি কোনো অপরাধ করে থাকি। সিকিউরিটির কড়া বাঁধনে আমরা অভ্যস্ত নই, তাই ক্ষণিকের জন্ত বেরিয়ে পড়তে সাধ হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, যদি জানতাম যে আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আপনার ক্ষতির সম্ভাবনা—তাহলে কখনই এ পথ নিতাম না। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আজ থেকে আপনাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার লংঘন হতে দেব না।

সুমিত্রা মিনতিভরা বড়ো বড়ো চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কি, আপনি রিপোর্ট করবেন ?

শংকর দেখে, ভদ্রলোকের ওপরে করুণ নয়নের প্রতিক্রিয়া।

ভদ্রলোক নরম হয়ে যান, এবারের মতো না হয় রিপোর্ট না করলেও চলবে। আপনাদের আমি অবিশ্বাস করি না। আমার শুধু অনুরোধ, যদি ভবিষ্যতে দরকার হয় আমাকে বা অন্ত রক্ষীদের একবার জানিয়ে যাবেন। অন্ততঃ এটুকু সহযোগিতা আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি। সব জায়গায় হয়তো রক্ষী সংগে থাকারও দরকার হবে না। আচ্ছা, আপনারা সিনেমা দেখুন।

ভদ্রলোক চলে যান ওদের দৃষ্টির অন্তরালে।

ইতিমধ্যে সিনেমা আবার আরম্ভ হয়ে গেছে।

আরব্যোপন্যাস থেকে মনগড়া, অবিশ্বাস্য কাহিনী। টেকনিকলারের অপরূপ স্বপ্নরাজ্য—বাঁদী থেকে বাদশাজাদীর চোখ ঝলসানো রূপের সমাবেশ।

পরাজয় আর বত্তো রাজ্যের লজ্জার গ্লানিতে অসাড় হয়ে গেছে শংকরের স্নায়ুমণ্ডলী—পর্দার ছবি অনেকক্ষণ মনের পটে প্রতিফলিত হয় না। কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রার দিকে একবার তাকায় শংকর। ম্লান হেসে পরম সহানুভূতিভরে সুমিত্রা ওর হাতের ওপর হাত রাখে।

তারপর কোন অজানা মুহূর্তে দুজনেই আবিষ্ট হয়ে গেছে পর্দার কাহিনীর মধ্যে। উড়ন্ত গালিচা উড়ে চলেছে চাঁদের আলোয়

প্লাবিত উজ্জ্বল আকাশে সুপ্ত নায়ককে নিয়ে। গিরি-প্রান্তর, মরু-কান্তার পার হয়ে, কতো জনপদ অতিক্রম করে সাতমহলা বাড়ীর অন্তঃপুরে নায়িকার কক্ষে প্রবেশ করল উড়ন্ত গালিচা। নায়কের স্বপ্নভংগ হয় নায়িকার করস্পর্শে।

তারপর নায়ক হারায় নায়িকাকে—বাস্তবের সংঘাতে মিলিয়ে গেল স্বপ্ন। বিপদসংকুল পথে নায়কের অভিযান—হারানো স্বপ্ন পুনরুদ্ধার করতে। সমুদ্রে জাহাজ ডুবি ; সর্বহারা নায়ককে বিক্রয় করা হোলো বাগদাদের বাজারে ; নায়কের পলায়ন ; হাজার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, কতো দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে—অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্তে দৈত্যের সহায়তায় হয় পুনর্মিলন।

এখানেই ছবির শেষ।

* * * *

একটা ছোটো কাফেতে চা-এর পর্ব শেষ করে প্রায়ান্ধকার রাজপথে ওরা নেমে পড়ে। শংকর-সুমিত্রার পরস্পরকে বলবার কথা যেন ফুরিয়ে এসেছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, ওরা এসে বসেছে পার্কে। নিওনের বাতি জ্বলে উঠেছে চারদিকে। রং-বেরং-এর আভায় কনট সার্কাস রূপান্তরিত হয়ে গেছে—সিনেমায় দেখা সেই বাগদাদ সহরে।

উড়ন্ত গালিচা।

আরব্যোপন্যাসের সুরু ইতিহাসের অন্ধকারময় গলিতে। কতো শতাব্দী পেরিয়ে, কতো সভ্যতার ধারা বেয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করে—আজও সে-কাহিনীর শেষ হোলো না। হলিউডের রূপস্রষ্টার মনে সে কথা আলোড়ন তোলে—বিংশ শতাব্দীর প্রখর সূর্যালোকের মধ্যেও। রূপে-রসে-বর্ণে সে কাহিনী জীবন্ত হয়ে ওঠে রূপালি পর্দায়। ফ্রেজনো ক্যালিফোর্ণিয়ায়, নাইরোবি কেনিয়ায়, সুদূর জাপানের কিয়োটো সহরে বা দিল্লী নগরীতে।

উড়ন্ত গালিচার কাহিনী কি একেবারেই মনগড়া ?

মাধ্যাকর্ষণের অমিতশক্তির পরাভব মানুষ কি প্রত্যক্ষ করেছে যুগে যুগে ?

না, সবই কবি-কল্পনা ?

অথবা, ধরো না কেন পুষ্পকরথের কথা—পক্ষিরাজের কাহিনী। কল্পনাই যদি হয়, একটা বাস্তব ভিত্তি তো তার থাকা চাই ? দৃশ্য জগতের ওপরে নির্ভর করেই না গড়ে ওঠে কল্পনা ? যে বস্তু কেউই দেখেনি, সেটার কল্পনা মানুষ করবে কী করে ?

পরশ পাথর। বহু মনীষী জীবনপাত করেছেন পরশ পাথরের নিষ্ফল সন্ধানে। সেটা কি একটা অলীক কল্পনার ওপরেই ভিত্তি করে ? সত্যই কি কেউ খুঁজে পেয়েছিল পরশ পাথর ?

মানুষ ভেবেছে চিরকাল চালু থাকবে এমন যন্ত্রের কথা—পার্পেচুয়াল মোশান মেশিনের কথা।

কোথা থেকে আসে এসব কল্পনা ? কোথা থেকে হবিবুল্লা পেয়েছিল এ আশ্বাস যে মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি তৈরী করবার একটা উপায় আছে ? বহ্নিবিহঙ্গের গ্রন্থাগারের সাত হাজার বই-এর মধ্যে কোথাও কি মিলবে এ আশ্বাসের আভাষ ? তার গবেষণাগারের কোন যন্ত্রটা দিয়েছিল পথের সন্ধান ?

শংকরের মন ভরে প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

* * * *

বহুক্ষণ বাদে ব্যারাকে ফিরবার পথে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করেছিল, কি শংকর, পারবে তো সমস্যার সমাধান করতে ? আমি কিন্তু তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছি।

শংকর অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিয়েছিল, কি করে বলি বলো ? তবে হবিবুল্লা খান যেটাকে সম্ভব করেছিল, শংকর রায় যে তা পারবে না—এ কথাটাও মন এখনও মেনে নেয়নি।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সুমিত্রা বলেছিল, এই তো মানুষের মতো কথা। [ক্রমশঃ।

বনহংস

[ইংরাজ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের 'Wild Swans at Coole কবিতা অবলম্বনে]

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

হেমন্ত গোধূলি : শান্ত সরোবর
বিষাদ-গম্ভীর হিমেল বনভূমি ;
হে বনহংস, দীর্ঘদিন পর
আবার কেন ওগো এখানে এলে তুমি ?

উনিশ বছর আগে যুগলে জলকেলি
এখানে করেছিলে নিবিড় সম্মোহে
প্রাণের উত্তাপে আবেগে উচ্ছলি
প্রণয়-ঘন-ক্ষণে শান্ত সমারোহে।

অমিত যৌবনে তেমনি বেগবান
অসীম প্রেমসুখে তোমরা উচ্ছল,
আমারি নেই শুধু সে উষ্ণ মন-প্রাণ
প্রতিটি শিরা আজ হিম-শীতল।

হে বনহংস দল, অশান্ত অবিরাম
কেবলি ঝাঁকে ঝাঁকে কোথায় যাও উড়ে,
হে চিরচঞ্চল, নয়ন অভিরাম
কোথায় যাবে দূরে কোন সে সরোবরে ?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে মিলিটারী ধরণের ভলান্টিয়ার-বাহিনী সংগঠনের পর সারাদেশে নানা স্থানে সেই ধরণের ভলান্টিয়ার-বাহিনী তৈরী হয়েছিল। "মেজর" সত্যগুপ্তের বি ভি দল এবং চট্টগ্রামের ভলান্টিয়ার-বাহিনীর কথা আগে বলেছি। তারা তখন থেকেই "কিছু করবার" গুপ্ত তোড়জোড় সুরু করেছিল। যুগান্তর দলের ছেলেরাও সর্বত্রই অধীর হয়ে উঠেছিল, "কিছু করবার" জন্যে। খাঁটী মিলিটারী প্যারেডের পর কংগ্রেসের নিরামিষ প্রোগ্রাম ছেলেদের বেখাপ্পা লাগছিল। চারিদিক থেকে ছেলেরা দাদাদের তাগিদ দিচ্ছিল,—অনেকের "দড়ি ছেঁড়ার" মতন মতিগতি।

চট্টগ্রামের দল রিভলভার যোগাড় করার নানা ভাবের চেষ্টা করছিল, এবং সেজন্যে কলকাতায়ও আসতো। কলকাতার যুগান্তরের দাদাদের কাছেও টোকা মারতো, এবং অনুকূলদার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাও করেছিল। সন্তোষ মিত্রের দলের "খোকা" (দেবেন দে) ২২ সাল থেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামে গিয়ে ওদের আশ্রয়ে ছিল। ওরা নাকি পাহাড়তলী অঞ্চলে এক ডাকাতি (ডাকলুট) করে অর্থসংগ্রহ করেছিল, এবং সেই ডাকাতিতে নাকি দেবেন দেও ছিল। সে তারপরে কলকাতায় পালিয়ে এসে অনুকূলদার আশ্রয়ে ছিল। অনুকূলদার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দাদাদের সাহায্য ওদের দরকার হয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই দাদারা জানতেন, ওরা কিছু করার তোড়জোড় করছে।

এই রকম অবস্থায় দাদারা পরামর্শ করে' স্থির করেছিলেন, কিছু না করলে আর চলে না। কিন্তু যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে একটু নতুন-কিছুও হওয়া চাই, এবং দেশের লোকের তাক্‌লাগানোর মতনও হওয়া চাই। অহিংস সত্যাগ্রহ করে পড়ে মার খাওয়ার যে-সাধনা স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় বলে সারা দেশ বিশ্বাস করতে সুরু করে দিয়েছে,—সে-সাধনার নিষ্ক্রিয় ক্লৈব্য যখন বিপ্লবী নওজোয়ানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়নি, তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শকে আর একবার একটু চাঙ্গা করে তোলার মতন কিছু করা—মন্দ কি! তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন সাহেব-মারার কর্মসূচী—এক সঙ্গে যত জায়গায় পারা যায়, সাহেবদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা "অভ্যুত্থান" করলে সেটাই হতো সিগ্‌ন্যাল স্বরূপ।

ঠিক হয়েছিল,—ছেলেরা নিজ নিজ ঘাঁটীতে নিজস্ব প্ল্যান তৈরী করবে এবং বাছাই করা ছেলের দল নিয়ে তৈরী থাকবে,—দাদারা চট্টগ্রামের সিগন্যাল পাওয়ার পর ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে আদেশ এবং কিছু মালমশলা পাঠাবেন,—তারপর ছেলের দল চারিদিকে ভেল্ দিগ্‌দিগ লাগিয়ে দেবে—দাদাদের হুকুম না পেয়ে কিছু করবে না।

একটা প্ল্যানের ছক দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। সমগ্র কর্মসূচীর গোড়া কলকাতায় মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত)—বিভিন্ন জেলার ঘাঁটীগুলোর সঙ্গে যুক্ত—কাজ সুরু করার আদেশ ও মালমশলা সরবরাহ করা তার কাজ। মুন্সীগঞ্জের যে ছেলের দল ক্ষেপেছিল,—প্রফুল্ল চ্যাটার্জি (জীবনের ভাই বাদল) তার চাঁই—মনোরঞ্জনদার সঙ্গে তারই সরাসরি যোগাযোগ। তার ঘাঁটী নারায়ণগঞ্জ—সেখান থেকে একদিকে বরিশাল, আর একদিকে মৈমনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারও ভার তার উপর। তাদের প্ল্যান হল, নারায়ণগঞ্জের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। তার দলে আছে জন আষ্টেক ছেলে—তার মধ্যে একজন আছেন, ১২।১৩ বছর বয়েস—মুন্সীগঞ্জের উমাচরণ সেনের নাতি,—আমাদের বড়দির ছোট ছেলে ঘাচ্‌রু, বীণা (বিনয় দত্তগুপ্ত), মনা (দ্বিজেন ব্যানার্জি), "স্বদেশী" (স্বদেশ ঘোষ—মুন্সীগঞ্জের প্রবীণ উকীল মতি ঘোষের ভাগনে) প্রভৃতি। বেঁচে ফিরে আসা হবে না বলেই যেতে হবে, এই তারা স্থির করেছিল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর এই ছেলের দল অধীর হয়ে উঠেছে,—কিন্তু কলকাতা থেকে আদেশ বা মাল আসছে না। বাদলের কাছে কিছু মাল ছিল, ছেলেরা বলে, তুমি চুপ করে বসে থাক, মালগুলো আমাদের দাও। শেষ পর্যন্ত তারা বাদলকে শাসিয়েছিল, তোমাকে খুন করে ফেলবো, যদি মাল না দাও। সে ঘাবড়ায়নি,—কিন্তু সেও ছটফট করছিল। বরিশাল ঘাঁটীর খবর নিতে সে বরিশাল গেল। তার ঠিক আগের দিনই সেখানকার ঘাঁটীর ছেলেরা মিটিংয়ে বসেছে, হঠাৎ পুলিস এসে ঘিরে ধরেছে। বাদল যখন বরিশালে পৌঁছেছে, তখন সেখানে পুলিস এমন ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় চালিয়েছে যে, বাদলকে কেউ আশ্রয় দিলে না। সে কোনরকমে সেখান থেকে ফিরে এসে মৈমনসিংহে যাবে বলে ঢাকায় গিয়ে সেখানেই ধরা পড়ে গেল।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর জেলায় জেলায় পুলিস এমন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, কোথাও কোনো ঘাঁটীই কিছু

খবর পাঠালেন। মোটাদা এসে সাহেবকে অমরদার (চট্টোপাধ্যায়) বাড়ী নিয়ে গিয়ে একদিন রেখে অন্যত্র পাচার করে দিলেন।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সূর্যসেনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের জেলেই কথা হয়েছিল,—ভবিষ্যতে কোনদিন আশ্রয়ের দরকার হ'লে, তাঁর কাছে এলে তিনি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ভাইকে সব কথা বলা থাকবে,—তিনি নিজে অনুপস্থিত থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না। লোকনাথ বল চৈতন্যদেবের বাড়ীর ঠিকানা জানতেন না, শুধু জানতেন তাঁর বাবার নাম, এবং তিনি শ্রীরামপুর কোর্টের উকীল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা, পলাতক আসামী অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের আশ্রয় ছাড়া যেখানে সেখানে যেতে পারেন না। তা ছাড়া ঘটনার পর প্রথম দিকের দিনগুলোতে পুলিস সারা দেশে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে—সর্বত্র স্পাই গিজ গিজ করছে। পলাতকেরা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। আমাদের যুগান্তর দলের দাদারা অনেকেই প্রচার করে থাকেন,—চাটগাঁর দলটা তাঁদেরই দল। কথাটা ডাহা মিথ্যা। সকল দলের লোকই সকল দলের পলাতকদের প্রয়োজন হলে আশ্রয় দিয়ে থাকেন,—কিন্তু সাধারণত পলাতকেরা নিজেদের দল বা অন্তরঙ্গ সহযোগী দলের কাছেই প্রথমে গিয়ে থাকে। লোকনাথ বলের উত্তর পাড়ায় আগমনও সেই কথারই প্রমাণ। ২৬ সালে সূর্যসেন কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন হরিনারায়ণ চন্দ্রের আশ্রয় থেকে,—এটাও ঐ কথারই প্রমাণ। তার আর একটা প্রমাণের কথা চন্দননগর গোঁদল পাড়ার নরেনদার (নরেন ব্যানার্জি—১৫।১৬ সালের "বড়দা") লিখিত পুস্তক "রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়" থেকে তারই ভাষায় শুনুন :—

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত কতিপয় বীর সন্তানকে চন্দন নগরে স্থানান্তরিত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়। বসন্ত কুমারের অফিসে বসন্ত কুমার (ব্যানার্জি—"মেজদা") ও ফরোয়ার্ড অফিসে নরেন্দ্র নাথের সহিত ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসেন। সহরের তদানীন্তন অবস্থা বুঝিয়া চন্দন নগরে আশ্রয়দান অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সেই সময়ে বসন্ত কুমার কাশীশ্বরী পাঠশালার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন, এবং নরেন্দ্রনাথও তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরামর্শ ক্রমে পরে স্থির হয়—তাঁহারা একজন শিক্ষয়িত্রী দিতে পারিলে, এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিবার অবস্থা থাকিলে চন্দননগরে আশ্রয়দান সম্ভব। সেই পরামর্শানুসারে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে এবং শশধর আচার্য স্বামী সাজিয়া চন্দন নগরে আসেন। সত্যেন্দ্রকুমার পল্লী মধ্যে শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীর নামে এক বাসা ভাড়া করেন। এই বাসা ভাড়া লইবার পূর্বে একবার গণেশ ঘোষ ২।১ রাত্রি কাশীশ্বরী পাঠশালা ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নূতন বাসায় অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, মাখন ওরফে জীবনলাল ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন সন্তান আশ্রয়লাভ করেন। প্রায় চারি মাসকাল তাঁহারা সেখানে নির্বিঘ্নে বাস করেন।···কোন রকমে সন্ধান পাইয়া ১৯৩০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শেষ রাত্রে মিঃ টেগার্ট কর্তৃক সেই বাসা আক্রান্ত হয়। তাঁহার আগমনের কথা পূর্বে আভাষে জানিতে পারা যায়, এবং বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িবার সময় থাকিলেও কোন বিশেষ কারণে সরিয়া পড়া ঘটিয়া উঠে না; তবে সারা রাত্র পাহারা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া পলাতকেরা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্বে অনন্ত সিংহ সেই বাসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই বাসা অবরোধকালে উভয় পক্ষে গুলী বর্ষণের ফলে মাখনলালের দেহাবসান ঘটে এবং অপর সকলে গ্রেপ্তার হন।···সেই সময়ে পণ্ডিচেরী পরিষদে প্রজা সমিতি পক্ষের চারুচন্দ্র রায় এবং ভোলানাথ দাস সদস্য ছিলেন। এই অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে উক্ত দুইজন সদস্যকে পণ্ডিচেরীতে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।··কিন্তু সেই ডেপুটেশনে চন্দন-নগরবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।····"

দেখা যাচ্ছে,—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত পলাতকদের চন্দননগরে রাখার ব্যবস্থায় লিপ্ত হন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রায় এক মাস পরে। চট্টগ্রামের দল যদি যুগান্তরদলের শাখা হত,—তাহলে আগে থেকেই চন্দননগরে তাদের ভাল আশ্রয়ের বন্দোবস্ত অবশ্যই রাখা হ'ত।

যাই হোক,—চন্দননগরের ঘটনা যেদিন ঘটলো, তার পরের দিনই কাগজের অসম্পূর্ণ খবরে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো—সব কথা ভালো করে জানার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় চন্দননগরে চলে গেলুম। গেলুম গোঁদল পাড়ায় নরেনদার বাড়ীর উদ্দেশে। কিন্তু গিয়ে সটান তাঁর বাড়ীতে ওঠা ভাল মনে হল না—যদি ওয়াচ্ থাকে? সুতরাং রাস্তায় একটু ঘুরলুম,—জুট মিলের পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার পর্যন্ত। তার পর মনে হল নরেনদার এক প্রতিবেশীর কথা নাম ত্রাহিনাথ মুখোপাধ্যায়—ডাকনাম তেরাজু—দলের লোক নন—কিন্তু আমার চেনা।

তাঁর কাছে নরেনদার খবর নোব মনে করে তাঁর বাড়ী গেলুম। তিনি বাড়ী নেই—মানকুণ্ডতে তাঁর ওষুধের দোকানে আছেন,—ফিরতে বেশী দেরী নেই। শুনে আমি গলিতে একটু পায়চারি করে এক বাড়ীর বাইরের রোয়াকে বসলুম। একজন ছোকরা, বছর ১৫।১৬ বয়েস, হঠাৎ কোথা থেকে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান?—কোথা থেকে আসছেন?—ইত্যাদি। তারপর সে চলে গেল এবং একটু পরে এক এক করে কয়েকজন লোক এল এবং ঐ রকম প্রশ্ন সুরু করলে—কি দরকার? অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি কেন?—ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত এক হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক এলেন এবং আমাকে কড়াভাবে ২.১টা প্রশ্ন করে বললেন,—আপনাকে থানায় যেতে হবে, চলুন।

শোনো কথা! মনে মনে আন্দাজ করে নিলুম, পাড়াটা গরম, সুতরাং হয়ত নরেনদার বাড়ীতে গার্ডও আছে,—না গিয়ে ভালই করেছি। বললুম,—বেশ তো থানায় যেতে হয়, যাবো,—কিন্তু ত্রাহিবাবুর যখন আসার সময় হয়েছে,—তখন তিনি এলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়েই থানায় যাবো। ভদ্রলোক বললেন, এ পাড়ার আর কেউ আপনাকে চেনে? তখন মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই বৃটিশ স্পাই নয়,—হ'লে পাড়ার ভেতর প্রকাশ্যে গণ্ডগোল করতো না,—হয়ত দলের দরদী,—হয়ত আমাকেই বৃটিশ-স্পাই মনে

করেছে। সুতরাং তখন বললুম,—নরেন ব্যানার্জিও আমাকে চেনেন।

ভদ্রলোক ছোকরাকে দিয়ে নরেনদাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে আমাকে দেখে, একটু মুখ টিপে হেসে বললেন,—এ কি? আপনি?—তা আমার ওখানে যাননি কেন? বলে ভদ্রলোককে চুপি চুপি কি বললেন। তখন ভদ্রলোক আমাকে এবং নরেনদাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে,—প্রথমে একচোট হাসাহাসির পর চায়ের ফরমাস দিলেন,—আর বললেন,—মাপ করবেন,—বৃটিশ স্পাইগুলো খুব ঘোরাঘুরি সুরু করেছে,—আমি বলি বুঝি—হা হা হা—(হেসে ফেললেন)।

তিনি হচ্ছেন ফরাসী পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর করালী বাবু (পদবী মনে নেই)—আমাদের বন্ধু। চা খেয়ে বেরোতেই ত্রাহিবাবু এসে হাজির। আমাকে দেখে বলেন,—থানায় নিয়ে যাবে না কি?—করালী বাবু বললেন, সে সব মিটে গেছে। নরেনদাকে বলে স্থির করলুম—ত্রাহিবাবুর বাড়ী রাত্রে খাবো এবং থাকবো—তারপর সকালে তাঁর সঙ্গে কথা করে বাড়ী ফিরবো।

সকালে নরেনদা নিয়ে গেলেন বসন্ত ব্যানার্জির বাড়ীতে। সেখানে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শুনলুম। এখানে একটা অবান্তর কথা বলে রাখতে চাই। আজ,—১৯৬০ সালে, ৭৫ বছর বয়সে সেই নরেনদার না আছে অন্নের সংস্থান,—না আছে মাথা গোঁজার জায়গা!

এই ঘটনার পর ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়ীতে বোমা মারা হয়,—টেগার্ট ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়,—এবং তার পরই ভারত ত্যাগ করে।

টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা করে অনুজা সেনগুপ্ত এবং দীনেশ মজুমদার। অনুজা ছিল রসিকদাসের চেলা,—এবং দীনেশ সাতুদার (সাতকড়ি ব্যানার্জি)। টেগার্ট ঐ পথে রোজ নির্দিষ্ট সময়ে যেতো,—ওরা দুজনে বোমা এবং রিভলভার নিয়ে দুদিক থেকে আক্রমণ করেছিল। প্রথমে গাড়ীতে বোমা মারে অনুজা,—বোমাটা গাড়ীর গায়ে লেগে গাড়ীটা ঝাঁকনি খায়—অনুজা রিভলভার নিয়ে গাড়ী আক্রমণ করে,—ঠিক তখনই আর একদিক থেকে দীনেশের নিক্ষিপ্ত বোমা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনুজাকেই আহত করে। বিস্ফোরণে অনুজার পেটটাই উড়ে যায়। সে ঘুরে স্কোয়ারের রেলিং পর্যন্ত গিয়েই পড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। দীনেশ দৌড়ে পালায় এবং অনেক দূর যাওয়ার পর ধরা পড়ে যায়।

বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু সে জেল থেকে পালিয়ে যায়, এবং অনেকদিন পরে ধরা পড়ে। ধরাপড়ার সময় পুলিসের সঙ্গে একটা গুলীর লড়াই দেয় এবং সে মামলায় তার ফাঁসী হয়।

যাই হোক,—ডালহাউসী স্কোয়ারের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ নারায়ণ রায়ের ডাক্তারখানা-ল্যাবরেটরী সার্চ হল এবং সেখান থেকে পাওয়া গেল TNT তৈরীর ফরমূলা ও পদ্ধতির টাইপ করা কাগজ।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন ডাক্তার নারায়ণ রায়,—সীতাংশু সরকার, গৌরীবাড়ী লেনের ব্রজদুলাল (শ্রীমানী?)—ডাক্তার ভূপাল বসু, হিমাদ্রি চক্রবর্তী (নাট্যশিল্পী তিনকড়ি চক্রবর্তীর পুত্র) ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের চেলা কালীপদ ঘোষ, রসিক দাস এবং আরো কয়েকজন)। অনুকূলদার নামেও ওয়ারেন্ট বেরুলো—তিনি গা ঢাকা দিলেন। মনোরঞ্জনদা'তো গা ঢাকা দিয়েই ছিলেন। তাঁরা পরে ধরা পড়েন।

হিমাদ্রি চক্রবর্তীর ঢালাইয়ের কারখানায় নাকি ঢালাই-করা বোমার খোল পাওয়া গিয়েছিল। তিনকড়িবাবুর তদ্বিরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। মামলায় সীতাংশু এবং ব্রজদুলাল রাজসাক্ষী হয় এবং সরকারী খরচে বিলেত চলে যায়। কালীপদ ঘোষ ছিলেন গোয়েন্দা-কর্তা নলিনী মজুমদারের আত্মীয়। তিনিও সরকারী খরচে বিলেত যান। বাকি সকলের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। রসিক দাসের বোধ হয় ১৫ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে আন্দামানে যেতে হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যমাত্র ছিল—তার সমর্থনে কোন স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। সুতরাং উকীলরা পরামর্শ করে আপীল করেন, এবং হাইকোর্ট থেকে রসিকদাস বেকসুর খালাস হন। অবশ্য পুলিশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে, এবং তাঁকে একা পেলোয়ায় জেলে বন্দী করে রাখা হয়।

T N T'র ফরমূলা ধরা পড়েছে, এবং যে গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবু থাকেন, সেই গৌরীবাড়ী থেকে ব্রজদুলাল ধরা পড়েছে, সুতরাং মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। বোস ইনষ্টিটিউটে যাওয়াও ঠিক নয়। সুতরাং ডালহাউসী স্কোয়ারের ঘটনার দিনই সন্ধ্যার পর গেলুম গৌরীবাড়ীতে গোপালবাবুর বাসায়।

তিনি বললেন,—এই সামনের রাস্তা দিয়ে এলেন নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ কেন? তিনি বললেন,—রাস্তায় একগাদা স্পাই আছে। তিনি বললেন, আপনিও যা জানেন, আমিও সেইটুকুই জানি। আর কিছু জানি না—শুধু এই পাড়ার এক ছ্যামড়াকে ধরে নিয়ে গেছে—এই মাত্র জানি। বলে, তিনি আমাকে বাড়ীর পিছনের গলি দিয়ে উল্টাডাঙ্গার খাল ধারে পৌঁছে দিলেন।

যাই হোক,—দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচলেও মুক্তীগঞ্জের দলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়নি। আমি থাকতুম আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে, আর ওরা থাকতো ৪১ নম্বর হ্যারিসন রোডে এক মেস করে। আমার সেখানে যাতায়াত তো ছিলই,—রাত্রে গল্পগাছায় বেশী রাত হয়ে গেলে ওদের ওখানেই খেয়ে শুয়ে থাকতুম।

চারি দিকে ধরপাকড় আর সার্চ লেগেই ছিল। এক দিন রাত্রে ওখানে থেকে গেছি,—সকালে পুলিস এসে বাড়ী ঘিরেছে—সার্চ হবে। সে বোধ হয় অক্টোবর মাস। আমাকে সেখানে দেখে এক পুরানো চেনা আই-বি অফিসার বললেন,—আরে,—আপনি এখানে? আপনার জন্তে যে ওরা (একদল পুলিস) আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে গেছে।—আমি বললুম, তাহলে শীঘ্র আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন,—নইলে হয়ত ওরা তালা ভেঙ্গে বসবে। তিনি বললেন, না তালা ভাঙবে না,—ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

সার্চ চলছে, ওদিকে চাও তৈরী হচ্ছে। আমরা চা খেলুম—, অফিসারদের বলা হল চা খেতে—তাঁরা খেলেন না,—শুধু সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানার দারোগা এক কাপ চা খেলেন। তারপর আমাকে নিয়ে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে এসে সার্চ করে বললে, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। বুঝলুম গ্রেপ্তার হলুম। ইলিসিয়াম রোডে আই-বি অফিসে এসে দেখি ৪১ নম্বর থেকে মাখন চ্যাটার্জি আর ধীরেন কুণ্ডুকেও নিয়ে এসেছে।

মনটা মুসড়ে গেল। 'রোড্‌স টু ফ্রিডম' বইটার অনুবাদটাকে ছাপার অনুমতি না পেয়ে "অবলম্বনে লিখিত" বলে প্রেস কপি তৈরী করে ফেলেছিলুম,—প্রকাশের ব্যবস্থা আটকে গেল বলে মনটা হায় হায় করতে লাগলো। সারাদিন interogation এর পর যখন আমি বললুম,—এক কথা ৫০ বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, আর আমি আপনার কোন কথার জবাব দোব না,—torture-এর জন্তে প্রস্তুত হয়েই বললুম,—তখন আমায় lockup-এ পুরলে। তারপর আর সাড়া-শব্দ নেই। শেষে ন' দিনের দিন আমাদের তিনজনকেই কিছু বচন দিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি এসেই সরস্বতী লাইব্রেরীর মহেন্দ্র দত্তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে বইটা প্রকাশের বন্দোবস্ত করে ফেললুম। "স্বাধীনতার পথ" নামে বই বেরিয়ে গেল।

তখন মনোরঞ্জনদা, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, সকলেই জেলে, রাজবন্দী হয়ে গেছেন। সরস্বতী প্রেসে এবং লাইব্রেরীতে আছেন শুধু শৈলেন গুহ রায় এবং মহেন্দ্র দত্ত। প্রেস ও লাইব্রেরীর অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে।

জীবনও জেলে গিয়েছিল, কিন্তু সে আইন-অমান্ত আন্দোলন সম্পর্কে। সুভাষবাবুর তো আগেই জেল হয়েছিল,—এবং পরে যে এম সেনগুপ্তেরও বোধহয় ছমাস জেল হয়েছিল বি-পি-সি-সির Council of Actionএর প্রথম ডিক্টেটর হিসাবে। তারপর একে একে হরদয়াল নাগ, অমরদা' (চ্যাটার্জি) প্রভৃতি নেতারা, এবং এই ডিক্টেটর-চেনের মধ্যেই জীবনও জেলে গিয়েছিল। কিন্তু মজা এই যে, এক শ্রেণীর নেতাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোলে ছেড়ে দেয়,—আর একশ্রেণীর নেতাদের মেয়াদ ফুরোলে অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিনা বিচারে আটক করে। সুভাষ বাবু, জীবন প্রভৃতি এই দ্বিতীয় দলের।

নুন তৈরীর হিড়িক লেগে গিয়েছিল চারিদিকে—এবং বে-আইনী নুন কলকাতার রাস্তায় বিক্রী করে আইন-ভঙ্গও চলছিল। বয়কট এবং পিকেটিংও চলছিল। পুলিস বেপরোয়া মারও সুরু করেছিল সর্বত্র। তাদের কায়দা হল, বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা, এবং অনুচরদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করা। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, এইভাবে ছেড়ে ছেড়ে গ্রেপ্তার করেও জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের ব্যারাকগুলোকে এই সময়েই জেলে পরিণত করা হয় আইন-অমান্ত বন্দীদের রাখার জন্তে।

মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথমে ডাণ্ডীতে যান নুন তৈরী করতে,—তখন পুলিসদল লাইন বেঁধে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল যাতে কেউ জলের ধারে না যেতে পারে। পুলিসের গায়ে হাত দেওয়া নিষেধ, সুতরাং অহিংস সত্যাগ্রহীরা পুলিসের লাইনের সামনা-সামনি গিয়ে আটকে গেল। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো, দুই দল পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে—নিশ্চলভাবে। সুতরাং মহাত্মাজী অহিংসা বাঁচিয়ে পুলিসের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্তে ফতোয়া দিলেন,—দুজন পুলিসের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্তে চেষ্টা করতে দোষ নেই। সেইভাবে সত্যাগ্রহীরা গোঁত্তা মারার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হলে deadlock কাটলো।

এই ভাবে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ধরসনাতে নুন তৈরীর অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন। পুলিস দল প্রথমে তাঁদের আটকালো। তারপর নেত্রী দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তারা একখানা চেয়ার এনে তাঁকে বসতে দিলে। তিনি বসলেন। আরো কিছুক্ষণ কাটলো। পুলিসের কর্তা জিজ্ঞাসা করলো, "কতক্ষণ এই ভাবে বসে থাকবেন?" তিনি কবি, তিনি জবাব দিলেন, "Till doomsday", কাজেই তখন পুলিস তাঁকে সসম্মানে গ্রেপ্তার করলে, এবং বাকি সত্যাগ্রহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিয়ে বাটনা-বাটা করে ছেড়ে দিলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যি ইতিহাসের এই সব মাল-মশলা সংগ্রহ করি আর ভাবি, এগুলো একটা বই-এর আকারে চিরস্থায়ী এবং স্মরণীয় করে রাখা দরকার। একখানা পুরানো বই পেয়েছিলুম Conventional Lies.—বইটা ছেঁড়া,—title page ছিল না,—কিন্তু Prefaceটা ছিল। বিলাতী সমাজের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, ঐতিহ্য, লোকাচার প্রভৃতির মনোহারী মুখোস নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলে লেখক সেগুলোর কদর্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। বইটা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। লেখক পালিয়েছেন ফ্রান্সে। সেখানে বইটা ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এবং সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। লেখক আবার সরে পড়েছেন।

লেখকের ওপর আমার অসীম ভক্তি হল, এবং আমাদের দেশের কাণ্ড-কারখানা নিয়ে ঠিক এমনি একখানা বই লেখার লোভ

আমাকে পেয়ে বসলো। খেটে খুটে লিখে খাড়া করে ফেললুম এক বইয়ের ছক "শ্রী ভাঁওতা"। কিন্তু বুঝলুম, কোনো প্রকাশকই এটা প্রকাশ করতে চাইবে না,—হয়ত কপিই মারা যাবে। সুতরাং প্রকাশ করতে হবে আমার নিজেকেই। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। একমাত্র ভরসা অমরদা (চ্যাটার্জি)—তিনি জেল থেকে বেরুলে দেখা যাবে চেষ্টা করে'।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও তার সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ সংস্থা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল—সর্বত্র অফিস শীল করা, ফাণ্ড বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি চলেছিল। তার ওপর লাঠি-গুলী-জেল চলছিল। ঢাকার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও এই সময়ের এক বড় ঘটনা। তখন হাডসন সাহেব ছিলেন পুলিস-সাহেব। তিনি নাকি মুসলমানদের প্রতি বেপরোয়া পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সে দাঙ্গার এক বিশেষ ঘটনা—দুটি হিন্দু মেয়ে, স্কুলের ছাত্রী, দুই ভগ্নী লাঠি হাতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান আক্রমণকারীকে সফল ভাবে রুখেছিল। পরে বোধ হয় মেয়ে দুটিকে হিন্দুদের তরফ থেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

৩০ সাল শেষ হয়েছে। বিপ্লবীদের সাহেব মারার ঝোঁক প্রবলতর হয়েছে। টেগার্টের পলায়নের পর লোম্যান তার পদ পেয়েছেন এবং বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থলও হয়েছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন ঢাকায় মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান এবং হাডসন বিপ্লবী বিনয় বোসের রিভলভারের গুলীতে আহত হল। লোম্যান মারা গেল, কিন্তু হাডসন বেঁচে গেল অনেকদিন হাসপাতালে থাকার পর। তার গুহ্যদ্বারের মধ্যে গুলী প্রবেশ করে' পাশের দিক ভেদ করে সে গুলীটা আটকে গিয়েছিল। অর্থাৎ সে আহত হয়েছিল পলায়মান অবস্থায়। আততায়ী বিনয় বোস বেমালুম সরে পড়েছিল।

কলকাতায় খবর পৌঁছালে চারিদিকে মহা উত্তেজনা—বিপ্লবী মহলে আনন্দোৎসব' লেগে গিয়েছিল। বাংলার জেলের ইনস্পেক্টর-জেনারেল সিম্পসনেরও ওপর স্বদেশীরা খাপ্পা হয়েছিল, তার কড়া জেলশাসনের ব্যক্তিগত উগ্রতায়। লোম্যান-হত্যার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন কলকাতা তোলপাড়—রাইটার্স বিল্ডিংএ দোতালায় সিম্পসনের অফিসে তিন বিপ্লবীর সশস্ত্র আক্রমণ এবং সিম্পসন নিহত। আততায়ী বিনয় বোস, বাদল এবং দীনেশ গুপ্ত!

সিম্পসনকে হত্যা করার পর বিনয় বোস নিজের রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করে;—বাদল পটাসসায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে, এবং দীনেশগুপ্ত জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। শোনা যায়, আক্রমণের সময় ঘরে উপস্থিত আর এক সাহেবের পাৎলুন খারাপ হয়ে গিয়েছিল,—এবং বারাণ্ডা থেকে এক তরুণ আমেরিকান পাদ্রী সাহেব কাণ্ড দেখে আল্‌সে টপকে খাঁটী আমেরিকান পদ্ধতিতে rain water pipe বেয়ে রাস্তায় নেমে পালায়।

বিনয় নিজে ডানদিককার রগে গুলী করেছিল,—গুলীটা মস্তিষ্ককে জখম করেছিল,—কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় তিনদিন পর্যন্ত তার প্রাণের স্পন্দন বন্ধ হয় নি। তারপর তার মৃত্যু হয়।

মুন্সীগঞ্জের মেয়ে আশাগুপ্তা (এখন ব্যানার্জি—সায়দার স্ত্রী) ছিল জীবনের দলের মেয়ে,—এবং তার মাও ছিলেন দলের একজন দরদী বন্ধু। দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক ছিল, এবং সেই সূত্রে তিনি জেলে দীনেশের সঙ্গে দেখা করতেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন। পরে বিচারে দীনেশের মৃত্যুদণ্ড ও ফাঁসী হয়েছিল।

[ক্রমশঃ।

আধুনিকা

দীপক মজুমদার

ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে,
ট্রেনের দোদুল দোলায় কিংবা সৌখীন মোটরের নিভৃত কন্দরে
অনেক বার দেখেছি তোমায়; অনেক বার।
দেখেছি আর ঘেমেছি—আটাশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ফুলে ফুলে উঠেছে!

ষোড়শ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে
তোমায় লোকে কি বলে ডাকত কে জানে!
হারেম অথবা রংমহালের বাইরে বড় একটা আসতে না,
পরিচিত পুরুষের অন্দর-মহলের বন্দী ছিলে তুমি।
কিন্তু তুমি কম ছিলে কিসে?
কটাক্ষদংশনে কত আমীর-ওমরাহ আর রাজা-মহারাজের
মন হরণ করেছ।

সেদিনও বুঝি ছিলে আধুনিকা।
জরিপাড় আর জড়োয়া,
রেশমী ওড়না আর ঘাঘরা ছেড়ে
আজ তুমি নতুন বেশ ধরেছো।

পাড়হীন শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে ছোটখাটো ব্লাউজ পরো;
বাঘরের মত কোমল জঠরের একাংশ অনাবৃত রেখে দাও,
কৃত্রিম কুঞ্চিত কেশদাম ঘোড়ার ল্যাজের মত ঝুলিয়ে রাখো—
আঙুর ওষ্ঠাধর লোভনীয় করে তোল অনেক বেশী।
গন্ধমদির কবোষ্ণ স্পর্শের আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে,
নীরব বক্ষ, গোলাপী কপোল আর চপল তনু নিয়ে ভীড় ঠেলে ওঠো
ট্রামে-বাসে।
লম্বগ্রীবা বাঁকিয়ে ছিম্‌ছাম্‌ রিষ্টওয়াচটায় টাইম দেখো।
ভ্যানিটি ব্যাগের ভ্যানিটি না থাকলে তোমাদের চলে না!

দফতরে কিংবা কল-কারখানায়,
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রাস্তায় অথবা ময়দানে—
সর্বত্র তোমার উপস্থিতি।
মাঝে মাঝে সংস্কৃতি-মিশনের সদস্যা হয়ে তুমি দেশান্তরী হও!

গান গাওয়ার মত কথা বলো,
গলে-পড়া মোমের মত হাসো—
নিঃশব্দে।
আমরাও নির্লজ্জ চেয়ে দেখি।

রবীন্দ্রনাথের গান

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতীয় সঙ্গীতের মূল রসটি হোলো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-রস। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি ছিলো নির্বিশেষের লীলাভূমি। বিশেষের স্থান ছিলো না ভারতীয় সংগীতের রাজ্যে। কোনো একটি বিশেষ সকালের রূপ বর্ণনা করে না ভৈঁরো কিম্বা ভৈরবী। তারা প্রকাশ করছে এমন একটি সকালকে যা সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছে আপনার মুখ থেকে। আমাদের রাগরাগিণীর রস তাই এই ব্যক্তি-বিশেষত্বহীন নৈর্ব্যক্তিক রস। বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বর্জিত রাগরাগিণীর মধ্যে। অথচ বিশেষকে নিয়েই সৃষ্টির লীলা। বিশেষ মনোভাব, বিশেষ হৃদয়াবেগ, বিশেষ অনুভূতিকে প্রকাশ করাই হলো আর্টের উদ্দেশ্য। নির্বিশেষের নিস্তরঙ্গ ধারায় যেই বিশেষ দেখা দিলো অমনি ভাব এলো, রস এলো, সৃষ্টি সুরু হোলো। চিরকালের সব সকাল ছেঁকে একটি নির্বিশেষ সকালের রসাস্বাদন করে মানুষের মন তৃপ্ত নয়। সে চায়—বসন্তের পেয়ালায় ঢালা একটি রঙীন সকাল, শরতের মন-কেমন-করা উদাসী সকাল, কালো মেঘের ঘোমটা দেওয়া বর্ষার সকাল, শীতের কুহেলি-মাখা সকাল, ভালোবাসার আলো-জ্বালা সকাল, বিরহের স্নিগ্ধ প্রশান্ত পাণ্ডুর সকাল, অশ্রুসিক্ত সকাল, আনন্দ-উজ্জ্বল সকাল—এই সকালগুলির প্রত্যেকটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিশেষ রস আস্বাদন করতে। ভারতীয় সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষের রাজ্যে বিশেষের প্রকাশ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অনুভূতির প্রকাশ নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের গান। গান আর নৈর্ব্যক্তিক রইলো না। বিশেষ তার অসীম বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিলো সুরের রাজ্যে। গান আর নিছক সুরের ব্যঞ্জনা রইলো না, গান তখন বিশেষ মনোভাবের ব্যঞ্জনা হয়ে উঠলো। ভৈঁরো আর ভৈরবী হার মানলো প্রত্যেকটি সকালের বিশেষ অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করতে। তাই সুরের মিশ্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়লো। আর এই সুরের মিশ্রণের প্রয়োজন হোলো শুধু সুরের জন্যে নয়, ভাব প্রকাশের জন্যে।

রবীন্দ্রনাথের গান আর একটি নতুনত্ব নিয়ে এলো আমাদের গানের এলাকায়। ভারতীয় দরবারী সংগীতে গানের সুরের ও কথার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো মিল ছিলো না। চমৎকার সুরের সঙ্গে অতি নীরস কথার মিলন ঘটানোই ছিলো রেওয়াজ। শুধু সুরটিকে দাঁড় করাবার জন্যেই গানের কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিলো এতোদিন।

গানের কথায় রস ও সুরের রস, এই দুই রসের মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। কবিতার রস আর সুরের রস, এই দু'টি আলাদা হলেও এদের মিলন সম্ভব। তবে সব মিলনের মতো এ মিলনও তিনিই ঘটাতে পারেন যিনি প্রজাপতি অর্থাৎ স্রষ্টা। রবীন্দ্র সংগীতে গানের কথা আর গানের সুর, এ দু'টির কোনোটাই আত্ম-বিজ্ঞপ্তির অহংকারে কুরুচির পরিচয় দেয় নি। কথা সুরকে অবজ্ঞা করে নি, সুরও কথাকে অবহেলা করে আপনার পার্থক্যের অসঙ্গতি প্রকাশ করে নি।

কোনো ক্ষেত্রেই সংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সংগীতের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাগরাগিণীর এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে তো সুর সৃষ্টি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'যতো দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারি নে। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তার বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এইরকমই চলবে। কেন না আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা-পথটার তাকে বাঁধে না।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে যদিও বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য ছিলো অফুরন্ত, কিন্তু সে গানগুলি সুরের দিক থেকে দরবারী সংগীতের ঠাটের মধ্যেই বদ্ধ ছিলো। বাগেশ্রী বাহারে তেওড়া তালে 'আমার মিলন লাগি তুমি', বেহাগ চৌতালে 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে', আশাবরী, ঝাঁপতালে 'মনমোহন গহন যামিনী শেষে', কানাড়া চৌতালে 'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে', শ্রীরাগ, তেওড়ায় 'কার মিলন চাও বিরহী', বড়হংস সারং, চৌতালে 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন', আড়ানা, চৌতালে 'বাণী তব ধায়'—এইগুলি হচ্ছে এই পর্যায়ের কতকগুলি গান।

প্রচলিত রাগরাগিণী দিয়ে সব অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, এইটে অনুভব করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন অনেক অনুভূতির সন্ধান পেলেন কবি যাদের ঐশ্বর্য, গভীরতা ও চমৎকারিত্ব ধরা পড়ছিলো না চলতি রাগরাগিণী দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ অনুভূতিগুলির পূর্ণ প্রকাশের তাগিদে নতুন সুর সৃষ্টির দিকে মন দিলেন। বলাই বাহুল্য যে, রাগরাগিণীর মিশ্রণ থেকেই নতুন নতুন সুরের সৃষ্টি। তাই ঠাট ও মিশ্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাগুলি আমাদের জানা দরকার। তিনি বলছেন—'গানের জীবকোষ হচ্ছে কয়েকটি বিশেষ সুরের মিলন। এই সব জানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন। এমনি করেই সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরী হয়ে ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে নিয়েই গানে তৈরী হয়।' রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন—'এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরেই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। সুরের ঠাটগুলি ইটের মতো হলেই তাদের দিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মতো হলেই তাদের দিয়ে জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়।' প্রতিটি অনুভূতির 'জাতিগত সাধারণতা' নয়, তার 'ব্যক্তিগত বিশেষত্ব', ফুটিয়ে তোলবার জন্যে রাগরাগিণীগুলোকে ভেঙে চুরে সুরের টুকরোগুলোকে নব নব সুর-রূপে বিকশিত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—'আমাদের দেশের গানের ঠাট এক একটা বড়ো বড়ো কালি, তাকেই বলে রাগিণী। আজ সেই কালিগুলোকে ভেঙে চুরে সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছেমত কোঠা গড়বার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এই ভাঙা-গড়ার স্বাধীনতা, নব নব সুর-সৃষ্টির জন্যে সুরের উপাদানগুলিকে ভেঙে চুরে নানা ভাবে সাজিয়ে নেবার স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। রাগরাগিণীর ঠাটগুলিকে ভেঙে ফেলে তাদের টুকরোগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সুরের নতুন জীবকোষ তৈরী করবার যে চেষ্টাই আমরা করি না কেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সেই টুকরাগুলি যতই টুকরো হোক তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে।' এই 'আস্ত জিনিসটার ব্যঞ্জনা'-র অনুভূতিই হোলো সুর-মিশ্রণ তত্ত্বের সার কথা। যিনি টুকরোর মধ্যে আস্ত জিনিসটা দেখতে পান না, তিনি মিশ্রণের অর্থাৎ নতুন সুর-সৃষ্টির অধিকারী নন। রূপের অখণ্ড ও সমগ্র অনুভূতি, শ্রুতির অনুভূতি ও মূর্ছনার জ্ঞান—এই তিনটি হচ্ছে নতুন সুর-সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। কি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গান 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু' গানটি দেখুন। গানটি আশাবরী, ললিত, রামকেলি ও বিভাসের মিলনের ফল। এমনি সৃষ্টির নিপুণতা যে গানটিতে কোনো একটি রাগকে আলাদা করে ধরবার যো নেই। মনে হচ্ছে, বুঝি একটিকে ধরেছি, দেখি, অমনি সে সরে গেছে। শুদ্ধ 'ধা' ও 'শুদ্ধ 'নি'র আশেপাশে আনাগোনা নেই, বিভাস রূপহীন, অথচ কতকগুলি সুর আছে বিভাসের প্রতিনিধি হয়ে। রামকেলি লুকিয়ে ফুটেছে স্বরবিন্যাসে। 'কুসুম ফোটে' কথাগুলির সুর ললিতকে প্রকাশ করছে। আর সব ছাপিয়ে আছে আশাবরী। ভীমপলশ্রীর সঙ্গে মূলতানের মিশ্রণে অনেক গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন, 'বুঝি বেলা বহে যায়', 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে', 'নাই রস নাই', 'আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া' প্রভৃতি গানগুলি। সারঙ, মল্লার ও কানাড়ার মিশ্রণ তিনি ঘটিয়েছেন, 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' গানটিতে। মীড় ও মূর্ছনার ঠাসবুনুনি নেই গানটিতে, আকস্মিক পরিবর্তনের খেলা ধরা দিয়েছে এর হৃদয়হরণ সুরে। তিলক কামোদ ও দেশ, এই দু'টি রাগের সঙ্গে মল্লারের মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'মনে যায় উড়ে যায় গো' গানটি এই তিন রাগের ত্রিবেণীসঙ্গম। 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ' গানটির সুরে পঞ্চমের সঙ্গে বাহার এসে মিলেছে। ললিতের আমেজও লেগেছে সুরটিতে। সোহিনীর সঙ্গে পঞ্চমের মিলন হয়েছে 'আজি বরিষণ মুখরিত' গানটিতে। এরকম মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ ঘটানো করেন নি। কি অনুপম এই মিশ্রণ। এরকম অনুরূপ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টির:

নাই রস নাই
আমি তোমার সঙ্গে
চক্ষে আমার তৃষ্ণা

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা সুরের গান রবীন্দ্রনাথ ভেঙেছেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের সুরে কেন, পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সুরেও গান বেঁধেছেন তিনি। বাল্মীকি-প্রতিভার 'কালী কালী বলো রে আজ', গানটি, আর 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' ও 'পুরানো সেই দিনের কথা' প্রভৃতি গান পাশ্চাত্য গানের সুরের ছাঁচে ঢালাই-করা।

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলির থেকে যে সব সুর আহরণ করে গান বেঁধেছেন রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মহীশূরী ভজনের সুরে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', মাদ্রাজী গানের সুরে 'নীলাঞ্জন ছায়া' ও শিখ ভজনের সুরে 'বাজে বাজে রম্য বীণা' গানগুলি।

হিন্দী গানও অনেক ভেঙেছেন, যেমন মিঞাকি মল্লারের সুরে গাঁথা 'কোথা যে উধাও হোলো' অপূর্ব গানটি। মিঞাকি মল্লারের রাগশুদ্ধতা ঘুচিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই গানটির কয়েক জায়গায় কোমল নি, কোমল ধা, নি, পা, এই স্বরগুলি ব্যবহার করেছেন। তাতে শুদ্ধতা-বিশারদ ওস্তাদদের মনে বিতৃষ্ণা জাগিয়েছেন হয়তো, কিন্তু সুরটি অপূর্ব হয়েছে। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের ঠুংরি চালের গানের সুরে বেঁধেছেন 'তুমি কিছু দিয়ে যাও'। কাফি সুরের হিন্দীগান ভেঙে 'এসেছে অশ্রুভরা বেদনা' আর ভৈরবী সুরে গাঁথা

মীরাবাঈয়ের একটি গানের সুরে পিলু আর বারোয়াঁ মিশিয়ে বেঁধেছেন 'কখন দিলে পরায়ে'। টপ্পাও মহাকবির প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয় নি। তবে রবীন্দ্রনাথ নিধুবাবুর টপ্পার চেয়ে পরিমিত তানের চিকণ ও সূক্ষ্মকাজের শোরীর টপ্পার ধরন বেশী পছন্দ করতেন। টপ্পার সুরে বেঁধেছেন—'বঁধু রহ রহ সাথে', 'হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোলো', 'কে বসিলে আজি হৃদয়-আসনে', 'এ পরবাসে রবে কে' প্রভৃতি গানগুলি।

দেশবিদেশের বহু গানের সুরে চয়ন করে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই যে তিনি নকলনবিশ ছিলেন না, অর্থাৎ যা পেলেন তাই হুবহু ধরে দিলেন—এই গোলামি তিনি কখনো করেন নি। যা নিয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর প্রাণের সুরের দু-একটি সুর মিলিয়ে তাঁর নিজের অন্তর-ঐশ্বর্যের রঙ মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্য করে গ্রহণ করেছেন। নিজের রঙ ও সুর না মেশালে কোনো কিছুকেই নিজের করে নেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন—বাহার রাগের 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ' গানটি। এটি হিন্দী গান ভাঙা। গানটি মূলত বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ গানটির জায়গায় জায়গায় এমন দু-একটি স্বর-যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করলে শুদ্ধ বাহারে লাগে না। এখন যদি কোনো ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ' গানটিতে শুদ্ধ বাহারের রূপ ফোটাবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েন তো তাঁকে বোঝাতে না পারলেও সাধারণ মানুষকে এটা সহজেই বোঝানো যাবে যে গানের সুরকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন গানের কথার ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে, রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটানোর জন্যে সুরকে তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—'যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকে বাহাল রাখিব রাখিব না কেন?'

তাই রবীন্দ্রনাথের হিন্দী-ভাঙা গানগুলিতে শুদ্ধ রাগরূপ ফুটিয়ে তোলবার অমার্জনীয় প্রয়াস থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরগুলির বিশেষত্ব লোপ করে তাদের সাধারণ করে জাতে তোলবার চেষ্টা করলে সুরগুলির অনন্যসাধারণতা নষ্ট করা হবে।

'কালো কালো, কখন দিলে পরায়ে, কোথা যে উধাও হলো।'

রবীন্দ্রনাথের গানে তান যোজনা সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথ তানের দীর্ঘ টানাটানি পছন্দ করতেন না। চিকণ কাজের স্বল্প তান এই ছিলো তাঁর পছন্দ। গানের একটি অংশ হচ্ছে রসাত্মক বাক্য। সেই বাক্যগুলিকে ভেঙে চুরে তাদের অংশ নিয়ে বেপরোয়া ব্যবহার করা যায় না। তাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে। তান হচ্ছে সুরের অলংকার। অলংকার পরতে জানা চাই। মাত্রাবোধ না থাকলে অলংকার সৌন্দর্যের হানি করে। বহু ললনা তাঁদের ললিত দেহে সেই বিপদের প্রমাণ নিয়তই বহন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিতে যে স্বল্প তান ব্যবহার করেছেন, সেই তানগুলিতে বিস্তারিত করবার অধিকার কারো নেই। কেন না স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার অধিকার আটপৌরে মানুষের নেই। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করেন, তার থেকেই রস, তার থেকে সৃষ্টি। যিনি গান গা'ন তিনি সাধারণত স্রষ্টা নন, তাই স্রষ্টার রসোপলব্ধি তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়। এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে…। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসেবেই চলে, সোনা হিসেবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। কেন না ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা।'

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানে, তাঁর গানের সুর-দেহে তানের স্ফীতি না যোগ করবার অধিকার গায়ককে দেওয়ার অর্থ হবে রবীন্দ্রনাথের গানকে সুরস্রষ্টা নয় সুর-কৌশলী গায়কের কৌশল দেখানোর যন্ত্র করে তোলা।

যেমন বাংলা কবিতায় ছন্দের আড়ষ্টতা দূর করেছেন রবীন্দ্রনাথ পয়ারের রাজত্বে যুগ্ম বর্ণকে দু মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করে শব্দের মধ্যে ফাঁকটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত করে, তেমনি নানা ছন্দের প্রবর্তন করে গানের সুর-দেহকে সাজিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাবের উপর লক্ষ্য রেখে গানের ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধন করেছেন, যেমন 'কালমৃগয়ার' 'আর নহে আর নহে' আর 'বসন্ত' গীতি-নাট্যের 'ধীরে ধীরে বও' গান দুটিতে ছন্দের মন্থরতা সৃষ্টি করেছেন ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে। আবার ছন্দে, ও তালে উল্লাস, পৌরুষ ও উচ্ছ্বাস ফুটিয়েছেন 'আমরা নূতন যৌবনেরি দূত' 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' প্রভৃতি গানে।

আবার যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। 'সর্বখর্বতারে দহে', 'গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' প্রভৃতি গান যুক্তাক্ষরের ধ্বনির মিশ্রণে অভিনব রূপ লাভ করেছে।

কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে ছন্দের বৈচিত্র্য এনেছেন, যেমন, 'বাজো রে বাঁশরী বাজো' গানটিতে 'মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক-অঙ্গনে' এই কথাগুলির ধ্বনি-বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

কোথাও আবার সুরের ছন্দের বিভিন্ন মাত্রায় কথার বিরামে ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন যেমন 'ফুলে-ফুলে ঢ'লে ঢ'লে' এই তিন মাত্রার ছন্দের গানে মাঝের মাত্রায় বিরাম দিয়েছেন। *

কোথাও আবার তালের বিভিন্নতায় গানে ছন্দ-বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন 'শ্যামল ছায়া নাই বা এলে' গানটি ২।৪ মাত্রা তালে, 'কাঁপিছে দেহলতা থর থর' এটি ৩।৪।৪ এই এগারো মাত্রা গুচ্ছের একাদশী তালে, 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' ৩।২ ৩ মাত্রার রূপকড়া তালে, 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেলো' গানটি ৩।৬ মাত্রার নবতালে ও 'বেতে বেতে একলা' গানটিতে ৩।২ মাত্রার ঝম্পক তালে।

* কথার দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক দেওয়া তালও সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'তুমি তো সেই যাবেই চলে' গানটিতে।

একই গানের নানা অংশের বিচিত্র ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে একই গানে বিভিন্ন তাল ব্যবহার করেছেন, যেমন 'ঐ আসে ঐ অতি' ও 'হে নিরুপমা' গান দুটিতে।

ভারতীয় সংগীতের ধারায় অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের সৃষ্টি স্রোতহীন বদ্ধ জলে নতুন সুর-সৃষ্টির স্রোত এনেছেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে কোন দিক থেকে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ সম্ভব তারও ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার নেশা বড়ো সর্বনেশে নেশা। নতুন কিছু করবার মত্ততার মতো সৃষ্টির শত্রু খুব কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সৃষ্টি-শক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তাই তারা শক্তির অপূর্ণতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্তে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করে থাকে।'

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগের অরুণ বর্ণে সহজেই নবীন, চরণ রাঙাবার জন্তে যাঁদের উষাকে নিউ মার্কেটে 'খুন' ফরমাশ করতে হয় না।'

তাক লাগানোর এই নেশার হাত থেকে আধুনিক সুরকারেরা যেন আপনাদের বাঁচিয়ে রাখেন। তবেই রবীন্দ্র-সংগীত-ধারার সঙ্গে যোগ রেখে তাঁদের সৃজন-প্রয়াসে তাঁরা নবীনের স্পর্শ পাবেন।

আমার কথা (৬৬)

শ্রীমতী গীতা সেন

রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে যাঁরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন—দরদ দিয়া যাঁরা উহার ভাবধারাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন—শ্রোতাদের অন্তরে যাঁরা উহার ব্যঞ্জনাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হয়েছেন আর উহার পরিবেশনায় সুর ও রূপ অবিকৃত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা যাঁরা করে চলেছেন—তাঁদের অন্যতমা হলেন সরলমনা, নিরহঙ্কারিণী ও প্রচারবিমুখা শ্রীমতী গীতা সেন। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বসে আমার অনুরোধে তিনি নিজ শিল্পি-জীবন ব্যক্ত করলেন :—

আমি ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাসে (ভাদ্র) পিতা ৺জিতেন্দ্রমোহন নাহা ও মাতা শ্রীমতী রেণুকা নাহার দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথমা কন্যা হয়ে কুমিল্লা শহরে জন্মাই। ঠাকুরদাদা ৺রায়বাহাদুর অনঙ্গমোহন নাহা ছিলেন সরকারী উকিল। দাদামহাশয় ত্রিবেণীমোহন বর্দ্ধন। মা নিজে গান শিখেছিলেন ছেলেবয়সে কিন্তু বিবাহের পর পারিবারিক রক্ষণশীলতার জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্য ভালভাবে তিনি জেনেছিলেন তাই আমায় ছয় বৎসর বয়স থেকে মা নিজে এস্রাজ বাজাতেন আর আমায় গান শেখাতেন। বাবাও পিয়ানো এবং অর্গ্যান বাজাইয়া আমায় নজরুলগীতি ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান শেখান। বাড়ীতে কিছুকাল মা'র কাছে পড়িয়া কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালায় ভর্ত্তি হই ও সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আই, এ, পড়ি। মা'র ইচ্ছা ছিল ছেলেবয়সে শান্তিনিকেতনে আসি কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষাশেষি যখন কুমিল্লা সহরে সৈন্যাবাস বৃদ্ধি পেল তখন অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে আমাকে শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। সেখানে মাসীমা শ্রীমতী ইন্দুলেখা ঘোষ তখন কলাভবনের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁহার প্রচুর প্রভাব পড়েছে আমার শিল্পিজীবনে। শান্তিনিকেতনে এসে গানে মুগ্ধ হয়ে আমি সঙ্গীতভবনে যোগদান করি ও এক বৎসর পরে পারিবারিক অসুবিধার জন্য কলিকাতায় বাবা মার কাছে চলে আসি। কিন্তু গান শেখা আমার চলতে থাকে বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি গীতবিতান-এ ভর্ত্তি হই। তথায় শ্রীমতী কনক দেবী ও শ্রীঅনাদি ঘোষ-দস্তিদার আমার কণ্ঠস্বর শুনে খুব খুসী হন। কয়েক মাস পরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীদেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে আমি কলিকাতার উন্মুক্ত আসরে প্রথম গান করি।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ভজন গানও শিখি। ক্রমশঃ আমার গলায় ভজন গান ভাল হতে লাগল। হায়দ্রাবাদ রাজপরিবারের তনয়া আমতুস সালাম ১৯৪৩ সালে কুমিল্লায় আমার গলায় ভজন শুনে সেবাগ্রামে (ওয়ার্দ্ধা) আসার জন্য অনুরোধ করেন। অসুস্থ মেহেরালী সাহেব আমার গাওয়া ভজন শুনে বলেন Sonorous Voice এবং আমাকে 'আশ্রম-ভজনাবলী' পুস্তক নিজ স্বাক্ষর সহ উপহার দেন। আচার্য্য নন্দলাল বসুর বোলপুরের গৃহে আমি প্রায়ই ভজন গাহিতাম। কলিকাতায় প্রথমে ডি, এন, মৈত্রর গৃহে আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কথকতার সাথে ভজন গান করি। পরে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বক্তৃতার সহিত আমি বহু বার ভজন ও বাউল সঙ্গীত গেয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানিনা, কলিকাতা বেতার কেন্দ্র আমাকে 'ভজন সঙ্গীত' গায়িকারূপে গ্রহণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

সঙ্গীতভবনে আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পেয়ে ধন্যা হয়েছি আর 'গীতবিতান'এ কনকদি' (শ্রীমতী কনক বিশ্বাস) আমাকে আন্তরিকতার সহিত গান শিখাইয়াছেন। এছাড়া শ্রীঅনাদি ঘোষ-দস্তিদারও আমাকে প্রচুর সহায়তা করেছেন। শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট কিছুদিন
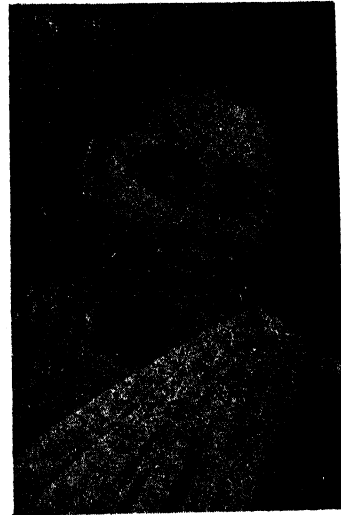
শ্রীমতী গীতা সেন

গান শিখেছি। শ্রীবিনয় রায়ও আমার অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। Traditional বাউল গান আচার্য্য সেন ও শ্রীনীহারবিন্দু সেনের নিকট শিখি।

১১৪৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে আমি প্রথম গান করি। কয়েক মাসের মধ্যে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোং থেকে আমার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়—শ্রীনীহারবিন্দু সেনের কথা ও সুর—'আমার সকল গান তোমারে শুনাতে চাই' ও 'মধু যামিনীর নিদহারা চাঁদ।' আর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড হল 'আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে ঐ বাজে' ও 'তোমার মন বলে চাই চাই গো' ১১৫৩ সালে আমার রেকর্ড হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'ক্ষম হে ক্ষম' 'পথে যেতে ডেকেছিলাম।' তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর পরে বর্ত্তমান মাসে বেরিয়েছে অতুলপ্রসাদের গান 'আনন্দে রুমকু ঝুমকু বাজে' ও 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা।'

১১৫০ সালের আগষ্ট মাসে (১০ই শ্রাবণ ৫৭) শ্রীনীহারবিন্দু সেনের সহিত আমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হই। বর্ত্তমানে আমি গীতবিতানে সঙ্গীত শিখাইয়া থাকি।

রবীন্দ্রজন্ম-শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হবে সারা ভারতে ১১৬১ সালে। উহার উদ্যোগ-আয়োজন ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হয়েছে। অবিকৃত গায়কী রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা হবে শতবার্ষিকীর অন্যতম অঙ্গ। এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা করিতে পারেন বেতারকেন্দ্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীগুলি। বেতারকেন্দ্র হইতে যেমন শান্তিনিকেতন 'সঙ্গীত-ভবন'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা শ্রোতারা আশা করেন, তেমন তাঁহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেকর্ডায়িত করা হউক—এই আশাও সমভাবে তাঁহাদের মনে বারে বারে উদিত হয়।

সুচরিতাসু

অনিরুদ্ধ কর

প্রেমে পড়া প্রেমিকদেরই সাজে
তোমার আমার মতন যারা লোক
শোভন থাকি কাজের কারুকাজে
এস বরং গল্প কিছু হক।

পাতার ফাঁকে রোদের ঝিলমিল
সরু সীঁথির মত বনের পথ
কৃষ্ণচূড়া ফোটায় এপ্রিল
হৃদয়ে চলে এ কার জয়রথ ?

নিরাপদের রাখি হে ব্যবধান
সাক্ষী থেক সকল তরুলতা
আবেগ যদি হঠাৎ বয় উজান
শিথিল তবু করি নি ভদ্রতা।

তোমার চোখে নিবিড় কত আলো
তোমার দেহে যত নদীর প্রেম
রক্তে তার ধ্বনি কে শোনান
অন্ধকারে বিপুল অ্যাবেস।

যেই কথাটা বলব বলে ভাবি
হয় না বলা সেই কথাটি আর
নীরবতায় হারায় যত দাবী
হৃদয়ে প্রোত গোপন বেদনার।

প্রেমে পড়া সাজে প্রেমিকদেরই
তোমার আমার মতন লোক যারা
কড়া নিয়ম প্রাণে পরায় বেড়ী
তোমার আমার মতন থাকে তারা।
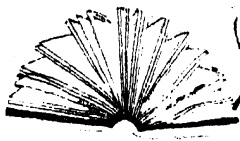
পত্রগুচ্ছ—শ্রীজওহরলাল নেহরু

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু লিখিত বিশ্ববিখ্যাত মনীষিগণের পত্রগুচ্ছের এক শোভন ও সুন্দর সংকলন, এই পত্রাবলীর মধ্যে নেহরুজীর স্বলিখিত কয়েকটি পত্রোত্তরও স্থান পেয়েছে পাঠকের সুবিধার্থে।

শ্রীজওহরলাল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূর্ত্ত প্রতীক, জীবনের অধিকাংশই তিনি অতিবাহিত করেছেন স্বদেশের মুক্তিসাধনায়, বর্ত্তমান পত্রগুচ্ছ সংকলনটির মাধ্যমে তারই এক অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করা যায়। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মনীষী ও সুধীজন ও অগণিত বান্ধবের লেখা এই পত্রাবলী ভারতের অহিংস মুক্তি-সংগ্রামের মূল্যবান ও প্রামাণ্য দলিলরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, ভারতের এই বরেণ্য সন্তানের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারারও এক ধারাবাহিক ইতিহাস নিহিত রয়েছে এর মধ্যে, যার মূল্য জাতির কাছে কম নয়। রাজনীতিজ্ঞ জওহরলাল ও মানব জওহরলাল, এতদুভয়েরই পরিচয় লাভ করি আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে; ব্যক্তি জওহরলাল, কর্মী জওহরলাল ও নেতা জওহরলালকে বুঝতে হলে এই সংকলনটি অবশ্য পাঠ্য, এরূপ একটি মনোরম ও প্রয়োজনীয় সংকলন প্রকাশ করার জন্ম প্রকাশক আমাদের ধন্মবাদার্হ। আমরা এই পত্রগুচ্ছ সংকলনটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, অন্যান্য আঙ্গিকও ত্রুটিহীন। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা—১২ মূল্য—১০৲ টাকা মাত্র।

সসেমিরা

সাহিত্যের অঙ্গনে রহস্য কাহিনীর স্থান আজও অনির্দিষ্ট, বস্তুতঃ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত বিষয়বস্তুটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁরই সহৃদয়তায় অপাংক্তেয় রহস্য কাহিনী পেয়েছিলো একদিন জাত সাহিত্যের সম্মান, হয়ে উঠতে পেরেছিলো সাহিত্যপদবাচ্য। শরদিন্দু বাবুর 'ব্যোমকেশ' চরিত্রটি বিখ্যাত বিদেশী রহস্যকাহিনীর অমর চরিত্রগুলির সঙ্গেই তুলনীয়, 'ব্যোমকেশে'র গল্পগুলি প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-চিত্তকে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো একদিন: আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে যে তিনটি নূতন রহস্যকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তারও নায়ক এই বিখ্যাত চরিত্রটি; লেখকের স্বচ্ছন্দ মধুর সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষা গল্পগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে, রহস্যকাহিনী অনুরক্ত পাঠক বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন বলেই আমরা মনে করি। বইটির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য অঙ্গসজ্জাও যথাযথ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭, মূল্য—৩৲ মাত্র।

ঋগ্বেদ

আলোচ্য গ্রন্থটি ঋগ্বেদ প্রথম অষ্টকের পদ্যানুবাদ, সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সন্ধানী পাঠক বইটি পাঠে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু ধারণা করিতে পারিবেন, শ্লোকাংশগুলি মনোরম ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক বেদ সম্পর্কে একটি সহজ সুসম্বদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন যা বেদানভিজ্ঞ পাঠককে রসগ্রহণে সহায়তা করবে। বেদ হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ, ইহার সম্বন্ধে একটু প্রাথমিক জ্ঞান হিন্দু মাত্রেরই থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্যে রচিত বর্ত্তমান পুস্তকটি যোগ্য সমাদর পাইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। ঋগ্বেদ—ডক্টর মতিলাল দাস, প্রকাশক—ভারত সংস্কৃতি পরিষৎ আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬১ নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩ মূল্য—৫৲ টাকা মাত্র।

ভারত-তীর্থ

আলোচ্য গ্রন্থখানি ক্ষীণ কলেবর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, শিক্ষাব্রতী লেখক মাদ্রাজ শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান করার উদ্দেশে পাড়ি দেন সুদূর দক্ষিণ ভারতে, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পঞ্জাব প্রদেশে কাটান কয়েকটি দিন; তারই স্মৃতিচারণ এই গ্রন্থটি। সরস কথকের দক্ষ বর্ণনায় কাহিনীটি আগাগোড়া উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, গুরুগম্ভীর অধ্যাপকের সাক্ষাৎ কোথাও মেলে না, কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে লেখক ভারত-তীর্থে পদসঞ্চার করেছেন, তারই পরিচয়ে ধন্য তাঁর এই রচনাটি পাঠককে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ দেবে, লেখকের ভাষাও কাব্যাশ্রয়ী, আমরা পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই সাধারণ। লেখক—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রকাশক—বিচিত্রা, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ মাত্র।

অবাক পৃথিবী

আলোচ্য গ্রন্থখানি খ্যাতনামা সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর আধুনিকতম রচনা। বর্ত্তমান যুগে সিনেমা বা ছায়াচিত্রশিল্প একটি প্রধান ভূমিকার অধিকারী, এই চিত্রশিল্প জগতের যবনিকার অন্তরালে আজও যে নৈরাশ্যজনক পটভূমি বিস্তৃত রয়েছে তারই আভাস মেলে বর্ত্তমান গ্রন্থটিতে। কয়েকটি মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী পুঁজিপতির বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল নায়িকা গোপা ও তরুণ চিত্রশিল্পকর্মীরা, আন্তরিক আগ্রহে গড়ে তুলেছিল তারা পরিচ্ছন্ন একটি ইউনিট, শিল্পনিষ্ঠার ঐকান্তিক আদর্শে অবিচল এই কয়েকটি মানুষ আশা করেছিল সাফল্যের, স্বপ্ন দেখেছিলো রঙীন ভবিষ্যতের, কিন্তু লোভ আর অসত্যের কলুষ স্পর্শে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব, আদর্শবাদ পরাজয় স্বীকার করল ঐশ্বর্য্যের বলদৃপ্ত পাশব শক্তির কাছে; বর্ত্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যাটিই কুশল লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসখানির মাধ্যমে। সমস্ত কাহিনীটি যেন এক নেতিবাচক সুরের রাগিণী, লেখকের নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রধান যদিও সেজন্য তাঁর বক্তব্য কোথাও দ্বিধাকুণ্ঠিত নয়। লেখকের স্বচ্ছন্দ ব্যবহৃত ভাষা ও তথ্যনিষ্ঠ যুগোপযোগী বিষয়বস্তু এ

রচনাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে, আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। প্রচ্ছটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—চলন্তিকা প্রকাশক, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩.৫০ নঃ পঃ মাত্র।

জব চার্ণকের বিবি

বর্তমানে শহর কলিকাতার অতীত অধ্যায় সাহিত্যকারদের ঔৎসুক্য জাগিয়েছে, বেশ কয়েক জন এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে কলম চালিয়েছেন, 'জব চার্ণকের বিবি' নামে সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটিতেও কলিকাতার জনক চার্ণকের জীবন ও কর্মধারার এক বিশদ বিবরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকটির লেখক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। অতিশয় দক্ষতার সহিত তিনি শহর কলিকাতার সূচনার কাহিনী বিবৃত করেছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক সামান্য চাকুরীয়ারূপে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছিলেন একদিন তরুণ চার্ণক। ক্রমে ক্রমে এই বিদেশই কেমন করে তাঁর আপন হয়ে গেল, তিনি ভালবাসলেন এই দেশকে, এই দেশের মেয়েকে, তাঁর জীবনে ঘটলো প্রেমের আবির্ভাব দুজন ভারতীয় নারীকে কেন্দ্র করে; সামান্যা গণিকা মতিয়া ভালবেসেছিলো চার্ণককে, সেই প্রেমকে সাদর স্বীকৃতিতে ধন্য করেছিলেন তিনি পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে পঙ্কজিনীকে স্বচ্ছন্দ সহৃদয়তায়। বর্বর সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন সেদিন এই বীর যুবক অকুতোভয়ে, প্রজ্বলিত চিতার গ্রাস থেকে কেড়ে এনেছিলেন অসামান্যা সুন্দরী ব্রাহ্মণ সদ্যবিধবাকে। এই রমণীকেই পরে বিবাহ করেছিলেন তিনি, আজীবন বিশ্বস্ত ছিলেন তিনি তাঁর এই বীর্য্যশুল্কা পত্নীতে। চার্ণকের জীবনে প্রেম ও কর্মপটুতার এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছিলো, সেই বিচিত্র জীবনধারার ছবি আঁকতে বসে লেখক কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করেননি আর সেজন্যই তথ্যনিষ্ঠ পাঠকের পক্ষেও রসগ্রহণে কোন বাধা থাকে না। ইতিহাস-রসাশ্রিত এই উপন্যাসটি পাঠক-সমাজে সাদরে গৃহীত হবে বলেই আমরা আশা করি। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা অতি সাধারণ। প্রকাশক—অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

রঙে-রেখায়

বর্তমান বাঙলা-সাহিত্যের আসরে রম্যরচনার অত্যন্ত প্রাধান্য, হাল্কা মেজাজের এই রচনাগুলি ক্রমেই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আলোচ্য পুস্তকটিও সেই শ্রেণীভুক্ত, এর রচয়িতা নবাগত হলেও বিস্ময়কর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর দিয়েছেন আত্মপ্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, সহজ সরল বৈঠকী ভঙ্গীটি পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে তোলে স্বাভাবিক ভাবেই। ইউরোপ ভ্রমণের এক ছবি এঁকেছেন লেখক কালি-কলমে, নানা চরিত্র ভিড় করে এসেছে ঠিক যেন প্রকাণ্ড এক ক্যানভাসে আঁকা হয়েছে নানা রঙা কয়েকটি ছবি, আপন আপন বৈশিষ্ট্যে তারা উজ্জ্বল, অনন্য। সন্দেহমাত্রের অবকাশ নেই যে, আলোচ্য গ্রন্থরচয়িতা অক্ষম হাতে ধরেন না তাঁর লেখনী, শুধু একটি জিনিষ একটু পীড়াদায়ক, তা হল, বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিক্‌পাল লেখকের রচনাশৈলীর সাথে তাঁর বিস্ময়কর সাদৃশ্য, এমন কি পড়তে পড়তে অনেকবারই সন্দেহ জেগেছে মনে ছদ্মনামে উল্লিখিত লেখকেরই কোন নূতন রচনার পরিচয় লাভ করছি কি না; আশা করি এই ত্রুটি সম্পর্কে ভবিষ্যতে লেখক আর একটু সতর্ক হবেন। কারণ অনুকরণ যতই নিখুঁত হোক না কেন মৌলিকতার গৌরব তার চেয়ে অনেক বড়। আমরা লেখকের সাফল্য কামনা করি। বইটির প্রচ্ছদশিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। রঙে-রেখায় ইবনে ইমাম, প্রকাশক—নয়া প্রকাশ, ২০৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৫ টাকা ৫০ নঃ পঃ মাত্র (ভারত সংস্করণ)।

Autobiography of a Yogi

by Paramhansa Yogananda

বিজ্ঞানসর্বস্ব যুগে অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয় দর্শনের উপর স্বভাবতঃই মানুষের অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে হিন্দু যোগীর আত্মজীবনীর এরূপ সাফল্য লাভ করা সত্যই বিস্ময়কর। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধরণের একটি পুস্তকের পক্ষে পাশ্চাত্য দেশে এতখানি জনপ্রিয়তায় অভিনন্দিত হওয়া, অবশ্য এটা ঠিক যে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তাঁর জীবনের অধিকাংশ-ই অতিবাহিত করেন পাশ্চাত্য দেশে, গুরুর আদেশে তরুণ যোগানন্দ ভারতের অমৃত আত্মার বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন সাগরপারে আর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল পরে সেই স্থানেই মহাসমাধি ঘটে তাঁর, এই সুদীর্ঘ কালে পাশ্চাত্যবাসী পেয়েছেন তাঁর সান্নিধ্য বহুজন গুরু বলে বরণ করেছেন এই হিন্দু যোগীকে।

হিন্দু যোগীর লিখিত এই গ্রন্থে যোগজীবনের মূলনীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে অত্যন্ত সরস ও সাবলীল ভাষায়—যাতে যোগরহস্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও বোধগম্য হয় বিষয়বস্তুর আবেদন, আত্মজীবনীর মাধ্যমে তিনি দার্শনিক অধ্যাত্মবাদী ভারতের মহিমময় রূপটিকেই বিশ্ব মানসের উপলব্ধি গোচর করেছেন। পুস্তকটি পাঠে এই উপলব্ধিই আমাদের পরম লাভ। আমরা আশা করি বিদেশের মত স্বদেশেও এই অপূর্ব গ্রন্থটি পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে, বইটির আঙ্গিক এককথায় ত্রুটিহীন, লেখকের ও অন্যান্য সাধুপুরুষগণের সুন্দর আলোকচিত্রগুলি এর অন্যতম সম্পদ। প্রাপ্তিস্থান—Yogoda Sat Sanga Society, Dakshineswar, P.O. Ariadah, West Bengal.

ইভ্‌নিং ইন প্যারিস

আধুনিক সাহিত্যকারদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দুর্লভ অধিকার যাঁরা ভোগ করেন সুধীরঞ্জন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর এই আধুনিক রচনাটিও পাঠক মনের প্রত্যাশাকে সফল করবে বলেই আমরা আশা করি। আলোচ্য উপন্যাসখানি প্যারিসের নাইট ক্লাবের পটভূমিতে রচিত, নাইট ক্লাবে ভিড় করে প্রমোদ প্রত্যাশী জনতা অথচ সেই আলোকোজ্জ্বল রঙ্গভূমির ঝলমলে যবনিকার অন্তরালে যে কত কান্না কত অশ্রু চাপা পড়ে যায় তার হিসাব কে রাখে? নাইটক্লাবের সামান্যা এক নর্তকী মিকির জবানীতে লেখক নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন সেই বেদনাকেই।—সুধীরঞ্জনের সহজ সুন্দর ভাষা কাহিনীটিকে এক অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা দিয়েছে, স্বাভাবিক মানবিক আবেদন ছড়ানো রয়েছে রচনার প্রতি ছত্রে, পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করে যে হৃদয়ের সত্তা তারই বন্দনা করেছেন লেখক অকুণ্ঠে। আমরা পুস্তকটির

সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জা রুচিসঙ্গত। ইভনিং ইন প্যারিস—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক—শঙ্করকুমার দত্ত, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, ১০এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫ মূল্য—৩৲

পথ বয়ে যায়

লেখক বলিষ্ঠ হাতে কলম চালান জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে কঠিন মাটিতেই, অবাস্তব কল্পনা বিলাসের কোন চিহ্ন নেই তাঁর রচনায় কোথাও, রাঢ় বাঙলার একান্ত আপন যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি তারই ছাপ পড়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে, রাঢ় বাঙলাকে লেখক চিনেছেন হৃদয় দিয়ে, মাটির সঙ্গে তাঁর যোগ বাহিরের নয় অন্তরের সেই মাটিরই মানুষের আনন্দ বেদনা সুখ দুঃখ ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরম মমতায়; ভবঘুরে সঙ্গীত সাধক নিমাই ওস্তাদের যে ছবিটি তিনি এঁকেছেন তাতে অভিভূত হয় মন, জীবনদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নিমাই ওস্তাদ শেষে পেল পরম শান্তি, বৃন্দাবনের পবিত্র পুণ্যভূমিতে রোগজীর্ণ জীবনের বোঝা নামিয়ে মিশে গেল তার প্রাণের দেবতা শ্যামকিশোরের পায়ে, চরম আত্মসমর্পণে ঘটলো পরম মুক্তি। শিশিরস্নাত শুভ্র যুঁইফুলের স্নিগ্ধ সুবাসই আঘ্রাণ করেন যেন পাঠক এই করুণ মধুর কাহিনীটির মাধ্যমে। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ। আমরা আলোচ্য গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। পথ বয়ে যায়—শক্তিপদ রাজগুরু, প্রকাশক—শ্রীতপনকুমার চৌধুরী, চলন্তিকা প্রকাশকের পক্ষে। মূল্য—৩'৭৫ নঃ পঃ মাত্র।

মহীয়সী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্বনামধন্য লেখক, দেশ সাপ্তাহিকের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গল্পেরই নবতম সংগ্রহ আলোচ্য গ্রন্থখানি। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণভঙ্গী যা একান্ত ভাবেই লেখকের নিজস্ব তার পরিচয়ে সমুজ্জ্বল গল্পগুলি পাঠককে আকৃষ্ট করে সহজেই। মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে যার মধ্যে মহীয়সী ও বনের রাজা, এদুটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, শেষোক্ত গল্পটিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যা এক কথায় অতুলন, শক্তিমান কথাশিল্পীর প্রধান যা গুণ তা হল পাঠকমনকে রচনার মধ্যে নিমগ্ন করে দেওয়া, এই একাত্মবোধের সাধনায় লেখক সফল হয়েছেন, গল্পগুলিও তাই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। গল্পগুলি পড়তে যে ভাল লাগে একথা পাঠক নিঃসংশয়েই বলতে পারেন আর সেটুকুই তো লেখকের সম্পর্কে সবচেয়ে দামী স্বীকৃতি। আমরা আশা করি পাঠক-সমাজ এই গল্পসংগ্রহটিকে সাদরেই গ্রহণ করবেন। বইটির অঙ্গসজ্জা মোটামুটি ভালই। মহীয়সী—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রকাশক শ্রীশঙ্করকুমার দত্ত, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, ১০ এ বকুলবাগান রোড কলিকাতা-২৫ দাম—তিন টাকা মাত্র।

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা

আধুনিক কালের কবিকুলে ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র একটি স্মরণযোগ্য নাম। শুধু কবি হিসেবেই নন, প্রাবন্ধিক এবং শিক্ষাব্রতী হিসেবেও ইনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর বিভিন্ন কবিতা একত্রে সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থটির রূপ নিয়েছে। গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতা কবির প্রতিভার পরিচায়ক। রূপ রস বর্ণ গন্ধময় পৃথিবীর বিশেষ রহস্য সন্ধানে কবিচিত্ত ব্যাকুল—তাঁর চিন্তায় কল্পনায়, নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান মেলে। কবি গভীরতার উপাসক, গভীর থেকে গভীরে তাঁর কবি-মন নিত্য অবগাহন করে চলেছে। গ্রন্থে কবিতাগুলি বলা বাহুল্য যথোপযুক্ত রসোত্তীর্ণ, সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী। কবিতাগুলির আবেদন অন্তরে যথেষ্ট রেখাপাত করে। প্রকাশক—সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো। দাম—তিন টাকা মাত্র।

প্রফেসর হোঁদারামের ডায়েরি

সরস শিশু-সাহিত্য রচনায় লেখক সিদ্ধহস্ত, সদ্য প্রকাশিত তাঁর এই রসরচনাটি বালক-বালিকার চিত্তহরণ করবে। নানাবিধ সমস্যা কণ্টকিত মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আজ হাসতে পারা, আলোচ্য বইটিতে যা শুধু শিশুরা নয় বয়স্ক ব্যক্তিও উপভোগ করবেন; মোট নয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই হাসায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাতুকুতু দিয়ে নয়। গুমোট গরমের পর ঝিরঝিরে একটুখানি বৃষ্টির মতই উপভোগ্য এই ছোট বইখানি এর ছোট ছোট সমঝদারদের খুশী করে তুলবে বলেই আমরা আশা করি। 'প্রফেসর হোঁদারামের ডায়েরি'—অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব), লেখাপড়া, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা।

ক্রীম

রোমান্টিক কল্পনা বিলাস আর আজকের সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নয়। বর্তমান সাহিত্য দাঁড়িয়েছে বাস্তবের কঠিন মাটিতেই। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের নানান দিকের ছবি আঁকতে বসেছেন আজকের সাহিত্যিক, সাহিত্যের আঙিনায় তাই আমরা দেখতে পাই অপরিচিত মানুষের মিছিল—পরিচিত হই তাদের বিচিত্র জীবন যাত্রার বিচিত্রতর রূপের সঙ্গে। আমাদের দেশ তন্ত্র মন্ত্রের দেশ, শ্মশানচারী তান্ত্রিকের নানা অভিজ্ঞতা, উপলব্ধির কথা শুনিয়েছেন আমাদের অবধূত তাঁর পূর্বতন কাহিনীগুলির মাধ্যমে; আর সেই কাহিনীগুলি এনে দিয়েছে তাঁকে অসীম জনপ্রিয়তা যা সত্যই বিস্ময়কর; পাঠক পেয়েছেন এক নতুন রসের সন্ধান—তারই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন লেখক। ক্রীম এই জনপ্রিয় লেখকের নবতম গল্পসংগ্রহ। আলোচ্য সংকলনটিতে মোট চারটি গল্প স্থান পেয়েছে; গল্পগুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য, অবধূতের যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তার থেকে এগুলি বঞ্চিত নয়; স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য একটু পীড়াদায়ক মনে হলেও, সাবলীল ভঙ্গীতে বলা সহজ গল্পগুলি সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়। ক্রীম,—অবধূত, ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল—

কম্যুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ গত ২৭শে জুন (১৯৬০) জেনেভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন পরিত্যাগ করায় আকস্মিক ভাবে উক্ত সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল। দশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আবার কবে আরম্ভ হইবে সে-সম্বন্ধে কোন কথাই বলা সম্ভব নয়। সোভিয়েট প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা মঃ জোরিন সম্মেলন ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাটি এবং উক্ত পরিষদ ১৯৫৯ সালের ২০শে নবেম্বর যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা রূপায়িত করার ব্যাপারে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা উত্থাপন করিবেন। তিনি অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনার বিশেষ সমর্থক এবং উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুতই রহিয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সম সংখ্যক প্রতিনিধির ব্যবস্থা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাটির সাফল্যপূর্ণ সমাধানের পক্ষে অনুকূল বলিয়া এখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে। সেই সঙ্গে তিনি আলোচনায় অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগদানের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে আলোচনার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কেন সম্মেলন পরিত্যাগ করিলেন তাহা বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৬০) সবদিক দিয়াই একটা অনুকূল অবস্থার মধ্যেই জেনেভায় দশ রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মুখে ছিল মে মাসে (১৯৬০) প্যারীতে শীর্ষসম্মেলন হওয়ার কর্ম্মসূচী। চারিদিকেই অবস্থা যখন অনুকূল তখন মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনাটি বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই সমস্ত অনুকূল পরিবেশ আকস্মিকভাবেই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। যোধনের পূর্ব্বেই শীর্ষসম্মেলন বানচাল হইয়া গেল। শীর্ষসম্মেলন উপলক্ষে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত ছিল। বিশ্ববাসীর মনে শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতা নৈরাশ্য আশঙ্কা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করে সন্দেহ নাই। তবু শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতার পরেও গত ৭ই জুন যখন জেনেভায় পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইল তখন বিশ্ববাসীর মনে আবার আশা জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহ আলোচনার পর আকস্মিক ভাবেই এই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দায়িত্ব কাহার, এ সম্পর্কে বিশ্ববাসী সকলেই একমত হইবেন, ইহা আশাকরা সম্ভব নয়। আপাত দৃষ্টিতে হয়ত মনে হইবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গে বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, এবং পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ এক যোগে সম্মেলন হইতে চলিয়া যাওয়ায় কম্যুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়ার জন্য দায়ী। কিন্তু যে-সকল ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা সম্মেলন পরিত্যাগ করিলেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। গত ৩রা জুন (১৯৬০) সোভিয়েট রাশিয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একটি সংশোধিত পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই পরিকল্পনা তিনটি স্তরে বা পর্য্যায়ে বিভক্ত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চারি বৎসরে নিরস্ত্রীকরণ কাজ সম্পূর্ণ হইবে। গত ৭ই জুন (১৯৬০) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে রাশিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে উল্লিখিত পরিকল্পনা সম্মেলনে পেশ করে। এই সময় সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হইলেও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে আলোচনা ব্যাহত হইবে না, যদিও শীর্ষসম্মেলনের ব্যর্থতা এই সম্মেলনের কাজকে অত্যন্ত কঠিন করিয়াই তুলিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন প্রস্তাব পশ্চিমী শিবিরে একেবারেই কোন উৎসাহ সৃষ্টি করে নাই, একথা বলা যায় না। ফরাসী প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা মঃ জুলে মস (M. Jules Moch) প্রথমে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না। রুশ পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় দেড় বৎসরের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র বহনের সব রকম যান নিষিদ্ধ করিতে এবং সেই সঙ্গে বিদেশ হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিতে ও বিদেশে যে সকল সামরিক ঘাঁটি আছে সেগুলি বিলোপ করিতে হইবে। পরমাণু অস্ত্র বহনের সমস্ত রকম যান নিষিদ্ধ করা হইতেই নিরস্ত্রীকরণের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত, ইহা ছিল ফ্রান্সের অভিমত। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের অভিপ্রায় অনুযায়ীই এই প্রস্তাব রচনা করা হইয়াছে।

রুশ পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে বিদেশস্থ ঘাঁটিসমূহ বিলোপের যে প্রস্তাব আছে তাহাই যে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার অগ্রগতির-কালে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পরমাণু অস্ত্র বহনের সমস্ত রকম যান নিষিদ্ধ করা এবং বিদেশ হইতে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবও কম প্রবল বাধা সৃষ্টি করে নাই। মঃ জুলে মস্ পরমাণু অস্ত্র বহনের যান নিষিদ্ধ করার পরিবর্ত্তে এ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবী করেন। বিদেশস্থ সামরিক ঘাঁটি সমূহ উচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁহার উক্তিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ গোরে বলেন যে, বিদেশস্থ ঘাঁটিগুলি বিলোপ করিলে সোভিয়েট রাশিয়ারই সুবিধা হইবে। তিনি মনে করেন, সাধারণভাবে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার কাজে অগ্রসর হইলেই বিদেশস্থ ঘাঁটিগুলি বিলোপের প্রশ্ন উঠিতে পারে। মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ইটন গত ১৫ই জুন নিরস্ত্রীকরণ

সম্মেলনের অধিবেশনে বলেন যে, বিদেশস্থ ঘাঁটিগুলি প্রথম পর্য্যায়ে বিলোপের জন্ত রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে নিরস্ত্রীকরণের কোন পর্য্যায়েই কোন পক্ষকেই সামরিক সুবিধা না দেওয়ার নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। তিনি বলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার নাটো সৈন্তবাহিনীকে যদি ইউরোপ হইতে অপসারণ করা যায় তাহা হইলে ঐ সৈন্তবাহিনী কয়েক হাজার মাইল দূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর তীরে অপসারিত হইবে, কিন্তু অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট সৈন্তই তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থান স্থান হইতে মাত্র কয়েক শত মাইল পূর্ব্বদিকে অপসারিত হইবে। রুশ পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায় সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের আপত্তির কারণ এই সকল উক্তির মধ্যেই প্রকাশিত রহিয়াছে।

গত ১৭ই জুন (১৯৬০) সম্মেলনের অধিবেশন হওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ইটালীর প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ সরকারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রাজ্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। মার্কিণ প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ইটন ওয়াশিংটন হইতে নিরস্ত্রীকরণের নূতন প্রস্তাব লইয়া গত ২৫শে জুন জেনেভায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিবার পথে তিনি লণ্ডন ও প্যারীতে যাইয়া উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। পর দিন পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া এই নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্ত্তী সপ্তাহে কোন একদিন এই প্রস্তাব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উত্থাপন করার কথা ছিল। হয়ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে উত্থাপনের পূর্ব্বে এই প্রস্তাব উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থার স্থায়ী পরিষদের পরবর্ত্তী প্যারী অধিবেশনেও উত্থাপিত হইত। কারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যেও এই প্রস্তাব সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করার সুযোগ আর হইল না। গত ২৭শে জুন কম্যুনিষ্ট শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সম্মেলন পরিত্যাগ করায় আকস্মিক ভাবেই সম্মেলন ভাঙ্গিয়া গেল। মিঃ ইটন ওয়াশিংটন হইতে যে প্রস্তাবটি লইয়া আসেন, তাহা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরটি আবার আটটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ব্যাপক জনবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র সহ মহাশূন্তে ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধকরণ। তৃতীয় পর্য্যায়ে আকস্মিক আক্রমণ নিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব আছে। উহাতে মহাশূন্ত যান এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের নোটিশ দেওয়ার, আকাশ হইতে এবং স্থলে ইন্‌স্পেকশানের জন্ত অঞ্চল গঠন এবং পারস্পরিক সামরিক ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থার কথা আছে। চতুর্থ পর্য্যায় পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী বিমানঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের স্থান, সাব-মেরিন ও নৌঘাঁটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে। পরবর্ত্তী স্তরে পরমাণু অস্ত্র পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্ত ঘাঁটি স্থাপনের জন্ত ঐরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে নূতন মার্কিণ প্রস্তাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার স্থানও আমরা পাইব না। তবে এইটুকু উল্লেখ করা যাইতে পারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বের মতই এই প্রস্তাবেও ইন্‌স্পেকশানের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছে। অতর্কিত আক্রমণ নিরোধের জন্তই ঐরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাশিয়ার চারিদিকে মার্কিণ সামরিক ঘাটি থাকায় অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যে রাশিয়াই বেশী করে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৫৫ সালে 'উন্মুক্ত আকাশ' (open skies) প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। রাশিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। কিন্তু এই 'উন্মুক্ত আকাশ' পরিকল্পনা দ্বারা তিনি কি ফল পাইবার আশা করেন? অতর্কিত আক্রমণের জন্ত রাশিয়ার বিমানঘাঁটিগুলিতে বোমারু বিমানগুলি সজ্জিত থাকার ফটো আকাশ হইতে অবশ্যই গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু ১৯৫৫ সালের বোমারু বিমানের যুগ এখন আর নাই। এখন missile বা ক্ষেপণাস্ত্রের যুগ। ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবস্থাই এমনি-ই যে যে-কোন মুহূর্ত্তে উহা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। কাজেই রাশিয়া যদি আকাশ ও স্থল হইতে ইন্‌স্পেকশনে সম্মতও হয়, তাহা হইলেও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে কি না তাহা বুঝা যাইবে কিরূপে? রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিবে কি না, কিম্বা কোন সময় নিক্ষেপ করিবে, এ সম্পর্কে রাশিয়ার অভিপ্রায় ইন্‌স্পেকশনের দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। রাশিয়ার মনের অভিপ্রায়টি জানিবার উপায় উদ্ভাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের অভিপ্রায় তাহার আছে কি না তাহা বুঝিবার বা জানিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে আক্রমণের জন্ত সৈন্ত সমাবেশ করার প্রয়োজন নাই, বিমানঘাঁটিগুলিতে বোমারু বিমান সমূহ সজ্জিত করিয়া রাখাও নিষ্প্রয়োজন। ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিতই রহিয়াছে। যে-কোন মুহূর্ত্তে উহা নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। উহা নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আছে কি না ইন্‌স্পেকশান দ্বারা জানিবার উপায় নাই। বে আইনী ভাবে আকাশ হইতে গোপনে ইউ-২ বিমানের সাহায্যে ফটো তুলিয়া কিম্বা আইন সঙ্গত ভাবে 'উন্মুক্ত আকাশ' নীতি অনুসারে ফটো তুলিয়া অতর্কিত আক্রমণ নিরোধ করা ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে অসম্ভব। অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেও যাহাতে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করাই অতর্কিত আক্রমণ নিরোধ করিবার একমাত্র উপায়।

ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনা এবং শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাওয়া খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ধীরে ধীরে উন্নতিই হইতেছিল। মঃ ক্রুশ্চেভের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের পর এই সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়। কিন্তু মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনার পর এই সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার তুলনা ষ্টালিনের সময়ে রুশ-মার্কিণ সম্পর্কের সহিতই করা যাইতে পারে মনে করিলে ভুল হইবে না। এই সম্পর্কের পুনরায় উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আবার আরম্ভ হইবে কি না, হইলেও কোন ফল হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। কম্যুনিষ্ট চীনের চাপে রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করিয়াছে, ভাঙ্গিয়া দিয়াছে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন। এমন কথাও উঠিয়াছে, কম্যুনিষ্ট চীন ও রাশিয়ার মধ্যে একটা তাত্ত্বিক বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে, এমন কথাও শোনা যায়। সত্যই তাত্ত্বিক মত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে কি না তাহা বলা কঠিন এবং সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্ত যে স্থান প্রয়োজন তাহাও এখানে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট চীনকে মানিয়া লয় নাই। রাশিয়া মার্কিণ শিবিরের সহিত সহাবস্থান নীতিকে কার্য্যকরী করিতে

চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া কম্যুনিষ্ট চীন ও রাশিয়ার মধ্যে কৌশলগত (tactical) মতভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের সুদূর প্রাচ্যভ্রমণ—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। গত ১২ই জুন (১৯৬০) প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন হইতে সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণের জন্ম যাত্রা করেন। এই ভ্রমণের পথে অল্প সময়ের জন্ম তিনি আলাস্কায় গিয়াছিলেন। সুদূর প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি ২৬শে জুন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সুদূরপ্রাচ্য ভ্রমণের কথা বলিতে গেলে যেমন তাঁহার ভারত ভ্রমণের কথাই প্রথমে মনে পড়ে, তেমনি তাঁহার জাপান ভ্রমণ বাতিল করা এই ভ্রমণ-সূচীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশি জাপানে তীব্র বিক্ষোভ সত্বেও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফর স্থগিত রাখার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই সফর স্থগিত রাখিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়াও নাকি মার্কিণ সরকারকে জানাইয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার নিরাপত্তার জন্ম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজনও করা হইয়াছিল। মিঃ হ্যাগার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্বেও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার জাপান ভ্রমণ সম্পর্কে অবিচলিত ছিলেন। গত ১১ই জুন জাপ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনে ইষ্টক নিক্ষেপ দ্বারা মার্কিণ বিরোধী বিক্ষোভ যখন উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই সময় মিঃ হ্যাগার্টি যখন গোপনে টোকিও ত্যাগ করিয়া আলাস্কায় চলিয়া গেলেন তখনও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান ভ্রমণের সঙ্কল্প অটুট ছিল। ১৪ই জুন তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় উপনীত হন। ইহার পরদিন অর্থাৎ ১৫ই জুন ২০ হাজার লোকের এক জনতা জাপ পার্লামেণ্ট ভবনের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে পাঁচ জন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। আহত হয় ৬৫০ জন। এই ঘটনার পর পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশির চৈতন্তোদয় হয়। জাপ মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশনে জাপান সফর স্থগিত রাখিবার জন্ম প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাপ সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার জাপান ভ্রমণ বাতিল করেন।

ম্যানিলায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিপুলভাবেই অভ্যর্থিত হইয়াছেন, যদিও ন্যাশনেলিষ্ট ইউথ মুভমেণ্টের সদস্যরা কিছু সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গের প্লেকার্ডগুলিতে লেখা ছিল, "আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই," "আমেরিকা, আমাদের দাবী মিটাইয়া দাও," "জাপানকে আমেরিকা অধিকতর পরিমাণে সাহায্য দিতেছে কেন," ইত্যাদি। ১৫ই জুন ফিলিপাইন কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ গঠনমূলক জাতীয়তাবাদকে শত্রুর ন্যায় ভয় করেন। তিনি কম্যুনিজমকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আরও বলেন যে, নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের ক্রমাগত চেষ্টায় উহাই প্রমাণিত হয়। তিনি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রশংসা করিয়া বলেন যে, ১৯৪৫ সাল হইতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধীনস্থ ৩৩টি দেশ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে চীন-সোভিয়েট আওতায় ১২টি দেশের স্বাধীনতা বলপূর্ব্বক হরণ করা হইয়াছে। ১৬ই জুন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং ফিলিপাইন প্রেসিডেণ্ট যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে ফিলিপাইন আমেরিকার নিকট হইতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাইতে পারে এইরূপ ইঙ্গিত রহিয়াছে। ফিলিপাইন হইতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ১৮ই জুন ফরমোসায় উপনীত হন। উহার পূর্ব্বদিন এবং ঐদিন সকালে কম্যুনিষ্ট চীন কুয়ময় দ্বীপের উপর গুলীবর্ষণ করে। ১৮ই জুন তাইপেতে এক বিরাট জনসমাবেশে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "The United States does not recognize the claim of the war like & tyranical Communist regime in Peiping to speak for all Chinese people. In the United Nations we support the Republic China, a founding member as only rightful representative of China in that organisation." অর্থাৎ 'সমগ্র চীনা জনগণের হইয়া পেইপিংএ অবস্থিত জঙ্গী মনোবৃত্তি সম্পন্ন, স্বৈরতন্ত্রী কম্যুনিষ্ট সরকারের কোন কথা বলিবার দাবী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে উহার একজন 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চীন প্রজাতন্ত্রকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানে চীনের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে আমরা সমর্থন করি।' প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং চিয়াং কাইশেক যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাইশেকের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ঐ অঞ্চলে লালচীনের চ্যালেঞ্জের জবাব দিবে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ফরমোসা হইতে ওকিনাওয়া হইয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেন। ওকিনাওয়ায় তিনি অল্পক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলেন। রুইকিউ দ্বীপপুঞ্জে ওকিনাওয়া একটি মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি। এই দ্বীপপুঞ্জ এক সময়ে ছিল চীনের অধিকারে। ১৮৭৪ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে আসে। জাপানের সহিত ১৯৫১ সালে যে শান্তি চুক্তি হয় তাহাতে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে অর্পিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ওকিনাওয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিমান ঘাঁটি হইতে সহরে যাইবার পথের দুই ধারে দণ্ডায়মান জনতা, "ওকিনাওয়া এখনই জাপানকে ফিরাইয়া দাও," "হাইড্রোজেন বোমা লইয়া ভাগো" ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে। ওকিনাওয়ায় পৌঁছিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, এই অঞ্চলে যে অবস্থা তাহাতে রুইকিউদ্বীপপুঞ্জ ও উহার জনগণের স্বাধীন বিশ্বের জন্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবার আছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন। দক্ষিণ কোরিয়ায় ইহা লইয়া তিনি তিনবার গেলেন। দক্ষিণ কোরিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েকমাস পর তিনি প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ায় যান। দ্বিতীয়বার যান ১৯৫২ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। দক্ষিণ কোরিয়া হইতে তিনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই জুন মধ্যরাত্রির পর জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি আপনা হইতেই অনুমোদিত হয়। জাপ সমাজতন্ত্রী নেতারা এই অনুমোদনকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন না। মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রেও এই চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে। জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি বহাল হইলেও মিঃ কিশি চাপে পড়িয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিতে রাজী হইয়াছেন। কবে তিনি পদত্যাগ করিবেন তাহা অবশ্য স্থির হয় নাই। জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলিতেছে, সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। এই চুক্তি অনুযায়ী আরও ১১ বৎসর জাপানের ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিবার অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান বিক্ষোভের ফলে উহা কার্য্যকরী করা বড় সহজ হইবে না। এই চুক্তিকে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের পরাজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ বিমান ইউ-২-র ঘটনার পর যে-সকল দেশে মার্কিণ ঘাঁটি আছে সেই সকল দেশের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের মনে এই ধারণা সুদৃঢ় হইয়াছে যে, এই সকল ঘাঁটি রাশিয়াতে গোয়েন্দাগিরির জন্য গোপনে ব্যবহার করা হইতেছে। উহার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। ইহার জন্য কম্যুনিষ্টদের উস্কানীদেবার কোন প্রয়োজন নাই। প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন যখন পণ্ড হইল সেই সময় জাপ পার্লামেণ্টে জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখে জবরদস্তিতে পাশ করাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত হয় নাই। প্রথমে স্থির করা হইয়াছিল যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মস্কো হইয়া টোকিওতে যাইবেন। কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণের জন্য তাঁহার আমন্ত্রণ যখন প্রত্যাহৃত হইল তখনও টোকিওতে যাওয়ার জন্য তাঁহার অভিপ্রায় অবিচলিতই রহিল। যে জাপ-মার্কিণ চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে সেই চুক্তি যেদিন অনুমোদিত হওয়ার কথা তাহার পরদিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের টোকিওতে পৌঁছিবার দিন ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া এই ভ্রমণ তাঁহাকে বাতিল করিতে হইল। ইহা যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে খুবই বিব্রতকর অবস্থা, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

নরওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্ক ও পাকিস্তানের ভিতর দিয়া ওকিনাওয়া ও জাপান পর্য্যন্ত মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির এক লহর রাশিয়ার চারিদিকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। পরমাণু বোমা যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ছিল, তখন এই সকল ঘাঁটি সার্থকতা আত্মরক্ষার দিক হইতে হয়ত ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সাল হইতে রাশিয়াও যখন পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইল তখন যে-সকল দেশে এই সকল ঘাঁটি অবস্থিত সেই সকল দেশ পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এইরূপ আক্রমণের সময়ে এই দেশগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এইজন্য এই সকল দেশ যদি ভারতের মত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহা হইলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না। রাশিয়া ও চীনের চারিদিকে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটির লহর কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করিতে পারিয়াছে কিনা কিম্বা পারিবে কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া কোন আলোচনা এখানে করিবার স্থান আমরা পাইব না। কিন্তু যে সকল দেশে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি অবস্থিত সেই সকল দেশের জনগণ যদি ভীত হয় এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সামরিক ঘাঁটিগুলির কোন সার্থকতাই থাকে না, সেই দেশের জনগণও গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বনাম কিউবা—

কিউবার সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে অর্থ নৈতিক বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ক্রমশঃই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। উহা লইয়া সশস্ত্র লড়াই বাধিয়া উঠিবে কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব না হইলেও কিউবা লইয়া রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইতিমধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গত ৯ই জুলাই (১৯৬০) ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সারা সোভিয়েট শিক্ষক কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিলে রকেট ব্যবহার করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজন হইলে সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী কিউবাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তিনি বলেন, "আমাদের দিক হইতে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সর্ব্বতো ভাবে সহায়তা করিব।" মঃ ক্রুশ্চেভের এই সতর্ক বাণীর জবাবে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার গত ১০ই জুলাই নিউ পোর্টে এক বিবৃতিতে বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম নিয়ন্ত্রিত কোন শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হইতে দিবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কিউবার পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াও তিনি বলিয়াছেন। কিউবা লইয়া রাশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সতর্কবাণী উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি তাহাই প্রথমে বিবেচনা করা আবশ্যক।

কিউবার কাস্ট্রো সরকারের সহিত রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। গত ফেব্রুয়ারী মাস কিউবার রাজধানী হাভানায় সোভিয়েট শিল্পের এক প্রদর্শনী হয় এবং রুশ সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ মিকোয়ান উহার উদ্বোধন করেন। ঐ সময় কিউবাকে শতকরা আড়াই ভাগ সুদে দশ কোটি ডলার সাহায্য দেওয়ার এবং চারি বৎসরে রাশিয়া কিউবার দশ লক্ষ টন চিনি ক্রয় করিবে, এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। ইহার পর পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিতও কিউবার বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে। ইহার পরে আসিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যে অর্থ নৈতিক বিরোধ সৃষ্টির ঘটনা। গত জুন মাসে রাশিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে অপরিশ্রুত তৈল ক্রয়ের এক চুক্তি কিউবা করিয়াছে। উহাই বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিরোধের মূল। কিউবায় যে সকল বিদেশী তৈল কোম্পানী আছে তাহারা রাশিয়ার অপরিশ্রুত তৈল ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই সকল কোম্পানী ভেনেজুয়েলা হইতে অপরিশ্রুত তৈল আমদানী করিয়া থাকে। রাশিয়ার অপরিশ্রুত তৈল হইতে এই তৈলের দাম অনেক বেশী। কাজেই কিউবার দিক হইতে রাশিয়ার তৈল ক্রয় করা লাভজনক। তা ছাড়া উহার জন্য ডলার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু রাশিয়ার তৈল ব্যবহৃত হইলে ভেনেজুয়েলা হইতে তৈলের আমদানী এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইবে। বিদেশী কোম্পানীগুলি

তাহাদের শোধনাগারে রাশিয়ার অপরিশ্রুত তৈল ব্যবহার করিতে অস্বীকার করায়, কিউবা সরকার মার্কিণ কোম্পানী টেক্সাকো ও এসো এবং বৃটিশ কোম্পানী শেল রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হুমকী দিয়াছে তাহারা কিউবার চিনি ক্রয় করিবে না, অন্ততঃ চিনি ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। কিউবায় যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার অর্দ্ধেকই ক্রয় করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিণ কিউবা অর্থ নৈতিক বিরোধের পরিণতি কি হইবে তাহা বলা কঠিন। শেল কিউবায় আর কারবার করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। টেক্সাকো কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহা যেন একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি। এই প্রসঙ্গে ইরাণের মোসাদ্দেক সরকার কর্ত্তৃক তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরিণতির কথা অবশ্যই মনে পড়িবে। মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজখাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনার কথাও উল্লেখযোগ্য। কিউবার অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে অনুমান করা অবশ্য সম্ভব নয়। কিউবাতে বিপুল পরিমাণে মার্কিণ মূলধন খাটিতেছে। মার্কিণ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত বিরোধের পরিণামে গুয়াতেমালার কি পরিণতি হইয়াছে তাহা আমরা জানি। বৃটিশ গিয়ানাকে কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া সেখানে জাহাজ বোঝাই সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিউবায়ও কম্যুনিষ্ট প্রাধান্যের কথা উঠিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে বলিয়া গত ১১ই জুলাই (১৯৬০) কিউবা নিরাপত্তা পরিষদ অভিযোগ করিয়াছে এবং সে-সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ করিয়াছে। এই অভিযোগ গুয়াতেমালার অভিযোগের পরিণামের কথাই স্মরণ করাইয়া দিবে।

আলজেরিয়া সমস্যায় অচল অবস্থা—

ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্য গল গত ১৪ই জুন (১৯৬০) তাঁহার বিবৃতিতে যখন আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাঁহার এই প্রস্তাব অনুযায়ী টিউনিশস্থিত আলজেরিয়ার বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিবার প্রাথমিক পর্য্যায় হিসাবে দুইজন প্রতিনিধিকে ফ্রান্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন সত্যই একটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, আলজেরিয়ার বিপুল রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের অবসান বোধহয় আসন্ন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের আলাপ-আলোচনার সর্ত্ত ছিল আগে বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। গত ১৪ই জুনের বিবৃতিতে এইরূপ কোন সর্ত্ত আরোপ করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই আলোচনাদ্বারা ফরাসী সরকার অন্ততঃ পরোক্ষে টিউনিশস্থিত আলজেরিয়া সরকারকে স্বীকার করিয়াছেন। আলজেরিয়াস্থিত-ফরাসী ঔপনিবেশিকদিগকে আয়ত্তে আনিবার পর এইরূপ প্রস্তাব করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় গত ৮ই মে (১৯৬০) প্রেসিডেণ্ট দ্য গল এ-সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ। অনেকে মনে করেন, চীন সরকার আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকার করায় এবং এই সরকারকে চীনের সাহায্যদান বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রেসিডেণ্ট দ্যগল আর বিলম্ব না করিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। একটি অসমর্থিত সংবাদ প্রকাশ বিদ্রোহী সরকারের তিনজন মন্ত্রী সম্প্রতি চীনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা চীন হইতে মস্কো হইয়া টিউনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। চীন সরকার নাকি বিদ্রোহী-দিগকে আত্মসমর্পণ না করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আরও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

আলজেরিয়ার বিদ্রোহী সরকারের পক্ষ হইতে যে দুইজন প্রতিনিধি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ফরাসী সরকার কোনরকম আলোচনায় সম্মত হন নাই। যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নির্দ্দেশ জারিল করিবার জন্যই শুধু তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে। বিদ্রোহী সরকারের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বলা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় প্যারিতে আর প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। বিদ্রোহী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফিরহাত আব্বাস তাঁহার পক্ষে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া যদি নিজে যাইতেন তাহা হইলে প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত এবং মীমাংসার পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত, এইরূপ মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪৬ সালে হো চি মিন নিজে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন এবং ফন্তেন্ব্লোতে তাঁহার সহিত ফরাসী সরকারের আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ইহার পরেই ইন্দোচীনে আরম্ভ হয় দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রপতি—

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২০শে জুন (১৯৬০) রাশিয়া ভ্রমণের জন্য বিমানযোগে যাত্রা করেন এবং রাশিয়া পরিদর্শনের পর গত ৫ই জুলাই নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত জানুয়ারী মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, এ কথা এই উপলক্ষে স্বতঃই মনে পড়িবে। মঃ ভরোশিলভ-ই তাঁহাকে রাশিয়া পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। মঃ ক্রুশ্চেভও পুনরায় আমন্ত্রণ করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র পরিদর্শনের জন্যও তিনি আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথমেই রাশিয়ায় গেলেন কেন, এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে। রাশিয়ার নিকট হইতে ভারত ৩১৩ কোটি টাকা সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইয়াছে ১৬৬৬ কোটি টাকা সাহায্য। খাদ্যশস্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত কর্ম্মসূচীর জন্য ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে। কিন্তু রাশিয়ার সাহায্য ভারতে ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথমে রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন, একথা ঠিক নয়। ইউ-২ বিমান সংক্রান্ত ঘটনা এবং শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হওয়ার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার রাশিয়া ভ্রমণের কর্ম্মসূচী স্থির হইয়াছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাশিয়া ভ্রমণটা শুধু শিষ্টাচার রক্ষার জন্য

তাহা বলা যায় না। ইহার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তিনি বামপন্থী অর্থনীতিতে বিশ্বাসী নহেন; কিন্তু রাশিয়ার সীমান্ত ভারতের সীমান্তে আসিয়া মিশিয়াছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা বর্ত্তমানে মধুর একথা বলা যায় না। কিন্তু রাশিয়ার সহিত মৈত্রীরক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও ভারত উপেক্ষা করিতে পারে না। শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে ভারত তাহাতেও সুখী হইতে পারে নাই। ভারত কি রাশিয়ার কি আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রভাব বিস্তারের দুরাশা রাখে না। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাশিয়া ভ্রমণ যদি আন্তর্জাতিক দুর্য্যোগকে প্রশমিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের পররাষ্ট্র নীতিরই জয় সূচিত হইবে।

আফ্রিকায় স্বাধীনতার অগ্রগতি—

১১শে জুন হইতে ১লা জুলাইয়ের মধ্যে আফ্রিকার আরও চারিটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। ফরাসী উপনিবেশ সেনেগল এবং ফরাসী সুদান ১১শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ সম্মিলিত হইয়া মালিযুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে মালিযুক্তরাষ্ট্রই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র। ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা, গিনি, ক্যামেরুণ এবং টোগোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড গত ২৫শে জুন বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। গত ২৬শে জুন মাডাগাস্কার দ্বীপ মালাগাসি নাম গ্রহণ করিয়া ফরাসী কমিউনিটির মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বেলজিয়াম শাসিত কঙ্গো রাজ্য ৩০শে জুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১লা জুলাই ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিল। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এবং ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ফরাসী কমিউনিটির মধ্যেই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নাইজেরিয়া আগামী অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বেলজিয়াম কঙ্গোর প্রধান সহর লিওপোল্ডভিল অন্যান্য সহরে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল। উহার মধ্যে প্রকাশিত হয় কঙ্গোর অধিবাসীদের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কঙ্গোলিজ ন্যাশনাল মুভমেণ্টের নেতা মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং আবাকো দলের নেতা কাসাভুবু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন রাষ্ট্রপতি। নূতন কঙ্গো প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা লাভের দশ দিন পরেই উহার আফ্রিকাবাসী সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিয়া বেলজিয়াম অধিবাসীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। উহার পরিণতি কি ভাবে হইবে তাহা এই মন্তব্য লেখার সময় পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে না।

চীন-নেপাল সীমান্তে

সম্প্রতি চীন-নেপাল সীমান্তে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে গত অক্টোবর মাসে ভারত-চীন সীমান্তের লাডাক অঞ্চলের ঘটনাই স্মরণ করাইয়া দিবে। চীন-নেপাল সীমান্তের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদে প্রকাশ যে, সীমান্ত হইতে কিছু দূরে মুস্তাংয়ের বিপরীত দিকে চীনারা ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিতেছে সংবাদ পাইয়া একটি নেপালী পর্য্যবেক্ষক দল ঐ দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চীনা সৈন্যরা সীমান্তের মুস্তাং নামক স্থানে প্রবেশ করিয়া উক্ত পর্য্যবেক্ষক দলের উপর গুলী চালায়। উক্ত ঘটনায় একজন সুবেদার নিহত এবং ১৭ জন নেপালী চীনা সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। এই ঘটনার একদিন পূর্ব্বে চীনা সরকার নেপাল সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, চীনা সৈন্যরা তিব্বতী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য নেপাল তিব্বত সীমান্তের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ঢুকিয়াছে। বিদ্রোহীরা দমিত হইলেই তাহারা চলিয়া যাইবে, কিন্তু নেপালের সীমানার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে না। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৈরলা উল্লিখিত মুস্তাংয়ের ঘটনা সম্পর্কে চীন সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানান। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই উহার উত্তর দিতে বিলম্ব করেন নাই। উত্তরে তিনি জানান এই দুর্ঘটনার সংবাদে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। উক্ত সংবাদ সত্য হইলে চীন সরকার গভীর দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং নেপালীরা বন্দী হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি জানান।

অতঃপর চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই নেপালের প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র দেন তাহা তিনি ৩রা জুলাই প্রাপ্ত হন। ঐ পত্রে তিনি মুস্তাং অঞ্চলের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া উহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, কয়েকজন নিম্নপদস্থ চীনা সৈন্য উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী। তাহারা নেপালী পর্য্যবেক্ষক দলকে তিব্বতী বিদ্রোহী বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, এই ঘটনার পর চীনা সৈন্যদিগকে ১০ কিলোমিটার পিছনে সরাইয়া আনা হইবে। নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ, ধৃত নেপালীদিগকে এবং ঘোড়াগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৈরালা ৪ঠা জুলাই তারিখে বলিয়াছেন যে, চীনের প্রধান মন্ত্রী যে-ভাবে নেপালের সকল দাবী মানিয়া লইয়াছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে যে মতভেদ রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নেপাল সরকার বলেন ধৃত নেপালীর সংখ্যা ১৭ জন। কিন্তু চীন সরকার ১০ জনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ মিঃ চৌ-এন-লাই বলেন, ঘটনার স্থানটি চীনের সীমানার অন্তর্গত। নেপাল সরকারের মতে ঐ স্থান নেপালের অন্তর্গত। নেপাল সরকার বলিতেছেন, নেপালী পর্য্যবেক্ষকরা নিরস্ত্র ছিল। কিন্তু চীন সরকার এ সম্পর্কে নীরব। চীন সরকার অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিয়াছেন এবং নিহত ব্যক্তির জন্য সমবেদনাই জানাইয়াছেন। মিঃ চৌ-এন-লাই এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চীন ও নেপালের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন ক্ষুণ্ণ হইবে না। —১৩ই জুলাই, ১৯৬০।
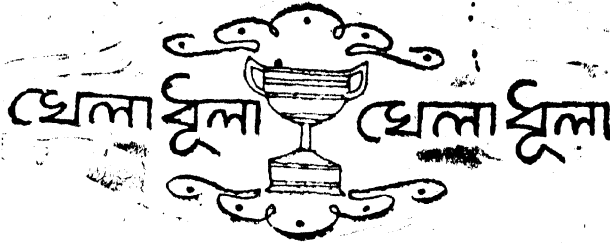
ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বাতিল

ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবারকার প্রতিযোগিতায় কয়েকজন প্রতিযোগী যোগদানের জন্য লণ্ডনে হাজির হয়েছেন। ১৫ই আগষ্ট এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। সম্প্রতি বিলি বাটলিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এবারকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে না। এইরূপ ঘোষণায় ভারত তথা বিশ্বের সাঁতারু যে বিশেষ নিরুৎসাহ হবেন তা বলাই বাহুল্য।

১৯৫৩ সাল থেকে বিলি বাটলিনের উদ্যোগে প্রতি বছর ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। বিলি বাটলিন এবারকার প্রতিযোগিতা বাতিল করা সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীরা আরও নানা কাজে ব্যস্ত থাকবেন বলে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

পূর্ব্বে স্থির ছিল যে এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য যাঁরা আবেদন করেছেন—তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভাবে শীঘ্রই অনুমোদন করা হবে। কিন্তু নাম অনুমোদনের দিনই প্রতিযোগিতা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় প্রতিযোগীদের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবারকার প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকেই এরই মধ্যে ফোকষ্টোন ও ডোভারে এসে অনুশীলন আরম্ভ করেছেন। একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে এই প্রতিযোগিতা বাতিল হওয়া সত্যই দুঃখের বিষয়। বহু অর্থ ব্যয় করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল সাঁতারুরা লণ্ডনে উপস্থিত হয়েছেন—বিলি বাটলিন কি তাঁদের ক্ষতিপূরণ করবেন? বিফল হয়ে কয়েকজন সাঁতারু নিজের চেষ্টায় চ্যানেল অতিক্রম করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল হউক—এটাই সকলে আশা করেন।

অলিম্পিক প্রতিনিধিসংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব

সম্প্রতি দিল্লীতে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের এক সভা হয়ে গেছে। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যা হ্রাস করে ভারত সরকারকে সুপারিশ করা হবে।

ক্রীড়া পরিষদের মতে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদানে অথবা বিদেশ সফরে ভারতীয় প্রতিনিধিদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবে এবং ইহা ক্রীড়া মানোন্নয়নের অন্যতম উপায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই [illegible]

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের যোগ্যতার যে ন্যূনতম মান নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন—সেই মানে যাঁরা পৌঁছিতে অসমর্থ হয়েছেন—তাঁদের বহু অর্থ ব্যয় করে রোমে পাঠানো সমীচীন হবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন মেলবোর্ণ অলিম্পিকের ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর ক্রীড়ামানের উপর ভিত্তি করে রোম অলিম্পিকের ভারতীয় প্রতিনিধিদের মান নির্দ্দিষ্ট করে। ক্রীড়া পরিষদ মনে করে মেলবোর্ণের ষষ্ঠ স্থানাধিকারীরা রোম অলিম্পিকে দশম স্থানের উর্দ্ধে উঠতে পারবেন না। কারণ বিগত চার বছরে এথেলেটিক ও অন্যান্য ক্রীড়ার আন্তর্জাতিক মান অনেক উঁচুতে উঠেছে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধাও এই বিষয়ে আছে। নির্দ্দিষ্ট মানে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদের রোমে পাঠাইয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করান যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহাতে ভারতীয় ক্রীড়ারও বিশেষ লাভ হবে না।

ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ কার্য্যকরী হলে ভারতীয় অলিম্পিক দলে পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কেহ কেহ শেষ পর্য্যন্ত বাদ পড়বেন। এই অবস্থায় মহিলা এথলীটদের, সাঁতারুদের, রাইফেল সুটার ও ভারোত্তোলকদের অলিম্পিক দল থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা আছে। মুষ্টিযোদ্ধা, মল্লবীর ও জিমনাষ্টদেরও যাওয়ার ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

ভারত সরকার অলিম্পিক দলের জন্য দেড় লক্ষ টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করতে সম্মত নন। সেইজন্য ভারতীয় দলের কর্ম্মকর্ত্তার সংখ্যাও কমাতে হবে। ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন দলগুলির প্রতিনিধিদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :—

এথেলেটিকস—১৩ জন এথলীট (পুরুষ), একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

হকি—১৮ জন খেলোয়াড়। একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

ফুটবল—১৮ জন খেলোয়াড়, একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

মল্লযুদ্ধ—৫ জন মল্লযোদ্ধা। একজন ম্যানেজার ও একজন শিক্ষক।

রাইফেল স্যুটিং—২ জন প্রতিযোগী ও একজন ম্যানেজার।

একজন চীফ-ডি-মিশন, একজন প্রথম শ্রেণীর হকি আম্পায়ার, ২ জন ম্যাসাজিষ্ট ও ২ জন পাচক।

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের নিশ্চয়ই নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশ মনঃপুত হবে না এবং তাঁরা প্রতিবাদও করবেন। তবে ক্রীড়া পরিষদের সুপারিশকে ক্রীড়ামোদীরা স্বাগত

অলিম্পিক রাইফেল শুটিং-এর বিচারক পদে প্রথম ভারতীয়

দক্ষিণ কলিকাতা রাইফেল ক্লাবের অন্যতম পরিচালক শ্রীপরিতোষ গাঙ্গুলী আন্তর্জ্জাতিক শুটিং ইউনিয়ন কর্তৃক রোম অলিম্পিকে রাইফেল শুটিংএর বিচারকরূপে কাজ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনি এই সম্মান লাভ করেছেন। রোম অলিম্পিকে পোল্যাণ্ডের মিঃ লুকাসিকের সহিত একাধ মিটার রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতা বিচারের ভার পড়েছে শ্রীগাঙ্গুলীর ওপর। এশীর ক্রীড়াবিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই অলিম্পিক শুটিং প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বেকারী পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। শ্রীগাঙ্গুলীর এই সম্মানে ভারতবাসী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করবেন।

ইংলণ্ডের "রাবার" লাভ

ইংলণ্ড ক্রিকেট দল তৃতীয় টেষ্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম ইনিংসে শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্য্যয় দেখা যায়। তবে "ফলো-অন" করে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করে। যার ফলে ইংলণ্ড দলের পক্ষে ইনিংসে জয়লাভ সম্ভবপর হয়নি।

রাণসংখ্যা :—ইংলণ্ড ১ম ইনিংস ২৮৭ (কাউড্রে ৬৭, ব্যারিংটন ৮০ ; বার্ডডা ৮০ রাণে ৫ উইঃ ও টেফিল্ড ৫৮ রাণে ৩ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১ম ইনিংস ৮৮ (স্মিথ ৩১ ; টম্যান ২৭ রাণে ৫ উইঃ ও ষ্টেথাম ২৭ রাণে ৩ উইঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২য় ইনিংস ২৪৭ (ম্যাকগ্লু ৪৫, এস, জে, ওলিন ১৮ ; মস ৩৬ রাণে ৩ উইঃ ও টম্যান ৭৭ রাণে ৪ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২ উইঃ ৪৭

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি

বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি হয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে নীল ফ্রেজার তাঁর দেশীয় খেলোয়াড় রড লেভারকে পরাজিত করেন। ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথ কৃষ্ণাণ নীল ফ্রেজারের নিকট পরাজিত হয়েছেন। ব্রেজিলের মারিয়া বুয়েনো মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়লাভ করে দ্বিমুকুট লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। অল্পের জন্য তিনি ত্রিমুকুট লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। ভারতের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জ্জী বালকদের সিঙ্গলস ফাইন্যালে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাণ্ডেলষ্ট্যামের নিকট পরাজয় বরণ করেন। নিম্নে সকল বিভাগের ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হ'লো :—

পুরুষদের সিঙ্গলস—নীল ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৩-৬, ৯-৭ ও ৭-৫ সেটে রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—মারিয়া বুয়েনো (ব্রেজিল) ৮-৬ ও ৬-০ সেটে মিস রেনল্ডসকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—আর এইচ ওসুনা (মেকসিকো) ও আর ডি. র‍্যালষ্টন (যুক্তরাষ্ট্র) ৭-৫, ৬-৩ ও ১০-৮ সেটে ডেভিস ও আর কে উইলসনকে (ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—মারিয়া বুয়েনো (ব্রেজিল) ও মিস ডি, আর হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র) ৬-৪ ও ৬-০ সেটে মিস এস রেনল্ডস ও মিস আর সুমানকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—রড লেভার (অষ্ট্রেলিয়া) ও ডার্লিন হার্ড (যুক্তরাষ্ট্র) ও ১৩-১১, ৩-৬ ও ৮-৬ সেটে মারিয়া বুয়েনো (ব্রেজিল) ও রব হোকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস—এ, আর ম্যাণ্ডেলষ্ট্যাম (দক্ষিণ আফ্রিকা) ১-৬, ৮-৬ ও ৬-৪ সেটে জয়দীপ মুখার্জ্জীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস—কে, হাণ্টজ (যুক্তরাষ্ট্র) ৬-৪ ও ৬-৪ সেটে এল, এম, হাটচিংকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) পরাজিত করেন।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের পরিচালনায় আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৪ই আগষ্ট থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ফেডারেশনের পরিচালকমণ্ডলী প্রতিটি জেলার তরুণ উদীয়মান ফুটবল খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়ার এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্ত্তমানে বাঁকুড়াতে খ্যাতনামা প্রবীণ খেলোয়াড় শ্রীএস, মিত্রের (ল্যাংচা) তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষণকার্য্য চলছে। ২৫শে জুলাই বাঁকুড়ার শিক্ষা-শিবির শেষ হবে। নিম্নে শিক্ষা-শিবিরের চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হলো :—

বহরমপুর—২৬শে জুলাই থেকে ৯ই আগষ্ট।
বর্দ্ধমান—১০ই আগষ্ট থেকে ২৪শে আগষ্ট।
চন্দননগর—২৫শে আগষ্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর।
সিউড়ী—৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৩শে সেপ্টেম্বর।
জলপাইগুড়ি—১লা অক্টোবর থেকে ১৫ই অক্টোবর।
মালদহ—১৭ই অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর।
বালুরঘাট—১লা নভেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বর।
২৪ পরগণা—১৭ই নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর।
চুঁচুড়া—১লা ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর।

পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টা সফল করার জন্য সকলের সাহায্য করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

যাঁহারা যাত্রাকে থিয়েটারের সহিত প্রভেদ করেন—তাঁহাদের বোধহয় অজানিত সেক্সপীয়ার বেন জনসন প্রভৃতি মহাকবির নাটক সকল প্রথমে এই যাত্রার ন্যায়ই অভিনীত হইত কবির বর্ণনায় রম্য, উপবন, সাগর,

আষাঢ়, ১৩৬৭ (জুন-জুলাই, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৫ই জুন) : হাওড়ায় উদ্বাস্তুদল কর্তৃক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস ঘেরাও—উদ্বাস্তু শিবিরে ক্যাশ ডোল বন্ধের জের।

২রা আষাঢ় (১৬ই জুন) : দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্য পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন) : পশ্চিমবঙ্গ পৌরকর্ম্মীদের প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার—পশ্চিমবঙ্গ পৌরসমিতি ও কর্ম্মচারী ফেডারেশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৪ঠা আষাঢ় (১৮ই জুন) : পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও উড়িষ্যার সরবরাহ সচিব শ্রীনীলমণি রাউতের বৈঠক।

৫ই আষাঢ় (১৯শে জুন) : পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে দিল্লীতে আকালী দলের দ্বিতীয় মোর্চ্চা আরম্ভ—বিভিন্ন স্থানে আকালী কর্ম্মী ও সদস্যদের গ্রেপ্তার বরণ।

৬ই আষাঢ় (২০শে জুন) : রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মস্কো সফরকালীন অনুপস্থিতির জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শপথ গ্রহণ।

৭ই আষাঢ় (২১শে জুন) : তিন দিবসব্যাপী কাশ্মীর সফরকালে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ভি, কে, কৃষ্ণমেনন কর্তৃক লাডাক সীমান্ত পরিদর্শন।

৮ই আষাঢ় (২২শে জুন) : ১৯৬০-৬১ সালের সেশন হইতে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী গৃহীত।

৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন) : অসমীয়াকে আসামের সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত—বিধান সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে বিল পেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার বিবৃতি।

১০ই আষাঢ় (২৪শে জুন) : বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে আসন্ন ১১ই জুলাই হইতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের প্রকাশ্য আহ্বান।

১১ই আষাঢ় (২৫শে জুন) : বিশিষ্ট কবি শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তের (৫৯) কলিকাতায় রাসেল ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে জীবনাবসান।

তিনসুকিয়া হইতে মরিয়াণী পর্য্যন্ত রেল সার্ভিস সম্পূর্ণ বন্ধ, রেলওয়ে রেলভ্যানের অ-অসমীয়া আরোহীদের উপর মারপিট।

১২ই আষাঢ় (২৬শে জুন) : রাজারহাট থানা এলাকায় বাগজোলায় জনতা, উদ্বাস্তু ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ—৪জন নিহত ও ২৫জন আহত : পুলিশের গুলীবর্ষণ ও সমগ্র অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী।

১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন) : "বর্ত্তমানে হিমালয় অঞ্চলবাসীদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে"—নৈনিতালের জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের দাবী।

১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন) : সারা আসামে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের পৈশাচিক রূপ—পথে ঘাটে বাঙ্গালী হত্যা : মেয়েদের নির্ব্বিচারে শ্লীলতা হানি।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার আশু রূপায়ণ প্রয়োজন—পশ্চিমবঙ্গ বন্যা তদন্ত কমিটির দৃঢ় অভিমত।

১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন) : ফরিদাবাদে (পাঞ্জাব) উদ্বাস্তু জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—৪ ব্যক্তি নিহত ও ১৫জন আহত।

১৬ই আষাঢ় (৩০শে জুন) : গৌহাটি সহরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারী—'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনে ক্ষিপ্ত অসমীয়াদের হাতে ১৬ জন আহত।

১৭ই আষাঢ় (১লা জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতকরা প্রায় ৯৯ জন কর্মচারীর বেতন ধর্মঘট—নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাসপেণ্ড করার প্রতিবাদ।

১৮ই আষাঢ় (২রা জুলাই) : কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আসন্ন ধর্মঘট (১১ই জুলাই) প্রসঙ্গে দিল্লীতে শ্রমসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের সহিত কর্মচারী যুক্ত-সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের মীমাংসা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

১৯শে আষাঢ় (৩রা জুলাই) : বাংলাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা করিতে হইবে—শিলচরে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা সম্মেলনের সুস্পষ্ট দাবী।

২০শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই) : গৌহাটিতে উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১ জন ছাত্র নিহত ও ৭ ব্যক্তি আহত।

রাওয়ালপিণ্ডির অদূরে ট্রেণ দুর্ঘটনায় ১৩ জন যাত্রী নিহত ও ৩৪ জন আহত হওয়ার সংবাদ।

২১শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) : তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দশ হাজার দুই শত কোটি টাকা বিনিয়োগ—পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ।

গৌহাটিতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব—ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে সন্ত্রাস ও হাঙ্গামা।

২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) : শিলং ও সহরতলী অঞ্চলে সারা রাত্রিব্যাপী কারফিউ—অপরাহ্ণ হইতে সহরব্যাপী সৈন্যবাহিনীর টহল সুরু।

২৩শে আষাঢ় (৭ই জুলাই) : সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক—জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত বেতার ভাষণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

আসাম রাজ্যের নানাস্থানে বাঙ্গালীদের উপর আসামীদের

পৈশাচিক তাণ্ডব—খুন, জখম ও গৃহদাহ এবং বাঙালী নারী নিপীড়ন অব্যাহত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে চৌরঙ্গীর (কলিকাতা) নাম পরিবর্তনের ব্যবস্থা—কলিকাতা কর্পোরেশনের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত।

২৪শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষিত—রাষ্ট্রপতি (ভারত) কর্তৃক নূতন অর্ডিন্যান্স জারী।

২৫শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): ধর্মঘট প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে সারা ভারতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

২৬শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): কলিকাতায় জনসভায় আসামে বাঙালীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা—পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ।

২৭শে আষাঢ় (১১ই জুলাই): রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্স জারী সত্ত্বেও পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা ভারতে (কলিকাতা সমেত) কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট আরম্ভ—কর্ম্মচারী যুগ্ম সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ (শ্রীনাথ পাই ও এস্, এম্, যোশী সহ) গ্রেপ্তার।

২৮শে আষাঢ় (১২ই জুলাই): বর্দ্ধমান ও আমেদাবাদের ধর্ম্মঘটী জনতার (কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী) উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ: ডাক, তার, রেল প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত।

২৯শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই): সরকারী অর্ডিন্যান্স এবং ছাঁটাই ও সাসপেনসন-এর হুমকী সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীদের দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট অব্যাহত—ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র কর্ম্মচারীদের ব্যাপক ধরপাকড়।

৩০শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের সমর্থনে অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সর্ব্বাত্মক হরতাল।

৩১শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই): আসামের হাঙ্গামায় ২০ জন নিহত ও ২০ হাজার শরণার্থী—দাঙ্গাবিধ্বস্ত আসাম রাজ্য সফরান্তে দিল্লী ফিরিয়া কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডীর বিবৃতি।

৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট বিনা সর্ত্তে প্রত্যাহার—কর্ম্মচারী যুক্ত সংগ্রাম পরিষদের আকস্মিক সিদ্ধান্ত।

সারা বাংলায় ঐতিহাসিক সর্ব্বাত্মক হরতাল পালন—আসামীদের নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণার অভিব্যক্তি।

বহির্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৫ই জুন): জাপ পার্লামেন্ট ভবনের (টোকিও) সম্মুখে পুলিশ ও ছাত্রদলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ—৫ জন ছাত্র নিহত ও পাঁচ শত জন আহত।

২রা আষাঢ় (১৬ই জুন): জাপানে গণ-বিক্ষোভ ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নির্দ্ধারিত জাপান সফর বাতিল।

৩রা আষাঢ় (১৭ই জুন): মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের দূর প্রাচ্যে সফর উপলক্ষে কুয়েময় দ্বীপে কমুনিষ্ট চীনের গোলাবর্ষণ।

৬ই আষাঢ় (২০শে জুন): "বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানুষের অগ্রগতি চিরতরে লুপ্ত হইবে"—রাশিয়ায় ১৫ দিনব্যাপী সফর শেষে মস্কো-এ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঘোষণা।

৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন): জাপ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোবসুকে কিশির পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা—প্রবল জনমতের চাপে শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার।

১১ই আষাঢ় (২৫শে জুন): কমনওয়েলথ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার বহিষ্কার দাবী—আদ্দিসআবাবায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকান স্বাধীন রাজ্য সম্মেলনের সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব।

পাকিস্তানের ১১ জন নেতৃস্থানীয় উলেমার দাবী—জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপযোগী শাসনতন্ত্র চাই।

১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন): জেনেভায় প্রাচ্য-প্রতীচ্য দশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত—রুশিয়ার নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির আলোচনা বর্জ্জন।

১৪ই আষাঢ় (২৮শে জুন): কম্যুনিষ্ট দেশগুলি কর্তৃক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি সমর্থন—বুখারেষ্ট সম্মেলনে যোগদানকারী প্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির (রুশিয়া ও গণচীন সহ) প্রতিনিধিদের যৌথ ইস্তাহার।

১৫ই আষাঢ় (২৯শে জুন): চীন-নেপাল সীমান্তবর্তী মুস্তাং এলাকায় চীনা বাহিনীর আক্রমণে নেপালী সীমান্তরক্ষী নিহত—১৭জন অসামরিক কর্ম্মচারী নিখোঁজ।

বেলজিয়ান শাসনাধীন কঙ্গোর স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৭ই আষাঢ় (১লা জুলাই): মুস্তাং এলাকায় চীনা হামলার বিরুদ্ধে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইএর নিকট নেপালী প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি, পি, কৈরালার প্রতিবাদ।

১৮ই আষাঢ় (২রা জুলাই): সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে বৃটেন ও সাইপ্রাস প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত।

২২শে আষাঢ় (৬ই জুলাই): শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে কঙ্গোতে আফ্রিকান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ—কয়েকটি শিবির দখল।

২৫শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের প্রতিশ্রুতি।

২৬শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): "কিউবায় আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম নিয়ন্ত্রিত শাসন বরদাস্ত করিব না"—মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সদম্ভ উক্তি।

২৭শে আষাঢ় (১১ই জুলাই): রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কিউবার অভিযোগ—আমেরিকা কিউবার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও আক্রমণাত্মক কার্য্য চালাইয়াছে।

৩০শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই): টোকিও-এ জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নোবসুকে কিশি ছুরিকাহত—আক্রমণকারী গ্রেপ্তার।

অবিলম্বে কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্যাপসারণের দাবী—বেলজিয়ামের প্রতি রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ।

৩১শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই): কঙ্গো প্রজাতন্ত্রকে সাহায্যদানে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের প্রতিশ্রুতিদান।

বেলজিয়ামের সহিত কঙ্গোর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ—কঙ্গো প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুমুম্বার ঘোষণা।

৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই): নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে উপস্থিতি।

অভিনয়ে রীতিবাদ

অভিনয় হচ্ছে একটি বিশেষ শিল্প। শুধু শিল্প বললে মনে হয় পুরোটা বলা হল না, সূক্ষ্মতর বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয়। উপলব্ধি এবং অনুভূতিকে কেন্দ্র করে এই সূক্ষ্মতর শিল্পটি গড়ে উঠেছে। মূলতঃ এই শিল্প রসাশ্রয়ী। একটি আধারের মধ্যে আর একটি চরিত্র ফুটে উঠবে—"আর একটি" কেন—অসংখ্য চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠবে একের মাধ্যমে, বিভিন্নধর্মী একেকটি চরিত্র—একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে আবেগধর্মিতা অন্যতম অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু একমাত্র অঙ্গ নয়। অভিনয় জিনিষটি শৃঙ্খলাবিহীনদের জন্যে নয়, চরিত্ররূপায়ণটাই হচ্ছে অভিনয়ের মূলকথা, অভিনয়ে সার্থকতা অর্জনের একটি নির্দিষ্ট রীতি আছে, এ কথা কোনক্রমেই ভুললে চলবে না যে, সেই রীতি অনুসরণ করলে তবেই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছনো যাবে, নচেৎ পথভ্রষ্ট হওয়া অথবা ভুল পথে চালিত হওয়া যেমনই স্বাভাবিক, তেমনই অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে খেয়ালখুসী মাফিক উল্টোপাল্টা পথে যেতে আপনি নিশ্চয়ই পারেন, আপনার সে স্বাধীনতায় বাধা দেবার কেউ নেই; তবে তা হলে অভীষ্টে পৌঁছনো আপনার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। রীতি সম্পর্কে আর একটু বিশদ হওয়া প্রয়োজন,—কিসের রীতি? আগেই বলা হয়েছে চরিত্ররূপায়ণই হচ্ছে অভিনয়ের মূলকথা আর অভিনয়শিল্প গড়েই উঠেছে উপলব্ধি আর অনুভূতিকে কেন্দ্র করে, একটি চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন অর্থাৎ আপনি নিজের মধ্যে দিয়ে সেই চরিত্রটিকে ফোটাতে চলেছেন আপনার নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে এবং অনুভূতি দিয়ে চরিত্রটির স্বরূপ আপনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তারই সাহায্যে আপনি চরিত্রটিকে ফোটাতে ব্রতী হয়েছেন, এই যে আপনার অন্তরের অনুভূতি—অভিনয় হচ্ছে তারই তো বহিঃপ্রকাশ। সেই অনুভূতিটিই তো আপনার অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে রূপ নেবে তা হলেই এখানে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে—অন্তরের এই রীতি হচ্ছে সেই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের রীতি—একটি নির্দিষ্ট প্রণালী যাকে অনুসরণ করাই এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিধেয়।

এই রীতি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানার আছে। আছে [illegible] অনেক কাহিনী।

এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী বলতে আমাদের মনে পড়েছে লি ষ্ট্র্যাসবার্গের নাম। পৃথিবীর অভিনয়-রীতি-বিশেষজ্ঞদের যিনি অন্যতম এবং এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের যিনি একজন সুযোগ্য অধিকারী। এই রীতির প্রচার এবং প্রসার করে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, প্রায় প্রতিটি মানুষকে তিনি বুঝিয়েছেন কেন এই রীতি গ্রহণীয়, এর পিছনে কি যুক্তি বিদ্যমান, কোথায় এর সার্থকতা। বলতে গেলে রীতি সম্পর্কে জনগণ এতখানি যে সচেতন হয়ে উঠছে, আমাদের মনে হয় তার পিছনে রয়েছে ষ্ট্র্যাসবার্গের অচিন্তনীয় অবদান। অভিনয়ের রীতি সম্পর্কে পৃথিবীর মধ্যে (যতদূর আমরা জানতে পারি) প্রথম সজাগ হয়ে উঠল রাশিয়া অর্থাৎ ইয়োরোপ, ইয়োরোপ খণ্ডই বোধ হয় প্রথম বুঝতে পারল যে, অভিনয়ে সফলতার পথ এলোমেলো আঁকাবাঁকা নয়, একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাযুক্ত পথ, ষ্টানিস্লাভস্কিই এই তত্ত্বের জনক। এঁর কল্যাণেই এই সম্পর্কে অবহিত হ'লে সারা ইয়োরোপ, তারপর ইয়োরোপ থেকে সারা দুনিয়া। তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করি আমাদের নমস্কার।

তবে এ কথাও মিথ্যে নয় যে সারা দুনিয়ায় এই রীতিবাদের প্রচার বা প্রসার নির্বিবাদে সম্পন্ন হয় নি, কোন কোন দেশ নির্বিবাদে এই রীতিবাদকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছে, কেউ কেউ তার উদ্দেশে প্রদর্শন করেছে রাশি রাশি অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। রীতি সম্পর্কে ষ্ট্যানিস্লাভস্কি খুঁটিনাটি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, অনেক কলা কৌশলের করেছেন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি করেছেন আলোকপাত। অভিনয় জিনিষটির প্রচলন হাল আমলের নয়, এই শিল্পটির বয়েস বড় কম হল না, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য সুকুমার শিল্পগুলির মতই অভিনয়ের আবির্ভাবও সেই স্মরণাতীত যুগে। সেই থেকে বর্ত্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য শক্তিমান অভিনয়শিল্পীর, দল এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কৃতিত্ব ছিল এবং এঁরা প্রত্যেকেই অভিনয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে কিছু না কিছু আবিষ্কার করে গেছেন কিন্তু সে রীতি বা সে আবিষ্কারের ফল থেকে উত্তর-সূরীরা বা পরবর্ত্তী দর্শকসমাজ বঞ্চিত, কারণ সে সব সম্পর্কে তাঁরা কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখে যান নি ভবিষ্যতের জন্যে। তাঁদের নীতি বা আবিষ্কারের রসাস্বাদন করেছে সমকালীন দর্শক সমাজ, তাঁদের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের রীতি ও আবিষ্কারের সৌরভও মিলিয়ে গেছে—ভেবে দেখুন যদি বিপরীত ঘটনাটি ঘটত তাহলে আজ আমরা কত উপকৃত হতে পারতুম, ষ্ট্যানিস্লাভস্কি সে ভুল করেন নি, তাঁর যা কিছু ধ্যানধারণা—তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অভিনয়ের মহড়া দেওয়ার রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁর রচিত বহুমূল্য পাঠ্যপুস্তক তাঁর অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় বহন করেছে।

ষ্ট্যানিস্লাভস্কি মঞ্চাভিনয়ে স্বাভাবিকতার দ্বারা চরিত্রের সত্যটিকে ফুটিয়ে তোলার দিকে যত্নবান। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে একটি সত্য আত্মগোপন করে আছে, তার সম্যক প্রস্ফুটন স্বাভাবিকতার দ্বারাই সম্ভবপর. তিনি দেখেছেন অনেক ক্ষেত্রে এই সত্যের যথাযথ বিকাশ ঘটে না, অভিনয়ের মধ্যে জড়তা আর কৃত্রিমতাই ফুটে ওঠে, এজন্যে ইনি শুধুমাত্র শিল্পীকেই দোষ দেন না, তাঁর মতে এ জন্যে আংশিকভাবে পরিচালকও দায়ী, কারণ উভয়ের মধ্যে গুরুত্ববোধের অভাবের জন্যেই এবম্বিধ জিনিষ ঘটে থাকে। উভয়েই চান

অল্প আয়াসে এবং ফাঁকি মেরে কার্যোদ্ধার করতে। একটি বক্সার (Boxer) নিজেকে গড়ে তোলার জন্তে যে পরিমাণ পরিশ্রম করেন, অভিনেতাকেও সমপরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে। অভিনেতা এখানে যোদ্ধার সঙ্গে তুলনীয়। বক্সারের সঙ্গেও এখানে তার তুলনা চলে। অভিনেতাকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে তুমুল যুদ্ধ করতে হচ্ছে। রীতিমত লড়তে হচ্ছে, প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ সে করে চলেছে মঞ্চের উপর, আর একটু বিশদ হই—আপনি যে চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন—আপনার নিজের চরিত্রটি যাতে সেই চরিত্রকে ছাপিয়ে না যায় বা আপনার অভিনয়ে চরিত্রটি চাপা পড়ে সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের চরিত্রটি যাতে না বিকশিত হয় এ বিষয়ে আপনাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে, আপনার চরিত্রটি কেবলই আপনার অভিনেয় চরিত্রকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে—আর আপনার শিল্পীসত্বা ক্রমাগত তাকে প্রতিরোধ করে চলেছে—এও তো যুদ্ধ। অভিনেতাকে প্রচুর শ্রম করতে হবে শারীরিক, মানসিক দুদিক দিয়েই। চরিত্রটির প্রতিক্রিয়া ঘটবে তার আবেগে, তার দেহে, তার মনে, তবেই শিল্পীর সাধনা সার্থক।

আগেই বলেছি যে এই রীতিবাদ সকলে মেনে নেয় নি। এর বলিষ্ঠ বক্তব্যকে ইংল্যাণ্ড মেনে নিতে পারল না। একজন তরুণ ইংল্যাণ্ডীয় অভিনেতা প্রকাশ্যে বললেন—"ও সব যত বাড়াবাড়ি, কোন প্রয়োজন নেই ঐ রীতি অনুসরণ করায়। আর একটি উক্তি··· ল্যাঙ্কাশায়ারে আমি রোমিওর ভূমিকায় অভিনয় করেছি, ঐ রীতিবাদ তো আমি মানিনি অথচ বেশ স্পষ্ট আমার নিজের মধ্যে ধারণা ছিল আমিই রোমিও অর্থাৎ আমি চরিত্রটির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলুম।" এর উত্তর দিলেন এক পরিচালক, তিনি বললেম মানলুম, তুমি নিজে স্পষ্ট অনুভব করলে যে তুমি রোমিও, কিন্তু সেখানেই কি শেষ, দর্শকদের মধ্যেও তো এই বিশ্বাস তোমাকে আনতে হবে—তুমি নিজে ভাবলেই তো চলবে না, তাদেরও মধ্যে এই অনুভূতি আনতে হবে যে তারা তোমায় দেখছে না। তারা রোমিওকেই দেখছে, সে বিষয়ে কতটা এবং কিভাবে কৃতকার্য হয়েছ বল। অভিনেতা চুপ, মুখে কোন কথা নেই। অভিনেতাকেও ব্যায়াম করতে হয় সে এক ভিন্ন ধরণের ব্যায়াম এ ব্যায়ামে শুধু দেহগঠনই হয় না এ ব্যায়ামে মনও গড়ে উঠে ধীশক্তি জেগে উঠে, অভিনিবেশ, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে, এ ব্যায়ামের প্রণালী অবশ্যই আলাদা, কিন্তু মূল একই। অভিনেতাকে পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে—কোন কিছু যেন তার চোখ এড়িয়ে না যেতে পারে, হৃদয়ের দ্বার তাকে উন্মুক্ত রাখতে হবে, ধীশক্তি, চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি তার হবে প্রখর, প্রতিটি চরিত্র তাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে হবে। তবেই সে হতে পারবে একজন সার্থক অভিনেতা। রূপদক্ষ শিল্পী।

ষ্ট্রাসবার্গের প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। একটি শিক্ষাদানকেন্দ্রের মাধ্যমে ইনি এ বিষয়ে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে "তিনি ক্লাস নেন, রীতিমত পাঠ দেন। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক, কোন এক অভিনয়ের একটি অংশবিশেষের 'ম্যাকসান' দেখানো হল একটি ছাত্রীকে। মেয়েটি কিছুতেই ষ্ট্র্যাসবার্গের দেখানো 'ম্যাকসান'টি প্রদর্শন করতে পারছে না। অনেক চেষ্টা সত্বেও মেয়েটি বারবার বিফল হচ্ছে, শেষে লজ্জায় মেয়েটি প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থায় যখন স্থানত্যাগ করছে, ষ্ট্র্যাসবার্গের কণ্ঠ আবার শোনা গেল—"শোন", খুব প্রশান্ত একটি কণ্ঠস্বর! মেয়েটি ফিরে তাকাল। ষ্ট্র্যাসবার্গ বললেন—তোমার মধ্যে দিয়ে ঐ "ম্যাকসান"টি তোমার মত করে যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিন্তু তোমার ছুটী নেই, মেয়েটির যাওয়া হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে ফিরে এসে আবার কাজে মন দিল। অভিনেতাকে তিনটে কাজ একসঙ্গে করতে হবে; অভিনয়, দর্শন এবং শ্রবণ—অর্থাৎ এইভাবেই শারীরিক এবং মানসিক যুগপৎ শক্তিনিয়োগ। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার ভাষণ এবং অঙ্গসঞ্চালন যথাযথ হচ্ছে কি না, আরও ভাল হয় আপন মনে নির্জনে অবসর সময়ে কোন নাটক থেকে তিন-চারটি চরিত্র-সম্বলিত অংশবিশেষ যদি আপন মনে অভিনয় করা যায়, এর ফলে অভিনয়ের মধ্যে পরিবর্তন আনা সহজ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করে যে সকল দিকপাল প্রয়োগকর্তা, পরিচালক, শিল্পীরা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে এই দুজন নিঃসন্দেহে সমান আসন দাবী করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের গরিমাও তো কোন অংশে কম নয়। তাঁদের সাধনা রঙ্গমঞ্চকে যে পরিমাণে পুষ্ট করেছে তার সাক্ষ্য দেবে তাঁদের সৃষ্টি; তাঁদের চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, ধীশক্তি থেকে যাদের উদ্ভব।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কিন্তু বিধি বাম! পূর্ণ দৈর্ঘ্য অজন্তার প্রযোজনা এবং তার প্রধান ভূমিকায় আমার অবতরণ কোনদিন সমাপ্ত হ'ল না।। আমার অজন্তা প্রযোজনার স্বপ্ন আকাশকুসুম হয়েই রইল, অথচ এই অজন্তাকে ঘিরে আমার কত স্বপ্ন, কত কল্পনা, কত চিন্তা। ধীরে ধীরে তিলে তিলে শনৈঃ শনৈঃ গতিতে এই অজন্তাস্বপ্ন আমার হৃদয়ের পরতে পরতে দানা বেঁধে উঠেছে। পৃথিবীটাই তো স্বপ্নের। জগতের রঙ্গমঞ্চে কোটি কোটি নরনারীর মিছিল চলেছে যুগের পর যুগ ধরে—স্বপ্নই মানুষের অবলম্বন, এর মধ্যে কল্পনায় বাস্তবে কোন ভেদাভেদ নেই অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইডিয়ালিসমে এবং রিয়ালিসমে চিরন্তন সংঘাত, স্বপ্নের ক্ষেত্রে নয়, স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই মানুষ বেঁচে থাকে। স্বপ্নই মানুষের প্রাণ, স্বপ্নই যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান পাথেয় অবশ্য আইডিয়ালিসম এবং রিয়ালিসমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর রূপভেদ আছে কিন্তু মূল একই। স্বপ্ন খালি কবির জন্তে নয়, শিল্পীর জন্তে নয়, ভাবুকের জন্তে নয়, স্বপ্ন তাদের একচেটিয়া নয়, স্বপ্ন আছে একটি অতি সাধারণ কঠিন কঠোর জীবনযাপনকারী, বাস্তবের রূঢ় আঘাতগ্রস্ত, সম্পূর্ণরূপে কাব্য সাহিত্য চেতনাবর্জিত নীরস ব্যক্তিটিরও উপার্জনের স্বপ্ন, সঞ্চয়ের স্বপ্ন, সংসারের স্বপ্ন—

সেটা কি স্বপ্ন নয়? সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর এক ইন্দ্রিয় থেকে স্বপ্নের জন্ম। সমগ্র চেতনা জুড়ে এর বিস্তার, মূলতঃ এ অপ্রত্যক্ষ ও স্পর্শাতীত, মূলতঃ এ অনুভবের, একে প্রত্যক্ষ করতে হয় অনুভূতির উদাত্ত আলোকে, একে উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে, ক্রমে তনু মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে মানুষের স্বপ্ন বিরাট হতে বিরাটতর রূপ নেয়, যত কিছু সীমা ও গণ্ডী করে অতিক্রম, দিক থেকে দিগন্তরে বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেখা যায় স্বপ্নের গতি দ্বিমুখীন, কখনো মানুষের স্বপ্ন পরিপূর্ণতার স্পর্শ প্রভাবে ভরে উঠে কখনো তা হতাশার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন যখন সফল হয় তখন মনে হয় যে জগতের যত কিছু আনন্দ, যত হাসি যত গান—এ যেন আমারই জন্যে। এই উদার উন্মুক্ত সীমাহীন আকাশ—এ যেন আমারই, নদীর কলকল ধ্বনি, বাতাসের বেগ, বিহগের কলকাকলিতে যেন আমার অবিসম্বাদিত অধিকার। যত কিছু পার্থিব আনন্দ সম্পদ তাদের সৃষ্টি যেন আমারই জন্যে। স্বপ্ন যখন সফল হয় না তখন বেদনা হয়ে ওঠে পুঞ্জীভূত, মনে হয় চারপাশ ঘিরে শ্বাস রোধ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিষাদের সুউচ্চ দুরতিক্রম্য প্রাচীর গড়ে উঠছে, সারা পৃথিবীকে দুঃখের কালিমায় দেখায় যেন মালিন্যময়ী। আমার অজন্তা-স্বপ্ন যখন সফল হল না তখন ঠিক এই অনুরূপ অনুভূতিই আমার মধ্যে জেগেছিল। অজন্তাকে ঘিরে আমার তো স্বপ্নের শেষ ছিল না। দিনের পর দিন এই পরিকল্পনা যত রূপ নিতে থাকে, একে কেন্দ্র করে আমার স্বপ্ন দেখাও তত ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে মনের মধ্যে তখন যে কত মনোরম ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার সীমা সংখ্যা নেই। পাঠক পাঠিকাদের অজানা নয় যে এই সঙ্গে রিদম্ অফ ভিক্ট্রী নামে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণেও আমি অগ্রসর হয়েছিলুম—বিধি প্রসন্ন। এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হতে পেরেছিল। অজন্তার পিছনে যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হল—সেও আর এক ইতিবৃত্ত—সে কাহিনী পরে বিবৃত করছি।

একেক সময়ে আমার মনে হয় যে কলকাতায় না এসে বম্বে থেকেই যদি 'রিদম্ অফ ভিক্ট্রী' আর 'অজন্তা' পরিকল্পনার রূপদানে ব্যাপৃত থাকতাম তা হ'লে ঘটনার স্রোত কোন্ ধারায় প্রবাহিত হোত? বোম্বেতে তখনও অসংখ্য আহ্বান পেয়েছি। ষ্টুডিও মালিকগণ স্বাগত জানাতে দ্বিধা বোধ করেন নি, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন? দূর প্রবাসে বড় একা একা লাগছিল তা ছাড়া ঘরের দিকে মনটা ভীষণ টানছিল, সুদূর বোম্বাইতে বসে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন বাঙলা দেশ আমার হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সেই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ, আমার জননী জন্মভূমি, যার পুণ্য ক্রোড়ে আমি জন্মেছি, যে বুক দিয়ে আমায় লালন পালন করেছে, যে আমার মুখে দিয়েছে তার বিশ্ববন্দিত ভাষা, যার অপার করুণা তৃষিত তাপিত জীবনের পরম প্রলেপ। দেশ দেশান্তরে যেখানে তার যত সন্তান আছে সকলের উদ্দেশে যে বিতরণ করে চলেছে মুঠো মুঠো অমৃত, তার কোল থেকে কতদিন দূরে থাকা যায়? মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদগ্রীব হয়ে ওঠে ঘরে ফেরার জন্যে, তাই যখনই কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধু আমায় আমন্ত্রণ জানালেন, আমি তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করে নিলুম সেই আহ্বান আমার দেশের আহ্বান হিসেবে। তাঁদের সঙ্গে কলকাতায় কাজ করার সম্মতি জানিয়েছিলুম তাঁদের। তাঁদের সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতা আমার মনে থাকবে চিরদিন, আমার শিল্পী সম্প্রদায় এবং সমস্ত কলাকুশলীদের কলকাতায় আনিয়ে কাজ করাতে তাঁরা অরাজী হলেন না।

উত্তরপ্রদেশের (তখনকার যুক্তপ্রদেশ) প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীভগবতীচরণ বর্মা চিত্রনাট্যটি হিন্দিতে অনুবাদ এবং সুসংস্কৃত করার ভারগ্রহণ করলেন। স্বর্গতঃ প্রহ্লাদ দত্ত পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে আলোকচিত্রায়ণের ভার নিলেন। পুণার প্রভাত ষ্টুডিওতে এঁর শিক্ষা পরে পাঞ্জাবে স্বর্গতঃ দলসুখ পাঞ্চোলীর সঙ্গেও ইনি কাজ করেছেন। আমার ছবির নায়ক ছিলেন সাহু মোদক। সুর-যোজনার ভার নিয়েছিলেন তিমিরবরণ। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীচারু রায় নিয়েছিলেন শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব। ব্যালেতে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে ছিল চল্লিশ। প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারবিদ্ শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল—ভারতের চলচ্চিত্র জগতে একটি বিশেষ আসন যাঁর অধিকারভুক্ত। সমগ্র প্রচেষ্টাটি রূপদানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন চারজন, তাঁরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমায় কলকাতায় আনান—এই বিরাট প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন তাঁরাই—তাঁদের নাম শ্রী বি-এল খেমকা, শ্রী এস-আর হেমাদ, শ্রী এস, দত্ত এবং শ্রী এস এন শেহগল।

কলকাতায় ফিরে এলুম। সেই চিরপরিচিত পরিবেশ, সেই কতকালের চেনা লোকগুলি, সেই প্রাণ থেকে প্রিয়তর বাঙলাদেশ, বাঙলার মাটি, আমার দেশ আমায় সাদরে গ্রহণ করল এক কথায় কিন্তু কলকাতার শীত আমায় সুনজরে গ্রহণ করল না। কলকাতা আমার মাতৃভূমি, জন্মস্থান, নিজের দেশ, তাই বলতে লজ্জা অনুভব করছি যে দেশের শীত আমার সহ্য হল না—অথচ জীবনের কতগুলি শীত যে এই শহরেই কাটিয়েছি তার সীমা-পরিসীমা নেই, তবুও এ দেশেরই শীত এতকাল বাদে সহ্য হল না। এর মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন আর একথা সকলেরই জানা আছে যে হঠাৎ জলবায়ুর পরিবর্তন সম্বন্ধে সকলেই সচেতন থাকেন না, ফলে ঐ হাওয়া বদলে স্বাস্থ্যকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করে—তার উপর আবার এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে এর আগে বেশ কিছুকাল আমার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। অতকাল বাদে কলকাতা ফিরলুম অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন—তারপর সময়টি জলবায়ু পরিবর্তনের—সব মিলে আমায় বেশ কাবু করে ফেললে। সুটিং যখন চলছিল তখনই আমার জ্বর চলছে। শিল্পশাস্ত্রে বিরাট প্রতিভার অধিকারী হওয়াই শিল্পীর একমাত্র গুণ নয়, যে কাজের ভার গ্রহণ করা সেই কাজটি যথাযথভাবে শেষ করা অর্থাৎ দায়িত্বটি যথোপযুক্তভাবে পালন করাই শিল্পীর আর একটি বিশেষ গুণ। এদিক দিয়ে যদি কেউ অবহেলা প্রদর্শন করেন তা হ'লে তিনি যতবড় প্রতিভাবান দক্ষ শিল্পীই হোন—যথার্থ শিল্পী বলে কোনদিন বিবেচিত হবেন না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্পী হিসেবে তিনি সম্পূ[র্ণ] ব্যর্থ। অজন্তা ছবিটিতে শিল্পী হিসেবে আমি যুক্ত তো ছিলুমই তা ছাড়া ছবিটি ছিল আমার নিজের—আমার নিজস্ব প্রযোজনা এই ছবি রূপ নিচ্ছিল। সুতরাং এই ছবির প্রতি শিল্পীর পূ[র্ণ]

দায়িত্ব পালন করলেও সম্পূর্ণ হয় না, প্রযোজিকার দায়িত্বও যে আমার সম্পূর্ণরূপে পালনীয়। এতাবৎ যত ছবিতে কাজ করেছি, শিল্পীর দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই কর্তব্য সমাধা করেছি। প্রযোজনার সম্বন্ধে আমার চিন্তা করবার কিছুই ছিল না, কিন্তু প্রযোজনা সম্বন্ধে যত কিছু করবার এ ছবিতে তা সব কিছুই আমাকে করতে হয়েছে। অতএব অনুমান করুন এই রকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ কোথায়, তখন অজন্তা, অজন্তা আর অজন্তা—অজন্তাই ধ্যান, অজন্তাই জ্ঞান, অজন্তাই সাধনা, শারীরিক অসুস্থতার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না—প্রতিটি মুহূর্ত তখন যে কি উত্তেজনায় কাটছে তা ভাষায় কেমন করে প্রকাশ করব ভেবে পাই না, প্রতিটি মুহূর্তই তখন আমাদের কাছে যেন বিধাতার পরম দান। অপরিমাপ্য যেন তাদের মূল্য। আমার মূল চিন্তা তখন চিত্রায়ণ সমাপ্তির দিকে, কবে, কত দিনে ছবির চিত্রায়ণ তথা সম্পাদনা শেষ হবে, তারপর যথারীতি একদিন দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ছবি মুক্তিলাভ করবে, সেই দিনটি কবে কবে—কবে—সত্যি কথা বলছি কারণ নির্দোষ সত্য ভাষণে কোন অপরাধ নেই, টাকার দিকেও আমার লক্ষ্য ছিল, ছবিটি মুক্তি পেয়ে যে টাকা আমার হাতে আসবে তারাই যে আমার সমস্ত স্বপ্নকে পরিপূর্ণ রূপ দেবে, যে বিরাট স্বপ্ন আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে তারা রূপ পাবে সেই টাকার সাহায্যে। আমার স্বপ্নভ্রমণের একটি বাগান ও আঙ্গিনাযুক্ত অনতিদীর্ঘ গৃহনির্মাণের এবং একটি নৃত্যশিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণের। এই কল্পনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করবার ক্ষেত্রে অর্থেরই প্রয়োজন বিশেষ করে,—তাইতো আমার অর্থের প্রয়োজন।

ফল যা হবার তাই হ'ল শারীরিক অসুস্থতাকে আমি উপেক্ষা করলে কি হবে সে আমায় উপেক্ষা করল না, আমি যত তাকে অস্বীকার করতে গেছি সে তত নিবিড়ভাবে আমায় ঘিরে রাখলে—ফলতঃ আমায় শয্যাশায়িনী হতে হল আমার সাধের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। আমার কল্পনায় নির্মিত সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল, এক ঝোড়ো দমকা হাওয়ায় আমার তাসের ঘরখানি ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একে শারীরিক যন্ত্রণা তায় মানসিক এই অবসাদ পরিস্থিতিকে একেবারে সোণায় সোহাগা করে তুলল, হতাশায় মন একেবারে ভেঙে গেল, মনের সে যে কি করুণ অবস্থা তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত।

রোগ বেড়ে চলে, অনেক বিখ্যাত চিকিৎসকদের চিকিৎসা চলে, ফল হয় না, শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যায়। শেষে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ রায় বলে গেলেন—নিউমোনিয়া এবং তাও খুব গুরুতর আকার নিয়েছে। তাঁর নির্দেশনায় তাঁর সহকারী স্বর্গতঃ ডাঃ অনিল চক্রবর্তী আমার রোগের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

আমার বহুযত্নপোষিত, সাদরে পুষ্ট, পরম নিষ্ঠায় লালিত সমস্ত স্বপ্ন একেবারে মিলিয়ে গেল তাসের ঘরের মত—দ্বিজেন্দ্রলালের "ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার" কথাটি এই প্রসঙ্গে বারংবার মনে পড়ে—কিন্তু আমিও কর্মক্ষেত্রে কারেজে ইয়ে মরেজে মন্ত্রে বিশ্বাসী, নৈরাশ্যবাদ আমায় কোনদিনই বশীভূত করতে সক্ষম হয় নি, জীবনকে আমি অন্বেষণ করেছি চিরকালই আশার আলোয়। যদিও এত বড় একটা পরিকল্পনা—কত যত্নে কত অধ্যবসায়ে কত নিষ্ঠায় তাকে রূপ দিতে অগ্রসর হচ্ছিলুম এবং নিজের মুখে বললে হয় তো অশোভন হবে তবুও সত্যের খাতিরে বলছি—যে এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে ভারতীয় চিত্রজগতে এক বিস্ময়কর আলোড়নের সৃষ্টি হোত। কিন্তু যাই হোক, কর্মের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, প্রচেষ্টার ব্যর্থতার জন্যে সারা জীবন হা-হুতাশ করার থেকে নতুন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাই সবচেয়ে সমীচীন। রোগশয্যায় নতুন ব্যালে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করে রেখেছিলুম সুস্থ হয়ে ওঠার পর সেই ব্যালে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হ'ল, তাদের মধ্যে কয়েকটি তো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যদিও আর্থিক সাফল্য তারা অর্জন করতে পারে নি। আর্থিক অসাফল্যের কারণও আছে, এই সময়ে আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হরেনদা নেই—ইতিমধ্যেই নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে হরেনদার জীবন যবনিকার অকালপতন ঘটেছে। পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন হরেনদা—হরেনদা যে আমার কতখানি শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা আমার কর্মসচিব ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে উপযুক্ত যোগ্যতার অভাব ছিল অনেকখানি, আর্থিক দিক দিয়ে আমার সফরগুলিকে তাঁরা সার্থক করে তুলতে পারেন নি—এ ক্ষেত্রে যে বিচক্ষণতার প্রয়োজন সেই পরিমাণ বিচক্ষণতা তাঁদের মধ্যে

ছিল না। অবশ্য এজন্যে দোষ আমি কাউকে দিই না, কেনই বা দেব? কারো বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই, কারণ ভুল-ভ্রান্তি মানুষেই করে আর এই ভুল করাটাও মানবচরিত্রের একটি অঙ্গ, তা ছাড়া কেউ যদি ভুল কখনো না করে তাহলে ইংরেজীতে "রিচিং পারফেকসান" প্রবাদটি বোধ হয় অভিধানের পাতায় চিরকালের মত অনুপস্থিতই থেকে যেত। [ক্রমশঃ

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনের স্মৃতিদিবস : মিনার্ভায় উদযাপিত

উনত্রিশে জুন মহাকবি শ্রীমধুসূদনের মৃত্যুদিন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এই দিনটিতে মহাকবি পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর লিটল থিয়েটারের অধিনায়কতায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে এই স্মৃতিদিবসটি উদযাপিত হল মধুসূদনেরই 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুটি প্রহসনের অভিনয়ের দ্বারা। প্রহসন দুটির অভিনয়, প্রয়োগনৈপুণ্য এবং পরিচালন দক্ষতা ত্রুটিহীন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে টিম-ওয়ার্কই প্রাণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এঁদের অভিনয় এই উক্তিটির সত্যতাই আর একবার প্রমাণ করল। "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনটির মঞ্চসজ্জা প্রাচীনকালের রীতি অনুযায়ী দর্শকসমক্ষেই করা হয় অর্থাৎ মঞ্চ সাজানো পর্দার আড়ালে হয় নি, পর্দা ওঠবার পর দর্শকের সামনেই সাজানো হল, তারপর অভিনয় শুরু হল, প্রহসনটি শেষ হতে পর্দা নামল।

প্রহসন দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রবি ঘোষ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য (নাট্যকার), কমল মুখোপাধ্যায়, বিধান মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সেন এবং সর্বশ্রীমতী শোভা সেন, নীলিমা দাস, সুমিতা দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুচিত্রা সেন—ছায়াবাণীর পরিবেশনায় নির্মীয়মান "সপ্তপদী"র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আলোকচিত্র : হেমেন মিত্র

সখের চোর

হাল আমলের সর্বজনপ্রিয় চিত্রতারকাকে নায়কের ভূমিকা দিয়ে এবং আরও নানাভাবে ছবিটিকে জমকালো করে তোলা হয়েছে, হলে কি হবে, যে অন্তঃসারশূন্য তার শূন্যতা বাহ্য আড়ম্বর বা চটকদারিতে পূর্ণ করা যায় না। ছবির নায়ক এক বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র এবং যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। বন্ধুদের সঙ্গে সে বাজী রেখে চুরি করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে বন্ধুরা বলেছিল যে, চুরি করা তার সম্ভব নয়, সে কখনই চুরি করতে পারবে না, এই নিয়ে বাজী হয়ে গেল। যে বাড়ীতে সে ঢুকল চুরি করতে, সেই বাড়ীর কর্তাটি বাইরে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ভিতরে একটি আস্ত ডাকাত। ঘটনাচক্রে তাঁরই কন্যার সঙ্গে নায়কের আলাপ হয়ে গেল। আলাপ পরিণত হল ঘনিষ্ঠতায় তারপর নানা ঘটনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলনে গল্পের সমাপ্তি।

যে মূল পটভূমিকাকে অবলম্বন করে ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে, সেই পটভূমিই অবাস্তব। এ কখনও সম্ভব না যুক্তিসম্মত যে একটি শিক্ষিত সুস্থমস্তিষ্ক ভদ্রসন্তান ছিঁচকে চুরি করতে পারে কি না তাই প্রমাণ করতে বাজী ধরবে? কোন ভদ্র শিক্ষিত সমাজে এ রকম বাজী ধরার প্রচলন আছে বলে আমরা তো এ পর্যন্ত শুনি নি। এই অবাস্তব পটভূমির উপর গল্প রচনা করে শুধু আপন চিন্তাশক্তির অসারতাই প্রমাণিত হয় নি সেই সঙ্গে সমাজে একটি কুৎসিত দৃষ্টান্তও রেখে যাওয়া হল। বন্ধুরাই বা কি রকম ভদ্রসন্তান যে, এই নিন্দনীয় ব্যাপারে বাজী ধরে বা এ বিষয়ে সফলতা নিয়ে বড়াই করে। তবে নায়িকার [illegible] যে চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, এ বিষয়ে

আমাদের প্রতিবাদ করার কিছু নেই, এই চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং এই সব চরিত্রের সাক্ষাত আমাদের বাস্তব জীবনে প্রচুর মিলছে। ছবিটি হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এ দেশের মানুষের "অর্থাভাব" কথাটির সঙ্গে আদপেই পরিচয় নেই, টাকাটা যেন এখানকার লোকেরা কোনরকমে খরচা করতে পারলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যে ভাবে মুড়িমুড়কির বা হরির লুটের মত টাকা বিতরণ করা হয়েছে তার ফলে মনে হয় যে, পরিচালক হয় তো ভেবেছেন যে টাকাটা খোলামকুচি, অস্বাভাবিকতারও সীমা আছে একটা। আর সেই নৌকো চালাতে চালাতে প্যানপ্যানানি গানের সেই মান্ধাতার আমলের টেকনিক বাংলা ছবিতে আর কতকাল চলবে?

অভিনয়াংশে প্রথমেই উল্লেখ করব ছবি বিশ্বাস এবং উত্তমকুমারের নাম। এঁদের অভিনয় হয়েছে যেমনই সাবলীল তেমনই চিত্তস্পর্শী। অন্যান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দক্ষতার ছাপ রেখে গেলেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তরুণকুমার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অমরেশকুমার, ছবি নন্দন মলয় বিশ্বাস চন্দ্রাদেবী, বিনতা রায়, শীলা পাল প্রভৃতি। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমতী বাসবী নন্দী ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

তিনজন বিখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ। বিয়ের খাতা:

প্রবীণ কথাশিল্পী ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখনীপ্রসূত 'বিয়ের খাতা' কাহিনীটি চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে নির্মলদের পরিচালনায়। সুরযোজনা করছেন নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, আশীষকুমার, অনুপকুমার, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, জহর রায়, সুনন্দা দেবী, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, তপতী ঘোষ, গীতা দে, মঞ্জুলা সরকার প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ।

বিষকন্যা:

প্রখ্যাত সাহিত্যিক জরাসন্ধের (শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) 'বিষকন্যা' কাহিনীটি জয়দ্রথের পরিচালনায় চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, শিশির বটব্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, পদ্মা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, তপতী ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আলোকচিত্র ও সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত ও গোপেন মল্লিক।

মধ্য রাতের তারা:

যশস্বিনী সাহিত্যশিল্পী শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'মধ্য রাতের তারা' নামক কাহিনীটিকে এবার আপনারা চলচ্চিত্রের আকারে দেখতে পাবেন এবং এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে আপনারা ছবি বিশ্বাস, অভি ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, মলিনা দেবী, প্রণতি ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, শীলা পাল প্রভৃতি অভিনয়শিল্পীর অভিনয়ও দেখতে পাবেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই ছবিটিতে সুরযোজনা করছেন।

রমা গঙ্গোপাধ্যায়—জনতা পরিবেশিত "গঙ্গা"র নায়িকা চরিত্রটির রূপদান করেছেন। আলোক চিত্র: হেমেন মিত্র।

সংবাদ বিচিত্রা

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতির রাশিয়া সফর :

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি রাশিয়া সফর করে দেশে ফিরে এসেছেন। রাষ্ট্রপতির এই পনেরো দিনব্যাপী রাশিয়া পরিক্রমাকে উপজীব্য করে ভারতরাষ্ট্রের ফিলম্‌স ডিভিসন চিত্রনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এর দৈর্ঘ্য হবে তিন থেকে চার হাজার ফুটের মধ্যে। রাষ্ট্রপতির সমগ্র রাশিয়া সফরটিকে এই ছবির মধ্যে ধরে রাখা হবে।

হলিউডে নেপালের রাজদম্পতি :

সাম্প্রতিককালে হলিউডে অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত বিদেশী অতিথিদের মধ্যে নেপালের রাজ-দম্পতির নাম উল্লেখযোগ্য। নেপালের রাজা এবং রাণী সম্প্রতি অ্যামেরিকা পরিভ্রমণ কালে স্বপ্নপুরী হলিউডও পরিদর্শন করেন। এরা ডিসনীল্যাণ্ডে যান এবং সেখানকার চিত্রায়ণ পর্যবেক্ষণ করেন তারপর প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে ডিন মার্টিন বার্লি ম্যাকলেন, জুলিয়েট গ্রেকো ক্লিফ রবার্টসন প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাত হয় ও বাকবিনিময় হয়। এরপর নির্মীয়মান ছবি জি আই-ব্লুস-এর সেটে যান এবং প্রযোজক হাল ওয়ালিস এবং অশেষ জনপ্রিয় শিল্পী এলভিস প্রেসলির সঙ্গে সাক্ষাত করে আলাপ-আলোচনা করেন। হলিউডে রাজদম্পতি মোট তিনদিন অবস্থান করেছিলেন।

চিত্রাভিনেত্রী সম্মানিতা :

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সাম্প্রতিক শুভ জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেত্রী ফ্লোরা রবসন সম্মানিতা হয়েছেন। রাণীর জন্মদিন উপলক্ষে চিরাচরিত যে উপাধি বিতরণের তালিকা প্রস্তুত হয় সেই তালিকায় এবারে ফ্লোরার নামও পাওয়া গেল। বর্তমানে ফ্লোরা একজন ডেম। তিনি ডেম অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার উপাধিতে বিভূষিতা হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য একজন ডেম এবং একজন নাইট সমপর্য্যায়ভুক্ত এবং সমান মর্যাদার অধিকারী।

ইতালীয় অভিনেতাদের ভিনিস ফেসটিভ্যাল বর্জনের সিদ্ধান্ত :

এবারের ভিনিস ফেসটিভ্যালে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ইতালীয় অভিনেতার দল এই উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ক্যাথলিক সিনেমা সেন্টারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব এমিলিও লোনেরোকে এই উৎসবে সভাপতিত্বে বরণ করার জন্যেই শিল্পীদের পক্ষ থেকে এই গোলযোগের সৃষ্টি, এর কারণ শিল্পী মহল লোনেরোর প্রতি মোটেই প্রসন্ন নন। লোনেরোর অনুদারনীতিই তাঁকে জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত করেছে। ক্যাথলিক চার্চের পক্ষ থেকে ইনি ছবি সেন্সার করতেন, সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমতে লোনেরোর ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামী ইতালীয় চলচ্চিত্রের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।

লীলা-লীনের বিবাহ সম্পন্ন :

ব্রিটিশ চিত্র পরিচালক ডেভিড লীনের (৫৩) সঙ্গে ভারতীয় মহিলা লীলা দেবীর শুভ পরিণয় প্যারীতে গত ৪ঠা জুলাই সুসম্পন্ন হয়েছে। বিবাহানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মেয়র জিন মেসে এবং এই বিবাহের সাক্ষী ছিলেন চিত্রতারকা মার্লন ব্র্যাণ্ডো। কয়েকবছর আগে নয়াদিল্লীতে লীলা-লীনের প্রথম আলাপ, লীন এরপর কয়েকমাস ভারতে থাকেন এবং ক্রমেই লীলাদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। লীন কিন্তু লীলার প্রথম স্বামী নন। আবার লীলাকে বিয়ে করার আগে লীনও তিনবার বিয়ে করেছিলেন, তিনটি বিবাহই বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছে। এই বিবাহে তাঁর তৃতীয়া পত্নী বিখ্যাত অভিনেত্রী য়্যান টড তারযোগে লীনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বলেছেন—আই য়্যাম সিওর, হি উইল বি হ্যাপি।

জিন-ষ্টুয়ার্টের বিবাহ বিচ্ছেদ :

কিছুকাল ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে, ষ্টুয়াট গ্রেঞ্জারের এবং জিন সিমন্সের বিবাহবন্ধন শিথিল হয়ে আসছে এবং শীঘ্রই এই বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদে পর্যবসিত হবে। এই নিয়ে অনেকের মধ্যেই বলাবলি চলছিল।

সম্প্রতি লণ্ডনে জিনস এই কানাঘুষার অবসান ঘটিয়েছেন, তিনি প্রকাশ্যে দ্বিধাহীনচিত্তে এই ঘটনার সত্যতাকে মেনে নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদিও ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখজনক, তবু এই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। গ্রাস ইস গ্রীনার ছবিটিতে জিন অভিনয় করছেন সেইজন্য তাঁকে লণ্ডনে থাকতে হচ্ছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে এই ছবির চিত্রায়ণ সমাপ্ত হওয়ার কথা। দশ বছর আগে ১৯৫০ সালে এঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জিন ষ্টুয়ার্টের দ্বিতীয়াপত্নী। ষ্টুয়াট এবং জিন যথাক্রমে ৬ই মে ১৯১৩ এবং ৩১এ জানুয়ারী ১৯২৯ জন্মগ্রহণ করেন।

অভিনেতা থেকে প্রযোজক :

শ্রীমতী নারগিসের স্বামী সুনীল দত্তকে অভিনেতারূপেই এতদিন দেখা গেছে। শোনা যাচ্ছে এবার প্রযোজকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার রূপদানের প্রাক্কালে তিনি আচার্য বিনোবা ভাবের আশীর্বাদ লাভ করেছেন।

বাঙলা ছবির প্রথম মহিলা সুরযোজিকা :

কথাচিত্রমের উদ্যোগে 'দিল্লী থেকে কলকাতা' নামে একটি গল্প চলচ্চিত্রের রূপ নিচ্ছে। এতে সুরযোজনা করেছেন স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী। প্রসঙ্গতঃ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, বাঁশরী লাহিড়ীই বাঙলা ছায়াছবির প্রথম মহিলা সুরযোজিকা।

আসামী বাঙালী

"আমরা বলিয়াছি, যে বরদলই দল শ্রীহট্ট পাকিস্তানকে দিয়া রাষ্ট্রের অনিষ্টসাধন করিতে দ্বিধাসুভব করেন নাই তাহাই "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা আজ লোক গণনার হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে সংখ্যা দেখাইয়া আসামে একদল আসামী আজ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে সে সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নহে। যে সরকার লোক গণনার হিসাবেও সত্যের অপলাপ করিতে দ্বিধাসুভব করেন না, সে সরকারকে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। তাহার পর কথা—বাঙ্গালীরা আসামে বহিরাগত নহেন। তাঁহারা অনেকে আসামের অধিবাসী। কাজেই তাঁহারা স্বাধিকারে তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে না পারিলে তাহাই অসঙ্গত ও অন্যায় হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেসের সভাপতির শিলচরে আগমনের পরেই কেন তথায় "সান্ধ্য আইন" জারি করা হইয়াছে? কিন্তু তাহারও পূর্বে জিজ্ঞাস্য—প্রথম সপ্তাহের পরেই—হাঙ্গামা দলনে—আসাম সরকারের ব্যর্থতায় কেন্দ্রীয় সরকার কেন আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন নাই? বাঙ্গালীর—দাবী—(১) যে সরকার নাগরিকদিগকে তাঁহাদিগের মৌলিক অধিকার ধনপ্রাণমান রাখিয়া বাস করিতে দিতে পারেন না, সে সরকার অযোগ্যতার জন্য বহিষ্কৃত হইবার উপযুক্ত। এই কথাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন। সুতরাং আসামের বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করান হউক। (২) নিরপেক্ষ ভাবে আসামের লোক গণনা করাইয়া তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা হউক এবং সরকারে ও সব চাকরীতে যথাসম্ভব সেই সংখ্যানুসারে লোক নিয়োগের নির্দ্দেশদান করা হউক। (৩) আসামে সম্প্রদায়নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সংবিধানদত্ত অধিকার সম্ভোগের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। (৪) যাহারা ভারতীয় নাগরিককে সংবিধানদত্ত অধিকারে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের বিচারের ব্যবস্থা করা হউক। বর্ত্তমানে আসামে যাহা হইতেছে, তাহাতে আসামই রাষ্ট্রের যাহাকে plague spot বলে তাহাই হইয়াছে। ইহার প্রতীকার দৃঢ়হস্তে ব্যবস্থার দ্বারা করিতে হইবে—নহিলে ভারতীয় ঐক্য ক্ষুন্ন হইয়া রাষ্ট্রের বিপদ অনিবার্য্যই হইয়া উঠিতে পারে।"

—দৈনিক বসুমতী।

একটি ঘটনা

"গোড়েশ্বরে সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমনই বীভৎস, তেমনই লজ্জাজনক। স্বামী বাঙালী, শুধুমাত্র এই অপরাধেই সেখানে এক অসমীয়া নারী তাহার পুত্রকে লইয়া নাকি স্বামীর উপরে আক্রমণ চালাইয়াছে। গোড়েশ্বর বন্দরে এই বাঙালী ভদ্রলোকের বসবাস নেহাত অল্প দিনের নয়, তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের। সেখানে তিনি এক অসমীয়া নারীকে বিবাহ করিয়াছেন; বিবাহের পর কয়েকটি সন্তানও তাঁহার হইয়াছে। কিন্তু যে স্ত্রীপুত্রকে তিনি খাওয়াইছেন-পরাইয়াছেন, তাঁহার বাঙালীত্বের অপরাধটা তাহারা ভুলিতে পারে নাই। স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে ঘর করিয়াছে বটে, কিন্তু স্বামীকে ভালবাসিবার পরিবর্তে বাঙালীকে সে ঘৃণা করিয়াছে মাত্র। ঘৃণা করিয়াছে সন্তানরাও। বাঙালীদের উপর অসমীয়াদের অত্যাচার শুরু হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাই স্ত্রী গিয়া স্বামীর উপরে এবং পুত্র গিয়া পিতার উপরে আক্রমণ চালাইয়াছে। সাবালক পুত্রটি নাকি পিতার মাথায় লাঠি মারিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। অসমীয়া নারীর অসীম দয়া, পুত্রকে ঠেকাইয়া তিনি বলিয়াছেন, হউক বঙ্গাল, পতি ত বটে। কিন্তু প্রাণে না মারিলেও ভদ্রলোককে তাহারা প্রহার দিয়াছে। হাতে মারিবার পর ভাতে মারিয়াছে। সমস্ত ধনসম্পত্তি কাড়িয়া রাখিয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করিয়াছে। এ বড় অদ্ভুত ঘটনা। বস্তুত মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি যে কতখানি উদগ্র হইয়া উঠিলে এমন বীভৎস ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। স্ত্রীটির সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলিব না; শুধু পুত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, বাঙালী পিতার পুত্র হইয়াও সে যদি অন্ধ অসমীয়াত্বের অহঙ্কারকেই আঁকড়াইয়া ধরে, তবে যে তাহার পিতৃপরিচয়কেই অস্বীকার করা হয়, এই সহজ কথাটাও কি তাহার জানা নাই?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দাসত্ব-প্রথা

"দাসত্ব-প্রথা পৃথিবীর বহু দেশেই আইনানুসারে বিলুপ্ত হইলেও কোন কোন দেশে উহা যে এখনও বর্তমান তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য, যে সমস্ত দেশে দাসত্ব-প্রথা বর্তমান সেখানে উহা সাধারণতঃ গোপনেই চলিতেছে। সেদিন বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ডস সভায় আন্তর্জাতিক দাসত্ব-প্রথা দমন সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকালে জনৈক সদস্য প্রকাশ করেন যে, আরব দেশে এবং আফ্রিকায় দাসত্ব-প্রথা এখনও প্রায় পুরাদমে চলিতেছে। বক্তা আরও বলেন যে, তিনি ফরাসী অধিকৃত সাহারা অঞ্চলে ২০ বৎসর বয়স্ক একটি ক্রীতদাস কিনিয়াছিলেন ৩৭ পাউণ্ড ১ শিলিং দামে। ক্রয় করিবার পর তিনি দাসটিকে স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দেন। লর্ডস সভার অপর একজন সদস্য বলেন যে, আরব দেশে, বিশেষ করিয়া সৌদি আরবে প্রায় প্রকাশ্যেই দাস-প্রথা চলিতেছে। কেবল চলিতেছে নহে, বাজারে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের দামও বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, আগে যেখানে একটি সুন্দরী বালিকা দাসীর দাম ছিল ১ শত ৫০ পাউণ্ড, এখন সেখানে ঐ রকম দাসী বালিকার দাম হইতেছে ৪ শত হইতে ৭ শত পাউণ্ড। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক দাসত্ব দমন প্রতিষ্ঠান যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আফ্রিকা এবং আরব দেশ হইতে দাসত্ব-প্রথা নির্মূল করিতে পারে নাই। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী লর্ড ল্যান্সডাউন বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিদেশে প্রচলিত দাসত্ব-প্রথার বিলোপের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। সাধু ইচ্ছা সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীন দেশগুলির গভর্ণমেন্ট এবং জনগণ যদি দাসত্ব দমনের কাজে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হয়, তবে বাহির হইতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কতটুকু কাজ করিতে পারিবেন?"

অবশ্য, সৌদি আরবের দাসত্ব-প্রথা সম্বন্ধে যে খবর বাহির হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত কিনা, আমরা জানি না।" —যুগান্তর।

তেলের খেল

"আমাদের অবস্থা কিউবা অপেক্ষা বহুগুণ ভালো। আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তিনটি শোধনাগার তৈরী হইতেছে এবং নিকটবর্তী রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত আমাদের আরো দ্রুত ও স্বল্পমূল্যে প্রায় অপরিমেয় অপরিশ্রুত তেল সরবরাহ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এতবড় বিরাট দেশের বাজার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হওয়ার আগে তৈল সম্রাটদের দশবার ভাবিতে হইবে। আজ তৈলনীতিতে দৃঢ় থাকিলে আমরা সহজেই সাম্রাজ্যবাদী তৈল কোম্পানীগুলিকে আরো বেশী নত করিতে পারি। সোভিয়েতের সঙ্গে গত পরশু দিল্লীতে যে নতুন তেল চুক্তি হইয়াছে তাহাতে আমাদের হাত আরো শক্তিশালী হইয়াছে কারণ সোভিয়েত কেরোসিন এবং ডিজেল তেল আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে ভারতে পৌঁছিবে এবং তাহার মূল্য ভারতের বর্তমানের বাজার দর অপেক্ষা কম। বাজার দরের উপর ইহার প্রভাব না পড়িয়া পারে কি? খনি ও জ্বালানিমন্ত্রী মালব্য নিজেই বলিয়াছেন, সোভিয়েত পেট্রলজাত দ্রব্য ভারতে আসার ফলে ইহার বর্তমান মূল্য হ্রাস পাইবে। আমাদের সম্মুখে এক স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত সাম্রাজ্যবাদী তৈল কোম্পানীগুলির খেল আর বেশীদিন চলিবে না—যদি অবশ্য আমরা এই স্বর্ণ সুযোগ গ্রহণ করি ভারত সরকার ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন, ইহাই আজ ভারতের সকল শ্রেণীর সর্বসম্মত দাবি।" —স্বাধীনতা।

আসাম বয়কট

"বাঙলার ছাত্রসমাজ আসামের বর্বরতায় বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাদের তীব্র বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকেও জানাইয়া আসিয়াছে। এবার কাজে নামিতে হইবে। সক্রিয় প্রতিবাদের পথ জনসঙ্ঘ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক বয়কট আসামী বর্বরতার শ্রেষ্ঠ জবাব। বাঙ্গালী ছাত্রেরা এই কাজে অগ্রসর হইলে আসামের বাঙ্গালী নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ হইবে। কোন্ দল এই প্রস্তাব আনিয়াছে তাহা যেন বড় হইয়া না ওঠে। কংগ্রেস, কমুনিষ্ট, পি, এস, পি, যে কেহ এই প্রস্তাব আনিলে তাহা আমরা সমর্থন করিতাম এবং ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করিতে ছাত্রসমাজকে বলিতাম। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে এই কাজে অগ্রসর হইতে লজ্জা নাই, গৌরব আছে।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

পল্লীগ্রামের চিকিৎসা সঙ্কট

"আমরা দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যার আলোচনা করিতেছি। আমরা গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ক্ষেত্রটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার কথা বলিতেছি। কেননা, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের যেখানে দুই বেলার আহার জুটিতেছে না সেখানে অসুখ বিপদে ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ নাই (গ্রামের ডাক্তার বিষয়ে পরে বলিতেছি) এবং আধুনিক বিজ্ঞান পদ্ধতিতে চিকিৎসার ধাত এখন আমাদের গ্রামের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই। জনশিক্ষা ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষক প্রেরণের মত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসক প্রেরণের কথা আমরা বলিতেছি। গ্রামাঞ্চলের সহর অথবা উদ্বাস্তু উপনগরীতে কিছু কিছু পাশকরা চিকিৎসক রহিয়াছেন, কিন্তু ইউনিয়নের মধ্যে পাশকরা ডাক্তারের ব্যবসায়ের সুযোগ নাই বলিলেই চলে। একটি চিকিৎসক পরিবারের ন্যূনতম দৈনন্দিন সংসার খরচ গ্রামে চিকিৎসা করিয়া উপার্জন হইতে পারেনা। গ্রামবাসীদের আর্থিক দুরবস্থা ও চিকিৎসা অজ্ঞতাই ইহার কারণ। তবুও ইউনিয়নের মধ্যে কিছু কিছু ডাক্তার যে না আছে তাহা আমরা বলিনা, এই ডাক্তারেরা হইতেছে "লম্ফ ডাক্তার"—অর্থাৎ সহরের কোন চিকিৎসকের ডিস্পেন্সারীর কম্পাউণ্ডার হইতে এক লাফে ডাক্তার হইয়া গ্রামে বসিয়া রোগী-নারায়ণের দৌলতে সামান্য রোজগার করে। ইহাকে "কোয়াক" বলা হয়। কিন্তু কোয়াক বা লম্ফ ডাক্তারের হাতে নিরীহ অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের প্রকৃত চিকিৎসা হয়না, জটিল এবং কঠিন রোগের ক্ষেত্রে হাতুড়ে বৈদ্যের রোগীর কপাল বরাদ্দে ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের লজ্জার কারণ ঘটিয়া থাকে। ইহা জাতীর লজ্জা এবং সমস্ত চিকিৎসা জগতের লজ্জা। চিকিৎসা বিদ্যা এবং ব্যবহার প্রয়োগের দিক হইতে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সামান্যতম সংস্পর্শে আসিতে পারে নাই, কেননা দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামে রাস্তা নাই, লোকবসতি সহরের মত চাউল গুদামের বস্তাতুল্য ঠাসাঠাসি করিয়া নাই, জলকাদা ভাঙ্গিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চিকিৎসা করিতে হইলে বহু সময়ের প্রয়োজন এবং এই কারণেই সহরের ডাক্তারগণও সহসা গ্রামের কলে যাইতে রাজি নহেন। যদি যাতায়াতের মোটামুটি সুবিধা থাকে তবেই সহরের চিকিৎসক কলে যাইয়া ব্লাকমার্কেটিং বলিব না তবে মোটা টাকার দর্শনী আদায় করিয়া থাকেন যেহেতু গ্রামে যাতায়াতে যে সময় লাগে তাহাতে সহরের অনেকগুলি বাড়ীর রোগী দেখা চলে।" —বারাসাত বার্তা।

শিক্ষায় গলদ

"আজকাল মারামারি হাঙ্গামা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাই গৃহীত হয় না। দেশের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের এই চণ্ডনীতি সম্পর্কে কটাক্ষপাত করিয়াছেন এবং উপযুক্ত আইন দ্বারা উহা নিরোধ করা যায় কি না চিন্তা করিতেছেন। অনেকে ছাত্রদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু চিন্তাশীল শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বিরোধকে শুধু ছাত্রদের একতরফা দোষ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নপত্র রচনায় যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, সেই রীতিতে বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে পঠন ও অনুশীলন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নপত্র রচনায় নতুন রীতি অনুসরণ করেন, কিন্তু পড়ানোর সময় কলেজগুলিতে সেই সনাতন রীতি অনুসৃত হয়। ইহা সত্য হইলে বিষয়টি অতীব গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া আজ নানা কারণে ছাত্র সমাজকে বিপথগামী করিতেছে। ছাত্রদের মধ্যে ন্যায় নিষ্ঠার অভাব ঘটিতেছে। তাহার জন্য শুধু ছাত্র সমাজই দায়ী নয়, দেশের ছেলেরা যদি প্রকৃত মানুষ হইতে না পারে নিষ্ঠাবান ও সংযত চরিত্র হইতে না পারে তাহার দায়িত্ব ছাত্রদের নয়

দেশের নেতৃত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই দায়ী। আইন করিয়া চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের চরিত্র সৃষ্টি হয় না, চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইলে সৎ আদর্শ উপস্থাপিত করিতে হয়। বর্ত্তমান সমাজ একটি পঙ্গুনীতিকে আশ্রয় করিয়া দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্জ্জনার মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। প্রসঙ্গক্রমে বিনোবা ভাবেজীর হৃদয় পরিবর্ত্তনের মহান উদ্দেশ্যে মহা পদযাত্রার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভালবাসার সামান্য একটু আস্বাদ পাইয়া নরপিশাচ ডাকাতরা আজ দলে দলে দস্যুতা পরিহার করিয়া এক মহিমময় বলিষ্ঠ চরিত্রের ছত্রতলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আর সরলমতি ছাত্রগণ ভালবাসা এবং সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া বলিষ্ঠ চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষরূপে পরিচিত হইতে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।"

—ভাগীরথী (কালনা)।

একটি উপেক্ষিত রেল-ষ্টেশন

"রাণাঘাট লালগোলাঘাট সেক্‌শনে বীরনগর ষ্টেশনটি আজ স্মরণাতীত কাল হইতে অবহেলিত এবং তাহার যাত্রী সাধারণও উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে কোনরূপ সেড্ নাই, ফলে যাত্রী-সাধারণকে দারুণ রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাছাড়া প্লাটফর্ম্মে কোনরূপ পানীয় জলের ব্যবস্থা রেল কর্ত্তৃপক্ষ অদ্যাপি করেন নাই। ফলে বহুলোককে এক ফোঁটা জলের জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হয়, এমন কি ষ্টেশনে বিশ্রামাগার তো দূরের কথা কোন প্রস্রাবাগার পর্য্যন্ত নাই। প্লাটফর্ম্মের কিয়দংশে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা অদ্যাপি করা হয় নাই—অথচ এই রেলষ্টেশনটির উপর দিয়া দৈনিক বহু যাত্রী যাতায়াত করেন। দৈনিক ৪।৫ খানি ট্রেণের ক্রসিং হয়, প্রায় পাঁচ শত জনের অধিক মাসিক টিকিটের যাত্রী বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে কিন্তু তাঁদের প্রতি রেল কর্ত্তৃপক্ষ আজও উদাসীন।" —কাণ্ডারী (রাণাঘাট)

বেকারদের চাকুরী পাইতে অসুবিধা

"কমলপুর: বিগত কিছুদিন পূর্ব্বে পরিষদের ম্যালেরিয়া নিবারক সংস্থা হইতে কতিপয় পদ পূরণের নিমিত্ত এখানকার কয়েকজন যুবকের যথারীতি সাক্ষাৎকার লওয়া হইলেও স্থানীয় যুবকদের উপেক্ষা করিয়া আগরতলা হইতেই পদ পূরণ করা হয়। ইহার পূর্ব্বেও আরও অনেকবার স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইণ্টারভিউ ডাকিয়া আগরতলা হইতেই লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল।"

—সেবক (আগরতলা)

শোক-সংবাদ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনস্বী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত গত ১০ই আষাঢ় রাত্রি সাড়ে তিনটের সময়ে ৫৯ বছর বয়সে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে দেহরক্ষা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দেশবন্দিত বৈদান্তিক পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাঙলার নাট্যজগতে এক সময় দিক্‌পাল মহারথী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং জাতীয়তার পূজারী বীর রাজা সুবোধ মল্লিক যথাক্রমে কবির খুল্লতাত এবং মাতুল। ১৯০১ সালের ৩০এ অক্টোবর কবির জন্ম। বাল্যকালে য়্যানি বেসান্তের তত্ত্বাবধানে বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন করেন। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর শিক্ষানবীশ হিসেবে কিছুকাল পিতা হীরেন্দ্রনাথের সলিসিটার ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ১৯৩১ সালে "পরিচয়" পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। যুদ্ধের সময়ে ইনি এ-আর-পিতে যোগ দেন, তার পর একটি ইংরেজি দৈনিকে কর্মগ্রহণ করেন। এর পর তাঁকে দেখা গেল ডি, ভি, সির চীফ ইনফরমেশন অফিসাররূপে। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানালেন (১৯৫৭-৫৮)। শেষ জীবনে ইনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনায় রত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে তন্বী, অর্কেষ্ট্রা, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত, প্রতিধ্বনি, ক্রন্দসী, দশমী, স্বগত এবং কুলায় ও কালপুরুষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। সুধীন্দ্রনাথের লোকান্তরে বাঙলা তথা ভারতের মনীষা পাণ্ডিত্য এবং মেধার জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল।

ডক্টর প্রকৃতিকুমার ঘোষ

ভারতবিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডক্টর প্রকৃতিকুমার ঘোষ বিমান দুর্ঘটনায় সপত্নী গত ৫ই আষাঢ় '৬৭ বছর বয়সে নিহত হয়েছেন। ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯২৯ সালে ইনি জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ায় এবং ১৯৫৪ সালে ভূতাত্ত্বিক হিসেবে আণবিক কমিশনে যোগ দেন। ১৯৫৮ সালে ইনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা গত ২৭এ আষাঢ় ৬৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি আইন ব্যবসায় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সাময়িকপত্রসেবী হিসেবেও ইনি প্রভূত সুনামের অধিকারী ছিলেন।

তপেন্দ্রনাথ সেন

প্রখ্যাত য়্যাটর্নি তপেন্দ্রনাথ সেন গত ২২এ আষাঢ় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ য়্যাটর্নি স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পৌত্র ছিলেন। য়্যাটর্নি হিসেবে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সংশ্লিষ্ট মহলে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
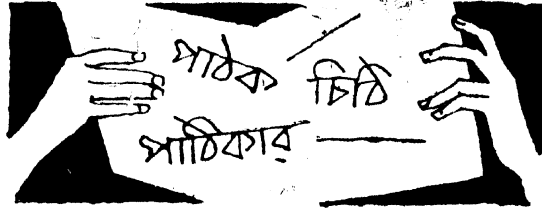
পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়—

আমি 'মাসিক বসুমতীর' একজন অনুরাগী পাঠিকা। 'মাসিক বসুমতীর' প্রতিটি রচনা আমি পড়ে থাকি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথেই এবং আমার অত্যন্ত ভালো লাগে পড়ে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৭) মাসে শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'চলার পথে' নামক ভ্রমণ কাহিনীটি পড়ে কয়েকটি কথা না লিখে কিছুতেই পারছি না। লেখকের সাইকেলযোগে সকল বিপদাশঙ্কা তুচ্ছ করে দুর্গম পথসমূহ অতিক্রমের প্রয়াস বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ততোধিক প্রশংসনীয় লেখনীর মাধ্যমে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে পাঠকের সামনে পরিবেশনের প্রচেষ্টা। লেখকের লিপিকুশলতায় ভ্রমণ কাহিনীটি সত্যিই উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু লেখক একস্থানে খাসিয়া এবং মণিপুরীদের সম্বন্ধে যে কয়টি লাইন লিখেছেন, তার প্রতিবাদকল্পেই এই পত্র লেখা। এখানে বলা প্রয়োজন যে আমি নিজে মণিপুরী এবং মানুষ হয়েছি শৈশবকাল থেকেই শিলঙে থেকে। কাজেই উপরোক্ত দুই জাতি সম্পর্কে আমার জ্ঞান লেখক অপেক্ষা অধিক বলা যায়। লেখক খাসিয়াদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি—"এদের পুরুষেরা অধিকাংশ খাকির হাফপ্যান্ট এবং কালো ফতুয়া পরে, মাথায় কালো ফেজের মত টুপী একটা আঁটে, কতকটা নেপালীর মত কিন্তু লম্বা টিকি এদের মাথায় নাই। এরকম পোষাক গারো, লুসাই, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, মণিপুরী ও নাগাদের মধ্যে চলন আছে। যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের সাধারণতঃ কোটপ্যান্ট পরতে দেখেছি। মেয়েদের পরিচ্ছদ তাজ্জব ধরনের। আমি যে কয়টি জায়গার নাম উল্লেখ করছি, তাদের কথাই বলছি। কালোর ওপর লাল ডোরাকাটা ব্লাউজ পরে আর কোমরে একটা মোটা রকমের লম্বা ওড়নার মতন জড়িয়ে যায়, যারা একটু শিক্ষিতা তারা ঐ ওড়না একটু দামী গোছের ব্যবহার করে আর তার সঙ্গে পেটকাটা ব্লাউজ ও বডিস ব্যবহার করে, এদের হাতে মাঝে মাঝে ভ্যানিটি ব্যাগ দেখা যায়।" লেখক হয়ত তাঁর বর্ণিত পোষাক পরা খাসিয়া পুরুষদেরই দেখেছেন। কিন্তু যতদূর জানি খাসিয়ারা লম্বা প্যান্টই বেশী পরে। শিলঙের মত শীতপ্রধান জায়গায় লম্বা প্যান্ট পরাটাই স্বাভাবিক। কয়েকজন হাফপ্যান্ট পরলেও তা যে খাকি বেশী তা বলা উচিত নয়, অন্যান্য রঙের প্যান্টও তারা পরে। আর খাসিয়ারা টুপী পরে নানা রকমের। অনেকে টুপী মোটেই পরে না। শিক্ষিত এবং সহরবাসীদের মাঝে শতকরা ২।১ জনের মাথায় মাত্র টুপী দেখা যায়। টুপী দেখা যায় তাদের মাথায় যারা গ্রাম্য, অশিক্ষিত, দিনমজুরী করে এবং বাজারে বসে। লেখকের বর্ণিত খাসিয়াদের ন্যায় পোষাকে মণিপুরী, নাগা, গারো, জয়ন্তিয়া প্রভৃতিদেরও দেখেছেন বলেছেন। অন্যান্য জাতির কথা বলতে পারি না তবে মণিপুরীরা কখনও এরূপ পোষাক পরে না তা জোর করেই বলতে পারি। মণিপুরীদের পোষাকের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিচ্ছি। মণিপুরী ছেলেরা বাড়ীতে সাধারণতঃ বেশ বড়, প্রায় ধুতির মত গামছা পরে। তাছাড়া ধুতিই হল তাদের প্রধান পোষাক। অবশ্য বর্তমানে অন্যান্য প্রদেশের মত ছেলেদের অধিকাংশকেই কোটপ্যান্ট পরতে দেখা যায়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে মণিপুরীরা কখনও টুপী পরে না। আর উৎসবাদিতে তারা সকলেই ধুতি পরে উপস্থিত থাকে, তখন প্যান্ট পরা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়।

এখন খাসিয়া মেয়েদের পোষাকের কথায় আসি। লেখক খাসিয়া মেয়েদের পোষাকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যে অত্যন্ত ভুল করেই দিয়েছেন তা বুঝতে পারছি। আসামে বহু জাতির বাস। তাই দিন দুয়েকের জন্য আগত বিদেশীর পক্ষে এক জাতির ভাষা, আচার ব্যবহার এবং পোষাককে অন্য জাতির বলে ভ্রম করা মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। এখানে লেখক যে পোষাকের কথা লিখেছেন সে পোষাকে খাসিয়া মেয়েদের কখনও দেখা যাবে না। লুসাই মেয়েদের পোষাককেই লেখক খাসিয়া মেয়েদের পোষাক বলে ধরেছেন। তবে সাধারণ মেয়েরা কালোর ওপর লাল ডোরাকাটা ব্লাউজ পরবে কি শিক্ষিতারা পেটকাটা ব্লাউজ পরবে এ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। রুচি, শিক্ষা এবং ধনীদরিদ্রের প্রকারভেদে সেটার প্রকারভেদ হয়ে থাকে, যেমন হয়ে থাকে বাঙালী মেয়েদের শাড়ী ব্লাউজের মধ্যে। খাসিয়া মেয়েরা সকলেই পরে লম্বা ফ্রক। তার ওপরে কাঁধের ওপর দুদিকে দুটো চারকোণা কাপড় বগলের নীচ দিক দিয়ে এনে বেঁধে রাখে। তার ওপরে একটা ছোট গোছের চাদরে ঘোমটা দিয়ে সামনে এনে তারপরে পেছনে টেনে গলায় পেছনে বেঁধে রাখে। এই হল অধিকাংশ খাসিয়া মেয়েদের, যারা খেটে খায় তাদের পোষাক। আর যারা শিক্ষিতা ও আধুনিকা অর্থাৎ কলেজে পড়ে অথবা চাকরী করে তারা তার ওপরেও একখানা বড় গরম চাদর কাঁধের কাছ দিয়ে সামনে এনে বুকের কাছে বেঁধে রাখে। আর ছোট মেয়েরা ফ্রকের ওপর একটা ছোট চাদরে ঘোমটা দিয়ে সামনে এনে পেছনে টেনে বাঁধে। খাসিয়া মেয়েদের এরূপ গরম আর ভারী পোষাক পরার কারণ—শিলং অত্যন্ত শীতপ্রধান জায়গা যেটা তাদের বাসস্থান। মণিপুরী মেয়েরা পরে ব্লাউজ ও নীচে লুঙ্গীর মত একখানা মোটা কাপড়, তার ওপরে ওড়না দেয়। এখানেও প্রত্যেক জাতের মধ্যে যেমন দেখা যায় সেভাবে বয়স, অবস্থা এবং রুচির প্রকারভেদে পোষাকেরও এদিক ওদিক হতে পারে। এইত গেল পোষাকের কথা। এখন খাসিয়া মণিপুরীদের সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখক যাহা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে

কিছু বক্তব্য আছে। খাসিয়াদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত বর্ণনাটির বিরুদ্ধে বলার বিশেষ কিছু নেই। হ্যাঁ, এদের সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্যটাই বেশী। এক কথায় এদের সমাজকে Matriarchal Pattern of Society বলা চলে। কারণ বিয়ের পর মেয়েদের পরিবর্ত্তে পুরুষেরাই যায় স্ত্রীর ঘরে। তাছাড়া স্ত্রী পায় সম্পত্তি। দোকানে এবং বাজারে বসে অধিকাংশ মেয়েরাই। কিন্তু কাঠ কাটা এবং রান্না করা ব্যতীত পুরুষের আর কাজ নেই বলা উচিত নয়। বহু পুরুষেরাও চাকরী করে, বাজারে বসে এবং অন্যান্ত বহু কাজও করে। এর পর মণিপুরীদের সামাজিক আদব-কায়দা সম্পর্কে লেখক যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন সেটা পড়ে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। লেখক লিখেছেন, মণিপুরীদের অতিথি হলাম। গ্রামসেবক আমায় আশ্রয় দিল। আমার আসার খবর দিল সারা মহল্লায়। দুন্দুভি বেজে উঠল, বাজল মাদল। লোকনৃত্যের মহড়া চলল কিছুক্ষণ। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের অভিনয় হল। কেঁদো সেদ্ধ মদ খাইয়ে ঘণ্টা দুই ধরে আনন্দের বন্যা বহে গেল যোয়ার বনে। পরের দিন সকালে এ রহস্যের তথ্য আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্য্যার রীতি এদের এইরকম—কুমারী মেয়ের ভাগ্যে যদি একশটি অতিথি বরণ করার সৌভাগ্য ঘটে তবে তিনি সতী পুণ্যবতী। আমি নিজে মণিপুরী কিন্তু মণিপুরীদের মাঝে এরূপ কোন রীতি আছে বলে জানিনা। লেখক হয়ত জানেন না যে মণিপুরীরা হিন্দু, তার ওপরে বৈষ্ণব। মদ ত দূরের কথা, মাংস ডিম খাওয়া পর্য্যন্ত তাদের সমাজে নিষিদ্ধ। মণিপুরে বহু বাঙ্গালীর বাস, তারা একথা ভালভাবেই জানেন। তবে প্রত্যেক সমাজেই যেমন আছে তেমনি মণিপুরেও কতকগুলি বেপরোয়া ছেলে মাংস ডিম খায় এবং মাঝে মাঝে লুকিয়ে মদও খেতে পারে। সেটা হল ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু প্রকাশ্যে এভাবে মদ খেয়ে হুল্লোড় করা মণিপুরী সমাজে কল্পনাও করা যায় না। এসম্পর্কে মণিপুরীরা এমন গোঁড়া যে কয়েক বছর পূর্ব্বেও কেউ মদ স্পর্শ করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত এবং প্রায়শ্চিত্ত করার পরে তাকে ক্ষমা করা হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুররাজ্যের চারদিকে বহু পার্ব্বত্যজাতির বাস। আমার মনে হয় লেখক যখন লিখেছেন তখন নিশ্চয় ঘটেছিল এরূপ ঘটনা, কিন্তু তিনি কখনও মণিপুরীর বাসায় থাকেননি, কোন পার্ব্বত্যজাতির মাঝে থেকেছিলেন। যে কোন লেখকেরই কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করার পূর্ব্বে —সে মন্তব্য ভালই হউক আর মন্দই হোক—উহার সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাচাই করে দেখা উচিত মনে করি। ভুল তথ্য পরিবেশন করার ফলে যে জাতির সম্বন্ধে লেখা হয় শুধু তার প্রতিই অবিচার করা হয়না। পাঠক-পাঠিকারও তাতে বহু ক্ষতি হয়। উপরন্তু যে কাগজে সে রচনা বেরোয় সে কাগজেরও বদনাম রটে। আর দু-একদিন থাকার পরে সে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে কোন কিছু লেখাও চলেনা; সে যত অল্প কথাই হোক। স্বীকার করি, লেখক ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, কোন জাতির সম্বন্ধে কিছু লিখেননি। কিন্তু সে ভ্রমণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে কোন জাতির কথা যখন আসবে তখন সেটা চিন্তা করে লেখা উচিত নয় কি? ভবদীয়া মিসেস ঊষা দেবী—ঢাকুরিয়া কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith Rs. 15/- only as subscription to M. Basumati.—Maharani Adhirani Sahiba, Baster, Madhya Pradesh.

Kindly continue to send Masik Basumati for a further period of one year.—Lilaboti Mukherji, Kanpur.

মাসিক বসুমতী পত্রিকার ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম।—মীনাক্ষী চৌধুরী, ধানবাদ।

Herewith sent Rs. 15/- as annual subscription for Monthly Basumati from Baisakh this year. —Saraswati Panigrahi, Puri.

মাসিক বসুমতীর জন্ত বাংলা ১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইতেছি।—মঞ্জুলা মিত্র, ফিরোজাবাদ, আগ্রা।

Herewith please find subscription for six months from Baisakh to Aswin for the current year.—Sm. Niharika Roy, Delhi.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম।—মীরা আচ্য, পুরী।

I send herewith Rs. 15/- for annual subscription of Masik Basumati.—Baghjan Indian Club, Assam.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন অবধি ছয় মাসের।—ঊষা মুখার্জ্জী, প্রতাপগড়, ইউ-পি।

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭.৫০ পাঠাইলাম। —রেবারাণী সমাদ্দার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। —অনীতা দাস, পাটনা।

Remitting herewith Rs. 15/- being the annual subscription of Monthly Basumati from Baisakh 1367 B.S.—Sm. Arati Rani Seriha, Chanda Maharastra.

মাসিক বসুমতীর আগামী ছয় মাসের চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইতেছি।—অপর্ণা সান্তাল, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সনের গ্রাহকমূল্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—শ্রীমতী বিভা মুখার্জ্জী, দিল্লী।

Please find herewith Rs. 15/- towards advance subscription for Masik Basumati for the year 1367 B.S.—Mrs. C. Kar, M. Sc. Goalpara, Assam.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী সুজাতা রায়, মালদহ।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী বীণা দত্ত, আমেদাবাদ।

Remitting herewith Rs. 7·50 being subscription of Monthly Basumati *from Baisakh* to Aswin. —Mrs. Ava Biswas B. A. (Hons) Hazaribagh.

বৈশাখ মাস থেকে এক বৎসরের গ্রাহকমূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—অপর্ণা ত্রিবেদী, বোম্বাই।

আমার দেয় মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭৷৷৹ টাকা পাঠাইলাম।—তৃপ্তি বসু, লক্ষ্ণৌ।

Have been impressed watching progress of Masik Basumati year to year. Kindly renew my subscription from Baisakh.—Miss Mahasveta Dutta, Sholapur, Maharastra.

Remitted Rs. 7·50 being half-yearly subscription for the magazine Monthly Basumati.—Mrs. Mayarani Das, Tripura.

I am sending herewith Rs. 15/- as the subscription of Monthly Basumati.—Begum Akhter Unessa, Barharwa, (S.P.)

বর্ত্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠালাম। —শ্রীমতী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, দার্জ্জিলিঙ।

I am sending 7·50 as subscription from Baisakh to Aswin.—Susama Chowdhury, Bolpur.

Sending herewith Rs. 7·50 being the amount for the subscription for six months.—Sm. Kamala Roy, Mehsena.

ছয় মাসের মাসিক বসুমতী পত্রিকার মূল্য পাঠাইলাম। ১৩৬৭ সনের বৈশাখ হইতে যথারীতি পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। —শ্রীহেমলতা দেবী, জলপাইগুড়ি।

চলতি বৎসরের গ্রাহকমূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—মায়া দাশগুপ্ত, আসাম।

Please find herewith Rs. 10·50 nP. being the half yearly subscription including registration fee *of your monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly by registered post.—Sadhana Aditya, N. H. T. A.*

মাসিক বসুমতীর বৈশাখ হইতে চৈত্র (১৩৬৭) পর্য্যন্ত এক বৎসরের চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীবন্দনা বড়ুয়া, কলিকাতা।

Herewith please find the annual subscription of Masik Basumati for 1367 B.S.—Pratima Moitra, Assam.

বসুমতী মাসিক পত্রিকার (১৩৬৭) জন্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম। —মায়ারাণী রক্ষিত, বোম্বাই।

১৩৬৭ সালের চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমণিমালা ঘোষ, ধানবাদ।

Sending herewith Rs. 7·50 being the subscription (Renewal) for the next six months from Baisakh.—Mrs. Amola Mukherjee, Darbhanga.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—Rina Roy, Jalpaiguri.

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Nirmala Roy, Lucknow.

১৫৲ টাকা মণি অর্ডার যোগে পাঠালাম। দয়া করিয়া আমাকে বৈশাখ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকাশ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। —মঞ্জু দত্ত, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠালে বাধিত হব।—মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য, কাটমণ্ডু, নেপাল।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র অবধি মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠালাম।—শ্রীমতী রমারাণী মিত্র, দিল্লী।

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের মূল্য বাবদ ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত, নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া সুখী করিবেন।—রাণু সেন, সম্বলপুর।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ২৪৲
ষাণ্মাসিক "	— ১২৲
প্রতি সংখ্যা "	— ২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	— ১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	— ৭·৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	— ১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	— ২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	— ১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	— ১·৭৫

(তৈলচিত্র)

বিদ্যুল্লতা
—শ্রীবি, বি, পালচৌধুরী অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৯শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৭] ॥ স্থাপি ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

হিন্দু কি জড়োপাসক ?

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেহের অঙ্গ বিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না, তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজ-কালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে (gneous principle) জড় বলিয়া জানেন, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া বুঝিতেন। আজ-কাল‌কার পাশ্চাত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চেতনাযুক্ত।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে। এই প্রণবমন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্যসম্বন্ধরহিত, ইহা তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণবমন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাযুক্ত।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি গাঁয়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শহীদ খুদিরাম ও কুসুম মাসী

অমিয় ভট্টাচার্য্য

এক

শহীদ খুদিরাম অনির্ব্বাণ বহ্নিশিখা। যতদিন স্বাধীন-ভারত বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন খুদিরামকে কেউ ভুলবে না। খুদিরাম বিপ্লবের অবিনশ্বর ভাব-মূর্তি। কিন্তু খুদিরামের জ্বালা আগুন বুকে করে যে মহীয়সী নারী তিলে তিলে দগ্ধ হল সকলের অগোচরে, স্বয়ং খুদিরামের কাছেও যার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল না,—সেই কুসুম মাসীকে না জানলে, খুদিরামের জীবনের তথা বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বাঙ্গালীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। আজ তার কথা বলতেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

দুই

১৯০৫ সাল। ঋষি অরবিন্দের নির্দ্দেশে গঠিত গুপ্ত সমিতি মেদিনীপুরের কর্ণেলগোলা মহল্লায় সভ্যসংখ্যায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই গুপ্তচক্রের নাম দেওয়া হয়েছে, 'আনন্দমঠ।' একটা চালাঘরে 'সন্তানেরা' কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। নগ্না, রক্ত-বসনা, খর্ব্বাকৃতি, মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি, গভীর নিশীথে ভক্তদের পূজা সুরু হয়। এই পূজার পদ্ধতিও অপরূপ; মাথায় শ্রীমদ্ভগবতগীতা ও হাতে তরবারি নিয়ে বামজানু মাটিতে পেতে সিংহের শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপরূপ ভঙ্গীতে ভক্তেরা শপথ গ্রহণ করে। তারপর আলোচনা চলে দেশোদ্ধারের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার, আর পাঠ করা হয় 'মুক্তি কোন্ পথে', 'ভারতে রণনীতি', 'ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডীর জীবন-কথা', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ।

খুদিরামের ভাগিনেয় ও বাল্যসঙ্গী
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়

এই মুক্তিযজ্ঞের হোতা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু,—পুরোহিত তাঁর সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উদগাতা,—বিপ্লবীদলের তৎকালীন নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

আর খুদিরাম এই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত-জীবন এক দুর্দ্দম ঋত্বিক।

তিন

খুদিরাম তখন মেদিনীপুর মাণিকপুর মহল্লায় তার ভগিনীপতি অমৃতলাল রায়ের বাড়ীতে থাকত। ঐ বাড়ীর সদর মহল ও অন্দরমহলের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান ছিল। খুদিরাম ও তার ভাগিনেয় ও বাল্যসঙ্গী ললিতমোহন থাকত ঐ সদর মহলের একটা কুঠুরীতে।

মাণিকপুর থেকে কর্ণেলগোলার গুপ্ত সমিতির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। খুদিরাম রোজ সন্ধ্যায় সমিতির চালাঘরে উপস্থিত হত, কাজ সেরে নতুন জীবনের সঞ্চয় নিয়ে যখন গভীর রাত্রে বাসায় ফিরত, মাণিকপুরের পল্লী অঞ্চলে তখন জীবনের কোন সাড়া থাকত না। অন্দরমহলে মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী দিদি অপরূপা দেবী (যিনি খুদিরামের কীর্ত্তিকলাপ সবই জানতেন,—অথচ প্রকাশ করতেন না) সেলাই হাতে নিয়ে জেগে বসে থাকতেন, আর সদর-মহলের কুঠুরীতে ললিতের ধর্ম্মাক্ত প্রতীক্ষা নিদ্রায় অবসন্ন হয়ে পড়ত। তারপর অকস্মাৎ সেই কুঠুরীর দরজায় বাজত খুদিরামের মৃদু করাঘাত। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু চোখে ললিত দরজা খুলে দিত, মাঝে মাঝে বিরক্তির সুরে বলে উঠত: 'তোমরা দেশোদ্ধার তো অমনিই করবে বুঝতে পারছি,—মাঝখান থেকে আমরা আর কতকাল তোমার জন্য না খেয়ে রাত জাগব, বলত?'

হেসে বলত খুদিরাম:—'খুব কষ্ট হয়, না রে! তা, কি করবো বল্? রাত জাগা তো নয়, রাতের তপস্যা; ঐ তপস্যা না হলে মুক্তির প্রভাত আসবে কেমন করে?'

চার

এমনি করেই দিন যায়, প্রতীক্ষার রাতও গড়িয়ে চলে।

অবশেষে, একবার অপরূপা দেবীকে বিশেষ কাজে তাঁদের হাটবোহিয়ার গ্রামের বাড়ীতে যেতে হল। মাণিকপুরের বাড়ীতে রন্ধনের ভার পড়ল রামধন পাণ্ডা নামধেয় এক উৎকলবাসী পাচকের উপর।

মেদিনীপুর বার্জটাউনে খুদিরামের আবক্ষমূর্তি

অমৃতবাবুর বাটীর সম্মুখ ভাগ (এই বাটীতে খুদিরাম থাকতেন)

অপরূপা দেবী যা পারতেন, বেতনভুক পাচক তা পারবে কেন? সে স্পষ্ট বলে দিল,—খুদিরামের জন্য অত বেশী রাত ভাত নিয়ে বসে থাকতে পারবে না।

খুদিরাম বলল :—'বেশ। তোমাকে রাত জাগতে হবে না। তুমি রাত দশটার মধ্যে রান্না শেষ করে আমার আর হাবলের (ললিতের ডাক নাম) খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে আড্ডায় চলে যেয়ো।' রামধন তাই করল। রোজ রাত দশটায় সে চলে যায়। খাবার ঢাকা থাকে অন্দর মহলে। গৃহকর্তা অমৃতবাবু জানতেও পারেন না, কখন জাগ্রত প্রহরী ললিত খুদিরামকে দরজা খুলে দিয়ে অন্দর মহলে নিয়ে আসে, আর কখনই বা তারা খাওয়া শেষ ক'রে সদর মহলে ফিরে যায়।

এক রাতে ঘটল বিপত্তি। খুদিরামকে নিয়ে অন্দরে এসে সবিস্ময়ে ললিত দেখল—বেড়াল এসে ঢাকা খুলে ফেলে সব খাবার খেয়ে গেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ঘরেও কিছু নেই। অথচ দুজনেই ক্ষুধায় অবসন্ন।

খুদিরাম স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস ভঙ্গীতে বলল : 'তা ভালই হল রে হাবল। মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভাল। শরীর ভাল থাকে। আজ না খেয়েই থাকা যাক্, কি বলিস্। একটা রাতই তো।'

চাপা ক্রোধে গর্জ্জে উঠল ললিত : 'তোমরা সন্তানের দল। তোমরা দেশোদ্ধার করবে,—সবই তোমরা পারো মামা! কিন্তু আমাদের খিদে প্রচণ্ড,—। বসে থাকতে পারব না। চলো বেরিয়ে পড়ি, দোকান থেকেই খাবার টাবার কিছু খেয়ে আসি।'

দুটি কিশোর বেরিয়ে পড়ল খাবারের অন্বেষণে সেই গভীর রাত্রে অন্ধকার পল্লী-পথে।

কোথায় খাবার? দোকান সব বন্ধ। ললিত রাগে গজ গজ করছে। খুদিরাম হাসছে। বলছে : 'বললাম, উপোস দিতে এক রাত। পারলি নে তো। এখন বোঝো,—কেমন মজা।'

হঠাৎ পাশের কুটীরের ভেজানো দরজা খুলে গেল। দেখা দিল এক নারীমূর্ত্তি।

—'কে রে তোরা, এত রাতে?'

—ললিত চমকে উঠল 'ঐ তো! ঐ তো কুসুম মাসী! ঠিক হয়েছে! তাইতো মনেই হয় নি তার কথা।'

পাঁচ

কুসুমকুমারী থাকত অমৃতবাবুর বাসার পশ্চিম দিকে, একটি মাটির ঘরে। উদ্ভিন্ন-যৌবনা, বালবিধবা। যে নারীর আশ্রয়ে সে বাস করত, পল্লীতে তার দুর্নাম ছিল পতিতা বলে, তবুও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে কুসুমকে খুবই ভালোবাসতেন অপরূপা দেবী, এবং সেই ভালোবাসার টানে কুসুমের অবাধ যাতায়াত ছিল অমৃতবাবুর বাড়ীতে। কুসুমের দিদি সম্বোধনে অপরূপা দেবী পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। আভিজাত্যের কৌলীন্য স্নেহের রসে অভিষিক্ত হয়ে এক অপূর্ব্ব মমতার যোগসূত্র রচনা করেছিল দুইটি নারীর মধ্যে।

ডালের বড়ী বিক্রী করে কুসুম জীবিকা নির্ব্বাহ করত। তাই অনেক রাত পর্য্যন্ত তাকে ডাল বাঁটতে হত।

কুসুমও রাত জাগে। খুদিরামও রাত জাগে। কুসুম রাত জেগে ডাল বাঁটে—আর খুদিরাম রাত জেগে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে।

আর, এমনি করেই রাতের পর রাত কাটে।

ছয়

কুসুম বলল : এসো, দুজনে ভেতরে এস। খাবার আছে। দুজনেরই হবে।...লজ্জা কি? এসো, খাবে এসো।

খুদিরাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন দেখছে কুসুমের দিকে চেয়ে। লণ্ঠনের স্বল্প আলোকে চিক চিক করছে কুসুমের হাতে কি ওগুলো?

ললিত অস্থির হয়ে উঠেছে : মামা, চলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কুসুম মাসী ডাকছে। খেয়ে আসি চলো।

খুদিরামের দিকে চেয়ে এবার ললিত আর কিছু বলতে পারল না। বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা খুদিরামের মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে এক উদ্ধত প্রতিবাদের মত ঝলসে উঠেছে। সে মুখের দিকে চেয়ে থাকা যায় না।

ডগরা পুকুর

ইসারায় দেখিয়ে দিল খুদিরাম—কুসুম মাসীর হাতে বিলিতী কাচের চুড়ী।
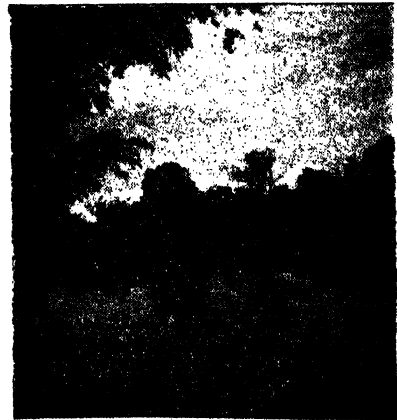
বিলিতী চুড়ী যে পরে, তার দেওয়া খাবার গিলবে খুদিরাম? তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো।

খুদিরামের ভাবান্তর ও রূপান্তর কুসুম মাসীর দৃষ্টি এড়ায়নি। হঠাৎ হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল কুসুম। তারই সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠলো চুড়ীগুলি।

বলল: ও, তাই বল।

হঠাৎ ভিতরে গিয়ে কুসুম নিয়ে এল লোহার জাঁতি। ঠুন্ ঠুন্ শব্দে ভেঙ্গে ফেলল দু' হাতের সব ক'গাছা কাচের চুড়ী। নিস্তব্ধ রাতে সেই ঠুন ঠুন শব্দ চারদিকে যেন এক আবেশময় মুক্তি-সঙ্গীত ছড়িয়ে দিল।

আবার হেসে উঠল কুসুম: এইবার হল ত। বাবা: আমিও বাঁচলুম। এইবার খাবে তো আমার হাতে?

আর তো আপদ নেই।

খুদিরাম, ললিত, দুজনকেই কে যেন যাদুমন্ত্রে ঘরে ঢুকিয়ে নিল, আর যাদুমন্ত্রেই যেন দুজনে কুসুম মাসীর পরিবেশিত খাবার নিঃশেষ করে দিল।

বাসায় ফিরে এসে খুদিরাম কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ললিত বলল: কি হয়েছে, মামা?

রুদ্ধ কণ্ঠে বলল খুদিরাম: কুসুম মাসীর আজ উপোস রে। সব খাবার আমাদের ঢেলে দিল। আমাদের জন্ত একটি মেয়ে আজ অনাহারে রইল। আমি সব সইতে পারি, মায়ের জাতের কষ্ট সইতে পারি না। আজ যদি দিদি না খেয়ে থাকতেন, সইতে পারতাম আমি?··খুদিরামের কণ্ঠ অশ্রুকম্পে রুদ্ধ হল।

সে জানত না, কুসুম মাসীর সে রাতের উপবাস, দীক্ষার রাতের উপবাস, স্বদেশসেবার মন্ত্রে নবজীবনের উদ্বোধন।

সাত

ঐ একটি রাত কুসুম মাসীর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। খুদিরামের সঙ্গে তার দেখা হত না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু অপরূপা দেবী ফিরে এলে তাঁকে বলেছিল কুসুম: দিদি, খুদিদা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি পথ চিনেছি।
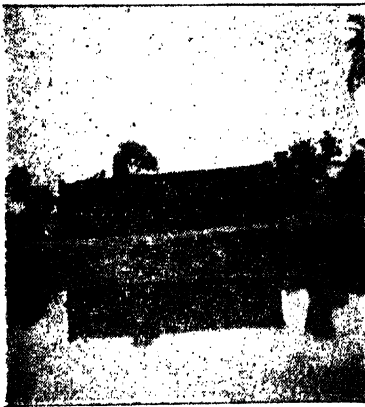
অমৃতবাবুর বাড়ী সংলগ্ন খিড়কী পুকুর

বড়ী বেচে এতদিন যা সঞ্চয় করেছিল, তাই দিয়ে কুসুম কিনল তাঁতের শাড়ী, বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখা, দেশজাত নানারকম প্রসাধন-সামগ্রী। সেগুলি বেচতে সুরু করল অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের কাছে। নিজের ভরণ-পোষণের জন্ত লভ্যাংশের সামান্ত কিছু রেখে বাকীটা দান করতে সুরু করল তদানীন্তন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান 'ছাত্রভাণ্ডারে'। সঙ্গে সঙ্গে চলল তার দেশাত্মবোধে নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার সাধনা, এক অনাড়ম্বর নিঃশব্দ অভিযানে।

ললিত বলল খুদিরামকে: মামা, শুনেছ? কুসুম মাসী গোপনে গোপনে কি সুন্দর কাজ করছে! ওকে একটু উৎসাহ দাও না তুমি, বেচারী একটু উৎসাহ পেলে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে দেশের কাজ করবে।

হেসে বলল খুদিরাম: পাগল! উৎসাহের দরকার কি? শক্তি যখন জেগে উঠেছে, তখন আপনিই সে পথ করে নেবে, তা'ছাড়া উৎসাহ না পেয়েও যারা দেশের কাজে লেগে থাকে, তারাই তো খাঁটি দেশপ্রেমিক।

আট

এই নারীর জীবনে খুদিরামের দেখা আর মিলল না। ঝড়ের মত এক রাতে এসে যে বীর কুসুমের পুরনো জীবন উড়িয়ে নিয়ে নতুন জীবনের তোরণ-দ্বার খুলে দিয়েছিল তার সম্মুখে, ঝড়ের মতনই আবার আর এক রাতে সে চলে গেল এক বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে আগুন নিয়ে হোলি খেলতে, আগুন ছড়াতে গোটা দেশে। ১৯০৮ সালের ১লা মে মজঃফরপুরে মিস্ কেনেডি ও মিসেস্ কেনেডির হত্যায় সেই খেলার শেষ।

আর ৩রা মে মেদিনীপুরের কয়েকটি বাড়ীতে একই সঙ্গে সুরু হল পুলিশী তল্লাস ও ধরপাকড়।

সেদিন মাণিকপুরের বাসায় ছিলেন অমৃতবাবু ও তাঁর ভাই শরৎ। অপরূপা দেবী নেই, পরিজনবর্গের কেউই নেই। মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে সবাই গ্রামের বাড়ীতে চলে গেছেন।

পুলিশ-ইন্সপেক্টর লালমোহন গুহ এসে অমৃতবাবুকে জানালেন—তাঁর বাড়ী খানাতল্লাস হবে।

সন্ত্রস্ত অমৃতবাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন: বেশ। যান বাড়ীর ভেতরে, কেউ নেই।

কুসুম সবই শুনছিল আড়াল থেকে। ত্বরিতপদে বাসায় গিয়ে ফিরে এল এক নতুন বেশে। এ সে কুসুম মাসী নয়, নয় এ সেই কৃচ্ছসাধনরতা দেশপ্রেমিকা কৃশাঙ্গী তাপসী, এ এক লাবণ্যময়ী মোহময়ী স্বৈরিণীর বেশ। মাটির কলসী নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় ইন্সপেক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল।

: আমি একটু খিড়কী পুকুর থেকে জল নেবো বড় বাবু, আমায় একটু বাড়ীর ভেতর যেতে দেবেন?

চোখে অপরূপ কটাক্ষ—নারীর সেই চিরন্তনী বিভ্রমোৎপাদিনী শক্তি।

ইন্সপেক্টর তখন অমৃতবাবুর কাছ থেকে খুদিরাম সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করছিলেন। কুসুমের দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণের জন্ত নির্ব্বাক্ হয়ে রইলেন। অপরূপ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক

উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী—গাগরী ভরণে যেন এক নাগরী চলেছে রূপের মাধুরী বর্ষণ করতে করতে।

রূপ-বিহ্বল ইন্সপেক্টর মৃদু হেসে অনুমতি দিলেন: তাড়াতাড়ি খিড়কী পুকুর থেকে জল নিয়ে চলে আসবে। দেরী কর না কিন্তু।

কোমর দুলিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল কুসুম অন্দরে। অন্দর পার হয়ে খিড়কী পুকুর।

পথেই শরতের সঙ্গে দেখা। ব্যস্তভাবে কুসুম বলল: শুনুন দাদাবাবু! খুদিদার ঘরটা আমায় তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিন। একটুও দেরী করবেন না। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

শরৎবাবু মন্ত্রচালিতের মত কুসুমকে খুদিরামের ঘরে নিয়ে গেলেন। উন্মত্তের মত বিস্রস্তবেশা কুসুম সারা ঘর হাতড়াতে লাগল। অবশেষে লেপের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বের করলো একটা রিভলভার।

শরৎবাবু স্তম্ভিত, আড়ষ্ট, নির্বাক্‌। একি সর্বনাশ! রিভলভার এখানে এল কোথেকে? 'Young America—Double Action'—গায়ে-লেখা রিভলভার। থর-থর করে কাঁপছে শরতের দেহ। কুসুম শরৎকে উপেক্ষা করে চক্ষের পলকে রিভলভারটি রেখে দিল তার কলসীতে। তারপর খিড়কী পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে কলসী কাঁখে পূর্ব্বের মতই হাসি ছড়াতে ছড়াতে নৃত্যের ভঙ্গীতে কর্ম্মব্যস্ত ইন্সপেক্টরের চোখে ধূলো দিয়ে সদর মহল দিয়ে বেরিয়ে গেল। খিড়কী পুকুরে কুসুম রিভলভারটি ফেলতে পারেনি। কেন না, তার চারদিকে বহু পুলিশ-কনষ্টেবল টহল দিচ্ছিল। জল-ভরা কলসীর মধ্যে অস্ত্রটি নিয়ে কুসুম গেল সদর মহলের সামনেকার রাস্তা পেরিয়ে ডগরা পুকুরে, সেখানেই নিক্ষেপ করল খুদিরামের সেই রিভলভার লোকচক্ষুর অগোচরে।

অনেক মহীয়সী নারীর কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়েছি। সোনার অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের নাম। তাঁদের আমরা পূজা করি, তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ করি প্রতি বৎসরে। কিন্তু এই নিরক্ষরা, বুদ্ধিহীনা যুবতীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে সেদিন একটা পরিবারের তথা জাতির সম্মান যেভাবে রক্ষা পেল, তাও কি আমরা উপলব্ধি করব না অন্তর দিয়ে? বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। হয়ত কোনদিনই এই নারীকে আমরা প্রকৃত মর্য্যাদা দিতে পারব না।

(তারাশঙ্কর বাবু! মনে পড়ে আপনার 'ধাত্রীদেবতা'র সেই নীচকুলোদ্ভবা মহীয়সী মেথরাণীকে। সেও তো হারিয়ে গেছে শত শত শহীদের স্মৃতিস্তূপে!)

আজও হয়ত ডগরা-পুকুরে অনুসন্ধান করলে খুদিরামের সেই রিভলভারটি পাওয়া যাবে, কিন্তু কুসুম মাসী তো নিজের বলতে কিছুই রেখে যায়নি তার পেছনে,—আগুন বুকে নিয়ে সে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল,—আগুন বুকে নিয়েই সে দগ্ধ হয়ে গেছে তিলে তিলে! বিস্মৃতির ডগরা-পুকুর থেকে আমরা কি তাকে তুলে ধরব না জাতির সম্মুখে?

নয়

১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট মজঃফরপুরে ফাঁসীর মঞ্চে খুদিরাম জীবনের শেষ জয়গান গেয়ে চিরকালের মত নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তার জ্বালান আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল লেলিহান্‌ শিখায়। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, আলিপুর জেলে নিক্ষিপ্ত

অমৃতবাবুর বাটীর পশ্চাদ্ভাগ

হলেন। মেদিনীপুর সহরে সুরু হল পুলিশী তাণ্ডব। দলে দলে মেদিনীপুরবাসী করল কারাবরণ।

এই আগুনের মহোৎসবে কে মনে রাখবে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখা কুসুম মাসীকে? মনে রেখেছিল একজন। সে খুদিরামের সেই বাল্যসঙ্গী ললিতমোহন।

শুনল ললিত,—কুসুম মাসী দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে একাকিনী শেষক্ষণের প্রতীক্ষা করছে।

সেই মাটির ঘর। নিস্তব্ধ অমাবস্যার রাত। ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলছে। জীর্ণশয্যায় কুসুম মাসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কেউ নেই পাশে। খুদিরামের তৃষিত আত্মা হয়ত ঘুরে ঘুরে খুঁজে ফিরছে তার সিদ্ধিকে, কিন্তু সেও কি মনে রেখেছে কুসুম মাসীকে? যৌবনের সে লাবণ্য অস্তমিত। কৃশতনু কালিমালিপ্ত। চোখে যেন সূর্য্যাস্তের লাল আভা। বসন্ত-গুটিকায় সারা দেহ আচ্ছন্ন।

ললিত ডাকল—মাসি!

হঠাৎ চোখ দুটো ধক্‌ ধক্‌ করে জ্বলে উঠল কুসুম মাসীর। আগুন! আগুন যেন শেষ শিখা বিস্তার করেছে নেভবার আগে! ললিতের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রলাপের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠল কুসুম: আগুন! আগুন! সবদিকেই আগুন জ্বলছে। ওই ত্যাখ, সবদিকেই খুদেদার মুখ আগুনের দড়িতে ঝুলছে,—আগুন ঐ ছড়িয়ে গেল সারা দেশে—আমি দেখতে পাচ্ছি—ত্যাখ,—ত্যাখ,...

কথা শেষ হল না। একবার সারা দেহ তীব্র আবেগে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

* * * *

আগুন জ্বলল দেশে। আগুনের শেষও হল। এল শান্তি। এল স্বাধীনতা। শুধু কুসুম মাসী তার বুকের আগুনে দগ্ধ হল অপরিচয়ের অন্তরালে। কেউ কি তাকে জাতির সম্মুখে তুলে ধরবে না শহীদের মর্য্যাদায়? *

---

* এই কাহিনী আমি শহীদ খুদিরামের ভাগিনের ও বাল্যসঙ্গী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়ের মুখে শুনেছি। তাঁকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।—লেখক।

অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা অপূর্ব শক্তি ও হাস্যকর চাপল্যের অদ্ভুত সমন্বয়। একদিকে তাঁর রচনায় যেমন গভীরতম পাণ্ডিত্য ও বিস্ময়কর বহিরঙ্গ মাধুর্য্য, অপরদিকে তা আবার অনুচিত তথ্যভারাক্রান্ত ও অনেকাংশে রসসৃষ্টিতে ব্যর্থ। তাঁর "জাতির পাঁতি" ও রবীন্দ্রনাথের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' আদিক কবিতা বা তাঁর 'তাজ' ও রবীন্দ্রনাথের "এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর সাজাহান" আদিক কবিতা পাশাপাশি রাখলেই বুঝতে পারা যায়, তথ্যের অরণ্যে যখন তিনি শ্রান্ত তখন অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথ হ্লাদৈকময়ী কবিতা রচনায় সিদ্ধকাম। মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত অভিযোগ যেমন কিছু পরিমাণে সত্য, অনুবাদের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

সত্যেন্দ্রনাথের গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল যেমন ফরাসী, ফারসী, ইংরাজী সাহিত্যের অভ্যন্তরে, নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যেরও অন্দরমহলে। এ-ভাষাও তাঁর কাছে কেবল অনুসন্ধিৎসা জাগায়নি, অনুবাদের প্রবল প্রেরণাও জুগিয়ে ছিল। আর সে প্রেরণা কোথাও বিস্ময়কর অনুবাদরূপে বাংলায় রূপান্তর লাভ করেছে, কোথাও হাস্যকর দুষ্প্রয়াস রূপে দেখা দিয়েছে। 'কাব্যসঞ্চয়ন'-এ সত্যেন্দ্রনাথের একটি চমৎকার অনুবাদ স্থান পেয়েছে। 'অথর্ব্ববেদ' হ'তে অনূদিত কবিতাটি···তার মূল আমি অথর্ব্ববেদ-এর ইংরাজি অনুবাদ ঘেঁটে কোথাও খুঁজে পাইনি, বোধ হয় ত্রুটি অনুসন্ধান বশতঃ, কিন্তু অনুবাদটি যে সুন্দর কবিতা হয়েছে তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। নিচে 'কাব্যসঞ্চয়ন' ধৃত কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল :—

মাঙ্গলিক

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;
ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্ম্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

—(অথর্ব্ববেদ) : সত্যেন্দ্র দত্ত

আবার উপরি উদ্ধৃত চমৎকার অনুবাদটির পাশে নিচের অনুবাদটি দেখুন, কি পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছে····

"লাবণ্যখনি নিশামণি কি গো পিতা এই বালিকার ?
কিবা সেই আদিরসের রসিক, কুসুম আয়ুধ যার ?
কিবা সে পুষ্পপ্লাবিত চৈত্র ? হেন রূপ নিশ্চয়
বেদ প্রণেতা সে বুড়া ব্রহ্মার সৃষ্টি কখনো নয়।

—রূপসী : কালিদাস : সত্যেন্দ্র

উদ্ধৃত অংশটির মূল "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্" নাটকে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ভাবগম্ভীর উনবিংশ অক্ষর পংক্তিক নিম্নলিখিত কবিতা। লক্ষ্য করার বিষয়, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত না হলেও এখানে অনুবাদে অক্ষরসংখ্যা তার কাছাকাছি। আর 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত'-এ যেমন বার আর উনিশ অক্ষরের পরে যতি পড়ে, এখানেও প্রায় সেই ধরণের যতিপাত হয়েছে। তবে এখানে 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত' ছন্দ অনুসরণের চেষ্টা একেবারেই তিনি করেননি, কারণ অন্যত্র তিনি লঘু-গুরু, অক্ষর সংখ্যা, যতিপাত সকল দিক থেকে 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত' ছন্দকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্"-এর মূল কবিতাটি দেখুন :—

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রোনুকান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ।

অর্থাৎ—

অস্যাঃ (উর্ব্বশ্যাঃ) সর্গবিধৌ প্রজাপতিঃ কান্তিপ্রদঃ চন্দ্রঃ অভূৎ নু ? (কিম্) শৃঙ্গারৈকরসঃ মদনঃ কান্তিপ্রদঃ অভূৎ নু ? (অন্যথা) বেদাভ্যাসজড়ঃ বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলঃ সঃ পুরাণঃ মুনিঃ ইদং মনোহরং রূপং নির্ম্মাতুং কথং প্রভবেৎ ? (ন কদাপি প্রভবেৎ ইতি মে মতিরিত্যর্থঃ)।

কি চমৎকার ভাবগম্ভীর মূল ও কি হাস্যকর তার অনুবাদ! এ কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে যে-ভাবে অনূদিত হয়েছে, তারই প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ :

কান্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এঁর জনয়িতা ?
আদিরস একাশ্রয় স্মর কিগো পিতা ?
কুসুম আকর যেগো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হ'তে ইনি কি গো হলেন প্রকাশ ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যাঁর
প্রত্যাহৃত সকল কামনা,
পুরাণ সে ব্রহ্মামুনি, সৃজিতে পারেন কিগো
অপূর্ব্ব এ রূপসী ললনা ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা অনেক মূলানুগ। তিনি "বেদাভ্যাস জড়ঃ"কে সত্যেন্দ্রনাথের মত "বেদপ্রণেতা" করেন নি এবং তিনি "বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহল :" কথাটি বাদ দেননি সত্যেন্দ্রনাথের মত। ছন্দেও তিনি কিছুটা সহজ ভাবে পয়ার দিয়ে আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর অনুবাদটি কবিতা না হলেও, কবিতা আকারে মোটামুটি অনুবাদ হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথের এ-কবিতাটি না হয়েছে কবিতা, না হয়েছে অনুবাদ।

কালিদাসের 'শকুন্তলা'র "বসন্ততিলক" ছন্দে বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি দেখুন :—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদানন সম্মুখীনা ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ।

আর সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ দেখুন :

নীরবে যদিও রহে বালা আলাপনে,
আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে।

যদিও সাহসে চাহে না সে মুখ পানে।
দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনো খানে।

—পূর্বরাগ : সত্যেন্দ্রনাথ।

লক্ষ্য করার বিষয় সত্যেন্দ্রনাথ চোদ্দ অক্ষর দিয়ে প্রথম কয়েকটি পংক্তি রচনা করেছেন অথচ পয়ার করেননি, ছ-মাত্রার মূল পর্বের মাত্রাবৃত্ত কবিতা করেছেন বলেই শেষের পংক্তিতে অক্ষরে (পয়ার বিচারে) কমতি হ'লেও ছন্দে গলদ নেই। কিন্তু এখানে যে চোদ্দ অক্ষর তা পয়ার না হলেও "বসন্ততিলক"ও নয়, কেন তা চোদ্দ অক্ষরের হ'লেও তার লঘুগুরু ভেদ ও চাল সম্পূর্ণ আলাদা। শকুন্তলার দৃষ্টি যে "অন্তবিষয়া" নয়, অর্থাৎ সে-চোখ যে কেবল ঘুরে দুষ্মন্তের দিকেই আসছে তা সংস্কৃতে স্পষ্ট হ'লেও বাংলায় একেবারে অস্পষ্ট। শকুন্তলার দৃষ্টি কি কোনো খানেই তিষ্ঠেনা—এই কথাটি কালিদাস লিখেছেন?

কালিদাসের 'শকুন্তলা'র চমৎকার প্রাকৃত কবিতাটি স্মরণ করুন—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিম্।
কমলবসইমেত্ত নিবুও মহুঅর বিম্হরিওসি ণং কহং।

সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা অনুবাদটি দেখুন—

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে
আম্রমুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে।
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে?

অনুবাদটি আক্ষরিক করার প্রয়াস পেয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। "অহিণহ মহুলোলুবো" বা "অভিনবমধুলোলুপঃ" সত্যেন্দ্রনাথ সুন্দর অনুবাদ করেছেন। মূলের ন্যায় এখানেও দুবারে 'অলি' ও 'ভ্রমর' কথা ব্যবহার করেছেন যথাক্রমে "মহুলোলুবো" এবং "মহুঅর" (মধুকর)-এর পরিবর্তে। কিন্তু মূলটি যত সুন্দর, অনুবাদ কি তত সুন্দর হয়েছে? মিলের দিক থেকেও এখানে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ এখানে সমস্ত মন দিয়ে অনুবাদ করেননি; কারণ মিল-মিলোনো খেলায় তাঁর জুড়ি নেই। যদি অনুবাদটিকে অবহেলা না করতেন সত্যেন্দ্রনাথ, তাহ'লে এটি একটি চমৎকার অনুবাদ হয়ে দেখা দিত বলে মনে হয়। *

অথচ মন দিলে তিনি যে ভাল অনুবাদ করতে পারতেন; তার বিশিষ্ট প্রমাণ নিচের অমরু শতকের কবিতাটি—

পল্লে রচিয়া বন্দনা-মালা দেয় না তোরণে দোলায়ে,
সম্বল তার আঁখি-পল্লের দৃষ্টি;
সুরভি অধরে মৃদু হাসি লয়ে বাতায়নে থাকে দাঁড়ায়ে,
পুষ্পাদলনা করে না পুষ্পবৃষ্টি!
মঙ্গল-ঘট বুকে ক'রে থাকে শ্রমজলে অভিষিক্ত
মাটিতে নামায়ে রাখিতে দেখিনি কভু সে,
তরুণীর পতি-অভ্যর্থনা বাহির হইতে রিক্ত
অন্তরে মিঠা অমৃত ছিটায় তবু সে।

—অভ্যর্থনা : সত্যেন্দ্রনাথ।

এর মূল দেখুন (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে):—

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্টৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো ন কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্। ৪০।

—অমরুশতক : কাব্যসংগ্রহ : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর

অর্থাৎ—

(দৃষ্টির দ্বারাই) দৃষ্ট্যা এব দীর্ঘা বন্দনমালিকা (অভিনন্দন-মালিকা) বিরচিতা, (নীলপদ্মের দ্বারা নহে) ইন্দীবরৈঃ ন। (স্মিতহাসির দ্বারা) স্মিতেন পুষ্পাণাং প্রকরঃ (পুষ্প গুচ্ছ) (কুন্দজাতি প্রভৃতি ফুল দ্বারা) কুন্দ জাত্যাদিভিঃ ন (নহে)। স্বেদমুচা পয়োধরযুগেন (স্বেদসিক্ত স্তনদ্বয়ের দ্বারা) অর্ঘ্যঃ দত্তঃ, ন কুম্ভাম্ভসা (কুম্ভ-জল-দ্বারা নহে)। তন্ব্যা স্বৈঃ এব অবয়বৈঃ (স্বর্গীয় সুন্দরীর অবয়বযুক্তা তন্বীর দ্বারা) বিশতঃ প্রিয়স্য (গৃহং প্রবিশতঃ প্রিয়স্য, ঘরে ঢুকছে এমন প্রিয়ের) কৃতং মঙ্গলম্ (মাঙ্গলিক কৃত)।

অনুবাদ চমৎকার হয়েছে। তবে এখানে আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ অনেক কিছু যোগ-বিয়োগ করেছেন। (মঙ্গলঘট অর্থাৎ স্তনদ্বয় মাটিতে নামিয়ে রাখেন সে নিবদ্ধ-যৌবনা রমণী—এটি কিন্তু মূল কবিতায় নেই)। কথা উঠতে পারে মূল কবিতাটিই এখানে গম্ভীর ভাব প্রকাশক নয়, তাই 'হাল্কা-চালের লীলাগুরু সত্যেন্দ্রনাথ' অনুবাদ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু হাল্কাচালের লীলাগুরু কেবল নন তা যাঁরাই তাঁর 'মহাসরস্বতী' আমরা 'গঙ্গাহৃদিবঙ্গভূমি' প্রভৃতি পড়েছেন তাঁরাই জানেন। আর এখানে অনুবাদে তিনি রাজা অমরুর নামে প্রচলিত হাল্কা কবিতাকে যেমন আদর্শ করেছেন, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, নানা উপনিষদ্ হ'তে অংশ বিশেষকে অজস্র অনুবাদের ক্ষেত্রে তেমনি আদর্শ করেছেন। ধরা যাক যজুর্বেদ হতে তাঁর অনুবাদ—

জাগিলে যে দূরে, ঘুমালে নিকটে, স্বপনে ফুটায় চোখ।
অনাদি জ্যোতির দূরগামী রেখা সে আমার শুভ হোক।

—মনোদেবতা : সত্যেন্দ্রনাথ।

অথর্ববেদ হ'তে 'প্রাণদেবতা' অনুবাদটি দেখুন—

নিখিল ভুবন বশে যার সেই প্রাণেরে নমস্কার,
প্রভু যে সবার আধার যে ওগো সবারি প্রতিষ্ঠার।
শব্দিত প্রাণে নমি আমি আর নমি ক্রন্দিত প্রাণে,
প্রাণবিদ্যুতে প্রণাম করিগো প্রণমি বর্ত্তমানে।

—প্রাণদেবতা : সত্যেন্দ্রনাথ

'কঠোপনিষৎ' হ'তে তিনি চমৎকার অনুবাদ করেছেন। ভাব-গম্ভীর মূলের রসমধুর অনুবাদটি কিন্তু কাব্যসঞ্চয়নে স্থান পায়নি। সেখানে অনেক বাজে কবিতাকে বাদ দিয়ে এটিকে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। এতক্ষণ যে কবিতাগুলি আলোচনা করছিলাম, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কবিতাটি বাদ দিলে আর কোনটিই সেখানে স্থান পায়নি। একটি চমৎকার অনুবাদ দেখুন:

[রবীন্দ্রনাথ চমৎকার অনুবাদ করেছেন:
নবমধুলোভী ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি?]

কঠোপনিষৎ ঃ বহুরূপ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ

অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশি,
নানারূপ ধরে আধার ভেদে
নিখিলের প্রাণ তেমনি করিয়া
একা নানা ছাঁদ বেড়ান ছেঁদে।
বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি
নানা সুরে গাহে যন্ত্র ভেদে
নিখিলের প্রাণ এক ভগবান
তেমনি বেড়ান হেসে ও কেঁদে।
তপন যেমন নিখিলের আঁখি—
কলুষে দূষিত হয় না তবু,
নিখিলের প্রাণ তেমনি গো তাঁরে
বাহিরের গ্লানি ছোঁয়না কভু।
সর্ব্বভূতের অন্তরতম
বহুরূপ তিনি গোপনচারী,
আপনার মাঝে তাঁরে যে দেখেছে
অক্ষয় সুখ তারি গো তারি।

এর মূল দেখুন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুঃ
ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।
একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌।
কঠোপনিষদ্‌ ২।২।

লক্ষ্য করার বিষয় এখানে মূলের ছন্দ বৈদিক ত্রিষ্টুভ। এ ছন্দ এগার অক্ষর ক'রে চারি পাদ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ এখানে সমস্ত মন দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন, এমন কি ছন্দটিও তিনি হয়ত অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাই প্রথমের অনেকখানি অংশ এগার অক্ষরের ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তবে ত্রিষ্টুভ ছন্দকে তিনি অনুসরণ করেননি জ্ঞাতসারে। ভাবতন্ময়তাজাত সত্যেন্দ্রনাথের সার্থক অনুবাদে অনেক সময় মূলের ছন্দের অনুসরণের উদাহরণ পাওয়া যায়। এটি তেমনি। সত্যেন্দ্রনাথের এ-অনুবাদটি কেবল ভাল হয়েছে তা নয়, মূলের যে অংশ একটু অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, সেখানে তিনি তার একটা সুস্পষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন ধরুন "বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" এ অংশটি খুব স্পষ্ট কি? 'বায়ু ভুবনে প্রবেশ ক'রে রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করে' অপেক্ষা "বাতাস যেমন ভুবনে প্রবেশি নানা সুরে গাহে যন্ত্র ভেদে" স্পষ্ট ও মিষ্ট নয়? সত্যেন্দ্রনাথের সার্থক অনুবাদ নির্মিতির লক্ষণাক্রান্ত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ হ'তে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আগে মূল ও পরে তার অনুবাদ দেখুন—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
নীলপতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমৎ বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা।

সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন :—

তুমি নর, তুমি নারী,—
যুবক, বালক, বালা ;
তুমিই আবার লাঠি হাতে ধরি'
বুড়া হ'য়ে হও আলা।
তুমি আছ চারিদিকে,
চারিদিকে তব মুখ ;
তুমিই আবার জন্ম লইয়া
না জানি কি পাও সুখ!
নীল পতঙ্গ তুমি
রাঙা আঁখি তুমি শুক
বিদ্যুৎ ভরা মেঘ তুমি, প্রভু
সাগর সমুৎসুক!
অনাদি তোমার নাম,
অন্ত তোমার নাই ;
তুমি আছ বলে বিশ্বভুবন
বর্ত্তিয়া আছে তাই।

—তুমি : সত্যেন্দ্রনাথ

অনুবাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ক'রে দেখুন :—

(১) ত্বং জাতো—সত্যেন্দ্রনাথ অর্থ করেছেন 'তুমি জন্মগ্রহণ করছ।'

(২) হরিত লোহিতাক্ষ (পক্ষী)—দেহে সবুজ রং আর লোহিত অক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী অর্থে সত্যেন্দ্রনাথ অর্থ করেছেন "রাঙা আঁখি তুমি শুক"।

(৩) ঋতবঃ—"তুমিই ঋতুসমূহ", সত্যেন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন।

(৪) সমুদ্রাঃ—"সাগরসমূহ"। সত্যেন্দ্রনাথ "সাগরসমুৎসুক"।

(৫) বর্তসে—সত্যেন্দ্রনাথ "বর্ত্তিয়া আছে তাই" প্রয়োগ লক্ষণীয়।

শ্বেতাশ্বতর হ'তে আর একটি অনুবাদ উপহার দিয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। কবিতাটির নাম "ব্রহ্মপ্রবেশ"।

নিজ তনু হ'তে তন্তু সৃজিয়া
ঊর্ণনাভের মত,
আপনার জালে আপনি আবৃত
হয়েছেন [illegible]

সাক্ষী, চেতন, পরম পুরুষ
সেই নিখিলের প্রাণ
আমাদের সবে ব্রহ্ম-প্রবেশ
সূত্র করুন দান।

—ব্রহ্ম-প্রবেশ : সত্যেন্দ্রনাথ।

শ্বেতাশ্বতর-এ আছে :

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেবো একঃ স্বমাবৃণোৎ। স নো দধাদ্‌ব্রহ্মাপ্যয়ম্‌। ৬।১০।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। ৬।১১।

অর্থাৎ—

তন্তুভিঃ (তন্তুদের দ্বারা) তন্তুনাভঃ ইব (মাকড়সার মত) যঃ এক দেবঃ (যে এক দেবতা) প্রধানজৈঃ (আপন অনন্ত কার্য্য দ্বারা) স্বভাবতঃ স্বম্‌ (আপনাকে) আবৃণোৎ (আবৃত করেছেন) সঃ (তিনি) নঃ (আমাদের) ব্রহ্মাপ্যয়ম্‌ (পরব্রহ্মরূপে আশ্রয়) দধাৎ (দান করুন)। ৬।১০

একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ (অলক্ষ্যভাবে অন্তর্নিহিত) সর্বব্যাপী (এবং) সর্বভূতান্তরাত্মা কর্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা) সর্বভূতাধিবাসঃ (সকল ভূতের নিবাসস্থান) সাক্ষী চেতা (চৈতন্যস্বরূপ এবং চৈতন্য কারক) কেবলঃ (সর্বথা বিশুদ্ধ) (এবং) নির্গুণশ্চ (গুণাতীতও)। ৬।১১

উল্লিখিত মূলের মধ্যবর্তী "তিনি আমাদের পরব্রহ্মরূপ আশ্রয় দান করুন" অংশটি সত্যেন্দ্রনাথে সর্বশেষে "আমাদের সবে ব্রহ্মপ্রবেশ সূত্র করুন দান" রূপে স্থান পেয়েছে। বাকী অংশের আক্ষরিক, ক্রমিক ও সুন্দর অনুবাদ করেছেন তিনি।

সংবাদপত্রে রেফারেন্স বিভাগ

ডি, আর, সরকার

যে কোন উন্নত মানের ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসে যে সমস্ত নিউজরেফারেন্স প্রয়োজনমত সরবরাহ করা হয়, তাহা এক দিকে যেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি অন্যদিক দিয়া বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা একটি বিশেষ জটিল ধরণের কাজ। কিন্তু যাঁহাদের উপর এই কাজের ভার ন্যস্ত থাকে, তাঁহাদের কাছে ইহা মোটেই জটিল নয়, কারণ তাহা হইলে এক একজন একই কাগজে দীর্ঘকাল এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারতেন না। তবে ইহা অতীব সত্য, যাঁহাদের উপর এই কাজ ন্যস্ত করা হয়, তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া চাই এবং সেই সঙ্গে বিশেষ বিচক্ষণ, স্বতঃপ্রবৃত্ত খবর-উৎসুক ও সন্ধানী হতে হবে।

আমাদের দেশে যদিও ইউনিভারসিটিতে আজকাল জারনালিজম্‌ কোর্স প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, কিন্তু এই রকমের কাজের শিক্ষার জন্য কোন রকম সংস্থান নাই। একমাত্র সংবাদপত্র-অফিসের মাধ্যমেই সুযোগ মত শিক্ষা লাভ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্রে সিটি এডিসন্‌ ছাড়াও প্রত্যহ ৫ হইতে ৬টি ডাক এডিসন ছাপা হয় এবং বিভিন্ন এডিসনে প্রাদেশিক প্রয়োজন মত বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় খবর ছাপা হয়, যাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন খবরই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তা হলে দেখা যায় সর্ব্বসমেত বিভিন্ন সংবাদসমষ্টি গড়ে প্রত্যহ ৪০০ হইতে ৫০০-এর মধ্যে থাকে। তার পর থাকে ভারতীয় সংবাদ, প্রাদেশিক সংবাদ, নিজস্ব সংবাদ, এডিটরিয়ল প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় চিঠিপত্র, স্পেশাল প্রবন্ধ, সান্‌ডে ম্যাগাজিন, বুক রিভিউ, স্পেশাল সাপ্লিমেণ্ট এবং আরও অনেক; যাহার সংখ্যা সর্ব্বসমেত একটি বিরাট অঙ্কের রূপ ধারণ করে। আধুনিক কালে প্রত্যেকটি দৈনিকপত্র মাত্র বৎসরে ৫।৭ দিন ছাড়া প্রত্যেক দিনই ছাপা হয়।

একমাত্র বিজ্ঞাপন ছাড়া যাহার হিসাব ও রেফারেন্স বিজ্ঞাপন বিভাগ রাখেন, সমস্ত নিউজ রেফারেন্স—ইনডেকস্‌ করা ও রেকর্ড করা নিউজ-রেফারেন্স সেকসনের কাজ। আমার বহুদিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি এবং শিখেছি যে, একমাত্র একটি কাগজই সারা ভারতে বিলাতের 'টাইমস্‌' কাগজের অনুরূপে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নানারকম সরঞ্জাম দিয়া—এবং প্রত্যেক বিশেষজ্ঞকে ভাল বেতন ও সুবিধা দিয়া এই সেকসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেন। কারণ, তাঁহাদের মালিকরা জানেন যে, এই সেকসন কাগজের মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং ইহার দ্বারা সাধারণের প্রয়োজন মিটাইয়াও কোম্পানীর প্রভূত রেভেনিউ আসে। একটি পুরান কপি সময় সময় ৪০ হইতে ৫০ টাকা মূল্যেও বিক্রয় হইয়া থাকে, যদি সেই দরকারী নিউজ বা কোর্টকেসের রেফারেন্স সমেত কাগজটি অনুসন্ধান করা যায়। কেবলমাত্র কাগজটি অফিসে এসে দেখে যাবেন, কি সংবাদটি কপি করবার জন্য অনেক সময় ৫ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্য্যন্ত চার্জ্জ দিতে বাধ্য করা হয়।

এখন দেখা যাউক, এই হাজার হাজার বিভিন্ন সংবাদ ও খবর বা ঘটনা—দিনের পর দিন যাহা কাগজে ছাপা হয় তাহা কিভাবে রাখা হবে, যাহা দরকার হলে অল্প সময়ে বার করা যাবে, তাহা যত নগণ্যই হউক কিংবা প্রাধান্যমূলক হউক। ইহা ছাড়া এডিটর, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটরস্‌, সাব এডিটরস্‌, রিপোর্টার্স—ইহাদের প্রয়োজনের বিরাম নাই। প্রত্যেকেই চান সঠিকভাবে রেফারেন্স দিতে, যাহাতে কোন তারিখ, কাল ও সময়ের কিংবা অঙ্কের ভুল না হয়। রেফারেন্স সেকসনের প্রধান কর্তব্য যে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ, তাহা নূতন কিংবা যত পুরাতন হউক, তৎপরতার সহিত বার করা, কারণ সম্পাদকের কলম থেমে আছে ঐ রেফারেন্সের জন্য। ভাল কাগজের সর্বদা লক্ষ্য থাকে যেন নির্ভুল খবর থাকে, তার ব্যতিক্রম হইলেই অত্যন্ত আলোড়ন হবে এবং এজন্য কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগ পুরান ফাইল থেকে নিশ্চিত হতে চান। এখন চিন্তার বিষয়, কিভাবে এই একটি বিরাট অনুষ্ঠান চালিত হবে ও রেকর্ড এমন ভাবে কার্ডে ইনডেকস্‌

হবে, যাহা অতি অল্প সময়ে এবং আয়াসে বার করা যাবে। যিনি রেফারেন্স চাইবেন, তিনি হয়ত আন্দাজে আনুমানিক তারিখও একটি আপনাকে দেবেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে যে, এই আনুমানিক তারিখ ভুল এবং তিনি তাহা না দিলেই ভাল করতেন, তাহলে কাজের পরিমাণ কিছু কম হত। তাহা অফিসের বা সাধারণের যাহারই প্রয়োজন হউক। কাজেকাজেই রেফারেন্স সেকসান নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা, তাহা বাহির করিবে। বিভিন্ন অফিসের নিউজ ইনডেক্স বিভিন্ন পদ্ধতির। বিলাতের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা "লণ্ডন টাইমস্"এ ৫০টি লোক শুধু নিউজ ইনডেক্স সেকসনে এ কাজ করেন এবং যিনি প্রধান, তাঁহার বেতন মাসিক আনুমানিক প্রায় ২০০০ টাকা।

আজ প্রায় শতাব্দী ধরে প্রতি তিন মাস অন্তর এই পত্রিকার ইনডেক্স বই সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কাগজের অফিসে, লাইব্রেরী, সামাজিক দপ্তর, রাজনৈতিক অফিস, এবং এমব্যাসী প্রভৃতিতে অমূল্য সম্পদ। কোন ঘটনা জানিবার প্রয়োজন হইলেই এই সকল বই থেকেই পাওয়া যায়। ইহারই অনুসরণ করে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাগজ, তবে অনেক স্থলে অদল-বদল করিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ 'টাইমস' একটি ইন্টারন্যাসান্যাল কাগজ, প্রত্যেক দিন একটি সংবাদপত্রে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি বিভিন্ন প্রকারের খবর থাকে। তাহা হইলে এই কাজ যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাদের দিনের পর দিন সেইগুলি ইনডেক্স করতে হয়। প্রত্যেক খবরের মধ্যেও একরকমের খবরের উল্লেখ থাকে যে, একটি খবরকে দশটি বিভিন্ন পদ্ধতিতেও বিভক্ত করতে হয়। ইহার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা অনেক। বিশেষ করে সম্পাদক ও তাঁহার এ্যাসিষ্টাণ্টদের লেখবার খোরাক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেক, ইহা ছাড়া News-referenceএর দরকার সাব-এডিটরদের, রিপোর্টারদের ও সর্বোপরি দরকার পাবলিকের। একজন লিখলেন—

"মহাশয়—কোন একটি কোর্টকেস, বহুদিন আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টের, জাজমেণ্টটি সেই কাগজ পাঠান। বহুদিন আগে একদল অভিযাত্রী হিমালয় অভিযান করিয়াছিল, সমস্ত খবর সমেত কাগজ পাঠান। ২০ বৎসর পূর্বে কোন মহিলা টেমস্ নদী পার হইয়াছিল, খবরটি পাঠান।" এইসব দরকার ম্যানেজেরিয়ল সেক্সান থেকে আসে, যাহা কোম্পানীর রেভিনিউ আর্জায়।

রেফারেন্স সেকসান প্রত্যেক খবরই Index করিতে বাধ্য, তাহা ফিলার (দু'তিন লাইন) হউক বা ডবল কলম লিড্ (দিনের শ্রেষ্ঠ সংবাদ) হউক। Refenceএ এমন এমন বুদ্ধিমান কর্মচারী আছেন যাঁহারা গত ছয় মাসের যে কোন খবর নিজের memory থেকে তারিখ, পাতা এবং পোজিসন বলিতে পারেন। অমুক তারিখে অমুক পাতায় উপরের দিকে কি নিচে। অনেকসময় একই খবর দু'তিন সোর্স থেকে আসে এবং চতুর সাংবাদিক বেশী লাইনেজ পাবার জন্য তাহার কিছু রূপ বদলে আবার পাঠান। কিন্তু সাব-এডিটর সন্দেহবশে রেফারেন্স সেকসানের উপর নির্ভর করেন, খবরটি আগে পাবলিশ হয়েছে কিনা।

এমন এমন চতুর সংবাদ-সরবরাহকারী আছেন, যিনি অম্লানবদনে একই খবর যাহা টেলিগ্রাম যোগে আগে পাঠাইয়াছেন তাহাই আবার সাপ্তাহিক নিউজ লেটারের ভিতর জড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাদের শুধু যে খবরটি পাবলিশ করা হয় না, উপরন্তু News-এডিটরের দ্বারা ওয়ার্ণিং দেওয়া হয়। তাহার পর ধরুন বৈদেশিক বার্তা। প্রত্যেক দেশ থেকে রয়টার যোগে খবর আসিতেছে। যদি কোন বিশিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকে, নিজেদের স্পেশাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ সেখানে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে সংবাদ cover করেন। প্রত্যেক খবর বিশেষভাবে রাখতে হবে। এনকোয়ারার খবরটি নামমাত্র বলেন। অনেক সময় খালি অথরের নাম বলিলেন। আপনাকে প্রত্যেক খবরের অথরের নামে আর এক দফা ইনডেক্স রাখতে হবে। যেমন এডিটর বলিলেন, লেবানন থেকে ওয়েষ্ট এশিয়ান করেসপণ্ডেণ্ট অমুক খবর পাঠিয়েছেন, আপনাকে তৎক্ষণাৎ সেইভাবে যোগান দিতে হবে। কেউ বলেন মিঃ ম্যাকমিলান একটি উক্তি দিয়াছিলেন আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে south আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য ব্যাপারে, খুঁজে বার করুন। কোথায় বলেছেন জানেন না, পার্লামেণ্টে কিংবা অন্য কোন বক্তৃতাস্থলে বা কমনওয়েলথ কনফারেন্সে—এরই উপর ভিত্তি করে আপনাকে বার করতে হবে রেফারেন্স। কারণ প্রত্যেক উক্তির ১০।১২ জায়গায় cross Reference রাখা হয়,—একটি ম্যাকমিলানের নামে, একটি subject লইয়া, একটি কমনওয়েলথ, কলমে ইত্যাদি, এর সম্ভবপর জায়গায় খুঁজিলে খবর বেরিয়ে যাবে। এনকোয়ারী আসবার সঙ্গে সঙ্গে Exportদের টেবিলে এল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। একবার কোন বৈদেশিক স্নোম্যান এক্সপিডিসন্ হিমালয়ে এসে একটি স্নোম্যানের লোম পাইয়াছিলেন, এখন এনকোয়ারী হইতেছে—লোমের রঙ ধূসর না সাদা। মহা বিভ্রাট! এক একটি এক্সপিডিসানের রিপোর্ট যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ২।৩ কলমে প্রকাশ হয়, এখন তাহার মধ্যে এত সূক্ষ্ম একটি আইটেম Indexএ নাই। সুরু হল প্রথমে তারিখগুলির খোঁজ, কিন্তু এই জাতীয় বহু এক্সপিডিশন্ এসেছে, এর রিপোর্টও বিচিত্র; এখন কোনটি খুঁজবেন। একজন ইংডেক্সার বলিলেন, বোধ হয় আমি পড়েছি, বিলাতের "ডেলিমেল" এক্সপিডিশন্ পাঠাইয়াছিলেন অমুক সময়। যাবতীয় খবরের ভিতর একটি অল্প সময়ে বেরিয়ে গেল। তাছাড়া ধরুন বৈদেশিক এক একটি দেশ ছাড়া যেমন (U. K., U. S. A. France, Itally Germany) প্রভৃতি ছাড়াও অনেক যৌথ প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন ইউ, এন। সিয়াটো। সেণ্টো। বাগদাদ প্যাক্ট, যাহা এখন নূতন নাম পেয়েছে। কমনওয়েলথ, উনেস্কো, এইসব সংস্থানের আলাদা Index রাখিতে হবে। এর পর দুটি যুক্ত দেশের বিষয়—যেমন আমেরিকা ও ভারতের আদান প্রদান, এই দুই দেশের এমবাসি। (ইণ্ডিয়া-ইউকে) ইষ্ট জার্মানি, ওয়েষ্ট-জার্মানি ইণ্ডিয়া ইউরোপোস্তিয়া, ইণ্ডিয়া-রাশিয়া প্রভৃতি জয়েণ্ট বৈদেশিক খবর এক বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে। স্পুটনিক, চন্দ্রালোকে রকেট, নিউক্লিয়ার উইপনস্ প্রভৃতি। আপনাদের এখন এই বলিয়া শেষ করিব। যাঁহারা এই কাজে আছেন তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। কোন ছোট-বড় খবর বিচার করলে চলবে না এবং সত্যিই যদি অনেষ্টির সহিত কাজ করা যায়, তবে কাগজে যাহা প্রকাশ করা হয়েছে, তাহা নিশ্চয়ই বার করা যাবে। তাহা নতুনই হোক, বড় পুরাতনই হোক আর জটিলই হউক।

বঙ্গবাসী ঃ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী' পরিত্যাগ করে কৃষ্ণচন্দ্র কিছুদিনের জন্য স্বগ্রাম শিবনিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তদানীন্তন াধুনিক শিক্ষার প্রচারে ব্রতী হন। নবযুগের চিন্তা-ভাবনার াশীর্ব্বাদ থেকে তাঁর আপন দেশের মানুষ যাতে বঞ্চিত না হয়, । উদ্দেশ্যেই তিনি শিক্ষা প্রচারের কার্য্যে অবতীর্ণ হন। এতে াপন জন্মভূমির উপর তাঁর মমতার কথাই প্রমাণিত করে। ানীয় ভূস্বামী সরকার-চৌধুরীদের সহযোগিতায় তিনি এখানে কটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবাসীতে াগদানের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করতে াকেন। অচিরে তিনি পণ্ডিত শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন রেন। এই বিদ্যালয়টি আজিও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। র্ত্তমানে ইহা একটি জুনিয়র হাই স্কুল। কৃষ্ণচন্দ্রের পরে এই লেই শিক্ষকতা করে শোনঘাটার রাধাকান্ত ভাদুড়ী ও কৃষ্ণপুরের ণ্ডিত হরনাথ চক্রবর্ত্তী অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁদের শক্ষক-জীবনের কথা আজিও নদীয়ার ঐ অঞ্চলে কিংবদন্তীর মত চলিত আছে। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত তাঁর জীবন-কথাতেও েখতে পাই "কৃষ্ণচন্দ্র 'সাধারণীর' কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে শবনিবাসে গমন করেন। তিনি জমিদারের সাহায্যে শিবনিবাসে াইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ র্মপটুতায় অল্পদিনের মধ্যে এই স্কুলের উন্নতি হয়। শিক্ষক হসাবে তিনি অনেক শিক্ষকের আদর্শ।" ৩০ কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাস ্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, এই সংবাদ অন্যত্রও দেখা যায় "Severing his connection with 'Sadharani' Srijut Krishna Chandra went to Shibnibash, his native village and there started a middle A. V. School." ৩১ কিন্তু শিবনিবাসের গ্রামাঞ্চলে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অন্যপ্রকার াহিনী প্রচলিত আছে। প্রত্যক্ষদর্শী প্রবীণেরা বলে থাকেন শিবনিবাস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় জমিদার সরকার-চৌধুরীরা। সম্প্রতি ঐ স্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী মহাশয় তাঁর ২১·২, ৫১ তারিখের এক পত্রে আমাকে লিখেছেন 'From hearsay, I could gather that the Sibnibas School (whatever might be its name) was not established by late Banerjee. The School in its present building was started by him.' মতের এই সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার ঐ অঞ্চলে নবশিক্ষার অন্যতম বার্ত্তাবাহী ছিলেন। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা অঞ্চলে শিবনিবাস স্কুলকে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রায় ৮৪ বৎসর পূর্বে কৃষ্ণচন্দ্র এই বিদ্যালয় হতে আধুনিক শিক্ষার শঙ্খ নিনাদ করেছিলেন।

বঙ্গবাসীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেকালে একশ্রেণীর ঋজুধর্মী গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠাতেই তাঁদের অনেকের শিক্ষানবিশি হয় এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে। তাঁদের অধিকাংশই বঙ্গবাসী-ঘোষিত নব্য হিন্দুধর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সমস্ত সাহিত্যিকদের অনেকেই কৃষ্ণচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের অগ্রজসদৃশ কৃষ্ণচন্দ্র, পূজনীয় শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুভাবের, হিন্দু রীতিপদ্ধতির প্রচার ও উহাদিগকে সমাজমান্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে লোকে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। বঙ্গবাসী সে সঙ্কোচ দূর করিয়াছে। বঙ্গবাসীর সে চেষ্টার মূলে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুখের হিন্দু ছিলেন না। তিনি কর্মী, আচারবান, গুরুভক্ত হিন্দু ছিলেন। তিনি শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবনকে প্রণালীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টায় তিনি অনেকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ...তিনি যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক, তখন পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অক্ষয় চন্দ্র সরকার, শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে ছিলেন।" ৩২ কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসীতে যে সমস্ত লেখক সমবেত হয়েছিলেন—উত্তর কালে তাঁদের অনেকেই খ্যাতনামা গদ্যসাহিত্যিক হিসাবে যশস্বী হয়েছেন। চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রায়সাহেব বৃন্দাবনচন্দ্র রক্ষিত, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রায়বাহাদুর দীননাথ সান্ন্যাল, রায়বাহাদুর জলধর সেন, নিখিলনাথ রায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের যশস্বী লেখকগণ কৃষ্ণচন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গবাসীতে লিখতেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের সংগে বঙ্গবাসীর অতঃপর মতবিরোধ ঘটে এবং তাঁদের মতানুকূল 'সঞ্জীবনী' প্রকাশ করেন। সেকালের ইতিহাসে অগ্রগামী ব্রাহ্মদের সংগে নবহিন্দুদের বিবাদ সংবাদপত্রের অন্যতম বিষয়-বস্তু ছিল। এই আড়াআড়ির সাক্ষ্য ভারতী, তত্ত্ববোধিনী ও প্রচার, নবজীবনের পৃষ্ঠায় মিলবে। ভারতী-প্রচারের বিরোধ চুকে গেলে নূতন করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সঞ্জীবনী-বঙ্গবাসীর মধ্যে। সঞ্জীবনীর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখতেন। "অল্প কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বে শিখণ্ডীর ভূমিকা

৩০। বঙ্গবাসী, ৬ই ফাল্গুন—১৩১৭।

৩১। The Telegraph—18, Feb. 1911.

৩২। নায়ক, ২রা ফাল্গুন—১৩১৭।

লইয়াছিলেন। বঙ্গবাসীর নেতাদের ব্লি-অ্যাকশনারী চেষ্টা ব্যঙ্গ করিয়া তিনি সঞ্জীবনীতে লিখিয়াছিলেন একটি কবিতা,—

"শ্রীদামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু।

নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু, আহা চামু! ৩৩

উল্লিখিত বঙ্গবাসীর লেখকদের অনেকের সংগেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ইন্দ্রনাথের সংগে কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্বের কথা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীতে অতঃপর যে 'পঞ্চানন্দ' লিখতে থাকেন—তার পিছনে যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত কৃষ্ণচন্দ্রের প্রেরণাও কম ছিলনা। ইন্দ্রনাথ লিখেছেন "এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের লাগিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এই আক্রমণে বসুজের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাভবস্বীকার করিয়া বঙ্গবাসীতে পঞ্চানন্দ দিলাম।"৩৪ ইন্দ্রনাথের 'ক্ষুদিরাম' গ্রন্থখানি কৃষ্ণচন্দ্রের স্বগ্রাম শিবনিবাস থেকেই লেখা। এসম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন,— "বঙ্গবাসীর উপহার দিতে হইবে বলিয়া আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই। ক্রমে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হইল না। মহাসঙ্কটে পড়িয়া বর্দ্ধমানে একদিন এক পরিচ্ছেদ 'ক্ষুদিরাম' লিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আর লেখা কোনমতেই ঘটিল না। অগত্যা, অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা করিলাম, বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার বাটি শিবনিবাসে গিয়া ৭।৮ দিন থাকিলাম, আর সেই কয়দিনে যতদূর পারিলাম ক্ষুদিরাম লিখিলাম। তাহাই ছাপা হইল, বঙ্গবাসীর মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম, এবং পড়িতে হয় নাই বলিয়া বোধকরি 'ক্ষুদিরাম' অনেককেই বাঁচাইয়াছে।" বঙ্গবাসীতে ইন্দ্রনাথ কৃষ্ণচন্দ্র একরূপ অভিন্নছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক— তখন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদনা বিভাগে প্রবেশ করেন। এই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রকে অগ্রজ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। তিনি যে কৃষ্ণচন্দ্রের বঙ্গবাসীর কাছে ঋণী ছিলেন, একথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। তিনি একখানি গ্রন্থ যোগেন্দ্র চন্দ্রকে উৎসর্গ করার কালে লিখেছিলেন— "আপনার বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাংলা লিখিতে শিখিয়াছি। আপনার বঙ্গবাসীর সম্পাদক পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙালার সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র, কিন্তু বঙ্গবাসীর ভাব ও ভাষা আমার হইয়া থাকিবে।"৩৫ আবার এই প্রসিদ্ধ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে লিখেছিলেন "কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার গণা-দিন শেষ হইয়াছিল, তাঁহার ইহজীবনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইয়াছিল—তিনি চলিয়া প্রভাবে গেলেন, কিন্তু যে ভাবের হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিস্ফুরণ হইয়াছিল, সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছিল, যে ভাবের আদর্শে তিনি স্বীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব, সে ভাবের প্রস্তাব, সে অগ্নিহোত্রের অগ্নিকুণ্ডের ভাব বহ্নিজিহ্বা সজীব করিয়া কে রাখিবে? কে হিন্দুকে হিন্দু হইতে বলিবে, হিন্দু হিন্দু হইলে যে কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা কে বাঙালীকে বুঝাইবে?" পাঁচকড়ির এই প্রশস্তি নিঃসন্দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু বঙ্গবাসী-প্রবর্তিত হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালের বাঙালী গ্রহণ করেনি। কালের নির্মম কুঠারাঘাতে তা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। সে যুগের ঐ নব্য হিন্দুয়ানিকে সেকালের অনেক কর্ষিত চিত্ত ব্যক্তিও শ্রদ্ধা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের মত প্রমথ চৌধুরীও এই নব্য হিন্দুদের জন্য লেখেন "বাংলার নব্য হিন্দুয়ানিই আমার কাছে অসহ্য, কেননা তার মূলে কোনরূপ সরল বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যে নেই, তার প্রমাণ নব্য হিন্দুরা তাঁদের মত খাড়া করাবার জন্য একবার যান দৌড়ে স্পেন্সরের কাছে, আর একবার শঙ্করের কাছে—তারপর Hegel, Eucken, Bergson, কবিরাজ গোস্বামী, দাশরথি রায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, Hertz, Poincare এ সবই তাঁদের গুরু। একটু দাঁড়াবার জায়গা পাবার জন্য, তাঁরা একবার এর পায়ে ধরছেন, আর একবার ওর পায়ে ধরছেন; শুধু এক কাজ করতে এঁরা একান্তই অক্ষম। সে হচ্ছে মনোরাজ্যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এই মানসিক কাপুরুষতা যেমন কমিক তেমনি ট্র্যাজিক। ৩৬ নবজাগৃতির যে প্রধান লক্ষ্য জিজ্ঞাসা, জীবন-রহস্য মন্থনের চেষ্টা, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির উপরে নিষ্ঠা—বঙ্গবাসীর হিন্দুধর্মে এই যুগ লক্ষণগুলির অভাব ছিল। রামমোহনের জ্ঞানাত্মিকা ব্রহ্মবাদ সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছিল এই সমস্ত আবেগপ্রধান ভক্তিবাদ ও অলৌকিক পৌরাণিক ধর্মের প্রাধান্যের জন্য। কিন্তু কালের রূপান্তরশীল ইতিহাসে রামমোহনের চিন্তাই ক্রমশঃ জয়যুক্ত হয়ে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে আবেগ-প্রধান সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পুরাণকে অবলম্বন করে কাব্য-কাহিনী লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যুক্তির দ্বারা পুরাণের অংশবিশেষকে স্বীকার করে নেন। অক্ষয় সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি, পঞ্চানন তর্করত্ন, ইন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা করলেন। এলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী; পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুর্নজাগরণ হল। এই সময়ে—Orthodox Society also tried to rationalise its instinctive resistance, and even Bankim Chandra Chatterjee reacted in this manner. ৩৭ এইগুলিই নবজাগৃতির প্রতিরোধের কারণ হ'ল। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-চিন্তার মধ্যে যে বাস্তব মনুষ্যজীবনের অন্বেষণ ছিল—বঙ্গবাসীর হিন্দু নেতাদের তাও ছিল না। বঙ্গবাসী-হিতৈষী শশধর তর্কচূড়ামণির কাছে ধর্মটা ছিল একটা লৌকিক ব্যাপার। ধর্ম মুখ্যতঃ বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ মাত্র। ধর্মকর্ম

৩৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৮।
৩৪। বঙ্গভাষার লেখক।
৩৫। উৎসর্গপত্র, রূপালহরী।
৩৬। সবুজপত্রের ডাক। দেশ ১৩ই কার্তিক ১৩৬৬।
৩৭। Notes on the Bengal Reniassance —Amit Sen

একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কিনা—এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না তর্কচূড়ামণির। তর্কচূড়ামণি সেকালে নব্য-হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার জন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন—বিদ্যাসাগর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগনায়কগণ তাঁর ধর্মব্যাখ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাত ধর্ম যে সেকালে গ্রহণযোগ্য ছিল না—তা বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, পরমহংস প্রভৃতি সকলেই উত্তর কালে এই মত ব্যক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শশধর তর্কচূড়ামণিকে কি চক্ষে দেখতেন, সে পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের রচনা থেকে এই প্রসঙ্গে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সেই সময়ে কোলকাতায় হিন্দুধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা করছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই কৌতূহলী হয়ে প্রথম তাঁর সভাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে তর্কচূড়ামণির দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হননি, এমন কি, এঁর সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন, তার একাধিক প্রমাণ আছে।" রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির বঙ্কিম-অধ্যায়ে লিখেছেন—"এই সময়ে কোলকাতায় শশধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন··কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার'-পত্রে তিনি যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।" "পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিম ও শশধরের সম্পর্কের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমকে 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' ধর্মব্যাখ্যায় নিরত দেখে চূড়ামণি তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। আলবার্ট হলে বঙ্কিমের সভাপতিত্বে চূড়ামণি বক্তৃতা দিলেন। দু'একদিন পর বঙ্কিম আর গেলেন না। তিনি বললেন, "কয়দিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম।··· তর্কচূড়ামণি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজধর্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এদের নাই, তাই যা খুসী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তর্কচূড়ামণির মত প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করেছিলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির আন্দোলন স্থায়ী হয়নি।৩৮ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি বঙ্গবাসীর উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক ও লেখক ছিলেন। নীতিগঠনের মূলে মানুষ তথা মনুষ্য-চরিত্র গঠনই প্রধান—বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষকগণ একথা সম্যক্ অনুভব করেননি। আর ঐ মৌলিক ও শাশ্বত জীবনবোধের অভাবে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম বিষয়ক জ্বালাময়ী বক্তৃতাগুলি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কেবল শশধর তর্কচূড়ামণিই নয়—বঙ্গবাসীর নব্য হিন্দু নেতাদের অনেকের বাণীই কালের ধূসর প্রকোষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর এই নব্য হিন্দু নেতাদের একজন।

বঙ্গবাসী হতে তদানীন্তন কালে যে লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে—তাঁদের সাহিত্য-সম্পদের মূল্যায়নের জন্ত পৃথক আলোচনার প্রয়োজন। বর্তমান ক্ষেত্রে তা অভিপ্রেতও নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণচন্দ্র ও বঙ্গবাসী। কৃষ্ণচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র সে যুগের একজন বিখ্যাত গদ্যলেখকও ছিলেন। তৎকালে তাঁর রচনাগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর Journalistic লেখা ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যাও বড় কম নয়। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মনীতি ও রাজনীতি ও সমাজনীতির উপর লিখতেন। মাঝে মাঝে জীবনী ও রম্য-ভ্রমণকাহিনীও লিখতেন। তাঁর রচনার ভাব ও ভাষা অতীব সরল—বক্তব্য স্পষ্ট ও ঋজুধর্মী। 'বঙ্গভাষার লেখক'-শীর্ষক আলোচনায় তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্রের যে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল, তার কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুকাল যাবৎ সংবাদপত্রের সংস্রবে আছেন। সংবাদপত্র পরিচালনে ইহাঁর অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছে। বঙ্গবাসীর পাঠকবৃন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষরূপে চিনেন। রাঢ় অঞ্চলে সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় ইহাঁর কর্ম্মতৎপরতা, শ্রমসহিষ্ণুতা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের কথা সকলেরই মনে জাগরূক আছে। শাস্ত্রে ও আপ্তবাক্যে ইহাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। হিন্দুর প্রাচীন রীতিনীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতি যাহাতে অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত রহিয়া যায়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চটকে যাহাতে হিন্দুসন্তান আত্মবিস্মৃত তথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে না পারে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অশ্রান্তশ্রমে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া তৎবিষয়ে লেখনী চালনা করিতেছেন। তাঁহার লক্ষ্য বড় স্থির, লেখনী সংযত। বিপক্ষপক্ষের ভ্রুকুটি-ভঙ্গিতে তিনি ভীত হইবার পাত্র নহেন। তিনি নিজ মনে ও জ্ঞানে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পাঠককে তৎবিষয়ে উপদেশ দিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। দেশের দুঃখে ও দেশের দুর্দ্দশায় তাঁর প্রাণ ব্যথিত, তাই তিনি সেই প্রাণের ব্যথা মুক্তপ্রাণে, নির্ভীকতা সহকারে পরিব্যক্ত করেন। রাজনীতি হউক, ধর্ম্মতত্ত্ব হউক আর আত্মতত্ত্বই হউক, যে নীতি বা তত্ত্বের তিনি আলোচনা করেন, তাহাতেই উহাঁর একাগ্রতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়।৩৯ হিন্দুধর্মের প্রচার ও লোকশিক্ষার জন্ত তখন বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হতে সুলভমূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকাশনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ ও পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। শাস্ত্রবিদ্ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্যে ও প্রচেষ্টায় এই বিভাগ হতে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র সেকালের বিখ্যাত বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। সহ-সম্পাদক হিসাবে তিনি সাধারণীকে নানা রচনাসম্ভারে সুশোভিত করেছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী, দৈনিক, জন্মভূমি, নবজীবন, প্রচার, বসুমতী, অনুসন্ধান, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তিনি রচনাদি প্রকাশ করতেন। বিশেষ 'বসুমতী'র সংগে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে 'নায়ক' লিখেছিল—"তাই বলিতেছি, কাঁদ বঙ্গবাসী, তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ত কাঁদ, কাঁদ বসুমতী, যে সন্তাবের কনকলেখায় তোমার অঙ্গ যিনি শ্রীসম্পন্ন করিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ত কাঁদ"—বসুমতীর পুরনো ফাইল অনুসন্ধানের সুযোগ পাই নাই। কিন্তু

৩৮। বঙ্কিম মনীষা—সমকালীন—আশ্বিন—১৩৬৬।

৩৯। জন্মভূমি জ্যৈষ্ঠ—১৩০৩।

কৃষ্ণচন্দ্র যে নিয়মিত বসুমতীতে লিখতেন—তা আর একটি সংবাদে সমর্থিত হয়। বসুমতীতে প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ হতে খানিকটা উদ্ধৃত করছি—"গত ২১শে মাঘ ব্রাহ্মমুহূর্তে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব দিবস রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অপরাহ্নে তিনি বসুমতীর জন্য তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং দুইটি স্বহস্তে প্যাক করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাত্রি ১১টার পর তাঁহার একটু মাথা ধরে, তিনি শয্যা গ্রহণ করেন, সেই শয্যাই তাঁহার শেষ শয্যা।"৪০ উক্ত সংখ্যাতে কৃষ্ণচন্দ্রের একটি রচনাও প্রকাশ হতে দেখা যায়। এই সংবাদ হতেই বসুমতীর সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথাটি বোঝা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সমকালীন পত্র-পত্রিকা-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত গদ্য লেখক ছিলেন, একথা আরও অন্য তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায়। তাঁর রচনার আদর্শ হিসাবে এখানে তাঁর কয়েকটি রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এগুলি হতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিপুরুষের স্বরূপটি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

"একথা যদি সত্য হয় যে, ভারতের উন্নতি করিতে হইলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা হইলে এখন হইতে সর্ব ধর্ম্মের, সর্ব বর্ণের, সকল শ্রেণীর বালকবৃন্দের রাজনীতিক আলোচনার পথ বন্ধ করিলে চলিবে না। করিলে আমাদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবে।

যদি বল, এখন যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শিক্ষা নাই, তদনুযায়ী বিদ্যালয় নাই, সেইরূপ আশ্রমধর্মী বালক নাই, তখন যে আদর্শে এখন আমাদের সমাজ চলিতেছে, সমাজের বর্ত্তমান যাহা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর বালকই বিদ্যালয়ের ছাত্র অভিধানে অভিহিত, তখন পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া বালকদিগকে রাজনীতিক আন্দোলন হইতে নিরস্ত করিতে হইবে। আমি বলি, একথাও ঠিক নহে। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলেও বালকদিগকে রাজনীতিক চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করা কখনও উচিত নহে। কারণ বলিতেছি।

কলিধর্ম্মে আমরা এখন অন্নগত-প্রাণ হইয়াছি। হা অন্ন, হা অন্ন করিতে করিতেই দেশের সাড়ে পনের আনা লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। দারুণ অন্নচিন্তাতেই সংসারী লোক ম্রিয়মাণ। ইহারা সজীব হইয়াও অন্নচিন্তায় নির্জ্জীব, জীবনের অস্তিত্বজ্ঞান ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ইহারা অন্নের ভাবনায় সদা শঙ্কিত, স্ফুর্ত্তিহীন, সঙ্কীর্ণ চিত্ত। এই চিন্তা ছাড়িয়া অন্য চিন্তা করিবার শক্তি বা সামর্থ্য ইহাদের প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। যখনই ইহারা এই ভাবনা ছাড়িয়া অন্য ভাবনায় মন দেয়, যখনই অন্য ভাবনা ইহাদের অন্নঅর্জ্জনের পথে বাধা স্বরূপ হইয়া উপস্থিত হয়, তখনই ইহারা দিশেহারা, হইয়া দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর দারুণ প্রকটমূর্ত্তি দেখিয়া সে সব ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবল অন্ন অর্জ্জনের পন্থাকেই সেবা করিতে থাকে। কাজেই ইহাদের দ্বারা স্বার্থ বিসর্জ্জনকারী দেশের ও দশের ভাবনা হইয়াই ওঠে না। হইতেই পারে না, হওয়া সম্ভবপর নহে।

ইহারাই আবার ম্যালেরিয়া-জ্বরে প্রপীড়িত হইয়া দিন দিন অস্থি মজ্জাশূন্য হইতেছে। অন্ন অর্জন করিবার সামান্য শক্তিটুকুও এইসব পীড়নে দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ইহার উপর রাজনীতিক চক্রের দুর্জ্জ্য সুকৌশলে পরিচালিত সূক্ষ্ম পেষণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—যাহারা দেশের অস্থি ও মজ্জা, শোণিত ও মাংস, জীবন ও প্রাণ, তাহারা এ দেশে এখন জীবনে মৃতবৎ হইয়া আছে, সজ্ঞানে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে, মানুষ হইয়া কালের পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছে। এমত অবস্থায় দেশের হিতকারী ব্যক্তিগণ ইহাদের নিকট ঘোর স্বার্থবলির মহাযজ্ঞের আয়োজন-অনুষ্ঠানের, জপ যজ্ঞের সাধনা অনুষ্ঠানের আশা করিতে পারেন কি? ধর্ম্মের পথ কালধর্ম্মে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, কর্ম্মের পথও যায় যায়, তাই এই ঘোর আপৎকালে ইহাদের আশা ছাড়িয়া, অন্যদিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইতেছে।

এমত অবস্থায়, আমাদের এই বর্ত্তমান আপৎকালে, যুবক-বালকবৃন্দই আমাদের আশা, যাহারা এখন অন্নচিন্তায় জর্জ্জরিত নহে, চাকরীর অর্দ্ধনাগপাশে অনেকে আবদ্ধ হয় নাই, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গের স্নেহমমতায় বদ্ধ হইয়া অনেকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নহে। এমত অবস্থায়, যেখানে স্বার্থবলির প্রয়োজন, যেখানে ভাবোন্মত্ততার আবশ্যক, যেখানে প্রাণের মায়া, সংসারের মায়া বিস্মৃত হইতে হইবে, সেখানে দেশের একমাত্র আশা বালকদিগের উপর।

পশ্চাৎ সমাজের আদর্শ আমাদের এ পরম পবিত্র সুদৃঢ় সুশৃঙ্খলে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজে ভগ্ন হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহা, ভাঙ্গিয়াছে তাহা সেই পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। তাই আমাদের পুনঃসংস্কার কার্য্যে পাশ্চাত্য সমাজই আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শে দেখিতে পাই—বালকগণ-যুবকগণই সমাজের ভগ্নশরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান সহায়। ইতালী, জার্মাণী, গ্রীস প্রভৃতি যে সব পাশ্চাত্য সমাজের লুপ্তপ্রায় গৌরবরবি অস্তমিত হইবার উপক্রম হইয়া সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দেশের ও সেই সমাজের বালকগণই তাহার প্রধান ও প্রথম সহায়। বয়োবৃদ্ধ গৃহস্থ যখন কর্ত্তব্য নির্ণয়ে পরাঙ্মুখ, স্বার্থ চিন্তায় যখন সংশয়চিত্ত, তখন যুবক-বালক হাসিতে হাসিতে সদা হাসিভরা মুখে ঘাতকের নৃশংস তরবারির সম্মুখে আপনার মস্তক পাতিয়া দিয়াছে, আপনাকে বলি দিয়া দেশের কাজ ও দশের কাজ উদ্ধার করিয়াছে; ইতিহাসে ভূরি ভূরি এই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাই বলি ভাই, যখন এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজে বা সহসা করিতে পারিবে না, যখন সংসারে নীচ স্বার্থে বদ্ধ হইয়া সমাজের হিতার্থে, দেশের ও দশের হিতার্থে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইবে না, যখন দেশের ও দশের ভাবে উন্মাদ হইয়া তন্ময় হইতে পারিবে না—তখন যাহারা এ কাজ পারে, তাহাদের পথে বাধা দিও না। অমানিশার শবসাধনে নিজের শক্তি নাই বলিয়া, যে উহাতে সমর্থ, তাহার পথের কণ্টক হইও না। শাস্ত্রে যাহা নির্দ্দেশ করিতেছে, এই স্বদেশে বসিয়া, গত দুই বৎসরের স্বদেশী আন্দোলন লক্ষ্য করিলে, তাহার অন্তরায় হওয়া কখনই তোমার উচিত নহে।" ৪১

৪০। বসুমতী ৬ই ফাল্গুন—১৩১৭।

৪১। রাজনীতিতে ছাত্র—বঙ্গবাসী—১৫ই চৈত্র ১৩১৪

কৃষ্ণচন্দ্রের এই রচনাংশ হতে সমসাময়িক স্বদেশী-আন্দোলনের প্রতি তাঁর উদারতার ভাবটিই পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। এই রচনাটি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একেবারে শেষভাগে লিখিত। তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাবটি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে চলেছিল। উক্ত রচনায় তিনি নবযুগের রাজনীতির চিন্তা-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কৃষ্ণচন্দ্র এদেশের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী উদ্ধৃত অংশে সমাজ-ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবটি উপলব্ধি করা যাবে।

"সমাজের সামাজিকগণ সংযমী না হইলে, বিধিনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না চলিলে, সমাজ বন্ধন হয়না। ইহা মূল সত্যকথা। সংযমেই সমাজের বল, সামাজিকগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া চলিলে, অপর সামাজিকগণের সুখ-দুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিলে, প্রবৃত্তির দাস হইয়া নীচ প্রবৃত্তির সেবা পরায়ণ হইলে, সমাজ বলহীন হয়। যতদিন আমাদের এই হিন্দুসমাজের সামাজিকগণ একথা বুঝিতেন, ততদিন আমাদের এই হিন্দুসমাজ পূর্ণবলে বলীয়ান ছিল। ধর্ম শাস্ত্র আমাদের সমাজ-বন্ধনের মূল ভিত্তি। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-সমাজ কিরূপ নীতিতে চলিবে, ক্ষত্রিয়-সমাজ কিরূপ নীতিতে চলিবে, বৈশ্য-সমাজেরই রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার কিরূপ হইবে, শূদ্র-সমাজের রীতি-নীতি কিরূপ হইবে, কোথায়ও বর্ণসঙ্কর হইলে সেই বর্ণসঙ্কর-সমাজের জন্য বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তাগণ, নিজ যোগবলে নির্ণয় করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।···এখন কালধর্ম্মে ধর্ম্মশাস্ত্রের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সংস্কার করিবার নিমিত্ত যাঁহারা উদ্‌যোগী বা অভিলাষী, যুগভেদে এ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি, বিভিন্নতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি করা উচিত। প্রমত্ত বুদ্ধিবলে আজ তাঁহারা যে পরিবর্ত্তন সংস্কারের উচ্চ চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, তপস্যা ও যোগবলে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ নিজ নিজ বিজ্ঞানবলে যে তাহা বুঝেন নাই, এমন নহে। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই যুগভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভেদ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা এখন তাহা বুঝিতে পার আর নাই পার, তাঁহারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন—আর বুঝিয়া তোমাদের উচ্ছৃঙ্খল মহাদায় হইতে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কালোচিত বিধি-ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট তুমি আমি অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, নগণ্য মনুষ্য, তথাপি তোমার চীৎকার দেখিলে প্রকৃতই প্রাণে ব্যথা লাগে।'৪২ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার উপরই বিশ্বাসী। ধর্ম্ম ভিত্তিমূলক বর্ণাশ্রম-সমাজ-ব্যবস্থা কৃষ্ণচন্দ্রের আদর্শ-সমাজ। তাঁর অসংখ্য রচনাতে এই মতবাদই গূঢ়তর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র সেকালের উৎকট নব্যতার ভোগবাদকে ধিক্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্মুখী স্বরূপকে তিনি সার্থক ভাবে আবিষ্কার করে স্বদেশ-সভ্যতার চিন্ময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ছাড়া মহৎগুণের সাক্ষাৎলাভ করেননি।

"আমরা যেমন অসভ্য আছি—সেই অসভ্যতাও আমাদের ভাল, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের ভোগ-সুখের আকর কামনা মুখর সভ্যতায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে তুচ্ছ

৪২। হেলায় হারাইও না। বসুমতী, ৬ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

করিয়া অন্তর্মুখীন প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করিয়া অন্তরে যে অপার আনন্দ ভোগ করিতেন, আমরা যেন সংসারে সংযমী হইয়া সেই আনন্দই প্রাপ্ত হইতে পারি। বহির্মুখীন প্রবৃত্তির কামাগ্নিতে পড়িয়া আমরা যেন দিনরাত্রি জলিয়া পুড়িয়া না মরি। পাশ্চাত্য জগতে দেখিতে পাই, এক জাতি পশুবলে আর এক জাতির উপর আধিপত্য করিয়া নিজজাতির ভোগ-সুখের জন্য অনবরত চেষ্টা করিতেছে, এই আধিপত্য বিস্তার বা রক্ষা করিবার জন্য মানুষ মারিবার কত কৌশল আবিষ্কার করিতেছে; সুখশান্তির আধার সামাজিক রীতি-নীতির সংশোধন আদি ব্যাপারে তাদৃশ অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া, সমর আয়োজনে, সৈন্য, কামান, বন্দুক, সমরপোত, বায়ুযান প্রভৃতি সমরোপকরণ সংগ্রহে অকাতরে ঋণের উপর ঋণ করিয়া অর্থ-সামর্থ্য ব্যয় ও কালক্ষয় করিতেছে; অন্তরে অন্তরে হিংসার জ্বালায়, ঈর্ষায়, দংশনে, অসহ্য জ্বালা সহ্য করিতেছে। আর যাহার উপর হিংসা করিতেছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মুখে বলিতেছে, তুমি আমার পরম বন্ধু, জীবন-মরণের সহায়, বিপদের আশ্রয় ইত্যাদি। এই কপট, এই অসরল, এই কৃত্রিম ভাবই পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিচয়।"৪৩ কৃষ্ণচন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার কপটমূর্ত্তিকে যেমন চিত্রিত করেছেন—তেমনই সেই সভ্যতার অনুকরণকেও কশাঘাতে জর্জরিত করেন। সেকালের অত্যধিক বিজাতীয় অনুকরণকে ধিক্কার দিয়ে তিনি লিখেছেন। "এখন আর আমরা আমার প্রতি, আমার নিজের প্রতি বড় একটা দৃষ্টি করি না। পরই এখন আমাদের প্রধান অন্তরের বস্তু হইয়াছে। আমার যাহা নিজের তাহা ভাল নহে, তাহা করা আমার কর্ত্তব্য নহে, তাহা করিলে, আমার ভাল না হইয়া মন্দই হইবে। আমাদের এখনকার সমাজে যাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত বা পরিচিত হইবার অভিলাষী, ইহাই এখন তাঁহাদের অনেকের, দৃঢ় ধারণা। অন্ততঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে আমরা প্রতিনিয়ত এই ভাবেরই পরিচয় পাইতেছি। এই ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে বলিয়া, আপনাকে নীচ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে· তাঁহারা এখন পরের অনুকরণ করিতে সদা ব্যস্ত। এ অনুকরণে সমাজে এ পরভাব প্রবেশ করিলে, পরভাব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলে আমাদের পরিণাম কি হইবে, একথা তাঁহারা ভাবেন না; না হয়, তাঁহাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিতে ভাবিতে তাঁহারা অসমর্থ। এজন্য আমাদের সমাজ এখন ক্রমে অপরের সমাজ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা এখন ক্রমশঃ আমাদের নিজত্বকে বিসর্জন করিয়া, স্বহস্তে বলিদান দিয়া, পরের পোষাকে সঙ সাজিয়া পরের আচার-ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া, এক অদ্ভুত জীব হইয়া সমাজে বিচরণ করিতে'ছ বা তাহারই উপক্রম করিতেছি। এখন আমরা নিজে নিজেই আপনাকে চিনিতে পারি না,—অপরে আমাদিগকে চিনিবে কিরূপে? কিন্তু এ সংসারে আমিই সব, আমার উন্নতি না হইলে এ সংসারের সমাজের উন্নতি নাই। যাহা নিজের তাহা ভাল, যাহা আমার তাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা আমার দেশের, তাহা আমার অতি প্রিয়বস্তু, অতি আদরের সামগ্রী. এইরূপ ধারণা এবং ইত্যাকার ধারণা মনে দৃঢ় না হইলে, আমাদের উন্নতির আর অন্য উপায় নাই"৪৪ [ক্রমশঃ।

৪৩। সভ্যতা বর্ব্বরতা নহে। বঙ্গবাসী, ২৪শে পৌষ, ১৩১৬।

৪৪। নিজেকে চিন ও জান।—বঙ্গবাসী ২৩শে আশ্বিন ১৩১৬।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

(৪)
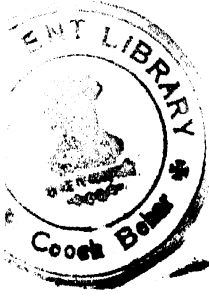
কান্তকবি রজনীকান্তকে একদিন রাম ভাদুড়ী মশাই বললেন—রজনী, বিয়েতে গেলে, দিলে কি? খেলে কি? পেলে কি?

রজনীকান্ত বললেন—দিলাম দৌড়, খেলাম আছাড়, পেলাম ব্যথা।

তাঁর কাছে এক চাষী মক্কেল এসেছে। জিজ্ঞাসা করলেন—বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল?

উত্তর—১৭ বছর।

—তোমার স্ত্রীর তখন বয়স কত ছিল?

—বছর ১২।

—এখন তোমার বয়স কত?

—আজ্ঞে, ৩০।৩২ বছর।

—এখন তোমার স্ত্রীর বয়স কত?

—আজ্ঞে, সে তো প্রায় ৪৬।৪৭ বছর হবে।

—সে কি গো? তোমার বউ হঠাৎ তোমার চেয়ে বড় হয়ে গেল—কেমন করে?

—আজ্ঞে, ঐ কথাটাই কোন ভদ্রলোককে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারলুম না—স্ত্রীলোকের বাড় যে বড় বেশী।

রজনীকান্ত কতকগুলি হাঁসের ডিম এনে রাজশাহীর বাড়ীতে এক কুলুঙ্গীতে রেখে দেন।

একদিন স্ত্রীর কাছে ডিম চাইলেন।

গৃহিণী বললেন—কোথায় রেখেছ?

রজনীকান্ত—উঁচুতে, পেড়ে আন।

রামহরি বলল—পণ্ডিত মশাই, আমার এক ছেলের নাম জগৎপতি, একজনের নাম সুরপতি, একজনের নাম শচীপতি, একজনের নাম ধরাপতি, আর একজনের নাম লক্ষ্মীপতি। আর এক ছেলে হয়েছে, তার নাম মেলাতে পারছি না—

পণ্ডিত মশাই—কেন, এ ছেলের নাম রাখ ভগিনীপতি।

রজনীকান্তের সাংসারিক জীবন বড়ই সুখের ছিল। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তাই স্ত্রীকে তিনি মনের মত করে গড়ে তুলে ছিলেন।

বিবাহের পর তাঁর স্ত্রী ২৩ বছর শাশুড়ীকে 'মা' বলতেন না—আপনি, আসুন, বসুন এই সব বলতেন। সেই জন্য কবি-জননী একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন—আমার একটি মাত্র পুত্রবধূ সেও আমাকে 'মা' বলে না।

রজনীকান্তের কানে একথা পৌঁছল। তিনি স্ত্রীকে অনেক করে বোঝালেন—তবুও কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। হুকুম করলে পাছে হিতে বিপরীত হয় তাই তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

একদিন রজনীকান্ত সপরিবারে নৌকো যোগে ভাঙ্গাবাড়ী থেকে রাজশাহীতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকোটা কাৎ হয়ে গেল। তিনি পড়ে গেলেন। দাঁড়ি মাঝিরা হৈ হৈ করে উঠল। বাবু ডুবে গেল, বাবু ডুবে গেল বলে চিৎকার করে ২।১ জন জলেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে বাবুর আর দেখা নাই। কবি-জায়া উন্মাদের মত শাশুড়ীর পা দুটি জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—মা, কি হবে মা, কি হল মা।

রজনীকান্ত কিন্তু নৌকোর পাশেই ছিলেন। দু'একটা ডুব দিয়েই নৌকোয় উঠে হাসতে হাসতে বললেন—কেমন, আর তো 'মা' বলতে মুখে আটকাবে না, এবার থেকে মাকে 'মা' বলে ডাকবে তো?

তখন সকলে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত মতলবের কথা শুনে হেসে উঠল—আর তাঁর স্ত্রী লজ্জায় মায়ের পা দু'টি জড়িয়ে ধরলেন।

হাইকোর্টে মামলা।

মফঃস্বল থেকে মোকদ্দমা এসেছে। এক পক্ষের উকীল দ্বারকানাথ মিত্তির আর অপর পক্ষের উকীল কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোকদ্দমাটি জমি সংক্রান্ত। অনেক দিনের ব্যাপার। আগে মুন্সেফ কোর্টে দু পক্ষই এসেছিল জমির দাবী নিয়ে। এ বলে আমার জমি, ও বলে আমার জমি। এক পক্ষ বলে, এ জমি বহুদিন ধরে আমার দখলে আছে, জমির ওপর যে চণ্ডীমণ্ডপ—তাও আমাদের সম্পত্তি।

অপর পক্ষ বলে—ও-সব মিথ্যে, ও জমি বহুকাল থেকে আমাদের দখলে। আর ও জমিতে কোন চণ্ডীমণ্ডপই নেই।

জমিতে চণ্ডীমণ্ডপ আছে কিনা দেখবার জন্য মুন্সেফ গেলেন—জমি দেখতে। গিয়ে সেখানে তিনি দেখলেন, জমিতে চণ্ডীমণ্ডপের কোন

মার্জনা চায় তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। সানিন তার উত্তরে জানালো, যেহেতু সে জানে সে কোনোই দোষ করে নি, তাই সামান্য বা অসামান্য কোনো রকম মার্জনাই সে চাইতে পারবে না।

সলজ্জ ভাবে বনদ্বিতীয় উত্তর দিলো, তাহলে দু'-পক্ষ বন্ধুত্ব সূচক গুলী ছুঁড়বে?

সানিন বললো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা কি হাওয়ার উদ্দেশে গুলী ছুড়বো?

দ্বিতীয় লেফটেনান্ট এবারে ভীষণ লজ্জা পেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বললো—না, না তা নয়। আমি কেবল বলছিলাম —আপনারা দু'-পক্ষই হচ্ছেন সম্মানিত ব্যক্তি। যাক্, এসব কথা আপনার সহযোগীর সঙ্গে হবে···আর কিছু বলতে পারলো না ও, বিদায় নিলো।

লেফটেনান্ট বিদায় নিলে সানিন চেয়ারে বসে মেঝের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ভাবতে লাগলো। একি হলো, হঠাৎ আমার জীবন একি অদ্ভুত পথ নিলো? আমার সব অতীত, সব বর্তমান যেন অর্থহীন হয়ে গেলো, মনে হচ্ছে ফ্রাঙ্কফোর্টে আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়তে হবে এই যেন আমার জীবনের শেষ ও চরম লক্ষ্য। তার মনে পড়লো তার এক বিকৃত-মস্তিষ্ক মাসী একটি গানের কলি বার বার গেয়ে নাচতেন!

'হে প্রিয় লেফটেনান্ট, ছোট্ট সঙ্গী হও আমার
এখানে এসো, হে প্রিয়।'

এবারে সে হেসে গান গাইতে লাগলো,

'ছোট্ট সঙ্গী হও আমার, হে প্রিয় লেফটেনান্ট।'

কিন্তু আর তো সময় নেই, এবারে সত্যিই কিছু করতে হয়, লাফিয়ে উঠলো সে—সামনে দেখলো পান্টালেওন একটা চিঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো বললো—আমি অনেকবার দরজায় টোকা দিয়েছি, সাড়া না পেয়ে ভাবছিলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। চিঠি দিয়ে বললো, সিনোরিনা জেম্মার কাছ থেকে।

সানিন মন্ত্রমুগ্ধের মত চিঠিটা খুলে পড়লো—জেম্মা লিখেছে বিশেষ একটি ঘটনা যা সানিনও জানে তাকে বড় চিন্তিত করে তুলেছে ও সে সানিনের সঙ্গে দেখা করতে চায় এক্ষুণি।

পেন্টালিওন আরম্ভ করলো, সিনোরিনা বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বোঝা গেলো সে জানে চিঠিতে কি লেখা ছিলো। তিনি বলে দিয়েছেন আপনি কি করছেন দেখে যেতে ও আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

সানিন বুড়ো ইটালিয়ানের দিকে চেয়ে দেখলো, ভাবলো—তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো—অবশ্য প্রথমে অসংলগ্ন মনে হলো ব্যাপারটা। কিন্তু কেনই বা নয়? নিজেকে জিজ্ঞেস করলো।

এবারে জোরে বললো—মঁসিয়ে পান্টালেওন। বুড়ো চমকে উঠে, তার চিবুক গলাবন্ধে আরো ঢুকিয়ে দিয়ে সানিনের দিকে চাইলো।

সানিন বললো, তুমি জানো কাল কি হয়েছে? পান্টালেওন মাথা নেড়ে চুলের ঝুঁটি পেছন দিকে ফেলে দিলো। ঠোঁট নাড়লো 'হুঁ'।

এমিল বাড়ী পৌঁছেই আদ্যোপান্ত সব বলেছে তাকে।

তুমি জানো। আচ্ছা, একজন অফিসার এসেছিলো আমার কাছে একটু আগে। সেই ইতরটা আমার সঙ্গে লড়তে চায়। আমিও বলেছি হ্যাঁ, লড়বো। কিন্তু আমার তো সহযোগী নেই। তুমি আমার সহযোগী হবে?

বিস্ময়ে পাণ্টালেওনের ভ্রূ যুগল উপরে উঠে চুলের ঝুঁটির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে ইটালিয়ানে বললো, সত্যিই আপনাকে লড়তে হবে? এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ফরাসীতে কথা বলছিলো।

নিশ্চয়ই। না হলে চিরজীবনের জন্য আমার অপবাদ থেকে যাবে।

হুঁ, আর আমি যদি রাজী না হই, তাহলে অন্য আরেক জনকে আপনি খুঁজে নেবেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

পাণ্টালেওন এবারে দৃষ্টি নত করলো। সিনোর ড সানিনি, আমি জানতে চাই আপনার এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের দরুণ একটি ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে কি কলঙ্ক পড়বে না?

আমার তা মনে হয় না, তাছাড়া অন্য কোনো পথ আমার নেই।

হুঁ, পাণ্টালেওন তার মুখ গলাবন্ধে আরো ঢুকিয়ে দিলো আর সেই পাজী ক্লুয়বারার কি হবে?

তার? কিছুই নয়।

ছিঃ, পাণ্টালেওন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দিলো। একটু কম্পিত স্বরে বললো, আমি এই হীন অবস্থায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি যে আমাকে সম্মানিত করলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি যে অতি উদার প্রাণ তার পরিচয় এই থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করতে হবে বৈ কি।

তার আর সময় নেই। মঁসিয়ে···সি·· সিপ্পা···

বুড়ো যোগ করে দিলো টোলা। এক ঘণ্টা চিন্তা করার সময় দিন আমায়। আমার উপকারকের মেয়ে জড়িত রয়েছে। আমি একটু চিন্তা করতে চাই···আমি বাধ্য এক ঘণ্টা, পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি আমার ইচ্ছা জানতে পারবেন।

আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করবো।

এবারে সিনোরিনা জেম্মাকে কি বলবো আমি গিয়ে?

সানিন একটা কাগজে লিখলো আমার জন্য চিন্তিত বোধ করবেন না। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কিছু বলবো। আপনার সহানুভূতির জন্য অনেক ধন্যবাদ। লিখে পাণ্টালেওনকে দিয়ে দিলো।

পাণ্টালেওন চিঠিটা পাশের পকেটে রেখে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বললো এক ঘণ্টার মধ্যে—কিন্তু হঠাৎ ফিরে এসে সানিনের হাত ধরে তার বুকে চেপে বলে উঠলো, হে উদার প্রাণ মহৎ যুবক! এক দুর্বল বৃদ্ধকে তোমার নির্ভীক বীরের হাত দুটো তুলে ধরতে দাও, তারপর একসা পিছিয়ে গিয়ে হাত দুটো ধরলো ও বেরিয়ে গেলো।

সানিন তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো। খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলো, কিন্তু বৃথাই তার চোখ লাইনগুলো দেখে যাচ্ছিল, কিছুই তার মাথায় ঢুকছিলো না।

১৮

এক ঘণ্টা পরে ওয়েটার এসে তাকে একটি পুরানো, দাগধরা কার্ড দিলো। তাতে ছাপানো ছিলো 'ভারিসির পাণ্টালেওন সিপ্পাটোলা ডিউক অব মডেনার রাজসভার সভাগায়ক।' ওয়েটারের পেছনে পাণ্টালেওনকে দেখা গেলো। তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরেছিলো একটা কালো ফ্রককোট ও সাদা সুতীর ওয়েষ্টকোট, তার ওপরে একটা নকল সোনার চেন ঝুলছিলো, আঁট কালো প্যাণ্টের ওপরে একটা কর্ণেলিয়ান পাথরের সীল ঝুলছিলো। খরগোসের চামড়ার তৈরী একটা কালো টুপি ছিলো তার ডান হাতে, বাঁ হাতে ছিলো এক জোড়া পুরু সুয়েডের দস্তানা। তার গলাবন্ধটি ছিলো আরো চওড়া ও আরো উপরে তোলা। তার কলারে লাগানো ছিলো একটা পিন। তাতে বৈদূর্য্যমণি পাথর বসানো। ডান হাতের তর্জনীতে ছিলো আংটি, তাতে ডিজাইন ছিলো একটি জ্বলন্ত হৃদয়কে ধরে আছে দুটি হাত। তার পোষাক থেকে ভাপসা গন্ধ বেরুচ্ছিলো কর্পূর ও কস্তুরী মেশানো। তার অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য যে কোন অন্যমনস্ক লোকেরও নজরে পড়তো। সানিন কাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালো।

কোমর পর্য্যন্ত নুয়ে, পায়ের সামনের দিক নাচের ভঙ্গীতে দূরে রেখে ফরাসীতে ঘোষণা করলো, আমি আপনার সহযোগী, আপনার কাছে জানতে এসেছি কয়েকটি বিষয়। আপনি কি শেষ পর্য্যন্ত লড়ে যাবেন?

শেষ পর্য্যন্ত কেন? মঁসিয়ে সিপ্পাটোলা! আমি কাল যা বলেছি তার কিছুই অন্যথা করবো না বটে কিন্তু আমি তো রক্তপিপাসু নই। দাঁড়াও, আমার বিপক্ষের সহযোগী এখনই আসবে। তোমরা দুজন কথাবার্তা বলে যখন ঠিক করবে সব তখন আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসবো। বিশ্বাস করো, তোমার উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নাও তুমি।

সানিন তাকে বসতে বলার আগেই পাণ্টালেওন বসে পড়লো চেয়ারে। সকলের আগে মানসম্ভ্রম ফরাসী ও ইটালিয়ান মিশিয়ে গাল দিয়ে বললো সেই নচ্ছার পাজী দোকানদার ক্লুয়বার যদি এখনও না বুঝতে পারে তার কি কর্তব্য, তাহলে ধিক সেই ভীরুকে, অতি অধম সে। এখন বলুন, সহযোগী হিসেবে আমার সব কর্তব্যই আমি করবো। যখন পাডুয়াতে ছিলাম তখন এক অশ্বারোহী সেনাদল ছিলো সেখানে। আমার সঙ্গে তার কয়েকজন অফিসারের আলাপ ছিলো। সম্মানরক্ষার সব নীতিই তাদের কাছ থেকে আমি জেনেছিলাম, এই সম্বন্ধে আপনার টারবুস্থির রাজকুমারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে। অন্য সহযোগীটি কি এখনই আসবে?

সানিন জানলা দিয়ে দেখে বললো—এখনই আসবে, ওই যে আসছে।

পাণ্টালেওন তার ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। চুল ঠিক করে নিলো, প্যাণ্ট থেকে কতকগুলো সুতো ঝুলছিলো, বুটজুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। সেই রকম সলজ্জ ও অপ্রতিভ ভাব নিয়ে কিশোর সেকেণ্ড লেফটেনাণ্টটি ঘরে এসে ঢুকলো।

সানিন পরিচয় করিয়ে দিলো মঁসিয়ে রিচার্ড, দ্বিতীয় লেফটেনাণ্ট সিনোর সিপ্পাটোলা সঙ্গীতশিল্প

সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট বৃদ্ধের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো। কেউ যদি তাকে বলতো, এই শিল্পীটি রন্ধননিপুণও বটে, তাহলে তার মনের ভাব কি হতো কে জানে! কিন্তু পাণ্টালেওনের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিলো যেন এ তার নিত্যকার কাজ। নিশ্চয়ই রঙ্গমঞ্চের স্মৃতি তার মনে জেগেছিলো আর সত্যিই সে যেন একটা অভিনয় করছিলো। দু' পক্ষই এক মুহূর্তের জন্ত চুপ করে রইলো।

কর্ণেলিয়ান সীলটি নাড়তে নাড়তে পাণ্টালেওনই প্রথমে কথা বললো—এবারে আরম্ভ করা যাক।

সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট উত্তর দিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু একজন প্রধানের উপস্থিতিতে··

সানিন বললো, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। বলে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলো।

বিছানায় শুয়ে সে জেম্মার কথা ভাবছিলো।

হঠাৎ বন্ধ দরজার ভেতর থেকে সহযোগীদের আওয়াজ ভেসে এলো। ফরাসীতে কথাবার্তা চলছিলো, একজন ইটালিয়ানঘেঁষা ও অন্যজন জার্মাণঘেঁষা ফরাসী বলছিলো—সে যে কি ভাষা—দু'জনে মিলে ফরাসীকে হত্যা করছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাণ্টালেওন পাভুয়ার অশ্বারোহী সেনাদল ও টারবুস্থির রাজকুমারের কথা পাড়লো। সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট সামান্ত মার্জনা-ভিক্ষা ও বন্ধুত্বসূচক গুলী ছোঁড়ার কথা বললো।

কিন্তু বুড়ো শুনতে চাইলো না। সানিন শঙ্কিত হয়ে শুনতে পেলো, সে বলছে সব সেনাদলের সব অফিসার মিলিয়ে একটি বিশে ভালো ও নির্দোষ তরুণীর কড়েআঙুলেরও যোগ্য নয়। অত্যন্ত অপমানজনক এই সমস্ত ঘটনা। প্রথমে সেকেণ্ড লেফটেনাণ্টটি বিশেষ উত্তেজিত হয়নি। কিন্তু এবারে সে-ও রাগতস্বরে বললো, এখানে সে নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে আসেনি।

পাণ্টালেওন চেঁচিয়ে উঠলো, এই বয়সে স্তায় ও নীতির কথা শোনা আপনার দরকার।

একটু থেমেই আবার তাদের কথাবার্তা প্রায় ঝগড়ায় পরিণত হচ্ছিলো। এক ঘণ্টারও বেশী কথাবার্তা চললো, শেষে এই প্রস্তাবগুলি ঠিক হলো! হানাউ-এর পাশে ছোটো বনে ব্যারণ ফন ডনহোফ ও মঁসিয়ে দ্য সানিন আগামীকাল সকাল দশটায় হাজির হয়ে কুড়ি পা দূরে থেকে গুলী ছুঁড়বে। সহযোগীদের কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে প্রত্যেক পক্ষ দুবার গুলী ছুঁড়বে। এক ঘোড়ার পিস্তল দিয়ে, রাইফেল নয়। হের ফন রিক্টার বিদায় নিলে গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে পাণ্টালেওন ফলাফল জানাতে শোবার ঘরে ঢুকে চেঁচাতে লাগলো, সাবাস রাশিয়ান! সাবাস নবীন! আপনারই জয় হবে।

কয়েক মিনিট পর উভয়ে রসেলীর দোকানের দিকে রওয়ানা হলো। সানিন পাণ্টালেওনকে প্রতিজ্ঞা করালো এই লড়াইয়ের খবরটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চোখ পিটপিট করে বললো গোপনীয়, গোপনীয়। মনে হচ্ছিলো তার বয়স যেন কমে গেছে, এত হাল্কা পায়ে হাঁটছিলো সে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি যদিও অপ্রীতিকর, তবু রঙ্গালয়ে সে-দিনগুলো যেন সে ফিরে পেলো, যখন সে মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করেছে। মাঝারি গলার গাইয়েরা কথায় কথায় শপথ করতে ভালোবাসে।

১৯

এমিল সানিনকে নিয়ে যেতে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। এক ঘণ্টার ওপর সে অপেক্ষা করছিলো। সানিনের কানে চুপি চুপি বললো, তার মা এই অপ্রীতিকর ঘটনার কিছুই জানেন না, তাকে যেন কিছুই জানানো হয় না। আরো বললো, তাকে এখন দোকানে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তার যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই, অন্ত কোথাও লুকিয়ে থাকবে সে। এতগুলো খবর এক নিঃশ্বাসে বলে সানিনের কাঁধে চুমু খেলো সে। তার পরই দৌড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। দোকানে ঢুকে জেম্মার সঙ্গে সানিনের দেখা হলো, কি যেন বলতে চাইলো সে কিন্তু তার ঠোঁটটা শুধু নড়ে উঠলো, একবার এপাশে একবার ওপাশে চাইলো সে। সানিন তাড়াতাড়ি বললো সব কিছু মিটে গেছে। মিটমাট হয়ে গেছে, কোনো ভয় নেই।

সে জিজ্ঞেস করলো, আজ কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?

হ্যাঁ, একজন এসেছিলো, কথাবার্তা হলো, শেষ পর্য্যন্ত আমরা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারলাম।

জেম্মা কাউণ্টারের পেছনে গেলো।

সানিন বুঝতে পারলো, জেম্মা তার কথা বিশ্বাস করে নি! যাই হোক, সে পেছনের ঘরে ফ্রাউ লেনোরের কাছে গেলো।

ফ্রাউ লেনোরের মাথাধরা সেরে গিয়েছিলো। কিন্তু তাকে ভীষণ বিষণ্ন দেখাচ্ছিলো। সানিনকে দেখে হাসলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন, তার আজ মন ভালো নেই। আজ সানিনের তার কাছে বসে থাকতে ভালো লাগবে না। সানিন লক্ষ্য করলো তার চোখের পাতাগুলো লাল ও ভারী দেখাচ্ছে।

ফ্রাউ লেনোর, কি হয়েছে? আপনি কি কাঁদছিলেন?

যে ঘরে তার মেয়ে ছিলো সেদিকে চেয়ে বললেন তিনি চুপ, জোরে বলবেন না।

কিন্তু কেন কাঁদছেন?

মঁসিয়ে সানিন, আমি নিজেই তার কারণ জানি না।

কেউ কি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছে?

না, না, হঠাৎ আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। জিয়োভান বাটিষ্টা ও আমার প্রথম যৌবন মনে পড়ে গেলো। জীবন কি ক্ষণস্থায়ী। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, চিন্তা করতে পারছি না। ভাবতে পারছি না বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে চিরকালই এরকম কেটে যাবে। কিন্তু বার্দ্ধক্য এসে যাচ্ছে। ফ্রাউ লেনোরের চোখ জলে ভরে এলো। আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না! কিন্তু আপনার জীবনে যখন বার্দ্ধক্য আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন কি বিষাদ নিয়ে আসে সে।

সানিন তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো। তার সন্তানদের কথা বলে বললো, তাদের মধ্যেই তিনি তার যৌবন ফিরে পাবেন। এমন কি সে ঠাট্টা করতেও চেষ্টা করলো—ফ্রাউ লেনোর নিজের সুখ্যাতি শুনতে চাইছেন! কিন্তু ফ্রাউ লেনোর গম্ভীর গলায় তাকে চুপ করতে বললেন। জীবনে এই প্রথম সানিন বুঝতে পারলো

বার্দ্ধক্যের জন্ত যে দুঃখ দেখা দেয় তার সান্ত্বনা নেই। অন্ত কথা বলে তা' ভুলিয়ে দেওয়া যায় না। নিজে থেকে এই বিষাদভাব কেটে যেতে দিতে হয়। এবারে সানিন বললো, ট্রেসেট খেললে কেমন হয়? ফ্রাউ লেনোর রাজী হলেন, মনে হলো খুসীও হলেন।

দুপুরে খাওয়ার আগে পর্য্যন্ত তারা তাস খেলে গেলেন। খাবার পরও আবার সুরু হলো। পাণ্টালেওনও যোগ দিলো। তার চিবুক গলাবন্ধতে ঢুকে গিয়েছিলো, চুল এসে কপালে পড়ছিলো। তার চালচলন এতই অদ্ভুত ঠেকছিলো যে, যে কেউ বুঝতে পারতো সে কোনো কিছু গোপন করে রাখতে চাইছে।

সারা দিন ধরে সবরকমে সে সানিনের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা দখানোর ত্রুটি করলো না। টেবিলে মেয়েদের ছেড়ে সানিনকেই প্রথম পরিবেশন করলো। তাস খেলতে সব সুযোগ সুবিধেগুলো সানিনকে ছেড়ে দিলো। হঠাৎ নিতান্তই অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠলো রাশিয়ানরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে উদার প্রাণ, নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত জাতি।

সানিন মনে মনে বুড়োকে গাল দিলো।

সানিন যত না মেডেম রসেলীর মনের ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলো তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হলো তার মেয়ের ব্যবহারে। সে যে তাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলো তা নয়, বরং সব সময় তার পাশে বসেছিলো, যখন সে কথা বলছিলো তার দিকে চেয়ে শুনছিলো। কিন্তু কোন কথায় সে যোগ দিচ্ছিলো না আর যখনই সানিন তাকে কিছু বলছিলো উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছিলো। তারপর ফিরে এসে এক কোণে বসছিলো—যেন কিছু ভাবছিলো। ফ্রাউ লেনোর পর্য্যন্ত তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে দু'-একবার জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে?

জেম্মা উত্তরে বললো কিছুই নয়, তুমি তো জানো মাঝে মাঝে আমি এ রকম চুপ হয়ে যাই।

তার মা-ও সায় দিয়ে বললেন, তা বটে।

এ রকম করে সারাদিন সুখে-দুঃখে কেটে গেলো। জেম্মা যদি একটু সহানুভূতি দেখাতো তাহলে সানিন হয়ত লোভ সামলাতে পারতো না, গর্বভরে সব প্রকাশ করে দিতো, কিম্বা বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে চিরবিচ্ছেদ চিন্তা করে হয়ত তার মন ব্যথিত হয়ে উঠতো। কিন্তু জেম্মা কোন কথাই বললো না। তাই কফি পানের আগে সানিন পিয়ানো বাজিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখলো।

এমিল ফিরলো দেরী করে, ও এসেই বিশ্রাম নিতে চলে গেলো পাছে কেউ হের ক্লুবারের সম্বন্ধে কিছু জানতে চায়। সানিনের বিদায় নেবার সময় এলো। জেম্মার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে তার লেনস্কি ও ওলগার বিদায়ের দৃশ্য মনে পড়ে গেলো, পুশকিনের লেখা ইউজিন ওনেগিন বইটিতে। জেম্মার হাত জোরে চেপে তার মুখের দিকে চাইলো কিন্তু জেম্মা অন্যদিকে চেয়ে আঙুল ছাড়িয়ে নিলো।

২০

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো তারায় ভরা আকাশ—ছোট, বড়, ঝক্‌ঝক্‌ করছিলো। আকাশে চাঁদ ছিলো না। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো, সানিন রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত গেলো, তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছিলো না। মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে চাইছিলো সে। সে আবার ফিরে গেলো। রসেলীর দোকানের কাছাকাছি যেতেই রাস্তার দিকের একটা জানলা সশব্দে খুলে গেলো ও অন্ধকারের মধ্যে একজন মহিলাকে দেখা গেলো। ঘরে কোনো আলো জ্বলছিলো না। সে শুনতে পেলো তার নাম ধরে কেউ ডাকছে।

ম'সিয়ে দিমিত্রি!

দৌড়ে জানলায় গেলো সে। জেম্মা ডাকছিলো তাকে। সে জানলায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মুখ বের করে দিয়েছিলো।

সাবধানী গলায় বললো ম'সিয়ে দিমিত্রি, সারাদিন ধরে একটি জিনিষ আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন আপনাকে হঠাৎ আবার দেখতে পেয়ে মনে হলো ওটা দিলেই ভালো হয়। এই বলে জেম্মা থেমে গেলো, তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

আকাশে মেঘ ছিলো না, প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে ছিলো। হঠাৎ ভীষণ জোরে ঝড় উঠলো, মনে হলো যেন সব কিছু কাঁপতে লাগলো। গরম ভাপসা বাতাস গাছপালা, বাড়ীঘর, রাস্তা সব যেন উড়িয়ে দিলো, সানিনের টুপি উড়ে গেলো—জেম্মার চুল এলোমেলো হয়ে গেলো। সানিনের মাথা জানলা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলো, অজানতেই তার মাথা জানলার ভেতর গিয়ে লাগলো, জেম্মা তার কাঁধ দুহাতে ধরে রইলো ও তার মাথা জেম্মার বুকে ঠেকে গেলো। এই ভীষণ ঝড় প্রায় এক মিনিট স্থায়ী হলো। তারপর বড় একঝাঁক পাখীর মত উড়ে চলে গেলো, আবার সব কিছু শান্ত হয়ে গেলো।

সানিন মুখ তুলে দেখলো অপূর্ব সুন্দর চেহারা, ভয়ে বিহ্বল অপরূপ মনোমুগ্ধকর বিশাল দুটি চোখ, এই রূপরাশি দেখে যেন তার হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেলো। একরাশ রেশমী চুল তার বুকে এসে পড়েছিলো, ঠোঁটে চেপে সে শুধু বলতে পারলো ও জেম্মা।

জেম্মার অনাবৃত হাত দুটি তখনও তার কাঁধে রাখা ছিলো। অসীম শূন্যের দিকে চেয়ে বললো, কি হলো? বিদ্যুৎ চমকালো নাকি?

সানিন আবার বললো, জেম্মা।

জেম্মা নিশ্বাস ফেলে ঘরের ভেতরে চাইলো ও চট করে একটা বাসি গোলাপফুল তার জামা থেকে বের করে সানিনকে দিয়ে বললো, আপনাকে ফুলটা দিতে চেয়েছিলাম।

সানিন দেখেই বুঝলো ফুলটা কাল সে কেড়ে এনেছিলো।

সশব্দে জানলা বন্ধ হয়ে গেলো—অন্ধকার পাল্লার পেছনে আর কিছু দেখা গেলো না।

সানিন তার টুপি ছাড়াই হোটেলে ফিরে গেলো, সে লক্ষ্যই করলো না যে টুপিটা সে হারিয়েছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।
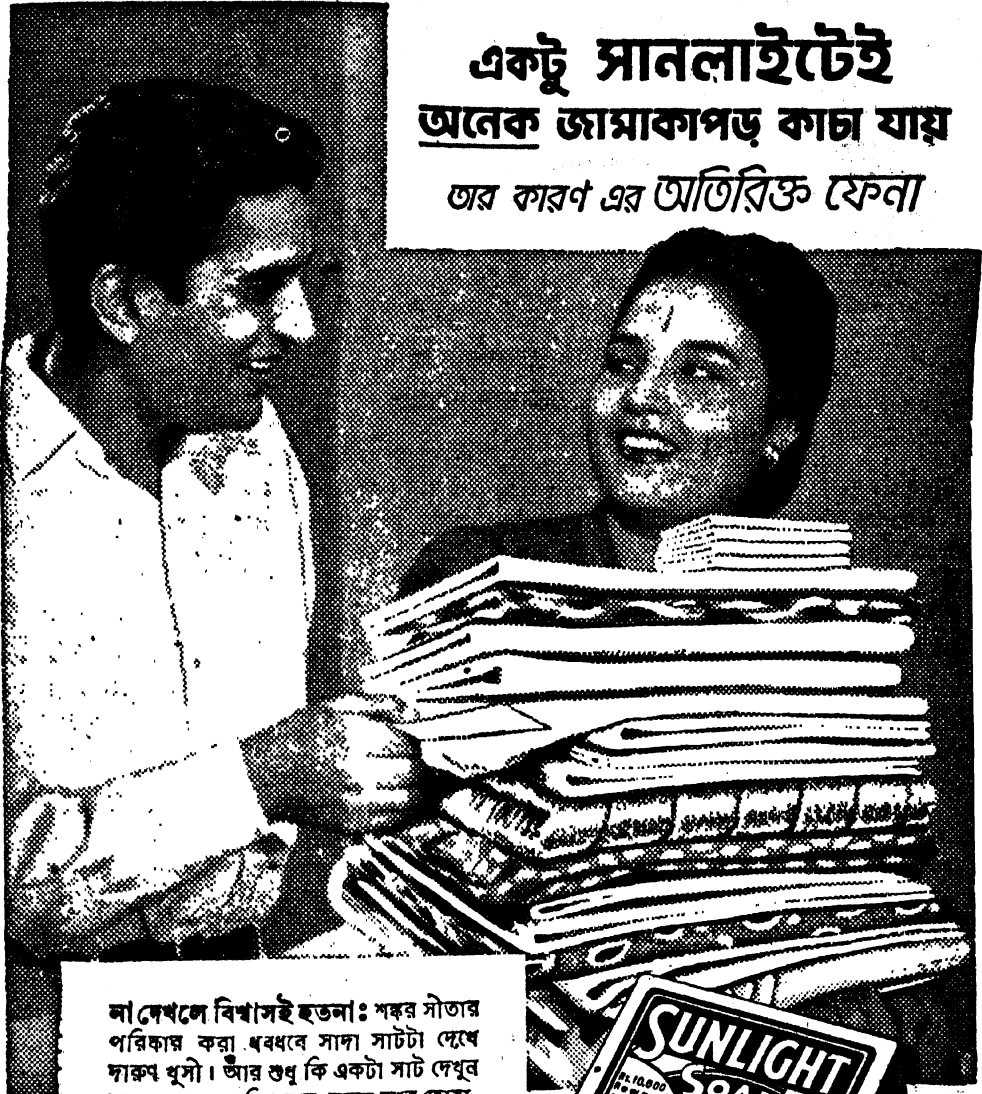
একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

যখন হল না, তখন একদিন ভায়লেটকে বললাম ভায়লেট, এ ভাবে আর কত দিন চলবে—ভাল রান্নার লোকের কি কোনও ব্যবস্থা করতে পারনি ?

ভায়লেট শুধাল, কেন ? আপনার কি কোনও কষ্ট হচ্ছে ? তাড়াতাড়ি বললাম, না না। সেদিক দিয়ে নয়, তবে তোমার উপর দারুণ অত্যাচার করা হচ্ছে।

মৃদু হেসে বলল, অত্যাচার করার অধিকার স্বইচ্ছায় আপনাকে দিয়েছি বলেই তা সইবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। এ নিয়ে আপনি ভাববেন না—সময় হলে সব ব্যবস্থাই করে দেব।

আমি চুপ করে গেলাম। এ নিয়ে আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে হল না। আর সত্যই ত খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে আমার কোনও কষ্ট ত হচ্ছিল না। ভায়লেট নিজেই রান্না করে খাওয়াত এবং তার মধ্যে সেবা-যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না।

শুধু তাই নয়, ক্রমে ভায়লেট সার্জ্জারীর সমস্ত ব্যবস্থা নিজের হাতে নিল তুলে—আমি কোনও কথা বলিনি। সকালে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে দিল অনেক, তিনটি কি বড় জোর চারটির বেশী রোগীকে সকালে আসতে দিত না। বিকালের দিকে রোগীর সংখ্যা দিল বাড়িয়ে। মনে ভেবেছিলাম—সকালে ভায়লেটকে রান্নাবান্না করতে হয়, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু রোগীদের মধ্যে এ নিয়ে যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হতে পারে সেটুকু ত আমার অজানা ছিল না। তবুও এ নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করিনি। ভায়লেটও এ সব ব্যবস্থা অনায়াসে করে যেতে লাগল—আমার সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করে। শুধু তাই নয়, ক্রমে লক্ষ্য করলাম—সমস্ত রোগীকেই সে আমার কাছে আসতে দিতও না। নিজেই রোগীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বলে দিত—ডাক্তারকে দেখাবার সময় এখনও আসেনি, দু'দিন এই কর, যদি না কমে ডাক্তার দেখবে। যাই হোক, এতে করে আমার তালিকায় যে রোগীর সংখ্যা কমে যেতে পারে, সেটুকু কি ভায়লেট বুঝতে পারেনি ? নিশ্চয়ই পেরেছিল। তবুও কেন যে এরকম করত, আমি আজও জানিনা। মোটের উপর সার্জ্জারীর দিক দিয়ে যা কিছু করবার ভায়লেট নিজের ইচ্ছায়ই করে যেতে লাগল—আমি চুপচাপ পড়ে ছিলাম একপাশে আমার ভাঙা মন নিয়ে পঙ্গু হয়ে।

আমার মন কি ভায়লেটের উপর খুব প্রসন্ন হয়েছিল সে সময় ? না। ঠিক তা নয়। ভায়লেটের চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক দিনই হারিয়েছি—তখনও ছিলনা। যদিও সে সময়টা ভায়লেটের সেবাযত্নে আমি যে অভিভূত একেবারেই হইনি, এমন কথা বলা যায়না। সেই সেবাযত্নের স্রোতে গা ভাসিয়ে অনায়াসে চোখ বুজে ভেসে চলে যাচ্ছিলাম—জীবনে যেন আর কোনও কিছুই করার নাই।

এই ভাবে দিন পনের কাটার পর একদিন ভায়লেটকে বললাম ভায়লেট। এই ভাবেই কি জীবনটা চলবে ?

গম্ভীর ভাবে বলল, না।

শুধালাম, তবে ?

বলল, আগে আপনি নিজের পায়ে দাঁড়ান—তারপর।

শুধালাম, তারপর কি ?

[illegible] করে।

শুধালাম, কি করতে বল ?

বলল, এখানে যদি আপনার ভাল না লাগে, এখানকার প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে হবে। চলে যাব ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম, কি লণ্ডনের মতন বড় সহরে। সেখানে একটা প্র্যাকটিস জমিয়ে তুলতে হবে।

চুপ করে রইলাম—কিছু বললাম না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, শুধু তাই নয় আরও—চুপ করে গেল।

শুধালাম, কি ?

বলল নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিথ্যা বন্ধন ছিন্ন করে ফেলতে হবে, নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে।

শুধালাম, অর্থাৎ— ?

জোরের সঙ্গে বলল, ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিভোর্স—মার্লিনের সঙ্গে আমার ডিভোর্স ! চুপ করে রইলাম—কোনও কথা বললাম না।

ভায়লেট শুধাল, কি,—চুপ করে রইলেন যে ?

বললাম, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। আমিই সব ব্যবস্থা করব।

শুধালাম, কি ব্যবস্থা করবে তুমি ?

বলল, সব। সে শক্তি আমার আছে। আপনি যেমন আছেন—তেমনই থাকুন। আপনি যে ধাতের মানুষ, আপনার দ্বারা কিছু হবে না—সেটা বোঝা উচিত ছিল। সত্যি। একটা কিছু করা দরকার।

• • •

একটা কিছু করা দরকার—কথাটা আমার মনে গিয়ে বিঁধল। এই দশ পনের দিন আমি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি—সাপের বিষে জর্জরিত মনে মানুষ যেমন ঘুমোয়। কারও সঙ্গে দেখা করিনি, ক্লাবে যাইনি—কারুকে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা পেতাম।

ইতিমধ্যে মার্লিন চলে যাওয়ার দিন দুই পরেই হবে, একদিন বিকেলে সার্জ্জারীতে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি—মনে হল টেলিফোন বাজল। টেলিফোন ধরতে প্রথমটা ভয় হল—যদি কেউ মার্লিনকে চায় কি বলব ! যাই হোক, টেলিফোনটা ধরলাম—এই যে ! গ্রেসের গলা। কোনও কথা শোনার আগেই তাড়াতাড়ি বললাম কে—মিসেস লালকাকা, মিসেস চাউডুরী ত বাড়ীতে নেই, একটু বেরিয়েছেন।

মিসেস লালকাকা বললেন, ওঃ—তা আপনারা ভাল আছেন ?

বললাম, হ্যাঁ। ভাল আছি। ধন্যবাদ।

বললেন, অনেক দিন দেখা হয় না—

বললাম, মার্লিনকে নিয়ে শীঘ্র একদিন যাব আপনাদের বাড়ীতে।

বললাম, ধন্যবাদ।

টেলিফোন কেটে দিয়ে যেন বাঁচলাম।

মার্লিন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, একথা যে কাউকে বলার নয়—লালকাকাদের ত নয়ই। অথচ কতদিনই বা চেপে রাখব। যাই হোক, এই ভাবে দিন পনেরো কাটার পর সেই দিন ভায়লেটের কথায় যেন প্রাণে একটা চমক লাগল—একটা কিছু করা দরকার। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কথাটা মনটাকে পেয়ে বসল। কি করি

...য়লেটের প্রস্তাবে মন একেবারেই সায় দেয়নি। এ দেশে আবার ...তুন করে জীবন গড়তে—না না, আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না। ...ন উৎসাহ কোথায়?

হঠাৎ মনে এল—সুধা নার্সিং-হোম। কথাটা কি ইতিমধ্যে ...লে গিয়েছিলাম? কথাটা মনে হওয়াতেই একটা নতুন ...ৎসাহের ক্ষীণ সাড়া জাগল মনে। সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ...াইটেকে আঁকড়ে ধরলাম—সুধা নার্সিং হোম। এই ক'দিনের ...াহারা অবস্থায় সহজেই মন যেন একটা অবলম্বন পেল। ...থাটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালবেলা উঠে, তৈরী হয়ে তিনখানা চিঠি ...খলাম। একখানা লিখলাম ম্যানচেষ্টারে টমাস কুকের আফিসে। ...খন জানুয়ারী মাসের প্রথম দিক, অনুরোধ জানালাম—মার্চের ...ঝামাঝি কিংবা এপ্রিলের প্রথম আমার ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার ...ন্য কোনও জাহাজে ব্যবস্থা এবং পাসপোর্ট ইত্যাদির বন্দোবস্ত ...রতে। লিখলাম—তাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেলেই ...মি ম্যানচেষ্টারে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করব। আর ...কখানা চিঠি লিখলাম—আমার জানা-শোনা জমি এবং বাড়ীর ...জেন্টদের কাছে, যাদের কাছ থেকে আমায় ওল্ড হল লেনের ...াড়ীখানি কিনেছিলাম। এবং যারা আমার বাড়ীর বিষয় ...বই জানেন। লিখলাম—আমার বাড়ীখানি আমি মার্চের ...ধ্যে বেচতে চাই, আট হাজার পাউণ্ড দাম আশা করি। ...ার একখানা চিঠি লিখলাম, লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ...টাইমস-এ। একটি বিজ্ঞাপন—সেলএ আমার ডাক্তারী ...্র্যাকটীসের বিষয় কিছু বিবরণ দিয়ে লিখলাম, প্র্যাকটীসটা আমি ...িক্রী করতে চাই। এবং এই চিঠিখানার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের খরচা ...হিসাবে একটি পাঁচ পাউণ্ডের চেকও পাঠিয়ে দিলাম।

এই সব করে, যখন সার্জ্জারীতে যাওয়ার জন্য বেরুলাম—...ন যেন অনেকটা হাল্কা বোধ হল। শুধু তাই নয়, মনে যেন ...একটু জোরও পেলাম। সার্জ্জারীতে গিয়ে ভায়লেটকে অবশ্য ...এসব কথা কিছুই বলিনি।

● ● ● ●

যতদূর মনে পড়ে, আরও বোধহয় পাঁচ-সাত দিন ...রের কথা।

ভায়লেট একদিন বলল, আমাকে দু'দিনের ছুটি দেবেন?

শুধালাম, কেন? কোথায় যাবে?

সংক্ষেপে বলল, আমার একটু কাজ আছে।

বললাম, বেশ। কিন্তু—

বলল, আপনার খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থাই আমি করে যাচ্ছি। ...দিনের জন্য একটি নতুন মেয়ে রেখে যাচ্ছি—চালাক চতুর মেয়ে, ...াকে দেখিয়েও দিয়েছি সব।

আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা তখনও ভায়লেটের কাছেই ...িল। ভায়লেট যেন এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে নারাজ ...এবং আমিও এদিক দিয়ে ভায়লেটকে অখুশী করতে চাইনি। ...নে মনে ভেবে নিয়েছিলাম—ভায়লেটের মাহিনার সঙ্গে সপ্তাহ ...হিসাবে একটা মোটা টাকা ভায়লেটকে দিতেই হবে।

বললাম, চলে যাবে, কিন্তু সার্জ্জারীতে রোগীর কাজ?

বলল, দুটো দিন যদি আপনি একটু কষ্ট করে চালিয়ে নেন। নতুন মেয়েটিই অবশ্য তাদের বসাবে।

বললাম, বেশ। যা হয় হবে।

হঠাৎ মনে হল—ভায়লেট কি অন্য কোথাও চাকুরীর চেষ্টা করছে নাকি? কথাটা ভাবতে ভাল লাগল না। আমার নতুন সেক্রেটারী। বুঝতে পারলাম ভায়লেটের উপর ইতিমধ্যে আমি মনে মনে অনেকটা নির্ভর করে ফেলেছি। সে নির্ভরতাটুকু যেন আর ছাড়তে পারি না।

শুধালাম, তুমি কোথায় যাবে? কি কাজ?

মৃদু হেসে বলল, সে সব পরে বলব।

● ● ● ●

ইতিমধ্যে আমার দু'খানি চিঠির জবাব এলো। টাইমস্ লিখেছে, দশ দিন পরে তারা আমার বিজ্ঞাপন কাগজে দেবে। তার পূর্ব্বে স্থান নাই। বাড়ীর এজেন্টদের কাছ থেকেও চিঠির জবাব এলো—তাঁরা শীঘ্রই বাড়ী বিক্রী করে দিতে পারবেন বলে আশা করেন, তবে আট হাজার পাউণ্ড দর দাঁ-ও পেতে পারে, সাত হাজার পর্য্যন্ত বোধ হয় পাওয়া যাবে।

ভায়লেট ফিরে এলো ঠিক দু' দিন পরেই। ফিরে এলো শনিবার রাত্রে। আমি সার্জ্জারী থেকে চলে আসার পর, তাই আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। পরের দিন রবিবার সার্জ্জারীতে রোগীর বালাই নাই,

তাই একটু বেলা করে সার্জ্জারীতে গেলাম। ভায়লেট একমুখ হেসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

শুধালাম, তুমি ফিরলে কখন?

বলল, কাল রাত্রে প্রায় দশটা।

বললাম, অত রাত্রে ফিরতে পারলে—কাল রাত্রে যে ভয়ানক ঠাণ্ডা ছিল?

বলল, মনে আনন্দের উত্তাপ থাকলে বাইরের ঠাণ্ডা গায়ে লাগে না।

মৃদু হেসে বললাম, এত আনন্দ তোমার কিসে হল শুনি?

বলছি। তার আগে একটা কথা শুধাই।

বললাম, বল।

শুধাল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এইবার আপনার মনে একটু উৎসাহ জেগেছে—না?

বললাম, হ্যাঁ।

বলল, ভালই হল। এইবার জীবনটাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার সময় এসেছে।

শুধালাম, কি রকম?

মৃদু হেসে বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

একটু অবাক হয়ে ভায়লেটের মুখের দিকে তাকালাম।

শুধালাম, কি ব্যবস্থা?

বলল, আমি এখানেই খবর পেয়েছিলাম ম্যানচেষ্টারে ডাঃ নাইটনের শরীর ভাল নয়। তিনি তাঁর প্র্যাকটীস্ ছেড়ে দিতে চান। তাই শুনে ম্যানচেষ্টারে গিয়ে ডাঃ নাইটনের সঙ্গে দেখা করলাম.।

শুধালাম, তার পর?

বলল, নিজের পরিচয় দিয়ে ডাঃ নাইটনকে বললাম যে, আপনি তাঁর প্র্যাকটীস্ কিনে নিতে রাজী আছেন?

শুধালাম, বললে?

বলল, হ্যাঁ কেন বলব না। ডাঃ নাইটন শুনে খুব খুশী। তিনি বললেন—যদিও আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ নাই তবুও আপনার প্রতি তাঁর [illegible] শ্রদ্ধা আছে। তাঁর প্র্যাকটীস্ আপনি নিলে তার [illegible] আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না। তিনি [illegible] রাজী হলেন। শুধু তাই নয়—

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শুধালাম, কি?

বলল, ডাঃ নাইটনকে আমি রাজী করিয়েছি, তিনি আপাততঃ সেল-এ আপনার প্র্যাকটীস্ নেবেন।

অবাক হয়ে শুধালাম, কি রকম?

বলল, তাঁর ত বয়স হয়েছে এবং শরীরও ম্যানচেষ্টারে ভাল যাচ্ছে না। তাই তিনি ম্যানচেষ্টার ছেড়ে একটু ফাঁকায় নিরিবিলি কোথাও থাকতে চান।

আমিই বললাম—আপনি সেল-এর প্র্যাকটীস্‌টা নিন, কাজও বেশী নয়, বরং ফাঁকায় ভালই থাকবেন। শেষ পর্য্যন্ত রাজী করিয়ে তবে এলাম। দিন কতক সেল-এ থেকে দেখবেন কি রকম চলে।

ভায়লেট উৎসাহের সঙ্গে বলে যেতে লাগল, আপাততঃ তিনি আপনার শুভ হল লেনের বাড়ীও নেবেন—কিনে নয়, ভাড়া হিসাবে। সার্জ্জারী ত নেবেনই—সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

বলে ভায়লেট একটু যেন গর্ব্বভরে আমার মুখের দিকে চাইল।

আবার বলল, নাইটনের যে রকম নাম এবং ম্যানচেষ্টারে যে পাড়ায় প্র্যাকটীস—তাঁর প্র্যাকটীস নিলে আপনি সহজেই খুব বড় হয়ে উঠতে পারবেন।

বললাম, তা এত তাড়াতাড়ি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভায়লেট বলল, তাড়াতাড়ি করলে এ-কাজ হত না। নাইটনের প্র্যাকটীস পড়ে থাকত না, চট করে কেউ নিয়ে নিত।

বললাম, কিন্তু ভায়লেট—

বলল, এর মধ্যে কোনও কিন্তু নাই ডাঃ চাউডুরী! ভগবান আপনার প্রতি প্রসন্ন, তাই চট করে এমন সুব্যবস্থা হয়েছে। আর আপনার কোনও দ্বিধা করা চলবে না।

ইতস্ততঃ করে বললাম, ভায়লেট! আমি যে অন্তরকম—

বলল, আপনার কি এখন মনের ঠিক আছে যে ভেবে কিছু ঠিক করবেন? ব্যবস্থার ভার যখন আমি নিয়েছি—আমিই সব করব।

ভায়লেটের কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে মন আপনা থেকে সঙ্কুচিত হল। ভায়লেটকে প্রতিবাদ করে কিছু বলবার জোর পেলাম না মনে। চুপ করে রইলাম।

একটু চুপ করে থেকে ভায়লেট বলল, শুধু তাই নয়—আপনার ডিভোর্সেরও ব্যবস্থা করে এসেছি।

চমকে শুধালাম, কি রকম?

বলল, কেটারিং রবিনসন ও কেটারিং—ম্যানচেষ্টারের বিখ্যাত সলিসিটার। তাদের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তারা সহজে কারও কেস নেয় না। আপনার কেস নিতে রাজী করিয়েছি। আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবার জন্ত তাদের প্রতিনিধি আপনার সঙ্গে এসে দেখা করবে—আমি তাদের চিঠি দিলেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—তারা যখন কেস নিয়েছে, যা কিছু করার তারাই করবে। আপনাকে কিছুই করতে হবে না।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। ভায়লেটকে নিয়ে এখন কি করি?

ভায়লেট উঠে দাঁড়াল। মৃদু হেসে আমার কাছে এসে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে একটু যেন আবদারের সুরে বলল, দু'দিন ভূতের মতন খেটে এত যে করে এলাম আপনার জন্ত—একটা শুধু ধন্তবাদও দিলেন না?

মুখ তুলে ভায়লেটের দিকে তাকালাম। চোখ দুটি খুশীতে শুধু যে জ্বলছে তাই নয়, তার ভিতরে আরও একটা কি যেন ফুটে বেরুচ্ছে—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন বললাম, ধন্তবাদ!

আমার কাঁধের উপর একটু জোর দিয়ে বলল, Cheer up Doc! কিছু ভাববেন না। ভায়লেটের উপর নির্ভর করুন—ভায়লেট সব ঠিক করে দেবে। যাই আপনার চা নিয়ে আসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৺শচীন্দ্র মজুমদার

মহাসুখ
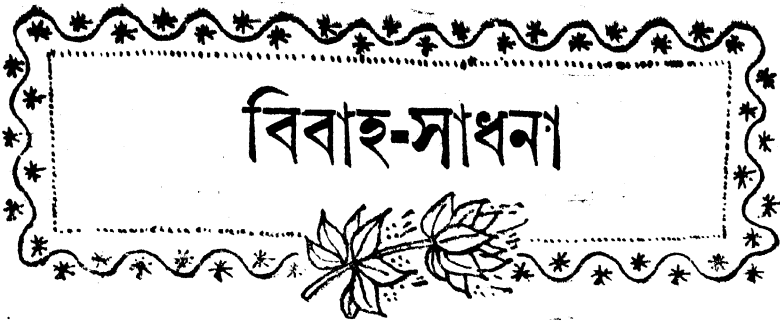
মহত্তর শৃঙ্গার রসকে উপলব্ধি না করলে মহত্তর প্রেমের সন্ধানও প্রাপ্তি হয় না। জীবসৃষ্টির জন্য সাধারণ রতি জীবস্তরের বস্তু। সমগ্র প্রাণিজগতে সেটির প্রকৃতি এক ধরণের, মানুষের বেলাতেও তার কোন তারতম্য হয় না। জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্যটি পূরণ করবার জন্য প্রকৃতি মানুষকে নিজের প্রয়োজনের অনুরূপ এবং অসম্পূর্ণ করে নির্মাণ করে। মানবস্তরে উন্নীত হতে গেলে প্রাকৃতিক জীবনের মৃত্যুমুখী গতির উজানসাধনা করে নিরন্তর আত্মপ্রয়াসের দ্বারা সোপানে সোপানে আপনাকে সম্পূর্ণ করে মানুষকে তার সকল প্রসুপ্ত শক্তি লাভ করতে হয়। এই বিশেষ প্রয়াসটির নাম সাধনা। মানবস্তরের রতিশক্তি ও রতিপ্রকৃতি সাধনালভ্য বস্তু। এ স্তরের মানুষ জীবসৃষ্টির কবল হতে মুক্ত।

পূর্বে বলা হয়েছে যে নারী কিশোর বয়সে সোজাসুজি প্রীতির ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিশোরী সদা প্রীতিসজাগ, সেটি তার নিজস্ব ধর্ম। পুরুষের পথ ভিন্ন হলেও কিশোর বয়সে তারও প্রীতির প্রবণতা হয়। জীবনের কঠিন আবর্তে পড়ে গেলে পুরুষ ও নারী, উভয়েই এই প্রীতির অনির্বচনীয় শক্তিটি হারিয়ে ফেলে। অতিশয় সহজেই পুরুষের সে শক্তিটি নষ্ট হয়। এই "কিশোর-কিশোরী" ভাবটা বিবাহের প্রাণ। এ ভাবটি না থাকলে বিবাহ কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না এবং ঊর্দ্ধপরিণাম লাভ করে না। পতিপত্নীর কায়িক বয়স যতোই হোক না কেনো, যত্ন থাকলে এ ভাবটি সঞ্জীবিত করে রাখা যায় এবং তাই রাখা বিবাহের আর্টের সাধনা। বস্তুতপক্ষে, কিশোর-কিশোরী ভাব আধ্যাত্মিক অলংকার। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা এ তত্ত্বটি নিগূঢ় করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তাঁরা বলেছেন যে "কিশোরী প্রেমের সার।" চণ্ডীদাস তাই বিশেষ করে ইঙ্গিত করেছেন,—

> কিশোরা কিশোরী এ দুইজন
> শৃঙ্গার রসের মূরতি হন।"

আমরা বলেছি যে, বিবাহ-জীবন বীণায় সুর বাঁধা ও অবিশ্রাম সেই সুর সাধা। বীণা এস্রাজ প্রভৃতি সুরযন্ত্রে খুব টান করে তার না বাঁধলে তাতে সুরের ঝঙ্কার ওঠেনা। ঢিলে তারে সুর হয় না। সমগ্র সৃষ্টি এই টানের (Tension) নিয়মের ওপর নির্ভর করে আছে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের আকর্ষণের কথা আমরা জানি। টান দিয়েই তারা স্ব স্ব কক্ষে স্থিত। ভূমণ্ডল নানা টানের সাম্যে শূন্যলোকে স্বস্থানে অবস্থান করে। মানবজীবনেও টান ভিত্তিগত সত্য। টান ভিন্ন জীবন গতিশীল ও উৎসাহশীল হয় না। আমাদের সকল কর্মে অন্তর্নিহিত টানের বিচিত্র খেলা। আমাদের সকল দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়াসে টানের ক্রিয়া। টান না হলে মানুষের যা সর্বোত্তম প্রকাশ, গান কাব্য প্রার্থনা হয় না। গানে কাব্যে ছন্দের কেন্দ্রাভিমুখী আঁট বন্ধনী এবং ভাবের প্রসারণশীল কেন্দ্রাপসারী গতি। এই ছন্দের টানে তাদের প্রাণশক্তিও মাধুর্যের সৃষ্টি হয়।

রতিও দৈহিক ও মানসিক টানের সৃষ্টি করে, টান তার অন্তর্নিহিত মূলগত সত্য। জীবস্তরে সে টান নিচু ও স্বল্প এবং মানবস্তরে বর্ণনার অতীত উচ্চ ও তীব্র। তা থেকেই ভালোবাসার উদ্ভব। টানের তারতম্যে প্রেমের নানা পর্যায়। পরমহংসদেব ভগবৎপ্রেমের কুলটার উপমায় এই টানের তীব্রতম অবস্থারই ইঙ্গিত করেছেন। মৃদুটানে কাম, মধ্যটানে ভালোবাসা এবং অধিমাত্র টানে ভক্তি। মৃদুস্তরে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, মধ্যস্তরে দেহোত্তর আনন্দ এবং অধিমাত্র স্তরে আধ্যাত্মিক উল্লাস। শেষের অবস্থাটিকে আমাদের দেশের সাধক-সাধিকারা দিব্য মহাসুখের অবস্থা বলেছেন, যার পরে শূন্যতা।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার দ্বারা এই তত্ত্বটির গভীর উপলব্ধি করে কামকে পূর্ণশ্রী করবার জন্য আমাদের সাধকেরা লীলার সৃষ্টি করেছেন। তার অনেক ছবি আমরা বৈষ্ণবকাব্যে পাই। কিশোরা-কিশোরী ভাব ভিন্ন সে লীলা হয় না, তাই বৈষ্ণব সকল কাব্যের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা কিশোর কিশোরী। এ অবস্থাতেই প্রীতি হতে আনন্দ পাওয়া সহজ। লীলার এমন পর্যায় আছে যার টান অবর্ণনীয়-ভাবে তীব্র। সে তীব্রতা এতো যে তার প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে জীবস্তরের পুরুষ মারা যায়। এ কথাটা প্রসঙ্গক্রমে বলতে হোল। নিজের ভাসাভাসা উপরস্থ শক্তির কারণে পুরুষ স্বভাবে আক্রামক হলেও টান সৃষ্টি করার কাজটা রমণীতে ন্যস্ত। আমাদের বৈষ্ণবীয় আত্মসাধনায় তাই রমণীকে অগ্নিকুণ্ড বলা হয়। অগ্নিকুণ্ডে যেমন তরল দুধ সিদ্ধ হয়ে ক্ষীরে পরিণত হয়, নারীর শক্তির অত্যুগ্র টানের সাহায্যে তেমনি পুরুষশক্তি ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে ঊর্দ্ধ পরিণামের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরাজয়। এ বিশিষ্ট গুণে গুণবতী বলে প্রত্যেক কিশোরীভাবাপন্ন পত্নী তার পতির ও নিজের কামশক্তির উন্নতি সাধন করতে সক্ষম।

এই উৎকান্তিতেই দেহাত্মের ভালোবাসা ও হৃৎপদ্মে ভক্তির অবস্থিতি।

আমি আমাদের দেশের সাধকলব্ধ জ্ঞানের কথা বিবৃত করছি, কারণ তাতে মানবকল্যাণ নিহিত আছে। আজ পর্যন্ত এ তথ্য গূঢ় গুহ্যমুখী বিদ্যা ছিলো। অবশ্য এখানে যা বলা হচ্ছে তা তথ্যের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র, সব কথা বলা অসম্ভব ও উচিতও নয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে এ প্রেমসাধনায় কায়াসাধনা, প্রাণসাধনা এবং বিবেকসাধনা প্রাথমিক ভিত্তি, তা না থাকলে এ সাধনা করা অসম্ভব।

মানুষের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় : বাক পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ। শেষোক্তটিকে আমাদের একটি বনিয়াদী জ্ঞানশাস্ত্র আনন্দেন্দ্রিয় বলা হয়। প্রকৃত আনন্দ ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার অভিব্যক্তির দ্বারা লভ্য। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকে আনন্দ বলে জানে, কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা ভিন্ন। অধিকাংশ বিবাহিতা রমণী ইন্দ্রিয়সুখকেও জানে না, আনন্দ তো ইন্দ্রিয়োত্তর অনুভূতি। সাধক-সাধিকা ভিন্ন অন্যের সে আনন্দ ইষ্ট এবং তার বিষয়ে চেতনা ও জ্ঞান হয় না।

কথাটা বুঝতে গেলে জানতে হয় যে সাধারণ মানুষ কিছু মননশক্তি ও সাধারণী কল্পনাশক্তি নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। এই স্তরটির উর্দ্ধেও যে অন্য স্তর আছে তা সে জানে না এবং জানতে চায়ও না। সে নিজের সামান্য মননশক্তি ও সাধারণ চালাকির গুণ নিয়েই খুশি থাকে, কেনো না তাতেই তার সংসারের লেনদেন করার কাজটা এক রকমে চলে যায়। মননের ওপর বুদ্ধি। সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে বুদ্ধি বলি বস্তুতপক্ষে সেইটাই চালাকি। চালাকির কোন খারাপ ইঙ্গিত নেই, ইংরাজিতে তাকে Cleverness বলে। বুদ্ধি উচ্চতর বস্তু, যা চেতনা সাধনা ভিন্ন লাভ করা যায় না। বুদ্ধির ওপরের স্তরে প্রাতিভজ্ঞান। ইংরাজিতে তাকে Intuition বললে পাঠকের তার বিষয়ে একটা বিকল্প জ্ঞান হয়। বিকল্প জ্ঞান মনগড়া প্রত্যয়। কিন্তু প্রাতিভজ্ঞান ঠিক Intuition নয়, তারও উর্দ্ধে। তাকে যোগসাধ্য Intuition বলা ঠিক হবে। যা হোক, মানুষ মাত্রেরই অসীম প্রসুপ্ত-শক্তি আছে। প্রাতিভজ্ঞান তার একটি। বিবেকজ্ঞানের উদয় বা আভাসকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। উষাকালে সূর্যে যেমন দিনমানের প্রদীপ্ত আলোর প্রতিশ্রুতি, প্রাতিভজ্ঞান তেমনি প্রদীপ্ত বিবেকজ্ঞানের উষার আলো। বিবেকসাধনার দ্বারা তাকে স্ফূর্ত ও আয়ত্ত না করলে সে শক্তিকে লাভ করা যায় না। কখনো কখনো আমরা অকস্মাৎ ও যান্ত্রিকভাবে প্রাতিভজ্ঞানে গিয়ে পড়ি, নূতন জ্ঞান হঠাৎ চিত্তে চমক দিয়ে যায়। কিন্তু সেই স্পর্শের মুহূর্তেই আবার সে ভূমি থেকে সরেও আসি। এ ব্যাপারটা দুর্লভ, কালেভদ্রে ঘটে থাকে। সাধনালব্ধ না হলে কেবল ইচ্ছা বা মনন করলেই প্রাতিভের ভূমিতে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থিতি করা অসম্ভব কথা। উচ্চতম স্তর প্রজ্ঞা, যা জ্ঞানের সীমা, যে জ্ঞান একান্ত ভাবে নিজের প্রতিভার দ্বারা লভ্য; কেউ কখনো তা শেখাতে পারে না। এ বিজ্ঞান সমাধি ভিন্ন লাভ করা যায় না।

সাধারণ জীবরতির অবসানে চিত্তভূমির অন্ধকার মূঢ় অবস্থা। [illegible] আত্মারত্ন দেশে উপস্থিতি। সে রতির অবস্থা একাগ্র এবং নিরুদ্ধ হলে সমাধিলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাতিভজ্ঞান লাভ করতে গেলে সাংসার কালে মনন ও কল্পনাকে নিরোধ করা উপায়। সেগুলি নিরুদ্ধ হলে আমরা প্রাতিভজ্ঞানের সম্মুখীন হই। রতি তার যথার্থে একাগ্র চিত্তভূমি। এ অবস্থাটি অনুভববেদ্য। এ বিষয়টিও বেশ অনুভববেদ্য যে সে সময়ে মনন কল্পনা ও বুদ্ধির কোনই অস্তিত্ব থাকে না। তাই সকল দম্পতি প্রত্যেক রতিতে এই ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সেটি তারা কোনদিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

কামগন্ধহীন প্রেমের আমাদের যে মহান বৈষ্ণবীয় আদর্শ আছে সেটি এই এবং পরবর্তী উচ্চতর অবস্থার বস্তু। সে দেহোত্তর সাধনার প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। কিন্তু সে প্রেম সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত হলেও পরম সত্য জিনিষ, কবির কল্পনা বা রূপক নয়। প্রাতিভ ভূমিতে উপস্থিত হলে মানবজোড়ের দম্পতি আর একটি অবস্থা লাভ করে, সেটি আত্মহারা আনন্দ। সমাধিকে আত্মহারা আনন্দের অবস্থা বলা হয়। কথাটা বেশ কঠিন হলেও বুঝতে ও অনুভব করতে চেষ্টা করা দরকার যে আমরা সেই অবস্থাকেই আনন্দ বলি—যখন ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ কিন্তু ইন্দ্রিয়তত্ত্বের ধ্যানগত অনুভব থাকে। এই সূক্ষ্ম অনুভব সৃষ্টি করতে পারে বলেই হিন্দু মনোবিজ্ঞায় যৌন অঙ্গকে আনন্দেন্দ্রিয় বলা হয়েছে। রতিতে যখন মানুষ এই ভূমিতে উপস্থিত হয়ে আত্মহারা হয় সেটি সমাধির—এ ক্ষেত্রে রতিসমাধির অবস্থা। তাহলে রতিতে দুটি অবস্থা হয়, রতিপ্রাতিভ এবং রতিসমাধি। যে সমাধিতে একটি মাত্র ইষ্ট জেগে থাকে, সেটি সবীজ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। রতিসমাধিতে আনন্দ ইষ্টটি জাগ্রত, সুতরাং সেটি আনন্দ সমাধির অবস্থা। রতির এই আত্মহারা আনন্দের অবস্থাকে দিব্য মহাসুখ বলে।

ইংরেজ রসজ্ঞ ভাবুক, জেমস হিণ্টন সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত প্রকৃত উচ্চরতির তুলনা করেছেন। বাংলা দেশের সহজিয় সাধকেরা রতিকে প্রকৃতপক্ষে জপে পরিণত করেছেন। সে তন্ময় পূজার এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের অবস্থা। সে অবস্থা দুটি প্রবর্তসাধক সাধিকার দেহমন আত্মা একীভূত হয়ে জপের য হয়ে যায়। এ জপের আগেও তাদের নিরন্তর ভক্তিরসভোগের ঈশ্বরপ্রণিধানের অবস্থা থাকে। ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিলাভে উপায়। সহজিয়ারা দুঃসাহসী ও আক্রামক সাধক। তারা ব যে মানুষ যেমন পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে, পরমেশ্বরকেও তেম নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য মানুষের সহিত মিলন খুঁজতে হ তাই তারা দিব্য মহাসুখের অবস্থায় পরমাত্মাকে ডেকে এনে তাঁ তাদের আত্মহারা পরমানন্দের অংশভাগী করতে চায়। আমা মনে রাখতে হবে যে, এটি অতিশয় একাত্মগ সাধনা এবং সা সাধিকার এই দৈহিক মিলনটি নৈমিত্তিক। সাধারণতঃ পতি প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত ও ঈশ্বরচেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে থ এবং কখনো কখনো তীব্র রসোপলব্ধির ক্ষণে মহাসুখের ম পরমেশ্বরের সাধনা করে এবং এ রতির টান ও আত্মহারা সবই পরমেশ্বরে অর্পণ করে। সাধনা সফল হলে এ দেহ [illegible] সহজিয়াদের মধ

মায়ের মমতা ও অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

আপনার শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে আপনি ওর কোন রকম যত্নের ত্রুটী রাখেননি। বুকভোলা স্নেহ ভালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতো। খাঁটি দুধ থেকে অষ্টারমিল্ক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। আর সে জন্য সহজে হজম হয়।

শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাবার জন্য অষ্টারমিল্কে লোহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে গড়তে সাহায্য করবে।

...মায়ের দুধেরই মতন

বিনামূল্যে ! "অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধনিক শিশু পরিচর্য্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিল্ক' পোষ্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

OS. 4-X51-C. BO

এই উক্তিতেই দেহোত্তর ভালোবাসা ও তৎপরে ভক্তির অবস্থিতি।

আমি আমাদের দেশের সাধকলব্ধ জ্ঞানের কথা বিবৃত করছি, কারণ তাতে মানবকল্যাণ নিহিত আছে। আজ পর্যন্ত এ তথ্য গূঢ় গুরুমুখী বিদ্যা ছিলো। অবশ্য এখানে যা বলা হচ্ছে তা তথ্যের সামান্য ইঙ্গিতমাত্র, সব কথা বলা অসম্ভব ও উচিতও নয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে এ প্রেমসাধনায় কায়াসাধনা, প্রাণসাধনা এবং বিবেকসাধনা প্রাথমিক ভিত্তি, তা না থাকলে এ সাধনা করা অসম্ভব।

মানুষের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়: বাক পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ। শেষোক্তটিকে আমাদের একটি বনিয়াদী জ্ঞানশাস্ত্রে আনন্দেন্দ্রিয় বলা হয়। প্রকৃত আনন্দ ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার অভিব্যক্তির দ্বারা লভ্য। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়সুখকে আনন্দ বলে জানে, কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা ভিন্ন। অধিকাংশ বিবাহিতা রমণী ইন্দ্রিয়সুখকেও জানে না, আনন্দ তো ইন্দ্রিয়োত্তর অনুভূতি। সাধক-সাধিকা ভিন্ন অন্যের সে আনন্দ হই এবং তার বিষয়ে চেতনা ও জ্ঞান হয় না।

কথাটা বুঝতে গেলে জানতে হয় যে সাধারণ মানুষ কিছু মননশক্তি ও সাধারণী কল্পনাশক্তি নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। এই স্তরটির ঊর্দ্ধেও যে অন্য স্তর আছে তা সে জানে না এবং জানতে চায়ও না। সে নিজের সামান্য মননশক্তি ও সাধারণ চালাকির গুণ নিয়েই খুশি থাকে, কেনো না তাতেই তার সংসারের লেনদেন করার কাজটা এক রকমে চলে যায়। মননের ওপর বুদ্ধি। সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে বুদ্ধি বলি বস্তুতপক্ষে সেইটাই চালাকি। চালাকির কোন খারাপ ইঙ্গিত নেই, ইংরাজিতে তাকে Cleverness বলে। বুদ্ধি উচ্চতর বস্তু, যা চেতনা সাধনা ভিন্ন লাভ করা যায় না। বুদ্ধির ওপরের স্তরে প্রাতিভজ্ঞান। ইংরাজিতে তাকে Intuition বললে পাঠকের তার বিষয়ে একটা বিকল্প জ্ঞান হয়। বিকল্প জ্ঞান মনগড়া প্রত্যয়। কিন্তু প্রাতিভজ্ঞান ঠিক Intuition নয়, তারও ঊর্দ্ধে। তাকে যোগসাধ্য Intuition বলা ঠিক হবে। যা হোক, মানুষ মাত্রেরই অসীম প্রসুপ্ত-শক্তি আছে। প্রাতিভজ্ঞান তার একটি। বিবেকজ্ঞানের উদয় বা আভাসকে প্রাতিভজ্ঞান বলা হয়। উষাকালে সূর্যে যেমন দিনমানের প্রদীপ্ত আলোর প্রতিশ্রুতি, প্রাতিভজ্ঞান তেমনি প্রদীপ্ত বিবেকজ্ঞানের উষার আলো। বিবেকসাধনার দ্বারা তাকে স্ফূর্ত ও আয়ত্ত না করলে সে শক্তিকে লাভ করা যায় না। কখনো কখনো আমরা অকস্মাৎ ও যান্ত্রিকভাবে প্রাতিভজ্ঞানে গিয়ে পড়ি, নূতন জ্ঞান হঠাৎ চিত্তে চমক দিয়ে যায়। কিন্তু সেই স্পর্শের মুহূর্তেই আবার সে ভূমি থেকে সরেও আসি। এ ব্যাপারটা দুর্লভ, কালেভদ্রে ঘটে থাকে। সাধনালব্ধ না হলে কেবল ইচ্ছা বা মনন করলেই প্রাতিভের ভূমিতে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থিতি করা অসম্ভব কথা। উচ্চতম স্তর প্রজ্ঞা, যা জ্ঞানের সীমা, যে জ্ঞান একান্ত ভাবে নিজের প্রতিভার দ্বারা লভ্য; কেউ কখনো তা শেখাতে পারে না। এ বিজ্ঞান সমাধি ভিন্ন লাভ করা যায় না।

সাধারণ জীবরতির অবসানে চিত্তভূমির অন্ধকার মূঢ় অবস্থা। মহত্তর রতির অবসানে আলোকের দেশে উপস্থিতি। সে রতির সহিত ওপরে বর্ণিত অবস্থাগুলির নিবিড় যোগ আছে। চিত্তের অবস্থা একাগ্র এবং নিরুদ্ধ হলে সমাধিলাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। প্রাতিভজ্ঞান লাভ করতে গেলে সাংখ্যর কালে মনন ও কল্পনাকে নিরোধ করা উপায়। সেগুলি নিরুদ্ধ হলে আমরা প্রাতিভজ্ঞানের সম্মুখীন হই। রতি তার স্বধর্মে একাগ্র চিত্তভূমি। এ অবস্থাটি অনুভববেদ্য। এ বিষয়টিও বেশ অনুভববেদ্য যে সে সময়ে মনন কল্পনা ও বুদ্ধির কোনই অস্তিত্ব থাকে না। তাই সকল দম্পতি প্রত্যেক রতিতে এই ভূমিতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সেটি তারা কোনদিন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

কারণবন্ধহীন প্রেমের আমাদের যে মহান বৈষ্ণবীয় আদর্শ আছে সেটি এই এবং পরবর্তী উচ্চতর অবস্থার বস্তু। সে দেহোত্তর সাধনার প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। কিন্তু সে প্রেম সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত হলেও পরম সত্য জিনিষ, কবির কল্পনা বা রূপক নয়। প্রাতিভ ভূমিতে উপস্থিত হলে মানবজন্মের দম্পতি আর একটি অবস্থা লাভ করে, সেটি আত্মহারা আনন্দ। সমাধিকে আত্মহারা আনন্দের অবস্থা বলা হয়। কথাটা বেশ কঠিন হলেও বুঝতে ও অনুভব করতে চেষ্টা করা দরকার যে আমরা সেই অবস্থাকেই আনন্দ বলি—যখন ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ কিন্তু ইন্দ্রিয়তত্ত্বের ধ্যানগত অনুভব থাকে। এই সূক্ষ্ম অনুভব সৃষ্টি করতে পারে বলেই হিন্দু মনোবিজ্ঞায় যৌন অঙ্গকে আনন্দেন্দ্রিয় বলা হয়েছে। রতিতে যখন মানুষ এই ভূমিতে উপস্থিত হয়ে আত্মহারা হয় সেটি সমাধির—এ ক্ষেত্রে রতিসমাধির অবস্থা। তাহলে রতিতে দুটি অবস্থা হয়, রতিপ্রাতিভ এবং রতিসমাধি। যে সমাধিতে একটি মাত্র ইষ্ট জেগে থাকে, সেটি সবীজ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। রতিসমাধিতে আনন্দ ইষ্টটি জাগ্রত, সুতরাং সেটি আনন্দ সমাধির অবস্থা। রতির এই আত্মহারা আনন্দের অবস্থাকে দিব্য মহাসুখ বলে।

ইংরেজ রসজ্ঞ ভাবুক, জেমস হিণ্টন সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত প্রকৃত উচ্চরতির তুলনা করেছেন। বাংলা দেশের সহজিয়া সাধকেরা রতিকে প্রকৃতপক্ষে জপে পরিণত করেছেন। সেটি তন্ময় পূজার এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণের অবস্থা। সে অবস্থায় দুটি প্রবর্তসাধক সাধিকার দেহমন আত্মা একীভূত হয়ে জপের যন্ত্র হয়ে যায়। এ জপের আগেও তাদের নিরন্তর ভক্তিরসভোগের ও ঈশ্বরপ্রণিধানের অবস্থা থাকে। ঈশ্বরপ্রণিধান সমাধিলাভের উপায়। সহজিয়ারা দুঃসাহসী ও আক্রামক সাধক। তারা বলে যে মানুষ যেমন পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে, পরমেশ্বরকেও তেমনি নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য মানুষের সহিত মিলন খুঁজতে হয়। তাই তারা দিব্য মহাসুখের অবস্থায় পরমাত্মাকে ডেকে এনে তাঁকে তাদের আত্মহারা পরমানন্দের অংশভাগী করতে চায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি অতিশয় একাত্মগ সাধনা এবং সাধক সাধিকার এই দৈহিক মিলনটি নৈমিত্তিক। সাধারণতঃ পতিপত্নী প্রেমভক্তিরসে আপ্লুত ও ঈশ্বরচেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো তীব্র রসোপলব্ধির ক্ষণে মহাসুখের মাঝে পরমেশ্বরের সাধনা করে এবং এ রতির টান ও আত্মহারা তা সবই পরমেশ্বরে অর্পণ করে। সাধনা সফল হলে এ দেহমিলন ত্যাজ্য। রতিসুখ মানুষের শ্রেষ্ঠতম সুখ। সহজিয়াদের মতে

দুঃখ যেমন কল্পনায় থাকলে সুখ হবার ধারণাটাও তেমনি কাল্পনিক। অনেক সময়ে দেখা যায় যে তীব্রতম কামনার বস্তুটিও হাতে পেলে সুখ বা দুঃখ কিছুই বোধ হয় না।

মনের বিচিত্র লীলাটি জানবার মতো জিনিষ। বাহিরের কোন উত্তেজনা পেলে মনে ইচ্ছা জাগে, তখন মন সঙ্কল্প করে ও পরে সেই অনুসারে কাজ করে। ইন্দ্রিয় উত্তেজনা গ্রহণ করবার এবং কাজ করবারও জন্ত। বৃত্তি তিনটির মাত্রাসাম্য আছে। কিন্তু যখন কোন একটি বৃত্তির মাত্রা বেশি হয় তখন সেটা অন্ত দুটি বৃত্তির অভিভাবক হয় এবং অন্ত দুটি বৃত্তি অভিভূত হয়ে থাকে। একই ক্ষণে তিনটি বা দুটি বৃত্তির একসঙ্গে উদয় হয় না। সুখবোধে সুখ অভিভাবক, দুঃখ ও মোহ অভিভূত। দুঃখবোধে দুঃখ অভিভাবক, সুখ ও মোহ অভিভূত হয়ে থাকে। মোহ যখন অভিভাবক অন্ত দুটি বৃত্তি তখন অভিভূত অবস্থা পায়। সদাসর্বদা আমাদের মনে এই বৃত্তিগুলির প্রবাহ হচ্ছে। তারা স্বধর্মে ক্ষণস্থায়ী, লয়োদয়শীল। একটির উদয় হলে অন্তের লয় হয়। কিন্তু উদিত বৃত্তিটারও তখনই লয় হয়ে অন্ত একটির উদয় হয়ে থাকে। তাই সুখের অভিভাবকত্ব শেষ হলেই দুঃখ বা মোহের উদয়। ছোট ছেলে নিত্য অশ্রুমলিন চোখে কাঁদতে কাঁদতেই হেসে ওঠে, আবার পরক্ষণেই দুঃখে কাঁদে। বয়স্কেরাও দপ করে রেগে জলে উঠে পরমুহূর্তে শান্ত হয়। তাদেরও ঠিক ওই রকম সুখ দুঃখ মোহের চক্রবৎ পরিবর্তনশীল অবস্থা। সুখের অনুভূতির পরক্ষণেই সুখের বিষয়বস্তুতে বিরক্তি বা উদাসীনতা আসে। এ সব কথা ও বৃত্তির অভিভাবকত্বের দশাগুলি একটু যত্নের সহিত আত্মপর্যবেক্ষণ করলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। সেটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমানের দ্বারা বা কারো কথায় নির্ভর করে সে সত্যকে গ্রহণ করতে হয় না। পাঠক-পাঠিকার সযত্নে আত্মপর্যবেক্ষণ করবার অভ্যাসটি করা উচিত, তা দিয়ে নিরন্তর আত্মজ্ঞানের বৃদ্ধি হয় এবং ব্যক্তিগত অনেক জটিল সমস্যারও নিরসন হয়। এ প্রবন্ধে আমি যা লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথার সত্যতা নিজেকে ও অপরকে পর্য্যবেক্ষণ করে পরখ করা যায়। আত্মপর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেশি।

সুখ দুঃখ মোহ মানুষের অন্তরের জিনিষ। যদিও বাহিরের উত্তেজনার কারণে তাদের সৃষ্টি হয়, দেহের বাহিরে কোথাও তাদের অবস্থিতি নেই। বলেছি যে, তাদের লয়োদয়শীলতা আছে। তবুও আমরা দুঃখকেই বা কেনো মাত্রাধিক এবং দীর্ঘস্থায়ী বলে জানি? কেনোই বা বলি যে সুখের তেমন স্মৃতি নেই, দুঃখের স্মৃতিটা মনে গভীর হয়ে থাকে? তার দুটি কারণ বা মনে রাখবার যোগ্য। প্রথম: সংসারে বাস করে নিজেরা পাওয়া ছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিদের দুঃখ পেতে দেখি, তাই আমাদের দুঃখের সংস্কার গভীর হয়ে আছে। দেখবার সময়ে আমরা চিন্তা করি না যে যাদের দেখছি ও যাদের কাছ থেকে সে সংস্কারটা গ্রহণ করেছি তারা নিজেদের আকস্মিক ঘটনাপূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিক জীবনের হাতে এলিয়ে দিয়ে আছে এবং বিপরীত পথে নিজেদের ভাগ্য সৃষ্টি করে চলেছে। কারো দুঃখ নিরোধ করবার চেষ্টা নেই। প্রত্যেকটি মানুষ একান্তভাবে ভিন্ন, তার দেহ মন আত্মা তার স্বকীয় বস্তু। তার নিজের দেহের অস্থি মাংস মজ্জা রক্ত তার মন আত্মা ভাগ্য ইত্যাদির নির্মাতা সে নিজে। সাধারণ মানুষ এ সবের কোন উপলব্ধি করতে পারে না, তাই নিজেকে আর পাঁচজনের সহিত অভিন্ন ভেবে তাদের দুঃখ থেকে সে দুঃখের সংস্কার গ্রহণ করে। ঠিক এক রকমেই রোগ যেমন দুই সহোদর ভাইয়েরও হয় না, একই প্রকারের এবং একই মাপের সুখ বা দুঃখ তেমনি সকলের ঘটতে পারেনা। একজনের পক্ষে যা সুখকর বা দুঃখকর তা আর একজনের পক্ষে সুখকর বা দুঃখকর না-ও হতে পারে। এক-পরিবারের বা এক-সমাজভুক্ত মানুষের পরিবেশগত সমতা যে কিছু থাকে তা স্বীকার্য। কিন্তু মানুষে-মানুষে স্বভাবগত গুণের সমতা কখনো হয় না। এই পরিবেশ থেকে মানুষ ক্লেশের সংস্কার গ্রহণ করে। সংস্কার মনের গুহাহিত সূক্ষ্মতম বস্তু। ক্লেশমূলক সংস্কার যথাকালে স্থূল আকারে প্রকাশিত হয়। আমাদের শাস্ত্র বলে যে সংস্কার এই দৃষ্ট জন্মে অথবা অদৃষ্ট কোন জন্মে ফলপ্রদ হয়। তীব্র যে ক্লেশসংস্কার তা এই জন্মেই ফল দর্শায়। আমরা যে পূর্বজন্মের সংস্কার নিজেদের আধারে ধরে রাখি তা আমাদের দেশের সুপ্রচলিত একটি বড়ো শাস্ত্রগত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় কারণ: মানুষ নিজের দুঃখকে নির্মূল করবার চেষ্টা না করে নিজেকে দুঃখ দিয়ে অভিভূত করে এবং সেই অবস্থায় থাকতে ভালবাসে। ছোট ছেলেরা তাদের নড়া বেদনাময় দাঁতটা নাড়িয়ে বিচিত্র একটা সুখ-বেদনা অনুভব করে। আমরা বয়স্কেরাও যে তা করিনি, তা নয়। বয়স্কদেরও ঠিক তেমনি দুঃখের একটি বেদনাময় সুখ উপভোগ করবার প্রবৃত্তি আছে। তাই আমরা আমাদের দুঃখের কথা সর্বদা বলতে ভালোবাসি। এ কথা মনে রাখা উচিত যে দুঃখ আন্তরিক বস্তু। বাইরের কোন উপকরণ দিয়ে তার নিবৃত্তি করা যায় না, মন দিয়েই তাকে বিনাশ করতে হয়।

সংসারে বাঁকা ও সোজা দুটো পথ। আমাদের চিন্তার অনুযায়ী আমরা পথ বেছে নিই। মানুষের চিন্তার চারটি ধরণ: কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-শুক্ল, শুক্ল এবং অকৃষ্ণ-অশুক্ল। কৃষ্ণচিন্তা দুঃখকর, শুক্লচিন্তা সুখ ও শান্তিকর। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-শুক্ল মিশ্রিত চিন্তা করে। আত্মজ্ঞানী কেবল শুক্লচিন্তা করে। যে চিন্তা অকৃষ্ণ অশুক্ল সেটি মুক্ত পুরুষের, অন্তের হয় না।

আমরা সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করি বলে সহজেই সংসারের বাঁকা পথে গিয়ে পড়ি। কুশিক্ষার বশীভূত হয়ে আমাদের কৃষ্ণচিন্তা করতে বাধ্য হতে হয়। আমরা সেই চিন্তা দিয়ে পরিবেষ্টিত শুধু নয়, আক্রান্ত। আমাদের অধিকাংশের জীবনে অতীত ও ভবিষ্যতের উপলব্ধি নেই, যেনো কেবল একটি বর্তমানের প্রবাহে বেঁচে থাকা। বর্তমানের প্রবাহ হয় না বলে সেটি দুঃখের পথ। সংসারের গড্ডলিকা প্রবাহে আর পাঁচ জন যা করে আমরাও অন্ধের মতো, যন্ত্রের মতো তাই করি। মানুষের অপরকে অনুকরণ করবার প্রবৃত্তিটা বিস্ময়কর ভাবে প্রবল। আমাদের যান্ত্রিক জীবনধারা তার কারণ। এই নিদারুণ কথাটায় সাধারণ মানুষের আত্মাভিমানে আঘাত লাগলেও সেটা অত্যন্ত সত্য কথা। অতিশয় তুচ্ছ বস্তুতেও আমাদের অনুকরণ বৃত্তির প্রকাশ। এই যন্ত্রধর্মী মানুষকে বাংলা দেশের প্রাচীন মনোবিজ্ঞান সংস্কারা মানুষ বলে। সংস্কারা মানুষ স্বরূপজ্ঞানহীন যন্ত্র। কেবল সংস্কারের তাড়নায় ও বহির্জগতের উত্তেজনা বশে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে যন্ত্রের মতো

কর্ম করে যায়। আমরা প্রত্যেকে, আমরা যাদের জানি, তারাও যাদের জানে সকলে সংস্কারী মানুষ।

সাধারণ মানুষ নিজের মুখটাকেও চেনে না। আত্মীয়-বন্ধুদের মুখ সে যখন ইচ্ছা স্মরণ করতে পারে, কিন্তু দু-চার সেকেণ্ডের বেশি কেউ নিজের মুখ স্মরণ করতে পারে না, পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ তাও পারে না, সদাই তাদের আত্মবিস্মৃতির অবস্থা। আত্মচেতনাশূন্যতা সাধারণ মানুষের ভাগ্য।

পায়ে-চলা মেঠো পথ একটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেটা নিজের খামখেয়ালীতে আঁকা-বাঁকা, শর-বৎ সোজা নয়। মাঠের সবুজ অঙ্গে সেটা মার্জিত পৈতার মতো দেখায়। একদা কোন ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সে পথটিকে পেতে দিলো। আঁকা-বাঁকা পথ দীর্ঘতম। তারপর হাজার হাজার পথিক আত্মবিস্মৃত হয়ে সেই আঁকা-বাঁকা পথটার শাসন মেনে এসেছে। রবার ষ্ট্যাম্পের নাম স্বাক্ষরের মতো সেই অগণিত পথিকেরাও সে পথটার গায়ে তাদের পায়ের রবার ষ্ট্যাম্পের স্বাক্ষর রেখে গেছে। মাঠটা অতিক্রম করবার সময়ে কারো তাড়াতাড়ি থাকলেও সেই সেই পথটার শাসন অগ্রাহ্য করে নূতন শর-বৎ সোজা একটা পথ করে নিয়ে পার হয়নি। পাঠক যদি আনমনা অবস্থায় সে মাঠ পার হ'তে যান, তিনিও ঠিক তাই করবেন। অবশ্য এ কথাটা জানার সচেতনতার কারণে করবেন না। চেতনা জাগ্রত হলে অনুকরণ বা অনুসরণ ক্রিয়াটা আর হয় না। চেতনা না হলে সংসারের গতানুগতিক পথ ছেড়ে আপন পথে চলা অসম্ভব কথা।

আমাদের বাউলদের একটা সুন্দর গান আছে :

আসা-যাওয়ার বান্‌ধা পথে
আজায় না ঘাস কোন মতে।

মাঠের বাঁধা পথে যেমন ঘাস জন্মায় না, সংসারের গতানুগতিকতার বন্ধ্যাপথেও তেমনি স্বরূপজ্ঞানের বিবেকের উদয় হয় না। তাই মানুষ নিজের ভাগ্যটিকে সদাসর্বদা বিকৃত করে পিলসুজের মতো সারা জীবন তেলকালি-মাখা হয়ে থাকে; প্রদীপের সম্প্রকাশ শক্তিটি আর লাভ করে না। সাধারণ মানুষ যন্ত্র বলেই চালাক লোকের সৃষ্টি করা নানা ধরতাই বুলির দাস হয়ে থাকে এবং সারা জীবন পরনির্ভর হয়ে কাটায়। স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করলে মানুষের দুঃখভাগ্য ও দাসভাগ্য ধ্রুব হয়। কিন্তু জীবনের অহরহ যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাতে তার দাসভাগ্যের কথা নেই। জীবন দুঃখের ওপর আধিপত্যের কথা বলে। এ স্বাধীনতা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা লভ্য, আর কিছু দিয়ে হয় না।

মানুষ এমন করেই বা কেনো? তার তৃতীয় একটা কারণ আছে। আমরা সামান্য যে মননশক্তি নিয়ে ঘর করি সেটা চিন্তন মনের ক্রিয়া। এ মনের ইংরাজি নাম Intellect. ইউরোপ ইন্টেলেক্টে খুব বেশি দাম দেয়, আমাদের দেশে তা দেওয়া হয়নি। চিন্তনমন অত্যন্ত মন্থরগতি। সে তাড়াতাড়ি ও সোজাসুজি কোন জিনিষ বোঝে না। বড়ো কথাটা এই যে চিন্তনমনের বা মননশক্তির পরের ব্যবহৃত চিন্তা বা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিষয় নিয়ে কারবার। সাধারণ মানুষ তাই অবলীলায় পরের মুখের ঝাল খায়।

মানুষ চলা পথটাই চেনে এবং নিজেও সেটা অনুসরণ করে চলে। কৃষ্ণচিন্তা সংসারে ব্যাপক। তার ফলে এতো বাদ-বিবাদ সংঘর্ষণ দ্বেষ হিংসা ঘৃণার প্রকাশ। প্রতিদিনের খবরের কাগজ কৃষ্ণচিন্তায় ভরা। "Vice is news virtue is not", সংবাদের এই সংজ্ঞা খবরের কাগজকে শাসন করে' অর্থাৎ তাতে শুক্লচিন্তার স্থান নেই। সাধারণ মানুষ শুক্লচিন্তা করে না শুধু নয়, সেটাকে চায়ও না। রেডিওর দ্বারা আমরা আকাশ থেকেও অবিরাম স্রোতে কৃষ্ণচিন্তা পাই। এমন ভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে আমরা অনুরূপ চিন্তা করতে বাধ্য হই। কৃষ্ণচিন্তার কারণে আমরা এখন দৈহিক স্বাস্থ্য বলতে রোগের অভাবের অবস্থা বুঝি, প্রাণশক্তিতে ভরপুর কিছু বুঝিনে। এ চিন্তা দুঃখ-ক্লেশের জনক। মানুষ মুখে দুঃখবিরোধী হলেও কাজে নিজেকে দুঃখ দিয়ে অভিভূত করে রাখে। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে অভিভূত হয়ে থাকতে ভালোবাসে। অনেক ব্যক্তি তন্ময় হয়ে দুঃখকে দুঃখবিলাসে পরিণত করে। তাদের দুঃখ কেড়ে নিলে জীবন স্বাদহীন শূন্য হয়ে যায়।

বেদন-মনটা ভারি মজার জিনিষ। স্মৃতি ছাড়া চিন্তন, সংস্কার, গতি ও কাম মনগুলির হাঁ ও না দুটি বিভাগ আছে। কিন্তু বেদন-মনের তা নেই। শুক্ল কোন বেদন তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ হতে পারে। সে কারণে বেশ বোঝা যায় যে, এই যাকে আমি ভালোবাসলুম, যার প্রশংসা করলুম, সামান্যতম কারণে কিংবা কোন ত্রুটি কল্পনা করে তখনি তাকে ঘৃণা করছি এবং তার নিন্দায় পঞ্চমুখও হয়েছি। আমাদের মনের এমন অবস্থা অনুক্ষণ ঘটে চলেছে। মৈত্রী উদাসীনতা ও শত্রুতা, মানুষে-মানুষে এই তিন ধরণের সম্বন্ধ হয়। এগুলিও সুখ দুঃখ মোহের মতো লয়োদয়শীল। পিতাপুত্র, পতিপত্নী, মা ও মেয়েতে মৈত্রীর সম্বন্ধ। এক মুহূর্তে তা উদাসীনতা বা শত্রুতায় পরিণত হতে পারে এবং নিত্য হয়েও থাকে। দূরতর পারিবারিক বা সামাজিক সম্বন্ধের বিকারের তো কথাই নেই। সুতরাং ভালোবাসার অনেক অন্তরায়। কৃষ্ণচিন্তায় মৈত্রী ভালোবাসার স্থান নেই।

সকল কৃষ্ণ প্রক্ষোভ-বিনাশী শক্তি ধরে। দ্বেষ হিংসা ঘৃণা ক্রোধ লোভ মোহ ভয় দম্ভ ইত্যাদি কৃষ্ণ-প্রক্ষোভ। বস্তুতপক্ষে এগুলি মনের ব্যাধিত অবস্থা। সূক্ষ্ম হলেও তারা স্থূলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জ্বর হলে যেমন সকল দেহ জ্বরে অভিভূত হয়, একটি কোন অঙ্গের বেদনায় যেমন সর্বাঙ্গের বেদনার অনুভব ও পীড়া, প্রক্ষোভেও তেমনি সর্ব দেহ ও মনে অভিভূত অবস্থা। হর্ষে সর্বাঙ্গীন হর্ষ। ভয়ে সমগ্র সত্তার ভয়। ক্রোধ হলে মানুষ তার সর্ব দেহ ও মন দিয়ে ক্রোধের একটা পুঁটলি হয়ে যায়। সুখকর ও দুঃখকর সকল প্রক্ষোভের বিষয়ে এ কথা সত্য। আমাদের ঐহিক সকল সুখে দুঃখের বীজ গোপন থাকে। সুখ থেকে যা দুঃখ হয় তা বিয়োগজনিত। সুখ পরিণামী বৃত্তি, অর্থাৎ মাটিতে বীজ দিলে যেমন পরিণামে একটি গাছ হয়, সুখও তেমনি দুঃখ হয়। পুণ্য কর্মের পরিণাম সত্য সুখ ও আনন্দ। অপুণ্য কর্মের পরিণাম দুঃখ। সে দুঃখ তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচিন্তার দ্বারা নিজেদের আমরা সর্বদা দুঃখ দিয়ে অভিভূত করে রাখি বলেই দুঃখ স্থায়ী বড়। বিবেকী ব্যক্তিরা বলেন, 'দুঃখমেব সর্ব্বম্' দুঃখই সব। তাই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

জিঘাংসা, প্রতিঘাতের ইচ্ছা, মানসিক বিদ্বেষ ও ক্রোধ দুঃখের চারটি রূপ, তাদের আরো শাখা-প্রশাখা আছে। দুঃখ যার একবৃত্তি হয়ে মনে স্থায়ী হয়ে থাকে সে ব্যক্তি পাগল হয়। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গেলে চিত্তের তিনটি বৃত্তির সহজ লয়োদয়শীলতা থাকা দরকার। দুঃখ-চিন্তার টান অতিশয় তীব্র। সে টান নিত্য ঘটতে থাকলে তার প্রভাব মনে সঞ্চারিত হয়ে হয়ে দেহের রক্তপ্রবাহের ও অন্য উপাদানের স্বাভাবিক ধরণ বদলে যায়, দেহযন্ত্রগুলির স্বভাবী অবস্থা আহত হয় এবং পরিশেষে তা নানা যান্ত্রিক রোগের আকারে ফুটে ওঠে। আমরা নিরন্তর যেমন নিজেদের দেহের উপাদান মন ও ভাগ্য নির্মাণ করছি, তেমনি দুঃখকর চিন্তা দিয়ে নিজেদের যান্ত্রিক রোগ এবং মৃত্যুও নির্মাণ করে চলেছি। যা হোক, রোগ মৃত্যুর কথা এখানে আলোচ্য নয়, প্রসঙ্গক্রমে কথাটা এসে পড়েছে। দেহ ও মনের কোন অঙ্গ এবং উপাদান আমরা ফেলে দিতে পারি না। কেবল কৃষ্ণচিন্তা ফেলে দেওয়া যায় এবং তাতে বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি না হয়ে অপরিসীম লাভ ও মঙ্গল হয়।

একটি গুরুতর কথা মনে রাখতে হবে যে, পাঠক বা পাঠিকা সংখ্যায় একজন নন, তিনি বহুসংখ্যক। অর্থাৎ তাঁর দেহ একজনের এবং সাধারণ বোধ একজনের হলেও তাঁর অন্তরে বহুসংখ্যক ব্যক্তির বাস। আমি বলে নিজের পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বহু আমি-র সমন্বয়। বাহিরের এই যে একটি আমি-র বোধ তার কারণ তিনি নিজের একটি নাম দিয়ে সর্বদা পরিচিত; তাঁর একটি দেহ; দেহের সুখকর ও দুঃখকর নানা সংবেদনের ঐক্য এবং নানা অভ্যাসজনিত একত্বাবোধ। তাঁর অন্তর্দেশে এই যে বহু সংখ্যক ব্যবহারিক আমি ব্যক্তি, তারা পরস্পরে অপরিচিত। একজন অন্যের কাছে ভিন্ন ভাষাভাষী; ভিন্ন স্বভাবের ও ভিন্ন ক্রিয়ারত বিদেশীর মতো। যেনো পাঠক বা পাঠিকার মনের পান্থশালায় বহু বিদেশীর বাস। যখন কোন একটি আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরের কোন উত্তেজনা গ্রহণ করে, তখনই সে পাঠক বা পাঠিকার দেহ মন ও সমগ্র সত্তার অভিভাবক হয়ে গিয়ে সেই উত্তেজনা অনুযায়ী ভালো বা মন্দ কাজ সৃষ্টি করে এবং তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগও করে। সে কর্মের ফলভোগ করে আর একটি "আমি," সে করেনা। প্রায়ই আমরা উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কোন একটা কাজ করে ফেলি এবং পরক্ষণে ভাবি যে সে কাজটা করা উচিত হয়নি। তখন তার জন্য মনে মনে অনুশোচনা করি। কাজটা করে আমার একজন "আমি" দুঃখ পায়, অনুশোচনা করে করে ভিন্ন একটি "আমি"। কর্মের কর্তা ও তার ফলভোগী দুটি বিভিন্ন ব্যক্তি। মানুষের অন্তর্দেশে এই বহু "আমি"-র কোলাহল, নানা বিপরীত দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া অবিরাম সম্পাদিত হয়ে চলেছে। কোলাহলটা শোনা এবং বিশৃঙ্খলতাটা দেখা না গেলেও তাদের তুলনায় কোন সহরের বড়ো একটা চৌরাস্তার কোলাহল ও বিশৃঙ্খলতাকে তুচ্ছ বলা যায়। প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মনের সভাগৃহে অনন্ত কোলাহল, তর্কবিতর্ক, চেঁচামেচি, বিশৃঙ্খলতা

বর্তমান। সেখানে কেউ কারো কথা শোনেনা এবং শাসন সংযম ও ভব্যতার নিয়ম মেনে চলেনা।

এই বহুসংখ্যক "আমি"-রা ব্যূহ রচনা করে নিজেদের চরম মূল প্রকৃত "আমি," অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানকে আড়াল করে রেখেছে। মেঘ উঠলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাইনা, বলি যে সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য মেঘের দ্বারা আবৃত হয় না, আমাদের দৃষ্টি আবৃত হয়। তেমনি নানা আমির আবরণের কারণে আমরা বিবেক বা চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনে। কিন্তু আমাদের অন্তর্দেশে বিবেক সর্বদা স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। বহুসংখ্যক "আমি-র" সহিত চৈতন্যকে একাকার বলে মনে হয় বলেই আমরা প্রত্যেকে বলি যে একটিমাত্র এই "আমি" আমার সকল কাজের কর্তা। সাধারণ মানুষ আকস্মিকভাবে কালেভদ্রে, যেমন কোন সঙ্কটের সময়ে, চৈতন্যের সহিত যুক্ত হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই চৈতন্যের ভূমি থেকে সরেও আসে। নিরন্তর সাধনার দ্বারা এই বহুসংখ্যক মিথ্যা "আমি"দের মন থেকে বিতাড়িত না করলে এই বিবেকের সাক্ষাৎ পেতে ও তাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারেনা। বিবেকসাধনা কখনো নিষ্ফল হয়না। বিবেকের পানে যেতে যেতে জ্ঞানদীপ্তি হতে থাকে। নিত্য এবং গভীর আত্মপর্যবেক্ষণের দ্বারা মনের এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটির উপলব্ধি করা যায়, আর কোন উপায় করা যায়না।

চেতনার চারটি ভূমি: নিদ্রা, জাগ্রত-নিদ্রা, আত্মচেতনা এবং পরচেতনা। শেষেরটি যে কি তা আমরা জানি না, অতএব তার কথা কিছু বলাও যায় না। নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা আত্মচেতনায় যুক্ত হতে পারি। সেটি মনের উচ্চতর অবস্থার প্রথম সোপানমাত্র। সাধারণ মানুষের চেতনার প্রথম দুটি অবস্থায় থাকে। জাগরণহীন অবস্থা নিদ্রা। স্বপ্নাবস্থার কথা এখানে বলা অবান্তর। প্রকৃতপক্ষে মানুষ খুব কম নিদ্রা যায়। আমাদের প্রাচীন মনোবিদ্যার মতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুটি ঘণ্টা কাল আমাদের প্রকৃত গভীর নিদ্রা হয়।

যখন আমরা জেগে আছি বলে মনে করি সে অবস্থাটা বস্তুতপক্ষে জাগ্রত-নিদ্রা। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান দিনমানকে "অবিদ্যারাত্রি" বলেছেন। অবিদ্যা অজ্ঞানতা। অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মকে আত্মজ্ঞান করা অবিদ্যা। সকল দুঃখ ক্লেশের মূল কারণ। লক্ষ্য করতে হবে যে দিনের বেলাটি ছাড়া চেতনার অন্য কোন ভূমিতে অবিদ্যার স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া নেই। দিনমক এই অবিদ্যা রাত্রিতে আমরা প্রত্যেকে স্বপ্নচারী। সে সময়ে আমরা জীবনের অনুরাগসঞ্জাত কাজগুলো মোটামুটি খানিকটা বুদ্ধিযুক্ত ভাবেই করি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মতভেদ, সংঘর্ষ এবং দ্বন্দ্বের নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশেরও সৃষ্টি করি। অন্য কোন চেতনার অবস্থায় তা করি না। দিন বলতে এখন অবশ্য সূর্যালোকের অবস্থিতির কালটুকু বোঝায় না। বিজ্ঞানের বলে দিন এখন কৃত্রিক আলো দিয়ে বহু প্রশস্ত হয়েছে এবং অবিদ্যার ব্যবহারক্ষেত্রটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দিনের কর্মসাধনেই মানুষের দুঃখের উৎপত্তি।

সব মানুষের কল্পনা করবার শক্তি আছে। কল্পনাশক্তিকে মনে রাখা দরকার। সেটি দু রকম: সৃষ্টিকর কল্পনা এবং সাধারণ কল্পনা। প্রথমটি মহাশক্তি, খুব অল্পসংখ্যক মানুষই সেটাকে লাভ করে। সবগুলি মনের সত্ত্বশক্তির অংশগুলিকে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশীল না হলে সৃষ্টিকর কল্পনার জন্ম হয় না। এ কল্পনার কেবল কবি দার্শনিক চিত্রকর ভক্ত ধর্মনেতা প্রভৃতি মহাজনদের অধিকার। সামান্য মানুষ সাধনা করলেও তার অধিকারী হয় না।

সামান্য কল্পনা সাধারণ মানুষের একটি বৃত্তি এবং সেটি তার নানা দুঃখক্লেশের আকর। এ কল্পনায় অস্তিত্ববিহীন, সর্বৈব মিথ্যা বস্তু সত্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বিপদ দুঃখ প্রকৃতপক্ষে ঘটেনি বা ঘটবে না, কল্পনায় সেটাকে বর্তমান বলে মনে করে আমরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করি। যাকে আমরা চিনিও না কল্পনার দ্বারা তার ওপর নানা মন্দ গুণ আরোপ করে তাকে দ্বেষ করি এবং নিজেদের দুঃখ বাড়াই। কল্পনার কারণে আমরা বাড়িয়ে কথা বলি, বহু মিথ্যা কথা কই, যা জানি না তার বিষয়ে জানার ভাণ করি এবং নানা প্রকারে মিথ্যা আচরণ করি। সামান্য কল্পনার অপগুণের সীমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

দিনান্তে যদি একবার নিজের সেই দিনটির নানা কর্মের হিসাব-নিকাশ করা যায় তাতে বেশ পরিষ্কার দেখা যাবে যে, মাত্র একটি দিনে আমি কতো দুঃখকর কাজের সৃষ্টি করেছি। এই হিসাব-নিকাশ করাটা বেশ অস্বস্তিকর। তাতে দেখা যায় যে, মূলতঃ আমি নিজেই আমার সকল দুঃখ-ক্লেশের জন্য দায়ী। এতো যে সুখস্বস্তির কামনা করি তার জন্য মনের একটা ঘষা পয়সাও আমি ব্যয় করি না। আরো বেশ বোঝা যায় যে আমার নিজের কাছেই আমি সম্মানের যোগ্য নই। আত্মজ্ঞান ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ জন্য এ হিসাবনিকাশ অমূল্য জিনিষ।

আত্মদর্শনের দ্বারা যার নিজেকে বিচার করে করে জানবার ও সংযত হবার আগ্রহ হবে তার জেনে রাখা ভালো যে কেবল অনাগত দুঃখকেই নিবারণ করা যায়। যে দুঃখ অতীত হয়ে গেছে তার বিষয়ে কিছু করবার নেই। যে দুঃখ বর্তমান তা এখনি অতীতে লীন হয়ে যাবে, তার বিষয়েও কিছু করা যায় না। বর্তমানে কালের স্থিতিটা ক্ষণিকের। অতীত ও বর্তমান দুঃখের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা কেবল অনাগত দুঃখকে নিবারণ করতে পারি।

মানুষের দুটি অবস্থা, একটি প্রকাশিত ও অন্যটি সম্ভাব্য বা অব্যক্ত। প্রথমটি রূপ এবং দ্বিতীয়টি স্বরূপ। উদ্যোগী হয়ে সাধনা

না করলে অন্য কোন উপায়ে স্বরূপকে লাভ করা যায় না। সংস্কারী সাধারণ মানুষ বহির্জগতে রূপে বাস করে। রূপের দশায় তার জন্ম এবং সেই দশাতেই অবসান হয়। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ নিজেকে এবং নিজের নিহিত শক্তিকে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি না করে জীবন হতে বিদায় গ্রহণ করে। স্বরূপের স্থিতি তার অন্তর্দেশে। বাইরের রূপের কবাটটি বন্ধ না করে দিলে স্বরূপে যাওয়া যায় না। জীবনে কোন বড়ো কাজ করতে গেলে আমাদের কথায় কথায় রূপের কবাটটি বন্ধ করে দিতে হয়।

* * * *

বাইরের কবাট দৃঢ়ভাবে বন্ধ করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে ও তাতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকতে হয়। সে-জীবন নিভৃতের চেয়েও নিভৃত, অন্তরঙ্গতম। তথায় প্রগাঢ়তম মিলন। রূপজীবনের কোন কিছুই সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। সেখানে কেবল সুনির্মল স্বরূপের প্রয়োজন। আমাদের দেশে শয়নমন্দির কথাটা প্রচলিত। বস্তুতপক্ষে, দম্পতির শয়নকক্ষ একমাত্র মন্দিরের সহিত তুলনীয়। কারণ, সে দাম্পত্যমন্দিরে প্রেমদেবতার ঐকান্তিক সেবা, সে-সেবায় কাম কামোত্তর পথে ধাবিত হয়। সে-সেবা পবিত্রতম। প্রেমই সেখানে অভিভাবক। সেখানে জগতের পরমতম শিল্প, একটি নূতন মানবের সৃষ্টি; যার দ্বারা পিতামাতা মৃত্যুশীল হয়েও অমরতা লাভ করে। এই শয়নমন্দিরেই একদা বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষের সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এই শয়নমন্দিরেই আগামীকালের মহামানবেরও সৃষ্টি হবে। সেখানে পতি-পত্নীর দ্বৈত জীবনকে অতীত করে অদ্বৈত সত্তার সাধনা। ঠাকুরঘরকে আমরা মন্দির বলি। সেখানে যেতে গেলে আমরা সংসারের যতো অভিমান এবং দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, লোভ, মোহ সব ত্যাগ করে প্রেমসাধনা করতে যাই। সেখানে নিজের বুকে ইষ্টদেবতাকে জাগিয়ে তাঁর সহিত একটি প্রগাঢ় আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই। সেখানেও অদ্বৈতরূপের সাধনা করি। মানুষের শুদ্ধসত্ত্বের নিবেদন জড়ো হয়ে হয়ে আমাদের বিখ্যাত মন্দিরগুলি মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। শুদ্ধসত্ত্বের নিবেদন ভিন্ন কোন মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের নৈবেদ্য না নিয়ে ঠাকুরঘরে যাওয়া বৃথাই যাওয়া।

তেমনি শয়নমন্দিরেও শুদ্ধসত্ত্বের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সব কয়টি মনের সত্ত্বশক্তি জাগ্রত ও একাগ্র না হলে ভালোবাসা হয় না। কোন অভিমান, বিকৃত চিত্তবৃত্তি, বাইরে থেকে অর্জন করা পার্সোনালিটি বা কোন অভিমানজনক উপাধির শয়ন-মন্দিরে কোনই স্থান নেই। সেখানে কেবলমাত্র সত্ত্বের স্থান আছে।

"সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি,
খোঁজে নিজের রতনমণি।"

শয়নমন্দিরে সত্ত্বকে জাগিয়ে কেবল নিজের রতনমণিকে খোঁজা। ভালোবাসা, করুণা, দাক্ষিণ্য, পবিত্রতা, সতীত্ব, সেবা সে রতন। শয়নমন্দিরই সে সকলের আকর। নারীর মতো পুরুষ কখনো ভালোবাসার দীপ্তিকে নিজের দেহ-মন আত্মায় বহন করতে পারে না। এ রতনের অলঙ্কার নারীই কেবল অবলীলায় পরতে পারে। ঐ গানটির শেষ কলি, 'নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি কোন অজানা জন।' এ প্রেমজীবনে শুধু সেই অজানা জনের বাঁশি শোনা, সংসারের আর কিছু শোনবার যোগ্য নয়।

বলেছি যে সাধারণ মানুষের সত্ত্ব শিশুসুলভ, কারণ সেটা শৈশবে অর্জিত। হোক তা শিশুসুলভ! শয়নমন্দিরে পতিপত্নীর সেই শিশুসুলভ ক্ষুদ্র সত্ত্বটুকু ভালোবাসার রসসিঞ্চনে প্রতিক্ষণ সমতুল্য হয়ে বৃদ্ধি পায়। সেই বর্দ্ধমান সত্ত্ব দম্পতিকে সংসারের নানা দুঃখ থেকে রক্ষা করতে পারে, তাদের আনন্দে অধিষ্ঠিত করে রাখতে সক্ষম।

দাম্পত্য কোন দ্বন্দ্বে বাইরের মানুষের পরামর্শ নেওয়া ঘোরতম বিপদের কথা। নিভৃত শয়নকক্ষে যেমন বাইরের কাউকে কেউ ডেকে নিয়ে যায় না, তেমনি অপরের বুদ্ধিকেও সে নিভৃত জীবনে তিলমাত্র স্থান দিতে নেই। কারণ প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ নিজের জীবন নিয়ে কুরুচিন্তায় বিভোর। তার জীবনের অনুরাগসঞ্জাত পীড়ার অবধি নেই। তাই কারো ওপর নির্ভর করতে নেই, অপর কারো জীবনের অনুকরণ করাও বিপজ্জনক। নিজেদের দ্বন্দ্ব নিজেরাই নির্মূল করা যায়। কুরুচিন্তায় রজের, অর্থাৎ দুঃখের অভিভাবকত্ব সত্ত্ব অভিভূত। বুঝতে হবে যে দ্বন্দ্বের ওপরে একটি অদ্বৈত, উচ্চতর তৃতীয় সদা প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে, সেটি শুদ্ধসত্ত্ব। প্রত্যেক দ্বন্দ্বযুক্ত বাক্যে ও অবস্থায় এ শুদ্ধসত্ত্বটি আছে। ভালো-মন্দর শুদ্ধসত্ত্ব মহত্তর ভালো। এক পা এগিয়ে তাতে গিয়ে পড়লেই তৎক্ষণাৎ দ্বন্দ্ব তিরোহিত হয়। যে-কোন মানুষ নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা প্রত্যেক দ্বন্দ্বের ও সংশয়ের অবস্থায় এ কাজটি করতে পারে। মনই শুদ্ধসত্ত্বটির ইঙ্গিত জানিয়ে দেয়। তার ফলে তখনই শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। শান্তি সেই অবস্থা যাতে চঞ্চল বা ক্ষিপ্ত কোন বৃত্তি অতীত বা লীন হয়ে গিয়েছে। পতিপত্নীর এটি নিরন্তর হাতে-কলমে করবার জিনিষ। তার শুভকর প্রমাণটি প্রত্যক্ষ।

যে ইন্দ্রিয়টি উভয়, অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে তার নাম জিভ। ইন্দ্রিয় সকলের সর্বার্থতা আছে, সকল বৃত্তিতে তারা যুক্ত হয়। কিন্তু জিভের মতো সর্বার্থতা আর কোন ইন্দ্রিয়ের নেই; তার চেয়ে দুরাচারী ও দুর্দান্ত আর কেউ নয়। বিবাহে এই ভয়ঙ্কর ইন্দ্রিয়কে কড়া শাসনে রাখতে হয়। জিভ বাক্য দিয়ে শুধু বাচালতা করে না, তার নীরব বাচালতাও বিস্ময়কর। বিবাহিত জীবনে জিভের একমাত্র কাজ যথার্থ হিতভাষণ ও লোভ সম্বরণ করা। মাঝে মাঝে নীরবতার অভ্যাসের দ্বারা তাকে শান্ত করে রাখতে হয়।

কল্যাণীর সংসার-সাগরে পাড়ি দেবার তরীটি অতিশয় ক্ষুদ্র। তাতে স্বরূপজ্ঞান ছাড়া রূপজগত থেকে কোন কিছুকে পাথেয় বলে জড়ো করা যায় না। সংসারের সকল মলিনবৃত্তিকে সে অনুক্ষণ বলে—

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী,
আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

বিজ্ঞানভিক্ষু

সাত

কালু সেন—এডিসন

"The trouble with facts seems to be, that if one treats them out of relation to life, they become lies."

—*Tames Branch Cabell*

পরের দিন ভোরবেলায় শংকর একটা ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে গেলো হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর উদ্দেশে।

সেখানে পৌঁছে দেখে যে প্রফেসর শিকদার সকলের আগেই হাজির হয়েছেন। প্রতিটি যন্ত্রের তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে চলেছেন—অণুবীক্ষণের দৃষ্টিতে। রসায়নাগারে প্রতি বোতলটি একে একে খুলে পরীক্ষা করে যাচ্ছেন। হাতে একখানা মোটা নোটবই—প্রতিটি 'আইটেম' তাতে লিপিবদ্ধ করে চলেছেন—নিজের মন্তব্য যোগ করে। মাঝে মাঝে পকেট থেকে গজের ফিতা বের করে ল্যাবরেটরীর উপকরণের আয়তন—দেওয়াল বা টেব্‌লের একধার থেকে যন্ত্রপাতিগুলোর দূরত্বের মাপ করে চলেছেন। উঁকি দিয়ে শংকর দেখে যে নোটবইএর পাতায় ঘরের একটা নক্সা তৈরী করেছেন ভদ্রলোক।

সপ্রশংসদৃষ্টিতে শংকর শিকদারের কর্মপ্রণালী লক্ষ্য করে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এত্তো মনোযোগ দিয়ে বৃদ্ধ পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত যে শংকরের উপস্থিতি তাঁর লক্ষ্যেই পড়লো না।

শংকর চলে গেলো লাইব্রেরীর দিকে। সহকর্মীদের সাড়া পাওয়া গেল। একটা লরী বোঝাই করে সকলেই এসে গেছে।

*   *   *   *

বেলা দ্বিপ্রহর অবধি লাইব্রেরীতে কাটিয়ে শংকর যখন আস্তানায় ফিরলো, তখন মাত্র আটাশখানা বই-এর পাতা ওল্টানো শেষ হয়েছে। হিসেব করে দেখলো যে, এই হারে পর্যবেক্ষণ চালালে শুধু হবিবুল্লার লাইব্রেরীটা শেষ করতেই বছর ঘুরে যাবে। কাজটা বারো জনের মধ্যে ভাগ করে নিলেও কমপক্ষে এক মাস লাগবার কথা!

শংকরের মনটা দমে যায়।

আহারাদির পর একটু দিবানিদ্রার বৃথা চেষ্টা! সর্বক্ষণ মনের মধ্যে রয়েছে একটা অস্বস্তি। 'অ্যাণ্টিগ্রাভিটি'র সমস্যা একরাশ সুতোর মতোই কোথায় জট পাকিয়ে গেছে—সে সুতোর গোড়াও পাওয়া যাচ্ছে না—শেষও পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর শংকর স্থির করল, এবার থেকে সুসংগত শৃংখলার সংগে রুটিন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে—শিকদার যেমন ভাবে সুরু করেছেন। তা না হলে এ সমস্যা সমাধানের কোনো আশাই নেই।

কাগজের প্যাড আর কলম নিয়ে বসলো শংকর। লিখলো—

আইটেম—১।

হবিবুল্লার আবিষ্কার কি—

(ক) বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলা যায়, না—

(খ) তথাকথিত মেটাফিজিক্সের পর্য্যায়ে পড়ে?

শংকর ভাবতে সুরু করে।

সুধীজন-সমর্থিত বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলোর মধ্যে যদি হবিবুল্লার আবিষ্কারের ভিত্তিটা গড়ে উঠে থাকে—তবেই এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। আর যদি যোগবল বা কালো ম্যাজিকই একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে সাধারণভাবে অ্যাণ্টিগ্রাভিটির সন্ধান মিলবে না।

অন্তত তার দ্বারা সম্ভব হবে না, এ রহস্যের মূলোদ্‌ঘাটন।

ধরে নেওয়া যাক ১ (ক)। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে হবিবুল্লার যন্ত্রের সন্ধান। ডাকিনীতন্ত্রের সংগে এ সমস্যার যোগাযোগ নেই।

সংগত কারণও রয়েছে এ রকম মনে করারও একটা প্রকাণ্ড অতি আধুনিক ল্যাবরেটারীর প্রয়োজন হয়েছিল হবিবুল্লার—তাই নয় কি?

হঠযোগীর কোনো উপকরণের প্রয়োজন হবে কেন?

শংকর লিখে গেল—

১ (ক)—সমর্থনে (১) হবিবুল্লার বিরাট গবেষণাগার (২) বিজ্ঞানে তার অসাধারণ জ্ঞান (৩) গ্রন্থাগারে বই।

১ (খ)—সমর্থনে—(১) হবিবুল্লার গ্রন্থাগারে মেটাফিজিওয়া বই-এর প্রাচুর্য (২) হৃষীকেশ যোগাশ্রমে তার হঠযোগ-শিক্ষা (?) (৩) সারা দুনিয়ায় তার ছন্নছাড়া পর্যটনের রহস্য।

প্রোবিবিলিটি বা সম্ভাবনা ১ (ক)—১ (খ)।

কিছুক্ষণ ভেবে শেষ অনুচ্ছেদের পরে শংকর যোগ করে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। তারপর লিখে চলে—

আইটেম—২

অ্যান্টিগ্রাভিটি র প্রেরণা বা আইডিয়া হবিবুল্লা পেলো কোথা থেকে?

এই পর্যন্ত এসে আবার কলম থামাতে হয়। সমস্যাটিকে আরো একটু ভেঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন। শংকর লেখে—

উত্তর আপাততঃ অজ্ঞাত।

আইটেম ৩।

আইডিয়া মানুষের আসে কোথা থেকে?

শংকর আবার থামে। দেখা যাক বিশ্লেষণ করে বড়ো বড়ো আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস।

আর্কিমিডিসের স্নানের জন্য বাথটাবে ভরা ছিল জল। তার মধ্যে প্রবেশ করতেই খানিকটা জল উপচে পড়ল—সংগে সংগে তাঁর দেহভারও গেল কমে। আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণের পন্থা হোলো আবিষ্কার। লোকলজ্জা ভুলে কিন্তু আর্কিমিডিস রাজপথে ছুটে বেরিয়ে গেলেন আনন্দের আতিশয্যে—

ইউরীকা! পেয়ে গেছি সমস্যার সমাধান!

নিউটন। নিউটন বসেছিলেন বাগানের বেঞ্চে। চোখের সামনে খসে পড়ল বৃন্তচ্যুত এক আপেল-ফল। তার মধ্যে নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন মহাকর্ষের স্বরূপ! নিউটন, গ্যালিলিওর আগেও তো জন্মেছিলেন বহু মনীষী—বিরাট প্রতিভা নিয়ে। তারাও নিশ্চয়ই জানতেন গাছ থেকে আপেল পড়ার কথা। কিন্তু তার তাৎপর্য কেন ধরা পড়ল না তাঁদের মনশ্চক্ষুতে?

ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিক সি, ভি, রমণের কথা মনে পড়ে। কিংবদন্তী আছে, ইউরোপ প্রবাসের পর রমণ দেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন জাহাজে। জাহাজ চলছিল ভূমধ্যসাগরের জল কেটে। হঠাৎ রমণের মনে হোলো যেন ভূমধ্যসাগরের জল অন্যান্য সাগরের চেয়ে বেশীমাত্রায় নীল। তা থেকে আবিষ্কৃত হোলো যুগান্তকারী 'রমণ এফেক্ট' পদার্থ থেকে আলোক বিচ্ছুরণের অভিনব ব্যাখ্যা।

পেনিসিলিন। আলেকজান্দার ফ্লেমিং-এর গবেষণাগারে। পুঁয সৃষ্টিকারী বীজাণুর প্লেটে হল সংক্রমণ আর এক বীজাণু ফাংগাসএর ব্যাপারটা ঘটেছিল হয়তো বা কারো অনবধানতা বশেই। ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন যে অনাহূত ফাংগাসের চারিদিকে পুঁযের বীজাণুর দল মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘনিয়ে এলো অ্যান্টিবায়োটিক কেমোথেরাপি'র নূতন যুগ। ফ্লেমিংএর আগেও কি ঘটেনি এমন দুর্ঘটনা? বীজাণুদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বভাব অহি-নকুলের সম্পর্ক তো জানা ছিল মানুষের চল্লিশ বছর ধরে। কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রে সেটাকে কাজে লাগাবার প্রেরণা একমাত্র ফ্লেমিং-এর কল্পনায় এলো কী করে?

সব আবিষ্কারই কি এই রকম?

তাও তো নয়।

অনেক বড়ো বড়ো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের একাগ্র সাধনায়। সেগুলোর মধ্যে দৈবের কোনো সংযোগ তো দেখা যায় না!

আইনষ্টাইন যখন ১৯০৫ সালে প্রথম প্রকাশ করলেন পদার্থের সংগে শক্তির সমতার ইকোয়েশন, নীলস বোর যখন পরমাণুর গঠন জগৎ সমক্ষে ধরে দিলেন তখন থেকেই তো পদার্থবিজ্ঞানীর নানা চেষ্টা চলেছে অ্যাটম ভেঙে শক্তি তৈরী করার। বহু মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায়, আপ্রাণ সাধনায় সম্ভব হয়েছে আণবিক মারণাস্ত্র; আইনষ্টাইনের ঘোষণার চল্লিশ বছর পরে। এর মধ্যে তো অভাবনীয় বরাত জোরের প্রশ্ন ওঠে না!

হয়তো বা সব আবিষ্কারের মূলেই ছিল এই কঠোর তপস্যা।

বৈজ্ঞানিকদের জীবনীকার হয়তো আবিষ্কারগুলোর বর্ণনা করেছেন নাটকীয় অত্যুক্তির মধ্যে। হয়তো বা দৈবঘটনা বা বরাত জোরকে আমরা মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে এসেছি। অনেক সময়ে বিজ্ঞানসাধকেরা নিজেরাই দায়ী আবিষ্কারের নাটকীয় প্রকাশের জন্য—

আজ মধ্যাহ্নভোজনের সময় হঠাৎ মনে হোলো এ পরীক্ষাটা করলে কেমন হয়?

স্বপ্নে পেলাম এই পদ্ধতি।

একটা গংগা ফড়িংকে দেখে আইডিয়া পেলাম নতুন ধরণের উড়োজাহাজের।

বিজ্ঞানসাধকদের অভিভাষণে অনেক সময়ই উল্লেখ পাওয়া যায় না এ কথার যে কী কঠোর পরিশ্রম তাঁদের করতে হয়েছে বড়ো বড়ো যুগান্তকারী আবিষ্কার সফল করবার জন্য।

আর্কিমিডিস্, নিউটন্, রমণ বা ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারের পেছনেও ছিল না কি এই একান্ত আত্মনিয়োগ?

আর একটা কথা।

এঁরা জীবনে সফল হয়েছিলেন। মুগ্ধ জনসাধারণ তাই তাঁদের নিয়ে কাহিনী রচনা করে। যাঁরা সফল হলেন না তাঁদের নাম থাকে না মানুষের স্মরণে। হয়তো বা বড়জোর বিজ্ঞানের ইতিহাসের জরাজীর্ণ অবজ্ঞাত পাতায় পাদটীকায় এঁদের উল্লেখ থেকে যায়।

টমাস্ এলভা এডিসন বড়ো হয়েছিলেন। তাই শিশুপাঠ্য কাহিনীতে অমর হয়ে রয়েছে এ-ঘটনা যে এডিসন তাঁর ল্যাবরেটরী গড়ে তুলেছিলেন একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ীর মধ্যে। একদিন হঠাৎ আগুন ধরে যায় মালগাড়ীর মধ্যে এডিশনের অনবধানতায়। কর্তৃপক্ষ এডিসনকে অপমান করে বহিষ্কার করে দিলেন।

কালীপূজার সময় নূতন ধরণের বোমা তৈরী করতে গিয়ে শংকরের গ্রামের কালু সেনের হাতের দুটো আঙুল খোওয়া যায়। গ্রামের লোক সে ঘটনার উল্লেখ করতো নির্বুদ্ধিতার একটা চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে। কালু সেন বড়ো হতে পারে নি। কিন্তু টমাস্ এলভা এডিশনের সংগে কালু সেনের সত্যিকারের পার্থক্য কোথায়?

পাঁচজনের কাছে কেউ যদি আস্ফালন সুরু করে মহাকর্ষের শক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আমি শূন্যে উড়ে যেতে পারি—সকলেই বলবে পাগল, ভণ্ড, প্রতারক। কিন্তু সত্যই যদি কেউ এ ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারে? তখন মহাপুরুষ, জিনিয়াস বলে সকলেই ছুটে আসবে পাত্তার্ঘ দিতে।

শংকরের কানে ভেসে এল, হবিবুল্লার আবিষ্কার সম্বন্ধে কৃষ্ণস্বামীর ঘোষণায় সেদিনকার সভায় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর অবিশ্বাস অবজ্ঞা মেশানো হাস্যধ্বনি।

যাঁদের রুচি আছে··

সেই সব মহাত্মাদের প্রতি আমার এই ছোট্ট ডাইরীটি উৎসর্গিত হলো। কে আমি প্রশ্ন নয়···তবে আজ আমি তাঁদেরই একজন যাঁরা স্বপ্নে-জাগরণে কেবলই ভাবেন আলু কফির ডালনার কথা, মটর ডালের কথা, ইলিশ মাছ, রুইয়ের মাথা, মুরগী মাংস আর পায়েস্ রসগোল্লার কথা। ভাবছেন পেটুক আমি? মোটেই নয়।

কয়েদী মাত্র। কয়েদখানায় আটক নই। আটক আমি হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালের কোন এক অজানা বেড থেকে লিখছি। আমার পরিচয় দিয়ে কি প্রয়োজন? শুধু শুনে রাখুন পেটের রোগের সাজায় এখানে আমি বন্দী। ভাল মন্দের আস্বাদ আমি পাই না। রুচি আছে, তবু ইচ্ছে মতো খাবার আমায় দেওয়া হয় না···এইতো আমার বড় সাজা। ···না, খেতে আমাকে এরা দেয় বৈকি! ডাবের জল, ছানা আর ঘোল···মাঝে মাঝে লবণ ছাড়া মুরগী সুপেরও স্বাদ পাই···স্বাদ পাই দুবেলা সেণ্টিগ্রেড থার্মমিটারের! কোন এক অজানা দিনের আশায় আছি। যেদিন নিষ্ঠুর ডাক্তার বলবে তুমি সুস্থ, তুমি মুক্ত, আজ থেকে খুশী মতো, ইচ্ছে মতো তুমি খেতে পারো। সেদিনের স্বপ্নে বিভোর আমি···

১লা আগস্ট

ঐতো পাশের বেডের ছেলেটা কি যেন গিলছে। মুরগী মাংস! আহা কতদিন খায়নি! আমাদের বাড়ীর সবাই মুরগী খায়। কেবল হেবলুটা খায় না। ছোট ভাই, ওকে কত বলেছি ওরে খারে খা। মুরগীর মতো মাংস হয় না, তবুও খেতো না।···

৬ই আগস্ট

হাসপাতালে আজ তেরো দিন হলো। মা, হেবলু রোজকার মতো আজ বিকেলেও এসেছে। তবে সঙ্গে খাবার কিছু আনেনি। পাশের বেডের ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কেন জানি না ছেলেটাকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। হাংলার মতো তাকানোটা অবশ্য ওর স্বভাব, আমাদের নার্সটার দিকেও ও অমন করেই তাকায়। সে যাকৃগে। ও কে দেখে আমার ঈর্ষ্যা হয়। পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে আছে। অথচ দু'বেলা মুরগী, মাংস ঠিক গিলছে। আমিও তো ওর মতোই রুগী। অথচ আমাকে ইচ্ছে মতো কিছুতেই খেতে দেওয়া হয় না।···

১৬ই আগস্ট

আজ আমাকে যারা দেখতে এসেছে, তাদের ভেতর একজন হচ্ছে নবাগতা। আমাদের হেবলুর বৌ। হাসপাতালে পড়ে আছি এরই মধ্যে হেবলুর বিয়ে হয়েছে। কিরণ চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। নতুন মাষ্টার মশাই এসেছেন। আরও কত কি! অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হেবলুটা বরাবরই বিয়ের বিপক্ষে ছিল। আমি ভাবছিলাম শেষটায় কেলেঙ্কারী না হয়। মা'র মুখে শুনলাম না, হেবলুটা ভাল ছেলের মতো সব কিছু মেনে নিয়েছে।···

১৮ই আগস্ট

আজও মা'র সাথে বৌ-মা এসেছে। মালতীর (আমার স্ত্রী) মুখে কিন্তু একটা মজার কথা শুনলাম। হেবলুটা মুরগী খায় না। কিন্তু কাল নাকি বৌ-মার হাতের রান্না ফেলতে পারেনি। বৌ-মা ওকে শুধু চাকৃতে দিয়েছিল। এক বাটি মাংসের সবটুকু খেয়েছে। বাহবা! বৌ-মার রান্নার তবে বাহাদুরী আছে। 'আচ্ছা বৌ-মা, কি এমন যাদু দিয়ে রাঁধলে যে হেবলুও মুরগী খেলো?'

'যাদু দিয়ে নয়, 'ডাল্ডা' দিয়ে।'

'ডাল্ডা দিয়ে? 'ডাল্ডায়' খাবারের এত ভাল স্বাদ হয়?' 'হ্যাঁ, 'ডাল্ডা'র নিজস্ব কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে খাবারের আসল স্বাদটি ফুটিয়ে তুলতে এর জুড়ী হয় না।' 'তাই নাকি? কিন্তু এর কি কোন উপকার আছে?' 'আছে বৈকি! প্রতি আউন্স 'ডাল্ডা'তেই ৭০০ ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' ৫৬ ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' মেশানো হয়।'

'ভাল, ভাল, খাঁটি জিনিষে রাঁধাতেও আনন্দ আছে। তা বৌ-মা আজ একটু বেশী করে 'ডাল্ডা' আনিয়ে রেখো। আমি আবার দুদিন পর বাড়ী ফিরছি কিনা! দেখা যাক্ তোমার 'ডাল্ডা'য় রান্না কেমন হয়।'

'হবে গো হবে! আগে বাড়ীতে তো এসো।' —মালতী সান্ত্বনা দিল।···সবাই চলে গেল। একটা মাত্র দিন। তারপর আমিও বৌমার হাতের রান্না খাবো।···হাসপাতাল ডাইরীর এইখানেই শেষ। আর নয়···

 হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আজ আর হাসি আসে না কেন ?

সেদিনকার 'প্যারালইয়া'গ্রস্ত উন্মাদ আজকের 'জীনিয়াস'-এ রূপান্তরিত হয়েছে !

পাগলে আর জীনিয়াসে তফাৎ কতটুকু ?

অ্যান্টিগ্রাভিটি কি তাহলে সত্য ?

কোনটা সত্য ? কোনটাই বা অসত্য ? 'ফ্লজিষ্টন' কি সত্য ? কোনোদিন কি ছিল তা সত্য ? প্রাক্-ইলেক্ট্রন যুগের ডালটনের সেই অবিভাজ্য-পরমাণু কি ছিল সত্য ?

কাল যা সত্য ছিল—আজ তা মিথ্যা হয়ে গেল কী করে ? একটা নূতন 'থিয়োরি'র জন্য ? সত্য কি তাহলে প্রচলিত 'থিয়োরি'রই নামান্তর ?

একশো বছর আগে রেডিও বা টেলিভিষণ ছিল অসম্ভব—কল্পনাতীত। কিন্তু আজ তা সম্ভব হয়েছে। অ্যান্টিগ্রাভিটি তাহলে কী ? একটা সত্য-অনাগত ভবিষ্যতের ?

যাই হোক, অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের মূলে নিশ্চয়ই ছিল হবিবুল্লার আজীবন সাধনা। বীজ বপন করা ছিল তার অন্তরে; প্রেরণার বারিসিঞ্চনে সে বীজ সহসা হয়েছিল অংকুরিত।

শংকর লিখে যায়—

তপস্যা—আইডিয়া
আইডিয়া + প্রেরণা = আবিষ্কার
কালু সেন—এডিসন
এডিসন = কালু সেন + সাফল্য—
পাগল—জীনিয়াস······
সত্য = f (প্রচলিত থিয়োরি)
ইত্যাদি।

আট

কাকতালীয় ন্যায়

"We must not forget that what we observe is not nature in itself. But nature as revealed to us by our method of questioning."

—*Werner Heisenberg* (Physics & Philosophy)

সান্ধ্য বৈঠক শুরু হয়ে গেছে ডিনারের টেবলে। শংকর লক্ষ্য করে ঘরের এক পাশে একটা বিরাট ব্ল্যাকবোর্ড এনে রাখা হয়েছে।

কৃষ্ণস্বামী ঘোষণা করছেন,—

হবিবুল্লার বাড়ী খানাতল্লাসী করে কতকগুলো ছিন্নপত্র পাওয়া গেছে—অনুমান যে এগুলো তার ডায়েরীর অংশ। এ ছাড়া পাওয়া গেছে কতকগুলো অংকের খসড়া, 'গ্রাফ' ও নক্সা। সব কাগজের টুকরোর 'ফটোষ্ট্যাটিক' কপি তৈরী করা হয়েছে। এগুলো আগে কর্মীদের হাতে দেওয়া হয়নি, কারণ, হবিবুল্লার জীবনী আর তার আবিষ্কারের পটভূমিকা সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

বহু কষ্টে, অনেক পরিশ্রমের পর বিশেষজ্ঞরা মাত্র এক পৃষ্ঠার একটা বড়ো অংশের সন্নিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন—ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো থেকে। বাকী টুকরোগুলো অসংলগ্ন অবস্থায়ই রয়ে গেছে। আমার আশা—হয়তো বা আপনারা এগুলো থেকে একটা কোনো সুসংগত অর্থ করে নিতে পারবেন।

সমবেত বৈজ্ঞানিকের দল সোৎসাহে মগ্ন হয়ে যায় কাগজের টুকরোগুলোর 'ফটো-কপি'র ওপর।

শংকর দেখে প্রথমেই একটা বড়ো অংশ—

১।···কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন জানতেন না যে পরবর্তী মানুষের চিন্তাধারা তাঁরা কতটা প্রভাবান্বিত করবেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সে যুগের প্রচলিত ধর্মান্ধতার প্রাচীর ধ্বংস করলেন। বিজ্ঞানের জন্য তাঁরা আহরণ করে নিলেন 'মিরাক্ল্' বা অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা। এঁদের চেষ্টাতেই পদার্থবিজ্ঞান উত্তীর্ণ হয়েছিল অলীক স্বপ্নবিলাসের অনিশ্চয়তা থেকে পরীক্ষাগারের যুক্তিসাপেক্ষ, পরিমাপসাপেক্ষ বিজ্ঞানে। তাঁদের বিরাট প্রতিভার ছায়া বিস্তৃত হল কালান্তরে—দ্রুত-বর্ধমান বিজ্ঞান সাধনার জটিল শাখা-প্রশাখায়। তাঁদের সময়কার অনেক 'থিয়োরি' প্রায় বিনা প্রমাণেই গৃহীত হয়ে গেল স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে।

টেক্সট বই থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা শেখে—Laws of Gravitation আর laws of motion—মহাকর্ষ আর গতির নিয়মাবলী। আজকের দিনে এই মূল নিয়মগুলোর কোনো অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন না শিক্ষকমণ্ডলী বা গ্রন্থকারের দল। অকাট্য প্রমাণের প্রশ্ন উঠলে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্যের সংস্থান। নিউটনের গ্রাভিটেশনের নিয়মের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যতিক্রম সংশোধিত করা হয় আইনষ্টাইনের 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' আপেক্ষিকতাবাদের পলস্তারায়। ছাত্রের দল সন্তুষ্ট হয়—শিক্ষকমণ্ডলীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই ভাবে চলেছে শিক্ষা বছরের পর বছর ধরে।

কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক মূল সূত্র কি কাকতালীয় ন্যায়ের মতো (আসলে কাকতালীয়ন্যায় একটু আলাদা এই সংজ্ঞা থেকে। কাকের ভরে তাল পড়ল এই ব্যাখ্যাকেই বলা হয় কাকতালীয়ন্যায়।) নয় ? একটা কাক ডেকে উঠল, সংগে সংগে তালও পড়ল গাছ থেকে। অতএব এ দুটো ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কৃত হোলো ! থিয়োরি খাড়া করা গেল, যখন তাল পড়ছে, তখনই কাক ডাকছে মানুষের গোচরে হোক কি অগোচরে তেমনি, আবার যখনই কাক ডাকছে, জগতের কোথাও না কোথাও তাল পড়ছে। এরকম থিয়োরি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা বেশ দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো। অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ খুশী হয়ে যায়—যাক তাহলে তাল পড়া অথবা কাক ডাকার একটা কারণ তো জানা গেল। সত্যই তো প্রকৃতির কি বিচিত্র নিয়ম !

আগেকার দিনে···ভারতের দার্শনিক···

এখানেই বড়ো অংশটার শেষ। অন্য টুকরোগুলো সাজানো রয়েছে এই ভাবে—

২।···পৃথিবীর বড়ো বড়ো চুম্বকঝটিকার মূলেও আছে··· জানস্পট, নানা রকমের গ্রহের সংস্থান···আপেক্ষিক গতি। এরকম ছোটোবড়ো নৈসর্গিক ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না প্রচলিত থিয়োরিগুলো থেকে। হাজার হাজার বছরের লিপিবদ্ধ ঘটনা

বিজ্ঞানসাধক উড়িয়ে দিলে···কারণ তাঁদের থিয়োরি···অমূলক বলে প্রমাণ···জানবার উপায় নেই।

৩।···বলে 'লেভিটেশন'। মধ্যপ্রাচ্যে ও সুদূর প্রাচ্যে··· আমেরিকায় 'লেভিটেশন'-এর প্রমাণ জনসমক্ষে প্রথম···ইংলণ্ডের মাধ্যমি···ড্যানিয়েল ডগলাস হোম···আশ্চর্য···

৪।···বিজ্ঞান অবজ্ঞা করে গেছে···কিন্তু কোনও সুষ্ঠ সমাধান ···ভারতবর্ষে জড়জগতের ওপর আত্মিকশক্তির জয়যাত্রার দিকে··· থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি···সন্ধান নেই। এই সমস্ত আবি···।

৫।···স্পেনে ভ্রাম্যমান জিপসীর দলে দেখেছি—আফ্রিকার জংগলেও এই 'কাল্ট'···কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবারও অধিকার··· চলে যায় না।

৬।···আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল বা প্রিন্সিপল্ অফ ইনডিটার মিনেসি সত্যকার—স্রোডিংগার-ডিরাকের টেউয়ের ইকোয়েশন থেকে যাক···রূপ ধরা···প্যারিটি বা ডিসপ্যারিটির প্রশ্ন ওঠে না, কেমনা···

৭।···কেপলারের মতো গণিতজ্ঞ প্রকাশ করেছেন···মহাকর্ষের বিপরীত শক্তিটার প্রকাশ হচ্ছে···এনরিকো ফার্মিও এই ভুল করেছিলেন···তলিয়ে ভাবতে গেলে একটা ভুয়ো ভিত্তির ওপরে···

৮।···কোয়ড্রেসারের···ইলেক্ট্রন প্রবাহের কথা আমার মনে এল···ম্যাট্রিক্স এর ইকোয়েশন থেকে পাওয়া গেল···

৯। ···এই (থিটা) হচ্ছে ডাইমেনশন বিহীন। কাজেই উত্তরে···

১০।···স্বতঃসিদ্ধ। নিউক্লীয়াসের চুম্বকশক্তি···প্রোটন-নিউট্রনের মধ্যে মেসনের আদান-প্রদানের যে···হয়ে দাঁড়ায় না কি? কোন···

১১। চেরেনকভ রশ্মি আলোকতরংগের গতিবেগ অতিক্রম··· তির্যক ভাবে চলে যায়। নীহারিকা···

১২। পাতঞ্জলের সংগে কেমন মিলে যায়···হঠযোগীর শরীরে এই ফীল্ড এর প্রতিক্রিয়া···আসন···

১৩। ···অ্যান্টিগ্রাভিটি যন্ত্রের পরিকল্পনা-করে ফেললাম।

১৪। এই বিরাট স্রোত বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত···প্রাইমারী পার্টিকল্ ও তাদের মধ্যেকার···গ্রাভিটেশন পোটেনশিয়াল···

১৫। ···সানস্পটের স্থান পরিবর্তন ও তাহলে এই ভাবে··· এই সরল ব্যাখ্যা কেউ কোনোদিন ভেবে···আসবে না? আমি পরীক্ষা সুরু···

১৬। কনট্রোল সার্কিটে যোগ করা হল এক···ছোটো একটা ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমার···একটা থার্মিষ্টরও সংযোগ করলাম···

১৮। ঠিক মনোমত···পরীক্ষা করার সুযোগ···আজ আর হয়ে উঠল না। কাল···

হতাশ হয়ে শংকর প্রশ্ন করে আর কিছুই কি নেই?

ম্লান হেসে কৃষ্ণস্বামী বললেন—না। এমন কি আমরা স্থির করে উঠতে পারি নি যে এগুলো একই সময়ের লেখা কি না। হাতের লেখা যে হবিবুল্লারই তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কাগজের টুকরোগুলো প্রায় একই ধরণের অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ একই নোটবই থেকে ছেঁড়া। তারিখ কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে গত তিন মাসের মধ্যেই এগুলো লেখা হয়েছিল।

প্রফেসর শিকদার গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করেন, ডায়েরীর পাতা এভাবে নষ্ট করার উদ্দেশ্য কী?

প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী জবাব দেন, কী করে জানব? হয়তো হবিবুল্লা ইচ্ছা করেই ডায়েরীর পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছিল। ধরে নিন, সন্দেহ হয়েছিল তার যে তার মেশিনের নকল করা সম্ভব এবং কেউ হয়তো সে ষড়যন্ত্র করছে।

রান্নাঘরে আগুন ধরাবার জন্ত হবিবুল্লার পাচিকা সংগ্রহ করতো ছেঁড়া কাগজের টুকরো। তার মধ্যেই এগুলো পাওয়া গিয়েছিল।

শিকদার বলেন, তা নাও হতে পারে হয়তো হবিবুল্লার হঠাৎ জ্ঞানোদয় হয়েছিল যে তার সমস্ত ধারণাই ভুল, অ্যান্টিগ্রাভিটি এ ভাবে সম্ভব নয়।

ভেবে দেখুন, কাগজপত্র নষ্ট করার এর চেয়ে সংগত কারণ আর কী থাকতে পারে?

কৃষ্ণমূর্তি বলেন, তাও হতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার আন্দাজ যেমন একটা আছে আমারও তেমনি একটা আছে। কী করে বলব কার আন্দাজ সত্য, কোন কারণটা সংগত?

তারপর আলোচনা উঠল ইকোয়েশন আর অংকগুলো নিয়ে। এ সম্বন্ধেও দেখা গেল সকলে একমত হতে পারলেন না। কোনো জায়গায় ইকোয়েশনের গোড়াও নেই, শেষও নেই। কতকগুলো অবশ্য কম্পিউটার সংক্রান্ত আর কতকগুলো হয়তো বা রিলেটিভিটির ইকোয়েশন। কতকগুলো চিরকুটে কেবল সংখ্যা লেখা মনে হয় কোনো একটা পরীক্ষার ফলাফল নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর অন্তর টুকে রাখা হয়েছে। নক্সাগুলোও প্রায়ই সবই কম্পিউটারের অংশবিশেষের।

সে রাত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে প্রথম সপ্তাহে সকলে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রগুলো আর লাইব্রেরীর বইগুলোর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণেই কাটাবেন।

প্রফেসার গোপালাচারী আর সুমিত্রা কাজের একটা তালিকা তৈরী করে সকলের মধ্যে বিলিব্যবস্থা করবার কতকগুলো প্রস্তাব করলেন। রাও আর শংকরের ওপর ভার পড়ল কম্পিউটারের তত্ত্বাবধান করার। স্বামীজি আর আলিমচান্দানী দরকার হলে ওদের সাহায্য করবেন। অমল বন্দো আর আলিমচান্দানীকে মোতায়েন করা হল কতকগুলো সূক্ষ্ম মাপের যন্ত্রের অনুশীলন করতে। বাকী সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলোর পরীক্ষার দায়িত্ব রইল দত্তগুপ্ত আর সুব্রাহ্মনিয়নের ওপরে। বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করবেন প্রফেসার শিকদার, আর মিঃ জন। স্বামীজি, কাউল আর সুমিত্রা লাইব্রেরী ঘরের সমস্ত কাজের ভার নেবেন।

একমাত্র প্রফেসর গোপালাচারীর ওপরেই কোনো বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হল না। সভাপতি হিসাবে তিনি সকলের খবরাখবর নেবেন, প্রত্যেকের অনুশীলনের ধারার একটা হিসেব রাখবেন। কোনো স্থান থেকে আশাজনক কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেলে সমগ্র, সম্মিলিত শক্তি কাজে লাগানো হবে সেই সূত্রের অন্বেষণে।

এ ব্যবস্থা মনঃপূত হোলো সকলেরই একমাত্র শিকদার ছাড়া। প্রফেসার শিকদার এব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে চান, যদি অন্ত কেউ তাঁর সংগে যোগ দিতে চান তাতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি যথেচ্ছ ল্যাবরেটরীতে

ঘুরে বেড়াতে চান, একটা বিশেষ কাজের মধ্যে তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখাটা তিনি অন্যায় বলে মনে করেন।

প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী, শংকর আর দলের অন্য অনেকেই শিকদারকে বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করেন যে কারো গতিবিধি সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা এটা নয় যে কোনো সময়ে যে কোনো কর্মী যে কোন যন্ত্র স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করবেন। ল্যাবরেটরীর যন্ত্রগুলোকে ভাল করে নেওয়া হচ্ছে কেবল অনুশীলনের সুবিধার জন্য, কারণ সময় সংক্ষেপ। কিন্তু প্রফেসর শিকদারকে তাঁর দৃঢ় মতামত থেকে এতটুকু সরানো গেল না। শেষ পর্যন্ত শিকদারের বদলে স্বামীজিকে দেওয়া হল বড়ো যন্ত্রপাতির ভার, শিকদার রইলেন স্বাধীন গবেষক হয়ে। এই ভাবে কোনো রকমে করা গেল তখনকার মতো সমস্যার সমাধান।

এ ছাড়া শংকরের একটা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল যে একদিন অন্তর সন্ধ্যায় সেমিনার বা আলোচনা সভা বসবে আর সেখানে সকলেই আলোচনা করবেন হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যেকের ধারণা বা আইডিয়া নিয়ে। দরকার হলে অথবা কারো মনে কোনো পরিকল্পনার উদ্ভব হলে কয়েক ঘণ্টার নোটিশেই অতিরিক্ত বৈঠক ডাকা হবে।

• • • •

নৈশ বৈঠকের শেষে বারান্দায় কতকগুলো আরামকেদারা যোগাড় করে আড্ডা চলছিল—আমাদের 'প্রজেক্ট-এ'র কর্মীদের। তার মধ্যে কোন এক ফাঁকে কালেশ্বর রাও শংকরকে ডাকল, চলো রায়, একটু বেড়িয়ে আসা যাক বাইরে থেকে।

পূর্ণিমার দু-তিন দিন বাকী। অসম্পূর্ণ চাঁদের আলোয় পথ দেখা যায়—কিন্তু দূরের আবছায়া দৃশ্যপটে লেগে থাকে স্বপ্নরাজ্যের মায়া। ব্যারাকের পেছনে একটা বড়ো ময়দান—ওপারে আবার ব্যারাকের সারি—অনেকগুলো জানালা আলোকিত। হিম পড়তে সুরু করেছে—ঘাসের আগায় শিশিরের চিকিমিকি।

• • • •

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পথ চলার পর রাও বলে, রায়, তোমার সংগে এখনো 'প্রজেক্ট' সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হয়নি। সত্যি করে বলো তো, কী মনে হয় তোমার এই ভুতুড়ে ব্যাপার সম্পর্কে?

শংকর একটা সিগারেট ধরিয়ে হেসে বলে, ঠিকই বলেছ রাও, এ ব্যাপারের সবটাই ভুতুড়ে। কখনো কখনো মনে হয় যেন একটা কিসের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু অনুসন্ধান করতে গেলে সবই আবার মরীচিকার মতোই মিলিয়ে যায়।

রাও বলে, কী জানি, আমি তো কোনো ইংগিতই পাচ্ছি না। বিজ্ঞান-সমর্থিত পন্থায় যদি হবিবুল্লা সব পথটাই চলত, তাহোলে না হয় যে কোনো সূত্র একটা ধরে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু ডাকিনীতন্ত্র, পাতঞ্জল, 'লেভিটেশন' আর পরলোক-কী-বাক্তের জটিল জগাখিচুড়ির মধ্যে রাস্তা বের করি কী করে?

শংকর বলে, আমার মনেও তো ঘুরছে ওই প্রশ্ন, দিন-রাত। হবিবুল্লার জীবনে, তার দর্শনে, তার ভাবধারায় খাঁটি বিজ্ঞান ও আমরা যাকে বলি কুসংস্কার—এ দুয়ের এমন অদ্ভুত সংযোগ কেন? আমার ধারণা কি জানো? এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে রয়েছে অ্যান্টিগ্র্যাভিটির মূল কথা। সুতরাং এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করার প্রয়োজন সবচেয়ে আগে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিনারা মিলছে না।

রাও বলে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ, রায়? অনেক বৈজ্ঞানিকেরই বিজ্ঞান ছাড়াও একটা করে বাতিক থাকে। যেমন গণিতের অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদন করেন বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চায়। বাখ-এর কনট্রাপুন্টাল ছন্দে তাঁরা খুঁজে পান বড় বড় গণিতের সমস্যার ছন্দোবদ্ধ সমাধান। ষ্ট্রভিনস্কী বা বেলা বার্টকের বেসুরো সাররিয়ালিষ্ট রচনার মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেন আনসার্টেনটি প্রিন্সিপল্-এর অমিত্রাক্ষর ছন্দ। হবিবুল্লার ক্ষেত্রেও অকাল্ট হঠযোগ বা প্রেতিনীতত্ত্বের চর্চা একটি বাতিকের মতোই দাঁড়িয়েছিল। হয়তো বা মূল আবিষ্কারের সংগে এ গুলোর সম্পর্ক একেবারেই গৌণ!

শংকর এবার তর্ক সুরু করে, রাও, আমি একথা বলছি না যে তোমার অনুমান সত্য নয়। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো? আমাদের বৈজ্ঞানিক মহলে একটা আকাশস্পর্শী আত্মম্ভরিতা কিছুকাল ধরে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির অনেক লীলা আজ আমরা থিয়োরি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি, তাই আত্মপ্রসাদেরও আর সীমা নেই আমাদের। ভেবে দেখলে, আমাদের আত্মবিশ্বাসটা এমন কিছু অসংগতও নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যে থিয়োরিগুলো অনেক পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি, সেগুলো দিয়ে একশোটার মধ্যে কমপক্ষে নিরানব্বইটি ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যে ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হোলো না—হয়তো বা একশোটার মধ্যে একটা এ রকম ঘটনা পাওয়া যায়—সেটাকে আমরা মনের দরজার বাইরে থেকেই বিদায় করবার চেষ্টা করি—কারো মতিভ্রংশ হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে।

তার পর হয়তো দেখা গেল, আমাদের চেয়েও বড়ো দরের কোনো তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিজ্ঞান-সাধক এইরকম দু-একটা ঘটনার মীমাংসা করে দিলেন আমাদেরই জানা বিজ্ঞানের মূলসূত্র থেকে। তখন আর আমাদের পায় কে!

হবিবুল্লার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা থেকে একটা থেকে একটা কথা আমার মনে লেগেছে। আমাদের অনেক ব্যাখ্যাই কি কাকতালীয় ন্যায়ের মতো নয়?

ভেবে দেখো রাও, মাত্র ষাট সত্তর বছর আগেও পদার্থবিজ্ঞানী আর রাসায়নিকদের কী আত্মপ্রসাদই না ছিল! পিরিয়ডিক টেবল এর সমস্ত মৌলিক পদার্থের স্বরূপ তাঁরা জানতেন। সে টেবল-এর মধ্যে যে ফাঁকগুলো ছিল সে সম্বন্ধেও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, যে যদি কোনো নূতন মৌলিক পদার্থ মেলে ওই ফাঁক ভরাবার জন্য তবে সে সমস্ত এলিমেণ্ট-এর থাকবে এই গুণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে এতো, আর তার কম্পাউণ্ডগুলোও হবে এই রকমের। দেখা যেতো তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। সেদিনের বৈজ্ঞানিকেরা তাই মনে করতেন যে পদার্থের স্বরূপ গ্রাভিটির স্বরূপ বিদ্যুতের স্বরূপ বা চুম্বকের স্বরূপ সম্বন্ধে আবিষ্কার করার মতো তথ্য প্রায় সব নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কেবলমাত্র মাপজোপের কয়েকটি সূক্ষ্মতর যন্ত্র তৈরী করা ছাড়া আর করবার মতো কিছুই নেই।

এঁদের এ আত্মবিশ্বাসের গর্ব কিন্তু মিলিয়ে গেল মাত্র কয়েক

মধ্যের মধ্যে। ইলেকট্রন বিদ্যুৎকণার আবিষ্কার হোলো। এলো ক্রুকস রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি। কুরী-দম্পতি প্রাণহীন পাথরের মধ্যে থেকে বের করে আনলেন অতি তেজস্ক্রিয় মৌলিকপদার্থের সমষ্টি। পদার্থের ক্ষয় নেই এত বড়ো ভিত্তিটা চোখের নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। গেলো ক্লাসিক্যাল মেকানিকস আর নিউটনের ইথার।

থিয়োরির ভগ্নস্তূপের মধ্যে নতুন করে আবার গড়ার কাজ শুরু হল প্রায় উনিশ শো সাল থেকেই। পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হোলো অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন নামে এক ভুঁইফোঁড় পেটেন্ট অফিসের কেরাণীর রিলেটিভিটি সম্পর্কে এক অবিশ্বাস্য প্রবন্ধ। আইনষ্টাইন বললেন—জগতে সবই মায়া সবই আপেক্ষিক; বস্তু আর শক্তি একই জিনিসের ভিন্নরূপ একমাত্র শাশ্বত হচ্ছে মহাশূন্যে আলোকতরংগের অপরিবর্তন গতিবেগ। তুমি যতো বেগে চলো না কেন, আলোকতরংগের আপেক্ষিক গতিবেগের তারতম্য হবে না সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের অংক থেকে।

তারপর উনিশো আট সালে বোহর রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেল জগত সমক্ষে তুলে ধরলেন তার ক্রমবিবর্তন হোলো শ্রোডিংগারের ইকোয়েশনে—যে কোনো চলমান পদার্থের কল্পনা করা যায় তরংগরূপে। এলো হাইসেনবার্গের আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপ্‌ল্‌ যাতে বলা হোলো যে কোনো চলমান কণার প্রকৃত রূপ, অবস্থান আর গতিবেগ এক সংগে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় না।

আজ আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি ভেবে দেখেছ রাও? 'প্রাইমারী পার্টিক্‌ল্‌' পরমাণুকণার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কালকে শুনেছি তা ছিল চব্বিশ আজকে শুনি বত্রিশ। আবার একটা 'পিরিয়ডিক্‌টেবল' আমাদের গড়ে তুলতে হবে (একটা চেষ্টাও চলেছে এসম্বন্ধে—দ্রষ্টব্য J. W. Grebe. "A Period Table for Primary Particles"—Annals of New York Academy of Sciences. 1958) সেগুলোকে সংঘবদ্ধ বা তালিকাবদ্ধ করতে। আর তোমার সেই অ্যাটমের মডেল আজ কোথায় গেল? আজ পরমাণুর মধ্যে ঢুকেছে 'আনসার্টেন্টি', 'ইন্‌ডিটারমিনেসি', 'রিলেটিভিটি' আর 'ফোর্থ ডাইমেনশন'। কেমন করে সে পরমাণুকে চর্মচক্ষুর সামনে তুলে ধরবে? তার গুণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রূপই গেছে হারিয়ে।

মাঝখানের এ ডামাডোলের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত 'প্যারিটি' বা সমতার নিয়ম গেছে হারিয়ে। টাউ মেসন আর 'থিটা মেসন' একই রকমের পার্টিক্‌ল্‌—কোনো তফাত নেই তাদের ব্যবহারে। কিন্তু একটা থেকে ভেঙে দুটো কণা বেরিয়ে আসছে আর একটা থেকে তিনটে।

কে জানে, ভবিষ্যতের কোনো আইনষ্টাইন আমাদের দেখাবেন কিনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর একটা নূতনতর রূপ? বলবেন—সব ঝুটা হায়—

রাও অসহিষ্ণু হয়ে শংকরের বক্তৃতার তোড়ে বাধা দিয়ে বলে, থামো রায়, মেনে নিচ্ছি তোমার সব কথা। মেনে নিচ্ছি যে আমরা অনেক ভুলই করেছি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথটা সরল অথবা সুগম কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেই ভুলগুলোর

সংশোধন করেই না আজ বিজ্ঞানের কাঠামোগুলো শক্ত করে দাঁড় করানো গেছে। তুমি কি বলতে চাও, যে আজকের যে বহুপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য, ইস্পাত কঠিন ভিত্তিগুলোর ওপরে আধুনিক থিয়োরির বনিয়াদ গড়ে উঠেছে—'থার্মোডাইনামিক্স্', 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল্ মেকানিক্স্', 'প্রিন্সিপল্ অফ রিলেটিভিটি', 'আনসার্টেন্‌টি প্রিন্সিপল্' বা 'কোয়াণ্টাম্ থিয়োরি'—এগুলো একেবারেই পল্‌কা? না, স্যার, আমাদের বহু বর্ষের অনুশীলনে দেখা গেছে—জগত সম্বন্ধে মানুষের যা অভিজ্ঞতা—'ফিজিক্যাল রিয়ালিটি,' বলতে আমরা যা বুঝি তার আর সব কিছুই এ ভিত্তিগুলোর ওপরে দাঁড় করানো চলে। শুধু তাই নয়, অনাগতকালের আবিষ্কার সম্বন্ধে নিখুঁত ভবিষ্যবাণী করা চলে আজকের থিয়োরি থেকে। সন্দেহের অবকাশ কোথায়, স্যার?

শংকর বলে, তোমার এ যুক্তি কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়েছি এতদিন। কিন্তু আজকের সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে হবিবুল্লার যন্ত্রটা। ভেবে দেখেছ কি, তোমার 'জেনারাল রিলেটিভিটি থিয়োরি'র কী অবস্থা দাঁড়ায় আজ হবিবুল্লার আবিষ্কারের পটভূমিকায়?

না রাও, যদি আমাদের এ সমস্যার সমাধান করতেই হয়, তবে আবার নতুন করে সুরু করতে হবে—দরকার হলে শ্লেটের সব লেখা মুছে ফেলে।

রাও, জড়পদার্থের কোনো বিজ্ঞান নেই—তার না আছে 'ফিজিক্স', না আছে 'কেমিষ্ট্রি'। তার শুধু আছে গুণ—সে গুণের কতকাংশ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর একটা অজানা অংশ তার বাইরে। মানুষের তৈরী সূক্ষ্মতম যন্ত্রে ধরা পড়ে ইন্দ্রিয়াতীত দু-একটা গুণ। 'ফিজিক্স' কেমিষ্ট্রি, ম্যাথেমেটিক্স এ সবই তো মানুষের মনগড়া। প্রকৃতির কাছে গ্রাম নেই, 'কিলোভোল্ট' নেই, 'আংষ্ট্রম' নেই এমন কি 'কোয়াণ্টাম্' পর্যন্ত নেই। এ সব মাপকাঠি তো মানুষেরই তৈরী।

শুধু বিজ্ঞান কেন, ধরো না দর্শন ধর্মশাস্ত্রের কথা। ভগবানের সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারার কী রকম বদল হয় যুগ থেকে যুগে··· দেশ থেকে দেশান্তরে। ভগবান হচ্ছেন বিরাট এক 'এক্স'। অফুরন্ত 'ইকোয়েশন' গড়ে তোলা যায় 'এক্স' দিয়ে। যে সব 'ইকোয়েশন' সরল করে আনলেও শেষ পর্যন্ত 'এক্স' থেকেই যাবে। 'এক্স' যদি মেনে নাও, তা যে কোনো ইকোয়েশনে ইহকাল—পরকালের কাজ চলে যাবে। নিরাকার 'ইন্ডিটারমিনেট নির্ণয়াতীত সংখ্যা বলে যদি 'এক্স'কে ধারণা করতে পারো তা ভালো কথা। তা যদি না পারো আকার অথবা 'এক্স'-এর বদলে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বসিয়ে নিলেও চলবে। পদার্থের বেলায়ও তাই আর তোমার চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, পরমাণুশক্তি আর মহাকর্ষের বেলাও তাই।

ব্যারাকের বারান্দায় থেকে খালাবাসির বাজার শব্দ আসছে। দূরের ব্যারাকটার আলোগুলো একে একে নিবে যাচ্ছে। সহসা উত্তাপাত হল। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রাও বললে—

তাই, কথাগুলো ঠিক এরকম ভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি। তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা বিজ্ঞানসাধকের দল কতটা রক্ষণশীল। বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা বিপ্লব ঢুকতে দিই না। নিতান্ত অকেজো না হলে পুরোনো থিয়োরিগুলো বর্জন করতে আমাদের বড়ো আপত্তি। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে ভদ্রসমাজে জরাজীর্ণ থিয়োরিগুলোকে চালু রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করি যতোদিন এ ভাবে চালানো যায়। হয়তো বা কিছু গলদ রয়ে গেছে আমাদের অনেক মতবাদের মূলে, তাই বোধ হয় তালিটা প্রায় রোজই লাগাতে হচ্ছে।

কে জানে, অ্যান্টিগ্রাভিটির বিকাশ হয়তো হচ্ছে আমাদের সকলের সামনেই। আমাদের সংস্কারের ঠুলিপরা চোখে সেটা ধরা পড়ছে না। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও রয়েছে নিউটনের আগে অথবা পরে—আবহমান কাল ধরে। কিন্তু সেটার প্রকৃত স্বরূপটা ধরা পড়ে গিয়েছিল একমাত্র নিউটনেরই চোখে। হবিবুল্লার চোখেও এমনি করে হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিল তার বিপরীত নিয়মটা।

চলো, রাত হয়ে গেল—এবার আস্তানায় ফিরে যাওয়া যাক। ঠাণ্ডাও পড়তে সুরু করেছে বেশ। [ক্রমশঃ।

সবুজ সাধ

সোনালী দত্ত

সবুজ রঙের ভালবাসা আর নীল আকাশের আলো;
কান্না-হাসি খচিত বিচিত্র জীবনপাত্রে ঢালো।
উচ্ছল ফেনিল ধারা ঝর্ঝরে ঝরুক তার কিনারে কিনারে,
আকাশ মাটির জয় বিঘোষিত হ'ক নিখিল প্রাণের
আকাশ-ছোঁওয়া মিনারে।
আমি যুগ-যুগ সঞ্চিত আকুল তৃষায় উদ্বেলিত হয়ে,
বিকম্পিত ব্যগ্র বাহু বাড়ায়ে সে পানপাত্র দৃঢ় মুষ্টিতে লয়ে
নিঃশেষে পান করব। আর বলব, 'ঢালো, আরও আরও ঢালো,
সবুজ রঙের ভালোবাসা আর নীল আকাশের আলো।'
কূজন-গুঞ্জিত বন-মর্ম্মরে বিভ্রম নামবে আঁখি-তারায়,
পুষ্পধনুর সুতীক্ষ্ণ শরে অন্তর অস্থির হবে উদ্বেল কামনার কারায়
প্রতি অঙ্গে অনুরণিত হবে অতৃপ্ত তৃপ্তির বাণী—
"আমায় তোমার পানে তুলে ধর
তৃপ্ত কর, পূর্ণ কর, হে প্রিয়তম সার্থক কর।"
আমি আমার পথ ভুলে তোমার পথে চলব,
শত সাহারার সুতীব্র পিপাসায় আমি জীবনপাত্র মেলে ধরে বলব—
"ঢালো আরও, আরও—আরও ঢালো
সবুজ রঙের ভালোবাসা আর নীল আকাশের আলো।"

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল'
বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
লাবণ্যময়ী হয়···! সুবাস ভরা রেক্সোনার
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১০

কপাল সত্যিই মন্দ নয় গণুদার।

সেদিনের মত মেজাজ বিগড়লেও অমিত ঘোষ তার আবেদন ভোলেনি। নিজের টেবিলে বসে ধীরাপদর সামনেই যথাস্থানে টেলিফোন করেছে একদিন। সুপারিশের ছলে অভিযোগ, যোগ্য লোক বছরের পর বছর ধরে হেজে-পচে মরছে, সেদিকে চোখ নেই কর্তাদের। গণেশ বাবু প্রুফ-রিডারকে সাব-এডিটার আর কবে করা হবে?

গণুদার প্রত্যাশা মিথ্যে নয়, ওটুকুতেই কাজ হয়েছে। মহৎজন তাকালেও ক্ষুদ্রজনের কপাল ফেরে। গণুদার ফিরেছে। গণুদা সাব-এডিটার হয়েছে। সেটা এত তাড়াতাড়ি যে বিস্ময়ে আর আনন্দে গণুদা নিজেই আত্মহারা।

পরিতোষণ গুণ একটা আর্ট বিশেষ। তোষামোদ যে করে আর যে তাতে তুষ্ট হয়, দুজনের মনের তারে মিল হওয়া চাই। অমিলটা জলের ওপর তেলের মত চোখে লাগে। গণুদা সেই মিল বোঝে না, মেলানোর আর্ট জানে না। তার চোখ কান-কাটা বাৎসল্যের টানটা ধীরাপদর-গলায় ফাঁসের মত আটকে বসার দাখিল। তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুই-এক পশলা বচসা হয়ে গেছে তাও জানে। বিস্তৃত ভাবে না জানলেও আঁচ পেয়েছে। উমা বুঝতে শিখছে একটু-আধটু, আর ধীরু-কা'র ওপর তার এমনই টান যে, যেটুকু বোঝে গোপনে ফাঁস না করে পারে না। অবশ্য তার বলাটা বাপের দিক টেনেই—বাবা চায় ধীরুকা'র আগের মতই তাদের ওখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উমাও তাই চায়। উমা আর তার বাবার মত মা-যে ধীরুকা'কে অত ভালোবাসে না, মায়ের রাগ আর অবুঝপণা দেখে উমা এই গোপন সত্যটাও প্রকাশ না করে পারেনি।

মনে মনে গণুদার ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে ধীরাপদ। সোনাবউদির ওপর খুশি হওয়ার কথা, তাও হয়েছে। কিন্তু অভিমানে মনে মনে ক্ষুব্ধও হয়েছে একটু। বাইরে চিড় খেলেও আর একটা অদৃশ্য যোগ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এটুকুর প্রতিই ধীরাপদর লোভ। কিন্তু সম্প্রতি সোনাবউদি সেটুকুই ছেঁটে দিয়েছে একেবারে। তার নির্বাক আচরণ প্রায় রূঢ়। মেয়েটা পর্যন্ত এসে দু' দণ্ড বসতে পায় না, আসতে না আসতে ঝাঁঝালো ডাক শুনে বা কঠিন ভ্রূকুটির তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়।

পরিতোষণ-কলার ব্যাপারে গণুদার যোগ্য দোসর রমণী পণ্ডিত। তাঁকে ঠেকানো শক্ত। পাহাড়ী জলের ধারার মত বার বার ঠোক্কর খেয়েও তিনি বক্তব্য-কেন্দ্রে এসে পৌঁছুবেনই। কুমুর সেই শাস্তির ব্যাপারের পর থেকেই তাঁকে এড়িয়ে চলছিল ধীরাপদ। তাঁকে কুমুকে দুজনকেই। কিন্তু রমণী পণ্ডিত না-ছোড়। গণুদার পদোন্নতিতে তাঁর কৃতিত্ব কম নয় কারো থেকে। গণুদার হবে যে, সে ঘোষণা তিনিই করেছিলেন—করেছিলেন বলেই যা-কিছু চেষ্টা-চরিত্র। নইলে হাত-পা গুটিয়ে বসেই থাকত হয়ত। অবশ্য গণুদা যে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ সে-জন্যে, সেটা রমণী পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। গণুদার খুব ইচ্ছে, তাঁদের দুজনকে বাড়িতে একদিন ভালো করে খাওয়ায়—তাঁকে আর ধীরাপদকে। কিন্তু তার স্ত্রীটি একেবারে বেঁকে বসেছে বলে ভদ্রলোক দুঃখ করছিল সেদিন, একটা বড় রেস্তরাঁয় তাঁদের নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে বলছিল।

ধীরাপদর মনোভাব উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন রমণী পণ্ডিত, উচ্চস্তরের মন্তব্য করেছেন তারপর, কি দরকার এ-সবের, কোনো প্রত্যাশা নিয়ে তো কেউ আর উপকার করতে যায়নি, ভালো হয়েছে সেই ভালো। পণ্ডিতের কালো মুখে অন্তরঙ্গ হাসি, কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি হঠাৎ অমন বেঁকে বসলেন কেন সেটাই আশ্চর্য—আমি না-হয় বলতে গেলে বাইরের লোক, আপনি তো আর সেরকম নন, কারো উপকার ছাড়া অপকারও কোনদিন করেননি।

ধীরাপদ সবিনয়ে তাঁকে উঠতে বলবে কি না ভাবছিল। রমণী পণ্ডিত তাও অনুমান করলেন কিনা কে জানে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন চট করে, ভদ্রলোক দুঃখ করছিল বলেই বলা, নইলে এ-সব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়। ঘুরে ফিরে নিজের দুরবস্থার প্রসঙ্গে এসে গেলেন তিনি, ধীরাপদর অনুগ্রহে বইয়ের বিজ্ঞাপন আর কবিরাজী ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে সামান্য কিছু পাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে কি আর হয়—এর ওপর মেয়েটা বড় হয়ে গেল, তার বিয়ের ভাবনা। একটা ঘর নিয়ে বসতে পারলে সব দিকে সুরাহা হয়, নইলে তো দুবেলা আহার জোটানই শক্ত, কোন্ দিকে আর তাকাবেন।

পণ্ডিত উঠে যাবার পর ধীরাপদ নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ। ব্যাপার বড় মন্দ হল না। এই সুলতান কুঠিতে এক সোনাবউদি ছাড়া আর কেউ তাকে দেখতে পারত না। এখন সকলেই আপনজন তার। গণুদা চাকরিতে উন্নতি হয়েছে

বলে খুশি তার ওপর, রমণী পণ্ডিত বিজ্ঞাপনের কাজ পেয়ে। একাদশী শিকদার আর একখানা বাংলা কাগজ পেয়ে খুশি, আর শকুনি ভটচায চ্যবনপ্রাশ পেয়ে। মাঝখান থেকে আপন যে ছিল সেই শুধু দূরে সরে আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় সুলতান কুঠির আঙিনায় একটা পুরনো গাড়ি দাঁড়ানো দেখে ধীরাপদ অবাক। কার কাছে কে এলো আবার! জামা-কাপড় বদলে সুস্থ হয়ে বসার আগেই চমকে উঠতে হল। আগন্তুক একজন নয়, দু'জন—তারা পাশের ঘর থেকেই বেরুলো। একজন ডাক্তার, হাতে ষ্টেথসকোপ আর ডাক্তারী ব্যাগ। সঙ্গের লোকটির হাতে কি সরঞ্জাম দুই একটা, ধীরাপদ ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না। পিছনে গণুদা।

কার অসুখ? কি অসুখ? কিছুই জানে না।

ধীরাপদ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের বিদায় দিয়ে গণুদা সামনে এলো। মুখে সলজ্জ হাসির মত।

ডাক্তার কেন?

ইয়ে, একটা ইন্সিওরেন্স করলাম, অফিসের ওই ভদ্রলোক ধরল খুব, তাছাড়া পণ্ডিতমশাইও পরামর্শ দিলেন—

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধীরাপদ ঘরে চলে এলো। কিন্তু গণুদার ইন্সিওরেন্স বৃত্তান্ত শেষ হয় নি, তাছাড়া একটু গল্পসল্প করার ইচ্ছেও প্রবল বোধহয়। সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে না বড়। গণুদাও ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ইন্সিওরেন্স গণুদা একার নামে করেনি, স্বামীস্ত্রী দুজনের নামে করেছে। দশ হাজার টাকার। একজনের অবর্তমানে আর একজন পাবে। এই বয়সে প্রিমিয়াম একটু বেশিই হল, কিন্তু ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে না করেও পারল না। অনুমোদনের আশায় জিজ্ঞাসা করল, ভালো করিনি?

জয়েন্ট ইন্সিওরেন্স শুনে ধীরাপদ তাজ্জব, এ বুদ্ধি আবার গণুদাকে কে দিলে। বলল, ভালোই তো—।

বীমা-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গণুদা মিঃ ঘোষের কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করল, তার মহত্ত্বের কথা বলল। বিকেলে একদিন তাকে চায়ে ডাকা আর এক বাক্স নারকেলের সন্দেশ পাঠানোর অভিলাষও জানালো। ধীরাপদর কোনরকম আগ্রহ না দেখে নিজেও দ্বিধান্বিত একটু, অসন্তুষ্ট হবেন না কি?

হতে পারে। এ-সবের দরকার নেই।

থাক তাহলে এখন। গণুদার ভালো-মন্দের সে-ই যেন একমাত্র পরামর্শদাতা।

তাকে বসতে পর্যন্ত বলেনি ধীরাপদ, আপাতত ঘর থেকে বেরুলে খুশি হয়। কিন্তু গণুদার যাবার ইচ্ছে নেই। ওকে এ রকম অবকাশের মধ্যে পেয়ে সুপরিকল্পিত সদিচ্ছাটা চাড়িয়ে উঠতে লাগল। স্ত্রীকে দিয়ে হল না দেখে চিড় খাওয়া আত্মীয়তাটুকু এই ফাঁকে নিজেই জুড়তে বসল সে। বাকপটু নয় রমণী পণ্ডিতের মত, একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলতে গেলে মুখ লাল হয়, খেই হারায়।—ইয়ে, একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলাম, তোমার বউদিকে তো চেনই—নিজের দেওরের মতই দেখে তোমাকে, তুমি গরদ এনে দিয়েছ কত খুশি—কিন্তু ভয়ানক অবুঝ, একটু আধটু ভুল বোঝাবুঝি হলেও আবার কি মিলেমিশে থাকে না কেউ?

ধীরাপদর দৃষ্টিটা খরখরে হয়ে উঠছে গণুদা লক্ষ্য করল না। স্ত্রীর একরোখা অবাধ্যতার কারণে নিজের সহিষ্ণুতা বজায় রাখার চেষ্টা।—কিন্তু ভয়ানক জিদ, মেয়েছেলের এত জিদ—কথাটা কিছুতে আর তাকে দিয়ে—

কী কথা?

কণ্ঠস্বরটা কানে লাগল খট করে। গণুদা সচকিত। ঢোঁক গিলে তাকালো, এই বলছিলাম—আগের মতই আবার—

কেন বলছিলেন? সবটা শোনার ধৈর্য নেই ধীরাপদর।

গণুদা হকচকিয়ে গেল, মুখ শুকালো। তবু সামলাতে চেষ্টা করল কোনপ্রকারে, তোমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধের জন্যে···

আমার অসুবিধে তাতে আপনার কী? অস্বাভাবিক রূঢ়তায় গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল আরো, আপনারা ডাকলেই আমি যাব ভেবেছেন কেন? কেন আমার প্রসঙ্গে এসব আলোচনা হয় আপনাদের? কেন বাইরের লোকের সঙ্গে পর্যন্ত আপনি আমার ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন?

নিস্পলক মুহূর্ত গোটাকতক। বেত্রাহতের মত বিবর্ণ পাংশু মুখে গণুদার প্রস্থান।

ধীরাপদ বিছানায় এসে বসল। খানিক বাদে নিজের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নিজেই হতভম্ব। এ আবার কি কাণ্ড করে বসল। একটা তুচ্ছ কারণে, প্রায় অকারণেই—এভাবে নিজের ওপর নিজের দখল হারিয়ে বসল কি করে? কেন?

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে, দশ মিনিটও হতে পারে। অটুট গাম্ভীর্যে সোনাবউদিকে সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে দেখে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

দু'হাত কোমরে, কুঁদুলী মেয়ের মত সোনাবউদি ঝাঁঝিয়ে উঠল, আপনি মশাই আমার ঘরের লোককে এভাবে অপমান করেন কোন্ সাহসে শুনি?

ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। ওর নিজের যেমন অস্বাভাবিক ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল, এই গাম্ভীর্য আর এই কটুভাষণও বিসদৃশ লাগছে তেমনি। উষ্ণ হয়ে উঠতে গিয়েও কেমন মনে হল ঠকবে তাহলে। নির্লিপ্ত জবাব দিল, ঘরের লোককে এবার থেকে ঘরে আটকে রাখবেন তাহলে।

কী? আবার কথা টকটকিয়ে। আরো গরম হয়ে চোখ পাকালো সোনাবউদি, আপনি না হয় আছেনই ছ'শ টাকা মাইনের চাকুরে, আপনার দৌলতেই না-হয় হয়েছেই বড় একটা প্রমোশন, না-হয় এসেই ছিল আপনাকে একটু তোয়াজ-তোষামোদ করতে—তা বলে লোকটাকে আপনি ঘর থেকে অপমান করে তাড়াবেন?

পাকানো-চোখের দুই তারায় চাপা কৌতুক উপচে উঠতে লাগল, ভুরুর ঘন কুঞ্চন প্রয়াসে তরল রেখা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, আর রূঢ় গাম্ভীর্য চিরে চিরে হাসির বিজলি ঝলসে উঠতে লাগল। শেষে সমস্ত চাপা অভিব্যক্তিটা গোটাগুটিই ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। প্রতিরোধের চেষ্টায় বার দুই ফুলে ফুলে উঠে হাসির দমকে সোনাবউদি মেঝের ওপরেই লুটিয়ে বসে পড়ল।

বেদম হাসি।

ধীরাপদ দেখছে। দু'চোখ ভরে দেখছে। চোখের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আর গলার কাছে একটা অব্যক্ত অনুভূতি তরল হয়ে ঠেলে

আনতে চাইছে তার। খুশিতে আনন্দে ধীরাপদ বিব্রত বোধ করছে।

হাসির ধকল সামলে স্থির হয়ে বসতে চেষ্টা করল সোনাবউদি। কি একটা গ্লানি ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার যেন। বলল, দু' ঘণ্টাও হয়নি দশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওর করে উঠল, মনে কত আনন্দ—আপনি দিলেন সব পণ্ড করে। যাকে বলছে আনন্দের কারণটা তার কাছে স্পষ্ট নয় মনে করে থামল না সোনাবউদি।—আমি আর যে সে লোক নই, কোন রকমে একবারটি মরতে পারলেই কড়কড়ে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি!

জীবন-বীমার এই খুপ্ত ধারাটিই গণুদা বেছে নিল কেন সেটা ধীরাপদর মাথায় ঢোকেনি তখনো। ওতে কিস্তির হার বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত ওটাই ভালো বলে বুঝিয়েছে কেউ তাকে। হতেও পারে ভালো, ধীরাপদর বীমার ব্যাপার জানা নেই। সোনাবউদির কৃত্রিম দম্ভের জবাবে সেও ঠাট্টাই করল।—আমি তো দেখছি আনন্দের বদলে ভদ্রলোকের কপালে দুঃখ আছে, আপনার ওই মরাটুকু হয়ে না উঠলেই তো সব গেল।

মরা হবে না বলেন কি! দু'চোখ টান করে ফেলল সোনাবউদি, তারপরেই হেসে অস্থির আবার।—ইন্সিওর করার তাগিদ অবশ্য আমিই দিয়েছিলাম, কিন্তু ডবল ইন্সিওর হল কেন তাও বুঝছেন না? দুজনের কুষ্ঠি ঘাঁটাঘাঁটি করে গণৎঠাকুরটি তো কবেই ভরসা দিয়ে রেখেছেন, দজ্জাল বউ বেশি দিন জ্বালাবে না, অনেক আগেই চোখ বুজবে! চোখ বোজার আনন্দে আবারও চোখ বড় করে ফেলল সোনাবউদি, দজ্জাল হই আর যাই হই, গেলে দুঃখ কম হবে ভাবেন নাকি, ওই দশ হাজার টাকার স্মৃতিটুকুই যা সান্ত্বনা তখন। আনন্দে আমার এক্ষুনি মরতে ইচ্ছে করছে।

ধীরাপদ হাঁ করে শুনছিল প্রথম। তারপর হেসে ফেলেছিল। কিন্তু হাসিটা থাকেনি বেশিক্ষণ। কেন জানি মনে হয়েছে, হাতে ক্ষমতা থাকলে জীবন-বীমার এই খুপ্ত ধারাটা সে নাকচ করে দিত। যুক্তি থাক আর নাই থাক, মৃত্যুকে মাঝে রেখে এই বণিকের সাবধানতা ধীরাপদর ভালো লাগল না।

সোনাবউদি প্রসঙ্গ ঘোরালো, ঘরে গিয়ে মুখ কালো করে শুয়ে পড়ল একেবারে, কি বলেছেন?

ধীরাপদ যথার্থই লজ্জা পেল এবারে, যা বলেছে নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য।

সোনাবউদি দেখল একটু, তারপর টিপ্পনী কাটল, আপনার আবার এত তেজ হল কবে থেকে?

এবারে জবাব দিল, বলল, যেদিন থেকে আপনি দুর্ব্যবহার শুরু করেছেন আমার সঙ্গে।

আমি! কি দুর্ব্যবহার? জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে ছদ্ম-প্রত্যাশায় ফিসফিসিয়ে উঠল, কেমন ব্যবহার করতে হবে?

চেষ্টা করে আহত সুরটাই বজায় রাখল ধীরাপদ, বেশ জোর দিয়েই বলল, গণুদার চাকরির উন্নতিটা তাঁর নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে, আমি কিছুই করিনি। আমার ওপর রাগ কেন আপনার··· কিছু যদি করতামও সেটা অনুগ্রহ ভাবতেন আপনি?

সোনাবউদি মুখের দিকে চেয়েছিল। চেয়েই রইল খানিক। এই চাউনিটুকু দিয়েই তার অভিযোগ মুছে দিল যেন। তারপর হাসল একটু, কি ভাবব?

ধীরাপদ জবাব দিল না। জবাবের প্রত্যাশাও করল না। সোনাবউদি হঠাৎ নিজের ভিতরেই তলিয়ে গেল যেন। খানিক আগের চপলতা নিশ্চিহ্ন। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, অন্যমনস্কের মত বলল, রাগ ঠিক নয়, কি জানি কি ভয় একটা।···অনেক লোভে শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষতি, বোধ হয় সেই ভয়। এবারে বড় করেই নিঃশ্বাস ফেলল, এত রাতে আপনি আর বাইরে খেতে বেরুবেন না, বসে থাকুন।

ধীরাপদ বসেই রইল।

···খুব হলে বলত বোধহয়, তোমার সব ভয় ভাবনা এবার থেকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দাও সোনাবউদি। ধীরাপদরও ইচ্ছে করছিল তাই বলতে।

বলতে যে পারবে না তাও জানে।

মাসের প্রথম শনিবার। মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের মাইনের দিন। বেলা চারটে নাগাদ পরিচিত স্টেশান ওয়াগনটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরে বাইরে তিন শিফটের বেতন-প্রত্যাশীরা অপেক্ষা করছিল। ম্যানেজার থেকে ঝাড়ুদার পর্যন্ত। এই একদিন গাড়িটা ছুটো-আড়াইটের মধ্যে এসে যায়। আজ আসছিল না বলে মনে মনে সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিল একটু। এবারে শনিবার পড়েছে মাসের ছয় তারিখে। দিনগুলোকে শনিবার পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে আসতে প্রাণান্ত। তারপর যদিই বা এলো, মাইনে হবে কি হবেনা সে-সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ ছিল। গাড়ি দেখে নিশ্চিন্ত তারা।

লাবণ্য সরকার নয়, টাকার ব্যাগ হাতে ধীরাপদ নামল স্টেশান ওয়াগন থেকে।

তাকে কেউ আশা করেনি বটে, কিন্তু দেখে অবাকও হল না খুব। হবার কথাও নয়। কারণ, লাবণ্য সরকারের অনুপস্থিতিতে আর কেউ টাকা নিয়ে আসবে সেটাই আশা করছিল তারা। মহিলাকে না দেখে সকলেই বুঝে নিল সে আজও ফেরেনি।

গত চারদিন আসেনি লাবণ্য সরকার, সে কলকাতায় নেই, তাও সকলেই জানে।

ক'মাসের মধ্যে মেডিক্যাল হোমে এই প্রথম পদার্পণ ধীরাপদর। ইচ্ছে করলে এক-আধ বার আসতে পারত। ইচ্ছে একেবারে হয়নি কখনো, তাও নয়। তাছাড়া ফাঁকমত এখানকার কাজ দেখাশুনা করাটাও চাকরির অঙ্গ। কিন্তু তেমন কোনো উপলক্ষ হয়নি বলেই আসেনি। তাকে নিয়ে এখানে যে প্রহসন ঘটে গেছে, তারপর অকারণে আসাটা চাকরির দাপট ভাববে সকলে। সেই সঙ্কোচে আসেনি। নইলে ম্যানেজার না হোক, রমেন হালদারের মুখখানি অন্তত একবার দেখার লোভ ছিল ধীরাপদর।

আজ যে আসবে নিজেও জানত না।

এই আসার পিছনে ক্যাণ্টীনে আজকের নীরব বৈচিত্র্যটুকু উপভোগ্য। কিন্তু বড় সাহেব হিমাংশু মিত্রর সামনে তেমন উপভোগ্য মনে হয়নি, তাঁর চাপা রাগ লক্ষ্য করে ধীরাপদ বরং হকচকিয়ে গিয়েছিল।

অস্তিত্ব নেই। তাই দেখে মুন্সেফ দ্বিতীয় পক্ষের সপক্ষে রায় দিয়ে দিলেন।

এখন ব্যাপারটি হয়েছে এই—ওখানে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল কিন্তু মুন্সেফ পরিদর্শন করবার আগেই দ্বিতীয় পক্ষ চণ্ডীমণ্ডপকে ভেঙে একেবারে সাফ করে দিয়েছে। তার কোন চিহ্নই রাখে নি।

প্রথম পক্ষও ছাড়বার পাত্র নন—তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা তুলে আনলেন।

মোকদ্দমার নথিপত্র দেখে দ্বারকা মিত্তির বললেন—হেম, মফঃস্বলের মুন্সেফের বুদ্ধিটা একবার দেখ—চণ্ডীমণ্ডপ যে নেই তার কোন তদারক না করেই রায় দিয়ে দিল, সেখানে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল কি না তাও একবার খোঁজ করে দেখেনি।

হেমচন্দ্র বললেন—মুন্সেফের বুদ্ধি ওরকম প্রায় গো-বুদ্ধিই হয়ে থাকে—কোন শা··মুন্সেফ হে, নামটি একবার দেখ তো।

নথিপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে মুন্সেফের নাম বেরোল—মুন্সেফ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্রের তখন মনে পড়ল—তিনি ওকালতী করবার আগে কিছুদিন মুন্সেফী করেছিলেন—তাই—

হাসতে হাসতে বললেন—ও দ্বারিক—ও যে আমিই হে।

উকীল উমাকালী মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একবার তাঁরা উভয়ে চুনারে বেড়াতে যান। হেমচন্দ্র সেখানে একদিন দুপুরে বসে ত্রিপদী কবিতা রচনা করছেন।

এমন সময় উমাকালী তাই দেখে বললেন—ও-রকম ত্রিপদী তো সকলেই রচনা করতে পারে।

হেমচন্দ্র—বেশ তো তুমিও বসে দেখ না।

উমাকালী—আপনি কি মনে করেন, যে আমি পারব না—নিশ্চয়ই পারব।

এই বলে উমাকালী তখনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে ত্রিপদী লিখতে সুরু করলেন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, কত দূর হল? উমাকালী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—গোড়ার দু'টো পদ লিখেছি, বাকীটা মেলাতে পারছি না—

হেমচন্দ্র—আচ্ছা দেখি, কি লিখেছ পড়?

উমাকালী পড়তে লাগলেন—

"চুনার নগর পর্বত উপর"

ব্যস্।

হেমচন্দ্র—বাঃ বেশ হয়েছে এর পর আর কি লিখবে ভেবে পারছ না—লেখ—

"চুনার নগর পর্বত উপর
ললনা-বর্জিত দেশ
ললনা বিরহে যার প্রাণ দহে
তাহার দফাটি শেষ"

নবীন সেনের পিতার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর মত বাংলা ভাষা ভূ-ভারতে কেউ জানে না। তিনি বিদেশে চাকরী করতেন, দেশে ফিরলেই কিশোর নবীনকে ভাষা নিয়ে বড় জ্বালাতন করতেন। পথে-ঘাটে যেখানে তাঁকে পেতেন, সেখানেই একটা না একটা প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতেন। একদিন নবীন সেন খেলতে যাচ্ছেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। অমনি প্রশ্ন—সন্ধি কা'কে বলে? যদি উত্তর দিতে না পার, তবে কানমলা খাবে। নবীন সেন দেখলেন, ভদ্রতা আর রাখা যায় না। উত্তর দিলেন—তারই নাম সন্ধি, যা কর্ণের সঙ্গে করের সংযোগ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বারুদ পড়ল। তিনি সেদিন নবীনকে "বেল্লিক" উপাধিতে ভূষিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের গৃহে 'বিচিত্রা' সভার অধিবেশন। কিছুদিন যাবৎ সভ্যদের বাইরে রাখা জুতো চুরি যাচ্ছিল।

শরৎচন্দ্র সভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু জুতো চুরি যাবার ভয়ে তিনি চুপি চুপি একটা খবরের কাগজে জুতোটা মুড়ে বগলে করে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বসলেন।

এদিকে শরৎচন্দ্রের কাজ দেখে কোন এক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে গোপনে সেই খবরটি দিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন—ও শরৎ, তোমার বগলে ওটা কি?

শরৎচন্দ্র আমতা আমতা করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ—ও' পাদুকাপুরাণ বুঝি?

চারিদিকে চাপা হাসির কলরব।

রবীন্দ্রনাথ তখন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়ীতে। বৈঠকী আলাপ চলতে চলতে হঠাৎ কবি দু'হাত দু'কানের ওপর চাপা দিয়ে বললেন—

—শিগ্‌গির বল এটা কি?

কোথাও কিছু নেই, এ কি প্রশ্ন, সকলে চুপ চাপ।

একজন বললেন—কি আবার?

—হ্যাঁ, অত চট্ করে যদি বলবে তবেই হয়েছে, ভেবে বল।

সকলেই চুপ।

—এটা 'চাপ-কান।'

রবীন্দ্রনাথ একবার মধুর ওপর এক কবিতা লিখেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী প্রবাসীতে সেটা বার করেছেন। একদিন ডাকের সঙ্গে এল এক বোতল মধু।

রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—তোমার মধুর কবিতাতে কেবল মধুই আসছে, মধুই আসছে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাই শুনে বললেন—তার চেয়ে আপনি চাল-ডালের ওপর যদি কবিতা লিখতেন—চাল-ডাল আসতো, সংসারের অনেক খরচ বাঁচত।

ডাঃ সেন থাকেন চুপচাপ, এদিকে রস আছে। বললেন—গুরুদেব যদি তার চেয়ে বধূর ওপর কবিতা লিখতেন, তবে বধূ আসতে পারত।

আমার পিতৃদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের খোস গল্প অফুরন্ত ছিল। তার কয়েকটির নমুনা দিচ্ছি।

উদারস্বভাব হারু দত্তের কন্যার বিয়ে। কন্যাকর্তা বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে বিবাহসভায় দণ্ডায়মান। বরও এসে উপস্থিত। অধ্যাপকেরা কিন্তু সেই দিনের বিয়ের লগ্ন নিয়ে মহাবিচার আরম্ভ

করছিলেন। শেষে স্থির হল, সেদিনের সকল লগ্নই দোষযুক্ত। সুতরাং আজ আর বিয়ে হবার উপায় নেই। বরকর্তা শুনে তো দুঃখিত হলেন—কন্যা কর্তার মাথায় বাজ পড়ল। এমন সময় তাঁর গুরুদেব নিমন্ত্রণে এলেন। কন্যাকর্তা ভক্তিভরে গুরুর চরণ-প্রান্তে প্রণাম করে লগ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। গুরু সকল কথা শুনে বললেন—তাই তো, আজ যে সব লগ্নই দুষ্ট; গোধূলি লগ্ন অবলম্বন করলে ভাল হত—তা এখন রাত হয়েছে আর তো গোধূলি নেই।

শিষ্য অর্থাৎ কন্যাকর্তা বললেন—আপনার যখন শুভাগমন হয়েছে, তখন গোধূলি নেই কেন? আসুন বিয়ে হবে। আপনার চরণধূলিই আমার গো-ধূলি।

এক জায়গায় কতকগুলি লোক বসেছিল। এক ব্রাহ্মণ উঠে গিয়ে দূরে প্রস্রাব করে এলেন। ব্রাহ্মণ এলে অপর এক ব্রাহ্মণ বললেন—পূর্বমুখে প্রস্রাব করা উচিত নয়। অন্য এক ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—না, হে না। মনু বলেছেন—দিনে পুব মুখে আর রাত্রিতে পশ্চিম মুখে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ। সেখানে এক চাষা বসেছিল, সে তাঁদের কথা সব শুনে বললে তাবতো—আমরা মুখ্যু চাষা লোক, অত শত জানি না। আমরা কি দিনে কি রেতে এই ভশচাজ্যি মশাই যে মুখে কইলেন ও মুখেও প্রস্রাব করি, আর ঐ ভশচাজ্যি মশাই যে মুখে কইলেন, ও মুখেও প্রস্রাব করি।

এক বোকা চাষা ভট্টাচার্যের টোলে হাজির হয়ে বলল—ঠাকুর, আমাকে একটা বিধেন দিতে হবে। ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—কিসের বিধান? চাষা বললে—আজ আমার বাপের দিবসি শ্রাদ্ধ; তা আমি করতে পারি কি না?

ভট্টাচার্য বললেন—তাতে বাধাটা কি?

চাষা বলল—আমার স্ত্রীর গামর বেজায় খোস পাঁচড়া হয়েছে, পুঁজ রক্ত বেরোচ্ছে।

ভট্টাচার্য—তোর স্ত্রীর গায়ে খোস হয়েছে তো তোর কি? তোর নিজের গায়ে তো হয় নি?

চাষা বলল—তবে যে আপনারা কয়ে থাকেন—স্ত্রীপুরুষের এক অঙ্গ, সবই মিথ্যে?

এক বৈরাগীর বাড়ীর উঠোনে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। অসময়ে তাতে একটা কাঁঠাল ধরে। বৈরাগীর একটা ছোট ছেলে ছিল। ছেলেটি কাঁঠালটি পাড়বার জন্য আবদার ধরল। বৈরাগী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ঐ কাঁঠালে বৈষ্ণবসেবা হবে। ওর জন্যে হাঙ্গামা করতে নেই। ছেলে বুঝল। ক্রমে কাঁঠাল তক্তপোষের নীচে স্থান পেল। ছেলে বৈষ্ণবসেবার তাগিদ দিতে ছাড়ে নি। পাকও ধরল যথাকালে। কিন্তু বৈষ্ণবসেবার উদ্যোগ হচ্ছে না দেখে ছেলে জোর তাগিদ লাগাল। একদিন সু-অবসর বুঝে বৈরাগীপত্নী ও পুত্রসহ সুপক্ব কাঁঠালটি উদর নামক বৃহদ্দেবতার পুজো লাগাল। ছেলেও বাদ পড়ল না বটে, কিন্তু বৈষ্ণবসেবার হতাশ হয়ে বাপকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা, কই, বৈষ্ণবসেবা তো হল না?

তখন বৈরাগী বলল—কেন হল না—বৈষ্ণবসেবাই তো হয়েছে—

তুই বৈষ্ণব, মুই বৈষ্ণব আর বৈষ্ণব ঘরে।
তিন বৈষ্ণব ঘরে থাকতে কাঁঠাল পাবে কি না পরে।

এক আখড়ায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হচ্ছিল। তিন-চারজন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কোন পণ্ডিতের তারিফ করল, কেহ বা বলল—অমন ব্যাখ্যা সকলেই করতে পারে।

সেখানে বসে ছিলেন দামু পণ্ডিত। দামু বললেন, এবারে আমি একটু ব্যাখ্যা করি—আপনারা সব ধীর স্থির হয়ে শুনুন। দামুর হাতে একখানি রামায়ণ ছিল সেখানে খুলেই তিনি পাঠ সুরু করলেন। বই-এর এক জায়গায় আছে—"রাভণো রাক্ষসাধিপঃ"।

"রাভণ" পাঠ করতেই এক শ্রোতা সেটা অশুদ্ধ বলে চীৎকার করে উঠলেন। অমনি অন্য শ্রোতারাও জো পেয়ে বলে উঠলেন—'রাভণ' কখনই হতে পারে না।

দামু পণ্ডিত হঠবার পাত্র নন। তিনি সকলকে স্থির হয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন—লোকে না বুঝেই 'রাবণ' উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পাঠ 'রাভণ'—কেন শুনুন, শাস্ত্র বলছেন—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোহস্তি ভকারশ্চ বিভীষণে।
ত্রীণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে ভকারং কিং ন বিদ্যতে।"

মশাইগণ, দেখুন, তিন সহোদরের মধ্যে কনিষ্ঠ দু'জন কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ, দু'জনেরই নামে "ভ" আছে; তবে বড় ভাই যিনি তাঁর নামে "ভ" না থাকা কি কখন সঙ্গত হতে পারে? কাজেই 'রাভণ' পাঠই শুদ্ধ, 'রাবণ' অশুদ্ধ।

মতি রায়ের যাত্রা হচ্ছে। অভিসার বেশ জমেছে। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীরা আজ রাত্রে কুঞ্জে যাত্রা করেছেন। কেউ হাতে তাম্বুল, কেউ কস্তুরী, কেউ যুঁই ফুলের মালা, কেউ গোলাপ, কেউ বেলফুলের গড়ে—কেউ বা চন্দন নিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেবার ইচ্ছায়। কত আশা করে কত প্রিয়-উপহার নিয়ে তাঁরা কুঞ্জে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর আসেন না—সখীগণ তাঁর আশাপথ চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। ভোরের বেলায় মনের দুঃখে সখীরা নিজের নিজের বাড়ীর দিকে ফিরলেন। পথে তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কে কি উপহার এনেছে। সকলেই নিজ নিজ উপহারের নাম করলেন। একজন বললেন—'বেল-যুঁইফুলের মালা এনেছি ভাই, কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য—যাঁর জন্য আনলুম—তিনি তো এলেন না! মালা যে শুকিয়ে গেল' বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে একজন সখী বললেন—'আমি ভাই এনেছি সজনে ফুলের মালা।' সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন—'ছিঃ ছিঃ, এমন কাজ করে—এত ফুল থাকতে সজনে-ফুল।' তখন সেই সখী বললেন—'আমি কি তোমাদের মত বোকা! আমার আপশোষের কিছু নেই। যদি কৃষ্ণ আসতেন, তাঁর গলায় পরিয়ে দিতুম—যখন এলেন না, তখন সুতো খুলে সজনে-ফুলের চচ্চড়ি করে খাব।'

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ও পারস্যাধিপতি দরায়ুসের পত্র-বিনিময়

পত্র-পরিচয় :—ভারতের ইতিহাসে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন মাসিডনাধিপতি ফিলিপের পুত্র, পণ্ডিত এরিস্টটলের শিষ্য। আলেকজাণ্ডার শুধু পারস্য ও জেরুজালেম দেশ জয় করেন নি, আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর স্বল্প জীবনপরিসরের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছিলেন ; তাঁর ঘটনা-বহুল জীবনের প্রতি কর্মে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। আলেকজাণ্ডারই প্রথম এশিয়া-ইউরোপের মিলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন, বিশ্বমৈত্রীর পরিকল্পনা তাঁরই। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপের ভাব-সামঞ্জস্যের জন্য তিনি পাঁচটি আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন ; প্রাচ্য প্রতীচ্যের নরনারীর বিবাহ দ্বারা রক্ত সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেন। দর্শন বিজ্ঞান অনুশীলন, অনুবাদ ও প্রচার করে তিনি এক নূতন জগৎ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাইশ বৎসর বয়সে, ৩৩৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে, আলেকজাণ্ডার ত্রিশ সহস্র পদাতিক এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে "গ্রানিকাস" নদীতীরে প্রথম পারস্য-বাহিনীকে পরাজিত করিলেন, এশিয়া-মাইনরের নগরগুলি ক্রমশঃ তাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস এই সংবাদে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—"দস্যু-তস্করাধিপ আলেকজাণ্ডারের মুণ্ড চাই, তার অনুচরগণের দেহ নদীজলে নিক্ষেপ করা হউক"। তারপর দরায়ুস পত্র লিখলেন আলেকজাণ্ডারের নিকট। আলেকজাণ্ডার দিলেন তার উত্তর ; চললো পত্র-বিনিময়। সেই পত্রগুচ্ছ মুসলিম ঐতিহাসিক মীরখন্দ তাঁর 'ইখওয়ানুস-সাফা' গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। এই পত্রের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যাবে দুইজন বিশ্ববিজয়লিপ্সু নরপতির পরস্পরের বিজয় আকাঙ্খা, দম্ভ, এবং তদানীন্তন যুগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত ; শেষাংশে সুদূর অতীত যুগের সম্রাটদের মনোবৃত্তির পরিচয়।

দরায়ুসের পত্র

দস্যুরাজ আলেকজাণ্ডার। যতদিন আকাশের সূর্য্য আপনার মস্তকে আলোক সম্পাত করবে, আপনি স্থির জানবেন যে, স্বর্গের দেবরাজ আমাকে মর্ত্ত্য-রাজ্যের আধিপত্য দান করেছেন। বিধাতা আমাকে যথেষ্ট গৌরব, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ দান করে সম্মানিত করেছেন, আমাকে অগণিত বিশ্বস্ত সামন্ত ও প্রজা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেছেন।

আমার নিকট সংবাদ এসেছে আপনি বহু দস্যু তস্কর এবং দুর্বৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। দস্যুর সংখ্যাবাহুল্য দেখে আপনার মস্তিষ্কে ধারণা জন্মেছে যে, তাদের সাহায্যে আপনি আমার সাম্রাজ্য, আমার প্রজাকুল ধ্বংস করে আমার রাজসিংহাসন ও রাজমুকুট হরণ করবেন।

সমস্ত ইউরোপকে প্রাচ্যদেশীয় লোক "রুম" আখ্যা দিত। রোম নগরকে ইউরোপের কেন্দ্র ব'লে বিবেচনা করত। এই প্রকার উদ্ভট কল্পনা রুম-দেশের লোকের স্বাভাবিক উন্মত্ততার পক্ষেই সম্ভব। আমার এই পত্র পাঠ করেই আপনি যে স্থান থেকে এসেছেন, সেখানে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। আপনার দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত অপরাধের জন্য আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি, আমার শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে না। কারণ আপনাকে আমি পারস্য-রাজ্যের প্রতিহিংসার উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করি না।

আমার সম্পদ ও শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য আপনাকে একপাত্র স্বর্ণ এবং এক ভাঁড় তিলশস্য পাঠিয়েছি। সঙ্গে আরও পাঠিয়েছি একটি চাবুক এবং গোলক। গোলকটি নিয়ে আপনি আপনার বয়সোচিত খেলা-ধূলা করতে পারেন আর চাবুকটি দ্বারা প্রয়োজন হলে আপনাকে শাস্তি দিতে হবে।

আলেকজাণ্ডারের প্রত্যুত্তর

পারস্যরাজ দরায়ুস! আপনি দাবী করেন যে, আপনি রাজাধিরাজ ; স্বর্গবাসী আপনার ভয়ে কম্পিত, সমস্ত জগতবাসী আপনার আলোকে উদ্ভাসিত। আপনার দাবী যদি সত্য হয়, তবে এই দীন শত্রু আলেকজাণ্ডারের ভয়ে বিচলিত হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব কি ?

সম্রাট দরায়ুস কি জানেন না যে, সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শক্তি ও সাম্রাজ্য বিতরণ করেন? যখন দুর্ব্বল মানব নিজেকে ভগবান বলে বিবেচনা করে, স্বর্গবিজেতা বলে মনে করে, তখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তার রাজ্য ধ্বংস করেন—এই সত্য সন্দেহাতীত।

যে মানুষ মরণশীল, যে মানুষ নিষ্পাপ নয়, যাঁর রাজ্য অন্য লোক জয় করতে পারে, যে মানুষ তার পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী অন্যের নিকট রেখে যায়, তার পক্ষে দেবত্বের দাবী কি করে

সম্ভব? আমি স্থির করেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেইজন্য আপনার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করব। আমি স্বীকার করি, আমি ভগবানের একজন দুর্ব্বল,' বিনীত দাস মাত্র, ভগবানের নিকট আমি আমার প্রার্থনা নিবেদন করি, আমার বিজয়ের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করি, ভগবানকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার পত্রের সঙ্গে আপনি আপনার বিরাট শৌর্য্যের চিহ্নরূপে আমার নিকট পাঠিয়েছেন একটি চাবুক, একটি গোলক, একটি স্বর্ণপূর্ণ পাত্র এবং এক ভার তিল। এই জিনিষগুলিকে আমি সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে মনে করেছি এবং মঙ্গলচিহ্নের প্রতীক বলে গ্রহণ করি, চাবুকটি ইঙ্গিত করে যে আমি হব আপনার শাস্তিদানের যন্ত্র, আমি হব আপনার শাসক, শিক্ষাদাতা এবং পরিচালক। গোলকটি সূচনা করে যে এই গোলাকার পৃথিবী আমার সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা শাসিত হবে, আপনার সম্পদের অংশরূপে সুবর্ণ পাত্র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আপনার সমস্ত সম্পত্তি আমার নিকট হস্তান্তরিত হবে। অসংখ্য তিলশস্য সূচনা করে যে এইগুলি অগণিত হলেও অতীব মসৃণ পদার্থ এবং সমস্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম বিস্বাদ।

এই সমস্ত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আমি আপনার নিকট প্রেরণ করছি একমাত্র সর্ষপ; আপনি এই সর্ষপ আস্বাদন করলেই ধারণা করতে পারবেন আমার যুদ্ধ বিজয়ের তীব্র স্বাদ। আপনি অহঙ্কারের বশে আত্মদম্ভে স্ফীত হয়েছেন, আপনার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে মদমত্ত হয়ে নিজেকে পৃথিবীতে বিধাতা বলে মনে করেন; আপনি নিজেকে স্বর্গরাজ্যাধিপতি বলে ঘোষণা করেছেন! আপনার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী, আপনার রণসজ্জা, আপনার শৌর্য্য দ্বারা আমার অন্তরে ভয় সঞ্চার করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য আমি স্থির বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা আপনার অহঙ্কার বিচূর্ণ করবেন। আপনি যে পরিমাণে নিজেকে স্ফীত মনে করেন, বিধাতা সেই পরিমাণে আপনাকে সঙ্কুচিত করবেন এবং আমাকে জয়যুক্ত করবেন। ভগবানের করুণার উপর আমার বিশ্বাস আছে, আমার নির্ভরতা আছে, আমার বিদায়-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

* * *

তারপর আরম্ভ হ'ল সেই ভীষণ যুদ্ধ। প্রথমে পদাতিক, তারপর অশ্বারোহী, তারপর সেনাপতিবৃন্দ; তার মধ্যস্থলে গ্রীকবীর ও পারস্য-সম্রাট। দরায়ুস হলেন পরাজিত, তিনি ইউফ্রেতীস নদী অতিক্রম করে পলায়ন করলেন। পরে প্রস্তাব করলেন সন্ধি বিনিময়ে অর্দ্ধেক রাজত্ব। সৈন্যাধ্যক্ষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে আলেকজাণ্ডার অবতীর্ণ হলেন দ্বিতীয়বার সংগ্রামে।—এবার তিনি জয় করলেন পারস্যরাজের সমস্ত সাম্রাজ্য। তারপর আবার লিখলেন চরম-পত্র দরায়ুসের নিকট। সেই পত্র ছিল বিজেতার লিপি বিজিতের নিকট।

আলেকজাণ্ডারের শেষ পত্র

দরায়ুস! এই নামেই আপনি পরিচিত। আপনার সমনামা পূর্ব্বপুরুষ দরায়ুস একদা সাগর-বেলাবেষ্টনবদ্ধ গ্রীক নগরগুলি ধ্বংস করেছিলেন, তারপর আবার গ্রীক উপনিবেশগুলি নষ্ট করলেন।... তাঁর সেনাপতি মারদানিয়াস গ্রীসের সমস্ত উর্ব্বর ভূমিখণ্ড, বর্দ্ধিষ্ণু নগরগুলি ভূমিসাৎ করেছিলেন। তারপর এসেছিল ম্যাসিডনের দুর্ভাগ্য—আমার পিতা ফিলিপের হত্যা।—সে হত্যার প্রচ্ছদপট রচনা করেছিল পারস্যরাজ্যের প্ররোচনা ও উৎকোচ।

আপনারা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করেন, ভীরুর মতন যুদ্ধ পরিচালনা করেন—শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে উপস্থিত হতে সাহস পান না—তাই শত্রুর নিধনের জন্য গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করেন। আপনি ত আমার গুপ্তহত্যার জন্য এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন—আপনিই আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুবিশাল বাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন, আমি আজ যে যুদ্ধ পরিচালনা করছি—সে আমার আত্মরক্ষার জন্য। স্বর্গের দেবতা আজ আমাকে আপনার রাজ্যের বহুলাংশ জয় করতে সুযোগ দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আমার কার্য্যের পশ্চাতে সত্য ও সততা আছে। আপনাকে আমি সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করেছি। যদিও আমি কৃতজ্ঞতা বা নীতির অনুরোধে আপনার কোন অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য নই, তবু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি আপনি পরাজিত বন্দিরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হন, আমি আপনার মহিষী ও সন্তানসন্ততিদের মুক্তি দেব—তার জন্য কোন মুক্তিমূল্য গ্রহণ করব না। যুদ্ধবিজয়ী রূপে আপনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আপনি দেখতে পাবেন যে আমি পরাজিত শত্রুর প্রতি সম্মানসূচক ব্যবহার করতে জানি। যদি আপনি মনে কোন সন্দেহ পোষণ করেন, তবে দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন, তারা আপনার পার্শ্বদেশ রক্ষা করবে। ইতিমধ্যে যদি আপনার কখনো আলেকজাণ্ডারের নিকট পত্র লেখার অবসর হয়, তখন স্মরণ রাখবেন যে, আপনি তাকে শুধু সম্রাট আলেকজাণ্ডার বলে সম্ভাষণ করবেন না, আপনার সম্রাট বলেই সম্ভাষণ করবেন।

পত্র-পরিণাম:—পরিশেষে ৩৩১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেকজাণ্ডার তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করে আরবেলা রণক্ষেত্রে পারস্যরাজ দরায়ুসকে পরাস্ত করেন, এবং পঁচিশ বৎসর বয়সে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। দরায়ুস তাঁর একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিহত হন। অবশ্য জীবিতকালে তিনি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

নিরো-জননী এগ্রিপিনার পত্র

পত্র পরিচয়:—রোমান সম্রাট নৃশংস নিরোর নাম ইতিহাস-পাঠকের নিকট অপরিচিত নয়। 'Rome burnt, Nero fiddled', রোম পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল; নিরো টাইবার নদীতে নৌকা-বিহার করে অগ্নিশিখার উৎসব উপভোগ করলেন। মাতা এগ্রিপিনার চক্রান্তে নিরো সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। মাতার ষড়যন্ত্রে তার সমস্ত জ্ঞাতি শত্রুদের বিষপানে হত্যা করান হয়। পরিশেষে অদৃষ্টের পরিহাসে নিরো তাঁর মাতা এগ্রিপিনাকে পুত্র-হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

নিরোর মতন কুৎসিত পুরুষ তখন রোমান সাম্রাজ্যে কেউ ছিল না। অথচ বন্ধুরা তাকে সুন্দরের দেবতা এপোলো বলে সম্ভাষণ করলে তিনি খুসী হতেন। কখনো কোন বন্ধু অথবা

কর্মচারীর উপর অসন্তুষ্ট হলে নিরো আত্মহত্যার উপকারিতা সম্বন্ধে পত্র লিখতেন, এই পত্রের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর দার্শনিক বন্ধু সেনেকা এমনি একখানা ইঙ্গিতপূর্ণ পত্র পেয়ে তরবারির আঘাতে স্বহস্তে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

একদা নিরোর বান্ধবী পাপাইয়া সাবিনা ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্রাট-মাতা এগ্রিপিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, এগ্রিপিনা তাঁর পুত্র সম্রাট নিরোকে হত্যা করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করেছেন। অথচ একদিন এই এগ্রিপিনা তাঁর তৃতীয় স্বামী ক্লডিয়াসকে হত্যা করেছিলেন—নিরোর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্ত। পুত্রহত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত এগ্রিপিনা ক্ষুব্ধ হয়ে সম্রাট নিরোকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে তদানীন্তন রোমের অধঃপতনের কাহিনী, ক্রুদ্ধা ফণিনী মাতার গর্জন, আক্ষেপ, আবেদন নিবেদনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই পত্র রোমের ইতিহাসের অমূল্য মণি।

সম্রাট নিরো, আমার পুত্র নিরো! তুমি কি সন্তানের প্রতি মাতার মমতার সংবাদ রাখ না? তুমি কি জান না, সন্তানের প্রতি মাতার প্রীতি কত গভীর, কত অসীম? নিরন্তর স্নেহের একটু প্রবাহে মাতার হৃদয়কে পূর্ণ করে দেয় কে? স্নেহের উৎস মাতা ভিন্ন আর কেউ জানে না: মাতা নিজের জীবনের বিনিময়ে যে বস্তু আহরণ করেন—তার চেয়ে প্রিয় আর কি আছে? সন্তান ধারণের জন্ত মাতা যে দুঃখ, যে যাতনা সহ্য করে, তার চেয়ে মূল্যবান্ বস্তু আর কি আছে? মাতা যদি সন্তানের স্বপ্ন না দেখত তবে হয়ত সে সন্তান ধারণের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত না,—সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি বিলোপ হয়ে যেত।

নিরো! তোমার কি স্মরণ নেই তোমাকে আমি জঠরে ধারণ করেছি, আমার রক্ত দিয়ে তোমাকে পালন করেছি। তুমি কি করে বিশ্বাস কর যে, আমি এত দুঃখে কষ্টে যে সন্তানকে ধরণীতে এনেছি, পালন করেছি, সিংহাসনে বসিয়েছি, আমার সেই দুঃখের ধনকে আমি বিনাশ করব? হয়ত আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দেবতার অভিশাপের ফল, কারণ সন্তান-স্নেহের আতিশয্যে দেবতাকে আমি অবহেলা করেছি। তাই বোধ হয় দেবতা আমাকে শাস্তি দিতে চান।

হতভাগিনী এগ্রিপিনা! তোমাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে! তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা' তুমি কখনো কল্পনা করতে পারনি! তোমার সম্বন্ধে অন্ত কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি।···আজ আমার 'সম্রাজ্ঞী' আখ্যার কোন মূল্য নেই। আমি সন্তান-হত্যার ষড়যন্ত্র করেছি! ছি! ছি! কি ঘৃণ্য অভিযোগ। এই অভিযোগ শুনে পৃথিবীর নিকৃষ্টতমা নারীও শিহরে উঠবে! আমি বুঝেছি রাজপুরীর পূতিগন্ধ যে গ্রহণ করেছে, সে সত্যই দুর্ভাগ্য! রাজপুরীর স্পর্শে অতি বড় জ্ঞানীও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। রাজপুরীর প্রশান্তিও ভয়ঙ্কর। না, না, আমি রাজপুরীকে অপরাধী করব কেন? তবু বলব এই রাজপুরীর সান্নিধ্যই ত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রচ্ছদপট! নয় কি নিরো?

নিরো! তুমি বলতে পার—আমি কী লোভে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব? কেন তোমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করব? তোমার কি স্মরণ নাই, তোমাকে সিংহাসনে বসাবার জন্ত আমি কি না করেছি? কি জন্ত আমি তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করব? কোন্ লোভে আমার দুর্ভাগ্য টেনে আনব? তোমার ধ্বংসের উপর আমি কোন্ প্রাসাদ রচনা করব? এ যে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি জানি সাম্রাজ্যের লোভে অনেক সময় মানুষ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে। এই প্রকার দোষদুষ্ট মানুষের পক্ষে চরমতম শাস্তিও যথেষ্ট নয়। উচ্চাভিলাষ সমস্ত অন্তায়কে অতিক্রম করে যায় ততক্ষণ, যতক্ষণ মানুষ তার অভীষ্ট বস্তুর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আমার অভীষ্ট ত তুমি, আমার সন্তান নিরো।··· না না, আমি তোমার হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারি না—এ অসম্ভব! আমি যদি তাই করে থাকি তবে কোন্ দেবতার কৃপা-বারি সিঞ্চনে আমার পাপ প্রক্ষালিত হবে?

আবার বলি সম্রাট নিরো! তোমার শিরে মুকুট পরাবার জন্ত আমি কত দুঃখ সয়েছি তা কি তোমার স্মরণ নেই? যাক সে সব অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমার কৃতজ্ঞতার অপমান করব না, আমার নির্দোষিতা আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না; বরং তোমার ন্তায়-বিচারের উপর নির্ভর করবে।

বিদায়—

তোমার জননী

পত্র পরিণাম:—নিরো কিন্তু জননীর পত্রদ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি, মাতার অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন নি। নিরো মাতৃহত্যার আদেশ দিলেন। ৫৯ খৃঃ-অব্দে রাজমাতা সম্রাজ্ঞী এগ্রিপিনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী এগ্রিপিনার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সাবিনা সম্রাট নিরোকে সেই আনন্দ-সংবাদ দিতে এলেন। নিরো মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন—সাবিনাকে পদাঘাত করলেন, অন্তঃসত্ত্বা সাবিনা সে আঘাত সহ্য করতে পারে নি। এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল এই কূটবুদ্ধি সাবিনা।

চৌদ্দ বৎসর রাজত্বের পর নিরো রোমান সিনেটের নির্দেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু নিরো স্বয়ং তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করে ঘাতকের আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন।

মহাকবি গ্যেটের প্রেমপত্র

১৮১৯ খৃঃ গ্যেটের দিয়ান কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্য-গুচ্ছে এক কবোষ্ণ ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। কবির বয়স তখন প্রায় সত্তর। প্রেমানুরাগে রঞ্জিত দিয়ান-কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যের মধ্যে পারসিক কবি হাফিজ কবিকে প্রেরণা দিয়েছিল। হাফিজের মানসী হাফিজকে যেমন উদ্দীপ্ত করেছিল প্রেমের এবং বাসনার ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে গ্যেটের প্রেমকে দীপান্বিত করেছিল মারিয়ানি ফন হিবলমেয়ার। ইনি ছিলেন ফ্রাঙ্কফার্টের জনৈক ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীর পত্নী। শ্রীমতীর স্বামী গ্যেটের বন্ধু ছিলেন। শ্রীমতী মারিয়ানি কবির সঙ্গে কাব্যজগতে ঐক্য অনুভব করেছিলেন। সে সখ্যের মধ্যে কবির সুরের সঙ্গে শ্রীমতী মারিয়ানির অন্তরের সুর উজ্জ্বল হয়ে উৎসারিত হয়েছিল। গ্যেটে শ্রীমতীকে উদ্দেশ

করে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। উত্তরে শ্রীমতী কবিতা লিখে গ্যেটেকে নিবেদন করেন। শ্রীমতীর কবিতা এতই গূঢ়সঞ্চারী হয়েছিল যে, সেই কবিতাগুলি মহাকবি নিজের সঙ্কলনে স্থান দেন। অবশ্য সেই কবিতাগুচ্ছ কবির নামেই প্রকাশিত হয়েছিল; শ্রীমতী মরিয়ানি-লিখিত কবিতাগুলো কবিগুরুকে প্রায়ই পরিমার্জন করতে হয়নি। কয়েকখানি পত্রের অনুবাদ দেওয়া হল।

অক্টোবর, ১৮১৯।

আমি দিয়ান পড়ছি, কতবার যে পড়েছি তার শেষ নাই। যে ভাব বা অনুভূতি আমাকে আশ্রয় করেছিল তার বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়। আমার আমিত্ব আর আমার অন্তরাত্মা তোমার নিকট স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছে। বাস্তবিক এ-আমি বিশ্বাস করি। আর এ বিশ্বাসবোধের কারণও আছে। কারণ এই যে, আমার অন্তর তোমার সামনে উন্মুক্ত তা তুমি দেখতে পাও—তাই বর্ণনার লাভ নাই। বর্ণনায় তা তোমার কাছে পূর্ণবলে মনে হবে না। তুমি জেনেও ছিলে এবং বুঝেও ছিলে যে, আমার ভিতর কী ঝড় বইছিলো। নিজের কাছে আমি নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। নম্রভাবে ও গর্বভাবে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম—আনন্দিতও হয়েছিলাম। সবই স্বপ্নের মত বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে একজন তার আপনজনের মূর্তিকে খুঁজে পায়, ফলে তার মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, কারণ এর মধ্যে সে একজন প্রেমিককে ও প্রেয়কে খুঁজে পায়। আমাদের অভ্রান্ত দৃঢ় সহযোগিতা ছিল, এইটাই প্রেয়রূপ—যার মধ্যে আমাদের গুণাবলী বর্তমান। এই গুণাবলী সব সময় আমরা পাই না। তাই অন্ত কিছু আবিষ্কার করি—প্রত্যয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সব সময় এ গুলি আমরা পাইনা, তবে এর মধ্যে উজ্জীবনী শক্তি আছে।

ইতি—

মনোমোহিনী মরিয়ানি,

আমার কথা না শুনে তুমি আর ব্যাডেনে থেক না। তোমার মধুর অধর নিঃসৃত বাণী আমি শুনছি এই জন্ত যে, তোমার নীরবতা ভেঙেছে। আমি জানি তুমি তোমার স্বামীর কাছে অছেন্ত, তোমার স্বামী আমাকে অভ্যর্থনা জানান। এতে আমার অনুভূতি তোমার সামনে জাগিয়ে তোলা হয়। কেন তুমি নীরবে ছিলে? এখন বল—ওগো বল—আমার কথা তুমি ভাবছ। আমাকে বলতে দাও যে, তোমার অনুভূতির সাড়া আমি দিয়েছি আর দিয়েছি আমার সমগ্র হৃদয়। কবি হাফিজ বর্ণিত আমি যদি বার্তাবহ দূত হতাম তাহলে তোমার সামনে আমি হাজির হতাম। আমাকে বার্তাবহ দূত হিসাবে স্বাগত না জানিয়ে তখন হয়ত স্বয়ং তুমি আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। এই আশা নিয়ে থামছি যে আমরা ওইখানে ছিলাম। ইতি—

২।১২।১৮৩০

* এর পর বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে লিখলেন:

আমাদের সমবেত মিলন, বিরহ ও আশার পরে আমরা যদি নিজেদের আনন্দের কথা না ভাবি তাহলে খৃষ্টমাস আগমন উপলক্ষে অন্ততঃ আমরা অপরের জন্ত ভাববো।

* শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ভিলমেয়ারকে অর্থাৎ মরিয়ানি এবং মরিয়ানির স্বামীকে।

এর কিছুদিন পূর্বে প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেল মারা যান কলেরায় আর্তদের সাহায্যের জন্ত হেগেল ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেয়সীকে লিখলেন:

যে বছর চলে গেছে সে বছরের আলোকমণ্ডিত বর্তিকাকে ভোলা যায় না। তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই। তোমার অনু... হয়েছিল তাই আমি উদগ্রীব কারণ তোমার ফুলরূপ প্রতিটি মুহূ... সব কিছু পূর্ণ করে। এক দুঃস্বপ্নে আমার ঘুম ভেঙে গেল এশিয়ার দৈত্য কলেরা মহামারী দেখা দিয়েছে, সকলে এই সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত পালাচ্ছে। ডাক্তারদের ভবিষ্য... বাণী বৃথা প্রতিপন্ন হয়েছে। বসন্তবাতাস একে দূরে সরিয়ে দে... দেয়। রোগ ভয়ে মানুষ ভীত হয়ে পড়েছে। ইতি—

তোমার প্রতি আমার কত আনুগত্য জান। তোমার মহান স্বামীকে নিয়েই বিপদ! বয়সের কড়াকড়ি হাস্তকর লাগে যখন দেহ ও মন কার্যাক্ষম থাকে। এইখানেই আমার নৈপুণ্য। বয়স আমার কাছ থেকে শুধু জিনিষটাই নেয়। আমার প্রিয়তম, গত গ্রীষ্মে আমার গৃহস্থালি কাজের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলে— তোমার পক্ষে এই শীতে ঘর-দুয়োরগুলো এই শীতকালে সাজিয়ে দেওয়া কী সম্ভব হবে। তোমার মুখে যাতে হাসি ফুটে ওঠে তার জন্ত কী পাঠাব, তুমি কিছু খাবার পাঠিও—অন্তর শুষ্ক হচ্ছে; হজমশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। ইতি

১০।২।১৮৩২

চিঠি পাঠাই তোমাকে। যে জীবন অতিক্রান্ত হয় তা চিঠির মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে। এই চিঠিগুলোর মধ্যে তুমি বিশ্রাম নিতে পারো। কাজে অগ্রসর হও—অবশ্য বাধা আসবে। তবু তার মধ্যে থাকবে সার্থকতা, সৌন্দর্য্যময়তা। তোমার উষ্ণতা আমাকে অপরিবর্তিত রাখে। আমার কাছ থেকে না পেলেও আমাকে চিঠি দিও। চিঠি না পাওয়ার জন্ত পত্র দিতে দেরী কর না; কারণ আমার পত্রের পর তোমার উত্তর এলে বহু দেরী হয়ে যাবে। ইতি

মোপাঁসা ও কুমারী মারিয়া বাস্কারসেক-এর পত্র-বিনিময়

পত্র পরিচয়:—মারিয়া বাস্কারসেক জন্মে রাশিয়ান। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই বাসকা তাঁর বিখ্যাত দিন-লিপি লিখতে আরম্ভ করেন। বাস্কারসেকের মাত্র ২৪ বৎসর ছিল পরমায়ু। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই আরম্ভ করলেন জীবনে বিদেহ উপভোগ। সে উপভোগ লেখার মধ্য দিয়ে, কল্পিত বা বাস্তব মানুষের কাছে প্রেম নিবেদনে। কখনো মানুষকে করতেন লুব্ধ, কখনো আহত, কখনো আশান্বিত, কখনো বিভ্রান্ত। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল আবেগ, ভাবের অকৃপণ প্রকাশ, প্রচুর রসপরিবেশন, অপরূপ শব্দবিন্যাস। তিনি প্রথমেই স্থির করতেন তাঁর পত্রাঘাতের পাত্র, পরে নিক্ষেপ করতেন পত্র-শর। সেই শরে আহত হন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস, দ্বিতীয় হেমিলটন, বিখ্যাত কবি জোলা, গনকোর্ট, এবং ইউরোপের বহু শিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সৈনিক আরও কত কে। অনেক সময় তিনি

তার একান্ত প্রিয়তমকে কল্পনা ক'রে লিখতেন পত্র, সে চিঠি থাকত টেবিলের উপরে, সেই পত্রের উত্তর দিতেন নিজেই—কল্পিত প্রেমিকের আসন থেকে, তিনি কখনো পুরুষ, কখনো নারীরূপে নিজের সত্তা অনুভব করতেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি মোপাঁসার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। মোপাঁসার লেখনীর প্রশস্তিতে সমস্ত ইউরোপ তখন মুখরিত। তাঁর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি তখন বহু নারীর কামনার ধন—মোপাঁসাকে সুন্দরের দেবতা "এপলো" নামে সম্মান করত। মিস্ বাসকা মোপাঁসাকে লিখলেন পত্র, ছদ্মনাম মিস্ হেসটিন্‌সের আবরণে।

মোপাঁসাও খুব রসিক লোক। তিনি নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর রূপ সুন্দর, লেখা সুন্দর, তাঁর খ্যাতির বিস্তৃতি বহুদূর; তিনি নারীর সাধনার ধন। সুতরাং তিনিও অপরিচিতা নারীর পত্রের উত্তর দিলেন—তাঁদের মধ্যে বহু পত্র-বিনিময় হ'ল—কেউ কাউকে চিনে না, জানে না, অথচ জানবার এবং জানাবার কৌতূহল তাঁদের অপরিসীম। এই পত্রধারার মধ্যে লেখক-লেখিকার মনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাওয়া যায়:—

মারিয়ার চিঠি

"হে ভদ্রমহোদয়! আমি আপনার লেখা পড়েছি। হাঁ, বলতে পারি, ভালই লেগেছে। আপনি ধার্মিকের নিষ্ঠা নিয়ে প্রকৃতির পট রচনা করেন, প্রকৃতির প্রেরণা আপনার অতি অনবদ্য; আপনি আপনার পাঠককে এরূপ অপরূপ মানবীয় ভাব দ্বারা স্পর্শ করেন যে, আমি মনে করি যেন আপনি বুঝি ঠিক আমাকেই আপনার লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং আমি আপনাকে আমার অহং সত্তা দিয়েই ভালবাসি। আপনি কি মনে করেন যে, এই স্তুতি সম্পূর্ণ অর্থহীন? সত্যি করে বলুন ত, আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

আপনি বুঝতেই পারছেন যে, আপনাকে আমার অনেক নূতন ও মনোরম কথা বলবার আছে, কিন্তু সমস্ত কথা একসঙ্গে একেবারে বলা সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে আমার দুঃখ এই যে, আপনি মহৎ। আপনার সুন্দর মনের আধার হব, এই সুখকর কল্পনা দ্বারা আমি উদ্‌বুদ্ধ—এই কথা জানিয়ে আমি আপনাকে প্রেরণা দিতে অপারগ, সুতরাং ইহা আমার কম অনুশোচনার বিষয় নয়।

অবশ্য আপনার [illegible]টি যদি সুন্দর না হয়ে থাকে, সুন্দরের উপাদান যদি আপনার [illegible] না নিহিত থাকে, তবে আপনার জন্ত আমি দুঃখিত কিন্তু [illegible] আমার মনের সুবর্ণবেদীতে আপনার আসন রচনা ক'রে সেব্যধার কাব্য রচনায় উৎসাহিত করব, অন্ত চিন্তা আপনার মন [illegible] করে দেব।

গত এক বৎসর [illegible] আপনাকে লিখব ভাবছি—কয়েক বার লিখবার উত্তোগ [illegible] ছিলাম—শেষ পর্য্যন্ত লেখাই হল না; ভাবলাম, হয়ত [illegible] শক্তির অযথা প্রশংসা করছি—সেটা অশুচিত। দুদিন [illegible] একটা খবরের কাগজে দেখলাম, কোন অনামিকা [illegible] অত্যধিক প্রশংসা ক'রে স্তুতি জ্ঞাপন করেছে এবং আপ[illegible] তত্ত্ববস্তু ছিলায় প্রশংসার উত্তর দেওয়ার জন্ত তার ঠিকানা চেয়েছে। আপনার সেই বিজ্ঞপ্তি পাঠ ক'রে আমি ঈর্ষান্বিতা হয়ে উঠলাম; আপনার কবি-প্রতিভা আমাকে নূতন ক'রে অভিভূত করল, তাই লিখছি আপনাকে এই পত্র।

আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি আপনার নিকট আমার পরিচয় প্রকাশ করব না। আপনাকে আমি দূর থেকে দেখব না, কারণ আপনার রূপ আমাকে আনন্দ দেবে কি না কে বলতে পারে? তবে আমি আপনার সম্বন্ধে জানি যে, আপনি তরুণ, আপনি অবিবাহিত। এই দুইটি তথ্যই যে-কোন মানুষকে দূর থেকে প্রশংসা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আপনার নিকট গোপন করব না যে, আমি খুবই সুন্দরী। এই একটি মাত্র সত্যই আপনাকে আমার পত্রের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবে। যদি আমি পুরুষ হতাম, আমি আপনাকে কোন পত্রই লিখতাম না। বৃদ্ধা ইংরেজ রমণীর কুৎসিতদর্শন আকৃতি নিয়ে আমি আপনাকে প্রশংসা-পত্রও লিখতাম না।"

ইতি—মিস হেসটিন্‌স্।

মোপাঁসার চিঠি

"হে ভদ্রমহিলা! আমার পত্র আপনার আশার অনুরূপ হবে না। প্রথমেই বলব যে, আপনার সহৃদয়তার জন্ত, আপনার প্রশংসার জন্ত, আপনাকে ধন্যবাদ। যাক, এবার বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের মতন কথা বলব।

আপনি আমার মনের আধার হতে ইচ্ছা করেন, বলুন তো কোন অধিকারে? আমি আপনাকে জানি না, আপনার মন, প্রবৃত্তি, আশা আকাঙ্খা আমার মনের সুরে বাঁধা না-ও থাকতে পারে। আমি আমার নারীবন্ধুদের যে কথা খুব আন্তরিকভাবে, আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি, তা আপনাকে কি করে বলব? আপনার সঙ্গে আমার অকপট আলাপ কি নির্ব্বোধের কাজ হবে না? আমার বান্ধবীদের প্রতি বিশ্বাসহীনতা হবে না?

মানুষের সঙ্গে পত্র-বিনিময়ে কি তাঁর মনের সঙ্গে কোন প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে পারে? পুরুষ নারীর প্রীতির মাধুর্য্য বহুলাংশে আসে তাদের সাহচর্য্যের আনন্দ থেকে, পরস্পর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। পুরুষ নারীর চঞ্চল নয়ন ও পত্রের স্থির অক্ষর বিন্যাসের অন্তরালে যে সুন্দর অদৃশ্য মূর্ত্তিটি অঙ্কিত হয়ে উঠে তার সুন্দর ছবিটি কল্পনা ক'রে পুরুষ নারীর পবিত্র প্রেম জন্মে, একথা কি সত্য নয়?

যার রূপ জানি না, যার কেশের বর্ণ দেখিনি, যার হাসির ঝঙ্কার শুনিনি, তার কাছে অন্তরের আবেদন কি ক'রে ফুটিয়ে তুলব? কি করে অন্তরের গোপন বাণী প্রকাশ করব?

আপনি আমার একখানি আধুনিক পত্রের উল্লেখ করেছেন। এই লিপিখানির লেখক একজন পুরুষ। তিনি আমার কাছে কোন এক বিষয় উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন। দেখলেন ত ব্যাপারখানা? এখন বুঝুন, একজন অপরিচিতা নারীর পত্রের উত্তর দেওয়া কি সমস্যা? গত দুই বৎসরে আমি প্রায় ৫০ ৬০ খানি পত্র পেয়েছি। এই সব পত্র যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক নারীও আছেন। সেই সমস্ত নারীর মধ্যে আমি কি উপায়ে নিজের প্রেমের আধার খুঁজে বার করব?

যখন সেই সব লেখিকা নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করবেন, ভদ্র সমাজে এসে মিশবেন, তখনই বাস্তবতা ও আন্তরিকতার প্রশ্ন উঠতে পারে। তা না হলে আমি আমার প্রিয়দর্শন একজন অপরিচিতা, এমন কি অপরূপ সুন্দরী অপরিচিতার জন্যও আমার পুরাতন বান্ধবীদের অবহেলা করব কেন? আমার অপরিচিতা হয়ত দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত হবে এবং তার মানসিক বৃত্তিও অত্যন্ত নীচু স্তরের হতে পারে। এই কাজটি মোটেই পুরুষোচিত হবে না—কি বলেন? যদি আমি আপনার নিকট নিজেকে নিবেদন করি, তবে সে নিবেদন কি আমার নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাসহীনতা হবে না?

ভদ্রে! বাস্তব মানুষের যুক্তিকে ক্ষমা করবেন, কারণ এটা কবির কাজ নয়।

ইতি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত।

গী দ্য মোপাঁসা।"

পুনশ্চ:—আমার পত্রের অনেক স্থান মুছে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা করবেন। কারণ সমস্ত পত্রখানি পুনরায় নূতন ক'রে লিখবার সময় নেই।

পত্র-পরিণাম:—এইরূপ পত্র-বিনিময় চলেছিল কিছু কাল ধরে। মারিয়া ছদ্মনাময়ী। তিনি লিখলেন:—"প্রিয় মোপাঁসা, আমি জানি আপনি খুব জনপ্রিয়। সত্যি কিন্তু আপনি তা নন। আপনার একান্ত প্রিয়তমা হতে আমি ইচ্ছুক নই। তার চেয়ে আমি অধিকতর মনোরমা"।

ক্রমে মোপাঁসার মনে হল এই মিস্ হেসটিনস নামধারী লেখিকা পুরুষ মাত্র এবং সেই ধারণার বশীভূত হয়ে তিনি পত্রের রূপ পরিবর্ত্তন করলেন। মারিয়া ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে লেখা বন্ধ করলেন। কিন্তু মারিয়ার নীরবতায় মোপাঁসার কৌতূহল বেড়ে গেল। তিনি মিস্ হেস্‌টিনস-এর সত্য পরিচয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, কিন্তু মারিয়া কিছুতেই নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত মোপাঁসার আগ্রহাতিশয্যে মারিয়া মোপাঁসার সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু তখন তাঁর মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে।

তাঁর সমাধির উপর মোপাঁসার একটি স্মারকলিপি উৎকীর্ণ আছে—"অপূর্ব্ব ছদ্মনাময়ী এই মারিয়া বাস্‌কারসেফ।"

উপরোক্ত পত্রগুলি অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী অনূদিত "বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী" নামক গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। আমরা তাঁর সৌজন্য স্বীকার করি।—স

ডেলী প্যাসেঞ্জার

দিলীপকুমার বসু

আমি নগণ্য কেরাণী এক ডেলীপ্যাসেঞ্জার
তাই, শহরের কোনো ঠোঁট-রাঙা নীলিমা রায়
অথবা, রুজমাখা যূথিকা দাস ট্রামে-বাসে চড়তে
বা নামতে গিয়ে নজর ফেলবে না মোর 'পরে।
নারীর সহজাত বুদ্ধিতে তারা জেনেছে
রোজগারের দৌড় আমার মোল্লার মসজিদ পর্যন্ত:
যাট থেকে একশো কুড়িতেই যৌবনের পাতা যাবে ঝরে।
ব্যর্থতার ভিত্তি বেয়ে জীবন-সমুদ্র মোরে হ'তে হবে পার;
আমি অনিয়মের ঝুলি কাঁধে দিন-যাপনের গ্লানি নিয়ে
ঊর্দ্ধশ্বাসে নিত্য ছুটি শুধু ছাড়া ডেলী প্যাসেঞ্জার।

মনকে বৃথা সান্ত্বনা দিই, এইতো হয়েছে বেশ,
না হয় হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠে হ'য়ে যাবো শেষ।
দুঃখ কিসের, আমি রব চির ব্যাচিলার।
মোর তরে দূর গাঁয়ে পাতার ছায়ায় ঢাকা কুঁড়ে ঘরের
আম-জাম-কাঁঠালে ঘেরা প্রাঙ্গণে বসে
সুচারু করে কোনো কাজলকালো কমলমণি
অথবা, লাজুকলতা চারুবালা গাঁথবে না হার;
আমার আসার আশায় পথ চেয়ে দুরু-দুরু বুকে
চকিত নয়নে কেউ ফিরিয়ে মুখ চাইবে না বার বার।
হায়, আমি যে কেরাণী এক তায়, ডেলী প্যাসেঞ্জার।

এমনি ভাবে ছোটার মাঝেই জীবনে একদিন
নেমে আসবে সন্ধ্যা। নিঃসঙ্গ আমি দূর গগনে
ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে আমার ঘরের বারান্দায়
টেনে আনা চেয়ারে বসে তারায় তারায় গড়ে তোলা
ছায়াপথ ধরে হয়তো বা মনের পাখাটি দেব মেলে।
শিরে-শিরে হাওয়ার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে কারো শঙ্কিতচিত্ত
সেদিন উঠবে না দুলে। সংসারের টুকি-টাকি কথায়, গল্প-গুজবে,
শয্যার পাশে বসে কেউ আমায় ঘুমের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে না;
রাতের নিস্তব্ধতাটুকু ভরিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে চাবে না।

[illegible] দিন
সংসারের লেন-দেন, বেচা-কেনায় হয়ো ম[illegible] প
নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ আমি হৃদয়হীন এক য[illegible] আমি [illegible] তার [illegible]
তাই, যেদিন আমার ডেলী প্যাসেঞ্জা[illegible] আপন[illegible] বিদেহ
মুক্তপ্রাণ জানি না স্বর্গে কি নরক থেকে দূ[illegible] বাস্তব মা[illegible]
সেদিন সংসার-ষ্টেশনে ব্যস্ত হ'য়ে [illegible] থেমেই [illegible] যাবে,
জানি, কারো চোখ হ'তে এক [illegible] হ'য়ে বসে[illegible], কখনো [illegible] ঝরে।
তবু, শূন্য ঝুলি নিয়ে পাড়ি দেবো [illegible] আপনার [illegible] মধ্যে ছিল
এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে যাবো যে, আগে আমি [illegible] অপরূপ শক্ত
শেষ ক'দিন আমায় তক্ত মরু [illegible] থাকে [illegible] পাত্র, পরে
পুরীর মৌসুমী হাওয়ায় ভরে [illegible] জন্ম [illegible] টি দ্বিতীয়
অনাত্মীয়া, তবু পরমাত্মীয়া এ [illegible] আছে কে। [illegible] কোর্ট, এবং [illegible] সিস্টার।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিত্যানন্দ, ডাক নাম নিতাই, নিমাইয়ের চেয়ে আট-নয় বছরের বড়। জন্ম বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে। বাপের নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা, মায়ের নাম পদ্মাবতী।

ব্রজের যে বলরাম সেই নিত্যানন্দ। শ্রীকৃষ্ণের বলরামকে চাই। তেমনি নিমাইয়ের নিত্যানন্দকে প্রয়োজন। বলরাম যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস তেমনি নিত্যানন্দ নিমাইয়ের। 'নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ।' নিত্যানন্দ নিমাইয়েরই আবির্ভাব-বিশেষ। 'সাক্ষাৎ হলধর।'

'ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগত-আনন্দ ॥'

সূর্য কী করে? অন্ধকার হরণ করে। আর প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত করে। তেমনি নিমাই-নিতাই দুভাই কী করে? অজ্ঞান হরণ করে। অজ্ঞান কী? তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কী? শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য আর কৃষ্ণসেবা শুধু কৃষ্ণেরই প্রীতির জন্যে, এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। আর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যে বাসনা, যার লক্ষ্য শুধু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি, তাই অজ্ঞান। সংক্ষেপে, কৃষ্ণভক্তি-কামনা ছাড়া অন্য কামনাই অজ্ঞান।

এই অজ্ঞানের নাম কৈতব। কৈতব মানে আত্মবঞ্চনা। জীব যখন ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চায় তখনই সে নিজেকে প্রতারণা করে। নিত্য-শাশ্বত সুখ শুধু কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণভক্তিতে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, ততক্ষণ ভক্তি অনুপস্থিত।

মোক্ষবাসনাই শ্রেষ্ঠকৈতব। মায়াধীন জীব যদি নিজেকে মায়াধীশ ঈশ্বর মনে করে, তাহলে আর ভক্তি থাকে না, সেব্য-সেবকত্ব থাকে না। শুভাশুভ কর্মও কৃষ্ণভক্তির বাধক। শুভকর্মের প্রেরণাও আত্মসুখের বাসনা, আর পাপকর্মের উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিতে সুখবাসনার লেশ নেই।

সেই অজ্ঞান নাশ করে দু-ভাই—নিমাই-নিতাই। শুধু অজ্ঞানই নাশ করেনা, প্রচ্ছন্নবস্তু, তত্ত্ববস্তুকেও প্রকাশ করে। তত্ত্ববস্তু কী? তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি আর নামকীর্তন। আর এ তত্ত্ববস্তুই আনন্দস্বরূপ।

কৃষ্ণভক্তির তিন স্তর। সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি আর প্রেমভক্তি। আর প্রেমভক্তিই প্রগাঢ়তমা।

দু ভাই আর কী করে? দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। দুই ভাগবত কী? এক ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্ত। 'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥' ভাগবতসঙ্গ করিয়ে নিমাই-নিতাই ভক্তের বশীভূত হয়ে থাকে। ভক্তের কাছে ভগবানের স্বাতন্ত্র্য কই? ভক্তই ভগবানের হৃদয়, ভগবানও ভক্তের হৃদয়।

সূর্য-চন্দ্র একসঙ্গে ওঠেনা আকাশে। কিন্তু নিমাই-নিতাই একসঙ্গে উঠেছে—"সমকালে দোঁহার প্রকাশ।" আর সূর্য-চন্দ্র কি গিরিগুহার অন্ধকার দূর করতে পারে? পারে না। কিন্তু নিমাই-নিতাই মানুষের চিত্তগুহার অন্ধকার ক্ষালন করে। দুই ভাই "হৃদয়ের ক্ষালে অন্ধকার।"

নবদ্বীপে গৌরের যেদিন জন্ম হল, সেদিন একচক্রায় নিতাই হুঙ্কার করে উঠল। কেউ ভাবল বজ্রপাত হল বুঝি। কেউ ভাবল বা কামানের গর্জন। কোথায়, কতদূরে?

শিশুকালে ভগবৎলীলার খেলা খেলে নিতাই। বসুদেব দেবকীর বিয়ে দেয়। কারাগার তৈরি করে সকলে মিলে ঘুমোয়, বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে আসে। শকট তৈরি করে তা আবার ভেঙে ফেলে। অন্যান্য শিশুদের বক, অঘ, ধেনুক সাজিয়ে কৃষ্ণরূপে তাদের নিধন করে। কোনোদিন বা আঙুলে করে পাহাড় তুলে ধরার কসরৎ দেখায়। এত সব কৃষ্ণবাললীলা শিখল কোথায়, কে বলবে?

[illegible] খেলা খেলে। [illegible]

লীলা করে। কোনো দিন বা শক্তিশেলের আঘাতে মূর্ছা যায়। হনুমানকে দিয়ে গন্ধমাদন আনিয়ে ওষুধ খেয়ে উঠে বসে। রাবণকে মেরে বিভীষণকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করে। দেশে গিয়ে চার ভাই একত্র হয়।

নিতাইয়ের বয়েস যখন বারো, তখন বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত।

নিতাইকে দেখে তার চমক লাগল। তার বাপ হাড়াইকে জিজ্ঞেস করল,—'কে এ?'

'আমার ছেলে।'

'নাম কী?'

'কুবের।'

হাসল সন্ন্যাসী। বললে, 'এ সদানন্দ শিশু আর নিত্যের প্রতি অভিমুখী, সুতরাং এ-ছেলের নাম নিত্যানন্দ।'

রাত্রে অতিথি হল সন্ন্যাসী। সকালে উঠে হাড়াইকে বললে, 'আমি একটি ভিক্ষে চাই।'

'কী চাই বলুন?'

'দেবে?'

'দেব।'

'তোমার এই ছেলেটিকে চাই। চিরকালের জন্যে নয়, কিছু দিনের জন্যে। কিছুদিন পরে আবার ও ফিরে আসবে।'

হাড়াই পণ্ডিত কথা রাখল। পদ্মাবতীও বাধা দিলনা।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিতাই বেরুল তীর্থভ্রমণে। প্রথমে বক্রেশ্বর, সেখান থেকে বৈদ্যনাথ, সেখান থেকে গয়া হয়ে কাশী, শিবরাজধানী। গঙ্গা দেখে বড় খুশি নিতাই, স্নান করে, পান করে, তবু যেন আর্তি যায়না। সেখান থেকে প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে পূর্বজন্মস্থান মথুরায়। যমুনার বিশ্রামঘাটে জলকেলি করে, গোবর্ধনপর্বতে গিয়ে বসে থাকে। দ্বাদশবন পরিক্রমা করে বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদে। কোথায় কৃষ্ণ? সন্ন্যাসী কিছু বুঝতে পারেনা—কেন এই কান্না? কী করে বুঝবে? সে তো ভক্তির পথের যাত্রী নয়।

নিতাই অবধূত সেজেছে। কিন্তু শিবকে বুকে নিলেও হৃদয়ে বাসুদেব।

তারপরে হস্তিনাপুর। 'বলরামকীর্তি দেখি হস্তিনানগরে। ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে।'

সেখান থেকে দ্বারকায়। তারপরে প্রভাস, নৈমিষারণ্য হয়ে অযোধ্যায়। সেখান থেকে গঙ্গাজন্মভূমি হরিদ্বার। তারপর ঘুরতে ঘুরতে দ্রাবিড়ে, দক্ষিণে। আবার—উত্তরে বদরিকাশ্রমে। এমনি তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে ঘুরতে লাগল নিতাই। 'নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ। ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস॥'

একদিন স্বামী শঙ্করারণ্যের সঙ্গে দেখা। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে। কী তার পূর্বাশ্রমের নাম-ঠিকানা জানতে চাইল নিতাই। শঙ্করারণ্য বললে, পূর্বাশ্রমে তার নাম ছিল বিশ্বরূপ, বাড়ি নবদ্বীপ। জগন্নাথ মিশ্র তার পিতা আর তার একটি ভাই আছে, নাম বিশ্বম্ভর, ডাকে সবাই নিমাই বলে। কেউ বা বলে গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ। যদি যাও কোনোদিন নবদ্বীপে তাকে দেখে এস।

অমিয়া মথিয়া কে বা লবনি তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কে বা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ॥

পরে দেখা মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে। যার কৃষ্ণরস-বিনা আহার নেই, কৃষ্ণের বিহার যার দেহে-মনে। ভক্তিরসের যে আদিম সূত্রধার। আকাশে মেঘ দেখলেই যে অচেতন হয়, কৃষ্ণপ্রেমে যে মদ্যপের মত ব্যবহার করে। পরস্পর পরস্পরকে দেখে প্রেমে নিস্পন্দ হয়ে গেল, কাঁদতে বসল গলা ধরে। ঈশ্বরপুরী ও অন্যান্য শিষ্যরাও কাঁদতে লাগল।

নিত্যানন্দ বললে, 'যত তীর্থ করলাম এতদিন তার সম্যক ফল আজ মিলল। প্রেমময় কলেবর মাধবেন্দ্রকে দেখলাম। দেখলাম প্রেম কাকে বলে।'

মাধবেন্দ্র বললে, 'কৃষ্ণ যে আমার প্রতি কৃপালু তা এতদিনে বুঝলাম, নিত্যানন্দের মত তিনি বন্ধু জুটিয়ে দিলেন। যেখানে নিত্যানন্দের প্রেম সেখানেই সর্বতীর্থময় বৈকুণ্ঠ।'

কৃষ্ণনামে যার অনুরাগ হয়েছে তার চিত্তে আর কৌটিল্য নেই, কাঠিন্য নেই। সে দ্রুতচিত্ত অর্থাৎ তার চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছে। সে তখন 'উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।' লোকে কী বলবে—এর আর সে ধার ধারে না, সে তখন উন্মাদের মত নাচে, হাসে, কাঁদে, গান গায়, আর্তনাদ করে। বাজিকরের হাতে যেমন পুতুল তেমনি অনুরাগের হাতে ভক্তটি।

"সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥"

মাধবেন্দ্রের সঙ্গ করে কত দিন চলে গেল খেয়াল নেই—নিতাই চলল সেতুবন্ধ। ধনুতীর্থে স্নান করে পৌঁছুল রামেশ্বরে। সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে নীলাচলচন্দ্রের নগরে। ধ্বজা দেখেই মূর্ছা গেল। আবার জগন্নাথকে দেখে মূর্ছা।

নীলাচল থেকে গঙ্গাসাগর। আবাব সেখান থেকে পুনর্বার মথুরায়। হাঁটতে-হাঁটতে বৃন্দাবন।

সেখানে আবার ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে দেখা।

'এখানে কাকে এত খুঁজছ?' জিগগেস করল ঈশ্বর।

'জানোনা কাকে? সেই কোটিমদনবিমোহন অখিললক্ষ্মীচিত্তহারী কৃষ্ণকে।' বললে নিতাই।

'সে এখানে কোথায়?' বললে ঈশ্বর। 'সে নবদ্বীপে।'

'নাম কী?'

'নিমাই পণ্ডিত।'

'কার ঘর?'

'শচীমাতার ঘর।'

'আমি জানি। প্রভুর প্রকাশ হয়েছে নবদ্বীপে।'

আর কথা নেই। নবদ্বীপের দিকে ছুটল নিতাই।

নিমাই পণ্ডিতের কোন্ বাড়ি? জ্যৈষ্ঠের রোদ মাথায় করে পথ দিয়ে হাঁটছে নিতাই আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করছে,—নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায়?

সবাই দেখিয়ে দিচ্ছে পথ, নিতাই শেষ পর্যন্ত নিমাইয়ের বাড়িতে না গিয়ে উঠল এসে নন্দন আচার্যের ঘরে।

'গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি,' সঙ্গীদের বলছে নিমাই, 'আমার বাড়িতে এক রথ এসে দাঁড়িয়েছে। রথ থেকে নামল এক মহাপুরুষ, প্রকাণ্ড শরীর, কাঁধের উপর বিশাল এক স্তম্ভ। পরনে নীলাম্বর, মাথায়ও নীলবস্ত্র বাঁধা। অবধূতের বেশ, তেজস্কর মূর্তি। প্রবল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আমাকে, এটা কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি? আমি বললুম, 'তুমি কে? কোন মহাজন?' সন্ন্যাসী বললে, 'ভাই হয়ে ভাইকে চিনতে পাচ্ছ না? বেশ, কাল পরিচয় হবে।' নিমাই তাকাল সঙ্গীদের দিকে। 'তোমরা যাও, মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে এস। নিশ্চয়ই সে এসেছে নবদ্বীপ, আত্মগোপন করে আছে।'

বলতে বলতেই বলরামের আবেশ এল নিমাইয়ের, সে গর্জন করে উঠল, 'মদ আনো, মদ আনো।'

সঙ্গীরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ কী বলছে নিমাই? মদ পাব কোথায়? মদ দিয়ে কী হবে? নিমাই খাবে? খাওয়াবে সকলকে?

শ্রীবাস বললে, 'প্রভু, মদ তো তোমার কাছে।'

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, সেই মদের মালিক তুমি। আর সেই মদিরার নাম প্রেম।'

হাসতে লাগল নিমাই।

শ্রীবাস বললে, 'অন্য লোক সে মদের নাগাল পাবে কি করে যদি তুমি না বিতরণ করো।' 'তুমি যাকে বিলোও সেই সে তারে পায়।'

"আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন। আপন বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিস্মরণ॥' শুধু তোমার দয়া, তুমি সেই মদগন্ধেই মাতোয়ারা করে দিতে পারো। আর যদি আস্বাদের অধিকারী হতে দাও, তা হলে তো কথাই নেই, উচ্ছিষ্টই আমার মহাপ্রসাদ।

হে আর্তবান্ধব, আমাদের কথা শোনো। তুমিই তো একমাত্র নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, তুমিই তো কৃপালু। আর পরদুঃখ বিমোচনের ইচ্ছাই তো কৃপা। কিন্তু তুমি তো দেখছি বাঁশি বাজাতে ব্যস্ত। তোমার মধুর মুরলীরবে তুমি নিজেই বিভোর। সেই সুধা-লহরী ভেদ করে আমাদের আর্তনাদ কি তোমার কানে পৌঁছুবে? কই আর পৌঁছুচ্ছে? অবিদ্যার প্রভাবে আর্তি যে ঠিক ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কিন্তু তুমি তো কৃপাময়, সর্বশ্রুতিমান, সর্বরক্ষণে সমর্থ। সুতরাং বিশ্বাস করে আছি, তুমি শুনবে। তোমার কাছে আমাদের ক্ষীণস্বরও গ্রাহ্য।

নিমাই সঙ্গীদের বললে, 'তোমরা ঘুরে-ঘুরে দেখ, খোঁজ করো, কোথায় সেই মহাপুরুষ আশ্রয় নিয়েছেন।'

নন্দন আচার্যের ঘরে নিতাই উন্মুখ হয়ে মুহূর্ত গুণছে।

হে ভুবনৈকবন্ধো, হে করুণৈকসিন্ধো, তুমি কোথায়? অধরবিম্বে মধুর, মন্দ হাসে মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃষ্টিপাতে শীতল, অরুণনেত্রে বিপুল, বেণুধ্বনিতে বিশ্রুত—হে মরকতমণিনীল নবকিশোর, কবে দেখব তোমাকে?

ফিরে এল নিমাইয়ের সঙ্গীরা, মুরারি মুকুন্দ

শ্রীবাস আর নারায়ণ। বললে, 'নগর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও মহাপুরুষের দেখা পেলাম না।'

'সব বাড়ি খুঁজেছ?'

'সব। বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, কোনো ঘরই বাদ দিইনি। এমন কি পাষণ্ডীদের ঘরও দেখে এসেছি। কোথাও কেউ নেই।'

মনে মনে হাসল নিমাই। "বড় গূঢ় নিত্যানন্দ।" "দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ।"

'তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।
তেঁহো যার অংশ—সেই নিত্যানন্দ রাম॥'

যিনি সকলের আশ্রয়, সকলের অধ্যক্ষ, সকলের আশ্চর্য, বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ তাঁরই অংশ। আর সেই সঙ্কর্ষণই বলরাম। আর সেই বলরামই নিত্যানন্দ।

ত্রেতায় আবার সেই ছিল লক্ষ্মণ। আগে ছোট ভাই, এবারে বড়। ছোট-বড় দুই হয়েই কৃষ্ণের সেবা।

'নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বে হইলা লক্ষ্মণ।
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥'

নিমাই বললে, 'চলো আমিও যাই। আরেকবার খুঁজি।'

তাই চলো।

নিমাই সোজা নন্দন আচার্য্যের ঘরের দিকে রওনা হল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?' অনুগামীরা প্রশ্ন করল।

'চতুর্ভুজ পণ্ডিতের ছেলে, আমার কীর্তনের সঙ্গী, নন্দন আচার্য্যের বাড়ি।' নিমাই তাকাল ভক্তদের দিকে। 'খোঁজ করেছিলে ওখানে?'

ভক্তবৃন্দ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বাড়ির ভিতরে ঢুকে সবাই দেখল বিশালবপু এক সন্ন্যাসী বসে আছে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নলিননেত্র, জ্যোতিষ্মান মধুর মূর্তি। মাথায় নীলবস্ত্র, পরিধানেও নীলাম্বর। আনন ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, সদাহাস্যপ্রসন্ন।

নিমাই চিনল। এই তো সেই তার স্বপ্নের মহাপুরুষ। তার 'প্রাণের ঈশ্বর', নিত্য আনন্দের উৎসার, নিত্যানন্দ।

আর নিতাই এ কাকে দেখছে? দণ্ড নেই, কমণ্ডলু নেই, পরণে ডোর কৌপীন নেই, নাগরবেশে এ কে মাধুর্যবারিধি! কে এই সর্বপ্লাবক উচ্ছলিত সুধা! নিতাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে।

'রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ।
এইমত নিত্যানন্দ হইল স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত॥'

নিমাই শ্রীবাসকে বললে, 'ভাগবতের একটি বচন পড়ো।'

শ্রীবাস তখুনি কৃষ্ণবর্ণনার এক শ্লোক পড়ল;

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং॥
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ॥

নটবরসুন্দর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছে। তার মাথায় শিখিপুচ্ছ, উভয়কর্ণে কর্ণিকার—ফুল, পরনে পীত নীল বস্ত্র, গলায় বৈজয়ন্তী। অধর-সুধায় বেণুর ছিদ্রগুলো ভরে ভরে দিচ্ছে। আর যেখানেই পা রাখছে সেখানেই চরণচিহ্ন জাগছে রতি প্রীতি আনন্দ।

শ্লোক শুনেই নিতাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। যদি বা জ্ঞান হল, কাঁদতে লাগল, ধূলিতলে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অদ্ভুত কৃষ্ণোন্মাদ আনন্দে লাফাতে লাগল। সাধ্যি নেই কেউ তাকে ধরে রাখে। তখন কী হল? তখন নিমাই এগিয়ে গিয়ে স্পর্শ করল নিতাইকে।

স্পর্শ করতেই নিতাই নিস্পন্দ হয়ে গেল। আর নিমাই তখুনি তাকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। আর কাঁদতে লাগল অনর্গল।

ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যেহেন রামকোলে॥

নিতাইও অশ্রুবিহ্বল। আর অনুচরেরা? তারা নিত্যানন্দময়। 'যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর। আজি তাঁর গর্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর॥'

কতক্ষণ পরে দুই ভাই শান্ত হয়ে বসল। নিমাই বললে, 'আজ আমার জন্ম সার্থক, ভক্তি কাকে বলে দেখলাম স্বচক্ষে। এই কম্প আর অশ্রু, আর এই গর্জন-হুঙ্কার ঈশ্বরশক্তি ছাড়া হবার নয়। তুমিই মূর্তিমন্ত কৃষ্ণপ্রেম। তোমাকে ভজনা করলেই জীবের কৃষ্ণভক্তি মিলবে। তোমার তিলার্ধ যে সঙ্গ করবে তার পাপের বাষ্প পর্যন্ত থাকবেনা। তোমাকে যখন মিলিয়ে দিলেন, তখন আর ভয় নেই, কৃষ্ণ উদ্ধার করবেন আমাকে। তুমি চতুর্দশ ভুবন পবিত্র করতে

পারো, আমি তো কোন্ ছার। আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী। আমাকেও দাও কৃষ্ণপ্রেম।'

স্তুতি শুনে লজ্জিত হল নিমাই। বিনম্রবচনে বলতে লাগল, 'অনেক তীর্থ ঘুরে আসছি। যত কৃষ্ণস্থান আছে দেখেছি। স্থানমাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখি কই? সবাইকে জিগগেস করি, কৃষ্ণের সিংহাসন পড়ে আছে, কৃষ্ণ কোথায়? কোন্ দেশে পালাল? 'কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত?' কেউ কেউ বললে, কৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়েছে। তাই এখানে এসেছি। শুনেছি নবদ্বীপে পতিতের ত্রাণ হবে এবার, তাই, আমি পাতকী, ছুটে এসেছি এখানে।'

ভক্ত অনুগামীর দল দেখতে লাগল দুজনকে। কেউ বললে, মাধব-শঙ্কর। কেউ বললে, কৃষ্ণ-বলরাম। যেন দুজনের কতদিনের নিগূঢ় পরিচয়। ঠারে-ঠোরে তাই আলাপ করছে দুজনে। সাধ্য কি তার এক বর্ণও কেউ বোঝে!

নিতাই বলছে, কানাই, তোর চূড়া কই, বাঁশি কই?

নিমাই বলছে, কই বা তোমার লাঙল-গরু? ব্রজের খেলা দৌড়োদৌড়ি, নদের খেলা গড়াগড়ি।

নিতাই বলছে, ব্রজের খেলা বাঁশির তান।

নিমাই বলছে, নদের খেলা হরিগান।

'ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া।' বলছে নিতাই।

'নদের বেশ কৌপীন পরা।' বলছে নিমাই।

কেহো বলে 'দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয়॥'

'এবার উঠুন।' নিমাই নিত্যানন্দকে বললে। 'নবদ্বীপের প্রতি যে আপনার করুণা হয়েছে, এই আমাদের মহাভাগ্য।'

ভূমিতল থেকে উঠে দাঁড়াল নিতাই। চলল নিমাইয়ের পিছে পিছে।

নিমাই বললে, 'কাল আষাঢ়-পূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা। ভগবান ব্যাসের আবির্ভাব-তিথি। আপনার ব্যাস-পূজা কোথায় হবে?'

নিমাইয়ের কাছ থেকেই অগোচরে ইঙ্গিত পেল নিতাই। শ্রীবাসকে দেখিয়ে বললে, 'আমার ব্যাসপূজা এই বামুনের ঘরে হবে।'

'কি হে শ্রীবাস, তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?' নিমাই জিগগেস করল।

'না, না, অসুবিধে কী?' 'তোমার উপর বোঝা চাপানো হবে।'

'না, না, সমস্ত ঘৃত-দুগ্ধ আমার বাড়িতে আছে।' বললে শ্রীবাস, 'একমাত্র পূজার পদ্ধতি আমার জানা নেই। কারু কাছ থেকে চেয়ে আনব পুঁথি। বরং এ তো আমার ভাগ্য। সন্ন্যেসীর ব্যাসপূজা দেখব। আগে দেখিনি কোনোদিন।'

সকলে তখন শ্রীবাসের বাড়ি গেল।

নিমাই বললে, 'কপাট দাও। কীর্তন সুরু করো। ব্যাসপূজার অধিবাসের উল্লাস কীর্তন।'

সন্ধে হয়েছে। সমবেত কণ্ঠে কীর্তন উঠল। হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল নিমাই-নিতাই।

কখনো বা কাঁদছে, কোলাকুলি করছে, কখনো বা পরস্পরের পা ধরতে চাইছে। কখনো গর্জন, কখনো রোদন, কখনো মূর্ছা। কখনো বা উল্লাসে মহামত্ত।

বলরাম ভাব ধরল নিমাই। বিষ্ণুখট্টায় গিয়ে বসল। নিতাইকে বললে, 'আমাকে হল মুষল দাও।'

হাত পাতল নিমাই। নিতাই যেন অলক্ষ্যে কী দিল হাতে করে। কেউ-কেউ দেখল স্পষ্ট হল আর মুষল দিল নিত্যানন্দ।

হঠাৎ আবার গর্জন করে উঠল নিমাই, 'মদ আনো, মদ আনো।'

শ্রীবাস একপাত্র গঙ্গাজল এগিয়ে দিল। তাই যেন মদ, তেমনি করে আনন্দবিভোর হয়ে খেল নিমাই।

সহসা আবার হুঙ্কার করে উঠল। 'নাড়া কই? আমার নিত্যানন্দ এসেছেন, নাড়া এখনো আসছে না কেন?'

'কে নাড়া?'

'নাড়াকে চেননা? অদ্বৈত আচার্যকে আমি নাড়া বলে ডাকি। সেই তো আমাকে ডেকে এনেছে বৈকুণ্ঠ থেকে। সে কি এখন আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে শান্তিপুরে? তাকে ডেকে নিয়ে এস। আমি যে ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার করে বেড়াব। দীনহীনকে বিলাব হরিভক্তি! নাড়া না এলে আমার বোলকলা পূর্ণ হবে কী করে?'

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে নিমাই বললে, 'আমি কিছু চাপল্য করেছি? কিছু কি প্রলাপ বকেছি?'

'না, না' সবাই আশ্বস্ত করল নিমাইকে, 'তুমি যেমন ছিলে তেমনিই আছ।'

'আমি বালক, আমার কোনো অপরাধ নিওনা।'

'তুমি কমনীয় কিশোর।' [ক্রমশঃ

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৮। মালার স্পর্শ। এ যেন রম্যতম স্পর্শ··নবীন ঘনশ্যামের। স্পর্শের সে কী অনির্ব্বচনীয় কোমলতা, কী আনন্দিত সৌরভ। বৃষভানু-নন্দিনীর মনে হল তাঁর মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ আনন্দ। সে আনন্দ যেন ফুটে বেরিয়ে এল পুলকাঞ্চিত কপোলে, আকুল হয়ে উঠল অলকে, ভেসে উঠল অশ্রুতে, হেলে পড়ল লজ্জায়, ধরা পড়ে গেল মধুর অধর-কিশলয়ের হাসিতে।

আনন্দের সেই গুচ্ছগুলিকে সত্বর তিরস্কার করতে গেলেন বৃষভানুনন্দিনী, কিন্তু কী যেন কি হঠাৎ ঘটে গেল তাঁর সত্তায়। এ সুখের দশা···আগে কখনও দেখেননি তাঁর সখীরা। এ এক অপরিচিতা দশা। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন "বকুলমালা"কে।"

ললিতা বলে উঠলেন—

"শ্যামা, বকুলমালা দুটিরই কেবল যে নামে সাম্য রয়েছে, গুণে সাম্য রয়েছে, তা নয়, সৌভাগ্যেও দেখছি সাম্য রয়েছে। দুটিকেই প্রীত করেছে কৃষ্ণের করস্পর্শ; দুটিই লগ্ন হয়ে রয়েছে রাধিকার কণ্ঠের উপকণ্ঠে;

> দুটিই গুণবতী,
> দুটিই সুকুমারী,
> দুটিতেই রয়েছে মর্দ্দিত গন্ধ।"

শ্যামা বললেন—

"ললিতে, লালিত্য দেখালে বটে ভনিতায়।"

২৯। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীরাধার ধাত্রী—"সুচরিতা"। শ্রীরাধাকে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে পাঠিয়েছেন পিতৃদেব ভানুসম তেজস্বী শ্রী "বৃষভানু"।

কারণ: তিনি মনস্থ করেছেন যথাবিহিত নীতিবিনীতি বিদগ্ধতাপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করবেন সপরিবার ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে; অতএব এই মহোৎসবের ব্যাপারে, এই অপূর্ব কমনীয়তার ব্যাপারে, সখীদের সুখের আরাধনা নিয়ে সত্বর পৌঁছতে হবে রাধাকে; কারণ, রাধা তাঁর কাছে সুরস-রন্ধন-কৌশল ও নবনবায়মান রন্ধন-চাতুর্য্যের মূর্ত্তিমতী তুরীয়-দশা।

৩০। ধাত্রী সুচরিতা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিয়ে শেষে বললেন—

"শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনেরাও আপনাকে বাপের বাড়ী যেতে অনুজ্ঞা দিয়েছেন, এবং জানিয়েছেন তাঁদের অনুমতি গ্রহণের জন্য আর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। অতএব চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। না নড়লে আমি নড়ছিনা! শ্রীবৃষভানু আরও আদেশ দিয়েছেন, "হে শ্যামা, মিথ্যে আলস্য ত্যাগ করে, সহেলিয়াদের সঙ্গে নিয়ে চলে এস। রাধার মন কন্নিয়ে নিয়ে এলেই ভাল হয়।'··· আর···

হে বিশাখে, ললিতা বড় গুণী মেয়ে, তাকেও সঙ্গে নিয়ে তুমি এস।"

সুচরিতার বাচন-ভঙ্গিমায় আনন্দে হেসে উঠলেন ললিতা। বল্লেন—

"সুচরিতা, হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ মহোৎসবের আয়োজন হল কেন?"

সুচরিতা বললেন—

"আকস্মিক নয়। জানেনই তো, সেদিন ব্রজভূমে অতিথি হয়ে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ব্রজরাজ নিমন্ত্রণ করেছিলেন আপামর সাধারণকে। সেই দিনই রাধিকার পিতারও মনে জেগেছিল একটি সুন্দর পরিকল্পনা,—কেমন হয়, যদি নিমন্ত্রণ করি, স-দার স-কুমার স-পরিবার ঘোষাধীশকে? তাই, এই প্রচণ্ড মহোৎসবের ব্যবস্থা।

৩১। গুণ-সারাধিকা রাধিকাকে শ্যামাদেবী তখন বললেন, "মস্ত বড় কৌতুকের ব্যাপার হবে দেখছি। এমন ভুবন-রঞ্জন ব্যাপার না দেখলেই নয়। বিশেষ করে পিতৃস্থানীয়দের আজ্ঞা যখন এসেই গেছে তখন,···উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন।"

ভানুভবন বৃষভানু ভবনে যখন সকলে উপস্থিত হলেন, তখন বৃষভানুর মনে হল···মূর্ত্তিমতী মহোৎসব-লক্ষ্মী যেন প্রবেশ করলেন তাঁর ঘরে।

৩২। রাধা এলেন পিতৃগৃহে। "কেমন আছিস্, ভাল আছিস্ তো?—শুভাগমনের আশীর্ব্বাদান্তে মস্তক আঘ্রাণ করলেন পিতৃদেব। তৎক্ষণে প্রণাম সেরে ফেললেন রাধা। বৃষভানু বললেন—"তোর হাতের রান্না বড় উপাদেয়। এবার রন্ধনের অপূর্ব কমনীয়তার কৌশল দেখিয়ে সার্থক কর তোর হাত। আগামী কাল নিমন্ত্রিত হয়ে ঘোষেশ্বর আসছেন আমাদের বাড়ীতে, স-পত্নীক, স-সুত, স-রাম। তাঁরা ভোজন করবেন।"

৩৩। ললিতা বললেন—

"তাত, রন্ধনের উপকরণ সব প্রস্তুত রয়েছে তো?"

উত্তর দিলেন বৃষভানু,—

"বহুদিন থেকেই রয়েছে। নানান কৌশলে সর্ব্বপ্রকার উপকরণই সংগ্রহ করা হয়েছে। অনন্ত যা অনন্ত।

আজই যে কেবল হয়েছে, বা খেলাচ্ছলে হয়েছে, তা নয়। তোমরা গুভবতীরা ভিতরে যাও, গিয়ে দেখ কোনটা হয়েছে, কোনটা হয়নি, কোনটা পদার্থ, কোনটা অপদার্থ, আরও যদি কিছু আনাতে হয় দেরী কোরো না যেন বলতে।"

৩৪। বাক্যের শেষ হতে না হতেই এক-রাশ বিদ্যুতের মত হর্ষের বিরামহীন ঝিলিক্ হানতে হানতে কলাবতীরা প্রবেশ করলেন অন্দর-মহলে। রাধার জননীকে প্রণাম করলেন সকলে। সদা-হাস্যময়ী জননী। তাঁকে দেখলেই স্ফূর্ত্তি ফোটে মনে। প্রণাম করেই তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। যারা বাড়ীখানায় কে যেন উজাড় করে রেখে দিয়েছে বিশ্বের কমনীয়তা। আর সামগ্রীর সমগ্রতা। নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন সকলে।

৩৫। এদিকে তখন বন থেকে ফিরছেন নওল-কিশোর। নরকাসুরের শত্রু যিনি, ধেনু চরিয়ে ফিরছেন তিনি ভবনে। নিত্যনবীন, নিষ্কপট। ব্রজের পথে পথে কুড়িয়ে নিচ্ছেন হাজার কটাক্ষের নীলপদ্মের পুজো। ফিরতেই ব্রজেশ্বর তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে গেলেন, মধুকণ্ঠে বললেন—

"কৃষ্ণ, বৃষভানু এসেছিলেন। বৎসরাবধি আশা পোষণ করে রেখেছিলেন আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবেন তাঁর ভবনে। শ্রী-আদি অনুচরদের পরামর্শও নিয়েছিলেন। জানই তো, তাঁর তুল্য গোধন কারও নেই। তোমাকেও নিমন্ত্রণ করে গেছেন আগামী কাল। যেতে হবে, তাঁর প্রণয় সফল করতে হবে। তুমি তৈরী থেকো।"

৩৬। মা যশোদা সেখানে এসে গিয়েছিলেন। যেই তিনি বলে উঠেছেন—

"ব্রজের কাছেই তোমার সহচরেরা চরাবে ধেনুর পাল। রক্ষা করতে তোমাকে আর কাল যেতে হবে না।"

অমনি মাত্রাহীন করুণায় যেন বিগলিত হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ; বললেন—

"এ আবার কি মা! নিমন্ত্রণ খেতে একলা যাব? সহচরেরা বাদ পড়বে?··কাজ নেই মা আমার অমন নিমন্ত্রণে গিয়ে।"

ছেলের মুখে এ তো অন্যায় কথা নয়! লোক-রীতিজ্ঞা জননী তাই বললেন—

৩৭। "অত গরম হতে নেই গোপাল। তোর ঐ এক হয়েছে, সব ছেড়ে দিয়ে সহচরদের নিয়ে মাতামাতি। যদি এতই প্রণয়, তবে তাদের নিয়েই থাক।"

মায়ের মুখ-ঝামটা খেয়ে, যিনি নিখিল ভুবনের উপদ্রব খণ্ডান, তাঁকেও থামতে হল, বন-বিহার থেকে নিবর্ত্তন করাতে হল মনটিকে; এবং সেটিকে প্রবর্ত্তন করাতে হল সেইখানে, যেখানে কর্ম্ম-কর্ত্তা শ্রীবৃষভানু নিজের দুহিতা শ্রীরাধাকে দিয়ে রন্ধন-পর্ব্বে ব্যস্ত। যে নাম নিত্য জপেন মনে মনে, সে নাম মনে আসতেই উদয় হল এক অনির্ব্বচনীয় প্রণয়ের। নিমন্ত্রণও এত সরস হয়!

৩৮। ভোর হল। ব্রজরাণীর মণি নিশান্তে সানন্দে সমাগতা হলেন বৃষভানুর পুরন্ধ্রীগণ। তাঁরা এলেন, নিশান্তের কিরণাবলীর মত ভাস্বর। সাদর অভ্যর্থনায় তাঁরা প্রীতিনম্রা হলেন লজ্জায়। তারপরে বৃদ্ধ যোগহীন ভাষায় বললেন—

"ব্রজেশ্বরি, আপনি ঈশ্বরী। তবু অবধান করুন রাধিকা-জনকের স্বার্থসারাধিকা বাণী।

তিনি বলেছেন—

"আপনার বাৎসল্য-লতায় এত ফুল ফুটেছে আর ফুলের গন্ধে এত ভরে উঠেছে আপনার জীবনী, যে বাক্যের ঈশ্বরীরও অসাধ্য পূর্ণস্তুতি করা আপনার। অতএব সংসারের তীব্র যাতনাকে হরিভক্তি যেমন করে খণ্ডন করে, তেমনি আমার গৃহে আজ পদার্পণ করে আপনিও খণ্ডন করুন গৃহের আপদ। সত্বর আসুন এবং আশা করি সঙ্গে নিয়ে আসবেন ব্রজরাজকে, পুত্রকে, পরিজনদের এবং সপুত্র শ্রীরোহিণী দেবীকে। আপনার করুণায় কল্যাণ হোক বৃষভানুর।··আমার গৃহেই আজ আপনাদের সকলকে শুভানুষ্ঠান করতে হবে অভ্যঙ্গ—উদ্বর্তন—স্নানাদি কর্ম্মের। অতএব নিবেদন,··· ত্বরিত শুভাগমন।"

৩৯। ত্বরিত ও সাদর উত্তর দিলেন ব্রজরাণী—

"আর্য্যারা এত বাড়িয়ে তুলেছেন বিনয়-মাহাত্ম্য যে তাঁরাই শেষ পর্য্যন্ত লাভ করে নিলেন বিনয়-মাহাত্ম্য। আপনারা আসুন। বৃষভানুর অগাধ বিনয় ও সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আশা করি তাঁর নির্দ্দেশ পালনীয় হবে।"

৪০। সূর্য্যের কাছে প্রার্থনা করে বৃষভানু যেমনটি চেয়েছিলেন, দেখতে দেখতে ঠিক তেমনিই চতুর্দ্দিকে সংগৃহীত ও সজ্জিত হয়ে গেল ঘোষাধীশের অভ্যর্থনা-মঙ্গল চারু উপচার। কার্যকুশলীর পক্ষে সকলি সম্ভব। পুরতোরণের পুরোভাগে পথের দিকে চেয়ে বসে রইলেন বৃষভানু। মহারাজ আসবেন,···পথের শোভায় তাই একটুকু নেই মালিন্যের লেশ, রুণ্ রুণ্ করে বাজছে কিঙ্কিনী-জালের মাল্য, শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণ কলসের শিখরে শিখরে নাচছে নবীন কিশলয়, মঙ্গল-নায়ক নারিকেল ফলের সবৃন্ত বিন্যাসে অমন্দ দীপ-শিখার অনন্ত বাহার। পথের দুপাশে ফলন্ত সুপারীর গাছ আর তরুণ রম্ভার স্তম্ভ, তাদের নিবিড় ও অভয়-বিন্যাসে অন্তর্গমিত হয়েছে ভাস্কর-কর। মৃদু মৃদু বাজছে মৃদঙ্গ, স্তব-সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে পণবাদি বাদিত্র। কিছুকাল পরেই বৃষভানুর অপেক্ষমান নয়নের উৎসবই যেন দেখতে পেল,—

প্রথমেই শ্রীব্রজরাজ-কিশোর আসছেন।

সহচরগণ সহিতে তিনি আসছেন···ভুবনমঙ্গলের যেন গণ-রাজ। বিদ্যুৎ খেলিয়ে তাঁর অঙ্গে ঝলমল করছে কনকবাস। নাগরঙ্গের পুষ্পিত গরিমার গাম্ভীর্যের মত ঐ যে আভীরের দল,···তাঁদের ধ্যানের ধন···মাটিতে ঐ চরণ—ফেলে ফেলে তিনি আসছেন। আর তাঁর পরেই আসছেন ব্রজরাজ-মহিষী। আহা, এতটুকুও ছলাকলার বালাই নেই তাঁর···বহু পরিবার পরিবৃতা হয়ে তিনি আসছেন। আর তাঁর পরেই আসছেন ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দ। তাঁর প্রত্যেকটি পরিজন যেন ভূমণ্ডলের সৌভাগ্য-সার। রাজ-দর্শনে উল্লসিত হয়ে উঠেছে জনতা।

৪১। দ্রুতচরণে এগিয়ে গেলেন বৃষভানু। ব্রজের চাঁদ কেশবের কেশের সে কী পারিপাট্য। তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রভুদম্পতিকে তিনি করলেন স-বহুমান সখ্য-নমস্কার। তারপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন স্বমন্দিরে।

৪২। স্ত্রীপুরুষদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সব ব্যবস্থা। যথাস্থানে তাঁদের পাদ্যার্ঘ্যাদি দিয়ে অর্চনা করা হল। পরিচারক পরিচারিকারা সঙ্কোচহীন সমাদরে নিয়ে এল অভ্যঙ্গ উদ্বর্তন স্নপনাদির যথাযোগ্য উপকরণ। কার্যপ্রধান বৃষভানুর ত্রুটি-হীন ব্যবহারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সকলে। তারপর বৃষভানু নিজে স্নান সেরে এসে প্রসাধিত করলেন সকলকে। রূপানুরূপ সম্প্রদান করলেন বরাম্বর, আভরণ, গন্ধানুলেপন ইত্যাদি। তারপর বিরামহীন প্রমোদে আপ্যায়িত করতে করতে তিনি ব্রজপুর-পরমেশ্বরীকে নিয়ে এলেন পাক-ভবনে, যেখানে সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীর মত ক্ষিপ্রহস্তে রন্ধন করছিলেন সাবধানী রাধা।

৪৩। রূপগুণ ও মাধুরীর শিখরিণী তিনি··বন্দনা করলেন শ্রীযশোদাকে, যিনি নিজের কুলের শ্রী ও যশোদায়িনী। স্নেহে ও শ্রদ্ধায় আবদ্ধা হয়ে গেলেন উভয়ে। সম্পূর্ণ গলে গেল যশোদার মন। একটু হেসে তিনি বললেন—

"রমণীদের এত বাহার মণিমাণিক্যের, তবু বলতেই হবে তাঁদের হাতের রন্ধনকলাটিও এক খান জলন্ত মণি। কিন্তু তোমার গা মা, ফুলের মত কোমল, অত আঁচ কি সইবে? বলে

নেই, তবু রূপ খুলেছে অদ্ভুত। তা এখন দেখাও দিকি কি কি রাঁধলে?"

শ্রীযশোদার কথা শুনে রাধিকার যেন সার্থক হয়ে গেল পরিশ্রম। লজ্জায় পড়লেন, কিন্তু কি করেন, যত পদ বেঁধেছিলেন, সবই দেখাতে হল ব্রজরাণীকে।

৪৪। ভোজ্যদ্রব্যগুলির সৌরূপ্য আর সৌরভ্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ব্রজেশ্বরী। দেখেই বুঝতে পারলেন রাধার হাতের রান্নার সুগুণ। গুণের আদরিণী তিনি, গলে গেল হৃদয়। রাঁধছিলেন রাধা, সেই অবস্থাতেই তাঁকে জড়িয়ে নিলেন বুকে, বললেন—

"এত বিভে! চোখ ফেরাতে যে পারছি না।"

৪৫। শ্যামা ললিতাদি সখীরা ছুটে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রজেশ্বরীর আননেন্দু। সুকুমারীদের সকলেরই গায়ে সুরভিসার। সকলকেই আলিঙ্গন করে ব্রজেশ্বরী বললেন—

"বলি ও শ্যামা, ও ললিতা, ও বিশাখা, তোমাদেরও প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। ভালবাসায় মন কেড়ে নিয়েছো বন্ধুর। এই রকমের মান-সওয়া রীতিই তো চলিত হওয়া উচিত মেয়েদের মধ্যে।"

ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীরোহিণী। তাঁকে যথাবিহিত শিষ্টাচারে বন্দনা করলেন স-সখী রাধা। ব্রজেশ্বরী বললেন—

৪৬। "বলভদ্রের মা, ভদ্রসমাজের কাছে পুজো পাওয়া উচিৎ...এঁদের পরস্পর-প্রীতির। আর আমাদের রাধাটি এত স্নিগ্ধা, যে বলতে ইচ্ছে করছে, ও যেন পৃথিবীর নন্দন-লতা, ও যেন রূপের মলয়-পাহাড়ের চন্দনলতা। ভাগ্য বটে বৃষভানুর। কেউ কি জানে তাঁর কাছে রয়েছে এমন সর্ব্বগুণের মহামণির এক খনি?

৪৭। উত্তর দিলেন রোহিণী,—

"শ্রীকৃষ্ণের মা, এর পরে আর কিছু বলা চলে না, ভাবা চলে না। ব্রজপতির যেমন গুণসিন্ধু নন্দন, বৃষভানুরও তেমনি এই সুমুখী নন্দিনী। যুগলমণি যেন...ঘোষপুরশ্রীর কণ্ঠে।

৪৮। লজ্জায় মিলিয়ে গেলেন সুন্দরী রাধা। শ্যামা, ললিতা, সকলে মুচকি হেসে ফেললেন, রাধার সেই মুখ দেখে। মনে মনে তাঁরা বলতে লাগলেন—

(১) "দেবী, যে ভাবোটি অনুভব করতে চাই, সেই ভাবোটিকে দিয়ে গেল আপনার ভাষা।"

(২) "ধন্য হলেম, আমরা ধন্য হলেম।"

(৩) "বৈশাখের তপ্তদেহে এ যেন নিঃসন্দেহে বৃষ্টি-ধারা।"

(৪) "ভাগ্যিস্ ঘোষপুরশ্রীর কণ্ঠে যুগল-মণি' বলেছেন... একাধিকরণেই করণের প্রতিপাদন হল, না-টেনেও টানা মানেটা বোধগম্য হল; কিন্তু যদি বলা হত, 'ঘোষপুরশ্রী-র কণ্ঠ ও মৌলির যুগল-মণি'...তবেই হয়েছিল আর কি!"

(৫) "অনুক্তিই ললিত হয়েছে।"

৪৯। এমন সময়ে মেয়েরা নিয়ে এলেন দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, তুলসী-বিল্বদল। এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আরাধনা করলেন শ্রীকৃষ্ণ-জননীর শ্রীচরণ। ভানু-গৃহিণী 'সংজ্ঞা'-র মত বৃষভানু-গৃহিণীও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। মূর্তিমতী সবিতের মত বিকীর্ণ করতে লাগলেন শোভা ও কীর্ত্তি। তাঁকে কাছে ডেকে আলিঙ্গন করে শ্রীকৃষ্ণজননী বললেন—

"বলি, রাধাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? প্রৌঢ়া গৃহিণীদের দিয়ে যা করানো উচিৎ, নবমালিকাকে দিয়ে তা করাচ্ছেন কেন? আগুনের আঁচে রোজ যে রোগা হয়ে যাবে। তখন আপনিও কি রোগা হয়ে যাবেন না...অনুতাপে?"

[ক্রমশঃ।

ইস্কুল-মাষ্টারের রূপকথা

মানস মজুমদার

পারুল বোন চম্পা ভাই আজকে না হয় এসো
সকাল-বিকেল টিউশনেতে কেনা মাথার চুল—
শঙ্খকুমার একটুখানি থাকুক না হয় আজ,
পক্ষীরাজের উড়ন ডানায় বাতাস নিঝুম ঝুম।

বাতাস নেই রাস্তায় নেই ইটকাঠেরা কাঁদে—
কয়লা ভিড়ে ধূম্ররাশি খুঁজছে ফিরে পথ,
চম্পা ভাই পারুল বোন আজকে ফিরে যাও,
মাঠ কেবল বুড়ো ফোঁটা আটটি চোখের জল।

কাজল জল মাটি মায়ের নিবিড় প্রাণের স্বাদ,
হাত পেতে পুজোর তালে মিথ্যে প্রবঞ্চনা—
পারুল বোন চম্পা ভাই ভুল বুঝো না আজ
ফেরো না জল শুধু কলস; জল পাবার নয়।

পাথুরে সে রূপ-কথাতে কাটলো অনেক দিন
মানুষ পড়ায় ইতিহাসে রোমাঞ্চ চমৎকার
আবার বেশ, আবেগ মেলা, আমেজ লাগা সুর
পারুল বোন চম্পা ভাই সর্বে ক্ষেতের ছাপ।

সর্বে ফুল বাহারী মত গন্ধে মাতে দিন,
তিক্তরসে মৌমাছিদের তৃপ্তি শুধু হল,
চম্পা ভাই পারুল বোন মিছেই নাড়ো জিভ,
নদীর বেগ পাবে না আর, শুধুই বালু-চর।

বাদির চরায় আটক জাহাজ: বিকল মেশিনারি
নোঙর করেই ব্যবসা কাদের ব্যবহাট, [illegible]
পারুল বোন চম্পা ভাই সবই দেখা [illegible]
সকাল-বিকেল টিউশনেতে জিরোয় [illegible] বক।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনয় বোসেরা ছিল মেজর সত্যগুপ্তের বি. ভি. (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) দলভুক্ত—যাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকায়। আমাদের, অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জের জীবন চ্যাটার্জির দলের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা এবং সহযোগিতা ছিল। জীবনের এক জুনিয়ার চেলা হিমাংশু বোস থাকতো মুন্সীগঞ্জে, এবং বিনয় বোস মুন্সীগঞ্জের নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজের ছেলেদের প্যারেড শেখাতে আসতো। এই হিমাংশু ছিল বিনয় বোসের আত্মীয়, এবং তার মারফৎ বিনয় বোসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হ'ত।

বিনয় বোসের মৃত্যুর পর সংকারের জন্য তার শবদেহ দাবী করা হলে, প্রথমে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে শবদেহ দিতে চায়নি—কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি ও তদ্বিরের ফলে তারা এই সর্তে শবদেহ দিতে রাজী হয়েছিল যে, শ্মশান যাত্রার সময় কোন শ্লোগান বা ধ্বনি দেওয়া হবে না,—শুধু হরিবোল ধ্বনি দিয়ে নীরবে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।

ওর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর মুন্সীগঞ্জ মেস থেকে আমরাই মর্গের কাছে গিয়ে জমায়েত হয়েছিলুম। বাইরের আরো ২।৪ জনও গিয়ে জমেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে কোনো সোরগোল হয়নি বলে কলকাতার লোক জানতেই পারেনি।

জীবনের ছেলেবেলার সহপাঠি হরিভূষণ ব্যানার্জি তখন আই বি ইনস্পেক্টর,—এবং তাঁর ছোট ভাই হারাণ ব্যানার্জি ছিল জীবনের একজন সিনিয়র চেলা। এই দুই ব্যানার্জির যোগাযোগেই বিনয়ের শবদেহ আমাদের হাতে দেওয়া হয়, ঐ নীরব শ্মশান-যাত্রার সর্তে।

আদেশের আশায় আমরা খাট নিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে মর্গের কাছে অপেক্ষা করছিলুম। আদেশ এল, মর্গ থেকে শবদেহ বার করার জন্যে পুলিসের পিছন পিছন আমি ঢুকে পড়লুম—মর্গের ভিতরটা দেখার জন্যে। ঘরটার মধ্যে যেন একটা হিমবাহ জমাট হয়ে আছে—আর মেঝেয় শায়িত এক গৌরবর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক—যেন ঘুমিয়ে রয়েছে—শুধু একদিকের রগে একটা রক্তের দাগ। অন্যান্যের সঙ্গে ধরাধরি করে দেহটাকে বার করলুম। খাটে শোয়ানোর পর চারিদিকে ভিড় জমে উঠলো। পুলিসের নির্দেশে অবিলম্বে হরিবোল ধ্বনি দিয়ে শব নিয়ে রওনা হতে হল। আমি ছিলুম বাহকদের অন্যতম। এসব কথা ভাবতে এবং বলতে আজও একটা গৌরববোধ হয়।

শবের পিছনে একটু দূরে থেকে একদল পুলিস চললো শ্মশান পর্যন্ত। তারা ফিরে এল শবের চিতারোহণের পর। একটা ছোট ভিড় শ্মশানে গিয়েছিল,—তারাও ২।১ জন করে ফিরে গেল। দাহের পর চিতায় জল দিয়ে ফিরে আসার সময় দেখা গেল, আমরা মুন্সীগঞ্জের দলই আছি।

হারাণ ব্যানার্জির বিরাট আওয়াজে ধ্বনিত হল "বন্দেমাতরম্"। আমরা ফিরতি পথে রওনা হলুম। সমস্ত চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়লো "বিনয় বোস কি জয়" ধ্বনিতে। সারাপথ প্রচণ্ড শ্লোগান-ধ্বনি চললো। তখন রাত শেষ হয়েছে,—কিন্তু ভোর হয়নি। শ্লোগানের আওয়াজে লোকের ঘুম ভাঙছে।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে বিটের পাহারাওয়ালা চ্যালেঞ্জ করে বসলো—কোন্ হ্যায় আপলোক ?—কাঁহাসে আতা ?—কাঁহা যাতা ?—থানামে জানে হোগা। তার কথার জবাবে আমরা আরো জোরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিই, আর সে আরো ঘাবড়ে যায়। শেষে আমরা ঠিক করলুম, থানায় যাওয়াটা মন্দ হবে না। চললুম তার সঙ্গে।

সুখিয়া ষ্ট্রীট থানায় নিয়ে গেল। সেরেস্তায় ডিউটি দিচ্ছিলেন যে এ এস আই,—তিনি চোখ মুছতে মুছতে এসে বিরক্তভাবে ঘটনার বিবরণ শুনে ঘুমন্ত দারোগা বাবুর কাছে খবর দিলেন। তিনিও চোখ মুছতে মুছতে এসে আমাদের দেখে চিনলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার ? পাহারাওয়ালা জবাব দিলে বাবুরা রাস্তায় হল্লা করছিল। বন্দেমাতরম বলে চেঁচাচ্ছিল।

দারোগা বললেন, "বন্দেমাতরম বোলা ? সর্বনাশ কিয়া ! আচ্ছা, তুম যাও।" তারপর আমাদের কাছে সব কথা শুনে বললেন,—তাইতো,—সেদিন আপনাদের ওখানে চা খেয়ে এলুম—আজ আপনাদের একটু চা খাওয়াতে পারলে ভাল হত। কিন্তু—। আমরা দুটো হাসি-ঠাট্টা করে বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

এখানে হারাণবাবু এবং হিমাংশু সম্বন্ধে ২।১ টা উল্লেখযোগ্য কথা বলে নিতে চাই। হারাণবাবু ছিলেন যেমন জোয়ান, হিমাংশু ছিল তেমনি দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন। কিন্তু তার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং সে ছিল গুপ্তসমিতির উপযুক্ত নীরব কর্মী। হারাণবাবু তাকে ভালবাসতেন, এবং বরাবরই তার ওপর গার্জেনের মতন আবদার করতেন

হারাণবাবু মাঝে মাঝে হরিভূষণবাবুর সঙ্গে দেখা করতেন এবং চেষ্টা করতেন, যুগান্তরদলের সম্বন্ধে আই বি-র মতিগতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারেন কি না। এ'রকম চালাকির চেষ্টা বিপজ্জনক, এবং তার ফলও একটু ফলেছিল।

একদিন হরিভূষণবাবু হারাণবাবুকে বললেন, হিমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার আমাদের অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করিস—কিছু কথা আছে। হারাণবাবু তদনুসারে হিমাকে নিয়ে গেলেন। ২।১ টা কথাবার্তার পর হরিভূষণবাবু হিমাকে রেখে হারাণবাবুকে ছেড়ে দিলেন।

অর্থাৎ হিমাকে গ্রেপ্তার করা হল। হারাণবাবু ফিরে এসে অপ্রতিভভাবে ব্যাপারটা বললেন,—এবং মনকে প্রবোধ দেবার জন্তে বললেন,—"যাই হোক,—মারধরটা হবে না। ছোড়দা সে কথা বলেই দিয়েছে।" কিন্তু কিছু মার হলই।

এক সাহেব অফিসার ওকে ধমক দিয়ে বলেছিল coward. ও জবাব দিয়েছিল, আমার মতন একটা ছেলেকে নিজেদের ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে coward বলছো—তোমরা বড় hero। সাহেব ওর পাঁজরে একটা রুলের গুঁতো মেরেছিল।

সেই ব্যথায় কিছুদিন ভোগার পর হিমাংশুর প্লুরিসি হল। ডেটিনিউ অবস্থায় প্লুরিসিতে ভুগতে ভুগতে হল থাইসিস। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কারমাইকেল কলেজে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল,—কিন্তু কিছু হল না—সেখানেই সে মারা গেল। তখন হারাণবাবুও গ্রেপ্তার হয়ে ডেটিনিউ হয়েছেন।

এই ৩০ সালেই ময়মনসিংয়ের কিশোরগঞ্জে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার সূত্রপাত কিন্তু মোটেই সাম্প্রদায়িক নয়। মুসলমান কৃষকরা চিরকালই হিন্দু-মহাজনদের কাছে কর্জ করে এবং সুদ দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষানুক্রমে সে কর্জ শোধ হয় না—অথচ হয়ত আসলের চেয়ে অনেক বেশী সুদ দেওয়া হয়েছে। এই রকমের কতকগুলো কেস ওখানে ছিল। ওখানে একটা ইয়ং কমিউনিষ্ট লাগ হয়েছিল, আগে বলেছি। কৃষক সমিতিও হয়েছিল। ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষকেরা একদিন মরিয়া হয়ে এক হিন্দু-মহাজনের বাড়ী চড়াও হয়ে পুরোনো ঋণের খত ফেরৎ চায়—বলে, অনেক সুদ দিয়েছি, আসলের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়ে গেছে, আর দোব না। এরকম অসাধারণ দাবী মিষ্টি মুখে করা যায়না—তারা গিয়েছিল মারমুখী হয়েই।

মহাজন স্বভাবতই সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে, এবং উত্তেজিত খাতকদল বাড়ী লুঠ করতে যায়। মহাজনের ঘরে বন্দুক ছিল,—তারা গুলী চালিয়ে ওদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু গুলী ফুরিয়ে গেলে ওরা আবার বাড়ী চড়াও করে, এবং বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, কর্তাকে খুন করে' লুঠ করে, ঋণের খতের বাণ্ডিল পুড়িয়ে সেখান থেকে ক্রমে অন্যান্য মহাজনদের বাড়ীও আক্রমণ করে। এইভাবে ঐ রকম কাণ্ড চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কলকাতার কাগজে এই খবর প্রকাশ হল সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে। কিন্তু ক্রমে খবর আসতে লাগলো, দু-একজন মুসলমানও মহাজনী কারবার করতো, এবং তাদের বাড়ীও লুঠ হয়েছে। আবার আক্রমণকারী কৃষক খাতকদলের মধ্যে কিছু হিন্দুও আছে, এখবরও এল। এই অবস্থায় ঢাকা থেকে একদল মোল্লা-মৌলবী সেখানে প্রেরিত হল, এবং কাণ্ডটা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করলে।

শচীন সেনগুপ্ত নবশক্তিতে যথাযথ খবরগুলো ছাপতে ছাপতে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন "গণদেবতার জাগরণ।" ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বসু শচীন বাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না লিখে অমন কথা লিখেছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, যেমন যেমন খবর এসেছে, তা থেকে যা বুঝেছি,—তাই লিখেছি। অন্য রকম লেখার নির্দেশ যদি আগে দিতেন, তাহলে হয় তা'ই লিখতুম, না হয় চাকরী ছাড়তুম।

এই কথা বলে ফিরে এসে তিনি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি দিনকার খবর সাজিয়ে লিখে দেখিয়ে দিলেন, ব্যাপারটার উৎপত্তি মহাজন-খাতক বিরোধ থেকে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই শচীনবাবুর চাকরী খতম হল। অজুহাত অবশ্য অন্যান্য নিরীহ ধরণের। একটা অভিযোগ আগে থেকেই জমে উঠছিল,—তাঁর সম্পাদনায় কংগ্রেসের নীতি যথাযথ ভাবে অনুসৃত হচ্ছে না। আমার লেখা ছাপাটা যে তার অন্যতম প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদিকে জেল ভর্তি হয়ে গিয়েছিল সত্যাগ্রহী বন্দীতে। ছোকরার সংখ্যাই বেশী, এবং সবরকমের ছেলেই আছে। জেলে চলছিল যেন ভূতের নৃত্য। ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে পৃথক আটক ছেলের দল সারাদিন দেওয়াল টপকে সব ওয়ার্ডে যাতায়াত করে। দিবাকর পাত্র এইভাবে দেওয়াল টপকাতে গিয়ে দুটো পায়ে এমন আঘাত পায় যে, পরে পা-দুটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে খোঁড়া হয়ে যায়। সরু লিকলিকে দুটো পা লটপট্ করে কোনো প্রকারে হাঁটতো। পরে সে কমিউনিষ্ট তত্ত্বদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিল এবং ডেটিনিউ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত '৩৮ সালে সে মানভূম অঞ্চলের কোনো স্থানে এক মহুয়া গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এর মূলে নাকি ছিল এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

সত্যাগ্রহীদের জন্তে জেলে ডিসিপ্লিন একেবারে ভেঙ্গে পড়ছিল। তাদের দিয়ে কিছু কাজ করাবার মতলবে কর্তৃপক্ষ একদল ছেলেকে জেলের সব্জীবাগান সাফ করার কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা এমন সাফই করলো যে, সব্জীবাগান হয়ে গেল এক পরিষ্কার ময়দান। এইরকম কাণ্ডকারখানার পর দমদমে সত্যাগ্রহী রাখার ব্যবস্থা হল।

সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থায় কোন কড়াকড়ি ছিল না। আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আমিও আলিপুর জেলে জীবনের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলুম। একটা ঘরে দেখা করার ব্যবস্থা ছিল। গিয়ে দেখি এক কোণে টেবিল-চেয়ারে সুভাষবাবুর ইন্টারভিউ হচ্ছে—একজন I B অফিসারও আছে। আর এক কোণে এক কম্বল বিছিয়ে জীবন একটি দল নিয়ে বসেছে। গিয়ে বসলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধে একটা আঙুলের চাপ দিয়েছে। ফিরে দেখি সুভাষবাবু দাঁড়িয়ে মৃদুহাস্য করছেন। আমি জীবনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম, আমার মাসতুতো ভাই। সুভাষবাবু মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

আজকাল পত্র-পত্রিকাদিতে বিশেষ বিশেষ লেখকদের লেখায় মাঝে মাঝে দেখা যায়,—তাঁদের সঙ্গে সুভাষবাবুর প্রথম এমন আলাপ

ছিল যে, সুভাষবাবুর ভাবটা ছিল যেন, তোমা বই আর জানি না। আমার সঙ্গে যে সুভাষবাবুর তেমন প্রণয়-টনয় ছিল না, সেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন,—কিন্তু সম্পর্ক একটা ছিলই—অনেকদিন ধরে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই।

দুই বিপ্লবীদলের অ্যামেলগ্যামেশন মিটিং যে আমার ঘরেই হয়েছিল, সেটাও সুভাষবাবু জানতেন,—আমি যে সেই মিলন ভঙ্গে দাদাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করেছিলুম, তাও তিনি জানতেন। তারপর আমার বিদ্রোহ এবং আত্মশক্তি ও নবশক্তিতে বেপরোয়া লেখার কথাও জানতেন।

২৯ সালে যখন দুই বিপ্লবীদল তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছে, আর তিনি গম্ভীরভাবে G O Cর চালে দুই দলকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন, তখন তিনি গোপনে পরামর্শ করতেন রাজেনদার (রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব) সঙ্গে। রাজেনদা এবং আমি উভয়েই গৌরাঙ্গ প্রেসে (কলেজ স্কোয়ার) সুরেশ মজুমদারের অফিসের আড্ডায় নিয়মিতভাবে যেতুম,—এবং সেখানে রাজেনদার সঙ্গে আমার সুভাষবাবু ও দাদাদের সম্বন্ধে কথাবার্তা চলতো। এটাও সুভাষবাবু জানতেন।

২৯ সালে মুন্সীগঞ্জে মন্দির-সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল। কালীবাড়ীতে সরাসরি পুজো দেওয়ার অধিকারের দাবীতে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাচ্ছিল—জোর করে দল বেঁধে মন্দিরে প্রবেশ ছিল তাদের লক্ষ্য। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দ তাদের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। জীবনের দলবল তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করছিল।

এই সময়ে একদিন বেলা দশটার সময় বি পি সি সির অফিস কর্মী বরদা আমার কাছে এল, সুভাষবাবু ফোনে বলেছেন, আমাকে এখনই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে। কিছু গূঢ় কথা জানা যাবে মনে করে গেলুম। গিয়ে দেখি সুভাষবাবু এক গাদা কাগজপত্র নিয়ে নীরবে কাজ করছেন,—আর তক্তাতে বসে গল্প করছেন কিরণ শঙ্কর রায়, সামসুদ্দীন আহমদ এবং জালাল-উদ্দীন হাসেমী।

সুভাষবাবু আমাকে বসতে বলে আবার কাগজপত্রে মন দিলেন,—আর ওঁরাও আমাকে চিনতো,—ওরাও টাইট হয়ে বসলো, আমার সঙ্গে সুভাষবাবুর কি কথা হয়, শোনার কৌতূহল নিয়ে। কিন্তু ঠিক এমনি ভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টাখানেক। ওরা যখন বুঝলো যে, ওদের সামনে সুভাষবাবু আমার সঙ্গে কথা কইবেন না,—তখন নিরাশ হয়ে একে একে সরে পড়লো। তারপর সুভাষবাবু আমাকে বললেন,—উনি খরচ দিলে আমি একবার মুন্সীগঞ্জে যেতে পারি কি না। আমি বললুম, পারি। উনি বললেন, জীবনবাবুর কাছ থেকে জেনে আসতে হবে,—কংগ্রেস ঐ মন্দির-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিতে পারে কি না—তাঁরা নিচ্ছেন না কেন? চিঠিতে এসব কথা লেখা তিনি ঠিক মনে করছেন না।

অনেকদিন পরে মুন্সীগঞ্জে চললুম। গিয়ে দেখি গোঁড়াহিন্দুরা জীবনের দলের ওপর বেজায় চটে গেছে। একটা ক্যাম্প হয়েছে, সেখানে সত্যানন্দ এবং তাঁর দোসর এক ব্রহ্মচারী থাকে, এবং জীবন, বাদল, সুরেন মজুমদার প্রভৃতিও থাকে। কালী মন্দিরের দালানের থামের সঙ্গে বেড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের সামনের চালায় পুলিস এবং মন্দিরের রক্ষাকর্তাদের লোক পাহারা থাকে। আমি যাওয়ার পর একদিন স্থির হল, কয়েকজন নমঃশূদ্র ভলান্টিয়ার প্রোসেসন করে মন্দিরপ্রবেশ করতে যাবে।

যথাসময়ে পুলিস লাঠি হাতে ব্যারিকেড করে দাঁড়ালো। ভলান্টিয়ারদের দুহাতে অঞ্জলিবদ্ধ পূজার ফুল—মিছিলের সামনে সত্যানন্দ এবং পিছনে সুরেন মজুমদার। ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে মিছিল আটকে গেল। পুলিস যথাশাস্ত্র হুকুম দিলে মিছিল ভেঙে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু চলমান মিছিল পিছনের ঠেলায় ব্যারিকেডের ওপরে গিয়ে পড়লো। সত্যানন্দকে গ্রেপ্তার করে সরিয়ে নিয়ে পুলিস লাঠি চার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিলে। কয়েকজনের মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। প্রথম সারিতে আমাদের ২২ সালের চরকা-মিস্ত্রী পঞ্চাননের ঠাকুরদাস ছিল,—তারও মাথা ফাটলো। সুরেন মজুমদারও গ্রেপ্তার হল।

জীবনের সঙ্গে কথাবার্তা হল। তার মত হচ্ছে, হিন্দুদের সমাজ সংস্কারের এ আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া ঠিক হবে না,—কারণ কংগ্রেস যেহেতু হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সংস্থা,—অতএব গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাতে আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারের অনেক বেশী সুযোগ পাবে।

যাই হোক,—আমি থাকতে থাকতেই ইন্দু-উত্তমাকে নিয়ে (বার্মার কংগ্রেস নেতা) ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত মুন্সীগঞ্জে এলেন,—ওঁরা বাংলার নানাস্থানে সফর করবেন, এবং সেইদিন বিকালেই রওনা হবেন।

আগের দিন সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এক প্রকাণ্ড জনসভা হয়ে গেছে। উত্তমাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে সে রকম আর একটা সভা করা সম্ভব হবে না বলে স্থির হল, মহিলাসমিতি এক সভা করে তাঁকে অভ্যর্থনা করবে। তার জন্যে এক ভাষণ লিখতে হবে। মেয়েরা ভূপেনবাবুকে বললে, আপনি গুছিয়ে লিখে দিন। তিনি বললেন, নারাণবাবু এখানকার কথা সব জানেন,—উনিই লিখুন। সুতরাং আমাকেই লিখতে হল। উত্তমা ছিলেন বার্মার বিপ্লবীদেরও একজন নেতা।

বিকালে ওঁদের সঙ্গেই আমিও নারায়ণগঞ্জে এলুম এবং পরদিন কলকাতায় চলে এসে সুভাষবাবুর কাছে রিপোর্ট দিলুম। এবারও কথা হল একা একা। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আর কেউ জানলে কোন দোষ হতে পারে। মনে হল, সুভাষবাবু আমার সঙ্গে একা-একা কথা বলার একটা Show করলেন—যেন দাদাদের একটু leg-pulling.—ভেবে বেশ মজা লাগলো। জীবনকে পরে কথাটা বলেছিলুম।

যাই হোক,—সত্যাগ্রহীদের "জেলখাটার" আর এক নমুনা দেখা গেল দমদম জেলে। শুনেছিলুম, সেখানে অবস্থা ও ব্যবস্থা এমন ঢিলে যে, বাইরের লোক নিঃসাড়ে ভিতরে যেতে এবং বেরিয়ে আসতে পারে। একদিন গেলুম দেখতে।

বাইরের বড় গেটে পুলিস-পাহারা আছে বটে,—কিন্তু গেট থাকে খোলা এবং দলে দলে লোক যায় আসে। রোজই বহুলোকের interview থাকে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অফিস পর্যন্ত সহজেই যাওয়া যায়—গেলুম। কিন্তু অফিসে না ঢুকে পাশের জেলের বন্দীশালার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সে গেটেও একজন শান্ত্রী আছে—যার ডিউটী মনে হল শুধু ঐখানে হাজির থাকা। কারণ

গেট খোলাই আছে, এবং এক-আধজন লোক, সত্যাগ্রহী বন্দী,—ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অফিসে যাচ্ছে বা অফিস থেকে ভিতরে ঢুকছে, শান্ত্রী চুপ করে খাড়াই আছে।

একটু দাঁড়াতেই দেখি, ভিতর থেকে রোহিণী (মুখার্জি—মুন্সীগঞ্জ) গেটে আসছে। সে আমাকে দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে' "আরে! তুমি আসছো?" বলে আমাকে ধরে সটান নিয়ে চললো ভিতরে। সম্ভবতঃ শান্ত্রী মনে করলে, নতুন আমদানী।

ভিতরে গিয়ে খানিক ঘুরে দেখলুম। বিরাট বিরাট ঘর,—না জেলখানা, না ব্যারাক। তার মধ্যে খাওয়া চলছে—কয়েক সারিতে একসঙ্গে খেতে বসেছে শতখানেক লোক—যেন মহোৎসব চলছে। আমি অস্বোয়াস্তি বোধ করছি,—যদি বেরোতে না পারি। রোহিণী বললে, কিছু ভয় নেই,—যখন এসেছ, তখন না খেয়ে যাওয়াটা কি ভাল! সুতরাং তার সঙ্গে খেতে বসে গেলুম।

তারপর সে গেট পর্যন্ত এসে শান্ত্রীকে শুনিয়ে বললে—যাও, অমরদা অফিসে আছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে,—অমরদা (চট্টোপাধ্যায়) এবং বঙ্কিম মুখার্জি সারাদিন অফিসে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে আড্ডা মারেন,—যখন খুসী আসেন যান,—আর ভিতরের বন্দীরাও যায় যখন প্রয়োজন হয়, তাঁদের কাছে অবাধে যাতায়াত করে। কাজেই শান্ত্রীর সে বিষয়ে কোনো মাথা-ব্যথা নেই—গেট খুলে দাঁড়িয়ে থাকাই তার ডিউটী। তা ছাড়া সত্যাগ্রহীরা যে জেল থেকে পালায় না, এটাও সকলেই জানতো। সুতরাং আমি বেরিয়ে সটান চলে এলুম।

এই রকম জেল খাটার সার্টিফিকেটের জোরে অনেক বিশেষ বিশেষ কর্মী আজও কংগ্রেসী সরকারের বড় বড় চাকরী করছেন। কিন্তু অন্য রকমের ঘটনাও আছে। অমরদা যখন এই দমদম জেলে বন্দী, তখনই কয়েকদিনের মধ্যে মেনিনজাইটিস রোগে অমরদার মেজ ছেলে দেবু মারা যায়—উনিশ-কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে—ছাত্র। দেখবার জন্যে কয়েকদিনের ছুটী চেয়ে অমরদা দরখাস্ত করেছিলেন,—কিন্তু ছুটী মঞ্জুর হওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। আমি সে সময়ে উত্তরপাড়ায় তাঁর বাড়ীতে ছিলুম,—এবং শব-সৎকারও করেছিলুম।

এদিকে জেলে গান্ধীমহলে আর এক ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে গিয়েছিল। মহাত্মার গ্রেপ্তারের পর লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে বিলাতী বয়কট এবং পিকেটিংও চলছিল। আগে একচোট লাঠি পেটা করা, তারপর গ্রেপ্তার ও জেল—এই ছিল সরকারী ব্যবস্থা। নিরুপায় অসন্তুষ্ট জনগণ স্বেচ্ছায় বয়কট সমর্থন করছিল। নুন তৈরী করার চেয়ে বেশী লোক জেলে গিয়ে পিকেটিং করে।

একদিকে এই বয়কটের ফলে ভারতের বিলাতী বণিক সম্প্রদায়ও—বম্বের টাইমস অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত—ডোমিনিয়ন ষ্টাটাসের ভিত্তিতে ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার সুপারিশ করতে আরম্ভ করেছিল,—আর একদিকে বিপ্লবীদের সাহেবমারার হিড়িকে সরকারও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে সুরু করেছিল। সুতরাং সরকার মহাত্মার সাহায্য সংগ্রহের মতলব আঁটলে।

আগষ্ট মাসের শেষ দিকে হঠাৎ মডারেট নেতা তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং কংগ্রেস নেতা জয়াকর জেলে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে জানালেন কংগ্রেস যদি আইন অমান্য ছেড়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে চান, তাহলেই তাঁদের মুক্তি দিতে রাজী আছেন।

কংগ্রেস নেতা জয়াকর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ না দিয়ে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য হঠাৎ খেপে পড়েছিলেন দেখে বেশ মনে হয়, ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। সাইমনকমিশন বয়কট করার সঙ্গে নেহেরু কমিটীর রিপোর্টে যেমন তাদের আলগোছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেস ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই সন্তুষ্ট হবে, তেমনি মহাত্মা জেলে থাকতে কংগ্রেস নেতা জয়াকর রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যোগ দেবেন, এটা আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল।

যাই হোক, একচোটে আইন অমান্য ছেড়ে দিয়ে রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সে যাওয়া তো যায় না। তাই দেখা গেল মহাত্মাজী তাঁর ১১ দফা সর্ত থেকে ৪টে রেখে বাকি ৭টা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং তখনকার মত দূতীয়ালী ব্যর্থ হল। ওদিকে '৩১ সালের জানুয়ারীতে বিলেতে রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্স শুরু হয়ে গেল।

সে দূতীয়ালীর ভিতরের কথা কখনো প্রকাশ হয়নি,—হবেও না। কিন্তু মহাত্মার ৭ দফা দাবী ছেড়ে দেওয়ার কারণ আন্দাজ করা যেতে পারে যে, আন্দাজের সঙ্গে পরবর্ত্তী ঘটনার মিল আছে।

সম্ভবতঃ সাপ্রু-জয়াকর মহাত্মাকে বুঝিয়েছিলেন,—আরউইনের বর্ত্তমান প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্সে যাওয়ার জন্যে একটু উদারতা দেখিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার না করলে আগামী শাসন সংস্কারেও '২০ সালের মতন কংগ্রেসের কোন দাবীর কোন পাত্তা থাকবে না।

মহাত্মা একটু কাৎ হয়েছিলেন, এবং তাঁর বগলের তলা দিয়ে ৭ দফা সর্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বভাবতই আরউইন তাতে রাজী হতে পারেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার দূতীয়ালী সুরু হল। মহাত্মা বললেন, আরো কাৎ হতে হলে একলা আমার ভরসা হয় না। ওয়ার্কিং কমিটীর সঙ্গে আমার পরামর্শ করার ব্যবস্থা করা হোক।

দেখা গেল, বিভিন্ন জেল থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য নেতাদের মহাত্মার সঙ্গে এক জেলে একত্র করা হল। এবং শেষ পর্যন্ত মহাত্মা চিৎ হতেই রাজী হলেন,—একটিমাত্র সর্ত রেখে বাকি তিনটি সর্তও ছেড়ে দেওয়া হল। স্থির হল, সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনের প্রমাণস্বরূপ অহিংস রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দিলেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে।

কিন্তু এততেও সরকার আগে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হল না,—তারা চায় একেবারে নাকে খৎ—আগে আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং সব দূতীয়ালী পণ্ডশ্রম হল। রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্স হয়ে গেল। লড়াই চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না।

ঘর পোড়ানো, দোকান লুঠ, ফসল নষ্ট করা প্রভৃতি নিত্য নূতন সরকারী অত্যাচারের খবর কাগজে বেরুতে লাগলো। সরকার প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করে কাগজগুলোকে জব্দ করার ব্যবস্থা করলে অনেক কাগজ বন্ধ রাখা হল। Cyclostyle এ ছেপে সংবাদ প্রচার হতে লাগলো। সরকার Cyclostyle ধরতে আরম্ভ করলে। যারা Secrecyর নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিল, সেই গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহীরাও Cyclostyle আশ্রয় নিলেন। আর একদিকে বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টাও বেড়ে চললো।

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
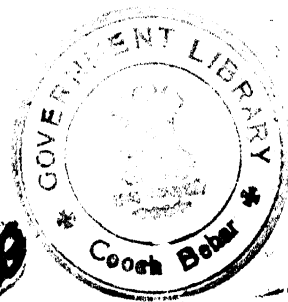
সুতরাং প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের ফেরতা সাপ্রু-জয়াকর আর একবার মহাত্মার সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। তারপরই দেখা গেল, সরকার মহাত্মাকে মুক্তি দিলেন। আর মুক্তি পেয়েই মহাত্মা ছুটলেন আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে। আরো দেখা গেল, সাক্ষাতের পরই দুই বন্ধুতে মিল হয়ে গেছে,—এক যে একটিমাত্র সর্ত বাকি ছিল—বন্দীমুক্তি—মহাত্মা সে দাবীটিও ছেড়ে দিয়ে আগেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।

বন্দীমুক্তি সরকার সুরু করলেন তারপরে—গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে—৩১ সালের মার্চ মাসের গোড়ায়। সে বন্দীমুক্তিও হল শুধু আইন অমান্য বন্দীদের মুক্তি। বিনা বিচারে আটক ডেটিনিউরা,—হিংসামূলক কাজের চার্জ নেই যে মীরাট মামলার আসামীদের ওপর, তারা—পেশোয়ারের দণ্ডিত গাড়োয়ালী সৈন্যদল,—সব বাদ দিয়ে বন্দীমুক্তি।

এই প্যাক্টকে armistice বা যুদ্ধ বিরতি বলে চালানো হল,—এবং তাড়াতাড়ি করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন করে' এই প্যাক্টকে পাশ করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এক অভিনব মাহাত্মিক কৌশলে। ওয়ার্কিং কমিটীকে দিয়ে এক হিটলারী ফতোয়া দেওয়া হল,—কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকে নির্বাচিত করতে হবে আইন অমান্য আন্দোলনের মুক্ত বন্দীদের মধ্য থেকে। তাদের ভোটের জোরেই কংগ্রেসে প্যাক্ট ratified হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা এইভাবে করে রাখা হল।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকার জন্যে মহাত্মার ভক্তেরা ঢাক পিটাতে সুরু করলেন, গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট একটা বিরাট জয়,—কারণ বড়লাট কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। কে, এম, মুন্সী তাঁর বইয়ে লিখলেন (I follow the Mahatma)—এ চুক্তি ভারতের ইতিহাসে বহু শতাব্দীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ঘটনা।

ওদিকে ৫ই মার্চের লণ্ডনের "টাইমস্" লিখলে,—আর কোন ভাইসরয়ের ভাগ্যে এই চুক্তির মতন বিরাট বিজয় ঘটেনি।

মহাত্মাজী বাণী দিলেন,—তাঁর লক্ষ্য যে স্বরাজ,—সে স্বরাজের সংবিধানে সুশৃঙ্খল আত্মশাসন প্রতিফলিত হবে,—যে সংবিধান ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করবে না।

কিন্তু জনমত ছিল বহুলাংশে প্যাক্টের বিরুদ্ধে। তরুণ, নওজোয়ান, কমরেড দল তো মহাত্মার ওপর বেশ খাপ্পাই হয়ে উঠেছিল। এমন কি, কংগ্রেসের অনেক নেতাও এ প্যাক্ট সহজে হজম করতে পারেনি। জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—তাঁর মনটা মুসড়ে গিয়েছিল—এরই জন্যে কি দেশের লোক একটা বছর ধরে এমন বীরের মতন লড়ে এসেছে? কিন্তু তিনি মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ করাটা ব্যক্তিগত "হামবড়াই" মনে করে চেপে গিয়েছিলেন। সুভাষবাবুও মনেপ্রাণে প্যাক্ট সমর্থন করতে পারেন নি,—কিন্তু কংগ্রেসে এক বামপন্থী সুরের বিবৃতি প্রচার করেই তিনিও ক্ষান্ত হয়েছিলেন। হোমরুলার যমুনাদাস মেটা কংগ্রেসে মহাত্মার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্যাক্ট সর্বসম্মতিক্রমেই পাশ হয়ে গেল। শতকরা ৫০ জন সোনা ডেলিগেট ছাড়া এর আরও দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জহরলালের পরামর্শে মহাত্মাজী প্যাক্ট ratification-এর প্রস্তাবের সঙ্গে নতুন করে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবী জুড়ে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়তঃ সরকারী-বে-চাল।

ঠিক কংগ্রেসের আগেই ভগৎসিং, রাজগুরু প্রভৃতির ফাঁসী দিয়ে সরকার তরুণদের আরো ক্ষেপিয়ে দিলে, যাতে তারা মহাত্মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মহাত্মার ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তরুণ দল ঐ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবীর সঙ্গে মহাত্মাকে আঁকড়ে ধরলে,—প্যাক্ট পাশ হয়ে গেল।

কিন্তু মহাত্মা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবীর সঙ্গে একটা 'adjustment' এর ফাঁকও রেখে দিতে ভোলেননি,—এবং পাছে সেটা নিয়ে কেউ হৈ-চৈ বাধায়,—তার জন্যে Subjects Committee-তে খুব জোর দিয়েই বললেন—"I shall get you Swaraj,—I promise it." সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের একটা অস্পষ্ট অথচ অর্থভিমধুর ব্যাখ্যা শোনালেন—"Equal partnership."

সুতরাং মহাত্মাকে আবার একটা Chance দেওয়ার ব্যবস্থা হল। আর তরুণদের ওপর থেকে কমিউনিষ্ট আদর্শের প্রভাব নষ্ট করার চেষ্টায় এক সোসিয়্যালিষ্ট আদর্শের—নরমপন্থী ট্রেডইউনিয়নিষ্ট বা বিলাতের পার্লামেণ্টারী লেবার পার্টির আদর্শের—আমদানী করে কংগ্রেস সোসিয়ালিজমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হল।

এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন জহরলাল। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্বন্ধে করাচী-কংগ্রেসের প্রস্তাবই সেই সোসিয়্যালিজমের আদর্শ। তাতে মূল-শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের অধিকারের সম্প্রসারণ, ভূমি-সংস্কার প্রভৃতির কথা ছিল। প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কে, এম, মুন্সী তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ে লিখেছেন,—"এতে ধনিকরা বিক্ষুব্ধ হবে, অথচ মার্কসবাদীরা সন্তুষ্ট হবে না। মহাত্মা প্রথমে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছিলেন,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত জহরলালের মুখ চেয়ে চেপে গিয়েছিলেন।"

এই তথাকথিত সোসিয়ালিজমের বাহার ভারতবাসী আজও দেখছে,—৩১ সাল থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত "ভদ্রলোকের এক কথা" চলছে। আর জহরলালের পরম বন্ধু সাম্রাজ্যবাদীরা আজ পর্যন্ত ঐ সুবাদেই জহরলালকে "সোসিয়্যালিষ্ট" বিশেষণে বিভূষিত ক'রে পরম পরিতোষ প্রকাশ করে আসছে।

যাই হোক, প্যাক্টকে সরকার যে খাতির দেখালে কংগ্রেসের আগেই ভগৎসিংকে ফাঁসী দিয়ে,—সে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেও তারা কসুর করলে না—নুনের ট্যাক্স বজায় রেখে। করাচী কংগ্রেসের বাইরে একটা কৃষ্ণ-পতাকাসহ বিক্ষোভ মিছিলও দেখা গিয়েছিল। জনগণের যুযুৎসু মনোভাব শান্ত হয়নি। প্যাক্ট সই হওয়ার তিন হপ্তার মধ্যে কানপুরে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল এবং গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী সে দাঙ্গায় নিহত হলেন।

নানাস্থানে যুব সম্মেলন ও ছাত্রসম্মেলন থেকে চুক্তি-বিরোধী প্রস্তাবও পাশ হতে লাগলো,—এবং মহাত্মা যখন রাউণ্ডটেবল কনফারেন্সে যাওয়ার জন্যে বম্বে থেকে জাহাজে উঠছেন, তখনও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল।

এই বিলাতযাত্রার আগে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। গুজরাটের কায়রা (?) জেলায় অজন্মা হওয়ার ফলে কৃষকেরা জমির খাজনা দিতে পারেনি, এবং সরকার তাদের জমি

…াম করতে সুরু করেছিল। মহাত্মাজী চুপ করে থাকতে পারেন না,—সুতরাং তিনি দাবী করলেন, অবিলম্বে একটা "Impertial Tribunal" গঠন করে' কৃষকদের অবস্থা ও সরকারী কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে—না হলে তিনি রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবেন না।

লোকের মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল। গভর্ণমেণ্ট একজন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী সেটাকেই Impertial Tribunal বলে মেনে নিয়ে চট করে জাহাজে চড়ে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজও ছাড়লো। তাঁর আগেই তাঁর ছাগলটাকে জাহাজে তোলা হয়েছিল।

এই যুদ্ধের হুঙ্কার, যুদ্ধ এবং সন্ধি সম্বন্ধে "শ্রীভাঁওতা" থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—তা থেকেই আপনারা ওগুলোর স্বরূপ এবং জনগণের মনোভাব ভাল করে বুঝতে পারবেন।

(লাহোরে পূর্ণস্বরাজের হুঙ্কার)—এক গুরুঠাকুর শিষ্যবাড়ী গিয়েছেন। শিষ্য গুরুদেবের পায়ের কাছে একটি আধুলি রেখে প্রণাম করতে গেল। আধুলি দেখে গুরুঠাকুর চটেই লাল। বললেন,—"তোর প্রণামী আমি গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না তুই ষোল আনা প্রণামী দিবি।" শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক দুঃখের কান্না কেঁদে গুরুদেবের অনেক সাধ্যসাধনা করে বিফল-মনোরথ হয়ে, শেষে কোমর বেঁধে রুদ্রমূর্তি ধরে হুঙ্কার দিয়ে বললে,—"চরণ দিবিনিরে শালা? তবে আজ তোর গুরুগিরির দফা রফা করবো।" ভাবগতিক দেখে গুরুদেব ধাতস্থ হ'ন।

(যুদ্ধ ও সন্ধি ১)—রামচরণ গাঁয়ের মোড়ল। গাঁ সুদ্ধ চাষারা তার কথায় ওঠে বসে। কারণ এককালে আদালতে সাক্ষী দিয়ে সে বেশ দুপয়সা রোজগার করতো—এখন বুড়ো বয়েসে তারই উপস্বত্ব থেকে বসে খাওয়া চলে, আর ধর্মকর্মেও মতি হয়েছে।…

গাঁয়ে অজন্মা হল—চাষারা জমিদারের কিস্তি দিতে পারলে না। পেয়াদা-বরকন্দাজ এসে আগে ভয় দেখালে,—শেষে অত্যাচার সুরু করলে।…নায়েব বাবু মোড়লকে ডেকে পাঠালেন। মোড়ল জোড়হাতে নায়েবের দরবারে হাজির হল। নায়েব বাবু স্বয়ং পা থেকে জুতো খুলে মোড়লকে তক্তা করে ছেড়ে দিলেন।

মোড়ল বললে, "বামুনের জুতো,—এ তো আমার বাবার ভাগ্যি।"—নায়েব তার ঘাড় ধরে এক ধাক্কায় ঘরের বার করে বলে দিলেন,—"তিন দিনের মধ্যে যদি সব খাজনা আদায় না হয়, তাহলে তো-শালার ভিটের ঘুঘু চরাবো।"

মোড়ল একছুটে গাঁয়ে এসে হাজির। চাষারা চারিদিক থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

মোড়ল একটু হাঁফ ছেড়ে নিয়ে বললে,—"ওঃ—প্রথমে সে একচোট কী জুতোজুতি! তারপর নায়েববাবু যখন দেখলে, মোড়লের পো সোজাপাত্র নয়,—তখন আপোষের কথা পাড়লে। তোরা সব খাজনাটা আগে দিয়ে দে,—তারপর আমি জমিদারবাবুর কাছে দরখাস্ত লিখে দোব,—আর স্বয়ং নায়েববাবু সুপারিশ করবে। বেচারী মাইনের চাকর বই তো নয়! খাজনা আদায় না হলে, তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে যে!"

(যুদ্ধ ও সন্ধি—২)—পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ এক জাহাজে চলেছেন। জাহাজে একটা লোক সমুদ্রের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে চীৎকার সুরু করেছে—কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না। শেষে একজন নাবিক বিরক্ত হয়ে বললে,—"ওকে আমার কাছে দাও,—আমি ঠাণ্ডা করছি।"

এই বলে সে লোকটার কোমরে একটা কাছি বেঁধে একেবারে ঝপাৎ করে ফেলে দিলে সমুদ্রের জলে। জলে পড়ে' লোনাজলের নাকানি-চোবানি খেয়ে তার চীৎকার পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। তখন তাকে জল থেকে তুলে নেওয়া হল। জাহাজে উঠে সে মনে করলে,—"বাপরে!—বাঁচলুম।"

* * * *

কাউকে একটা দুঃখ ভোলাতে হলে তার ঘাড়ে আর একটা বড় দুঃখ চাপাতে হয়। তারপর সেই দ্বিতীয় দুঃখটা ঘুচিয়ে দিলেই সে মনে করে—বাপরে!—বাঁচলুম! তখন আর তার প্রথম দুঃখটার কথা মনে থাকে না।

স্বরাজের অভাবের দুঃখে যদি কেউ আইন অমান্য করে,—তার মাথা ভেঙ্গে, ঘর জ্বালিয়ে, ফসল নষ্ট ক'রে, তাকে জেলে দিয়ে নাস্তানাবুদ করে দাও। তারপর সেইটে বন্ধ করে রফা করো—লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে—পূর্ণ স্বরাজ্য, আইন অমান্য—দুই-ই ধামাচাপা পড়বে।

এই হল পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামের রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্সে পর্য্যবসানের ইতিহাস। পরবর্তী ইতিহাস আরো মনোহারী।

[ক্রমশঃ।

রূপকথা

[বোরিস পেষ্টারনাক]

হারিয়ে যাওয়া এক সময়
কোন এক রূপকথার দেশে
স্তেপির আন্দোলিত ভূমি
পার হ'য়ে গেছে দ্রুতবেগে

কোন এক ঘোড়সওয়ার রণপ্রান্তরে।
ধূলির কুজ্ঝটিকার ভেতর
উঠেছে তার সম্মুখে জেগে
অন্ধকার অরণ্যানী সেই দূরান্তে।

উৎকণ্ঠিত
মনে মনে ভেবেছিল সে:
'সম্মুখে জলাভূমি, সাবধান
দৃঢ় করে ধর পিঠের জিন।'

তবুও শোনেনি কোন মানা
ঘোড়া চলেছে ছুটে
দ্রুতগতি
অরণ্যানী-ঘেরা ঢালু পথ পার হয়ে।

পার হ'য়ে গেছে
শুকিয়ে যাওয়া নদী-পথ ধরে
পার হ'য়ে গেছে প্রান্তর
আর পার হয়েছে পাহাড়।

পথ হারিয়ে সে এলো
হিংস্র পশু চলা সংকীর্ণ পথে—
সে পথ চলে গেছে
জলাভূমির দিকে।

তবুও ভাবেনি কোন কথা।
সে সন্দেহ জেগেছিল মনে
জলভেজা তির্যক পথ বেয়ে নেমে গেছে ঘোড়া
জলার দিকে।

জলার অপর পারে
অগভীর নদীর শেষে
জ্বলে ওঠে কোন এক গুহা গহ্বরের মুখ
ভয়াবহ আলোকশিখায়।

রক্তিম ধূমে
ঢেকে গেছে তার দৃষ্টি
দূরের ক্রন্দন ধ্বনি
বেজেছিল অরণ্যের পথে পথে।

ঘোড়সওয়ার আবার চলেছে ছুটে
কান্নার সন্ধানে
নিয়েছে পথ চিনে সন্ধানী চোখে
তারপর দেখে সম্মুখে—

দৃঢ় হাতে বর্শা তুলে—
কোন এক ড্রাগনের
মস্তক লেজ
আর দেহের কঠিন আবরণ
তার জ্বলন্ত মুখের আগুন
পড়েছে ছড়িয়ে দিকে দিকে।
এক যুবতী কুমারী বন্দী
তার দেহের তিন পাকে পাকে।

চাবুকের মতো
ড্রাগনের গলা দোলে
কুমারীর কাঁধের কাছে।
সে দেশের নিয়ম ছিল
কোন এক
রূপসী কুমারীকে দিতে হবে সঁপে
বন্দী আর শিকাররূপে
অরণ্যের এই বিকট পশুর কাছে।
এই উপহার
দিয়েছিল মানুষেরা
ড্রাগনেরে, নিজেদের
জীবনের কামনায়

কুমারীকে অত্যাচারের হিংস্র আকাঙ্ক্ষায়
ড্রাগন ধরেছিল
দৃঢ় পাকে
বাহু আর গ্রীবায়।

ঘোড়সওয়ার আকাশে দৃষ্টি তুলে
জানিয়ে করুণ প্রার্থনা দূর স্বর্গে
বর্শা তুলে ধরে
সংগ্রামের তরে।

* *

চক্ষু নিমীলিত।
পাহাড়, মেঘ,
নদী, স্রোতস্বিনী।
বছর, শতাব্দী।

সংগ্রামের কঠিন আঘাতে ভূমিতে শয়ান ঘোড়সওয়ার
হারিয়েছে তার শিরস্ত্রাণ
আর প্রভুভক্ত ঘোড়ার
পদাঘাতে মৃত ড্রাগন।

ঘোড়া আর মৃত ড্রাগন
পাশাপাশি বালুকায় শুয়ে
ঘোড়সওয়ার অচেতন
আর কুমারী স্তব্ধ।

নীলাভ আকাশ। মৃদু-বাতাসে
কমনীয় দুপুর।
কে এ নারী? কোন রাণী?
অথবা কি রাখাল বালিকা? অথবা রাজকুমারী?

আনন্দের উচ্ছ্বাসে
থামেনি অশ্রু-ঝরা
তবু মাঝে মাঝে দেয় ঢেকে
কঠিন বাঁধনে মৃত্যুর শীতল ঘুম।

তারপর চেতনা এলে ফিরে
ঘোড়সওয়ার খোলে চোখ
আর থাকে প'ড়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে
গভীর বেদনায়।

তবুও তাদের হৃদয়ে জোয়ার আসে
কখনও বা তার কখনও বা কুমারীর।
জীবনের সংগ্রামে পরাস্ত
শুয়ে পড়ে চির-নিদ্রায়।

চক্ষু নিমীলিত,
পাহাড়, মেঘ।
নদী, স্রোতস্বিনী
বছর, শতাব্দী।

অনুবাদ—মিহির সাতী

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

বিচিত্র পশারী

—সন্তোষকুমার মজুমদার

জল-সিঞ্চন

—বিভূতিভূষণ কুমার

প্রাচুর্য্য —আশুতোষ সিন্‌হা

স্থান-অভাব —মদন বসু

বরাহ-বিগ্রহ (সীমাচলম)

—খগেন মুখোপাধ্যায়

ধারাবাহিক উপন্যাস
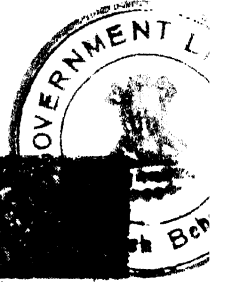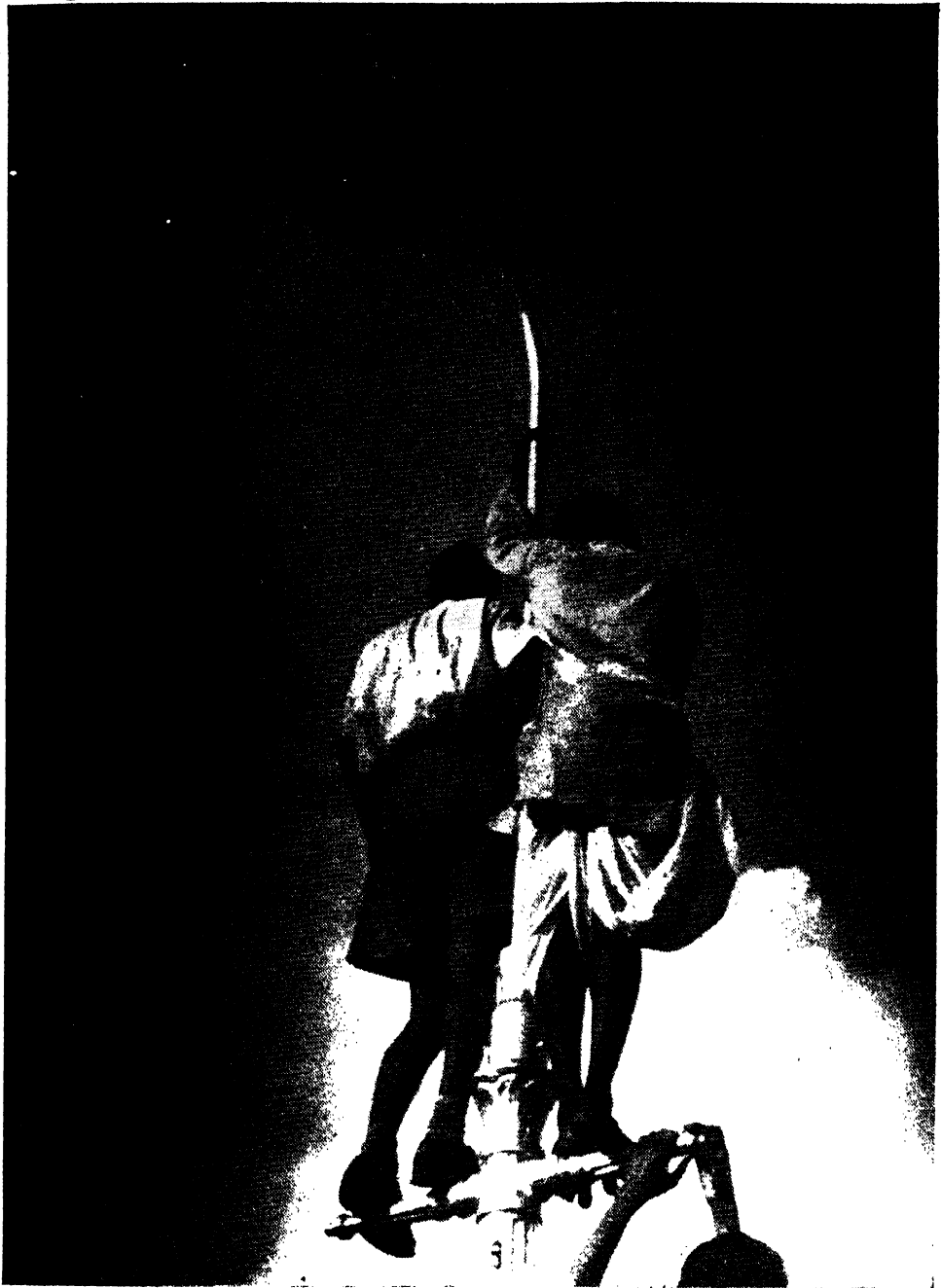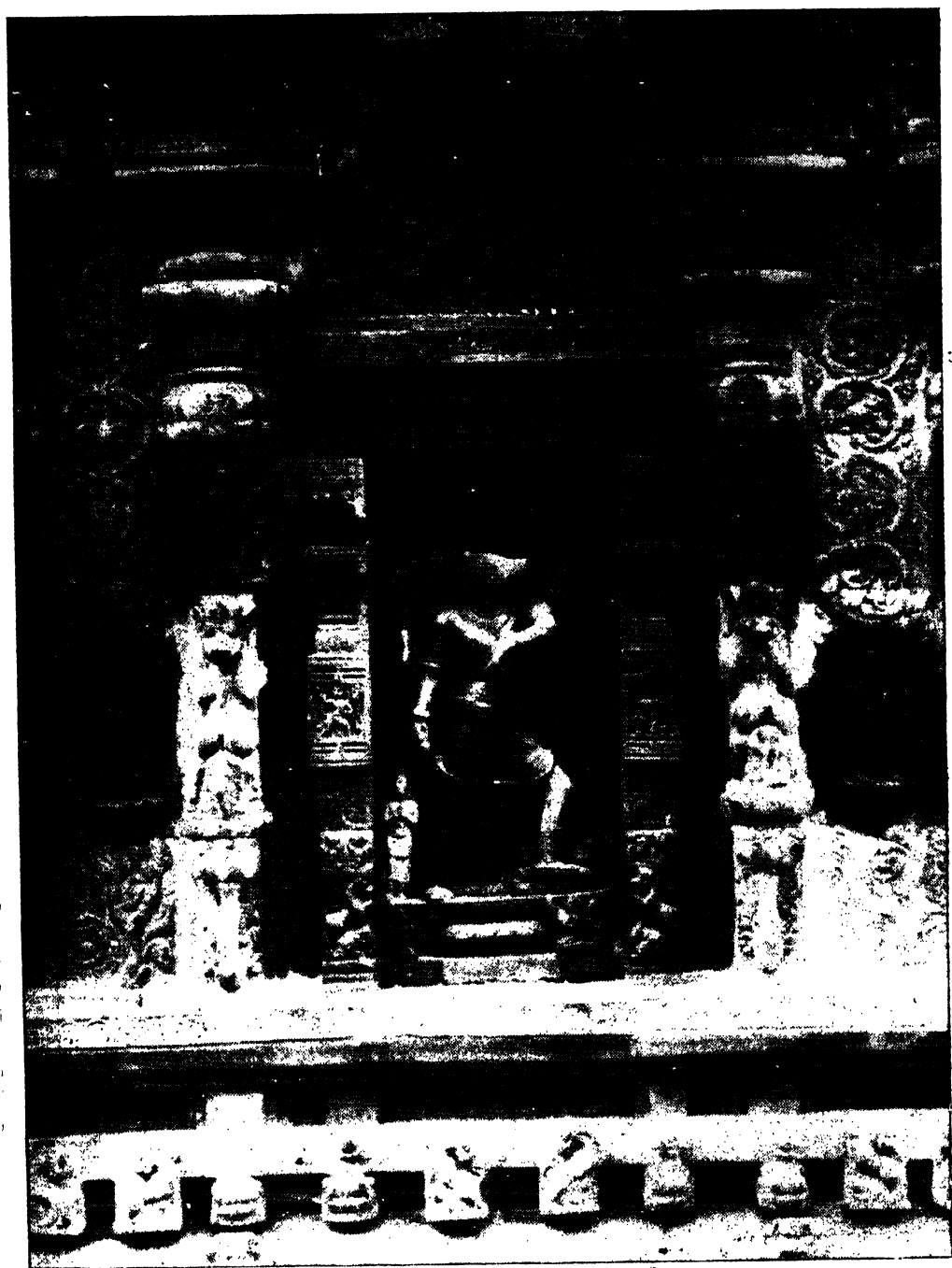
বিজন ভট্টাচার্য

২

আর পাঁচটা জমিদার আর জমিদারীর মতোই দ লেগেছিলো পাঁচবড়ার সেন-বংশে। তিন চার পুরুষ আগেকার কাহিনী সত্যিই রূপকথার মতো। বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য কিংবদন্তী কয়টাও চালু আছে বংশাবলী জড়িয়ে। যেমন ঠাকুরাণী পুকুরের গল্প। কি, না আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, গ্রামে জলকষ্ট। এই সেনবংশেরই তস্য প্রপিতামহ জনার্দন সেনের স্ত্রী পুষ্করিণী খনন ব্রত করছেন। আড়ে প্রস্থে দেখা যায় না এত বড় ঝিল। হাজার বাগদী মজুর কোদাল হাতে নেমে গেছে। ঝুড়ি ক'রে মাটি ফেলে ফেলে পাড় হয়েছে পর্বত-প্রমাণ। ওদিকে গভীরে পুকুর চলে গেছে পাতাল পর্যন্ত। অথচ জলের দেখা নেই। আশ্চর্য ঘটনা। নদীমাতৃক বঙ্গদেশ। তিন হাত খুঁড়লে জল। দুর্ভাবনায় পড়লেন জনার্দন।

পাপস্খালনের জন্যে এক ব্রত ছেড়ে আর এক ব্রত। একদিন খান, তো তিন দিন উপবাস। কৃচ্ছসাধনে ক্ষীণ হলো দেহ। এদিকে কোদাল পড়ছে একটি উঠছে। শুধু বালি আর বালি। এক ফোঁটা জল নেই। ব্রত বুঝি পণ্ড হয়। এমন সময় হঠাৎ একদিন স্বপ্ন পেলেন জনার্দন। মকরে চড়ে শঙ্খ-পদ্ম হাতে স্বয়ং গঙ্গাদেবী এসে তাঁকে বলছেন—সুরধুনীর পদস্পর্শ না পেলে আমি আবির্ভূতা হতে পারছি না। তোর বৌকে পুকুরে নামতে বল।

দুপুর রাতে নিদ্রাভঙ্গ হলো জনার্দনের। কাছাকোঁচার ঠিক নেই। পেটের কাছে কাপড় মুঠো করে চেপে ধরে জনার্দন ছুটলেন অন্দরবাটীতে—সুরধুনী, তুমি এসো।

ঝাড়লণ্ঠন জলে উঠল। মহলে মহলে সাড়া পড়ে গেল। এয়োস্ত্রীরা সব বরণডালা সাজিয়ে জোকার পুকার দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে এলেন। পুরোভাগে চললেন সতীসাবিত্রী সুরধুনী। হাতে পঞ্চপ্রদীপ।

তারপর বরণডালা মাথায় করে একটির পর একটি সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন অচঞ্চল সুরধুনী গভীর অতলান্ত তলে। সুরধুনীকে আর দেখা গেল না। স্থির পরিধির ওপর ভেসে এসে দুলতে লাগল শুধু পঞ্চপ্রদীপের ডালা। স্ত্রী-র পুণ্যে ব্রত সার্থক হলো জনার্দনের।

সেই থেকে ঐ পুকুরের নাম হলো ঠাকুরাণীর পুকুর। পালপার্বণ ব্রত-অনুষ্ঠানে আজও তল্লাটের লোকের কাছে ঠাকুরাণীর পুকুরের জল পবিত্র গঙ্গাজল।

—কিংবদন্তী আরও আছে।

এটা আরও পরের ঘটনা। সত্যব্রতর প্রপিতামহ নকুলেশ্বর সেনের সংসারে কোন আসক্তি ছিল না। রাজার মতো ঐশ্বর্য। তবু নিজের ভোগসুখ বিলাস-ব্যসনে তিনি এক কানাকড়িও খরচ করতেন না। সত্যপ্রিয় ঋষিপ্রতিম লোক। পরের দুঃখে সদাই বিগলিত-করুণা। জমিদারীর ভেতরে কেউ অনশন অর্ধাশনে আছে শুনলে নিজে আর সেদিন জলস্পর্শ করতেন না। পুজোপাঠ, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে সাধারণো দান-ধ্যান, এ ছিলো তাঁর নিত্যকর্ম। অনাসক্ত বিবাগী মন। বিষয়-আশয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নিবদ্ধ থাকতো শুধু বহির্বিশ্বলোকে। জাগতিক করণীয় কর্তব্য ভুলচুক হয়ে যেতো প্রায়ই। তবে ভুতের বোঝা ভগবানই বইবেন। সাংঘাতিক কোন বিচ্যুতি কোনদিনই ঘটেনি। হঠাৎ নিস্তরঙ্গ সুখের সংসারে হৈচৈ পড়লো একদিন। সূর্যাস্ত হয়-হয়, তবু লাটের কিস্তি দেওয়া হয়নি। নীলামে উঠলো তবে জমিদারী। ভেদবুদ্ধি অর্বাচীন সরিকের দল লাফালাফি সুরু করলো, নকুলেশ্বর ইচ্ছে করে তাদের পথে বসিয়েছে।

মহলে মহলে শোকছায়া নামলো। নিয়তির মতো অনিবার্য নিদারুণ এক রাজদণ্ডের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন সবাই।

তিন দিন তিন রাত বিশালাক্ষীর মন্দিরে দরজা বন্ধ করে রইলেন নকুলেশ্বর। কারো মুখদর্শন করলেন না। এদিকে জমিদারীর তরফ থেকে জরুরী এক প্রতিনিধি দল চলে গিয়েছে কলকাতা। আমলাগোমস্তারা গঙ্গার দিকে চেয়ে আছে কখন বজরা আসে।

সপ্তাহ কাল পরে কালোবিন্দুর মতো দেখা গেল যেন নদীবক্ষে—বজরা ফিরছে। অধীর জনতা কান পেতে শুনলো, শুধু আসছে না। বাজনা বাজিয়ে আসছে। লাল নীল হরিৎ নিশান উড়িয়ে প্রমত্ত বজরা দুলে দুলে আসছে।

আনন্দের আতিশয্যে অধীর হলো জনতা। আমলাগোমস্তাদের কেউ কেউ মা মা বলে লাফিয়ে পড়লো নদীবক্ষে। পুকার দিয়ে বেজে ওঠলো শঙ্খ পল্লীর ঘরে ঘরে। যাক, তা হ'লে সর্বনাশ হয়নি। প্রতিবিধান হয়েছে। মেজো আর ছোট তরফের বুদ্ধিমত্তায় রক্ষা পেয়েছে নকুলেশ্বর সেনের জমিদারী।

পুষ্পমাল্য ধান-দূর্বায় অভিনন্দন জানানো হলো বজরা থেকে মেজো আর ছোটবাবু নামতে না নামতেই। নকুলেশ্বরের স্ত্রী স্বয়ং এসে আশীর্বাদ করলেন দেবর ব্রজেশ্বরকে। আর আশীর্বাদের ছলে একথাও স্পষ্ট করে জানালেন—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। ব্রজেশ্বর

থাকতে তাঁদের আর ভাবনা নেই। ব্রজেশ্বর যেন অথর্ব অগ্রজ নকুলেশ্বরের সব দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করেন।

প্রশস্তিবাচন আর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর স্বতঃই আশা করা যায় অন্ততঃ বাহাদুরীর খাতিরেও বিজদর্শী ব্রজেশ্বর কিছু বলবেন। কিন্তু ব্রজেশ্বরকে দেখা গেল নতমুখে অঝোরধারায় অশ্রুবর্ষণ করছেন। বলছেন—দাদা কই, মহাপাতকী আমি, দাদা আমাকে ক্ষমা না করলে এ তুচ্ছ প্রাণ গঙ্গায় বিসর্জন দেব। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত ব্রজেশ্বর বজরা থেকে লাফিয়ে পড়ে ভিড় ঠেলে 'দাদা' 'দাদা' করে ছুটলেন গৃহাভিমুখে। পিছনে চললো কৌতূহলী জনতা। কি ব্যাপার? একটু পরে রুদ্ধশ্বাসে বার্ত্তা জানা গেল যে নকুলেশ্বর রায়ের হয়ে একজন অনন্যা সুন্দরী কন্যা নাকি ক্লাইভের এজলাসে সূর্য্যাস্তের আগেই রাজস্ব দিয়ে এসেছে।

সেই সব খানদানের-ই উত্তর পুরুষ সত্যব্রত। হাবভাব আদব-কায়দার চলনের ভঙ্গীটাই একদিন এমনি ছিল যে আর পাঁচটা চোখ হাঁ করে চেয়ে থাকতো সত্যব্রতর দিকে। সরাসরি কথা কইবার সাহস হতো না। কৌতূহলের নিবৃত্তি হতো অন্য কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে কে ভদ্রলোক!

তা পাঁচবড়ায় জমিদারদের একটা খানদান ছিল বৈ কি! প্রপিতামহ সেই নকুলেশ্বর সেনের আমল থেকে তাঁর নাতিনাতকুড় সর্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর সেন অবধি তেজে-বিক্রমে প্রত্যেকে সৌরসেনী। ছ ফুট সাড়ে ছ ফুট করে লম্বা দেবদুর্লভ সেই কার্ত্তিকেয় দেহকান্তি দেখলে সত্যিই মাথা আপনা থেকে নুয়ে আসতো। বৌ আনা হতো কিন্তু যাচাই করে—সাড়ে চার ফুটের বেশী লম্বা হবে না। কটিদেশ অর্থাৎ কোমর বরের হাতের মুঠপ্রমাণ না হলেও নিশ্চিতভাবে সরু। গড়ন হবে ছিপছিপে অথচ কনুই-এর হাড় দেখা যাবে না। আর চাই ডৌল। মুখের আদল লম্বা, গোল, কি ডিম্বাকৃতি যাই হোক না কেন, চোখ দুটি চাই রক্তকমলের পাপড়ি। শুধু পটলচেরা বললে সে চোখের কিছুই বলা হয় না।

রূপারোপের পর বউ যাচাই হতো তারপর গুণসম্পদে।—বউ-এর চলন কেমন, বলন কেমন, বিচার কেমন, শাস্ত্রজ্ঞ কি না, সংস্কৃত বাদেও সংস্কৃতি কিছু আছে কি না—এই সব দেখে। সত্যব্রত সেই বংশেরই সন্তান। কুলকৌলীন্য আজ আর কিছু নেই। তবু হাবভাব চেহারায় কৌলীন্য একটা কয়লার ময়লার মত থেকেই আছে। এটা অস্বীকার করবার নয়।

পিতৃকুলে অভিসম্পাত আসে সবিকি মামলায়। স্বামী নিজের স্ত্রীর হাতে জলস্পর্শ করেন না। ঘোলের সরবৎ-এ যে বিষ মেশানো নেই, সে কথা কে বলবে? তারপর ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খলতা। সেই সপ্রেম পটলচেরা চোখের দৌরাত্ম্য। রাতের অন্ধকারে মেজো তরফ গিয়ে ঢুকেছিলেন সেজো তরফের ঘরে। সেজো বাড়ী ছিলেন না। তিন নম্বর লাটের কাছারীতে গিয়েছিলেন মিথ্যে সাক্ষীর তদ্বিরে, সেই ফাঁকে। তারপর ফিরে আসতেই খণ্ডপ্রলয়। মেজো তরফ টেনে বার করেন গাদা বন্দুক, আর সেজো রিভলভার। রায়ের প্রাণ মাটির মত। অন্তর্বিরোধ ঠেকাতে এসে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান গুলী খেয়ে। মরবার সময় দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়ে যান, স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। শেষ রক্ষে হয় টাকায়। তারপর পাপের বাসায় সাপের ডিম পাড়ে। নিত্য নতুন ফোঁস ফুটে ফুঁসে বেড়ায় কালগোখুরা। একটার পর একটা অনর্থ হতে থাকে সংসারে। নকুলেশ্বর সেনের সার্থক স্বপ্ন জমজমাট এক হাঁড়ির পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা কাচের মত। কালি কালি জমির মত চারমহলা প্রাসাদের অন্ধিসন্ধি চিরে সরিকী পাঁচিল ওঠে পাঁচ দশ হাত অন্তর। কাছের মানুষ দূরে চলে যায় চিরজনমের মত। চোখের দেখাটা পর্য্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে না কোনদিন। সত্যব্রতর বাবা দেবদত্ত সেন মারা যেতেই এটর্নীর হাতে সম্পত্তির দায়ভার তুলে দিয়ে সত্যব্রতর মা স্বর্ণলতিকা মেয়ে চিত্রলেখার হাত ধরে গিয়ে ওঠেন শ্রীরামপুর, তাঁর ভাই-এর কাছে। সত্যব্রত তখন সবে বি-এ পাশ করেছে। জীবনে উন্নতি করবার শুভসংকল্প নিয়ে সে চলে যায় বিলেতে। বিলি ব্যবস্থা মত মাসান্তে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয় সত্যব্রতকে। সবাই মনে করে খেতাবী কোন রাজার বেটা। ফ্যাশান শো আর নাইট ক্লাবে বোতাম টিপলেই সঙ্গিনী আসে। দু-এক পাক নাচার পরই পরদেশী 'বালমা'র ঠোঁট কাঁপে। কপালের ভ্রূ ধনুক হয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দৃষ্টিতীর। বারোয়ারী কদমতলায় এই সব বৃন্দেদূতীদের পাল্লায় পড়ে টাকা খরচ হয় সত্যব্রতর জলের মত। তারপর আর থাঁও মেলে না। বিদেশ বিভূঁই, কে-ই বা সাহায্য করে। তলিয়ে যেতে যেতে ধরে ফেলে গুভময়। দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বারবারায় টিউটর করে।

শ্রীরামপুরের—মামাবাড়ীর কেউ বিলেত যায় নি। তবু কাজে কর্মে সাহেবিয়ানা পুরোদমে সাব্যস্ত এ বাড়ীতে। বড় মামা হরপ্রসাদের যদ্যপি টিকি আছে, রাত্রে তিনি রোজ মুরগী খান। বাড়ীর মেয়েরা কনভেন্টে পড়ে না কিন্তু ফরাসী মেমসাহেবের কাছে বাড়ী বসে ফ্রেঞ্চ শেখে। বাজার সরকার দীননাথ যখন হিসেবের খাতায় হিসেব মেলান, ট্রেলোপ্রাকার মিস পার্কার তখন একশ কুড়ি স্পীডে পাশে বসেই চিঠি টাইপ করে। ভেটকী মাছের কাঁটা সহযোগে ছ্যাঁচড়া একটা এখনও হয় বাড়ীতে। কিন্তু সেই কাঁটা চিবোতে বাড়ীর মেয়েদের খেতে তিনটে করবার রেওয়াজ নেই। ফ্যাক্টরী সাইরেনের সঙ্গে সঙ্গে কিচেন বন্ধ। একটা বাজলেই ঠাকুর চলে যাবে। পুজোপাঠ হবে হোক, কিন্তু ধুনো দিয়ে ঘটা করে কাঁঝ-ঘন্টা বাজবে না। সশ্রম জীবনে বিশ্রাম আছে কিন্তু হাই তুলে তুড়ি বাজিয়ে শ্রীমধুসূদন বলা চলবে না। ঘড়ির টাইমে বাঁধা নির্ঘণ্ট, মা ফলেষু কদাচ ন। স্রেফ কাজ করে যাও।

যুদ্ধের পর বিলেত থেকে যখন প্রথম ফিরে এলো সত্যব্রত তখন সে পুরোদস্তুর সাহেব। শ্রীরামপুর মামাবাড়ীর হাক আখড়াই চাল তার ঠিক পছন্দ হলো না। ঠিক করলো কোন হোটেলে গিয়ে থাকবে। মা স্বর্ণলতিকা খুব একটা আপত্তি করেন না। হোটেলে থেকে সুবিধে হয় কাজকর্মের তো তাই হবে। বোনের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেন হরপ্রসাদ। পাঁচবড়ার রাজরক্ত, ও রক্ত যতই তপ্তনীল হোক না কেন, বিশ্বাস নেই এক মুহূর্ত্ত। বলেন, বেশ তো তাই থাকবে। আমার কোন আপত্তি নেই। স্থির হলো হোটেলেই উঠবে সত্যব্রত।

কিন্তু হোটেলে টাকা কোথায় সত্যব্রতর! স্বর্ণলতিকাকে ডেকে বলে, এখন তো কিছু দাও। রোজগার করবো, ফেরৎ দেবো—এখনই তো দরকার টাকার।

চিন্তিত হল স্বর্ণলতিকা। সোনাদানা ঐশ্বর্য্য একদিন কি ছিল না ছিল আজ সে কথা সত্যিই অবান্তর। এক ছেলের জন্যেই তাঁকে এ পর্য্যন্ত কম খেসারত দিতে হয়নি। অস্থাবর কিছু সম্পত্তি ছাড়া কাঁচা টাকা তিনি কোথায় পাবেন? মেয়ে চিত্রলেখার বিয়ের বাবদ যে টাকাটা তিনি আলাদা করে রেখেছেন এখন তাতেও তিনি হাত দিতে পারবেন না। সে টাকা আছে এটর্নীর ঘরে, শীলমোহর করা। মেয়ের বয়স বাইশ না হওয়া পর্য্যন্ত হাত দেওয়া যাবে না সে টাকায়। সত্যব্রতর কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসেন স্বর্ণলতিকা।

: টাকার কথা বলছিস, টাকা কোথায় খোকা!

স্বর্ণলতিকার কথা বিশ্বাস হয় না সত্যব্রতর। অসহিষ্ণু হয়ে বলে, টাকা—দাও টাকা। এখন টাকা কোথায় বললে আমি কোত্থেকে টাকা পাবো? দাও, দেখো আমি সে টাকা চতুর্গুণ করে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো একদিন। টাকা ঢাললে তো টাকা আসবে? টাকা দাও। মা হয়ে ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারছো না!

: বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় খোকা! টাকা আমার নেই। টাকা আমি দিতে পারবো না। দৃপ্ত অথচ আহত কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ দুঃখ দুটোই সেদিন ফুটে উঠেছিল স্বর্ণলতিকার। কিন্তু সত্যব্রতর চোখে তখন টাকা ছাড়া আর কিছু নেই। মায়ের কথার উত্তরে শ্লেষ করে বলে, পূজোপাঠ তো কম শুনি আজও। বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করো তো আমি তাঁরই এক খামখেয়াল, অথচ সে খামখেয়ালীর দাম কেন তিনি দিয়ে যাননি? আর তুমি, তুমি একজন যা-তা লোক, তুমিও দায়িত্ব এড়ালে টাকা নেই। কি বলবো, আচ্ছা চলি।

চলে গেল হোটেলে সত্যব্রত। হাতে গাদাবন্দুক নেই, রিভলবারের গুলীও চালায়নি সে, তবু স্বর্ণলতিকার বক্ষ বিদীর্ণ হলো অনিবার্য্য ভাবে।

৩

দশ ছয় ষোল আনা,—দুটো ভগ্নাংশকে একত্র করে জুড়ে দিলে যেমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে এমন আর কিছুতে নয়। অন্নদা রায় অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মনস্থির করতেই অনেক সময় লেগে গেল অন্নদা বাবুর। অকারণ কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বতোষকে খানিকটা প্রতিযোগীর চোখে দেখে আসছিলেন অন্নদা। ব্যবসাগত রেশারেশির মনোভাবটা প্রত্যক্ষ না হলেও মনে মনে তিনি যে বিশ্বতোষ সম্পর্কে কোনদিনই সমস্বার্থের একাত্মতা অনুভব করেননি, এটা সত্য কথা। আর এই করেননি বলেই, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও অন্নদা বাবু খানিকটা বরাবরই দ্বিধান্বিত ছিলেন। ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে সম্প্রসারণটাও ঠিক আশানুরূপ হয়নি এতদিনেও। চেম্বার অব কমার্সে চটের ব্যাপারে তাঁর কথার দাম কমে গেছে। আর চটের বাজারে কথার দাম কমা মানেই মানুষ হিসেবে নিজে ছোট হয়ে যাওয়া। এ সব যা হয়েছে, অজ্ঞাতসারেই হয়েছে তাঁর। দোষ দিচ্ছেন না কাউকেই তিনি এ জন্যে। আজ দেখছেন, ভুল করেছেন তিনি মূল হিসেবে গোলমাল করে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার সম্পর্কে প্রত্যয়েরও যে একটা [illegible] ... [illegible] তিনি বুঝতে পারেননি। এতদিন পর আজ তাঁর সেই ভ্রান্তির নিরসন হয়েছে। একেবারে আপন করে বুকে টেনে নিতে হবে বিশ্বতোষকে। তবেই তার মনেরও সংশয় মিটবে। প্রফুল্লনলিনীর সঙ্গে একদিন অন্নদা বাবুর কি সম্পর্ক ছিল, সেকথা বিশ্বতোষ নিশ্চয়ই মনে করে থাকবে না।

ক্লাইভ বিল্ডিং থেকে অন্নদা বাবু সেদিন একটু তাড়াতাড়িই বেরোলেন। কাজকর্ম সেরে ভেবেছিলেন একেবারে সঙ্গে করেই ধরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু বিশ্বতোষের কি একটা আগে থেকেই কাজ ছিল। ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারলো না সঙ্গে। আলীপুরে নেমে গেল। অন্নদা বাবু একাই ফিরলেন মনোহরপুকুরের বাড়ী। দোতলায় উঠেই হাতটা বাড়িয়ে ধরেন কমলকামিনীর দিকে। হাসি মুখে বলেন, সতীর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেললাম কমল!

: সে কি! কার সঙ্গে?

: ছেলে যে তোমার খুব পছন্দ হবে এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

: তবু শুনি?

: কেন, বিশ্বতোষ। বিশ্বতোষের সঙ্গেই আমি সতীর বিয়ে দেবো। তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি, আপত্তির কথা নয়। বিশ্বতোষের সঙ্গে সতীর বিয়ে নিয়ে এর আগেও অনেক কথা হয়ে গিয়েছে কমলকামিনীর স্বামীর সঙ্গে। অন্নদা বাবু তখন রাজী হননি। যুক্তি দেখিয়েছেন, তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আজ হঠাৎ স্বামীর মুখে তার বিপরীত যুক্তি শুনে হতবাক্ হয়ে যান কমলকামিনী।

: আমার আপত্তি কি বলছো? তোমারই তো ধনুকভাঙা পণ ছিল জানতুম যে বিশ্বতোষের সঙ্গে তুমি মেয়ের বিয়ে দেবে না। আজ হঠাৎ......

: হঠাৎ নয়, হঠাৎ নয়। অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি মনস্থির করেছি কমল। দেখলাম ব্যবসায়িক স্বার্থের খাতিরেই অমিয়নাথের সঙ্গে আমার এখন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। মেয়ের বিয়ে যখন আমাকে দিতেই হবে...। নিজের ছেলে যা করলে তা তো চোখের ওপরেই দেখতে পেলে। সুতরাং গ্যারান্টি যখন কোনখানেই নেই, তখন বিশ্বতোষ-ই ভালো। ঠিক করিনি?

: খুব ঠিক করেছো। আমি খুব খুশী হয়েছি।

: আমি জানতাম তুমি খুশী হবে।

: সতীকে কিছু বলেছো?

: না। সতীকে বলা নয়। আমি চাই, একটা সহজ স্বাভাবিক পরিবেশের ভেতর থেকে ওরা পরস্পর পরস্পরকে জড়াক। অঙ্গীকার আর শপথ, যা করবার তা ওরাই করুক। আমরা দেখি। প্রাণের খুশীকে উপবগিয়ে ওঠেন কমলকামিনী। বলেন, আমার মেয়ের আমি কিন্তু—যাই বলো তুমি, অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেবো।

: সে তুমি দিও।

অন্নদা বাবু যখন কমলের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিন জন চাকর যথারীতি তাঁর শরীর থেকে নিত্যকার পদ্ধতি মতো জুতো-জামা প্যান্ট খুলে নিয়ে চলে যায়। এক সেট যায় আর এক সেট আসে। স্বামিস্ত্রী-র হাসিঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে তারা সুযোগ বুঝে কাজ করে চলে। পারিবারিক কোন কথায় তাদের আপাতত কোন

কৌতূহল দেখা যায় না। যেন অন্নদা বাবু রেগে গেলে-ও ওরা ভয় পাবেনা। রসিকতা করে হেসে উঠলে-ও হাসবেনা ওরা। সমীচীন মুহূর্তগুলো বুঝে বুঝে শুধু হাত-পা শরীর ধরে নাড়াচাড়া করবে। অন্নদা বাবু-ও এমনি ঢিলেঢালা ভাব করেন যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর কর্সা নাদুসনুদুস শরীরটা ওঁদের চোখের ওপর তিনজন চাকর অন্নদা বাবুর আচ্ছড় শরীরটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় বলে কমলের-ও লজ্জা করেনা। অন্নদাবাবুর সঙ্গে কটিনষ্টি করে কত হাসি কত কথা বলেন কমল, যেন ঘরে অন্য প্রাণী নেই।

অন্নদা বাবু হেসে বলেন, শুধু অর্থ আর বৈভব থাকলেই সব হয় না। আমি বলছি সতীর কথা। স্বয়ংবরসভা ডেকে পতি-নির্বাচন করতে পারবে না আমার মেয়ে। সে ব্যক্তিত্ব নেই আমার সতীর। সুতরাং তার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে গেলে অগত্যা আমাকেই খুঁজে পেতে এনে দিতে হবে ছেলেকে।

: না, ও নিজেরা উদ্যোগ করে না করলে কিছুটি হবার নয়। সে আমার ছেলের বেলাই খুব শিক্ষে হয়েছে।

হঠাৎ অন্নদা বাবুর মনে পড়ে যায়, টেলিফোনে নেমন্তন্ন করে খেতে বলেছেন রাত্রিতে বারবারাকে। স্ত্রীকে বলেন : ভাল কথা। ওদের কিন্তু আমি রাত্রে খেতে বলেছি। শুভময় আসবে বারবারাকে নিয়ে।

: খেতে বলেছো, দেখবে ঠিক ডিনার টাইমে আসবে। আমাদের মতোন? রাত্তিরে নেমন্তন্ন আর সকালে গিয়ে নিজেই কুটনো কুটছি।

: এ তোমার রাগের কথা হলো কমল! বারবারা তার আনন্দ জানবে কোথা থেকে? Dinner at eight. সেদিক থেকে দেখবে ঘড়ির কাঁটার এতটুকু এধার-ওধার নেই। ঠিক এসে গেছে বারবারা। তোমার সকালবেলা গিয়ে কুটনো কোটার আনন্দটা এর পরিপ্রেক্ষিতে মিলিয়ে নাও। দেখবে ঠিক আছে হিসেবে। হাজার হলেও মেমসায়েব তো?

কারা যেন উঠে আসে কাঠের সিঁড়ি ধরে। আড়চোখে পর্দার দিকে তাকিয়ে কমল বলেন : ঐ বুঝি এলো বারবারা।

বারবারা? এত তাড়াতাড়ি? একটু অবাক হন অন্নদা বাবু। উঠে যান হলঘরে।

পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়ে এতই জমে উঠেছিলেন অন্নদা বাবু, যে খেয়ালই ছিলো না তাঁকে দমদম বিমানঘাঁটিতে যেতে হবে বিশ্বতোষের সঙ্গে। মিঃ টমসনকে বিলেত যাবার প্রাক্কালে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্যে।

: আরে কি আশ্চর্য দেখ এখন অবধি আমি তৈরী হতেই পারলুম না। কি করা যায় বল তো?

নিজের অপ্রস্তুতির জন্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অসহায় যুক্তি দেখান অন্নদা বাবু।

অসম্ভব একটা দামী স্যুট পরে এসেছে বিশ্বতোষ। চলবার ফেরবার প্রত্যেকটি কায়দায় আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ। বলে : বেটেটা হলে আমিই বারণ করতুম। কিন্তু টমসন যাচ্ছে আমাদেরই কাজে আপনার পরামর্শ মতো। একবারটি গেলে ভাল হতো না?

দুটো স্বার্থের সূতো একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। উঁ—একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসার শব্দ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন অন্নদা বাবু বিশ্বতোষের দিকে ঠোঁটটা কামড়ে। বলেন : না, গেলে তো ভাল দেখাতোই। তবে ভাবছি, এই মাত্তর তাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে এলুম। তারপর তুমি যখন যাচ্ছোই।

কথার মাঝখানে কমল আর সতী এসে হাজির হতেই অন্নদা বাবু যেন একটা খেই পেয়ে যান। বলেন : এক কাজ কর না কেন? কমল তোমার সঙ্গে যাক। দেখাটাই তাহলে আরও ভাল হবে কি বল?

বিশ্বতোষের চোখে-মুখে চমকটা ফোটবার আগেই ফোঁস করে ওঠেন কমল : কোথায় যাবে কমল? এরোড্রামে টমসনের জন্যে ফুল নিয়ে? স্বপ্নেও ভেবো না।

অন্নদা বাবু একটা বে-চালের পর মাথা চুলকোন। তারপর মোক্ষম চাল চালেন হাসিমুখে।

: ঠিক আছে ঠিক আছে: যেতে হবে না তোমাকে। তুমি বসে বসে ডিভিডেণ্ট খেও। শেয়ারহোল্ডার হয়ে কোম্পানীর কোন কাজ করছো না তো? সতী যাবে। সতী, তুমি বিশ্বতোষের সঙ্গে দমদম যাবে। টমসন সায়েব বিলেত যাচ্ছে আজ। আমার আগেই বলা আছে মার্কেটে। যাবার পথে কিছু ফুল তুমি নিয়ে যেও। সায়েবও খুব খুসী হবে। বলো, বাবার শরীরটা তেমন ভাল নেই। তাই আমায় পাঠিয়ে দিলেন। টমসনের পকেট থেকে অনেক চকোলেট খেয়েছো। যাও কাজটি করে এসো।

বিশ্বতোষ কোন কথা বলে না। অন্নদা বাবুর কথার সূত্র ধরে কমল বলেন : আর এ সব লৌকিকতার ব্যাপারে তড়িঘড়ি দৌড়ঝাঁপ ছেলেছোকরাদের পক্ষেই সম্ভব। নাও, যাবে তো তৈরী হয়ে এসো সতী। দেরী করো না।

অন্নদা বাবু বিশ্বতোষকে সাক্ষী মানেন—কি হে পার্টনার, বলো কিছু।

খড়পোরা বাঘের মাথাটাকে চাপড়ে আদর করে বিশ্বতোষ। সতীকে বলে : যাবেন তো দেবী, দেরী করবেন না। আবার ফুলের ব্যাপারটা আছে। অন্ততঃ মিনিট পনেরো আগে পৌঁছুতে চাই।

বিশ্বতোষের সঙ্গে ফুল নিয়ে যাবার প্রলোভনে যতটা নয়। বুড়ো টমসনকে একবাক্স চকোলেট দিয়ে অবাক করে দেবার ইচ্ছেটা ছেলেমানুষের মতো পেয়ে বসে সতীকে। বলে : ফুল নয়, চকোলেট। আমাকে চকোলেট কিনে দিতে হবে টমসনকে।

অন্নদা বাবু হাসল। বলেন : বেশ তো। তোমার চকোলেট, আর আমার ফুল। টমসনকে বলে দিও। ভালই হবে।

প্লেনের তাড়ার চাইতেও তখন বিশ্বতোষের তাড়া বেশী। হাতঘড়ি দেখে সতীকে বলে : আর দেরী করবেন না, আসুন।

অসহিষ্ণু হয়েছে বিশ্বতোষ। সতী অসহিষ্ণু হয়ে না উঠলে তাকে আজ অনেক কথা বলবার আছে বিশ্বতোষের। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রওনা করে দিয়ে আসেন কমল ওদের। ঘুরে ফিরে এসে অন্নদা বাবুর হাত ধরে বলেন : চল, এবার আর একবার দেখি। তবে প্লেনে যাবার কথা ভাবলেই যে ভয় করে।

অন্নদা বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—সে ভয় একলা গেলে। দুজনে একসঙ্গে থাকলে আবার ভয় কি কমল? পাঁচিলটা বহুৎ বেল করে গিয়েছে মহল থেকে। অন্নদা বাবুর

আগামীর
প্রস্তুতি

হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কমল বলেন : চল না আমরাও বেরিয়ে পড়ি ওদের পেছন পেছন ?

অন্নদা বাবু হেসে বলেন : মনে আছে? সেই একবার হেডলাইট মেরেছিলাম জি টি রোডে। কানগর যাচ্ছিলে কালীপুজোর তুমি তোমার দাদার সঙ্গে ?

পঁচিশ বছর আগেকার কালীপুজোর রাতের কথা ভাল মনে পড়ে না কমলের। ঈষৎ হাসিমুখে অন্নদা বাবুর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে 'বেলফুলের মালা' আর 'ঠাণ্ডিবরফ'এর ঝিমিয়ে পড়া সুরে মধুর কোন কোন পূর্ণিমার রাত চোখে ভেসে ওঠে কমলের। রসভঙ্গ করে বারবারা। শুভময়ের হাত ধরে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটায় এসে হাজির। সত্যব্রতও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে।

ওদিকে বিশ্বতোষের গাড়ীর স্পীডোমিটারের কাঁটা থর-থর করে কাঁপছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠা ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

একে রাস্তাটা খারাপ তার ওপর আবার দু'-এক মিনিট অন্তর যানবাহনের বাধা, নইলে মনের আবেগ ঠিক ঘড়ির কাঁটার ধরা পড়তো উর্দ্ধশ্বাস গতিবেগে। শীতের ঠাণ্ডায় ওপরের ধোঁয়া রাস্তায় এসে নেমেছে। দূরের পথ অস্পষ্ট। হেডলাইটের আলোতেও সেই ধূলিধূসর নোংরা আচ্ছাদন ভেদ করবার নয়। সামনের দিকে নজর রেখে ষ্টীয়ারিং ঠিক রাখে বিশ্বতোষ। বলে : ফুল আর চকোলেট ভাগ্যে নেই টমসনের, তার কি হবে ?

সতী হাতঘড়ি দেখে বলে : ঠিক পেয়ে যাবো দেখবেন।

: আশাবাদীকে কখনো ভাগ্যবানে বিশ্বাসী হতে নেই।

: মানে ? মুখ ফেরাতেই সতীর কানের হীরেটা আলো ফেলে বিশ্বতোষের চোখে-মুখে। সতী বলে : আপনি বুঝি আশাবাদে বিশ্বাস করেন ?

: আশাবাদী কে নয় বলুন ? তবে আশা যে স্থলে কুহকিনী সেখানে একদম নয়। ও ছলনায় ভুলতে রাজী নই।

: কবিরা বলেন, আশা কিন্তু কুহকিনী।

বলুন কবিরা। আজে-বাজে কথা কইবার লাইসেন্স আছে ওঁদের। আমার সে লাইসেন্স নেই। প্রথমতঃ ব্যবসাদার বলে দ্বিতীয়তঃ পাট আর যাই করুক, কখনও কুহক সৃষ্টি করতে পারে না জানবেন।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সতী। বলে : না, তা পারে না ঠিকই। কিন্তু পাট নিয়ে যে স্পেকুলেশান করেন আপনারা তা কিন্তু কবিকল্পনাও ছাপিয়ে যায়। কাটকার বাজারে দেখুন—আপনারা প্রত্যেকেই ডক্টরেট।

: ডক্টরেটের বিষয়বস্তু কিন্তু পাট। ফুল ভুল দুল নয়। বনলতা সেনের Scope নেই এখানে।

গাড়ীর স্পীড অস্বাভাবিক মন্থর হয়ে যায়। বিশ্বতোষ সতীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে : আর, যদি কোন বনলতা সেন আসেনই, তিনি নাটোরেরই হোন বা যেখানকারই হোন, তাঁকে আসতে হবে পাটের মতো স্থূল সুনির্দিষ্ট ভাবে। আপনার ভাষায় 'ডক্টর অব্ জুট'-এর পক্ষে একমাত্র তখনই স্পেকুলেশান করা সম্ভব। তখন যে কোন মূল্য, টাকা ছেড়ে ঘড়ি আংটি বোতাম যায় তুচ্ছ এ জীবনও।

বিশ্বতোষের চোখ দুটো ঝিমিয়ে আসে। সতীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে : জানবেন, আমরা, যারা পাটের কারবার করি মিস, ব্রেক পাট, পাট ছাড়া কিছু বুঝি না আমরা। Everything in terms of jute।

নাকে মুখে অনর্গল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পায়ের চাপে গাড়ী ছুটিয়ে দেয় বিশ্বতোষ।

পাটের দাপটের কথা শুনে চুপ করে থাকে সতী। বিশ্বতোষ বলে : উত্তরটা ভেবে রাখুন। ফেরবার পথে শুনবো। এখনও হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে। দেখি যদি টমসন সায়েবকে আপনার চকোলেট ধরিয়ে দিতে পারি। [ক্রমশঃ।

মায়ের মায়া

(Tennyson রচিত Home They Brought Her Warrior Dead হইতে)

সবিতা রায়-চৌধুরী

তরুণ সেনানী করি ঘোর রণ,
মহামরণেরে করিলে বরণ,
চিরনিদ্রিত পুণ্য সে দেহ, গৃহে আনা হল তার,
পাষাণ-প্রতিমা বীরপ্রিয়া চোখে
এক কণা জল ঝরিল না শোকে,
হারায়ে চেতনা, সে তো লুটিল না, করিল না হাহাকার।
সমব্যথী যত সজিনী দল,
তরুণীরে হেরি হল চঞ্চল,
স্থির নির্ব্বাক, বিধবারে যেরি গুঞ্জন ওঠে ধীরে
জীবন-প্রদীপ নিবিবে তাহার,
হৃদয়ে চাপা ব্যথার পাহাড়,
[illegible] না গলিলে আঁখি-নীরে।
সদ্য-বিধবা তরুণীর কানে
সখীদল মিলি, মৃদু গুণ-গানে
গাহে কুলে-কুলে, বিগত বীরের যত গৌরবগাথা,
"ক্ষমাশীল অরি, প্রকৃত মিত্র,
প্রেম প্রদানের যোগ্য পাত্র,"—
নির্ব্বাক পতি-বিয়োগ-বিধুরা কহিল না তবু কথা।
নীরব চরণে এক সংগিনী,
বীর পাশে ধীরে আসিয়া তখনি,
বদন হইতে আবরণখানি সরায়ে লইল ধীরে,
চিরনিদ্রিত সেই প্রিয়মুখ
দেখিয়াও তার ভাঙিল না বুক,
অসহ ব্যথায় লুটিল না হায়, ভাসিল না আঁখিনীরে,
বৃদ্ধা তাহার ধাত্রী তখন,
শিশুটিরে শেষে করিল স্থাপন,
পাষাণ-প্রতিমা সে উদাসিনীর কোমল অঙ্ক 'পরে,
টুটিল এবার পাষাণের ভার
ছুটে দুর্ব্বার অশ্রুজোয়ার,
কাঁদিয়া কহিল, "বাছা রে আমার, বেঁচে আ[illegible] তরে।"

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আইভান তুর্গেনিভ

১৬

জার্মাণ ডিনার যে কি তা সবাই জানে। দারুচিনি আর ময়দার পিণ্ডের ঝোল। সেদ্ধ করা গরুর মাংস, কর্কের মত শুকনো আর সাদা চর্বির টুকরো লাগানো তাতে। আলু, বীট, মূলো সব সেদ্ধ, ভিনিগার দেওয়া ইলমাছ, মাংসের সঙ্গে জেলি আর মেল্স্ পাইজে অর্থাৎ লাল টক রসের পুডিং। কিন্তু বিয়ার ও ওয়াইন চমৎকার। সোডেনেও তারা এই খেলো। আহার বেশ ভালোভাবেই চলছিলো, সবাই যে খুব ফূর্তি করছিলো তা নয়, এমন কি হের ক্লুবার 'যা আমরা ভালোবাসি' তার উদ্দেশে যখন পান করলো তখনও সবাই চুপচাপই ছিলো। খাবার পর এলো কফি—পাতলা, খয়েরি রং-এর সত্যিকারের জার্মাণ কফি। খাঁটি ভদ্রজনের মত হের ক্লুবার সিগার খাবার আগে অনুমতি চাইলো জেম্মার কাছে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ অশোভন ও গ্লানিকর একটা ঘটনা ঘটে গেলো, খানিকটা অশিষ্টও।

পাশাপাশি টেবিলগুলোর একটিতে বসেছিলো প্রধান সেনাদলের কয়েকটি অফিসার। তাদের কথাবার্তা ও চাহনি থেকে বোঝা যাচ্ছিলো জেম্মার রূপ তাদের আকৃষ্ট করেছে। তার মধ্যে একজন তার দিকে এরকম ভাবে চেয়েছিলো যে মনে হচ্ছিলো ফ্রাঙ্কফোর্টে জেম্মাকে দেখে থাকবে। সে নিশ্চয়ই জেম্মার পরিচয় জানতো। হঠাৎ সে গ্লাস হাতে করে উঠে দাঁড়ালো, সেনাদলের লোকগুলো ভীষণ মদ খাচ্ছিলো, তাদের টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতল দেখা যাচ্ছিলো, সে এগিয়ে এলো জেম্মার টেবিলের দিকে। গৌরবর্ণ, সুন্দর প্রিয়দর্শন তরুণ ছিলো সে দেখতে। অবশ্য এখন মদ্যপানের ফলে তার গালের পেশীগুলি কুঁচকে উঠছিলো, চোখ বেরিয়ে আসছিলো। প্রথমে তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলো কিন্তু কি করে সে দেখবার জন্য তারাও খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠছিলো, আর বাধা দিলো না।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না অফিসারটি। মদ্যপানের ফলে তার কণ্ঠস্বরে জড়তা এসেছিলো, জেম্মার সামনে এসে চেষ্টা করে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো সে 'সারা ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরের, না, সারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী শপগার্লে'র (দোকানীমেয়ের) স্বাস্থ্য পান করি আমি।' বলেই তার গেলাসের অবশিষ্ট পানীয় উদরসাৎ করলো। 'আর তার দেবদুর্লভ আঙুল দ্বারা আহৃত গোলাপটি নিয়ে পুরস্কৃত করি নিজেকে।' জেম্মার প্লেটের পাশে টেবিলের ওপরে রাখা একটি গোলাপ ফুল কুড়িয়ে নিলো সে। প্রথমে বিস্ময়ে ও ভয়ে জেম্মা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তারপর ভয়ের জায়গায় দেখা দিলো ক্রোধমিশ্রিত ক্রোধ। তার মুখে রক্তিম আভা দেখা গেলো, তার কালো গভীর দু'চোখে একবার ঘৃণায় একবার ক্রোধে চেয়ে দেখলো তরুণটির দিকে। মনে হলো এ দৃষ্টিতে অফিসারটি লজ্জিত হলো, জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে চেষ্টা করলো, নত হয়ে অভিবাদন করে তার সুহৃদবর্গের মধ্যে ফিরে গেলো। তারা তাকে অট্টহাস্যে ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো।

হের ক্লুবার টুপি পরে উঠে দাঁড়ালো, মার্জিত কণ্ঠে যদিও উচ্চৈঃস্বরে নয়—বললো 'অত্যন্ত বর্বর আচরণ' সেই সঙ্গে কড়াসুরে ওয়েটারকে ডেকে বিল দিতে বললো। শুধু তাই নয়—গাড়ী জুততে আদেশ দিলো ও বললো, ভদ্রলোকদের পক্ষে হোটেলে খাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের অপমানিত হতে হয় হোটেলে এসে। জেম্মা স্থির হয়ে বসে হাঁপাচ্ছিলো। এ কথা শুনে হের ক্লুবারের দিকে চেয়ে দেখলো, সেই দৃষ্টিতে যে দৃষ্টি দিয়ে সে অফিসারটির দিকে চেয়েছিলো। এমিল রাগে কাঁপছিলো।

কঠোর স্বরে জেম্মাকে হের ক্লুবার বললো—উঠে এসো। এখানে বসা আর শোভন নয়। চলো আমরা ভেতরে যাই।

জেম্মা চুপ করে উঠে দাঁড়ালো, হের ক্লুবার তার কনুই বাড়িয়ে দিয়েছিলো, হাতে হাত ধরে সসম্ভ্রমে এগিয়ে গেলো তারা হোটেলের ভেতরে। হের ক্লুবার তার সুবেশ ও সুদর্শন চেহারার সঙ্গে সদর্পে ও সসম্মানে তাল রেখে চলেছিলো। বেচারা এমিলকেও তাদের পেছন পেছন যেতে হলো।

কিন্তু হের ক্লুবার যখন ওয়েটারকে বিল শোধ করে দিচ্ছিলো —এক পয়সাও বখশিস দেয়নি সে ওয়েটারকে শাস্তিস্বরূপ—সানিন দ্রুতপায়ে অফিসারদের টেবিলের পাশে গেলো। সেই অফিসারটি যে জেম্মাকে অপমান করেছিলো তার বন্ধুবর্গকে ফুলটি শোঁকার জন্য একজনের পর একজনকে দিচ্ছিলো। সানিন পরিষ্কার ফরাসীতে তাকে উদ্দেশ করে বললো, দেখুন, এইমাত্র আপনি যা করে এলেন, তা ভদ্ররীতিসংগত নয়, তা আপনি যে ইউনিফর্ম পরেছেন তার অযোগ্য, অতি নীচ আপনি। অফিসারটি লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু তার চেয়ে বয়সে বড় একজন অফিসার জোর করে বসিয়ে দিলো তাকে। তারপর সানিনের দিকে ঘুরে ফরাসীতে উত্তর দিলো, কে আপনি? একজন আত্মীয়, মেয়েটির ভাই না ওর ভাবী স্বামী?

সানিন বললে', আমি তার পরিচিত মাত্র। আমি হচ্ছি রাশিয়ান। কিন্তু এরকম উদ্ধত আচরণ দেখে তো চুপ করে থাকতে পারি না। এই আমার কার্ড ও আমার ঠিকানা—মহাশয়রা আমাকে খুঁজে পাবেন।

এ কথা বলে সানিন একটি কার্ড ছুঁড়ে ফেললো টেবিলে ও

প্লেটের ওপর ফেলে রাখা জেম্মার গোলাপটি তুলে নিলো। সেই ভদ্রলোকটি আবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করছিলো কিন্তু অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠলো 'ভদ্রলোক, বসে থাকো' এবারে সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সানিনকে বললো, তাদের সেনাদলের একজন অফিসার কাল সকালে সানিনের সঙ্গে দেখা করবে। সানিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলো। সানিন যে খানিকক্ষণের জন্ত ছিলো না বা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলো হের ক্লুবারের যেন নজরেই এলো না। গাড়োয়ান ঘোড়া জুতছিলো, অস্থির হয়ে সে তাকে তাগাদা দিচ্ছিলো। জেম্মাও সানিনকে কিছু না বলে অন্তদিকে চেয়েছিলো। কিন্তু তার কোঁচকানো ভুরু, শুকনো ঠোঁট ও শান্তভাব থেকেই তার অধীরতা বোঝা যাচ্ছিলো। একমাত্র এমিলই সানিনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলো, জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো। সে সানিনকে দেখেছে অফিসারদের কাছে যেতে, একটা সাদা কাগজ চিঠি বা কার্ড খুঁজে দিতে। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো সানিনকে জড়িয়ে ধরতে। তার সঙ্গে গিয়ে, ওই অধম অফিসারগুলোর মাথা ভেঙে দিতে, উত্তেজনায় তার সারা শরীর কাঁপছিলো। কিন্তু কোনো রকমে চাঞ্চল্য দমন করে সে দেখছিলো তার মহৎ রাশিয়ান বন্ধুটি কি করছে।

গাড়োয়ান ঘোড়া জুতলে পর সবাই গাড়ীতে গিয়ে বসলো। এমিল লাফিয়ে গাড়োয়ান ও টার্টালিয়ার পাশে উপরে উঠে বসলো। ওখানেই সে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলো। হের ক্লুবারকে দেখতে হবে না ভেবে সে খুশী হয়েছিলো। সে তার সারা অন্তর দিয়ে ওকে ঘৃণা করছিলো এখন।

সারা রাস্তা হের ক্লুবার নিজের মনে একাই বকে গেলো। কেউ তার কথার প্রতিবাদ করলো না। অবশ্য তাই বলে তাকে যে কেউ সমর্থন করছিলো তাও নয়। বললো সে ভীষণ ভুল করেছে ওদের চারদিক বন্ধ করা গ্রীষ্মকালীন ঘরে না নিয়ে গিয়ে। যদি তারা যেতো তাহলে এই অশোভনতা কিছুই ঘটতো না। তারপর বললো, সরকার তার সেনাদলকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় তার জন্য তারা জনসাধারণের প্রতি শিষ্ট আচরণ করতে পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তার এই তীব্র সমালোচনায় যেন নব্যতন্ত্রীদের চিন্তাধারার ছোঁয়াচ লাগানো ছিলো। সেজন্তই চারদিকে এত অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এরই শেষ পরিণতি হচ্ছে বিপ্লব। এবারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে ফ্রান্স। অবশ্য সে নিজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাই পছন্দ করে। কখনই সে বিপ্লবী হবে না। তবু এ রকম স্বেচ্ছাচারিতা দেখে সে চুপ করে থাকতে পারে না। রীতিপরায়ণতা ও মর্য্যাদা, দুর্নীতি ও আত্মসম্মান সম্বন্ধে আরো কয়েকটি অতিপ্রচলিত মন্তব্য বলে সে তার বক্তব্য শেষ করলো।

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে জেম্মা তার প্রণয়ীর জন্ত স্পষ্টতঃই লজ্জা বোধ করছিলো। খাবার আগেও অবশ্য মনে হয়েছিলো কোনো কারণে হের ক্লুবারের প্রতি বিরক্তি বোধ করছে সে, সেজন্তই সানিনকে দূরে রাখছিলো, এমন কি তার উপস্থিতিতে অস্বস্তিই বোধ করছিলো। শেষের দিকে সে খুব কষ্ট পাচ্ছিলো, সানিনকে সে কিছুই বলেনি, কিন্তু মিনতিভরা চোখ নিয়ে চাইলো সে সানিনের দিকে। সানিন যত না হের ক্লুবারের প্রতি বিরাগ বোধ করছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী অনুকম্পা বোধ করছিলো জেম্মার জন্ত। সারাদিন যা ঘটে গেলো তার জন্ত সে যেন একটু খুসী হয়েছিলো। যদিও সে জানতো কাল সকালে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

অবশেষে এই যন্ত্রণাদায়ক পরিচ্ছেদের শেষ হলো। যখন সে জেম্মাকে গাড়ী থেকে নামতে সাহায্য করছিলো, কোনো কথা না বলে সানিন সেই কেড়ে আনা গোলাপটি আস্তে তার হাতে ফিরিয়ে দিলো। সে লজ্জায় লাল হয়ে সানিনের হাতে একটু চাপ দিলো ও কুঁকড়ি ফুলটি কোথায় লুকিয়ে ফেললো। সন্ধ্যা সবে ঘনিয়ে আসছে তখন, তবু সানিন বাড়ীর ভেতর গেলো না। জেম্মাও তাকে যেতে বললো না। তাছাড়া পান্টালেওন তখনই দরজায় এসে বললো ফ্রাউ লেনোর শুয়ে আছেন। এমিল সসঙ্কোচে বিদায় নিলো, সে যেন সানিনকে এড়িয়ে যাচ্ছিলো—সানিনের ব্যবহার তাকে এতই মুগ্ধ করেছিলো। ক্লুবার সানিনকে সঙ্গে করে গাড়ীতে পৌঁছে দিলো তার হোটেলে অত্যন্ত ঘটা করে ভদ্রতার সঙ্গে বিদায় নিলো। এই অতি সপ্রতিভ ও মার্জ্জিত জার্মাণ ছেলেটি পর্য্যন্ত যেন কুণ্ঠিত হয়েছিলো। অবশ্য সকলেই তাই বোধ করছিলো।

যাই হোক, সানিন তার অস্বস্তি সহজেই ঝেড়ে ফেললো তার জায়গায় তার মন ভরে গেলো মধুর আনন্দে, এমন কি উল্লাসেও বলা যেতে পারে। অকারণ পুলকে তার মন থেকে সব চিন্তা চলে গেলো। পায়চারী করে শিস্ দিতে লাগলো সে।

১৭

পরদিন সকালে যখন সে প্রাতঃকৃত্য শেষ করছিলো, ভাবছিলো যে অফিসারটির জন্ত দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবো, তার পরে এলে তাকে আমাকে খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু জার্মাণরা খুব ভোরে ওঠে। নয়টা বাজতে না বাজতে ওয়েটার এসে খবর দিলো সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট ফন রিষ্টার তার দর্শনাভিলাষী। সানিন তাড়াতাড়ি তার কোট পরে নিয়ে ভদ্রলোককে আসতে বললো। ভদ্রলোককে দেখে অবাক হয়ে গেলো সে, নেহাতই বালক দেখতে তাকে। শ্মশ্রুগুম্ফহীন বালকটি তার মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়ে অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ করতে লাগলো, তরবারি পাশে রেখে চেয়ারে বসতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো। জড়িয়ে জড়িয়ে, থেমে থেমে কোনো রকমে অতি খারাপ ফরাসীতে বললো তার বন্ধু ব্যারণ ফন ডনহোফ, হের ফন সানিন তাকে যে কাল অপমান করেছে, তার জন্ত ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে পাঠিয়েছে। যদি সানিন ক্ষমা না চায়, তবে তাকে দেখে নেবে। সানিন যখন বললো সে ক্ষমা না চেয়ে লড়তে রাজি আছে, তখন সে ঠেকে ঠেকে কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলো কোথায়, কখন কার সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা হবে। সানিন উত্তর দিলো, যদি সে দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে, তবে ইতিমধ্যে সানিন একজন সহযোগী ঠিক করে নেবে। (যদিও সে ভেবে পাচ্ছিলো না কোথা থেকে এই সহযোগীটি আবিষ্কার করবে সে?) হের ফন রিষ্টার বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালো, দরজার কাছে গিয়ে বিমর্ষ ভাবে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, তার বন্ধু ব্যারণ ফন ডনহোফকে অবশ্য স্বীকার করতে হয়েছে যে, কালকের ঘটনার জন্ত তিনিও খানিকটা দোষী। সেজন্ত সানিন যদি অল্প

সকলেই জানে কোম্পানীর কাজে দু'তিন দিনের জন্য ছোট সাহেবের সঙ্গে লাবণ্য সরকারেরও বোম্বাই যাওয়া প্রয়োজন হয়েছে। কোম্পানীর কাজে বোম্বাই দূর নয় মোটেই। আকাশ-পথে ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার মাত্র। আর যে যাই ভাবুক, লাবণ্যর যাওয়াটা ধীরাপদ অন্তত খুব দরকার মনে করেনি। সেখান থেকে নিয়মিত কাঁচা মাল আমদানীর ব্যাপারে মাঝে মাঝে গোলযোগ হচ্ছে বলে যাওয়া। সিতাংশু মিত্র একা গেলেই হত। ওষুধের সরকারী অনুমোদন লাভের তদবিরে গিয়ে বড় সাহেব যেমন লাবণ্য সরকারকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সিতাংশুরও হয়ত সেই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্তস্তলের আর কেউ উদ্দেশ্যের এই একমাত্র সাদাসিধে ব্যাখ্যাটাই মেনে নিতে রাজি নয়। প্রগলভ ভ্রূকুটি তার কুটিলতা ভরা। তাছাড়া, আর একটা শাদা কথা, এই ক'টা দিন অফিস নীরস লাগছে ধীরাপদর।

কিন্তু লাবণ্য সরকারের বোম্বাই যাওয়ার খবরটা যে হিমাংশু মিত্রও জানতেন না, ধীরাপদ একবারও কল্পনা করেনি। তিনি ফ্যাক্টরীতে এসেছেন তাও জানত না, ঘরে ডাক পড়তে অবাক হয়েছিল। গিয়ে দেখে গম্ভীর। তারপর প্রশ্ন শুনে হতভম্ব।

সতুর সঙ্গে লাবণ্যও বম্বে গেছে?

ধীরাপদ জবাব দিতে পারেনি, মাথা নেড়েছিল হয়ত।

কাল সকালে বাড়িতে এতক্ষণ কথা হল, একবারও বলোনি তো?

যেন ওরই অপরাধ কিছু। কোনো স্বাস্থ্য সাময়িকীতে ভেষজ-উৎপাদন সমস্যাগত রচনা লেখার আলোচনায় গতকাল তাঁর বাড়িতে অনেকক্ষণই কেটেছে বটে। মেজাজ বেশ প্রসন্ন ছিল বড় সাহেবের। এই সব নীরস লেখার মধ্যেও ধীরাপদর কাব্য-ভাবের ব্যঞ্জনা নিয়ে হাল্কা ঠাট্টা পর্যন্ত করেছেন। মন্তব্য, ও বা ওর বউ দুজনের একজন কবিতা লেখে নিশ্চয়। বউ নেই শুনে পাইপ দাঁতে চেপে লঘু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, হোয়াই? এনি হার্ট ব্রেকিং অ্যাফেয়ার?

ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়, সেই ছেলেবেলার শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারোনি নাকি হে।

এর মধ্যে লাবণ্য সরকার, কলকাতায় আছে কি নেই এটা যে একটা বলার মত খবর, একবারও মনে হয়নি। আজই বা হঠাৎ কার কাছে শুনলেন, কে জানে।

জবাব না পেয়ে ঈষৎ রুক্ষস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তার যাওয়ার দরকার হল কেন?...তোমাকে বলে গেছে কিছু?

ধীরাপদর এবারও বাক-নিঃসরণ হয়নি, মাথা নেড়েছে। চকিতে আর একদিনের কথা মনে পড়েছে তার। লাবণ্য সরকার ছেলের সঙ্গে কথা কইছেন শুনে যেদিন নিজের গাড়িতে ওকে ডেকে নিয়েছিলেন। সেদিনও এমনি বিরক্তি লক্ষ্য করেছিল ধীরাপদ, তবে এতটা নয়।

হিমাংশু মিত্র বলেছেন, এভাবে গেলে তাদেরও বলে যাওয়া দরকার, তোমারও জেনে রাখা দরকার। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিন আজ, মাইনে যেন হয়—।

আর কিছু বলেন নি। মেডিক্যাল হোমের মাইনের দিনের কথা ধীরাপদর মনেও ছিল না। উনি বলে না গেলে গণ্ডগোল কিছু হতই, মাইনে হ'ত না হয়ত। তবু ধীরাপদর ধারণা, বড় সাহেবের এই উষ্মা সেই ত্রুটির সম্ভাবনার কারণ নয় আদৌ। এত বিরক্তির কারণ শুধু তাঁর অগোচরে ছেলের সঙ্গে লাবণ্য সরকার গেছে বলে।

ডাক্তারের চেয়ারে বসে লাবণ্যর মত ধীরাপদও ম্যানেজারকেই ডাকল প্রথম। দু'হাত একবার কপালে ঠেকিয়ে ম্যানেজার কলের মত সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজকের এই বিপরীত পরিস্থিতিটি উপভোগ্য। আদেশের অপেক্ষায় প্রসারিত দুই গোল চোখ ওর মুখের ওপর স্থির।

বসুন, বসুন—। হাসিমুখে অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন জানালো ধীরাপদ, মিস সরকার আজও ফেরেননি, এদিকে কিভাবে কি হয় আমি তো কিছুই জানিনে— আপনি একটু সাহায্য করুন।

পদস্থ ওপরঅলার এ হৃদ্যতায় খুব বিশ্বাসী মনে হল না ভদ্রলোককে। কলের মতই বসলেন, পে-শিটএর নাম আর টাকার অঙ্কগুলো দেখে নিয়ে মুখ তুললেন। অর্থাৎ ঠিক আছে।

ধীরাপদ প্রথমেই তাঁর মাইনেটা দিয়ে নিল। তারপর একে একে নাম ডেকে চলল। ম্যানেজার টাকা গুণে দিতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক যে সহজ হতে পারছেন না একটুও বোঝা যায়, মুখে টুঁ-শব্দটি নেই। এমন কি যারা মাইনে নিয়ে যাচ্ছে তারাও যেন চুপচাপ তাদের ম্যানেজারের নীরব বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করে যাচ্ছে।

বেশ জনাকতক বাকি তখনো। একজন মাইনে নিতে এসে জানালো, চারটের ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন এবং বাইরে থেকেই দু'-চার জন রোগী বিদায় করেছেন।

এই সুযোগে ম্যানেজারকেই অব্যাহতি দিল ধীরাপদ।—আপনি ওঁকে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলে দিন, আর এ ক'টা পেমেণ্ট আমি নিজেই করে দিচ্ছি।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মতই ম্যানেজার উঠে গেলেন।

সব শেষে রমেন হালদারের ডাক পড়ল। দারোয়ান বেয়ারা ঝাড়ুদারেরও পরে। ধীরাপদ ইচ্ছে করেই আগে ডাকেনি।

শুকনো মুখ, চকিত চাউনি। একে একে সকলের মাইনে হয়ে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল হয়ত। কিন্তু ছেলেটা বোকা নয়, এক নজর চেয়েই বুঝল সকলের পরে ডাক পড়াটা কোনরকম ভুল বা অবহেলার দরুন নয়, উল্টে পক্ষপাতিত্বসূচক।

ধীরাপদ মিটিমিটি হাসছিল।—বোসো।

বিনয়ের বিঘ্ন দূর করে বসল কোনরকমে। মাইনে নিল। টাকাক'টা গুণে নেবার বাসনা থাকলেও ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে পকেটে রাখতে গেল।

গুণে নাও, সকলকে দিয়ে থুয়ে দিচ্ছি, কম বেশি হতে পারে।

সলজ্জ হাসি। গুণল। নিশ্চিন্ত।

ভালো আছ?

হ্যাঁ। লাজুক লাজুক সঙ্কোচ, আপনি ভালো আছেন?

ধীরাপদর মজা লাগছে।—ভালো আছি কি নেই একবার গিয়ে তো দেখে আসতে পারতে। ক'মাসের মধ্যে একবারও তো এলে না। মনেই ছিল না বুঝি?

ছিল। ঠিক সাহস হয়নি সার···

সার! হাসি চেপে ধীরাপদ ভুরু কোঁচকাতে চেষ্টা করল। লঘু বিস্ময়।—সার কি হে! তুমি সার বলতে নাকি আগে?

ওরই মুখে শোনা লাবণ্য সরকারকে দিদি ডেকে বিপাকে পড়ার গল্পটা মনে পড়ে গেল। অন্তরঙ্গ হবার অভিলাষ সত্ত্বেও ভরসা না পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ছেলে সেয়ানা কেমন জানে। আনন্দে বিনয়ে আধখানা হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করল যেন, আগের মত দাদা বলে ডাকব?

না। ঠাকুরদাদা বলবে। হেসে ফেলল, আর তাহলে আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে ওষুধের দোকান করবে না ঠিক করেছ তুমি?

কি যে বলেন দাদা···। যেন কত ছেলেমানুষি স্বপ্নের জাল বুনেছে একদিন সেটা নিজেই বুঝছে এখন।

কিন্তু সংকোচ আর বেশিক্ষণ থাকল না। খুশিতে আনন্দে চাপা গলায় এরপর অনেক কথাই বলে ফেলল সে। দাদা এমন একজন পদস্থ ব্যক্তি কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি, এত সরল আর নিরহঙ্কার বলেই···। এই জন্যেই অমন গণ্ডগোলটা হয়ে গেল, মিস সরকার পর্যন্ত জানত না, অন্যের আর দোষ কি! আর কারো কথা বলতে পারে না কিন্তু ও নিজে খুব খুশি হয়েছে। ক'দিন তো দোকানে শুধু তার কথাই আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রথম সকলেই ভেবেছে জেনারাল সুপারভাইজার সাহেব এবারে শোধ নিয়ে ছাড়বে, ম্যানেজার হুজুত মজাটি টের পাবেন। শুধু রমেনেরই তা মনে হয়নি একবারও, তার ঠিক বিশ্বাস ছিল দাদাটি কক্ষনো ও-রকম লোক নয়।

একসঙ্গে এত কথা বলতে পেরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রমেন হালদার। ধীরাপদ টিপ্পনী কাটল, এত বিশ্বাস যে দাদাকে সার বলছিলে।

কি করব, রমেন নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে প্রায়, এতদিনের মধ্যে আপনি একদিনও এলেন না, সাহস হয় কি করে। একটু থেমে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, এবার থেকে আপনিই আমাদের মাইনে দেবেন বুঝি?

সেটা কি তোমার ভালো লাগবে খুব?

রমেন লজ্জা পেল আবারও। লাবণ্য সরকারকে নিয়ে অনেকদিন অনেক বে-ফাঁস কথা বলেছে। ক'দিন নেই বলে কত নীরস লাগছে, আগে হলে তাও রসিয়ে ব্যক্ত করত হয়ত। আজ একদিনে এতটা পেরে উঠল না। সত্যি হোক মিথ্যে হোক সামনের মুরুব্বিটিকেই তোয়াজ করল, আপনি দিলে ভালো লাগবে।

আলাপে ছেদ পড়ল, ভিতরের দরজা ঠেলে ম্যানেজার গলা বাড়ালেন। ছোকরা অর্থাৎ রমেন কেমন জমিয়ে বসেছে এক নজরে দেখে নিয়ে সংবাদ দিলেন, ফ্যাক্টরী থেকে চীফ কেমিষ্ট টেলিফোনে জানিয়েছেন, তিনি এখানে আসছেন—তাঁর জন্যে যেন অপেক্ষা করা হয়।

গল্প আর জমল না। দু'পাঁচ মিনিট বসে থেকে রমেন হালদার উঠে গেল।

নির্দেশ শুনে ধীরাপদ অবাকই হয়েছে একটু। কি আবার দরকার পড়ল হঠাৎ। কিছুদিন ধরে লোকটির মেজাজের হদিস পাচ্ছিল না আবার। যতদিন হাতে ধরে কাজ-কর্ম শেখাচ্ছিল, এক রকম ছিল। তারী কাছে পেয়েছিল অমিতাভ ঘোষকে ওই ক'টা দিন। এখন আবার কিছু একটা পরামর্শের জন্যে গেলেও রুক্ষ মূর্তি। অথচ ফ্যাক্টরীর কাজেও খুব যে ব্যস্ত তা মনে হয় না। নিজের চেম্বারে কমই দেখা যায় তাকে। বেশির ভাগ সময় হয় অ্যানালিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টএ নয়তো লাইব্রেরিতে সন্ধান মেলে তার। কিছু একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মাথায় ঢুকেছে হয়ত। তার এ ধরনের এক একটা ঝোঁকের গল্প ধীরাপদ জুনিয়ার কেমিষ্টদের মুখে শুনেছে। তখন কাছে গেলেও বিরক্তি।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধীরাপদ অনুভব করল সদ্য বর্তমানে চিফ কেমিষ্টের মেজাজ চড়া। কিন্তু কতটা চড়া আর কি কারণে চড়া তখনো কল্পনা করতে পারেনি। হড়বড়িয়ে এলো, ইশারায় তাকে ডেকে দোকান ছেড়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

দোকানের লোক তটস্থ। [ক্রমশঃ।

Never lend books; no one ever returns them.
The only books I have in my library are those
people have lent me. —*Anatole France*

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

[এ্যাডভেঞ্চার অফ লে ভেরী]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

১
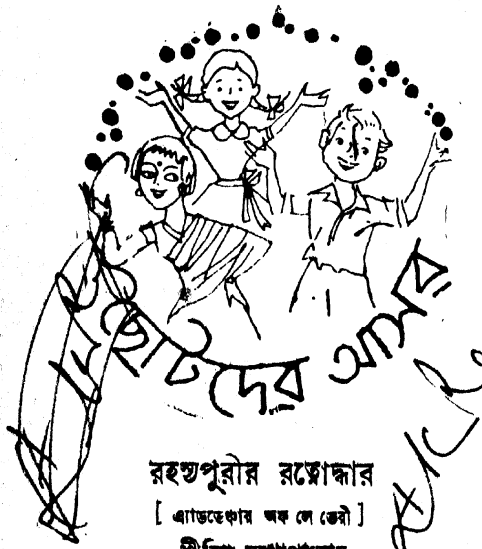
ঘুমের দফারফা আর কা'কে বলে! এমন জানলে এ-রাস্তায় কে পা-বাড়াত তোমার সঙ্গে! মিসেস্ এলিসের কথায় অস্বস্তি ফুটে বেরুল।

তাঁবুর মধ্যে পেট্রোম্যাক্সের আলোটা কমানো ছিল, তবুও কাছাকাছির সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দুটো জালের ঝোলার মধ্যে একটায় মিসেস্ এলিস ও অপরটায় মিঃ লে ভেরী শুয়ে। চোখে কারুরই ঘুম আসছিল না।

চারিদিকে মোরা আর গ্রীনহার্ট গাছের জঙ্গলে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাঁবু পড়েছে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে অভ্যস্তদেরও এখানে রাত কাটাতে গা-ছম-ছম করে, আর মিসেস্ এলিস তো সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, আমেরিকার শহরে মেয়ে। তার পক্ষে ভয় পাওয়া আর বিচিত্র কি?

কি, খুব ভয় করছে না কি? মিঃ লে ভেরী প্রশ্ন করেন মিসেস্ এলিসকে।

তা একটু করছে বই কি। এত দিন বইয়েতেই বন-জঙ্গলের কথা পড়েছি আর ফিল্মে ছবি দেখেছি, কিন্তু এর জীবন্ত রূপ যে এত বীভৎস, এর পথযাত্রা যে এত বিপদসঙ্কুল ও প্রাণান্তকর তা সত্যিই ধারণা করতে পারিনি!

এর মধ্যেই ভয় পেলে চলবে কেন, এই তো সবে আরম্ভ!

ভয়টা প্রথম দিকেই করে বেশী, তারপর আস্তে আস্তে সয়ে যায়। উত্তরে বললেন মিসেস্ এলিস।

কথাগুলো যদিও বেশ জোর দিয়েই বললেন তিনি, কিন্তু একটা আড়ষ্টতায় সেগুলো যেন নিতান্তই প্রাণহীন বলে মনে হ'ল। অস্বস্তিতে অনবরতই এপাশ-ওপাশ করছিলেন মিসেস্ এলিস।

এমনি গভীর জঙ্গলের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারাই জানে রাত্রে এর ভয়াবহ রূপ ও বিচিত্র শব্দের সঙ্গে কি আতঙ্ক লুকিয়ে থাকে মানুষের মনের উপর কি অদ্ভুত অনির্বচনীয় অনুভূতিই না জাগায় তারা। সময় সময় স্থানীয় বন্য-অধিবাসীরাও পাগল হয়ে যায় রাত্রে জঙ্গলের এই জীবন্ত ভয়াবহতায়। কোথাও হয়ত বিরামহীন ভাবে একই কর্ণবিদারী শব্দ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়ে চলেছে, কোথাও বা সে শব্দ যেমন করুণ তেমনি হৃদয়বিদারক। কোথাও ঝোড়ো-হাওয়ার সঙ্গে গাছেদের ঝটাপটি, জীবজন্তুদের আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি দারুণ সঙ্ঘর্ষ। কোথাও বা এক সঙ্গে সব মিলিয়ে মিশিয়ে বিভিন্ন শব্দের প্রতিধ্বনিতে একটা জীবন্ত অস্বস্তিকর ভয়াবহ পরিস্থিতি—সেখানে মানুষের পাগল হওয়া আর বিচিত্র কি?

রাত্রে এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুম অর্থে যে কি, তা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করছিলেন শ্রীমতী এলিস।

তাঁবুর এক পাশে ছিল মিউ গুয়েনার একদল বন্য অধিবাসী আর এক পাশে ছিল কাবির ইণ্ডিয়ানরা। বন্য অধিবাসী হিসাবে অত্যন্ত নৃশংস ও সন্দিগ্ধ এই কাবির ইণ্ডিয়ানদের দল। পরস্পরকে কেউ তারা বিশ্বাস করে না। এমন কি, বাপ ছেলেকে নয় এবং ছেলে বাপকে নয়। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে খুন করে বসে অতর্কিত আক্রমণে। তারা সকলেই এখন আমাদের এই অভিযানের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী।

আমাদের মাথার উপর উড়ছিল অজস্র রক্তপায়ী বাদুড়, আর কানে আসছিল তাদের পরস্পরের আক্রমণ করার বিকট চীৎকার। হিংস্র জানোয়াররা হয়ত ওৎ পেতে বসে আছে আশপাশে; আর ইয়া লম্বা-চওড়া বিরাট ময়াল সাপরা হয়তো নিঃসাড়ে কোন গাছের ডালে বেড় দিয়ে ঝুলছে কারুকে ছোবল মারার প্রতীক্ষায়। তাঁবুর বাইরে এ সব কিছু না দেখলেও, এমনি আমরা আশঙ্কা করছিলুম।

দিগন্তবিস্তৃত বনানীর এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য হয়ত সব নিস্তব্ধ চুপচাপ হয়ে যায়, কোন সাড়া-শব্দ থাকে না—ঘুমের মায়াজালে যেন ছেয়ে যায় জীব-জগতের এই অন্ধকারপুরী। মনে হয়, যা হোক এবার বোধ হয় নিশ্চিন্তে একটু ঘুমনো যাবে, কিন্তু কোথায় ঘুম! ভাবতে না ভাবতেই সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জেগে ওঠে জীবনের সাড়া—নানা সুর ও স্বরের কর্ণবিদারী ঐক্যতান যেন হঠাৎ কোন অর্কেষ্ট্রা পরিচালক হাতের ছড়িটি তুলে ধরলেন তাঁর যন্ত্রীদের উদ্দেশে।

সেদিন অস্তগামী সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনাঞ্চল যখন গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল, তখন আমরা তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলুম। কিন্তু রাতের প্রথম দিকেই হঠাৎ একটা ঘণ্টাধ্বনির মত আওয়াজ আমাদের কানে এলো।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে এ আবার কিসের ঘণ্টা? বলে এলিস লাফিয়ে উঠল।

এর আগে এই শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাই তাকে বললুম, এতে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এটা 'বেলবার্ড' নামক এক রকম পাখীর ডাক।

এই বেলবার্ডের ডাক শেষ হতে না হতেই তার সঙ্গে আবার আরম্ভ হল বেবুনের বিকট আওয়াজ। একটা দুটো করে অসংখ্য বেবুন সমস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিলে। একদিকে ঐ বেলবার্ডের ঘণ্টা-বাজানোর শব্দ, আর একদিকে বেবুনদের কান-ফাটা আওয়াজ মিশিয়ে রাত্রের প্রথম দিকেই এলিসকে কাবু করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় প্রহরের কাছাকাছি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক গোঙানিতে এলিস একেবারে ভেঙে পড়ল। খোলা ধোঁয়া চারদিকে

উঠে সে বলল, কেউ কাছেই কোন মেয়েছেলেকে খুন করেছে বোধ হয়—শুনছ ?

শব্দটা যে খুবই করুণ ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ শব্দ যে এই বন্য জীবদের মধ্যেই জনৈক কপিধ্বজের, তা জানা না থাকলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

আমি এলিসকে বললুম, জঙ্গলের জীবনই এই,—অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে অসহ্য ভয়াবহতা। দিনের-পর-দিন নতুন সংশয়, সন্দেহ আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযান—একেই তো বলে এ্যাডভেঞ্চার !—ভোর হয়ে এলো, এখন একটু ঘুমবার চেষ্টা করো।

বৃটিশ গুয়েনার বহু যুগের গল্পকথার মত এই 'লষ্ট ওয়ার্লড' রহস্যের বাদুপুরী—এ্যাডভেঞ্চারে ভরা। বহু পুরাতন সময় থেকে অভিযানকারীর দল ও বন্য অধিবাসীদেরও অনেকে এখানকার নদ-নদী ধরে হীরকের উৎস-সন্ধানে গিয়ে পথ হারিয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, কেউই সেই আকাঙ্ক্ষিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। তবু মানুষের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতির রহস্য-উদ্‌ঘাটনের অপরাজেয় আশা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, নদী-নালায়, সমুদ্রের অতলে আর অজানা-অচেনা অপরিচয়ের দেশে—বিপদের মুখে জীবনকে তুচ্ছ করে।

উত্তর-আমেরিকার এই বৃটিশ গুয়েনা কেবলমাত্র হীরকের জন্যই বিখ্যাত নয়,—এর নদী, জঙ্গল, পাহাড়, জীবজন্তু ও অসংখ্য বৈচিত্র্যও তাকে বিখ্যাত করেছে। এখনও এর ভেতরকার বহু রহস্য-সন্ধানীরা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। প্রাণিতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদ-বিদ্যাবিশারদ ও নৃতত্ত্ববিদরাও বহু দিন ধরে এখানকার বহু জিনিসের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এখানকার জলা-জঙ্গলাকীর্ণ বহু জায়গার মানচিত্রও এখনো তৈরী হয়নি। মাঝরুণি, রূপনোনি, স্কুইবো, জুয়াপিরি ও নিগরো প্রভৃতি নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল, এঁ্যাকব্যাঁক—কোথা থেকে কার কোন্ ক্যাকৃড়া বেরিয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছে, তাও সঠিক সব জানা যায়নি এখনও।

যে শ্বেত-ইণ্ডিয়ানদের বংশ পৃথিবীর বুক থেকে একদিন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে লোকের ধারণা ছিল, তাদের সন্ধান, কারিব ইণ্ডিয়ানদের নিদারুণ প্রতিহিংসার নিদর্শন, স্বর্ণহ্রদের অলৌকিক কিংবদন্তী, রক্তপায়ী হিংস্র গাছ-গাছড়া ও অদ্ভুত জীবজন্তুর আকর্ষণ সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে মিঃ লে ভেরীকে এই ভয়াবহ দেশের অভ্যন্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—হীরকের উৎস-সন্ধানে, আবিষ্কারের নেশায় পাগল করে।

একবার তিনি প্রায় পাঁচ হাজার ক্যারেট ওজনের হীরে ওখান থেকে সংগ্রহ করে আনেন এবং আর একবার প্রায় ত্রিশ ক্যারেট ওজনের একটি হীরের টুকরো পান। বহুকাল পর্য্যন্ত আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে স্বাভাবিক অপরিচ্ছন্ন হীরের মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু তবুও এই দেশের অনাবিষ্কৃত অভ্যন্তরের সম্পূর্ণ রহস্যের সন্ধান করতে পারেননি বলেই লে ভেরী বার বার নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও আবার অভিযান করেছেন, এবং শেষ বার কি ভাবে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সভ্য জগতের লোকের কাছে বহু আশ্চর্য্য, অসম্ভাব্য ও অদ্ভুত জিনিসের সন্ধান দেন,—এই রোমাঞ্চকর কাহিনী তারই ইতিবৃত্ত।

২

আমি তখন আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বয়স মাত্র আঠারো বছর। নিউ গুয়েনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হবার সুযোগ ঘটে সেই সময়ে। আমি ও আমার এক বন্ধু দু'জনে একদিন নিছক এ্যাডভেঞ্চারের মন নিয়ে একটা লম্বা ছুটির সদ্ব্যবহার করতে মাঝরুণির অভিযানে বেরিয়ে পড়ি। এ-বয়সে বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ, নরখাদক ক্যানিবলস্‌দের চাক্ষুষ দর্শন যে সত্যই উত্তেজক ঘটনা তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এর সঙ্গে বিনামূল্যে সোনা ও হীরে সংগ্রহ করার লোভও আমার কিছু কম ছিল না।

মাঝরুণির নদীপথে, জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতের পাদদেশে, নদীর চড়াইয়ে ও জলের মধ্যে স্বর্ণরেণু ও ছোট ছোট হীরকখণ্ডের যে সন্ধান মেলে তা আমরা আগে থেকেই জানতুম এবং সেই প্রথম যাত্রায় আমরা সফলকামও হয়েছিলুম খানিকটা। সে বার ছোটবড় সব মিলিয়ে-মিশিয়ে প্রায় ৫০০০ ক্যারেট ওজনের হীরের টুকরো সংগ্রহ হয়েছিল আমাদের। ওখানকার ছোট ছোট হীরের টুকরোগুলি প্রধানতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নানা ধরণের শিল্পকাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঘড়ির জুয়েল ও কাচ-কাটার যন্ত্রেই এরা লাগে সবচেয়ে বেশী। নানা আকারে কেটে ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে যে সব হীরে জুয়েলারীর কাজে বসান হয়ে থাকে, এগুলি ঠিক ততো উঁচুদরের না হলেও এদেরও বেশ দাম আছে এবং ওজন হিসাবেই সেটা ঠিক হয়ে থাকে।

প্রথম বারের এই অভিযানে একবার ভীষণ জ্বরে পড়ে জর্জ টাউনের এক হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় আমাকে। সঙ্গে পয়সা-কড়ি বিশেষ কিছু না থাকায়, মৃত্যু হলে কবর-খরচের জন্যে নগদ টাকার বদলে ৮৫ ডলার মূল্যের হীরে ওখানে জমা দিই।

এর পর ১৯২১ সালে ঐ পথে আমার দ্বিতীয় অভিযান। কিন্তু সে বারের যাত্রাটা কেবলমাত্র হীরে-সোনার লোভে বা বন্যজন্তুদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের লোভে নয়,—সে বার আমার যাত্রার সত্যিকার উদ্দেশ্য ছিল, হীরকের উৎস-সন্ধানে। অর্থাৎ কোথা থেকে, কত দূর থেকে, পাহাড়ের গা বা গহ্বর থেকে, কোন আকর থেকে নদীর স্রোতে এই সব হীরের কুচি, গুঁড়ো, গড়াতে-গড়াতে গুয়েনার অসংখ্য নদীগুলিকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করেছে, স্বচক্ষে তাই দেখা। পৃথিবীর মধ্যে যে তিন-চারটি জায়গায় সব চেয়ে বেশী পরিমাণ হীরে পাওয়া যায়, এই বৃটিশ গুয়েনা আজও তাদের মধ্যে তৃতীয়-স্থান অধিকার করে আছে।

সে বার ছোট-বড় নদী-নালা ধরে জঙ্গলের অভ্যন্তরে বহুদূর চলে গিয়েছিলুম আমি—ডুবুরি নামিয়ে নদীর পাঁক-মাটি পরীক্ষা করেছিলুম, পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়ায় উঠতেও বাকী রাখিনি। এ সবের জন্যে বৃটিশ গুয়েনার ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে দু-দু'বারই আমাকে অনুমতি-পত্র নিতে হয়েছিল। জঙ্গলের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে আমি বহুদূর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলুম বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারিনি—হীরকের উৎস সন্ধানে সাফল্যলাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু কোন দিনই আমার মনে হতাশা আশ্রয় করেনি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে, আন্তরিক চেষ্টায় সব জিনিসই সফল হয়। একবারে না হয়, দু'বারে না হয়,

তিন বারের বার আমি কৃতকার্য্য হবই। এবং মনের মধ্যে এমনি একটা উৎসাহ ছিল বলেই, একদিন আমেজোন ও অরিনকো নদীর মাঝ-বরাবর স্পেনীয় অভিযানকারী যে অগাধ ঐশ্বর্য্যের খনি 'এল্ ডোরাডোর' অনুমান করেছিলেন, আমি তার চাক্ষুষ প্রমাণসহ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করি।

তৃতীয় বারের পর আমার সঙ্কল্প অত্যন্ত দৃঢ়। যেমন করেই হোক, এবার আমায় কৃতকার্য্য হতেই হবে। যে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে আমি দু-দু'বার বিফল-মনোরথ হয়েছি, নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছি—এবার যেমন করেই হোক সে লজ্জার কালিমাকে মুছে ফেলে, সেখানে গৌরবের জয়-তিলক এঁকে দিতে হবে। মনে এমনি একটা আত্মবিশ্বাস ও আশা নিয়ে সে বার আমি সমস্ত প্ল্যান তৈরী করে ফেললুম। অন্যান্য বারের অভিযানে যে সব ফাঁক ছিল, যে সব অসুবিধার মধ্যে আগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললুম। যাতে কোন দিক থেকে কোন বাধা, অন্তরায় আবার না আমায় ফিরিয়ে দেয়, সে জন্য সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতাই আমি অবলম্বন করলুম।

কিন্তু বিপদ হ'ল এলিসকে নিয়ে। এলিস পণ করে বসল, সে-ও আমার সঙ্গে যাবে। এ অভিযান, এ যাত্রা যতই কষ্টকর ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল হোক সে আমার পাশে থাকবেই। মনে মনে ভদ্রমহিলার আমার উপর এই ভালবাসা ও দুঃসাহসিকতাকে আমি তারিফ করলেও, মুখে তাকে না যাওয়ার জন্য অনেক বোঝালুম, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—আমার সঙ্গে সে যাবেই!

শেষ পর্য্যন্ত তার কথাই রইল। সে-ও সাথী হ'ল আমার। তারপর একদিন শুভ-মুহূর্ত্তে আমরা বোষ্টন বন্দর থেকে অতলান্তিকের বুকে পাড়ি দিলুম—দক্ষিণ-আমেরিকার নিউ গুয়েনার উদ্দেশে।

আমাদের জাহাজ এসে থামল জর্জ্জ টাউনে। বৃটিশ গুয়েনার সমুদ্র-তীরের প্রধান শহর হচ্ছে এই জর্জ্জ টাউন। এবং এই প্রদেশের একমাত্র বিখ্যাত শহর বলতে এই জর্জ্জ টাউনকেই বোঝায়। এখানকার লোক-সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। নানা জাতের, নানা রঙের, নানা লোককে এখানে একসঙ্গে যে ভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোথাও ঠিক তেমন দেখা যায় না।

এখানে পৌঁছে প্রথমেই আমাদের সব চেয়ে বড় ও প্রধান কাজ হ'ল গুয়েনার জঙ্গলাকীর্ণ অভ্যন্তরে জলপথযাত্রার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা।

মজবুত নৌকা তৈরীর পক্ষে স্থানীয় গ্রীনহার্ট গাছই ছিল প্রশস্ত। সেই কাঠ দিয়ে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত দু'খানা মাঝারি সাইজের নৌকা ও দুটি বড় মাপের বজরা তৈরীর ব্যবস্থা করলুম।

এর পর লোক রিক্রুটের পালা। যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে, উপস্থিত মুইবো নদীর মোহানায় আমাদের বেস-ক্যাম্পে (Base Camp) দাঁড় টেনে আর লগি ঠেলে নৌকা দু'টোকে নিয়ে যাবার জন্যে চুয়াল্লিশ জন স্থানীয় অধিবাসীদের আমরা কাজে নিযুক্ত করলুম। বেছে বেছে যে সব লোক আমরা ঠিক করেছিলুম, তারা স্বাস্থ্যের দিক থেকে যেমন ছিল বলবান, তেমনি দেখতেও ছিল সাঙ্ঘাতিক।

তাদের কারু কারু চেহারা এমনই সাঙ্ঘাতিক যে, আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলে সাক্ষাৎ যমদূত বলে চমকে উঠাও বিচিত্র ছিল না। যমের দক্ষিণ দোর যাবার জন্যে সঙ্গী হিসাবে এরাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত।

লোক রিক্রুটের সময় এক মজার কাণ্ড ঘটল। মাইনে দিয়ে কাজে লোক নেওয়া হবে শুনে, কাতারে কাতারে স্থানীয় বক্তরা আমাদের কাছে আসতে আরম্ভ করল চাকরির লোভে, এবং এসে যাত্রাপথ সম্বন্ধে বিপদ-আপদ ও সম্পদ-ঐশ্বর্য্যের নানা আজগুবি অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল। এদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ এক্সপিডিসনের দলভুক্ত ছিল। সেই অভিযানে বোট ছিল তিনখানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই তিনখানি বোটই নাকি বিক্ষুব্ধ মুইবো' নদীতে ডুবে যায় এবং বহু লোকের জীবনান্ত ঘটে অভিযান পণ্ড হয়ে যায়।

ক্রমশঃ যাত্রার দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আর যতই আমরা গোছগাছ করতে লাগলুম, ততোই যেন ভিড় বাড়তে লাগল এই সব লোকের। ভগ্নস্বাস্থ্য, শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত্ত ছেলে-বুড়োও ছিল তাদের মধ্যে প্রচুর।

শেষ পর্য্যন্ত যখন তাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, এ-ব্যাপারে লোক নেওয়া আমাদের শেষ হয়ে গেছে, তখন তারা আমাদের কাছে পয়সা চাইতে লাগল। পেট-বাজিয়ে খাবার দেবার জন্য অনুরোধও করতে লাগল অনেকে। কেউ কেউ একটা সিগারেটের জন্যও ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে পায়ে-হাতে ধরাধরি করতে লাগল। অনেক কষ্টে সে-যাত্রা রেহাই পাওয়া গেল তাদের হাত থেকে। এলিসের অনুরোধে এটা সেটা ক'রে সবাইকেই প্রায় দেওয়া হ'ল কিছু না কিছু।

এদিকে মজা হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে অনেকেরই পেটে ভাত নেই এবং দেখলে মনে হয় খিদের জ্বালায় মরতে বসেছে, কিন্তু কোমরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই ছেঁড়া ন্যাকড়ায় অথবা ছোট একটি থলিতে কিছু না কিছু চূর্ণ হীরক সঞ্চিত আছে। মরে গেলেও এগুলিকে সহজে ওরা বেহাত হতে দেয় না। এর মূলে আছে আর এক মজার গল্প। সে গল্পের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে: এই হীরে কাছে থাকলে তারা নাকি ভূত-পেত্নীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং এই হীরে সঙ্গে নিয়ে মরলে নরকযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের অভিযানকারীর দল সকলেই প্রস্তুত হয়ে গেল। মালপত্র বোঝাই করে আমরা নৌকাগুলিকে লোকজন সমেত আমাদের যাত্রার প্রধান ঘাঁটি মুইবো নদীর মুখে পাঠিয়ে দিলুম। ঠিক হ'ল, আমরা নিজেরা দেমারারা নদীর পথে খানিকটা ষ্টিমারে ক'রে গিয়ে সেখানে পৌঁছব পরের দিনই।

দেমারারা দিয়ে প্রায় ষাট মাইল খাড়া পশ্চিমে গেলে তবে মুইবোর মোহানায় পৌঁছান যায়। যথাসময়ে সেখানে পরের দিনই আমরা এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে আগে থেকেই আমাদের পথ-প্রদর্শক কাৰিব ইণ্ডিয়ান ও বন্য-অধিবাসীদের দল নৌকাগুলি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের উপস্থিতিতে তাঁরা সকলেই উৎসাহিত হয়ে অভিবাদন জানাল।

নৌকাগুলিতে দাঁড় টানার জন্য চব্বিশ জন করে দাঁড়ি ও একজন করে মাঝি আমরা ঠিক করে দিয়েছিলুম। দাঁড়িরা যাতে মাঝির

বাধ্য হয়ে চলে, সে জন্য মাঝিরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রত্যেক নৌকার সঙ্গে একজন ক'রে প্রবীণ লোক ছিল দলপতি হিসাবে। অর্থাৎ সেই হ'ল সকলের উপর ; ইংরেজীতে যাকে বলে 'হেড-ম্যান।' তারই নির্দ্দেশে চলতে হবে, সবাইকে মাথা পেতে নিতে হবে তার আজ্ঞা।

এখান থেকেই আমাদের সত্যিকার যাত্রা আরম্ভ হ'ল একদিন। সত্যিকার এ্যাড্‌ভেঞ্চারের পথে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে যাত্রা করলুম আমরা। এক সঙ্গে প্রায় শতাধিক দাঁড় ফেলার ছপাক-ছপাক শব্দ আর তার সঙ্গে কদাকার কুচকুচে কালো দাঁড়ি মাঝি ও মুটে-মজুরদের সুর-ভাঙ্গা, সমবেত কোলাহল ও সঙ্গীত প্রভৃতি সব মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল সবারই মুখে। [ক্রমশঃ।

ইস্পাতনগরী—ভিলাই

অমরনাথ রায়

গ্রাম থেকে নগরী

মধ্যপ্রদেশের একটি ছোট গ্রাম—ভিলাই। বছর ছয়েক আগেও সেখানে ছিল চালা ঘর, চাষীর ক্ষেত ও খামার। শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর ছিল ভিলাইয়ের পরিবেশ। দিগন্তবিস্তৃত গমের ক্ষেতের ওপর দিয়ে বাতাস ঢেউ তুলে বয়ে যেত। ভোর না হতেই রাখাল বালকেরা পাঁচন হাতে বেরিয়ে পড়ত গরু চরাতে। আবার পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়তে না পড়তেই গরুর পাল নিয়ে রাখাল বালকেরা ফিরে আসত ঘরে।

শহরের ছোঁওয়া তখন একটুও লাগেনি ভিলাইয়ের বুকে। কে জানতো তখন—এই মনোরম গ্রামটিই একদিন পরিণত হবে এক বিরাট বিশাল ইস্পাতনগরীতে। কে জানতো তখন যে এই গ্রামের বুকেই গড়ে উঠবে একদিন ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাতের কারখানা। লোহার ঠকঠক ঠুনঠুন আওয়াজ আর অজস্র শ্রমিকের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠবে গ্রামখানি! ভিলাইয়ের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চাষীর চালা ঘর, চাষের জমি ও খামার। আর তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে এক বিরাট ইস্পাত কারখানা ও অজস্র শ্রমিকের অসংখ্য বাসস্থান। পাকা মজবুত ঘর-বাড়ী, পাকা রাস্তা, রেলপথ, ইস্কুল, হাট-বাজার, হাসপাতাল—সবই হবে। রাতের প্রগাঢ় অন্ধকার ঘুচিয়ে দেবে অসংখ্য জোরাল বিজলী বাতি। ভিলাইয়ের গ্রামত্বটুকু যাবে ঘুচে। অখ্যাতনামা এক গ্রাম পরিণত হবে এক অতি আধুনিক বিরাট ইস্পাতনগরীতে।

না, এত বড় পরিবর্তনের কথা ভারতের কোন লোকই ভাবতে পারেনি ছ'বছর আগে। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণটা কি? গোড়াতেই তা বলে রাখা দরকার।

কেন এই পরিবর্তন?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। কিন্তু তখন দেখা গেল যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ রয়েছে অনেক পিছিয়ে। বিশেষ করে দেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। কাজেই দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর আর্থিক উন্নতি সাধনের যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে একটি হলো দেশে ভারী শিল্প গড়ে তোলা। আর ভারী শিল্পের মধ্যে ইস্পাত-শিল্পই হচ্ছে অন্যতম।

ইস্পাত-শিল্প আমাদের দেশে রয়েছে—সত্যি কথা। কিন্তু কারখানার সংখ্যা কম। উৎপাদনও কম। জামসেদপুরের 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী', বার্ণপুরের 'দি ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' আর মহীশূরের 'দি মাইশোর আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস'। ভারতের এই তিনটিই হচ্ছে পুরনো কারখানা।

১৯৫৭ সালে ভারতে ইস্পাত উৎপন্ন হলো ১৩৪৪০০০ টন। কিন্তু চাহিদা বেশী। তাই সে বছর বিদেশ থেকে ইস্পাত আমদানী করতে হলো দশ লক্ষ সত্তর হাজার টন। এই পরিমাণ ইস্পাত কিনতে গিয়ে দেশের প্রচুর অর্থ তুলে দিতে হলো বিদেশীদের হাতে। সেটা দেশ ও দশের ক্ষতি। ভারত সরকার তা উপলব্ধি করলেন এবং দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্যে পুরনো তিনটি ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার ব্যবস্থা করা হলো। সেই সঙ্গে নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলাও স্থির হলো। ভিলাই হ'চ্ছে সেই নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানার একটি।

ভারত-সোভিয়েট যুগ্ম প্রচেষ্টা

১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে স্থির হলো যে, মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএ একটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হবে। এর কিছুকাল আগে থেকেই ভারত সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের কথাবার্ত্তা চলছিল নতুন ইস্পাত কারখানাটি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে উভয় সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হলো যে সোভিয়েট সরকার নতুন কারখানাটির জন্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিগুলি ধারে সরবরাহ করবেন। একজন সোভিয়েট চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং ইস্পাত শিল্পে অভিজ্ঞ একদল সুদক্ষ কারিগর নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করবেন। শুধু তাই নয়। কারখানার কাজ চালু হওয়ার পরও তিন বছর কিছু সংখ্যক সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার ভিলাইয়ে থাকবেন। তাঁদের কাজ হবে কারখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া। আরও স্থির হয় যে ভিলাই কারখানার পরিকল্পনা ও নক্সা প্রণয়নের জন্যে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের পঁচিশ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। ভারতে অবস্থানকালে সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার, বিশেষজ্ঞ ও কারিগরদের বেতন ভারত সরকারই বহন করবেন।

ভারত সরকারের কাজ হবে ভিলাইয়ের পথ-ঘাট, রেলপথ, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ করা। এক কথায় ভিলাই নগরীটিকে গড়ে তোলা, কারখানা ও শহর পত্তনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমশলা সংগ্রহ করাই হবে ভারত সরকারের কাজ। ঐ চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে ভিলাই পরিকল্পনার প্রতি পদক্ষেপে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যুক্তভাবে ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা কাজ করবেন। কারখানার জন্যে সোভিয়েট সরকার যে যন্ত্রপাতিগুলি সরবরাহ করবেন তার মূল্য ৬৩'১ কোটি টাকা। এ ঋণ বারোটি সমান কিস্তিতে ভারত সরকার শোধ করে দেবেন। ঋণের জন্যে শতকরা

২২% হারে সুদ দিতে হবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে।

ভিলাইয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধা

ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে বেশ ভালভাবে চিন্তা ক'রে দেখা হয়েছে সুবিধা-অসুবিধার কথা। পরে ভারত ও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সুপারিশক্রমে ভিলাইকে ইস্পাতনগরীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে দরকার লোহা-পাথর (আয়রন ওর), লাইম স্টোন, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, জল ও বিদ্যুত। কাঁচা মালগুলি ভারতে প্রচুর আছে। আর আছে ভিলাইয়ের কাছাকাছিই। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত আছে। আর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নানাবিধ যান বাহনের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ রয়েছে ভিলাইয়ে। সহজে আনা যাবে আর এখানে উৎপাদিত ইস্পাত ভারতের সর্বত্র সহজেই চালান দেওয়া যাবে। এই সব সুবিধার কথা বিবেচনা করেই ভিলাইকে ইস্পাতনগরীর উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

শেষ কথা

পরিকল্পনা তো বহু আগেই শেষ হয়েছে। কারখানা ও শহর নির্মাণের কাজও সমাপ্তির পথে। ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভিলাইয়ের প্রথম ব্লাষ্ট ফার্ণেসটিতে অগ্নিসংযোগ ক'রে আনুষ্ঠানিক ভাবে কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছেন। ভিলাইয়ে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে। কারখানা ও ইস্পাত নগরী গড়ে তুলতে খরচ হয়েছে মোট ১৭৮ কোটি টাকা।

এত অর্থ ব্যয়, এত পরিশ্রম সার্থক হোক। ভিলাই আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করুক। পরিণত হোক ভারতের তীর্থক্ষেত্রে।

ভুলের রাজত্ব

বিনোদ শ দাশ

তোমরা বোধ হয় এক ভুলো মন ভদ্রলোকের গল্প শুনেছো, যিনি এক কাজ করবেন ভেবে অন্য কাজ করে বসতেন। যেমন ধরো, স্নান করতে গিয়ে গান করতে শুরু করতেন। খাবার জন্য আসনে বসে ঘুমিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যের বেড়ান শেষ করে ছড়িগাছটিকে ঘরের কোণে রাখবেন ভেবে সেটাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে নিজেই ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প'র যখন তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়া হোল তখন একগাল হেসে বললেন, ওহো, বুঝলে কিনা ভুলে গিয়েছিলাম

এটা নেহাৎই গল্প, এরকম ভোলা মন মানুষের জন্ম কেবল গল্পলেখকদের কল্পলোকেই নাকি সম্ভব। কিন্তু আমরা এমন বহু মনীষীর নাম জানি যাঁরা ছিলেন অনেকটা এই রকমের আত্মভোলা, বেহিসাবী। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন না কি ছিলেন আশ্চর্য্যরকমের আত্মভোলা। একবার তাঁরা কাজে গিয়েছিলেন য়ুরোপের একটা বড়ো সহরে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটা দোকানে বসিয়ে গিয়েছেন অন্য একটা দোকানে কিছু জিনিষপত্র কেনবার জন্য। এদিকে বৈজ্ঞানিক কিছুক্ষণ বসবার পর ভাবলেন রাস্তাটাতে একটু পায়চারী করা যাক কিন্তু কী মুস্কিল, বেড়াতে বেরিয়ে ভদ্রলোক পথ ফেললেন হারিয়ে। এমন কি, নিজের হোটেলের নামও মনে পড়ে না। এদিকে স্ত্রী এসে বৈজ্ঞানিককে দেখতে না পেয়ে মহা বিব্রত বোধ করলেন। নোতুন যায়গা। আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক কোথায় গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল বৈজ্ঞানিক দোকানটির পাশের রাস্তাটিতেই হারিয়ে গিয়েছেন। আবার একদিন বৈজ্ঞানিক বাসে যাচ্ছিলেন। কনডাক্টার টাকার ভাঙানী সমেত টিকেট দিয়েছে। ভদ্রলোক কিন্তু খুচরোগুলো গুণে উঠতে পারলেন না। মহা হাঙ্গামা। কনডাক্টার বোধ হয় জোচ্চুরি করে ঠকিয়ে দিয়েছে তাঁকে। কনডাক্টার ভীষণ রেগে বৈজ্ঞানিকের চোখের সামনেই সেগুলো গুণে দিল এবং বলল, মশাই অঙ্ক টঙ্ক কিছু শিখেছেন না, না ?

কী হাসির কথা তাই না ? যাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে জগতের বড়ো বড়ো অঙ্ক কষিয়েদের মুণ্ডু ঘুরে যায় তিনি কিনা সামান্য মুদ্রা গুণতেই ভুল করে ফেললেন ?

বড়ো বড়ো মনীষীদের হাস্যকর ভুলের এমন অনেক গল্পেই তো করা যায়। তাই মনে হয় এমন কোন মানুষ নেই যে না ছোটবড় অনেক ভুল করেছে সারা জীবনে। তোমরা বলবে মানুষের ভুল করাই যদি ধর্ম তবে মাষ্টার মশাইরাও নিশ্চয় ওই দোষে দোষী। মাষ্টার মশাইরাও তো অনেক দিন দেওয়াল বোর্ডে অঙ্ক কষতে ভুল করেছেন, ভুল ইংরিজি বলেছেন, ইতিহাসের ভুল তারিখ বলেছেন। আচ্ছা, মাষ্টার মশাইরা যদি ওই ভুলের দোষী হন তবে ওঁরা তোমাদের প্রতি এত নির্দয় হবেন কেন ? এই দেখো না, সে বার মণ্টু পাঁচ নম্বরের একটা অঙ্ক ভুল করে আসায় জন্য সেটায়ই পেলে না। মণ্টু কি কিছু কম অঙ্ক জানে ? কিন্তু মাতঃ পন্থা। ভাগ্য অপ্রসন্ন ওর প্রতি। সামান্য ভুলের জন্য ওর আশা ভঙ্গ হয়েছিল।

তবে কী জানো, এগুলো সবই না জেনে ভুল করা। জেনে শুনে কেউ কী আবার ভুল করে না কি ? তোমরা শুনলে কিন্তু অবাক হবে আমরা প্রত্যহ জেনে-শুনে অসংখ্য ভুল করে থাকি। আমরা একটা বিরাট ভুলের রাজ্যে বাস করছি। সে কেমন ! আচ্ছা বলত ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে তোমরা কী দেখো সকালে ? উত্তরে নিশ্চয় বলবে, কেন সূর্য ? পূর্বদিকে সূর্য ওঠে ? আমি বলব ভুল হোল। তোমরা অবাক হবে, সে কি। আমরা রোজই তো তাই দেখি। চোখে দেখা কি কখনো ভুল হয় ? ঠিকই বলেছ তোমরা। কিন্তু বলতো, সূর্য কী পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে। আমরা সবাই তো পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা জানি তবু এই ভুল করে থাকি কেন ? আমরা আজ জেনেও যে ভুল করছি কয়েক শত বছর আগে মানুষ না জেনেও সেই ভুল করত। যদিও ভারতে আহ্নিক গতির কথা আগেই আবিষ্কার হয়েছে। তবু যখন গ্যালিলিও য়ুরোপে প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা শোনালেন তখন তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। আবার দেখো, আমরা একটা দিকের নাম দিয়েছি পূর্ব আবার একটার নাম পশ্চিম। কিন্তু ভেবে দেখো তো সত্যিই পূর্ব ও পশ্চিম বলে এই বিশ্বজগতে কী কোন দিক থাকতে পারে ?
[illegible]

সেখান থেকে তুমি কি বলতে পারবে পৃথিবীর কোনটা পূর্ব আর কোনটা পশ্চিম দিক? তোমরা বলো সমুদ্রের জল আর আকাশের রঙ নীল। কিন্তু ভেবে দেখো তো মহাশূন্যের বা মহাসাগরের কি কোন বর্ণ থাকতে পারে? এই তো গেল দেখার ভুলের কয়েকটা উদাহরণ।

আবার জেনে শুনে আমরা অনেক ভুল কথাও বলে থাকি। যেমন ধরো আমরা বলি বারোটা বেজেছে আবার বলি, আমার বয়স দশ বছর। কিন্তু কথাগুলো কি ঠিক বলা হোল? তুমি যখন ভারতবর্ষের একটা যায়গাতে দাঁড়িয়ে বলছ বারোটা বেজেছে তখন ঠিক সেই সময়ে লণ্ডনে তোমার কোন বন্ধু তা অস্বীকার করে বলবে, না বারোটা বাজতে এখন অনেক দেরী। তাহলে তোমার বয়স অনুসারে দশ বছর যে পার হয়েছে তা কি ঠিক হিসেব সম্মত হোল? তাই বলছি, এই মহাশূন্যে কালের কোন মাপ নেই। সময়ের যে কবে শুরু আর কবে শেষ হবে তার কোন স্থিরতা নেই। মহাকালের তাই কোন পরিমাপ নেই। আমরা সময়কে কৃত্রিম ভাগ করে তার কয়েকটা নাম দিয়েছি।

আবার বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, আমরা যদি গ্রহান্তরে থাকি তবে আমাদের না কি সময়ের মাপের ধারণা হোত অন্য রকমের, একটা গল্প আছে, এক ভদ্রলোক একদা কিছু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমোতে ঘুমোতে এক স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াতে যান। ঘুম ভাঙবার পর যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন তিনি দেখলেন তাঁর ছেলেপুলেরা সব মরে গিয়েছে। তেমনি বৈজ্ঞানিকদের একটা কথা শুনলে তোমাদের আষাঢ়ে গল্প বলে মনে হবে। ধরো, তুমি এখান থেকে পাঁচ মাসের ছুটি নিয়ে গ্রহান্তরে হাওয়া পরিবর্তন করতে গেলে। প্লেন তোমাকে নিয়ে ছুটল সেই গ্রহটিতে আলোকের গতি থেকেও আরো দ্রুত গতিতে। নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব করে, তুমি যখন পৃথিবীতে ফিরবে তখন দেখবে পাঁচ বছরের অনেক বেশী সময় কেটে গিয়েছে। শুধু ভুল কি সময়ের বেলাতেই হয়? তোমরা জ্যামিতিতে পড়েছো, যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অথবা উচ্চতা নাই অথচ অবস্থান আছে, তাহাকে বিন্দু বলে। এইরূপ কয়েকটি বিন্দুর সমবায়ে রেখার উৎপত্তি হয়। আচ্ছা, বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা প্রভৃতি যদি কিছুই না থাকল তবে অবস্থান থাকবে কী করে আর রেখাই বা সৃষ্টি হবে কী করে যার স্পষ্টতঃই দৈর্ঘ্য রয়েছে দেখতে পাই আমরা। আর একটা সাধারণ ভুলের কথা বলি শোন। ধরো ট্রেণ চলেছে চল্লিশ মাইল বেগে। তুমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতে ট্রেণের কামরায় একদিক থেকে অন্যদিকে হেঁটে গেলে। জিজ্ঞেস করলে বলবে পাঁচ মিনিটে তুমি আট গজ হেঁটেছ। কিন্তু সত্যিই তুমি আট গজের অনেক বেশী হেঁটেছ। কেননা ওই সময়ের মধ্যে ট্রেণটা অন্ততঃ দুই-তিন মাইল হেঁটে গিয়েছে। আবার অনেক সময় তোমরা বোধহয় লক্ষ্য করেছ দুটো বাস যদি পাশাপাশি একই গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলে তখন মনে হয় বাসগুলো বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে আর ইঞ্জিন দুটোই শুধু গর্জন করে চলেছে। এটা যদি লক্ষ্য না করেও থাকো তবে আমি বলব এটা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যখন ট্রেণ ছোটে তখন বাইরে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ট্রেণটা স্থির আছে আর বাইরের গাছপালা টেলিগ্রাফ-পোষ্টগুলো উলটো দিকে ছুটে চলেছে।

এই রকম জানাশোনা ভুলের সংখ্যা আমাদের জীবনে রয়েছে অগুনতি অথচ কথা বলবার সময় আমরা তা লক্ষ্য করিনে। আজ পৃথিবীতে এমন সব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে যাতে মনে হবে পৃথিবীতে সত্য বলে বোধ হয় কিছু নেই। এক সময়ে যে তথ্যকে সত্য বলে জেনে এসেছি সে সব আজ মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বলি মানব অর্থাৎ মনুর অপত্য। অথচ বলা উচিত মানব অর্থাৎ মনুর অপত্য। আমরা জেনে এসেছি মহেঞ্জোদারো হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আর্যদের ভারতে আসার আগে দ্রাবিড় দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। আজ সে কথা অস্বীকার করলে অনেকেই অবাক হবে। আমরা জানি, রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এটা যদি প্রমাণিত হয় যে পুরুর হাতে আলেকজাণ্ডারই এইসা মার খেয়েছিলেন যে পরে রাত্তিরবেলা পুরুর সঙ্গে একটা মিটমাট করে ভারত থেকে চম্পট দিয়েছিলেন, তখন অনেকেরই তা' স্বীকার করতে কষ্ট পেতে হবে। শুধু কি ইতিহাসের পাতাতেই মিথ্যে লুকোন আছে? বিজ্ঞানের বইতেই দেখো না ভুল লুকোন আছে। আমরা জানি পদার্থ হোল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট। একে ইংরিজিতে বলে থ্রি ডাইমেনশনস। কিন্তু আজ বলা হচ্ছে পদার্থের ফোর ডাইমেনসনস রয়েছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ছাড়া চতুর্থ ডাইমেনসনটি হোল সময়। এটি বুঝতে গেলে আমাদের অনেকেরই মাথা গুলিয়ে যায়। ভূগোলে দেখো না আমাদের বাবা, দাদারা ভারতবর্ষ বলতে যে ভৌগোলিক স্থানটি জেনে এসেছেন আজ ভারত বলতে আমরা তার থেকেও অনেক ছোট যায়গাকেই বুঝিয়ে থাকি।

এখন তোমরা বলতে পারো আমাদের জ্ঞানের জগত যদি ভুল আর মিথ্যেতেই ভরা এবং আমরা যদি কোন কিছুকেই চিরন্তন সত্য বা চিরন্তন মিথ্যে বলে ছাপ মেরে দিতে না পারি, তবে পরীক্ষার খাতায় তোমাদের ভুলের জন্য নম্বর কেটে দেওয়া হবে কেন? আমিও তো তাই বলি। অবশ্য পরীক্ষার খাতায় তোমাদের পরিবেশিত অলৌকিক তত্ত্বগুলো দেখে আমরা অনেক সময় হেসে থাকি, কিন্তু হলপ করে আমি বলতে পারি সেই খাতাগুলোকে যদি মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয় তবে কোনদিন ভবিষ্যতের কোন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় তাই থেকে কোন সত্য উদ্ঘাটিত করতে পারবেন।

গল্প হলেও সত্যি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রাবণ ১৩৫০। দুর্ভিক্ষের হাহাকারে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত। টাকা দিয়েও খাদ্য মেলে না। ঘরের টাকা বের করে কালোবাজারীদের পেছনে পেছনে চোরের মত ঘুরে পাঁচ টাকার জিনিষ পঞ্চাশ টাকায় কিনতে হয়। লক্ষ লক্ষ নর-নারী দুর্ভিক্ষের অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে 'ফ্যান দাও, একটু ফ্যান' বলে মর্মান্তিক চীৎকারে কেঁদে বেড়াচ্ছে মহানগরীর পথে পথে ক্ষুধা মিছিল।

এমনি দিনে পূর্ববঙ্গের জনৈক জমিদারের একমাত্র কন্যার বিবাহ।

মহাভারতের অনুবাদক কালী সিংহের প্রাসাদোপম গৃহ ভাড়া নিয়ে সজ্জিত হয়েছিল বিবাহমণ্ডপ। বিবাহের ব্যয়বরাদ্দ চল্লিশ হাজার টাকা।

দান সামগ্রী যৌতুকাদিতে বিবাহমণ্ডপ এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল, যেন কোন প্রদর্শনীর বিভিন্ন জিনিষের ষ্টল খোলা হয়েছে। হীরা-জহরতের অলংকার থেকে আরম্ভ করে কাঁসা-পেতলের বাসন পর্যন্ত কোনটারই প্রাচুর্য কম নেই।

এই উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন বাংলার একজন বিখ্যাত লেখিকা। গাড়ী থেকে নেমে যখন তিনি বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর বিস্ময় আর চেপে রাখতে পারলেন না। সংগীটিকে বললেন: এ যে রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব দেখছি!

লেখিকাটির সমস্ত প্রাণ-মন যেন বেদনায় ভরে উঠলো। যে বছরে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে পথ-কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই বছরে ধনীর দুয়ারে ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী। স্বাদু আহার তাঁর মুখে উঠলো না, পারলেন না তাঁর সংগীটির সংগে প্রাণ খুলে কথা বলতে।

ফেরবার পথে সংগীটিকে বললেন: এমন দুর্দিনে যেখানে অগণিত নরদেবতা অনাহারে অনিদ্রায় তিলে তিলে মৃত্যুর করালগ্রাসে এগিয়ে চলেছে, সেই মুহূর্তে এমন বিলাসিতা, ঐশ্বর্যের এমন আড়ম্বর সত্যিই আমার মনকে বড় পীড়া দেয়। অবশ্য চৌধুরী মশাইয়ের একটিই মাত্র কন্যা এবং দেবার সামর্থ্য তাঁর আছে, তিনি তো দেবেনই কিন্তু এর সংগে দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এতটা মনঃপীড়ার কারণ হতো না। দেখো বাবা, জমিদারদের এখন বিলাসিতার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কবিগুরুর 'দুর্ভাগা দেশ' একবার মনে করে দেখো, আমার মনে হয়, এ অভিশাপ একদিন সত্য হবে।

অভিশাপ সত্যিই লেগেছে। কবিগুরুর ভবিষ্যৎ-বাণী আজ সমস্ত দেশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে—

'বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সাথে অন্নপান।'

এই লেখিকাটি আর কেহই নহেন, স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবী সম্পন্ন ঘরের মেয়ে হলেও সমাজের অবজ্ঞাত, নিপীড়িত নর-নারীর প্রতি অসামান্য সহানুভূতির পরিচয় আমরা বারোও করেক বার পেয়েছিলাম।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে একটি সাহিত্য-সভায় যোগ দেবার জন্য সাজাদপুরে (পাবনা) গিয়েছিলেন। ট্রেণ থেকে নেমে আট মাইল পথ পান্কীতে যেতে হয়েছিল। পান্কী থেকে নেমে সকলের কুশলবার্ত্তা শুধালেন তিনি।

আমরা বললাম, আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বললেন, হ্যাঁ বাবা, বয়স হয়েছে, ক্লান্ত হওয়া অসম্ভব কি, তবে এই পান্কী-বাহকদের কথা চিন্তা করে আর একটু বেশী ক্লান্তি এসেছে।

আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালুম তাঁর দিকে।

অনুরূপা দেবী বললেন, দেখো, না খেয়ে খেয়ে এই বাগ্‌দীগুলোর কি হাল হয়েছে? আমাকে নিয়ে আসতে যেন তাদের কতই কষ্ট হল। অথচ এই বাগ্‌দীরাই ছিল একদিন বাংলার রক্ষক। বাংলার রাজাদের বাগ্‌দী লেঠেল বিদেশের ভয়ের বস্তু ছিল। বাগ্‌দী ডাকাতের নামে সমস্ত দেশ আতংকিত হয়ে উঠতো। আজ পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাদের কি দুরবস্থা, ভাবলে কার না কষ্ট হয়?

আমার লেখা 'ক্ষুধার্ত ভগবান' কবিতাটি শুনে তিনি বললেন: সত্যিকারের দুর্ভিক্ষের রূপ তুমি দেখেছো বাবা, তাই লিখতে পেরেছো অমন কবিতা। কত লোক মরেছে অনাহারে আর কত লোক লাখ লাখ টাকা করছে কালোবাজারীতে, তার ইয়ত্তা নেই। পরাধীন দেশে বাস করে এমনি কুকুর-বিড়ালের মতই মরতে হবে আমাদের। তবু ইংরেজ সরকারের মতে একে দুর্ভিক্ষ বলা চলবে না। একেই বলে নিয়তির পরিহাস!

আমি বললাম: ইংরেজই তো সৃষ্টি করেছে এই দুর্ভিক্ষ, সারা দুনিয়া জানে, কাজেই তার স্বীকার করা না করায় কি আসে যায়?

এবার বললেন সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী: অথচ মজা দেখো, লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরছে, কন্‌ট্রোলের সামনে দিন-রাত্রি যাপন করেও হয়তো এক মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না, মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে অথচ একটি দোকান লুঠের সংবাদও তো শোনা যাচ্ছে না! এমন নিষ্ক্রিয় ভাবে কোন দেশের লোক মরেছে শুনেছো? আরে বাবা, মরতে যখন হবেই তবে একটা মরণ-কামড় দিয়েই মর...বলতে বলতে তাঁর স্বর উত্তেজনায় ভরে উঠলো। আবার খানিক নীরব থেকে বললেন: তোমরা সাহিত্যসভা কর আর যাই কর, এই সব অজ্ঞ দেশবাসীর ভেতর শিক্ষার ব্যবস্থা কর। নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেশের অজ্ঞ চাষাভূষা, মজুর শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালাও, অন্ধজনে আলো দাও, মৃতজনে দাও প্রাণ, এরা বুঝে নিতে শিখুক নিজেদের পাওনাগণ্ডা সুদে-আসলে—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন অনুরূপা দেবী।

আজ এতদিন পরে তাঁর কথা লিখতে গিয়ে শুধু মনে হচ্ছে, যে বাংলা-সাহিত্য হারিয়েছে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী আর বাংলার অবহেলিত জনগণ হারিয়েছে তাদের স্নেহময়ী জননী।

People are always blaming their circumstances for what they are. I don't believe in circumstances. The people who get on in this world are the people who get up and look for the circumstances they want, and, if they can't find them, make them.

—*Bernard Shaw.*

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

সংসারের উনকোটি কাজের মধ্যে যে ক'টা কাজ লোকজনদের হাত দিয়ে করালে কিছুতেই তৃপ্তি মেলে না, সুধাময়ীর তার মধ্যে সন্ধ্যা-জ্বালানোর কাজটিই বোধ হয় সর্বপ্রধান।

বহুদিন ধরে অবশ্যকরণীয়ের তালিকাভুক্ত থেকে থেকে ওটা যেন একটা সংস্কারে এসে দাঁড়িয়েছে। না দিতে পারলে খুঁতখুঁত করে মনটা—তাই এই ভরা মাঘের বর্ষায় উত্তুরে বাতাস যখন পা থেকে মাথা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তখনও একদিনের মত মুলতুবী রাখতে পারেন না এ কাজটাকে। শরীরটা শত আলিস্যি জানালেও মনে মনে চোখ রাঙিয়ে শাসন করেন তাকে।

আর তসর কাপড়ের ওপর পশমের গায়ের কাপড়টা আরও একটু ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কাঁপা-কাঁপা পায়ে উঠে আসেন তিনতলার ঠাকুরঘরে।

গোপালকে জল-বাতাসা দিয়ে আসনটাতে চুপ করে বসে থাকেন একটুক্ষণ। ঠিক যে ধ্যান জপ করেন তা নয়—একটু জিরিয়ে নেন নিজে। তা না হলে আজ-কাল তিনতলায় উঠতে বড়ো হাঁফ ধরে যায়।

প্রদীপ জ্বালানোর কাজটা কষ্টসাপেক্ষ বলে মনে না হলেও শাঁখ বাজানোর জন্যে একটু দম নিতে হয় আগে হতে।

তার পর জ্বলন্ত প্রদীপটা হাতে নিয়ে ঘরের চারপাশে সন্ধ্যা দেখিয়ে আবার রেখে দেন পিলসুজের ওপর। আসবার সময় শুধু কয়েকটা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নেন প্রদীপের শিখায় ওপর ধরে আর আনেন গঙ্গাজলের ঘটিটা। আগে আগে এই সঙ্গে প্রদীপটাও আনতেন হাতে ধরে। কিন্তু আজকাল আর নেন না ওটা। কারণ সন্ধ্যা দেখিয়ে আবার ওটা তিনতলায় রেখে দিয়ে যাওয়া আর ক্ষমতায় কুলোয় না মোটে।

অগত্যা ধূপকাঠিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রদীপের চেয়ে ওর উজ্জ্বলতা কম কিন্তু ওর সুগন্ধ মনকে স্পর্শ করে। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দেন সুধাময়ী—এর বেশী আর কী-ই বা করতে পারেন তিনি? সত্যি তো সামর্থ্য তাঁর দিন দিন কমছে বই আর বাড়ছে না?

হিসাব মত বয়েসটা তাঁর পঞ্চান্ন থেকে ষাটের ভিতর থাকলে কী হবে? রসকষহীন শুষ্ক জীবনটা যে মনে মনে আশী-পঁচাশীতে পৌঁছে গেছে একেবারে।

টুকটুক করে তিনতলা থেকে নেমে দোতলায় পূর্বদিকের বড় ঘরটার দরজায় এসে দাঁড়ান সুধাময়ী। ঘটি থেকে তিন-চার কোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন চৌকাঠের উপরটায়।

এ ঘরটা তাঁর নিজের শোবার ঘর। বহুদিনের স্মৃতিজড়ানো অদ্ভুত একটা মমতা মিশে আছে এ ঘরের আনাচে-কানাচে। এখন অবশ্য আর এত বড় ঘরটার কোন প্রয়োজনই হয় না তাঁর। ধরতে গেলে অব্যবহারেই পড়ে থাকে—তবু বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এ ঘরটায় এলে শান্তি বোধ করেন মনে মনে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে খচখচ করে মনটা। অপ্রয়োজনে এত বড় একটা ঘর আগলে রাখার জন্যে মনে মনে দায়ী করেন নিজেকে। হিমাদ্রিকে কত সাধ্যসাধনা করেন—তাঁর সাথে ঘরটা বদলাবদলি করে নেবার জন্যে। তা ছেলে কী তাঁর কোন কথা কানে নেয়? তার সেই এক কথা—আমিই বা অত বড় ঘরটা নিয়ে করবো কী? অবশ্য একথাটা হিমাদ্রিকে দিয়ে কবুল করিয়ে ছেড়েছেন সুধাময়ী যে বিয়ের পর থেকে সে এই ঘরেই শোবে। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে!

আর কত দিন এই ক্লান্ত হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে এ বাড়ীর অবসন্ন সন্ধ্যাগুলোকে অভ্যর্থনা জানাবেন সুধাময়ী? নিষ্প্রাণ এই বাড়ীটাকে যক্ষের মত আগলে নিয়ে আর কত দিন তাঁকে প্রতীক্ষায় থাকতে হবে এমন একটি মানুষের, যে এসে তাঁর হাত থেকে তুলে নেবে এ বাড়ীর সন্ধ্যাপ্রদীপ? বুকের কাছে একহাতে ধরে রেখে অন্য হাতে আড়াল করে রাখবে বাতাসের দাপট থেকে—ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার আলো দেখাবে এ ঘরে ও ঘরে।

সেদিন পরম নিশ্চিন্তে অবসর নেবেন সুধাময়ী। এমনি শীতের সন্ধ্যায় আর কাঁপা-কাঁপা পায়ে অবশ্যকরণীয় কর্তব্যের জের টেনে ঘুরে বেড়াতে হবে না তাঁকে।...ভাবতে ভাবতে ঘরের ভিতরে এসে সুমুখের বড়ো শ্বেতপাথরের উপর হাতের প্রথম ধূপটা নামালেন সুধাময়ী। টেবিলের ধারে দাঁড় করানো রজনী বাবুর ফটোখানা আঁচল দিয়ে মুছে দিলেন নিত্যদিনের মত।

অন্যমনস্ক মনটা কিছুটা যেন ফিরে এলো নিজের জায়গায়। ছবিটার উদ্দেশ্যেই যেন অস্ফুটস্বরে বললেন—তোমার আর দোষ কী বলো? তুমি তো খুঁজে খুঁজে মনের মতন সব জিনিস দিয়েই ঘর সাজাবার চেষ্টা করেছিলে। আমার অদৃষ্টেই কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। তুমি থাকলে বোধ হয় এমনটা হতে পারতো না এ সংসারে। ভাবতে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসে চোখ দু'টি। আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে টেবিলের কাছ থেকে সরে আসেন তাড়াতাড়ি। এই ভরসন্ধ্যাবেলায় আর চোখের জল ফেলে ছেলেটার অকল্যাণ করবার সাধ নেই তাঁর।

এমনিতেই তো ছেলেটার কী যে হয়েছে হাজার গবেষণা করেও তার হদিশ করতে পারেন না সুধাময়ী। ছোটবেলা থেকে একটু শান্ত-গম্ভীর প্রকৃতি হলেও এমনতর নিরানন্দ স্বভাব তো কোনকালে ছিল না হিমাদ্রির? কী ভীষণ ঘরকুণো যে হয়ে গেছে ও! এ বয়সের এই কী স্বাভাবিক ধরণ?

পাশের ঘরটায় হিমাদ্রি শোয় রাতের বেলা। সেখানে সন্ধ্যা জ্বালাতে এসে ঘরটার অবস্থা দেখে সত্যি সত্যি আবার চোখে জল এলো সুধাময়ীর। বইতে আর বিছানাতে একাকার হয়ে আছে ঘরটা।

কেন কিছু বলে না হিমাদ্রি? কেন সে এত উদাসীন? নাঃ, হিমাদ্রির গতিবিধি রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে সুধাময়ীকে। একবার ইচ্ছা হল দীনেশকে ডেকে খুব খানিকটা বকাবকি করেন। তিনি না হয় আগের চেয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছেন কিন্তু তাই বলে বাড়ীর সব লোকজনগুলো পর্য্যন্ত এত কুঁড়ে? বাড়ীর একটা মাত্র ছেলের এত হেনস্তা?

নেহাত ভরসন্ধ্যাবেলা বলেই বকাবকিটা তখনকার মত মুলতুবী রেখে আস্তে আস্তে নীচের তলায় নামলেন সুধাময়ী। বাঁ-পায়ের পাতাটায় বড্ডো ব্যথা হয়েছে—এক হাতে সিঁড়ির হাতল ধরে তবে নামতে হয় আজ-কাল।

নীচের তলার প্রথম ঘরটা ড্রয়িংরুম সাজানো। রঞ্জনী বাবু থাকতে অনেক রাত পর্য্যন্ত এই ঘরে বসে পড়াশোনা করতেন। দেওয়াল-আলমারিতে সাজানো গৃহকর্তার আইন বিষয়ক বইগুলোতে বহুদিন হাত না পড়ায় ধুলো জমেছে। ঐ সব দেখলে নিজের অক্ষমতা আরও বেশী করে পীড়া দেয় সুধাময়ীকে।

ধূপকাঠিটা দরজার ছিটকিনিতে গুঁজে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনে এসে দাঁড়ান বারান্দায় টাঙান একটা বাঁধানো ছবির তলায়। একটা মেয়ের ফটো। অনুমান বছর পনের বয়েস হবে মেয়েটার। ওর আবক্ষ প্রতিকৃতিটা হাসছে শুধু।—ওর হাসিটা যেন হাতের মুঠোয় ধরা এক মুঠো যুঁইফুল।

প্রথম বার বহরমপুরে গিয়েই এই ছবিটা সঙ্গে করে এনেছিলেন রঞ্জনী বাবু। নিজে হাতে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন এইখানে। তা সে-ও তো আজ বছর পাঁচেকের কম নয়। তবে?

তবে কেন আজও এর কোন মীমাংসা হল না? কোনখানটায় যে গরমিল হল কিছুতেই তা ঠিক করতে পারেন না সুধাময়ী। হিমাদ্রিটাও কোন কিছু বলে না যে! এমন বিশ্রী চাপাস্বভাব হয়েছে হতভাগাটার! একটা কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সোজা উত্তর পাবার জো নেই। এই যে সেদিন অত রকম ভূমিকা পাঁচ মিশেলী কথার ভণিতা করে হিমাদ্রির খেতে বসবার সময় রঞ্জনাদের কথাটা তুললেন সুধাময়ী—কী ভাবে তা এড়িয়ে গিয়ে সুমুখ হতে সরে গেল হিমাদ্রি তা কী আর বোঝেন নি তিনি?

গৌরচন্দ্রিকা শুনেই গোগ্রাসে কোন মতে খাবারগুলো খেয়ে নিয়ে ঘুম পাওয়ার দোহাই পেড়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার কারণ কী, এখনও তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে হিমাদ্রিকে?

কিন্তু কেন? কেন আজকাল এমন করে এ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলে হিমাদ্রি? তবে কী রঞ্জনাকে ওর পছন্দ হয় নি? তাই বা কেমন করে হবে? রঞ্জনা তো কোন দিক থেকেই অপছন্দের মেয়ে নয়? তা হলে কী রঞ্জনাদের তরফ থেকে কোন দুর্ব্যবহার পেয়েছে সে? তাই অমন করে মন গুমরে থাকে ও? নাঃ তাই বা কেমন করে হবে? পরমেশ বাবু তো হিমাদ্রিকে চক্ষে হারান। আর রঞ্জনা? না না সে একটু চঞ্চল স্বভাব বটে কিন্তু তেমন মেয়ে তো নয়?

আর যদিই বা ধরে নেওয়া যায় যে ওরাই খারাপ ব্যবহার করেছে তা তাতেই বা এত লুকোচুরির কী কারণ থাকতে পারে? তা এমন কী-ই বা হতে পারে যা মায়ের কাছেও বলা চলে না? চরম পর্য্যন্ত ভাবলে এই অবধি হতে পারে হয়ত যে বিয়ে দেবে না বলেছে ওরা। তাতেই বা কী এমন ক্ষতি হয়েছে? ওদের মেয়ে না পেলে কী সারাজীবন আইবুড়ো থাকতে হবে সুধাময়ীর ছেলেকে?

না—না, এসব কি ভাবছেন সুধাময়ী? সত্যিই হয়ত ওরা পশ্চিমে গেছে হাওয়া খেতে। হিমাদ্রিকে ভালো করে যেতে বলেনি —ঠিকানা টিকানা জানায় নি তাইতেই অভিমানী ছেলেটার মান হয়েছে। আর সত্যিই তো বাপু এ আবার কী ব্যবস্থা? পশ্চিমে যাওয়া কী পালিয়ে যাচ্ছিলো তোদের? সারাজীবনই তো পশ্চিমে কাটালি, এখনও সখ মেটে নি? অত বড় মেয়ে গলায় নিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো! এ কেমনধারা আক্কেলের কাজ?

যাক্ গে—নানান কথা ভাবতে ভাবতে বড্ডো দেরী হয়ে যাচ্ছে আজ। একটু তাড়াতাড়ি পা চালান সুধাময়ী। পাশে হিমাদ্রির পড়বার ঘরটায় ধূপ দিয়ে আবার ওদিকটায় যেতে হবে। ভাঁড়ার ঘরে লক্ষ্মীর ছবির সামনে সন্ধ্যা দেখাতে।

কিন্তু আজকের এ কর্তব্যটা শেষ পর্য্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন করাটা অদৃষ্টে ছিল না বোধ হয়। তাই হিমাদ্রির পড়বার ঘরের আলোর সুইচটা টিপেই ভূতদেখার মত চমকে উঠলেন সুধাময়ী।

দক্ষিণের খোলা জানলাটার কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে আছে হিমাদ্রি। ওর গায়ের ওপরকার অবহেলায় ধরে রাখা পশমী চাদরটা হু-হু করে ছুটে-আসা জলো বাতাসটার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। ওর কোলের ওপর অবশ্য একটা খোলা বই নজরে পড়লো সুধাময়ীর—বাতাসে তার অনেকগুলো পাতাই ফরফর করে উড়ছিলো। কিন্তু এতক্ষণ এই অন্ধকার ঘরে বসে হিমাদ্রি যে ওর কোন পাতাটায় এমন মনোনিবেশ করে সারাটা বেলা কাটিয়ে দিলো তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন!

সুধাময়ীর পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। এই নিঃশব্দ নির্জন বাড়ীটায় হিমাদ্রি যে এতক্ষণ উপস্থিত আছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন ধারণা ছিল না তাঁর। সেই দুপুরবেলায় ভাত খাবার পর থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে কতকটা নিজের মনেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে হিমাদ্রি ক্লাশ নিতে গেছে কলেজে।

তাই বিকেল থেকে তার সম্বন্ধে আর কোনরকম তদারক করেন নি তিনি।

আশ্চর্য্য, এমন করেও বসে থাকে মানুষে? একটা সুস্থ সবল জোয়ান ছেলের এ কী অকাল-বৈরাগ্য? নাঃ, সত্যি হিমাদ্রি পাগল করে দেবে সুধাময়ীকে।

টেবিলের ধারে হাতে-ধরা ধূপ কাঁটা নামিয়ে রেখে একটু ব্যস্ত পায়েই হিমাদ্রির কাছে এসে দাঁড়ান। ওর মাথার এলোমেলো চুলে একটা হাত রেখে চিন্তাব্যাকুল স্বরে বলেন—কী হয়েছে রে হিমু? একলাটি এই অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছিস কেন?

সুধাময়ীকে দেখে পর্য্যন্তই মনে-মনে এ প্রশ্নের একটা সদুত্তর খুঁজছিলো হিমাদ্রি। পায়নি।

বিনামূল্যে!
লেডিস্ রুমাল
হিমালয়
বুকে স্নো'র
বিশেষ প্যাকেটে
পাছে ষ্টক্ ফুরিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি করুন!
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
হিমালয় বুকে স্নো
FREE
HANDKERCHIEF
INSIDE
রুমাল

তাই মায়ের দৃষ্টিভঙ্গীটাকে একেবারে দিক পরিবর্তন করাবার উদ্দেশ্যে সে একটু চেষ্টাকৃত চপল কণ্ঠেই বললে—দেখো না মা, কী বিশ্রী যে বর্ষাকালের মত বৃষ্টি শুরু হল, কিছু ভালো লাগছে না। বিকেল থেকে ভাবলুম একটু বেরুবো, তাও বৃষ্টির জ্বালায় হল না দেখছি।

—তাই বুঝি এই সারাটা বেলা ধরে এই জলো বাতাসে বসে বসে ভাবছিস? খুব হয়েছে আর ভাবতে হবে না তোকে। নে চল্ তো দেখি, আমার ঘরে চল্। মায়ে-বেটায় শুয়ে-শুয়ে গল্প করি একটু। বিকেল থেকে তো খাস্‌নি কিছু। তারার মাকে বলি খান-কতক লুচি ভেজে আনুক তাড়াতাড়ি।

—না-না মা, এখন আর খাবো না কিছু। সত্যি সত্যি আমার ভীষণ দরকারী কাজ আছে একটা। ইকনমিক্‌সের খার্ড পার্টটা ফেলে এসেছি প্রফেসর ঘোষের টেবিলে। রাত্রে এসে বরং আজ তোমার কাছে বসে লুচি খাবো। কেমন?

সুধাময়ীকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আলনা থেকে গরমের পাঞ্জাবীটা টেনে নিলো হিমাদ্রি। তারপর দেরাজ থেকে গাড়ীর চাবিটা নিয়ে চটির আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেলো সে।

আর সুধাময়ী? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকেও যেতে হল ধীরে ধীরে অর্দ্ধদগ্ধ ধূপকাঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।

তিনি নিঃসন্দেহেই জানেন রাত্রেও তাঁর ঘরে গিয়ে খেতে বসবে না হিমাদ্রি। লুচির থালার সাথে দুনিয়ার যত রাজ্যের বাজে খবর টেনে এনে সমান ভাবে রসাস্বাদন করতে পারবে না আগেকার মতন। সুধাময়ীর সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়ায় হিমাদ্রি। এইটাই তার বর্তমান বৈলক্ষণ্য।

কিন্তু কেন?

নিজেই ভাবে হিমাদ্রি। কেন এমন করে পালিয়ে বেড়ায় সে? যে মা ছাড়া হিমাদ্রির কেউ নেই—কিছু নেই সারা পৃথিবীতে—সেই মাকে সে এত দুঃখ দেয় কী জন্যে?

না—না, মাকে দুঃখ দিতে পারে না।

মা দুঃখ পাবেন, এমন কোন কাজ করবার কথা ভাবতেও ভালো লাগে না তার। তবু সে যে আজ মাকে দূরে রেখে পালিয়ে বেড়ায় সে শুধু মাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যেই। আর কোন কারণে নয়।

আজকেও তাই নিতান্ত বাধ্য হোয়েই মাকে এড়িয়ে পালিয়ে এলো হিমাদ্রি। সে যে নিশ্চিত জানে মার কাছে ঘনিষ্ঠ হলেই কোন কথার অবতারণা অনিবার্য্য।

আগেকার মত এক বিছানায় শুয়ে গল্প করতে গেলেই পাঁচ রকম কথার মধ্যে দিয়ে পরমেশ বাবুদের কথাটা না তুলে মা থাকতে পারেন না কিছুতেই। অবশ্য তার জন্যে তাঁকেও বিন্দুমাত্র দায়ী করে না হিমাদ্রি। মার পক্ষে এ উদ্বেগ অপরিত্যাজ্য, তাও সে বোঝে। কিন্তু উপায় কি?

মাকে সব কথা জানানো কী হিমাদ্রির পক্ষে সম্ভব? আর তা ছাড়া জানিয়ে লাভই বা কী? শুধু মর্মান্তিক আঘাত দেওয়া মাত্র। না, না, অকারণে মাকে এমন করে আঘাত করতে পারবে না হিমাদ্রি।

তার চেয়ে এই ভালো। এই মায়ে-ছেলের লুকোচুরি। এতে মায়ের মনে একটু অভিমানের মেঘ হয়তো জমছে কিন্তু হিমাদ্রি জানে সে মেঘের গুরুত্ব নেই। হিমাদ্রি যে কোন মুহূর্তে একটু সচেষ্ট হলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারবে। মায়ের কাছে নিজের মনটাকে উন্মুক্ত করতে না পারার পিছনে অবশ্য আরও একটা ভয় আছে মনে মনে। নিজের যে ক্ষতটাকে সে বহু সন্তর্পণে মায়ের চোখ এড়িয়ে এখনো লুকিয়ে রেখেছে। এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে সম্ভবতঃ তা প্রকাশ হয়ে পড়বে মায়ের কাছে। হিমাদ্রি আর সেটাকে গোপন রাখতে পারবে না মায়ের নজর থেকে।

কিন্তু নিজের ক্ষত বা ক্ষতির পরিমাণ যত বেশীই হোক, একটা বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে হিমাদ্রি, পরমেশ বাবুর বাড়ী আর যাবে না হিমাদ্রি। কোন কারণেই নয়।

গত পনের দিনের মধ্যে অবশ্য দু'বার হিমাদ্রির ডাক এসেছে পরমেশ বাবুর বাড়ী থেকে। বিনীত প্রত্যাখ্যানে ভদ্র অজুহাতে দু'বারই সে ডাক ফিরিয়ে দিয়েছে হিমাদ্রি। মলিভিলায় সে আর যাবে না—কোন কারণেই যেতে পারবে না সে।

এমন একদিন হয়ত ছিল যেদিন হিমাদ্রির জগত থেকে মলিভিলার অস্তিত্ব লোপ করবার কথা ভাবতেও পারতো না হিমাদ্রি। কিন্তু আজ পারে। বিধাতার অনেক নিষ্ঠুর অনুশাসনের মত সে বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছে মাথা পেতে ভাগ্যের এ পরিবর্তনকে।

কিন্তু তাই বলে গত পাঁচ মাস আগেকার একটি স্মরণীয় সন্ধ্যার অপমান ভুলে গিয়ে নতুন করে আবার মলি-ভিলায় যাতায়াত শুরু করা তার পক্ষে অসম্ভব! ওঁরাই বা কোন মুখে কোন দাবীতে আবার ডাকতে পাঠালেন, সেই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য্য হয়ে যায় হিমাদ্রি। এমন কিছু সুদীর্ঘকাল আগেকার ঘটনা নয় যে একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেলেন ওঁরা? কই হিমাদ্রি তো ভোলে নি? জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সেদিনের কোন ঘটনা ভুলতে পারবেও না বোধ হয়।

* * * *

যেদিন বিকেলে এই ঘটনার সূচনা হল সেদিনটাও ছিল এমনি বর্ষণমুখর। সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ে পড়ে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে মনমেজাজে পর্য্যন্ত একটা স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। বোধ করি তারই আমেজে বিকেলের দিকে কলেজ থেকে বাড়ী ফেরবার সময় এক কাপ চা খেয়ে নেবার বাসনায় সুমুখের একটা রেস্তর্যাঁয় ঢুকেছিল হিমাদ্রি।

আর সেইখানেই দীর্ঘকালের পর একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেলো কলেজ-জীবনের অন্তরতম বন্ধু অবনীশ রায়ের সাথে।

ওকে দেখে উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল অবনীশ। দূরের চেয়ারটাকে বাতিল করে ওর সুমুখের চেয়ারটায় এসে বসেছিল চক্ষুর নিমেষে। তার পর খুসমেজাজে দু'-তিন রকম খাবারের ফরমায়েস করে দিয়ে হাসি আর গল্পে এক পলকে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুললো একেবারে।

ওর চপলতার পরিমাণ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল হিমাদ্রি। ভাবছিল—কী আশ্চর্য্য, এতটুকুও কী পরিবর্তন হয়নি অবনীশের? ঠিক সেই আগেকার মতই আছে ও। তেমনি কাজিল আর আড্ডাবাজ, দু'-চারটে টুকরো কথা আর কুশল সমাচার বিনিময়ের

পরেই হোটেলের ডাইনিং হলে উপস্থিত বহুলোকের মাঝখানেই সে শুধিয়ে বসলো—তারপর তোর সেই সুইট-হার্টের খবর কী? আর কতকাল ধরে কোর্টশিপ চালাবে ভাই? আমাদের নিমন্ত্রণটার আর দেরী কত?

লাজুক-প্রকৃতি হিমাদ্রি ওর কথা শুনে ঘেমে ওঠে প্রায়। কেমন করে আশেপাশের লোকদের মুখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে। বিব্রত কণ্ঠে বলে—কী আজে-বাজে বকছিস্ এতলোকের সামনে? সে সব কিছু নয়।

—কিছু নয়? সে কী কথা রে? সে বার তোদের বাড়ীতে আমি নিজের চোখে দেখে এলাম তাঁকে। অত ঘটা করে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি তুই।—চলে যেতে কবিত্ব করে বললি—ইনি এ বাড়ীর পূর্ণ স্বত্বে মালিক হবেন অদূর ভবিষ্যতে। তবে আবার হোল কী, শুনি?

হিমাদ্রি বোঝে, অবনীশ সহজে ছাড়ান দেবে না তাকে। তাই সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। মৃদুস্বরে বলে—না ভাই, ও সব কথা তুলে তুই আমার বিড়ম্বনা আর বাড়াস না। ও প্রসঙ্গটা যেতে দে। এটা তো বুঝতে পারছিস হবার হলে এতদিনে নিশ্চয় হয়ে যেতো, হবার নয়—তাই হয়নি।

ওর সংকুচিত ভাবে ভ্রূক্ষেপও করে না অবনীশ। বলে—ওরে বাবা, এ যে দেখছি বেজায় জখমী লাস। কলজে ফুটো করে গুলিটা চলে গেছে। আরে ব্যাপারটা কী হল তাই বল না ভাই। এমন হতাশ প্রেমিক-মার্কা মুখ করে বসে আছিস কেন? এমন বাদলার বাজারে তোর ব্যর্থপ্রেমের গল্পটাই না হয় শোনা যাক।

—আঃ, অবন তোর এই ফাজলামিগুলো ছাড়বি? সব তাতে ইয়ার্কি করা ব্যায়রামটা যে তোর কবে সারবে!

হাল্কা সুরে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করেও ঠিক সহজ হতে পারে না হিমাদ্রি। কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস থেকে যায় ওর কথার সুরে। তবুও অবনীশ নাছোড়বান্দা। সে হিমাদ্রিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরের অপেক্ষাকৃত নির্জন এলাকায়। বেয়ারাকেও ইংগিত করে দেয় টেবিল বদল করে খাবার দিতে।

তারপর সেইখানেই জাঁকিয়ে বসে চা-ওমলেটের রসাস্বাদন করতে করতে আগের মতই লঘুহাস্যে বলে—আমার এই ইয়ার্কি করা ব্যায়রামটার কথা বলছিস্? তা বাপু, অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি তাঁরা সবাই একমতে বলেছেন, এ ব্যায়রামটা আমার মরবার আগে সারবে না।—কিন্তু সে যাই হোক, আমি ফাজিলই হই আর যা-ই হই না কেন, তোর বন্ধু তো বটে? সে হিসাবে আমার দাবী তুই অস্বীকার করবি কেমন করে? আমায় তোকে বলতেই হবে এমন কী ঘটনা ঘটলো যাতে তোর মত ছেলে নামঞ্জুর হয়ে গেলো সে মহারাণীর দরবারে?

—না রে, তুই একটু ভুল বুঝছিস ব্যাপারটা। আসলে ঘটনাটা ঠিক এ ধরণের নয়। তাঁদেরও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, রঞ্জনা তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাঁরা তো সবচেয়ে সুপাত্রটির হাতে তাকে তুলে দেবার চেষ্টা করবেনই। সেইটাই তো স্বাভাবিক। তবে রঞ্জনার বোধ হয় এটা ঠিক উচিত হয়নি। তবে একটা কী জানিস? আমাদের প্রত্যেকেরই মনে অবচেতন ভাবে খানিকটা অর্থলিপ্সা বোধ হয় থাকেই। তাই একটু বিবেচনা করে দেখলে সে বেচারাকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

—আহা, তা বেশ তো। কে বলছে তাঁকে দোষ দিতে? আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি, সে নির্দোষ জহরতটি বর্ত্তমানে কোথায় বিরাজ করছেন?

হিমাদ্রি এবার নাচার হয়েই বললে—নাঃ, তোর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়লুম দেখছি আজ। নেহাতই যখন ছাড়বি না তখন আগে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শোন্। তারপর তোর ঐ সব টীকা টীপ্পনিগুলো জাহির করিস।

পরমেশ বাবু অর্থাৎ রঞ্জনার বাবা আর আমার বাবা ছাত্রজীবনে একসময় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমার বাবা এ্যাটর্নি ছিলেন। জানিস তো? পরমেশ বাবু ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তাই পরবর্ত্তী জীবনে যদিও তারা কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তবু তাঁদের দু'জনার মধ্যে অল্পবিস্তর যোগাযোগ বোধ হয় বরাবর ছিল। তাই কলেজ ছাড়বার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও বহরমপুর কোর্টে একটা কেসের তদ্বির করতে গিয়ে বাবা পরমেশ বাবুর বাড়ীতে ওঠেন। সেইখানেই রঞ্জনাকে দেখে খুবই পছন্দ হয়ে যায় বাবার। তাকে একেবারে বৌ করে ঘরে তোলবার পাকা কথা দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে আসেন।

আমি অবশ্য তখন এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের কাছে এ ইতিবৃত্ত শুনেছি। মায়েরও অবশ্য প্রথমটায় খুব ইচ্ছা ছিল না এ বিয়ে হয়। তাঁর মনে ভয় ছিল বিলিতী স্কুলে পড়ে একটু বিলিতী-ঘেঁষা আদব-কায়দায় বড় হয়েছে রঞ্জনা, আমাদের প্রাচীনপন্থী সংসারে হয়ত সে নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু রঞ্জনাকে একবার চোখের দেখা দেখেই তাঁর সমস্ত আপত্তি কোথায় ভেসে গেলো!

তুই তো রঞ্জনাকে দেখেছিস, কাজেই তার চেহারার আর বেশী বর্ণনার দরকার কী? তবে একথাটা বললে বোধ হয় অতিভাষণ হবেনা যে, সুন্দর চেহারা ছাড়াও ওর চলনে-বলনে এমন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল যা একবার দেখলেই যে কোন

মানুষকে ওর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে পারতো।—না রে হাসির কথা নয়। আমি রঞ্জনাকে অনেক দিন ধরে চিনি বলেই বলতে পারছি, রূপগুণের এমন সমন্বয় খুব অল্প মেয়ের মধ্যেই দেখা যায়। আর সমস্ত কিছুর ওপরে ছিল একটা অদ্ভুত সতেজ প্রাণ। বোধ হয় সহরের বাইরে উন্মুক্ত পরিবেশে বড়ো হয়েছিল বলেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসি এত কথায় কথায় গান আমি আর কোন বাঙালীর মেয়ের মধ্যে আগে কখনও দেখিনি। মাকে যে ও কী রকম মায়ায় ফেলেছে সে চোখে না দেখলে তোরা ধারণায় আনতে পারবি না।

—মাকে নাই বা দেখলাম, মায়ের ছেলেকে তো দেখছি, তাইতেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবো বলে বোধ হয়। বন্ধুর উচ্ছ্বাসে ঠাট্টা করবার এ সুযোগটুকু ছাড়ে না অবনীশ। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্‌টে নেয় হিমাদ্রি। অর্থাৎ রঞ্জনার ব্যক্তিগত স্বভাবের বিশ্লেষণটা স্থগিত রেখে স্থূল ঘটনার বিবরণ দিয়ে চলে সংক্ষেপে।

—তোকে তো আগেই বললাম পরমেশ বাবু ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। সম্প্রতি রিটায়ার্ড করবার পর তিনি কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে একখানি হালফ্যাসানের বাড়ী করেছেন। সংসার অবশ্য তাঁর ভারী নয়। শান্তস্বভাব স্ত্রী আর অশান্ত স্বভাব ওই মেয়েটিই তাঁর সম্বল। রিটায়ার্ড করবার পর বাড়ী করে গুছিয়ে বসতে গিয়ে হাতের সম্বলও বোধ করি প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। তাই মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েই তিনি ইদানীং প্রায় রোজই সকালে আমাদের বাড়ীতে আসতেন।

রঞ্জনাও আসতো তাঁর সঙ্গে। মায়ের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে তিনি নানা সাংসারিক বিষয়ের আলোচনা করতেন মায়ের সাথে। সেই সঙ্গে নিজের আর্থিক দীনতার কথা তুলে বার বার লজ্জা পেতেন। আর আমাকে উপযুক্ত যৌতুক দেবার অক্ষমতা নিয়ে আক্ষেপ করতেন।

মা যতই বলতেন—তাতে আর কী হয়েছে বেয়াই? আমরা রঞ্জনাকে নেবো বলেছি। আপনার টাকার হিসাবে আমাদের কাজ কী?

উনি ততই বলতেন—না না বৌ-ঠাকরুণ, এটা কী একটা কথা হল? আপনি মহৎ, তাই এতবড় কথাটা বলতে পারলেন, তাছাড়া আপনার লক্ষ্মীর সংসার, অভাবটাই বা কী? কিন্তু আমারও তো একটা সাধ-আহ্লাদ ছিল? খুকী আমার একটা মেয়ে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনি ধরে নিতে পারেন যে ভবিষ্যতে বাড়ীখানা—

আচ্ছা আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই হবে'খন। বলতে বলতে মা রান্নাঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকতেন ওঁর জলখাবারের জোগাড় করতে।

সত্যি কথা বলতে কী, রান্নাঘরের রোয়াকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ওই কাজটা পরমেশ বাবু নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করতেন রোজ। আর সেই সঙ্গে মায়ের হাতের সুক্তো, শাকের ঘণ্ট হতে সুরু করে পিঠে-পরমান্ন পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসেরই অপর্যাপ্ত গুণগান শুনিয়ে মায়ের মনটিকে একেবারে ভিজিয়ে দিতেন। আবার তারই মাঝে মাঝে বলতেন—খুকীকে আপনার বৌ হবার যোগ্য করে নেবেন বৌ-ঠাকরুণ। ও' আবার এ সব কিছুই জানে না! [illegible] কাল—ও সব গৃহলক্ষ্মীর কাজ আর শিখবার সময় পেলো কখন? তাতে আবার যা চঞ্চলপ্রকৃতি ওর। কে জানে কত বিরক্তই না করবে আপনাকে।

মা তাড়াতাড়ি বলতেন—সে জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না বেয়াই মশায়। আমি সব শিখিয়ে নেবো। কিছুই আটকাবে না। ও' এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। বয়েস হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বিরক্তির কথা বলছেন? ওটা আপনার একদম ভুল ধারণা। আমার মেয়ে নেই—ওর এই ছেলেমানুষি স্বভাব আমার খুব ভালো লাগে। আপনি কেন মিছিমিছি এর জন্যে ব্যস্ত হন?

পরমেশ বাবু সান্ত্বনা পেতেন মায়ের কথায়। রঞ্জনাকে ডেকে এনে মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়ে তাকে তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল বোঝাতেন বার বার।

তারপর বাড়ী ফিরে যাবার সময় হলে বেশীর ভাগ দিনই আমাকে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করে বাড়ী ফিরে যেতেন।

একটু থেমে হিমাদ্রি আবার বলে—ওঁরা হয়ত আশা করতেন রাত্রের নিমন্ত্রণ হলেও আমি একটু বিকেল থাকতে যাবো। আমারও যে যেতে ইচ্ছা করতো না তা নয় কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠতাম না সকাল সকাল যেতে। লজ্জা আর সংকোচে আগু-পিছু করতো মনটা। শেষ পর্য্যন্ত মা এসে তাড়া না লাগালে কোনদিনই আমার যাওয়া হয়ে উঠতো না।

ওদের বাড়ী গিয়ে পরমেশ বাবুর সাথে দেখা করে যখন উপরে যেতাম, তখন রঞ্জনার মা-ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরে কাছে বসাতেন। তবে অতি শান্তস্বভাবের মানুষ তিনি, অনেক কথা বলতে কোনদিনই পারতেন না। তাই একটু পরেই রঞ্জনার ঘরে আমায় বসিয়ে দিয়ে সংসারের কাজে তিনি অন্যত্র চলে যেতেন।

আর আমি একা ঘরে বসে বসে শুধু অবাক হয়ে দেখতাম রঞ্জনাকে।

সকালবেলায় যে মেয়েটি বাপের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে গিয়ে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতো। আর দেখা হলেই মুখ নীচু করে হেসে ছুটে পালাতো—বিকেলবেলায় নিজের ঘরে সে স্বরূপে প্রকাশিত।

কী আনন্দ-উজ্জ্বল নিঃসংকোচ স্বভাব যে ওর! ওকে যতই দেখতাম ততই অবাক হতাম আমি। কোনদিন ওকে চুপ করে কোথাও এক মিনিটও বসে থাকতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। নাচে গানে ও যেন সর্বদাই মুখর, হাসিখুশীতে সর্বদাই ভরপুর। আমি মুখচোরা মানুষ, ওর সাথে মন-প্রাণ খুলে কোলাহল করে নিজের আনন্দ ব্যক্ত করতে পারতাম না। শুধু নীরব দর্শক হয়ে ওর আনন্দটা মনে মনে ভোগ করে নিতাম মাত্র।

একটানা হিমাদ্রির কথা শুনতে শুনতে অবনীশের চপল রসনা অনেকক্ষণ আগে হতেই তাগাদা দিচ্ছিলো অবনীশকে। শুধু হিমাদ্রির উচ্ছ্বাসে বাধা দেবে না স্থির করেই সে বহু কষ্টে রাশ টেনে রেখেছিল নিজের। এবার আর পারলে না—বিজ্ঞের মত মুখ করে চোখটা একটু ওপর পানে তুলে বললে—বুঝেছি, বুঝেছি। কিছু সংকোচ করিস্ না তুই—বলে যা। তোর বক্তব্যটা আরও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে কবির ভাষায় আমিই বলে দিচ্ছি—তোদের দু'জনকার আনন্দ আহরণের রূপটা ছিল স্বতন্ত্র। ও ছিল মধুকরা আর তুই ছিলি

মধুসঞ্চয়ী। কেমন ঠিক বলেছি না? একটু লজ্জিতমুখে হাসে হিমাদ্রি। তারপর বলে—যে যাই হোক, এমনি করেই নানান্ ঘটনার মধ্যে দিয়ে দিনে দিনে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অনেকখানি মেলামেশা করে ফেলেছিলাম ওদের সাথে। এখনও অবশ্য মাঝে মাঝে যাই—কথার শেষের দিকটায় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় হিমাদ্রি। অধৈর্য্য অবনীশ আবার তাড়া লাগায় ওকে—কী, আবার ঝিমিয়ে পড়লি কেন? তারপর কী হল তাই ছাই বল্ না।

একটু চুপ করে থেকে হিমাদ্রি বলে—সুজন মিশ্রকে চিনিস্? সেই যে—খুব কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক।—বেহালার ওদিকটায় থাকেন। চেহারাটাও খুব চমৎকার। অবশ্য ভদ্রলোক যে কী কাজ করেন তা আমি এখনও সঠিক জানি না। শুনেছি বিজনেশ আছে। তবে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ক'খানা যে তাঁর গাড়ী আছে আমি আজ পর্য্যন্ত তাই দেখে শেষ করতে পারিনি বোধ হয়।

—বটে? তিনিই না কী তোর রাইভ্যাল? কে বল্ লোকটা? কী নাম বল্লি? সুজন মিশ্র? নাঃ, এ নামে কারোকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। তা রঞ্জনাদের বাড়ীতে তার শুভাগমনটা হলো কী করে, শুনি?

হিমাদ্রি বলে—সে-ও এক অভিনব কাহিনী। রঞ্জনাদের কলেজ থেকে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অভিনয় হয়েছিল ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে। আমিও গিয়েছিলাম দেখতে। চ্যারিটি শো—কাজেই বাইরের বহু বড় বড় লোক সেখানে ছিলেন।

আর সেইখানেই সুরূপা চিত্রাঙ্গদার বেশে রঞ্জনাকে দেখে মোহিত হয়ে যান মিশ্র সাহেব। ঠিকানা জোগাড় করে বিরাট এক পুষ্পস্তবক নিয়ে পরদিন সকালে তিনি রঞ্জনাদের বাড়ীতে এলেন অভিনয়ের তারিফ আর অভিনন্দন জানাতে। তারপর আরও শুনবি? না ভাই, তারপরে আর বলবার মত কিছুই নেই। ওঁর অপর্য্যাপ্ত উপহারে নিত্য-নতুন গাড়ী আর কড়া ইস্ত্রির স্যুটের পাশে অতি সহজেই ম্লান হয়ে গেল তোদের এই চারশো টাকা মাইনের প্রফেসর হিমাদ্রি সরকার।

নিজের বাগ্‌দত্তা জেনেও যে রঞ্জনাকে নিয়ে কোনদিন একলা গাড়ীতে কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করতে পারিনি, ভেবেছি রঞ্জনার মা-বাবারা কী ভাববেন? মিশ্র সাহেব সামান্য পরিচিত হয়ে সেই রঞ্জনাকে নিয়ে সমস্ত বেলার মত পাড়ি দেন দূরের পাল্লায়। প্রথমে ভাবতাম পরমেশ বাবুরা বোধ হয় চক্ষুলজ্জাতেই কিছু বলতে পারছেন না। পরে বুঝলাম তা নয়। পরোক্ষ ভাবে ওঁদের সমর্থনই রয়েছে ওদের বেড়াতে যাওয়ায়। ওঁদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে মিশ্র সাহেবের ঐশ্বর্য্যের ঝলমলানিতে। রঞ্জনারও বোধ হয় তাই। কিন্তু আমি এখন উঠি ভাই? বাইরে এতক্ষণে বোধ হয় বৃষ্টিটা ধরেছে।

তবে চল আমিও উঠি এবার। বলে অবনীশও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। কিছুক্ষণ আগেও তার গল্প শোনবার যে অদম্য উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এখন আর তার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

সোদরপ্রতিম বন্ধুর সমবেদনায় বিষণ্ণ ছায়া ছড়িয়েছে সারা মুখে।

বাইরের করিডরে এসে সে শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো হিমাদ্রিকে। তুই তা হলে ওদের ওখানে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিস?

হিমাদ্রি বলে—ঠিক ছেড়ে এখনও দিইনি কিন্তু দিতেই তো হবে ভাই। তুই তো আমায় চিনিস, এ ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার ধাতে পোষাবে না। সাধ্য তো নেই-ই—রুচিও নেই হয়তো। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কী জানিস? মাকে এখনও কিছুই বলতে পারিনি। শুধু ওরা সবাই পশ্চিমে হাওয়া খেতে গেছে বলে কোন রকমে ভুলিয়ে থামিয়ে রেখেছি। তা না হলে ওখানকার খবরাখবর না পেলে মা ভয়ানক বকাবকি সুরু করে দেয়। রঞ্জনার দুবেলার খবর না পেলে তাঁর মনই ভালো থাকে না।

এর পর আর অবনীশকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দেয় না হিমাদ্রি। হাত নেড়ে সংক্ষিপ্ত একটা বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায় বিপরীত ফুটপাতে রাখা ওর ছোট গাড়ীখানার উদ্দেশ্যে।

* * * *

—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু ওঠেন। অবনী-দাদাবাবুরা খোঁজতে এয়েছেন আপনারে। আমি তানাদের বোটকখানায় বসায়ে এলাম।

সকালবেলায় দীনেশচরণের ডাকাডাকিতে অবসন্ন দুটি চোখ মেলে তাকালো হিমাদ্রি।

ঘরের মেঝের ওপর রোদ এসে পড়েছে। বেলা হয়েছে অনেক। গতরাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি হিমাদ্রির। অবনীশের সাথে হোটেলে বসে ঐ সব কথা আলোচনা করার ফলে থিতিয়ে আসা স্মৃতিটা আবার গুলিয়ে উঠেছিল মনের মধ্যে। পরিণামের ফলভোগে উত্তপ্ত মস্তিষ্কটাই সারারাত্তের জন্যে নির্বাসন-দণ্ডভোগ করলো ঘুমের রাজ্য থেকে। তাই একটা তিক্ত অবসাদ ঘিরে রেখেছে সমস্ত শরীর আর মনটায়।

আজকের প্রভাতী অতিথিরা তাই হিমাদ্রির মনের অঙ্গনে ঝরা শেফালীর পথ বেয়ে আসে না। বরং একরাশ বিরক্তি ছড়িয়ে দেয় তার মুখব্যঞ্জনায়। তবুও দীনেশকে চা দিতে বলে দিয়ে জলসচরণে চটিটা গলিয়ে নেয় হিমাদ্রি। তারপর কোনমতে গেঞ্জিটা পায়ে চড়িয়ে চোখে-মুখে একটু জল দিয়ে বাইরের ঘরে চলে আসে হিমাদ্রি।

ওর অতৃপ্ত মুখ দেখেই বোধ হয় অবনীশ আন্দাজ করে নেয় ওর অবস্থাটা। বলে—কি রে, এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিলি নাকি? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?

হিমাদ্রি লজ্জিত স্বরে বলে—না না এমনিই, শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই শুয়েছিলাম একটু। বলতে বলতে লক্ষ্য করে হিমাদ্রি, অবনীশ একা নয়, আরও একজন অপরিচিত ভদ্রলোক এসেছেন অবনীশের সাথে।

অবনীশ যৌতিমাফিক পরিচয় করিয়ে দিলে দু'জনার মধ্যে। বললে—হিমাদ্রি! এঁকে আমি ধরে নিয়ে এলাম তোর কাছে। পরিচয় শুনলে তুই নিশ্চয় এঁকে চিনতে পারবি। ইনি হচ্ছেন চিমনলাল এ্যাণ্ড মার্চেন্ট কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার শ্রীকমলাক্ষ মিশ্র।—আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু। কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই ওঁর দরজায় যেতে হয়। আর এর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি কমল বাবু! ইনি শ্রীহিমাদ্রি সরকার। আমার কলেজ-জীবনের প্রাণের দোসর। খুব ভালো স্কলার। বর্তমানে বঙ্গভারতী কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক।

কমলাক্ষ আর হিমাদ্রি পরস্পরের মধ্যে নমস্কার-বিনিময় করে নেয়। তারপর দীনেশচরণের পরিবেশিত চা আর চিড়েভাজায় মনোযোগ দেয়।

হিমাদ্রি মনে মনে বোঝে, ওরা একটা কিছু মতলব ভেঁজে এখানে এসেছে। কিন্তু সেটা যে কি হতে পারে, তা অনুমান করে উঠতে পারে না।

সুমুখে রাখা খবরের কাগজটা পর্য্যন্ত টেনে নেবার সাহস হয় না, পাছে ওদের প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়। বরং কমল বাবুর কথা বলার কোন মনোমত গৌরচন্দ্রিকা খুঁজে না পেয়ে দিনের কাগজটা টেনে নিয়ে মেলে ধরে সামনে। কিন্তু অধৈর্য্য প্রকৃতি অবনীশ খুব বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করবার মানুষ নয়।

দু'-চারটে কথার পরই সে আজ প্রভাতে উঠেই ওদের দু'জনকার মধ্যে আলাপ করিয়ে দেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সে কেন বোধ করলো তার বিস্তারিত বিবরণ সুরু করলো। চায়ের নিঃশেষিত পেয়ালাটার মধ্যে দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—আজ সকালে উঠেই এমন প্রভাতী অভিযান চালালাম কেন জানিস্ হিমাদ্রি! গতকাল সন্ধ্যাবেলা নিজেরই একটু দরকারে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম কমলাক্ষ বাবুর সাথে। সেইখানেই হঠাৎ কথাপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়লো তোর ওই সুজন মিত্রের আসল পরিচয়। সেটা এতই অদ্ভুত যে শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না কিছুতেই। কমলাক্ষ বাবুকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে চলে এলাম তোর কাছে। এবার সবটা শুনে তুই তোর কর্ত্তব্য স্থির কর।

হিমাদ্রির ভালো লাগে না। নিজের অন্তরের যে পরাজয়ের লজ্জাটুকুকে সে সকলকার কাছ থেকে লুকুতে চায়, অবনীশ বার বার তাকেই সর্বসমক্ষে টেনে আনবার প্রতিজ্ঞা করেছে যেন। ভারী বিরক্তি লাগে তার। অথচ মুখ ফুটে সে কিছুই বলতে পারে না। উল্টে বরং একটা অগত্যা গোছের ধন্যবাদ দেয় কমলাক্ষ বাবুকে। কারণ, শুধু অবনীশের অনুরোধে সে ভদ্রলোক অযাচিত খোঁজতে এসেছেন হিমাদ্রির বাড়ীতে। এ ক্ষেত্রে সুজন মিত্রের আসল পরিচয় জানবার জন্যে হিমাদ্রি আদপে ব্যগ্র কী না সে কথাটাই অবান্তর হয়ে গেছে। তাই কতকটা বাধ্য হয়েই হিমাদ্রিকে শুনতে হবে ওদের বক্তব্য।

তবে নবাগত বলে কমলাক্ষ বাবু বোধ হয় একটু সংকোচ বোধ করেন প্রথমেই এ ধরণের একটা পরচর্চ্চা সুরু করতে। তাই অবনীশের জবানীতেই কথাগুলো হিমাদ্রির কর্ণগোচর হল।

—কমলাক্ষ বাবু বলছিলেন, কয়েক মাস আগে একজন ভুখোড় জালিয়াতের পাল্লায় পড়েছিলেন উনি। আর একটু হলে সেই মহাপুরুষটির কৃপায় ওঁর হাজতবাস পর্য্যন্ত হয়ে যেত। লোকটার আসল নাম হীরেলাল পাণ্ডে। স্থানবিশেষে পরিচয় দেয় সুজন মিত্র বলে। সুন্দর ঐ চেহারাটা ছাড়া আর কোন ঐশ্বর্য্যই নেই ওর। একটা কানাকড়িও নেই নিজস্ব বলতে। কিন্তু এমন সাজপোষাক করে এত হাইসার্কেলে ও মেলামেশা করে যে ওকে দেখলে ওর আসল অবস্থা কারু কল্পনাতেও আনবার সাধ্য নেই। যে সুবাদেই হোক কয়েক জন অবাঙ্গালী ব্যবসাদারের সাথে ওর খুব খাতির আছে।

কয়েক জন বড় বড় নামকরা লোক এমন কী দেশের কয়েক জন হর্তাকর্তার সাথেও ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ইচ্ছা করলে তাদের মারফত অনেক অসাধ্যসাধনও করতে পারে।

কিন্তু লোকটা একটা ঝানু বদমাইস। ধরাছোঁয়ার পাওয়া যায় না সহজে। আবার সকলকার কাছে বলে বেড়ায় ওর কস্তুরী সংগ্রহের ব্যবসা আছে। কিন্তু কমল বাবুর ধারণা লোকটা আসলে একটা স্মাগলার। চোলাই কারবার করে তলে তলে।

উনি তো বলছেন পুলিশেরও নজর পড়েছে লোকটার কার্য্যকলাপে। কিন্তু অত বড় বড় জায়গায় ওর আনাগোণা বলেই উপযুক্ত প্রমাণ হাতে না পেলে গ্রেপ্তার করতে ইতস্ততঃ করছে ওরা। অবনীশের কথা শুনতে শুনতে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে হিমাদ্রি, চীৎকার করে বলে—এ সমস্ত কী বলছিস্ তুই? অমন একটা ভদ্রলোক।—আচারে আচরণে অত যার—

—সেইজন্তেই তো ছুটে বলতে এলাম রে! ভদ্র শুধু ওর বাইরের আবরণটা—ভেতরটা মোটেই নয়। সমস্তটাই ধোঁকা। সবটাই ভুয়ো। আর ভুয়ো বলেই নিজের চেকনাইয়ের দিকে ওর অত কড়া নজর। সত্যিকারের লোকটা একটা পেনিলেস্ বেগার! শুধু তাই নয় একটি পাকা ফোর টোয়েনটি।

—তাহলে তো এক্ষুণি একটা কিছু করা উচিত আমাদের? একথা শুনে আর এক মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকতে পারছি না আমি। থাকা উচিতও নয়। কত বড় একটা বদমাইসের খপ্পরে পড়েছে ওরা সেটা ওদের জানানো উচিত। তা না হলে ওরা যে ধরণের অবাধ মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাতে করে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। সময় থাকতে সাবধান হতে না পারলে রঞ্জনার সমস্ত জীবনটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে হয়ত।

হিমাদ্রির মুখের কথাটা লুফে নিয়ে অবনীশ বলে—আমি তোকে সেই পরামর্শ দেবার জন্তেই তো এলাম। তুই আগে গিয়ে তাঁদের সমস্ত কথা জানা। তাঁরা যদি তোর কথার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারেন—চাক্ষুষ প্রমাণ চান—তাহলে আমি আর কমল বাবু যাব সেখানে। কমলাক্ষ বাবুর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে—বুঝিয়ে বলে আসবো। কেমন?

এবার হিমাদ্রি সুবোধ বালকের মত মাথা নীচু করে, শোনে অবনীশের পরামর্শ। কিছুক্ষণ আগেও যে অবনীশের এই অযাচিত হিতাকাঙ্ক্ষা যা হিমাদ্রি মনে এক তিক্ত বিরক্ত ভাবের সৃষ্টি করেছিল এখন সেই অবনীশের বন্ধুত্বই হিমাদ্রির কাছে জগতের এক অপার্থিব সম্পদ বলে বোধ হল।

কৃতজ্ঞচিত্তে বন্ধুদের বিদায় দিয়ে সকালের অধিবেশন শেষ করলো সে। তারপর একলাটি নিজের ঘরে বসে বসে আপনার বিচলিত অন্তরটাকে সন্ধ্যাবেলাকার নাটকীয় পটভূমিকায় গুরুত্ব অংশগ্রহণের জন্ত তালিম দিতে লাগলো মনে মনে।

কিন্তু সে কী সহজসাধ্য কাজ? অনায়াস সাধ্যসাধনা? রঞ্জনা অন্ত জনকে ভালবাসে অন্তকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে, একথা যত মর্মান্তিকই হোক হিমাদ্রির,—তবু তা সয়ে এসেছে। কিন্তু রঞ্জনা আজ বিপন্ন তার বাস্তব জীবনে আজ হিমাদ্রিকে তার একান্ত প্রয়োজন—এমন কী তার ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু ভালোমন্দ আজ হিমাদ্রির হাতে—একথা ভাবতে আজও নিভৃত অন্তরে যে মাধুরী ছড়ায় সে যে আরও দুঃসহ। সে চিন্তা যে আজও জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে যায় সারাটা তনু-মনে।

তবুও ওই জ্বালাধরা চিন্তাটাকেই নেড়েচেড়ে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিলো হিমাদ্রি।

কলেজে পড়াতে যাওয়া পর্য্যন্ত হলো না। সত্যি কথা বলতে কী, পড়াতে যাবার কথাটা মনেই এলো না সারা দিনের মধ্যে।

যেন কলেজে যাওয়ার থেকে অনেক বড় একটা কর্ত্তব্যের সন্ধান দিয়ে গেছে অবনীশ। আর সে নির্দ্দেশ প্রতিপালনের জন্তে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছে হিমাদ্রি। পড়াতে যাওয়ার মত তুচ্ছ কাজের অবকাশ কোথা আজ?

মায়ের তাগিদে একবার উঠে দায়সারা মত দু'টি খেয়ে এলো, তারপর থেকে ওর সমস্ত মধ্যাহ্ন-আকাশ জুড়ে কত যে টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘ ভেসে এলো জমা হলো আবার উড়ে গেলো তার ঠিকঠিকানা রাখার সাধ্য ছিল কোথা? কী সে? সে কী শুধু অলস দিবাস্বপ্ন না অতীত স্মৃতির সযত্ন রক্ষিত ছায়াছবি?

রঞ্জনার মুখখানাই বা কত বার কত বিচিত্র ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ালো সুমুখে। কখনও বা সে মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল। হিমাদ্রির পানে রোষান্বিত নয়নে তাকিয়ে বলছে—কে? কে তোমায় বলেছে স্বজনের স্বভাবচরিত্র নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে? জানো না আমি ওকে ভালোবাসি।

কখনও বা সে মুখ রঞ্জনার স্বভাবসুলভ প্রসন্ন আননে বলছে—সত্যি হিমাদ্রি আমার জন্তে এত ভাবো তুমি? উঃ কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার।

আবার কখনও সে মুখ বেদনায় বিবর্ণ। ঠোঁট দুটি কাঁপিয়ে অভিমানের সুরে বলছে—কী এমন অপরাধ আমি করেছি—যার জন্তে তুমি আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়ালে?

—না না রঞ্জনা, এ আমাদের বিচ্ছেদ নয়, এ শুধু সাময়িক ব্যবধান। আপন মনেই রঞ্জনার শত প্রশ্নের উত্তর দেয় হিমাদ্রি। পরিশিষ্টে আবার সান্ত্বনা দিয়ে বলে—ঐ শয়তানটার হাত থেকে তোমায় আমি বাঁচাবই রঞ্জনা! তোমার জীবনের এতটুকু ক্ষতিও আমার সইবে না।

দুপুর গড়ালো। তবু লোকের বাড়ী যাবার মত একটা ভদ্রগোছের সময় ধার্য্য করতে হিমাদ্রিকে অপেক্ষা করতে হলো। তিনটে থেকে উদ্যোগ করে বহু কষ্টে পাঁচটা নাগাদ রওনা দিলো হিমাদ্রি।

সে কোথায় যাচ্ছে অথবা কী তার উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে বাড়ীতে অবশ্য কিছুই জানায়নি সে।

হেমন্তের ছোট বেলা। পাঁচটায় পরেই চারিধারে মুঠো মুঠো কুয়াশা ছড়িয়ে দিলো যেন।

বাড়ীতে থাকতে যে বেলাটা পড়তেই চাইছিল না এখন সে অতি সহজেই একটা ধূসর রংয়ের উড়ানী ঢেকে দ্রুতপায়ে চলে গেলো হিমাদ্রিকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

মল্লিভিলায় পৌঁছে নিজের গাড়ীটাকে গেটের বাইরে রাখলো হিমাদ্রি। কারণ, গেটের ভিতর গাড়ী-বারান্দার নীচেটায় একটা সাদা রংয়ের সেভরলে গাড়ী আগে হতেই এসে দাঁড়িয়েছে। আর তার খোলা দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তকমাআঁটা ড্রাইভার। অনুমান করা কঠিন নয় যে গাড়ীটা মিশ্র সাহেবের।

বাড়ীর ভেতর পা দেবার পর মুহূর্তেই কানে এলো রঞ্জনা আর মিশ্র সাহেবের সম্মিলিত পদধ্বনি।

বেড়াতে যাচ্ছে ওরা। চকিতে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ালো হিমাদ্রি। ওদের এমন সুন্দর সান্ধ্য অভিযানের মধ্যে একান্ত অবাঞ্ছিত ভগ্নদূতের মত এসে দাঁড়াবার আর ইচ্ছা হোল না তার।

সিঁড়ির তলায় একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালেও ওদের দেখবার কোন অসুবিধাই হোল না ওর।

টুকটুকে লাল একটা সাড়ী পরেছে রঞ্জনা আর সেই রংয়েরই একটা জামা দিয়েছে গায়ে। হিমাদ্রির মনে হয় ওর সারা শরীর দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে যেন। গাঢ় রংয়ের লিপষ্টিক লাগানো ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোঝরা দাঁতে অনর্গল হাসছে রঞ্জনা। সে হাসি হয়ত কিছুটা উগ্র কিন্তু তবুও অপরূপ!

মিশ্র সাহেবেরও ইভনিং স্যুটে কোথাও ত্রুটি নেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তাঁরও সুঠাম চেহারা নয়ন ভরে দেখবার মত। সন্ধ্যার আবহাওয়াতেও হিমাদ্রি দু'চোখ ভরে দেখলে ওদের সান্নিধ্যের নিবিড়তা, দু'কান ভরে শুনলে ওদের কলহাস্যের ঐক্যতান।

একবার মনে হল এখান থেকেই ফিরে যাবে হিমাদ্রি। কী হবে আর ওদের মিলনের অন্তরায় হয়ে? ওরা যদি বাস্তবিকই পরস্পরকে চেয়ে থাকে তবে হিমাদ্রি কেন তাতে বাধা সৃষ্টি করবে? কিন্তু ফিরে যেতে পারলো না হিমাদ্রি। বরং ওরা বেরিয়ে যাওয়া মাত্রেই দৃঢ়পায়ে ভিতরে ঢুকলো সে। কর্ত্তব্যবোধে সে তখন নিজের বক্তব্য পেশ করবার জন্তে কৃতসংকল্প।

পরমেশ বাবু আর তাঁর স্ত্রী মলিনা দেবী দু'জনেই বসেছিলেন বাইরের ঘরে। পরমেশ বাবু বসেছিলেন একটা সাময়িক পত্রিকা হাতে নিয়ে। ঠিক যে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন তা-ও নয়, চোখ বুলিয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছিলেন শুধু।

আর মলিনা দেবী কী যেন একটা জামায় বয়নশিল্পের কারিগরী করছিলেন একমনে। বোনার কাঁটা দু'টো পশমের খেই কাঁধে জড়িয়ে অবিরাম ওঠানামা করে চলেছিলো তাঁর দুটো হাতের মধ্যে।

হিমাদ্রি ঘরে ঢুকতে ওর পদশব্দ পেয়ে দুজনেই ওঁরা চোখ তুলে তাকালেন। পরমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে হিমাদ্রি! তারপর? কী মনে করে?

কিছুদিন আগেও অবশ্য মল্লিভিলায় আসতে হলে কিছু মনে করে আসবার দরকার হোত না হিমাদ্রির। বরং কোন কারণে না আসতে পারলে এদেরই মনে করাকরির ধূম পড়ে যেতো একেবারে।

তবুও আজ এ অপমানটুকু গায়ে মাখলো না হিমাদ্রি। সে যে আজ অনেক বড় কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্তে এখানে এসেছে। যার ওপর রঞ্জনার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।—এত সামান্ত কারণে বিচলিত হওয়া তো তার আজ সাজে না?

তাই প্রসন্নমুখেই জবাব দিলো হিমাদ্রি—আজ্ঞে না, এমনিই। ক'দিন আসতে পারিনি। শরীরটারও জুত ছিল না বিশেষ। কথার শেষে ওঁদের দু'জনকার পায়ের ধূলো মাথায় নেয় হিমাদ্রি।

বিনিময়ে মলিনা দেবী ওর চিবুকস্পর্শ করে স্নেহাশীর্বাদ জানান। পরমেশ বাবু সুমুখের একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন—বসো।

নির্দেশিত চেয়ারটায় বসলো হিমাদ্রি। ইচ্ছা ছিল ভাসা-ভাসা দু'-চারটে কথা বলে নিয়ে তবে আলোচ্য প্রসঙ্গে যাবে সে। কিন্তু মানসিক উত্তেজনা অত ধৈর্য্য আজ আর রাখতে দিলো না তাকে।

তার আর দোষ কী? আজ তার সারা অন্তর জুড়ে পুজোর দালানের ঢাকের বাদ্যির মত বাজছে ঐ এক চিন্তা—এক গুরু দায়িত্বের কথা। মস্তিষ্কের অন্ত সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ ডুবে গেছে সে মহা কলরোলে।

তাই একটু খাপছাড়া সুরেই সে হঠাৎ সুরু করলো—আপনাদের সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা ছিল আজ। সেইটা বলবার উদ্দেশ্যেই এলাম আমি।

মলিনা দেবী ওর কথায় বোনা থামিয়ে প্রশ্নভরা চোখে তাকান ওর দিকে। পরমেশ বাবু বলেন—তা বেশ তো বলো না। কী বলবে?

ভূমিকা করেও প্রসঙ্গটা সুরু করতে বেশ একটু দ্বিধা আসে হিমাদ্রির। এ ধরণের পরচর্চায় ঠিক অভ্যস্ত নয় সে। কারো সম্বন্ধে এতটুকু বিকৃত মন্তব্য করতে তার রুচিতে বাধে চিরকাল। তবু আজ জোর করে সংকোচ কাটিয়ে সুরু করলো সে।—

আজ সকালে অবনীশ এসেছিলো আমার বাড়ীতে। ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।—কলেজ থেকে একসঙ্গে পড়েছি দুজনে। ওর কাছে শুনলাম, সুজন বাবু লোক একেবারেই ভালো নয়। অবনীশের সাথে তার পরিচিত কমলাক্ষ মিশ্র বলে এক ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তাঁর সাথে সুজন বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ওঁরা তো বললেন—সুজন বাবু আসল নাম সুজন মিশ্রই নয়।—হীরেলাল পাণ্ডে। বহু লোককে নাকি আজ অবধি প্রতারণা করেছেন উনি। ব্যবসা বা নিজস্ব সম্পত্তি বলতে নাকি কিছুই নেই।—সমস্ত শুধু চালবাজি।

একটু থেমে সে আবার বলে—দু'-চারজন অবাঙালী চোরাকারবারীর সাথে খুব যোগাযোগ আছে শুনলাম। মনে হয় স্মাগলিং বা ঐ ধরণের একটা কিছুই করেন উনি। ওরা বলছিল পুলিশেরও নজর পড়েছে ওর কার্য্যকলাপে। উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই ওকে গ্রেপ্তার করবে ওরা। তাই বলছিলাম, এ ধরণের একটা লোককে—

কিন্তু আমি একটা কথা বলি কিছু মনে করো না, ওর চরিত্র সংশোধনের ভারটা হঠাৎ তোমার ওপর পড়লো কেন?

—আজ্ঞে না, সংশোধনের জন্যে নয়—সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছিলাম—

—থাক্‌ থাক্‌, আর তোমায় বলতে হবে না কষ্ট করে। আমি তোমার কথার ভাব বুঝে নিয়েছি। সুজনের সঙ্গে সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহস না পেয়ে এবার ব্যাকবাইটিং পলিসী নিয়েছো, কেমন তাই না?

হিমাদ্রি থতমত খেয়ে যায় পরমেশ বাবুর কথার হাবভাবে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে—এ আপনি কী বলছেন? আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, তবে আমি ওদের ডেকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

—কিচ্ছু দরকার নেই। কারণ কোন কাজ হবে না তাতে। প্ল্যানটা তোমাদের মোটামুটি ভালই। তবে একটা কথা ভেবে দেখতে তোমাদের ভুল হয়েছে হে! আমিও একজন রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট। লোকচরিত্র সম্বন্ধে আমারও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। মুখের ভাব দেখেই খানিকটা বুঝে নিতে পারি কার কথাটা সত্যি আর কারটা মিথ্যে।

—আপনি আমায় এতখানি অবিশ্বাস করবেন, তা আমি কোন দিন ধারণাতেও আনতে পারিনি।

—আমিই কি ধারণা করেছিলাম কোন দিন, স্বার্থের প্রয়োজনে তুমি এতখানি নীচে নামতে পারো?

এবার ওঁর কথায় বাধা দেবার চেষ্টা করেন মলিনা দেবী। —এ তুমি কা'কে কী বলছো আজ? হিমাদ্রিকে—

পরমেশ বাবু ধমকে ওঠেন—তুমি থামো। সব কথায় মেয়েমানুষের কথা বলা আমি পছন্দ করি না।

তারপর হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বলেন—যাই হোক্‌, আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না তোমায়। তবে এ কথাটা তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে সুজনের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি আর তদন্ত করে বেড়িও না। সুজন যে বড়ঘরের ছেলে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। তাছাড়া সে বড় অভিমানী ছেলে, আমার বাড়ীতে এ ধরণের আলোচনার আভাস পেলে হয়তো আমাদের শুধু ভুল বুঝতে পারে।

এর পর হতবুদ্ধি হিমাদ্রিকে আর কোন কথা বলবার সুযোগই দিলেন না পরমেশ বাবু। একটু চুপ করে থেকে হিমাদ্রি প্রকৃতিস্থ হবার আগেই বলেন—আচ্ছা আমি এখন একটু বেরুবো মনে করছি। তুমি তাহলে—ওরে ভজা, বাবুকে সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দে।

এর পরেও পিতৃবন্ধুর সম্মান রক্ষা করে আপন ভদ্রতা বজায় রেখে নীরবে মাথা নীচু করে মলিভিলা থেকে চলে এসেছিল হিমাদ্রি। কিন্তু আর সে পথ মাড়ায় নি।

অত সহজে যারা মানুষের পুরোন বন্ধুত্বকে অস্বীকার করতে পারে তাদের সঙ্গে হিমাদ্রির কোন সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।

বরং ভিতরে ভিতরে যারা অত ঐশ্বর্য্যের কাঙাল, সময় থাকতে তাদের সম্পর্কে ছেদ টানতে পেরেছে বলে সে ভগবানকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দেয়।

• • • •

মায়ের কিন্তু উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

তবু তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা কিছুতেই বলতে পারে না হিমাদ্রি। শুনলে মা মর্মান্তিক দুঃখ পাবেন। কী হবে তাঁকে অনর্থক দুঃখ দিয়ে? কাজেই এক সময় মায়ের তাগাদায় বাধ্য হয়ে তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। বলতে হয় পরমেশ বাবুরা কলকাতায় নেই। বাইরে গেছেন হাওয়া বদলাতে।

মা সুধাময়ী কিন্তু এ উত্তরেও সন্তুষ্ট হতে পারেন না কিছুতেই। বাইরে গেছেন? বলিস্‌ কী রে? কবে? একবার জানতেও পারলাম না? এত আনাগোনা? তা যাবার সময় একবার বলেও গেলো না আমায়? তা হ্যাঁ রে, আমায় না হয় না বলুক, তোর কাছে চিঠিপত্র ঠিকমত আসে তো? কী জানি বাবু তোদের আজকালকার রীতি-নীতি ধারা-ব্যবস্থা কিছুই মগজে ঢোকে না আমার।

আর কথা বাড়ায় না হিমাদ্রি। চট করে সরে যায় মায়ের সামনে থেকে।

কে জানে, এর পর'মা হয়ত নিজেই ওদের চিঠি লেখা মনস্থ করে ফেলে ওদের বর্তমান ঠিকানা চাইতে সুরু করবেন হিমাদ্রির কাছে।

কাজেই মাকে একটু এড়িয়ে না চলে হিমাদ্রির আর উপায় ছিল কী? [ক্রমশঃ।

অব্যক্ত

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

তুমি তো বলনি কিছু বলবার কিছু ছিল না কি?
তোমার সন্ধ্যার স্বপ্নে লীন, তবু বিষণ্ণ একাকী।
কত বার ভাবি, তবু ডাক দিয়ে যেতে পারি না কো
তোমার চোখের কোণে ভুলে যদি একবার ডাকো।
তবুও সন্ধ্যায় দীপ যখন তোমার চোখ জ্বালে;
সবই কি হয়েছে বলা? ভাবি এই আশ্চর্য সকালে!

দুলাল দেববর্মণ

সাধারণ শাদা শাড়ী। লাল পাড়। আঁট-সাঁট করে কেরতা দিয়ে পরা। গায়ে হালকা চকোলেট রঙের ব্লাউস। কাঁধের দুই দিকে ঝুলে পড়েছে দু'গাছি বিনুনী। উপরের দিকে তুলে আধভাঙা করে বাঁধা।

এর আগেও ওকে দেখেছি। অনেক বার। রঙীন শাড়ীর আড়ালে ওর নিজস্ব ঔজ্জ্বল্যটুকু প্রায়ই থাকে ঢাকা। শাদা শাড়ীতে সেই উজ্জ্বল শ্যামলিমাটুকুই যেন ফুটে উঠেছে! বিনতি ফর্সা নয়। কালোও ঠিক না। উজ্জ্বল শ্যামাংগী মেয়ে। ফর্সা ও কালো—দুইয়ের উদারতাটুকুই যেন রূপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওর সারা দেহে।

প্রথম থেকেই ওকে ছুটাছুটি করতে দেখছি। সারা মাঠ! স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর অধিনায়িকা ও। কাঁধের একটু নীচেই একটা চক্রাকার বিজ্ঞাপন—একটা গাঢ় সবুজ রঙের ব্যাজ। যেমনি গড়ন, উচ্চতাতেও নেহাৎ কম যায় না। বিনতি ছাড়া আর কে-ই বা দাঁড়াতে পারতো অধিনায়িকার পদে!

অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষক। স্থানীয় বালিকা-সমিতির বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। যাদের জন্ত এই অনুষ্ঠান তাদের বয়ঃসীমা অবশ্য খুব বেশী নয়। আট থেকে পনেরো মাত্র। অষ্টমী থেকে পূর্ণিমা যেমন। কিন্তু যারা এটা পরিচালনা করছে, তাদের বয়স ঢের বেশী। ষোলো থেকে ছত্রিশ বলা চলে। তার থেকেও কেউ-কেউ বেশী হয়তো। মাঠে এসে দেখা গেলো—প্রতিযোগীদের চাইতে পরিচালিকাদের সংখ্যাই বেশী। দর্শকদের সংখ্যা আবার তার চাইতেও। অবশ্য মহিলা দর্শকও এসেছেন কিছু-কিছু। এই ছোট্ট শহরে যে কতো লোক বাস করে এই মাঠে বসেই তার একটা আন্দাজ করা যায়। অন্তত পুরুষগুলোর তো বটেই!

খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। বাচ্চা-মেয়েদের সূচ-সুতো দৌড়, চোখ বেঁধে দৌড়, অংক কষা দৌড় ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এবার আরম্ভ হবে অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মেয়েদের। ব্যালান্স দৌড়!

চারদিকে লোকারণ্য। তিন-চার সারি লোকের পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম—টুটুল সংগে নেই! সে আবার গেলো কোথায়? এইতো। কাছেই দাঁড়িয়েছিলো হাত ধরে! জোর করে কোল থেকে নেমে পড়েছিলো একটু আগে। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো নাকি? না পাড়ার বাচ্চাদের দলে মিশে—

কি রকম, কা'কে খুঁজছেন?

তাকিয়ে দেখি—পাড়ার গণেশ মুখুজ্যে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বানপ্রস্থে যাবার বয়স। এই প্রথম দেখলাম খেলার মাঠে!

বললাম, টুটুলকে খুঁজছি। কাছেই দাঁড়িয়েছিলো, হঠাৎ—

তাহলে কাছাকাছিই কোথাও আছে, ব্যস্ত হবেন না! আসুন, এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে—

আমি কিন্তু বেশ দেখতে পেলাম না। এক—টুটুলের জন্তে ভাবনা, তার উপর যা ভীড়ের বহর! মুখুজ্যে মশাই তো পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করেছেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তাঁরই পিছনে। খাটো চুল, গোলগাল মাথাটুকুর পেছনটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না!

একবার জোর হাততালি পড়লো। শুনতে পেলাম। তারপরেই একটা বাচ্চা ছেলের কান্না! কে কাঁদছে—টুটুলের গলা না?

ভীড় ঠেলে কাছে যেতে হলো। যা ভেবেছি! পড়ে গিয়ে থুঁতনিতে চোট লেগেছে! ঠোঁটের খানিকটাও কেটে গেছে বোধ হয়। রক্ত ঝরছে!

কিন্তু এর চেয়েও বেশী অবাক হতে হলো—

টুটুলকে দেখে নয়, টুটুলকে যে কোলে তুলে নিয়ে বসলো—তাকে দেখেই! সেই শাদা শাড়ী—লাল পাড়! হালকা চকোলেট রঙের—

যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তাই হলাম। ভীড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জনও সুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে আবার আদিখ্যেতা দেখানো হচ্ছে—

বাবাঃ, মেয়ে নয় তো—দস্যি। উনি আবার এসেছেন ভলান্টিয়ারী করতে। হতো যদি আমার ছেলে, তাহলে এতক্ষণ—

আর একজনের মন্তব্য: আহা, মেয়েটিরই বা কী দোষ। যে ভীড়, অতটুকু বাচ্চা ছেলেকে ছেড়েই বা দেওয়া কেন? লাইন টপকে মাঠের মধ্যে চলে গিয়েছিলো বোধ হয়—

মাথার মধ্যে জ্বলে উঠলো! তাই বলে অতটুকু ছেলের দাঁত মুখ সব ভেঙে দিতে হবে?

টুটুলের কান্না প্রায় থেমে এসেছিলো। কাছে গিয়ে একখানা হাত চেপে ধরলাম ছেলেটার—

ওকে বললাম, থাক আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। দুধের বাচ্চার দাঁত-মুখ ভেঙে দেবার সময় যার খেয়াল থাকে না, তার আবার এতো কেন?

আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে শাদা শাড়ীটার অনেকখানিই লাল হয়ে উঠেছিলো। সেই রক্তাক্ত শাড়ীর মতোই আরক্ত হয়ে উঠলো ওর মুখখানি।

ভীড়ের মধ্যে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মন্তব্যগুলোর দিকে এতক্ষণ সে ভ্রূক্ষেপই করে নি। কিন্তু আমার কথাগুলো কানে যেতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো বিনতি। সেই মাঠের মধ্যেই টুটুলকে দাঁড় করিয়ে রেখে সেখান থেকে চলে যাবার জন্তে পা বাড়ালো। আর একবার ফিরেও তাকালো না পিছনের দিকে!

ওদিকে তখন বিশ্রামের সময়। টিফিন চলছে।

টুটুলকে নিয়ে মাঠের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি, পিছন থেকে ছুটে এলো দু'টি মেয়ে। স্বেচ্ছাসেবিকা। কাঁধের একদিকে সেই সবুজ রঙের বিজ্ঞাপন। একজনের হাতে আয়োডিনের শিশি। আর একজনের তুলো আর ব্যাণ্ডেজ।

একজন বললো, ক্যাম্প থেকে আসছি, বিনুদি পাঠিয়ে দিলেন।

একবার মনে করলাম, ওদের সাহায্য নেবো না। তারপর আবার টুটুলের ঠোঁটের দিকে তাকালাম। মত বদলাতে হলো। আয়োডিন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল ওরাই। হাতগুলি নেহাৎ অপটু নয় দেখলাম।

ফার্ষ্ট-এইড ট্রেনিং নেওয়া আছে বিনুদির। আমরা তার কাছ থেকেই শিখে নিয়েছি।—জিজ্ঞাসিত হয়ে জানালো ওরা।

ভীড়ের মধ্যে ফিরে এলাম। টুটুলকে বললাম, খুব হয়েছে, চল এবার ফিরে যাই।

টুটুল রাজী হলো না—এখনো যে অনেক খেলা বাকী—! ঐ দেখো না, আবার বাজনা বাজছে!

সমিতিরই বাজনা, ব্যাণ্ডপার্টি। একটা ড্রাম, ছটো সাইড ড্রাম, আর ছ'-একটা আনুষঙ্গিক। একজোড়া বিগলও আছে। বাজাতে বাজাতে মেয়ে ক'টা মাঠের চার পাশ দিয়ে ঘুরে গেলো।

ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে দিলো তাহলে?

চমকে উঠলাম—সেই গণেশ মুখুজ্যে! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরিয়ে দেবেন না কেন?

আত্মসংবরণের ভাণ করলো মুখুজ্যে—এমনিতেই বললাম আর কি! যে ভাবে কোলে নিয়ে বসেছিলো, ভাবলাম বুঝি—

কী ভাবলেন?

বললাম তো, কিছুই না।—সত্যি সত্যিই এবার বাক-সংবরণ করলো মুখুজ্যে।

কিন্তু বাক্-সংবরণ করলেও দৃষ্টি-সংবরণ করতে পারলো না। অর্থপূর্ণ চোখ ছুটির দিকে তাকালেই সে চৌর্যবৃত্তি ধরা যায়।

মুখুজ্যে মশাইয়ের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালাম। টুটুলকে নিয়েই।

কী মশাই, মেয়েটি কি আপনার চেনা?

এখানেও সেই প্রশ্নের ধাক্কা।

প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকালাম। শুধু সেই একখানি মুখই নয়, আশে-পাশে আরো অনেকগুলি—উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে দেখছে!

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনাদের জানতে না চাওয়াই ভালো।

ও—তাই নাকি!

নেহাৎই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর একজন টিপ্পনী ছুঁড়লো।

তৃতীয় মন্তব্যটি কানে আসবার আগেই আবার স্থান পরিবর্তন করলাম।

আবার বাঁশি বেজে উঠলো। বিশ্রাম সমাপ্ত। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভের সংকেত-ধ্বনি।

কে যেন একগোছা ফুল ছড়িয়ে দিলো মাঠের মধ্যে। ছাউনীর ভেতর থেকে আবার ছড়িয়ে পড়লো মেয়েরা। সারা মাঠ।

আবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই শাদা শাড়ী, লাল পাড়। সেই হালকা চকোলেট রঙের ব্লাউস। কাঁধের উপরে ঝুলে পড়া এক জোড়া আধ-ভাঙা বিনুনী।

টুটুলকে শুধালাম, ঐ মেয়েটিই তো তোকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো, না রে? ঐ যে লাল পাড় শাদা শাড়ী—এই দিকেই

যা—ও আবার 'মেয়েটি' হতে যাবে কেন? টুটুল আমার ভুল সংশোধন করে দিলো—ও তো আমাদের বিনু দিদিমণি।

বিনু দিদিমণি!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ও আবার তোদের দিদিমণি হলো কবে থেকে?

কেন, সবাই-ই তো ওকে দিদিমণি বলে ডাকে!

সবাই দিদিমণি বলে ডাকে বলে কি তুইও তাই বলেই ডাকবি?

কী বলে ডাকবো তবে?

সে-কথা ওকেই জিজ্ঞেস করিস।

আপাততঃ এ প্রসংগ চাপা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ঠোঁটে কি খুব লেগেছে?

টুটুল উত্তর দিলো, না তো!

তবে কাঁদছিলি যে?

সলজ্জ হাসি হাসলো টুটুল। বললো, একটুখানি লেগেছিলো মোটে। দিদিমণি তো শুধু ঠেলে দিয়েছিলো, ফেলে দিয়েছিলো ঐ পিছনের লোকগুলোই! বিনুদি তখন ছুটে এসে—

আবার ওকে বিভুদি বলছিস !—এবার একটু তিরস্কারই জানাতে হলো টুটুলকে।

টুটুল আবার শুধালো, কী বলে ডাকবো তবে ?

বলা বাহুল্য, এবারও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না।

উত্তর হয়তো একটা দিতে পারতাম। কিন্তু সে উত্তর আমার মনঃপুত নয়। টুটুলেরও হতো না।

সম্পর্কটা অবশ্য পাড়াতুতো। এক পাড়ারও ঠিক নয়। এক শহরের। তাও খুব বেশী দিন থেকে না। ওরা হচ্ছে নোয়াখালি জেলার। আমরা রাজশাহীর। দেশ-বিভাগের পর বাস্তুত্যাগের বন্যায় ভাসতে ভাসতে এসে এই শহরের চড়ায় আটকে গিয়েছি আমরা। ওরাও তাই। ওরা মানে—ও, ওর মা, ওর একটি ছোটো বোন। বিনতির বোন মিনতি।

আমার পরিচয় অবশ্য অন্যরকম।

টুটুল আর টুটুলের মাকে নিয়েই একদিন পাড়ি জমিয়েছিলাম ভিটে-মাটি-দেশ ছেড়ে। নতুন করে আবার জোগাড়ও হলো ভিটের। কিন্তু টুটুলের মাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। আর একটি অচেনা অজানা দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়ে বসলো সে। টুটুল তখন একেবারেই বাচ্চা ছেলে। সবে মাটিতে পা দিতে শিখেছে।

নতুন বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে বললেন, ছেলের মা আর বাবা—দুই-ই হওয়া যায় না একসংগে। অতএব, ওর জন্যে আর একটি মা নিয়ে আসুন।

প্রথমে রাজী হতে চাইনি। টুটুলকে কোলে নিয়েই ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম টুটুলের মাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুস্কিল বাধলো ঐ টুটুলকে নিয়েই। ও মা চায়। রাত-দিন কাঁদতে লাগল মা মা করে।

সুতরাং দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর প্রস্তাবে রাজী হলাম। বাধ্য হয়েই।

বন্ধুরা সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। এই শহরেই একটি যোগ্য পাত্রী আছে। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। লেখাপড়াও জানে ভালোই। কেবল বয়েসটা একটু বেশী, এই যা। তা আমার মতো দ্বিতীয় পক্ষের ঘরে—মানাবে ভালোই।

একদিন কনেও দেখে এলাম। বন্ধুরা মিথ্যে বলেননি। বিনতির পরনে সেদিন অবশ্য শাদা শাড়ী ছিলো না। তার পাড়টিও ছিলো না লাল রঙের। গায়েও ছিলো হয়তো অন্য কোনো রঙেরই ব্লাউস একটা। কিন্তু সেই সাজেও ওকে মানিয়েছিলো বেশ। আজও সে কথা মনে আছে।

বিনতির মা অনেক করে বলেছিলেন। হাতে ধরতে বাকী রেখেছিলেন কেবল। গরীব বিধবা মানুষ। মেয়ে দুটিকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে আছেন। এখন আমি যদি দয়া করে বড়ো মেয়েটিকে—

দয়া করতে অবশ্য আমারও আপত্তি ছিলো না। থাকবার কারণও ছিলো না বিশেষ কিছু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপত্তি এসে গেলো। একেবারে অনতিক্রম্য আপত্তি। সেই বড়ো মেয়েটির তরফ থেকেই।

বিনতিই বেঁকে দাঁড়ালো শেষটায়। বললে, দোজবরে ছেলেকে তবু বিয়ে করা যায়। কিন্তু ছেলের বাবাকে—কিছুতেই নয়।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ক'নের জিদের জন্যই সে যাত্রা হার স্বীকার করতে হলো বরকে। বরের বন্ধুদেরকেও।

সেই বিনতি।

বন্ধুরাও অবশ্য রেগে গিয়েছিলেন। ওর চেয়েও নাকি অনেক ভালো মেয়ে আছে। এই মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারবেন। সুতরাং ভয়টা কিসের ?

ভয় অবশ্য আমারও ছিলো না। তবু বিয়ে আর করতে চাইনি। কী দরকার অযথা ঝঞ্ঝাট করে ? এ ক'বছর যদি ছেলেকে মানুষ করতে পারি, আরো ক'বছরও পারবো। মানুষ হয়ে উঠতে টুটুলের আর ক'বছরই বা।

সেই থেকে বিনতিদের সংগে আমার পরিচয়। তবে বিনতির নিজের সংগে ঐ পর্যন্তই। ওর ছোটো বোন মিনতির সংগেই যা দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বেশ চঞ্চলা, তরলা মেয়েটি, দেখা হলেই বিভূতিদা' বলে ডাকে। কুশল জিজ্ঞাসা করে। আমাকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় পাল্টা প্রশ্ন। ওর মার খবর জিজ্ঞাসা করি। ওর দিদির খবরও। দিদির খবরটা বরং একটু বেশী করেই শোনায় ও। হয়তো ইচ্ছে করেই। দুষ্টু মেয়ে।

মিনতি ডাকে বিভূতিদা' বলে। সুতরাং সম্পর্কটা সেই পাড়াতুতোই। অত্যন্ত শিথিল।

না, এই পাগলা ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আবার কখন সরে পড়েছে। আগের বার তো শুধু ঠোঁট আর থুঁতনির উপর দিয়েই গেছে। এবার যদি আবার—

কা'কে খুঁজছেন বিভূতিদা' ?

হাসির ঝলকে চমকে উঠলাম। মিনতি। বললাম, টুটুলকে খুঁজছি। এই তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ। হঠাৎ পালিয়ে গেছে—

টুটুলকে যে এইমাত্র দেখে এলাম,—দিদির কাছেই রয়েছে। ক্যাম্পে বসে গল্প হচ্ছে। আপনি জানেন না ?

কী করে জানবো বলো ? আমাকে তো আর জানিয়ে যায়নি কেউ ?

হাসির ঢেউয়ে চলকে উঠলো মিনতি—চলুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি—

কিন্তু ক্যাম্পের কাছাকাছি এসেই ছুটে পালিয়ে গেলো মিনতি। ওকে দেখতে পেলে ওর দিদি নাকি ভারী বকবে। দুষ্টু মেয়েটি।

টুটুলের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। প্রথম ডাকে কোনো সাড়া এলো না। দ্বিতীয় ডাকে উত্তর পেলাম—এই যে, আমি এখানে—আইসক্রীম খাচ্ছি।

আইসক্রীম খাচ্ছি ! অতটুকু ছেলের এই অবাধ্যতার জন্য রাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠলো। আমার কাছ থেকে পালিয়ে আসা হয়েছে এই ছাই-ভস্ম খেতে। মজাটা দেখাচ্ছি দাঁড়াও—

এই টুটুল, পাজী ছেলে কোথাকার—শীগ্‌গির বেরিয়ে আয় বলছি। তা না হলে—

তা না হলে কী করবেন, মারবেন নাকি ?

থমকে দাঁড়ালাম। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিনতি নিজে।

তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে টুটুল—সেই অবাধ্য ছেলেটা! পরম নিশ্চিন্তে আইসক্রীম গিলছে। বিনতির আর এক হাতে একটি কাগজের ঠোঙা। খুব সম্ভব মিষ্টি-খাবারে ভর্তি।

প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্যই। হঠাৎ উত্তাপ ফিরে এলো গলায়—

মেরে-ধরে খোঁড়া করে দিয়ে আবার আদর দেখানো হচ্ছে। নিজের ছেলে হলে কেউ পারতো ও রকম করতে? পরের ছেলে তাই। কথায় বলে মার চেয়ে মাসীর দরদ, তাকেই বলে—

তাকে যে কী বলে সে কথা অবশ্য উচ্চারণ করিনি। করবার দরকারও ছিলো না আর। ঐটুকু আঘাতেই ও আহত হলো প্রচুর। আহত না হলে তখুনি ঠেলে সরিয়ে দিতো না টুটুলকে। শুধু সরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত নয়, হন-হন করে তক্ষুণি চলে যাওয়া হলো সেখান থেকে! এমন কি টুটুলের মুখের খাবারটাও নিয়ে গেলো রাগ করে—ঠোঙাশুদ্ধই।

মনে মনে একটু অনুশোচনাও হলো। কথাটা অমন কড়া করে না বললেও চলতো।

আর একদিনের অপমানের প্রতিশোধ আজ যে এই ভাবে নিতে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি আমি।

ছেলেটাও তেমনি। আবার সেই বায়নাক্কা। খেলা শেষ হয়ে গেলে নিজেই ওকে নিয়ে গেলাম একটা খাবারের দোকানে। কিন্তু—দোকানের খাবার খাবো না। কোথাকার খাবার খাবে তাহলে? মাসীমার দেওয়া আইসক্রীম আর রসগোল্লা খাবো। শোনো কথা ছেলের! আর বিনতিরই বা কি আক্কেল—দিদিমণি থেকে একেবারে মাসীমা তাই বলে?

জিজ্ঞাসা করলাম, মাসীমা আবার কে রে?

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো টুটুল। তার পর বললো, একথাও তুমি জানো না, বাবা? দিদিমণি যে বললেন—আমি তোর মাসীমা হই?

কথাটা সত্যিই আমি জানতাম না। জানা আমার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না হয়তো। স্বয়ং দেবতারাই নাকি যা জানতে পারেন না, আমি জানতে যাবো কোন্ সাহসে?

তবু কথাটা শুনতে ভালো লাগলো। দিদিমণি থেকে মাসীমা! এবার মাসীমা থেকে যদি—কিন্তু সে কি সত্যিই সম্ভব?

সম্ভাবনার কথাটা অবশ্য মনে মনেই কল্পনা করলাম। একবার নয়, অনেক বার!

ছেলেটাকে নিয়ে খুব খানিকটা ঘুরলাম। বললাম, চল আরো একটু বেড়িয়ে আসি—যাবি?

টুটুল তো বেড়ানোর নামে পাগল। সত্যি যাবে বেড়াতে? তাহলে নদীর ওপারে চলো। ব্রীজের উপর দিয়ে পার হবো। আমি কিন্তু হেঁটে হেঁটেই ব্রীজ পার হবো বলে রাখছি। ভারী মজা লাগে আমার ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটতে—

দুষ্টু ছেলেটি কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই সব ভুলে গেলো। কিন্তু আমি ভুলতে পারলাম না। বিনতিকে অমন কড়া করে বলা সত্যিই উচিত হয়নি আমার। ও হয়তো মনে মনে ভাবছে, লোকটা সত্যিই কী অসভ্য! উপকারীর উপকারটুকুও স্বীকার করতে জানে না।

ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেলো। ফিরেই দেখি—অবাক কাণ্ড! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে একটি মেয়ে। উজ্জ্বল হাসি—নিশ্চয়ই সেই দুষ্টু মেয়েটি!

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মিনতি যে, ব্যাপার কী? এই রাত্রে?

আমি ব্যাপারের কী জানি। দিদিকেই সব জিজ্ঞেস করুন না।

দিদি আবার কোথায়?

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে মিনতি জানালো, বাড়ীর ভিতরে। অনেকক্ষণ থেকে আমরা বসে রয়েছি! যান—

গেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি, বিনতিই দাঁড়িয়ে আছে। হাতে সেই কাগজের ঠোঙাটি। তবে আরো একটু পুষ্ট হয়েছে সেটি। পরনে এখনো সেই শাদা শাড়ীই। লাল পাড়। গায়েও সেই—

টুটুল সংগে সংগেই ছুট দিয়েছিলো। নতমুখী হয়ে টুটুলকে কোলে তুলে নিলো সে। তারপর বললো, শেষ পর্যন্ত তোর জন্যেই আমাকে হার স্বীকার করতে হলো দুষ্টু ছেলে।

দুষ্টু ছেলেটির মতোই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো টুটুল। হয়তো সমর্থন-সূচক হাসিই।

বিনতিকেও হাসতে হলো। ওর শাড়ীতে এখনো সেই লাল রঙের ছোপ। টুটুলেরই কেটে যাওয়া ঠোঁটের রক্ত। শুধু সেই শাদা শাড়ীতেই নয়, ওর সারা মুখে-চোখেও যেন ছড়িয়ে পড়েছে সেই রক্ত-রঙীন ছাপ। লাল লাল।

আর, সে ছাপ শুধু লজ্জা বা পরাজয়েরই নয়। দাবীরও।

নির্ব্বেদ

প্রতিমা দাশগুপ্ত

বৃদ্ধ কোষাধ্যক্ষ পুন্নক বর্দ্ধণের শুষ্ক ওষ্ঠাধর গভীর আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠলো। কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

মা, আমার সারা জীবনের সঞ্চয়—আমার পৃথিবীর, আমার সর্ব্বহারা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রথম তুই—আর দ্বিতীয়—নিজের দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করলেন তিনি। স্বল্পালোক-বিচ্ছুরিত ভূগর্ভ প্রোথিত প্রকোষ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে এলো তাঁর সে হাত। সে হস্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ান্ধকার কক্ষের আকণ্ঠপূর্ণ রত্নরাজি, মণি-মাণিক্যের রাশি—কাঞ্চন-বাট বক্র বিদ্যুতের উজ্জ্বলতা নিজেদের দেহে ধারণ করে তীব্র হেসে উঠলো। পুন্নক বর্দ্ধণের কম্পিত কণ্ঠস্বরে মধ্য রজনীর নিস্তব্ধতা শতধা হোয়ে খণ্ডিত হোলো সে অপরিসর কক্ষটির চতুর্দ্দিকে। বনান্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা অস্ত গেল—মণিকুট্টিমের ভূমিস্থিত ঘৃতপ্রদীপ অবসানের ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত হোয়ে উঠলো।

বজ্রাহত বনস্পতির মতো আজ আমি নিরুপায়—নির্জ্জিত। সারা জীবনের উদ্যমময় এই সঞ্চয় ঐশ্বর্য্যকে আজ চোখের সম্মুখে কতকগুলি আতসীখণ্ডের মতো প্রতীয়মান হোচ্ছে—কঠিন হস্তে পুন্নক বর্দ্ধণ মাণিক্যের স্তূপ হোতে একটি চন্দ্রোপল মণি তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলেন ভূমির উপর—সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, পিতৃহৃদয়ের স্নেহ-অরণ্যের মধ্যে উৎপাত কণ্টকতরুর মতো অভিশপ্ত প্রতীয়মান হোচ্ছে আজ আমার কাছে এ সম্পদরাশির আবর্জ্জনা, যদি দু হাতে এগুলিকে পিষ্ট করে তোর বহির্ম্মুখী মনকে গৃহে বদ্ধ করে রাখতে পারতাম তা হোলে এই মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হোমঅগ্নির ভস্মের মতো দূরে ফেলে দিতাম পঞ্জরছেদিত আমার সারা জীবনের এই সঞ্চয়স্তূপ। আর প্রয়োজন নেই আমার এই বিদীর্ণ কঙ্কালের শ্বেত অস্থিরাশির শুভ্রতার মতো এই ধনরত্নের রাশি। যদি ইচ্ছা হয় তুই গ্রহণ কর এ ধন-সম্পদ—আমার অবশিষ্ট জীবনের ঐহিক সুখ-সম্পদ কুশ-অগ্রের মতো এই মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলাম আমি—শুধু তুই গৃহে থাক। দীর্ণ অনুনয়ে পুন্নক বর্দ্ধণের কণ্ঠস্বর কম্পিততর হোলো—অস্বচ্ছ চোখের আবিলতার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালিত হোলো কক্ষের চতুর্দ্দিকে। দুই হস্তে সজোরে নিজের চক্ষু দলিত করলেন তিনি। এতক্ষণ কোন শুভ্রতাকে পিতৃহৃদয়ের দৈন্য জ্ঞাপন করছিলেন তিনি? তাঁর ক্ষীণ দৃষ্টি আর একবার প্রদক্ষিণ করে এলো নিঃসঙ্গ কক্ষের প্রতিটি কোণ। কক্ষের অনুন্নত চারটি প্রাচীর বিদ্রূপভরা চাহনি নিয়ে কঠিন হাসি হেসে উঠলো।

বিম্বিসার তাঁর রাজত্বকালে তাঁর আবাল্য সহচর ও সুহৃদ পুন্নক বর্দ্ধণকে নিয়োজিত করেছিলেন কোষাধ্যক্ষের পদে। একান্তে তাঁকে আহ্বান করে বলেছিলেন—পুন্নক, কোষাধ্যক্ষের পদে তোমাকে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যটা নিতান্তই গৌণ—নিরত তোমার সাহচর্য্য লাভটাই যে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তা বুঝতে আশা করি তোমার ক্লেশ হয়নি। তারপর মৃদু হেসে বলেছিলেন, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্বের তথ্য আমার অমাত্যবর্গেরা প্রায় সকলেই অবগত আছেন, তাই রাজসভার ষড়চক্র ও তাঁদের রোষবহ্নি থেকে তোমাকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখাটাও আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে পুন্নক বর্দ্ধণের কণ্ঠ সেদিন রুদ্ধ হোয়ে গিয়েছিল। সজল আঁখিপল্লবের সিক্ত ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হোয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের আনন্দ।

কৈশোর-অতিক্রান্ত সদ্যযৌবনে উপনীত পুন্নক বর্দ্ধণের তখন অতি দুরবস্থা। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় এতদিন পিতৃব্যগৃহেই প্রতিপালিত হোয়ে আসছিলেন তিনি। পিতৃব্য তাঁর পিতৃকল্পই ছিলেন। এখনও প্রায়ই তাঁর ছবিটি স্মরণপথে ভেসে আসে। ঐ বৃহৎ মানুষটির বৃহৎ দেহপ্রাচীরের অন্তরালে ভাগ্যহত বালকটির জন্য করুণা আর স্নেহরাশি হিমালয়-শিখর হোতে নেমে আসা শত-সহস্র গঙ্গোত্রী স্রোতধারার মতো ব্যাপ্ত হোয়েছিল। ভাগ্যহত ভিন্ন তখন আর কি ছিলেন পুন্নক বর্দ্ধণ? অতি সাধারণ একজন গ্রামিক ছিলেন তাঁর পিতা। নিজের অবস্থায় অতি পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট এমন মানুষ সচরাচর চোখে পড়তো না। কোন উচ্চ অভিলাষ ছিলো না তাঁর জীবনে। মাথার উপর বংশপত্রে আচ্ছাদিত একখানি পর্ণকুটির, এক স্থালী শ্যামাক ধানের অন্ন আর কিঞ্চিৎ মুদ্গ-সূপ ছাড়া আর কোন কামনা ছিলো না তাঁর। নিজস্ব ক্ষুদ্র পৃথিবীর গণ্ডির ভিতর নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও তাঁর স্বচ্ছন্দ জীবনগতির বাধা বলে মনে হোতো মাঝে মাঝে। আহার ও নিদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট সময় মুদ্রিত নয়নে মলিন শয্যার উপরে অর্দ্ধশায়িত কিম্বা গৃহসংলগ্ন চত্বালের উপর উপবেশন করে ভাবলেশহীন দুই চোখের দৃষ্টি সুদূরে প্রেরণ করে কোন পরমার্থচিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন, বালক পুন্নকের কাছে তখন তা অপার রহস্যের মতোই মনে হোতো!

সে নৈঃশব্দ ভাষাহীন দৃষ্টির দুর্ভেদ্য পরিখায় পিতাপুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হোয়ে উঠেছিল তার বাধা ঠেলে বালক পুন্নক কোন দিন এক পদও অগ্রসর হোতে পারেনি পিতার সান্নিধ্যে। তাঁর জননীও কোনদিন পারেননি তাঁর এই নির্লিপ্ততা দূরীভূত করতে। বৃদ্ধ বয়সেও মায়ের শীর্ণ করুণ মুখচ্ছবি ভাসমান হোয়ে ওঠে অন্তরের মধ্যে। দারিদ্র্যদুঃখক্লিষ্টা তাঁর জননী—জীবধাত্রী ধরণীর মতো—মাতৃধৈর্য্যের মতোই মৌন ছিলো তাঁর অন্তরের শত-সহস্র ব্যর্থতার অনুযোগ। এখনও মনে আছে, জীর্ণ পেটিকা খুলে মা বের করে দিয়েছিলেন তাঁর অবশিষ্ট আভরণ যুগ্ম কেয়ূর গ্রামের বৃদ্ধ কৃষাণের হাতে। কৃষাণের রুক্ষ-কর্কশ হাতের মধ্যে—বালক পুন্নকের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ-সর্পের মতোই ঝলসিত হোয়ে উঠেছিল জননীর সেই লঘু স্বর্ণ-আভরণ। তারই বিক্রয়লব্ধ কার্ষাপণে পুন্নক প্রবেশ করতে সক্ষম হোয়েছিলেন তাঁর বিদ্যা লাভের প্রথম আরোহণীতে। তারই কিছুকাল পরে গভীর এক মেঘ সংঘর্ষণের নিশা অন্তে পিতৃহীন হোলেন পুন্নক—এক পক্ষও অতীত হোলোনা জননীও তাঁর অনুগামিনী হোলেন।

অসহায় পুন্নকের চোখের সম্মুখে নির্দ্দয় পৃথিবী তার তরঙ্গায়িত বারিধিরাশি নিয়ে মুখ ব্যাদান করে এগিয়ে এলো। নিজস্ব বলতে রইলো আবাসগৃহের কয়েকটি স্থূণা ও মাথার উপর একখানি পর্ণ-আচ্ছাদন। সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তটিতে তাঁর সম্মুখে দেবতার রূপ ধরে দেখা দিলেন পিতৃব্য পদ্মোদ্ভব। জননীর কাছে পিতৃব্যের নাম শুনেছিলেন পুন্নক কিন্তু পিতামাতা বর্ত্তমানে কোনদিন তাঁর সাক্ষাৎ সৌভাগ্য লাভ হয়নি পুন্নকের। সে দিন তাঁর পতনোন্মুখ গৃহে দিব্যকান্তি
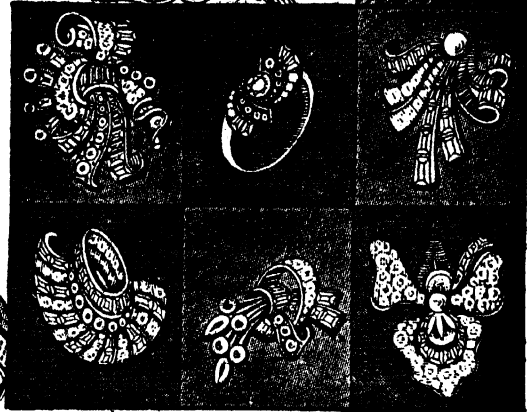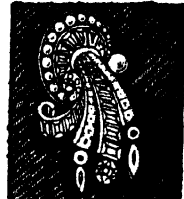
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি. ১৬৭ সি/১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

পিতৃব্য পদ্মোদ্ভব নিজের পরিচয় দিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র অন্তর্নিহিত অশ্রুসাগর উচ্ছল হোয়ে উঠেছিল পুন্নকের। এক রকম ক্রোড়ে করেই পদ্মোদ্ভব নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে নিজ গৃহে। নিরুৎসুক পিতার স্নেহের অভাব পূর্ণ করলেন পিতৃকল্প পিতৃব্য। বর্দ্ধিত হোতে লাগলেন পুন্নক তাঁর গৃহে। বিম্বিসারের পিতার অন্যতম প্রধান অমাত্য ছিলেন পদ্মোদ্ভব, তাই তাঁর গৃহে আর যাই থাক, স্বচ্ছলতার অভাব ছিলো না। পুন্নক বর্দ্ধণের সুশিক্ষার সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থাই করে দিলেন তিনি। একমাত্র তাঁরই সহায়তায় পুন্নক উন্নীত হোতে পেরেছিলেন শ্রেষ্ঠতম বিত্তালয়ে ও রাজপুত্র বিম্বিসারের সতীর্থ জনিত সৌভাগ্য লাভে। আশু মহাসঙ্কট হোতে পরিত্রাণ পেলেন পুন্নক কিন্তু দুর্ভাগ্য—তাঁর পিতৃব্যপত্নীর প্রসন্নতা লাভ করতে সক্ষম হোলেন না কোন দিন। তাঁর হৃদয়ে স্নেহের ফুল ফোটাতে কোন দিন পারলেন না পুন্নক। উপরন্তু তাঁর মনের অন্তরালে পুন্নকের প্রতি যে তিক্ত বৃক্ষের মূল প্রতিদিন প্রসারিত হোচ্ছিল প্রায়শঃই সেটা সবলে উৎপাটন করে তার বিষতিক্ত রসে আপ্লুত করে দিতেন নিরপরাধ পুন্নককে।

এক পিতৃব্য ছাড়া তাঁর পুত্র-কন্যাদের কাছে এমন কি তাঁর গৃহ-পরিজনদের নিকটেও তিনি অবাঞ্ছিত অতিথির সমাদর লাভ করতেন। সকলের কাছেই সমভাবে অপরাধী ছিলেন তিনি। স্থালীর অন্ন পিতৃব্য-পত্নীর শ্লেষবাক্যে যতই গলদেশে কঠিন শিলার মতো প্রতীয়মান হোতো ততই তিনি অধিকতর আগ্রহে আকৃষ্ট হোতেন তাঁর অধ্যয়নে। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে আশাপূর্ণ চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিতেন কোন দিন যদি দৈব প্রসন্ন হন, কোন দিন যদি এ ক্লান্ত ধৈর্য্যের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। দৈব একদিন প্রসন্ন হোলেন, যখন তরুণ বিম্বিসার পিতার অকালমৃত্যুর পর রাজপট্টে আরূঢ় হোলেন। বিত্তালয়ের পাঠ সমাপ্ত হবার তাঁর আর প্রায় বর্ষকাল বাকি ছিল। কিন্তু কোন সাহসভয়ে প্রত্যাখ্যান করবেন, তখন তাঁর এই শুভাদৃষ্টকে? পিতৃব্য-পত্নীর মুখর গঞ্জনায় অন্নের গ্রাস তখন অশ্রুলবণাক্ত হোয়ে উঠেছে।

পুন্নক অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। পিতৃব্যের গৃহ চিরদিনের মতো ত্যাগ করে আসবার কালে পিতৃব্য-পত্নীর পাদমূলে প্রণাম করে বলেছিলেন, মা, তোমার তণ্ডুলের প্রতিটি কণা আমার প্রতিটি শোণিতবিন্দুর মধ্যে কৃতজ্ঞতার ঋণে জর্জরিত হোয়ে রইলো, যদি কোন দিন সময় আসে—তাঁর বাক্য সমাপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রত্যুত্তরে পিতৃব্যপত্নী তাঁর দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সে চাহনির স্মৃতি এই প্রবীণ বয়সেও মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো অন্তস্তল রুদ্ধ করে দাঁড়ায়। পিতৃব্যের কাছে বিদায় গ্রহণ কালে তিনি শুধু বলেছিলেন, কত ক্লেশ পেয়ে গেলে আমার গৃহে। কত আশা করে কত আগ্রহ ভরে তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম···পদ্ম হিম-বিন্দুটিকে যেমন সযত্নে নিজের পত্রের অভ্যন্তরে আবৃত করে রাখে তেমনই আমি চেয়েছিলাম সকলের নির্দ্দয় আঘাত থেকে রক্ষা করতে কিন্তু পারিনি। আমার প্রতি তুমি কোন অভিমান রেখো না পুন্নক! নতজানু হোয়ে পদ্মোদ্ভবের পদপ্রান্তে উপবেশন করেছিলেন পুন্নক—তাত! আপনার কৃপা ব্যতীত সে হতভাগ্য বালকের দগ্ধ ললাট নিরূপণ কোন উৎসন্ন মুখে পরিচালিত করতো তাকে সেদিন? বদ্ধ বাক্যে রুদ্ধ কণ্ঠ আর কোন ভাষা খুঁজে পায়নি। সে সুদীর্ঘ কাল হোতে আজ নিশীথের শেষ প্রহরটি পর্য্যন্ত রাজা বিম্বিসার প্রদত্ত সে সৌভাগ্যের গুরুভার প্রাণপণে বহন করে চলেছেন পুন্নক বর্দ্ধণ। রজনী প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রখর ভাস্করের ক্ষমাহীন দীপ্তি, কোন অজানিত কৃষ্ণ শৈল-গুহামুখের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর অবশিষ্ট জীবনের পথ নিয়ন্ত্রণ করবে পৃথিবী স্তব্ধ আসনে বসে নিশ্বাস সংবরণ করে তারই আশঙ্কায় প্রহর গণনা করছে। অস্তাচল-দ্বিবাস্পতি এখনও নিদ্রাগত—রাত্রির অবশিষ্ট যাম সে ক্লান্ত গণনার মধ্যযামে—সন্তর্পণে তক্র তার পত্রচ্ছেদের ফাঁকে ফাঁকে পাঠ করে নিল পুন্নক বর্দ্ধণের জীবনের আর কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

কোষাধ্যক্ষের পদে স্থিতিশীল হোয়ে বসবার বৎসর খানেক পরেই নানা স্থান হোতে পুন্নক বর্দ্ধণের বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। কত অনূঢ়া কুমারীর পিতা, আত্মীয়-পরিজন হতমনোরথ হোয়ে ফিরে যেতে লাগলো পুন্নক বর্দ্ধণের গৃহ হোতে, দিনের পর দিন কত ঘটক ব্রাহ্মণকে একবাক্যে ম্লান মুখে ফিরে যেতে হোলো, কত সুরূপা কন্যার চিত্রপট তাঁর গৃহে সঞ্চিত হোতে লাগলো, কেউই তারা পুন্নকের ঘুমন্ত যৌবননদীকে জাগ্রত করতে পারলো না। বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর বুকে পুন্নকের ধারণার অতীত বিস্ময়কর একটি ঘটনার অবতারণা হোলো তাঁর নিজের গৃহে। এক দ্বিপ্রহরে তাঁর গৃহদ্বারে একখানি পল্যাঙ্কিকা এসে থামলো। গবাক্ষপথে সেই দিকে দৃষ্টি চালিত করে বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হোয়ে গেলেন পুন্নক বর্দ্ধণ। চারজন দাসীর হস্তধৃত বস্ত্রাভ্যন্তরের নিম্নে দেখা যাচ্ছে কোন মহিলার পদপ্রান্তদেশ এবং সে গতিশীল পদযুগল তাঁর কক্ষ নির্দ্দেশ করেই অগ্রসর হোচ্ছে। মুহূর্ত্ত পর ভৃত্য সংবাদ বহন করে নিয়ে এলো একটি মহিলা তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

ব্যস্ত হোয়ে পুন্নক বর্দ্ধণ বললেন, তাঁকে শীঘ্র জ্ঞাপন কর—আমার গৃহে কোন পুরকামিনী বাস করেন না।

তাঁর কথা সমাপ্ত না হোতেই দর্শনপ্রার্থী মহিলাটি সশরীরে তাঁর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই বৎস! পুত্রের গৃহে মাতার দ্বার চিরদিন অবারিত। পুন্নকের বিস্ময়াহত চোখের সম্মুখে পিতৃব্যপত্নী তাঁর চিরদিনের কঠোর মুখকোষ উন্মুক্ত করে সস্নেহ দৃষ্টিসম্পাত করলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে শশব্যস্ত হোয়ে উঠলেন পুন্নক। নিজহাতে গৃহতলে বিছালেন তাঁর উপবেশনের আসন।

পিতৃব্যপত্নী বসলেন না—বললেন, চলে আসবার সময় তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে একদিন তোমার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করবে, আজ তো সে দুদিন এসেছে, তোমার বাক্য রক্ষা কর পুন্নক! অজানা আশঙ্কায় পুন্নকের ললাটদেশে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। এতদিন পর আবার নূতন কোন অভিযোগ বহন করে নিয়ে এলেন পিতৃব্যপত্নী? মৌন পুন্নককে লক্ষ্য করে পুনর্বার পিতৃব্যপত্নী বললেন, মাতা আজ যাচ্ঞা নিয়ে পুত্রের দ্বারস্থ, তাকে কি বিফল-মনোরথা হোয়ে ফিরে যেতে হবে?

এতক্ষণ পর পুন্নকের কণ্ঠে ভাষা এলো, মা, আমার দৈন্ত তোমার রাজৈশ্বর্য্যে উজাড় করে ঢেলে দিলেও সে কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও পরিশোধ হবে না। সে স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমার

শক্তির গণ্ডিতে আবদ্ধ এমন কোন আদেশ যদি আমার উপর থাকে, প্রাণ গেলে তা রক্ষা করবার চেষ্টা করবো।

পিতৃব্যপত্নীর দুই চোখে মুহূর্ত্তের জন্ত দামিনী ক্রীড়া করে গেল পুন্নকের কথা শুনে—কিন্তু শান্ত কণ্ঠে প্রকাশ করলেন তাঁর বক্তব্য। কোনরূপ আর্থিক সাহায্য লোভের বশবর্ত্তিনী হোয়ে তিনি আসেননি। তাঁর ধনী ভ্রাতার প্রথমা কন্যাটিকে পুন্নককে গ্রহণ করতে হবে এই তাঁর অনুরোধ। বহুক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে রইলেন পুন্নক। হৃদয়ের বেলাভূমিতে সফেন তরঙ্গরাশি বার বার উচ্ছলিত হোতে লাগলো। আবার স্ব-ইচ্ছায় সে উদ্বন্ধন দণ্ডে মস্তক রক্ষা করবেন! এত নির্ব্বোধ তিনি? পুনরপি পিতৃব্যপত্নী বললেন, তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোন হেতু নেই পুন্নক! চন্দ্রিকা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, সর্ব্বাংশেই তোমার উপযুক্তা হবে। যদি ইচ্ছা কর স্বচক্ষে একবার তাকে দেখে আসতে পারো। বংশানুচরিতে সৌন্দর্য্যে ও পিতৃবৈভবে কোন দিক দিয়েই সে তোমার চেয়ে লঘিষ্ঠা নয়। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে শেষের কথাগুলি তাঁর ঈষৎ বক্র হোয়ে উঠলো।

পুন্নকের অন্তস্তল কথা কয়ে উঠলো—এই তো তোমার সময় পুন্নক। তোমার মার্জ্জনার প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতার মধ্যে দর্শন করতে দাও পিতৃব্যপত্নীর লজ্জাহত অপরাধ-মলিন মুখচ্ছবি। অশান্ত হৃদয়াবেগ সংযত করে কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন তিনি। একটি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হোয়েছিল এই চিন্তায়। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে, স্মৃতির পটভূমিকায় ফুটে উঠেছিল বিগত দিনের কত আলেখ্য ছবি। পরান্নভোজী, পরাশ্রয়ী আখ্যা দিয়ে কত মুখর গঞ্জনায় জর্জরিত করেছেন তাকে পিতৃব্যপত্নী। আজ এই তো প্রকৃষ্ট সময়—তাঁর ক্ষমার উদারতার মধ্যে আজ পিতৃব্যপত্নী দর্শন করুন তাঁর নিজের হৃদয়ের দৈন্য। তারপর বিবাহিত জীবনের সুখ-শান্তি, সেটা অদৃষ্টের ব্যাপার—সে অদৃষ্ট-ক্রীড়ায় বিজয়ী বা পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা সমভাবে বর্ত্তমান। তার উপর নির্ভর করতেই হবে।

চন্দ্রিকা—পিতৃব্যপত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী তাঁর গৃহে এলো চন্দনচর্চিত ভালে আর রক্ত পট্টাম্বরে সজ্জিতা হোয়ে—সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দুর-বিন্দুর আলিম্পন ধারণ করে। কিন্তু পুন্নকের ললাটফলকে বিধাতা পুরুষের ভবিষ্যৎ লেখন বাল্যকালেই সমাপ্ত হোয়েছিল। দেহের অপরূপ বর্ণসুষমার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি চন্দ্রিকার অন্তস্তলে কোনদিন বিকশিত হোতে পারেনি। নীলোৎপলের মতো গাঢ় রঙ্গে আবৃত সে হৃদয় কোনদিন প্রণয়-রক্তরাগে রক্তিম হোয়ে উঠলো না। স্বামীর বাল্যের পরভৃত জীবন সে কোনদিন বিস্মৃত হোতে পারলো না। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল পুন্নক তার প্রসন্নতা লাভ করতে। কিন্তু ভুলতে পারেনি চন্দ্রিকা তার ঐশ্বর্য্যময় পিতৃগৃহ। পুন্নকের অবস্থাও তখন হীন ছিলো না। তিন বর্ষকাল অবধি কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করে নিজের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন তিনি। চন্দ্রিকার আগমনের প্রাক্‌কালে স্বোপার্জ্জিত অর্থের বহুলাংশ ব্যয় করে গৃহসজ্জায় আর পরিজনে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তাঁর নিজের আবাসগৃহ। চন্দ্রিকার স্বাচ্ছন্দ্যে ও বিলাসে কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে—পিতৃব্যপত্নীর মুখ পুনর্ব্বার যেন অবজ্ঞায় বক্র না হোয়ে ওঠে। পিচ্ছিল সরণির প্রথম সোপানে সেই সময়েই সর্ব্বপ্রথম পদক্ষেপ করলেন পুন্নক। বহু বর্ষ পূর্ব্বে পুন্নকের বিবাহ-রজনীর পূর্ব্ব সন্ধ্যায় আজকের মতো এমনিই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বিম্বিসারের কোষাগারে। প্রতিপদের চন্দ্রমা শীর্ণা হোতে শীর্ণতরা হোয়ে বিলুপ্তা হোলেন আকাশপ্রান্তে। পুন্নকের হস্ত-রক্ষিত স্তিমিত প্রদীপশিখা সঘন কম্পিত হোয়ে উঠলো। উত্তপ্ত দক্ষিণ হস্ত অর্দ্ধ পথে স্তব্ধ হোয়ে গেল। একি করতে যাচ্ছেন তিনি! কার উপরে ঢেলে দিতে যাচ্ছেন কৃতঘ্নতার হিংস্র হলাহল? পথ-প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে এনে যে তাকে উপবেশন করালো সৌভাগ্যের সিংহাসনে তাকেই আজ নিষ্ঠুর দংশনে ক্ষত করে দিতে উদ্যত হোয়েছেন?

পরমুহূর্ত্তে সে অন্তর স্তিমিত দুর্ব্বল বাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে গেল কোন কঠিন কৃষ্ণবর্ণ যুগল পরুষ হস্তের পীড়নে। মহার্ণব তার উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করে তার কত বৈভব সৈকত-পুলিনে—তাতে সে নিঃস্ব হয় না। আজ রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসন পাঠাতে হবে ভাবী পত্নীর পিতৃগৃহে—কোন প্রকারেই যেন তিনি তাঁদের চোখে হেয় প্রতীয়মান না হন। দ্বিতীয় বার তিনি চিন্তা করবার অবসর পেলেন না। লৌহ-ফলকের মতো কঠিন হোয়ে উঠলো তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি। সম্মুখের অলঙ্কারের স্তূপ হোতে উঠিয়ে নিয়ে এলেন বহুমূল্য একখানি রত্ন-ললাটিকা। তারপর হোতেই আরম্ভ হোলো পুন্নকের করুণ উত্‌ক্রমময়ী প্রয়াস। ধরিত্রী দোহন করে তার সম্পদরাশি চন্দ্রিকার পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দিতে চেয়েছিলেন পুন্নক কিন্তু সে সম্পদ মস্তকে ধারণ করবার মতো ভাগ্য চন্দ্রিকার হয়নি। ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান ছিলো সে। কারণে অকারণে সেই কথাটিই তার বিশেষ করে মনে পড়তো আর স্বামিগৃহের সঙ্গে পিতৃগৃহের তুলনা করে পুন্নকের প্রতি সারা অন্তর ভরে তার ধূমায়িত হোয়ে উঠতো বিদ্বেষ-বহ্নি। সমস্ত দেহমন দিয়ে পুন্নক অনুভব করতো সে বহ্নির তাপ আর অধিকতর আগ্রহে সচেষ্ট হোতো সে বহ্নি নির্ব্বাপিত করতে। এই রকমই ঘটে থাকে মানুষের জীবনে। নিজের বিবেককে যদি কোন রকমে একবার প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে দুর্ব্বল যুক্তির ভঙ্গুর প্রাচীরের অভ্যন্তরে, তার পরেই ছিন্ন হোয়ে যায় সঙ্কোচের প্রাথমিক আবরণ। প্রথম অপরাধ প্ররোচিত করে দ্বিতীয় অপরাধ প্রবর্ত্তনায়। প্রায়ই স্থানান্তরিত হোতে লাগলো নানাবিধ ভূষণ আভরণ বিম্বিসারের কোষাগার হোতে পুন্নকের গৃহে—কিন্তু বজ্রমণির মতোই সুকঠিন

হোয়ে রইল চন্দ্রিকার কণ্ঠ—সে কণ্ঠ কোনদিন গীতিময়ী হোয়ে উঠলো না। হতাশ হোয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অনুযোগ জানিয়েছিলেন পুন্নক—আমি তো বিবাহের পূর্ব্বে কিছু গোপন করিনি চন্দ্রিকা! আমার সম্বন্ধে পিতৃব্যপত্নীর কিছুই অজানা ছিলো না। বক্র হাস্যে উত্তর দিয়েছিল চন্দ্রিকা—সমস্ত জেনেও তাঁর গণনায় কিছু ভ্রম ছিলো। জন্মগত মর্য্যাদার কথাটা তিনি ধার্য্য করেন নি সে গণনার মধ্যে। আজ তোমার সমস্ত সর্ব্বস্ব দিয়েও পারবে না সে শূন্যতার স্থান পূর্ণ করতে। জ্যোতিরিঙ্গমের লঘু পক্ষ আকাশের চন্দ্রকে স্পর্শ করে আসবার ক্ষমতা ধারণ করে না।

মূক হোয়ে গিয়েছিল পুন্নকের সমস্ত অভিযোগ চন্দ্রিকার এই স্পর্দ্ধিত বাণীর সম্মুখে। এক বৎসরের মধ্যে পিতার লোকান্তর ঘটবার পর পিতৃগৃহে গিয়ে চন্দ্রিকা আর ফিরলো না স্বামিগৃহে। নিশাচরীর মতো সারাজীবন ধরে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলো পিতৃদত্ত অসীম সম্পদরাশির মধ্যে আর আভিজাত্যের সৌধ-চূড়ে।

যে জল-উদ্ভিদশূন্য বালুকা-প্রান্তর কখনও নিজ নেত্রে ধারণ করেনি সজল মেঘের ঘন কজ্জল আজ তার ওপর ছায়া পড়লো গভীর ইন্দ্রনীল শৈলমূলের। পাষাণ-বন্ধন টুটে আজ তার সমস্ত সঞ্চিত আবেগ চঞ্চলা নির্ঝরিণীর মতো বেরিয়ে এলো। শালবতী এলো তাঁর জীবনে। বারাঙ্গনাকে বন্দিনী করলেন নিজের অঙ্গনে। অভিভূত হোয়ে গেলেন পুন্নক বর্দ্ধণ তার স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয়ে। জীবনে এই প্রথম মনে হোলো মানুষের জীবনে সুখ জিনিষটা হোচ্ছে অতি সহজলভ্য—পুষ্পিত গাছের ওপর ফোটা সুগন্ধি ফুলের মতো। হাত বাড়ালেই যেমন তাকে ধরে আনা যায় মানুষও ইচ্ছা করলে সেই রকম সুখ ধরে আনতে পারে তার জীবনের মধ্যে। হোলোই বা সে বারাঙ্গনা? ওপরের দেহটার উপরেই সকলের দৃষ্টি কিন্তু সে স্থূল দেহ বিন্যাসের অন্তরালে সঞ্চিত রয়েছে যে তার অন্তর ভরা নন্দনবনের মধু, কে তার খোঁজ রাখে?

শালবতীর প্রথম আবির্ভাব হয় বিম্বিসারের তদানীন্তন রাজধানী রাজগৃহে। তারপর সমগ্র বৈশালী, কোশল, বিদিশা, মগধ জুড়ে মধুপ-গুঞ্জন-ধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। জীবনের এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার গৃহে প্রবেশ করে পুন্নকের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেল এক রাত্রির মধ্যে। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী শালবতীর সুমিষ্ট আদর আপ্যায়ন তার বহ্নিদহন-জর্জরিত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ সেচন করলো। এমন প্রীতিময়ী চোখের দৃষ্টি জীবনে কোন নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি পুন্নক! তাঁর সর্ব্বস্ব বিক্রীত হোয়ে গেল এক রাত্রির মধ্যে সে নারীটির কাছে। উন্মত্তের মতো ভালোবাসতে লাগলেন তাকে। কনক রজত, প্রবাল, মুক্তার অলঙ্কারের উপঢৌকনে আচ্ছন্ন করে দিতেন তাকে প্রায়ই। প্রলোভন বার বার তার শীর্ণ অস্থিময় হস্তে সঙ্কেত দিতে লাগলো নিত্য নূতন দুষ্কৃতির প্ররোচনায়।

পুন্নকের ভাগ্যের বঙ্কিম স্রোতগতি পরিবর্ত্তনে কোনদিন সক্ষম হয় নি। শালবতীও পারলো না সে গতির স্রোত বিপরীতগামী করতে। নিজের ললাটে করাঘাত করে মুখর গঞ্জনায় অভিভূত করে দিল পুন্নককে। সচমকে মূক বললেন সে কি? আমাদের উভয়ের এই পরম সৌভাগ্যকে বৃথা অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করছো কেন? উত্তরে শালবতী একটি তীক্ষ্ণ রুক্ষ হাসি হাসলো। পাষাণ-শৃঙ্খলে চিরদিনের মতো বন্দিনী করতে চাও আমাকে? এ কথা কি তোমার মনে কখনও উদয় হয়নি যে গর্ভিণী পণ্যাঙ্গনা অপরকে আকর্ষণ করতে কখনও সক্ষমা হয় না?

সজোরে দুই হস্তে কর্ণরন্ধ্রপথ রুদ্ধ করলেন পুন্নক। শালবতীর জীবনের এই রূঢ় সত্যের দিকটি থেকে এতদিন অন্ধ হোয়েছিলেন তিনি। আজ যেন তামসী অন্ধ যামিনী সহসা সহ্য করতে পারলো না রূঢ় মার্ত্তণ্ডের তীব্র আলোকচ্ছটা···। অব্যক্ত বেদনায় সর্ব্ব অন্তর মন মথিত হোয়ে গেল পুন্নক বর্দ্ধণের। নীড়ের বন্ধন, মাতৃত্বের আস্বাদ কোন প্রকারেই বিচলিত করতে পারলো না শালবতীকে। পুন্নকের গৃহের বন্ধনে আর কিছুতেই অবরুদ্ধা হোয়ে থাকতে চাইলো না সে। পুন্নকের বহু কাতর অনুনয়ের পর অন্তত গর্ভস্থ সন্তানটি তাঁর হাতে সমর্পণ করতে সম্মতা হোলো সে। মহাব্যোমের পারাবারে ভাসমান একটি পরমাণু বিনষ্ট হোতে রক্ষা পেলো সে কাতর প্রার্থনায়।

পুন্নক বর্দ্ধণের জীবনে আর একটি নতুন অধ্যায়ের পত্র উন্মোচন হোলো। তার শুষ্ক ক্ষেত্র ভূমির মতো রিক্ত জীবনে কুসুমের সৌন্দর্য্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হোলো একটি কন্যা। সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন পদক্ষেপে শালবতী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করলো। মুহূর্ত্তের জন্য ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করলো না পিছনের দিকে। অশ্রুসাগরের জোয়ার নেমে এলো পুন্নকের দুই চোখে কন্যাটির দিকে তাকিয়ে। সমস্যাও দেখা দিল অন্তর ভরে। তাঁর নারীহীন গৃহে কার যত্নে কন্যাটি বর্দ্ধিতা হবে? ভাগ্যহত মানুষের জীবনে যখন সৌভাগ্য চিরতরে তার দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক দিয়ে বিধাতার করুণা অন্য দ্বার উন্মোচিত করে। বিম্বিসারের করুণাময়ী মদ্র মহিষী বার্ত্তাবহ প্রেরণ করলেন পুন্নকের কাছে। ইচ্ছা করলে পুন্নক বর্দ্ধণ কন্যাটিকে রাখতে পারেন তাঁর অন্তঃপুরে। সেখানে কন্যাটি স্নেহে পালিতা হবে, তাঁর দাসীদের কাছে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হোয়ে মস্তক পেতে পুন্নক বর্দ্ধণ গ্রহণ করলেন সে আদেশ। বস্ত্রখণ্ডে আবৃত মৃদুস্পন্দিত উত্তপ্ত শিশুদেহটি বক্ষে ধরে ধাত্রী চলে গেল রাজ-অন্তঃপুরে। কর্ম্মব্যস্ত প্রহর অন্তে প্রত্যহ অপরাহ্ণে উন্মুখ হোয়ে দণ্ডায়মান থাকতেন অন্তঃপুরের লৌহদ্বারের বাইরে। ধাত্রীহস্তধৃত শিশুটিকে তুলে দিত পুন্নকের দুই সাগ্রহ বাহুর অভ্যন্তরে। পিতৃত্বের আস্বাদন তাঁর জীবনে আর একটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করলো। শুভ্র শেফালিকার মতো শিশুমুখখানির দিকে তাকিয়ে ভুলে যেতেন তিনি বিগত দিনের সমস্ত ব্যর্থতার ক্ষোভ। অর্দ্ধ দণ্ড পরে ধাত্রী এসে কন্যাটিকে আবার উঠিয়ে নিতো তাঁর ক্রোড় থেকে। অন্তঃপুরের বিশাল দ্বার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হোতো তাঁর তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে।

এর পর হোতে কিছুকাল পুন্নক বর্দ্ধণের জীবনেতিহাসের পত্র ধীরে ধীরে সাবলীল গতিতে উন্মোচিত হোতে লাগলো। অপরূপ দেহছন্দ আর পদ্মের মতো মুখশ্রী নিয়ে পৃথিবীগাত্রে জ্যোতির্লেখার মতো ফুটে উঠতে লাগলো শ্রীলা পুন্নক বর্দ্ধণের কন্যা।···বিম্বিসারের মদ্রদেশীয়া রাণীর স্নেহচ্ছায়ার অন্তরালে তরুণী শ্রীলা তখনও রাজ-অন্তঃপুরে নির্ভীক অন্তরে বসুন্ধরা

ভ্রমণ করে ফেরে। পিতার বক্ষ ভরে যায় কন্যার অপরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ একটা আশঙ্কা এক একবার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে যায়—। শালবতীর পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে শ্রীলার সর্ব্বদেহে।

—ধীপাল—বিম্বিসারের জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র একদিন এলো রাজ-অন্তঃপুরে বিম্বিসারের মহিষীদের সঙ্গে দেখা করতে।—অন্তঃপুরের স্ফটিক প্রাঙ্গণে জলযন্ত্রের উৎসধারা যেখানে কল্লোলিত হোয়ে উঠেছে সেখানে সে প্রথম দেখে শ্রীলাকে। অশোক-কুসুমের রক্তরাগে চিত্রিত পদতল উৎসধারার মধ্যে প্রসারিত করে, বেণীমুক্ত কেশজাল আলুলায়িত করে লীলাময়ী ভঙ্গীতে বসে ছিল শ্রীলা। সুগৌর নধর দেহপল্লবে শেফালীর রস্তে রাঙ্গানো দুকূল পরম আনন্দে লিপ্ত হোয়ে রয়েছিল।—নিজের অজ্ঞাতে ধীপালের ভ্রূযুগল একত্র সমাবেশিত হোয়ে উঠলো। স্বভাবগত ভঙ্গীতে নিম্নোষ্ঠটিকে দন্তাঘাতে পিষ্ট করে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সে দিকে। মুখ তুলে সহসা সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে নিজেকে সংবৃত করে ত্রস্তে স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেল শ্রীলা। অপ্রস্তুত ধীপালও অগ্রসর হোলো অন্তঃপুরের দিকে। পথে সাক্ষাৎ হোলো অন্তঃপুরের প্রধানা পরিচারিকার সঙ্গে। ধীপালের প্রশ্নে পরিচারিকার অধরোষ্ঠ কুটিল হাসিতে বক্র হোয়ে উঠলো। তার মুখে শ্রীলার পরিচয় শ্রবণ করে প্রচ্ছন্ন আনন্দের আভায় উজ্জ্বলিত হোয়ে উঠলো ধীপালের মুখ। নবোদ্ভিন্ন গুম্ফের দুই প্রান্ত বার বার জোরে নিষ্পিষ্ট করতে লাগলো।

—নিজের গর্ভজাত সন্তানটিকে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় শালবতী আর কিছু দিতে না পেরে অন্ততঃ মাতৃত্বের শেষ আশীর্ব্বাদটুকু রেখে গিয়েছিল নিরীহ শিশুটির ওপর—নিজের দেহের ধমনীগত উচ্ছৃঙ্খল শোণিত-স্রোতোধারা। পিতা পুত্রক বর্ষণের স্নেহরাশি পারেনি সে ধারার গতির স্রোত রুদ্ধ করতে। ধীপালের নিক্ষিপ্ত ফুলশরে শ্রীলা এত শীঘ্র জর্জরিত হবে তা ধীপাল নিজেও উপলব্ধি করতে পারেনি। যে শোণিতের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল শালবতী তার অনিয়ন্ত্রিত জীবনের দ্রুত গতি, তারই আহ্বান ঘরের বাহির করে আনলো শ্রীলাকে। এক গ্রহ-তারকাহীন অন্ধতামিস্র রজনীতে সে এলো সে অন্তঃপুরের লৌহদ্বারের বাইরে আবাল্য পরিবেশের যা মাতৃ-অধিকা মত্ত মহিষীর স্নেহ পশ্চাতে ফেলে। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার তার পিছনে ক্রন্দন করে উঠলো।

সমগ্র মগধের তখন অতি ঘোর দুর্দ্দিন। বিম্বিসারের অসপত্ন রাজ্যের শান্তি তখন করাল মূর্ত্তি ধারণ করে শোণিতপঙ্ক আননে ভ্রূকুটি-কুটিল বয়ানে সারা মগধের দিকে চেয়ে আছে। স্বেচ্ছাচারী পুত্রের হস্তে আপন প্রাণ বলিদান দিলেন বৃদ্ধ বিম্বিসার। সাত দিবস সপ্ত রাত্রি ধরে ধর্ম্মপ্রাণ মগধবাসীরা দলে দলে অতিক্রান্ত হোয়ে যেতে লাগলো মগধ রাজ্যের সীমানা। শুধু দন্তহীন বৃদ্ধ এক বর্ষ্মণ স্থাণুর মতো অনড় হোয়ে রইলেন তাঁর নিজগৃহে।

কয়েক দিবস ধরে মগধের জনহীন রাজপথে অর্দ্ধ দগ্ধ কুশাঙ্কুর, ধর্ম্ম, বিনয়ের ছিন্ন পত্ররাশি বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হোতে লাগলো; তারপর শান্ত হোয়ে এলো ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ মগধ নগরী। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আবার অভ্যস্ত হোয়ে উঠলো নাগরিকরা। নূতন যুগকে স্থান দেবার জন্য পুরাতন অব্দ ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করলো পৃথিবীর রঙ্গপট হোতে।

অজাতশত্রুর কুঞ্চিত ভ্রূ ও দৃঢ়বদ্ধ মুখভঙ্গী লক্ষ্য করে সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান লোকটি শিহরিত হোয়ে উঠলো। কম্পিত কণ্ঠে বললো, আমি মিথ্যা বলিনি তত্রভবান!

মন্ত্রণাকক্ষের প্রাকার অজাতশত্রুর বিদ্যুদ্‌গর্ভ কণ্ঠস্বরে স্পন্দিত হোয়ে উঠলো—তোমার এ অভিযোগের প্রমাণ প্রদর্শন করতে পারো?

লোকটির আনত দেহ ঋজু হোয়ে উঠলো উৎসাহপূর্ণ উত্তেজনায়, অবশ্য মহাধীপ! আর যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকো অজাতশত্রুর অর্দ্ধসমাপ্ত বাক্যের পাদপূরণ করে দিল লোকটি—আপনার দত্ত কঠিনতম শাস্তি মস্তক পেতে গ্রহণ করবো প্রভু!

মগধ নগরীর উপর শ্রাবণী সন্ধ্যার বরিষণ তখন সদ্য সমাপ্ত হোয়েছে। দিগন্তরালে দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে বলাকাশ্রেণী উড়ে চলে গেল কোন নামহীন সিন্ধুপারে। নীলাম্বরে দেহ আবৃত করে তামসী সন্ধ্যা অবতীর্ণা হোলো। রাজবর্ত্মের নির্জ্জন একটি রাস্তার ততোধিক নির্জ্জন একটি বাটে শ্রেণিবদ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকটি নারী। আকৃতিতে ও আস্যে বর্ণ ও দেহগঠনে তারা প্রত্যেকেই এক একজন অপর হোতে ভিন্ন কিন্তু তাদের বহিঃসসজ্জা ও প্রসাধন বিন্যাস সম্পূর্ণ এক ধরণের। সুলভ অঙ্গরাগের প্রলেপ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তাদের মুখের পাণ্ডুর বিশীর্ণতা, দেহের ক্লান্তছন্দ তবু তাদের অধর ছুঁয়ে আছে কৌতুকময়ী হাসি। সহসা কবরীতে কুন্দমালা জড়ানো একটি স্ত্রীলোক চঞ্চল হোয়ে উঠলো—পার্শ্ববর্ত্তিনী নারীটির পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করে বললো—ঐ তাখ আজও আবার এসে উপস্থিত হোয়েছে। পূর্ব্ব গগনের মূলে ক্ষীণ শশিকলার অস্পষ্ট বিকিরণের মধ্যে দৃশ্যমান হোলো ঈষৎ আনত একটি দেহ। সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক-পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে সন্তর্পণ পদক্ষেপে কুব্জদেহধারী ব্যক্তিটি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হোলো সেই শ্রেণীবদ্ধ স্ত্রীলোকগুলির সম্মুখে। হস্ততলে সযত্ন রক্ষিত প্রদীপটি একটি স্ত্রীলোকের মুখের সম্মুখে ধরে একদৃষ্টে কয়েক দণ্ড তাকে নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করলো লোকটি—পরে বার কয়েক মস্তক আন্দোলন করে স্বগত উচ্চারণ করলো, না না এতো সে নয়। এর মুখে কোথায় সে স্বর্ণকমলের মতো ভাস্বতী রূপ? আমারই ভ্রম···আমারই ভ্রম—অনুচ্চস্বরে নিজের স্বগতোক্তি আবৃত্তি করতে করতে সে বৃদ্ধ ব্যক্তি অগ্রসর হোলো পরবর্ত্তিনী নারীটির সম্মুখে। পলকহীন নয়নে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে কম্পিত কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলো মা গো, তুই কি আমার শ্রীলা? আহা! মুখের সে অপরূপ শ্রী আজ কোন ক্লেশে এমন বিশীর্ণ হোয়েছে! উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে গেল।

স্থির তটিনীর জল উর্ম্মিমুখর হোয়ে উঠলো—। মুখে অঞ্চল দিয়ে সরব কৌতুক হাস্যে কুটি কুটি হোয়ে ভেঙ্গে পড়লো স্ত্রীলোকটি। একে অন্যের গায়ে চলে পড়তে লাগলো সে দুরন্ত হাসির আবেগে। কেউ বৃদ্ধকে সরোষে গালি দিল, কেউ বা বললো উন্মাদ—কেউ কেউ বললো মস্তিষ্কহীন কামুক বৃদ্ধ। পংক্তিবদ্ধা রূপাজীবাদের আর

একটির দিকে অগ্রসর হোতেই সে মুহূর্ত্তের মধ্যে নীচু হোয়ে ভূমি হোতে এক মুষ্টি ধূলি সংগ্রহ করে ত্বরিত হস্তে নিক্ষেপ করলো বৃদ্ধের মুখ লক্ষ্য করে। দুই হস্তে নিজের চোখ চেপে ধরে মাটির উপর বোসে পড়লো বৃদ্ধ। হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপ কঠিন মৃত্তিকার উপর পতিত হোয়ে শতধা হোয়ে ভেঙ্গে গেল।

অদূরে তিমির-যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অজাতশত্রুকে লক্ষ্য করে উল্লসিত কণ্ঠে নিশাপাল বললো, তত্রভবান চাক্ষুষ প্রদর্শন করলেন, আমার অভিযোগ মিথ্যা নয়। প্রতি সন্ধ্যায় বৃদ্ধ এই অখ্যাত পল্লীতে এই রকম ভ্রমণ করে ফেরে।

চিন্তাবিষ্ট মনে অজাতশত্রু পথ চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর নিশাপালকে বললেন, তুমি তোমার কার্য্যে যাও। আমার সঙ্গে আসবার প্রয়োজন নেই।

দ্বিধাভরে নিশাপাল বললো, এত রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করা কি প্রভুর সমীচীন হবে? সে কথার উত্তর না দিয়ে অজাতশত্রু দ্রুতপদে অগ্রসর হোয়ে গেলেন।

মরকত পাদপীঠের উপর দুই চরণ স্থাপিত করে শুভ্র কোমল শয্যাসনে অর্দ্ধাসীন হোয়েছিলেন অজাতশত্রু তাঁর নিজস্ব বিশ্রাম-গৃহে। দ্রাক্ষাপত্রের আকারে নির্ম্মিত রজতপাত্রের উপর নানা বর্ণময়ী মদিরার স্বুবর্ণপাত্র বহন করে দাসী তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মানা হোলো। একটি চষকে কিঞ্চিৎ মদিরা ঢেলে নিলেন অজাতশত্রু, তারপর ইঙ্গিতে দাসীকে বহিষ্ক্রান্তা হোতে আদেশ দিলেন কক্ষ হোতে।

কিয়ৎকালের মধ্যে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন পুন্নক বর্দ্ধণ। অজাতশত্রুর গর্ব্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে পুন্নক বর্দ্ধণের অনিদ্রাক্লান্ত কোটরগত চক্ষু দুটি সজল হোয়ে উঠলো। বিম্বিসার প্রাণপ্রতিম সুহৃদ, সহোদর-প্রতিম প্রভু—তাঁর জীবনের একমাত্র ও সর্ব্বশেষ আকর্ষণ চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল তাঁর শুষ্ক এই জীবনবৃন্ত থেকে। অসীম জগতের অগণিত অনন্তরাশির মধ্য হোতে লুপ্ত হোয়ে তার পথ নির্দ্দিষ্ট হোলো কোন কোটি কোটি ছায়াপথ নীহারিকার মধ্যে—উদয় অস্তাচলের দুর্গমপথে, অসীম স্বর্গের চিরন্তন রহস্যের মধ্যে।

পুন্নক বর্দ্ধণ?

আনতমুখ পুন্নক বর্দ্ধণ সচমকে মুখ তুলে তাকালেন অজাতশত্রুর দিকে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে মুখে অনুসন্ধান করতে চাইলেন শিশু অজাতশত্রুকে, যে নধর দুই হাত বাড়িয়ে শিশু হাস্যের কলকাকলীতে তাঁর ক্রোড়ে উঠবার জন্য আকুতি জানাতো।

পুনরায় অজাতশত্রুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হোলো, প্রত্যহ কোন স্থানে তুমি সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হও পুন্নক বর্দ্ধণ? উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বক্র ও কুটিল হাস্যে পরিপূর্ণ হোলো অজাতশত্রুর সর্ব্ব মুখ।

শূন্য দৃষ্টি কক্ষের কঠিন প্রাচীরগাত্রে নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন পুন্নক বর্দ্ধণ। গম্ভীর ও ঈষৎ মত্ত কণ্ঠে পুনরপি অজাতশত্রু বললেন: উপলব্ধি করতে পেরেছি তোমার এ মনোবিকার। বৃদ্ধ বয়সেও তুমি তোমার ব্যসনে ঘৃতাহুতি দিতে পারোনি। অসংলগ্ন ভাবে পুন্নক বর্দ্ধণের স্মরণ হোলো একদিন বিম্বিসার পুত্রকে শিখিয়েছিলেন তাঁকে যুক্তকর সম্বোধন করতে। অজাতশত্রু বলে চললেন কিন্তু তোমার প্রতি এই একমাত্র অভিযোগ নয়। তারপর ফিরে তাকালেন মন্ত্রী বর্ষকারের দিকে। বর্ষকার প্রস্তুত হোয়েই ছিলেন, অজাতশত্রুর কথা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে বাহির করে আনলেন একখানি সমুজ্জ্বল অলঙ্কার। গুরুগম্ভীর স্বরে অজাতশত্রু বললেন, ভালো করে লক্ষ্য করে আমাকে বল পুন্নক বর্দ্ধণ! এ সীঁথি মৌড় তুমি কোথা হোতে সংগ্রহ করলে?

পুন্নক বর্দ্ধণের স্তিমিত চক্ষুর সম্মুখে জ্বলন্ত প্রস্তরের মতো ঝলসিত হোয়ে উঠলো বহুদিন পূর্ব্বের সেই রত্নলতিকা। তাঁর জীবনের প্রথম অপরাধ তাঁর জীবন ভরা পরাজয়ের গ্লানি আজ আবার নতুন করে উদ্ঘাটিত হোলো তাঁর সম্মুখে। চন্দ্রিকা নিকৃষ্ট গ্রন্থের মতো অবলীলাক্রমে ত্যাগ করে চলে যেতে পেরেছিলো স্বামীর সে প্রথম উপহার। তার পর সেটি অধিকার করে শালবতী। তার পরের ইতিহাস পুন্নকের বিদিত নেই।

অসহিষ্ণু অজাতশত্রু মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, এই মুহূর্ত্তে তুমি দ্বারপালদের নিয়ে এই বৃদ্ধের গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে অলঙ্কার-পত্র মূল্যবান সামগ্রী ইত্যাদি যা কিছু পাও এনে রাজকোষে সমাবেশিত কর। তার পর পুন্নক বর্দ্ধণের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, বুদ্ধিহত বৃদ্ধ, নিজেকে অতি চতুর ভেবেছিলে তুমি কিন্তু তোমার চেয়েও চতুরতর প্রাণী যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা তোমার জ্ঞাত ছিলো না। এ অলঙ্কার সম্প্রতি একটি নটীর নিকট হোতে পুনরধিকৃত হোয়েছে। দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করে পুনরায় তিনি বললেন, প্রাণদণ্ডই তোমার যথোপযুক্ত শাস্তি হোতো, কিন্তু তোমার পলিত কেশ আর জরাগ্রস্ত দেহের দিকে লক্ষ্য করে সে দণ্ড থেকে তোমাকে আমি অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু স্মরণ রেখো—তাঁর স্বর উচ্চ গ্রামে উঠলো—তোমার কক্ষের চতুর্দিকের প্রাচীরের বাইরে এক পদ নিক্ষেপ করার অনুমতি এই মুহূর্ত্ত থেকে তোমার থাকলো না। রাজপুরী হোতে প্রত্যহ দুই স্থালী অন্ন তোমার অবশিষ্ট জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত লাভ করবে—তোমার বয়সের দিক থেকে বিবেচনা করে এই করুণা তোমাকে আমি করলাম।

এতক্ষণে পুন্নকের অন্তরের হাহাকার শুষ্ক হাসিতে ধ্বনিত হোয়ে উঠলো – শীত-নিদ্রায় আচ্ছন্ন এই জড় মণ্ডুকের দেহটার উপর অস্ত্রাঘাত করতে চেয়েছিলে অজাতশত্রু? তার শীতল শোণিতে তোমার অস্ত্রই রক্তিম হোয়ে উঠতো শুধু সুখ-দুঃখ অনুভবের অতীত শুষ্ক তৃণ-পল্লবের মতো এ দেহ তাতে কোন বেদনাই পেতো না। তাঁর প্রগল্ভতায় অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে উচ্চ কণ্ঠে অজাতশত্রু বিশ্রামগৃহের দ্বাররক্ষককে আহ্বান করে আদেশ দিলেন, শীঘ্র এ বৃদ্ধকে কক্ষের বাহির করে বর্ষকারের হস্তে সমর্পণ কর। স্থির অবিচল চোখের দৃষ্টি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ করে দ্বাররক্ষকের সঙ্গে বহিষ্ক্রান্ত হোয়ে গেলেন পুন্নক বর্দ্ধণ—শীর্ণ অধরোষ্ঠটি বারে বারে কম্পিত হোতে লাগলো।

সে নারীটিকে এক বৃদ্ধা থেরীই প্রথম আবিষ্কার করে। জেতবন বিহারের পশ্চাদ্দেশে প্রতি সন্ধ্যায় সে একটি স্ত্রীলোককে অসংলগ্ন ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে। কয়েক দিন লক্ষ্য করবার পর সে ভিক্ষু সোমদেবকে কথাটা জানায়। ভগবান সুগত তখন অস্থায়ী ভাবে কিছুদিনের জন্য জেতবনের বিহারে বাস করছিলেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল আশঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতির জন্য ভিক্ষুদের মন তখ

পানীয়া ভরণে

—বরুণ ঘোষ

পানপাত্র

—অজয়কুমার দে

—অজিত কুমার
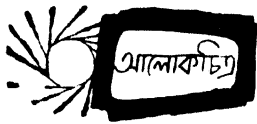
॥ শিশু-মেলা ॥

—দুলাল সেনগুপ্ত

—প্রভাতকুমার মল্লিক
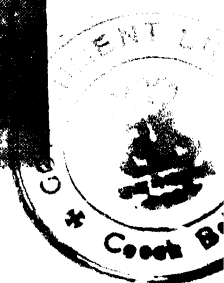
॥ শিশু-মেলা ॥

—শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মনুমেণ্ট মেরামত

—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে। তাই সোমদেব কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হোলেন। পরদিন সন্ধ্যায় বিহারের গ্রন্থকুটীর-প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন করে রইলেন অপরিচিতা নারীটির আগমন প্রত্যাশায়। তখন শূন্যে সান্ধ্যগগনে ধ্যানমগ্ন মহাশান্তির ছায়া—অদূরে সঙ্ঘারাম হোতে শ্রমণদের সমবেত কণ্ঠের সুগভীর স্তব-পাঠের রেশ ধীর মলয়জ বায়ুর সঙ্গে মিলে অনন্ত অম্বরে লীন হোয়ে যাচ্ছিল। বিহারের অদূরবর্ত্তী ক্ষীণা সরসীর প্রান্তে ঘন বকুল-বীথিকার ছায়ায় শ্বেত শিলাপট্টের উপর নতমুখী হোয়ে বসেছিল নারীটি। সোমদেব সন্তর্পণ পদক্ষেপে অগ্রসর হোলেন সে দিকে।

পশ্চাদ্দেশে বনানীর শুষ্কপত্রের চূর্ণিত শব্দে সচমকে ফিরে তাকালো সে নারী—সভয়ে উঠে দাঁড়ালো তার শিলাসন থেকে। পিছনের দিকে এক পদ সরে যাওয়া মাত্র সোমদেবের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হোলো তার দিকে নিস্তব্ধ নিষেধের মতো। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লো নারীটি। কথা বলার আগে সোমদেব তার মুখের দিকে একবার তাকালেন। বিশুষ্ক মুখের অন্তরালে কোটর-প্রবিষ্ট শঙ্কিত চক্ষুর দৃষ্টির অন্তরালে সন্তর্পণে দেখা দিয়ে যাচ্ছে বিগত দিনের রূপৈশ্বর্য্য। চোখের নীচে স্তিমিত দীপশিখার ধূমাঙ্কিত কালির মত গভীর কৃষ্ণরেখা আর ক্লান্ত দেহচ্ছন্দ নিয়ে নতমুখী হোয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সোমদেব গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে তুমি ?

আবেগে কম্পিত হোলো সে শীর্ণ মুখের প্রত্যেকটি রেখা। শুভ্র বস্ত্র-বাসের অন্তরাল হোতে দুটি একত্রিত হাত বাহির হোয়ে এলো—আমার কোন পরিচয় নেই ভদন্ত !

বৃথা বাক্যব্যয় না করে সোমদেব বললেন ভালো, তবে প্রত্যহ বিহারের পশ্চাদ্দেশে তোমার এই বিস্ময়কর পদচারণের উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারি ? অপরিচিতা স্ত্রীলোকটির কোটরগত দুই চক্ষুর ওপর নীলাঞ্জন মেঘের সজল ছায়া পতিত হোলো—অপ্রমাদ অমৃতের পথানুসন্ধানী হোয়ে এ ক্লিষ্ট দেহভার ভগবান তথাগতের পদতলে রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কয়েক দিবস পূর্ব্বে এখানে উপনীতা হোয়েছি কিন্তু কোন রকমেই সে সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি না। আপনি অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন ভদন্ত ?

তরুণ ভিক্ষু সোমদেব ঈষৎ হেসে বললেন, তোমার আকাঙ্ক্ষা দেখছি অতি উচ্চ গগনস্পর্শী। যে ব্রহ্মচারী পরাবৃত্তির মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েও আমরা তাঁর চরণপ্রান্তের সীমাদেশে পৌঁছাতে পারিনি তাঁকে তুমি লাভ করতে চাও তোমার কয়েক প্রহরের প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষায় ? তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। এখন স্পষ্ট ব্যক্ত কর—কোন্ তথ্যানুসন্ধানের জন্য তুমি এমন গুপ্তচরী কার্য্যে নিয়োজিতা হোয়েছো ?

কঠিন উপলের আঘাতে ব্যথিতা উর্ম্মিমালার মতো তার অন্তরের অশ্রুসাগর-তরঙ্গমেলা উচ্ছলিত হোয়ে উঠলো—সে মর্ম্মভেদী কঠিন বাক্যে সান্ধ্যস্তোত্র সমাপন করে প্রবীণতম স্থবির আনন্দ উত্তরাসংগে দেহ আবৃত করে নিজের কক্ষে ফিরে যাচ্ছিলেন—তাদের কথোপকথনে আকৃষ্ট হোয়ে ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হোলেন। তাঁকে দেখে কণ্ঠের কঠিন স্বর পরিবর্ত্তন করে সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে সোমদেব বললেন, এ স্ত্রীলোকটির গতিবিধি অতিশয় সন্দেহজনক শাস্তা। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিহারের বাইরে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়। আমার মনে হয়, এ নারীটিকে কেউ নিয়োজিতা করেছে গোপনে আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য। স্থবির আনন্দ তড়িৎ গতিতে বিচলিত হোয়ে উঠলেন না। সোমদেবের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি বিহারে গমন কর, আমি এর তথ্যানুসন্ধান করছি। সোমদেব চলে যাওয়ার পর আনন্দ স্ত্রীলোকটির আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর বহুদর্শী অভিজ্ঞ চক্ষুর সম্মুখে নারীটির জীবনের ইতিবৃত্ত এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পঠিত হোয়ে গেল। হতভাগিনীর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণসম্পদ প্রথম যৌবনে ক্ষণিকের ভুলে রঙ্গপত্রের মূল্যে বিক্রীত হোয়ে গেছে। আজ তার জীবনকুঞ্জে বোধ হয় সমাপ্ত হোয়েছে সে ক্ষণিক অভিসার-নিশার—উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি, বিশীর্ণ কপোলদেশের পাণ্ডুরতা, চক্ষুর নিম্নে গভীর কালিমা তারই প্রমাণ। সোমদেবের মতোই স্থবির আনন্দ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে ?

বীণার তন্ত্রীর মতো কম্পিত হোয়ে উঠলো নারীটির কণ্ঠস্বর, আপনি গুণভৃৎ প্রবীণ ব্যক্তি—করজোড়ে আমি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। কোন হীন উদ্দেশ্য-পরিচালিতা হোয়ে আমি এখানে আসিনি, পথশ্রম-ক্লান্ত ধূলি-ধূসর আমার এ ক্ষতপদ—উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে।

রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকটির প্রতি করুণা হোলো আনন্দের। বললেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষায় তুমি এ ক্লেশ সহ্য করছো ?

সংসারক্লান্ত হৃদয়ের ভার বিমুক্ত হওয়ার জন্য। মহাবোধির চরণ-যুগল-প্রান্তে একান্ত নির্ভরশীলা হোয়ে নির্ব্বাণ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোন অভিপ্রায় আমার নেই। শান্ত হাসি হাসলেন স্থবির আনন্দ। আগে প্রেম সঞ্চয় করো তোমার অন্তরের মধ্যে, তারপর তোমার কণ্ঠে আসবে সুর—প্রত্যাখ্যানোদ্ধত আনন্দের পিছনে অবহেলিতা নারীটি নিস্তব্ধ ক্রন্দনে বিধুরা হোয়ে উঠলো।

শুক্লা একাদশীর খণ্ডচন্দ্রের বিপরীতে ঝাউজি বৃক্ষের ছায়া দীর্ঘতর হোয়ে নেমে এলো বিহারের বাহিরের নির্জ্জন প্রাঙ্গণে। প্রতিদিনের মত আজও শীতল কূপবারিতে কমণ্ডলু পূর্ণ করে বিহার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন স্থবির আনন্দ। পূর্ব্বসন্ধ্যার অপরিচিতা নারীটি সহসা কোন অলক্ষিত স্থান হোতে বাহির হোয়ে এসে তাঁর পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালো। ভ্রূ কুঞ্চিত করে স্থবির আনন্দ তাকালেন তার দিকে। সাশ্রুনয়নে যুক্তকরবদ্ধা নারীটি কাতর প্রার্থনায় উদ্বেল হোয়ে উঠলো, আপনার আনন্দলোকে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়ে আমাকে ধন্যা করুন। আশ্রয় দিন আমাকে আপনার স্নেহারণ্যের ছায়ায়।

তার দিকে চেয়ে মুহূর্ত্তকাল চুপ করে রইলেন স্থবির আনন্দ। পরে বললেন, তুমি নিজেই তোমার নিজের আশ্রয়। আমি তোমাকে আশ্রয় দেবার কে ?

শাস্তা ! এ জীর্ণ দেহতরণী দীর্ঘকাল চালনা করে শুধু দুঃখময় কূলই উত্তরণ করেছি, আশ্রয় কোথাও মেলেনি। সে বিলম্বিত, শূন্যময় যাত্রাপথটাকে এতদিন বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর লেগেছিল। কিন্তু আজ তাকে প্রণাম। আমার গন্তব্য স্থানে অবশেষে তো আমাকে সে পৌঁছে দিল। এইবার আপনি আমাকে কৃপা করুন। তথাগতের চরণ সান্নিধ্যে আমাকে প্রবেশ

করবার অনুমতি দিন।—বলতে বলতে নতজানু হোয়ে বসে পড়লো নারীটি আনন্দের চরণপ্রান্তে। তিনি কিছুক্ষণ করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন পদলীনা সে নারীটির দিকে—পরে বললেন, তথাগতের দর্শন লাভ করার জন্ম তোমার এ আকুলতা কেন? পরম সত্যস্বরূপ বুদ্ধ যিনি, তিনি এই বাহিরের প্রাঙ্গণে—তোমার দেহের মধ্যেই বিরাজ করছেন—বৃথা তুমি বাহিরে তাঁর অনুসন্ধান করছো।

সে নিরাকার বিরাট সত্তাকে অন্তর-মন দিয়ে অনুভব করবার মতো শক্তির সাধনা আমার নেই। তাঁর বন্ধ বিহীন প্রকাশ-রূপ দর্শন করে আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যের পথ বরণ করে নেবো, এই আমার অন্তরের সর্ব্বশেষ কামনা।—আনন্দ চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন—পরে বললেন, অন্তর থেকে তোমার এই কামনা, হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য দূর করতে হবে—। মৈত্র, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা সুখ দুঃখ—পুণ্যাপুণ্যের চিন্তা দিয়ে চিত্তপ্রসাদ লাভের অধিকারিণী হোতে হবে তোমাকে। তখন অনুভব করবে তোমার সে দ্বিধা ও বাসনা বর্জ্জিত, আনন্দময় অন্তরে তোমার অভীষ্টকে তুমি লাভ করেছো তাঁর দর্শন জনিত তৃষ্ণা আর তখন তোমার থাকবে না—।

কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো নারীটি। আমি দুর্ব্বল—সে ক্ষমতা আমার নেই—আপনি আমাকে পথ নির্দ্দেশ করুন।

নতমুখে পুনরায় কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন স্থবির আনন্দ—পরে বললেন, আচ্ছা, এসো তুমি আমার সঙ্গে—। সায়াহ্নের শেষ রেখার মধ্য দিয়ে—সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্ষীণ আলোর মাঝখানে নারীটি চলতে লাগলো আনন্দের পশ্চাতে—তার জীবনের সর্ব্ব শেষ পথ খুঁজে নিতে।

পূর্ব্বে বনান্তরে অলস শয়নে শায়িতা উষার নিদ্রাক্রান্ত নয়ন ধীরে ধীরে উন্মীলিত হোলো। শত শত সুপ্ত বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে বাহির হোয়ে এলো রাত্রির নিভৃত নীড় হোতে। অসীম গগনগাত্রে বলাকার শ্রেণী ঝাঁপ দিয়ে উড়ে চললো চিরপরিচিত বাসস্থান ছেড়ে চির-নীহারাবৃত কৈলাস পর্ব্বতের সন্ধানে।—

কুশী নদীর তুষারশীতল জলে বার বার নিমজ্জিতা হোতে লাগলো একটি নারী।—আজ তার বড়ো আনন্দের দিন।—মহাস্থবির আনন্দের করুণা আশ্রয় লাভ করে পঞ্চবর্ষ কাল ধরে সে ভ্রমণ করে এসেছে এক বিহার হোতে অন্য বিহারে। আজ সে উপস্থিত হোয়েছে তার তীর্থস্থান কপিলবস্তুতে—যেখানে তার ইষ্টদেবতা প্রথম চক্ষু উন্মীলন করেছিলেন। যাত্রার শেষ পথে উপনীতা হোয়েছে সে। জীবন-মন্থনে তার যে হলাহল উঠেছিল অমৃতরূপে রূপান্তরিত হোচ্ছে তারা এক একটি নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

স্ত্রীলোকটির মুণ্ডিতমস্তক আর হরিদ্রা রঙে রঞ্জিত অন্তর্ব্বাসের দিকে তাকিয়ে মহাস্থবির আনন্দ মৃদু হাসলে—প্রজ্ঞা পারমিতার প্রসাদে তোমার জীবন আজ সম্রাজ্ঞীর চেয়েও সার্থক। বৃহৎ শান্তি উদার বৈরাগ্য আর নিঃস্বার্থ প্রীতির মধ্য দিয়ে আজ তুমি উপনীতা হোয়েছো তোমার ধ্যানের তপোলোকে।

অন্তর্ব্বাসের ভিতর থেকে বিবর্ণ একটি জলটখণ্ড বাহির করে এনে স্ত্রীলোকটি বললো, এখনও পার্থিব মায়াবিমুক্ত হোতে পারিনি শাস্তা! কুশী নদীর জলে এ চিত্রপট বিসর্জন দিয়ে সর্ব্বশেষ আকর্ষণ হোতে মুক্তি চেয়েছিলাম—দ্বিধাগ্রস্ত মন বাধা দিল, পারলাম না। আপনার পদপ্রান্তে এ চিত্রপট চিরদিনের মতো বিলীন হোয়ে আমার অন্তর দ্বিধাবর্জ্জিত মায়ামুক্ত হোক—দুহাতে চিত্রপটটি বিদীর্ণ করতে যেতেই তাকে বাধা দিলেন মহাস্থবির—বৈরীকেও তুমি নিঃস্বার্থ প্রীতি দান করবে যে তোমাকে প্রথম জীবনে বিপথগামিনী করেছিল তাকেও আজ তোমার নির্ম্মল অন্তঃকরণের মৈত্রী দান করবে।

মস্তক নত করে নারীটি শুনলো তাঁর বাণী, পরে বললো, যথার্থ শাস্তা! অন্তরে গভীর আনন্দের সন্ধান পেয়ে পার্থিব তুচ্ছ ক্ষোভ অতি অকিঞ্চিৎকর হোয়ে গেছে আমার কাছে—চিত্রপটখানি পুনরায় অন্তর্বাসের ভিতর রাখতে রাখতে নত নেত্রে নারীটি বললো: এ চিত্রপট আমার বৃদ্ধ পিতার আমার বিগত জীবনের সর্ব্বশেষ আকর্ষণ।

চারিধারের শৈলমালার অভ্যন্তরে নিস্তব্ধ নীল একটি সরোবর, তারই প্রান্তদেশে কয়েকটি স্থূল শিলাস্তম্ভের উপর শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠ দণ্ডায়মান।

মহাস্থবির আনন্দের পশ্চাতে সঙ্কুচিত পদক্ষেপে উঠে নারীটি এলো সে প্রকোষ্ঠের ভিত্তিগাত্রে। উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়ে আনন্দ বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করলেন সেই কক্ষ-অভ্যন্তরে পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী নারীটিকে নিয়ে। সুগন্ধি সর্জ্জরসের ধূমজাল ভেদ করে নারীটির অভিভূত চোখের দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হোলো শুভ্র একটি অমলাসনের উপর—যেখানে জ্যোতিষ্মান এক ব্যক্তি মুদ্রিত নেত্রে শান্ত সমাহিত মুখভাব নিয়ে পদ্মাসনে উপবেশন করে আছেন। শুভ্র শুক্তির মতো পদনখরে যেন শত-সহস্র গলিত চন্দ্ররেণুর নির্ম্মলিমা পরিব্যাপ্ত হোয়ে রয়েছে। রক্তপদ্মনিভ উন্মুক্ত করতলের উপর প্রতিফলিত হোয়েছে যুগ-যুগান্তরের বরাভয় আশ্বাস। সে আশ্বাসবাণী ধারণ করে নারীটির শুষ্ক দুই চোখ সজল হোয়ে উঠলো। তথাগত ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করলেন—ক্ষমাসুন্দর চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হোলো নারীটির মস্তক লক্ষ্য করে—তাঁর নীরব আশীর্ব্বাণী বহন করে। আর্ত্ত পৃথিবী যেন কম্পিত হোয়ে উঠলো—ধ্বনিত হোলো সে নারীকণ্ঠ:

কিঞ্চিৎ বেদনার শূলে জর্জরিতা—স্পর্শ করো না এ দুর্গতাকে।
তথাগত অপরূপ হাসি হাসলেন। সমগ্র ঊর্দ্ধাকাশ ভেদ করে মৃত্তিকার প্রতি রন্ধ্রের অভ্যন্তর হোতে বিশাল বারিধিরাশি অতিক্রম করে কোন দূর-দূরান্তর হোতে ভেসে এলো তাঁর আশীর্ব্বাদ—পৃথিবীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো সরল শুভ্র সুন্দর তুমি—তথাগতের দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে স্পর্শ করলো নারীটির মুণ্ডিত মস্তক—মহাস্থবির আনন্দের উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হোয়ে উঠলো অমৃতধারায়

অত্তনা চোদয়ত্তানং পটিমাসে অত্তমত্তনা।
সো অত্ত গুত্তো সতিমা সুখং ভিক্খু বিহাহিসী।

স্থবিরার নির্ম্মল ললাট আর্দ্র হোয়ে গেল সে আশীর্ব্বাদে।

অনবদ্য শিল্প-কৌশল...
আধুনিক গঠন সৌন্দর্য...

ন্যাশনাল একো-র
নতুন মডেল এ-৭৪৪

সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চকচকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভালভ—৯ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর স্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেকশন; ম্যাজিক আই; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের জন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা; টেপ্ রেকর্ডারের জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারাণ্টি।

৪১৫্ নীট

স্থানীয় ট্যাক্স স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • ব্যাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দ্রাবাদ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

দুই পিতা, দুই কন্যা

স্মৃতি সেনগুপ্তা

যে যুগের কথা হচ্ছে তখনও পাল্কি চুল্কি চালেই চলে। গ্রামের মেঠো পথে, মাঠের মাঝে "হেঁইয়ো হেঁইয়ো" ক'রে পাল্কি চলে ছুল্কি চালে—

সেই সময়ের গ্রামের রূপটি এই—শান্ত ছায়া-ঘেরা গ্রাম। সবুজ ছায়ার কোলে কোলে মেঠো ঘরের ভীড়। ছিমছাম পরিপাটি ক'রে সেগুলো গোবর দিয়ে নিকানো। নিকানো দেওয়ালের গায়ে সাদা ও গেরুয়া রং দিয়ে আলপনা আঁকা। অনেক দূর চলে যাওয়া মাঠ। ধানের ক্ষেত, অরহর-ক্ষেত, তিল তিসি-ক্ষেত। মাঝে মাঝে আবার নিজের থেকে ওঠা দ্রোণ ফুলে ছেয়ে থাকে সে ক্ষেত।···গ্রামের মানুষ সরল সাদাসিধে। তারা প্রতাপশালী জমিদারকে ভয় করে, মানে, বাধ্য হয়ে তাঁদের কথা শোনে। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ রুখে দাঁড়ায় না। হয়ত বুকে আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি, কিন্তু সেটা চাপা আগুন। যাক আমাদের গল্প অন্য ধরণের, কাজেই এ কথায় কাজ নেই।

* * * *

—কুনঠে বাঁশী বাজছে রে?

—কেনে তুই জানছিস না?

—না।

—হামি তু-কে বলব না। যা না কেনে তুই ঐ বগাই মোড়লের কাছে। ও তুকে বুলবে।

—কেনে তুই বুলনা বাই?

—না তু-কে হামি বুলব নি। এতো বোড়ো একটা খোবোর আর তুই কিনা বুলছিস—হামি জানছি না? যা তুকে বুলব নি।

—বুল না রে বাই?

পথ চলতি দুটো চাষীর কথা এগুলো। একজন জানতে চায় আরেক জন বলবে না। তাকে কিছুতেই বলবে না। কেন বলবে সত্যিই তো এতবড় একটা খবর আর কি না ও জানে না?

সত্যিই মস্তবড় খবর একটা। হয়ত ঐ চাষীটা জানে, খেয়াল নেই। কিংবা ও না-ও জানতে পারে, হয়ত নূতন লোক। কিন্তু জানবারই কথা।

* * * *

জমিদার-বাড়ীর বার মহল। সামনের আঙিনায় অনেকগুলো সাদা-কালো পায়রা ছড়ানো ধান খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এক পাশের উঁচু বারান্দায় জমিদার স্বয়ং বসে আছেন পাশে নায়েব ও ছেলে বিজয়। নীচের উঠোনে অনেকগুলো লোক। ঝাকড়া-ঝাকড়া চুল, কালো তেল-চুকচুকে পেশীবহুল সুঠাম দেহের গড়ন। বেঁটেখাটো ধরণের। তাদেরই সাথে জমিদারের কথা হচ্ছিল।

—হ্যাঁ শোন, তোদের ডেকেছি কেন। জানিস-ই তো কাল বিজুর বিয়ে। আজই বরযাত্রীর দল রওনা হচ্ছে বিকেলে। তা তোরা পাল্কি নিয়ে বিকেলে চলে আসবি সবাই, আসবি বুঝলি? কি রে সবাই রাজী তো? আর রাজী না-হবারই বা আছে কি! এই বলে জমিদার হরশঙ্কর বাবু একবার সকলের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইলেন। সকলেই সম্মতি প্রকাশ করল। কেবল এক জনের মধ্যে একটু ইতস্ততের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। তারপর সেই লোকটা এগিয়ে এল। বুড়ো হয়ে গেছে সে, তবে শরীর বেশ মজবুত। হাত জোড় করে জমিদারকে সে বললে—বাবু, হামি পারব না বাবু, হামি আসতে পারব না।

—কেন রে? আর কোথাও যাবি নাকি? না না তোর যাওয়া হবে না। তোর পাল্কিই তো সবচেয়ে ভালো রে মধু। তোর পাল্কিতেই তো বিজু আর বৌমা আসবে। এ কি তোর কম ভাগ্যের কথা?

—না বাবু, হামি পারব নি।

—কেন? এবারে জমিদার বাবুর গলার স্বরটা একটু কঠোর শোনা গেল।

মধু একবার জমিদার বাবুর দিকে চাইল। তারপর মুখ নীচু ক'রে বলল—না বাবু, সে হামি বুলতে পারব নি। হামি যেতে পারবি নি, হামি যাব নি বাবু—হামি যাব নি। গলায় স্বর ওর আটকে গেল। অবাক হ'য়ে গেলেন জমিদার হরশঙ্কর। রাশভারী জমিদার তিনি, তাঁর কথা কেউ অমান্য করে না। আর এই একটা সামান্য দুলে বাগদী তাঁর কথা শুনছে না? কিন্তু তিনি অবাক্ হ'য়ে শুধু—আশ্চর্য্য! বলেই থেমে গেলেন। হয়ত মধুর ছলছল করা কালো চোখের মধ্যে কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু একবার কঠিন-শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বাঘের চামড়ার চটিটায় শব্দ তুলতে তুলতে বারান্দা পেরিয়ে অন্দরে চলে গেলেন।

ব্যাপারটা কেমন থমথমে হ'য়ে গেলো। ফিসফাস্ কথা আরম্ভ হ'য়ে গেলো উঠানে জমা লোকগুলোর মধ্যে। নায়েব বিজয় সকলেই চুপ। কেটে গেল কয়েক দণ্ড। তারপর বিজয় বাধ্য হ'য়েই বলল—আচ্ছা এবার তোমরা যাও। আর মধু তুমি থেকো, তোমার সাথে কথা আছে।

সবাই চলে গেল। শুধু মধু এক পাশে মুখ নীচু ক'রে বসে

রইল। নায়েব মশাইও চলে গেলেন। বিজয় ধীরে ধীরে মধুর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল—মধু, তুমি এমনি করলে কেন? আমরা কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি? সত্যি ক'রে বল তো তুমি এমনি করলে কেন? কি জন্যে তোমার আপত্তি?

এতগুলো প্রশ্নে মধু বোধ হয় ঘাবড়ে গেল। একবার বিজয়ের দিকে মুখ তুলে চাইল। আবার মুখ নাবিয়ে নিল। কিছু বলল না।

—মধু! বল তুমি কেন—

—দাদাবাবু, হামি, হামি বুলতে পারবি নি। না, না, না, দাদাবাবু তালে তুর যে কষ্ট হবে। হামি ক্যামন কইরে বুলব। হামাকে আর কিছু জিগগাস করিস নি দাদাবাবু!

—কেন? না, তুমি বল আমি কষ্ট পাব না। তুমি বল।

—ঠিক বুলছিস দাদাবাবু, তুই কষ্ট পাবি নি তো? ঠিক বুলছিস তুই?

—হাঁ ঠিক।

—বেশ। তবে শুন দাদাবাবু, যখন তুই বুলছিস—তুই কিছু মনে করিস নি বুঝলি? তুকে হামি দোষ দিব না, শুধু তুকে আমার দুটো মনের কথা বলব। মধু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলতে আরম্ভ করল—ত্যাখ দাদাবাবু, এমনি এক দিনে দুবছর আগে তুর বিহা হইছিল। হামার পাল্কি চড়েই তুই তোর বো নিয়ে আইছিলি। তুর বোকে হামি দেখেছি। খুব সোন্দর হইছিল তুর বো। তুর সেই বোকে তুই ত্যাগ করলি দাদাবাবু? হামি জানতুম ও খুব ভালো বো ছিল যে তোর। কেনে ওকে তুই ছাড়লি রে? হামার পাল্কিতে ও এসেছিল মা নথ্‌থী। আর হামি আরেকজনকে হামার পাল্কীতে কইরে আনব? সতী নকথীকে বেসজ্জন দেইছি হামি, হামার এই পাল্কী করেই। আবার আরেকজনা সেই পাল্কী করেই আসবে? হামার পাপ হবে না দাদাবাবু? তুই-ই বোল?—সতী নকথী বোকে তুই আর ঘরে আনবি না দাদাবাবু? ওর কি দোষ রে দাদাবাবু? বল না? সেই জন্যই তো হামি পাল্কী দেবো না তোর বিয়েতে। তুই আবার বো আনবি আবার যদি ও বোকে তুই ত্যাগ করিস দাদাবাবু? ও হামি সইতে পারব নি। তুর পা ছুঁয়ে বুলছি দাদাবাবু হামি পারব নি পারব নি—। হামার পাপ হবে যে। কেনে তুই তাকে ত্যাগ করলি—দাদাবাবু তুই যদি আবার তোর ও বোকে আনতে যাস, তবে—তবে, হামি হামার পাল্কী নিয়ে তোর বোকে আনতে যাবো। দাদাবাবু বুল, তুই তো উ বোকে আনতে যাবি? উজ্জ্বল হয়ে উঠল মধুর দুচোখের দৃষ্টি—

মধু, তা কি হয়, কেমন করে হয় রে?

—ক্যান দাদাবাবু। উ কি কোনো দোষ করছে। হামি তো শুনছি তোর বো সীতা সাবিত্তীর ছিল। তবে কেনে তুই উকে আনবি না রে?

—না মধু তা হয় না, সে হয় না, সে হয় না।

—তালি তুই আর কি তুর কমলা বোকে আনবি নি দাদাবাবু?

—না। শুধু একটা "না" বলে বিজয় চলে গেল। হয়ত জল হয়ে পড়ে গেল——দূরে গাঁয়ের একটি কোমল সুন্দর মুখের কথা। হয়ত বা দুঃখ পেল। কে জানে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল কিনা? কিন্তু যা হবার নয়, তার জন্য বৃথা দুঃখ করে লাভ কি? মনের মাঝে এ রকম একটা ভাবও উঁকি মারল। বিজয় গেল, বোধ করি, এ বিষয়ে মধুর সাথে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

মধু নিঃশব্দে সামনের দিকে পা বাড়াল।

এবারে আমাদের একটু পেছনে তাকাতে হবে।···এই তো বছর দুই আগে ধুম-ধাম করে বিজয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মধু বাগ্‌দীর পাল্কী চড়ে বৌ এল। নাম তার কমলা। কমলা এল সুন্দর লাল চেলীপরা গ্রাম্য-বধূ। কিন্তু একদিন আবার মধু বাগ্‌দীর পাল্কী চড়েই ফিরে গেল সেই সে দিনের গাঁয়ের—সেই চলে যাওয়ার পর কত দিন চলে গেল। কিন্তু রাঙ্গা চেলীপরা বধূ আর ফিরল না। গাঁয়ের লোক জানলো না জমিদার-বাড়ীর ব্যাপার, কেন আর বৌ ফিরে এল না? এ প্রশ্ন তাদের মনে জেগেছিল। কিন্তু জমিদার-বাড়ীর রহস্য তাদের দৃষ্টির স্মৃতির অগোচরে। কিন্তু রহস্য লুকিয়ে থাকে না, একদিন তা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েই। তাই এই গাঁয়ের জমিদার-বাড়ীর ভেতরের ঘরেও সব শোনা গেল। এখানে তার পরিচয় সংক্ষিপ্ত। জমিদার হরশঙ্কর সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরের মেয়ের সাথে বিজয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। সে মেয়ে শুধু সুন্দরী ছিল বলেই তিনি তাকে পুত্রবধূ করেছিলেন। টাকা পয়সা তিনি চান নি। জানি না এ তাঁদের প্রতি দয়া না ঐশ্বর্য্যের দম্ভ।

কমলা অনেক দিন বাপের বাড়ী যায় না, সেই বিয়ের পর থেকে। তাই বার বার সেখান থেকে চিঠি আসে তার শ্বশুরের কাছে। সে যেন আসে একবার, কতদিন তাঁরা দেখে না। এমনি করে বহুদিন চলে গেল, তবু কমলা এল না। তাই কমলার বাবা হরশঙ্কর বাবুকে চিঠি লিখলেন—তিনি কি তার মেয়েকে একবারের জন্যও তাঁদের কাছে আসতে দিতে পারে না? মেয়েকে কি তিনি কিনে নিয়েছেন নাকি? পিতৃস্নেহ ভরা এক অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কয়েকটা অভিমান ভরা কথার উত্তরে এল কঠোর উত্তর—আপনার মেয়েকে দয়া করে পুত্রবধূ করেছি। এক পয়সাও নেই নি। একেই আপনার ভাগ্য মনে করুন। আমাকে চোটপাট দেখানোর আপনি কেউ নন। আপনার মেয়ে আমার ঘরের বৌ। সে যাবে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে, আপনার কথায় নয়। দারুণ আঘাত পেলেন। আত্মসম্মানে ঘা দিল কমলার বাবার। তাই তো শেষে একদিন ঐ মধু বাগ্‌দীর পাল্কী চড়েই চলে গেল শ্যামল গাঁয়ের কমল বধূ।

এদিকে হরশঙ্কর বাবু এর প্রতিশোধ স্বরূপ আবার বিজয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

আজ তারই বাজনা বাজছে জমকালো সুরে। এ তো আনন্দ উৎসব নয়, প্রতিশোধের হুহুঙ্কারের মতই মনে হচ্ছে এ বাজনার সুর। প্রতিশোধ। তাই সেবারের চেয়েও এবারের বিয়েতে আয়োজন অনেক বেশী। হয়ত প্রশ্ন উঠবে—বিজয় কেন এ বিয়েতে রাজী হ'ল? কিন্তু ভুললে চলবে না সে জমিদারের বংশধর। ঐশ্বর্য্যের দম্ভের গর্ব যে তার শিরায় শিরায়।

* * * *

মধু তার বাড়ীর দাওয়ায় বসে ছিল। উঠোনের জামরুল গাছের নীচে বসে মেয়ে লক্ষ্মী বাসন মাজছিল। এ এক মাত্র মেয়েই আছে তার। বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আচ্ছা যাক সে কথা।

খেলো হুঁকোটায় মুখ লাগিয়ে জয়ন্তী ফুলগুলোর দিকে উদাস ভাবে চেয়েছিল সে। হুঁকোর টান দিতেও ভুলে গিয়েছিল সে।

—বাবা?

—কেন রে?

—তুই আজ যাবি না? জমিদার-বাড়ীতে। হোথায় যে আজ বররাতরা যাবে। তেনাদেরকে নিয়ে তুই যাবি না। তা বাবা তোর পাল্কীটা—

—না রে নকথী আমি এবার যাব না।

—কেন বাবা?

—পাপ হবে যে রে?

—পাপ? কেনে?

—পাপ হবে না? নকথী মাকে আমার এই পাল্কী করেই এনেছিলাম। আবার হামারই পাল্কী করে তেনাকে ফিরায়ে দিয়ে আলাম। তেনাকে বিদায় দিয়ে আবার—আর বলতে পারলো না মধু শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

কুলবধূত্ব ঘুচে গেছে ঐ কমলা বৌ-এর মত। হয়ত ধরন আলাদা কিন্তু পরিণতি তো এক। তাই মধু বাগ্‌দীর চোখের জল আজ বাধা মানে না, অ-দূর গাঁয়ের এক তারই মত হতভাগ্য পিতা ও কন্যার কথা ভেবে। যে পিতার মাঝে সে আছে নিজে আর কন্যার মাঝে লক্ষ্মী।

সানাই-এর সুর স্তিমিত হয়ে এসেছিল, আবার জোরে বেজে উঠল সানাই। সে তীব্র সুর মধু বাগ্‌দী সহ্য করতে না পেরে কানে আঙুল দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল।

সানাই-এর তীব্র সুর খোলা মাঠের বাতাসের আবর্তে আবর্তে ছড়িয়ে পড়ল।

নীলগিরি

শ্রীমতী ইভা ভট্টাচার্য্য

প্রকৃতির সংগে মানুষের যে কতোখানি সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে, তা বুঝতে পারা যায় যখন বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের সম্পূর্ণ নাগালের বাইরের জগৎকে আমরা দেখি। আমরা যন্ত্রচালিত যুগের মানুষ, তাই আমরা কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তুলেছি বড় বড় সহর। কিন্তু প্রাণীর সঙ্গে প্রকৃতির এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাই সে সুযোগ পেলে চোখ-ঝলসানো আবদ্ধ—এই কারাগার থেকে ছুটে চলে যায় উন্মুক্ত হাওয়া ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচিত সুন্দর প্রকৃতির কোলে।

দেশ ভ্রমণ প্রত্যেক মানুষকেই আনন্দ দেয়। কিন্তু এই আনন্দ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। নানা অসুবিধা মানুষকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তাই আমি এই রকম ভাগ্যহীন মানুষদের সমবেদনা জানাই। আমার স্বামী একজন রেলের কর্মচারী; তাই সুযোগ-সুবিধা কিছু থাকায় দেশভ্রমণের উৎসাহও আমার আর পাঁচজনের অপেক্ষা বেশী।

সমতল ভূমির অনেক বড় বড় শহর আমার ইতোমধ্যে দেখা, যেমন দিল্লী, বম্বে, পাটনা, কানপুর, পুণা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, কোচীন ইত্যাদি। বাঙালীর পক্ষে মহানগরী কোলকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই শহরগুলি আমার [illegible] মুগ্ধ করেনি, যতোখানি করেছে মাথেরান বা উটাকামণ্ডের পার্ব্বত্য-শোভা। সত্যি, প্রকৃতির সেই মন ও নয়নমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য বর্ণনার ধৃষ্টতা আমি রাখিনা। তবু যাঁরা আমারই মত—কল্পনার চক্ষে দেশ ভ্রমণ করে আনন্দ পান, আমি চেষ্টা কোরবো আমার উটীর সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁদের মানসলোকে ফুটিয়ে তুলতে।

প্রথমে স্থির কোরেছিলাম, এ-বছর স্বাধীনতা-দিবস উটীতেই উদ্‌যাপন কোরবো। কিন্তু দেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করবার দায়িত্ব যাঁদের ওপর, নগণ্য হলেও আমার স্বামী তাঁদের মধ্যেই। কাজেই গত বছরের মত এবারেও তিনি অধিকতর শ্রমের মধ্য দিয়েই ঐ পুণ্য দিনটি পালন কোরলেন। ২৫শে অগষ্ট মাদ্রাজের রায়পুরম থেকে যাত্রা আরম্ভ কোরলেও তাঁরই সরকারী কার্য্যোপলক্ষে পথে আর কোনাম জংশনে এক রাত কাটাতে হয়। পরদিন রাতে নীলগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে আমরা উটাকামণ্ডের পথে রওয়ানা হই। ২৭শে অগষ্ট সকালে আমরা মেটুপালয়ম্ ষ্টেশনে উটী যাবার জন্য গাড়ী বদল করি। এই গাড়ী খুব ছোট। ইঞ্জিন সামনে না টেনে কামরাগুলিকে পেছন থেকে ঠেলে পাহাড়ের উচ্চতায় নিয়ে চলে। গাড়ীর মাঝে মাঝে ও একেবারে সামনে সর্বসমেত চার জন গার্ড। প্রথমে রেললাইন যতদূর দেখা যায় সরল রেখায় এগিয়ে গেছে। পার্বত্যশোভা উপভোগ করবার জন্য কামরায় খোলা জানলায় কাচের শার্শির সুবন্দোবস্ত—আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পেলাম পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের একাকার অবস্থা। গাড়ী ক্রমশঃ ঘুরে ঘুরে ধাপে ধাপে উঠতে লাগলো। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ প্রায়ই গভীর হোয়ে উপত্যকার আকার নিয়েছে। সেই খাদগুলি অতিক্রম করার জন্যে ইঞ্জিনীয়াররা নির্মাণ করেছেন অত্যুচ্চ সেতু বা ভায়া ডাক্ট। কোথাও বা পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে স্বল্পালোকিত বা তমসাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ। মেটুপালয়ম্ থেকে উটাকামণ্ডের সাড়ে আটাশ মাইল রেলপথে এইরকম ষোলটি ছোট-বড় সুড়ঙ্গ আল্পসের বুকে বিখ্যাত বড় টানেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিমেষহীন দুটো চোখ জানালার মধ্য দিয়ে আকুল আগ্রহে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একেবারে শীর্ষদেশ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে কী শোভা! নীল, লাল, সাদা হলদে আর কতো রঙের ছোট-বড় ফুল ও লতাপাতা দুই পাশেই পাহাড় ছেয়ে রয়েছে। মনে হ'ল, জানিনা কোন্ শিল্পী সকলের অলক্ষ্যে রচনা কোরেছেন এই সুন্দর গালিচা। ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামলে আমার স্বামী জানালা থেকেই পুষ্পমঞ্জরী চয়ন কোরতেন।

এরই মাঝে মাঝে আবার পাহাড়ের কোন্ উপর থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণাধারা। যখন তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ মেঘাবৃত পর্বতচূড়ার শোভা ও মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখছে, তখন গিরিদরী-বিহারিণী ঝর্ণাও প্রকৃতির আর এক বৈচিত্র্য দেখাবার জন্য কলধ্বনিতে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে চোলেছে। অযোরঝরা ঝর্ণার মধুর দৃষ্টি মুহূর্তমধ্যে পর্বতচূড়া থেকে নেমে আসে ফুল ও লতাপাতায় সজ্জিতা নৃত্যরতা ঝর্ণার বুকে। কিন্তু কিছুক্ষণেই সেও আবার চলে যায় দৃষ্টির বাইরে, যেমন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে বহুদূরে নীচে মিলিয়ে গেল কারখানার [illegible] কোলকাতার শহর।

সুদূর মেঘের কাছাকাছি বসা এখন আর নিছক কাব্যকল্পনা নয়। বরং নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি গভীর অরণ্য; সেখানে সূর্যের আলোও সহজে প্রবেশাধিকার পায় না। ঘন গভীর জঙ্গল, আর আমাদের গাড়ী উঠছে একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। যতই উঠতে থাকি ততই শীত অনুভব করি। শেষে আমার ছোট কাশ্মীরী শাল বার করে গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় কিন্তু বাহাদুরী করে শার্কস্কিনের স্যুটেই তখন পর্যন্ত রইলেন। কখনো রোদ, কখনো মেঘ, কখনো ধূলোর মত হালকা বৃষ্টি। আমাদের পলকা মিটারগেজের গাড়ী দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে একটু দুলছেও। কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই সেখানকার পার্বত্য আবহাওয়ার।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ষ্টেশন আসছে, কোনটা হিলগ্রোভ, কোনটা বা কলর। দু-একটা ষ্টেশনে আমাদের উর্দ্ধগামী গাড়ীর পাশে দেখি উপর থেকে নিম্নগামী গাড়ী এসে দাঁড়ালো। পাশের গাড়ী যখন ঢালু লৌহপথ বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো, তখন কেমন জানি মনে হয় এখনি বুঝি হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়বে। আমাদের গাড়ী এতক্ষণে সাইডিং ছেড়ে ষ্টেশনে ফিরে এসে আবার উর্দ্ধমুখে ঘুচ-ঘুচ করে যাত্রা শুরু কোরলো। গাড়ীর পাটাতনের নীচে খটাং কোরে আওয়াজ হলো। এবারে কামরার নীচে ঘড়ির মতো দাঁতকাটা চাকা রেলপথের ঠিক মাঝে পাতা অনুরূপ দাঁতকাটা পাটি আঁকড়ে ধোরলো। উঁচু-নীচু লৌহপথে পাছে গাড়ী পিছলে যায় তাই লাইন বরাবর এইরকম লৌহদন্তপাটির ব্যবস্থা। তবে ষ্টেশনগুলিকে পাহাড়ের গা কেটে সমতল করা হয়েছে; তাই সাইডিং-এ কোন দন্তপাটির ব্যবস্থা নেই।

অধিকাংশ ছোট ষ্টেশনেই ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টার প্ল্যাটফর্মের ওপরেই ষ্টেশনঘরের লাগোয়া। কাছেই লাইনের কিছু দূরে রেল-কর্মচারীদের সারবন্দী নীচু ছোট ছোট ঘর। আমাদের গাড়ী তাদের ঘরের সামনে যেতেই বাসিন্দারা সব কাজকর্ম্ম ছেড়ে দরজায়, জানালায় বা একফালি বারান্দায় ভীড় করে কৌতুহলের সঙ্গে গাড়ীর যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ কোরতে লাগলো। কিন্তু কেন? এ লৌহপথ ধরে প্রতিদিনই তো কতো বার গাড়ী যায়, আসে। তবে কি তারা প্রতিদিনই কাজকর্ম্ম ছেড়ে এইভাবে যাত্রীদের মিছিল দেখে? কিছুক্ষণ ভাবতেই বুঝতে পারলাম যে তাদের জীবনে এটুকু বৈচিত্রের কতোখানি প্রয়োজন। মানুষ সমাজ ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীব কিন্তু অর্থোপার্জনের তাগিদায় তাদের লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়
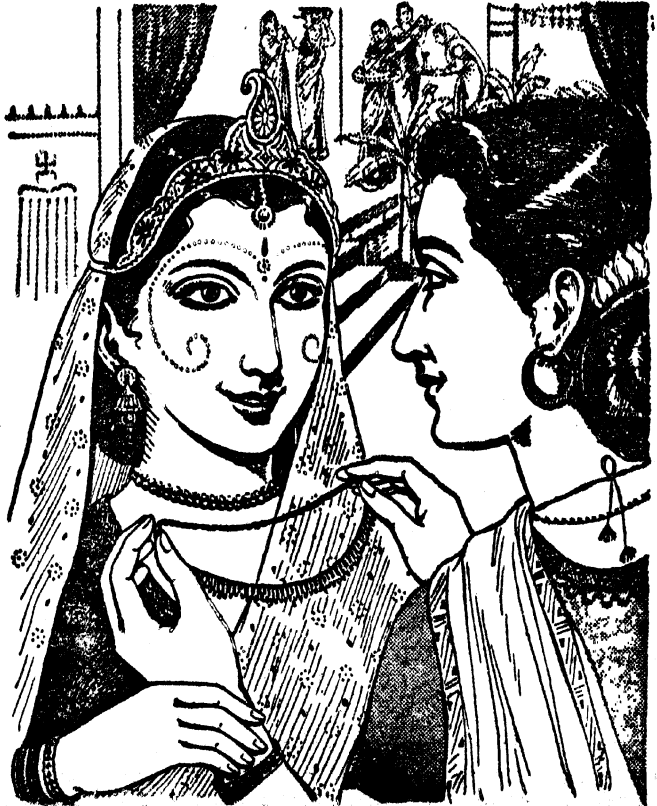
পর্যন্তে নির্জন স্থানে নির্বাসিত কোরেছে। সঙ্গী মেলে না তাদের, কইতে পারে না তাদের সুখদুঃখের কথা। তাই তারা সব কাজ ফেলে ছুটে আসে বিচিত্র ভাবভঙ্গী ও বেশভূষার বিভিন্ন মানুষের চলমান শোভাযাত্রা দেখতে; আর শুধু দৃষ্টি-বিনিময়ে চলে স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ের কথোপকথন।

পথ চলতে গাড়ী মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়, তৃষ্ণা নিবারণ করে। চারিধারে বড় বড় ফার্ণ, ইউক্যালিপটাস, ঝাউগাছের মতো আরো বড় বড় গাছ। তারি ফাঁকে ফাঁকে মেঘের ফাটল দিয়ে যেটুকু রোদ পোড়েছে, যাত্রীরা অনেকে গাড়ী ছেড়ে নেমে তাই সেবন কোরছে। গাড়ী আবার গাছে-ছাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। কোয়েম্বাটুর থেকে আসা দীর্ঘ রাস্তা সাপের মতো পাক খেয়ে খেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে পাহাড় বেঁধেছে। জঙ্গলের মধ্যে বাতাবীলেবুর গাছ খুঁজে খুঁজে গুণছি, দেখি জমজমাট কুণুর শহর এসে পোড়লো। দু'পাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ী, টালির ছাদগুলো দূর থেকে লাল লাল টুপির মতো দেখায়। পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত মোটরচলা রাস্তা গেছে। ওয়েলিংটনের সেনাছাউনীও পথে পড়লো; আর দেখলাম অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট কারখানা।

বেলা দুটো নাগাদ আমরা লাভডেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আপাততঃ আমরা এখানেই নামবো। অন্যান্য ষ্টেশনের থেকে এটা একটু বড়ো। পেছনেই নতুন বাড়ীতে ডাক ও তারঘর খুলেছে। ভাবলাম, যাত্রার শুরুতেই যখন এতো কিছু দেখলাম, না জানি তিনদিনের অবস্থানে আরো কতো কি দেখবো। হলোও তাই।

লাভডেল ষ্টেশনের পেছনেই উঁচু পাহাড়ের ওপরে রেলের সরকারী বিশ্রামভবনে আমরা আশ্রয় নিলাম। সুসজ্জিত সেই রেষ্ট-হাউস সমুদ্রতল থেকে সাড়ে সাত হাজার ফিটের মতো উঁচুতে। আরাম আয়েসের উপকরণের অভাব নেই। সারি সারি শোবার, খাবার, মজলিশের ঘর সবই আছে। সামনে বড়ো বারান্দা। বারান্দা কাচের আবরণে ঘেরা। বসবার বা খাবার ঘরগুলিতেও কাচের দোর-জানালা। যেখানেই বসি না কেন, বাইরের প্রকৃতির শোভা ও বিভিন্ন রূপপরিবর্তন অবারিত দেখা যায়। আমরা খানসামাকে চা পানের ব্যবস্থা কোরতে বোলে শোবার ঘরে ইলেক্ট্রিক রেডিয়েটার খুলে একটু গড়িয়ে পথশ্রম অপনোদন করলাম। বাইরের দারুণ শীত ও কনকনে হাওয়া এড়িয়ে গরম ঘরে বড়ো আরাম পেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় টোকা পড়লো। বেরিয়ে এসে খাবার ঘরে বোসলাম। ওয়েটার ইতোমধ্যে টেবিলে বিলেতী কায়দায় গরম দুধ, রুটী, চা ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছে। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমরা কাচের দরজা, জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের পার্ব্বত্যশোভায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলাম। মনে হলো শীতের কষ্ট আর ক্ষুধা নিবারণের তাড়া না থাকলে হয়তো বাইরে বোসে বা বেড়িয়েই বিকেলটা কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু সন্ধ্যাগমের সাথে সাথে শীতের প্রকোপ এতো বাড়লো যে বেশী দূরে যেতে ভরসা হোলো না। গরম চা দুধ ইত্যাদিতে শরীর একটু গরম হোলো না। ক্লোক চাপিয়ে বাড়ীটার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে হরেক রকম ফুলের বাগান, ফার্ণ পাইন ও আরো অনেক পাহাড়ী গাছে ঘেরা টিলাটি প্রদক্ষিণ করলাম। সন্ধ্যার আগেই কাচের ঘরে ফিরে এলাম।

সেই বাড়ীর পাহারাদারকে উটী থেকে তরকারী কিনতে পাঠানো হোয়েছিলো। ইতোমধ্যে সে ফিরে এলো। শীতের দেশের টাটকা ভালো শাকসবজী দেখে আমি কম্বল ছেড়ে রন্ধনশালায় ব্যবস্থা দিতে গেলাম। আমার স্বামী ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রান্নার সমস্ত ভার বাবুর্চির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আমি বাঙালী; তাই রন্ধন ব্যবস্থার ভার সম্পূর্ণভাবে শীতে জড়সড় বিলাতী কায়দাদুরস্ত সেই প্রৌঢ় খানসামার হাতে তুলে দিতে কিছুতেই রাজি হোলাম না।

কোলকাতার শীতের বাজারের মতো চমৎকার তরী-তরকারী দক্ষিণ-ভারতে বহুদিন পরে পেয়েও যে কোনও ভদ্রলোক স্বাদগন্ধহীন বিলাতী রান্নায় তৃপ্ত হোতে পারে ভেবে আমি আশ্চর্য্য হোলাম। বোলতে লজ্জা নেই, আমার প্রতিবেশী এতোক্ষণ ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে পাশের খাটে কম্বলের নীচেই ছিলেন এবং অনেক অনুরোধে কম্বলের নীচে থেকেই অতি কষ্টে কদাচিৎ জবাব দিচ্ছিলেন। তিনিও এবার আমার উৎসাহে সুখকর শয্যা ছেড়ে বার হয়ে এলেন আমায় সাহায্য করবার জন্য। ভদ্রলোকের বীরত্ব দেখে আমি তো অবাক! যাই হোক, মহোৎসাহে আমরা সকলে মিলে রান্না কোরে রাতের আহার শেষ কোরলাম।

পরদিন সকালে বাবুর্চি শোবার ঘরেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে গেলো। চা-পানের পর আমরা উটীর রাস্তা ধরে মাইলখানেক পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলাম। আর মাইল দুয়েক গেলেই উটীর কেন্দ্রস্থলে পৌঁছনো যেত। পথের দুধারে পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদদেশ পর্য্যন্ত সারবাঁধা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দেড় হাত দু-হাত উঁচু ঘন সবুজ পাতার কফিবাগান। পিঠে ঝুড়ি বেঁধে বহু মেয়ে কফিপাতা তুলছে। হঠাৎ 'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' ভেবে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভালো কোরে দেখি, দূর পাহাড়ে একজন লোক গাছের পোকা মারবার জন্য পাম্প কোরে ডি-ডি-টি ছড়াচ্ছে। আমরা এ পাহাড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়েও পাহাড়ে কফিবাগানের কথাবার্তা দিব্যি শুনতে পাচ্ছিলাম। কফিবাগানের প্রান্তে ফুলের বাগিচা-ঘেরা মালিকের রঙীন বাড়ী, ভারী সুন্দর মানিয়েছিলো। রাস্তার ধারে ধারে জংলী বিলিতী বন্য বা অনাদরে বর্দ্ধিত ফুলের ছড়াছড়ি—লাল, নীল, হলদে নানা রঙের বাহার। নীচে কোন্ অজানা উৎস থেকে নির্ঝরিণী কলকল শব্দে বয়ে চোলেছে আর উপরে কানের পাশে শোঁ-শোঁ করছে ঠাণ্ডা হাওয়া। আমাদের বেলা এগারোটার গাড়ীতে উটী যাবার কথা। তাই গরম ওভারকোট খুলে হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চললাম। পথে বেশ মজার ব্যাপার ঘটলো। দুটি লোক পথের ধারে ভেড়া চরাচ্ছিল। দূর থেকে আমাদের আসতে দেখে একজন রাস্তায় বোসে পোড়ে আর্তনাদ করে ভিক্ষে চাইতে লাগলো। আমরা পাশ কাটিয়ে আসতেই লোকটি তার ভেড়াদের পালে ফিরে গেলো।

দুপুরে হাল্কা গরম জামা চাপিয়ে লাভডেল ছেড়ে উটীর ট্রেণ ধোরলাম। গোটা দুই সুড়ঙ্গ ছাড়িয়ে প্রথমে ফার্ণহিল ষ্টেশন, তার পর উটীর বিখ্যাত লেকের ধার দিয়ে চোলে আমরা পার্ব্বত্য রেলপথের শেষ ষ্টেশন উটাকামণ্ডে পৌঁছলাম। এখানকার ষ্টেশন

মস্ত বড়ো। ইংরেজ-আমলের সাবেকী ঘরবাড়ীতে সাজানো ঝকঝকে শহর উটাকামণ্ড। আর আছে ইংরেজী ঐতিহ্যের পুরানো গির্জা ও রেসকোর্স। পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে-ধাপে সারে-সারে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে বহু ঘর-বাড়ী নেবে এসেছে শহরের কেন্দ্রস্থলের সমতল পর্য্যন্ত। আধুনিক যানবাহন মোটর-বাসের পাশেই চোলেছে ঘোড়ায়-টানা ঝটকা গাড়ী। মস্ত বড়ো বোর্ডে ও গাড়ীর গায়ে লাল অক্ষরে লেখা পোড়ে আমি আপন মনেই বোলে উঠলাম এখানেও ক্যালটেক্স।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে লেক চক্কর দিয়ে আমরা বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের বাগানঘেরা প্রাসাদ, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও রাজভবন দেখলাম। বরোদার মহারাজের প্রাসাদে ইদানীং আগমন কদাচিৎ হয়, তাই বাগানে জনকয়েক মালী কাজ কোরলেও যত্নের অভাব চোখে পোড়লো। তবে লতাপাতার ঝাড় কেটে ছেঁটে নানা রকম জীবজন্তু বা অন্য রূপে সাজান হোয়েছে। তার পরে গেলাম মহীশূরের মহারাজার উদ্যানবাটিকা দেখতে। সুসজ্জিত সুন্দর প্রাসাদ, পরিষ্কার খেলার মাঠ, নানা ফুলে ভরা বাগান দেখেই বোঝা যায় কাছেই মহীশূর বা ব্যাঙ্গালোর থেকে মহারাজা প্রায়ই আসেন। জমকালো দরবার-কক্ষের সিংহাসন, মূল্যবান আসবাবপত্র, ঝাড়-লণ্ঠন, গালিচা, বাঘছাল ইত্যাদি বিলাস উপকরণের শতাংশ পেলেও যে কোনও দরিদ্রের ভাগ্য ফিরে যাবে। পুরুষানুক্রমে অপচিত সৌভাগ্য-সম্পদের সামান্য নমুনা দেখেই বুঝলাম কিছুকাল আগেও ভারতীয় নবাব-নিজামদের বিলাসব্যসনের মাত্রা কেন ভুবনবিখ্যাত ছিল।

সেখান থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতর দিয়ে আমরা রাজভবন দেখতে চোললাম। সুন্দর সাজান বাগান, কোথাও ইতালীয় ধাঁচে, কোথাও বা জাপানী ধাঁচে। বিচিত্র ফুলের মেলা, রংয়ের খেলা। কোথাও অগভীর জলাশয়ে সেতু-বাঁধা, কোথাও বা কলসী-কাঁখে নারীমূর্ত্তি সাজানো। যেদিকেই দেখি রকমারি ফুলের ছোট-ছোট বাগান। বাগান ধাপে ধাপে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে রাজভবনের দিকে। এটি একটি বিরাট অট্টালিকা। বড় বড় কাচের দরজা-জানলা। শোবার বসবার, পড়বার, মজলিশের বিভিন্ন কক্ষ, বিচিত্র তাদের আসবাবপত্র। এক কক্ষের সঙ্গে কক্ষান্তরের আসবাবের ও বিন্যাসের কিছুমাত্র মিল নেই, কেবল আগুনের চুল্লী ও দেয়ালে দেয়ালে কাঠের কাজের আবরণ ছাড়া। রাজভবন ঘিরে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ শোভা আর স্থানে স্থানে রং-বেরঙের তারার মতো ফুটে রয়েছে দেশী বিদেশী ফুল। সামনে পেছনে কতো রকমের গোলাপ কতো রঙে চারি দিক আমোদিত কোরে রোয়েছে। অতি বেরসিকও এতো বড়ো বড়ো গোলাপের কদর বোঝে, কিন্তু একটু আদর কোরতে হাত বাড়িয়েছি কি, স্বামী দেখালেন কালোমুখে ছোট বোর্ড সাদা দাঁত বার কোরে ফুল তুলতে নিষেধ কোরছে। পেছনের টেনিস লন দুটি তারের জালে লতানে গোলাপ উঠিয়ে আড়াল করা আছে দেখলাম। রাজভবন থেকে আমরা নেবে এলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্য দিয়েই। কচি সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ ময়দানে মেঘের ছায়া খেলা কোরছে। ভ্রমণকারীদের ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি কোরে খেলছে। আজকের সভ্য মানুষ আমরা। বাইরে জুতো-চটীতে পায়ের পাতা মুড়েই চলি। দীর্ঘ দিন পরে সবুজ ঘাসে আস্তীর্ণ মাটীতে অনাবৃত পায়ে হাঁটতে রোমাঞ্চ লাগছিলো। তবে বাগানে বিহাররত আর সকলে যেরকম সকৌতূহলে আমাদের দুজনের জুতো-হাতে খালি-পায়ে চলার দৃশ্য উপভোগ কোরছিলেন তাতে একটু অস্বস্তি বোধ হোচ্ছিল বৈ কি! কাছেই আদিবাসী টোডাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে। তবে আজকের সভ্য মানুষ তাদের জীবন যাপন যেরকম পশুশালায় আবদ্ধ প্রাণীদের পর্য্যবেক্ষণ করার মতো দেখে, সে কথা ভাবতে কৌতুকের চেয়ে দুঃখই হয় বেশী। উটীর দুপুরে তাপ নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা আড়াইটা। কাজেই গার্ডেনের নিষ্ক্রমণের মুখেই যে দুজন পেশাদারী ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা বাগিয়ে ওৎ পেতে প্রতীক্ষায় ছিলো, তাদের নিরাশ কোরতে হোলো। স্বামী নিজের ক্যামেরাটি একবার তাদের দেখিয়েই এগিয়ে চোললেন। সিনেমা হল সংলগ্ন একটি আমিষ ভোজনালয়ে ঢোকা হোলো। শরীর তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পোড়ছে। কিন্তু হা অন্ন! তখন আদেশ মতো বিলিতী চপচপাটী আনতেই বাড়তি কথা না বোলে আহারে মনঃসংযোগ কোরলাম। নেপথ্যে সিনেমা হলের মধ্য থেকে ইংরেজী সুর ভেসে সুখ-বস্ত্রের অভাব পূরণ কোরলো।

ফেরার পথে ভাবলাম, এসেছি ট্রেনে, কাজেই সড়ক ধরে বাসেই লাভডেল ফিরবো। শহরের অঙ্ক বরাবর এই রাস্তাটি কেন্দ্রস্থলে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে গেছে। দুধারে ছোট বড় বহু দেশী-বিদেশী কায়দায় হোটেল, বহু দোকান-পাট। পণ্যসামগ্রীর জলুষের কোন অভাব নেই সে সব দোকানে। আর উটীর বিখ্যাত জংলী মধু ও ইউক্যালিপ্টাসের আরক তো আছেই। গুটিকয়েক সিনেমা হলে ইংরাজী তামিল ও হিন্দী ছবি চোলছে। আধুনিকতম হলটি বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হোচ্ছে। তবে উটীর আবহাওয়ায় এয়ার কণ্ডিশনের প্রয়োজন নেই। বাসে চড়ার প্রায় পনেরো মিনিট পরে ড্রাইভার গাড়ী ছাড়লো এবং প্রায় পনেরো মিনিট রেসকোর্সের চারি পাশে চক্কর দিয়ে পূর্ব্বের জায়গাতেই ফিরে এলো। অবশেষে বাস শহরতলীর পথ ধোরলো ও মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমরা লাভডেল পৌঁছে গেলাম।

শরীর খুব ক্লান্ত। চা-পানের পর আমার স্বামী আবার বাবুর্চির হাতে রান্নার ভার ন্যস্ত কোরে আমায় উষ্ণ কম্বলের ভেতর সুখে নিদ্রা যাবার হিতোপদেশ দিলেন। তিনি অতিকষ্টে চোখ দুটি-মাত্র কম্বলের মধ্য থেকে বার করে আমায় বোলে, পুনরায় কম্বলের মধ্যে অন্তর্হিত হোলেন। ভদ্রলোক আমার অনুরোধটুকু কোরতে এতো কষ্ট স্বীকার কোরলেন দেখে ভাবলাম বাবুর্চিকে ডেকে যা হোক মাংস ও এক তরকারী ভাত কোরতে দেওয়া যাক্‌। বাবুর্চি জানতে চাইলে কোন প্রণালীতে সে এই সব তৈরী কোরবে। অর্থাৎ সে কেবল ইউরোপীয়ান রান্নাই জানে। আমরা বিবেচনা করলাম রুচিসুখকর ইণ্ডিয়ান না হোলেও ইউরোপীয়ান স্বাদে যখন অভ্যাস আছে, তখন তাই রাঁধুক। সব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে কম্বল ও রেডিয়েটারের উষ্ণতায় একটু গা এলিয়ে দিলাম। কিন্তু হায়! এই জন্যেই কি রেহাই পেলাম? পাকস্থলীতে যে অগ্নিদেবের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে তা উপশম করবার জন্যে রন্ধনশালায় অগ্নিদেব কি ক্রোধ রাঁধছেন তাই দুশ্চিন্তা কোরছি; হঠাৎ খাটের পাশে

ঘরের জানালার বাইরে কিসের যেন শব্দ শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে জানালার ধারেই জোরে জোরে নানা রকম শব্দ পেলাম। প্রতিবেশীকে একথা জানাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হোলেন না। তিনি আমাকে অভয় দিলেন, বাইরে কোনো শত্রু নেই; রেডিয়েটার জেলেও যাকে তাড়ানো যাচ্ছে না সেই প্রবল শত্রু শীত-ঘরের মধ্যেই তাঁকে আক্রমণ কোরেছে। সেই দারুণ প্রতাপশালী শীতের কবল থেকে রক্ষা পেতে তিনি লাল কম্বলের দুর্গে আত্মগোপন কোরলেন। ভদ্রলোকের কাছে আর সাহায্যের প্রত্যাশা না কোরে নিজেই উঠে জানালার বাইরে টর্চ ফেলে চারিধার দেখলাম। কেউ নেই; শুধু অশরীরী আত্মার মতো বড় গাছ পালার ঝুঁটী ধোরে নাড়ছে; গ্যারেজের টিনের দরজায় ধাক্কা মেরে শব্দ কোরছে। নিশ্চিন্ত মনে নিজের বিছানায় ফিরলাম। এতক্ষণে আমার প্রতিবেশী অতিকষ্টে দুটি চোখ বার কোরে আমায় কুশল-প্রশ্ন কোরলেন।

তখন আমার রান্নার বন্দোবস্ত নিয়ে আশংকা জেগেছে। সঙ্গের ভৃত্য অনভ্যস্ত শীতে অসুস্থ হোয়ে পড়েছে। ডাক্তার যে পথ্যের নির্দেশ দিয়েছেন তাও তৈরী কোরতে হবে। আমার স্বামীও ততক্ষণে শীতের আক্রমণ খানিকটা সামলেছেন। তাই আমার সঙ্গে রন্ধনশালার খোঁজ-খবরে এলেন। গিয়ে আমাদের ভূত দেখার মতো হতবাক অবস্থা! বলি তাহলে শুনুন! চুল্লীর মুখে একটা পাত্রের ঢাকা খুলে দেখি তাতে প্রায় সের আড়াই জলে একটু নুনসহ আধ সের মাংস ও দুটি কাঁচা লংকা টগবগ কোরে ফুটছে। তবু অপর পাত্রটির আশায় ধৈর্য্য ধোরে তার আবরণ উন্মোচন কোরে ভূত দেখার পর প্রায় জ্ঞানশূন্য হবার অবস্থা। সেখানে দেড় সের জলে বাঁধা কপির কুচো আর নুন, ব্যস! তার চেয়েও বড়ো দুঃখের কথা যে, আমার স্বামী রেলের লোক খাদ্য-অখাদ্য বিচারের বিলাসিতা তাঁর কর্ম্মজীবনে কদাচিৎ পেয়েছেন।

পাকস্থলীসম্মত যে কোন বস্তু তিনি গলাধঃকরণ করা অভ্যাস কোরেছেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, আদিমকালের ইউরোপীয়ান ঋষিদের অকৃত্রিম প্রণালীতে প্রৌঢ় খানসামা যা রেঁধেছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার কোরে ফেলাই ভালো। রাগে তখন আমার সর্বশরীর জলছে এবং মুখে একমাত্র মাতৃভাষা বেরোচ্ছে। ভাগ্যক্রমে আমার আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুই-ই বাবুর্চ্চির কাছে সমান দুর্বোধ্য। কাজেই তার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড কোরে আমরা যখন ইউরোপীয়ান সেদ্ধগুলোকে ভারতীয়-স্বাদের উপযোগী কোরতে কোমর বাঁধলাম, তখন সে সোৎসাহে আলমারী খুলে কাচের বাসন, প্লেট, ছুরি, কাঁটা, চামচে খাবার টেবলে দক্ষতার সংগে কেতা-অনুযায়ী সাজাতে লেগে গেলো।

পরদিন সকালে শাকসব্জী কেনার উদ্দেশ্যে আবার আমরা উটী গেলাম। মস্ত বড়ো বাজার। দোকানে দোকানে নানা রকম তরকারী থরে-বিথরে সাজানো। শীতকালের সমস্ত আনাজই আছে। দোকানী মাদ্রাজে নিয়ে যাবার উপযোগী কোরে বড়ো ঝুড়ি বেঁধে আলু, দু রকমের কপি, টোম্যাটো, বীট, গাজর, ভুট্টা, পেঁয়াজ ভরে দিলো। সস্তা ভেবে এক বিঘত লম্বা ভালো মটরশুঁটি পাঁচ সের কিনলাম। কিন্তু বিলের শেষের অঙ্কটা দেখে তো অবাক! অনুসন্ধানে বুঝলাম, সাড়ে কুড়ি টাকা হিসাবের বড় অঙ্ক [illegible] পড়েছে। উত্তর ভারতের অতি সাধারণ মটরশুঁটি দক্ষিণ দেশে সত্যিই দেবদুর্লভ। প্রবেশমুখে বিভিন্ন বাজার-দর অবশ্য তামিল ভাষায় লেখা ছিল, কিন্তু সেটা অবস্থাভেদে আমাদের নিরক্ষরতাকেই উপহাস করেছে।

হাতে সময় ছিলো। পায়ে হেঁটেই হ্রদের দিকে চললাম। পথে দু-একজন শ্বেতাঙ্গকে অশ্বারোহণ-অভ্যাস করতে দেখলাম। তখন রেসের সময় নয়, কাজেই ময়দান ফাঁকা। হ্রদটি বেশ মনোরম, তবে কোডাইকানালের লেকের অতুলনীয় শোভা এখানে নেই। সরকার থেকে নৌকো ভাড়া দেবার ব্যবস্থা আছে। তাতে করে আমরা ঘন্টাখানেক নৌকাবিলাস করলাম। আমার স্বামী সংগে মাঝি নিলেন না। নিজেই দু' হাতে দাঁড় টেনে লেকের মাঝে নৌকো বেয়ে চললেন। আমি আগে নৌকা বাইবার চেষ্টা কখনো করিনি। তিনি আমায় বললেন, 'সাহস করে একবার চালাও দেখি।' এক দাঁড়ে তিনি রইলেন, অপরটা আমায় দিলেন। আনাড়ী হাতেও দেখি বেশ চালাচ্ছি। গত আধ ঘণ্টা স্বামীর অক্লেশে দু' হাতে দু'খানা দাঁড় টানা দেখে ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা সহজসাধ্য। কিন্তু দু' হাতে একখানা দাঁড় অল্পক্ষণ টানাতেই হাঁপিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক অনুমতি দিলেন, 'থাক, আর চালাতে হবে না।' কিন্তু তখন আমার বেশ মজা লাগছে, কাজেই পারে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত চালিয়ে গেলাম। সে কি আনন্দ! কিন্তু আমরা দু'জন ছাড়া রোদ ও ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে লেকের বুকে তখন দু'টি বিদেশী পরিবার মাত্র নৌকাবিহার করছিলেন। একটিতে বুড়ো-বুড়ী পাঁচটি বিভিন্ন বয়সী মেয়েকে নিয়ে ঘুরছিলেন। অপর কর্ত্তা-গিন্নীর নৌকো তাঁদের ছোট থেকে বড়ো পাঁচ জন ছেলেতেই সোৎসাহে পালাক্রমে টেনে পাশে এনে ফেললো। পঞ্চকন্যার পিতা পাঁচ জোয়ানের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেন। আর সময় হাতে না থাকায় আমরা উটী ষ্টেশনে ফেরার পথ ধরলাম। কাজেই বাইচের শেষ দৃশ্য দেখা আর হোলো না।

বড়ো শ্রান্ত হয়েছিলাম। কাজেই লাভডেলে ফিরে অল্প কিছু আহার সেরে লাল কম্বলের ভেতর আশ্রয় নিলাম। প্রতিবেশী তাঁর কেল্লার ভেতর থেকেই জানালেন যে, খাতায় তিনি শুধু ঘর থেকে ঘরেই নয়, বিছানা থেকে বিছানাতে টেলিফোনের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব লিখে যাবেন। এমতাবস্থায় রাত যখন দশটা, আমার নীলগিরি নৈশ শোভা দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে। স্বামীকে সেকথা জানালাম। আজও বোলতে পারি না সে-রাতে তিনি স্বেচ্ছায় বা আমার সামান্য আশা পূরণের জন্য তাঁর কেল্লা ছেড়ে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে বেরোলেন। অবশ্য তিনি শীতের সংগে সংগ্রামে সাজপোষাকের কিছু বাকী রাখেননি। সর্বোপরি প্রিন্সকোটটিও চাপিয়ে নিলেন। অবশ্য প্রচুর গরম জামা পরা উচিতই হোয়েছিল। কারণ, বেরুতেই ভীষণ কনকনে শীতের মালুম পেলাম। শন শন করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, একটু একটু পাতলা বৃষ্টিও পড়ছিল। সঙ্গে ছাতা ও টর্চ ছিল। ভাবলাম, যখন বার হয়েছি, খানিকটা ঘুরেই আসি।

রেষ্টহাউসের বৈদ্যুতিক আলো ছাড়তেই চারিধারে মেঘে-ঢাকা জমাট অন্ধকার যেন আমাদের চেপে ধরলো। দূর পাহাড়ের চূড়োয় কেবল মিশনারী স্কুলের কয়েকটি আলো জোনাকীর মতো জ্বলছে। আঁকাবাঁকা ঢালু রাস্তা বেয়ে ষ্টেশনের দিকে নামতে লাগলাম। ডাল পালা রেলিংয়ের বাইরে পাইন ও নানা রকম আকাশছোঁয়া

গাছ ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় রাস্তা দেখে নিয়ে সেই অন্ধকারে অন্ধের মতো হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূর যেতেই পাশের জঙ্গল থেকে অজানা শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় যেন পায়ের গতি মন্থর হোয়ে এলো। কিন্তু তবুও হেঁটে যাই, কি এক কৌতূহলের নেশায়! গভীর অন্ধকারের অতলে ডুবে আমি কেমন না জানি দিশাহারা হোয়ে গেলাম। স্বামী যখন ডান বা বাঁ কোন দিকের পথ ধরবেন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বললাম, 'আর না এগিয়ে ফেরাই ভালো।'

আধুনিক নগর-জীবনে বাস করে এতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অভ্যাস নেই; তাই হয়তো অহেতুক আশংকায় গা ছমছম করছিল! তাই বা কেন? অন্ধকারের বুক চিরে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিত্ত ঝলমল না কোরে ভয়ই তো বাড়লো বেশী, যখন আমাদের পাশেই একটি মোটরগাড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেলো বিপরীতগামী অপর একটি জীপকে পথ ছেড়ে দিয়ে। নৈশ অভিযানে আর এগোতে দুঃসাহস হোলো না। গাড়ী দু'টি চলে যেতেই দ্রুতপদে চড়াইয়ের রাস্তাটুকু হেঁটে রেষ্ট-হাউসে ফিরে এলাম। অন্ধকারের আতঙ্ক থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে হাঁফ ছাড়লাম।

তিন দিন ধোরে নীলগিরির কোলে প্রাণ ভরে বেড়ানো হোলো। তার পর ২১শে আগষ্ট লাভডেল ছেড়ে রওয়ানা হবার জন্য তৈরী হোলাম। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য সাজেসৃশন বুকে বিশ্রাম-ভবনের দেয়ালে সাজানো আজকের দিনে দৃষ্টিকটু বিজাতীয় কুকুর ও ঘোড়সওয়ারদের ছবিগুলো সরিয়ে ফেলতে বিশেষ কোরে লিখলেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ নীচে নামবার এক্সপ্রেস-ট্রেণ ধরলাম। ফুলের দেশ থেকে ফেরার পথে অনেকেই রকমারি চারাগাছ মাটির বা কাঠের টবে ভরে নিয়ে চোলেছেন। সারা দিনই মেঘলা। গরম জামা-কাপড় পরে আছি। প্রতি পাকে ট্রেণ নীচে, আরো নীচে নামছে। চারি পাশে মেঘ থেকে অল্প-স্বল্প বৃষ্টিও হোচ্ছে। পাহাড়গুলোর মাঝে ফাঁকে-ফাঁকে মেঘ খেলে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো মেঘে মেঘে শুভ্র হয়ে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে কালিদাসের বর্ণনায় বাচ্চা হাতীর পালের মতো আস্তে আস্তে মেঘদূতেরা উঠে আসছে রৌদ্রদগ্ধ দক্ষিণাপথের হাহাকার বহন কোরে। মাদ্রাজে ফিরেই আবার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যকে তৃষ্ণার্ত্ত রেল-ইঞ্জিনের জন্য জলের সন্ধানে কতো বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে। আর এখানে ঘন জঙ্গলের উপর পেঁজ-তুলোর মতো সাদা মেঘ অবাধ আনন্দে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের গাড়ীও মাঝে মাঝে তাদের ভেদ করে নামতে লাগলো। অনেক সময় বেশ দূরে সরে এলে তখন বুঝতে পারি এতক্ষণ মেঘ কাটিয়ে এলাম। ফিরতি পথে বর্ষাচ্ছন্ন নীলগিরির রূপ দেখলাম।

একটি-দু'টি কোরে আবার টানেলগুলি পার হোয়ে গেলো, যেন কত দিনের চেনা। টানেলের ভেতরে লাইনের দু'পাশে বর্ষার জল নিকাশের নানাবিধ ব্যবস্থা। ধ্বস নিবারণের জন্য পাহাড়ের গায়ে রিটেনিং-ওয়ালের দেয়ালে বহু উইপ-খোল বা জলছিদ্র দিয়ে কৌটায় কৌটায় জল চোঁয়াচ্ছে। চড়াইয়ের পথের অচেনা স্থানগুলো ফেরার পথে যেন বহু পরিচিত বোধ হচ্ছে। চারিপাশের সোজা সিঁড়ি চোখে দেখতে দেখতে আমি অন্যমনস্ক হোয়েছি, দেখি দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যরশ্মির হালকা-লাল আলো উঁকি মারছে। মুখ ফসকে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'এখন সকাল ক'টা হবে? সূর্য্যোদয়ের ভোরের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

স্বামী পরিহাসের সুযোগ নিয়ে বললেন, 'হাতে ঘড়ি বেঁধে সময়ের হিসেব নেই? সূর্য্য উঠছে না, অস্ত যাচ্ছে?' নিজের প্রশ্নে ও তাঁর উত্তরে খুব লজ্জায় পোড়ে গেলাম। সূর্য্যদেব মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমায় সত্যিই ঠকিয়েছেন। মেঘে মেঘে কখন বেলা গেছে, টেরই পাইনি।

নীলগিরির ঘনারণ্যে সূর্য্য ও মেঘের লুকোচুরি খেলায় আমিও মনে মনে যোগ দিলাম। যখন কোনও পাহাড়ের চূড়োর উচ্চতা অনুমান কোরতে উদ্‌গ্রীব হোয়ে উপরে দৃষ্টিপাত করি, তখন সূর্য্যি ঠাকুর দিগন্তবিস্তৃত মেঘের আড়ালে লুকোন, আবার যখন কাছেই ঝুলন্ত মেঘের ভেলায় মনমাঝিকে ভাসিয়ে দিই, সেই অবসরে তিনি আচম্বিতে আমার মুখে আলো ফেলে টুকী দেন! শেষ পর্য্যন্ত সে খেলায় আমিই হারলাম। যতই নীচে নেমে এলাম, ততই পালকের মতো সাদা মেঘের আস্তরণ পুরু হোলো, তার ওপরে নীলগিরির বুকে তিনি কখন মুখ লুকোলেন জানতে পারলাম না। মেট্টুপালয়ম ছাড়তেই সন্ধ্যা নেমে এলো। চোখের সামনে নীলগিরি গত রজনীর সুখস্বপ্নের মতো স্মৃতিতে মিলিয়ে গেলো।

বরষাসুন্দরী

পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর আকাশ হ'তে ধরণীর কক্ষপথে
নেমে আসে বরষাসুন্দরী;
ঝর ঝর ঝরে জল শতধারে অবিরল
ধরণীরে সুশীতল করি।
নিদাঘ তাপেতে হায়, জীবকুল মৃতপ্রায়
শ্বাসবায়ু বহিছে সঘনে
পরশি শীতল বায়ু লভিলা নূতন আয়ু
বরষার স্নেহধারা সনে।
মুগ্ধা জননীর প্রায় স্নেহের পরশে হায়
জুড়াইলা তাপ-জ্বালা সবে
ঘুম পাড়ানিয়া গানে জগতে আবেশ আনে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ রবে।
সুকেশিনী মেঘে ভাসি নিবিড় কুন্তল রাশি,
এলাইয়া ধায় বায়ু-রথে
হাসির চমকে হায় সৌদামিনী শোভা পায়
মিলাইয়া যায় অর্দ্ধপথে।
ম্লান ধরণীর গ্লানি মুছিতে বরষা-রাণী
বর্ষে-বর্ষে এস এ ধরায়
সঞ্জীবিত কর বিশ্বে, নবীন মোহন দৃশ্যে
পূর্ণ করো নবীন আশায়।

মধ্য-রাতের কবিতা

প্রতিভা রায়

কী একটা স্বপ্নের পর ঘুমটা হঠাৎ যেন্ ভাঙল।
কান পেতে শুনি শুধু মশকের গান।
সে গানের দুর্ভেদ্য ভাষা আমার মনেতে
নতুন চেতনা এক আনল।

অসহ্য গুমোট রাত। বিছানায় বয়ে গেছে বান।
ঘামেতে ভিজেছে দেহ। উঠে গিয়ে ছাদে দাঁড়ালাম।
ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে উর্দ্ধে আকাশে তাকালাম।
দেখি যেন আকাশের বুকে
 দুর্ভেদ্য ভাষায় লেখা কার যেন নাম।

ফের গিয়ে শুয়ে পড়ি বিছানায়।
কানে বাজে একঘেয়ে মশকের গান,
গানের কথার সাথে আকাশের তুলনা করি,
মনে মনে শুধু এক মিল খুঁজে পাই :
এই গানে যার ভাষা, তারি নাম আকাশের গায়।

হেথা নয়

বকুল বসু

চল যাই, ওগো, চল চলে যাই।
রব না হেথায় ক্ষণকাল আর,
আর নয় সন্তাপের পারাবার—
চল দূর হ'তে দূরে চলে যাই।

যেখানে মানুষ নাই, অন্যায় বিচার নাই,
সেই দেশে চল ওগো হৃদয়ের ব্যথী,
হব দূর-দূরান্তরের সাথী—
ভেবনা ক্ষণেক আর, চল চলে যাই।

হেথা ব্যথা-ভরা স্মৃতি জাগে বারে বার, তাই
হৃদয়ে আগুন জ্বলে—ভীষণ আগুন—
তবু ওগো এলো যে ফাগুন।
সাথী ত্বরা করে চল, মোরা চলে যাই।

আজ সব মুছে হৃদয়ের গান শুধু গাই,
তুমি শুধু রবে কাছে—আরও কাছে—
ওগো, হৃদয়ের গভীরতা মাঝে।
তবু হেথা নয় ওগো হেথা নয়, চল চলে যাই।

বস্তি

কান্তা দাশ

এখানে বস্তির ঘর
দুরন্ত বৈশাখে,
ঘূর্ণী ঘোরে হু-হু করে
আগুন বাতাসে।
ঘরের কাজ এইমাত্র সেরে
মধ্যদিনের গৈরিক প্রহরে
সুকান্তের কয়েকটা কবিতা পড়লাম।
কবিতা! না যেন বাঁধছেঁড়া পাগলা জোয়ার গান।
 "অবাক পৃথিবী অবাক
 সেলাম তোমায় সেলাম
 এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।"
তারপর?
যৌবনের উপোসী প্রাণ
এ যেন বিদ্রোহের আরেক অভ্যুত্থান,

নিঝুম বস্তির পাশে
এলো-মেলো কালবৈশাখী প্রেতিনীর হাসি
কচি-কঙ্কালসার শিশুর গোঙানি,
এ যেন কুঁকড়ে কুঁকড়ে কুকুর-জীবনের অকাল মরণ।
আজ
আমি দেখেছি নর-দানবের বড় নিষ্ঠুর পীড়ন—
অবিবেকী অতি নির্যাতন মনুষ্যত্বের।
তাই
বস্তির পাঁজরে পাঁজরে
আত্মক্লান্ত মহাকাল—
বেদনার কি মহা জিজ্ঞাসা তার;
বস্তির অন্তিম আঁধারে
যে শিশু নতুন শপথের বাণী নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে,
সেই শিশুর প্রসব কত দূর?

একনিষ্ঠ বলিষ্ঠ তার সাথে
সুমুখে তার যে ঘোর সংগ্রামী পথ,
তাই
দম-আটকানো বস্তির জীবন-বৈশাখে

এক ঝলকে
সবার
চোখে...

রাগপ্রধান বনাম বাংলা খেয়াল

অধুনা রাগপ্রধান গান কথাটি বাংলা দেশের সঙ্গীত-সমাজে বিশেষ ভাবে চালু হয়েছে। বর্ত্তমান সঙ্গীত-সমাজের শিল্পিগণই মনে হয় এই নামকরণের স্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টির প্রাক্কালে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে—"আমাদের সঙ্গীত নিছক স্বেচ্ছাচারিতা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা যুক্তি ও তথ্যে পূর্ণ একটি কলাসম্পদ। মাত্র আচারভ্রষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারাই কলুষিত হইয়াছে ও যাহা দৃষ্টে আমরাও নিষ্ঠাহীন, অবিশ্বাসী ও বিপথগামী হইতেছি।"

(সঙ্গীতঅনুসন্ধিৎসা)

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকার ও সুরকারগণ কেহই মূর্খ ছিলেন না। বরং সকলেই উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন—যা তাঁদের রচনাবলী পাঠেই জানা যায়। তাঁদের কোন সৃষ্টিই পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল না বরং সুসংবদ্ধতার এক অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ অক্ষয় অমর হয়ে যুগ যুগ ধরে বিরাজিত রয়েছে।

সৃষ্টির এক ভয়াবহ মোহ বর্ত্তমানে আমাদের পেয়ে বসেছে যা মনে এনে দেয় দ্বন্দ্ব দলাদলি সন্দেহের তুফান। এ প্রশ্নের উদ্ভবের যথেষ্ট কারণ বিভিন্ন ভাবে বর্ত্তমানে দেখা দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল রাগপ্রধান কি? ইহা কি রাগের বিশুদ্ধ প্রকাশ? খেয়াল (হিন্দুস্থানী) সঙ্গীতের পরিপূরক? বাঙালীর নিজস্ব উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সৃষ্টির প্রয়াস? বাংলা রাগপ্রধান গান ও বাংলা খেয়াল-ঠুংরী কি পৃথক বস্তু নয়? বাংলা রাগপ্রধান গানের পাশে বাংলা খেয়াল গানকে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বলে স্বীকার করা হবে তো? রচনা বাংলা হলে কি তা খেয়াল-ঠুংরী-পদবাচ্য হবে না? ভাষা দৃষ্টে কি রাগসঙ্গীত নির্ণয় করা হবে? স্বরই কি আসল নয়? যন্ত্রসঙ্গীতে কি ভাষা প্রকাশ পায়, না কি স্বরসমূহের নির্দিষ্ট বিন্যাস দেখেই রাগসঙ্গীত নির্ণীত হয়?

সঙ্গীতের শ্রেণীবিচারে আমরা অক্ষম হয়েছি বলেই আজ এত সংকট উপস্থিত হয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি দরদ থাকলে রাগসঙ্গীত নির্ণয়ের দৃষ্টি থাকলে কখনই এরূপ অবস্থা হোত না। আমরা বোধ হয় এ দিকটায় দু' চোখই হারিয়েছি।

আজ স্থির মস্তিষ্কে সঙ্গীত-সমাজকে বিচার করতে হবে রাগপ্রধান কি—খেয়াল-ঠুংরীই বা কি? এদের শ্রেণী কি আলাদা নয়?

আরোহী-অবরোহী স্থায়ী-অন্তরা বাদী-সম্বাদী-অঙ্গ-পায়কী-বিস্তার তান-বাট—লয়কারী প্রভৃতি নির্দিষ্ট স্বরসমূহের স্ববিন্যাস দেখেই কি আমরা রাগ-নাম নির্ধারণ করি না? বিচার করে দেখতে হবে রাগপ্রধান কি।

প্রচলিত মতবাদ, যে গান একটি বা ততোধিক রাগসমন্বয়ে গঠিত এবং যাতে একটি রাগের প্রভাবই প্রধানরূপে বর্ত্তমান, তাকেই রাগপ্রধান গান বলে। রাগপ্রধান গানে কোন বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন মানা হয় না। বাণীবহুল হাল্কাধরণের আধুনিক ধাঁচের রচনা দেখা যায়। বড়জোর তফাটুকু খেয়ালের চালে।

কিন্তু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের (খেয়ালে) গঠন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের—উপরি উক্ত রীতি সেখানে প্রযোজ্য হয় না। এখানে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। নতুবা বিন্দুমাত্র ত্রুটির ফলে রাগ-রাগিণী নাম-রূপ ভ্রষ্ট হয়; উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-পদবাচ্য হয় না। সে নিয়ম-কানুন কি? এখানে সেই গঠনকৌশলের কথা।

অর্থাৎ নির্দিষ্ট আরোহী-অবরোহী স্থায়ী-অন্তরা বাদী-সম্বাদী অঙ্গ-বিস্তার তান-বাট লয়কারী ও ঠাট পরিচয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন। অন্যথায় এ গান রাগসঙ্গীত-পদবাচ্য হবে না রংপ্রধান বা রাগপ্রধান নামই প্রাপ্ত হবে। রাগসঙ্গীতে কোন বিশেষ ভাষার একচ্ছত্রতা অন্ধভাবে গোঁড়ামী দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিদ্বেষ বশতঃ অনুসরণ করা উচিত নয়—অন্য ভাষার প্রতি ঘৃণাপরবশ হয়ে।

"—বদ অভ্যাসটা এমন শেকড় গেড়েছে মনের মধ্যে যে, গাইলুম হয়তো পুরোদস্তুর একখানি খেয়াল (ঠুংরী), কিন্তু তার ভাষাটা যেই হল বাংলা অমনি ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বলে ফেললুম এটা খেয়াল-ঠুংরী'নয় গো, এটা রাগপ্রধান। খেয়াল-ঠুংরী তার সুরের গড়নে ভাষার সংগে কি তার সম্পর্ক? কিন্তু খেয়াল-ঠুংরী গাইলেই 'সেইয়াটিকে' না হলে আমাদের চলছে না!

······একদল আছেন যাঁরা বলেন, খেয়াল-ঠুংরীর মধ্যে আবার ভাষা নিয়ে ব্যস্ত হও কেন? সুরের ক্ষেত্রে ভাষাটা কিছু নয়।

ভাষার যদি কোন প্রয়োজনই নেই খেয়াল-ঠুংরীতে, তাহলে রামকিরি রাগের গান গাইতে ভোর কি 'চিড়িইয়াকে' দরকার লাগে কেন? ভাষার দরকার আছে, ভাষাকে বাদ দেওয়া যায় না, যায় নি। তার জন্যেই, বাঙালী শ্রোতা ও বাঙালী গায়ক-গায়িকাদের জন্য তার নিজের মাতৃভাষায় খেয়াল-ঠুংরী তৈরী করতেই হবে। রাগপ্রধান বলে ভয়ে ভয়ে হাজির করলে চলবে না। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, খেয়াল গান গাইছি।" (দৈনিক বসুমতী)

আজ সঙ্গীত-সমাজকে ও শিল্পিগণকে রাগপ্রধান ও বাংলা খেয়াল-ঠুংরীর শ্রেণীবিচারে অগ্রসর হতে হবে। নতুবা সংকটের আবর্তে হাবুডুবুই আমরা খাব—বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে আমরা সক্ষম হব না।

মজ্জ রাখতে হবে যে, যে কোন সুনির্ব্বাচিত উন্নত ধরণের ভাষার মাধ্যমেই রাগসঙ্গীতের বাণীরচনা করা সম্ভব। যদিও নূতন ভাষার সুশব্দ চয়ন দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

এ কঠিন কাজে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মূলসূত্র এই যে, রচনা ভাবসমৃদ্ধ হবে। ভাষা দাঁত-ভাঙ্গা ভারী বা খুব হাল্কা ধরণের হবে না।

হিন্দীর সমান স্তরে বা ঢঙ্গে গান বাঁধতে হবে। রচনা নিশ্চয়ই ৪/৬ সারির অধিক হবে না। তবেই হিন্দীর সহিত ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে—উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-পদবাচ্য হবে। রচনা হাল্কা-ভারী মিশ্রিত বাণীবহুল অবস্থা প্রাপ্ত হলেই এবং অন্যান্য নিয়ম-কানুন পালন না করলেই গান রাগপ্রধান বা রংপ্রধান হবে বলে মনে করি।

অভিজ্ঞ সংগীতশিল্পীর অনুসন্ধিৎসু মন নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, হিন্দী ভাষায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র কারণ এ ভাষার পক্ষে দীর্ঘদিন যাবৎ অসংখ্য গবেষক ও গুণী সাধক সঙ্গীতজ্ঞের ও গান রচয়িতাগণের নিরন্তর সাহায্য—সর্ব্বোপরি সম্রাট-বাদশাহগণের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা।

অধিক অগ্রসর ও উন্নত শিল্পিবৃন্দ অনুভব করিতে পাবেন যে, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের জন্ম (অপরাপর হিন্দী-গানেও) হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন সংগ্রাহক ও গুণীজন কর্ত্তৃক আংশিক ভাবে (টুকরা টুকরা) অসংখ্য সুশব্দ সুনির্ব্বাচন যেন অলৌকিক ভাবে করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা যেন কোন না কোন ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আবার দেখা যায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে (হিন্দী-ভাষার ক্ষেত্রে) গায়কেরা লয়কারী করতে গিয়ে শব্দের বিচ্ছিন্নতা এলেও, অর্থ বিকৃত হলেও আমরা শ্রোতারা বিনাদ্বিধায় মেনে নিই। কিন্তু কই, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের এই উদারতা কোথায়? এক্ষেত্রে আমরা হৈ-চৈ করে উঠি। বুঝি সব একাকার হয়ে গেল—ভাষা রসাতলে গেল। দরদ উথলে উঠল! বাংলা ভাষায় খেয়াল-ঠুংরী হয় না। বাংলা খেয়াল-ঠুংরী রচনাকারীকে ও সঙ্গীত পরিবেশনকারীকে এই ভাবে নিবৃত্ত করা হল।

বাংলা ভাষায় খেয়াল-ঠুংরী হয়। এ সত্য অচিরেই প্রত্যেককে স্বীকার করতেই হবে। আজ এ সত্য আমরা নিজেদের স্বার্থের কারণে স্বীকার করছি না। কারণ, বাঙালী শ্রোতা তার মাতৃভাষার মাধ্যম একবার পেলে—নিজভাষার অপরূপ মোহিনী-শক্তির পরিচয় পেলে নামীদের আজ রুজি-রোজগার কমে যাবে (কারণ স্বীকার করলেই গাওয়ার দায়িত্ব আসবে আবার সৃষ্টির ক্ষমতা সকলের নেই, বিশেষ করে বাংলা খেয়াল-ঠুংরী রচনা)

"…বাংলা ভাষার বিশুদ্ধ খেয়ালের প্রচলন খুবই কম। যাঁহারা খেয়াল শ্রেণীর গান করে তাঁহারা হিন্দী ভাষা রচিত গান ছাড়া অন্যদিকে বিশেষ নজর দিতে চান না। কিন্তু বাংলা ভাষার আলংকারিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এই ধরণের গান গাওয়া যায় কি না সে সম্বন্ধে গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়—।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

তাছাড়া…"সঙ্গীতে রস, রাগের অধীনই হউক বা ভাষার অধীনই হউক, একথা নির্ভরতার সহিত বলা যায় যে, 'আগে ভাব ও পরে রূপ'। ভাষার মাধ্যমে এই ভাব-রসটি যেমন সহজলভ্য ও সহজবোধ্য হয়, রাগ মাধ্যমে এরূপ হইবার সুবিধা সবিশেষ নাই। তবে এখানে ভাষা নিজ সমৃদ্ধির জন্ম যেমন রাগকে আশ্রয় করে, রাগও তেমনি নিজ রঞ্জকতার এক বিশেষ অলংকার হিসাবে ভাষাকেও একান্ত আপন বোধে গ্রহণ করে।" (সঙ্গীতঅনুসন্ধিৎসা)

সৎপ্রচেষ্টার মূল্য আছে। চিন্তনীয় হিন্দীর মত শত শত বৎসর না হোক, দীর্ঘদিন যাবৎ কি বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত রচনায় অনুশীলন আমরা করেছি? তবে কেন বলা হবে যে বাংলা খেয়াল-ঠুংরী হয় না? ধৈর্য্য ধরে আমাদের সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতই অসুবিধা দেখা দিক না কেন।

তবে সাবধান জাত পাট (শ্রেণী-বিন্যাস) যেন ঠিক থাকে। রাগপ্রধান ও খেয়াল-ঠুংরী যেন একাকার হয়ে না যায়। আমরা যেন অপর ভাষার নিকট উপহাসাস্পদ না হই। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায় যে, বাঙালী মুষ্টিমেয় গায়ক-গায়িকা (যাঁরা গুরু-স্থানীয়) আজও হয়ত অক্ষমতা বা গোঁড়ামীর বশে বাংলা ভাষার কার্যক্ষমতা অস্বীকার করবেন, কিন্তু সাধারণ বাঙালী শ্রোতৃ-সমাজ ও উদার সাধক গুণী ব্যক্তি ও সর্ব্বোপরি অবাঙালী গুণী সমাজও একথা জোর করে বলা চলে যে, সত্যকার বাংলা খেয়াল-ঠুংরী রচিত এবং গীত হলে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন দ্বারা মেনে নেবেন।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মাধ্যমে মানব-সমাজকে স্বর্গীয় আনন্দের সন্ধান দেওয়া যায়। সেই সন্ধান দেবার পথ হল রাগ-রাগিণীর

অলৌকিক সুরপথ। এ পথ বেয়ে গায়ক কি ভাবে শ্রোতৃসমাজকে আনন্দসাগরে অবগাহন করাবেন? সে হল শ্রোতৃসমাজের মাতৃভাষা। এই ভাষা যখন কার্যক্ষেত্রে বাংলা খেয়াল-ঠুংরীর মাধ্যম হবে তখন এক অনাবিল রসাস্বাদনের পুলকে ভাবে-রসে শ্রোতৃসমাজ স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করবে, তার অসীম ক্ষমতা মানুষের পঙ্কিলতা মলিনতা নীচতা অশান্তি দূর করে দেবে।

মানুষের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ হবে। সমাজের সুস্থতা ফিরে আসবে। ভক্তিমূলক গানের প্রাবল্য দেশে বাড়বে, চটুল কুৎসিত গানের অপমৃত্যু ঘটবে—রাগ-রাগিণী পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। স্বাধীন ভারতে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে মাতৃভাষার উন্নয়নে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাগপ্রধান গেয়ে মন যদি কিছুটা তৃপ্তি পায়—চলুক না। ক্ষতি কি? কিন্তু তাই বলে রাগপ্রধানই সব—রাগ-রাগিণী বাংলা ভাষায় প্রকাশমান হলেও এ ভুল ধারণা আমরা যত শীঘ্র ভুলে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

রাগপ্রধান এবং খেয়াল-ঠুংরী একেবারে পৃথক জিনিষ বলে মনে রাখতে হবে। তবেই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের দরবারে বাঙালীর বাংলার সম্মান বাড়বে—বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত জনপ্রিয়তা লাভ করবে। এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী হতে পারেন বঙ্গ-সঙ্গীতের সেই সব নামী-অনামী সাধক-সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি আমি আবেদন জানাই। আপনারা আজ এগিয়ে এসে বাংলা ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করুন—বাংলা খেয়াল-ঠুংরীকে স্বীকার করুন। নিজেদের সৃষ্ট সত্যকার বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গান সর্ব্বত্র (রেডিও, সিনেমা, সম্মেলনে, জলসাতে) প্রচার করুন, খেয়াল-ঠুংরী হিসাবেই, রাগপ্রধান হিসাবে নয়।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে দুই ভাবে।

প্রথমতঃ—সুরের প্রতি—রাগবিস্তারের প্রতি—দরদের প্রতি শিল্পীর দৃষ্টির অভাব।

দ্বিতীয়তঃ—প্রদেশবাসীর মাতৃভাষায় মাধ্যমে গান রচিত না হওয়া। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া প্রদেশবাসীর মুখ ভরে, পেট ভরে না। রসাস্বাদনের ভাবগ্রহণের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটে। 'আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়।'

কাজেই গানে ভাষা ও সুরের প্রাধান্য না দিয়ে কেবলই তান-বাটের দাপাদাপি করলে (অবশ্য সঙ্গীতের সুর ও শুদ্ধতা বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করতে হবে) ভাষা, ভাব ও অর্থ শ্রোতৃসমাজের বোধগম্য না হলে তাঁহারা যে ভক্তিমূলক সুরাশ্রয়ী গান ও কীর্ত্তনগানের আসরে অন্যথায় হাল্কা চটুল গানের আসরে হাজির হবে, তা স্বাভাবিক।

সেজন্য আমাদের আজ বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গান রচনায় ও সাধনায় দ্বারা সুর আয়ত্ত করে ঈশ্বর-নাম-গুণকীর্ত্তন করার মাধ্যমে দেশবাসীর ভিতর ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তাই বলে ভয়ে ভয়ে অন্ধ গোঁড়ামী বা বিদ্বেষ বশতঃ দলাসক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ধরণের বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গুলিকে রাগপ্রধান গান বলা অবশ্য অন্যায় হবে। বাংলা খেয়াল ঠুংরী নিশ্চয়ই হয় এবং করা যায়। একথা আজ জোর করে বলার দিন এসেছে। আমিও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছি গবেষণালিপ্ত সাধক-সঙ্গীতজ্ঞদের। জনৈক সাধক মহাগুণী প্রচারবিমুখ সঙ্গীতাচার্য্যকে আমি জানি যিনি স্বীয় শিষ্যদিগকে হিন্দী ও বাংলা খেয়ালতানে প্রতি রাগে বা পৃথক রাগে তালিম দিয়ে থাকেন। ইনি বিভিন্ন সঙ্গীত-সাময়িকী পত্রিকা মারফৎ ইহার প্রকাশ-মাধ্যমে দেশকল্যাণকামী মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি 'সঙ্গীত-অনুসন্ধিৎসা' নামক পুস্তক প্রণেতা এবং মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ওস্তাদ কাদের বক্স সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর সৃষ্ট গানগুলি সত্যই বিশুদ্ধ (বাংলা) খেয়াল-ঠুংরী স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, একথা মুক্তকণ্ঠে দৃপ্তভাবে বলতে পারি। সে গান শিখলে সত্যই বুক ফুলিয়ে বলতে পারা যায় 'খেয়াল গান গাইছি।'

এর কারণ এই বাংলা-খেয়াল (ঠুংরী) গঠনের পদ্ধতি যা কি না হিন্দীতে অনাদিকাল থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের বিভিন্ন রাগের গানসমূহ স্থায়ী অন্তরার মাধ্যমে যখন প্রকাশক্ষম হয়, তখন তার মাধুর্য্যের তুলনা করা যায় না।

বাংলা খেয়াল-ঠুংরী গানে মাতৃভাষায় ভাব-রস-অর্থ শিল্পী ও শ্রোতার বোধগম্য হয় বলে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। কথা উঠতে পারে—হিন্দী ভাষার মাধ্যমেও তো এরূপ হয়! কিন্তু সে কেবলমাত্র পাকা বোদ্ধা মুষ্টিমেয় শ্রোতার মনে—আপামর শ্রোতার নিকট নয় ভাসা ভাসা ছাড়া। যা কি না বাংলা খেয়াল-ঠুংরীতে স্বাভাবিক ভাবে এবং সামগ্রিক ভাবে ঘটবে।

বাংলার শিল্পিগণকে মাতৃভাষায় মাধ্যমে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে বিশুদ্ধ ভাবে প্রচারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে—দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলবে না।

বাংলা দেশে এবং উহার বাহিরে উভয় গানই গাইতে হবে (হিন্দী এবং বাংলাভাষায়)। ভিনভাষীরা কি বাংলা দেশে বাঙালী শ্রোতার সুবিধার জন্য (যাদের উপস্থিতি সর্ব্বাধিক যে কোন অনুষ্ঠানে) নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় গান কারন, তাঁদের মাতৃভাষাপ্রীতি সত্যই অতুলনীয়!

সংশয়-লোকলজ্জা ত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়ে উভয় ভাষীর একতরফা ভাষা-অনুরাগ থাকে ততক্ষণ বাংলা এবং অন্য প্রদেশে আমাদের বাংলা-হিন্দী উভয় গানই পরিবেশন করা সমীচীন বলে মনে করি। মাতৃভাষার বিকাশের প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে, তবেই এক দিন বাংলা খেয়াল-ঠুংরী শুধু সর্ব্বজনগ্রাহ্য হবে না—ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এর অনুশীলনও হয়ত ব্যাপক ভাবে সুরু হবে। এ আশা দুরাশা নয়, বিদ্বেষপ্রসূত নয়। কারণ নিজ ভাষার প্রতি অপরিসীম ও অকৃপণ আনুগত্য পরভাষার প্রতি ঘৃণা বোঝায় না।

বাঙলা দেশ আবার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত অনুশীলনে সারা ভারতকে নেতৃত্ব দেবে। বঙ্কিম-জননীর মুখে আবার আমরা হাসি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হব।

—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

আমার কথা (৬৭)

শ্রীসুবিনয় রায়

শান্তিনিকেতন শিক্ষা-ভবনের প্রাক্তন ছাত্র—শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক—কবিগুরুর স্নেহছায়ায় বর্ষা-সঙ্গীত আয়ত্ত—পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীত-চর্চ্চা—আর স্নেহময়ী মাতার অনুপ্রেরণা—সমস্ত একত্রীভূত হইয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পিরূপে সজ্জন, সরলমনা ও বিনয়াবনত শ্রীসুবিনয় রায়ের আবির্ভাব শ্রোতাদের মানস-পটে একটি স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরায় বলেন :—

কলকাতায় আমার জন্ম ৮ই নভেম্বর ১৯২১ সাল। মাণিকগঞ্জ মহকুমার (ঢাকা) মালুচী স্বগ্রাম। পিতা শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় এবং মাতা শ্রীমতী সুখময়ী দেবী হলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত আচার্য্য পণ্ডিত ৺সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। প্রথমে বাড়ীতে ও পরে মেট্রোপলিট্যান ইন: (মেন) পড়ি। বাড়ীতে ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় মা ও মাসীমারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন আর আমি ছেলেবেলা থেকে তা শুনতাম। মায় সঙ্গে বাল্যকাল হতে শান্তিনিকেতনে যাতায়াত ও কলকাতায় গুরুদেব প্রযোজিত উৎসবানুষ্ঠানাদিতে যোগদান করেছি। বাঁশী বাজাতে পারতাম নয়-দশ বৎসর বয়স থেকেই। কি করে যে পারতাম—জানিনা। গান-বাজনার সুরগুলি বাঁশীতে তুলে নিতায় তাড়াতাড়ি। ছোটোখাটো অনেক জলসায় তখন থেকেই বাঁশী বাজিয়েছি। অন্যের গাওয়া গানের সঙ্গে বা একক ভাবে উহা বাজিয়েছি। পনের-ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গলায় গান করা বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। মনে মনে গুন-গুন করতাম—কিন্তু কেউ এসে পড়লে থেমে যেত গলা।

১৯৩৮ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁর নিকট রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার 'হাতে-খড়ি' হয় আমার। প্রতি রবিবার সকালে তাঁর বাড়ী যেতাম। সেখানে আসতেন শ্রীসমরেশ চৌধুরী, ৺সুজিতরঞ্জন রায়, সুনীলকুমার ঘোষ, শ্রীমতী ইলা ঘোষ (মিত্র) প্রভৃতি। চমৎকার ভাবে গান-বাজনা, গল্প-গুজব, চা-পান-এর মধ্য দিয়া সময় কাটত। লোকজনের সামনে গান গাইবার অভ্যাস হতে থাকে আমার সেই সময়—আর অনাদিদা'র ব্যক্তিগত স্নেহ, উৎসাহ-বাণী, অনুপ্রেরণা ও সযত্ন শিক্ষার গুণে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মাতে থকে। তাঁর পরিচালিত তদানীন্তন কয়েকটি অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে গানের মধ্যে নেন ও একক কণ্ঠে গান গাওয়ার সুযোগ দেন। ফলে কণ্ঠ-সঙ্গীত যে আমার হতে পারে—এই কথা আমি অনুভব করি অনাদিদা'র প্রচেষ্টায়।

পর বৎসর শান্তিনিকেতনে যাই এবং শিক্ষাভবনে আই, এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হই। রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। শৈলজাদা', সঙ্গীত-ভবনের অধ্যক্ষরূপে সুপরিচিত। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রবিদ ও রসায়নাধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত ছিলেন—একথা অনেকের কাছে অজানা রয়েছে। প্রথমে বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে রসায়ন-শাস্ত্র পড়ি। গান শেখার কথা সঙ্কোচের জন্ত মুখ ফুটে বলতে পারি নি। কিছুদিনের মধ্যে আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি টান ও সামান্ত পারদর্শিতা লক্ষ্য করে তিনি আমায় বলেন, "আমাদের এবারকার বর্ষামঙ্গলের জন্ত রোজ 'নাট্য-ঘর'-এ গান শেখাই; সেখানে তুমি এসো—অনেক গান তুলে নিতে ও পরে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে।" তাঁর নির্দ্দেশমত প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে অন্যান্যের সাথে বর্ষা-সঙ্গীত শিখি আর শৈলজাদা'র অপূর্ব্ব শিক্ষাদান-পদ্ধতির গুণে অল্প দিনেই আমার মধ্যে সুর-তাল-লয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগতে লাগল এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধ গায়ন-পদ্ধতির সন্ধান পাই। উন্নতি লক্ষ্য করে তিনি স্থানীয় ছোট ছোট সাহিত্য-সভা ও জলসায় আমাকে একক সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দেন। বিভাগীয় সাহিত্য-সভাগুলিতে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত। পূর্ব্বোক্ত বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল তখন পুরাদমে চলছে। একদিন শুনি, কবিগুরু বর্ষামঙ্গলের জন্ত নূতন গান লিখেছেন ও স্বয়ং ছেলেমেয়েদের সেগুলো শিখাবেন। ১৯৩৯ সালের শ্রাবণ মাস। শৈলজাদা' আমাকে নিয়ে গেলেন 'উত্তরায়ণে' এবং গুরুদেবের পদতলে দিনের পর দিন ধরে পনের-ষোলটি নূতন বর্ষাসঙ্গীত শিখি। সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও আমার জীবনে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা।

১৯৪০ সালে কলকাতায় ফিরে দুই বৎসর পরে সিটি কলেজ থেকে বি, এস-সি পাশ করি। সেই বৎসর শান্তিনিকেতনে যাই সঙ্গীত-ভবনে ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার জন্ত। তখন শ্রীসমরেশ চৌধুরী অন্যতম সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। সমরেশদা' রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তাঁর সান্নিধ্য লাভে আমি খুব উপকৃত হই। গান শেখার সঙ্গে তবলা ও এস্রাজ বাজাইতে শিখি। তখন তথায় সাহিত্যসভা, মন্দিরের উপাসনা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একক ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে থাকি। ব্যক্তিগত

শ্রীসুবিনয় রায়

ও পারিবারিক কারণে অল্প দিনের মধ্যে অসমাপ্ত অবস্থায় কলিকাতায় ফিরি। এখানে এসে ১৯৪২ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে অডিশন দিই ও নিয়মিত বেতারশিল্পী হই।

১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-ভবনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। ইহার জন্ত আমি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ও শৈলজাদা'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এতদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছি—এখন শুরু হল সঙ্গীত-অধ্যাপনা।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে গিয়ে অনুভব করতে লাগলাম যে নিজের সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তি, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলেছে। ক্লাস, রিহার্সাল, বৈতালিক, বিভিন্ন ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে কি করে সময় কাটত, তা বুঝতেই পারি নাই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সঙ্গীত শিক্ষাও চলত। ইন্দিরা দেবীর নিকট পুরানো ব্রাহ্মসঙ্গীত ও শৈলজাদা'র কাছে অনেক দুষ্প্রাপ্য গান শিখতে থাকি। রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ইন্দিরা দেবী জাগিয়ে তোলেন। ৭ই পৌষ মন্দিরের উপাসনায়, বর্ষামঙ্গলে, বসন্তোৎসবে ও মাঘোৎসবে আমি একক সঙ্গীত করি। স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী ও স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমার ঘ:ট সেখানেই। তাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীতসম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও উপদেশবাণী আমার চির-পাথেয়। আমার সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে শান্তিনিকেতন 'ছেড়ে এসে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনঃ এ কাজ নিই। সেই সময় ভবানীপুর গীতবিতানে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই ও ১৯৪৫ সালে স্থাপিত উহার উত্তর কলিকাতা শাখার কাজ আমার তত্ত্বাবধানে চলিতে থাকে। এই সময়ে শ্রীসুখেন্দু গোস্বামীর সহায়তায় তাঁর গুরুজী সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর সান্নিধ্য লাভ করি। তাঁর কাছে খা খেয়াল শিক্ষা করি পরে সুখেন্দু বাবু তালিম দেন। শ্রদ্ধে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বহুদিন বিষ্ণুপুরী-ঘরাণ ধ্রুপদ-ধামার শিখি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে এগুলি কতখানি সহায়ক হয়েছে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এচ, এম, ভি ও কলাম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীদ্বয়ে বহু বৎস আমি 'ট্রেণার'এর কাজ করি। কলাম্বিয়াতে আমার গাও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দু'খানি রেকর্ড আছে।

কয়েক বৎসর পরে আমি 'দক্ষিণী'তে অধ্যাপকের কাজ নি এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে গ্রন্থাগারিক হিসাবে শিক্ষা নেবা জন্ত ইংল্যাণ্ডে যাই। তথায় দেড় বৎসর অবস্থান কালে লণ্ডঃ অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লেষ্টার, চিগওয়েল (এসেক্স) ইত্যাদি স্থা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি—রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিই—রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান পরিচালন করি। চিগওয়েলে অনুষ্ঠিত বিশ্বযুব-উৎসবে (Reporting bacl function) আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি। এছাড়া লণ্ড বি-বি-সি কেন্দ্র হ'তে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছিলাম।

১৯৫৩ সালে বিলাত থেকে ফেরার পর I. S. Instt.এ গ্রন্থাগারে যোগ দিই ও বর্ত্তমানে আমি উহার 'মিউজিয়াম'এ তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত আছি।

১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে চাঁদপুর বাবুরহাট নিবাসী শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ইন্দিরাকে বিবাহ করি।

১৯৫৫ সালে উত্তর কলিকাতায় "গীতবীথি" রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি উহার প্রতিষ্ঠাতা-অধিকর্ত্তা ও অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত আছি।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশুদ্ধ গায়কীর সম্যক প্রচার ও প্রসার শ্রীসুবিনয় রায়ের শিল্পিজীবনের বর্ত্তমান কর্মধারা।

সবুজ বনের ছায়

"Under the green wood tree"

—Shakespeare

সবুজ বনের স্নিগ্ধ ছায়
আমার সাথে রইতে চায়
পাখীর সাথে সুর মিলিয়ে
মনের কথা কইতে চায়
চলিয়া আয়, চলিয়া আয়, চলিয়া আয়।
হেথায় কোন শত্রু নাই
নাইকো কোন অর্বাচীন
হেথায় শুধু ঝড়-বাতাস ঠাণ্ডালাগা শীতের দিন।

উচ্চ আশা ত্যাগ করিয়া
রোদের' পরে পৃষ্ঠ দিয়া
বাঁচার মত আহার নিয়া
শুধুই যারা থাকতে চায়
চলিয়া আয়, চলিয়া আয়, চলিয়া আয়।
হেথায় কোন শত্রু নাই
নাইকো কোন অর্বাচীন
হেথায় শুধু ঝড়-বাতাস ঠাণ্ডালাগা শীতের দিন।

অনুবাদক—প্রফুল্ল মণ্ডল
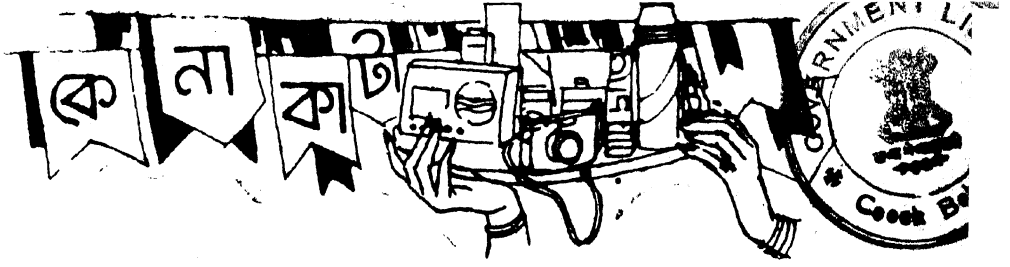
সিগার ব্যবহার—কয়েকটি কথা

ধূমপান সকল সমাজে বা সকল দেশেই চলতি আছে এবং সে এ-যুগেই নয়, যুগ-যুগান্তকাল আগে থেকেই। তবে এইটুকু ...যায় যে, আগে যেমন হুক্কা বা গড়গড়ায় তামাকু-সেবনের ...পকতা ছিল, এখন সে-টি তুলনায় কমেছে। সেস্থান ক্রমে দখল ...েছে বা করছে সিগারেট ও বিড়ি আর তার পাশাপাশি পাইপ ...সিগার।

আমাদের দেশের তুলনায় আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতে ...ারের ব্যবহার অনেক বেশি। বৃটেনের জনপদসমূহে প্রচুর ...কে সিগার সেবন করতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর ধূমপায়ীরা ...ারেটের চেয়েও সিগার খেয়ে বেশি আনন্দ পান। অবশ্য এর ...নে কতকগুলি যুক্তিও তাদের দেখাবার রয়েছে। ভালো ব্র্যাণ্ডের ...ার ভালো মেজাজ এনে দিতে পারে নাকি সহজেই।

ইংল্যাণ্ডে সিগার-তৈরীর ছোট-বড় কারখানা রয়েছে বেশ ...কটি। তবে এ সকল কারখানায় যে-সব সিগার উৎপাদিত ... সেগুলির প্রয়োজনীয় তামাক (পাতা) আমদানী করা ... বাইরে থেকে। আভ্যন্তরীণ এই ব্যবস্থাতেই বৃটেনের ...ার-চাহিদা কিন্তু মেটে না। বৃটেন তৈরী করা সিগার আমদানী ... থাকে কিউবা, জামাইকা, হল্যাণ্ড, ও সুইজারল্যাণ্ড ...ক। তবে কিউবা ও জামাইকার কারখানায় উৎপাদিত ...ারের দাম একটু বেশি—হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের ...ত সিগার সেই তুলনায় কম দামেই বিক্রি হয়। সেজন্যে ...মাজকে ডাচ, সুইচ, বা বৃটিশ-ব্র্যাণ্ড সিগারই হাতে তুলে ...ত দেখা যায় বেশি, দামের প্রশ্ন ছাড়া এর গন্ধটাও এক্ষেত্রে ...দর কাছে সুখকর বলে গ্রাহ্য।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সিগার উৎপাদন-কেন্দ্র বলতে পারা যায় ...না। এখানে তৈরী সিগারের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার ...খানাগুলিতে সিগার উৎপাদনের জন্যে যে তামাক প্রয়োজন হয়, ... সম্পূর্ণটা সে দেশেই (কিউবা) পাওয়া যায়। অর্থাৎ ...্যাণ্ডের কারখানার ন্যায় হাভানা কারখানাগুলিকে বাইরে থেকে ...াক আমদানী করতে হয় না মোটেই। হাভানায় কুশলী ...গরেরা হাতেও সিগার তৈরী করে থাকে—যার পরিমাণ ...্যান্ত কম নয়।

জামাইকায় যে সিগার-শিল্প গড়ে উঠেছে, সেটি অবশ্য তুলনায় ...নিক। যুদ্ধোত্তর কালেই এখানকার কারখানাগুলি অধিক ...রলাভ করে। সিগারসেবীদের একটি দল আছে, যারা হাভানা ...ারের পক্ষপাতী, আবার আর এক শ্রেণী পছন্দ করে জামাইকা ব্র্যাণ্ড। হাভানা ও জামাইকা যাদের কাছে সমভাবে আদৃত, এমন লোকের সংখ্যাও আজকের দিনে অবশ্য কম বলা যায় না। গুণে, গন্ধে, স্বাদে যেটি ভালো বলে স্বীকৃত হবে, তার বাজার সর্বত্র নিশ্চিত।

সিগারের বহিরাবরণ কালো হলেই যে খেতে ভালো হবে না, এমন কোন কথা নেই। অন্ততঃ নিয়মিত সিগারপায়ী যারা, তারা এইটি জোর দিয়েই বলতে পারবেন। আসল কথা হলো, যে সিগারটি খেতে হাতে নেওয়া হলো, তা কোন্ ব্র্যাণ্ডের, কোন্ কোয়ালিটির। চালু ব্র্যাণ্ড বা কোয়ালিটির জিনিস হলে ব্যবহারে আনন্দ পাওয়া যাবেই, এ প্রশ্নাতীত। মোটের ওপর রংটাই যে বড় কথা নয়, প্রাচ্যের বর্মী চুরুট থেকেও তা বোঝা যায়। বহুদিন থেকেই বর্মী চুরুটের একটি বেশ বড় বাজার রয়েছে।

সব কারখানাতেই একই কোয়ালিটির সিগার তৈরী হয় না, সাইজও হয়ে থাকে এর বিভিন্ন ধরণের। সাড়ে তিন ইঞ্চি থেকে প্রায় সাত ইঞ্চি পর্যন্ত সিগার দেখতে পাওয়া যায় বাজারে। বিভিন্ন সাইজের সিগারের নামও বিভিন্ন, দামও স্বভাবতঃই বিভিন্ন। এই শিল্পটি যত দিন যাবে ততই সম্প্রসারিত হবে এবং সিগারেটের সঙ্গে এর চলবে পাল্লা, এইটুকু বলতে পারা যায়।

মানুষের স্বাস্থ্য ও চুল

দৈহিক-সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ চুল, এ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। চুল যথারীতি আঁচড়ানো বা সুবিন্যস্ত না থাকলে, যথেষ্ট কালো ও ঘন না রাখতে পারলে, মুখশ্রী একটু হলেও ম্লান হতে বাধ্য, আর সে নারীদের তো বটেই, পুরুষদেরও। এখানে মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে চুলের সম্পর্ক কতখানি অর্থাৎ সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো-মন্দ থাকার ওপর চুলের ভাল-মন্দও নির্ভর করছে কিনা, পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

অমনি মনে করা যায় এবং সে ধরণের দাবী অবাস্তবও নয় যে, মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকলে চুলও ভাল থাকবে, আর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লে চুলের ওপর এর প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। এ দিক থেকে চুলকে অনায়াসেই একটি স্বাস্থ্য-নিরূপক 'ব্যারোমিটার' বলা চলতে পারে। সুতরাং চুল সুন্দর রাখতে হলে টাক-পড়া বা অকালপক্কতার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে চুলের নিয়মিত যত্ন যেমন চাই, তেমনি প্রয়োজন সাধারণ স্বাস্থ্য মজবুত রাখা, শারীরিক সামর্থ্য অটুট রেখে চলা।

কিন্তু এই মাত্র চুল ও স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বিষয়ে যে সাধারণ নিয়মের কথা বলা হলো, এর ব্যতিক্রম যে হয় না বা হবে না, এমন নয়।

স্বাস্থ্য ভালো আছে, চুল খারাপ হয়ে গেলো, পাক ধরে গেলো অকালেই, এরূপ দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে অজস্র। আবার চুল মাথায় বেশ ঠিক আছে, অথচ সাধারণ স্বাস্থ্য পড়ছে ভেঙে এমন দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল বলা চলে না। কাজেই প্রশ্নটি আরও নিবিড় ভাবে দেখার-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, স্বীকার না করে উপায় নেই।

টাক বা পাকা চুলের ব্যাপার নিয়ে স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছেন, এ যাবত কম নয়। কোন্‌টি কেন হয়, সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতিই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী কি না, এ সম্পর্কে ইউরোপীয় শরীর-বিজ্ঞানীরাও চিন্তা-আলোচনা চালিয়েছেন অনেক। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্যে কত ধরণের ওষুধপত্র, টনিক, টেবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে, ইয়ত্তা নেই। নানা জাতীয় তেল ওষুধ বের করা হয়েছে চুল সুন্দর ও সতেজ রাখবার জন্যে, এর ক্ষয় ও অস্বাভাবিকতা রোধ করবার জন্যে। এতে কতটা কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, তা অবশ্যি পৃথক আলোচনার বিষয়।

চুলে অকালে পাক ধরলেই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছে বুঝতে হবে কিনা, প্রসঙ্গত এই প্রশ্নটি সামনে রাখা যায়। বিলেতের কতক বিশেষজ্ঞের দাবী এব্যাপারে আমাদের সাধারণ দাবীকে একরূপ উড়িয়ে দেয়। সাধারণত: ধরে নেওয়া হয়, অল্পবয়সে চুল সব যদি শাদা হয়ে যায়, শরীরের সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন কঠিন রোগ থাকবে। কিন্তু উক্ত বিশেষজ্ঞ-মহল বলতে চান যে, সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে পাকা চুলের সম্পর্ক অল্পরূপ। কুড়ি থেকে ত্রিশ বছরের ভেতর যদি মাথা শাদা হয়ে যায়, তাতেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। পরন্তু বুঝতে হবে—এইটি নিশ্চিত ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

মাত্র কয়েক বছর হলো পাশ্চাত্যের কতিপয় চিকিৎসক এই জিনিষই আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দাবী রেখেছেন—যৌবনে যাদের চুলে পাক ধরে যায়, সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে তা প্রায়ই হয় না। বাপ-মায়ের দিকে এমনটি যেখানে আগেই থাকবে, সেখানে এই অকালপক্কতা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়, ভাববারও নয়। তাঁদের দাবী—এমন বহু শতবর্ষীয় বৃদ্ধকে তাঁরা দেখেছেন, যাদের মাথা হয়ত শাদা হয়ে গিয়েছিলো এমন কি বিশ বছর বয়সও হতে না হতেই।

রাতারাতি চুলে সব পাক ধরে গেল, এই জাতীয় ব্যাপারও যে না হয়, বলতে পারা যাবে না। অতিমাত্র উদ্বেগ বা দুঃখ এসে হাজির হলে অর্থাৎ মনের পর্দায় সহসা প্রচণ্ড আঘাত পড়লে চুল দেখতে না দেখতে শাদা হয়ে যেতে পারে। যৌবনেই কারো যদি এমনি দুর্বিপাক হয়, সে নিশ্চয়ই সাধারণ-স্বাস্থ্যের কারণে হলো না। প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্দ্ধক্যের কোঠায় পৌঁছার পর কারো মাথা শাদা হয়ে পড়লে প্রশ্ন ওঠে না তখন। কেননা, এ একটি স্বাভাবিক অবস্থা—শারীরিক অবনতির সঙ্গে এর যোগাযোগ খুব নিবিড়, সহজেই অনুমেয়। চুল বিবর্ণ যাতে না হয়ে যেতে পারে, সেজন্যে উপযুক্ত যত্ন ও চিকিৎসার দাবী উপেক্ষা করা চলে না।

ভিটামিন ব্যবহার ও অন্যান্য প্রক্রিয়া মারফত উপকার দেখা গে অনেক ক্ষেত্রে, সে-ও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

ফুল ও অন্ধকার

অন্য সব প্রাণীর ন্যায় গাছকেও বাঁচতে হলে আলো চাই সূর্য্যরশ্মি চাই। গাছে ফুল ফোটাবার দাবী রাখলে আলো ন হলে সাধারণত: চলবেই না। কিন্তু আলো যেমন চাই, অন্ধকার চাই—এইরূপ বললে হেঁয়ালি ঠেকতে পারে। অথচ সম্প্রতিকা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় ধরা পড়েছে, গাছ পুষ্পিত হতে হ আলো-আঁধার দুই-ই সমভাবে প্রয়োজন।

পরীক্ষা করে সত্যি দেখা গেছে—পরিমিত অন্ধকারের অভা সকল গাছ-গাছড়াতেও ফুল ফোটে না কিংবা সেই সকল গাছ মুকুলি হতে বাধা পায়। এই ব্যাপারে রাত্রির অন্ধকারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পত্রে পুষ্পে গাছের পরিপুর্ণ বিকাশের জন্যেই আলো পাশাপাশি থাকতে হবে অন্ধকার।

বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত—দিন-রাত্রি প্রায় সমান না হ গাছের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয় না। এইজন্য দিনের আলো অনুপাতে রাত্রির অন্ধকারও দরকার, বলা হচ্ছে। কতকগু গাছ অবশ্যি দিনান্তে অল্প সময়ের জন্য অন্ধকার পেলেও পুষ্পিত হয় কিন্তু সব গাছের বেলায় এই নিয়ম বা বিধান খাটে না। অনে ক্ষেত্রে ফুল যদিও বা হলো পর্য্যাপ্ত অন্ধকারের অভাবে বীজ পাওয়া ভরসা কমে যায়। আবার, বীজ না হলে নতুন গাছের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে পড়ে আপনি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নেলর ফুলের জন্যে অন্ধকারে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এর ভেতর গবেষণা করেছেন। দাবী রাখ হয়েছে—এব্যাপারে দিনের বেলা কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করে গাছের ফুল ফোটার সহায়তা করা যেতে পারে কিন্তু রাত্রিে কৃত্রিম আলো করে কোন গাছকে রাখা হলে দেখা যাবে তা মুকুলি হচ্ছে না। তার কারণও স্পষ্ট-অন্ধকারের মেয়াদ সেক্ষেত্রে ক যায় বলেই এমনি ঘটে থাকে।

আলোচ্য বিষয়ের গবেষণা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, গবেষণা সূচনা হয়েছে মাত্র। অন্ধকারের দীর্ঘ স্থায়িত্বে গাছের জীবনে ওপর কি ভাবে প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্পর্কে বিলেতে চিন্তা আলোচনা চলেছে এখনও। অন্ধকার আলোর অভাব জনিত পরিস্থিতি ছাড়া কিছু নয়। এই অন্ধকারে এমন কি উপাদান আছে, যা জন্যে গাছ বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হতে পারে? বৃটেনের ন্যা আমেরিকাতেও এই নিয়ে গবেষণা কম চলছে না। যা হোক এটা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়েছে যে, গাছের পক্ষে দিনের আলোর ন্যায় রাত্রির অন্ধকারও আবশ্যক। একটানা শুধু অন্ধকার হলেও চলে না, সূর্য্যরশ্মি থাকলেও নয়। একটির পর একটি পর্য্যায়ক্রমে হ চললেই ফুল ঠিক ভাবে ফুটবে। কেন, পূর্ব্বেই বলা হলো উত্তর এখনও গবেষণা-সাপেক্ষ।

The nose of the bulldog has been slanted backwards so that he can breathe without letting go.

—*Churchill.*

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

ঘড়-ঘড় শব্দে ট্রাম এগিয়ে আসতে লাগল। কত নম্বর? গলা বাড়িয়ে, মাথা কাত করে গাড়ীর নম্বরটা দেখতে চেষ্টা করল মঞ্জু। 'পঁচিশ'। যদিও বান্ধবীর ওখানে যাবে বলে উল্টো পথে অনেকটা দূরই চলে এসেছে, তবু লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে 'পঁচিশ নম্বরে' চেপে বসলে বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে রজতের ওখানে পৌঁছে তার হোটেলের করিডোর-পথ অতিক্রম করে রজতের দরজায় টোকা দিতে পারে সে। ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ী থামাল। যারা নামবার ভিজে-পথে সন্তর্পণে পা ফেলে নামল। যারা উঠবার তারা তেমনি সন্তর্পণে পা ফেলে হাতল ধরে উঠল। পা বাড়ালেই ট্রামের চত্বর। দু'জন ভদ্রলোকের মধ্য দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু না—ট্রামটা যখন মোড়ের মাথায় বাঁক ঘুরে চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মঞ্জু বুঝল ও ট্রামে চাপেনি। হাঁ, শরীর দিয়েই বুঝল মঞ্জু, ও যায়নি। দোকানঘর থেকে নেমে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অবচেতন-মন যেখানে একেবারে ট্রামে চেপে বসেছিল, মঞ্জুর চেতন-মন কিন্তু সেখানে বুঝে উঠতেই পারলে না রজতের হোটেলে যাওয়ার মতো একটা উদ্ভট আজগুবী চিন্তা ওর মনে কি করে এলো। ভাবলো, হবে হয়তো নীলকে ওর হঠাৎ-উপস্থিতি দিয়ে চমকে দেবার কথাটাই ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে তার কথা—ওকে দেখে যে আজ শুধু চমকেই উঠবে না, দেখেও বিশ্বাস করতে চাইবে না।

চিন্তা আর স্বপ্ন আনাগোনার অর্থ বিশ্লেষণ আমরা বড় একটা করিনে। যখন করি, তখনও এ ভাবেই করি। এতে কিছু অর্থ যে বোঝা না যায়, তা নয়। কিন্তু সবটা যায় না। গূঢ় অর্থ মনের নিগূঢ়েই থেকে যায়। মঞ্জুরও যে তাই গেল না কে বলবে! অপরের মনস্তত্ত্ব বোঝার যত অহমিকাই করুক, সে জন্য নিজের মনটাও ধরার মধ্যে থাকবে এমন কোন কথা নেই। ডাক্তার কি তার নিজের রোগ ডাক্তার বলেই ধরে উঠতে পারে? না ডাক্তার, ডাক্তার বলেই নিজেই চিকিৎসার সুবিধা করে উঠতে পারে? গভীরে যদি এমন কোন কথা থেকেই থাকে মঞ্জুর যে, তার এই যাওয়ার ইচ্ছাটা রজতকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেওয়া ছাড়াও আরো কিছু নিভৃত-অর্থ বহন করে। মঞ্জু তা নির্ণয় করে উঠতে পারেনি—তার জন্য অগৌরবের কিছু নেই। মনের অপ্রকাশিত অংশই প্রকৃত এবং জোরালো এ বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে। অনেক সময় তা আদপেই ঠিক নয়। মঞ্জুর ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ, যে গ্রাহ্য করাটা বিদিতে-অবিদিতে মানুষের চলা-ফেরাকে কাটছাঁট করে চলে, সেই গ্রাহ্য করাটাই ওর চরিত্রে অনুপস্থিত। ও যখন যেটা করে বুঝতে হবে অন্তরে বাইরে সেটারই প্রাবল্য চলছে। তাই মাতাল আকাশের দিকে চোখ পড়তেই ট্রাম থেকে নামিয়ে নীলের ওখানে নিয়ে চলেছে মঞ্জুকে তার মনের যে ব্যক্তঅংশ, মনের অব্যক্তঅংশের কাছে তার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।

দু'-তিনটে ট্রাম এলো, থামলো, চলে গেল। গেল কয়েকটা বাস। আটের-বি, বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

একটা ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভারী কুয়াশার মতো উড়ে চলে গেল শরীরের উপর দিয়ে। ভিজে শরীরে বাতাস শীত ধরিয়ে দিলে। আঁচলটা গায়ে জড়িয়েও আরাম হলো না। একবার বৃষ্টিটায় যে সামান্য জোর ধরেছিল। তাতে ট্রামের কাচের শার্সি ছুঁইয়ে জামা আর শাড়ী কিছুটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। তা এখনও শুকোয় নি—একটা মস্ত হাঁচি বেরিয়ে এলো। হাতে রুমাল নেই। ব্যাগটা নাকে-মুখে চেপে ধরে বিজ্ঞানসম্মত হাঁচি দিল মঞ্জু। পাশের আনমনা ধূমপানরত ভদ্রলোকটি চমকে উঠলেন। একটা খালি ট্যাক্সির ড্রাইভার ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে গাড়ীর গতি মন্থর করল। ডাকবে? ক'টা টাকা যাবে কিন্তু সময় বাঁচবে অনেক। আজ তার ব্যাগে টাকা আছে। জয়ার কিছু ওষুধপত্রের বাকী বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মমতার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিতে পারেনি। মমতা আজ একটা জরুরী কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ততক্ষণে ট্যাক্সি দূর। সামনে দাঁড়িয়ে ঝক্ঝক্ শব্দ তুলছে—যাদবপুরের বাস। একগাদা ভিড়ের সঙ্গে-সঙ্গে পায়-পায় চলে গিয়ে বাসে উঠে পড়ল সে। ব্যাগটা বুকের উপর চেপে ধরে ভিড়ের চাপের মধ্যে লেপটে দাঁড়িয়ে রইল।

নীলকে যদি না পায় বাড়ীতে? যদিও সে জানে সাধারণতঃ নীল বিকেলে বাড়ী ফিরে আর বেরোয় না। নিজের কাজ নিয়ে থাকে। তবু সংবাদ না দিয়ে এলে বাড়ী না পাওয়ার যে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়—সেটা তো আছেই। যদিও পাওয়া যাবে এই আশাতেই যাচ্ছে—তাই বলে নীলকে বাড়ী না পেলেই কি ওর এই বেরিয়ে পড়া বৃথা কষ্ট ভোগ করা হবে? না। বাসে ঘুরতেও ওর অপূর্ব লাগে। জানালার ধারটিতে একটু বসবার জায়গা পেয়ে বাইরের দৃশ্য—চোখের উপর নিয়ে ছুটতে পারলে তো কথাই নেই—অপূর্ব! আরো অপূর্ব যদি দিনটা হয় বৃষ্টি-মেঘ-বদলের। উঃ—ভদ্রলোকটি একেবারে ওর পা'টা মাড়িয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যথার মুখে সবিনয় হাসি টেনে ভদ্রলোককে পা'টা সরাতে বলল মঞ্জু। অপ্রতিভ মুখে পা টেনে নিয়ে, পেছনের লোকটিকে ঠেলে একটু সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তিনি। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়ীর মধ্যে দেহটাকে ঠেসে দিলেন এক পাঞ্জাবী মহিলা। ব্যস্, আর কারু দেহের সঙ্গে কারু দেহের চুল পরিমাণ ফাঁক রইল না। মঞ্জু বুকের উপর চেপে-ধরা ব্যাগটা সরিয়ে মহিলাটিকে ঐ ব্যাগের স্থানটুকুও ছেড়ে দিল। চলতে চলতে বার কয় বাসের ঝুঁকি সামলালো মহিলাটির মাংসল বাহু চেপে ধরে। পাঞ্জাবী মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের ওজনে।

বারবপুর—গাড়ীর গায়ে সজোরে থাবড়া মেরে হেঁকে উঠল কন্ডাক্টার। বাব কয় বাহু চেপে ধরার ভেতর দিয়ে যে অপরিচিত দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল তাতেই মঞ্জুকে নামবার উদ্যোগ করতে দেখে পরিচিতের মতো জিজ্ঞাসা করলেন মহিলা, সে এখানে নামছে কি না? মাথা নাড়া আর হাসির ভেতর জবাব সেরে নেমে পড়ল মঞ্জু।

তারপর সেই দোকান, বাজার, পথ। এ পথের কোথাও কোন সজ্জা নেই, চমৎকারিত্ব নেই, শোভা নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। দোকানগুলো প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানীরা টুলে নয়ত লোহার চেয়ারে বসে বসে পা নাচাচ্ছে। নিয়ন যদিও কিছু কিছু দোকানে জ্বলছে কিন্তু অধিকাংশ দোকানেই জ্বলছে বাল্‌ব। নিয়নের পাশে সে আলোকে দেখাচ্ছে কেরোসিনের আলোর মতো হলদে নিষ্প্রভ শ্রীহীন। ব্যবসাকেন্দ্রটুকুতে তবু এ-ও আছে। তারপরে ছাড়াছাড়া দালান কোঠা-বাড়ী। আর তার খোলা গবাক্ষপথে বা খোলা দরজাপথে দেখা পাওয়া আলো। বাঁধানো রাস্তা যেখানে কাঁচা পথে পড়েছে সেখান থেকে সুরু ভিজে মাটি। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, ব্যাঙের ঐকতান। দড়মা-টিন-মাটির চালাঘর। লণ্ঠনের মিটিমিটি আলো।

এ পথে মঞ্জু প্রথম দিন এসেছিল, সে-ও ছিল এক উত্তীর্ণ সন্ধ্যা, মমতাকে দেখতে এসেছিল মৌরী আর সে। ভীতু মৌরী ভয় পাচ্ছিল প্রতি পদে। নীলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন সেটাই। দরজা খুলে দিয়েছিল নীল। অপরিচিতের সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনায় 'বসুন' বলে ওদের বসিয়ে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। তারপর মমতার মা ডেকে আলাপ করিয়ে দিলে দু'-দু'টো বিয়ের কথা শুনে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল মঞ্জুকে—'আপনার নয় কেন? ভাল দিন নেই আর কাছে?' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল ও, 'ভালো পাত্র নেই কাছে।' ওর জবাব শুনে নীলের দৃষ্টি হঠাৎ যেন ওর সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল। ওর মুখের ওপর চোখের অনুসন্ধানী আলো ফেলেছিল সে। মঞ্জু জানে না নীল কি দেখেছিল। কিন্তু মঞ্জু নীলকে সেই আলোতেই দেখে নিয়েছিল।

কাঁচা পথে এসে পড়তেই রাস্তার বাতি সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল। বোঝা গেল মেঘ যতই সন্ধ্যাকে আগবাড়িয়ে নিয়ে আসুক, সন্ধ্যা নামল সবেমাত্র এই।

এই বাদল-সন্ধ্যা, এই ভিজে-হাওয়া, এই তুষার-সদৃশ বৃষ্টি ঝোপ-ঝাড় কাঁচা পথে রিক্সার টুং-টুং সঙ্গীত—সব কিছু এতো ভালো লাগছিল যে, গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল মঞ্জুর। প্রকৃতি যেন ওর ভেতরের আনন্দের সঙ্গে সমতালে ওকে ভালো লাগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ তার আয়োজন নিয়ে।

ওর আনন্দের সব চাইতে বড় কারণ ও আজ জয়ী। জয়া ভালো হয়ে গেছে। জয়ার মন সুস্থ হয়ে উঠছে। জয়ার বিশ্বাস ও মরেই গিয়েছিল। একবিন্দু রক্তও দেহে আর অবশিষ্ট ছিলনা। ওকে বাঁচিয়েছে মঞ্জু-মমতা-মৌরীরা তাদের রক্ত দিয়ে। প্রথম প্রথম আকুল হয়ে এই একই প্রশ্ন সে ওদের বার বার করেছে, মমতা, তুমি রক্ত দিয়েছ? মঞ্জু কে কে রক্ত দিল কে আরো? তোর দিদি-বৌদিরা? ওদের সবার রক্ত আর ধমনীতে—আমার উপর এই কথার আশ্চর্য্য ক্রিয়া লক্ষ্য করে প্রথমে ওরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর জয়ার মনস্তাত্বিক চিকিৎসা শুরু করেছে এই পথে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই কথা ওরা নানা ভাবে শোনায় জয়াকে। ডান হাতের পাঁচ আঙুল ঢুকিয়ে বুকের উপর দু'হাত রেখে চোখ বুজে থাকে জয়া। যেন নিঃশব্দে অভাবিত সুখ উপভোগ করে।

জয়ার এই সুখ, জয়ার এই নিরাময় মনের আর শরীরের, মঞ্জুর কাছে এ কেবল একটি মেয়ের সুখই নয়, বাঁচাই নয়। ওর শক্তির জয়, ওর ব্রতের জয়! জয়া আত্মহত্যা করে ওকে যেন হারিয়ে দিতে বসেছিল।

আর মঞ্জুর আনন্দের কারণ, যে সব ঘটনা ওদের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল। পর্দার ছবির মতো যার নায়ক-নায়িকারা ঘটনার শেষের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। কিন্তু হারানোর ব্যথা রেখে গিয়েছিল হৃদয়ে—আবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটছে। তারা জীবনে ফিরে আসছে! আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, বাড়ীতে ডাক পড়বেই সজ্জাকারের। যে সামিয়ানা নামিয়ে ও তুলে ফেলতে হয়েছিল গাড়ীতে, আবার তা নামবে এসে বাড়ীতে। পুলকে বাবা ধরাখানাকে হাতের মুঠোর সরার মতো দেখবেন। বাসরঘরে বসেও দূর লক্ষ্যে মৌরীর দিকে তাকিয়ে থাকবে সুদর্শন—নীরবে সিগারেট খেয়ে চলবে সে। রমণীর রমণীয় সৌন্দর্য্য দূরে বসে সম্ভোগ করবে না বিজয় গৌরব উপভোগ করবে বসে সে—মঞ্জু জানে না। কিন্তু এক একজন ব্যক্তিকে দিয়ে যেমন এক-একটা কাজ কিছুতেই ভাবা যায় না, তেমনি সুদর্শনকে দিয়েও মঞ্জু কিছুতেই ভাবতে পারে না, দূরে বসে দূর নিরীক্ষণে মৌরীকে দেখতে দেখতে গোটাকয় সিগারেট নিঃশব্দে শেষ না করেই মৌরীর কাছে বাসর-সম্ভাষণ নিয়ে এগিয়ে এসেছে সুদর্শন।

কিন্তু না, মমতাকে মঞ্জু বাসুদেবের পাশে কল্পনা করছে না। ইচ্ছে করে নয়, আজ আর এ কল্পনা সে করতেই পারে না। মমতাকে হাসপাতালে তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে যদি মঞ্জুর দেখবার সৌভাগ্য না হতো তবে ঘটনাটা নিয়ে মনস্তাপ মঞ্জুর থাকতো। কিন্তু আজ নেই—একেবারেই নেই। সাদা পোষাক পরিহিত—সাদা মস্তকাবরণ-আবৃত মমতা। রোগীদের শয্যাপার্শ্বে ঘুরছে। এর শিয়রে, তার পায়ের কাছে, ওর পাশে দাঁড়াচ্ছে! চলতে চলতে থেমে পড়ে রোগীর মুখভাব লক্ষ্য করছে। শিয়রে ঝোলানো রোগীর অবস্থা লেখা বোর্ডটা হাতে নিয়ে পড়ছে। টান হাটা দিচ্ছে বড় ডাক্তারের উদ্দেশে—এ রূপ আশ্চর্য্য। এ রূপ অতুলনীয়! এই সেবা—না ঐ 'সেবা' শব্দ আর নয়। খাদ্য এলার্জির মতো মঞ্জুর শব্দ এলার্জি হয়েছে। ঐ 'সেবা' কথাটা শুনলেই শরীরে মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে ওর। সে ক্রিয়াটা যে কি হয় বোঝাতে পারবে না। নিজেও বোঝে না। অধৈর্য? চাঞ্চল্য? অস্থিরতা? কি জানি! বোঝাতে পারে না ও।

ওর ধারণা, 'সেবা' শব্দটা ক্রমবিবর্তনের পথে। তার আভিধানিক অর্থ বদলে যাচ্ছে। তার রূপান্তর ঘটছে অমাত্যের স্বৈরাচারের দাঁড়োয়ায়, ধনীর ভুয়া বিনয়ের মুখোশে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় বাস করে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে—আর বুইক ৭০৭-এ ভ্রমণ করতে করতে এঁরা এতদিন হাজার হাজার টাকার

কে জানে আরো কত কত ?) বিজ্ঞাপন ছড়ান—'আপনাদের সেবা' করতে সাহায্য করুন।' অর্থাৎ জিনিষের চারগুণ দাম এবং এই বিজ্ঞাপনের টাকা গুণে দিন। আপনাকে আরো নিঃস্ব আর আমাকে আরো ধনী হতে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আর রাজত্বের বেলায় কাজ করে বর্মের—লৌহবর্মের চাইতেও প্রচণ্ড যার রাধশক্তি! অস্ত্রে বেঁধেনা নয়, ও শব্দের শস্ত্র বুকে এঁটে রাখলে কেউ অস্ত্র নিক্ষেপ করে না।

পাড়াটার ভেতর ঢোকার পর থেকেই কেমন যেন লণ্ডভণ্ড, তছ্‌নছ্‌ দেখাচ্ছিল পল্লীটাকে। সবাই যেন বাইরে। কথা বলছে। জটলা করছে। দাঁড়িয়ে আছে। ছত্রাকার জিনিষপত্র, ছেলেতে, মেয়েতে বুড়োতে মিলে কুড়িয়ে ঘরে তুলছে।

মনের ভেতর এতো ছবি, এতো কথা নিয়ে চলছিল মঞ্জু যে, চোখের দেখাটা রিক্সার গতির সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, সরে যাচ্ছিল ন[illegible] থেকে। দেখছিল। বুঝছিল না। নীলের দরজায় নেমে এতক্ষণে চোখের উপর ভেসে-যাওয়া দৃশ্য স্পষ্ট হলো। বাড়ীটা যেন সমগ্র পল্লীর একটা নিদর্শন হয়ে পড়ে আছে। হাঁড়ি-কলসী বাসনপত্র টেনে ছুঁড়ে ফেলা। চাল ডাল ছড়িয়ে আছে স্যাঁতসেঁতে কেঁচোর-তোলা ভেজে মাটির মধ্যে একাকার হয়ে। বিস্মিতভাবে খোলা দরজা দিয়ে ারের দিকে তাকালো মঞ্জু। দেখল দু' কনুই টেবিলে রেখে, দু' করতলে মাথা চেপে ধরে চেয়ারে বসে আছে নীল। ভাড়া চুকিয়ে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল মঞ্জু। কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে ?

আশ্চর্য্য হলেও ধীর ভাবেই হাত নামালো নীল মাথা থেকে। প্রতিপ্রশ্ন করলো সে—কি ব্যাপার—এই বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ?

—আমার দিকে ব্যাপার কিছু নেই। ইচ্ছে করলো। এলাম। কিন্তু আপনাদের এখানের ব্যাপারটা কি ? আপনাদের সবার ঘরের জিনিষ বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কে ?

হাতের ব্যাগ চৌকির ওপর নামিয়ে রেখে নীলের বিছানার উপর বসল মঞ্জু। কিন্তু যেখানটায় বসল, সেখানটায় চালচোয়ানো জল পড়ে একেবারে ভিজে আছে। একটু সরে বসতে বসতে তার দিকে তাকিয়ে-থাকা অন্যমনস্ক নীলের দিকে তাকিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করল সে—হয়েছে কি ?

নীল তবু একটু সময় চুপ করে রইল। যেন যে ভাবনাটা ভাবছিল সে, সেটাকে সরিয়ে রাখতে সময় লাগল। তারপর মুখ খুলতে যেতেই, কে যেন বাইরে থেকে হেঁকে উঠল, ওহে নীল, তোমার জিনিষপত্র সব যে বাইরে পড়ে রইল। ঘরে তোল। বলতো তোমার মাসিমাকে পাঠিয়ে দি। দেবো ?

ঘর থেকে তেমনি হেঁকে জবাব দিল নীল, দরকার নেই। নষ্ট হবার মতো কিছু নেই। আমি তুলছি পরে।

[ক্রমশঃ।

রোগশয্যায়

অসীম বসু

আমাকে এই নির্জনতা থেকে
সরিয়ে নিয়ে যাও।
আমি সইতে পাচ্ছিনা এই নিঃসঙ্গ জীবন,
যেন নির্জনের কাঁধে ভর দিয়ে
মৃত্যু অহরহ চলছে ফিরছে
আমাকে চার পাশে রেখে।

এই নির্জনের গন্ধ নিয়ে নিয়ে
মা-মণি, আমি পাগল হোয়ে যাব।
আমাকে সরিয়ে নাও অন্য কোথাও।

কোলকাতার হাসপাতালগুলো বেশ
রাস্তার ধারে। যেখানে অজস্র
মানুষের কলগুঞ্জন, বাস, ট্রামের
দূরাগত মুগ্ধ সঙ্গীত।

মা-মণি, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো
আমি কান পেতে শুনবো
অসংখ্য মানুষের কলকণ্ঠ।
আমি কান পেতে শুনবো
মহানগরীর হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ;
আমার অসুখ ভুলিয়ে দেবে।

আমি প্রতিদিন জানালা দিয়ে
দেখবো সন্ত-জাগ্রত শহরের কলকণ্ঠের
মধ্য দিয়ে সূর্য্যটা একটু একটু করে
আমার মুখে আলো ফেললো—
রেণু রেণু স্বর্ণের কুচিগুলোর উত্তাপ
নিয়ে আমি মুহূর্ত্তে গা-ঝাড়া দিয়ে
উঠে দাঁড়াবো।

মা-মণি, আমাকে এই নির্জনতা থেকে
সরিয়ে নিয়ে যাও।
আমি হাজার মানুষের গুঞ্জিত
মৌচাকের মধ্যে ডুবে থাকবো।

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

শমিতা এবারে নিশ্চিন্তে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে। বিরাট বাড়ীটাকে ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে শমিতার এত শীতেও দেহ দিয়ে ঘাম ছুটে গিয়েছে। ওপরের একখানি ঘর মাত্র তারা ভাড়া নিয়েছে। নীচের এক তলায় কেবল রান্নাঘর। ছোট্ট ঘরের মধ্যে দু'জন বসলে বাসনপত্র রাখার জায়গা থাকে না। তবু শমিতার ভাল লাগে। শ্যামল রান্নাঘরে ঢোকে না। বন্ধু-বান্ধব কেউ এলে চা-এর জন্ত রান্নাঘরের দরজায় এসে অনুনয় করে। বলে, দু' কাপ চা করো না শমিতা?

তখন শমিতা হয়ত কান্না চাপিয়েছে। বলে, পারবো না। মুখ না তুলেই জবাব দিয়েছে শমিতা। যেন শ্যামলের কথাটা মন দিয়ে শোনেনি কিংবা শুনেও তার কোন গুরুত্ব দিতে সে চায়নি।

—ভদ্রলোক সকালবেলাতেই এসেছেন। আমাদের প্রথম সংসারে অতিথি এসে এক কাপ চা না পেয়ে চলে যাবে?

—দু'দিন পরে বুঝি বন্ধু-বান্ধবকে আনা যেত না?

—বন্ধুরা কি দিন-ক্ষণ দেখে আসবে?

—বেলা একটার সময় খেতে হবে, যেন মনে থাকে!

—আজ তো ছুটীর দিন।

বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। কুঞ্চিত দু'-একটি চুল পাক খেয়ে ঝুঁকে পড়েছে কপালের ওপর। ফর্সা রঙ আঁচের আভায় রাঙা হোয়ে উঠেছে। শ্যামল কয়েক সেকেণ্ডের জন্ত শমিতার নূতন

শ্যামল! শ্যামল! ডাকতে ডাকতে সোজা দেবেশ ভিতরে ঢুকে পড়ে।

—এ যে শমিতা! শ্যামল কোথায়?

—শমিতা সবে ঘরদোর সাফ করে হাতে ময়লা, জামায় কাপড়ে ধূলো-লাগা অবস্থায় এলোমেলো হোয়ে বসে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়টা সামলে নিয়ে ঘোমটা টেনে দিল।

—আমি দেবেশ। নতুন সংসার পেতেছো? দেখতে এলাম, কেমন আছ?

শমিতা কথা বলবে কি, আড়ষ্ট হোয়ে বসেই থাকে। শহরের মেয়ে সে, এখন পাড়াগাঁয়ে এসেছে স্কুলমাষ্টারের বৌ হয়ে। শহরের মেয়ে হোয়েও স্বামীর কাছে অন্ত পুরুষের সুমুখে লজ্জা করতে শিখেছে। বাড়ীতে মায়ের কাছেও শিখে এসেছে।

—কথাই বলবে না দেখছি! আচ্ছা চলি।

দেবেশ চলে গেলে ঘোমটা খুলে নিশ্চিন্তে বসেছে আবার। বন্ধুটা কেমন মানুষ! বন্ধু বাড়ীতে নেই জেনেও এসে ঢুকেছে। কেউ নেই বাসায়, এ অবস্থায় তার সঙ্গে ঘোমটা খুলে গল্প করবে নাকি শমিতা? নতুন এসেছে সে। লজ্জা করবেনা? বাড়ীওয়ালারা রয়েছে না? যার বন্ধু তার কাছে আদর। শমিতার কাছে দেবেশ কে?

বলেছে, ভারী ভাল লাগল হে! বেশ গুছিয়ে নিয়েছ মনে আর গৃহিণীটাও··· হা হা কোরে হেসে উঠেছে দেবেশ।

শ্যামল গম্ভীর হোয়েছে। বুঝতে পারেনি দেবেশ শমিতার জার জন্য এই গাম্ভীর্য্য না দেবেশের লজ্জাহীনতার জন্ত।

দেবেশ আর যায়নি শ্যামলের বাসায়। ভেবেছিল, তার দাবী ছে শ্যামলের কাছে। শ্যামল বেকার বসে থাকার সময় দেবেশ নের পর দিন শুধু নয়, মাসের পর মাস তাকে বেঁধে খাইয়েছে। র বেড়াবার পাশ দিয়েছে। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে সিনেমায় য়েছে। দু'জনে এক বিছানায় অনেক সময় ঘুমিয়েছে। আপনি কে তুমি ও শেষ পর্যন্ত তুইতে নেমেছে যে সম্বোধন সেখানে, তৃতীয় ক্তির আবির্ভাবে দেবেশ এতটা যে পর হবে বুঝতে পারেনি!

শ্যামল তবু দেবেশকে জোর কোরে ধরে নিয়ে গিয়েছে একদিন। মিতা চা কোরে দিয়েছে, মুড়ি দিয়েছে। শ্যামল খাওয়ার সময় সিকতা করার চেষ্টা করেছে।

—মুড়ি কেমন লাগছে খেতে?

হেঁট হোয়ে মুড়ি খাচ্ছিলো দেবেশ। মুখ তুলে শ্যামলের দিকে য়ে প্রশ্নটার মানে বুঝতে চেষ্টা করেছে।

—চা খেয়ে দেখ মিষ্টি হোলো কি না।

আবার চাইলো দেবেশ শ্যামলের দিকে—হাসছে শ্যামল।

—মিষ্টি-হাতের চা, মিষ্টি তো লাগবেই! তুমি এই কথা জানাতে চাও তো ওঁকে?

শমিতা ঘোমটা তুলে দুই বন্ধুর চা খাওয়া দেখছিলো! বেশের কথায় সুন্দর মুখটা রাঙা হোয়ে উঠলো। শ্যামলের দিকে য়ে হাসিটা গোপন কোরতে গিয়েও চাপতে পারলো না।

—কি, খুশী তো? কিন্তু আমিও খুব ভাল চা তৈরী করতে রি, তোমার চেয়েও ভাল। দেবেশ শমিতাকে শোনাতে চাইল।

এবারে শমিতা সরে গিয়েছে। শ্যামল বললে—সত্যি! বেশের রান্না তুমি খাওনি তাই। চলে গেলে বাজে কথা ভেবে!

—বেশ তো! খাওয়াবার ব্যবস্থা কর। এবারে শমিতা ওদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

—যাবে কি আমার ওখানে?

—নিয়ে চলুন না।

কথা বলেই শমিতা চেয়েছে শ্যামলের মুখের দিকে। কি কথা র চোখে-মুখে দেখে নেবে শমিতা।

—বেশ, মাইনেটা পেলেই হবে একদিন। যাবে তো ঠিক?

মাইনে পাওয়ার কথায় সব সুর কেটে যায়। সে কবে? মিতা ভেবেছিলো এক দিন একটু বেড়িয়ে আসবে। দেবেশের া খাবার লোভ তার নেই। বরং নিজে দেবেশের সংসারে গিয়ে ন্না কোরে খাইয়ে আসবে। দেবেশ যত ভাল রান্নাই করুক য়েদের কাছে সে কিছুই নয়। শ্যামলের পুরানো বন্ধু। শুধু নয়, অন্তরঙ্গ, একান্ত আপনার। দিনের পর দিন শ্যামলকে খাইয়েছে। জামা-কাপড় না থাকলে নিজের জামা-কাপড় তুলে য়েছে অম্লান বদনে। দেবেশ সেদিন হঠাৎ শমিতা একা-থাকা বস্থায় বাড়ীতে ঢুকে যে লজ্জায় ফেলেছিল, তারপর শ্যামলের ছে সব শুনে দেবেশের ওপরে সহানুভূতিতে মন ভরে ঠছিল শমিতার। আরও মন ভরে উঠেছিল দেবেশের একা-একা অসহায় অবস্থায় থাকার কথা ভেবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু বিয়ে কোরে যখন সংসারী হোয়েছে তখন আর এক জন একাই থেকে গেল নিঃসঙ্গ অবস্থায়!

—তোমার বন্ধুকে এক দিন নেমন্তন্ন কর না? শ্যামলের মেজাজ বুঝে শমিতা প্রস্তাব তুলেছে।

—হঠাৎ বন্ধুর ওপর এতটা দরদ? বেশ গম্ভীর ভাবেই শ্যামল কথা বলেছে।

—না, এমনিতেই বলছিলাম। নিজে হাতে রান্না কোরে খায় রোজ-রোজ! পুরুষমানুষ রোজ-রোজ পারে নাকি?

—তা হোলে তুমি গিয়ে রান্না কোরে দিয়ে এসো না মধ্যে মধ্যে।

—তুমি হোলে পারতে?

—কি দরকার, নিজেকে করতে হবে বলেই তো তোমায় নিয়ে আসা।

—তবে বন্ধুর একটা বউ এনে দাও।

—বাঃ। সে বেচারী থাকলে তোমার এই সহানুভূতিতে তোমাকে হয়ত হাতের কাছে যা থাকত তাই-ই দিয়ে বসত।

কথাটা যেমন কোরে যে সহানুভূতি নিয়ে শমিতা বলতে গিয়েছিল শ্যামল সে ভাবে নেয়নি। শমিতার নিজেরই কেমন মনে হয়। শ্যামল যেন ভুলে গিয়েছে দেবেশের কথা। দেবেশের প্রতি শ্যামলের কৃতজ্ঞতা নেই। শ্যামল যেন দেবেশকে এড়িয়ে এড়িয়েই

চলতে চায়। শ্যামল যখন কোথাও ঠাঁই পায়নি দেবেশ তখন তাকে ঠাঁই দিয়েছিল, সে কথা কেমন কোরে ভুলে গেল সে ?

শমিতার পীড়াপীড়িতে শ্যামল একদিন খাওয়ার নেমন্তন্ন করলো দেবেশকে। দেবেশ রাজি হতে চায়নি। বলেছে, মাইনে পাও আগে, তারপর।

—না, শমিতা ধরেছে আজই, মাইনে পেলে তো তোমার বাসায় আমরা যাব।

বেশ, তাই হবে।

রবিবার ছুটীর দিন। স্কুলের হাঙ্গামা নেই। দুই বন্ধুতে বহু দিন পরে একসঙ্গে খাবে। শমিতার ভারী আনন্দ। রোজ-রোজ হাত পুড়িয়ে একজন খাবে, আর একজন নিশ্চিন্তে অপরের হাতে আরাম করবে—ভাল লাগেনি এই ব্যবস্থা শমিতার। বরং উচিত ছিল বন্ধুকে তাদের বাসায় খাওয়ার কথা বলতে। দরকার পড়লে সে অন্তত কিছু দিয়েও খেতে পারত। তাতে সঙ্কোচের কোন কারণ থাকতো না।

সারা দিন ধরে শমিতা খুব যত্ন কোরে রান্না করলো নানা রকম মাছ-তরকারী। কিছুটা স্বামীর ঋণ সে শোধ করবে। অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে এই ভাবে নিমন্ত্রণ কোরে দেবেশকে সে খাওয়াবে।

খেতে বসে দেবেশ যখন রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল শমিতা তখন আড়ালে থেকেই শুনছিল সব। এমন মানুষটার প্রতি শ্যামল অবিচারই করেছে। এরকম বন্ধুকে বিয়ে করে এনে সংসার পাতার পর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে দিতে আছে ?

দেবেশ সরল শিশুটির মত এটা-ওটা চেয়ে নিলো। পাশে বসে শ্যামল শুধু দেখতে লাগল, সে দেবেশের চেয়ে অনেক কম খায়। তা ছাড়া শমিতার রান্নায় উচ্ছ্বসিত হবার কোন কারণ তার নেই। তার কাছে তো আর নূতন নয়।

খাওয়ার প্রায় শেষে তৃপ্তিতে যখন ঢেঁকুর তোলে দেবেশ, তখন শমিতার মনে হয় মানুষটাকে সত্যিই অসহায়। বলে, বিয়ে করুন, হাত পুড়িয়ে কত দিন খাবেন ?

—বিয়ে করব বললেই কি আর করা যায় ?

—কেন ?

—আমার মত এই চেহারার মানুষকে বিয়ে করবে কে ?

শমিতা হাসল। বলল—বাংলা দেশের ও বদনাম দেবেন না ; পুরুষ-কুপুরুষের প্রশ্ন আছে না কি এদেশের মেয়ের বিয়েতে ?

—আছে বৈ কি। আমার এই চেহারা দেখে একবার গ্রামের এক মেয়ে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। কথার শেষে কেমন করুণ ভাবে হাসতে থাকে দেবেশ।

চমকে ওঠে শমিতা। ঔৎসুক্য বাড়ে।—কোথায় ?

—হুগলির এক গ্রামে।

এবারে শমিতার যেন গলা ধরে আসে। তবু বলে, কোন্ গ্রাম আছে ?

—সে কি তুমি চিনবে ? রাজপুর !

আর দাঁড়ায়নি। শমিতা আড়ালে চলে গিয়েছে। আর কথা নি। হঠাৎ কথা বন্ধ করায় ওরা ভেবেছে শমিতা সেই মেয়ের রেগেছে ! আর দেবেশের প্রতি সহানুভূতিতে দুঃখ পেয়েছে। ওরা কেউই জানতে পারেনি সে মেয়ে ওদের সুমুখেই ! সেদিন সে নিজে তাকিয়ে দেখেওনি দেবেশকে। শুধু বাড়ী-শুদ্ধ লোকের আলাপ-আলোচনা শুনে সে স্পষ্ট মাকে জানিয়েছিল যে, ওখানে বিয়ে করবে না সে।

শমিতার বাড়ীর লোকে বিয়ে দিলেও দেবেশ নিজে বিয়ে করতো না। কন্যাপক্ষের যে আগ্রহ সাধারণতঃ দেখা যায়, সে আগ্রহ না থাকায় দেবেশ নিজেই কোন রকমে মেয়ে-দেখা সেরে চলে এসেছিল। দেবেশ বুঝেছিল, এদের কন্যাদায় গলায় বাধেনি। ওদের কিছু-কিছু কথাবার্তাও কানে এসেছিল দেবেশের।

তারপর দেবেশ কোন দিন আর বিয়ের কথা মুখে আনেনি। মাষ্টারী নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

শমিতা কতক্ষণ রান্নাঘরে চুপ কোরে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল ছিল না। শ্যামলের ডাকে খেয়াল হয়। ও-ঘরে খেতে দিয়েছে দু'টি মানুষকে। ভুলেই গিয়েছে কখন শমিতা।

—আমাদের পান দেবেনা ?

চোখের কোণে কেন যেন একটু জল এসেছিল। মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ওদের সুমুখে।

—খাওয়া হোয়ে গেল ?

—তুমি তো শুধোলে না কি লাগবে না লাগবে ? কৌতুক উঁকি দিয়েছে শ্যামলের চোখে।

—আমার শরীরটা হঠাৎ—

—খারাপ হোয়েছে ! কি হোলো ? দেবেশ যেন উদ্বিগ্ন হোয়েছে ভীষণ।

—না, এমনি হঠাৎ মাথাটা ধরেছে।

—ও !

দেবেশ চলে গিয়েছে। শমিতা ভাত সামনে রেখে শুধুই নাড়াচাড়া করছে। মন চলে গিয়েছে সেদিনের রাজপুরে। দেবেশ চলে আসায় মুখে হাসি ফুটেছিল বাড়ী-শুদ্ধ লোকের সঙ্গে তারও। আজ দেবেশের মুখ থেকে শুনে সেদিনের দেবেশের চলে আসার সময়ের মুখটার কথা মনে পড়ে। সে ব্যথা দেবেশ আজও ভোলেনি। এ কি মেয়েমানুষের মন তার ! লেখাপড়া শিখেছে সে। মাষ্টারী করছে। নিজের সম্বন্ধে এ রকম ছোট ধারণা কেন ? শমিতার চেয়েও কত সুন্দরী তাকে এখনও স্বামিরূপে পেলে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মাকে শেষ ক'টা দিন একটু শান্তি দিতে পারে। একটু করুণ হাসিও ফোটাতে পারে।

—তখন আমাদের খেতে দিয়ে চলে গেলে যে রান্নাঘরে, আর দেখা দিলে না, ব্যাপার কি ? রাত্রে শ্যামল প্রশ্ন করেছে শমিতাকে।

—এমনিই।

—বন্ধুর দুঃখে ?

—না।

—কোন মেয়ে বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে তোমার দুঃখের তো কারণ নেই ? তুমি চেন নাকি সে মেয়েকে ?

কোন জবাব দেয়নি শমিতা। সেদিন তাকে চেনেনি শমিতা, আজ চিনেছে। দেবেশকে দেখে চিনেছে। এমন সদাশিব মানুষকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল বাইরেটা দেখে। লোকটার এই বৈরাগ্যের জন্য শমিতার নিজেকে খানিকটা দায়ীই মনে হয়।

কয়েক দিনে যখন শমিতা ভুলে এসেছে দেবেশের কথা, তখন শ নিজেই এসে হাজির। তার বাসায় বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মন্ত্রণ।

দেবেশকে দেখে মনে পড়েছে শমিতার আগের কথা। নেকটা রোগা হোয়ে গিয়েছে দেবেশ। মুখের দিকে চাইলে মনে য় ব্যথায় সে মুখ আহত। তার ওপরে সে পুরুষ হোয়ে নিমন্ত্রণ রতে এসেছে নিজে রেঁধে খাওয়াবে বলে।

—আপনি রান্না করবেন তো? প্রশ্ন করেছে শমিতা।

—ও ছাড়া আর কে? জবাব দিয়েছে শ্যামল। আর কাউকে তা সেই দাম্ভিকা আসতে দেয়নি?

যেটাকে শমিতা ভুলে এসেছিল অনেকটা এবং জোর কোরে ভুলতে চেয়েছিল সেখানেই আঘাত দিয়েছে শ্যামল। শমিতা বলেছে—আমি রাঁধব।

—বেশ তো! কৌতুক বোধ করেছে শ্যামল।

—তা কি হয়? তোমার কষ্ট হবে। লজ্জায় কালো মুখকে আরো কালো করে বলেছে দেবেশ।

—আপনি রান্না করবেন আর আমি মেয়ে হোয়ে খাব, সেটা হয় কি?

—থাক তুমিই যাও শমিতা! চল বরং আমিও যাই। দেখে আসি দেবেশের সংসার।

সমস্ত ঘরটা একটা ছোটখাটো কুরুক্ষেত্রের বেশে এলিয়ে ইতস্তত পড়ে আছে তরী-তরকারি, জামা, কাপড়, বাসন বালতি, চা দুধ, চালে-ডালে আর বিছানায় বইতে। দেখে হাসি পায় আবার শমিতার মত মেয়ের কান্না পায়। নিজে হাতে সবকিছু গোছায়। তার পর রান্নার যোগাড় করে। উনুন জ্বালে, রান্না চাপায়। দেবেশ বসে বসে অস্বস্তি অনুভব করে। ছটফট করে। আরো ছটফট করে যখন শ্যামল চলে যায় একটু কাজে।

কাজ করতে করতে শমিতা দেবেশের মুখের দিকে না চেয়েই বলে, আচ্ছা সেই মেয়েটির ওপরে আপনার খুব রাগ আছে, নয়?

—কোন্ মেয়েটির ওপর?

—যে আপনাকে বিয়ে করতে চায়নি।

—না।

—কেন?

—আমাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, হয়ত মুখে আপত্তি না জানিয়ে সে পরে আমাকে বিপদেই ফেলতো।

—আচ্ছা, তার চেহারা আপনার মনে আছে?

—না। তবে অনেকটা তোমাদের মতই দেখতে।

হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলো শমিতা ভয়ে ভয়ে। না অন্যমনস্ক দেবেশ।

—আচ্ছা যদি সে মেয়েটার দেখা পান, তবে কি করবেন?

—কিছুই না। তাকে ধন্যবাদ জানাবো।

—সত্যিই আমি তাকে চিনি। তাকে দেখাতে পারি। ঠোঁট টো অজানা ভয়ে কাঁপে।

—তাকে আমি দেখেছি।

শমিতার সেদিনের রান্না কেউ খেতে পারেনি। কোনটা নুনে পোড়া। কোনটা আধসেদ্ধ।

মুখ বুজে সকলেই খেয়েছে কিছু কিছু। বেশীর ভাগ পড়ে থেকেছে পাতে। একমাত্র শ্যামল বুঝতে পারেনি কার রান্না ওটা। শমিতার না দেবেশের? শুধিয়েছে—কার রান্না এটা? কেউ জবাব দেয়নি।

বাড়ী ফিরে শ্যামল শুধিয়েছে তুমি রান্না করেছ, অথচ এরকম হবার মানে বুঝলাম না।

—ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে ও-রকম হোয়েছে।

—কি গল্প? ওর দুঃখের কাহিনী তো?

—হ্যাঁ।

—অভাবের কাহিনী শুনে বুঝি চোখে জল এসেছিল। সত্যিই জল আসে। বিরাট সংসার ওর ঘাড়ে। একপাল লোক ওর মুখপানে তাকিয়ে আছে। ও টাকা পাঠাবে তবে তারা খাবে। এই কাহিনী শুনেছো তো সারাদিন?

কোন জবাব দেয়নি শমিতা। অজানতে কোন সময় চোখে জল এসেছে।

সত্যি দুঃখু হয়। বেচারী ঐ সংসারের জন্যই বিয়ে করতে পারলোনা!

কি বললে? উৎকণ্ঠায় উঠে বসেছে শমিতা।

—কিছু নয়, ঘুমোও।
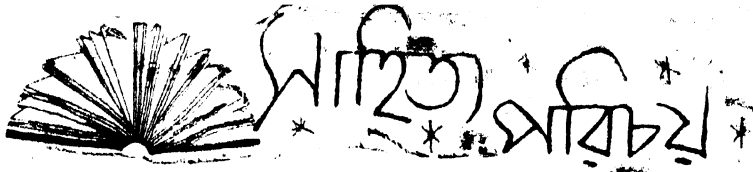
উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

তরঙ্গের পর

আলোচ্য গ্রন্থখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত একখানি প্রেমের উপন্যাস, মিষ্টি আমেজ-লাগানো সুরে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে আত্যোপান্ত। তরুণী নায়িকার ঐশ্বর্য্যলোলুপ ধনলিপ্সু হৃদয়ে কেমন করে হঠাৎ জাগলো অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন, প্রেমের মায়াবী পরশ দূর করে দিল সব মালিন্য সব কলুষকে। কুশল হস্তে লেখক এঁকেছেন তারই ছবি। হরিনারায়ণ বাবুর মনোরম স্নিগ্ধ লিখনশৈলীর গুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়েই পাঠকের মনের দরজায় হাজির হয়, উপন্যাসের পরিণতিটুকু একান্ত স্বাভাবিক ও সার্থক। সুতপা ভালবেসেছিল তরুণকে একদিন, প্রধানতঃ তার অর্থসম্পদের বাহ্যিক জলুষে আকৃষ্ট হয়েই কিন্তু প্রেমের দুরন্ত তরঙ্গে ভেসে গেল সব আবিলতা। দয়িতা দয়িতকে চাইলো ভালবাসলো শুধু ভালবাসার দাবীতেই, আত্মপ্রকাশ করলো তাদের হৃদয়ের সত্য স্বমহিমায় স্বাধিকারে। কুশলী সাহিত্যকার নিপুণ হাতে টেনে নিয়ে গিয়েছেন কাহিনীটি, পড়ার শেষে পূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে পাঠকের অন্তর আর সেটাই এই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। বইটির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য আঙ্গিক রুচিসঙ্গত। প্রকাশক, মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২, দাম—পাঁচ টাকা।

হিরণ্ময় পাত্র

বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটি, আমাদের বেদে-পুরাণে সৃষ্টির তামসী রূপকে দেখানো হয়েছে, সর্ব্বত্রই সত্যের মহিমোজ্জ্বল সত্তার পাশাপাশি। সত্যের ধর্মের ন্যায়ের পরম সুন্দর শুচিস্নিগ্ধ রূপটিকে আবৃত করে রাখে এই অসত্য তামসী সৃষ্টি বাহ্য সৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই, তাই শাস্ত্রজ্ঞ স্থিতধী জন সৃষ্টির তামসী সত্তার নামকরণ করেছেন "হিরণ্ময় পাত্র", অসত্যের এই পাত্র অপসারিত হলেই হয় সত্যের প্রকাশ স্বমহিমায়। কদাচার বা পাপের ঘৃণ্য ছবি আঁকাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, অন্ধকারের পটভূমি যেমন আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়, সত্যের আনন্দঘন মূর্ত্তিটিরও সম্যক মহিমা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না—যতক্ষণ না অসত্যের অন্ধকার ভেদ করে সে দেখা দেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই তামসী সৃষ্টির যথার্থ মূল্য আমাদের উপলব্ধিগোচর হয়। বেদ-পুরাণের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট বারোটি কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে, লেখক প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন, আখ্যানগুলির প্রাণসত্তাকে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের সহিত সমতা রেখেছে তাঁর গম্ভীর ধ্বনিপূর্ণ সমৃদ্ধ ভাষা, যেমন কুশলী সংগীতজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে নিপুণ সঙ্গতিয়া—কোথাও ঘটেনি ছন্দপতন, ভাষা ও ভাব একই খাতে বয়ে গিয়েছে স্বচ্ছন্দ অন্তরঙ্গতায়, আর সেটাই এই বইখানির সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ, অন্যান্য আঙ্গিক সাধারণ। লেখক—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী। ত্রিবেণী প্রকাশন—প্রাইভেট লিঃ, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২, দাম চার টাকা মাত্র।

জল পড়ে পাতা নড়ে

বাস্তবের কঠিন মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক সাহিত্য আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেন বর্ত্তমান লেখক। সাংবাদিক সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত আলোচ্য পুস্তকখানিও বাস্তবের পটভূমিতে রচিত একটি জীবনধর্মী কাহিনীর সার্থক রূপায়ণ। উপন্যাসটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি সম্পূর্ণ আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় রচিত, বাস্তবানুগ আখ্যানটি সহজেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এর ভাষার বৈচিত্র্যে। এক গ্রাম্য পারিবারিক কাহিনী সহজ অন্তরঙ্গতায় স্থান ভরে নেয় পাঠকমনে, সাধারণ চরিত্রগুলি দেখা দেয় আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে। আকারে বৃহৎ হলেও লেখকের মুন্সিয়ানায় আগাগোড়া কৌতূহল বজায় থাকে ক্লান্তিকর বা বোরিং হয়ে ওঠে না কোথাও। সাহিত্য ক্ষেত্রে ভাষা নিয়ে আজ যে পরীক্ষা নীরিক্ষা চলেছে আলোচ্য গ্রন্থটি তার এক সার্থক নিদর্শনরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহিত্যের অঙ্গনে লেখক সুপরিচিত, তাঁর পূর্ব সুনামকে বর্ত্তমান গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখবে, এ আশা আমরা স্বচ্ছন্দেই করতে পারি। লেখকের বিরুদ্ধে আমাদের একটিমাত্র অভিযোগ এই যে, বাস্তবছবি আঁকতে বসে মাঝে মাঝে তিনি শ্লীলতার গণ্ডিকে অতিক্রম করেছেন যা মার্জ্জিতরুচি মানুষের পক্ষে একান্ত অরুচিকর, মনে হয় এসম্বন্ধে আর একটু সংযমের পরিচয় দিলে তিনি ভাল করতেন। বইটি পাঠক-সমাজে আদৃত হবে বলেই আমরা আশা করি। প্রচ্ছদ সুন্দর, অন্যান্য আঙ্গিকও প্রশংসনীয়। ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২, দাম আট টাকা মাত্র।

সভাপর্ব

শক্তিশালী সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নতুন করে কোন পরিচয় দেওয়ার নেই, আলোচ্য বইটি তাঁর সদ্য-প্রকাশিত এক ছোট গল্পসংগ্রহ, মোট সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। নরেনবাবু সম্পূর্ণ ভাবেই আমাদের ঘরোয়া লেখক, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য, আপনক্ষেত্রে তিনি অনন্য বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয়না, নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি আমাদের চারপাশের প্রত্যহ দেখা মানুষগুলির এক নতুন রূপ, মানুষের মনের ভেতর রয়েছে যে বিচিত্র মহাদেশ তিনি তারই আবিষ্কারক, আলোচ্য কাহিনীগুলিও সেই একই অন্তর্দৃষ্টির বাহকবাহী। মানব মনের নানা বিচিত্র ভাবতরঙ্গকে সার্থক ভাবেই

কাশ করেছেন লেখক গল্পগুলির মাধ্যমে, প্রথম ও শেষ গল্পটি শেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, "সভাপর্ব" গল্পটির নায়িকার সাধারণ বনে এক মুহূর্ত্তের জন্মও যে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগল তা লোড়ন জাগায় পাঠকমনেও। সাধারণ জীবন যাপনে একঘেয়েমি ড়িত করে তুলেছিল সন্ধ্যার নারীমনকে তাই মুহূর্ত্তের জন্মও মান্যা হয়ে উঠতে চেয়েছিল অসামান্যা মুহূর্ত্তের জন্ম ও বসিয়েছিল জেকে নায়িকার আসনে, কল্পনা-আশ্রয়ী নারীমনের এই স্বাভাবিক বপ্রবণতাকে কুশল লেখনীতে প্রকাশ করেছেন লেখক আলোচ্য ল্পটিতে; অন্যান্য গল্পগুলিও সুপাঠ্য। প্রচ্ছদ শোভন, অঙ্গসজ্জ থাযথ। পরিবেশক—ডি হাজরা এণ্ড কোং ১৩ সূর্য সেন ষ্ট্রীট লিকাতা—১২, দাম—দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

দেহ-দেউল

মানুষের মধ্যেই ভগবানের বাস। মানুষকে ভালোবাসা গবানকে ভালোবাসারই নামান্তর। মানুষকে কেন্দ্র করেই যুগে গে কালে কালে ভগবানের পূত মহিমার দিব্য বিকাশ ঘটে াসছে সকল কালে, সকল সমাজে। মুখ্যতঃ এই পটভূমিকে বলম্বন করেই আলোচ্য গ্রন্থটি রূপ পেয়েছে। একটি অনন্য-াধারণ নারীর চরিত্রের মাধ্যমে সুসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এই াশ্বত সত্যেরই জয়গান গেয়েছেন। জীবনের পূর্ণতা প্রেমে, প্রেমের এক অসাধারণ আলেখ্য লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে অঙ্কিত হয়েছে। বিরহ-মিলনের যে সময়ের মধ্যে প্রেমের যে প্রকাশ সেই প্রেমকেই লেখক দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সমগ্র গ্রন্থে রসঘন পরিবেশ রচনাতেও গজেন্দ্রকুমার নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের এক গভীর সত্যকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কিশোরী বাবু তার মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার প্রভাবে আপন দেহকে দেব-দেউলে পরিণত মনে করে ধন্য; তার এই মোহ বর্দ্ধিত থেকে বর্দ্ধিততর হতে থাকে অবশেষে, সে-ও জীবনের মূলমন্ত্রের পাঠোদ্ধার করে, সেও খুঁজে পায় জীবনের সারসত্যকে, জীবনের অর্থও আর দুর্বোধ্য থাকে না তার কাছে। গ্রন্থটি সর্বতোভাবে সুখপাঠ্য—এবং বক্তব্য হৃদয়স্পর্শী এবং এর আবেদন অন্তর স্পর্শ করে। দেহ-দেউল গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সাহিত্যিক দক্ষতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রকাশক—অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ ১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম তিন টাকা মাত্র।

নীলাঞ্জনের খাতা

আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর যে ক'জন সাহিত্যস্রষ্টার জন্যে বাঙলা তথা সারা ভারতবর্ষ গর্ববোধ করতে পারে, বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই একজন। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-মিলনের সমষ্টি এই জীবন, এই জীবনের আছে নানা রূপ; আলোচ্য উপন্যাসটিতে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় বিশেষ একটি রূপের পূর্ণাঙ্গ চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনের এই ঘাত, সংঘাত প্রতিঘাতকে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন লেখক।
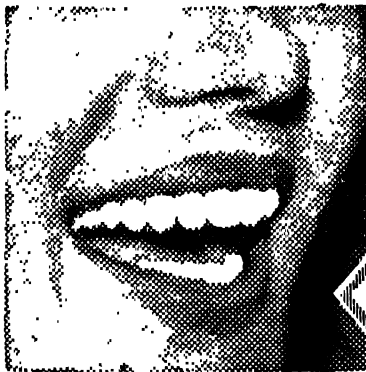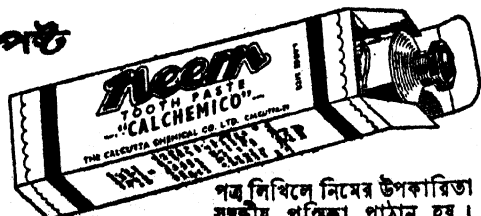
ফলে যার চিত্রায়ণ কেবলমাত্র অকৃত্রিমই নয় সর্বাংশে নিখুঁত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখকের বলিষ্ঠ, সারবান এবং অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় মেলে প্রকৃষ্ট পরিমাণে। স্বনামধন্য সাহিত্যশিল্পীর লেখনীজাত এই উপন্যাসটি সর্ব্বতোভাবে রসোত্তীর্ণ। ঘটনা-সংস্থাপনে, চরিত্রসৃষ্টিতে, সংলাপ যোজনায় বলা বাহুল্য, সকল দিক দিয়েই বুদ্ধদেব বসু অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাপসী চরিত্রটি সুচিন্তিত এবং সুরূপায়িত। উপন্যাসটিতে বিশিষ্টতা এবং বিচিত্রতার এক মিলন ঘটেছে। বুদ্ধদেব বসুর বলিষ্ঠ লেখনীর কল্যাণে গ্রন্থটি যথেষ্ট সাফল্যের অধিকারী হতে সমর্থ হয়েছে। উপন্যাসটির পাতায় পাতায় লেখকের সর্বজনস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বিদ্যমান। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। দাম—চার টাক. মাত্র।

রাণী বৌ

সাহিত্যক্ষেত্রে মৌলিকতার দাবী করতে পারেন যে বিরল সংখ্যক কয় জন, প্রাণতোষ ঘটক তাঁদেরই অন্যতম। তিনি মূলত: চিত্রধর্মী সাহিত্যকার তাঁর লেখা পড়তে পড়তে যে আনন্দ পাঠক পান, তা কলমে-আঁকা নিখুঁত ছবি দেখার, সংক্ষিপ্ত বাক্যের সাহায্যে খণ্ড-খণ্ড জীবনচিত্র তিনি গ্রথিত করে তোলেন সুদক্ষ মালাকরের মতই সহজ পারঙ্গমতায়। স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাই তাঁর বক্তব্য মুখর ও প্রাণবন্ত। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রাণতোষ বাবুর অধুনাতম গল্পসংগ্রহ, একটি বড় গল্প ও দু'টি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে, প্রথম গল্পটির নামেই নামকরণ হয়েছে বইটির, আর এই গল্পটি শুধু প্রথমই নয় প্রধানও, সম্পূর্ণ সমাজ-সচেতন কালোচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত 'রাণী বৌ' গল্পটি একটি সুন্দর বাস্তব জীবনচিত্র ধন নয়, মান নয়, শুধু দুমুঠো অন্নের অভাব যে কত প্রবল হয়ে উঠতে পারে তারই প্রভাবে মানুষ যে মনুষ্যত্বও পণ্য করে তোলে নির্দ্বিধায়, কুশলী রচয়িতা সেই চিত্রই এঁকেছেন আলোচ্য কাহিনীর মাধ্যমে। 'রাণী বৌ' গল্পটির মধ্যে সার্থক উপন্যাসের পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, আশা করি যথাসময়ে লেখক এসম্বন্ধে অবহিত হবেন। লেখকের ভাষারীতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ। পুস্তকটির আঙ্গিক প্রশংসনীয়। ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬ দাম—চার টাকা মাত্র।

গল্প

আলোচ্য পুস্তকখানি শ্রীঅন্নদাশংকর রায় লিখিত একখানি ছোট গল্পের বই। মোট পঁচিশটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে বিভিন্ন পর্য্যায়ের অন্তর্গত হিসাবে। অন্নদাশংকরের লিখন শৈলীর প্রভাবে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে নিটোল রসোত্তীর্ণ। বেগবান ভাষা, তীব্র মননশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'গল্প' কে দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা পড়তে পড়তে নতুন করে অভিভূত হতে হয় এই সার্থক শিল্পীর শিল্পায়নে। প্রত্যেকটি গল্পই অনবদ্য, ছোট গল্পের আঙ্গিক নিখুঁত ভাবে বজায় রয়েছে সর্ব্বত্র, 'হাসন সখী' দু'কান কাটা' 'উপযাচিকা' ইত্যাদি গল্পগুলির সৌকর্য্য ও তীক্ষ্ণতা মোপাঁসার গল্পের স্বাদ এনে দেয় ম যেমনই নিখুঁত শৈলী তেমনই তীব্র বিশ্লেষণ, কলম যে 'তরবা চেয়ে শক্তিধর' এই বিদেশী প্রবাদটিই বার বার মনে জেগে পাঠকের। তরুণ অন্নদাশংকরের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ একা চমক লাগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেও। সাদর স্বীকৃতিতে তিনি করেছিলেন সেদিন নবীন আগন্তুককে, আজও অন্নদাশংকর বহন ক চলেছেন সেই উত্তরাধিকারকে—তাঁর সম্বন্ধে এইটাই আমাদে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, অন্যান্য আঙ্গিক উচ্চাঙ্গের প্রকাশক—শ্রীগোপাল দাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

পত্রলেখার বাবা

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাম্প্রতিকতম গল্পসংগ্রহ পত্রলেখার বাব মোট নয়টি রচনা স্থান পেয়েছে এতে। মধ্যবিত্ত সমাজের না চরিত্র বাস্তবানুগ কাহিনীর মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে লেখকের সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ছাপ পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি গল্পেই 'পত্রলেখার বাবা' নামীয় গল্পটিতে মানসিক বিকৃতি বা পার্ভাসনে এক সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায়, আলোচ্য গল্পটির নায়কের বিলাস ছি কুৎসামূলক পত্ররচনা, এই মানসিক বিকৃতির আধিক্য শেষ পর্য্যা প্রয়োজিত হল তার নিজেরই সংসারে, স্বীয় কন্যার বিরুদ্ধে বেনাম চিঠি লিখল সে; গল্পটির পরিণতি একাধারে ট্রাজিক ও হাস্যকর নিপুণ প্রয়োগশিল্পের ছাপ সর্বত্র লক্ষ্যণীয়। অন্যান্য গল্পগুলি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশিষ্ট। লেখকের ভাষা সরল ও বলিষ্ঠ গল্পগুলির ভাব প্রকাশে যা একান্ত সহায়ক। বইটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি, একথা অকুণ্ঠেই স্বীকার করি আমরা। অঙ্গসজ্জা যথাযথ প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা মাত্র

অন্দর মহল

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একখানি আধুনিক গল্পসংগ্রহ। লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বচ্ছ সাবলীল ভাষারীতি সহজ সাবলীলতায় পাঠক-মনকে স্পর্শ করতে তিনি পটু, বর্ত্তমান গ্রন্থেও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনধারার সার্থক রূপায়ণে বইটির গল্পগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতা আশ্রয়ী মানুষ আজ হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত "অবতরণ" গল্পটির আবেদন বিশেষ ভাবে মনকে স্পর্শ করে, আবার "চন্দন, ধূপ, ধুনোগন্ধ" গল্পটি প্রকাশ করেছে মনের ঘাত-প্রতিঘাত নিরুদ্ধ পীড়িত সত্তার বিদ্রোহকে নিপুণ ভাবে, অতি সহজেই লেখক পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর বক্তব্যকে আমাদের কাছে। গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে সুরবালা চরিত্রটির জন্য। আমরা বইটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আঙ্গিক সাধারণ। ত্রিবেণী প্রকাশন—২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কঙ্গো ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহার জীবনকালের মধ্যে অন্ততঃ এক বার তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দিও শেষ না দেখিয়া এ সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে গঠিত জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলে বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই, ইটালীর আক্রমণ হইতে ইথিওপিয়াকে রক্ষা করার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। জার্ম্মাণী ১৯৩৩ সালে এবং ইটালী ১৯৩৭ সালে জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর সাহায্যপুষ্ট ফ্রাঙ্কো, স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করার ফলে ফ্রাঙ্কোই জয়ী হইয়াছিল। কার্য্যতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই জাতিসঙ্ঘের ভরাডুবী হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ পর্য্যন্ত কি কি ভাল কাজ করিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিবার স্থান এখানে নাই। নিরাপত্তাপরিষদ তথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিভেদ ও পৃথকীকরণ নীতি এবং আলজিরিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল আক্রান্ত হইলে গোড়াতেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। রাশিয়া হুমকী না দিলে বৃটেন ও ফ্রান্স সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া তাহাদের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে রাজী হইত কি না, তাহা লইয়া মতভেদ অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু কঙ্গোর ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ যে খুবই দ্রুততার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। গত ১৪ই জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদে ৮-০ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গো প্রজাতন্ত্র হইতে বেলজিয়ামকে সৈন্য অপসারণ করিতে আহ্বান জানান হয় এবং সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশীল্ডকে কঙ্গো গবর্ণমেণ্টকে সামরিক সাহায্য দিবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রস্তাবে ইহাও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, কঙ্গোলীজ সৈন্যদল অবস্থা পুরাপুরি আয়ত্তে না আনা পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোকে সামরিক সাহায্য দিবে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেন, ফ্রান্স এবং চিয়াং কাইশেক সরকারের প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত ছিলেন। এই প্রস্তাবে তাঁহারা যে ভেটো প্রদান করেন নাই ইহাই রক্ষা। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গোর অবস্থা সম্পর্কে এখানে প্রথমে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

গত ৩০শে জুন বেলজিয়াম কঙ্গোকে স্বাধীনতা দান করে। কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের ৭ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ কঙ্গোলীজ সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়া শ্বেতাঙ্গদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সংবাদ যেভাবে পরিবেশিত হয় তাহাতে এই বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবু এই সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিদ্রোহী সৈন্যরা সেনা বাহিনীর বেলজিয়াম অফিসারদের অপসারণ এবং বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবী করে। সংবাদে আরও প্রকাশ, ৬ই জুলাই বিদ্রোহীরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং পার্লামেণ্ট ঘেরাও করিয়া শ্বেতাঙ্গদিগকে অপসারণের দাবী জানায়। ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় এক বেতার ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা বলেন যে, এই আন্দোলনের মূল ইউরোপীয় অফিসারদিগকে এবং নন্-কমিশণ্ড অফিসারদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তথ্যপ্রচার দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ কাশামুরা বেতার ভাষণে বলেন যে, "আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা সর্ব্বত্র গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে।" প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বা এই অভিযোগও করিয়াছেন কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহী হইবার জন্য বেলজিয়াম সেনানায়করাই দায়ী। অনেকে মনে করেন যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কঙ্গোকে স্বাধীনতা দেওয়ায় এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছে। কঙ্গোর জনগণ ও নেতাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনের কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কঙ্গোতে কোন শিক্ষিত শ্রেণী নাই, দেশী সিভিল সার্ভিস নাই। এই অবস্থায় মধ্যে হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করায় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের এই বাঁধা বুলি আমাদের অজ্ঞাত নয়। প্রকৃতপক্ষে এইজন্যই কি স্বাধীনতা লাভের পরেই কঙ্গোতে হাঙ্গামা এবং শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল? শ্বেতাঙ্গদের উপর কতটুকু অত্যাচার হইয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে জানা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে কঙ্গোতে যে ব্যাপক ও বিপুল হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহা ছিল স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। বেলজিয়ম নৃশংসতার সহিত এই হাঙ্গামা দমন করিয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল কি? তাহার বিবরণই বা সংবাদপত্রে কতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে?

কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহ এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অত্যাচারের বিবরণ অতিরঞ্জিত করিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থরক্ষার জন্য সামরিক ও বে-সামরিক বড় বড় চাকুরীতে শ্বেতাঙ্গরাই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কঙ্গোলীজ সৈন্যদের বিদ্রোহ সেই স্বার্থে বাদ সাধিয়াছে। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্যরা অত্যাচার করিতেছে,

তাহাদের ধনপ্রাণ মর্য্যাদা আর নিরাপদ নয়, এই অজুহাত তুলিয়া বেলজিয়ম সরকার পুনরায় কৌশলে সন্ত স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গো দখলের আয়োজন করিলেন। স্বাধীন কঙ্গোর শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্ট ও কঙ্গোর মধ্যে যে চুক্তি হয় তদনুসারে কাটাঙ্গা প্রদেশের কামিনা এবং লিওপোল্ডভিলি প্রদেশের বিটোনায় বেলজিয়ান সৈন্যের ঘাঁটি থাকিবে। এই দুইটি ঘাঁটিতে বেলজিয়ান সৈন্য তো ছিলই, তা ছাড়া বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্ট কঙ্গোতে আরও সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন প্যারাশুটযোগে কঙ্গোতে বেলজিয়ান সৈন্য অবতরণ করিতে লাগিল। প্যারাশুটবাহিনী কঙ্গোর অনেকগুলি সহর দখল করিয়া বসিল। কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলে কার্য্যতঃ বেলজিয়াম সৈন্যের দখলে চলিয়া গেল। বিমানঘাঁটিগুলি, চলাচল ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলি এবং সেতুগুলিও তাহারা দখল করিয়া বসিল। বস্তুতঃ স্বাধীন কঙ্গোতে কঙ্গো সরকারের শাসনের অস্তিত্বই একরূপ বিলোপ হইয়া গেল। সেই সঙ্গে চলিতে লাগিল কঙ্গোলিজদের উপর বেলজিয়াম সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচার। কিন্তু এই অত্যাচারের সংবাদ বাহির বিশ্বে প্রকাশিত হইতে দেওয়া হইল না। গত ২০শে জুলাই (১৯৬০) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বা এই সকল অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। একদিকে বিদ্রোহ দমনের নামে বেলজিয়াম সৈন্যরা কঙ্গোর স্বাধীন সত্তার উপর আঘাতের পর আঘাত হানিতে লাগিল, আর একদিকে গত ১১ই জুলাই কাটাঙ্গা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ময়েস সোম্বে (Mr. Moise Tshombe) কাটাঙ্গা প্রদেশকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রোডেশিয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্যদলের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। উত্তর রোডেশিয়া সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখার এবং কতক সৈন্য কঙ্গোতে প্রবেশ করার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলিয়াছেন যে, সামরিক সাহায্যের অনুরোধ আসিয়াছে বটে, কিন্তু কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই ধরণের কোন অনুরোধ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না।

বেলজিয়ান সৈন্যের আক্রমণে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কঙ্গোর স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হওয়ার গুরুতর আশঙ্কার সম্মুখে গত ১১ই জুলাই কঙ্গো মন্ত্রিসভা নিম্ন কঙ্গোতে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনুরোধ জানান। মার্কিণ সরকার অবশ্য নিজে এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট এই অনুরোধ পাঠাইয়া দেন। কঙ্গোতে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণের অসুবিধা ও বিপদও ছিল অনেক। কঙ্গোতে মার্কিণ সৈন্য আসিলে রুশ সৈন্যও যে আসিত না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ১৩ই জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত প্রস্তাবে যে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা এবং বেলজিয়মকে সৈন্য সরাইয়া লইতে অনুরোধ করা হয় সে কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে দ্রুততার সহিত-ই কঙ্গোতে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক সাহায্যের এক অংশ গত ১৫ই জুলাই (১৯৬০) তারিখেই কঙ্গোতে পৌঁছে। জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য কঙ্গোতে পৌঁছিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী গঠনেও যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কঙ্গোর পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আফ্রিকার স্বাধীন রাজ্যগুলি, আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের সহিত জড়িত নয় এইরূপ দেশে এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধে যে সকল দেশ নিরপেক্ষ সেই সকল দেশ হইতে সৈন্যবাহিনী কঙ্গোতে প্রেরণ করা হইয়াছে। মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইলে রুশ সৈন্য-বাহিনীও প্রেরণ করিতে হইত। কঙ্গোতে রুশসৈন্যের উপস্থিতি-পশ্চিমী শক্তি বর্গের অভিপ্রেত নয়। কাজেই মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করা হয় নাই। যে সকল দেশ সৈন্য সরবরাহ করিবে না তাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সরবরাহ করিবে। ১৭ই জুলাইয়ের সংবাদ প্রকাশ, বেলজিয়ান সৈন্যদল শান্ত ভাবে এবং নিরুপদ্রবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীর হাতে কঙ্গোর রাজধানী লিওপোল্ডভিলের নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পণ করিয়াছে। কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুলুম্বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ র‍্যালফ বাঞ্চের নিকট এক চরম পত্রে জানাইয়া দেন যে, ১৯শে জুলাইয়ের মধ্যে বেলজিয়ান বাহিনীকে কঙ্গো হইতে সরাইয়া লইতে যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বাধ্য না করেন তবে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থী হইবেন। বেলজিয়ান মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বেলজিয়ানদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য যতদিন প্রয়োজন হইবে ততদিন তাহারা কঙ্গোতে অবস্থান করিবে।

কাটাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা—

বেলজিয়াম সম্মত হওয়া সত্ত্বেও কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিতে না দিতে অনমনীয় জেদ এবং কাটাঙ্গায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর প্রবেশ স্থগিত রাখা কঙ্গোর সমস্যাকে বারুদস্তূপে পরিণত করিয়াছে ইহা মনে করিলে মোটেই ভুল হইবে না। বস্তুতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গায় প্রবেশ স্থগিত রাখায় মুখ্যমন্ত্রী মিঃ সোম্বে প্রথম দফা জয়লাভ হইয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হওয়ার কোন কারণ নাই। কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর অনমনীয় জেদের পিছনে যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন রহিয়াছে, একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কঙ্গোর কাটাঙ্গা প্রদেশই খনিজ সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী। কাটাঙ্গায় তামা এবং ইউরেনিয়াম হইতে পশ্চিমী শিল্পপতিরা প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন। কাটাঙ্গার খনিগুলিতে বৃটিশও বেলজিয়াম পুঁজি নিয়োজিত রহিয়াছে। বৃটিশ ও বেলজিয়াম খনিমালিকদের 'কার্টেল' 'Union Minier Du Haut Katanga' মিঃ সোম্বে বিশেষভাবে সমর্থন করিতেছে। মিঃ সোম্বে সম্পর্কে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বা টাস সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। মিঃ সোম্বে এক সময়ে ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত তাঁহার ভাগ্যসূত্র গ্রথিত হয়। বেশী দিনের কথা নয়, তিনি ছলচাতুরী দ্বারা এবং 'ওভারড্র' করিয়া বেলজিয়ান কোম্পানীর প্রায় ১ কোটি বেলজিয়ান ফ্রাঁ আত্মসাৎ করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহার বিচার হয়। কিন্তু পরে যে অবস্থার

উদ্ভব হয় তাহাতে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয় এবং ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেই হইতেই তিনি বেলজিয়ানদের নির্দেশ নির্বিচারে মানিয়া লইতেছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখা যায়, বেলজিয়ম এখন আর কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করিতেছে না। কিন্তু গোপনে কি করা হইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ডাঃ র‍্যালফ বাঞ্চে গত ৪ঠা আগষ্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশের প্রস্তুতির জন্য এলিজাবেথভিলে পৌঁছান তখন সরকারী ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয় নাই। কিন্তু কাটাঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার ফলেই যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশ স্থগিত রাখা হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কাটাঙ্গাকে কঙ্গো হইতে পৃথক করিবার জন্য যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের একটা চক্রান্ত চলিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। ১৩ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদে কঙ্গো সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর গত ১৮ই জুলাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আফ্রিকার সদস্যরাষ্ট্র সমূহ এক বিবৃতিতে বাহির হইতে কঙ্গো সংহতি ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াসের নিন্দা করিয়াছেন। গত ২০শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আর একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব উত্থাপন করে টিউনিশিয়া এবং সিংহল। এই প্রস্তাবে কঙ্গো হইতে অবিলম্বে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ কার্য্যকরী করিবার জন্য বেলজিয়ম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাছাড়া কঙ্গোতে আইন শৃঙ্খলা ও কঙ্গো সরকারের ক্ষমতা পরিচালন ব্যাহত হইতে পারে এবং কঙ্গোর অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন কিছু না করিবার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকেও অনুরোধ করা হইয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কি ভাবে এই প্রস্তাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই অবস্থা দেখিয়া মনে না জাগিয়া পারে না। কাটাঙ্গা রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বৃহৎরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-বাহিনীর প্রস্তাবিত কাটাঙ্গা প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কাটাঙ্গা রেডিওর এই দাবীর প্রতিবাদ করা হইয়াছে বলিয়া যেমন জানা যায় না, তেমনি কাটাঙ্গার মন্ত্রীরা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং কেবেল দ্বারা বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বৃহৎরাষ্ট্রের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন। এই অন্যান্য বৃহৎরাষ্ট্রের মধ্যে যে রাশিয়া নাই, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুলুম্বা একাধিক বার জানাইয়াছেন যে, কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অবিলম্বে অপসারিত না হইলে তিনি রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। রাশিয়াও কঙ্গোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের কাজ যে মোটেই সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবু সম্মিলিত বাহিনীর কাজ এ পর্য্যন্ত মোটামুটি একরকম ভালই চলিতেছিল। কিন্তু কাটাঙ্গায় ধাক্কা লাগিয়া ভরাডুবী ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে।

মিঃ সোম্বের উল্লেখযোগ্য সৈন্যবাহিনী কিছুই নাই। হাজার তিনেক সৈন্য মাত্র আছে। বেলজিয়ম অবশ্য খুব দ্রুত শিক্ষা দিয়া সৈন্য তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীকে বাধা দিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিবার কারণ বলিয়া মনে হয় না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিলে আক্রমণকারীরূপেই প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে প্রতিরোধ করা হইবে, মিঃ সোম্বের এই সকল উক্তি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। উহার পিছনে একটা গভীর চক্রান্ত এবং উদ্দেশ্য রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য ও চক্রান্তের কিঞ্চিৎ আভাস সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনীর কাটাঙ্গা প্রদেশে প্রবেশ স্থগিত রাখার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কাটাঙ্গায় প্রবেশ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট মিঃ হ্যামারশিল্ডের রিপোর্টের মধ্যে। কাটাঙ্গার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী যাহাতে কাটাঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে আইন প্রণয়ন করিতে বলিয়াছেন। কাটাঙ্গার পরিস্থিতি তাঁহার কাছে রাজনৈতিক সমস্যা বলিয়া মনে হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার এই রিপোর্ট একটা সঙ্কট সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতেছে। মিঃ সোম্বের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ যাহাতে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার কয়েকজন পর্য্যবেক্ষক মনে করেন, বেলজিয়ানরা আশা করিতেছেন যে, ফ্রান্স ভেটো প্রয়োগ করিয়া মিঃ সোম্বের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দিবে না। মস্কো হইতে টাস যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, যথাসম্ভব শীঘ্র কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণের জন্য সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকার আরও বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী যদি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে যে দেশের সৈন্যবাহিনী ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে তাহাদের সেখানে প্রেরণ করা দরকার। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই হয়ত নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু কঙ্গোকে লইয়া আন্তর্জ্জাতিক আকাশ যে গভীর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গোর ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উহার জন্য দায়ী হইবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ। এই ব্যর্থতা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মর্য্যাদাকেই শুধু বিনষ্ট করিবে না, উহার অস্তিত্বেরও আর কোন সার্থকতা থাকিবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনীর কাটাঙ্গা প্রবেশ স্থগিত রাখায় কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুলুম্বা যে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। গত ৭ই আগষ্ট কোনাক্রিতে (গিনি) তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনীর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাঁহার সরকারকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঘানা ও গিনির সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কঙ্গোতে ঘানার তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য আছে এবং আরও তিন ব্যাটালিয়ান সৈন্য গঠনের পরিকল্পনা আছে। ঘানার রিজার্ভ সৈন্যও যথেষ্ট আছে। গিনির সৈন্যসংখ্যা ২ হাজার এবং চেকোস্লোভাকিয়ার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। কাটাঙ্গার অর্থমন্ত্রী ব্রুসেলস-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, ঘানা যদি কাটাঙ্গায় সৈন্য প্রেরণ]

করে, তাহা হইলে কাটাঙ্গাকে যুদ্ধের জন্ত আরও অধিক প্রস্তুত দেখিতে পাইবে।

মার্কিণ বোমারু বিমান আর-বি—৪৭

মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমান ভূপাতিত করার দুই মাস পরেই আরও একটি মার্কিণ বিমান সোভিয়েট রাশিয়া ভূপাতিত করিয়াছে। এই বিমানটি আর-বি—৪৭ সামরিক বিমান। গত ১লা জুলাই (১৯৬০) একটি রাশিয়ান জঙ্গী বিমান আর্কেঞ্জেলের নিকট উহাকে গুলীবিদ্ধ করিয়া বারেণ্টস সাগরে নিপাতিত করে। দুই জন মার্কিণ বৈমানিককে সোভিয়েট জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয়, এক জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট তিন জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ১লা জুলাই তারিখে এই বিমানটিকে নিপাতিত করা হইলেও ১২ই জুলাইয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাশিয়া এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সর্ব্বপ্রথম ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে এই বিমানটিকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কোলা উপদ্বীপের (Kola peninsula) নিকটে বারেণ্টস সাগরে স্ভ্যাটোই নস্ (Svyatoi Nos) অন্তরীপের কাছে এই মার্কিণ সামরিক বিমানটি রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে। বিমানখানি আর্কেঞ্জেলের দিকে যাইতেছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে দুই জন বৈমানিককে (একজন চালক এবং আর একজন সহকারী-চালক) জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয় তাহাদের কথায় জানা যায় যে, এই ছয় ইঞ্জিনবিশিষ্ট আর-বি—৪৭ সামরিক বিমানটি বৃটেনেস্থিত মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি হইতে রাশিয়ার উত্তর সীমান্তে গোয়েন্দাগিরির জন্য যাত্রা করে এবং পরে উহা বৃটেনে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, এই বিমানখানি আর-বি—৪৭ বোমারু বিমান। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই বিমান প্রচুর সংখ্যায় আছে। এই বিমান ঘণ্টায় ৮৫০ হইতে ৯৫০ কিলোমিটার গতিতে উড়িয়া যায় এবং ১০ হাজার হইতে ১৪ হাজার মিটার ঊর্দ্ধে উড়িয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, এই বিমানখানি রাশিয়ার আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল। বিমানখানি ভূপাতিত করার দশ দিন পর্য্যন্ত কেন নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ ক্রুশেভ বলেন যে, বিমানখানি নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা জানিবার জন্যই কিছু সময় তাঁহারা এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। নরওয়েস্থিত বোডো (Bodoe) বিমান-বন্দরের পর্য্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সহিত এই বিমানের রেডিও সংযোগ ছিল।

মিঃ ক্রুশেভ বলেন যে, মার্কিণ রেডিও কেন্দ্রগুলি বিশেষ করিয়া নরওয়েস্থিত মার্কিণ রেডিও কেন্দ্র হইতে এই বিমানখানির জন্য বিশেষ উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া গুলী করিয়া বিমানখানিকে ভূপাতিত করিয়াছে অথবা রাশিয়ায় অবতরণ করিয়াছে। পরে তাঁহাদের ধারণা হয়, বিমানখানি কোন দুর্ঘটনায় জলে নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থায় মঃ ক্রুশেভ বিমানখানিকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করার কথা বৈদেশিক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন। ধৃত মার্কিণ বৈমানিকদ্বয়ের উক্তিতে প্রকাশ, বিমানখানি বৃটেনের অন্তর্গত শায়ারস্থিত ব্রিজ নর্টনের ঘাঁটি হইতে যাত্রা করিয়াছিল। রাশিয়া এই বিমান সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রতিবাদ জানায়। এই ঘটনা সম্পর্কে গত ১৩ই জুলাই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান কমন্স সভায় বলেন যে, বৃটেনস্থিত মার্কিণ ঘাঁটি সম্পর্কে যে চুক্তি হইয়াছে তাহা সংশোধন করার প্রশ্নটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। রাশিয়ার প্রতিবাদের উত্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে, বিমানখানি রাশিয়ার ভূমির উপরে অথবা রাশিয়ার জলভাগের উপরে উড়িয়া যায় নাই। উহা রাশিয়ার জল-সীমার বাহিরে গুলীবিদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হউক, রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে এসম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাশিয়ার অনুরোধে ২২শে জুলাই (১৯৬০) নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহূত হয় এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ২৬শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার নিন্দাসূচক প্রস্তাব ২-৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

মার্কিণ বিমান আর-বি—৪৭ সংক্রান্ত ব্যাপারটির তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ইটালীর পক্ষ হইতে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহাতে বলা হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রশকে ধৃত বৈমানিকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হউক। উক্ত দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কেই রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে। রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগ অসঙ্গত হইয়াছে কি না এবং আর-বি—৪৭ বিমান সম্পর্কে অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে রাশিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছে কি না তাহা তর্কের বিষয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ হেনরী ক্যাবট লজ গত ২৫শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ বলেন যে, যে-আর-বি ৪৭ বিমানটি রাশিয়া গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে তাহা কোন সময়েই সোভিয়েট অঞ্চল হইতে ৩০ মাইলের কম দূরত্বের মধ্যে আসে নাই। একটি রুশ জঙ্গী বিমান উহাকে সোভিয়েট অঞ্চলে তাড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়াই মার্কিণ বিমানটি এইরূপ কম দূরত্বের মধ্যে আসিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, মার্কিণ বিমানটি যে আইনসঙ্গত পথেই উড়িতেছিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রুশ প্রতিনিধি মঃ কুজনেৎসভ নিরাপত্তা পরিষদে যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিবেচনার যোগ্য। ২রা জুলাই—মার্কিণ বিমান বিভাগ বলিয়াছিল, বিমানখানি কোথায় তাহা তাহাদের জানা নাই। এই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিমানখানি কোথায় আক্রান্ত হয় তাহা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের-জানাই ছিল, নতুবা ২রা জুলাই তারিখে ঐরূপ কথা তাহারা বলিবে কেন? তিনি বলেন যে, বিমানখানি যেখানে ধ্বংস হইয়াছে সেখানে উদ্ধার পার্টি পাঠান হইল না কেন? পেট্রোল ফুরাইয়া যাওয়ায় বিমানখানি কোথাও নামিতে বাধ্য হইয়াছে, এমন কথাই বা কেন বলা হইল? মার্কিণ আর-বি—৪৭ বোমারু বিমান রাশিয়ার ভূভাগ কিম্বা দরিয়ার উপরে গিয়াছিল কি না, তাহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ছাড়া আর কেহই প্রমাণ করিতে

পারে নাই। রাশিয়া বলিতেছে, উহা সোভিয়েট সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বলিতেছে যে, উক্ত বিমান রাশিয়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই। কিন্তু কিরূপে তাহারা তাহা জানিতে পারিল তাহা বলিতেছে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই, তাহা হইলে উহা যে রুশ দরিয়ার নিকটেই কোথাও গিয়াছিল ইহা বুঝা যাইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সে কথা অস্বীকার তো করে নাই, শুধু বলিয়াছে ৩০ মাইলের নিকটতর কোন সময়ই হয় নাই। বিমানখানির উদ্দেশ্য খুবই নির্দোষ হইতে পারে, কিন্তু রুশ সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক আমেরিকা তাহা বুঝিতেছে না কেন? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য সন্দেহ সৃষ্টির পক্ষে যে যথেষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। আর-বি-৪৭ বিমান কখনই রাশিয়ার ভূভাগ কিম্বা দরিয়ার উপর যায় নাই, ইহা যদি প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহা হইলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কেসটি শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

মার্কিণ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনী :—

আগামী ৮ই নবেম্বর (১৯৬০) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্ব্বাচনের তোড়জোড় এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট পদের নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ডেমোক্রাটিক দল ম্যাসাচুসেটসের প্রতিনিধি সেনেটর জন এফ্‌ কেনেডিকে তাঁহাদের প্রার্থিরূপে মনোনীত করিয়াছেন। ভাইস্ প্রেসিডেন্ট পদের জন্য ডেমোক্রাটিক্ দলের পক্ষে মনোনীত হইয়াছেন টেক্সাসের প্রতিনিধি সেনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা লিণ্ডন জনসন। প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্ব্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন বর্ত্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ প্রতিনিধি হেনরী কাবট লজ। ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে মিঃ নিক্সন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মার্কিণ প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ লজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পররাষ্ট্র নীতিও বিশ্ববাসী জানেন। তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে এই নীতির পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। শীর্ষ-সম্মেলন সম্পর্কে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের জন্য তিনি অপেক্ষা করিবেন। পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর সহিত শান্তি চুক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি হইবে মঃ ক্রুশেভ হয়ত এইরূপ আশাই পোষণ করেন।

মিঃ আইসেনহাওয়ারের দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্টসিপের শেষের দিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল ইউ-২ বিমানের ঘটনায় তাহা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ঘটিল আর-বি—৪৭ বিমানের ঘটনা। ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলে তিনি এই আন্তর্জাতিক দুর্যোগের অবসান ঘটাইতে পারিবেন কিনা, তাহা এখনই বলা কঠিন। তবে এইরূপ আশা করা হয়ত অসঙ্গত নয় যে, ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী মিঃ কেনেডি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলে তিনি হয়ত বর্ত্তমান মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতিতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে আগ্রহশীল হইবেন। যদি আগ্রহশীল হন তাহা হইলে উহা কার্য্যকরী করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না।

বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী—

গত ২০শে জুলাই সিংহলে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহাতে শ্রীলঙ্কাফ্রিডম পার্টি ৭৫টি আসন দখল করিতে সমর্থ হওয়ায় এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে এবং পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোলোমন বন্দরনায়কের পত্নী শ্রীযুক্তা সিরিমাভো বন্দরনায়ক সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হইলেন। শ্রীযুক্তা বন্দরনায়ক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনি সিংহল পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচিতা কিম্বা মনোনীতা সদস্যা নহেন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি চারি মাস প্রধান মন্ত্রী থাকিতে পারিবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সদস্যা নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। ইহা অবশ্য কঠিন কিছুই হইবে না। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি যদিও ৭৫টি আসন দখল করিয়াছে তাহা হইলেও নূতন সরকার যে ছয়জন সদস্য মনোনয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে লইয়া সরকারী দলের সদস্যসংখ্যা হইবে ৮১জন। সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ মোট সদস্যসংখ্যা ১৫১জন। যদিও এই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব বেশী নয়, তাহা হইলেও এই দল ট্রটস্কীপন্থী, কম্যুনিষ্টপার্টি এবং জাতিক বিমুক্তি পেরামুনার সমর্থন লাভ করিবে। এই তিনটি দল মোট ১৮টি আসন দখল করিয়াছে। শ্রীলঙ্কাফ্রিডম পার্টি ফেডারেল পার্টির সমর্থন পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই দল সিংহলবাসী তামিল ভাষা-ভাষীদের প্রতিষ্ঠান। এই দল ১৫টি আসন দখল করিয়াছে।

শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি যে স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসর ২৫শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়া নিহত হওয়ার পর সিংহলের রাজনীতিক্ষেত্রে যে-সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এতদিনে তাহার পরিসমাপ্তি হইল। মিঃ বন্দরনায়ক নিহত হওয়ার পর শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক প্রধান মন্ত্রী হইয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, সিংহলে গৃহযুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। সিংহল গৃহযুদ্ধের পথে গেল না বটে, কিন্তু গত ১৯শে মার্চ্চের নির্ব্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টি ৫০টি আসন দখল করিয়া বৃহত্তম দলে পরিণত হয় এবং উহার নেতা মিঃ ডাড্‌লী সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সেননানায়ক মন্ত্রিসভার পরাজয় হয়। অতঃপর গবর্ণর জেনারেল প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া ২০শে জুলাই সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার দিন ধার্য্য করেন। এই নির্ব্বাচনে সিংহলের রাজনৈতিক অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিল।

শ্রীযুক্তা বন্দরনায়কের মন্ত্রিসভা পররাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে কোন শিবিরে যোগদান না করার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিবেন

তাঁহার স্বামীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় কলম্বো বন্দর ও পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বন্দরনায়কের মন্ত্রিসভা বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করিবেন। চাবাগান, রবার বাগান প্রভৃতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রশ্ন অপেক্ষা ভারতীয় বংশোদ্ভবদের নাগরিক অধিকার লাভের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিবেই তিনি চাহিয়াছেন। ইহা খুবই সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সিংহলের কোন প্রধান মন্ত্রীই এ পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। তবে তাহাদের অবস্থা যদি আরও খারাপ না হয় তাহা হইলেই সুখের বিষয় হইবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৮ সালের ভাষা সমস্যা লইয়া যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছিল সে কথা স্বতঃ-ই মনে পড়ে। শ্রীযুক্তা বন্দরনায়ক শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টিকে সবল ও সতেজ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যদি তিনি সিংহলের অত্যন্ত কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারেন তাহা হইলে বিশ্বের প্রথম মহিলামন্ত্রী হিসাবে তিনি একটা কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

আইসেনহাওয়ারের চ্যালেঞ্জ—

চিকাগোতে রিপাবলিকান দলের জাতীয় কনভেনশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত ২৬শে জুলাই (১৯৬০) মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মুখে এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি রাশিয়াকে আহ্বান করিয়াছেন বিশ্বব্যাপী এক নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বিশ্ববাসী কম্যুনিজম চায়, না স্বাধীনগণতন্ত্র চায় এই প্রশ্ন লইয়া হইবে নির্ব্বাচন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীনে এই নির্ব্বাচন হইবে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁহার সাম্প্রতিক ভ্রমণ এবং বক্তৃতায় আমেরিকার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। উহার উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে, এই তুলনামূলক জাতীয় মর্য্যাদা সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি মঃ ক্রুশ্চেভকে চ্যালেঞ্জ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, মঃ ক্রুশ্চেভ কি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনায় সর্বত্র, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক মহাদেশে একটি মাত্র সরল প্রশ্ন লইয়া গণভোট গ্রহণে সম্মত হইবেন? এই প্রশ্নটি হইল, "আপনি কম্যুনিষ্ট শাসনাধীনে, না মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে স্বাধীন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার অধীনে বাস করিতে চান?" প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আরও বলিয়াছেন, "এই গণভোটের ফলাফল দ্বারা সোভিয়েটগুলি কি বিশ্বে তাঁহাদের মর্য্যাদা পরিমাপ করিতে ইচ্ছুক আছেন? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আনন্দের সহিত ইহাতে রাজী আছে।' মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার শুধু একটি কথা বলেন নাই। তিনি বলেন নাই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফরমোসা, ফিলিপাইন, পাকিস্তান ইরাণ, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে যে স্বাধীন গণতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহার অধীনে বিশ্ববাসী বাস করিতে চাহেন কি না?

মার্কিণ সাহায্যে পুষ্ট দক্ষিণ কোরিয়ার সিংম্যান রীর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান, জাপ-মার্কিণ সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে গণবিক্ষোভের কথা বিশ্ববাসী জানে না, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাপানে গণবিক্ষোভের ফলে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে জাপান ভ্রমণ বাতিল করিতে হইয়াছে, জাপ প্রধানমন্ত্রী কিশিকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। যে-সকল দেশ মার্কিণ সামরিক জোটের কবলে পড়িয়াছে সেই সকল দেশের সাধারণ মানুষ নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। অকৃপণ হস্তে প্রচুর মার্কিণ সাহায্য দান করিয়াও এই সকল দেশের জনগণের দুঃখদারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয় নাই। বরং দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই সকল দেশে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি কম্যুনিজমের অগ্রগতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই সকল দেশের জনগণ সর্বদা পরমাণু অস্ত্রের আক্রমণ আশঙ্কার মধ্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে বাস করিতেছে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে-ভাবে প্রশ্নটি তুলিয়াছেন তাহাতে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস দেখা যায়। প্রশ্ন আসলে কম্যুনিজম বনাম গণতন্ত্র নয়, প্রশ্নটা কম্যুনিজম বনাম ধনতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থাৎ ভোটাধিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জ্জিত হয় নাই, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলিকে অর্থসাহায্য দিয়া অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার বিরুদ্ধে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। গণভোট গ্রহণের ফলাফল কি হইবে তাহা আমরা অনুমান করিতে চাই না। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বিশ্ববাসী সে গণতন্ত্র চাহিবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ইহুদী-নিধনকারী আইখম্যান—

নাৎসী নেতা এডলফ আইখম্যানকে আর্জ্জেণ্টিনা হইতে অপহরণ করায় উক্ত দেশকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য ইসরাইলকে অনুরোধ করিয়া গত ২৩শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর্জ্জেণ্টিনা এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে যে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে, আর্জ্জেণ্টিনা তাহা মানিয়া লয়। একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ এ বিষয়ে অবহিত আছেন যে, নাৎসীরা ইহুদীদের উপর যে উৎপীড়ন করিয়াছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই নিন্দিত হইয়াছে এবং সকল দেশের লোকেই চায় যে, আইখম্যানের অপরাধের জন্য তাহার বিচার হউক। অপর সংশোধন প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আর্জ্জেণ্টিনার সহিত ইসরাইলের যে সৌহার্দ্য রহিয়াছে তাহা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবের পক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে ০ ভোট হইয়াছিল। রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড ভোট দানে বিরত ছিল। এই বিরোধে নিজে জড়িত বলিয়া আর্জ্জেণ্টিনা ভোট দেয় নাই। ইসরাইল নিরাপত্তা-পরিষদের সদস্য নহে বলিয়া তাহার ভোটাধিকার নাই।

হিটলারের সময়ে জার্ম্মাণ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদী নিধন-যজ্ঞের উদ্ভাবক ছিল আইখম্যান। তখন তাহার বয়স ছিল ৩৩ বৎসর। আইখম্যান ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে। যুদ্ধ পর শাস্তির ভয়ে সে ১৫ বৎসর লুকাইয়াছিল। ইসরাইল রাষ্ট্র আর্জ্জেণ্টিনায় তাহার সন্ধান পায় এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া ইসরাইলে লইয়া আসে। —১লা আগষ্ট, ১৯৬০।
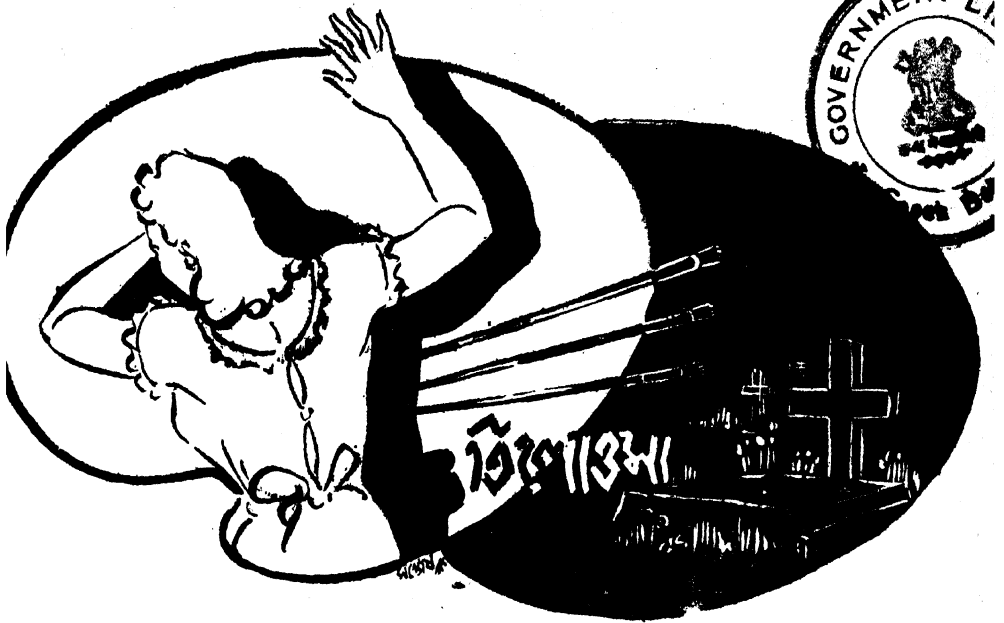
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

চার্চের ঘণ্টা বাজ্‌ছে; মনে হয় কোন বহুদূরাগত আত্মার করুণ ক্রন্দন। আলো-অন্ধকারে মেশা ঝাউ ও দেবদারু গাছের ছায়াতলে যে কফিন নামানো হয়েছে তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ প্রাণহীন। রাত্রিশেষের হিমেল বাতাস হু-হু করে বইছে—থেকে থেকে কাকজ্যোৎস্নার নীলাভ আলোকরাশি যেন কাঁপছে। কবরের মাটি খোঁড়া শেষ হয়ে গেছে। কফিন নামিয়ে দেওয়া হোল। ওরা আজ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চার্চের ঘণ্টার বিষাদভরা সুরে যে ব্যথাভরা ক্রন্দন সে ওদেরই। চার্চের ঘণ্টার সুরে যে কান্না তা হেলেনের চোখের জলে যেন একাত্মা হয়ে গেছে।

মাটি দেওয়া হ'য়ে গেল। আবার সেই চাপা কান্না। এক অস্বাভাবিক চাপা আওয়াজ যা বর্ণনা করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে সে আওয়াজ বুঝি আজও সেই সমাধিক্ষেত্রে শোনা যায়!

* * *

আজকাল এখানে আমি প্রায়ই আসি। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে দূর থেকে এই সমাধিক্ষেত্রকে মনে হয় অশরীরী। দিনের আলোতে মনে হয় দূরবিসর্পী সাদা ফুলের এক বিচিত্র সমারোহ! অসংখ্য ছোট-বড় শ্বেত স্মৃতিফলক। দূর থেকে মনে হয় সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে এদের সৃষ্টি হয়েছিল। আজও এরা অম্লান। রাত্রির অন্ধকারে এদের রহস্যময়তা যেন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ধরিত্রীর অন্ধকার গর্ভ থেকে এরা এইমাত্র বুঝি উঠে এল—আদিম রহস্যময়তা, হিমশীতল কাঠিন্য বোধ হয় এদের একমাত্র পরিচয়। জ্যোৎস্না-রাত্রির ধূ-ধূ করা আলোকবন্যায় কখনও কখনও মনে হয় এরা কথা কয়, হাসে। ঝাউ ও দেবদারুর পাতায় মৃদু মর্ম্মরধ্বনি জাগে। শুভ্র স্মৃতিফলকগুলো চাঁদের আলোতে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। সহসা মনে হয়, প্রত্যেকটি স্মৃতিফলক অনেক দিনের না-বলা কথা, অগীত সঙ্গীতে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। বহুকালের কণ্ঠস্বর আজ স্তব্ধ হয়ে আছে। চাঁদের আলোতে সে কণ্ঠস্বরগুলো যেন স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়—যখন হু-হু করা বাতাসে ঝাউ ও দেবদারুর পাতাগুলো সিপ্‌-সিপ্‌ করে। আবার কখনো মনে হয়, কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় সমবেত কণ্ঠের একটা চাপা কান্নার ব্যথাতুর বিলাপ স্মৃতিফলকগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এখানে আসতে মাঝে মাঝে ভয় হয়। তবুও এক দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে কে যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে। এখানকার নীরব রহস্যময়তা ঝাউ ও দেবদারুর পত্রসম্ভার, হু-হু করা বাতাসের মর্ম্মোচ্ছ্বাস মনকে দিশাহারা করে দেয়।

ঝাউ ও দেবদারুবীথির ছায়ার নীচে দাঁড়ালে দেখা যায় একটি স্মৃতিফলক—শুভ্র ও স্বতন্ত্র; কারুকার্য্যবিহীন এক শ্বেত পাথরের খণ্ডবিশেষ—এখানে লেখা আছে অল্প কয়েকটি কথা।—

"Here lies one who has sipped venom for art's nectar."

—কথাগুলির সঙ্গে মিশে আছে হেলেনের উত্তপ্ত অশ্রুজল। একটি অনন্ত শিল্পিমনের অপমৃত্যু, আর অপবসন্তের মর্মভেদী হাহাকার। কিন্তু কেন?—শিল্পী অজয় রায় মানুষের চেয়ে ভালবেসেছিল তার শিল্পকে, সৌন্দর্য্য ভালবেসেছিল; সৌন্দর্য্যের আধারকে নয়। কিন্তু সে কি তার অপরাধ?

* * *

একটি পোর্ট্রেট। নাম দেওয়া হয়েছিল "তিলোত্তমা।" হালকা সবুজ রঙের পটভূমিকায় সেই আবক্ষ প্রতিকৃতিটি সত্যিই অপূর্ব। সবচেয়ে আশ্চর্য্য তার চোখ দু'টি। মনে হয় এইবার বুঝি চোখের

পাতাগুলো নড়ে উঠবে, আর অবনতমুখী, লাজনম্রা তিলোত্তমা বুঝি এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রভাতের অরুণিমার মত ফুটে উঠবে অস্পষ্ট আলো-ছায়ার কুহেলীতে। ঠিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এমন অপূর্ব ছিল সেই 'তিলোত্তমা!' অথচ আশ্চর্য্য! হেলেন বিশ্বাস করতে পারেনি অজয় এত অদ্ভুত শিল্পকর্মের স্রষ্টা!

"আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তিল তিল ক'রে গড়ে তুলেছি এই তিলোত্তমা" বলেছিল শিল্পী ভিনসেণ্ট অজয় রায়।

—"কিন্তু, এ'-ও আমি—" পরিপূর্ণ বিস্ময়ে হেলেন চিত্রার্পিতের মত বলেছিল।

"হ্যাঁ, তিলোত্তমার অপার্থিব সৌন্দর্য্য হেলেনের দেহাতীত রূপ"—

"কিন্তু"—সেদিন হেলেন আর কিছু বলতে পারে নি।

দিনের পর দিন অজয় সমাধিমগ্ন হয়ে থাকত তার ষ্টুডিওতে। এমন অনেক দিন গেছে, অজয় আহার-নিদ্রা ভুলে গেছে। হেলেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠত। কিন্তু সে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। অজয় তার নিজস্ব পৃথ্বীর স্বপ্নময় আঙিনায় একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে ঘুরে বেড়াত—রঙ ও রূপের আরাধনায়। সে জগতে হেলেনের প্রবেশাধিকার কোন দিনই ছিল না। নানা বিচিত্র শিল্পসৃষ্টিতে ভরে উঠেছিল অজয়ের সোনার তরী। কিন্তু সেখানে হেলেনের প্রবেশ নিষেধ। অজয় স্পষ্ট বলেছিল, তার আগমনে ভরাডুবী হবার সম্ভাবনা ছিল বেশী। প্রতিদিন সন্ধ্যার বিবিত্র বর্ণ সমারোহে হেলেনের প্রতিকৃতি সামনে রেখে অজয় কবিগুরুর 'উর্বশী' কবিতাটি আবৃত্তি করত। একরাশ রজনীগন্ধার শুভ্র রূপে ও গন্ধে, ধূপের সুরভিতে ষ্টুডিও হয়ে থাকত যেন এক কল্পলোকের অবিস্মরণীয় লীলাভূমি। হেলেন অবাক-বিস্ময়ে সব দেখত আড়াল থেকে। সেখানে ছিল তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অনেক দিন সে ভেবেছে কেন এমন হোল? ভিনসেণ্ট নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে,—তিলোত্তমা তার জলন্ত নিদর্শন। অথচ তার সঙ্গ ভিনসেণ্ট যেন একেবারে সহ্য করতে পারে না। কোনদিন কোনও অলস মুহূর্ত্তে ভিনসেণ্ট কি বলেছে—হেলেনের সুরে সুর মিলিয়ে—"আজ এই সন্ধ্যার স্বর্ণালোকে আমরা দু'জন অভিন্ন।" কাজের অবকাশে, যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কথা কোন দিন বলেনি ভিনসেণ্ট। এক এক সময়ে রুদ্ধ অভিমানে হেলেনের দু' চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। কখনও বা একটা নিষ্ফল আশানাশে তার কাজল-কালো চোখে বিদ্যুতের শাণিত দীপ্তি ঝলসে উঠে। অথচ কি-ই বা সে করতে পারে?

ওদিকে রজনীগন্ধার আবেশে, অজয়ের মুগ্ধদৃষ্টিতে তিলোত্তমা বুঝি লাজুকলতার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে।

চারকোলের কালো আউট লাইন থেকে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ক্যানভাসের ওপর কঙ্কালের প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। অজয় তন্ময়। তুলির লীলায়নে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে চাপা অধরোষ্ঠে রক্তিম হাসির আভাস। অকস্মাৎ হাত থেকে ইজেলটা পড়ে গেল—

"ভিনসেণ্ট!" এক আকস্মিক প্রশ্নে; আচমকা আহ্বানে।

অজয় প্রায় আর্ত্তনাদ করে উঠল, "কে? কে? এখানে?"

ষ্টুডিওর ভিতরে হেলেন কখন এসে দাঁড়িয়েছে। অজয় চীৎকার করে উঠল—"আবার তুমি এখানে?"

হেলেন ব্যথাতুর দৃষ্টি নিয়ে বললে, "ভিনসেণ্ট, তুমি এত নিষ্ঠুর!"

"ভিনসেণ্ট! কে ভিনসেণ্ট? আমি শিল্পী অজয় রায়।"

বঙ্কিম হাসি হেসে বললে হেলেন—"তোমার ধর্মকে তুমি অস্বীকার কর! তোমার মত শিল্পী আমাদের কম্যুনিটিতে কত বড় গৌরব।"

অজয় বিকৃতকণ্ঠে বলে উঠল—"কত বড় গৌরব! এ গৌরব কোথায় ছিল যখন তোমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, অর্থহীন ছন্নছাড়া একটা meaningless Vagabond. তিনি স্পষ্ট বলেছেন—আমি তোমার যোগ্য নয়। তোমাদের গৌরবের মাপকাঠি অর্থের প্রাচুর্য্য, বস্তুতান্ত্রিক অহমিকা। তুমি তারই মেয়ে—কেন তুমি এখানে আসতে চেষ্টা কর বার বার?" ক্ষণকাল পরে উদাসস্বরে বললে—"আমি শিল্পী। সেই-ই আমার একমাত্র ধর্ম। ভুলে যাও আমি তোমাদের কম্যুনিটির একজন।"

লজ্জায়, অপমানে ও ক্রোধে হেলেন তখন কাঁপছিল। প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তার যেন লোপ পেয়েছে। সারা দেহে ও মনে পুঞ্জিত আক্রোশ ও বেদনা ফেনায়িত হয়ে উঠছে অস্বাভাবিক ভাবে। অতিকষ্টে সে বললে ঠোঁট দুটো দাঁতে চেপে—"চিরদিনের মত আমাদের সম্পর্ক আজ শেষ হয়ে যাক। কোন দিন আর তোমার কাছে আসব না। আমার ছবি আমাকে ফেরত দাও।"

"তিলোত্তমা আমার। তোমার কোন অধিকার নেই ওতে—"

"তিলোত্তমা ও হেলেন কি অভিন্ন নয়?"

"না। সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি ভালবাসি তিলোত্তমা—হেলেনের সৌন্দর্য্য। হেলেনের রক্ত-মাংসের শরীরটা নয়। আমি ভালবাসি দেহাতীত, দেহ নয় তিলোত্তমা দেহাতীত, হেলেন দেহসর্বস্ব।"

সহসা তীব্রকণ্ঠে হেলেন বলে উঠল—"তবে কেন তুমি আমাকে পাবার জন্য, আমার এই দেহটার জন্য বাবাকে অনুরোধ করেছিলে একদিন?"

"সেদিন ভেবেছিলুম আমার তিলোত্তমা ও হেলেন বুঝি এক হয়ে মিশে আছে। আজ বুঝতে পারছি ভুল—সব ভুল। আমি দেহাতীতকে চাইলেও দেহ আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু তা অসম্ভব!" তারপর গভীর বেদনার স্বরে বললে, "ভালবাসি, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্যের আধারকে নয়—তবু—"

"না, না—না, এ হতে পারে না; আমি—আমি এ হতে দেব না।" চীৎকার ক'রে ওঠে হেলেন। সামনের একটা সদ্য শেষ হওয়া পোর্ট্রেট টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে। কতকগুলো তুলি নিষ্ফল আক্রোশে ছুঁড়ে দেয় অজয়ের দিকে। হঠাৎ যেন সে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র বেগে ছুটে যায় সে যেখানে তিলোত্তমা বসান আছে। অজয় চীৎকার ক'রে ওঠে—"তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে? হেলেন, হেলেন?" এক প্রবল ধাক্কায় সে হেলেনকে ফেলে দেয়।

* * * *

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে হেলেনের ঘর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কাঁচা লাল রক্তের মত কতকগুলো অগ্নিশিখা কাঁপছে, যেন ভয়াল প্রতিহিংসার সহস্র রূপ পৃথিবীর আদিম ড্র্যাগনের মত উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে সারা ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে!

একটা কুণ্ডলী-পাকান চিঠি পুড়ছে—তার রক্তবর্ণ শিখাগুলো নাচছে। চিঠির দগ্ধাবশেষ ইলেকট্রিক হিটারের ওপর—অস্বাভাবিক

রক্তকণিকার মত। হেলেন স্থিরদৃষ্টিতে নিষ্কম্প দীপশিখার মত চেয়ে আছে। কয়েকটা অবিচল মুহূর্ত। কি দেখছে সে?

লাল রঙের অঙ্গারে, দগ্ধাবশেষ চিঠির অক্ষরগুলো যেন সে এখনও স্পষ্ট দেখতে পায়। অজয়ের চিঠি। হেলেনের তীব্র দৃষ্টির সামনে তার অক্ষরগুলো পুড়ে, কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে—কয়েকটা কথা কিন্তু হেলেনের বার বার মনে পড়ে যায়, জড়িত ভাবে সে যেন কথাগুলো আবৃত্তি ক'রে—"জোনাকীর আলো আছে তারারও আলো আছে—কিন্তু উত্তাপ নেই। আমার জীবন জোনাকীর আলো, তারকার অসমাপ্ত ঝিলিমিলি। এ জীবনে নেই কোন উত্তাপ। কিন্তু আলো আছে। আমি দিতে পারি সেই আলোটুকু। জীবনে যদি জোনাকীরা নিবে যায়, তারকার অপমৃত্যু হয়, আর যদি আসে সেই আকাঙ্ক্ষিত উত্তাপ, তুমি কি তা' চাইবে? জোনাকীর আলো আর তারার ইশারা যদি এক হয়ে মিশে যায়—"

—হেলেনের চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারে তার হাত দুটো সরে যায়—যেখানে চিঠির দগ্ধাবশেষগুলো পড়ে আছে। আলতো ভাবে সে স্পর্শ করতে চায়, সহসা একটা দমকা বাতাসে সেগুলো ইতস্তত উড়ে যায়। যেন অনেকটা মোহাবিষ্টের মতই সে খুঁজে বেড়ায় কিছু—যা সমস্ত সত্তা দিয়ে সে চেয়েছিল কিন্তু তার স্পর্শের বহু দূরে রয়ে গেছে সেগুলো। কোন দিন আর পাওয়া যাবে না। গভীর রাত্রিতে অবরুদ্ধ বেদনায় হেলেনের ফুলের মত দেহ থর-থর ক'রে কাঁপে। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়। আবার পর মুহূর্তেই এক অসহ্য কুটিল আক্রোশ তার সারা দেহ মনকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলে। এক অসহনীয় আবেগে নিজেকে চেপে ধরে সে। ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে নিজের লবণাক্ত বিস্বাদ রক্তে তার রক্তিম ঠোঁট যেন সৃষ্টির আদিম বন্যতায় আরও রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে শিকারলুব্ধ নিশাচর পাখীর মত সে উচ্চারণ করে—"আমি চাই অজয় রায়কে—মানুষ অজয় রায়—তার পৌরুষ, তার দেবদুর্লভ দেহরেখা—শিল্পী অজয় রায়ের তুলি আর রঙের খেলাকে চিরদিনের মত নিঃশেষ ক'রে দিতে হবে।"

জীবনের দৈনন্দিন ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র করে যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ আপাত গৌরববিহীন পথপরিক্রমা, তার মূল্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই সেদিনের ঘটনা অজয় কোন মতেই ভুলতে পারে না। হয়ত কিছুই নয়, সামান্য একটু নারীমনের অর্থহীন উচ্ছাস, অপরিণত মনস্তত্ত্বের ব্যর্থ বিলাপ। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হেলেনের চোখে ছিল সেদিন জিঘাংসার ক্রূর উপচ্ছায়া—সে দৃষ্টি এখনও অজয় চোখ বুজলে যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। সে কি অর্থহীন, তুচ্ছ? মাঝে মাঝে কাজের অবকাশে অলস মুহূর্তে অজয় দিশাহারা হয়ে যায়—হেলেন তার শিল্পিসত্তাকে কি এতই অবহেলা করে? কি চায় সে? অনেক রাত্রে যখন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে যায়, রজনীগন্ধার মদির সুরভি নিবিড় হয়ে ওঠে—অজয় নিঃশব্দে পদচারণা করে। অনুসন্ধান ক'রে ফেরে হেলেনের অতলান্ত মনের মৃগতৃষ্ণিকাকে। কিন্তু সবই নিষ্ফল। কিছুই পায় না সে।—

অগণিত উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন—"কেমন আছেন এখন শিল্পী অজয় রায়? কি ক'রে এমন হোল?—"

তিনি সত্যিই অজাতশত্রু। কিন্তু এ কি মর্মান্তিক ঘটনা!

নার্সিং হোমে তিলধারণের স্থান নেই। যারা অজয় রায়ের ছবি ভালবাসে সবাই এসেছে—শুধু এক বার দেখতে শিল্পী অজয় রায়কে।

ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, সকলকে আশ্বাস দিয়ে—"এখন বিপদ কেটে গেছে। ভয়ের কিছু নেই। ডান হাত কনুই থেকে এ্যামপুট করা হয়েছে—কারণ সাংঘাতিক জখম হয়েছিল রিভলবারের গুলীতে। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।" পরম নিশ্চিন্তে তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

কিন্তু শিল্পীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা কি খুব উৎফুল্ল বোধ করেছিল? শিল্পীর হাতের লীলায়নে রঙের যে স্বপ্ন তা চিরদিনের মত অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনদিন আর আবির্ভূত হবে না 'তিলোত্তমার' অভিসার—সেই স্বপ্ন নিয়ে, পদ্মকোরকের আবেশ হিল্লোলে।—

"এক অন্ধকার রাত্রিতে শিল্পী অজয় রায় একাকী আক্রান্ত হন। আততায়ীর রিভলবারের গুলীতে তিনি যখন আহত হন তখন পথ ছিল জনবিরল—হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের অস্পষ্ট গ্যাসলাইটে কিছুই স্মরণ করতে পারেন নি তিনি।"—সংবাদপত্রে এতটুকু কলাম। এবং এখানেই শেষ। আমাদের দেশের শিল্পীরা এর চেয়ে আর কি-ই বা আশা করতে পারেন? কাগজের এক কোণে তাঁদের সংবাদ এতটুকুই যদি দৈবক্রমে ওঠে—সেটাই তাঁদের পরম সৌভাগ্য বই কি?

রাজনীতির চক্রানিনাদে সংবাদপত্রে আর সব কিছুই গৌণ। যাক্ ও কথা; তবুও শতসংবাদকে অতিক্রান্ত করে সেদিন সারা শহরময় একটি সংবাদ জেগে উঠেছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কেন এমন হলো? আততায়ী কে?—কিন্তু পাওয়া যায় নি কোন উত্তর।

…রাতের অন্ধকারে নার্সিং রুমের উন্মুক্ত জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে কখনও কখনও শুনতে পাওয়া যায় এক ফুঁপিয়ে চাপা কান্নার আওয়াজ। অজয় অবোধ শিশুর মত বিছানায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে। তার বড়ের স্বপ্ন চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। হেলেন কি তাই চেয়েছিল?

'তিলোত্তমা'র গলায় যে রজনীগন্ধার মালা এক দিন অজয় অর্পণ করেছিল আজ তা শুকিয়ে গেছে। বৈশাখের আতপ্ত দিবাবসানে অজয় নির্বাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তিলোত্তমার অপার্থিব রূপময় স্বপ্নের দিকে চেয়ে থাকে। সে শুধু স্বপ্নই। কোন দিন আর অজয়ের হাতে বর্ণাঢ্য রঙের সমারোহ লীলাপদ্ম হয়ে উঠবে না, কোনদিন আর ফুলের সৌরভের মত জেগে উঠবে না শিল্পিমনের গন্ধময়তা। সব শেষ। দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ে অজয়ের। মৃত্তিকার রঙ, আকাশের নীলিমা, প্রকৃতির শ্যামলিমা আজ অর্থহীন, রূপহীন; মৃত ও বোবা। সন্ধ্যার অন্ধকারের মত শিল্পী অজয় রায়ের অপমৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসে—নিঃশব্দে অলক্ষ্য অভিশাপের মত। শিল্পের অবলুপ্তিতে আসে শিল্পীর অপমৃত্যু। জীবন তার কাছে গৌণ; একটা পন্থা মাত্র। শিল্পই তার চরম লক্ষ্য। কিন্তু আজ শিল্পী অজয় রায় হারিয়ে ফেলেছে তার শিল্পায়ন। জীবন-মৃত্যুর বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই অনাগত দিনের শেষে কি জবাবদিহি দেবে সে?

একটা অদম্য আবেগে অজয় শিহরিত নিঃশ্বাসে জয়ার জোয়ারের মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জীবনের সমস্ত বন্ধন, মমতা, যেন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়তে চায় সে শিল্পের অমৃত চেয়েছিল; কিন্তু পেয়েছে সে আজ তীব্র হলাহল। জীবন আজ বিষাক্ত। জীবনে যতটুকু অমৃত পেয়েছিল তা অক্ষয় থাকুক। শিল্পহীন জীবনে আছে শুধু বিষের অন্ধ কুয়াশা। গরলভরা প্রস্রবণ। সহসা দু'চোখে নেমে আসে তার কালরাত্রির গাঢ় তমিস্রা, সে যেন বড় ক্লান্ত আজ। অস্পষ্ট স্বরে সে বিদায় অভিনন্দন জানায়—এই সুন্দরী ধরিত্রী, প্রভাতের অরুণিমা, বিদায়।

—আর্সেনিকের তীব্র বিষে তার সারা শরীর নীল হয়ে যায়। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে—বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঊর্মিমালার মত। অন্তিম মুহূর্তে ক্ষুদ্র এক চিঠিতে পাওয়া যায় তার শেষ অভিলাষ—আমার সমাধির ওপর যেন লেখা থাকে এই কয়টি কথা—"Here lies one who has sipped venom for art's nectar"—আশ্চর্য মানুষের মন! হেলেন অজয়ের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল তার মৃতদেহের ওপর বাতাহত বেতসীলতার মত। মৃত্যুর পরপারে হেলেন বোধ হয় পেয়েছিল মানুষ অজয় রায়কে তার জীবনের পরম পাওয়াকে। তখন যে শিল্পী অজয় রায় এ জগতের অন্তরালে নিঃশেষ হয়ে গেছে! হেলেন কি সুখী হয়েছিল? কেন ছিল সেদিন তার চোখে অশ্রুজল?

আজও ঝাউ ও দেবদারুবীথির ছায়ার নীচে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যায় হু-হু করা বাতাসের মর্মোচ্ছ্বাস। অনাড়ম্বর শ্বেত স্মৃতিফলকটি স্পর্শ করলে অনুভব করা যায় যেন একটি শিল্পিমনের ব্যথাভরা হাহাকার।

মেঘ

[রূপার্ট ব্রুকের Clouds কবিতাটির অনুবাদ]

নীল বিভাবরী বেয়ে নেমে আসে স্রোতের মতন
অন্তহীন সৈন্যশ্রেণী অনাহত স্নিগ্ধ কলরবে;
পৃথিবীর বুকে নেমে বয়ে চলে প্রাণ-প্রস্রবণ
সুদূর দক্ষিণদেশে, কখনো বা দূর মহানভে
চন্দ্রমার বুকে ঢাকা সৌন্দর্য্যের পানে দেয় ছুঁড়ে
তুষারের গুচ্ছ কত।

—কারা যেন থমকে দাঁড়ায়
গভীর চিন্তার মাঝে সঙ্গিহীন, ক্লান্ত দুটি পায়
উদ্দেশ্যবিহীন মনে চারিদিকে বহু ঘুরে ঘুরে।
ব্যথিত দু'চোখ মেলে গভীর সুন্দর কোন সুরে
অপরূপ শ্লথ কোন অস্পষ্ট মৃদু ভঙ্গিমায়
বিশ্বের কল্যাণ চেয়ে বারম্বার আশিস জানায়,
যদিও একথা জানে সমস্ত গোপন মন জুড়ে—
ব্যর্থ তবু, শূন্য তবু,
অর্থহীন এই আশীর্বাদ।

মৃতরা মরে না কেউ, তারা বলে সবাই বেঁচে থাকে
বাস করে তাদের কাছে সর্বদা—সারা দিন-রাত—
মৃতের আনন্দে যারা ধনী হলো আর তার শোকে।
তারা যেন চলে আলো এই সব মেঘের মতন
স্নিগ্ধ শান্ত আকাশের পিঠে চড়ে দৃপ্ত রাজবেশে
বিষণ্ণ শোভাযাত্রায়, মৃদুগতি, অতি বিচক্ষণ;
এবং তাকিয়ে দেখে শ্রান্তিহীন দৃষ্টি নির্নিমেষে
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, চন্দ্র আর এই মানুষের দল
যারা আসে, যারা যায়,—পৃথিবীতে আজো অবিরল!

অনুবাদ: জগৎকুমার বিশ্বাস

নির্বৃত্ত
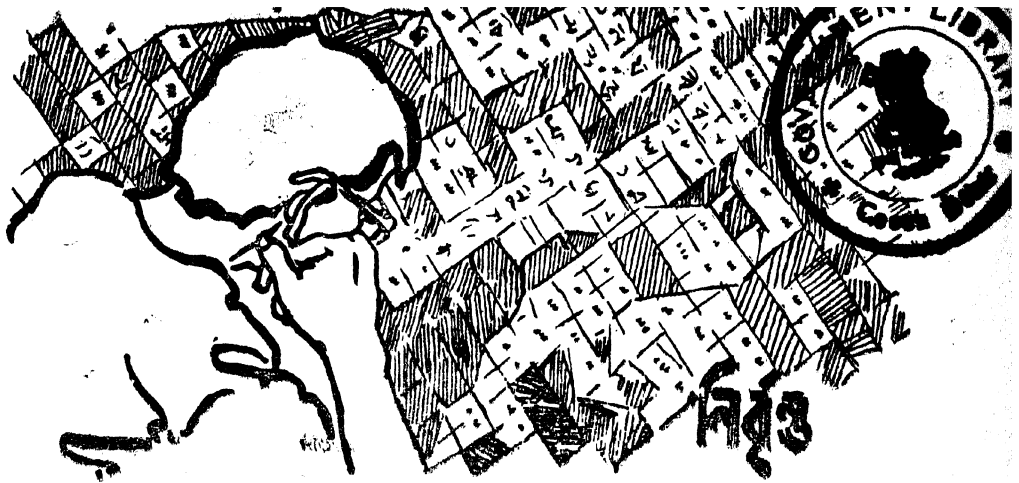
সুদেব সেনগুপ্ত

ঘটনাচক্রে রাতটা কাটাতে হোল বন্ধুর মেসে। বন্ধু বলতে অনিমেষ। শুকনো মত খিটখিটে মেজাজের পুরুলেন্সওলা একে দা চেনে এমন বন্ধুমহলে মেলে না সহজে। তবু মনে হয় সকলের চেনা থেকে আমার চেনাকে অতি সহজেই পরখ করে নিতে পারি। কারণ, ওর মনের অন্তলে ডুব দিয়ে তো আর কেউ জানতে চায়নি কেন মাস চার আগে অনিমেষ বিষ খেয়েছিল ? তাছাড়া ওর সাথে দৃষ্টিভঙ্গীর আমার আদৌ তফাৎ ছিল না বলে বলতে গেলে আমাদের হরিহর আত্মা। তবে মুস্কিল হোত ওর 'নিউরটিক' কথাটা নিয়ে। নারী নিয়ে কোন উৎসাহ যখনই প্রকাশ করতে গেছি অনিমেষ বলতো, কি দিন দিন নিউরটিক হোতে চলেছ তোমরা ? কেন, ভিন্ন রং-এ ছাপিয়ে দেখতে পারো না জীবনটাকে ? অন্য কেউ হোলে হয়তো ভেবে বসবে, নির্ঘাত ক্ষেপে গেছে অনিমেষ। আমাদের কাছে অবিশ্যি এ' একেবারে কিছুই না। তবু সে বা একগুঁয়ে। আইডিয়েলিষ্টিক। ওর মতের তিলভর নড়চড় হলেই সেরেছে। আনতাবড়ী কথার তুড়িতে সকলকে বোকা বানিয়ে তবে ছাড়ত। তাই মেপে জুপে কথা বলতে হোত ওর সাথে।

সে জন্যেই লালচে আলোতে সিঁড়ির চাতালে পা দিয়ে ভাবছিলাম ওকে কি বলতে হবে।

অসহায়ের মতো শেষে বললাম—কি করা যায় এখন ? থমকে স্থির নেত্রে তাকাল খানিক। অনিমেষ এক সময় জবাব দিল—তাতে ঘাবড়াবার কি আছে ? রাতটার জন্যে না হয় প্রবাসীই হোলে এখানে।

আলগোছে কথাটা বলে সে তাকিয়েছিল আবছা-আলোতে অস্বচ্ছ পিচঢালা নিচের রাস্তাটার দিকে। এ ভাবে একটানা দাঁড়িয়ে আমার হাড়গোড় রীতিমত কনকন করছিল। তবু পরিশ্রান্ত আমার খাবার বা বিশ্রামের আয়োজন না করে নির্বিকারে তাকিয়েছিল। পা টিপে ওর পেছনে যেতেই অবাক হলাম। দেখলাম, এলিয়ে দুলিয়ে শরীরটাকে টেনে অস্পষ্ট ছায়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছিল তন্বীটা। শেষে ও আর দেখাই যাচ্ছিল না। তবু অনিমেষ নেশাড়ে মানুষের মতো ভাবনা-বিভোর চোখ দুটো মেলে অপলক তাকিয়ে আছে সেদিকে। সহসা আপন মনে আউড়ে গেল—এক সময় তাকাবার মতো আমারও সব কিছু ছিল। কিন্তু আজ চোখাচোখি হতেই হাসিটা লুকিয়ে ফেললাম। আমার পা থেকে মাথা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে লজ্জায় সুরেই বলে চলল—দেখেছিস, তোকে যে এভাবে দাঁড়িয়ে রেখেছি মনেই ছিল না।

—বটে। আমি না হয়ে এখানে অন্তরালবর্ত্তিনীটা যদি হোত তাহলে ব্যস্ততার অন্ত থাকতো না, কেমন ?

হেসে আমার কাঁধে ধাক্কা দিল অনিমেষ।—পাগলামো খুব হচ্ছে না ? চল—তেড়ে আমায় টেনে নিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে রাত ন'টা বেজে গেছে। অনিমেষকে বললাম—খেয়ে নেয়া যাক চল। শুয়ে শুয়ে গল্প জমবে বেশ।

শোবার কথাটায় কেমন কুঁকড়ে ওঠে অনিমেষ। অস্থির চোখ দুটো একটু এদিক ওদিক চালিয়ে সহসা বলে উঠল—অত শীগগির খেয়ে কি হবে ? তাছাড়া অত তাড়াতাড়ি আমি ঘুমিয়ে পড়ি না।

—তোকে না ডাক্তার বলেছেন বেশি করে ঘুমুতে ?

—ডাক্তার বললেই হোল ?

ওর জবাবটা মনঃপুত না হওয়াতে চুপ করে গেলাম। আমাকে নিশ্চুপ দেখে একটু মেজাজী সুরেই বলল অনিমেষ—তাছাড়া আজকালকার ডাক্তার না ঘোড়ার ডিম। সামান্য ছড়ে গেলেই লাগাও এ টি এস পেনিসিলিন। তিলকে তাল।

আমি তবু নিরুত্তর।

—আমার কিই বা হয়েছে যে দিনরাত বিছানায় টান হয়ে থাকতে হবে ?

ওকে এবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম—একই রোগে আমার মেজদাও ভুগছিলেন, জানিস ? ওঁকে ছ'মাস বিছানা থেকে উঠতে দেননি ডাক্তার।

এবার চেয়ারটাকে সরিয়ে এনে আমার গা ঘেঁষে বসল অনিমেষ। উৎসুক হয়ে সহসা শুধালো—তারপর, তোর মেজদার কি হোল ?

উত্তাপভরে এত জোরে কথাগুলো বললো যে আমি খেই হারিয়ে ফেললাম। কোন জবাব আসছিল না চট করে মুখে।

ততক্ষণে অনিমেষ ডানহাতে আমাকে শীতল এক ঝাঁকুনী দিয়ে আবার বলে উঠেছে—তারপর তোর মেজদা'র কি হোল? কি রকম কেঁপে কেঁপে উঠছিল কথাগুলো। হাকিমের কাছ থেকে রায় শোনার জন্যে আসামী ততটা উদ্‌গ্রীব] হয় না, যতটা উন্মুখ হয়ে আকুল প্রত্যাশা করছিল অনিমেষ আমার কাছ থেকে জবাব শোনার।

এবার ভাবলাম, সুযোগ একবার পেয়েছি যখন আর ছাড়ছি না। ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে চেষ্টা করা যাক কিছু আদায় করা যায় কি না। কিছুক্ষণ পরেই ওকে বললাম—ঠিক আছে, খাওয়াটা সেরেনি। তারপর সব বলছি।

আশ্চর্য্য, কথা বলামাত্র উঠে দাঁড়াল অনিমেষ। যেন একটা যান্ত্রিকসত্তার মানুষ আপন গরজে যখন ষ্টার্ট দেয় তখনিই চলে। নিজের অস্তিত্বটা কৃত্রিম; মৌলিক এক জীবনীশক্তির অভাবে সে যেন একেবারে অসার। নিষ্ক্রিয়।

খাবার পাটটা চুকিয়ে চুপচাপ শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বসে পড়লাম দু'জনে পাশাপাশি। স্তব্ধ দুজনেই। আমিও যেন অবাক হয়ে কি ভাববার চেষ্টা করছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে গম্ভীর সুরে অনিমেষ বলে উঠল—ক'দিন থেকে মোটেই পড়াতে মন বসছে না।.

—কেন?

—অনেক খোঁজাখুঁজি করি জবাবটা। মনে হয় যেন কিছুই করতে পারলাম না জীবনে। ফুসফুসের এক পাশ যেন কে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে। তালু আগুনের মত তাতানো থাকে দিন-রাত।

—আচ্ছা, তুই কত দুধ খাস?

—একপো। কিন্তু কেন?—পুরুলেন্সের ফাঁকে গম্ভীর দৃষ্টি হানে অনিমেষ।

—সর্বনাশ! মেজদা'র তো তোর মত এতটা ছিল না, তবু উনি রোজ এক সের—

অনিমেষ বেজায় চটে গেল—আজে বাজে কি বকছিস তুই? মেজদার কি রোগ আর আমার কি, না জেনে সব গুলিয়ে ফেলছিস! সাইকো এনালিসিসে ও-সব ছাইমুণ্ডের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু দেখতে হয়, মনের ইনটিরিয়ারে ঢুকে, হোয়াট ইজ রিপ্রেসড···

জবাবটায় ক্ষুব্ধ হলাম। কাঁথাটা মুড়ে ঘুমাবার চেষ্টা করলুম।

অনেকক্ষণ পর অনিমেষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আমাকে খুশী করার চেষ্টা করল—আমার কথা তোমার মেজদাকে জিগগেস করেছিলে?

আমার কোন জবাব না পেয়েও একটানা ছেঁড়াছেঁড়া অনেক কিছু বলে চলল। অনেক চেষ্টা করেও কথাগুলো একসূত্রে বাঁধতে পারলাম না। শেষে কানে এলো—মেজদা'র সাথে আলাপ করিয়ে দেবে?

—চেষ্টা করবো।

—রাগ করেছিস, না? আমার বিছানায় এসে বসল অনিমেষ। ইনিয়ে-বিনিয়ে আবার বলে চলল—কা'কে কোন সময় কি বলি খেয়ালই থাকে না। পাগলের কথায় রেগে যাওয়া সুস্থমস্তিষ্কের লক্ষণ নয়।

একটু থামে। আবার বকে চলে—আজকাল ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়েছি। এম-এটা' পাশ করা চতুর্থ বারেও হবে না দেখছি। কিন্তু কেন যে এমন হয়! আর ডাক্তাররাও যেন কি! এত দিনেও আমাকে সুস্থ করতে পারলে না। এদের কাণ্ড দেখে ইচ্ছে হয় ডাক্তারী পড়ি। দেখিয়ে দি' নার্ভাসনেস কি ভাবে তাড়াতে হয়। আজকাল বই নিয়ে নিজেই ডাইগনোসিস করি। মনেও হয় আমি খুব সহসা নীরোগ হয়ে যাবো। কিন্তু ডাক্তাররা কি ইচ্ছে করে আমাকে ভালো করছেন না? হয়তো ওদের শক্তির বাইরে···

ওপাশ ফিরলাম আমি। অনিমেষ বেরিয়ে গেল। রাত কিন্তু কাটাতে পারছিলাম না কিছুতেই। স্মৃতির জঞ্জাল ঘেঁটে কত চেষ্টা করলাম। কিন্তু সন্ধান পেলাম না এ ধরণের মনোবিকারের। কারো সাথে মিল পাচ্ছিলাম না অনিমেষের। আমিও কি জানি কেন অস্থির হয়ে উঠেছি সহসা। এ-কাত ও-কাত ছটফট করে রাত বারোটায় অচেনা কোন এক নাড়ির টানে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। হকচকিয়ে গেলাম টেবিল-লাইটটা জ্বালা দেখে। আলতো পা ফেলে এসে দেখতে পেলাম ব্রিল সাহেবের সাইকোলজির একটা বই খোলা। যে অনিমেষের কিছুদিন আগে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জেগেছিল তার তা হলে আবার প্রাণের প্রতি গভীর মমতা জেগেছে।

বাইরে এলাম। অনিমেষ আমাকে দেখেনি প্রথমে। বাঁ পাটা খুঁড়িয়ে ঘাড় হেঁট করে দাওয়ায় ছোটাছুটি করছিল তখনও। ওকে দেখে আমার মনে কি ভাবটা জেগেছিল জানেন? বারুদবিদ্ধ পাখীটা মৃত্যুর প্রাক্-মুহূর্তে অমানুষিক বিক্রমে ছট-ফট করতে করতে পাখা দুটোতে ক্ষীণ শক্তি সঞ্চার করে চাইছিল পালিয়ে যেতে। প্রাণে বাঁচতে। সহসা ডানা ঝাপটে দুর্বল আক্রোশে দ্রুতগতিতে গোত্তিয়ে নিচে নেমে আসছিল। এক্ষুনিই ধপ করে লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

চঞ্চল হয়ে উঠলাম। একি হোল অনিমেষের!

—এখানে কি হচ্ছে? ওকে অপ্রস্তুত করার চেষ্টায় ছিলাম। অনিমেষের ত্রস্ত পা দুটো হঠাৎ এমন ভাবে থমকে গেল, ঘাবড়ে গেলাম আমিও। নিমেষে ওর ঘোলাটে ভয়ংকর চোখ দু'টো দেখতে পেলাম। চোখ নয়তো যেন দুটো অগ্নিপিণ্ড। আমাকে চট করে কোন জবাব দিতে পারছিল না।

বললাম—অস্থির না হয়ে···

কথা কেড়ে নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল—অস্থির! তুই কি করে জানলি?

—তুই কি ভাবিস যে তোর মনের কথা একটুও আঁচ করতে পারি না আমরা?

হঠাৎ আমার প্রতি ওর আস্থা বেড়ে গেল। এক ঝলক চঞ্চল হাসি খেলে গেল মুখের ওপর দিয়ে—একটা গল্প শুনবি?

নামমাত্র স্বীকৃতি চেয়েছিল। কোন প্রত্যুত্তর না নিয়েই আমাকে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। আমার শোনার চাইতে ওর বলার আগ্রহটাই যে বেশি।

অনিমেষ নড়ে-চড়ে, গাটাকে বেঁকিয়ে লতিয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বলার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

সময় চেয়ার-টেবিল, বই, সেণ্ড-লাইট সবকিছুতে দৃষ্টি চালিয়ে উঠল—গল্পের মজে ছাপিয়ে বলব আমার—সবি জারেক [..]র জীবনের একটা ঘটনা। নায়ক ধর আমি, আর নায়িকা [..]ন্তা সরকার। দাঁড়া, ভেবে দেখি কি ভাবে বললে গল্পটা [..]লা হবে—

একটা ডায়েরী তরতর করে পড়ে যাচ্ছিল যেন। তবে অনিমেষ [..]হয়ে বলতে পারেনি বলে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করছি।

শব্দপূরণ প্রতিযোগিতার ফল একদিন বন্ধুরা এসে জানালো [আ]মাকে। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছি আমি। কোথাকার নিয়াটোলার অমিতা সরকার প্রথম। পনের টাকা, আর কুড়ি [টা]কা। বন্ধুরা তো আনন্দে বুঁদ—এবার আমাদের খাইয়ে দাও।

দিলদরিয়া মন করে ওদের সব ক'টা টাকা দিয়েই বললাম—[তো]মাদের যার যা খুশী খেয়ে নিও। আমি যাবো না কিন্তু। [শ]রীরটা ক'দিন ধরে ভালো যাচ্ছে না ভাই।

—চটে গেলি?

—না ভাই! হেসে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু [আ]মি যে সন্তুষ্ট হোতে পারলাম না। 'মিররে' তাকিয়ে দেখলাম [মু]খটা সত্যি কেমনতর বিমর্ষ। কানটা ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছিল। [শি]রা উপশিরায় অসহ্য যন্ত্রণার স্রোত বয়ে চলছিল—কোথাকার [তু]চ্ছাতিতুচ্ছ একটা মেয়েই শেষ পর্যন্ত পেলো প্রথম পুরস্কার!

ছোট্ট খুপরীটা থেকে সেদিন আর বেরোতে পারলাম না। [চা]করদের নিচে শিখিয়ে দিয়ে এলাম—কেউ খোঁজ করলে যাতে [']বাবু নেই' বলে। সারাটা দিন অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে কাটল। [আ]লমারি ভর্ত্তি বই একের পর এক টেনেই চললাম। কিন্তু মন [ব]সাতে পারলাম না কোনটাতেই। রাশি রাশি ভাবনার মেঘ [আ]নাগোনা করছিল মনের ভেতর। যেন শুধুই চিড় খেয়ে পড়ছিল—মেয়েমানুষের কাছেই হার মানলাম শেষ পর্য্যন্ত? ছি! ছি! অদ্ভুত লজ্জা তো!

না, না, না। এ কিছুতেই হোতে পারে না। পেছিয়ে থাকবো না আমি। স্যারের দোরে ধর্ণা দিয়ে আগে রেজাল্টটা বাগিয়ে নিতেই হবে ভালো করে। এক বছর প্রাণান্ত চেষ্টার পর ফার্ষ্ট ক্লাশ সেকেণ্ডও হলাম! স্যার তো উল্লাসে গদগদ—এ রকম কিছুই আশা করেছিলাম তোর কাছ থেকে। এম-এতে তুই ফার্ষ্ট হবিই হবি। ভাবলাম, আমার বি-এ'তে ফার্ষ্ট ক্লাশ বন্ধুটা নিজের কথা বলছে না তো!

হারমোনিয়াম শিখে গলাটাকে আগেই ধাতস্থ করেছিলাম। এবার ভাবলাম, তাহলে ক্ষান্ত কেন? চর্চাটা করি না কেন এক বার? তার পর এক দিন ঝোঁক চাপল ছবি আঁকবো। কিন্তু কি করে আঁকবো? লোকে অত কি করে আঁকে? আমি ত কত দিন চেষ্টা করেছি। কই কিছুই তো পারিনি। এ ভাবনা নিয়ে পেন্সিল-কাগজ হাতে তিন তিনটে ঘণ্টা কি করে যে কাটিয়ে গেলাম নিজেই টের পাইনি।

হঠাৎ অজয় ঢুকেই অবাক হয়ে গেল—এ কি! তুই আঁকতেও জানিস! বা! ফাইন কার্টুন এঁকেছিস তো?

—যাঃ!—চোখ পড়ল টেবিলের কাগজটার ওপর। পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি আঁকিবুকির খেলা খেলছিলাম এতক্ষণ। তাতেই যে একটা নারীর কার্টুন ফুটে উঠতে পারে ভেবে বিমূঢ় হয়ে বলতে উঠলাম।

—সব দিকেই এক্সপার্ট জ্যাক ব্রাদার! হয়ে যাবে তোমার।

শিশুর মত সরল আবেগ প্রকাশ করলাম—তোদের কাছে শুধু প্রেরণা চাই ভাই! আত্মবিশ্বাসে অটল আমি।

বছর খানেক বাদে। একদিন প্রতিভা বসুকে ট্রামে বন্ধুর ইশারায় চিনতে পারি। সেদিন সমস্ত শরীর ছাপিয়ে হঠাৎ ঈর্ষার জ্বালা বাড়ছিল। মহিলা কবি বা সাহিত্যিকের নাম যে আমি শুনিনি তা নয়। তবু মেয়ে-সাহিত্যিক দেখে আমার সামর্থ্যের কোন এক দুর্বল অংশ হঠাৎ যেন বেজায় কেঁপে উঠল। এ তো ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স। মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাবো। তখনই যেন বার বার কে ঘা দিতে লাগল—তুমি না গর্ব করে বেড়াও তুমি শিল্পী, গায়ক, ভাল ছাত্র। সাহিত্যিক হোতে পেরেছ আজও।

বন্ধুকে না বলে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়লাম। শরীরের লোমকূপ দিয়ে ঝিলিকে-ঝিলিকে আগুন বেরিয়ে আসছিল আমার। নিজের এ দুর্বলতাকে ঢেকে তবু যে অক্ষমতায় বিজয়টীকা পরিয়ে দিতেই হবে আমাকে।—কি করে পারা যায়? টানা-পোড়েনের মধ্যে রাস্তার এমাথা ওমাথা ঘুরঘুর করে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে 'তিনের-বি'তে চড়ে ছুটে চললাম ন্যাশানেল লাইব্রেরিতে।

এটুকু বলে অনিমেষ থেমে গেল। ওর মনের ভেতরকার উদ্বেগী অনুভূতির আতিশয্য চোখের কোণে উপচে পড়ছিল। হঠাৎ পাশের দাঁত দুটো পিষে আবার বলে চলল। ব্যাপারটাকে গভীরভাবে উপলব্ধির কাছে ঠেলে দিয়ে ওর নিষ্করুণ মুখের দিকে তাকালাম চকিতে।

সুবোধ ঘোষ আর প্রেমেন মিত্তিরের ভাষা মুখস্থ করলাম। গল্প লিখলাম নিজেকে নিয়ে। পাঁচটা গল্পের সেরাটা বেছে পাঠালাম 'দেশে'। ছাপা হোল। সাগরময় বাবু আমার এ গল্পের দারুণ প্রশংসা করেছিলেন। ভাবলাম, নিজে কতো প্রতিভা নিয়ে জন্মেছি।

চাঙা হয়ে ভাবছিলাম বন্ধুবরকে শুধাই—তুমি কেন অবাক হচ্ছ অনিমেষ? আর্দ্ধেক এগিয়ে পাছে গুম হয়ে যায় এই ভয়ে বললাম না কিছু।

···হঠাৎ আজ মনে হল, যা ছিল সবই তো ব্যয় করে ফেলেছি। প্রতিদানে কি পেলাম? আবার মনে জাগল—আমার জীবনের এ সব ঐশ্বর্য্যের মূলে কে? এতো প্রেরণা পেলাম কোত্থেকে? নারীর কাছ থেকে হঠাৎ যেন একটা কেউটে সাপ ছোবল মারল অনিমেষকে। সেদিন শব্দপূরণ প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়তেই একথা স্মরণ করতে পারলাম আবার। তার পর মনে হোল, নিজে কতো অসহায়।

যে নারী এককালে শুধু একরাশ ঘৃণা-তাচ্ছিল্য মাখা ছিল আমার আজ মনে হোল, সে নারীই যে আমার দৈন্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আমি প্রাণ-মন দিয়ে নারীই চাই। মোপাসাঁর 'ইভেন্তের' শেষ দু'লাইন কি তাহলে মিথ্যে? ছেলেরাই কি বেশি পাগল হয় মেয়েদের চাইতে?

ফিক্ করে হাসল অনিমেষ। বলার নেশায় এতোই সে বিভোর

হয়ে পড়ল যে, মনে হল, এমুহূর্তে সে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে চলেছে। আনমনে সহসা একটা বই টেনে পাতা ওলটাতে লাগল। আচমকা আমার চোখে পড়ল, একটা বিচ্ছিন্ন কাগজের ওপর বড় হরফে লেখা ...'শব্দপূরণ প্রতিযোগিতা।' চমকে উঠলাম দু'জনেই। তড়বড়িয়ে কাগজটা পৃষ্ঠা চাপা দিয়ে আমার চোখের আড়াল করতে চাইল অনিমেষ।

চিঠি দিলাম অমিতাকে। চিঠি আর চিঠি আরো চিঠি। লিখলাম—তোমাকে প্রশংসা না করে পারছিনে। তুমি ভরিয়েছ আমার জীবনকে। কিন্তু আশ্চর্য! কোন সাড়া পেলাম না। জানিনা কেন, যে যতোই উপেক্ষা করল ততই যেন ওকে অগাধ ভালোবাসতে লাগলাম। আমার একখানা ছবিও পাঠালাম। তবু তার আগ্রহ দেখা গেল না এ আবেগপ্রবণ লোকটাকে দেখার। খুবই ভেঙে পড়লাম। লেখা দিলাম থামিয়ে।

এমনি একদিন কী কাণ্ড! বিমর্ষ হয়ে বসেছিলাম চেয়ারে। হঠাৎ দেয়ালের 'মিররটা'র দিকে চোখ দিতেই আঁতকে উঠলাম। আজও অনিমেষ মুখটাকে যদিও যেরকম ভয়মাখা করে ফেলল তাতে আমিও হকচকিয়ে গেলাম। পুরুলেন্সের অন্তরালে গভীর খাদের চোখ দুটো সহসা চোখে পড়ল। কে যেন জমাট বেঁধে কাজল লেপে দিয়েছে প্রান্তদেশে। প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে চোয়ালের হাড় দুটো। মাথায় টাক। বীভৎস। ধিক্কার দিয়ে বিকট এক আওয়াজে সমস্ত কামরাটাকে কাঁপিয়ে তুললাম—চেহারা! কুৎসিত! বীভৎস! বিশ্রী! আমার কিছুই নেই এ দুনিয়াতে আমার চেহারা যে নেই। আমি মিথ্যে।

অনিমেষ বলতে বলতে হঠাৎ আমাকেও কাঁপিয়ে তুলেছে বিকট আওয়াজে, বুঝতে পেরে লাল হয়ে উঠল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম—দমকা হাওয়ার মতো লাফিয়ে নামলাম নিচে। আমার চঞ্চল স্বেদাক্ত শরীর লক্ষ্য করে দোকানদার সন্দেহ করছিল। আর্সেনিক দিতে চাইছিল না। অনেক অনুনয় করলাম, ছেড়ে দিন। উঃ! এ্যাপয়েন্টমেন্টের যে দেরি হয়ে যাচ্ছে!

দরজা ভেজিয়ে শীতল পা ফেলে ঢুকলাম ঘরে। চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালালাম এক বার। ধড়াস্ করে উঠল বুকটা। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে বিজ্ঞপ্তি জাহির করলাম। রাত তখন প্রায় একটা। দু'-একটা ট্যাক্সি আর লরীর ঘর্ঘরে মাঝে মাঝে নড়ে-চড়ে বসছিলাম। আর্সেনিকের শিশিটা হাতে তুলে ভাবলাম, সামান্য এক নারীর জন্যে নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করবো? জীবনটা এতো তুচ্ছ। এ আমার নিশ্চয় অন্যায়।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অনেকক্ষণ কাটল। বিষ খাবো না সাব্যস্ত করে শুতে যাবো অমনি আবার ভেসে উঠল নিজের ছবিটা আর্শিতে। কেঁপে উঠলাম। এ চেহারা নিয়ে জীবনটা আমার শুধু হতাশই হবে। না, না, এ আর রাখা যায় না। পারলাম না নিজেকে সামলাতে। খপ করে খুলে ফেললাম শিশির কর্কটা। ঢক-ঢক করে সমস্তটা গিলে অসুরের শক্তিতে ছুঁড়ে ফেললাম মিররটাতে।

শেষের কথাগুলো অনিমেষ আমাকে প্রাণ দিয়ে কাতরোক্তি করে ছবির মত সামনে তুলে ধরে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। [illegible] দিয়ে এ ভাবে বলতে পারে না যদি না নিজে অভিজ্ঞ হয়। অনবরত টপ টপ করে ঘাম পড়ছিল ওর গণ্ডদেশ গড়িয়ে। থেমে হঠাৎ কি যেন একটা কথা চিবিয়ে ফেলল অনিমেষ। তখন আর আমিও বলিনি কিছু।

রাত প্রায় শেষ। ঘটনাটা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছিল চোখ দুটো। হঠাৎ কল-চালার আওয়াজ কানে ঢুকতেই চকিতে উঠে সুইচটা টিপে দিলাম। দেখলাম, কালো বোতল আর নীলাভ কাচের গ্লাসটা রেখে অনিমেষ নির্বিকার এদিকে আসছে। তৃপ্তির একটা ঢোক গিলে সহসা ঘোলাটে গলায় বলল—বাবরে শুধু ঘুমানো যাবে নিশ্চিন্তে। এতক্ষণে যেন ক্লান্ত হয়েছি...

আলোটা নিবিয়ে আবার বলল—ঘুম আসছে না বুঝি?

না এড়িয়ে গিয়ে শুধোলাম—অমিতার খবর নিয়েছিল কেউ?

—জেনে না মানে? আমার বাবাই খোদ অমিতার বাবার সাথে দেখা করে আসেন, অমিতা জন্মাবার পর ভদ্রলোকের চাকরীতে প্রমোশন হওয়ায় মেয়েকে ভাগ্যবতী ভেবে শব্দপূরণ প্রতিযোগিতার অমিতার নামে একটা এন্ট্রি পাঠান। তারপর বসন্ত হয়ে সে মেয়েটি মাস দুই বাদেই মারা যায়। কিন্তু জানিস ভাই, ভেবে দুঃখ হয় একটা জীর্ণ মোহে কি ভাবে একটা জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে।

—তাই বুঝি? তা হলে জীবনটা পৃথিবীর বুক থেকে বিষ খেয়ে মুছে যেতে পারেনি।

—সরি। ছেলেটা বিষ খেয়েই মারা যায়? দেখেছিস কি, বলতে কি বলেছি? অনিমেষ আরো গুটিকয় যুক্তি দিতে চাইল একতরফা। শুধু এ কথাটা সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে শেষের দিকে বলল—সত্যি, প্রেম একবার আসে মানুষের জীবনে।

আগের দিন শব্দপূরণ প্রতিযোগিতার যে কাগজ অনিমেষ লুকিয়ে ফেলতে চাইছিল, সকালে সেটা খুঁজে নিলাম। চোখ বুলিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম দু' মিনিট।

অনিমেষের সাথে দেখা হোল আবার। চোখাচোখি হোল দু' জনের। কিন্তু একে অপরকে এমন ভাবে দেখলাম যেন পরস্পর ভীষণ অন্যায় করেছি। অনিমেষ তবু প্রাণ খুলে কিছুটা বলতে পারছিল। আমার কথাগুলো শুধু পেটের ভেতরই দলা পাকাচ্ছিল। বেরোল না কিছুতেই।

—আজ কি মনে হচ্ছে জানিস?

বললাম—কি?

—তুই যেন আমাকে নীরোগ করেছিস। এক রাতে মাথা কত খোলসা মনে হচ্ছে। সাইকো এনালিষ্টরা এভাবেই মনের ইন্‌টিরিয়রে ঢুকে বিকার তাড়িয়ে দেয়। যাকগে তুই মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাস, কেমন? শুকনো হাসলাম।

তারপরও অনিমেষকে দেখেছি। খোঁচা দিয়ে ওকে বলেছি মেয়েদের কোন কথা উঠলে—বদ্ধ নিউরটিক তুই।

অনিমেষ হেসেছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মতো হেসেছে। গভীর হেসেছে। তবু মনে হয়েছে এ হাসি কত শাশ্বত। কিন্তু আজও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ভুলতে পারি না—অনিমেষ এক সময় চার মাসের অচেনা শিশুকেই ভালোবাসতো। আজকের হাকিম একদিন এ জন্যে আত্মঘাতী হতেও চেয়েছিল। কিন্তু বাবার জন্যে পারেনি। এসব কথা কি আজ ওর মনে আছে? কলেজ-অধ্যক্ষা ওর স্ত্রী কি এ-সব শুনেছেন?

বার্ধক্যে বারাণসী

নীলকণ্ঠ

দুই

"The temple is lit by naked electric bulbs that hang from the ceiling and throw a harsh light on the sculpture, but where they do not penetrate render darkness more mysterious. The impression you take away with you, not withstanding that vast, noisy throng, or may be because of it, is of something secret and terrible."

—A Writer's Notebook [page : 290]

৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী পর্যন্ত ; ৺মা কালী থেকে ৺বিশ্বনাথ পর্যন্ত তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে দেখতে যায় যারা তাদের অনেকের মুখে প্রায় শুনবেন ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ভারি অন্ধকার ; ভারি অপরিষ্কার। এখানে পাণ্ডাদের আর যাত্রীদের ভীড়ে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয় ; ভালো করে দেখা যায় না মূর্তির মুখ। পূজা করা যায় না প্রাণভরে ; নিভৃতে নির্ভয়ে করা যায় না মন্ত্রোচ্চারণ। পৃথিবীর দূরপ্রান্ত থেকে যারা আসে ভারতবর্ষের মাহামানবের মন্দির প্রাঙ্গণে তারাও উদভ্রান্ত হয় এই দেখে ; ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যায় নিজের দেশে। সেখানে গিয়ে বই লেখে ; সে বই পড়ে আবার আমরাই মূর্ছা যাই। লজ্জা পাবার চেষ্টা করি দেবদাসীর নৃত্যের কথা লেখা আছে দেখে। অথবা আমাদের মন্দির নয় কেন মুক্ত ভীড় আর অন্ধকার আর অপরিষ্কারের কলঙ্ক থেকে তাই নিয়ে দৈনিক পত্রের মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন' কলামে খোলা চিঠি লিখে জন্মসার্থক করি। ভুল বলেছি। ৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী ; ৺মাকালী থেকে ৺বিশ্বনাথ। কোথাও, কাউকেই দেখতে যায় না এরা ; দেখাতে যায়। নিজেদের জাহির করতে যায় জগতের সর্বত্র। কত তীর্থ ঘুরেছে তারই সচিত্র সচল বিজ্ঞাপন এরা। এদের লেখা বইতেই পাবেন কেবল ৺কাশী কলিকাতা থেকে কতদূর ; এখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কি কি দেখবার অথবা কেনবার আছে ; হোটেল, ধর্মশালা অথবা যাত্রীনিবাসের সংখ্যা কত ; ইত্যাদি। ওদের বইতেই পাবেন ৺কাশীর area কত মাইল-গজ-ফুট-ইঞ্চিতে। পাবেন না কেবল ৺কাশী ভারতের হিন্দুর কাছে কি এবং ৺কাশীর মন্দিরে আসা লোকে আর অগণিত মানুষের পায়ের ধূলায় অপরিচ্ছন্ন অপরিসরে যিনি স্মরণাতীত কাল থেকে অচল হয়ে আছেন সেই ৺বিশ্বনাথ হিন্দুধর্মের কে!

মন্দিরের বাইরে থেকে যে চলে যাবে না ; প্রবেশ করতে পারবে কেবল মন্দিরের মধ্যে নয়,—মূর্তির অন্তরে কেবল সেই তারবে জানতে পারবে হিন্দুরা যার আরাধনা করেছে যুগেযুগান্তরে সে মাটির পুতুল নয় ; প্রাণের প্রতিমা। পৌত্তলিক বলে যারা হিন্দুদের উপহাস করেছে তারা জানেনি যে সে মাটিকে হিন্দুরা মাটি করেনি কোনও দিন। 'মাটির' মূর্তি থেকেই হিন্দুর হৃদয়ে চিরকাল মূর্ত হয়েছেন 'মা'-টিই ; প্রমূর্ত হয়েছেন তিনি। যার প্রাণে একবার গেছে এই বার্তা, যার প্রাণে একবার বেজেছে এই বাণী কেবল সেই জেনেছে যে মানুষের পায়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার হয় না ; পবিত্র হয়। হিন্দুর মন্দির য়ুরোপের আর্ট গেলারি নয় ; কনোশুয়ার অথবা ক্রিটিক ছাড়া সেখানে আর সকলের জন্যই অলিখিত নির্দেশ ঝুলছে : নো এ্যাডমিট্যান্স। হিন্দুর মন্দির নয় আধুনিক ভারতের ড্রয়িং রুম যেখানে কার্পেটের ওপর চার থাকের সোফার মাঝখানে বেতের টেবিলের ওপর কাগজের ফুলে আর ঘরের কোণে এক দেওয়াল যেখানে আরেক দেওয়ালের ডিসটেম্পার্ড মুখে চুম্বন করছে সেখানে সযত্নে দাঁড় করিয়ে রাখা মাটির তৈরী ঘোড়া অথবা ভাঙ্গা কুঁজোয় ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থিত, কৃষ্টির আর আঁতেলেকতুয়াল দৃষ্টিতেই কেবলমাত্র।

৺বিশ্বনাথের মন্দির এর চেয়ে অনেক বড়ো। এখানে রাজা আর প্রজা ; জ্ঞানী এবং মূঢ় ; পাপী এবং পুণ্যাত্মার আসন পাশাপাশি। এর অন্ধকারকে যারা শুধু বিদ্যুৎ-আলোর অভাব মনে করে তাদের চোখ আছে তবু দৃষ্টি নেই। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ নেই কিন্তু ভিতরের দৃষ্টি আছে সে জেনেছে যে এই অন্ধকারের উৎসব হতে যে আলো অনন্তকাল ধরে নিত্য-উৎসারিত সেই দিব্যালোকে ৺বিশ্বনাথের গর্ভ আলোকময়। অগণিত, অসংখ্য মানুষের পায়ের ধূলোয়, জলে-কাদায় পাঁক যে দেখে মন্দিরপ্রাঙ্গণ অপরিষ্কার সে দুবেলা চোখ ধোয় তবু তার দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ বোজা কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন সে এই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির সমুদ্র দেখতে পায় ; এই পাঁকের মধ্যে পায় পদ্মগন্ধ। তার কণ্ঠে অবারিত হয় সুরের সুরধুনী : এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজ, তারই মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।

অচল ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে অন্ধকারে আলো করে এমনই একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল এই ৺কাশীতেই একজন, লোকে আজ করে আজও যাঁর উদ্দেশে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে : সচল ৺বিশ্বনাথ। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার উত্তা

তরঙ্গে, কখনও তার দূর্বস্নাত তীরে, কখন বন্ধবার প্রকোষ্ঠের অন্ধকারে, সুধা ও বিষ্ঠাকে, মেঘ ও রৌদ্রকে, শীত ও গ্রীষ্মকে সুখ ও দুঃখকে, পরম পাওয়ার গভীর আনন্দ এবং চরম না পাওয়ার সুগভীর বেদনাকে তিনি সমজ্ঞান করেছিলেন। সুখে তিনি বিগতস্পৃহ; দুখে তিনি নিরুদ্বিগ্ন। বীতরাগভয়ক্রোধ তিনি। তাঁর কথা না বললে আগে, সর্বাগ্রে স্মরণ না করলে ৺কাশীর কথা বলা হয় না।

এই ৺কাশীতেই ৺কালী মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই সচল ৺বিশ্বনাথ একদিন প্রস্রাব করে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন ৺কালীর গায়ে। সঙ্গে ছিলেন আরেক মহৎ জীবনজিজ্ঞাসু। তিনি এরকম আশ্চর্য দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে জবাব লেখা হলো মাটিতে: গঙ্গোদকং। কিন্তু ৺কালীর গায়ে তাকে ছিটিয়ে দেওয়া কেন? তার উত্তর আরও বিস্ময়কর; আরও বিশ্বাসের বাইরে: পূজা।

প্রস্রাব যাঁর কাছে গঙ্গাজল; মূত্র যাঁর পূজার মন্ত্রপূত বারি কেবল তাঁকে জানলেই ৺কাশীকে জানা হয়। তাঁর নাম জানলেই প্রণাম করা হয় ৺বিশ্বনাথকে। ৺কাশীতে মৃত্যু হলে কেন হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে শিবলোক প্রাপ্ত হয় মানুষ তার জন্তে যেতে হয় ৺কাশীতে নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যিনি ৺বিশ্বনাথ কেবল অন্ধের দৃষ্টিতেই অচল; মোহান্ধের চোখেই সে মন্দির অন্ধকার; মানুষের পায়ের ধূলায় সে প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার। সুদীর্ঘ কালব্যাপী এই ৺সচল বিশ্বনাথ বসেছিলেন অচল ৺বিশ্বনাথের পায়ের কাছে। যেখান থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিলিয়ে গেছেন একদিন সেখানেই। মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের দুঃসাধ্য সাধনা দিয়ে আর জ্যোর্তিময় আরাধনা দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের প্রশ্নের উত্তর। কেন একজন দুঃখ পায় আর আরেকজন পায় সুখ। আবার এমন একজনও কেন থাকতে পারেন যিনি সুখে দুঃখ এবং দুঃখে অনুভব করতে পারেন সুখ। যিনি শীতকে উষ্ণ; উত্তাপকে নির্বাণ; রূপকে অপরূপ; মূত্রকে মন্ত্রপূত বারি মনে করতে পেরেছিলেন ৺বিশ্বনাথের মন্দির প্রবেশ করবার আগে অনুপ্রবেশ করতে হবে তারই অলৌকিক জীবনের অন্তর্লোকে। অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলীক নয় যাঁর দিব্য ইতিহাস সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম করে তাঁকে প্রণাম করে আরম্ভ করছি এই ৺কাশীরই কাণ্ড। এই ৺কাশীর কথা অমৃতসমান; যে শোনাচ্ছে এবং যিনি শুনছেন, সেই দুয়ের ওপরই বর্ষিত হোক সেই একের আশীর্বাদ। সেই এক হয়েছিলেন একদিন এই ৺কাশীতে সেই ৺একজন,—সেই ত্রৈলঙ্গ স্বয়ং সহায় হোন। তাঁর কথা তিনিই বলুন যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়ে করান পর্বতলঙ্ঘন। অয়ম্ আরম্ভ শুভায় ভবতু।

ঝড় উঠবার আগে যেমন কৃষ্ণবর্ণ আকাশ থমথম করতে থাকে আতঙ্কে; আশঙ্কায়, আশ্বিনের আকাশ যেমন নিরুপম নীলে আসন পাতে আসন্ন ৺মহাপূজায়; তেমনই মহামানবের সময় হ'লে আবির্ভাবের দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে। অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন এই মহামানবরা; যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথীর যারা বিষিয়ে দিয়েছে বায়ু, নিভিয়ে দিয়েছে আকাশ উবুড় করা আলো তাদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুন্দর হাস্তে বলেছেন: ক্ষমা করো; ভালোবাসো। বিদ্বেষ বিষ নাশো। সকল যুগের সব সাধকের ধারা যেখানে মেলাতে চেয়েছেন যাঁরা তাঁরা এসেছেন কখনও রাজগৃহের দুগ্ধফেননিভ শয্যায়; কখনও দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে। কখনও অবহেলায় আর অবজ্ঞায় সকলের অগোচরে আরম্ভ হয় তাঁদের জ্যোতির্ময়ী তপস্যা। লোকে উপহাস করে। উপহাসের উত্তরে হাসেন তাঁরা যেমন হেসেছেন ধনীর দীনতায়; জ্ঞানীর মূঢ়তায় চিরকাল। আকাশ অন্ধকরা দুর্যোগের কালো মেঘে মেঘে ধনধান্তপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তরুণ বালক উন্মাদ যন্ত্রণায় পাথরের গায়ে নিষ্ফল মাথা কোটে; কবির কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়; বাঁশি হয় সঙ্গীতহারা। অমাবস্তার অন্ধকার লুপ্ত করে গানের আর আলোর ত্রিভুবন, অশ্রুজলে শুধায় নিপীড়িত মানবাত্মা: যাহারা তোমার বিষিয়েছে বায়ু আর নিভিয়েছে আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ। তুমি কি বেসেছ ভালো?

সেই জিজ্ঞাসায় টলে ধ্যাননিমগ্ন ধূর্জটির আসন। অভয়ঙ্কর আনন সহসা হয় রুদ্র, দীপ্ত ভয়ঙ্কর। ধেয়ে আসে ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে বাধাবন্ধহারা; মেঘে মেঘে ডম্বরু বাজে নটরাজের, দধীচির অস্থি নামে অভিশপ্ত অসুরলোকের শিরে বজ্র হয়ে। ধূর্জটির আসন টলে আর দুলে ওঠে পৃথিবী; গর্জে ওঠে আকাশ কলম্বু-রোলে। প্রস্তুতি পূর্ণ হয় কুরুক্ষেত্র পর্বের; সুদর্শন চক্রের দেখা মেলে আর শোনা যায় শঙ্খের মুখে: সম্ভবামি যুগে যুগে। দুর্জনের, দুর্যোধনের বিনাশ; আর ধর্মের, ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আবির্ভূত হচ্ছি আবার। গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, পুঁথি পাঁজি, উপদেশ, তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, দর্শন, তত্ত্ব, তথ্য, স্মৃতি, কারুর শরণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আজ; স্মরণ কর শুধু আমাকে। মামেকং শরণং ব্রজ। যিনি ব্রজ হয়ে দুর্জনের দুর্যোধনের বিনাশ করেন, তিনিই ব্রজরূপে রক্ষা করবেন ধর্মকে; ধর্মরাজকে।

আবির্ভাব-মুহূর্তে যেমন রোমাঞ্চিত হয় মর্ত্যভূমি, এঁদের তিরোভাবের লগ্ন আসন্ন হলে তেমনই অবারিত হয় সমুখে শান্তি পারাবার। যাবার সময়ে এঁদের খসে পড়ে তারা। চলে গেলে আকাশে উজ্জ্বল হয় একটি নীলাঞ্জনরেখা।

শতাব্দীকাল কি তারও আগে দক্ষিণভারতে এসেছিলেন এমনই এক ভগবানের দূত। সংসারজীবনেই তাঁর নাম ছিলো শিবরাম। তাঁকে কেবল দীর্ঘকায় বললে ভুল হয়: তিনি ছিলেন সুদীর্ঘকায়। সাধারণ মানুষ দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিনহাত হয়; মরে গেলে ওই সাড়ে তিন হাত জমিরই দরকার হয় তার। কিন্তু জীবন যে মৃত্যুর চেয়ে ঢাঙা তাই প্রমাণ করবার জন্তেই যেন শিবরাম এক হাত অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলায়। এই শিবরামই উত্তরজীবনে ত্রৈলঙ্গস্বামী হলে,—বারাণসীর লোকেরা তাঁকে বলতো সাড়ে চারহাত সাধু। শুধু সুদীর্ঘাঙ্গনয়, সুদীর্ঘায়ুও বটে। কেবল কাশীধামেই তাঁর লীলা দেড়শত বৎসর ধরে অব্যাহত ছিলো। আয়ু নয়, মানুষের আয়ু এত হয় না। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর হয়েছিলো; তার কারণ আয়ু নয়; আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,—যা কেবল যোগী-তনুতেই সম্ভব।

সুদীর্ঘকাল ধরে লৌকিক দৃষ্টির সামনে অনেক অলৌকিক অঘটনের নায়ক এই পরমযোগী নিজের জীবন দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা সনাতন ভারতের বাণী। আমরা যাকে অলীক বলতে না পেরে বলি অলৌকিক আসলে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পশুর শক্তি দেহে; মানুষের, মনে। এই মন দিয়ে সে এমন বস্তু নেই যাকে না মুহূর্তে তৈরী করতে পারে সর্ব্বসমক্ষে; এই মন নিয়ে সে চোখের পলক পড়বার আগে সেই দুরধিগম্য স্থান যেখানে না উপস্থিত হতে পারে, এই মন দিয়ে সে এমন মন নেই যার খবর না সংগ্রহ করতে পারে ইচ্ছে করলেই। মানুষের মধ্যে এই শক্তি আছে; কেবল তাকে যুগের পর যুগ কাজে না লাগানোর কারণেই, অবশ অঙ্গের মতোই, হয়েছে অকার্যকরী।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর অনন্ত জীবনকর্ম থেকে মাত্র দুটি অধ্যায় উপস্থিত করছি এখানে; এই দু'টি দৃষ্টান্তই উজ্জ্বল উদাহরণ, কেন ত্রৈলঙ্গকে না জানলে ৺বিশ্বনাথকে জানা অসম্ভব, সেই উক্তির। ত্রৈলঙ্গর আবির্ভাব অথবা এই দুই ঘটনার কিম্বা তাঁর তিরোধানের সময়-তারিখ উল্লেখ করছি না। কারণ ত্রৈলঙ্গদেবের অবস্থান সময়ের উর্দ্ধে, তাই। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কাশীর গঙ্গায়।

ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপান্বিত এক ভূপতি সপার্ষদ বরুণা থেকে অসি গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেখানে নৌকাবিহার করছেন একদিন। আর দেখছেন ভীমকান্তি এক নগ্নদেহ গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; একখণ্ড বিশাল কালো শিলা যেন ভেসে যাচ্ছে আকাশের নীলনদীতে। দিনের আলো কাশীর গঙ্গায় তখন সবেমাত্র এসেছে। ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যার জ্বালা দীপ নেভবার অপেক্ষায়। ঘাটের পর ঘাটের গায়ে দাঁড়ানো আকাশ-উদ্ধত বাতিগুলোর গায়ে সাদা কালোর ছায়া, নৌকয় নৌকয় ভরে গেছে গঙ্গার বুক। সেদিনকার কাশীর গঙ্গাবক্ষের বর্ণনায় বলছেন এক বিদেশী লেখক যার ভাষান্তর সম্ভব; কিন্তু ভাবান্তর অসম্ভব:

"Benares...Then in the morning before the sun rises you drive through the city, the shops still closed and men under rugs lying asleep on the pavement; a scattering of pepole are going down to the river, with brass bowls in their hands, for their prescribed bath in the sacred water. You get on to a houseboat, manned by three men, and slowly row down by the ghats. It is chilly in the early morning. The ghats are unevenly peopled. One, I don't know why, is crowded. It is an extraordinary spectacle...

"It is a moving, a wonderfully thrilling spectacle; the bustle, the noise the coming and going give a sense of seething vitality; and those still figures of the men in contemplation by contrast seem more silent, more still, more aloof from human-intercourse".

[illegible] এক [illegible] [illegible] রাজার নৌকার দিকে ভেসে আসছিলেন জলবিহাররত ত্রৈলঙ্গস্বামী। নৌকার কাছ বরাবর হতে রাজতরণীতে যারা কাশীর লোক ছিলো তারা সাড়ে-চার হাত সাধুকে চিনতে পারলো; রাজা সেই সিদ্ধযোগীকে সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর নৌকায়। সানন্দচিত্তে, কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ মুক্তপুরুষ উঠে এলেন জল ছেড়ে কাঠের ডাঙায়। আসন গ্রহণ করলেন কিন্তু কথা বললেন না নির্বাক সাধু। নিস্তব্ধ নৌকাকে নিয়ে বয়ে যেতে লাগলো শান্ত সুরধুনী। জবাকুসুম সঙ্কাশ সর্বপাপঘ্ন দিবাকর উদিত হলেন পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে দীপ্ত করে। রাজার তরবারী চেয়ে নিলেন যোগী; তারপর নিক্ষেপ করলেন গঙ্গাবক্ষে। চক্ষের নিমেষে সেই মহার্ঘ্য অস্ত্র নয় রাজ-অলঙ্কার অন্তর্হিত হলো উত্তরবাহিনীর অতলে। হায়! হায়! করে উঠলো পার্শ্বচর। দুর্বের রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেলো রুষ্ট রাজনয়নে। তরবারি ব্যবহারের বস্তু ছিলো না; ছিলো মর্যাদার প্রতীক। ইংরেজ সরকার দেশী রাজার প্রভুভক্তিতে সন্তোষের নিদর্শন দিয়েছিলো, তরবারি উপলক্ষ্য।

হীরকাঙ্গুরীয় ফেলে দিলে রাজা উত্তপ্ত হতেন না এতটুকুও। একটা গেলেও দশটা আসতো। কিন্তু এ তরবারি আবার কে দিতে পারে তাঁকে!

৺কাশীর ঘাটে ভিড়লো কাঠের নৌকা। রাজা কি ভয়াবহ শাস্তি সাধুকে দেন তারই আসন্ন আশঙ্কায় সমস্ত জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সম্বরণ করে মহা আতঙ্ক জপ করছে যখন মৌনমন্ত্রে, তখন ত্রৈলঙ্গ জলের অতল থেকে দু'হাত দিয়ে তুলে আনলেন তরবারি; একখানা নয়; দুটি তরোয়াল। রাজার হাতে যমজ সেই অস্ত্র তুলে দিয়ে বললেন: 'বেছে নাও; কোনটা তোমার?' হতবুদ্ধি রাজা চিনে উঠতে পারলেন না সেই বস্তু; যা নিজের একান্ত গর্বের একমাত্র বস্তু খোয়া গেছে বলে রণহুঙ্কার দিচ্ছিলেন তিনি তা ফেরৎ পেয়েও ফেরৎ পাচ্ছেন না। রাজা তাকালেন মহাযোগীর ধ্যানাচ্ছাদিত চোখে; মহাযোগী তাকালেন শান্তসমাহিত দৃষ্টিতে রাজার চোখে। সেই দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিলো যে কত মিথ্যে মানুষের অহঙ্কার। যে মানুষ জন্মমুহূর্তে বাছুরের মতো হাম্বারবে জানায়, হাম, হাম; অর্থাৎ সব হামারা হ্যায়। আর সবার বেলায় হায় হায় করে ওঠে বাছুরের অন্ত্রের মতো ধুনুরীর হাতে: তুঁহু! তুঁহু! সব তুমি; সব তুমারা হ্যায়।

রাজার ধন রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যান যোগী অতল জলের আহ্বানে। নিজের তরবারি নিজের নয় জেনে রাজা তাকে জলে নিক্ষেপ করেন কি না সেকথা আজও অলিখিত রয়ে গেছে ইতিহাসে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিই আসলে অদ্বিতীয়। উলঙ্গ সাধুকে ধরে নিয়ে এসেছে আদালতে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় মোসাহেবের দল। সাধুর হয়ে কয়েকজন বললেন সাধুর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত; অতএব আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের অভাব দুয়েই এঁর সমান অনাসক্তি। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন: খাদ্যের বেলায়? উত্তর হলো: সুধা ও বিষ্ঠায় সমান আসক্ত অথবা সমান নিরাসক্ত; রুচিও আছে; অরুচিও আছে। বেশ,—সাহেব আদেশ করেন,—সাহেবের খাদ্য যা হিন্দুর অখাদ্য তা'ই আজ খেয়ে দেখাতে হবে যোগীকে যে কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাঁর।

সাধু কথা বললেন এতক্ষণে: তার আগে আমার খাদ্যও তোমাকে খেয়ে দেখাতে হবে যে তোমার খাদ্য যেমন আমি খেতে পারি, আমার খাদ্যও তুমি খাবার ক্ষমতা রাখো।

সাহেব বললেন: তথাস্তু। হিন্দুরা নিরামিশাষী, এই জেনেই হাঁ। দিয়েছিলেন সাহেব।

ত্রৈলঙ্গস্বামী মলত্যাগ করলেন হাতের তালুতে, তারপর তা গ্রহণ করলেন মুখবিবরে। গ্রহণ করলেন সেই পরমপ্রসন্নাননে যে আনন্দে মাতৃস্তনে মুখ দিতে উন্মুখ হয় সদ্যোজাত। সর্বচরাচর ব্যাপী যিনি অনলে আছেন অনিলে আছেন; যিনি একই সঙ্গে চলিষ্ণু এবং যুগ যুগ ধরে অপেক্ষামান; যিনি চৈতন্যের আশীর্বাদ চৈতন্যে জড়ত্বের অভিশাপ, যিনি একই সঙ্গে মূক এবং মুখর; যিনি আদি যিনি অনাদি, যিনি অন্তে আছেন; অনন্তে আছেন'—যিনি একই অঙ্গে নররূপে এবং সিংহরূপে অপরূপ, আজ তিনিই বিষ্ঠায় বয়ে এনেছেন মধুগন্ধ। মুঠোর মধ্যে যাকে ধরেছেন তাকে সীমিত দৃষ্টি দেখছে মনুষ্য শরীরের আবর্জনা বলে; তার থেকে নির্গত হচ্ছে নিদারুণ দুর্গন্ধ।

কিন্তু অসীমে যার দৃষ্টি অবারিত সে জেনেছে এ মল নয়; পরিমল। এখানেও এই মুহূর্তে উপস্থিত তিনি যিনি অনুপস্থিত হলে সূর্যের দীপ্তি, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি, তারার আলো, অশ্বত্থের পাতা, কৌস্তুভের কান্তি, মহাকালের আবর্তন অপহৃত। এখানেও এই মুহূর্তে তাঁরই অবস্থান যিনি উপস্থিত থাকলে তবেই অগ্নিতে উত্তাপ, বায়ুতে বেগ, শরীরে প্রাণ, এবং আকাশে সকালসন্ধ্যা হয়।

দক্ষিণ ভারতের এই মহাযোগীর কাছে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে আরেক উদযোগী। গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন ত্রৈলঙ্গ; হিমালয়ের শিখরে যেন উমানাথ। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছেন আঙুলের সাহায্যে ঈশ্বর এক না অনেক? অঙ্গুলী সংকেতে উত্তর এসেছে তার। মহৎ জীবন জিজ্ঞাসার মহত্তর উত্তর: যিনি এক তিনিই অনেক; অনেকের মধ্যে তিনি একাকার।

ত্রৈলঙ্গর এই দিব্যজীবন যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণের বস্তু নয়। বিশ্বাসের বিষয়। ভগবান জ্ঞান দেন; বুদ্ধি দেন। বিশ্বাস দেন না। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার বিশ্লেষণে যা হয় না; বিশ্বাসে তাই হয়। বিশ্বাসে যা হয় তা বিশ্বাসের বাইরে। এই বিশ্বাস যে পায়নি সে পায়নি দিব্যজীবনের নাগাল। এবং এই বিশ্বাস তাঁর অহৈতুকি কৃপা। কৃপা ছাড়া এক পা এগুনোর উপায় নেই বিশ্বাসের পথে। কার ওপর ভর করবে এই নিঃসংশয় নির্মল বিশ্বাস তা নির্ভর করে কেবল তাঁর ওপর যাঁর করুণায় মূক হয় কথায় উন্মুক্ত; পঙ্গু পার হয় পাহাড়। সে কোন্ ধ্রুব বিশ্বাস যার কথা এখন বলছি তা বুঝবার ব্যাপার নয়; হৃদয়ে বাজবার বীণা। এমনই একটি বিশ্বাসের প্রজ্বলন্ত মূর্তি দেখা গেছে একবার সুদূর মিশরে।

মিশরে সেবার বৃষ্টি হয়নি। রৌদ্ররুক্ষ মরুভূমির সীমাহীন ঊর্ধ্বে আকাশের নীল শকুনির মিছিল; তার পাখার ছায়ায় দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন। জীবনের জয়যাত্রা ব্যাহত; মহাকালের চাকা অচল। রাস্তায় গরু-বাছুর ধুঁকছে। মাঠের শ্যামলিমা মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। শস্যশ্যামলা হয়েছে বিশুষ্ক কঠিন। সব বুভুক্ষু সন্তানের রক্তিম চোখের মণিতে জ্বলছে মাঁর ভুঁখা হুঁ-র পদ্মরাগমণি। মায়েরা যাপন করছে বিনিদ্র রাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে; কখন বৃষ্টি নামবে। আকাশের নীল বুক চিরে দেবতার অশ্রু কখন ফোঁটায় ফোঁটায় নামবে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের বুক ভরে দিতে করুণাধারায়। বধির আকাশের দেবতা। ধূলির কান্না পৌঁছয় না গিয়ে তাঁর কানে; তাঁর চোখে আসে না তৃষ্ণার বারি। ধূ-ধূ করে মরুভূমির কঠিন বুক। বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে কেবল মরীচিকার আমন্ত্রণ; মৃত্যুর আলিঙ্গন।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ভীত মানুষের মিছিল নীল নদীর তীরে বৃষ্টির জন্যে বেরিয়েছে প্রার্থনা করতে রাত্রির অন্ধকারে। মিশরের আবালবৃদ্ধ বনিতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনায় উচ্চারিত হয়: নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জিত ছায়া সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর। বৃষ্টির গানে বৃষ্টিহীন রাত কাঁপতে থাকে। মাটি তৃষ্ণা যার বক্ষ জুড়ে সেই ধরিত্রীর আর্তনাদ ওঠে দিকে-দিগন্তরে জল দাও; জল দাও। আকাশের বধির কর্ণে ব্যর্থধ্বনি ফিরে আসে প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গে।

নিঃশব্দ সেই মিছিল চলেছে এগিয়ে। কারুর মুখে কথা নেই। হাওয়া বন্ধ; মহাকালের রথের চাকাও অচল হয়ে গেছে বুঝি। একটি বালক এই মিছিলের সঙ্গে চলেছে ছাতা নিয়ে সঙ্গে। সমস্ত মিছিলে কেবল তারই হাতে ছাতা। একজন তাই দেখে বলতে ছাড়েনি: ছাতা কি হবেরে, পাগলা? এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর করেছে মিশরীয় সেই বালক: বা তোমরাই তো বললে প্রার্থনার পর বৃষ্টি পড়বেই—?

অবোধ সেই মিশরীয় বালকের এই অসঙ্কোচ উত্তরে সেদিন নাইল নদীর বুকে নিঃসীম ছায়া পড়ে আছে যার সেই হৃদয়হীন আকাশের চোখে দু' ফোঁটা জল টলমল না করে পেরেছে?

[ক্রমশঃ]

When men lie their eyelids flicker. When women lie their eyes tell nothing. They are betrayed by twitching at the corner of their mouths. Men never lie with hands closed. Women generally close their hands when they lie.

—*Orson Welles.*

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার

ভূমি অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ও আবর্তিক ফসলের ব্যবস্থা করে, আলু ও চীনা বাদাম থেকে তিন শত রকমের জিনিষ তৈরী করার পন্থা উদ্ভাবন করে আমেরিকাকে যে বিশ্বের খাদ্য ভাণ্ডারে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে যে সুষম খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের মান উন্নত করা হয়েছে তার মূলে রয়েছেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

আমেরিকার মধ্যাঞ্চলের রাজ্য মিজুরীতে, তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে একটি উদ্যান উৎসর্গ করা হয়েছে—এটি জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশন্যাল পার্ক। এই ধরণের পার্ক মিজুরীর আর কোথাও নেই। ১৯৪৩ সালে শ্রী কার্ভার লোকান্তরীত হন এবং ঐ বছরেই কংগ্রেসে গৃহীত একটি আইনের সাহায্যে এটিকে ন্যাশন্যাল পার্কে পরিণত করা হয়। তাঁর জন্মস্থানের সন্নিকটে মিজুরীর ডায়মণ্ডেও তাঁর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এখানে তাঁর স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিভাগের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী রোজার সি আর্ণেষ্ট সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থেকে এই জ্ঞানতপস্বীর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

কার্ভারের জীবন ও সাধনা উপন্যাসের চেয়ে বিস্ময়কর। তাঁর অভিভাবকরা ছিলেন খুবই দরিদ্র, তাঁদের তাঁকে লেখাপড়া শেখাবার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। এই অবস্থায় বালক কার্ভার দশ বছর বয়সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান এবং সতের বছর বয়স পর্যন্ত নানা জায়গায় থেকে অতিকষ্টে স্কুল ও কলেজের পড়া শেষ করেন। এই সুদীর্ঘ সতের বছর নিজের খাইখরচ ইত্যাদি চালিয়ে স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে ধোপার কাজ, সেলাই-এর কাজ এবং আরও কত কাজই না করতে হয়েছে। ১৮৯১ সালে আইওয়ার ষ্টেট কলেজ অভ এগ্রিকালচারাল মেকানিক্যাল আর্টস্‌এ ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে পাঁচ বছরেই তিনি দুটি ডিগ্রী লাভ করেন—একটি ব্যাচেলার অভ সায়েন্স, আর একটি মাষ্টার অভ সায়েন্স। ২৮ বছর ধরে যারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-বিভাগের কর্ণধার ছিলেন তাঁরা সকলেই এসেছেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে। কার্ভার ছাড়া জেমস্ জি উইলসন্ ও হেনরি ওয়ালেসও এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র।

পরীক্ষা পাশের পর আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য কার্ভারকে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রায় দু'বছর তিনি সেখানে উদ্ভিদ বিদ্যা, জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং গ্রীণ হাউসের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। সেখানে থাকাকালে তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ সালে কার্ভারের সঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো শিক্ষাব্রতী, সমাজকর্মী বুকার টি ওয়াশিংটনের দেখা হয়। বুকার ওয়াশিংটন তাঁকে আলাবামার টাসকিগী ইনষ্টিটিউটে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এর পর তিনি সেখানে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

কার্ভার যখন এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন তখন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে একটি মাত্র ফসলই হত। তুলাই ছিল তখনকার একমাত্র ফসল। এজন্য জমির উর্বরতাও গেল নষ্ট হয়ে। কার্ভারের চেষ্টায় এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হল, এক ফসলের আবর্তন, জমি হল দু'টির
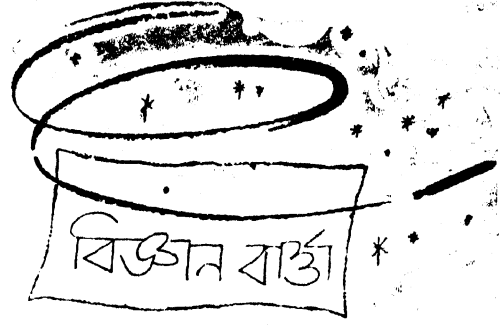
ফসলা। বহু জিনিষ তিনি আবিষ্কার করে গেছেন: আলবামার লাল মাটি থেকে নূতন রং, তুলার গাছ থেকে খেত সার, চীনাবাদাম থেকে ১১ রকমের রং, আলু থেকে জুতা পালিশের রং, গাছের শেকড় থেকে নকল মার্বেল পাথর, বনজলতা ও টম্যাটো থেকে রং, ঠ থেকে ঘেঁষে তৈরীর পাথর প্রভৃতি।

এসব ছাড়া শবজী থেকে শিশু পক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধ হিসাবে তিনি একটি তেলও আবিষ্কার করে গেছেন। তবে কোন আবিষ্কারই তিনি পেটেণ্ট করে যাননি।

জীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কারই পেয়েছেন। ১৯৩৯ সালে যে তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে রুজভেল্ট পদক দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন অন্যতম। লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সদস্য ডাঃ কার্ভারকে ১৯৪০ সালে স্থাপত্য শিল্পী, ইঞ্জিনীয়ার ও রসায়নবিদগণের আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের ব্রোঞ্জ পদক এবং ১৯২৩ সালে স্পিনগার্ণ পদক দ্বারাও পুরস্কৃত করা হয়। ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সারা জীবনের সঞ্চয় ৩০ হাজার ডলার টাসকিগী বিশ্ববিদ্যালয়কেই দান করে গেছেন। এই অর্থ সাহায্যে কৃষি রসায়ন সম্পর্কে গবেষণার জন্য জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ফাউণ্ডেশান স্থাপিত হয়েছে। দিন মজুরী করে কিভাবে লেখাপড়া করা যায় তাই ছিল সেদিনকার সমস্যা—এই সমস্যা সমাধানে টাসকিগী ইনষ্টিটিউট অনেকখানি সাহায্য করেছে।

তুষারপাতের মধ্যেও গাছপালাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা

ওয়াশিংটন, ৩০শে জুলাই—আমেরিকার ফ্লোরিডার মত বিভিন্ন অঞ্চলে তুষারপাতের জন্য লেবু জাতীয় গাছসমূহকে বাঁচানো খুব কঠিন হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঐ সকল গাছপালার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে পারলে এরা বেঁচে থাকে। মার্কিণ বিজ্ঞানীরা এজন্য এম এইচ—৩০ নামে একপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। এই ওষুধ প্রয়োগে এই ধরণের গাছের বৃদ্ধি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এভাবে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ফলে যে এদের আর মৃত্যু ঘটে না এই খবর ইউনাইটেড ষ্টেটস রাবার কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে লক্ষিত তৈল সংগ্রহের উপায়

ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে পরিমাণ জমাট তৈল রয়েছে তা গালিয়ে সংগৃহীত করতে পারলে পৃথিবীর তৈল উৎপাদনের পরিমাণ সাতগুণ বেড়ে যাবে। আমেরিকার ইলেকট্রনিক টিউব

ম্যানুফ্যাকচারার রেথিয়ম কোম্পানী সম্প্রতি এজন্ত পরীক্ষামূলক একপ্রকার ইলেকট্রনিক হিটার তৈরী করেছেন. এতে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের নল ব্যবহৃত হবে। এতে অতি তীব্র আলোকচ্ছটারূপে ১০ হাজার ওয়াট পর্যন্ত তাপশক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে তাঁরা আশা করছেন।

টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা রেকর্ড করার অভিনব যন্ত্র

আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল বিজিনেস মেন্‌স্ কর্পোরেশন টেলিফোনে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ ও প্রণালীবদ্ধভাবে রেকর্ড করার একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটির নাম '১০০১ ডেটা ট্র্যান্সমিশান সিষ্টেম।' কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অতিরিক্ত বেতনের হিসাব ও জিনিষপত্রের তালিকা প্রস্তুত করা, বিল তৈরী করা এবং হিসাবপত্র রাখার ব্যাপারেও এ যন্ত্রটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারে।

আর্দ্রতা ও সংক্রামক রোগ বিস্তারের বাহন

মার্কিণ ভূপদার্থ বিজ্ঞানী ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ কে 'এইচ কিংডম বলেছেন, আবহাওয়ায় শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে ১৫ ভাগ আর্দ্রতাই হল বহু সংক্রামক রোগ বিস্তারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত যখন কোন রোগী হাঁচি দেয় তখন সেই হাঁচি হাজার হাজার জলের কণার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোগ বীজাণু আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আবহাওয়ার আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৮৫ থেকে ১৫ পর্যন্ত হলে সেই জলকণাসমূহ অনেকক্ষণ থাকে। আর্দ্রতার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে তারা আরও মাটির কাছাকাছি নেমে আসে। ভিজে আবহাওয়ায় পুষ্ট বীজাণু আর্দ্রতা হ্রাস পেলেই জলাভাবে মরে যায়। ১৯৫৭ সালে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা যে সংক্রামক রোগ আকারে দেখা দিয়েছিল তখনকার অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই রোগ বীজাণু যখন চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন এই রোগের তেমন আক্রমণ হয়নি, হয়েছে তার কয়েক মাস পরে, আবহাওয়ার আর্দ্রতা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা ৮৫ থেকে ১৫ ভাগের মধ্যে থাকার সময়েই এই রোগ সংক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল।

শল্য চিকিৎসাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণ

আমেরিকার ভেটারেন্‌স্ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান বা প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: হ্যারী লিঙ্কন এবং তাঁহার সহকর্মিগণ জানিয়েছেন, শল্য চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সঙ্গে যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যখন অতি দ্রুত রক্তপাত হতে থাকে, তখন যকৃত থেকেই পোটেশিয়াম নির্গত হয় এবং রক্তে পোটেশিয়ামের অবস্থিতির দরুণ বিষক্রিয়ার ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। দশটি রোগীর মধ্যে চারিটির ক্ষেত্রে এই রকম হতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন শল্য চিকিৎসা বা সার্জারীর সময়ে অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্ত রোগীর দেহে প্রচুর পরিমাণে রক্ত দিতে হলে সেই রক্তটি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—পোটেশিয়ামের পরিমাণ যে রক্তে কম সেই রক্তই রোগীকে দিতে হবে। তবে শল্য চিকিৎসার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে খুব কম লোকেরই মৃত্যু ঘটে।

হীরার মূল্য নির্ধারণের অভিনব যন্ত্র

জহুরী তো জহর চেনেই—কিন্তু সাধারণ লোকেও যাতে হীরা, চুনি, মণি, পান্নার ভালমন্দ বিচার করতে পারেন, তাদের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন অ্যালবার্ট এস স্যামুয়েল নামে জনৈক আমেরিকান তার একটি উপায় উদভাবন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত একটি যন্ত্র সাহায্যে হীরা, চুনি, পান্না ইত্যাদির ছবি বৃহদাকারে পর্দার উপর প্রতিফলিত করা হয়। পদার্থটির উপর রেখায় চার হাজার সমচতুর্ভুজ বা খোপায় অঙ্কিত থাকে। এই সব মণিমাণিক্যে কোন ত্রুটি থাকলে তা ঐ চিত্রে ধরা পড়ে—ঐ ত্রুটির জন্ত ঐ সকল সমচতুর্ভুজের মধ্যে কোন কোনটিতে তেমন আলোকপাত হয় না, অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই বিষয়টি বিচার করেই সেই মণিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দেড় ক্যারেট ওজনের একটি মণিকে প্রকৃত আকৃতির ৩৯১০ গুণ বড় করা হয়।

পরমাণুশক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগে খনিজ পদার্থ

শান্তিকালীন কার্যে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান ও সংস্কার কল্পে আমেরিকায় যে সর্বাধুনিক পদ্ধতি চালু রয়েছে তা পর্যালোচনা করার জন্ত ভারতের পারমাণবিকশক্তি বিভাগের দু'জন পদার্থ বিজ্ঞানী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এখন তাঁরা নয়াদিল্লীতে ফিরে আসছেন।

এই দু'জন ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানীর নাম শ্রীযুধিষ্ঠির ও শ্রীনরেন্দ্র দয়াল। উভয়েই পারমাণবিক শক্তি বিভাগের কাঁচা মাল ডিভিসনের কর্মী। তাঁরা ২৭শে জুলাই ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হয়েছেন। লণ্ডনে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তাঁরা ভারত যাত্রা করবেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার উদ্যোগে দু'মাস পর্যবেক্ষণ সফরের বর্ণনা করে ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানীদ্বয় বলেন যে, তাঁরা অধিকাংশ সময়ই যুক্তরাষ্ট্রে ইউরেনিয়ামের স্নায়ুকেন্দ্রে পশ্চিমাঞ্চলের কলোরাডো, অ্যারিজোনা ও নিউমেক্সিকোতে অতিবাহিত করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পরমাণুশক্তি সংক্রান্ত খনিজ দ্রব্যগুলির পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় ভারতে ইতোমধ্যেই বেশ অগ্রসর হয়েছে। ভারতের এই পরিকল্পনায় কোন কোন মার্কিণ পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি কার্যকরী হতে পারে তা পর্যবেক্ষণ করাই তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীদয়াল বলেন, "ভারতে আমরা এই ধরণের কাজ কয়েক বছর ধরেই করছি, তবে উন্নততর মার্কিণ প্রক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্তই আমরা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি।" তিনি বলেন, "ভারতীয় পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্ত কতকগুলি মার্কিণ পদ্ধতি যথাযথ গ্রহণ করা যেতে পারে, অপর কতকগুলি সংশোধিত আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে।"

শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য]

সর্ব্ব-ভারতে তথা বিশ্বে নিজ-শিক্ষণীয় বিষয়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন যিনি—বর্ত্তমানে যুব-জনোচিত স্বাস্থ্য, উদ্যম ও উৎসাহের অধিকারী যিনি—ছাত্র-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতাকে অবরোধের অভিলাষে গঠনমূলক কর্ম্মধারায় লিপ্ত আছেন যিনি—আর ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্ত কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করেছেন যে শিক্ষাব্রতী—সেই সম্মানার্হ ব্যক্তি হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৯৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর অমিয়চরণ ভাগলপুরে (বিহার) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন বিচার-বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। পিতামহ ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জিলার মাহেশতলার জমিদার ছিলেন। অমিয়চরণের মাতা শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ও সিভিলিয়ান এস, সি, মুখার্জ্জির বড় ভগ্নী। সন্তোলোকান্তরিত প্রশান্ত মুখার্জ্জি, এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জি ও শ্রীমতী রেণুকা রায় এম, পি, হলেন অমিয়চরণের মাতুল সন্তান। তিনি ১৮৯৯ সালে ভাগলপুর জিলা-স্কুলে ভর্ত্তি হন ও তথা হইতে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রহিসাবে ১৯১৩ সালে Applied Mathematics-এ প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরূপে এম-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডি, এন, মল্লিক প্রভৃতিকে আর তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সুশীল সেন, ডাঃ নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্র মোদক, ডি, পি, খৈতান, ডাঃ শম্ভুনাথ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। অধ্যক্ষ দেবেন্দ্র সেন পরিচালিত বিহার ন্যাশানাল কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন তিনি ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ পারিজা, শ্যাম ত্রিপাঠী ও আরেকজন সহ বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন পৌঁছান এবং কেম্ব্রিজস্থ CLARE কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি Wrangler (র‍্যাঙলার) হইয়া Foundation বৃত্তি পান। সেই সময় তিনি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির দুইবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর এক বৎসর Mathematical Physics & Astronomy বিষয়ে Cavandish ল্যাবরেটরীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিলাতে তিনি এডিংটন, হার্ডি, বেকার, লারমোর প্রভৃতি অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ১৯১৯ সালে দেশে ফিরিবার সময় 'ইজিপ্ট' জাহাজে লোকমান্য তিলক, সি, ওয়াই, চিন্তামণি প্রমুখ ভারতীয় নেতাদের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। উক্ত বৎসর তাঁহাকে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে লওয়া হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় নাই ; কারণ তদানীন্তন ডি-পি-আই মিঃ ফকাস্ বিরুদ্ধতা করেন। যাহা হউক, পাটনা কলেজে তিনি 'অস্থায়ী' অধ্যাপকপদে বৃত হন এবং 'পরিদর্শকের শিক্ষা' গ্রহণের জন্ত তাঁহাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অমিয়চরণ ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া I. E. S. হইতে পদত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু ১৯২০ সালে এলাহাবাদ মুইর সেন্ট্রাল কলেজে স্থায়ী অধ্যাপকপদে তাঁহাকে লওয়া হয়। সেই সময় কটক কলেজে যোগদানের আহ্বান আসে। কিন্তু
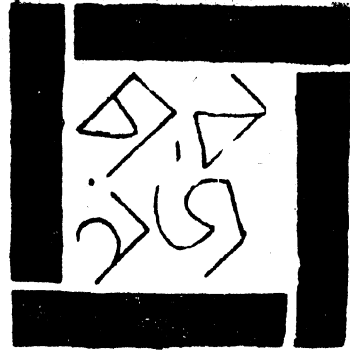
পূর্ব্বপরিচিত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী (ইউ, পি,) সি, ওয়াই, চিন্তামণি তাঁহাকে এলাহাবাদে থাকার জন্ত অনুরোধ করেন। ১৯২২ সালে তথায় Unitary University স্থাপিত হয়। ১৯২৪ সালে ডক্টর মেঘনাদ সাহা উহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তথাকার তিন বৈজ্ঞানিক-অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর সাহা ও শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গভীরভাবে লিপ্ত হন। ফলে ১৯৩০ সালে National Academy of Sciences এবং ১৯৩৫ সালে National Institute of Sciences ওদের যুক্তপ্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠে।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় Hydro-Dynamics, Wave-Mechanics ও ১৯৩৭ সালে Astro-Physics বিষয়ে গবেষণা করেন। তৎলিখিত পুস্তক Recent Advances in Galactic Dynamics, Mathematical Researches in India for last 50 years, Sun & Planets—Part of Cepheid Variable Star ও বহু তথ্যমূলক প্রবন্ধ বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকমহলে ভূয়সী প্রশংসা পায়। এছাড়া শিশুভারতী ও প্রবাসীতে তৎলিখিত এবং ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁহার প্রবন্ধগুলি এদেশে প্রচুর সমাদৃত হয়।
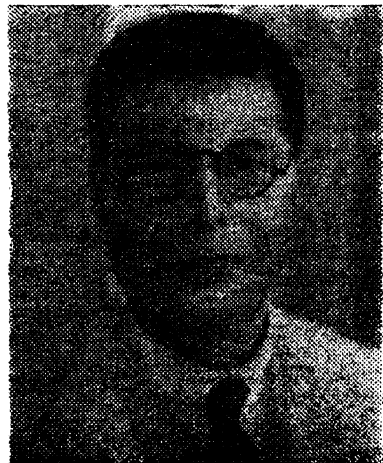
শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩২ ও ১৯৪২ সালে উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি, ১৯৪০ সালে মাদ্রাজ বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিভাগীয় সভাপতি, ১৯২৭—৪৪ সাল পর্য্যন্ত এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীর (প্রাদেশিক) কর্ম্মসচিব, জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমীর ও জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সভাপতি ও অন্যতম সহঃ সভাপতি, কলিকাতা ও বারাণসী অঙ্কশাস্ত্র সোসাইটীর সভাপতি এবং ১৯৫৩ সালে উত্তরপ্রদেশ অধ্যক্ষ-সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০—৫৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি "বিশেষ বিবাহবিষয়ক" রেজিষ্ট্রার থাকাকালীন আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী ও শ্রীমতী সুচেতা দেবী এবং রাজা হাতী সিং ও শ্রীমতী কৃষ্ণা নেহরুর বিবাহকার্য্য পরিচালনা করেন।

১৯৫০ সালে ভারত সরকার কয়েকজনের সহিত তাঁহাকে আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও স্ক্যাণ্ডানেভিয়া দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয় ও মানমন্দির পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি হাভার্ড, মাউণ্ট পালোমার, মাউণ্ট উইলসন প্রভৃতি মানমন্দিরগুলির কার্য্যকলাপ দেখিয়া মুগ্ধ হন।

কর্ম্মদক্ষতা ও সততার পুরস্কার হিসাবে রাজ্য সরকার ১৯৫২ সালে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের পদে বৃত করেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এক সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ১৯৫৫ সালে তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে কমনওয়েলথ উপাচার্য্য সম্মেলনে (কেমব্রিজ ও ডারহাম) তিনি যোগদান করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে বিন্ধ্যপ্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে One-man Commission, ১৯৫৬-৫৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা, ১৯৫৮ সালে কৃষিবিভাগে স্পেশাল অফিসার হিসাবে কার্য্য করার পর তিনি বর্ত্তমানে হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত রহিয়াছেন।

১৯২১ সালে হাজারীবাগের শ্রীমতী প্রভা নিয়োগীকে তিনি বিবাহ করেন। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের প্রথম মহিলা-বিচারক, চৌদ্দ বৎসর স্থানীয় পৌরসভার সদস্যা, মহিলা শিল্প-ভবন স্থাপয়িত্রী, স্কাউটের সহকারী প্রাদেশিক কমিশনার, নিখিল ভারত গৃহ-শিল্প-বোর্ডের সভ্যা, নিখিল ভারত সমাজ-কল্যাণসংস্থার মহিলা বিভাগের চেয়ারম্যান, নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের (ইউ, পি,) দশ বৎসর সভানেত্রী ও সর্ব্বভারতীয় নারী-সম্মেলনের তিন বৎসর সহঃ সভানেত্রী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি নানা সামাজিক কর্ম্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াছেন।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক ব্যানার্জ্জির প্রচেষ্টায় ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সোসাইটী স্থাপিত হয়। তিনি রয়্যাল এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটীর ফেলো, আন্তর্জ্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়নের সদস্য, উজ্জয়িনীস্থ কেন্দ্রীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান উপদেষ্টা বোর্ডের সভ্য, জাতীয় ক্যালেণ্ডার কমিটীর সদস্য ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সোসাইটীর চেয়ারম্যান রহিয়াছেন।

"অধ্যয়নং তপঃ"—এই মহাবাণীকে রূপায়িত করিতে হইলে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :—

(১) শিক্ষকদের রাজনৈতিক আবর্ত্তে জড়িত না হওয়া ;

(২) ছাত্রদের এন, সি, সি, স্কাউট, রোভার ও নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া ;

(৩) Disciplinary type of education অর্থাৎ শিশুবয়স হইতে ধারাপাত, সংস্কৃত-ব্যাকরণ পঠন প্রভৃতির ব্যবস্থা ;

(৪) কর্ম্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান্‌, সততাপরায়ণ, আদর্শবান্‌ ও উন্নতমনা শিক্ষক নিয়োগ ;—এই চারিটি পন্থাবলম্বন প্রয়োজন।

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

[বস্ত্র-শিল্পের অন্যতম নায়ক]

"উদযোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—প্রবাদটি বাংলা তথা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের অন্যতম নায়ক শ্রীসূর্য্যকুমার বসুর সম্পর্কে বিশেষ ভাবে খাটে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার ভেতরেই তিনি জীবন-পথে পা বাড়ান ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, সফলতার মাল্য নিয়ে এগিয়ে আসতে পেরেছেন তিনি বহুদূর। বলতে কি, সূর্য্যকুমারের বিপুল উদ্যম ও অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁর সকল সাফল্যের জন্যে দায়ী।

আজ থেকে ৮০ বছর আগে শ্রীবসু বিক্রমপুরের রাউতভোগ গ্রামে জন্মগ্রহণ (১৮৮০ সালের ২৩শে নভেম্বর) করেন। বাল্য-বয়স থেকেই দৈন্যের বিরুদ্ধে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে, সংগ্রাম দিতে হয়েছে তাঁকে অবিরাম। প্রথমাবস্থায় গ্রামের সার্কেল স্কুলে এবং পরে মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন। এখানকার শেষ পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রশ্ন এসে সামনে দাঁড়ালো, কি করে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়। আর্থিক সমস্যা তো রয়েছেই, তদুপরি আর একটি সমস্যা উপযুক্ত স্কুল পান কোথায়? রাউত-ভোগের নিকট অঞ্চলে হাই স্কুল ছিল না যে, তিনি বাড়ি থেকে পড়বেন। শেষ অবধি ভর্ত্তি হলেন যেয়ে বিক্রমপুরেরই বজ্রযোগিনী হাই স্কুলে। গৃহশিক্ষকতার পেশা নিয়ে তিনি পড়াশুনা চালাতে থাকেন। এমনি ভাবেই তিনি এনট্রান্স ও এফ, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন।

সূর্য্যকুমারের কলেজ-জীবনের সূচনা কিন্তু কলকাতায় (ডাফ

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু

কলেজ)। পরে এক সময়ে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে গিয়ে পড়েন এবং সেখানে থেকে যান ঢাকায়। ঢাকার কলেজ হতে এফ, এ, পাশ করলে পর তাঁর একটু অবস্থান্তর ঘটে। সে সময় তাঁর অগ্রজ ভ্রাতা ৺রেবতীমোহন বসু শিবপুর কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে ঢুকেছেন—যার দরুণ সূর্য্যকুমারের আর গৃহশিক্ষক হিসাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীবসু যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র, সারা বাংলায় চলেছে তখন (১৯০৫ সাল) লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবল ঢেউ তাঁর তরুণ মনকেও বিশেষ ভাবে দোলা দেয়। জাতির সংকল্প ছিল সেদিনে স্বদেশী গ্রহণ ও বিলেতী বর্জন। কী করে আন্দোলন সফল হবে, চিরকালের মতো বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন চলতে পারে কি ভাবে, এই নিয়ে সূর্য্যকুমারের ভাবনায় তখন অন্ত ছিল না। ভেবে তিনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন শেষ অবধি—বিলেতী পণ্য বর্জনের পাশাপাশি নিজেদের শিল্প-প্রতিষ্ঠা না করলে নয়।

বাংলা দেশে বাঙালীদের কোন কাপড়ের কল তখনও হয় নি। বস্ত্রশিল্পে বাংলাকে স্বয়ংসম্পন্ন করে তুলতে শ্রীবসু ব্যাকুলতা অনুভব করেন। কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থাতেই তিনি কি করে খবর পান—আমেদাবাদে কেশবলাল মানিকরাম মটা বাংলায় যাতে কাপড়ের কল গড়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্য থেকে বাংলার কতিপয় শিক্ষিত ও উদ্যমশীল ছাত্রকে স্পিনিং উইভিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতিতে ট্রেনিং দেবেন, কিন্তু সে কাজটি কোনরূপ টাকা-পয়সা না নিয়ে। এই সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে সূর্য্যকুমার স্বভাবতঃই ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৯০৬ সালে কাউকে কিছু না বলে আমেদাবাদে চলে যান তিনি। শ্রীমেটা ছিলেন সে সময়ে একটি মিলের উইভিং মাষ্টার ও ম্যানেজার। তাঁর অধীনে থেকে শ্রীবসু শিক্ষানবীশী আরম্ভ করেন নিতান্ত আগ্রহ নিয়ে। তিন বছর এভাবে কাটিয়ে তিনি বয়ন (উইভিং) বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর সাথে আরও ১৪ জন বাঙালী যুবক এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন একই সময়ে।

বাংলার মাটিতে বাঙালীর প্রথম সুতা ও কাপড়ের কল হিসাবে শ্রীরামপুরে ১৯০৬ সালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ স্থাপিত হয়। আমেদাবাদ থেকে ফিরেই সূর্য্যকুমার বঙ্গলক্ষ্মীর তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের অধীনে অবৈতনিক শিক্ষানবীশরূপে বয়ন বিভাগে কাজে প্রবৃত্ত হন। অল্প দিন মধ্যেই এই লাইনে তিনি প্রভূত দক্ষতা প্রদর্শন করেন—যার ফলে মিল-কর্তৃপক্ষ উইভিং মাষ্টার ও সহকারী ম্যানেজারের পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন পরম আগ্রহে। ১৯২১ সাল অবধি এই দায়িত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি।

ইত্যবসরে শ্রীবসুর মন পূর্ব্ববঙ্গে একটি বস্ত্র-মিল প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সুরু (১৯২১) হয়ে গেছে এর ভেতর দেশের সর্বত্র। বঙ্গলক্ষ্মী মিল ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন সূর্য্যকুমার—লক্ষ্য থাকলো কাজের ভেতর দিয়ে স্বদেশী ছড়ানো। অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রবীণ মোক্তার ৺রজনীমোহন বসাকের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। উভয়ে মিলে নিবিড় পরামর্শ করে ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী সংগঠন করেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাড়া পড়ে যায় দেশব্যাপী—৩০ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী হয় অল্পদিন মধ্যেই। নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার তীরে কাপড়ের মিল বসে গেল—সূর্য্যকুমারের স্বপ্ন ও সাধনা সফলতার পথ পেল খুঁজে।

শ্রীবসুর অপূর্ব্ব সাংগঠনিক শক্তি ও কর্মপ্রতিভার ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালে ২নং ঢাকেশ্বরী মিল স্থাপিত হয় ১নং মিলেরই কাছাকাছি। এই দুইটি মিল আজও পাকিস্তানে বিপুল পরিমিত বস্ত্র উৎপাদন করে চলেছে। তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যম ও প্রচেষ্টায় দেশ-বিভাগের পর ঢাকেশ্বরী মিলের আরও একটি ইউনিট (৩নং) স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে। এই মিলগুলিতে কয়েক সহস্র নর-নারী আজ কাজ করছেন, সে কম কথা নয়।

ঢাকেশ্বরী মিলের দায়িত্ব ছাড়াও সূর্য্যকুমার অন্নপূর্ণা কটন মিলস লিঃ এবং আরও কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হয়েছেন। এক সময় তিনি ছিলেন বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির সভাপতি। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। সে উপলক্ষে তিনি রুশিয়া ছাড়াও বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, পশ্চিম জার্মাণী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র-মিলসমূহ পরিদর্শন করে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন স্বদেশে। প্রাচ্যের জাপানে যেয়েও তিনি বহু যন্ত্রপাতি তৈরী কারখানা এবং কতকগুলি বড় রকমের বস্ত্র-মিল নিজের চোখে দেখে এসেছেন। ঢাকেশ্বরী মিলের অগ্রগতির ইতিহাসের সাথে সূর্য্য বসুর নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না।

সব কিছু ছাড়িয়ে সূর্য্যকুমার একটি দরদী প্রাণ—সমাজসেবা তাঁর জীবনের একটি মুখ্য আদর্শ। এযাবৎ অসংখ্য দুর্গত পরিবার তাঁকে আশ্রয় করে দাঁড়াবার ঠাঁই খুঁজে পেয়েছে। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন প্রশ্নে এই অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ এখনও ভাবনা নিয়োজিত করছেন। শিক্ষিত উদ্যমশীল বাঙালী যুবকদের বস্ত্রোৎপাদন ব্যাপারে উন্নততর জ্ঞানার্জনের সুযোগ করে দেবার জন্যে ঢাকেশ্বরী মিলেরই আওতায় তিনি একটা ফাণ্ড রেখেছেন—যার নাম কেশবলাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাণ্ড। এই ফাণ্ড থেকে বহু ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয় এবং এমন কি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাঁদের বিদেশেও শিক্ষার জন্যে পাঠানো হয়। সূর্য্যকুমারের কাছ থেকে দেশ ও জাতি এখনও আরও অনেক পাবে বলে আশা রাখে।

শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত, এম, বি, ই,

[ক্রীড়া-জগতের অন্যতম স্তম্ভ]

বাংলা তথা ভারতের ক্রীড়ামোদী মহলে পঙ্কজ গুপ্তের একটি পাকা আসন নির্ণীত হয়ে আছে বহুদিন। শুধু হকি বা ফুটবলই নয়, বলতে গেলে সমগ্র ক্রীড়া-জগতে নিজ যোগ্যতাবলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। একটি চমৎকার খেলোয়াড়-সুলভ আনন্দোচ্ছ্বল মন রয়েছে তাঁর ভেতর সব সময়

সজীব—কাছাকাছি যেয়ে একটু আলাপেই যা নজরে পড়ে যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম সহরে শ্রী গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে। তাঁহার পৈতৃক ভূমি ছিল অবশ্য পূর্ব্ববঙ্গেরই ফরিদপুর জেলায়। মাত্র দু'বছর যখন বয়স তাঁর, তখনই তিনি পিতৃহারা হন। সেই থেকেই তাঁকে দেখাশুনো করতে থাকেন তাঁর কাকা—যিনি নিজে ছিলেন একজন সরকারী চাকুরে। কাকার অনুশাসনে থেকেই পড়াশুনো হয়ে চলে বালক পঙ্কজের।

প্রবেশিকা পরীক্ষা অবধি ঢাকার উকিলস্ ইনষ্টিটিউশনের তিনি ছিলেন নিয়মিত ছাত্র। ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করেই তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং ভর্ত্তি হন সংস্কৃত-কলেজে আই-এ ক্লাসে। ক্রমে এগিয়ে এসে ১৯২২ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজে তিনি পড়াশুনো করেন আর এখানেই হয় তাঁর ছাত্র-জীবনের সমাপ্তি।

ছাত্রাবস্থাতেই শ্রীপঙ্কজের খেলাধূলোর দিকে প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

শ্রী গুপ্ত সব রকম খেলাতেই প্রায় অভ্যস্ত এবং রীতিমতো উৎসাহীও বটে, কিন্তু এর ভেতর তুলনায় হকি খেলাতেই তাঁর আনন্দ বেশি, দখলও বেশি। অবশ্য ঢাকার গেণ্ডেরিয়ায় প্রথমে তিনি ক্রিকেট খেলা শুরু করেন এবং উয়াড়ী ক্লাবের আওতায় থেকে ফুটবল খেলা। তারপর ক্রমে হকি ও টেনিস খেলার দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। কলকাতায় এসে কিন্তু তিনি বেশি সময় দিতে থাকেন অন্যান্য খেলা ছেড়ে হকিতেই। অল্পদিন যেতে না যেতেই ক্রীড়ামোদী মহলের দৃষ্টি পড়ে যায় তাঁর ওপর।

সেকালের বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন রোজার সাহেব। শ্রীপঙ্কজ একদিন ময়দানে হকি খেলছেন আপন মনে, হঠাৎ রোজার যেয়ে দাঁড়ান তাঁর কাছাকাছি। কি জানি কি ভেবে তিনি দাবী রাখেন—শ্রী গুপ্তকে একজন নামকরা রেফারী হতে হবে—তাঁর পক্ষে যা হওয়াটা অসম্ভব নয়। নতুন প্রেরণা ও উদ্যম খুঁজে পেলেন এই যুবক—সফলতাও এসে জুটলো তাঁর খুব তাড়াতাড়ি। একজন নামকরা রেফারী (বিশেষ ভাবে সর্ব্বভারতীয় হকি ও ফুটবল খেলার) হিসাবে সেদিনে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেন, তা ম্লান হয়ে যায়নি আজও।

পঙ্কজ গুপ্ত

ভারতীয় ক্রীড়াজগতে পঙ্কজ গুপ্ত একটি মস্ত স্তম্ভস্বরূপ, এ বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। খেলাধূলোর সংগঠন নিয়ে তাঁকে প্রায় দিনরাত ব্যস্ত ও কর্ম্মতৎপর দেখতে পাওয়া যায়। এসোসিয়েসনের আই, এফ, এ'র (ভারতীয় ফুটবল সমিতি) সাথেও তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন—কখনও সম্পাদক রূপে, কখনও বা সভাপতিরূপে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ সম্মানজনক আসন তাঁর অধিকারভুক্ত। আই, এফ, এ, শীল্ড (কলিকাতা) ফাইন্যালের প্রথম ভারতীয় রেফারী তিনিই।

ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়ানুরাগী হিসাবে শ্রীগুপ্ত এর ভেতর বিদেশ সফরে গেছেন বহুবার। ভারতীয় ক্রিকেট টীম নিয়ে তিনি ১৯৪৬ সালে ও ১৯৫২ সালে বিলেতে যান, আর অষ্ট্রেলিয়ায় যান ১৯৪৭-৪৮ সালে। ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের নেতৃত্ব করেন তিনি লস এঞ্জেল, বার্লিন, লণ্ডন, নিউজিল্যাণ্ড, প্রভৃতি বহুস্থানের বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় ফুটবল টীম নিয়ে সোভিয়েট দেশে যান। টোকিও'য় ১৯৫৮ সালে যে এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, তাতেও তিনি যোগদান করেন। আন্তর্জাতিক হকি ও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তাঁকে আম্পায়ারের কাজ করতে দেখা গেল কতবারই। ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে তিনি দু'বার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট-কন্‌ফারেন্সে (লণ্ডন) অংশগ্রহণ করেন। বহির্ভারতে যখন যেখানে গেছেন, সর্বত্র সমাদৃত হয়ে আসছেন তিনি এ যাবৎ।

শ্রীগুপ্তের জীবনের আরও একটি বিশিষ্ট দিক—তিনি একজন প্রথম পর্য্যায়ের ক্রীড়া সাংবাদিক। ছেলেবেলা থেকেই লেখার একটা হাত তৈরী হয়ে যায় তাঁর। সেটা অবশ্য শুধু খেলাধূলো প্রসঙ্গেই নয়, অন্যান্য বিষয়ও। পুরনো 'বেঙ্গলী' কাগজের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—দেশপ্রিয় জে, এম্ সেনগুপ্তের 'এডভান্স' পত্রিকাতেও তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। ১৯৩৭ সাল অবধি 'এডভান্সে'র ক্রীড়া-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তারপর তিনি যোগদান করেন 'পত্রিকা'তে (অমৃতবাজার পত্রিকা) আর সে-ও ক্রীড়াসম্পাদকরূপেই। এক্ষণে সেই পদে তিনি অধিষ্ঠিত নেই বটে কিন্তু সাংবাদিকতার নেশাটি তাঁর রয়েছে ভালভাবেই। ১৯২৮ সাল থেকে তিনি 'হিন্দু'র কলকাতার ক্রীড়া-সংবাদদাতারূপে কাজ করে চলেছেন।

খেলাধূলোর পাশাপাশি সমাজ-সেবা-মূলক ক্রিয়াকলাপেও শ্রীগুপ্ত কম উদ্যমশীল নয়। বাত্যা-বিধ্বস্ত মেদিনীপুরের দুর্গতদের বাঁচাবার জন্যে সেবারে যে কলিকাতা সংবাদপত্র সাইক্লোন সাহায্য কমিটি গঠিত হয়েছিল, ওতে সভাপতিপদে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর সম্পাদক ছিলেন তিনি (পঙ্কজবাবু)। সেদিনে জাতীয় সমর ফ্রন্টেরও তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। তাঁর বিভিন্ন সেবাকার্যের জন্যে ১৯৪২ সালে তৎকালীন ইংরেজ

সরকার তাঁকে এম, বি, ই, উপাধি প্রদান করেন। রাজনৈতিক পুঁথি-পুস্তক পড়ার একটি সুন্দর ছবি রয়েছে তাঁর বরাবর। তিনি এখনও যথেষ্ট উদ্যমশীল এবং নির্ধারিত কাজের ব্যাপারে খুব ক্ষিপ্র। জীবনে এমনিভাবে তিনি আরও প্রতিষ্ঠা পাবেন,এ আশা আমরা রাখতে পারি।

শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়

[পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী]

দেশ ও জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, এমন নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা আজও বিরল। ভারতের বঞ্চিত নারী জাতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, ছাত্র-সমাজকে কঠোর দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যাঁরা বাল্য, কৈশোর ও ছাত্র-জীবনে আত্মনিয়োগ করে পরবর্তী জীবনে দুর্গত, নিপীড়িত মানুষের ও জাতির সেবায় নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন, এমনি একজন মহিলা হচ্ছেন পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জী। প্রচার-বিমুখ নিরলস কর্মী ইনি, দেশ ও জাতির অগণিত মানুষের উন্নতিই এঁর একমাত্র কাম্য। নিন্দা বা স্তুতির কামনা না করেই দিনের পর দিন ইনি জনমানসের সেবায় আত্মনিয়োগ করে চলেছেন। বাল্যকাল থেকেই জনগণের ও ছাত্র-সমাজের সেবার দুর্নিবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি জীবনপথে এখনও পর্য্যন্ত এগিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে। বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতা হয়তো সম্মুখে এসেছে অনেকবার কিন্তু কখনই কোন অবস্থাতেই তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হননি—সবল হস্তে ও সুস্থ মনোবল নিয়ে কর্ত্তব্যের হাল ধরে আছেন সর্ব্বদা। এ জন্যেই তাঁর জীবন এত সার্থক, এত সুন্দর এবং এতখানি সম্ভাবনাময়।

যে সাংসারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শ্রীমতী মুখার্জ্জী বড় হয়ে উঠেন, সকল দিক দিয়েই তা চমৎকার। তাঁর পিতা স্বর্গতঃ বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ইছাপুর গ্রামে। বিক্রমপুরের এই বিশিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারটির বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ জন্তে এ পরিবারটির অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে বৃটিশ শাসনের সময়ে। এই বিপ্লবী পরিবারেরই মেয়ে শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জী। পরিবারের ঐতিহ্যই তাঁকে দেশ ও জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করে বাল্যকাল থেকে।

পূরবী মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী মুখার্জ্জীর জীবনে দুটি ধাপ সমান গতিতে চলেছে। একটি তাঁর রাজনৈতিক জীবন আর একটি সাংসারিক জীবন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি সাংসারিক জীবনের কর্ত্তব্য অবহেলা করেননি একদিনও। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতাতে শ্রীমতী মুখার্জ্জীর জন্ম হয় এবং কলকাতা মহানগরীতেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত। স্বর্গীয়া সরলাদেবী প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী-শিক্ষা সদনে তিনি অষ্টম-শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। লেখাপড়ায় বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন মেধাবী। কিন্তু চোখের পীড়ার জন্যে তাঁকে স্কুল ছেড়ে দিতে হলো। তাঁর লেখাপড়ায় ছিল অদম্য আগ্রহ। তাই প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী হয়ে তিনি ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে। ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আশুতোষ কলেজে এসে ভর্ত্তি হলেন ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে। কিন্তু একদিকে চোখের অসুখ, অন্যদিকে রাজনীতিতে ও ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্যে শ্রীমতী মুখার্জ্জীকে অনার্স ছেড়ে দিতে হলো শেষ পর্য্যন্ত। ১৯৪৫ সালে আশুতোষ কলেজ থেকে তিনি সসম্মানে ডিগ্রি নিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে বি, টি, ক্লাশে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু নিপীড়িত জনগণের ও দেশ-সেবায় প্রবল আগ্রহে তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষা দিবার কথা ছিল, কিন্তু দেশসেবার কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বানে তাঁকে পরীক্ষা দেবার বাসনা ত্যাগ করতে হলো। তিনি ছাত্র-আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র-কংগ্রেসের সভানেত্রী ছিলেন। এ সময়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ছাত্র-সমাজকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকেই তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের মহিলা-উপসমিতির তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা হিসাবে তাঁর কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্যা। তিনি বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গরা কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা। তিনি দশ বৎসরের অধিককাল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা আছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি কটক র‍্যাভেনস কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যা থাকা কালীন তিনি উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ও সাহায্য বিভাগের এবং স্ত্রী-শিক্ষার উপমন্ত্রী হন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে এ গুরুদায়িত্বভার সম্পাদন করেছেন। সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কাজে তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হ'তো। পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন যাতে হ'তে পারে, এ জন্যে তিনি দিনরাত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন। তাঁর দ্বার উদ্বাস্তুদের জন্যে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকতো। বহু দরিদ্র উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। নিজের দায়িত্ব-বোধ, কঠোর কর্ত্তব্য-পালন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ রায় কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে উন্নীত করেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় নিজের কর্ম্মকুশলতায় একদিন পশ্চিম বঙ্গের পুরোপুরি মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আরও কৃতিত্বের সঙ্গে দেশ ও জাতির সেবা করবেন।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ঈশ্বরের আশীর্বাদের করুণাধারা নিয়তই ঝরে পড়ে মানুষের উপর। মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সকল দিক দিয়ে তাকে পূর্ণতাও দেন তিনিই। জীবনের প্রতি মুহূর্তে মিলতে থাকে তাঁর অমৃত আশীষের স্পর্শ। নিজেকে পূর্ণ করে তোলার জন্তে মানুষকে তিনি অফুরন্ত সুযোগ দিয়ে থাকেন, নানা সুযোগ, নানা বিভাগে। বুদ্ধিমানেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ঈশ্বরদত্ত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে—অজ্ঞেরা মোহজালেই আচ্ছন্ন থেকে যায় মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না তারা—বিধাতার আশীর্বাদের মহিমার মর্ম তারা করতে পারে না উপলব্ধি। বিধাতার আহ্বানে তাদের দিক থেকে পাওয়া যায় না কোন সাড়া, ঈশ্বরের ডাকে দুয়ার তাদের উন্মুক্ত হয় না, সে ডাক ফিরে যায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে এই শেষের দলেরই অন্তর্ভুক্ত আমি। ভগবান আমাকে কি দেন নি? রাশি রাশি সুযোগ, কত সম্ভাবনা, কত খ্যাতি, কত যশ, কত নাম, কোন কিছুরই তো তিনি অভাব রাখেন নি। কিন্তু হ্যাঁ, ঐ এক কিন্তুই এর মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক, সব কিছুই পেয়েছি তবু, তবু এর মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে এক বিরাট শূন্যতা। খুব সামান্ত একটুখানি জায়গা জুড়ে এই শূন্যতার প্রথম আত্মপ্রকাশ, তারপর একটুখানি জায়গা থেকে ক্রমে এক বিরাট অংশ হল তার অধিকারগত। তারপর তার পরের ইতিহাসও কিছু কম নয়, কত কি ঘটে গেল, আনন্দ-বেদনায় ভরা কত ঘটনার ঘনঘটা বয়ে গেল কিন্তু সেই শূন্যতা আর পূর্ণ হ'ল না। ভগবান সুযোগ প্রত্যেককেই দেন—সুযোগ তিনি বারংবার দেন—সুযোগ তিনি আপনা থেকেই দেন—কাদের দেন? দেন তাদেরই যারা তাঁর দানের মহিমার মর্মোপলব্ধি করতে পারে, যারা তা পারে না তারা তাঁর দেওয়া সুযোগও একবারের বেশী দুবার পায় না। তারা যখন বুঝতে পারে যে বিধাতার ডাক প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে'আমার দুয়ার থেকে, তারা যখন উপলব্ধি করে তাদের চরম অবিমৃষ্যকারিতা। বিধিদত্ত অনুগ্রহের মহিমার [illegible] যখন তারা সমর্থ হয় তখন কিন্তু "[illegible] দেরী হয়ে গেছে" তখন মাথা খুঁড়লেও সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না। আমার নিজের জীবনেতিহাস থেকেই এই অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চিত হল তবে সান্ত্বনা এই যে আমি একা নই—এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমার সঙ্গে আরও অনেক নাম উল্লেখিত হতে পারে তবু, এ সত্ত্বেও আমি এখনও এই কথাই বলব যে অনেক কিছুই তো হল, জগত নানারূপেই আমরা চোখের সামনে ধরা দিল, লাভ-লোকসানের হিসেবটাও তো জমজমাট-তবুও যে সুযোগ আমি হেলায় হারিয়েছি পরে একবার যদি সেই সুযোগ পাই তো ভগবানের সেই আশীর্বাদকে আর আমি ফিরে যেতে দেব না দ্বারপ্রান্ত থেকে, তার আসন হবে আমার শিরোদেশে সেই আশীর্বাদের আলোয় আমি নিজেকে করে তুলব ধন্যা, পূর্ণা, সৌভাগ্যশালিনী।

কিন্তু এই ভুলেরও প্রয়োজন আছে, এরাও তাৎপর্যশূন্য নয়, নয় এরা অর্থবিহীন। এই ভুল করা থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেতে পারি এই ভুলের মধ্যে শিক্ষার বীজ উপ্ত আছে। এই ভুলই মানুষের চোখের সামনে এক নতুন দৃষ্টি মেলে ধরে ভুলের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলবার একটা নতুন রাস্তা দেখতে পায়। বলতে গেলে ভুলই মানুষকে খাঁটি করে তোলে, ধাক্কা খেতে খেতেই তো মানুষ সার সত্যকে খুঁজে পায়, তাই দীর্ঘ চলার পথে এই ভুলের আবেদনও তো কম নয়।

অন্য প্রসঙ্গে চোখ ফেরান যাক। যে সময়ের কথা বলছি—সেই সময় "ফিল্ম ব্যালে" সম্বন্ধে প্রায়শঃই নানা আলোচনায় নিজেকে লিপ্ত রাখতুম, ফিল্ম ব্যালের নানা খুঁটি-নাটি দিক নিয়ে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত থেকেছি, ফিল্ম ব্যালে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছি সর্বসাধারণ্যে। ছায়াছবিতে এই ব্যালের সুযোগ সম্বন্ধে সেদিন যে সব কথা ভেবেছি প্রসঙ্গতঃ তারই একটি সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—

কয়েক বছর আগেও (তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী) ফিল্ম ব্যালে পরীক্ষামূলক হিসেবে গণ্য ছিল—কিন্তু আজ তা সকল পরীক্ষার গণ্ডী সসম্মানে অতিক্রম করে গেছে। ব্যালে শিল্পী—অর্থাৎ যাঁকে ব্যালেরিনা বলা হয় তাঁকে ক্যামেরার সামনে নৃত্যপ্রদর্শনের সময় কতগুলি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে তাঁর সম্মুখভাগ সম্বন্ধে, তাঁর আলঙ্কারিক পরিকল্পনার সম্বন্ধে, তাঁর প্রচলিত ভঙ্গী সম্বন্ধে—এসব বিষয়ে তাঁকে অন্য সময়েও সজাগ থাকতে হবে—অন্য সময় অর্থে মঞ্চের উপর যখন তিনি কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন অর্থাৎ মঞ্চে নৃত্যকলাপ্রদর্শনের সময়ে একজন ব্যালেরিনাকে তাঁর সম্মুখভাগ, আলঙ্কারিক পরিকল্পনা, প্রচলিত ভঙ্গী সম্বন্ধে যতখানি'সচেতন থাকতে হয় তার থেকে তাঁকে ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আরও অনেক বেশী সচেতন থাকতে হয় যখন ছবিতে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছেন। এর প্রধান কারণ যে মঞ্চে তিনি নৃত্য দেখাচ্ছেন উপস্থিত দর্শকদের সামনে এখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর সোজাসুজি যোগাযোগ, এই যোগাযোগ কোন কিছু মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল নয় এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ—ছবির বেলাতেও তাই—দর্শকের সঙ্গেই শিল্পীর যোগাযোগ তবে তফাৎ এই যে—এ যোগাযোগ পরোক্ষ এখানে ক্যামেরা হচ্ছে মাধ্যম—ক্যামেরা অর্থাৎ যন্ত্রে অনেক কিছুরই খুঁটিনাটি অবধি ধরা পড়ে যায়—সেইজন্তে ছবির বেলায় শিল্পীর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ছবির ব্যালে অর্থে অবিরাম ভঙ্গীমা, মঞ্চের ব্যালে

অর্থে স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণের সুযোগ। ছবির ব্যালেতে শিল্পীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সম্ভাবনার চিহ্ন বিদ্যমান, অনেক নতুন নতুন কলাকৌশলের সুযোগ রয়েছে। এই ছবির মাধ্যমে মায়াজাল বিস্তারের সম্ভাবনাও অবিদ্যমান নয়। মঞ্চে কলাকৌশলের মাধ্যমে যতটা মায়াজাল বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে ছবিতে সেই সম্ভাবনা আরও বেশী আরও বলিষ্ঠ, আরও উন্নত। নৃত্যের শ্রেণী-বিভাগ করলে দেখা যায় যে নাচ সাধারণতঃ প্রেমমূলক ধর্মমূলক অথবা দৃশ্যমূলক, মোটামুটি এইভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়, এই পটভূমিকে উপজীব্য করেই নৃত্যাংশ কল্পিত হয়। শিল্পীরা যেন বাকশীল মানুষ প্রজাপতি, সাফল্যের বিজয়োল্লাসের অবিস্মরণীয় মুহূর্তে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা তাদের মধ্যে তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষণ শক্তিরই অর্থান্তর ভূতলে পতনপ্রবণতা। আপন আপন অননুভবনীয় এবং ইচ্ছানুযায়ী গঠনক্ষম শিল্পনৈপুণ্যে দর্শকসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করাই শিল্পীদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, স্বপ্ন। ছন্দের প্রসঙ্গে মন দেওয়া যাক। ছন্দ কোথায় নেই—ছন্দ এমন একটি বস্তু যা কোন সীমিতির বাঁধন মানে না, কোন সীমায়িত গণ্ডীজালে আবদ্ধ নয় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে আটকানো নয়, জীবনের প্রতিটি লয়ে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মে ছন্দ রয়েছে ছন্দকে বাদ দিলে জীবন নিরর্থক, জীবন রূপহীন, জীবন অসার্থক। ছন্দ জীবনের মধ্যে আনে একটা অর্থ, একটা শৃঙ্খলা, একটা সংহতি, ছন্দ জীবনের একটি বিরাট সম্পদ, এদের পারস্পরিক যোগও অপরিহার্য, ছন্দ আর জীবন, জীবন আর ছন্দ—এদের যোগ অঙ্গাঙ্গী। পৃথিবীতে মরদেহে আমরা যা কিছু দেখছি, যা কিছু আমাদের দৃষ্টি সীমার অন্তর্গত যা কিছু আমাদের দৃষ্টির নাগালের ভিতরে সব কিছুর মধ্যেই ছন্দের স্বাক্ষর দেখা যায়, আমাদের চলাফেরা, কথাবলা, নৃত্যগীত সব কিছুর মধ্যেই ছন্দের স্বাক্ষর। আলো, শব্দ, বাতাস, জলধারার বহমানতার মধ্যেও ছন্দের স্পর্শ। ললিতকলার মধ্যে নৃত্যের স্থান, সেখানেও ছন্দের সংযোগ কিছু কম নয়। আমার সাফল্যের মূলে এর অবদানের পরিমাণ কিছু কম নেই। ছন্দে ছন্দেই নাচের গতি এগোতে থাকে। আমার নিজের জীবনেই দেখুন প্রথমে বিভিন্ন মঞ্চে নৃত্যপ্রদর্শন তার পর ছন্দে ছন্দে এগোতে এগোতে এলুম চলচ্চিত্রে. মঞ্চে ঈশ্বরানুগ্রহে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছি, ছবিতেও (আলিবাবা, রাজনর্তকী, কুমকুম দি ডান্সার) জনপ্রিয়তা তো কিছু কম পাই নি।

আমার বিশ্বাস, ফিল্ম ব্যাপের মধ্যে দিয়ে নতুন ধরণের নৃত্যকলার সৃষ্টি হতে পারে এই নৃত্যকলার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রকাশ হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আঙ্গিকে সে দিক দিয়ে এর উন্নতির প্রচুর সুযোগও মিলবে। বর্তমানযুগে ছায়াচিত্রে নাচের সুযোগ প্রচুর, সুযোগ অর্থে ব্যাপ্তির ক্ষেত্রই বোঝাতে চাইছি, সে ক্ষেত্র সবদিক দিয়েই বৃহৎ—"3—D2" এবং সিনেমাস্কোপের কল্যাণে আজ এর সুযোগের কোন অভাব নেই, কোন অসুবিধার আজ একে পড়তে হবে না, হতে হবে না কোন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন। বিগত দিনের তুলনায় আজিকের দিনে ছবির জগতে নৃত্য পরিচালকদের সুযোগ, সুবিধা, প্রয়োজন, গুরুত্ব, মূল্য অনেক-অনেক বেশী। আমার জীবনকে আমি নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছি আমি ডুব দিয়েছি আমার জীবনের গভীর থেকে গভীরে, আমার জীবনরহস্যের সূত্রসন্ধানে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছি, দেখেছি আমার জীবন বাস্তব আর কল্পনার একটা অদ্ভুত সমন্বয়। ভুল মানুষেই করে, মানুষেই তা বুঝতে পারে মানুষেই তা শোধরাবার চেষ্টা করে," ভুল করাটা মানুষের জীবনে স্বাভাবিকই ভুলটা ভুল আর অপরাধটা অপরাধ সুতরাং ভুল মানে অপরাধ নয়, ভুল করাটাও মানুষেরই একটা স্বাভাবিক 'ধর্ম বিশেষ'।

আজকের দিনের শিল্পীদের কলাকুশলীদের কত সুযোগ ছিল ও কত সম্ভাবনা, আমাদের দিনে কোথায় ছিল ও "Dimension" আর কোথায় ছিল সিনেমাস্কোপ শুধু তাই নয় আজ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যা যোগ যার ফলে ভারত নিজেকে নানাভাবে উপকৃত করে তুলতে পারছে, বিশ্বজোড়া সহযোগিতার অর্জনের পথ আজ তার কাছে উন্মুক্ত এ সব সুযোগ সেদিন ছিল কোথায়? আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের প্রগতিবাদী চিত্র নির্মাতারা কেন সুযোগের যথাযথ সদ্ব্যবহার করছেন না। রঙ্গীন কার্টুনের কথা কি একবারও তাঁদের চিন্তায় উদিত হয় না। এ দেশে এখন রঙ্গীন কার্টুন নির্মাণে আপত্তিই বা কি আর বাধাটাই বা কোথায় ওদের দেশে ওয়াল্ট ডিসনী এর পথ প্রদর্শক বলা যায়, সিণ্ডারেল্লা, স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ার্ফস, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি তাঁর অসামান্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে ব্যালের অন্তর্ভুক্তি তিনি ঘটিয়েছেন, আমাদের দেশে যে অজস্র রূপকথা ছড়িয়ে রয়েছে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে সুন্দর রঙ্গীন কার্টুনচিত্র হয় আমাদের দেশে, আমাদের দেশে কাহিনীর অভাব? গল্পের রাজা আমাদের দেশ। এ দেশের গল্প প্রাচুর্য সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে, আমাদের রূপকথার গল্পগুলিকে অবলম্বন করে ব্যালের অন্তর্ভুক্তি সহযোগে আমাদের দেশে রঙ্গীন কার্টুনচিত্র নির্মাণে কেন উদ্যোগী হচ্ছেন না এ দেশের চিত্র নির্মাতার দল? কেন? [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৈলঙ্গস্বামী

তমসাচ্ছন্ন মানবসমাজে আলোর অমৃত বারতা বহন করার জন্যে, দিকভ্রান্ত নরকুলকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে, অন্যায়, অসত্য, অসুন্দরের একাধিপত্য অবসান করে সেইখানে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ভারতবর্ষে যে যুগপুরুষের দল বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন তৈলঙ্গস্বামী তাঁদেরই একজন। ভারতের মহিমা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, স্মরণাতীত যুগ থেকে ঈশ্বরের মানসপুত্রেরা, যুগদেবতারা, পূজ্য সাধকেরা আবির্ভূত হয়েছেন এই ভারতভূমিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে। তাঁদের পুণ্য আবির্ভাবে ধরার ধ্বান্ত হয়েছে মোচিত, দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিতে ভরে গেছে দিকমণ্ডল। পরমপূজ্য তৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় যুগবিধায়কের দিব্যজীবনী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করার জন্যে চিত্রনির্মাতারা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ দাবী করতে পারেন। এ প্রচেষ্টা সাধু এ কথা অনস্বীকার্য। তবে এই মহাপুরুষদের আলোকোজ্জ্বল জীবনকাহিনী যেখানে চলচ্চিত্রের উপজীব্য, চিত্রনির্মাতাদের কর্তব্য কিন্তু সেইখানেই শেষ নয় তাঁদের প্রধান

কর্তব্য যাতে জীবনকাহিনী অবিকৃতভাবে প্রচারিত হয় সে দিকে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য রাখা কিন্তু ছবিটি যখন মুক্তি পেল দেখলুম অনেক উল্টো-পাল্টা, ভ্রমাত্মক তথ্য কাহিনীর মধ্যে পরিবেশিত হয়ে গেছে। কোথাও দেখলুম ঘটনা ঠিক আছে তবে পাত্র বদলে গেছে। জীবনীচিত্র আর ঐতিহাসিক চিত্রের মূলে বা সাধারণ সংজ্ঞায় বলতে গেলে কোন প্রভেদ নেই। অতএব এই সব ঐতিহাসিক চিত্রে ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে তার গুরুত্ব বা মর্যাদা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর এ ছবিগুলি মূলতঃ তথ্যপ্রধান। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর স্ত্রীকে ছবিতে দেখানো হয়েছে—তাঁর পুত্রকন্যার উল্লেখও শোনা গেল অথচ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন যে ত্রৈলঙ্গ বিবাহিত জীবনে কোনদিনই প্রবেশ করেন নি—সংসার বৈরাগ্য তাঁর আজন্ম তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু তিনি তীব্র আপত্তি প্রকাশ করায় সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। শ্রীধরকে এখানে অগ্রজ রূপে দেখানো হয়েছে আসলে শ্রীধর ছিলেন ত্রৈলঙ্গের অনুজ। নর্মদার ঘটনা পুরোপুরি সত্য, মিথ্যার সংস্রব মাত্র নেই কিন্তু এই দুগ্ধ-জলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল কার সঙ্গে? ত্রৈলঙ্গের মত দিব্যপুরুষ ছুটো ভণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন? প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তাঁর সমকক্ষ না হলেও একজন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে সেই সিদ্ধ পুরুষের নাম খাকীবাবা। ত্রৈলঙ্গের মত মহাপুরুষকে ছুটো ভণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করিয়ে তাঁর চরিত্রটিকে যে কতখানি হেয় করা হল তার তুলনা মেলা ভার। ছবির পিছনে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি নেই। এই ছবির সবচেয়ে বড় অভাব উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি, উমাচরণের অনুপস্থিতি ছবিটিকে যে কতখানি শূন্য করে তুলেছে তার ইয়ত্তা মেলে না। ঠাকুরের জীবনে স্বামীজী যেমনই অপরিহার্য ত্রৈলঙ্গের জীবনে উমাচরণও ঠিক তাই, ত্রৈলঙ্গের ভক্ত ছিলেন অসংখ্য কিন্তু দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন মাত্র পাঁচজন। উমাচরণ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তিনকাল মিশির ও সাধক জীবনে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নাম নেন। ইনি ছোট ত্রৈলঙ্গ বলে খ্যাত; তাঁর অসংখ্য মন্ত্রশিষ্য ছিলেন বা আছেন, অনেকে এই দু'জনকে (ত্রৈলঙ্গ এবং ত্রৈলঙ্গ) এক ও অভিন্ন বলে ভেবে থাকেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছিলেন উমাচরণ এ প্রসঙ্গে তার চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নেই। উমাচরণকে ত্রৈলঙ্গের জীবন থেকে কোন রকমে বাদ দেওয়া যায় না; উমাচরণকেই ত্রৈলঙ্গ তাঁর (উমাচরণের) পূর্বজন্ম দেখিয়েছিলেন এবং তা প্রমাণও করে দিয়েছিলেন, উমাচরণের সামনেই ত্রৈলঙ্গ মাতৃমূর্তিকে প্রকট করেছিলেন, দেবীমূর্তি বালিকার রূপ নিয়ে উমাচরণের সামনে এসে দাঁড়াল, উমাচরণ ছুটে গিয়ে দেখলেন বিগ্রহ স্থানে বিগ্রহ নেই বালিকামূর্তি ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে গেল—উমাচরণ আবার গিয়ে দেখলেন বিগ্রহ যথাস্থানেই বর্তমান, গুরুর কাছে মিনতি জানালেন উমাচরণ—বাবা, আজকের এই অলৌকিক ঘটনাকে চিরকালের মত স্মরণীয় করে রাখুন, উমাচরণের অনুরোধে ত্রৈলঙ্গ বললেন,—যা গিয়ে দেখে আয়—শব নেই আর এই মুহূর্ত থেকে তা থাকবেও না, উমাচরণ গিয়ে দেখলেন দেবীমূর্তির পদতলে শব নেই—সেই প্রতিমা আজও শবশূন্য, সেই আশ্রম আজও আছে। আজও আছে সেই শবহীনা বিগ্রহ। বারাণসীর ত্রৈলঙ্গ আশ্রমটির কয়েকটি শট কি দেখানো যেত না? ছবি বিশ্বাসের ও কি রূপসজ্জা হয়েছে? ওই রূপসজ্জা ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী, পুণ্যকল্প ঋষির নয়, ও রূপসজ্জা কুৎসিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির।

ত্রৈলঙ্গ এবং ঠাকুরের যুগপৎ ভূমিকায় অবতরণ করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গুরুর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস পিতা নৃসিংহের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মাতা বিদ্যাবতী, তাঁর সপত্নীর ও কল্পিত ত্রৈলঙ্গজায়া সাবিত্রীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন পদ্মাদেবী, স্বাগতা চক্রবর্তী ও তপতী ঘোষ, বালক ত্রৈলঙ্গের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীমান তিলক। কাশীর রাজদম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মিহির ভট্টাচার্য ও সুনন্দা দেবী, মঙ্গলাদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য। অন্যান্য-অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন গঙ্গাপদ বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস। ম্যালকম, প্রীতি মজুমদার, পরিতোষ রায়, সুশীল দাস, লীলা পাল এবং আরতি দাস প্রভৃতি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন চিত্রসারথী সর্বশেষে এই কথাই আবার বলি যে ইতিহাসাশ্রিত পুণ্যকাহিনীর এ রকম ভ্রমাত্মক এই ধরণের রূপায়ণ সম্ভবপর হতে পারে এ আমরা ভাবতে পারি নি।

সুমিত্রা দেবী, "মিশরকুমারী"-র একটি বিশিষ্ট চরিত্রে ইনি রূপদান করছেন।—আলোকচিত্র দেবেন মিত্র

গরীবের মেয়ে

স্বর্গতা অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে গরীবের মেয়ে অন্যতম, একটি তরুণীর অসাধারণ আত্মত্যাগই এই উপন্যাসের মূল

উপজীব্য। চমৎকার জমাটি গল্প। ছায়াছবির যথেষ্ট উপাদানও এর মধ্যে বিদ্যমান। গল্প যতই ভালো হোক তাতে ছায়াছবির উপযোগী যত উপাদানই থাকুক পরিচালকের পরিচর্যার উপরই নির্ভর করে তার চলচ্চিত্রায়ণের সার্থকতা। উপযুক্ত পরিচর্যার দোষে গল্পের যথাযথ বিকাশ ঘটে না, গরীবের মেয়ের চিত্রায়ণ সম্পর্কে এই আমাদের প্রধান বক্তব্য। গরীবের মেয়েতে সামাজিক পটভূমিকায় একটি তরুণীর অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ছবিটিকে ঘটনার ঘনঘটায় ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাতে গতির আবেগে ভরিয়ে তোলা হয়েছে ঠিকই সে দিক দিয়ে পরিচালক সফল হয়েছেন বলা যায় কিন্তু চরিত্রগুলির দিকে তিনি বোধহয় নজর দেন নি। আমাদের মনে হয় চরিত্রগুলি যেন যথাযথ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি। বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি চরিত্র এখানে মিছিল করে দাঁড়িয়েছে, কোনটিই যেন শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পেল না।

ছবিটিতে কয়েকটি অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ল। সুশীল বলছে সে নীলিমাকে ছোট বোনের মত দেখে আসছে অথচ নীলিমার সঙ্গে সে যে আচরণ করছে তা অগ্রজসুলভ নয় বা প্রণয়ী সুলভ। নীলিমা তার মাতৃবিয়োগের পর যখন জলে ঝাঁপ দিল তখন সেইখানে দাহকারীরাও উপস্থিত, অতগুলো চোখের উপর দিয়ে একটি মেয়ে জলে ঝাঁপ দিল আর সেটা কারোর নজরে পড়ল না। শুভেন্দু বুদ্ধিমান না হলেও নেহাৎ গাধা নয়, যে কাগজটাতে সে শ্বশুরের সই মক্সো করছিল সে কাগজখানাকে সে নষ্ট করে দিল না কেন সাধারণত: আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখানে কি বলে—এসব ক্ষেত্রে ঐ কাগজখানি নষ্ট করে দেওয়ারই কথা আর শুভেন্দুর মত ছেলে সেটিকে সযত্নে উপেক্ষা করে গেল এই বা কি করে হয়, ছবির শেষাংশে সুশীলের যে বিয়ের আসর দেখানো হয়েছে ঐ কি বিপ্রদাসের মত ধনী সম্পন্ন ব্যক্তির মেয়ে এবং ভুবন রায়ের মত ধনী সম্পন্ন ব্যক্তির ছেলের বিবাহ আসর? একটা শুভউৎসবে উপস্থিতের সংখ্যার ও রকম দীনতা বিশেষভাবে চোখে লাগে।

এই ছবিতে অভিনয় করে গেছেন স্বর্গত নট ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। এই ছবিতে তিনি এক অনন্যসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন, তাঁর এই ছবির অভিনয় বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রজগতের গৌরববৃদ্ধিকারক। রূপদক্ষ শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্যের পরেই এ প্রসঙ্গে যাঁর নাম করা যেতে পারে তিনি অনিল চট্টোপাধ্যায়, অভিনন্দন-যোগ্য অভিনয় তিনি প্রদর্শন করলেন। তাঁকে সাধুবাদ। এঁরা ছাড়া ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কার্তিক সরকার, শ্রীমান সুখেন, শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, রেণুকা রায়, লীলা পাল, সাধনা রায়চৌধুরী, কুমারী রূপা প্রভৃতির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন স্বনামধন্য শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ থিয়েটার

সম্প্রতি বিশ্বরূপায় গিরিশ থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে এক ভাবগম্ভীর মনোজ্ঞ পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন স্বামী মুক্তানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করলেন নটপূর্ব শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি গান গেয়ে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক অজিত ঘোষ, এবং আলোকশিল্পী তাপস সেন। গিরিশচন্দ্রের রচনা থেকে আবৃত্তি করেন শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য্য।

ডাউন ট্রেণ গিরিশ থিয়েটারের প্রথম নাট্যোপহার। প্রখ্যাত শিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য অভিনেতা হিসেবে গিরিশ থিয়েটারে যোগদান করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত জাতির নটগুরুর নামাঙ্কিত এই নাট্যশালা জাতীয় সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করুক, এই নাট্যশালার মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধিশালী হোক, এই নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে বাঙলার নাট্যগগনে উদিত হোন প্রতিভার বরপুত্র অনেকানেক নাট্যজ্যোতিষ্ক—গিরিশ থিয়েটারের স্মরণীয় বোধন লগ্নে এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। পরিশেষে এই মহত্তম প্রচেষ্টার জন্যে উদ্যোক্তাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন নিবেদন করি।

আমি কি ভাবি—বেটি ডেভিস

আমাদের মত যেসব মানুষ জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন ছায়াছবি ও মঞ্চের পটভূমিতে, তাঁরা একটু বিরক্তি বোধ করেন স্বতঃই সেই সব সবজান্তা মন্তব্যে যা নবাগত নবাগতারা অকুণ্ঠেই উচ্চারণ করেন, চলচ্চিত্র শিল্পের ভাল মন্দ ইতিকর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে যে

সন্ধ্যা রায়, "পঙ্কতিলক"এর এএকটি বিশেষ ভূমিকায় ইনি অংশ গ্রহণ করছেন।—আলোকচিত্র হেমেন মিত্র

সম্বন্ধে তাঁদের বলতে গেলে কোন পরিষ্কার ধারণাই হয়ে ওঠেনি তখন পর্যন্ত।

যে পর্যন্ত না নিজেদের মতকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার মত অভিজ্ঞতা তাঁদের অর্জিত হচ্ছে অন্ততঃ সেই সময়টুকু অবধি তাঁরা একটু কম মুখর হলেই মঙ্গল, ব্যক্তিগতভাবে এইসব বালখিল্য সমালোচকদের সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই।

যতক্ষণ না অযোগ্যতা বা অকর্মণ্যতার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সামনে আসে ততক্ষণ অবধি প্রযোজক পরিচালক, নাট্যরূপকার ও আলোকচিত্রীর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ পোষণ করা অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পক্ষে শোভন নয়।

অভিজ্ঞ কর্মী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমার স্মৃতিতে জেগে উঠছে বহুপূর্ব্বের ফেলে আসা কয়েকটি দিনের কথা যখন আমি আলেক্ গায়েনেশের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রোডাক্‌সান, এম্-জি-এম্ এর "দি স্কেপগোট" ছবির জন্যে কাজ করেছিলাম। বহুদিন ধরে আমি বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি সাধারণ ভাবে ও আলেকের নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষভাবে কৌতূহলী ছিলাম, বিখ্যাত চিত্র "দি ব্রিজ অন্ দি রিভার কোয়াই" এর জন্য যখন তিনি "অস্কার" পুরস্কার পান যা তাঁর যোগ্যতারই এক স্বীকৃতি মাত্র, অন্য অনেকের মতই আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দনে নন্দিত করি অকুণ্ঠে।

আমেরিকার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্পে ও অন্যান্য মহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সম্বন্ধে অভিমত যে কি তাও জানবার জন্য আগ্রহী হন অনেকে; এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল না কারণ দেশ কাল পাত্র ভেদে এই শিল্পের মূলরীতির যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে তা আমার মনে হয় না, অভিনয় শিল্পের মূল কথাটা সর্ব্বত্রই এক।

চলচ্চিত্র জগতে অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয় প্রতিক্ষণে, নতুন নতুন সহকর্মীদের সান্নিধ্যে প্রতিমুহূর্তে শিল্পী নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন নিজের শিল্পকৃতিকে।—

পরিচালক ও আলোক চিত্রীর নির্দেশ মেনেও ক্যামেরার সামনে সর্বদাই আমি নিজের গতিবিধিকে খানিকটা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করেছি যাতে অভিনীত চরিত্রটির মধ্যে আসে ব্যক্তিত্ব ও জীবন।—

চরিত্রটিকে সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখলে তবেই তাতে প্রাণ আরোপ করা শিল্পীর পক্ষে সম্ভব, ব্যক্তিগত জীবনে আমি সর্বদাই এই মতের পরিপোষণ করি, নিজের অভিনয়েও এই ধারা আমি বজায় রাখতে চেয়েছি বরাবর সফল হয়েছি কিনা সে বিচার আমার নয়, শুধু আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা কখনও এইটুকুই বলতে পারি জোর গলায়।

এ প্রশ্নও আজ উঠেছে যে অভিনয় শিল্পের জগতে টেলিভিসনের কি ধরণের ভূমিকা এই শিল্পে T. Vর কি কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় অবদান আছে?

আমার মনে হয় আছে, শিল্প জগৎ ও টেলিভিসন পারস্পরিক উন্নতির পথে পরস্পরের সহায়, উভয়ের কাছে উভয়েরই অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।

কাজেই চলচ্চিত্র শিল্প ও T.Vর মিতালী যে তাদের যুক্ত ভাবে নিয়ে যাবে উন্নতির ও সাফল্যের পথে এ আশা বোধহয় দুরাশা নয়।

সব শেষে একটা কথা মনে করিয়ে দিই; T.V,-তেই হোক, পর্দায়ই হোক বা মঞ্চের মাধ্যমেই হোক আমরা দর্শক-কে কি দিচ্ছি সেটাই প্রধান—কিভাবে দিচ্ছি সেটা নয়।

সংবাদবিচিত্রা

দেবী চৌধুরাণীর পরিচালক : সত্যজিৎ রায় নন

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনা দেবী চৌধুরাণী এগারো-বারো বছর আগে একবার চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল যে প্রেম আঢ্যের প্রযোজনায় দেবী চৌধুরাণী আবার নতুন করে চলচ্চিত্রায়িত হবে এবং এই পুনঃ চলচ্চিত্রায়ণের বিশেষ আকর্ষণ যে পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা দেবেন সত্যজিত রায়। বর্ত্তমানে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এই সংকল্প বর্জিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ যে এঁরা জানতেন না যে দেবী চৌধুরাণীর চিত্রায়ণে অনেক আগেই আত্মনিয়োগ করেছেন শ্রীবি, এল, খেমকা এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় যথাযথ স্বত্বাদিও তিনি অধিকারভুক্ত করেছেন।

দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে ছায়াচিত্র : মহারাষ্ট্র সরকারের উদ্যম।

মহারাষ্ট্র সরকারের প্রচারবিভাগ দৃষ্টিহীনদের সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এই এক রীলের ছবিটির পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীশিবদাসানীর উপর, তিনি বলেছেন যে দৃষ্টিহারাদের জন্যে করুণাভিক্ষা করা এই চলচ্চিত্রায়ণের উদ্দেশ্য নয়, তারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত হলেও অকর্মণ্য নয় এ বিষয়ে সর্বসাধারণকে অবহিত করাই এই চিত্রনির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারত-পাক মিলিত উদ্যম

ভারতীয় চিত্র প্রযোজক বক্সী জং বাহাদুর এবং পাকিস্তানীয় চিত্র প্রযোজক মহম্মদ ইসাক মিলিত হয়ে একটি চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এঁরা একটি পাঞ্জাবী ছবির নির্মাণকার্যে রত, স্থির হয়েছে যে কাহিনী, গান, সঙ্গীত পরিচালনার ভার ভারতীয় প্রযোজককে গ্রহণ করতে হবে, কিছুসংখ্যক শিল্পীও তাঁকে সরবরাহ করতে হবে। প্রধান ভূমিকায় একজন ভারতীয় অভিনেত্রী আত্মপ্রকাশ করবেন।

রোম্যান নোভারোর পুনরাবির্ভাব

কাল আমলের হলিউডের সবচেয়ে বিস্ময়কর আনন্দ সংবাদ হচ্ছে রোম্যান নোভারোর পুনরাবির্ভাব। দীর্ঘকাল পরে রোম্যান নোভারো আবার ছবির জগতে ফিরে এলেন পৃথিবীর চিত্রামোদীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দজনক সংবাদ আর কি থাকতে পারে। হেলার ইন পিঙ্ক টাইটস নামক ছবিটির মাধ্যমে দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁর অভিনয় দেখা যাবে। এঁর সঙ্গে এই ছবিতে সোফিয়া লোরেনও অভিনয় করছেন। সে যুগে রোম্যান নোভারো ছিলেন স্বপ্ন, জনপ্রিয়তার উচ্চতম শীর্ষে ছিলেন সমাসীন, সারা বিশ্ব জুড়ে ছিল

তাঁর অনুরাগী গুণগ্রাহীর দল। ১১১১ সালে অর্থাৎ আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে 'দি গোট' নামক চিত্রের কল্যাণে তাঁর খ্যাতি দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'দি প্রিসনার অফ জেণ্ডা' 'ক্যারামুস' 'রোড টু রোমান্স' প্রভৃতি তদানীন্তন নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয় প্রতিভা স্বাক্ষরিত হয়ে আছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

তিপ্পান্ন বছর বয়স্কা বেটি ডেভিস এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক গ্যারি মিলারের বিবাহ বন্ধন সম্প্রতি ছিন্ন হয়েছে। এই বিবাহ বন্ধন কয়েক বছর স্থায়ী হয়েছিল। আজকের দিনের হলিউডের অভিনেত্রী কুলের প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা আসন পাবার যোগ্যতা রাখেন শ্রীমতী ডেভিস তাঁদেরই অন্যতমা।

শুভ-পরিণয়

সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী জিনি টিয়ার্নি প্রসিদ্ধ তৈল ব্যবসায়ী উইলিয়ম হাওয়ার্ড লীর সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন। লী ইতিপূর্বে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী হেডি লামারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কাউণ্ট অলেগ কাসিনী হচ্ছেন জিনির প্রথম স্বামী। সম্প্রতি মৃত প্রিন্স আলী খাঁর সঙ্গেও এব গভীর প্রণয়ের কথা সুবিদিত। লীর বয়েস বর্তমানে বাহান্ন আর জিনির একচল্লিশ।

ড্যানি কে ও জেফ স্যাণ্ডলার : আরব দেশসমূহে প্রবেশ নিষিদ্ধ

আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় ড্যানি কে এবং জেফ স্যাণ্ডলারের সম্পর্কে যথেষ্ট তিক্ত হয়ে উঠেছে। আবর রাষ্ট্রে এঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্যেই না কি আরব সরকার এই নীতি অবলম্বন করেছেন।

ম্যাণ্ডলারের আসনে গোল্ডষ্টেন

টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের প্রধান কর্ণধার বাডি ম্যাণ্ডলার সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন রবার্ট গোল্ডষ্টেন। চলচ্চিত্র জগতে ইনিও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। দীর্ঘকাল ধরে ইনিও নানা ভাবে চলচ্চিত্রের সেবা করে আসছেন।

ছুরিকাঘাতের অপরাধে লেখিকা কারারুদ্ধা

চিত্রকাহিনী রচয়িত্রী মিস য়্যানি বারনেবী (৩৮) কে লেফটানেণ্ট কর্ণেল ওয়াল্টার স্প্যারোকে ছুরিকাঘাত করার অপরাধে এক বছরের জন্যে শ্রীঘরে পাঠানো হয়েছে। স্প্যারো হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের রাণী-মাতা এলিজাবেথের সম্পর্কিত ভ্রাতা।

প্যারাস্যুটের বিশ্বাসঘাতকতা : তরুণী শিল্পী অকালে নিহত

প্যারাস্যুটও বিশ্বাসঘাতকতা করল আর তারই ফলে মাত্র ২৮ বছর বয়সেই করুণ ভাবে প্রাণ হারাতে হল ক্লডেট ত্রিগিলনকে। "ব্যাবেটি গোস টু ওয়ার'এ ইনি অভিনয় করছিলেন, তাতে প্যারাস্যুটে অবতরণের দৃশ্য ছিল ঐ দৃশ্যের মহড়া দেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটল, লাফ দেওয়ার পর দেখা গেল প্যারাস্যুট খুলল না, ফলে একটি সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে হল। মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে এই সব কাজের আগে জিনিষগুলি কেন ভাল করে পরীক্ষা করা হ'ল না? এই করুণ ঘটনায় ভবিষ্যতে যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহল বত্নবান হলেই আমরা সুখী হব।

সেখানে আছে সুন্দর মাঠ

Iolo Aneurin Williams-এর 'There are sweet fields'

পাহাড়গুলির নীচে আছে
সুন্দর মাঠগুলি ;
জীবন সেখানে মুখর-আনন্দে প্রবাহিত
যেন ছোট-ছোট ঝর্ণা।

সূর্য সেখানে ভুলে যায়
প্রখর উত্তাপ,
আর উঁচুতে স্থিতি-শীল পাথরগুলোর মাথা থেকে
বাতাস (সেখানে) কখনো প্রবল জোরে নামে না

প্রবীণ ব্যক্তির এই গান
সেখানে একান্ত উপযুক্ত :
তার যৌবন অনেক বলিষ্ঠ ছিল,
কিন্তু বলিষ্ঠ-যৌবনের বহু পুরোনো প্রণয়
তাকে আর ব্যথা দেয় না।

—মনোময় চক্রবর্তী।

মোহনবাগানের নূতন অধ্যায় রচনা

একবার নয়, দু'বার নয়—নয় বার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ বিজয় করে ভারতীয় ফুটবলে নতুন ইতিহাস স্রষ্টা বাঙ্গালা তথা ভারতের জনপ্রিয় দল মোহনবাগান তাঁদের ক্লাবের ইতিহাসে আরও একটা নতুন সাফল্য সংযোজন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর পূর্ব্বে ভারতীয় দল হিসাবে এক মাত্র মহমেডান স্পোর্টিংই এই কৃতিত্বের অধিকারী ছিল।

মোহনবাগান শেষ খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে দুই গোলে পরাজিত করে। শেষ খেলায় দুই পয়েন্ট পেলেই লীগ বিজয়ের কৃতিত্ব লাভ করবে, আর এক পয়েন্ট অপচয়ে লীগ বিজয়ের পথে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় খেলা দেখার জন্য মাঠে অভূতপূর্ব্ব দর্শক-সমাগম হয়। এই দিনকার দর্শক-সমাগম বর্ত্তমান মরশুমের বহু বড় বড় খেলাকে হার মানিয়েছে। দলের সভ্য ও সমর্থকদের ভেতর এই দিন উৎসাহ ও উদ্দীপনার বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। লীগ বিজয়ের সুনিশ্চিত ধারণা নিয়েই সমর্থকরা আনন্দোৎসবের জন্য নানা রকম আতসবাজী, বেলুন, প্রচারপত্র, কাঁসর-ঘণ্টা নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু এক মাত্র গোললাভের আশায় সভ্য এবং সমর্থকদের উৎকণ্ঠিত চিত্তে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে যে মুহূর্ত্তে মোহনবাগান গোল করে তার সাথে সাথেই হাজার হাজার কণ্ঠের হর্ষনিনাদে ময়দানের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। মোহনবাগানের প্রথম গোলের সঙ্গে সঙ্গেই একজন অত্যুৎসাহী কিশোর দর্শক আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মাঠের অভ্যন্তরে ছুটে গিয়ে গোলদাতা সুনীল নন্দীকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, খেলা শেষে অগণিত দর্শক মাঠের ভেতর এসে দলের খেলোয়াড়দের পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ক্যালকাটা মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ক্যালকাটা মাঠ থেকে খেলোয়াড়দের শোভাযাত্রা করে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়।

নিজ দলের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা অস্বাভাবিক নয়। 'তবে কোন দলকেই অন্ধ ভাবে সমর্থনের কোন সার্থকতা'আছে বলে মনে হয় না। জনপ্রিয় দলগুলির সমর্থকরা সময় সময় উৎসাহের আতিশয্যে মাঠে অশোভনীয় আচরণ করেন, এটাই দুঃখের বিষয়।

১৯১১ সালে ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শীল্ড বিজয়ী ভারতীয় ফুটবলে ইতিহাস রচনাকারী মোহনবাগান ক্লাবের সাফল্যে বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করবে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে সকলেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন, তা বলাই বাহুল্য।

মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের তালিকা

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	পঃ
১৯৩৫	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮
১৯৬০	২৮	২২	৫	১	৬১	১০	৪৯

আই-এফ-এর বদান্যতা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে আই, এফ, এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্তরায় খেলাধূলার প্রচার ও প্রসারের বিভিন্ন খাতে আই, এফ, এ-র তরফ থেকে আর্থিক সাহায্যের এক ফিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই আই, এফ, এ বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এই সকল সাহায্যের ভেতর রাজ্যপালের টি, বি, আফটার কেয়ার কলোনীর প্রতিষ্ঠাকল্পে ৭৩০০০৲ টাকা আর জি কর মেডিকেল কলেজে ৫০,০০০৲ টাকা এবং জন এণ্ডারসন ক্যাজুয়েলটি ব্লকে ২০,০০০৲ টাকা সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গত বছর আসামের বন্যার্ত্তদের জন্য ১০,০০০৲ টাকা আই, এফ, এ দান করেছিল। এবারও আসামের দাঙ্গাহাঙ্গামায় দুঃস্থদের আই, এফ, এ'র তরফ থেকে ১৫০০০৲ টাকা সাহায্য করা হয়েছে। শ্রীদত্তরায় এই সকল সাহায্য প্রসঙ্গে কলকাতার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের অকৃপণ সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রী দত্তরায় সাহায্যের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন সকলেই তাতে আই, এফ, এ'কে সাধুবাদ জানাবেন। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে প্রতি বছর আই, এফ, এ চ্যারিটি খেলা বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু এই টাকার মোটা অংশ আই, এফ, এর বেতনভুক সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায়কে পুষতে ব্যয় করতে হয়। চ্যারিটি খেলার অর্থব্যয় করে মোটা মাইনের সম্পাদক পোষার কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। প্রতি বছর চ্যারিটি খেলার সংগৃহীত অর্থ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আই, এফ, এ'র তরফ থেকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, এমন সব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হয় যাদের মোটেই সাহায্য পাওয়া উচিত নয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান কেবল সাহায্য পেয়ে থাকে আই, এফ, এর সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায়ের অনুগ্রহে।

আই, এফ, এর চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ বণ্টনের একটা তদন্ত হওয়া দরকার, ক্রীড়ামোদীদের এই দাবী করাটা অন্যায় হবে না।

ভারতীয় অলিম্পিক ফুটবল দল গঠিত

রোম অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৮জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। আর একজন খেলোয়াড় যাতে অন্তর্ভুক্ত হন তার জন্য চেষ্টা চলছে। ২৪ বছর বয়স্ক বাঙ্গালার খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। ১৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাঙ্গালা থেকে সর্ব্বাধিক আট জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। বোম্বাই থেকে পাঁচজন, অন্ধ্র থেকে তিনজন এবং সার্ভিসেস ও মাদ্রাজ থেকে একজন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন।

গত অলিম্পিকে যোগদানকারী ছয়জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, এ পর্য্যন্ত যতগুলি অলিম্পিক দল প্রেরণ করা হয়েছে তাহা অপেক্ষা এবারকার দলটি সর্ব্বাধিক তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ২৩ বছর। ভারতীয় দলের সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক খেলোয়াড় বাঙ্গালার কেম্পিয়া। তাঁর বর্ত্তমান বয়স ২৭ বছর। আর সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ খেলোয়াড় অন্ধ্র প্রদেশের সেণ্টার ফরওয়ার্ড হামিদ। তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। অলিম্পিকে প্রাথমিক পর্য্যায়ের ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জাকার্ত্তা ও কলকাতায় যোগদানকারী খেলোয়াড় অন্ধ্রের কালিম ও বাঙ্গালার রহমানের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালার অরুণ ঘোষ ও বোম্বাইয়ের ফ্রাঙ্কোকে দলভুক্ত করা হয়েছে।

তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে অরুণ ঘোষের অন্তর্ভুক্তিকে সকলেই স্বাগত জানাবেন। কিন্তু বাঙ্গালার রহমান ও অন্ধ্রের কালিম বাদ পড়ায় সকলেই বিস্ময় অনুভব করেন। দলীয় রাজনীতির কবলে তাঁরা পড়েছেন বলে অনেকেই অভিযোগ করছেন। তা না হলে বোম্বাইয়ের ফ্রাঙ্কো ও অন্ধ্রের হাকিমের দলে স্থান লাভের কি স্বার্থকতা আছে?

যাহা হউক' ভারতীয় খেলোয়াড়রা উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক এটাই সকলে চান। নিম্নে ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম দেওয়া হ'লো :—

গোল—থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ (বোম্বাই)।

ব্যাক—চন্দ্রশেখর (বোম্বাই), লতিফ (বোম্বাই), ও অরুণ ঘোষ (বাঙ্গালা)। হাফ—ফ্রাঙ্কো (বোম্বাই), কেম্পিয়া (বাঙ্গালা), রামবাহাদুর (বাঙ্গালা) ও হাকিম (অন্ধ্র)।

ইনসাইড—জার্ণেল সিং (বাঙ্গালা) ও ইউসুফ খাঁ (অন্ধ্র)।

ফরওয়ার্ড—পি, কে, ব্যানার্জী (বাঙ্গালা) অধিনায়ক, চুনী গোস্বামী (বাঙ্গালা), বলরাম (বাঙ্গালা), সিমন সুন্দররাজ (মাদ্রাজ) দেবদাস (বোম্বাই) ও হামিদ (অন্ধ্র)।

১৯তম খেলোয়াড়—ক্যাপ্টেন লাহিড়ী (সার্ভিসেস)।

ষ্টাণ্ডবাই—গোল—এস শেঠ (বাঙ্গালা)।

ব্যাক—মাধবন (মহীশূর)।

ষ্টপার—কালিম (অন্ধ্র)।

ফরওয়ার্ড—রহমাতুল্লা (বাঙ্গালা) ও কানাইয়ান (বাঙ্গালা)।

আই, এফ, এ, শীল্ড প্রতিযোগিতা

ভারতের প্রাচীন ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা ২৪শে আগষ্ট থেকে আরম্ভ হবে এবং সম্ভব হলে ২১শে সেপ্টেম্বর ফাইন্যাল খেলা হবে বলে স্থির হয়েছে। এ বছর আটটি বহিরাগত দল নিয়ে চৌত্রিশটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

আই, এফ, এ, শীল্ডে যোগদান একদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানের দলগুলির একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আই, এফ, এ, কর্ত্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আটটির বেশী বহিরাগত দল যোগাড় করতে পারেন নি। এই আটটি দলের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি দল—মহীশূর একাদশ, টাটা স্পোর্টস ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান নেভীর সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি আছে। আর বাকি পাঁচটি দল—ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্লাব, কটক সম্মিলিত দল, আম্বালা জেলা একাদশ, দিল্লী একাদশ ও পাটনা এথেলেটিক এসোসিয়েশন এদের খুব বেশী খ্যাতি আছে বলে মনে হয় না। স্থানীয় দলের মধ্যে ছয়টি গ্রীয়ার, পোর্ট কমিশনার্স, বাটা, ভবানীপুর, ক্যালকাটা ও ড্যালহৌসী—এরা দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে খেলে। জেলা দলগুলির মধ্যে তিনটি দল—বর্দ্ধমান (বনবিহারী জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন), হাওড়া ও ২৪ পরগণা আছে। এই দলগুলি বিশেষ শক্তিশালী তা বলা
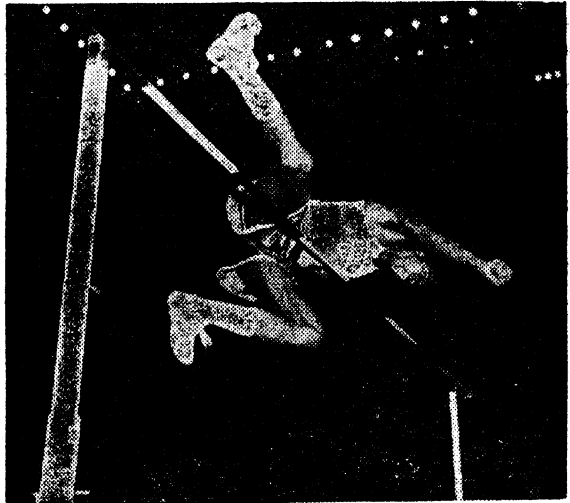
চ্যাম্পিয়ান হাই-জাম্পার—বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাই-জাম্পার ১৮ বৎসর বয়স্ক জন টমাস। ইনি রোমে অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করছেন।

চলে না, সুতরাং আই, এফ, এ, শীল্ড বিজয়ের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবারও স্থানীয় দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

গত বছরের অসমাপ্ত আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যালের দু'টি দল—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলকে তালিকার দুই প্রান্তে রাখা হয়েছে। মোহনবাগানের দিকে তৃতীয় রাউণ্ডে রাখা হয়েছে লীগ "রানার্স আপ" মহামেডান স্পোর্টিং, মহীশূর রাজ্য একাদশ ও বোম্বাই টাটা স্পোর্টস ক্লাব। এই চারটি দল বাই পেয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে আছে। তালিকার অপর দিকে ইষ্টবেঙ্গল। ইণ্ডিয়ান নেভী ও ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল আছে। এই তিনটি দলও তৃতীয় রাউণ্ডে প্রথম খেলবে।

আই, এফ, এ, এ'র সম্পাদক শ্রীএম, দত্তরায় খেলার ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত সম্পর্কে বলেছেন যে "ব্যালট" প্রথায় ইহা করা হয়েছে। খেলার তালিকায় মোহনবাগান ও মহমেডান দলকে একই দিকে দেওয়ার ফলে আই, এফ, এ, সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায় এবং টুর্ণামেন্ট কমিটির অনেক সদস্যের ভেতর তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছে বলে প্রকাশ। "ব্যালট" প্রথার গোপনীয়তা যে ছিলো না তা এই বাক্‌বিতণ্ডা থেকে উপলব্ধি করা যায়। "ব্যালট" প্রথাতেই যদি ক্রীড়াসূচী প্রস্তুত হয়ে থাকে—তা হ'লে কোন দল কোন দিকে থাকবে—এই নিয়ে মতবিরোধ কেন? ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা ব্যাপারে এত সব কারসাজি করা হয়ে থাকে—যার ফলে আজ কোন নামকরা দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। যাহা হউক, প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব ঐতিহ্য আবার ফিরে আসুক—এটাই ক্রীড়ামোদী মাত্রেই আশা করেন।

আর একবার ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেছেন যে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর কলকাতার ময়দানে ষ্টেডিয়ামের জন্য আরও ১০ একর জমি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। পূর্ব্বে তাঁরা ১৩ একর জমি দিয়েছিলেন। এই ১৩ একরের মধ্যে ষ্টেডিয়াম হবে। বাকিটায় রাস্তাঘাট হবে ও গাড়ী রাখার ব্যবস্থা হবে। ডাঃ রায় আরও বলেছেন যে, রোমের যে স্থপতি ষ্টেডিয়ামের নক্সাটি করবেন তার কমিশনের দেয় অর্থের জন্য ভারত সরকার বিনিময় মুদ্রার ব্যবস্থা করতেও সম্মত হয়েছেন। এই ষ্টেডিয়াম করতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই টাকার শতকরা দু'ভাগ রোমের স্থপতিকে কমিশন হিসাবে দিতে হবে। তিনি পর্য্যায়ক্রমে তাঁর যে নক্সা পাঠাবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা বিবেচনা করে তাঁকে জানাবেন। ডাঃ রায় আশা প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে এবং কাজ শেষ হতে আঠার মাস সময় লাগবে।

প্রকাশ যে, মোহনবাগান মাঠেও একটি ষ্টেডিয়ামের জন্য নক্সা প্রস্তুত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রোমের স্থপতিকে বলেছেন। ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ষ্টেডিয়ামের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

খবরগুলি বেশ মুখরোচক ও গালভরা। কলকাতার ষ্টেডিয়াম নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বাঙ্গালা দেশের সব ব্যাপারই অদ্ভুত! ভারত সরকারের বড় বড় উন্নয়ন কার্য্য হচ্ছে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিরাই সকল কার্য করছেন। বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে—"ছেলে ধরতে পারে না—তো কেউটে ধরবার সখ" কলকাতার ষ্টেডিয়ামের নক্সা করার মতন ভারতে স্থপতি পাওয়া গেল না? তাই বহু অর্থ ব্যয় করে রোমের স্থপতিকে আমদানী করতে হ'লো? বাঙ্গালা দেশের সব কাজেই বাড়াবাড়ি। তা না হলে কলকাতায় ষ্টেডিয়াম হ'লো না। ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামের যাও বা সূত্রপাত হলো তাও "আধাখিচুড়ির" মতন রয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম না হলেও কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে "ইলেকট্রিক স্কোরবোর্ড" তৈরী হয়েছে। তাজ্জব বাঙ্গালা দেশ।

মিলখা সিং-এর কৃতিত্ব

রোম অলিম্পিকে ভারতের একমাত্র ভরসা খ্যাতনামা দৌড়বীর মিলখা সিং অলিম্পিকের পূর্ব্বে সম্প্রতি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক এথেলেটিক প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার দৌড় ৪৫.৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি ফ্রান্সের আবডু সেই ও জ্যামাইকার মেল স্পোজকে পরাভূত করার যোগ্যতা লাভ করেন। আবডু সেই ৪৬.১ এবং মেল স্পোজ ৪৭.৫ সেকেণ্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিলখা সিং গত সপ্তাহে গ্লাসগো রেঞ্জার্সের এক প্রতিযোগিতায় ৪৬.৩ সেকেণ্ডে ৪৪০ গজ অতিক্রম করে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এই প্রতিযোগিতায় মিলখা সিং 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তিন জন দৌড়বীরকে পরাভূত করেন।

মিলখা সিং-এর এই সাফল্যে ভারতবাসী মাত্রেই আসন্ন রোম অলিম্পিকে তাঁর পারদর্শিতা সম্পর্কে আশাবাদী। মিলখা সিং ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক, ইহাই সকলে আশা করেন।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দু'টি আদিবাসী কিশোরীর আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হইল। আলোকচিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীঅজয় ঘোষ।

LIFEBUOY

শ্রাবণ, ১৩৬৭ (জুলাই—আগষ্ট, '৬০)

অন্তর্দেশীয় —

১লা শ্রাবণ (১৭ই জুলাই): আসামের উপদ্রুত এলাকা সফরকালে গৌহাটিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—সাম্প্রতিক হাঙ্গামা ও গোলযোগ (বাঙালী-বিরোধী) আসামের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে।

২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): আসামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের দাবীতে জনসংঘের উদ্যোগে সত্যাগ্রহ—দমদম বিমান ঘাঁটিতে দশ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার।

৩রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই): ধর্মঘটকারী দশ হাজার বাঙালী কর্মচারীর (কেন্দ্রীয় সরকার) উপর ছাঁটাই-এর খড়গাঘাত।

৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): দাঙ্গা বিধ্বস্ত আসাম রাজ্য সফরান্তে দিল্লী ফিরিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ফতোয়া—আসামের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ, উদ্বাস্তুরা ফিরিয়া যাইতে পারেন।

৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত—আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৩৩.৫ ও আই-এস-সিতে ৪৮.৭ জন উত্তীর্ণ।

৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): ধর্মঘটী কর্মচারীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাস্তিদানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ—বিভাগীয় প্রধানদের প্রতি আবশ্যক কার্য্যক্রম গ্রহণের অধিকার প্রদান।

আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. পি. চালিহার এক মাসের জন্য ছুটি গ্রহণ—অর্থসচিব মিঃ ফকরুদ্দীন আলি আমেদের উপর মন্ত্রিসভার সর্বাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত।

৭ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই): আসামের গ্রামাঞ্চলে বাঙালীদের গৃহে লুঠতরাজ, অত্যাচার ও অগ্নি-সংযোগ অব্যাহত।

৮ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই): "আসাম রাজ্যের বহু স্থলে এখনও বিক্ষিপ্ত আক্রমণ চলিতেছে"—দমদম বিমান ঘাঁটিতে সাংবাদিকদের নিকট আসাম রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশের স্বীকৃতি।

৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর-সমূহে দুর্নীতি ও দৌরাত্ম্যের রাজত্ব—ধর্মঘটে যোগদানকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অফিসারগণ কর্তৃক লব্ধ বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): আসাম হইতে বাঙালী বিতাড়নের ফলে পশ্চিমবঙ্গে জটিল সমস্যার উদ্ভব—সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তুতি।

১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই): আসামে বাঙালীদের উপর নারকীয় অত্যাচার অব্যাহত—ডিব্রুগড়ের সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে মারপিট, লুঠতরাজ ও গৃহদাহের সংবাদ।

১২ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই): 'আসামে বাঙালী নিধন-যজ্ঞের প্রধান উদ্যোক্তা আসামের প্রজাসমাজতন্ত্রী দল'—সর্ব্ব ভারতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি শ্রীএন্‌. সি. চ্যাটার্জ্জীর নিকট লিখিত পত্রে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৩ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আলোচনা।

আসামের গৃহহারাদের জন্য অবিলম্বে পুনর্ব্বাসন দাবী—'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন প্রসঙ্গে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব।

মোহনবাগান দল কর্তৃক নবমবার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন।

১৪ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই): স্বতন্ত্র নাগা অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি—দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত নাগা নেতৃবৃন্দের আলোচনার জের।

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): কুচবিহারের (পশ্চিমবঙ্গ) পথে আসামের হৃত সর্বস্ব শত শত উদ্বাস্তুর মিছিল—পতিত ৪০ হাজার বাঙালী রেল কর্মচারীর আসাম হইতে বদলীর আবেদন।

১৬ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট): লোকসভায় আসাম সম্পর্কিত মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের দাবী স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার কর্তৃক নাকচ।

১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বেতন কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি গ্রহণের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাইর ঘোষণা।

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): "এ যাবৎ আসাম হইতে বিতাড়িত ১৩ সহস্রাধিক বাঙালী উদ্বাস্তু নরনারীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন"—রাইটার্স বিল্ডিংস-এ সাংবাদিকদের নিকট পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও ত্রাণ সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

১৯শে শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট): কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-ধর্মঘট—ছাত্র ভর্তি ও প্রাক্‌ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সমস্যা সমাধানের কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি।

২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট): কলিকাতা ও কালিম্পং-এর দশজন চীনার প্রতি এক মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগের নির্দ্দেশ—চীনের (কম্যুনিষ্ট) পক্ষে ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ।

২১শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট): আসাম সফরান্তে কলিকাতায় ভারতীয় জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বিবৃতি—তিন দিন আসাম উপত্যকায় সরকারের অস্তিত্ব ছিল না।

২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): শিলং-এ বাঙালী আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে কেন্দ্রীয় আইন-সচিব শ্রীঅশোক সেনের অপূর্ব্ব ঘোষণা—'পশ্চিমবঙ্গে যাইতে চাহিলে কোন সাহায্য করিব না।'

আসামী বর্ব্বরতার প্রতীকার না করায় সরকারের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন—আসাম দিবসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বিরাট সম্মেলনে দৃঢ় সঙ্কল্প অভিব্যক্ত।

২৩শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট): অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণার ব্যবস্থা—লোকসভায় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

৩৫ জন নিহত, ৫ জন নারী ধর্ষিত ও ১০৩১টি বাড়ী বিধ্বস্ত—আসামের বাঙালী বিরোধী হাঙ্গামা সম্পর্কে শিলং-এ সাংবাদিক বৈঠকে আসামের অর্থসচিব মিঃ ফকরুদ্দীনের হিসাব পেশ।

২৪শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট): বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম্মঘট শুধু অযৌক্তিক নয়, অগণতান্ত্রিক—লোকসভায় সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট): আসামের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা রাজভবনে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বাতিল—রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সিদ্ধান্ত।

২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট): আসামের রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না—দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর স্পষ্টোক্তি।

শ্রী এ, পি, জৈনের নেতৃত্বে সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সাত দিবসব্যাপী আসাম সফর সুরু।

২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট): ঠাকুর পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতিনিধি স্বনামধন্যা সাহিত্যিক দেশিকোত্তমা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর (৮৭) শান্তিনিকেতনে জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

২৮শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট): আসামে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সেনাবাহিনীর হস্তে অর্পণের দাবী—ভারত মহিলা সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রস্তাব।

২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট): "কংগ্রেসের হাতে সংবিধানের শুচিতা বিনষ্ট হইয়াছে"—স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রী কে, এম্ মুন্সী।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): বিক্ষুব্ধ বাংলায় (কলিকাতা সহ) ১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনতা দিবস) শোকদিবস হিসাবে পালন—আসামে বাঙালী নির্য্যাতন ও কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ।

আসামের ধুবড়ী সহরে আবার হাঙ্গামা—বাঙালীদের শান্তিপূর্ণ সভার পর ইতস্ততঃ ছুরিকাঘাত ও মারপিট।

৩১শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট): রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে বিমান বাহিনীর দুই জন অফিসার বরখাস্ত—রাজ্যসভায় দেশরক্ষা-সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৭ই জুলাই): রাষ্ট্রসঙ্ঘ ফৌজ কর্ত্তৃক বেলজিয়ান বাহিনীর নিকট হইতে লিওপোল্ডভিলের (কঙ্গো) প্রজাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ।

২রা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই): জাপ ডায়েটের অতিরিক্ত অধিবেশনে মিঃ হায়াতো ইকেদা নূতন প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত।

কঙ্গো হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ দাবী—রাষ্ট্রসঙ্ঘে সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুলুম্বার চরমপত্র।

৪ঠা শ্রাবণ (২০শে জুলাই): কঙ্গোস্থ প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েট সৈন্য প্রেরণের আবেদন—কঙ্গোমন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫ই শ্রাবণ (২১শে জুলাই): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক (বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী)—সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির অভূতপূর্ব্ব সাফল্য।

৬ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই): কঙ্গো হইতে বেলজিয়াম সৈন্য অপসারণের আহ্বান—রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত।

৮ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই): "পাক-ভারত মিত্রতার স্বপ্ন সফল হয় নাই—" ঢাকায় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের খেদোক্তি।

৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই): পুনরায় চীনা সৈন্যের নেপাল সীমান্ত অতিক্রমের অভিযোগ—নেপাল কর্ত্তৃক চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর সর্ব্বশেষ পত্রের জবাব প্রদান।

১০ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই): কম্যুনিজম ও স্বাধীন গণতন্ত্রের (মার্কিণ ব্যবস্থা) মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাশিয়ার প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের চ্যালেঞ্জ।

১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই): পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক পর্য্যালোচনা—ঢাকায় পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের উপস্থিতিতে উচ্চ পর্য্যায়ে সম্মেলন।

১৩ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই): দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ঘানার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত।

১৫ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই): চীন নেপাল সীমান্তবর্ত্তী নিরস্ত্রীকৃত এলাকা হইতে চীনা ফৌজ অপসারিত।

১৭ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট): কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুলুম্বা কর্ত্তৃক অবিলম্বে কাটাঙ্গায় (কঙ্গো হইতে বিচ্ছিন্ন) রাষ্ট্রসংঘ ফৌজ প্রেরণের দাবী।

১৮ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট): "রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে কাটাঙ্গা প্রবেশে বাধা দেওয়া হইবে"—কাটাঙ্গা প্রধানমন্ত্রী সোম্বের ঘোষণা।

২১শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট): হিরোসিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের পঞ্চদশ বার্ষিক স্মারক অনুষ্ঠান জাপানের যুবরাজ আকিহোতির নেতৃত্বে ২৫ হাজার নর নারীর মৌন মিছিল।

২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট): কিউবাস্থ প্রায় সমস্ত মার্কিণ শিল্প-সংস্থা বাজেয়াপ্ত—কিউবার ডাঃ ফিদেল ক্যাষ্ট্রোর বিপ্লবী সরকারের কার্য্য-ব্যবস্থা।

২৪শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট): লাওসে সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ক্ষমতা দখল—ক্যাপ্টেন কং লি'র (ভিয়েনতিয়েনস্থ ছত্রী বাহিনীর সেনাধিনায়ক) নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান।

কাটাঙ্গা হইতে অবিলম্বে বেলজিয়েন ফৌজ প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত।

২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট): তিন শত সৈন্য সমেত রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কজোল্ডের কাটাঙ্গার রাজধানী এলিজাবেথভিলে উপস্থিতি।

২৮শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট): মার্কিণ সরকার কর্ত্তৃক ওয়াশিংটনস্থ সোভিয়েট কূটনীতিজ্ঞ মঃ ভ্যালেণ্টিন ইভানোভের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ জারী।

২৯শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট): কান্দাহারে (আফগানিস্থান) দুইটি পাকিস্তানী বিমান ভূপাতিত—আফগান সরকার কর্ত্তৃক পাক্ সরকারের নিকট আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ।

৩০শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট): পুনর্ম্মিলনের ধাপ হিসাবে উত্তর কোরিয়ার ফেডারেল ইউনিয়ন—উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কিম ইল সুং কর্ত্তৃক নূতন প্রস্তাব পেশ।

৩১শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট): সাইপ্রাস স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত।

প্রধান মন্ত্রীর স্বরূপ

"পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসামের ব্যাপারে—অপরাধী আসাম সরকারের, আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের ও উপদ্রবকারী অসমীয়াদিগের অপরাধের গুরুত্বহ্রাস জন্য তাঁহার প্রভাব শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, আসামে অবস্থা স্বাভাবিক; সুতরাং তথায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কোন কথা উঠিতেই পারে না। প্রথম কথা—যে সময়ে লোক তথায় রাষ্ট্রপতির শাসন চাহিয়াছিলেন, তখন অবস্থা কিরূপ ছিল? তখন কেন সে বিষয় অবজ্ঞাত হইয়াছিল? দুষ্কৃতকারীদিগকে সমর্থন জন্যই কি তাহা করা হয় নাই? দ্বিতীয় কথা—জওহরলাল আসাম হইতে ফিরিয়া যাইয়াই যে বলিয়াছিলেন, তথায় অবস্থা স্বাভাবিক, তাহা কি নির্জলা মিথ্যা নহে? সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত কতগুলি স্থানে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন না? আর মিজো জেলার মিষ্টার লালমাওয়ালা, (আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য) ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দেব গত ১০ই আগষ্ট শিলচরে উদ্বাস্তুশিবির পরিদর্শন করিয়া আসিবার পরে মিষ্টার লালমাওয়ালা বলিয়াছেন—ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—প্রমাণ, শিলচর উদ্বাস্তু শিবিরে আগতদিগের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে। গত ১০ই তারিখে তাহাদিগের সংখ্যা ছিল (১৫টি শিবিরে)—৪ হাজার ৩ শত ৪১জন। উদ্বাস্তরা কোন কোন অত্যাচারীর নামোল্লেখও করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মনে এখনও আতঙ্ক। তাঁহারা যে সকল অত্যাচারীর নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদিগকে দণ্ডদানের কোন ব্যবস্থাই আসাম সরকার করেন নাই। যতদিন তাহারা দণ্ডিত না হয়, ততদিন লোক কিরূপে জওহরলাল কোম্পানীর নির্ব্বিঘ্নতার কথায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে?"

—দৈনিক বসুমতী।

কর্তব্যে উপেক্ষা

"পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই খাদ্যের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী। এই পরমুখাপেক্ষিতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণকে যে কেবল উচ্চমূল্য দিয়া ধান-কাঁকর ইত্যাদি মিশ্রিত চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে তাহাই নহে, এজন্য বৎসর-বৎসর পশ্চিমবঙ্গ হইতে ৩০।৪০ কোটি টাকা উড়িষ্যা, অন্ধ্র ইত্যাদি অঞ্চলে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে যাহাতে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের যে সব অঞ্চলে খাদ্যশস্যের চাষ হয় সেই সব অঞ্চলে যাহাতে বন্যার জন্য ফসলের ক্ষতি না হয় তাহা দেখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাবরই গাফিলতি দেখাইয়া আসিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের একটি ভাণ্ডারবিশেষ। কিন্তু এই অঞ্চলে লোনা জল হইতে জমির ফসল ও জমির উর্বরতা রক্ষার জন্য যে দুই হাজার মাইলের উপর বাঁধ রহিয়াছে, তাহার যথাযথ সংরক্ষণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাবরই উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। অথচ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর-কলিকাতার লবণ হ্রদ সংস্কারের জন্য তাঁহাদের উৎসাহের অন্ত নাই। সুন্দরবন অঞ্চল এইভাবে উপেক্ষিত হইবার ফলে প্রত্যেক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের যে কত হানি হইতেছে এবং লোনা জল প্রবেশের ফলে প্রত্যেক বৎসর কত জমি যে দুই-তিন বৎসরের জন্য চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

আসামের ছাত্রসমাজ

"কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা, অসমীয়া ছাত্র সমাজের বৃহত্তর অংশ এই সব যুগ চৈতন্য ও নব্য মানবতার দাবী হইতে বহু দূর অন্ধকারে রহিয়াছে। এমন কি তাদের অধিকাংশই আজও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং অতি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ও জাতি বিদ্বেষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। যেখানে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রবৃন্দ এবং তথাকথিত শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি অধ্যাপকেরা পর্যন্ত অতি নিকৃষ্ট স্তরের প্রতিক্রিয়াশীলতার রজ্জুতে আবদ্ধ, সেখানে সামাজিক মনস্তত্ত্ব কিভাবে প্রগতিবাদের আদর্শকে গ্রহণ করিবে? এ জন্য দেখা যায় আসামে সত্যকার কোন প্রগতিশীল আন্দোলন নাই—যেটুকু আছে তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে আসামে বামপন্থী মতবাদ ও আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল। "আসাম একমাত্র অসমীয়াদের জন্য" এই অদ্ভুত মনোভাব যাহারা বহন করে, তারা কিভাবে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিতে পারে এবং কি ভাবেই বা সর্বভারতীয় সাহায্যে ও অর্থে আসামকে গড়িয়া তোলার (যেমন, ব্রহ্মপুত্রের উপর ব্রীজ নির্মাণ, তৈল শোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি) দাবী করিতে পারে? কিম্বা, আসামের বাহিরে কলিকাতায় ও অন্যত্র আসামের ছাত্রেরা কি ভাবেই বা পড়াশুনা চালাইবার কথা ভাবিতে পারে? একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আসাম ভারতীয় ইউনিয়নের একটি অঙ্গ রাজ্য এবং এখানে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের বসবাসের, জীবিকার্জ্জনের ও লেখাপড়া শিখিবার আইনসঙ্গত অধিকার আছে—যেমন আছে অসমীয়াদের পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র সমান অধিকার, ইহা ভারতীয় সংবিধানে আইনের দ্বারা গ্যারেণ্টিকৃত। কিন্তু অসমীয়া ছাত্রসমাজের একটি বৃহৎ অংশ সমস্ত আইনকানুন, নীতি ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির বহ্ন্যুৎসবে মাতিয়াছে। তাদের এই মানসিক বিপর্যয় সারা অসমীয়া সমাজের উপর কি ভয়ানক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে এবং ভবিষ্যৎ আসামকে নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রভ্রষ্ট করিয়া একটা আরণ্যক ভূমিতে পরিণত করিতে চলিয়াছে—এই সমাজ-মনস্তত্ত্ব কোন চিন্তাশীল অসমীয়ার কি মনে হইতেছে না? বাঙ্গালীকে মারিয়া জাতি বিদ্বেষের তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা আসামের মনুষ্যত্বকে যে হত্যা করা হইতেছে, একথা কি ছাত্র ও যুব সমাজের একবারও মনে হয় না? অথচ কলিকাতায় আমরা বিপরীত দৃশ্য দেখিতেছি—এখানকার ছাত্র সমাজের গণতান্ত্রিক চেতনা ও প্রগতিশীল আদর্শ সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া

ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে নূতন আশা বহন করিয়া আনিতেছে। আর আসামে—যেখানে ছাত্রেরা বীভৎসতার রণরঙ্গে মাতিয়াছে। বাঙালী ছাত্রদিগকে ডাণ্ডা ও ছোরা হাতে তাড়া করিয়াছে। মারপিট, খুন, জখম, গৃহদাহ ও নারী ধর্ষণ—অসমীয়া ছাত্রদের (অন্ততঃ একাংশের) বিরুদ্ধে ইহাই হইতেছে অভিযোগ।"

—যুগান্তর।

বাক্যবাগীশ নেহেরু

"এই বাক্যবাগীশ জানিয়া রাখুন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালিকা নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখেন নাই—ভাঙিয়াছেন কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দলের অনুরোধে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনোভাব আঁচ করিয়া। কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী আরো জানিয়া রাখুন, আসামে রাজত্বকারী কংগ্রেসী দলের দ্বারা ভারতীয় ঐক্য কতটা রক্ষা পাইবে তাহা মানুষ বুঝিতে শুরু করিয়াছে। স্বাধীনতা ও ভারতীয় ঐক্য রক্ষা করার শক্তি এবং অধিকার তাহাদেরই যাহারা ভ্রাতৃহত্যাকারীদের প্রকৃত অনুসন্ধান চায়। শ্রীনেহেরুর দীর্ঘ বক্তৃতায় এত বড় নিষ্ঠুর ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের আশ্বাস পর্যন্ত নাই। শুধু কি তাই? এই দলীয় স্বার্থের রক্ষক বলিতেছেন, আসামে আইন-শৃঙ্খলা কখনো ভাঙিয়া পড়ে নাই। কাজেই কেন্দ্রের কিছুই করিবার নাই। এই অতিবিজ্ঞ রাজনীতিক আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ বলিতে কি বোঝেন আমরা জানি না। যে কোনো ভারতীয় নাগরিক এটুকু জানেন যে, কংগ্রেস রচিত সংবিধানেও ভারতের যে কোনো নাগরিকের এই দেশের যে কোনো জায়গায় নিরাপদে চলাফেরা এবং বাস করার অধিকার আছে। সেই অধিকার যখন অন্তর্হিত হয়, মানুষ যখন প্রাণের দায়ে ভিটামাটি ছাড়িতে শুরু করে, যখন প্রতি মুহূর্তে শারীরিক নিরাপত্তার জন্য শঙ্কিত থাকে, তখনও আইন-শৃঙ্খলা ভাঙে না? আমরা বলি শ্রীনেহেরু নিজেদের সংবিধানটিকে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া তারপর আইন-শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা করুন।"

—স্বাধীনতা।

কর্পোরেশনের কাউন্সিলার

"কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের আবার ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব সার্থক হইবে যদি ভাতা দিয়াও ভাল এবং সৎ লোক কর্পোরেশনে আনা যায়। নলকূপ কেলেঙ্কারি এবং জলের মেইন পাইপ বসানোর ঘটনায় দেখা গিয়াছে বহু সততাবর্জ্জিত বেকার এবং অর্দ্ধবেকার কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া আসিয়া ঢুকিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইহাদের মধ্যে বামপন্থী বেশী। একবার দুষ্কর্ম্ম ধরা পড়িবার পরেও ইহারা পুনরায় পার্টি মনোনয়ন লাভ করিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ পার্টির বেতনভুক কর্ম্মী। সম্প্রতি শচীন সেন নামক এক কমুনিষ্ট কাউন্সিলার কংগ্রেসী প্রার্থীকে কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে সমর্থন করায় বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইহার পকেট ঘেঁষিয়া দাঁড়ানো এই ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব। পত্নীকে ইনি কর্পোরেশনের স্কুলে ঢুকাইয়াছেন, বাড়ীর কাছের একটি স্কুল হইতে এক শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলী করাইয়া পত্নীকে সেখানে আনিয়াছেন। কংগ্রেসী সহযোগিতা ছাড়া এসব কাজ সম্ভবও নয়। ইঁহাকে দিয়া কাজ পাইতে খুব অসুবিধাও হয় না, চাঁদা চড়াইবার অভিজ্ঞতা [illegible] যথেষ্ট। এই শ্রেণীর লোক যতদিন কাউন্সিলার থাকিবে ততদিন সহরের কোন উন্নতি হইতে পারে না, ইহা পার্টিনেতা এবং ভোটদাতারা যতদিন না বুঝিবেন এবং ইঁহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ না করিবেন ততদিন কলিকাতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারই থাকিবে। ভাতাও অপচয়ই হইবে, কোন লাভ হইবে না। এই জাতীয় অন্যায়ের প্রতিবাদ কংগ্রেস কর্মীরা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কমুনিষ্ট কর্মীরা সজাগ হইবেন কবে?"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

থানার ঘরেও জল পড়ে

"এতদিন কেবল দরিদ্র মানুষেরই 'ঘরের চালে খড় নাই—জল পড়ে'—এই ধরণের কথা বলিতে শুনা যাইত। এখন দেখিতেছি—বীরভূমের পুলিশ বিভাগের ঘরেও 'ঘরে খড় নাই—জল পড়ে'। মহম্মদবাজার থানার বহুদিন ছাউনী নাই, যাহার ফলে ঘর ভিজিয়া যায়। ইহাই আমাদের মহম্মদবাজার থানার বর্ত্তমান চিত্র। শুধু তাহাই নহে, সরকারের বহু বিঘোষিত 'গ্রাম-সহর' প্যাটার্নের—যেখানে আধুনিক যুগের সুযোগ সুবিধার কমতি নাই অর্থাৎ কোন, বিজলী বাতি সবই রহিয়াছে কিন্তু এই সব সুবিধার সহজলভ্য সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উক্ত থানাটি এখনও ঊনবিংশ শতকের সেই অন্ধকার যুগেই লণ্ঠনের আলোতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিতেছে! এই সম্পর্কে পুলিশকর্তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াও দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ইহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই বা এই অব্যবস্থার প্রতিকার হয় নাই। জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে অবহিত হইবেন—ইহাই সকলে আশা করে।"

—বীরভূমবাণী।

বাঙালী জাগো

"ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যে বাংলার নর-নারী হাসিমুখে বিদেশী শাসকদের নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, নির্ব্বিচারে জীবন দিয়াছে, অম্লান বদনে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়াছে সেই বাংলাকেই বলি দিয়া যখন স্বীকৃত হইল ভারতের স্বাধীনতা তখনই সূচিত হইয়াছিল বাংলার ভাগ্যাকাশে দুঃখ দুর্দ্দশার এই দুর্য্যোগ। স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনে বাংলার যে অংশকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল তাহার হিন্দু অধিবাসিগণ যখন অত্যাচারিত হইয়া দলে দলে বাংলায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন বাংলায় দেখা দিল খাদ্যাভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, বৃদ্ধি পাইল বেকার সমস্যা, দেখা দিল বাসস্থানের সঙ্কট। বাংলা নির্ভীক ভাবে এই সকল সমস্যা সমাধানের দাবী করিয়াছে ভারত সরকারের কাছে। ইহা যেন বাংলার উপর অন্যান্য প্রদেশের বহুকালের পুঞ্জীভূত ঈর্ষা ও ক্রোধে ইন্ধন সংযোগ করিয়াছে। সেই কারণেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ একযোগে চিরতরে বাঙ্গালীর মুখ বন্ধ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বাংলার কৃষ্টি ও শিল্প, বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ত্যাগ ও আতিথেয়তা, দেশাত্মবোধ ও বীরত্ব অন্যান্য সকল প্রদেশের নিকট ঈর্ষার বস্তু ছিল। চাকরীর ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর আধিপত্য অন্য প্রদেশের জনগণের অন্তরে ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছিল। বাংলার জ্ঞান ও বিদ্যা সাধকেরা আজ অন্তর্হিত, বাংলার নেতৃত্ব আজ

দুর্বল ; তাই সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক চাপের যাঁতাকলে বাঙ্গালীকে নিষ্পেষণ করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। বাংলার অন্ন জলে যাহারা পুষ্ট, বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির আওতায় যাহারা মানুষ আজ তাহারাই বাংলাকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। অথচ বাঙ্গালী কোনদিন প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেন নাই। বাংলার কলকারখানায় অবাঙ্গালীর নিয়োগ, বাংলার ব্যবসাক্ষেত্রে অবাঙ্গালীর আধিপত্য বাঙ্গালীর উদার মনোভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যকলাপ এবং বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ ব্যবহার বাঙ্গালীর দিব্যচক্ষু আজ খুলিয়া দিয়াছে।" —বর্তমান ভারত (চকবাজার, হুগলী)।

শোক-সংবাদ

আচার্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বাঙলায় নারী-জাগরণের অন্যতমা পুরোধা, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধিকা সংস্কৃতির ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের রচয়িত্রী, রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং পাশ্চাত্য-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যা (অস্থায়ী) পরম শ্রদ্ধাস্পদা আচার্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার গত ২৭-এ শ্রাবণ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটেছে। জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার আলোয় সারা ভারতকে যাঁরা আলোকিত করে তুললেন, পবিত্র ভারতভূমিতে যাঁরা জাগরণের মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসে যাঁরা নতুন ঐতিহ্যের ধারা সৃষ্টি করলেন ইন্দিরা দেবী সেই বিশ্বপূজ্য ঠাকুর পরিবারের সার্থকনাম্নী দুহিতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্যতমা ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯-এ ডিসেম্বর বিজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইনি কিছুকাল বিলেতে অতিবাহিত করেন। ছাত্রীজীবনে বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে পদ্মাবতী পদক দ্বারা উৎসাহিত করেন (১৮৯১)। ১৮৯৯ সালে দিকপাল সাহিত্য-স্রষ্টা, স্বর্গীয় প্রমথনাথ চৌধুরীর (বীরবল) সঙ্গে ইনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য সারগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করে দেশের সাহিত্য সম্পদের মূল্য ইনি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছেন। ইন্দিরা দেবীর সাহিত্য সাধনা ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুশীলন সংস্কৃতির এই দুটি বিভাগকে বহুলাংশে পুষ্ট করেছে। ফরাসীভাষায় ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী পদক দিয়ে সম্মানিতা করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানাত্মক দেশিকোত্তমা (ডি লিট) উপাধি প্রদান করেন। রবীন্দ্রভারতী এঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করে এঁর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। ইন্দিরা দেবীর অসামান্য লেখনী থেকে যে সকল গ্রন্থ জন্ম নিয়েছে তাদের নাম, নারীর উক্তি, বাঙলার স্ত্রী আচার, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম, পুরাতনী, হিন্দুসঙ্গীত, প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্র স্মৃতি।

জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতবরেণ্য বৈদান্তিক সুপ্রবীণ জ্ঞানতপস্বী আন্তর্জা[তিক] খ্যাতিসম্পন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতপ্রবর জগদীশ[চন্দ্র] চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গত ১১শে শ্রাবণ ৮১ বছর বয়[সে] জীবনাবসান হয়েছে। সংস্কৃতির পীঠস্থান পুণ্যভূমি বারাণ[সী] ও কেমব্রিজে ইনি শিক্ষার্জন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে[র] ছাত্র হিসেবে এম-এ, পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন। রো[ম] বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকরূপে ইনি যথেষ্ট প্রসি[দ্ধি] অর্জন করেন। হিন্দু রিয়ালিজম, কাশ্মীরী শৈবইজম, বৈদিক [...] অফ দি ম্যান অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্স প্রমুখ গ্রন্থগুলি তাঁর সুগভীর অসামান্য পাণ্ডিত্যের নিদর্শনবিশেষ। কলকাতার ভূতপূর্ব মে[য়র] শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী তাঁর একমাত্র কন্যা।

তেজেশচন্দ্র সেন

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী তেজেশচন্দ্র সে[ন] শান্তিনিকেতনে ৭ই শ্রাবণ ৬৭ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যা[গ] করেছেন। ১১০১ সালে ইনি এখানে যোগদান করেন এ[বং] জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভা[বে] যুক্ত ছিলেন। তেজেশচন্দ্রের মৃত্যুতে বিশ্বভারতী একজন অভিজ্ঞ দরদী ও নিষ্ঠাবান অধ্যাপককে হারাল। অধ্যাপক হিসেবে ছাত্রমহ[লে] তেজেশচন্দ্র অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী ছিলেন।

ডাঃ সুধীর বসু

বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে[র] ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ সুধীর বসু, গত ১৭ই শ্রাবণ ৫৯ বছর বয়ে[সে] লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ১৯২৮ সালে ইনি মেডিক্যাল কলে[জ] থেকে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গুডিভ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ঐ কলেজেই ইনি অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। গ[ত] ১লা জুলাই ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইনি অবসরগ্রহ[ণ] করেছেন। মৃত্যুকালে ইনি ইডেন হাসপাতালে অধ্যক্ষের আস[নে] সমাসীন ছিলেন। ডাঃ বসু রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস এ[বং] রয়াল কলেজ অফ অবস্টেট্রিক্স্ অ্যাণ্ড গিনেকলজীর সদ[স্য] ছিলেন।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিল্পপতি এবং কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই শ্রাবণ মাত্র ৪২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। ইনি স্বর্গত রায়বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাণিজ্যমহলে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এঁর আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে বাঙলার বাণিজ্য জগত বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক পাঠিকার চিঠি
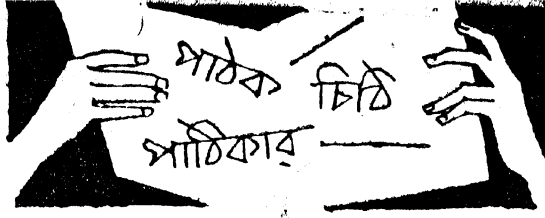
সমালোচনা

মহাশয়, আমি 'মাসিক বসুমতীর' একজন নিয়মিত গ্রাহিকা। পনার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "চলার থ" শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করতে ইচ্ছা রি। শ্রীযুক্ত দে মণিপুরী অতিথি সংকারের ও মণিপুরী কুমারীর াত্রত উদ্‌যাপনের যে অদ্ভুত ও অবাস্তব বিবরণ দিয়েছেন, আমি কজন মণিপুরী কুমারী হয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই ও লেখককে বিলম্বে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করি। পর্য্যটক হাশয় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেরই চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই হাস্যকর। আপনারা তো জানেন, ারতের এই পূর্ব্বপ্রান্তের অধিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব হিন্দু। তার মাজে মদ কেন, মাংসেরও প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অবশ্য ালের গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে যদি সহরের কোন কোন াবিবেচক যুবক গোপনে মদ্ ব্যবহার করে থাকেন শ্রীযুক্ত দে কানমতেই তাকে সমাজের নিয়ম বলতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ণিপুরী সমাজ বিশেষতঃ পল্লীসমাজ কেবল সংযমী ও আচারশীল য় রক্ষণশীলও বটে। কুমারীকন্যার পরপুরুষের সহিত অবাধ মলামেশা নিন্দনীয় বলে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর ধ্যে থেকেও মণিপুরী সমাজে আজো বাইরের রক্ত প্রবেশ করতে পারেনি তেমনি খুব কম মণিপুরী কুমারীই নিজের সমাজ ত্যাগ করেছেন। এ অবস্থায় কিছুতেই কোন মেয়ে বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে এমন কদর্য্য সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন না। আমি র্বের সঙ্গে জানাতে চাই যে, নিজস্ব রীতি-নীতি সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার মধ্য দিয়ে ভারতের এই পূর্ব্বপ্রান্তের মানুষ শতাব্দীর এক উন্নত ও নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন যে সভ্যতার রূপ দেখে ইংরেজ লেখক T. C. Hodson ও Fantion Bowers আজ থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর আগে বলেছিলেন An Oasis of Civilisation কিন্তু লেখকের হাস্যকর অভিজ্ঞতা পড়ে মনে হলো যেন এক হাজার বৎসর আগেকার আফ্রিকার গভীর জংগলের রূপকথা শুনছি। লেখক মণিপুরী নারীর চরিত্র এঁকেছে উচ্ছৃঙ্খল বহুগামী রূপে। কিন্তু লেখককে দৃঢ়কণ্ঠে জানাচ্ছি মণিপুরী নারী সকল ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুনারীর মতোই একনিষ্ঠ পূজারিণী। লেখককে আহ্বান জানাই তিনি মণিপুরী পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে দেখুন মণিপুরী নারীর পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষীরূপে আজও যেখানে বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সঠিক অভিজ্ঞতা লাভ করুন মণিপুরী রীতির সম্বন্ধে। লেখক মণিপুরী পুরুষের যে পোষাকে বর্ণনা দিয়েছেন তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধারণতঃ ধুতি পাঞ্জাবীই মণিপুরী পুরুষের পরিধেয়। উৎসব বিশেষে উষ্ণীষও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাছাড়া লুঙ্গির সাথে আমাদের পরিচয় নেই। আর দীর্ঘবৎসর খাসিয়া পরিবেশে শিলং সহরে কাটিয়েছি লেখককে এও জানাতে চাই খাসিয়া রমণীর পোষাক সম্বন্ধে যে অভব্য মন্তব্য করেছেন তাও সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। সর্ব্বশেষে লেখকের ভৌগোলিক জ্ঞানের যে নিতান্ত অভাব লোয়ার বনের অবস্থিতি নির্ণয়ে তার আভাস মেলে। লোয়ার বন বলে কোন জায়গা মণিপুরে নেই যদি উখার বনকে ভুল করে লোয়ারবন বলে বর্ণনা দিয়ে থাকেন তবে লেখককে জানাচ্ছি উখারবন কাছাড়েরই এক নগণ্য জায়গা। সে জায়গা মণিপুরী পল্লীও নয় এবং যে কতিপয় সংখ্যক মণিপুরী সেখানে বাস করেন তারা সকলেই অত্যন্ত আচারশীল হিন্দু। লেখক এরকম পরিমিত জ্ঞান নিয়ে কোন জাতিবিশেষের সম্বন্ধে এরূপে মন্তব্য প্রকাশ না করলেই ভাল করতেন। —শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী, শিলং।

মহাশয়, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত "চলার পথে" প্রবন্ধটি আমি বেশ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি। আমি শিলং প্রবাসী একজন মণিপুরী এবং এই প্রবন্ধে লেখক শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় আমাদের মণিপুরী সমাজ সম্বন্ধে যে বিবরণ পাঠিয়েছেন সে সম্বন্ধে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। লেখক বলেছেন, "এক রাতের ঘটনা উল্লেখ করলে বোধ হয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আমার ভ্রমণ কাহিনী। অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে কিন্তু লেখকের কল্পিত কাহিনী বলে কেহ যদি ভুল করেন তবে তিনি খুব ভুল করবেন।" কিন্তু ঘটনাটি আমার নিকট অবিশ্বাস্য ও হাস্যকর। প্রশ্ন করি, লেখক কি বাস্তবিকই মণিপুরী সমাজের আচার-ব্যবহার ও চালচলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন? তা না হলে তিনি কি করে একটি জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মন গড়া ও কল্পিত কাহিনী উপস্থাপিত করলেন? সে কি নিজের ভ্রমণ কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই? মদ আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শুধু মদ কেন আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন বৈষ্ণবেরা মাছ-মাংস পর্য্যন্ত আহার করেন না। অবশ্য আজকাল কোন কোন যুবক হোটেলে পরিবারের চোখ এড়িয়ে ঐসব ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তা বলে কি মদ বা মাংস আহার করা আমাদের সমাজের প্রচলিত নিয়ম বলব? এ ছাড়া আমাদের সমাজে কুমারীদের পরপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা নিন্দনীয়। লেখকের উক্তি এখানে উল্লেখ করছি। "মণিপুরীদের অতিথি হলাম,···একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের অভিনয় হল। কেদো সেদ্ধ মদ খাইয়ে ঘণ্টা দুই ধরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল লোয়ার বনে। পরের দিন সকালে এ রহস্যের তথ্য আবিষ্কার করলাম। অতিথি পরিচর্য্যার রীতি এদের এই রকম কুমারী মেয়ের ভাগ্যে যদি একশটি অতিথি বরণ করবার সৌভাগ্য থাকে তবে তিনি সতী পুণ্যবতী।" আমাদের সমাজের অতিথি পরিচর্য্যার রীতি কি এতই কদর্য্য? আশ্চর্য্যই বটে, পড়ে মনে হচ্ছে আমরা মণিপুরীরা আজ থেকে প্রায় হাজার হাজার বৎসর

আগেকার যুগের কোন আদিম অধিবাসী। এ ছাড়া, মণিপুরী ছেলেদের পোষাকের বিবরণও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এও জানতে চাই, বহু দিন যাবৎ আমরা খাসিয়া পরিবেশে কাটাচ্ছি। তাই এই ভদ্র ও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি সম্পর্কে লেখকের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। খাসিয়া রমণীরা কোমরে মোটা রকমের লম্বা উড়না জড়ায় না। জড়ায় নেপালীরা। শিক্ষিতা রমণীরাও পেটকাটা ব্লাউস ও বডিস ব্যবহার করে না। সহরে খাসিয়ারা অত্যন্ত শিক্ষিত ও ওদের আচার ব্যবহার সাহেবী ধরণের হলেও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে খাসিয়া মহিলা মোটেই সাহেবী পোষাকের অনুকরণ করে না। এ ব্যাপারে যে কোন জাতি অপেক্ষা ওরা সংযত ও সুরুচির পরিচয় দেয়। পরিশেষে আমার অনুরোধ, শ্রীচট্টোপাধ্যায় যেন তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। কে, বিজয়া দেবী। বি, এ, তৃতীয় বর্ষ কলা বিভাগ। রেজলেওন্, শিলং।

মহাশয়, আমি আপনাদের একজন ৭৬ বৎসর বয়সের গ্রাহক। আমার তিনটি অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে: ১ম। আপনাদের 'মাসিক বসুমতী'র সূচীপত্র হয় বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বে বা পরে রাখুন—মধ্য ভাগে না রেখে। ২য়। আপনাদের মৌলিক প্রবন্ধগুলি 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গে'র অক্ষরে ছাপিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহজে পড়িতে পারে। ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে বৃদ্ধদের কষ্ট হয়। ৩য়। ১৩৬৭ আষাঢ় মাসের 'বসুমতী'র ৪১০ পৃষ্ঠায় "চার জন" প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে। ৪১১ পৃষ্ঠার শিরোনামা 'মাসিক বসুমতী'। ৪১১ পৃষ্ঠায় শিরোনামা 'মাসিক বসুমতী' না হয়ে 'চারজন' হইলে ভাল হয়। এই রূপে অন্যান্য প্রবন্ধের পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। ইতি। আপনাদের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্যারীসেন লেন, সাহেবজাদা বাজার, কটক—২।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, গত জ্যৈষ্ঠমাসের মাসিক বসুমতীতে আমার তোলা দুইখানি ছবি ছাপানো হ'য়েছে, ('শিলালিপি', 'পথ বেঁধে দিল') কিন্তু তাতে ভুলক্রমে আমার নাম 'দিলীপ চাকলাদার' ছাপানো হয়েছে কিন্তু আসলে ওটা হবে 'দীপক চাকলাদার'। আপনাকে বিশেষ অনুরোধ যেন আগামী মাসের মাসিক বসুমতীর 'আলোকচিত্র-র' পাতায় এই ভুল সংশোধন ক'রে নেন। শুভেচ্ছান্তে ইতি—দীপক চাকলাদার। ১৫-এইচ, কার্ণ রোড, কলিকাতা-১১।

মহাশয়, "বসুমতী" মাসিক পত্রের বিগত বৈশাখ সংখ্যায় "বঙ্গবাসী:—দেশ ও কাল" নামক প্রবন্ধে শ্রীহারাধন দত্ত মহাশয় আমাদের সম্মুখে একটি মনোরম চিত্র ধরিয়াছেন এ শ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠে মন পুলকিত হয়, এবং হওয়াও বাঞ্ছনীয় বটে। আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত প্রবন্ধে স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'সংবাদ-ভাস্কর' স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য" এবং সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে "হিতবাদী" ও "বসুমতী"র নাম পাওয়া যায় নাই। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির—জন্ম সন প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম সন দেওয়া হয় নাই। অন্যত্র নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম সন—১৮৫২ খৃষ্টাব্দ লিখিত হওয়ায় প্রমাদ ঘটিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম ১৮৪৭ ইং সন বটে। ভবদীয় শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত, কালিনগর চা-বাগান—পোঃ রামকৃষ্ণনগর।—(কাছাড়)

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

ভারতের বাইরে সাগরপারে আমরা নিম্নলিখিত গ্রাহকবর্গকে পাইয়াছি।

1. Mrs. A. Naylor
   No 7, Woodcraff Road
   Liverpool (15)
   England. U. K.
2. Mr. S. N. Sen
   Post Box no 334 (Central)
   Tokyo, Japan.
3. Mr. B. K Banerjee
   C/o M/s Imperial Chemical
   Industries Ltd.
   Wilton Castle, Block 'B'
   Engineering Dept.
   Wilton Middleborough U. K.
4. Mr. Tapan Ukil
   ba. A. Mittang.
   Kriebathal
   Abu Mithwada/sa
   East Germany.

I am sending herewith Rs 15/ only, for Masik Basumati from Baisakh to Chaitra 1367 B. S. Secretary Milani, Raigarh—M. P.

এক বৎসরের মূল্য পাঠালাম—Secretary Satsang—S. P. Behar.

We are sending herewith yearly subscription of your esteemed monthly. Please issue magazine from Ashar.—I. E. L. Recreation Centre, Hazaribagh.

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে আমার গ্রাহিকা মেয়াদ শেষ হইয়াছে। আজ ৭.৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। আষাঢ় সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অঞ্জলি বসাক, নিউ দিল্লী।

Please subscribe me for 'Masik Basumati' for one year. Remitting Rs 15/—for the purpose—Juthika Roy B. A.—Shillong.

Sending herewith Rs 7·50 nP. as the subscription for Monthly Basumati for another six months.—Kanak Maitra, Kanpur.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম। আষাঢ় হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী গীতা দাশগুপ্ত—Bina—M. P.

I am remitting herewith Rs 7·50 nP, on account of subscription towards Monthly Basumati for the period from Ashar to Agrahayan. —Leele Ghose, Meerut.

Remitting subscription for M. Basumati kindly continue the Magazine and oblige.—G. R. Choudhury, Kimin,

মনি অর্ডার যোগে এই বৎসরের বাৎসরিক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠানো হইল—Guptipara High School, Hooghly.

(অপ্রকাশিত রেখাচিত্র)

নর্তকী শ্যামাবাঈ

—শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৩৯শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৭] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

দুঃখ

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে, তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে, তাহার তাহা সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা, আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি, যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে, দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব, যত মহত্ত্ব, সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-এক দিক দিয়া বলা হইয়াছে—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে। আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কৃষক চাষ করিয়া যে-ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যত বড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্য-রচনা তো বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে, ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই-সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের

দয়াকে নিজের লোভের মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু, হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে হইবে? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ, তুমিই বিপদ; হে মাতা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই ভয়। তুমিই ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং তুমিই—

'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥'

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎ-বদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ—সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে। —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অহল্যা

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী আমরা জানি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে, ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ করে অহল্যার নিকট গেলেন। কিন্তু গৌতমরূপী ইন্দ্রকে অহল্যা চিনতে পারলেন না, স্বামী বলেই গ্রহণ করলেন। তখন—

পতিব্রতা নাহি জানে পতির বরণ।
তখনি শয়নগৃহে করিল গমন।

তারপর গৌতম ঘরে ফিরে এসে যখন অহল্যাকে জিজ্ঞেস করলেন—

গৌতম বলেন প্রিয়ে জিজ্ঞাসি তোমারে।
শৃঙ্গার লক্ষণ কেন তোমার শরীরে॥
অহল্যা বলেন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমারে॥

তখন গৌতম ধ্যানে সমস্ত অবগত হয়ে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—

শাপিলেন অহল্যারে ক্রোধে মুনিবর।
শাপ দিনু তোর তনু হউক প্রস্তর।

ইন্দ্রকে গৌতমের অভিশাপ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এমন যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পরস্ত্রীগামী তার শাস্তি আরও কঠোর হলেও আমাদের কোন ক্ষোভ ছিল না। বরং সময় সময় মনে হয়েছে, ইন্দ্রের শাস্তি পর্যাপ্ত হয়নি। কিন্তু অহল্যা? যতবার কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েছি, ততবার মনে এই ক্ষোভ হয়েছে, অহল্যাকে কেন শাপ দেওয়া হোল? কি তার অপরাধ? সে তো ইন্দ্রকে তার স্বামী গৌতম বলেই জেনেছে ও স্বামী গৌতমরূপেই গ্রহণ করেছে। স্বামীর বেশধারীকে সে চিনবে কি করে? তাকে এরূপ অভিসম্পাত দেওয়া গৌতমের অত্যন্ত অন্যায় নয় কি? জ্ঞানী ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এরূপ অন্যায় কাজ কেন করলেন? এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি, কারণ কোন সদুত্তর এর ছিল না। অহল্যাকে অভিসম্পাত দেওয়া গৌতমের ঋষিজীবনের এক চরম কলঙ্ক। কৃত্তিবাসের লেখনী গৌতম ঋষির মুখে এরূপ কলঙ্ক-কালিমা লেপন করেছে। কিন্তু মূল রামায়ণের ঘটনাও কি তাই? বাল্মীকিও কি এরূপ অন্যায় করেছেন? তিনিও কি বিনা অপরাধে অহল্যার প্রতি অভিসম্পাত দ্বারা এক নিরপরাধা নারীর সমগ্র জীবন ব্যর্থ করে দিলেন? মনে এই সংশয় জাগতেই বাল্মীকির মূল রামায়ণ খুললাম। খুলে দেখি, বাল্মীকি লিখছেন :—

মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ॥
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো॥

অর্থাৎ অহল্যা তাকে গৌতমবেশধারী সহস্রাক্ষ ইন্দ্র বলে চিনতে পেরেও দুর্বুদ্ধিহেতু দিব্যরমণকুতূহল বশতঃ তাদৃশ কার্য করতে অভিপ্রায় করলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণমনোরথ হয়ে সুরশ্রেষ্ঠকে বললেন—প্রভো, আমি কৃতার্থ হলাম। এখন শীঘ্র এ স্থান হতে প্রস্থান কর।

সমস্ত সংশয়, সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটল। মহর্ষি বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধায় শির আনত হল। তাইতো, ঠিকই তো। অহল্যা ইন্দ্রকে ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পারলেন, কিন্তু তবুও ব্যভিচার করতে মনে দ্বিধা হোল না। বরং পাছে ইন্দ্র স্বামীর কাছে ধরা পড়ে, পাছে তার নিজের এই পাপাচরণ স্বামী জানতে পারে এজন্য ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললেন। কিন্তু ইন্দ্রের অদৃষ্ট খারাপ, অহল্যারও পাপের ভরা পরিপূর্ণ। তাই ইন্দ্র পর্ণশালা হতে বহির্গত হতেই গৌতমের সঙ্গে দেখা। গৌতম তাকে আত্মবেশধারী দেখে ও তাঁর শয়নগৃহ হতে বহির্গত হতে দেখে ব্যাপারটা এক নিমিষেই বুঝে নিলেন। তারপর সেই পরদাররত (গুরুপত্নীরত) পাপাত্মাকে অভিশাপ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজ কুটীরে প্রবেশ করে অহল্যাকেও অভিসম্পাত করলেন—

ইহ বর্ষসহস্রাণি বহুনি নিবসিষ্যসি।
বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি॥

অর্থাৎ এই আশ্রমে বহু সহস্র বৎসর নিরাহারা, বাতভক্ষা, ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করত বাস করিবে।

নিমিষে অহল্যা অদৃশ্যা হয়ে গেলেন। আমাদের সমস্ত সংশয়ের অবসান ঘটল। গৌতমের কাজ অত্যন্ত সংগত মনে হোল। অহল্যার প্রতি তাঁর অভিশাপে মনে আর কোন ক্ষোভ থাকল না। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও জানা গেল যে অহল্যা পাষাণ হন নি, হয়েছিলেন অদৃশ্যা।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর গল্প

রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা কে না জানে। তিনি মধ্যযুগীয় সাধক দাদূ কবীর প্রভৃতি 'কামধেনু দোহন করে' 'তৃষিত পথিকদের' পরিতৃপ্ত করেছেন! এই 'ভক্তিরসের রসিক' পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের আর একদিকের পরিচয় হয়ত সকলের জানা নেই। হিমালয়ের মতো এই বিরাট জ্ঞানযোগীর অন্তর্দেশ থেকে হাস্যরসের একটি সহজ নির্ঝরিণী সব সময় উৎসারিত হত। যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই এটা উপলব্ধি করেছেন। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালে গভীর তত্ত্বমূলক বিষয় বোঝাবার সময় তিনি মাঝে মাঝে হাস্যরসাত্মক সুন্দর সুন্দর গল্পের অবতারণা করতেন। তাতে অনেক জটিল বিষয়ও ছাত্রদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত। শুধু গল্প হিসাবেও সেগুলো পরম উপভোগের সামগ্রী। ১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে 'বলাকা' এবং 'মানুষের ধর্ম' পড়বার সময়ে তাঁর মুখ থেকে এ-ধরনের অনেক গল্প শুনেছিলাম। এখানে তার কয়েকটি উদ্ধার করে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম।

অরসিকেষু

এক সেকেলে পিসিমা গান বাজনা মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। গানের সুর কানে ঢুকলেই তিনি রেগে মেগে আগুন হয়ে উঠতেন। বিধাতার এমনি পরিহাস যে তাঁর আপন ভাইপোকেই গানের বাতিকে পেয়ে বসল। বেচারার এমন দুর্ভাগ্য যে গলা সাধতে বসলেই পিসিমা উগ্র মূর্তি হয়ে তেড়ে আসেন। তবু গানের বাতিক কি সহজে যায়—পিসিমা শত লাঞ্ছনা গঞ্জনার ঝাঁটা মেরেও রাগ রাগিণীর ভূত তার ঘাড় থেকে নামাতে পারলেন না।

একদিন এক বিরাট তানপুরা নিয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে একমনে গলা সাধছিল। দুয়ারের দিকে চেয়ে হঠাৎ দেখতে পেল পিসিমা এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। আচমকা পিসিমাকে দেখে প্রথমটায় বেচারার গলা আটকে যাবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু পিসিমার চোখে মুখে এক অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করে সে সাহস পেল। আশ্চর্য! পিসিমা সে দিন আর রেগে মেগে তেড়ে আসছেন না, তানপুরাটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভাইপোর মনে হল এতদিনে পিসিমা গানের মর্ম বুঝতে পেরেছেন,—আজকের রাগালাপ শুনে নিশ্চয়ই তাঁর মনে পরিবর্তন এসেছে। দারুণ উৎসাহে সে গলা থেকে রাগ রাগিণী বিস্তার করতে লাগল।

গান থামতেই পিসিমা ভাইপোর কাছে এসে তাঁর স্বভাবিক উগ্র মূর্তি ধারণ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "হারামজাদা, এত বড় একটা লাউ নষ্ট করে তা দিয়ে গলা সাধা হচ্ছে। বে-হিসাবী কোথাকার! লাউটা দিয়ে সারা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন খাওয়ানো যেতো।"

WRONG (রঙ)

এক নর্তকীর নাচে মুগ্ধ হয়ে দর্শকের দল মুহুর্মুহুঃ হাততালি দিয়ে চলেছে। যেমন নিখুঁত দেহের সৌন্দর্য তেমনি নিখুঁত নাচের ভঙ্গী। নাচের আসর আশ্চর্য ভাবে জমে উঠেছে। হঠাৎ সহ-নর্তকীর একখানা হাত অসাবধানে নর্তকীর গালে এসে লাগতেই তার তাল কেটে গেল। নর্তকী দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নাচতে লাগল। হাততালির বদলে এবার শুরু হলো হৈ-হল্লা। নর্তকী দৌড়ে গিয়ে নাচ থামিয়ে দিল।

আসরের প্রথম সারিতে বসে দু বন্ধু নাচ দেখছিল। প্রথম বন্ধু বললে, "There is something wrong with her" দ্বিতীয় বন্ধু নর্তকীকে ভাল করে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বললে, "wrong নয়, there is something রঙ with her".

আসলে নর্তকীর গায়ের রঙ ছিল মেক আপ করা। সহনর্তকীর হাতখানা তার গালে লেগে রঙ উঠে যাওয়াতে আসল রূপ ধরা পড়ার ভয়ে হঠাৎ এই পরিবর্তন।

ষাঁড়

এক মাতাল নেশার ঘোরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার বাতাস খাবার ভারি ইচ্ছে হলো। একটা দোকানে ঢুকে দু' আনার বাতাসা নিয়ে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিল।

দোকানী বললে, "এখন পাঁচ টাকার ভাঙতি নেই, ফেরবার পথে আপনার পাওনাটা নিয়ে যাবেন।" মাতাল দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করল দোকানের সামনে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা কয়েক পরে ফিরবার সময় একটা দোকানের সামনে ষাঁড়টা দেখে মাতালের পয়সার কথা মনে পড়ল। দোকানীকে বললে, "আমার পাওনাটা দিয়ে দাও।" দোকানী তো অবাক, "কিসের পাওনা মশাই।" মাতাল রেগে মেগে আগুন, "বাটপাড়ী করবার আর জায়গা পাও না? আমায় বোকা ঠাউরিয়েছ বুঝি? এই খানিক আগে বাতাসা কিনে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গেলাম।"

দোকানী বললে, "আপনি ভুল করেছেন মশাই, এটা বাতাসার দোকান নয়, চিটে গুড়ের দোকান।"

মস্তবড় একটা ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছে—মাতাল গলার স্বরে সেই ভাব এনে বললে, "ভেবেছিলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। আমার পাওনাটা ফাঁকি দেবার জন্যে এরই মধ্যে বাতাসার দোকান পালটে চিটে গুড়ের দোকান বানিয়েছো। লোক ঠকাবার বেশ কায়দা শিখেছ দেখছি। ভেবেছ, দোকান পালটে বোকা সাজলেই পয়সা ফাঁকি দেওয়া যায়।" মাতাল ষাঁড়টাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "আমি কিছুই লক্ষ্য রাখিনি বুঝি? এই যে সেই ষাঁড়—দোকান পালটালেও ষাঁড় পালটাতে পারনি।"

বরায় সম্বন্ধ

কত জন বন্ধুতে মিলে গল্প গুজব চলছিল। কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে কার কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সবাই সে গল্প বলে পরস্পরকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। একজন বললে, "ওঃ তোরা সেই বৈজ্ঞানিকের কথা বলছিস—যিনি একটা নতুন থিওরি লিখে বিলাত থেকে সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হন। এখন ঠিক মনে পড়ছে না পিসিমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তোদের বলব।"

আর একজন বললে, "আমার কে হন জানিস? তিনি বাবায় আপন মাসতুতো ভাইয়ের মামাশ্বশুর। ছোট বেলায় আমাদের বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়তেন। তখন তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।"

একজন বাঙাল এতক্ষণ চুপ করে বন্ধুদের কথা শুনছিল—আর মাঝে মাঝে পা দোলাচ্ছিল। হঠাৎ হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললে, "তা হলে দেখা যাচ্ছে তোদের সকলের চাইতে আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা বেশি ঘনিষ্ঠ। কী সম্বন্ধ জানিস? বরায় সম্বন্ধ।"

সবাই কান খাড়া করে উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করল, "সে আবার কী।"

বন্ধুটি বললে, "বরায় সম্বন্ধটা কী তাই জানিসনে? তবে বলি শোন। আমার যে পিসিমা—তার যে দেবর—তার যে মেসো—তার যে খুড়তোতো ভাই—তার যে মামা তার শ্বশুরবাড়িতে এক বরই মানে কুলের গাছ ছিল। বৈজ্ঞানিক ছেলেবেলায় সেই বরই গাছ থেকে নিয়মিত বরই খেতেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বরায় সম্বন্ধ।"

এ কথা শুনে বাকি বন্ধুরা সব চুপ করে সম্বন্ধটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

বর্বর

এক বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীরা দারুণ ক্ষেপে গেছে। রেগে মেগে সবাই চলে যায় আর কি। তাদের নাকি মোটেই আদর যত্ন করা হচ্ছে না—সবাই বরকে নিয়েই ব্যস্ত।

—"এমন ছোটলোক তো কখনো দেখিনি! আমরা খেলাম কি না খেলাম সে দিকে কারো কোন খেয়ালই নেই।"

—"বরতো তাদের আত্মীয়ই। সব সময় আসবে যখন খুশি তাকে আদর যত্ন করতে পারবে। আমরা কি আর কখনো পাত পাততে আসব?"

—"বরযাত্রীদের তো সবাই বরের ডবল আদর যত্ন করে থাকে, মশাই।"

কন্যাপক্ষের লোকেরা এতক্ষণ তাদের রাগ থামাবার জন্যে বহু সাধাসাধি করছিল, কিন্তু তাদের গোঁ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে দেখে এবার একজন উত্তর দিল, "তাহলে আমরা যা ধারণা করেছিলাম—তাই ঠিক। আপনাদের যখন বরের ডবল আদর যত্ন প্রাপ্য তখন তো ঠিকই আপনারা ডবল বর অর্থাৎ কিনা বর্বর।"

রাংতা কুড়ানো

ক'জন ভাঙখোরের হঠাৎ ইচ্ছা হলো সবাই মিলে দুর্গাপূজা করবে। তখন তাদের নেশা বেশ জমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই একজন দুর্গার পোজে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ হলো লক্ষ্মী, কেউ সরস্বতী, কেউ কার্তিক, কেউ গণেশ। সব চেয়ে ষণ্ডা প্রকৃতির লোকটি অসুরের মতো মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়ালো। তার পর একজন পুরুত সেজে পুজার কাজ সমাধা করল। পুজার পর সবাই ঠিক করলে এবার প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যাক। লক্ষ্মী সরস্বতী সব সমেত দুর্গাকে বয়ে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়, অগত্যা সাব্যস্ত হলো শুধু মূল প্রতিমাকে বিসর্জন দিলেই চলবে। সবাই মিলে বগল বাজিয়ে দুর্গাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলল। চলতে চলতে পথের পাশে একটা মজে যাওয়া পাতকুয়ো চোখে পড়তেই সবাই মিলে দুর্গাকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর বিসর্জনের দুঃখে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

পর দিন ঘুমের পরে নেশা ছুটে যেতেই সবাই ভাবতে লাগল—দুর্গার না জানি কী গতি হয়েছে—বেচারা হয়তো কুয়োর গর্তে দম বন্ধ হয়ে মরেই গেছে। তারা একজোট হয়ে ভয়ে ভয়ে দুর্গার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। পাতকুয়োর কাছে এসে সবাই গর্তের ভিতর উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল। সবাই অবাক হলো দুর্গা মারা যায়নি—ঠিক গত কালকের মতোই দেবীর পোজে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে কুয়োর গর্তের ঠাণ্ডায় তার ভাঙের নেশা তখনো বেশ তাজা ছিল। সে ইয়ার বন্ধুদের দেখে গম্ভীর স্বরে বললে, "কী রে রাংতা কুড়োতে এয়েছিস বুঝি?"

জন্মান্তর

বন্দে আলী মিয়া

একটি প্রসন্ন রাত্রি ফিরিবে কি জীবনে আবার
মানস-সাগর হতে ফিরিবে কি কলহংস দল?
দারুচিনি-বনে আজ নামিয়াছে তুষারের ঢল
আমার তাসের ঘর লুটাইছে পথের ধুলায়।

আমি কি হেনেছি কভু কোনোদিন বিষের সায়ক।
তুমি কি দেখেছো কভু বজ্রাহত মূক বনস্পতি।
শুনেছো কি কোনোদিন তটিনীর কূলভাঙা গান—
আমার শৈলচূড়া চূর্ণ হলো তব পদতলে।

এসেছে সিন্দবাদ—উড়ে আসে শ্মশান-শকুন
জাহাজ ছুটিছে বায়ে—ছেঁড়া পালে ঝড়ের মাতন।
গরজে লক্ষ ঊর্মি—প্রলয়ের বাজিছে বিষাণ
মহাকাল গ্রাসিয়াছে জীবনের সুন্দরে আমার।

দুর্বার অশ্বের গতি—রথচক্র চলে অবিরাম
দুরন্ত কামনা-নাগ ক্ষুব্ধ রোষে ফুঁসিতেছে আজ।
ধূমকেতু পুচ্ছে জলে সপ্তর্ষির পাবক দাহন
দক্ষিণ-দিগন্তে ঘোর রক্তধ্বজ আজও দেখা যায়।

বাউল

শ্রীসত্যকিঙ্কর গুপ্ত

অসময়ে বান বাদল হ'লেই এই দুর্ভোগ। বিষ্ণুপুর থেকে যাবে রাধানগর কিম্বা রামসাগর ষ্টেশনে নেমে জয়রামপুর, কাঁচা-পাকা রাস্তায় গেলে তো কোন রকমে দ্বারকেশ্বরের তীর; তারপর? বারুণী ঘাটে নৌকা নেই, চলো সদরঘাট। সেখানেও বসে আছে দশ-বিশজন যাত্রী। চলো আরও উজিয়ে পাইকপাড়ার ঘাটে হয়তো চালু হ'য়েছে নৌকা এই আশায়। চলো আরও মাইলখানেক নদীর পাড় ধরে।

দ্বারকেশ্বরের চর। শরকাশের বন। আর বালি। বালি আর বালি। থম্‌কে দাঁড়াবে। মরুদ্যানের মত এ আবার কি? খানিকটা জায়গা ঘিরে তাল, বেল আর পেয়ারা গাছ। মাধবী আর তরুলতার ঝোপ! সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা কোরবে—"ব্যাপার কি হে? কে ছিলো এখানে?"

"ওটা ছিল আশ্রম, বুঝেচেন" উত্তর দেবে নবনীপুলের পাল, "কোথাকার কোন বাউল আশ্রম বানালে আর দু'দিন না যেতেই সব ফক্কিকার! কোথায় গেল বাউল আর কোথায় বা তার সেবাদাসী।"

"গেল কেন? এতো সব তৈরী ক'রে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল কেন?"

উত্তর পাবে না এবার। কেউ জানেনা সে গোপন কথা। কিন্তু আমি জানি।

আমিই কি আর জান্‌তে পারতাম? যোগাযোগ। সবে সেই সময় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছি।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ"

কে যেন গেয়ে আসে! একতারা হাতে, পরনে গেরুয়াবসন। কাঁচা-পাকা চুলগুলি চুড়ো ক'রে মাথার ওপর বাঁধা। কপালে গোবিন্দ-তিলক। গলায় তুলসীর মালা। দরাজ গলায় ডেকে চলেছে নিতাই বাউল। ভ্রূক্ষেপ নেই কোন দিকে। চাহিদে নেই ভিক্ষে নেওয়ার। নেহাৎ যারা ছাড়বে না, দেবেই ভিক্ষে, বাটিতে ক'রে নিয়ে আসবে চাল, আলু, বেগুন তাদের জন্যে বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ফাঁক ক'রে ধরবে তার ভিক্ষের ঝুলি। ভিক্ষেতেও নাকি কামনা থাকবে না। 'কামনা টুকুই তো ময়লা' বলতো নিতাই বাউল।

কত কি যে শুনলাম বাউল আর তা'র সেবাদাসীর বিষয়ে! ক'দিন পরের কথা। নিমন্ত্রণপত্র এসেছে বাউলের আশ্রম থেকে। চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্ত্তন হবে। তিনদিন হবে মচ্ছব। মহোৎসব। নরনারায়ণ সেবা হরিভক্তিপরায়ণ নরনারায়ণদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাউল। আমিও গেলাম।

হৈ-হৈ কাণ্ড। মণ্ডপের ওপর হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে। অন্য দিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। অবাক হ'য়ে দেখছিলাম দরজা-গোড়ায় মাধবীলতার তলায় দাঁড়িয়ে।

স্মিতহাস্যে এগিয়ে এল বাউল। "কে রে আমার নিমাইচাঁদ! ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে কেন ভাই?"

বুঝলাম না ব্যাপারটা। বললাম, "বোধ হয় ভুল করছেন, আমি নই।"

"সে কি রে!" চিবুকে হাত দিয়ে বললে বাউল, "তুই-ই তো সেই শচীদুলাল—নইলে এমন গৌরকান্তি, আজানুলম্বিত বাহু!"

ভাবলাম, বাউল সন্ন্যাসীর মাঝে থাকে নাকি এমনি পাগলা পাগলা ভাব। হয়তো তেমনিই। টেনে নিয়ে চললো বাউল, "ওগো ও রাধে—ও ললিতে—ও বিশাখা, কে কোথায় আছিস গো দেখে যা, ধরে এনেছি তোদের ননীচোরাকে।"

আমার অবস্থা যে তখন কী! পাগল ক'রে দেবে নাকি আমাকেও! কুলুঙ্গীর ওপর গৌর-নিতাইএর মাটির মূর্ত্তি, গলায় টাটকা গাঁদা ফুলের মালা। পাশে নামানো খোল-করতাল। একতারা আর আনন্দলহরী।

বসতে হ'লো মাদুরের ওপর। রাই এলেন। ধীর মন্থর পদক্ষেপে। গৌরাঙ্গী যুবতী। কপালে তিলক, নাকে রসকলি। মিষ্টি হেসে বললেন, "ভয় পেলে নাকি খোকা? ওর অমনিই স্বভাব। সারা দুনিয়া ও ওই রকমই দেখে। গৌর অঙ্গ হ'লেই নিমাইচাঁদ আর কালো হ'লেই কালা।"

বাউল ততক্ষণে কল ছাড়াতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, খেতে হবে। আমি যে ওর নিমাইচাঁদ।

অহরহ লেগেই আছে মচ্ছব আর নাম-সংকীর্ত্তন। কোন কিছুর অজুহাতে নর-নারায়ণ সেবা। রামায়ণ আর কীর্ত্তনীয়ার দল, এক আসর তো গাইতেই হবে বাউলের আখড়ায়। তা ছাড়া যেদিন থাকবে না কিছু বায়না, রাত্রের খোরাকীটুকু নিয়ে হ'য়ে যাবে এক পালা। মূলগায়েন আখর দেবে, "এ বৃন্দাবনে-শ্রীগোবিন্দ ছাড়া তো পুরুষ দেখি না গো রাই।" চোখের জলে ভেসে যাবে বাউল।

যেখানে-সেখানে বাউলের গল্প। বাউলের নামে মুখর আকাশ-বাতাস। দেউলী থেকে বনকাটি আর কেষ্টপুর থেকে কুমোরহাটি যেখানেই দেখবে দশজনা—জানবে ঠিক ওই বাউলের গল্প।

কিন্তু বাউলের গল্প যে কি, সত্যিকার পরিচয় কি ওর, কেউ তা' জানে না। মনগড়া কাহিনীর প্রতিযোগিতা চলে সর্ব্বত্র। কোত্থেকে আসে এতো পয়সা? যে খেলা চালিয়েছে বাউল তাতে ছেলেখেলার মত পয়সার দরকার। নিষ্কাম ভিক্ষেতে তো সম্ভব নয় এতো সব! কেউ বলে সিদ্ধাই। অষ্টসিদ্ধির পেয়েছে হয়তো একটা কিছু। কেউ বা সন্দেহ করে ওর সত্যিকার বাউলত্বে।

তাই এলাম আবার। জান্‌তে হবে কি আছে এই অসম্ভবের মূলে।

শান্ত পরিবেশের আশ্রম! ভিড় ভড়কা কিছু নেই। পেয়ারা গাছের ওপর একটা শালিক পাখী। ওপরে একটা শঙ্খচিল আশ্রম পরিক্রমা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। চোখাচোখি হ'য়ে গেল আশ্রমকর্ত্রীর সাথে। মুখ নামিয়ে নিচ্ছিলাম। ভরসা পেলাম, "লজ্জা কি ভাই ভেতরে এসো।" জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই উত্তর দিলেন ঠাকরুণ, "ঠাকুরের কথা বলছো? আসছেন এখুনি। পুজোতে বসেছেন। ব'স। ব'স এই মণ্ডপের ওপর।"

ব'সে থাকলে কি চলবে আমার? জান্‌তে এসেছি যে আমি, দেখতে এসেছি সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম কুম্ভক ক'রে বসে আছে বাউল। এ সব কি জানতাম ছাই! বাউলই বলেছিল একদিন পাগলামির ঝোঁকে, "বাউল হওয়া কি আর সোজা কথা রে নিমাই? বায়ুতে লয় হ'য়ে যাবে, তবেই না বাউল!"

ঠাকরুণ এলেন। খেতে দিলেন লেবু, কলা, শশা আর শাঁখআলু। গুরুগম্ভীর শব্দে বেজে উঠলো খোল। "গোবিন্দের গোপালা জয় জয়" স্তব আরম্ভ হয়েছে গোবিন্দের।

"কে রে আমার নিমাই চাঁদ?" আবার সেই প্রাণগলানো ডাক, স্নেহমধুর সম্বোধন।

নিত্য আসি, নিত্য যাই। ভালবাসেন, বাউল, আপ্যায়ন করেন রাই। দূরত্ব সরে যায় ক্রমশঃ। কিন্তু কাহিনী? যা' শুনতে আসা এই বাউলের আখড়ায়। বাউল তার কাছ দিয়ে ঘেঁষে না একটুও। তাই মরীয়া হ'য়ে বলেই ফেললাম একদিন আবদারের সুরে, "দাদা, একটা কথা বলছি, মনে করবেন না কিছু, বলবেন আমায় আপনার পুরানো কাহিনী—মানে আপনার সত্যিকার পরিচয় আর কি! এতো আপন ক'রে নিয়েও দূরে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাঘ্রঝম্পনে এগিয়ে এলো বাউল। "কেন? কেন হে ছোকরা? এই জন্তে বুঝি তুমি এসো এই আখড়ায়? মুখ সাম্‌লে কথা বলবে বলছি," ঠিক্‌রে বেরিয়ে এলো চোখের তারাগুলো, দাড়ি জটা গেল দাঁড়িয়ে।

ভয়ে পিছিয়ে এলাম। বললাম, "না—না মাফ্‌ করবেন দাদা, ভুল হ'য়েছে আমার, আর জানতে চাইব না কখনও—মাফ করবেন।"

গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন রাই।

"কি হ'ল—কি হ'ল গো? কার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা কইতে হয় জান না?" সাম্‌লে নিলেন সেই সাময়িক আবহাওয়াটা।

ভেবেছিলাম যাব না! কী প্রয়োজন ওই সব বাউল বোষ্টমের গুহ্যকথা জানার কিন্তু মনটা যেন আন্‌চান্‌ করে! ডগ্‌ ডগ ক'রে চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে বাউলের দাড়ি ভরা মুখ, কানে বাজে তার মধুমাখা ডাক, "ওরে আমার নিমাই চাঁদ"।

যাব না যাব'না ক'রেও গেলাম আখড়ায়।

"অভিমান হয়েছিল বুঝি! বুকে টেনে নিলে বাউল। আয়, আজ তোকে বলবো আমার কাহিনী। উজাড় কোরে দোবো। যা' আর কেউ জানেনা এই দুনিয়ায় তাই শোনাবো তোকে আজ।"

বাংলার কোন অখ্যাত পল্লীগ্রামের ভিখারী বৈষ্ণবের একমাত্র সন্তান নিতাই। শিশু বয়সে মাতৃহীন হ'য়ে পিতার কোলে পিঠে মায়ের আদর পেয়ে মানুষ হ'য়ে উঠলো। বাপের গলার গলা মিলিয়ে শীতের ভোরে নাম দিত নিতাই, "রাই জাগো রাই জাগো" বলে, চব্বিশ প্রহরের ধুলোটের সময় পিতার পাশে পাশে নেচে নেচে গাইতো—

"নিতাই ঘরে এলো—আমার গৌর ঘরে এলো রে,
ধূলো ঝেড়ে শচীমাতা নিল কোলে ক'রে রে।"

লীলা পূর্ণ করে পিতা গেলেন অমর ধামে। বারো বছরের বালক নিতাইও চলে গেল গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে। ভাগ্যের অন্বেষণে নয় বেঁচে থাকার স্বাভাবিক চেষ্টায়।

হাওড়া ষ্টেশন। বিরাট ভিড় মানুষের। অতো ভিড় দেখে নি সে কখনও। গাজনের মেলাতেও না। ভয় ভয় করছিল অতো ভিড়ে। ঝিম ঝিম করছিল ওর মাথা। এতো আলো! এত উঁচু উঁচু সব বাড়ি! এখানে যে বাঁচতে গিয়ে ম'রে যাবে। তার চেয়ে ফিরে যাবে বাপের কুঁড়েতে? হাতে তুলে নেবে করতাল। নাম সংকীর্ত্তন আর মুষ্টিভিক্ষা। শীতের ভোরে নাম দেওয়া আর গরমের দিনে চব্বিশ প্রহর। উঠে পড়লো নিতাই সামনের একটা গাড়িতে। কত গাড়িই তো ছাড়ছে অহরহ। দরজার কোণায় বসে রইল বালক। ষ্টেশনের নাম দেখে দেখে যেতে হবে কি না! কিন্তু এ কি!—এ কোথায় চলেছে গাড়ি? তাহ'লে কি—

পাশে বসেছিলেন এক খাঁ সাহেব, তাঁর যেন ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সুরমা লাগানো চোখগুলি দিয়ে দেখে নিলেন একবার, ভাঙা বাংলায় বললেন,—"কঁহা যাবি খুকা।"

"আজ্ঞে অণ্ডাল, অণ্ডালের পর কাজিপাহাড়ী তারপর ওই দামোদরটুকু পেরিয়ে শ্রীপাট পুরুল্যে।

হো হো ক'রে হেসে ওঠেন খাঁ সাহেব।

বিরাট শহর বিরাট বাড়ি আর বিরাট মানুষ খান্‌ রফিউদ্দিন। ভয় লাগে নিতাইয়ের। অবাক হ'য়ে যায়।

মেহেদি রং-করা দাড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে অশ্বাস দেন খাঁ সাহেব—"বোস্ কি রে বাচ্চা—এখানে থাকবি—গান শিখবি আমার কাছে।" কত লোকই তো আসে গান শিখতে খান সাহেবের কাছে। দেখছে তো নিতাই অহরহ। শুধু কি বোম্বাই আর পুণা, কাথিয়াওয়াড় আর রাজপুতানা? সারা ভারত ভেঙে আসে সঙ্গীত রসপিপাসুর দল খান রফিউদ্দিনের "কলামঞ্জিলে।"

দিন গড়িয়ে মাস হয়। মাস পেরিয়ে বছর। পুরানো ভীতি যায় হারিয়ে। হারিয়ে যায় সব পুরাতন স্মৃতি। খান রফিউদ্দিনের আদরের দুলাল দিলখুশ খাঁ ভাবতেই পারে না কবে নাকি সে ছিল ভিখারীর ছেলে। হাতে করে মানুষ ক'রেছেন খাঁ সাহেব তাঁর কুড়িয়ে আনা ছেলেকে। তাঁর কল্পনার সঙ্গীতলোক দেখতে পেয়েছেন খান দিলখুসের কণ্ঠে। সান্ত্বনা পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব ঘরানা বাঁচিয়ে রাখার। তাই তো অবাক-বিস্ময়ে সাবাস দিতে দিতে কোলে তুলে নিয়েছেন সঙ্গীতবিশারদ খান রফিউদ্দিন। গায়ে দিয়েছেন রেশমের বুটিদার পিরাণ, মাথায় কাশ্মীরী ফেজ, সাথে করে নিয়ে এসেছেন পঞ্চকোটের হোলীর আসরে।

বাণী বন্দনা গাইলো খান দিলখুস। চন্দ্রকোশ রাগের ধ্রুপদ। সজীব হ'য়ে উঠলো সভাগৃহ। যেন অভিনন্দন জানালো নবীন ওস্তাদকে।

মুবারক জানিয়ে ঢুকলো বুড়ি রুণী বাঈ। বাঁধা আসর ওর। দোল দুর্গোৎসব আর সরস্বতী পুজো এ তিনটে সময় নতুন ক'রে জানাতে হয় না ওকে। ও তো আর নতুন নয়। নতুনের ভেতর এবার সাথে নিয়ে এসেছে মেয়ে রোশনাইকে। পরিচয় করিয়ে দিলে বুড়ি রাজা সাহেবের সাথে, "যার কথা বলেছিলাম হুজুরকে শ্রীপঞ্চমীর মাইফিলে।" আভূমি কুর্নিশ ক'রে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তরুণী বাঈজী রোশনাই। এগিয়ে আসে সারেঙ্গী। তবলা আর মন্দিরা। হোলীর গান ধরেছে রোশনাই বাঈজী। হোলী খেলতে গিয়ে কেমন ক'রে লাজের মাথা খেয়ে একে গড়িয়ে পড়ে আরেকের গায়ে। সরম ভরম গেল কোথা তা'দের? তা'রা না কুলললনা। দরদভরা কণ্ঠে গেয়ে চলে রোশনাই কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণীদের বৃন্দাবন লীলাগীতিকা। গানের মীড়ের সাথে মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের তন্ত্রীগুলো। রোশনাই বাঈজীর চোখে জল।

গেষ্টহাউসের ছোট একটা কুঠরীতে ঘুমুচ্ছিল খান দিলখুস। নারীকণ্ঠের আহ্বানে ঘুম ভেঙে গেল।

"শুনছেন, ওস্তাদজী শুনছেন, কী ঘুম বাবা, উঠুন না একবার। শুনুন, বেরিয়ে আসুন তো।"

ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে এলো তরুণ ওস্তাদ যন্ত্রচালিতের মত।

"আসুন, আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন না পা চালিয়ে।"

জ্যোৎস্নার আলোয় বেশ বোঝা যায় রোশনাই বাঈজীকে। কর্কশকণ্ঠে কী একটা যেন ডেকে উঠলো। চমকে উঠলো ওস্তাদ দিলখুশ। তাইতো! এ করছে কি সে? জেনে শুনে কি বিপদ ডেকে আনবে না কি? না কি অসীম শূন্যতা ভাল লেগেছে ওর! শেষ রাতের বসন্তসমীরণে যেন ঠাণ্ডার আমেজ। সারা পৃথিবীতে যেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস। বেশ লাগে। আভিজাত্যের গণ্ডী থেকে শেকল কেটে বেরিয়ে আসা। মন তার উদাস হ'য়ে যায়। যেন মনের মণিকোঠা থেকে তার ভিখারী বাপ হাতছানি দিয়ে বলে ওরে বৈষ্ণব-রক্ত যে তোর ধমনীতে। তাইতো রোশনাই বাঈজীর ভেতর দেখতে পেয়েছে সে তার প্রাণের ঠাকুর বৃষভানুনন্দিনীর রূপ। শুনতে পেয়েছে রাই অভিসারিকার কণ্ঠ। উন্মাদিনী রাই যেন ডাকে।

"ওগো ওঠো এসো—তোমার জন্যে চেয়ে চেয়ে রাত যে গতপ্রায়।"

"তাইতো!" ডেকে উঠলো নিতাই।

"কে রাই?"

চুপ ক'রে গেল বাউল। বললাম, "তারপর?"

"তারপর যা দেখছো। মিলন হলো চরণদাস বাবার আখড়ায়। ভেক নিলাম দু'জনে। প্রচুর অর্থ রাই-এর। অসদুপায়ের অর্থ সদ্ব্যয় করা হচ্ছে।" হা হা ক'রে বিকট হাসি হেসে উঠলো বাউল।

"কিন্তু ঠাকরুণ ছেড়ে এলেন তাঁর প্রাক্তন জীবন?"

"ধরিনি তো কিছু—তা ছাড়ব আর কি?" পেছন থেকে এগিয়ে আসেন রাই ঠাকরুণ। লজ্জিত হ'য়ে পড়ি আমি। তাঁর উপস্থিতিতে অন্যায় হ'লো না কি তাঁর বিষয় আলোচনা করা?

"ধরা পড়েছিলাম বুড়ি বাঈজীর ফাঁদে।" বলে চলেন রাইঠাকরুণ "গান শিখিয়েছিল বুড়ি—মানুষ করেছিল অমানুষের খোরাক যোগাবার জন্যে। কিন্তু আমি তো ভাই মানুষ খুঁজে পাইনি। সারা দুনিয়া খুঁজে মরেছি কোথায় আমার মনের মানুষ—"

হেসে বললাম, "পেলেন তো এবার।"

অহরহ বৃষ্টির জ্বালায় বেশ ক'দিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি আশ্রমে। বিকেলের দিকে যেন পরিষ্কার হ'য়ে এলো মেঘটা। ভাবলাম দেখি গিয়ে কি করছে ক্ষেপাক্ষেপি এই বাদলায়।

দ্বারকেশ্বরের বড় স্রোতটা মিশে গিয়েছে দক্ষিণ দিকের ছোট স্রোতটার সাথে। আশ্রমের সামনের নিচু জায়গাটা দিয়ে তৈরি করে নিয়েছে তার পথ। একহাঁটু জল পার হয়ে উঠলাম আশ্রমে। কেউ কোথাও নেই। গৌরকুঠরীর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ঠাকরুণ পুজোয় বসেছেন। নিমীলিত নেত্র। আর এক দিন যেমন দেখেছিলাম ঠাকুরকে। কিন্তু এমন সময়ে? বাউল নেই আশ্রমে। গেল কোথায় পাগলা? সন্ধ্যা-আরতির সময় গেল গড়িয়ে। ঠাকরুণ তো উঠলেন না। বানের জল যে বেড়ে আসছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

তিন দিন তিন রাত্তির চললো প্রতিযোগিতা। ওপরে বৃষ্টি নীচে বন্যা। প্রকৃতির প্রলয় লীলা। সূর্য্য উঠলো চতুর্থ দিনের সকাল বেলা। দেহে প্রাণ এলো। বান তখন পড়তির মুখে। মনটা ভারি ছটফট করছিল আশ্রমের জন্যে। যে জায়গায় আশ্রম, তার কি কোন চিহ্ন আছে?

আছে। শুধু চিহ্ন থাকার মতই আছে। দরজা জানালা সমেত সামনের দেওয়ালটার কোন অস্তিত্বই নেই। কুলুঙ্গীর ওপর গৌর-নিতাই। জলে ভেসে চলেছে খোল। বোধ হয় সবাই চলে গেছে তারই অভিসারে।

কত দিন পেরিয়ে গেছে। কত মাস কত বছর। সংসারের ঘানিতে পেষাই হ'য়ে গেছে সব পুরানো স্মৃতি। কী খেয়াল হ'ল সেদিন জয়দেবের মেলা দেখতে হবে। বাংলার বাউল বোষ্টুমের না কি মেলা বসে ওখানে।

বাউলের গান হচ্ছিল হ্যারিকেন টাঙিয়ে। কোমরে ডুগি, হাতে একতারা। সাদা চুলের চুড়োবাঁধা মাথা নেড়ে নেড়ে গেয়ে চলেছে বাউল—

"পাখী মোর উড়ে গেল রে মন"...

যেন চেনা চেনা। যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। অজান্তে এগিয়ে এসেছি কখন। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। গান গেল থেমে। হকচকিয়ে উঠলো সবাই। চিবুকে হাত দিয়ে বললে বুড়ো "কে রে আমায় নিমাই চাঁদ"—হো হো করে কেঁদে উঠলো বাউল। "বলতে পারিস আমার রাই কোথা?"

অন্ধকার রাত্রে অজয়ের শুকনো বালিতে বসলাম দুজনে, আবার কতকাল পরে যেমন ক'রে বসতাম দ্বারকেশ্বরের বালুচরে।

"বললে কি জানিস্! বললে তুমি আমার কত যুগের কামনার ধন! চম্‌কে উঠলাম আমি। সে কি গো! আমি যে ভাই নিষ্কাম ভিখিরী! পালিয়ে এলাম। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। কিন্তু ভুল হ'য়ে গেল রে ভাই! মনটাকে তো ছুঁড়ে ফেলা যায় না। রাই যে আমার গোটা মনটা জুড়ে বসে আছে। ফিরে গেলাম পুরানো আখড়ায়। কেউ কিছু সংবাদ দিতে পারে না ঠিক্ কোরে। আজ পঁচিশ বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি রাই কোথা, কোথা রাই বলে। একদিন পাবোই দেখা! কি বলিস্!" হাসতে হাসতে চোখের জলে বুক ভেসে গেল বাউলের।

তিক্ত প্রসঙ্গটা বাড়িয়ে লাভ কি? বললাম, "দাদা শোবেন কোথায়?"

"তুই যেখানে শুবি!" যেন কতকাল পরে সাক্ষাৎ পেয়েছে কত আপনার জনের।

পাশাপাশি শুয়ে সন্ন্যাসী আর গৃহী। নিষ্কাম ভিখিরী আর কাম-কাঞ্চন-বিলাসী! ভাবছিলাম কত আশা! কত বুড়ো হ'য়েও আশায় বুক বেঁধে দৌড়াদৌড়ি করছে বাউল নবদ্বীপের রাসের মেলা আর জয়দেবের পৌষ সংক্রান্তি, পুরীর রথযাত্রা আর কৃষ্ণনগরের দোল। বছর বছর যেখানে সমবেত হয় হাজার হাজার বোষ্টম, বাউল। পাবেই সাক্ষাৎ একদিন। উনতিরিশ সালের বানের কথা কি শোনেনি বুড়ো?

বললাম, "দাদা—দাদা—শুনুন"—

চোখ মেলে দেখি কোথায় দাদা! যেন ভোর হয়ে গেছে। কেন্দুলীর মাটিতে নেমে এসেছে কুয়াশা। পাগলা বাউল গেল কোথা? বায়ুতে কি লয় হ'য়ে গেল না কি?

অলিভার ক্রমওয়েলের পত্রাবলী

[সংবাদপত্রে মুদ্রিত পত্র হিসাবে ক্রমওয়েলের এটি প্রথম পত্র। তখন তিনি "বীর সৈনিক ক্রমওয়েল" রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পত্রখানি অনেক সরকারী রাজকর্মচারীকে লিখেছিলেন; তবে সম্বোধিত রাজকর্মচারীর নামটি পাওয়া যায় না বর্তমানে। প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্বের পটভূমিকায় পত্রটি লিখিত।]

গ্রান্টহাম
১৩ই মে ১৬৪৩ খৃঃ

মহাশয়,

ঈশ্বরের কৃপায় আজকের সন্ধ্যায় শত্রুর বিপক্ষে আমরা জয়লাভ করেছি। নানা রঙের ঘোড়া নিয়ে তাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী সুসজ্জিত ছিল এবং তিন বা চার বাহিনীর পদাতিক সৈন্য ছিল।

সন্ধ্যার শেষের দিকে আমরা ফিরছিলাম—শহরের দু' মাইলের মধ্যে তারা এসে পড়েছিল এবং আমাদের মুখোমুখি হয়ে তারা দাঁড়িয়েছিল। যখনই আমরা সঙ্কেত পেলাম তখনই আমরা সৈন্যবাহিনী স্থাপন করলাম—সেই সৈন্যবাহিনীতে দশটি বাহিনী ছিল—তার মধ্যে আবার কয়েকটি বাহিনীর অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়ত আর হতে পারে না—সেই সৈন্যবাহিনী দেখলে আপনিও এই কথা বলতেন, তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই সামান্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমরা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিলাম। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলাম—দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অপরের দেহের অংশ হাতবোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে—পদাতিক বাহিনী ওপরের উভয় দিকে গোলা ছুঁড়ছিল। আর আধ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশী সময়ের মধ্যে আমাদের দিকে আমাদের মধ্যে শত্রু বাহিনীকে না আসতে দেখে আমরা তাদের আক্রমণ করবার মনস্থ করলাম। দুই দিকে বহু গোলা নিক্ষেপের পর আমাদের ক্লান্ত দেহ নিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম—এবং একরূপ বৃত্তাকারেই আমরা অগ্রসর হলাম, আর তারা আমাদের প্রতিহত করবার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। আমাদের লোকেরা তাদের ভীষণ ভাবে আক্রমণ করল এবং ভগবানের কৃপায় সেই দাঙ্গাকারীরা পালিয়ে গেল। তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমরা দু' তিন মাইল পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম। তারা এলোমেলো ভাবে পশ্চাদপসরণ করেছিল।

আমার মনে হয়, আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের দুই বা তিন জন লোককে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল যখন তারা পশ্চাদপসরণ করছিল, কিন্তু মৃত্যুর খতিয়ান কততে গিয়ে পৌঁছেচে সে-বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই। আমরা পঁয়তাল্লিশ জন লোককে বন্দী করেছি। অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তি ছাড়া আমাদের বহু বন্দীকে মুক্তি করেছি—এই সব বন্দীদের আমাদের কাছ থেকে তারা নিয়ে গিয়েছিল—এখন আমি বিশ্রাম করছি। ইতি

ভবদীয় অলিভার ক্রমওয়েল।

নিম্নে বর্ণিত পত্রটিও প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্বের ভূমিকায় লিখিত। Lincolnshire প্রায় শত্রু-কবলিত হয়ে পড়েছিল। শত্রুসৈন্যের হাত থেকে নগরীটি মুক্ত করবার জন্য নগরীর পুরশাসক এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে পত্রটি লিখেছিলেন।

Lincolnshire
২৮শে মে ১৬৪৩ খৃঃ

মাননীয় Colchester-এর পুরশাসক ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ,

আপনাদের পুনরায় লেখা আমার কর্তব্য বলে মনে করি, কারণ একটি মহৎ কাজের জন্য আমাদের কাছে আপনাদের আরও শক্তি পাঠাতে হবে। আমি অনুমান করি যে, লর্ড ফেয়ার ফক্সের পরাজয়ের কথা আপনারা শুনেছেন। আমাদের ওপর ভগবানের অশেষ কৃপা। আর এই কৃপা যদি আমাদের ওপর না থাকত তা হলে লর্ড ফেয়ার ফক্স জানতেন না যে কী ভাবে প্রতিহত করতে হয়। আপনাদের নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি যে শত্রুসৈন্যকে দমন করতে না পারলে আপনাদের ওপর গিয়ে তাদের চড়াও করা ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না।

আমাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে আপনারা আমাদের ঘাঁটিকে কেন শক্তিশালী করবেন না; এই অবহেলার বিচার আপনারা করুন আর ভাবুন কত অসুবিধা, অদূরদর্শিতা আর অসঙ্গতি আপনাদের ওপর শেষে বর্তাবে। নিজের বিচার-বিবেচনা ছাড়া আপনাদের আমি আর লিখব না: আমি আপনাদের আবার বলি—আর আমার এ-কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে আপনাদের ওপর বিপদ আসবে। আমার কর্তা নিউ ক্যাসেলের ছ' হাজার ফুটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। আর যাট ঘোড়সওয়ার বাহিনীর পরে আমার প্রভু ফেয়ার ফক্স তিন হাজার ফুটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। আর নয় ঘোড়সওয়ার

বাহিনীর পর আমরা ছাব্বিশটি ঘোড়সওয়ার বাহিনী আর পদাতিক সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সৈন্যরা কেমার কম-এর কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। আমার ক্রিয়াকলাপ এবং আপনাদের কর্মিতকর্মা ভাব খুব ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত, আর এ না হলে আপনাদের ভাল আর কিছু করতে পারব না।

আপনারা যদি সাহায্য পাঠান তবে আপনাদের সৈন্যবাহিনী বোস্টনে যেন আসে। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের কাছে সৈন্যবাহিনী দ্রুত সত্বর পাঠান। অর্থের কথা ভুলবেন না। খুব পীড়াপীড়ি আমি করছি না যদিও সাহায্যের প্রয়োজন আমার কাছে আছে। আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি পদাতিক সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। একটা হতভাগ্য ভদ্রলোকের ঘাড়ে বেশী বোঝা চাপাবেন না; আর এই হতভাগ্য ভদ্রলোক তার জীবনের সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাদের হিতের জন্য, সেবার জন্য সব কিছু নিঃশেষে দিতে চায়। আমার জন্য আপনাদের অর্থ প্রার্থনা করছি না আমার যদি উদ্দেশ্য থাকত, কোন কিছু আশা করতাম (অর্থাৎ যে অর্থ আমি পদের জন্য পাই) তা হলে আমি মুখ খুলতাম না। আমি নিজেকে অযথাকারে ইচ্ছুক হতে পারি কিন্তু তাতে অপরে প্রীত হবে না। আমি অনুরোধ করি সৈন্য ও রসদ পাঠান। আমাদের প্রার্থনা ভুলবেন না। ইতি

ভবদীয় অলিভার ক্রমওয়েল।

প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষপর্বে ক্রমওয়েল Ely নামক স্থানের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট আইন পাশ করে। Ely-এর ধর্মযাজক আইন বহির্ভূত ধর্মীয় বক্তৃতা দিতেন। সেই ধর্মযাজকের অপরিণামদর্শিতা দেখে ক্রমওয়েল নিম্নবর্ণিত পত্রটি সেই পুরোহিতকে লেখেন। ক্রমওয়েলের নির্দেশ সেই পুরোহিত প্রথমে মেনেননি। ফলে ক্রমওয়েল স্বয়ং সেই পুরোহিতের কাছে যান এবং পুরোহিতের নির্বুদ্ধিতাকে তিনি ভর্ৎসনা করেন।

Ely 10. 1. 1643.

শ্রীযুক্ত হিচ,

পাছে সৈন্যরা কোন উত্তেজনা বা উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ কাথেড্রাল চার্চের সংস্কার চেয়ে বসে এই কারণে আপনাকে অসৌজন্যমূলক এবং গর্হিত প্রার্থনাসভার কাজ হতে বিরত থাকতে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই এবং এর পরে যদি কোন গণ্ডগোল দেখা যায় তবে আপনাকে জবাবদিহী করতে হবে। আমার উপদেশ হল, মৌখিক পাঠ দিন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিন যার ফলে পার্লামেণ্টকে তারা সন্দেহের চোখে না দেখে, এবং ঈশ্বরের পরম অস্তিত্ব বিষয়ে উপদেশ দিন সকলকে। আশা করি এ-সব আপনি সম্যক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব বেশী ধর্মপাঠ করেন এবং আপনার ধর্মপাঠের তালিম সাধারণ পর্য্যায়ের স্তর ছেড়ে 'মাত্রাতিরিক্ত' হয়ে উঠেছে। ইতি

আপনার প্রিয়বন্ধু, অলিভার ক্রমওয়েল।

রচনাকাল: প্রথম গৃহযুদ্ধের শেষ পর্ব।

পত্রটির শিরোনামায় লেখা ছিল আমার প্রিয় ভাই কর্ণেল ভালান্টাইন।

কর্ণেল ভালান্টাইনের সঙ্গে ক্রমওয়েলের সহোদরার বিবাহ হয়েছিল।

League before york, 5th July 1644.

প্রিয় মহাশয়,

বিচারের সময় বা শোকের সময় ভগবানের গুণগান শ্রদ্ধার সহিত করা উচিত যাতে আমরা একসঙ্গে দুঃখ প্রকাশে সমর্থ হই।

বাস্তবিক ইংলণ্ড এবং ঈশ্বরের গির্জাগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে বহু আশা ভরসা পেয়েছে, কারণ এ-রূপ ঘটনা যুদ্ধের পর আর ঘটে নি, এ পূর্ণ পরাজয়ের লক্ষণ, আমাদের দল মুখ্যতঃ ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে। আমরা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ কখনই করি নি তাদের আমরা নির্মূল করেছি। কতগুলো ঘোড়া থাকার জন্য যে দক্ষিণের বাহিনী আমি পরিচালনা করেছিলাম সে-বাহিনী কয়েকজন ছটকে আমাদের ঘাঁটির কাছে রক্ষা করেছে আর রাজকুমারের সমস্ত ঘোড়াগুলোকে আঘাত হেনেছে। আমাদের অস্ত্রের কাছে তারা মাথা নত করেছে। আমাদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী দিয়ে তাদের পদাতিক বাহিনী আমরা আক্রমণ করেছিলাম। বিশদ বিবরণ এখন আমি দিতে পারব না—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, রাজকুমারের কুড়ি হাজার সৈন্যের মধ্যে আর চার হাজারও অবশিষ্ট ছিল না।

মহাশয়, গোলার বর্ষণে তোমার ছেলে মারা যাওয়ায় ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। তার পা ভেঙে গিয়েছিল। প্রয়োজনবোধে তার পা কাটতে হয়েছিল, তারপর সে মারা যায়। ভাই, বিচার এই ভাবে হয়েছে: আমাকে ঈশ্বর তবুও সাহায্য করেছেন—আমরা বিবাদ করছি আর বেঁচে আছি। তোমার অমূল্য ধন আনন্দে পূর্ণ ছিল; দুঃখ আর পাপ তাকে আর জানতে হবে না। সে সাহসী মহানুভব যুবক ছিল। ঈশ্বর তোমাকে সান্ত্বনা দিক। মৃত্যুর আগে তার এত সন্তোষ ছিল যে সে তার আমার পক্ষে বা আরও কারো পক্ষে বর্ণনা করা অসম্ভব। "ব্যথার চেয়েও এ মহৎ"—এ কথা তোমার ছেলে বলেছিল, কিছুক্ষণ পর বলেছিল এক গুরুভার তার ওপর বর্তিয়েছে। আমি তাকে বললাম সেটি কী? সে বলল শত্রু সৈন্যদের হত্যা করবার হাত থেকে ঈশ্বর তাকে মুক্তি দিয়েছে, এ-তে তার যন্ত্রণা লাঘব হয়েছে। তার ঘোড়া মারা যাওয়ার পর গুলীর আঘাতে ভূপতিত হয়। আমি জানালাম আমাদের আরও তিনটি ঘোড়া ছিল। তাদের ছেড়ে দেওয়া হল এবং তোমার ছেলে বলল দক্ষিণ আর উত্তর দিক উন্মুক্ত করতে—যাতে সে দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যাওয়া দেখতে পায়। সৈন্যদলে সকলেই তাকে ভালবাসত যারাই তাকে চিনত—কিন্তু ঈশ্বরে প্রয়োজনের জন্য কমলোক তাকে চিনল; কারণ সে রত্ন ছিল।

ঈশ্বর স্বর্গে মহৎ সত্ত্ব, এই জন্য বেশী আনন্দ করার তোমার হেতু আছে। এ-সান্ত্বনা তোমার দুঃখকে নিঃশেষে পান করুক, কারণ এ যা বলছি তা সান্ত্বনার জন্য অর্থহীন শব্দ নয়—উপরন্তু এ-গুলো বাস্তব, সন্দেহাতীত সত্য। ক্রাইষ্টের শক্তিতে তুমি সব কিছু করতে পার। তা খোঁজ, তা হলে তোমার বিচার তুমি সহজে সইতে পারবে। চার্চের দেবতার কাছে তোমার এই করুণা তোমার ব্যক্তিগত দুঃখ উপশম করবে—ঈশ্বরই তোমার শক্তি হোক এই প্রার্থনা করি—

তোমার বিশ্বাসী অনুগত প্রিয় ভাই

অলিভার ক্রমওয়েল।

রচনাকাল : স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ

Alwinck 17-7-50.

ভাই Richard Mayorকে লিখিত

লণ্ডনে আমার অনেক কাজ ছিল বলে আমি নীরব ছিলাম, এর জন্ত আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এর সাক্ষী শুধু আমি, আপনার বা আপনাদের কোন স্নেহ আমি চাই না কারণ আপনারা আমার জন্ত প্রার্থনা করেন। সেই ছোট ছেলেটি কী করছে জানাবেন। বাপ মা আমার প্রতি অবহেলা দেখালে দোষারোপ করব না। আমি জানি আমার ছেলেরা অলস কিন্তু এককালে পুতুলের প্রতি আমারও আকর্ষণ ছিল। আমি সন্দেহ করি সত্যিই কী সেই মেয়েটির স্বামী মেয়েটিকে নষ্ট করেছে—প্রার্থনা করি আমার কাছ থেকে সে কিছু জানুক। প্রচুর সময় আমার হাতে থাকলে তাকে আমি লিখতাম। আমার মেয়ে যদি সন্তান প্রসব করে তবে তাকে ক্ষমা করব, তবে তার লালন পালন বিষয়ে আমার অন্ত মত। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করুক। আমি আশা করতে পারি আমার ছেলেকে আপনি সৎপরামর্শ দিচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি এর প্রয়োজন আছে। বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনে সবচেয়ে বিপদকাল। আর তা ছাড়া পৃথিবী অন্তঃসারশূন্য। খৃষ্টের কাছাকাছি থাকা কত ভাল। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন অন্ত কোন প্রীতিপ্রদ কাজ নাই। তাঁকে ডাক। তা হলেই তুমি আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে। তুমি জান, কত কাজের চাপ আমার ওপর। আমার করুণার প্রয়োজন। আমি বুঝি আর কি কী অনুভব করি। পৃথিবীতে রাজপ্রাসাদ আর ব্যবসাই সব চেয়ে কাম্য বস্তু নয়। আমি পৃথিবীতে সান্ত্বনা পেতাম না, যদি না ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস থাকত। সত্যিই এসব আমি চাইনি। তাদের দিকে তাকিয়ে ভগবান আমাকে এ কাজে নিয়োগ করেছেন। সেই জন্ত আশা নাই এমন কথা বলতে পারি না; কারণ পরমপিতা সামান্ত প্রাণীকে দিয়ে তাঁর মনের ঈপ্সা পূরণ করেন। তিনিই আমার ভবিষ্যত পূর্ণ করবেন। এ-ক্ষেত্রে আপনার প্রার্থনা আমি চাই। আমার স্নেহের বোনের কাছে, ভাইয়ের কাছে, ছেলের কাছে এবং সংসারের অন্ত সকলের কাছে আমি তাদের প্রিয় স্মৃতিমাঝে উদিত হতে চাই। ইতি—

অলিভার ক্রমওয়েল

স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধকালীন অবস্থায় পত্নীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। পত্রটাই পত্রের অন্তঃসঙ্গতি।

Edinburgh
12. 4. 1651.

আমার প্রিয়তম,

ঈশ্বরকে প্রশংসা করি, জগতের মানুষ হিসাবে আমার শক্তি আরও বেড়েছে; কিন্তু এ আমাকে তৃপ্তি দেবে না যদি না আমি একটি মানুষকে ভালবাসতে না পারি এবং স্বর্গীয় পিতার সেবা উত্তমরূপে সমাধা না করতে পারি। আর যদি না সেই পরমপিতার মুখ হ'তে নিঃসৃত আলোক না দেখি—যে আলো জীবনের চেয়েও ভাস্বর, এবং আমার নানা দুষ্কর্মের মধ্যেও অধিকতর ভাস্বর আর এই আশাতেই আমি সঞ্জীবিত আর আমি এমন আশা করি না যা থেকে আমি ভাল ফল পেতে না পারি। আমার জ তুমি প্রার্থনা কর—আমি সত্যই তোমার জন্ত এবং আমার প্রি সংসারের জন্ত রোজ প্রার্থনা করি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর গু আশীর্বাদ আমাদের ওপর করুন।

প্রিয়তম, ঈশ্বরের অনন্ত করুণার কথা মনে রেখ। হতভাগ বেটি'র কথা ভাবি। আমি ভাবি সে যেন প্রয়োজনবোধে ঈশ্বরে না খুঁজে প্রতি কাজে ঈশ্বরের অভিমুখে সত্যই সে অগ্রসর হয় যে এবং আরও সান্নিধ্য লাভ করে যেন এবং প্রতারণা থেকে কলে হৃদয়ের প্রতি সে যত্ন করে যেন; আর পৃথিবীর গর্ব, পার্থিব সংসর্গে প্রতারণায় হয়ত সে সেই খপ্পরে পড়ে—এই সন্দেহই আমি করি আমি বেটির জন্ত আর বেটির স্বামীর জন্ত সর্বদা আন্তরিকতা সহিত প্রার্থনা করি। বাস্তবিক তারা আমার প্রিয়। আ আমার ভয় হয় পাছে শয়তানেরা তাদেরকে প্রতারণা করবে। জা আমাদের অন্তর কত দুর্বল, আর প্রতিকূলে সব কত তুচ্ছ আ আমাদের হৃদয়ের প্রবঞ্চনা কেমন আর এই মিথ্যা জগৎ আমাদে প্রলুব্ধ করে থাকে। ভগবানের নিষ্কলঙ্ক মন তাদের ওপর ভ করুক। ঈশ্বরকে সত্যের মধ্যে তারা খুঁজুক এবং তা হলে ঈশ্বরে তারা পাবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের আমার ভালবাসা দিও; তারা সুস্থ সুখী হোক এই প্রার্থনাই করি। তারা পত্র দিয়েছে বলে আ খুশী, তারা আমাকে আরও বেশী পত্র দেয় যেন।

লর্ড হাবার্টের আমাদের গৃহে ঘন ঘন আসা বিষয়ে সাবধ থেক। তিনি যদি আসেন কুৎসা রটতে পারে এই ভেবে যে আ তাঁর সঙ্গে দর কষাকষি করছি। আমার কথা তুমি নিশ্চ বুঝতে পারছ।…আমি আর লিখতে পারছি না—আমি ক্লা নিজেকে বিশ্রাম দিই। ইতি—তোমারই

অলিভার ক্রমওয়েল

রচনাকাল : স্কটল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধ। পত্রটি পত্নীকে লিখিত

Edinburgh, 3rd May 16

আমার প্রিয়তম,

এই পদ হতে পদত্যাগ করতে আমি আদৌ ইচ্ছুক নই যদিও এ বিষয়ে আমার বেশী কিছু বলবার নাই। তবু আম প্রিয়তমের কাছে লিখতে আমি ভালবাসি কারণ প্রিয়তম আম অন্তরের মধ্যে রয়েছে। তোমার আত্মা সঞ্জীবিত হচ্ছে এ ক ভাবতেই আমি দীপ্ত হই: ঈশ্বর তোমার ওপর করুণা বেশী পরিম বর্ষণ করেছেন। তোমার অন্তর এই ভাব ভাবতে পারে কারণ ঈ তাঁর মুখনিঃসৃত জ্যোতি তোমার ওপর বর্ষণ করেছেন। আর জীবনের চেয়ে ভাল। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনাকে আশীর্বাদ করে এবং অপরের কাছে তোমাকে উদাহরণ হিসাবে খাড়া করছেন। প্রা করি ঈশ্বরের প্রার্থনা তুমি শোন এবং সর্বদা সেগুলি গ্রহণ কর

আমি জেনে আনন্দ পেলাম এই জন্ত যে, ছেলেমেয়েরা তো কাছে আছে। আমি আশা করি ভাল পরামর্শ শোনবার সুযে দেবে ছেলেকে। আমার কর্তব্য যায় প্রতি আছে, এ কথা মা জানিও। সংসারের অন্ত সকলকে আমার কথা বল আর আমার প্রার্থনা কর। ইতি—

তোমার অলিভার ক্রমওয়েল

পত্রটি ক্রমওয়েল কর্তৃক লিখিত। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনি পার্লামেন্টের সর্বময় কর্তারূপে সমাসীন ছিলেন। এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তি ইংলণ্ডের বিপক্ষে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই কারণে তিনি পুত্রকে লেখেন এ বিষয়ে অবহিত করার জন্ত। পুত্র হ্যারীকে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের সর্বপ্রধান সামরিক পদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

Whitehall.

26th August 1656

পুত্র হ্যারী,

কয়েকজনের মুখ থেকে শুনলাম যে পুরাতন শত্রুরা আয়ারল্যাণ্ড এবং কমনওয়েলথের অপরাপর অংশ আক্রমণ করবার জন্ত মতলব আঁটছে—আর শত্রুপক্ষ জাতীয়তাবাদী লোকেরা বহু পত্র লিখছে যাতে করে সেই খানে হঠাৎ বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সুতরাং আমরা এই ভাবতে পারি যে তুমি যথাযথ উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছ—যাতে করে আমাদের শক্তি যে কোন অবস্থার জন্ত তৈরী হয়ে বসে আছে। আর সেই প্রান্তে তুমি যত বেশী পার তত বেশী পরিমাণে আয়ারল্যাণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে যোগ রাখবে—আর সৈন্যবাহিনীর দুটি তিনটি দল বেশ বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে রাখার—প্রয়োজন বোধে যাতে করে আমরা সাহায্য পেতে পারি। আর ও বিষয়ে তুমি যত্ন নেবে সব চেয়ে ভাল যত্ন নেবে যার ফলে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করা যায় এবং যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করা যায়—আর এই জন্ত উত্তরের দিকে বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হবে—সেখানে নানা অসন্তুষ্ট ও কর্মিতকর্মা লোক নতুন আলোড়নের জন্য সচেষ্ট, আর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি সন্দেহ করছি না, তা হলেও তুমি কর্ণেল কাওপারের কাছে এ সংবাদটা জানাবে। পরিশেষে এই বিপদ বিষয়ে তিনি আরও পরিশ্রম করবেন এবং সাবধান হবেন।

ইতি—

তোমার স্নেহময় পিতা।

Cockpit, Liverpool.
17. 12. 60

স্বামীকে লিখিত শ্রীমতী এলিজাবেথ ক্রমওয়েলের পত্র।

প্রিয়তম,

আমি ভেবে অবাক হই যখন তুমি এই বলে দোষারোপ কর যে তোমাকে আমি প্রায়ই চিঠি লিখিনি—বিশেষতঃ সেই সব ক্ষেত্রে যখন তোমার একটা পত্র পেয়ে তোমাকে তিনখানা পত্র লিখেছিলাম। আমি ভেবে নিশ্চিত যে পত্র কৈবল্য লাভ করেছে। পাছে তোমার প্রতি এই কাজে আমার অবহেলা ফুটে ওঠে যদি সত্যিই আমি নিজেকে জেনে থাকি তা হলে বলতে পারি আমি পত্র না লিখে থাকতে পারি না। তুমি কি ভাবতে পার পত্র না দিয়ে তোমাকে অবহেলা জানাব? এর চেয়ে আমি আমাকে অবহেলা প্রদর্শন করব।

কিন্তু প্রিয়তম, যখন তোমাকে পত্র দিই তখন তোমার পত্রের উত্তরে খারাপ কিছুই লিখি না। আর একথা ভাবতেই আমার মনে হয় তোমার কাছে আমি নগণ্য এবং আমার অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে তোমার প্রেম ঢেকে রাখে।

তুমি যে আমাকে দেখতে চেয়েছ এর জন্ত কত আনন্দ আমার হচ্ছে। তবু ঈশ্বরের করুণার কাছে নিজেকে আমি সমর্পণ করব যিনি আমাদের দু' জনের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছেন এবং যাঁর কৃপায় আমরা আবার মিলিত হব। তাই তার নাম আমরা করব। সত্যি তোমার অনুপস্থিতিতে আমার জীবন অর্দ্ধেক বলে মনে হয়। ঈশ্বর এ-ও কী তাঁর নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেন যা আমি তার মহত্বের জন্য স্বীকার করব?

তুমি ভাবছ অন্ত জনের কাছে আমি লিখব যাদের কথা আমার মনে আছে। প্রিয় নিজে ভুল করে ভেব না যে আমি তোমাকে কম পত্র দিই, আমি প্রার্থনা করি তুমি তোমার অনুরাগিণীকে মনে রেখ।

ইতি—

তোমারই এলিজাবেথ ক্রমওয়েল।

এই সেই—সে তো নেই

শেখ সিরাজুদ্দীন আমেদ

স্মৃতির পাহাড় হোতে পথ এঁকে-বেঁকে
চলে গেছে দূর ঐ বিস্মৃতির জলে
জীবনের সব ফুল সব ঝরা পাতা
গ'ড়ে গেছে পথ'পরে শবের মিছিল
কিছু তার ঢাকা আছে ধূলির চাদরে
কিছু তার কিছু বাকী নেই
কিছু সব ব'য়ে আনে ঝড়ো হাওয়া জলে
জলে-গলা স্মৃতিপট রোমন্থন করে
ঝরা পড়ে ঝরা পাতা ;
স্তিমিত পথ আলতো কোরে হেঁটে
আচমকা ফিরে এসে ভাবি
—এই সেই,—কই, সে তো নেই।

সিরিয়ার জাগরণ

রেজাউল করীম

বহু প্রাচীন দেশ বিলুপ্ত হয়েছে কালের অনন্ত গর্ভে। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পসাহিত্যের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা করে তাদের অতীত ইতিহাসের যৎসামান্য উদ্ধার করেছেন, সেগুলি ব্যতীত তাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানবার উপায় নাই। সিরিয়া এমনি একটি প্রাচীন দেশ। বহু শতাব্দী ধ'রে নানা ভাবে বিভিন্ন পথে পরিক্রমা করতে করতে ধীরে ধীরে সিরিয়ার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সিরিয়ার উপত্যকা, তার পাহাড়-পর্বত, তার দিগন্ত-প্রসারী মরুভূমি, তার নদীনালা, সাক্ষ্য দেয় যে, সিরিয়া আদিযুগে মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করেছে।

কাল বড় কঠিন বিচারক। কালের কুটিল কশাঘাতে ও তার অমোঘ বিচারে বহু জিনিষ ধ্বংস হয়ে গেছে। এই কালের অমোঘ দণ্ডে সিরিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন আজ লুপ্তপ্রায়। আধুনিক যুগে বিবিধ প্রকার খননকার্য্যের ফলে প্রতি বছর সিরিয়ার বলিষ্ঠ অধিবাসীদের গৌরবের বস্তুগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সিরিয়ার উপর কত বিজয়ী জাতির অভিযানের ঝড় বয়ে গেছে। কত আক্রমণকারীর দুর্ব্বার ধাক্কা পড়েছে তার উপর। কিন্তু এসব সহ্য করেও দীর্ঘ যুগ ধ'রে সিরিয়া বহু সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। এর ফলে এখানে একটা সামগ্রিক ও সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, সিরিয়া বরাবর একটা উন্নত সভ্যতার মানদণ্ড বজায় রেখেছে।

সিরিয়া প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র-বিন্দু। অতীত যুগের প্রায় ছ'হাজার বছরের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, সেই আদিযুগেও এখানকার অধিবাসীরা একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল, তারই সাহায্যে তারা উন্নত ধরণের চাষ করত। সমুদ্রের তীরে তীরে দাঁড়বাহী জাহাজে ক'রে তারা ব্যবসায় বাণিজ্য করত। এরা মৃত্তিকা ও প্রস্তর দিয়ে বড় বড় অট্টালিকা ও সুন্দর সুন্দর বাসভূমি নির্ম্মাণ করত। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু ধাতু দিয়ে তৈয়ার করত। অতি প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি সিরিয়া একটি জাগ্রত ও জীবন্ত সভ্যতা বজায় রেখেছে। বিশ্বের ইতিহাসের উপর তার সভ্যতার ছাপ দেদীপ্যমান। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সিরিয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে তৎকালজ্ঞাত বিশ্বের ইতিহাস।

সিরিয়ার প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রাচীন যুগে সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে যারা বসবাস করত, তারা ছিল সেমিটিক জাতির গোষ্ঠিভুক্ত। এই সেমিটিকগণ খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব্বে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে এতদঞ্চলে এসেছিল। সেমিটিকদের এই শাখা অ্যামোরাইট (Amorites) বলে অভিহিত অ্যামোরাইটদের বসতি স্থাপনের বহু পূর্ব্ব থেকে সিরিয়া ও মিশর বরাবরই আরবদেশের সহিত সংস্রব রক্ষা করে চলত। আরব উপদ্বীপ থেকে প্রতিবছর জনস্রোত সিরিয়া অভিমুখে ধাবিত হ'ত। উর্ব্বরতা আর কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান এই দুটি কারণে সিরি বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল দেশ ছিল। মিশর, ক্রীট, গ্রীস এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, এমন এই সব দেশের সহি সিরিয়ার প্রচুর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বহু যাযাবর জাতির নিক সিরিয়া প্রলোভনের বিষয় হয়ে পড়েছিল। সিরিয়ার দক্ষিণপ্রান্তে ছিল বিশাল মরুভূমি। সেইজন্য আরবদের উপজাতিগুলি যখনই জনসংখ্যার চাপ অনুভব করত, তখনই তারা মরুভূমি পার হ সিরিয়া চলে আসত এবং বসতি স্থাপন করত। এই সব প্রাচী জাতি ও উপজাতির পৃথক নাম ছিল, তাদের পৃথক সভ্যতা ছিল সত্য বটে, তারা বিভিন্ন সময়ে সিরিয়াতে বসবাস আরম্ভ করে কিন্তু একই দেশে বহুদিন বাস করার ফলে তাদের মধ্যে একটা ঐ স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে এই সব সম্মিলিত জাতি উপজাতিগুলি "সেমাইট" নামে অভিহিত হয়েছে। একথা সত্য এদের অনেকে আরব-বংশসম্ভূত। কিন্তু কালক্রমে তারা সিরিয়াতে একই জাতিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীযুগে সিরিয়া এমন স জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, যারা আরবও নয়, সেমিটিকও নয় তারা ছিল হিটাইটস (Hittites) এবং হুরিয়ানস্ (Hurrians) এ খৃষ্টপূর্ব্ব দু'হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনর থেকে সিরিয়া বসবাস করবার জন্য এসেছিল। মহাবীর আলেকজান্ডারে সিরিয়া অধিকারের পর বহু গ্রীস এখানে বসবাস আরম্ভ করল এর পরে রোম যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত সিরিয়া দখল করে ছি তখনও বহু গ্রীক এখানে বসতি স্থাপন করে ছিল। সিরিয় সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, উক্ত দে পালাক্রমে মিশর, পারস্য, ও বাইজানটাইন কর্ত্তৃক বহু বার অধিকৃ হয়েছিল। কিন্তু এত সব বৈদেশিক অভিযান ও অধিকার সত্ত্বে সিরিয়া সকল সময় আরব উপদ্বীপের সঙ্গে বন্ধন অটুট রেখেছি এবং এর সেমিটিক কালচারকেও সযত্নে রক্ষা করেছিল। সিরিয় অধিবাসীদের অ-সেমিটিকগণ এর সভ্যতা ও জাতীয় ভাষার দ্বা প্রভাবিত হয়েছিল।

সিরিয়ার উপর যে সব বৈদেশিক শাসক দীর্ঘকাল ধরে রা করেছে, তাদের পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাদের পতন হয়েছে, তা এসেছে আর চলে গেছে। কিন্তু সিরিয়ান জাতি বরাবর ভিত্তির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারা এব সুস্পষ্ট জাতীয়তার মান রক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়, তা সেমিটিক আরবজাতির সহিত সম্পর্ক রক্ষা করেছে। তাদের উ যুদ্ধ হয়েছে, বিপর্য্যয় এসেছে, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও হয়ে —এই সব উপদ্রব সমগ্র ভৌগোলিক সিরিয়াকে একটা রাজনৈতি ঐক্য দিতে পারেনি, কিন্তু তবুও সিরিয়ার অধিবাসিগণ বিশ্বসভ্যত ভাণ্ডারে কিছুটা দান করতে পেরেছে।

অ্যামোরাইটগণই প্রথম বৃহৎ সভ্যজাতি, যারা খৃষ্টপূর্ব্ব তিন হাজ থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে সিরিয়াতে বসতি স্থা করেছিল। আলেপ্পো অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে, তারা ছোট ছোট রা স্থাপন করে। অ্যামোরাইটগণের সমসাময়িক কালে ইউফ্রে নদের অববাহিকা ও মেসোপটেমিয়াতে বসতি স্থাপন ক্যানানাইটগণ (Cannanites) এদের কিছু অংশ প্যালেষ্টাইনে এসেছিল। এই অঞ্চলে তারা কয়েকটি নূতন নূতন নগর স্থা করল, তাদের মধ্যে জেরুজালেম এবং হেবরণ (Hebr

উল্লেখযোগ্য। ক্যানানাইটগণের একটি শাখা ভৌগোলিক সিরিয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলের উত্তর দিকে বসবাস করতে থাকে। এদেরকে সাধারণতঃ ফিনিশিয়ান বলা হয়। সভ্যতার ভাণ্ডারে ফিনিশিয়ানগণ যথেষ্ট দান করেছে—তারাই ঐ অঞ্চলের বর্ণমালার প্রথম উদ্ভাবক। নৌ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি তারাই করেছিল সে যুগে।

যিশুখৃষ্টের জন্মের পনর শ' বছর পূর্ব্বে আরমেয়ানগণ (Armaeons) সিরিয়াতে বসবাস করতে থাকে। তারা সিরিয়ার উত্তর দিকে শামালের (Shamal) মধ্য ভাগে হামা (Hama) এবং দক্ষিণে দামেস্কনগরের পত্তন করে। আরমেয়ানগণ ঐ অঞ্চলে সভ্যতার দুটি নিদর্শন রেখে গেছে—স্থাপত্য ও বাণিজ্যের ভাষা। তারা বড় বড় নগর নির্ম্মাণ করেছে। তাদের সংস্কৃতিও ছিল উচ্চাঙ্গের। দেশ বিদেশে তারা বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। তাদের ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ভাষা আজও প্রচলিত। তারা সিরিয়াতে একটা সুগঠিত গবর্ণমেণ্টের আদর্শও স্থাপন করেছে। যিশুখৃষ্টের সময় সিরিয়ার সাধারণ ভাষা ছিল আরমেইক ভাষা। বর্ত্তমান সিরিয়ার ভাষা সেই আরমেইক ভাষা থেকে উৎপন্ন। এই ভাষা আরবী ভাষার সঙ্গে আজও জীবিত আছে। এখনও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে আরমেইক ভাষা দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব দু' হাজার বছরের শেষের দিকে হুরিয়ানগণ এবং হিটাইটগণ সিরিয়া আক্রমণ করে। এ-দুটো জাতি সেমিটিক জাতি ছিল না এবং এরা বেশীদিন সিরিয়াতে বসবাস করেনি। তবে এদের কিছু নিদর্শন সিরিয়াতে অক্ষুণ্ণ ছিল। অতঃপর সেমিটিক জাতির অপর একটি শাখা এমিরিয়ানগণ (Amyrions) সিরিয়ার উপর বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নূতন সেমিটিকগণ এখানে চার শ' বছর প্রভুত্ব করেছিল। সভ্যতার ভাণ্ডারে তারা বেশী কিছু দান করতে পারেনি। অতঃপর পারসিকগণ সিরিয়া অধিকার করল; এবং খৃষ্টপূর্ব্ব চার শত বছর পর্য্যন্ত তারাই সেখানে প্রভুত্ব করেছিল।

তারপর এল ম্যাসিডোনিয়ার কর্ত্তৃত্ব। খৃষ্টপূর্ব্ব তেত্রিশ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার সিরিয়ার উত্তর সীমান্তে পারসিক সৈন্যগণকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করলেন। এবং রণক্ষেত্রের একটি স্থান নির্ব্বাচন করে সেইখানে তাঁর বিজয়ের নিশানস্বরূপ আলেকজাণ্ড্রেটা নগর স্থাপন করলেন। সে-নগর আজিও বিদ্যমান। এই ঘটনার পর সমগ্র ভৌগোলিক সিরিয়ার রাজনৈতিক ভাগ্য পশ্চিম দেশের সহিত জড়িত হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে সিরিয়াবাসিগণ নিজেদের সভ্যতাকে ধ্বংস হতে দিল না। আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ সেলুকাইড (Selukides) নামে অভিহিত। এরা এই অঞ্চল শাসন করতে লাগল। তারা লাটাকিয়া, আণ্টিওক, আপামেয়া, এই সব বড় বড় নগরের পত্তন করে। একদিকে মিশর ও অপর দিকে মেসোপটেমিয়ার সহিত সিরিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ত ছিলই, তদুপরি গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে সিরিয়ার সভ্যতা একটা নূতন রূপ গ্রহণ করল। হেলেনিক সভ্যতা ও সিরিয়ান সভ্যতার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল। এই যুগে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। সিডনের বিখ্যাত দার্শনিক জেনো (Zeno) এবং তাঁর শিষ্য, দ্বিতীয় জেনো, সিরিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা দর্শনের উদাসীন সম্প্রদায় (stoics) স্থাপন করেন। তাঁদের দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গ্রীকদের পতনের পর রোমকগণ সিরিয়া অঞ্চল অধিকার করে। যিশুখৃষ্টের জন্মের ষাট বছর পূর্ব্বে রোমকগণ প্রায় সমগ্র সিরিয়া অধিকার ক'রে ফেলল। তারা প্রায় চারশ' বছর ধ'রে সিরিয়া শাসন করেছিল। তারপর রোমান সাম্রাজ্য দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। পূর্ব্বাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে পড়লেন বাইজানটাইন সম্রাটগণ। এঁদের যুগে কতিপয় সিরিয়ার প্রতাপশালী ব্যক্তি রোমের সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সেপটিমাস সেভেরাস (Septimus Severus), প্রথম সিরিয়াবাসী, যিনি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কার্থেজের ফিনিশিয়ান বংশসম্ভূত। তাঁর স্ত্রী জুলিয়া ডোমনা (Julia Domna) সিরিয়ার মেয়ে। সম্রাট তাঁকে অগাষ্টা উপাধিদান করেন। পরে তাঁদের পুত্র কারাকুলা সম্রাট হয়েছিলেন। এর পর সিরিয়ান বংশসম্ভূত আরও কতিপয় ব্যক্তি রোমান-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রোমে সিরিয়ান সম্রাটগণের রাজত্বকালে সিরিয়ার নগরে নগরে বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়েছিল। তাঁদের নির্ম্মিত বহু মনুমেণ্টের ধ্বংসাবশেষ আজিও পালমিরা, বোস্ট্রা, দামেস্ক ও আণ্টিওকে দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রীক-রোমান যুগে দর্শনে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, কবিতায় বহু সিরিয়ান সুনাম অর্জ্জন করেছেন। সিরিয়া ইউরোপকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়েছে, তা হচ্ছে খৃষ্টধর্ম্ম। দক্ষিণ-সিরিয়ার প্যালেষ্টাইনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, মহাত্মা যিশুখৃষ্ট। আণ্টিওক থেকে সেই ধর্ম্ম ধীরে ধীরে গ্রীক-জগতে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তারপর সারা ইউরোপ খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করল। সিরিয়ার উপর গ্রীস ও রোমের প্রভাব দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তবুও সিরিয়া তার উপর থেকে আরব-প্রভাব নষ্ট হতে দেয়নি। রোমের নির্ম্মিত থিয়েটার, বিজয় তোরণ ও বড় বড় অট্টালিকা দেখে আরবগণ চমকিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তবুও সিরিয়ার আরবগণ তাদের বৈশিষ্ট্য হারায়নি।

সিরিয়ার সহিত আরব উপদ্বীপের ও আরব জাতির সম্পর্ক প্রাচীন ও গভীর। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরবগণ সিরিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পরবর্ত্তী যুগে মক্কাতে যখন ইসলামের বাণী ঘোষিত হল, তখন সিরিয়া রোমকদের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর সিরিয়াকে বাইজানটাইন রোমকদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে খালেদ ইবনে ওলিদ এবং তৎপরে ওবায়দুল্লাহের নেতৃত্বে আরব-বাহিনী সিরিয়ার দিকে ধাবিত হল। তারা ইয়ারমুকের যুদ্ধে একটা যুগান্তকারী জয়লাভ করল। তারপর সমগ্র সিরিয়া আরবদের হস্তগত হ'ল। অতঃপর সিরিয়া আরবভূমিতে পরিণত হ'ল।

উমাইয়া বংশের খলিফাগণ যখন ক্ষমতা হস্তগত করলেন তখন তাঁরা দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তাঁদের শাসনকালে সিরিয়ার ইতিহাসে নূতন যুগ আরম্ভ হল। সিরিয়া হয়ে পড়ল সমগ্র আরব মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। দামেস্কের আরব শাসকগণ একটি সুগঠিত রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। তাঁরা

রাজ্যশাসনের জন্ত এমন একটা পলিসি গ্রহণ করলেন যা দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে গেল। তাঁরা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটা নূতন সমাজ গড়ে তুললেন। বহু উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করলেন। দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত আরব রাষ্ট্র একটা সুদৃঢ় রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। শাসকগণ জাতীয় আয়কে নাগরিকদের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করলেন। জাতীয় নিরাপত্তা-রক্ষা ও সম্পদ-বৃদ্ধির জন্ত নানা উপায় অবলম্বন করলেন।

উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশ যখন বাগদাদে নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন সিরিয়ার রাজনৈতিক মর্য্যাদা নষ্ট হল। এটা একটা প্রদেশে পরিণত হল। সিরিয়াবাসিগণ বড় বড় চাকরী থেকে বঞ্চিত হল। আব্বাসী খলিফাগণ পারসিকদের উপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করল। তবে প্রথম যুগের আব্বাসী বংশের খলিফাগণ সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অঞ্চলগুলিকে অবহেলা করেন নি। তাঁরা এর বন্দরগুলির সংস্কার সাধন করলেন। যাতে বাইজানটাইনগণ সহজে আক্রমণ করতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সিরিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এ সব অঞ্চল তদারক করবার জন্ত খলিফা হারুণ-অর-রশিদ, প্রতি বছর একবার সিরিয়া পরিদর্শন করতেন।

আব্বাসীদের শাসনকালে সিরিয়ার শাসনকার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলছিল। কিন্তু খলিফা আলমুতাসিমের সময় আব্বাসীয়গণের ক্ষমতা দুর্ব্বল হয়ে এল। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা খলিফা হলেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বল। যারা আরব-বংশ-সম্ভূত নয়, এমন সব লোকের হাতে ক্ষমতা চলে গেল। তাদের দুর্ব্বলতার কারণে গোটা সাম্রাজ্যটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের ক্রুসেডারগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে লাগল। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের পর সিরিয়াতে শান্তি ফিরে এল বটে কিন্তু পূর্ব্বদিক থেকে দুর্ব্বার বেগে তাতার আক্রমণ সিরিয়ার মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দিল। এর কিছুদিন পর মেমলুক বা দাসবংশীয় রাজারা সিরিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করল। এই বংশের রাজারা তাতার বা মোগল আক্রমণকে বাধা দিলেন। মেমলুক বংশ মিশর ও সিরিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করল। মেমলুকগণ তিনশ বছর রাজত্ব করেছিল, তারপর তুরস্কের ওসমানীয় বংশের সুলতান সেলিম ১৫১৬ সালে মিশর ও সিরিয়া অধিকার করলেন। এর পর থেকে সিরিয়ার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল।

১৫১৬ খৃষ্ট-অব্দ থেকে ১৯১৮খৃষ্ট-অব্দ পর্য্যন্ত চারশ' বছর সিরিয়া ও অপরাপর আরবদেশগুলি ওসমানীয় বংশের তুর্কি সুলতান কর্তৃক শাসিত হয়ে আসছিল। সিরিয়াতে তুর্কি অধিকারের প্রথম যুগে ইউরোপের রিনেসান্স এবং ভৌগোলিক আবিষ্কার এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভৌগোলিক আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের পথকে সিরিয়া ও আরব দেশ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর ও কুমারিকা অন্তরীপের দিকে নিয়ে গেল। এর পর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যার ফলে আরব-জগত পশ্চিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আরব দেশসমূহ পশ্চিম দেশের ক্রমপ্রসারশীল সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে চলে গেল। সুতরাং এখন হতে দেশের বুকে নেমে এল অন্ধকার যুগ। আরবগণ নূতন সভ্যতার আস্বাদও পেল না। আরব দেশ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভাবে পশ্চিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়া তুর্কি সাম্রাজ্যের একটা অর্থনৈতিক সম্পদের কেন্দ্র হয়ে থাকল আরও বহুকাল পর্য্যন্ত। যদিও তুর্কি যুগ সিরিয়ার পক্ষে একটা নিষ্ফল যুগ ছিল, তবুও সিরিয়াবাসিগণ বরাবরই স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্ত আন্দোলন করেছিল। এই সব আন্দোলনের মধ্যে ফাকরুদ্দিন আলমা-আলির আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর রাজ্য লেবানন ও প্যালেষ্টাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁরই মত "আজ্-জাহার-আল ওমর" আর একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন "একর" প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে তুর্কিশক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে সংগ্রাম করেছিলেন। এ দুজনের চেয়েও শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ করেন আমীর বশির আল্শিহাবী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৭৯০ থেকে ১৮৪০ খৃষ্ট-অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বছর ধরে আমীর বশির লেবাননের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। তিনি কখনও স্থির হয়ে বসে থাকেননি। তিনি অনবরত তুর্কিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়াকে তুর্কিশাসন-কবল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা হয়েছিল ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে। তিনি ১৮৩১ সালে সিরিয়া থেকে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটাবার জন্ত নূতন আন্দোলন আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। তাঁর ব্যর্থতার প্রধান কারণ ইউরোপের কয়েকটি শক্তি তুর্কির সুলতানকে সাহায্য করেছিল।

১৯২০ সালের পূর্ব্বে বর্ত্তমান সিরিয়ার ইতিহাসে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু তার পর থেকে সিরিয়ার ভাগ্যে নানা বিপর্য্যয় ঘটে গেল। আধুনিক সিরিয়ার সহিত আরব জাতির জাগরণের ইতিহাস অবিচ্ছেদে জড়িত। এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, সিরিয়ার জাগরণ আরব জাতির জাগরণ। এইখানেই আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদের কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা প্রথমে সিরিয়াতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সিরিয়ার বর্ত্তমান ইতিহাস চারটে সুস্পষ্ট অংশে বিভক্ত —(১) আরব জাগরণের যুগ, (২) ফরাসী ম্যানডেটের যুগ, (৩) স্বাধীনতার যুগ, (৪) মিশরের সহিত ঐক্যের যুগ।

সুদীর্ঘ কাল ধরে তুর্কি সুলতানগণ সিরিয়া শাসন করতেন। তাঁরা নানাপ্রকার ভেদনীতির দ্বারা আরব-জগতকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেননি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সিরিয়া তার জাতীয়তার আদর্শ পরিত্যাগ করেনি। এবং আরব-জগতের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রচার করেছে। আরবদের সহিত তাদের প্রধান বন্ধন ছিল আরবী ভাষা ও আরবী কালচার। তাদের এই ভাষা ও কালচার তাহাদিগেক অন্ধকার যুগের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে রক্ষা করেছে। সিরিয়া এবং আরবদেশ পুনরায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই তাদের সাংস্কৃতিক জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। তুরস্কের ক্ষমতা যখন ম্লান হতে লাগল, তখন সিরিয়ার নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলন করার সুযোগ উপস্থিত। তাঁরা একটি "জাতীয় আরব পার্টি" গঠন

করলেন। এর উদ্দেশ্য হল আরব দেশকে তুর্কি-শাসন থেকে মুক্ত করা। জাতীয় দলের নেতাদিগকে তুর্কি সরকার কঠোরভাবে নির্য্যাতন করতে লাগল। কাউকে দিল ফাঁসী, কাউকে করল নির্বাসিত। কিন্তু তবুও আন্দোলন দমল না। প্রথম মহাসময়ের সময় আরবগণ দেখল যে, তুরস্কের উপর আঘাত হানবার সময় ও ক্ষণ উপস্থিত। মক্কার শরীফ হোসেন তুর্কি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সমগ্র আরবজাতি তাঁর আহ্বানে উৎসাহের সহিত সাড়া দিল। একটি আরব-বাহিনী গঠিত হল। এই সৈন্যবাহিনী মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তারা ১৯১৮ সালে সগৌরবে দামেস্কে প্রবেশ করল। বিজয়ী বেশে আরবসৈন্যদের দামেস্ক প্রবেশ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অতঃপর সমগ্র আরব-জগত তুর্কির কবল থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেল। তুর্কি জার্ম্মাণ মিত্রাদির বিরুদ্ধে সিরিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল। সিরিয়ার স্বেচ্ছাসেবক দল সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলে অত সহজে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করতে পারত না। জেনেরাল এলেনবির সৈন্যদলকে আরব জাতীয়তাবাদিগণই আসল সাহায্য করেছিল। তাদের তুর্কিবিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে, তারা ধর্মনেতা খলিফার বিদ্রোহাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু আরবদের আন্তরিকতার সুযোগ নিয়ে জয়লাভ করলেও মিত্রপক্ষ তাদের প্রতি যে-বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ইতিহাসে তার নজির নাই বললেই চলে। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে যখন সিরিয়ার অধিবাসিগণ নূতন স্বাধীনতার উৎসব পালনে মহাব্যস্ত, যখন সিরিয়ার সিংহাসনে হোসেমের পুত্র ফাইসালের রাজ্যাভিষেক-উৎসবে অধিবাসিগণ মত্ত, এবং যখন প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চৌদ্দ দফায় উৎপীড়িত জাতির অন্তরকে স্বাধীনতার আশায় উদ্দীপিত করে তুলছিল, ঠিক সেই সময় পশ্চিম দেশের সাম্রাজ্যবাদিগণ, আরব-জগতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। তারা সাইক-পিকট গোপন চুক্তিকে কার্য্যকরী করবার জন্য কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠল। এই চুক্তি আরব জগতে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করবার ব্যবস্থা করল। প্রভাবাধীন অঞ্চল বলে বৃটেন লাভ করল মেসোপটেমিয়া আর ফ্রান্স লাভ করল সিরিয়া। ইতিমধ্যে বালফুর ঘোষণার কথাটাও জানাজানি হয়ে গেল। এই ঘোষণার ফলে প্যালেষ্টাইনে ইহুদি রাজ্য স্থাপনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বালফুর ঘোষণাই সিরিয়ার বর্ত্তমান গণ্ডগোল ও ট্রাজেডির মূল কারণ। যখন শেরিফ হোসেন, বৃটেনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করলেন, তখন তাঁকে বন্দী ক'রে সাইপ্রাসে নির্ব্বাসিত করা হ'ল। সেইখানে ভগ্নমনোরথে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সিরিয়া পেল নামমাত্র স্বাধীনতা। গোপন চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স সিরিয়া অধিকার করল। এই ভাবে সিরিয়ার উপর ফ্রান্সের ম্যানডেট চাপান হ'ল। সিরিয়ার উপর বিদেশী শাসনের আর একটা নূতন যুগ আরম্ভ হল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত সিরিয়াকে ম্যানডেটের চাপ সহ্য করতে হয়েছে। ফ্রান্স এই দেশকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করল এবং তাদের উপর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগল। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী সিরিয়ার অধিবাসিগণ এই ম্যানডেটকে স্বীকার করে নিতে সম্মত হল না। তারা অহরহ বিদ্রোহ ও নাশকতামূলক পদ্ধতির দ্বারা ফ্রান্সকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। অবশেষে ১৯২৩ সালে সমগ্র দেশের জন্য সংবিধান রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠিত হল। কিন্তু এর কাজ শেষ হতে না হতে ফরাসী হাই-কমিশনার একে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনি সিরিয়াবাসীদের রচিত গণ-পরিষদের নানারূপ পরিবর্তন সাধন ক'রে তাকেই গ্রহণ করবার জন্য আদেশ জারি করলেন। ফরাসীদের সমর্থিত এই সংবিধান অনুসারে একটা সাধারণ নির্ব্বাচনও হয়ে গেল। তাতে ফ্রান্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু জাতীয়তাবাদী নেতা নির্ব্বাচিত হলেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে কয়েকবারই নির্ব্বাচন হয়েছিল। এই সব নির্ব্বাচনে বিপুল সংখ্যায় স্বাধীনতাবাদিগণই অধিকাংশ আসন দখল করল। তারা কিছুতেই ফ্রান্সের কাছে নতিস্বীকার করেনি। এবং বহু সংগ্রামের পর সিরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করে তুলল। ১৯৩৬ সালেই ফরাসীগণ বুঝতে পারল যে সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করা তাদের স্বার্থের জন্য একান্ত দরকার। তাদের সঙ্গে একটা সাময়িক সন্ধির জন্য আলোচনাও হতে লাগল। কারণ, সিরিয়ার স্বাধীনতার দাবী আর অগ্রাহ্য করা যায় না। ১৯৩৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর একটা সন্ধি হ'ল। কিন্তু ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট সে সন্ধিপত্র অনুমোদন করল না। সুতরাং সিরিয়াতে আবার গণ্ডগোল বেধে উঠল।

ইতিমধ্যে এল দ্বিতীয় মহাসমর। সিরিয়ার প্রতিরোধ-শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯৪৩ সালে আবার একটা সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল। তার পর বসল একটা নূতন পার্লামেণ্ট। সিরিয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হ'ল এবং শাকরী আলকাতলী এই রিপাবলিক রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। আলকাতলীর অধীনে যে জাতীয় সরকার গঠিত হ'ল, সে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে ফরাসী শাসনমুক্ত সিরিয়াকে একটি সুগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ১৯৪৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর এই জাতীয় সরকার সিরিয়ার বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করল। এই ভাবে সিরিয়া থেকে ফরাসী ম্যানডেটের অবসানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কিন্তু ফরাসী সরকার অত সহজে সিরিয়া ছাড়তে রাজী হল না। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে জাতীয় সরকারের হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হল না। এবং সিরিয়ার প্রতিরোধকে বাধা দিতে মনস্থ করল। কিন্তু সিরিয়াবাসিগণও সহজে নতিস্বীকার করল না। তারা নূতন সৈন্যদল গঠন করল। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বহু সিরিয়ান সেনাপতি বিদ্রোহী দলে যোগদান করল। দেশের বহু অঞ্চল থেকে ফরাসী সৈন্য বিতাড়িত হতে লাগল। ফরাসী সৈন্য যেদিন দামেস্ক নগরের ওপর বোমা নিক্ষেপ করল, সেই দিন থেকে তাদের পঁচিশ বছরের প্রভুত্বের অবসান সূচিত হল। ফরাসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হতে লাগল। সিরিয়ার প্রশ্ন "উনো"তে উত্থিত হ'ল। "উনো" সকল দিক বিবেচনা ক'রে সিরিয়া থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্য অপসারণের দাবী স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। (১৯৪৬ সালের ১৭ই এপ্রিল)। এই ভাবে সংগ্রাম করতে করতে সিরিয়ার জনগণ আলকাতলীর নেতৃত্বে তাদের দেশ থেকে বিদেশী সৈন্যের সম্পূর্ণ অপসারণ করল। তারপর দ্বিতীয়

মহাসমরে সিরিয়া অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মহাসমরের পর সিরিয়ার স্বাধীনতা অন্যান্য দেশে স্বীকার করে নিল। সিরিয়ার স্বাধীনতা প্রকারান্তরে আরব-জাতীয়তা ও স্বাধীনতার গোড়ার পত্তন রচনা করল।

সিরিয়ার বহু ভাগ্য-বিতাড়িত ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে মিশরের সহিত তার ঐক্যগঠন। যেদিন সিরিয়া স্বাধীনতা ও জাতীয়তার দাবী উত্থাপন করেছিল, সেইদিনই সে সমগ্র আরব ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিল। কিন্তু সে ঐক্য তখনও সম্ভব হয়নি। তবু সিরিয়া সেই আরব ঐক্যের আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৫০ সালে সিরিয়ার যে সংবিধান রচিত হ'ল, তার গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, সিরিয়াবাসিগণ আরব জাতির অন্তর্গত। আরব ঐক্যসাধন তার অন্যতম লক্ষ্য। মিশরের সহিত কি ভাবে সিরিয়ার ঐক্য স্থাপিত হ'ল, এবার সেই কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব।

১৯৫২ সালে মিশরে একটি প্রচণ্ড বিপ্লব হয়ে গেল—তার ফলে সেখান থেকে রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটিত হয়ে গেল। এবং সেইখানে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হল। মিশরের বিপ্লবী নেতাগণ আরব-ঐক্যের লক্ষ্য সামনে রেখে বিপ্লবের আদর্শকে রূপ দিতে লাগল। এর ঠিক দু' বছর পর সিরিয়াতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হ'ল। ক্রমে ক্রমে মিশর ও সিরিয়ার লক্ষ্য ও গতি একই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করাই এই দু'টি রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্যে পরিণত হ'ল। এশিয়া মহাদেশকে কুক্ষিগত ক'রে রাখবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি যেসব দেশ-রক্ষামূলক চুক্তি ও জোট তৈরার করেছিল, মিশর ও সিরিয়া একই সুরে সেগুলির বিরোধিতা আরম্ভ করল। ১৯৫৫ সালে বান্দুঙে আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলনে যেসব মৌলিক নীতি গৃহীত হয়ে গেল, এ দু'টি রাষ্ট্র সেই সব নীতিকে স্বীকার করে নিল। তারা আরব জাতীয়তা ও ঐক্যের সমর্থক হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি ও সহ-অস্তিত্বের আদর্শকেও স্বীকার করল। কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমস্ত প্রকার বৈদেশিক হস্তক্ষেপেরও বিরোধিতা করার নীতির উপর তাদের অকুণ্ঠ আস্থা জ্ঞাপন করল। মৌলিক নীতিগুলিতে একমত হয়েই ক্ষান্ত থাকল না, তারা রাজনৈতিক ঐক্যের পথে একটু একটু করে এগিয়ে এল। ১৯৫৫ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপর যুক্ত-কর্তৃত্ব স্থাপন করল। এই সেনাবাহিনী আরব দেশের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারপর মিশর যখন সুয়েজখালের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করল, তখন সিরিয়া তাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হ'ল। ১৯৫৬ সালে যখন ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করল, তখন সিরিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়ে মিশরের পাশে এসে দাঁড়াল। এই দুর্দ্দিনে মিশর ও সিরিয়ার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হল। তারপর বাকী ছিল আর একধাপ অগ্রসর হওয়ার। সেটাও অতি সহজে সংঘটিত হয়ে গেল। মিশর ও সিরিয়া বুঝল যে, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন এক, তখন আর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে থাকবার কোন অর্থ হয় না। তারা এখন উভয়ে মিলিত হয়ে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করতে প্রস্তুত হ'ল।

১৯৫৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী মিশরের নব-রচিত সংবিধান ঘোষণা করল যে, মিশর হচ্ছে আরব জাতির অন্তর্গত দেশ। ১৯৫৭ সালে মিশর সিরিয়াকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করল। মিশরীয় সৈন্যদের একটা দল তাদের সিরিয়ান কমরেডদের সহিত উত্তর সীমান্তে একই সঙ্গে লড়াই করেছে। এই বছরই মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হল দু'টি ভদ্রলোকের চুক্তি—একটি হল সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে, আর অপরটি হল অর্থনৈতিক ঐক্য সম্পর্কে।

তারপর ১৯৫৭ সালের ৬ই জুলাই সিরিয়ার প্রতিনিধি সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রতিনিধি সভা স্বীকার করে যে, সিরিয়ার অধিবাসিগণ আরবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। এই প্রতিনিধি সভার মন্ত্রিসভার সভাপতির মাধ্যমে ঘোষণা করছে ও আশা করছে যে, সিরিয়ার সরকার আরব ঐক্য গঠনের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করতে থাকবেন। এবং তাঁর সে প্রচেষ্টার বিবরণ সভাকে যথাসময়ে জ্ঞাত করবেন। অতঃপর সিরিয়ার মন্ত্রিসভা কি ক'রে ও কোন পন্থায় মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র স্থাপিত হতে পারে সে সম্পর্কে মিশরের সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকবেন। মিশর থেকে অতি দ্রুত এর উত্তর এল। মিশরের সভাপতি নাসের সিরিয়ার প্রতিনিধি সভার প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করেন যে, মিশর স্বেচ্ছায় সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত রাষ্ট্রের মাধ্যমে যোগদান করতে প্রস্তুত আছে এবং সেই মর্মে সিরিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তাতে মিশরবাসীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছে।

এর পর উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের মধ্যে সরকারী ভাবে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হল। উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা কতকগুলি আনুষঙ্গিক প্রস্তাব গ্রহণ করল। উভয় রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ নেতাদেরকে এই মর্মে আরও আলোচনার জন্য আহ্বান করা হল। অতঃপর ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এসব আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হ'ল এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে সকলেই সম্মতিজ্ঞাপন করলেন। তাঁরা স্থির করলেন যে ফেডারেল ঐক্য অপেক্ষা পূর্ণএকতার বন্ধনে উভয় রাষ্ট্রকে একীভূত করা হোক। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫৮ সালের পহলা ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভাবে জন্ম নিল "ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক।"

এই সিদ্ধান্তকে সার্ব্বজনীন ভাবে সমর্থন করার জন্য গণভোটের প্রয়োজন হল এবং অবিলম্বে গণভোট গৃহীত হ'লে সমগ্র সিরিয়াবাসী একবাক্যে মিশর-সিরিয়া ঐক্যকে সমর্থন করল এবং এই গণভোটেই নাসেরকে সম্মিলিত আরব-রিপাবলিকের সভাপতি বলেও স্বীকার করে নিল। শত শত বছর ধরে বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে এবং উত্থান-পতনের ও জয়-পরাজয়ের অনিশ্চিত ও বন্ধুর পথে পাড়ি দিতে দিতে অবশেষে আরব ঐক্যের সোনালী স্বপ্নের কিয়দংশ সফল হল। সম্মিলিত আরব রিপাবলিক আরব দেশের বুকে আরব ঐক্যের আদর্শকে উচ্চে তুলে রাখল। এর নেতাদের যদি দূরদর্শিতা থাকে, তুর্কি যে-ভুল করেছিল, যদি তারা সযত্নে সে-সব ভুল পরিহার করে চলে, তবে তাদের এ-ঐক্য স্থায়ী হবে। সভাপতি নাসের, নবরাষ্ট্র-গঠনের পর যখন প্রথম সিরিয়া গমন করেন তখন তিনি বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ৫ই মার্চ এই নব-রাষ্ট্রের সংবিধান ঘোষিত হল। মিশরে ও সিরিয়াতে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হতে লাগল।

ষ্টীল লাইফ

—তনু দাশগুপ্ত

পদ্মবন

—আশুতোষ সিন্‌হা
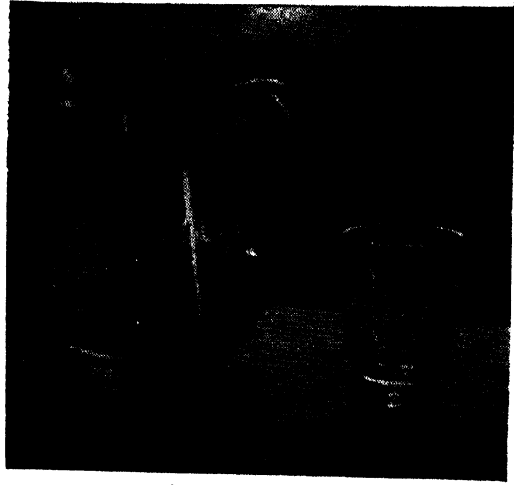
পোড়মাটির কাজ (বংশবাটী)

—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

—লালচাদ বর্দ্ধণ
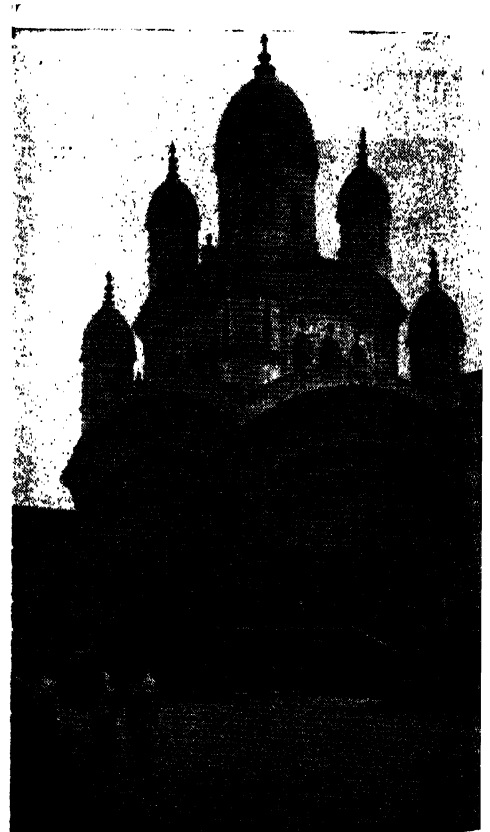
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—কুমারী বাপি শেঠ
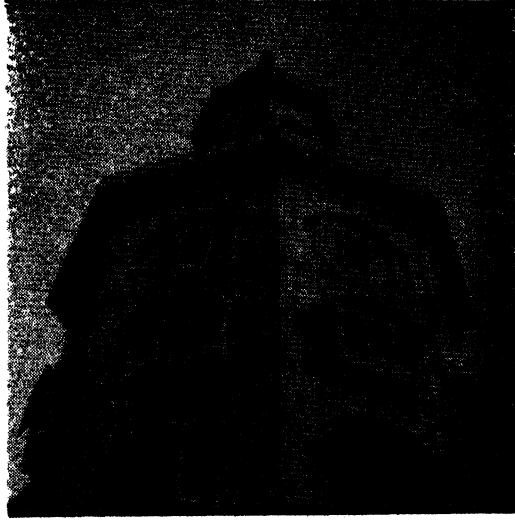
বাবা অটল টাওয়ার
(অমৃতসর)
—শান্তিকুমার গুপ্ত

মাছের আশায় —রমেন বাগচী

বন্যাভীরু —অশোক ধর

সম্বুদ্ধ

তখন আমার তরুণ বয়স। ছাত্রজীবন ঠিকমত উত্তীর্ণ হই নাই। বাংলাদেশের প্রায় সীমা-রেখায় একটি শহরে কিছুদিন বাস করিতে হইয়াছিল।

ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন শহর। বিশেষ করিয়া যে পাড়াটিতে আমি থাকিতাম, সেটি যেমন ঝকঝকে পরিষ্কার তেমনই মার্জিত-রুচি। নূতন রাস্তা, নূতন বসতি, শহরের কেন্দ্র ছাড়িয়া যাঁহারা এই উপকণ্ঠে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক। ইহারই এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাড়িতে আমিও গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম।

গিয়াছিলাম, বিশ্রামার্থে। পরীক্ষার পরে বলিয়াও বটে, এবং শরীর কিছু অসুস্থ ছিল বলিয়াও বটে। সেখানে গিয়া স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইল। করার মধ্যে চারবেলা ঠাসিয়া খাওয়া, যতক্ষণ ইচ্ছা বই পড়া, আর মাঝে-মাঝে গল্প-কবিতা লেখার মক্স করা—ভাবী কালের লেখক-জীবনের তখন গোড়াপত্তন হইতেছিল। আর, সকলের চেয়ে বড় কাজ যতক্ষণ পারি ঘুরিয়া বেড়ানো।

বেড়াইবার জন্যই গিয়াছিলাম, জায়গাও বেড়াইবার মত। ছোট শহর, তাহার চারি পাশ জুড়িয়া কাঁচা ও পাকা বহুপথ বহুদিকে চলিয়া গিয়াছে। এক একদিন এক একটা পথ ধরিয়া সোজা হাঁটা দিতাম, যতক্ষণ না ক্লান্তি লাগে। সীমান্তভূমিতে যাহা হয়—এক একদিকের পথের এক এক রূপ: কোনটার দুইধারে সবুজের সমারোহ, কোনটা বা গিয়াছে তৃণহীন প্রান্তরের বুক চিরিয়া, কোনটার বা পাশে পাশে সংকীর্ণ জলস্রোত। একটা পথের উপর দাঁড়াইয়া অন্য পথের দৃশ্য কিছুতেই তুলনায় মিলানো যায় না। আমি যেদিন যে-পথে ইচ্ছা যাইতাম। যতদূর চলিতাম, মন ক্লান্ত হইত না। ক্লান্ত হইত দেহ। তখন পথের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতাম, আবার হয়ত আরও সম্মুখে আগাইয়া যাইতাম, তারপর আবার এক সময়ে ফিরিয়া আসিতাম। কাজও কিছু ছিল না, কৈফিয়ৎ লইবারও কেহ ছিল না।

শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিল। ছুটিও শেষ হইবার মুখে। এবার ফিরিবার পালা। মনে মনে প্রস্তুত হইতেছি, বাক্স গোছানো তখনও আরম্ভ করি নাই। এমন সময়ে অকস্মাৎ অদ্ভুত এক ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

বলিয়াছি, আমার দিন কাটিত ঘরে ও পথে। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আমার বিশেষ হয় নাই। একে ত গায়ে পড়িয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতে যাওয়াই আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাহাতে প্রয়োজনও কিছু ছিল না। শরীর ক্ষীণ বলিয়া ক্লান্তিও সহজে আসিত, কোলাহল কলরব ভাল লাগিত না। তাহার চেয়ে অনেক বেশী আরাম পাইতাম নীরব বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে।

চিরদিন আমি শহরের ঘিঞ্জিতে মানুষ, খোলামাঠের ঘুঘুর ডাক রেডিও-গ্রামোফোনের গানের চেয়ে অনেক বেশী মিষ্ট লাগিত। পাড়া-প্রতিবেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা ঘটিবার বিশেষ উদ্যোগ বা উদ্যম কোন পক্ষ হইতেই ছিল না।

তবুও একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকিতে কেহই পারে না। আমারও দুটি-একটি সঙ্গী উহারই মধ্যে জুটিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যাহার সঙ্গে হইল সে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু।

প্রথম দিন তাহাকে দেখিলাম, কালো হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা। স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করিতেছে—আবার বাড়ির মাঠে সে ফড়িং-এর পিছনে দৌড়াইয়া ফিরিতেছিল। বর্ষার ভিজা ঘাসের উপরে বিকাল-বেলার রৌদ্রে অসংখ্য ফড়িং বসিয়াছে, ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়াই তাহার খেলা। সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ভৃত্য, সে কিছুতেই বালককে ফিরাইতে পারিতেছে না। বৃথাই চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে আর মোটা স্থবির দেহটা লইয়া তাহার পিছনে ছুটিবার প্রয়াস পাইতেছে।

এক সময়ে আমার দিকে চাহিল, কহিল—দেখুন ত বাবুজী! একে আমি কি করে সামলাব? এই, শীগগির এস, নইলে বাবুজী ধরে নিয়ে যাবেন।

আমি কহিলাম, থাক না, বেশত খেলে বেড়াচ্ছে। যাও খোকা, তুমি প্রাণ ভ'রে ছোটো—আমি কাউকে ধরে নিই না;

খোকা ঘাবড়াইল না, সোজা আসিয়া আমাকেই ধরিয়া লইয়া চলিল, ধরে দেবে চল না?

—আরে সর্বনাশ! আমি কি ধরতে পারি?

—তুমি পারবে। আমি পারছি না যে। খালি উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

—আমিই বা কি করে ধরব? উড়ে উড়ে যাবে।

—বা রে! তুমি—ত বড়।

—আমি উড়তে পারি? পারি নে ত? তাহলে কি করে ধরব?

—পার না?

—না। এই দেখ। ভাল করে দেখ, চার দিকে। ডানা আছে আমার?

খোকা হাসিয়া ফেলিল। মানুষের ডানা থাকে বুঝি?

—ও! থাকে না বুঝি? তাহলে উড়তেও পারে না। ফড়িং ধরে কি হবে? খাবে!

—দূর!

—তবে? ধরলে ফড়িংটার ব্যথা লাগবে। এই ত বেশ দেখতে হচ্ছে।

—বা। ধরলে সেটা আমার হবে। আমি বাড়ি নিয়ে যাব। এগুলো ত মাঠের।

—ভাবো না মাঠটাই তোমার, সবগুলোই তোমার।

—সবগুলো আমার?

—হ্যাঁ ? তাবো, তাহলেই ত হ'ল। তাড়া করলে ভয় পাবে, পালিয়ে যাবে। তাড়া কোরো না। দেখো ওরাই আসবে ভাব করতে।

বলিতে বলিতে কখন একটি ফড়িং আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিয়াছিল। খোকা চেঁচাইয়া উঠিল, ঐ, ঐ, তোমার ঘাড়ে বসেছে।

আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে গেলাম। ফড়িং উড়িয়া গেল। কহিলাম, দেখলে ত ? আমি তাড়া করিনি, তাই আমার কাছে এল। ভয় পেলে না। তুমিও তাড়া কোরো না, তাহলে তোমাকে দেখেও ভয় পাবে না।

সেই হইল আলাপের সূত্রপাত। খেলার শেষে খোকা আমার বাড়িতে আসিল, বিস্কুট এবং মিষ্টি খাইল—আমি অসুস্থ ও বাজার দূর বলিয়া এগুলি আমার মজুতই থাকিত—তারপর কাল আসব বলিয়া বিদায় লইল।

পরদিন আসিল ও। সে বয়সে শিশু, আমি রোগশয্যার 'পরে মনে শিশু, দুই অসমবয়সী শিশুর বন্ধুত্ব অচিরাৎ নিবিড় হইয়া উঠিল।

তাহাদের বাড়িতেও সে-ই একদিন আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। আমার বাড়ীর কাছেই। পাঁচিলঘেরা ছোট বাড়ি, কিন্তু সৌখিন লোকের বাড়ি। বিস্তীর্ণ উঠান জুড়িয়া ফুলের বাগান, ঘর-বাহির ঝকঝক করিতেছে। নূতন বাড়ি।

খোকার বাবা অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্যক্তি। নাম শুনিয়া চিনিলাম, এ নাম পূর্বেও শুনিয়াছি, সভাসমিতির বিবরণ, ও তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ইত্যাদির আলোচনায়। অমায়িক ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু অভিমান নাই, সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির মানুষ। এটা তাঁহার দেশ, কর্মস্থল অন্যত্র। দেশ বলিয়াই বহু যত্নে এখানে এই বাড়িটি করিয়াছেন। বৎসরের ছুটিগুলা যথাসম্ভব এইখানেই কাটাইয়া থাকেন। আর বেশী দিন চাকরি করিবার ইচ্ছা নাই। প্রয়োজনও নাই বিশেষ। এবার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এইখানেই থাকিবেন, পড়া আর লেখা লইয়া বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবেন, এমন কল্পনাও প্রথম দিনের পরিচয়েই ব্যক্ত করিলেন।

খোকার মাকেও দেখিলাম। বেশ সহজেই সম্মুখে আসিলেন, আলাপ করিলেন। চালচলনে শালীনতা আছে, অহেতুক কুণ্ঠা নাই। সুন্দর সুশ্রী মহিলা, এবং খোকার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও মমতা এত তীব্র যে সাধারণ ভাবে মাতৃস্নেহ বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট হয় না।

ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। অনেক দিনই সে বাড়িতে গিয়া বিকালবেলাটা কাটাই। কোন দিন খোকা আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, কোন দিন বা নিজেই চলিয়া যাই। আমার লোভের একটা বড় জিনিস ছিল সেখানে—অধ্যাপকের লাইব্রেরি। অজস্র বই এবং বহুবিধ বিষয়ের। আলমারিতে স্থান হয় না, টেবিলে চেয়ারে বিছানার উপরে পর্যন্ত বই স্তূপাকার হইয়া আছে—যেখানায় হাত দিই সেইখানাই দেখিয়া মনে হয় আহা, পড়ার সময় কি পাইব ! ইচ্ছা করিতে লাগিল, চুলায় যাউক কলেজ, এইখানেই থাকিয়া যাই কিছুকাল, যত দিন পারি প্রাণ ভরিয়া পড়িয়া লই।

আর কি সুন্দর ছিল তাঁহার এই বইগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান। যেখানাই ধরি, এমন সহজ সুন্দর ভাষায় এমন অনায়াসে তাহার পরিচয় আর বিশ্লেষণ বলিয়া দেন, যেন পাঁচবার পড়া পুরানো বইও একটা নূতন রূপ আর অর্থ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। নেশা ধরিল। প্রায়ই যাই, বসিয়া বসিয়া বই পড়ি। ফেরার সময়ে দু'-একখানা হাতে করিয়া লইয়া আসি, বাড়িতে যতক্ষণ পড়া যায়। এমনই করিয়া কিছুদিন কাটিল। আমার ছুটি যত শেষের দিকে আগাইতে লাগিল, আমার পড়িবার ক্ষুধা, তাঁহার মুখের ব্যাখ্যা শুনিয়া তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল, খালি মনে হয়, আরও আগে কেন এখানে আসি নাই, আরও আগে কেন ইঁহাদের চিনি নাই।

সে বাড়িতে যতক্ষণ থাকিতাম, বেশীর ভাগ সময় কাটিত লাইব্রেরি-ঘরে। অধ্যাপক প্রায়ই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে থাকিতেনও না। তাঁহার বেড়াইতে যাইবার সময় ছিল সন্ধ্যার দিকে —সন্ধ্যার মুখে বাহির হইতেন, কখন ফিরিতেন জানি না। আমার হিমলাগানো বারণ ছিল, আমি অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই প্রায় বাড়ি ফিরিতাম।

অধ্যাপকের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইত, ঘনিষ্ঠতা বিশেষ হয় নাই। তিনি আসিতেন যাইতেন, খাবার-টাবার দিতেন, কিন্তু গল্প করিতে প্রায় বসিতেন না। মনে হইত, বাহিরে হাসিখুশী এবং অমায়িক হইলেও তাঁহার মনের মধ্যে কোথাও একটা কঠিন সংযম আছে, ইংরাজীতে যাহাকে বলে reserve। খুব বেশী হৈ-চৈ করিতে তিনি স্বভাবতঃই পারিতেন না, চেষ্টাও করিতেন না। এই বাড়ি, ইহার ঘর-সংসার গৃহস্থালী, বাগান, নানাবিধ পশুপাখী আর খোকা, ইহাকে লইয়াই তাঁহার এক অখণ্ড রাজত্ব, তাহার শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁহার দিবারাত্রি কাটিয়া যাইত। সে বিধানও বিচিত্র— কুকুর, বিড়াল, পায়রা, রাজহাঁস, প্রত্যেকের খাওয়া ও থাকার সর্ববিধ সুব্যবস্থা ; ঘরের জিনিসপত্র প্রতিটি নিজের স্থানে ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কোনটি একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো নাই। খোকার ত' প্রতিটি প্রয়োজনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যবস্থা তাঁহার নিজের হাতে। একটিমাত্র স্থানে তাঁহার সে শাসন খাটিত না, তাহা হইল পড়ার ঘরটি। সেখানে বই দিনে দশবার করিয়া ঝাড়িয়া তাকে তোলা হইতেছে, দশবার করিয়া অধ্যাপক তাহাদের টানিয়া নামাইতেছেন, যেখানে ইচ্ছা ফেলিয়া রাখিতেছেন। বিছানার উপরে বইয়ের স্তূপ জমিয়া আছে, তাহারই মধ্যে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া কিঞ্চিৎ স্থান বাহির করিয়া তিনি কোনক্রমে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেছেন, একটা বই চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সেই অবস্থাতেই পড়িতে লাগিয়া যাইতেছেন।

আমার এ সকল ব্যাপারে দৃষ্টি বিশেষ প্রখর নয়, তবু হয়ত তখনই একটা জিনিস আমার লক্ষ্য হইয়াছিল। দু'জনেই শিষ্টবুদ্ধি ও মার্জিতরুচির লোক, রসিক, অমায়িক, কিন্তু ইহাদের দুইজনে বিস্তৃত আলাপ আলোচনা হইত অত্যন্ত কম, অন্ততঃ আমার সম্মুখে। নিজেদের জীবনের আলাপচারের দিকটা হয়ত ইঁহারা নিভৃত অবসরের জন্যই সঞ্চিত রাখিতে চাহিতেন।

আর একটি জিনিস প্রথম দিনেই চোখে পড়িয়াছিল, দুইজনের বয়সের তফাৎ। অধ্যাপকের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বয়স কিছুতেই ত্রিশের কাছে বলিয়াও মনে করিতে

পারিতাম না। হয়ত দ্বিতীয় পক্ষ, হয়ত অধ্যাপকই প্রথম বয়সে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। অবশ্য বয়সের তফাৎ থাকিলেও সেটা হঠাৎ বুঝা যাইত না। অধ্যাপকের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশী, সেটা জানিয়াছিলাম তাঁহারই কথায়। স্বাস্থ্য ও যৌবন তাঁহার এখনও অক্ষুণ্ণ, একগাছা চুলও পাকে নাই, সুন্দর সুগঠিত দেহ, অক্লেশে বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বলিয়া মনে করা চলিত, স্ত্রীটিও তাই—তাঁহার বয়স পঁচিশের উপরে; সেটা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম অঙ্ক কষিয়া। তিনি গ্রাজুয়েট, ছাত্রীজীবনের পরে বিবাহ হইয়াছে। গ্রাজুয়েট হইবার বয়স ও খোকার বয়স যোগ করিলে অঙ্কটা পঁচিশের উপরে উঠে। দেখিয়া তাঁহার বয়স একুশ-বাইশের বেশী মনে করিতে পারিতাম না।

অবশ্য এ সকল হিসাব লইয়া তখন মাথা ঘামাইতাম মনে হয় না, এগুলি সম্ভবত সাজাইয়া গুছাইয়া ভাবিয়াছিলাম পরে—যখন ইঁহাদের জীবন লইয়া আরও অনেক কথা ভাবিতে হইয়াছিল।

ছুটি শেষ। বাড়ি ফেরার দিন আসন্ন। হয়ত পাঁচ দিন, হয়ত বা দশ দিন। তারপরই ফিরিয়া যাইব। বাড়িতে সেই মর্মে চিঠিও লিখিয়া দিয়াছি। সেখান হইতে উত্তর এবং ডাক্তারের অভিমত আসিবে, টাকাকড়ি আসিবে, তারপরই এখানকার সমস্ত দায়-দেনা মিটাইয়া দিয়া যাত্রা করিব—হয়ত আর কোন দিন আসা হইবে না। তখন একদিকে অধ্যাপকের লাইব্রেরি অন্যদিকে সেই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মোহ আমাকে প্রাণপণে পিছনে টানিতেছে—গেলেই ত চলিয়া গেলাম। দিন-রাত্রির একটি ক্ষণও বৃথা কাটিতে দিতেছি না। যতখানি পারি পড়ি আর যতক্ষণ পারি বেড়াই। সন্ধ্যার আইনও আর মনে নাই, রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথে পথে ঘুরি বা জাগিয়া জাগিয়া বই পড়ি।

অনেক রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোরের বেলা, চোখের ঘুম তখনও ছাড়ে নাই, হঠাৎ বাইরের দরজায় আঘাত পড়িল—বাবুজী!

ঘুমচোখেও গলা চিনিলাম। অধ্যাপকের সেই বৃদ্ধ ভৃত্য, খোকার দেহরক্ষী, রামদীন, এত ভোরে?

উঠিয়া দরজা খুলিতেই সে কহিল, চলুন। মাইজী ডেকেছেন।

—মাইজী। না বাবুজী?

—ন' না। বাবুজী নয়। তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, কি হয়েছে, রামদীন?

—কিছু না। আমি কিছু জানি না। মাইজী বললেন বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।

স্পষ্ট বুঝিলাম কিছু একটা গোপন করিতেছে। সেটা কি বুঝিতেছি না। অথচ ইহাকে সেজন্য পীড়াপীড়ি করিয়াও লাভ নাই। কিন্তু, কি? কোন বিপদ আপদ? এমন কি বিপদ হইতে পারে, যাহার জন্য আমার ডাক পড়িল—আমি একে বিদেশী, তাহাতে প্রায় অপরিচিত?

রামদীন কহিল, বাবুজী, জলদি।

জামা একটা টানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম।

দোতলায় পূর্বে কখনও উঠি নাই। নীচে লাইব্রেরি-ঘরেই বসিতাম। রামদীন আমাকে সোজা উপরে লইয়া গেল। পাশাপাশি দুইটি ঘর, তাহার ওপাশে খানিকটা খোলা ছাদ। উঠিয়াই দেখিলাম, প্রথম ঘরটির সম্মুখে রেলিং ধরিয়া অধ্যাপকের স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ অন্যদিকে। আমি গিয়া কাছে দাঁড়াইলাম। কহিলাম, কি ব্যাপার?

তিনি মুখ ফিরাইলেন না। হাত দিয়া ঘরের খোলা দরজাটি দেখাইয়া দিলেন।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ইঙ্গিত মানিয়া ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম, তারপর ঘরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে এক পাশে, দেওয়ালের গায়ে একটি খাটে, অধ্যাপক শুইয়া আছেন। হঠাৎ আমার সমস্ত দেহে বিদ্যুতের শক লাগার মত হইল। অধ্যাপকের দেহ নিশ্চল। মৃত!

বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তারপর বাহির হইয়া আসিলাম। কহিলাম, কি হ'ল?

—জানিনে।

—কখন হ'ল?

—জানি নে।

—ঘুমের মধ্যে? আপনি টের পাননি?

—আমি ও-ঘরে শুই।

কহিলাম, এখন কি করবেন?

—বুঝতে পারছি না। তাই আপনাকে ডেকেছি।

—এখানে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

—থাকলেও জানিনে। আমাদের সঙ্গে কারু সম্পর্ক নেই।

—বন্ধু-বান্ধব?

—সামান্য।

—তাহলে?

একটু থামিলেন। তারপর কহিলেন, নির্ভর করা যায় এমন লোক একজনই আছেন, ডক্টর বোস।

—কে তিনি? আপনাদের ডাক্তার?

—আমাদের ডাক্তার ঠিক নন, অসুখ বিসুখ বিশেষ হয় না ত। ওঁর বন্ধু। খুব শক্ত লোক।

—তাঁকেই ডাকা যাক তাহলে। রামদীন!

রামদীন কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। মুখ বেদনার্ত। বুড়া মানুষ, প্রভুকে ভালবাসিত। নিঃশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিলাম, তুমি ডাক্তার বাবুর বাড়ি জান?

—জী।

—তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। কত দূরে বাড়ি?

—দূর নয়।

—বেশ।

—কি বলব?

অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, যা হয়েছে তাই বলবে।

—জী।

—খোকাবাবুকে নিয়ে যাও। মাসীমার কাছে নিয়ে আসবে। বোলো, তুমিই আবার নিয়ে আসবে, ততক্ষণ থাকবে সেখানে। আর কিছু বোলো না।

খোকা বাগানে ঘুরিতেছিল, তাহার একটি কুকুর, ও দুইটি বিড়াল তাহার পায়ে পায়ে ফিরিতেছিল। খোকাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া রামদীন বাহির হইয়া গেল।

বারান্দায় একটা ছোট বেঞ্চি ও গোটা দুই চেয়ার পড়িয়াছিল। অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, বসুন।

বেঞ্চিটায় বসিলাম। তিনিও একা, চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতের উপরে মুখ রাখিয়া দূরে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। চোখে জলের আভাসমাত্র নাই, মুখশ্রী ঈষৎ শুষ্ক, ঠোঁট দুটি কঠিন হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে। তাঁহাকে কোনদিন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। তখন আর কিছু করিবার নাই, অকস্মাৎ এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমার চিন্তাশক্তি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি একই ভাবে বসিয়া রহিলেন, একটুও না নড়িয়া চড়িয়া। আমার দৃষ্টি বার বার তাঁহার উপরে গিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মুখে, তাঁহার দেহে, তাঁহার বসার ভঙ্গীটির প্রতি। এক একবার তাকাই। হঠাৎ মনে পড়ে অসভ্যতা হইতেছে, চক্ষু ফিরাইয়া নিই, আবার কখন অতর্কিতে চক্ষু তাঁহার উপরে গিয়া পড়ে। আমার এই দৃষ্টিনিয়োগ তিনি টের পাইতেছেন, এমনও মনে ছিল না। তিনি যেন গভীর ধ্যানমগ্ন। তাঁহার সেই নিশ্চল দেহ, নিষ্কম্প মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া আমার শুধু একটি কথাই মনে হইতে লাগিল—কী অসম্ভব শক্তি এই ক্ষীণদেহ মেয়েটির মধ্যে! কতখানি মনের বল থাকিলে এই অবস্থায় মানুষ এমন স্থির থাকিতে পারে!

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল জানি না। মনে হইতেছিল বহুক্ষণ, কিন্তু আসলে বোধ হয় মিনিট পনর'র বেশী হইবে না। একটি গাড়ি আসিয়া দ্বারে থামিল। রামদীনের আগে আগে দ্রুত পা ফেলিয়া একটি ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকিলেন। মুখ ফিরাইয়া একবার রামদীনকে কি বলিলেন, সম্ভবত প্রশ্ন করিলেন কোথায়, তারপর সোজা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

আমি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম। দূর হইতে দেখিয়াই লোকটির উপরে শ্রদ্ধা আসিল। এক একজন থাকে, যাহাকে দেখিলেই মনে হয় এ লোক শক্তিধর, ইহার উপরে নিঃসংশয়ে নির্ভর করা যাইতে পারে। একটু লম্বার দিকে, মুখে-চোখে বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। দোহারা চেহারা, কিন্তু চলার ভঙ্গীতে বোঝা যায় প্রচুর শক্তি ও সজীবতার অধিকারী। চুল পাকা, বয়স পঞ্চাশ ত বটেই, অনেক বেশীও হইতে পারে, কিন্তু জরার কোন লক্ষণ চোখে পড়িল না। সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। হাতে একটি ছোট ব্যাগ।

উপরে উঠিয়া তিনি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার পিছনে, খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কিছুক্ষণ তিনি একদৃষ্টে মৃত দেহটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার তাহার বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন। সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল। দেহ শক্ত। তাহার অর্থ, মৃত্যুর পর বেশ কিছুক্ষণ হইয়াছে। ডাক্তার হাতের আঙুল টিপিয়া দেখিলেন, চোখের পাতা ঠেলিয়া চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

অধ্যাপকের দেহ ও মুখ বিবর্ণ রক্তহীন। নাকের ডগা ও ঠোঁট ঈষৎ নীল। মুখে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব, যেন কি একটা কষ্টের ছাপ। অন্য কোন বৈলক্ষণ্য আমার চোখে পড়িল না।

ডাক্তার অনেকক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলিয়া ঘরের চতুর্দিকে তাকাইলেন, তাঁহার দেখাদেখি আমিও ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলাম।

ঘর বেশী বড় নয়। এ বাড়ির সকল কিছুরই মত, পরিচ্ছন্ন ও সযত্নে সাজানো। খাটটি একেবারে নূতন মনে হইল। চকচকে পালিশ, বার্ণিশে কোথাও এতটুকু মালিন্য নাই। খাটের মাঝখানে অধ্যাপক লম্বালম্বি শুইয়া। তাঁহার বালিশের পাশে, দেহের পাশে, কয়েকখানা বই ইতস্তত: ছড়ানো। কাল রাত্রেও অনেকক্ষণ যাবৎ পড়িয়াছেন, বুঝিতে কষ্ট হয় না।

খাটটির গড়ন কিছু নূতন রকমের। খুব নীচু খাট, মেঝে হইতে পুরা এক হাতও উঁচু হইবে কিনা সন্দেহ। খাটের চারপাশে রেলিং, কিন্তু সাধারণত: রেলিং যেভাবে হয় সেরকম নয়। প্রায় দশ-বারো ইঞ্চি খাড়া তক্তার বেড় দিয়া খাটটি আগাগোড়া ঘেরা, যেন সবশুদ্ধ একটি বাক্স, তাহার ডালাটা নাই। এরকম খাট আর কখনও দেখি নাই। সম্ভবতঃ অধ্যাপকের নিজস্ব কল্পনা। খাটের উপরে যাহারা বই খাতা কাগজ লইয়া ঘুমায়, তাহাদের পক্ষে এ রকম খাট সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। বই, খাতা, পেন্সিল পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না।

এক পাশে একটি বুককেস, বই ভর্তি। অন্য পাশে, জানলার গায়ে, ছোট একটি টেবিল, রাইটিং কেস ও সেক্রেটারিয়াটের সংমিশ্রণ। এ-ও স্পেশাল ডিজাইন। দুইটি চেয়ার। একটি কাপড়ের র‍্যাক্। সবই নূতন।

দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ফ্রেমে-বদ্ধ টেনিসব্যাট। এখনও খেলিতেন তাহা হইলে।

খাটটি দেয়ালের একেবারে গায়ে ঘেঁষিয়া আছে। দেয়ালে, খাট হইতে কিছু উঁচুতে ও শিয়রের দিকে বাতি বসানো। এটা খনি-এলাকা, বিদ্যুতের ব্যবহার বেশী নয়, গ্যাসের ব্যবহার প্রচুর। আমি নিজে যে-বাড়িটাতে আছি, সেখানেও গ্যাসের বাতি গ্যাসের উনান। এও দেখিলাম, দেয়াল বাহিয়া উপর হইতে গ্যাসের পাইপ নামিয়াছে, ক্রমে বাঁকিয়া একটি বাড়িতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এমন কায়দায় মাপিয়া বসানো যে বাতি জ্বালিলে তাহার আলো ঠিক শয়ান ব্যক্তির হাতের বইতে পড়িবে। ঈষৎ নীলরঙের ডুম্ বাতির গায়ে। বাতিটা তখনও জ্বলিতেছে। নিশ্চয়ই অধ্যাপক পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, ঘুমের মধ্যেই প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। বা হয়ত তাঁহার আলো জ্বালিয়া ঘুমানো অভ্যাস ছিল।

ডাক্তার হাত বাড়াইয়া চাবি ঘুরাইয়া দিলেন, বাতি নিবিয়া গেল। পোড়া গ্যাসের এক ঝলক গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বসিলেন। আমি রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। অধ্যাপকপত্নী তখনও একই-ভাবে বসিয়া আছেন।

ডাক্তারের আহ্বানে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন। ডাক্তার কহিলেন, কি করে হ'ল?

—জানিনে।

—কোন অসুখ-বিসুখ বলেছিলেন?

—না।

—কখন হল?

—জানিনে।

—টের পাননি?

—আমি ওঘরে শুই খোকাকে নিয়ে।

—নিয়মিত?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, আপনাদের আত্মীয়স্বজন কে আছেন এখানে?

—নেই। থাকলেও আমি জানিনে।

—খবর দেবার মত কেউ?

—ওঁর ভাই আছেন, ম্যাণ্ডালে-তে। খবর দিতে হবে, আসতে পারবেন মনে হয় না। এসেই বা কি করবেন।

—আপনার দিকে?

—সে-ও বহুদূর। তাদের কথা পরে ভাবলে চলবে।

ডাক্তার আবার চুপ করিয়া কি ভাবিলেন। কহিলেন, আপাতত যা করবার সে আমি ঠিক করে নিচ্ছি। আপনাকে শক্ত হ'তে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না।

—ভেঙে পড়িনি ত'?

আশ্চর্য, স্থির ও শান্ত স্বর। একটু যেন ক্লান্ত, যেন মনের কোন্ বহুদূর অন্তস্তল হইতে উঠিয়া আসিল কথাটা।

ডাক্তার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তারপর কহিলেন, খোকা কোথায়?

—অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

—ভাল করেছেন। কিন্তু একবার তাকে নিয়ে আসবেন না, দেখতে?

—এনে কি হবে?

—তা বটে!

ডাক্তার হঠাৎ আমার দিকে চাহিলেন। আপনি কে?

অধ্যাপকপত্নী কহিলেন, প্রতিবেশী। খোকার বন্ধু। আপাতত যা বলার করার ওঁকেই বলতে হবে।

—বেশ।

ডাক্তার আমাকে ডাকিয়া লইলেন। দু'জনে নীচে নামিয়া আসিলাম। ডাক্তার বলিলেন, এখানে ছেলেদের একটি দল আছে, এ-সব ব্যাপারে তারাই ভরসা। আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

রামদীন তাহাদের ডাকিতে গেল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে পরিচিত প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবও কয়েক জন আসিয়া পড়িলেন।

ডাক্তার সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। মৃত্যুর কারণ লিখিলেন asphyxia ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ। দেহ লইয়া ছেলেরা চলিয়া গেল। শুনিলাম, শ্মশান অনেক দূর। আমার রুগ্ন দেহ, অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্মশানযাত্রীরা ফিরিয়া আসিল। সংবাদ পাইয়া আমি আবার গেলাম। তখন দেখিলাম, অধ্যাপকপত্নীর পরিচিত কয়েকজন মহিলা আসিয়াছেন। রাত্রে তাঁহারা কেহ কেহ এ বাড়িতে থাকিবেন।

সন্ধ্যার পরে, কলরব ও আলোচনা যখন স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যাপকপত্নী হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার কহিলেন, আমি এই সম্ভাবনাই ভাবছিলাম। এতক্ষণ হয়নি এইটেই আশ্চর্য!

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কহিলেন, শুইয়ে রেখে দিন। এখন দরকার শুধু বিশ্রাম, আর কিছু নয়। ওষুধ দিয়ে জ্ঞান করানোর চেয়ে এখন এই ভাবে থাকাই ওঁর পক্ষে ভাল।

আমি কহিলাম, আমি কি থাকব রাত্রে?

ডাক্তার কহিলেন, কিছু দরকার নেই, আমি থাকছি। আপনি বাড়ি যান, দরকার হয় ত' ডেকে পাঠাব।

পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর মূর্ছা ভাঙিয়াছে। দুর্বল। শুইয়া আছেন। ডাক্তার উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ডাক্তার তখনও বাড়ি যান নাই। কহিলেন, আপনাকে আমার দরকার আছে।

কহিলাম, বলুন।

নির্জন লাইব্রেরি-ঘরে দুজনে আসিয়া বসিলাম। ডাক্তার কহিলেন, আপনার পরিচয় আমি শুনেছি। এদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এইটেই দেশ, অথচ এদের আত্মীয়-স্বজন বলতে বিশেষ নেই। চিরকাল বাইরে থেকেছে, বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেশী নয়। আপনি বাইরের লোক, আমিও তাই। অথচ, আপাতত বোধ হয় আমরা দুজনই এদের বন্ধু বা ভরসা।

আমি কহিলাম, সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি ত বেশী দিন থাকব না। আমার ফেরার সময় হয়ে এল। আপনিও কি এখানকার লোক নন?

—না। মাঝে মাঝে এসে থাকি। এদের সঙ্গে পরিচয় আছে, এইমাত্র। কিন্তু সম্পর্ক গভীর না হলেও, এদের প্রতি আমার কিছু দুর্বলতা আছে। অধ্যাপককে আমি স্নেহ করতাম। আর এই মেয়েটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। অদ্ভুত শক্ত মেয়ে!

—তাই ত দেখলাম। এ ভাবে এই ব্যাপারকে কেউ সহ্য করতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

—সেইখানেই আমার আশঙ্কা। এত বেশীরকম চেপে রাখছে নিজেকে, এর ভয়ঙ্কর রি-অ্যাকশন হওয়া অসম্ভব নয়।

—হ্যাঁ। ফিট হ'লেন দেখে আমার ভয় হয়েছিল।

—ওটা কিছু নয়। বরং ওটা একটা বেষ্ট রিল্যাক্সেশন। এরকম ফিট আরও দু'-চারবার হতে পারে। তখন চুপচাপ শুইয়ে রেখে দেওয়াই একমাত্র চিকিৎসা। সে যাক, যা বলছিলাম। আপনি কি দিনকতক থেকে যেতে পারবেন?

—কত দিন, বলুন?

—অন্তত এই শ্রাদ্ধের ব্যাপারটা মিটে যাওয়া পর্যন্ত?

—তা পারব।

—এরা ব্রাহ্ম। শ্রাদ্ধ মানে হৈ-হৈ ব্যাপার কিছু নেই। শুধু একটা উপাসনা। আর কিছু লোকজনকে সেদিন একটু জল খাওয়ানো। ভাইটাই কে কে আছে, জেনে নিয়ে তাদের চিঠি দেবার ব্যবস্থা আমি করছি। তারা কেউ আসে, ভাল। না এলে আমাকে আর আপনাকেই চালিয়ে নিতে হবে শেষ পর্যন্ত।

—তারপর?

—তার পর বেশী কিছু নেই। বাড়ি নিজের, টাকাকড়িও আছে। মেয়ে শক্ত। ঐ এক ছেলে, ঝামেলা নেই। রামদীন

বহুদিনের লোক, অত্যন্ত বিশ্বাসী, মেরে তাড়ালেও ছেড়ে যাবে না। শহর জায়গা, হঠাৎ বিপদ-আপদের কিছু নেই। তার পরে আর কি, ভগবান ভরসা।

—বেশ। আপনি যা বলবেন, আমি তৈরি থাকব।

—আপনাকে আমি বলেছি সেটা প্রকাশ করবেন না। ভয়ানক অভিমানী মেয়ে, কারো সাহায্য বা করুণা সইতে পারে না। সেইজন্যেই আরও বেশী করে শক্ত থাকার ভাণ করে।

—বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা বলুন ত? আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছি, ভরসা পাইনি। ওঁকে আমি যতটুকুন দেখেছি, চমৎকার জোয়ান স্বাস্থ্য বলেই মনে হয়েছে। অবশ্য আমি ডাক্তার নই, বাইরে থেকে যা মনে হত তাই বলছি। হঠাৎ কি হ'ল? এভাবে মারা গেলেন কেন?

ডাক্তার হাসিলেন। মানুষ মারা যায় কেন? সব মৃত্যুর কি কারণ আমরা বুঝি?

—হার্টফেল? হার্ট কি দুর্বল ছিল?

—অসুস্থ ছিল বলে আমি জানি নে।

—আপনি সার্টিফিকেট লিখেছেন,' অ্যাসফিক্‌শিয়া, সেটা কি হঠাৎ হ'তে পারে?

—হঠাৎই হয়।

—কি কারণে?

—কারণ অনেক রকম হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঠিক কি হয়েছিল আমি কি করে বলব?

বলিতে বলিতে ডাক্তার ঈষৎ অন্যমনস্ক হইলেন। তার পর সে ভাবটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কহিলেন, আমি চলি এবারে। বিকালে আসছেন ত, এ বাড়ীতে?

—যখন বলবেন, আসব।

—বেশ।

বিকালে গিয়া দেখিলাম, রোগিণী অনেক সুস্থ। ধাক্কাটা অনেক সামলাইয়া লইয়াছেন ইতিমধ্যে। অবশ্য অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িবার লক্ষণ কোন সময়েই দেখি নাই।

ছেলেকেও দেখিলাম, আপন মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে। মায়ের অত্যন্ত বাধ্য। তাহার উপরে মায়ের প্রভাব এমনই প্রবল যে, এত বড় ঘটনাটাকেও যেন স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ করাইয়া আনিয়াছেন তাহাকে। আশ্চর্য মেয়ে!

[ক্রমশঃ।

সুরা না সুধা

পানাসক্তি এক বিচিত্র ব্যসন। মানব সমাজে সুরাপানের অভ্যাস বহুল প্রচারিত, এই অভ্যাসের সম্বন্ধেই দু'চার কথা এখানে বলার চেষ্টা করব।

অনেক সময় অনেকের পানাসক্তি প্রায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়, যেমন শোনা গিয়েছে কোন কোন লক্ষপতি নাকি পুরো দু'-বোতল হুইস্কি দৈনন্দিন জলযোগ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন, এই ধরণের মদ্যাসক্তি বলা বাহুল্য মানুষকে নিশ্চিত সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়। দ্রুত গতিতে পান করলে সুরার অনিষ্টকারিতা বৃদ্ধি পায়, এ্যালকোহলের বিষক্রিয়ায় মগজ আচ্ছন্ন হয়ে যায় যদি অল্প সময়ের ভিতর কেউ অধিক পরিমাণ মদ্য পান করেন—অথচ ঠিক সেই পরিমাণ মদ্যই যথোপোযুক্ত সময়ের ব্যবধানে গৃহীত হলে তার ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। সুরার পরিমাণ অপেক্ষা কি ভাবে তা পান করা হয় তার উপরই তার ক্রিয়া বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। জল বা সোডার সঙ্গে মিশ্রিত মদ্য অপেক্ষা নির্জলা মদ্য অনেক বেশী অনিষ্টদায়ক।

সুরাপানের সমর্থক কেউ কেউ এমন ধারণা করেন যে মদ্যপানে মনের স্ফূর্তি ও কার্যাক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, সুরার প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়ে এবং সময় বিশেষে সম্পূর্ণ ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ারও আশঙ্কা থাকে, এ অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। এ্যালকোহল সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যই আজও সাধারণের অজানা, যেমন নিয়মিতরূপে মদ্য পানে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি যে কোন অনভ্যস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক কম সময়ের মধ্যে নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাও আমাদের অনেকেরই জানা নেই, আবার দুর্বল ক্ষীণ দেহ মানুষের শরীরে সুরাপানের প্রতিক্রিয়া যত ত্বরান্বিত হয় কোন সবল সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হয় না। সুরাপায়ীর পক্ষে কয়েকটি নিয়ম অবশ্য পালনীয়, তিনি যেন সর্বদা মনে রাখেন যে শূন্য উদরে সুরাপান অতিশয় ক্ষতিকর, পানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু আহার করা বিধেয়, পূর্ণ উদরে মদ্যপান করলে তার অনিষ্টকারিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়।

অলিভ অয়েল বা জলপাইয়ের তেল ও মাখন মদ্যপানের অব্যবহিত পূর্বে গ্রহণ করলে পানের প্রতিক্রিয়া অনেক কম হয়, মত্ততা যিনি পরিহার করে চলতে চান এমন ব্যক্তি এই নির্দেশগুলি মেনে চললে উপকৃত হবেন।

অনেকে নিয়মিত সুরাপায়ী না হলেও বেশ কিছুদিনের ব্যবধানে মদ্যপান করার আগ্রহ অনুভব করেন, বলা বাহুল্য এই ধরণের পানাসক্তি বিশেষ ক্ষতিকর নয়, কিন্তু পানাভ্যাস মানুষকে করে তোলে নেশার দাস এবং নিয়ে যায় ক্রমিক অধঃপতনের পথে।

পরিশেষে একটু বক্তব্য আছে, শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশগুলির অনুকরণে আমাদের দেশেও আজ সুরাপানের অভ্যাস প্রসার লাভ করেছে ক্রমেই ব্যাপক ভাবে, দেশের সরকার ও সমাজ-সচেতন মানুষের দৃষ্টি যদি এখনও এদিকে নিবদ্ধ না হয় তবে কে বলতে পারে যে ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া একদিন আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে না?
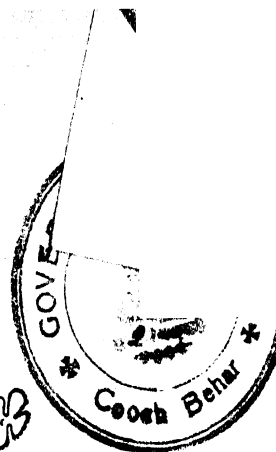
বাঙলায় কন্‌ট্র্যাক্ট ব্রীজ

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

['তাসা কর্ম্মনাশা' এই প্রবাদবাক্যটি শুনে শুনে তাসখেলা সম্বন্ধে কোনওরূপ আগ্রহ ছিলনা আমার। প্রথমে ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু প্রভৃতি খোলামাঠের খেলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার দরুণ। এর মধ্যে প্রথমোক্ত খেলাটিই ছিল বেশী প্রিয় আমার, খেলতুমও ভালই যদিও তৎকালীন নামকরা খেলোয়াড় গোষ্ঠ-পাল, উমাপতি কুমার, রবি গাঙ্গুলী, সামাদ প্রভৃতির সমকক্ষ নয়। সে সময়ে তাস, পাশা ক্যারাম ইত্যাদি খেলাকে আমল ত' দিতুমই না বরঞ্চ যাঁরা এই খেলা খেলত তাদের কুঁড়ে বলে বিদ্রূপ করতেও পিছপা হতুম না। তখন এইরূপ কোনও খেলায় নিজেও যে জড়িয়ে পড়তে পারি এচিন্তা মনেও স্থান পায়নি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, ১৯২২ কি ১৯২৩ সালে ঠিক মনে নেই দানাপুরে ফুটবল খেলতে গিয়ে ডানপায়ের হাঁটুতে ভীষণ চোট পেয়ে হাসপাতালে দেড় মাস থেকে যদিও সেরে উঠি কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে—ফুটবল খেলা, যা আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় খেলা, সেটি ছাড়তে হয়। প্রায় সাত আট বছর বাদে আবার খেলতে সুরু করি এবং চালিয়েছিলুমও দু'তিন বছর কিন্তু আগের মত খেলতে পারিনি কারণ খেলতুম তখন ভয়ে ভয়ে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয় আরও বাড়তে থাকে এবং ছেড়ে দিতে হয় এই খেলা একেবারে। কিন্তু গোড়া থেকে খেলাধূলায় একটু বিশেষ আকর্ষণ থাকায় বিকেল বেলা মনটা একটু ছুঁক ছুঁক করত। গড়ের মাঠে খেলা দেখে দুধের সাধ-ঘোলে মেটান গোছে কাটতে লাগল মন্দ নয়। তাতেও ভাঁটা পড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে দুটো কারণে। প্রথমতঃ কর্ম্মস্থল থেকে ছুটি পাওয়া বা নেওয়া শক্ত হ'য়ে পড়তে লাগল—কতদিন আর খেলা দেখতে যাব বলে একটু আগে ছুটি নেওয়া যায়? দ্বিতীয়তঃ যদিওবা ছুটি পাওয়া যায় মাঠে ঢোকা একরূপ অসাধ্য হয়ে পড়ল। ছেড়ে দিলুম খেলা দেখা সেদিন থেকে যেদিন চোখের Tear gas-এর জের কাটাতে লেগেছিল প্রায় সাতদিন অর্থাৎ ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের I. F. A. Shield এর ফাইনাল খেলার দিনে।

এরপরে সময় কাটাবার জন্য সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়ে বসতুম এবং আস্তে আস্তে দেখে শুনে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্রীজ খেলাটি শিখতে লাগলুম। বলাবাহুল্য সেই সময়ে এই খেলাটিই সচরাচর খেলা হ'ত ক্লাবে। খেলাটিও লাগতে লাগল মন্দ নয় কারণ খেলাটিতে ভাববার খোরাক আছে বিশেষ—আমার মনে হয় দাবা-খেলার চেয়ে কোনও অংশে কম ত' নয়ই বরঞ্চ কিছু বেশীই।

ভালভাবে শেখবার উদ্দেশ্যে কিনে ফেললুম বই একখানা Culbertson's Blue Book। পড়ে আকর্ষণ আরও গেল বেড়ে এবং ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বইই কিনলুম, সেগুলির মধ্যে Culbertson's Gold Book, Oswald Jacoby's Four Aces বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে এক সদগুরুর (স্বর্গীয় নীতিশচন্দ্র মিত্র) সন্ধান মিলে গেল ভাগ্য গুণে এবং তাঁর সঙ্গে চ করে অভিজ্ঞতাও লাভ করলুম যথেষ্ট। বলতে বাধা নেই যে প্রথমে "তাসা কর্ম্মনাশা" বলে বর্জ্জন করতুম যে খেলাকে সেই খেলাটিই এমন ভাবে হৃদয় জয় করল আমার যে খাওয়া দাওয়া, সাংসারিক দায়িত্ব কিছুটা শিথিল হ'য়ে পড়ল। এর জের অনেকদূর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে এবং এখনও তার জের টানতে হচ্ছে। কিন্তু এই খেলাটির মধ্যে পেয়েছি বহু জিনিষের সন্ধান যথা ইহা অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্গ, চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি ও একাগ্রতা চর্চ্চার মাধ্যম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা পুরানো কথা যা কোনও ব্রীজখেলার শেষ পর্ব্বে পারিতোষিক বিতরণ কালে সভাপতি বলেছিলেন :—

...As physical exercise develops the body mental exercise develops the brain and this game seems to be the best medium of such ai exercise..."

অর্থাৎ 'যেমন শারীরিক চর্চ্চার দ্বারা শরীরের উন্নতি সাধিত হয় সেইরূপ মস্তিষ্কের চর্চ্চার দ্বারা মানসিক শক্তির উন্নতি করা চা এবং আমার মনে হয় যে এই খেলাটি এইরূপ চর্চ্চার একটি শ্রে মাধ্যম।'

উপরোক্ত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছি পরবর্ত্তী কালে নি কর্ম্মজীবনে—স্মরণশক্তির অভাব বোধ করিনি সুদীর্ঘ ৩৭ বৎস কর্মকালে কোনও সময়ে এবং একাগ্রতার অভাব হয় না যে কোন বিপরীত পরিস্থিতিতেও।

যা'হোক ঘরে বসে খেলাগুলির মধ্যে ব্রীজ খেলাকেই শ্রেষ্ঠ ম হওয়ায় এবং এই খেলাটির প্রতি আমার নিজের বিশেষ আক থাকায় এই খেলাটি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দে এই প্রবন্ধ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি, যদি পাঠকদিগের নি থেকে কিছুটা সমর্থন পাই তাহলে পরিশ্রম সার্থক ও নিজে ধন্য বলে মনে করব।

এইরূপ একটি পাশ্চাত্য খেলার বাংলায় রূপদান করা ব কঠিন মনে করে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়ি সেই সময়ে প্র সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় শুধু মৌখিক উৎ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি পরন্তু তরুণ হিন্দুস্থান নামক বাংলা দৈ কাগজে নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রকাশ করে আমায় কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করেছেন—আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। পরে ব 'নবশক্তি' ও 'আত্মশক্তি' নামক সাপ্তাহিকে আমার লেখা নিয়মিত স্থান লাভ করেছে। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌ মহাশয় এ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সেই সময়ে প ও পাঠিকাদিগের নিকট থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিলুম সো আজ বহুবৎসর বাদে এই খেলাটিকে আধুনিক উন্নত ছাঁচে নূতনরূপ দিয়ে প্রকাশে চেষ্টিত হয়েছি, জানি না কতদূর কৃত হব সবই নির্ভর করছে পাঠক পাঠিকাদের উপর।]

ব্রীজ খেলার সাধারণ বিবরণী

ব্রীজ খেলা দু'রকমের—অক্‌সন্ (Auction) ও কন্‌ট্রাক্ট (Contract)। শেষোক্ত খেলাটির আবির্ভাব আমাদের দেশে বেশী দিনের নয়, কিন্তু এই খেলার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত খেলার (Auction) আদর স্বভাবতঃই কমে গেছে। কারণও খুবই স্বাভাবিক—উৎকর্ষতা লাভের জন্য দরকার নিবিড় মনোযোগ, তাসের বিভাগ ও অবস্থিতি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা উপরন্তু রয়েছে স্লামের (Slam) মোটা অঙ্কের বোনাস (Bonus)। ডাক ও খেলা ঠিকমত না হ'লে এই বোনাস লাভ করা সম্ভব নয় কিছুতেই, আন্দাজে হয়ত এক আধ বার কৃতকার্য্য হওয়া যেতে পারে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে বিপক্ষ দলের খপ্পরে পড়ে মোটা অঙ্কের খেসারৎ দিতে হয়। এই বোনাস ছাড়াও কন্‌ট্রাক্ট খেলার আকর্ষণ হ'ল গেম বোনাস (Game Bonus)। গেমের ডাক ডেকে খেলা করতে পারলেই এই বোনাসের অধিকারী হওয়া যায়, অপর পক্ষে অক্‌সন্ (Auction) খেলায় কম ডাক হলেও বেশী ডাকের খেলা করতে পারলে স্লাম ও গেমের বোনাস পাওয়া যায়। সুতরাং কন্‌ট্রাক্ট খেলায় দরকার বিজ্ঞানসম্মত ধারায় ডাকের আদান প্রদান ও উন্নত ধরণের ক্রীড়াপদ্ধতি এবং এইজন্যই কন্‌ট্রাক্ট খেলা আজ ক্রীড়াজগতে অধিক আদরণীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে এই খেলার যথেষ্ট আদর আছে বটে কিন্তু সাধনা বা চর্চ্চা গতানুগতিক রকমের। প্রকৃত সাধনা বলতে যা বোঝায় তার নিতান্ত অভাব আমাদের দেশে। এর প্রমাণ এই যে, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনও পুস্তিকা বা সাময়িকী প্রকাশিত হ'য়েছে বলে আমার জানা নেই। একমাত্র ইন্ডিয়ান ব্রীজ ওয়ার্ল্ড (Indian Bridge world) নামক পত্রিকা ছাড়া। উক্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার আমার উপরই পড়েছিল এবং চেষ্টাও করা হয়েছিল প্রচুর চালানোর জন্য, কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য যে ক্রেতার অভাবে বহু টাকা লোকসান দিয়ে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলুম কয়েক মাস পরেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে এই খেলার পক্ষপাতী সমর্থকের সংখ্যা খুব নগণ্য নয় এবং ক্রীড়াবিদও আছেন যথেষ্ট। আশা করি পরবর্তীকালের এইরূপ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং এইরূপ প্রচার ও ক্রীড়ায় উন্নতি সাধন করে জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলা তথা ভারত একটি উচ্চ আসন গ্রহণ করবে।

খেলাটিকে প্রধানতঃ দুটি অংশে ভাগ করা যায়—১। ডাক (Bidding) ও ২। খেলা (Play-out)। খেলা আবার দু' প্রকারের—(ক) ডাক পূরণের জন্য খেলা ও (খ) বিপক্ষদলের ডাকের বাধাদানের জন্য খেলা। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাসের অবস্থিতি ও বিভাগ ঠিকমত আন্দাজ করতে পারলে অভিজ্ঞতার ফলে খেলার সময়ে একটি পিঠ বাড়ান যায় আবার দূরদৃষ্টি বলে বিচক্ষণতার দ্বারা বিপক্ষ দলের একটি পিঠ কমান যায়। অনেক সময়ে দেখা গেছে যে কোনও একটি দানে একটি নির্দিষ্ট তাস প্রথমে খেলার দরুণ বিপক্ষদল চুক্তি সম্পাদনে অসমর্থ হয়। এগুলিকে হঠাৎ এর (accident) পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে এবং এসম্বন্ধে চর্চ্চা অনাবশ্যক।

ব্রীজ খেলা সম্বন্ধে বইগুলির মধ্যে নবযুগ আনে Culbertson-এর Blue Book যদিও তার আগে Manning Foster, Dalton প্রভৃতি নামকরা খেলোয়াড়ের বইগুলির খুবই কদর ছিল কিন্তু মনে হয়, সবগুলিই চাপা পড়ে যায় উক্ত Blue Book-এর আবির্ভাবে। ইহার কিছু পরে Culbertson আরও উন্নতধরণের পুস্তক প্রকাশ করেন Gold Book নাম দিয়ে এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত দুটি বইয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে নূতন বই প্রকাশ করেন, আধুনিকতম প্রথার নাম তার Contract Bridge Complete। ইতিমধ্যে নামকরা খেলোয়াড় Oswald Jacoby প্রণীত Four Aces বইটিও খুব প্রসিদ্ধিলাভ করে। যাই হোক, বইগুলির মূল বিষয়বস্তুও লক্ষ্য হ'ল কি ভাবে বা কোন প্রথা অবলম্বন করে সহজে ঠিকমত ডাকে পৌছান যায়। বিভিন্ন লেখক নিজ নিজ ভাবধারায় বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে ঐ উদ্দেশ্য সমাধানের চেষ্টা করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা বা অনুশীলন দ্বারা দেখা গেছে যে একমাত্র উচ্চডাক (Slam Bidding) ছাড়া গোড়ার দিকের ডাকের নিয়মগুলি মূলতঃ একই প্রকারের শুধু প্রকাশভঙ্গি কিছুটা পৃথক করে Commercial দর সৃষ্টি করা হয়েছে পাঠকবর্গের রুচিভেদানুযায়ী। সে যাই হোক, লেখক-সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয় আমার, উদ্দেশ্য হ'ল Bridge খেলা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদিগকে অবহিত করতে সাহায্য করা। এবিষয়ে যদি কিছুটা সফল হই তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক ও নিজেকে ধন্য মনে করব।

উদ্বোধনী ডাক (Opening Bid)

তাস বন্টনের পর ডাক দেবার প্রথম পালা হ'ল বন্টনকারীর। প্রথমে তাকে বিচার করতে হবে যে যেরূপ তাস তিনি পেয়েছেন সেরূপ তাসে ডাক দেওয়া উচিত কি না? এই উচিত কি অনুচিত বিবেচনা করতে গেলে দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থা (system) যা দিয়ে নিজে বোঝা যায় ও 'খেড়ি'কেও (partner) বোঝান যায় সহজে যে তাসের পিঠজয়ের ক্ষমতা কিরূপ। যে পন্থা অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য অধিকতর কার্যকরী হয় সেটিকেই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে যেতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে এই খেলাটির আদর পাশ্চাত্য দেশেই অধিক এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা খেলাটির উৎকর্ষ সাধনে গবেষণাও করেছেন বহু। স্বভাবতঃই উদ্বোধনী ডাকের নিয়মও আবিষ্কৃত হয়েছে নানা প্রকারের। প্রত্যেক গ্রন্থকার নিজ নিজ পন্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানা রূপ উদাহরণ দিয়ে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর প্রণালীটিই শ্রেষ্ঠ। বইগুলি পড়ে বা অতগুলি পন্থার কথা শুনে প্রথম শিক্ষার্থিগণ পড়েন বিপদে, কোনটি ঐগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা গ্রহণীয় বিচার করা হয়ে পড়ে কঠিন। কঠিন মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার পরেও আমি নিজেই মধ্যে মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট তাসে ঠিক মত ডাকে পৌছবার সময়ে। যাই হোক, এ বিষয়ে মন্তব্য করা আমি ধৃষ্টতা মনে করি। আমার নিজস্ব মত এই যে সবগুলি প্রণালীই মূলতঃ এক, শুধু তফাৎ প্রকাশভঙ্গীর যা আগেই বলা হয়েছে।

ডাককে সাধারণ ভাবে Telegraphic code বলা চলে। যেমন তাস বন্টনকারী তাস তুলে একটি ইস্কাবন ডাকলেন এই code এর অর্থ হল প্রথম সুযোগেই খেড়ীকে জানান যে—স্থির খেড়ি, আমি

উদ্ভাবন রংয়ে খেলতে ইচ্ছে করি এবং আমার হাতে একটি ডাকের উপযুক্ত তাস আছে। এই উপযুক্ততা বিশ্লেষণ ও ঠিকমত নিরূপণের জন্যই system বা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুনের উদ্ভাবন। বিভিন্ন লেখক উঁচু তাসের অর্থাৎ টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলামের পিঠ জয় করবার ক্ষমতানুযায়ী দর বেঁধেছেন বিভিন্ন উপায়ে। এগুলির মধ্যে Oswald Jacoby প্রণীত Four Aces বা Culbertson প্রণীত Contract Bridge Complete এই দুটি বইয়ের ধারাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই দরগুলি নিম্নরূপ :—

		Jacoby	Culbertson
টেক্কা	...	৩	৪
সাহেব	...	২	৩
বিবি	...	১	২
গোলাম	...	½	১
মোট		৬½	১০
চারটি রংয়ের মোট	...	২৬	৪০
পিছু পিছু গড়	...	২	৩·০৮

এর পূর্ব্বে culbertson দর বেঁধেছেন ট্রিক (Trick) হিসেবে এবং দেখিয়েছেন যে ৮ থেকে ৮½ ট্রিকে সব পিঠ জয় করা যায় স্বাভাবিক ভাবে। একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে উপরোক্ত দুটি বা অপর যে কোন প্রণালীই ধরুন না কেন, মূলতঃ সবগুলিই এক, কারণ উদ্দেশ্য একই—কি প্রকারে ডাকের বিনিময়ে নিজ ও খেঁড়ীর মধ্যে তাসের বিভাগ ও পিঠজয়ের ক্ষমতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ডাকে পৌঁছান যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ ঠিক ডাকে পৌঁছুতে সক্ষম হন না কোনও জুটি অথবা ক্ষমতার অধিক ডাকে উঠে খেসারত দিয়ে থাকেন এবং তর্কের খাতিরে System এর দোষারোপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দেখা গেছে যে ত্রুটি System এর নয়, দোষ উহার অপপ্রয়োগের। আর একটি ত্রুটি সচরাচর দেখা যায় যে কোনও কোনও খেলোয়াড় কোনও প্রচলিত প্রণালীর অন্ধভক্ত বা দাস হ'য়ে পড়েন অথবা কেহ কেহ প্রচলিত প্রণালীকে নিজেদের মনোমত ভেঙ্গেচুরে ব্যবহার করে থাকেন। এর কোনটিই বাঞ্ছনীয় ত' নয়ই এবং প্রয়োজনও হয় না বিশেষ। প্রথমোক্ত পন্থাটিকে বিশেষ খারাপ ফলদায়ক বলে মনে হয় না এবং বরদাস্তও করা চলে কিন্তু দ্বিতীয় পন্থাটি বর্জ্জনীয় ও অচল। কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে পড়ে অসাধুতার পর্য্যায়ে—যদি না গোড়াতেই বিপরীত পক্ষকে উপরোক্ত রদবদল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল করা হয়। যা হোক, প্রণালী সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে প্রণালীগুলি নিয়মানুগ হবার সোপান মাত্র, খেলার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ই প্রধান।

আমাদের দেশে Culbertson Systemই বেশী চালু ও প্রিয় এবং আমি নিজেও এই প্রণালীরই সমর্থক। সুতরাং এই প্রণালীর উপর নির্ভর করেছি আমার মন্তব্য ও লেখাগুলিকে। কিন্তু সামান্য বিপদ দেখা যাচ্ছে ইদানীং কারণ Culbertson তাঁর শেষ বইয়ে (Contract Bridge Complete) উচ্চ তাসের পিঠ জয়ের ক্ষমতা নির্দ্ধারণে ব্যবহার করেছেন সংখ্যানুপাতিক দর (Numerical value) ট্রিক-দরের (Trick value) বদলে যা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু উভয় প্রথারই মূল এক বিধায় এবং সংখ্যানির্দ্ধারণে খেলোয়াড়গণের অসুবিধা ও কিছুটা সময় লাগে মনে হওয়ায় ট্রিক-দর ধরেই বিশদ আলোচনা করা গেল যদিও, পাঠক-পাঠিকাদিগের অবগত্যার্থে সংখ্যাঙ্কের তালিকাও দেওয়া হ'লো।

ট্রিক-দর হিসাবে Culbertson এর নির্দ্দেশানুযায়ী ২½ ট্রিক থাকলে উদ্বোধনী ডাক দেওয়া চলে বা দেওয়া উচিত প্রায়ই পথে, ঘাটে এবং খেলার টেবিলে এই আড়াই ট্রিক নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুনতে পাওয়া যায়। এই তর্ক সীমাবদ্ধ থাকে পরস্পরের খেঁড়ীর মধ্যে ও বিষয়বস্তু প্রায়ই হয় আড়াই ট্রিক না থাকা সত্ত্বেও উদ্বোধনী ডাকের পরিণতি বিষয়ে কিন্তু শুনিনি কোনও আলোচনা যে গ্রন্থকার উদ্বোধনী ডাকের জন্য আড়াই ট্রিকই নির্দ্ধারিত করলেন কেন। এই প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। সেই প্রশ্নের জবাব হিসাবে এবং শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য এই আড়াই ট্রিকের অঙ্কশাস্ত্রমতে ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হল। গ্রন্থকার মনে হয় Trade Secret হিসাবে অথবা বিষয়টি অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক বোধে ব্যাখ্যা করেন নি তাঁর কোনও গ্রন্থে।

টেক্কা পরে সাহেব, বিবি-গোলাম প্রভৃতি তাসগুলি পিঠ জয় করবার ক্ষমতা লাভ করে একের পর একে। প্রথমে টেক্কা চারটি চার পিঠ জয় করে কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে ঐ সময়ে গড়ে চারটি সাহেবের মধ্যে দুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় এবং বাকী দুটি সাহেব স্বাধীনভাবে পিঠ জয় করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে অর্থাৎ ফেরাই (Free cards) হয়। ঐরূপে টেক্কা, সাহেব চলে যাবার পর বিবিগুলি যথাক্রমে গোলাম, ১০ ও পরবর্ত্তী তাসগুলি এমন কি ২ পর্য্যন্তও ফেরাই হয়। এই নীতির উপর নির্ভর ক'রে Culbertson ঐ উচ্চ তাসগুলির পিঠজয়ের ক্ষমতার অনুপাতে প্রত্যেকটির দর নির্দ্ধারিত করে Honour trick বলে অভিহিত করেন। এই Honour trick এর পুরা দর হ'ল ৮ থেকে ৮। যার দ্বারা তেরটি পিঠই জয় করা যেতে পারে। এই দর নির্দ্ধারণের উপরই উদ্বোধনী ডাকের আড়াই ট্রিকের উৎপত্তি—সাধারণ অঙ্কশাস্ত্রের ত্রৈরাশিক নিয়মের বশে। যথা ৮ থেকে ৮।। ট্রিক যদি দরকার হয় তেরটি পিঠ জয় করতে তাহলে একটির ডাকের খেলা করতে হলে অর্থাৎ সাতটি পিঠ জয়ে দরকার হয় অন্ততঃ ৪।। ট্রিক। প্রথমে ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক খেলোয়াড় ৮টি Honour trick এর মধ্যে গড় অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ বা দুটি Honour trick পেয়েছেন। উদ্বোধনকারীর হাতে যদি গড়ের উর্দ্ধে একটি সাহেব অথবা একটি বিবি ও একটি গোলাম বেশী থাকে তবেই তিনি সাধারণতঃ প্রথম ডাক দেবেন। কারণ স্বাভাবিক বিভাগানুযায়ী তাঁর নিজের ২½ ট্রিক এবং খেঁড়ীর ২ ট্রিক ধরে উভয়ে মিলে ৪½ ট্রিক হয় এবং ৪½ ট্রিকে সাত পিঠ জয় করা খুবই সম্ভব এবং এই হ'ল Culbertson মতে উদ্বোধনী ডাকের মূলনীতি। এই নীতির উপরই পরবর্ত্তী ডাকগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাসের ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খেলোয়াড়েরা কিছুটা ব্যতিক্রম করে থাকেন এই নীতির এবং খেঁড়ী এই ব্যতিক্রম ঠিকমত বুঝতে না পারলেই আসে বিপদ ও

হয়ে পড়ে খেঁচাতে খেঁচাতে কথা কাটাকাটি—ফলে পতন আসন্ন হয়ে পড়ে উক্ত দলের। এইরূপ পতন আমি লক্ষ্য করেছি বহুক্ষেত্রে এবং এটি এমন এক ত্রুটি যা দলগত স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যেমন ফলাফল কিছুটা খারাপ হলেই পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ ও নিজ নিজ দোষ স্খালনের প্রচেষ্টা। খেলার টেবিলে এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি এবং এই ব্যাধি বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন দলগত স্বার্থের খাতিরে। ভুলচুক হওয়াটা মাঝে মধ্যে খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কার ভুল তা নিয়ে আলোচনা উচিত নয় খেলার টেবিলে। ভুল যদি হ'য়েই পড়ে খেলোয়াড়েরা নিজেরা সে ভুল নিশ্চয়ই পরে বুঝতে পারেন এবং ভবিষ্যতে যাতে সেরূপ ভুল না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হবার অবকাশ তাদের দেওয়া খুবই দরকার। দর্শকগণের সামনে উক্ত ভুল দেখিয়ে অপদস্থ না করে। এরূপে বাড়ে খেড়িদের মধ্যে মনের মিল এবং এই জুটিদের মধ্যে মনের মিলই জয়লাভের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। শুধু এই খেলাতেই নয়, অপরাপর প্রায় সকল খেলাতেই এবং কেবল খেলাতেই কেন, সকল ক্ষেত্রেই—পরস্পরের মধ্যে মনের ও মতের মিল (Teamwork and unity) উন্নতির মূলে একটি বলিষ্ঠ উপকরণ।

অন্ততঃ আড়াই ট্রিক তাস হাতে থাকলে উদ্বোধনী ডাক দেওয়া চলে এটা স্থিরীকৃত হবার পর প্রশ্ন হ'ল কি ডাক হবে? এবিষয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে কিন্তু সবগুলি মতেরই সারাংশ এই যে, অল্পায়াসে যে ডাকের দ্বারা নিজ হাতের তাসের পিঠ জয় করবার ক্ষমতা, তাসের বিভাগ ও পরিস্থিতি নিজ খেড়িকে জানান যায় ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে ডাক শেষ ক'রে সেইটিই শ্রেষ্ঠ ডাক। সাধারণভাবে উদ্বোধনীডাকের নিয়মের সারাংশ নিম্নরূপ।

১। ন্যূনপক্ষে আড়াই ট্রিক হাতে না থাকলে 'পাস' (pass) দেওয়া উচিত।

২। আড়াই বা সামান্য বেশী ট্রিক থাকলে রংয়ের (ইস্কাপন, হরতন, রুহিতন, বা চিড়িতন) একটি-ডাক দেবে। উক্ত রংয়ের পাঁচখানি তাস থাকা সঙ্গত টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলামের মধ্যে অন্ততঃ একখানি ছবি সমেত আর চার তাসের ডাক হ'লে উক্ত ছবিগুলির মধ্যে দুখানি থাকা শ্রেয়ঃ।

৩। ডাকের উপযোগী দুটি রংয়ের তাস হাতে থাকলে বড় রংয়ের ডাক হবে আগে যাতে অল্পডাকের মধ্যে দুটি রংই দেখান সম্ভব হয় খেড়িকে। যেমন ইস্কাবন ও হরতন বা রুহিতন ও চিড়িতন থাকলে যথাক্রমে একটি ইস্কাবন বা একটি রুহিতনের ডাক আগে হবে। একটি ইস্কাবনের উপর খেড়ি দুটি রুহিতন বা দুটি চিড়িতন ডাকলে দুটি হরতন ডেকে হাতে তাসের বিভাগ ও ক্ষমতা অল্পের মধ্যে জানান সম্ভব। সেইরূপ রুহিতন ও চিড়িতনের মধ্যে প্রথমে রুহিতনের একটি ডাকের উপর খেড়ি—একটি ইস্কাবন বা একটি হরতন ডাকলে দুটি চিড়িতন ডাকে ক্ষমতা ও তাসের বিভাগ অল্পের মধ্যে জানান সম্ভব।

৪। একটি নো-ট্রাম্প (No trump) ডাক দিয়ে উদ্বোধন করতে হলে ট্রিক বা (Honour trick—playing trick) রংয়ের ডাক অপেক্ষা কিছু বেশী থাকা প্রয়োজন, কারণ অতি স্বাভাবিক বিপক্ষদল প্রথমে খেলায় সুবিধা পাওয়ায় তাদের রংয়ের তাস বেরাই করে নেওয়ার সুবিধা পায় আগে। সুতরাং রংয়ের ডাকের খেলা করা অপেক্ষাকৃত সহজ 'নো-ট্রাম্প' ডাকের খেলা করা অপেক্ষা যদিও নো-ট্রাম্প গেম করা যায় কম পিঠ নিয়ে। সব দিক বিচার ক'রে বলা যায় যে, একটি নো-ট্রাম্প দিয়ে ডাক উদ্বোধন করতে দরকার ৩½ ট্রিক থেকে ৪+ট্রিকের তাস আর দরকার অন্ততঃ আটখানি উঁচুতাস (টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম ও দশের মধ্যে)। বলা বাহুল্য যে একটি 'নো-ট্রাম্প' ডাক উদ্বোধন করতে হলে বিশেষ নজর রাখতে হবে তাসের বিভাগের দিকে অর্থাৎ বিভাগটি হওয়া উচিত "নো-ট্রাম্প" ডাকের উপযোগী যেমন ৪-৩-৩-৩, ৪-৪-৩-২ বা ৫-৩-৩-২। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে দুই তাসের রংয়ে অন্ততঃপক্ষে সাহেব থাকা প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম হলে বিপজ্জনক বোধে কোনও রংয়ের ডাকে উদ্বোধন করাই শ্রেয়ঃ।

উপরোক্ত নিয়মগুলি সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও ডাক উদ্বোধন কালে কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রে ডাক সুরু করতে হয়। প্রথমতঃ ডাক উদ্বোধন করবার পর খেড়ির কাছ থেকে বদলি-ডাক এলে উদ্বোধনকারী উক্ত বদলি ডাক অন্ততঃপক্ষে একচক্র বাঁচিয়ে রাখতে ন্যায়তঃ বাধ্য এই কারণে যে বদলি ডাকদারের (Responder) তাসের পূর্ণ ক্ষমতা একটি মাত্র ডাকে জানা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়; ফলে ডাকের আদান-প্রদানের মারফত শ্রেষ্ঠ ডাকে পৌঁছানর সুবিধা নষ্ট হতে পারে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি, গেম পর্য্যন্তও নষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং উদ্বোধনকারীর দ্বিতীয় ডাকের জন্য প্রস্তুত সর্ব্বসময়ে থাকা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তুতির সুযোগ না থাকলে এবং মূল্য আড়াই ট্রিকের সামান্য অধিক হলেও সাধারণ ডাকের চলিত প্রথা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম করতে হয়। অর্থাৎ সেইরূপ ক্ষেত্রে বড় রংয়ের ডাক (Major suit) আগে না হ'য়ে আগে ডাক হবে ছোট রংয়ের ডাক (Minor suit) যাতে করে অল্প ডাকের মধ্যে উদ্বোধনকারী নিজ তাসের ক্ষমতা খেড়িকে জানাতে সক্ষম হয়। খেড়িও উপরোক্ত ডাক শোনবার পর নিজ হাত অনুযায়ী পছন্দ মত ডাক বেছে নিতে পারে অল্পের মধ্যে এবং অযথা উঁচু ডাকে উঠে খেসারত দেবার সম্ভাবনা কম হয় উপরোক্ত প্রথায়।

পাঠকগণের বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য দু'একটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হ'ল।

উদাহরণ নং ১। তাস বণ্টনকারী তাস পেয়েছেন :—

	ট্রিকদর
ই—টে, বি, ১০, ৫	১½
হ—সা, ৪	½
রু—৪, ৩, ২	০
চি—সা, বি, ১, ৮	১
মোট	৩

উপরের তাসটি উদ্বোধনী একটি ডাকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নিয়মানুযায়ী ডাক হওয়া উচিত, একটি ইস্কাবনের কিন্তু বিচার করে দেখলে এই ডাক সমীচীন বলে মনে হবে না। কারণ একটি ইস্কাবন ডাকের উপর খেড়ি দুটি হরতন ডাকলে উদ্বোধনকারীকে বড়ই বিব্রত

হ'য়ে পড়তে হবে। চারতাসে দুটি ইস্কাবন ডাক দেওয়া উচিত নয়, দুটি নো-ট্রাম্প বা তিনটি চিড়িতন ডাকের উপযোগী ক্ষমতা তাসটিতে নেই অথচ বাধ্যতামূলক উদ্বোধনী ডাকের ক্ষমতা হাতে আছে। এরূপক্ষেত্রে চিন্তা করে ডাক দিতে হবে। চিন্তা করতে হবে খেড়ির কাছ থেকে কি ডাক আসার সম্ভাবনা বেশী। যিনি ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেন তিনিই ডাকে সাফল্যলাভ করেন অধিকাংশ সময়ে। উপরের উদাহরণের তাসে খেড়ির কাছ থেকে হরতনের ডাক আসতে পারে, এইরূপ আন্দাজ করে প্রথম উদ্বোধনীডাক হলে একটি চিড়িতনের একটি ইস্কাবনের বদলে। এর উত্তরে খেড়ির কাছ থেকে একটি হরতন বা একটি রুহিতনের ডাক এলে উদ্বোধনকারী ডাক না বাড়িয়ে একটি ইস্কাবন ডেকে নিজ তাসের ক্ষমতা ও বিভাগ খেড়িকে জানাতে সক্ষম হবে। অপর পক্ষে খেড়ির কাছ থেকে একটি ইস্কাবনের ডাক এলে ঐ ডাক বাড়িয়ে দুটি ইস্কাবনের ডাক চলবে। এমন কি একটি চিড়িতনের উপর খেড়ির একটি হরতন ডাক এলে একটি নো-ট্রাম্প ডাকও অচল নয় বরঞ্চ খেড়ির তাসের পূর্ণ ক্ষমতা জানবার পক্ষে এই ডাক বিশেষ কার্য্যকরী। তাসটির সামান্য অদলবদল করলে, রুহিতনের সংখ্যা একখানি কমিয়ে চিড়িতনের সংখ্যা একখানি বাড়িয়ে দিলে দ্বিতীয় চক্রে একটি ইস্কাবনের ডাকই হবে খেড়ির একটি হরতনের ডাকের উপর আর একটি নো-ট্রাম্প ডাক চলবে না।

উদাহরণ নং ২।

	ট্রিক দর
ই—বি, ৩, ২	½
হ—টে, গো, ৯, ৪	১+
রু—সা, ১০	½
চি—সা, বি, ৮, ৭, ৫	½+

হাতটির মোটশক্তি ২½ ট্রিকের বেশী ও উদ্বোধনী ডাকের সম্পূর্ণ উপযোগী কিন্তু কি ডাক হবে? নিয়মমাফিক ডাক হওয়া উচিত একটি হরতনের কিন্তু খেড়ির কাছ থেকে দুটি রুহিতনের ডাক আসতে পারে আন্দাজ করে ঐ ডাক থেকে নিবৃত্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। দুটি রুহিতনের উপর তিনটি চিড়িতনের ডাক আত্মঘাতী এবং দুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী ক্ষমতা তাসে নেই। সুতরাং একটি চিড়িতনের ডাকই প্রশস্ত। খেড়ি উত্তরে একটি রুহিতন ডাকলে দ্বিতীয় চক্রে ডাক হবে একটি হরতনের এবং একটি ইস্কাবনের ডাকলে ডাক হবে একটি নো-ট্রাম্প। সুতরাং হাতের শক্তি অনুযায়ী ডাক একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উদাহরণ নং ৩।

	ট্রিক দর
ই—টে, বি, ৭, ৩	১½
হ—সা, বি, ৫, ২	১
রু—সা, ৪	½
চি—বি, গো, ৬	½+
	৩½+

হাতটির শক্তি ৩½ ট্রিকের সামান্য উপরে ও তাসের বিভাগ ৪-৪-২-৩ অর্থাৎ একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী বিশেষত: প্রত্যেক রংয়ের উঁচু তাস থাকা হেতু কিন্তু প্রয়োজনমত ছবিতাস অর্থাৎ আটখানি না থাকায় একটি ইস্কাবন ডাকই প্রশস্ত। খেড়ি দুটি রুহিতন বা দুটি চিড়িতন ডাকলে দ্বিতীয় চক্রে ডাক হবে দুটি হরতন। খেড়ির দুটি রুহিতন বা দুটি চিড়িতন ডাকের পর দুটি নো-ট্রাম্প ডাক দেওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু সবদিক বিচার করলে এরূপ ডাক যুক্তিযুক্ত নয় যদিচ সময়ে সময়ে ঐরূপ ডাক ফলপ্রসূও হয়ে থাকে। একটি ইস্কাবনের উপর খেড়ি একটি নো-ট্রাম্প ডাক দিলেও দ্বিতীয় চক্রে দুটি হরতন ডাকই বাঞ্ছনীয় আবার ঐ ডাকে ছেড়েও দেওয়া চলে—নির্ভর করে খেলা সম্পূর্ণ খেড়ির তাসের বিভাগ ও উচ্চতাসের অবস্থিতির উপরে। যদি খেড়ির তাস একটি নো ট্রাম্প ডাকের সর্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন হয় এবং ইস্কাবনের সাহেব ও হরতনের টেক্কা ঠিক স্থানে থাকে তবে তিনটি নো ট্রাম্পের খেলা করা অর্থাৎ গেম করাও অসম্ভব নয় কিন্তু এরূপ ঘটে শতকরা ২০-২৫ বার মাত্র। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া গেমের ডাকে পৌঁছবার চেষ্টা অবাঞ্ছনীয়।

উদাহরণ ৪।

	ট্রিকদর।
ই—টে, ১০, ৮, ৩	১
হ—সা, ৮, ৭, ৬	½
রু—সা, বি	১
চি—বি, ১০, ৩	½
	৩

এটি ৩নং উদাহরণের তাস অপেক্ষা সামান্য তফাৎ ও কম শক্তিশালী হলেও উদ্বোধনী ডাকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। টেক্কা, ১০ ও দুখানি ছোট তাস নিয়ে একটি ইস্কাবন ডাকের উপর খেড়ি দুটি চিড়িতন বা দুটি রুহিতন ডাক দিলে দ্বিতীয় চক্রের ডাক একটি সমস্যা হ'য়ে পড়ে। কি ডাক হবে? সাহেবের পর তিনখানি ছোট তাসে দুটি হরতনের ডাক অনুচিত এবং দুটি নো-ট্রাম্প ডাকে হাতের যথার্থ শক্তি অপেক্ষা বেশী শক্তি দেখান হয়। এইরূপ তাসে তিন তাসে অন্তত: বিবি বড় একটি চিড়িতন ডাক খুব কার্য্যকরী ও সমর্থনযোগ্য। তিন তাসে চিড়িতন ডাকবার পর আর কোনও রংয়ের ডাক চলেনা, আবার নো-ট্রাম্প বা খেড়ির হরতন ও ইস্কাবনের একটি ডাক বাড়িয়ে দুটি করা। এরূপ ডাকে ও কম ডাকের মধ্যে উভয় হাতের সম্মিলিতশক্তি জানা ও রং নির্বাচনে সুবিধা ও শক্তির বাইরে ডাক দিয়ে অযথা খেসারত দেবার সম্ভাবনা থাকে কম।

তিন তাসের (Minor Suit) ডাক ও আসল ডাকের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবার জন্য নীচের প্রয়োগগুলি স্মরণে রাখতে হবে, নচেৎ ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আসতে পারে:—

(ক) তিন তাসের ডাক সীমাবদ্ধ থাকলে রুহিতন ও চিড়িতনের ডাকের মধ্যে এবং ঐ তিন তাসের মধ্যে টেক্কা, সাহেব অথবা বিবি থাকা উচিত। বলা বাহুল্য, এইরূপ তিন তাসের ডাক কেবলমাত্র প্রযুক্ত হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে উপযুক্ত বড় রংয়ের (Major Suit) ডাক দেওয়ার অসুবিধা বা খেড়ির ডাকের উপর বদলি ডাকের অসুবিধা অনুভূত হয়।

(খ) তিন তাসে Minor Suitএর ডাক দিয়ে উদ্বোধন করলে খেড়ির ডাকের পর আর নতুন রংয়ের ডাক চলে না। দ্বিতীয় চক্রে—নতুন রংয়ের ডাক দিলে প্রথম চিড়িতন বা রুহিতনের ডাকটি

সাধারণ ডাকের পর্য্যায়ে পড়বে আর তখন তিন তাসের ডাকের পর্য্যায়ে থাকে না। খেড়ির একটি ডাকের উপর একটি নো-ট্রাম্প অথবা সেই ডাক দুইটির ডাকে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশ করে যে প্রথম উদ্বোধনী ডাকটি (একটি রুহিতন বা একটি চিড়িতন) তিন তাসের ডাকও হ'তে পারে এবং সেইরূপ বিবেচনা করে খেড়ি পরবর্ত্তী ডাকে অগ্রসর হবেন।

উদ্বোধনকারীকে সর্বসময়ে সচেষ্ট থাকতে হবে প্রথম চক্রে প্রথম ডাকটিকে ডাকের প্রাথমিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। এর সামান্ত ব্যতিক্রম হ'লে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা এসে পড়তে পারে ; যেমন—

১। বিপক্ষ দলের ডাকে খেড়ি 'ডবল' দিলে ছেড়ে দেওয়া হয় কঠিন কারণ, উদ্বোধনী ডাক ঠিকমত না হ'লে সাধারণতঃ ভয় আসে পাছে বিপক্ষদল ডবলের চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলে। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে নিজের ডাকে ফিরে গিয়ে খেসারত দিতেও দেখা যায়, যদিচ খেড়ির ডবলে খেললে বিপক্ষদলের কাছ থেকে ঐরূপ খেসারত আদায় হ'ত। কেন এই সন্দেহের অবকাশ রাখা? ঠিকমত উদ্বোধনী-ডাক দিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

২। ঐরূপ দু'-একবার ঘটলে অথবা বিপক্ষদল ডবল্‌ দেওয়ার পর চুক্তির খেলা করতে পারলে হয় খেড়ির ধৈর্য্যচ্যুতি—বলা বাহুল্য যে, সাধারণতঃ ডবলের খেলা করার পর যে খেলোয়াড় ডবল দেন তার অবস্থা হয়ে পড়ে কিছুটা হাস্যকর দর্শকবৃন্দের সামনে, সচরাচর কেউই তলিয়ে দেখেন না যে ত্রুটি ডবলদারের (Double) নয় ত্রুটি উদ্বোধনী ডাকের। অধিকন্তু আস্থা কমে যাওয়ায় উচিতমত ডবল দিতে আসে ভয় এবং স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভাব ঘটে, ফলে বিপক্ষদল কম খেসারত দিয়ে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়।

৩। ডাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সীমারেখা নির্দ্ধারণ শক্ত হয়ে পড়ে—ফলে নয় বেশী ডাকে উঠে খেসারত দিতে হয়, নতুবা বিপক্ষদল কম ডাকে খেলা করে নিয়ে চলে যায় যেখানে নিজেদের তদপেক্ষা বেশী ডাকের খেলা করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান।

ডাক উদ্বোধনকারীকে ডাক শুরু করবার আগে স্মরণ রাখতে হবে হ'বে যে Honour Trick ছাড়াও Playing Trickও ডাকের পক্ষে বিবেচ্য বিষয়। সময়ে সময়ে এমন কতকগুলি তাস হাতে আসে যেগুলির Honour Trick হিসাবে একটি ডাকের পক্ষে অনুপযুক্ত কারণ বিপক্ষদলের ডাকে প্রতিরোধ ক্ষমতা (Defensive value) নেই বললেই চলে, একটির বেশী পিঠ এমন কি একটিও পিঠ জয় করা যাবে কিনা সন্দেহ অথচ নিজের রংয়ের ডাকে বহুপিঠ হয়ত বা গেম করাও অসম্ভব নয়। এরকম তাসগুলির অসাধারণতার জন্ত পরে আলোচিত হবে।

উদ্বোধনী ডাকের সারাংশ

১। ন্যূনপক্ষে আড়াই ট্রিক (১১ থেকে ১৩ পয়েন্ট) না থাকলে 'পাস' দেওয়া উচিত।

২। আড়াই বা সামান্ত বেশী ট্রিক থাকলে উদ্বোধনী একটি রংয়ের ডাক হবে। ডাক দেওয়ার সময় সাধারণতঃ খেড়ির কাছ থেকে কিরূপ ডাক আসার সম্ভাবনা অধিক এবং খেড়ির ঐরূপ বদলী ডাক এলে দ্বিতীয় চক্রে ডাকের জন্ত প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

৩। সাধারণতঃ দোরংয়া (Two suiter) তাস হাতে থাকলে বড়টির ডাক আগে হবে পরে দ্বিতীয় চক্রে ছোটটির ডাক হবে। উদ্দেশ্য অল্পডাকের মধ্যে খেড়িকে দুটি রংই জানান এবং খেড়িকে রং বাছাই করবার সুযোগ দেওয়া।

৪। সাড়ে তিন ট্রিক থেকে ৪+ ট্রিকের কাছাকাছি তাস হাতে থাকলে এবং তাসের বিভাগ মোটামুটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী হলে ও অন্ততঃ আটখানি ছবি তাস (টে, সা, বি, গো, ১০) থাকলে একটি নো-ট্রাম্প ডাক হবে।

৫। উপরোক্ত তাস অপেক্ষা কিছু কমজোরী তাস থাকলে এবং বিকল্পডাকের পূর্ণক্ষমতা না থাকলে, কম মূল্যের রংয়ের (Minor suit) বিবি বড় তিন তাসের উদ্বোধনী একটি ডাক চলতে পারে। এই ডাকের সুবিধা বহুবিধ, তন্মধ্যে প্রধান এই যে, অল্প ডাকের মধ্যে খেড়িকে তাসের পূর্ণক্ষমতা জানান সম্ভব হয়।

[ক্রমশঃ।

ফুলকলি

শ্রীকালীপদ কোঙার

মৌমাছি মন এক গুন গুন গুন গুন গানে,
মাতাল বসন্তে আজ কথা কয় তোর কানে কানে।
হে অস্ফুটা ফুলকলি, হে কিশোরী মেয়ে,
ভাঙবে না ঘুম কি গো, দেখবি না চেয়ে?
জাগবি না যৌবনের মাতাল হাওয়ায়,
গানে গানে যেথা ঐ মৌমাছি গুঞ্জন ছড়ায়?

বাসন্তী চুম্বনে তোরে
জাগালাম যৌবনের রাতে
চোখ মেলে দেখ ওরে,
তোরই বাঞ্ছিত ধন তোমার সভাতে।

বঙ্গবাসী ঃ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেশ ও কাল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীহারাধন দত্ত

নব্য হিন্দুধর্মের উপর কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তা ভাবনা তাঁর অনর্গল লেখনী-মুখে এমনি ভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। সমাজতত্ত্ব রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, স্বদেশতত্ত্ব-বিষয়ক কৃষ্ণচন্দ্রের সকল রচনাতেই দেশ জাতির ঐতিহ্যপ্রীতির সন্ধান মেলে—উনবিংশ শতাব্দীতে বিজাতীয় সভ্যতার প্লাবনে যখন দেশ ও জাতির সুদৃঢ় সভ্যতার সৌধ ভগ্নপ্রায় হয়ে ভাসমান হয়েছিল—তখন এদেশেরই একদল পাশ্চাত্যশিক্ষিত মনীষী জাতিকে আত্মমুখী করার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-অক্ষয়চন্দ্র সেই মনীষিবৃন্দের মধ্যে বিখ্যাত। কৃষ্ণচন্দ্রও সেই গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। কৃষ্ণচন্দ্রের সুলিখিত প্রবন্ধরাজি ও তদানীন্তন সমাজকে আত্মমুখী করার কার্যে ব্যাপৃত ছিল। উনিশ শতকের শেষপাদে কৃষ্ণচন্দ্র সংবাদপত্র সেবার মাধ্যমে ঐ মহান আদর্শকে জাগ্রত রেখেছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত মনীষিগণের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগরিমা গ্রহণের যে উদারতা ছিল—কৃষ্ণচন্দ্রের রচনারাজি হতে সেই উদারতার সন্ধান তেমন পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টি নিজদেশ ও সমাজের গরিমা কীর্ত্তনের মধ্যেই অধিকাংশে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গির সংগে এখানেই ছিল তাঁর পার্থক্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা প্রধানতঃ ধর্ম সমাজ ও রাজনীতি অবলম্বনে লিখিত। এ ছাড়া সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত তাঁর অসংখ্য রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত আছে। ঐ সকল সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্তমানে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য। তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা গেছে, নিম্নে তারই একটি তালিকা দেওয়া গেল।

পত্রিকা	সাল	তারিখ	রচনা
জন্মভূমি	১৩০০ সাল (মাঘ)		আনী বেসান্ত
অনুসন্ধান	১২৯৬ ৩য় বর্ষ (৪৫)		....
ঐ	১২৯৭ ৪র্থ বর্ষ	১৫ই ভাদ্র	আমাদের আসাম যাত্রা
ঐ	ঐ	১৫ই আশ্বিন	ঐ
বসুমতী	১৩১৭	৬ই ফাল্গুন	হেলায় হারাইও না
বঙ্গবাসী	১৩১৪	১৫ই চৈত্র	রাজনীতিতে ছাত্র
"	১৩১৫	১০ই শ্রাবণ	হিন্দুর শিক্ষা (১)
"	১৩১৫	১৭ই শ্রাবণ	ঐ (২)
"	ঐ	২৪শে শ্রাবণ	ঐ (৩)
"	"	৬ই ভাদ্র	ধৈর্য্য
"	"	১৩ই ভাদ্র	শৌচ
"	"	২০শে ভাদ্র	ব্রহ্মচর্য (১)
"	"	১০ই আশ্বিন	ঐ (২)
"	"	৮ই কার্তিক	মিতাহার
বঙ্গবাসী	১৩১৫		
"	"	১৫ই কার্ত্তিক	দয়া
"	"	২২শে কার্ত্তিক	নিয়ম
"	"	৬ই অগ্রহায়ণ	তাপ
"	"	১৩ই অগ্রহায়ণ	দান
"	"	২৭শে অগ্রহায়ণ	দান—একটি উপাখ্যান।
"	"	১১ই পৌষ	বেদান্ত শ্রবণ
"	"	৩রা মাঘ	আস্তিক্য
"	"	২৪শে মাঘ	ব্রত
"	"	১লা ফাল্গুন	ঈশ্বরপূজা
"	"	৮ই ফাল্গুন	সন্তোষ
"	"	১৫ই ঐ	মতি
"	"	২১শে ফাল্গুন	ভারতের ভারতত্ব
"	"	১৪ই চৈত্র	লজ্জা
"	"	২৮শে চৈত্র	পরিশিষ্ট
"	১৩১৬	৪ঠা বৈশাখ	আত্মজ্ঞান
"	"	১১ই বৈশাখ	পাত্র
"	"	১৮ই বৈশাখ	আসন
"	"	১লা জ্যৈষ্ঠ	মানব শ্রেষ্ঠ জীব
"	"	৮ই জ্যৈষ্ঠ	সুখ
"	"	২৯শে জ্যৈষ্ঠ	শুভেচ্ছা
"	"	১২ই আষাঢ়	বিচার
"	"	১৯শে আষাঢ়	সৎসঙ্গ
"	"	২৬শে আষাঢ়	সন্তোষ
"	"	১লা শ্রাবণ	জীব জুহরী
"	"	৮ই শ্রাবণ	কর্ম্ম
"	"	১৫ই শ্রাবণ	সত্তের ভাণও ভাল
"	"	২২শে শ্রাবণ	মায়া সম্বন্ধে
"	"	২৯শে শ্রাবণ	প্রত্যাহার
"	"	৫ই ভাদ্র	করুণা
"	"	১৫ই ভাদ্র	মৈত্রী
"	"	১৯শে ভাদ্র	মুদিতা
"	"	২৬শে ভাদ্র	উপেক্ষা
"	"	২রা আশ্বিন	আত্মমর্যাদা
"	"	৯ই আশ্বিন	মনুষ্যত্ব চাই
"	"	১৬ই আশ্বিন	আত্মশুদ্ধি মহৌষধ
"	"	২৩শে আশ্বিন	নিজেকে চিন ও জান
"	"	৩০শে আশ্বিন	শাস্ত্র দিগ্‌দর্শন
"	"	৪ঠা অগ্রহায়ণ	পরিণাম ভয়ানক
"	"	১৮ই অগ্রহায়ণ	হিন্দুর মহত্ব
"	"	১০ই পৌষ	ধর্ম্মহীনতা
"	"	২৪শে পৌষ	সভ্যতা বর্ব্বরতা নহে

(৪৫) এই সময়ে অনুসন্ধানে প্রকাশিত রচনার সংগে লেখকের নাম প্রকাশ করা হোত না। পত্রিকার প্রচ্ছদেই কেবল মাত্র লেখকগণের নাম ঘোষিত থাকতো।

বঙ্গবাসী	১৩১৬		
"	"	২রা মাঘ	ইতিহাসতত্ত্ব
"	"	৯ই মাঘ	অধঃপতনের কথা
"	"	১৬ই মাঘ	বর্ণবিচার
"	"	৩০শে মাঘ	ধর্ম্মে ভিত্তি—মোক্ষে পরিণতি
"	"	৭ই ফাল্গুন	ক'লমহিমা
"	"	২১শে ফাল্গুন	আর না
"	"	২৮শে ফাল্গুন	এ উন্নতি—অবনতি
"	"	৫ই চৈত্র	সত্ত্বই মহাআশ্রয়
"	"	১২ই চৈত্র	পুরুষ প্রকৃতি
"	"	১৯শে চৈত্র	শুভ বিবাহ
"	"	২৬শে চৈত্র	বিবাহে যুগ
"	১৩১৭	৩রা বৈশাখ	বিবাহে সম্বন্ধ বিচার
"	"	১০ই বৈশাখ	বিবাহ সম্বন্ধ বিচারে
"	"	২৪শে বৈশাখ	সম্বন্ধ বিচারের পরিশিষ্ট
"	"	৭ই জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে বয়স
"	"	১৪ই জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে বাকদান
"	"	২১শে জ্যৈষ্ঠ	গাত্রহরিদ্রা
"	"	২৮শে জ্যৈষ্ঠ	বিবাহে হুলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ
"	"	৪ঠা আষাঢ়	বিবাহে নান্দীমুখ
"	"	১৮ই আষাঢ়	মার্কিনে বিবাহ ব্যবস্থা
"	"	২৫শে আষাঢ়	বিবাহে জলসাধা ও অন্য কর্ম্ম
"	"	১৮ই ভাদ্র	বিবাহে বরসজ্জা
"	"	২৫শে ভাদ্র	বিবাহে দানবিধি
"	"	৩১শে ভাদ্র	বিবাহে দানাধিকারী
"	"	৭ই আশ্বিন	বিবাহে সম্প্রদান
"	"	১৪ই আশ্বিন	বিবাহে স্ত্রী আচার

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত রচনাগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ববর্তী ২।৩ বৎসরের মধ্যে লিখিত। এই রচনাগুলি 'হিন্দুর শিক্ষা' শিরোনামায় বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে লিখে গেছেন। তিনি যে সমস্ত সংবাদপত্রে লিখতেন—সেগুলির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকা হ'তে তাঁর সমগ্র রচনারাজির উদ্ধার কঠিন শ্রমসাপেক্ষ। অথচ কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার অবিসম্বাদিত কীর্ত্তি ঐ রচনাগুলিই। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায় তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করে গেছেন তা এযুগেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলে গৃহীত হতে পারে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধে বাংলার সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতির উপকরণ ছড়িয়ে আছে। শুধু সাময়িক পত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে বলেই—তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন। তাঁর রচনাগুলি সংগৃহীত হলে সমসাময়িক বাংলা-দেশের ভাব আন্দোলনের একটি বিচিত্রমুখী ধারার অনুসন্ধান পাওয়া যাবে এবং তাঁর বিশ্বাস নিষ্ঠা ও প্রতীতির বলিষ্ঠতা আজও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

বঙ্গবাসী পরিত্যাগ করার পর কৃষ্ণচন্দ্র কিছুকালের জন্য মেদিনীপুর নাড়াজোল-রাজের ম্যানেজারীর পদ গ্রহণ করেন, তিনি আত্মকর্ম-পটুতায় নাড়াজোলরাজকে সন্তুষ্ট করেন। এই সময়ে তাঁর বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে পেনসন [...] রাজের ম্যানেজারী পদ হতে অবসর গ্রহণ ক[...] সম্পাদনা কালে তিনি বৈদ্যনাথের বালানন্দস্বামীকে গুরুরূপে [...] হন। বালানন্দের উপদেশ মত তাঁর ধর্মজীবন পরিচালিত হত। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত বালানন্দ-কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র অবসর কালে বঙ্গবাসী ও বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতেন। শেষ জীবনে তিনি ধর্ম্মকথা ছাড়া আর অন্য কোন কথাই আলোচনা করতেন না। ১৯১১ সালে ১২ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৯শে মাঘ—১৩১৭) কাশীধামে কৃষ্ণচন্দ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় সংবাদপত্রসেবী, সাহিত্যিক, স্বাদেশিক ও স্বধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসামূলক যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকখানি পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করা গেল।

"আবার বন্ধু-বিয়োগের বিষম বাজ বুকে বাজিল। ধর্ম্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত রবিবার প্রাতঃকালে পুণ্যধাম ৺কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যবাসরে পুণ্যক্ষণে পুণ্যাত্মার শুভসম্মিলন। চিরতাপধৌত—মণিকর্ণিকার পুণ্যময় শ্মশান-ক্ষেত্রে উত্তরায়ণে মাঘী পূর্ণিমার সংস্পর্শে শুভ সংক্রান্তির দিনে যাহার দৈহিক অবসান যে অবসানে পূর্ব্বে গঙ্গাগর্ভে অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের ধ্যানজ্ঞানে যাঁহার তপস্তিমিত নেত্রের সম্মুখে শত সৌরকরোজ্জ্বল কিরণপ্রভায় মুক্তির পথ পলকে পলকে উদ্ভাসিত, তাঁহার পুণ্যময়তার পরিচয় কি আর দিতে হয়?

আমাদের কৃষ্ণচন্দ্রের এই ঐহিক দৈহিক শেষ। তাঁহার আত্মা আজ পরমাত্মায় বিলীন। আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের, দেশের কৃষ্ণচন্দ্র দেশের, ধর্ম্মের কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম্মের, বর্ণের কৃষ্ণচন্দ্র বর্ণের, সমাজের কৃষ্ণচন্দ্র সমাজের, সাহিত্যের কৃষ্ণচন্দ্র সাহিত্যের গৌরব-জীবনে মরণে দেখাইয়া গেলেন।

চিরগৌরবান্বিত পুরুষসিংহ কৃষ্ণচন্দ্র চিরস্মেরাননে এজীবনে যে আদর্শের কিরণরাগে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, জীবনের অবসানে সেই আদর্শের পুণ্যময়ী দীপ্তিপ্রভায় অলৌকিক আলোকরশ্মির কোটি রেখা রাখিয়া গিয়াছেন। এ পার্থিব প্রপঞ্চে জীবনের আদ্যন্তে এমন পুণ্যময়তা কয়জনের দেখিতে পাও? আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের গৌরব রাখিয়াছেন। আজ তাঁহার জীবনাবসানে কাঁদিব, না হাসিব? যাঁহার জীবন আদ্যন্ত গৌরব-ময়, তাঁহার এই পুণ্যময় অন্তর্ধানে কাঁদিব কেন?

কাঁদিব না, আজ প্রাণ ভরিয়া হাসিব; কিন্তু এ কি? আজ হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেছি কেন? আজ হাস্যবিস্মিত পুলক বিকশিত নেত্রপথে যেন অলক্ষ্যে অবিরল অশ্রুধারা! আজ যে জ্বালাময়ী স্মৃতিজ্বালা জ্বলিয়া উঠিতেছে! কৃষ্ণচন্দ্র যে যোগীন্দ্রচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন, যে যোগীন্দ্রচন্দ্রের সাহিত্যের সেবা প্রসারে, ধর্ম্মব্রতের মহিমা উদ্‌ঘোষণে, কার্য্যক্ষেত্রে সাধন-প্রসাদনে, বিধবা তপ্তাশ্রুপূর্ণ কণ্ঠশোষী জীব-কাতরার কাতর মোচনে নিত্য-সত্য সুহৃদরূপে সুদৃঢ় সহায় ছিলেন, আজ আবার তাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! মায়ামোহমুগ্ধ দুর্ব্বলচিত্ত জীব আমরা কত

ছিব ! ধৈর্য্যে, স্থৈর্য্যে, ঔদার্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, জ্ঞানে, গৌরবে, কারুণ্যে, তৈজে, শ্রমে, অধ্যবসায়ে যোগীন্দ্রচন্দ্র যেমন, কৃষ্ণচন্দ্রও তেমনই যে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রতিভায়, প্রভায়, সহিষ্ণুতায় কর্ম্মপটুতায়, বিজ্ঞতায়, বিচক্ষণতায়, ধার্ম্মিকতায়, সহৃদয়তায়, গরিমায়, মহিমায় এমন প্রাণময় যুগল মিলন অতুলনীয় নয়কি? আজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিয়োগে, যে যোগীন্দ্রচন্দ্রের বিয়োগস্মৃতি চকিতে-চমকে বিজলী-বিভার স্ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহারা চির দুর্দ্দম-কর্ম্মী, তাঁহারা দৃঢ়চিত্তধর্ম্মী, তাঁহারা স্বজন বিয়োগে বিচলিত না হইতে পারিতেন। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি, অতি প্রিয়জনের বিয়োগেও বিধুরতার বিন্দুমাত্র তাঁহাদের বাহ্যাঙ্গ বা বাহ্যভাব বিকশিত করিতে পারে নাই। তাঁহারা ধৈর্য্য, স্থৈর্য্যের আদর্শ পুরুষ বটে; বহু বহু বৎসর ধরিয়া, তাঁহারা আমাদের সম্মুখে চরিত্রাদর্শের পূর্ণ চিত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের মতন শিষ্যমণ্ডলীকে তাঁহারা আচার্য্যরূপে ধর্ম্মকর্ম্মে শিক্ষা দিয়াছিলেন; জীবনসত্যের পথ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শিষ্যত্বের মর্য্যাদা রাখিতে পারিলাম কৈ। সে মহাদর্শের সর্ব্বোন্নত শিক্ষা বা ধারণা করিতে সমর্থ হইলাম কৈ? সে জীবনলক্ষ্যের উচ্চ পথ পাইবার শক্তি সঞ্চারিল কৈ? তাইত আজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যময় দেহান্তরে প্রাণ কাঁদে, যোগীন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি জাগরণে নয়ন ভাসে, ভুলিব কেমনে, সে উদার হৃদয়, সুসম্বদ্ধ সুগঠিত দীর্ঘকায় নির্ভীক নির্দ্বন্দ্ব কর্ম্মবীর কৃষ্ণচন্দ্রকে? ভুলিব কেমনে সেই কৃষ্ণচন্দ্রের সেই সময়োচিত গুরুগাম্ভীর্য্য আবার সেই সময়োচিত পরিহাস-হাস্যরসময় মাধুর্য্য? বহু বৎসর যে একসঙ্গে একক্ষেত্রে এই বঙ্গবাসীর পবিত্র পীঠস্থানে ব্রতী ছিলাম। তিনি ব্রতসাধনার আচার্য্য, আমরা শিষ্য। কি অকপট শিক্ষকতা! কি কর্ম্মণ্যতায় আন্তরিকতা! সে কি ভুলিতে পারি? তাইত আজ প্রাণ কাঁদে, বুক ফাটে।

কিন্তু উপায় কি? নিয়তির গতিরোধ কে করিবে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গবাসীর সম্পাদকতায় কৃতিত্বের চরম গৌরব লাভ করিয়া ভাষায় রচনায় সমগ্র বঙ্গদেশে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতির আদর্শ শিক্ষা প্রসার করিয়াছিলেন, যিনি আত্মজীবনে আত্মচরিত্রে ধর্ম্মাদর্শে নিরপেক্ষতার নিদর্শন পদে পদে প্রদর্শন করিতেন, যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের অপ্রতিহত অকপট সাধন পালনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া, গগনভেদী সঙ্কেত পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; পরন্তু কত পথভ্রষ্ট পথিককে ধর্ম্মবর্ত্মে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি নিয়তির নিয়মানুশাসনে আমাদের দুর্ভাগ্যে বঙ্গবাসীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। সম্পর্ক ত্যাগ করুন, কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য বঙ্গবাসীর হিতসঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্গবাসীর শুভানুধ্যানে বঙ্গবাসীর পত্রে পত্রে জীবনে মরণে তাঁহার হিতৈষণার চিত্ররেখা পূর্ণাঙ্কিত। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। গত কার্ত্তিক মাসে তিনি কাশীবাসী হন। চিরপুণ্যময় স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ কাশীধামে তাঁহার অন্তরে বাহিরে যে রোগ প্রশমতার সুলক্ষণ, প্রাণে যে প্রফুল্লতার নিদর্শন দেখা দিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় নাই, এত শীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু নিয়তির গতিরোধ কে করিবে? আজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যময় দেহান্তরে তাঁহার চিরকুল্ল গুণস্মৃতিতে প্রাণের ভিতর হৃদয় বিষাদের যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। তাঁহার গতিগত কতদিনে হইবে। কে বলিতে পারে? তিনি পুণ্যাত্মা। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার আদর্শে পূর্ণগঠিত। কৃষ্ণচন্দ্রের বিয়োগে তাঁহাদের হৃদয়ে মলিন শোকছায়া স্পর্শ করিবে না, ইহা বুঝিয়া আমরা শান্তি লাভ করিতে পারি। তিনি নাই, কিন্তু তিনি যে পুণ্যের পুলকপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুণ্যের সংসার উজ্জ্বল রহিবে ইহা আমাদের আশ্বাস।" (বঙ্গবাসী, ৬ই, ফাল্গুন—১৩১৭)

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক এই শিরোনামায় সেকালের আর একখানি দৈনিকে যাহা প্রকাশিত হয়েছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"বঙ্গবাসীর একসময়ে সম্পাদক, সুলেখক, কর্ম্মী ও সাধক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দকানন ৺কাশীক্ষেত্রে, গঙ্গাতীরে গতকল্য রবিবার প্রাতঃকালে দেহত্যাগ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে পরকালে বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে এমন মৃত্যু ঈপ্সিত মৃত্যু। উত্তরায়ণের কালে মাঘীপূর্ণিমার সন্দর্শন সময়ে, অবিমুক্ত পুরী কাশীধামে, গঙ্গার গর্ভে থাকিয়া, বিশ্বনাথের কৃপাবারি স্পৃষ্ট হইয়া এমনভাবে দেহত্যাগ ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় সাধের বড় সোহাগের মৃত্যু। কৃষ্ণচন্দ্র মরণে বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, মরণে ব্রাহ্মণের সাধ মিটাইয়াছেন। এই হেতু তাঁহার মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত বা শোকসন্তপ্ত হই নাই। মরণকালে তাঁহার ষাট বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল; এখনকার হিসাবে মৃত্যুটা নিতান্ত অসময়ে ঘটে নাই। তবে যাহাদের তিনি অবলম্বন ছিলেন, বন্ধু, সখা, মিত্র, পিতা—আত্মীয় ছিলেন, তাহারা এমন মৃত্যুতে দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত হইবেনই। সে শোকের সন্তাপ কালপ্রভাবে প্রশমিত হইবে, ভগবানের অপার করুণায় তাহা শীতল হইবে। তাঁহার কাশীলাভ হইয়াছে, তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিত্যধামের আনন্দময়ী স্থিতি আমরা শোকের দীর্ঘশ্বাসে মলিন করিতে চাহি না! যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, আমাদের ব্যথা আমরা সহিব; কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র জীবনে কি করিয়া গেলেন, কোন ভাবের বিকাশ করিলেন, তাহা এখনই বুঝিয়া রাখা উচিত।

৺যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত বঙ্গবাসীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের অগ্রজ সদৃশ কৃষ্ণচন্দ্র, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে, বাংলার হিন্দুভাবের, হিন্দু রীতি পদ্ধতির প্রচার ও উহাদিগকে সমাজমান্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাংলার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে লোকে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। বঙ্গবাসী সে সঙ্কোচ দূর করিয়াছে। বঙ্গবাসীর সে চেষ্টার মূলে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুখের হিন্দু ছিলেন না, তিনি কর্ম্মী, আচারবান, গুরুভক্ত হিন্দু ছিলেন। তিনি শাস্ত্রের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবনকে প্রণালীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টায় তিনি অনেকটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দীর্ঘকায়, উদারহৃদয়, প্রসন্নচিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র কার্য্য করিতে জানিতেন, অনবরত কর্ম্মেই রত থাকিতেন। তিনি বক্তৃতা করিতে জানিতেন না, বক্তৃতা করিতে ও কলমবাজী করিতে ভালবাসিতেন না, তিনি যখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক তখন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও পরিচালকবর্গের মধ্যে

ছিলেন। এই যে ন্যাশানালিজমের কথাটা এখন মুখে শুনিতে পাই, ইহার মূলতত্ত্ব বঙ্গবাসীই প্রথমে প্রকাশ করেন। আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ—অনন্ত অতীতকাল হইতে ঋষিমুনিদের সময় হইতে যে ভাবের ধারা, আচারনিষ্ঠার ধারা এ দেশে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমাদের পৈতামহ সামগ্রী। একথা ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে প্রথমে বঙ্গবাসীই শিখাইয়াছিলেন। সে শিক্ষার মূলে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতি সমাজতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, আজ সেই মনীষিবর্গের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন, পূজনীয় শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ রোগশয্যায় শায়িত, পূজনীয় শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মুমূর্ষু। জানি না ভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার প্রভাব কোন দিক দিয়া কেমনভাবে চলিতেছে। তবে দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যাঁহারা এই ভাবের প্রচারক তাঁহাদের অনেকেই যেন প্রাতঃকালের তারকারাজির ন্যায় একে একে নির্ব্বাসিত হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; আমাদের সান্ত্বনা কেবল দীর্ঘশ্বাসে, হতাশার মর্ম্মযাতনা বিকাশে। কৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার গণা দিন শেষ হইয়াছিল, তাঁহার ইহজীবনের পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল. তিনি চলিয়া প্রভাবে গেলেন। কিন্তু যে ভাবের হিন্দুর হিন্দুত্বের পরিস্ফুরণ সম্ভবপর হইয়াছিল, যে ভাবের আদর্শে তিনি স্বীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব, সে ভাবের প্রভাব, সে অগ্নিহোত্রের অগ্নিকুণ্ডের ভাব বহ্নিজিহ্বা সজীব করিয়া কে রাখিবে? কে হিন্দুকে হিন্দু হইতে বলিবে? হিন্দু—হিন্দু হইলে যে কত সুখ, কত আনন্দ তাহা কে বাঙালীকে বুঝাইবে?

কৃষ্ণচন্দ্র সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন। তিনি গৃহস্থ হইলেও তাঁহার জীবনের ভঙ্গীটা সন্ন্যাসীর ভাবে বিমণ্ডিত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বিধবা পত্নী ও শিশু-পুত্র-কন্যা-দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন বটে; পরন্তু আমাদের মনে হয় সদ্গুরুর কৃপায় তাঁহার পুত্র-কন্যা সকলের ঐহিক মঙ্গলই সাধিত হইবে। সেজন্য আমরা চিন্তা করি না। সেজন্য আমাদের দুঃখ নাই। দুঃখ কেবল এই যে, কৃষ্ণচন্দ্র যে ভাবের বাহক ছিলেন, যে ভাবের আদর্শে নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে ভাব বহন করিবার আর কেহ রহিল না। তাই বলিতেছি কাঁদ বঙ্গবাসী, তোমার কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদ—কাঁদ বসুমতী, যে সদ্ভাবের কনক লেখায় তোমার অঙ্গ যিনি শ্রীসম্পন্ন করিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদ—আর আমরা দেহের বত্রিশ পঞ্জর চাপিয়া অগ্রজের পথ-প্রদর্শকের, কর্ম্মীর, গুরুসেবক ও ভগবদ্ভক্তের স্বর্গারোহণে, বুক ফাটাইয়া কাঁদি। কাঁদিতে কাঁদিতে যদি কাজে ও কথায় সামঞ্জস্য করিতে পারি—তাহা হইলে এ রোদন সার্থক হইবে, এমন রোদনে সোনা ফলিবে। যাহাদের জোরে আমাদের জোর ছিল, তাহাদের কেহ বা স্বর্গত, কেহ বা অনন্তের তারে বসিয়া দিন গণনা করিতেছেন, কেহ বা জরার-জর্জরতায় মুহ্যমান হইয়া আছেন —আর আমরা বর্ষাকালের অর্কবৃক্ষের ন্যায় নিষ্পত্র ও নিরাভরণ হইয়া আছি! যিনি আমাদিগকে এমন বন্ধু, এমন সখ্য, এমন গুরু দিয়াছিলেন, তিনিই আমাদিগকে এ বিপদে রক্ষা করিবেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা দশদিক অন্ধকার দেখিতেছি, শ্রীভগবান সকলের মঙ্গল করুন।" (নায়ক। ২রা ফাল্গুন, ১৩১৭)।

তৎকালীন অনেক ইংরাজী, দৈনিক, সাপ্তাহিকেও কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু

অমিত শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। The Telegraph, পত্রিকায় কৃষ্ণচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ হতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই ইংরেজী দৈনিকখানি যা উল্লেখ করেছিল তা এই স্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"Yet another, Scarcely have we dried up the tears with which we followed our Kali Prasanna and Chandra Nath to the funeral pire, grim death has claimed its tole from one who was very dear and near to us in life—we mean, the Late Krishna Chandra Banerjee, who for more than a decade was our close friend and associate in the field of Journalism in Bengal. Krishna Chandra, a short sketch of whose life is published elsewhere, was not only a friend and associate, but he was something more; he was indeed a valued preceptor and mentor to whom not only ourselves but the whole range of Bengali writers owe a deep debt of gratitude. He was a devoted and ardent lover of our mother tongue at whose holy shrine he poured forth his life blood to worship and adorn her in the most befitting manner. He spared no pains to promote the cause of vernacular Journalism in Bengal and it is to a certain extent due to him that the influential and widely-read vernacular weekly Bangabasi, which he edited for sometime with marked ability under the guidance of its talented founder and proprietor, the late lamented Jogendra Chandra Bose enjoys its present prosperous condition and high status. His masterly contributions to this paper which embraced wide and varied range of subjects—literary, social, religious, political—have earned for him something which is sure to out live the ravages of time. He has left behind him something from which his grateful countrymen will surely continue to draw inspirations for generations to come. After severing his connection with the Bangabasi he accepted service under the Narajole Raj as Manager with much credit. Of late he had been spending a retired and pious life on the holy banks of the Ganga at Benares, where he calmly passed away from this world on the holy Sankranti of Magh last. Even on the eve of his death he did not cease from contributing his religious articles to the vernacular papers which will certainly have an abiding place in Bengali literature. In him Bengal has lost a son whose memory ought to be enshrined in the hearts of all genuine lovers of our mother tongue. We offer our sincere condolence to his bereaved family who have this consolation that with them many a sad heart now mourns his loss."

(—*The Telegraph*, Feb. 18, 1911)

আমাদের এই আলোচনা সর্বাঙ্গীন নহে। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের সব কথা, সকল সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার সমগ্র রচনারাজিরও একখানি সার্থক তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করিবার রহিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর যে সংবাদ পরিবেশিত হল তাও খণ্ডিত। বঙ্গবাসীর ইতিহাস সুদীর্ঘ। আমরা সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের সংগে সংশ্লিষ্ট বঙ্গবাসী সম্পর্কেই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করেছি। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের শেষপাদের ভাব আন্দোলনের সঠিক পরিচয় দিতে গেলে—বঙ্গবাসীর রক্ষণশীল অথচ সংগ্রামমুখী কর্ম্মাদর্শের বিচিত্রমুখী কাহিনী উদ্ধারের আবশ্যকতা আছে। অচিরে ঐটি সম্পন্ন হলে একটা মহৎকার্য সাধিত হবে।

শেষ

হাসপাতালে

আবদুল মজিদ

এখন সুদূরে তুমি, দুর্যোগের আবর্তে জাহাজ
রোগার্ত যখন আমি ডুবুডুবু মৃত্যুর শিকার
শিয়রে গ্লুকোজ, জল কণ্ঠের নীরস শুষ্কতার
অরুচি প্রতিষেধক, প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখে আজ
হলুদ, খয়ের রঙ ছোট-বড় শিশির ঔষধ
টেবিলে সাজানো পাশে। রোগগন্ধ শয্যা অগোছালো
মলিন, শিথিল, হিম ; মূর্তিমতী মমতা দাঁড়ালো
পার্শ্বে এসে সেবিকার অবয়বে ঘুচাতে বিপদ।

বড়োই নিঃসংগ আমি, দেহে নিয়ে রোগটা খারাপ
অনেকে বলেছে দুঃখে, 'বাঁচবে না, এমন অকালে
মরণ খুবই কম, তবু ভাল সংসারের জালে
পড়েনি বিয়েথা করে হয়নি যে সন্তানের বাপ।'
চোখের দেখাও এসে দেখলে না, তোমার আমার
বিয়ের কথাটা ঠিক যদিও বা ছিল পাকাপাকি
ঈশ্বর করেছে রক্ষা, কেউ বলে তুমি তাই নাকি
পড়নি' আমার হাতে, স্বামিসুখ দুর্ভাগ্যে তোমার।

সকালে ব্যাসপূজা, রাত্রে কী ভাব হল নিতাইয়ের, হুঙ্কার করে উঠে দণ্ড-কমণ্ডলু ভেঙে ফেলল।

দণ্ড-কমণ্ডলু সন্ন্যাসের চিহ্ন। যারা সন্ন্যাসী তারা যোগমার্গী, কৈবল্যকামী। তাদের ভাগবতী প্রীতি কাম্য নয়, তাদের কাম্য মোক্ষ। কিন্তু ভক্তের লক্ষ্য কৃষ্ণপাদমূল। প্রবাস থেকে ফিরে পথিক তার নিজের ঘরেই সর্বক্লেশের উপশম পায়। তখন সে ঘর আর সে ছাড়ে না। তেমনি সমস্ত কামনাক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে ধৌতাত্মা ভক্ত কৃষ্ণপাদমূলেই তার সমগ্র বিশ্রাম পায়। তখন আর সেই চরণাশ্রয় সে ছাড়ে না।

ভোরবেলা শ্রীবাসের ভাই রামাই পণ্ডিত খবর দিল নিমাইকে।

কী ব্যাপার, নিমাই ছুটল শ্রীবাসের বাড়ি।

গিয়ে দেখল, নিতাইয়ের বাহ্যজ্ঞান নেই, শুধু আপন মনে হাসছে।

'চলো, আমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে চলো।' নিতাইকে নিয়ে স্নানে চলল নিমাই। আর নিজ হাতে নিমাইয়ের ভাঙা দণ্ড-কমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জন দিল।

'আজ ব্যাসপূজা। তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও।' বিহ্বল নিতাইকে মনে করিয়ে দিল নিমাই। 'আর চাঞ্চল্য কোরো না।'

স্নান করে নিমাই-নিতাই চলল শ্রীবাসের ঘরে।

শ্রীবাস নিজেই পূজো করছে। আর সব ভাগবতেরা মিলে কীর্তন জুড়েছে, মেতেছে নৃত্যানন্দে। পূজান্তে নিতাইয়ের হাতে এক গাছ ফুলের মালা দিল শ্রীবাস। বললে, 'এই মালা নাও, মন্ত্র পড়ে ব্যাসদেবকে দাও আর প্রণাম করো।'

নিতাই নিলনা মালা।

শ্রীবাস বললে, 'শাস্ত্রের বিধান, নিজের হাতে মালা দিতে হবে। মালা পেলে ব্যাস খুশি হবেন আর তোমার আকাঙ্ক্ষা সফল করবেন।'

কিসের মালা, কোথায় ব্যাস, অভিভূতের মত নিতাই তাকিয়ে রইল।

'নাও, মালা ধর।' শ্রীবাস আবার তাড়া দিল। 'আমি দিলে হবে না। তোমার পূজো তোমাকেই করতে হবে।'

নিতাই মালা ধরল। কিন্তু মন্ত্র কী, মনে করতে পারল না।

কত ব্যাসপূজা করেছে আগে অথচ কিছুই এখন স্মরণে নেই।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নিমাই কোথায়? তাকে ডাকো। সে এর বিহিত করুক।

আঙিনায় কীর্তনিয়াদের সঙ্গে ভিড়েছে নিমাই। দেখুন এসে নিতাই কী রকম করছে। ব্যাসপূজো করছে না।

'সে কী? পূজো করো। ব্যাসের গলায় মালা দাও।' নিমাই আদেশ করল।

মুহূর্তে হাতের মালা নিতাই নিমাইয়ের গলায় উপহার দিলে। আর তক্ষুনি নিমাই ষড়ভুজ মূর্তি ধারণ করল। আর সেই মূর্তি দেখে মূর্ছিত হল নিতাই।

> প্রভু বোলে 'নিত্যানন্দ, শুনহ বচন।
> মালা দিয়া ঝাট করো ব্যাসের পূজন॥'
> দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর।
> মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥
> চাঁচর-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
> ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
> শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
> দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥
> ষড়ভুজ দেখি মূর্ছা পাইল নিতাই।
> পড়িলা পৃথিবীতলে ধাতু মাত্র নাই॥

নিতাইয়ের গায়ে হাত বুলুতে লাগল নিমাই। বললে, 'ওঠো, কীর্তন করো। যার জন্যে তুমি এসেছ সেই প্রেম ভক্তি বিতরণ করো। যাকে খুশি তাকে দাও, ঢোল দাও সর্বঘটে। প্রেম দিয়ে পৃথিবীর পিপাসা নিবারণ করো। উদ্ধার করো বসুন্ধরা।'

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল নিতাই। কিন্তু সম্যক জ্ঞানে সে নিমাইয়ের দাস, নিমাইয়ের সেবক। কখনো ছোট ভাই হয়ে লক্ষ্মণ কখনো দাদা হয়ে বলরাম। আর সেবকের যে আদর করে না তার বিষ্ণুস্থানে অপরাধ।

যে লক্ষ্মণমন্ত্র জপ না করে শুধু রামমন্ত্র জপ করে তার সর্বচেষ্টা অফলা।

'ভক্ত ভেদে রতিভেদ, পঞ্চ পরকার।' শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মধুর। শান্ত-রতির গুণ কৃষ্ণ নিষ্ঠা। আর কৃষ্ণে তার মমত্ব বুদ্ধি নেই, শুধু পরমাত্মা বুদ্ধি। শান্ত-রতি প্রেম পর্যন্ত যায়।

দাস্য-রতির গুণ সেবা। কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই, আছে মমত্ব বুদ্ধি। আর কৃষ্ণ আমার প্রভু আমি তার দাস, আছে আবার সেই সম্ভ্রম বোধ। আমি কি যে-সে পাত্র? আমি কৃষ্ণের কৃপাপাত্র। তাই দাস্যরতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত।

সখ্যরতিতে সমত্ব বোধ, বিশ্বাস-বিস্তার। যে উচ্ছিষ্ট ফল দাস্যে দেওয়া যায় না তাই দেওয়া যায় সখ্যে। দাস্যে কৃষ্ণকে বড় মনে করে, সখ্যে সমান সমান। তাই সখ্যরতি যায় প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ ও অনুরাগ পর্যন্ত।

বাৎসল্যরতিতে হীনত্ববোধ। কৃষ্ণই তখন অনুগ্রহের পাত্র, আশীর্বাদভাজন। কৃষ্ণ অবোধ, ভালো-মন্দ সে কী জানে কী বোঝে, আমার উপরেই তার নির্ভর, এই বুদ্ধিতে ভক্ত গরীয়ান। বাৎসল্যে আর বিশ্বাস নয়, অনুগ্রহ। দাস্যের সেব্য-সেবক নয়, বাৎসল্যে পাল্য-পালক। প্রয়োজন বোধে তাড়ন-ভর্ৎসন। তাই বাৎসল্যরতি যায় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় রাগ অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত।

মধুর রতিতে "অতিশয় সেবা," দাস্য সখ্য বাৎসল্যের সেবার চেয়েও বেশি। শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, বাৎসল্যের লালন তো আছেই, সর্বোপরি নিজাঙ্গ দিয়েও সেবন আছে। এ ভাব প্রেয়সীর ভাব, কৃষ্ণবাঞ্ছার মূর্তির বাইরে যার আর কোনো আরাধন নেই। কৃষ্ণের প্রীতি বিধানই এ ভাবের সার কথা। তা দেহ দিয়েই হোক গেহ দিয়েই হোক আর লেহ দিয়েই হোক। তাই মধুররতি যায় মহাভাব পর্যন্ত।

নিত্যানন্দের কী কথা? নিত্যানন্দের কথা, 'চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর একজন।' 'মুক্তি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্বথা।' 'নিত্যানন্দ অবধূত—সভাতে আগল। চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইলা পাগল॥'

'মা, দেখ, দাদা এসেছে।' বাড়ি এসে নিমাই ডাকল মাকে।

'কে, বিশ্বরূপ এসেছে?' শচী ব্যাকুল হয়ে এল।

'দেখ, দাদাকে এনেছি। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বরূপ। আমার সেই দাদা।'

নিতাইয়ের মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে রই শচী। বললে, 'নিমাই বলছে তুমি আমার বিশ্বরূ সত্যি, তুমিই কি আমার সেই হারানো ধন?'

'হ্যাঁ, মা, আমিই তোমার সেই বিশ্বরূপ।' নিত স্নেহ গাঢ় স্বরে বললে, 'আজ হতে তোমার আব সেই দুই ছেলে।' নত হয়ে নিমাই প্রণাম করলে শ দেবীকে।

নিতাইয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ কর শচী। 'বাবা, তুমিই আমার বিশ্বরূপ, আমার নিমাইে বড় ভাই। আমার নিমাইকে তুমি দেখো।'

একদিন নিভৃতে শচী দেবী নিমাইকে বললে, 'ক শেষ রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তুমি অ নিত্যানন্দ পাঁচ বছরের ছেলে হয়ে গিয়েছ।'

'বলো কী?' খুব মজা পেল নিমাই।

'ছুটোছুটি করে মারামারি করছ দুজনে। ঠেলাঠে করতে-করতে, দেখলাম, দুজনে ঠাকুরঘরে গি ঢুকলে। আর অমনি ঠাকুর ঘর থেকে দুটো ন ছেলে বেরিয়ে এল, ঠিক তোমাদের বয়সী। তারা জানো?'

'কে তারা, মা?'

'তারা কৃষ্ণ-বলরাম।'

'বলো কী? কী করল তারা?'

'তারা তোমাদের দু ভায়ের সঙ্গে মারামারি শু করে দিল। বললে, তোমরা কে? এখানে এসেছ কে এ বাড়িতে যত দই দুধ সন্দেশ আছে সব আমাদের এতে তোমাদের কিছু ভাগ নেই।'

'উত্তরে আমরা কিছু বললাম?' নিমাই হাস লাগল।

'হ্যাঁ, নিত্যানন্দ বললে, সেকাল আর নেই। ত গোয়ালার যুগ ছিল, দই-মাখন খুব খেয়েছ লুটে-পুটে এখন বামুনের যুগ, এখন আমাদের খাবার পালা। ত ভালয়-ভালয় এ ঘর-দোর ছেড়ে চলে যাও, আমাে খেতে দাও। যদি না যাবে তো মার খাবে বলে দিচ্ছি

'তখন কৃষ্ণ-বলরাম কী বললে?'

'কৃষ্ণ-বলরাম বললে, আমাদের দোষ নে তোমাদের দুজনকেই তা হলে বাঁধব। বলরামে

বেশি রাগ, আর তার যত তড়পানো সব নিত্যানন্দের উপর। ভয় দেখায়, শাসায়, আর বলে, এই দেখ, কৃষ্ণ আমার দিকে। নিতাই বলে তুমি কৃষ্ণের কী ভয় দেখাচ্ছ? গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর।'

'বা, দুই দিকেই তুই ঈশ্বর উপস্থিত।' নিমাই পরিহাস করে উঠল। 'তারপর?'

'এই রকম ঝগড়া করতে করতে কাড়াকাড়ি করে চার জনে সব খেয়ে ফেলল। এমন সময় স্পষ্ট নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। যেন বলছে, মা, বড় খিদে পেয়েছে, ভাত দাও। ঐ ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এই অদ্ভুত স্বপ্নের কী অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।' শচী দেবী বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

নিমাই বললে, 'তুমি সুস্বপ্ন দেখেছ। এ কথা আর কারু কাছে বোলো না। তোমার ঘরের ঠাকুর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। আমিও ভোগ দিতে গিয়ে দেখি নৈবেদ্যের আধাআধিই নেই। কোথায় যায়, লজ্জায় বলিনে কাউকে।'

'কেন, কোথায় আবার যাবে?'

'আমার কিন্তু সন্দেহ ছিল তোমার পুত্রবধূই ঐ আদ্ধেক ভোগ সাবাড় করে।' আবার পরিহাস করল নিমাই। 'এতক্ষণে আমার সন্দেহের নিরসন হল।'

অন্তরালে থেকে সব শুনতে পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর স্নেহসরস পরিহাসে হাসল আপন-মনে।

শচী দেবী বললে, 'কিন্তু স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করলি?'

'ব্যাখ্যা তো সোজা। তুমি নিত্যানন্দকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।'

'তবে তাই যা, নিতাইকে খেতে বলে আয়।' শচী দেবী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তথাস্তু। নিতাইকে গিয়ে তক্ষুনি বললে নিমাই। 'চলো আমার বাড়িতে আজ তোমার ভিক্ষে। দেখো, যেন চঞ্চলতা কোরো না।'

কে কাকে বলছে। নিতাই হাসল।

নিমাই-নিতাই দু' ভাই খেতে বসেছে পাশাপাশি। কিন্তু এ কী দেখছে শচী দেবী? দেখছে কৌশল্যার ঘরে যেন রাম-লক্ষ্মণ খাচ্ছে।

আরবার আমি আই দুইজন দেখে
বৎসর পাঁচের শিশু যেন পরতেখে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জনে চতুর্ভুজ—দুই দিগম্বর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রী হল মূষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল॥

কাঁদতে-কাঁদতে শচী দেবী ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তখন কোথায় কার খাওয়া। দু' ভাই ব্যস্ত হয়ে মাকে সুস্থ করতে বসল।

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। কৃষ্ণই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ব। কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সর্ব কারণের কারণ। রসময়, রসের সদন। রস-নির্যাস-আস্বাদন। একই ঈশ্বর, ভক্তের ভাব অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ। এইরূপ আকারে স্বরূপতঃ কোনো ভেদ নেই। তাই নিমাইয়ে ভক্তরা কখনো দেখে রামসীতা কখনো বা রাধাকৃষ্ণ, কখনো বা নৃসিংহবরাহ, কখনো বা লক্ষ্মী-রুক্মিণী। একই বৈদূর্যমণি, এক দিক দেখলে নীল আরেকদিক থেকে দেখলে লাল। তেমনি ধ্যান ভেদে বিচিত্র প্রকাশ। প্রত্যেক প্রকাশেই কৃষ্ণ শাশ্বত, পরিপূর্ণ। ঈশ্বরে দেহ-দেহী ভেদ নেই। যেমন লবণপিণ্ডের সর্বত্রই লবণ তেমনি কৃষ্ণে সমস্তই আনন্দ। যেই রস সেই কৃষ্ণ, যেই কৃষ্ণ সেই রস।

কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়। কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ববিশ্বের বিশ্রাম॥ সবার আশ্রয় কৃষ্ণ—কৃষ্ণে সবার স্থিতি। কৃষ্ণই সর্ব-অংশী। সর্বভূতাধিবাসঃ। সর্বভূতান্তরাত্মা। সর্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

আবার কী? কৃষ্ণ লীলাপরায়ণ। লীলা পুরুষোত্তম। 'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।' কৃষ্ণের আবার খেলা আছে। শিশু যে খেলে, কোনো কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে খেলে না, আনন্দের জন্যে খেলে। কৃষ্ণ যে পরম দেবতা তা সে শুধু খেলে বলে। দিব ধাতু থেকে দেবতা। দিব ধাতু দ্যুতি আর ক্রীড়া দুইই বোঝায়। তাই যে দ্যুতি বিস্তার করে বা ক্রীড়া বিস্তার করে সেই দেবতা। কৃষ্ণ পরমজ্যোতির্ময় বা কৃষ্ণের খেলা সমস্তোত্তম, তাই কৃষ্ণ পরমদেবতা। 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ। গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ।' কিন্তু খেলা তো একলা হবার নয়। 'স একাকী ন রমতে।' খেলায় আবার সঙ্গী চাই। কৃষ্ণের খেলার সঙ্গীদের

নাম পরিকর। আর খেলার স্থানের নাম ধাম। 'দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥' সেই ভগবান কোথায় থাকেন? 'স ভগবান কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' ভগবান প্রতিষ্ঠিত নিজের মহিমায়। 'স্বে মহিম্নীতি।' নিজের মহিমায় মানে স্বরূপশক্তির মহিমায়। আর স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষই ভগবানের ধাম। যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না তাইই কৃষ্ণের পরম ধাম। 'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।'

কৃষ্ণ-আবেশে সমাসীন, নিমাই রামাইকে বললে, 'শান্তিপুরে যাও, অদ্বৈতকে গিয়ে খবর দাও। বলো যার জন্য এত কেঁদেছিলে, হুঙ্কার করেছিলে, সে এসেছে প্রকাশ পেয়েছে। আর শোনো, নিত্যানন্দের আসার কথাটাও বোলো কানে-কানে। সমস্ত আগমনই তার আকর্ষণে। বোলো যেন সস্ত্রীক আসে।'

রামাই তখুনি ছুটল শান্তিপুর।

সামনে এসে দাঁড়াতেই অদ্বৈত বললে, 'কী রে, আমাকে বুঝি নিয়ে যেতে এসেছিস্?'

রামাই বললে, 'সবই তো আপনি জানেন। এবার তবে চলুন।'

'কোথায় যাব?' অদ্বৈত অবাক হবার ভাব করল। 'তোরা একটা ছেলেকে নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছিস বলে আমিও গিয়ে তোদের দলে ভিড়ব? তোরা কাকে অবতার বলছিস? কোন শাস্ত্রে নদীয়ায় অবতার এল? আমি কি তোদের মত নির্বোধ? তোর দাদা শ্রীবাসকে গিয়ে জিগগেস কর আমি কে?'

'তার আমি কী জানি। শাস্ত্রেরই বা আমি কী বুঝি?' রামাই বললে, 'তবে ভগবান যা বলে দিয়েছেন তাই আপনার কাছে নিবেদন করছি।'

'কী, কী বলে দিয়েছেন?'

'বলে দিয়েছেন যার জন্যে এতদিন কেঁদেছেন, পুজা করেছেন, কঠোর উপবাস করেছেন তিনিই আবির্ভূত হয়েছেন। তিনিই ডেকেছেন আপনাকে।'

যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ॥

'ডেকেছেন?' এ কী, অদ্বৈত যে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। 'সত্যি, সত্যি এসেছেন তিনি? আমাদের মধ্যে এসেছেন? বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিনি এসেছেন এ ধূলির ধরণীতে?' অদ্বৈত উঠে নৃত্য শুরু করল। 'ওরে শোন, তিনি এসেছেন। আমার ডাকে তিনি নেমেছেন বৈকুণ্ঠ থেকে। আমিই তাঁকে এনেছি। আমিই তাঁকে এনেছি।'

যাওয়ার উদ্যোগ পড়ে গেল। ষড়জ পুজার সজ্জা তৈরি হল। অদ্বৈতের সঙ্গে চলল তার স্ত্রী সীতা দেবী। আর অনুগামী রামাই।

পথে আবার বেসুর ধরল অদ্বৈত। জিগগেস করল, 'কোথায় চলেছি বল তো, কার কাছে?

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি।'

'তোকে কী বলে দিলেন সত্যি করে বল তো আবার শুনি।'

'শুধু বললেন যেন শিগগির আপনি একবার দেখা করেন তাঁর সঙ্গে।'

'কিন্তু উনিই যে আমার আকাঙ্ক্ষিত তা আমি বুঝব কিসে?' অদ্বৈত আবার দ্বিধায় পড়ল। বললে, 'শোন, যদি উনি আমার মাথায় পা তুলে দেন, পা তুলে দেবার ওঁর সাহস হয়, তবেই বুঝব তিনি আমার প্রাণেশ্বর।'

রামাই বললে, 'তার আমি কী জানি। আমার যদি ভাগ্যে থাকে দেখব সেই অপূর্ব দৃশ্য।'

'দেখবি?' যেন বিশ্বাস্য নয় এমনি জিজ্ঞাসা অদ্বৈতের।

'কেন দেখব না? আপনার জন্যেই তো তাঁর আসা। আপনারই তো হুকুম এবার যেন ভক্তি বিতরণ করেন ঘরে ঘরে।'

চিত্ত আর্দ্র হল অদ্বৈতের। তবু যেন ঘোর কাটে না।

নবদ্বীপে পৌঁছে বললে, 'আমি যাব না নিমাইয়ের কাছে। তুমি গিয়ে তাঁকে বলো যে আচার্য আসেনি।'

'আপনি তা হলে কোথায় যাবেন?' রামাই অবাক মানল।

'আমি সস্ত্রীক নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকব। দেখি তিনি কী করেন। দেখি তিনি আমাকে ডাকান কি না।'

নন্দন আচার্যের বাড়িতে অদ্বৈতকে পৌঁছে দিয়েই রামাই ছুটল বাড়িতে। নিমাই এখন কোথায়?

দেখ গিয়ে 'ত্রিদশের রায়' তোমাদের বিষ্ণু খট্টায় এসে বসেছেন।

অদ্বৈত এসেছে, অন্তরে জেনেছে নিমাই। চলো যাই শ্রীবাসের বাড়ি। সেখানে গিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বসেছে বিষ্ণু খট্টায়। বললে, 'ওরে নাড়া এসেছে। নাড়া এসেছে আমাকে পরীক্ষা করতে।' 'নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।' নন্দন আচার্যের বাড়ি লুকিয়ে রয়েছে। কতক্ষণ থাকবে?

নিত্যানন্দ নিমাইয়ের মাথায় ছাতা ধরেছে, গদাধর কর্পূর-তাম্বূল জোগাচ্ছে, চামর দোলাচ্ছে নরহরি। মুকুন্দ মুরারি শ্রীবাস করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

এমন সময় রামাই এসে উপস্থিত।

'আমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে নাড়া পাঠিয়েছে তোমাকে?' বললে নিমাই, 'ওকে গিয়ে বলো নন্দন আচার্যের বাড়িতে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। বলো আমি ডেকেছি। শিগগির যেন চলে আসে।'

আবার ছুটল রামাই।

সত্যি? আমি এসেছি, নন্দনের বাড়ি রয়েছি, কেউ না বললেও টের পেয়েছেন? অভিভূতের মত এগিয়ে চলল অদ্বৈত। অনুগামিনী সীতাও চলল সঙ্গে।

শ্রীবাসের ঘরে এসে দাঁড়াল দুজনে। কই নিমাই কোথায়? এ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বসে। আর এ তো শ্রীবাসের ঘর নয়, এরই নাম বুঝি বৈকুণ্ঠ।

দিব্যদর্শন হল অদ্বৈতের। জ্যোতির্ময় দেবতারা নিমাইয়ের স্তুতি করছে, অগণন ঋষি দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। পৃথ্বী ও আকাশ এক হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র বন্দনার সুধাক্ষরণ।

ঐশ্বর্য দেখতে চেয়েছিল, অদ্বৈত ঐশ্বর্য দেখল।

'আমাকে চিনতে পারছ?' বললে নিমাই, 'আমি ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। তোমার হুঙ্কার আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। জীবের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে জীবোদ্ধারের উদ্দেশ্যে আমাকে তুমি ডেকে এনেছ। কার সাধ্য তোমার ডাক না শোনে।'

সস্ত্রীক কাঁদতে লাগল অদ্বৈত। বললে, 'আমার শক্তি কী তোমাকে আকর্ষণ করি? তুমি নিজ করুণায় অবতীর্ণ হয়েছ। জীবের দুঃখ তুমিই ভালো জানো। আর তুমি ছাড়া কে আছে তাকে তুলবে পাপপঙ্ক থেকে? আজ আমার সব আকাঙ্খা পূর্ণ হল, তোমার দর্শন পেলাম। জন্মকর্ম সফল হল। যদি অনুমতি করো তো চরণযুগল পূজা করি।'

পায়ের কাছে বসল দু'জনে, অদ্বৈত আর সীতা। অশেষ-বিশেষে চৈতন্যচরণ পূজা করতে লাগল। পূজার শেষে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তখন নিমাই কী করল? অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ করল। তার মাথার উপরে পা রাখল।

সর্বভূত-অন্তরাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়॥

'নাড়া।' ডাকল নিমাই, 'এখন একবার নৃত্য কর। আমি দেখি।'

অদ্বৈত নাচতে লাগল।

আর সকলে কীর্তন ধরল। অদ্বৈতও যোগ দিল কীর্তনে। আর তপস্যা নয়, ধ্যান-জ্ঞান নয়, এখন শুধু নৃত্যগীতে কৃষ্ণভজন।

নিমাই আপন গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়ে দিল। বললে, 'বর চাও, বর নাও।'

অদ্বৈত বললে, 'যে বর চেয়েছিলুম তা তো পেয়ে গেছি। আর কিছুই আমার চাইবার নেই।

'না, আছে।' নিমাই বললে জোর দিয়ে।

'তবে এই বর দাও যে প্রেমভক্তি তুমি দিতে এসেছ তা যেন সর্বলোকে পায়—সে অধিকারে যেন কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ না থাকে। ভক্তিতে চণ্ডালে-ব্রাহ্মণে মূর্খে-পণ্ডিতে যেন তারতম্য না থাকে। নির্বিশেষে সকলে যেন পায় সে করুণা।'

নিমাই বললে, 'তথাস্তু।'

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যও মধুর। মাধুর্যই ভগবত্তার সার। আর কারুণ্যই সেই মাধুর্যের প্রতিবিম্ব। স্বতন্ত্র পুরুষ হয়েও কৃষ্ণ ভক্তপরবশ। 'অহং ভক্ত-পরাধীনঃ।' 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।' কৃষ্ণ যদি করুণ না হয় তবে ক্রন্দন শুনবে কে? 'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে।' কৃষ্ণের এত করুণা যে নিজেই নিজতত্ত্ব শিখিয়েছেন। হয় গুরুর মধ্য দিয়ে নয়তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে, অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে। যেমন অর্জুনকে কৃপা করলেন নিজের থেকে। সর্বগুহ্যতম কথা আবার শোনাই তোমাকে। আমাতে মন ঢালো, আমাকেই খুশি করো। আমি যে তোমাকে আগে থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। আর ভালোবাসা ছাড়া কী আছে খুশি করবার। এই তো সংসারে সর্বোত্তম কথা—পরমং বচঃ।

[ক্রমশঃ।

বাঙালী জাগো

ডাঃ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রাক্তন উপাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আসামে নরমেধ যজ্ঞ হইয়াছে। এই যজ্ঞের বলি বাঙালী হিন্দু। শত শত বাঙালী নরনারী নিহত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙালীর ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়া বর্ব্বর আসামীরা তাহাদিগকে নূতন ইহুদী" করিয়া দিয়াছে। অসভ্য, অকৃতজ্ঞ অসমীয়ারা শ্লোগান ধরিয়াছে "বঙ্গাল খেদা"। শুধু আসামেই বা বলি কেন প্রায় সব দেশেই বাঙালীকে আর যেন কেহ সহ্য করিতে পারিতেছে না। অথচ এই বাঙালীর জন্যই ভারতবর্ষ স্বাধীন। এই বাঙালীর জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতের বরাসন লাভ হইয়াছে। এই বাঙালীই ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে জাগরিত করিয়াছে। বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি একজন বাঙালী। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বিশ্বে প্রচার করিয়াছে একজন বাঙালী বিপ্লবী-সন্ন্যাসী। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন বাঙালী। তিনিই স্বায়ত্ত-শাসনের বীজমন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেন। বাঙালী ছিল দেশের নেতা। বাঙালী-ই ছিল ভারতের আশ্রয়। বাঙালীই ছিল ভারতের বুদ্ধি। ভারতের গৌরব। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রেষ্ঠাংশ যে বাঙালীর হাতে ছিল তাহা বৃটিশ "রাজ-প্রতিনিধি" কার্জ্জন বুঝিয়াছিলেন। বাঙালীকে হীনবল করিবার জন্য তিনি বাংলাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববাংলা হইল মুসলমান-প্রধান বাংলা বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি মুসলমানপ্রধান দেশ সৃষ্টি করা। বাঙালী হিন্দুকে দুর্ব্বল করা।

অসমীয়াদের বাঙালী-বিদ্বেষের কারণ কি? এই বিদ্বেষ শুধু ভাষাগত, না ইহার অন্য কিছু কারণ অন্তরালে আছে? কেহ কেহ গোপন কারণের ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহাতে কোন সত্য আছে বা ইহা নিছক গুজব, তাহা আমরা জানি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও চাহি না।

এই নরহত্যার তদন্ত করিবার জন্য কেহ কেহ একটি "জুডিসিয়াল ট্রাইবুন্যাল" গঠিত করিবার জন্য দাবী জানাইতেছেন। "জুডিসিয়াল ট্রাইবুন্যাল" গঠিত হইবে কিনা জানি না।

আসামের ঘটনা ইন্‌কুয়্যারী করিবার জন্য যদি একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়, তাহা হইলে কি হইবে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কোন বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করা যে কি কঠিন, তাহা ব্যবহারজীবী মাত্রই জানেন। এই প্রমাণের প্রথম অন্তরায় "এভিডেন্স এ্যাক্ট"। দ্বিতীয়তঃ অসমীয়াদের বিরুদ্ধে কোন অসমীয়াই সাক্ষ্য দিবে না। আর যখন রক্তপ্রবাহ দেখিয়া বাঙালী নরনারী ছুটিয়া পলাইতেছিল, তখন তাহাদের ঘটনাগুলি দেখিবার সময় ছিল কোথায় বা দৃষ্ট ঘটনা মনে রাখিবার মনের অবস্থাই বা ছিল কোথায়? তৃতীয়তঃ আসাম গভর্ণমেণ্ট নিজেকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। তাহাতে বাঙালীদের পক্ষে সাক্ষী সাবুদ মিলিবে না। চতুর্থতঃ এখনও মীরজাফর আছেন। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য আপনজনকে ভাসাইয়া দিবার লোকের অভাব হইবে না। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট যেখানে সংশ্লিষ্ট। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইলে কিছু কাল গত হইতে পারে এবং হিন্দু বাঙালী আমরা কিছু সান্ত্বনা পাইতেও পারি—বিচার হইবে। হয়ত হৈ চৈ করিবার বা ভুয়া নাম কিনিবার সুযোগও মিলিতে পারে। কি আসল সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে কি! নিহত ব্যক্তিগণও আর ফিরিয়া আসিবে না। যিনি যাহাই মুখে বলুন না কেন, গৃহহারাদের আর সম্পূর্ণ পুনর্ব্বাসন হইবে না। পুনর্ব্বাসন যে কি, দণ্ডকারণ্য তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যদি ইহাই আমার মত হয় তাহা হইলে বাঙালীর বাঁচিবার রাস্তা আমি কি নির্দ্দেশ করিতেছি। আমি বলি, বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাঙালী আত্মরক্ষার মন্ত্র জানে। আত্ম আপনভোলা ভাবপ্রবণ বাঙালী আত্মবিস্মৃত, তাই আজ সে নির্য্যাতিত, লাঞ্ছিত।

তাই বাঙালী, আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিও না। কবে কে তোমাকে সাহায্য করিবে, কবে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ইহার প্রতীক্ষা করিও না। তোমরা ত আত্মরক্ষার মন্ত্র জান; সেই মন্ত্রের সাধনার দিন আবার আসিয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতেই হইবে। জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে ভয় করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না তো আর। তোমরা অপটু নও তোমাদের পটুতায় এবং শক্তিতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। তোমরা আত্মবিস্মৃত। একবার দর্পণে মুখ দেখ—তোমরা কে। অরবিন্দ, সুভাষ, ক্ষুদিরাম প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে।

সে দিন বোম্বাইতে শ্রীরাজাগোপালাচারী বাঙালীর দুঃখে নাকি কাতর হইয়া বিগলিত অশ্রুজলে আসামে একটা "শুভেচ্ছা মিশন" পাঠাইবার জন্য বলিয়াছেন। তিনি তো বুড়ো হাড়ে দিল্লী, হিল্লি মক্কা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং চোখা চোখা ভাষণও দিতেছেন। তিনি নিজে আসাম দেখিতে একবার যাইলেন না কেন? অথচ এই অতি বৃদ্ধের লোলুপদৃষ্টি ভারতের সিংহাসনের উপর রহিয়াছে। তাঁহার দলের একজন বাঙালীকে আসাম যাইয়া আসামের অবস্থা দেখিয়া সে সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কিছু করিতে পারিলেন না, সেখানে অন্য বাঙালী কি করিবে? তাই বলি, বাঙালী ঘুমাইও না আর, জাগো! জাগো!

A man who lives for his children, sacrificing
everything for them, is doing them a misservice.

—PRIESTLEY.

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

২১

ভোরের অল্প আগে সে ঘুমিয়ে পড়লো। তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। গ্রীষ্মের এই হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটা লেগে সে বুঝতে পারলো প্রায় তখনই—জেম্মা খুব সুন্দরী বা তাকে খুব ভালো লাগেতা নয়, সে তো আগেই জানতো তা নয়—সে বুঝতে পারলো জেম্মাকে সে ভালোবাসে। এই ঝড়ের মতই প্রেম তার জীবনে হঠাৎ এসে দেখা দিয়েছে। আর এখন তাকে বোকার মত লড়াই করতে হবে। দুঃখে তার মন ভরে গেলো। যদিই বা সে প্রাণ না হারায়—এই মেয়েটিকে ভালোবেসে কি হবে তার, অন্যের বাগ্‌দত্তা সে। যদি সেই অপর লোকটি বড় রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, জেম্মা যদি তাকে ভালোবাসে, হয়ত এখনই তাকে ভালোবাসে—তাহলে কেমন হয়? একি প্রশ্ন—কি সুন্দরী সে···

সারা ঘরে পায়চারী করতে লাগলো সে। টেবিলে বসে কাগজ কলম টেনে নিয়ে কয়েক লাইন লিখলো—আবার কেটে দিলো। ···জেম্মার কথা চিন্তা করতে লাগলো সে—অন্ধকার জানালায় জেম্মার সেই সুন্দর চেহারা তারার আলোয় ঝড়ে এলোমেলো করা তার চুলের রাশি, গ্রীক-দেবীর মত তার সুন্দর দু'টি বাহু, সেই বাহু দু'টি তার কাঁধের উপরে রাখা।

জেম্মা জানালা দিয়ে যে গোলাপ ফুলটি ছুঁড়ে দিয়েছিলো, সেটা তুলে নিলো। মনে হলো শুকনো পাপড়িগুলো থেকে মিষ্টি হাল্কা সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যা অন্য গোলাপ থেকে অনেক বেশী মিষ্টি।

কাল যদি সে নিহত হয় বা বিকলাঙ্গ হয়ে থাকতে হয় সারা জীবন?

বেশ পরিবর্তন না করে, বিছানায় না গিয়ে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

কে যেন তার কাঁধে টোকা দিলো।

চোখ খুলে দেখে পান্টালেওন সামনে দাঁড়িয়ে।

বুড়ো বললো, 'ব্যাবিলনে যুদ্ধের আগে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মত সে ঘুমিয়ে আছে।'

সানিন বললো, 'কেন? এখন ক'টা বাজে?'

'পৌনে সাত—হানাউ দু' ঘণ্টার রাস্তা। আমাদেরই প্রথম পৌঁছানো উচিত। রাশিয়ানরা সব সময়ই প্রতিপক্ষের আগে চলে। ফ্রাঙ্কফোর্টের সব চেয়ে ভালো গাড়ী ভাড়া করেছি আমি।'

সানিন মুখ ধুতে গেলো।

'পিস্তলগুলো কোথায়?'

'পাজী নচ্ছার জার্মাণটি পিস্তল আনবে ডাক্তারও আনবে।'

কালকের মত পান্টালেওন তার দুর্দ্ধর্ষভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু যখন সে গাড়ীতে উঠে সানিনের পাশে বসলো—গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে যখন ঘোড়াগুলো কদমচালে রওয়ানা হলো, তখন পাডুয়ার অশ্বারোহী সেনাদলের ভূতপূর্ব বন্ধুটির মধ্যে অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা গেলো। সে যেন নিরুৎসাহ হয়ে গেলো, মুষড়ে পড়লো। কোনো রকমে খাড়া করা দেওয়াল যেন হঠাৎ ধ্বসে গেলো।

'হে ভগবান, হায় পবিত্র ম্যাডোনা আমরা কি করতে যাচ্ছি!' তার চুলের মুঠি হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বললো, 'আমি কি বুড়ো হয়ে পাগল হয়ে গেলাম, কি করছি আমি?'

আশ্চর্য্য হয়ে হেসে উঠলো সানিন, পান্টালেওনের কোমর জড়িয়ে ধরে ফরাসীতে বললো—'পাত্রেতে মদ ঢালা হয়েছে পান করতে হবে আমাদের সব ভুল প্রমাদ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা দুজন পেয়ালার শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত পান করে যাবো। তবু আমি বলবো আমি পাগল হয়ে গেছি। সব কিছু ছিলো কি শান্ত, কি সুন্দর—অকস্মাৎ এ কি হয়ে গেলো?'

সানিন জোর করে হেসে বললো, 'যেমন অর্কেষ্ট্রা ঐকতান বাজায়, কিন্তু তোমার তো কোনো দোষই নেই।

পান্টালেওন সামনে আসা চুলের ঝুঁটি পেছনে করে দিলো, নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তা আমি জানি। তাই মনে করি। কিন্তু একি পাগলামি নয়?'

গাড়ী চলতে লাগলো।

ভারী সুন্দর সকাল হয়েছিলো। সদ্যজাগ্রত ফ্রাঙ্কফোর্টের রাস্তা ছিলো পরিষ্কার ও ফিটফাট। জানলাগুলো টিনের পাতের মত ঝকমক করছিলো, যখন তারা নগরদ্বার পেরিয়ে গেলো শুনতে পেলো ঈষৎ লাল আকাশে লার্ক পাখী গান গাইছে। হঠাৎ পথ যেখানে মোড় ঘুরেছে, একটা বিরাট পপলার গাছের পেছন থেকে একটি পরিচিত ব্যক্তিকে দেখা গেলো, কয়েক পা এগিয়ে এসে ওদের দেখে থমকে গেলো। সানিন আবার চাইলো···এ কি এ যে এমিল!

পান্টালেওনের দিকে ফিরে চাইলো সানিন, 'সে কি? এমিল কি সব জানে?'

নিরুপায় ইটালীয়ানটি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, 'বলেছি তো আমি পাগল হয়ে গেছি। বেচারা আমাকে সারা রাত শান্তি দেয়নি, অবশেষে আজ সকালে তাকে সব বলে দিয়েছি।'

সানিন নিজের মনেই বললো—এই তোমার গোপনকথা লুকিয়ে রাখা।

এমিল যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে গাড়ী আসতে সানিন ঘোড়া থামাতে গাড়োয়ানকে আদেশ দিলো—'বেচারা'কে কাছে আসতে বললো। অস্থির পদে এমিল এগিয়ে এলো, তাকে রক্তহীন দেখাচ্ছিলো, যেদিন সে মূর্চ্ছা যায় সেদিনের মত ফ্যাকাসে। ভালো করে দাঁড়াতে পারছিলো না সে।

তীক্ষ্ণ স্বরে সানিন বললো, 'এখানে কি হচ্ছে? বাড়ী ছেড়ে এসে?'

কম্পিত স্বরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে এমিল বললো, 'আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে দিন।' ভীষণ জ্বরে লোকের যেমন দাঁতে দাঁত লেগে যায় সেরকম এমিলের দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল 'কিছু করবো না আমি, বাধা দেবো না, আপনার সঙ্গে যেতে দিন আমায়।'

সানিন বললো 'আমার প্রতি তোমার যদি কিছু মাত্র ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা থাকে তবে এখনই বাড়ী যাও কিম্বা হের ক্লুয়বারের দোকানে কাউকে কিছু না বলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।'

এমিল কোনো রকমে কাতরোক্তি করলো, 'আপনার ফিরে আসার? আর আপনি যদি......'

গাড়োয়ানের দিকে একবার সাবধানী দৃষ্টিতে চেয়ে সানিন বললো, 'এমিল ভেঙ্গে পড়ো না। বাড়ী যাও, এমিল আমার কথা শোনো। তুমি তো বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো, অন্তত সে খাতিরে বাড়ী যাও।'

সানিন তার হাত বাড়িয়ে দিলো। এমিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সানিনের আঙুলগুলো ঠোঁটে ঠেকালো, তারপর ঘুরে ফ্রাঙ্কফোর্টের উদ্দেশে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চললো।

পান্টালেওন আপন মনে বললো আর একটি মহৎ প্রাণ হৃদয় কিন্তু সানিন তার দিকে অন্য মনে চাইতেই গুটিগুটি মেরে সিটের এক কোণায় বসে পড়লো। সে জানতো সে অপরাধ করেছে। প্রতি মুহূর্তে তার বিস্ময়ের ভাব বেড়ে যাচ্ছিলো। সত্যিই কি সে সহযোগীর পাঠ অভিনয় করছে, সেই কি গাড়ী ডেকেছে, সব কিছু ঠিক করেছে, ভোর ছ'টার সময় বাড়ী ছেড়েছে? কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে এবার তার রুগ্ন পা দুটোতে বড় ব্যথা করছে।

সানিন বুঝলো তাকে খুসী করা দরকার, কি বললে তার উদ্দীপনা ফিরে আসবে সে জানতো। বললো 'সম্মানিত সিনর সিপ্পাটোলা কোথায় তোমার সেই নির্ভীকতা, কোথায় সেই তেজ আর বীরত্ব?'

সিনর সিপ্পাটোলা ভুরু কুঁচকে নড়ে চড়ে বসলো, গম্ভীর স্বরে বললো 'সেই তেজ আর বীরত্ব? সব শেষ হয়ে যায়নি, এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে।'

শুরু করলো এবারে তার শিক্ষা, তার গীতি নাট্যতে গান গাওয়া, মহাপুরুষ গার্শিয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চড়াগলার গায়ক—যার যখন তারা হানাউতে পৌঁছালো সে অন্যমানুষ হয়ে গেছে। তুমি যদি ভেবে দেখো, দেখবে পৃথিবীতে কথার মত শক্তিশালী ও কথার মত শক্তিহীন আর কিছু নেই।

২২

যে ছোট বনে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিলো হানাউ থেকে দুই ফার্লং দূরে ছিলো সে বন। পান্টালেওনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে তারাই প্রথম এসে পৌঁছালো সেখানে। গাড়োয়ানকে বনের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তারা একটা ঘন ঝোপের ছায়ায় গিয়ে বসলো তাদের প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো।

অপেক্ষা করতে সানিনের কিছু খারাপ লাগছিলো না। সরু পায়ে চলা রাস্তাটা ধরে সে হাঁটছিলো, পাখীর গান শুনছিলো ফড়িং এর পেছন ঘুরছিলো, অধিকাংশ রাশিয়ান এরকম অবস্থায় পড়লে যা করে তাই করছিলো সে, অর্থাৎ চেষ্টা করছিলো কোনো চিন্তা না করার। একবার মাত্র চিন্তা তার মনে উদয় হলো যখন সে দেখলো একটা ছোট লাইনগাছ খুব সম্ভবতঃ কালকের ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছে। গাছটি মরে যাচ্ছিলো, তার পাতাগুলো শুকিয়ে গিয়েছিলো। তার মনে হলো একি একটা খারাপ লক্ষণ? কিন্তু পরমুহূর্তেই শিস দিয়ে ভাঙ্গা ডালগুলো ডিঙিয়ে পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। বরঞ্চ পান্টালেওনই বিরক্তি প্রকাশ করছিলো, তার পিঠ ও হাঁটু ঘষে, কেশে, জার্মানদের অভিশাপ দিচ্ছিলো। উত্তেজনায় তার হাই উঠছিলো, তার ছোট শুকনো মুখ ভারী মজার দেখাচ্ছিলো দেখে সানিন হাসি সামলাতে পারছিলো না।

অবশেষে নরম রাস্তায় চাকার শব্দ তাদের কানে এলো। পান্টালেওন উঠে দাঁড়িয়ে বললো 'ওরা আসছে'। অবশ্য একটু ভীত হয়েছিলো সে কিন্তু ব-রর-র করে আওয়াজ করে সে তার শঙ্কার ভাবটা ঝেড়ে ফেললো। বললো আজ বড় ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘাসেও পাতায় ঘন হয়ে শিশির পড়েছিলো কিন্তু জঙ্গলে বড় গুমোট গরম ছিলো।

গাছের ছায়ায় শীগগিরই দুজন অফিসারকে দেখা গেলো তাদের সঙ্গে বেঁটে, মোটা গোবেচারা ও ঝিমুনো চেহারার সেনা দলের ডাক্তারকে দেখা গেলো। তার হাতে একটা মৃৎপাত্রতে ছিলো জল—যদি দরকার হয়, যা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ছিলো ডাক্তারির ছুরি কাঁচি ও ব্যাণ্ডেজ। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো এরকম পরিস্থিতিতে আসাতে সে অভ্যস্ত ছিলো, এ ছিলো তার আয়ের একটি পথ—প্রত্যেক লড়াইতে সে আট চেরভনৎসি পেতো, প্রত্যেক পক্ষ থেকে চার মুদ্রা। হের ফন রিক্টার পিস্তল নিয়ে আসছিলো। হের ফন ডনহোফ এলো ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে—সে ভাবছিলো এটা থাকাতে তার সম্ভ্রম বাড়ছে।

সানিন ফিসফিস করে বললো 'পান্টালেওন, যদি—আমি যদি—মারা যাই—তুমি জানো সব কিছু ঘটতে পারে—তাহলে আমার পাশের পকেটে একটা কাগজে একটা ফুল জড়ানো আছে সেটা সিনোরিনা জেম্মাকে দেবে। শুনতে পাচ্ছো? দেবে তো?'

বৃদ্ধ বিষাদমাখা চোখে তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো। ভগবান জানেন সানিন যা তাকে করতে বললো সে তা বুঝলো কিনা।

প্রতিদ্বন্দ্বী ও সহযোগীরা কেতাদুরস্ত ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করলো। একটি মাত্র লোক অবিচলিত ছিলো, সে হলো ডাক্তারটি। সে ঘাসের ওপর বসে হাই তুলছিলো। যেন বলতে চাইছিলো 'আমি তো আর এখানে বীরত্ব ও আদবকায়দা দেখাতে আসিনি।' হের ফন রিক্টার হের 'সিবাডোলা'কে জায়গা ঠিক করতে বললো। হের 'সিবাডোলা' আবেগজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলো—'যা খুশী তাই করুন আপনারা, আমি কেবল দেখে যাবো।' তার 'তেজের দেওয়াল' আবার ভেঙে গিয়েছিলো।

হের ফন রিষ্টার একাই কাজ সুরু করলো। বনের মধ্যে চারদিকে ফুলগাছে ঘেরা একটা খোলা জায়গা বের করলে। জায়গা মেপে, একটা গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন করে দিলো, মাটিতে বসে পিস্তল বের করে গুলী ভরতে লাগলো। ভীষণ ঘামছিলো সে, সাদা রুমাল দিয়ে ঘনঘন মুখ মুছছিলো। পা'টালেওন তার পেছন পেছন ঘুরছিলো—মনে হচ্ছিলো তার যেন জ্বর এসে গেছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এই সময় দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন শিক্ষক-এর কাছে শাস্তি পেয়ে ছাত্র দু'জন বিরস বদন করে আছে।

তারপর এলো সেই মুহূর্তটি যখন·······

দু'জনে তাদের পিস্তল নিলো হাতে।

এবারে হের ফন রিষ্টার পা'টালেওনকে বললো এক, দুই, তিন বলার আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মানুসারে এখন তার দুই প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা ও উপদেশ দেওয়া দরকার। এ শুধু নিয়ম রক্ষার্থে তবে হের 'শিবাভোলা' খানিকটা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন। প্রকৃত পক্ষে একজন নিরপেক্ষ দর্শকেরই কাজ এটা, কিন্তু যেহেতু এখানে আর কেউ নেই সেজন্য হের ফন রিষ্টার স্বেচ্ছায় তার নিজের অধিকার ত্যাগ করে পা'টালেওনকে ভার দিচ্ছে। ইতিমধ্যে সেই অপরাধী অফিসারটির মুখদর্শন করবে না বলে পা'টালেওন একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। হের ফন রিষ্টারের অনুরোধে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বুক চাপড়ে ইটালীয়ান ও ফরাসীর মিশ্রণে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'কি হিংস্রতা! দুটি তরুণ প্রাণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণ দেবে? কেন? কিসের জন্য? কি সাংঘাতিক! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

সানিন তাড়াতাড়ি যোগ দিলো 'আমি আপোষ চাইনে।' তার প্রতিদ্বন্দ্বীও বললো 'আমিও নয়।'

এবারে ফন রিষ্টার বিস্ময় বিমূঢ় পা'টালেওনকে বললো, 'এবারে বলুন এক, দুই, তিন।'

বলা মাত্র পা'টালেওন জঙ্গলে ঢুকে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠলো 'এক,দুই, তিন।'

সানিনের গুলী লক্ষ্যচ্যুত হয়ে একটা গাছের ডালে ভীষণ আওয়াজ করে লাগলো। ব্যারণ ফন ডনহোফ সঙ্গে সঙ্গে এক পাশ লক্ষ্য করে হাওয়ার উদ্দেশে গুলী ছুঁড়লো।

তারপর খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। শুধু পা'টালেওনের কাতরোক্তি শোনা গেলো।

ডনহোফ জিজ্ঞেস করলো, 'আবার হবে?'

সানিন বললো 'আপনি কেন শূন্যে গুলি ছুঁড়লেন?'

'তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।'

সানিন বললো 'এবারেও কি শূন্যে গুলী ছুঁড়বেন?'

'হয়ত, জানিনে'—

ফন রিষ্টার আরম্ভ করলো 'দেখুন প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা রীতিবিরুদ্ধ।'

সানিন পিস্তল মাটিতে ছুঁড়ে বললো 'আমি আর গুলী ছুঁড়বো না।'

ফন ডনহোফও পিস্তল ফেলে দিয়ে বললো 'আমি আর লড়তে চাইনে। তাছাড়া এখন স্বীকার করছি সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম।'

একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সে হাত বাড়িয়ে দিলো। সানিন দৌড়ে এসে ঝাঁকুনি দিলো। পরস্পরের দিকে চেয়ে দু'জনই সলজ্জ হেসে উঠলো।

পা'টালেওন হাততালি দিয়ে গলাফোলা পায়রার মত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো 'সাবাস, সাবাস।' একটা মাটিতে ফেলা গাছের ডালে ডাক্তার বসেছিলো, উঠে পাত্রের জল ঢেলে দিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফন রিষ্টার ঘোষণা করলো 'সম্মান রক্ষার্থে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে।'

অতীত দিনের কথা স্মরণ করে পা'টালেওন চেঁচিয়ে উঠলো 'সাবাস।'

অফিসারদের অভিবাদন পর্ব শেষ হলে যখন ওরা গাড়ীতে গিয়ে বসলো, সানিনের মনে হলো ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলো সে, সেই সঙ্গে লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলো। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ এ যে নেহাত লোকহাসানো ছেলে খেলা, গতানুগতিক রীতিঅনুসারে দুপক্ষের হাস্যকর পরিস্থিতিতে হাস্যকর আচরণ। সেই গোবেচারা চেহারার ডাক্তারটি তো নাক সিঁটকে হেসেই ফেলেছিলো যখন দেখলো ব্যারণ ফন ডনহোফের সঙ্গে সে প্রায় গলাজড়াজড়ি করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর যখন তার পাওনা চার চেরভনৎসি পা'টালেওন তাকে মিটিয়ে দিচ্ছিলো··· সবকিছুই বড় অপ্রীতিকর?

সানিন সত্যিসত্যিই খানিকটা লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করছিলো। কিন্তু এ ছাড়া আর কিই বা করা যেতো? সে কিছুতেই এই তরুণ অফিসারটিকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারতো না হের ক্লুবারের অনুকরণে। সবই সত্য, তবু তার মন গ্লানি ও অনুতাপে ভরে গেলো।

পা'টালেওন বিজয়গর্বে মেতেছিলো, বিজয়ী সেনাপতি রণক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় এর চেয়ে বেশী আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করতেন না। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে সানিনের ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছিলো। ডন জুয়ানের কমাণ্ডারের পাথরের বা ব্রোঞ্জের মূর্তির মত বীরোচিত সম্মানলাভের যোগ্য সানিন—সে স্বীকার করলো—নিজে অবশ্য ভয়ে বা উত্তেজনায় কাঁপছিলো।

'কিন্তু আমি হচ্ছি শিল্পী, আমার স্নায়ু দুর্বল। আর আপনি হচ্ছেন তুষার আর গ্রানাইট পর্বতের পুত্র।'

কি করে যে এই উদ্দীপিত শিল্পীটিকে শান্ত করবে সানিন ভেবে পাচ্ছিলো না। দুঘণ্টা পূর্বে তারা যেখানে এমিলকে দেখতে পেয়েছিলো, প্রায় সেখান থেকেই আনন্দে চিৎকার করে একটা গাছের পেছন থেকে এমিল বেরিয়ে এলো। টুপি নাড়িয়ে, লাফিয়ে চলন্ত গাড়ীতে উঠে সানিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'আপনি অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন। আমাকে ক্ষমা করতে হবে, আমি আপনার কথা শুনে ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে যাইনি। যেতে পারি নি। এখানেই অপেক্ষা করছিলাম। সব কিছু খুলে বলুন। তাকে কি··হত্যা করেছেন?'

অতি কষ্টে সানিন এমিলকে চুপ করিয়ে পাশে বসালো। পা'টালেওন সানন্দে সবিস্তারে ও সাড়ম্বরে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিটি খবর দিলো, ব্রোঞ্জ মূর্তি কমাণ্ডারের কথাটিও বাদ গেল না। দু'পা ফাঁক

করে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডার সানিনের পাঠ অভিনয় করলো। এমিল মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলো, মাঝে মাঝে আনন্দে চিৎকার করে উঠছিলো, মাঝে মাঝে নির্ভীক বন্ধুটিকে চুমু খাচ্ছিলো।

গাড়ী দেখতে দেখতে ফ্রাঙ্কফোর্টে এসে সানিনের হোটেলের সামনে দাঁড়ালো।

যখন সে তার দুজন সঙ্গীর সঙ্গে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলো, একটি ভদ্রমহিলা—ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢাকা ছিলো—অন্ধকার বারান্দা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সানিনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায় দ্রুত-পায়ে নেমে গেলেন। ওয়েটার ওর কাণ্ড দেখে অবাক, আশ্চর্য্য হয়ে বললো, 'এই মহিলা বিদেশী ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করবেন বলে একঘণ্টার উপর বসেছিলেন।' চকিতের জন্য ওকে দেখলেও তখনই চিনতে পেরেছিলো সানিন জেম্মাকে। তার রেশমের বাদামী ওড়নার ভেতরে সানিন তার চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিলো।

বিরক্তির স্বরে জার্মানে বললো, 'তাহলে ফ্রয়লাইন জেম্মা সবই শুনেছেন?' এমিল ও পান্টালেওন তার পেছনে ছিলো। আরক্ত মুখে ও অপ্রতিভ হয়ে এমিল থেমে থেমে বললো 'কি করব, আমাকে সবই বলতে হলো। সে বুঝতে পেরেছিলো—কিছুই লুকোতে পারি নি—যাই হোক, তাতে—এখন আর কি আসে যায়!' এবারে উৎসাহের সঙ্গে বললো 'চমৎকার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, আর সে আপনাকে অক্ষত ও সুস্থ দেখে গেছে।'

অসন্তুষ্ট হয়ে সানিন মুখ ফিরিয়ে নিলো, বললো 'কি বাচাল তোমরা দুজন!' নিজের ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

এমিল আব্দারের সুরে বললো, 'আমার উপর রাগ করবেন না।'

সানিন কিন্তু সত্যি ওর উপর রাগ করেনি। সে কি সত্যিই অন্তর থেকে চাইছিলো জেম্মা এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানবে না? 'আচ্ছা রাগ আমি করছি না। কিন্তু যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা দেখানো হয়েছে আমাকে আর নয়। তোমরা গেলে এবারে একটু ঘুমোতে পারি। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে!'

পান্টালেওন বললো, 'হ্যাঁ, সত্যিই বিশ্রামের প্রয়োজন আপনার। মহাপ্রাণ সিনোর, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে আপনার, চলে এসো এমিল, পা টিপে-টিপে—আস্তে।'

সঙ্গী দু'জনের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সানিন ঘুমের কথা পেড়েছিলো। কিন্তু এবারে একা হতেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভীষণ ব্যথা হয়েছে বুঝতে পারলো। কাল রাতে একটুও ঘুম হয়নি তার—বিছানায় শুতেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলো সে।

২৩

কয়েক ঘণ্টা সে অকাতরে ঘুমালো। স্বপ্ন দেখছিলো আরেকটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমেছে সে এবারে প্রতিপক্ষ হের ক্লুযবার। পাশে দেবদারু গাছের ডালে একটা টিয়েপাখী বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছিলো এক, দুই, তিন···তিন···তিন-তিন। এই টিয়েপাখীটি ছিলো পান্টালেওন।

তারপর তিন-তিন আওয়াজটা এত স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে আর স্বপ্ন বলে ভুল করা যায় না। চোখ খুলে, বালিশ থেকে মাথা তুলে শুনলো কে দরজায় টোকা মারছে।

'ভেতরে এসো!'

ওয়েটার ভেতরে এসে বললো একজন ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

জেম্মা হয়ত—তার মনে উদয় হলো, কিন্তু দেখা গেলো, মহিলাটি জেম্মার মা—ফ্রাউ লেনোর।

ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

তার পাশে বসে সানিন তার হাত ধরে বললো, 'কি হয়েছে, মেডেম রসেলী, কি ব্যাপার? শান্ত হোন আপনি!'

'হের দিমিত্রি, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমি!'

'কিসের কষ্ট, কি হয়েছে?'

'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। কি করে জানবো বলুন!' জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিলো তাঁর।

'কিন্তু হয়েছে কি? বলুন আমাকে। এক গ্লাস জল খাবেন?'

রুমাল বের করে এবারে ফ্রাউ লেনোর চোখ মুছলেন। আরো জোরে কাঁদতে সুরু করলেন।

'আপনাকে ধন্যবাদ, জল চাইনে। আমি জানতে পেরেছি সব।'

'সব? কি সব জানতে পেরেছেন?'

'আজ যা ঘটেছে। তার কারণ সব কিছুই জেনেছি। আপনি অতি উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কি কাণ্ড ভেবে দেখুন। এবারে বুঝতে পারছি সোডেনে যেতে কেন আপত্তি করেছিলেন অবশ্য বেড়াতে যাওয়ার দিন এ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি তিনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি সব কিছু পূর্ব্বাহ্নেই জানতেন। আমি আপনার কাছে এসেছি, জানি আপনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যদিও আপনাকে মাত্র পাঁচ দিন জেনেছি। কিন্তু দেখুন আমি বিধবা। নিঃসহায় আমার মেয়ে'···

চোখের জলে ফ্রাউ লেনোরের কথা আটকে যাচ্ছিলো। সানিন বুঝতেই পারছিলো না কি হয়েছে। সে শুধু বললো 'আপনার মেয়ে?'

ফ্রাউ লেনোরের অশ্রুসিক্ত রুমালের পেছন থেকে আর্তনাদের মত শোনা গেলো, 'আমার মেয়ে জেম্মা···আমাকে বলেছে সে হের ক্লুযবারকে বিয়ে করবে না। আর এ সংবাদটা হের ক্লুযবারের কাছে আমাকেই দিতে হবে।'

সানিন চমকে উঠলো এতটা সে আশা করেনি।

ফ্রাউ লেনোর বলে চললেন, 'কেলেঙ্কারির কথা ছেড়ে দিন, যদিও কে কবে শুনেছে একটি তরুণী তার প্রেমিককে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু হের দিমিত্রি, জানেন এতে আমাদের সর্বনাশ হবে।' ফ্রাউ লেনোর তার রুমালটি মোচড়াতে লাগলেন যেন তার সমস্ত দুঃখ এই রুমালের পাটে পাটে পূর্ণ করে দিতে পারলে খুসী হতেন। 'হের দিমিত্রি, আমাদের দোকানের আয় থেকে আমাদের আর চলে না। হের ক্লুযবার সঙ্গতিপন্ন, যতদিন যাবে আরো সঙ্গতি বাড়বে তার। কেন তাকে বিমুখ করবে? সে তার ভাবী পত্নীর হয়ে লড়েনি, কেবলমাত্র সেজন্য! স্বীকার করছি, এটা তার খুব উচিত কাজ হয়নি। কিন্তু সে একজন নাগরিক মাত্র, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা নেই, কিন্তু একজন অচেনা সামান্য অফিসারের অবিমৃশ্যকারিতার বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া কি তার মত মর্য্যাদাশীল ব্যবসায়ীর শোভা পায়? আর এ কি অমার্জনীয় অপরাধ?'

'মাপ করবেন, ফ্রাউ লেনোর—মনে হচ্ছে আপনি আমাকে এজন্য দায়ী করছেন'—

'আপনাকে কিছুর জন্যই দায়ী করছিনা। আপনার কথা ওঠেই না। সব রাশিয়ানদের মতই আপনি সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত—

'মাপ করবেন—আমি তা নই—'

'আপনি বিদেশী, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন মাত্র, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমি'—ফ্রাউ লেনোর সানিনের কথা যেন শুনতেই পেলেন না। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে হাঁপাতে লাগলেন, রুমাল ভাঁজ করে নাক ঝাড়লেন। তাঁর দুঃখ প্রকাশের ধরণ দেখে যে কেউ বুঝতে পারতো উত্তর ইউরোপের আকাশতলে তাঁর জন্ম হয়নি।

'আর যদি ক্রেতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় তবে কি করে তার ব্যবসা চলবে? কে কোথায় এমন কথা শুনেছে? আমি তাকে কি করে বলবো জেম্মার সঙ্গে তার বিয়ে হবে না? কি খেয়ে বাঁচব আমরা? আগে বাদাম দিয়ে অ্যাঞ্জেল কেক ও নোগাত আমরাই শুধু বানাতাম, তার জন্য খুব বিক্রী হতো আমাদের দোকানে। এখন সবাই অ্যাঞ্জেল কেক বানায়। এ ছাড়াও ভেবে দেখুন আপনার দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা সারা সহরে সবাই বলাবলি করবে, চাপা দেওয়া যাবে না। আর হঠাৎ বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে! এ যে কেলেঙ্কারির একশেষ। জেম্মা খুব ভাল মেয়ে, আমাকে খুব ভালোবাসে—কিন্তু সে জেদী ও সাধারণতন্ত্রী জনমতকে ভয় করে না। একমাত্র আপনিই এর মীমাংসা করতে পারেন।'

আরো বেশী আশ্চর্য্য হয়ে সানিন বলল, 'আমি? ফ্রাউ লেনোর?'

'হ্যাঁ, আপনি, একমাত্র আপনিই। সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি। এর চেয়ে ভাল সমাধান আর আমি ভেবে পেলাম না। আপনি বিবেচক ও মহৎ। ওর জন্যেই লড়েছেন আপনি। আপনাকে সে বিশ্বাস করে। আপনার ওপর আস্থা রাখতে বাধ্য সে—তার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করেছিলেন। আপনিই একমাত্র তাকে বোঝাতে পারবেন—আমার যতদূর সাধ্য আমি করেছি—সে নিজের ও আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন—আমি হাঁটু গেড়ে আপনাকে মিনতি করছি'—এই বলে ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—মনে হলো এখনই সানিনের পায়ে লুটিয়ে পড়বেন। সানিন বাধা দিলো তাঁকে—'ফ্রাউ লেনোর, ভগবানের দোহাই! কি করছেন আপনি?'

ব্যাকুল হয়ে তিনি তার হাত দু'টি ধরে বললেন—'প্রতিজ্ঞা করুন—'

'ভেবে দেখুন, ফ্রাউ লেনোর, আমি কি করে…?'

'প্রতিজ্ঞা করুন। আপনি কি চান এই মুহূর্তে আমি আপনার পদতলে প্রাণত্যাগ করব?'

কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সানিন। ইটালীয়ান প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এর আগে তার হয়নি। বললো—'আপনি যা বলবেন তাই করব আমি। ফ্রয়লাইন জেম্মাকে বলবো আমি—'

ফ্রাউ লেনোর আনন্দধ্বনি করলেন।

'কিন্তু সত্যি বলছি আমি জানিনা—তাতে কোন ফল হবে কি না।'

ফ্রাউ লেনোর উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'আমাকে নিরাশ করবেন না। একবার কথা দিয়েছেন। খুব কাজ হবে তাতে, আমি জানি। আমার যতদূর সাধ্য আমি করেছি, সে অন্ততঃ আমার কথা আর শুনবে না।'

একটু পরে সানিন জিজ্ঞেস করলো, 'সে হের ক্লুয়বারকে বিয়ে করবে না—এ কথা নিশ্চয় করে বলেছে আপনাকে?'

'সে একেবারে অস্বীকার করেছে। সে ঠিক তার বাবা জিয়োভান বাটিষ্টার মত রগচটা।'

সানিন আস্তে আস্তে বলল, 'রগচটা! জেম্মা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তাহলেও খুব ভালো সে। আপনার কথা শুনবে। আসবেন আপনি এখনই? হে আমার প্রিয় রাশিয়ান বন্ধু!'

উত্তেজিত হয়ে ফ্রাউ লেনোর চেয়ার ছেড়ে উঠে সানিনের গলা জড়িয়ে ধরলেন—'একটি বিপন্না জননীর আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। এক গ্লাস জল দিন আমায়।'

সানিন একগ্লাস জল এনে দিলো, কথা দিলো এখনই আসবে বলে, ফ্রাউ লেনোরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। ঘরে ফিরে এসে বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইল সামনের দিকে।

নিজের মনেই বলল—সব কিছু যেন প্রতিশোধ নিতে চলেছে—মাথা ঘুরে যাচ্ছে। সে তার অন্তরের দিকে পর্যন্ত নজর দিল না, জানতে চাইল না কি হচ্ছে সেখানে। শুধু বুঝতে পারছিল বিপর্যয় ঘটে গেছে। আত্মগতভাবে বলল—কি দিনটাই গেছে আজ—রগচটা! সে? তার নিজের মাই তো বললেন—আর এখন আমাকে গিয়ে উপদেশ দিতে হবে—তাকে—কি চমৎকার উপদেশই দিতে হবে আমাকে—?

সানিনের মাথা ঝিমঝিম করছিল। সব অনুভূতি, সব চিন্তা, সব বোধশক্তি ছাড়িয়ে জেম্মার ছবি ভেসে উঠলো। সেই যেদিন বিদ্যুতালোকে সন্ধ্যায়, তারায়ভরা আকাশের নীচে অন্ধকার জানলায় পেছনে জেম্মা দাঁড়িয়েছিল সে ছবি চিরতরে তার মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

২৪

অনিশ্চিত পা ফেলে সানিন মেডেম রসেলীর বাড়ী এলো। তার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে পারছিল সে, এমন কি শুনতে পাচ্ছিল পর্যন্ত। জেম্মাকে কি বলবে সে? কি করে কথাটা শুরু করবে? দোকানের ভেতর দিয়ে বাড়ী ঢুকলো না সে, ঢুকলো পেছনের দরজা দিয়ে। বাইরের ছোট ঘরটিতে ফ্রাউ লেনোরের সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখে যুগপৎ আশায় ও আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি।

চুপি চুপি বললেন তার হাত দুটো হাতে নিয়ে 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বাগানে যান, সে বাগানে আছে। মনে রাখবেন আপনার ওপর ভরসা করে আছি।'

সানিন বাগানে গেল।

জেম্মা বাগানের পায়ে-চলা রাস্তার পাশে বেঞ্চিতে বসে একটা বড় ঝুড়ি থেকে খুব পাকা চেরী বেছে বেছে একটা প্লেটে রাখছিল। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে প্রায় সাতটা বাজে মেডেম রসেলীর ছোট বাগানে তেরছা হয়ে অস্তসূর্যের লাল রশ্মি পড়ে সব রাঙিয়ে

দেখাচ্ছিল। পাতাগুলো থেকে শনশন আওয়াজ আসছিল, মৌমাছিরা শেষ বারের মত ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছিল পাখার আওয়াজ তুলে, একটা ঘুঘু অবিশ্রান্ত একঘেয়ে ডেকে চলেছিল।

সোন্ডেনে যাওয়ার দিনের মত জেম্মা সেই বড় টুপিটি পরেছিল। টুপিটির নিচে থেকে এক ঝলক সানিনকে দেখে নিয়ে সে আবার ঝড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল।

সানিন আস্তে আস্তে জেম্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অজানতেই তার পদক্ষেপ ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছিলো। তারপর ···কি বলবে সে—কোনরকমে এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারল— 'কেন সে চেরী বাছছে!'

উত্তর দিতে জেম্মার একটু দেরী হল। অবশেষে ধীরে ধীরে বলল, 'ওইগুলো—যেগুলো সবচেয়ে পাকা—ওগুলো দিয়ে জ্যাম তৈরী হবে—এইগুলো দিয়ে হবে টার্ট। জানেন তো আমরা চিনি দেওয়া গোল টার্ট বিক্রী করি।'

এই বলে জেম্মার মাথা আরো নীচু হয়ে গেল। তার ডান হাতে দু'আঙুলে এক জোড়া চেরী ধরেছিল, ধরাই রয়ে গেল।

'আপনার পাশে বসতে পারি?'

একটু সরে বসে জেম্মা বলল—'বসুন।'

সানিন বসে পড়ে ভাবতে লাগল কি করে কথাটা আরম্ভ করি? কিন্তু জেম্মাই তাকে সাহায্য করল।

তার আরক্তিম অনুপম মুখখানা ফিরিয়ে ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলল, 'আজ আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিলেন। কি শান্ত ও ধীর আপনি। মনে হয় বিপদ কাকে বলে আপনি জানেন না।' কৃতজ্ঞতায় তার দুচোখ জলে ভরে এল।

'ছেড়ে দিন ওসব কথা। বিপজ্জনক কিছুই ছিল না। অত্যন্ত নির্দোষ ভাবেই সব মিটে গেছে।'

জেম্মা ইটালীয়ান ভঙ্গীতে একটা আঙুল ডান দিক থেকে বাঁদিকে নাড়াল। 'না, না, এরকম বলবেন না। আমাকে ঠকাতে পারবেন না। পান্টালেওন আমাকে সব বলেছে।'

'আর আপনি তাকে বিশ্বাস করেছেন। কমাণ্ডারের মূর্ত্তির সঙ্গে আমার তুলনা করে নি সে?'

'তার হাস্যকর উপমা ও বাক্যবিন্যাসের কথা ছেড়েই দিন। কিন্তু সে নিজে যা অনুভব করেছে যা আপনি যা আজ করেছেন তার মধ্যে হাসির কিছু নেই। আর শুধু আমার জন্য—কেবল মাত্র আমারই জন্য, আমি জীবনে কখনো ভুলব না।'

'ফ্রয়লাইন জেম্মা—আমি নিশ্চয় করে বলছি'—আরো জোরের সঙ্গে বলল সে, 'কখনও ভুলতে পারব না।' স্থির দৃষ্টিতে আবার সানিনের দিকে চেয়ে ঘুরে বসল।

এখন সানিন তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের গড়ন দেখতে পাচ্ছিল। তার মনে হল এরকমটি আর কখনো দেখেনি। সেই মুহূর্তে তার মনে যে ভাবের উদয় হল, সে কখনো এর আগে তা অনুভব করেনি। তার সারা অন্তর প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

'আর আমার প্রতিজ্ঞা' বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তার মনে এল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সে শুরু করল আমার—'ফ্রয়লাইন জেম্মা।'

'বলুন'

তার দিকে না চেয়ে সে পাকা চেরীগুলো বেছে বেতে লাগল, সাবধানে বোঁটা ধরে পাতাগুলো থেকে চেরী ছিঁড়তে লাগল। কিন্তু কি স্নিগ্ধ কি স্নেহসিক্ত স্বরে বলল 'বলুন।'

'আপনার মা আপনাকে কিছু বলেছেন'···

'কি সম্বন্ধে?'

'আমার সম্বন্ধে?'

বাছা চেরীগুলো হঠাৎ জেম্মা ঝুড়িতে ঢেলে দিল।

'আপনার সঙ্গে মা কথা বলছিলেন?'

'হ্যাঁ'

'কি বলেছেন তিনি?'

'বলেছেন···আপনি হঠাৎ আপনার পূর্বের অভিপ্রায়···আপনার মত·· পরিবর্ত্তন করেছেন।'

জেম্মা আবার মাথা নত করল। টুপির তলায় তার মুখ হারিয়ে গেল। এখন শুধু তার নমনীয় কোমল গ্রীবা দেখা যাচ্ছিল একটা বড় ফুলের বোঁটার মত।

'কি অভিপ্রায়?'

'আপনার—ভবিষ্যত জীবন—সম্বন্ধে—'

'অর্থাৎ—আপনি কি হের ক্লুয়বারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মা বলেছেন আপনাকে যে আমি হের ক্লুয়বারের স্ত্রী হতে চাই না?'

'হ্যাঁ।'

জেম্মা বেঞ্চিতে সরে বসল। ঝুড়িটা কাত হয়ে পড়ে গেল। কয়েকটা চেরী রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। এক মিনিট কেটে গেল—আর এক মিনিট।

এবারে জেম্মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মা কেন আপনাকে এ সব বলেছেন?'

সানিন জেম্মার গ্রীবা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অস্বাভাবিক জোরে তার বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছিল।

'কেন বলেছেন? আপনার মা মনে করেন যেহেতু অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, আমার উপরে আস্থা জন্মেছে আপনার—আপনাকে আমি উপদেশ দিলে শুনবেন আপনি।'

জেম্মা হাত দুটো আস্তে আস্তে কোলের উপর রাখল। তার জামার ভাঁজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খানিক পর বলল—'মঁশিয়ে দিমিত্রি আপনি আমাকে কি উপদেশ দেবেন?'

সানিন দেখতে পেল কোলের উপরে রাখা জেম্মার হাত দুটো কাঁপছে, বুঝতে পারল তাই লুকোবার জন্য সে জামার ভাঁজ ঠিক করতে ব্যস্ত। সে আস্তে আস্তে জেম্মার সেই কম্পমান, ফ্যাকাশে হাত দুটোর উপর নিজের হাত রাখল। বলল—'জেম্মা—আমার দিকে চেয়ে দেখবেন না?'

জেম্মা মাথা ঝাঁকিয়ে টুপিটা পিছনে করে দিল। আগের মতই কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসভরা দুচোখ দিয়ে তাকে চেয়ে দেখল। সানিন কি বলে শোনার জন্য জেম্মা অপেক্ষা করেছিল কিন্তু তার দৃষ্টিতে সানিনের সব ভুল হয়ে গেল। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি এসে

পড়েছিল তার কচি মুখটিতে, সূর্য-কিরণের চেয়েও উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট দেখাচ্ছিল তার মুখের ভাব।

একটুখানি হেসে, একটুখানি ভুরু তুলে সে বলল—'ম'শিয়ে দিমিত্রি, আমি আপনার উপদেশ শুনব। কি উপদেশ দিচ্ছেন আপনি?'

সানিন বলল—'উপদেশ? দেখুন আপনার মা মনে করেন সেদিন হের ক্লুবার বিশেষ সাহসের পরিচয় দেন নি বলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করা'···

জেম্মা আস্তে বলল, 'কেবল সেজন্য?' নিচু হয়ে ঝড়িটা তুলে বেঞ্চে নিজের পাশে রাখল।

—'তাতে দেখুন—অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে আপনার তাকে প্রত্যাখ্যান করা। তার আগে পরিণাম ভেবে দেখতে হবে, আপনার পরিবারের প্রতিটি প্রাণীর স্বার্থ এতে জড়িত।'

'এ সব তো মায়ের কথা। এ সবই তার মত। কিন্তু আপনার মত কি?'

'আমার মত?' সানিন চুপ হয়ে গেল। তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। 'আমিও মনে করি'···কোন রকমে এইটুকু বলল।

জেম্মা দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'আপনি? আপনিও?'

'হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি মনে করি'···আর কথা খুঁজে পেল না সানিন।

'ভালো, যদি আপনি বন্ধুরূপে আমার মত পরিবর্তন করতে উপদেশ দেন—অর্থাৎ পূর্বের মত পরিবর্তন না করতে বলেন তাহলে আমি ভেবে দেখব।' বাছা চেরীগুলো অন্য সব চেরীর সঙ্গে মিশিয়ে দিল সে, কি যে করছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না। 'মা আশা করেন আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। ভাল, হয়ত সত্যিই···'

'কিন্তু ফ্রয়লাইন জেম্মা, আপনার প্রত্যাখ্যানের কারণগুলো শুনতে পেলে খুশী হতাম···'

'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

ভুরু কুঁচকে সে নীচের ঠোঁটটি কামড়ে ধরল, গালে রক্তিম আভার জায়গায় ফ্যাকাশে দেখা দিল। 'আপনি আমার জন্য যা করেছেন তাতে আপনার কথা শুনতে আমি বাধ্য। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করব আমি। মাকে বলব—আবার ভেবে দেখব। ওই মা আসছেন।'

ফ্রাউ লেনোর বাগানের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি, শান্ত হয়ে বসতে পারছিলেন না। হিসেব করে দেখলেন জেম্মার সঙ্গে সানিনের এতক্ষণে নিশ্চয়ই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। যদিও মাত্র পনের মিনিট সানিন বাগানে এসেছিল।

যেন ভীষণ আতঙ্কে সানিন মিনতির সুরে বলল, 'না, না ভগবানের দোহাই, তাকে এখনই কিছু বলবেন না। অপেক্ষা করুন, আমি বলব আপনাকে, আমি লিখে জানাব। অন্ততঃ ততক্ষণ কোন কিছু স্থির করবেন না। দয়া করে অপেক্ষা করুন।'

জেম্মার হাতে একটু চাপ দিয়ে, বেঞ্চ ছেড়ে ফ্রাউ লেনোরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল—টুপি নেড়ে ও অস্পষ্ট কয়েকটি কথা বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিস্মিত ফ্রাউ লেনোর মেয়ের কাছে এলেন।

'জেম্মা—দয়া করে আমাকে বল।'

জেম্মা উঠে দাঁড়িয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। 'মা, তুমি একটু অপেক্ষা করতে পারবে? কাল পর্যন্ত পারবে? আর কালকের আগে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।'

জেম্মা নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে তার নিজের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। ফ্রাউ লেনোর আশ্চর্য হলেন জেম্মার মুখের ভাব দেখে—সেখানে বিষাদের ছায়াও ছিল না—খুসীতে ভরা ছিল তার চাহনি।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'কি হলো তোমার? তুমি তো কখনো কাঁদ না আর হঠাৎ—'

'মা এ কিছুই নয়। অপেক্ষা কর। আমরা দুজনেই অপেক্ষা করব। কালকের আগে কিছু জানতে চেয়ো না, চল, সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে চেরীগুলো বেছে ফেলি।'

'কিন্তু তুমি সব বিবেচনা করে দেখবে?'

জেম্মা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি বিবেচনা করে দেখব।' চেরীগুলো একত্র করতে লাগলো সে, তার চোখের জলে ভেজা মুখের সামনে ধরে দেখতে লাগল। অশ্রু তার গালে আপনিই শুকিয়ে গেল মুহূর্তে ভুলে গেল সে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিজন ভট্টাচার্য

৪

সত্যব্রতর সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি সতীর। স্বাভাবিক ভাবে কথাটা হয়তো মনেই পড়তো না তার। কিন্তু যে মানুষটা প্রায়ই আসে যায় বাড়ীতে, আলোচনার সূত্র ধরে নামটা যার যখন তখন উঠে পড়ছে এর-ওর কথায়, তাকে সবাই দেখছে সবাই চিনছে শুধু সতীর সঙ্গেই কার্য্য কারণ যাই হোক দেখা হচ্ছে না কিছুতেই, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগে সতীর কাছে। তাই এমনিতে যে ইচ্ছেটা হয়তো হতোই না স্বাভাবিক ভাবে, অস্বাভাবিক একটা পরিস্থিতিতে পড়ে সেইটেই এখন জিদ-এর মত হয়ে উঠল মনে মনে। যে কোন প্রকারে একটি বার যেন দেখাটা হওয়াই দরকার সত্যব্রতর সঙ্গে।

সেদিনও বিশ্বতোষের সঙ্গে বেড়িয়ে রাত করে বাড়ী ফিরল সতী। বাড়ী ফিরতে মা বললেন, ভদ্রলোকের ছেলেকে কথা দিস অথচ মনে রাখতে পারিস না। তোর জন্যে অপেক্ষা করে করে এই একটু আগে চলে গেল সত্যব্রত। বেশ হাসিখুশী আমুদে ছেলেটি। অত বছর যে কন্টিনেন্টে কাটিয়েছে হাবভাবে তার কিছু মাত্র বোঝবার উপায় নেই। তুই ছিলি না, অথচ আমার সঙ্গে বসে বসে সে কত গল্প! এতটুকু দেমাক নেই, অহংকার নেই। ও কে জানিস? ও হচ্ছে শ্রীরামপুরের হরপ্রসাদ গুপ্তর ভাগ্নে। পাঁচঘড়ার জমিদার বংশ ওরা। উনি সব খবর রাখেন। আরও বুঝতে পারবি সত্যব্রতর বোন চিত্রলেখার সঙ্গে শ্রীপতি নন্দীর একমাত্র ছেলে শ্রীপতির বিয়ে হয়েছে। মায়ের কথা অবাক হয়ে শোনে সতী। সবাই চেনাজানা, একান্ত পরিচিত লোক। সতী অবাক হয়ে বলে, শ্রীপতিদার সুন্দরী বৌ চিত্রলেখা তা হলে সত্যব্রত বাবুর আপন বোন? রাত করে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে এইসব খবর শুনলো সতী সেদিন। তারপর তার দিনসাতেক বাদে, ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়ে সখীস্থানীয়া ছোট মামী নন্দিতার কাছে শোনে সতী, চিত্রলেখার ননদ অন্নপূর্ণার সঙ্গে এই সবেমাত্র চলে গেল সত্যব্রত নেমন্তন্ন খেয়ে। কথাটা উঠল নেমন্তন্ন বাড়ীতে দেরীতে পাতা পড়বার প্রশ্ন নিয়ে। নন্দিতা বললো, অন্নপূর্ণার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পর ছোট মামার অনুরোধে সত্যব্রত প্রথমে সোপ্রানোতে একটা ইংরিজি গান গেয়ে শোনালো। তারপর অন্নপূর্ণা ধরাধরি করে বসিয়ে দিল পিয়ানোতে। বললে বিশ্বাস করবি না, আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পিয়ানো বাজিয়ে গেল সত্যব্রত একটানা, একবারটি হাত তুললো না। আর সে কি চমৎকার হাত। এক এক সময় ষ্ট্রোকের গুণে মনে হচ্ছিল যেন রবিশঙ্করের হাতে সেতার শুনছি। গান ভালবাসিস তুই শুনলে তোর খুব ভাল লাগতো।

এই রকম একবার না। পর পর কয়েকবার। সতী চলে গেছে, সত্যব্রত হয়তো ঠিক তার পরই এসে হাজির হয়েছে। অথবা সত্যব্রত চলে যেতেই সতী গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। দেখাটা কখনও হয়ে ওঠে নি কিছুতেই।

সেদিন ছিল বাবুবারার সঙ্গে শুভময়ের বিয়ের রাতের তারিখ। ছোট একটা ঘরোয়া উৎসব। বেশী লোককে নেমন্তন্ন করা হয় নি। অন্নদাবাবু আর কমল সন্ধ্যেরাত্তিরে এসেই আশীর্ব্বাদ করে গেছেন। ছোটমামী নন্দিতার সঙ্গে সতীর যেতে যেতে হয়েছে রাত সাতটা কি বড়জোর সাড়ে সাতটা। শুভময়ের বন্ধু সত্যব্রতর তখন কোন কারণেই উৎসব বাসর ছেড়ে চলে যাবার কথা নয়। কিন্তু সতী গিয়ে শোনে, সত্যব্রত এসেছিল ঠিকই বিকেল ছ'টা নাগাদ। এসেই ট্যাক্সীর লগেজ বক্স খুলে নিউ মার্কেটের সমস্ত গোলাপ ফুল উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছে। আর যাবার সময় বাবুবারাকে বলে গেছে, পরের বাসর সাজাতে সাজাতে নিজের বাসরের অকল্যাণ ডেকে আনছি—হঠাৎ একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে—এ বছরটা তুমি আর শুভময় দুজনে মিলে বাসর শয্যাটা সাজিয়ে নিও মনোমত করে, পারি তো রাত্তিরের দিকে একবার আসবো। অদিন অক্ষণে যে বন্ধু দিন রাত চব্বিশঘণ্টা শুভময়ের বাগান বাড়ীতে পড়ে থাকে সৌহার্দ্দ্যের দায়ে, শুভ দিনটিতে সন্ধ্যে না লাগতে লাগতেই আঁকপাঁক করে তার চলে যাবার কথা নয়। কিন্তু তবু বিকেল নাগাদ চলে গেছে সত্যব্রত। রাত করে অবিশ্যি একবার আসবে বলে গেছে কিন্তু তারও কোন নিশ্চয়তা কিছু নেই। সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যেই অবিশ্যি সতীর আজ এখানে আসা নয় কিন্তু এই সাক্ষাৎকার তো হলেও হতে পারতো। হলো না।

মনঃক্ষুণ্ণ হয় সতী। অকারণে কারণ টেনে বার করে। অনর্থক হেতুবাদ এনে সংশয়াপন্ন করে মন। দেখা হবার কথা না থাকলেও ভাবে একটা কথা ছিল যেন এই সাক্ষাৎকারের। খারাপ হয়ে যায় মনটা। অথচ এ সম্পর্কে একটি মাত্রার বেশী কৌতূহল প্রকাশ করাও মনে হয় যেন অশোভন হবে। অন্ততঃ সতী যদি প্রকাশ করে সেই কৌতূহল তো লাগবেই চোখে। বাবুবারা কি নন্দিতা

করলে সে সব কথা মনে হবে না। কেন না সবাই জানে, ওরা ভীষণ উচ্চকিত। একটা কিছু মনে হলে তা নিয়ে বড্ড বেশী হৈ-চৈ করে। কিন্তু সতী সে চরিত্রের নয়। সতী চাকাচাপা, সসম্ভ্রম, সংযত। তাই কোন আধিক্যই শোভা পাবে না তাকে। সতীর ক্ষেত্রে সে কৌতূহলের মানে অন্তরকম হয়ে দাঁড়াবে। মন দেওয়া থোওয়ার কথা উঠে পড়বে। হঠাৎ যদি কেউ মন্তব্য করে বসে, ভালবাসে তাই, তা হলেও কিছু বিচিত্র হবে না। আর একবার এই কথা এক জনের মনে হলে অন্য পাঁচ জনের মনেও সেই কথা বিজকুড়ি কাটবে। এক জনের মনের কথা তখন পাঁচ জনে ছড়াবে। তারপর সব মন মৌন নয়। কেউ কেউ সেই কথা তখন প্রকাশও করবে। তখন কথার পাখাও নিশ্চিত গজাবে। এক কথা তখন সাত কথা হয়ে বেলঘরে থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত উড়ে বেড়াবে। অন্নদাবাবু শুনবেন, বিশ্বতোষ জানবে, নন্দিতার দাদা অতীনদা-ই বা কথাটা কি ভাবে নেবেন, বোঝা যাবে না। অকারণ হাজারটা ঝামেলা চাজারটা বখেড়া হবে। সুতরাং কোন কৌতূহলই প্রকাশ করা সম্ভব নয় সতীর পক্ষে। অনেককিছু ভেবে চুপ করে থাকে সতী। চুপ করে থাকে আর নিজের মনেই নাড়াচাড়া করে কথাটা। ঘুরে বেড়ায় খানিকটা আনমনা হয়ে, একা একা। সঙ্গীসাথী ছাড়া নিঃসঙ্গতাটাই যেন ভাল লাগে বেশী। নিভৃত নিরালায় নিজের সত্তাটাকে দুখানা করে ভেঙে মুখোমুখি খানিকক্ষণ গল্প করা যায়। সত্যব্রতর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে দেখাশোনা হলে হয় তো এ সব কোন প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু সাক্ষাৎ না হয়েই এই জ্বালা হয়েছে সতীর। প্রশ্নটাও উঠেছে তারই সূত্র ধরে। ফুল পাতা কাণ্ড কিছুই নেই-এ গাছের, অথচ শিকড় চলে গেছে যেন মাটির গভীরে।

রাত ন'টা অবধি অপেক্ষা করল সতী নানা অছিলায়। কিন্তু সত্যব্রতর সঙ্গে যে দেখা হবে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শুনেছিল, ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে সত্যব্রত। আনন্দ অনুষ্ঠানের মাঝখানে তাই কথাচ্ছলে খাপখাইয়ে বারবারাকে বলেছিল কথাটা সতী। বলেছিল, সত্যব্রতবাবু থাকলে বেশ পিয়ানো শোনা যেতো। উত্তরে বারবারা একবার বলেওছিল সতীকে সেদিনকার মত থেকে যেতে রাত্তিরটা। বলেছিল, তুমি থেকে যাও আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি মাকে। কথা যখন দিয়েছে আসবে তখন—দেখবে সত্যব্রত ঠিক আসবে। বেশ পিয়ানো শোনা যাবে রাত্তে। বারবারার প্রস্তাবটা ভাল লাগলেও ঠিক সায় দিতে পারে না সতী। এক যাত্রায় পৃথক ফল, এসেছে নন্দিতার সঙ্গে, কথা আছে ছোটমামার গাড়ীতেই ফিরে যাবে বাড়ী, কেমন কেমন দেখাবে যেন। তা ছাড়া বেলঘরের বাগানবাড়ীতে সত্যব্রতর পিয়ানো শোনবার জন্য রাত কাটানো, কিছু মনে না করলেও মা কমলকামিনী ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবেন না। আর কথাটা শুনলেই ছোটমামী নন্দিতা এমনি চোখ করে তাকাবে যেন বোঝাতে চাইবে শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়েই সতী বাবা মা'র সঙ্গে না এসে তার গাড়ীতে এসেছে। সত্যব্রত যে প্রথমটা থাকবে না বিকেল নাগাদ ফুল দিয়ে গিয়ে ঘুরে আসবে অনেক রাত্তিরে, আর সতীও যে ফেরবার সময় বারবারার ওখানে থেকে যেতে চাইবে, এসবই আগে থেকে ঠিকঠাক করা, সাজানো-গোছানো ব্যাপার। সাতপাঁচ ভেবে ইচ্ছে থাকলেও রাজী হয় না সতী। তবে নন্দিতার ছেলের ভাতে সত্যব্রত যে পিয়ানো বাজিয়েছিল, তার প্রশংসা সতী এমন উচ্ছ্বসিতভাবে করে গেল বারবারার কাছে যে সত্যব্রত তার আংশিক রিপোর্ট শুনলেও পরের দিনই যে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, সে সম্বন্ধে তার কোন সংশয় রইল না।

রাত ন'টা নাগাদ মনোহরপুকুরের বাড়ীতে ফিরে গেল সতী। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে নিজের বুদ্ধিকে নিজেই তারিফ করতে লাগলো এই কথা বলে যে রাত করে বেলঘরে বাগানবাড়ীতে ফিরে গেলেই সত্যব্রতর গুণগ্রাহী বারবারা নিশ্চিতভাবে তার কানে সতীর সপ্রশংস মন্তব্যগুলো তুলে তুলে দেবে, আর তার পরের দিনই সত্যব্রত সেই কথা শুনে নিশ্চিত ভাবে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। হারজিতের প্রশ্ন কিছু নেই। তবু নিজের গলায় নিজের হাতেই জয়মালা পরিয়ে বিজয়িনী হয় সতী।

রাতের প্রসাধন শেষ করে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে খোলাচুল অনেকক্ষণ ধরে চিরুণী দিয়ে ঠেলে ঠেলে পিছনে দেয় সতী। আকাশে চাঁদ নেই, তাই আলো-ছায়ার খেলা নেই আজ। ছাতের আলসে ত্রিকোণ হয়ে ভেঙে পড়েনি লনএ। রাস্তার ইলেকট্রিক পোষ্ট আর গাছের ঝোপের ফাঁকে দৈবাৎ যদি লক্ষ্মীপেঁচা আসে তো আর সাদা ডানা দেখা যাবে না আজ। অস্পষ্ট একটু দেখা না গেলে আজে বাজে কতকগুলো কথার নক্সাও কানে শুনতে ভাল লাগবে না। কান পেতে থাকলেও বোবা রাত আর কথা কইবে না আজ। অপেক্ষা করে করে শুয়ে পড়ে সতী।

শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুম আসে না। যে জয়মাল্য সে একটু আগেই নিজের হাতে গলায় পরেছে, সেই মালাই এখন সে টেনে টেনে ছেঁড়ে। ভেবেছিল সত্যব্রত ছুটে এলেই জয় হবে তার। কিন্তু এখন সে দেখছে সে হিসেব তার সম্পূর্ণ ভুল। বারবারার মুখে দুটো চাটু কথা শুনেই যদি ছুটে আসে সত্যব্রত হ্যাংলার মত তার কাছে, তো সে মানুষ তো প্রত্যাশা করে বসে থাকবার মত বিশিষ্ট হতে পারে না। তাই সতী চায় না সত্যব্রত এসে তার সঙ্গে কালই দেখা করুক। সত্যব্রত এলেই তার মনের চালচিত্তির ভেঙে যাবে। এলোমেলো কত কথাই যে কত ছাঁদে ভাবে মনে, সতী নিজেই তার খেই ধরতে পারে না। দিন গেছে এক উৎকণ্ঠায়। এখন সেই উৎকণ্ঠার যখন নিবৃত্তি হলো তখন এই নিবৃত্তিই হলো আর এক উৎকণ্ঠার কারণ। আশ্চর্য্য গতিবিধি সতীর মনের।

তবে তার উৎকণ্ঠা কার জন্তে? কিসের কারণে? সত্যব্রত তো নিমিত্তের ভাগীদার। তবে সে কি নিজেই নিজেকে পৃথক করে দুই সত্তায়? তারপর এক মুখ অন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে যাচাই করে মিললো কি না? এত এলোমেলো হয় কি করে?

সারা রাত ঘুম নেই চোখে। ঘরময় ঘুরে ঘুরে ছায়া ফেলে আর ছায়া দেখে সময় কাটে সতীর। নিজেরই ছায়া। তবু মনে হয় যেন আর কেউ, অন্য কোন জন আছে কোনখানে, এই ঘরের ভিতর।

৫

ব্রাণ্ড, কারপো, গ্রেট ইষ্টার্ণ হলেই হতো ভাল। কিন্তু মায়ের টাকার সুদের ওপরেই নির্ভর করে, মাস গেলে যখন সামান্য চার পাঁচ শ' টাকার জন্তে এটর্নী মুখার্জি ফার্মের মুখ চেয়ে থাকা, তখন রাজার-চাল আর আসবে কোত্থেকে।

বাপের প্রথম চোটে শ্রীরামপুর মামাবাড়ী থেকে বেরিয়ে সত্যব্রত প্রথম মাস দুয়েক রইল ব্রিষ্টল হোটেলে। কিন্তু তার পরেই ধার-দেনা, নেই নেই, বন্ধু বান্ধবও বিশেষ পাত্তা দেয় না, সত্যব্রত উঠল গিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি ছোট্ট একটা আর্মেনিয়ান হোটেলে। নাম রিফিউজ।

হোটেল কর্ত্রী হচ্ছেন জনৈকা আর্মেনিয়ান মহিলা। তাঁর নাম থেলমা। হাসি খুসী গিন্নিগিন্নী চেহারা। তিন মেয়ে নিয়ে হোটেলের চারতলায় থাকেন। তিনতলা দোতলায় সব বোর্ডার থাকে। ঘর-ঘর করে ভাড়া দেওয়া। লাগাও বাথ কিচেন'এর বন্দোবস্ত থাকায় চাকর নিয়ে রেঁধে বেড়ে খাবার সুবন্দোবস্ত আছে তা ছাড়াও আছে কমন কিচেন, টাকা ফেল খাকো খাও। দুংতোটি পর্য্যন্ত নাড়তে হবে না নিজের হাতে।

প্রশ্নটা আর্থিক অকুলানের। একখানা ঘর ভাড়া করে সত্যব্রত তাই একা থাকে। নিকুঞ্জ মাইতি পুরোনো চাকর। স্বর্ণলতিকা পাঠিয়েছেন ছেলের খাতিরে। সেইসব দেখাশোনা করে।

প্রথম কটা মাস বেশ কাটালো। বাবু চাকর নিকুঞ্জ মাইতি। যেমন বাইরে তেমন ভেতরে। ভোল ফিরিয়ে দেয় সংসারের ক' দিনের মধ্যেই। তোয়াজে থেকে আর ভালমন্দ জিনিষ খেয়ে শরীর ভাল হয়ে গেল সত্যব্রতর। সর্ব্বসাধারণের 'বিলাভেড মাসীমা' থেলমার-ও নজর আছে। গুড মর্নিং করে সত্যব্রতর ব্যক্তিগত কুশল নেওয়া তার প্রাত্যহিক কর্ম। নজর মাসীমার প্রত্যেকের ওপর। সকলের জন্যেই সমান দৃষ্টি। সকাল থেকে রাত অবধি দোতলা তিনতলা ঘুরে ঘুরে সবাইকে 'হোম কমফর্ট' দিয়ে বেড়ান। কাজে কর্মে মেজাজ বিগড়োলেও মুখের হাসি কক্ষনো মিলোয় না। থেলমার হোটেল তাই সব সময় ভরতি। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সিট খালি কথনও নেই।

কিন্তু সুপ্রসন্ন মাসীমা বোর্ডারদের বেলাতেই। অন্যদের সম্পর্কে কঠিন, কঠোর। নিজের স্বামীকে-ও থেলমা ছেড়ে কথা বলে না। স্পষ্টই বলে, আমার স্বামীটা একটা জানোয়ার। মেয়ে-মানুষের বদ দোষ না থাকলে কি হবে, যে লোক অত মদ খায় তার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখি না। 'জোনাথান'কে সে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। বেচাল করলে মারধরও করে। সসপ্যান তো তাই-ই সই। বেচারা জোনাথান।

স্বামীকে দেখতে পারে না কিন্তু মেয়েদের চোখে হারায় না থেলমা। নজর ছাড়া কখনও নয়। কোন মেয়ে আড় হলো চোখের তো চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একসা করবে থেলমা। যা কর, কর চোখের ওপর। আড়াল আবডালে যেতে পাবে না। সমাজের পুরুষদের উপর বিশ্বাস নেই থেলমার। একটু অসতর্ক হলে শুধু মেয়ের হাত ধরেই টান মারবে না। ছুঁচ হয়ে ঢুকে পরে ফাল হয়ে বেরুবে। কারবার নষ্ট করবে, ক্ষতি করবে ব্যবসার। তিন মেয়ের কোন মেয়ের তাই বিয়েও হয় নি এতদিন। বড় বড় মেয়ে। বয়েসকালে সব সুন্দরী হয়ে উঠেছে। বেটাছেলের গায়ে মা মাঁথলেও বেটাছেলেরা এসে গায়ে মাখে। অমান আর কি কুরুক্ষেত্র বেধে যায় সংসারে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে অনর্থ করে থেলমা শেষটায় বাপের দোষ দেয়। বলে, সব ঐ রক্ত। ঐ রক্তের মধ্যেই চক্রান্ত আছে। মেয়েদের আমার কোন দোষ নেই। মাথা খারাপের কারণ ঘটে এই একটা সময়। নইলে রিফিউজ, সত্যিই রিফিউজ। থেকে আরাম হোটেলটায়।

প্রথম কটা মাস বেশ গেল। চাকরী করবে না বিজনেস করবে সত্যব্রত। বিজনেসে পয়সা আছে। হাই সোসাইটীতে মেলামেশা করতে লাগলো। গীষ্পতিকে মধ্যস্থ করে দু'চারটে পার্টির কাছ থেকে মোটা হাতে কিছু-কামাইও করলো। স্বর্ণলতিকা জানলেন, কর্ম্মিতকর্মা হচ্ছে ছেলে। দায়ভার থেকে এবার মুক্ত হবেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সুরু হলো আবার খামখেয়ালী। প্রচুর মদ খেতে লাগলো আর রেসের মাঠে কপাল ঠুকে রাতারাতি ভাগ্য ফেরাতে গেল। যার টাকা নেই তার-চরিত্রও থাকতে নেই। নিকুঞ্জ দেখে, রাত তিনটে পর্য্যন্ত আলো নেভেনা ঘরে। জুয়োড়ীর আড্ডা তিন তাসের খেলা রোজই জমে ওঠে রাতে।

পয়সা চাই পয়সা নেই। নিকুঞ্জ মাইতি ধার দেনা করে এনে সংসার চালায়। মাইনের টাকা তো হাতেই পড়ে না। উপরন্তু সত্যব্রত এসে নিকুঞ্জর পিঠ চাপড়ে বলে, তোর আবার টাকার দরকার কিসের? আপাততঃ কিছু ধার দে। টাকা না থাকে তো হোটেলের দারোয়ানের ঠেঙে ধার কর। ইজ্জৎ রক্ষে হচ্ছে না।

নিকুঞ্জর মুখে কথা সরে না। অবস্থা বুঝে সে চলে যায় শ্রীরামপুর, স্বর্ণলতিকার কাছে। দেশে চাষাবাদের আকাল আর স্ত্রীর অসুখের কথা বলে গচ্ছিত টাকার—শত খানেক এনে তুলে দেয় সত্যব্রতর হাতে।

এক শ টাকা সামান্য টাকা এ বেলা আনলে ও বেলা নেই। দুদিন বাদেই ঘরে আলো জ্বলে না। হেঁসেল বন্ধ করে নিকুঞ্জ তখন ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর চানা চিবোয়। সত্যব্রত তখন বেলঘরের বাগান বাড়ীতে বারবারা কে বাংলা শেখায়—আর দুবেধে মত ডিনারটা সেরে নেয়। বেলা একটা নাগাদ মামাতো ভাই ঝণ্টুর ম্যাঙ্গো লেনের অফিসে ঢু মেরে লাঞ্চটা ম্যানেজ করে গ্রেট-ইষ্টার্ণেই। পয়সা নেই তো উচ্ছ্বাস আছে,—সত্যব্রত তখন সান্ধ্য-সাহিত্য চক্রে এলিয়টের 'হলো মেন' আর-বায়রনের 'সাইনারা' আবৃত্তি করে, মার্কিণ দুনিয়ার 'স্কাই-স্ক্র্যাপার' আর 'গ্যাজেট'এর নিন্দে করে বলে, প্রকৃতিমুখীন না হলে মরে যাবে মানুষ। বেলঘরের বাগান বাড়ীতে কখনও পিয়ানো বাজায় ঝড়ের বেগে। আবার গীষ্পতির অফিসে বসে বাতিল কামউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের পুনঃপ্রবর্ত্তন দাবী করে লেকচার দেয়। কলকাতার পৌরশাসন ব্যবস্থার গলতি দেখিয়ে 'প্ল্যানিং দি টাউন' শিরোনামা বিতর্কে খবরের কাগজে চিঠি বেরোয় না সত্যব্রতর, এমন সপ্তাহ কমই যায়। যারা সম্পর্কে আসে তারা বিভ্রান্ত হয়ে বলে দিকভ্রান্ত প্রতিভা। বান্দ গভর্ণমেণ্ট এদের সার্ভিস দেশের কোন কাজেই লাগাতে পারলো না। গীষ্পতিদের মহল জহুরী চেনে। তারা হেসে বলে, হামবাগ। শুভময় জানে, এ ঘোড়া কক্ষনো বাজী জিতবে না। বন্ধুত্বের দায় স্বীকার করে বলে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ লোকসান দিয়ে যায়।

হোটেল ভাড়া বাকি পড়েছে পাঁচ মাস। থেলমা মাসীমা আ ক'দিন হলো সত্যব্রতকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গৃহস্বামী বা ভৃত্য কারো কোন পাত্তা করা যাচ্ছে না। রাত্রে আফি পেতে

নিকুঞ্জকে বলিবা ধরা যায় সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা হয় না খেলমার। প্রশ্ন করলে নিকুঞ্জ বলে, সাতাব যাতার শিখা। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে করে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে খেলমা। জিনিষপত্র হয়ে যে খেলমা রাগ করে বাইরে টেনে ফেলে দেবে, সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে নিকুঞ্জ। সত্যব্রত চোরের মত ঢোকে হোটেলে রাত করে। আবার অন্ধকার থাকতে থাকতেই চোরের মত বেরিয়ে যায় পা টিপে।

একদিন হাতে হাতে ধরা পড়ল পলাতক। স্নানটা সেরেই ভোর বেলা বেরিয়ে যাচ্ছিল সত্যব্রত, পড়বি তো পড় সামনেই মাসীমা। সকাল বেলাই তারস্বরে চেঁচামিচি আরম্ভ করল: তাহ কি আমি ধর্মশালা খুলে বসেছি তোমার জন্যে? টাকা দিতে না পারো তো উঠে যাও এই মুহূর্তে। নয়তো আমি তোমায় পুলিসে দেবো।

হট্টগোল চেঁচামেচি। বোর্ডাররা সব ঘুম চোখে ছুটে এসে সালিশী করে একটা আপোষ-রফার চেষ্টা করে কিন্তু কে কার কথা শোনে? যেমন মাসীমা তেমনি সত্যব্রত। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে পশ্চাৎপদ নয়। মাসীমা লালবাজারে টেলিফোন করে তার দূর-সম্পর্কিত এক সার্জেন্ট ভাগ্নেকে ডেকে এনে সত্যব্রতকে পুলিসী হামলার ভয় দেখায়। তাই শুনে সত্যব্রতর মাথায়ও খুন চেপে যায়। ইজ্জতে ঘা লেগে সে দেখায় খেলমাকে বিলেতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। চুনোপুঁটি সার্জেন্ট ভাগ্নে তার কেশাগ্র স্পর্শ করবে কোন সাহসে? সার্জেন্ট ভাগ্নেটিও আবার তৈরী তেমনি মামা জোনাথানের ছাঁদে। অফ টাইমে মামীকে স্রেফ কোমরের বেল্ট দেখিয়ে ভাব জমিয়েছে মামাতো বোনের সঙ্গে। সত্যব্রতর কথার উত্তরে সে শুধু মিষ্টার মিষ্টার করে আর লম্বা কথায় খেলমাকে আশ্বস্ত করে রিপোর্ট লিখে নিয়ে যায়।

বেইজ্জতির একশেষ। উপায়ান্তর না দেখে নিকুঞ্জ টেলিফোনে খবর করে স্বর্ণলতিকাকে। কি বলতে কি বলে নিকুঞ্জ—স্বর্ণলতিকা বোঝেন সত্যব্রতকে লালবাজার থেকে গাড়ী ভরত্তি পুলিস এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

দুপুর বেলাও গোলমাল থামে নি। মাসীমা তখনও ভাগ্নেকে দিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করাচ্ছে আর সত্যব্রতর অস্থাবর মালপত্তর ক্রোক করবে বলে শাসাচ্ছে চীৎকার করে। সত্যব্রত হোটেলে নেই। সার্জেন্ট ভাগ্নে; ওদিকে ভাব জমিয়েছে মামাতো বোনদের সঙ্গে রিকিউজ-এর চারতলায়। মাসীমার বেতে কাটছে, আসতে কাটছে। অথচ মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে সাহস হচ্ছে না ভাগ্নেকে এই অবস্থায়। খেলমা শুধু চীৎকার করে আর মাঝে মাঝে তেড়ে তেড়ে যায় জোনাথানের ওপর। বুড়ো শুধু বসে বসে খাবে আর মজা দেখবে। আপৎকালেও যে দু পা এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াবে স্ত্রীর, এমন ভাগ্য খেলমা করে আসে নি।

জোনাথান বলে, why shout for nothing. Have peace.

গরম তেলে জল পড়ে জ্বলে ওঠে কড়াই। খেলমা চেঁচায়: Peace! You talk of peace?

খণ্ডপ্রলয় শেষ হতে না হতেই মহাপ্রলয় লেগে যায় চারতলার সিঁড়িতে। তিন মেয়ে আর সার্জেন্ট ভাগ্নে ছুটে এসে না ধরলে জোনাথানকে সেদিন নিশ্চিত ভাবে অপঘাত মৃত্যু হতো একেবারে উল্টে পড়ে যেতো রেলিং টপকে নীচে।

ইতিমধ্যে স্বর্ণ একবার ঘুরে গেছে হোটেলে। সত্যব্রতর সঙ্গে দেখা হয়নি। নিকুঞ্জর পিঠ চাপড়ে বলে গেছে, আবতাও মত কোন ভয় নেই। যাবার সময় মাসীমাকে ডেকে পরিস্থিতি স্পষ্ট করতে বারণ করে গেছে বিশেষ ভাবে। বলেছে, টাকার জন্যে কোন চিন্তা নেই। টাকার গ্যারান্টর সে নিজে। ঝকঝকে নতুন গাড়ীর গায়ে সে কথা নিশ্চিত ভাবেই লেখা ছিল খেলমার চোখে। তাছাড়া বাববাবাও দুপুর নাগাদ একবার টেলিফোনে খুব করে ধমকে দিয়েছে খেলমাকে। মাসীমা প্রথমটা টেলিফোনে চেঁচিয়ে উঠতেই ওপাশ থেকে বাববাবা এক করে ধমক,—আমি রিকিউজ'এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি কি? আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই সত্যব্রতর বাকি টাকার ব্যাপারটা নিয়ে।

কথাবার্তার ধরণধারণে কতকটা হাই-সোসাইটীর কোমর চোমরাদের পাল্লায় পড়ে যাওয়া গেছে বলে ধারণা হয়েছে মাসীমার। তারপর তিনটে নাগাদ এসেছেন স্বর্ণলতিকা, সঙ্গে চিত্রলেখা। মাসীমাকে ডেকে এক চেকে বক্রী টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন তিনি। নিকুঞ্জকে দিয়ে নিউ মার্কেট থেকে ঘি ময়দা চাল ডাল কিনিয়ে এনে ভাঁড়ার সাজিয়ে দিয়ে গেছেন নিজের হাতে। মাসীমার দু: স্বর্ণলতিকার সঙ্গে তিনি ঐ এক বক্রী টাকার কথা ছাড়া অন্য একটা কথাও বলতে পারেন নি। বলতে পারেন নি, তিনি সত্যই মাসীমার চোখে সত্যব্রতর সুবিধে-অসুবিধে দেখে থাকেন। বলতে পারেন নি দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল অপেক্ষা করে করে শেষবার সত্যব্রতকে তাড়া করা ভিন্ন তার আর কোন গতি ছিল না। কৃতকর্মের জন্য সত্যি অনুতাপ করেন মাসীমা। তারপর স্বর্ণলতিকা চলে গেলে মাসীমা পা টিপে টিপে সত্যব্রতর ঘরে গিয়ে নিজের হাতে ফুল রেখে আসে ফুলদানীতে। দুটো দুটো চারটে সুদৃশ্য অর্কিড ঝুলিয়ে দিয়ে আসে জানালায়। মেজের ওপরকার ছেঁড়া ম্যাটিং পাল্টে দিয়ে নতুন ম্যাটিং বিছিয়ে দেন সেইদিনই।

নিকুঞ্জ মজা দেখে আর মুখ টিপে টিপে হাসে। অল্পসল্প কথা বার্তার ফাঁকে সে ভাল করেই সমঝে দেয় খেলমাকে, যে অপ্রীতিকর এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে আজ যারা এলো আর গেল রিকিউজ হোটেলে, তাদের পদনখের এক কণা ধুলোবালি দিয়ে মাসীমার এই নগণ্য সরাইখানাটাকে সে তিনবার কিনে বেচতে পারে।

স্বর্ণলতিকার প্রশংসা আর ধরে না মাসীমার মুখে। খালি বলে She is all queen in elegance. একেবারে রাজরাণী মত। বারো শ' টাকার চেকের নীচে লম্বা সইটা সে দেখিয়ে বেড়া বোর্ডারদের।

বিকেল নাগাদ হোটেলে ফেরে সত্যব্রত। জামা জুতো খোলা ফাঁকে দু-চার কথায় সে সত্যব্রতকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলে। মেজাজ ভাল না থাকায় সব কথা ধৈর্য্য ধরে শোনবার তার মেজাজ থাকে না। বিশ্ব সংসারের ওপর তার অভিমান। আরাম চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে অপরের চোখে ধুলো দেয় সত্যব্রত। নিকুঞ্জকে বলে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা।

আগের দু-দিন খাওয়াই জোটেনি ভাল করে। স্বর্ণ র সঙ্গে

আজ ভরপেট লাঞ্চ'-এর পর গোটা দুয়েক বিয়ার খেয়ে শরীর ভেঙে ঘুম আসে সত্যব্রতর। ঘুমিয়ে পড়ে সত্যব্রত।

ঘুম ভাঙে অবেলায়। পার্ক স্ট্রীটের পশ্চিমের জানলা দিয়ে এক টুকরো লাল আলো চুরি করে ঢুকেছে সত্যব্রতর ঘরে। সত্যব্রত চোখ খুলেই দেখে সতী। সতী বসে আছে সামনের চেয়ারে, অস্তরাগের সবটুকু সোনা চোখে-মুখে মেখে।

আশ্চর্য হয় না সত্যব্রত। সবার সব কিছু হাত পেতে নিতে নিতে পাওয়াটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে সত্যব্রতর। চোখে মুখে তখনও ঘুমের আমেজ। বলে, আপনি? কতক্ষণ এসেছেন আপনি? সতীর জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে বসে বলে, কিছু মনে করবেন না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সতী বিব্রত হয়ে বলে, আমি আরও ভাবছিলাম··

: বিঘ্ন ঘটালেন ঘুমের, এই তো। মোটেই নয়। কারণ আপনি এসেছেন ঘুম পার করে। তা সে যা হোক, মাসিমা কোথায়? আপনি নিশ্চয়ই একা আসেননি।

: কেন? আসতে নেই বুঝি?

: না, থাকবে না কেন। তবে আসেন তো নি কোন দিন। তাই বলছিলাম··

: না, আমি একাই এসেছি।

সত্যব্রত আপন মনে হাসে। বলে, Morning shows the day—কথাটা জানলেন একেবারে ভুল।

সতী স্মিত হেসে চুপ করে শোনে সত্যব্রতর কথা।

খানিকটা আত্মগত হয়ে কথা বলে সত্যব্রত: আপনি আমার সকালটা আজ দেখেননি তাই।···Stormy, Cloudy, all thunder and lightning, কিন্তু বেলা চারটের পর থেকেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। All sun and sunshine—সবটা মিলিয়ে কি বলবো, একটা সিম্ফনি।

সিম্ফনিই শুনছে সতী। স্বপ্নের সঙ্গে ঝড়ো বাস্তবটাকে মিলিয়ে দেখছে সে সামনা সামনি। অপরিজ্ঞাত যা তা আছে অগোচরে। বিশ্বাস আছে, সে অগোচরও গোচর হবে একদিন। কিন্তু সেকথা মনে করে আজ আর বসে থাকবার সময় নেই সতীর।

সতী বলে, আসেননি কেন, এত দিন?

সত্যব্রতও কম অবাক হয় না সতীর কথায়। বলে: যাইনি, না? কেন যাইনি!

তারপর দুজনেই হেসে ফেলে একসঙ্গে। একটা নতুন সিম্ফনি।

৬

তারপর মুছে গেল আর সব কিছু,—চেনা জানা পরিচিত মুখ, লোকলজ্জা ভয়। টান টান মন দৃষ্টির নিরীখে রাখে ধ্রুব সত্য—এক লক্ষ্য স্থির। সতী জানে এক সত্যব্রত, সতী ভিন্ন সত্যব্রতর কেউ নেই আর।

ব্যাপারটা ঘটলো একটু তাড়াতাড়ি-ই। প্রিয়ার গালের একটা তিলের বিনিময়ে মুহূর্তে বিকিয়ে গেল সমরখন্দ, বোখারা।

অন্নদা বাবু ক্ষুণ্ণ হলেন। খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্বার্থকে এক ধর্মরাজ্য পাশে বাঁধবার স্বপ্ন বানচাল হয়ে গেল তাঁর।

তেমন সতীকে ডেকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কর্ণকুহর তখন বধির হয়ে গেছে সতীর। সত্যব্রত ভিন্ন অন্য কোন নাম তখন সে আর শুনতে পাচ্ছে না কানে।

অন্নদা বাবু বললেন, আমি চাই তুমি সুখী হও জীবনে। কিন্তু অলীক একটা স্বপ্নকে আশ্রয় করে যদি কোন সৌধ গড়ে তোল, ঝড় বাস্তবের ঝাপটায় সে ইমারৎ তো ফুঁ দিলে ভেঙে যাবে মা। হ্যাঁ, আমি আছি—তোমার অন্নদা। তেউড়ী ঠিক আগলে রাখবো দুর্দিনে সঙ্কটে বিপদে যতদিন আছি, ততদিন বুক দিয়ে রুখে দাঁড়াবো সব অঘটন। কিন্তু মা—অবিত্যকালের জন্যে তো আমি তোমার পাহারাদারী করতে পারবো না। আমারও বয়স হয়েছে, শক্তি কমে আসছে দিনের দিনে। ভারী হয়ে আসে অন্নদা বাবুর কণ্ঠস্বর।

অন্নদা বাবুর কথা মিথ্যে নয়। সতীকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর ভালবাসেন বলেই তাঁর এই উৎকণ্ঠা। কিন্তু সতী! সতী কি করবে? বৈষয়িক ভালমন্দের নিক্তির কাঁটায় প্রাণের সম্পদের দাম যাচাই করবে? সৌরভের কোন মূল্য নেই বলে বাতিল করে দেবে সমস্ত গোলাপ? পূর্ণ চাঁদ, সে তো সোনার হরিণ। সূর্য্য সত্যি, মিথ্যে চাঁদ। কিন্তু চন্দ্রমার নিজের কোন আলো নেই বলে কি মিথ্যে হয়ে যাবে পূর্ণিমা রাত? সত্যি মিথ্যে একাকার হয়ে যায় সতীর মনে। সে কোন কথা বলে না অন্নদা বাবুর কথার উপরে।

সমুদ্র তখন ফুলে উঠেছে সতীর চোখে চাঁদের দিকে মুখ ক'রে।

ছ-টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। সত্যব্রত আসবে কথা আছে ঠিক সাতটার সময়। হাতে সময় এখনও আধ ঘন্টার ওপর। প্রসাধন সেরে তৈরী হয়ে নিতেই এ সময়টুকু লেগে যাবে। ইচ্ছে ছিলো আজ একটু সেজেগুজেই বেরোবে সতী। জুঁইফুলের কুঁড়ির মালাটা জড়াবে খোঁপায়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে সময়টুকুও পাওয়া যাবে না।

বেণী বাঁধবারই তো ফুরসুৎ হবে না। তা জড়াবে কখন জুঁইমালা? শেষ মুহূর্ত্তে হয়তো খোলা চুল হাতে পাকিয়ে এলো খোঁপাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে তাড়াতাড়ি। দেরী তো আর করা যাবে না ঘরে।

উন্মনা হয় সতী। লগ্ন এগিয়ে আসছে। লগ্নই তো। প্রত্যাশিত এই সব টুকরো টুকরো মুহূর্ত্তগুলোকে এক তোড়ায় বাঁধলেই তো হলো সেই পরম লগ্ন। ফিরে ফিরে তাকায় সতী। সমস্ত শরীরটায় একটা দোলা লাগে পুলকের। হাসবার যেখানে কোন কথা নেই সেখানে অকারণ খিলখিলিয়ে হেসে উঠে শিউলী ঝড়িয়ে দেয় শুভ্র হাসিরাশির।

বিশ্বতোষ বিব্রত বোধ করে একটু। বুঝতে পারে না, কি আনন্দে হাসে এত সতী। পরে ভেবে নেয়, নিশ্চয়ই তাকে খুশী করবার জন্যে। অপর পক্ষের তেমন কোন সাড়া না পেলে ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ এমন বেসুরো বেতালা হয়ে যায় মেয়েরা। বিশ্বাসটা যেখানে কম সেখানে আশ্বাস ছাড়া হয় তো প্রাণ খুলে হাসতে বাধে। সতী যে বেশী হাসছে, সে ব্যতিক্রমটাও ঐ একই কারণে। তাকাও না বললে চোখে চোখ রেখে ঠিক রমণীয় হয়ে উঠতে পারছে না। চমকানোর চাইতে ঝলকাচ্ছে বেশী। বিশ্বতোষ ভাবে, সতীরও ঠিক তেমনি কোন একটা কিছু হয়েছে। অত যে অকুণ্ঠ,

হয় তো কুণ্ঠিত বলেই। এখন আর কি এতটুকু প্রশ্রয় পেলেই রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে ঠিক ঠিক।

বেদনাকরুণ হয়ে ওঠে বিশ্বতোষের মন সতীর দুঃখের কথা ভেবে। এ প্রশ্রয়টুকু সে তো অনায়াসেই দিতে পারে সতীকে। শুধু অরুণাবাবুর সঙ্গে জড়িয়ে স্বার্থের কথা ভেবে হতে যাবে কেন, এ কথা তো তার নিজের অন্তরের কথা। সে তো চায় না, এই দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা আরও বিলম্বিত হোক। দুজনের মাঝখানে একটা স্বচ্ছতর পর্দা অনন্তকালের জন্যও আড়াল করে রাখুক উভয়কে। তবু কেন এই আগুন নিয়ে খেলা করবার দুর্দম স্পৃহা তার। ভাবে, ভেতর ভেতর সে নিজে হয়ত একটু উদ্ধত। এটা তার ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। ভালবাসার জনের কাছে আবার টক্কর দেবার কি আছে? আর এই ঠেলা মারা স্বভাবের জন্যেই যদি কিছুটা বীতরাগ এসে থাকে সতীর মনে, সে দোষ তার সম্পূর্ণ নিজের। তার জন্যে সতীকে সে কখনও দায়ী করতে পারে না। মনে পড়ে সতী একদিন কথাচ্ছলে তাকে চরিত্রের দাপট কথাটা বলে ঠাট্টা করেছিল। আজ বিশ্বতোষের মনে হয়; সত্যি কথাই বলেছিল সতী। এই দাপটই হয়েছে তার চরিত্রের মস্ত বড় দুর্বলতা।

নিজের অপৌজন্যের কথা স্মরণ করে নিজেই বিব্রত বোধ করে বিশ্বতোষ। কুণ্ঠিত হেসে বলে, হাসলে যে সতী?

: না কিছু নয়, এমনিই।

: এমনিই?

: সত্যি।

বিশ্বতোষ ভাবে, কই, এই হাসি বা এই যে কথা কইল সতী এর ভেতরে তো কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। বেশ তো সহজ সুন্দর বলেই মনে হলো। কপটতা তো নেই কোনখানে। এখন তার নিজের পক্ষ থেকে পাল্টা একটা স্বীকৃতি পেলেই না আরও বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সতী! কিন্তু কই, সে তার নিজের মুখোসটা তো এখনও একটানে খুলে ফেলতে পারছে না। বাধছে কোথায়? বিশ্বতোষের মনে হয়, সে নিজেই নিজের কাছে একটা বাধা। তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে নিজেই। আর কেউ নয়।

গুটিয়ে গিয়ে ফুলে ওঠে বিশ্বতোষ। বলদর্পী ইন্দ্রজিৎ সে। মেঘের আড়ালে চলে যায় সে। যেন না সতী দেখতে পায়।

নির্ভুল সঙ্কেতে সময় হিসেব করে ঘড়ি কথা কয়। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। আর দেরী করবার সময় নেই। রঙ-এ রঙ মিলিয়ে কাপড় পরতে হবে, প্রসাধন শেষ করতে হবে। তারপর সেই জুঁই কুঁড়ির মালাটা,—এতক্ষণে বুঝি বা ফুটেই উঠলো শ্বেত পাথরের বাটিতে।

এতটুকু দ্বিধা নয়। উঠে পড়ে সতী। তবু কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আচ্ছা আপনি কিন্তু এখন একটু বসছেন, কেমন? চলে যাবেন না যেন। এক্ষুণি মা এসে পড়বেন। আপনাকে বিশেষ করে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

খুসী হয় বিশ্বতোষ সতীর কথায়। এ বাড়ীর মিসেস রায় অবধি তাকে আপ্যায়িত করবার জন্যে সর্বদা অস্থির। আত্মশ্লাঘায় ভরে যায় বিশ্বতোষের বুক। অরুণা রায়ও ইতিমধ্যে একদিন বলছিলেন কথায় কথায়—জীবনে যা করবো বলে মনে করেছিলাম, তার সিকি ভাগ আজও করে উঠতে পারলাম না। এখন তোমরা রইলে,…। সতীকে রেখেছিলেন এই সব কথাপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যার মত, বিশ্বতোষের চোখে চোখে। বলেছিলেন, আমি পারলাম না, কিন্তু তোমরা ঠিক পারবে। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে বিশ্বতোষ।

এই সব কথা আর তার নিজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছ' আনার ছেঁদো ম্যাজিকানা যেন আর মানাচ্ছে না তাকে একেবারেই। ছাবাটা ফেলতে হবে এবার তাড়াতাড়ি অরুণাবাবুকে অতিক্রম করে,—এই পাটকল চটকল ছাড়িয়ে, গঙ্গার পাড় ধরে গঙ্গানদী পিছনে ফেলে, সাগরের দিকে। সমুদ্র পারের সবুজ এরে অনন্বয় হতে হবে তাকে। সে হবে শিল্পপতি।

জলন্ত সিগারেটটা ছাইদানে ডুবিয়ে দিয়ে বিশ্বতোষ গিয়ে দাঁড়ায় জানার সামনে। হাতে ছেনী আর হাতুড়ি। অরুণাবাবুর এক দুষ্প্রাপ্য শিল্পসংগ্রহ। কোন এক প্রাচীন ঢোকরা কামারের অপূর্ব কারুকীর্তি। এই ছেনী আর হাতুড়িই মুঠো করে ধরতে হবে তাকে। বিশ্বতোষের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে চেপে বসে দুদিকে। বিস্ফারিত দুই চোখ যেন তাকিয়ে থাকে নিজেরই মুখের দিকে,—এক অপরাহত তাস্কর।

কার প্রসাধন কে আর করে। হাত কেঁপে কৌটা নড়ে যায় সতীর। মালাটা জড়ালো, তাও যেন কেমন আলগা আলগা হয়ে রইল খোঁপায়। প্রজাপতির পাখার চাঞ্চল্য নিয়েও হাত পা কেমন যেন শিথিল হয়ে আসে থেকে থেকে। প্রতি শব্দেই তার আবির্ভাব। এই বুঝি এসে পড়লো। হয়তো বা এসে অপেক্ষাই করছে তার জন্যে। কোনমতে শাড়ীখানা পাক দিয়ে পরে বেরিয়ে পড়ে সতী। না যদি সে আসে এখনও, তো সে-ই অপেক্ষা করবে আগবাড়িয়ে। ঘরে আর মন টিকছে না সতীর।

বিশ্বতোষ বসে আছে। অথচ সেই ড্রইংরুম দিয়েই বেরিয়ে গেল সতী একটা সোনালী প্রত্যাশাকে অগ্রবর্তী করে চোখের তারায়। মিহি মসলিনে মুড়ে একটা রেখার মত রঙ্গভঙ্গে চলে গেল সতী ত্বরিৎপায়ে, বিশ্বতোষকে তার নজরেই পড়লো না। কি ভেবে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল ল্যাণ্ডিংএর কাছে, ঠিক সিঁড়ির মুখটায়। আবার নেমে চলে গেল।

রূপরাগ দেখে অবাক হয় বিশ্বতোষ। আজই কি তবে কনে দেখার দিন ছিল?

পাশাপাশি চলতে ফিরতে সতীকে বিশ্বতোষ অনেক দেখেছে। কিন্তু এত সুন্দর তাকে কোনদিনও দেখায়নি। হয়তো বা সেদিন অন্য কথা ছিল তার মনে। এতটা একাগ্রতা নিয়ে আসেনি সেদিন। একটু দাঁড়িয়েছিল তবু। তা বিশ্বতোষ ডেকে ফেরালেই পারতো? ডাকে নি কেন? সতীকে তারিফ করে একটি কথাও তো বলে নি বিশ্বতোষ। না ডেকে ফেরালে আপনা থেকে কি কোন মেয়ে ফিরে আসে? অন্তত: সে মেয়ে জানে তাতে তাকে সুন্দর দেখায় না। তাই সতীও ফিরে আসে নি। এটা শীলতার কথা। একটা মেয়ের লজ্জা থাকবে না? লজ্জাই তো মেয়ের অঙ্গ আভরণ! বিশ্বতোষ ভাবে, শেষ পর্যন্ত সহজ শালীন বোধটাও কি তার ভোঁতা হয়ে গেল! নিজের মুখের লাগাম তো তার নিজেরই হাতে। অত করে রাশ টানা কেন তবে

জানতো যদি ঘোড়া বেচাল হবে? বিশ্বতোষ কি জানে না, যে কোনখান ঘোড়া বেচাল করলে খেলার মাঠে তার কদর পড়ে যাবে? বিশ্বতোষ ভাবে, নিজেই তাকে সে খর্ব্ব করেছে অনর্থক এতটা বাড়াবাড়ি করে।

সতী! সতী!—ছুটে বেরোয় বিশ্বতোষ ড্রইংরুম থেকে বারান্দায়। বারান্দা থেকে সিঁড়ি ধরে নীচে।

নেই সতী। এদিক, ওদিক, কোনদিকে নেই। এগিয়ে যায় বিশ্বতোষ।

তোড়া বাঁধা এক ঝাড় মস্ত মোটা লাল গোলাপ নিয়ে যাচ্ছিল মালী সতীর ঘরে। বিশ্বতোষ তাকে ডেকেই সতীর কথা জিজ্ঞাসা করে: মালী সতীকে দেখেছো?

বাগান আর বাগিচা এতদিন ঘেঁটে ফুলের বারতা জেনেছে মালী। হাসি ভরা মুখে আঙুলের ইশারায় সে ফুলবাগানের দিকে ইঙ্গিত করে বলে: সতী দিদিমণি বাগিচায় আছেন। চলে যায় মালী ফুল নিয়ে হেসে।

শিহরণ লাগে শরীরে বিশ্বতোষের।—বাগিচাতেই তবে মানাবে ভাল। যদি বোবা না হয় তো তাকে বিশ্বতোষ আজ মুখর করে তুলবে ঝর্ণার মত। এগিয়ে যায় বিশ্বতোষ।

দুধারে কাঠের গ্যালারীতে সারি সারি শ্বেতশুভ্র ক্রিসানথামাম আর রাগরক্ত ডালিয়ার সমারোহ লেগেছে। সামনের তারের জালে গুল্মলতার বেড়াজাল আড়াল করে রেখেছে লোকালয়। সাদা পাথরের নুড়ি ছড়ানো পথ ধরে এগিয়ে যায় বিশ্বতোষ বাগানের দিকে।

সামনেই প্রশস্ত টেনিস লন। পাশ দিয়ে চলে গেছে পাথর বিছানো পায়ে হাঁটা পথ। লনটাকে পাক দিয়ে দিয়ে এসেছে বাগিচায়। এখানে ওখানে ছিটিয়ে আছে কয়েকখানা লোহার বেঞ্চ। আলো জ্বলছে দু তিনটে গাছের ফাঁকে। চুপচাপ নিস্তব্ধ নিরালা পরিবেশ।

এখানেই কোথাও সন্ধান পাওয়া যাবে অভিসারিকার। চঞ্চল দু পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় বিশ্বতোষ। দেখে, ময়ূরীর মত পিঠ টান টান, দীর্ঘ সুষম দৃপ্ত পদক্ষেপ, হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলেছে সতী, পাশে সত্যব্রত।

ফুলবাগানে যেন আগুন লেগে গেছে। আগুনই জ্বলে ওঠে বিশ্বতোষের চোখে। ঠিক সেই আদিম উল্লাস। দাঁতে দাঁত ঘষে রোমশ দু'খানা হাত যেন বুকের পাটার চাপড় মারতে থাকে অনবরত। আঙুলেরও যেন নখ বেরিয়েছে। দামী টুইড-এর শক্ত কাঁধ, পাঁচ পাঁচ দশ আঙুলের শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে ছিটকে বেরিয়ে আসে বিশ্বতোষ। রহস্য কিছু নেই। পরিষ্কার ছবি। রাতের আঁধারে আরও সমুজ্জ্বল। নিজের মুখে কালি লেপে দিতে ইচ্ছে করে বিশ্বতোষের। নিজের শরীরের মাংস নিজে ছিঁড়ে খেয়ে হাড়গুলো সব মনে হলো সত্যব্রতর গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে।

দাহ আর দাহ! সমস্ত শরীরে যেন আগুন লেগে গেছে আর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ভেতরটা। উদ্ধত মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে বিশ্বতোষ।

দুরন্ত হাডসন গাড়ী আজ এক আর্ত্তবাহী এম্বুলেন্স-কার। অপঘাতে-আহত কোন অবিবেকী পথচারীকে নিয়ে চলেছে হাসপাতাল।

[ক্রমশ।

সম্পর্ক

তরুলতা ঘোষ

প্রত্যহের
প্রত্যুষ আর রজনীর
আলো আর ছায়া দিয়ে গড়া
চলমান ব্যবধানখানি
সংখ্যাহীন মুহূর্তের অপরূপ খণ্ড দিয়ে ভরা।
তোমার বা আমার
লুব্ধ স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ দিয়ে
হয়ত পাবনা অনুভূতি—
তবু এরা অপরূপ আপন স্বরূপে,
তাই যদি মেনে নিই তবু কিছু কথা থেকে যায়—
ভেবে দেখ তুমি আর আমি
গহন অন্তর থেকে কত রং এনে
ক্রমাগত রাঙাচ্ছি এদের।
এরা তো আয়নার মত
সপ্তবর্ণ ফিরে দেয়
শুধু যদি পায়।

তুমি আর আমি
আলো-প্রতিফলিত তুষারের
বর্ণালী দিয়ে
রূপ-রং রস যা দেবার
দিয়েছি।
একটি মুহূর্ত যদি
তুমি আর আমি
ভিন্ন-ভিন্ন রঙেতে রাঙাই, তবে
দু'জনেতে
দুই।
দু'জনের মাঝখানে সুদুর্লঙ্ঘ্য কালের প্রাচীর।
কিন্তু যদি
একটি সোনার মুহূর্ত
তুমি আর আমি
দু'জনেতে করি অধিকার,
একই রঙে দু'জনে রাঙাই,

তবে শোন চুপি-চুপি বলি—
তুমি আর আমি
দেখা এক।

বিজ্ঞানভিক্ষু

সপ্ত

আবিষ্কার বনাম মিরাক্ল্ ।

"There are more things in heaven and
earth than are dreamt of in your philosophy"
—Shakespeare

"Philosophy contains things of which no
trace can be found between heaven and earth"
—Georg, Christoph Lichtenberg
(1742-1799)

পরের দিন সকালে শংকরের ঘুম ভাঙলো অনেক দেরীতে।

প্রথমেই গেল সে সুমিত্রার সন্ধানে। শুনলো সুমিত্রা ভোর বেলায়ই বেরিয়ে গেছে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর দিকে।

প্রাতরাশের সময় আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবলো। তার পর খেয়ালের মাথায় চলে গেল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। সমস্ত দিন তার কেটে গেল—আইনষ্টাইনের 'জেনারাল রিলেটিভিটি থিয়োরি'-র মূল প্রবন্ধগুলোর অনুশীলনে। সংগে একজন রক্ষী থাকাটা গা-সওয়ার মতো হয়ে উঠছিল—তাই পড়াশুনার সময়ও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি কোনো বিঘ্নই সৃষ্টি করল না।

লাইব্রেরী বন্ধ হবার পর সারা সন্ধ্যাটা তার কেটে গেল উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পার্কের অপেক্ষাকৃত নির্জন কোণে ক্রমাগত পায়চারি করে। হবিবুল্লার ডায়েরির ছেঁড়া পাতার টুকরোগুলো তার মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। "আলম্পাটের স্থান পরিবর্তন?" তার সংগে গ্রাভিটেশনের সম্বন্ধ কোথায়? কোন ছোটোখাটো নৈসর্গিক ঘটনার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না "প্রচলিত থিয়োরি থেকে"? "আত্মিক শক্তি"র সংগে "থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি"র কোন যোগসূত্র আছে কি?

"এলব্রিকো কার্মির ভুল" কোথায়? "কেপলারের মতো গণিতজ্ঞ" কী প্রকাশ করেছেন? এ সমস্তের সংগে "চেরেনকভ রশ্মি", "পাতঞ্জল" আর "হঠযোগীর শরীরের কীল্ড" এরই বা সম্পর্ক কোথায়?

কোন ইকোয়াশেন আছে ডাইমেনশূন্ত 'থিটা'? ম্যাট্রিক্সের ইকোয়েশন? কিসের ম্যাট্রিক্স?

এ সমস্ত কথার টুকরোগুলো কি কোনো যুক্তির সুতো দিয়ে গেঁথে তোলা সম্ভব হবে? কে জানে?

ব্যারাকে ফিরে এল শংকর নিশুতি রাতে।

* * * *

শংকর স্বপ্ন দেখছিল।

একটা বিরাট প্রান্তরে সে আর সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রয়েছে...... দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর।

হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিম কোণে ঝড়ের মেঘ...

না মেঘ নয়, কাতারে কাতারে সৈন্য এগিয়ে আসছে আকাশজুড়ে, পিঠে তাদের বাঁধা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স!

হবিবুল্লা না?

হ্যাঁ, হবিবুল্লাই তো! হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হবিবুল্লার ইনভেনশন সুরু হয়েছে!

এ কী হবিবুল্লার মুখ কোথায় গেল? ধোঁয়ায় তাদের সব শরীর বিলুপ্ত হয়েছে।

না, হবিবুল্লা নয়—অগণিত ভাঙা বাক্স উড়ে চলেছে! কী সর্বনাশ!

সুমিত্রা, এখন কী উপায়?

সুমিত্রা বলে—শংকর একমাত্র উপায় হচ্ছে তোমাকে উড়তে হবে। তুমি হচ্ছ সেনাপতি, তোমার কাছেই আছে মাধ্যাকর্ষণ তৈরী করার বন্দুক—আকাশে উঠে মহাকর্ষ সৃষ্টি কর, তাহলেই ওগুলো সব মাটিতে পড়ে যাবে।

তাইতো শংকর উড়বে কী করে?

নিজের দিকে তাকিয়ে শংকর দেখে যে হাঁ সেনাপতি ত সেই তার পরনে রয়েছে ইউনিফর্ম—জেনারেলের ইনসিগনিয়া...

কিন্তু হবিবুল্লার যন্ত্রগুলো বড়ো কাছে এসে পড়েছে। চারদিক থেকে বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজ, কতগুলো বাক্স যে কামানের পাল্লা অতিক্রম করে এগিয়ে এল—

—আমি তো উড়তে পারছি না সুমিত্রা।

সুমিত্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলে,—সংস্কার ত্যাগ করো শংকর তা হলেই পারবে। ওই দেখো, অমল বসো, আলিমচান্দানী, সুব্রাহমনিয়ম সকলেই উড়ে চলেছেন! পারতেই হবে শংকর, তা নইলে দেশের সর্বনাশ

শংকর চেষ্টা করে—বিশ ফুট, ত্রিশ ফুট পর্যন্ত উঠে আবার সে নেমে যায়। আর্তকণ্ঠে বলে—সুমিত্রা এখন উপায়? সংস্কার যে আমার কিছুতেই যাচ্ছে না।

সুমিত্রা বলে—আচ্ছা দেখি কৃষ্ণস্বামী হয়তো একটা উপায় বলে দেবেন—

বাজগুলোর শব্দে কথা শোনা যায় না—,

সুমিত্রা বলে, শংকর দেখ দেখ কৃষ্ণস্বামী তোমার জন্য উড়ন্ত গালিচা নিয়ে আসছেন।

উড়ন্ত গালিচা আসছে—ভীমবেগে।

শংকর চেপে বসেছে উড়ন্ত গালিচার ওপরে হাতে তার বন্দুক—হবিবুল্লার বাজগুলো কোথায়?

ঐ যে দেখা যাচ্ছে এবার তাদের সারি।

এইবার শংকর।

শংকর বন্দুকের নিশানা ঠিক করে মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করতে থাকে। বাজগুলোও সব নীচে পড়তে থাকে।

একী বিস্ফোরণ হচ্ছে কোথায়? আণবিক বোমা?

না হবিবুল্লার বাজগুলোই ফেটে যাচ্ছে।

এ কী, সারা দিগন্ত লাল হয়ে উঠছে কেন?

বহ্নিবিহংগ।

একী, উড়ন্ত গালিচা হঠাৎ নীচে নামছে কেন?

হোম হচ্ছে। বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। আগুনের লেলিহান শিখা উঠেছে আকাশজুড়ে। সব বাজগুলো তার মধ্যে পড়তে থাকে।

চুম্বকের দুর্বার শক্তিতে সে হোমকুণ্ড উড়ন্ত গালিচাকে টেনে নিচ্ছে। গালিচা পড়তে থাকে বাণবিদ্ধ পাখীর মতো—কী সর্বনাশ।

একজন পুরোহিত হোম করছেন। না, পুরোহিত নয়, প্রফেসর শিকদার। বাহ্যজ্ঞানশূন্য শিকদার এক মনে আহুতি দিয়ে চলেছে যজ্ঞকুণ্ডে।

কী সর্বনাশ। এখনই শংকর পড়বে যে যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে। এখন উপায়?

চীৎকার করে শংকর বলে—"প্রফেসর শিকদার আমি শংকর। আমাকে বাঁচান।"

তার গলায় স্বর ফোটে না।

শিকদারের কোনো বাহ্যজ্ঞান নেই।

তবে—

* * *

ধড়মড় করে শংকর উঠে বসে। সমস্ত শরীর তার ঘর্মাক্ত। যাক, স্বপ্নই তাহলে।

* * *

পরদিন প্রত্যুষে শংকর হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে চলে গেল। প্রথমেই ঢুকলো সে গ্রন্থাগারে। ঘরের মাঝখানে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে নেয়—তারপরে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল বইএর আলমারীর দিকে। প্রথম যে বইখানায় হাত পড়ল, সেটা তুলে নিয়ে এক জায়গায় খুলে নেয়। তারপর চোখ খোলে শংকর। ভাবে, সত্যিই এটা 'র‍্যাণ্ডম্ সিলেকশন্' হল কি না।

যে পাতাটা খুলেছিল তাতে রয়েছে—

"The phenomena I am prepared to attest are so extraordinary, and so directly oppose the most firmly-rooted articles of scientific belief—amongst others, the ubiquity and invariable action of the force of gravitation—that, even now, on recalling the details of what I witnessed, there is an antagonism in my mind between *reason*, which pronounces it to be scientifically impossible, and the consciousness that my senses, both of touch and sight....are not lying witnesses."

প্রবন্ধটা স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্-এর লেখা। তার শিরোনামা—Researches into the phenomena of Modern Spiritualism. এটা প্রকাশিত হয়েছিল Quarterly Journal of Science, আঠারশো একাত্তর সালে।

সমস্ত বইখানার এইরকম অনেকগুলো পৃষ্ঠিকায় সমাবেশ। —হবিবুল্লা বাঁধিয়ে নিয়েছিল মরোক্কো লেদারে। শংকর পাতা উল্টে যায়। এটা বিখ্যাত মাধ্যমিক ড্যানিয়েল ডগলাস হোম-এর শূন্যে বিচরণের কাহিনী।

ড্যানিয়েল ডগলাস হোম।

এখানেই তাহলে হবিবুল্লা পেয়েছিল ওই নামটা।

শংকর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

* * * *

কিছুক্ষণ বাদে গ্রন্থাগার থেকে কম্পিউটার-এর 'ম্যানুয়েল' ও কম্পিউটার সংক্রান্ত আরো কতকগুলো বই যোগাড় করে সে ওপরে কম্পিউটারটার পরীক্ষায় মগ্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে রাও এসে উপস্থিত হল সেখানে। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় সেদিন অপরাহ্নে কম্পিউটারগুলো চালু করা হল।

সেদিন থেকে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতেই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রান্নাঘর থেকে প্রয়োজন মতো চা-কফি বা অন্য পানীয়ের-ও সরবরাহ হচ্ছিল। কাজেই দিনের মধ্যে ব্যারাকে ফিরবার প্রয়োজন ছিল না।

মাঝে একবার গ্রন্থাগারে উঁকি দিয়ে শংকর দেখল সুমিত্রা আর কৌল একরাশ বইএর গাদার মধ্যে ইন্‌ভেণ্টরী নিতে ব্যস্ত। অন্যান্য ঘরেও সহকর্মীদের কর্মব্যস্ততার সাড়া। নীচের তলায় বিরাট 'পাওয়ার প্ল্যাণ্টটা'কে চালু করানো হয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা স্পন্দিত হয়ে উঠেছে রীম্-রীম্ রীম্-রীম্ শব্দে। শংকরের মনে হল যেন সেটা বহ্নিবিহংগের পাখার শব্দ।

'ফায়ারবার্ড' প্রাণ পেয়েছে আবার। ফিনিক্সের নিদ্রাভংগ হয়েছে।

* * * *

সে দিন সন্ধ্যার আগে হবিবুল্লার গ্রন্থাগার থেকে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌সের বইয়ের তাড়া নিয়ে শংকর ব্যারাকে ফিরে এল একাই। হলঘরে প্রবেশ করে এককাপ কফি নিয়ে বসে যায় সে। সহসা তার নজরে পড়ে যে প্রফেসর শিকদারও আর একটা টেবলের পাশে বসে আছেন একা। শংকরকে দেখে শিকদার তাকে আহ্বান করলেন—"এই যে রায়—এসো—এদিকে এসে বোসো।"

শংকরের মনে পড়ে গতরাত্রের স্বপ্নের কথা। প্রধান পুরোহিতের

মায়ের মমতা ও অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

আপনার শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে আপনি তা কোন রকম যত্নের ত্রুটী রাখেননি। মা তারই স্নেহ ভালবাসার সাথে ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক দিয়েছেন। কারণ আপনি জানেন যে অষ্টারমিল্ক ঠিক মায়ের দুধেরই মতো। খাঁটি দুধ থেকে অষ্টারমিল্ক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী। আর সে জন্য সহজে হজম হয়।

শিশুদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচা-বার জন্য অষ্টারমিল্কে লৌহ আছে। এতে ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয়েছে, ফলে আপনার শিশুর দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে গড়তে সাহায্য করবে।

...মায়ের দুধেরই মতন

বিনামূল্যে! "অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা" (ইংরেজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্য্যার সব রকম তথ্য সম্বলিত। ডাক খরচের জন্য ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়, 'অষ্টারমিল্ক' পোষ্ট বক্স নং ২২৫৭, কোলকাতা-১

OS. 4-X51-C. BG

বেশে প্রফেসর শিকদারকে চমৎকার মানিয়েছিল কিন্তু! হাসি চাপতে গিয়ে শংকর বিষম খায়।

শিকদার তার ভাবান্তর লক্ষ্য করেননি। শংকর পাশে গিয়ে বসতেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যংগের সুরেই প্রশ্ন করেন, "কী হে, তোমাদের 'স্পুটনিক্' আকাশে উড়ছে কবে?"

শংকর একটা পাল্টা রসিকতা করবার চেষ্টা করে, "স্পুটনিক আকাশে উড়লেও তো আপনাকে ছাড়া তা উঠবে না জমি থেকে।"

শিকদার পরম বিস্ময়ের ভান করেন, "বলো কী হে, আমাদের মতো বুড়োদের নিয়ে কী হবে? আমরা হচ্ছি নেহাতই মাটির মানুষ। তোমরা হচ্ছ নব্য বৈজ্ঞানিক, আকাশপথে বিচরণ তো তোমাদেরই একচেটিয়া। সে কাজে বিজ্ঞানের যতোটুকু ঘাটতি, কল্পনায় তা পুষিয়ে যায়।"

শংকর এবার তর্ক শুরু করে, "আপনার মতে, ব্যাপারটা তাহলে সম্ভব নয়?"

শিকদার শুষ্ক হেসে বললেন, "অসম্ভব কথাটা ইদানীং বিজ্ঞানের অভিধান থেকে বাদ পড়ে গেছে। আজকাল কথা বলার আগে 'প্রোবাবিলিটি' বা সম্ভাব্যতার মাপকাঠিতে সবই মাপ করে নিতে হয়। সে হিসেবে বলতে হয়—হবিবুল্লার যন্ত্রের 'প্রোবাবিলিটি' আমার ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার সম্ভাবনার মতো।"

শংকর প্রশ্ন করে, "তাহলে হবিবুল্লা সেটাকে সম্ভব করেছিল কী করে?"

শিকদার বলেন, "সম্ভব হোলো কী করে? এ প্রশ্নের অনেক সদুত্তরই দেওয়া যায়। প্রথমতঃ হবিবুল্লা অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব করেনি, কিন্তু ক্যামেরার চোখকে ফাঁকী দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি বা হবিবুল্লা আকাশে উঠবার একটা যন্ত্র তৈরী করে থাকে, অ্যান্টিগ্রাভিটির সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তৃতীয়তঃ—"

শংকর বাধা দেয়, "তার মানে?"

শিকদার বলেন, "বুঝতে পারলে না? প্রথম রাত্রে আলোচনার সময় তুমিই তো এর একটা সমাধান দেখিয়েছিলে। মহাকর্ষ একটি শক্তি সে শক্তির সংগে লড়াই করা যায় পাল্টা শক্তি লাগিয়ে।"

শংকর বলে, "কিন্তু অতোটুকু যন্ত্রের থেকে অত বড়ো শক্তি পাওয়া যাবে কী করে? এক পাউণ্ড মাল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাইরে পার করতে গেলে রসদই পোড়ানো চাই কমপক্ষে দু'-তিনশো পাউণ্ড। পরমাণু শক্তির মতো কোনো অত্যুগ্রশক্তি দিয়ে হবিবুল্লার বাক্সের মতো ছোটো একটা বাক্সেও সেটা সম্ভব হতে পারে বলে সেদিন একটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সে আন্দাজ তো ভুল প্রতিপন্ন হল।"

শিকদার বলেন, "তোমরা কোনো জিনিসই তলিয়ে ভাবতে চাও না। চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসো। ছবিতে আমরা যতোদূর দেখেছি হবিবুল্লা তো মহাশূন্য অবধি পৌঁছয়নি, কোনো রকমে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট অবধি উঠেছিল জমি থেকে। হিসেব করেই দেখো না কেন? কতটুকু শক্তির দরকার তিনতলা অবধি পৌঁছাতে? একটা মাঝারী ধরণের হাউইতেই সে কাজ চলে যেতে পারে। যদি বলো—হবিবুল্লা একটা নতুন 'প্রোপালশন' এর কায়দা আবিষ্কার করেছিল—আমি বলব সেটা অবশ্য সম্ভাবনার বাইরে নয়। কিন্তু তাতেও আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।"

শংকরের মনে ক্ষণিক সন্দেহের দোলা কিন্তু তর্কে তা প্রকাশ পেতে দেয় না, বলে, "তাহলে বলতে চান 'অ্যান্টিগ্র্যাভিটির কথাটা মিথ্যে?"

শিকদার বলেন, "বস্তুতঃ তাই দাঁড়াচ্ছে নাকি? প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক ঘটনারই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা। 'অ্যান্টিগ্র্যাভিটির' কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না, কিন্তু অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বলে যে ঘটনাটা আমাদের দেখানো হোলো—সেটার ব্যাখ্যা সম্ভব হলেও হতে পারে।"

শংকরের মনটা দমে যায়। ভদ্রলোক হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে মন স্থির করে ফেলেছেন, এ মত বদলানো যাবে না কোনো যুক্তি-তর্ক দিয়ে। তবুও চেষ্টা করে সে—

"হবিবুল্লার যন্ত্রের কথাটা না হয় আপাততঃ বাদ দিলাম। কিন্তু প্রফেসর শিকদার, আপনার মতে আজকের দিনের সব মতবাদই কি অকাট্য? নতুন কোনো বড়ো আবিষ্কারের স্থান নেই কি, আগামী দিনের গবেষণায়?"

শিকদার বলেন, "এইজন্যেই তো তোমাদের সংগে তর্ক করতে চাই না। আবার কোনো বিচার না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলে? তুমি জিজ্ঞাসা করছ—আমার মতে সব থিয়োরি নির্ভুল কী না।"

"না, নিশ্চয়ই নয়। অনেক মতবাদই আজ প্রচলিত—যেগুলো আর দশ বছরও ধোপে টিকবে না। বরঞ্চ আজকালকার তরুণ বৈজ্ঞানিকদের 'ফ্যাশন'-ই হচ্ছে ভালো করে সব জিনিসের পরীক্ষা না করেই রাতারাতি একটা 'থিয়োরি,' একটা মতবাদ বা একটা 'ইকোয়েশন' বের করে দেওয়া। দুঃখের বিষয়, খ্যাতির অমৃতফলও পেয়ে যান এঁরা রাতারাতিই। কিছুদিন পরে অতি যত্নের সংগে নির্ভুল পরীক্ষা করার পর দেখা গেল যে সে থিয়োরি অচল। তাতে কিন্তু 'থিয়োরি'র স্রষ্টার কিছু যায়-আসে না। ততদিনে তিনি অমৃতফলটি হজম করে আবার এক জমকালো থিয়োরি বাজারে ছেড়েছেন।"

"কিন্তু সব থিয়োরি তো ভুল নয়, স্যর! কতকগুলো বহু পরীক্ষিত মতবাদের ওপরে নির্ভর করে বিজ্ঞান ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে। এ মতবাদগুলো এনে দিয়েছে তথাকথিত 'থিয়োরি-পস্টুলেট হাইপথেসিস' কণ্টকিত রাজ্যে পরম শৃংখলা। এই সমস্ত সত্য আহরিত হয়েছে তিলে তিলে, যুগে যুগে বহু শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উজ্জ্বলতম অবদান। মৃত্যুকে এই মহাপুরুষেরা ভয় করেননি। কুসংস্কারের মোহজাল এঁদের বন্ধন করতে পারেনি। একটু আধটু হয়তো হিসেবের গরমিল পাওয়া যেতে পারে এঁদের আহরিত জ্ঞানে—কারণ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তো তখনও তৈরী হয়নি। কিন্তু মূল সত্যগুলোর বনিয়াদ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।"

"তার ফলে আজ দুনিয়ার রূপ বদলে গিয়েছে।"

"আমি একথাও স্বীকার করি যে ভবিষ্যতে জন্মাবেন আরো নিউটন, আরো কেপলার, আরো আইনষ্টাইন। এঁরা শোনাবেন আরও চমকপ্রদ নূতনতর কথা। কিন্তু হবিবুল্লার মতো একজন অর্ধশিক্ষিত দাম্ভিক উন্মাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

শংকর যুক্তি তোলে, "কিন্তু হবিবুল্লাকেই বা এতটা তাচ্ছিল্য করছেন কেন আপনি? ল্যাবরেটরীর কতকগুলো যন্ত্রপাতির যে

ভাবে সন্নিবেশ করেছিল হবিবুল্লা, দেশে বা বিদেশেও এমন অদ্ভুত কর্মনৈপুণ্য আমার নজরে পড়েনি। ধরুন না কেন, কম্পিউটারগুলোর কথা। কেবলমাত্র যন্ত্রগুলোর ব্যবহারেই যে হবিবুল্লা পারদর্শী হয়েছিল তা নয়, মূল যন্ত্রগুলোর সংগে অনেক নূতন সার্কিটও সে যোগ করেছিল। বলতে গেলে পুরো 'অ্যানালগ কম্পিউটার'টাই প্রায় নিজের হাতে গড়ে তুলেছিল। এগুলো থেকে পরিচয় মেলে তার স্বকীয়তার, তার অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির।

"আর অর্ধশিক্ষিত বলছেন কা'কে? তার গ্রন্থাগারে রয়েছে সাত হাজার বই—প্রতি বইখানাই সে নাড়াচাড়া করত। দোষের মধ্যে বলতে পারেন—হবিবুল্লা কেম্ব্রিজ, হার্ভাড কি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হবার সুযোগ পায় নি।

"হবিবুল্লাকে যদি অনধিকারী বলে বাতিল করে দেন, তাহলে ১৯০৫ সালে পেটেণ্ট অফিসের এক নগণ্য কেরাণীকেও বাতিল করা উচিত ছিল, কয়েক বার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করা ছাত্র রামানুজকেও বাতিল করা উচিত ছিল আর তৃতীয় শ্রেণী অবধি বিদ্যা বলে রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করা উচিত ছিল। এই উন্নাসিক আত্মম্ভরিতা—"

শিকদার হাত তুলে বলেন, "ধীরে রায়, ধীরে। বক্তৃতাটা না করলেও চলবে। আমি বলি কি, তুমি হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীটা আর একবার ঘুরে দেখে এসো। মেনে নিচ্ছি যে কতকগুলো যন্ত্রের সন্নিবেশে অসাধারণ কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন তোমার 'কম্পিউটার'। আমি অন্য কম্পিউটারের 'সার্কিট' সম্পর্কে বিশেষ খবর রাখি না, কাজেই উদ্ভাবনী শক্তির কথাটার সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু যে লোক কোনো কোনো যন্ত্র গড়ার কাজে প্রশংসনীয় বুদ্ধিমত্তার বা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, সেই লোকেরই গড়া অন্য অনেক যন্ত্রে অত্যন্ত অনবধানতা বা অজ্ঞানতার ছাপ সুস্পষ্ট। দোতলায় কোণের ঘরটাতে আছে একটা 'ম্যাগ্নেটোমিটার' তার 'সার্কিট'টা ভুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র এ ভুল করত না। সে ঘরেই আছে একটা 'টাইম-রীলে' সুইচ টেপার পরও সংযোগের সময় নির্দিষ্ট ভাবে বিলম্বিত করবার জন্য। তাতে তিনটে বাড়তি 'ভ্যাল্ভ' লাগাবার কোনো সংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নীচের তলায় 'ইলেক্ট্রন্ ডি ফ্রাকশন ক্যামেরা'-র ভ্যাকুয়াম করবার ব্যবস্থাতে দোষ রয়ে গেছে। এ রকম আরো অনেক অসংগতি চোখে পড়বে যদি ভালো করে লক্ষ্য কর। তোমাদের প্রধান দোষ, কোনো কিছুই তোমরা খুঁটিয়ে দেখতে চাও না!"

"তারপর, হবিবুল্লার গ্রন্থাগার। বিজ্ঞানের অমৃতরসের সন্ধান যে পেয়েছে ওই সব 'ট্র্যাশ' প্রেতিনীরহস্যে কী করে তার মন ভরতে পারে—আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।"

"শেষে একেবারে মোক্ষম যুক্তি তুলতে চাও—রবীন্দ্রনাথ আইনষ্টাইনের নজীর তুলে। আইনষ্টাইনের মূল প্রবন্ধগুলো আর একবার পড়ে দেখলে তোমার যুক্তির অসারতা বুঝতে পারবে। মূল কথাটা হচ্ছে—আইনষ্টাইন কোনো চটকদার যন্ত্র আবিষ্কার করেন নি। তিনি বললেন—বিশ্বজগতটা এই রকম ভাবে দেখলে অনেক জিনিসেরই
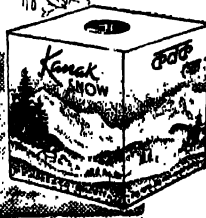
হিসেব মিলে যায়। আপেক্ষিকতাবাদ করলেন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী, যেমন মহাশূন্যে আলোকতরংগের গতিবেগটাই হচ্ছে সমস্ত পদার্থের গতিবেগের সীমা। তিরিশ বছর পরে সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরী হবার পর তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ইলেকট্রনের ওপরে চুম্বকের সাহায্যে তিন শত গুণ শক্তি প্রয়োগ করলে তার গতিবেগ হওয়া উচিত ছিল আলোকতরংগের তিরিশ গুণ—'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' সত্য না হলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে সাইক্লোট্রনের দৈত্যকায় সংস্করণ 'কসমোট্রন'-এর শক্তি নিয়েও কোন পরমাণুকণাই আলোক-তরংগের গতির সংগে পাল্লা দিতে পারেনি—ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এ ছাড়া তাঁর আরো কতো ভবিষ্যদ্বাণী কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে—সে সব কথা তোমরা তো পাঠ্যপুস্তকেই পড়েছ। তা সত্ত্বেও আইনষ্টাইনের প্রতিষ্ঠা তো রাতারাতি সম্ভব হয় নি?

"আর তোমাদের হবিবুল্লা করলেন কী? কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা মতবাদের ধার দিয়ে না গিয়ে রাতারাতি একেবারে অ্যান্টিগ্রাভিটি-মেশিনই আবিষ্কার করে বসলেন। ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় পাওয়া গেল গুরুগম্ভীর কথা কাকতালীয় ন্যায়, সান্স্পট, চেরেনকভ রশ্মি, ফাবির ভুল—আর চিরকুটে হয়তো বা বাজারের হিসেব। তোমরা যদি প্রচার করতে চাও এই কথা—যে হবিবুল্লা ছিল শতকরা একশোভাগ জীনিয়াস—আমি বলব কলকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশের বিন্দে সেকরাও ছিল জীনিয়াস। তার হাতের কাজ নাকি ছিল অসাধারণ, আর গহনার নূতন 'ডিজাইন'ও সে মাঝে মাঝে করত!

"তবে তোমার হবিবুল্লার একটা ক্ষমতার কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হয়। তার তথাকথিত আবিষ্কারের ফলে আমাদের ক'জনের বেশ জামাই আদরেই দিন কাটছে—গৌরী সেনের পয়সায়!"

শংকর অবশ্য এ সব মন্তব্যের জবাব দিতে পারত। বড়ো বড়ো লোকের ভুল কি হয় না? গণিতের অনেক মহাপণ্ডিত সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন 'সিরিজ' আবিষ্কার করতে পারেন, দুরূহ 'ফুরিয়ার ট্র্যান্সফরমেশন' করে ফেলেন তারা চোখের নিমেষে—কিন্তু বাজারের হিসাবে প্রায়ই তাঁদের গরমিল দেখা যায়। সুতরাং 'ম্যাগ্নেটোমিটার' এর মতো অতি সাধারণ যন্ত্রে হবিবুল্লার ভুল এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সত্যিই তো শিকদারের মতো সব যন্ত্র সে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে নি। কাজেই সে বিপজ্জনক তর্কের অবতারণা না করে—তর্কের ধারা বদলাবার চেষ্টা করে—

"হবিবুল্লার লাইব্রেরীর কথায় একটা বিষয় মনে এসেছে, প্রফেসর শিকদার! যুগে যুগে বিজ্ঞান-বহির্ভূত নানা রকম বিষয়—যেমন "মেটাফিজিক্স', আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরই কৌতূহল আকর্ষণ করেছে। সার উইলিয়াম ক্রুকস্ জীবনের শেষের দিকে আত্মা আর মাধ্যমিকের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছিলেন, অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি গড়ে তুলে সে ক্ষমতার পরিমাপ পর্যন্ত করেছিলেন। তারপর, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কি আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটিতেও ইন্দ্রিয়াতীত বোধ—'একষ্ট্রা সেন্সরী পারসেপশান্' সম্বন্ধে রীতিমতো গবেষণা আজও চলেছে। অনেক বুদ্ধিমান পণ্ডিতও বিশ্বাস করেন এ রকম একটা ক্ষমতার অস্তিত্বে। তা ছাড়া নির্ভরযোগ্য বহু লিপিবদ্ধ কাহিনী রয়েছে 'মিরাক্‌ল্' বা অলৌকিক ঘটনার—বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। যেমন ধরুন, নিউগিনির বহু অধিবাসী সামনের ওই মিলিটারি ট্রাকটাকেই ভুল করবে অলৌকিক ব্যাপার বলে। এ সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?"

শিকদার বললেন, "বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে না—'বুড়ো বয়সে ভীমরতি।' সার উইলিয়াম ক্রুকসের সেই দশাই হয়েছিল। তা ছাড়া শেষ জীবনে ক্রুকস্ তথাকথিত আত্মিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর অনেক 'নোট' পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন তথাকথিত মাধ্যমিকের দল তাঁর সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছে।

"আর, একষ্ট্রা-সেন্সরী পারসেপশান বা 'প্যারাসাইকলজি' নিয়ে বচসার শেষ হয়নি। প্রথমতঃ অন্য অনেক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় ষোল আনার জে বি রাইনের অনেক ফলাফল সমর্থন করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করে এ সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল আর তার ব্যাখ্যা।"

"তারপর তোমার প্রশ্ন 'মিরাক্‌ল্।"

"তথাকথিত মিরাক্‌ল্ আর অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা কি তোমার মতো কৃতী ছাত্রকে বলে বোঝাতে হবে? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণসাপেক্ষ। কোনো পণ্ডিত হয়তো মস্কো থেকে ঘোষণা করলেন যে তিনি একটা আশ্চর্য ঘটনা বা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। এখানে দিল্লীতে বসেই সম্ভব হবে মস্কোর পণ্ডিতের সে পরীক্ষা হুবহু নকল করার। তোমার পরীক্ষাতেও একই ফল পাওয়া যাবে। রঞ্জেনের 'এক্স্‌রে' আবিষ্কার একটা অভাবনীয় ঘটনা কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্রের পক্ষে সম্ভব 'এক্স্‌রে' তৈরী করা।

"আর মিরাক্‌ল্ বা অলৌকিক ঘটনা এমনই একটা জিনিস, যে সাধারণ লোক হাজার চেষ্টা করলেও সেটা আবার সম্ভব করতে পারে না। ধরো, আজ রাতে তুমি স্বপ্ন দেখলে যে মংগলগ্রহের প্রধান মন্ত্রী হয়ে বসে আছ। মিরাক্‌ল্ সম্বন্ধে তোমার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী কতকটা সেই রকম আর কি!"

শংকর প্রতিবাদ করে, "কিন্তু 'মিরাক্‌ল্' সম্বন্ধে একটা খোলা মন রাখা উচিত নয় কি আমাদের? অনেক অলৌকিক ঘটনার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তো থাকতে পারে! একটা উদাহরণ—যেমন ধূমকেতু। ইচ্ছা করলেই তো আমরা ধূমকেতু সৃষ্টি করতে পারছি না—বা রোজই তা দেখতে পাচ্ছি না। নিউটনের পরবর্তী যুগে বৈজ্ঞানিকদের ধূমকেতুর অস্তিত্বটাই উড়িয়ে দেবার একটা হাস্যকর চেষ্টা ছিল—যেহেতু ধূমকেতুর সম্বন্ধে তখনকার জানা বিজ্ঞান থেকে কোনো ব্যাখ্যা মিলত না।

"সেদিন রাত্রে আপনিই একটা কথা বলেছিলেন—আমার মনে আছে কথাটা। ম্যাজিসিয়ান থলি থেকে খরগোশ বের করে চলেছে একটার পর একটা করে। এর একটা সহজ সরল ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে। 'মিরাক্‌ল্'-এর কী এই রকম কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে না?"

শিকদার এবার অট্টহাস্য করে উঠলেন, "বাঃ, এবার নিজের জালে নিজেই ধরা পড়ে গেছে। এ গোলোকধাঁধা থেকে উ

পেতে গেলে মনস্থির করে নাও। সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপরে আস্থা রাখবে, না মিরাকল্-এর মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়াবে বিশৃংখল খেয়ালে। তোমাদের মনটা এখনও কাঁচা। অভিজ্ঞতার মূল্য তো এইখানেই—বাজে চিন্তায় সময়ের অপব্যয়টা বেঁচে যায়।"

শংকর লজ্জা পায় নিজের নির্বুদ্ধিতায়—একটু ক্ষুব্ধও হয়। কী ভাবে শিকদার আলোচনাটার মোড় ঘুরিয়ে তারই অস্ত্রে তাকে পরাস্ত করে দিলেন! না, এবার থেকে বেশ হিসেব করেই শিকদারের সংগে কথাবার্তা বলতে হবে।

শংকরকে নিরুত্তর দেখে শিকদার আবার বলেন, "রায়, তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা উঁচু না হলেও, তোমার জ্ঞান ও প্রতিভার আমার আস্থা আছে। অন্ততঃ তোমার 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি' সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলোর সারবান যুক্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। তাই একটা উপদেশ দিচ্ছি। লক্ষ্য করছি, ইদানীং তুমি হবিবুল্লার লাইব্রেরীর 'ট্র্যাশ'গুলো ঘাঁটতে সুরু করছো। ও সমস্ত ছেড়ে দাও। আমার ধারণা ক্রমশই দৃঢ়তর হচ্ছে যে হবিবুল্লার শুধু 'প্যারানইয়া'ই ছিল না, তার Schizophrenia ও ছিল।"

শংকর এখন প্রসংগটার মোড় ঘোরাতে পারলে বাঁচে। জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে আর কী দেখলেন?"

শিকদার বলেন, "সবটা দেখা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে খটকা লাগছে একটা ব্যাপারে—হবিবুল্লার অত বড়ো ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন কী ছিল? পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীর সংগে রসায়নাগারই বা কেন? 'অ্যাষ্ট্রনমি'ই বা ঢুকলো কী করে এর মধ্যে? গবেষণাগারের আয়তন আর সাজসরঞ্জামের বাহুল্য দেখে মনে হয় যে কমপক্ষে দশ বারোজন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ওর মধ্যে গোটা জীবনই কাটিয়ে দিতে পারেন নূতন কোনো যন্ত্র আমদানী না করেও। অনর্থক এ অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কী?

"হবিবুল্লার স্বভাবটা ছিল অনেকটা আমাদের সেনগুপ্ত সাহেবের মতো। সেনগুপ্ত এখন গবেষণা ছেড়ে দিয়ে ক্যাটালগ দেখছে কোন যন্ত্রটা নতুন বেরিয়েছে। কাজে লাগুক বা না লাগুক সেনগুপ্তের সেটা চাই-ই চাই। তা নইলে বৈজ্ঞানিক সমাজে তার মান থাকে না।"

বাইরে থেকে এল মিলিটারি ট্রাকের শব্দ। শিকদার এবার উঠে পড়েন, বলেন—"আজ তাহলে ওঠা যাক। ওই দেখ, তোমাদের 'স্পুটনিক'-এর দল আকাশভ্রমণ করে ফিরে এসেছে। মহা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে এবার।"

যেতে যেতে শিকদার একবার শংকরের দিকে ফিরে তাকান তারপর শেষ মন্তব্য করেন—"একটা কথা কিন্তু জেনে রেখো, রায়, তোমাদের এই অ্যান্টিগ্রাভিটির মূল রহস্য উদ্ঘাটন না করে আমি ছাড়ব না।"

* * * *

ঘরে ফিরে শংকর স্নান করতে গেল।

যে সমস্ত নূতন 'আইডিয়া'র শাখা-প্রশাখা গজিয়ে উঠেছিল তার মূল যেন শিথিল হয়ে এসেছে। শিকদারের যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ভদ্রলোককে ভুল প্রতিপন্ন করবার এতো আগ্রহই বা কেন তার?

বৈজ্ঞানিক পরশুরামের প্রস্তুতি চলেছে আর একটা আবিষ্কারের উচ্ছেদ করবার জন্য। সে চেষ্টায় ন্যায় হোক, অন্যায় হোক যে কোনো উপায়ে বাধা দেবার এই অদম্য প্রবৃত্তি কেন? ভদ্রলোক তো আর শংকরের কোনো ক্ষতি করেন নি!

সুমিত্রা হয়তো এই বিজিগীষার একটা বিশ্লেষণ করে ফেলত। কী আছে এই যুযুৎসার মূলে? শিকদারের অসাধারণ পণ্ডিত্য আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর একটা অন্ধ ঈর্ষা? না, ভদ্রলোকের আত্মম্ভরিতার প্রতি একটা অহেতুক ঘৃণা?

কিন্তু শিকদারকে ভুল প্রতিপন্ন করতেই হবে।

শংকর মনকে শাসন করবার চেষ্টা করে। যে শংকর রায়, সহজে শিকদারকে পরাস্ত করতে পারবে না তুমি। পর্যবেক্ষণ করবার শক্তিটা বাড়াতে হবে অনেক, কাজও করতে হবে আর সব বাজে চিন্তা বিসর্জন দিয়ে ফাঁকী দিলে চলবে না। সহজ নয় খণ্ডন করা বুড়ো শিকদারের যুক্তিগুলো!

একমাত্র পথ হচ্ছে, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভব হবিবুল্লার পন্থায় হোক কি অন্য ভাবেই হোক!

কিন্তু সম্ভব বললেই তো আর কার্যোদ্ধার হচ্ছেনা, কাজে সেটার প্রমাণ করা যায় কী করে? কোথায় আছে উপায়?

সুমিত্রা—সুমিত্রাই সুখী—ওকে এতটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে হাবুডুবু খেতে হয় না। মনোবিজ্ঞানী হলে কী হয় আসলে নারীসুলভ 'ইনষ্টিংক্ট'-জৈব প্রেরণা হচ্ছে ওদের সব বিশ্বাসের মূলে। ওর কাছে অ্যান্টিগ্রাভিটি একটা আবিষ্কার মাত্র! যেমন পেনিসিলিন বা 'রেডার।' হবিবুল্লা যা পারে শংকরেরও তা পারা উচিত! একেবারে সোজা যুক্তি!

শংকর অনুভব করে, 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'তে তার বিশ্বাস যেন দানা বাঁধতে পারছে না। তুলাদণ্ডের একদিকে দু'হাজার বছরের পুঞ্জীভূত জ্ঞানের সমষ্টি অন্যদিকে একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স! একদিকে শিকদারের দৃঢ় অবিশ্বাস, অন্যদিকে সুমিত্রার সরল বিশ্বাস!

হবিবুল্লার যন্ত্রটা হয় একটা 'আর্টিফ্যাক্ট'-একটা মিথ্যা একটা প্রবঞ্চনা, না হয় একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। যথাসম্ভব শীঘ্র চাই একটা নির্দেশ একটা প্রেরণা, একটা সিদ্ধান্ত। নচেৎ শিকদারের কাছে বোধ হয় পরাজয় অনিবার্য। সারা ভারতের লোক আজ তাদের বারোজনের মুখ চেয়ে বিফল মনোরথ হলে ঘনিয়ে আসবে জাতীয় বিপর্যয়!

চোখের সামনে জেগে ওঠে রাত্রের সেই দুঃস্বপ্ন হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ সৈন্য আকাশ জুড়ে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে আক্রমণ করতে, পিঠে তাদের অ্যালুমিনিয়মের বাক্স!

* * * *

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শংকর প্রতিজ্ঞা নেয়, এ সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে কাল থেকে।

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

বড় মন্থরগতিতে দিন কাটছিল হিমাদ্রির। নিরানন্দ একঘেয়ে দিন বিস্বাদ লাগে। বন্ধুদের সাহচর্য্যও তার আর ভালো লাগে না আদপে। কারণ তাদের হাসি তামাসার কলোচ্ছ্বাসে ওর অন্তরের সুর মেলে না। সমবয়সীদের হাসি গল্প নিতান্ত ছেলেমানুষী বলে বোধ হয়। নিজেই যে অকালবৃদ্ধ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে না সে।

বেশীর ভাগ সময়ই তার কেটে যায় আপন পড়ার ঘরের কোণটিতে। এমন ঘরকুনো হয়ে গেছে ও যে বাড়ীতে কোন বন্ধুবান্ধব দেখা করতে এলেও আজকাল বিরক্ত লাগে ওর। দেখা করতে আদপে ইচ্ছা করে না।

অবনীশ অবশ্য এর মধ্যে একদিন এসেছিল। হিমাদ্রি বলতে না চাইলেও ওর পেটের ভেতর তাড়নার ডুবুরী নামিয়ে সমস্ত কথা টেনে তুলে নিয়েছিল জোর জবরদস্তি করে। কিন্তু সেদিনের সব কথা শোনবার পর সেও ভেঙে পড়েছিল একেবারে।

সকরুণ ভাবে বলেছিলো—তোর ভালো করতে গিয়ে খারাপই করলাম শুধু। পারিস তো আমায় ক্ষমা করিস ভাই।

হিমাদ্রি সান্ত্বনা দিয়ে বলে—না না তোর আর দোষ কী এতে? শুভঙ্করকে যে ওঁরা এতখানি বিশ্বাস করে ফেলেছেন তাতো আমিও বুঝতে পারিনি আগে।

আর কিছু বলেনি অবনীশ। মাথা নীচু করে সেই যে সে চলে গিয়েছিল—আর আসেনি।

অন্যান্য বন্ধুদের হিমাদ্রি নিজেই সযত্নে এড়িয়ে চলে। এমন কি তার জন্যে অনেক সময় আজকাল পাওনাদার তাড়ানোর মত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে সে। তাই তার বুদ্ধিমান চাকর দীনেশচরণ মিলিটারীর মত জোর কদমে বেরিয়ে এসে হিমাদ্রির দর্শনাভিলাষী আগন্তুককে জানিয়ে দিয়ে যায় দাদাবাবু বলেছিলেন যে দাদাবাবু বাড়ীতে নেই। এর পর বন্ধুদেরই বা দোষ কি।

অবশ্য হিমাদ্রির এই পলাতক মনোবৃত্তির সব চেয়ে বড় কারণ হোল লোক লজ্জা।

ওর বিয়ের কথাটা বন্ধুমহলে এতদিন ছিল সর্বজনবিদিত। আজ সেটা নাকচ হয়ে যাবার খবরটাও তপ্ত খোলায় ভাজা খৈয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে। কিন্তু তার কার্য্য কারণ সম্বন্ধে হিতৈষীদের যে অপরিসীম কৌতূহল আছে হিমাদ্রি তাকে ভীষণ ডরায়। আর তাই শুধু নিজের কানে হাত চাপা দিয়ে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ায় পরিচিত জন সমাজের সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আশায়।

এমন সময় হঠাৎ একদিন ডাকে চিঠি এলো পরমেশ বাবু হিমাদ্রির দর্শনাকাঙ্ক্ষী। শরীর সুস্থ নয় বলে নিজে আসতে পারছেন না। হিমাদ্রি যদি একবার সময় করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে বড় ভালো হয়।

পরের ডাকেই উত্তর দিলো হিমাদ্রি—কাজের চাপে বড় ব্যস্ত সে। আশা রাখে পরমেশ বাবু তাকে মার্জনা করবেন।

এরপর এলো ভজহরি পরমেশ বাবুর চাকর। তার হাতে সবিশেষ অনুরোধের চিঠি। একটু ইতস্তত: করে তাকেও ফেরালো হিমাদ্রি জানালো তার শরীর খারাপ।

ভজহরি চলে যাবার পর মনটা অবশ্য একটু খচ খচ করছিলো। মনে হচ্ছিল ব্যবহারটা বড্ডো রূঢ় হয়ে গেল যেন। তবু নিজের জেদে মনের সে দুর্বলতাটুকু জয় করলো হিমাদ্রি। দাঁতে দাঁত চেপে বার বার আওড়ালে—না না কিছু অন্যায় হয়নি। ঠিকই হয়েছে বরং। বয়েসে যত ছোটই হই আমাকে ওভাবে অপমান করা ওঁরই কি সেদিন উচিত হয়েছিলো?

এ ঘটনার দু'তিনদিন পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কলেজ থেকে ফিরে নিজের পড়বার ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলো হিমাদ্রি।

পরমেশ বাবু নিঃশব্দে কখন এসে বসে আছেন কোণের একটা চেয়ারে। বাড়ীর কেউই বোধহয় ভাবতে পারে নি তাঁর আগমনের সংবাদ। কারণ জানতে পারলে দীনেশ এসে নিশ্চয় আলো জেলে পাখা ঘুরিয়ে খাতিরযত্ন করে বসাতো। মা আসতেন জলখাবারের রেকাবী সাজিয়ে।

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালালো ঘরের। তারপর নম্র-ভাবেই স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো ওঁনার কাছে। মনে তার রাগ বা অভিমান যাই থাক্ কারো সঙ্গে সামনা সামনি রূঢ় ব্যবহারে সে ঠিক অভ্যস্ত নয়।

কিন্তু কাছে এসে পরমেশবাবুকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল হিমাদ্রি। কী ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন উনি। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে গলায়। মুখের রেখায় রেখায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

একে তো পিতৃতুল্য ভদ্রলোক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েও আবার সেধে এসেছেন বাড়ীতে—তাইতেই অনেক নরম হয়ে গেছে মনটা। তাতে আবার ওঁর শরীরের এই অবস্থা দেখে রাগটা একেবারেই পড়ে

গেল হিমাদ্রির। ব্যগ্রকণ্ঠেই সে জিজ্ঞাসা করলে—কী হয়েছে? এত কাহিল দেখছি কেন আপনাকে? অসুখবিসুখ করেছিল কী?

পরমেশ বাবু কোন কথার উত্তর দেন না নতমুখে বসে থাকেন শুধু। মিনিট খানেক পরে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হিমাদ্রির হাত দু'টো জড়িয়ে ধরা গলায় বলেন—আমাকে তুমি ক্ষমা করো হিমাদ্রি।

—একী বলছেন আপনি? বয়েসে আমার চেয়ে কত বড়ো আপনি।—

—যত বড়ই হই, তোমাকে অপমান করবার কোন অধিকারই আমার নেই—সেদিনও ছিলনা। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো হিমাদ্রি, তোমাকে অপমান করবো বলে আমি ও রকম করিনি। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল হয়েছিল আমার। ভীষণ ভুল—মারাত্মক ধরণের ভুল হয়েছিল। যার চেয়ে সর্বনাশা ভুল আর হতে পারে না। তার ফলও পাচ্ছি। প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়ে গেছে। আজ আর এর কোন উপায় নেই। সারা জীবনের অনুশোচনাতেও এর বিন্দুমাত্র ভারও লাঘব হবে না তাও জানি। কিন্তু সেজন্যে নয়। তোমার প্রতি অকারণে যে দুর্ব্যবহার আমি করেছি সর্বক্ষণ তা আমার লজ্জা দেয়। তাই এত বড় অন্যায় করেও আবার বেহায়ার মত এসেছি তোমার বাড়ীতে। ক্ষমা চাইতে। তুমি আমায় ক্ষমা করো হিমাদ্রি—বলো তুমি আমায় ক্ষমা করেছো। জীবনের পুঞ্জীকৃত হতাশার মধ্যে অন্ততঃ এটুকু সান্ত্বনা আমার থাক্।

পরমেশ বাবুর কাতরতা হিমাদ্রির মনকে স্পর্শ করে। নরম গলায় সে বলে—আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন। কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো? বাড়ীর খবর কী? রঞ্জনা কাকীমা সব ভালো আছেন তো?

—স—ব ভালো আছে। নিজের নিজের কর্ম অনুযায়ী সবাই ভালো আছে। বলতে বলতে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো পরমেশ বাবুর চোখের কোণ থেকে।

হিমাদ্রি তখনকার মত ইস্তফা দেয় এ প্রসঙ্গে। পরমেশ বাবুকে সময় দেয় নিজেকে সংবৃত করবার।

দীনেশকে ডেকে তার নিজের আর একজন বাইরের লোকের জলখাবার আনতে বলে দেয়। বাইরের লোকটি যে পরমেশ বাবু সে খবরটা আর মার কানে পৌঁছুতে দেয় না তক্ষুণি।

কিছুক্ষণ পরে আপনা হতেই কিছুটা সহজ হয়ে আসেন পরমেশবাবু হিমাদ্রির সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে তাঁর মনের অর্গলও খুলে যায়। কতকটা যেন স্বগোতোক্তির মত বলে যান তিনি—তুমি জানো না হিমাদ্রি সে'দিন তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা আমি করেছিলাম সেটা আমার হিট অব মোমেন্ট বলা চলে না। কিছুদিন থেকে নানা কারণে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছিল।—তিল তিল করে জমা হয়েছিল আমার মনের মধ্যে। অবশ্য এখন একথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে নিজের ভেতরের লোভটা উৎকট রকমের বেড়ে গিয়েছিল বলেই আগেকার নজরে লাগা সমস্ত জিনিষকেই তুচ্ছ জ্ঞান করছিলাম সে সময়ে। এক এক সময় এখন ভাবি সবই আমার নিয়তির খেলা। গ্রহের টানে এ সমস্ত দুর্বুদ্ধি হয়েছিল আমার। তা না হলে এতদিনের ব্যবস্থা করা সাজান জিনিসটা নিজের হাতে এমন করে বানচাল করি?

ওর কথায় হিমাদ্রি বাধা দেয়। বলে—যাক্ যা হ'য়ে গেছে—

—না না হিমাদ্রি আমায় বলতে দাও। ক্ষমা চাইতেই যখন এসেছি তখন মুক্ত কণ্ঠে সবকথা না বললে—অকপটে সব কিছু স্বীকার না করলে আমার পাপমুক্তি হবে না। —হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, আমার নিয়তিই আমায় এমন করে দিক্ ভুল করালে রকমারি টোপ ফেলে ফেলে মনের ভেতরের শয়তানটাকে জাগিয়ে তুললে। মাথাটা খারাপ করে দিলে একেবারে।

যে সময় বেশ কিছুদিন থেকেই সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাব আসছিল রঞ্জনার সম্বন্ধে। কে যে অমন অদ্ভুত প্রস্তাব করে করে পাঠাচ্ছিল আজ পর্যন্ত আমি তা ঠিক করতে পারিনি। কী ধরণের অদ্ভুত সব প্রস্তাব শুনবে? —তখন অবশ্য তোমায় কিছুই জানাইনি কারণ আমি জানতাম তোমরা ওসব পছন্দ করতে পারবে না।

হঠাৎ একদিন বড় একটা গাড়ী করে দু'জন ভদ্রলোক এলেন তাঁদের প্রস্তাব রঞ্জনাকে সিনেমায় নামাবার। প্রথমেই হিরোইনের রোল পাবে আর পঞ্চাশ হাজার টাকা। টাকার অঙ্ক শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। লোভ যে একেবারেই হয়নি তা বলতে পারি না। দু'একটা এ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট করেছিল রঞ্জনা কিন্তু

তাইতে যে সে লোকের এতটা নজরে পড়ে গেছে তা আমি কল্পনাতেও আনতে পারি নি।

রঞ্জনাকে অবশ্য এ প্রস্তাবের আভাসও জানতে দিই নি। নাচে গানে ওর কী রকম ঝোঁক জানো তো বাবা। শুনলে হয়ত অগ্রপশ্চাৎ কিছু না ভেবেই হাঙ্গামা বাধাবে যাবার জন্যে। তাই নিজের মনেই দোমনা করছিলাম। কিন্তু, রঞ্জনার মা আমায় বড় বিপদে ফেললে। একেই তো আমি মনে মনে বুঝতেই পারছিলাম একবার সিনেমায় নামলে রঞ্জনার পক্ষে আর তোমাদের ঘরের বউ হওয়ার সম্ভবনা কম। তাতে আবার ওর মা কেঁদে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুললো। ওরা আগেকার দিনের মেয়েমানুষ। ওসব অভিনয় শিল্পটিল্প বোঝে না। অভিনেত্রী জীবনকে ওরা ঘৃণা করে। তার ধারণা মেয়েমানুষের জীবনে পেশাদার নটী হওয়ার চাইতে মৃত্যু অনেক মঙ্গল।

কাজে কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ওর জেদে পড়ে এ প্রস্তাব ফেরাতে হল আমায়। হাজার হোক গর্ভধারিণী তো।

এর দিন পনের পরে এলেন এক অন্যপ্রদেশী ভদ্রলোক। তাঁর প্রস্তাব আরও বিচিত্র। সোজাসুজি বলে বসলেন তিনি রঞ্জনাকে মাসে পাঁচশ' টাকায় বেঁধে রাখতে চান।

তুমি জানো বাড়ী করে আমি নিঃসম্বল হয়ে পড়েছি। সংসারের কোনো আয়ের রাস্তা নেই। তাই টাকার দিকটা হয়ত মনে একটু দ্বিধা জাগালো। কিন্তু সংস্কার? তাছাড়া ভাবলাম এ আর ক'দিনের? বড় জোর হয়ত দশটা বছর টাকা দেবে ওরা। তার জন্যে মেয়েটার সমস্ত ভবিষ্যত নষ্ট করবো? জাতজন্ম সব খোয়াবো?

তাই জিজ্ঞাসা করলাম রঞ্জনাকে যাবজ্জীবন এই টাকা দেবার চুক্তি করে উনি লেখাপড়া করে দিতে রাজী আছেন কী না? সে ভদ্রলোক তাতেও রাজী হলেন।

তবুও সংস্কার ছাড়তে পারলাম না। শেষ পর্য্যন্ত বিদায় করলাম তাঁকে। যাবার সময় আবার কী বলে গেলেন জানো? বললেন—অন্যলোকের কাছে যদি আরও বেশী টাকায় আমি কখনও রঞ্জনাকে ভাড়া দিতে রাজী হই তবে তার আগে যেন তিনি একটা খবর পান। টাকা বাড়াতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। ভীষণ রাগ হয়ে গেল শুনে, বললাম—রঞ্জনা নীলেমের মাল নয়—ভদ্রঘরের মেয়ে। দয়া করে সে কথাটা মনে রাখবেন।

তিনি ত' বিদায় হলেন। কিন্তু একটি কথা তিনি আমার মনে গেঁথে দিয়ে গেলেন যে রঞ্জনা আমার যেমন তেমন মেয়ে নয়, তার বিয়ের জন্যে এমন করে লোকের দরজায় গলবস্ত্র হয়ে বেড়াবার আমার কিছু দরকার নেই। বরং একটা ভালো রকম অবস্থাপন্ন ঘরবর দেখে রঞ্জনাকে সমর্পণ করে আমাদের সন্ততিহীন দু'টি জীবনের ভবিষ্যতের ভরসা করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ঠিক এই রকম একটা মনের অবস্থায় এলো সুজন। ওর জাঁকজমক পোষাক আষাক গাড়ীর বাহার আমাদের চমক লাগিয়ে দিলো। তার ওপর রঞ্জনাকে উপহার দেবার ধুম—সেও তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছো।

আজ আর আমার অস্বীকার করবার উপায় নেই—এইবার আমি টোপ গিললাম।

সুজন রঞ্জনাকে বিয়ে করতে চায় এ আভাস দেবার পরদিন থেকেই আমি রঞ্জনার জন্যে পুরানো ছকে রাখা ভবিষ্যতটা বাতিল করে দিলাম।

সত্যি কথা বলতে কী তারপর থেকেই তোমায় দেখলে আমার রাগ হতো। বোধ হয় বিবেকটা খচখচ করতো বলেই তোমার ওপর অত রাগ হতো আমার।

—যাক গে, ও অপ্রিয় প্রসঙ্গ যেতে দিন। হিমাদ্রি বলে।

—না না আর সে কথা বলছি না আমি। ওতে নিজেরই লজ্জা বাড়ে বই তো নয়। তার পরের ঘটনা থেকেই বলছি তোমায়। কী বলছিলাম? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে যেদিন বকাবকি হল সেইদিনেই ওরা বেড়িয়ে ফিরলো রাত এগারোটায়।

একেই তো তোমায় কতকগুলো কড়া কথা বলে মনটা তিক্ত হয়েছিল তাতে আবার রোজই ওদের দেরীর মাত্রা বাড়ছে দেখে আমি ওদের জানিয়েছিলাম যে এ ধরণের বেড়াতে যাওয়া নিয়ে অনেক কথা কানাকানি শুরু হয়েছে। তাই তোমাদের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত এ ধরণের বেড়াতে যাওয়া তোমাদের বন্ধ রাখতে হবে।

এ কথায় সুজন যেন একটু উত্তেজিত হল, বললে—আপনি কী আমায় বিশ্বাস করেন না?

আমি বললাম—বিশ্বাস না করলে আর তোমার হাতে মেয়ে দেবার মনস্থির করলাম কী করে? কিন্তু এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই নয়। সমাজে বাস করতে গেলে দেশাচার লোকাচার তো মানতে হবে। বেশ তো রঞ্জনাকে যদি তুমি সত্যিই পছন্দ করে থাকো তাহলে একটা শুভদিন দেখে বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলো। তাহলেই তো আর কোন কথা বলবার থাকে না কারো।

কিন্তু এটা তো বোঝ যে আমায় আইবুড়ো মেয়ের সুনাম বদনামের দিকটা আমায় নজর রাখতেই হবে। সেটাকে অগ্রাহ্য করে এ ধরণের মেলামেশাকে তো আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে ওরা বাধ্য হোয়েই বেড়াতে যাওয়া খানিকটা কমিয়ে দিলো। বাড়ীতে অবশ্য সুজন রোজই আসতো।

কিন্তু আজ বলবো কাল করবো করে করে বিয়ের দিন স্থির করা আর কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। কথাটা যখনই উঠতো তখনই একটা না একটা কাজের অজুহাত করে কথাটা ধামাচাপা দিতো সুজন।

মাঝে মাঝে সপ্তাখানেক এমন কী পনের দিন পর্য্যন্ত ওর আনাগোনাও বন্ধ থাকতো। শুনেছিলাম ব্যবসার প্রয়োজনে ওকে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।

কী যে ওর ব্যবসা, কোথায় ওর বাড়ী সে সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি ওর সঙ্গে। বলেছিল—বাড়ী ওর এলাহাবাদে। সেখানেই বর্ন এ্যাণ্ড ব্রট আপ ও। পশ্চিমা-বাঙ্গালী আর কী। তবে আত্মীয়স্বজন বাপ-মা কেউই নেই। বাবা কিছু টাকা ব্যাঙ্কে ওর নামে রেখে মারা গিয়েছিলেন। তখন ও খুবই ছোট। মা গেছেন তারও আগে। ব্যাঙ্কের টাকার সুদে একটা বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়া করেছে বরাবর। তার পর সেই টাকাতেই ব্যবসা শুরু করে। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কোন অপিস বা দোকান করার ও কোনদিনই পক্ষপাতী নয়। ওতে নাকি খরচ আর আড়ম্বরটা বড্ডো বেড়ে যায়—লাভ থাকে না। তার ওপর যা দারুণ ট্যাক্স।

ভাই ও সাপ্লাইয়ের কাজ করে। ওতে লাভ থাকে বেশী—কিন্তু সরকারের নজর পড়ে না।

হিমাদ্রি, আজ আমি তোমাকে সত্যিই বলছি রঞ্জনাকে দোষ দেব কী, ওর কথা শুনে আমি পর্য্যন্ত যেন কেমনতর হয়ে যেতাম। তাকে সন্দেহ করবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। হয়ত আমাদের ষোল আনা বিশ্বাসভাজন হবার জন্তেই ও'দিন আমাকে সঙ্গে করে সে দু'টো বড় আপিসেও নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে ওর কথাবার্ত্তা শুনে ওর খাতির প্রভাব দেখে ওর কর্মকুশলতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশও ছিল না। ওর পর্য্যাপ্ত রোজগার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্বন্ধে আর কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে বলেও আমার মনে হয়নি।

ওর কথাবার্ত্তায় চালচলনে ওর সম্বন্ধে আমরা এত মোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে ওর বিয়ে করবার সময়ের অভাবটাও আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বোধ হয় নি। তবু শুধু কর্তব্যবোধে মাঝে মাঝে আমি তাগাদা দিতাম বিয়ের দিনটা স্থির করবার জন্তে।

এমনই একদিন তাগাদা করবার পরদিন সকালে রঞ্জনাকে আর পাওয়া গেল না বাড়ীতে। প্রথমটায় আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পরে রঞ্জনার মা রঞ্জনার মাথার বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি বার করে নিয়ে এলো। রঞ্জনা লিখেছে, আমরা যেন তার জন্তে চিন্তা না করি। সে বাড়ী থেকে স্বেচ্ছায় চলে গিয়ে গোপনে সুজনের সাথে মিলেছে। বৃথা অনুসন্ধান করে তাদের শান্তিভঙ্গ না করাই এক্ষেত্রে সমীচীন। পরিশেষে আমাদের আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি শেষ করেছে রঞ্জনা। মন খুলে আশীর্বাদ করতে পারলাম কৈ? এই প্রথম আমার মনে খটকা লাগলো—গোলমেলে বলে বোধ হলো ওদের ধারাটাকে।

ভাবলাম, আমি তো বিয়ে দিতে রাজীই ছিলাম, তবে কেন এমন করে পালিয়ে গেলো ওরা! অকারণ এ জটিলতা সৃষ্টি করলো কেন? বিয়ের পর প্রতিষ্ঠিত সামাজিকতার দিকে না গিয়ে এমন ভিত্তিহীন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ঝাঁপিয়ে পড়লো কেন?

তাহলে কী সুজন রঞ্জনাকে সত্যি করে বিয়ে করতে রাজী নয়? আমার নির্বোধ অনভিজ্ঞ মেয়েটা ওর ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে ভুল করলো?

কিম্বা হয়ত এমন কোন একটা লজ্জাকর পরিচয় সুজনের আছে যার দরুণ বিয়ে করতে গেলে নানা কথাবার্ত্তা উঠতে পারে, তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের অবশ্যম্ভাবী আনাগোনাকে সে ভয় করে।

রঞ্জনার মাকে পর্য্যন্ত কিছুটি না বলে ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান সুরু করলাম এবার। পরিচিত মহলে রটিয়ে দিলাম রঞ্জনা তার পিসীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছে—কুচবিহারে।

হিমাদ্রি প্রশ্ন করে—অনুসন্ধান কী করে করলেন? সুজনবাবুর ঠিকানা আপনার জানা ছিলো?

—হাঁা জানতাম। সুজনের বাসায় কোনদিন না গেলেও তার ঠিকানাটা আমি নিয়ে রেখেছিলাম। সেই ঠিকানা মিলিয়ে বেহালায় একটা হোটেলে তার খোঁজ করতে গেলাম। গিয়ে দেখি, সুজন সেখানকার বাসা তুলে দিয়ে গেছে।

আরও ভয় হোল। মনে হোল আরও অনেক আগেই খোঁজখবর করা উচিত ছিল আমার। বিশেষ করে হোটেলের চেহারাটা দেখে চমকে উঠলো মনটা। অতি সাধারণ শ্রেণীর একটা হোটেল। সুজনকে এ পরিবেশে কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

আশেপাশের যাকেই দেখি তাকেই সুজনের বর্তমান ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করি। কেউই সঠিক বলতে পারে না। প্রশ্নগুলোও এতদিনের পরে ক্রমশঃ বাঁকাপথ ধরতে লাগলো আমার। মানে এতদিন পরে ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করতে সুরু করলাম আমি।

কিন্তু যত লোককেই জিজ্ঞাসা করি কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারে না তার সম্বন্ধে কোন কথা।

উল্টে দু'-একজন আমায় বিদ্রূপ করে গেলো। বললে—কেন? রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় মৃগনাভির শেয়ার-টেয়ার কিছু কিনেছেন না কী? হীরেলাল—থুড়ি, মিঃ সুজন মিশ্র মশাইয়ের জন্ত বড়ই উতলা দেখছি আপনাকে।

কী উত্তর দেব এ কথার? ছুটে যাই অন্তজনের কাছে, ওরা যা বলে সে সব মাথামুণ্ডবিহীন কথা। বেশীর ভাগই হেঁয়ালী—খোঁয়াটে মতন।

বহু কষ্টে বহুলোকের কাছে ঘুরে বহুলোকের হাতে পায়ে ধরে ওর সম্বন্ধে যে তথ্য আমি সংগ্রহ করলাম তোমার মন্তব্যের সাথে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নতুন করে সে কথাগুলো তোমার সামনে উচ্চারণ করতেও আমার লজ্জা করছে হিমাদ্রি—সে কথাগুলো এখনকার মত থাক্। আমি তারপর থেকে তোমায় বলছি। আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম নিজের নির্বুদ্ধিতার পরিমাণ দেখে। কোন উপায় না পেয়ে ছুটে গেলাম এক আইনজ্ঞ বন্ধুর কাছে। সব শুনে অনেক ভেবেচিন্তে সে পরামর্শ দিলো—ওদের যখন এখনও বিয়ে হয়নি তখন এখনও উপায় আছে রঞ্জনাকে ফিরিয়ে আনবার। কোন রকমে যদি একবার প্রমাণ করতে পারো রঞ্জনার বয়েস এখনও আঠারো বছর পূর্ণ হয়নি, তাহলেই তোমার রঞ্জনা আবার তোমার হবে। উল্টে নাবালিকা হরণের দায় এসে পড়বে সুজন মিশ্রের ঘাড়ে।

আমি পাগলের মত রঞ্জনাদের খোঁজ করে বেড়াতে লাগলাম, সেই সময় প্রতি পদক্ষেপে আমার তোমার কথা মনে হয়েছে হিমাদ্রি! প্রতি মুহূর্তে আমি ভেবেছি রঞ্জনার কত বড় হিতৈষী তুমি। রঞ্জনার বাপমায়ের চেয়েও মঙ্গলাকাঙ্খী। তুমি আমাদের যে সময় সাবধান করেছিলে সে সময় যদি সাবধান হতাম তবে আজ আর এ দশা হতো না আমার মেয়েটার।

রঞ্জনার মা-ও চব্বিশ ঘণ্টা এই কথাই বলে। আমারও মনে হয়—তোমার মনে এত কষ্ট দিলাম বলেই রঞ্জনার আমার এত দুর্গতি হল। নিজেকে তাই কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে পারি না। তুমি আমায় ক্ষমা করো—

এবার হিমাদ্রি ওঁকে থামিয়ে দেয়, বলে—কেন বার বার ও'কথা বলছেন? আপনি আমার পিতৃতুল্য। একদিন যদি ঘটনাচক্রে ভুল বুঝে আমায় দুটো কটু কথাই বলে ফেলে থাকেন তাতে এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যায় নি আমার। তবে একথা সত্যি সে সময় মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আজ আর কোন কষ্ট নেই—বিশ্বাস করুন। মিছিমিছি এ নিয়ে আর মনে কোন খেদ রাখবেন না আপনি।

হিমাদ্রির কথা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন পরমেশবাবু। তারপর হঠাৎ একেবারে ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন হু হু করে। বললেন—আমি সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিয়েছি হিমাদ্রি। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তোমাকে আমি আর কোন দিন ফিরে পাবো না তাও জানি। কেমন করেই বা পাবো? কোন অধিকারে তোমায় আবার ফিরে পেতে পারি আমি? তোমায় ফিরে পাবার জোরটাই তো হারিয়ে গেছে আমার।

—কেন বার বার ও'কথাটা তুলে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন? তাতে কী হয়েছে? আমি আগের মতই একদিন যাবো'খন আপনাদের বাড়ীতে। মনে করুন ও সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে কোনদিন ছিল না —হবার কথাও হয়নি।

—সত্যি বলছো হিমাদ্রি? তুমি আগের মতই থাকবে আমার কাছে? আবার যাবে আমাদের বাড়ী? ওঃ, তা যদি যাও কী খুশী যে হবে রঞ্জনার মা তা আর তোমায় বলতে পারি না। সে যে সত্যি তোমায় এত ভালবাসে আমি আগে তা জানতে পারি নি। এমন দিন যায় না যে সে তোমার নাম করে না কাঁদে। আর তার শরীরটাও খুব খারাপ। খুব বেশীদিন আর বোধহয় বাঁচবেও না সে।

—আপনি কাকীমাকে বলবেন নিশ্চয় আমি একদিন যাবো আপনাদের বাড়ীতে। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সুজনবাবুদের কী সেই পর্য্যন্ত আর কোন খবরই পাননি?

—ওদের কথা শুনবে? ও, সবটা তোমায় বলা হল না, নয়? হ্যা বহু অনুসন্ধানের পর খবর পেলাম ওদের। লক্ষ্ণৌয়ে একটা হোটেলে আছে রঞ্জনা আর সুজন।

যে লোকটা খবর দিলে সে অবশ্য রঞ্জনাকে দেখে নি। তবে সুজনকে চেনে। বললে—মিত্র সাহেব তো নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এখন উনি প্যালেস্ হোটেলেই আছেন। এখন ওখানে বেশ কিছুদিন বোধহয় ওঁকে থাকতে হবে। শুনলাম নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রীও আছেন সঙ্গে।

বিস্তারিত পরিচয় না দিয়ে মোটামুটি খবর জেনে নিলাম লোকটার কাছ থেকে। তারপর সেই রাত্রের গাড়ীতেই আমরা স্বামি-স্ত্রী দুজনে চলে গেলাম—লক্ষ্ণৌতে।

রঞ্জনাকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। ঐ শয়তানটার কবল থেকে যে করেই হোক্ ফিরিয়ে আনতেই হবে আমাদের কাছে। তখন কী ছাই জানি যে আমাদের রঞ্জনাই আর আমাদের নেই? তা বোঝাবে কা'কে? যাই হোক, বুঝতেই পারছো কী দারুণ উদ্বেগ আর উত্তেজনা নিয়ে আমরা পরের দিন ওর হোটেলে গেলাম।

দোতলার গাড়ীবারান্দায় বসে রঞ্জনা শান্ত ভাবে কী যেন একটা বই পড়ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে খুব খুশী হোল প্রথমটায়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—সুজন এখানে নেই, বৈষয়িক কাজে দু'দিনের জন্যে অন্যত্র গেছে।

সুজনের অনুপস্থিতি আমার কাছে ঈশ্বরদত্ত সুযোগ বলে মনে হল। দু'চারটে কথার পর রঞ্জনার শোবার ঘরে চলে এলাম আমরা। কারণ, যে কথা আমরা বলতে এসেছি গাড়ীবারান্দার মত কমন্ প্লেসে তা তো বলা চলে না।

ঘরে এসে এ কথা সে কথার পর আমরা আমাদের আসার উদ্দেশ্য রঞ্জনাকে খুলে বললাম।

শুনে রঞ্জনা ঠিক পাগলের মত হয়ে গেল। যা ইচ্ছা তাই বলতে লাগলো আমাকে আর তার মাকে।

সব কথা আর পর-পর ঠিক মনে নেই, তাই সব তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারবো না।

তবে রঞ্জনার মা-ই বোধহয় প্রথমে বলেছিলেন—সুজন তোকে প্রতারণা করেছে খুকী। আসলে ওর কিছুই নেই। তাই আমরা তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

মায়ের কথা শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লো রঞ্জনা। বললে—ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আমায়? কেন? কে কী বলেছে তোমাদের?

ওর মা বললেন—না রে, এটা বলাবলির কথা নয়। ভালো করে খোঁজ নিয়েই জানতে পেরেছি আমরা। কলকাতার নামকরা জালিয়াত ও। এখনও সময় আছে খুকী, আমাদের সাথে তুই ফিরে চল।

এমনি ধরণের আরও কিছু কথা আমরা বলেছিলাম। এমন কিছু কথা কাটাকাটি বা তর্কাতর্কিও হয়নি। কিন্তু রাগে আর উত্তেজনায় কী রকম যেন হয়ে গেল রঞ্জনা। বিশেষ করে ঐ জালিয়াত কথাটা বলতেই যেন ক্ষেপে গেল।

উঠে গিয়ে ঘরের কোণায় রাখা বড় মতন একটা আলমারি খুলে ফেললে। তার ভিতর থেকে গোছা গোছা সাড়ী ব্লাউজ এনে আমাদের সামনে স্তূপাকার করে ফেলতে লাগলো। বললে—জালিয়াত? নামকরা জালিয়াত? তা এ জিনিসগুলোও সব জাল বলে মনে হচ্ছে না কী? এককাপড়ে বাড়ী থেকে নিয়ে এসে এই দু'মাসের মধ্যে যে আমায় কমপক্ষে পাঁচসাত হাজার টাকার জিনিস কিনে দিলো তার চেয়ে বেশী প্রতারণা আর কে করেছে আমায়?

ওর ভাবভঙ্গিমা দেখে আমরা কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাল ছাড়ি নি। বললাম—শুনেছি বাজারে ওর বহুটাকা দেনা। হয়ত তোকে ভোলাবার জন্যে এ সবও সেই ধারকরা টাকাতেই কিনে এনেছে ও। কিছুদিন পরেই হয়ত—

—কে বলেছে? কে বলেছে এসব কথা? আচ্ছা তাই যদি সত্যি হয়—তোমাদের কথাই যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়—আমার স্বামী যদি কপর্দকশূন্যও হয়, আমাকে খুশী করবার জন্যে ধার করেই কিনে এনে থাকে এ সব জিনিস, তবে সেই অপরাধে তাকে ছেড়ে চলে যেতে বলছো তোমরা? স্বামীর সাথে মেয়েদের সেই সম্বন্ধ?

রঞ্জনার মা বললেন—স্বামী? কে তোর স্বামী? সুজন তোকে বিয়েই করে নি?

রঞ্জনা বললে—না মা, এটা তোমাদের ভুল ধারণা। বি[illegible] আমাদের হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে টানা মো[illegible] আমরা আসি পাটনায়। সেইখানেই একজন পুরোহিত এসে [illegible] মন্ত্র আমাদের বিয়ে দেন। ওঁর দু'-একজন বন্ধুও সেখানে ছি[illegible]

তবে হ্যাঁ, কলকাতার বাড়ী থেকে স্বাভাবিক ভাবে আমাকে বিয়ে করে আনতে ও রাজী হয়নি কেন, সেটার কারণটা আজও আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? আমার মনে তো তা নিয়ে কোন খেদ নেই? তবে! হ্যাঁ—এ কথা সত্যি, আমি এভাবে চলে আসায় তোমাদের হয়ত অনেকের কাছে অনেক কথাই শুনতে হয়েছে। কিন্তু তার আর উপায় কী বলো? আমার মুখ চেয়ে না হয়—

আমি ধমক দিয়ে বললাম—বাজে বকিস না। আমাদের দুঃখের সান্ত্বনা চাইতে আমরা তোর কাছে আসিনি। জেনে রাখ, আজ রাত্রের গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে তোকে। ভালো কথায় যদি না যাস্ তবে আমি জোর করে নিয়ে যাবো তোকে।

এই পর্য্যন্ত বলে মিনিট দুয়েক চুপ করে বসে রইলেন পরমেশ বাবু। তার পর হঠাৎ অস্বাভাবিক জোর করে বলতে লাগলেন—আরও শুনবে হিমাদ্রি এর পর? এর পর রঞ্জনা আমাদের যা খুশী তাই বলে অপমান করতে লাগলো, ধরতে গেলে তাড়িয়ে দিলে আমাদের। বললে—কী উদ্দেশ্যে আমাকে তোমরা এভাবে উৎপীড়ন করছো তা আমি জানি না, জানবার কোন আগ্রহও নেই আমার। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা তোমরা কোরো না—এই আমার অনুরোধ।

কারণ আমি আর নিতান্ত শিশু নেই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আমার স্বামীর আশ্রয় থেকে নিয়ে যাওয়ার কাজটা খুব সহজসাধ্য হবে না তোমাদের পক্ষে। কিন্তু আমি শুধু এই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে, তোমরা একটা বাজে শোনা উড়ো কথার ওপর নির্ভর করে আমাকে আমার স্বামীর ঘর চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যেতে বলছো কোন্ বিবেচনায়? ছিঃ ছিঃ, এই তোমাদের নীতিজ্ঞান? এই তোমাদের সুরুচির পরিচয়? আমাকে তাহলে তোমরা একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে কোনদিনই চাওনি? চেয়েছিলে এক-সিন্দুক টাকার সঙ্গে বিয়ে দিতে?

হিমাদ্রি! ওর এই সব বড় বড় কথা আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। মরিয়া হয়ে ওকে আঘাত করবার জন্যেই বললাম, এত নিষ্ঠা তোর ছিল কোথায়? হিমাদ্রিকেও তো একদিন স্বামী বলে জেনেছিলি? তবে তার সঙ্গে এতটা বেইমানী করলি কী করে? কী ব্যবহারটা করেছিস্ তার সঙ্গে?

এ কথাটা শুনে একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো হতভাগী। তারপর কী বললে জানো? বললে—হিমাদ্রিবাবুর সাথে কোন খারাপ ব্যবহার আমি করিনি। আমার নিশ্চিত ধারণা হিমাদ্রিবাবু কোনদিনই আমায় সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। তুমি তাঁকে তাঁর পিতৃসত্যের ফাঁস পরিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলে। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক—হয়ত সে বন্ধন একদিন স্বেচ্ছাতেই গলায় তুলে নিতেন। কিন্তু অবাঞ্ছিত এ বন্ধন হয়ত একদিন তাঁর কাছে দুঃসহ বোঝার মত বোধ হতো।

তাই সুজন আমাদের বাড়ীতে আনাগোনা সুরু করবার

কিছুদিন পর থেকে তিনি যখন স্বেচ্ছায় আমাদের বাড়ী আসাযাওয়া কমিয়ে দিলেন তখন আমি এতটুকু বিস্মিত হইনি। বুঝে সুঝেই আমার তরফ থেকে আমি তাঁকে তাঁর পিতৃসত্য পালনের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু আজও আমি তাঁকে—আমি তাঁকে মানুষ হিসাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

হিমাদ্রি, তোমার ওপর তার এই বিশ্বাস দেখে আমি সব কথা খুলে বললাম। বললাম—যে হিমাদ্রিই সর্বপ্রথম সুজনের স্বরূপ পরিচয় নিয়ে এসেছিল আমার কাছে। সেদিন আমি তাকে বিশ্বাস করি নি।

উত্তরে রঞ্জনা বললে—আমি আজ বিশ্বাস করতে পারছি না, হিমাদ্রি তোমাদের এই সব বলেছে।—আর যদি বলেই ছিল তবে সেদিন কেন জানাও নি আমায়? আমি জানি হিমাদ্রি আমায় কোনদিনই চায় নি। সে চেয়েছিল তার বাবার কথার দাম দিতে। কিন্তু অমন করে কারো গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে মরণও ভাল। আমি জানি—আমি জানি হিমাদ্রি আমায় কোনদিনই চায়নি। তা যদি হোত তবে সুজনের আনাগোনা, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা দেখে অমন করে নিঃশব্দে সরে যেতে পারতো না সে। এগিয়ে আসতো, প্রতিবাদ করতো নিশ্চয়।—কিন্তু আজ আর ওসব কথা কেন? আজ আমি স্বেচ্ছায় যাকে বিয়ে করেছি কোন কারণেই তার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাদের আমি মিনতি করছি এ প্রসঙ্গ থামাও তোমরা। আমি শুনতে চাই না, জানতে চাই না—কিছু চাই না তোমাদের কাছে। তোমরা চলে যাও—দয়া করে নিষ্কৃতি দাও আমায়।

আর কী বলবো? হার মানলাম নিজের মেয়ের কাছে। মাথা নীচু করে আমরা দুজনে যখন চলে এলাম রঞ্জনা তখন তার বিছানার ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রঞ্জনার ইতিবৃত্ত শেষ করে পরমেশ বাবু কখন যে চুপ করেছেন তা টের পায় নি হিমাদ্রি।

সারা মন জুড়ে তার ক্ষণপূর্বের শোনা রঞ্জনার কথাগুলোই তোলপাড় করছে শুধু।

তার উচ্ছ্বাসবিহীন লাজুক ভালবাসাকে রঞ্জনা কী রকম সাঙ্ঘাতিক ভুল বুঝেছে সেই কথাটাই বার বার আছড়ে পড়ছিল তার মনের মধ্যে।

চমক ভাঙলো রাত এগারোটা বাজার কথাটা যখন সরবে ঘোষিত হল বাইরের বারান্দার দেওয়ালঘড়িতে। পরমেশ বাবু নীরবে উঠে দাঁড়ালেন চলে যাবার জন্যে। হিমাদ্রিও তাকে তেমনি নিঃশব্দেই বিদায় দিলো। মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবার প্রস্তাবটা পর্য্যন্ত উঠলো না কারো পক্ষ থেকে।

পরমেশ বাবুর অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল হিমাদ্রি। দূরে ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে সে মূর্তিটা যখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল একবারে তখন আচ্ছন্ন ভাবটা খানিকটা কাটলো মনের। কর্তব্যবোধটা সজাগ হ'ল। মনে হ'ল ভদ্রলোক হয়ত বাস পাবেন না আর। হিমাদ্রির উচিত ছিল ওঁকে একটু এগিয়ে দেওয়া। ভারী অভদ্রতা হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, এই সামান্য কথাটা একটু আগে মাথায় এলো না! মনটা যেন কী রকম হয়ে গেছে আজকাল। অসভ্যের মত হয়ে গেছে স্বভাবটা।

নিজেকে অনেক শাসন করে হিমাদ্রি। তবু প্রবোধ দিতে পারে না কিছুতে।

* * * *

আপন মনের এই অপরাধী ভাবটাই বোধহয় মলিভিলার দিকে বার বার অঙ্গুলি সংকেত করেছিল হিমাদ্রিকে। তাই দিন তিনেক পরেই একদিন সন্ধ্যেবেলায় মলিভিলার গেটের সামনে আবার এসে দাঁড়ালো হিমাদ্রি। তবে আগেকার মত সরাসরি উপরে উঠে গেলো না আর। ভজহরি মারফত খবর পাঠাল অন্দর মহলে।

ওর আগমনবার্তা শুনে ক্ষণকাল পরেই পরমেশ বাবু নিজে নেমে এলেন নীচে। ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভিতরে চলো। এখনও কী এই বুড়োটাকে ক্ষমা করতে পারোনি?

—না না সে কি কথা, এমনিই খবর দিলাম ভিতরে। বাড়ীটা বড় নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল;—ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো বাড়ীতে নেই, বেরিয়েছেন কোথাও।

—কোথায় আর যাবো বাবা! এইখানেই পড়ে আছি দুজনে। তবে বাড়ীটা আমার নিস্তব্ধ নিঃঝুমই হয়ে গেছে হিমাদ্রি—অন্ধকার হয়ে গেছে চিরদিনের মত।

নিঃশব্দে পরমেশ বাবুর অনুগমন করে হিমাদ্রি—উত্তর দেয় না কথার। সত্যি কথা বলতে কী ওঁর আক্ষেপে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জোগায় না তার মুখে। কারণ ওঁর কথার মধ্যে যে মর্মান্তিক সত্য আছে তা এ বাড়ীতে ঢোকামাত্রেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে হিমাদ্রি। আপন চর্মচক্ষু দিয়েই দেখতে পেয়েছে এ বাড়ীর নিরানন্দময় রূপটুকু। সে রূপ যেন আশাহীন মুমূর্ষুর শিয়রে নিশিজাগরণ-ক্লান্ত সেবিকার মত বিষাদ-গম্ভীর। তার কর্তব্য আছে কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনে নেই সার্থক পরিণামের সোনালী আশ্বাস।

জড়েরও যে জীবন আছে, তার প্রতিটি অণুরেণুতে ভরে আছে জীবনের স্পন্দন এ কথা এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই শুনেছিল হিমাদ্রি। আজ প্রথম জানলে শুধু বিজ্ঞানেই নয় মানুষের মনেও এর সুস্পষ্ট অনুভূতি পাওয়া যায় সময় বিশেষে।

দোতলার বারান্দায় আলো জ্বলছিল একটা—ঘরগুলো অন্ধকার। হিমাদ্রির মনে হল বারান্দার আলোটাও যেন কমজোর হয়ে গেছে আগেকার চেয়ে। কৃপণের মত সংকীর্ণ দাক্ষিণ্যে দীনতর করে রেখেছে পরিবেশ। কে জানে ভজহরি হয়ত ধুলোমোছার সময় পায়নি অনেক দিন।

শোবার ঘরে এসে পরমেশ বাবু হাত বাড়িয়ে একটা ডিমলাইট জ্বালালেন। তার পর ঘরের বাইরে চলে গেলেন ত্বরিত চরণে। বোধ হয় সমস্ত ঘটনার জন্যে মনে মনে নিজেকে দায়ী করেন বলেই বিবেক-দংশনে এমন অশান্ত প্রকৃতি হয়ে গেছেন তিনি। কোথাও স্থির হয়ে টিকতে পারেন না এক মুহূর্ত।

মলিনা দেবী শুয়েছিলেন আপন শয্যাপ্রান্তটিতে। হিমাদ্রিকে দেখে যথাসাধ্য ব্যস্তভাবে উঠে বসলেন শয্যার উপর। তাঁকে দেখে কয়েক মুহূর্ত আর কথা বলতে পারে না হিমাদ্রি। শুধু জীর্ণশীর্ণ বললেও যেন বোধ হয় কিছুই বলা হয় না তাঁর শরীরের অবস্থা। অম

সুন্দর মানুষটার এই অল্প কিছুদিনে শরীরের এত অধোগতি কি করে সম্ভব হ'ল সে কথাটা ভেবে আর কূল পায় না হিমাদ্রি। হতবুদ্ধিভাবে বলে—কী হয়েছে? কোন শক্ত অসুখ করেছিল নাকি?

মাথা নেড়ে স্পষ্টস্বরে উত্তর দেন মলিনা দেবী—না, না, কৈ? অসুখ তো করেনি আমার। কিছুই হয়নি। কথার শেষে একটু হাসবারও চেষ্টা করেন যেন।

হিমাদ্রির মনে হয়, সে হাসির চেয়ে কান্না অনেক ভাল। কি আর বলবে সে? মোহের বশে এঁরা যে ক্ষতি হিমাদ্রির করেছেন তার চেয়ে শত গুণ বেশী করেছেন নিজেদের। এদের ওপর অনুযোগ বা অভিমানের চেয়ে সমবেদনাই বেশী আসে যেন। বিশেষ করে এই যে, শান্তস্বভাব স্বল্পভাষিণী মহিলাটি নিজের একমাত্র সন্তানের নিয়ত ভবিষ্যতের চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছেন এঁর প্রতি অকৃত্রিম মমতায় হিমাদ্রির সমস্ত অন্তর ভরে যায়।

স্বল্পালোকিত সে ঘরখানিতে অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে নীরবে বসেছিল হিমাদ্রি। মলিনা দেবীও বিশেষ কিছু বলেননি আর।

কিন্তু তাতে পরস্পরকে বুঝে নেবার কোন অসুবিধা হয়নি ওদের। সমবেদনায় মৌন ভাষণই বোধ হয় বেশী প্রাঞ্জল। কোন কথা না বলে অনেক কথা বলাটাই সহানুভূতি জানাবার সর্বোত্তম ভঙ্গিমা।

চলে আসবার আগে প্রণামান্তে বিদায় চাইলো হিমাদ্রি। মলিনা দেবী শুধু দক্ষিণ হস্তটি ওর মাথার ওপর একটুক্ষণ রেখে বললেন—আবার এসো। ঝরঝর করে জল ঝরে পড়লো তাঁর চোখ থেকে।

সকরুণ সে মিনতিভরা অনুরোধটুকু এড়াতে পারে না হিমাদ্রি। মাথাটা দুলিয়ে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটু দ্রুতপায়েই ঘরের বাইরে চলে আসে সে। কে জানে হয়তো নিজের মুখটাকে লুকিয়ে ফেলতে চায় মলিনা দেবীর দৃষ্টি থেকে।

* * * *

এর পর থেকে মাঝে মাঝে মলিভিলায় আসতো হিমাদ্রি। নিজের পরিচিত পৃথিবীর সকলকে লুকিয়ে অতি সন্তর্পণে নিজের জীবনের দু'-একটি সন্ধ্যা চুরি করে আনতো এই হতভাগ্য প্রৌঢ় দম্পতির জন্তে। অপব্যয় করতো তার কিছুটা মূল্যবান সময়।

ভয় করতো অন্তে হয়ত হাসবে—বিদ্রূপনেত্রে তাকাবে তার 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার' প্রয়াস দেখে। তবু কেন যে ছেদ টানতে পারে নি, মাঝে মাঝে এখানে এসেছে, এই জড়চেতন নিরানন্দ পাষাণপুরী কিসের আকর্ষণে তাকে টেনে এনেছে, তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি।

বোধহয় আপন অন্তরের যে বেদনার বোঝাটা তাকে অহোরাত্র বয়ে বেড়াতে হয় একমাত্র এ বাড়ীর বেদনার্ত্ত বাতাসে তাকে সে মেলে দিতে পারে বলেই এ বাড়ীতে এলে তার মনটা হাল্কা হয়।

বিশেষ করে পরমেশ বাবু আর মলিনা দেবীর চোখ এড়িয়ে একটুক্ষণ রঞ্জনার ঘরে এসে বসবার সুযোগ হিমাদ্রির পক্ষে সেও কি কম প্রলোভন!

নিঃসঙ্গ সে ঘরে বসে কত দিনের কত স্মৃতি যখন রাত্রির মত নিঃশব্দে আপনার কৃষ্ণ পক্ষ বিস্তার করে সমস্ত হৃদয় কালো করে তোলে তখন তারই মাঝে কি যে এক স্নিগ্ধতার আভাস খুঁজে পায় হিমাদ্রি অন্যত্র সন্ধান মেলে না।

আজকাল মনে হয় সেদিনের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্তে পরমেশ বাবুকে দায়ী করা বৃথা। এ তার নিজের দৈন্ততা, সম্পূর্ণ তার নিজের পরাজয়। কারণ এতদিন ধরে রঞ্জনা তার যে ভালবাসাকে কোনদিন অনুভবই করতে পারেনি তেমন নিষ্ফল ভালোবাসার এ পৃথিবীতে কোন দামই নেই। পুরুষের প্রেম সমুদ্রের মত উদ্দাম না হয়ে যদি নারীর প্রেমের মত অন্তর্মুখী হয় তবে'এই তার স্বাভাবিক উচিত পরিণাম।

আর রঞ্জনার স্বয়ংবর-সভাতেই যখন তার পরাজয় ঘটেছে তখন পরমেশ বাবুর মতামত বা অবিচার সে সবই তো গৌণ কথা।

আর রঞ্জনাই বা অন্যায় করেছে কোনখানে? সারাজীবন কান পেতে হিমাদ্রির ভালবাসার মৌনগুঞ্জন শোনবার সাধনা করার চাইতে তার কানে যদি সুজনের ভালবাসার মুখর স্তাবকতা বেশী সুধা ঢেলে থাকে, তবে হিমাদ্রি কোন যুক্তি দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে?

মনের চেতন অবচেতনে এমনিতর কত যে চিন্তা ঘোলা জলের ঘূর্ণীর মত পাক খেয়ে বেড়ায় হিমাদ্রি নিজেই তার থৈ পায় না কিছুতেই।

আরও মাস দু'য়েক পরের কথা। সেদিন কলেজে শেষের ঘণ্টায় দর্শন পড়ানোর দায়িত্ব ছিল হিমাদ্রির। পড়ানো শেষ হলে অপরাহ্ণবেলায় ক্লান্তচরণে সুমুখের অঙ্গনটুকু পার হয়ে নিজের ছোট হিলম্যান গাড়িখানির দিকে পা বাড়িয়েছিল হিমাদ্রি। আর ভাবছিল মা আজ ক'দিন থেকে দক্ষিণেশ্বর যাবার কথা বলছেন—আজ সন্ধ্যাবেলায় না হয় একবার ঘুরিয়ে আনবে মাকে।

হঠাৎ হিমাদ্রির চোখ পড়লো পরমেশ বাবুর দিকে। তিনি তখন এসে গেটের কাছটায় হিমাদ্রির জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে দেখে মনে মনে ওঁর হঠাৎ এখানে আসবার একটা সম্ভাব্য কারণ খোঁজে হিমাদ্রি।

ওঁর শুকনো মুখে আর উদ্‌ভ্রান্ত চাউনিতে কি যেন একটা অশুভ ঘটনার ইংগিত দেখতে পায় হিমাদ্রি। মনে মনে ভয় পায় সে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পরমেশ বাবুর কাছে। বলে—আপনি এখানে যে? আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? কেন কি হয়েছে?···

কোন কথা না বলে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিগ্রামখানা হিমাদ্রির দিকে এগিয়ে দেন পরমেশ বাবু। হাতটা তার থর থর করে কাঁপছে। কম্পিত হস্তে টেলিগ্রামটা টেনে নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো হিমাদ্রি। হাজারিবাগ হসপিট্যাল থেকে আসছে টেলিগ্রামটা। লিখছে—রঞ্জনা দেবী আপনাদের আত্মীয় কী? যদি হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব চলে আসুন। তিনি গত পনের দিন যাবৎ আমাদের হেপাজতে আছেন।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যায় হিমাদ্রি। ধীরে ধীরে বলে—এই তো শুনলাম রঞ্জনা লক্ষ্ণৌয়ের হোটেলে আছে। তবে আবার হাজারিবাগ হস্‌পিট্যালে গেলো কী করে?

পরমেশ বাবু ভারী গলায় বলেন,—আমার কাছেও তো সেটাই সমস্যা। তার ওপর দেখো গত পনেরদিন যাবৎ হাসপাতালে আছে—লিখছে। তা আমাদের টেলিগ্রাম করলো না কেন? আর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই বা আসছে কেন টেলিগ্রামটা? সুজন কোথায়? রঞ্জনার কোন একটা অসুখ-বিসুখ হলে সে আমদের জানাতে পারতো না কী?

হিমাদ্রি বিবশ গলায় বলে—কি জানি? ব্যাপারটা সত্যিই কেমন যেন অদ্ভুত মতন লাগছে। কিন্তু সে যাই হোক, আপনাকে তো যত শীঘ্র সম্ভব যেতে লিখেছে।

একটু থেমে বলে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে এত কথা না বলে চলুন না অন্ততঃ গাড়ীটার ভিতর গিয়ে বসা যাক। পরমেশ বাবু নীরবে হিমাদ্রির অনুগমন করে এসে বসেন গাড়ীর ভিতরে। কিন্তু কোন কথা বলেন না। তাঁকে আজ অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখায়।

একটু পরে হিমাদ্রিই বলে—কি ঠিক করলেন? আজ রাত্রের গাড়ীতেই হাজারিবাগ যাবেন তো?

—উঁ? হুঁ। আমি তো যাবোই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তোমার কাকীমা বড় গোলমাল সুরু করেছে দেখছি। তাই জন্যেই তো পরামর্শ করতে এলাম তোমার কাছে। ও নিজে তো টেলিগ্রামখানা পড়তে পারছে না—আবার আমার কথাতেও বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। আমি একা যাবো শুনে ওর ধারণা হচ্ছে যে খুকী অসুস্থ। হাসপাতালে আছে। ও তাই কাঁদে আর বলে—মিথ্যা কথা, সমস্ত তোমাদের মিথ্যা কথা। যেখানে যে অবস্থাতেই থাক খুকী আমার সেখানে যেতে বাধা কী?

আমি বলি—তুমি নিজেই যে মরতে বসেছ। তোমায় আর ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? তা কোন কথাই কী সে মানছে? যতদূর বুঝছি আমায় উনি সহজে রেহাই দেবেন না। না গিয়ে ছাড়বেন না সঙ্গে। কিন্তু আমার পক্ষেই কী সম্ভব ঐ হাড়গোড় বেরকরা মানুষটাকে নিয়ে এত রাস্তা যাওয়া?

হিমাদ্রি কিছুই বলে না। সামান্য একটু সমর্থন জোগায় মাত্র। নিজের অন্তর থেকে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধু মাত্র ওঁদের অশান্তি, ওঁদের উদ্বেগের, কথা চিন্তা করা হিমাদ্রির পক্ষে সেও একটা সাধনা বৈ কি। সহানুভূতির বশে পরমেশ বাবুর সাথে নতুন করে সে যে সম্বন্ধই পাতিয়ে থাক অন্যের বিবাহিতা রঞ্জনার কাছ থেকে সে যে সুদূরতম, সে কথা সে ভুলে যায়নি। আজ রঞ্জনা সম্বন্ধে তার উদ্বেগ বা আগ্রহ এতটুকু মাত্রাধিক হলে সেটা অন্যের চোখে যে কতখানি বিসদৃশ হবে সে জ্ঞান তার আছে।

পরমেশ বাবুও তখন ওর তরফ থেকে কোন উত্তর বা আলোচনার অপেক্ষা না রেখে একলা বলে যাচ্ছেন। অস্ত্রপরীক্ষায় যেমন নিমেষে দিগন্তব্যাপী শরজাল বিস্তার করে আবার পলকে তাকে অভ্রভেদী বাণে শতছিন্ন করে আপনার ক্ষমতা সপ্রমাণ করে আজ এই উত্তেজিত মুহূর্তে পরমেশ বাবুও তেমনি মুখে মুখে নিজের জীবনের বিশেষ বিশেষ বিপদ সম্পদের এক ঘন ঘটাময়ী সুদীর্ঘ তালিকা রচনা করে বলে চলেছেন—জানো হিমাদ্রি, এ জীবনে আমি—আমি বহু পথে চলেছি। ভালোমন্দ বহু ধরণের লোকও দেখলাম। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। সব মায়া সব মরীচিকা। তোমায় সত্যি বলছি বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছে এ জগতটার উপর। বিশেষ কোন কামনা বাসনাও আর নেই। শুধু ওই খুকীর জন্যে—ওই মেয়েটার জন্যেই যত ভয় যত ভাবনা আমার। ওই আমার একমাত্র বন্ধন। হ্যাঁ, হিমাদ্রি আমি স্বীকার করছি খুকীর মঙ্গলের জন্যে আজও আমি স—ব করতে পারি। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না আমার। এই তো একদিন খুকীর মঙ্গল হবে মনে করেই তোমাকে সরিয়ে সুজনকে আমি প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। আবার আজ যদি রঞ্জনার জন্যে প্রয়োজন হয়, তবে হয়ত সেই সুজনকে আমি খুনও করতে পারি। হ্যাঁ, অমন অবাক হয়ে দেখছো কি? আমি পারি, রঞ্জনার জন্যে দরকার হলে আমি সব কিছু করতে পারি।—পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় কিছুতেই হাত কাঁপে না আমার।

উত্তেজনার মুখে এতগুলো কথা বলে ফেলেই দারুণ হতাশায় ভেঙে পড়লেন পরমেশ বাবু। প্রায় অশ্রুবিকৃত স্বরে বললেন—কিন্তু কি করতে পারলাম আমি? সমস্ত অন্তরের এই অগাধ স্নেহ দিয়ে কতটুকু মংগলসাধন করতে পারলাম মেয়েটার? অমন ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটা আমার নিয়তির টানে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেল পৃথিবীতে? আর ধরতে গেলে আমিই তাকে অকূলে ভাসালাম। একথা সত্যি যে, লোভে পড়েই এতটা অধঃপতন হল আমার। তা না হলে তোমার কাকীমা অনেক চেষ্টা

বাইরে যতদিন ছিলাম মনে মনে বড় ভাবনা ছিল কী করে মেয়েটাকে সুপাত্রে দেবো, কলকাতায় এসে মাথাটা ঘুরে গেল। নিজের মেয়েটাই যেন আবিষ্কার করলাম নতুন করে। ভাবলাম, এমন যার মেয়ে তার আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কী? তেমন একটা বড় ঘর দেখে যদি মেয়েকে তুলে দিতে পারি তবে বুড়ো বয়সে মেয়ের দৌলতেই সুখে থাকবো আমরা। উঃ হিমাদ্রি, এমন যদি না হতো। এমন করে যদি আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন না দেখতাম আমি!

পরক্ষণেই আবার রাগতস্বরে বলেন—কিন্তু এ তুমি দেখে নিয়ো হিমাদ্রি—এত সহজে হাল ছাড়বো না আমি। আমার একমাত্র সন্তানের জীবনে যদি এতটুকু ক্ষতি করবার চেষ্টা করে সুজন তবে সহজে নিস্তার দেবো না তাকে। রীতিমত একটা বোঝাপড়া হবে এবার। কিন্তু একটা কথা তুমি আমার রাখো হিমাদ্রি—আজ রাত্রের গাড়ীতে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো হাজারিবাগে। তুমি সঙ্গে থাকলে অনেকটা ভরসা পাই হিমাদ্রি! তোমার কাকীমাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। তোমার ওপরে তার অগাধ নির্ভরতা—

—না না, তা কী করে সম্ভব? আমি কেন যাবো? বাড়ীতে মা নিছক একা থাকবেন। তাছাড়া আপনি বুঝতে পারছেন না, সুজন বাবুরা হয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে নেবেন আমার যাওয়াটাকে। ভাববেন, তাঁদের বিপদের দিনে তামাসা দেখতে গেছি আমি।

—না-না সে অসম্ভব। আপনি বরং অন্য কারোকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমায় নয়···আমায় আপনি ক্ষমা করুন—

এর পরে আরও দু'-একবার অনুরোধ করে পরমেশ বাবু। বলেন —না হিমাদ্রি, তোমাকে আর কোন কারণেই ভুল বুঝতে দেবো না আমি। রঞ্জনাও আমার তেমন মেয়ে নয়। একমাত্র সুজন যদি বাঁকাভাবে নেয় কথাটাকে। কিন্তু আমি বলবো আমাদের পরিবারের পুরোন বন্ধু হিসাবে তোমার নিশ্চয় অধিকার আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার।

ম্লান একটু হেসে হিমাদ্রি উত্তর দেয়—আপনি আমি পুরোন বন্ধু বলে আমাদের সম্বন্ধটাকে যত সহজে বজায় রেখেছি অন্যের পক্ষে কী অত সহজে মেনে নেওয়াটা সম্ভব? বিশেষ করে সুজন বাবুর পক্ষে?

—তা বটে তা বটে। একদিক থেকে কথাটা তুমি ঠিকই বলেছো। তবু তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমার দিক থেকে অনেক সুবিধা হতো। আমি যেন ভাবতেই পারছি না সেখানে গিয়ে কী অবস্থায় দেখবো।

—না না অত ভয় পাচ্ছেন কেন? হয়ত দেখবেন তেমন কিছুই হয়নি।

—হেঁ হেঁ, রঞ্জনার মা-ও তাই বলছিল একবার। হয়ত একটা বাচ্চাটাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনাও হয়ে থাকতে পারে। সুজন বাবুর তাই লজ্জা হয়েছে খবর দিতে। তা না হলে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ কেন করতে গেলো টেলিগ্রামটা? তোমার কী মনে হয়? কী বলো?

নিজের মনের খবরটা আর পরমেশ বাবুকে খোলসা করে জানাতে পারে না হিমাদ্রি, মৌখিক একটু হেসে এ প্রসঙ্গে ইতি টানে। বলে—আচ্ছা, আজ রাত্রের গাড়ীতেই যখন যাবেন তখন আর দেরী করাবো না আপনাকে। চলুন একটু এগিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে।

কথা কইতে কইতে পরমেশ বাবুকে তাঁর বাড়ীর দরজা পর্য্যন্তই এগিয়ে দিয়ে এলো হিমাদ্রি। ওকেও নামবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন পরমেশ বাবু। কিন্তু হিমাদ্রি আর রাজী হল না নামতে। কারণ মলিনা দেবীর কাতর অনুরোধ তার পক্ষে এড়ানো যে কঠিনতর কষ্টসাপেক্ষ হবে তা' সে জানে। তাছাড়া নিজেকে এবার একটু একলা পেতে চায় হিমাদ্রি। মনটা তার তাড়া-খাওয়া খরগোশের মত মুখ লুকুতে চাইছে—পালাতে চাইছে পরিচিত জনসান্নিধ্য থেকে।

একা গাড়ীতে বাড়ী ফেরবার সময় কত কথাই ভাবলো হিমাদ্রি। সুজনের কথা, রঞ্জনার কথা, পরমেশ বাবুর কথা।

—রঞ্জনাকে উনি ভালবাসেন। নিজের মুখেই তো বললেন সে ভালবাসার কোন মাপকাঠি নেই। তা সে তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্চর্য্য না হয়ে পারে না হিমাদ্রি যে অত স্নেহের পাত্রীর অসুস্থতার সংবাদে ঠিক অতখানি ব্যাকুল হননি পরমেশ বাবু। বরং রঞ্জনার তরফ থেকে ডাক এসেছে রঞ্জনাকে তিনি এবার কাছে ফিরে পারেন, এ খবরে নিজের অজান্তেই উনি যেন একটু খুশী হয়েছেন বলে বোধ হয়। তাই প্রথমটায় খুব নার্ভাস হয়ে পড়লেও নিজের মনেই কতকগুলো সান্ত্বনাও রচনা করে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। তবে হিমাদ্রিকে এবার উনি দয়া করে মুক্তি দিলেই পারেন। সুজন আর রঞ্জনা ফিরে এলে পরমেশ বাবুর সুখের সংসার হিমাদ্রি সেখানে একান্ত অবাঞ্ছিত হয়ে যাবেই। না না, আর ওদের বাড়ী গিয়ে নিজেকে লোক-চক্ষে এভাবে হাস্যাস্পদ করে তুলবে না হিমাদ্রি—কিছুতেই নয়।

[ক্রমশঃ।

গৌরীশঙ্কর মজুমদার

জল জল আর জল, যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই জল। যেন আকাশ আর জলে মিশে গিয়েছে। তার মধ্যে মাঝ দরিয়ায় একটি মাত্র শব্দ ছপ্‌-ছপ্‌-ছপ্‌। একটি হারিকেন টিপ-টিপ করে জ্বলছে, তাতে কেবল সেই সীমাবদ্ধ জায়গাটুকু ভাল দেখা যাচ্ছে। আকাশের উপর তারার মেলা আর মাথার উপর পূর্ণাঙ্গ চাঁদ যেন তার সব জ্যোতি জলের উপর দিচ্ছে। অগণিত তরঙ্গমালার সাথে চাঁদের শুভ্র আলোর যেন এক মিতালী ঘটেছে। শুধু একটি মাত্র প্রাণী নৌকায় বসে তামুক টানছে।

প্রাণ যেন বেরিয়ে যায় আর কতক্ষণ ধরে রাখবে, তবুও আপ্রাণ চেষ্টায় ছুটছে জোরে খুব জোরে। পিছনে তাকিয়ে দেখে সেই বিরাট দৈত্যটা লম্বা পা বাড়িয়ে যেন ডাকছে, আয় না ভয় পাচ্ছিস কেন? সামনে তাকাতেই একটা আলো যেন চোখটাকে ধাঁধিয়ে দিল। আর ভয় কি, এই তো জনপদে এসে পড়েছি, একবার পৌঁছে নিই, তারপর দেখে নেব।

আয় না পালাচ্ছিস কেন, আয় না।

না না।

কেন আমি কি তোকে খেয়ে ফেলবো?

হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাবছো আমি যেন কিছু বুঝতে পারি না তাই না? এখন বেশ আদর করে ডেকে পরে হাড়ের গুঁড়ো রেখে দেবে। জীবন থাকতে তা হবে না।

আমাকে বিশ্বাস করছিস না? তবে দাঁড়া—

প্রাণপণে ছুটছে আর দৈত্যটাও বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ পা পিছলে বালুর উপর পড়ে গেল আর সেই দৈত্যটা এসে বুকের উপর চেপে বসল। বাঁচাও শের আলি, ফকির মিঞা, বসির সাহেব বাঁচাও। ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠল মীরমদন। না, না, আমি মরব না কিছুতেই না; বলতে বলতে মীরমদন দাঁড়িয়ে উঠে ছুটতে যাবে এমন সময় বসির সাহেব বাঁ হাতে তাকে ধরে ফেলল। চমক ফিরতে মীরমদন দেখল অন্ধকার রাত্রি আর এক টিপটিপে আলোতে বসির সাহেব তখনও তামুক টানতে ব্যস্ত। স্বপ্ন বুঝতে পেরে একটু মুচকি হেসে মীরমদন বসির সাহেবের পাশে বসে পড়ল। নৌকাটা ঠিক আগের মতন ছপ ছপ শব্দ করতে করতে চলে যাচ্ছে।

আজ প্রায় সুদীর্ঘ আট বৎসর এই জলের উপর মীরমদনের কেটে যাচ্ছে। নামে মাত্র সে একটা কুঁড়ে ঘর করে রেখেছে, তাও প্রায় ডাঙ্গা থেকে তিন মাইল দূরে একটি ছোট ত্রিভূজাকৃতি দ্বীপের উপর। নারিকেল পাতার ছাউনি, যত সব আগাছা ডাল-পালা দিয়ে বেড়া। কিন্তু যখন সে ভেতরে আসে তখন মনে করে যেন সে রাজপ্রাসাদে শুয়ে আছে। কেউ তাকে কিছু বলে না। নিজের অবাধ স্বাধীনতা এই ছোট দ্বীপটির উপর।

একবার একটা ছোট গ্রামের কাছে তাদের ছিপ নৌকাটা ভিড়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে মাঝবয়সী এক লোকের সঙ্গে মীরমদনের আলাপ হয়। ক্রমে আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠে। একদিন সেই লোকটি মীরমদনকে তার জীবনের ঘটনা বলতে বলে।

মীরমদন বললে, চট্টগ্রামের এক দরিদ্র মুসলমান-পরিবারে তার জন্ম। বাবা-মার অনেক প্রার্থনার ছেলে। বড় আদর-যত্নে আমি মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু জানিস ভাই, ছোটবেলা থেকেই যেন ভাল জিনিষকে ভাল মনে হত না। মারামারি কাটাকাটি দলবদ্ধ হয়ে চুরি করা খুন করা এই সমস্ত কাজে বেশ আনন্দ পেতাম। চোখের সামনে কত আত্মীয়-স্বজন কত লোককে মরে যেতে দেখেছি আর তাদের কান্না ও বিলাপ শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই মনকে গলাতে পারতাম না। সব যেন মনে হত মিথ্যা। লোকে জীবহত্যা করলে আহা-উহু করে, আর আমি বলতাম, কি রে কেমন বেশ ভাল লাগল তাই না? এ ভাবে যে কত জীবহত্যা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। একবার এক বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে ঢুকেই দেখি, স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিতা এক মহিলা ঘুমাচ্ছে। সাথে সাথে একটা ঔষধ নাকের সামনে ধরতেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়, ধীরে ধীরে সমস্ত গহনা খুলে নিজের কোমরে বেঁধে ফেললাম। এতটা কাজ, নিমেষের মধ্যে এবং বেশ হাসিমুখে করেছিলাম। বাড়ীতে এই সমস্ত কৃতিত্বের জিনিষ দেখানর সাথে সাথে বাবা-মা একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

ছিঃ, এতবড় নিষ্ঠুর পাপী কুলাঙ্গার তুমি?

না বাবা।

ফের না বলছ কোন্ মুখে, একজনের সখের জিনিষ আর তুমি তা চুরি করে নিয়ে এসেছ?

অন্যায় আমি করি নাই বাবা।

এর চাইতে আর বড় নিষ্ঠুর কাজ কি হতে পারে যা তোমার কাছে অন্যায়?

কেন বাবা, একদল লোক যারা সমাজের উচ্চস্থানে বসে ঐশ্বর্য্য লুঠে খাবে দরিদ্ররা সেখানে গেলে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দেবে, হাত পাতলে একটা পয়সা দিবে না। কেবল ঘৃণা আর কেবল ঘৃণা। কেন এমন হবে? কিন্তু কোন

দিনে
দিনে
দিনে
দি...
রেক্সোনা সাবানে 'ক্যাডিল'
বলে একটি বিশেষ ধরনের তেল
মেশানো হয়, যাতে ত্বক আরও
কোমল, আরও সুন্দর, আরও
লাবণ্যময়ী হয়...! সুবাস ভরা রেক্সোনার
পরশ সারাদিন আপনাকে সজীব আর
সতেজ রাখে। সৌন্দর্য্য সাধনায় সর্ব্বদা
রেক্সোনা ব্যবহার করুন।
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে আপনার ত্বককে আরও লাবণ্যময়ী করে।
রেক্সোনা প্রেপাইটরী লিঃ অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ তৈরী।
RP. 165-X52 BG

কিছুতেই কর্ণ হল না। বাবা মা ঐ অপরাধ ক্ষমা করলেন না। বাড়ী হতে আমাকে বার করে দিলেন আর বললেন যে, আজ হতে আমরা মনে করব আমাদের মৃত সন্তান।

তারপর থেকে জীবন আরও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলল। চবঘুরের মত রাস্তায় ঘুরে বেড়ান আর অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়া। একদিন এক গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি পিছন থেকে যেন একটা ডাক এল—কি রে কোথায় যাচ্ছিস শোন না।

একবার পিছন তাকিয়ে আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু নিস্তার কোথায়? দেখি যে সেই লোকটা একেবারে সামনে এসে দাড়িয়ে পড়েছে।

চল না দুটো কথা বলবি বসে।

কোন উত্তর দিলাম না।

আরে চল না দোস্ত, লজ্জা করছিস কেন?

না না লজ্জা না।

ব্যস, তবে আর কি চলে আয়।

পিছু নিলাম। খানিকটা আসার পর একেবারে ঘাঁটিতে এসে পড়লাম। দেখি যে খুব হাসি, ঠাট্টা-তামাসা আর সাথে সাথে মদ।

ওস্তাদ চেয়ে দেখ।

একটু চোখ বাঁকা করে দেখে ওস্তাদ বলল, কি রে নয়া শিকার করলি বুঝি? তা বেশ হয়েছে এখন ভাল করে তৈরী কর।

হো-হো, হা-হা, হি-হি শব্দে হেসে উঠল ওস্তাদ। তারপর একটু থেমে বলতে লাগল, জানিস অনেক বেটাকে এখানে আসতে হবে অনেক কিছু শিখবার জন্যে—আবার আরম্ভ হল হা-হা, হো-হো—আর খাচ্ছে মদ।

আবহাওয়াটা তখন যেন সেরকম ভাল লাগল না, কিন্তু সেই বন্ধু পীরমহম্মদ পরে তার ওস্তাদের অনেক প্রশংসা করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা ভাই, তোমরা সব কি কর?

আরে সে তুই জানিস না, ও তাছাড়া তোকে বলাও হয়নি।

না বলনি ত ভাই।

বুঝলি, বলতে গেলে আমরা সব এক একজন রাজা।

কি রকম? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমরা জলদস্যু, যখন যে অভিযানে যাই থলে থলে সোনাদানা টাকাকড়ি আর সব দামী জিনিষ নিয়ে আসি। তারপর বেশ কয়েক দিন হাসিহল্লা, মদমাংস আর জুয়া খেলে কাটিয়ে দিই।

কি রকম করে এসব তোমরা পাও আমি পীরমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে কাজ খুব সোজা রে। ধর না কেন, পাঁচ ছয়জন একটা নৌকা নিয়ে দুপুর রাতে বড় নদীতে বেরিয়ে পড়ি। হয়ত দূরে একটা বড় নৌকা দেখতে পেলাম, আস্তে আস্তে আমাদের নৌকা তার কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর বুঝলাম বেশ কিছু পাওয়া যাবে, ব্যস আর কি, হৈ-হৈ মার-মার করে গিয়ে উঠে পড়লাম, তারপর যা করলাম তা বেশ বুঝতেই পারছিস, কি বল মীরমদন?

শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল, পীরমহম্মদকে তখন আর কিছু বললাম না।

সারারাত ঘুম হল না, কেবল ভাবতে লাগলাম, কি করব। একবার সোনার রঙ একবার টাকার ঝনঝনানি শব্দ এবং সেই সাথে খুনের প্রচণ্ড নেশা এই তিনটে মিলিয়ে যে আমাকে পাগল করে তুলল, কি করব কি করব। পরক্ষণে ভাবলাম তাইতো করবই বা কি। পিছনে তাকাতে দেখি সব অন্ধকার, সব যেন দূরে সরে যাচ্ছে। কোন দিশা ঠিক করতে না পেরে পরদিন পীরমহম্মদকে বললাম, ভাই, ওস্তাদের দয়া কি আমার উপর হবে?

সাবাস বেটা সাবাস, বলে পিঠে দুই চাপড় দিয়ে পীরমহম্মদ বলল চলে আয়।

কথাটা বলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ সেই চাপড়ে চমক ফিরতেই বলে উঠলাম, কোথায়?

আরে ওস্তাদের কাছে।

হাঁ চল যাচ্ছি।

সেই থেকে আমার জীবন জলদস্যুতে পরিণত হয়।

এ অনেক দেরী হয়ে গেল, আচ্ছা ভাই সাহেব, চললাম আজকের মত আবার যদি দেখা হয় তাহলে আরো কিছু বলব খ'ন।

ছিপ নৌকায় ফিরে আসতেই দেখি শের আলি, ফকির মিঞা সব রেগে আগুন। বলি নবাবের কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনতে পারি?

আরে চল চল, সে সব বলব 'খন।

আবার ছপ্ ছপ ছপ শব্দ আরম্ভ হল। বসির সাহেব মনের আনন্দে গান ধরল।

"সুখের লাগি ঘর বাঁধব ঠিক করেছিনু ভাই,
মন আমার কোথাও যেতে চায় না তাই।"

শুধু একটি মাত্র টিমটিমে আলো আর আমরা চারজন। এমন সময় দূরে একটা আলো টলমল করতে দেখে ফকির মিঞা মীরমদনকে বলল—এই মীরভাই।

কি কি?

আরে উঠ না, দেখ না একটা আলো টলমল করছে না?

না না।

আরে উঠ না দেখ না।

অনেক ঠেলাঠেলিতে মীরমদন উঠে দেখল, তাইতো আলোটা অমন করছে কেন?

ও শেরভাই নৌকাটায় বোধহয় জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে। তাই অমন করছে, বলে উঠল বসির সাহেব। আর এদিকে মীরমদন ও ফকির মিঞা প্রাণপণে দাঁড় টেনে যাচ্ছে ছপাত—ছপাত—ছপাত। সকলে বেশ বুঝতে পেরে গিয়েছে যে বড় নৌকোটায় বেশ কিছু পাওয়া যাবে। তাই এত আকুল আগ্রহ। বাঁচাও কে কোথায় আছ—বাঁচাও মরে গেলাম, বাঁচাও বাঁচাও।

আর এদিকে মীরমদন বসির সাহেবকে বলল—বেশ কিছু পাওয়া যাবে কি বল বসির ভাই?

মীরমদনদের ছিপখানা প্রায় হাত তিরিশ দূরে আছে, এমন সময় সেই বড় নৌকাটা সব নিয়ে ভুস করে ডুবে গেল। সাথে সাথে মীরমদন ও আর সবাই জলে লাফিয়ে পড়ল। সাঁতার দিচ্ছে

ডুব দিচ্ছে আর হর সোনার জিনিষ নয় কোন পড় নতুবা কোন দামী জিনিষ পাচ্ছে। পাচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে তাদের ছিপ নৌকায়। যেন এসব কাজ কিছু শক্ত নয়, এ কাজে তারা অনেক অভিজ্ঞ।

আরে জলের উপর ও সাদা জিনিষটা কি কাঠের সাথে আটকে আছে? খুব জোরে সাঁতার দিয়ে কাছে গিয়ে সেটাকে টেনে ধরল। বেশ ভারি লাগছে, দু'হাত দিয়ে অতিকষ্টে টেনে তুলল, তুলেই মীরমদন একেবারে অবাক হয়ে গেল। এ কি, এটা এখনও বেঁচে আছে! ভাল করে আর দেখা হল না। কোনরকমে পিঠের উপর ফেলে নিয়ে ধীরে ধীরে ছিপে এসে উঠল। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মীরমদন।

ওদিকে শের আলি বসির সাহেব, ফকির মিঞা মীরমদনকে দেখতে না পেয়ে অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। বিরক্ত হয়ে বসির সাহেব বলে উঠল, আরে চল চল ফিরে যাই, ও শালা হয় ডুবেছে না হয় কোন কিছুতে খেয়ে নিয়েছে।

এদিকে মীরমদন আলোটা এনে সামনে ধরতেই দেখে, এক পরমাসুন্দরী কন্যা ঘুমুচ্ছে। হাতে ছোট ছোট চুড়ি, পরনে সাদা ফ্রক আর লাল ফিতা দিয়ে চুল বাঁধা, অপূর্ব্ব দেখতে লাগছে! একদৃষ্টে মীরমদন মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে, আর ভাবছে আল্লা বোধহয়, তোকে নিরালায় বসে তৈরী করেছিস, আজ তোর ভাগ্যে এই ছিল। হঠাৎ কপালের মাঝখানে একটা সরু কাটা দাগ দেখতে পেয়ে মীরমদন মনে মনে বলে উঠল—তাই তো বলি তোর রূপ ক দেখবে শুনি, কপাল যে তোর ফাটা তোর কপালে হবে না ত কার হবে শুনি? তা না হলে তোর বাপ মা সব ডুবে যায় আর তুই কি না আমার মত এক ডাকাতের হাতে পড়িস, দেখছি তোর অনেক দুঃখ আছে!

কি রে তুই বেঁচে আছিস, আমরা ভাবলাম বুঝি তোকে কুমীরে খেয়ে নিলে, কি বল ফকির মিঞা, বসির সাহেব তাই না? বলে উঠল শের আলি।

কি বলছিস শের ভাই, মীরমদন বলল। আর কি বলব বল, তোর আক্কেলের বাহাদুরি দিই, আসার সময় কি পেলি কিছুই দেখালি না আর ফিরেই যদি আসবি ত বলে এলি না কেন? আমরা সব খুঁজে খুঁজে হাল্লাক।

সর্ব্বনাশ! এই মীরমদন, এটাকে আবার কোথায় পেলি রে! মীরমদনের দিকে চেয়ে বসির সাহেব বলে উ ।

কি ভাই সাহেব কি ভাই সাহেব, বলে শের আলি ফকির মিঞা বসির সাহেবের কাছে এসে নীচে চাইতেই দেখে, সেই সুন্দর মেয়েটি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

আর বলিসনে, যত সব উৎপাত আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। দেখ ত কার না কার মেয়ে বাপ মা সব ডুবে গিয়েছে, আর এ টি ঠিক বেঁচে আছে। কেন বাবা সাথে সাথে ডুবে গেলেই চুটে যেত—সব ল্যাঠা চুকে যেত।

কি রে তোর দেখছি বেশ মায়া পড়ে গিয়েছে মীর ভাই, বলল শের আলি।

নে নে জলে ফেলে দে যত সব উৎপাত। বেশ খাচ্ছি দাচ্ছি আর ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি, কারো ধার আমরা ধারি না, কি বল বসির সাহেব? তার মধ্যে কিনা মীরভাই এক আপদ সৃষ্টি করল। অত মায়ায় নিজেকে জড়াসনে, তাহলে আসল কাজে ঢিলে পড়ে যাবে তখন কিন্তু ওস্তাদজী রক্ষা রাখবে না, এই বলে দিচ্ছি। চল, শেরভাই, ফকিরভাই আবার ওদিকে সব বোধহয় গেল। এই বলে তিন জনেই ছিপ থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ল। আর মীরমদন মেয়েটিকে সামনে নিয়ে পাথরের মত বসে রইল।

ভোর হবে হবে, অন্ধকার প্রায় কেটে উঠেছে। শেষরাত্রে মীরমদনকে একটু তন্দ্রায় ঘিরে ধরেছিল। এমন সময় মা-মা! বা-বা শব্দ হইতেই মীরমদন চমকে উঠল। ভাল করে চোখ মুছে মীরমদন মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে মেয়েটি হাসছে। তাহলে মেয়েটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, মীরমদন মনে মনে ভাবল। প্রথমে শক্ত করার চেষ্টা করল মনটাকে কিন্তু পারল না, বাধ্য হয়ে একটু ভ্রুকুটির হাসি হাসল। আর যাবে কোথায়? মেয়েটা দুহাত উঁচু করে মীরমদনের কোলে যাবার আবেদন জানাল।

যাঃ যাঃ অত সুখ খায় না, বেঁচেছিস এই না, কত মনে মনে বলতে লাগল মীরমদন। কিন্তু পার হয়ে যাওয়া কি অত সোজা, আরোও তাড়াতাড়ি মা-মা বা-বা বলতে বলতে মেয়েটি মীরমদনের দিকে চেয়ে হাত-পা ছুড়তে লাগল।

কেমন যেন এক আবেগের মাথায় মীরমদন বিদ্যুতের বেগে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

না না আমি এমন হতে পারব না কিছুতেই, না বলে মেয়েটাকে কোল থেকে ঝপাৎ করে শুইয়ে দিয়ে পিছন ফিরতেই দেখে শের আলি, বসির সাহেব সব হাসছে।

দেখ না বসির সাহেব এ এক বড় উৎপাত হয়েছে তাই না?

তাই নাকি মীরভাই? নে আর অভিনয় করতে হবে না, এখন চল তোর ঘরে চল, অনেক বেলা হল।

চল বসির সাহেব, তাই চল বড় ক্লান্ত লাগছে।

আবার শব্দ আরম্ভ হল ছপাত-ছপাত-ছপাত—শের-আলি ও ফকির মিঞা দাঁড় বাইতে লাগল। ধীরে ধীরে ছিপ নৌকাটা সেই দ্বীপটার গায়ে এসে লাগল।

নে চট করে নেমে পড়, আবার পরে তোর সাথে দেখা করব'খন বলে উঠল বসির সাহেব।

তত দিনের যেন অভিজ্ঞ বেশ যত্নের সাথে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে এক-পা দু'-পা করে এগুতে লাগল মীরমদন।

একবার পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল, বসির সাহেব ও ফকির মিঞা হাত নাড়ছে আর হেসে যেন বলছে—যা দোস্ত, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। ধীরে ধীরে তারাও মিলিয়ে গেল।

মীরমদন ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে তার সেই বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন কিছু খাবারের যোগাড় করতে হবে, তা না হলে মেয়েটা মরে যাবে। মনে মনে বলতে লাগল মীরমদন।

হঠাৎ দূরে একটা মোটাসোটা ছাগলকে ঘাস খেয়ে বেড়াতে দেখে মীরমদন কাছে গিয়ে ধরল এবং খপ করে ছাগলটাকে তার সেই কুঁড়ে ঘরের কাছে নিয়ে এসে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ঘরে ঢুকে দেখে, মেয়েটা ভীষণ ভাবে কাঁদছে। একটু যেন মায়া হল, তাই বলে উঠল, এই ত হয়ে গিয়েছে—দিচ্ছি মা, বলে একটা বাটিতে খানিকটা দুধ নিয়ে পাতার আগুনে গরম করে খাইয়ে দিল। ব্যস্, সাথে সাথে হাসি আর বা-বা-মা-মা বলে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। মীরমদন পাশে বসে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। মেয়েটা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মীরমদনকে অন্য রকম করে ফেলল।

শুধু এই নিয়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না, তাকে আহারের সন্ধান করতে হবে, কিছু রোজগারও করতে হবে। তাই মেয়েটাকে সাবধানে ঘরে রেখে বসির সাহেব ও শের আলির সাথে এক রাত্তে সে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

সেই রাতটা বোধ হয় মীরমদনের পক্ষে শুভ ছিল। হয়ত সেই জন্তে খানিকটা দূর যেতেই একটা বড় নৌকা দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি ছিপটা চালিয়ে গিয়ে হৈ হৈ করে চার জনে উঠে পড়ল। বাঁচাও বাঁচাও, আওয়াজ আর রক্তে লাল হয়ে যেতে লাগল পাটাতনটা। তার পর মীরমদন এক জায়গায় দেখে, একটা চৌদ্দ বছরের মেয়ে ঘুমাচ্ছে। এক সেকেণ্ডের ভিতর কোমর থেকে চকচকে ছোরাখানা বের করে ফেলল। তার পর শুধু একটা শব্দ, উঃ মা! ব্যস্, আর কিছু না। তাড়াতাড়ি করে গহনাগুলো খুলে নিল। সবগুলো হাতে নিয়ে—সব পেয়েছি, সব পেয়েছি—হা হা-হা বলে জোরে হেসে উঠল।

কি রে, ব্যাপার কি? অত হাসছিস কেন? বলে উঠল শের আলি।

হা-হা-হা, হো-হো-হো শের আলি চেয়ে দেখ, জলটা কেমন লাল হয়ে গিয়েছে। বুঝলি, শেষকালে মেয়েটা বলে উঠল, উঃ মা, আহা যেন কত মা-ভক্ত বলতে লাগল মীরমদন।

কেবল ভোর হয়েছে, এমন সময় মীরমদন তার সেই কুঁড়েঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই দেখে, মেয়েটা চীৎকার করে কাঁদছে। রাগে মীরমদন জ্বলে উঠল, এই সবেমাত্র একটা খুন করে এসেছে তখনও তার নেশা কেটে উঠেনি আর হাত-পা বেশ চাঙ্গা আছে। মনে হচ্ছে আরও একটা খুন অনায়াসে করতে পারবে। তীরবেগে মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল এবং দুটো হাত মেয়েটার গলার উপর রাখল। জোর দিতে যাবে, এমন সময় একগাল হেসে মেয়েটা বা-বা মা-ম! বলে উঠল। হাত যেন আপনা থেকে সরে এলো, মীরমদন একদৃষ্টে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল।

সবটাই যেন গোলমাল হয়ে গেল। খানিকটা চুপ করে বসে থেকে খপ্ করে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে আদর করে বলতে লাগল, না রে, তোকে কি মারতে পারি? একটু পরে মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে মীরমদন ঘরের বাইরে গেল, তার পর ঘরে এসে কাজ করতে যাবে, এমন সময় চেয়ে দেখে, মেয়েটা তার কোলে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে।

ওঃ, কি আমার রাজরাণী রে! সব সময় কোলে নিয়ে থাকতে হবে। অত যদি কোলে চড়ার সখ, তবে বাপ-মাকে খেয়েছিস কেন? যত সব আপদ।

এসে পড়েছিস ত এক ডাকাতের হাতে, বেঁচে আছিস এই না কত, আবার কোলে—বলে মীরমদন নিজের কাজে মন দিল।

দেখতে দেখতে বারো মাস, বারোটা বৎসর কেটে গেল। মেয়েটা বেশ বড় হয়ে উঠল। মীরমদন তার নাম রেখেছে মুন্না। কথায় কথায় বা-জান বা-জান আর নানা রকম আবদার। মুন্নার মুখের দিকে চেয়ে মীরমদনও মায়ায় গলে যায়। তাই তার আবদার সহ্য করতে হয় আর সময় সময় শাসনও করতে হয়। কিছু দিন পর মীরমদন ঠিক করল মুন্নাকে তার যৌবনে শেখা নানা রকম খেলা শেখাবে। কারণ মুন্নাকে ছেড়ে সে কোনদিনই থাকতে পারবে, একথা সে কল্পনাই করতে পারে না। যদি মুন্না খেলাগুলো শিখে নিতে পারে, তাহলে সে এই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

সত্য সত্যই এ স্বপ্ন তার একদিন সফল হল। মুন্না মীরমদনের নির্দেশমত খেলাগুলো তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল। একদিন মুন্না মীরমদনকে বলল—আচ্ছা বা-জান, চল না, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

কেন মা?

অন্য কোথাও গিয়ে এই সব খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করব আর দুজনে বেশ সুখে থাকব। এমন মিষ্টি কথা মীরমদন যে কোন দিন শুনবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। সত্যই ত ভাববেই বা কেমন করে, খুন আর হিংসা যার জীবনের পেশা, তাকে মিষ্টি কথা বলবেই বা কে? যাকে দেখলে সবাই বাঁচাও, বাঁচাও ডাক ছাড়ে।

যাব মা যাব, মীরমদন বলে উঠল। কয়েক দিন পরে তাই সে পাগলের মতন শের আলি, বসির সাহেবদের খুঁজতে লাগল। একদিন দেখা পেতেই বড় ক্লান্ত হয়ে বলল, ভাই সব তোদের সাথে এই সুদীর্ঘকাল বেশ হাসি আর সুখের ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছে। কিন্তু তোরা জানিস, মুন্না আমাকে বড় মায়ায় ফেলে দিয়েছে। এখন ওসব খুন করতে গেলেই মুন্নার ছবি মুখের উপর ভেসে উঠে, তখন না পারি খুন করতে, না পারি ছেড়ে দিতে। তাই ঠিক করেছি, তোদের এবং ওস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। যে বসির সাহেব মীরমদনের মুখে এ রকম কথা শুনলে হেসে উড়িয়ে দিত, সেই বসির সাহেব আজ কোন কথা না বলে মাথাটা নিচু করে থাকল।

ওস্তাদজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মীরমদন বেরিয়ে পড়ল তারপর ঘুরতে ঘুরতে আরাকান নামে এক সহরে এসে উপস্থিত হল। লোকে লোকারণ্য। তাই মীরমদনের প্রথমে ভয় হয়ে গিয়েছিল। এই বুঝি তাকে চিনে ফেলল আর যদি একবার চিনতে

ধারে তাহলে মুস্কো একেবারে অবধারিত। তবুও ভয়ে ভয়ে যা ছিল সে বাঁশটা থেকে নিয়ে এসেছিল তা থেকে দুটো বাঁশ একটা ঝুলি একটা ঢোল খানিকটা মোটা তার এবং আরও অনেক কিছু কিনে ফেলল। কয়েক দিন পরে বেশ ভাল একটা পাড়া দেখে সে তার তল্পিতল্পা নিয়ে বসে গেল। ডুগ-ডুগ-ডুগ করে ঢোলটা বাজতে আরম্ভ করল। পাঁচ দশ মিনিট পর্য্যন্ত বিশেষ কোন লোক হল না দেখে মুন্না মীরমদনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে বলল, চল বা-জান অন্য জায়গায় যাই।

দাঁড়া না দেখ না।

ভেল্কির খেলা বাবু ভেল্কির খেলা, সাথে সাথে ডুগ ডুগ-ডুগ শব্দ। দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ জন লোক হতেই মীরমদন মুন্নাকে নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিল। নানারকম ভাবে ডিগবাজী খাওয়া বাঁশের ডগায় মুন্নাকে দাঁড় করিয়ে বাঁশটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখা, খালি হাতে মুন্নার তারের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া প্রভৃতি অনেক খেলা দেখাল মীরমদন। খেলা শেষ হতেই টুপ-টাপ করে অনেক পয়সাও পড়ল। মুন্না সেগুলো গুণে মীরমদনকে বলল, বা-জান দু'টাকা হয়েছে।

তাই নাকি? মীরমদন বলে উঠল।

মনে মনে বেশ আনন্দ হল মীরমদনের। সে ভাবতে লাগল, এভাবে পাঁচ জায়গায় খেলা দেখাতে পারলেই দশ টাকা আয় হবে, দুজনের খেতে চার টাকা আর মুন্নার এ জিনিষটা ও জিনিষটার জন্য এক টাকা, বাকি পাঁচ টাকা একেবারে মজুত, কি বল মুন্না?

কি বা-জান বাই, মুন্না তখন জিনিষপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিল।

না ভাবছিলাম কি যে—

কি ভাবছিলে বা-জান?

না না ও সব কিছু না, নে তুই তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে। মুন্নার সাথে সাথে মীরমদনও হাত লাগিয়ে জিনিষপত্রগুলো ঠিক করে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে অন্যত্র রওনা হল। এই ভাবে দুটো বৎসর কোথা দিয়ে কেটে গেল তা মীরমদনও জানতে পারল না।

বা-জান, ঐ কাপড়টা কিনে দেবে, মুন্না মীরমদনকে বলল। কথাটা মীরমদনের কানে গেল না। কারণ, তখন সে গভীর চিন্তায় ব্যস্ত। সে ভাবছে তাহলে আল্লা বোধ হয় মুন্নার দিকে চেয়েছে, মুন্নার একটা গতি হয়ত সে করতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণে মুন্নাকে ছেড়ে থাকতে হবে চিন্তা করে মীরমদন শিউরে উঠল। মুন্না আবার বলতে লাগল ও বা-জান, দেখনা ঐ কাপড়টা আর ঐ খেলনাটা কিনে দেবে, দাও না, বা-জান। মীরমদনের এতক্ষণে চমক ভাঙল, কিরন্তেই বলে উঠল, ওঃ ওঃ, ঐ কাপড়টা আর খেলনাটা আচ্ছা তোকে কিনে দেব খন। এই সব কথা বলতে বলতে তারা সেই বড় দোকানটা ছাড়িয়ে চলে গেল। খানিক দূরে গিয়ে সে মেয়েকে বলল কি করবি মা ঐ কাপড় আর খেলনা নিয়ে? আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, কেই বা দেখবে ওসব। তার চেয়ে দেখবি তোর সাদীর সময় আমি কত ভাল

কাপড় কিনে দেব, কি বল মা তাই না? মুন্না তখন একটু আহ্লাদের সুরে বলল, আচ্ছা আচ্ছা সে হবে 'খন পরে, এখন তুমি ওটা কিনে দাও না বা-জান। মুন্নার কথা শেষ হতে না হতেই ও ফেরিওয়ালা বলে ছুটো আওয়াজ মীরমদনের কানে এল। পিছন ফিরতেই দেখে, এক তিনতলা বাড়ীর বারান্দা থেকে একটি মহিলা তাকে ডাকছে। সেই বাড়ীর সামনে যেতেই মহিলাটি তাকে তার খেলা আরম্ভ করাতে বলল। মীরমদনও সব ঠিকঠাক করে নিয়ে ঢোলে আওয়াজ করল ডুগ-ডুগ-ডুগ।

দেখতে দেখতে বেশ ভীড় জমে গেল আরও, মুন্নাও মীরমদনের সাথে বাঁশের খেলা নানারকম ডিগবাজী দেখাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মীরমদন তার কাঁধ থেকে ঢোলটা নামিয়ে বলতে আরম্ভ করল ভাই সব, এবার যে খেলাটা আপনারা দেখতে পাবেন তা খুবই শক্ত ও ভয়ের কিন্তু এই আমার মেয়ে মুন্না কেমন সহজে তা করে ফেলবে। এই বলে মীরমদন ঢোলটা কাঁধে নিয়ে শব্দ করল ডুগ-ডুগ-ডুগ। ওদিকে মুন্না খালি হাতে একটা তারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে আরম্ভ করল এবং দর্শকরাও বেশ আগ্রহের সাথে দেখতে লাগল। হঠাৎ মুন্নার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল, তখন সে আর তাল ঠিক না রাখতে পেরে সোজা মাটিতে পড়ে গেল। কি হল কি হল দেখি দেখি বলতে বলতে সব লোক এসে সেখানে ঘিরে ধরল। এ রকম যে একটা ব্যাপার হয়ে যাবে এ ভাবতেও পারেনি সেই তিনতলার বাড়ীর মহিলা। তবু ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর কর্তাকে সাথে নিয়ে সোজা এসে ভীড়ের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তারপর ভীড় ঠেলতে ঠেলতে সামনে এসে হাজির হলেন। এসে দেখতে পেলেন মীরমদন, মুন্না তোর কি হল মা বলে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। আঘাতটা বেশ গুরুতর হয়েছে বুঝতে পারলেন সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। তাই তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী ডেকে অচৈতন্য মুন্নাকে তুলে দিলেন গাড়ীতে সেই ভদ্রলোক তাঁর আবদুল সাহেব। মীরমদন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পাশে বসে মিনতির সুরে জিজ্ঞাসা করল, বাবু আমার মুন্না মা ভাল হয়ে যাবে বাবু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ কেন যাবে না?

গাড়ী তখন তীব্রবেগে ছুটে চলেছে সদর হাসপাতালের দিকে। কোথায় থাকল মীরমদনের ঝোলাঝুলি আর কোথায় থাকল তার সম্বল যা সে দ্বীপটা থেকে নিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'ইণ্টারনাল হেমারেজ' কি হবে তা বলা শক্ত, তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আবদুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদনকে অন্তভাবে বুঝিয়ে বললেন, একটু জোরে আঘাত লেগেছে, তবে দুদিনে সেরে যাবে, তুমি কিছু ভেব না মীরমদন!

আচ্ছা বাবু, আল্লা আপনাদের মঙ্গল করুন, আল্লা আপনাদের সুখী করুন।

আবদুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদনকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মীরমদন কিছুতেই শুনল না। তাই তাঁরা মীরমদন পাগলের মত হাসপাতালের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা রাত চলে গেল অনাহারে অনিদ্রায়, নানা চিন্তা, ভাবনার ভিতর দিয়ে। মনে হতে লাগল মীরমদনের সেই গভীর রাত্রে নদীর বুক থেকে মেয়েটার প্রাণ রক্ষা করার কথা। মনে পড়ল মুন্নার আবদার ও গায়ে পড়ার ভাব যা কিনা তার মত নিষ্ঠুর নির্দয় জলদস্যুকে মায়ায় আবদ্ধ করেছিল। সে নিজে কিছুতেই মায়ায় জড়াবে না, এমন কি তার বন্ধু বসির সাহেব বলেছিল 'আরে নিজেকে অত মায়ায় জড়াসনে' হয়ত ওদের কথা শুনলে তাকে আজ এমন হতে হত না। যত সব ঐ মুন্নার জন্তে। আবার মনে পড়ল সেই বড় দোকানটার কাছ দিয়ে আসবার সময় মুন্নার আহ্লাদের কথা—'বা-জান ঐ কাপড় আর খেলনাটা আমায় কিনে দেবে। ও বা-জান শুনছ না কেন?'

সব মিলিয়ে যেন মীরমদনকে আরও পাগল করে তুলল। স্থির থাকতে না পেরে একেবারে সোজা সেই তিনতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

কি মীরমদন—আবদুল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

বাবু, আমার মুন্না কেমন আছে? ও ভাল হয়ে যাবে ত বাবু? তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব।

না না ও সব ভাল হয়ে যাবে, তুমি অত পাগল হচ্ছ কেন মীরমদন!

আল্লা আপনাকে সুখী করুন আপনার মঙ্গল করুন, বলতে বলতে মীরমদন চলে গেল।

পরদিন বৈকালবেলায় আবদুল সাহেব খবর নিতে গিয়ে শুনলেন যে মুন্না এক ঘণ্টা আগে মারা গিয়েছে। জ্ঞান সে ফিরে পায় নি, শুধু শেষ সময়ে কোনরকমে একবার বা-জান বলে ডেকে উঠেছিল। ব্যস, তার পর সব শেষ হয়ে যায়।

মীরমদন আসতে আবদুল সাহেব অতিকষ্টে তাকে জানালেন আর সাথে সাথে নিজেও কেঁদে ফেললেন।

বাবু আমার মুন্না নেই, আমার মুন্না নেই বলে বুকফাটা কান্না কেঁদে উঠল মীরমদন। তারপর একটু পরে মুন্না, মুন্না, মা আমি যাচ্ছি বলে ছুটতে আরম্ভ করল অচেনা পথের দিকে। আবদুল সাহেব ও তাঁর স্ত্রী মীরমদন কোথায় যাও শোন একবার শোন—বলে বার বার ডাকতে লাগলেন। কিন্তু সে কথা আর মীরমদনের কানে গেল না।

একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রাম-সীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয় সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি, বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা কেবল বর্ণনামাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্ত নৃপতিদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীনভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল কবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান। —বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার রূপ লাবণ্য আপনারই হাতে!

মুখশ্রীকে অকারণ রোদে—ধুলোয় কালো বা নষ্ট হতে দেন কেন? চেহারার লাবণ্যতা রক্ষার ভার হিমালয় বুকে স্নোর ওপরই ছেড়ে দিন—তারপর দেখুন চেহারার চমক। একটু খানি হিমালয় বুকে স্নো ঘষে দেখুন, হারানো কান্তি ধীরে ধীরে আবার কেমন ফিরে আসছে! ক্লান্ত শুষ্ক ত্বক সজীব হয়ে উঠছে! হিমালয় বুকে স্নো আপনার মুখে কখনও ব্রণ বা দাগ পড়তে দেবে না। নিজের চেহারায় দেখুন···লাবণ্যতা এনে ধরেছে···

হিমালয় বুকে স্নো!

Erasmic

হিমালয় বুকে স্নো

HIMALAYA BOUQUET SNOW

ইরাসমিক লণ্ডনের পক্ষে, ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

গহনা

গী দ্য মোপাসাঁ
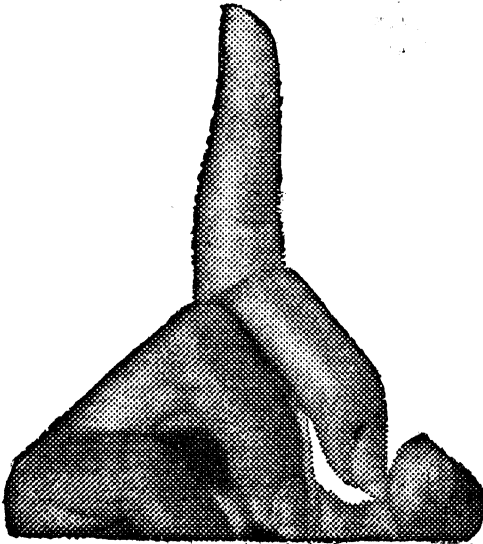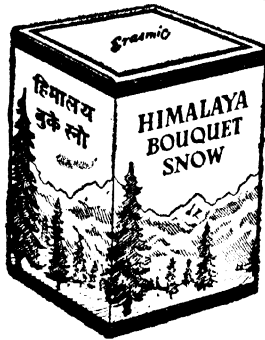
সুশ্রী, লাবণ্যময়ী মেয়ে তিনি। যেন ভাগ্যের দোষে কেরাণী-পরিবারে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর কোন সম্পত্তি ছিল না এবং কোন ধনী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সংগে পরিচিত হবার সম্ভাবনা বা ভালবাসা অথবা বিয়ে হবারও কোন আশা ছিল না। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের এক সামান্য কেরাণীর সাথে বিয়ে হল তাঁর

কোন গয়না পরবার সামর্থ ছিল না, তাই অতি সাধারণ ভাবে থাকতেন। অসুখী—শ্রেণীচ্যুত তিনি। মেয়েদের জাতি ও শ্রেণী নেই, সৌন্দর্য এবং লাবণ্য দিয়েই তাদের জন্ম ও পরিবার নির্ধারণ করা হয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য, ও মার্জিত প্রবৃত্তি এবং মনের নমনীয়তা দিয়েই তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সাধারণ মেয়েদের এই সব গুণগুলি থাকলে তারা সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সংগে এক পংক্তিতে স্থান পাবে।

কষ্টের শেষ নেই তাঁর। সৌন্দর্য এবং বিলাসিতার জন্যই যেন জন্মেছেন—এই মনে করতেন তিনি। দীন আবাসালয়, শোচনীয় দেয়ালগুলি, বসবার জীর্ণ আসন আর কদর্য পোষাক তাঁকে উৎপীড়িত করে, ক্রোধানলে জ্বালিয়ে দেয়। 'ব্রিটানি'র ছোট মেয়েটি যখন তাঁর ঘরের কাজ করতে আসে তখন তাকে দেখে মনে পড়ে যায় হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের কথা। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন।··· ভাবতে থাকেন সেই ঘরগুলির কথা আর ব্রোঞ্জ-নির্মিত মশাল দীপালোকে উদ্ভাসিত সুশোভিত দেয়ালগুলির কথা···খাটো সার্ট পরিহিত দীর্ঘাকৃতি দু'জন পরিচারক প্রশস্ত কেদারায় তন্দ্রা যায়··· আর কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের সৃষ্টি করা হয় কক্ষে। ভাবতে থাকেন প্রাচীন রেশমী-কাপড়ে সুশোভিত কক্ষগুলির কথা। সৌখীন আসবাবপত্র, যার ভেতর শোভা পায় বহুমূল্যের অলংকার। মনে পড়ে সুবাসিত সুদৃশ্য ক্ষুদ্র কক্ষগুলির কথা—যেখানে অন্তরংগ বন্ধু বা পরিচিত অথবা বিশিষ্ট ভদ্রলোক—যাদের সব স্ত্রীলোকেরাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, তাদের সংগে পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলাপ করা যায়।

গোলাকৃতি টেবিলে তিনি আর তাঁর স্বামী সামনা-সামনি খেতে বসলেন। তিন দিন ধরে টেবল-ক্লথটা বদলান হয়নি। ভদ্রলোক স্যুপের ঢাকনাটা খুলেই উল্লসিত হয়ে বললেন—"আ! গরুর মাংসের স্যুপ। এর চেয়ে আর কিছুই আমার ভাল লাগে না।" স্ত্রীলোকটির চোখে আবার ভেসে ওঠে অতীত দিনের কাল্পনিক ছবি। ভাবতে থাকেন তৃপ্তিকর আহার্যের কথা। ঝকঝকে রূপোর বাসনপত্র আর "বিগতদিনের মানুষ এবং পরীদের বনের ভেতর বিচিত্র পাখী" এই ছবি দিয়ে সাজানো দেয়াল কাগজগুলোর কথাও ভাবেন। কল্পনায় দেখতে পান···এই ত মাছ আর জেলিনোভের ডানা খেতে খেতে স্তুতিবাদ শুনছেন আর অধরে ফুটে উঠছে স্ফিংকসের হাসি।

তাঁর না আছে ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ না রত্নালংকার। শুধু এই সবই তাঁর ভাল লাগে, এই সবের জন্যই যেন জীবন। তিনি চাইতেন তাঁকে দেখে সবাই ঈর্ষা করুক, প্রলুব্ধ হ'ক। আরও চেয়েছিলেন নিজেকে দুর্লভ করতে।

কনভেন্টের এক ধনী বান্ধবী ছিল তাঁর কিন্তু তার কাছে আর যেতেন না। বান্ধবীর বাড়ী থেকে ফিরে এলে ভীষণ কষ্ট হ'ত নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে ক'রে। সারা দিন দুঃখে হতাশায় কাঁদতেন।

একদিন বিকেলে তাঁর স্বামী হাতে একটা বড় খাম নিয়ে গর্বিতভাবে বাড়ীতে ঢুকলেন।

"এই নাও তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।"

তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে একটা ছাপান কার্ড বের করলেন, তাতে লেখা ছিল এই—

"শিক্ষামন্ত্রী এবং মাদাম জর্জ রাঁপনো মঁসিও এবং মাদাম লোয়াজেলকে ১৮ই জানুয়ারী সোমবার রাত্রে মন্ত্রীর বাসভবনে আসবার জন্য বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।"

স্বামী আশা করেছিলেন স্ত্রী খুব খুসী হবেন কিন্তু তিনি কার্ডটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—"এ দিয়ে আমি কি করব?"

"ওগো, আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব খুসী হবে। তুমি তো বের হও না এটা একটা সুন্দর সুযোগ। কার্ডটা সংগ্রহ করতে আমার অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কেরাণীদের বেশী কার্ড দেওয়া হয় না আর সবাই এটা চায়। তুমি ওখানে গিয়ে দেখবে সবাই সরকারী কর্মচারী।"

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীর দিকে···ধৈর্য্যচ্যুত হল তাঁর "ওখানে আমি কি পরে যাব?"

এত ভাবেনি তাঁর স্বামী; ইতস্ততঃ করে বলেন—"যে পোষাকটা পরে তুমি থিয়েটারে যাও সেটাও আমার বেশ লাগে—আমার কাছে—"

বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন···স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

দু' ফোঁটা বড় বড় চোখের জল চোখের দু' কোণ থেকে আস্তে আস্তে বেয়ে মুখের কোণের দিকে গাড়িয়ে পড়ল।

স্বামী তোৎলাতে থাকেন—"কি হ'ল? কি হ'ল?"

প্রচণ্ড চেষ্টায় নিজের কষ্টকে চাপেন—অশ্রুসিক্ত কপোল দু'টি মুছে শান্ত কণ্ঠে বলেন—"কিছু না। শুধু আমার সাজবার জিনিস নেই বলেই এই উৎসবে যাব না আমি। কার্ডটা তোমার সহকর্মীদের কাউকে দিয়ে দাও, তাদের স্ত্রী আমার চাইতে ভাল পোষাক পরতে পারবে।"

স্বামীর দুঃখ হল। বলেন—"শোন মিতিল্‌দ্! একটা চলনসই পোষাকের কত দাম হবে? সেটা পরে তুমি অন্য উৎসবেও যেতে পারবে।"

একটু চিন্তা করলেন তার স্ত্রী এবং এমন একটা সংখ্যার কথা ভাবলেন যেটা শুনে মিতব্যয়ী স্বামী ভীতিপ্রদ আর্তনাদ না করে অথবা সংগে সংগে প্রত্যাখ্যান না করে। একটু ইতস্ততঃ করে বলেন—"আমি ঠিক জানি না তবে মনে হয় যে চারশো ফ্রাঁ-তেই হয়ে যাবে।"

স্বামীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সামনের গ্রীষ্মের সময় বন্ধুদের সংগে নাঁত্যারে প্রতি রবিবারে আলুয়েত পাখী শিকার করতে যাবার পরিকল্পনা ছিল তার। বন্দুক কেনবার জন্য এই টাকাটাই তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন। তবুও বললেন—"বেশ তাই হবে। আমি তোমায় চারশো ফ্রাঁ দিচ্ছি আর ভালো দেখে একটা পোষাক কিনবার চেষ্টা কর।"

উৎসবের দিন এগিয়ে আসে। মাদাম লোয়াজেলকে কেমন উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ দেখায়। পোষাক তাঁর তৈরী। একদিন বিকেলে স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করেন—"কি হয়েছে তোমার? আজ তিন দিন ধরে তোমাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?" জবাব দেয় মাদাম লোয়াজেল—"কোন দামী পাথর অথবা অলংকার নেই বলে অস্বস্তি লাগছে আমার। উৎসবের দিন ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে না আমার।"

"প্রকৃতির ফুল দিয়ে সাজবে তুমি। এই সময়ে ফুলগুলিও ভারী সুন্দর। দশ ফ্রাঁ-তেই দু'-তিনটে চমৎকার গোলাপ পাবে।"

কথাটা মনঃপুত হল না মাদাম লোয়াজেলের।

"না। ধনী স্ত্রীলোকদের ভেতর দীনভাবে যাবার মত অবমাননাকর আর কিছুই নেই।" বলেন তিনি। তাঁর স্বামী চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—"তুমি কি বোকা! তোমার বন্ধু মাদাম ফরেসতিয়ের কাছ থেকে গয়না ধার করে নিয়ে এসে যাও। তোমার সংগে তার যথেষ্ট বন্ধুত্ব আছে, আর সে দেবেও গয়না।"

আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন মাদাম লোয়াজেল—"ঠিক। এটাতো আমি কখনও ভাবিনি।"

পরদিন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তার দুঃখের কাহিনী বলেন বন্ধুকে।

মাদাম ফরেসতিয়ে কাচের আলমারী থেকে গয়নার একটা বড় বাক্স বের করে, সেটা খুলে মাদাম লোয়াজেলকে বললেন—"পছন্দ করে নাও ভাই।"

মাদাম লোয়াজেল প্রথমে দেখতে পেলেন কতকগুলো বালা, তারপর একটা মুক্তার হার, ভেনিসিয়ান ক্রশ একটা, সোনা আর আর দামী পাথরের ওপর চমৎকার কাজ-করা গয়না।···আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা গয়না পরে দেখতে লাগলেন···ঠিক করতে পারেন না কোনটা নেবেন আর কোনটা ফেরৎ দেবেন। বারে বারে বলতে থাকেন—"তোমার অন্য আর কিছু নেই?"

"হ্যাঁ আছে। খুঁজে দেখ। জানি না কোনটা তোমার পছন্দ হবে।"

মাদাম লোয়াজেল হঠাৎ কালো সাটিনের বাক্সের ভেতর একটা চমৎকার হীরের কণ্ঠহার দেখতে পেলেন—দুর্দমনীয় বাসনায় তার বুকটা দুরু-দুরু করতে থাকে।···ওটা নেবার সময় হাতটা কাঁপতে থাকে। পোষাকটা উঁচু হয়ে গলার কাছে এসেছে, তার ওপর দিয়ে হারটা গলায় পরলেন···খুসী হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেন।

একটু ইতস্ততঃ করে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন—"শুধু এটাই আমায় ধার দিতে পার?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" জবাব দেন বান্ধবী।

লাফিয়ে গলার কাছে উঠে আবেগে বান্ধবীকে চুমু খেয়ে গয়নাটা নিয়ে চলে গেলেন।

উৎসবের দিন এল। মাদাম লোয়াজেল সাফল্যলাভ করলেন।··· তিনি ছিলেন সহাস্যময়ী, সবচেয়ে সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদের ভেতর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক পুরুষেরাই তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন, নাম জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁরা মাদাম লোয়াজেলের সংগে পরিচিত হবার জন্য চেষ্টা করছিলেন।

মন্ত্রিমণ্ডলীর সব কর্মচারীরাই তাঁর সংগে নাচতে চাইলেন। স্বয়ং মন্ত্রীও তাঁকে লক্ষ্য করলেন।

খুশীর নেশায় বিভোর হয়ে নাচলেন তিনি। সাফল্যের গৌরবে, স্তুতি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলির সুখ-মেঘলোকের ভেতর দিয়ে নেচে চললেন তিনি। রূপে তিনি বিজয়ী হলেন—যে বিজয় এত পূর্ণ, এত মধুর স্ত্রীলোকদের কাছে।

মাদাম লোয়াজেল ভোর চারটের সময় বাড়ী যাবার জন্ত বেরিয়ে এলেন। তাঁর স্বামী মাঝরাত্রের পর থেকে ছোট একটা নির্জন ঘরের ভেতর তিনজন ভদ্রলোকের সংগে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরাও আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন।

মাদাম লোয়াজেলের স্বামী স্ত্রীর রোজকার করবার অতিসাধারণ পোষাকটা এনেছিলেন। ঠিক ছিল এই পোষাকটা পরে তিনি বেরিয়ে আসবেন। মাদাম লোয়াজেলের স্বামী পোষাকটা স্ত্রীর কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিলেন। বল-নাচের জমকালো পোষাকের সংগে রোজকার সাধারণ পোষাকটা অতি বিসদৃশ লাগছিল। যাঁরা দামী ফার-কোট গায়ে দিয়ে এসেছিলেন যাঁদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতে চাইলেন মাদাম লোয়াজেল।

স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বললেন মঁসিও লোয়াজেল—"দাঁড়াও। বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগবে। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনছি।"

মাদাম লোয়াজেল শুনলেন না, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। তারা রাস্তায় নেমে এসে কোন গাড়ী দেখতে পেলেন না। দূরে কয়েকটা গাড়ী, চলে গেল। অনেক ডাকাডাকিতেও তারা এল না।

হতাশ হয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তারা স্যানের দিকে চললেন। পথে একটা পুরোন জীর্ণ গাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। এই গাড়ীগুলো প্যারী সহরে রাত্রেই শুধু চলাচল করে। যেন এই জীর্ণ গাড়ীগুলোকে দিনের বেলায় বার করতে গাড়োয়ানরা লজ্জা পায়। রু মার্তির-এর বাড়ীর দরজার কাছে গাড়োয়ান তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। বিষণ্ণ মুখে তারা বাড়ীতে ঢুকলেন। মাদাম ভীষণ পরিশ্রান্ত। মঁসিও লোয়াজেল ভাবতে থাকেন যে দশটার সময় তাকে অফিসে হাজির হতে হবে।

কাঁধের ওপর থেকে সাধারণ পোষাকটা রেখে দিয়ে মাদাম লোয়াজেল আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন নিজেকে পূর্ণ মহিমায় আর একবার দেখবেন ব'লে। সহসা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। গলায় হারটা নেই।

তার স্বামী পোষাকটা অর্দ্ধেক খুলেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন—"কি হল ?"

পাগলের মত তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"আমি···আমি···মাদাম ফরেস্তিয়েরের হারটা দেখছি না তো।"

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন মঁসিও লোয়াজেল···তারপর বললেন—"কি ? কি বললে ? এ সম্ভব নয়।"

···তাঁরা দুজনে পোষাকের প্রত্যেকটি ভাঁজ—কোটের পকেট সব জায়গায় খুঁজে দেখলেন কিন্তু কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।

"তুমি নিশ্চিত যে বল-নাচের পরেও সেটা তোমার গলাতে ছিল ?" জিজ্ঞেস করলেন মঁসিও লোয়াজেল।

"হ্যাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ের ঘরের ভেতরে যখন ছিলাম তখনও ছিল।"

"—কিন্তু পথে সেটা প'ড়ে গেলে আমরা শব্দ শুনতে পেত নিশ্চয়ই গাড়ীর ভেতর আছে।"

"—হ্যাঁ, তা হতে পারে। গাড়ীর নম্বরটা জান ?"

"—না। তুমিও লক্ষ্য করনি ?"

"—না।"

তাঁরা মাথা হেঁট করে ভাবতে থাকেন। মঁসিও লোয়াজে পোষাকটা আবার প'রে নিয়ে বললেন—"যে সমস্ত পথে আমরা হেঁ গিয়েছি সেই জায়গাগুলো আমি দেখে আসছি।" তিনি বেরি গেলেন। মাদাম লোয়াজেল সেই সান্ধ্য-পোষাক পরেই চেয়ারে ওপর ধপাস ক'রে বসে পড়লেন···শুতে যাবারও শক্তি নেই তাঁর ঘরে আগুন নেই। কোন কিছু ভাবতে পারলেন না তিনি মঁসিও লোয়াজেল পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সং দেখা করলেন, খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন, কেউ যদি ফের দেয় তাকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনি ঘোড়ার গাড়ীর মালিকদে কাছেও গেলেন। যেখানে হারটা পাবার আশা আছে সেই স জায়গাতেই তিনি গেলেন।

মাদাম লোয়াজেল এই ভীষণ ভাগ্যবিপর্যয়ের ভেতর উদ্‌ভ্রান্তে মত সারাদিন ধরে স্বামীর জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মঁসিও লোয়াজেল বিকেলের দিকে বাড়ীতে ফিরলেন। বিবর্ণ মুখটা চুপসে গিয়েছে, যেন। হারটা পেলেন না তিনি।

তোমার বন্ধুকে লিখে দাও যে হারটার একটা জায়গায় একটু ভেংগে গিয়েছে, সেটা মেরামত করিয়ে ফেরৎ পাঠাবে। আমরাও একটু সময় পাব যদি খুঁজে পাওয়া যায় হারটা।

স্বামীর কথানুযায়ী মাদাম লোয়াজেল লিখে পাঠালেন।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। তাঁরা হারটা পাবার আশা ছেড়ে দিলেন।

—মঁসিও লোয়াজেলের যেন পাঁচ বছর বয়স বেড়ে গেল। তিনি বললেন—"এই গয়নার মত আরেকটা কিনতে হবে।"

পরদিন তাঁরা গয়নার বাক্সটা নিয়ে তাতে যে দোকানের নাম লেখা ছিল সেই দোকানে গেলেন। দোকানের মালিক কতকগুলো বই দেখে বললেন—"মাদাম, আমি তো হার বিক্রী করিনি শুধু বাক্সটাই বিক্রী করেছিলাম।"

স্বামি-স্ত্রীতে মিলে এক দোকান থেকে অন্ত দোকানে খোঁজ করতে লাগলেন কোথায় মেলে সেই হারিয়ে-যাওয়া হারের মত আরেকটি হার। দুঃখে, কষ্টে তাঁদের শরীর ভেংগে পড়ল।

শেষে পালে রোইয়ালের একটা দোকানে তাঁরা খুঁজে পেলেন ঠিক সেই রকম একটা হীরের হার। দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। দোকানের মালিক ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ-তে বিক্রী করতে রাজী হলেন।

তাঁরা অলংকার-বিক্রেতাকে অনুরোধ করলেন যে তিন দিন পর্যন্ত হারটা যেন বিক্রী না করা হয়। তাঁরা এই সর্ত করলেন যে যদি পুরোন হারটা ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হবার আগেই পাওয়া যায় তবে তাঁরা হারটা চৌত্রিশ হাজার ফ্রাঁ-তে কিনবেন।

মঁসিও লোয়াজেলের বাবা আঠার হাজার ফ্রাঁ রেখে গিয়েছিলেন। বাকী টাকাটা তিনি ধার করলেন। একজনের

কাছ থেকে ধার করলেন এক হাজার ফ্রাঁ, আরেকজনের কাছ থেকে পাঁচ শ', এর কাছ থেকে পাঁচ লুই···ওর কাছ থেকে তিন লুই। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার ভয়ে তিনি মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নাম সই করে অর্থ সংগ্রহ করলেন।—শেষে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ সংগ্রহ করে হারটা কিনে আনলেন।

মাদাম লোয়াজেল হারটা নিয়ে গেলেন বান্ধবীর কাছে। মাদাম ফরেস্তিয়ে অভিমানাহত হ'য়ে বললেন—"হারটা তোমার আগেই ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল, কারণ আমার দরকারে লাগতে পারতো তো।" তিনি আর বাক্সটা খুলে দেখলেন না। মাদাম লোয়াজেলের ভীষণ ভয় করছিল—যদি বান্ধবী বদলী হারটা বুঝতে পারেন! তবে তিনি কি বলবেন? হয়তো চোর বলে মনে করবেন!

* * * *

মাদাম লোয়াজেল নিষ্ঠুর দারিদ্র্যকে সাহসের সংগে বরণ করে নিলেন। এই ভয়ংকর ঋণ তিনি পরিশোধ করবেনই। ঝি-কে ছাড়িয়ে দিলেন। বাড়ী বদলে একটা পুরোন ভাংগা ঘর ভাড়া নিলেন। বাড়ীর ভারি কাজ, রান্নাঘরের সব কাজ তিনি নিজেই করতে লাগলেন। মাটির বাসন আর সসপ্যানের তলা মেজে মেজে তাঁর আংগুলের গোলাপী নখগুলো সব ক্ষ'য়ে গেল। নোংরা জামা-কাপড়গুলো কেচে দড়িতে শুকোতে দেন। প্রতিদিন সকালে আবর্জনাগুলো নীচে নামিয়ে এনে রাস্তায় ফেলে দেন। ওপরে জল তুলে নিয়ে যান মাঝপথে থেমে থেমে দম নিয়ে। তিনি নিজেই বাস্কেট হাতে নিয়ে বাজারে যান—ফলওয়ালা, মুদীর দোকানে, মাংসবিক্রেতার কাছে যান গরীবের পোষাক পরে। একটি একটি করে 'সু' জমাতে থাকেন। প্রত্যেক মাসে দোকানের বিল্ শোধ করতে হয়। কাউকে আবার নতুন করে বিল্ করতে হয়···তাতে কিছুটা সময় পাওয়া যায়।

মঁসিও লোয়াজেল বিকেলে এক ব্যবসায়ীর দোকানে হিসেব লেখেন। রাত্রে লেখা কপি করেন—প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচ 'সু' করে পান। এমনি ক'রে দশ বছর কাটলো।

দশ বছর পরে সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গিয়ে তাঁদের হাতে কিছু সুদের টাকাও জমল।

মাদাম লোয়াজেলকে এখন বৃদ্ধা মনে হয়। তিনি এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। চুলগুলো বিচ্ছিরি ভাবে আঁচড়ানো—স্কার্টটা ঠিক করে পরেন নি। হাতটাও লাল। তিনি এখন জোরে কথা বলেন। এখনও জল দিয়ে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করেন।

যখন তাঁর স্বামী অফিসে থাকেন মাঝে মাঝে তিনি জানলার ধারে বসে পুরোন দিনের সেই বল্-নাচ-উৎসবের দিনটির কথা ভাবেন···যেদিন রাত্রে তাঁকে এত রূপসী দেখাচ্ছিল। যদি সেই হারটা না হারাত তা হ'লে এতদিনে তার কি অবস্থা হ'ত কে জানে! কি বিচিত্র, পরিবর্তনশীল এই জীবন!

একদিন রবিবারে সপ্তাহের কাজের ক্লান্তি দূর করবার জন্য মাদাম লোয়াজেল 'সাঁ-এলিজে'তে বেড়াতে গেলেন। হঠাৎ তিনি একজন ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলেন একটি বাচ্চাকে সংগে নিয়ে বেড়াচ্ছেন···ইনি মাদাম ফরেসতিয়ে···চিরযৌবনা, চিরসুন্দরী, চির-প্রলোভনময়ী।

মাদাম লোয়াজেল একটু বিচলিত হলেন। খুলে বলবেন সব মাদাম ফরেসতিয়েকে? নিশ্চয়ই বলবেন। এখন তো সব দেনা শোধ হয়ে গিয়েছে···তবে কেন বলবেন না? এগিয়ে গিয়ে বললেন—"সুপ্রভাত জান্!"

একজন ভদ্রমহিলাকে এমন পরিচিত ভাবে নাম ধরে ডাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মাদাম ফরেসতিয়ে···তিনি চিনতে পারলেন না মাদাম লোয়াজেলকে। একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন—"কিন্তু মাদাম···আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।"

"না। আমি মাতিলদ লোয়াজেল।"

"ও বেচারী মাতিলদ, তুমি কি রকম বদলে গিয়েছ!" চেঁচিয়ে উঠে বললেন মাদাম ফরেসতিয়ে।

"তোমার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত দিনগুলি আমার ভীষণ দুঃখ-দুর্দশায় ভেতর দিয়ে কেটেছে···এর কারণ তুমি!"

"আমি? কি রকম?"

"···মনে পড়ে মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতে উৎসবে যাবার জন্য তুমি হীরের হারটা আমায় ধার দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ···হ্যাঁ, তারপর?"

"সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

"কি? তুমি তো আমায় ফেরৎ দিয়েছিলে হারটা?"

"আমি ঐ রকমই অন্য আরেকটা হার তোমায় দিয়েছিলাম। আজ দশ বছর পরে হারটা কেনবার জন্য যে-টাকা ধার করেছিলাম শোধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিছুই ছিল না আর হারটা কেনাও আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। যাই হোক, এখন আমি মুক্ত··· খুব খুশী।"

মাদাম ফরেসতিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন—"তুমি বলতে চাও যে আমার হীরের হারটার বদলে তুমি সেই রকমই অন্য আরেকটা হার দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। তুমি বুঝতে পারনি। দুটো হারই অবিকল এক রকম ছিল।" গর্বমিশ্রিত আনন্দের সরল হাসি ফুটে ওঠে অধরে।

···মাদাম ফরেসতিয়ে বেশ বিচলিত হয়ে বান্ধবীর হাত দুটো ধরে বললেন—"ও বেচারী মিতিলদ! আমার হারটা তো নকল ছিল। ওর দাম ছিল মাত্র পাঁচশো ফ্রাঁ।"

অনুবাদক : সুধীরকান্ত গুপ্ত।

It is a woman's business to get married as soon as possible, and a man's to keep unmarried as long as long as he can. —*Shaw*.

নিখিল রায়

ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র। বারান্দার দিকে আলসে দৃষ্টি নিয়ে ফিরে শোয়। টবে ফুলের চারাটায় কাঁচা রোদ এসে সবে নাচানাচি শুরু করেছে। এক্ষুণি লাফিয়ে এসে পড়বে চৌকাঠে। আরেকটু গুটিসুটি মেরে এগিয়ে এসে মালার জরিপরানো জুতোটায় চকমকিয়ে উঠবে। তারপর টেবিলের সিগারেট-কেস আর অ্যাশট্রেটার উপর অনেকক্ষণ ধরে বসবে। ঘরের কোথাও কিছু বদলাবে না—রঙ ছাড়া। দরজার পর্দাটা শুধু একটু সরে যাবে, চুড়ির হালকা আওয়াজ তুলে চায়ের কাপ হাতে আসবে মালা।

নাঃ, আজ আর কিছুতেই বেরোবে না সুপ্রিয়। ইচ্ছা করছে সারাটা দিন মালাকে নিয়ে শুধু গল্প করে। গল্প আর শুধু গল্প! কতোদিন হেসে কথা বলেনি তার সঙ্গে, সেই চাকরী যাবার পর থেকে। বেচারা খেটেই মরছে কেবল। নিজের জন্য তাকে এভাবে কষ্ট দেওয়াটা সঙ্গত হচ্ছে না। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে সুপ্রিয়? তেজ না থাকা মনটাকে নিয়ে সে নিজেই কেমন টাল সামলাতে পারছে না। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন। মালা যদি নিজে থেকেই কোথাও বেড়িয়ে আসার বায়না ধরে মনটা আপনা থেকেই চুপসে আসে সুপ্রিয়র। চাকরী খোঁজার অজুহাত দেখিয়ে তখুনি সরে পড়ে। কিন্তু মন তার কেবলই ঘুর-ঘুর করতে থাকে জাগ-ফেলে-রাখা দিনগুলোর আশে-পাশে, গড়ের মাঠ আর কোর্ট-উইলিয়মের কাঁধঘেঁষা জায়গাটায়। যেখানে লোকের ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। ঝিঁঝিঁদের কতো গান আর উড়ু-উড়ু চুলের গন্ধপাওয়া সন্ধ্যার সাক্ষী ওই নিভৃত জায়গাটুকু। সময় বেশি নিয়ে কোনদিন ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট নয়তো ফলতার মাঠে মাঠে ছুটে বেড়ানো।

পুলকে ভরে ওঠে সুপ্রিয়র মন। একটা চাকরী হলেই তো সব ফিরে পাওয়া যায়। মালার বায়না থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয় না। দু'টো ফুসফুস ভরে হাওয়া নিয়েও কিন্তু সুস্থ হতে পারে না সুপ্রিয়, পরক্ষণেই নিস্তেজ হয়ে যায় তার মন—তাও বুঝি আর হবার নয়।

বন্ধু মহলে এরই মধ্যে কথাটা উঠেছে। কানাঘুষা চলছে আড়ালে আড়ালে। লক্ষ্য করেছে সে এসে পড়লেই আলোচনাটা হঠাৎ থামিয়ে দেয় বন্ধুরা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসির চিমটি কাটে। স্ত্রীর রোজগার নিয়ে প্রকাশ্যেই কেউ কেউ তর্ক তোলে। সুপ্রিয় মেয়েদের রোজগারের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে সবল প্রতিবাদের চেষ্টা করে। কিন্তু এই রহস্যময় ঠোঁটটেপা হাসির মধ্যে কোথায় যেন হুল আছে। মনে মনে কেবলই ঘামতে থাকে সুপ্রিয়। এ হাসির অর্থ কি?

অর্থ অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকলো না। নীরদ কাল স্পষ্টই বলে দিলো, সে নাকি হাসপাতালে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। আর কিছুদিন এভাবে চোখ বুঁজে পড়ে থাকলেই ব্যস, স্ত্রীরত্নটি তামাদি হতে আর বাকি থাকবে না। এমন কি অতনু বোসের নামটি পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে নীরদ।

হঠাৎ কে যেন গুঁড়িগুঁড়ি ভুষোকালি ঝরিয়ে দিলো রোদপোয়ানো বারান্দাটায়। মুখ সরিয়ে নিল সুপ্রিয়। কালিপড়া হারিকেন চিমনীর ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকা শিখাটির মতো তার চাহনিটাও কেমন জ্যোতি মোছানো, রক্তাক্ত। কিছুতেই

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মালাকে সে এমন করে ভাবতে পারে না। পূর্বে অতনুর সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, মালা এখন তার স্ত্রী। এতোদিন পরে আজ খুঁটিয়ে কুঁটিয়ে মিলাতে বসলো সুপ্রিয়। সম্প্রতি মালার চলন বলন কেমন আচমকা যা তার মনকে শত চেষ্টা সত্বেও অবিশ্বস্ত ভাবে নড়িয়ে তোলে। তবে কি—

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ঘড়ির দিকে এতোক্ষণে তাকিয়ে দেখলো সুপ্রিয়। মালা ডিউটি থেকে ফিরছে। এক-রাশ অবসাদ নিয়ে ঘরে ঢুকলো মালা।

ভালো করে নিরীক্ষণ করলো সুপ্রিয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। রাতজাগা ক্লান্তিতে মালার পাণ্ডুরে মুখখানায় চোখ দুটি যেন বড়ো উজ্জ্বল, কোন অজানিত সুখতৃপ্তির ছোঁয়া যাই-যাই করেও যেন যেতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র।

আড়মোড়া ভেঙ্গে আলসে ভাঙলো মালা, উঃ, সারাটি রাত কাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে। একটা দারুণ ক্রাইসিস গেল অতনু বাবুর। যাক, আর ভয় নেই। কিন্তু আমার যা ঘুম পাচ্ছে।···ও কি, এখন কোথায় বেরুচ্ছ?

অতনু প্রসঙ্গ সুপ্রিয়র গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। সারা হাসপাতালে অতনু ছাড়া কি আর রোগী নেই। ক্রাইসিস শুধু কি একলা অতনুরই। পাঞ্জাবীর বোতামগুলো দ্রুত পরাতে লাগলো সে। হাত ধরে ফেললো মালা, কিছু না খেয়ে বেরিয়ো না লক্ষ্মীটি। হাসপাতালের পোষাকটা বদলে স্নান করে এখুনি তোমার চা-খাবার করে দিচ্ছি।

ভেতরে টগবগ করতে থাকে সুপ্রিয়। না না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে। দরকার বোধ করলে দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিলেই চলবে। তাছাড়া সারা রাত তোমার খাটুনি গেছে, একটু বিশ্রাম তোমার একান্তই দরকার।

ও আমার যথেষ্ট অভ্যেস আছে। তুমি দাঁড়াও, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমার তৈরী হয়ে যাবে খ'ন।

এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, আর দেরী করলে হয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাই হবে না। বানিয়ে বললো সুপ্রিয়।

তা'হলে দোকান থেকে কিছু খেয়ে নেবে বল? সানুনয় কণ্ঠ মালার। পিছন ফিরে সূক্ষ্ম বিষাদক্লিষ্ট হাসি হাসলো সুপ্রিয়। তারপর আর দাঁড়ালো না।

মনটা মুচড়ে মুচড়ে ব্যথিত হয়ে উঠলো মালার। সময় নেই, অসময় নেই যে যেখানে আশা দিচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সুপ্রিয়। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ভুলেই গেছে। একটা চাকরীর জন্যই তো! টেবিলের উপর সুপ্রিয়র পার্স'টি নজরে পড়তেই আর্তস্বরে চমকে উঠলো মালা, কি ভোলা মানুষ! বাড়ী না ফেরা পর্য্যন্ত হয়তো কিছু খাওয়াই হবে না। মালার চোখ ভরে এলো জলে।

ট্রামে বসেও স্বস্তি ছিল না সুপ্রিয়র। বুকের পাশটায় মাছুলীটা অনবরত খোঁচা মারছিল। ছি ছি, টিকিটটা পর্যন্ত স্ত্রীর পয়সায় কেনা! নাঃ, নেমে পড়ে হাঁটতে থাকলো সে। যেমন করে হোক

যেখানেই হোক একটা চাকরী তাকে যোগাড় করতেই হবে। খবর কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটা খুলে ধরতেই চাকরী খালির হিড়িক পড়ে গেল। এ পর্যন্ত লাগসই অনেক দরখাস্তই করেছে সে। একটা ইন্টারভিউও পায়নি। খবরের কাগজ দেখে চাকরী হয় না, এ ধারণাটা পাকাপাকি হয়ে গেছলো তার। তবুও ক্লান্ত মনে পাতাটা খুলে বসলো সে।

আজ ন'মাস বেকার বসে আছে সুপ্রিয়। ধরতে গেলে মালাই তাকে পালন করছে এখন। ভাবতেও যে কোন পুরুষের পক্ষে লজ্জার। এতোদিনে এই নিষ্কর্মা স্বামীর প্রতি মালার আকর্ষণ যদি কিছু কমেই থাকে, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় কি? তাছাড়া এক সময়ে অতনু মালার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিল। বর্তমানে ভারত সরকারের বড় চাকুরে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে এসেছে হাসপাতালে। মালা মনোযোগী হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত মনোযোগী! সেবা করতে গেলে দরদী মনের আবেদনের কথা স্মরণ করে কতো বার নিজের কৌতূহল শাসন করেছে সুপ্রিয়। কিন্তু—কিন্তু যখনই মনে পড়ে যায়, এমনি করেই সে-ও একদিন মালার সেবায় মুগ্ধ হয়েছিল। ভালোবেসেছিল। মনে পড়ে, কতো যন্ত্রণাভরা রাতে চোখ খুলে সবিস্ময়ে দেখেছে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে অতন্দ্র চোখ মেলে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে মালা। সে চাহনির মধ্যে থাকতো কি এক গভীর অনুভূতি। মধুর স্পর্শ! কি জানি, অতনু বাসের মধ্যেও যদি সে তেমন কিছু খুঁজে থাকে? নীরদের কথাটা মনের মধ্যে মুহূর্তে একটা ঘূর্ণি দিয়ে যায়। না না, এ-সব কি ভাবছে সে! মালাকে সে ভালবাসে এর বেশি ভাববার দরকার কি? একটা চাকরী হলেই সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। তখন মালাকে কি সে ফুরসত দেবে নাকি? বেড়িয়ে খেলিয়ে বাড়তি সবটুকু সময় সে লুঠ করে নেবে।

এই তো সেদিন মালা গোটা জ্যাকেটটাই হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। অনেক আপত্তি করেছিল সুপ্রিয়। কেন মিছিমিছি খাজে খরচ করতে গেলে, ও তোমার দেলকে সাজানোই থাকবে।

ভাসা-ভাসা চোখ দু'টো শুধু টলমল করেছিল মালার। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তুমি পড়তে ভালোবাসো বলেই কিনেছি।

বেশ কিছুদিন ঘুরে অবশেষে একটা কাজ অবশ্য জুটালো সুপ্রিয়। ঠিকে চাকরী। ইংরাজী প্রুফ দেখা। মালাকে লুকিয়েই কাজটা নিল সে। হোক না সামান্য কাজ, মনটা হাঁফ ছেড়ে তো বাঁচবে ক'দিন।

এরই মধ্যে অতনুও ছুটি পেয়ে গেছে হাসপাতাল থেকে। একটা বিরাট দুশ্চিন্তা যেন নেমে গেল সুপ্রিয়র ঘাড় থেকে।

সে দিনটা ছিল ছুটীর। দু'-হপ্তা পর সুপ্রিয় এই প্রথম পেল একটা দিনের আয়েস।

তখন বিকেল। বাইরে এবার রঙ বদলের পালা। আয়নার মুখোমুখী বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল মালা। চুলের বন্যা ঘাড়ের পাশটার বাঁক ঘুরে ঝুপ করে কোলের ওপর আলপনা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শেষ প্রান্তটায় আলগা হাতে চিরুণী চালিয়ে গোছাচ্ছিল সে। গা-ধোওয়া খালি গায়ে শুধু পাতলা শাড়ীটা জড়ানো। এখানে সেখানে আঁটসাট যৌবন উঁকিঝুঁকি মারছে। হাতের মৃদু ঝাঁকুনীর সঙ্গে সঙ্গে নিটোল বুকটা দুলে দুলে শাড়ির পাড়টায় আঁচড় কাটছে। ফিতেটা কামড়ে ধরে দু হাত তুলে চুলের গোড়ায় একটা শক্ত গিঁট দিতে যাচ্ছিল মালা। আয়নার দিকে ঝুঁকে পড়ে তড়িৎ বেগে ঘাড় ফিরালো সে। কি-ও। বড়ো হাসি পেলো তার। একটা ভ্রু-ক টেনে ধরে চোখের পাশটায় খানিকটা খাঁজ ফেলে দুষ্টু মিস্তরা একটা ভঙ্গি করলো, তুমি ভারি ইয়ে, কতোক্ষণ ধরে দেখছো বলতো?

হালকা হয়ে যায় সব মেঘ। হাসলো সুপ্রিয়। চাকরী যাবার পর প্রথম হাসি।

অমন ভাবে তোমায় দেখতে পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। আমি শিল্পী হলে তোমার ছবি আঁকতাম।

হেসে ফেললো মালা, তবেই হয়েছিল আর কি। বাব্বা, এমন চোর-পায়ে এসেছো জানতেও পারিনি!

সুপ্রিয় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। দাঁড়ায় মালার পিঠ ঘেঁষে। কাঁধের দু' পাশে হাত ভরে দিয়ে মালার মুখখানা বুকের কাছে উল্টে ধরে।

খিল-খিল করে হেসে উঠে হাত দিয়ে সুপ্রিয়র মুখটাকে আস্তে সরিয়ে দেয় মালা, উঁহু, ভারী দুষ্টুমী আরম্ভ করেছ। ও ঘরে যাও দেখি, আমি কাপড় ছাড়বো।

মালাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না সুপ্রিয়র। মালারও কি ইচ্ছা করে সুপ্রিয়রবুক থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে? কিন্তু অত সহজেই ধরা দিতে কেমন লজ্জা লাগছিলো তার। স্বামীর মুখে সামান্য একটু হাসি ফোটাতে এই ক'মাস ধরে সে কম সাধনা করেনি। তাই সুপ্রিয় যখন আজ নিজে থেকেই এগিয়ে এলো, মালা কিছুতেই পারলো না ধরা দিতে—অন্ততঃ রাত্রির আগে তো কোন মতেই নয়।

চল না কোথাও বেড়িয়ে আসি! বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে সুপ্রিয়র মুখের পানে তাকালো মালা। কি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

হারানো সুর নতুন হয়ে কণ্ঠে বাজলো। কিন্তু কি করবে মালা? অতনুর সঙ্গে যে আগে থাকতেই সব ঠিক-ঠাক হয়ে আছে! তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন তিনি কাঁটায় কাঁটায়। টেবিলের ওপর হাতঘড়িটার দিকে আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। আজ থাক। আরেক দিন, কেমন? তোমার যেখানে খুশি!

থাক কেন? এমনি বিকেল···

হেসে ফেললো মালা, ভয় নেই গো মশাই আরো পাওয়া যাবে। তাছাড়া, ঠোঁটের কোন টিপে হাসলো, আদুরে বউটি তোমার পাশে থাকলে যে কোন বিকেলই মিঠে লাগবে। সুপ্রিয়র মাথার চুলে নরম হাতে আঙুল চালিয়ে দিয়ে হাল্কা ঝাঁকুনি দেয়—তাহলে ছুটি মঞ্জুর তো!

কিন্তু কোথায় যাবে?

মস্ত খবর আনতে, অতনু বাবুর বাড়ী। হঠাৎ কুমকুমের ছোপ লাগে মালার গালে। কি একটা লুকোবার চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠলো তার চোখে-মুখে।

ঝিন-ঝিন করে উঠলো সুপ্রিয়র মন। আলগা হয়ে গেল বাহুর বাঁধন। ঘর ছেড়ে চলে এল ধীরে ধীরে।

অতনু ছাড়া পেলেও মালা যে তাকে ছাড়েনি এ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুপ্রিয়র চোখও এড়ালো না। এ অভিসার তাহলে এই প্রথম নয়? কিন্তু মুখের ওপর বলার এ সাহস মালা পেলো কোত্থেকে। কি বলতে চায় সে? স্ত্রীর অন্নে শরীর পুষ্ট করা যে অপৌরুষের, এই কথাটাই কি সইয়ে সইয়ে বোঝাতে চায় তাকে? এর জন্য তো সে প্রস্তুত হয়েই আছে। এই ক'মাসেও কি সে তা বুঝতে পারেনি? সে জন্য অতনু বোসের সঙ্গে এতো গোপন পরামর্শেরই বা কি দরকার? স্পষ্ট বলে দিলেই হয় একদিনের জন্য নয় বরাবরের জন্যই ছুটি চায় সে।

সিগারেটের আগুন সেক্ দিয়ে পুড়িয়ে দিল আঙুলটা। টুকরোটা ছুড়ে ফেলে শব্দ করেই উঠলো, জাহান্নামে যাও।

সামনে দাঁড়িয়ে ঝর-ঝর করে হেসে উঠলো মালা, কা'কে জাহান্নামে যেতে বলছ, সিগারেট না আমাকে।

চোখ তুলেই নামিয়ে নিল সুপ্রিয়। কি সুন্দর করে সেজেছে মালা! ফেলে দেওয়া পোড়া সিগারেট টুকরোটার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো চুপ করে।

কখন ফিরতে পারবো ঠিক কি। যদি দেরী দেখ রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়ো না যেন। লক্ষ্মীটি বল, মিছিমিছি অপেক্ষা করে থাকবে না আমার জন্যে। সুপ্রিয়র ঘাড় নাড়া সম্মতি আদায় করে ঝলমলিয়ে সামনে দিয়ে নেমে গেল মালা।

একটা চাবুক খেয়ে যেন চমকে উঠল সুপ্রিয়। এ কি করছে সে? কেন সে মালাকে যেতে দিল? সে কি তাকে ধরে রাখতে পারতো না? এমন ভাবে মালাকে কিছুতেই বয়ে যেতে দিতে পারবে না সুপ্রিয়। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে। যেমন করে হোক মালাকে ফিরাতেই হবে।

অতনুর বাড়ীর কাছটায় পথ সোজা করতে গিয়ে সামনের পার্কটায় ঢুকে পড়লো সুপ্রিয়। কিন্তু ওই রাস্তাটুকু পার হবার আগেই তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অতনুর বিরাট হুডখোলা বিউইকখানা মালাকে নিয়ে মোড়ের মাথায় পিছন ফিরলো।

গোটা পৃথিবীটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে পায়ের তলায় ছড়িয়ে পড়লো সুপ্রিয়র। দারুণ আক্রোশে জ্বলতে থাকলো সে। একটা হেস্ত-নেস্ত আজ সে করবেই।

রাত অনেক। বাইরে দরজার গাড়ী থামার শব্দ হলো। নিঃশব্দে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো সুপ্রিয়। গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মালা। অতনুর মুখোমুখী। দু'-এক টুকরো কথা। হালকা হাসির ঝলক। তারপর অপসৃয়মান গাড়ীর লাল আলোটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বহুদিন পর একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো মালা। খুশির আমেজ যেন উপচে পড়ছে।

বারান্দার আলো জ্বালতেই কিন্তু গর্জে উঠলো সুপ্রিয়। চৌকাঠে পা দিয়েই রীতিমত চমকে গেল মালা। রুখু চেহারা। উসকো-খুসকো চুল। সুপ্রিয় আজ মরীয়া ভয়ংকর। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উদ্বেগ কণ্ঠে এসে জড়ো হলো মালার—একি! আবার অসুখটা……

এবারে ফেটে পড়লো সুপ্রিয়। থামো। যথেষ্ট হয়েছে। আমার চোখে আর ধুলো দেবার চেষ্টা করো না। তার আগে জানতে পারি কি এতো রাত পর্যন্ত অতনু বাবুর সঙ্গে কি জরুরী কাজ ছিল? তোমাকে আর বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল মালা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এ কথার কি জবাব দেবে সে!

কি, চুপ করে কেন? বিদ্রূপের কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলো সুপ্রিয়। ভেবেছিলে, যা বানিয়ে বলবে তাই বিশ্বাস করবো আমি। কিন্তু আজ হাতে হাতে ধরে ফেলেছি, তাই জানতুম এর কোন জবাব তৈরী থাকবে না তোমার মুখে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অতি কষ্টে সংযত হতেও কয়েক মিনিট লেগে গেল মালার। সুপ্রিয়র চোখে সোজাসুজি চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বললো, এর চেয়ে আর কি বেশি তোমার কাছে আশা করতে পারতাম। জেনে রাখো, অতনু বাবুকে নিয়ে তোমার চাকরীর তদ্বিরেই গেছলাম।

অভিমানাহত বুকটা আস্তে আস্তে নেমে এলো মালার। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর হাতব্যাগটা রাখলো। এর ভেতর কাগজপত্র আর দরখাস্তের ফরম আছে। কাজটা হয়ে যাবে। বড় সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারপর আর কোন কথার প্রতীক্ষা না করেই দ্রুত শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিলো।

দুটি বিদূষকের জন্ম

কবিতা সিংহ

জব্বলপুরে আমি বছরে একবার আসি। কারণ, বছরে একবারই আমার ছুটি হয়। মা বলেন— 'কি যে তোর এক সইয়ের বৌ-এর বকুলফুলের সরযূদি' হয়েছে।' মার কথায় অবশ্য প্রচ্ছন্ন শ্লেষ থাকে না, প্রসন্ন প্রশ্রয় থাকে। মা সরযূদি'কে ভালোবাসেন। ওঁরা সংসারী মানুষ। তাই যে মেয়ে সংসার-তরণীর হাল এত চমৎকার ভাবে ধরে চালিয়ে নিয়ে আসছে তার ওপর ভালোবাসা থাকারই কথা। মা বলেন—'দু-দুটো যোগ্য ছেলের মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নেয়া ত কম শক্ত কথা না, তারপর আর একটা ত বাওরা হয়ে চলে গেল নেপালে না ভূটানে, সেটাকে আবার ফিরিয়ে এনে কাছে বসানো। কাছে রাখা ভাই-এর মত যত্ন করে পোষ মানানো এমনটি আর ক'জন পারে? ধন্যি মেয়ে বাপু।'

মেয়েদের কথা ত হল; এবার আবার আমাদের, মানে আমাদের সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো পরিবারের বিভিন্ন বয়সের পুরুষদের কথা বলি। আমরা সময় পেলেই সরযূদি'র কাছে ভুলতে আসি, জুড়োতে আসি। জব্বলপুরের সেই নির্জন রাস্তার শেষে সেই সুন্দর শাদা বড় বাংলোটা যেন একটা অতিকায় রাজহাঁসের মত বিশাল দুটো ডানা ছড়িয়ে নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। অস্নাত রুক্ষ শরীরে আমরা যখন ট্রেণ-জার্নি'র পর এক্কা থেকে সরযূদি'র শাদা নির্মল বাংলোটা নিদাগ আকাশের নীচে দেখতে পাই, তখনি যেন একটা ঝিরঝিরে ঝরণার শব্দ শুনতে পাই। এত ভালো লাগে যে মনে হয় যেন একটা সত্যি হয়ে যাওয়া মরীচিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

আমাদের সত্যিকারের মরীচিকায় আঠরোটি চৌকোঘর, বিশাল বাগান, তরকারির, ফুলের,—আর তাছাড়া সরযূদি'র নিজের একটা গোলাপ-বাগান, আর সেই সিমেন্টের শানবাঁধানো, দিনে হীরের চাঙড়, রাতে রূপোর চাঙড় চাতালেই আমাদের সব চেয়ে বেশী লোভ। এই বাড়িতেই, না একালের, না সেকালের, যেন সকল কালের সরযূদি' লাল সেমিজের ওপর ঘরোয়া করে লাল পাড় শাড়ি পরে, বিদ্যুৎবেগে এঘর ওঘর করে বেড়ান। কখনো গিয়ে দেখি সরযূদি' রান্নাশালে ঠাকুরের সংগে দাঁড়িয়ে বিশাল বিশাল হাঁড়ি নামাচ্ছেন, কখনো দেখি, আমার আগে যাঁরা এসে গেছেন তাঁদের জন্যে গুদামঘর থেকে চারপাই বের করে দিচ্ছেন, তবে বেশীর ভাগ সময়েই দেখি হয় জামাইবাবুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন, নাহলে নির্মলেন্দু বাবুর সিগারেটের টিনটা লুকিয়ে রেখে তাঁকেও ভোগাচ্ছেন, কখনো দেখি না সরযূদি' একলা বসে আছেন। হাল্কা একটি পালক হয়ে আপন মনে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। এই দুই বুড়োই তাঁকে জ্বালিয়ে খেল। তিনি যেন বন্দিনী রাজকন্যা। তাঁর যেন একা থাকার উপায় নেই!

চুপ করে সরযূদির পাতা চারপাই-এ শুয়ে শুয়ে সরযূদি'র কথাই ভাবছিলাম। সেই দারুণ আকাঙ্খার রাত্রি আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সরযূদি'র এখানে শেষ পর্য্যন্ত আসতে পেরেছি, তাঁর হাতের রান্না খেয়ে তাঁরই পাতা বিছানায় শুয়ে আছি। আমার এপাশে ওপাশে পাতা চারপাইতে লক্ষ্ণৌর বড় মেসো, দিল্লীর রুণু, কলকাতার মেজ মামা, সিন্ধির ফুলদাদা, ফুলবৌদি শুয়ে অতি আহারের পর পরিতৃপ্তির জাবর কাটছেন। গোলাপের গন্ধ ভেসে আসছে পশ্চিমের শুকনো বাতাসে। বড় গোল চাঁদের আলোয় সমস্ত চাতালটা রূপোর চাঙড় হয়ে গেছে। আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝখানে আমরা সবাই মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে রান্নাশালের দিকে তাকাচ্ছি। দূরে ফুলবাগান পেরিয়ে তরকারি-বাগান ছাড়িয়ে লম্বা টানা রান্নাশালে সরযূদি'র নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। কখনো জ্যোৎস্নায় ভিজে নীল হচ্ছে শাদা শাড়ি কখনো রান্নাঘরের হলদেটে তেলপড়া আলোয় কমলা হচ্ছে,—সরযূদি যে কখন আসবেন। ও পাশে দুটো খাটিয়ায় দুই মোষ পড়ে আছেন। জামাইবাবু আর নির্মলেন্দু বাবু। দুজনেই সরযূদি'কে আঁকড়ে থাকবেন। আমাদের জন্য একটু ছাড়তেও সে কি কঞ্জুষপনা। গেল বছর দিল্লীর রুণুকে একা গোলাপবাগানে যেয়ে একটু বুঝি মন খুলতে গিয়েছিলেন সরযূদি', অমনি একটা বুড়ো থপথপ করতে করতে হাজির—সরযূ, আজ তুমি আমায় খাইয়ে দেবে বলো?

তারও আগের বছর আমাকে, রবিমামাকে, সমর মেসোকে মিনুদি'কে এমন কি মাকেও সরযূদি' কত কথা যেন বলতে চেয়েছিলেন, বলতে পারেননি। আমাদের সকলের কাছেই তা

সরযূদি' একখানা সিকি পড়া বাংলা উপন্যাস হয়ে আছেন। না, সরযূদি'র কাজ আর শেষ হতে চায় না! রুণুটা শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে গান ধরল,—'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ···'

জামাইবাবু এতক্ষণ বুড়ো আঙুলের ডগায় চটি দুলিয়ে পা নাচাচ্ছিলেন—হঠাৎ ফেটে পড়লেন।—কি রে বাবা, রান্নাঘরেই কি রাত কাটাবে নাকি?

—হ্যাঁ রে, তোর মুণ্ডু ভাঙবে,—এ পাশের খাটিয়া থেকে আওয়াজ ছাড়লেন নির্ম্মলেন্দু বাবু।

—ধুৎ বুড়োখোকা, জামাইবাবুর গলা শোনা গেল। একটা সিগারের আগুনে আর একটা জ্বালিয়ে নির্ম্মলেন্দু বাবু বললেন, দূর! হাসির হররা উঠল খাটিয়াগুলোর ভিতর থেকে। বেশ আছে দুই বুড়ো একজন সরযূদি'র স্বামী, অন্যজন সরযূদি'র স্বামীর অবিবাহিত বন্ধু। ওঁদের বাড়িতেই থাকেন। জামাইবাবু রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট অফিসার। সরযূদি'র চারটি ছেলে। চারজনই কৃতী। ছড়িয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। আর ও এসেছে পূজোর মরশুমে। নির্ম্মলেন্দু বাবু—ট্রিবল্ এম-এ। ইতিহাসে ফিলজফিতে, ইংরেজীতে। আমারও ইতিহাস আছে। ওঁর সংগে তাই আমার ঘনিষ্ঠতা বেশী। সত্যিই বুড়োখোকাটি আমাদের এই নির্ম্মলেন্দু বাবু, টুক করে আমাকে একটু আচার দিলেন। সরযূদি'র ভাঁড়ারঘর থেকে চুরি করা!—চুপ্‌চাপ্ মুখ চালাতে লাগলাম। ওদিকে জামাইবাবুর সংগে পরামর্শ করা আছে, রাত্তে ভূতের ভয় দেখানো হবে অতিথিদের। কিন্তু এই দুই বুড়োখোকাকে আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়? সরযূদি' কখন আসবেন। দূরে বাগানের মধ্য দিয়ে সরযূদি' আসছেন। তাঁর দুধরঙা শাড়ি—নীলচে কাশের মত দুলছে চাঁদের আলোয়। তাঁকে দেখে দুই বুড়ো ঝগড়া থামাল, রুণুটা চিৎকার আরম্ভ করল।

—কি গো সরযূদি', এত রাত পর্য্যন্ত রান্নাঘরে কি করছিলে? আমাদের গল্প যে আর জমছে না!—সার্কাসের ক্লাউনের খেলা আর কতক্ষণ ভালো লাগে? ওপাশ থেকে চিনু মাসিমা ধমকে উঠলেন,—ওকি রুণু, ওঁরা না তোমার গুরুজন হন?

—বাহা বাহা, বেশ বলেছে—নির্ম্মলেন্দু বাবু হেসে উঠলেন। পাকা-পাকা গোঁফগুলো হাসির ধমকে নড়তে লাগল। সত্যি ঠিকই বলেছে রুণু। শুনি ত খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার আর অফিসার ছিলেন দুজনে—কিন্তু নিজেদের মর্য্যাদা রেখে চলতে শিখলেন না এখনো!

হাওয়াটাকে হাল্কা করে উড়িয়ে দিয়ে সরযূদি' বললেন,—ছানার মালপোয়া কালকে কে কত করে খাবি বল্ দেখি?

গালে পান পুরে জামাইবাবুর খাটিয়ার একদিকে বসে পড়লেন সরযূদি।

নির্ম্মলেন্দু বাবু বললেন,—হ্যাঁ রে, খাটিয়াটা লোহার ত? কর্ত্তা-গিন্নীর যা ওজন ফর্দ্দাফাঁই না হয়ে যায় না—

জামাইবাবু বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর খাটিয়ায় গিয়েই বসোগে, পা দিয়ে যা রান্নাঘরের খশবু বেরুচ্ছে!

আবার শুরু হল। না শুরু আর হবে না। সরযূদি' এসেছেন। তিনিই হাল ধরলেন বানচাল আসরের। চিনু মাসী গান ধরল। তারপর গল্প আর গল্প। আস্তে আস্তে কখন ঘুম এসে গেল। জানি না। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলো। শীত করছে। সমস্ত চাতালটাই প্রায় জনহীন। যে যার ঘরে চলে গেছে। ভারী ভালো লাগছিল। নতুন জায়গায় এমন গোল চাঁদের আলোর তলায় শুয়ে এমনি কোজাগরী পূর্ণিমার মাঝরাতে জেগে উঠবার জন্তেই যেন আমি জব্বলপুরে এসেছিলাম এমনি মনে হচ্ছিল।

হঠাৎ দূরে ফস্ করে আগুন জ্বলে উঠল! দেশলাই না? সিগারেটের নেশা জেগে উঠলো আমার। বাগানের দিকে রূপোলী চাতালের শেষ প্রান্তে সরযূদি'র গোলাপ বাগানের অন্ধকারের মধ্যে পা ডুবিয়ে চেন স্মোকার নির্ম্মলেন্দু বাবু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। আমি এগিয়ে গেলাম। বিশাল, স্থুল, বেঢপ মানুষটা চুপ করে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কোমরের কষিটা আলগা হয়ে লুঙ্গিটা নীচে একটু নামানো। কালো গোলদাগটা সারা কোমর জুড়ে ভুঁড়ির ভাঁজে লুকিয়ে গেছে। আমায় দেখে হাসলেন নির্মলেন্দু বাবু। আমি তাঁর পাশে বসে সিগারেট ধরালাম।

—সরযূদি'র গোলাপ গাছ কিনা, তাই এখন থেকে গোলাপ দিচ্ছে, শীত পড়লে কি বাহারটাই না খুলবে। তখন আমি থাকব না, দেখতেও পাব না।

—অন্ধকারে সব গোলাপগুলোই ব্ল্যাকপ্রিন্স মনে হচ্ছে না রে মিণ্টু, ভারী গলায় বললেন নির্মলেন্দু বাবু অথচ দিনের বেলায় দেখো, টুকটুকে লাল।

যাঃ! সরযূদি'র বাগান বলেই বুঝি। সব লাল গোলাপই ত' রাতে কালো দেখায়।

হ্যাঁ রে হ্যাঁ তাই বটে,—আজকালকার ছেলেগুলোর সংগে যদি কথায় পারি।

থামুন মশাই, একটু লঘু সুরেই বললাম আমি,—আপনারা দুজনেই দারুণ বিদ্বান, যত দিন কাজ করেছেন সবাইকে থরহরি কম্প করিয়েছেন শুনেছি, তবে এখানে এসে ক্লাউন সেজে দিদিটিকে আমার জ্বালাচ্ছেন কেন বলুন ত?

হাল্কা মেজাজে কথাটা বলেছিলাম।

ভেবেছিলাম, এর উত্তর পাবো 'তোর' দিয়ে শুরু আর 'তোর তাতে কি রে?' দিয়ে শেষ হবে। কিন্তু বোধ হয় দিনের লাল কথাও রাতের অন্ধকারে কালো শোনালে আমার কানে। নির্ম্মলেন্দু বাবু তাঁর কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে ছাওয়া মুখখানা তুললেন আমার দিকে। চাঁদের আলোয় আমি অবাক হয়ে দেখলাম। দুটো সম্পূর্ণ অচেনা চোখ। এমন চোখ যেন তাঁর মুখে এর আগে আর কখনো দেখিনি। ঠিক বলেছিস মিণ্টু, তুই, রুণু তোরা ঠিক বলেছিস, সত্যি আমি আর স্নেহময় ক্লাউনই বটি। না না কিছু ভাবিস নি, আমি কিছু মাইণ্ড করিনি, এতে কিছু অন্যায় নেই যে, —তবে কি জানিস মিণ্টু, সার্কাসের সবচেয়ে ওস্তাদ খেলুড়েরাই ক্লাউন সেজে থাকে। লোক হাসায়, তাক লাগে, আর সার্কাসে অদ্ভুত সব হাস্যকর ভঙ্গি দেখায়, হাস্যকর ভঙ্গি করেই, অবশ্য আসর বিপদ থেকে বাঁচায়। ওরে,—ক্লাউনের মত মহৎ জী[ব] আর দুনিয়াতে আছে?

আমি ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে উঠলাম। যেন একটা অন্ধকার ঘরে হাতড়ে হাতড়ে তার যে ভূগোল তৈরী করেছিলা[ম] দপ্ করে আলো জ্বলে উঠতেই দেখলাম ভূগোলটা আকারে ঠিক হয়ত, কিন্তু প্রকারে কেমন যেন অন্য!

—তুই ত' জানিস না মিণ্টু সব।

সব জানি না, তবে একটা জিনিষ আমার ভালো লাগেনি—আপনি ত চলে গিয়েছিলেন, আবার ফি[রে] এলেন কেন?

—কেন? জানি মিণ্টু, তোরা সবাই আমায় দোষী করিস্, কিন্তু ফিরে এলাম ঠিক সরযূর জন্তে নয়—

—তবে?

আমার ভারী অবাক লাগছিল। আশ্চর্য্য, আমার সামনেই এ গল্প রয়েছে। পাত্র-পাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ গল্পটা আমরা কেউ দেখতে পাইনি।—কেউ দেখতে পাইনি গল্পটা হয়েছে রয়েছে, ক্রমাগত বদলাচ্ছে, সমানে অন্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা সে সব কেউ দেখছিনে। আমরা এতকাল ধরে খালি পুরোনো জারের আচার খাচ্ছি।

নির্ম্মলেন্দু বাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। সেই তি[ন] কোণা ব্যাপারের গল্প আর কি। দুটি প্রেমিক আর একটি প্রেমাস্পদা। প্রেমিক দু'টির কথা ত' ভাবলেই হাসি পায়। সরযূদি যদিও এখন প্রায় মায়ের বয়সী, তবু এখনো তাঁর নাকের বাঁশি নিখুঁত, হাসির মধ্যে ইন্দ্রমায়া, চোখ দুটি সেই কোকিল-ডাকা ঋতু[র] মত, হঠাৎ ঘর থেকে দুটি কোকিল এসে সময় বলে যায় ভুল সময় বলে যায় অবশ্য। কিন্তু সেই দুই সুপুরুষ সুপাত্রের স[ব] ডুবে গেছে মাংসে। শরীরের ভূগোলের উঁচু-নীচু সব ভরাট হ[য়ে] গেছে চর্ব্বিতে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ভাগলপুরের রিটায়া[র্ড] জজসাহেবের সেই বাড়িটা।

সরযূদি' তাঁর সেই আঠারো বছর বয়সের ছবিটা থেকে নেমে এ[সে] যেন বাগানে বেড়াচ্ছেন। ঠিক অমনি লেসের ঝালর দোলানো থি-কোয়ার্টার ব্লাউজ, ব্রাহ্ম মেয়েদের মত শাড়ি পরার ধরণ। তাঁ[র] গলার লম্বা মফচেনে বিকেলের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। সরযূদি'র বাবা মানে আমাদের গৌর মামা ছিলেন বিষম খৃষ্টান-ঘেঁষা। একবার এক মোটর এ্যাকসিডেন্টের সময় এই দুই অভিন্নহৃদয় ব[ন্ধুর] সঙ্গে তাঁর আলাপ। ভাগলপুরে বিরাট জমিদারী চুণের ব্যব[সা] ইত্যাদির মালিক ছিলেন স্নেহময় চ্যাটার্জ্জির বাবা। তার ও[পর] তিনি নিজে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার। আর নির্ম্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় ট্রিপ[ল] এম-এ, আই-এ-এস অফিসার, তিনিই বা কম যান কিসে। এ্যাকসিডেন্টের জের কেটে গেলেও আলাপের জের কিছুতেই কা[টল] না। দু' মাসের ছুটিতে পশ্চিমে শরীর সারাতে এসেছিলে[ন] নির্ম্মলেন্দু বাবু, দু'বেলা দু' বন্ধুই হাজিরা দিতে লাগলেন জজসাহেবে[র] বাড়ি। সরযূদি'র অবস্থা হল সবচেয়ে সঙ্গীন। তিনি দু'জ[নের] দিকেই আকৃষ্ট হলেন। দু'জনেই সুদর্শন গুণবান, সদ্বংশজাত। দু'টি ভাই। দু'টি ভাই বললেও যেন দূরে দূরে বাধা হয়।

একটি মানুষের দু'টি পিঠ। দু'টি ছায়া। ব্যাপার ক্রমশঃ যখন ঘোরালো হয়ে উঠলো, যখন নির্ম্মলেন্দু বাবু বুঝলেন, স্নেহময় সরযূদি'কে আর স্নেহময় বুঝলেন নির্ম্মলেন্দু বাবু সরযূদি'কে ভালোবাসছেন, তখন সত্যিই তারা যে একটি মানুষের দু'টি ছায়া, তা প্রমাণ করবার জন্তে দুজনেই পালালেন। একই সময়ে।

পালাবার আর একটা কারণও ছিল,—নির্ম্মলেন্দু বাবু বললেন, —আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলাম, অনেক চোখ খারাপের রুগী যেমন জিনিষের দুটো করে ছায়া দেখে সরযূও তেমনি আমাদের দেখছে। বুঝলি মিণ্টু, তোর সরযূদি' সত্যিই দ্বিচারিণী হয়ে পড়ল। শেষটা এটা বুঝতে পেরেই যেন আমাদের দৌড়টাও বেশী লোক-দেখানো হয়ে পড়লো।

—জামাই বাবু আবার ফিরলেন কি করে ?

—আরে, ওর ত' ব্যাবসা চাকরী সব কাছাকাছি, ও ত আমার মত অতদূর পাড়ি দিতে পারল না। অগত্যা গৌরপ্রসন্ন বাবু ওকে সহজেই পাকড়াও করলেন আর সরযূ ?—যেহেতু এযুগে দু'জন পুরুষ বিয়ে করবার রীতি নেই, সেহেতু স্নেহময়কেই বিনা দ্বিধায় বিয়ে করে ফেলল। আমি বললাম—তা মশাই ভালোই ত হয়েছিল, আপনি আবার জুটলেন কেন এসে ?

—আমি জুটিনি রে স্নেহময় চিঠি লিখে আমায় আনিয়েছে। আমি অনেক দূরে পালিয়েছিলাম। ওদের বিয়ের কথা শুনতে আমার খুব ভালোই লেগেছিল। আমি ত স্নেহময়ের জন্তেই সরে এসেছিলাম। স্নেহময়ের সংগে সরযূর বিয়ে হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে যে আবার আমাদের বন্ধুত্বটা সরল হল। ইতিমধ্যে স্নেহময়ের চিঠি এসে হাজির। স্নেহময়ের চিরকালের রীতি হল বিরাট বিরাট চিঠি লেখা। খুঁটি নাটি, বৃত্ত বৃত্তান্ত। কিন্তু খামটা বড় পাতলা। স্নেহময় যদি শেষ পর্য্যন্ত চিঠিই লিখল তবে এত পাতলা চিঠি লিখল কেন ? চিঠিটা খুললাম। ঠিক ডিটেকটিভ বই-এর হুমকি দেয়া চিঠির মত। শুধু দুটি লাইন—'নিমু, শীগগির চলে আয়, তোর পরামর্শ ছাড়া চলবে না'—তাড়াতাড়ি রওনা হলাম। ট্রেনে বসে বসে তোলপাড় করছি মনে মনে, এত জরুরী তলব কেন ? ঝগড়া টগড়া হল নাকি দু'জনের ? কলকাতায় পড়া মেয়ে, তেজী মেয়ে, মানিয়ে নিতে পারল না নাকি স্নেহময়ের সংগে, সারা ট্রেনে মনে মনে তৈরী করতে করতে চললাম গিয়ে কি বলব ? কি ভাবে মেটাব ওদের ঝগড়া।

ভাগলপুরে নামবার সংগে সংগে হার্টের প্যালপিটেশন বেশ বাড়ছে টের পেলাম। কান মাথা সব গরম হয়ে উঠেছে। বুঝলাম স্বাস্থ্য ভাল হয়ে এতদিনে শরীরে যে তাজা রক্ত জমেছে সব আমার কানে, মাথায় ভলকে ভলকে ঠেলে উঠছে। ওদের বাড়ি যখন ঢুকলাম, তখন হার্টের বিট প্রায় আড়াই শ'। কারণ সিঁড়ির মুখে দেখলাম জল জল করছে সরযূর বিয়ে হয়ে যাওয়া রঙিন সিঁথি।

'আমার বুকটা'—সত্যি বলছি মিণ্টু—দুর দুর করে উঠল। সরযূ আমার দিকে সে যে কি দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। যেন তার দু' চোখের মধ্যে দিয়ে কতদিনের অস্নাত অভুক্ত ভিখারিণী তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমার বিষম ভয় হতে লাগল। আমি টের পেলাম দুহাতে দুটো স্যুটকেশ ধরে আমি যেন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছি। তবে কি স্নেহময়ের ধারণা হয়েছে যে সরযূ দ্বিচারিণী নয়, সে আমাকেই ভালোবাসে। সেই অভিমানে আমাকে ডিঙিয়ে দিয়ে নিজেই কেটে পড়ল !

আমি ভয়ে ভয়ে সরযূকে জিজ্ঞেস করলাম,—স্নেহময় আছে ত ?

সে মিষ্টি ভংগিতে বলল—হ্যাঁ আছেন।

সরযূ যেন আরো কিছু বলত। তার দুটো ঠোঁট স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সিঁড়ির তলায় লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল স্নেহময়। তার চুল উস্কোখুস্কো। চোখ লাল দিশাহারা।

—আয় নিমু ভেতরে আয়।

লাইব্রেরী ঘরে বসে আমরা দুজনে ঘণ্টা দুই আলোচনা করলাম। বিয়ের রাতেই সরযূ স্নেহময়কে বলেছে—ঐ একই ভাবে নির্মলেন্দুকেও আমার চাই। সামাজিক উপায়ে সম্ভব নয় দু'জন স্বামীর স্ত্রী হওয়া, কিন্তু অসামাজিক উপায়ে ত' সম্ভব। আমরা দু'টি বন্ধু দুজনের হাতে হাত দিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। কিছু ত একটা করতে হবে ? কিন্তু কি করতে হবে ?—আযৌবন সরযূকে ভুলিয়ে রাখতে হবে, ঘিরে রাখতে হবে, পাহারা দিতে হবে, ব্যাইগ্যামি থেকে পলিগ্যামিতে চলে যাওয়া এক 'পা দরস্ত বৈ ত' নয়। ওর দ্বিচারিণীত্ব যদি বা সয় ওর বহুচারিণীত্ব যে কিছুতেই সইবে না।

যখন লাইব্রেরী ঘরের দরোজা খুলে গেল, আমিও বেরিয়ে এলাম লাল চোখ আর উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে। সরযূ তখনো সিঁড়ির রেলিং ধরে তীব্র দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু তার অবাক দৃষ্টির সামনে আমরা দুটি কৃতী যুবক নায়ক থেকে মুহূর্ত্তে ক্লাউনে নেমে গেলাম। আমাদের বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গি কথাবার্ত্তা সরযূকে—অবাক করে তুলল। সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানিস আমরা দুজনে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে সে কখনো আমাদের ভালোবাসতে না পারে। স্নেহময় তার স্বামী আর আমি তার স্বামীর বন্ধু এই ভাবে থাকতে থাকতে বুড়ো হতে থাকলাম। শেষ পর্য্যন্ত এলাম এই জব্বলপুরে। এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে সরযূর আগুন তার চারটি ছেলে আর দুটি ক্লাউন নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ঝিমিয়ে এল। ভাবলুম বয়সের জলে তার আগুন বুঝি নিভেছে। কিন্তু আগুন জ্বলে উঠল আর এক দিক দিয়ে। তোদের টানতে লাগল সরযূ এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে। তোরা আসতে লাগলি। সরযূ ডাকলে কি না এসে থাকা যায় ?

আপনি কি বলতে চান আমরা আসব না ?

আসবি না মানে ? তোরা আসিস বলেই ত' আমরা খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছি। এখন সরযূর সে বয়সও নেই সে শরীরও না ; ওর সব ভয় দেখানো দাবানল এখন ছেলেখেলায় ফুলঝুরি হয়ে গেছে। যে জিনিটা ওর ভেতর ছিল, বদলে এ বয়সে যেমন হতে হয় তেমনই হয়েছে, আর আমরা দুটিতে আছি চিরকেলে ক্লাউনের মুখোশ পরে। মাঝে মাঝে এক একবার সন্তর্পণে মুখোশ খুলে দেখে নেই, দু'জনে ঠিক আছি কিনা।

আমি বললাম, তবু কোনোদিন জানতে ইচ্ছে করে না সরযূদি' আপনাদের এখনো ভালোবাসে কিনা ?

নির্মলেন্দু বাবু কাঁচা-পাকা গোঁফে ছাওয়া মুখখানি নামালেন, গোলাপবাগানের দিকে তাকালেন। একদম শেষ ফুলটির দিকেই বোধ হয়। তার পর অস্ফুট গম্ভীর গলায় বললেন। করে।

দু'জনেরই। হ্যাঁ দু'জনেরই।

ষাঁড়-গাধা-ছাগলের কথা

(অপ্রকাশিত)

স্বকান্ত ভট্টাচার্য

একটি লোকের একটা ষাঁড়, একটা গাধা আর একটা ছাগল ছিলো। লোকটা বেজায় অত্যাচার করতো তাদের ওপর। ষাঁড়কে দিয়ে ঘানি টানাতো, গাধাকে দিয়ে মাল বওয়াতো আর ছাগলের সবটুকু দুধ দুইয়ে নিয়ে বাচ্চাদের কেটে কেটে খেতো, কিন্তু তাদের কিছুই প্রায় খেতে দিতো না। কথায় কথায় বেদম মার দিতো।

তিন জনেই সব সময় বাঁধা থাকতো, কেবল রাত্তির বেলায় ছাগলছানাদের শেয়াল নিয়ে যাবে বলে গোয়ালঘরের মাচায় ছাগলকে না বেঁধেই ছানাদের সঙ্গে তুলে রাখা হ'তো।

একদিন দিনের বেলায় কি ক'রে যেন ষাঁড়, গাধা, ছাগল তিন জনেই ছাড়া অবস্থায় ছিলো। লোকটিও কি কাজে বাইরে গিয়ে ফিরতে দেরী করে ফেললো। তিনজনের অনেক দিনের খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই গাধা সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ভালো ভালো জিনিস খেতে আরম্ভ করলো। ষাঁড়টা কিছুক্ষণের মধ্যেই সাফ ক'রে ফেললো লোকটির চমৎকার তরকারীর বাগানটা। ছাগলটা আর কি করে, কিছুই যখন খাবার নেই, তখন সে বারান্দায় মেলা একটা আস্ত কাপড় খেয়ে ফেললো মনের আনন্দে।

লোকটি ফিরে সে কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে গেলো! তারপর চেলা কাঠ নিয়ে এমন মারলো তিনজনকে যে আশেপাশের পাঁচটা গ্রাম জেনে গেলো লোকটির বাড়ি কিছু হ'য়েছে। সেদিনকার মতো তিনজনেরই খাওয়া বন্ধ করে দিলো লোকটি।

রাত হতেই মাচা থেকে টুপ ক'রে লাফিয়ে পড়লো ছাগল। তারপর গাধা আর ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করলো :—গাধা ভাই, ষাঁড়ভাই, জেগে আছো? দুজনেই বললো :—হ্যাঁ, ভাই!

ছাগল বললো :—কি করা যায়?

ওরা বললো :—কি আর করবো, গলা যে বাঁধা।

ছাগল বললো :—সে জন্যে ভাবনা নেই, আমি কি-না খাই! আমি এখুনি তোমাদের গলার দড়ি দুটো খেয়ে ফেলছি। আর খিদেও যা পেয়েছে।

ছাগল দড়ি দুটো খেয়ে ফেলতেই তিনজনের পরামর্শসভা শুরু হয়ে গেলো। তারা পরামর্শ ক'রে একটা সমিতি তৈরী ক'রলো। ঠিক হলো আবার যদি এ রকম হয়, তা'হলে তিনজনেই একসঙ্গে লোকটিকে আক্রমণ করবে। ষাঁড় আর গাধা দুজনে একমত হয়ে ছাগলকে সমিতির সম্পাদক ক'রলো। কিন্তু গোল বাধলো সভাপতি হওয়া নিয়ে। ষাঁড় আর গাধা দুজনেই সভাপতি হতে চায়। বেজায় ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। শেষকালে তারা কে বেশি যোগ্য ঠিক করবার জন্যে সালিশী মানতে মোড়লের বাড়ি গেলো। ছাগলকে রেখে গেলো লোকটির ওপর নজর রাখতে। মোড়ল ছিল লোকটির বন্ধু। গাধাটা চেঁচামেচি করে ঘুম ভাঙাতেই, বাইরে বেরিয়ে মোড়ল চিনলো এই দুটি তার বন্ধুর ষাঁড় আর গাধা। সে সব কথা শুনে বললো : বেশ, তোমরা এখন আমার বাইরের ঘরে খাও আর বিশ্রাম করো পরে তোমাদের বলছি কে যোগ্য বেশি। বলে সে তার গোয়ালঘর দেখিয়ে দিলো। দুজনেরই খুব খিদে, তারা গোয়াল ঘরে ঢুকতেই মোড়ল গোয়ালের শিকল তুলে দিয়ে বললো : 'মানুষের বিরুদ্ধে সমিতি গড়ার মজাটা কি, কাল সকালে তোমাদের মনিবের হাতে টের পাবে।'

এদিকে অনেক রাত হয়ে যেতেই ছাগল বুঝলো, ওরা বিপদে পড়েছে। তাই আসতে তাদের দেরী হচ্ছে। সে তার ছানাদের নিয়ে প্রাণের ভয়ে ধীরে ধীরে লোকটির বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো বনের দিকে।

সকাল হতেই খোঁজ খোঁজ পড়ে গেলো চারিদিকে। লোকটি এক সময় খবর পেলো ষাঁড় আর গাধা আছে তার মোড়লবন্ধুর বাড়ি।

অমনি দড়ি আর লাঠি নিয়ে ছুটলো সে মোড়লের কাছে জানোয়ার আনতে।

'মানুষকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই' এই কথা ভাবতে ভাবতে খালি পেটে ষাঁড় আর গাধা পালানর মতলব আঁটছিলো। এমন সময় সেখানে লোকটি হাজির হলো।

তারপর লোকটির হাতে প্রচণ্ড মার খেতে খেতে ফিরে এসে গাধা আর ষাঁড় আবার মাল বইতে আর ঘানি টানতে শুরু ক'রলে আগের মতোই। কেবল ছাগলটাই আর কখনো ফিরে এলো না কারণ, অনেক মহাপুরুষের মতো ছাগলটারও একটু দাড়ি ছিলো।

উপদেশ : নিজের কাজের মীমাংসা করতে অন্যের কাছে কখনো যেতে নেই।

একটি মাতার কাহিনী

[হ্যান্সের "The story of a mother-এর অনুবাদ]

মা ছেলের শিয়রে বসে আছেন। ছেলেটির চোখ বসা মুখ ফ্যাকাসে। খুব ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে ছেলেটি। ছেলের ঐ অবস্থা দেখে মা বড্ড বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। হবেন বৈ কি একমাত্র সন্তান যে।

হঠাৎ মা বাইরের দরজায় কড়া নাড়বার আওয়াজ শুনতে পেলেন। মা দরজা খুলেই দেখতে পেলেন একটা বুড়ো লোক, সারা শরীর একটা ঘোড়ার চামড়ার তৈরী কম্বল ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তো ঐরকম কম্বল গায় দেবেই, কারণ বাইরে যে আ

বরফ পড়ছে। বরফ পড়ে পড়ে চারদিক পেঁজা তুলোর মতো সাদা হয়ে গেছে। গাছে একটাও পাতা নেই। লোকটি ঘরে ঢুকেছে। শীতে অনভ্যস্ত কাঁপছে দেখে, মা তাড়াতাড়ি পানীয় গরম করতে চলে গেলেন। বুড়োটি ছেলেটির পাশে বসতেই ছেলেটি কেমন যেন চুপ হয়ে গেল।

মা গরম পানীয় বুড়োকে দিয়ে পাশে রাখা একটা ভাঙা নড়বড়ে চেয়ারে বসে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। মা বুড়োকে বললেন—একে বাঁচাতে পারবো না ?

বুড়োটি এমন ভাবে মাথাটা নাড়লো যা'তে হ্যাঁ-ও বোঝা যায় না, না-ও বোঝা যায় না। এই বুড়ো লোকটি কিন্তু আর কেউ নয় স্বয়ং যম। মৃত্যুর রাজা।

মা নির্ব্বাক, নিশ্চল। শুধু চোখের জল তার চিবুক ভিজিয়ে দিতে লাগলো। মার মাথাটা কেমন যেন ভারী ভারী লাগছে। না লাগার কোন দোষ নেই। তিন দিন তিন রাত খাওয়াও নেই, ঘুমও নেই। ঐ প্রশ্নের ঐ রকম উত্তর পেয়ে মা যেন কেমন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। ঠিক ঘুম নয়; কেমন যেন একটু তন্দ্রালু ভাব।

মিনিটখানেক পরে মা একটা আওয়াজে চমকে উঠে দেখতে পেলেন, ঘরে কেউ নেই। তার ঝিমিয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে বুড়োটা ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেছে। ঘরের কোণে বুড়ো-ঘড়িটা ভাঙা আলমারীর ওপরে বসে আর টিক্ টিক্ করে সময় গুনছে না। পেণ্ডুলাম স্থির। পেণ্ডুলামের সীসের বলটাও নেই। কোথায় বা গড়িয়ে পড়ে গেছে। ঘড়িটা হারিয়েছে যান্ত্রিক প্রাণ। চার দিক নিঝুম।

মা বিছানায় ছেলেকে না দেখে উদ্ধশ্বাসে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে মা দেখলেন একটা বুড়ী, কালো লম্বা একটা জামা পরে বরফের ওপর বসে আছে। মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, বলতে পারো একটা বুড়ো একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে এই দিকে গেছে কি ?

বুড়ী বললে—হ্যাঁ, দেখেছি বুড়ো একটা ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে গেছে। আর বুড়োটা যে স্বয়ং যম। তা'বাদে সে তো হাওয়ার আগে আগে যায়। আর যা নিয়ে যায় তা' তো সে কখনো ফিরিয়ে দেয় না।

মা বললেন—আচ্ছা বুড়ী-মা, তুমি শুধু বলো আমায় যে সে কোন দিকে গেছে? বলো। আমি ঠিক তাকে খুঁজে বার করবোই।

বুড়ী বললে—হ্যাঁ, আমি জানি সে কোন পথে গেছে। কিন্তু তার আগে, আমাকে তোমার শোনাতে হবে গান। যে মিষ্টি সুরের গান গেয়ে তুমি তোমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে সেই গান। আমি যে সে গান তোমার শুনেছি। তোমার মিষ্টি গলার মিষ্টি গান শুনতে আমি খুব ভালবাসি। আমার নাম রাত্রি। যখন তুমি ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি গান গেয়ে তোমার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে, তখন তোমার কপাল বেয়ে যে জল পড়তো সে জলও আমি দেখেছি।

মা বললেন—আচ্ছা, আমি তোমায় সব গান শোনাবো। যত ঘুমপাড়ানী গান জানি সমস্ত শোনাবো। এখন আমার সময় বইয়ে দিও না। আমায় ছেড়ে দাও লক্ষীটি। ছেলেকে খুঁজে নিয়ে আসি। তারপর তোমায় সব গান শোনাবো। কেমন ?

বুড়ী কিন্তু নির্ব্বাক নিশ্চল।

মা বললেন—বলো বুড়ী মা, কোন দিকে সে গেছে। বলো চুপ করে থেকো না।

রাত্রি-বুড়ী বললে—না। তা হ'বে না। জানো তো, আমার কথার কোন নড়চড় হয় না।

মা তখন নিরুপায় হয়ে গাইতে লাগলেন গান। মন প্রাণ ঢেলে গাইতে লাগলেন সব ঘুমপাড়ানী গান, যত গান জানতেন। আজকে তাঁর মিষ্টি গান যেন আরও মিষ্টি হয়ে উঠলো। সেই মিষ্টি গান শুনে রাত্রি-বুড়ী বললে—সোজা ডান দিকে যাও। ডান দিকে যাবার পথ একটা ঘন বন দেখতে পাবে। ঐ বনের দিকেই যমরাজ তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে।

মা চললেন বনের দিকে। বনের ভেতর ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে মা এসে পড়লেন এক চৌমাথা রাস্তায়। মা এখন ভেবে পান না যে কোন দিকে এগুবেন। পাশেই ছিল একটা কাঁটা গাছ। বরফ পড়ে গাছটা হয়ে গেছে একদম ন্যাড়া। একটাও ফুল নেই। একটাও পাতা নেই। শুধু আছে কাঁটা।

মা কাঁটা গাছকে জিজ্ঞেস করলেন—বলতে পারো কাঁটা গাছ, কোন পথে যমরাজ আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে ?

কাঁটা গাছ বললে—হ্যাঁ বলতে পারি। কিন্তু বলবো না। যতক্ষণ না তুমি তোমার বুকের মাঝে আমায় জড়িয়ে ধরছ। মাতৃস্নেহের উত্তাপ যে আমি চাই। দেখছো না, বরফ আর শীতে আমি কেমন জমে মরে যাচ্ছি। মা তখন কাঁটা গাছকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন যেমন করে তিনি স্নেহ বাৎসল্যে জড়িয়ে ধরতেন নিজের ছোট ছেলেটিকে। কত কাঁটা বিঁধে গেল তাঁর বুকে। সারাটা বুক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। সন্তানহারা মায়ের মাতৃস্নেহের উত্তাপে কাঁটা গাছের ডালে ডালে পাতা আর ফুল ফুটে উঠলো। তখন কাঁটা গাছ পথ দেখিয়ে বললে—এই পথে যাও। মা চলেছেন কাঁটা গাছের দেখানো পথ দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে মা এসে পড়লেন একটা বিরাট হ্রদের সামনে। হ্রদ ভর্ত্তি স্বচ্ছ নীল জল। এতো স্বচ্ছ যে হ্রদের তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়। হ্রদটা ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। একটা নৌকো পর্য্যন্ত না। চারদিক শুধু জল—আর জল।

মা এই হ্রদ পার হবেন কেমন করে? এমন কি ঠাণ্ডায় হ্রদটা জমেও যায়নি, যাতে করে তিনি হেঁটে যেতে পারেন। মা মনে মনে বললেন—যেমন করেই হোক্, আমায় পার হ'তেই হবে। পার না হ'লে ছেলেকে খুঁজে পাবো কেমন করে? মা একবার ভাবলেন যে হ্রদের সমস্ত জল খেয়ে শুকিয়ে দেওয়া যায় না? আবার পরক্ষণেই ভাবলেন—সে কি সম্ভব? মা প্রার্থনা করলেন—হে ঠাকুর, আমায় একটা কিছু বিহিত করে দাও। না হ'লে যে আমার ছেলেকে আর খুঁজে পাবো না। ছেলেহারা মায়ের দুঃখ কি তুমি একটুও বোঝ না ?

হ্রদ তখন বললো—আমায় কি কেউ সাঁতরে পার হতে পারে? সে যে মানুষের অসাধ্য।

মা বললেন—কিন্তু হ্রদ, আমায় যে পার হ'তেই হবে। নইলে আমি কেমন করে যমরাজের কাছ থেকে আমার ছেলেকে আনবো? তুমি আমায় একটা উপায় বলে দাও, লক্ষী।

হ্রদ বললে—বেশ তোমার চোখ দুটো আমায় দাও পছন্দ।

তোমার ঐ সুন্দর কালো হরিণ-চোখ দুটি যদি আমায় দাও, তা'হলে আমি তোমার ওপারে যমপুরীতে পৌঁছে দেবো। সেখানে যমরাজের সুন্দর আর প্রকাণ্ড ফুলের বাগান আছে। আর ঐ ফুলগুলোই হচ্ছে—এক একটা মানুষের জীবন।

মা আচ্ছা বলেই—নিজের কালো হরিণ চোখ দু'টো হ্রদকে দিয়ে দিলেন।

হ্রদ তখন মাকে কোলে তুলে নিয়ে ওপারে যমপুরীতে পৌঁছে দিল।

যমপুরী একটা বিরাট বাগানবাড়ী। বাগান, পাহাড়, গুহা, দীঘি, কুয়ো, ফুলগাছ আরো কত কি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু মা তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। দেখবেন কেমন করে বলো? মার তো চোখ নেই। চোখ তো মা হ্রদকে দিয়ে দিয়েছেন।

মা যমপুরীতে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, যমরাজ কোথায়? যমরাজের কোথায় গেলে দেখা পাবো? তিনি যে আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছেন।

যমরাজ তো এখনো ফেরেন নি। আর তুমিই বা কে? কেমন করে হেথা ঢুকলে? কেই বা তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দিলে? বললে একজন কাশফুলের মতো সাদা চুল মাথায় বুড়ী।

মা বললেন—করুণাময় ভগবান্‌ই আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কে আর দেখাবে বলো? তিনি ছাড়া কে আর আছেন? তিনি দয়াময়। তাঁর দয়াতেই তো বেঁচে আছি। তুমি আমায় একটু দয়া করে বলো না, কোথায় গেলে আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পাবো?

তা তো আমি জানি নে। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে কাল রাত্তে অনেক ফুল ও গাছ তোলা হয়েছে। যমরাজ এক্ষুণি এসে সেই গাছগুলো পুঁতবেন এই বাগানে। তুমি বোধহয় জানো যে এক একটি গাছ এক একটি মানুষের বংশ আর একএকটি ফুল এক একটি মানুষের জীবন। ঐ ফুলের মাঝে তুমি যদি কান পাতো, তা হ'লে শুনতে পাবে মানুষের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক্ আওয়াজ। তোমার ছেলের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ তুমি শুনতে পাবে? আচ্ছা, তোমায় যে এত খবর বললুম তার বদলে তুমি আমায় কি দেবে? যদি আমায় কিছু দাও তাহলে তোমায় আরও অনেক খবর দেবো।

মা বললেন—আমার যা ছিল তা তো সব দিয়ে দিয়েছি। দেবার মত আর যে কিছু নেই।

বুড়ী বললে—তোমার মেঘের মতো কালো কালো চুল আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। তোমার ঐ চুলগুলো আমায় দাও না? তার বদলে আমি যে কিছু দেবো না, তা' কিন্তু ভেবো না। আমিও তোমায় আমার সাদা সাদা রেশমী চুলগুলো দেবো। আমায় অত স্বার্থপর ভেবো না কিন্তু।

এই নাও বলে মা তার মেঘের মতো কালো চুলগুলো বুড়ীকে দিয়ে সাদা চুল নিলেন।

তারপর তারা দু'জনে চললো যমপুরীর বাগানের দিকে। ফুলগাছের পর ফুলগাছ। এখানে গাছ, ওখানে গাছ। গাছে গাছে ছয়লাপ। গাছে গাছে ফুলগুলো হাসিতে ঢল হয়ে দুলছে।

মা তখন বুড়ীটিকে বললেন, এত বড় বাগানে, এত ফুলের মাঝে, আমার ছেলের জীবন কোন ফুলে আছে, বুঝতে পারি না যে।

বুড়ী বললে, চলো তোমায় দেখিয়ে দিই তোমার বংশের ফুলো গাছ। সেই গাছের ফুলের ভেতর শুনতে পাবে, তোমার ছেলে বুকের ধুকধুক আওয়াজ।

বুড়ী মাকে তার বংশের ফুলের গাছ দেখিয়ে দিয়ে বললে কান পেতে শুনে বার করে নাও তোমার হারিয়ে-যাওয়া ছেলেকে।

মা তো চোখে দেখতে পান না। তাই ফুলে ফুলে তিনি কান পেতে যাচ্ছেন। কান পেতে যেতে যেতে মা চেঁচিয়ে উঠে বললেন, পেয়েছি, পেয়েছি এই ফুলটাতে আমার ছেলের বুকে ধুকধুক আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। ছিঁড়বো, বুড়ীমা, ছিঁড়বো?

বুড়ী তখন চেঁচিয়ে বললে, না। না। ছিঁড়ো না।

বুড়ীমা দেখলেন সত্যিই ফুলটা কেমন যেন একটু শুকিয়ে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। গন্ধও তেমন বিশেষ নেই।

বুড়ী ফুল দেখে বললে, ফুল না ছিঁড়ে ঐখানে চুপটি করে বসে থাকো। যখন যমরাজ এসে এই ফুলটা তুলতে যাবেন, তখন তুমি তাকে বেশ ভয় দেখিয়ে বলবে, যমরাজ তুমি যদি এ ফুলটি তোলো, তা' হ'লে আমিও কিন্তু আসেপাশের যত ফুল আর যত গাছ আছে সব পটাপট তুলে ফেলবো। তা' হ'লে যমরাজ ভয় পেয়ে আর তোমার ছেলের জীবন-ফুল তুলবেন না। তাঁকে সব ফুলের হিসেব রাখতে হয়। সেই হিসেব আবার ভগবানের আসল হিসেবের খাতায় তুলতে হয়। ভগবানের হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন ফুলই তুলতে পারেন না।

এই সব কথা বলতে বলতে বুড়ী আর মা পেলেন বরফ-ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ।

বুড়ী বললে, বরফ ঠাণ্ডা হাওয়া যখন বইছে যমরাজ তখন নিশ্চয়ই আসছেন।

মাকে দেখে যমরাজের বিস্ময়ের আকাশে বাজ পড়লো। যমরাজ বললে, আরে—তুমি এখানে কি করে এলে? রাস্তাই বা তোমায় কে চিনিয়ে দিলে? আর আমার আগেই বা কেমন করে এলে?

মা বললেন, আমি যে মা। সন্তানের জন্যে আমরা সবখানে যেতে পারি, সব কিছু করতে পারি।

যমরাজ এবার সেই ফুলটি ছিঁড়তে যাচ্ছেন।

তোমায় কিছুতেই আমার ছেলের জীবন-ফুল তুলতে দেবো না বলেই ফুলটিকে শক্ত করে ধরে রইলেন মা।

যমরাজ বললেন—তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না আমি যে যমরাজ।

কেন, করুণাময় ভগবান—বললেন মা।

আমি তো তাঁর কথামতই কাজ করি। আমি যে তাঁর বাগানের মালী। তাঁর কথামতো এ স্বর্গরাজ্যে আমি ফুলগাছ লাগাই, জল দিই, লালন পালন করি। আবার তাঁর কথামতই সেসব গাছ কেটে-ছেঁটে তুলে ফেলি। আমি যে তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর আদেশে তো আমি তোমার ছেলের জীবন-ফুল তুলতে এসেছি।

আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও বলেই মা পাশের গাছের ফুলগুলো আঁকড়ে ধরলেন। আমায় ছেলেকে ফিরিয়ে দাও বলছি। না

দাও! দেবে না? না দিলে কিন্তু আমি এই ফুলগুলো ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলবো বলছি—বললেন মা।

যমরাজ বললেন—দাঁড়াও। হাত দিও না। আচ্ছা, এইমাত্র তুমি না বললে যে তুমি ছেলেহারা শোকার্ত্ত মা। সন্তানের জন্যে সব কিছু করতে পারো। সবখানে যেতে পারো। আর মা হয়ে তুমি অন্য ছেলেদের জীবন-ফুল তুলতে চাইছো? মা হয়ে তুমি এ কাজ করতে চাও। তোমার নিজের স্বার্থ রাখতে গিয়ে শত সহস্র মায়েদের মনে সন্তান হারানোর কষ্ট দেবে? সন্তান হারানোর কষ্ট তুমি এখনও পাচ্ছো। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুমি মা হয়ে কি করে ও-কথা মুখে আনলে। তুমি জানো, প্রতিটি ফুল এক একটি ছেলের জীবন। যেটিকে তুলবে, সেইটিই মারা যাবে।

না, না, না। আমি কোন ফুলই ছিঁড়বো না। না, না, না। আমি কাউকে আর আমার মতো সন্তান হারানোর শোক দেবো না। আমি জানি সে কষ্ট, সে দুঃখ, সে শোক। না, না, না। আমি আর কিছু করবো না, বলেই মা খুব কাঁদতে লাগলেন।

যমরাজ বললেন—এই নাও তোমার চোখ দুটো। হ্রদ পেরিয়ে আসবার সময় ও-দুটো তুলে এনেছি। চোখ দুটো পরে নাও, তাহ'লে সব দেখতে পাবে। তোমায় সব কিছুই দেখিয়ে দিই।

মা এবারে সব কিছুই বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। পারবেনই তো। হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলে ধোয়া চোখ কি না?

এবারে যমরাজ মাকে নিয়ে এলেন একটা কুয়োর ধারে, আর বললেন—চেয়ে দেখো কুয়োর ভেতর।

মা কুয়োর ভেতর দেখলেন—জলে ভাসছে সুন্দর ফুল। দেখতে দেখতে ফুল দুটো বড় হয়ে উঠলো। একটি ফুলকে ঘিরে দেখা দিল—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, আনন্দ আর শান্তি। আরেকটি ফুলকে ঘিরে দেখা দিল—অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, দুঃখ আর অশান্তি।

মা বললেন—দু'টি ফুলের দু' রকম জীবনলিপি কেন?

যমরাজ বললেন—সবই ভগবানের ইচ্ছে। তোমরা তো জানো, যে তাঁর ইচ্ছের ব্যতিরেকে কোন কিছু হবার জো নেই। তুমি যে ফুলটি তুলতে যাচ্ছিলে সেইটিই হোল ঐশ্বর্য্যবান্, সুখী ফুলটি। আর আমি যেটি তুলতে যাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে ঐ দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ, শোকভরা ফুলটি।

মা বললেন—এ দু'টো ফুলের ভেতর কি আমার ছেলের জীবন আছে?

যমরাজ বললেন—হ্যাঁ। ঐ দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ শোক ভরা ফুলটিই হচ্ছে তোমার ছেলের। তোমার ছেলেকে আজীবন ঐ রোগ, শোক, জরায় ভুগতে হবে। কষ্ট পেতে হবে। তুমি মা হয়ে কি তাই চাও?

মা বললেন—না! না! তা' আমি চাই না। আমি চাই ওর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি।

যমরাজ বললেন—তাই তো তোমার ছেলেকে আমি স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তাকে সঁপে দেবো ভগবানের পায়ে। যেখানে শুধু শান্তি! শান্তি! শান্তি!

মা নিজেকে শান্ত ও সংযত করে বললেন—হ্যাঁ। হ্যাঁ তাকে তুমি স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাও। আমি তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিতে চাই না। যেখানে শুধু রোগ, শোক, জরা, দুঃখ আর অশান্তি।

অনুবাদ—দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়

ছোটদের বায়না

শশাঙ্কজীবন চক্রবর্ত্তী

সারাদিনে ধরাবাঁধা চব্বিশ ঘণ্টা,
কেন থাকে গোণা গাঁথা বল দেখি ভণ্টা?
দু'-চারটে ঘণ্টা কি, কম করা যায় না,
ভগবান শুনবেনা—ছোটদের বায়না?

সকাল সাতটা থেকে দশটা না থাকলে?
থাক্‌তে হয় কি বসে বই খাতা আগলে?
তেমনি রাত্রিবেলা ছ'টা থেকে নয়টা,
নাই যদি থাকে তবে করি কার ভয়টা?

এই ছটা ঘণ্টাই কী যে হয় কষ্ট,
খুলে আর বলব কি, সোজাসুজি পষ্ট,
শুনলে বুড়োরা ঠিক, মেরে দেবে গাঁট্টা,
এক্ষুণি, গুড়োদের গুণে গুণে আটটা!

পড়তে বসেই কত, নদী বয় চক্ষে,
পড়ে কি সেসব গুরুজনদের লক্ষ্যে!
দূরু থেকে, তাঁরা মন ভুরু দু'টি কুঁচকে,
দুরু দুরু বুকে কাঁদি আমরা যে পুঁচকে!

অথচ দিনেরা কিছু হলে কম লম্বা,
সরস্বতী-কে বেশ দেখাতুম, রম্ভা!
পড়ার ঘণ্টাগুলো হ'লে নিশ্চিহ্ন,
থাকতো কি করবার, খেলাধুলো ভিন্ন!

শুনেছি ত মন দিয়ে, পারে যদি ডাক্‌তে,
ভগবান পারেন না চুপ করে থাক্‌তে,
আয় না রে, সব্বাই, বলে দেখি আয় না,
বিধাতা শোনেন কিনা, ছোটদের বায়না?

পশু-পাখীর ঘুম

মিহিরকুমার ভট্টাচার্য

তোমরা বোধহয় জান যে, প্রত্যেক জীবের বিশ্রামের জন্য ঘুমের প্রয়োজন। কারো ঘুম বেশী আবার কারো ঘুম কম। বিভিন্ন প্রাণীর ঘুমের মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। এমন অনেক প্রাণী আছে যারা একটানা সুদীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। সেজন্য এসব প্রাণীদের কুম্ভকর্ণ বলা যেতে পারে। তবে এরা বছরের সব সময়ই ঘুমায় না কেবল শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটায়।

সেজন্ত এদের এই ঘুমকে বলা হয় শীত-ঘুম। এবার তোমাদিকে কয়েকটি প্রাণীর শীত-ঘুমের কথা বলছি।

ভালুকের কথা তো তোমরা জান। সারা শীতের সময় এদের দেখা পাওয়া যায় কদাচিৎ। যে যার আস্তানায় লম্বা ঘুম দেয়। তখন এরা প্রায় চার-পাঁচ মিনিট বাদ বাদ একবার করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। যেই এদের শীত-ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন এরা কয়েক ঘণ্টা বা দু-একদিনের জন্ত বনবাদাড়ে একটু বেড়িয়ে আসে। সাদা ভালুকদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এদের মধ্যে যারা সন্তান-সম্ভবা তারাই কেবল শীতের সময় লম্বা ঘুম দেয়—প্রায় তিন চার মাস। আরও মজার কথা কি জান? ভাবী মায়েরা ঘুমাবার সময়ই বাচ্চা প্রসব করে—এবং বাচ্চাসহই ঘুমিয়ে থাকে। গ্রিজলী নামক তেজী ভালুকরাও শীতের আভাস পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুহায় ঢুকে লম্বা ঘুমের আয়োজনাদি আরম্ভ করে দেয়।

গ্রাউণ্ড স্কুইরেল (একজাতের কাঠবিড়ালী) শীত-ঘুমে—মড়ার মত পড়ে থাকে তার বাসায়—তখন তার শারীরিক কোন অনুভূতিই থাকেনা। যেই শীত চলে যায়—তখন আবার গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে নিজের কাজ আরম্ভ করে দেয়। উড-চাক নামক কাঠবিড়ালী শীতের সময় একটানা প্রায় ছ'মাস ঘুম দেয়। ঘুমাবার সময় এদের দেহে কোন চৈতন্ত থাকেনা। ওদের খোঁচা দিলে বা কানের কাছে খুব জোরে শব্দ করলেও ঘুম ভাঙ্গেনা। এ থেকেই বুঝতে পারছো এদের ঘুম কী গভীর। ঘুমাবার জন্ত এরা বাসার (সুড়ঙ্গ) মধ্যে লতা, ঘাস, পাতা দিয়ে একটা আরামদায়ক বিছানা তৈরী করে এবং বাসার মুখ আবর্জনা দিয়ে বন্ধ করে দেয় যাতে কোন শত্রু বাসায় ঢুকতে না পারে। মাথাটাকে পিছনের পা-দুটোর মধ্যে রেখে দিব্যি ঘুম দেয়। ঘুমের সময় এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি প্রায় থাকে-ই না এবং দেহের তাপমাত্রাও খুব কমে যায়।

শামুক তোমাদের অনেকেরই পরিচিত প্রাণী। ডাঙায় যেসব শামুক থাকে তাদের ঘুমও বেশ লম্বা। এদের লম্বা ঘুম সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর ঘটনার কথা জানা গেছে। মিশরের মরুভূমি অঞ্চলে একজাতের অদ্ভুত শামুক দেখা যায়। এদেরই এক জাতভাই শীত ঘুমের ইতিহাসে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ যাদুঘরে এজাতের একটি শামুক সংগৃহীত হয়। শামুকটির দেহে কোন প্রাণের লক্ষণ ছিল না। সুতরাং কর্মচারীরা শামুকটিকে মৃত মনে করে রেখে দেন। তার পর চার বছর বাদে ১৮৫০ সালের মার্চ মাসে দেখা গেল যে, শামুকটির শরীর থেকে আঠালো রস নিঃসৃত হচ্ছে। তখন জলে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেল যে, সে চলা ফেরা আরম্ভ করেছে, 'এই চার বছর সে ঘুমিয়েছিল।

প্রায় সব জাতের শামুকই শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। তখন এরা মাটির নীচে বা পাথরের ফাটলে আস্তানা গাড়ে যাতে শত্রুর নজরে না পড়ে। আর ঘুমাবার সময় এরা দেহের শক্ত আবরণীর ঢাকনাটা বন্ধ করে রাখে।

লম্বা ঘুমের জন্ত আমেরিকার ডরমাউসও (একজাতের ইঁদুর) বিখ্যাত। ফরাসী ভাষায় 'ডরমার' শব্দের অর্থ হলো—ঘুমানো। ডরমাউস প্রায় ছ'মাস শীত-ঘুমে কাটিয়ে দেয়। তখন এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয় খুব মৃদু এবং শরীরটা খুব শক্ত হয়ে যায় ও দেহের উত্তাপও খুব কম থাকে। শীত চলে গেলেই এরা আবার স্বাভাবিক জীবন আরম্ভ করে।

হেজ-হগ নামক একজাতের অদ্ভুত জন্তু আছে। এদের প্রধান খাদ্যই হলো পোকামাকড়। হেজ-হগও শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। এদের মধ্যে শীত-ঘুমের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যখন তখন এদের শীত-ঘুম ভেঙ্গে যায়। তবে অধিকাংশ হেজ-হগই বসন্ত ঋতু না আসা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়।

মশার শীত-ঘুমও বিখ্যাত। অধিকাংশ মশাই শীতকালে ঘুমিয়ে কাটায়। দেখা গেছে কোন কোন জাতের স্ত্রীমশা প্রায় ছইমাস ঘুমিয়ে কাটায়—এই সময় এরা কোন খাদ্য না খেয়েই থাকতে পারে।

আফ্রিকার লাং-ফিসের শীত-ঘুমও উল্লেখযোগ্য এবং এদের ঘুমাবার কায়দাটিও বিচিত্র, লাং-ফিস জলের তলায় পাঁকের মধ্যে সতের-আঠারো ইঞ্চির মত গভীর একটা গর্ত তৈরী করে তার মধ্যে লম্বা ঘুম দেয় এবং লেজটা বাঁকিয়ে মাথার কাছে নিয়ে আসে। সারা শরীরটা একরকম চটচটে আঠালো রস (এদের শরীর থেকেই রসটা নিঃসৃত হয়) দিয়ে মেখে রাখে। এর উদ্দেশ্ত বোধ হয়—শত্রু যাতে চট করে তার সন্ধান না পায়। ঘুমের সময় এদের শরীরে জীবনের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না।

পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলভুক্ত অঞ্চলের কার্পজাতীয় বড় বড় মাছও শীত-ঘুম দেয়। ঘুমাবার আগে এরা জলের তলার কাদার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে—তার মধ্যে ঘুম দেয়। কোন কোন কার্পজাতীয় মাছের দৈহিক উত্তাপ হিমাঙ্কের নীচে নেমে যায়—এদের শীত-ঘুমের সময়। দারুণ ঠাণ্ডায় এদের শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধই থাকে। দেহে উত্তাপ ফিরে এলে আবার এরা চাজা হয়ে ওঠে।

এছাড়া বাদুড়, ব্যাজার, কাঁকড়া-বিছা, মাকড়সা, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ, গিরগিটি, নিউট প্রভৃতি প্রাণীরাও সাধারণতঃ শীতকালে লম্বা ঘুম দেয়। খাওয়াদাওয়া না করে এরকম লম্বা ঘুম-এর ফলে কিন্তু এদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ হলো এদের শরীরে একরকম চর্বিজাতীয় পদার্থ জমা থাকে এবং সেই পদার্থের সাহায্যেই শীত-ঘুমের সময় এদের শারীরিক পুষ্টি সাধিত হয়।

মুর্শিদাবাদের নাম

বাসুদেব পাল

আজকের মুর্শিদাবাদকে এককালে কেউ বলতো,—'মুখসুসাবাদ' আবার কেউ বলতো,—'মুখসুদাবাদ'। সে যে কতদিনের আখ্যান ইতিহাসের ছায়াপথে তার সঠিক সন্ধান মেলে না। কিংবদন্তীর কথা,—এই মুখসুসাবাদের উৎপত্তি নাকি জনৈক বৈষ্ণবকে কেন্দ্র করে। নাম তাঁর মধুসূদন দাস। ধনকৌলিন্সের বলে দশদিগরের দশজন একডাকেই চিনতো তাঁকে। পরম বৈষ্ণব মধুসূদন কালযাপন করতেন নেহাৎ সাধারণভাবে। সামান্ত এক আখড়াতেই পরম সুখে দিন কাটতো তাঁর। এহেন বৈষ্ণবের এক মোটা অঙ্কের অর্থের দ্বারাই একদা মুখসুসাবাদ শহরের পত্তন হয় এবং মধুসূদনেরই নামানুসারে উক্ত নয়া নগরের নামকরণ করা হয় 'মুখসুসাবাদ'। অপর এক জনশ্রুতিতে পাওয়া যায়: মধুসূদন নাকি নানকপন্থী ধার্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন। একবার গৌড়েশ্বর

হুশেনশাহের নিদারুণ পীড়া হয়। সংবাদ পেয়ে মধুসূদন সেই পীড়া আরোগ্যের উদ্দেশ্যে গৌড়ে যাত্রা করেন এবং অনতিকালের মধ্যেই তাঁর অপূর্ব চিকিৎসা-বিদ্যায় গৌড়েশ্বর সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে ওঠেন। এ-হেন বৈদ্যের পারিশ্রমিক বা পুরস্কার হিসাবে হুশেনশাহ অকাতরে প্রভূত অর্থ দান করেন। প্রবাদ মতে, এই অর্থই নাকি মুখসুসাবাদ পত্তনের প্রকৃত ইন্ধন। পুঁথির পাতায় কিংবদন্তীর কথাও নেহাৎ কম নেই। এও এক প্রবাদ বা কিংবদন্তী, যথা, মখসুস আলি খাঁ নামে একজন মস্ত ধনী ব্যবসায়ী মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে কাশীমবাজারের সন্নিকটে চুনাখালিতে বাস করতেন এবং তাঁর নামানুসারেই নাকি চুনাখালির উত্তরাংশের নামকরণ হয় মুখসুসাবাদ।

'আকবর নামা'র এক স্থানে এই বাঙলারই শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁর ভাই মখসুম খাঁর নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের অভিমতে; এই মুখসুস খাঁ চুনাখালিতে ফৌজদাররূপে অবস্থানকালে চুনাখালির উত্তরাংশ 'মুখসুসাবাদ' নামে পরিচিত হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) টাভার্নিয়ার এইক্ষেত্রে উপনীত হ'ন এবং এই সব স্থানগুলোকে তিনি 'অতি মনোরম' বলেই অভিহিত করেন। ইনিই এর নাম নির্দ্দেশ করেছেন 'মদেসুবাজারকী'। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় এই মখসুসাবাদ লুণ্ঠিত হয়। কাশীমবাজারের বণিকগণ বিদ্রোহীদের সাথে এক চুক্তি দ্বারা এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। লাহোর চিত্রশালায় রক্ষিত (১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত) আওরঙ্গজেবের আমলের একটি টাকার প্রতিচ্ছবি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ সময়ে মুখসুসাবাদে মুঘলদের এক টাকশাল ছিল।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার রাজধানী ছিল জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায়। ঐ সময়ে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্‌শান বাংলার সুবাদার ছিলেন আর মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হ'ন। অকস্মাৎ আজিম উসশান এবং মুর্শিদকুলী খাঁর মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্তে গভীর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার মধ্যস্থলে অবস্থিত মুখসুসাবাদেই তাঁর সমস্ত দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সাথে জগৎ শেঠের পূর্ব্বপুরুষ মানিকচাঁদ এবং নারায়ণ কানন গো মুখসুসাবাদে উপনীত হ'ন।

আওরঙ্গজেবের দেহাবসানের পর মুঘলদের মধ্যে প্রচণ্ড গৃহবিবাদ হয়। মুঘলদের এহেন গৃহ-দ্বন্দ্বের সুযোগে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রভূত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন এবং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফর্‌রুখশিয়ারের সময়ে বাংলার নবাবী পদেও অধিষ্ঠিত হ'ন। তদবধি মুখসুসাবাদের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে মুর্শিদাবাদ নামে পরিণত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ খাঁটি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পিতা তাঁকে ইরাণদেশীয় এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করে দেন। উক্ত বণিক তাঁকে ইস্পাহানে নিয়ে গিয়ে পুত্রের ন্যায় পালন করেন এবং তাঁকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে নামকরণ করেন—মহম্মদ হাদী। পরিণত বয়সে মহম্মদ হাদী বেরারের দেওয়ানের অধীনে সামান্য এক চাকুরী গ্রহণ করেন। অল্প কিয়ৎকালের মধ্যে উক্ত কার্য্যে অপূর্ব্ব দক্ষতা প্রদর্শন করে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবই তাঁকে এহেন সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর মহম্মদ হাদী বাংলায় দেওয়ানীপদ গ্রহণ করে কারতলব খাঁ আখ্যা লাভ করে ঢাকায় গমন করেন। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত স্থানেই স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে মহম্মদ হাদী বা কারতলব খাঁ পুনরায় বাদশাহ' কর্ত্তৃক 'মুর্শিদকুলী মতিমন্‌উলমুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী জঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত হন। সেই থেকেই তিনি 'মুর্শিদকুলী খাঁ' এই নামে পরিচিত।

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ দে ভেরী)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

৩

আমরা যাত্রা করলুম ভোর থাকতে-থাকতে। সামান্য জলপথ অতিক্রম করতে-না-করতে চারিদিক ঝলমল করে উঠল। মাথার উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ আর নীচে কাকচক্ষুর মত জলের উপর দিয়ে আমরা হেলে-দুলে চলতে লাগলুম।

বজরার ছাউনির মধ্যে বসে থাকার সময় সেটা নয়। কাজেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে পাটাতনের উপর বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে-খেতে গল্প করতে লাগলুম।

এলিস আমাদের সঙ্গী দাঁড়ি-মাঝি ও এই সবলকায় লোকদের খোলা শরীরের দিকে লক্ষ্য করে বললে, আচ্ছা শুনি তো এরা ভাল খেতে পায় না, অথচ এদের এমন সুন্দর স্বাস্থ্য হয় কি করে ?

উত্তরে আমি বললুম, মুক্ত বাতাস আর বিশুদ্ধ জল—প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সম্পদ এই দুটি। জল-বাতাস শহরের পরিবেশে দূষিত হয় বলেই সাধারণত আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। তার উপর খাদ্য তো আছেই। তাছাড়া প্রত্যেক জাতির বংশানুক্রমিক ধারাও আছে একটা।

গল্প করতে করতে বেলা বাড়তে লাগল। বজরার পাটাতনের উপরেই আমরা বসে প্রাতরাশ সারলুম। সঙ্গের নৌকাগুলি সমেত বজরা এগুতে লাগল ঘণ্টায় প্রায় ছ'সাত মাইল করে। শহরতলী ছাড়িয়ে ক্রমশঃ আমরা গ্রামের পরিবেশে এসে পড়লুম। দু'পাশের দৃশ্যও গেল বদলে। কোলাহল নেই, কলের চিমনীর বিষাক্ত ধোঁয়া নেই, নির্ম্মল আকাশ। যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত শান্ত পল্লীশ্রীর দৃশ্য—সবুজের পর সবুজের বিবিধ সমারোহ। ঝোড়-ঝাড়, ক্ষেত-খামার আর চাষীদের নিজের হাতে গড়া ডালপালা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কুঁড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা অসঙ্কোচে এখানে উড়ে বেড়াচ্ছে, গরু-বাছুর চরে বেড়াচ্ছে মাঠে-ঘাটে। মধ্যে মধ্যে ভেড়ার পাল নাচানাচি করছে মনের আনন্দে। হিংস্র জীবজন্তুর সমাগম এখানে যে নেই তা এদের দেখলেই বেশ বোঝা যায়। মধ্যে মধ্যে দু'চারজন কৌপীনধারী বুনো মানুষকেও ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও তীর-ধনুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে কেউ ওত পেতে বসে আছে, আবার কেউ বা বর্শা হাতে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে

আছে নদীর পাড়ে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে। এরা আমাদের লোকজনদেরই সমগোত্রীয়।

দৃশ্যের এই পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই শহুরে মেয়ে এলিসের মনে শিহরণ এনে দিয়েছে। অপলক দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই বিচিত্র শোভার মধ্যে ডুব দিয়েছে সে। নদীর জলের রঙ কিছুদূর অন্তর মধ্যে মধ্যে বদলাচ্ছে বহুরূপীর মত। কোথাও জল কাচের মত স্বচ্ছ, কোথাও ঘোলা, আবার কোথাও বা গাঢ় কালো। এই নদীতে স্রোত কিন্তু সর্ব্বত্রই ভয়াবহ প্রখর। কোথাও-কোথাও আবার বাঁকের মুখে স্রোতের জল বাধা পেয়ে পাক খাচ্ছে। নদীর এই জায়গাগুলি একটু ভয়ের; এখানে খুব সাবধানে দেখে-শুনে নৌকা চালাতে হয়।

এবার পল্লীর দৃশ্য ছাড়িয়ে, ছোট-বড় উন্মুক্ত প্রান্তর, জলাভূমি অতিক্রম করতে করতে আমরা ক্রমশ: জঙ্গলের সম্মুখীন হতে লাগলুম। দু'ধারেই এখন নানা ধরণের ছোটবড় গাছ নজরে পড়তে লাগল। আর ঐ সব গাছেদের কোন-কোনটার গায়ে লতাগুল্ম পাক খেয়ে উপরে উঠেছে। অদ্ভুত সব পরগাছা বিচিত্র পত্রপল্লব আর ফুল নিয়ে উদ্ভিদ জগতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে এই নিভৃতে। আমেরিকায় থাকতে শুনেছিলুম, এখানে নাকি বহু মূল্যবান অর্কিডের সন্ধান পাওয়া যায়।

নদীর পাড়ে বড় বড় গাছ থেকে মোটা কাছির মত ঝুরি নেমেছে। ডালপালাও কোথাও-কোথাও ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। যতই জঙ্গলের মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি, নদীর দু'পাড় ততই ক্রমশ: আমাদের কাছে সরে আসছে—সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে তার প্রসার! এবং এই চওড়া যতই কমে আসছে, জলে টানের তীব্রতা ততই যাচ্ছে বেড়ে।

দাঁড়ি-মাঝিদের উপর এখন জোর পড়ছে অনেক বেশী। তারা প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে বটে, কিন্তু এর আগে যে গতিতে নৌকাগুলি এগিয়ে চলেছিল, এখন সে গতি প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে এসেছে। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে এঁ্যাকব্যাঁকের মাথায় নৌকাগুলিকে সামলাতে এখন বেশ বেগ পেতে হচ্ছে সবাইকে। দু'পাশের ঘন বনের মধ্যে আকাশের নীলিমা তখন প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে—চারিদিক থেকেই যেন ছেয়ে আসছে গাঢ় তমিস্রা। পত্র-পল্লবিত বিবিধ গাছের শাখা-প্রশাখার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আমাদের নৌকাগুলি এগিয়ে চলতে লাগল উজান ঠেলে। বিরুদ্ধ-স্রোতের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে দাঁড়ি-মাঝিরা ঘেমে নেয়ে উঠেছে সকলে। অত্যন্ত দ্রুত দাঁড় ফেলে চলেছে তারা। কিন্তু এই দাঁড় বেশীক্ষণ তাদের আর ফেলতে হ'ল না, একটা বাঁকের মুখ অতি কষ্টে অতিক্রম করতেই খরস্রোতের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ও উপর থেকে জল পড়ার মত প্রবল শব্দ আমাদের কানে আসতে লাগল। ক্রমশ: নদীর চেহারা গেল বদলে। যেসব টুকরো টুকরো ফেনা নদীর বুকে ইতস্তত: ভেসে বেড়াচ্ছিল, সেগুলি গাঢ় জমাট বেঁধে টানের সঙ্গে নৌকার গায়ে এসে ধাক্কা দিতে লাগল। সঙিন অবস্থা! সারা নদীর জল তখন এই গাঢ় জমাট ফেনায় ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের ঠেলে নৌকা নিয়ে দশ হাতও আর এগুনো অসম্ভব হয়ে উঠল! এ অবস্থায় এগুতে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না ভেবে আমরা সেদিন আর না এগিয়ে, নৌকাগুলিকে নিয়ে পাড়ে ভেড়াবার আয়োজন করলুম।

নদী এখানে খুব চওড়া না হলেও, স্রোতের তীব্রতায় গাঢ় ফেন ঠেলে তীরে পৌঁছতে আমাদের বেশ হিমসিম খেয়ে যেতে হ'ল নদীর পাড়ে কয়েকটা মোটা গাছের সঙ্গে কোন রকমে কাছি দি নৌকাগুলিকে আমরা বেঁধে ফেললুম।

তীরের সর্ব্বত্রই এখানে জঙ্গল। দু'পাশে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদিও আমরা চলেছিলুম, তবু এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বলে মনে হ'ল।

উপস্থিত স্রোতের ভয়াবহ টান ও ফেনার চাপ না কমা পর্য্য এখানেই আমাদের তাঁবু ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দলের লোকে কাঠ-কাঠরা, ঝোলা-ঝুলি, তাঁবু, খুঁটি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপ নাবিয়ে নদীর পাড়েই উন্মুক্ত জায়গায় রাত্রিবাসের আয়োজন করল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হতে লাগল নৌকার মধ্যে। স্রোতের বে নৌকাগুলি এ-ওর গায়ে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছিল আর ঘুরছিল তা ছাড়া ফেনাসমেত ঢেউগুলি এসে উপচে পড়তে লাগল নৌকা পাটাতনের উপর। বজরার উপর থেকে নদীর পাড়ে 'গ্যা ওয়ের' মত কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে, আমিও এলিস ডাঙায় নে এসে আশ্রয় নিলুম তাঁবুর মধ্যে।

দুরন্ত নদীর এই উন্মত্ত স্রোত রাত্রে আরও কি ভয়াবহ আকা ধারণ করবে তা আমাদের কারুরই জানা ছিল না বলে, ডাঙা তাঁবুতেই সে যাত্রা আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমরা মন করেছিলুম।

বেলা থাকতে থাকতেই জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নামে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘন গাছপালার আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্য্যের আলো মাটির বুক স্পর্শ করতে পারে না। চিরদিনই এমনি অন্ধকারাচ্ছ হয়ে থাকে জঙ্গলের বহু জায়গা।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও নদীর বুকে পড়ন্ত সূর্য্যের রঙিন রশ্মি ছত্র ফেনার উপর পড়ে যে রংমশালের আলো ছড়াচ্ছিল, নৌকার উপরে যার তাপ আমরা খানিকটা অনুভব করছিলুম, নদীর পাড়ে নে তার সবটুকুই যেন লোপ পেয়ে গেল। যদিও বেলা তখন প্রা পড়ো পড়ো, তবুও চারটে না বাজতে-না-বাজতেই এই ধরণের অন্ধক আমাদের আশ্চর্য্য করে দিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুট ঘু অন্ধকারে যে চতুর্দ্দিক ঢেকে ফেলবে তা বুঝতে মোটেই দেরি হ'ল না

দলের লোকেরা বিশেষ করে কাবিব ইণ্ডিয়ানরা (সাধারণত: এ দেশীয় অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ানই বলা হয়ে থাকে) ইতি মধ্যেই মশা জালতে শুরু করে দিল। বন-জঙ্গলে হিংস্র জীব জন্তুদের ভয় দেখা বা তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই আগুনই হচ্ছে সব চে ভাল প্রতিরোধক।

আমাদের প্রধান যে 'গাইড' তার নাম দিয়েছিলুম আ টাইগার। খুব শক্তিশালী ও বিজ্ঞ পুরুষ সে। এ পথের অ কিছুই তার জানা। এখানে ক্যাম্প ফেলার পর টাইগার বল রাত্রের দিকে রক্তপায়ী এক প্রকার বাদুড়ের ভয়ই নাকি এখানে চেয়ে বেশী। এই বাদুড়ের পরিচয় আগে থেকেই আমি জানতু অন্ধকার রাত্রে তাদের ভাঁটার মত চোখগুলো জ্বলতে থাকে, এই মারাত্মক ধরণের সন্ধানী চোখ দিয়ে তারা জীব জন্তু ও ম খুঁজে বেড়ায়। কোথাও কোন ঘুমন্ত পশু বা মানুষের শরীরের

খোলা অংশ পেলেই, নিঃসাড়ে তার ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ সূক্ষ্ম দাঁত অনাবৃত জায়গায় ধীরে ধীরে চালিয়ে দিয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেয়ে নেয়। হঠাৎ মানুষ যখন বুঝতে পারে, তখন তার উত্থান শক্তি প্রায় রহিত হয়ে যায়, এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই মারাত্মক জীবটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে, এখানে আমাদের তাঁবুতে এক প্রকার মজবুত তারের জালে বেশ ক'রে ঢাকা দিয়েছিলুম। বাকী আমাদের নিজস্ব রক্ষীরা ক্যাম্বিস ও চটের থলেয় তাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

সারা দিনের ক্লান্তিতে চোখের পাতা যদিও ভারী হয়ে এসেছিল, তবু এই নতুন জায়গায় ভয়-ভয় মনে ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেও বেশ বেলা হয়ে গেল আমাদের। যতটুকু ঘুম হয়েছিল, তাতেই শরীরটা বেশ ঝর ঝরে মনে হ'ল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনদের মনটা আজ বেশ প্রফুল্ল। তাঁবুর মধ্যেই আমরা প্রাতরাশ সারলুম। সে দিনটা ছিল আবার এলিসের জন্মদিন। প্রতিবারেই এই জন্মদিনে আমরা প্রচুর আমোদ আহ্লাদ করি, কিন্তু এখানে তার উপায় কোথা! তাকে কি উপহার দেওয়া যায়, আমি তাই ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ তাঁবু থেকে বাইরে বেরুতেই অনতিদূরে পত্রপল্লবহীন শুষ্ক একটি গাছের গায়ে একটি গাছের গায়ে এক থোকা বিচিত্র রঙের অর্কিড আমার নজরে পড়ল। ফুলের চেয়ে পবিত্র জিনিস যেমন আর কিছুই নেই, তেমনি আমার কাছে এর চেয়ে মূল্যবান জিনিসও নেই আর কিছু।

আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের গাইড ও দোভাষী বানথাইকে ডেকে বললুম, আজ এলিসের জন্মদিন ওকে কিছু অর্কিড দিতে চাই ঐ গাছটা থেকে ফুলগুলো। সংগ্রহ করে আনো দেখি। জন্মদিনের কথায় বানথাই উল্লসিত হয়ে আরও কয়েক জনকে সঙ্গে করে তখুনি ঐ ফুটন্ত অর্কিডগুলি এনে হাজির করল আমার কাছে।

অর্কিড দেখে এলিস তো মহা খুশি। সত্যিই এমন বড় ফুল, এমন রঙের বিচিত্র রূপ এর আগে কখনো দেখেছি ব'লে মনে করতেই পারলুম না।

সেগুলিকে নিয়ে সযত্নে ছোট একটি ভাসের মধ্যে রেখে দিল এলিস, আর কয়েকটি বেছে বেছে নিজের জামায় পরে গর্ববোধ করতে লাগল। অরণ্যপুরীর মধ্যে প্রকৃতির এই দান সেদিন এলিসের জন্মদিনকে সার্থক ক'রে আমাদের দু'জনকেই প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

সেদিন একটু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একদল বন্য আকাওয়া জাতির সঙ্গে দেখা হ'ল আমাদের। এরা যাযাবরের দল। বন থেকে বনান্তরে শিকার ক'রে, কাঠ পাথর কুড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় এরা। মাঝে মাঝে, দু'এক বছর অন্তর শহরে গিয়ে বন্য জীবজন্তুর ছাল, রকমারি পাথর ও শুকনো অর্কিড বিক্রি করে আসে। সেখানকার শহরের বাজারে মেয়েদের টুপিতে লাগাবার জন্যে শুকনো অর্কিডের বেশ চাহিদা আছে।

গত রাত্রে এই বনের কিছু দূরেই ছিল ঐ আকাওয়ারা। অন্ধকারের মধ্যে সেখান থেকেই আমাদের তাঁবুর আশপাশের আগুন ওদের নজরে পড়ে, তাই ভোরের দিকেই আমাদের দেখতে ওরা এসে হাজির হ'ল।

আকাওয়াদের প্রকৃতি কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ। ওরা বামন অবতারের বংশধর কিনা কে জানে! দেখতে যেমন বেঁটে, গায়ের রঙ তেমনি কালো আবলুস কাঠের মত। এছাড়া নাক-মুখও ভারী বিশ্রী, বদখত। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা যিনি, তিনি হচ্ছেন চারফুট পাঁচ ইঞ্চি! বাকী সবাই সাড়ে তিন ফুট চার ফুটের মধ্যে। পরনে তাদের কিছু নেই বললেই হয়—একেবারে যেন 'নুডিষ্ট' কলোনীর লোক! মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই সামান্য ইঞ্চি-তিনেক একটু লজ্জাবস্ত্র কোমরে মোটা দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে কেবল। কেউ কেউ আবার গাছের ছাল বা শুষ্ক ঘাসের গুচ্ছ দিয়েও লজ্জা নিবারণ করেছে।

এলিস এদের দেখে কিছুতেই তার হাসি চাপতে পারছিল না। আমি তাদের কাছে ডেকে বসালাম এবং তাদের দলপতিকে একটা মোটা সিগার খেতে দিলাম। ধূমপানে এরা কিন্তু বেশ অভ্যস্ত। কি করে, কোথা থেকে এই অভ্যাস যে এরা আরম্ভ করেছে তা ধরবার উপায় নেই। বন থেকে সংগ্রহ করা এক শুকনো পাতা পাকিয়ে, চকমকির আগুন জ্বালিয়ে সিগারের মত সেগুলোকে তারা খায়। আমার কাছ থেকে সিগার পেয়ে ওদের দলপতি ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারপর আমার দেওয়া সিগারে হুস-হাস কয়েকটা টান মেরে, ধোঁয়া ছেড়ে, অন্যান্যদের প্রসাদ দিল। সিগার খেয়েই হোক বা আমাদের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির জন্যেই হোক, সে একটা ছোট মোড়কের ভিতর থেকে একটা পাথর বার ক'রে সেটা আমাকে নিতে অনুরোধ করলে। এ ধরণের পাথর এর আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণের সেই পাথরের ভেতর থেকে নানা রঙের জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে—খানিকটা ওপেল পাথরের মত।

পকেট থেকে আই-গ্লাসটা বার করে সেটাকে ভাল করে দেখতে লাগলুম। জিনিসটা যে মূল্যবান কিছু হবে তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমি পাথরটার বিনিময়ে তাকে রূপোর কয়েকটা মুদ্রা বার করে দিতে গেলাম, কিন্তু টাকার উপর তার বিশেষ লোভ নেই, সে খাবারদাবারের দিকে ইঙ্গিত করলে। তখন আমরা তাকে আমাদের যে সব টিন-ফুড ছিল, তার কয়েকটা টিন ও কিছু রুটি তাকে দিলুম। এক মুখ হেসে সে সেগুলি গ্রহণ করে দলের সবাইকে বিতরণ করে দিলে। তাদের মত বন্য বর্বর জাতির মধ্যেও সকলে মিলে এই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে খাওয়ার দৃশ্য দেখে আমার মন খুশিতে ভরে গেল। এলিস হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, ও দলপতি হবার উপযুক্তই বটে!

আমার মন ছিল কিন্তু তার ঐ পাথরের দিকে। আমি ইশারায় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এ পাথর তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?

আমাদের দোভাষী বানথাই দু'তিন রকম ভাষায় কথা বলতে পারে। সে তাকে আমার কথাগুলো নানাভাবে তার কানে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার কথা সে যে ঠিক বুঝতে পাচ্ছে বলে মনে হল না। অবশ্য এ নিয়ে বহুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর যা বোঝা গেল, তা হচ্ছে: এই জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছিল, তারই কাছাকাছি জায়গা থেকে সে সেটা সংগ্রহ করে। আঙুল দিয়ে সেই পাহাড়ের দিকটাও সে দেখিয়ে দিলে।

পরের দিন রাত্তিরটাও আমাদের এইখানে কাটাতে হ'ল। তখনও ক্ষিপ্তা নদীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন থামেনি। তবে আশা করা গেল যে, নদীর প্রবল স্রোত পরের দিন একটু কমবে।

কিন্তু পরের দিন ভোর হবার আগেই লোকজনদের চীৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। এলিস ও আমি পেট্রোম্যাক্সের আলো ও রিভালবার হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ব্যাপারটা চীৎকার-শব্দ করার মতই। কালা আদমিদের মধ্যে পাঁচ-সাত জন একেবারে ধরাশায়ী! গভীর রাত্রে রক্তপায়ী বাদুড়ের রক্তশোষণে তারা ক'জন ঝিমিয়ে পড়েছে এবং যে সব জায়গায় তারা দাঁত ফুটিয়েছিল, সেই সব ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে কখন পায়ের কাপড় একটু সরে গিছল, সেই সময় ওত পেতে বসে থাকা ঐ পিশাচ-বাদুড়ের দল নিঃসাড়ে গাছ থেকে নেমে এসে পায়ের অনাবৃত জায়গা থেকে রক্ত চুষতে আরম্ভ করে দেয়। এমন কায়দা করে দাঁত ফোটায় তারা এবং ডানা দিয়ে এমন করে বাতাস করতে থাকে যে, ঘুমন্ত মানুষ কিছুই টের পায় না,—যতক্ষণ না এই রক্ত-শোষণের ফলে তার দেহে যন্ত্রণার উদ্রেক হয়।

আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের তুলে বসালুম এবং ক্ষতস্থানগুলি যাতে বিষিয়ে না যায়, সে জন্যে লোহার ছেঁকা দিয়ে পুড়িয়ে, একটি ক'রে 'আয়রণ পিল' খাইয়ে দিলুম। 'আয়রণ পিল' শরীরে নতুন রক্তের সঞ্চার করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্ব্বল মানুষকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে অব্যর্থ ওষুধ। আগেকার দিনে প্রত্যেক শিকারী ও অভিযানকারী দলের সকলের সঙ্গেই এই 'আয়রণ পিল' থাকত।

আজ আমাদের যেমন করেই হোক এখান থেকে আস্তানা তুলতে হবে। শুধু পিশাচ-বাদুড়ের ভয়েই নয়, বৃথা সময়ও আমরা নষ্ট করতে চাই না। তাছাড়া শেষ রাত থেকেই নদীর ফেনিল জলস্রোতের তীব্রতা কমতে আরম্ভ করেছিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ঐ বাদুড়-চোষা লোকেরা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠতেই আমরা মালপত্র গোছাতে আরম্ভ করে দিলুম। দড়ি-দড়া খুলে, বেঁধে, সমস্ত-কিছু গুছিয়ে নৌকায় তুলতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দাঁড়ি-মাঝি ও লোকজনদের সমবেত সুরে সেই গান আরম্ভ হয়ে গেল—

'ইয়া ইয়া বো-চালুক্কা লিও
ঈ ঈ বো-লিও বো-লিও চুলুও।'···

চলতে চলতে বোঝা গেল, জলের উপর আগেকার সেই ফেনার ধাক্কা এখন না থাকলেও, স্রোতের টান বিশেষ কিছুই কমেনি। কোন রকমে দাঁড় ফেলে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলতে লাগল নৌকাগুলি ও আমাদের বজরা।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, সেখান থেকে এখন বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছি আমরা। সভ্য মানুষের সাক্ষাৎলাভের পালা অনেক আগেই তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন ক্রমশঃ যেন মনুষ্য সমাজ থেকেই আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলুম। ডাঙায়, নদীর চরে কিনারে বা পাতলা-ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোন জীবের গন্ধ-বাষ্প নেই! এই ধরণের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নদী-পথে অনেকটা অতিক্রম করলুম আমরা।

ক্রমশঃ নদী আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। দু'ধারে ঝাপ্সা অন্ধকারের মধ্যে এখন শুধু আকাশচুম্বী সবুজের প্রাচীর। হঠাৎ দৃশ্যের বেশ কিছুটা পরিবর্ত্তন হ'ল এখানে। বহুবর্ণের বৃক্ষলতাগুল্মের সাক্ষাৎ হতে লাগল। কোন কোন জায়গায় এখানকার গাছগুলি এমন ভাবে হেলে পড়েছে যে, আমাদের নৌকাগুলি নিয়ে তার তলা দিয়ে পার হওয়াই মুস্কিল! তাছাড়া এই জায়গাটায় আমাদের কেবল ভয় হচ্ছিল যে, কোন হিংস্র জন্তু না এই সব *হেলে-পড়া গাছের ডালপালা থেকে নৌকার উপর লাফিয়ে পড়ে।*

একথা ভাবতে-না ভাবতেই দাঁড়িদের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উঠল, 'ট্যাপির ট্যাপির!' এই ট্যাপির এক প্রকার জলহস্তী বিশেষ। দেখতে মুখটা এদের শূকরের মত।

আমি ও এলিস বজরার ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাদের গাইড 'টাইগার' অনতিদূরে একটা গাছের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। দেখি, নদীর পাড়ের দিক থেকে জলের উপর হেলে-পড়া একটা মোটা গাছের ডালে, বেশ মোটাসোটা একটা জন্তু জল থেকে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর ডালটার গায়ে সম্ভবতঃ শেওলা থাকায় বার বার পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িদের খুব আস্তে দাঁড় ফেলতে বলে, আমি আমার দূরবীণটা এনে চোখের উপর তুলে ধরলুম। সমস্ত জিনিসটা অপেক্ষাকৃত অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে।

জন্তুটা গাছের ডালে ওঠবার চেষ্টা করছিল যে একান্ত প্রাণভয়ে, তা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমরা জানতে পারলুম। এবং চাক্ষুষ যা দেখলুম, তাতে আমাদের হাত-পা ভয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার অবস্থা! এই নাতিপ্রশস্ত নদীর গর্ভে এই ধরণের বৃহদাকার জন্তু থাকার ব্যাপারই প্রথমটা আমাদের যেমন আশ্চর্য্য করেছিল, তেমনি তার চেয়েও আশ্চর্য্য করল এখানের রাক্ষুসে মাছরা। আকারে তারা খুব বড় না হলেও, দলে ছিল অসংখ্য। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে ঐ জলহস্তীকে তারা আক্রমণ করছে। তাদের হাঁ ও ধারাল দাঁতগুলি পর্য্যন্ত বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ছিল আমাদের দূরবীণের মধ্যে।

ট্যাপির বেচারা যখন কিছুতেই ঐ গাছের ডালটিতে আশ্রয় নিতে পারল না—যা অবশ্য তার পক্ষে খুবই অসম্ভব ছিল, তখন সে নিতান্ত অসহায়ের মত জলের উপর গা-ভাসিয়ে দিল। আর তখন তারা অর্থাৎ ঐ মাছেরা চতুর্দ্দিক থেকে তাকে ছোবলাতে লাগল নৃশংসভাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

নদীর স্রোতে আমাদের নৌকা তাদের অত্যন্ত কাছে ভেসে আসছিল দেখে, দাঁড়িরা আবার দাঁড় টানতে শুরু করলে।

নিরীহ মৎস্যকুলের এই হিংস্রতা দেখে এলিস ও আমি হতবাক্ হয়ে গেলুম। প্রকৃতির বুকে এমন কত বিচিত্র জীবই যে আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। চেরি ক্রেটনের নাম তোমরা হয়ত অনেকে শুনে থাকবে। আফ্রিকার নিভৃত জঙ্গলের বহু বিচিত্র জীবজন্তুর জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী ফিল্মে তুলে তিনিই প্রথম পৃথিবীর সভ্য মানুষদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু এই রাক্ষুসে মাছদের কথা তাঁর কাছেও শোনা যায়নি, যা আজ আমরা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পেলুম। [ক্রমশঃ।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
ঠাকুমারও পছন্দঃ ঠাকুরমা কি আজকের লোক- তার এতদিনের অভিজ্ঞতা! তিনিও খুশী হয়েছেন লক্ষ্মীর সানলাইট সাবানে কাচা কাপড় দেখে। কি ধপধপে ফর্সা, আর ঝকঝকে রঙীন।
লক্ষ্মী জানে যে অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায় এবং লক্ষ্মী এটাও দেখেছে যে ধুতি, সার্ট, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব কিছুই আশ্চর্য্য রকম সাদা ও উজ্জ্বল হয় সানলাইটে। সানলাইটের কার্য্য-করী, প্রচুর ফেনা ময়লার প্রতিটী কণাকে বার করে দেয়, কাপড় আছড়ানোর দরকার হয়না। আপনার পরিবারের কাপড় কাচার জন্য আপনিও সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন না কেন?
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
S. 268 C-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বিয়োগান্তক

শ্রীমতী প্রতিমা সেন

লতিকাদি' শীগগির যান, পাঁচ নম্বর কেবিনের সিরিয়াস্ কেস, বলে নার্স নমিতা অন্য ঘরে চলে যায়।

লতিকা আপন মনে গজ গজ করতে থাকে—একটু কি বসবার জো আছে, রুগীর সেবা করতে করতেই জীবনটা গেল, আর পারি না। বলতে বলতে এগিয়ে যায় পাঁচ নম্বরের দিকে।

পাঁচ নম্বরের রুগী তখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। সকালের দিকে অপারেশন হয়েছে, অক্সিজেনের সাহায্যে এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

লতিকা একবার নাড়ি দেখে পাশের চেয়ারে এসে বসে। লতিকা প্রবীণা মহিলা, চল্লিশের ওপর বয়স। আজ প্রায় বিশ বছর এই নার্সের কাজ করছে। পাঁচ ছয়টা হাসপাতাল ছেড়ে এই সরকারী হাসপাতালে প্রায় সাত আট বছর একটানা কাজ করছে। কখনও ছুটি নেয় না লতিকা, ছুটি পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। নেহাত যদি শরীর খারাপ হয় তো দু'তিন দিনের বেশী ছুটি নেয় না।

তাই যখন লতিকা হঠাৎ আসে না, হাসপাতালে হৈ হৈ পড়ে যায়, সিষ্টাররা বলাবলি করে কি হলো লতিকাদি'র।

মণিকা বলে, লতিকাদি' না এলে ভাল লাগে না; বেশ মানুষটি।

সবিতা বলে, আমাদের খুব ভালবাসেন।

আমার তো অনেক সময় রাত্রের ডিউটি করে দিয়েছেন, সরমা বলে।

সত্যি নিজের দিকে কখনও লতিকা তাকিয়ে দেখে না। সারাদিন পরিশ্রম করে। অন্যদেরও অনেক কাজ প্রায়ই করে দেয়।

লতিকাকে সারাদিন নিজের মনে খাটতে দেখলে মনে হতো কি যেন ঢাকতে চাইছে লতিকা।

সরমা নমিতা ওরা মাঝে মাঝে লতিকাকে ধরতো,—লতিকাদি' বসুন, একটু গল্প করা যাক্, এখন তো আর আমাদের ডিউটির সময় নয়।

লতিকা বলতো, তোরা বস না, আমার কি আর বয়েস আছে, বুড়ো হয়ে গেলাম, কাজই ভাল লাগে।

—আহা, কি এমন আপনার বয়স হয়েছে? খেটে খেটেই তো বুড়ো হয়ে গেলেন। কোন রকম আমোদ স্ফূর্ত্তি করবেন না শুধু কাজ, সরমা বলে।

নমিতা বলে, লতিকাদি' এবার আপনি কিছুদিনের ছুটি নিন, আপনার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।

—হাঁ ছুটি নিয়ে কি করব শুনি? আমার কে আছে, যে আমি ভাববো—মরে যাবো হয়ে যাবে।

—আচ্ছা লতিকাদি', আপনার কি কেউ নেই? নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছেন।

—নেই কেন রে, ওই তো মনোরমাদি' আছে, যে আমাকে মানুষ করেছিল, বলতে বলতে লতিকা অন্য ঘরে চলে যায়।

লতিকা কিন্তু সত্যি এই বিশ-বাইশ বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেও হার মানছে। মনের ফাঁকটা সব সময়েই কাজ দিয়ে ভরে রাখতে চায়। কিন্তু কাজ দিয়ে চাপতে গিয়ে নিজেকে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছে।

মাঝে মাঝেই আজকাল ভীষণ দুর্ব্বল মনে করে। মনে হয় আর বেশীদিন বাঁচবে না। ডাক্তারেও বলেছে, আপনার হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, আপনি কিছুদিন রেষ্ট নিন।

লতিকা শুনে দুদিন চুপচাপ থাকে। তার পর আবার খাটতে থাকে, বলে তোদের লতিকাদি' এমনি মরবে না, এই তো বেশ আছি।

লতিকা ভাবে, হঠাৎ যদি মরে যাই তো ভালই হয়, তবে একবার যদি,—আপন মনেই বলে কে জানে আর দেখা হবে কি না।

এই ভাবেই চলছিল লতিকার। হেসে নমিতা, মণিকা জিজ্ঞাসা করতো লতিকাদি', আপনার তো কেউ নেই, এত যে টাকা জমাচ্ছেন কা'কে দিয়ে যাবেন?

মরবার সময় যাকে মনে পড়বে তাকেই দিয়ে যাবো।

লতিকার সেদিন রাত্রের ডিউটি, পাঁচ নম্বর রুগীকেই বিশেষ করে দেখতে বলা হয়েছে। লতিকা অন্য ঘর ঘুরে এসে পাঁচ নম্বরে ঢোকে।

অন্যমনস্ক হয়ে রুগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কাঁচাপাকা গোঁফে মুখ ভর্ত্তি। বহুদিন রোগ ভোগের জন্য চোখের কোলে কালি। বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন বয়স, মাথার দুপাশে টাক। রুগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই লতিকার মনে হয়, এত রুগীর সেবা করলাম, একবার যদি রুগী হয়েও এখানে আসে, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

আজকাল প্রায় একটা কথা লতিকার মনে হয়, এমন করে নিজেকে গোপন করা হয়তো ঠিক হয়নি। যতই হোক হিন্দুর মেয়ে, আরও কিছুদিন সইলে বুঝি ঠিক হয়ে যেত। কত মানুষের কত দুঃখের জীবন শুনেছে, তারা তো এভাবে পালিয়ে আসেনি!

মাঝে মাঝে লতিকার মনে হয় ফিরে যাবে নাকি? ছেলের জন্যই না হয় ফিরে যাবে, এইভাবে থেকেই কি সুখ পাচ্ছে?

এতদিন চেষ্টা করেও তো মন থেকে মুছতে পারেনি। ছেলের জন্ত তো তার প্রাণ সব সময় আকুল হয়ে আছে। ছেলের কথা মনে পড়তেই চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয় লতিকা। না না সে কখনই ফিরে যাবে না, এইভাবে নিঃসঙ্গ জীবনই টেনে নিয়ে যাবে, জীবনের শেষ দিন অবধি। আর তার ছেলে হয়তো তাকে এখন চিনতেই পারবে না, সে তো আরও লজ্জা।

হঠাৎ লতিকার চিন্তায় ব্যাঘাত হয়। রুগী চোখ মেলে চেয়ে বলে একটু জল, একটু জল।

লতিকা তাড়াতাড়ি ফিডিং গ্লাসে করে জল নিয়ে মুখে ঢেলে দেয়।

—আঃ কি আরাম হলো, কখন থেকে জল-তেষ্টা পাচ্ছিল, বলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

লতিকা মন থেকে সব ঝেড়ে আবার নিজের কাজে মন দেয়। রুগীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে কিছু দরকার কি না, গায়ের চাদরটা ভাল করে ঢেকে দেয়।

সেদিন কোয়ার্টার্সে ফিরে লতিকা শুয়ে পড়ে। মনটা ভাল লাগে না, মনে হয় লতিকা শেষ অবধি ঠিক থাকতে পারবে কি না? শরীর ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, এতদিনের চেষ্টা সবই বুঝি একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে! শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে, মনের পাতায় গ্রামের মেয়ে ললিতা ভেসে উঠে, মনে পড়ে···

ললিতার বিয়েতে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। পাড়ার লোক ও আত্মীয়রা সকলে এসেই একবার করে সতী দেবীকে বলেছিল, তোমার খুব বরাত জোর, নয়তো ললিতার এভাবে বিয়ে হচ্ছে। এমন তো নয় মেয়ে তোমার সুন্দরী, দুটো পড়তে শিখেছে না হয়, তা আজকাল অমন কত মেয়েই আছে, সবই বরাত।

সতী দেবীও সেটা খুব বেশী মেনে নিয়েছিলেন, নয়তো বোনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসে ললিতাকে পছন্দ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা হয়েছিল একটু মজার। বোনের বিয়ের সম্বন্ধ করতে ঝাড়গ্রামে গিয়েছিল। গ্রামের রাস্তা ভাল করে বুঝতে পারেনি মোহন, ভুল রাস্তায় ভুল বাড়িতে ঢুকলো।

সদরের কড়া নাড়তেই ললিতা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কা'কে চাই, বলে ললিতা সরে দাঁড়িয়েছিল; সুন্দর সুপুরুষ চেহারার যুবক দেখে চমকে যায়, ভাবে, ঐ গ্রামের লোক বলে তো মনে হয় না।

মোহনও আমতা আমতা করে বলে,—একটু দরকারে এসেছিলাম, মানে—

ভিতরে এসে বসুন, মাকে বলছি।

কিন্তু একটু পরেই মোহন তার ভুল বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে যাবার জন্ত, ললিতা ততক্ষণে চা-মিষ্টি হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

সতী দেবী বাধা দিয়ে বলেন, তাতে কি হয়েছে, শহরে ছেলে গ্রামের রাস্তা চিনতে পারনি, একটু মিষ্টিমুখ কর, এই অবেলায় কিছু খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?

মোহন লজ্জিত হয়ে বলে, আবার মিষ্টি কেন? দেখুন তো কি রকম ভুল করে আপনাদের বিরক্ত করলাম, আমি চলি।

কিন্তু সতী দেবী ছাড়েন না, না না মিষ্টিমুখ খেয়ে যাও, গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

মোহনও আর কথা বলে না, ঘোরাঘুরি করে সত্যি অনেকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল, সেজন্ত মিষ্টিমুখেতে আর আপত্তি করে না।

যাবার সময় সতী দেবীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়, সতী দেবী এতে একটু বিব্রত বোধ করেন, কে জানে যদি ব্রাহ্মণ হয়, কিন্তু সে সঙ্কোচটা মোহনই ভেঙ্গে দেয়, বলে আপনি আমার মায়ের মতন, আমার নাম রাধামোহন দে, ললিতকে নমস্কার করে বিদায় নেয়।

সতী দেবী রাধামোহনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন, মনে মনে বলেন জামাই করার মত চেহারা, নামটিও খাসা রাধামোহন দে।

ললিতার মনেও রাধামোহন রেখাপাত করে যায়, কি সুপুরুষ চেহারা, তেমনি চলার ভঙ্গিমা, ললিতাও তাই একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল রাধামোহনের চলে যাওয়ার পর। কলকাতার ছেলে শুনে মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাহলে আর দেখাও হবে না।

রাধামোহন পথে নেমে নামটা একবার দেখে নেয়, শ্রীহরিসাধন দত্ত। বোনের বিয়ের কথা তখন আর মনে নেই মোহনের, সোজা কলকাতায় চলে যায়।

মনটা বেশ খুসী করেই বাড়ী ঢোকে, আশালতা ভাবেন, বুঝি মেয়ের বিয়ের কিছু আশ্বাস নিয়েই এসেছে।

সে ভুলটা মোহনই ভেঙ্গে দেয়। বোন মঞ্জুকে ডেকে বলে তোর বিয়ের আগে আমার বিয়েটাই হয়ে যাক।

আশালতা শুনে বলেন, কেন ওঁরা কি বদলি বিয়ে দিতে চান?

মোহন বলে, না না ওঁদের ওখানে যাওয়াই হয়নি।

—সে কি! ওখানে না গিয়ে গেলি কোথায়?

যাওয়া হয়নি শুনে মঞ্জুও একটু দমে যায়। মোহন তখন আগাগোড়া সব ঘটনাটা বলে। আশালতা শুনে সুখী না হলেও মুখে খুসীর ভাব ফুটিয়ে বলেন, মেয়ে দেখেই যখন পছন্দ হয়েছে তখন মেয়ে তো সুন্দরী, কি বল?

—না তা ঠিক বলা যায় না, তবে আমার ভাল লেগেছে, আমি ওখানেই বিয়ে করবো।

আশালতা বুঝলেন এর পর আর কোন কথা চলবে না, তবুও মনের কথাটা চাপতে পারলেন না, মঞ্জুর বিয়েটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।

ললিতাকে দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, অতি সাধারণ মুখ-চোখ, তার উপর সামনের দাঁত একটু উঁচুও ছিল। সেজন্ত সতী দেবীর যথেষ্ট ভাবনা ছিল, বিয়ে দেবেন কি করে, তার উপর সে রকম সঙ্গতিও নেই। হরিসাধন দত্ত গ্রামের স্কুলের হেড মাষ্টার। ললিতাকে তাই কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেওয়াবেন ভাবছিলেন।

মোহন যাবার দুদিন পর এক বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেল সতী দেবীকে। সতী দেবী আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন। আনন্দে দিশেহারা হলেন।

ললিতাও আনন্দে ও লজ্জায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। মায়ের

মাঝে আয়নায় মুখখানা ভাল করে দেখে নিল। না মন্দ লাগছেনা, সেদিনও তো ঠিক এমনি করেই ছিল। ললিতা ভাবে, রং মাজা মাজা তা হোক্ অনেকে আবার এমনি রংই পছন্দ করে। দাঁতটা একটু উঁচু, নয়তো নাক মুখ চোখ কিছু মন্দ নয়।

ললিতার চুলের খুব বাহার, কপালের উপর চুলগুলো খুব সুন্দর লাগে। কোমর অবধি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। পিছন থেকে ললিতাকে বেশ সুন্দর লাগে।

হরিসাধন শুনে বলেন, অত হৈ-চৈ করার কিছু নেই, ছেলের রূপ দেখে তো মেয়ের বিয়ে দেবো না। আগে খোঁজ খবর নিই, তার পর হৈ চৈ করো।

সতী দেবী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেন না, সকলকেই শুভ সংবাদটা দেন। মুখে মুখে সকলেই জানতে পারে।

সতী দেবী বেশ গর্ব্ব অনুভব করেন, বিয়ে হোক বা না হোক মেয়েকে পছন্দ তো করেছে। মনে ভাবেন, মেয়ে খারাপ দেখতে হলে কি হবে, রাধামোহন যদি জামাই হয় তো দেখাবার মতই হবে।

হরিসাধন খবর নিলেন। জানাশুনার কাছে যাচাইও করে নিলেন। সকলেই বললে এ বিয়েতে আপত্তি কিছু নেই। হরিসাধনও দেখলেন, পাত্র ভালই, চাকরী করে কলকাতায়, নিজের বাড়ী—সংসারও বড় নয়। দুই ভাই চাকরী করে, এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে আর দু'টি বোন অবিবাহিতা। আপত্তির কিছু নেই।

সাত দিনের মধ্যেই ললিতার বিয়ে হয়ে গেল। হরিসাধন যথা সাধ্য ঘটা করেই বিবাহ দিলেন।

বর দেখে শুনে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, ললিতা সত্যি সৌভাগ্যবতী।

বিবাহের প্রথম বছর ললিতারও বেশ সুখেই কাটে। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা সে রকম সহৃদয় না হলেও, স্বামীর দিক থেকে কোন প্রকার অভাব প্রকাশ পায়নি। ললিতাকে প্রথম থেকেই শাশুড়ী ননদ ভাল চোখে দেখেনি। মঞ্জু তো একদিন বলেই ফেললো, এই দেখে দাদার মাথা ঘুরে গেল!

শাশুড়ী ও অন্য সকলে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলে, তাদের পছন্দ নয়। তবুও ললিতা স্বামীগরবে গরবিনী ছিল, যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার তো পছন্দ। সে গর্ব্বও ললিতার বেশীদিন রইল না। ক্রমেই স্বামীর মনেও অসন্তোষ দেখতে পায়।

বিবাহের বছরেই ললিতার ছেলে হয়। ছেলেকে নিয়েই সময় কাটাতো। ললিতা বুঝতে পারে স্বামীর সে রং কেটে গেছে, ললিতার আসল রূপ দেখে বিরক্তই হয়। ললিতাও প্রথম প্রথম সবই করতো, যাতে স্বামী শ্বশুরবাড়ী পছন্দ হয় তাই করে। গুণে রূপ ঢাকার চেষ্টা করে।

সারাদিন সংসারের সব কাজ নিজেই করতো। কিন্তু ললিতার দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। মোহনের সঙ্গে তার বিবাহ হওয়াটাই যেন তার অপরাধ, এমনি সকলের ভাব। তাও ললিতা মুখ বুজে সহ্য করতো, স্বামীকে কিছুই জানতে দিত না।

মোহন অফিস থেকে আসার আগেই ললিতা সব কাজ সেরে রাখতো, ভাবতো এতে মোহন খুসী হবে। কিন্তু তাতে ফল হতো বিপরীত।

প্রত্যহই মোহন এ কাজ সে কাজ নিয়ে রাগারাগি করতো, সেদিন যেন রাগটা বড্ড বেশী প্রকাশ পায়।

—সেজেগুজে বসে থাকার কি আছে। মা-বোনেদের একটু সাহায্য করলে তো পার, আর তাও যদি তেমন দেখতে হতে।

ললিতা চুপচাপ উঠে যায়, জানায় না যে সেই সব কাজ করে এই বসেছে, পাশে গিয়ে টিপটা তুলে ফেলে, মুখটা আঁচলে মুছে নেয়।

এরকম প্রায়ই হয়, ললিতা চুপ করে থাকে, মোহনও ভাবে ললিতা সারাদিন কিছু করে না। আশালতাও কিছু প্রকাশ করেন না, বরং খুশি হন ছেলে-বৌ-এর ঝগড়ায়।

আড়ালে পেলে আশালতা ললিতাকে দুকথা শুনিয়েই দেন, খুব তো ভুলিয়ে বিয়ে করলে, এখন কেন ভোলাতে পারছ না? এদিকে বছর না ঘুরতেই ছেলে হয়ে গেল, শুনিনি কখনও বিয়ের দশ মাস পরেই ছেলে হওয়া।

আশালতার এই অশোভন ইঙ্গিতে ললিতা লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না, চোখ ফেটে জল আসে। মনে মনে ভাবে আর যেন ছেলে না হয়। রাত্রে প্রায়ই না খেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ললিতার খাওয়ার কথা কেউ জানতেও চায় না। শ্বশুরবাড়ীর এই নির্দয়তা ক্রমেই ললিতার অসহ্য হয়ে উঠে। এক এক সময় মনে করে মার কাছে ফিরে যাবে কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় না মার কাছে ফিরে যাবে না, মাকে তার দুঃখ জানাবে না। তা উপর বাবা নেই। বাপের বাড়ীতে ললিতার সুখের কথাই জানে। ললিতা কোন দিনও তার দুঃখের কথা জানায়নি।

এদিকে শ্বশুরবাড়ীও অসহ্য হয়ে উঠছে। স্বামীও যদি একটু ফিরে চাইতো। ললিতার এক এক সময় কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করতো। যাই করে তাতেই মোহন রাগ প্রকাশ করে, কি করলে যে স্বামীর মনের মত হবে, কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আশালতাও সুবিধে পেয়ে গেলেন। মোহনের কাজ প্রায় নিজেই করতে লাগলেন। ললিতা এগিয়ে এলে বলেন, তোমার যা কাজের ছিরি! ওরকম মোহনের অভ্যাস নয়। গ্রামের মেয়ে জানবেই বা কি করে, আমি করে দিচ্ছি, নয়তো বলবেন, মন্দ করে দিচ্ছে। ললিতা চুপ করে সরে যায়; অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলাই সার হয়।

একদিন আশালতা মোহনের সামনেই বললেন, বৌ-এর যে কোন কাজ নেই, তোকে খেতে দেওয়া এসব তো আমরাই করে দিচ্ছি, আমি ভাবছি ঝিকে রেখে কি লাভ, বৌমাই তো করতে পারে। কটা লোকের এক কাঁকে বসে বাসন মাজা।

মোহনও সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঝিয়ের কি দরকার, গ্রামের মেয়ে ওদের ওসব অভ্যাস আছে, পারবে না কেন?

ললিতা আর যেন থাকতে পারে না। সারাদিন ছেলে দেখা রান্না করা তার উপর এতগুলো লোকের বাসন মাজা!

ললিতা গ্রামের মেয়ে হলেও বাসন মাজতে সে তার মাকেও কখনও দেখেনি। সে রকম অবস্থাও তার বাড়ীর নয়। জমিজমা ওদের যথেষ্ট আছে, বাপের যা আয় ছিল তাতে ওদের তিন ভাইবোনের খুব ভালই চলতো। আর সতী দেবী খুব

বড় বাড়ির মেয়ে বলে ওদের চালচলনে বেশ বনেদিয়ানা ছিল। কিন্তু সে কথা ললিতা বলে কি করে ?

বাসন মেজে সংসারের সব কাজ করতে লাগলো। মোহনকে তাতেও প্রসন্ন দেখল না। আশালতা ভাবেন আরো কি কাজ দেওয়া যায়।

এদিকে ললিতার শরীরও দিনের দিন খারাপ হতে লাগলো। সেদিন তাই ভেঙ্গে পড়লো ললিতা মোহনের কাছে—কেন তুমি আমার দিকে ফিরে তাকাও না ? আমি যে আর পারছিনা। সব কথাই মোহনের কাছে জানালো। শেষে বললে আমার যে ছেলে আছে সেটা ভুলে যাও কেন ? ছেলেকেও তো কেউ দেখবে না।

কিন্তু এতটুকু সহানুভূতি পেল না বরঞ্চ আরো কটু কথাগুলো। —তোমার ছেলে ওরা দেখতে যাবেই বা কেন ? ওদের কতো কাজ আছে, আর দশমাসের বিয়েতেই কারুর ছেলে হয় তাও তো শুনিনি, এতো লোকের তো বিয়ে হলো কারুর তো হয়নি। কার ছেলে কে জানে।

ললিতা আর স্থির থাকতে পারে না টলে পড়ে যায়। মোহন ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

ললিতা ঠিক করে আর কিছুতেই এবাড়ীতে থাকবে না। যেখানে তার চরিত্রকে সন্দেহ করে সেখানে ও থাকবে না, যেখানে হোক চলে যাবে। তাবে ছেলেকে নিয়েই পালিয়ে যাবে, আবার ভাবে না, নিয়ে যাবে না, তাতে সন্দেহটাই স্বীকার করা হয়। ছেলের জন্য ডুকরে কেঁদে ওঠে। ঘৃণায় লজ্জায় ললিতা কাঁপতে থাকে। যাকে এত ভালবাসে, যাকে খুশী করার জন্য সব হাসি মুখে মেনে নিয়েছে, তার কাছে এই নির্দয়তা।

দুপুরবেলা কাউকে না জানিয়ে ছেলেকে ফেলেই ললিতা পালিয়ে যায়।

পথে নেমে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারেনা আর কোথায় যাবে ঠিকও নেই। পাগলের মত হন্ হন্ করে চলতে থাকে, ছেলের জন্য চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। কোনদিকে না তাকিয়েই এগুতে থাকে। হঠাৎ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে বাসের সামনে। ললিতা জ্ঞান হারায়।

সেখানেই নামছিলেন হাসপাতালের কাজ সেরে মনোরমা। ভিড় ঠেলে মনোরমাই এগিয়ে এসে ললিতাকে নিয়ে গিয়ে তোলে নিজের বাড়ীতে। মনোরমার সেবাতেই ললিতা জ্ঞান ফিরে পায়। ঠোঁটের সামনেটা কেটে গেছে, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেছে।

ললিতার জ্ঞান ফিরলে পর মনোরমা জানতে চান কোথায়

বাড়ী। ললিতা কিছু বলে না। মনোরমা বোঝেন এখন বলবে না—ভাবেন থাক, পরে জানলেই হবে।

মনোরমা হাসপাতালের নার্স। এক মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হন। নার্সিং পড়ে এখন নার্সিং করছেন। একলাই থাকেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ললিতা বেশ সুস্থ হলে পর বলে, আপনি আর কতদিন রাখবেন, আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না।

ললিতা ঠিক করে যেমন করে হোক নিজের পায় দাঁড়াতে হবে। ফিরে যাওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়, তাতে আরো দুর্দশা বাড়বে।

মনোরমা অনেক পীড়াপীড়ি করেন ফিরে যাবার জন্য কিন্তু ললিতা কিছুতেই রাজী হয়না, বলে, আপনি একটা কাজ যোগাড় করে দিন আমি চলে যাবো। মনোরমা তাও একবার শেষ চেষ্টা করেন বলেন, ছেলের জন্য ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু তাতেও ফল হয় না অগত্যা বলেন, এই কাঁচা বয়সে তো আমি তোমাকে যেখানে সেখানে কাজ দিতে পারি না, তা তুমি যখন কিছু পড়েছ তখন একটা পাশ করে নাও তারপর দেখি কি করা যায়।

মনোরমার কেমন যেন মায়া হয় লতিকাকে দেখে। ললিতা নিজের নামটা লুকিয়েই লতিকা বলে। সেই থেকেই লতিকা নাম।

ললিতাকে আর লতিকার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, লতিকা তাবে ভালই করেছিল নাম লুকিয়ে। নতুন নামে তার নতুন জন্মই হয়েছে। চেহারাতেও মিল নেই। ঠোঁটের উপর সেলাই-এর দাগ। সামনের দাঁত বাঁধান, দাঁত উঁচু আর নেই।

লতিকাকে পাশ করিয়ে নার্সিং পড়াল। তারপর থেকে এই নার্সিং করছে।

মনোরমা মাঝে মাঝে লতিকাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন আর ভাবতেন আশ্চর্য্য মেয়ে। স্বামী পুত্রের জন্য সব সময় কাঁদছে কিন্তু মুখে বলবে না।

তাই দেখে মনোরমা বলতেন, কি রে, এবার ফিরে যাবি? রাগ পড়েছে?

লতিকা বলতো, তোমার তাই মনে হচ্ছে, না? একটু থেমে বলতো মনোরমাদি' তোমাকে বড় জ্বালাতন করছি, একটা কাজ দেখেই চলে যাবো, এতটা যখন করলে তখন আর একটু কষ্ট কর আমার জন্যে।

মনোরমা বলেন, তা আর যাবি না, কাজ হয়ে গেল এখন ফেলে যাবি বই কি।

লতিকা বোঝে কোথায় আঘাত দিয়েছে তাড়াতাড়ি বলে তুমি তাড়িয়ে না দিলে আমি যাবোই না।

সেই থেকে লতিকা মনোরমার কাছেই ছিল। মেয়ের মত মনোরমার সব দেখা-শুনা করতো।

মনোরমার কাছেই লতিকা থাকতো যদি না মনোরমাকে তাঁর ভাই এসে নিয়ে যেত। বয়স হয়েছিল মনোরমার, প্রায়ই নিজের লোকের নাম করতেন। তাই ভাই এসে নিয়ে যেতে চাইলে লতিকাই জোর করে পাঠিয়ে দেয়। বুড়ো বয়সে নিজের লোকের কাছে শান্তি পাবেন।

লতিকা একেবারে একা হয়ে যায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকে।

সারাটা দিন ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়। ভাবে, লুকিয়ে থেকে কি লাভ, এ ভাবে ছেলেকে ত্যাগ করা ঠিক হয়নি। সে তো কোন অন্যায় করেনি। এখনও যদি কিছুদিন বাঁচে তাহলে বাকী জীবনটা হয়তো সুখে কাটবে। কিন্তু যাওয়ার কথা ভাবলেই লতিকার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মন কিছুতেই সায় দেয় না। আবার ভয়ও হয় ধরা দিলে তারা হয়তো এতদিন পর স্বীকার নাও করতে পারে। আর কে জানে ছেলে বেঁচে আছে কি না। যার জন্য প্রাণ আকুল হচ্ছে সেই হয়তো নেই, ছেলের কথা মনে আসতো চোখে জল আসে, দু'বছরও হয়নি তখন।

পরের দিন হাসপাতালে আসতেই লতিকা শোনে, পাঁচ নম্বরে রোগীর অবস্থা ভাল নয়।

লতিকাকে যেন কাজে পেয়ে বসল। দিবারাত্র খাটে লাগলো। মনে হতো লতিকা যেন নিজেরই কারুর সেবা করছে রাত্রে ডিউটি করে আবার বিকেলের দিকেই চলে আসতো।

লতিকার জন্যই পাঁচ নম্বর রোগী বেঁচে উঠলো। লতিক রকম-সকম দেখে সিষ্টাররা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতো, কি লতিক পাঁচ নম্বরের সঙ্গে প্রেমে পড়লেন নাকি?

লতিকা হেসে বলতো, হয়তো তাই।

সেদিন পাঁচ নম্বরের রুগী মিষ্টার দে ভালই ছিল। আপন মনেই বলে উঠেন আজ আর কেউ এলো না।

লতিকা বলে, ভাল আছেন দেখেই হয়তো আসেনি, ক'দিন যা গেল আপনার।

—আসবারই বা কে আছে, ওই ছেলে। মেয়ের কথা বাদ দাও। লতিকা যেন চমকে যায় মেয়ের কথা শুনে, শান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে আপনার আর কেউ নেই, স্ত্রী, ছেলের বৌ।

—না স্ত্রী আমার অনেক দিন মারা গেছেন। ছেলের বিয়ে এখনও দেওয়া হয়নি।

—ওই ছেলে রেখেই বুঝি স্ত্রী মারা যায়, নির্লিপ্ত হয়ে জিজ্ঞা করে।

—হ্যাঁ ওই একরকম। অনেক খোঁজ নিয়েছিলাম, কোন খব পাইনি। হয়তো আত্মহত্যাই করেছিল।

লতিকা মিষ্টার দের খোলামনের পরিচয় পেয়ে, সাহস করে জিজ্ঞাস করে—কেন?

—সে অনেক কথা। হয়তো আমারই অন্যায় হয়েছি ছেলের কাছেই বেশী লজ্জা করে। মাকে মনে না থাকলেও ম মতই স্বভাব পেয়েছে।

লতিকা চুপ করে থাকে। কিন্তু মিষ্টার দে'র সব কথা জা জন্য বড় আগ্রহ হয়। মিষ্টার দে-ই আগে কথা বলেন, আ ভাগ্যেই হয়তো বৌ থাকবার নয় সিষ্টার। নয়তো দ্বিতীয় আমার রহিল না, ছেলেকে মানুষ করার জন্য বাধ্য হয়েই করতে হলো, কিন্তু সে-ও বছর পাঁচেকের মেয়ে রেখে মারা গেল

মিষ্টার দে এমন ভাবে কথা বলেন যেন কোন আপন লে সঙ্গে কথা বলছেন।

যাবার দিন মিষ্টার দে-কে সকলেই বিদায় দিতে এলো। অনেকদিন ছিলেন হাসপাতালে। মিষ্টার দে নিজের ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বললেন, এই আমার ছেলে মানসকুমার দে, এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। সকলেই মানসকে প্রতি নমস্কার করলো, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করলো না লতিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কাকে খুঁজছে মানসের মধ্যে।

মানসও যাবার সময় কি ভেবে লতিকাকে প্রণাম করে, লতিকা অপ্রস্তুত হয়ে সরে যায়. মানস বলে, আপনার জন্যই আমি বাবাকে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আপনার সেবায়েই বাবা বেঁচে উঠলেন। লতিকারও ইচ্ছা করে মানসকে জড়িয়ে ধরতে।

এর পরই লতিকার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়। সকলেই লক্ষ্য করে লতিকা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। সব সময় কিছু ভাবছে। লতিকা এখনও খুব খাটে কিন্তু সে রকম কাজে উৎসাহ নেই প্রায়ই ছুটি নেয়। বলে, আর পারছি না, বুড়ো হতে চললাম খাটার শক্তি আর নেই।

লতিকার জীবন বাঁধাধরা গতেই চলতে থাকে, কিন্তু কারুর লক্ষ্যে না পড়লেও লতিকাকে প্রায়ই শিমুলিয়া লেনের মোড়ে দেখা যেত, মনে হতো কার জন্য অপেক্ষা করছেন। কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বলতো, এই একটু দাঁড়িয়ে দেখছি। বেশ ফাঁকা জায়গাটা, ভাল লাগে। লতিকার বুড়ো বয়সে কবিত্ব জেগেছে ভেবে সকলে হাসাহাসি করতো। লতিকা যাবে না ভাবলেও, কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যেত।

এর পর অনেক দিন কেটে যায়। লতিকার সেবায় কত লোক ভাল হয়ে চলে গেল। লতিকা ভাবে এ বেশ কাজ রুগ্ন অথর্ব লোকেরা সব আসবে, তাদের সেবা করো, তাদের যত্ন কর ভাল করে তোলো, তার পর প্রিয়জনের হাতে তুলে বিদায় নাও। এর পর আর কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে।

দুদিনের অতিথি হয়ে আসে—আপন মনের দরদ দিয়ে সেবা করো। কিন্তু সেবার সঙ্গে মায়া যেন না থাকে। লতিকা ভাবে রুগীর হয়তো এসব কথা মনেই আসে না, ভাবে পয়সার বিনিময় পেয়েছি। আবার ভাবে হয়তো মনে থাকে, এই যেমন সে নিজে ভাবছে, সেই রকম হয়তো তারও মনে পড়ে।

লতিকার মনে হয়, সারাজীবনটা তো সেবা করেই গেল কিন্তু নিজে কি সে কারুর সেবা পাবে? পরেই লতিকা ভাবে, রুগীর সেবা করেই যেন যেতে পারি, সেবা যেন নিতে না হয়।

ভগবান হয়তো শুনেছিলেন লতিকার কথাটা। লতিকাকে কারুর সেবা নিতে হলো না। দু'তিন দিন ভুগে হঠাৎ লতিকা হৃদরোগে মারা গেল।

সকলে লতিকাকে মৃত্যুশয্যায় দেখে অবাক হয়ে গেল মাথায় লম্বা করে সিঁদুর, সিঁথিটা জল জল করছে। পাশে মানস দাঁড়িয়ে। মানসকে সবমাই চিনেছিলো।

সরমা বলে উঠলো, আশ্চর্য্য, লতিকাদির স্বামী পুত্র সব ছিল!

মানস গম্ভীর হয়ে বলে, মা বেঁচে থাকতে মাকে চিনলাম না।

আয়েষা সুলতান বেগম

শিবানী ঘোষ

সুলতান আহ্‌মদ মির্জার স্ত্রী কুতুক বেগম সবেগে আপন কক্ষে প্রবেশ করে ডাক দিলেন—গুলনর!

বাঁদী এসে কুর্নিশ জানিয়ে বলে—আদেশ করুন বেগম সাহেবা।

কুতুক বেগম দেহের ওড়নাটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—অসহ্য! বুঝলি গুলনর, আমি একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছি।

চুপ করে থাকে গুলনর। কে কার জন্যে অসহ্য হয়ে উঠেছে তা তার জানা আছে ভাল করেই। কিন্তু তবু বেগম সাহেবার মুখের ওপর তো কিছু বলা যায় না। দাসী বাঁদীদের এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুতুক বেগম বলেন—শোন্ গুলনর, আমার ঐ সতীন-বেটীরা হিংসেয় ফেটে যাচ্ছে। আমার স্বামী আমার রূপের বশ, তাই ওদের অন্তর্দাহ। তাই ওরা সরাতে চায় আমাকে। কিন্তু গুলনর, তুই ওদের বলে দিস, শয়তানীতে আমিও কিছু কম যাই না। দরকার হলে ওদের বুকে আমি ছুরি বসাতেও পারি।

গুলনর বলে—আপনার এইখানে শরাব নিয়ে আসবো কি বেগম সাহেবা?

—শরাব? আচ্ছা নিয়ে আয়।

শরাবের বোতল এবং পেয়ালা নিয়ে আসে গুলনর। কুতুক বেগম জাজিমের ওপর বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বলেন—পেয়ালাটা ভর্তি করে দে গুলনর!

সফেন শরাব-ভর্তি পেয়ালা বেগম সাহেবার হাতে এগিয়ে দেয় গুলনর। কুতুক বেগম পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলেন—উঃ, এতক্ষণে যেন ভেতরটা একটু জুড়োলো। সতীন-বেটীরা বুকে একেবারে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল।

গুলনর বুঝতে পারে, এইবার নেশার ঝোঁকে প্রলাপ বকা সুরু হবে বেগম সাহেবার। কাজেই তাঁর কাছে আর না থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে আর একটি পেয়ালা ভর্তি করে দিয়ে চলে যায় সেখান থেকে।

নেশায় ধীরে ধীরে বুঁদ হয়ে যান কুতুক বেগম। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করলেন সুলতান আহমদ মির্জা।

স্বামীকে দেখে কুতুক বেগম জড়িত কণ্ঠে বলেন—কিছু বলবে আমাকে?

আহমদ মির্জা বলেন—হ্যাঁ একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন তো দেখছি তুমি প্রকৃতিস্থ নও।

—প্রকৃতিস্থ নই? কি বলছো প্রিয়তম! একটু গলা ভিজিয়েছি বলে তুমি মনে করছো আমি মাতাল হয়ে গেছি? আরে না না কুতুক বেগম এমন অল্পে মাতাল হয় না। যা বলবার বলে ফেলো।

আহমদ মির্জা বলেন—আমি বলছিলাম কি, আয়েষাকে আমি এবার সমরখন্দে রেখে আসবো।

কুতুক বেগম পুনরায় শরাবের পেয়ালা ভর্তি করতে করতে জড়িত কণ্ঠে বলেন—হঠাৎ পাঁচ বছরের খুকীকে সমরখন্দে রেখে আসার কারণ?

—তার কারণ তোমার আওতায় থাকলে সে তোমার বড় মেয়ের মতই কুচক্রী হয়ে উঠবে।

স্বামীর কথা শুনে কুতুক বেগম বলেন—কি! কি বললে? আমার বড় মেয়ে সালিকা কুচক্রী হয়েছে?

আহমদ মির্জা বলেন—হাঁ বিলক্ষণ। তোমার আওতায় মানুষ হলে কারও মনের প্রসারতা বাড়তে পারে না। তোমার কাছে থেকেই সালিকা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সংকীর্ণমনা।

তাঁর কথা শুনে হা-হা করে হাসতে হাসতে কুতুক বেগম বলেন—তুমি আজকাল বেশ ভালো ভালো কথা বলতে শিখেছো তো? তা নাও একটু শরাব দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও।

আহমদ মির্জা উঠে পড়ে বলেন—থাক ও জিনিষ তোমারই রাখো। আর শোনো, আয়েষাকে আমি সমরখন্দ নিয়ে গিয়ে ওমর শেখ মির্জার সাথে কথা কয়ে ওকে বাবরের বাগ্‌দত্তা করে রাখবো। পরে ওর যৌবন আগত হলে ওদের বিবাহ হবে।

কুতুক বেগম বলেন—ছোট মেয়ের জন্যে তোমার ভাবনা বড্ড বেশী দেখছি। বলি বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে কিছু ভেবেছো?

আহমদ মির্জা বলেন—সালিকার জন্যে তোমাদের মত কুচক্রী মানুষকেই তো মনোনীত করে রেখেছো। এতে আমার আর ভাববার প্রয়োজন কি? আচ্ছা এখন আমি চলি। বলে ঘর থেকে চলে যান আহমদ মির্জা।

কুতুক বেগম শরাবের পেয়ালা রেখে দিয়ে খানিকটা ঝিম্ হয়ে ভাবেন—তাই তো ও এমন করে এসে কথাগুলো বলে গেল কেন? গলার স্বরের মধ্যে কোন মিষ্টতার আভাষ পাওয়া গেল না তো? তবে কি তাঁর রূপ নষ্ট হয়েছে? একবার আয়নাতে দেখতে হবে মুখটা। কুতুক বেগম হাঁক দেন—ওরে কে আছিস এখানে?

ছুটে আসে কিশোরী সালিকা বেগম। সে বলে—জানো মা, বাবা আয়েষাকে নিয়ে সমরখন্দে চলে গেলেন ঐ সৎমায়েদের জন্যে—তাঁরাই নাকি বলেছেন ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় মানুষ করতে।

কুতুক বেগম বলেন—ঐ সতীন-বেটীদের এবার আমি জীবন্ত কবর দেবো। কিন্তু তার আগে একবার আমার রূপটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে। সালিকা, একবার আয়নাটা দিস তো।

সালিকা বলে—ও ভারী আয়না আমি আনতে পারি না।

কুতুক বেগম বলেন—আচ্ছা তবে গুলনরকে ডেকে দে।

আহমদ মির্জা সমরখন্দ গিয়ে দেখা করলেন, ওমর শেখ মির্জার সাথে। ওমর শেখ পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়ে আয়েষা সুলতানকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তখুনি মেয়েটিকে তাঁর পুত্র বাবরের বাগ্‌দত্তা হিসেবে কথা পাকা করে ফেললেন আহমদ মির্জার সাথে।

আয়েষা-সুলতান তখন সমরখন্দেই মানুষ হতে থাকে এক ধাত্রীর কাছে। বয়োবৃদ্ধির সংগেই সে পারদর্শিনী হয়ে ওঠে বিভিন্ন বিষয়ে। রূপ গুণ ক্রমশঃই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার সারা অঙ্গে। এই ভাবে সে হয়ে ওঠে ষোড়শবর্ষীয়া এক কিশোরী।

এমন সময় একদিন কিশোর বাবর ফরগনা থেকে এলেন সমরখন্দে।

সেদিন আয়েষা সুলতান একাকিনী পায়চারী করছে নির্জন উদ্যানে। হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে যায় এক অজানা অচেনা যুবককে দেখে। আয়েষা তখুনি ছুটে চলে যেতে উদ্যত হয় সেখান থেকে। তখন যুবকটি একবার ডাক দেয়—শোনো।

থমকে দাঁড়ায় আয়েষা। যুবকটি এগিয়ে এসে বলেন—তুমি আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছো কেন?

মৃদু হেসে মেয়েটি বলে—কই না তো!

যুবকটি প্রশ্ন করেন—তোমার নাম কি?

—আয়েষা।

—কাদের বাড়ীর মেয়ে তুমি?

আয়েষা সুলতান অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয় তাদের বাড়ী।

যুবকটি উল্লসিত হয়ে বলেন—ও তুমিই আহমদ মির্জার মেয়ে? তবে তুমিই হবে আমার জীবনসাথী।

আয়েষা চমকে উঠে বলে—তা কেমন করে হবে। আমি যে একজনের বাগ্‌দত্তা।

যুবকটি বলেন—তুমি কার বাগ্‌দত্তা তা জানো কি?

আয়েষা বলে—হাঁ, ওমর শেখ মির্জার পুত্র জহিরুদ্দিন বাবর হবেন আমার স্বামী।

যুবকটি হেসে বলেন—আমিই সেই জহিরুদ্দিন বাবর।

বিস্মিত হয়ে আয়েষা বলে—তুমিই বাবর!

বাবর এগিয়ে এসে ধরেন আয়েষার হাতটা। আয়েষা স্মিত হেসে তাকিয়ে থাকে তার মুখের পানে। সহসা পেছন দিক হতে পদশব্দ শুনে চমকে উঠে আয়েষা বলে—কে যেন এদিকে আসছে। আচ্ছা আমি এখন চলি, আবার পরে দেখা হবে।—বলেই ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে চলে যায় আয়েষা সুলতান।

বাবরের মন তখন ভরে ওঠে আনন্দে। বড় চমৎকার তে মেয়েটি!

১৫০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বাবরের সাথে হল আয়েষ সুলতানের বিয়ে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হল খোজন্দ সহরে। তখ বাবরের জীবনে নানান দিক থেকে এসেছে নানান বাধা বিশেষ করে খুস্রো শাহ্ আর আহমদ্ তাম্বলের সাথে যুদ্ধ লি থাকায় বিশেষ অশান্তি এসেছে তাঁর মনে।

তবু আয়েষাকে পেয়ে তখন তাঁর সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে আয়েষা তখন বাবরকে যেন এক নতুন জীবন দান করেছে। তা বাবরের সমস্ত ভালবাসা তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে বর্ষিত হয় ঐ মেয়েটী ওপর।

এই আয়েষা-সুলতানের গর্ভেই এল বাবরের প্রথম কন্যা-সন্তান তার নাম রাখা হল ফকরুন্নিসা। কিন্তু বাঁচল না শিশুটি। এ মাস পূর্ণ হতেই সে চলে গেল এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে। কন্যা-বিয়োগে বাবর এবং আয়েষা দুজনেই অভিভূত পড়েন শোকে।

এই সময় বাবর ছিলেন ফরগনার সম্রাট। তাঁকে সিংহা থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে তখন উঠে-পড়ে লেগেছে তাঁর আত্মীয়-অনাত্মীয়েরা। বিপক্ষ দলের দলপতি হলেন সা বেগমের স্বামী মামুদ। কিন্তু সেই কুচক্রী লোকটি বাবরকে কো

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে !

সত্যিই, লাইফবয় মেখে স্নান করতে কি আরাম ! শরীরটা তাজা আর ঝরঝরে রাখতে লাইফবয় সাবানের তুলনা নেই। ঘরে বাইরে ধুলো ময়লা লাগবেই লাগবে। লাইফবয় সাবানের চমৎকার ফেনা ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের যত্ন লাইফবয়ে।

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আরম্ভ করতে না পেরে একটি দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে আপন স্ত্রী সালিকাকে পাঠিয়ে দিলেন আয়েষার কাছে।

বহুদিন পরে দিদিকে দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে আয়েষা সুলতান বেগম। তার বাবা মা তো কবে গত হয়েছেন, এখন আপন বলতে আছে শুধু এই দিদিটি। সে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সালিকা বেগমকে নিয়ে যায় ভেতর-বাড়ীতে।

সালিকা জিজ্ঞেস করে—তোর স্বামী কোথায়?

আয়েষা বলে—ও দুদিন হল বাড়ী নেই। নানা দিকে নানা গোলমাল চলেছে তো তাই ও খুব ব্যস্ত রয়েছে।

সালিকা বলে—দু'দিন বাড়ী নেই? তা তুই ওকে কিছু বলবি না?

আয়েষা বলে—কি আবার বলবো দিদি! এরকম তো অনেক দিনই ওকে বাইরে কাটাতে হয়। আর না করলেই বা চলবে কেন? আমি ওড়না আড়াল করে ওকে যদি সব সময় কাছে রাখি তবে দেশ শাসন হবে কি করে?

বোনের কথা শুনে সালিকা বলে—এই জন্যেই তোর এই দশা। পুরুষদের অত বিশ্বাস করা ভাল নয়। এই যে দু'দিন তোর কাছে রইলো না তা রাতটা কোথায় কাটালো শুনি?

আয়েষা বলে—ছি দিদি, একি তুমি বলছো! ও সে-ধরণের মানুষই নয়।

সালিকা বলে—আরে বাবা কত মানুষ দেখলাম। বাইরে তাদের কত্তই না ভাল মনে হয় এদিকে ভেতরে ভেতরে তারাই করে বেড়ায় কত কাণ্ড। আর তোর স্বামীর মন যদি নিষ্পাপ হত তা হলে তোর কোলে সন্তান এসেও কি কখনও চলে যায়? তা যা হোক বাপু তোর সংসার তুই বুঝিস, এখন আমি চললাম।

আয়েষা বলে—সে কি দিদি এখুনি চলে যাবে?

সালিকা বলে—হ্যাঁ যাই। তা শোন্, তোকে যে কথাটা বলতে এসেছিলাম। আমার ছেলের জন্মদিন দোসরা শাবানে। যাবি, বুঝলি?

—আচ্ছা।

সালিকা সুলতান বেগম চলে যেতেই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে আয়েষা সুলতানের মন। সত্যি অনেক রাতই তো তার স্বামী বাড়ী থাকে না। তবে সত্যি কি ওর অন্য কোন প্রেয়সী আছে? নিশ্চয়ই আছে। না হলে তার দিদি এমন কথা বলে যাবে কেন? ও গিয়ে সেখানেই রাত কাটায়। যাবার সময় মিথ্যে করে বলে যায় অন্য কাজের কথা।

—কি এত ভাবছো প্রিয়তমা? বলি এই রত্নটিকে নয় তো?

আয়েষা বেগম কোন কথা না বলে একবার বিষাদ নয়নে তাকায় বাবরের মুখের পানে।

বাবর বলেন—আবার তুমি মেয়ের কথা ভেবে শোক করছো? আমি তোমাকে বলেছি না তুমি ছেলে ভালবাসো, দেখবে এবার তোমার কোলে আসবে একটি ফুটফুটে ছেলে।

আয়েষা বলে—এই দুদিন তুমি কোথায় ছিলে?

বাবর বলেন—ও আর বলো কেন! বনে-বাদাড়েই প্রায় কেটেছে এই দুটো দিন।

আয়েষা জিজ্ঞেস করে—রাত্রে কোথায় ছিলে?

—সে'ও প্রায় বনে-জঙ্গলেই কেটেছে। দুটো রাত একেবারে ঘুমোতে পারিনি। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে যে কি জঘন্য ষড়যন্ত্র চলেছে, তা তোমাকে কি বলবো? কিন্তু আমিও এসবে বড় কম যাই না। তাদের কি ভাবে শাস্তি দিতে হয়, তাও আমার ভাল রকম জানা আছে।

আয়েষা বলে—তুমি সত্যি বলছো রাত্রে বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছো?

বাবর বলেন—তবে তোমাকে কি আমি মিথ্যে বলছি?

আয়েষা বলে—আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমি কাজের নাম করে নিশ্চয়ই কোন বিলাসকুঞ্জে গিয়ে রাত কাটাও।

তার কথা শুনে বাবর বিস্মিত হয়ে বলেন—এ কি তুমি বলছো আয়েষা?

আয়েষা বলে—ঠিকই বলছি। তোমার মনে পাপ আছে বলেই আজ আমি কন্যাহারা।

আয়েষার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান বাবর। এবার তিনি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলেন—এসব কথা তোমাকে কে বলেছে?

আয়েষা বলে—আঃ, আমার হাত ছাড়ো।

বাবর বলেন—না আগে বলো, তোমায় কে বলেছে আমি বিলাসকুঞ্জে গিয়ে রাত কাটাই?

আয়েষা বলে—কে আবার বলবে! তুমিই তো বলেছো জৈনব সুলতানকে তুমি ভালোবাসো।

বাবর বলেন—হ্যাঁ, জৈনব সুলতান বেগমকে আমি ভালবাসতা[ম] সত্যি কথা। কিন্তু যেদিন আমাদের বিয়ে হয়েছে, সেদিন থেকে আমি তার কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

আয়েষা বলে—আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

—বিশ্বাস করো না! তবে দূর হয়ে যাও আমার সাম[নে] থেকে!—বলেই বাবর ক্রোধে আরক্ত হয়ে সজোরে ধাক্কা দে[ন] আয়েষাকে।

আয়েষা বেগম সেই ধাক্কার টাল কোন রকমে সামলে নিয়ে ব[লে] —ইস্, এই তোমার পৌরুষ! বেশ, তবে আমি এখুনি চলে যা[চ্ছি] তোমার বাড়ী থেকে।

আয়েষা তখুনি নিজের দু'-একটা প্রয়োজনীয় জিনিস [নিয়ে] বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। এবং সে গিয়ে ওঠে তার দিদি সালি[কা] বেগমের কাছে।

আয়েষা সুলতান বেগমের এই আচরণে অত্যন্ত অবাক হন বাবর। হঠাৎ ওর মধ্যে এমন পরিবর্তন এল কি করে? আয়েষাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, সে এমন ভাবে যেতে পারলো? না কি এইটাই তার আসল পরিচয়। এত[দিন] তা চাপা ছিল অন্য কোন কারণে। তখনও মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে পারেন না বাবর। তবে মনে মনে এইটুকু স্থির রাখেন, আয়েষাকে তিনি আর কখনই ঠাঁই দেবেন না [নিজের] কাছে। অনুতপ্ত হয়ে সে ফিরে এলেও তাঁর মন গলবে না। তিনি জৈনব বেগমকেই বিবাহ করবেন। যে আয়েষার জন্যে সেই মেয়েটিকে অবহেলা করছেন, এবার তিনিই তার প্রতি[দান] করবেন।

ওদিকে আয়েষাকে আসতে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে ওঠে সালিকা সুলতান বেগম। তবে তার চেয়েও খুশী হয়ে ওঠে তার স্বামী মাসুদ। বাবরের কাছ থেকে যখন তার স্ত্রীকে টেনে আনা গেছে, তখন ফরগনা অধিকার করা তার পক্ষে আর মোটেই কষ্টকর নয়। এখন শুধু কৌশলে আয়েষার নিকট হতে বাবরের কতকগুলো গোপন তথ্য জানার অপেক্ষামাত্র।

এদিকে বাবরের সাথে বিবাদ করে চলে এসে দিন কয়েকের মধ্যেই অত্যন্ত বেদনায় ভরে ওঠে আয়েষার মনটা। তার মনে হয় এমন করে চলে আসা তার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। স্বামীর সাথে এমন রূঢ় ব্যবহার সে কেন করলো। হাত কামড়ায় আয়েষা। কান্নায় সজল হয়ে ওঠে তার চোখ।

সেদিন বেদনা-ভরা মন নিয়ে একাকিনী বসে রয়েছে আয়েষা। এমন সময় সেই ঘরে প্রবেশ করে মাসুদ। তাকে দেখে বুকের ওড়নাটা সামলে নেয় আয়েষা।

মাসুদ বলে—জানো আয়েষা, এতদিন আমার বাড়ী ছিল অন্ধকার। তুমি আসাতে চতুর্দিক যেন আলোয় ঝলমল করছে।

আয়েষা ব্যস্ত হয়ে খানিকটা সরে বসে বলে—এ কি আপনি আমার গা ঘেঁষে বসবেন নাকি?

মাসুদ ক্রুর হাসি হেসে বলে—তা বসলামই বা। দুদিন পরে যাকে নিকে করতে হবে তার দেহের পরশ না হয় একটু আগেই পেলাম?

তার কথা শুনে শিউরে উঠে আয়েষা বলে—এ কি বলছেন আপনি। আমার স্বামী জীবিত থাকতে এমন ঘটনা কখনই ঘটতে পারে না।

তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠে আয়েষা বলে—স্বামীর গরব আর করো না আয়েষা। বাবর এবার এক অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে আর কখনই গ্রহণ করবেন না। তা তুমি যদি বাবরের কতকগুলো গুপ্ত কথা আমাকে জানিয়ে দাও, তবে আমি এই রাতেই গিয়ে তাকে শেষ করে আসতে পারি।

আয়েষা তার কথা শুনে চমকে উঠে বলে—কে বলেছে আমার স্বামী আবার বিয়ে করতে যাবেন। কে বলেছে তিনি আমাকে আর গ্রহণ করবেন না?

মাসুদ বলে—এ কথা আজ আর কারও অজানা নেই। তাই বলছিলাম আয়েষা তুমি আমার বুকে এসে আমার সব জ্বালা দূর করো। বলেই সে চেপে ধরে তার হাতটা।

তখন আয়েষা সুলতান বেগম সজোরে চীৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন আমার হাত! আমি আপনাকে এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছি না।

তার চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে সালিকা সুলতান বেগম। এসেই সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বলে—আচ্ছা তুমি এত তাড়াতাড়ি করছো কেন? তোমাকে কতবার বলেছি না একাজ ধীরে সুস্থে করতে হবে। ওকে এখন একা থাকতে দাও। দেখছো ওর মনটা ভাল নেই। বলেই বোনের প্রতি ফিরে সালিকা বলে—তুই কিছু মনে করিস না আয়েষা। এখন শুয়ে পড়। রাত্র অনেক হল।

এই বলে সালিকা ও মাসুদ চলে যায় ঘর থেকে।

এদিকে আয়েষা, তার দিদি এবং দিদির স্বামীর কথায় এবং ব্যবহারে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার বুঝতে বাকী থাকে না এরা তাকে দিয়ে ওদের নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে চায়। এরা হত্যা করতে চায় বাবরকে। দিদি সালিকার প্রতি তার জেগে ওঠে এক নিদারুণ বিতৃষ্ণা। এই জন্যেই সেদিন সে গিয়েছিল তার বাড়ীতে এবং মিথ্যে সে বাবরের দুর্নাম রটিয়ে তার মন দূষিত করেছে। আয়েষার দারুণ আফশোষ হয় সেদিন সে তার কপট অভিসন্ধি না বুঝে স্বামীকে কি অকথা-কুকথাই না বলেছে। কিন্তু না আর নয়। আজ রাতের অন্ধকারেই আয়েষা এই শত্রুপুরী থেকে চলে যাবে তার স্বামীর কাছে। গিয়ে সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে তার অপরাধের।

এই মনে করে নিশ্চপ হয়ে বিছানায় বসে থাকে আয়েষা। ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসে রাত। বাড়ীর সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ে নিদ্রায়। তখন আয়েষা অত্যন্ত সন্তর্পণে সেই বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটে যায় ফরগনার দিকে।

যখন আয়েষা বাবরের প্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছালো তখন ভোর হয়ে এসেছে। আবছা আলোয় দেখা গেল অত্যন্ত সুসজ্জিত করা হয়েছে প্রাসাদটি। দেখে একটু অবাক হয়ে যায় আয়েষা। বিশেষ কোন উৎসব না থাকলে এমন করে তো প্রাসাদ সাজানো হয় না। তবে আজ কিসের উৎসব? কই এত তাড়াতাড়ি কোন উৎসব আছে তা আসবার সময় তো আয়েষা শোনেনি।

একটা গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আয়েষা। চেয়ে দেখলো সেদিক পানে এগিয়ে আসছে একটি কাঠকুড়ানী বৃদ্ধা। আয়েষা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গা, বলতে পারো এই ফরগনার রাজপ্রাসাদ আজ এত সুসজ্জিত কেন?

কাঠকুড়ানী বৃদ্ধাটি বলে—ও মা আজ যে সম্রাট বাবরের বিয়ে।

চমকে উঠে আয়েষা বলে—সে কি সম্রাট, কি আবার বিয়ে করবেন?

বৃদ্ধা বলে—হ্যাঁ গো। তা না হলে তাঁর চলবে কেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী যদি তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্য একজনের সাথে ঢলাঢলি করে তবে তাঁর বিয়ে না করে আর উপায় কি বলুন মোসাম্মৎ।

আয়েষা জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা সম্রাট এবার কাকে বিয়ে করছেন তুমি বলতে পারো?

বৃদ্ধা বলে—এবার তিনি বিয়ে করবেন সুলতান মহম্মদ মির্জার মেয়ে জৈনব সুলতান বেগমকে।

—জৈনব সুলতান কে! কথাটা উচ্চারণ করে আর যেন স্থির থাকতে পারে না আয়েষা। মনে হচ্ছে তার সমস্ত শরীরটা যেন টলছে। সে একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে বসে পড়ে সেখানেই।

তাকে ঐ ভাবে বসে পড়তে দেখে বিস্মিত হয়ে কাঠকুড়ানী বৃদ্ধাটি বলে—আপনার কি হয়েছে মোসাম্মৎ?

আয়েষা সুলতান দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলেন—না গো আমার কিছু হয়নি।

কে তুমি

কুমারী মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্তা

বোধ হয় বিধবা ও
তাই পরে সাদা শাড়ী থাকে নিরাভরণা,
এলোচুলই ভালবাসে
মাঝে মাঝে খোঁপা বাঁধে
খুবই সন্তর্পণে, যেন কত অপরাধ।
বিমর্ষ মুখখানি
তবু ভারী সুন্দর
দু'টি সুগভীর চোখ
দেখে মায়া লাগবেই
আমার তো বেশ লাগে চুরি করে দেখতে।
আবার কখনো ভাবি
বোধ হয় কুমারী মেয়ে
শুভ্র মনের মত পবিত্র বেশবাস
কাছ থেকে হয়তো বা মনে হবে ফোটা ফুল।
কেন এ বিরাগ ওর ?
একটু সাজলে পরে এমন কি ক্ষতি হয় ?
নিটোল ফর্সা হাতে
ঘড়িটা কি অপরূপ
আরেকটা হাত কেন খালি থাকে কে জানে !
এ হাতে সোনার বালা
মানাতো কি সুন্দর !
সাধ হয় দেখি ওকে লাল শাড়ী পরিহিতা
কপালে ছোট্ট টিপ
কানে মুক্তার কণা
একটু গোলাপী আভা অধরে।
সকালে বিকেলে শুধু যার কথা ভেবে মরি
জানি না কিছুই তার পরিচয়
হয়তো সে কল্পনা
কিংবা কুহেলী, মায়া
অথবা মানসী প্রিয়া আমারই।

নরনারী : ৯ই শতাব্দী

কাকলী বসু

"আমরা তো জন্মেছি নির্মল কর্মহীন দিনে
মুহূর্ত্তের চূড়া থেকে উন্মুক্ত উদ্‌ঘাটন
আতাত্র নগ্নতা হ'তে ধোঁয়াভরা আকাশেতে
নির্বিশেষ সমর্পণ ;—ভ্রূণ থেকে সাবয়ব।
তবু তো মৃত্যু আছে", এই বলে সে তাকাল
মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি তাকিয়েছিল
আকাশের পানে। যে আকাশ কাল হলো
মিলের ধোঁয়ায়। যে আকাশ দিয়েছে আশ্বাস
প্রথম পুরুষ আর প্রথমা নারীকে ;
সে যে সেই নারী।
স্বপ্নের খোসা দেখে কাঁপে তার স্বপ্নিল ছায়া ॥

ছেলেটির মুখ,
নির্বিকার প্রেতায়িত ঠাণ্ডা শামুক
অব্যক্ত বিগলিত অন্ধকার রাতে
শূন্যতায় প্রক্ষিপ্ত মূর্তি যেন এক।
শব্দময় স্তব্ধ বুকে তার
সময়ের দাগ কাটে চেতনের নিভৃত কোণায়।

ছেলেটি ভাবলো শেষে এই প্রিয়া তার
গুহা হত গূঢ় অন্ধকার,
ঠেলে দোহে জ্বেলে দেবে হাজার মশাল।
নাই বা রহিল তার নাগরিক কাপট্যে ছলনা
কর্কশ রুক্ষতা থাক আদম ইভের
তবু জানে তারা, হৃদয়ের স্পষ্ট উচ্চারণে
প্রচ্ছন্ন প্রাণের আয়োজনে
মন তার সুব্যক্ত, বাঙ্ময়।

নরনারী : প্রমত্ত সভ্যতা আর রক্তাক্ত হৃদয়
চিন্তার তৃণ ছিঁড়ে বৃথা শুধু স্নায়ু অপব্যয়
তার চেয়ে জমা হোক কান্নার ফসল
শব্দহীন অট্টহাস্যে শতাব্দীরে নির্ধূম ঘৃণায়।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

(Browning-এর Summum Bonum হইতে)

এক মৌমাছি বাপ্য রেখেছে
সারা বছরের মধুরিমা আর সৌন্দর্য্যের দল :
একটি রত্ন হৃদয়েতে ধরে
বিস্ময় আর খনির বিত্তব স্থল :
মুক্তার মাঝে জড়াইয়া আছে
সিন্ধুর ছায়া-আলো:

মধু ও পুষ্প, ছায়া আলো, আর বিস্ময়, বৈভব
সত্যের কাছে উজ্জ্বলতার রত্নের পরাভব,
বিশ্বাস সে ত পবিত্র চেয়ে মুক্তাখণ্ড ভালো
বিশ্বের এই দীপ্ত সত্য, প্রত্যয় পূততম
আমার জন্য, মনে
জমা রহিয়াছে শুধু কুমারীর একটিই চুম্বনে।

অনুবাদিকা—শ্রীমানসী ব

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভায়লেটের এ-সব ব্যবস্থার আর যে কোনও প্রয়োজন নাই, আমি যে অন্য রকম ঠিক করেছি—বলি-বলি করেও ভায়লেটকে বলা হলনা। এই ঠাণ্ডায় ম্যানচেষ্টারে গিয়ে দু'দিন খেটে সব ব্যবস্থা করে এক প্রাণ উৎসাহ ও আনন্দ নিয়ে আমাকে এসে যখন সব বলল, তখুনিই তার মুখের উপরে এ সব ব্যবস্থা বৃথা, বলতে আমার বাধল।

শুধু তাই নয়, আমার কথাটা বললে ভায়লেট হয়ত ভীষণ দুঃখিত হবে—কেন জানি না, এরকম একটা ধারণাও আমার মনে হয়েছিল। মার্টিন চলে যাওয়ার পর ভায়লেট সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে আমাকে যে রকম সেবা-যত্ন করেছে তাতে সে যে আমার প্রতি একেবারেই উদাসীন নয়, সহজে বুঝতে পেরেছিলাম। আমাকে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সুখী করার জন্য সে যেন প্রাণপাত করছে। তাই হঠাৎ তার মনে দুঃখ দিতেও মন সঙ্কুচিত হল। কিন্তু বলতেই ত হবে।

বলি-বলি করেও সেদিন কথাটা বলা হলনা। ভায়লেট যেন সমস্ত দিন নিজের প্রাণের আনন্দে মশগুল হয়ে ঘুরে বেড়াল—নিজের ভাবেই তন্ময়। পাঁচ বার আমার কাছে এসে—ম্যানচেষ্টার গেলে কি রকম কি ব্যবস্থা হবে না হবে—এই কথা বলে গেল।

পরের দিন সকালবেলা মনে হল—আর দেরী করা উচিত নয়। আজই ভায়লেটকে সব বলব। সকালবেলাই একখানা চিঠি পেলাম—টমাস কুকের চিঠি। মার্চের শেষ সপ্তাহে P&O জাহাজে আমার ভারতবর্ষে যাওয়ার ব্যবস্থা তারা করেছে এবং আরও লিখেছে—পাসপোর্ট ইত্যাদির বন্দোবস্ত তারা শীঘ্রই করে দেবে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব ম্যানচেষ্টারে গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে আমাকে। চিঠিখানি পকেটে নিয়ে সার্জারী অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

ভায়লেটের সঙ্গে দেখা হল—একগাল হেসে আমাকে অভিনন্দন জানাল। এত প্রাণখোলা হাসি ভায়লেটের এর আগে দেখেছি কি না সন্দেহ।

তিনটি রোগী ছিল। তাদের দেখার কাজ শেষ করে, ভায়লেট 'চা' নিয়ে আমার ঘরে বসে বলল, "দেখুন, ডাঃ নাইটকে আজই আপনার একখানা চিঠি লেখা দরকার—তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে এবং ব্যবস্থা পাকা করে। দিন কয়েক বাদে একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই চলবে।"

মুখে কিছু না বলে পকেট থেকে টমাস কুকের চিঠিখানি বার করে ভায়লেটকে দিলাম। বললাম, "পড়ে দেখ।"

ভায়লেট চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। লক্ষ্য করলাম, পড়তে পড়তে মুখ অসাধারণ গম্ভীর হয়ে গেল। পড়া শেষ করে চোখ তুলে সোজা আমার দিকে তাকাল। শুধাল, "এর মানে কি?"

বললাম, "ভায়লেট! আমি আর এদেশে থাকব না। নিজের দেশে ফিরে যাব ঠিক করেছি।"

একটু স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে রইল চেয়ে। সহজেই বুঝতে পারলাম—দারুণ রেগে গেছে, চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। শুধাল, "তাহলে আমাকে এমন নাচালেন কেন?"

বললাম, "ভায়লেট। ভেবে দেখ, যা ঘটেছে তারপর এদেশে আমার মন আর থাকতে চাইছে না—সেইটেই স্বাভাবিক।"

বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "তা একথা আগে বলেননি কেন?"

বললাম, "ভায়লেট! উত্তেজিত হয়ো না। তুমি যে এত শীঘ্র এত কাজ করে বসবে—আগে বুঝতে পারিনি।"

বলল, "কি বুঝেছিলেন? আমি শুধু শুধুই এতদিন আপনার বোঝা বইছি?"

কথাটা ভাল লাগল না। বললাম, "ভায়লেট! এতদিন তোমার উপর একটা বোঝার মতন ছিলাম—সে জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

বলল, "চুকে গেল? শেষ পর্যন্ত আপনার মুখের একটু দুঃখ প্রকাশেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব ভেবেছিলেন? আপনার দম্ভ ত কম নয়!"

জোরের সঙ্গে বললাম, "ভায়লেট! কি যা-তা বলছ?"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিজেকে যেন সামলে নিল। ধীরে ধীরে বলল, "এদেশে আপনার এমন সোনার ভবিষ্যৎ—সব ছেড়ে আপনি দেশে ফিরে যাবেন? না—না ডাঃ চাটুজ্যে! তা হতে পারে না, ভেবে দেখুন—লোকসান আপনার।"

দৃঢ়স্বরে বললাম, "ভায়লেট! আমি ফিরে যাবই।"

মুখখানা যেন কেমন একটু করুণ হয়ে উঠল। একটু যেন কাতর ভাবেই বলল, "কেন যাবেন? কি আছে দেশে আপনার?"

একটু গর্ব্ব ভরেই বললাম, "যা আছে, তা তোমরা ধারণাও করতে পার না। আছে—সতীর পুণ্য স্মৃতি।"

শুধাল, "তার মানে?"

বললাম, "শোন ভায়লেট। মার্লিনের আগে দেশে আমার আর এক বিবাহ ছিল। সে মারা গেছে। আমারই জন্য দিয়েছে প্রাণ। তবে তার স্মৃতি আছে। দেশে ফিরে গিয়ে তার নামে নার্সিংহোম করে নিজেকে দেব বিলিয়ে—সেই স্মৃতির তর্পণে।"

ভায়লেট আবার যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "উঃ অসহ্য, অসহ্য! পুরুষের মধ্যে এই ভাববিলাস অসহ্য!"

বললাম, "এ সব বোঝার শক্তিটুকুও নাই তোমাদের।"

তীক্ষ্ণ ভাবে বলল, "এ-সব বুঝতে কোনও শক্তির দরকার হয়না। এ-সব মনের আদিম দুর্ব্বলতা।"

গম্ভীর ভাবে বললাম "যাক, এ-সব নিয়ে আর কোনও আলোচনা করতে চাইনা তোমার সঙ্গে।"

একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে। চোখের মধ্য দিয়ে যেন একটা রাগ ও ঘৃণা ঠিকরে বেরুচ্ছে। একটু পরে যেন নিজের মনেই বলতে লাগল "সতী! সতী! যার বিষয় জানিনা সেই সতী। জীবনে সতী কেউ নেই ডাক্তার। ওটা একটা আদর্শ—একটা কল্পনাবিলাস মাত্র। এখানে আমি আপনার চোখ খুলে দিয়েছি। সেখানে যদি কেউ আপনার চোখ খুলে দিত, দেখতেন—"

চেঁচিয়ে ধমক দিলাম, "ভায়লেট! চুপ—তার বিষয়ে কোনও কথা আমি সইবনা। এ তোমাদের দেশের মেয়ে নয়।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর এ কি! মুখখানা একটু নরম হয়ে ক্রমে যেন গেল ভেঙ্গে। চোখ দিয়ে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হল কি? বেচারা! জীবনে সুন্দর চিনল না। ধমকটা একটু যেন বেশী রকমের হয়ে গেছে।

একটু সান্ত্বনার সুরে বললাম, "ভায়লেট! বৃথা নিজেকে অভিভূত ক'রনা।"

হঠাৎ টেবিলের উপর মাথাটি রেখে ফুঁপিয়ে উঠল কেঁদে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, "বৃথা! বৃথা। নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর আপনি! কোনও ইংরেজকে নিয়ে আর সম্ভব নয়, তাই আপনাকে নিয়ে জীবনটাকে হয়ত নতুন করে গড়তে পারব—হয়ত দেখতে পাব আবার জীবনে সুন্দরকে। সব ভেঙ্গে গেল—সব—"

হঠাৎ উঠে দ্রুতপদে ঘর থেকে গেল চলে।

* * * *

সেদিন ভায়লেটের ওখানে আর লাঞ্চ খাওয়া হল না। খানিকক্ষণ অফিসঘরে চুপচাপ রইলাম বসে। ঘড়িতে দেড়টা যখন বাজল—লাঞ্চ খাওয়ার ডাক এল না, তখন নিজেই উঠে গেলাম খাওয়ার টেবিলের কাছে। দেখলাম—খাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত নাই। ভায়লেট কোথায়? শোবার ঘরে? ডাকলাম—ভায়লেট! কোনও জবাব এলো না। ঘুমুচ্ছে? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সার্জ্জারী থেকে বেরিয়ে পড়লাম—ষ্টেশনের কাছে একটা ক্যাফে আছে, সেইখানে যা হয় কিছু নেব খেয়ে।

বিকেলবেলা সার্জ্জারীতে যখন এলাম—তখন সন্ধ্যা হয়েছে। জানুয়ারী মাসের দশ-বারো তারিখ—এখন ত ৪টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যে হয়। সার্জ্জারীতে গিয়ে দেখলাম—সার্জ্জারীর দরজা বন্ধ। একটু অবাক হলাম। রোগীদের জন্য দরজা ভায়লেট ত খুলেই রাখে।

দরজার ঘণ্টা টিপতেই—সেই মেয়েটি এসে দরজা দিল খুলে। সেই মেয়েটি—যাকে ভায়লেট ম্যানচেষ্টার যাওয়ার সময় আমার রান্নার জন্য রেখে গিয়েছিল। একটি ১৮।১৯ বছরের মেয়ে—নাম মিস্ হোয়াইট। তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে শুধালাম, "তুমি! ভায়লেট কোথায়?"

মৃদু হেসে বলল, "তিনি চলে গেছেন স্যর!"

শুধালাম, "কোথায়?"

বলল, "তা ত বলে যান নি? তবে আমাকে সব বুঝিয়ে বলে গেছেন—আপনার রান্নাবান্নার ব্যবস্থার কথা।"

অফিসঘরে গিয়ে বসলাম। এ কি! টেবিলের উপর চাপা দেওয়া একখানি চিঠি। চিঠিখানা খুললাম—ভায়লেটেরই চিঠি বটে!

লিখেছে—"ডাঃ চৌধুরী! আমার জীবনে আপনাকে আর প্রয়োজন নাই। এমন কি—আপনার মুখ দেখারও ইচ্ছা আর নাই আমার। তাই চলে যাচ্ছি, টাকা'কড়ির কোনও দাবী-দাওয়া আমি রাখি না, তাই এক মাসের নোটিশ দেওয়ার কোনও কারণ নাই।"

ইতি—

ভায়লেট মিলবার্ণ।

চিঠিখানা পড়ে, খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ভায়লেটও জীবন থেকে চলে গেল!

বারো

ভায়লেট চলে যাওয়ার বোধ হয় পাঁচ-সাত দিন পরেই—ব্যাপারটা ঘটল।

একদিন রাত্রে, রাত তখন বোধ হয় দশটা, আমি আমার লাউঞ্জে বসে আছি—শুতে যাব-যাব ভাবছি। আগুনটাকে যতদূর সম্ভব প্রখর করে দিয়েছি, কেন না বাইরে দুর্দান্ত শীত—বোধ হয় এতক্ষণে বরফ পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আগুনের কাছ থেকে যেন নড়তে পারছি না, তাই শুতে যাই-যাই করেও শুতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোন বাজল। এত রাত্রে কে টেলিফোন করে—জরুরী রোগী? না—যাবে না, এত রাত্রে এই শীতে বেরুনো অসম্ভব—ভাবতে ভাবতে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। এ কি! গ্রেস লালকাকা!

শুধালাম, "কি খবর—এত রাত্রে?"

গম্ভীর গলায় বলল—"আপনি এখুনিই চলে আসুন আমাদের বাড়ীতে। দেরী করবেন না।"

শুধালাম, "এত রাত্রে কেন?"

বলল, "সব কথা টেলিফোনে বলা যায়না। চলে আসুন—এতটুকুও দেরী না করে।"

কিছুই বুঝলাম না, তবুও বুকটা যেন কেঁপে উঠল। কি হল? টেলিফোনে গ্রেসের যেরকম গলা লালকাকার সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে কি? যাই হোক, অমন করে ডেকেছে—বেরুতেই ত হবে।

গায়ে মোটা ওভারকোট চাপিয়ে, মাথায় টুপী দিয়ে ঢেকে কোনও

রকমে কাঁপতে কাঁপতে গ্যারাজে গিয়ে গাড়ী বার করলাম। চললাম —লালকাকাদের বাড়ীর দিকে।

গাড়ীতে যেতে যেতে মনে হল—মার্লিনের কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বলব! বলব—শুয়ে পড়েছে। আর ত দুটো মাস—তারপর আমাকে এদেশে আর কে কোথায় পাচ্ছে।

গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল মার্সল্যাণ্ড রোডে—লালকাকাদের বাড়ীর সামনে। দেখি—দরজায় একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ কেন? বাড়ীর সদর খোলাই ছিল। দরজা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি পুলিশটি শুধাল—"আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার।"

বললাম "আমি ডাঃ চৌধুরী। লালকাকাদের বিশেষ বন্ধু।"

পুলিশটি বলল, "ওঃ! আচ্ছা আপনি যান ভিতরে, উপরে সবাই আছেন।"

ভিতরে গিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলাম। লালকাকাদের বসবার ঘরে গিয়ে দেখি—মিঃ লালকাকা মিসেস লালকাকা ও আরও দুজন ভদ্রলোক আছেন বসে। আমি যাওয়া মাত্র মিঃ লালকাকা উঠে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। গ্রেস গম্ভীর ভাবেই বসেছিল। আমার অভিনন্দনের উত্তরে সামান্য একটু মাথা নাড়াল মাত্র।

দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে মিঃ লালকাকা আমার আলাপ করিয়ে দিলেন—ইনি ডাঃ রাসেল এবং ইনি পুলিশ ইনস্পেক্টার জোন্স। ডাঃ রাসেল ব্রুকলানের ডাক্তার মার্সল্যাণ্ড রোডের দিকে প্রাকটিস। এ কথা আগেই জানতাম। উভয়ে উঠে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

বসে শুধালাম, "কি ব্যাপার?"

সকলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ইন্সপেক্টার জোন্স গম্ভীর ভাবে বললেন, "ডাঃ চৌধুরী! ক্ষমা করবেন। আপনার স্ত্রীকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।"

চমকে শুধালাম, "আমার স্ত্রী! তিনি কোথায়?"

ইন্সপেক্টার জোন্স বললেন, "তিনি এখানেই আছেন।"

কেমন যেন ফ্যাল-ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে চাইলাম। কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। ইন্সপেক্টার জোন্সই আবার বললেন, "ওঁকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি—জেল থেকে পলাতক আসামীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে এবং শুধু তাই নয়, টাকাকড়ি দিয়ে তাকে এ দেশ ছেড়ে আবার পলায়নের সাহায্য করতে। গুরুতর অপরাধ।"

অবাক হয়ে শুধালাম, "সে কি?"

ইন্সপেক্টার জোন্স বললেন, "আপনি কিছুই জানেন না—আমরা জানি। (মৃদু হেসে) আপনি ভেবেছিলেন তিনি আপনাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। আপনি সব জানলে আপনাকেও ত গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হতাম।"

একটু চুপ করে থেকে গ্রেসের দিকে চেয়ে আকুল ভাবে শুধালাম, "মিসেস লালকাকা! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

গ্রেস এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আমার কথা শুনে চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। একটু নিজেকে সংযত করে থেমে থেমে বলে যেতে লাগল, "কি চরিত্র! কি চরিত্র! পাছে আপনাকে বললে, আপনিও তার অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যান—তাই আপনাকে কিছু বলেনি। বাঁচিয়ে গেছে আপনাকে। প্রথম যেদিন ঝড়ের রাত্রে আমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিল, আমাকে পর্য্যন্ত কিছু বলেনি। পাছে আমাদের গায়ে কোনও আঁচড় লাগে। শুধু বলেছিল (আবার কান্নায় গলা ভেঙে গেল এবং একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে) ভাই! কিছুদিনের জন্য তোমার এখানে থাকতে চাই। ভেবেছিলাম হয়ত আপনার সঙ্গে একটা ঝগড়াঝাঁটি করে চলে এসেছে। আজ পর্য্যন্ত আমরাও ত কিছু জানতাম না।"

হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে শুধালাম, "তা এতদিন আপনাদের কাছে ছিল, খবর দেননি কেন?"

শান্ত গলায় গ্রেস বলল, "বারণ করেছিল। ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ত আমাদের নাই ডাঃ চৌধুরী! বলেছিল—সময় হলে আমিই খবর দেব ভেব না। শুধু একদিন বলেছিল টেলিফোন করে একটা খবর নাও ত কেমন আছেন, আমার কথা কিছু বলো না।"

উঠে দাঁড়ালাম। শুধালাম, "কোথায় সে? কোথায় সে?"

ডাঃ রাসেল কথা কইলেন, "অত উত্তেজিত হবেন না। ডাঃ চৌধুরী! তাঁর শরীর খুব খারাপ। হার্টের অবস্থা ভাল নয়। এখন একটু ঘুমুচ্ছেন—তাই আমরা সব অপেক্ষা করছি। নার্স পাশে আছে। ও অবস্থায় আপনি গিয়ে ঘুম ভাঙালে এতদিন পরে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হলে হার্ট সে ধাক্কা না-ও সইতে পারে।"

কি বলব বুঝতে না পেরে আবার যন্ত্রচালিতের মতন বসে পড়লাম।

গ্রেসই ভাঙা গলায় বলে যেতে লাগল, "আসার দু'-তিন দিন পর থেকেই শরীর বিশেষ খারাপ হতে সুরু হল। প্রায়ই শুয়ে থাকত, বুকের মধ্যে কি রকম অস্থিরতা। মাঝে, একটু একটু জ্বরও হতে লাগল। ডাঃ রাসেল রোজ এসে দেখতেন। কতবার বলেছি—ডাঃ চাউডুরীকে একটা খবর দি। গম্ভীর ভাবে বলেছে—না, সময় এখনও হয়নি। আজই পুলিশ আসার পর বলল—এইবার সময় হয়েছে, ওঁকে খবর দাও। ঘুম ত একেবারেই ছিল না। এঁরা এসে ত তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমিই ডাঃ রাসেলকে খবর দিলাম। তার পর, আজই দেখলাম—কেমন যেন এলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিই এঁদের বললাম—ঘুমটুকু শেষ হতে দিন। তাই এঁরা দয়া করে অপেক্ষা করছেন।" এই বলে চোখে রুমাল দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল।

ইন্সপেক্টার বললেন, "আমরা এখন ওঁকে সোজা ম্যাঞ্চেষ্টারে জেল-হাসপাতালেই নিয়ে যাব ডাঃ চাউডুরী! সেখানে চিকিৎসার ত্রুটি হবে না। আপনি ভাববেন না।"

হঠাৎ কেন জানি না, ইন্সপেক্টার জোন্সের দিকে চেয়ে বললাম, "কি করে জানলেন—আমি কিছুই জানি না? আমিও অপরাধী।"

মৃদু হেসে ইন্সপেক্টার বললেন, "না, ডাঃ চাউডুরী! আমরা সমস্ত খবর জানি। অনেক দিন ধরে আপনি ও আপনার স্ত্রীর উপর নজর রেখেছি—যদি তাকে ধরতে পারি। খবরাখবরও নিয়েছি অনেক। আপনাকে বিশেষ করে বাঁচিয়ে দিল—আপনার পূর্ব্বতন সেক্রেটারী মিস ভায়লেট মিলবার্ণ। তাঁর কাছে আমরা সবই শুনেছি। যাই হোক, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অনেক দিন ধরে চেষ্টা করলাম, কিছুতেই ত লোকটিকে ধরা গেল না।"

শুধালাম, "কে সে, কে ?"

ইন্সপেক্টার বললেন, "আপনার স্ত্রীর ভাই।"

চুপচাপ হয়ে গেল ঘর। কারও মুখে কোনও কথা নাই। একটু পরে ডাঃ রাসেলকে কাতর ভাবে বললাম, "আমি শুধু একবার পা টিপে টিপে দেখে আসব—ঘুম ভাঙাব না ডাঃ রাসেল।"

ডাঃ রাসেল বললেন, "আপনিও ত একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। আপনি নিজেই ত বুঝতে পারছেন। হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়—সেটা কি ঠিক হবে ?"

হায় রে! নিজের স্ত্রীকে একবার চোখে দেখাও এখন অপরের অনুমতিসাপেক্ষ!

* * * *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নার্স এসে খবর দিল—ঘুম ভেঙেছে। গ্রেস তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল—"আমি যাচ্ছি। ডাঃ রাসেলও উঠলেন তাঁর হাতবাক্স নিয়ে। দুজনে চললেন মার্লিনের ঘরের দিকে। যাওয়ার সময় ডাঃ রাসেল আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন, এ খবরটা ক্রমে আমরা জানিয়ে দেব মিসেস চাউডুরীকে।"

ইন্সপেক্টার বললেন, "যদি বিশেষ কিছু বাধা না থাকে ডাক্তার, তাহলে ওঁকে নিয়েই আসবেন। আমরা আর বেশী দেরী করতে চাই না। নইলে আবার এত রাত্রে পুলিশ-সার্জনকে খবর দিতে হবে।"

যেতে যেতে ডাক্তার বললেন, "আমরা ওঁকে নিয়েই আসব। বোধ হয় যেতে পারবেন। দরকার হলে ইঞ্জেক্‌শানের ব্যবস্থা ত আছে আমার সঙ্গে। আপনাদের গাড়ী—"

ইনস্পেক্টার বললেন "আমাদের গাড়ী রাস্তায় অপেক্ষা করছে।"

দুজনে চলে গেলেন—মার্লিনের ঘরে।

প্রায় ১৫।২০ মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। লালকাকা বা ইনস্পেক্টার কেউ কোনও কথা বলেনি। তবে ইনস্পেক্টার ইতিমধ্যে একবার উঠে নীচে গিয়ে একজন সার্জেন্টকে ডেকে নিয়ে এলেন উপরে।

কতক্ষণ পরে মনে নেই, ক্রমে মার্লিনের ঘরের দিক থেকে এগিয়ে এল তিন জন—ডাঃ রাসেল, গ্রেস ও মার্লিন। ইনস্পেক্টার ও লালকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি শুধু উঠে দাঁড়ালাম নয়, কেন জানি না সরে গেলাম চোখের সোজাসুজির সামনে থেকে একটু আড়ালে—মার্লিনকে সোজা নিজের মুখ দেখাতে হঠাৎ একটা লজ্জা এলো কি প্রাণে ?

গ্রেস মার্লিনের বাহুখানি ধরে এগিয়ে আসছিল—চেয়ে দেখলাম মার্লিনের মুখের দিকে। কেঁপে উঠল প্রাণ—একখানি শীর্ণ ভাঙা মুখে সেই গভীর দুটো বিষণ্ণ কালো চোখ আরও বিশাল আরও গভীর হয়ে উঠেছে, যেন তার মধ্যে তলিয়ে যেতে ভয় হয়, পাছে থৈ না পাই।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েই সেই চোখ দুটি চারিদিকে যেন ঘুরে বেড়াতে লাগল—যেন কিসের সন্ধানে। পড়ল এসে আমার মুখের উপরে। সজল হয়ে উঠল চোখ দুটি—ঠোঁটে উঠল ফুটে মৃদু হাসির রেখা। অস্ফুটস্বরে মুখ দিয়ে বেরুল—"বিকো!"

আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। দ্রুতপদে এগিয়ে গেলাম—মার্লিনের কাছে। ঝাঁপিয়ে এলিয়ে পড়ল মার্লিন আমার বুকে। একপ্রাণ নিশ্বাস ঢেলে আমার কানে কানে যেন বলল, "আর আমাদের মধ্যে কোনও আড়াল নাই বিকো।"

আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না। লীনা—এ নামটুকু ও যেন গলায় আটকে গেল।

তারপর সব শেষ। গেল চলে। যাওয়ার সময় মুখ ফিরিয়ে একবার চেয়েছিল আমার দিকে—বুলা! অমন করুণ মৃদু হাসি আমি আজ পর্য্যন্ত জীবনে দেখিনি!

[ক্রমশঃ।

আফ্রিকা

সুশান্ত ঘোষ

অদূরে বিশাল এক মরুভূমি কবেকার শীতোষ্ণ উষায়
ডলার, বাণিজ্য আর গাঢ় তামসিক মূল্য সমারোহে
ছড়িয়েছে, বুদ্ধের সঙ্ঘের ডাকে। তৈলাক্ত নেশায়
দুর্বল অস্থির শিরা কাঁপছে না। জলমগ্ন প্রথম প্রবাহে
সমুদ্রের টানে—কত কাল কেটেছিল ভাবো কতদিন—
কে তার হিসেব রাখে ? সন্ধ্যার খেলায় শেষে ফেরে
অবুঝ দুরন্ত শিশু, সে কি বোঝে হৃদয়-তর্পণ
নিবিড় রক্তেই কেন হতে চায় ? নিজেদের প্রাচীন সে ঘরে।

অন্ধকারে চেনা ছিল আরেক শ্মশান, কোন গুপ্তচর
ফিরে এল নিথর কঠিন অমারাতে ? বিবর্ণ পেঁচার
নির্জীব কোটর হ'তে দগ্ধ চোখ জ্বলে উঠে যেন
শমীবৃক্ষে নিবে গেল। আর মোহনার থেকে শঙ্খকণ্ঠ
ভেসে আসে,-যীশুর পূজোর স্তব, পূজারী ভূলুণ্ঠ
আনত প্রণামে, সবাই দেখবে তাকে একবার কালিয়দমন।

পুরাণ-প্রেমকথা

(দণ্ডকারণ্য)

মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এক জনপদ শত শতাব্দীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে।

দিকে দিকে আজ প্রাণের সাড়া পড়ে গেছে। আশা আর আশ্বাসে আনন্দ আর উল্লাসে কোলাহল পড়ে গেছে এই বনস্থলীতে।

দৈত্যগুরুর অভিশাপে অরণ্যে পরিণত এই জনপদে আশ্রয় পেয়েছে সেদিন থেকে বহু যুগ পরের আর এক অকারণেই অভিশপ্ত, গৃহহারা বাস্তুত্যাগীর দল।

এই অভিশপ্ত কাননকে শাপমুক্তির উল্লাসে মনের আনন্দে তারা গৃহকুটীর গড়ে তোলে। বহুদিনের বন্ধ্যা মৃত্তিকায় পড়ে খনিত্রের আঘাত; মৃত্তিকা শিউরে ওঠে আতঙ্কে নয়, আনন্দে; নতুন করে শস্যশ্যামলা হওয়ার আনন্দে, ফলবতী হওয়ার আশ্বাসে।

শিশুদের কলকাকলির সঙ্গে আজ বনের পাখীরাও সে ঐকতানে সুর মিলায়,—জানায়—'এস এস, সুস্বাগতম্।'

বরষার বারিধারা আজ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তোলে এ অহল্যা কাননকে।

আর জনগণের সকল শ্রমের সার্থক মূল্যস্বরূপ গড়ে ওঠে তাদের ফুলে-ফলে সুশোভিত আনন্দ নিকেতন তপোবনের শান্ত আর উপবনের সৌন্দর্য্য নিয়ে। আর আপন শ্রমের সার্থক আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এ বাড়ীর এক তরুণ পুরুষ আনমনেই চারিদিক তাকিয়ে দেখে, তার পর এক সময়ে চোখ পড়ে যায় পাশের বাড়ীর লতাকুঞ্জের দিকে। যেখানে আশ্রয় পেয়েছে কোন দূর দেশের এক তরুণী কন্যা তার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে।

আপন কাজে ব্যস্ত সে মেয়েটি, হয়ত সেই দৃষ্টির আকর্ষণেই চোখ তুলে একবার তাকায় আর সে দৃষ্টির ভাষা উপলব্ধি করে একটু বা হাসে, একটু লজ্জা হয় আর নিরালায় হয়ত স্বপ্ন দেখে।

যে স্বপ্ন দেখে চিরকালের কুমার-কুমারী, যে স্বপ্ন দেখেছিল এই মাটিতেই বহু যুগ আগেকার এক তরুণ-তরুণী। অজা আর দণ্ডক।

এক সরলহৃদয়া, অপাপবিদ্ধা ঋষিকুমারী, আর সব পেয়েও সে ভাগ্যদোষে সর্বহারা; নির্ব্বাসিত রাজপুত্র কুমার দণ্ডক···এই সেই দণ্ডকারণ্য। তারও বহু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের আর এক রাজপুত্রের নির্ব্বাসনস্থল এই দণ্ডকারণ্য।

অত্যাচারী আর রাজকার্য্যে অনুপযুক্ত, তাই জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও রাজসিংহাসনের পরিবর্ত্তে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হলেন কুমার দণ্ডক। আশ্রয় নিলেন এক অরণ্যের উপকণ্ঠে। কিন্তু সত্যই কি অত্যাচারী ছিলেন সেই কুমার? ছিলেন রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত? অথবা এই নির্বাসন-দণ্ডের অন্তরালে ছিল কোনও বিমাতার কুটিল অনুশাসন? স্বীয় পুত্রকে রাজসিংহাসনের অধিকারী করার আকুল আগ্রহে যিনি ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সব ভুলে গিয়েছিলেন? কে জানে সেই যুগ যুগ আগেকার কথা!

কিন্তু নির্বাসিত রাজপুত্রের সঙ্গে ছিল তার একান্ত অনুগত, অনুচরের দল। ছিল পাত্র, মিত্র, আত্মীয় বান্ধব, ছিলেন শুভাকাঙ্খী অমাত্যবর্গ। স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছিলেন তারা কুমারের সঙ্গে এই অরণ্যপ্রান্তে।

আর এই অনুপযুক্ত রাজপুত্রের বাহুবলে এবং অমাত্যবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজকের মতই সেদিনও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এক ঐশ্বর্য্যময়ী নগরী; তার পিতৃরাজ্য থেকে অনেক—অনেক দূরে। কুমারের নাম অনুসারে সে রাজ্যের নামকরণও হয়ে গেল।

—রাজ্যপাট ত গড়ে উঠল; রাজসম্মানও পেলেন কুমার কিন্তু শুভাকাঙ্খীদের মনে স্বস্তি নেই, তাদের আকাঙ্খা উপযুক্ত কোনও রাজতনয়ার পাণিগ্রহণ করলে কুমার আর মহা সমারোহে অভিষেকের আয়োজন করে একেবারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করবেন তাদের গড়ে তোলা এ রাজ্যের। কুমার সব দেখেন আর মনে মনে হাসেন ভাবেন—কই তেমন কন্যার সন্ধান পাই কই? যাকে দেখলে মনে হবে—এই ত সেই! যুগ যুগ ধরে যাকে কামনা করে আসছি এই সেই অন্তরতমা প্রেমলতা।

মনের কথা প্রকাশ পায় না। তাই অস্ত্রশস্ত্র আর মৃগয়ায় দিন কাটায়—রাজকার্য্যের ভার অমাত্যবর্গের হাতেই থাকে। এমনিই এক বসন্ত-প্রভাতে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন কুমার। সঙ্গে ছিল বয়স্য অনুচরের দল। নগরের প্রান্তেই এক অরণ্য। পশু-পক্ষি-সমাকীর্ণ গহন বন।অরণ্যের মাঝে এক বনকুরঙ্গীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সেদিন পথ হারিয়ে ফেলেন কুমার। দলছাড়া হয়ে পড়েন সঙ্গীদের কাছ থেকে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অনুচরদের বিস্তর অনুসন্ধানের পর যখন পথের খোঁজ পেলেন কুমার, তখন তাঁর কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত আর উন্মনা ভাব দেখে বিস্মিত হলেন তাঁরা।

কি হয়েছে তাঁর? সঙ্গীরা বলাবলি করে, জানে না তারা সেদিন বন মধ্যে শুধু পথই হারাননি তিনি; মনও হারিয়ে এসেছেন সেই অরণ্যের এক সরসীতটে।

আর সেই মন খুঁজতেই তিনি প্রায় প্রতিদিনই যেতে লাগলেন সেই বিজন বনে সঙ্গি-সাথীদের এড়িয়ে—একাকী। তারই মনের অনুসন্ধানে! অথবা অন্য কারও মন পেতে কে জানে?

সঙ্গি-সাথীরা তাঁর হাব-ভাব দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। শুভাকাঙ্খীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। কোথায় যান কুমার একাকী সেই বিজন বনে? আর তাঁর রক্ষাকল্পেই রক্ষিগণ অলক্ষ্যে তাকে অনুসরণ করে; বয়স্যরাও কৌতূহলী হয়ে মৃগয়াছলেই বনমধ্যে যাতায়াত সুরু করেন। তাদেরই মধ্যে একজন একদিন দু'টি মৃগশাবক শিকার করে আনেন। এক আশ্রমবালকের পালিত মৃগশাবক নেহাৎ কৌতুকছলেই ধরে আনল। আর পল্লবিত হয়ে সে কথা প্রকাশ পায় বনপ্রান্তের এক আশ্রম-তপোবনে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে নিরীহ আশ্রমবাসিগণ। উপদ্রবের আশঙ্কায় শঙ্কিত হন তাঁরা।

২

—"অজা! সখি অজা!" নিস্তব্ধ বনভূমির মধ্য থেকে ভেসে আসে একটি আকুল তরুণীকণ্ঠ। অতি ক্রতগতিতে এগিয়ে আসে সেই সুললিত কণ্ঠস্বর, বসন্তের পাতাঝরা পথে মর্ম্মরধ্বনি তুলে। কিন্তু ধ্যানময়ী অজার কানে সে স্বর পৌঁছায় না।

কোন্ চিন্তায় কে জানে আপন ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে ঋষিকুমারী অজা! বনসরসীর শান্ত জলের পানে চেয়ে। কি দেখে অজা জলের দিকে হেঁট হয়ে চেয়ে?

—নিজের রূপ না সেই কুবলয়দলের মত···? চিন্তার জাল ছিন্ন করে সেই সুললিত কণ্ঠস্বর অজার কানে প্রবেশ করে ···"সাড়া দাও না কেন সখি? কোথায় তুমি?"

আরও দ্রুত পায়ে কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অজ্ঞাসখী ললিতা। তখনই তাকে অজ্ঞার ধ্যান। ললিতাকে অমন বিস্মিত নেত্রে তাকাতে দেখে অপ্রতিভ অজ্ঞা, লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়ায়। মুখে অপূর্ব হাসি, ঈষৎ চকিত নয়ন—কেমন যেন ধরা পড়ে যাওয়া ভঙ্গী।

অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, "জল নিতে এসেছিলাম।" তারপর সচকিতে তাকিয়ে দেখে, নাঃ জলপাত্রটি ভেসে যায়নি ; ধারেই কাত হয়ে পড়ে আছে। তাই তাড়াতাড়ি সেটি তুলে জল ভরার জন্ত এগিয়ে যায় জলের ধারে।

অবাক কণ্ঠে ললিতা বলে—"সে কি, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আঁধারে তুমি জল নিতে এসেছ ?"

..."না না, এসেছি ত অনেকক্ষণ" বলেই থম্‌কে গিয়ে চুপ করে যায় অজ্ঞা।

..."তাহলে এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ? কি করছিলে ?" এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে থতমত খেয়ে চুপ করে থাকে অজ্ঞা। আর ধীরে ধীরে আননে তার রঞ্জন ফুলের ছোপ ধরে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার মত মনের অবস্থা নেই ললিতার। তার প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠে বলে, "জানো, এ বনে আজ দস্যুর আগমন হয়েছে।"

ললিতার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে হল না বলে বেঁচে গেল যেন অজ্ঞা। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল—"দস্যু !"

"হাঁ হাঁ, দস্যু নয়ত কি !" অন্তরের উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে ঋষিকুমারী ললিতার অঙ্গভঙ্গিমায়। চঞ্চলা কিশোরী না জানি কিসের আশঙ্কায় ভীত-ত্রস্ত হয়ে সাবধান করতে এসেছে প্রিয় সখীকে।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, "জানো আশ্রমবাসীরা বলছেন অরণ্যপ্রান্তের নূতন নগরী থেকে অত্যাচারী রাজপুরুষদের আনাগোনা সুরু হয়েছে আমাদের এ তপোবনের আশে-পাশে।"

—সে কি ! অজ্ঞা ভরা কলস কাঁখে তুলে জল ছেড়ে উঠে আসে পথে, ললিতার নিকটে ; ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"আমাদের এ ধারেও এসেছে ? কে বললে তোমায় ?"

"কে আবার বলবে—জানো মৃগয়ার নামে এরা সারা বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। আর কোনও শিকার না পেয়ে দেবলের যে হরিণছানা দুটি খেলে বেড়াচ্ছিল তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে" বলতে গিয়ে চোখে জল এসে যায় ললিতার। "অপদার্থ, কাপুরুষ।"

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় অজ্ঞা। এ কি করে সম্ভব ! পোষা হরিণশিশু, তাই মানুষ দেখলে ভয়ে পালায় না তাদের ধরে নিয়ে গেছে ? ক্রোধে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হঠাৎ দ্রুতছন্দে এসে ললিতার হাত চেপে ধরে যেতে যেতে বলে, "এস ত' দেখি কোথায় তারা ?"

"না না তুমি তাদের কাছে কোথায় যাবে সখি !" বাঁ হাতে নিজের চোখ মুছে বাধা দিতে দিতে চলে ললিতা—"তারা বড় দুর্দান্ত আর অনাচারী। এরা না পারে এমন কাজ নেই। আর আশ্রমবাসীরা বলছিলেন শুধু মৃগয়াই এদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য হয়ত কোনও অভিসন্ধি আছে এদের। তাই এত আনাগোনা। তুমি একা সেখানে যেও না সখি। হাত ছাড়ো আমার, উঃ !"

এবার [illegible] দাঁড়ায় অজ্ঞা। হাত ছেড়ে দেয় সখীর। উত্তেজনায় তার মাথার ঠিক ছিল না। তাই ত' কোথায় যাবে সে ? যদি সত্যিই অত্যাচারী আর অনাচারী হয় এরা ? ললিতার কথার সত্যতা উপলব্ধি করে মত পরিবর্তন করে। এই হরিণশিশু দু'টি তাদের বড় প্রিয়, তাই তাদের মৃত্যু আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল অজ্ঞা, এবার শান্ত হয়ে খানিক চিন্তা করে তারপর বলে—"আচ্ছা গৃহে যাও ললিতা। আমি কুটিরে গিয়ে পিতার বিশ্রামাবকাশে সবকথা জানিয়ে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।" মনের রাগ মনে দমন করে স্বীয় আশ্রমকুটিরে ফিরে আসে অজ্ঞা।

কিন্তু বলি বলি করেও বলা হয় না কোনও কথা পিতার কাছে। নিজের পিতাকে সে চেনে, তাই জানে সারাদিনের জপ, তপ, ধ্যান, ধারণায় শুষ্ক, আতপ্ত হয়ে আছেন পিত এখন। এ সময় কোনও অন্যায় বা অত্যাচারের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র, অগ্নিসংযোগ হবে তাতে, ক্রুদ্ধ সে তেজবে সহ্য করা সম্ভব হবে না কোনও অনাচারীর পক্ষে। হয়ত লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাবে তাদের। তাই চিত্ত সংযত করে আপন গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করে সে। কিন্তু হরিণশিশু দু'টির কথা কিছুতে ভুলতে পারে না। মনের আকাশে ভেসে ওঠে ললিতার অশ্রুভরা দু'টি চোখ। সুখ আর দুখু হরিণছানা দু'টি আজ নৃশংস এক পাষণ্ডের কবলে, কে জানে এখনও জীবিত আছে কি না। মাতৃহারা দু'টি অসহায় মৃগশাবক সমিধ সংগ্রহ কালে বনমধ্যে একদিন কুড়িয়ে পায় দেবল, ললিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সেই থেকে ললিতা আর দেবল পালন করে আসছে তাদের। কত দিন অজ্ঞার কাছ থেকে দুধ চেয়ে নিয়ে গেছে দেবল—শিশু দু'টিকে খাওয়াবে বলে কৌতূহলী অজ্ঞা দুধ নিয়ে নিজেই গেছে দেবলের সঙ্গে। কিশোরী ললিতা সযতনে দুধের পাত্রটি শিশু দুটির মুখের সামনে ধরেছে। সুখ একটু সবল, তাই সাগ্রহে চুক্‌-চুক্‌ করে সে দুধ পান করেছে ; কিন্তু দুখু দুর্বলা, তাই তার নামকরণ করেছে দেবল সুখু আর দুখু।

দুখুর নিজের পান করার ক্ষমতা নেই দেখে ললিতা অতি স্নেহে সযতনে আপন অঙ্কে তুলে নিয়েছে তাকে। আর কার্পাসে পলিতা করে দুধে ভিজিয়ে ভিজিয়ে তার মুখে দিয়েছে আর গা হাত বুলিয়ে দিয়েছে তাদের পরম স্নেহে। এমনি করেই ব করে তুলেছে তাদের। আর অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকি দেখেছে অজ্ঞা, সুকুমারী এই কিশোরীর এমন স্নিগ্ধ-মাতৃ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। আর আপন মনেই ভেবেছে কো থেকে আসে এই অপত্যস্নেহ ! কি বোঝে এই বালিকা মাতৃস্নেহের অথবা প্রতি কন্যারই এটা জন্মগত সংস্কার, সুপ্ত থাকে অন্ত আর আধার পেলে এমনি ভাবেই ঝরে পড়ে সেই অপত্যস্নেহ।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অজ্ঞা আর আবেশে নিজেরও হৃদয় ভ ওঠে এক অপূর্ব্ব পুলকরসে। এক সময়ে সেও বসে পড়ে ললি পাশে আর হরিণশিশু দু'টিকে তুলে নেয় আপন অঙ্কে। স্নেহে সমাদরে তাদের গায়ে হাত বুলোতে থাকে।

হরিণশিশু দু'টিও পরম তৃপ্তিতে শুয়ে শুয়ে সে আদর উপ করে। এমনি ভাবে দু'টি হরিণশিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা তিনটি প্রাণীর খেলাঘরের সংসার। মনের আনন্দে ও সুখে ওঠে দিন দিন সুখু আর দুখু। দেবল কচি কিশলয় আহরণ এনে তাদের খাওয়ায়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় বন-উপবনে।
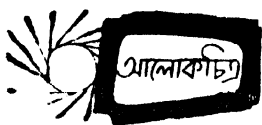
জলসিঞ্চন

—ভাস্কর চক্রবর্ত্তী
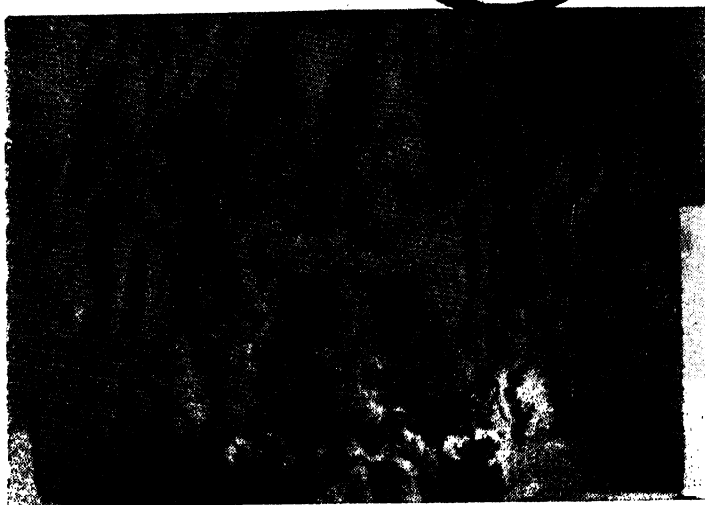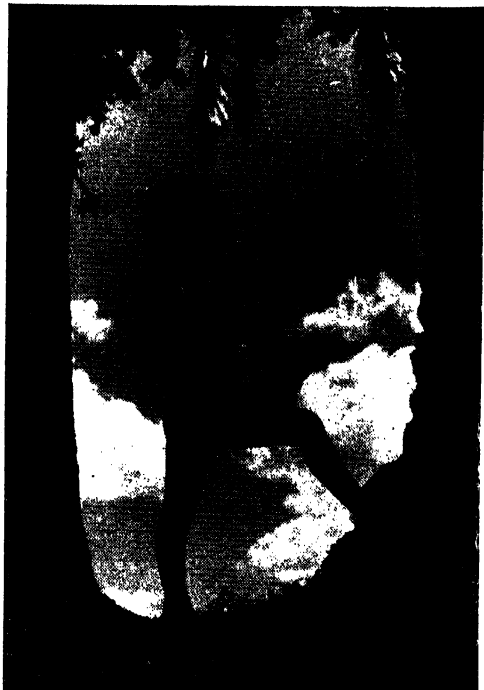
[illegible]প্রাসাদ (জয়পুর)

—যতীন্দ্রনাথ পাল

শিবদুর্গা (ইলোরা)

—সুখেন্দুকুমার মণ্ডল

স্মৃতির ব্যথা —মীরেন অধিকারী

বাঁশুরিয়া

—রামকিঙ্কর

ধাত্রীপান্নার ভবন

—বাদসা ঠাকুর

পাঠিকা —মহাদেব পাল

সাঁচিস্তুপ —সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
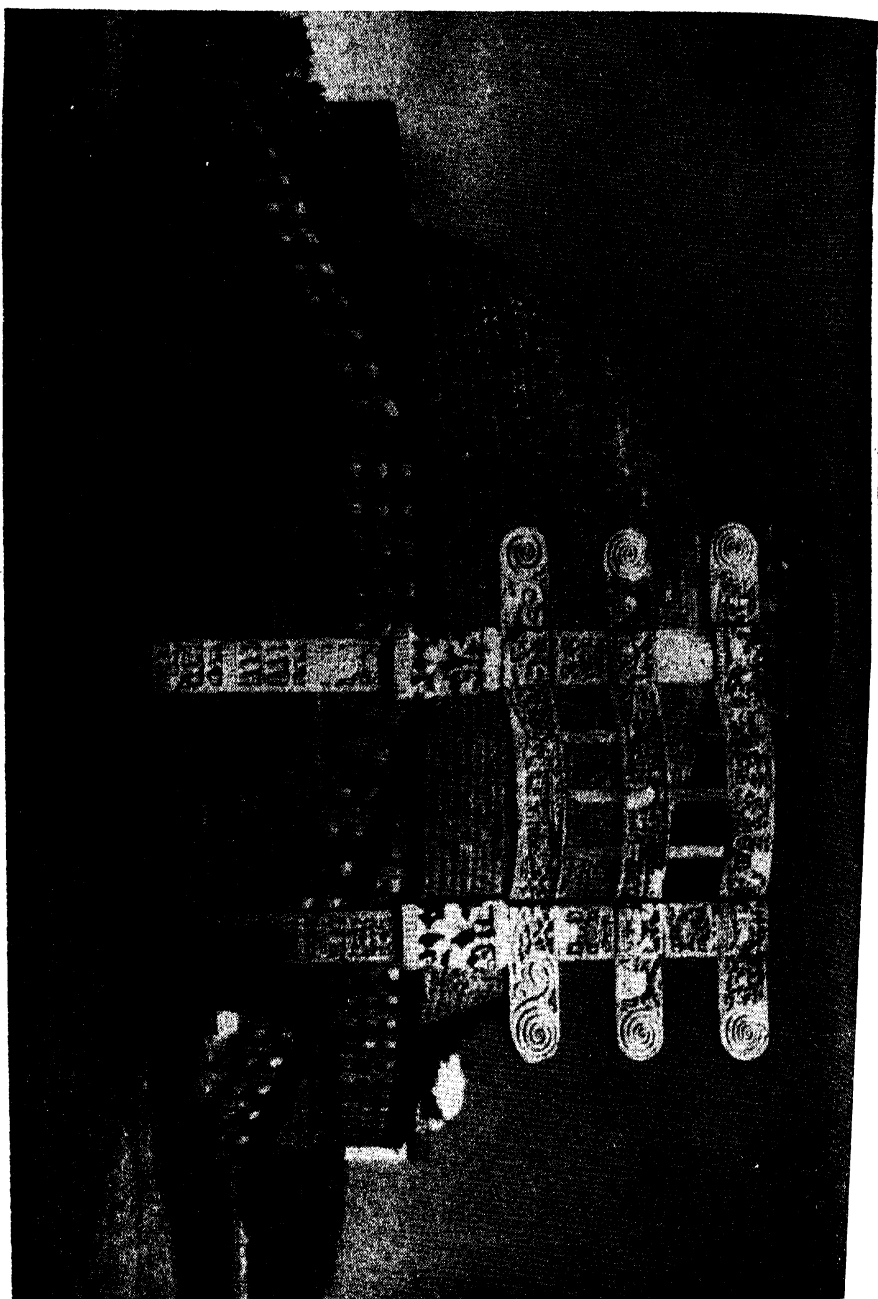
হারিয়ে যাবার ভয়ে অজা নিষেধ করে তাকে দূরে নিয়ে যেতে, ললিতা লজ্জার নালিশ জানায় মায়ের কাছে। ঋষিপত্নী হাসেন আর দেখেন মাতৃস্নেহের বীজ অঙ্কুরিত হতে সুরু করেছে নবযৌবনা মুনিতনয়াদের দেহ-মনে। কিশোরী ললিতা এখনও এ হাসির মর্ম হয়ত ভাল বোঝে না কিন্তু যুবতী অজা বোঝে সখী-মাতার এ হাসির অর্থ। তাই সরমে রাঙা হয়ে উঠে, আস্তে ব্যস্তে আপন অঙ্ক হতে নামিয়ে দেয় শুধু দুধকে। তারপর এ কথা সে কথা বলে এক সময়ে নিজ গৃহ পানে রওনা হয়, কিন্তু মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে সখীর মায়ের সেই নিগূঢ় হাসির ছবি। লজ্জিতও হয়ে ওঠে। কিন্তু আপন মনে নিরালা গৃহকোণে বসে স্বপ্ন দেখে একটি সুখময় আনন্দময় গৃহ সংসারের স্বামিসন্তান পরিবৃত শান্ত তৃপ্ত এক গৃহকোণ। নারীর চিরন্তন স্বপ্ন।

এমনি এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল অজা। সেদিন সরসীতটে দিনান্তের কর্ম্ম শেষে গিয়েছিল বৈকালিক স্নানের জন্ম তপোবন-প্রান্তে দীঘির ঘাটে। স্নানান্তে শীতল হয়ে বসেছিল এসে জলাশয়ের পাশে, কুমুদ কহ্লার ফুটে আলো করে ছিল সে জলাশয়। ভ্রমর অবিরাম গুঞ্জন করে ফিরছিল এ ফুল হতে সে ফুলে মধু পানের আশায়। চারি দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অজা, অস্ফুট স্বরে বলেছিল, বসন্ত এসেছে, বনে বনে অশোক-কিংশুকে তাই এত রং-এর মেলা। সূর্য্যাস্তের রক্তিম রেখা পড়ে অপরূপ হয়ে উঠেছিল সেদিন বনের শোভা। সেই অপরূপতার মাঝে মুগ্ধ আবেশে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল অজা, যাই যাই করেও গৃহে ফিরতে তখুনি মন সরছিল না তার। এমনি সময়ে পিছনে কার পদশব্দে সচকিতে ফিরে তাকায় অজা। আর তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়—অপরূপ এক যুবা পুরুষ। অঙ্গদে কুণ্ডলে সুশোভিত চাঁচর চিকুর বেষ্টিত, মদনবিজিত এক বীরমূর্ত্তি। মধ্যাহ্নের রবিকরে ক্লান্ত আরক্ত আনন, ধূলিপ্রলিপ্ত দেহ। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বোধ করি কলস্বনা এই স্রোতস্বিনী দেখে জল পানের আশায় নেমে এসেছেন তিনি। আর নিকটে এসে ভাববিহ্বলা এক তরুণীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক-বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন তাকে। অকারণেই রাঙা হয়ে ওঠে অজার মুখ। সঙ্কুচিত হয়ে পথ খোঁজে সে উঠে আসবার। আর তখনই সম্বিত ফিরে পান সেই তরুণ পুরুষ এবং জলপাত্র দেখে তার কাছে পানীয় আকাঙ্ক্ষা করেন। পাত্র পূর্ণ করার কথা এতক্ষণ খেয়াল ছিল না অজার। দ্রুত পদে গিয়ে জল নিয়ে এসে সেই অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢেলে দিয়েছে। অজা পিপাসার্ত্তকে জল দানে তৃপ্ত করে পুণ্য সঞ্চয় করেছে। তৃষ্ণা নিবারণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকেন এই আলুলায়িতকুন্তলা রূপসী কন্যার পানে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলেছেন, "কে তুমি অনুপমা—বনদেবী অথবা জলপরী কেউ ?"

অজা মাথা নেড়ে জানায়—'না।' কথা বলার শক্তি নেই অজার, সমস্ত শরীর তার থর-থর করে কেঁপে ওঠে সেই মুগ্ধ পুরুষের সুললিত কমনীয় কণ্ঠস্বর শুনে—এ কি শিহরণ বয়ে চলেছে তার সমস্ত দেহে? কঙ্কণিকাগুলি এমন উন্মত্তের মত নাচতে সুরু করেছে কেন? কি এক আবেশে অবশ হয়ে যায় অজার সমস্ত দেহ। মাটির জলপাত্র যেন লোহার মত ভারী লাগতে থাকে, বিব্রত বোধ করে অজা। পথিককে সচেতন করার উদ্দেশ্যে পিছন ফিরে জল নেওয়ার ছলে দীঘিতে নেমে আসে অজা, আস্তে আস্তে জলে ঢেউ দিয়ে দিয়ে জল ভরতে থাকে। কিন্তু একটি পাত্রে আর কতক্ষণ জল ভরা যায়? তাই নিজেকে সংযত করে কলসী কাঁখে নিয়ে উঠতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্লান্ত পথিক তখন চলাচলের পথের ওপরেই এলিয়ে দিয়েছে তার পরিশ্রান্ত দেহ—মস্তকের আবরণ পরিণত হয়েছে বীজন-পত্রে, স্বীয় ক্লান্তি দূর করার মানসে। নয়নভ্রমরা কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত। প্রলুব্ধ মধুকরের মত এক ক্ষুদ্র কমলিনীকে অনুসরণ করে চলেছে। এবার অজা কাছে এসে দাঁড়াতেই পুনরায় অঞ্জলিবদ্ধ করে মুখের কাছে ধরেন, সেই অপরিচিত পথিক মৃদু হেসে বলেন, "তৃষ্ণা মেটেনি, আরও জল খাব।" এবার জলপানে কিছু সুস্থ বোধ করেন তারপর অপার কৌতূহল নিয়ে অজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, "কে তুমি কুমারী? এই নিবিড় বনমধ্যে সত্যই মানবী কি? অথবা তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে জল দান করতে এসেছ কোনও দয়াময়ী জলকন্যা মূর্ত্তিতে?"

সরমে রাঙা হয়ে মৃদুকণ্ঠে অজা জানায় তার পরিচয়। নিবিড় বন এ নয়। বনপ্রান্তেই আছে এক তপোবন, সেই তপোবনেই আশ্রম তাদের। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তার পিতা। তপশ্চর্য্যা মানসে বাস করেন এ বনে। সঙ্গে আছে কনিষ্ঠা কন্যা; কুমারী অজা। পিতার সেবার মানসে ধীরে ধীরে আলাপে মগ্ন হয়ে যায় উভয়ে। অপরিচিত সেই পুরুষও জানান তার আপন পরিচয়—এই বনের অন্য প্রান্তে গড়ে উঠেছে এক নতুন নগর। সেইখানেই বসতি করেন তিনি। আজ মৃগয়ায় এসে দিক্‌ভ্রম হয়ে যায় তাঁর।
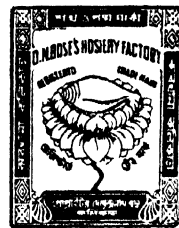
সঙ্গিসাথীদের খুঁজে না পেয়ে, অনেক ঘুরে তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে নেমে এসেছিলেন এই সরোবর-কূলে। আর মুগ্ধ নয়নে সেই রূপসীর পানে তাকিয়ে মনে মনে বলেন—"এমন অপরূপা এক সরসী-কমলের দর্শন পাব, এ ছিল আমার স্বপ্নেরও অগোচর!"

কিন্তু মুখই কি শুধু মনের ভাব প্রকাশ করে? নয়নের কি ভাষা নেই? আছে বই কি। নতুবা অজ্ঞা কেন অত সরমে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে? অচেনা পুরুষের বাঙ্ময় সেই দৃষ্টির ভাষায়! অকারণেই সে লাল হয়ে ওঠে বসন্তের অশোক-কিংশুকের মত।

দেখে দেখে আশা যেন মেটে না, সেই অরুণ সদৃশ তরুণ পুরুষের কত সময় পার হয়ে যায় এ ভাবে, কে তার হিসেব রাখে? দিনান্তের রক্তিমাভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বৃক্ষান্তরালে, গোধূলি লগ্ন পার হয়ে যায় সন্ধ্যাদেবীর আবির্ভাবে। একটি দু'টি করে তারা ফুটে ওঠে; দীঘির শীতল জলে আপন প্রতিবিম্ব দেখার আশায়। এমনি সময় দূরে ভেসে ওঠে জনকোলাহল। উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধানে ব্যস্ত মানুষের সাড়া পড়ে যায়। সচকিত হয়ে উঠে পড়েন সেই কুমার। অসীম আগ্রহে অজ্ঞার মৃণাল সদৃশ হাত দুটি আপন হস্তে তুলে নিয়ে অনুনয় জানান আবার দর্শন পাবার। তারপর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে যান।

আপন ভাবে বিভোর হয়ে বসে থাকে অজ্ঞা। এ এক নতুন অনুভূতি! তার কুমারী জীবনে এক নবচেতনার উন্মেষ হয়। কমলকলিকা যেন প্রস্ফুটিত হতে সুরু করেছে অরুণ সদৃশ এক তরুণের প্রেমকিরণে।

এমনি সময় ধ্যান ভাঙায় এসে ললিতা। সারা তপোবন খুঁজে এসেছে তাকে। তাঁদের প্রিয় লতাবাটিকায়, কুঞ্জকাননে। অবশেষে হতাশ হয়ে ভীত অন্তরেই এসেছে এই সরসীকূলে, এসে অবাক হয়ে গেছে সখীর এই তন্ময় রূপ দেখে। তার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে অজ্ঞা লজ্জিত হয়ে উঠেছে আর তখনই গৃহ সংসারের কথা তুলে ব্যস্ততার ভাণ করে আপন কুটিরে ফিরে এসেছে।

কিন্তু মন পড়ে থাকে তার সেই উপবন মধ্যে—সরসীর তীরে, আর প্রত্যহ দিবসের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে অপরাহ্নের সেই অবসর কালের জন্য—যেখানে নিভৃতে মিলিত হয় দুটি তরুণ-তরুণী উৎসুক-ব্যাকুল হৃদয়ে। ধীরে ধীরে গাঁথা হতে থাকে একটি অপূর্ব্ব প্রেমমালিকা দুটি তরুণ হৃদয়ের বাসনাকুসুমে প্রণয়রতনে গাঁথা এ মালিকা—যৌবনদেবতার শ্রেষ্ঠ উপহার তরুণী অজ্ঞা রূপান্তরিত হয় যুবতী প্রেমিকার সার্থক আনন্দে।

৩

"অজ্ঞ-মা!" সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয়েছে পিতার। ত্রস্তে উঠে পড়ে সাড়া দেয় অজ্ঞা। আপন চিত্ত সংযত করে পিতার আহার্য্যের ব্যবস্থা করে। সযতনে পাতা আসনের সামনে হস্ত মার্জনা করে। তারপর নিয়ে আসে আহার্য্যপাত্র। ফল, মূল, শর্করা, সামান্য দুগ্ধ দিনান্তের আহার। তৃপ্ত মনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন মুনিবর। তারপর পিতা ও দুহিতার আলাপ-আলোচনা চলে। সমস্ত দিনের নানান সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা শোনায় অজ্ঞা পিতাকে। পিতাও জানান বাহির-বিশ্বের অনেক কাহিনী কন্যাকে। শাস্ত্রকথাও শোনান কন্যাকে অবসর বিনোদন কালে। এমনি কথোপকথন কালে বলেন সেদিন অরণ্যের লোকসমাগমের কথা। শুনেছেন তপোবনের অন্যান্য আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। তপোবনের ধারে-কাছে রাজপুরুষদের আনাগোনা দেখে সন্দেহ হয়েছে হয়ত মৃগয়াছলে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে তাদের। মুনিবর চিন্তিত মনেই বলেন—"হয়ত একথা সত্য নয় নেহাৎই যৌবনের ক্রীড়া-কৌতুক এ-সব। কিন্তু তবু সকলের সাবধান হওয়া ভালো" তিনি সেই পরামর্শই দিয়েছেন সবাইকে। কন্যাকেও বলেন সাবধানে থাকতে। ফলাহরণে, পুষ্পচয়নে অথবা পানীয় আনয়নকালে সঙ্গিনীদের সঙ্গে যাওয়া ভালো। আরও বলেন, "এ অরণ্যের অন্য প্রান্তে যে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে নানা জনরব উঠেছে। কেউ বলে, অত্যাচারী আর উদ্ধত এক রাজপুত্র তার অনুচর নিয়ে লীলাক্ষেত্র করে তুলেছে সে অঞ্চলকে। আবার কারও মত যৌবনধর্ম্মের স্বাভাবিক চাপল্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও অনাচার দেখা যায় না এ কুমারের চাল-চলনে। নেহাৎ ভাগ্যদোষে সে নির্ব্বাসিত।" বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, ত্রিকালজ্ঞ এই মহাপুরুষ। ভাবেন—সূর্যবংশে হয়ত অভিশাপ আছে কোনও, তাই রাজ-সিংহাসনের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ তাদের যো[illegible] করি ললাট-লিপি।

তার পর এক সময়ে উঠে পড়েন পিতৃদেব। শিষ্য-প্রশিষ্যে[illegible] সমাগম হয়েছে বাহিঃপ্রাঙ্গণে; অধ্যয়ন অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হবে[illegible] তিনি। পিতা প্রস্থান করেন আর বলি বলি করেও সুখ-দুঃখ[illegible] কথা পিতাকে জানাতে ভরসা হয় না তার। তবে কি জানি, এ[illegible] অনাচারী রাজপুরুষদের সঙ্গে কোনও সংযোগ থাকে, তার পরিচি[illegible] সেই যুবাপুরুষের?—"আচ্ছা তিনিও ত মৃগয়ায় এসেই পথ হারি[illegible] ফেলেছিলেন" আপন মনেই ভাবে অজ্ঞা; "যেদিন প্রথম দে[illegible] হয়েছিল তার সঙ্গে। তাহলে তিনিও কি সেই অত্যাচা[illegible] রাজপুরুষদেরই কেউ?" সন্দেহে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে তার মন —"লীলা-মৃগয়ার ছলেই কি আসেন তিনি প্রতিদিন তার সমীপে[illegible] না না না, তা কখনোও সম্ভব নয়"—আপন মনেই শিউরে উ[illegible] মাথা নাড়ে অজ্ঞা "অমন মদনবিজিত রূপ অমন প্রশস্ত হৃদয় আ[illegible] সুমধুর কণ্ঠস্বর কোনও দুর্বিনীতের হতে পারে না। ইনি আলা[illegible] ইনি পিতার বর্ণিত সেই অনাচারীদের কেউ নন। বিনয়ী শান্ত[illegible] এই যুবক অতি ভদ্র অতি সুশীল। পিতা তার শাস্ত্রগুরু জা[illegible] জেনে সাগ্রহে শিষ্য হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন তিনি।" [illegible] ম্লান কণ্ঠে একদিন জানিয়েছিলেন—কৈশোরে সুযোগ হ[illegible] তাঁর কোনও বিদ্যাভ্যাসের বা শাস্ত্রপাঠের। নিজের অপ[illegible] স্বীকার করেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই কাটিয়েছেন, শাস্ত্রপাঠে যে[illegible] আকাঙ্খাও হয়ত ছিল না। তবে উপযুক্ত গুরুর সন্ধান য[illegible] পেয়েছেন, তখন তাঁর পদপ্রান্তে বসে শাস্ত্রশিক্ষা করবেন তি[illegible] অজ্ঞা সানন্দে সায় দিয়েছে তাঁর এ প্রস্তাবে। অজ্ঞা আবার [illegible] করে দেবলের সুখ-দুঃখের কথা পিতার কাছে না বলে কাল দেখা[illegible] তাঁরই কাছে মিনতি জানাবে সে, যদি উদ্ধার করে এনে দিতে পা[illegible] তিনি।

৪

পরদিন প্রাতে ঈষৎ ভারী মন নিয়ে গৃহকার্য্য করে চলেছিল অঞ্জা। সুথু-দুথুর কথা চিন্তা করে মন ভালো ছিল না, ইতিমধ্যে হঠাৎ বহিঃপ্রাঙ্গণে অতি পরিচিত একটি পুরুষ-কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ায় সে। এ কার কণ্ঠস্বর? সত্যিই কি তিনি এসেছেন? অঞ্জা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শোনে, হ্যাঁ তিনিই এসেছেন পিতার নিকট। ভক্তিভরে চরণ-বন্দনা করে অতি বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করেছেন আপন অভিলাষ। পিতাকে গুরুপদে বরণ করে শাস্ত্রশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ তাঁর! তাই শরণ নিয়েছেন তাঁর। পিতারও কণ্ঠস্বর শোনে অঞ্জা। নানাবিধ প্রশ্ন করে চলেছেন তিনি এবং প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সাগ্রহে অনুমতি দেন। কুমার দণ্ডককে শিষ্যরূপে পেতে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অঞ্জা, তারপর পুষ্পচয়ন উদ্দেশ্যে লতাকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হয়। পথেই দেখা হয় দেবল ও ললিতার সঙ্গে। সুথু-দুথুকে কোলে নিয়ে অঞ্জার কাছেই চলেছিল তারা। সানন্দে উল্লাসে জানায় তারা, সুথু-দুথুকে উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন এক মহানুভব ব্যক্তি।

দেবল আরও সংবাদ পরিবেশন করে। তিনিই গুরুদেবের কাছে শিক্ষাগ্রহণ মানসে তপোবনে এসেছেন।

ওঃ তিনিই! এবার চমকিত হয় অঞ্জা, তাহলে তিনিই রাজকুমার? উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন সুথু-দুথুকে? শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে অঞ্জার তরুণী-হৃদয়।

এর পর দেবল ও ললিতার সঙ্গেও ভাব হয়ে যায় কুমারের। সুথু-দুথুকে যিনি উদ্ধার করে এনে দিয়েছেন, তিনিও পরমবন্ধু তাদের। একসময় দেবল বড় বড় চোখ করে প্রশ্ন করে সে তরুণ পুরুষকে, নিশ্চয় খুব শক্তি আছে তাঁর? তাই অমন দুর্দান্ত দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এনেছেন তাদের।

হাঁ, মাথা নেড়ে স্বীকার করতে হয়, কুমারকে প্রায় যুদ্ধ করেই উদ্ধার করতে হয়েছে। তারপর ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে অঞ্জার পানে চেয়ে বলেন;—"অবশ্য আশ্রমমৃগ এবং দেবল ললিতার পালিত মৃগশিশু এ দুটি, সেটা তারা জানত না বলেই ধরে নিয়েছিল নতুবা—"

যাকগে যাকগে, অতি উদার চিত্তেই ক্ষমা করে দেবল সেই দুষ্কৃতকারীদের এবং সাগ্রহে সমাদরে পরমবন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা এই বীর যুবাকে।

তাদের খেলাঘরের একজন সঙ্গী বাড়ে। প্রত্যহ সমিধ সংগ্রহে বনমধ্যে ফল আহরণের কালে এবং ললিতা অঞ্জার পুষ্পচয়ন কার্য্যেও সহায়তা করেন তিনি। আবার গুরুর পদপ্রান্তে ব'সে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা চলতে থাকে নিয়মিত। আর সবার চোখের অন্তরালে দুটি তরুণ হৃদয়ে কন্দর্পের আবির্ভাব হয়। একজনের মৃদু চরণধ্বনি অন্যের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝিণিঝিণি সুর তুলে পুলক জাগায়, আবার সকল কর্মের মাঝেও উচ্চকিত হয়ে থাকে অঞ্জা। কুমারের গলার ধ্বনিময় সুমিষ্টস্বরে হৃদয় মধুর আবেগে ভরে ওঠে তার।

৫

সুখময় দিনগুলি যেন পাখীর ডানায় ভর করে চলে যায়। কিন্তু সুখ নেই ললিতামাতা সুদতী দেবীর প্রাণে। "হায় সরলা বালিকা কিসের মোহে আবিষ্টা হয়েছে জানে না।" অভিজ্ঞা রমণী তাই একই নাটকের পুনরভিনয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিতা হয়ে থাকেন, নিতান্ত শুভার্থিনী মমতাময়ী মুনিপত্নী এক সময়ে সাবধান করেন অজাকে। স্মরণ করিয়ে দেন বৃহস্পতিপুত্র কচের কথা। কে জানে ইনিও তেমনি ছলনায় মোহে ভুলিয়ে রাখতে চান কি না তাদের? হয়ত তেমনি করেই শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে এসেছে এই যুবক মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রশিক্ষার লোভে। আর অজার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দেবযানার মতই যদি একদিন পরিত্যাগ করে চলে যায় তাকে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পর? তাছাড়া পিতার কানে গেলেও ফল খুব শুভ হবে না। সব শুনে বেদনায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে সরলা তরুণী। ভাবে, কি হবে তাহলে তার? যদি কুমার তাকে গ্রহণ না করেন? দুশ্চিন্তায়, বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে অজা। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে ওঠে। তাই পালিয়ে বেড়ায় অজা নিজের কাছ থেকে, দণ্ডকের কাছ থেকে। সন্দেহের বিষ ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে তাকে।

এ-সবের কিছুই জানতে পারেন না কুমার। তাই অজার এমন আচরণে বিস্মিত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ব্যাকুল চিত্তে ভাবেন, কেন অজা এমন করে এড়িয়ে চলছে, তারপর একদিন আতুর হয়েই অজার অনুসন্ধানে এসে দাঁড়ান, লতাকুঞ্জের নিভৃতে ফুলবীথিকায় আপন মনেই ফুলমালা গেঁথে সাজি ভরিয়ে তুলছিল অজা অপরাহ্নবেলায়। অকস্মাৎ পদশব্দে সচকিতে তাকিয়েই দেখে, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন কুমার। বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে দেখেন কুমার—অতি বিষণ্ণ মলিন মুখ অজার। আপন অশান্তি ভুলে আকুল কণ্ঠে ডাকেন—"অজা!"

এ সেই কণ্ঠস্বর! যে মধুর ধ্বনিময় সুর প্রথম দিনে ভুলিয়ে নিয়েছিল অজার সকল সত্তা। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ে।

দু হাতে পথ রোধ করে বলেন—"কি হয়েছে অজা—কেন তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ আমার কাছ হতে এমন করে? আরও কাছে সরে আসেন তিনি—"কথা বলবে না?" হায়, কি করবে অজা এখন? তার সকল সংযম ভেসে যায় সেই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে। থর থর করে কেঁপে বসে পড়ে অজা। দু হাতে মুখ ঢেকে আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ে।

বিস্মিত হল কুমার। বসে পড়েন অজার পাশে, তারপর অতি স্নেহে সমাদরে শান্ত করতে থাকেন তাকে। ধীরে ধীরে আপন হাতের মধ্যে তুলে ধরেন অজার অশ্রুকাতর মুখ, আশ্বাসবাণীতে অভয় দিয়ে শোনেন সব কথা। আর আপন অন্তর দিয়ে অনুভব করেন কুমারী অজার অন্তর-ব্যথা। তার পর মৃদু হাস্যে অজার মুখের অতি নিকটে আপন মুখ রেখে গাঢ় স্বরে বলেন, "আমাকে তোমার সেই রকম হৃদয়হীন বলেই মনে হয় অজা?"

অজা লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বলে, না। কিছু শান্ত হয়েছে সে ততক্ষণে। কুমার এবার মনঃস্থির করে আপন কণ্ঠহার খুলে অজার গলায় পরিয়ে দেন।

অজা শিউরে উঠে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, "এ কি?"

ধীর মধুর কণ্ঠে বলেন কুমার, "অরণ্য সাক্ষী রেখে আজ ত[illegible] সন্ধ্যায় তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম অজা! আম[illegible] হৃদয়লক্ষ্মীরূপে বরণ করে নিলাম তোমায়।"

—"কুমার"! থর থর করে কেঁপে ওঠে অজার সুকুমার তনু সুখে ও হরষে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে।

—"না কুমার নয়, বলো, স্বামী" "আমাকে তোমার মালা দেবে [illegible] অজা?" প্রেমস্নিগ্ধ মধুর হাসিতে ভরে ওঠে কুমারের মুখ অজার সরমরঞ্জিত আননে তখন ফাগের খেলা চলেছে, অ[illegible] লজ্জিতা কম্পিতা দুটি মৃণাল বাহু এক সুগন্ধী বনকুসুমের মা[illegible] তুলে নেয় সাজি হতে। পরিয়ে দেয় তার প্রেমের দেবতাকে তারপর আবেগ-স্ফুরিত কণ্ঠে বলে, "স্বামী!"

"অজা! প্রিয়া! প্রিয়তমা! গভীর আবেগে সাগ্র[illegible] দণ্ডক বক্ষে ধারণ করেন অজাকে; অতি সমাদরে মস্তক চুম্ব[illegible] করেন তার। আর অজা? অজা বুঝি মরে যাবে এত সুখে তার কুমারীহৃদয়ের একান্ত কামনা বাসনা আজ সফল হয়েছে স্বামীর বক্ষলীনা অজা। ভাবে এত সুখ বুঝি স্বর্গেও নেই।

"অজা!" আপন বক্ষলীনা অজার ফুল্ল কমলের মত মুখখা[illegible] তুলে ধরেন কুমার। ডাকেন, "প্রিয়া!"

অজা স্বামীর দিকে একবার তাকিয়েই পলকে মুখ নামিয়ে নে[illegible] সপ্রেম নয়নে তাকিয়ে থাকেন কুমার সেই অপরূপ মুখখানির পানে তারপর অধীর আগ্রহে ও আবেগে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দে[illegible] অজার মুখ।

"আর ভয় নেই ত তোমার?" কানে কানে বলেন তিনি স্বামীর আদরে ব্যতিব্যস্ত অজা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে জানায় "না" মৃদু-মধুর কণ্ঠে স্বামী বলেন—"তোমার শুভার্থিনীকে বলো অন্ত মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের জন্যে আসিনি আমি এখানে। মর্ত্য জগতে এই পারিজাত কুসুমটির লোভেই আমার আগমন।" অজা সলা[illegible] স্বামীর বুকে মুখ লুকায়। স্বামী সস্নেহে বুকে চেপে ধরে কানে কা[illegible] অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—"অমৃতময় দেশের স্নেহহীন প্রেমহীন দেবত্ব অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীর সুখকেই আমি চাই অজা। কি হ[illegible] আমার সেই অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে যদি তোমাকেই বঞ্চনা করতে হয় অজার সাড়া নেই। সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে স্বামীর বক্ষে।

৬

আনন্দে আবেগে অতি মধুময় হয়ে ওঠে তাদের দিনগুলি দিনের পর রাত্রি আসে রাতের পর দিন। আর এক বৎসে[illegible] পালা শেষ হয়ে আসে শুভ পুণ্যাহ কাল, বৈশাখ মাস মার্তণ্ড [illegible] চলেন বীর বিক্রমে, তাঁর সপ্তরথের ধ্বজা উড়িয়ে যজন, যাজ[illegible] দান, ধ্যানে প্রবৃত্ত হল পুণ্যকামিগণ। এরই মধ্যে আম[illegible] আসে পাতালপুরী থেকে। দৈত্যরাজ দানযজ্ঞের আয়োজ[illegible] করেছেন। বিশাল সে আয়োজন! স্বর্গ মর্ত্য পাতালে [illegible] আয়োজনের সাড়া পড়ে যায়। উৎসুক আগ্রহে যোগদান কর[illegible] প্রস্তুত হয়েছেন নিমন্ত্রিতগণ। দৈত্যগুরু গেলেন সসম্ম[illegible] নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যান্য মুনি-ঋষি সমভিব্যাহারে। প্রিয় শি[illegible] দণ্ডকের উপর দিয়ে গেলেন আশ্রমের ভার।........

সুখে ও আনন্দে দিন কাটে দু'টি তরুণ-তরুণীর। বাধা-ভয় হীন উচ্ছল স্রোতে ভেসে চলে তারা। মনের আনন্দে স্বপ্ন রচনা করে ভবিষ্যৎ দিনের। দণ্ডক শোনাল তার কল্পনার কথা তরুণী প্রিয়ার কানে কানে; বলে—"গুরুদেব ফিরে এলে নিয়ে যাবো তোমাকে আমার আপন আলয়ে।" সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন তিনি। খবর দিয়েছেন তিনি অমাত্য-প্রধানদের।

—"কি খবর?" কুমারের কথা শেষ না হতেই উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে অজা।

—"সুখবর।"

প্রসন্ন হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে কুমার বলেন—"তাদের রাজ্যের রাণী আছেন এই বনের মধ্যে। উপযুক্ত সম্মানে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে?" গভীর স্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন "আর আমিও পাব তোমাকে প্রকাশ্য ভাবে আমার সকল কাজের মাঝে।"

—"কিন্তু পিতা? তিনি কি অনুমতি দেবেন?" অজার স্বরে উৎকণ্ঠা।

"ওঃ গুরুদেব! এবার কুমার কিছু চিন্তিত হন, বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে আসে তাঁর—এ চিন্তা তাঁরও হয়েছে ক'দিন থেকে।

স্বামীকে চিন্তিত দেখে শঙ্কিত হয় অজা। প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাসের পরে মনে হয়েছে অজার, পিতার কথা। কঠোর-তপস্বী বেদজ্ঞানী শাস্ত্রাচার্য্য তিনি। যদি স্বীকার না করেন তাদের এ গান্ধর্ব্ব মিলনকে? ভবিষ্যতের ভাবনায় শঙ্কিত হয় অজা, হায়, কেন তার আগে মনে হয়নি এ কথা? সরলা অজার এখন এ কথা স্মরণে এল না যে তখন হারাবার ভয়েই অধীর হয়ে ছিল সে। সময় ছিল না তার এত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার। আজ পূর্ণ সুখ উপভোগ করে স্থির হয়েছে তার মন। তাই ভবিষ্যৎ চিন্তায় অবকাশ হয়েছে। আর সেই চিন্তাতেই মনে সুখ নেই তার।

—"কুমার, কি হবে তাহলে?" স্বামীর হাত দু'টি ধরে বলে অজা।

কুমারের সম্বিত ফিরে আসে। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হেসে বলেন—"তাঁর পাদস্পর্শ করে ক্ষমা চেয়ে নেবো, ভয় কি?"

এ আশ্বাসের বাণীতে ভরসা পায় না অজা। পিতাকে সে চেনে, দৈত্যগুরু ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা হয়ে, ক্ষত্রিয়কুমারকে বরণ করেছে সে, এ অপরাধ ক্ষমা করবেন না পিতা। তাই সকল কাজের মাঝেও একটা অশান্তি পেয়ে বসে তাকে। স্বামীর আকুল আহ্বানেও তেমন সাড়া দিতে পারে না সে। কুমারের বাহুবন্ধনের মধ্যেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, শিউরে উঠে এক একদিন।

"কি হলো?" স্বামী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—"অমন চমকে উঠলে কেন?" পিতার জন্য আশঙ্কার কথা নিয়ত বলে মন খারাপ করতে চায় না স্বামীর। কিন্তু তার ভাবনার যেন শেষ নেই। এরই মধ্যে একদিন খবর এল যজ্ঞ শেষ হয়েছে পাতালরাজের। ত্রিপাদ ভূমি দান করে বিষ্ণুপদাশ্রিত হয়েছেন বলিরাজ। পিতা ফিরবেন এবার তাহলে। আর কোনও কথা গোপন থাকবে না।

গোপন রাখার উপায়ও নেই। সুদত্তা দেবী জানিয়েছেন তার মাতৃত্ব সম্ভাবনার কথা। শুনে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে সে। ললিতা, কেবল এ সংবাদে মহা খুশী হয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। এক শিশু সঙ্গী আসছে তাদের। সুখু এখন বড় হয়ে গেছে, কোলে থাকতে চায় না। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে। তাই এমন দিনে একটি শিশুর আগমনবার্ত্তা তাদের প্রাণে উল্লাসে ভরে দিয়েছে। কুমার দণ্ডক আদরে আদরে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছেন অজাকে। আশার আশ্বাসে বলেন, আর দেরী করব না আমি। এবার তোমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। গুরুদেব ফিরে এলেই সব কথা বলে অনুমতি নেব।

শুনে ঈষৎ ম্রিয়মান কণ্ঠে অজা বলে, কিন্তু পিতা? চেন নাকি তাঁকে?

—"চিনি বই কি' রাজকীয় গাম্ভীর্য্যের স্বর ফুটে ওঠে কুমারের কণ্ঠে। "যুক্তি দেখিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবো তাঁর কাছ থেকে।"

"যুক্তি? কি যুক্তি?" অন্ধকারে আলো খুঁজে বেড়ায় অজা।

"যুক্তি এই যে জ্যেষ্ঠা কন্যাও তাঁর ক্ষত্রিয় রাজ যযাতি-মহিষী আর তা ছাড়া তুমি আমার স্ত্রী। আমার ভাবী সন্তানের মাতা। সস্নেহ আদরে সান্ত্বনা দেন অজাকে।

অজাও আশ্বস্ত হয় স্বামীর সান্ত্বনা-বাক্যে। সুরু হয় তাদের জল্পনা কল্পনা ভাবী সন্তানকে ঘিরে। এমনি দিনে দৈত্যগুরুর আগমন-বার্ত্তা আসে। যজ্ঞ শেষে রওনা হয়েছেন তপোবন অভিমুখে। যুগপৎ আনন্দ ও আশঙ্কায় অজা অধীর হয়ে থাকে পিতার প্রত্যাগমন আশায়। এই সময় একদিন দণ্ডক এসে সানন্দে বলেন, "জানো অজা, পিতা ক্ষমা করেছেন আমাকে।"

—"পিতা ক্ষমা করেছেন?" বিস্ময় ও চাঞ্চল্যে উঠে দাঁড়ায় অজা।

—"পিতার সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হলো? কি বললেন তিনি?"

—"ওঃ না:"—এবার থতমত খেয়ে চুপ করে যান কুমার। তারপর হাসিমুখে বলেন, "না গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। আমি আমার পিতার কথাই বলছি। সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি ক্ষমা করেছেন তাঁর অধম সন্তানকে—বৃদ্ধ অসুস্থ তিনি, ফিরে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন।" "আবেগে ছল ছল করেন কুমার। আপন মনেই বলেন "কতদিন দেখিনি তাঁকে?" তারপর বলেন তার শৈশব কালের কত স্মৃতি কত আনন্দবেদনার কথা।

নিজে আজ পিতার আসনে বসে শৈশবের কাহিনীকে বিচার করে চলেন। উদ্ধত কৈশোরের তাড়নায় কত অন্যায় না জেনে করেছেন। শাসন করার কারণ করার তেমন কেউ ছিল না তাই একরোখা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভয় করত তাকে সবাই মান্যও করত হয়ত কিন্তু ভালোবাসত কি না কে জানে? না না ভালোবাসাও পেয়েছেন বই কি অনেকের। বিশেষ করে আচার্য্য বশিষ্ঠদেব অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাকে।

—"আর জানো অজা, তাঁরই আগ্রহে আমি পিতার ক্ষমা পেয়েছি, অন্যান্য সব বাধা বিপত্তিরও অবসান ঘটিয়েছেন তিনি।"

"তিনি নিজেই আসছেন আমাদের নিয়ে যেতে।"

"আমাদের?" অতি ম্রিয়মান কণ্ঠে প্রশ্ন করে অজা।

এ প্রশ্নে ঈষৎ চকিত হয়ে কুমার তাকান অজার দিকে, আপন আনন্দের আবেগে স্ত্রীর ভাবনার কথা মনে ছিল না তাঁর। তাই সচেতন হয়ে সাগ্রহে বলেন—"হ্যাঁ আমাদের বই কি। আমাদের

দুজনকেই নিতে আসছেন তিনি।" শুধু তাই নয় আরও এক ভাবনার কথা মনে হয়েছে তাঁর সেই পরামর্শই করেন তিনি অজার সঙ্গে।

গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করলে কুমার স্বয়ং গিয়ে নিয়ে আসবেন আচার্য্য বশিষ্ঠদেবকে। তাঁর অনুরোধে হয়ত ক্ষমা পাবেন তাঁরা এবং অযোধ্যাপতি খাণ্ডবাজের পুত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে হয়ত আপত্তি থাকবে না তাঁর। কত আশা কত পরামর্শ।

রাজকুমার নির্ব্বাসন-দণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। ফিরে চলেছেন পিতৃরাজ্যে। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হতে। দণ্ডক নগরীতে তাই উৎসবের আয়োজন পড়ে যায়। আলোয়মালায় পত্রে-পুষ্পে দিনে দিনে সুসজ্জিত হয়ে উঠতে থাকে নগরী। সে নগরের আনন্দ-কোলাহলের ঢেউ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শান্ত তপোবন-তটে এসে লাগে সেই ঢেউ। সুদন্তী দেবী আনন্দিতা হন মুনিকন্যার রাজরাণী হওয়ার সংবাদে। দেবল মহা আনন্দিত, তার পরম সুহৃদ আজ রাজা হতে চলেছেন। আর ললিতা তার সখীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর হলেও তার সুখে সুখীও বটে। তাই বিদায় দিনে তাকে কি ভাবে সাজিয়ে দেবে তারই জল্পনা কল্পনা চলে।

কিন্তু হায়, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'।

তাই দৈত্যগুরু তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যেই শোনেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব বারতা। তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। এ-ও কি সম্ভব? পথশ্রমে ক্লান্ত মুনিবর, মনের অবস্থাও খুব সুখকর নয়। বলিরাজ পরাজিত হয়েছেন দেবতার ছলনায়। পুনর্ব্বার এক পরাজয় ঘটল দেবতার কাছে দৈত্যের। মনে মনে সূক্ষ্ম অপমানবোধ নিয়ত পীড়া দিয়ে চলেছিল তাঁকে।

তারপর এ-কান সে-কান করে বিকৃতরূপে সংবাদ পান তিনি। দপ করে জ্বলে ওঠে তাঁর ক্ষুৎপিপাসাতুর অপমানিত মন! "কি এত বড় স্পর্দ্ধা!" শিষ্যের ছদ্মবেশে এসে নষ্ট করেছে তার আশ্রমের পবিত্রতা: এক অনাচারী যুবরাজ? সরলা কন্যার প্রতি অবৈধ আচরণ করে ধর্ম্মনাশ করেছে তাঁরই প্রিয়তমা কন্যার আর তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাঁর কাছ থেকে? ক্রোধে অধীর হয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন তিনি আশ্রম অভিমুখে। দেবতার সঙ্গে সামান্য মানুষও ছলনায় পরাজিত করতে চায় তাঁকে? অভিশাপের ভয় নেই প্রাণে? ক্রোধে ক্ষোভে অধীর উন্মত্তভাবে প্রবেশ করেন আশ্রম-প্রাঙ্গণে। আর প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন—পিতার আগমন প্রতীক্ষায় সামনেই উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে কন্যা। কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে যান তিনি। ওঃ তাহলে জনরব মিথ্যা নয়। তাঁর কুমারী কন্যা আজ সন্তানসম্ভবা। আর তারই পশ্চাতে দণ্ডায়মান সেই দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা! আগুন নিয়ে খেলা করার শাস্তি আজ পাবে। অবরুদ্ধ ক্রোধে ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে তাঁর দুনয়ন। এদিকে পিতাকে দেখে দণ্ডক ও অজা নতমস্তকে পিতার পদবন্দনার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু সরে যান কঠোর তপস্বী গ্রহণ করেন না প্রণাম। প্রজ্বলিত নয়নে অভিশাপ দেন আপন যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে ফেলে—"সবংশে-ধ্বংস হও, পাপিষ্ঠ! যে আগুনে আমার অন্তর পুড়িয়েছ সেই আগুনে ছারখারে যাবে তোমার সর্ব্বস্ব!"

—"না না না পিতা" আকুল আর্ত্তনাদে অজা পিতার দিকে ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণেই আর্ত্তকোলাহলে ভরে ওঠে দশদিক। "আগুন—আগুন লেগেছে কোথায়। আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে কন্যা পিতার পায়ের নিকটে।

—হায়, ব্রহ্মশাপের আগুনে দাবানল জ্বলে ওঠে সেই বিস্তৃত অরণ্যে। আর সে অগ্নি তার শত শত লেলিহান জিহ্বা মেলে ছুটে চলে এক আনন্দ নগরীর পানে। সে নগরের আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হতে দেরী হয় না। অকস্মাৎ অগ্নিবেষ্টিত হয়ে মুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয় আর্ত্তকোলাহলে। কে আছ! বাঁচাও বাঁচাও, জল জল এ কি হল! একি করে সম্ভব হল! দূর অরণ্যের দাবানল কি করে এতটা পথ অতিক্রম করে এখানে জ্বলে উঠল, কিছু বুঝবার আগেই ভস্মে পরিণত হয়ে গেল তিল তিল। করে গড়ে ওঠা এক জনপদ, ব্রহ্মশাপের রোষাগ্নিতে।

হায় ব্রহ্মশাপ! হায় অগ্র-পশ্চাৎ-বিবেচনাহীন ক্রোধ! কত আশা, কত ভরসা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আনন্দ। সবই নিমেষে পরিণত হয়ে গেল ভস্মস্তূপে।

তারপরেও কি বেঁচেছিল অজা? স্বামীর ভস্মীভূত দেহের পাশে পড়ে থাকা সে কন্যা বোধ হয় মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় পাষাণ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর, সেদিনের সেই জনপদ পরিণত হল ধীরে ধীরে বিজনবনে। কুমার দণ্ডকের কত আশার কত আকাঙ্খার নগরী রূপান্তরিত হল শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যে দণ্ডকারণ্য নাম নিয়ে।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে। মহাকালের রথ বহু যুগের পথ অতিক্রম করে গেছে। আকাশে বাতাসে বন মর্ম্মর ধ্বনিতে গেছে কত হাহাকার, সেদিনের সে কথা স্মরণ করে। প্রেমেন্দু মন্দিরে আজও শত শত নরনারী শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় বহুকাল আগের পুরাণের দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমকথা স্মরণ করে। সে শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে একবিন্দু নয়নজলও কি পড়েনা সেই অতৃপ্ত কামনা অভিশপ্ত দম্পতির উদ্দেশ্যে? হয়ত পড়ে, আর সেই অশ্রুজলেই হয়ত দ্রবীভূত হয়ে গেছে, শতাব্দীর অভিশাপ, কে জানে?

তারপর একদিন সেই ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে এই অরণ্য। তারই প্রস্তুতি চলেছে আজ। বহু বহু কাল পরে তাই বসতি করতে এসেছে আর একদল অভিশাপগ্রস্ত মানুষ; এ অরণ্যকে সেদিনের মতই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করার আকাঙ্খা বুকে নিয়ে। বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে, আবার বেঁচে উঠবেন দণ্ডক নতুন যুগের মানুষের আশার আকাঙ্খার মাঝে। আজকের অজার প্রাণে থাকবে না আতঙ্ক আশঙ্কা, থাকবে না অভিশাপের ভয়, শাপ-মুক্ত অহল্যার মত মুক্ত হয়েছে। আজকের দিনের মানুষেরা তাই সুখে আনন্দে ঘর বাঁধতে চলেছে নতুন উৎসাহে। অভিশাপের আশঙ্কা নয়, দেবতার আশীর্ব্বাদই বর্ষিত হোক তাদের ওপর। দৈত্যাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক আজকের নতুন মানুষেরা।

আধুনিক
গৃহিণীদের
মতে

খুব সহজে !

হাজার হাজার গৃহিণীরা আজ সার্ফ ব্যবহার করে জেনেছেন যে সার্ফের মতো এত ফরসা করে কাপড় আর কোন কিছুতেই কাচা যায় না।

সার্ফের কাপড় কাচার শক্তি অতুলনীয়। কাপড়ের ভেতরের সব ময়লা, এমনকি লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে—তাই সার্ফে কাপড় সবচেয়ে ফরসা হয়।

আধুনিক এই কাপড় কাচার পাউডারটিতে কাচারও কোন ঝামেলা নেই। তাই সার্ফই আজকের দিনে কাপড় কাচার সবচেয়ে সহজ উপায়।

ধুতি, শাড়ি, ব্লাউজ-জামা, ফ্রক, সার্ট, তোয়ালে, ঝাড়ন, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, এক কথায় আপনি বাড়ীর সব কাপড় চোপড়ই সার্ফে কাচুন—দেখবেন রঙীন কাপড় ঝলমলে আর সাদা কাপড় ধবধবে ফরসা করে তুলতে সার্ফের জুড়ী নেই।

সার্ফ দিয়ে বাড়ীতে কাচুন, কাপড় **সবচেয়ে ফরসা** হবে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

SU. 11A-X52 BO

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার মানিক ব্যানার্জি (স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুমুসলমান-দাঙ্গার শান্তিপ্রচারের সময় পার্কসার্কাসে শচীন মিত্র সহ নিহত) আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে আসতো—সে তখন এম, এ পড়তো (৩০ সাল)। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, এবং তার নীতি-কর্মসূচী প্রভৃতির তুলনা করে' আমি আলোচনা করতুম, মানিক ছিল আমার উৎসাহী সমর্থক। তখন আমাদের দেশে রুশ-বিরোধী অপপ্রচার চলে প্রচুর—রুশিয়ার বইপত্র আসে না—পাশ্চাত্য লেখকদের কিছু কিছু বই আসে, যার মধ্যে প্রচলিত অপপ্রচারের বিরোধী কিছু কিছু কথা পাওয়া যেত—যেমন ওয়েব-দম্পতির বই, মরিসহিণ্ডাসের বই, জেলদা কোটসের লেখা প্রভৃতি। তা থেকে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কথা উদ্ধৃত করে' মাঝে মাঝে "মডার্ণ রিভিউ" কিছু লিখতো। আমরা সেই সব লেখা প্রাণপণে খুঁজে পড়তুম—আমি এবং মানিক।

একদিন সে লণ্ডনের "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার এক স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট এনে হাজির—বললে যা কাগজ এসেছিল, সব সাবাড় হয়ে গেছে—আমি শেষ মুহূর্তে এক কপি পেয়ে গেছি। সেটাতে রুশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরের অদ্ভুত সাফল্যের রিপোর্ট বেরিয়েছিল। ধনবাদী দুনিয়ার অর্থনীতিবিদ পণ্ডিতেরা যে পরিকল্পনাকে অসম্ভব কল্পনা বলে বিদ্রূপ করেছিলেন, তাঁরা একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন। সাফল্যের আংশিক স্বীকৃতির সঙ্গে তাঁরা নতুন ধরণের অপপ্রচার শুরু করেছেন, ষ্টেলিন কেমন করে রুশ জনগণকে আধপেটা খাইয়ে চাবকে খাটাচ্ছে! ধনবাদী দুনিয়ায় তখন অবশ্য ২৯-৩৪ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছে।

যাই হোক, করাচী কংগ্রেসের আগে অমরদা (চ্যাটার্জি) জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তিনি কংগ্রেসে যাবেন—আমার মনটা ছটফট করতে লাগলো এই বিশিষ্ট কংগ্রেস দেখার জন্যে—তাঁকে বললুম। তাঁর মায়া হল, তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। তিনি যে আমাকে স্নেহ করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসে গেলুম, ডেলিগেট হয়ে নয়, দর্শক হয়ে। সেই প্রথম সরোজিনী নাইডুর এক বক্তৃতা শুনলুম, তেমন বক্তৃতা আর কখনো শুনিনি এবং শুনবোও না। চমৎকার আলঙ্কারিক ইংরাজী ভাষায় প্রায় দু'ঘণ্টা ঝড়ের মতন আবেগময়ী বক্তৃতা—যেন প্যাণ্ডেলযুক্ত সকল লোককে মাতিয়ে তুললো! শুধু কথা, আর কথা এত কথা কোথা থেকে কেমন করে জোগায়, ভাবলে অবাক হতে হয়।

সরোজিনী নাইডু একবার কংগ্রেস কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত হয়েছিলেন ভারতীয়দের অবস্থা পরিদর্শন এবং কংগ্রেসী প্রচারের জন্যে। তখনকার একটা কথা মনে আছে। জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং কথা-কাটাকাটি চলছে। স্মাটস বলেছেন, I am a strong man, সরোজিনী নাইডু তেড়ে ফুড়ে জবাব দিচ্ছেন, I am also a strong woman!

বেপরোয়া মেয়ে! পরবর্তীকালে তার আর এক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। একবার তিনি কলকাতায় এসেছেন—ঠিক মনে নেই—হয়ত ৩৮সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ-আই-সিসির মিটিংয়ের সময়েই হবে। কে একজন তাঁর সামনে কথাবার্তার মধ্যে জিন্নার নাম করে বলেছিলেন agent of British Imperialism, সরোজিনী নাইডু ক্ষেপে গিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চড় উঁচিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—Say once more—অর্থাৎ আর একবার বললে চড়িয়ে গাল ভেঙে দেবে। সবাই 'থ' হয়ে গিয়েছিল।

এ-আই-সি সির যে সভায় প্রেসিডেণ্ট ছিলেন যিনি,—এবং সে সভায়ও তিনি এমন এক বেপরোয়া কাজ করেছিলেন,—যা না করলে ভারতের পরবর্তী ইতিহাস হয়ত অন্য পথে চলতো। সে সভায় কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতির পদত্যাগ পত্রের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল বলে সুভাষবাবু সভায় প্রেসিডেণ্ট হননি। সেই সভাতেই প্রেসিডেণ্টের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেস সভাপতিরূপে নির্বাচিত করা হয়। সরোজিনী নাইডু বলেছিলেন, Even at the risk of being a bit unconstitutional, আমি এই নির্বাচনের অনুমতি দিলুম, কারণ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদ এক দিনও খালি থাকা উচিত নয়!

কেউ কম যান না! ব্যাপারটা শুধু অবৈধ নয়,—সৌজন্য-হীনতার একটা দৃষ্টান্ত। কারণ এ অবস্থায় প্রেসিডেণ্টকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে ফেরৎ পাঠানোই

রেওয়াজ। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সুভাষবাবুকে বর্জন করার এই first chance পেয়েই চোখ-কান বুজে কাজ হাসিল করে নিলেন! বড়লোকের অভিমানী ছোট ছেলের মতন সুভাষবাবুর এই পদত্যাগপত্র দেওয়ার ফলেই কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, '৩১ সালের করাচীর যে চেহারাটা আজও মনে আছে, সে হচ্ছে প্রশস্ত ও পরিষ্কার সড়ক। মনে হয়েছিল, করাচী সহরের ছোট রাস্তাগুলোই কলকাতার সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মতন চওড়া,—আর প্রধান সড়কটা সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের দ্বিগুণেরও বেশী চওড়া। পথ ঘাট চমৎকার পরিষ্কার। বড় বড় রেষ্টুরেণ্টের সামনে রাস্তার ধারের ফুটপাতের মতন জায়গায় Upholsterd sofa settee ও টেবিল দিয়ে সাজানো, দলে দলে লোক সেখানে বসেই চা প্রভৃতি খায়—বেশ অদ্ভুত লাগে।

ফেরার পথে সুক্কুর বাঁধ দেখলুম—সুবিস্তীর্ণ সিন্ধু নদের শুষ্ক গর্ভের ওপর বিরাট নির্মান কার্য চলছে। একজন বাঙ্গালী ওভারসিয়ারের অতিথি হলুম। ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা অদ্ভুত দে-আঁশলা হয়ে গেছে। খচ্চরের পিঠে বস্তা চাপিয়ে সারি দিয়ে মালবহন চলছে সিন্ধুগর্ভের ভিতর দিয়ে। ভদ্রলোক বললেন, চালু পথের বাইরে অনেক জায়গায় চোরাবালি আছে, সেখানে গিয়ে পড়লে মারা যেতে হয়,—একবার "দো গাধাহা মাটীর ভিৎরে ধসে গেল,"—বাঁচবার উপায় নেই।

তিনিই আমাদের গাইড হয়ে নিয়ে গেলেন মহেঞ্জোদাড়ো দেখতে—কাছেই। কাগজের লেখা পড়ে যা মনে আশা করে রেখেছিলুম, সেরকম কিছু নয়। তবে উপরের ভূপৃষ্ঠের বেশ খানিক নীচে একটা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গলিপথ, দেওয়াল, থাম, কুঠুরী,—যেন কাঁচা ইটের গাঁথনী,—একটা অভিনব ব্যাপার বটে। তখনও খনন কার্যের অনেক বাকি,—প্রথম দফার আবিষ্কার নিয়েই কাগজে প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। খনন কার্য স্থগিত আছে সময় সংক্ষেপ করার জন্ম আমাদের অবশ্য সবটা দেখা হয়নি।

তারপর গেলুম "সাধ-বেলা" দেখতে সিন্ধুর-বিস্তীর্ণ গর্ভের মধ্যে স্বল্প-পরিসর জলধারার পাশে এক ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষকুঞ্জ শোভিত দ্বীপের-মতন—ছোট দ্বীপ, কিন্তু বেশ উঁচু। তখন বোধহয় চৈত্রমাস। বর্ষার যখন সিন্ধুর বিশাল ও প্রবল জল স্রোত এক সমুদ্রের আকার ধারণ করে, তখনও "সাধবেলা" তার মধ্যে মাথা উঁচু করে-দাঁড়িয়ে থাকে। শিখ সাধুদের আশ্রম—এক মোহন্ত মহারাজ কিছু লোক-লস্কর নিয়ে সেখানে বাস করেন, আর মাঝে মাঝে ২।১ জন উট্‌কো শিখ সাধু সেখানে অতিথি হন। অমরদা পলাতক অবস্থায় কিছুদিন জটাজুটধারী শিখ সাধুবেশ ধারণ করে ভারত পরিক্রমা করেছিলেন, এবং সেই অবস্থায় কিছুদিন সেখানে ছিলেন। বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ তাঁকে ভালবেসে সেখানেই থেকে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু অমরদা হঠাৎ একদিন সরে পড়েছিলেন, এবং কিছুদিন পরে পুলিশও সেখানে গিয়েছিল তাঁর সন্ধানে।

আমরা যখন গিয়েছিলুম, তখন বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ মারা গেছেন, তাঁর শিষ্য গদী পেয়েছেন। আশ্রমের বিরাট দেবোত্তর

সম্পত্তি এবং নগদ আয় আছে,—শিখ রাজারা এবং বড়লোকেরা ভক্ত। মহারাজ অমরদার বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশ দেখে আগে চিনতে পারেননি। পরে একা একা কিছু কথাবার্তার পর পরিচয় দিতে তিনি চিনতে পারলেন, এবং একঠোঙ্গা পেস্তা কিসমিস প্রসাদ দিলেন। অমরদাও কিছু নগদ প্রণামী দিয়েছিলেন।

তারপর যাওয়া হল লাহোরে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে। সেখানে ট্রিবিউনের সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক বৃদ্ধ কালীনাথ রায় এসে অমরদার সঙ্গে দেখা করলেন এবং অমরদা তাঁর কাছে আমাকে পরিচিত করে দিলেন—ভবিষ্যতে পরিচয়টা কোন কাজে লাগতে পারে। তারপর সেখান থেকে, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসা হল।

তখন আমার মনটা নেচেছে,—কোন প্রকারে রুশিয়ায় যাওয়া যায় কিনা। করাচীতে সেই চেষ্টার কাজ শুরু হয়েছিল। পেশোয়ারের কংগ্রেস নেতা ডাক্তার চারু ঘোষ অমরদার সঙ্গে দেখা করতে এলে অমরদা আমার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি আমার রাশিয়ায় যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন কিনা—পেশোয়ারী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে—যারা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করে। চারুবাবু বললেন, পুস্তু ভাষায় ভাল কথাবার্তা বলার মতন শিক্ষা থাকলে তিনি চেষ্টা করতে পারেন। তারপর তিনি কলকাতার বড় বাজারের পেশোয়ারী কংগ্রেসনেতা মোল্লা জানমহম্মদকে ডাকিয়ে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা হল, কলকাতায় ফেরার পর আমি মোল্লা জানমহম্মদের কাছে পুস্তু ভাষা শিখবো, এবং তারপর পেশোয়ারে চারুবাবুর কাছে যাবো। ব্যবস্থা হয়েছিল ভালই, কিন্তু ব্যাপারটা বেশীদূর এগোতে পারেনি। কেন—তা পরে বোঝা যাবে। ঐ সব ব্যবস্থার পর চিন্তাধারা একটু নতুন পথ ধরেছিল। একখানা ঘরের প্রয়োজন বোধ করছিলুম,—যেখানে আমার গোপন আস্তানা হবে, বইপত্র থাকবে, লেখাপড়া করবো। প্রকাশ্য আস্তানা অবশ্য আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেই থাকবে। মাড়োয়ারী বন্ধুকে বললুম। সে বললে, ভবানী দত্ত লেনে বসন্তলাল মুরারকাদের বাড়ীর নীচে একটা ছোট "বাইরের ঘর" আছে। সেটা প্রায় খালিই থাকে, সেটা হয়ত ওরা ভাড়া দিতে পারে। আমি ফোনে জিজ্ঞাসা করে বলবো।

বসন্তবাবু অমরদাকে খাতির করেন, জানতুম। আমি অমরদাকে বললুম। তিনি বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে বসন্তবাবু বললেন, হাঁ, ঘরটা দেওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এক মাড়োয়ারী ছোকরা এক বাঙ্গালী বাবুর জন্তে ঘরটা চেয়েছে, আর ঐ ছোকরার একটা দল আছে, তাদের "বোম্ব-ওয়ারিকা খেয়াল" আছে। তাই আমি "না" বলে দিয়েছি।

অমরদা বললেন, সে সব ভয় কিছু নেই—আমার জানা লোক। তখন বসন্তবাবু রাজী হলেন,—ঘরটা পেলুম। মাড়োয়ারী বন্ধুকে কাণ্ডটা বললুম। সে কখনো সে ঘরে আসার চেষ্টা করেনি। বস্তুত—আমি ছ'মাসের ওপর সে ঘরে ছিলুম,—কেউ জানতেই পারেনি—কাউকেই বলিনি বা আসতে দিইনি। শুধু অমরদাই মাঝে মাঝে আসতেন,—আর জানতেন শুধু আত্মশক্তির মোটাদা আর মানিক। মানিককে বলে রেখেছিলুম, আমি যদি জেলে যাই, তাহলে সে যেন আমার সংগৃহীত বইয়ের গাদা থেকে ভাল বইগুলো বেছে নিয়ে নিজের হেপাজতে রাখে, যাতে ফিরে এসে পাই। ভাল বই আবার অনেক জোগাড় করেছিলুম, তার মধ্যে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তের মিলিটারী ও অন্যান্য অভিযান সংক্রান্ত বই এবং ম্যাপও অনেকগুলো ছিল।

সেখানে বসেই "শ্রীভাঁওতা" সম্পূর্ণ করি। আর রজনীকান্ত দাসের বইগুলো এবং "মডার্ণ রিভিউ" থেকে পণ্ডিত শঙ্কাসুন্দরমের প্রবন্ধগুলো নিয়ে একখানা বড় বই লিখতে সুরু করি "ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন।" দেশে ও বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথায় ঠাসা বই। ১৯২০ সাল পর্যন্ত লিখে বেশ বড়সড় প্রথম খণ্ড শেষ করে,—তার পরের অবস্থায় নতুন ফ্যাক্টরী লেজিসলেশন, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি লেখা হয়েছিল।

তারপর অমরদারই অর্থানুকূল্যে আত্মশক্তি লাইব্রেরী থেকে নিজের নামেই "শ্রীভাঁওতা" প্রকাশ করলুম। ভয় ছিল, বইটা বাজেয়াপ্ত হবে, কিন্তু হল না। কিন্তু বাঙ্গলার রাজনৈতিক সাহিত্য-জগতে একটা রীতিমত সোরগোল উঠেছিল। এখানে বলা দরকার, "ভাঁওতা" কথাটার সাহিত্যে প্রচলনের গৌরব বা অগৌরব আমারই। আমার "শ্রীভাঁওতা" প্রকাশের আগে কথাটা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পায়নি, কারণ ওটা নেহাৎ পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া একটা slang শব্দ। আজ শব্দটা রাজনৈতিক সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে।

Advance কাগজে বিজন সেনের লেখা এক কলম রিভিউ বেরিয়েছিল—তাতে বলা হয়েছিল,—(Advance 9. 8. 31)

"The author is well known as a writer of political articles....The main burden of his thesis is that, political India has now fallen a victim to some false theories....and blurred the vision of the people, moreover, a set of men, some selfish and some misguided, installed themselves on their shoulders, and are leading, or more appropriately misleading, them from one futility to another...

"The charges are downright, and in setting them forth the author has shown so much analytic skill, courage of conviction, and wealth of language, that even those who will honestly differ, will not be able to withhold word of admiration for them....

"The infusion of so much heat into the discussions is, we believe, partly due to his great sincerity of convictions and partly to the consciousness of the fact that a desperate disease calls for a desperate remedy, We welcome the book as an extremely thought-provoking political production."

"অমৃতবাজার পত্রিকা"তে রিভিউ বেরিয়েছিল ভাল, কিন্তু ছোট আর প্রবর্তক এক লম্বা রিভিউ করে শুধু আফশোষ করেছিল, এমন সর্বনেশে আইডিয়া দেশে কোথা থেকে এল? ইত্যাদি—

ব্যক্তিগত অভিনন্দনও বেশ কিছু পেলুম। উপেনদার সবচেয়ে বড় appreciation "ভাঁদোড়"—তিনি আপ্যায়িত করতেন "ভাঁদোড়" বলেই। তাঁর যে আমার ওপর স্নেহটা প্রায় ভক্তির পর্যায়ে উঠেছিল, তার বহু প্রমাণ পরবর্তী কালে পাওয়া গেছে। যথাসময়ে সে কথা আসবে।

উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেবের কাকা বৃদ্ধ সর্বজনমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি—তিনি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে আলাপ করে পিঠ চাপড়ে আশীর্বাদ করলেন। আবদুল মোমিন congratulate করলেন। টালায় তখন কমরেড বাদল গাঙ্গুলী (বর্তমানে স্বতন্ত্র পার্টির অন্যতম সংগঠক) এক সাম্যরাজ পার্টি গঠন করেছেন—তিনি সেই থেকে হলেন আমার একজন বন্ধু ও admirer, একদিন হ্যারিসন রোডে বেনেটোলার কাছে অতুল সেনের (নোয়াখালীর অসহযোগী উকীল ও বিখ্যাত অ্যামেচার হাস্য-কৌতুকশিল্পী) সঙ্গে দেখা। তিনি রাস্তার মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার চাপদাড়ি শোভিত দুই গালে দুই চুমু খেয়ে, ঝাঁকানি দিয়ে একাকার। গান্ধী-কংগ্রেস-বিরোধী আবহাওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ এই "শ্রীভাঁওতার" appreciation, হুড়মুড় করে' অনেক বই বিক্রী হয়ে গেল।

এর পর সেনগুপ্ত এবং অমরদা বেরুলেন পূর্ববঙ্গ সফরে। সঙ্গে চললেন ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী, শচীন মিত্র, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জী—আমি সঙ্গ নিলুম কিছু "নিরেনব্বুই বনাম এক" এবং কিছু "শ্রীভাঁওতা" সঙ্গে নিয়ে। সিলেট, শিলচর, করিমগঞ্জ, কুমিল্লা এবং খুলনা ও বাগেরহাটে কিছু বই ছড়িয়ে এলুম।

শ্রীহট্টে জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অতিথি। কুমিল্লায় হরদয়াল নাগের বাড়ীতে একদিন থেকে, এক মিটিং করে অখিল দত্তের বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ খেয়ে (অমরদা ও আমি) শ্রীহট্টে এসেছিলুম। সেখানে সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। অমরদা ও আমি একদিন বেশী থেকে গেলুম। এক মিটিংও হল। ২২ সালের বিক্রমপুরের বানরী বিদ্যাশ্রমের অন্যতম সংগঠক তখন শ্রীহট্টে এক বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের পুরাতন সহকর্মী—দেখা হল এবং আলাপ-আপ্যায়ন হল। পলাতক বিনয়ভূষণ দত্তগুপ্ত, আমাদের বীণা, তখন সেখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সে গোপনে এসে দেখা করে' গেল।

জমিদারের অতিথি—দুপুরে খেতে বসেছি তিনজন একসঙ্গে—মাঝে অমরদা, এক পাশে ব্রজেন্দ্র বাবু, এক পাশে আমি। কাঁসার থালার চারিদিকে গোটা কুড়ি বাটি সাজানো—নানা রকমের কাণ্ড, ষোড়শোপচার কোথায় লাগে।

কথাবার্তা চলছে রাজনীতি নিয়ে—ব্রজেন্দ্র বাবু ইউনিভারস্যাল ফ্রাঞ্চাইমেন্টের কথা তুলেছেন। মনে রাখা দরকার, সেটা '৩১ সাল, ১৯ সালের শাসনবিধিতে প্রদেশে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল শতকরা মাত্র ১৩ জনের। সুতরাং অনেকেরই মাথায় তখন সার্বজনীন ভোটের অধিকারটা ছিল একটা সুখস্বপ্নের মতন। আমার মাথায় তখন কমিউনিজম গিজগিজ করছে, আর মুখটাও হয়ে গেছে বেশ খানিক ঢিলে। আমি সটান বলে বসে'ছি,—ওটাতো বড় লোকদের চৌচুরী মশায়।

বলেই অপ্রতিভ হয়ে গেছি—ষোড়শোপচারে অতিথি সেবার পর যে জমিদার গৃহস্বামীর কথার এই জবাব! কিন্তু সামলে নেওয়ার জন্যে তেড়ে ফুঁড়ে বলে চললুম, ক্যাপিট্যালিষ্ট রাজ্যে জনগণের সার্বজনীন ভোটের মোট ফল, ইলেকশনের সময় কোন বড়লোক কত ছলে বলে কত ভোট সংগ্রহ করতে পারে, তারই কম্পিটিশন। ব্রজেন্দ্র বাবুও আমার বাণী শুনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন, তিনি আমতা আমতা করে বললেন, তা বটে, তা যা বলেছেন, ঠিকই।

যাই হোক, সেখান থেকে গেলুম শিলচরে, এবং অতিথি হলুম সতীন্দ্র দেবের (কংগ্রেস নেতা)। তারপর করিমগঞ্জে শ্রীশ দত্তের বাড়ী হয়ে, আখাউরা থেকে চাঁদপুরে রেলে এসে ষ্টিমারে এলুম একেবারে খুলনায় এবং কংগ্রেস নেতা উকীল নগেন সেনের অতিথি হলুম। আবার দমদম জেলের যে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কথা আগে বলেছি, তিনি ইতিমধ্যেই রিটায়ার করেছেন এবং খুলনাতেই তাঁর স্বগৃহে এসে বসেছেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে অমরদা আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। এক এক কপি বই তাঁকে উপহার দিলুম। বই দিচ্ছিলুম গান্ধীভক্তদের বাদ দিয়ে। বাগেরহাটে গিয়েও কয়েক ঘণ্টা থেকে এক কর্মীদলের আড্ডায় বই দিয়ে এসেছিলুম। পরে তাদেরই একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বহরমপুর বন্দিশালায়, '৩৪ সালে।

সফরের দলটার মধ্যে সেনগুপ্ত, শচীন মিত্র এবং কৃষ্ণ চ্যাটার্জী গান্ধী কংগ্রেসপন্থী—অমরদা কংগ্রেস লীডার বটে, কিন্তু বিপ্লবী চরিত্রও তাঁর অটুট ছিল, আর রুশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রতিও তাঁর দরদী মনোভাব ছিল। ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী কথাবার্তা এবং বক্তৃতায় সোসিয়্যালিজ-কমিউনিজম বলতেন। আর আমি নিজেকে কমিউনিষ্ট মনে করতে সুরু করেছি। একদিন কানাই গাঙ্গুলীকে যাচাই করার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম,—আপনি যে ভাবায়
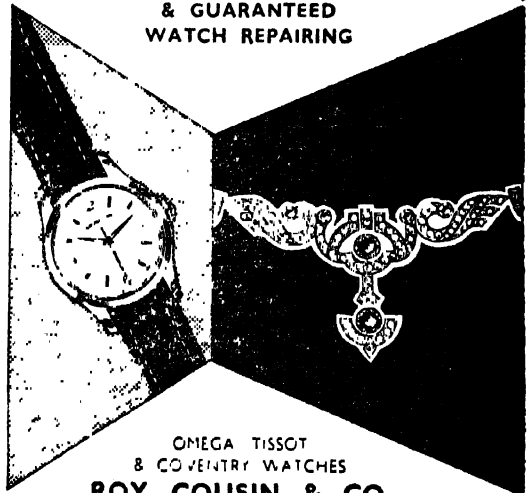
সোসিয়ালিজম-কমিউনিজমের কথা বলেন, সেগুলো বেশ স্পষ্ট নয়—বলশেভিকদের প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশন, ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রোলেটারিয়েট মানেন ?—বুর্জোয়াদের নিরস্ত্র করা এবং ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানেন ?

তিনি গাঁইগুঁই করে যা বললেন, তাতে ধরা পড়ে গেলেন যে, তিনি বলশেভিকবিরোধী সোসিয়ালিষ্ট। কিছু বাণী দিয়ে ছেড়ে দিলুম। তিনি পরে অমরদার কাছে অনুযোগ করে বলেছিলেন, নারাণ বাবু এ সব radical idea কোথায় পেলেন ? অমরদা হাসতে হাসতে কথাটা আমার কাছে বলেছিলেন। "ও বলতে চায়, আমার চেলার মতিগতি এমন হল কি করে ?"

যাই হোক, ফিরে এসে "ভারতীয় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন" বইটা ছাপাবার কথা অমরদার সঙ্গে আলোচনা হল। নভেম্বর মাসে (ঠিক মনে নেই) বহরমপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্সের ব্যবস্থা হচ্ছিল। ঠিক হল, কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিলি করতে হবে, তাতে বইটার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে advance booking এর ব্যবস্থার কথা থাকবে। বিজ্ঞাপনের খসড়া লেখা হল।

এমন সময় একদিন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। "শ্রীভাঁওতা" সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তরুণ সাংবাদিক তখন Advance কাগজে চাকরী করে, এবং Editor বলে তার নামই ছাপা হয়—জেল এডিটর—কোন কারণে এডিটরের জেল হলে সে জেলে যাবে। বাবু দেশ প্রেমিক মালিকদের খেল।

কাগজের অফিসে অফিসে সরকারী প্রেস নোট এসেছে—তার মধ্যে খবর—"শ্রীভাঁওতা" proscribed. শচীনন্দন সংবাদ জানা মাত্র ছুটে এসেছে আত্মশক্তি লাইব্রেরীতে খবর দিতে। আমি খবর পেয়ে রাত্রেই বই সরাবার বন্দোবস্ত করে ফেললুম। আর কোন উপায় না দেখে আত্মশক্তি লাইব্রেরীর সামনের পাইওনিয়ার টেলারিং নামক দর্জি দোকানের এক ছোকরা assistant-কে বললুম। বাড়ীটার ভিতরে ওদের একটা ঘর ছিল, এবং সেখানে রাত্রে সে থাকতো। বন্দোবস্ত হল, কতকগুলো বইএর বাণ্ডিল সেখানে একদিনের জন্যে রাখা হবে,—পরের দিন সন্ধ্যার পর আমি সেগুলো আবার সরিয়ে নিয়ে যাবো। তদনুসারে বাণ্ডিলবাঁধা বইগুলো সেখানে সরালুম—এবং একুশ কপি বই লাইব্রেরীর সেল্‌ফেই সাজানো থাকলো। রাত তখন অনেক।

পুলিস সার্চ করতে আসবেই, এবং একুশ কপি বই পেয়ে গেলে পরম পুলকিত হবে, আর বেশী খোঁজাখুঁজি করে আমাকে বিব্রত করবে না। হলও ঠিক তাই। পরদিনই সার্চ হল, এবং একুশ কপি বই পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল। একবার জিজ্ঞাসা করলো আর বই কি হল ? আমি বললুম, সব বিক্রী হয়ে গেছে। দপ্তরীর ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বই পায়নি। ল্যাঠা চুকে গেছে।

রাত্রে একটা বাথটবে বইয়ের বাণ্ডিলগুলো বোঝাই করে একটা ছোট কার্পেট চাপা দিয়ে এক চেনা মুটের মাথায় দিয়ে ঘরে নিয়ে গেলুম। পরে '৩৪ সালে বহরমপুর বন্দিশালায় টালার ক্ষিতীশ ঘোষের (detenu—কমিউনিষ্ট) মুখে শুনেছিলুম—ওরা মোটাদার কাছ থেকে গোপনে এক টাকা দিয়ে বইটা কিনে নিয়ে গিয়ে চার-পাঁচ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রী করতো।

সাধারণত বই প্রকাশের পরই Proscribed হয় "শ্রীভাঁওতার" বেলায় দেরী হল কেন ? আন্দাজে একটা কারণ খুঁজে নিলুম। সাধারণত বই হাতে পেলে লোকে গোড়াটা এবং শেষটা আগে দেখে নেয়। বিশেষত বইগুলো পড়ে দেখাই যাদের চাকরী, তাদের ও কাজটায় আনন্দ থাকে না, এবং তারা যতটা পারে সর্টকাট করে। সম্ভবত: I. B-র যে অফিসারের হাতে কাজটা পড়েছিল, তিনি গোড়াটা এবং শেষটা একটু দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন, বইটা একটা ব্যঙ্গ-কৌতুক বা ফাজলামি মাত্র। তার কারণ হচ্ছে, প্রথম অধ্যায় সৃষ্টিই একটা ভাঁওতা। তাতে লেখা হয়েছে।

"সৃষ্টির পূর্বে যখন কোথাও কিছু ছিল না,—বেদের ভাষায়—যখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল—তখন একদিন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হঠাৎ ফট করে' আপনি গজিয়ে উঠলেন।···

"সেই নিরবিচ্ছিন্ন, নিবিড়, নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে গজিয়ে উঠে একা একা তিনি বড় ফাঁপরে পড়লেন। কাজেই অনেক ভেবে চিন্তে শেষে প্রকাণ্ড এক ভাঁওতা ঝাড়লেন।

"দেখতে দেখতে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোম গজিয়ে উঠলো। ক্রমে গ্রহ উপগ্রহ, নদনদী, পাহাড়, জঙ্গল, মৎস্য-কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি সবই ফটফট করে গজালো। তারপর যেদিন মানুষ গজালো, সেইদিন থেকে ব্রহ্মাবুড়োর মাতব্বরীতে ঘুণ ধরলো।

"ভোজ্যের আগেই উদর গজানোতে, সে গহ্বর পূর্ণ করার জন্য যখন সকলে হাঁ করে ব্রহ্মা বুড়োকেই গিলতে উদ্যত হ'ল, তখন থাবড়ে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন,—বৎসগণ, স্থিরো ভব। আমার গায়ে আর কতটুকুই বা হাড়-মাস,—তোমাদের এতগুলি কাঁড়তো এতে ভরবে না। তা আমি এর উপায় করে দিচ্ছি।

"এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলো নখ, দাঁত, হল, লেজ কন্‌ট্রাক্ট, ইলেকশন তৈরী করে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন এই সব অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের দিলুম, তোমরা যে যার পার পরস্পরে মুণ্ডপাত করে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।

"ব্রহ্মার ভাঁওতা বুঝতে পেরে মানুষও সেই সর্বশক্তিমান [illegible] ভাঁওতার সাধনা আরম্ভ করলে। জানোয়ারগুলো সোজাসুজি [illegible] যাকে পারে, ধরে খায়। কিন্তু মানুষ মানুষকে খায় বটে, কিন্তু [illegible] ভাঁওতার কৃপায়, যে খায় সে-ই টের পায়,—যাকে খায়, তার হজম হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হুঁসই থাকে না।"···

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতার—

"ভাঁওতায় যিনি যত বড় ওস্তাদ, তিনি তত বড় অবতার—আধুনিক ভাষায়—লীডার।

"মানুষের মধ্যে প্রথম অবতার যিনি,—যিনি তখনো [illegible] দৈর্ঘে মানুষের পুরো অবয়ব পাননি,—তিনি ভাঁওতা মেরে বলিরাজাকে পাতালে পাঠালেন।

"পরশুরাম একটু কাটখোট্টা ধরণের ছিলেন, কাজেই ভাঁওতাবা[জি] তিনি একটু কম জানতেন। তাই মানুষ আজ তাঁর কথা ভু[লে] মেরে দিয়েছে।

"রামচন্দ্র রামরাবণিক্য হলেই মানাতেন ভাল—ভাঁও[তায়] তিনি ওস্তাদ ছিলেন না। কিন্তু ভাঁওতার মহিমা তাঁর [illegible] ক্ষুণ্ণ হয়নি। কৈকেয়ীর ভাঁওতায় দশরথ এবং রাবণের ভাঁওতায় রামচন্দ্র না ভুললে রামচন্দ্রকে আজ কে চিনতো ?···

"শ্রীকৃষ্ণের ভাঁওতাবাজীর কথা লিখতে গিয়ে মানুষ কত বড়বড় শাস্ত্রই না লিখে ফেলেছে! তাঁর সব চেয়ে বড় ভাঁওতা কুরুক্ষেত্রে মটর-ড্রাইভারি। অর্জ্জুনের পাশে নিরস্ত্র বসে বসে সারা লড়াইটায় তাঁকে উত্তেজিত করলেন,—ক্লৈব্য পরিহার কর। হত্যার পাপ তোমার নয়, কারণ কে কাকে হত্যা করে? তুমি যাকে হত্যা করবে,—আমি তাকে আগে থেকেই মেরে রেখেছি। স্বরাজ ভোগের কামনায় নয়, পরন্তু দুষ্টের দমনের জন্ম—ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্ম যোগস্থ হয়ে, মায়া-মমতা শূন্ম হয়ে শত্রু নিধন কর,—যুদ্ধ কর!

"শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধদেবের অহিংসার ভাঁওতা। আজপর্যন্ত কোটি কোটি লোক সে ভাঁওতার চক্রে পড়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। Laboratory, factory, dock এ disarmament হচ্ছে,—সবরমতীতে পূর্ণ স্বরাজ্য তৈরী হচ্ছে,—বৌদ্ধ চীন আধ-শতাব্দী ধরে আরশোলার বদলে মানুষ ভক্ষণ করে পালোয়ান হয়ে উঠলো। আমাদের দেশে এখনো সকলে ওটাকে শ্রীভাঁওতার লীলা বলে বোঝে না, সুতরাং আমরাই হচ্ছি আসল বুদ্ধু।

"তারপর কলির আমল। এইবার ঘোড়সওয়ার এসে সব কচুকাটা করবে!

"খৃষ্টানীর ভাঁওতায় ইম্পিরিয়্যালিজম নন্দের আলয়ে কৃষ্ণের মতন দিনে দিনে বাড়ছে···ইউনিটির ভাঁওতায় ভ্যানিটির পরিতৃপ্তি চলেছে; বামুনাইয়ের ভাঁওতায় কোটি কোটি মূর্খ কুড়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। সভ্যতার ভাঁওতায় ক্যাপিট্যালিজম দুধেভাতে আছে। শাসন সংস্কারের ভাঁওতায় ঘুষ, Law and order এর ভাঁওতায় যথেচ্ছাচার, election এর ভাঁওতায় ষড়যন্ত্র, Contract এর ভাঁওতায় লুঠ চলেছে। কাল পূর্ণ হয়েছে—কল্কী বুঝি এল!"

বইটার শেষ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে,—"এই শ্রীভাঁওতার লীলা যে ভক্তিভরে অনুসরণ করে,—অচিরে তার গোজন্ম মোচন হয়ে সে দাদালোকে স্থান পায়। অতএব সকলে একবার বদন ভরে' বল, জয় শ্রী ভাঁওতা"!

সম্ভবত বইটার গোড়া ও শেষ একটু পড়ে' ওটাকে একটা ব্যঙ্গ রচনা মাত্র মনে করে' গাদায় ফেলা হয়েছিল,—তাই সঙ্গে সঙ্গে ওটা proscribed হয়নি। পরে হয়ত বা অসৎ কোন I.B অফিসার বইটা পড়ে কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার ফলেই শেষপর্যন্ত proscribed হয়েছিল। দু'একটা উদ্ধৃতি দিলেই কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধরুন,—তৃতীয় অধ্যায়—ঈশ্বর।

"ক্রমবিকাশ জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম,—এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধবোধ মানব মনের চরম পরিণতি। একটা মিথ্যা গোঁজামিলকে যতই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' এক স্থানে থাকতে চেষ্টা করুক না কেন,—মানব মনকে প্রকৃতির নিয়মে উন্নতির পথে চলতেই হবে,—এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ-বোধ তাকে পদে পদে বস্তুজগতে টেনে আনবেই।···

"তাই বর্তমান যুগের মানবমন বস্তুজগতের প্রতি কতক পরিমাণে মনোযোগী হয়েছে, এবং দয়াময় প্রেমময় ইচ্ছাময়ের অস্তিত্বে—সন্দেহ প্রকাশ করছে। যে সমাজে সবাই মাতাল, সেখানে মদ না খেলে একঘরে হতে হয়। কাজেই এই সন্দেহবাদীরা পাপিষ্ঠ বলে অভিহিত। এই সন্দেহবাদকে চেপে রাখবার জন্যে ভদ্র মহোদয়গণের কি বিরাট সংঘবদ্ধ অভিযান! কত তন্ত্র, কত মন্ত্র, কত মন্দির, কত পুজো, কত গুরু-পুরুত, কত আয়োজন-অনুষ্ঠান!

"—প্রাচীন ভারতের প্রকৃত বীরত্ব অবাস্তব ধর্মরাজ্যের কল্পিত রাজাধিরাজ ঈশ্বরের খাসমহাল স্বর্গে যাবার জন্যে পক্ষীরাজ অশ্বের ডিমে বহুশত বৎসর তা' দিয়েছে,—এবং মধ্যযুগে বৈদেশিক শক্তির সংস্পর্শে আসার পর বেশী দিন নিজ গৌরবময় স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি —

"এই অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য মুষ্টিমেয় লোকে চালাচ্ছে কোটি কোটি লোকের ওপর,—যে কোটি কোটি লোক ইচ্ছা করলে মুহূর্তে ঐ অত্যাচারীদলকে পিষে মারতে পারে কিন্তু চার্চ আর পাদরী সম্প্রদায় তাদের বিভ্রান্ত করে নিয়ত দুর্বল করে রাখছে। God, king and Country র দোহাই দিয়ে অত্যাচারীর দল জনগণকে মুঠোর ভেতর রেখেছে। আমাদের দেশেও আজপর্যন্ত ঈশ্বরের দাড়ি আর ঈশ্বরের টিকির লড়াইয়ে সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে।—বাস্তব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সমাজের বিরোধ হলে, তার মীমাংসা সম্ভবপর হয়। কিন্তু অশ্বডিম্বের বর্ণগন্ধ নিয়ে বিরোধ হ'লে তার মীমাংসা কে করবে? কাজেই জগতে ধর্মের নামে, ঈশ্বরের নামে, অধর্ম এবং শয়তানীরও অন্ত নেই।

"অহেতুকী ঈশ্বরভক্তির মোহ থেকে বাঁচিয়ে তরুণ মনকে অনন্ত উন্নতির পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উদ্রেকের সাধনার পরিবর্তে মানবজীবনের সমস্যাগুলোর সমাধানের ভার নিজেদের স্কন্ধেই বহন করার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে তরুণের দৃষ্টিকে শূন্যমার্গ থেকে টেনে এনে বাস্তবজগতেই নিবদ্ধ করতে হবে।—তরুণজগতকে বোঝাতে হবে যে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র প্রত্যক্ষ শক্তি প্রকৃতি। জগৎ প্রকৃতিরই সম্পূর্ণ অধীন—আর কারো নয়।

"যদি পুজো করতে হয়, তারই পুজো কর। কিন্তু তার জন্য কোন fashionable মন্দির-মসজিদ, তোষামোদমূলক মন্ত্রতন্ত্র, দলাদলির কল আচার অনুষ্ঠান, জগৎকে মিথ্যা বলে বর্জন করার মতন বৃথা-চেষ্টামূলক আহাম্মকী সাধনা,—বা হস্ত-পদ-চিন্তা-বুদ্ধিযুক্ত মানুষের শালগ্রাম শিলার মত জড়ত্ব প্রাপ্তি বা সমাধির মতন সিদ্ধির কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির পুজোর প্রকৃত মন্দির ল্যাবরেটরী, মানমন্দির, ওয়ার্কশপ,—প্রকৃত মন্ত্র বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র, প্রকৃত আচার-অনুষ্ঠান কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য—আবিষ্কার সভ্যতা, প্রকৃত সাধনা অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, ব্যবস্থাপ্রণয়ন প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলন, এবং প্রকৃত সিদ্ধি এই অমূল্য মানবজীবনের পরিপূর্ণ সম্ভোগ, সদ্ব্যবহার, সার্থকতা।

"এই সিদ্ধির পথে সমগ্র মানব জাতিকে পরিচালিত করবার জন্যে—ধ্বংস ও সৃষ্টির একীভূত প্রতীক যোদ্ধা কল্কীর আবির্ভাব প্রয়োজন। অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্যের স্তূপের মধ্যেই সেই কল্কীর বীজ লুকিয়ে আছে। অনুসন্ধান করে' বা'র কর। তার ধ্বংসপাগল রক্ত পতাকার তলে সমবেত হও···"ইত্যাদি —

তার পর ধরুন চতুর্থ অধ্যায়—ধর্ম—তাতে রুশবিরোধী প্রচলিত অপপ্রচারের জবাবে লেখা হয়েছে,—

"এই ধর্মপ্রপীড়িত দুনিয়াটার মধ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতা আর সুখ-সুবিধার প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী, সেই রুশিয়া সম্প্রতি ধর্মের

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-১০

বিলোপ সাধনের দায়ে 'ধর্মদ্রোহীদের দরবারে অভিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু…গত ১৯৩০ সালের ২৫ জানুয়ারীর বিলাতী Forward পত্রে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে,—

"The Church of the Tsarist regime was a slave Church in bondage to the now universally admitted corrupt wealthy ruling powers who in Russia formed the state...The Church was left entirely free to deal with important questions such as whether the raising of two or three fingers should be the sign of the cross; whether the priest should be ordained by a Bishop laying his hands on his head or not, whether holy oil should be used or not, and whether or not the priest should be forced to shave off their beard. In exchange for these holy privileges there were certain duties and obligations. The metropolitan or the chief leader of the Church had to live near and in close touch with the grand princess, and he had to give them support in all their wars against all their enemies, The Church leaders had to take their side in suppressing civil disorders and in allaying discontent among the serfs and lower orders." (বামপন্থী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির কাগজ)।

"সরলার্থ:—ঘণ্টার বাঁটের দৈর্ঘ কতখানি হওয়া উচিত, বা কোন্ দিকে মুখ করে' দাঁড়ানো দরকার, আত্মার সদ্‌গতির জন্য এই সব গুরুতর বিষয়ে" পাঁতি দেওয়া সম্বন্ধে পুরুতরা স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতার বিনিময়ে বড় পুরুতঠাকুর কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপারে বাধ্য থাকবেন। যথা—তিনি রাজপ্রাসাদের কাছেই বাস করবেন, সকলপ্রকার যুদ্ধব্যাপারে সম্রাটকে সমর্থন করবেন, এবং অন্তর্বিদ্রোহ বা ছোটলোকদের অসন্তোষ দমনে তাঁকে সাহায্য করবেন (এবং প্রত্যহ তাঁদের সাতগুষ্টির জয়কামনা করবেন)।

"১৯১৪ সালে রুশিয়ার চার্চের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল নগদ প্রায় ২৫ কোটি টাকা। চার্চের কর্মচারী বা পুরুতদের হাতে নগদ টাকা ছিল প্রায় সওয়া বারো কোটি। এছাড়া দেবোত্তর পরিমাণ ছিল ৫৪ লক্ষ একর বা দেড় কোটি বিঘার উপর জমি। তার খাজনা আদায় হত তিন কোটি টাকারও বেশী।

"বিপ্লবের পর এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে" জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই চীৎকার করছে পুরুতের দল এবং 'সম্পত্তিহারা' কয়েকজন ধনী।

"ঘুষ দিয়ে ধর্ম পোষা রুশিয়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেখানে যার যা ইচ্ছে সে সেইরকম বিশ্বাস বা ধর্ম আচরণ করতে পারে:…"

যাই হোক, শ্রীভাঁওতা জব্দ হওয়ার পর আরো বেশী সতর্ক হয়ে চলছিলুম গ্রেপ্তার ও বন্ধনদশার আশঙ্কায়। অবশেষে সত্যই একদিন পালে বাঘ পড়িল—নভেম্বরে একদিন হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে detenu হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকলুম এবং অনেক ঘাটের জল খেয়ে মুক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরলুম '৩৭ সালের শেষে।

এই ছ'বছরে জেল, বন্দিশালা অন্তরীণের অপূর্ব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমান্তরালে বাইরে চলছিল অপূর্ব বিচিত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, '৩৫ সালের শাসন সংস্কার, প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন এবং গণআন্দোলনের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রসার। বিপ্লবান্দোলনের ধারা বইতে সুরু করলো এক নতুন খাতে। (ক্রমশঃ।

তোমাকে, একদিন এক—

সমরেন্দ্র ঘোষাল

তোমাকে একদিন এক বিস্ময়কর সূর্যোদয় দেখিয়ে
আমার আরো কাছে টেনে এনে বলেছিলাম:
'এ সূর্যোদয় যেন শুধু তোমার আমার'।
তুমি চোখ নামিয়েছিলে।
বলেছিলে: 'যাও কাব্য কোরো না।'
আরও সেদিন, একটি বিকশিত গোলাপের বুকে যেদিন
হেমন্তের দু' ফোঁটা শিশির
চেয়েছিল তার ক্ষণকালীন অস্তিত্বকে
দ্বিতীয়া-চাঁদের কাছে সাক্ষী রাখতে।
তোমাকে, আমার আরো কাছে পেয়ে বলেছিলাম:
'এ মায়ারাত যেন শুধু দু'জনার।'
আজ সময়ের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে
তোমাকে আমাকে।
তোমার কবিতা আজ নিয়মিত স্থান পেয়ে চলে
সহরের সেরা যত সাপ্তাহিকে।
আমি আজ খুঁজে মরি পশ্চাতের আমাকে
দশটা-পাঁচটা শুধু ফেলপ্যাচ-ফাইলে।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শীতের শেষ হলেও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ তক্ষণে। কোম্পানীর
স্পেশাল ওয়াগনটার সামনে আর কোনো গাড়ি চোখে
না। অমিতাভ ঘোষ ট্রামে বা ট্যাক্সিতে এসেছে। নিজের
া গাড়িটা তাকে কমই চালাতে দেখেছে। নিজের অত ধৈর্য নেই
হতে পারে আবার চারুদির নিষেধের দরুণও হতে পারে।
ষ্টিয়ারিং-এ বসতে দেখলেই চারুদির নাকি বুক কাঁপে, স্ত্রে
নষ্ক, কখন কার ঘাড়ে গাড়ি তুলে দেবে ঠিক নেই। চারুদিকে
শুনেছে, ছোঁড়া হাড়-কেপ্পন, চোদ্দশ' টাকা মাইনে পায়,
ওপর ব্যবসার লাভ—ব্যাঙ্কের টাকায় ছাতা পড়ছে, না কিনবে
নতুন গাড়ি না রাখবে একটা ড্রাইভার।

ওই গাড়িটা আপনি এনেছেন ?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, সে-ই এনেছে।

সরাসরি গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল সে, পিছনে ধীরাপদ।
ার ঘাড় ফেরালো, সপ্রশ্ন প্রতীক্ষা, অর্থাৎ কোন্ দিকে যেতে

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে ইশারায়
র রাস্তা দেখিয়ে দিল।

সিগারেট ধরানো হল। চুপচাপ খানিকক্ষণ। অপরিচিত
মত গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে।

কাথায় যাচ্ছি ?

ারুদির বাড়ি। সংক্ষিপ্ত জবাব।

রকম সকম দেখে ধীরাপদ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। কোনো খারাপ খবর
বুঝছে না। জিজ্ঞাসা করল, সেখানে হঠাৎ ?

ে বসল।—মামাকে যাবার জন্য টেলিফোন করেছিল।
রু অভিব্যক্তি, আপনার যাবার ইচ্ছে না থাকলে নেমে যান।

ীরাপদ হাসি চাপল। কারণ না জানলেও মেজাজ গরম কতখানি
। তার হেপাজতে গাড়ি, তাকেই নেমে যেতে বলা।

কন্তু এই রাগ সবটাই যে ওরই ওপর, ধীরাপদ স্বপ্নেও ভাবেনি।
ক শুনে সচকিত। নিজের অগোচরে পকেটের প্যাকেট
াচ্ছে আবার। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর।—আপনি
াজ আজকাল তাহলে ভালোই দেখাচ্ছেন ?

টাই প্রশ্ন নয়। নিরীহ মুখে চুপচাপ প্রতীক্ষা করাই সমীচীন
ল ধীরাপদর।

আর ঠিক এই কারণেই হঠাৎ একেবারে যেন ফেটে পড়ল লোকটা।—হাঁ করে দেখছেন কি, কাজ দেখাবার খুব সখ, না ? কেন আপনি মাইনে নিয়ে এলেন ? নিজের কাজ ফেলে কেন আপনি এ-সব কাজ করবেন ?

ধীরাপদ বিমূঢ় খানিকক্ষণ। আক্রমণটা এই পথে হবে ভাবা শক্ত।—না করলে আজ এদের মাইনে হত কি করে ?

ফুটন্ত তেলের ওপর জলের ছিটে পড়ল যেন।—না হলে না হত, তাতে আপনার অত মাথা ব্যথা কিসের ?

দুর্বোধ্য রাগের ঝাপটায় ধীরাপদ নাজেহাল। হঠাৎই আবার মনে হল, লাবণ্য সরকার সিতাংশুর সঙ্গে বোম্বাই গেছে, হিমাংশু মিত্র সে খবরটা আজই পেলেন কেমন করে ? অমিতাভ ঘোষই বা হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন, তার কি অভিলাষ ছিল ?

ধীরাপদ আবারও বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল তাকে, লোকগুলো এই একটা দিনের আশায় সারা মাস কাজ করে, তাদেরও ঘর-সংসার ছেলে-পুলে আছে, মাসের এই ছ' তারিখেও মাইনে না পেলে তাদের ভয়ানক কষ্ট হত—

থাক্ থাক্ ! সরোষে আধখাওয়া সিগারেটটা পায়ে করে পিষল বারকতক।—ও-সব বড় বড় লেকচার মামার বক্তৃতার জন্য লিখবেন, তারা কষ্টে পড়ত—পড়ত, তাতে আপনার কি ?

অন্ধ রাগ যুক্তি দিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ধীরাপদ আর সে চেষ্টা করল না। চুপ একেবারে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাও বরদাস্ত হল না, অমিতাভ সশ্লেষে বলে উঠল, ফিরে এসে ওই মেয়ে আপনাকে খুব ধন্যবাদ দেবে ভেবেছেন, কেমন ?

—তাই তো। নরম হবার ফলে বার বার ঘা পড়ছে দেখে ধীরাপদ অন্য রাস্তা ধরল, আমাকে চারুদির বাড়ি ধরে নিয়ে চলেছেন কেন, বিচার-টিচার করবেন ?

একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমিতাভ পকেটে হাত ঢোকালো আবার। সিগারেট চাই। প্যাকেট আর দেশলাই পাশে রেখেছে খেয়াল নেই। ধীরাপদ ঝুঁকে সে দুটো তুলে তার হাতে দিল। তারপর শান্ত অথচ ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ? অবুঝের মত এভাবে মাথা গরম করছেন কেন ?

জবাবে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সরোষে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল সে।

একটু অবকাশ দিয়ে ধীরাপদ আবারও তেমনি জোর দিয়ে বলল, কারো ধরুবাদের ধার ধারি না, আপনার মামা বলেছেন মাইনে যেন হয়, তাই দিয়েছি। এতে অপরাধটা কোথায় হল জানলে বোঝা যেত···মুখের ওপর পারব না বলে দিলে খুশি হতেন?

জানালা থেকে মুখ ফেরালো। সিগারেটটা ধরানো হয় নি। মামার কথায় মাইনে নিয়ে এসেছে জানত না বোঝা গেল। গলার স্বরও উগ্র নয় অতটা।—মামা কখন বলেছে?

দুপুরে, ফ্যাক্টরীতে।···তাঁকেও বিরক্ত দেখলাম খুব, মিস সরকারও বসে গেছেন জানতেন না।

রাগের বদলে আগ্রহ দেখা গেল ঈষৎ।—কি বলেছে?

বলেননি কিছু। ধীরাপদ হাসল, তিনিও আপনার মতই অসন্তুষ্ট আমার ওপর, কেন গেল, কি বৃত্তান্ত কিছু খবর রাখিনে কেন। তবে, মনে হয় আসল রাগটা মিস সরকার গেছেন বলেই।

তপ্ত মেজাজ ঠাণ্ডা। শেষ বচনে তাপ মোচন। শ্লেষে, বিদ্রূপে খলখলিয়ে উঠল হঠাৎ, রাগ হবে না! কতবড় মহারথীর মেয়ে পাকড়াও করবেন ছেলের জন্যে, ভবিষ্যতের কত আশা, তার মধ্যে এক ডাক্তার মেয়ে!

ঝল-ঝলে মুখ করে সিগারেট ধরালো। ধীরাপদ মেজাজের উজানে পড়ে ছিল এতক্ষণ। এবারে স্রোতের মুখে। নিরাপদ নয় কোনো। হোমরা-চোমরা রাজনৈতিক কর্ণধার-বিশেষ একাধিক জনের সঙ্গে বড় সাহেবের অন্তরঙ্গ হৃদ্যতার কথা সকলেই জানে। উঁচু মহলের অনেকের সঙ্গেই খাতির তাঁর। ইঙ্গিতটা কার প্রতি, অথবা, বিশেষ কারো প্রতি কিনা, ধীরাপদ ঠাওর পেল না।

আর কিছু বলল না দেখে কৌতূহল চেপে ধীরাপদ বলল, তা তো হল, কিন্তু আপনার ব্যাপারখানা কী? ও বেচারাদের আজ মাইনে হল বলে আপনি অমন রেগে গেলেন কেন? আপনার যেন কিছু একটা উদ্দেশ্য পণ্ড মনে হচ্ছে?

অনেক মানসিক রোগ আছে যা রোগী নিজে দেখতে পেলে সারে। অন্তস্তলের তেমনি একটা বক্র ইচ্ছার ওপর এক ঝলক আলোকপাত হল যেন। নিজেরই অস্বস্তি। তবু গোঁয়ারের মতই জোর দিয়ে বলল, হয়েছে তো, আপনি সর্দারী করতে গেলেন কেন?

কেন গেল সে কৈফিয়ত ধীরাপদ আগেই দিয়েছে। ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের ঘনিষ্ঠতায় মামাটির বীতরাগের একটা কারণ শুনেছে। কিন্তু এই স্বার্থটাই সব বলে ধীরাপদর অন্তত মনে হয়নি। কথা-প্রসঙ্গে আরো কিছুর আঁচ পাবে ভেবেছিল।

কিন্তু প্রসঙ্গের আপাতত ওখানেই ইতি। অমিতাভ ঘোষ বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারের উদ্দেশে হঠাৎ নির্দেশ দিল, ওই মোড়ের মাথায় গাড়িটা রাখো একটু—।

কিছু না বলেই গাড়ি থেকে নেমে গেল। অদূরে ফুটপাথ ঘেঁষা লাইটপোস্টের উল্টো দিকে ফোটো-ষ্টুডিও। সেখানেই গেল। ফোটোর কথা মনে হলেই ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করে কেমন। কি একটা অনস্বচ্ছ প্রলোভন উকিঝুকি দেয়, সেটা নির্মূল করার তাড়নায় নীরব যোঝাযুঝি চলে খানিক।···ক্যামেরা নেই সঙ্গে, রাত করে ওখানে আবার কি কাজ পড়ল এখন। হয়ত ছবি ডেভেলপ করতে দিয়েছে, নয়ত ফিল্ম-টিল্ম কিনবে কিছু।

অদূরের লাইটপোস্টের ওধারে চোখ পড়তেই বিষম চমকে উঠল ধীরাপদ। সর্বাঙ্গে বিদ্যুত-তরঙ্গের ঝাঁকুনি একটা।

বীটার রাইস!

আশ্চর্য, মেয়েটার কথা ধীরাপদর মনেও পড়েনি এতদিন!

বাস-ষ্টপে প্রতীক্ষারত সেই দেহ-পসারিণী মেয়ে। যৌবন বিকি-কিনির আশায় যে-কোনো আগন্তুকের প্রত্যাশায় যে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ক্ষীণ তনু, সেই কড়কড়ে লাল ব্লাউস, সেই ঝকঝকে ছাপা শাড়ি, সেই দগদগে প্রসাধন, সেই সব কিছু। মেয়েটা জায়গা বদল করেছে, এলাকা বদল করেছে। এক জায়গায় পসার বেশিদিন চলে না বলে পসারিণী জায়গা বদল করেছে।

বীটার রাইস! বীটার রাইস! বীটার রাইস!

আশ্চর্য! বার বার আউড়েও শব্দ দুটো স্নায়ুতে স্নায়ুতে সেভাবে আর ঝনঝনিয়ে উঠছে না। শিরায় শিরায় সেভাবে আর তরল আগুন ছড়াচ্ছে না। ভেতো-চাল কটু-চাল কষা-চাল? না, মুৎসই বাংলা খোজায় তাড়নায় ভিতরটা সেভাবে আর উদগ্র উঠছে না। ছবিটা যে দেখাই হল না শেষ পর্যন্ত সেই খেদও তেমন করে আর উপলব্ধি করছে না।

মেয়েটা জায়গা বদল করেছে···।

ধীরাপদ কী বদল করেছে?

মোড়ের মাথায় আলো কম একটু। মেয়েটা পায় পায় এগিয়ে আসছে। গাড়ির দরজা খোলা, ধীরাপদ ও-ভাবে চেয়ে আছে বলেই এগিয়ে আসছে। প্রত্যাশার সম্ভাবনা কতটুকু দেখতে এগিয়ে আসছে।

ধীরাপদ চেয়ে আছে চিত্রার্পিতের মত।

একেবারে ঘটনা ধরে না চিনুক, মেয়েটারও চেনা-চেনা লাগছ বোধহয়। লাগাই স্বাভাবিক। অনেকদিন দেখেছে। একেবারে কাছাকাছি মুখোমুখিও দেখেছে। গাড়িটার পাঁচ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। আর নড়ল না। প্রসাধনের ফাটলে ফাটলে হাসির রেখা গোটাকতক, চোখের তারায় আমন্ত্রণের প্রত্যাশা এক একটুখানি ইঙ্গিতের আশা।

হঠাৎই চমকে উঠে হাত দুই দূরে সরে গেল মেয়েটা। ধীরাপদর হুঁস ফিরল যেন। সামনেই একটা প্যাকেট হাতে অমিতাভ ঘোষ সবিস্ময়ে ধীরাপদর দিকে তাকালো একবার, তারপর অদূরবর্তিনী দিকে। কিছু বুঝে উঠছে না কি ব্যাপার।

মেয়েটার মুখ নিষ্প্রভ, আশাভঙ্গের ক্ষোভ আর যাতনা। আশাটা গোটাগুটি বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারছে না বোধহয়। এ একটু করে সরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা এদিকেই। যাচাই দৃষ্টি। এতটুকু ইশারার আঁচ পেলে আবার দাঁড়াবে। আ এগোবে।

উঠে আসুন।

ধীরাপদর ডাকে অমিতাভ গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করল। গাড়ি চলল।

কি ব্যাপার? মেয়েটিকে চেনেন নাকি?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। চেনে।

ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? কি বলছিল?

বলছিল না কিছু, শুধু এসে দাঁড়িয়েছিল।

দৃশ্যটা বড় অদ্ভুত লেগেছিল অমিতাভর, কথা শুনে আরো অবাক।—কি জন্তে?

ধীরাপদ মুচকি হাসল একটু।—আমার জন্তে আপনার জন্তে কোনো একজনের জন্তে।

অমিতাভ ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎই বোধগম্য হল ব্যাপারটা।—বাই জোভ! উৎফুল্ল মুখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল, নিচুগলায় বলল, দেখার মত তেমন কিছু দেখলাম না···কিন্তু আপনি চেনেন কি করে? ঘটনা আছে নাকি কিছু?

ধীরাপদ হাসছে অল্প অল্প। মাথা নাড়ল। আছে।

আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই, অ্যাঁ? দেখতে এমন, অথচ···বলুন না ছাই, শুনি?

সবুর সয় না যেন। এই ব্যাপারে চিক কেমিষ্টের ছেলেমানুষী আনন্দ লক্ষ্য করছে ধীরাপদ। আড়চোখে পাশের প্যাকেটটা দেখল একবার। কি আছে···ছবি না ফিল্ম?

তারপর বলল।

দিনের পর দিন মেয়েটার বাস-ষ্টপে দাঁড়ানোর গল্প আর আশার গল্প।

ময়দানের গল্প আর শীতের রাতে বিনামূল্যে পসারিণীর সেই পসার লুঠ হবার গল্প।

মেয়েটার সেই কান্নার গল্প আর সেই বুকভাঙা হতাশার গল্প।

অমিতাভ ঘোষ স্তব্ধ। একটু আগের বাসনাসিক্ত প্রগলভতা নিশ্চিহ্ন। নির্বাক খানিকক্ষণ, তারপর ভেঙে উঠল হঠাৎ। অধম হাঁ করে বসে না থেকে তখন বললেন না কেন? ড্রাইভার—

ড্রাইভার সচকিত।

ধীরাপদ বাধা দিল, না ঠিক আছে, চলো।

অমিতাভ ঘোষ দুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অবুঝের মতই ঝাঁঝিয়ে উঠল আবার, মেয়েটার এই অবস্থা আপনি আগে বললেন না কেন?

মেয়েটার এই অবস্থা তাতে আপনার কী?

খানিক আগে মেডিক্যাল হোমের কর্মচারীদের দুরবস্থা প্রসঙ্গে অমিতাভ ঘোষ ধীরাপদকে, ঠিক এই কথাই বলেছিল। তখন বিঁধেছিল বলেই হোক বা লোকটাকে শান্ত করার জন্তেই হোক, ধীরাপদ ঠিক তেমনি করেই বলে বসল মুখের ওপর।

সিগারেটের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে। সিগারেট পেল ধরালো। ওতে উত্তেজনা কমে কি বাড়ে ধীরাপদর ধারণা নেই। কিন্তু যে কোনো বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে এই যেন একমাত্র সম্বল লোকটার। বাকবিতণ্ডার স্পৃহা নেই আর, চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগল।

ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে ধীরাপদ। অমিতাভ ঘোষকে গল্প বলে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, অতনু-উজ্জ্বলতায় মুখে বরফ-গলানো জলের ঝাপটা পড়েছে যেন। কিন্তু ধীরাপদ নিজে তেমন ঠাণ্ডা হতে পারছে না। নিজের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিযোগ কি একটা, নিজের প্রতি নিজের বিদ্বেষ। আর কোথাও না গিয়ে বাড়ি যেতে পারলে হত।

তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যেত, নিজের দিকে তাকানো যেত, বিচার বিশ্লেষণে বসা যেত।

রাত মন্দ হল না, সেখানে দেরি হবে না তো?

অমিতাভ জবাব দিল না, জানালার গায়ে মাথা রেখে সিগারেট টানছিল, চিবুক নামিয়ে একবার তাকালো শুধু।

বাইরের ঘরের আলোয় বাগানের ওধারে চারুদির গাড়িটা দেখা যায়। সিঁড়ির গায়ে ষ্টেশান-ওয়াগনটা দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে দোরগোড়ায় দেখা দিল পার্বতী। বাইরের ঘরেই ছিল, কেউ আসছে জানত হয়ত। কিন্তু আসছে বলে কোনরকম আগ্রহ নেই।

একজনের বদলে দু'জন দেখে পার্বত্য রমণীর অটল গাম্ভীর্যে একটু যেন চিড় খেল মনে হল ধীরাপদর। আজ পর্যন্ত পাঁচটা কথাও হয়নি, তবু তার প্রতি মেয়েটাকে বিরূপ মনে হয়নি একদিনও। আশ্চর্য্য, আজও মনে হল না।

অমিতাভ আগে ঘরে ঢুকে ধুপ করে সোফায় বসে পড়ল। পিছনে ধীরাপদ।

কর্ত্রীকে খবর দেবার কোনরকম তাড়া দেখা গেল না পার্বতীর। চুপচাপ ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই রইল। জোরালো আলোয় লক্ষ্য করলে মুখে একটু প্রসাধনের আভাস মেলে। মাথার চুলও চকচকে, টেনে বাঁধা। আর একদিন চারুদি যেমন করে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেদিনও অমিত ঘোষের আসার কথা ছিল। পরনের ফরসা আঁট শাড়ির আঁচলটা গলায় জড়ানো।

ধীরাপদর মনে হল এসে ভালো করেনি। খানিক আগের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধটা যেন হঠাৎই কোন মন্ত্রবলে পরিপুষ্ট হয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে। সামনে যে দাঁড়িয়ে তাকেই শুধু দেখছে না, ফোটো অ্যালবামের স্নায়ুবিভ্রমী ছবিগুলোও চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে। এই আকণ্ঠ আঁট বসনার সঙ্গে সেগুলোর মিল যেমন স্পষ্ট, অমিলটাও তীক্ষ্ণ তেমনি।

এই স্বল্প নীরবতাটুকুও বিসদৃশ রকমের ভারী লাগছিল ধীরাপদর।

চারুমাসি কই? প্রশ্ন অমিতাভরই বটে, কিন্তু সে প্রশ্নে তাগিদ নেই কিছুমাত্র। দুচোখ পার্বতীর মুখের ওপর।

বাড়ি নেই।

পার্বতীর সংক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা জবাব শুনে ধীরাপদ অবাক। জবাবটা অমিতাভও আশা করেনি বোঝা গেল। জোড়া ভুরু কুঁচকে গেল একটু, আমাকে টেলিফোনে আসতে বলল, বাড়ি নেই মানে? গাড়িও তো দেখলাম বাইরে?

পার্বতী নিরুত্তর। অর্থাৎ, জানাবার যেটুকু জানিয়েছে।

ধীরাপদ কি ভুল দেখেছে? বিরক্তির বদলে অমিতাভ ঘোষের সমস্ত মুখে একটা চাপা খুশির তরঙ্গ দেখছে,—ভুল দেখছে? পকেটে হাত ঢোকালো, সিগারেটের খোঁজ। কিন্তু সচেতন মনে খুঁজছে না, হাত পকেটেই থেকে গেল। মামা এসেছিল? মামার সঙ্গে বেরিয়েছে?

পার্বতী এবারেও জবাব দিল না। নির্বিকার গাম্ভীর্যে হাবভাব লক্ষ্য করছে, পরিবর্তন লক্ষ্য করছে।

জবাবের প্রত্যাশাও বোধ হয় করেনি মানুষটা। আনন্দসিক্ত তরল চঞ্চল মুহূর্ত গোটাকতক।

ধীরাপদর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল অমিতাভর। চমকালো একটু। সহজতার আড়ালে ঢোকার অপটু প্রয়াস। পকেট থেকে হাত বেরুলো, সিগারেটও। কিন্তু ধোঁয়ার তৃষ্ণা প্রবল নয় আপাতত, প্রয়োজনে ওটা সহায়ও বটে। দেশলাই-প্যাকেট সোফার হাতলের ওপর রেখে সাদাসাপটাভাবেই বলে ফেলল, কোনো সিনেমায় গিয়ে ঢুকেছে তাহলে, ঘড়ির দিকে চোখ, শিগগীর ফেরার আশা নেই—আপনি কি করবেন?

অর্থাৎ, চারুদির ফিরতে যত দেরিই হোক, তাকে অপেক্ষা করতেই হবে, এখন সমস্যা ধীরাপদকে নিয়ে। গাড়িতে তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ধীরাপদ বলেছিল বটে। প্রকারান্তরে তাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এখানে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে যাবার কথা আর মনেও ছিল না, সংগোপন নিভৃতে একটা লোভনীয় দেখার ভোজে মগ্ন ছিল। অমিতাভ ঘোষের ভণিতা ক্রমশই স্পষ্ট যে হেসে ফেলার কথা। কিন্তু তার বদলে একটা ধাক্কা খেয়ে অপ্রতিভ একেবারে। এই দুজনের মাঝখানে সে অবাঞ্ছিত তৃতীয় লোক বসে আছে একজন।

না, আমি আর রাত করব না, উঠি—

গোটাগুটি উঠে দাঁড়াবার আগেই পার্বতীর স্থৈর্যে চাঞ্চল্য দেখ গেল। তার দিকে ঘুরে নিরুত্তাপ গলায় বলল, তাঁরা সিনেমা যাননি, আপনি বসুন।

প্রায় আদেশের মত শোনালো কথা ক'টা। ধীরাপদ হকচকি গেল কেমন। না পারে ফিরে বসতে না পারে যেতে। কি অমিতাভ ঘোষের ইচ্ছার বেগে আর যাই থাক, দুর্বল ছলনা নেই সেটা যেমন স্পষ্ট তেমনি কলাকৌশল-বর্জিত। এক চা রেষারেষির আনন্দে তার গোটা মুখ উৎফুল্ল। বলে উঠল, সিনেম না গিয়ে থাকলে গঙ্গার ধারে গেছে, সেই দু' ঘণ্টার ধাক্কা—ব তাহলে।

অনাবৃত বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধীরাপদ নীরবে হাবুডুবু খে উঠল একপ্রস্থ। অপলক নেত্রে পার্বতী ওই লোকটার দিকেই চে রইল খানিক, তারপর ধীরাপদর দিকে।

ধীরাপদ পালাতেই চায়। আর এক মুহূর্তও থাকতে চায় এখানে। হাসতে চেষ্টা করে, মেরুদণ্ডহীনের মতই পালা অজুহাত খুঁজে নিল। বিড়-বিড় করে বলল, না আমি য কোম্পানীর গাড়ি সেই সকাল থেকে আটকে রেখেছি, ড্রাইভারটা ছেড়ে দেওয়া দরকার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সটান গাড়িতে। চলো—

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটেছে। কিন্তু ধীরাপদ বিরক্ত, যত ছোটা দরকার তত্তো জোরে ছুটছে না। এক আসনে মাথা আর এক আসনে পা ছড়িয়ে বসেছে। স্নায়ু শিথিল হোক, মা শূন্য হয়ে যাক, শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল ঠাণ্ডা হোক। শুধু দেখার কথা, দেখেছে। দেখে দেখে হাসার কথা। অন্তত কি একটা ঘূর্ণীপাক থেকে মুক্তির তাড়নায় ধীরাপদ হেসেই উঠল।

···কিন্তু পুরুষের কোন্ ফাঁকটা নারী ভরে তোলে? সান্নিধ্য ভালো লাগে—কেন লাগে? এই ভালোলাগার সংবে এমন অমোঘ এমন অপরিহার্য কেন? ধীরাপদ আগে শুধু হাসত। এখনও তাই করবে। লাবণ্য সরকার বোঝাই

সিতাংশু মিত্রর সঙ্গে, হিমাংশু মিত্রর সঙ্গে চারুদি বেড়াতে বেরিয়েছে—অমিতাভ আসবে জেনেও বেরিয়েছে। এলেই বা, পার্বতী আছে বাড়িতে, পার্বতীর চুল কে বেঁধে দিয়েছে আজ?… চারুদিই হয়ত।

ধীরাপদ হাসতে পারছে বটে। কিন্তু হাসিটা ভিতর থেকে কে যেন টেনে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে। দু'জনের নিরিবিলির দুরন্ত লোভে অমিতাভ ঘোষ প্রকারান্তরে ঠেলে তাড়িয়েছে ওকে। ধীরাপদর হাসতে পারার কথা। পারেনি। উল্টে, দেখার ফাঁকে প্রলোভনের তীরে ভিক্ষুকের মত বসে ছিল, বসে থাকতে চেয়েছিল। পার্বতী যে কারণে থাকতে বলেছিল ওকে, কিছু না বোঝার ভাণ করে সেই কারণটাকেই প্রশ্রয় দিয়ে পালিয়ে এসেছে সে। তাকে দস্যু-মুঠোর কলে রেখে এসেছে। কিন্তু সে-জন্যে সুস্থ পরিতাপ দূরে থাক, তলায় তলায় কার নির্মম উল্লাস। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল ধীরাপদ। দুই চোখ বিস্ফারিত। কা'কে দেখছে?' কার উল্লাস?

কি করবে? চোখ রাঙাবে তাকে? বসে বসে শুধু শুকনো রিক্ত নিঃশ্বাস কুড়োতে বলবে কতগুলো? জগৎ দেখতে বলবে? দেখে কি পাবে! সে তো কেবল বলছে ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো।

বাসনার বিবরে একটা সুপ্ত প্রতিবাদ অজগরের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কামনার কথা। তার পদসঞ্চার আগুনের মত, ঘাতকের মত। ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মত। সে আপোষ জানে না।

…লাবণ্য বোম্বাই গেছে সিতাংশুর সঙ্গে। হিমাংশু বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে চারুদি। ঘরে অমিতাভ ঘোষ আর পার্বতী। নারী আর পুরুষ। নারী আর পুরুষ আর প্রকৃতি। বিশ্ব ছুটেছে এক সুনিশ্চিত কক্ষপথে।

ধীরাপদর নির্দেশে ষ্টেশান-ওয়াগন যে-পথে চলেছে, সেটা সুলতানকুঠির পথ নয়।

আসার সময় যে-পথে এসেছিল, সেই পথ।

মোড়টার বেশ কিছু আগে নেমে পড়ে গাড়িটা বিদায় করে দিল। চেতনার কন্দরে কন্দরে যত রাত ভরাট হয়ে উঠেছে, বাইরের রাত অত নয়। লোক চলাচল কিছু হাল্কা বটে। দোকান-পাট একেবারে বন্ধ হয়নি, ফোটো-ষ্টুডিওটা আধখানা খোলা।

লাইট-পোষ্টের গায়ে ঠেসান দিয়ে মেয়েটা ঠায় দাঁড়িয়ে তখনো। সেই মেয়ে। খদ্দের জোটেনি।

চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। দূর কম নয়, তবু কি করে টের পেল সেই জানে। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ব্যবধান কমছে, সংশয়ও কমে আসছে।

ধীরাপদ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

কাছাকাছি এসে থমকালো একটু। চিনেছে। আর ইশারার প্রয়োজন নেই, আমন্ত্রণ দরকার নেই। একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। পাশে এসে। হাসছেও বোধ হয়। অনুরাগের ছক-বাঁধা হাসি, খদ্দের বুঝে ওজন-করা হাসি। কিন্তু ধীরাপদ একবারও তাকালো না। তাকাতে পারল না। এক-পা দু'-পা করে বড় রাস্তা ধরে চলতে লাগল সে।

মেয়েটা পাশে পাশে।

ট্যাক্সি। ধীরাপদ চমকেই উঠেছিল :…ট্যাক্সিঅলারাও জানে বোধ হয় সব, বোঝে বোধ হয়। গতি মন্থর করে ট্যাক্সিঅলা গলা বাড়ালো, থামবে কিনা নির্বাক প্রশ্ন।

দরজা খুলে দিতে মেয়েটাই আগে উঠল। কলের ম উঠে ধীরাপদ দরজাটা টেনে দিল। ড্রাইভার পিছন ফিরে ত ালো একবার, কোনো নির্দেশ না পেয়ে সামনের বড় রাস্তা ধরেই চলল সে।

রাস্তার থেকে ট্যাক্সির মধ্যে আলো কম অনেক। ধীরাপদ স্বস্থি বোধ করল একটু, স্বস্থি বোধ করতে চেষ্টা করল। মাঝখানে ফিকে অন্ধকারের ব্যবধান। সে এ-পাশের দরজা ঘেঁষে বসে আছে মেয়েটা ওপাশে। ফিরে ফিরে দেখছে, ও একবার তাকালেই সরে আসবে হয়ত। সঙ্গীর হাবভাব দেখে খুব যেন ভরসা পেয়ে উঠছে না।

চৌরঙ্গীর ওপর পড়ে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল কোথায় যেতে হবে?

ধীরাপদই কি জানে কোথায় যেতে হবে! গাড়ি থামাতে বলল। নেমে মিটার দেখে ভাড়া মেটালো। মেয়েটাও নেমে দাঁড়িয়েছে।

চৌরঙ্গীর জোরালো আলোয় ধীরাপদ এই প্রথম চোখ মেলে যেন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, আঁতকে উঠল প্রায়। তার কি হয়েছিল? এ কোন্ প্রেতিনীর সঙ্গ নিয়েছে সে! এক আচমকা আঘাতে দিশা ফিরে পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে যেন। ধীরাপদ দেখছে, নারী নয়, নারীর কঙ্কাল। কটকটে লাল ব্লাউসটা চোখে

হুলের মত বিঁধছে, দগদগে ক্ষত-ছাপের মত লাগছে ছাপা শাড়িটা, মুখের শুকনো প্রসাধনে হিজিবিজি চিড় খেয়েছে।

মুহূর্তে সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল ধীরাপদর, ধারালো দু'চোখে মোহগ্রস্ত উষ্ণতার লেশমাত্র নেই, একটা দুঃসহ ক্ষোভ গুমরে ঠেলে উঠছে ভিতর থেকে।

মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে। দু'চোখ টান করে চেয়ে আছে তার দিকে। এই আলোর জোয়ারার মধ্যে এসে কোথায় গোলযোগ ঘটে গেছে, বুঝেছে। দুই চোখে নীরব অভিযোগ নীরব উদ্বেগ, আর নিভন্ত আশা। ও-চাউনির ভাষা মূক নয় আদৌ, আমি অন্ধকারের মেয়ে, অন্ধকারে ছিলাম, এই আলোতে তুমি আমাকে টেনে এনেছ। সেই সঙ্গে অব্যক্ত আকূতি, তোমার মোহ ভেঙেছে সে-দোষ আমার নয়, আমাকে ঠেলে দিও না, আজকের এই দিনটার মত আমাকে বাঁচার প্রতিশ্রুতি দাও, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে ঘৃণা করলেও দয়া করো, এ অস্তিত্বের মিছিলে আমিও তো একজন—

মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করছে ধীরাপদর। মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে কোমলতার ছাপ পড়ছে একটা। পণ্যা নারীকে নয়, মেয়েটাকেই দেখতে চেষ্টা করল সে। আগে যেমন দেখত বয়েস যার কুড়ি একুশ, অপুষ্ট, বড় শুকনো আর বড় করুণ, ওই প্রসাধন পরিহার করলে মুখখানা যার সুশ্রীই মনে হয়। এত কাছে থেকে এভাবে অবশ্য আগে দেখেনি। পুরুষের অকরুণ বিশ্বাসঘাতকতার ময়দানে কেঁদে ভাসিয়ে ছিল যেদিন, সেদিনও না। এই মুখ দুর্ভিক্ষের মুখ। প্রাণের শিখাটুকু শুধু ধিকি ধিকি জ্বলছে।

সামনেই বড় রেস্তরাঁ একটা। নৈশ ভোজনবিলাসীর ভিড় কম নয় একেবারে। ক্যাবিনে ঢোকার মুখে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অদূরের এক কোণে কল-বেসিন দেখিয়ে বলল, হাতমুখ ধুয়ে এসো ভালো করে।

মেয়েটা চলে গেল। ধীরাপদ চুপচাপ এসে বসল। বয় খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল—রাতের পুরো খাবার।

হাতমুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মেয়েটা ফিরে এলো।

ধীরাপদ এই রকমই কল্পনা করেছিল, চমকে উঠল তবু। প্রসাধনের রঙ ধুয়ে-মুছে গেছে। সমস্ত মুখে যেন রক্ত নেই এককোঁটা। নিঃসাড়, বিবর্ণ, পাণ্ডুর।

আধ ঘণ্টা।

খাবারের ডিশে ধীরাপদর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করছে শুধু। মুখে কিছু উঠছে না বড়। মেয়েটা খাচ্ছে। ধীরাপদ তাই দেখছে চেয়ে চেয়ে। এমন খাওয়া আর দেখেনি। হাত দিয়ে, মুখ দিয়ে, চোখ দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে খাচ্ছে যেন। এক একবার সামনের লোকটার দিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে হঠাৎ, কুণ্ঠাও বোধ করছে হয়ত একটু। পরক্ষণে এক খাওয়া ছাড়া আর কিছুই মনে থাকছে না।

অব্যক্ত যাতনায় গলার ভিতরটা বুজে আসছে ধীরাপদর। চোখের কোণগুলো শিরশির করছে। এক একজনের দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে যে ক্ষুধার তাড়নায় সেটা এই ক্ষুধা।

খাওয়া হয়ে এসেছে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। ধীরাপদর ডিশের দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেল একটু। মৃদু স্বরে বলল, আপনি কিছু খেলেন না তো?

তোমাকে আর কিছু দেবে?

নীরব কৃতজ্ঞতায় শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। মাথা নাড়ল। আর কিছু না।

তোমার নাম কী?

কাঞ্চন।

নাম শুনে হাসি পাচ্ছে ধীরাপদর, কাঞ্চনই বটে, নইলে পরিহাস এতদূর গড়াবে কেন।—কোথায় থাকো?

প্লেটের ওপর আঙুল ক'টা নড়াচড়া করতে লাগল। নিরুত্তর।

ধীরাপদ আবার জিজ্ঞাসা করল, থাকো কোথায়? গলার স্বর ঈষৎ রূঢ়।

মেয়েটা মুখ তুলল একটু, কিন্তু তাকাতে ভরসা পেল না। চোখ নামিয়ে নিল। এমন লোকের পাল্লায় সেও আর পড়েনি বোধহয়।

বস্তিতে।

সেটা কোথায়?

বলল।

সেখানে আর কে থাকে তোমার?

বাবা আর ভাইবোনেরা।

তারা কি করে?

বাবার চোখে ছানি···চোখে দেখে না।

আর ভাইবোনেরা?

তারা ছোট।

ফাঁক নেই কোথাও। মঞ্চে-ধরা নাটকের মত, আট ঘাট বাঁধা। বাবার চোখে ছানি, ভাইবোনেরা ছোট। বড় যে, সে দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু দায়িত্ব পালনের এই রাস্তাটা ওকে শেখালো কে? ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করল না। থাক, আরো কি শুনবে কে জানে!

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরল একটা। ড্রাইভারকে যে পথের নির্দেশ দিল শোনা মাত্র মেয়েটা চকিতে ঘুরে বসল আধা-আধি। লোকটার মাথায় ছিট আছে কি না সেই সন্দেহ হওয়াও বিচিত্র নয়। এবারেও সরে এসে বসতে বা কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না সে।

ধীরাপদ কোণে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। তোমার বস্তি এলে বোলো।

কম পথ নয়। এতটা রাস্তা মেয়েটা রোজ হেঁটে আসে হেঁটে ফেরে? না কি তার খদ্দেররা পৌঁছে দিয়ে যায়? কিন্তু আর কিছু জেনে কাজ নেই ধীরাপদর। অনেক জেনেছে। জানার ধকলে স্নায়ু অবশ।

একটা কাঁচা গলির মুখে ট্যাক্সি দাঁড়াল। আলো নেই। এক-ফালি সরু লম্বা অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। সেই হাঁ পেরিয়ে বস্তি। টিম-টিম আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দূর থেকে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে বস্তিঘরগুলোও।

মেয়েটা নেমে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে ধীরাপদ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আবার ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে চালাতে নির্দেশ দিল।

নোট হাতে মেয়েটা বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে।

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ধীরাপদ।

এত অবাক হবার কি আছে! সেও তো খদ্দেরই বটে। খদ্দের ছাড়া আর কি।

দাঁতে করে নিজের পায়ের মাংস টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ধীরাপদর।

সুলতানকুঠি।

ট্যাক্সি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। আজকের মত নিজের অস্তিত্বটুকুও মুছে ফেলতে চায় ধীরাপদ। এই রাতের অস্তিত্বও। পায়ের নিচে শুকনো পাতা আর শুকনো কাঠ-কুটোর শব্দ খড়খড়ে বিদ্রূপের মত লাগছে। সুলতানকুঠিতে নিষুতি রাত। চোরের মতই সেই সুপ্তির গহ্বরে এসে দাঁড়াল সে।

একবারেই ঘরে না গিয়ে কদমতলার বেঞ্চিতে এসে বসল। ঘরে ঢুকলেই তো আলো জ্বালতে হবে। যাক আরো কিছুক্ষণ। আলো নাকি জীবনেরই প্রতিবিম্বিত মহিমা। এই মুহূর্তে অন্তত ধীরাপদ সেই মহিমার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না।

কিন্তু না চাইলেই ছাড়ে কে। মাথার ওপর ওই তারাময়ী আকাশটাও নির্লজ্জ, বিবসনা। যৌবন-স্বপ্নে বিভোর।

ধীরাপদর কানের কাছটা গরম ঠেকছে আবার। একটু আগের অমন বাস্তব আঘাতটাও মিইয়ে আসছে। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল চট করে। পায়ের নিচে কঠিন মাটি-উপলব্ধি করতে চাইল।

দরজা খুলে ঘরে এলো। অন্ধকারে জামা-কাপড় বদলে অন্ধকার হাতড়েই গামছাটা কাঁধে নিল। পা-টিপে কুয়ো-তলার দিকে চলে গেল তারপর। ভীরু সতর্কতায় কয়েক বালতি জল তুলল কুয়ো থেকে। একটুও শব্দ যেন না হয়, শব্দ হলে অপরাধ হবে যেন। সুলতানকুঠির সুপ্তি-ঘন অন্ধকারের পরদাটা ছিঁড়ে যাবে।

শান্তি।

শরীরটা জুড়িয়ে গেল, ঠাণ্ডা হল। বেশ ধীরে-সুস্থে আরাম করে সবটা জলই মাথায় ঢালল সে। একটা বিকারের ঘোর কেটে গেছে যেন, আর ভাবনা নেই, আর সমস্যা নেই।

গা মুছে ভিজে কাপড়ে ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল। কাপড় আনেনি, ঘরে গিয়ে বদলাবে।

কিন্তু সোনাবউদির ঘরের পিছন দিকের শেষ জানালাটা পেরুবার আগেই মুহূর্তের জন্য দু'পা আড়ষ্ট একবারে। অন্ধকারে জানালার গরাদ ধরে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে। চাপা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার! এত রাতে চান কেন?

গরম লাগছিল কেমন। অস্ফুট জবাব দিয়ে ধীরাপদ দ্রুত ঘরের দিকে পা চালিয়ে দিল। সে পালাতে চায়।

পালানো হল না।

ঘুরে এসে দেখে সোনাবউদি' বারান্দায় তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। কাছে আসতে আপাদ-মস্তক দেখে নিল একবার।—কি হয়েছে?

ধীরাপদ সেই জবাবই দিতে যাচ্ছিল, গরম বলতে পারল না। সোনাবউদি'র দিকে চেয়েই চোখ দুটো থমকালো হঠাৎ। আদুড় গায়ে শাড়ির আঁচলটা বেশ করে জড়ালো। নিজের অগোচরে সোনাবউদি'র মুখের ওপর থেকে তার চোখ দুটো নেমে এসেছে। যৌবনের কোমল তরঙ্গ হৃদয়ের তীরে এসে স্তব্ধ যেখানে—সেইখানে।

কিছু না···। ধীরাপদ হঠাৎই আবার সবলে ছিঁড়ে নিয়ে এলো নিজেকে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। তারপর নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। এবারেও আলো জ্বালল না। সোনাবউদি' অবাক হয়ে খানিক অপেক্ষা করবে জানা কথা। আলো জ্বাললে আবারও হয়ত ঘরে আসবে। সর্বত্র একি অদ্ভুত ষড়যন্ত্র আজ? সেই ষড়যন্ত্রে সোনাবউদি'ও একজন।

এই না একটু আগে ঠাণ্ডা হয়েছিল, গা জুড়িয়েছিল, সব সমস্যার শেষ হয়েছিল। কাপড়টা তো এখনো জবজবে ভিজে। সোনাবউদি' কি দেখল? কি বুঝল? কি ভাবল?

ধীরাপদ কি করবে এখন? নিজের এই চোখ দুটোকে খুবলে তুলবে?

অন্ধকারেই কাপড়টা বদলে নিল।

তারপর বসল। বিছানায় নয়, মাটিতে। ঠাণ্ডার তাগিদ আবারও। আকুতি। মাটিতেই শুয়ে পড়ল আস্তে আস্তে।

ঠাণ্ডা মাটি।

[ক্রমশঃ।

প্রথম প্রেরণা, শেষ সান্ত্বনা

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার প্রথম দিনের কবিতার অক্ষরে কথায়,
সতর্ক শিল্পীর মত গড়েছি যে সযত্নে তোমায়,
অরুণিমা রায়।
চুপি চুপি নেমে এসে শিশিরের শব্দের মতন,
ভোরের কুঁড়ির বুকে ছমছম ছায়ার কম্পন।
চোখ চেয়ে চারি দিকে মোম-রং সূর্যের উত্তাপে,
প্রথম কবিতা তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে দুর্বাসার শাপে?
যুগে যুগে যে ছবি এঁকেছি সবাই সেই ছবি আঁকার উল্লাসে,
সারা'রাত পতঙ্গের পাখা উড়ে উড়ে আলোর চারি পাশে,
অনেক কবিতা আমার পুড়ে হল ক্ষয়।
মরে-যাওয়া নক্ষত্রের হিম,
সকালের পতঙ্গের মৃত্যুশীত কার্পেট শয্যায়।
আমার উন্মাদ কল্পনা ঝড় হ'য়ে ভেঙে দিল লবঙ্গের বন,
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল উত্তরের হাওয়া, রেখে গেল
স্বাক্ষর নির্জন।
যশ এল, অর্থ এল, পরিশেষে সব গেল চলে,
লুপ্ত হল সূর্যের রঙীন টিপ পড়ন্ত বিকেলে।
সব শেষে প্রতিভায় সৌম্য স্পর্শ রেখে গেল
সমাধি-সন্ধ্যায়,
প্রথম কবিতা তুমি ফিরে এলে চুপিসাড়ে অরুণিমা রায়।
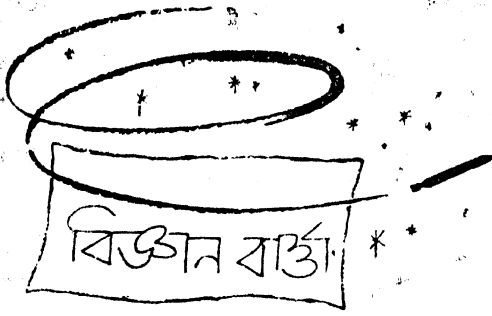
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও আমাদের খাদ্য

প্রাচীন কালে রোমের লোকেরা মনে করতেন যে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সিমের মধ্যে বাস করে, তাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় রোমের লোকেরা সিম খেতেন।

যে সমস্ত ক্রীতদাস পিরামিড তৈরী করতো তাদের দেহ বেশ সুস্থ ও সবল থাকবে, এই আশায় মিশরের লোকেরা তাদের রশুন খাওয়াতেন।

এমন কি, ঔপনিবেশিক আমেরিকাতেও রন্ধনবিদ্যা সম্পর্কে একটি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, খাওয়ার আগে বিয়ারের মত রুটিও ভাল করে পাকিয়ে নিতে হয়।

যুগ যুগ ধ'রে বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে নানা রকম ঐন্দ্রজালিক গুণের আরোপ করা হয়েছে। এমন কি, আগেকার দিনেও খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে হাজারো রকমের বিভ্রান্তি ব্যাপক ভাবে প্রচারিত আছে।

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতাল, সরকারী গবেষণাগার, সরকারী খাদ্যদপ্তরের প্রায় ১৪ হাজার খাদ্যবিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত আমেরিকার ডায়েবিটিক অ্যাসোসিয়েসান খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকম ভুল ধারণা দূর করবার জন্য সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছেন।

এই বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সেবা সমিতি, মহিলাদের ক্লাব, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে বক্তৃতা দেন। তাঁরা রেডিও এবং টেলিভিসনেও বক্তৃতা দেন। ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন দেখলেই তাঁরা তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচার করা এবং এ ব্যাপারে হাতুড়ে লোকদের ভ্রান্ত প্রচারকে লোকচক্ষে তুলে ধরাটা এঁদের প্রধান কাজ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, খাদ্য নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন? যার যা ভাল লাগে তা খেতে দিতে আপত্তি কি?

আমেরিকার ঐ অ্যাসোসিয়েসান খাদ্য সম্বন্ধে ৩৬ পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকাতে এই প্রশ্নের জবাব জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। ঐ পুস্তিকাতে তাঁরা বলেছেন, বর্তমান শতাব্দীতে খাদ্য সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো ঠিক। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে তার প্রমাণ দেওয়া মুস্কিল। কিন্তু লোকের মুখে মুখে বংশানুক্রমে যে সব ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলো কম অনিষ্টজনক নয়। এই সব ভ্রান্ত প্রচারে আস্থা স্থাপন করে বহু লোক এখনও পুষ্টিজনক খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করতে পারছেন না।

প্রধানত তিনটি কারণে খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যসমূহকে ভুল থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, চিকিৎসা বিষয়ক খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে বহু লোক উপযুক্ত সময়ে রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে, পথ্য হিসাবে শুধু ফল খেলেই ক্যান্সার সেরে যাবে। অথবা যথাসম্ভব অনাহারে থাকলে হৃদযন্ত্র ভাল হয়ে যাবে, এই কথায় বিশ্বাস করে অনেক রোগী সময়মত ডাক্তার ডাকেন নি।

দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক—গৃহকর্ত্রীরা জল দিয়ে গুঁড়ো-করা শস্য, 'উর্বর' ডিম, কাঁচা দুধ এই সব তথাকথিত 'স্বাস্থ্যকর খাদ্য' কিনে সংসারের খরচ বাড়ান। শুধু যে এতেই খরচও বাড়ে তা নয়, এই সব ধারণা আমাদের খাদ্যশিল্প সম্পর্কেও অবিশ্বাস জন্মায়।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষাগত—যাঁরা খাদ্য সম্বন্ধে এই সব ভুল ধারণায় আস্থা স্থাপন করেন, তারা আজ বিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি মোটেই বিশ্বাস করতে পারেন না।

আজকের যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য সম্পর্কে বহুল প্রচারিত কতকগুলো ভুল ধারণা, এবং ঐ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের তালিকা দেওয়া হোল। আপনার খাদ্য বস্তু সম্পর্কে কুসংস্কার দূর করতে এই সব তথ্য আপনাকে সাহায্য করবে।

১। সাদা ডিম বাদামী রঙের ডিম থেকে বেশী পুষ্টিকর।

—প্রকৃত তথ্য হচ্ছে ডিমের রঙের উপর উহার গুণাগুণ মোটেই নির্ভর করে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুরগীর ডিম ভিন্ন ভিন্ন রঙের হয়।

২। বাড়ীতে-ভাঙা আটা বা ময়দা কলে-ভাঙা আটা বা ময়দা থেকে বেশী পুষ্টিকর।

—আসলে কলে-ভাঙা গম আর চাকীতে-ভাঙা গমের গুণগত কোন পার্থক্যই নেই। কলে না ভেঙে বাড়ীতে কষ্ট করে গম ভাঙানোর চেষ্টাকে বর্তমানে মিলের কাপড় বাদ দিয়ে আজিকালের সেই চরকা-তাঁতের আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

৩। কৃত্রিম মাখন আসল মাখন থেকে কম ক্যালরি খাদ্যযুক্ত থাকে।

—এটাও মোটেই সত্য নয়। দুটোর মধ্যেই ক্যালরির পরিমাণ সমান।

৪। চিটাগুড়, রক্তশূন্যতা আর বাতের রোগীর পক্ষে ভাল।

—চিটাগুড়ের মধ্যে ভিটামিন আছে একথা সত্য, এর মধ্যে অন্য কোন বিশেষত্ব নাই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এই গুড় জীবজন্তুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়—এবং এটা ঐ ভাবেই ব্যবহৃত হবে।

৫। মাংস, ডিম আর দুধ না খেলে গেঁটেবাত সেরে যায়।

—এ রকম কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না।

৬। প্রচুর পরিমাণে মাছ এবং সেলারী শাক খেলে মস্তিষ্কের উন্নতি হয়।

—এ ধারণাও ভুল। ফসফারাস মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী; আর মাছে ফসফারাস আছে এজন্যই সম্ভবতঃ মাছ খাওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু মাংস, ডিম আর দুধেও প্রচুর পরিমাণে ফসফারাস আছে। এইগুলিও মাছের চেয়ে কম উপকারী নয়। কিন্তু সেলারী শাকে ফসফারাস নেই। কাজেই সেলারী শাক মস্তিষ্কের উন্নতি করতে পারে না।

৭। ঝিনুক, কাঁচা ডিম এবং অলিভ যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে।

—অন্যান্য বহু খাদ্যের মতই এগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। কিন্তু যৌনশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে এর বিশেষ কোন গুণ নেই।

৮। পপকর্ণ নামে এক জাতীয় ভুট্টা মাংস এবং দুধের স্থান ণ করে।

—ভুট্টা কখনও মাংস আর দুধের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। কর্ণের মধ্যে ক্যালরি আছে যথেষ্ট কিন্তু মাংস আর দুধের মধ্যে ছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটীন ও ধাতব পদার্থ; পপকর্ণের মধ্যে ছটো একদম নেই।

৯। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে অতিরিক্ত খাদ্য য়াজন।

এটাও অলীক কল্পনা। তিন বার উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ লেই শরীর ঠিক থাকে। অনাহারেও মস্তিষ্কের কাজের বিশেষ ন তারতম্য হয় না। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক স্থ্যের ১২ জন ছাত্র দুইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪½ দিন করে না খেয়ে ক। ঐ সময় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে অনাহারে দের বুদ্ধিবৃত্তি বা উপলব্ধির বিশেষ কোন তারতম্য হয়নি।

১০। রোষ্ট করা মাংস রান্না করা মাংসের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর।

—পরীক্ষা করে দেখা গেছে রান্না করা মাংস আর রোষ্টের মধ্যে ন মূলগত পার্থক্য নেই।

১১। পাকা এবং সুমিষ্ট চেরীফল দেহের জীর্ণ তন্তুকে নষ্ট র দেয়।

—কোন খাদ্যই দেহের তন্তুকে নষ্ট করতে পারে না। বুড়ো য়দের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে দেহের পুষ্টির পক্ষে সহায়ক খাদ্য য়মত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের যখন বয়স খুব বেশী বাড়তে ক তখন আগের মত কর্মক্ষমতা থাকে না। সেই সময় আগের মতই বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে কিন্তু পরিমাণ টো কম।

১২। টাটকা কমলালেবুর রস জমানো কমলালেবুর রস অপেক্ষা উপকারী।

কমলালেবুর মধ্যে ভিটামিন সি থাকে খুব বেশী। টাটকা র জমাট সব কমলালেবুর মধ্যেই ভিটামিন সি সম পরিমাণেই ক। কাজেই উপকারিতার দিক থেকে এদের মধ্যে কোন তম্য নেই।

১৩। সব রকম ফল এবং শাক-সব্জী কাঁচা খাওয়া উচিত।

—সব খাদ্য তার স্বাভাবিক অবস্থায় খেতে হয় এইরূপ তত্ত্ব কই বোধ হয় উক্ত ধারণা প্রচলিত হয়েছে। শাকসব্জী রান্না করা হজমের সুবিধা এবং সুস্বাদু করার জন্য। কিন্তু এটা ঠিক যে করে সিদ্ধ করলে খাদ্যের ধাতববস্তু ও ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

১৪। শসা আর তরমুজ খেলে পোলিও রোগ হয়।

—এক জাতীয় জীবাণু পোলিও রোগ সৃষ্টি করে। কোন ইই ঐ জীবাণু থাকে না।

১৫। খোলা ক্যানের মধ্য থেকে খাদ্য বের করে নেওয়া ত—ঐ ক্যানে খাদ্যবস্তু থাকা বিপজ্জনক।

—যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলেছেন যে, নটি খোলার পর খাদ্যবস্তু সেই ক্যানের মধ্যেই রাখা ভাল। কিন্তু ক্যানটি ঢাকা দিয়ে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে হবে। খাদ্যবস্তুর অম্ল পদার্থ কিছু থাকলে ঐ ক্যান থেকে সামান্য পরিমাণে হা গন্ধ যেতে পারে, কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়। এই সব ক্যানে খাদ্য ভরতি করার সময় ক্যান এবং খাদ্যবস্তুকে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া হয়। অন্য কোন পাত্রে জীবাণু থাকতে পারে এবং ফলে খাদ্যবস্তু নষ্ট হয়ে যেতেও পারে।

১৬। শাকসব্জী রান্না করার সময় জল তিনবার করে পালটিয়ে নিতে হয়।

—রান্না করার আগে সব শাকসব্জী বা কাঁচা জিনিষই ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। কিন্তু রান্নার সময় জল বদলানো উচিত নয়। শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি রান্নার সময় জল যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল, না হলে ভিটামিন আর ধাতবপদার্থ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৭। দুধ কোষ্ঠবদ্ধকারক :—

এই তথ্যও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দুধ খাওয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি হবে কোন রোগী বেশী পরিমাণ দুধ খেলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য খাদ্য কম খাবে। কাজেই কোষ্ঠবদ্ধতার রোগীকেও দুধ দেওয়াতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গুণসম্পন্ন খাদ্যও খেতে হবে।

১৮। জল চর্বি বৃদ্ধি করে।

—এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। জলের মধ্যে ক্যালরি থাকে না, কাজেই চর্বি বৃদ্ধিতে বিন্দুমাত্র সহায়তাও জল করতে পারে না।

১৯। বরফজল খেলে হৃদরোগ হতে পারে।

—হৃদ্‌রোগ হওয়ার কারণ ভিন্ন। তবে বিশেষ ধরণের কোন একটি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগী বরফজল অথবা অন্য কোন উত্তেজক পানীয় পান করলে বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতে পারেন।

২০। খাওয়ার পর স্থিপ করলে ওজন কমে।

—ওজন কমানোর এই পথ একেবারেই বাজে। খাওয়ার পর স্থিপ করলে অবশ্য ক্ষুধা বাড়তে পারে—পরের বার খাওয়ার সময় আগের থেকে বেশী করে খাওয়া যায়। স্বাভাবিক পরিমাণে তিনবার খাওয়ার চেয়ে কম পরিমাণে 'বার বার খেলে হয়তো অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ হতে পারে।

২১। পাঁউরুটি অপেক্ষা রুটির মধ্যে ক্যালরি কম থাকে।

পাঁউরুটিকে সেঁকে নিয়ে টোষ্ট করতে হয়। একমাত্র পাঁউরুটির জল শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া টোষ্টের মধ্যে পাঁউরুটির সব গুণই থাকে। জলের মধ্যে ক্যালরি নেই। তাই টোষ্টের ক্যালরির কোন হেরফের হয় না।

২২। দুধ-মেশানো কফি র-কফির চেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

—দুধ বা চিনি ছাড়া কফিতে কোন ক্যালরি নেই। কফির সঙ্গে দুধ আর চিনি মেশালে কফিতে ক্যালরির সৃষ্টি হয় অথচ কফির উত্তেজনা বৃদ্ধি শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

২৩। আঙুরের রস ক্যান্সার আরোগ্য করে।

—পরীক্ষা করে এ রকম কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

২৪। রোজ একটা করে ভিটামিন ট্যাবলেট খেলে স্বাস্থ্য যদি ভাল হয়,—তবে রোজ দুটো-তিনটে ট্যাবলেট খেলে স্বাস্থ্য আরো ভালো হবে।

—আসলে কিন্তু অতিরিক্ত ভিটামিন খেলে ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের পক্ষে ত বটেই। কাজেই কোন অসুখ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন মত ভিটামিন খেতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে শরীরের পুষ্টির জন্য সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্যই যথেষ্ট। এই খাদ্যতালিকায় থাকবে কিছুটা দুধ, সামান্য পরিমাণ মাংস, মাছ অথবা ডিম, কিছু পরিমাণ শাকসব্জী এবং ফল আর ততটা পরিমাণের রুটি বা অন্য কোন খাদ্যশস্য।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার কৃথ এল্ টুয়েনম্যান বলেছেন, "অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য কিছুই নেই; দরকারী হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টিজনক খাদ্য।"

আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে খাদ্য সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো ত্যাগ করুন।

সহরের রাস্তায় খালিপায়ে চলবেন না

খালিপায়ে পথ চললে কি পায়ের গঠন ভাল থাকে?—এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ওয়াসিংটনের ডাঃ আ[illegible] রুবিন।

তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের পথে যেখানে পাকা রাস্তা নেই সেখানে খালিপায়ে হাঁটা পায়ের পক্ষে মন্দ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে চলার সময় পায়ের সব জায়গাতেই সমান জোর পড়ে পায়ের স্বাস্থ্যে[illegible] ভাল করে তোলে।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে বেশীর ভাগ সহরেও রা[illegible] পাকা। এখানে খালিপায়ে পথ চললে পায়ের একই অংশের উপ[illegible] সব সময় জোর পড়বে। ফলে সেই অংশগুলো বেশী শক্ত হ[illegible] সমস্যার সৃষ্টি করবে। কাজেই সহরের পথে জুতো পায়ে দিয়ে প[illegible] চলা নিরাপদ তো বটেই, পায়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্যও একা[illegible] অপরিহার্য। জুতো পায়ে থাকলে চলার সময় জোরটা পায়ের [illegible] অংশেই পড়বে। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশে অর্থাৎ ঘাসে-ঢা[illegible] নরম পথে খালি পায়ে চলতে আপত্তি নেই।

সেই ছেলে

কান্তা দাশ

অমৃত লীলার সন্ধানে
জন্ম নেয় এক শিশু,
মুখখানি হাসিতে ভ'রে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্ট অবিশ্রান্ত ঘটনায়
বিপর্যয়ের সূত্র ছিঁড়ে সেই শিশু বাড়ে।
অবাক আমি কণ্ঠে প্রশ্নের বারুদ চেপে
বিস্ময় মনে নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি,
দেখি—
জল-জল সংগ্রামীর রক্তাভা পথে
রক্তগামী নিশান অগ্রবর্তী হাতে
ওই শিশু
কঠিন আলাতে বারুদ মেশানো মনে
বিস্ফোরক বিক্ষোভে:
ধরিত্রীর রুদ্ধ বাতাস মুক্ত করবার অঙ্গীকারে
পুঞ্জীভূত মনের আগুনে মিছিলে জাগে,
মনুষ্যত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে
ধনীদের অভিশাপ কুড়ায়,

আর একদিন···?
শিশু ঝড়ের রুদ্ধ গতিতে
মনের উত্তাপ শাখায় বাঁচবার প্রতিজ্ঞায়
কাদের পাপে—
বুকের রক্ত উগ্র শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।
কেন?
ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করি
মনের কার হাজার ব্যথা নিয়ে,
মনুষ্যত্বের আদর্শের জ্বলন্ত শপথে
গুপ্ত গুহায় নীরব নিস্পন্দ অন্ধকার ছিন্ন করে
যে শিশু জেগে ছিল
কেশরদোলা ঝড়ের রাগে,
হঠাৎ কেন সে হারিয়ে গেল রক্তঝরা কুয়াশাতে
তাই—
সূর্যোদয়ের মহাক্ষণে দীপ্তমুখে
শিশুরা উঠে আশার নতুন পথ চেয়ে,
জানো আমার মনের আকাশ কাঁপে।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫০। বৃষভানুগৃহিণী বললেন—"ব্রজেশ্বরি, এ যে আমার অবিবেচনার কাজ হয়েছে, তা আপনি ঠিকই বলছেন। তবে আমার মেয়েটি রন্ধনরসিকা। ওটি ওর স্বভাব। তার উপর বিশেষ করে আজকের দিনটি উদার আনন্দের মহোৎসবের দিন। দারাসুত নিয়ে ভোজন করবেন ঘোষাধীশ, তাই মেয়ের আমার বুদ্ধি ভাল, নিজেই রান্নার কাজ নিয়ে মেতেছে। ওরও আনন্দ কি কম? আর তাও বলি, ওর হাতের এমনিই গুণ যে যাই রাঁধুক না কেন, সে রান্নাটি হতেই হবে চেহারায় ভাল, মুখরোচক আর সুগন্ধি।

৫১। তাই, ওর বাপ কৌতুক করে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওদিকের ঘরে আরোও অনেক রাঁধিয়ে রয়েছেন; পুরুষই বলুন আর মেয়েই বলুন, সকলেই নিজেকে নিজে কৃতার্থ করতে চাইছে আজ। এখন আপনাকে স্বয়ং এঁদের অভিভাবিকা হয়ে দেখতে হবে, সামঞ্জস্য রেখে উল্লাসের সঙ্গে সব ঠিক্‌ঠাক হচ্ছে কিনা।"

কথা শুনে ব্রজের পরমেশ্বরী যেই হাসতে হাসতে বলেছেন—"তাহলে যেমনটি আদর ক'রে রাধা আমাদের বেঁধেছেন, ঠিক তেমনটি শিল্প ফলিয়ে রোহিণীকে করতে হবে পরিবেশন···"

৫২। অমনি কথার শেষ না হতে হতেই বলে উঠলেন বৃষভানুগৃহিণী—"ঘোষেশ্বরি, রাম আর কৃষ্ণ, আহা, আমাদের কুমার দুটি, যেন শ্বেতকমল আর নীলকমল। তাঁদের আর আমাদের ঘোষরাজাকে, এবং স্বামিসোহাগিনী আপনাকে আর রোহিণী দেবীকে পরিবেশন করতে দিন আমার মেয়েটিকে। শ্যামা, ললিতা, ললিতার বাল্যসখীরা, তারাও কেউ কম যায় না, লঘুহস্তে তারা বরঞ্চ পরিবেশন করুক শ্রীকৃষ্ণের সহচরদের।"

৫৩। এসব শোন্‌বার মত কথা, কানে পশবেই। কিন্তু মনের ভাব গোপন করলেন রাধিকা। মিষ্টি-মধুর একটি হাসি অধরকিশলয়টিকে ম্লান করতে করতে হঠাৎ যেন কেমন লয় পেয়ে গেল। নিরুদ্ধ বাণীর মধ্য দিয়ে তার আত্মগরিমা হঠাৎ যেন দেখিয়ে গেল এক অভিনয়; সৌহার্দ্যের তীব্র নীতিশব্দটিকে সখীদের হৃদয়ে যেন ছুড়ে মারতে মারতে নিম্নকণ্ঠে তিনি মাকে বললেন,—"একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি মা, ব্রজেশ্বরী আর আপনি যদি বলেন তাহলে ভিতর-বাড়ীতে পরিবেশনের ভার আমি নিই। বাইরে পরিবেশনের ভার নিন শ্যামা। আমাদের মধ্যে উনিই একমাত্র সাবধানী। ওঁর পক্ষে ভালই হবে।"

৫৪। পরস্পরের সমান ইচ্ছে, সমান ভাব, সমান ভাবের উদ্বোধন, সমান পাণ্ডিত্য। শ্যামা বললেন—"অমন হরিণচোখে আর নীতিশাস্ত্র শেখাতে হবে না সই! মোটেই উপাদেয় নয়, পরিবেশনে যত্নবতী হওয়া আপনারই কর্তব্য, কারণ আপনার পিতৃদেবই নিমন্ত্রণ করেছেন এঁদের। এঁদের সকলেই শিবঠাকুর ইত্যাদিদের মতই দুঃখ ঘোচাতে পারেন।"

৫৫। অতএব আরম্ভ হয়ে গেল দুটি কলহংসিকার মধ্যে কৌতুক-কলহ। সে কলহ সকলের কানে ঢালতে লাগল অতিরস। রসদ জোগাল কুতুহলের। এমন আমোদ আর কখনও পান নি ব্রজেশ্বরী। বাৎসল্যের, সম্পদের, মাধুর্য্যের যিনি ঈশ্বরী তাঁরও মনে অনির্বচনীয় একটি প্রীতির ফুল ফুটিয়ে দিল সেই কলহ। তিনি বললেন—"তোমাদের দু'জনের পক্ষেই ভাল হবে। অত ভয় কিসের? আমার আদেশ উপদেশ তোমাদের দুজনকেই দিশা দেবে। দুজনেই পরিবেশন করবে।"

৫৬। ঘননিবিড় আনন্দে তার পরে পড়তে লাগল সার সা গম্ভারী কাঠের পিঁড়ে, শুভ্র সূক্ষ্ম বসনের আসন পাতা হল পিঁড়ে উপর। ঐ দেখ বেঁকে-চুরে যাচ্ছে। ব্রজেশ্বরীর আদেশে, স বাঁকা সোজা হয়ে গেল। যাক্ এবার সবাই বসবেন সুখাস আনন্দে।

৫৭। পাদপদ্ম ধৌত করে উপবেশন করলেন সান্দ্রস্নেহে তাঁর স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে দক্ষিণে বসলেন স্ফটিকেন্দ্র-সুন্দর বলরা বামে বসলেন নীলমণীন্দ্র-সুন্দর কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বামে বসানো কুসুমাসবকে। দ্বিজন্মা বলে কী তাঁর মোষের মত তার খা তাঁর বামে বসলেন যথাক্রমে সুবলাদি কৃষ্ণের প্রিয় সহচরেরা।

ব্রজের ঐশ্বর্য্যের মাঝে উপবেশন করে ঐশ্বর্য্যের মূল কা ব্রজরাজ ছোট একটি কল্যাণ-হাসি হাসলেন। ছড়িয়ে প অপূর্ব কমনীয় তাঁর আদর। কুতুহলী হয়ে উঠলেন হ সেই কুতুহলের ঢেউ লাগল গিয়ে দনুজেন্দ্র-দলন তদনু দ্বিজ বালকবর শুক বিদূষকে, এবং প্রণয় বন্ধু-বল সুবল সখাগণে যখন শোভার আভাসমা ব্রজরাণী ডাক দিলেন শ্রীরাধা কিন্তু এগিয়ে যাবেন কেমন করে বৃষভানুনন্দিনী? নবীন ও শ্রদ্ধায় আবদ্ধ হয়ে গেল যেন তাঁর চরণ। সৌন্দর্য্য যেন কম উপহার ফেলে গেল তার চরণে। আবার তাঁকে ডাক দি ব্রজরাণী। তিনি তখন বহুমান-পুরঃসর ব্রজরাজের থ পরিবেশন করলেন অন্ন। বাৎসল্যরস যাঁকে রাঙিয়েই রেখেছে আর আনন্দ পেতে কতক্ষণ, রামকে পরিবেশন করলেন শ্যামা।

৫৮। তারপর যখন রামানুজকে পরিবেশনের সময় এল ব্রজেশ্বরী বলে উঠলেন—

"বৃষভানুনন্দিনি, তুমি নইলে শ্যামার আর পরিবেশনের চলছে না। তোমার খুব কাছেই রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই বরং দাও।"

গ্রহের মত একটি আগ্রহের দুষ্ক্রিপা রাধার মধ্যে ফুটি-ফুটি হয়ে ফুটে উঠেছিল লজ্জা-ধ্বংসী একটি চাঞ্চল্য, শুকিয়ে গেল সেই অভিব্যক্তি। নিত্যকালের পরমায়ু একটি মৃদু আঘাতে যেন পরাস্ত হয়ে গেল তাঁর মন।

কম্পিত হল তাঁর কর। তারপরে জোর করে নিজেকে সামলে নিতে নিতে তিনি পরিবেশন করলেন শ্রীকৃষ্ণকে।

৫৯। ব্রজরাণীর আদেশে দু'জনেই যখন কুসুমাসবাদি সহচরদের পাতে পরিবেশন করতে লাগলেন অন্ন তখন আত্মশ্লাঘার খই ফুটল কুসুমাসবের মুখে।

প্রথম মৈ। "আমরা ব্রাহ্মণ, পৃথিবীর দেবতা-ষাঁড়। আমরাও আজ পবিত্র হয়ে গেলুম, বৃষভানুকন্যার হাতের রান্না খেয়ে।"

দ্বিতীয় মৈ। "সাক্ষাৎ লক্ষ্মী গো,···পরমা রমা। এর তুলনাটি কোথায় পাবে, কোন্ দেশে, কোন্ কালে?"

তৃতীয় মৈ। "বুঝলে হে, এঁর হাতের রান্না খাচ্ছ এর পরে আর···নাঃ, অন্য হাতের রান্না মুখে রুচবে না।"

চতুর্থ মৈ। "তুমি তো নিজের আলোয় নিজেই মগ্ন, এখন কি বলো হে বয়স্য।"

প্রহসন-মাধুরীর সে কী ঢেউ নাচানো বটুর, বৃষভানুনন্দিনীর হাতের রান্নায় সে কী পাতভরানো তার। থাকতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ মনের ভাব লুকিয়ে, রাগের ভাণ করে বললে—

"বাচাল, বাচালের বাক্যিতে কেবল প্রহসন, অত বকিস নি।"

৬০। বটু বললেন—"কেন বদন বুজে খাব নাকি? হাজার বদনে বকলেও কি এমন রান্নার ব্যাখ্যান ফুরোয়?"

৬১। বটু আর কৃষ্ণের মাঝখানে বসেছিলেন শ্রী শুক। নড়ে নড়ে উঠছিল তাঁর ঘাড়ের কুকাটিকা। দপ করে রেগে ওঠাই তাঁর স্বভাব। মনের মত কৃষ্ণের দেওয়া খাবার খেতে খেতে কী যেন বলবেন বলে যেই গলা বাড়িয়েছেন, অমনি বলে উঠলেন ব্রজেশ্বরী—"দ্বিজোত্তম, কি বলতে চাইছেন বলুন।"

বটু বললেন—"আজ দ্বিজোত্তম হয়ে গেছি।"

ব্রজেশ্বরী—"শুককে জিজ্ঞাসা করছি।"

৬২। শুক—"ওহে দ্বিজকুমার, দয়া করে তোমাকে আর চাতুরী ফলাতে হবে না বচনে। আমার চেয়েও তুমি বেহেট। আগল নেই তোমার মুখে। আর বলতে হবে না। নীরস চেষ্টা। রেহাই দাও ব্রজকুমারকে। বলে বসলেন কিনা "রমার চেয়েও পরমা" বলিহারি তাঁর সঙ্গে উপমার বহর। এ তোমার দুর্বার অপরাহত অপরাধ।"

শুনে ব্রজরাজ বলে উঠলেন—"কোন দেশের এ পক্ষী? —মহাবিজ্ঞ তো? ব্রজরাজকে পূর্ববৃত্তান্ত জানিয়ে দিলেন ব্রজেশ্বরী।

৬৩। ব্রজরাজ তখন বললেন—"তাহলে ইনি কেন নিজের দেবীর গৌরবকে টেনে নামাচ্ছেন?"

মহারাণী বললেন—"রমা দেবতা, তাঁর সঙ্গে রাধার উপমা? অপরাধের আশঙ্কা রয়েছে তাই রাধার জন্তে বেচারীর অত ভয়-ভাবনা, অত মমতা, রাধাকেও আবার ভয় করেন তো। অনেক বুদ্ধি খরচ করে বলেছেন।"

৬৪। এদিকে অন্য ঘরে ততক্ষণে মুখে কথা নেই, দুটি পরিবেশনকারিণী হেসেই কুটিপাটি। হাস্যমুখী রাধা শেষে বললেন—"একজোড়া দ্বিজন্মার বাচালতায় আমি যেন লজ্জার ডোরে বাঁধা পড়ে গেছি। সুন্দরী ভামা, তুমিই পরিবেশন কর ভাই।"

পরিবেশনের ভার হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেন রাধা। এর পরে সত্যিই ফিরে গিয়ে পরিবেশন করা অসম্ভব ব্যাপার বুঝেই ব্রজেশ্বরী গুণলেন প্রমাদ, অতএব নিজেই সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং রাধাকে ধরে নিয়ে এলেন পরিবেশন মাঙ্গল্যে।

৬৫। দুটি সখীই পুনর্বার রত হলেন পরিবেশনে। পূর্ব-ক্রমটিকে আক্রমণ করেই সে যেন এক পরাক্রম ফলিয়ে আরম্ভ হল এই পরিবেশন। আনন্দ ধরে না ব্রজরাণীর। মনে হল সস্নেহে অভিনন্দন জানিয়ে কিছু বলেন, কিন্তু মনে মনেই বললেন—"দ্বিজ-শিশুর অতি স্তবে লজ্জাস্রু বাঁধা পড়েছিলেন, পরিবেশনে তাই এমন এই অনিয়ম। অমুকের মেয়েই বটে! তা মেয়ে তুমি অমুকের মেয়ে নও, বটু সত্যিই বলেছে তুমি রত্নাকরেরই পুত্রী।"

কিন্তু মনের বলা এক আর মুখের বলা আর এক।

তাই মুখ দিয়ে কেবল বেরুল—"যথাক্রমেই গুণবতীর পরিবেশন চলুক, কেমন?" আজ্ঞায় বিজ্ঞা হলেন রাধা।

৬৬। এই রকমের সরস হাস্য পরিহাস ও পরিতোষের মধ্য দিয়ে ভোজন-পর্ব এগিয়ে চলল। খেতে খেতে ব্রজরাজ আনন্দে হাসছেন···হ্যাঁ রেঁধেছে বটে, পরিপাটি রান্না, পাকা হাত। অনুমোদনের সে কী ঘটা! যেন ব্যঞ্জনগুলিতে আবির্ভূত হয়েছেন ষড়রস। বলরাম প্রভৃতি সহচরদের ঐ একই দশা, সবাই তৃপ্ত। কিন্তু কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব। তাঁর মনে হল—খাচ্ছেন তিনি এবং যে দেবী রেঁধেছেন তিনিই খাওয়াচ্ছেন অন্ন; অথচ সেই অন্নে যেন একটি ভাবের সৌরভ লেগেছে; ও-অন্তর থেকে এ অন্তরের, এ-অন্তর থেকে ও-অন্তরের। রসান্তরের পথে তিনি যেন পৌঁছে গেছেন অভিরসথে।

৬৭। ভোজন-পর্ব সাঙ্গ হল নিমন্ত্রিত সকলকেই বরাম্বর, অঙ্গদ কঙ্কনাদি ভূষণ, মাল্য, আলেপন, তাম্বূল, স্তুতিবাদ ইত্যাদিতে অর্চনা করে বিশ্রাম নিতে চললেন বৃষভানু স্বয়ং। ভিতর বাড়ীতে তখন খেতে বসলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দুটি জননী। গরীয়সী ও দয়াবতী দুটিকে পরিবেশন করে খাওয়াতে বসলেন বৃষভানুনন্দিনী। যাঁর যেটি ভাল লাগছে আনিয়ে দিচ্ছেন সেটি তাঁকে, সে এক নবীন আমোদের ধারা। রসাস্বাদে মুগ্ধা হয়ে দুটি জননী বলাবলি করতে লাগলেন—"বটুর মুখের বালাই নেই, কিন্তু তখন যা বলেছিল এখন দেখছি ঠিকই বলেছিল ···এর পরে আর অন্যের হাতের রান্না মুখে রুচবে না বয়স্য।"

৬৮। তারপরে ব্রজেশ্বরী বললেন—"রাধিকা, তোমার কাজের ধারা বড় সুন্দর! তোমার হাতের রান্না না হলে এর পর দেখছি কারোর হাতের রান্না আর আমার মুখে রুচবে না। আমার ছেলেটিরও না। তাই ভাবছি, আগে থেকেই তোমার গুরুজনদের এমন হিত-কথায় অনুরোধ করব, যা অনুমতির আভাস না পেলে এমন ভাবে সেটিকে বোধ করব, যাতে করে তুমি আমার ঘরে সৌখীন রাঁধুনী হয়ে আবির্ভাব হও, আমার হাতে নিত্যনূতন গয়নাগাঁটি পাও আমারও লাভ হয়, আর আমার কৃষ্ণেরও মঙ্গল হয়।"

৬৯। সেই শুনে রাধাজননী বলে উঠলেন—"ব্রজেশ্বরীর বুদ্ধি বটে! আমাদেরও বুদ্ধি খুলল। কথায় যেমন আলো তেমনি প্রেম রাধাকে তো বাড়াচ্ছেনই, যাঁরা প্রীত করেন তাঁদেরও তুষছেন প্রত্যহই···সাত তাড়াতাড়ি গিয়ে ও রেঁধে দিয়ে আসবে, সত্যিই যাবে আপনার বাড়ী। আপনার প্রসাদেই তো ব্রজলোক আজ লোকোত্তর, কালচক্রও তাকে কাঁপায় না, আপনিই আমাদের গতি

গুরুজনদের কাছে এই যে সম্মতি পাওয়া হল, সেই থেকে অন্ত গেল বাধায় গমনাগমনের ভয় এবং প্রশস্ত হয়ে গেল···যা মন চায়, তা পাওয়ার পথ।

১০। এই ধরণেই, কিন্তু প্রকারান্তরে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোকুল-কুললললনাদের হৃদয়-কারাগারের অভ্যন্তরে, হৃদয়-চোরের মত দুর্দান্ত ভাবে বাঁধা পড়ে যেতে লাগলেন গোকুলচন্দ্র। হৃদয়গুলিও যেন প্রবল ভাবে ও দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে লাগল কান্ত-সান্নিধ্যের সিক্ত-শোভনতা। ফুল তোলার নাম করে লতাকুঞ্জে ঘুর-ঘুর করার সাধ তাঁদের বেড়ে গেল। যৌবনের সম্পত্তি দিলে, যে দেবতা মিলিয়ে দেন মনের মানুষ, অঙ্গহীন সেই দেবতার মতই সেই কুঞ্জে যে ঘেড়িয়ে বেড়ায় তাঁদের হৃদয়নাথ অঙ্গসঙ্গের চাহিদার তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু ফুলবাণ যে রেহাই দেয় না কাউকে,···বিঁধবেই। তাই মিলনের শিক্ষার নীচে···রসের প্রদীপ হতে চাইল সকলের মন। কুঁড়ি ছিল, কুসুম হয়ে ফুটল অনুরাগ, এক বছরের এই খেলায়। আকাশের মেঘ কি অত নীল হয়?

এই খেলায় দোষের যে সম্ভাবনা থাকতে পারে, ভাবতেও পারলেন না গুরুজনেরা। কারণ, যিনি বিশ্বসুহৃদরূপে চির-জাগরূক হয়ে রয়েছেন হৃদয়ে, নিখিল ব্রজজনের যিনি প্রেমাস্পদ, তিনিই যে তাঁদের অকৈতব প্রেমের আশ্রয়। আত্মসাধারণ্য উপাধিহীন, স্বানুকূল দোষানুসন্ধানশূন্য অভিসরণ করতেন ললনারা, তখন তাঁদের প্রণয় চাপল্য আচ্ছন্ন হত না গুরুজনদের বাধায়, সফল হয়ে উঠত তাদের মনোরম।

১১। এই নিত্যসিদ্ধাদের মধ্যে, এই লক্ষ্মীর চেয়েও প্রেয়সী ও প্রেয়সীদের মধ্যে যোগমায়া তাঁর নিজের মায়াছন্দের আনুকূল্যে সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন "উচ্চারতির" অর্থাৎ 'আমরা পরকীয়া' এ ভাবনাটির এবং সেই ভাবনাটিকেই পূজা করতেন গোকু কুলললনারা···উৎকণ্ঠা, ভয় প্রভৃতি প্রেমসঙ্কোচের নৈবেদ্য দিয়ে 'আমরাই গুরুজন' এই অভিমান করতেন যে সব গৌরবান্বিতারা 'আমাদেরই পতি' এই অভিমান ছিল যে সব নারীদে সেই "যোগমায়ারই" কৃপায় তাঁদেরই তত্তৎ-প্রতিচ্ছায়ায় সৃ হয়ে গেল তাঁদেরি কান্তি-স্বরূপিণী অন্যা নারী এবং সেই মায়িব নারীগণও বিরাজ করতে লাগলেন যে যার স্ব-স্ব গৃহে গৃহে। এব "যোগমায়ার" কৃপাতেই গুরুজনদের অবিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কৃষ্ণে সঙ্গে তাঁদের নদী-সাগরের মত মিলন প্রসঙ্গ।"

১২। এই রকমের একটি সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হলেও শ্রীনন্দ যশোদার মধ্যে কিন্তু উদিত হল এক অভিনব অনুভূতি। বাৎসল্য লতায় বাঁধনে তাঁরা বাঁধা। শিব-ব্রহ্মা-বন্দনীয় তাঁদের তনয় যে সময়ে কুসুমশরের শরণ্যতায় যশোধারী হয় মানব, পুত্রের সে কৈশোর-কাল উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিন্তু অনুভব করলে কিশোর হয়নি তাঁদের পুত্র, এবং কমনীয়তার পৌগণ্ড ভমরব নি ছেলের পৌগণ্ডও এখনও যায়নি ও শীঘ্র যাবে না। অতএব কম নয়নাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন-প্রসঙ্গ সহসা সঙ্গোপনীয় না হলে তাঁদের উভয়ের কাছেই হয়ে রইল সম্ভাবনার অবিষয়।

১৩। এমন কি, বস্তুমহিমার পরাক্রমেই গোকুলকু ললনাদের উপর আপনা হতেই তাঁদের অভ্যস্ত হয়ে গেল···ব সম্বন্ধ; অসহ্য বোধ হল···সম্বন্ধশূন্যতা। স্বভাব-শক্তির ব বিস্ময়কর তেজোবৈভব!

[ক্রমশঃ

ইতি নিমন্ত্রণ-স্বীলাম-কৌতুকো নাম দশমঃ স্তবকঃ।

অবাঞ্ছিত অতিথিকে এড়াতে চান?

সম্ভবতঃ আপনি কখনও না কখনও অবাঞ্ছিত অতিথি সমাগমের অস্বস্তি ভোগ করে থাকেন? এমন অবস্থায় পড়েন যখন ভদ্রতা বাঁচিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার উপায় অন্বেষণ করেন মনে মনে? আমাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয় মাঝে মাঝেই। এই সমস্যা নতুন কিছু নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর এক অনামী দার্শনিক এই প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলে গেছেন বহুপূর্ব্বেই, 'অনাহূত বান্ধব সময়াপহারী তস্কর মাত্র।' এখন প্রশ্ন এই যে, এরূপ অবস্থাপন্ন মানুষের কি করণীয়? ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে 'Prevention is better than cure'. অর্থাৎ রোগ 'আরোগ্য করার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা অধিকতর কাম্য, সে হিসাবে অবাঞ্ছিত অতিথির আগমন-সম্ভাবনা মাত্রই বর্জনীয়। সুচতুর সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব নিয়োগ করে আপনি অন্ততঃ অফিসে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্ত হতে পারেন, এই কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী আপনার পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কারণ একথা কি স্বতঃসিদ্ধ নয় যে, সময়োচিত মিথ্যা উদ্ভাবনে পুরুষাপেক্ষা নারীজাতির মস্তিষ্ক অনেক বেশী উর্ব্বর?

অতএব একটি বুদ্ধিমতী মেয়েকে একান্ত সচিবরূপে বরণ করুন, তারপর প্রয়োজনমত তাঁকে শুধু বলে দিন যে, 'ভদ্রে! আপনি অতীব তীক্ষ্ণধীসম্পন্না, আপনাকে আর বেশী কি কইব, শুধু দেখবেন যেন কাজের মাঝে আমাকে কেউ না জ্বালায়।' অতঃপর অবাঞ্ছিত ভী ঠেকিয়ে রাখার জন্য এই সুশীলা রমণীটি যে সব উপায় অবলম্ব করবেন, তা জানতে পারলে আপনার নীতিবোধ কিঞ্চিৎ বিপর্য্য হবে বটে কিন্তু উদ্দেশ্য সাধিত হবে যথাযথই।

নির্ব্বাক ভাবে শুনবেন আপনার প্রভুভক্ত সেক্রেটারী এ সত্যান্বেষ্টে কখনও মরণাপন্ন রুগী জানিয়ে আপনাকে নার্সিং হো পাঠাচ্ছেন, কখনও অফিসবোর্ডের জরুরী মিটিং-এ বসাচ্ছেন অ কখনও বা আকস্মিক দুর্ঘটনাগ্রস্ত পত্নীর (আপনার স্ত্রী থাক না থাক) পাশে হাজির করে দিচ্ছেন। স্বকর্ণে শুনে এই নির্জলা সত্যভাষণের প্রতিবাদমাত্র করতে পারবেন না আপনি কা তাতে ক্ষতি আপনারই। এসত্ত্বেও যদি কোন নাছোড়বান্দার হা হতে নিষ্কৃতি না পান সামনা-সামনি হতেই হয় তার সঙ্গে তখন দেখবেন বিপদে মধুসূদনের মতই আপনার সেক্রেটারী প্রবেশ কর অকুস্থলে, ব্যাকুল উদ্বেগ চোখে-মুখে ফুটিয়ে যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকা সে আপনাকে জানাবে, স্বয়ং বড়সাহেব বোর্ড মিটিং-এ আপন উপস্থিতি তলব করেছেন সেই মুহূর্ত্তেই। ব্যস, আপনাকে পায় কে অবাঞ্ছিত হতভাগ্যের চোখের সামনে দিয়েই হাওয়া হয়ে যাবে আপনি স্বচ্ছন্দে, ভদ্রতাসূচক কয়েকটি অর্দ্ধোচ্চারিত অসমা কথার মধ্যেই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

যোগভ্রষ্ট

আলোচ্য উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক রচনা। তারাশঙ্কর মহৎ স্রষ্টা, তাঁর সাহিত্যে তাই আমরা [জী]বনের গভীর স্পন্দনকেই অনুভব করতে পারি নানা বৈচিত্র্যের [মা]ধ্যমে। বর্ত্তমান গ্রন্থটিও সেই জীবনবোধেরই পরিচয়বাহী। ভূমিকায় [লে]খক উল্লেখ করেছেন যে কিছুদিন হতেই সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে [তাঁ]র মনে যে সংশয় জেগেছে—মানুষ কেন আসে এ পৃথিবীতে, [মহা]ন মহাশক্তি এর—পেছনে আছে কি না, এই মর্মজিজ্ঞাসাই এই [গ্রন্থ] রচনার কারণ। তাঁর অন্তরের মর্মান্তিক ব্যাকুল প্রশ্নেরই [স্ব]তঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে [ক্ষ]ত-বিক্ষত হয়েছে সুদর্শন আর তার জীবন-জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে [তী]ব্র থেকে তীব্রতর দিনের পর দিন, ফাঁসির মঞ্চে জীবনাবসানের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে প্রশ্ন করে গেছে "আমি কে, আমি কী, আমি [কে]ন"? এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন মানবের; উদ্দেশ্যহীন আদর্শহীন—[আ]ধুনিক মানুষের তো এটাই একমাত্র প্রশ্ন, জীবনবোধসম্পন্ন [আ]ধুনিক মানুষ সর্বক্ষণ এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে, [বস্]তুবাদী এই জগতে ঈশ্বরবাদের স্থান নেই, অথচ সব সংশয় [থে]কে একদিন মানুষ মুক্তি পেয়েছিল শুধু এইটুকুরই জোরে। [...] গলিত ঈশ্বরবাদ বর্ত্তমান মেনে নিতে পারে না, আর সেজন্যই [...] আত্মার অশান্ত ক্রন্দনেরও অন্ত নেই। তারাশঙ্করের অনিন্দ্য [লেখ]নী এই যুগযন্ত্রণাকেই অনবদ্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছে। হতাশা-[...] সংশয়পীড়িত মানবাত্মার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য [গ্রন্থ]টির প্রতি ছত্রে, যে জিজ্ঞাসা, যে প্রতিবাদের উত্তর বর্ত্তমান [যুগে]র প্রত্যেকটি জীবনবোধসম্পন্ন মানুষই অন্বেষণ করে চলেছেন [নিরল]স অক্লান্ত ভাবে।— গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ, প্রকাশক—[...]বর্ণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ [মূল্য]—পাঁচ টাকা।

নির্বাসিতের আত্মকথা

আলোচ্য গ্রন্থখানি অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ [বন্দ্যো]পাধ্যায় লিখিত একটি পুরানো বইয়ের আধুনিকতম [সংস্ক]রণ। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে একদিন যাঁরা জীবন-মৃত্যুকে [পায়ে]র ভৃত্যসম জ্ঞান করতেন লেখক তাঁদেরই অন্যতম। সেদিনের [...] আজ রূপকথায় পর্য্যবসিত, ত্যাগ দুঃখবরণের অগ্নিপরীক্ষা [...] হয়েছিল সেদিন যাঁদের, তাঁদের কথা আজকের স্বাধীন ভারতের [নাগ]রিকেরা কতটুকুই বা মনে রেখেছেন? তবু এ সত্য অনস্বীকার্য্য [...] তাঁদের ভুলে যাওয়া চলে না, ভুলে যাওয়া অপরাধ। এই সত্যেরই [...]র বহন করে এনেছে বর্ত্তমান গ্রন্থটি। লেখক বিখ্যাত [মা]ণিকতলা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড নিয়ে যান আন্দামানে, সেখানে যে দশ বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন কয়েদীরূপে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিবৃত করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে। লেখকের ভাষা বেগবান ও সরস, মর্মান্তিক দুঃখের কথাকে তিনি যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে অভিভূত হতে হয়, কোথাও এতটুকু হতাশার সুর নেই, নেই বেদনার কাঁদুনি গাইবার সামান্যতম প্রয়াস। যে নির্ভীক অনমনীয় মনোবল একদিন প্রেরণা যুগিয়েছিল বাঙলার এই বীর সন্তানদের "ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান" গেয়ে যাওয়ার তারই সুরে অনুরণিত সমগ্র রচনাটি। বইটি এক কথায় অনবদ্য। আমরা পুস্তকটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। বইটির আঙ্গিক রুচিসঙ্গত। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—তিন টাকা।

অপরাহ্ণ

প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিমল করের আধুনিকতম উপন্যাস "অপরাহ্ণ"। আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসধর্মী বড় গল্প বলাই বোধ হয় সমুচিত, পাত্রপাত্রীদের আত্মকথার মাধ্যমে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে; তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ভঙ্গীতে চারটি মানুষের মনের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখক এই ধরণের লেখা লিখতে পারদর্শী, বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাঁর সেই পটুত্বের স্বাক্ষর রয়েছে, নরনারীর প্রেম যে শুধু যৌবনেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, শুধু জৈবিক নিয়মেরই দাসত্ববাহী নয়, যৌবনের অপরাহ্ণে আগত্যা কমলা ও প্রৌঢ় অবিনাশের জীবনে এই প্রশ্নই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল একদিন, জীবন-গোধূলির এই শান্ত ও প্রসন্ন প্রেমকে গ্রহণ করতে পারল না কমলার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যা, স্বীকৃতির বদলে ধিক্কার দিয়ে তারা সরে গেল দূরে। স্বজন-পরিত্যক্ত কমলার জীবনে প্রেম এলো রিক্ততার উপহারে ডালি সাজিয়ে; প্রেমের দামে কি পেলো আর কি পেলো না, এই আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জ্জরিতা হল কমলা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পলে। নিপুণ কলমে লেখক কমলার অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি যে আমাদের আনন্দ দিয়েছে একথা আমরা অকুণ্ঠেই স্বীকার করি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য তিন টাকা।

উত্তর পুরুষ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র আজ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধিকারে, নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সদ্যপ্রকাশিত একখানি বড় গল্প বা উপন্যাস। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বর্ত্তমান সমাজের একটি নবাগত সমস্যা, পুত্রবতী নারীর পুনর্বিবাহ,

আজকাল বহু সংসারেই এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, আলোচ্য বইটির নায়িকা, স্বামীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এই ঘটনা তার পূর্বস্বামীর পিতামাতার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে ও তাঁরা তাঁদের বংশধর বাচ্চুকে তার মার সংস্পর্শচ্যুত করে মানুষ করে তুলতে প্রয়াসী হন, নায়িকা ইভার মাতৃহৃদয় ফেলে আসা সন্তানের মায়ায় অস্থির হয়ে ওঠে বার বার। বার বারই সে ছুটে যায় বাচ্চুর খোঁজে তার পূর্বস্বামীর গৃহে, এই টানাপোড়েন চলে বাচ্চুকে নিয়ে তার মা ও পিতামহের মাঝে অবশেষে বাচ্চুর বৃদ্ধ পিতামহের মৃত্যুর পর সে কেমন সহজে তার বংশের উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেয় সেইটুকুর ইঙ্গিত দিয়েই উপন্যাসটি সমাপ্ত করা হয়েছে। এই সমস্যামূলক উপন্যাসটি নিপুণভাবে রেখায়িত হয়েছে যশস্বী কথাশিল্পীর কুশল কলমে, মাতার পুনর্বিবাহ সন্তানের জীবনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তার একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় বইটিতে, লেখকের ভাষা সহজ ও মনোরম, সাবলীল ভঙ্গীতে বলা গল্পটি পাঠকের ভাল লাগবে বলেই আমরা আশা করি। আঙ্গিক সাধারণ। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ঋণাঞ্জলি

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রীনির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মূল গ্রন্থের সম্পূর্ণ রস বজায় রেখে এই অনুবাদটি আমাদের উপহার দিয়েছেন—যা অনুবাদ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। মূল গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ-এর নাম ভারতবাসী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এতদুভয়ের মধ্যে মিলন সেতু নির্মাণে এই মহাপুরুষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; ৺গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে যে দীনবন্ধু নামে ভূষিত করেন অ্যাণ্ড্রুজ-এর জীবনে সেই নাম সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে। দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক, যীশুখৃষ্টের জীবনবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কাটিয়েছেন তিনি জীবন, আলোচ্য গ্রন্থে খৃষ্টের ধর্ম ও মানবিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে খৃষ্টের ধর্মে স্থান নেই কোন সঙ্কীর্ণতার কোন ধর্মীয় গণ্ডীর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মকে মিলিয়ে তবেই অ্যাণ্ড্রুজ উপলব্ধি করেন একদিন যীশুখৃষ্টের সত্যধর্মকে সামগ্রিক ভাবে। তিনি বলেছেন, 'এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরমপ্রভু যীশুকে প্রকৃত মানবপুত্ররূপে অন্তরে পেতে চাই তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক-প্রাণ এক-আত্মা আমাকে হতে হবে, বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।' এই সত্যকে অ্যাণ্ড্রুজ নিজের জীবনে কর্মের মাঝে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, শুধু মাত্র উপলব্ধিগোচর করেই থেমে যাননি। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর এই জীবনবাদেরই পরিচায়ক। ভারতে তিনি যে দু'জন মহাপুরুষকে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করেন, তাঁদের একজন ৺গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অপর জন ৺মহাত্মা গান্ধী। এই দুই জগদ্বরেণ্য মহামানবের জীবন ও ধর্মধারায় খৃষ্টের সত্যধর্মকেই প্রতিফলিত হতে দেখেন অ্যাণ্ড্রুজ আর সকল সংশয় সকল দ্বিধার অবসান ঘটে তাঁর। ধর্ম যে কখনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকতে পারেনা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন তিনি। আপন জীবনের এই চরম উপলব্ধিকেই রূপ দিয়েছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে, যীশুখৃষ্টের প্রকৃত মহিমা যে দেশ কাল পাত্রের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, এ কথাটাই এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। নিজের বক্তব্যকে অসংশয়ে প্রকাশ করেছেন দীনবন্ধু, কোন দুর্বলতা কোন মোহ আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাঁর সত্যদৃষ্টিকে, ধর্মের এক পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল ব্যাখ্যা করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে। এই মহাপুরুষের জীবন-দর্শনকে উপলব্ধি করতে হলে বইটি অবশ্যপাঠ্য। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। প্রকাশক রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ দাম—চার টাকা।

মহাশ্বেতা

অতুলনীয় অপরাজেয় কথাসাহিত্যিকের বিস্ময়কর সৃষ্টি "মহাশ্বেতা"। তারাশঙ্করের লেখনী বহু বিস্ময় সৃষ্টি করেছে আজ অবধি তবু মনে হয়, সে সবই তাঁর এই নবতম সৃষ্টির পাশে ম্লান হয়ে পড়েছে। বর্তমান উপন্যাসের নায়িকা নীরার যে ছবি এঁকেছেন তিনি তা শুধু অনবদ্যই নয়, অভাবনীয়। অগ্নিসাধিকা এই নারী জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনি, পুরাণোক্ত মহাশ্বেতা-চরিত্রটির মতই তার চরিত্র তেজে তপস্যায় পরিশুদ্ধ, যে তেজ জীবনের কঠোর পরীক্ষার শাসনে ভেঙ্গে পড়েনি কোথাও এক মুহূর্তের জন্যও। চরম প্রয়োজনের দিনেও জ্বলে উঠেছে সে আপন মহিমায় আপন সত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে। অগ্নিসম্ভবা এই নারী ভালোবেসেছিল একদিন, অপর সব নারীরই মতন সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় করে অথচ তার সেই একান্ত প্রিয়জনকে অপরাধী সন্দেহ করে বিচার করল যখন সে, তখন কোন হৃদয়দৌর্বল্যকেই প্রশ্রয় দেয়নি সে। তার প্রেমকে ছাড়াতে দেয়নি কঠোর অকরুণ ন্যায়-নিষ্ঠার পথ মুহূর্তের তরেও। আবার যখন বুঝল সে ভুল করেছে, অবিচার করেছে ভ্রম-সংশোধনের জন্য তিলেক দ্বিধা করেনি। ছুটে গিয়েছে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে, মার্জনা ভিক্ষা করে তার অনুগামিনী হয়েছে জীবনের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব সুখ-সম্পদকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অকাতরে। কোমলে কঠোরে-মেশা 'নীরা' চরিত্রটি অপরূপ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, চিরবিরহিণী মহাশ্বেতা জীবনব্যাপী ত্যাগ ও তপস্যায় পরিশুদ্ধা হয়ে তবেই লাভ করেছিলেন তাঁর দয়িতকে একদিন, "মহাশ্বেতা"র নায়িকা নীরাও লাভ করল তার দয়িতকে জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরই, দীপ্তিমতী এই মেয়ের অপরূপ জীবনালেখ্য সুদক্ষ পরিণত লেখনীতে রেখায়িত করেছেন তারাশঙ্কর। পড়তে পড়তে পাঠকের মন তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণরূপেই। আমরা বইটিকে সাদর স্বাগত জানাচ্ছি। প্রচ্ছদ মনোরম, অপরাপর আঙ্গিকও ভাল। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

নবাঙ্কুর

সুলেখা সান্যালের এই উপন্যাসটি নবপ্রকাশিত নয়, এটি এ উপন্যাসের সদ্য-প্রকাশিত শোভন ও সুন্দর দ্বিতীয় সংস্করণ 'নবাঙ্কুর' পাঠে আমরা আনন্দিত হয়েছি, একথা অকুণ্ঠেই স্বীকা

রি। আশা করি, এই সুন্দর পুস্তকটির নব আবির্ভাবকে পাঠক-সমাজও সাদর স্বীকৃতি দেবেন। উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রগুলি বিশিষ্ট উজ্জ্বল. বিশেষতঃ ছবির চরিত্র এক কথায় অপূর্ব. চারদিকের ক্ষয়-ক্ষতি-ধ্বংসের মধ্যেও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে না, সে পথচলা থামায় না মুহূর্তের জন্যও, নতুন পৃথিবীর গৌরবময় পথচলায় অংশী হওয়ার আশা ও ভরসা-ভরা মনকে নবীন উৎসাহে ভরে নিয়ে পথ চলে সে দৃঢ় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে। ছবির চরিত্রটিই আলোচ্য বইখানির সব চেয়ে বড় সম্পদ, লেখিকার ভাষারীতি সহজ ও সরল রসোপভোগের সহায়ক। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। প্রকাশক নয়া প্রকাশ, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬, দাম সাত টাকা মাত্র।

Literatures in Modern Indian Languages

আলোচ্য পুস্তকটি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যের বিষয় যে বক্তৃতাদি প্রদত্ত হয়েছে তারই এক সুষ্ঠু সংস্করণ। বিখ্যাত মনীষিগণ পুরাতন ও আধুনিক এই উভয়বিধ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণামূলক যে সব সুচিন্তিত ভাষণ প্রচার করেছেন বেতারে এবং তার অধিকাংশই সংকলিত হয়েছে বর্ত্তমান গ্রন্থে। ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে একটি সুসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায় বইটির মধ্যমে, এ জন্য সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্যজীবী উভয়বিধ পাঠকই সংকলনটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। সাহিত্যের ভবিষৎ সম্বন্ধেও কয়েকটি সারগর্ভ রচনা এতে স্থান পাওয়ায়, গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ সংকলনের গৌরব দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দেই, সংকলনকারের স্বলিখিত সুন্দর ভূমিকাটি এর আর এক আকর্ষণ, আমরা পুস্তকটি পাঠে পরিতৃপ্ত হয়েছি একথা সহজেই বলতে পারি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। Literatures in Modern Indian Languages, Edited by V. K. Gokak, The Publications Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India, Delhi. Price Rs 2·50

প্রবাদ বচন

অন্যান্য সকল ভাষার মত বাঙ্গলা ভাষায় অসংখ্য প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে, আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাদ্বয় সেই সব প্রবাদ বচনের কিয়দংশ সংগ্রহ করে সুসম্বদ্ধরূপে প্রকাশ করেছেন। প্রবাদ বচনের ব্যবহার বহুল প্রচারিত, পাঠক ও লেখক এই উভয়বিধ সম্প্রদায়ই বে বর্ত্তমানে পুস্তকটি সমাদরের সহিত গ্রহণ করবেন সে আশা আমরা নিঃসংশয়েই পোষণ করি। কারণ ভাব প্রকাশকে জোরালো করার জন্য প্রবাদ বচন সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রবাদ বচনগুলি বর্ণানুক্রমিক শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো হওয়াতে প্রয়োজন মত সেগুলি খুঁজে নেওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জাও প্রশংসনীয়। লেখক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

প্রতিবিম্ব

ছোট গল্পলেখক হিসাবে প্রভাত দেবসরকার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁর অধুনাতম উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'র মূল গল্পাংশটি আত্মপ্রকাশ করেছিল 'দেশ' সাময়িকীর পাতায় ইতিপূর্ব্বেই। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে তীর্থের আকর্ষণ বড় কম নয় তীর্থযাত্রী এক শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধার মাতৃহৃদয়ের অপরূপ আলেখ্য এঁকেছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসটিতে। পুত্রহারা বিনোদিনী তীর্থের পথে পা বাড়িয়েছিলো একদিন তীর্থের মাটিতেই দেহরক্ষা করবে, এই ছিল তার সুপ্তবাসনা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠল অবলম্বনের জন্য, মাটির ঠাকুর পাথরের গোপালের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল রক্তমাংসের বন্ধন, অকালে কালান্তরিত সন্তানের একমাত্র চিহ্ন বালক পৌত্রকে বুকে চেপে ধরে আপন ঘরেই ফিরে গেল সে। মাতৃহৃদয়ের এই দ্বন্দ্বকে কুশল কলমে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে স্বল্পসংখ্যক চরিত্রগুলি সুন্দর ভাবে, পাণ্ডা পীতাম্বরের অর্থলোলুপতার অন্তরালে লুকিয়েছিল যে মমতাস্নিগ্ধ হৃদয় তার আত্মপ্রকাশ ও মুগ্ধ করে মনকে। গ্রন্থখানি স্বল্প কলেবরের মধ্যেই সুসম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। প্রচ্ছদ ও অন্যান্য আঙ্গিক মোটামুটি। আমরা পুস্তকটির সাফল্য কামনা করি। পরিবেশক—ডি, হাজরা এণ্ড কোং। ১৩ সূর্য সেন ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২ দাম—দুই টাকা।

সঙ্গীতমুকুর (প্রথম খণ্ড)

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিত আলোচ্য গ্রন্থখানি সঙ্গীতরসিক ও শিক্ষার্থিগণের নিকট সমাদৃত হবে বলেই মনে হয়, লেখক স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী, সহজ সরল ভাষায় তিনি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি রাগ-রাগিণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ও সেগুলির বাণীরূপ প্রকাশ করেছেন স্বরলিপি সমেত, জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী বিশেষভাবে উপকৃত হবেন পুস্তকটি পাঠে। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। লেখক—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—২৫।ই বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা-৪, মূল্য—দেড় টাকা মাত্র।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জনৈকা বঙ্গললনার প্রতিকৃতির আলোকচিত্র মুদ্রিত হইতেছে। প্রচ্ছদশিল্পী শ্রী পি, সাহানা
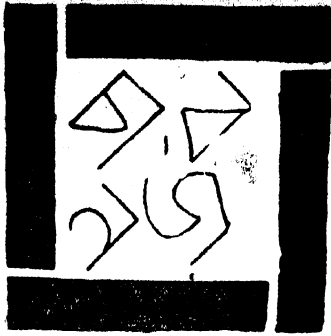
ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

(চিকিৎসক, সমাজসেবক কৃতীপুরুষ এম. বি, জে পি]

রাজনৈতিক জীবনবাদ দিয়েও যে দেশ ও দশের সেবা করা যায় তার পরিচয় পাওয়া যায় ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনে। আত্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ও সততা থাকলে যে ক্ষুদ্রকেও বিশাল করা যায় বর্তমান ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ তার সাক্ষ্য।

ডাঃ সরকার ঐ কলেজেরই অবৈতনিক সম্পাদক এবং কলেজ সংশ্লিষ্ট চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট। আদি নিবাস বর্দ্ধমান জিলা হলেও ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ১৯০৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে হিন্দু স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২৩ সালে উক্ত কলেজ হতে আই, এস সি পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯২৯ সালে সসম্মানে এম, বি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে ডাঃ সরকার তদানীন্তন ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল বর্ত্তমান ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে—প্যাথিওলজির শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনাল মেডিক্যেল স্কুল মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হলে ডাঃ সরকার ঐ কলেজের প্যাথিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে ডাঃ সরকার কলেজের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। অদ্যাবধি ডাঃ সরকার ঐ পদে বহাল আছেন।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

বর্ত্তমানে ডাঃ সরকার (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যা[ল] ফ্যাকাল্টী (২) পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টী (৩) পশ্চিম[বঙ্গ] মেডিক্যাল কাউন্সিল (৪) পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল এবং (৫) ট্রপিক্যাল পরিচালক সমিতি সংস্থাগুলির সদস্য। ডাঃ সর[কার] একসময় কলিকাতা করপোরেশানের কাউন্সিলরও ছিলেন। ১৯[..] সালে ডাঃ সরকার জে, পি উপাধিতে ভূষিত হন। এ ছা[ড়া] ডাঃ সরকার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সর[কার] মেডিক্যাল কলেজ এবং কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজের ছাত্র [..] নির্ব্বাচক কমিটির সদস্য ছিলেন এবং আছেন। ডাঃ সর[কার] কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ৺যতীশচন্দ্র সরকারের ৫[..] সন্তান।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়

[পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার]

ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার আগ্রহ ছিল এই মানুষটির মনে য[..] গেলে ছেলেবেলা থেকেই। সঙ্কল্পিত পথে এগিয়ে [..] বিপুল প্রেরণা ও উৎসাহ দেন তাঁকে তাঁর পিতৃদেব। আগ্রহের [..] অধ্যবসায়ের যখন মিলন ঘটলো, প্রত্যাশিত সফলতা তখন যেন [..] হাজির হলো আপনি। পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের বর্ত্তমান [..] ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায় এদিক থেকে সত্যি একজন স[..] ও সফলকাম পুরুষ।

শ্রীরায়ের পৈতৃক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার দোহার গ্রা[মে।] তাঁর বাবা রায় সাহেব ৺দেবেন্দ্রকুমার রায় ছিলেন রংপুর সহ[রে] নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট। এই সহরেই রমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম [..]বাং ১৩১১ সালে। অল্পদিন মধ্যে রায় সাহেব দেবেন্দ্রকুমা[র] ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে বদলী হয়ে আ[..] হয়। তাই পুত্র রমেন্দ্রচন্দ্রের পড়াশুনোর ব্যবস্থাও হয় রং[পুরের] পরিবর্ত্তে, ঢাকাতেই। একদিকে তাঁর পিতৃদেব যেমন ছিলেন বি[..] শিক্ষানুরাগী, অপরদিকে মা (৺হেমন্তকুমারী দেবী) ছিলেন এ[..] ধর্ম্মপরায়ণা নারী। ছেলের জীবনের ওপর বাপ-মায়ের চারি[ত্রিক] প্রভাব পড়ে থাকবে অনেকখানি, সেটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

১৯২১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে শ্রীরমে[..] প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে ১৯২৫ সালে [..] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এস-সিতে (পাশকোর্স) প্রথম স্থান অ[ধিকার] করেন। ইঞ্জিনীয়ারিং লাইনে যাবেন বলে তাঁর মন ব্যাকুলতা [..] করছিল কতকাল থেকেই—এক্ষণে সত্যি সত্যি সে দিকে [..] ছাড়পত্র তিনি পেলেন। কলকাতায় এসে শিবপুর ইঞ্জিনী[য়ারিং] কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে আর দেরী করলেন [না।] মনোমত বিষয় পড়বার সুযোগ পাওয়ায় তিনি অসীম উৎসাহ[ে] করতে থাকেন। কলেজে বৃত্তি লাভ করলেন এবং বি-ই (ফাই[নাল]) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রমাণ তুলে ধরলেন আপন যোগ্যতার।

তারপরই শুরু হয় শ্রীরায়ের কর্ম্মজীবনের গৌরবমণ্ডিত অ[ধ্যায়।] বি-ই পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও ক[লিকাতা] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দু'টি বৃত্তি পান এবং এই [..] পর পর রেলওয়ে এবং পি-ডব্লিউ ডি'তে আবশ্যক ট্রেনিং [..] করেন। তাঁর সর্ব্বপ্রথম কাজ নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালি[টি]

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়

ইঞ্জিনীয়ার রূপে সেখানে তিনি রেখেছেন তাঁর দক্ষতার প্রাথমিক স্বাক্ষর। ১৯৩২ সালে তিনি সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, তিনি কখনও কাজ করেন ময়মনসিংহে, কখনও কলকাতায় আবার কখনও বা আলিপুরদুয়ারে। দশটি বছর এমনি কর্ম্মসূচীর ভিতর দিয়ে তাঁর চলে যায়। তৎপর ১৯৪২ সালে তিনি সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটেশনে যান এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হন। ১৯৪৬ সালে আবার ফিরে আসেন তিনি তৎকালীন বাংলা সরকারের ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস বিভাগে। দু'বছর বাদে জাতীয় সরকারের আমলে তিনি সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের সমধিক দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। এই সময় থেকে তিনি রাজ্যের সড়ক উন্নয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকেন নিবিড়ভাবে। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি লাভ করেন সরকারী সড়ক উন্নয়ন ডাইরেক্টরেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সম্মানিত পদ। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন তিনি বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারী মাসে। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বত্র স্বীকৃতি পাওয়ায় অল্পদিন মধ্যেই তাঁকে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত করা হয়। আজও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ববহুল আসনটি অধিকার করে আছেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ইঞ্জিনীয়াররূপে রমেন্দ্রচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তদারকী বা পরামর্শে বহু গঠনমূলক কাজ হয়েছে এযাবত। সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটেশনে তিনি যখন ছিলেন, সে সময় দেশে সাতটি বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হয়—যার পিছনে এই কর্ম্মী পুরুষের শ্রম রয়েছে বিপুল। পরবর্ত্তী দিনগুলোতে শ্রীরায় যখন সড়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপন যোগ্যতার প্রমাণ তুলে ধরেন জাতির সম্মুখে। দেশ বিভাগের মুহূর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সড়ক ছিল মোট ১১০০ মাইল। এক্ষণে এই খণ্ডিত রাজ্যেই তা দাঁড়িয়েছে সাত হাজার মাইলের ওপর এবং অধিকাংশই সুন্দর ঢালা কিংবা সিমেণ্ট কংক্রীটের পথ। রাজ্যের নদী-নালাগুলোর উপর ছোট বড় বহু সেতু তৈরী হয়েছে স্বাধীনতার পর এই ১২।১৩ বছর মধ্যে। এ সকল জাতীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রীরায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষণে রাজ্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব নিয়ে যখন আছেন, সে সময়ও তাঁর সামনে রয়েছে দুটি বৃহৎ সড়ক নির্ম্মাণ পরিকল্পনা—কলকাতা-দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওয়ে নির্ম্মাণ ও কলকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ে নির্ম্মাণ পরিকল্পনা। আলোচ্য পরিকল্পনা দুটিকে রূপদানের জন্যে তিনি সজাগ ও তৎপর রয়েছেন সর্ব্বক্ষণ. এবং তাঁর এই স্বপ্ন ও প্রয়াসও সফল হবে, এরূপ আশা নিশ্চয়ই পোষণ করা যায়।

ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জ্জী

[চিকিৎসা জগতে বাংলার মহিলা এম, এস]

"বিদ্যা বিনয়ং দদাতি" চিরসত্য কথাটির প্রমাণ পাওয়া গেল ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জ্জীর সাক্ষাতে। রাত সাড়ে নটায় বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তেই হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন ডাক্তারী বিদ্যায় কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মাষ্টার অব সার্জ্জারী ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত আর কোন মেয়ের পক্ষেই সে ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে নাই। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হতেই একটু আভাস দিয়েছিলাম বলে দ্বিতীয়বার আর ভূমিকার দরকার হয় নাই। হাস্যোজ্জ্বল মুখে একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললেন শ্রীমতী মুখার্জ্জী। প্রশ্ন করতে দেরি হলেও উত্তর পেতে দেরী হয় নাই।

শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জ্জী ১৯১৮ সালে কলিকাতায় এক ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার পঞ্চম সন্তানের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মুখার্জ্জী। পিতা ৺কমলকুমার মুখোপাধ্যায়কে কর্ম্মব্যপদেশে সর্ব্বদাই স্থানান্তরিত হতে হতো। বাল্যের শিক্ষা তাকে ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে হয়। অবশেষে ১৯৩৪ সালের কলিকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশে ভর্ত্তি হয়ে ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে আশুতোষ কলেজ হতে আই, এস, সি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৯৪৩ সালে এম, বি ডিগ্রি লাভ করেন। এম, বি ডিগ্রি লাভ করার পর

ডাঃ শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জ্জী

শ্রীমতী মুখার্জ্জী সার্জ্জারীতে সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি এম, এস এর জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন এবং ১৯৫৪ সালে এম, এস পাশ করিয়া মাষ্টার অব সার্জ্জারী উপাধি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হয়ে কলম্বো প্লানে প্লাষ্টিক সার্জ্জারীতে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী মুখার্জ্জী ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় একবৎসর বিভিন্ন হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে দেশে ফিরে আসেন। শ্রীমতী মুখার্জ্জী ব্রিটিশ এসোসিয়েশান অব প্লাষ্টিক সার্জ্জনদের এসোসিয়েটেড সদস্য। বর্ত্তমানে শ্রীমতী মুখার্জ্জী মেডিক্যাল কলেজে সিনিয়র ভিজিটিং সার্জ্জন পিডিয়াট্রিকস এবং সার্জ্জন ইনচার্জ প্লাষ্টিক সার্জ্জারী ইউনিট পদে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীমতী মুখার্জ্জীর মা ও তিনটি ভাই বর্ত্তমান। ভাইয়েরা সবাই কৃতী। ডাক্তার হওয়ার পিছনে কাহারও কোন অনুপ্রেরণা আছে কিনা প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পটভূমিকা না থাকলেও তাঁহার মা এবং মায়ের খুড়ো মশাই ৺ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের আগ্রহ এবং আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে এ বিষয়ে যে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী মুখার্জ্জী আজ পর্য্যন্ত অবিবাহিতা। একমাত্র ইংরেজী নভেল পড়া ছাড়া তাঁহার অন্য কোন ব্যক্তিগত সখ নেই।

ডাঃ কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

[মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও হাসপাতাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট]

বাংলাদেশের বহু বিস্তৃত সর্ব্বাধিকারী পরিবারের সুনাম, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সেই ঐতিহ্যেরই একটি উজ্জ্বলবিকাশ প্রখ্যাত-শল্য চিকিৎসক ডাঃ কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী। জীবনে স্বপ্ন দেখাটাই এই মানুষটির কাছে বড় নয়, স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণেরই মূল্য দিয়ে এসেছেন তিনি বরাবর। এ যাবত সাফল্য তাঁর জুটেছে প্রতিটি ধাপেই—আপন যোগ্যতাবলেই আজ তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেণ্ডেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সর্ব্বাধিকারীদের আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ (কলকাতা) প্রাচীন ভবনে কনকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯১০ সালের ১২ই অক্টোবর. স্বনামধন্য সার্জ্জন স্বর্গত কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর তিনি প্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র। এদেশের জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে কর্ণেল সর্ব্বাধিকারীর অবদান সর্ব্বজনবিদিত। বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদাতিক বাহিনীর তিনিই উদ্যোক্তা। আর জি, কর মেডিক্যাল কলেজেরও (তখনকার কারমাইকাল মেডিক্যাল কলেজ) তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্ম্মী। এদেশে তিনিই হলেন প্রথম সুযোগ্য ডাক্তার যিনি স্বতন্ত্রভাবে শল্য চিকিৎসাতেই নিজকে একজন বিশেষজ্ঞ করে তোলেন। সেদিনে ইংরেজ আই-এম-এসদের সঙ্গে সর্ব্বভাবে টেক্কা দিয়ে ভারতীয় ডাক্তারগণের সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যও তাঁরই ছিল অগ্র ভূমিকা। কনকচন্দ্রের পূজ্যপাদ পিতামহ রায় বাহাদুর ব্রিগেডিয়ার সার্জ্জন সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীও ছিলেন একজন নিতান্ত স মানী ও প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার আগে আর কোন বাঙালীই ব্রিগেডিয়ার সার্জ্জনের দায়িত্বশীল আ পাননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী উপাচার্য্য পরলোক সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ছিলেন কনকচন্দ্রের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠতা বাল্য বয়সে পিতৃহারা কনকচন্দ্র এই পূতচরিত্র পুরুষের সজাগ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ অনুশাসনে থেকেই বড় হবার পথ খুঁজে পান।

ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর ছাত্রজীবন ধাপে ধাপে সাফল্য অর্জ সুন্দর নিদর্শন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৬ সাল—এই ব বছর ইনি পড়াশুনো করেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে। ১ সালে তিনি কৃতিত্ব সহকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এ থেকেই। হেয়ার স্কুলে পড়বার সময়ই তিনি 'সব দিক থেকে ছেলে'র জন্যে নির্দ্ধারিত স্বর্ণপদক পান। আই-এস-সি পরীক্ষা করেন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আর সেটি ১৯২৮ সালে

কনকচন্দ্র ডাক্তারী লাইনে যাবেন, এ বহু আগে থেকেই নির্দ্ধারিত ছিল এবং সেভাবেই চলেছিল তাঁর জীবন সংগঠন। দেখা গেলো আই-এস-সি পাশ করার পরই তিনি ভর্ত্তি হ যেয়ে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে (তৎকালীন কারমাই মেডিক্যাল কলেজ)। শুধু ভর্ত্তি হওয়াই নয়, সেখানে প্র পরীক্ষাতেই বিশিষ্টতার ছাপ রেখে চলেন তিনি। ১৯৩৪ এম, বি ফাইন্যাল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক ও অনার্স সার্টিফিকেট পান।

ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর সাফল্যময় কর্ম্ম-জীবনের সঙ্কল্পিত প্রস্তুতি এইখানেই ঠিক শেষ হয়ে গেল না। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩ অবধি তিনি হাউস সার্জ্জনরূপে (শিক্ষানবীশ) আর মেডিক্যাল হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। কিন্তু সার্জ্জ শল্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে তাঁর মন বিশেষ হয়ে ওঠে। ইত্যবসরে তিনি চলে যান ইংল্যাণ্ডে এবং মিড হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে সরাসরি ঢুকে অটুট উদ্যম ও অধ্যবসায় গুণে প্রাথমিক এফ-আর-সি-এস তি করে ফেলেন অল্পদিন মধ্যেই (১৯৩৯ সাল)। এর প বার্থোলোমিউ হাসপাতাল (লণ্ডন) ও রয়েল ইনফারমারি (এডিন-

ডাঃ কনকচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

—এই দুটি শিক্ষা-সংস্থায় তিনি সার্জ্জারী বিষয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করেন। যাপন নিষ্ঠা ও শ্রমের পুরস্কারও তিনি পেয়ে যান হাতে হাতে—১৯৪০ সালেই এডিনবরা এফ-আর-সি-এস ও লণ্ডন এফ-আর-সি-এস পরীক্ষায় সকলকাম হন এবং গৌরব বর্দ্ধিত করেন পরিবার ও সমাজের। সার্জ্জারীতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির দাবী থেকে তিনি জার্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি বহু দেশের বহু হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সেইদিনে।

বিলেত থেকে দেশে ফিরে (১৯৪০) ডাঃ কনকচন্দ্র আবার যোগদান করেন আর, জি, কর হাসপাতালেই, তবে এবারে সার্জ্জিক্যাল বিভাগে ভিজিটিং সার্জ্জনরূপে। ১৯৪৬ সালে এই হাসপাতালে তাঁরই উদ্যোগে একটি অর্থোপেডিক (বিকলাঙ্গ ও অস্থি চিকিৎসা) বিভাগ খোলা হয় আর তিনিই নিযুক্ত হন এই নতুন বিভাগের প্রধান। এই সময় থেকেই চিকিৎসার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বিশেষজ্ঞ হবার জন্তে মনে তাঁর সঙ্কল্প প্রবল হয়। সেই সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত হ'তে বিলম্ব হয় না, সে প্রমাণ বিশেষ ভাবে আজ সকলের চোখের সামনেই।

অর্থোপেডিক বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও ডাঃ সর্ব্বাধিকারী আর, জি, কর হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৪৯ সালে। এই পদ অলঙ্কৃত করে থাকেন তিনি ক্রমাগত প্রায় তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫২ সাল অবধি। ইতোমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্ব্বাচন অনুসারে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অর্থোপেডিক সার্জ্জারীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সম্পর্কের প্রথম সূত্রপাত কিন্তু এইখানেই। তিনি শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন ভিজিটিং অর্থোপেডিক সার্জ্জনরূপে। বিকলাঙ্গ চিকিৎসার এই বিশেষ দিকটিতে বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়ার পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থোপেডিক বিভাগের (স্নাতকোত্তর) অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। গত ১লা জুলাই মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারিনটেণ্ডেন্টের গৌরবময় আসন তিনি লাভ করেছেন—এ নিঃসন্দেহে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তির স্বীকৃতি।

জনকল্যাণ ও সমাজসেবার অন্যান্য দিকেও ডাঃ কনকচন্দ্রকে যথেষ্ট উৎসাহী দেখতে পাওয়া যায়। রাজা রামমোহনের জন্মস্থান, সর্ব্বাধিকারীদের আদি নিবাস হুগলী জেলার রাধানগরে যে পল্লী উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে, এর সঙ্গে তিনি বহু বছর ধরে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। কলকাতা রোটারী ক্লাবের সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সংযোগ রয়েছে ১৯৫১ সাল থেকে। এই ক্লাবের উদ্যোগে বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার জন্তে টেম্পল ষ্ট্রীটে যে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, এর প্রারম্ভিক ব্যবস্থাপনার ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর অবদান কম নয়। ঝামাপুকুর লেনে (কলকাতা) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্তে হেল্‌থ সেণ্টার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তাঁকে নিতান্ত উদ্যোগী দেখা গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রাক্তন ফেলো। আজ ডাঃ কনকচন্দ্র যে সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করেছেন, তা বহন করে আনবে তাঁর জন্তে আরও নতুন মর্য্যাদা, এ আশা ও দাবী রাখা চলে সহজেই।

আছো কি হেথায় কেহ

(Walter de la Mare রচিত The Listeners-এর অনুবাদ)

'আছো কি হেথায় কেহ ?' শুধালো পথিক
চাঁদের আলোতে দুয়ারে হানিয়া কর,
অশ্ব তাহার তৃণ-আহরণে রত
স্তব্ধ কাননে তুলিল যে মর্ম্মর।

গম্বুজ হ'তে মাথার উপরে উড়ে গেল কোন পাখী ?
পুনঃ কর হানি 'আছো কি হেথায় কেহ ?' পথিক কহিল ডাকি
কারুকাজ করা জানালার ফাঁকে কেহ তো দিল না দেখা ;
বাহিরে যেথায় পথিক দাঁড়ায়ে নীরবে আছিল একা।
ধূসর তাহার নয়ন-দিঠিতে প্রশ্ন রহিল আঁকা।

অশরীরী যারা সেই গৃহবাসী, উঠিল চমকি সবে,
ভাবে নাই তারা মরজগতের কেহ আসি কথা কবে।
চাঁদঝরা রাতে অসীম আঁধার হলের প্রান্তে আসি
শিহরি শুনিল, পথিক কণ্ঠে নীরবতা গেল নাশি,
সচকিত হয়ে নির্জ্জন রাত চুপিচুপি উঠে হাসি।

এতক্ষণে বুঝি পথিক বুঝিল ভিতরে রয়েছে কারা,
ইন্দ্রিয়াতীত কোনো অনুভূতি বলে—তাই বুঝি তারা
স্তব্ধ এমন তর, বারবার ডাকে কথা নাহি বলে।
আহ্বানে তার আবছায়া রাতে বায়ু কাঁপে থরথর, ;
তারকা খচিত পর্ণছায়ায় রচিত যে অম্বর—
তারি তলে থাকি অশ্ব তাহার তোলে একা মর্ম্মর।

সহসা আবার করহানি দ্বারে অধিক উচ্চস্বরে—
মস্তক তুলি ঊর্দ্ধনয়নে কহিল পথিক শোনো—
'বোলো তাহাদের বোলো,
আমি এসেছিনু, সাড়া তবু পাই নাই
প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি আমারি জেনো।'
একাকী কেবল ছায়াসুগভীর নীরব প্রাসাদ মাঝে
কথাগুলি তার প্রতিধ্বনি হয়ে একেলা একেলা বাজে।
অশরীরী শ্রোতা শুনিল সকলি রহিল অচঞ্চল,
অশ্বের পদাঘাতে বনপথ হয়ে উঠে উচ্ছল ;
ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ মিলালো, গেল চলি বহুদূরে,
ধীরে ধীরে পুনঃ সেই জগতের শান্তি আসিল ফিরে।

অনুবাদিকা—পূরবী ঘোষ

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পাওয়ার্সের বিচার—

সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ সামরিক আদালতের বিচারে (Military Collegium of the Supreme Court of the U. S. S. R) মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের চালক ফ্রান্সিস গ্যারী পাওয়ার্স দশবৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বিচারের তৃতীয় দিবসে প্রসিকিউটর জেনারেল রোমান রুদেন্কো তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় বলেন যে. ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত পাওয়ার্সের মত ব্যক্তি কোন দ্বিধা না করিয়াই পরমাণু বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণ করিতে পারিত; তিনি তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবার দাবী করেন। তিনি বলেন, পাওয়ার্স যে-অপরাধ করিয়াছে তাহার জন্ত সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু সে আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করায় তিনি তাহাকে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার দাবী পেশ করেন। পাওয়ার্সের পক্ষে রুশ কৌসিলী মিখেইল গ্রিনেভের (Grenyev) সমস্যাটা বড় সহজ ছিল না। অ'সামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, অপরাধও অত্যন্ত গুরুতর। সোভিয়েট রাশিয়ার আইন অনুযায়ী তিনি অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকারও করিতে পারেন না কিন্তু গ্রিনেভ একজন দক্ষ কৌসিলী। নুরেনবুর্গের বিচারে তিনি জার্ম্মাণ যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। পাওয়ার্সের কৌসিলী হিসাবেও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অপরাধী পাওয়ার্সকে প্রশ্ন করিবার সময় এবং তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় মানবীয় দিকটাই তিনি বিশেষভাবে আদালতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রশ্নে পাওয়ার্সের জীবনের যে-সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে সে-গুলি শুধু উল্লেখযোগ্যই নয় রাশিয়ার জনগণের মধ্যে উহা সাড়া জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ। গ্রিনেভ পাওয়ার্সের পিতামাতা, তাহার পিতার ব্যবসা, পরিবারবর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তরে জানা যায়, তাহার পিতার জুতো তৈয়ারীর ব্যবসা ছিল এবং তাহার মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। তাহার পিতা বহু বৎসর কয়লার খনিতে কাজ করিয়াছেন। একটি দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, তিনি অল্পের জন্ত বাঁচিয়া যান। একটি প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলে যে, সে শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পিতার কিছু জমি আছে বটে, কিন্তু ঐ জমিতে উৎপন্ন হয় তাহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না।

গ্রিনেভের প্রশ্ন হইতে আরও যে সকল তথ্য উদ্ঘাটিত হ তাহা হইতে আরও জানা যায়, তাহার পিতার জুতা তৈ ব্যবসায় কোন মাইনে করা শ্রমিক নাই। পাওয়ার্স তাহার পিত অনেক কাজে সাহায্য করিতেন। কিরূপ পরিবেশের মধ্যে পাওয় বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা প্রমাণের জন্ত কয়েকখানি ফটোও গ্রিনে কোর্টে দাখিল করেন। পাওয়ার্সের পিতার সন্তান-সন্ততি সম্প যে-সকল প্রশ্ন করা হয় তাহার উত্তরে প্রকাশ, তাহার কোন ভা নাই তাহার পাঁচটি ভগিনী আছে। একজন জুতা প্রস্তুতকারকে সহিত তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় ভগিনীর স্বা ইলেক্‌ট্রিক ফিটারের কাজ করে। তাহার তৃতীয় ভগিনী একজ প্রাক্তন শিক্ষককে বিবাহ করিয়াছেন—তাহার স্বামী এখন একজ ডাকপিয়ন। তাহার এক ভগিনীর বিবাহ এখনও বাকী আছে পাওয়ার্সের শিক্ষার জন্ত তাহার পিতামাতাকে বহু কষ্ট স্বীক করিতে হইয়াছে সে গ্রাজুয়েট এবং জীব বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞা তাহার প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাহার শিক্ষার জ পরিবারের যে ব্যয় হইয়াছে তাহা লাঘব করিবার জন্ত অবস সময়ে তাহাকে খাটিতে হইত। পাওয়ার্স কেন পাইলটে কাজ গ্রহণ করিলেন তাহার কাহিনীও তিনি বিবৃত করেন, গ্রিনে তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতি ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলেন যে, ব্যাপক বেকা সমস্যার জন্তই পাওয়ার্স সামরিক বিভাগে চাকুরী গ্রহ করিতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন যে, রাজনীতির প্রতি পাওয়ার্সে কোন আগ্রহ নাই। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও তিনি নহেন কোন নির্ব্বাচনে সে কোনদিন ভোট দেন নাই। গ্রিনেভ তাহা বক্তৃতায় মার্কিণ জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন ডলারের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ডলার হচে পীতবর্ণ শয়তান। অর্থ অতলস্পর্শী সাগর। সম্মান, সত্য সবই এ অতলস্পর্শী সাগরে নিমজ্জিত হয়। পাওয়ার্স অবশ্য বলিয়াছেন যে তিনি অর্থ চাহেন ভাল ভাবে জীবনযাপনের জন্ত, ভাল গৃহ নির্ম্মাণে জন্ত এবং ব্যবসা করিবার জন্ত।

প্রসিকিউটর জেনারেল রোমান রুদেনকো পাওয়ার্সের গুরুত অপরাধের কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনি কঠোর ভাষায় আক্রম করিয়াছেন মার্কিণ রাজনীতিকে। শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার জ তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এ বিচারের সময় শুধু পাওয়ার্সের অপরাধ-ই উদ্‌ঘাটিত হয় না মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর গুরুতর অপরাধজনক এ আক্রমণাত্মক কার্যাবলীও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আক্রমণাত্ম গোয়েন্দাগিরির সহিত সংযুক্ত থাকার জন্ত তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তা ও নরওয়েকেও দায়ী করেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার এডেন্যুরকে তিনি হিটলারের অনুগামী বলিয়া অভিহিত করেন তিনি বলেন যে, পাওয়ার্সের শাস্তি শুধু তাহার পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ না আক্রমণাত্মক শক্তির সহিত শান্তির শক্তির সংগ্রামেও উহা গুরুত্ব ভূমিকা গ্রহণ করিবে। পাওয়ার্সের কৌসুলী গ্রিনেভ মার্কিণ জীব যাত্রার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়া যে অবস্থার মধ্যে পাওয়ার্স এ অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সে-সম্পর্কে বিচারপতিকে বিবেচ করিতে অনুরোধ করেন। সরলভাবে এবং আন্তরিকতার সহি

বীজ থেকে বৃক্ষ...

পাওয়ার্স সমস্ত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সোভিয়েট আইনের মধ্যে মানবিকতা রহিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া একটা বিরাট শক্তি, পাওয়ার্সের মত ব্যক্তির প্রতি উদারতা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ। তিনি লঘুদণ্ডের প্রার্থনা জানান। গ্রিনেভের বক্তৃতা শেষ হইলে আদালতকে সম্বোধন করিয়া পাওয়ার্স বলেন, তিনি স্বীকার করিতেছেন যে তাহার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর এবং শাস্তিযোগ্য। শুধু তাহার অপরাধের কথা বিবেচনা না করিয়া কি অবস্থায় তাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন কোন গুপ্ত তথ্য ও রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের হস্তগত হয় নাই। সেগুলি সমস্তই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতে পড়িয়াছে। কৃতকার্য্যের জন্ত তিনি গভীর অনুতপ্ত এবং আদালতের কাছে এই নিবেদন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন দিন রাশিয়ার জনগণের প্রতি কোনরূপ শত্রু ভাব পোষণ করেন নাই, তাঁহারা যেন শত্রুভাবে নয়, মানুষ হিসাবেই তাহার বিচার করেন। পাওয়ার্সের উক্তি যে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাওয়ার্স তাহার কৃতকার্য্যের জন্ত শুধু অনুশোচনাই প্রকাশ করেন নাই, বলিয়াছেন, তাহার মনে হইতেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তিনি খুব ক্ষতি করিয়াছেন। ১লা মে তারিখে তাহার বিমানযাত্রার দুই সপ্তাহ পরে প্যারীতে যে শীর্ষ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর দিয়া বিমান চালনার ফলে তাহা বানচাল হইয়া যাইতে পারে, এই সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তাহার মনে জাগে নাই। তাহাকে যখন আদেশ দেওয়া হয় তখন শীর্ষ-সম্মেলনের তারিখের কথা তিনি জানিতেন না। এইরূপ বিমান চালনার ফলে, সংঘর্ষ সৃষ্টি হইতে পারে কি না, তাহা যাঁহারা তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের বিবেচ্য। পাওয়ার্স বলেন, "আদেশ পালনই আমার কাজ।" এই কাজ যে তাহার ভাল লাগে নাই তাহাও পাওয়ার্স অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। ভাল কাজ পাইলে তিনি পুনরায় আর এই কাজের জন্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেন না। কাজ যে অত্যন্ত কঠোর, দেহ মনের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া পাওয়ার্স বলেন যে, একবার বিমান চালানার পরে তিনি দুই দিন সমস্ত কাজের অযোগ্য হইয়া পড়েন। এই ইউ-২ বিমান পরিচালনার উদ্দেশ্য যে গোয়েন্দা-গিরি করা সে সম্পর্কে প্রথম হইতেই তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের ভিতরে প্রায় ১২০০-১৩০০ মাইল প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার বিমান যখন গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয় তখন বিমানখানি ৬৭-৬৮ হাজার ফুট উচ্চে ছিল। আকাশ হইতে ফটো তুলিবার যন্ত্রপাতি বিমানে ছিল কিনা তাহা তিনি জানিতেন না। তবে তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, রাডার ষ্টেশনের কাজকর্ম্মে বাধাসৃষ্টি করিবার যন্ত্রপাতি তাহার বিমানে ছিল। কিন্তু পাওয়ার্স ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বিমানে যে সকল যন্ত্রপাতি ছিল সে-গুলি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের যে জ্ঞান থাকে তাহা তাহার নাই। তবে তাহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তদনুসারে তিনি সুইচ খুলিতেন ও বন্ধ করিতেন। বিশহাজার মিটার উচ্চে যে-বিমান উড়িতেছে তাহাতে কি আছে তাহা মাটি হইতে দেখা অসম্ভব। বিমানে পরমাণুবোমা থাকিলে কোন হাতল ঘুরাইলে উহা বর্ষিত হইত কিনা, প্রসিকিউটর জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলেন যে, হ্যাঁ বর্ষিত হইতে পারে। তাহার উত্তরে আদালত গৃহে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। উহা লক্ষ্য করিয়া পাওয়ার্স বলেন যে, তাহার বিমানে পরমাণুবোমা ছিল না। তাহার সঙ্গে একটি শব্দহীন পিস্তল এবং ২০৫ রাউণ্ড গুলী ছিল। পাওয়ার্স বলেন উহা শিকারের জন্ত তাহার সঙ্গে ছিল। কোন মানুষকে হত্যা করিবার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন না। তাহার সঙ্গে একটি বিষভরা পিন ছিল। সে-সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার্স বলেন যে, তাহার উপর অত্যাচার করা হইলে আত্মহত্যা করিবার জন্ত ঐ পিন তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার উপর কোন অত্যাচার করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাহার উপর কোন অত্যাচার করা হয় নাই। তাহার প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনোভাব কিরূপ এবং তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে পাওয়ার্স বলেন, তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করা হইয়াছে।

সোভিয়েট সামরিক আদালত পাওয়ার্সকে দশ বৎসর কারা দণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায়ে আরও বলা হইয়াছে যে, এই দশ বৎসরের প্রথম তিন বৎসর তাহাকে কারাগারে থাকিতে হইবে এবং অবশিষ্ট সাত বৎসর কোন কর্ম্মশিবিরে থাকিতে হইবে। এই দণ্ডাদেশ ১লা মে হইতে বলবৎ হইবে। পাওয়ার্সের প্রতি দণ্ডের কঠোরতায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পাওয়ার্স তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর সহিত তাহার যে-চুক্তি হইয়াছে তাহা প্রকাশ করার অপরাধে মার্কিণ আইন অনুসারে তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড, অথবা দশ হাজার ডলার জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হইতে পারে। পাওয়ার্সের বিচার ১৭ই আগষ্ট (১৯৬০) আরম্ভ হয় এবং ১৯শে আগষ্ট শেষ হয়। এই বিচার অনুষ্ঠিত হয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের কলাম হলে (Hall of Columns of the House of Trade Unions)। বিচার দেখিবার জন্ত দেড় হাজারের অধিক লোক আদালতে উপস্থিত ছিল। ১৪০ জনেরও অধিক বৈদেশিক সংবাদদাতা বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ার্সের পিতা অলিভার পাওয়ার্স, মাতা ইভা পাওয়ার্স, পত্নী বারবারা, শাশুড়ী মোটলে ব্রাউন, পাওয়ার্স পরিবারের একজন বন্ধু এবং তিনজন ব্যবহারজীবী এই বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। মার্কিণ ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের পাইলট পাওয়ার্সের বিচার শেষ হওয়া উক্ত বিমান সংক্রান্ত ঘটনার একটি দিকের উপর যবনিকা পাত হইল। কিন্তু পাওয়ার্সের বিচারের সময় শুধু পাওয়ার্স নিজেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়ায় নাই, পাওয়ার্সকে যাঁহারা গোয়েন্দাগিরির জন্ত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদেরও বিচার হইয়াছে বলিতে পারা যায়। তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ক্ষমতা সোভিয়েট সামরিক আদালতের নাই, তাঁহারা তাহার এক্তিয়ারের বাহিরে। বিশ্বজনমতের আদালত তাঁহাদের সম্পর্কে কি রায় প্রদান করিবেন, সে-সম্পর্কে এখানে কোন আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সোভিয়েট প্রসিকিউটর জেনারেল রুডেনকো পাওয়ার্সের অপরাধ অপেক্ষা মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নীতিকেই তীব্রভাবে

াক্রমণ করিয়াছেন। এই বিচারে আইসেনহাওয়ার, নিক্সন এবং ার্টারই মুখ্য স্থান পাইয়াছেন, উপরওয়ালার নির্দ্দেশ পালনকারী ্যাওয়ার্সের স্থান হইয়াছিল গৌণ।

স্বাধীনতার পথে আফ্রিকা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে াধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়াছে। গত দশ ৎসরের মধ্যে অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঃজে স্বাধীনতা লাভ করে নাই। স্বাধীনতার জন্য কোথাও ীর্ঘস্থায়ী, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম দিন স্থায়ী সংগ্রাম চলিয়াছে। ্খনও কতকগুলি দেশের স্বাধীনতা লাভ হয় নাই। তন্মধ্যে ালজিরিয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলজিরিয়ায় গত াঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে। স্বাধীনতা াওয়ার পরেও প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুশক্তি সেই স্বাধীনতাকে ্পর্যাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কঙ্গো ইহার একটি উল্লেখযোগ্য ষ্টান্ত। আফ্রিকার আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ানেক পূর্ব্বে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বর্ত্তমান াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৬ সালে ইটালী ইথিওপিয়া খল করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ইথিওপিয়া পুনরায় স্বাধীনতা াভ করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন স্বাধীন দেশ হইলেও ্ই স্বাধীনতা শুধু শ্বেতাঙ্গদের স্বাধীনতা। কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা কাণঠাসা হইয়া আছে। তাহাদের কোন স্বাধীনতাই নাই। িশর ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাধীনতা লাভ করে। াইবেরিয়া প্রকৃত পক্ষে কোন সময়েই বৈদেশিক প্রভুশক্তির অধীনে াসে নাই। গত ১৯৪৭ সালে লাইবেরিয়ার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী ৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দশ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকায় ক্ষিণ আফ্রিকা উইনিয়ন, মিশর, আবেসিনিয়া বা ইথিওপিয়া এবং াইবেরিয়া এই চারিটি দেশমাত্র স্বাধীন ছিল। মোটামুটিভাবে ০টি দেশে বিভক্ত আফ্রিকা মহাদেশে উল্লিখিত চারিটি দেশ ছাড়া ার কোন দেশ স্বাধীন ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আফ্রিকা মহাদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতা াভ করে লিবিয়া ১৯৫২ সালে। এই দেশটি উত্তর আফ্রিকার পকূলে টিউনিসিয়া ও মিশরের মধ্যে াবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দী হইতে ১৯১১ াল পর্য্যন্ত এই দেশ ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের ান্তর্ভুক্ত। ইটালী এবং তুরস্কের মধ্যে ্দ্ধের ফলে ইটালী লিবিয়া অধিকার করে। ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় ১৯৪৩ সালের ানুয়ারী মাসে ত্রিপলীর পতন হয় এবং িবিয়া মিত্রশক্তিবর্গের যুক্ত শাসনাধীনে াসে ১৯৪৯ সালের ২১শে নবেম্বর সম্মিলিত াতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে লিবিয়াকে ৯৫২ সালে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব গৃহীত য়। ১৯৫১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর লিবিয়ার াধীনতা ঘোষিত হয়। ইরিত্রিয়া ইটালীর ্বল হইতে মুক্ত হইয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসাবে ইথিওপিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। এখানে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং ন্যায়াসাল্যাণ্ড লইয়া ১৯৫৩ সালে এই ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশন আসলে দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। সুদান, মরোক্কো এবং টিউনিশিয়া ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। গোল্ডকোষ্ট ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ্চ বৃটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ঘানা নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ফরাসী উপনিবেশগুলিকে লইয়া ১৯৫৮ সালে যখন তথাকথিত 'ফরাসী পরিবার' গঠিত হয় তখন ফরাসী গিনি উহা হইতে বাহির হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ক্যামেরুন্স গত ১লা জানুয়ারী (১৯৬০) স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার পর পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো অধ্যুষিত টোগোল্যাণ্ড ফ্রান্সের অছিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া গত ২৭শে এপ্রিল (১৯৬০) স্বাধীনতা লাভ করে এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এই দেশটি জার্ম্মাণীর অধীনে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য টোগোল্যাণ্ড দখল করে। যুদ্ধের পর সন্ধির সর্ত্তানুসারে উহার দুই-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের দখলে চলিয়া যায়। পশ্চিমের একতৃতীয়াংশ বৃটিশের অধিকারে যায় এবং উহাকে গোল্ডকোষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ঘানা নাম গ্রহণ করিয়া গোল্ডকোষ্টের স্বাধীনতা লাভ করায় টোগোল্যাণ্ডের বৃটিশ অধিকৃত উক্ত অংশটুকুও স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৬০ সালের জুন, জুলাই এবং আগষ্ট এই তিন মাস আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ফরাসী উপনিবেশ সেনাগল এবং ফরাসী সুদান ১৯শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ মিলিত হইয়া মালি ফেডারেশন গঠন করিয়াছে। তথাকথিত ফরাসী পরিবারের মধ্যে উহাই প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ফেডারেশনে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সেনাগল তাহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছে। কি ভাবে উহার মীমাংসা হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড গত ২৫শে জুন এবং ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড গত ১লা জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে। এই দুইটি দেশ যুক্ত হইয়া সোমালিয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়াছে। ২৬শে জুন মাডাগাস্কার দ্বীপ মালাগাসি নাম গ্রহণ করিয়া ফরাসী পরিবারের

মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বেলজিয়ান কঙ্গো গত ৩০শে জুন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরেই বেলজিয়মের হস্তক্ষেপের ফলে কঙ্গোতে যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান কিভাবে হইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না।

আগষ্ট মাসে (১৯৬০) ফরাসী কমিউনিটি বা ফরাসী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত আরও নয়টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। উহাদের নাম দাহোমে, নাইজার, আপার ভোল্টা, আইভরি কোষ্ট, চাদ, উবাঙ্গীসারী, মধ্য কঙ্গো, গাবোন এবং মৌরিটানিয়া। বৃটিশের অধীনস্থ নাইজেরিয়া অক্টোবর মাসে স্বাধীনতা লাভ করিবে। স্বাধীনতা পথে অগ্রগতির দিক হইতে ১৯৬০ সালটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল এবং আরও হয়ত করিবে। কিন্তু তবু আফ্রিকার অনেকগুলি দেশের স্বাধীনতা লাভ বাকী থাকিবে। বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেন টাঙ্গানাইকাকে যৎকিঞ্চিৎ স্বায়ত্তশাসন দিবে। ন্যায়াসাল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ারও একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। উগাণ্ডা, কেনিয়া, সিয়েরালিওন এবং গাম্বিয়াকে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসন দিবার জন্য বৃটেন আলাপ-আলোচনা চালাইতেছে। ফরাসী অধিকৃত মাতানিককে স্বাধীনতা দিবার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইবে। কিন্তু আলজিরিয়ার ভবিষ্যৎ এখনও বুঝা যাইতেছে না। ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই। বৃটিশ প্রটেক্টরেটের অন্তর্গত বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড এবং এবং সোয়াজিল্যাণ্ডের ভবিষ্যত সম্পর্কেও কিছু অনুমান করা যাইতেছে না। মরোক্কোর যে অংশ স্পেনের অধিকারে ছিল তাহা স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকাস্থিত সাহারার একটি অংশ এবং স্পেনীয় গিনি এখনও স্বাধীনতা পায় নাই। ইউরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম আফ্রিকায় আসে পর্ত্তুগাল। আফ্রিকায় তাহার সাম্রাজ্য অবশ্য খুবই বিস্তৃত নয়। পশ্চিম আফ্রিকায় এঙ্গোলা, পূর্ব্ব আফ্রিকায় মোজাম্বিক, সেনেগাম্বিয়া উপকূলে পর্ত্তুগীজ গিনি এবং কোপ ভের্ডে দ্বীপপুঞ্জ, সানটোমে এবং প্রিন্সিপি দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের অধিকারে রহিয়াছে। পর্ত্তুগাল হয়ত সর্ব্ব শেষে আফ্রিকা ছাড়িবে।

স্বাধীন সাইপ্রাস—

গত ১৬ই আগষ্ট (১৯৬০) মধ্যরাত্রিতে সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে চুক্তি অনুসারে সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিল তাহাতে সাইপ্রাসে বৃটেনকে সামরিক ঘাঁটি রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের পর হইতে সাইপ্রাসে স্বাধীনতা এবং গ্রীসের সহিত যুক্ত হওয়ার আন্দোলন তীব্র আকারে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু উহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই এই আন্দোলন চলিতেছিল। কিন্তু বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে তাহার এই সামরিক ঘাঁটিটি সহজে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয় নাই। মিশরের স্বাধীনতা লাভ এবং উহার পরে সুয়েজ অঞ্চলে বৃটিশের সামরিক ঘাঁটি রাখা যখন আর সম্ভব হইল না, তখন বৃটেনের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে সাইপ্রাস বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিল। গ্রীস নাটোর সদস্য। কাজেই সাইপ্রাস গ্রীসের সঙ্গে যুক্ত হইলেও নাটোর ঘাঁটি সেখানে রাখার কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু বৃটেন তাহাতে রাজী হইল না। বৃটেনের বিভেদ নীতি সাইপ্রাসেও চলিতে লাগিল। সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহাদের দাবী এনোসিস অর্থাৎ গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাসের সংযুক্তি। এই দাবীর পাল্টা দাবী হিসাবে সাইপ্রাসের তুর্কীরা দাবী করিল উহাকে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করিবার। উভয় দাবীর মীমাংসার জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। অবশেষে একটা মীমাংসাও হইল। কিন্তু সাইপ্রাসে বৃটেনের সামরিক ঘাঁটি রাখা লইয়া আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হইল। এই সমস্যার সমাধান হওয়ায় সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভ করিবার ছয় বৎসর ব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। সাইপ্রাসকে বিভক্ত করিবার হুমকীও দেখানো হইয়াছিল।

সাইপ্রাসের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জনই গ্রীক। তুর্কীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন মাত্র। যে-চুক্তি অনুযায়ী সাইপ্রাস স্বাধীনতা পাইল তাহা সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক। সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হইবেন একজন গ্রীক। গ্রীক অধিবাসীরাই তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবেন। একজন তুর্কী হইবেন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবেন তুর্কী অধিবাসীরা। প্রেসিডেন্ট সাত জন গ্রীক মন্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তিন জন তুর্কী মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। সরকারী চাকুরীগুলিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বণ্টন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রীক অপেক্ষা তুর্কীদিগকে তাহাদের সংখ্যার হার অপেক্ষা বেশী চাকুরী দিবার ব্যবস্থা হইবে। গ্রীকরা শতকরা ৮০ জন হইলেও তাহারা পাইবে শতকরা ৭০টি চাকুরী। তুর্কীরা শতকরা ২০ জন হইয়াও শতকরা ৩০টি চাকুরী পাইবে। সামরিক বিভাগে শতকরা কত সৈন্য গ্রীক এবং কত সৈন্য তুর্কী হইবে তাহাও স্থির করা হইয়াছে। দুই হাজার সৈন্যের শতকরা ৬০ জন হইবে গ্রীক এবং ৪০ জন হইবে তুর্কী। যে অঞ্চলে শুধু এক সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে সেই অঞ্চলে অসামরিক শাসন পরিচালক, পুলিশ ইত্যাদি সবই ঐ সম্প্রদায়ের লোকই হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারা দ্বারা যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়, তাহা হইলে সাইপ্রাসে কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আর থাকিবে না। এই ভাবে সমস্ত বিষয়েই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সাইপ্রাসকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যে বিভক্ত করা হইবে না, সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বস্তুতঃ সাইপ্রাসের পাঁচটি প্রধান সহরের প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া পৃথক এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ মিউনিসিপালিটি গঠন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে নাটো কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী এবং তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনার ফলে যে ফরমূলা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদনুসারেই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সাইপ্রাসের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন।

উল্লিখিত ফরমূলায় স্থির করা হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত আইন সভায়, রচিত কোন আইন সম্পর্কে কো

সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইবার জন্য একটি কাউন্সীল অব ষ্টেট থাকিবে। একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উহার প্রেসিডেণ্ট হইবেন। সাইপ্রাস যুক্ত থাকিবে একটি যুক্তকমাণ্ডের মাধ্যমে। গ্রীক ও তুর্কী পালাক্রমে এই কমাণ্ডে নেতৃত্ব করিবে। সাইপ্রাসের আইনসভার জন্য গত জুলাই মাসে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্ব্বাচন হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে আর্কবিশপ ম্যাকারিওয়ে প্রগট্রিওটিক ফ্রণ্ট ৩০টি আসন দখল করিয়াছে এবং ডাঃ কুচুকের নেশন্তালফ্রণ্ট দখল করিয়াছে ১৫টি আসন। 'আকেল' অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি পাঁচটি আসন পাইয়াছে। প্রগট্রিওটিক পার্টির সহিত আকেলের নির্ব্বাচনী তঁাতাত ছিল। সুতরাং প্রগট্রিওটিক পার্টির গবর্ণমেণ্ট যে স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাইপ্রাসের ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভর করিবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রচিত এই শাসন ব্যবস্থায় গ্রীক ও তুর্কীরা কি ভাবে কার্য্য করিবেন তাহারই উপরে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগবাঁটোয়ারা সত্ত্বেও গ্রীক ও তুর্কীরা যদি মিলিত ভাবে চলিতে না পারেন, তাহা হইলে সাইপ্রাস সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে।

জীবন্ত প্রাণীর মহাশূন্যে অভিযান—

সোভিয়েট রাশিয়া জীবন্ত প্রাণীসহ যে মহাকাশচারী জাহাজ (Space Ship) মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়াছিল উহা হইতে প্রাণীদিগকে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। এই মহাকাশচারী জাহাজটি ভূপৃষ্ঠ হইতে দুই শত মাইল উর্দ্ধে প্রতি ১৯ মিনিটে একবার করিয়া ১৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার পর উহা হইতে প্রাণিবাহী ক্যাপসুলটি অর্থাৎ আধারটি স্খলিত হইয়া গত ২১শে আগষ্ট (১৯৬০) নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় পৃথিবীর বক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজটিতে ষ্ট্রেলকা ও বেলকা নামক দুইটি কুকুর, ৪০টি নেংটি ইন্দুর, ২টি ইন্দুর, কীটপতঙ্গ, গাছ, তণ্ডুলশস্য এবং কতগুলি জীবাণু প্রেরণ করা হইয়াছিল। ক্যাপসুল বা আধারটি ভূপৃষ্ঠের যে-স্থানে অবতরণ করিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল তাহা হইতে মাত্র ছয় মাইল দূরে পৃথিবীতে নামিয়া আসে। পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিবার পর দেখা গেল কুকুর দুইটি, ইন্দুরগুলি এবং কীটপতঙ্গগুলি জীবিত এবং সুস্থই রহিয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্যের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহাদের কর্ম্মশক্তি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। মহাকাশচারী জাহাজে চড়িয়া জীবন্ত প্রাণীর মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা এবং জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা যে যুগান্তকারী ঘটনা একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। প্রাণীগুলি যেমন জীবিত ও সুস্থ রহিয়াছে, কুঁড়িগুলি তেমনি ফুটিয়াছে ফুল হইয়া। এই ঘটনার মধ্যে সাফল্যের সহিত মানুষের গ্রহান্তর ভ্রমণের বিপুল সম্ভাবনা সূচিত রহিয়াছে।

রাশিয়া সর্ব্বপ্রথম মহাশূন্যে স্পুটনিক প্রেরণ করে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। ঐ বৎসর ৩রা নবেম্বর জীবন্ত কুকুর লাইকা সহ দ্বিতীয় স্পুটনিক মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কুকুরটিকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জীবিত প্রাণীসহ রকেট শূন্যে প্রেরণ করিয়া আবার জীবিত অবস্থায় সেই প্রাণীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবিরাম গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছিল। মহাকাশচারী জাহাজে করিয়া জীবিত প্রাণী মহাশূন্যে প্রেরণ করা আর কঠিন নয়। কিন্তু মহাশূন্যে প্রাণীর দেহমন সুস্থ রাখা এবং সুস্থ দেহমন সহ আবার তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা এত দিন বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। আজ উহা মানুষের আয়ত্তাধীন হইতে চলিয়াছে। মানুষের গ্রহান্তর ভ্রমণও সম্ভব হইবে, এমন শুভদিনের আর বোধহয় খুব বেশী দেরী নাই।

কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোর সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা আশঙ্কায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশীল্ড যে নীতি অনুযায়ী কঙ্গোতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহার সাম্রাজ্যবাদী রূপ ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, আশঙ্কা হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কঙ্গোতে সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকাই গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমতঃ গত দেড় মাসের মধ্যে কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অসামর্থ্যের জন্যই এইরূপ হইয়াছে ইহা স্বীকার করা সম্ভব নয়। বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে মিঃ হ্যামারশীল্ডের নিকট যে তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে প্রকৃত অবস্থার সহিত যে তাহার কোন মিল নাই, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ কঙ্গো হইতে বেলজিয়ান সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে বেলজিয়ম তাঁহাকে মিথ্যা কথাই বলিয়াছে। ইহাতেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নির্ব্বিকার। কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাতে কাটাঙ্গা সম্পর্কে তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কঙ্গোর অখণ্ডতাকেই ক্ষুণ্ণ করা শুধু হয় নাই কাটাঙ্গার বিদ্রোহী সরকারকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিঃ সোম্বেকে মিঃ হ্যামারশীল্ড যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে কাটাঙ্গায় সৈন্য ও পুলিশ সজ্জিত থাকিবে এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করিয়া যাইবে। তাহাদের কাজকর্ম্মের সহিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই সুযোগে অখণ্ড কঙ্গোর সমর্থকদিগকে কাটাঙ্গার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সম্মুখেই কাটাঙ্গার পুলিশ ও সৈন্য ঠেঙ্গাইতেছে, গুলী পর্য্যন্ত করিতেছে।

কাটাঙ্গার মত কাসাই প্রদেশও বিদ্রোহ করিয়াছে। কঙ্গো বাহিনী যখন এই বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত সেই সময় প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু লুমুম্বা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার যে ঘোষণা করিলেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষ যে ভাবে কঙ্গোর বেতার কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বিমান চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন তাহার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কর্ত্তৃপক্ষ এমন ভাবে কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহাতে কঙ্গো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিমীশক্তিবর্গেরই সুবিধা হয়। প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু যে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়াই উল্লিখিত ঘোষণা করিয়াছেন তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কাসাভুবু যখন লুমুম্বাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ঘোষণা করিতে বেতারকেন্দ্রে আসেন

তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জবাহিনী তাঁহাকে বাধা দেয় নাই। কিন্তু লুমুম্বা যখন বেতার বক্তৃতা দিতে আসেন তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

সংবাদে দেখা যাইতেছে, মিঃ লুমুম্বা এখনও ক্ষমতায় আসীন রহিয়াছেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত চলিতেছে। তিনি আজ স্বাধীন ও অখণ্ড কঙ্গোর প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী তাঁহার পতন দেখিতে চান, তাঁহার পতন ঘটিলেই তাহারা আনন্দিত হইবেন। কাসাই প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য রুশ বিমানে সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে। এই জন্যই বোধহয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বিমান চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মিঃ লুমুম্বার রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনায় মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বিচলিত হইয়াছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলিয়াছেন "আফ্রিকায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাশিয়া কঙ্গোতে একতরফা কার্য্যকলাপ চালাইতেছে।" উহার বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি উহা বন্ধ করিবার জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বেনামীতে কঙ্গোর স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা আজ স্পষ্ট হইয়াই উঠিয়াছে। মিঃ লুমুম্বাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। এখন তাঁহাকে অপসারিত করিয়া কঙ্গোর ঘাড়ে চাপিয়া বসিবার যে চেষ্টা চলিতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহারই অংশীদার হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কঙ্গোর গৃহযুদ্ধ যে-ভাবে উস্কানী দিতেছেন তাহাতে এই গৃহযুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি জড়িত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী নিহত—

গত ২৯শে আগষ্ট (১৯৬০) প্রকাশ্য দিবালোকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রিদপ্তরে একটি বোমানিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী পাশা এল হাজ্জা মাজালী নিহত হন। বোমাটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত আরও ১২জন নিহত হইয়াছে। জর্ডানের রাজা হোসেনকে হত্যা করাও নাকি ঐ বোমা নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নাকি ঐসময় পররাষ্ট্র দপ্তরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার রওনা হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। তিনি তাই রক্ষা পাইয়াছেন। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাজালী ধনী বেদুইন শেখ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। গত বৎসর বসন্ত কালে আর একবার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহার চেষ্টাতেই জর্ডান বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য কূটনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য বৃটেন তুর্কী সাম্রাজ্যের খানিকটা ভগ্নাবশেষ লইয়া জর্ডান রাজ্য গঠিত করিয়াছে। জর্ডানের প্রথম রাজা আবদুল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হন। রাজা আবদুল্লার পুত্র প্রিন্স তালাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করিবেন সেই সময় তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি হয়ত এখন কোন উন্মাদ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পুত্র হোসেনকে রাজা করা হয়। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ২৩ বৎসর। ইহাকে অভ্যুত্থানের সময় রাজা হোসেনের রাজত্বেও অবসান হইয়া আসিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্য আসিয়া তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করে।

অনেকে মনে করেন, গত ২৯শে আগষ্ট যে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে জর্ডানে অবস্থিত প্যালেষ্টাইন উদ্বাস্তুদের গোপন হস্ত আছে। জর্ডানের অধিবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ তাহারাই। জর্ডানের সৈন্য বাহিনীতেও তাহাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইহাকে অভ্যুত্থানের পর তাহাদের স্থানে বেদুইনদিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। বোমা-বিস্ফোরণের ইহা আর একটি কারণ হইতে পারে।

লাওসে সামরিক অভ্যুত্থান—

লাওসের রাজা সভং ভাথামা এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলী যখন লুয়াং প্রবাংয়ে গিয়াছিলেন সেই সময় গত ৯ই আগষ্ট ক্যাপ্টেন কংলের নেতৃত্বে রাজধানী ভিয়েনটিয়েনে সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং শাসন ক্ষমতা তাহাদের অধিকৃত হয়। বিপ্লবী কমিটি জাতীয় পরিষদের সভাপতি প্রিন্স সোভমনফুমাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। তিনি উদার নৈতিক জাতীয়তাবাদী। তিনি পাথেট লাওয়ের সহিত আপোশ করিয়াছিলেন এবং দেশকে নিরপেক্ষ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালের উপনির্ব্বাচনে পাথেট লাও নেতারা অধিকাংশ আসন দখল করিলে মার্কিণ সাহায্য বন্ধ হইয়া যায় এবং সোভমনফুমা প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হন ফুই সানানিকোন্। তিনি পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া শাসন বিভাগ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সময় যে বিদ্রোহ হয় সে সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটি এই বিদ্রোহের সহিত উত্তর ভিয়েটনামের কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পান নাই।

উক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের পর লাওসের অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠে। রাজধানীতে একটি সরকার এবং মফঃস্বলে আর একটি সরকার দেশের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতে থাকেন। গত ৩০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, তিনসপ্তাহব্যাপী সঙ্কট অবসানের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সোভমনফুমা বামপন্থী দক্ষিণপন্থী সবরকম সদস্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন।

—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

Happiness ? Good health ; bad memory.

—*Schweitzer*.

বারানসী

নীলকণ্ঠ

তিন

ভ্রমণ কথাটার গোড়াতেই কেন ভ্রম শব্দটা বসানো কে জানে ; কিন্তু ঠিক শব্দটাই ঠিক জায়গায় বসেছে।

বাঙলায় যে সব ভ্রমণ কাহিনী বেরোয় এবং জীবনচরিত তার প্রথমটায় ভ্রম এবং দ্বিতীয়টায় বিভ্রম ছাড়া আর কিছু উৎপাদনের প্রচেষ্টা থাকে কদাচ। এর জন্যে, এই কাল্পনিক ভ্রমণের এবং অবাস্তব জীবনের জন্যে বাঙালী লেখকদেরই কেবল দায়ী করে লাভ নেই ; পাঠকের দায়িত্বও কম নয়। ভুল বললাম। বাঙলা বইয়ের পাঠক আজও আসেনি ; বাঙলা বইয়ের পাঠক যারা আজও তারা সবাই আসলে পাঠিকা। সেই পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের কারণেই ভ্রমণের দুধে ভ্রমের জল মেশানো। বাঙলা জীবনচরিতে জীবন ছাড়া আর সবই উপস্থিত। যারা বলে বাঙালী উপন্যাস লিখতে পারেনি একখানা আজও, তারা আজও একখানাও বাঙলা বিওগ্রাফি পড়েনি,—তাই এমন কথা বলে। জীবনচরিতের ক্ষেত্রে বাঙালী অনায়াসে ফ্যাক্টের পরিবর্তে ফিকসন চালায় এবং পাঠকরা তা গলাধঃকরণ করে উইদাউট স্লাইট ফ্রিকশান। ভ্রমণের ক্ষেত্রেও যা দেখেছে সে তার চেয়ে অনেক বেশী যা দেখেনি, যা দেখা যায় না, যা দেখা যাবে না কোনওদিন তারই উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পাতার পর পাতা অপব্যয় না করা পর্যন্ত আর যাই হোক রমণীয় ভ্রমণকাহিনী হলো না। বাঙালী পাঠিকা তথা পাঠকদের কৃপায় যদি ভ্রমণকাহিনীকে বেষ্ট সেলার হতে হয় তাহলে মনের কথা চাই বেশি ভ্রমণের কথার চেয়ে ; সে কথায় যত মণ ভ্রম তত মনোযোগ পাঠকের ; থুড়ি,—পাঠিকার।

এইজন্যেই হিমালয়ের কথাতেই কেবল হিমাচল ভ্রমণের বই অচল। শুধু কুয়াশার কথায় হিমালয়ের কথা লিখলে সে বই পোকায় কাটে ; আধ্যাত্মিক কু-আশায় আবৃত করতে পারলে হিমালয় বৃত্তান্তের আপাদমস্তক, তখনই সে বই খদ্দেরে কাটে। তখনই হিমালয়ের বইয়ের আদর হিমালয় থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থিত কলকাতার বাঙালী আলয়ে। শুধু গাইড-চালিত হলে বাঙলা ট্রাভেলগ চলে না ; প্রয়োজন হয় পথ দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ভৈরবী মিস-গাইডের। অথবা লেডি কেরাণীর সঙ্গে জানতে হয় রাজপুত্রের আনরোমান হলিডে-র আরব্যোপন্যাস ; ছড়াতে হয় হুইশপারিং ক্যাম্পেন, সে পাঠক তো বটেই হিমালয়ে যাদের আজন্ম বাস, বেশির ভাগ সময়ে উপবাস এবং অপমৃত্যু তারাও জানতে চেয়েছে একে ? এ কেরাণীকে ? জানতে চাইবেনই তো ! তুষারমানব পর্যন্ত শোনা গেছে ; তুষারমানবীর কাহিনী বাঙলা হিমালয়কাণ্ড ছাড়া, এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কোথাও খুঁজে পাবে না তা জানি—সকল দেশের রাণী সে যে আমার লেডি কেরাণী।

এই গেলো এক ; এর ওপর আছে আবার আরেক। গোদের ওপর বিষফোড়া ; বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; দেশে-বিদেশে চালু অলীকবাবুর গপপোর ওপর মেরুতীর্থ পর্যটকের অলৌকিক অধভূত অর্ধেক-ভূত আর অর্ধেক অদ্ভুত। বাঙালী যেমন যতক্ষণ না কেউ বাপ-চৌদ্দপুরুষের রেখে যাওয়া যথাসর্বস্ব উড়ে ফুঁকে দিয়ে নীল রক্ত লাল করছে, ততক্ষণ তার জীবনী পড়তে নারাজ ; তেমনই যে জায়গায় যেতে হলে রক্তবমি না হয় অন্তত একজনের ; কয়েকজনের যদি দুর্গন্ধযুক্ত এমন 'অতীত' না থাকে যা স্বীকার না করা পর্যন্ত মেরুতীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য অনর্জিত থাকে ; যদি না এর ওপরেও বাকী সব কজনের মাথা খারাপ হয় তাহলে সে বই-এর আশা নেই পাঠিকার মন কাড়ার। পুস্তকপ্রিয়াদের পসন্দ নয় সে বই। যে বই বর্তমানে যত বিকৃত সে বই-ই বর্তমানে তত বিক্রীত।

কাশী হচ্ছে ভারতের সেই একমাত্র তীর্থকেন্দ্র যা এই দুই দুর্ভাগ্য সুখবঞ্চিত। কল্পনার বুরকায় ঢাকা নয় তার আপাদমস্তক। অসূর্যম্পশ্যা নয় ৺বিশ্বনাথধাম ; দিবালোকের মত স্পষ্ট ; বাঙালীর ওপর অবাঙালী সর্বভারতের পুঞ্জিত ক্রোধের চেয়েও সুস্পষ্ট। কাশীর কোথাও ধোঁয়া নেই। পৌঁছবার কষ্ট নেই কাশীতে। কাশীর গলি হোক যত ঘোরালো ; তার মন্দিরে হোক যত অল্প আলো ; সেখানে ধুঁকতে ধুঁকতে কাউকে করতে হয় না রক্তবমন অতীত-দুষ্কার্যের কণীয়-স্বীকৃতি না উচ্চারণ করা তক। অথবা সে গলিতে সম্ভাবনা নেই হঠাৎ-সাক্ষাতের, 'দেখা না দেখায় মেশা কোন বিদ্যুল্লতার।' সেখানে যারা যায় তাঁরা হয় ধর্ম, নয় অধর্ম করতে যায় ; সেখানে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা হয় ধর্মের ষণ্ড, নয়, যতেক অধর্মের দারুণ পাষণ্ড। কিন্তু ধর্মে অধর্মে, ষণ্ডে পাষণ্ডে, বিশ্বনাথ এবং বিশ্বের যতেক অনাথ নিয়ে কুহেলিকামুক্ত কাশী ভারতের মধ্যে মহাভারত। এই মহাভারতের কথা যিনি পরিবেশনে উদ্যত তিনি কাশীরাম দাস নন ; অতএব তা অমৃতসমান নয়। যিনি শোনাচ্ছেন তিনি ধন্য হতে চান না ; যিনি পড়বেন তাঁর পুণ্যবান না হলেও চলবে ; কিন্তু পড়তে পড়তে চোখ কান খোলা না রাখলে চলবে না।

চলবে না যে তার কারণ কাশীকাণ্ড কেবল পড়বার নয় ; দেখবারও। কাশীতে যাবার পথেই প্রয়োজন সজাগ দৃষ্টি অসতর্ক

কানের। যদিও কাশীতে যেতে ঘোড়া অথবা উটের পিঠের দরকার নেই ; যেমন দরকার নেই নৌকা, ষ্টিমার অথবা জাহাজের। উড়ো জাহাজের পিঠে অবশ্য চাপা যায় ; পৌঁছনও যায় কয়েক ঘণ্টারও কম সময়ে ; কিন্তু পৌঁছনও যায় না কোনও দিন সেই মানুষের কাছে যে মানুষ সমস্ত মন্দিরের চেয়ে বড়, গীর্জার চেয়ে অনেক : তীর্থস্থান। সকল কালে সকল দেশে সমস্ত দেবতার চেয়ে পবিত্র, প্রণম্য ; সকল যুগের সাহিত্য আর ইতিহাসের সে বর্তনীর একমাত্র উপাদান। সেই মানুষ যার মধ্যেই কেবল আর কৃষ্ণ কখনও আলাদা আলাদা আধারে, কখনও একই সভ্যতার চরম দুর্দিনের আঁধারে পরমাবির্ভূত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। যে মানুষ দনুজবেশে কখনও দলিত ; আবার দুর্গা বলতে যার ও কখনও নীলোৎপল দু চোখ বেয়ে ভক্তির অশ্রু উদ্বেলিত।

আমার এই কাশীর কথাও কল্পিত ভ্রমণকাহিনীর অকল্পিত কথা নয় ; মানুষেরই অপরূপ কথা। সেই মানুষ যাদের দ,—কাশীতে মরলে শিবলোক-প্রাপ্ত হয় ; আর ব্যাসকাশীতে ল পরাধীন ভারতে যে গর্দভ হতো ; স্বাধীন ভারতে আজ সে লী হয়। কাশী উপলক্ষ্য মাত্র ; সেই লক্ষ কোটি মানুষই মার লক্ষ্য কেবল।

হেঁটে গেলেই সব চেয়ে ভালো হয় ; কারণ :

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো
মেসিন-পক্ষীরাজে ;
যেতে চাও কাদা ছুড়ে যেতে পারো
মোটর যানে তা সাজে।
সস্তায় হারে টুয়ে যেতে চাও
ট্রেনের টিকিট কাটো ;
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও
সবার সঙ্গে হাঁটো।

আজকের গতির যুগে হেঁটে যাও মানেই হঠে যাও। অবশ্য এই রর গতির বাকী এখনও অনেক দূর ; অনেক দুর্গতির বাকী তার। বুও হেঁটে নয় কিছুতেই। কিন্তু হেঁটে নয় যেমন, তেমনই নয় উড়ো াহাজে 'দেশে দেশে চলি উড়ে' বলতে আমার আপত্তি দারুণ ; রণ আমি কেবল বাঙালী নয়,—আমি নিদারুণ প্রভিন্সিয়াল াইণ্ডেড। এবং বাঙালী মাত্রকেই নিজেকে 'ডেড' না মনে করতে ল বাঙালী মাইণ্ডেড মনে করতেই হবে নিজেকে। উড়ে যাবার রকার কেবল তারই যাওয়া আসা যার ব্যবসা ; আসা যাওয়া যার নশা সে কোন দুঃখে তাড়া করতে যাবে অত ; অত তাড়াতাড়িতে াড়াবাড়িতে যাবার তার দরকার কি। আস্তে আস্তে হাসতে-হাসতে াসতে ভাসতে যাবে সে। যেমন সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের াত যখন বাঁকা তখন যেমন উড়ে চলে, অনেক ওপর দিয়ে নীল াদীর জলে যেমন মরাল, তেমনই বলাকারা, মুখে নিয়া সৃষ্টির প্রথম াণী ; হেথা নয় ; হেথা নয় ; অন্ত কোথা ; অন্ত কোনখানে। উড়ে যাওয়া হচ্ছে পরীক্ষার পড়া ; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও যার ফলে ীরস টিউটরিয়েলে পর্যুদস্ত। জলে জাহাজে এবং ডাঙায় জাহাজে চপে যাওয়া হচ্ছে তারাশঙ্করের মত বিশুদ্ধ বিষয়ও রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সকলের বিস্ময়।

তাই ট্রেনে চাপো। ফার্ষ্ট ক্লাসে অথবা শীতাতপনি কামরায় নয় ; তৃতীয় শ্রেণীতে। গান্ধীর মতো নামে থার্ড, ফার্ষ্ট ক্লাসের চেয়েও আরামপ্রদ নয়। যে গাড়িতে তোমা আপামর জনসাধারণ চলেছে দুর্গন্ধযুক্ত ল্যাভাটরির লজ্জা, ছারপে দংশন, অন্ধকূপ হত্যার আশঙ্কার সহ যাত্রী হয়ে, স্বাধীন ভা যার জনগণ মন অধিনায়ক, ভাগ্য বিধাতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাস ক অতি অল্প সপরিবারে অসংখ্য কামরাযুক্ত প্রাসাদে আর যার আবা বনিতারা উপবাস করে অসংখ্য লোকে মিলে অতি স্বল্প স্থানে ব করার দুর্ভাগ্যের স্বর্গে. এবং সে প্রাসাদে রাজপ্রাসাদের বাস আ কতকাল যে অব্যাহত থাকবে বলা অসম্ভব,—কারণ রবীন্দ্রনাথ অনে আগেই বলে গেছেন : হে রাজেন্দ্র তব হাতে অন্তহীন কাল। স্বাধী ভারতের ট্রেনে চাপো যার গায়ে অলিখিত নির্দেশ সর্বদাই ঝুলছে বত্রিশ জন বসিবেক ; চৌষট্টি জন দাঁড়াইবেক ; একশত আটাশ জ বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক ; এবং দুই শত ছাপ্পান্ন জন ঝুলিবেক।

এই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চাপো যদি স্বাধীন ভারতে হতে চা জীবনের সহযাত্রী।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই, কাশী যাবার পথে আমার সুদর্শ রায়ের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। অদ্বিতীয় সুদর্শন রায়। কাশী বললে যেমন কাশীর দিদিমার কথা মনে পড়ে তেমনই যার কথা সঙ্গে স না মনে পড়ে পারে না, তারই নাম সুদর্শন। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের ষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ডের ; বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বের যতেক অনাথে যেখানে দেখা মেলে চোখ খুললেই ; সে চোখ না খুললেও মেলাই দে মেলে এমন বৈপরীত্যের সেই কাশীর উত্তর মেরু হল যদি কাশী দিদিমা ; তবে তার দক্ষিণতম প্রান্ত হচ্ছে সুদর্শন নিঃসংশয়ে। বি রাবণ ছাড়া একা রামে জমে না রামায়ণ ; কেবল যুধিষ্ঠিরে আধুনিক নিউ রিয়ালিসতিক ফ্যাসনে তোলা আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রা বিরসতম অখাদ্য গল্পের নামে ইনহিউম্যান দলিল চিত্র হয় ; দুর্যোধনে বিনা যুদ্ধের সূচ্যগ্র মেদিনী না দেবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অসম্ভব হ কুরুক্ষেত্রের নাটক। শুধু কাশীর দিদিমাতে কাশীকাণ্ডের প্রকা ফাঁক থেকে যায়। মেঘ ছাড়া রোদ্রের ছায়াবিহীন আলোর কালোহারা সাদায় ; দ্বন্দ্বহীন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনহীন জীবনের দলি হয় ; জীবননাট্য হয় না। তাই সুদর্শন রায়কেও উপস্থিত কর চাই। কাশীর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে নয় ; কাশীর কাব্যকে উপস্থিত মহাকাব্যে উত্তীর্ণ করবার কারণে ; কাশীর রূপকে অপরূপ কণ্টাষ্ট দেবার অভিলাষে।

সুদর্শন রায় বলে যার কথা এখন বলতে যাচ্ছি ; সুদর্শন তার নাম নয়,—'রায়' নয় তার পদবী। নাম আর পদবী বানানো বটে ; তবে যার কথা বলতে যাচ্ছি সে লোকটা সত্য। কাশীর দিদিমার মতোই জ্যান্ত তার চেয়েও জলজ্যান্ত এই মানুষের কথা বলতে বসে তার নাম, পদবী, ধাম বাধ্য হচ্ছি পালটে দিতে ; কারণ লোকটা বেঁচে আছে আজও। এবং আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে অন্যায় না হলেও, বাঁচার ওপর যে কোনও ঘা দিলেই, তা আরও অন্যায় হয়। অবশ্য সুদর্শন রায় আজ কেবল বেঁচেই আছে তার স্বনামে। বেঁচে মরে আছে কোনও রকমে ; মরে বেঁচে যাবার আশায় ওই কাশীতেই। সুদর্শন রায় একদিন অবশ্য জীবিত ছিলো, প্রতি মুহূর্তে জীবিত। এই মরার, এই আধমরার দেশে যা মেরে

[না]চাবার মন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো সে ; ময়ূর যেমন মেঘ হলে [প্র]থম তোলায় নিয়ে আসে প্রেরণা জন্ম মুহূর্তেই, কর্ণের অঙ্গে যেমন [জ]লমল করত সহজাত কবচকুণ্ডল ; সুদর্শন রায় এই ভেজাল নাম [আ]র পদবীর আড়ালে যে মানুষটা বাস করত ; করত একদিন, [আ]জ আর করে না, সেই মানুষটা ঠোঁটের কোণে তেমনই ভূমিষ্ঠ [হ]বার লগ্নেই সঙ্গে করে এনেছিল নির্ভেজাল হাসি।

সুদর্শনের হাসিকে কেবল হাসি বলে ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের বলাকা-কে আরেক খানি বই মাত্র বলার অপরাধ হয় ; অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়, প্রথম দুজন বাঙালী গ্রাজুয়েটের অন্যতম, মাত্র এই হয়ে দাঁড়ায়। সুদর্শনের হাসি,—আমি তো ছেলে মানুষ, কাশীর এই মহাভারত যদি স্বয়ং কাশীরাম লিখতেন তা হলেও শক্ত হতো তার যথার্থ বর্ণনা করা ; কারণ তা বর্ণনার বিষয় নয় ; শোনবার বিষয়। উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত সেই হাসি যেন শিবের জটা থেকে মর্ত্যাভিমুখে অবতরণরত প্রাণগঙ্গার কলমন্দ্র রোল। দুঃখের বরষায় তার সেই হাসির দমকে মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে সূর্যের প্রসন্নানন ; জলে ধোয়া আকাশের বুকে ঝকমক করে বর্ষার রৌদ্রের পদ্মরাগমণি।

কিন্তু তবুও তা হাসি নয় ; কান্নার মুখোস মাত্র। একদিন সেই হাসির মুখোস সরে গিয়ে উন্মুক্ত না হলে তার অশ্রুমুখ ; জীবনের মুকুরে না হলে প্রতিবিম্বিত,—সুদর্শন রায়ের কথা, কাশীর কথা বলতে বসে, লেখা সবচেয়ে সিরিয়াস কলমেও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতো ? নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কি হতো আর তা। সুদর্শন নয় কেবল। গোটা মানবজীবনটাই হাসি-কান্নার মুখোস মাত্র। কান্নাকে চাপবার কারণে মানুষের হাসি এবং পরের পতনে অন্তরের হাসিকে কুমীর-ক্রন্দনে আবরণ দেওয়ারই ছদ্মনাম জীবন। লাইফ ইজ এ ব্রিফ ক্যাণ্ডেল নয় ; লাইফ ইজ এ লং স্ক্যাণ্ডাল। হাসিকে কান্না এবং কান্নাকে হাসি করার চেয়ে স্ক্যাণ্ডালাস আর কি আছে। আয়ুর বাল্‌ব কত ক্যাণ্ডল পাওয়ার,—এ প্রশ্ন সেক্সপীয়ার সঙ্গত ; মানুষের আয়ুর বাল্‌ব কত স্ক্যাণ্ডালপাওয়ার তাই হওয়া উচিত কিন্তু আসলে জীবনসঙ্গত জিজ্ঞাসা।

সুদর্শন রায়ের সঙ্গে সেবারে দেখা কাশী যাবার পথে নতুন করে আবার। সুদর্শন সেই সুদর্শনই আছে। সেই হাসি সেই বেপরোয়া বোহেমিয়ান সুদর্শন রায়—যার মতে বাঁচার উদ্দেশ্য মাত্র দুটি। একটি মদ ; অপরটি মেয়েমানুষ। কিন্তু সেখানেও, সেই চরম অধঃপতনের পথে প্রথম অগ্রসর সুদর্শন রায়কে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কারণ কোনটাই তার লুকোবার চেষ্টা নেই। বাইরে বৈরাগ্যের বেশ পরে আত্মীয়-অনাত্মীয়-ঘরে লুকিয়ে নোংরামি করার প্রবৃত্তি নয় তার ; দুশ্চরিত্রতার সমস্ত রকম রাস্তা জানা থাকলেও ঘর নষ্ট করার মন্ত্রে তার অরুচি ছিলো। পরস্ত্রী, কুমারী, কি বিধবার সঙ্গে প্রণয় অনেক দূরের কথা ; পরিচয় পর্যন্ত সে এগুতো না। কেন জানতে চাইলে, বলত সুদর্শন রায়ের দোষ অগুণতি ; গুণ একটি। সে দুশ্চরিত্র পুরুষ ; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ নয়। তার প্রচুর মদ্যপান এবং প্রচুরতর সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গ সমাজের অভিধানে যাদের সংজ্ঞা পতিতা, তাকে নিশ্চয়ই সমাজের সেই সব জীবেদের পরিভাষায় সব্বনেশে লোক বলে অভিহিত করেছিলো অথবা করবে চিরকাল যারা ড্রিঙ্ক করেও মাতাল হয় কদাচ ; এবং যারা সময়ে সময়ে পড়তে জানে বলে বড় বড় ঘরের বড় বড় স্ক্যাণ্ডালের জনক হওয়া সত্ত্বেও মরে যাবার পর ওবিচুয়ারি পায় প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রের আধকলম জুড়ে যার মধ্যে মোটা লাইনে দাগানো কথাগুলো হচ্ছে : স্বভাব এবং আদর্শচরিত্রের গুণে তিনি ছিলেন সকলের অনুকরণযোগ্য।

ওবিচুয়ারি ঠিকই লেখে। যে সমাজে একদিন সবাই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় পেত না,—সে সমাজে নয় ; যে সমাজে আজ কারুরই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় ; সেই সমাজে এই জাতীয়, এই বজ্জাতীয় জীবেরাই যে সকলের অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হ'বে, তা আর বিচিত্র কি !

সুদর্শন রায় অবশ্য চিরকাল এ রকম ছিলো না। তার ঘর ছিলো ; মনের মতো ছিলো ঘরণী ; এবং রাজকন্যার মতো এক মেয়ে। প্রচুর বিত্ত সেদিনও ছিলো ; আজও যেমন আছে। সুদর্শন ছিলো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব ক'লকাতার মধ্যমণি। তার বাড়ি ছিলো কালচারের পীঠস্থান। বারো বছর ঘর করবার পর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে একদিন চলে যায় মেয়ের মাষ্টারের সঙ্গে। কেন যায় তা অন্য কেউ জানেই না, সুদর্শনের আজও পর্যন্ত তা অজানা। এবং চলে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্ত্রী, যার নাম দিলাম এখানে আলেয়া, এমনও কোনও কারণ ঘটায়নি যা থেকে, নাকি কল্পনা করা যায় এত বড় দুর্ঘটনার ভগ্নাংশ পর্যন্ত। মেয়ের যে মাষ্টার সে যে কেবল অর্থেই দরিদ্র তা নয় ; স্বাস্থ্যেও হৃতসর্বস্ব। তার মধ্যে আট বছরের মেয়ের মা কি দেখলো তা সেই জানে ; চলে যাবার পর তবেই ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে বেরুতে লাগলো চিঠির টুকরো ; প্রেমের প্রমাণ। সেই টার্ণ নিলো সুদর্শন। মদ আর মেয়েমানুষ ; মেয়েমানুষ আর মদ। ডুবে গেল সে অধঃপতনের অতলে। জেগে রইলো তখনও কেবল তার যৌবনের ভগ্নাবশেষ,—হাসির ডগাটুকু।

কাশী যাবার ট্রেণে হঠাৎ দেখা সুদর্শনের সঙ্গে কত বছর বাদে বলা অসম্ভব ; অর্থাৎ ইটস এজেস সিনস আই লাষ্ট স হিম। ফার্ষ্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার সুদর্শন নিয়ে গেলো তৃতীয় শ্রেণী থেকে হতভাগ্য আমাকে প্রতি মুহূর্তের চেকারতাড়িত হবার রিসকের মধ্যে। থার্ড ক্লাশ থেকে আমাকে টানাটানি করে নামিয়ে নেবার আগে কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হয়েছিলো গান্ধীর ক্লাসে বাধ্য হয়ে। সেখানে তখন জোর তর্ক চলছিলো মানত করার মানে হয় কিনা। একজনের মতে এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় হাতে হাতে। আরেকজনের অভিমতে, এ সবই অন্ধ কুসংস্কার নয় কেবল ; নিজের স্বার্থের জন্যে পাঁঠা মানত করা রীতিমত নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা। অন্য আরেকজন তর্কের ধার দিয়ে গেলো না ; সে সুরু করে দিলো এক গল্প। মুহূর্তে কলহে রূপান্তরিত হতে পারত যা তা নেমে এল সাগ্রহ উৎকর্ণতায় সবাই ঘেঁষে বসলো ; গল্পবলিয়ের কাছ ঘেঁষে।

মা কালীর কাছে গেছে মধ্যবিত্ত উকিল বাপ ছেলের চাকরি জন্যে ; সওয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে বলেছে : আমার অবস্থা পাড়া বটু ঘোষের চেয়ে অনেক খারাপ ; শুনেছি সে পাঁচসিকের পুজো দিয়েছে ; মানত করেছে ছেলের চাকরি হলে জোড়া পাঁঠা দেবে তার কথা শুনো না মা ; তার ছেলের চাকরি না হলেও চলবে তার পাঁচসিকে পুজোর জায়গায় আমার সোয়া পাঁচ আনা পুজো দেওয়াতেই তো বুঝছ যে আমার কি অবস্থা এবং আমার ছেলে

চাকরি হওয়া কত দরকার। মা কালী বলেন : তা যদি বলো তো তোমার পাড়ারই আরেকজন এসেছিলো আজ সকালে তার ছেলের চাকরির জন্যে ; সে এক পয়সার পুজোও দেয়নি ; মানতও করেনি এক কানাকড়ির কোন কিছু। অবস্থা ভেবে চাকরি দিলে তো তার ছেলেকেই দিতে হয়। উকিল খচে যায় সাজ্যাতিক ; এড:জার্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট না করা জাজের ওপর রাগের মতোই মা কালীর মেজাজের ওপর সব নির্ভর করে জেনে বিমর্ষ হ'য়ে চলে যাবার আগে স্বগতোক্তি করে : তাহলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো ! শুনে মা কালী কিন্তু রাগ করেন না ; ভক্তের প্রতি অনুরাগের একগাল হাসি হেসে বলেন : তাই তো করি ; তোরা যে কেন মাঝ থেকে মানত মেনে মরিস, সেইটেই শুধু স্বয়ং মা কালী হয়েও আজও বুঝতে পারি না।

মানতের বিপক্ষে যারা তাদের হাসির গমকে অথবা ষ্টেশনে পৌঁছবার কারণে মনে নেই ট্রেণ থামতেই এক ঝটকায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার কামরায় তোলে সুদর্শন। যত বাধা দিই তত বলে চেকার ধরলে টাকার জন্যে ভাবনা নেই ; তার জন্যে আছে সুদর্শন রায়। বুঝি সুদর্শন কিছু বলতে চায় ; এমন কিছু যা বলা যায় না হাটের মধ্যে ; তাই চুপ করে যাই।

কিন্তু সুদর্শন রায় প্রথম শ্রেণীর অভিজাত নিভৃতে যেকথা প্রথমেই বলে সেকথায় আর চুপ করে থাকা যায় না, চমকে উঠতে হয়। সুদর্শন আমার দু'হাত চেপে ধরে বলে : ও গল্প কান দিও না ; মানত সত্য বলে জেনো ; মানতে কাজ হয়— ! থাকতে না পেরে উচ্চকণ্ঠে না বলে পারি না : দাও টু ক্রটাশ ? মুহূর্তে সেকথা চাপা দিয়ে সুদর্শন এবার আরো চমকে দেয় : জানো, আলেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার ?—কোথায় ? আমার কণ্ঠে কৌতুহলের বান ডেকে যায়। কাশীতেই একদিন দেখা হয়ে যায় সুদর্শনের তার বারোবছরের বিবাহিত জীবনের বৃন্তচ্যুত বউয়ের সঙ্গে। যেভাবে দেখা হয় তা বানানো গল্পের খাতিরেও বিশ্বাস করা অসম্ভব হোত। কিন্তু জীবনের কাছে জীবন্ততম উপন্যাসও অলৌকিকত্বে কিছু নয়। তাই। সুদর্শন এসয্যাল কাশীতেও ধর্মস্থানের চেয়ে অধর্মস্থানের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে বেশী। পতিতালয় থেকে পতিতালয়ে বাঈজীর সুর থেকে সুরে ; সুরার পাত্র থেকে সুরার পাত্রে সুরবিহার এবং সুরাবিহার করে বেড়ায় সুদর্শন। সেই সময়ে দালাল একদিন নিয়ে যেতে চায় তাকে এমন এক পতিতার কাছে যে পতিতা হয়েও নয় সম্পূর্ণ অধঃপতিতা। তার ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য সান্নিধ্য যা নির্ভর করে অর্থের ওপর নয় ; তার মেজাজের ওপর। কৌতুহলী হয়ে যায় সুদর্শন। সুদর্শনের কথাও দালালের মুখে শুনে দাঁড়ায় এসে সেই 'নহে মাতা নহে বধূ' উর্বশী সুদর্শনের সম্মুখে।

সুদর্শনের মুখ দিয়ে বেরোয় : আলেয়া ?

আলেয়া শুধু বলে : তুমি ?

চুপ করে যায় সুদর্শন। আলেয়ার কথা চাপা দিতে মানতের কথাই তুলি আবার : সুদর্শন,—মানতের কথা কি বলছিলে ! বলতে বলতে থেমে গেল কেন ? সুদর্শন হাসে। থেমে যাইনি ; সেকথায় আসবার জন্যেই আলেয়ার কথা পেড়েছিলাম। তুমি এতক্ষণ ভাবছিলে মাল খেয়ে কথার খেই হারিয়েছি,—তাই না ! সুদর্শনের খোঁচা গায়ে না মেখে জিজ্ঞেস করি। মানত করেছ কখনও ?

করেছি,—বলে সুদর্শন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে মানত করেছিলাম—

কিসের জন্যে ?

আলেয়ার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলাম বিশ্বনাথের কাছে ; বিশ্বনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন ; এখন ভাবি কথা রাখার চেয়ে কথা না রাখাই তাঁর ভালো ছিলো—

কি মানত করেছিলে ?—একটু চুপ করে থেকে জানতে চাই আমি।

চোখের জল ! জবাব করে সুদর্শন রায়।

মানে ?

প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে কোনও বেদনায়, কোনও আঘাতে, কোনও বিচ্ছেদে কোনও দিন চোখ দিয়ে বার করব না এক কোঁটা চোখের জল !

বলেই হা-হা করে পাগলের মত অর্থহীন হাসে সুদর্শন।

আমার কাছে সে মুহূর্তে তার হাসি কিন্তু অর্থহীন মনে হয় না। শুধু সুদর্শনের নয় ; তার হাসির মধ্যে দিয়ে সকল কালে সব মানুষের হাসির অর্থ কুড়িয়ে পাই আমি। চোখের জল ঢাকা ছাড়া মানুষের হাসির অর্থ নেই আর কিছু !

[ক্রমশঃ।

মায়াময়মিদং

বিমলচন্দ্র ঘোষ

দুঃখের দিনে প্রেম পলাতক উড়ে যায় সুখ ঝড়ে।
দরদের ভয় যুড়োয় আদরে ফুল তো মুষড়ে পড়ে।

দারিদ্র্য দেখে মমতা পালায় বিপদে উধাও স্নেহ।
প্রতিভার খ্যাতি বাড়ে চিরদিনই শ্মশানে পুড়লে দেহ।

ক্ষেপে যায় স্নেহ একবার হেড়ে দু'বার চেঁচিয়ে ডাকলে।
কর্পূর হ'য়ে মোহ উড়ে যায় দিনরাত কাছে থাকলে।
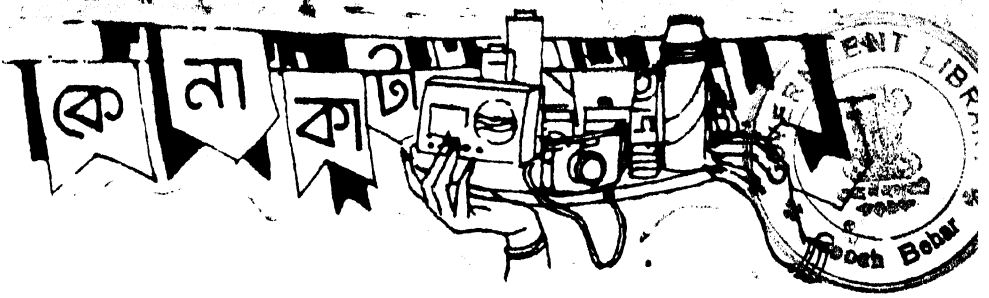
অর্থোপার্জনের জন্য লেখা

লেখকরা যে লিখে থাকেন সে তাঁদের পেশা না নেশা? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠতে পারে। এর উত্তর দিতে যেয়ে লেখক-শ্রেণীই হয়ত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবেন। কেউ কেউ হয় তো দাবী করবেন, লেখার মূলে রয়েছে নেশা, টাকা-পয়সা অর্থাৎ পেশাগত প্রশ্নটা এখানে গৌণ। আবার অপর শ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী সোজা বলতে চাইবেন—পেশাটাই আসল কথা, লিখে রোজগার হলে, সুনাম জুটলে লেখবার নেশাও হবে আপনি।

এই নিয়ে প্রচুর গবেষণ-আলোচনা ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে বটে কিন্তু 'তৈলাধার পাত্র' কি 'পাত্রাধার তৈল'—এ ধরণের জটিলতার ভেতর ঢুকে নীট লাভ কতটা? লেখক লিখে থাকেন, অন্ততঃ আজকাল, শুধু নেশায় নয়, পেশাগত প্রশ্নও এখানে আছে। আবার পেশাকে সফল ও জোরদার করতে হলে নেশার মাত্রাও না বাড়ালে নয়। এ শুধু এ দেশেরই নয়, সকল সমাজের লেখকদের দিকে তাকিয়েই বলা চলতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের গোড়াকার দিনগুলোতে, এমন কি সে-দিন অবধিও বলতে পারা যায়, কবি ও সাহিত্যিকগণ এদেশে সে-ভাবে সমাদৃত হন নি। অর্থাৎ লিখে টাকা-পয়সা তাঁদের যতটা পাওয়া উচিত ছিল, তা তাঁরা পান নি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিতান্ত দৈন্যের ভেতর দিনাতিপাত করতে হয়েছে তাঁদের। তবু যে বিচিত্র রচনা ও রস-সম্ভার তাঁরা দেশ ও জাতিকে দিয়ে গেছেন, এ নেহাৎ নেশা ছাড়া কিছু নয়। সেখানে তাঁরা দি তাঁদের লেখার উপযুক্ত দাম পেতেন, বিনিময়ে দিতে পারতেন াহিত্যের আরও নতুন নতুন অমূল্য উপহার, এ হয়ত ঠিক।

সাহিত্য লেখকের নেশা ও পেশা দুই-ই না হলে সাধারণতঃ লতে পারে না। ক'জন এমন আছেন, যিনি শুধু লিখেই যাবেন নের খেয়ালে, টাকা-পয়সার দিকে তাকাবার তাঁর দরকার নেই। কথা ঠিক, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রস-রচনা প্রভৃতির কোনটাই াইরে থেকে অমনি হাজির হবার নয়। এ সম্পূর্ণভাবে অন্তরের ামগ্রী—আবেগ ও প্রেরণালব্ধ সম্পদ। প্রকৃত দামী কিছু পরিবেশন রতে হলে নেশায় বিভোর হওয়া চাই বৈ কি! সেই সঙ্গে খাওয়া-ার জন্যে ভাবতে হবে না, এইটুকু নিশ্চয়তা যদি থাকে, তবে দিক থেকেই আশার কারণ হয়।

একটি জোরালো দাবী অনুসারে লেখক ঠিক আপন মনে লিখে বেন বটে কিন্তু সে লেখা প্রকাশের জন্যে উপযুক্ত মাধ্যম বা ব্যবস্থা থাকলে নয়। ধনী-গৃহেই সব কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হবে, ন কোন কথা নেই। ভাব-সম্পদ কখন কার কাছে ধরা দেবে, বলা কঠিন। গুণী ও শিল্পীর আবির্ভাব সব কুলেই হতে পারে, গরীবের ঘরেও। কিন্তু অর্থের আনুকূল্য না পেলে নিছক ভাব-সম্পদের অধিকারী হয়ে ক'জন লেখকের পক্ষে কতদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব? কালিদাস মহাকবি আখ্যাত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের আর্থিক সাহচর্য্য পাবার পরই। মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরথও চলার বেগ পেল তখনই বেশিরকম, যখন তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য রচনাবলী অবশ্য তাঁর পুরোপুরি নেশা থেকেই সৃষ্টি—অর্থ পাওয়ার প্রয়োজন ও তাগিদ হতে ততটা নয়। কিন্তু কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে লিখে টাকা-কড়ি তেমন না পেলে সৃষ্টির পথ বিঘ্নিত হতো বা হতে পারতো। পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগররূপে যাঁকে পাওয়ার সৌভাগ্য জাতির হলো, প্রথমাবস্থায় তাঁকে কতই না কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করতে হয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় আছে এবং দেখানোও যায়।

আজকাল একরূপ বাজারই দাঁড়িয়ে গেছে—অর্থোপার্জ্জ নয় জন্যে লেখা। সাহিত্য শিল্প-কর্মের 'হাতে খড়ি'র কতক কাল হয়তো নেশাটারই প্রাধান্য থাকে, কিন্তু সে মোহ বা আবেশ কাটতে বিলম্ব হয় না। বাজারে দর দাম না হলেই, লিখে সামান্য কিছু পারিশ্রমিকও না মিললেই কলমের জড়তা আপনি আসতে থাকে। আবার আলোচ্য বিষয়টির আর একটি দিকও বিবেচনা করবার আছে। আজকের বাজারে ভাল লেখা পরিবেশন করলে, সাহিত্য-কর্ম মোটামুটি নিখুঁত ও রসোত্তীর্ণ হলে সাধারণতঃ না বিকিয়ে পারে না। অর্থাৎ কোন না কোন মহল থেকে লেখক আপন সৃষ্টির দাম পানই, এমনটি আশা রাখা চলে। টাকা-পয়সা বা পারিশ্রমিক পাওয়া যায় বলেই এ যুগে লেখকসংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত—পুরনো খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণ নতুন খ্যাতি অর্জন করছেন দিন দিন। বিচিত্র হাতে বিচিত্র রচনা সৃষ্টি ও পরিবেশিত হওয়ার পথ আগের তুলনায় সে জন্যেই এখন অনেক বেশি। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করবার জন্যে জাতীয় সরকারও কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছেন, এ-ও নিশ্চয়ই একটি আশার কথা।

মোটের ওপর ব্যাপারটি এই পর্য্যায়ে এসেছে, এখনকার লেখক-সমাজ লেখাটাকে পেশাই করে নিয়েছেন কতক সংখ্যক লেখক পুরোপরি, অনেকে হয়ত বা অংশতঃ। লিখলেই নাম মাত্র হলেও টাকা পেতে হবে—নিছক একটি নেশা থেকে বা একদম বিনে পয়সায় এমনটি দীর্ঘদিন চলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বহু লেখক ও সাহিত্যিক রয়েছেন আজকের দিনে জীবিকা নির্বাহের জন্যে লেখাটাই যাঁদের এক মাত্র পেশা বা সম্বল। লিখতে পারেন ভালো

ভালো, অন্ত কাজে মন নেই কি হাতই নেই, তেমন লেখককে লেখা বিকিয়েই টাকা-কড়ি না পেলে নয়।

বিলেতে লেখা ও লেখক প্রসঙ্গে বহু আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এ যাবৎ। সংশ্লিষ্ট মহল বিচার করে দেখেছেন লেখকের লেখার তাগিদের পিছনে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ধন ও মান লাভ আর মনের কৌতূহল মেটানোর প্রশ্নটি প্রবল। তার ভেতর টাকা-কড়ি পাওয়ার প্রশ্নটিকে স্থান দিতে হয় বলতে গেলে সকলের আগে। বাজারে নাম কিনতে চান প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যিকই, কিন্তু টাকা-পয়সার কথা সম্পূর্ণ ভুলে নয়। অবশ্য একবার যাঁদের পেশাদার লেখক পর্য্যায়ে খ্যাতি হয়ে গেছে, সাহিত্যকর্ম তাঁদের যে মানেরই হোক, বর্ত্তমান বাজারে দাম পেতে খুব আটকায় না।

আরও একটি কথা—মৌলিক রচনা ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যেরও বাজারে আজকাল দাম-দর মিলছে। অনুবাদ যদি সত্যি সরেস ও সার্থক হয় এবং উঁচুদরের বইকে কেন্দ্র করে সে অনুবাদ হয়ে থাকে, অনুবাদ-শিল্পী বা সাহিত্যিক পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবেনই, এ আশাও আজ ঠিক অবাস্তব নয়। তবে সাহিত্য-কর্ম করতে চেয়ে রাতারাতি সুনাম অর্জন যেমন সচরাচর সম্ভবপর নহে, তেমনি প্রথম পাদেই সকল লেখকই টাকাকড়ি পেয়ে যাবেন, এমন দাবীও রাখলে চলে না। অনেককেই আশায় বসে থাকতে হবে একটা সময় পর্য্যন্ত বাড়িয়ে যেতে হবে এর ভেতর স্ব স্ব লেখনীর রচনাশক্তি। অর্থোপায় বা টাকা রোজগার করা ছাড়া লেখার পিছনে অন্ত কারণ আছে বলে যাঁরা ভাবেন, বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ডাঃ স্যামুয়েল জনসনের মতে তাঁরা একরকম নির্বোধ। শ'ও নাকি অর্থ ছাড়া লেখনীতে হাত দেওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না—অবশ্য প্রচুর সুনাম ও সম্পদ দুই-ই পেয়ে গেছেন তিনি জীবনে।

লেখাটাকে পেশা হিসাবে যেখানে গ্রহণ করতে চাওয়া হবে, যেখানে মেনে নিতে হবে একে অর্থোপার্জনের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, সেক্ষেত্রে লেখকের বেশ কয়েকটি দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন থেকে যায়। সতর্ক ও দরদী শিল্পী হতে হবে এমন লেখককে—বাস্তবকে অস্বীকার করবার দুরন্তপনা তাঁকে সহসা না পেলেই ভাল নয়। নিজের কলমের ওপর পুরো আস্থা থাকা চাই প্রতিষ্ঠাকামী লেখকের আর ভরসা রাখা চাই—লেখা ঠিক মানসম্পন্ন হলে দামও মিলবে, আজ না হোক, দু'দিন বাদে। সত্যিকারের ভালো লেখা যাতে ভালো দাম পায় কুশলী ও চিন্তাশীল লেখক যাতে বঞ্চিত ও অবহেলিত না হতে পারেন, বলা বাহুল্য, সে-সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে লেখক-সমাজের নিজেদেরই।

মানুষের স্বাস্থ্য—কয়েকটি কথা

স্বাস্থ্য অর্থাৎ শরীরের সুস্থ অবস্থাই মানুষের পরম সম্পদ, কথাটি মোটেই নতুন নয়। আর এ-ও জানা কথা—স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে, টাকা-পয়সা, নাম-যশ-প্রতিপত্তি কোন কিছুই ভাল লাগে না, এমন কি খেলাধূলো আমোদ-আহ্লাদও নিতান্ত ব্যর্থ। কিন্তু যে-স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল বলে এমনি দাবী রাখা হয়, কি ভাবে একে দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, কোন্ অবস্থায় শরীরকে রাখা চলে বরাবর ব্যাধি-বিমুক্ত, সেইটি বড় কথা এবং এই নিয়ে শরীর-বিজ্ঞানী বা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের ভাবনা আজও শেষ হয়নি।

পুঁথি-পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলো সাধারণ-বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে—যেগুলো প্রতিটি মানুষেরই অবশ্য পালনীয়। শরীর
ও মজবুত রাখতে হলেই নিয়মিত স্নান, আহার ও ঘুম চ
খাওয়া-পরাটা একটু বেশ ভালো ধরণের চাই, আর সর্বোপরি
নিশ্চিন্ত ও বলিষ্ঠ মন। কিন্তু কার্য্যতঃ এ সব নিয়মকানুন অ
ক্ষেত্রে পালিত হয় না এবং এ অক্ষমতার পিছনে রয়েছে একটি বে
একাধিক কারণ। যেখানে অর্থনৈতিক দুর্গতি ব্যাপক, বাঁচবার জ
সংগ্রাম দিয়ে দিয়ে যে সমাজে মানুষের মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে, সেখ
স্বাস্থ্যবিধি কার পক্ষে কতটুকু রক্ষা সম্ভব? তবু এর ভেতরই নি
অবহেলার দরুণ স্বাস্থ্য যেন ভেঙ্গে না পড়তে পারে, সেদিকে ব
নজর না রাখলে নয়।

বর্ত্তমান অগণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে সাধারণতঃ যেটি ল
করা যায়, অসুখ যখন হয়ে গেলো, তখনই মাত্র চিকিৎসার কথা হ
অসুখ যাতে শরীরে দেখা দিতে না পারে, সেই প্রতিব্যবস্থার সু
এ সমাজে কোথায়? সহরাঞ্চলে জনমত সজাগ থাকার ব্যবস্থা যেটুকু
চালু আছে, পল্লী অঞ্চলসমূহ এদিক থেকে এখনও যথেষ্ট উপেক্ষি
এই অবস্থায় ব্যষ্টিগত স্বাস্থ্য তথা সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, এ আ
রাখলেও অর্থ হবে না। এক্ষণে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কয়ে
মতামত পর্য্যালোচনা করা যাক্। ভাল স্বাস্থ্য নেহাৎ ভাগ্যের ব্যা
কিনা, এ প্রশ্ন ওঠানো হয়েছে এবং এই নিয়ে গবেষণা-আলোচ
করেছেন বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। বিলেতের চিকিৎ
গবেষণা পরিষদের বিভাগীয় ডিরেক্টার ডাঃ জেরেমি মরিস এই অভি
প্রকাশ করেছেন—ভালো স্বাস্থ্য ঠিক টাকা-পয়সার ওপর নি
করে না। সে টাকা-পয়সা কোন্ সূত্র বা পন্থায় ব্যয়িত হলো, আ
ক্ষেত্রে সেইটিই বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। ভালো মন নি
ভালো পরিবেশের মধ্যে থাকলে অনেক বিপদ থেকে রেহাই পা
সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকরা নিজেদের স্বাস্থ্য-সমস্যা নি
নিজেদের ভেতর আলোচনা করতে পারেন এবং এরূপ চি
আলোচনায় সুফলও পাওয়া যায়। হাতে টাকাকড়ি আসার প
এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সুন্দর পরিবেশের জন্যে ব
নন, যদৃচ্ছা জীবন যাপনেই যাঁদের মনের তাগিদ। শর
সংক্রামক ব্যাধিগুলোর আবির্ভাবের দ্বার খুলে রাখা
এমনিভাবে। যারা নিরক্ষর বা সামান্য শিক্ষিত, স্বাস্থ্যের প্র
তাদের অনেকেই উদাসীন বলেই যে কোন ফাঁকে বিপদ দেখা দে
সহজ কথায় জীবিকার মান উন্নয়ন বা দারিদ্র্যের বিলুপ্তি—শুধু
হলেই হবে না, উন্নততর স্বাস্থ্যের জন্য আরও কিছু চাই, বিশেষভ
চাই স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা।

একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, যারা খেটে খেতে অভ্যস্ত, তা
শরীর অন্য সকলের তুলনায় ভাল। আর যারা একান্ত আরামপ্রি
কর্মবিমুখ, তাহাদের প্রায় একটা না একটা অসুখ লেগেই থা
শ্রমজীবীদের মাঝে হৃদরোগের (করোনারী) আক্রমণ খুব কম
দেখা যায়, অথচ যাঁরা কায়িক শ্রম এড়িয়ে চলেন, হৃদরোগীর সং
তাঁদের মধ্যেই বেশি। বিলেতের চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদের সামা
ইউনিট দশ বছর এই ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে এমন অভি
জানিয়েছেন। তাঁদের মতে কর্মবিমুখ লোকদের যত কম
ও যতটা সহজে রোগ দেখা দেয়, কর্মব্যস্ত মানুষের শরীরে সে
রোগ অনুপ্রবেশ করতে পারে না, এ পরীক্ষায় দেখা গেছে।

স্বর ও শ্রুতি-তত্ত্ব

আমাদের কণ্ঠস্বরকে আমরা দু'প্রকারে ব্যবহার করি— ভাষাকথনে ও সংগীত পরিবেশনে অর্থাৎ কথা বলায় ও ান করায়। একই কণ্ঠের ধ্বনি ভাষারূপে ভাব প্রকাশ করে, াবার সেই ধ্বনি সংগীতোপযোগী হলে গান-রূপেও ভাব প্রকাশের ারণ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বোঝা যায় স্বর দটি দুই অর্থে দুই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়—ব্যাকরণের ক্ষেত্রে সংগীতের ক্ষেত্রে। বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় প্রধানত: সংগীতের ত্রে স্বর ও সামান্যত: ব্যাকরণের ক্ষেত্রে স্বর সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছু আলোচনা করব।

আমাদের সংগীতে 'সপ্তক' শব্দটি বহুল-বিদিত। সাতটি স্বরের ই সপ্তক-পদবাচ্য। এই সাতটি স্বরের উচ্চারণ—সা রে গা মা ধা নি। কিন্তু এ হল সংক্ষিপ্ত রূপ। আসলে স্বরগুলির পূর্ণ ম যথাক্রমে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও াদ। এর মধ্যে ষড়জ গ্রামে ষড়্‌জ, ঋষভ ও গান্ধার স্বরত্রয়ের স্পর ক্রমিক অনুপাত পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ স্বরত্রয়ের পরস্পর মক অনুপাতের সহিত তুল্য-মূল্য। অর্থাৎ পঞ্চমকে ষড়্‌জ াবে ধরলে পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ যথাক্রমে ষড়্‌জ, ঋষভ ও ার হয়। তিন স্বরযুক্ত এই দু প্রস্থ স্বরের মধ্যস্থিত (মধ্য বোধক) মধ্যম যোগসূত্র স্থাপনা ক'রে সপ্তক গঠন করেছে। কের সাতটি স্বরের মধ্যে ষড়জ (ষড়জ নয়—ড় হসন্ত, জ হসন্ত) স্বরের স্থান প্রধান। 'ষড়্‌ভিঃ জায়তে' এই অর্থে ষড়জ; ং যে স্বরের অনুপাতে বাকি ছটি স্বরের (ঋষভ, গান্ধার, ম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ) স্থান স্থিরীকৃত হয় সেটিই ষড়্‌জ।

প্রাচীন কালে আমাদের সংগীতে এক সপ্তকে এই দু'টি স্বর াও আরো দুটি স্বর বিশেষ নামে গণ্য হত, যথা—অন্তর ার ও কাকলী নিষাদ। সংগীতের এই সব স্বরের সঙ্গে করণশাস্ত্রের অ, ই, উ ইত্যাদি স্বর গভীর সম্বন্ধযুক্ত। ব্যাকরণ-ের স্বর বলতে সেই বর্ণগুলি বোঝায়, যেগুলি উচ্চারণের জন্য কোনো বর্ণের সাহায্য আবশ্যক হয় না। সংগীতশাস্ত্রে ারা যেমন ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি বোঝায়, ব্যাকরণ র স্বর দ্বারা তেমনি অ, ই, উ ইত্যাদি বর্ণ বোঝায়। সংগীতের ও ব্যাকরণের স্বর যে পরস্পর গভীর সম্বন্ধযুক্ত, নিম্নোদ্ধৃত িকা ১ থেকে তা পরিস্ফুট হবে—

ব্যাকরণের স্বর	ব্যাকরণের স্বরের দার্শনিক অর্থ	ব্যাকরণের স্বরের সমকক্ষ সংগীতের স্বর	সংগীতের স্বরের ভাবরূপ বা বৈশিষ্ট্য
অ	অক্ষর ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম	ষড়্‌জ	ষটচক্র থেকে উৎপন্ন ও ষটচক্রের জনক
ই	শক্তি	ঋষভ	বীর্য ও পরাক্রমের দ্যোতক
উ	পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম	গান্ধার	শৃঙ্গার, করুণ রসের দ্যোতক
ঋ	পরব্রহ্ম	অন্তর গান্ধার	বিস্তারের দ্যোতক
ঌ	পরমেশ্বরের মনোবৃত্তি, মায়া	কাকলী নিষাদ	বিকাশের দ্যোতক
এ	শিব ও শক্তির মিলিত তানরূপ	মধ্যম	শান্তরস, গভীর ভাব
ও	সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের মিশ্ররূপ	পঞ্চম	জাগৃতিসূচক
ঐ	ব্রহ্ম ও জ্ঞানের একরূপতা	ধৈবত	দুই রূপ—এক রূপে শান্ত, মৃদু ; দ্বিতীয়, ক্রিয়াত্মক তথা উগ্রতা ভয় ও জুগুপ্সার ভাব
ঔ	বিশ্বে পরমতত্ত্বের ব্যাপকতা	নিষাদ	শৃঙ্গার, করুণ রস

এই তালিকায় ব্যাকরণের স্বরের আ, ঈ ও ঊ উল্লিখিত হয় নি। কারণ, আ = অ + অ, ঈ = ই + ই এবং ঊ = উ + উ, অর্থাৎ প্রত্যেকটিই হ্রস্বস্বরের দ্বিত্ব মাত্র। তা ছাড়া, অন্য নয়টি ব্যাকরণের স্বর, অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ সহ নয়টি সংগীতের স্বরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অবশ্য এ সম্বন্ধে আরো অনেক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আছে, বর্তমান প্রবন্ধে যার আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলার আছে উল্লিখিত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ষড়জ গ্রামের স্বরাবলী ও ব্যাকরণের স্বরাবলী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত বিশেষ বিশেষ স্বরসমষ্টি দ্বারা গঠিত বিশেষ বিশেষ রাগে ব্যবহৃত স্বরাবলীর একটি সামগ্রিক ভাব-রূপ প্রকাশ পায়। আবার, রাগ গানে যোজিত হলে সেই গানই সার্থক হয়, যে গানে রাগের ভাব-রূপটি গানের তথা কাজের ভাব-রূপের সঙ্গে সমঞ্জস হয়। আমাদের সংগীতের প্রাচীন যুগের আচার্যগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

১। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকৃত 'প্রণবভারতী' গ্রন্থ থেকে ত ও অনুবাদিত।

এবারে শ্রুতি প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্রুতি কা'কে বলে? যা শোনা যায় তাই শ্রুতি?[২] কথাটা মেনে নিলে যথেষ্ট ফাঁক থেকে যায়। তা হলে শ্রুতি কাকে বলব? যা স্বরের শুদ্ধ অশুদ্ধ অথবা অবিকৃত ও বিকৃত অবস্থার কারণ, যা স্বরের উচ্চতা নিম্নতা পার্থক্যের মানদণ্ড, যা স্পষ্টরূপে প্রয়োগ হলে স্বর-রূপে গণ্য এবং প্রয়োগ না হলে শ্রুতিরূপে গণ্য, যা স্বর থেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন এবং গমকাদি প্রয়োগে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাগ অভিব্যক্তির সহায়ক, সেই অনুরণনাত্মক ও অনুরঞ্জক শ্রবণযোগ্য ধ্বনিকে শ্রুতি বলে।

আমাদের সংগীতের প্রাচীন আচার্যগণ এক সপ্তকে সংগীতোপযোগী, শ্রবণযোগ্য, অনুরণনাত্মক ও অনুরঞ্জক এরূপ বাইশটি ধ্বনিস্থান গণ্য করেছেন এবং তাদের শ্রুতি আখ্যা দিয়েছেন। তা ছাড়া আরো সূক্ষ্ম শ্রুত্যন্তর আছে। কিন্তু সে-সব সূক্ষ্ম ধ্বনি কানে শুনে অনুভব করা ও অনুভব করানো এবং প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এজন্য আবহমান কাল থেকে বাইশটি শ্রুতিই স্বীকৃত হয়ে আসছে। বাইশটি শ্রুতির নাম যথাক্রমে এইরূপ—১, তীব্রা ২, কুমুদ্বতী ৩, মন্দা ৪, ছন্দোবতী ৫, দয়াবতী ৬, রঞ্জনী ৭, রক্তিকা ৮, রৌদ্রী ৯, ক্রোধা ১০, বজ্রিকা ১১, প্রসারিণী ১২, প্রীতি ১৩, মার্জনী ১৪, ক্ষিতী ১৫, রক্তা ১৬, সন্দীপনী ১৭, আলাপিনী ১৮, মদন্তী ১৯, রোহিণী ২০, রম্যা ২১, উগ্রা ২২, ক্ষোভিনী। প্রাচীন ষড়্জ গ্রামে তীব্রাকে প্রথম শ্রুতি গণ্য করে চতুর্থ শ্রুতি ছন্দোবতীতে ষড়্জ, সপ্তম শ্রুতি রক্তিকাতে ঋষভ, নবম শ্রুতি ক্রোধাতে গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতি মার্জনীতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতি আলাপিনীতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতি রম্যাতে ধৈবত ও দ্বাবিংশ শ্রুতি ক্ষোভিনীতে নিষাদ ব্যবস্থিত ছিল। তা ছাড়া ছিল অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ যথাক্রমে একাদশ শ্রুতি প্রসারিণী ও দ্বিতীয় শ্রুতি কুমুদ্বতী-আশ্রয়ী। এ সম্পর্কে পরমপূজ্য আচার্য ভরত ঋষির নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

ষড়্জশ্চতুঃশ্রুতির্জ্ঞেয়ঃ ঋষভস্ত্রিশ্রুতিঃ স্মৃতাঃ।
দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ।
চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিশ্রুতির্ধৈবতস্তথা।
দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়্জগ্রামে স্বরান্তরে।।

—নাট্যশাস্ত্র

অর্থাৎ, ষড়্জ চার শ্রুতি, ঋষভ তিন শ্রুতি, গান্ধার দুই শ্রুতি, মধ্যম চার শ্রুতি, পঞ্চম চার শ্রুতি, ধৈবত তিন শ্রুতি ও নিষাদ দুই শ্রুতি—ষড়্জগ্রামের স্বরান্তর এরূপ।

প্রাচীন কালে গায়ন ও বাদনক্রিয়া বীণা যন্ত্রে আধারিত ছিল। বীণার উপরিভাগে মেরুকে শূন্য ধরে সেখান থেকে চার শ্রুতি অন্তরে দ্বিতীয় পর্দায় ছন্দোবতী শ্রুতিতে ষড়্জ এবং তারপর উল্লিখিত শ্রুতি-ক্রমানুযায়ী নির্দিষ্ট পর্দায় অন্যান্য স্বর ব্যবস্থিত ছিল। এই ভাবে ব্যবস্থিত স্বরগ্রামই ষড়্জগ্রাম নামে পরিচিত। এই ষড়্জগ্রামে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম চতুঃশ্রুতিক, ঋষভ ও ধৈবত ত্রিশ্রুতিক, এবং গান্ধার ও নিষাদ দ্বিশ্রুতিক। নিম্ন-তালিকা থেকে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে :

বীণার উপরিভাগ থেকে পর্দা-সংখ্যা	শ্রুতির ক্রমিক সংখ্যা ও নাম		প্রাচীন ষড়্জ গ্রাম
	১ তীব্রা		
১—	২ কুমুদ্বতী	···	(কাকলী নিষাদ)
	৩ মন্দা		
২—	৪ ছন্দোবতী	···	ষড়্জ
	৫ দয়াবতী		
	৬ রঞ্জনী		
৩—	৭ রক্তিকা	···	ঋষভ
	৮ রৌদ্রী		
৪—	৯ ক্রোধা	···	গান্ধার
	১০ বজ্রিকা		
৫—	১১ প্রসারিণী	···	(অন্তর গান্ধার)
	১২ প্রীতি		
৬—	১৩ মার্জনী	···	মধ্যম
	১৪ ক্ষিতী		
	১৫ রক্তা		
	১৬ সন্দীপনী		
৭—	১৭ আলাপিনী	···	পঞ্চম
	১৮ মদন্তী		
	১৯ রোহিণী		
৮—	২০ রম্যা	···	ধৈবত
	২১ উগ্রা		
৯—	২২ ক্ষোভিনী	···	নিষাদ

কিন্তু বর্তমানে উক্ত ষড়্জ গ্রামের মধ্যমকে, ভরতোক্ত অবিনাশী, অবিলোপী ও অলঙ্ঘ্য মধ্যমকে, ষড়্জ গণ্য করে গায়ন ও বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ষড়্জের স্থানের এরূপ পরিবর্তনে আভ্যন্তরিক স্বরের শ্রুত্যন্তর ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তা হলেও ষড়্জ গ্রামে ও আধুনিক স্বর-সপ্তকে মোট শ্রুতি-সংখ্যা ঠিক বাইশ-ই আছে। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বিষয়গুলি পরিস্ফুট হবে। উক্ত তালিকায় ক্রমিক শ্রুতি-সংখ্যা ও নাম, প্রাচীন ষড়্জ গ্রাম, আধুনিক স্বর, বিকৃত স্বর, নাম ও মতান্তর প্রভৃতি উল্লেখ করা হল। আশা করি, তাতে বোধগম্যতার দিক থেকে সুবিধাজনক হবে।

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রুতি	প্রাচীন ষড়জ গ্রাম	আধুনিক স্বর	বিকৃত স্বর	মতান্তরে বিকৃত
১	তীব্রা				
২	কুমুদ্বতী (কাকলী নিষাদ)				
৩	মন্দা				
৪	ছন্দোবতী	ষড়্জ			
৫	দয়াবতী				
৬	রঞ্জনী				
৭	রক্তিকা	ঋষভ			
৮	রৌদ্রী				
৯	ক্রোধা	গান্ধার			
১০	বজ্রিকা				
১১	প্রসারিণী (অন্তর গান্ধার)				
১২	প্রীতি				

২। তুলনীয় : শ্রবণাচ্ছ্রুতয়ো মতাঃ—সংগীতরত্নাকর।

১৩	মার্জনী	মধ্যম	ষড়জ
১৪	ক্ষিতী		অতি কোমল ঋষভ
১৫	রক্তা		কোমল ঋষভ
১৬	সন্দীপনী		প্রাচীন শুদ্ধ (ত্রিশ্রুতি) ঋষভ
১৭	আলাপিনী	পঞ্চম	ঋষভ
১৮	মদন্তী		অতি কোমল গান্ধার
১৯	রোহিণী		কোমল গান্ধার
২০	রম্যা	ধৈবত	গান্ধার
২১	উগ্রা		তীব্র গান্ধার
২২	ক্ষোমিনী	নিষাদ	মধ্যম
১	তীব্রা		তীব্র মধ্যম
২	কুমুদ্বতী (কাকলী নিষাদ)		তীব্রতর মধ্যম
৩	মন্দা		তীব্রতম মধ্যম
৪	ছন্দোবতী	ষড়জ	পঞ্চম
৫	দয়াবতী		অতিকোমল ধৈবত
৬	রঞ্জনী		কোমল ধৈবত
৭	রক্তিকা	ঋষভ	ধৈবত
৮	রৌদ্রী		অতিকোমল তীব্র নিষাদ (চতুঃশ্রুতি) ধৈবত
৯	ক্রোধা	গান্ধার	(কোমল কোমল অতি কোমল নিষাদ) নিষাদ নিষাদ
১০	বজ্রিকা		অনুকোমল কোমল নিষাদ নিষাদ
১১	প্রসারিণী (অন্তর গান্ধার)	নিষাদ	
১২	প্রীতি		তীব্র নিষাদ
১৩	মার্জনী	মধ্যম	ষড়জ

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রাচীন ষড়্‌জ গ্রামের গান্ধার ও নিষাদ, বর্তমান কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ষড়্‌জ গ্রামের মধ্যম স্বরকে ষড়্‌জ গণ্য করে আনুপাতিক ভাবে যে আধুনিক স্বরাবলী পাওয়া যায়, তাতে নিষাদ কোমল হয় (খাম্বাজ) কিন্তু আধুনিক শুদ্ধ স্বরসপ্তকে এই কোমল নিষাদের পরিবর্তে ষড়্‌জ গ্রামের অন্তর গান্ধারের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধযুক্ত নিষাদকে (শুদ্ধ) গ্রহণ করা হয়েছে (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

বর্তমানে সাধারণভাবে বলা হয়, স্বর বারোটি; যথা—ষড়্‌জ কোমল ঋষভ, ঋষভ, কোমল গান্ধার, গান্ধার, মধ্যম, তীব্র মধ্যম, পঞ্চম, কোমল ধৈবত, ধৈবত, কোমল নিষাদ ও নিষাদ। পূর্বালোচনা থেকে জানা গেছে, এক সপ্তকে শ্রুতি-সংখ্যা বাইশ। উক্ত বারোটি স্বর বাইশ শ্রুতির মধ্যে বারোটি স্থান অধিকার করে থাকে, আরো দশটি শ্রুতি অতিরিক্ত থেকে যায়। এই শ্রুতিগুলির কার্যকারিতা কি? এ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে আর একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সেটি হল, স্বর-সংবাদ তত্ত্ব।

আমাদের সংগীতে স্বরসংবাদ একটি অপরিহার্য তত্ত্ব। বিষয়টি সরলভাবে বুঝতে হলে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া সুবিধাজনক। সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা শব্দ দুটি পরিচিত। যেখানে বন্ধুত্ব সেখানেই সামঞ্জস্য ও ভাবের আদান-প্রদান হয়। শত্রুতার ক্ষেত্রে তার উল্টা ভাব। সংগীতে স্বরগুলিও পরস্পর বন্ধু অথবা শত্রুর ভাব ধারণ করে, তাকে বলা হয় যথাক্রমে সংবাদ ও বিবাদ। দুটি স্বরের মধ্যে পরস্পর ধ্বনি-সামঞ্জস্য হলে হয় স্বর-সংবাদ। কিন্তু ধ্বনি-সামঞ্জস্য না হলে বিবাদ উপস্থিত হয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তানপুরা বাঁধার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তানপুরা সামনাসামনি রাখলে মাঝখানের তার দুটি ষড়্‌জে, ডান দিকের প্রথম তারটি মন্দ্র পঞ্চমে ও বাঁ দিকের শেষ তারটি মন্দ্র ষড়্‌জে বাঁধা হয়। উক্ত রীতিতে তানপুরা ঠিকভাবে মেলানো হলে ষড়্‌জের সঙ্গে পঞ্চমের সংবাদ সাধিত হয় এবং আওয়াজ সুরেলা মনে হয়। ষড়্‌জের সঙ্গে পঞ্চমের তেরো শ্রুত্যন্তর (তালিকা দ্রষ্টব্য)। এ ক্ষেত্রে ষড়্‌জ ও পঞ্চমের মধ্যে তেরো শ্রুত্যান্তরে (ষড়্‌জ পঞ্চমভাবে) সংবাদ হয়। কিন্তু পঞ্চমের তারটি কিঞ্চিৎ চড়িয়ে বা নামিয়ে দিলে এই সংবাদ বিঘ্নিত হয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং আওয়াজ বেসুরো মনে হয়। আবার, তানপুরার প্রথম তারটি পঞ্চমের পরিবর্তে মধ্যমে ঠিকভাবে মেলালে বোঝা যাবে, এ ক্ষেত্রেও ধ্বনি-সামঞ্জস্য ঘটে অর্থাৎ ষড়্‌জ ও মধ্যমের মধ্যে স্বর-সংবাদ হয়। ষড়্‌জের সঙ্গে মধ্যমের নয় শ্রুত্যন্তর (তালিকা দ্রষ্টব্য)। ষড়্‌জ ও মধ্যমের মধ্যে নয় শ্রুত্যন্তর (ষড়্‌জ-মধ্যম ভাবে) সংবাদ হয়। কিন্তু মধ্যমের তার ন্যূনাধিক করলে সংবাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেসুরো আওয়াজের সৃষ্টি করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ষড়্‌জ ও মধ্যমস্বর নয় শ্রুত্যন্তরে (ষড়্‌জ-মধ্যম ভাবে) সংবাদ সাধন করে এবং ষড়্‌জ ও পঞ্চম তেরো

শ্রুত্যন্তরে (ষড়জ পঞ্চম ভাবে) সংবাদ সাধন করে। শুধু তাই নয়, যে কোনো দুটি স্বরের মধ্যে নয় শ্রুতি বা তেরো শ্রুতির অন্তর থাকলে যথাক্রমে ষড়জ-মধ্যম ভাবে বা ষড়জ-পঞ্চম ভাবে সংবাদ সাধিত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা এ প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

ষড়জ-মধ্যম সংবাদ	ষড়জ-পঞ্চম সংবাদ
ষড়জ—মধ্যম	ষড়্জ—পঞ্চম
কোমল ঋষভ—তীব্র মধ্যম	কোমল ঋষভ—কোমল ধৈবত
ঋষভ—পঞ্চম	ঋষভ—ধৈবত
কোমল গান্ধার—কোমল ধৈবত	কোমল গান্ধার—কোমল নিষাদ
গান্ধার (আধুনিক)—ধৈবত (ত্রিশ্রুতিক)	গান্ধার (আধুনিক)—নিষাদ (আধুনিক)
মধ্যম—কোমল নিষাদ	মধ্যম—ষড়জ

রাগের বাদী-সংবাদী তত্ত্ব এই ষড়জ-মধ্যম ভাব অথবা ষড়জ-পঞ্চম ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাগের বাদী ও সম্বাদীর মধ্যে হয় ষড়জ-মধ্যম ভাব তথা নয় শ্রুত্যন্তর অথবা ষড়জ-পঞ্চম ভাব তথা তেরো শ্রুত্যন্তর বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাগের বাদী সম্বাদী ঠিক ধার্য হয়েছে কিনা সহজেই যাচাই করে নেওয়া সম্ভব। একমাত্র ভয়ানক রসের রাগের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন মারবা রাগে তীব্র ধৈবত(৩) বাদী ও কোমল ঋষভ সম্বাদী। তীব্র ধৈবত থেকে কোমল ঋষভ সাত, শ্রুত্যন্তর মাত্র যা ষড়জ-মধ্যম বা ষড়জ পঞ্চম ভাবের বহির্ভূত। কিন্তু যেহেতু মারবা ভয়ানক রসের রাগ, সেজন্য এই রাগের পক্ষে তীব্র ধৈবত কোমল ঋষভের বিবাদের প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্যই এই রসে বাদী ও সম্বাদী হিসাবে যথাক্রমে তীব্র ধৈবত ও কোমল ঋষভ স্বর গ্রাহ্য। নয় শ্রুত্যন্তর ও তেরো শ্রুত্যন্তর স্বর-সংবাদই প্রধান। তা ছাড়া, ছয় শ্রুত্যন্তর ও সাত শ্রুত্যন্তর সংবাদও প্রামাণিকভাবে গ্রাহ্য—অবশ্য এ দুটি অপেক্ষাকৃত অল্প প্রধান সংবাদ।

রাগ রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বর-সংবাদ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তা না হলে রাগ-রূপায়ণ ব্যাহত হয়। এ দিক থেকেও বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন, ধরা যাক, ভীমপলাসী ও মালকোষ রাগ। দুটি রাগেই কোমল নিষাদ ব্যবহার হয়। দুই রাগে ব্যবহৃত কোমল নিষাদের স্বরূপ অর্থাৎ স্থান (শ্রুতি-স্থান) সম্বন্ধে আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। পঞ্চম-যুক্ত ভীমপলাসী রাগ পরিবেশন কালে তানপুরার ডান দিকের প্রথম তারটি মন্দ্র পঞ্চমে বাঁধা হয়। কিন্তু পঞ্চম-বর্জিত ও মধ্যম-যুক্ত মালকোষ রাগ পরিবেশনকালে ঐ তারটি মন্দ্র মধ্যমে বাঁধা হয়। ভীমপলাসী রাগ পঞ্চম-যুক্ত ও মালকোষ রাগ পঞ্চম-বর্জিত। এই কারণ ছাড়াও তানপুরার তার উক্ত রীতিতে বাঁধার অন্য গূঢ় কারণ আছে। যাঁরা যোগ্য গুরুর নিকট রাগ-সংগীতের চর্চা করেন তাঁরা জানেন ও উপলব্ধি করেন, ভীমপলাসীর কোমল নিষাদ সাধারণ কোমল নিষাদ অপেক্ষা এক শ্রুতি উঁচু। কোমল নিষাদ ক্ষোভিনী শ্রুতি—আশ্রয়ী (ষড়জ গ্রাম দ্রষ্টব্য) এবং পঞ্চম থেকে পাঁচ শ্রুত্যন্তরে অবস্থিত। পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে, পাঁচ শ্রুত্যন্তরে স্বর-সংবাদ হয় না। সেজন্য ভীমপলাসী রাগে কোমল নিষাদ ক্ষোভিনীর পরবর্তী শ্রুতি তীব্রাকে আশ্রয় করে এবং পঞ্চমের সঙ্গে ষট শ্রুত্যন্তর রক্ষা করে। তখন তানপুরার পঞ্চমের সঙ্গে তীব্রা শ্রুতি-আশ্রয়ী এই কোমল নিষাদের ষট শ্রুত্যন্তর সংবাদ হয়। সে-ক্ষেত্রে তীব্রা শ্রুতি-আশ্রয়ী এই কোমল নিষাদ স্বর-রূপ গ্রহণ করে এবং ক্ষোভিনী কোমল নিষাদ-রূপ স্বরত্ব বর্জন ক'রে শ্রুতি হিসাবে গণ্য হয় ও ভীমপলাসী রাগে প্রয়োগহীন ভাবে থেকে যায়। অপর পক্ষে, মালকোষ রাগে কোমল নিষাদ ক্ষোভিনী শ্রুতি-আশ্রয়ী ও মধ্যম থেকে নয় শ্রুত্যন্তরে অবস্থিত। সেজন্য তানপুরার মধ্যমের সঙ্গে এই কোমল নিষাদের নয় শ্রুত্যন্তরে ষড়জ-মধ্যম-ভাবে সংবাদ হয়। সুতরাং মালকোষ রাগে ক্ষোভিনী শ্রুতি-কোমল নিষাদ স্বর-রূপ ধারণ করে রাগে এবং তীব্রা শ্রুতি, যা ভীমপলাসী রাগে কোমল নিষাদের স্ব-রূপ গ্রহণ করেছিল, শ্রুতি হিসাবেই থেকে যায়। সেজন্যই আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকারগণ বলেছেন, শ্রুতি ও স্বর পরস্পর পৃথক হয়েও অভিন্ন। তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য রাগগুলি বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে, বিশেষ বিশেষ রাগে বিশেষ বিশেষ স্বরের আশ্রিত শ্রুতি-স্থান পৃথক এবং আবহমান কাল থেকে স্বীকৃত বাইশ শ্রুতিই আমাদের সংগীতের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। যে রাগে যে শ্রুতিগুলি ব্যবহৃত হয় সে-রাগে সেই শ্রুতিগুলি স্বর-রূপে গণ্য হয় এবং অবশিষ্টগুলি শ্রুতিরূপে গুপ্ত থাকে।

—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

৩। তীব্র ধৈবত—চতুঃশ্রুতি ধৈবত (তালিকা দ্রষ্টব্য)।

পূজার নতুন রেকর্ড

কলম্বিয়া

GE 25016—(আধুনিক) "রঙিলা রঙিলা মন নিলারে" ও "এইটুকু এই জীবনটাতে।" গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

GE 25017—(আধুনিক) "আর ডেকো না সেই মধু নামে" ও "মধুমালতী ডাকে আয়।" গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 25018—(ধর্ম-মূলক) "আর লুকাবি কোথায় মা কালী" ও "কালো মেয়ের পায়ের তলায়।" শ্যামা-সংগীত গান দুখানি গেয়েছেন পান্নালাল ভট্টাচার্য।

GE 25019—(আধুনিক) "কপালে সিঁদুর সিঁদুর টিপ" ও "আমি ভাবি শুধু ভাবি।" গেয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

GE 25020—(আধুনিক) "তোমায় কেন লাগছে এতো চেনা" ও "নব মঞ্জরী ঐ ফুটেছে।" গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 25021—(ধর্ম-মূলক) "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" ও "সখিগণ সঙ্গে চললি।" কীর্তন দুখানি গেয়েছেন গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 25022—(আধুনিক) "অলির কথা শুনে" ও "আমি দূর হ'তে তোমারেই।" গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

GE 25023—(আধুনিক) "ও বাঁশী হায়" ও "ওগো আর কিছু তো নাই।" গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর।

GE 25024—(আধুনিক) "ওগো আমার মনের" ও "কথা আছে তুমি আজ জানবে।" গেয়েছেন গীতা দত্ত।

GE 25025—(আধুনিক) "তুমি দিয়েছো যত" ও "এ মন কেমন করে জেনেছে।" গেয়েছেন গায়ত্রী বসু।

GE 25026—(ধর্ম মূলক) "রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা" ও "গৌরাঙ্গ না হত।" কীর্ত্তন দুখানি গেয়েছেন কীর্ত্তন-কলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ।

GE 25027—(দ্বিজেন্দ্র-গীতি) "তোমারেই ভালবেসেছি" ও "আয়রে বসন্ত ও তোর।" গেয়েছেন কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

GE 30456—(চিত্রগীতি) 'কানা মাছি' চিত্রের গান। "এক্ষ কষতে গেলে" ও "এই নিরিবিলি ঝিলিমিলি।" এই গান দুখানি গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

P 11934—(পল্লীগীতি) "দূর কোন্ পরবাসে" ও "বাঁশী শুনে আর কাজ নাই।" গেয়েছেন কুমার শচীন দেব বর্মণ।

N 82887—(আধুনিক) "যদি তুমি না এই গান" ও "এ জীবনে আমি যারে চেয়েছি।" গেয়েছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

N 82888—(আধুনিক) "কত ব্যথা ঝরে যায়" ও "ঘুম ঘুম এই রাত সুন্দর।" গেয়েছেন উৎপলা সেন।

N 82889—(আধুনিক) "দোল দোল চতুর্দোলায় চড়ে" ও "পান্না হীরা চুনী তো নয়।" গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82890—(রবীন্দ্র-গীতি) "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে" ও "পথ চেয়ে যে কেটে গেল"। গেয়েছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82891—(আধুনিক) "এই তাঁবু-ঘরে দেখবে এসো" ও "ফুস্ মন্তর ফুস্ মন্তর"। গেয়েছেন সনৎ সিংহ।

N 82892—(পল্লীগীতি) "ও আমার দরদী" (ভাটিয়ালী) ও "ও কানাই পার করে দে" (সারি গান)। গেয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং অন্যান্য শিল্পী।

N 82894—(আধুনিক) "কত আশা নিয়ে তুমি" ও "আমি যে কত একেলা"। গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N 82895 (আধুনিক) "ও কালো কোকিল তুমি" ও "রোদ পোয়ানো চলদে পাতা।" গেয়েছেন ইলা বসু।

N 82896—(আধুনিক) "আমার না যদি থাকে সুর" ও "জানি তোমার প্রেমের।" গেয়েছেন মান্না দে।

N 82897—(আধুনিক) "সন্ধ্যা বেলার একটু হাওয়া" ও "কেন এই গান গাওয়া।" গেয়েছেন নির্মলা মিশ্র।

N 82898—(আধুনিক) "এই আঁধারে আমি চলে গেলে" ও "এই মন সেই গান গেয়ে যায়।" গেয়েছেন শ্যামল মিত্র।

N 77014—(চিত্রগীতি) 'কোন এক দিন' চিত্রের গান। "খোকা এসো খুকু এসো" ও "ওগো পথ তোমার কথা।" গেয়েছেন শ্যামল মিত্র ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৬৮)

শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

শুধু বাংলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতের সঙ্গীত-জগতে জনপ্রিয়তার শিখরে শিখরে ধাবমান তরুণ সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনীও এক অপূর্ব সঙ্গীত!

শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, ১৯২৭ সালে এই কলিকাতার বুকেই আমার জন্ম। পিতা শ্রীঅতুলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ সন্তান আমি। শ্যামবাজার এ, ভি স্কুল হতে শিক্ষা সমাপনান্তে কিছুদিন চাকুরীও করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা করে যাচ্ছি। কোন কল্পনা বা কোন খ্যাতির আশা অথবা কোন অনুপ্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করি নাই। বাড়ীতে বাবা, মা, ভাই বোন কেউই বিশেষ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ না হলেও সকলেই অল্প-বিস্তর গান গাইতে পারেন। ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের মত গানটা আমাদের সংসারে একটা বাঁধা-ধরা নিয়মের মত চলে আসছে। প্রথম জীবনে নিজের শিক্ষক নিজেই ছিলুম। পরে নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না রাখতে পেরে সুশান্ত রায় মহাশয়ের ছাত্র হয়ে পড়লাম। জনসাধারণ সুশান্ত বাবুর প্রতিভার সম্যক পরিচয় না পেলেও আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। সঙ্গীত-জগতে দাঁড়াবার প্রথম শিক্ষা তাঁর কাছেই পেয়েছি। গান শিখছি। তাই উৎসাহ বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে অডিশন দিই কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি নাকি কোন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর স্বর নকল করি, সেই অজুহাতে বেতার কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বেতারশিল্পী বলে মনোনীত হতে পারি নাই। নকল করার উদ্দেশ্য আমার কোনকালে ছিল না এবং নাই। যাহা ঈশ্বরের দান তাহার উপর আমার হাত নাই।

কোন রকম নিরুৎসাহ না হয়ে সঙ্গীত চর্চ্চা করে যেতে লাগলাম এবং ১৯৪৬ সালে মেগাফোন কোম্পানীতে "তুমি নাই, তুমি নাই" গানখানির রেকর্ড করলাম। এই আমার প্রথম রেকর্ড। এর পরেই ১৯৪৬ সালে পুনরায় অল, ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে দ্বিতীয়বার অডিশন দেওয়ার জন্যে ডাক আসে, যথারীতি অডিশনও দিই এবং এবার বেতারশিল্পিরূপে মনোনীত হই। যতদূর মনে পড়ছে, আমিই প্রথম বেতারশিল্পী, গোড়া হতেই সন্ধ্যার দিকে প্রোগ্রাম

শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

পাই। বেতারে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৬ সাল হতেই কলম্বিয়ায় নিয়মিত ভাবে রেকর্ড করে যাই। ১৯৪৭ সালে "তুমি কেমন করে গান কর" "শ্যামল বরণী ওগো কন্যা" "হে মহাপৃথিবী" গানগুলি রেকর্ড হওয়ার পর "জানালার কাছে বসে আছ।" গানখানি নিজের দেওয়া সুরেই রেকর্ড করি।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্য মনোনীত হয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্যে রাশিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, যুগোশ্লেভিয়া এবং পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি ঘুরে আসি। বিদেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মর্য্যাদা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি! রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম, তার উপর রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ক আমার আদর দেখে কে। ১৯৫৭ সালে সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় বোম্বেতে জভার, হানিমুন এবং মায়া প্রভৃতি চিত্রে গান গেয়ে আসি। বাংলা চিত্রে যে কয়টি বইয়ে গান গেয়েছি তার মধ্যে ক্ষুধিত পাষাণ, অসবর্ণা, সাগরিকা, অভয়, যাত্রী, বাঁশিওলা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সালে সবিতা চাটার্জ্জীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বর্তমানে কলিকাতার বেতার কেন্দ্র ছাড়াও রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্যে দিল্লী বেতারকেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত আছি। তাছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত বেতার-কেন্দ্র হতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবার জন্যে মাঝে মাঝে ডাক আসে।

বর্তমানে আমি কোন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে এসেই গান শিখে যায়। সঙ্গীত-জীবনে যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী শান্তি দা (শান্তিদেব ঘোষ) নীহারবন্ধু সেন, সলিল চৌধুরী, ৺অনুপম ঘটক, ৺সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, নচিকেতা ঘোষ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর দাশগুপ্ত, প্রবীর মজুমদার এবং রতু মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরদিন স্মরণ থাকবে।

কুল্-এ বুনো হাঁসের দল

(W. B. Yeats-এর The Wild Swans at Coole-এর আক্ষরিক অনুবাদ)

চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

শারদ হাসির মুক্তা ঝরে সবুজ গাছের ফাঁকে,
রুক্ষ ধুলায় সরণি-প্রাপ্ত গহন বনের বাঁকে।
প্রদোষ আলোয় নিথর জলে আকাশ পড়ে ধরা,
বাড়তি জলের উপল বুকে ওই বুনো হাঁস ওরা।
উনিশ শরৎ অতীত হ'লো প্রথম গোণার পরে!

গোণা আমার কই হ'লো শেষ? ঐ যে ডানার ভরে
শূন্যে ওরা ছড়িয়ে পড়ে মুগ্ধ খুসির রোলে;—
ছিন্ন-মালা সাজায় যেন মুক্ত গগন-কোলে।
কী অপরূপ উজল গাথা—তাকিয়ে আমি থাকি,
ব্যথিত মম হৃদয় আজি বিষাদছায়ায় ঢাকি।

'কুল'-এর এ তীর সেদিন ছিল প্রদোষ আলোয় ঢাকা,
উড়তে ছিল সেদিন তারা কাঁপিয়ে তাদের পাখা,—
অপলক সেই প্রথম দেখা—হাল্কা চরণ ফেলে,
হায় রে আমার সেদিনগুলো হারিয়ে কোথায় গেলে!

ক্লান্তিহীন কিন্তু এরা মুগ্ধ যুগলতায়।
নীল আকাশে, শীতল জলে ব্যস্ত মুখরতায়।
কোমল ওদের হৃদয় মাঝে সময় অচল নাকি?
যাক্ না যেথায় পাখনা মেলে আবেগপ্লুত পাখী।

নিথর জলে ভাসছে বেশ! ত্যজি এমন তীর
নলখাগড়ার জঙ্গ কোথায় বাঁধবে পুনঃ নীড়?
হঠাৎ জেগে দেখবো যেদিন, চলেই গেছে তারা—
কোন সে হ্রদের মানুষ সেদিন পাবে খুসির ধারা?

চ্যুতি

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লান্ত ক্ষণ, আষাঢ়-কালো মেঘ-সজল দিন,
বনবীথিতে ত্রস্ত মৃগী চপল চোরা আঁখি—
অনেক দূরে সুতনু ঋজু তরুণ মৃগ ফেরে,
চকিত তার পদধ্বনি শুনতে পেলো না কি?

বহুধা পথ বহু বিপদ জেনেছে মৃগী বলে,
ঝঞ্ঝা স'য়ে কেটেছে তার বয়ঃসন্ধিক্ষণ,
কিশোরী ছিল, যৌবনের চারু আবেশ এলো,
অপরিচিত ব্যঞ্জনাতে ভরেছে তার-ও মন।

গরিমাভরা দেহের সাথে চরণ ছিল লঘু,
এসেছে যতো লুব্ধ মৃগ জীবনে ছায়া ফেলে—'
পড়েছে তারা অনেক পিছে, হ'য়েছে আঁখি ভোর,
প্রদোষ আজ আলোকে ভরা, গ্লানি কি আর মেলে!

অপরিসীম পূর্ণতায় তৃপ্ত ছিল প্রাণ,
নিজেকে নিয়ে মগ্নতায় কেটেছে দিনরাত—
আজকে তবে কেন এ চ্যুতি, বাঁধন কেন শেষ,
বাইরে-মনে জমেছে ভার, ঘটাবে ধারাপাত।

তৃষ্ণাতুরা রয়েছে চেয়ে বারিধারার পানে
তৃপ্তি নেই, অকস্মাৎ কেটেছে যেন যতি—
পূর্ণ ছিল জীবন, আজ পুলক এলো ছেয়ে,
তরুণ মৃগ আসুক তবে দুর্বারিত গতি।

এ সব ক্ষুদ্রাকার জিনিসের ভেতর নষ্ট হবার মতো কিছু নেই। পরে সব ঘরে তুলছে সে—নীলের এই জবাব শুনে বাইরের কণ্ঠস্বর বাধাবিধির সীমানা-বেড়ার উপর দিয়ে গলা বাড়ালো, —না, না নীল, জিনিষগুলো ঘরে তোল তুমি এ সবের প্রয়োজন বুঝবে না। কিন্তু তোমার মার কাছে এর একটা হাঁড়ি শিশিও দরকারী। খুব জোর বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। এখন না তুললে যাবে কিন্তু সব নষ্ট হয়ে।

অগত্যা উঠে গিয়ে নীলকে বলতেই হলো—আচ্ছা তুলছি আমি।

মঞ্জু উঠে দাঁড়ালো—চলুন আমি আপনাকে সাহায্য করি।

—আপনি বসুন। ফের ঘরে এসে ঢুকল নীল। বললো—আমি এখন ওসব তুলতে যাচ্ছি নাকি।

—আচ্ছা, আপনারই বা দরকারটা কি? আমিই তো তুলে রেখে আসতে পারি—না?

—আরে পাগল নাকি! বসুন আপনি। আছে কি বলুন। কতগুলো হাড়ি-কুড়ি-টিন এই তো। মা চলে যাবার পর ওগুলোর মুখও খোলা হয়নি। ভেতরে কিছু থাকবার কথা নয়। হয় তো নেই-ও। থাকলেও আজ আর তা খাবার যোগ্য নেই। বৃষ্টি আসে তো ধোয়া হয়ে থাকবে। মমতা এসে যদি মনে করে ওগুলো অপরিহার্য তো ঘরে তুলবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন।

বসল মঞ্জু। বললো—বেশ। তবে শুনি এখন হয়েছেটা কি? কে বা কারা আপনাদের গোটা পাড়াটার সংসার এমন করে বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে গেল?

ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করতে করতে কথা বলা, কথা শোনা, তাবা এ অভ্যেসটা রঞ্জতের। নীলের নয়। কিন্তু মঞ্জু দেখলো, আজ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে তিন হাত ঘরটুকুরই এদিক ওদিক বারকয় হাঁটাহাঁটি করলে নীল। তারপর যে চেয়ারটায় বসে টেবিলের উপর কনুই আর দু' হাতের তালুতে মাথা চেপে বসেছিল, সেটায় না বসে এসে বসল সে মঞ্জুর কাজের চৌকির সঙ্গে লাগানো বেতের চয়ারে। বসেই আবার উঠল। সিগারেট আর দেশলাইটা নিয়ে এলো টেবিল থেকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে দেশলাই আর প্যাকেটটা একটু ছুঁড়ে দেওয়া ভাবে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললো—জবর-দখল কলোনী কাকে বলে নিশ্চয়ই জানেন?

—জানি।

—এটা হলো সেই জবর-দখল কলোনী। অনাবাদী পতিত জমি তার সাপখোপ জঙ্গল নিয়ে পড়েছিল মনুষ্য বসতি থেকে বহু দূরে। একদল রাজনৈতিক-বলির মানুষ এলো। আশ্রয় নিল। জঙ্গল কাটলো। বন পরিষ্কার করলো। দরমা-মাটি-টিন-বাঁশের চালা তুলে—ঘর বানালো। ঘর—একটা দুঃখের তির্যক রেখা ঠোঁটের ওপর হাসির টানে টেনে নিলে নীল—ঘর, কিছুই নয়, শুধু একটা আশ্রয়। জীবন-যাত্রার একটুকরো নিশ্চিন্ততা। আড়ালে বসে 'উপোস করবার আর মৃত্যু এলে রূঢ় রাস্তার উপর না মরে একটু নির্জনে নিঃশব্দে চোখের পাতা দুটি বুজবার একবিন্দু মর্যাদা—এই তো। হঠাৎ রাশ টেনে আবেগ সংযত করলে নীল। একেবারে স্তিমিত কণ্ঠে বললো—তা জমির মালিক ইচ্ছে করলে প্রথমেই হয়ত বাধা দিতে পারতো। কিন্তু দেয়নি। পড়ো জমি, পড়ে আছে। আরো বহুকাল ধরে পড়ে থাকবে। তার চাইতে মানুষ আসুক। বসতি গড়ে উঠুক। জমি যাবে কোথায় যতক্ষণ পূর্বপুরুষের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেনা পঞ্চাশ বিঘে জমির দলিলটি মুঠোয় রয়েছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

হাতের সিগারেটটা ঘরে ফেললেও ক্ষতি ছিল না। আরো ক'টা সিগারেটের টুকরো মেঝের ওপর ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। দরজা খোলা ছিল বলেই বোধ হয় বাইরের দিকেই এবার সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলল নীল। বললো—অবশ্যি মালিক ব্যক্তিটি জানেন, খুব সহজে সুবিধে করে ওঠা যাবে না। তাই পথ বেছে নিয়েছেন অতর্কিতে হামলা করে তছনছ করে দিয়ে যাওয়ার। আমাদের শক্তি হবে না লড়াই করবার, না লাঠির দ্বারা, না আইনের দরজায় অর্থের দ্বারা।

মঞ্জু বসে রইল।

নীল উঠে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। নীরবে কতটুকু সময় পায়চারি করলো। তার পর এক সময় বলে উঠল—গিয়েছিলাম ভদ্রলোকের কাছে। কিন্তু এক মারোয়াড়ী জমির টাকা নিয়ে বসে আছে। সে এখানে রং-এর কল বসাবে। ভদ্রলোকটিরও আজ টাকার প্রয়োজন। কংগ্রেস নমিনেশন পেয়েছেন। সামনের ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন—

—ও, সেবার জন্য তৈরী হচ্ছে না—বুঝি বলতে যাচ্ছিল মঞ্জু। প্রথম মুখ খুলতে যাচ্ছিল মঞ্জু কিন্তু খুললো না সে। 'সেবা' শব্দটা উচ্চারণ করতেও আজকাল ওর ঘৃণা হয়—হাঁ, ঘৃণা হয় মঞ্জুর। শুধু উচ্চারণ করতে নয়—শুনলেও দুকানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে ওর। মঞ্জুর মনে হয়, 'সেবা' কথাটা যদি আজ হারিয়ে যায় তবে, দেশটা বিনির মতো কেঁদে উঠবে "হারিয়ে গেছি আমি" বলে।

মাটির দিকে চোখ রেখে পায়চারি করতে করতে নীল যেন নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগল—এখন কথা হলো, মানুষগুলোকে নিয়ে যাই কোথায়! ষ্টেশনে, বেত্তিয়ায়, বিহার দণ্ডকারণ্যে—কোথায়?

—নীল আছো নাকি হে? ডাক এলো বাইরে থেকে। নীল সাড়া দিলে তারা দরমার দরজা ঠেলে এসে ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়ালো। এখন কি করা কর্তব্য—পরামর্শ করতে এসেছে তারা নীলের সঙ্গে।

মঞ্জুকে একটু বসতে বলে উঠোনে নেমে এলো নীল। যেমন বসেছিল তেমনি দু' হাত কোলের উপর রেখে টান হয়ে বসে রইল মঞ্জু। যেন ছবি তুলতে বসেছে সে।

ঘরের আলোটা যে ক' জনার মুখের ওপর এসে পড়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে রইল মঞ্জু। উদ্বিগ্ন কাতর শঙ্কায় ভরপুর কতগুলো মুখ—.দেখছ তো নীল দেশের ব্যাপার? দিনে ডেকে নিয়ে, রাতে

পাগলা কুকুর ক্ষেপা হাতি ছেড়ে দিচ্ছে। ঘরে দিচ্ছে আগুন লাগিয়ে। কে ভেবেছিল এমন অবস্থা হবে বলো? তবে কি···এ অবস্থায়··· ষ্টেশনে···কিন্তু কথা হলো তোমার মা মাসিমারা···ষ্টেশনের ঐ — বাদলা-বাতাস তাদের গায় জড়ানো কোচার খুঁট, মাথার চুল উড়িয়ে ঘরে যেতে লাগল। শাঁখের একটা দীর্ঘ টানা শব্দ উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। নীলেদের বাড়ীর সামনে টিউবওয়েলটায় ঘটাং ঘটাং শব্দ উঠতে লাগল জল তোলার। আসবার পথে যে মেয়ে বৌদের হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে কলের জল পাম্প করতে দেখে এসেছিল তাদের জল তোলা এখনও চলছে। আজ হাঙ্গামার জন্য হয়তো কারুরই সন্ধ্যায় জল তোলা সম্ভব হয়নি।

যে মেঘটার কথা বলে এই কিছুক্ষণ পূর্বে নীলকে বৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে কে যেন জিনিষপত্রগুলো ঘরে তুলতে বলে গিয়েছিল। সেই মেঘটা এখন আকাশ কালো করে গুমোট বেধে রয়েছে কিনা মঞ্জু জানেনা। নীলের ঘরের দরজা এমন উঁচু নয় যে আকাশ দেখা যাবে। মেঘ থেকে থাকলেও বৃষ্টি নামেনি। আকাশ ভরা বৃষ্টি যে কোন মুহূর্তে মাথায় নেমে আসার কথা ভাবছেও না কিন্তু এরা। এখানে তো নীলের ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে। মাঠের উপর থাকলেও বোধহয় ভাবতো না। গিয়ে আশ্রয় নিত গাছের তলায়। পাতাগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করতো এদের মাথাগুলো বাঁচাতে। কিন্তু পারতো না।

এই যে কোচার খুঁট গায়ে তুলে দিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া চোয়ালে, বিধ্বস্ত চেহারায় যারা দাঁড়িয়ে আছে, ব্যক্তি হিসাবে মঞ্জুর এঁরা কেউ চেনা নয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে সবাই ওর চেনা, জানা, দেখা। পূর্ব বাংলার মেয়ে সে। এঁরা অপরিচিত হবে ওর কাছে কি করে। ঐ যে জল তুলছে মেয়েরা টিউবওয়েলে ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে, ও তাদের দেখেছে নদীর জলে কলসী ডুবিয়ে জল তুলতে। ভরা জল ছলছলিয়ে ঘরে ফিরতে। ভরা পদ্মার টানে ভরা কলসী উপর করে কের জলতে আনতে যেতে।

পদ্মা—পাড়াপাড় লীন পদ্মা তার ঢেউ, তার উত্তাল জলরাশি নিয়ে ছুটে চলেছে সমুদ্র সঙ্গমে। ঘূর্ণিজল মস্ত মস্ত ঘূর্ণিসৃষ্টি করে, পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে যেন কোন অতল পানে। লম্বা লম্বা জেলে নৌকো জাল ফেলছে। মাছ ধরছে? ইলশে মাছ ধরা জালের ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি ঢেউএর দোলায় ডুবছে ভাসছে। রূপালী রোদ চিক্‌চিক্ করছে নদীর বুকে রূপার ঢেউ তুলে। পাড় ভেঙ্গে পড়ার শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে ঝপ্, ঝপ্। গ্রামান্তরের নৌকো এসে লাগছে পাড়ে। সতর্ক মাঝি নৌকো বাঁধছে সাবধানে? ছেলেরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পাড়ে নামে—মেয়েদের নামাচ্ছে হাত ধরে ধরে—

কুশল জিজ্ঞাসা করতে করতে, সংবাদ দিতে আর নিতে নিতে, এর বাড়ীর উঠোন, তার বাড়ীর পুকুর পাড়, ওর বাড়ীর ধানের গোলার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে মঞ্জু যাদের এরাই তো তারা। মঞ্জুর অচেনা হবে কি করে এরা। আজ তাদের সেই বাড়ীঘর, জোত জমি, বাগান পুকুর কোথায় গেল? এরা নিঃস্ব হল কেন। এক টুকরো জমি, এক কলসী জলের জন্য এরা মেয়ে পুরুষরা বিভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে কেন?···দেখছ তো ব্যাপার স্যাপার দিনে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে; রাতে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে—

আর তারপর লোকগুলোর ঊর্দ্ধশ্বাস দৌড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখো ঘরমুখো বাঙ্গালী। ছুটছে ঘরের দিকে। আমরা কি করবো।

সবাই চলে গেলে নীল এসে ঘরে ঢুকল। দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বললো, মাথাটা জমাট বেঁধে আছে। একটু চা না হলে চলছে না। চলুন কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।

নীরবে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

দরজায় তালা দিতে দিতে নীল হাসল। বললো, জানি নেওয়ার মতো কিছুই নেই তবু তালা না দিয়ে শান্তি নেই—সত্যি মানুষ একটা অদ্ভুত সৃষ্টি।

দরজায় তালা ঝুলিয়ে পেছন ফিরে দেখল মঞ্জু উঠোনের ছড়িয়ে থাকা টিন কৌটো তুলে তুলে বুক হাতে জড়ো করছে।

—এ কি করছেন!

—জিনিষগুলো তুলে রেখে যাই। একটা ছড়ানো সংসারের ওপর দিয়ে কি কোন মেয়ে হেঁটে চলে যেতে পারে।

নীল এগিয়ে এলো আরো কাছে।—আচ্ছা, আপনিই বলুন, এগুলো এখন তোলার মানে হয় কোন? যারা টেনে ফেলে দিয়ে গেছে, তারাও দু আঙুলের বেশী চার আঙুলে ধরার—সম্মান দেয়নি। টিনগুলোর গড়িয়ে পড়া মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে উঠোনময় ছোটাছুটি করেছে যত আরশোলা—আমার যা কষ্ট হয়েছে সে ঐ আশ্রয়চ্যুত আরশোলাগুলোর জন্য। নইলে ঘর দোর—পরিষ্কার হয়ে তো আমি রক্ষা পেয়েছি।

তবু মঞ্জু বললো—ঐ দাওয়ার উপর রেখে যাই?

—আপনি কিন্তু আমার আত্মসম্মানে আঘাত করছেন। আপনি রাখুন—বলে মঞ্জুর রাখার অপেক্ষা করলে না। নিজেই নীল তার হাত থেকে কৌটোগুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে উঠোনের ওপর তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে দিয়ে বললে, নিন মুছুন হাতটা। ইস্; দেখুন তো শাড়িটার কি হাল করেছেন।

মঞ্জু হাত দিয়ে কাপড়টা ঝাড়লে। বেরিয়ে আসতে আসতে একবার আকাশের দিকে তাকাল। তেমনি কালো—মেঘে ঢাকা আকাশ। মাটি ভিজে আরো এক আধবার গুঁড়ো বৃষ্টি বোধহয়—ঝরে গেছে। দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। রাস্তার বাতির ব্যাসের তলাটুকুতে একটু উজ্জ্বল আলো। তারপর সেই আলো তরল হতে হতে কিছু দূরে মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার কতটুকু ব্যবধানে আবার একটি আলো। তার তলায় ব্যাসটুকু তেমনি আলোকিত। তারপর সেই আলো আবার তেমনি তরল হতে হতে অন্ধকারের ভেতর মিশে গেছে। দুজনে মাথার উপর আকাশ ভরা মেঘ, পায়ের তলায় কাচারাস্তার জল কাদা মাটি আর এই আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল। যে নীলকে দেখে সেই থেমে পড়ে। ভীত অসহায় চোখে তাকায় তার মুখের দিকে। জিজ্ঞাসা করে, এখন কি করা যায়, মারোয়াড়ী যে টাকা দিতে চাচ্ছে, তার কিছু কম সমও ওরা যদি ধরে দেয় তবে ও মালিক জমি তাদেরই দিয়ে দেয়। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা। সে কথা আর ভেবে কি হবে।

তবে অন্যত্র গিয়ে তো শেষে—ক্ষেপা হাতির পায়ের তলায় পিষে মরতে হবে—নয়তো আগুনে পুড়ে। এখানেই থাকায়—একটা কোন উপায় যেন বের করে নীল।

বাজারের ওপরের চায়ের দোকানটায় ঢুকে দুটো চেয়ার টেনে বসল ওরা। চায়ের অর্ডার দিলে নীল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে—কথা হচ্ছে কি—জানেন, মানুষগুলো মানে আমরা বোধ হয় মরেই গেছি। দেশই বলুন আর ব্যক্তিই বলুন মরে না গেলে কি কেউ পড়ে পড়ে এমন মার খায়, না এতো পর্বত প্রমাণ ধৃষ্টতা সহ্য করে।

—না, মার খাওয়া ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে।

—যেমন ?

—যেমন ধরুন, গ্রামে ডাকাত পড়েছে। গ্রামের লোক ঘুমে অচৈতন্য। ডাকাত দল গ্রামের সব ধনরত্ন লুঠে নিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এমনি সময় এক গৃহস্থ সবার আগে জেগে উঠলো। ডাকাতদের হাত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে আনবার জন্য, তাদের বিতাড়িত করবার জন্য সংগ্রাম করলো এবং সব চাইতে বেশী মূল্য দিল—সংগ্রাম শেষে সেই গৃহস্থের সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যদি গ্রামের লোকেরা তাকে নিষ্ঠুর আঘাতে মেরে ফেলতে চায়। ছলে বলে কৌশলে ঠকায়, বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে—তখনকার মতো তার নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ? অক্ষমের মার দুর্বল মুহূর্তের জন্যই তোলা থাকে। এবং সে মার বীরকেও এক এক সময় সহ্য করতে হয়।

নীল তাকিয়ে রইল মঞ্জুর মুখের দিকে।

মঞ্জু কয়েক ঢোক চা খেয়ে নিয়ে বললো—কিন্তু এ মার খাওয়া কখনোই চিরকালের জন্য হতে পারে না। বড় জোর গৃহস্থের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার কালটুকু পর্যন্ত। তবে হাঁ, যদি গৃহস্থের শক্তি ফিরে পাওয়ার ভয়ে মাথাটা তার ধড় থেকে আগেই কেটে ফেলা যায় অর্থাৎ যে জন্য সেই চেষ্টাই করছে সবাই মিলে—এবং যার জন্য তার ওপর কোপের ওপর কোপ ; ছুরির পর ছুরি চালানো হচ্ছে, তবে অবশ্যি ভিন্ন কথা। একটু থামল মঞ্জু। তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর বললো কিন্তু শক্তিমানকে নিঃশক্তি করে ফেলাকেই যারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখার একমাত্র উপায় মনে করে—নিজেদের শক্তির ওপর এই যাদের শ্রদ্ধা, তারা কি শুধু আপাত অধিকার বলে পারে একটা গোটা জাতকে মেরে ফেলতে ? তাও পেছন থেকে ছুরি চা'লয়ে ? অসম্ভব।

একটা দমকা জলো বাতাস এসে ঢুকলো ঘরে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটা উড়ে গিয়ে পড়ল একটি লোক—বোধ হয় এই বাজারেরই কোন দোকানদার হবে তার চায়ের কাপের ওপর কাপটা উল্টে চা নিচে গড়িয়ে পড়লো লোকটির কাপড়ে। দোকানে ঠাণ্ডা চা—শরীর পুড়ল না। জামা কাপড় নষ্ট করে দিলে। উঠে দাঁড়িয়ে জামা কাপড় ঝাড়তে লাগল লোকটি—বললো, গেল যে পণ্ডিতমশাই গরিবের ছ'টা পয়সা জলে।

যে ছোকরা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলের চা মুছে নিচ্ছিল তাকে ষ্টলের ম্যানেজার পণ্ডিতমশাই আদেশ করলো, বিশ্বনাথকে এক কাপ চা আর এক পিস কেক—তোমাকে দাম দিতে হবে না বিশ্বনাথ আমি খাওয়াচ্ছি তোমাকে। বিগলিত মুখে লোকটি কে বসে পড়ে পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করলো—তা, পণ্ডিত মশাই সেদিন আপনার ইস্ত্রী এসেছিলেন এখানে ? ওরা সবাই বললে খুব সোন্দর নাকি দেখতে ?

পণ্ডিতমশাই-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—কে কে বললে হে ? নরেন্দ্র দেখেছে ? হ্যা, কমলার চেহারাটা—চোখটা আড় করে পণ্ডিতমশাই মঞ্জু আর নীলের দিকে এক পলক তাকালো। তার স্ত্রী যে রূপসী সে কথাটা ওরা শুনছে কিনা সেটাই বোধহয় দেখলে—

মঞ্জু আর নীল আরো এক কাপ চা খেয়ে উঠে পড়লো। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

—কি করে যাবেন ?

একটু ভাবলো মঞ্জু। তারপর বললো, এ বৃষ্টি থামবে না শীগগির। বরং আরো জোরে আসবে। ঐ তো বাস ষ্ট্যাণ্ড—আমার কষ্ট হবে না। আপনারই বাড়ী ফিরতে হবে অনেক পথ ভিজে।

কিন্তু পথে নেমে ক'য়েক পা যেতেই একটা খালি ট্যাক্সি দেখে হাত তুলে থামালো মঞ্জু। দরজা খুলে নিজে উঠে বসে, নীলকে ডাকলো—আসুন।

গাড়ীতে উঠে বসল নীলও। রুমাল দিয়ে ভিজে হাত মুখ মুছতে মুছতে বললো—উঠলাম তো। তারপর ? আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো ?

—আমাকে পৌঁছে দিতে হয় না।

—তবে আপনি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন ?

—না।

—তবে ?

—চলুন তো।

—কোথায়—দিল্লী নয়তো ?

—কেমন হয় গেলে ?

[ক্রমশঃ

If you're a film actress in Britain, you spend your life smuggling your physical equipment through the Customs.

—KAY KENDALL.

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় সিমলা গেলুম। অপূর্ব লাগল এই সিমলা পাহাড়। প্রকৃতির যেন লীলাভূমি। প্রকৃতি এখানে মুক্তহস্ত, এতটুকু কার্পণ্যের প্রকাশ নেই এখানে। অকৃপণ হাতে তার অফুরন্ত সম্পদে সে ভরিয়ে তুলেছে এই শৈলশৃঙ্গকে। এ যেন চিরযৌবনের প্রতিমূর্তি। আমার হোটেলের চারপাশ ঘিরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার রোগাহত মনকে যে কি পরিমাণে আনন্দের প্রলেপে ভরিয়ে তুলল তার তুলনাই মেলে না। মন যেখানে পূর্ণ থাকে সেইখানে সবচেয়ে বড় আনন্দের স্পর্শচিহ্ন। পূর্ণতার মধ্যেই আনন্দের উদ্ভব। শরীর থেকে রোগ বিদূরিত হয়েছে, ধীরে ধীরে দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশাতেই এই শৈলশিখরে বাসা বাঁধা। এখানে এসে দেখলুম সৃষ্টির প্রচুর খোরাক এদিকে সেদিকে ছড়ানো। হোটেল থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির অফুরন্ত অবদানগুলি প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে কত অনুপ্রেরণা এসেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। সিমলা পাহাড়ের মনোরম পরিবেশে অতিবাহিত ১৯৪৬ সালের সেই কটা দিনের স্মৃতি আমার জীবনে চিরকাল বেঁচে থাকবে। ১৯৪৬ সাল ভারতের স্বাধীনতার আগের বছরটি। সিমলায় থাকতে থাকতে এই সংক্রান্ত অনেক কল্পনা আমাকে ঘিরে ধরে। স্বাধীনতা সংক্রান্ত অনেক চিন্তাই আমার মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

১৯৪৬ সাল। সারা ভারতে একটি পরম উত্তেজনাপূর্ণ বছর। পরের বছর আমরা স্বাধীনতা পাচ্ছি। দু'শো বছরের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে কত সহস্র আত্মত্যাগ সফল হতে চলেছে কত ক্ষয় কত ধ্বংস কত বিপর্যয়ের মধ্যে যে দীর্ঘকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম—সেই সংগ্রাম আজ বিজয়লক্ষ্মীর কৃপা পেতে চলেছে, যে স্বাধীনতা যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছিল তার যজ্ঞফল আজ লব্ধ বললেই হয়। কত লাঞ্ছনা, কত আত্মত্যাগ, কত উৎপীড়ন ——— রক্ত ঝরে রক্তিম হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। কত মায়ের কোল খালি হয়ে গেছে। কত সর্বহারা বাবার বুকফাটা আর্তনাদে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস। কত রমণী চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিঁদুর মুছেছে—সে সাক্ষ্য তো অনুপস্থিত নয়—কিন্তু সকল প্রকার জ্বালার এইবার অবসান, এবার জ্বালা নয় এবার প্রশান্তি, এবার যাতনা নয় এবার সমৃদ্ধি, এবার বঞ্চনা নয়, এবার সম্ভাবনা।

সিমলা তখন জমজমাট, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভাগ্যনির্ধারকদের আলাপ আলোচনা পূর্ণগতিতে চলছে তখন। মুহুর্মুহুঃ বসছে বৈঠক পরাধীনতার শেষে স্বাধীন ভারতের রূপটি হবে কেমনতরো, কেমনতরো হবে তার শাসনতন্ত্র, তার রাষ্ট্রের স্বরূপটি হবে কেমন, কতগুলি বিভাগে শাসন প্রণালীকে ভাগ করা হবে, কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সমস্যাগুলির সমাধান হবে কোন পথে···এই সব সাধুচিন্তার তখন শেষ নেই। সব মিলিয়ে সিমলা তখন রীতিমত জমজমাট। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ তখন সেইখানেই।

আমার পরবর্তী ব্যালেগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রচুর সুবিধে পেয়েছিলুম, সৃষ্টির অজস্র উপকরণ আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয়েছিল। উপাদানের অপ্রাচুর্য বা দৈন্য মোটেই ছিল না। মন প্রফুল্ল, প্রশান্ত স্নিগ্ধ, শারীরিক ক্রমপ্রগতি তখন যথেষ্ট আনন্দই দিচ্ছে, প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্যাবলী আর তার উপর পরাধীনতার বন্ধনমোচনজনিত এক আন্তরিক উল্লাস এই সব মিলে অন্তরের মধ্যে এক বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে তোলে।

তারপর একদিন কলকাতায় ফিরে এলুম। মায়ের কাছে ছিলুম কিছুদিন। কিছুকাল মায়ের কাছে কাটিয়ে আবার চলে গেলুম বোম্বাই। বোম্বাইতে এবারে মাসখানেক অতিবাহিত করলুম। আমার এক মাস বোম্বাই-বাসের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট তারিখটিও পড়ে যায়। সেই তারিখ জাতির বন্ধনমোচনের দিন, জাতির নব-জন্মের দিন, জাতির নব-জাগরণের দিন, সেই পরম পবিত্র মুহূর্ত, সেই পুণ্য-পবিত্র লগ্ন, সেই পরম পুণ্যক্ষণ। সেই বহু যত্নপোষিত স্বপ্নটির সফল হওয়ার দিন সেই গ্লানি ক্লেদ থেকে মুক্তিস্নানের দিন, সেই নবোদঘাটিত যাত্রাপথের প্রথম পদার্পণের দিন। বোম্বাইতেই এই শুভদিনটি উদযাপন করলুম।

ফিরে এসে কয়েকটি ব্যালে নিয়ে কিছুকাল নিমগ্ন ছিলুম, ব্যালেগুলির সম্বন্ধে যে সব কল্পনা আমার মনের মধ্যে ছিল সেগুলি আস্তে আস্তে রূপ পেতে থাকল। তারপর সেই রূপায়ণের তোড়জোড় আর বিলিব্যবস্থা। শেষে একদিন তারা মঞ্চস্থ হল। সেগুলিকে মঞ্চস্থ করার পর কলকাতার বাইরে তাদের মঞ্চস্থ করার অভিপ্রায়ে কিছুকালের জন্যে কলকাতা ছাড়তে হল। এবারে আমার গন্তব্য যুক্তপ্রদেশ এবং পূর্বপাঞ্জাব (ফিরোজপুর পর্যন্ত)। ব্যালেগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল, তাদের মধ্যে "বার্থ অব ফ্রিডম," "উইদার নাও ? "ভুখ", "ডিভাইন সোল" "সমর্পণ" এবং "অজন্তার" নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কি সমালোচকেরা, কি দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসায় এবং অভিনন্দনে ভরিয়ে তুলেছিলেন এদের। আমার একক নৃত্য "দ্রৌপদী"ও যথেষ্ট সাধুবাদ অর্জন করতে পেরেছিল। আমার প্রচেষ্টা পরিপূর্ণতার

মুখ দেখল। সেই পরিপূর্ণতা দর্শক দরবার থেকেই তো এসেছে, তাঁদের সাধুবাদই তো আমাদের পাথেয়।

১৯৫৭ সালের ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর বার্ণপুর কুলটিতে (I. I. S. C. O.), ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে চিত্তরঞ্জনে আর ১৯৫৮ সালের ২১শে জুন কলকাতায় আমি নৃত্য প্রদর্শন করি। সেই ২১শে জুনই আমার শেষ নৃত্য প্রদর্শন। শেষ যেদিন নৃত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মঞ্চে আরোহণ করি—সেদিন আমার নাচের বিষয়বস্তু ছিল "দ্রৌপদী"।

আবার কয়েক বছর আগে পিছিয়ে যাই—কয়েকটি বছর পিছন ফিরে না তাকালে কয়েকটি কথাও না বলা থেকে যাবে। এতক্ষণ মঞ্চজগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু বলা হল। এইবার চিত্রজগতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্বন্ধেও দুকথা বলা দরকার আমার জীবনেতিবৃত্ত থেকে এদের বাদ দেওয়া যায় না। ছবির কাজ তখনও করে গেছি, মঞ্চের সঙ্গেও যোগসূত্র ছিন্ন করি নি। ফেমাস পিকচার্স প্রযোজিত "ভোলা শঙ্কর" এ আমি মোহিনীর ভূমিকাটি গ্রহণ করি। পৌরাণিক পটভূমিকায় এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছিল। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন স্বনামধন্য ভীবরাম যেদেকার। যোগলেকার পরিচালিত এম র‍্যাণ্ড টির নন্দকিশোর ছবিটিতেও আমি অভিনয় প্রদর্শন করি। এই ছবিটিতে দেবদাস'র চরিত্রটির রূপ দিই। এরপর আমাকে সত্যিই একটি ভাল ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। চলচ্চিত্রজগতের প্রখ্যাত পুরুষ শ্রী পি, এল, সন্তোষীর কাছ থেকে এই আহ্বান আসে। তিনি আমাকে তাঁদের সন্তোষী প্রোডাকসান্সের "শিন শিনাকী বুব্লাবু" ছবিটিতে অভিনয় করার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। এর বৈচিত্র্যপূর্ণ, বর্ণবহুল কাহিনী গড়ে উঠেছিল যবদ্বীপ বলিদ্বীপকে পটভূমি করে। আমার অভিনেয় চরিত্রটি আয়তনে খুব বড় ছিল না। বিরতির আগে অবধি চরিত্রটির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু চরিত্রটি আমার খুব ভালো লেগেছিল, বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলুম ঐ চরিত্রে রূপ দিয়ে, চরিত্রটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যরস ছিল। এরপর বিখ্যাত প্রযোজক জেমিনী দেওয়ানের "তিতলীতে" পার্বতীর ভূমিকায় আমি আত্মপ্রকাশ করি। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন এক দিন

একটি পথে প্রতিনিয়ত পড়ছে হাজার হাজার পথিকের পদচিহ্ন, কিন্তু তারই মধ্যে যে কত বোঝবার আছে, কত জানবার আছে, কত দেখবার আছে এ খোঁজ ক'জন রাখে—তবে কেউ কেউ রাখে—যারা রাখে তারাই তো সন্ধানী। সেই সন্ধানীদের চোখে এমন অনেক কিছু ধরা পড়ে যায় যা সাধারণের চোখে পড়ে না। 'কোন এক দিন' ছবিটির গল্পাংশ এমনই এক বিচিত্র পটভূমি অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নায়ক বাবা-মার স্থির করা বিবাহে আপত্তি জানিয়ে বন্ধুর ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং সারাদিন সে ট্যাক্সি ড্রাইভার সেজে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র চরিত্রের একাধিক আরোহী তার গাড়ীতে ওঠে, বিভিন্নতার সমাবেশে সে একটি বিশেষ রূপ খুঁজে বার করতে সমর্থ হয়, এবং এই ব্যাপকতার স্পর্শে জগতের এক নগ্নচিত্র উদ্‌ঘাটনে সে সমর্থ হয়, জগত তার আসল রূপটি নিয়ে তখন নায়ক কমলেশের সামনে নিজেকে মেলে ধরে।

ছবিতে আরোহীদের সংলাপ কিছু কমালে ভালো হোত। শব্দগ্রহণ ব্যর্থ, ফলে ছবিটি অনেকখানি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কাহিনীর বৈচিত্র্য দর্শকসাধারণের অন্তরে রেখাপাত করবে। কাহিনী রচনা করেছেন সুবীর হাজরা। পরিচালনার ক্ষেত্রে তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন কমল মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিতে সুর যোজনা করেছেন সরোজ কুমারী।

যাত্রী

একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টায় সফল হলেন এস, এম, ফিল্ম ইউনিট। সফল হলেন সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার। চিত্রামোদীদের কাছে এক অনবদ্য চিত্রোপহার দিয়ে চলচ্চিত্রের দরবারে একটি বিশেষ আসন নিজের অধিকারভুক্ত করলেন। যাত্রীর বিশেষত্ব এবং অভিনবত্ব আমরা আশা রাখি আপনাদের মুগ্ধ করবে। ছবিটি ভারতদর্শনের ছবি, একদল যাত্রী একটি স্পেশ্যাল ট্রেণে সারা ভারত দেখতে বেরিয়েছে। দর্শকসাধারণের সামনে রূপালী পর্দায় সমগ্র ভারতের ছায়াছবি প্রকট হয়ে উঠবে, সারা ভারতের অসংখ্য দর্শনীয়

তীর্থস্থান, মন্দির, শিল্পকর্ম, দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সকলেই যাত্রী। কাহিনীতে একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বহু'র সমাবেশে "এক"-একটি বিশেষ রূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে, পরিচালক প্রধান চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচারই করেছেন। তাদের চরিত্রের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রেও কোন বাধা সৃষ্টি করেননি। সারা ভারতের মধ্যে যে শাশ্বত সত্যের অবস্থান, সেই শাশ্বত সত্যের উদ্ঘাটনই এই ছবির মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির গানগুলি সন্নিবেশিত করে ছবির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অভিনয়শিল্পীরাও সকলেই নবাগত। এই ছবি দু'ভাবে আনন্দ দেবে, অনেক দর্শক ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, তাদের বিশেষত্ব, তাদের শিল্পসম্পদ ইত্যাদি দেখে আনন্দলাভ করবেন আবার অনেকে এর অন্তর্নিহিত গভীরতার অন্বেষণ করবেন। ছবিতে ত্রুটি নেই, এ কথা বলব না, বলা সঙ্গতও হবে না, তবে এঁরা যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাটির রূপদানে সমর্থ হলেন, চলচ্চিত্রজগতে যে নতুনত্বের আমদানী করলেন, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে নতুন পথের সন্ধান দিলেন সেদিক দিয়ে বিচার করলে তো এঁরা নিঃসন্দেহে বারংবার সাধুবাদের অধিকারী। আমরা এঁদের অভিনন্দন জানাই।

বিশ্বরূপা

গত ২০এ অগাস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বিশ্বরূপায় বহুজন প্রশংসিত "সেতু" নাটকটির দুই শত রজনীর অভিনয়-উৎসব মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ দিন বিশ্বরূপায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ঘটেছিল। অনুষ্ঠানে নাট্যকার, কাহিনীকার, পরিচালক, আলোকশিল্পী, শিল্পিবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্মিগণকে বহুমূল্য উপহার প্রদানে আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং উপহারগুলি বিতরণ করেন শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে বিশ্বরূপার উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীমতী কানন দেবী

রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনোর গল্প

কি রহস্য, কি ইন্দ্রজাল, কি পরমাশ্চর্য, অবিশ্বাস করার উপায় নেই, রটনা নয় ঘটনা, জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী নয়—সত্য। স্পষ্ট সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, অকাট্য সত্য। কোন রূপকথার রাজকুমার, কোন কল্পলোকের অধিবাসী, কোন পরমসুন্দর তরুণ—যার একটিমাত্র নাম শিহরণ বইয়ে দিয়েছে তরুণী-সমাজে, আলোড়ন এনেছে যুবতীমহলে, উন্মাদনা এনেছে নারীচিত্তে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য—এতে কোন ভুল নেই। নারী-হৃদয়ে তার অটল আসন বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে সমকালীন সমাজকে, তাকে অদেয় কিছুই নেই নারীদের, নারীদের হৃদয়-সিংহাসন কেবলমাত্র তারই জন্যে। এমন কি যারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নয়, যাদের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই, যারা তাকে চোখে দেখেনি পর্যন্ত তারাও তার জন্যে উন্মাদ, তাদেরও তাকে অদেয় কিছুই নেই, তার জন্যে তারা দিশাহারা, প্রতিটি হৃদয়দুর্গের দ্বারগুলি এর কাছে অর্গলমুক্ত, সেখানে এ বিজয়ী বীর। রাডল্ফ ভ্যালেন্টিনো সেই বিস্ময়কর নাম, হলিউডের ইতিহাসে যে নাম চিরকালের জন্যে স্মরণীয় যার প্রভাব নারী-হৃদয় থেকে মুছে যাবার নয়। হাজার হাজার তরুণী যার কাছে মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে মনে করছে জীবন ধন্য, জন্ম সার্থক।

ভ্যালেন্টিনোর পুরো নাম রাডোলফো আলফানজো র‍্যাফেলো পিয়ারে ফিলিবার্ত গাগ্লিয়েলমি দ' ভ্যালেন্টিনা দ' আন্তনগুয়েলা।

১৮৯৫ সালে রাডল্ফের জন্ম। বাবা ছিলেন সেনাবিভাগের একজন সচিব। ভ্যালেন্টিনো তাঁর বাবাকে হারালেন যখন তাঁর বয়েস এগারো। আঠারো বছর যখন ভ্যালেন্টিনোর বয়েস তাঁর বিধবা মা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর মার্কিণ মুলুকে। ইতিপূর্বে ইটালির রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারের একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ভ্যালেন্টিনো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

অ্যামেরিকায় গিয়ে দেখলেন জীবিকা সংগ্রহ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যে আট শ' পাউণ্ড তাঁর সঙ্গে ছিল দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল। এইবার কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হল, হ'তে হ'ল রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন, প্রথমে নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে মালীর কাজ নিলেন তিনি তারপর একটি ভোজনালয়ে থালা ধোওয়ার কাজ নিলেন সেখানে কাচের থালাগুলি এত ভাঙতে আরম্ভ করলেন যার ফলে তাঁকে ইস্তফা দিতে হল সেখান থেকে, কিছুকাল পেশাদারী নর্তকের কাজ করে চিত্রজগতে প্রবেশ করলেন। গোড়ার দিকে ছোট ছোট ভূমিকা—তারপর নায়কের ভূমিকায় দেখা দিলেন ফোর হর্সমেন অফ দি অ্যাপোক্যালিপ্স'তে, এটি একটি যুদ্ধচিত্র। এরপর ভ্যালেন্টিনোকে দেখা গেল 'দ' শেক ছবিতে

এই ছবিই তাঁকে জগদ্বিখ্যাত করে তুলল। ছবিটি একটি ব্যর্থ ছবি কিন্তু সেই ছবি ভ্যালেন্টিনোকে উপস্থাপিত করল সকলের পুরোভাগে। ভ্যালেন্টিনোর নাম ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে, মুখে মুখে ঐ একটি নাম। মেয়েদের স্বপ্ন তখন ভ্যালেন্টিনো। অসংখ্য বিবাহের প্রস্তাব আসতে লাগল অগণিত প্রেমপত্র লিখিত হতে থাকল ভ্যালেন্টিনোর উদ্দেশ্যে। মেয়েদের চোখে, (সে পরিচিতাই হোক আর অপরিচিতাই হোক) ভ্যালেন্টিনো যে কি ছিলেন সে সম্বন্ধে এই রচনার প্রথমাংশেই আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু ভ্যালেন্টিনোর ব্যক্তিগত জীবন সুখের হয় নি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী অভিনেত্রী জীন একার বিবাহ-সম্বর্ধনার পূর্বেই তাঁকে পরিত্যাগ করেন। যদিও তাঁদের বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট ছিল আর মজার ব্যাপার এই, কাগজে কলমে জীন চিরকাল নিজেকে পরিচয় দিয়ে গেছেন "মিসেস ভ্যালেন্টিনো দি ফার্ষ্ট" বলে। দ্বিতীয় সহধর্মিণী রূপে ভ্যালেন্টিনোর হাতে হাত রাখলেন ছায়াজগতের বিশিষ্ট শিল্পসজ্জাকারিণী নাটাসা রামবোভা, নাটাসাকে যখন বিয়ে করলেন ভ্যালেন্টিনো জিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ তখনও আইনের চোখে স্বীকৃত হয় নি। ফলে ভ্যালেন্টিনোকে যেতে হ'ল হাজতে, হানিমুনের পরিবর্তে, পরে স্থির হ'ল যতদিন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হচ্ছে ততদিন তিনি ও নাটাসা পৃথক অবস্থান করবেন। এ বিবাহ সুখের হয়েছিল কিন্তু স্থায়িত্বলাভ করে নি ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে নাটাসার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ডোর ছিন্ন হয়ে গেল। এর পর তাঁকে সর্বত্র দেখা যেত অভিনেত্রী পলা নেগ্রির সঙ্গে, একরকম প্রায় স্থিরই ছিল যে পলা ভ্যালেন্টিনোর তৃতীয়া পত্নী হবেন কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে মাত্র ৩১ বছর বয়েসে ভ্যালেন্টিনো তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করলেন। ভ্যালেন্টিনোর প্রচুর সম্ভাবনাময় জীবননাট্যের যে এত দ্রুত যবনিকাপতন ঘটবে তা ভাবা যায়নি।

একটি মানুষের মৃত্যু যে এতগুলি নারীকে শোকাচ্ছন্ন করতে পারে এর অনুরূপ তুলনা মেলে না, আজ পর্যন্ত সারা হলিউডে দেখা গেল না যে ঐ রকম আর একটি ঘটনা ঘটল, এমন কোন মানুষ আর চোখে পড়ল না যে অতগুলি নারীর প্রেমলাভে সমর্থ হয়েছে। তাঁকে নিয়ে শেষবারের মত যে শোভাযাত্রা হল মেয়েদের ভীড় সামলাতে পুলিশ রীতিমত দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কত দোকানের কাচ ভেঙে ফেলেছে মেয়েরা শেষবারের মত তাঁকে দেখবে বলে। শবানুগামিনীর মোট সংখ্যা তিরিশ হাজার। অ্যামেরিকাতেই এই মৃত্যুসংবাদে পনেরোটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করল, অনেক মেয়ে পাগল হয়ে গেল।

এই সেই মানুষটি যাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি মেয়েদের চোখে ঘুম নেই যার জন্তে, যাঁর নামে মেয়েরা সারাটা পৃথিবী হারিয়ে ফেলে, সে মানুষটি দেখতে কেমন, কেমন তার রূপ, কেমনতরো তার আকৃতি? এই বিবরণীটি পাঠ করার পর এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক ভাবেই আপনার মনের কোণে দু'একবার উঁকি মারবেই—খুব যদি আগ্রহ থাকে সে সম্বন্ধে জানবার—তবে জেনে রাখুন, যে মানুষটি খুব একটা সুপুরুষ বা আকর্ষণীয় ছিলেন না! তবে···?

সেন্সার প্রসঙ্গে : যে দৃশ্যগুলি আমরা কখনও দেখতে পাব না

সেন্সার সম্বন্ধে রঙ্গামোদীদের কাছে নতুন করে বলার কিছু নেই। সেন্সার বোর্ড কি, কি উদ্দেশ্যে ঐ বোর্ড গঠিত, চলচ্চিত্রে ঐ বোর্ডের করণীয় কি এসকল বিষয়ে জনসাধারণ সবিশেষ অবহিত আছেন। ছবির যে সব অংশ সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুপযোগী বলে তাঁরা মনে করেন তৎক্ষণাৎ সেই অংশগুলি তাঁরা কাঁচির সাহায্যে নির্মূল করেন। এ সকল তথ্য সাধারণে সুপ্রচারিত। তবে ছবির যে সব অংশে সেন্সারের কাঁচি পড়ল সেই অংশগুলির ইতিবৃত্ত সাধারণ্যে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সেন্সারের নির্দেশানুসারে কয়েকটি ছবির পরিবর্জিত অংশ সম্বন্ধে যথাসংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র আমাদের পাঠকপাঠিকার সামনে তুলে ধরছি। এই অংশগুলি বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবিগুলিকে ভারতবর্ষে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রিন্স হু ওয়াস এ থিফ (মার্কিণ ছবি):

একটি নাচের দৃশ্যে মেয়েদের নিম্নাঙ্গে পরিধেয় পরিচ্ছদ অত্যন্ত পাতলা স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণের ছিল, সেই নাচের দৃশ্যটির উপর প্রবল বেগে সেন্সারের কাঁচি চলল। দৃশ্যটিকে অনেকখানি ছোট করে

শ্রীমতী কাজরী গুহ

দেওয়া হল। যে সব দৃশ্য পা নাচার সঙ্গে সঙ্গে গোপনবাসগুলি এবং দেহের বিশেষ বিশেষ অংশ আপত্তিজনকভাবে পরিদৃশ্যমান হচ্ছে—সেই দৃশ্যগুলি একেবারে বাদ দেওয়া হল।

ম্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন ফেবিয়ান (বৃটিশ ছবি):

যে দৃশ্য দখান হচ্ছে জর্জ তার গুরুজন আত্মীয়কে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলছে সেই দৃশ্যটি কাঁচি চালিয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট করে দেওয়া হল।

ষ্টোরি অফ এসথার কোষ্টেলো (মার্কিণ ছবি):

মিঃ লান্দির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এসথার যখন "নো নো নো" বলছে—সেই শব্দগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া হল।

দি গ্রীণ ম্যান (বৃটিশ ছবি):

একটি বাক্যাংশ—Everyone blamed the referee, মোকামী শব্দটি বাদ দেওয়া হল।

গন্ধর্বকন্যা (ভারতীয় ছবি):

গৃহস্বামী একটি ভাড়াটের শিরোদেশে পদাঘাত করছেন—এই দৃশ্যটি কেটে বাদ দেওয়া হল।

সাকী (ভারতীয় ছবি):

সোহনের সীমাকে ধর্ষণের প্রচেষ্টার সমুদয় দৃশ্যটিই বর্জন করা হল।

কোণ্ডাভীতি ডোঙ্গা (ভারতীয় ছবি):

একটি নাচের দৃশ্যে নর্তকী নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন করে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করছে, নৃত্যটিও আপত্তিকর, দর্শকরা সেই উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে আপন আপন ওষ্ঠ লেহন করছে এবং নিজেরা পরস্পরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে—এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হল।

ডোঙ্গালু ডোঙ্গা (ভারতীয় ছবি):

সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টার স্নানাগারে বন্দী হয়ে আছেন—এই দৃশ্যটি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হল।

আপনি জানেন ?

প্রশ্ন ঃ

১। তাঁকে "টোটেম পোল উইথ এ টুথেক" এর মত দেখায় বলে তাঁর আকৃতির বর্ণনা করা হয়েছে। আসল "বীফ কেক বয়" আখ্যাতেও তিনি পরিচিত। কে এই অভিনেতা ?

২। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন সম্বন্ধীয় প্রথম ছবিটি গৃহীত হয় ১৯৩২ সালে নামভূমিকায় কে অভিনয় করেন ?

৩। "কন্টিনেণ্টাল" সুরধ্বনিকে কোন পুরুষশিল্পী বিখ্যাত করে তুললেন ?

৪। "৩-ডি"তে গৃহীত প্রথম ফিচার ফিল্মটির নাম কি ?

৫। ম্যানা ল্যানোয়েজের কাহিনী একটি সঙ্গীতমুখর রোম্যাণ্টিকধর্মী ছায়াছবির বিষয়বস্তুতে পরিণত হল—কার ছেলেমেয়েদের তিনি পাঠ দিতেন ?

৬। একটি ফিল্ম ক্যামেরা প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি করে ছবি তুলতে পারে—(ক) ১২টি, (খ) ১৬টি (গ) ২৪টি ?

৭। ৩৫ এম, এম গজের একটি হাজারফিট দীর্ঘ সেলুলয়েড-রীল কতক্ষণ ধরে চলতে পারে—(ক) ৩৩ সেকেণ্ড, (খ) ১০ মিনিট (গ) ৪ মিনিট ১১ সেকেণ্ড ?

৮। ছবির প্রদর্শন যখন চলতে থাকে তখন সময়ের প্রতি অর্ধাংশে দর্শক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন আর তা সম্পূর্ণরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে—এই ধারণা কি সত্য ?

৯। আয়রণ পেটিকোট ছবিটিতে রুশীয় বৈমানিকের ভূমিকাগ্রহণ কে করেছিলেন ?

১০। একটি আট-রীলের ছবিতে পৃথক পৃথক কতগুলি করে ছবি থাকে ? —(ক) ২২,০০০ (খ) ১,০০,০০০ (গ) ২,৩৪০,০০০

১১। (ক) ম্যারিয়া ভন লস এবং (খ) ফিলিস ইসলি—এই দুইজন স্বনামধন্যা শিল্পী রঙ্গজগতে কোন নামে প্রচারিতা ?

১২। একটি "ক্যালেণ্ডার-ভঙ্গীর" কল্যাণে নর্মা জিন বেকার ৫০ ডলার উপার্জন করেন ? কে ইনি ?

১৩। একটি ছবিতে অভিনয়করাকালীন জিন সিবার্গকে এক লৌহনির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করতে হয়, এই পরিচ্ছদটির ওজন ৩৫ পাউণ্ড, এটি পরিধান করতে এবং পরিহার করতে আধঘণ্টা সময় লেগেছিল—ছবিটির নাম কি ?

১৪। ১৯২৭ সালে গৃহীত আল জলসনের যে ছবিটি অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের মুখে শব্দ এবং সঙ্গীত যোজনা করে—সেই ছবির নাম কি ?

১৫। আট বছর ধরে এডনা পারভায়ান্স যাঁর জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রধান সঙ্গিনী ছিলেন ১৯১৫ সালে তাঁর সাপ্তাহিক আয় ছিল ১২৫০ ডলার। ভিভিতে থাকেন তিনি—কি নাম এই শিল্পীর ?

উত্তর ঃ

১। ভিক্টর ম্যাচিয়োর, ২। বরিস কারলোফ, ৩। ফ্রেড অ্যাষ্টেয়ার, ৪। বাওয়ানা ডেভিল, ৫। শ্যামের রাজার, ৬। (গ) ৭। (খ), ৮। হ্যাঁ, ৯। ক্যাথারিণ হেপবার্ণ, ১০। (খ) ১১। (ক) মার্লেন ডিয়েট্রিচ এবং (খ) জেনিফার জোন্স, ১২। মার্লিন মোনরো, ১৩। সেণ্ট জোন (St. Joan), ১৪। দি জাজ সিঙ্গার, ১৫। চার্লস চ্যাপলিন

From middle-age on, everything of interest is either illegal, immoral, or fattening.

—ALEXANDER WOOLCOTT.

এই উৎসব-রাঙিন দিনে...

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আরো স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে

ক্লীয়ারটোন সামগ্রী

বাড়ীর সবাইকেই ক্লীয়ারটোন জিনিসগুলির একটা-না-একটা ব্যবহারের সুযোগ দিন। প্রত্যেকটি জিনিস কাজকে আরো হাল্কা, জীবনকে আরো স্বচ্ছন্দ করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী হয়েছে। বাড়ীর সবাই এসব পেলে খুশি হবে। আপনার কাছাকাছি ক্লীয়ারটোন বিক্রেতার দোকানে আজই সকলে মিলে গিয়ে জিনিসগুলি দেখুন।
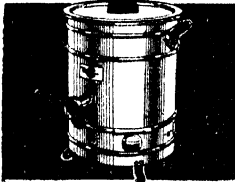
ক্লীয়ারটোন জলগরমের পাত্র
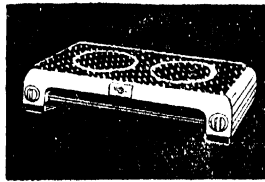
ক্লীয়ারটোন হট্ প্লেট
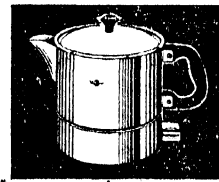
ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেট্‌লী
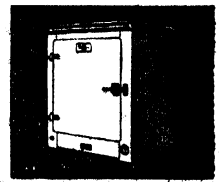
ক্লীয়ারটোন হট্ কাবার্ড
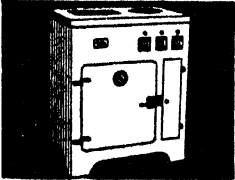
ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার হীটার

ক্লীয়ারটোন পারিবারিক ইস্ত্রি
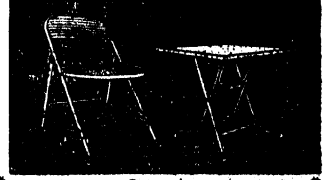
ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং স্টীল চেয়ার ও টেবিল
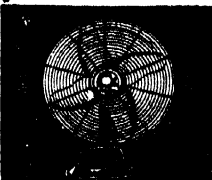
ক্লীয়ারটোন পাখা
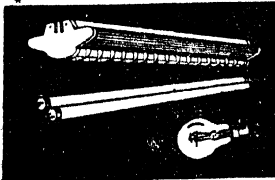
ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্লুরেসেন্ট টিউব ও সরঞ্জাম
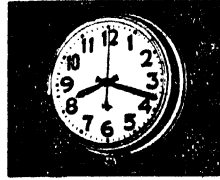
ক্লীয়ারটোন বৈদ্যুতিক ঘড়ি
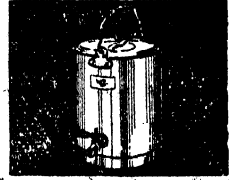
ক্লীয়ারটোন থারমাস জার

কাছাকাছি ক্লীয়ারটোন বিক্রেতার দোকানে গিয়ে আপনার বাড়ীর জন্যে এইসব দরকারী জিনিস দেখুন

GRA জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা - বোম্বাই - পাটনা - মাদ্রাজ - ব্যাঙ্গালোর - দিল্লী - সেকেন্দ্রাবাদ

ক্লীয়ারটোন—স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্য সুন্দর জিনিস
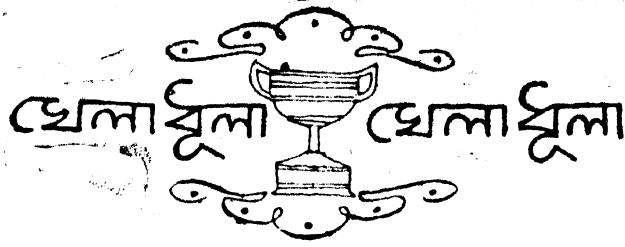
রোমে সপ্তদশ অলিম্পিকের পরিসমাপ্তি

এবার রোম মহানগরীতে সপ্তদশ অলিম্পিকের আসর বসে। ৮৫টি রাষ্ট্রের আট সহস্রাধিক ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এর আগে মেলবোর্ণ অলিম্পিকই সর্ব্ববৃহৎ আসর বলে খ্যাত ছিল। এই অনুষ্ঠানে ৬৭টি দেশের ৫৮৬৭ জন প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয়েছিলো—৬৪ বছর পূর্ব্বে এথেন্সে। সেই অনুষ্ঠানে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্রের ২৮৩ জন ক্রীড়াবিদ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এবার নিয়ে রোমে দ্বিতীয় বার অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। আনুমানিক দ্বিসহস্রাধিক বছর পূর্ব্বে রোমে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন রোম মহানগরী উৎসব-মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের সকল ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি থাকে রোমের দিকে। তবে সকলেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আলাপ-আলোচনার অবসান হয়েছে। ১৯৬৪ সাল না আসা পর্য্যন্ত অলিম্পিক আসর আর বিশেষ জমবে না। তবে বর্ত্তমানে বেশ কিছুদিন কে কি পেলো—এই নিয়ে সকলে আলোচনায় মত্ত থাকবেন।

এবারকার প্রতিযোগিতায় কত ঘটনা ঘটেছে—তার ইয়ত্তা নেই। প্রথম দিনেই ফরমোজা চীনকে কুয়োমিন্টাং নামে মার্চ্চ পাষ্টে অংশ গ্রহণ করতে হয়। তারা অবশ্য প্রতিবাদ করতে ছাড়ে নি। সাদা পতাকায় 'প্রতিবাদ' লিখে তারা মার্চ্চ পাষ্টে যোগ দেয়। তারপর ডেনমার্কের সাইকেল-চালক নার্ট প্র্যানমার্কের মৃত্যুতে সমগ্র অলিম্পিক নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তারপর ম্যারাথন দৌড়ে বিশ্বের খ্যাতনামা এ্যাথলীটরা পরাজিত হন ইথোপিয়ার অখ্যাত দৌড়বীরের কাছে।

এবার রোমে অত্যধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিযোগীদের বেশ-কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়। তবে রাশিয়ার প্রতিযোগীরা কি তাপ, কি ঠাণ্ডা—সবটাতেই নিজেদের মানিয়ে নেওয়ায় তাঁরা সাফল্য অর্জ্জন করেছেন।

রাশিয়া ৪৩টি স্বর্ণপদক পেয়ে এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমেরিকা ৩৪টি স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পায়।

অলিম্পিক এ্যাথেলেটিক আট দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। এবার নয়টি বিভাগে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ অথবা উহার সমতুল্য হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি ক্ষেত্রে পুরুষ এবং তিনটিতে মহিলা প্রতিযোগীরা কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

বিশ্বরেকর্ড ছাড়া কমপক্ষে ৩৬ বার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ হয়—আর না হয় উহার সমতুল্য। তার মধ্যে পুরুষ এ্যাথলীটই ২২টি নতুন রেকর্ড করেছেন। রাশিয়া জিমন্যাষ্টিকে ও আমেরিকা এ্যাথেলেটিকসে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জ্জন করেছে। সন্তরণে আমেরিকা এবার অষ্ট্রেলিয়ার আধিপত্য ভেঙ্গে দিয়েছে। সাইকেল চালনায় ইটালী বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেছে। মুষ্টিযুদ্ধে আমেরিকা ও ইটালী দুই জনেই বেশী স্বর্ণপদক ভাগ করে নিয়েছে। ভারোত্তোলনে রাশিয়াই সর্ব্বাধিক সাফল্য অর্জ্জন করে।

হকি ছাড়া ভারত কোন পদক লাভ করতে পারে নি। তবে এবারকার অলিম্পিকের কয়েকটি বিষয়ে ভারতের ক্রীড়া পদ্ধতির উন্নতি দেখা যায়। এ্যাথেলেটিকসে ভারত বিশ্ব-খ্যাতি অর্জ্জন করে। চ'ল্লিশ কোটি ভারতবাসীর আশা-ভরসা উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে সাফল্য লাভের জন্য বিদেশী দৌড়বীরদের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও দশমিকের এক ভগ্নাংশের জন্য ব্রোঞ্জপদক লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেবল ভারত বলেই নয়—এশিয়ার এই দৌড়বীর বিদেশী প্রতিযোগীদের সঙ্গে যেরূপ পাল্লা দিয়েছেন তা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। সাধ্যমত চেষ্টা করে এমন কি যে স্বল্প সময়ে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দৌড়াননি, সেই স্বল্প সময়ে দৌড়ে স্থান অধিকার করতে পারেননি—তাতে ভারতবাসীর দুঃখ করার কারণ নেই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিলখা সিং ৪৫.৫ সেকেণ্ডে দৌড়েও প্রথম তিনটি স্থান লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে সুদীর্ঘ ৬০ বছর পর ভারতীয় এ্যাথলীট মিলখা সিং শেষ পর্য্যায়ে দৌড়াবার অধিকার লাভ করেন। এ ছাড়া ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণে ভারতের জোড়া সিং অষ্টম স্থান লাভ করেন। এটাও কম কৃতিত্ব নয়।

ক্লে পিজিয়ন স্যুটিং-এ ভারতের কারনি ফাইন্যালে উঠেও অষ্টম স্থান পান।

পাকিস্তানের কাছে হকিতে ভারত পরাজিত হওয়ায় প্রতিটি ভারতবাসীই ব্যথিত হয়েছেন।

১৯২৮ সালে সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিজয়ী হকি চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করার পর দীর্ঘ ৩২ বছর ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে টোকিওতে ১৯৫৮ সালের এশীয় ক্রীড়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে পাকিস্তান গোলের গড়পড়তার হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল।

হকির কায়দা অপূর্ব্ব দক্ষতা সম্পর্কে প্রাক-যুদ্ধ-কালে ভারতের যে খ্যাতি ছিল ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালেও যাহার নমুনা দেখা গিয়াছিল এবার ভারতীয় দলের খেলায় তা দেখা যায় নি।

ভারত—তার দীর্ঘ বিশ্ব খেতাব হারাবার ফলে চতুর্দ্দিকে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণ বলেন, "রোমে ভারতীয় হকি পরাজয়ের কারণ—হকি খেলায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ। তবে এই পরাজয় ক্রীড়ামূলক মনোবৃত্তিতেই গ্রহণ করতে হবে ও আগামী অলিম্পিকে যাতে গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারা যায়—তার ব্যবস্থা এখনই করতে হবে।"

বিজয়নগরের মহারাজকুমার বলেছেন, "ভারতের এই পরাজয় চরম বিপর্য্যয়ের কারণ। পাকিস্তান দল যে জিতেছে—তার একমাত্র কারণ দলের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে দলের অধিনায়ক ও দেশকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। পাকিস্তানের জয়লাভের জন্য অভিনন্দন করা উচিত। এর মধ্যে ফাঁকি নেই।" মাত্র বার বছর সাধনার ফলে পাকিস্তানের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। ভারত না পেলেও পাকিস্তান পাওয়ায় হকির স্বর্ণপদক এশিয়াতেই এসেছে। তবে এশিয়ার এই আধিপত্য আর কত দিন চলবে—তা বলা কঠিন। বর্ত্তমানে স্পেন, ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেছে। এর মধ্যে স্পেনের খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদি স্পেন হকি নিয়ে সাধনা করে—তা হলে ১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে তারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে পারবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত কেনিয়ার খেলার মানও খুবই উন্নত হয়েছে। জার্ম্মাণীর খেলার ধারাও বেশ ভাল হয়।

ফুটবলে যুগোশ্লোভেকিয়া এবার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। ডেনমার্ক দ্বিতীয় স্থান পায়। ফুটবলে ভারত নিজ গ্রুপে মাত্র এক পয়েন্ট পেয়ে সর্ব্বনিম্ন স্থান পেলেও এবার ভারতীয় ফুটবল বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। পেরুর বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও হাঙ্গেরী ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভারত যেরূপ উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে তাতে বিশ্বের দরবারে ফুটবলে ভারতের মর্য্যাদা সত্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে অলিম্পিকের বিশিষ্ট খেলাধুলার স্বর্ণপদক লাভকারীর নাম প্রদত্ত হইল :—

এ্যাথেলেটিক্‌স

১০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—আরম্যান হ্যারী (জার্ম্মাণী)। মহিলা—উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)।

২০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—লিভিও বেরুটি (ইটালী)। মহিলা—উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)।

৪০০ মিটার দৌড় :—পুরুষ—ও, ডেভিস (আমেরিকা)।

৪০০ মিটার হার্ডল :—পুরুষ—গ্লস ডেভিড (আমেরিকা)।

৮০ মিটার হার্ডল :—মহিলা—আইরিন প্রেস (রাশিয়া)।

১১০ মিটার হার্ডল :—পুরুষ লি ক্যাগপুন (আমেরিকা)।

৮০০ মিটার দৌড়:—পুরুষ—পিটার স্নেল (নিউজিল্যাণ্ড)। মহিলা—এল শেভ্‌কোভা (রাশিয়া)।

৫০০০ মিটার দৌড়:—পুরুষ—ম্যারে হ্যাগবার্ট (নিউজিল্যাণ্ড)।

১০,০০০ মিটার দৌড়:—পুরুষ—পি, বোলিটানিকভ (রাশিয়া)।

১৫০০ মিটার দৌড়:—পুরুষ—হার্ব হনিয়ট (অষ্ট্রেলিয়া)।

৪×১০০ মিটার রিলে:—পুরুষ—জার্ম্মাণী। মহিলা—যুক্তরাষ্ট্র।

৪×৪০০ মিটার রিলে:—পুরুষ—আমেরিকা।

৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ:—পুরুষ—জেড ক্রিমকোয়াইক (রাশিয়া)।

উচ্চ লম্ফ:—পুরুষ—আর শ্যাভিরকেজ (রাশিয়া), মহিলা—ইওল্যাণ্ডা ব্যানাস (রুমানিয়া)।

দীর্ঘ লম্ফন:—পুরুষ—রালফ বোষ্টন (আমেরিকা)। মহিলা—ভি, ক্রেপাকিনা (রাশিয়া)।

ডিসকাস ছোড়া:—পুরুষ—এ্যাল ওয়েটার (আমেরিকা) মহিলা—নিনা পোস্রোমারেভা (রাশিয়া)।

বর্শা ছোঁড়া:—পুরুষ—ভি, টেলিবুলেস্কো (রাশিয়া)। মহিলা—ই, ওজোলিনা (রাশিয়া)।

সপপাট:—পুরুষ—ডব্লিউ নাইডার (আমেরিকা)। মহিলা—তামারা প্রেস (রাশিয়া)।

পোলভল্ট:—পুরুষ—ডন ব্র্যাগ (আমেরিকা)।

২০ কিলোমিটার ভ্রমণ:—পুরুষ—ভাভিমির গোলুভগিচি (রাশিয়া)।

হপ-ষ্টেপ-জাম্প:—পুরুষ—পাইমাণ্ডো ডি, ইনজেও (ইটালী)।

ম্যারাথন:—পুরুষ-বিকিলা আবেচে (ইথিওপিয়া)।

সন্তরণ

১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল—পুরুষ জন ডেভিট (অষ্ট্রেলিয়া)। মহিলা—ডন ফ্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া)।

২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক পুরুষ—ডব্লিউ মুলিকেন (আমেরিকা) মহিলা—অনিতা লেনিসব্রো (বৃটেন)।

১০০ মিটার বাটারফ্লাই: মহিলা—ক্যারোথিন স্থুলার (আমেরিকা)।

২০০ মিটার বাটারফ্লাই: পুরুষ—মাইকট্রম্ (আমেরিকা)।

৪×১০০ মিটার মিডলে রিলে: পুরুষ—আমেরিকা। মহিলা—আমেরিকা।

৪×২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রিলে: পুরুষ—আমেরিকা।

৪×১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রিলে: মহিলা—আমেরিকা।

৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল: পুরুষ—ম্যারে রোজ (অষ্ট্রেলিয়া)। মহিলা—ডন ভ্যালজা (আমেরিকা)।

১৫০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল: পুরুষ—জে, কনরাডস (অষ্ট্রেলিয়া)।

১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক: মহিলা—এল, বার্ক (আমেরিকা)।

স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং: পুরুষ—গ্যারী টোবিয়ান (আমেরিকা)। মহিলা—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্ম্মাণী)।

হাই বোর্ড ডাইভিং: পুরুষ—আর ওয়েবষ্টার (আমেরিকা)। মহিলা—ইনগ্রিড ক্র্যামার (জার্ম্মাণী)।

সাইকেল রেস

১০০ কিলোমিটার দলগত রেস:—ইটালী। ১০০০ মিটার সাইকেল রেস:—সান্তে গার্দোয়ানী (ইটালী)। ২০০ মিটার ট্যাণ্ডেম রেস—জিয়ান্নি বরোটা ও সার্জিও ব্র্যানচেটো (ইটালী)। ৪০০০ মিটার টিম পারস্যুটা (ইটালী)। ১০০০ মিটার স্প্রিন্ট—সান্তে গার্দোয়ানী (ইটালী)। ১৭৬ কিলোমিটার রেস—ভিক্টর ক্যাপিটনভ (রাশিয়া)।

মল্লযুদ্ধ (রোমান ষ্টাইল)

ফ্লাইওয়েট—ডি, মট্টা পিরুভেলেস্কু (রুমানিয়া)। ব্যাণ্টাম ওয়েট—ওলেগ ক্যারাভেগি (রাশিয়া)। ফেদারওয়েট—মুস্তাহির শেখ (তুরস্ক), লাইট ওয়েট—এ্যাভিরাণ্ডি কোভিস্তেভ (রাশিয়া), ওয়েল্টার ওয়েট—সিটহার্ট ব্যয়রেক (তুরস্ক)। মিডল ওয়েট—ডিমিট্রো ডবরেভ (বুলগারিয়া), লাইট হেভি ওয়েট—টেভিক কিস (হাঙ্গেরী), হেভি ওয়েট—আইভান বজগান (রাশিয়া)।

মল্লযুদ্ধ (ফ্রিষ্টাইল)

ফেদার ওয়েট—এম, জ্যাগিমানি (তুরস্ক), মিডল ওয়েট—এইচ, গাজার (তুরস্ক), লাইট ওয়েট—এগ, উইলসন (আমেরিকা), ব্যাণ্টাম ওয়েট—টি, ম্যাকনান (আমেরিকা), ওয়েল্টার ওয়েট—ডগলাস ব্লু গাগ (আমেরিকা), হেভি ওয়েট—ডব্লিউ ডিরেট্রিচ (জার্ম্মাণী)।

মুষ্টিযুদ্ধ

ফ্লাই ওয়েট—জি, টোরক (হাঙ্গেরী), ফেদার ওয়েট—এফ, মুসো (ইটালী), লাইট ওয়েট—কে, প্যার্জিয়র (পোল্যাণ্ড), লাইট ওয়েল্টার ওয়েট—বি, মেমক (চেকোশ্লোভাকিয়া), ওয়েল্টার ওয়েট—জি, বেনভেনুইটি (ইটালী), ব্যাণ্টাম ওয়েট—ওলেগ গ্রিভরেভ (রাশিয়া), লাইম মিডল ওয়েট—ই, উইলবর্ট ম্যাকলার (আমেরিকা), মিডল ওয়েট—এডওয়ার্ড ক্রুক (আমেরিকা), লাইট হেভী ওয়েট—ক্যাবিস ক্লে (আমেরিকা), হেভি ওয়েট—ফ্র্যান্সিসকো ডি মিশেলী (ইটালী)।

ভারোত্তোলন

লাইট ওয়েট—ভিক্টর বোশেখ (রাশিয়া), মিডল ওয়েট—জুরিনভ (রাশিয়া), লাইট হেভি ওয়েট—আইরামুজ প্যালিনিস্কি (পোল্যাণ্ড), মিডল হেভি ওয়েট—আরকাডি বোরেভিয়েভ (রাশিয়া), ব্যাণ্টাম ওয়েট—ইউরিভ্রাশভ (রাশিয়া)।

জিমন্যাষ্টিক

পুরুষদের:—একক—বোরিস স্তারালিন (রাশিয়া)। দলগত—জাপান। মহিলাদের:—একক—লারসিনা ল্যাটিনানা (রাশিয়া), দলগত—রাশিয়া। মহিলাদের:—ফ্রিম ব্যালান্স—ইভা বসকোভা (রাশিয়া)। পুরুষদের:—পোমেল্‌হর্স—ই, একম্যান (ফিনল্যাণ্ড); পুরুষদের রিং—এ, অ্যাসিরিয়ান (রাশিয়া), পুরুষদের হরাইজণ্টাল বার—জাপান। পুরুষদের—ফ্রি ষ্ট্যাণ্ডিং—এম, আইওহারা (জাপান)।

বাস্কেট বল—আমেরিকা। ওয়াটারপোলো—ইটালী। ডেকাথলন—র‍্যাফার জনসন (আমেরিকা)। মডার্ণ পেণ্টাথলন—ফেরেন্স নেমেস (হাঙ্গেরী)। দলগত—হাঙ্গেরী।

ভাদ্র, ১৩৬৭ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৭ই আগষ্ট) : রাজ্যসভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের সূচনায় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও নিখিল ভারত শান্তি পরিষদের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিষোদ্গার—ভারতীয় হইয়াও নিজেদের দেশকে হেয় করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ।

২রা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট) : সীমান্তে চীনা আক্রমণ রোধকল্পে ভারত সরকার কর্তৃক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন—রাজ্যসভায় পররাষ্ট্র বিষয়ক বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ—রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে খসড়া পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রদান।

৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) : আসামে হাঙ্গামা দমনের জন্য প্রয়োজন হইলে গুলী চালানো হইবে—ধুবড়ীর জনসভায় আসামের স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ ফকরুদ্দীন আলি আমেদের ঘোষণা।

৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) : "আসামে ভারতীয় সংবিধানের ধারা লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং পরিস্থিতি আয়ত্তে আনয়ন ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে"—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কঠোর মন্তব্য।

৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) : উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডব—লক্ষ লক্ষ নর-নারী ও শিশু বিপদের সম্মুখীন এবং রাজ্যের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) : ভারতে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা সংগঠনের সঙ্কল্প পুনর্ঘোষণা—লোকসভায় তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

৭ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) : কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসামের উপদ্রুত অঞ্চল সফরকারী সংসদীয় প্রতিনিধিদলের জরুরী বৈঠক।

৮ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) : দিল্লীর পথে আসামের রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা—দমদম বিমানঘাঁটিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসাম পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) : আসামের দাঙ্গা সম্পর্কে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা ও অর্থসচিব শ্রীফকরুদ্দীন আলি আমেদের দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক।

আসাম পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বৈঠকের দাবী—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত রাজ্যের বিরোধী নেতাদের আলোচনা।

১০ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট) : তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া (১০,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ) লোকসভায় অনুমোদিত।

১১ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট) : আসামে তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের জজ নিয়োগের দাবী—ভারতীয় জনসংঘ কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভায় (হায়দ্রাবাদ) পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের (জনসংঘ সাধারণ সম্পাদক) রিপোর্ট গৃহীত।

১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) : দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় আর তিন হাজার কোটি টাকার রপ্তানীর লক্ষ্য পূর্ণ হইবে—দিল্লীতে রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পসচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর আশা প্রকাশ।

১৩ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট) : আসাম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা কর্তৃক রাজ্য বিধান সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত।

লোকসভা সদস্য শ্রীকংসারি হালদারের (কমুনিষ্ট) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—আলিপুরের তৃতীয় ট্রাইব্যুনালে কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রদান।

১৪ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট) : "আসামের ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন নাই"—আসাম সফরকারী সংসদীয় প্রতিনিধি দল কর্তৃক পার্লামেণ্টে রিপোর্ট পেশ।

১৫ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট) : নেফা (উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী) সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে চীনের উত্তর দান—লোকসভায় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

"আসামের উপদ্রুত অঞ্চলসমূহ হইতে এযাবৎ ৪৪ হাজার শরণার্থীর (বাঙ্গালী) পশ্চিমবঙ্গে আগমন"—রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বিবৃতি।

১৬ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর) : আসামের হাঙ্গামা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী নাকচ—লোকসভায় আসাম বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বক্তৃতা।

১৭ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর) : আসামের ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে সর্ব্বাত্মক বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত।

১৮ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) : যথাসময়ে আসাম দাঙ্গার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে লোকসভা কর্তৃক শ্রীঅতুল্য ঘোষের (পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস প্রধান) প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯শে ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর) : গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিপুরার পশ্চিমবঙ্গভুক্তির দাবী—পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের স্মারকলিপি প্রচার।

পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় পরিণতিতে ৪০ হাজার নর-নারীর রোটক সহর ত্যাগ—সহর রক্ষার জন্য তিন সহস্র সৈন্য ও দুই সহস্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ।

২০শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর) : ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে বিদ্রোহী নাগাদের গুলীবর্ষণের সংবাদ—দুইখানি বিমান ধ্বংস : একখানি বিমানের লোকজন নিখোঁজ।

চন্দ্রগ্রহণের চূড়ামণিযোগ উপলক্ষে গঙ্গার (কলিকাতা) ঘাটগুলিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী নর-নারীর অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ।

২১শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): শোষণ ও বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের স্বাধীনতা ক্রমশঃ সঙ্কোচ করার দৃঢ় সঙ্কল্প—রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বর্ণনা।

২২শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর): আসামের ঘটনাবলী সম্পর্কে সরকারী নীরবতায় ব্যাপক তদন্ত দাবী—রাজ্যসভায় কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও পি এস পি সদস্যদের সংশোধন প্রস্তাব।

২৩শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): ৪০ হাজার পোষ্য সহ পশ্চিমবঙ্গের ৮ হাজার কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীর শোচনীয় অবস্থা—শাস্তিমূলক বিধান প্রত্যাহারের ব্যবস্থার জন্য রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট বামপন্থী নেতাদের আবেদন।

২৪শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): ভারতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ—ভারত সরকারের নিকট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ।

২৫শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): আসামের সরকারী ভাষার প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা—১৭ই সেপ্টেম্বর গৌহাটিতে বিভিন্ন ভাষাভাষীদলের প্রতিনিধিদের বৈঠক আহ্বান।

২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): দাঙ্গার (বাঙালী উৎসাদন) সময় নওগাঁ জেলায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত—আসামের অতিরিক্ত চীফ সেক্রেটারীর রিপোর্ট: ডেপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ তিনজন উর্দ্ধতন অফিসার সসপেণ্ড।

২৭শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): "বিপদের ঝুঁকি, লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্রতী হইতে হইবে"—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

কাছাড়, গোয়ালপাড়া ও ত্রিপুরাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী: আসামের পার্ব্বত্য ও উপজাতি এলাকা স্থানীয় স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাব—কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান।

২৮শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা—দিল্লীতে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে সাধারণভাবে অনুমোদন।

নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত পন্থের সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি, পি, চালিহার বৈঠক।

২৯শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): "বহিঃশত্রু নহে—আভ্যন্তরীণ শত্রুই ভারতের বিপদের হেতু"—কৃষ্ণনাথ কলেজের (বহরমপুর) শতবার্ষিকী উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে 'উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য।

৩০শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): আসামে উদ্বাস্তদের (অসমীয়া দাঙ্গায় বিপন্ন) পুনর্ব্বাসন সম্পর্কিত প্রশ্ন—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত আসাম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার আলোচনা।

৩১শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): ৬ই অক্টোবর হইতে সারা পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনায় প্রারম্ভিক কার্য্যের সূচনা—সাংবাদিক বৈঠকে (কলিকাতা) রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারী শ্রীআর গুপ্তের বিবৃতি।

বহির্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৭ই আগষ্ট): রাষ্ট্রসংঘের ৮২-জাতি নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠক সুরু—পরমাণুশক্তি উৎপাদনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত বন্ধ করার জন্য দুই দফা মার্কিণ প্রস্তাব পেশ।

কঙ্গোতে ছয় মাসের জন্য সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন—সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিক লুমুম্বার ঘোষণা।

৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট): ভূপাতিত মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের বৈমানিক-ফ্রান্সিস প্যারি পাওয়ার্সের দশ বৎসর কারাদণ্ড—গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ সম্পর্কে বিচারে রুশ সামরিক আদালতের রায়।

৪ঠা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): লিওপোল্ডভিলেতে ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীদের উপর কঙ্গো সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ—কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বার নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রতিবাদ লিপি।

২১শে আগষ্ট তারিখে উৎক্ষিপ্ত রুশ মহাকাশ যানের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন—প্রেরিত কুকুরদ্বয়ের জীবিতাবস্থায় মহাশূন্য হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবতরণের ঘোষণা।

৬ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): কঙ্গোলী প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক কঙ্গোর ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশোল্ডের কার্য্য-ব্যবস্থা সমর্থন।

৯ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট): রোম নগরে সাড়ম্বরে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধন—ইটালীর প্রেসিডেন্ট সিনর-গ্রঙ্কির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

১০ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): রোম অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরীর নিকট ভারতের ২-১ গোলে পরাজয়বরণ।

বেলজিয়ানদের সহিত জাতিসংঘ বাহিনীকেও কঙ্গো ছাড়িয়া যাইতে হইবে—কঙ্গো প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বার ঘোষণা।

১২ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট): ফ্লোরিডায় নিগ্রোদের সহিত শ্বেতাঙ্গদের দাঙ্গা—শ্বেতাঙ্গ পুলিসের গুলীচালনায় কয়েকজন হতাহত—আমেরিকায় নিগ্রো নির্য্যাতন অব্যাহত।

১৩ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): জর্ডনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ হাজ্জা মাজালী (৪৪) ও অপর নয়জন নিহত—আম্মানাস্থ জর্ডানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বোমা নিক্ষেপের জের।

১৭ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-প্রধানদের রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে (২০শে সেপ্টেম্বর) যোগদানের জন্য রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের আহ্বান।

কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার ও চিয়াং চীনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন—কিউবান প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফিদেল কাষ্ট্রোর ঘোষণা।

১৯শে ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): যুদ্ধ বাধিলে বিশ্বের বিশেষভাবে ছোট ছোট দেশগুলিরই সর্ব্বাধিক বিপদ—হেলসিঙ্কিতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের সতর্কবাণী।

খালের জল সংক্রান্ত চুক্তির ফলে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার

পথ প্রশস্ত—রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

২১শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) : রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট জোসেফ কাসাভুবু অপসারিত—প্রধানমন্ত্রী মিঃ লুমুম্বা কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ।

রাষ্ট্রসংঘে গণ চীনকে গ্রহণের প্রশ্নে রুশিয়ার ব্যাকুলতা—প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের কর্ম্মসূচীভুক্ত করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারস্কজোল্ডকে অনুরোধ।

২২শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বয়কট ব্যবস্থা—দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত ফ্রণ্টের পরিকল্পনা ঘোষিত।

২৪শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর) : অলিম্পিক হকি ফাইন্যালে (রোমে অনুষ্ঠিত) পাকিস্তানের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়ী।

কাটাঙ্গা প্রদেশে কঙ্গো সেনাবাহিনীর প্রবেশ—কঙ্গোর প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাট্রিস লুমুম্বা কর্ত্তৃক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ।

২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) : রোমে সপ্তদশ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি—রুশিয়ার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন ও ৪৩টি স্বর্ণপদক লাভ : ৩৪টি স্বর্ণপদক পাইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্থান অধিকার।

লাওসে পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত ও সামরিক আইন জারী—প্রিন্স বেনি অউম (সরকারের ইন্সপেক্টর জেনারেল) কর্ত্তৃক সরকারের (প্রিন্স সৌভানা ফুমা সরকার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

২৮শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর) : সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ—প্রেসিডেণ্ট সুয়েকার্ণোর কার্য্যব্যবস্থা।

২৯শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর) : রকেটযোগে ৬০ মাইল ঊর্দ্ধাকাশে মানুষ প্রেরণ ও নিরাপদে উদ্ধার—সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সফল প্রচেষ্টার সংবাদ।

৩০শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর) : কঙ্গোতে সামরিক অভ্যুত্থানের (সাম্রাজ্যবাদী) ব্যর্থ চেষ্টা—রাষ্ট্রপ্রধান য়ুবুটু কর্ত্তৃক জঙ্গী নেতা কর্ণেল মোঠুতু গ্রেপ্তার।

কয়েকটি দিন

জয়ন্তী রায়

প্রাত্যহিক প্রয়োজনে কতদিন পার হ'য়ে আসি,
কত যে ঘুমের রাত এসে চলে যায়,
সেই সব নিমেষে ফুরায়।
কিছু তার বেশ
অবসর কালে তার কোন অবশেষ,
মনের গহন থেকে হঠাৎ হাওয়ায়
ফুটে ওঠা ফুল-সম জাগেনা তো মনে ;
ওরা যেন ঝরাপাতা ঝরে যায় বনে।

কিন্তু মনে থাকে,
সুন্দর কয়েকটি দিন, দূর থেকে ডাকে,
আকাশের নীলিমায়, ঘাসের শিশিরে,
অথবা ফুলের মুখে তার মিল থাকে।
হয় তো এক-একটা দিন মনে হল আশ্চর্য্য রঙীন,
বিকেলের লালরোদ ফুটন্ত চাঁপার মত সুন্দর সৌখিন,
সুরুচি গন্ধের মধু সমস্ত মনের মাঝে সুর হ'য়ে বাজে।

হয়তো বা একটি সকাল :
পূর্ব-দিগন্ত তার লাল ঘন লাল
আকাশ উজ্জ্বল, আর হাওয়ার শরীর
দূত হ'য়ে আসে যেন নভোচারী ছোট পাখীটির ;
মনে মনে গান জাগে, কী যে ভাল লাগে
সমস্তটি দিন—সমস্তটি দিন,
আনন্দ আওয়াজ যেন বাজে রিনঝিন্
[illegible]

আর, এক একটি দুপুরে,
অকারণ উদাসীন বাউলের গান
টেনে নিয়ে যায় দূরে, প্রান্তহীন মাঠ, ধান,
আর নীল আকাশ সেখানে
মিশে গেছে, মিলে গেছে, একই
লয়ে তানে—

তাই বলি,
যেন এক-একটি কলি
সেই সব দিন, কেবলই মনের মাঝে
ফুটে ফুটে ওঠে—সুর হ'য়ে বাজে
সেই সব অকারণ অবারণ মনোহর দিন।
আর সব প্রাত্যহিক প্রয়োজনে
যতদিন পার হ'য়ে আসি,
যত রাত এসে চলে যায়
সেই-সব নিমেষে ফুরায়।

আসামের রহস্য.

"১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপাল সার আকবর হায়দারী যে বিষ বিসর্পিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতীকার করা কি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য ছিল না? কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কি রাষ্ট্র খণ্ড খণ্ড করার প্রতীকার না করায়—রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ উপস্থাপিত করা যায় না? আইন অনুসারে—বিমলাপ্রসাদ চালিহা ও ফকরুদ্দীনের মত জওহরলাল নেহরু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থকেও বাঙালীদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের জন্য দায়ী করা যায় না—তাহা আজ রাষ্ট্র সচেতন ও অধিবাসী মাত্রকেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ডক্টর কুঞ্জরু ও সর্দার পান্নিকর যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরেও যে সরকার পদত্যাগ করিতে অসম্মত, সে সরকারের সম্বন্ধে রাষ্ট্রবাসীর অবশ্যই কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য—সরকারের পরিবর্তন সাধন। আর আজ বাঙালীকে তাহার কর্তব্য আবার ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। অত্যাচার যখন উগ্র হয়—আর যাহারা ক্ষমতার পরিচালক তাহারা সেই অত্যাচারের (সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়) সমর্থক হয়, তখন কি হয় অরবিন্দ বলিয়াছেন—"To hit back, to assail and crush the assailant, to vindicate one's menhood becomes an imperious necessity to outraged humanity." যাঁহারা—ভারত সরকার ও আসাম সরকার কর্তৃক বিকৃত—ভারতীয় সংবিধান দেখাইয়া বাঙালীদিগকে আসামে যাইতে প্ররোচিত করিতেছেন, তাঁহারা কি স্বীকার করেন না, আসামে বাঙালীদিগকে আত্মরক্ষার ও বাঙালী রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন ও কর্তব্য? যদি কোথাও কোন বাঙালীর উপর অত্যাচার হয়, তবে তখন স্বামী বিবেকানন্দের সেই উপদেশ স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে—কেহ যদি তোমার গালে একটি চড় মারে তবে তাহাকে দশটি চড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাহাই গৃহীর ধর্ম। আসামের ব্যাপারে কংগ্রেস কিরূপ কাজ করিয়াছে—কংগ্রেসের সভাপতি কি ভাবে আসাম সরকারের ও আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাফাই গাহিয়াছেন এবং শেষে শ্রীঅতুল্য ঘোষের দ্বারা ব্যাপক তদন্ত "যথাকালে" হইবে স্বীকার করাইয়া যে কুকার্য্য করিয়াছেন—তাহা যেন বাঙালী ভোটদাতারা নির্বাচনের সময় মনে রাখেন।"

—দৈনিক বসুমতী।

শিক্ষা-বিপর্য্যয়

"হাবড়া হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা একটি খবর পাঠাইয়াছেন। তাহাতে জানা গেল, সরকারী সাহায্যে গ্রামাঞ্চলের বালিকাদের পড়াশুনা করিবার যে সুযোগ রহিয়াছে, তাহা সঙ্কুচিত হইবে। ডি আই অফিস হইতে এক সার্কুলার পাঠাইয়া নাকি জানানো হইয়াছে যে, ৮ম শ্রেণী অথবা তাহার নিম্ন কোনও [illegible] যাহারা ছাত্রী, তাহাদের মধ্যে ১৪ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স, অধ্যয়নের ব্যাপারে তাহারা আর সরকারী সাহায্য পাইবে না। এই সিদ্ধান্তটা যদি কার্যকরী হয়, তবে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ঘরের অনেক মেয়েরই যে পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তার কারণ, শহরের মেয়েরা যত অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, গ্রামের মেয়েদের সচরাচর তার চাইতে কিছুটা বেশী বয়সেই বিদ্যালয়ে পাঠানো হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় এই সার্কুলার যে গ্রামাঞ্চলের বালিকাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। আবার, ব্যাপারটাকে যদি বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখা যায়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ক্ষতি শুধু গ্রামাঞ্চলের মেয়েদেরই হইবে না; ক্ষতি হইবে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের আদর্শেরও। সে-কথা বিবেচনা করিয়াই আমরা বলিতেছি যে, এই সার্কুলারটি এখন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শিয়ালদহ বিজলী ট্রেণ

"রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে রেল বিভাগের উপমন্ত্রী মিঃ শাহনাওয়াজ খাঁ বলিয়াছেন যে, শিয়ালদহ বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা অন্তত: আংশিকভাবে ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে চালু হইতে পারিবে। অবশ্য, তিনি এই ঘোষণার সঙ্গে একটা মস্ত "যদি" যোগ করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালু হইতে পারিবে, যদি ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগও তাঁহাদের আবশ্যকীয় কাজ সমাপ্ত করিতে পারে। এই "যদি" মিঃ শাহনওয়াজের অন্যথা আশাপ্রদ ঘোষণাকে কার্যত: নৈরাশ্যপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মোটের উপর শিয়ালদহ বিভাগের রেলের বৈদ্যুতীকরণ কোন-না-কোন অজুহাতে যেরূপ বিলম্বিত হইয়া আসিতেছে, তাহা মনে করিলে ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মাঝামাঝি সে কার্য আংশিক-পরিমাণে সমাপ্ত হইবার আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হইবে, যদিও রেলের যাত্রীদের দুঃখ ও দুর্ভোগের কথা ভাবিতে গেলে শিয়ালদহ বিভাগের বৈদ্যুতীকরণ অনেক আগেই সমাপ্ত হওয়া উচিত ছিল।"

—যুগান্তর।

কৃষক সার পায় না কেন?

"গতকল্যকার "স্বাধীনতা"র প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে, আমোনিয়া সারের অভাবে কৃষকদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। বর্দ্ধমানের কৃষকগণ চেষ্টা করিয়াও সার পাইতেছেন না। সাধারণ ডিলারগণ কিছু কিছু পরিমাণ সার বিক্রয় করিতেছেন কালোবাজারের দরে। সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যান্ত সার দেওয়া হইতেছে না, কোন কোন ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইলেও তাহার পরিমাণ অতিশয় নগণ্য। পশ্চিম বাংলার সার বিতরণের ভার এখনো পর্য্যন্ত র‍্যালী ব্রাদার্স, শ'ওয়ালেশ প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়। ইহা সত্যই বিস্ময়কর। এদিকে বিপুল পরিমাণ সার পশ্চিম বাংলার বাহিরে চালান হইয়া যায় এ ঘটনাও সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কংগ্রেস সরকার সব ব্যাপারে যেমন এ ব্যাপারেও তেমনই। আইনসভার ভিতরে এবং বাহিরে বার বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এবিষয়ে জনগণের কোন লাভই হইতেছে না। গত বৎসর যদিও বা সার

বিতরণ ব্যবস্থায় কিছুটা সংশোধনের ইঙ্গিত দেখা গিয়াছিল, এবারকার অবস্থাটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো খারাপ। দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সরকার এ বিষয়ে এখন তৎপর হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতে পারে কি ?"

—স্বাধীনতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক সিদ্ধান্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যাওয়ায় এখানে মহা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পাঁচটি পদের তিনজন পদত্যাগ করিয়াছেন, রেজিষ্ট্রারও পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে চাহিতেছেন না এবং অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কেন এখানে কাজ করা মুস্কিল বলিয়াছেন তার উপযুক্ত অনুসন্ধান এবং প্রতিকার আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ডেমোক্রাসি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই বাতিল করিয়াছেন, বর্দ্ধমান বা কল্যাণীতে তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন নাই। তিন টাকায় গ্রাজুয়েট ভোট কিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা একমাত্র কলিকাতাতেই আসিয়াছে, ফলে একদল ভাগ্যান্বেষী এবং শিক্ষার সহিত সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন। লেখাপড়া এবং গবেষণা রসাতলে গিয়াছে, অর্থলোভ, ক্ষমতালোভ এবং আশ্রিত-বাৎসল্য উহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সাত বৎসরের কাজ তদন্ত করিবার জন্য এবার একটি তদন্ত কমিশন বসিলে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইবে। নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার পদে যাঁহাদের নাম হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ক্ষিতীশচন্দ্র সেন এই দুটি নাম আমরা সমর্থন করি।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

জার বাজার

"প্রতিবারের মত এবারও পূজা আসিতেছে। যত দুঃখকষ্টই থাক না কেন, বৎসরের এই সময়টিতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি উৎসব-মুখর হইয়া উঠে। কয়েকদিনের জন্য হুতশ্বাস ও অশ্রু দমিত হয়। গত বিশ বৎসর ধরিয়া এমন বৎসর মনে পড়ে না, যে-বৎসরে কোনও না কোন দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীকে বিব্রত করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু, ৪২-এর রক্তাক্ত বিপ্লব, ছাত্র-বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, খণ্ড আন্দোলন—ইত্যাদি ঘটনা বাঙ্গালীর বুকে রক্তের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। এ বৎসরও আসিয়াছে আসাম-হাঙ্গামা—নারকীয় তাণ্ডব। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে বিতাড়িত ৫০ লক্ষ বাঙ্গালী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যে লাঞ্ছিত ও ব্যথিত বোধ করিতেছেন। তথাপি পূজা আসিতেছে। সুতরাং পূজার বাজারও সরগরম হইতে সুরু হইয়াছে। বৎসরান্তে এই সময়ে পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজনকে নববেশে সজ্জিত করিতে হয়। ইহা আমাদের উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। যে বাঙ্গালী অর্থাভাবে পুত্রকন্যার জন্য নূতন বস্ত্রাদি কিনিতে না পারে, হতাশ্বাসে তাহার বুক ভরিয়া যায়। কিন্তু দীর্ঘ ১৩ বৎসরের 'সমাজবাদী শাসনের' ফলে অসংখ্য বাঙ্গালীরই এই অবস্থা। ইঁহাদের কথা কে ভাবে ? আমরা আন্তর্জ্জাতিক ভাবাপন্ন। কঙ্গো, কিউবার জন্য মাথা ঘামাই, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর দুঃখে বিগলিত হই কিন্তু নিজ দেশবাসীর দিকে দৃষ্টি দিতে ভুলিয়া যাই। আমাদের এই আত্মভোলা স্বভাবের জন্যই দুঃখকষ্টের সীমা-পরিসীমা নাই। আসামের দাঙ্গার পর আশা করা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালীর চোখ খুলিবে। কিন্তু তাহার লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

স্ত্রী-শিক্ষা

"অধুনা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বাড়িতেছে ইহা একটি শুভ লক্ষণ। এক সময় মেয়েদের শিক্ষিত করা এ দেশের অনেকেই পছন্দ করিতেন না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি লোকের অধিকতর আগ্রহ বাড়িয়াছে। জাতীয় সরকারও স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতির পথে সহায় রহিয়াছেন। তাই বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নারী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষায় গড়িয়া উঠিতে না পারিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারকল্পে ৮ম শ্রেণী পর্যান্ত ছাত্রীদের স্কুলের বেতন মকুব করিয়া দিয়াছেন। ইহা একটি উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি সহরাঞ্চলের জন্য নহে ; পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির জন্য। সহরাঞ্চলের অধিবাসিগণের অধিক সঙ্গতি বা উপার্জ্জন ক্ষমতা নাকি বেশী এবং এই কারণেই সহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সেই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কাঁথি সহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলিও সেই আওতায় পড়িয়াছে। কাঁথি সহরটি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে অবস্থিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি গ্রামাঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই সমূহ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নহে। কোনওরূপে সহরের পাশে থাকিয়া পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা দীক্ষা ও সহরের আব্রু বজায় রাখিয়া চলিয়াছে এবং অধিকাংশ ছাত্রীরাই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে এই সহরের স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে আসে। কিন্তু সরকারী এই বিধানের মূলে উহাদের শিক্ষার পথ কি করিয়া প্রশস্ত হইতে পারে। ঐ সব স্বল্প আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলির ছাত্রীদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ থাকিলেও অর্থাভাবে উহাদের পড়া বন্ধ করিতে হইবে। নচেৎ সুযোগ সুবিধা মত উহারা মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে গিয়া পড়িতে পারে এরূপ সামর্থ্যও অনেকেরই নাই। কাজেই ঐ সব ছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ ছাড়া উপায় কি।"

—নীহার (কাঁথি)।

চরম উপেক্ষা

"ভারতের লোকসভায় আসামের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও বঙ্গাল খেদা বিষয়বস্তুর উপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে—ব্যাধির দাওয়াই হিসাবে প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবে বাঙ্গালীকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিবার পরিবর্ত্তে সর্ত্তসাপেক্ষ চপেটাঘাতই করা হইয়াছে। ধর্ষিত, নিহত, অত্যাচারিত এক ভাষাভাষী মানব সমাজের উপরে চরম উপেক্ষা আর অবহেলাই এ প্রস্তাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ধারণের চরমতম ফল বাঙ্গালী লাভ করিয়াছে। সত্যের বিকৃত রূপের উপর বাহবা তাহার আশাকে

ধূলিস্যাৎ করিয়াছে। ১লা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে সর্ব্ববাদিসম্মত প্রস্তাব যাহা আবেদন-নিবেদনের স্তর ধরিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে অন্ততঃ তাহাই লোকসভার সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাঙ্গালী মানুষের সমবেত জন-প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে প্রথিত আওয়াজ দিল্লীর প্রাকারভেদে অসমর্থ হইয়াছে। কতিপয় লেজুড়বাদী পদপ্রান্তে করজোড়ে বন্দনারত নেতৃত্ব প্রয়াসীর নরম গরম উভয়বিধ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ ও মধ্যপন্থা সবদিকের ঠাট বজায় রাখা প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইয়াছে। সুচতুর দিল্লীর নায়কগণ ঐ পন্থাই সাবাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবটা এইরকম যে, একুল-ওকুল দু'কুলই রক্ষা পাইল। মীরজাফরী চক্রান্তের বনিয়াদ বেশ পাকা করিয়া অলীক ভারত-মাতার বন্দনা চলিবে। হায় বাঙ্গালী, তোমার ভাগ্যাকাশে আজ চরম দুর্দিন! তুমি আজ পরাভূত, ধর্ষিত। নেতৃত্ব তোমার স্বার্থরক্ষায় প্রয়াসী নয়—যারা প্রয়াসী তারা অবহেলিত, উপেক্ষিত কারণ বাঙালী যৌবনকে ডাক দিতে তারাও ভয় পায়।"

—বীরভূমবার্ত্তা।

পূজার বাজার ও ত্রিপুরা সরকার

"পূজার বাজারে বস্ত্রের মূল্য সম্পর্কে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই। সারা ভারতে যে বিষয়ের উপর এত আলোচনা হইয়া গেল, সর্ব্বত্র দর কমাইবার নীতি গ্রহণ করা হইল, আমাদের সরকারের এই বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য আছে কি না তাহাও তাহারা প্রকাশ করেন নাই। সারা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরাও জড়িত। সর্ব্বত্র যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, ত্রিপুরা সরকার তাহা গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? তাহা হইলে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে ত্রিপুরা সরকারের যে বিভাগটির অস্তিত্ব এইসব দেখাশুনার জন্ম রহিয়াছে তাহারা বাহিরের জগতের কোন খবরই রাখেন না? ত্রিপুরারাজ্যেও এতদ্‌সম্পর্কে যে সব আলোচনা হইতেছে, তাহাও তাহাদের কর্ণে গিয়া পৌঁছিতেছে না। এতখানি অথর্ব বা অপদার্থ ভাবিবার কারণ হয়ত হইত যদি মাঝে মাঝে তাহাদের কর্ম্মতৎপরতার আভাষ আমরা না পাইতাম। তাহা দ্বারা ইহাই কি ধারণা করিয়া লইতে হইবে যে তাহারা মতলবমত জাগেন এবং মতলবমত জাগেন না এবং মতলবমত চোখ, কান, বুজিয়া "সোহহম্‌" মন্ত্র জপিতে থাকেন? দুর্গাপূজা উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রই কিছু না কিছু নূতন কাপড় খরিদ করিয়া থাকে, ইহা অনেকটা উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই চল হইয়াছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই পূজার কেনা কাটা শেষ হইয়া যাইবে। প্রতি বছর এই সময়টায় বস্ত্রের মূল্য যেভাবে উর্দ্ধগতি হয় তাহা কি ত্রিপুরা সরকারের বিশেষ বিভাগটি জানেন না? সরকারীভাবে জানার চেষ্টা না হইলে বে-সরকারীভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের কেহ কেহ কি টের পান না? অন্যান্য বৎসর এই সম্পর্কে আলোচনা হইলেও সরকারপক্ষ হইতে হয়ত করণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু এই বৎসর যেখানে দর কমাইবার জন্ম নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেখানেও তাহাদের হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার কারণ কি?" —গণরাজ (আগরতলা)

বাংলা কি এখনও ঘুমাইয়া রবে?

"অসমীয়া বর্ব্বরতা আজ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে বাঙ্গালী তথা বাংলা আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র বাংলা আজ সঙ্কটাপন্ন—সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজ রিক্ততার ও অসহায়তার উপান্তে আসিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিতেছে যেন। প্রবাসে বাঙ্গালী নিধন, বিতাড়ন, স্বদেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অনশন অর্দ্ধাশন ব্যাধি মৃত্যু—চতুর্দিকে যে মহামরণের ছায়া ঘনায়মান! সমগ্র বাঙ্গালীজাতির জীবনে যে একটি অবক্ষয় দেখা দিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজ যেন সুস্পষ্ট। জীবন আর জীবিকার লড়াই এ বিব্রত বিড়ম্বিত বাঙ্গালী আজ নৈরাশ্যের অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এই বিপদের অকূল পাথার হইতে বাংলাকে উদ্ধার করিতে হইলে বাস্তব চেতনা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; নেতৃবৃন্দকে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং দেশাত্মবোধের জাগৃতি যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কী ছিল আর এখন অর্থাৎ পঞ্চাশ পরে বাঙ্গালী কী হইয়াছে? দেশের কল্যাণশ্রী অবলুপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত—এই দুই চিত্র অবলোকন করিলে বার বার মনে প্রশ্ন জাগে বাঙ্গালী কোন্ পথে ছুটিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ কী? তাই বলি জাগো রে বাংলা জাগো, আর ঘুমাইয়ো না।"

—মাভৈঃ (আসানসোল)।

আর ধামা চাপা নয়

"লোকসভায় বিতর্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের কোন প্রান্তেই আসামের ব্যাপারে কাহারও টনক নড়ে নাই। সেদিন খোদ রাজধানী দিল্লীতেই নাগরিকদের এক বিরাট সভায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হইয়াছে। সভার সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ শ্রী এন্‌ সি চট্টোপাধ্যায় দুইটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়াছেন। হয় আসামকে বহুভাষী রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, আর নয় তো গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিপুরাকে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্ব্বাসন পরিষদও এই মর্ম্মেই স্মারকলিপি প্রচার করিয়াছেন। আসামের ব্যাপারটা আর ধামাচাপা দেওয়া চলিবে না—যে কোন একটা বিকল্প ব্যবস্থা মানিতেই হইবে।"

—পল্লীবাসী (কালনা)

শোক-সংবাদ

হিরণ্ময়ী দেবী

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী দেবী গত ১৫ই ভাদ্র ৭৬ বছর বয়সে পাণিত্রাস গ্রামে পরলোকগমন করেছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
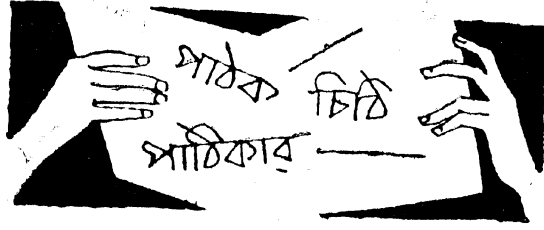
পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন, আমি মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা। আমার ছেলেবেলা থেকে অর্থাৎ আজ প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে থেকে মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পরিচয় আর সেই পরিচয় এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে আমাকে আজ তার একনিষ্ঠ ভক্ত করে তুলেছে। এ কথা আজ বলাই বাহুল্যমাত্র যে সকল দিক দিয়েই মাসিক বসুমতী আজ সর্বভারতীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকার নেতৃস্থানীয়। আজ মাসিক বসুমতীর সমকক্ষ ভারতের মধ্যে কোন পত্র-পত্রিকাই নেই, এ দিক দিয়ে বিচার করলে মাসিক বসুমতী আজ শীর্ষস্থানীয়। মাসিক বসুমতী দীর্ঘকালের পত্রিকা —কিন্তু আপনার সম্পাদনাই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে আপনি যেদিন থেকে মাসিক বসুমতীর ভার গ্রহণ করলেন সেইদিন থেকেই মাসিক বসুমতীর জয়যাত্রা সার্থকতার মুখ দেখতে লাগল আর আজ তো কথাই নেই, আজ তার গতির সঙ্গে পাল্লা রাখা কঠিন। আপনার সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধির মুখ দেখুক —এ শুধু আমার নয়, এ সারা বাঙালী জাতির প্রার্থনা। পাঠক-পাঠিকার মনের কথাটি আপনি যে ভাবে ধরতে পারেন তা ভাবতে সত্যিই বিস্ময় জাগে, এ কথার অর্থ—যেটি আমরা চাই —সেইটিকেই আপনি কোন না কোন সময়ে তুলে ধরেন মাসিক বসুমতীর পাতায়। মাসিক বসুমতী মুক্তহস্তে পাঠকসাধারণের চহিদা মিটিয়ে চলেছে। আপনার প্রবর্তিত বিভিন্ন বিভাগগুলি মাসিক বসুমতীর আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একটি পত্রিকার মধ্যে একসঙ্গে অতগুলি বিভাগের সমাবেশ এবং তাদের সুচারুরূপে সম্পাদনা—এ নিঃসন্দেহে অবর্ণনীয় প্রতিভার পরিচায়ক। আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আচ্ছা! বহুকাল আপনার কোন লেখা মাসিক বসুমতীতে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সেই "রাজায় রাজায়" তো কবে শেষ হয়ে গেছে। চিঠিখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়ল, আপনি কর্মব্যস্ত মানুষ এই চিঠি হয়তো আপনার অনেকখানি মূল্যবান মুহূর্ত কেড়ে নেবে; সে জন্যে মার্জনা চেয়ে রাখছি।—বিনীতা—নন্দিনী সেন, নয়াদিল্লী।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

"মাসিক বসুমতী"র সর্বংসহা বলে একটা প্রসিদ্ধি রয়ে গেছে। খ্যাতি, কি অখ্যাতি—সে প্রশ্ন অবান্তর। ঠিক মনে পড়ে না কেমন করে রটনা হয়েছিল কথাটার। যতোদূর স্মরণে আসে, শ্রীসজনীকান্ত দাসেরই দেওয়া বিশেষণ এটা—শনিবারের চিঠির সেই অগ্নিজ্যোর আর অগ্নিভাষণের যুগের।

অকালে হঠাৎ হোলো দুর্মতি। ধাঁ করে একখানা উপন্যাসই লিখে ফেললাম। যে বয়সে প্রথম সাহিত্য অথবা কাব্যচর্চাটা মানায়, সে সময়টা কেটে গেছে হালে-পানে। আজে বাজে কাজে পরম লগ্ন গেছে বয়ে। বাংলা ভাষার রচনাটা এতদিন ছিল, নিতান্ত অপরিহার্য—আমি ভালো আছি, খোকার জ্বর হইয়াছে—ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মবিশ্লেষণ করেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এ অকাল-বসন্তের সার্থকতা।

আপনাকে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজন উপন্যাসটা বেশ বেয়াড়া ধরণের। বৈজ্ঞানিক উপন্যাস বা "সায়েন্স ফিকশন" আমাদের সাহিত্যে নূতন নয়। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রাজ্ঞের দল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেই এ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ছেলেবেলার শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁদের রচনা আমাদের মনে জাগিয়ে তুলতন নানা রকমের স্বপ্ন। সত্য কথা বলতে গেলে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উঞ্ছবৃত্তিতে আমাদের যুগের অনেককেই প্ররোচিত করেছে এই সব স্বপ্ন।

আজও অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকদের মধ্যে কয়েকজন সে ধারাটা বজায় রেখে চলেছেন। জুলে ভার্ণে আর এইচ, জি, ওয়েলসএর বহু উপন্যাস বার বার অনুবাদ করা হয়েছে বাংলা ভাষায়। তবে দেখা গেছে, এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক গল্পের প্রচার বা চাহিদা সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী পাঠকদের মধ্যে।

'সায়েন্স ফিকশন' এর কটু সমালোচনাও শোনা যায় বিদেশের বাজারে—"Science fiction is that which is neither science nor fiction"। উপন্যাসটা লেখার সময়ে এ সংজ্ঞাটা দুঃস্বপ্নের আবছায়া স্মৃতির মতো জড়িয়ে ছিল আমার চেতনায়। শেষ পর্যন্ত শ্যাম-কুল দুইই বজায় রাখতে পেরেছি কিনা সে বিচারটা ছেড়ে দিলাম আপনাদের ওপরে। আর আপনাদের চালুনীতে ছাঁকাই করে যদি লেখাটা রসোত্তীর্ণ বলে উত্তীর্ণ হয় তবে পাঠক পাঠিকাদের ওপরে।

বলা বাহুল্য, এটা পরিণত বয়স্কদের জন্য লেখা (দয়া করে পরিণত বয়স্কের 'ডেফিনিশন'এর প্রশ্ন তুলে আমাকে আর মুস্কিলে ফেলবেন না) বিশেষ করে দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য। এখানে বিজ্ঞান কথাটার ব্যাপক অর্থটাই ধরে নেওয়া হয়েছে সমাজবিজ্ঞান ও মানববিজ্ঞান—'সোশ্যাল সায়েন্সস' ও 'হিউম্যানিটিজ' অন্তর্ভুক্ত করে।

সমাজবিজ্ঞানের একজন দিকপালের সার্টিফিকেটটাও এখানে জুড়ে দিচ্ছি "হবিবুল্লার মেশিন"-এর সমর্থনে—

"Viewed as literature, science fiction is only, of moderate interest. It is often crudely written lacking in characterization, and without insight

into human emotion and motivation. Viewed sociologically, however, it is of extreme interest. For one may observe in science fiction, almost in the classic form, the interplay which exists between social forces and the emergence and success of a new literary regime."

[Arthur. S. Barron, "Why do scientists read science Fiction ?" Bulletin of Atomic Scientists, February, 1957]

বিজ্ঞানের উপরোক্ত সংজ্ঞা যদি মেনে নেওয়া যায় তবে আপনাদের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সব গল্প-উপন্যাসই-সায়েন্স ফিকশন্। কেন না, মনোবিজ্ঞান অথবা সমাজবিজ্ঞানের কোনও না কোনো মূল সূত্র আবিষ্কার করা যায় প্রতি কাহিনীর মধ্যেই।

তাই ভরসা আমার, হিন্দুর হিন্দুত্ব থেকে সুরু করে পক্ষধর মিশ্রের আধুনিক বিজ্ঞানবার্তার সুদক্ষ বিশ্লেষণ পর্যন্ত নানা শ্রেণীর বিস্তৃত গ্যালারীতে "হবিবুল্লার মেশিন" একেবারে অপাংক্তেয় হবে না।

আরো একটা কথা। পদার্থবিজ্ঞানের গল্প লিখতে বসলে বিজ্ঞানের দুর্বোধ্যশব্দগুলো একেবারে পরিহার করা যায় না। যাঁদের এতে ধৈর্যচ্যুতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের আশ্বাস দেবার জন্ত একথা বলছি, যে যন্ত্রপাতির নাম অথবা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রিনো—নিউক্লীয়ার ম্যাগ্নেটিজম্ ইত্যাদির ব্যাখ্যাগুলো না জানা থাকলেও মূল কাহিনীর রসগ্রহণে কোনো বাধা পড়া উচিত নয়। সব কিছুর বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে "হবিবুল্লার মেশিন" পরিভাষার একখানা অভিধান হয়ে দাঁড়াত। তা ছাড়া পরিভাষার "ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণিকা"র চাইতে ইলেকট্রন যেন সহজ বলে মনে হয় আমার কাছে—সেজন্ত সুবিধামতো মূল শব্দগুলোরই ব্যবহার করেছি। এটা কিন্তু পরিভাষা কমিটির ওপরে কোনো কটাক্ষ নয়, সে কথাটাও জানিয়ে রাখা দরকার।

"বিজ্ঞানভিক্ষু" ছদ্মনামেরও একটা তাৎপর্য আছে সেটা বিদ করবার চেষ্টা করেছি কাহিনীর মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে গ্রন্থকারের কৈফিয়তের মধ্যে। নীতিমূলক বক্তৃতায় যাঁদের আপত্তি এ কাহিনী তাঁদের জন্য নয়। আচ্ছা, তাহলে দেখুন হবিবুল্লার মেশিন চালু করা যায় কি না। ইতি— শ্রীপ্রভাতকুমার ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানভিক্ষু), ই-৩৭ এন সি এল কলনি পুণা ৮।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৬ মাসের জন্ত ৭।৷০ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ সংখ্যা থেকে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত কোরবেন—ভারতী মুখার্জ্জী, পুণা।

আমি আপনার মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। আষাঢ় হইতে নিয়মিত সংখ্যা পাঠাইবেন—শ্রীমতী কল্যাণী গাঙ্গুলী, চাকুলিয়া (সিংভূম) বিহার।

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। আশা করি শ্রাবণ সংখ্যা হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইতে থাকিবেন—মালতীরাণী গাঙ্গুলী, বোম্বাই।

I am sending my yearly subscription from Sraban to Ashar.—Santana Debi, Burdwan.

মাসিক বসুমতীর আগামী এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলাম। —অনীতা গুপ্ত Katni, M. P.

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—শ্রীমতী নির্মলা সাহেলা, Shahdo, M. P.

Remitting herewith Rs 15/- towards my annual subscription for your famous Monthly Basumati. Kindly continue to send the sa.me from Sravan and oblige—Protima Das, Rajkot

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা হিসাবে ১৫৲ টাকা পাঠাইতেছি। ভাদ্র মাস হইতে শুরু করিবেন—S. N, Bhattacharyya, Bongaon, 24-Parganas.

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম। Aloka Sadhu Khan, Calcutta.

Remitting Rs. 7·50 as the subscription of monthly Basumati for further six months from the month of Ashar.—Mrs. Gouri Mazumder, Jamnagar.

Please find herewith the renewal subscription of one year for your most widely read monthly magazine.—Mrs. Sudhira Ghosal, Varanashi.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ মাস হইতে এই চাঁদা চলিবে। আষাঢ় পর্য্যন্ত দেওয়া আছে—কমলা ব্রহ্মচারী, এলাহাবাদ।

Herewith Rs. 15/- towards yearly subscription of your monthly.—Sm. Bela Banerjee, Dhanbad.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ সংখ্যায় আমার গত বৎসরের মূল্য শেষ হইয়াছে। সুতরাং ভাদ্রের সংখ্যা যথাযথ পাঠাইবেন—শ্রীমতী সুমিত্রা মল্লিক, বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। সংখ্যাগুলি নিয়মিত পাঠাইবেন—নীলিমা মুখার্জ্জী, পাটনা।

আগামী শ্রাবণ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিলে অশেষ সুখী হইব। ১৫৲ টাকা বাৎসরিক চাঁদা পাঠাইলাম। —শ্রীমতী নমিতা দত্ত রায়, আসাম।

শ্রাবণ মাস থেকে বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—নিবেদিতা রাহুত, জলপাইগুড়ি।

আগামী ভাদ্র মাস হইতে পুনরায় ১ বৎসরের জন্ত গ্রাহিকা মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী লীলা বসু, ভুসয়াল, মহারাষ্ট্র।

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী বেলা বাগচী, এলাহাবাদ।

(অপ্রকাশিত রেখাচিত্র) জনৈকা বিখ্যাতা সঙ্গীতশিল্পী

—শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

৩৯শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৭] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ, তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা; এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম, শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি এই কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে, অথচ কোন চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরণা—সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরণাই উপত্যকায় যে-সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে। তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি, শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায়, শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে, সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে—ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়, বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই-সব ছোটোদের, এই-সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে, তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নিচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে; তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবিদাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, "হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ—তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।"

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরাজননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া; তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই, হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমীরাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে।" তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলনপিপাসিনীর যে রসব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্তনিঃশ্বাস বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন-সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী, তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ।"

কিন্তু তবুও যে-শরৎ বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে-শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসিমুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনীগানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি, পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া; তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগঙ্গাধর দাস সরস্বতী

বৈষ্ণব সাহিত্যে পূর্ব্বরাগ সাহিত্যের তথা পদাবলীর প্রাণসঞ্চার করে হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি করেছে ;—আর সেখান থেকে বিশুদ্ধ লোহিত স্রোত সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের শিরায়, উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে।....তাই, সেদিন হতেই শ্রীরাধার অন্তরে যেন দাবানল দাহ ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে ! হায় ! আমার একি হল !

শুধু—"কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে ভেল পরমাদ ॥" (বিদ্যাপতি)

আহা কি দেখিনু যমুনার কূলে,—কালো তমালের তলে, শান্তস্রোতা যমুনার তটে, কৃষ্ণকান্তি, চাচর-চিকুর, আয়ত নেত্রের কালো কাজল চাউনি, আর আজানুলম্বিত বাহু,—হাতে তার বাঁশের বাঁশী, মস্তকে বনফুল আর শিখিপুচ্ছ..একে যেন আমি চিনি।—সখি রে। মনে হয় হয়ত বা দুদিন আগে এরই সাথে একই খেলাঘরে খেলায় মত্ত ছিলাম, জানি না,—কি কারণে আজ বিস্মৃতির অতলান্তে,..কভু মনে পড়ে, কভু মনের গহনে চিন্তার জালে স্মরণে আসে না কে সে ! তার সাথে আমার কি বা সম্বন্ধ ! কোন নূতন অনুভূতি নয়, কোন নূতন উপলব্ধি নয়—আমি শুধু নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছি। তাই পূর্ব্বরাগ বলে,—রূপ নয় অরূপের ব্যাখ্যায় সখিগণ লয়ে উন্মনা, আবেগাকুলা, সংশয়চিন্তা, লজ্জাবিনম্রা শ্রীরাধা মত্ত।...সখি রে, মেঘ দেখে এলাম যমুনার কূলে, তার কালোজলে সেই মেঘ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আসন্ন বর্ষণ, কৃষ্ণ মেঘের কোলে যেমন বলাকা-শ্রেণী সারি বেঁধে ধাবিত হয়—বনফুলমালা গলে তেমনিই শোভা পাচ্ছে। আসন্ন বর্ষার ধারা ভূপতিত হচ্ছে—শ্রীরাধা কাঁদছে।

চতুরা অষ্টসখি—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবিকা—প্রায় সকলে রূপে গুণে বিশেষতঃ বয়সে শ্রীরাধার সমান। তাই শ্রীরাধার আসল কথা জানতে পেরেও তারা তামাসায় মত্ত হয়েছে,—বল, বল্ না সখি,—পুবগগনের মেঘের কথা ; আহা দুষ্ট মেঘের বুঝি আর সময় হল না রে ! সখীরা শ্রীরাধাকে ছাড়বে না ;—কি অলক্ষুণে মেঘ যা তাদের শ্রীরাধাকে পেয়ে বসেছে, তার প্রতিকার তারা করবেই —শুধু মেঘের পরিচয় পেলেই হয়। বল না সখী সেই মেঘের কথা ! সখিগণের সহানুভূতিতে দ্রবীভূতা হয়ে শ্রীরাধা তখন বলছে,—

"শুনলো প্রাণের সই মনের কথা তোরে কই
গিয়েছিলাম যমুনারি জলে।
নন্দেরি দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বেরি তলে।
দিয়া হাস্য সুধাচার অঙ্গ ছটা আভা তার
আঁখি-পাখী তাহাতে পড়িল
মন-মৃগ সেই কালে পড়িল রূপের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল।" (শ্যামানন্দ দাস)

অষ্টসখীর মুখের হাসি মনেই রয়ে গেল,—শ্রীরাধার অবস্থা দেখে আর সেই হাসি ওষ্ঠে-অধরে পল্লবিত হল না। তারা বিকারগ্রস্তা শ্রীরাধাকে কত কথায়, কত সান্ত্বনায়, কত বিচিত্র আলোচনায়, অবশ্য সে আলোচনা, সে সান্ত্বনা ও সে কথা ঐ দারুণ আঘাতকারী 'মেঘ'-কেন্দ্রিক,—তবুও তার ঘোর কাটল না। তখন সখিগণ জানাল,—ওরে, তুই বা কেন এত ভেঙ্গে পড়ছিস্ বল ? পবনের অনুকূলে মেঘ ওঠে আবার বিপরীত পবনে সে কেটে যায়। তাই শুধু ক্ষণিকের মেঘ ; ও মেঘ যেমন উদয় হয়েছে, তেমনিই সহসা কেটে যাবে রে, তুই আর কাঁদস্ না।

কিন্তু না—"হেম গৌরী তনু রাই আঁখি দরশন চাই
রোদন করিব অভিলাষ,
জলধর ঢর ঢর অঙ্গ অতি মনোহর
রূপে ভুবন পরকাশ।
সখিগণ চারি পাশে সেবা করে অভিলাষে
সে সেবা পরম সুখ ধরে।"
(নরোত্তম)

শ্রীরাধা কাঁদবেই।—সে নিত্যকে, নিয়ন্তাকে, প্রেম ও প্রেমিককে, প্রাণ ও প্রাণেশ্বরকে, নয়ন ও নয়নমণিকে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষই যুক্ত করেনি—সেখানে জন্ম-জন্মান্তরের একই সত্বার আভাষ পেয়ে হৃদয়-বিনিময় হয়েছে। তাই আজ ব্রজভূমিতে নরলীলায় রাধা ও কৃষ্ণ দুই নর-নারী অভিন্নতার অভাবে বিচলিত। অর্থাৎ শ্রীরাধার এই রোদন বা প্রেমোদ্রেক অভিন্নতা আনয়ন করে, মিলনের সঙ্কেত বা রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার গৌরচন্দ্রিকা এই পূর্ব্বরাগ।—এই

প্রথম দর্শনে শ্রীরাধা-অঙ্গে এবং তার মন-ভূমিতে "প্রীত্যঙ্কুর" উদগম হয়েছে। কাজেই সখীদের কোন সান্ত্বনাই কাজে লাগল না,—যখন তারা শ্রীরাধাকে স্তুতি করছে,—

"বৃন্দাবনেশ্বরি ! বয়োগুণ রূপলীলা
সৌভাগ্য কেলি-করুণা-জলধে অবধেহি।"...

কিন্তু শ্রীরাধার এখন কোন স্তুতি, কোন সান্ত্বনা শুনবার মত অবস্থা নয়। ওরে সখি, তোরা আবার আমায় সেইখানে নিয়ে চল,...পূর্ব্বরাগের মেঘ জমাট বেঁধে শ্রীরাধার অন্তরাকাশে অনুরাগের বর্ষণধারা সঞ্চিত হয়েছে। তাই কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় করে সখিদের পায়ে ধরে বলছে,—ওরে, তোরা আমাকে বাঁচা ; আর একটিবার সেইখানে চল, যেখানে মেঘ উঠেছে। সে মেঘের রূপ বর্ণনায় তোদের আমি বুঝাতে পারবো না, সে শুধু আমার নয়নের জলে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, চল, চল্ তাকে আবার দেখতে চল্।... পূর্ব্বরাগ বিরহে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

কিন্তু এতে সখীদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। তারা বার বার বলছে, নারে সখি, তুই ভুল করিস্ না ;—

"তুঁহু গুণ মঞ্জরী রূপে গুণে আগরী
মধুর মাধুরী গুণ ধামা।
ব্রজ নব যুবদ্বন্দ প্রেম সেবা অনুবন্ধ
ঐছে বরণ তনু শ্যামা।"...

[শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিজকৃত প্রার্থনা]

শ্রীরাধাকে অষ্টসখি গর্ব্বিত করে তুলছে, তারা তাকে উদ্বুদ্ধ করছে, ওরে,—তোরই বা রূপ কম কি, গুণ তোরই বা কম কিসের ? তোর জন্যেও সে চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, তুই থাম্ থাম্—ব্যস্ত হোস না।

সত্যিই শ্রীকৃষ্ণচিত্তও বিকল হয়েছে,—শ্রীরাধাকে দেখে তার চঞ্চলচিত্তে যেন সব কিছুরই অভাব জেগে গিয়েছে—তার মদন-জ্বালা বেড়ে গিয়েছে,—

"ধনী অলপ বয়স বালা
জনু গাঁথহি পুহপ-মালা
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা।"

(বিদ্যাপতি)

তাই, শ্রীরাধাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণেরও মনে অনুরাগের মেঘ এসে জুড়ে বসল। তার আঁখি-পাখি—

"ধাওল দুহু লোচন রে যতহি গেলি বরনারী।"

(বিদ্যাপতি)

শ্রীরাধা যতদূর গেল, সেই পথে তার দৃষ্টিও ছুটল। না ছুটে পারে না।....সখিরা পরস্পরের এই প্রেমোদ্রেক জেনেই বলেছে, ওরে সখি তুই কাঁদিস না। সেই, সেই-ই আসবে।

কিন্তু লজ্জিত শ্রীরাধা পরমপ্রভু, হৃদয়েশ্বরকে ছোট করতে তো চাই-ই না, উপরন্তু একথা শুনে মহাপাতকী হবে বলে সখীদের কাছে জানাল,—ওরে, তোরাও কি আমার মত বিকারগ্রস্ত হয়ে ভুল কথা বলছিস্ ? তোরা কি জানিস না,—

"কো বাধম ওদাত্তমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্য্যাৎ।"

কে সে অধম আছে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তজনোচিত প্রেম সেবা না করিবে ? তাই সখি তোরা কার কাছে আমার রূপের গরব করছিস ?

তখন অষ্টসখি আবার শ্রীরাধাকে রাগাত্মিকার তত্ত্ব দিয়ে বুঝাল।—না সখি আমরা ভুল করিনি, তোর মনে প্রেমভক্তি সঞ্চার হয়েছে আর সেই হেতুই তোর ক্ষণে ক্ষণে ত্রাস,—কেন তুই কি জানিস না ?—

"ভক্তৌ খলু ভগবান স্বয়মেব বশীভূতঃ তিষ্ঠতি,
তামরস-কোষে মধুপ ইব, রসিক যুবত্যামিতি।"

ওরে আবেগমনা, সংশয়াকুলা—তবে শোন, যেমন মৌচাকে গন্ধ পেয়ে দিগন্ত হতে মৌমাছি ছুটে আসে, তেমনি ভক্তির সুগন্ধ ও আস্বাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আসবে। তুই কি জানিস না,—"প্রেমে কৃষ্ণ হয় বশ।"

শ্রীরাধা তবু তাদের কথা শুনবে না—

"কহহিমো সখি কহহিমো কতয়ে তা হেরি বাসা,
দূরহ দুগুণ এড়িমো আবয়ো পুনু দরশন আশা।"

(বিদ্যাপতি)

সখি তোরা আমাকে বল, দূরত্ব দ্বিগুণ হলেও আমি তাকে দেখতে যাবো—যাকে দেখে আমার নয়ন, মনপ্রাণ, জীবন যৌবন চির ধন্য হবে। বল তোরা—সে কোথায় থাকে ?

কিন্তু না, যখন সখীরা তার কথায় রাজী হল না, তখন উপারান্তর না দেখে,—

"বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।"

(চণ্ডীদাস)

তখন শ্রীরাধার—"দিবা নিশি দিশি দিশি কালা মনে পড়ে।" তখন সখীরা চিন্তায় অধীর হয়ে উঠল। তারা শ্রীরাধাকে তিরস্কার করে বলল,—আচ্ছা বলত দেখি,—তুই যে এমন করছিস তা তোর শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের আঁচলে সর্ব্বদা বাঁধা থাকবে, না রে ? তোর প্রয়োজন মত আমরা তোকে দেবো।

উত্তরে শ্রীরাধা জানাল,—সখী, রাখ তোদের গরব। তোদের ভরসা আমি করি না। কালাকে আমিই বেঁধে রেখেছি,

—"কালা সে কেশ কালা সে বেশ
লোটন বাঁধিয়া রাখি,
যখন কালারে পড়য়ে মনে
আউলিয়া তাহা দেখি।" (চণ্ডীদাস)

কালা আমার চুলের খোপায়। যখন কালা দরশন তরে চিত্ত চঞ্চল হয়, তখন চিকন-কালো চুলের গোছা বুকে আঁকড়ে কাঁদি। এই তো আমার কালা। আমার জন্ম জন্মান্তরের তপস্যায় কালো চুলেই কালাকে দেখি। আর সেই রূপ-সাগরে, নয়নের স্রোতে মন প্রাণ অঙ্গ ভাসিয়ে দিয়ে কোন বিনির্মুক্ত মহাসমুদ্রে শান্তির তরঙ্গোল্লাসে নৃত্য করি। তাই-কালার জ্বালা আমিই বেঁধে রেখেছি।

এমত অবস্থায় ব্রজভূমিতে ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধার গোপন কৃষ্ণ-প্রেমের সমালোচনা সুরু হয়েছে। তাই আবার সখিরা তাকে নিবৃত্ত হতে বলছে। কিন্তু দুষ্ট বাঁশী যে "রাধা রাধা" ছাড়া বাজে না। সুর নয় ত প্রাণের ডাক ; প্রেমমিলনের ইঙ্গিত। তাই ব্রজনারীদের অপবাদে সে নিরস্ত হতে পারবে না। কারণ আত্মাকে বাদ দিয়ে যেমন সজীব দেহ নয়, তেমনি প্রাণেশ্বরকে বাদ দিয়ে

[ল]শও থাকে না। শ্রীরাধা কুল, লাজ ভয় ত্যাগ করেছে এক কৃষ্ণ [লা]গি—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (গীতা) তাই [তি]নি অপবাদের কাছে লজ্জিত নয়, কলঙ্কের ভয়েও ভীত নয়। বরং [সখী]দেরকে শ্রীরাধা পাল্টা উপদেশ দিয়েছে—

"তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি।"—আর আমি স্রোতবিথার [মাঝে] এ তনু ভাসায়েছি কি করিবে কুলের কুকুরে?—তাই সখি তোরা [আমা]কে বিরত হতে বলিস না। আমাকে কাঁদতে দে, পথ ছেড়ে দে, [কু]লের বাঁধনে আমাকে বাঁধতে চাসনা; আমার কুল নেই, কলঙ্কেরও [ভ]য় নেই। "কৃষ্ণকলঙ্কী"—এই আমার সারাজীবনের, জন্মজন্মান্তরের, [যু]গযুগান্তরের নারীধর্ম্মের, প্রেমের পরমতৃপ্তি ও অবিনশ্বর [শা]ন্তি।

"আমি কৃষ্ণ-পদ-দাসী তেঁহো সুখ রসরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ,
কি বা না দেন দরশন জারে আমার তনুমন
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ।

তাই কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীর জন্যই—"বাঁশীতে বলে রাধা রাধা।" আর এই উদ্দাম উত্তরোল ডাক শুনেই—শ্রীরাধার অভিসার শুরু হয়।—কিন্তু অভিসারের বিভিন্ন বাধাকে অতিক্রম করে দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে চলেছে।—'দিবাভিসার',—দিনের বেলা শ্রীরাধার বুঝি মিলন সম্ভব হল না। রাত্রি এল,—আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র, তাই জ্যোৎস্নার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নিতে পারল না—তাই 'জ্যোৎস্নাভিসার'ও ব্যর্থ হ'ল।—এল তিমির,—এই তিমিরে গৌরাঙ্গী রাধা নিজেকে পরিধানের বস্ত্র দিয়ে লুক্কায়িত করল বটে,—কিন্তু তার আরও কত বাধা। হায়রে প্রেম! প্রেমের পথে লক্ষ বাধা—এই বাধাকে অতিক্রম করে তাকে পাড়ি দিতে হবে—প্রেম-রস-সিন্ধু সাগরে, তবেই তার কৃষ্ণ-পূজা সার্থক হবে আর সার্থক হবে মিলন। তাই এই অন্ধকারেও পা ঢাকা দিয়ে তার পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই,—পায়ের নূপুর, তারাও তাকে বাধা দেবে। শ্রীরাধা পায়ের নূপুরকে বুঝিয়ে বলল,—ওরে আমার প্রিয়সঙ্গী, প্রিয় আভরণ, ওরে নূপুর,—তোরা আমায় ক্ষণিকের তরে ছেড়ে দে;—তখন শ্রীরাধা—

"মঞ্জীর মুক্ত চরণাব্জ বিধায় দেবী।
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যো।

অথবা—"গীতগোবিন্দে"—"মুখরং মধুরং ত্যজ মঞ্জীরম্—নীলয় নীলনিচোলম্।" নূপুর যুগলকে খুলে, নীল আঁচলে শ্রীসুন্দর লাবণ্য বিচ্ছুরিত মুখমণ্ডলকে আবৃত করে শ্রীরাধা 'তিমিরাভিসারে' চলল। আবার কখনও অভিসারিণী রাত্রি জাগরণে চিন্তায় নিমগ্না থাকতো—'বর্ষাভিসারে।'..আকাশে মেঘ, চপলা কিশোরী সমা অহরহ বিদ্যুল্লতার হাসি, আর ঝর ঝর বরষা,—এমত সময় তার বাঞ্ছিতের শুভ আগমনে আনন্দেও আতঙ্কে শিহরি উঠতো,—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলে বাটে,
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ কাটে।"
(চণ্ডীদাস)

এ ছাড়াও 'গ্রীষ্মাভিসারে' শ্রীরাধা কি দারুণই না যন্ত্রণা, জ্বালা ভোগ করতো, কবি চণ্ডীদাস সে কথাও বলেছেন—

"একে বিরহানল দহই কলেবর তাহে পুনঃ তপন কি তাপ।
ষামি গলয়ে তনু নুনীক পুত্তলী জনু হেরি সখী করু পরিতাপ।"

অবশেষে—বিভিন্ন অভিসারের বাধাকে একে একে অতিক্রম করে সৌভাগ্যশীলা প্রেমাস্পদা শ্রীরাধার দুর্নিবার প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পিত হল।—তাই বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস গাইলেন—

"ঐ ছলে মিলল নাগর পাশ,
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ।"

কিন্তু আবার কি হল! দুঃখের অতল সাগরে নিমজ্জিত করে ব্রজভূমিতে কান্নার রোল উঠল—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রস্থানে। এখন শ্রীরাধার পরিণতি কি হল!—সখী আমার একি হলরে?

"সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বঁধুয়ার সনে,
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে।" [চণ্ডীদাস]

বল্ সখি, তোরা বল—আমায়—

"হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।"—কেন এমন হলরে?

অষ্ট সখিরা শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—কেন রে অবোধ তুই কি জানিস না,—

"সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।" (চণ্ডীদাস)

অতএব—এখন বিলাপ, রোদন আর বিরহ আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! কিন্তু শ্রীরাধার এই প্রেম-বিরহের আগুন—যেন তপস্বিনীর ধ্যানের আসনের চারিপাশে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। এই অগ্নিকুণ্ডেই তার সাধনার পূর্ণাহুতি দিয়ে নিজের অভীষ্টকে লাভ করবে। তাই এই বিরহের আগুনে পুড়েও, ব্রজভূমি বিচলিত হ'লেও শ্রীরাধাতে শ্রীকৃষ্ণের অভাব হয়নি।

বিরহানলে জর জর শ্রীরাধা—চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্বেগ, তনুতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু ইত্যাদি দশম অবস্থার মধ্যে আবর্ত্তিত হয়েও বলেছে—না, না, আমার প্রাণনাথ মথুরায় যায়নি, যাবে না। ওরে সখীরা, তোরাই আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিস—শুধু সে চলে গেছে এই কথা বার বার শুনিয়ে;—আমি জানি,—

"বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য সঃ কচিন্নৈব গচ্ছতি।" আর সে যাবেই বা কি করে বল,—

"তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে;
এবুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে।"

তাই পলায়নের কোন পথ নেই। ব্রজনারীর রাগানুরাগের সুদৃঢ় আবরণে তাঁর পথ চিররুদ্ধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে সেই কথাই বলেছেন,—

"ব্রজছাড়া কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে।"

প্রেমতত্ত্ব

সুধাংশু চৌধুরী

অন্তরে অনন্তসৌন্দর্যের মধুরতা নিয়ে প্রেম মানুষের প্রত্যন্তের অপ্রেমিক মানুষটিকে প্রেমিক করে তোলে। বসন্ত-স্পর্শে ঝরাপাতার বুকে যেমন জাগে নবজন্মের শাশ্বত সুষমা, তেমনি যৌবনের উপবনেও নবজন্মের শাশ্বত সুষমা নিয়ে আসে মধু বসন্ত। সে বসন্ত-স্পর্শ হৃদয়-আনন্দলোকের সুপ্ত বনাংকুরে বহে আনে চিরানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ফল্গুপ্রবাহ। মুকুল থেকে পূর্ণ বিকাশের আনন্দে ফুল যেমন অনন্তসৃষ্টির অমরাবতীতে তার পবিত্র সুরভির দ্বার খুলে দেয়, প্রেমও জীবনোদ্যানের বুকে প্রস্ফুটিত হোয়ে তার সুরভির স্পর্শে অন্তরের সুপ্ত প্রেমময় মানুষটিকে জাগ্রত করে তোলে। তখন 'The roses of love glad the garden of life'—প্রেমের পুষ্পমঞ্জরী যৌবনের উপবনকে করে তোলে আনন্দময়। তখন সৌন্দর্য-বোধশক্তি জাগে, মানুষ হোয়ে ওঠে তখন সুন্দরের উপাসক—হোয়ে ওঠে প্রেমিক। মন হয় কোমল। নির্জীব হোয়ে ওঠে সজীব। অকবি হোয়ে ওঠে কবি। সুরা হোয়ে ওঠে সুর। সে মিলনমধুর সুর মূর্চ্ছনায় গোধূলীর সোনাঝরা সন্ধ্যায় মন চায় মানস-সায়রে ভাসিয়ে দিতে জীবনের আশা-আনন্দের মূর্ত প্রতীক সে ছোট্ট ভেলাখানিকে। যে ভেলা সুরেলা প্রেমের বার্তাকে বহন করে ভেসে যাবে আনন্দের অমরাবতীতে—চিরবসন্তের স্বপ্নকুঞ্জে—কোন নাম-না-জানা মানসীর মানস-কুঞ্জে।

প্রেম সুন্দর। তাই প্রেমের দিব্যদৃষ্টির কাছে সৃষ্টি মধুর—সৃষ্টি সুন্দর। অন্তরে প্রেমের রঙ লাগে, সে রঙে পৃথিবী হোয়ে ওঠে রঙিন। তখন সুন্দর আর অসুন্দরের মধ্যে থাকে না কোন বিভেদ। প্রেমের দৃষ্টিতে সব কিছুই সুন্দর, তাই প্রেম সুন্দর।

প্রেম পবিত্র। প্রেমের পবিত্র স্পর্শে অন্তরে জাগে পবিত্র ভাবধারা। প্রেম সমস্ত বাসনা-কামনার ঊর্ধে, তাই বাসনার রঙে রাঙিয়ে তাকে অপবিত্র করা যায় না। প্রেম কলনিনাদিনী ভাগীরথীর মতোই পবিত্র। সাত্বিক এবং শাশ্বত প্রেমের কাছে কোন অপবিত্রতার স্থান নেই, তাই প্রেম পবিত্র।

প্রেম অন্তর্যামী, 'Love's a stranger to the breast' কিন্তু অনুভূতির মধ্যে দিয়ে তাকে অনুভব করা যায়। তার গন্ধকে অনুভব করা যায়। তাই কবিগুরু বলেছেন,—

> ...প্রেম অন্তর্যামী।
> বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
> গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?

কিন্তু প্রেমকে আমরা দেখতে পাইনা, 'গোপনে থাকে প্রেম, যায় না সে দেখা।' তাই তাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, তাই প্রেম অন্তর্যামী।

লজ্জায় প্রেম সুন্দর। 'লাজরক্ত হইল কন্যা পরথম যৌবনে'—লজ্জায় প্রেমের ক্রমবিকাশ। লাজরক্ত প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। যে লজ্জাশীলা তাহাকে বুক চিরিয়া রাখিতে পারি...প্রেম পুরাতন হয় না। লজ্জানম্র দেখিলেই সে প্রেম নবীন হইয়া উঠে। (উদ্ভ্রান্ত-প্রেম)

কবিগুরু তাঁর 'লজ্জা' কবিতায় তাঁর মানসীর প্রেমকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন,—

> আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান
> কেবল শরমখানি রেখেছি।
> চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
> সযতনে আপনারে ঢেকেছি।
>
> * * *
>
> বসন্ত নিশীথে বঁধু লহো গন্ধ, লহো মধু,
> সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
> দিয়ো দোল আশে-পাশে কোয়ো কথা মৃদুভাষে
> শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।
>
> * * *
>
> শুন বঁধু শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
> কেবল শরম থাক্ আমারি।

প্রেয়সীর মুখ দিয়ে লজ্জার যে প্রকাশ, এ প্রকাশে প্রেম আরো সুন্দর—আরো মধুর—আরো স্বর্গীয়।

এই যে স্বর্গীয় প্রেম, এ প্রেমকে বিস্মরণের পর্দা দিয়ে কোনদিন ঢেকে রাখা যায় না। সুখদুঃখ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নানাভাবে কেটে যায় জীবনের মুহূর্তগুলো। জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনা বিস্মরণের অতলতলে তলিয়ে যায় কিন্তু জীবনে প্রথম-আসা প্রেমের স্মৃতিকে কোনদিন ভুলতে পারা যায় না। তাই বাইরণ বলেছেন,—

> When age chills the blood,
> When our pleasures are past,
> For years fleet away with the wings of the dove,
> The dearest remembrance of will still be the last,
> Our sweetest memorial the first kiss of love,
> (The first kiss of love)

কবি এখানে বলছেন, যখন আমাদের রক্তপ্রবাহ হোয়ে আসবে শীতল, নিভে যাবে আসক্তির আলাময় বাহ্নশিখা, আর জীবনের মুহূর্তগুলো পাখীর ডানায় ভর দিয়ে যাবে উড়ে, তখনো আমাদের অন্তরের প্রত্যন্তে প্রথম প্রেমের সে মধুময় স্মৃতি অম্লান এবং অবিস্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

একথা আবার আমরা উদ্ভ্রান্ত প্রেমের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকেও শুনতে পাই—এতোদিন যে দেখি নাই, তবুও—

> 'সে চাঁদমুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে।'

তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রেম যেমন অমর, তার স্মৃতিও তেমনি অমর। অন্তরের প্রত্যন্তে সে স্মৃতি অমর হোয়ে থাকে।

অপরিচিতির ভেতর দিয়ে পরিচিতির যে চিরন্তন প্রবাহ, সে প্রবাহের পথ-রেখা ধরেই প্রেম আসে আমাদের জীবনে। সে দুটি মন একত্বের মূর্চ্ছনায় মুখর ও মধুর হোয়ে ওঠে—চাওয়া ও পাওয়ার কামনায় রাঙিয়ে তোলে মনের আকাশকে—মুখের ভাষা হারিয়ে যখন চোখের ভাষায় উঠে আসে প্রেমের মৌন-মুখরতা, সে সময়

যদি দুটি মনের মধ্যে আসে বিচ্ছেদ তখন প্রেমকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিরহে প্রেম সুন্দর। কারণ—

'ব্যর্থ সে মিলন সুর—মূর্চ্ছনাটি তার
বিশ্বে তবু জাগি রবে বহি স্মৃতি ভার।
('অকথিত'—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

সে স্মৃতিভার প্রেমের বিরহব্যথায় পূর্ণ থাকে, তাই সে স্মৃতির মূর্চ্ছনা অবিস্মরণীয় হোয়ে থাকে। বিরহের মধ্যে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে যে অনুরাগ, যে অন্তর্দাহ, যে শূন্যতা, যে বিরহাকৃতি, যে ব্যাকুলতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়, তাতে প্রেমের গভীরতার দিকে আরো এগিয়ে যাওয়া যায়। বিরহের যাতনায় ব্যাকুল কোন একজন উর্দু কবির মনের ব্যথাকে এখানে তুলে ধরছি—

"দিদার বাদা হসৃনা সাকী
নিগাহ হে মস্ত!
বাজমে খেয়াল ম্যয় কাদহ
এবে খবোশ হ্যায়।"

প্রিয়াকে কাছে পাবার জন্য মদের নেশার মতো ঘিরে ধরেছে কবির মনকে। কিন্তু যখনি তিনি ভাবেন তাঁর প্রিয়াকে তিনি আর কোনদিনই পাবেন না—সে অধরা, তখন তিনি ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তখন তিনি তার মমতায় ভরা প্রাণের তারাটিকে খুঁজে ফেরেন লক্ষ লক্ষ তারার মধ্যে—

মিলেই চরখ মে হবু আখতার
আগর দিল হায় তো কেয়া
একদিল হোতা যো দরদ সা
কাবিল হো তা।' (উর্দু শের)

কারণ, এ নিষ্ঠুর আকাশের বুকে লক্ষ লক্ষ তারা আছে, কবির কাছে তারা নিষ্ঠুর হৃদয়। তিনি তো সেগুলোকে চান না, তিনি চান তাঁর মনের তারাটিকে। সে তারাটি মমতায় ভরা—যে তারাটিকে তিনি ভালোবাসেন।

সে মমতায় ভরা তারাটি তাঁর কাছে অনন্যা এবং অসাধারণ। কারণ প্রেমের দৃষ্টিতে রূপের প্রয়োজন নেই। সেখানে প্রাণের আকর্ষণই বড়ো। তাই প্রেমিকের দৃষ্টিতে প্রেয়সী বাহ্যিক রূপহীনা হলেও সে সুন্দরী—সে মধুর। তাই লক্ষ লক্ষ হৃদয় যতই মাধুর্যময় হোক না কেন, কবির মানসীর কাছে তারা যে সুন্দর নয়। এই বিচ্ছেদের মধ্যে প্রেম পবিত্র—প্রেম অন্তরতম। তাই প্রেমে বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন। কারণ, 'বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না'। প্রেমে সুখও আছে দুঃখও আছে। তাই কবিগুরু বলেছেন—

...হৃদয়ের প্রেম
সুখদুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার
চিরদৈন্য চিরপূর্ণ হেম। (দুর্বোধ)

দুঃখ বেদনা ছাড়া প্রেম হয় না। তার ইংগিত আমরা বাইরণের মধ্যেও পাই—

Ah ! Love was never yet without
The pang the agony, the doubt
Which rends my heart with ceaseless sigh
While day and night roll darkling by,
(Translation of a romaic love song)

টেনিসনের মধ্যেও অনুরূপ শুনতে পাই—

Love is hurt with jar and fret,
Love is made a vague regreat,
(The Miller's daughter)

তাই সহজেই বলা যায়, প্রেম দুর্লভ বস্তু। তাকে পেতে হলে দুঃখ-যাতনা, সন্দেহ মৃত্যুযাতনা ও বক্ষ বিদীর্ণ করা অন্তরের শত শত দীর্ঘশ্বাসকে দিনের পর দিন সয়ে যেতে হয়। এই দুঃখসমুদ্র মন্থন করে যে অনন্ত বস্তুকে লাভ করা যায় তাই হলো 'প্রেম'।

কিন্তু এই প্রেম গোটা একটা মানুষকে ছন্নছাড়া করে দেয়—আবার গৌরবের আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পার্বতীর বিরহে দেবদাস হয়েছিল ছন্নছাড়া আর শৈবলিনীর বিরহে প্রতাপ হোয়ে উঠেছিল বীর্যশালী। তাই প্রেমের মধ্যে সুখও আছে, দুঃখও আছে। শান্তিও আছে, অশান্তিও আছে। আবার চিরবিচ্ছেদে প্রেমের অনুভূতির মধ্যে যেমন আছে হাহাকার, তেমন আছে মনকে উচ্চতর আদর্শের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা। কাজি নজরুলের 'ব্যথার দান' আর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' যেমন আছে হাহাকার, তেমন আছে মানসীর 'প্রেমকে পবিত্র' এবং শাশ্বত বলে অনুভব করার বাণী। তবুও উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের লেখককে অন্তিমবড়ো প্রেমের মধ্যে যে মর্মদাহী জ্বালা আছে, সে জ্বালা তাঁর প্রেমিক মনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। সেইজন্যই হয়তো তিনি বলেছেন—

'অব বিষ সম লাগয়ে মোই।
হরি হরি! পিরীতি না করে জনি কোই।'

এই যে আঘাত, এ আঘাতে প্রেমকে আরও মহৎ করে তোলে। 'আঘাতে আঘাত করে মহৎ উদ্ধার'। প্রেমে আঘাত আছে, প্রত্যাঘাত নেই। প্রেম যেখানে সত্য সেখানে কোন প্রত্যাঘাতই আসতে পারে না। তাই বাইরণের বিচ্ছেদ-বিধুর মন প্রিয়াকে আঘাত দিতে পারেনি। ভগবানের কাছে তার সুখই কামনা করেছেন—

Alas ! again no more we meet,
No more our former looks repeat ;
Then let me breathe this parting prayer,
The dictate of my bosom's care ;
May Heaven do guarde my lovely Quaker,
That anguish never can o'ertake her ;
That peace and virtue ne'er forsake her,
But bliss be aye her hearts partaker !
(To a beautiful Quaker)

হায়! যদিও কবির সংগে তাঁর মানসীর আর দেখা হবে না—হবে না চোখে চোখে সে মধু-মিলন, তবুও তিনি মনে প্রাণে ভগবানের কাছে তাঁর মানসীর সুখ কামনা করেন, ভগবান তুমি তাকে রক্ষা কোরো—দুঃখযাতনা ও মনস্তাপ যেন তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে না পারে—শান্তি এবং ধর্ম যেন তাকে কোনদিন ছেড়ে না যায়—নিয়ত যেন তোমার আশীর্বাদ তার অন্তরকে ঘিরে রাখে।

তাই বলেছি প্রেম যেখানে সত্য সেখানে প্রত্যাঘাত নেই। একজন অসুখী হোয়েও আর একজনকে সুখী করবার জন্য যে দুর্বার কামনা সেখানে প্রেম সত্য। ভালোবাসা সাত্ত্বিক।

প্রেম অতন্দ্রস্পর্শী এবং পবিত্র। সে পবিত্র প্রেমকে বাসনার স্পর্শে কলুষিত করবার অধিকার কারো নেই। তাই কবিগুরু বলেছেন—

জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লহ তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী
চেওনা তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্ম মানবের। (নিষ্ফল কামনা)

সুতরাং বাসনার বহ্নি নিভিয়ে আমাদের অন্তরের প্রেমকে অন্তরে রেখে তার পবিত্রতাকে আমরা মহীয়ান করবো। সে প্রত্যন্তের লুকানো প্রেম হবে পবিত্র।

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয় তলে মাণিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় তারে কলঙ্কের মতো।
('ব্যক্তপ্রেম'—রবীন্দ্রনাথঠাকুর)

সেজন্তই হয়তো কবিগুরু তাঁর 'শেষের কবিতা'র নায়ক-নায়িকাকে প্রেমের বন্ধনে বন্দী করে বাসনার বন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কারণ বাসনাটাই বড়ো নয়। 'মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টেনে রাখে না, দূরেও সরিয়ে দেয়।'

প্রেম স্বর্গীয়। সে স্বর্গীয় প্রেমের কাছে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও মাথা নোয়াতে হয়েছিল। রাধার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণোমদনকদনারুণো
হরতু তদুপাহিত—বিকারম্।
(গীতগোবিন্দম্, দশমঃ সর্গঃ, গীতম্।১১।)

'হে রাধে, কামবিষ বিনাশক তোমার ঐ মনোহর পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। আমার অন্তর দারুণ মদনারুণে জ্বলিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সে বিকার দূরীভূত হউক।'

এই তো গেল প্রেমের বাসনাহীন স্বর্গীয় ভূমিকা, কিন্তু বাস্তব জগতে শেলী মিলন পিয়াসী। প্রিয়াকে কাছে পাবার যে দুর্নিবার বাসনা তা ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে—

The fountains mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion ;
Nothing in the world is single,
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle
Why not I with thine ?

নির্ঝর মিশে তটিনীর সাথে তটিনী মিশিছে সাগর জল
লহরীর পর লহরী তুলিয়া পবন মিশিছে গগন তল
একটির সাথে আরটি মিলিবে জগতে কেহই রবে না একা
তুমি আমি সাকী কেন না মিলিব এবে বিধাতার বিধিতে লেখা?

তাই—

What is all this sweet work worth—
If thou kiss not me ? (Love's Philosophy)

মিছে এতো হাসি, মিছে এতো গান, মিছে এতো আলো ভুবন ভরে,
তুমি যদি প্রিয়ে নাহি দাও চুমা বারেক এ মোর কপোল 'পরে?

তাঁর মতো আমরাও বাস্তববাদী। কারণ, প্রেম যে স্বর্গীয়, সে স্বর্গের অমরাবতী তো আমাদের এই মর্ত্যের বুকেও আছে—

Some portion of paradise still is on earth,
And Eden revives in the first kiss of love.

এবং এখানেই তো রয়েছে ইডেন, যেখানে আদম আর ঈভের মিলনে সৃষ্টির বুকে নবজন্মের স্বাক্ষর বহন করে এনেছিল।

যেদিন পৃথিবীতে প্রেম বলতে কিছু ছিল না, ছিল না বাসনার বহ্নি জ্বালা, সেদিন তো সৃষ্টির উৎসও ছিল না। আর যেদিন সৃষ্টির উৎস নিয়ে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আদম আর প্রথম নারী ঈভের মধ্যে মিলন হলো, সে মিলনে ছিল প্রথম প্রেম, প্রথম লজ্জা, প্রথম অনুরাগ, প্রথম শিহরণ, প্রথম সুখানুভূতি—আর ছিল প্রথম কামনার সৃজনশীল আলিংগন। সে আলিংগনে ইডেনের স্বপ্নকুঞ্জে হয়তো মধুরাতি যাপন করলো পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ও নারী। তখন পুরুষ ও প্রকৃতির চোখে সুন্দর বলে মনে হলো পৃথিবীকে। মধুর বলে মনে হলো পৃথিবীকে।

প্রেমহীন পৃথিবী নীরস। বাসনা না থাকলে সৃষ্টি হতো না। তাই আমাদের জীবনে প্রেমেরও প্রয়োজন, বাসনারও প্রয়োজন। ফুলেরও প্রয়োজন, তার সুরভিরও প্রয়োজন। ফুলকে বাসনার রঙে রাঙিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরবো আর তার সুরভিকে রাখবো দেবতার চরণে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য—পূজো করবার জন্য। তাই মানসীকে বলবো—

এসো থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্য ভার।

তারপর একদিন ঝরে যাবে বাসনার ফুল—মিশে যাবে পৃথিবীর ধূলো-কাদায়। তারপর বাকি থাকবে সে সুরভি, তারপর বাকি থাকবে বাসনা-কামনার ঊর্দ্ধে যে অমর—চিরন্তন প্রেম, সে প্রেমকে সংগে নিয়ে অন্তহীন অনন্তের পদপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবো আর বলবো—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ-বিধুর নয়ন-সলিলে, মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।
আজি সেই চির-দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হোয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রীতি—
একটি প্রাণের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি—
সকল কালের সকল কবির গীতি।

—মধুরেব—

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের মাতৃভূমি শৃংখলিতা। মা যেখানে বন্দিনী, ছেলে-মেয়েদের জীবন যে সেখানে দুর্বিষহ, স্বাধীনচেতা মানুষমাত্রকেই সে-কথা ব'লে জানাবার দরকার হয় না। তেমনি এক দিনে জানা গেল যে, একজন শিক্ষাব্রতী, কলকাতার একজন অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার (স্বাধীন ভারতে বর্তমানের লোকসভা) সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন আরো অনেকের সঙ্গে। অধ্যাপক তখন তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাইরেও নামী-লোক ব'লে পরিচিত হ'তে শুরু করলেও, পরবর্তীকালের জনবরেণ্য দানবীর ব'লে তখনো সর্বজনপরিজ্ঞাত নন। গুণীকে চেনবার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বঙ্গগৌরব আশুতোষ। তিনি ঐ অধ্যাপককে করতেন স্নেহ এবং দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর যোগ্য সমাদর। এর পর অধ্যাপক Constituent Assemblyতেও (অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা) যখন নির্বাচিত হলেন, তার আগের একদিনের ঘটনা—যেদিন আমাদের বর্তমান সহঃ রাষ্ট্রপতি তৎকালীন আমাদের বাণীমাতৃকার অধ্যাপক দর্শনাচার্য রাধাকৃষ্ণণের একমাত্র ভারতবাসী হিসেবে বিলেতের বিজ্ঞান-সভা বৃটিশ য়্যাসোসিয়েশনের সদস্য নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষে কলকাতায় এক সম্বর্ধনা-সভায় আচার্য রাধাকৃষ্ণন তাঁর প্রতিভাষণে বললেন যে, তিনি উপলক্ষ মাত্র; যে গৌরব তাঁকে কেন্দ্র ক'রে অর্পিত হয়েছে তা অর্পণ করা হয়েছে তাঁর দেশকে, দেশবাসীকে, আর যে যা করবেন তার লক্ষ্য থাকে যেন দেশ ও দেশবাসী। ব্যক্তিগত গৌরব অর্জন করার ভাগ্য অনেকেরই হয়েছে, সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, আর আমাদের এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ও বাইরে এমন গুণী ব্যক্তি কয়েকজন আছেন, যাঁরা খ্যাতির প্রত্যাশা না ক'রে নিঃস্বার্থ ভাবে ক'রে যাচ্ছেন মহৎ কাজ, যা দেশসেবা আর তাঁদের মধ্যে একজনের নাম আমার কেবলই মনে পড়ছে, যিনি হলেন আদর্শপুরুষ আচার্য হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তারপর থেকে এই আদর্শপুরুষ ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কে দেখবার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা জাগল। আমার পুরাতন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরেন্দ্রকুমারের আত্মীয়। হেমকে একদিন বললুম—তুমি আমায় ওঁর মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে? সে বললে—আগে খোঁজ নিই, তিনি কলকাতায় আছেন কি না। তিনি তো হয় মধুপুরে, নয় দিল্লীতে প্রায়ই যান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিনি তখন কলকাতার বাইরে। তারপর পরিচিত হবার বাসনাটা দমন করতে হ'ল সাময়িকভাবে নানা কর্মের জন্যে ব্যাপৃত থাকায়। কত ঝড়, কত তুফান মানুষের জীবনে, আর সংসারে সার পাওয়ার পরিবর্তে সং সেজেই নানা পথ অতিক্রম। কেটে গেল কয়েকটা বছর। অতঃপর একদা ঘোষিত হ'ল হরেন্দ্রকুমারের রাজ্যপাল পদে নিয়োগের সংবাদ। পেলুম একটা উপলক্ষ আর লিখে জানালুম তাঁকে শ্রদ্ধাভিনন্দন। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে—শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেই পরিচিত হবার সুযোগ মিলবে জেনে আনন্দিত। সেদিন থেকে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে জানবার, তাঁর বিরাট হৃদয়ের পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই অমায়িক জ্ঞানী মানুষটির সাদাসিধে পরিচ্ছদে হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটি আজো যেন প্রতিভাত আমার সামনে। ওরকম সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার কম লোকের মধ্যেই দেখেছি।

তাঁর জীবনে একটি রূপ চোখে পড়েছিল প্রথম, যা হ'ল সংযমের। 'দা ঠাকুরের' ভাষায় সং সাজানো যমকে অর্থাৎ তাকে কলা দেখানো। রাজ-ভবনে যে-ঘরে তিনি বসতেন, একদিন সেই ঘরে, শীতের বেলা দশটা হবে তখন, তিনি এসে বসলেন, পরনে আধুনিক ভারতীয় গলাবন্ধ কোট ও ট্রাউজার। নানা কথার মাঝে পোষাক নিয়ে কথা উঠল, কোন্ কোন্ পরিচ্ছদের কী কী তাৎপর্য সেই সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। বললেন—শীতকালে ধুতি পরলে তার সঙ্গে শালটাই পছন্দ করি, যেটা হ'ল ভারতের নিজস্ব, আদি যুগে গ্রীসেও অবশ্য ছিল এবং বর্তমানে য়্যাফ্রিকার কয়েকটি দেশেও আছে প্রচলন আর এককালে খোলা-বুক কোটের সঙ্গে দিনে টাই ও বিকেল থেকে বো যথেষ্ট পরেছি কিন্তু ঐ টাই বা বো গলাবন্ধ ভারতীয় বা ব্রেজিলীয় কোট পরলে আর প্রয়োজন হয় না এবং হওয়া উচিৎও নয়, কারণ যদিও আমি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কিন্তু আমাদের দেশে তো সর্বধর্মের সমান অধিকার, তাই দেশীয় বা জাতীয় পোষাকের সঙ্গে ও দুটো যে বাদ দেওয়া হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে, কারণ ও দুটো হ'ল খ্রীষ্টদেবের ক্রসের প্রতীক। তারপর উঠল তামাকের কথা, যার প্রচলন জাহাঙ্গীরের সময় থেকে। বললেন—প্রথম দায়ে প'ড়ে আর সময়াভাবে চুরুটিকা (cigarette) ফুঁকতে হয় কিন্তু তামাকের সঙ্গে কি ওর তুলনা চলে? আমি বরাবর তামাকই খেতুম; এখনো রাতে সকল কর্মের অবসানে খেয়ে থাকি। ট্রেণে খাবার জন্যে আমার একটা গড়গড়া আছে, যেটা মাত্র আধ হাতের কিছু বেশি উঁচু, তার মাথায় ঢাকা লাগানো, কল্‌কেটা তার ভিতর বসিয়ে ঢাকা লাগিয়ে দিলে সেটা থেকে আগুন ছড়াবার ভয়ও নেই আর সেটা দেখতে একটা গম্বুজওয়ালা মন্দিরের মতো।

বাস্তবজগতের স্থূল বিষয়ের আলোচনা থেকে ক্রমে এসে পৌঁছানো গেল বিষয়ান্তরে। বলতে লাগলেন—মধুপুরের বাড়িটা করেছিলুম প্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্যে। তাই তো মাঝে মাঝে সেখানে ছুটে যাই। ইট, কাঠ, পাথর, ধোঁয়া আর হট্টগোলে ভরা নগরজীবনের হট্টমন্দিরে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, ক্লান্তি জমে ওঠে। সবুজের সমারোহ যে প্রাণশক্তিকে শান্তি দেয়, তাই দৃষ্টিপথে পাহাড়শ্রেণী দেখলে, শ্যামল মাঠ দেখলে, তা আত্মায় আনন্দের বাণী জাগিয়ে দেয় অন্তরে। আদর্শ ভবন বলতে বোঝায় উদ্যানযুক্ত ভবন, যাতে বাস করা ক'জনের ভাগ্যেই বা ঘটে শহরে। তপোবনের বাসিন্দা না হয়ে যদি ঋষিরা ধূম্রজটাজালশোভিত প্রাণ আড়ষ্ট করা অট্টালিকা-নগরীতে বাস করতেন তা হ'লে বোধ হয় তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই মৃত্যু ঘটত by sinco. ঐ শ্যামায়মান সবুজের মাঝে পানিহাটিতে Bengal Chemical-এর কারখানায় কিছুদিন বাস ক'রে এসে দীর্ঘকালের বাসস্থান ও সাধনকেন্দ্র কলকাতা-বিজ্ঞান-মহাবিদ্যালয় ভবনের সঙ্গে তুলনা ক'রে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলতেন প্রথমটা

হ'ল নন্দনপুরী আর দ্বিতীয়টা? কী সংজ্ঞা দেওয়া উচিৎ? অথচ কর্ম ছাড়া মানুষের চলে না, তাই কর্মভূমির সঙ্গে যোগ অবিচ্ছিন্ন। প্রতীচ্যে নগরপ্রান্তিক গ্রাম বা শহরতলীর সঙ্গে কর্মমুখর জনচঞ্চল মহানগরীগুলোর যেমন সহজে অল্প সময়ে যাতায়াতের নানা সুযোগ সুবিধা, আমাদের দেশে তো এখনো তা হয়নি। ওদের দেশে শহরতলী বা গ্রামের উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে, চেষ্টা আছে, নগর-জীবনের নানা সুযোগ সুবিধা যাতে প্রতিটি গ্রামে মেলে তার ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে আর আমাদের গাঁগুলো? চিকিৎসক, ডাকঘর, রেল ষ্টেশান, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, কোনটি সহজে মেলে? যাদবপুর, ব্যারাকপুর অঞ্চলগুলোয় তবু bus পাওয়া যায় কিন্তু এমন অসংখ্য গাঁ এখনো আছে যেখানে সাইকল্ রিক্সই একমাত্র ভরসা। সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য চেষ্টা চলছে সব গাঁকেই আলোকিত করবার, সে আলোর রশ্মি দেখে যাব কি না জানি না। দেশ যখন ছিল পরাধীন, তখন নীরব ও সত্যিকারের কর্মীর অভাব ছিল না, কিন্তু আজ? মানুষ ভাগ্যের দাস, তাই ভাগ্যদোষে আজ কাজের চেয়ে কথা বেড়ে চলেছে। কেন এমন হ'ল? কর্মীর সত্যি অভাব ঘটেছে—এ কথা যে বিশ্বাস করতে মন চায় না কিছুতেই। রাজ্যপালের আসনে আমরা অনেককেই দেখেছি স্বাধীন ভারতে কিন্তু এই মানুষটিকে পেয়ে ঐ আসন যেন ধন্য হয়েছে। বাঙলা দেশের নানা সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নতির পথে তাঁকে দেখা গেছে পুরোধারূপে। ধর্মের কুসংস্কার সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারেনি এই উদার প্রাণকে। তাই তাঁকে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে, বিদ্যাসাগরকে, অরবিন্দকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আবার কলকাতায় নেপাল-রাজের সম্বর্ধনা সভায় বাঙলা ও বাঙালীর পক্ষ থেকে ক্রীশ্চান হয়েও "ব্রাহ্মণরূপে" রাজাকে আশীর্বাদ জানাতে। সর্বধর্মের লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমি আর তার চেতনার উন্মেষণ বঙ্গভূমিতে। সমন্বয়ের বীজ এদেশের মাটিতেই অংকুরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে ফলে-ফুলে নগাধিরাজের অভ্রভেদী শিখরে, গঙ্গাসঙ্গমের তটভূমিতে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের সুর জেগে আছে এদেশের পল্লবমর্মরে। এদেশের কবি বন্দনা জানিয়েছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব জাগরণকে, এদেশের শিল্পী তাঁর তুলির মাধ্যমে ধ'রে রেখেছেন এখানকারই সৌন্দর্য, এখানকারই ব্যথা-বেদনার ইতিহাস, এখানকার লোকেরই কণ্ঠে জাগে সেই গান, যে-গানে মেলে স্মরণাতীত কাল থেকে আধুনিক কালের নানা জীবনের নানা বিরহ-মিলনের, নানা সংঘাতের, নানা উপলব্ধির কাহিনী। হরেন্দ্রকুমার এই দেশেরই লোক। আজন্ম এখানকার এই সব-কিছুর সঙ্গেই তিনি ছিলেন পরিচিত।

একদা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের এক সভায় দেখা। তাঁর মন যে কত-কিছু ভাবে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সভার অবকাশে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন কথায় কথায়—কুমারী তরু দত্ত যদি আয়ু পেতেন, তাহ'লে আরো অনেক কিছুই আমরা তাঁর কলম থেকে পেতুম। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ বললেন—তা যখন হয়নি, তখন যতটুকু পাওয়া গেছে, তাই নিয়েই বিশ্লেষণ ও আলোচনা সমীচীন আর এও তো হ'তে পারত যে, আয়ু হয়তো তিনি পেতে পারতেন—কিন্তু দীর্ঘজীবনে যদি তাঁর [illegible] অবস্থা হ'ত! তাহ'লে? সত্যিই তো, এদিকটা তো আমরা ভাবি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব'লে চললেন—মানুষ যা বলে, তা সব-সময় ভেবে বলে না; কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে না ভেবে অনেকেই একই ভুল কথা ব'লে থাকে। যেমন বলে—ঈশ্বরকে তো দেখিনি, কিন্তু কই বলে না তো গান দেখিনি, হাওয়া দেখিনি। গান যে দেখবার নয়, শোনবার; হাওয়া যে বোধ করবার, তেমনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হয়, তারপর দর্শন ব্যাপারটা অন্য স্তরের। এমনিধারা বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেত তাঁর বহু কথায় ঝলকে। আর একদিন। এসেছেন আমাদের কলকাতার কূটনৈতিক Corps-এর এক সভায়। সমাপ্তি-বাচনে মামুলি কথার বদলে বললেন—আমি একটা গল্প বলি। ব'লে গল্প শুরু করলেন—যাত্রাপথের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে অনেকের মানসিক অবস্থা নিয়ে। বললেন—যে-পথে যেতে অনেকগুলো পান্থনিবাস পড়ে, তার শেষেরটায় পৌঁছতে কেউ কেউ পারে না অনেক কারণে। অজ্ঞশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এটি বেশি লক্ষ্য করবার। তারা ভূতেই আটকে গেছে, ভগবানে পৌঁছতে পারেনি। আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না কিন্তু ভূতের আবির্ভাব? এই সোজা কথাটা কেউ ভাবে না কেন যে—যুদ্ধে ও দাঙ্গায় যে বেচারারা প্রাণ হারিয়েছে, তারা তাদের হত্যাকারীদের সম্বন্ধে কোন শোধ নিতে পেরেছে কি কোনোকালে? আধারবিহীন আত্মা শক্তিহীন। প্রদীপবিহীন আলো কি জ্বলে?

অভিনয়কলা সম্পর্কেও একদিন তাঁর আলোচনা শুনেছিলুম। চৌষট্টিকলায় অভিনয়শিল্পের স্থান থেকে আরম্ভ ক'রে চ'লে এলেন বর্তমানকালে। বললেন—"দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়"—এ-কথা আর এখন বিজ্ঞানের কৃপায় চলচ্চিত্রের যুগে খাটে না, তবে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর ও শিশিরকুমার সমশক্তিমান অভিনেতাকুলতিলক হ'লেও গিরিশই বেশি ক'রে টিঁকে থাকবেন অনাগতকালে তাঁর সব নয়—কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে। অপর দুজনের যে সেদিকটায় কোনো অবদান আমরা পেলুম না।

যে-কোনো ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সাধারণ শ্রেণীর ছিল না, তাও লক্ষ্য করেছি। বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ প্রসঙ্গে অনেকে বলেন এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হরিনাথ কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ যেমন কবিতায় লিখে গেছেন যে তাঁর মৃত্যুতে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে এক একটা দেশের এক একটা ভাষার গ্রন্থাকারগুলো যেন পুড়ে যাচ্ছে ঐ চিতায়, তেমন হরেন্দ্রকুমারকেও বলতে শুনেছি, যেদিন হরিনাথের মৃত্যু খবর পেলুম সেদিন মনে হ'ল যেন নিজের কাণে শুনতে পেলুম এই তরুণ বাঙালীর মহাযাত্রায় নানা দেশের ভাষা-সরস্বতী ক্রন্দনরতা। আমরা Live for others, think of others ভুলে গেছি স্বার্থের সংঘাতে। দিনের পর দিন ব্যাপৃত থাকি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। ভাববার সময় পাই না প্রতিদিনের দেখা সেই পুরোনো আকাশটা কী ক'রে প্রতিদিনই অমন নতুন থাকে। "এই বিংশশতাব্দীরে ব দুঃখ দিয়েছে মহিমা" কথাটা খুব সত্য স্বীকার করলেও ইতিহাস কী বলে? আগের শতাব্দীগুলোর কি দুঃখ ব'লে কিছু ছিল না? হয় তো দুঃখবোধের ধারা ও পটভূমিকা ছিল আলাদা। ঊনবিং শতাব্দীতে দেখি যেন জ্ঞানালোকবর্তিকার মিছিল বেরিয়েছে সেই বর্তিকাধারী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো 'বেঙ্গল

কাজ' করেছেন। সে কাজ কি অনায়াস আয়াসে হওয়া সম্ভব? কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা, কত নিপীড়ন তাঁদের সইতে হয়েছে প্রতি পদক্ষেপে। তাই আজ আমরা তাঁদের কর্মের সুফল ভোগ করছি আর তাঁদের ঘিরে যত কিছু দুঃখ, বাধা, নির্মমতা পার্থিব নিয়মে তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যেমন মিলিয়ে যাবে আজকের শত প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের গুঞ্জনধ্বনি মহাকালের ইঙ্গিতে আগামী কালে।

কিছুকাল আগের তুলনায় বর্তমানকালে আমাদের দেশে আয়ু বেড়েছে যদিও তারই ফাঁকে ফাঁকে অকালমৃত্যু যা চিরকালই ছিল, আজো আছে, তবু জেনে আনন্দ হয় যে চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছেন শতোত্তীর্ণ ডাঃ কেশব কার্ভে, একশর ঘরে পা দিলেন ডাঃ মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায়। এ ছাড়া আমাদের অবগতির অন্তরালে আরও কত দীর্ঘায়ু বর্তমান আছেন তার তো সীমা সংখ্যা মেলে না। সে তুলনায় আশি পার করতে না পারলেও খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন হরেন্দ্রকুমার। তাঁর এই দীর্ঘজীবনে তিনি কি দেখলে সুখী হন একদিন প্রশ্ন করায় বলেছিলেন—মনীষায়, প্রতিভায় জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান স্মরণীয় আর আজো নবীন যুগের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তার বিকাশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাদের একটা দিক বড় কষ্ট জাগায় মনে, যা হ'ল তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি আছে কিন্তু শান্তি নেই, সমৃদ্ধি নেই, উপার্জন আর খাদ্য-বস্ত্রের জন্তে যেভাবে তারা সংগ্রাম ক'রে চলেছে দিনের পর দিন তাতে অনেকের আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। সমস্ত দিন আশার ছলনে খাটুনির অন্তে দারুণ হতাশা তারা বোধ করে, কর্মের ফাঁকে ফাঁকে বা অন্তে যারা কাজ ক'রে তারা, আর যারা কর্মের সংস্থানে দ্বারে দ্বারে 'হত্যে' দিয়ে নিরাশ হয়ে নৈষ্কর্ম্যের রুক্ষ মূর্তিই অহরহ দেখছে তারা, "অন্নহারা গৃহহারা চায় উর্ধ্বপানে, ডাকে ভগবানে।" যদি তিনি দেখে যেতে পারেন এদের অর্থাৎ তাঁর দেশবাসীকে বেকার জীবন কাটাতে হবে না, তারা পাবে শান্তি, রচনা করবে নীড়, পথে প্রান্তরে গাছতলায় জীবনযাপন করতে হবে না কাউকে, তবেই তিনি আরামে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজতে পারবেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নব নব কর্মও তো উদ্ভাবন করা যেতে পারে, করবার কত কাজই তো প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু করাবে কারা? এ তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমষ্টিগত। শুধু উপযুক্ত বেতন পেলে, যাতে মোটা ভাত-কাপড়ের আর গৃহের সমস্যা মেটে, এমন বহু লোক আছে যারা কর্মের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পারবে। এখন এদের কাজ দেবার মালিক শুধু রাষ্ট্র নয়। শিল্পপতিরা শুধু নিজেদের লাভের দিকটা দেখে যে-সব বিরাট প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তা ছাড়াও তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে অন্নহীনদের মুখে অন্ন দেবার জন্তে কিছু করতে, অবশ্য যা সমাজসেবা এবং service to humanity ব'লে গণ্য, তাহ'লে তাতে যে তাঁদের কেবলই ক্ষতি হবে এমন কথা আমার নয় বরং আমি আমার ক্ষুদ্র-শক্তির উপর নির্ভর ক'রে এইটুকু বলতে পারি যে, রাষ্ট্র যাতে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করে সে চেষ্টা আপ্রাণ সফল করতে আমার দিক থেকে কোনো ত্রুটি হবে না। য়্যামেরিকা কুবেরপুরী কিন্তু রাশিয়া আর জাপানের দিকে চাইলে অহংবোধনায় বুক ফুলে ওঠে। ক'টা বছরের মধ্যে কী ভাবে তারা বেকারীত্ব উচ্ছেদ করায় চেষ্টার সার্থকতা দেখিয়েছে। অজন্মা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ধ'রে নিয়েও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশে কিছু কম নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও উত্তীর্ণ হতে হবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাদের এড়িয়ে, রোধ ক'রে আর সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার যাতে হয় সে অভিযানও চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের চেষ্টায় কী না হয়? দেশকে ধনধান্যপুষ্পভরা সম্পদশালিনী মূর্তিতে দেখার আশা যে তিনি পোষণ করতেন, তা জানতে পেরেছিলুম সেদিন, যা তাঁর বহুস্থানের ভাষণের মাধ্যমে কচিৎ জানা যায়। বরেণ্য জননায়ক শ্যামাপ্রসাদ একদা ছিলেন হরেন্দ্রকুমারের ছাত্র। গুরুর বিষয় একদিন গল্প করতে করতে তিনি বলেছিলেন—শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কি শুধু বাঁধা ধরা সময়ে পঠনপাঠনে? শিক্ষক যতদূর সম্ভব সব শিক্ষাই দেবেন ছাত্রছাত্রীদের সস্নেহে, লক্ষ্য রাখবেন তাদের ভালোমন্দের দিকে আর হরেন্দ্রকুমার সেদিক দিয়ে আদর্শ শিক্ষক। তিনি শুধু—

'ছাত্রী ও ছাত্র,
চিরদিন সবে তারা নিন্দার পাত্র।'

ব'লে নাক সিঁটকোননি। তাদের নানাভাবে উপদেশ দিয়েছেন। পুত্র-কন্যা ও ছাত্র-ছাত্রী বড় হ'লে সব চেয়ে আনন্দ তো পিতা-মাতার ও শিক্ষক-শিক্ষিকার। তাই ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকেও ছিল তাঁর যথেষ্ট নজর। বলতেন—Health is wealth, একে তো খাদ্যশক্তিযুক্ত সুখাদ্য আজকাল দুর্মূল্য ও সাধারণত দুষ্প্রাপ্য প্রায়, তাই মুখরোচক অখাদ্যকুখাদ্য সস্তায় খারাপ দোকান থেকে কিনে, খারাপ রেস্তরাঁ থেকে না খেয়ে, হয় ভালো দোকান থেকে এনে, ভালো রেস্তরাঁয় গিয়ে খাও, আর নইলে সস্তায় অখাদ্যের বদলে ডিম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, সস্তা ফল সদ্ব্যবহার করো। বীজাণুর ভয় থাকবে না, খারাপ ঘিয়ের জন্তে ভাবতে হবে না।

১৯৫৬ সাল। জুলাইয়ের শেষের দিকেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেদিন ভাবতে পারিনি যে এই সুস্থ মানুষটি (বাইরে থেকে যা দেখেছি) আর ক'দিন পরে ৭ই আগষ্ট আকস্মিক ভবের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেবেন। কার কখন ডাক আসে বলা তো যায় না। এ যেন—

মৃত্যু যেদিন বলবে জাগো প্রভাত হ'ল তোমার রাতি
নিভিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।

৭ই অগাস্টের সংবাদপত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা 'টেলিগ্রাম' যে সংবাদ পরিবেশন করলে তা পাওয়ার পর কেবলই মনে হয়েছে দিনে দিনে তিলে তিলে যে-জীবন-ডালি কত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, হাসি-কান্নার ভিতর দিয়ে সাজানো হয়, তা উজাড় ক'রে ফেলে দিতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় লাগে। তবে যে-মানব-জীবন ফুল-ফোটা আর ফুল-ঝরা, হাজারে হাজারে যা পৃথিবীতে ঘটছে প্রতিদিন, সেই অসংখ্য জীবনের সঙ্গে এই জীবনটির তুলনা হয় কি? এ আলাদা জাতের, এ জীবন যাঁর, তাঁর উদ্দেশে বলতে পারা যায়—

Harendro Coomar is dead
Long live Harendro Coomar,

বলা যায়

জগতোত্তীর্ণ পরিক্রমার অন্তে আবর্তন
তব ভাস্বর জীবনরশ্মি আলোকিত করে মন।

আধুনিকতায় ভারতীয় নারী

শৈলদেব চট্টোপাধ্যায়

যান্ত্রিক সভ্যতা, বা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ও সমাজে আসে নানা বিষয়ের সংস্কার। "Old order changeth, yeilding place to the new." এই হ'ল সভ্যতার ধারা। ক্রমবিকাশের নিয়ম। পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিত।

পরিবর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন, এ কটি আসে মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের তাগিদে অথবা রাষ্ট্রীয় অনুশাসনে।

কিন্তু এই তাগিদ বা চাহিদা মেটাতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের, তথা তার সমাজের আসে মঙ্গল অথবা চিত্তবিভ্রান্তি; যার থেকে মানুষকে অনেক সময় ভাবতে হয় সে এগিয়ে চলেছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে। যেমন সেকালের যুদ্ধে দেখা যেত একটি তরবারি বা বল্লমের আঘাতে একটি শত্রু নিহত কি আহত হ'ত। আর এখন একটি বোমাতে একটি 'হিরোশিমা' সহর শেষ হ'লেও বলি এইটেই সভ্যযুগ। আদিমযুগ বর্বর যুগ। তাই সভ্য অসভ্যের বিচার কোন্ মানুষে করবে কে জানে? কোন কালে এর মীমাংসা হবে কি না তাই বা কি ক'রে জানবো?

তাই এখন দেখা যাক আমরা এই সভ্যযুগের নারী-প্রগতির কি আখ্যা দেব। আদিম না আধুনিক?

যান্ত্রিক সভ্যতায় যে জড় পৃথিবী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহ নেই। মাটি, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—সবই যেন কম্পমান। সবই যেন তাণ্ডবের উল্লাসে উল্লসিত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে—এক কথায় সর্ব্বতোমুখী একটা আমূল পরিবর্তন ও গতি। অতি বেগবতী গতি! অতি দ্রুতগতিশীল পদার্থ যখন ভাঙে তখন তার ভাঙনও যেন কোন 'সাবধানী' পদার্থের অপেক্ষাও ভয়াবহ হয়। এমন কি গতিশীলটির চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, এ টা আমরা দেখি। ওই সকল সংস্কারের সঙ্গে এলো, বহু সংস্কার। প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু 'শিব গড়তে বানর গড়া' কথাটি আজও লুপ্ত হয়নি।

ভারত চাইলো তার পূর্ব আদর্শের নারীর আমূল পরিবর্তন। তাতে কি এলো কে জানে। তা'ছাড়া অন্যান্য সংস্কারের তুলনায় নারী-প্রগতিটার যেন সর্বব সংস্কারের লক্ষ্য হ'ল।

ইংরেজ যুগে যা আসছিল আজ আবার তাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। একজন ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি ব'লেছিলেন 'ভারতীয় নারীকে ভাঙতে হ'লে, চাই তাদের অন্দর বিজয়।'

তাই তাঁরা তাঁদের ভাবধারায় প'ড়তে উপদেশ দিলেন ভা নারীকে।

পরবর্ত্তী কালে এলো ভারতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকর্ত্তারা চাইলেন নারীকেই স্বাধীনতার অগ্রগা হিসাবে। সে যে কারণেই হোক্, তাঁরা চান ভারতীয়-আদর্শের ন মৃত্যু। যুগ বা কালের তাগিদে তাঁরা চান নারীকে অর্থ নৈ কাঠামোয় তৈরী ক'রতে। যেতে যায় যাক্ ভারতীয় ন সংস্কৃতি! জাহান্নামে যাক্ ভারতীয় আদর্শের নারী। বিবেকানন্দের ভারতীয় নারীর উচ্চ-প্রশংসার আদর্শবাদ! আসুক সৃষ্টির বিচিত্র ধারায় নারীর নব নব রূপ! বিবেকা চেয়েছিলেন কবে ভারতীয় নারী আমেরিকার নারীর মতই স্বা ভাবে চলা ফেরা করবে,—হাটে, বাজারে, স্কুলে, কলেজে, খে এবং ধর্ম্মাচরণে,—পুরুষের সকল কাজের সহায়করূপে, সংসার জীব একান্ত সহধর্ম্মিণীরূপে।

পরিবর্ত্তনে এলো কি তাই? মনে হয় এসেছে স্বৈরাচারি যথেচ্ছাচারিতা।

মানুষের বিবেক বুদ্ধি থাকাতে মানুষকে বলি মানুষ। পক্ষে পশু। তবু মানুষের ভুলেই মানুষ ভাল মন্দের বিচার ক করে। কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গায় আপাত ভালকেই ভাল ম করে। চোখে, মুখে ভাল লাগলেই দেখে, খায় ও উপভোগ করে তাই কবিও বলেন;—

"চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইবোনা?"

বৈদিক যুগের নারীর কোন কিছুতে পরাধীনতা দেখি না বৌদ্ধ যুগের তো কথাই নেই। সম্ভবতঃ মুসলমান যুগে হি নারীর পর্দানশীনতা ও সকল কিছুতে উপেক্ষিতা! পরে জাতি কৃষ্টি জয় ক'রতে এসে ইংরেজ তাদের অনুকরণে চাইলো ভারতী সকল সংস্কৃতির পরিবর্তন, নারী-আদর্শও।

প্রথমে রক্ষণশীলরা চীৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু যা আসবা ক্রমান্বয়ে এসে গেল। যারা চীৎকার করার তারা চীৎকার ক' যায়। যারা ভেঙে গড়বার তারা গড়ে। তারপর যুগের 'রথচ আছেই। তাকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না। যদি বা সে থা পিছনে রথ চলে যায়।

এখন দেখা যাক্ কেমন ক'রে আস্তে আস্তে এলো এই নারী আধুনিকতা। প্রথমেই বলেছি যান্ত্রিক-সভ্যতায় বা বিজ্ঞান

বিকালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক'রে এলো সাইকেল, রেল, মোটর ; বে মানুষ উড়তেও শিখ্‌লো, ডুবতেও শিখ্‌লো, ভাসতেও ালো। তারপর আরও এগিয়ে এলো। মানুষের ছায়াছবি ালোকে হাত পা নাড়্‌তে সুরু ক'রল। আবার সেই ছবি যেমন ানুষের গলা নকল ক'রে কথা কইলো, বক্তৃতা দিলো, গানও াইলো, ঠিক তেমনি ক'রেই এলো এই আধুনিক নারীর াধুনিকতা।

আস্তে আস্তে এলো রাস্তায়, এলো স্কুলে, কলেজে, বক্তৃতা-ঞ্চে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত অফিসের টেবিলে। আর এক দিকে খা দিল গানে, নাচে, জলসায়, নাট্যকলায়, শেষ পর্য্যন্ত সিনেমার পালী পর্দায়। নব নব রূপ-সজ্জায়। শেষকালে যেটি এলো, াইটেই মনে হয়, স্ত্রী-পুরুষের আধুনিকতার আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াল।

এই আধুনিকতা পৃথিবীর অপর পিঠে ছিল। আমাদের দেশেও াস্তে আস্তে এর বিস্তৃতি হ'ল। তার থেকে কি এলো! কেমন লো! কে বিচার ক'রবে! কে ব'লবে!

যাই হোক্‌, প্রাচীন বৈদিক যুগ হ'তে কোন দিনই শিক্ষার ারতীয় নারী যে অনগ্রসরা ছিল, তা আমার মনে হয় না। তাঁরা কলদিকেই উন্নতা এবং সুস্থ-চিন্তাশীলা ছিলেন।

তবে মধ্যযুগে যে কোন এক বর্ব্বরতায় নারীকে অনগ্রসরা অন্তঃপুরবাসিনী ক'রে তুলেছিল, তার অবসান দরকার 'য়েছিল, এ কথাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু প্রকৃত নারী-প্রকৃতিকে ুষ-প্রকৃতিতে পরিণত করতে যাওয়া—সেটা নারীত্বেরই অপমান যমন পুরুষ-প্রকৃতিকে নারী-প্রকৃতিতে ঢালাই করতে গেলে ুরুষেরও মানও থাকে না।

স্ত্রী-শিক্ষার অকাট্য যুক্তির কথা অস্বীকার করবে কে? এর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিতসমাজ মাত্রেই উপলব্ধি করবে। তাই ামাদের দেশের মহাপ্রাণ রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে িদ্যাসাগর, পরে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অপূর্ব ণন-ভঙ্গিমায়, নারী তার পূর্ব সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে থাকে। াদের লেখনীই আজ বাংলার তথা ভারতের নারীকে এগিয়ে ানতে থাকে। যে-কোন ভাল জিনিষ বা সংস্কার আসে হামানবের প্রচেষ্টায়। কিন্তু অবশেষে কালের গতির সঙ্গে এবং নিপুণদের হাতে প'ড়ে, আরম্ভ হয় তার বিকৃতি। কারণ হাত রে সকল জিনিষই ময়লা ও আবিলতাযুক্ত হয়।

তাই স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে এলো স্ত্রী-স্বাধীনতা বা আধুনিকতা। রপর আধুনিকতা থেকে এলো প্রায় যথেচ্ছাচারিতা। সেটা আর ভুল নয়, নেওয়ার ভুল।

রাষ্ট্র স্বাধীনতায় মানুষ পায় সম্পদ, স্বাস্থ্য, এককথায় মানুষ র মনুষ্যত্ব আর জাতি পায় প্রাণ। তেমনি স্ত্রী-শিক্ষায় বা াধুনিকতায় আমরা আশা করি মহিমমণ্ডিত মাতৃজাতি। যার সে থাকবে নৈতিক কাঠামো, মহিমময়ী মর্য্যাদা, আত্মিক ও ৈহিক উন্নতি ও সৌষ্ঠব। অপর পক্ষে চলন-বলনের কায়দা, জ-সজ্জার বাহার ও অঙ্গবিলাস শুধু পোষাকী পুতুলের মতই দাস। কে ঘরে রাখতে বা আনতে আনন্দ, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ও াণহীন পুত্তলিকার মতই। তাতে ক'রে আমরা তাকে দিতে ি কিছু, কিন্তু আজ্জি-পেতে পারে না একটুও। যুগের পরিবর্ত্তন

কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না। তেমনি যুগাবর্ত্ত মানুষের অলক্ষ্যে কেমন ক'রে এসে যায়, পরবর্তী যুগে মানুষই ভেবে পায় না।

তাই স্ত্রী-শিক্ষার মাধ্যমে এলো আধুনিকতা। কিন্তু যেমন বন্যায় জল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সঞ্চিত আবিলতা, তেমনি আবার দিয়েও যায় কতকগুলি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় আবর্জ্জনা। যার থেকে পরে দেখা দেয় মহামারী। তাই আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষায় যে আধুনিকতা এলো, তাতে শতাব্দীর সঞ্চিত ময়লা গেল সত্যিকথা, কিন্তু পরবর্ত্তীকালের মানুষ সামান্য বিশ বছরের ভেতরেই যা দেখলো তাতে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় নারীর কোন বিশিষ্টতা বা ভারতীয় নারী নূতন ভাবধারা কিছু দিতে পারলো বলে মনে হয় না। যা দিলো তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। যা নূতন সেটুকু মনে হয় সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর-প্রিয়তা, বাবু-পটুতা ও স্বেচ্ছাচারিতা। এখন আর ভারতীয় ঐতিহ্যের কিছু দেখা যায় বলে মনে হয় না, কোন সভ্যতার আদর্শে পর্ড়বে তাও বলা যায় না। তবে খানিকটা "সিনেমা সভ্যতার" যুগ বললে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য পুরুষও এ সভ্যতার বাদ পড়ে না। তবে এখানে তাদের বিষয় আলোচনা করছি না।

স্ত্রী-শিক্ষার যে প্রয়োজন ছিল, এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে শিক্ষার আশা ছিল নারীকে প্রকৃত নারীত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যাতে ক'রে একটি নারী জীবনে, সুষ্ঠু কন্যা, মনোরমা ভার্য্যা, সম্পূর্ণ মাতা হতে পারে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে গেলে চাই স্বাস্থ্য, মনোবল, দেহের শুচিতা ও মনের পবিত্রতা। কারণ দেহ-মন যদি অশুচি ও অপবিত্র হয় তাহলে কোন মহৎ জিনিষই অনুষ্ঠিত হ'তে পারে ব'লে মনে হয় না। কারণ লোমকূপই যদি ময়লা দিয়ে বন্ধ ক'রে দিই তো' ভেতর পরিষ্কার হবার উপায় রইলো কোথায়?

এর জন্য ভদ্র মহিমময়ী নারীর দোষ বা গুণের বিচার করতে চাইনা, তবে আধুনিক শিক্ষা ও অনাচারই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিশ্বের প্রতিটি জিনিষই নিয়মের মাধ্যমে চলে। নারীর শিক্ষা কি পুরুষোচিত হলেই নারী হয়? না নারীকে পৌরুষেয়ত্বে নারীত্বের লাঞ্ছনা করা হয়? তাই পুরুষ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত নারী, সমাজকল্যাণকারী হবে কি করে? তাই আজকের ভারতীয় তথা বাঙালী নারী কখনই স্পর্দ্ধা ক'রে দাবী করতে পারে না সমাজকল্যাণকামী কন্যা বলে। তাই এই শিক্ষার ফলে নারী না পারছে সম্যক্ পুরুষ হ'তে, না পারছে পরিপূর্ণ নারী হ'তে। ফলে গার্হস্থ্য জীবনে আসছে অসন্তোষ ও পারিবারিক বিপ্লব। তাই পারিবারিক জীবনের মাঝে হয়তো কবিগুরুর গানই মনে পড়ে, "আজি কী পাইনি"।

আজ স্কুল কলেজে যে শিক্ষার মাধ্যমে নারী নিজেকে পুরুষোচিত আদব-কায়দায় তৈরী করছেন, তা না ক'রে নারীত্বের মর্য্যাদায় নিজেকে গঠন ক'রলে নারীত্বের বা মাতৃত্বের শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। অবশ্য সাগরপারে তা' বলে না। সেখানের আদর্শ যে আমাদের আদর্শ নয়, তা' মোপাসাঁ'র "Useless beauty" গল্প থেকে বড় চমৎকার বোঝা যায়। গল্পের নায়িকা ব'লছে, "নিরর্থক মানুষে তার দৈহিক রূপ নষ্টার জন্য

যায় যাচ্ছে। কুরুচিত যৌবন কটাক্ষ কুলো বড় অগৌরব-সহুত হচ্ছে।" তাই শেষকালে স্বামীর অস্বীকার ক'রে যুক্ত প্রজাপতির মত লোকচক্ষে রূপমগ্নী হতে চান। কিন্তু ভারতীয় আদর্শ তা' ছিল না। এখন অবশ্য প্রায় কাউন্টেস্ ও মাসাক্রেটের মতই অতিরুচিতেই এসে যাচ্ছেন। ভারতীয় আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। চরিত্র বড় কথা। এর মাঝে বহু কিছু থাকে। মায়া, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, দৈহিক ও মানসিক শুচিতা ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, এ সবের ধার আজকাল কেউ ধারে বলে মনে হয় না।

তাই মনে হয়, স্ত্রী শিক্ষার বা আধুনিকতার সকল Logyই থাক, সকল Ismও থাক। তবে সবের মাঝে থাক নারী-চরিত্র গঠন শিক্ষা। যে শিক্ষায় নারী হ'তে পারবে প্রকৃত কন্যা, মনোরমা ভার্য্যা, আদর্শ মাতা। তার জন্ম, সতী, সীতা ইত্যাদি থাকবে সুমুখে আদর্শরূপে। তাহলে কোন আদর্শবাদই নারীকে অ-ভারতীয় ক'রে তুলবে না। এতে করে এমন বুঝবো না যে, আমরা সে যুগে বা সত্যযুগে ফিরে যেতে চাই। চাই কি? আদর্শ, বলিষ্ঠ, স্বতন্ত্র আধুনিকতায় ভারতীয় নারী হ'তে। অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জগতে, নারীকে সম্মানিত তথা নারী-পূজা করতে গিয়ে নারীকে ভোগের বিলাসিতায় ক'রে তুলেছে। হয়তো আগে হত পর্দা রেখে স্বার্থপরভাবে, আর এখন হয়তো হয় সেইটে উন্মুক্ততার মধ্য দিয়ে। ফল একই। তফাৎ দেখার। তফাৎ চিন্তাধারায়। তফাৎ মনন-শীলতায়। ভারতীয় নারী ছিলেন মাতৃপূজার প্রতিমা। অর্থাৎ সংক্ষেপে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ নারী পূজা করেন ভোগের সামগ্রী হিসেবে, আর ভারত পূজা করে মাতৃরূপে।

তাই মনে হয়, আধুনিকতায় নারীর পোষাক বা সাজসজ্জার মূল্য আগের থেকে আজ বেড়েছে সত্যি কথা, কিন্তু আদর্শের দিক দিয়ে, ভারতীয় আদর্শের কাছে নারীর মূল্য ক'মেছে বই বেড়েছে বলে মনে হয় না। জগতের সত্য জগতেই লুকিয়ে আছে; মানুষ ভাবে, মানুষ তার জন্ম দিচ্ছে। পৃথিবীর ধ্বংস পৃথিবীই লুকিয়ে রেখেছে; মানুষ ভাবে সেই সৃষ্টি করছে। দেহ, রঙ, স্বভাব, যাবতীয় জিনিষ কিছু কিছু স্বভাবজ, দেশজ, প্রকৃতিগত। এমন কি, জলহাওয়াও ঋতুগত। যার জন্য এক ভারতেই বহুবর্ণ ও বহু আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়।

সুতরাং শিক্ষা ও আদব কায়দাও সব দেশের এক ক'রতে গেলে উপকারের তুলনায় অপকারই বেশী আসে। ক্ষমার তুলনায় ঘৃণার উদ্রেক হয় বেশী। আপাতঃ সুখ, আপাতঃ মধুর ভারত কোনদিন চায়নি। সাত্ত্বিক সুখ, সাত্ত্বিক আনন্দ, এমন কি আহারেও সাত্ত্বিকতা যাঁরা চেয়ে গেছেন, তাঁরা কোনদিনই সাময়িক সুখে উৎফুল্ল হ'তে পারেননি। তাঁরা যে কোন জিনিষ যুগ হ'তে যুগান্তরের জন্য, স্থান হ'তে স্থানান্তরের জন্য, এমন কি লোক হ'তে লোকান্তরের জন্য সৃষ্টি ক'রতেন।

তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন :—

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥"

তাই এখন তমো গুণাবৃত পৃথ্বী সাত্ত্বিকতা ভুলে যেতে চায়। [illegible] দিন দিন যেন্তেই চলেছে, কাজের আঘাত নেই। যদি আজে পূর্ণ জ্ঞানে আশা হয়। কারণ কোন পাপ ধ্বংস হবার পূর্ব্বে মানুষের স্বভাব ও সুবুদ্ধি অন্তর নিতে চায় না। তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন অতি অকাট্য। সকল দিক থেকেই। কারণ মানব-মানবী নিয়ে বাস ক'রতে হ'লেই চাই শিক্ষা, চাই স্বাস্থ্য, চাই আধুনিকতা। এ সবের উদ্দেশ্য মানবীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করা। সভ্য থেকে সভ্যতর করা। মর্য্যাদাসম্পন্ন থেকে মর্য্যাদাসম্পন্নতর করাই আধুনিকতা ও স্ত্রী-শিক্ষার মুখ্য ও উপভোগ্য উদ্দেশ্য।

তাই নারীকে পূজ্যতর ভারতই একা যতখানি ক'রেছে, ততখানি কোন দেশই করেনি। বিবেকানন্দ সত্যিই বলেছেন,— "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে, মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ, সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন্‌কালেও পারিবে না। তোমাদের জাতির যে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই সব শক্তি-মূর্ত্তির অবমাননা করা।"

তাই শিক্ষিতা নারীর সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে, আধুনিক নারীর সৃষ্টি ক'রতে গিয়ে যদি নারীকে আমরা যথেচ্ছাচারিতার নামিয়ে দিই, যদি ভারতীয় আদর্শচ্যুতা করি, তাহ'লে আমরা এ অপরাধের শাস্তি নিক্তির ওজনে ফিরে পাব যা পাচ্ছি।

রূপ-যৌবন উপভোগ ও সাজ-সজ্জার আড়ম্বরকে, ইঙ্গ-বঙ্গ মিশ্রিত কায়দায়, নিত্যনূতন ভূষণলাঞ্ছিতা নারীকে আধুনিক রুচি-সম্মতা, শিক্ষিতা বা আদর্শ নারী, পূজাযোগ্যা নারী বলে চলে কি? চললেও প্রকৃত জ্ঞানের দুয়ারে মূক ও গন্ধহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাস। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা কি আমাদের বেশী মূর্খ ছিলেন? নিশ্চয় না। সংসারের বাইরে থেকে যাঁরা কিসে মানব সমাজের মঙ্গল হয়, তাই কল্পনার গাঢ় বাস্তবে রূপ দিতেন অনাদি ও অক্ষয় আদর্শ। যার কাছে পাশ্চাত্ত্য ঋষিরা অবাক হয়ে মাথা হেঁট করেছেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন আমেরিকায়, "যে জাতি সীতাচরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই।" অবশ্য আজকাল এসব চরিত্রকে উপহাসের পর্য্যায়ে ফেলতেও কেউ কেউ কুণ্ঠাবোধ করে না। এরজন্য মা বোনেরা দায়ী নয়, সমগ্র জাতি দায়ী—তথা শিক্ষা ও আচার।

অবশ্য একথাও সত্য যে, মানুষের জীবন যে ব্যাকরণের মত শুষ্ক ও রুক্ষ সূত্রে আবদ্ধ থাকবে, একথা সত্যই অসত্য ও অন্যায়। তথাপি একথাও ঠিক যে, এতবড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিয়ম ব্যতিরেকে চলে না। প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহ ভীষণ বেগবান আবর্ত্তে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে; তথাপি সকলেই নিয়মে বাঁধা। এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মহাপ্রলয় হ'য়ে যেতে পারে। তাই নারীরা আধুনিকতা, শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞানসমন্বিত হ'য়ে, স্বচ্ছতোয়া সরসীতে রাজহংসীর মত বিচরণ করে করুক—কিন্তু ঐ সরসীতেই। আকাশে উড়তে গেলেই আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা হয় বেশী।

যে আধুনিকতা, যে স্ত্রী-শিক্ষার বেলা আজ আমরা [illegible] হ'য়ে উঠেছি, যার [illegible] আমাদের [illegible]—[illegible]

জীবনে অভাবনীয় সাড়া এসে গেছে, সেটা যাদের দেশ থেকে এলো, তাদের কি হ'ল ?

Modernism তথা আধুনিকতার শুরু হ'ল ফরাসী রাজ্য। তাদের দেশের নারী কি ? ফরাসী নারী বিলাসিতার রাঙতা-মোড়া পুরুষ চক্ষের বিভ্রান্ত ধাঁধাঁ। কল্পলোকের মেনকা অথবা উর্বশী। যাতে ক'রে পুরুষেরা ভুলে গেল মাতৃজাতি। ভুলে গেল জীবনাদর্শ তথা জীবনের অস্তিত্ব। ডুবিয়ে দিল রমণীর মদিরালসে জীবনের উৎস। সেখানের মুক্ত আধুনিকারা মুক্তভাবে পুরুষের হ'ল বিলাস-তরঙ্গিনী। সে নারীর এখন আদর্শই হ'ল পুরুষানুরাগ এবং পুরুষের তরফেও ওই একই ভাব। উভয়পক্ষই আজ উভয়পক্ষের জন্ত পেয়েছে কতকগুলি নির্লজ্জ দেহলিপ্সার উন্মাদ পরিকল্পনা। পুরুষপক্ষে লাভ হ'ল হীনবীর্য্যতা, শৌর্য্যহীনতা ও ক্লীবতা ; আর নারীর লাভ হ'ল এক কথায় 'যে তিমিরে, সেই তিমিরে।' অর্থাৎ জ্ঞান-গরিমা বাদে পুরুষের ভোগ-সামগ্রী। আসল কথা হচ্ছে, যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। সেই নারী নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সরকারী দপ্তরখানায়, সমাজে, সামাজিকতায়, যেখানে যেখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, সেখানে সেখানে আজ অবাধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু সেইটেই নারীর যোগ্য আসন, বা তাতেই কি আধুনিকতার চমোৎকর্ষ ? মনে হয়, না।

প্রকৃতিপুরুষের চিরন্তন ঘর বাঁধার ইচ্ছা, মাতৃত্বের গৌরব না পেলে কি নারীত্বের ক্লীবত্ব হয় না ? এই যে মুক্ত ক'রলেও যারা বন্ধন চায়, এটা অস্বীকার করে লাভ কি ? সেই জন্যই এই আধুনিকতার বাস্তব সমাজে হয়তো প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সুযোগ দেয়, কিন্তু মনের জগতে এই আধুনিকত্ব নারীকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে তুলবে না কি ?

নিরর্থক ভোগেচ্ছায়, বিলাসিতায়, প্রগল্‌ভতায় বাকচাতুর্য্যে, পরিচ্ছন্নতায়, অবাধ মেলামেশায় দৈহিক শুচিতা, মানসিক শুচিতাও নষ্ট হয়।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অনুমাত্রও সহানুভূতি নাই।"

তাই এর কুফল সর্ব্বত্র আজ প্রকট। ফরাসীরাজ্য-প্রত্যাগত বন্ধু-বান্ধবের মুখে তাদের আধুনিকতার রহস্য শুনে কি যে ব'লবো, তাই ভাবতে হয়। তাই আজ নেপোলিয়নের ফ্রান্স মাত্র সাতদিনে বিজেতার পায়ে আত্মসমর্পণ করে। কিসের অভাবে ? শুধু অস্ত্রবলের, বাহুবলে অভাবে ? কখনই না। নৈতিক বলের অভাবে, নৈতিক দুর্ব্বলতাই এই অধোগতির প্রধান কারণ। জাতির হীনবীর্য্যতাই দায়ী। কিসে এই হীনবীর্য্যতা ? উপরি-উক্ত আলোচনাতেই তা' প্রকটিত হয়েছে। আমাদের রাণা প্রতাপ, শিবাজী বহুবার জয়-পরাজয়ের সম্মুখীন হ'তেন, কিন্তু বিজেতা কখনই মনোরাজ্য দমিত করতে পারতো না ; তাই মানসিক তেজ তাঁদের কখন খর্ব্ব হ'ত না। তাই বিজেতারা তাঁদেরকে কখনই তাঁদের বিরুদ্ধে জাগাতে সমর্থ হ'ত না।

এই মনোবল, এই তেজ, এই অহঙ্কার পরবর্তী যুগে আমরা নেতাজীতেও পাই। বারবার কারারুদ্ধ হ'য়েও কেন তাঁর মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়নি ? নৈতিক চরিত্রবলে, অদম্য উৎসাহের জোরে, গগনস্পর্শী সাহসের গুণে। কোথা থেকে আসে এই শক্তি ? সাত্ত্বিক মাতৃবলে। যোগ্য মায়ের পরিবেশনে। পূজাযোগ্যা মায়ের ছায়ায়। মা ভাল না হ'লে, সন্তান ভাল হবে কি ক'রে ?

আজ মায়েরা আধুনিকা হলেন। বীর সন্তানও বাংলা তথা ভারত থেকে অন্তর্হিতপ্রায়। বোধ করা যায় না। কারণ এখানকার সমাজ-ব্যবস্থাই এইরূপ। যার জন্য ইংরাজীতে যাকে বলে outstanding genius, আজ আর তার একটিরও দেখা মেলে না। তার কারণ বহু কিছু থাকতে পারে ; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ, Cinematic civilisation, অর্থাৎ "নাচে-গানা" civilisation এর কারণ। পুরুষেরা গভীর কোন চিন্তা করতে পারে না। এক কথায় পুরুষেরা 'মেনিমুখো' হ'য়ে উঠেছে। গভীর চিন্তার অবসর কোথায় ? নিজেকে সন্ধানের অবসর নেই। সব দেশই 'প্যারিস' হবে। জাতির অস্তিত্ব আধুনিকাদের কাছে ফিরে চাইতে হবে। আধুনিকাদের উন্নত ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় নিয়ে যেতে হবে। সমাজ-ব্যবস্থায় আধুনিক-পৌরাণিক মিশ্রিত ক'রে আধুনিকতা ক'রলেই জাতির মা অত্যাধুনিক হবে।

মৃন্ময় মূর্ত্তিকে শুধু সাজিয়ে, জাঁকজমক দিয়ে, বাদ্য সহকারে পূজা করলেই মায়ের পূজা হয় না। অন্তরের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিকে জাগাতে হয়, তবেই পূজার সার্থকতা ধরা দেয়।

'পশুবলি' উঠিয়ে দিলেই অন্তরের পশুত্বের বিনাশ হয় না। তাই আন্তরিক পশুত্বের বলিদান চাই। তা' না হ'লে পূজা অঙ্গহীন হয়।

তেমনি আধুনিকা তৈরী করতে হলে পৌরাণিকা-কুসংস্কারের ভূত তাড়াতে হবে সত্যিকথা ; কিন্তু নারী-চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদানগুলি পরিত্যাগ ক'রে শুধু জাঁকজমকে ও সাজ সজ্জা দিয়ে নারী পূজা ক'রলেও সে পূজা ঠিক উপরিউক্ত তামসিক পূজাই হবে। তাতে অন্তরের পশু-প্রবৃত্তির উদ্বোধন করা হবে। মানুষ আজকের মত শিশ্নোদর-পরায়ণ হয়ে উঠবে। তাতে জগতের অকল্যাণ এগিয়ে আসবে। পশু-প্রবৃত্তি থেকে পশু-স্বভাব সন্তানদের দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকারই হবে না। কালাপাহাড়ের মত তামসিকতায় আচ্ছন্ন হ'য়ে সৃষ্টিকে ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই জন্যই পশু কোন সৃষ্টি-শিল্প জানে না ; ধ্বংস কার্য্যই তারা জানে।

তাই এই আধুনিকতায় ভারতের নিজস্ব দান খুঁজে পাওয়া যায় না—আছে পাশ্চাত্ত্যের রং-বাহার। সেটা রূপচর্চ্চা পর্য্যায়ে পড়ে। তা'তে আজকের জগতে নাটকীয় অস্তিত্ব আছে। আজকের শিক্ষায় বা আধুনিকতায় নারী কি ক'রে তার স্বকীয় চেষ্টায় রুজি-রোজগার ক'রবে তা' থাকতে পারে। কিন্তু কিসে জাতির মর্য্যাদা, স্বাস্থ্য, উন্নত জীবনধারা, নূতন আত্ম-চেতনা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে, সে আধুনিকভাব কি আজ নারী তথা আধুনিকারা স্মরণ করেন ? তাই যদি না হয়, তাহলে আধুনিকা কি এলো ? আর আধুনিকতারই বা মূল্য কোথায় ? জননবিজ্ঞান ও যৌনবিজ্ঞান সৃষ্টির জন্য তো ঈশ্বরই নারীকে বিভিন্নরূপে গড়েছেন ; তাতে মানুষ

দু'এক পোঁচ বাড়িয়ে বিশেষ কি দক্ষতার পরিচয় দিল! সে তো মৃত্তিকা-শিল্পীর মত পুতুল সাজানোই হ'ল। প্রাণ পেল কই? প্রাণহীন "তাজমহলের" থেকে তাই প্রাণময় শা-জাহান আরও মহান্। তাই কবি বলেছেন:—

"কীর্ত্তির চেয়ে তাই তব জীবনের রথ
তোমার পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
তুমি যে মহৎ, কীর্ত্তিরে তোমার বারংবার।"

তাই নারীর মোহ উদ্দীপক রূপ শুধু ঝর্ণা হ'য়ে আশা পর্য্যন্ত। আসল এবং প্রকৃত রূপ পায় মাতৃত্বের অতল সমুদ্রে। ঝর্ণা কিছু ধ'রে রাখে না। সব ধুয়ে নিয়ে এসে রত্ন-গর্ভা অতল সমুদ্রে, মাতৃত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে সুগম্ভীর ভাব ধারণ করে সেখানে, আর যৌবন-উচ্ছলা ঝর্ণারূপ নেই। রত্নগর্ভার গর্ভে স্থির, মৌন, সুগম্ভীর। আবার সেখানে মহা-ওঙ্কার ধ্বনিতে উদ্বেলিত। তাই নারীর আধুনিকতায় ঝর্ণাধারার মত উচ্ছলতা থাক, কিছু আবিলতাও আসে আসুক, কিন্তু সমুদ্রের মত মাতৃত্বে এসে যেন নিজেকে বহুরূপে নদ, নদী, হ্রদ, ঝর্ণা, বৃষ্টি হ'য়ে যেমন সমুদ্র সন্তানরূপে বহে, যেমন আবার মাতৃত্বে বিলীন হয়, তেমনি ভারতীয় জ্ঞান-গরিমায়, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, শত সহস্ররূপে এই বিশ্বে বিকশিত হ'য়ে যেন আধুনিকারা অতল সাগরের মতই রত্নগর্ভা হয়ে বিশ্বে বিরাজ করুন। তবেই হবে আধুনিকতার চরম উৎকর্ষ, চরম ও পরম নারীত্বের অতুলনীয় আধুনিকতা।

এই আধুনিকতা পাশ্চাত্ত্যের দু'এক logyতে আসবে না। আসবে বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর হৃদয়-জ্যোতিঃ বিবেকানন্দের মানস চক্ষে দেখা ভারতীয় নারীর আদর্শবাদ থেকে। সেই যে ভারত-ললনাদেরকে উদ্দেশ ক'রে যুব সন্ন্যাসীর উদাত্ত আহ্বান:— "হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

ভারত সবই ভুলে গেছে। আত্মভোলা শঙ্কর হ'য়ে আজ সকলেই গরল পান ক'রে চলেছে। কিন্তু জাতিকে আজও প্রাণময় করতে পারে শক্তিস্বরূপিণী শক্তির আধার ভারতীয় নারীজাতি। সন্তান পথভ্রষ্ট হ'লেও, মাতৃজাতি কিভাবে তাঁদেরকে আধুনিক ভাবে, কিভাবে সন্তানকে পরিচালিত করবেন, এ চিন্তা তাঁদেরকেই করতে হবে। নইলে পশুমাতা হ'য়ে সন্তান সমেত শিকারীর গুলীতে নিহত হ'তে হবে।

ভারতের নারী সর্ব্বতোভাবে ভারতীয়া, ভারতীয়ভাবসম্ভবা, সিন্ধুপারের বিদেশিনী নয়—অ-ভারতীয় জীবনাদর্শে প্রভাবিতা হইলে ছিন্নমূলা লতার ন্যায় বিশুষ্কা; বিশীর্ণা, মৃতকল্পা ও পরিশেষে পর্য্যবসিতা হইয়া সমাজে মহতী বিনষ্টির কারণ হইবে—এই অথণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত মননশীল প্রবন্ধটির যুগোপযোগী সতর্কবাণী শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠার সহিত শ্রুত হউক, শ্রবণান্তে জীবনে অনুশীলিত ও সমাচরিত হউক। যে মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হউক ভারতীয়া নারী।

দ্বিতীয় স্বজন

নচিকেতা ভরদ্বাজ

সেদিন আকাশে কোনো মেঘ ছিল,—মেঘের কী যে রঙ ছিল—
আজ কিছু মনে নেই তার!

হাওয়ায় প্রান্তর ছিল। অশথের ডালে মনে আছে
পাতারা কাঁপছিল সুখে। ঝিলের নরম জলে রূপোলী দুপুর
কয়েকটি ঢেউ তুলে নূপুর বাজিয়ে গেছে!
আকাশের আলোর বিস্তার
ক্রমেই প'শ্চিমে চলে, তুমি এলে গান-গান কথার সুদূরে
দু ঠোঁটে বাজিয়ে ধীরে,—শেষ ধাপে বসলে এসে
যেখানে নির্জন জলে বর্ণ ফলিয়াছে।

কবিতা পড়লাম আমি তুমি শুনলে তন্ময় হয়ে!

আমার দৃষ্টির মোম দীপ হয়ে জ্বলে থাকল, আর এক সত্তার গভীরে
সমস্ত দৃষ্টের রঙ, আঁকা থাকল আকাঙ্ক্ষার জলে।
তুমি কি জেনেছ কিছু,—অথবা জানোনি। মৌন সম্পদ বিজয়ে
আমি তবু অন্ধকার! সময়ের অতল তিমিরে
সব মুছে গেল তবু-সমুদ্র ভনব আমি সেদিনের পূর্বের কল্লোলে।
(এমন যে এমন হয়? প্রেম কেন পূর্ণতা খোঁজে
আর এক জনের ঠিক বুকের ভিতরে?)

কয়েকটি তির্যক রশ্মি পড়েছে পায়ের কাছে। কী একটা পাখীর হৃদয়
ডাকছে শিরীষ গাছে। পাতা পড়লো অশথের থেকে।

তুমি একটু নড়ে বসলে। আলতো দুটি মৃদু হাত বইয়ের উপরে
বললে, "খাতাটা দেখব?"···জেগে থাকল শুধু একটি স্নিগ্ধ পরিচয়
সব প্রশ্ন মুছে গিয়ে। অথচ একটি মুখ অপর মুখের কাছে
বিস্ময়ে—বিবেকে
কী গভীর অন্ধকার! কেউ কাউকে চেনেনা এ সময়ের বাড়ে।

পরিচয় প্রাণ পেল। দুজনের মুক্ত পথ তারপর কত এঁকে বেঁকে
একক অদ্বৈত হল। তবু মনে হয় আজো নির্জন প্রহরে··
তোমাকে আশ্চর্য লাগে। মানুষ কী করে পায় মানুষের মন
কী করে দুচোখ জানে আর দুটি চোখের আহ্বান,
কী করে মনের মুখ দেখা যায় আর এক মনের আয়নায়··
—একথা ভেবেছি আমি—একক অদ্বৈত এই ভালোবাসা
কেন তবে খুঁজে মরে আর এক দ্বিতীয় স্বজন?
কারণ এ জীবনই যে আর এক জীবনের নাম?

মায়ের ছেলে

(অপ্রকাশিত নাটক)

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
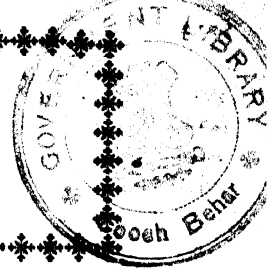
প্রস্তাবনা

(গান)

জননী, ত্রাহি, ত্রাহি, ত্রাহি,
ত্রাস-রুদ্ধকণ্ঠ শঙ্কিত ভাষা
নাহি আলো নাহি আশা
কিছু নাহি নাহি নাহি—
কেমনে জননী তব ভক্ত মহিমা-
গাথা গাহি।
গেছে সত্য ধর্ম্ম ত্রেতা দ্বাপর দ্বিপাল ধর্ম্ম
কলিকাল কবলিত পুণ্য ভারত ভূমি
লুপ্ত সকল কুলকর্ম্ম।
জানি না জননী আর কার মুখ-চাহি
অলস জীবন-ভার বাহি।
কে আমি জানি না কোথায় বসতি ঘর,
চির পর-প্রত্যাশী চিনি না আপন পর,
রোগ শোক জর্জ্জর, কামিনী-কিঙ্কর
পাহি, পাহি, মাগো পাহি,
তব করুণা-সলিলে অবগাহি,
তব ভক্ত মহিমা—গাথা গাহি।

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীভবদেব সিদ্ধান্তের বাড়ীর অন্তঃপুর।
(ঠাকুরঘর হইতে উগ্রচণ্ডামূর্ত্তিতে শ্রীমত্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর দরদালানে প্রবেশ)

সিদ্ধেশ্বরী। ও মা অপর্ণা, অপর্ণা, ওরে ও-মুক্তকেশী—ওরে তোরা সব কোথায় গেলি। একবার দেখ, দেখ, চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ।

(একঘড়া জল কক্ষে লইয়া কন্যা অপর্ণা (গৃহিণী) প্রবেশ করিলেন)

অপর্ণা। (সুর করিয়া গঙ্গাস্তব পাঠ)

বন্দমাতা সুরধুনী　　　পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত-পাবনী পুরাতনী,
বিষ্ণুপদে উপাদান,　　　দ্রবময়ী তব নাম
সুরাসুর নরের জননী।
ব্রহ্মা কমণ্ডলে বাস,　　　আছিলা ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী,
জীবে দেখি দুরাশয়　　　নাশিবারে ভব ভয়,
অবনীতে অবতীর্ণা হইলে আপনি।

সিদ্ধেশ্বরী। বলি শুনছিস, না কানের মাথা খেয়েছিস?

অপর্ণা। (হস্ত সঙ্কেত করিয়া নিষেধ)—আঃ

(দালান হইয়া ঠাকুরঘরের ভিতরে গেলেন, ঠাকুরঘরের অন্য দোর দিয়া শ্রীমান গজেশ বাহির হইল)

সিদ্ধেশ্বরী। বলি তোদের এটা বামনবাড়ী না চাঁড়ালের বাড়ী? জাতজন্ম বলতে যে আর কিছুই রইল না। নৈবিদ্যি এঁটো করে খায়, এমন তো কখন দেখিনি বাপু।

গজেশ। (মুখ ভেঙ্গাইয়া) এই বুড়ি থুথুড়ি!

সিদ্ধেশ্বরী। এই, এই, কি দস্যি ছেলেগো, এর ঠাকুর দেবতা বলে ভয় নেই।

গজেশ। না নেই। চোখ বুজিয়ে গালে মুখে চড়িয়ে ববম্ ববম্ করলেই বুঝি পুজো হয়। যখন ভৈরব এসে তোমার ঘাড় মটকে দেবে তখন মজাটি টের পাবে।

সিদ্ধেশ্বরী। যত বড় মুখ না তত বড় কথা, ভৈরব আমার ঘাড় মটকাবে। আর তোরে বুঝি কোলে নিয়ে নাচবে। আমার মহাদেব ফিরিয়ে দিয়ে যা, ফিরিয়ে দিয়ে যা বলছি।

গজেশ। না, তুই আমার হাত থেকে খাবার কেড়ে নিলি কেন?

সিদ্ধেশ্বরী। ঠাকুরের নৈবিদ্যি খেলে যে মরবি হতভাগা।

গজেশ। হ্যাঁ মরবো, ঠাকুর বুঝি মানুষ মারে? তবে মানুষ যখন তখন ঠাকুরের নাম করে কেন? ঠাকুরকে ডাকে কেন, আমার মা বলে গিয়েছে, ঠাকুর কাউকে মারে না, আমার বাবার সঙ্গে ঠাকুরের কত ভাব ছিল। ঠাকুর আমাদের আপনার লোক।

সিদ্ধেশ্বরী। দে আমার ঠাকুর দে, ছেলে মুখে বুড়োর হাড় জ্বালানো কথা।

গজেশ। তোকে দেব না, তুই পুজো করতে জানিসনে। ঠাকুরের মাথায় ফুল দিয়ে লাউশাকের মাচা ভাবিস।

(অপর্ণার প্রবেশ)

অপর্ণা। গজেশ।

গজেশ। (নিরীহ ভাল মানুষটির মতো) কেন?

অপর্ণা। তোর হাতে ও কি?

গজেশ। মাটির ঢেলা।

অপর্ণা। তুই আমার মাকে গালাগাল দিয়েছিলি?

গজেশ। (মাথা নাড়িল)

সিদ্ধেশ্বরী। গালাগালি দিসনি, মিথ্যুক কোথাকার।

গজেশ। লাউ গাছের মাচা বুঝি গালাগাল।

অপর্ণা। তুমি চুপ করো মা। তুই আমার মায়ের শিবঠাকুর তুলে এনেছিস?

গজেশ। বুড়ি যে আগে আমায় গালাগাল দিল।

অপর্ণা। তুই ঠাকুরদের নৈবিদ্যি চুরি করে খেয়েছিস?

গজেশ। চুরি করিনি ঠাকুরকে বলে খেয়েছি।

অপর্ণা। ঠাকুর খেতে বলেছিলেন?

গজেশ। বারণ করেনি তো।

অপর্ণা। স্নান করেছিলি?

গজেশ। না।

সিদ্ধেশ্বরী। ঐ শোন, নিজের মুখে গুণের সব কথা শোন মা। চান করবে। এড়া কাপড়ে খায়, চাঁড়াল চাঁড়াল।

অপর্ণা। মা—তুমি থাম। সন্ধ্যে-আহ্নিক করেছিলি?

গজেশ। (মাথা নাড়িল) আমার মন্ত্র মুখস্থ নেই।

অপর্ণা। এতগুলি ব্রাহ্মণের ছেলে এ বাড়ীতে রয়েছে তাদের কাউকে মন্ত্র পড়িয়ে দিতে বললিনে কেন?

গজেশ। কেউ মন্তরের মানে বলে দিতে পারে না।

অপর্ণা। তোর পৈতে কই?

গজেশ। (দেখিল সত্যই গলায় পৈতা নাই) বাঃ রে আমার পৈতে কোথায় গেল? ঐ বুড়ি আমার পৈতে লুকিয়ে রেখেছে। শিগ্‌গীর আমার পৈতে ফিরিয়ে দাও। নইলে ভাল হবেনা বলছি।

অপর্ণা। তোর পায়ের কাছে দেখ দেখি ওটা কি?

গজেশ। (বুড়ির প্রতি) আমার পৈতে আর লুকিয়ে রাখতে হয় না। (কুড়াইয়া গলায় দিল)

অপর্ণা। তুই আমার মাকে বুড়ি বলিস কেন?

গজেশ। বুড়িকে বুড়ি বলবো না তো কি বলবো?

অপর্ণা। দিদিমা বলবি। দে মায়ের শিব ঠাকুর ফিরিয়ে দে। (ফিরাইয়া দিল) মা তুমি যাও চন্দন ঘসগে আমি নতুন নৈবিদ্যি তৈরী ক'রে দিচ্ছি। [সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান] ওরে মুক্ত। (গজেশের প্রতি) এইদিকে আয়, আমার কাছে বোস। (গজেশ বসিল) হ্যাঁরে তোরে এত করে বুঝিয়ে বলি, ও রকম অনাচার করিস্‌নি। ব্রাহ্মণের ছেলে সকালে উঠে গঙ্গা নাইবি, সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্ব্বি, পুজো কর্ব্বি, তারপর তোর মামার কাছে পড়বি, তবে তো ওঁর মতো পণ্ডিত হবি।

গজেশ। আমি পণ্ডিত হবোনা। মামীমা—তোমার পায়ে পড়ি মামীমা তুমি মামাকে বুঝিয়ে বল, মামা যেন আমায় পণ্ডিত করে না দেয়।

অপর্ণা। কেন রে, ব্রাহ্মণের ছেলে পণ্ডিত হবি না কেন? পণ্ডিতের কত মান। দেখছিস তো তোর মামাকে, বড় বড় রাজা জমিদার সদাগর সবাই এসে ব্যবস্থা নেয়, কত খিদেয় দেয়। দেশ-বিদেশের কত লোক তোর মামাকে মানে চেনে, ওঁর মতো হতে তোর ইচ্ছে হয়না?

গজেশ। না—

অপর্ণা। পণ্ডিত হবিনে তো কি কর্ব্বি? একটা কিছু করতে হবে তো।

গজেশ। আমার মুর্খ হতে ইচ্ছে হয়। সত্যি মামীমা আমি মুর্খ হয়ে তোমাদের সঙ্গে ভাত রাঁধবো, কুটনো কুটবো। রাখালদের সঙ্গে মাঠে গরু চরাব, গাছ থেকে ফল পেড়ে খাব। বেশ মজা হবে।

অপর্ণা। হ্যাঁরে তুই বলিস কি? এতবড় পণ্ডিতের ভাগ্নে হয়ে তুই মুখ্যু হয়ে থাকবি। লোকে যে আমায় দুষবে, বলবে, গজেশের মামী গজেশকে সংসারে খাটায়, তাই ওর লেখাপড়া হলনা। তোর মা মরবার আগে তোকে যে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছে, দুষ্টুমি কোরোনা লক্ষ্মীবাবা, ভাল করে লেখাপড়া শেখ।

গজেশ। মায়ের কথা তোমার মনে আছে মামীমা?

অপর্ণা। তা আর নেই, যেবার মারা গেল, সেইবার পুজোয় এখানে এলো, আহা কত দুঃখু করতে লাগল, সেইবারই তো বলেছিল, আমি যদি মরি তুমি আমার গজেশকে দেখো বৌ।

গজেশ। মায়ের সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল মামীমা?

অপর্ণা। আমি তাকে ননদ ভাবিনি। সে আমার ছোট বোন ছিল, যাও বাবা যাও, গঙ্গা নেয়ে এসে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নাও। এখনি তোমার মামা টোলে গিয়ে বসবেন।

গজেশ। আমি এখানে বসি মামীমা। তুমি আমার কাছে বসে মায়ের গল্প বল আজ আর খেলতে যাব না। আচ্ছা আমার মা কেমন দেখতে ছিল বলতো? খুব ভাল? না? আমার একটু একটু মনে পড়ে, মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট দেখি, আবার গণ্ডগোল হয়ে যায়, তুমি বল।

অপর্ণা। সে আর একদিন বল্‌বো, তোমার মামার আসবার সময় হল, এখুনি টোল বসবে, তুমি যাও বাবা নেয়ে এসো, মন দিয়ে পড়াশুনো করগে।

(বৈরাগী বাউলের প্রবেশ, সঙ্গে নারী)

বাউল। দুটো ভিক্ষে পাই মা, একটা গান শোনাবো?

অপর্ণা। শোনাও—

(গান)

গুরুমশায় পায়ে ধরি লেখাপড়া শিখিওনা আমায়—
তোমার বিদ্যা তোমাতে থাক্‌ ওবিদ্যা দিওনা আমায়—
(অবিদ্যা দিওনা আমায়)।

মুখ্যু ছেলে হয়ে আমি চরাব ধেনু,
সাঁজের বেলায় কদমতলায় বাজাব বেণু,
ধুলো ঝেড়ে মা জননী বল্‌বে গোপাল কোলে আয়।
খাওরে ননী যাদুমণি রোদ লেগেছে সোনার গায়।
সকাল বেলা বাজবে শিঙ্গা ঢোল, বল্‌বে সবাই
গা তোল গা তোল।

দিয়ে ক্ষীর নবনী (আমায়) সাজিয়ে দেবেন মা জননী—
পীতধড়া মোহন চূড়া, হাতে বাঁশী মুখে হাসি,
বাজন নূপুর পায়।

(সদ্যস্নাত ভবদেব সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

ভিক্ষা লইয়া বাউল চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধান্ত মশায় তাহাকে যাইতে নিষেধ করায় সে দাঁড়াইল।

গজেশ মামাকে দেখিয়া সকলের অলক্ষ্যে চলিয়া গেল।

ভবদেব। ওহে গায়ন শোন, শোন, তোমার একি গান? প্রাকৃত রসের গান, না অপ্রাকৃত রসের গান?

বাউল। আমি অত শত জানিনে ভটচার্য্যি মশায়—

ভবদেব। না, না, আমি তোমায় অতি সহজ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছি। যে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর আজীবন মূর্খ হয়ে থাকবেন সঙ্কল্প করলেন, বস্তুতঃ তিনি কি প্রাকৃত মনুষ্যসন্তান, না অপ্রাকৃত কিশোর কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি কার কথা বলছ?

বাউল। আমি আসি পণ্ডিতমশাই।

ভবদেব। না, না, শোন, এখানে মূর্খ শব্দটি কবি কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন, শব্দটি ভাব-বাচক না অভাব-বাচক? যদি অভাব-বাচক হয়, তাহলে অপ্রাকৃত কিশোর সম্বন্ধে সে শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি সর্ব্বরসের কল্পতরু, তিনি যে মূর্খতা কামনা করেন সে অবস্থা বিদ্যার অভাব নয়, সর্ব্ববিদ্যার পূর্ণতা, মহাবিদ্যা।

বাউল। আমি আপনার কথা বুঝতে পাচ্ছিনা পণ্ডিত মশাই, আমি এখন আসি। (প্রস্থান-উদ্যত)

ভবদেব। না, না শোন তোমার এ গানে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে।

অপর্ণা। না গো বাছা তুমি যাও। (বাউলের প্রস্থান)

ভবদেব। আহা—কেন ওকে যেতে বললে, কেন? ওর কাছে আমার প্রশ্ন আছে। সত্যই আমি তত্ত্বটি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত ঠিক সিদ্ধান্ত করতে পাচ্ছি না।

অপর্ণা। ও গরীব মানুষ একা তোমার বাড়ীতে ভিক্ষে করলে ওর চলবে?

ভবদেব। আজ না হয় এখানেই আহারাদি কর্ত্ত। দেখলে না গানটির মধ্যে কোথাও কৃষ্ণচন্দ্র কি যশোমতীর নামোল্লেখ নাই। অথচ পীতধড়া, মোহনচূড়া, সর-নবনীর কথা রয়েছে—তারপর এ গুরুমশায় কে? ইনি কি পৌরাণিক সন্দীপনিমুনি।

অপর্ণা। ও বাউল তোমার মত ন্যায়শাস্ত্র পড়ে গান গায় না, তুমি তর্ক করলে ও পারবে কেন?

ভবদেব। না, না, আমিতো তর্ক করছি না। সিদ্ধান্ত আমি নিজেই কোর্ব্বো, আমি শুধু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলাম।

অপর্ণা। ওকথা থাক্। তুমি গজেনের পড়ার কি ব্যবস্থা করছ তাই বল।

ভবদেব। গজেশ, শুনেছি ওর বুদ্ধি খুব প্রখরা তবে পাঠে তেমন মন নেই।

অপর্ণা। শুনেছ কি গো, তুমি নিজে ওকে পড়াওনা?

ভবদেব। ওতো এখন ব্যাকরণ পড়ে, আমার অধ্যাপনা ঠিক বুঝতে পারবে না, তাই আমি ভূতনাথের উপর ওর পড়ানোর ভার দিয়েছি—সেই মাঝে মাঝে বলে গজেশের তেমন অভিনিবেশ নেই।

অপর্ণা। ভাল করে পড়ালে পড়বেনা তেমন ছেলে তো ও নয়। ভূতনাথ ওকে পড়াতে পারে না, তাই ও মন দেয় না। তুমি নিজে পড়িয়ে শুনিয়ে ওকে একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির পণ্ডিত করে দাও, আমি কুলক্রিয়া করে একটা সুন্দর বউ ঘরে আনি।

ভবদেব। ও! তাই বল, তোমার শাশুড়ী হবার সাধ হয়েছে।

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। বাবা! তোমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা হয়েছে। মা! উনুনে ধরিয়ে দিয়েছি, এস।

ভবদেব। হ্যাঁরে গজেশ কোথায় গেল রে?

মুক্তকেশী। আমি পুকুরে চাল ধুতে গিয়েছিলাম, দেখে এলাম গজেশ সেই বাউলটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

ভবদেব। সে কি! ব্রাহ্মণের ছেলে বাউলের সঙ্গে ফিরবে কেন?

অপর্ণা। হ্যাঁ, ওর যেমন কথা, বাউলের সঙ্গে ফিরছে, ভাল লেগেছে তাই গান শুনছে বল্।

মুক্তকেশী। না মা—আমি কত ডাক্‌লাম, আমার কথা শুন্‌লো না।

অপর্ণা। তুমি তাহলে কাউকে খোঁজ নিতে পাঠাও।

ভবদেব। আমি এখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করব, না, গজেশের সন্ধান করব, এদিকে বেলা হয়ে—ওহে ভূতনাথ।

(নেপথ্যে—আজ্ঞে যাই ভটচার্য্য মশায়) (ভূতনাথের প্রবেশ)

ভূতনাথ। আমায় কিছু আজ্ঞা করছেন কি?

ভবদেব। গজেশ কোথায় একটু সন্ধান করোতো বাপু।

ভূতনাথ। আজ্ঞে তার কথা ক'দিন থেকে আপনাকে বলবো মনে করেছি, পাছে আপনি রাগ করেন সেই ভয়ে বলিনি।

ভবদেব। যা বলবার পরে বোলো, এখন তার খোঁজ করো, যেখানে থাকে সেখান থেকে তাকে নিয়ে এস।

ভূতনাথ। আপনার গজেশ যেমন অবাধ্য তেমনি দুষ্টু, তেমনি অনাচারী, আমি কিছুতেই ওকে পেরে উঠিনে।

ভবদেব। এখন আমি তোমার কোন অভিযোগ শুনবো না, আগে সে দুর্বৃত্তকে চতুষ্পাঠীতে নিয়ে এসো, তারপর তার অনাচার সম্বন্ধে বিচার হবে।

ভূতনাথ। যদি আমার কথায় না আসে?

ভবদেব। তোমার সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে যাবে, তাকে ধরে আনবে, বেঁধে আনবে।

ভূতনাথ। আপনার অনুমতি পেয়েছি, এখন আমিই ওকে শাসন কর্ত্তে পারবো।

অপর্ণা। তুমি ভাল মুখে আসতে বোলো, সে আসবে না কেন, নিশ্চয়ই আসবে।

ভূতনাথ। আপনি ওকে জানেন না, মা, ও ভয়ানক ছেলে, আপনার কাছে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে বলে আপনি ভাবেন ও তেমন দুষ্টু নয়।

অপর্ণা। নিজের ভাই দুষ্টু হলে তার সঙ্গে যেমন ব্যাভার কর—দুটো কড়া কথা বললে, আবার একটু কোলে টানলে।

ভূতনাথ। আমার ভাই যদি ওরকম হয়, আমি এমন মার দিতাম, তার হাড় একদিকে, মাস একদিকে হত, মায়ের কাছে সবাই জব্দ।

ভবদেব। ওহে ভূতনাথ, তুমি এরকম প্রহারের পক্ষপাতী তাতো আমি জানতেম না, আমি তোমায় যে দু'একটি ছাত্রের পড়ার ভার দিই, তাদের তুমি তাড়না কর, প্রহার কর—আচ্ছা যাও, আগে গজেশকে নিয়ে এস, যদি না আসে ধরে আনবে, সহসা প্রহার কোরো না, বুঝেছ?

[ভূতনাথের প্রস্থান।

অপর্ণা। এই রকম পণ্ডিতের কাছে তুমি গজেশকে পড়তে দিয়েছ? ও ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

ভবদেব। তাইতো দেখছি, ছাত্রটি মেধাবী কিন্তু ওর প্রকৃতি যে এতখানি রাজসিক, তাতো আমার জানা ছিল না।

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। আমি দেখেছি বাবা, ভূতনাথদা গজেশকে যখন তখন মারে।

ভবদেব। তুই থাম্ ছুঁড়ী, ও আবার রসান দিচ্ছে, তোমার ভাইটিও বড় সোজা ছেলে নয়।

মুক্তকেশী। গজেশের মুখ ভারি আল্গা, ও যা খুসী তাই গালাগাল দেয়, নৈবিদ্যি চুরি করে খেয়েছিল, তাই দিদিমা ওকে বকেছিলেন, দিদিমাকে কত গালাগাল দিলে।

অপর্ণা। তোর এরকম স্বভাব কেন হচ্ছে, আমায় বলতে পারিস্, এর কথা ওকে, তার কথা আর একজনকে, এক কথা পাঁচ জনকে পাঁচরকম করে লাগাস্ কেন, বলতো ?

ভবদেব। কি করে বল। কাজ-কর্ম্মতো কিছু নেই, ভাত হজম করা দরকার তো। পাড়ায় কি কি ঘটনা ঘটেছে একবার খবর নিয়ে এসোতো মা, মুখুজ্যেদের বড়বৌ আর ছোটবৌতে পরশুদিন দুপুর বেলা যে কলহ হয়ে গেছে, তার ফলাফলটা শুনিয়ে দিয়ে যাও।

অপর্ণা। তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করবে না ?

ভবদেব। আমার সন্ধ্যা-আহ্নিক ও একরকম বিড়ম্বনা বললেই হয় গৃহিণী। শাস্ত্র-ব্যবসায় দিয়েছেন, তবু এমনি মায়ের খেলা, পরমতত্ত্ব বিচার—তাও অদৃষ্টে নেই। সেখানেও দশজনের জন্য শুধু বস্তু আর পদার্থের বিচার, কেউ একবার বলেও না ঠাকুর এই তত্ত্ব বিচার কর, এই রস বিচার কর। শুধু পদার্থ—পদার্থ আর পদার্থ। বুঝেছ ব্রাহ্মণী—এই পদার্থ বিচার করে দিন দিন অপদার্থ হয়ে গেলাম।

(ভূতনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ভূতনাথ। ভট্চায্যি মশায়।

ভবদেব। কিহে তুমি গজেশের খোঁজ কর্ত্তে যাওনি ?

ভূতনাথ। আমি সন্ধান নিয়ে জানলাম, ও-পাড়ার এক চণ্ডালের ছেলে ওলাওঠায় মারা গেছে, তাদের শব বইবার লোকের অভাব পড়ে। গজেশ চণ্ডালের শব নিয়ে শ্মশানে গেছে।

ভবদেব। হা জগদম্বা, কি সর্ব্বনাশ, চণ্ডালের শব নিয়ে শ্মশানে গেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডালের শব নিয়ে গেল। কোন্ চণ্ডাল ?

(মুক্তকেশীর প্রবেশ)

মুক্তকেশী। পাঁচু গয়লা বলে গেল, যজ্ঞেশ্বর চাঁড়ালের ছেলে বিষ্টু মারা গেছে।

অপর্ণা। দুধের ছেলে, চাঁড়াল মিনষেরা কি বলে তাকে নিয়ে গেল ?

মুক্তকেশী। তারা যেতে বলেনি, গজেশ ইচ্ছে করে গিয়েছে।

ভবদেব। তোমার কাছে সব খবরই আসে দেখছি।

মুক্তকেশী। আমি তো আর পাড়ায় যাইনি, পাঁচু বলে গেল যে, তোমার কাছে কথা বলতে সাহস করে না, তাই আমার কাছে বলে।

ভূতনাথ। এখন আমি কি করবো বলুন ?

ভবদেব। বলবো আমার মাথা আর মুণ্ড।

ভূতনাথ। শ্মশানঘাট থেকে তাকে ধরে নিয়ে আস্‌বো ?

অপর্ণা। তাই যাও—একে ওলাওঠা ব্যায়রাম তার উপর চাঁড়ালের মড়া, ওই কচি ছেলে।

ভূতনাথ। তার উপর আজ শনিবার চতুর্দ্দশী রাত্রে অমাবস্যা।

ভবদেব। আরো কি কি সংযোগ হয়েছে পাঁজি-পুঁথী দেখে আমায় বল।

অপর্ণা। আর পাঁজি-পুঁথী দেখতে হবেনা, তুমি যাও বাবা তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ভবদেব। না, না, তা হয়না গৃহিণী—শবানুগমন করেছে দাহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্মশানঘাটে থাকতেই হবে।

অপর্ণা। সমস্তদিন খাওয়া হবেনা যে।

ভবদেব। তা আর কি কর্ব্বে বল ? যেমন অবাধ্য সন্তান। তার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডালের শব বহন করেছে, সমাজে জাতিচ্যুত না করে।

অপর্ণা। হাঁ জাত-পাত করবে না আরো কিছু। গঙ্গায় ডুব দিলেই শুদ্ধ হবে।

ভবদেব। তুমি তো এক কথায় মীমাংসা করলে। আমি তো আর পারবো না—আমায় এখন সমস্ত প্রায়শ্চিত্তবিধিটি তন্ন তন্ন করে বিচার কর্ত্তে হবে। নারায়ণ পুজোর অবকাশ নেই। সন্ধ্যাহ্নিকে মন দিতে পারিনে। এখন যাই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি ওলটাই গিয়ে, সে প্রকাণ্ড গ্রন্থ, অন্য নৈয়ায়িকদের নিমন্ত্রণ করি। এখন পাঁচ সাতদিন এই তর্কই চলল আর কি, হা মহামায়া, খেলাঘর বেঁধেছ বটে।

(বিষকম্ভক)

গায়িকা। বড় মজার খেলাঘর—

পঞ্চভূতে হাসে-কাঁদে কেউ সাজে বউ

কেউ সাজে বর।

(আমি) অন্ধি সন্ধি পাইনে খুঁজে

কে জানে কে কারিকর।

নব দ্বারে নয়টি দ্বারী

নিশানধারী চলব ভারি,

করে পায়চারি—

(শুধু) কর্ত্তা কোথায় শুধাইলে

বলে জানিনে খবর।

এঘরের ঘরণী যিনি

নাম শুনি তাঁর মহামায়া,

কৈলাসেতে শিবের বামে

কাশীধামে স্বর্ণকায়া,

সবাই চায় তাঁর শ্রীচরণ-ছায়া—

এখন তিনি থাকেন না ঘরে

শ্মশানে মশানে নাচেন শবের উপরে,

তাঁর চরণ ধরে আনতে ঘরে

ঘর ছেড়েছেন ভূতেশ্বর,

সেই অবধি ভূতের বাসা হয়েছে এ ঘর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্মশান ভৈরব ঘাট।

বৈরাগী, গঙ্গেশ, অদূরে বৈরাগীর সহধর্ম্মিণী মহামায়া।

(বৈরাগী গঞ্জিকা সেবন করিতেছিলেন।)

বৈরাগী। তুই আমার সঙ্গে এখানে এলি কেন?

গঙ্গেশ। তোমার সঙ্গে আসিনি আমি মড়া পোড়াতে এসেছি।

বৈরাগী। তুই এইটুকু ছেলে তুই আবার মড়া পোড়াবি কি? তুই আমার কাছেই এসেছিস, কেন এলি?

গঙ্গেশ। তোমার গান আমার ভাল লাগল যে।

বৈরাগী। মড়া পোড়ান হয়ে গেছে?

গঙ্গেশ। চিতেয় তুলে দিয়েছি।

বৈরাগী। কে মরেছে, মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে?

গঙ্গেশ। যোয়ান ব্যাটাছেলে।

বৈরাগী। বাপ আছে?

গঙ্গেশ। আছে, বুড়ো।

বৈরাগী। কাঁদছে?

গঙ্গেশ। ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছিল।

বৈরাগী। হুঁ:। আর কে আছে?

গঙ্গেশ। মা আছে। বউ আছে। ছেলে আছে।

বৈরাগী। সবাই কাঁদছে?

গঙ্গেশ। আছাড়ি পিছাড়ি করে কাঁদছিল এখন মাঝে মাঝে কাঁদছে?

বৈরাগী। তিনমাস পরে আর কাঁদবে না, ছ'মাস পরে ভুলে যাবে। আজ খুব কাঁদছে, না?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ, কান্না দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল।

বৈরাগী। (গাঁজার কলিকা দিয়া) এই নে খা।

গঙ্গেশ। আমি খাইনে।

বৈরাগী। তবে রেখে দে, চিতেয় শুইয়েছে কেমন আছো। (একতারা বাজাইয়া গান ধরিল)

(গান)

কে গো তুমি অঙ্গ মেলে শুয়েছ চিতায়।
(তুমি) আজ সকালে বলেছিলে
ঘর ছেড়ে যাবে না কোথায়।
ঘরে তোমার কতই আকিঞ্চন
সাধ করে অষ্ট অঙ্গে নিয়েছ বাঁধন।
(তোমার) ক্ষেত খামার রইল পড়ে গোলা ভরা ধান,
কার উপরে করলে অভিমান।
(আজ) আসবো বলে চলে গেলে
বলে গেলে না কোথায়।
(তোমার) মা কাঁদে, বাপ কাঁদে
কাঁদে তোমার ছেলে।
প্রাণপ্রিয়া পত্নী কাঁদে
বলে কোথা যাও গো আমায় ফেলে।
তুমি কারো কথা শোন না যে, এ'কি ঘুমে পেল তোমায়।

(গানের সময় পুত্র-শোকাতুর যজ্ঞেশ্বর আসিল)
গান শেষ হইলে বৈরাগীর পায়ের ধূলা লইল।

যজ্ঞেশ্বর। এখন আমি কি করি বলত ঠাকুর?

বৈরাগী। তুমি কে বাবা?

যজ্ঞেশ্বর। আমি যজ্ঞেশ্বর চাঁড়াল।

বৈরাগী। তোমার ছেলে?

যজ্ঞেশ্বর। হ্যাঁ বাবা-ঠাকুর, জল-জ্যান্ত যোয়ান ছেলেটাকে চিতেয় তুলে দিয়ে আলাম।

বৈরাগী। ঐ বিছানায় তো সবাইকেই একদিন শুতে হবে।

যজ্ঞেশ্বর। আজ যদি আমি শুতে পার্ত্তাম, তাহলি তো কথা ছেল না। মাগী মুচ্ছো গিয়েলো। আমার অমন লজ্জাশীলে বউ ঘরের লক্ষ্মী কখনো কারো সামনে বেরোয় না। আমার পায়ের উপর পড়ে বললে তোমরা ওরে কোথায় নিয়ে যাও, নিজেই নিজের চোখের জল মুছি, মনরে বলি, মন তুমি শক্ত হও। আমি আমাদের ওনাদের শান্ত করি।

বৈরাগী। কি বলে শান্ত করলে?

যজ্ঞেশ্বর। ঐ আপনি আমারে যে কথা বললে, আমিও তাঁনাদের সেই কথাই বললাম। একদিন সবাইকেই যাত্তি হবে, তুমি যাবা, আমিও যাবা, তবে দুদিন আগু আর দুদিন পাছু।

বৈরাগী। এইতো তুমি আসল কথাটি বুঝেছ বাবা।

যজ্ঞেশ্বর। না বাবা বুঝিনি কিছু, ও মুখের কথা বাবা, শুনে শেখা, পাঁচজনে বলে আমিও বলি, এখন তো মনে হচ্ছেনা আমি মরবো।

বৈরাগী। আমি আর তোমায় কি শেখাব বাবা! আমিও তোমার মতো আসল ব্যাপার কি কিছুই জানিনে। তুমি ক্ষেত খামার কর, কেউ সংসার করে, কেউ টোল করে, ছাত্র পড়ায়, আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করি।

যজ্ঞেশ্বর। না বাবা-ঠাকুর, আমায় ছলনা করোনা, তুমি তো পেটের দায়ে বৈরাগী নও বাবা। তুমি গান কচ্ছিলে আমার প্রাণ শীতল হয়ে গেল, কত বৈরাগীর গান শুনেছি, এরকম তো শুনিনি।

বৈরাগী। তোমার পরিবার মূর্চ্ছো গিয়েছে, আহা মার প্রাণে বড় লাগে—তোমার পরিবারের তুলনায় তোমার শোক কিছুনা। সে ভুলতে পারবে না। মনে হয় আর পাঁচটার মুখ চেয়ে ভুলবে। ভোলে না। মায়ের শোক কি সোজা শোক বাবা। বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন, দশ মাস পেটে জায়গা দিয়েছে, বিইয়েছে, তিল তিল করে এইটুকু রক্তের দলাকে অতবড় যোয়ান করেছে। তারপর যমের হাতে তুলে দিয়েছে। আমার মা আমার দিদিকে দিয়েছিল। দিয়ে আর ওঠেনি। সেই শোওয়াই শেষ শোওয়া। দিন পনের পরে মাকে চিতেয় তুলে দিলাম, সেই থেকে আর ঘরে যাইনি। মাগী বললে আমায় কোথায় রেখে যাবে? আমি বললাম সাহস থাকে সঙ্গে এসো। স্বামী স্ত্রী-তে ভিক্ষা করি, কত লোকে কত বলে। বলুকগে।

যজ্ঞেশ্বর। তুমি তাহলে দুঃখ পেয়েছ বাবা-ঠাকুর।

বৈরাগী। দুঃখু পায়নি, এমন একটা লোক দেখাতে পার? পারবে না বাবা। বাড়ী যাও, পরিবারকে যত্ন করো। আর একটি দিনও রাগ করে পরিবারকে কড়া কথা বোল না।

যদি কখনো কিছু অন্যায়ও করে মনে করো যে ছেলেকে চিতের শুইয়ে দিয়েছ সে তার মা, মা—মা—বড় সহজ জিনিষ নয় সব মাই এক। আমার মাকে বলো তার ছেলে মরেনি, এ মায়ের কোল ছেড়ে সেই মায়ের কোলে গিয়েছে। মায়ের কতখানি মমতা জান ?

গান (বিভাষ)

তুমি আসবে বলে শ্মশানে (জীবনান্তে শেষের দিনে)
ধাত্রী রূপে জগদম্বা বসে আছেন এখানে।
(সেদিন) ভাই বন্ধু সুত দারা দেখবেনা কেউ আর
গঙ্গাজলে ধুয়ে দেবে দেহের অঙ্গার
(ক্রমে) ভুলে যাবে সকল সংসার।
(তোমার) সোনার অঙ্গ ছাই হবে
জগতে ঘোষণা রবে,
যে ছিল সে নাই, নাই,
গেছে কোথায় কে জানে।
লোকে বলে শিবের তরে শ্মশান-বাসিনী—
আমি বলি জীবের তরে অসুর-নাশিনী
(হলেন) দয়াময়ী মা জননী মধুর-হাসিনী
নিলেন কোলে আপন বলে
অনাথ সন্তানে।

বৈরাগী। (যজ্ঞেশ্বরের প্রতি) যাও—বাবা, চিতের আগুন নিবিয়ে বাড়ী যাও। তোমার ছেলে মা আনন্দময়ীর কোলে হাসছে খেলছে আনন্দ করছে,—মা আনন্দময়ী, যাঁর সংসার তিনি ঠিক চালাচ্ছেন (যজ্ঞেশ্বর চলিয়া গেল) আমরাই বুঝতে পারিনি। (গঙ্গেশের প্রতি) কই তুই গেলিনে ?

গঙ্গেশ। না।

বৈরাগী। কেন ?

গঙ্গেশ। ওদের সঙ্গে যাবনা।

বৈরাগী। এই যে বললি মড়া পোড়াতে এসেছিলি। ওরা তো এইবার বাড়ী যাবে।

গঙ্গেশ। আমি চাড়ালের মড়া ছুঁয়েছি। মামার বাড়ী ফিরে গেলে সবাই আমায় বকবে।

বৈরাগী। তবে তুই এসেছিলি কেন ?

গঙ্গেশ। তুমি বললে, তুমি শ্মশানে থাক, ওরা শ্মশানে আসছিল, তোমার দেখা পাব বলে আমিও এলাম।

বৈরাগী। গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে নে, চল্ আমি তোকে মামার বাড়ী রেখে আসি।

গঙ্গেশ। মামার বাড়ী যাব না।

বৈরাগী। কি করবি তাহলে ?

গঙ্গেশ। তোমার কাছে থাকবো।

বৈরাগী। আমার কাছে থেকে তোর কি লাভ হবে ?

গঙ্গেশ। তোমার কথা ভাল লাগে, তোমার গান ভাল লাগে, তোমায় দেখতে ভাল লাগে।

বৈরাগী। এই মাটী করেছে, আমায় ভাল লাগে কিরে! তুই আমার মতো ঘরছাড়া বৈরাগী হবি নাকি ?

গঙ্গেশ। হব। তুমি আমায় ওই রকম গান শিখিয়ে দেবে ?

বৈরাগী। বৈরাগীরা শুধু গান গায় না, আবার ভিক্ষে করে।

গঙ্গেশ। আমিও ভিক্ষে করবো।

বৈরাগী। বড়লোক গেরস্ত যখন বলবে, ভিক্ষে নেই দেয়েজে খেটে খেতে পার না হতভাগা ? এইনা বলে যখন তোমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে, তখন তাদের ওপর রাগ করতে পারবে না বাবা।

গঙ্গেশ। কুকুর লেলিয়ে দেবে কেন ?

বৈরাগী। তুমি গরীব মানুষ, দুর্ব্বল, প্রাণের দায়ে লাফাতে লাফাতে পালাতে থাকবে। কুকুরটা পিছনে পিছনে ছুটবে। লোকে হাততালি দেবে। দেখলে বেশ আমোদ হবে।

গঙ্গেশ। তোমায় কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলো ?

বৈরাগী। হুঁ—কতবার—

গঙ্গেশ। আমি যদি কুকুরটাকে ধরে একদিকে টান মেরে ফেলে দিই তাহলে কোন দোষের হবে ?

বৈরাগী। পারিস তুই ?

গঙ্গেশ। আমি বাঘের বাচ্ছা ধরতে গিয়েছিলাম।

বৈরাগী। ধরতে গিয়েছিলি ধরিসনি তো ?

গঙ্গেশ। না, আমার মা বারণ করেছিল।

বৈরাগী। তাহলে তুই এখানে থাকবি ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ আমার মা কোথায় তুমি জান—

বৈরাগী। (উচ্চকণ্ঠে) মহামায়া।

গঙ্গেশ। তুমি কাকে ডাকছ—মহামায়াকে ?

(মহামায়া আসিলেন)

মহামায়া। এস, দুটো খেয়ে নাও।

বৈরাগী। এই ছেলেটি আমাকে ছাড়ছেনা যে।

গঙ্গেশ। তোমার নাম মহামায়া ?

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা, আমার নাম মহামায়া।

গঙ্গেশ। খুব আশ্চর্য্যতো।

মহামায়া। কি আশ্চর্য্য।

গঙ্গেশ। আমার মাকে সবাই মহামায়া বলে ডাকতো।

মহামায়া। তোমার মা কোথায় বাবা ?

গঙ্গেশ। মা নেই, মামীমা বলে মা মারা গেছে।

মহামায়া। তোমার মা কতদিন মারা গেছে ?

গঙ্গেশ। অনেকদিন, আমি তখন খুব ছোট।

মহামায়া। সেই থেকে মামার বাড়ীতে আছ ?

গঙ্গেশ। হ্যাঁ, আমার মনে হয় মা আমার পাশে পাশে আছে। আচ্ছা, মানুষ মরে গেলে কোথায় যায় বলতে পার ?

বৈরাগী। না মলে আর সেটি জানবার উপায় নেই বাবা।

গঙ্গেশ। তুমি জান, আমায় বলছনা। বলনা তোমার পায়ে পড়ি, আমি আমার মাকে দেখতে চাই, মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়ে থাকি, মনে হয় চোখ খুললেই দেখবো সামনে মা দাঁড়িয়ে আছে।

[ক্রমশঃ

কাশ্মীরের কোলে কয়েকদিন

শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রাবস্থায় ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে রচনা লিখেছি, হ্যাজলিটের প্রবন্ধ পাঠও করেছি। কিন্তু সেই সময় যদি ইস্কুল বা কলেজ থেকে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো, যেমন শুনেছি পাশ্চাত্যদেশে আছে, তাহলে আমাদের শিক্ষা যে কতটা বাস্তবানুগ ও সম্পূর্ণ হত তা আজ যখন বেড়াবার নেশায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে সুরু করেছি, তখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ইতিহাস পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যদি পাঠ্যবিষয়গুলি অথবা দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, ত্রিচীনপল্লী, দেবগিরি, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি ঘটনাস্থলগুলি স্বচক্ষে দেখতাম, তাহলে আর ইতিহাসের পাঠ মুখস্থ করেতে এত বেগ পেতে হত না। ভূগোলের বেলায় সেই একই কথা! প্রদেশের অবস্থান, প্রধান সহর এবং পাঞ্জাবের পাঁচটি নদীর নাম মুখস্থ করতে করতে সেদিন যে গলদঘর্ম হয়েছি, আজ যখন সেইগুলির অবস্থান ও গতি নিজচোখে দেখছি তখন মনে হচ্ছে—হায়! এইগুলি সেদিন কেন দেখিনি! সুখের বিষয়, স্বাধীনতার পর এদিকে কিছুটা সাড়া পড়েছে। ভ্রমণকালে এবার কয়েকটি শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদলের সাথে দেখাও হল। মনে হয় এই সুযোগ আরও ব্যাপক ও প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উত্তরভারত ও দক্ষিণভারত ভ্রমণ মোটামুটি শেষ হবার পর থেকেই মনে হয়েছে কাশ্মীর ভ্রমণ না হলে উত্তর-ভারত ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! তাই 'ভূস্বর্গ কাশ্মীর' দর্শনের লোভ অনেক দিনের। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা ও তুষারমৌলী হিমালয়ের আকর্ষণ চিরন্তন। তাছাড়া আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আজ কাশ্মীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই এবার পূজার ছুটিতে কয়েকজন বন্ধু কাশ্মীর ভ্রমণের প্রস্তাব করায় সে সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। তাছাড়া শৈলশিখরে যাত্রার ট্রেণ কন্‌সেসনও এই সময় রেলকর্তৃপক্ষ যখন দিচ্ছেন শুনলাম, তখন একেবারে যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ তাই ঘটে গেল। ১৮ই অক্টোবর ১৯৫৮ বেলা ১০৷৷০ টায় তুফান মেলে আমরা যাত্রা সুরু করলাম। আমাদের দলে সর্বসমেত ১১ জন সভ্যাসভ্য। দুইটি পরিবারে মেয়ে পুরুষে ৭ জন এবং আর ৪ জন দুইপরিবারের বন্ধু। সারাপথ আনন্দ-কোলাহল করতে করতে আমরা ১৯শে রাত্রি প্রায় ৮৷৷০ টায় নয়াদিল্লী ষ্টেশনে পৌছুলাম। এখানে এসে প্রথম বিপত্তি হল আমাদের ট্রেণ দিল্লী অর্থাৎ পুরাতন দিল্লী ষ্টেশনে যাবে না—এই সংবাদে। এই সংবাদ আবার সংগ্রহ করা গেল বেশ খানিকটা দেরীতে। আমরা ট্রেণে নিশ্চিন্তে বসে আছি ট্রেণ পরের ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাবে বলে, অথচ দেখছি অন্য কামরার যাত্রীরা একে একে নেমে পড়ছে এবং কেহ কেহ পাশেই দণ্ডায়মান কাশ্মীর মেল ডুপ্লিকেটে অর্থাৎ অতিরিক্ত কাশ্মীর মেলে গিয়ে উঠছে। আমাদের আসন রিজার্ভ করা আছে কাশ্মীর মেলে, ডুপ্লিকেট মেল নয় অথচ সেই ট্রেণ অন্য ষ্টেশন থেকে ছাড়বে শেষ মুহূর্তে জানা গেল। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে ট্যাক্সি নিয়ে অচেতন ও 'সচেতন' মালপত্রসহ পুরাতন দিল্লী অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলাম, নচেৎ সব-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে। দিল্লী ষ্টেশনে এসে দেখলাম কাশ্মীর মেল দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাদের জন্য দুইখানি কামরা রিজার্ভ আছে। রাত্রিটা সুনিদ্রায় কাটবে আশ্বস্ত হয়ে তবে আহারাদির চিন্তায় আমরা মন দিলাম।

শরতের শিশির-ঝলমল, শেফালী-স্থলপদ্মশোভিত সোনালী প্রাতে পূর্বদিন বাড়ী ছেড়েছি। বাঙলার প্রাণের উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার আগমনী-গান সানাইএর সুরে বাজছে শুনতে শুনতে এসেছি, তার রেশ পরের দিন সুদূর দিল্লী নগরীতেও কানে বাজছে, হৃদয়যন্ত্রীতে যেন করুণ সুরই রণিয়া রণিয়া উঠছে। পূজার কয়টা দিন বাঙালী বাড়ী যেতেই ব্যগ্র, বাড়ী ছাড়া তার কাছে সত্যিই পীড়াদায়ক। কিন্তু উপায় নাই, কারণ পূজার ছুটির কয়েকটামাত্র দিন সম্বল করে সকলে বাইরে পাড়ি দিয়েছি, কাশ্মীর যাতায়াতে পথেই যে কেটে যাবে ৬।৭ দিন আর মাত্র ৩ দিন থাকে কাশ্মীরের জন্য। কাশ্মীরে অবসর যাপন দূরের কথা, প্রধান প্রধান দর্শনীয়গুলিই সব দেখা যায় না ৩ দিনে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করেও। তাই পঞ্চমীর দিনে পূজামণ্ডপে শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার আবরণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে মাকে প্রণাম জানিয়েই ষষ্ঠীর দিন বেরিয়ে পড়তে হল। ইচ্ছা ছিল দিল্লী পৌঁছিয়ে যে সময়টুকু পাওয়া যাবে তার মধ্যেই নয়াদিল্লী কালী-বাড়ীতে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে সপ্তমী দিবসে প্রণাম করে আসব। কিন্তু একে ট্রেণ পথে বিলম্ব করল, তার উপর ষ্টেশনে এসে এক বিভ্রাট। ফলে সে আশা ত্যাগ করে পাঠানকোটের পথে পা বাড়ানো গেল।

দিল্লী ছাড়ালেই পাঞ্জাবে পড়লাম। পঞ্চনদের দেশ সম্বন্ধে ভূগোলে পড়েছি, এর বীরত্বকাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ভারতের বহু রাজ্যের উত্থানপতনের কাহিনী পাঞ্জাবের পথে পথে মিশে আছে। পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে। আজিও স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের তরুণরা দলে দলে যোগ দেয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বুকের রক্ত ডালি দিতে। পাঞ্জাবের অমৃতসরেই জালিয়ান ওয়ালাবাগ নিদ্রিত ভারতের জাগরণ এনে দিয়েছে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতি এই মহাতীর্থেই রক্ততিলক ললাটে পরে স্বাধীনতার সুদুর্গম পথে একদা যাত্রা সুরু করে। বাঙলার ন্যায় পাঞ্জাবও বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে। ত্যাগে, শৌর্যে, বীর্যে পাঞ্জাব ভারতের ইতিহাসে একদা গৌরবময় অধ্যায় রচনা করলেও, নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে পাঞ্জাব খণ্ডিত হল—স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে সে তার শেষ বলি নিবেদন করল নিজের অঙ্গচ্ছেদে। পাঞ্জাব বলতে আজ পূর্ব-পাঞ্জাব। বাঙলার ইতিহাস এই একই ইতিহাস। তাই বাঙলার ও পাঞ্জাবের ভাগ্য একদিক দিয়ে একসূত্রে গ্রথিত। পাঞ্জাবের পুণ্যধূলি শিরে নিয়ে আমরা ধন্য হলাম। দুর্ভাগ্য যে, সময়াভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের মহাতীর্থ দর্শন ঘটল না—দূর থেকে

তাকে প্রণাম জানালাম। পাঠানকোটে ট্রেণ এসে পৌঁছুল পরদিন সকাল ৮টায়।

ট্রেণ থেকে আমরা পাঠানকোটে নামলাম গরম জামা-কাপড় পরে কাশ্মীরের শীতের সঙ্গে যেন লড়াই করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে। এর পর আর ট্রেণে নয়, একেবারে বাসে ২৫০ মাইল শ্রীনগর। বয়সে যাঁরা নবীন, তাঁরা বেশভূষার পারিপাট্যে মগ্ন, তাঁরা তো গরমের রকমারি স্যুট নিয়ে গেছেন, কৈন কার কত রকমের স্যুট আছে, তার প্রদর্শনী তাঁদের এক একজনের স্যুটকেসে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের বাসে সুন্দরী তরুণীও ছিলেন এক-আধজন। মেয়েরা শাড়ী পরে শুধু গরম লেডিস-কোট ও মোজাতেই সজ্জিত হলেন! আমি দলের পুরুষের মধ্যে বেশভূষায় একমাত্র ব্যতিক্রম অর্থাৎ ধুতি-পরিহিত। অবশ্য ভিতরে একটি সুতী ড্রয়ার, পায়ে মোজা এবং গায়ে সোয়েটার ও গরম কোট ছিল। আমরা দার্জ্জিলিংএ যাওয়ার সময় সুখ্না ছাড়ালেই ঠাণ্ডা অনুভব করি, তাই এখানেও হয়ত খানিকদূর গিয়েই ঠাণ্ডা পাব এবং বেশি ঠাণ্ডা পাব এরূপ অনুমান করেই শীতবস্ত্ররূপ বর্মে আমরা আগে থেকেই দেহকে সুরক্ষিত করলাম। অথচ জম্মু ও কাশ্মীর রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাসে বেলা ১০।টায় রওনা হয়ে প্রথম যেখানে থামলাম অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রবেশদ্বারে অনুমতিপত্র (permits) পরীক্ষা করানোর জন্য লখনপুর চেক্ পোষ্টে, সেখানে রীতিমত গরম করতে লাগল। একে একে গরম কোট সকলে খুলতে আরম্ভ করলেন। পাঞ্জাবের সীমানা ছাড়িয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের এলাকায় পৌঁছিয়ে মনে এক অচিন্তনীয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। দূরে হিমালয়ের বিভিন্ন শাখা দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা জম্মু উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমাদের বাস দ্রুতগতিতে ছুটল। চারিপাশে সবুজ গাছপালা, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র যেন হরিৎবর্ণের গালিচা ধূসর বর্ণের পাহাড়ের বর্ডার দেওয়া। বাঙলাদেশের অনেক গাছপালা চোখে পড়ল। রাস্তার উভয়পার্শ্বে কাশফুলের সীমাহীন সারি যেন চামর দুলিয়ে আমাদের মতো অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে। পাঠানকোট থেকে জম্মু শহর পর্যন্ত ৫৭ মাইল একরকম সমতল বললেই হয়। জম্মুতে পৌঁছুতে আমাদের বেলা প্রায় ২টা হল। এইখানেই মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করা গেল টুরিষ্ট সেণ্টারে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এইরূপ টুরিষ্ট সেণ্টার জায়গায় জায়গায় স্থাপন করেছেন টুরিষ্ট বা ভ্রমণার্থীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখার জন্ত। বলতে ভুলে গিয়েছি, পাঠানকোটে ট্রেণ থেকে নামতেই আমাদের পরিচয় পেয়ে সেখানকার টুরিষ্ট অফিসার সাদর সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে তাঁদের কেন্দ্রে নিয়ে যান, বাসে আসনের ব্যবস্থা করেন এবং ২৫০ মাইল পথে যেতে রাত্রি হয়ে গেলে মধ্যপথে ডাকবাংলোয় আমাদের রাত্রিবাসেরও ব্যবস্থা করে দেন। তিনি আমাদের ধন্তবাদের পাত্র। আমরা অবশ্য টেলিগ্রাম করে খবর দিয়ে রেখেছিলাম কলিকাতা থেকে রওনা হবার আগেই। জম্মুতে ভ্রমণার্থীদের কেন্দ্রে থাকবার ও খাবার ভাল ব্যবস্থা আছে, ভাল হোটেলের ন্যায়ই ব্যবস্থা। জম্মুতে বহু হিন্দু আছেন, হিন্দু মন্দিরও দেখা গেল। কাশ্মীরে কিন্তু বিপরীত। জম্মু আসার পথে আমরা পাঞ্জাবের রাবি নদীর বাঁধ ও সেচ খাল দেখলাম। দূরে পাকিস্তানের সীমানা দেখলাম। নদীর জলের মুখ বন্ধ করে দিয়ে খাল দিয়ে জলধারা পরিবর্ত্তিত করার ফলেই নাকি পাকিস্তানের সহিত 'খালের জলের বিরোধ' নামে খ্যাত বিরোধের সৃষ্টি। মধ্যাহ্ন, ভোজনের পর আমরা জম্মু ত্যাগ করে রওনা হলাম কাশ্মীর অভিমুখে। ড্রাইভার বললেন পথে সন্ধ্যা হলে প্রথমে যেখানে ডাকবাংলো পাওয়া যাবে সেইখানেই রাত্রিবাস করা হবে। ভ্রমণার্থীর ভীড় বেশ হয়েছে, তাই যাদের বাস আগে পৌঁছুবে তারাই আগে ডাকবাংলো দখল করবে। এই অপরিচিত, নির্জন, নির্বান্ধব দুর্গমস্থানে দারুণ শীতের মধ্যে রাত্রে যদি আশ্রয় না মিলে তাহলে কি উপায় হবে এই কথা ভেবে আমরা শিউরে উঠলাম। কুদে ডাকবাংলোয় স্থানাভাব। তার পরবর্তী ডাকবাংলো যে স্থানে তার নাম বটোট। জম্মুর পর থেকে সমতল ছেড়ে বাস পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল এবং উঠতে উঠতে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চ কুদে সন্ধ্যায় যখন পৌঁছুল তখন বেশ শীত লাগতে লাগল। কুদের উচ্চতা দার্জ্জিলিংএর সমান। এই খানেই কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা বন্দী আছেন। কুদ থেকে বটোট হয়ে বানিহাল গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তবে কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছাতে হয়। জম্মু থেকে বানিহাল পর্য্যন্ত পথ যেমন দুর্গম ও ভয়ঙ্কর, তেমনই সুন্দর। মেয়েদের মাথার কাঁটার ন্যায় সর্পিল পথ বারে বারে অতিক্রম করতে হয় এবং একধারে শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতমালা এবং অপরধারে অতল গহ্বর—এরই মাঝখান দিয়ে বাস ছুটে চলেছে দূরে বহুদূরে। লোকালয়শূন্য জনহীন দীর্ঘপথই বেশী। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে ভয়ঙ্কর ও ভীষণের ভিতরে যাত্রা করার মধ্যেও আনন্দ আছে। একেই ইংরাজীতে বলে Adventure বা দুঃসাহসিক যাত্রা। তবে দূরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলির অপূর্ব শোভা, মাঝে মাঝে কোথায়ও নির্ঝরের কলগান, কোথায়ও পার্বত্য নদীগুলির উদ্দামতা, পাহাড়ের বুক চিরে সাগরের উদ্দেশে নদীর এই অভিসার মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। এই পথেই পাঞ্জাবের শতদ্রু (রাবি) পড়ছে, তারপর বানিহালের পথে আমরা চেনাব বা চন্দ্রভাগা নদীকে এত গভীরতম প্রদেশে প্রবাহিত দেখলাম যে, উহার জল নীল বলে প্রতিভাত হল। এদেশের লোক এইরূপ এক জায়গার নাম 'কালাপানি' দিয়েছে। অসংখ্য নদীনালার এই দীর্ঘপথে পুলের সংখ্যাও কম নহে। বানিহালের আগেই বটোটে আমরা সন্ধ্যার সময় পৌঁছুলাম। এই জায়গাটা কুদের পরে এবং কুদের চেয়েও কিছুটা নীচে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে। এখানেও অত্যধিক শীত। শীতের প্রচণ্ডতা একটু অনুমান করা যাবে আমাদের সঙ্গীদের রাত্র শয়নকালে লেপের মধ্যে জামাকাপড়ের হিসাব পেলে। প্রকাশ, বন্ধুবর অজিত শোবার সময় গায়ে সুতিগেঞ্জি, সোয়েটার, গরম কোট, গরম প্যাণ্ট, গরম মোজা, এবং বিরাট অলষ্টারও লেপের নীচে পরে ছিলেন। আরও দুই একজন এরই রকমফের। এখানকার শীতের সঙ্গে শীতকালে দার্জিলিংএর শীতের তুলনা করা চলে। এরূপ প্রচণ্ড শীত কিন্তু কাশ্মীর ভ্রমণের কোথায়ও এমন কি তুষার-রাজ্য খিলানমার্গেও পাইনি।

বটোটে রাত্রিবাসের পর ভোরে বাসে চেপে আমরা রওনা দিলাম। বটোট ডাকবাংলোটি পাহাড়ের গায়ে। এখানকার

প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম। এখান থেকেই রামবন নামক বনবিভাগ আরম্ভ। কিছুদূর অগ্রসর হতেই ডালিমগাছের সারি দেখা গেল। আগেই বলেছি, কুদ থেকে বটোট হয়ে বানিহাল পর্য্যন্ত পথটি যেমন ভয়াবহ তেমনই সুন্দর। বানিহাল সমগ্র পথের মধ্যে উচ্চতম স্থান। প্রায় নয় হাজার ফুট অর্থাৎ দার্জিলিংএর ঘুমের চেয়েও উঁচু। বানিহালে একটি টানেল বা সুড়ঙ্গপথ আছে। এই অঞ্চলে তুষারপাতের ফলে পথ যাতে রুদ্ধ হয়ে না যায়, তার জন্য অত্যধিক তুষারপাতের এলাকায় মাঝে মাঝে রাস্তার উপর চালা তুলে দেওয়া হয়েছে এমন করে, যাতে তুষার ঢালু চাল বেয়ে রাস্তায় না পড়ে খাদে পড়ে। এখানে একটি নূতন টানেল বা সুড়ঙ্গপথ পাহাড় কেটে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে দেখলাম। বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম পড়ে রয়েছে, ক্ষুদে রেল-লাইন বসানো হয়েছে পাথর কেটে কেটে ছোট ছোট রেলে বয়ে আনার জন্য। শুনলাম, জার্মাণ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে এই সুড়ঙ্গপথ নির্ম্মিত হচ্ছে। একটি যাওয়ার ও আর একটি আসার জন্য দুইটি আপ ও ডাউন পথ। এই নির্ম্মীয়মান টানেলের নাম দেওয়া হয়েছে 'জওহর টানেল'। এই টানেল সমাপ্ত হলে ২০ মাইল পথ সংক্ষেপ হবে জানা গেল। এই সংক্ষিপ্ত পথে বর্তমান পথের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পাওয়া যাবে কিনা জানি না। পথ তো আরও সংক্ষেপ করা যায়, যদি বিমানে পাঠানকোট থেকে শ্রীনগরে যাওয়া যায়। এতে শুধু পথ নয়, সময়ও সংক্ষেপ হয়। কিন্তু দুর্গম পথে চলার দুঃসাহসিকতার (Adventure) যে আনন্দ, শিখরের পর শিখরে আরোহণ এবং শুভ্রশীর্ষ তুষার-কিরীট ও রজতশোভা ঝরণার নয়নলোভা সৌন্দর্যের সমারোহ দর্শনে যে তৃপ্তি, তা বিমানে গেলে মিলে কিনা সন্দেহ। এ যেন "শিখরের পর শিখরে ছুটিব, ভূধরের পর ভূধরে লুটিব"…। বানিহাল থেকে আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে আরম্ভ করলাম। এর পর থেকে কাশ্মীর উপত্যকা আরম্ভ হল। সমতল জম্মু উপত্যকা থেকে ক্রমশঃ উপরে ৯০০০ নয় হাজার ফুট উচ্চে উঠে আবার নামতে নামতে কাশ্মীর উপত্যকার সমতলভূমিতে শ্রীনগরে চলেছি। এ যেন See-Saw খেলা। আমাদের বাস যেন উঁচু-নীচু এই পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে কোঁস কোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। ডিজেল-চালিত এই বিশেষ ধরণের বাসে নাকি মাঝে মাঝে হাওয়া ছাড়ার কোঁস কোঁস করে শব্দ হয় এইরূপ শুনলাম। বেলা ১টায় আমরা কাজীগুণ্ড নামক জায়গায় পৌঁছলাম। কাজীগুণ্ড সমুদ্রতট থেকে ৫২০০ ফুট। এইখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর উপত্যকা শুরু। এখানে ডাকবাংলোয় বসে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করা গেল। রাস্তার ধারে পাঞ্জাবী হোটেলে অর্ডার দেওয়া রুটি ও মাংস তাড়াতাড়ি খেয়ে লওয়া গেল। হোটেল যেমন নোংরা, রান্নাও তেমনই খারাপ। এখানে খেয়ে সেদিন তৃপ্তি হল না। এখানে থামবার ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না। ড্রাইভার আমাদের নামতে বললেন এখানে Check post আছে, check হবে এই কথা বলে। অথচ শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম এখানে check হল না এবং ড্রাইভারের নিজের কোন দরকার ছিল বলে আমাদের তিনি ধাপ্পা দিয়েছেন। পরে জানা গেল আমাদের জনৈক দয়ালু বন্ধু নরেনদার কাছে ড্রাইভার খাবার জন্য কয়েকটি টাকা নিয়েছেন। আমাদের আহারাদির পরেও অনেকক্ষণ ড্রাইভারের যখন কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন অনেকে প্রমাদ গণলেন। ড্রাইভার আসলে কি খেতে গেছেন সেই চিন্তা সকলকে বিব্রত করতে লাগল। কারণ পথ বড় দুর্গম, কোন বিশেষ পানীয়ের প্রভাবে আমাদের বিপদ না হয়, এই কথাই সকলের মুখে মুখে। তবে যাবার সময়কার এই ড্রাইভারটি ছিলেন যে অত্যন্ত দক্ষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইবার পথটুকু সবই সমতলে, তাই শ্রীনগরে পৌঁছতে আমাদের ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগ্‌ল না ; যদিও ড্রাইভার মহাশয়কে শ্রীনগরে গিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন করার কথা বললে তিনি বলেছিলেন ঘণ্টা দুই লাগবে অর্থাৎ ৪টা বাজবে শ্রীনগরে পৌঁছুতে। দেখা গেল ১টার সময় কাজীগুণ্ডে না থেমে সোজা শ্রীনগরে গেলে খুব জোর ২টা বাজ্‌তো। আমরা কাজীগুণ্ড থেকে ২টায় বেরিয়ে ৩টার মধ্যে শ্রীনগরে পৌঁছুলাম অর্থাৎ আমাদের journey's end বা ভ্রমণের শেষ সীমায় এলাম। কলিকাতা থেকে শ্রীনগরে ট্রেণে ও বাসে মোট ১৪৭০ মাইল দীর্ঘ পথ আমরা অতিক্রম করলাম। ২৬৭ মাইল পথ এবং তাও পার্বত্য পথ বাসে অতিক্রম করাও আমাদের জীবনে অভূতপূর্ব ঘটনা। দুইদিন ধরে বাসে চলাও ইহাই প্রথম। এতক্ষণে আমরা আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত খাস কাশ্মীরে পৌঁছুলাম। বানিহাল গিরি-পথ কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশদ্বার, একথা পূর্বেই বলেছি। ৮০ মাইল দীর্ঘ এবং ২৫ মাইল প্রস্থ এই কাশ্মীর উপত্যকাই তার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিয়ে, তার নদী, নির্ঝরিণী, হ্রদ, তুষারশিখর নিয়ে, তার মনোরম মোগল উদ্যানগুলি নিয়ে পারস্য কবি বর্ণিত 'ভূস্বর্গ' নাম সার্থক করেছে। এই সুষমাময়ী কাশ্মীরভূমি এশিয়ায়, এমনকি বোধহয় জগতে অতুলনীয়া। ইহারই কোলে কয়েকদিন অবস্থান যে কোন ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ বস্তু। কাশ্মীর উপত্যকা চারিদিকে পর্বত-বেষ্টিত, অসংখ্য তুষারশুভ্র শৈলশিখর রৌদ্রকিরণে ঝলমল করে' নয়ন মুগ্ধ করে। ঝিলাম নদী শ্রীনগরের চরণ চুম্বন করে কল কল নিনাদে ছুটে চলেছে পাহাড় উপত্যকা অতিক্রম করে সাগরের বুকে মিলিত হবার জন্য। ঝিলামের উভয়তীরে শ্রীনগর—কাশ্মীরের রাজধানী—অবস্থিত। ৯টি সেতু সহরের দুই তীরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। এছাড়া শ্রীনগরের আর একদিকে ৫ মাইল লম্বা ও ২৷০ মাইল চওড়া পর্ব্বতবেষ্টিত মনোরম ডাল হ্রদ। এই হ্রদে সারি সারি নৌকা সজ্জিত রয়েছে। এই নৌকাগুলির মধ্যেই এক একটি গৃহ—কারুকার্য্যখচিত শয়নকক্ষ, ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, বাথরুম ইত্যাদি। এই গৃহ-নৌকা (House-boat)তে বাস করা এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল কারণে শ্রীনগরকে প্রাচ্যের ভেনিস নগরী (Venice of the East) বলা হইয়া থাকে। নৌকা-গৃহ থেকে দূরে ধ্যানগম্ভীর হিমালয় দর্শন করলে মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। কত কবি হিমালয় দর্শনে কত কাব্যরচনা করেছেন। মহাকবি কালিদাস একে 'দেবতাত্মা হিমালয়' বলে অভিহিত করেছেন। এই হিমালয় দর্শনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হিমালয়কে তপোমূর্তিবলে অভিহিত করে বলেছেন—

"তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার মতো।"

কবি হিমালয়ের শিখরের পর শিখরের ধূসর তরঙ্গ দেখে ইহাকে

হোমশিখার অগ্নিবাণী প্রস্তরশিখায় পরিণত হয়েছে বলে কল্পনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করিছে আকুতি,
সেই বহ্নি-বাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন মন্ত্র উচ্ছ্বসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।"

দুইধারে ঋজু ঋজু পপ্‌লার শ্রেণী শোভিত প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আমাদের বাস এসে পৌঁছুল কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কেন্দ্রস্থল ভ্রমণার্থীদের বিশ্রামকেন্দ্র (Tourists' Recep'ion Centre)এ। বিরাট অট্টালিকা, বিরাট অফিস—সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—ভ্রমণার্থীদের বিশ্রামের মনোরম স্থান। আমরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতে কাশ্মীর সরকারের ডিরেক্টর অব টুরিজম্ ও এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর আমাদের সাদর সম্বর্ধনা জানালেন এবং আমাদের তাঁহারা কি সাহায্য করতে পারেন জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, আমাদের থাকার ব্যবস্থা আমাদের বন্ধুরা ইতোমধ্যেই ঠিক করে রেখেছেন গৃহ-নৌকায় বা House-boatএ এবং আমরা বন্ধুদের সঙ্গে একত্র সপরিবারে থাকবো। আমি সাধারণতঃ এইরূপ ভ্রমণের সময় আত্মপরিচয় দিই না, কারণ, পরিচয়হীন একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে ভ্রমণে বের না হলে ভ্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয় এবং জনসাগরে একাত্ম হয়ে না বেড়ালে অনেককিছু জানা ও শেখা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ হ্যাজলিটের ভাষায় Citizen of the World বা বিশ্বনাগরিক হওয়ার আনন্দ পাওয়া যায় না। কি করে কাশ্মীরের Tourist Directorate আমাদের পরিচয় পেয়ে শুধু বিশেষ আদর আপ্যায়নই করলেন না, বাস থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে টুরিষ্ট অফিসের প্রাঙ্গণে সদ্য আয়োজিত কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসত যুবরাজ করণ সিংএর সম্মানার্থে এক পার্টিতেও নিমন্ত্রণ জানিয়ে বসলেন। চারদিন ট্রেন ও বাসে ১২০০ মাইল ভ্রমণ করে আমরা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত। মাপ করবেন বলে পালিয়ে বাঁচলাম। অবশ্য ধরা যখন পড়লাম, ইচ্ছা ছিল পরে একবার সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে আসব যুবরাজ ও প্রধান মন্ত্রী বক্সী সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু এমন তড়িৎ-গতিতে ভ্রমণ সারতে হল যে, সময়ই পেলাম না।

বাসকে অতিরিক্ত কিছু ভাড়া দিয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে ডালগেট রোড দিয়ে আমাদের অস্থায়ী নৌকাবাসের দিকে গেলাম। বড় নৌকাগৃহে সহর থেকে যাতায়াত করতে হবে একপ্রকার ছোট নৌকা করে। এগুলোকে এখানে বলে 'শিকারা'। যতবার পারাপার করতে হবে ততবার এর জন্য পয়সা তো দিতেই হবে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি অসুবিধা যাতায়াতে সময় বেশি লাগবে। ইচ্ছা হল খপ করে সহরে চলে গেলাম, কেনাকাটা করলাম বা সহরে বেড়ালাম, তা হওয়ার কিছু অসুবিধা আছে। এইজন্য আমাদের মধ্যে অনেকে নৌকাগৃহে বাস করাতে আপত্তি জানালেন। কলিকাতা হইতে জনৈক বন্ধু মারফত হাউসবোট ঠিক করা হয়েছে, মালপত্র নিয়ে লেকের তীরে এসেও পড়েছি, শরীর এত ক্লান্ত ও অবসন্ন যে, কোথাও একটু স্থিতি হতে পারলে বাঁচি, এমন সময়ে কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন মহিলা সঙ্গিনী বেঁকে বসলেন,—হাউসবোটে *যাব না, হোটেলে যাব। আমরা তো প্রমাদ গণলাম। মেজাজ সকলেরই রুক্ষ। এমন সময় দুইদলের পক্ষ থেকে দুজন উৎসাহী তরুণ প্রতিনিধি 'শিকারা'য় করে নক্ষত্রবেগে হাউসবোট যাচাই করে* দেখতে বেরিয়ে পড়লেন। এই কথা ঘোষণা করে গেলেন যে, যদি হাউস-বোট বাসের উপযোগী না হয়, তাহলে আমরা অন্যত্র যাব নচেৎ এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করার সুযোগ ছাড়ব না, কারণ এখানে বাস করায় একটা বিশেষ মূল্য আছে, পারাপারের যতই অসুবিধা থাকুক না কেন। তাঁরা ঘুরে এসে ঘোষণা করলেন যে, প্রথমে আমাদের জন্য যে হাউস-বোট নির্দিষ্ট ছিল সেটা পরীক্ষা করে তাঁরা বাতিল করেছেন এবং অপর একটি সুন্দর হাউস-বোট তাঁরা নির্বাচিত করেছেন। এতক্ষণে ধৈর্যের সীমা শেষ হবার উপক্রম হওয়ায় সকলেই দ্বিরুক্তি না করে 'শিকারা'য় গিয়ে বসলাম। হাউস-বোটে আমাদের সমগ্র দলটি দুইদলে বিভক্ত হয়ে দুটি ঘর দখল করলেন। যাঁরা কর্ৎিকর্মা তাঁরা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত ভাল ঘরটি যে নেবেন, অন্য কোন বিবেচনা করবেন না, এটা সহজেই অনুমেয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চা পানের পরই আমরা আবার দুই দলে দুখানি শিকারায় বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখতে। প্রথমেই আমরা বিজলী আলোতে লেখা 'নেহেরু পার্কে' শিকারায় করে গেলাম। পাহাড়ের পটভূমিকায় ডাললেকের তীরে মনোরম বেড়াবার স্থান এই পার্কটি। এখান থেকে কাশ্মীর রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। এখান থেকে আমরা স্থানীয় বাজারে গেলাম। বাজারে অল্পক্ষণ ঘুরে আমরা রাত্রে বোটে ফিরলাম।

পরদিন সকালে আমরা দুখানি শিকারায় বেরিয়ে পড়লাম 'সহর' শ্রীনগর দেখতে। প্রথমে আমরা লেকের গলিপথে কৃষকদের—লেকের তীরে সারিবদ্ধ বাড়ীর মধ্য দিয়ে চললাম। যারা ভূমির মালিক কৃষক, তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। লেকের ধারে ধারে, কোথাও লেকের মধ্যস্থলে দ্বীপের মতো সব ছোট ছোট জমি। এই জমিতে প্রধানতঃ তরি-তরকারির চাষ হয় দেখলাম। কপি, শালগম, গাজর, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা প্রভৃতি শাকসব্জী ইহাদের অর্থাৎ লেকের ধারের চাষীদের প্রধান উপজীবিকা। এই সব শাকসব্জী ছোট ছোট নৌকায় করে এরা হাউস-বোটে বিক্রয় করে ও সহরের বাজারে চালান দেয়। এই সব সব্জীচাষীরা কত পরিশ্রমী তা দেখলে অবাক্ হতে হয়। ছোট ছোট নৌকায় ছোট ছোট ছেলে, কখনও মেয়েরা লেকের পাঁক ও পানা বোঝাই করছে আর সেগুলি নিয়ে গিয়ে লেকের ধারে ধারে চাষের জমিতে সার হিসেবে দিচ্ছে। এই পাঁক ও পানা জমির ধারে ধারে জড় করে স্থানে স্থানে লেক বুজিয়ে ফেলে জমি বাড়াবারও অপচেষ্টা হচ্ছে। শুনলাম এই চাষীরা শাকসব্জী বিক্রী করে এবং নিজেদের শীতকালের সঞ্চয়ের জন্য কিছু কিছু শাকসব্জী পূর্ব থেকে শুকিয়ে রাখে। কারণ শীত সমাগমে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গেলে এরা চাষের কাজকর্ম করতে পারে না এবং খাদ্য সামগ্রীরও অভাব হয়। তাছাড়া কাশ্মীরী লঙ্কা বাইরে রপ্তানি করাও এদের একটা প্রধান ব্যবসা। এই লঙ্কার রঙ লাল এবং এতে তরিতরকারী লাল রঙে রঞ্জিত হয় বটে তবে ঝাল নেই। এইজন্য নাকি কাশ্মীরী লঙ্কার কদর খুব। কোন কোন চাষীর বাড়ীতে লঙ্কা মালার মতো করে ঝুলছে, কাহারও কাহারও ছাদ লঙ্কার স্তূপে লাল হয়ে গেছে দেখা গেল। [ক্রমশঃ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যে সময়ে "শ্রীভাঁওতা" লিখি, ঐ সময়েই আর দুজন তরুণ লেখক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একজন কবিরূপে, আর একজন রাজনৈতিক প্রাবন্ধিকরূপে। প্রথম জন হচ্ছেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বর্তমান যুগান্তর সম্পাদক)—তাঁর "বিপ্লবী-নায়িকা" ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়, এবং হঠাৎ একজন নতুন ভাল কবির আবির্ভাব কলকাতার সাহিত্যের বাজারকে সচকিত করে তোলে।

দ্বিতীয় জন শিবরাম চক্রবর্তী (বর্তমানে শিশু-সাহিত্য ও রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত)। রুশবিরোধী প্রচারের অন্যতম প্রধান আড্ডা পণ্ডিচেরীর 'অরবিন্দ-আশ্রম' থেকে নলিনী গুপ্তের "বলশেভিকী" নামক এক বই কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে শিবরাম এক প্রবন্ধ লেখেন "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী।" একজন তরুণ লেখকের লেখনী থেকে এমন জোরালো যুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল লেখা বেরুতে পারে দেখে যেন লোকের তাক লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্তনে কবি হলেন বিরাট সাংবাদিক, আর প্রাবন্ধিক হলেন হাস্য-কৌতুকে মাতোয়ারা। আমার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, শিবরাম রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সরে' না গেলে বিবেকানন্দেরই পর্যায়ের সাংবাদিক হতে পারতেন। কিন্তু তা না হয়ে হয়ত ভালই হয়েছে।

যাই হোক, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই পলাতকদের ধরার জন্যে পুলিস যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল,—তারই সঙ্গে চলেছিল চট্টগ্রাম থেকে মিলিটারী বাহিনীর গ্রামাঞ্চলে রুটমার্চ। তারা এক একটা গ্রামে যায়, এক একটা স্কুলে ঢুকে শিক্ষকদের পটান ঠেঙাতে সুরু করে, জোর করে লোকের বাড়ী ঢুকে ছাগল-মুরগী কেড়ে এনে খায়, এমনি করে গ্রামের পর গ্রামে চলে রুটমার্চ। তখন গবর্ণর অ্যাণ্ডারসনের রাজত্ব,—আয়ার্ল্যাণ্ডে সিনফিন দমনের (Black and Tan) সন্ত্রাসবাদী শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বাংলায় এসেছেন। আজও লোকে অ্যাণ্ডারসনী শাসন বলে' সরকারী সন্ত্রাসবাদী শাসনের নামোল্লেখ করে' থাকে।

সুতরাং বিপ্লবীদের সাহেব-মারার প্রোগ্রামও এগিয়ে চলেছিল সমান্তরালভাবে। হুগলী-বিদ্যামন্দিরের কংগ্রেসকর্মী সিরাজুল হক (হামিদুল হকের ভাই) ৩১ সালে কলকাতার পটুয়াটোলা লেনে এক সাবানের কারখানা খুলে বসেছিল এবং ডক এলাকায় জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে গুপ্ত যোগাযোগ করে' রিভলভার সংগ্রহের চেষ্টা করতো। আত্মশক্তি লাইব্রেরীতেও সে আসতো—আমার সঙ্গে বিদ্যামন্দিরেই আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি তার কাছ থেকে দুটো ভাল "গুপ্তি" কিনেছিলুম, এবং লাইব্রেরীতেই বই-এর দুই সারি বাণ্ডিলের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলুম। মজবুদ Walking Stick—বাঁটের কাছের একটা পিনের মাথায় চাপ দিলে ভিতর থেকে সরু লম্বা কিরীচ বেরিয়ে আসে—তা দিয়ে অতি সহজেই মানুষের দেহকে ফুঁড়ে ভেদ করে' দেওয়া যায়। সে দুটো অন্যত্র সরাবার আগেই পুলিস আসে আমাকে গ্রেপ্তার করতে। পরে এক রিভলভার সহ ধরা পড়ে' সিরাজের জেল হয়েছিল।

পুলিস অফিসাররা বই ঘাঁটতে সুরু করতেই আমি একটু রাগতভাবে বললুম,—আপনারা বসুন, আমি সবই আপনাদের দেখাবো,—আর তা না হলে আমি এই বসলুম, আপনারা সব লণ্ডভণ্ড করুন। সুতরাং তাঁরাই বসতে রাজি হলেন—আমি পটাপট এক দিক থেকে এক এক গোছা বই নামিয়ে তাঁদের দেখিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিই। খানিকক্ষণ এমনি চলার পর "আসল" সেলফে হাত পড়লো। দুটো লম্বা তাক বোঝাই দু'সারি করে' চার সারি একই রকমের বাণ্ডিল—তারই এক তাকে আছে গুপ্তি।

আমি এক দিক থেকে একটা বাণ্ডিল টেনে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেখালুম—উপেনদার "Memoirs of a revolutionary" বই। নিরীহ তাকটার মাঝখান থেকে আর একটা বাণ্ডিল, এক আর এক কিনারার আর একটা বাণ্ডিল টেনে দেখালুম। বললুম উপেনদার "নির্বাসিতের আত্মকথা" সব বিক্রী হয়ে গেছে,—ইংরাজী বইটা কিছু বিক্রী হওয়ার পর সবই রয়ে গেছে। অফিসাররা বললেন—থাক্ থাক্ আর দেখার দরকার নেই।

ঘরে আমার কোন জিনিসপত্র পাওয়া গেল না দেখে আই-বি অফিসার বললেন,—আপনার জিনিসপত্র কৈ? আমি দাঁত বার করে বললুম—কিছুই নেই। তিনি বললেন,—কাপড়-চোপড়? আমি পকেট থেকে ডাইং ক্লিনিং-এর এক রসিদ বার করে দেখিয়ে বললুম—এক সেট এই, আর এক সেট দেখছেন অঙ্গে। তিনি বললেন, গামছা? আমি লজ্জার ঢংয়ে বললুম, দরকার হয় না, রুমালেই চলে,—কারণ আমি স্নানই করি না। তিনি বললেন, বিছানা? আমি বললুম, নেই,—কাউন্টারে শুই, হাত

যা বই মাথায় দিয়ে। তিনি বললেন,—সেবারে যে একটা বড় ট্রাঙ্ক দেখেছিলুম? আমি আবার দাঁত বার করে বললুম,—সেটাকে বেচে খেয়েছি।

এতেও ওদের কোন সন্দেহ হয়নি,—কারণ ওরা বেশ জানতো, আত্মশক্তি লাইব্রেরী ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।

যাই হোক,—গুপ্তির কথা মোটাদা'র কাছেও গোপন করেছিলুম—সেজন্যে একটা দুশ্চিন্তা নিয়েই জেলে চললুম। যাওয়ার সময় লাইব্রেরীর চাবিটা রেখে গেলুম শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের কোণায় আর্টপ্রেসের মালিক অতুল ঘোষের কাছে (যশোরের লোক এবং ছাত্র নেতা)—আর তাঁর আলোয়ান খানা চেয়ে নিলুম—বললুম, মোটাদা'কে বলবেন, তিনি জেলে আমার কাপড়-চোপড় দিয়ে আসবেন এবং আপনার আলোয়ান নিয়ে আসবেন। আশা করেছিলুম, মোটাদাকে গুপ্তির খবরটা জানিয়ে দিতে পারবো—কিন্তু তার কোনো সুযোগ পাইনি।

আমি দশটার সময় লাইব্রেরী খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস এসেছিল। মোটাদা একটু দেরীতে আসতেন। এক হিসাবে ভালই হয়েছিল। একা বলে আমি ম্যানেজ করেছিলুম ভালই।

আমাকে প্রথমে ইলিসিয়াম রোতে S B Officeএ নিয়ে গেল। ভিতরের লম্বা বারান্দায় কয়েকখানা টেবিল-চেয়ার ছড়ানো আছে। এক টেবিলে এক ছোকরা বসে আছে—আর এক টেবিলে আমাকে বসালে। এক অফিসার আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ছোকরাকে দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টু হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, চেনেন নাকি ছোকরাকে!—আপনাদেরই দেশের। আমি বললুম, কোথায় বাড়ী? তিনি বললেন, বিক্রমপুরেই। আমি যথাশাস্ত্র "চিনিনা" বলে চেপে গেলুম। বুঝলুম,—অফিসার জানেন, আমি বিক্রমপুরের লোক।—মন্দ নয়।

একটু পরে এক সিনিয়র ইনস্পেক্টর সুরেন ঘোষ এসে আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন এবং প্রথমেই ভনিতা সুরু করলেন,—হুঃ—হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল! আমি বললুম, কি হল? তিনি বললেন, সেবার গিরিজাবাবুই কিছু করতে পারলেন না,—আর এবার আমাকে পাঠিয়েছে, আপনাকে tackle করতে।

মনে করলুম, যে রকম ফোলানো কথা বলছেন,—হয়ত এখনই ল্যাং মারবেন। কিন্তু দেখলুম,—তিনি কথাটা বলেছেন আন্তরিক ভাবেই। কাগজ কলম নিয়ে বললেন, এখন বলুন তো, আপনার দেশ কোথায়? আমি বললুম, সবইতো আপনাদের সেরেস্তায় আছে। তিনি বললেন, তা হলেও আমাকে লিখতে হবে—duty—কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখা গেল কলমে কালি নেই। আমার কলমটা চাইলেন,—দেখা গেল, তাতেও কালি নেই। অগত্যা বলে পেন্সিলেই লিখতে সুরু করলেন,—বললেন, পরে কালিতে লিখে নোব'খন। এরই মধ্যে একজন অফিসার এসে তাগাদা দিলেন hurry up—van ready.

দেশ কোথায়, বাপের নাম কি, বর্তমান ঠিকানা, কি পেশা ইত্যাদি লেখা হল। পূর্বোক্ত অফিসার আর একবার তাগাদা দিয়ে বললেন, তিনি আর দেরী করতে পারেন না। সুরেনবাবু লেখা বন্ধ করে' বললেন,—মরুকগে যাক্—আপনি এইখানেই একটা সই করে দিন। আমিও সর্টকাট করে একটা সই করে দিয়ে প্রিজন ভ্যানে গিয়ে উঠলুম। দেখলুম, আর কয়েকজন অচেনা যাত্রী।

ভ্যান প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে পৌঁছালো। সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বলেছে, বাইরে দিনের আলোর রেশ আছে। গেটের ভিতরে ভিড় জমেছে—"স্বদেশী বাবুরা" এসেছেন দলের লোকদের receive করতে।

সুরেশ দাস, হরিদা এবং ভূপতিদা এসেছেন,—মুন্সীগঞ্জের দলের কয়েকজন ছেলেও এসেছে, অন্যান্য দলেরও কিছু লোক আছে। তখন রোজই সন্ধ্যায় এক গাড়ী করে' নতুন মাল আমদানী হয়। বিভিন্ন দলের লোক নিজ নিজ দলের লোকদের ধরে নিয়ে যায় নিজেদের আড্ডায়—যারা বেশী মাল পায়, তাদের ভারি ফুর্তি, আর যারা কিছু পায় না, তারা মুখ চুণ করে ফিরে যায়। অদ্ভুত মনোবৃত্তি—যেন যারা যত বেশী ধরা পড়ে, তারাই তত বড় পার্টি!

ভূপতিদা সবাদের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন,—আমাকে দেখে পিছিয়ে গিয়ে হরিদাকে সংবাদ দিলেন,—নারাণ এসেছে। তারপর একটু পরামর্শ করে' তিনজনে কেটে পড়লেন। আমি ভেতরে ঢুকতেই মুন্সীগঞ্জের দল—বাদল, মাখন, বীরেন কুশারী (জিতেন কুশারীর ভাই) প্রভৃতি আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো,—তাদের কাছে থাকতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করে জানলুম অনুকূলদাও আছেন, বললুম, আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারপর স্থির করবো। ওরা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। আমি তাঁকে চুপি চুপি বললুম, আপনার কাছে থাকবো খাট আনান।

তারপর মুন্সীগঞ্জের ছেলেরা আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে জেদ ধরে বসলো, তাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বললুম, আমি অনুকূলদাকে বলে এসেছি, ওখানেই থাকবো। তার বলে, আমরা অনুকূলদাকে গিয়ে বলে আসছি। আমি বললুম, তার চেয়ে তোমরা সকলেও আমার সঙ্গে চল, অনুকূলদার কাছে থাকবে। তারা বললে, আমাদের অত আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ সে হবে একটা রীতিমত ওলটপালটের ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত তারা হার মানলো। বললে, দাদারা যে আমাদের খুব পছন্দ করেন, তা নয়।

ব্যাপার হচ্ছে,—জেলে ডেটিনিউদের তিনটে "কিচেন" বা পৃথক তিনটে "হাড়ি।" বড়দল যুগান্তর পার্টি ও তাদের সহযোগীরা—তারা যে ওয়ার্ডে থাকে, সেটার নাম "সাতখাদা"—দাদারা ও তাঁদের চেলারা, মুন্সীগঞ্জের ছেলেরা, শ্রীসংঘের অনিল রায় প্রভৃতি থাকেন। অনুশীলন পার্টির ওয়ার্ড পৃথক। আর "থার্ড কিচেন" হচ্ছে পাঁচমিশেলী—তার মধ্যে একদল কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টিক,—কিছু যুগান্তরের "revolt"—কিছু অনুশীলনের "revolt"—২।৪ জন "ছুটকো"—এবং অনুকূলদার মতন ২।১ জন "বিশিষ্ট" ব্যক্তি। দিনের বেলা ওয়ার্ডের ঘরগুলো খোলা থাকে, সকলে সব ঘরে আসা-যাওয়া এবং মেলামেশা করে। রাত ৯টায় সব ঘরে দরজায় তালা পড়ে।

পরদিন বিকেলে মাঠে বেড়াচ্ছি,—ভূপতিদা এসে বললেন,—দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি,—এখানে তুমি ...

াদাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগ্যাণ্ডা চালিয়ো না। আমি বললুম, দা, আপনিও ছেলেদের একটু বলে দেবেন,—আমাকে যেন না টায়। এইভাবে এক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান চুক্তি হয়ে গেল।

তারপর রোজই দেখি, ২ ৩ জন করে ডেটিনিউকে ইলিসিয়াম া'তে নিয়ে যায়,—৩।৪ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে কিছু গল্পগাছা করে ফেরত য়ে যায়। প্রয়োজনীয় সংবাদ বা হদিস সংগ্রহের নতুন প্ল্যান।

একদিন বরিশালের শঙ্কর মঠের আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীকে নিয়ে য়েছিল। তিনি ফিরে এসে নলিনী মজুমদারকে (I B Chief) ক চিঠি লিখে আমাকে দেখাতে এনেছেন। দেখি. চিঠিতে তিনি খেছেন,—"আমি মনু মানি না,—কিন্তু আপনি মানেন। মনু লেছেন, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয়, তাহলে তার জিহ্বা র্তন করা বিধেয়। সুতরাং মনুর কথা অনুসারে আপনার জিহ্বা র্তন করা বিধেয়।" চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বললেন,—"আমার ঙ্গে ধর্ম-আলোচনা করতে আসে—বেটা শয়তান!"

একদিন হঠাৎ ডাক পড়লো তিনজনের—আমি, হরিদা এবং মর ঘোষ (অতুলদার ভাই)। মোটাদাকে খবর দেওয়ার কোন বিধে করতে না পেরে মনে মনে অনেক জল্পনা-কল্পনা করছিলুম,— খন একটা চান্স নেওয়ার চেষ্টা করলুম। ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ঞ্চি চওড়া একটা কাগজে আত্মশক্তি লাইব্রেরীর বইএর াণ্ডিলগুলো ভাল করে গুছিয়ে রাখতে লিখলুম—কাগজটাকে াকিয়ে মুড়ির মতন করে বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ডগায় টিপে য় নিয়ে গেলুম যদি পাচার করার কোন সুযোগ জুটে যায়।

সুযোগ জুটে গেল ভালই! পূর্ণদাসের একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট য়েন সাহা এক ছোকরার জন্যে তদ্বির করতে গিয়ে I. B. Office এ বসে আছেন—আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালে সেই ঘরেরই ার এক টেবিলে। হরিদা'রা একবার আড়চোখে সুরেনসা'র কে চেয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। আমার অফিসার ভিতরে গেছেন, রজায় আছে এক কনস্টেবল পাহারা। খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ফিসার আসছে না দেখে কনষ্টেবল দরজার বাইরে গিয়ে উঁকি মেরে খছে,—ঠিক এই অবসরে আমি বাঁ হাতটা সুরেনসা'র দিকে বাড়িয়ে লুম—তিনিও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন—'মুড়ি'টা পাশ হয়ে গেল— ামি শুধু আস্তে বললুম—'মোটাদা—আত্মশক্তি লাইব্রেরী।'

জেলে ফিরে এসে শুনি,—হরিদা'রা প্রচার করে দিয়েছেন,— রেনসা'টা স্পাই হয়ে গেছে। প্রমাণ,—সে গ্রেপ্তার না হয়ে . B. Office-এ বসে আছে! অবাক কাণ্ড! আমার চিঠি ন্তু ঠিক মোটাদা'র কাছে পৌঁছেছিল,—এবং মোটাদা' গুপ্তিগুলো পেয়েছিলেন এবং সরিয়ে ফেলেছিলেন। পরে সুরেনসা'র কাছে দলের গল্পটা বলেছিলুম। আজও মাঝে মাঝে পথেঘাটে তাঁর ঙ্গে দেখা হলে সেই গল্প স্মরণ করে হাসাহাসি হয়।

যাই হোক, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন জেলে একটা সাড়া পড়ে গল,—বীণা দাস অ্যাণ্ডারসনের ওপর গুলী চালিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এসেছে। চারিদিকে ছুটোছুটি—তাকে দেখবার জন্যে— ন্তু সে তো চলে গেছে ফিমেল ইয়ার্ডে! আমি ঘরে ঘরে গিয়ে লে এলুম—'আমাদের দলের মেয়ে।' বড়াই করে বেড়াবার যে যাদের মুখ চুলকে উঠছিলো, তাদের মুখ বন্ধ হল—মুখ দেখে মার প্রতি মনোভাবটাও বোঝা গেল।

সাহেব-মারার কর্মসূচীর জীবন্ত পরিচয়ও পাওয়া গেল। বীণাদাস বোধ হয় কমলা দাশগুপ্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল—যুগান্তর দলেরই মেয়ে। ভালই লাগলো—মনে হল, প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনে এই রকম মেয়েরাই একদিন অঘটন ঘটাবে, নেতৃত্ব করবে।

খবর পেলুম, অজিত মৈত্র প্রেসিডেন্সি জেলেই কয়েদী হয়ে জেল খাটছে—জেলের তাঁতের কারখানায় কাজ করছে। কারখানা দেখার অজুহাতে গেলুম। দেখি অজিত কয়েদী পোষাক পরে সতরঞ্চি বুনছে। জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? সে হাসিমুখে বললে, ১১০ ধারা, ১ বছর। বুঝলুম,—গোয়েন্দা বিভাগের ২৬ সালের রাগের জের।

জেলের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কারখানা দেখেন,— এবং তাঁর নীচে কাজকর্ম তদারক করে এক একজন কয়েদী মেট, এক এক বিভাগে। তাঁতঘরের তদারক করেন তখন ব্যারিষ্টার বি, কে, লাহিড়ী—বি ডিভিশন কয়েদী মেট! তাঁর সঙ্গে আলাপ করলুম। তিনি দুঃখ করে বললেন, "যে সব স্বদেশী বাবুদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিয়ে ব্যবসায়ে সাহায্য করেছি, তাঁরা অনেকে রাজবন্দী হয়েছেন,—আর আমিই হয়েছি চোর।"—কথাটা ভাববার মতন।

আমি একখানা সতরঞ্চির অর্ডার দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এলুম, অজিত বুনে দেবে আমার পছন্দমত ডিজাইন অনুসারে। ৮´×৫´ মাপের চমৎকার মজবুত সতরঞ্চি—ওজন চার সের, দাম বোধহয় লেগেছিল ১৪ টাকা। এই উপলক্ষে অনেকদিন কারখানায় যাতায়াত চলেছিল। একখানা "নিরেনব্বুই বনাম এক" এবং একখানা "ভাঁওতা" গোপনে আনানোর জন্যে ওয়ার্ডারদের সঙ্গে গল্পসল্প করে ভাব করতুম। একজন লড়াই-ফেরতা শিখ এবং একজন হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডারের সঙ্গে বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলুম।

অমরদার কাছে এক চিঠি লিখে উপেনদার সন্ধান নিলুম একটু কায়দা করে। এক প্রকাণ্ড পোষ্টকার্ডে বাবা, মা, বৌদি, নিতাইকাকা, ধনুদা (অমরদার পিসতুতো ভাই—ওঁর বাড়ীতেই থাকেন) এবং তার সঙ্গে বাঁকার বাপের শুভসংবাদ চেয়ে লিখলুম এবং সকলের শুভসংবাদ পেলুম। বাঁকার বাপ হচ্ছেন উপেনদা— বাঁকা হচ্ছে শ্রীমান গণেন—ছেলে বেলায় ভারি শয়তান ছিল বলে, ওর নাম রাখা হয়েছিল বাঁকা—সর্বদা বেঁকেই আছে!

উপেনদার কাছে বই আছে নিশ্চয়, এবং তাঁর কাছ থেকেই আনানো সহজ,—কারণ কলকাতায় তাঁর দেখা পাওয়া সহজ। তখন তিনি কর্পোরেশনের চাকরীতে ঢুকেছেন এবং ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার—কার্ট রেজিষ্ট্রেশন পদ পেয়ে পার্কসার্কাসের মোড়ের অফিসে বসেন। আমার শিখ ওয়ার্ডার দোস্ত তাঁর কাছে দুদিন ঘুরে এক কপি 'ভাঁওতা' সংগ্রহ করে এনে দিলে—একদিন রাত বারোটার পর ডিউটিতে এসে। হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার দোস্তও ইতিমধ্যেই একদিন রাত্রে এক কপি "নিরেনব্বুই বনাম এক" এনে দিয়েছিল অন্য কারো কাছ থেকে—মনে নেই। বই দুটো বি কে লাহিড়ীকেও পড়তে দিয়েছিলুম। আরো অনেকেও পড়েছিল—রীতিমত গোপনে।

আমাদের "কিচেনে" তখন দিবাকর পাত্রও ছিল, চন্দননগরের কালীচরণ ঘোষও (বর্তমানে কমিউনিষ্ট নেতা) ছিলেন। আমি ওয়ার্ডারদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যাত্রাও—কি অত কথা ছাই— তিনি জানতে চাইতেন। আমি বললুম, আমি আগে ওদের

বাড়ীর অবস্থা নিয়ে সুরু করি, তারপর গরীব আর বড়লোকদের জীবন এবং পরে মালিকদের শোষণের কথা পাড়ি। বলি—গরীবের এ গরীবী ঘুচতে পারে, যেমন রুশিয়ায় হয়েছে—সবই ওরা বেশ মন দিয়ে শোনে এবং সায় দেয়। কিন্তু যখন বলি কপালের লেখা, ভগবানের বিধান, এইগুলো যতদিন গরীবদের মাথা থেকে না মুছে যাবে, ততদিন কিছু হবে না,—তখনই ওরা তর্ক সুরু করে দেয়। একজন ওয়ার্ডারের এ বিষয়ে মহা উৎসাহ—মহা তার্কিক ব্যাটা। তাকে বোঝানোর জন্যে সেদিন এক লম্বা বক্তৃতা করেছি।

শুনে কালীবাবুরও উৎসাহ বেড়ে গেল। তিনি বললেন, "আমার মুস্কিল হচ্ছে, আমি মোটেই হিন্দী বলতে পারি না। আপনার ঐ বক্তৃতাটা আমাকে বাংলা হরফে লিখে দিন, আমি মুখস্থ করবো।" মন্দ নয়! দিলুম লিখে হিন্দী বক্তৃতা বাংলা হরফে।

আমাদের "কিচেনে"র ম্যানেজার ছিলেন খুলনার নির্মল দাশ কমিউনিষ্ট। প্রায় ত্রিশজন ডেটিনিউয়ের daily allowance প্রায় ৪০ টাকা—রোজ বাজার হয় এই টাকার, অথচ খাওয়া-দাওয়া যাচ্ছেতাই। নির্মল দাশের পৃথক ঘরে টেবিলে মজুদ থাকে নানা রকমের খাদ্যবস্তুর টিন প্রভৃতি—সে সব মাল কেউ পায় না। উনি বলেন, ওঁর কি-সব ব্যাধি আছে, তার জন্যে উনি মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে ঐসব জিনিসের extra supply পান। একটা চাপা গুঞ্জরণ চলে। পরে আমরা শুনেছিলুম,—তিনি নাকি কিছু কিছু টাকা বাঁচিয়ে বাইরে পাঠান—পার্টির জন্যে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একদিন মিটিং বসলো, এবং অনেক ক্যাচালের পর ঠিক হল, পালা করে' এক এক মাস এক একজন ম্যানেজার হবে। প্রথম নূতন ম্যানেজার করা হল দিবাকর পাত্রকে প্রথম দিন থেকেই খানার সুস্পষ্ট উন্নতি দেখা গেল।

ইতিমধ্যে জেলে সরস্বতী পূজো হয়ে গেছে। সাতখাদার অন্যতম নেতার অনিল রায় প্রধান উদ্যোগী—ভূপতিদা প্রভৃতিও আছেন। ওঁরা আর দুই "কিচেন"কে নিমন্ত্রণ করলেন উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে। আমাদের থার্ড কিচেনে মিটিং বসলো—কি করা হবে। কমিউনিষ্টরা বললেন—ঠাকুর পূজো আমরা মানি না—আমরা যোগ দিতে পারি না—পূজো-সংক্রান্ত সকল উৎসব আমরা বর্জন করবো। অন্য অনেকে বর্জন করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেন। আলোচনা গরম হয়ে উঠলো। আমায় মত জিজ্ঞাসা করলে আমি বললুম, বর্জনের পলিসি ভুল, ওতে ফল হয় বিপরীত। প্রথমতঃ, আপনাদের সঙ্গে কমিউনিজমের ওপরে ওদের মন আরো বিরূপ হবে, আর দ্বিতীয়তঃ, পূজোর ওপর ওদের আরো জেদ চড়ে যাবে। সুতরাং আর কেউ যোগ না দিলেও আমি যোগ দোব। অঞ্জলিতে নয়, উৎসব-আনন্দে। অঞ্জলিতে যোগ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য নয়। ফলতঃ অর্বাচীন কট্টর কমিউনিষ্টরা ছাড়া বাকি সকলেই যোগ দিলে। থিয়েটার হ'ল—পরশুরাম রচিত বিরিঞ্চি বাবা। আমি বিরিঞ্চিবাবার পার্ট করলুম। অনিল রায়ই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন—অবশ্য ভূপতিদার পরামর্শে। তখন সুখেন্দু গোস্বামীও ওখানে ডেটিনিউ ছিলেন, ভাল গান গাইতে পারেন, তখনও বিখ্যাত গায়ক হননি—একদিন তাঁর গান হল আরো ২।১ জনেরও। আমাকেও পীড়াপীড়ি করে' বিপদে ফেলা হয়েছিল। আমি নাটকের পরে প্রহসনের মতন এমন এক গান গাইলুম, যা ক্লিন্টিনদের এলাকার বহির্ভূত।—পাড়াগেঁয়ে যাত্রাদলের "বেহুলা" পালা শুনেছিলুম তারই এক গান typical যাত্রার সুর। চাঁদসদাগর বাণিজ্যযাত্রা থেকে ফিরে এসেছেন, তাঁর স্ত্রী সনকাসুন্দরী গাইছেন—

> দুঃখের কথা বলবো কি আর—শোনো বলি ও সদাগর
> তোমা বিনে এ জীবনে যে দশা হয়েছে আমার
> পঞ্চমাস গর্ভকালে বাণিজ্যোতে গিয়েছিলে
> অনেক জন্মের পুণ্যফলে পেয়েছি পুত্র লখিন্দর।

হঠাৎ একদিন এক আই-বি অফিসার হাজির—ডেটিনিউদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার family allowance দেবেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার familyতে আপনার dependant কে কে আছেন?" আমি বললুম,—"আমার dependant কেউ নেই, non-dependantও কেউ নেই, familyই নেই।" তিনি বললেন,—"আহাহা, বুঝতে পারছেন না। সরকার family allowance দেবে বলেই এই এনকোয়ারী হচ্ছে।" আমিও বললুম,—"আহাহা, বুঝতে পারছেন না—আমার কেউই নেই।" শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝলেন না, এবং আমাকেও বোঝাতে না পেরে বিদায় হলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর খুলনার এক ছোকরা ডেটিনিউ, সরস্বতী লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট, আমাকে এসে ধরলেন—আমার দোস্ত ওয়ার্ডারকে দিয়ে বাইরে একখানা চিঠি পোষ্ট করাতে হবে, এবং চিঠিখানাও গুছিয়ে লিখে দিতে হবে। তিনি অফিসারের কাছে বলেছেন, তিনি প্রতিমাসে বাড়ীতে ৪০ টাকা করে পাঠাতেন। বাড়ীতে যদি পুলিস এনকোয়ারীতে যায়, বাড়ীর লোকেরা যেন সেই কথাই বলে—'না হলে—বোঝেন না'?' বুঝলুম, চিঠি লিখে দিলুম, এবং পোষ্ট করিয়ে দিলুম!

৩১ সালের শেষে আমি যখন জেলে যাই, তখন ডেটিনিউদের allowance fix করা হয়ে গেছে—কিন্তু যখন থেকে জেলে ডেটিনিউ রাখা সুরু হয়েছে, তখন থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোনো fixed allowance ছিল না—শুধু একটা ঢালোয়া হুকুম দেওয়া ছিল—ডেটিনিউদের যা যা প্রয়োজন সবই দেওয়া হবে। প্রয়োজনটাও যখন স্থির করে দেওয়া হয়নি, তখন স্বভাবতই প্রয়োজন মানে ডেটিনিউরা যা প্রয়োজন মনে করবে, অর্থাৎ চাইবে। একজন করিৎকর্মা ডেপুটী জেলার ছিলেন ডেটিনিউদের সংক্রান্ত সকল ব্যাপার দেখাশোনা করতেন, এবং প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন।

প্রথমে ব্যবস্থা ছিল ডেটিনিউরা একটা Requisition বইয়ে order লিখে দিতো, এবং Office থেকে সব জিনিসের একটা list করে দেওয়া হ'ত কনট্রাক্টরের হাতে। ডেপুটী জেলারবাবু কাজ সংক্ষেপ করার জন্যে পরে ব্যবস্থা করেছিলেন,—কনট্রাকটর একটা লরী বোঝাই করে নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য একেবারে জেলের মধ্যে ডেটিনিউদের ইয়ার্ডের দরজায় নিয়ে হাজির করে,—আর ডেটিনিউরা হরির লুঠের মতন যার যা পছন্দ বা যে যা পারে হাতিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যায়,—আর তারপরে কনট্রাক্টর একটা Cash Memo বই এবং একটা খাতা নিয়ে ডেটিনিউদের ঘরে ঘরে গিয়ে বসে জিনিস মিলিয়ে নামে নামে খাতায় লিখে Cash Memo লিখে দেয়। তারপর আবার ডেটিনিউরা বলে দিতো—আমার জন্যে একটা অমুক জিনিস আনবেন। দামী দামী চাদরার

দুটকেশ ছোট বড় তাঁরটে পর্যন্ত এক একজন নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২।৪ জন গ্রামোফোন পর্যন্ত কিনেছে।

বোধহয় আপনাদের মনে হচ্ছে আষাঢ়ে গল্প—এও নাকি হয়! হয়—এবং গড়ায়ও অনেক দূর পর্যন্ত। যখন allowance fix করা হল, তখন কে কত টাকার জিনিস নিয়েছে, তার একটা হিসেব করা হল। দেখা গেল, অনেকেই অনেক বেশী টাকার জিনিস নিয়েছে, এবং তার ব্যবস্থাও হল,—মাসে মাসে allowance-এর অর্দ্ধেক টাকা কেটে নেওয়া হবে। ডেটিনিউরা বললে,—ব'য়ে গেল।

কিন্তু আষাঢ়ে গল্পটা এখানেই শেষ নয়। ডেপুটী জেলারবাবুর নামে ৪৬ (বা ৮৬) হাজার টাকা তছরূপের চার্জ দিয়ে তাঁকে Suspend করা হল। তিনিও বললেন,—ব'য়ে গেল!

কনট্রাক্টরের কনট্রাক্টরীও গেল—তিনি 'ব'য়ে গেল' বলেছেন কি না জানিনা।

এই সময়ে বোধ হয়, ১৯৩২ সালের এপ্রিলে গভর্ণমেণ্ট এক ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়। সরকারী কর্মচারীদের বেতন সাময়িকভাবে কিছু কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়—নীচের গ্রেড বাদ দিয়ে কিছু উপরের গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতনের শতকরা দশভাগ,—তার উপরে শেষ ধাপ পর্যন্ত শতকরা ১৫ ভাগ, এবং স্বয়ং লাটসাহেব স্বেচ্ছায় বেতন কম নেবেন শতকরা ২০ ভাগ, এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডেটিনিউদের daily (food) allowance একটাকা ছ'আনা থেকে একটাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। নতুন সমস্যা—আমাদের মিটিং বসলো—লড়তে হবে। প্রথমে দরখাস্ত করা হবে, তারপর দরখাস্ত না-মঞ্জুর হলে hunger strike. প্রথমে প্রস্তাব উঠলো আমাদের allowance কমানো চলবে না বলে দরখাস্ত করতে হবে কারণ আমরাতো সরকারের কর্মচারী নয়!

আমি বললুম ওরা ব্যয় সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা করেছে, তাতে আমাদের ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনের নীতিটি মেনে নেওয়া দরকার, কিন্তু শতকরা হিসাবে আমাদের allowanceটা যে সর্বোচ্চহারে কাটা হয়েছে, সেটার কোন যুক্তি ওরাও দিতে পারে না। সুতরাং ওদের হিসাব মতই আমাদের allowance দু'আনা কমানো হলে আমরা রাজী আছি,—অন্যথা লড়াই করবো, এইভাবে দরখাস্ত করা হোক। অনুকূলদা আমাকে সমর্থন করলেন, কিন্তু অনেকেই চুপ করে থাকলো, এবং প্রথম প্রস্তাবই পাশ হয়ে গেল।

দরখাস্ত করা হল, এবং কয়েকদিন পরে দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ার খবর এল। আবার মিটিং বসলো। Hunger Strike এর নোটিশ দেওয়ার প্রস্তাব হল। অনেকেই বললেন, একচোটে ঐ নোটিশ না দিয়ে, আমরা নিজেরা Catering চালাতে পারবো না বলে Catering ছেড়ে দেওয়া হক। তাই হল।

জেল কর্তৃপক্ষ প্রায় কয়েদীদের মতন খানা নিয়ে এল বেলা দেড়টার সময়। মুখে তাদের ওপর হাম্বিতম্বি করতে করতে একদল চালাক ডেটিনিউ হুড়োহুড়ি করে সার দিয়ে খেতে বসে গেল, এবং তাড়াতাড়ি বেশী করে খেয়ে ভাত ডাল ফুরিয়ে ছেড়ে দিলে। বাকি লোকের খাওয়া হলনা—ওরা আবার ভাত আনলে, তবে খাওয়া হবে। আর ডেটিনিউদের তো উপোস করিয়ে রাখা চলবে না, সুতরাং ভাত আনতেই হবে।

কিন্তু সারাদিন কেটে গেল, দফার দফায় অফিসে ভাতের জন্যে তাগাদা গেল, কিন্তু কর্তাদের কলাটি। হিসেব করে বেঁধেছে, না কুলোলো তো বয়েই গেল। আবার খাবার এল রাত্রে। কে খেলো বা কে খেলোনা, কেউ দেখলে না।

ওদের জব্দ করার এই পদ্ধতিতে অনেকে ক্ষেপে গেল। যারা প্রথমেই ঠেসে খেয়ে ওদের জব্দ করার প্ল্যান করেছিল,—তাদের উপোস করানোর জেদ নিয়ে উপোসীরাই জোরের সঙ্গে Hunger Strike declare করার প্রস্তাব করলে। অনেককেই সেটা সমর্থন করতে হল। প্রস্তাব পাশ হল। Hunger Strike-এর নোটিশ দেওয়া হল।

অনুকূলদা চুপচাপ সব দেখছিলেন—তিনি আমাকে বললেন,—আমি কিন্তু Hunger Strikeএ যোগ দোব না—একলাই চাল-ডাল আনিয়ে নিজে রেঁধে খাবো। ভরসা পেয়ে আমি বললুম,—আমি থাকবো আপনার সঙ্গে। অনুকূলদা বললেন,—বেশ,—আর কাউকে কিন্তু নেওয়া হবে না। কিন্তু হাওড়ার বীরেন মুখুজ্যে জানতে পেরে এসে অনুকূলদাকে ধরলেন,—এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সঙ্গে নেওয়া হল। তিন জনের নামে অফিসে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, এবং বাজারের ফর্দ পাঠিয়ে মাল আনিয়ে একজন "ফালতু" (কয়েদী attendant) নিয়ে আমাদের তিন জনের এক "কিচেন" হল। দাদারা বোধহয় তখন বন্দী হয়ে গেছেন।

নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনশন সুরু করে দেওয়া হয়েছিল,—কয়েকজন উগ্র বীরের প্ররোচনায়,—যারা বেশী ভাত খেয়ে কর্তৃপক্ষকে জব্দ করেছিলেন। অনেকেই অনশন সুরু করেছিল একটা দ্বিধা নিয়ে। দু একদিন উপোস করার পরই যখন নোটিশের জবাব এল, সরকার তার নীতি বদলাবে না, এবং দরকার মত ব্যবস্থা করবে—তখন পেটের ক্ষুধা এবং মনের দ্বিধা মিলে অনেককেই বেহাল করে ফেলেছে—তারা ধড়ফড় করছে Hunger Strike ছাড়বার জন্যে।

জেলার ছিল ছোট রায়ান সাহেব—১৯২৬ সালের আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের জেলার রায়ান সাহেবের ছোট ভাই—প্রায় দাদার মতনই নিরীহ মানুষ। আমার সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল দুজনের নাম উপলক্ষে। দু'দিন কথাবার্তায় আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল বলে আমি বলে দিয়েছিলুম,—"তোমাকে একটা কমমূল্য বলে দিই, তাহলে আমার নাম মনে থাকবে। তোমার নাম তো রায়ান? আর আমার নাম না-রায়ান—তুমি Positive, আর আমি Negetive. সেই থেকে সে আমার নামতো ভুল করেইনি,—দেখা হলেই দুটো কথা না কয়ে যেতো না। সে একদিন বললে, "অনেকেই বলছে, তারা Hunger Strike ছাড়তে রাজী, কিন্তু পারছে না for others. আমি ওদের বোঝাচ্ছি যে, allowance কাটা হয়েছে temporarily—আবার বাড়িয়ে দেওয়া হবে কিছুদিন পরে।"

তারই দু একদিন পরে strike মিটে গেল। সকল দলই নিজ নিজ "কিচেন" হাতে নিলে। আমরা কিন্তু আমাদের "কিচেন" ভাঙলুম না। আমাদের তিন জনের একটা "বোর্ড কিচেন" বজায় রইলো। সব কিচেনের চেয়ে আমাদের কিচেনে

খাওয়া ভাল—অনুকূলদা যেমন গোছালো "গিন্নী"—তেমনি রাঁধিয়ে।

একদিন আমাদের থার্ড কিচেনে feast হল,—আমাদের ফোর্থ কিচেনের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করে' ওরা মাংসের পোলাও খাইয়ে দিলে। ওরা ২৭ জন, আমরা তিন জন। আমি অনুকূলদা'কে বললুম, ওরা চাল মারলে। একদিন আমাদের কিচেনে ওদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দেওয়া যায় না? অনুকূলদা বললেন, পোলাও করেই খাইয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু নিরিমিষ্যি পোলাও—সে অবশ্য ওদের পোলাওয়ের চেয়ে, খেতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না—লাগাতে চাও একদিন? ২।৪ দিন নিজেদের একটু সাদামাটা খেতে হবে।

তাইই স্থির করা হল,—এবং নিঃসাড়ে কয়েকদিন ধরে, কিছু পোলাওয়ের চাল আর ঘি আনিয়ে জমানো হল। তাছাড়া কিছু কিছু বিড়ি আর তামাকপাতা আনিয়ে ফালতুদের দিয়ে ডবল দামে বিক্রি করিয়ে কিছু নগদ পওসাও জমানো হল। তারপর হঠাৎ একদিন ওদের নিমন্ত্রণ করা হল। যে ওয়ার্ডার আমাদের বাজার করে দিতো তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, নগদ টাকা, একদিনের allowance এবং পরের দিনের allowance এর পরিমাণ টাকা তার কাছে ধার নেওয়ার বন্দোবস্ত করে' দই আর মিষ্টি আনিয়ে নেওয়া হল। অনুকূলদা কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। আমাদের তিনজনের কিচেনে ওদের ২৭ জনকে বাদাম-পেস্তা-কিসমিস্ দেওয়া চমৎকার নিরামিষ পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ খাইয়ে দেওয়া হল। ওদের তাক লেগে গেল।

জেলের মধ্যে যখন এই সব রকমারি খেল চলছে,—তখন বিলাতে আর একরকম খেল চলছে রাউণ্ড টেবিলকে কেন্দ্র করে'। মহাত্মাজী ছিলেন কংগ্রেসের Sole delegate—plenipotentiary—সর্বক্ষমতাসম্পন্ন একক প্রতিনিধি—তাঁর কথাই কংগ্রেসের কথা। সরোজিনী নাইডু এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যও গিয়েছিলেন, কিন্তু সে নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্বের অধিকারে। মোসলেম লীগ দল বেঁধে গিয়েছিল। হিন্দু-মহাসভার তরফ থেকেও এম এন সরকার, বি সি চ্যাটার্জি প্রভৃতি একটা দল গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ফয়সালার একটা সর্বসম্মত ফরমূলা আবিষ্কার করার দুশ্চেষ্টা দুনিয়ার চোখের সামনে ব্যর্থ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়,—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তথাকথিত সোসিয়্যালিষ্ট শ্রমিক নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাণ্ডের হাতে সকল দল মিলে ফয়সালার ভার ছেড়ে দিলেন—তিনি যা যা ফতোয়া দেবেন, তাই হবে শেষ কথা।

স্বরাজকে লাহোরে Complete Independence করে'—তাকে আবার 'পূর্ণ-স্বরাজ' ক'রে—বিলাতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী আবার নেহেরু রিপোর্টে ফিরে গিয়ে বললেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে।—লাহোরোত্তর কংগ্রেসের Sole delegate, plenipotentiary!

ভূতপূর্ব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—কংগ্রেসের Creed হল independence,—আর আপনি বলছেন, ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই ভারত সন্তুষ্ট হবে,—কেমন করে' হবে? মহাত্মাজী বললেন,—"মানে,—আমরা স্বাধীন হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই থাকবে।" লয়েড জর্জ চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন,—"অ!" (Oh I see).

বেচারা লয়েড জর্জের মাথায়ও ঢোকেনি—সব সদরেরই একটা করে খিড়কী থাকে! ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রের গোড়া এইখানে। যাই হোক, মহাত্মাজী ফিরে এলেন খালি হাতে। ভারতবাসী আবার সংগ্রামের জন্য উন্মুখ। ফেরার পথে পোর্ট সৈয়দে এসে মহাত্মাজী বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বললেন,—তিনি শান্তির জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। বম্বেতে পৌঁছেই তিনি এক প্রস্তাব রচনা করেছিলেন,—আবার সংগ্রাম সুরু করা হবে না বলে'। ৩১ সালের শেষ—তখন লর্ড আরুইন চলে গেছেন, এবং নতুন বড়লাট এসেছেন উইলিংডন। তিনি তৈরী হচ্ছিলেন, রাউণ্ড টেবিলের অবসরে,—আক্রমণ সুরু করার জন্যে। সে সুযোগও এসে গেল।

মহাত্মাজীর বম্বে পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি খাজনা বন্ধের নীতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব পাশ করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর জহরলাল, সেরওয়ানী প্রভৃতি নেতাদের ধরে জেলে পুরলে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লালকোর্তা আন্দোলনের সংগঠক ও নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ এবং তাঁর ভাই ডক্টর খাঁ সাহেবকেও জেলে পোরা হল। বাংলায়ও আরো নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগলো—জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে। ঠিক মনে নেই,—বোধ হয় এই সময়েই শরৎ বসু এবং জে এম সেনগুপ্তকেও অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করা হয়।

শরৎ বসুকে বোধ হয় কার্শিয়ংয়ে রাখা হয়েছিল। উপযুক্ত family allowance ছাড়াও তাঁর Insurance primiumও সরকার দিতে বাধ্য হয়েছিল—১০০০ টাকা হিসাবে। সেনগুপ্তকে রাখা হয়েছিল রাঁচীতে—এবং বোধ হয় ৩২ সালে, সেখানেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

জেলে সুভাষবাবুর স্বাস্থ্য আবার খারাপ হয়েছিল, এবং তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছিল। সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেন এই সর্তে যে, তিনি সরাসরি সুইজারল্যাণ্ডে চলে যাবেন চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। সেই সর্তে মুক্ত হয়ে তিনি ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন।

১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মহাত্মাজীকেও গ্রেপ্তার করা হল। তার আগে তিনি সরকার কর্তৃক চুক্তিভঙ্গের নানা অভিযোগ শুনে বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে দেখা করার জন্য এক চিঠি লেখেন, কিন্তু বড়লাট তাঁর দেখা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মহাত্মাজী এব্যাপারটাকে সরকারের নূতন নীতি বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর একবার সারা দেশে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র নেতাদের গ্রেপ্তারও করা হয়, কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার সংস্থাও বে-আইনী ঘোষিত হয়, সর্বত্র কংগ্রেসের অফিস, ছাপাখানা, তহবিল প্রভৃতিও বন্ধ, দখল বা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৩২ সালের ২রা মে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের রিপোর্টে জানা যায়,—প্রথম চার মাসের মধ্যেই ৮০০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। [ক্রমশঃ

২৭
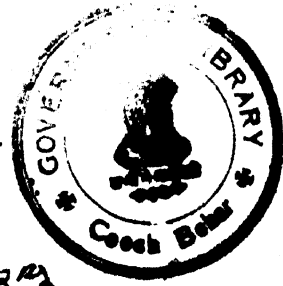
শান্তিপুরে ফিরে গেল অদ্বৈত। কিন্তু শান্তি কই?

আবার জেগেছে অবিশ্বাস। যা দেখে এলাম সব সত্যি তো? না কি ছায়াবাজি?

টিঁকতে পারল না। আবার চলল নবদ্বীপ। হাজির একেবারে শ্রীবাসের আস্তানায়।

এ কি, স্বয়ং প্রভু এখানে! আর যেখানেই নিমাই, সেখানেই কৃষ্ণকথা।

অদ্বৈতকে দেখে উঠে দাঁড়াল নিমাই। কোথায় অবিশ্বাস? পূর্ণপ্রসন্ন মনে অদ্বৈত প্রণাম করল নিমাইকে। নিমাইও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। প্রণাম করল অদ্বৈতকে।

'সীতাপতির জয় হোক।' পরিহাস করল নিমাই। 'লোকাভিরাম সীতাপতি যখন এসেছে তখন আর আমাদের ভয় কী।'

অদ্বৈতের স্ত্রীর নাম সীতা। সেই ইঙ্গিতে এই পরিহাস।

'কই—এখানে রঘুনাথ কোথায়?' অদ্বৈত প্রতিধ্বনি করল। 'এখানে তো যদুনাথ বসে।'

'তা তুমি যদি শান্তিপুরে থাকো, আমার নবদ্বীপ চলে কি করে?' নিমাই আবার সরস ইঙ্গিত করল।

তার মানে, তুমি যদি শান্তরসেই ক্ষান্ত থাকো, আমার এই নবধা ভক্তি তবে কে আস্বাদ করে? দ্বীপ যদি জলের মধ্যে আশ্রয়, ভক্তিও তাহলে সংশয়ের মধ্যে স্থিরস্থিতি।

তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে শ্রীবাস। উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'কই আর থাকতে পারলেন শান্তিপুর। তোমার আকর্ষণে চলে এসেছেন নবদ্বীপ। যে নবদ্বীপে এখন নিত্যানন্দের অবস্থিতি। আর কে না জানে, ভক্তই নিত্য আনন্দের উৎস।'

'তারি জন্যেই তো শ্রীতে যার বাস সেই শ্রীবাস এখানে চরিতার্থ।' অদ্বৈতও খেই ধরল।

'শ্রী মানে লক্ষ্মী তো?' বললে শ্রীবাস। 'লক্ষ্মী আর কোথায়? এখন তো বিষ্ণুপ্রিয়া।'

নিমাই হাসল, বললে, 'শ্রীশব্দের আরেক অর্থ ভক্তি। তোমরা সকলে যেখানে উপস্থিত, সেখানে শ্রী নেই—ভক্তি নেই—এ হতেই পারে না।'

'শ্রীবাস ঠিকই বলেছে।' অদ্বৈত বললে, 'ভক্তি তো বিষ্ণুর প্রিয়া। সুতরাং শ্রী ওখানে বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে বিরাজ করছে। বিরাজ করছে তোমার ঘরণী হয়ে।'

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভীষ্টকে পাবার জন্যে যা করতে হয় তাই অভিধেয়। এক কথায়—কর্তব্য। অভীষ্ট কে? অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। গীতায় বলেছে শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ব্রহ্মের আনন্দ অনুভূত হলে থাকেনা তার ভয়লেশ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন। ভগবানকে জানলেই জন্মমৃত্যুর পার হওয়া যায়, তা ছাড়া পার হবার আর পথ কই? তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিন্তু ভগবানকে জানবার উপায় কী?

একমাত্র ভক্তিই উপায়। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।

ভাগবতে বলছে শ্রীকৃষ্ণ, একমাত্র ভক্তিতেই জানা যায় আমাকে। গীতাতেও সেই কথা। ভক্ত্যা মামভিজানাতি। সেই কথা আবার বেদান্তে। বিদ্যৈব তু তন্নির্ধারণাৎ। বিদ্যাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বিদ্যা অর্থ জ্ঞানাত্মিকা ভক্তি। ভক্তি দিয়ে শুধু জানা নয়, ভক্তি দিয়ে দেখা যায়, প্রবেশ করা যায় তত্ত্বে, স্বরূপের উদ্ঘাটনে। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেব-ম্বিধোহর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।

এখন নবদ্বীপ, নববিধা ভক্তির সাধনের কৌশল কী?

শ্রবণ। বারে বারে শোনো কৃষ্ণকথা। অভ্যাস করো বলতে। শুধু নামের অক্ষরের উচ্চারণেই ভক্তি জাগবে। 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হতে'।

স্মরণ। বারে বারে ভাবো কৃষ্ণকে। তার লীলাচিন্তন করো। একমাত্র ভগবৎস্মৃতিই ভক্তি।

তারপরে পাদসেবন করো। অর্চন-বন্দন করো। নয়তো বন্ধুতা করো, না পারো, দাসত্বের বোঝা তুলে নাও। আত্মনিবেদন করো। গলিয়ে ঢেলে দাও নিজেকে।

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা রেখো না। অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতায় চলে এস। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হয়ে সেবা করো।

> ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
> কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
> তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।
> নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥

'শচীদেবী আমাকে পাঠিয়েছেন।' একজন লোক এসে বললে।

'কী খবর?' ব্যস্ত হল শ্রীবাস।

'অদ্বৈত আচার্যকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন। যেন ওঁর ওখানে উনি বিশ্রাম করেন।'

'কী আনন্দ।' উথলে উঠল অদ্বৈত। 'স্বয়ং শ্রীভগবানের সঙ্গে জগজ্জননীর হাতে আজ প্রসাদ পাব।'

'আমি দেখতে পাব না সে দৃশ্য?' শ্রীবাস বললে, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। আর যদি গিয়ে পড়ি, আমিও না কোন্ ছুটি প্রসাদ পাব?'

'বা, তুমি যাবে কোন্ সুবাদে?' বললে অদ্বৈত। তোমার নেমন্তন্ন হয়নি।'

'তা ছাড়া তুমি গেলে দুজনের রান্না রাঁধতে এঁর কষ্ট হবে।' নিমাই বললে সস্নেহে।

'আমাকে বলছেন?' চমকে উঠল অদ্বৈত। 'বা, আমি রাঁধতে যাব কেন? আপনার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া রাঁধবে।'

'হ্যাঁ, তাঁর কষ্ট হবে।' মমতামাখানো স্বরে বললে নিমাই।

'হোক কষ্ট। শাশুড়ি-বৌয়ে খাটবে। খাব আমরা দুজনে। ছাড়ব না।' শ্রীবাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

লোক ছুটল শচীকে খবর দিতে।

ভোজন পরে হবে, আগে দর্শন করতে দাও। সেই তরুণারুণকরুণাময় বিপুলায়ত নয়নকে দেখতে দাও চোখ ভরে। যার নয়ন তরুণ-অরুণ, করুণাময়, বিপুল ও আয়ত, সেই বিশ্ববিমোহনকে দুই চোখে আস্বাদ করি। নেত্ররসায়নকে দেখে শীতল করি নেত্র।

অদ্বৈত শ্রীবাসের কানে কী বলছে অস্ফুটে।

'কী বলছে অদ্বৈত?' জিগগেস করল নিমাই।

'বলছে, নিত্যানন্দকে যে রূপ দেখিয়েছিলে তা কেন দেখাচ্ছ না?' বললে শ্রীবাস।

'বা, এই যে আমাকে দেখছ, এই তো আমার যথার্থ রূপ।' সরল কণ্ঠে বললে নিমাই, 'আর এই রূপ—এই গৌররূপই তো অদ্বৈতের প্রিয়। কি, ঠিক নয়?'

অদ্বৈত ফাঁপরে পড়ল। যদি বলে, ঠিক, তা হলে অন্যরূপ আর দেখা হয়না। আর যদি বলে, না, শ্যামসুন্দরকেই দেখতে চাই, তা হলে গৌররূপে অনাদর আসে।

'গৌররূপের মত প্রিয় আমাদের আর কিছু নেই, তবে স্বরূপে সেই যে শ্রীকৃষ্ণ তা একবার এখন দেখতে চাই।' অদ্বৈত বললে।

'কি করে কী দেখানো যায় তার কিছুই আমি জানিনা।' নিমাই বললে কুণ্ঠিতের মত। 'কিছুই আমার ইচ্ছাধীন নয়। যদি শ্যামসুন্দরকে দেখতে চাও, চোখ বুজে হৃদয়ে কৃষ্ণকে ধ্যান করো। কৃষ্ণই কৃপা করে দেখাবেন তাঁর নিজ রূপ।'

অদ্বৈত চোখ বুজল।

এ কি, চোখ যে একবার বুজল, আর খোলে না দেখি। জনড় কাঠ হয়ে গেছে অদ্বৈত। বসে বসেই অচেতন হয়ে পড়েছে।

'আচার্যের এ কী হল ?' সবাই ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে উঠল।

'বোধহয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছে।' বললে নিমাই। 'তাই আনন্দে নিস্পন্দ।'

চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥

'আচার্যের কী ভাগ্য!' বললে শ্রীবাস, 'গৌররূপ তো দেখছেই, দেখল আবার শ্যামরূপ।' চেতনা ফিরে পাচ্ছে অদ্বৈত।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বলছে গদগদ হয়ে, 'এই যে এতক্ষণ দেখছিলাম জ্যোতির্ময় শ্রীমূর্তি, সে কোথায় গেল ? সেই নয়নোৎসব কোথায় ? সেই বিমুগ্ধ-হাসমধুর কোথায় লুকোল ? দৈবতং জীবিতঞ্চ, প্রাণের দেবতা ও বল্লভকে কোথায় পাব ?'

'তুমি কাকে দেখলে বলো স্পষ্ট করে।' সবাই ঘিরে ধরল অদ্বৈতকে।

'আর কাকে!' অদ্বৈত ইঙ্গিত করল গৌরাঙ্গকে। 'যিনি এই সামনে বসে আছেন সেই করুণা-বলোকনকে। সব, সব তাঁর কীর্তি।'

'বা, আমি কী করলাম ?' সরল সাজল নিমাই।

'আমি যেই চোখ বুজলাম উনি আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করলেন।' বলতে লাগল অদ্বৈত। 'প্রবেশ করে শ্যামরূপ ধরলেন। বহুল জলদের ঘনীভূত কান্তি কারুণিক কিশোর মূর্তি। দেখা দিয়ে আবার চলে এলেন বাইরে। বাইরে এসে দেখ আবার ধরেছেন নিজরূপ।'

'তুমি বসে বসে ঘুমুলে আর স্বপ্ন দেখলে, তাতে আমার কী দোষ ?' মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল নিমাই।

গভীর নিশীথে বনে বনে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ ? ব্রজের তরুলতা জিগগেস করল গোপবালাদের। আমরা একটি চোরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার নাম কী ? চোর বলেই তো তার নাম করব না। কিন্তু তোমাদের উপর তার মন নেই, তাকে খুঁজলে তোমাদের মানের লাঘব হবে। জানি লক্ষ্মীর কটাক্ষে সে কোথাও বিভোর-বিবশ হয়ে আছে, আমাদের দিকে সে চাইবে কেন ? আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী ? সে লক্ষ্মীর সেব্য, বনচারীদের প্রতি কেন তার আকর্ষণ হবে ? তবু যে চোর, তাকে ধরতে হবে বৈ কি। খুঁজে বার করতে হবে।

তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না; বললে তরুলতা। তোমরা কার কথা বলছ বুঝতে পারছি। কিন্তু সে তো সুশীল, তার নামে অযথা অপবাদ কেন ?

সে সুশীল ? খুব চিনেছ তাকে। সে সব চেয়ে পাকা চোর। তার মত দৃঢ় সাহসী আর কেউ নেই। শোনো, আকাশ থেকে নিবিড়নীল মেঘমালার কান্তি পর্যন্ত হরণ করেছে। কত বজ্র দিয়ে সুরক্ষিত সেই কান্তি। সেই চোরের হাত থেকে সেই কান্তিরও নিস্তার নেই। আমরা তো সামান্যা। অবলা অখলা, আমাদের মনোরত্ন চুরি করে পালাবে সে আর এমন কী বেশি কথা। জগতে যত মাধুর্য আছে সমস্তের পরিপাক হচ্ছে কন্দর্পে। বলতে পারো বা চন্দ্রে, পদ্মে, হংসে, মৃগে, মীনে, পুষ্পপল্লবে। সকলের মাধুর্য চুরি করে এই চোর নিজ মাধুর্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। সে কোথায় পালাল বলতে পারো ?

কী করে বলব ? যে চুরি করে সে কি কখনো ধরা দেয় ? আর চোর যত দূরে থাকে ততই ভালো।

কত দূরে ?

দূরেই হোক অদূরেই হোক তাকে দেখতে পাবেনা। সে বড় চতুর। সে লুকিয়ে থাকবে।

কোথায় লুকোবে ? তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। দূর হতে দেখলেও তাকে চিনতে পারব।

চিনেই বা লাভ কী! ধরবে কী করে ? তোমরা পিছু পিছু ছুটবে আর সে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্যে ? কেন, সেও ছুটতে পারবে না ?

না, সেটি হবার জো নেই। এ অন্যরকম চোর। এ বিলাসী। আর বিলাসে তার গতি অলসমন্থর জানোনা বুঝি, সে চলে আবার থমকে-থমকে দাঁড়ায়।

তাই বুঝি ? কিন্তু তার গায়ের রঙ তো কালো আর এই রাতও কালো। তাতে আবার বনের আঁধার। যদি কোনো কুঞ্জের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে তাকে দেখবে কি করে ?

বলো কী ? আঁধার কি তাকে লুকোতে পারে ? বরং আঁধারই তাকে দেখে মুখ লুকোবে। কোটি চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি তার সর্বাঙ্গে।

তাই যদি হয়, এ বৃথা প্রয়াস ছাড়ো। শেষকালে ঐ চোরই তোমাদের ধরে নিয়ে পালাবে। রাত্রি অবসন্ন হোক, প্রভাতে তাকে অন্বেষণ করো।

আমাদের নিয়ে সে পালাবে কী! তার আরেক গুণের কথা জানোনা বুঝি। সে আবার আমাদের অপাঙ্গ দৃষ্টিপ্রসঙ্গে একেবারে বিবশবিভোর। তাই যদি পথ জানো তো বলে দাও কোথায় আমাদের সেই সৌন্দর্য মাধুর্যের অফুরন্ত সমুদ্র?

'পুণ্ডরীক! পুণ্ডরীক!' একদিন হঠাৎ উচ্চরোলে কান্না জুড়ল নিমাই। 'তোর বিরহ আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। বাপ রে, বন্ধু রে, একবার দেখা দে। একবার কাছে আয়। আমার নয়ন ও হৃদয় শীতল কর।'

কে এই পুণ্ডরীক?

সবাই ভাবল, পুণ্ডরীক বলতে কৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করছে। নিমাইয়ের এ কাতরতা কৃষ্ণ ছাড়া আর কারু জন্যে নয়।

কিন্তু ঐ শোনো। নামে আবার নতুন বিশেষণ দিচ্ছে।

'পুণ্ডরীক, ও বাপ বিদ্যানিধি, দেখা দে। আমার মন-মনের তৃষ্ণা দূর কর।'

তবে এ পুণ্ডরীক নিশ্চয়ই কোনো প্রিয়ভক্ত, বিদ্যানিধি তার উপাধি।

'কার জন্যে কাঁদছেন? যদি কোনো ভক্ত হয় তো বলুন ডেকে দি। আপনার এই বিলাপে বুক ফেটে যাচ্ছে আমাদের।' ভক্তদল মিনতি করল।

'তোমরা বিদ্যানিধিকে চেন না? চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার, কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর।' বললে নিমাই। 'কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধুমাঝে ভাসে নিরন্তর। অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর॥'

'চট্টগ্রামের লোক?'

'হ্যাঁ, এখানে, নবদ্বীপেও তার একখানা বাড়ি আছে। বাইরে বিলাসী, অন্তরে দীনাতিদীন। কেউ তাকে, তার আসল রূপকে চেনে না। দারুণ গঙ্গাভক্ত। পাদস্পর্শভয়ে গঙ্গাস্নান করে না, সমস্ত দেবার্চনের আগে গঙ্গাজল পান করে। দিনের বেলায় লোকেরা গঙ্গায় নেমে কুলকুচো করে, দাঁত মাজে, চুল ধোয়, এসব দেখে ভীষণ যন্ত্রণা পায়। তাই গভীর রাতে, গঙ্গা যখন নির্জন, তখন সে আসে দর্শন করতে। কিন্তু কবে আমি তাকে দর্শন করব? তাকে ছাড়া আমার স্বাস্থ্য নেই, শান্তি নেই।'

'সে তো এখন চট্টগ্রামে। সে আসবে কি করে?'

'আসবে, শিগ্‌গিরই আসবে।' বললে নিমাই 'আমাকে ছেড়ে সে পারবে না থাকতে। কিন্তু এলে তাকে চিনবে কি তোমরা? তাকে তোমরা বিষ মনে করবে। মনে করবে বা সংসারদাস। আস ভক্তকে চেনে কয়জনে?'

কদিন পরে ঠিক পুণ্ডরীক চলে এল নবদ্বীপ।

এসে থাকল গুপ্তভাবে। একমাত্র মুকুন্দ দ খবর পেল। মুকুন্দ দত্তর বাড়ি চট্টগ্রাম – হয়তো সেই সুবাদে।

এদিকে নিমাইয়ের কান্নার বিরাম নেই। 'বাপ *বিদ্যানিধি, দেখা দে। কেন এসেও আসছিস না আমার কাছে? তোকে ছাড়া প্রাণে বাঁচি কি করে?'*

এসেছেন বলছেন, তবে কোথায় সে? ভক্তের দল পরস্পরের দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু হয়ে।

গদাধরের সঙ্গে মুকুন্দের গাঢ়তম বন্ধুতা। তাই মুকুন্দ গদাধরকে বললে চুপি চুপি, 'ভাই, নবদ্বীপে একজন বড় ভক্ত এসেছেন, দেখতে যাবে?'

'বা, নিশ্চয় যাব।' গদাধর লাফিয়ে উঠল। 'ভক্ত দেখতে আমার বড় লালসা। কিন্তু কে সে মহাজন?'

'আমাদের গ্রামের এক জমিদার, আর এরই নাম বিদ্যানিধি।'

'নিশ্চয় যাব। এখুনি যাব।'

গদাধরকে মুকুন্দ নিয়ে গেল পুণ্ডরীকের বাড়ি। এই দেখ, এই আমাদের বিদ্যানিধি।

দেখে শ্রদ্ধাভক্তি উড়ে গেল গদাধরের। এ সে কী দেখছে, কাকে দেখছে?

দেখল খাটে পুরু বিছানার উপরে পুণ্ডরীক বসে আছে, চারধারে নরম বালিশের স্তূপ, মাথায় চন্দ্রাতপ। গায়ে বিলাসবেশ, সুরূপ সুন্দর, পাশে রূপোর পানের বাটা, তাম্বূলরাগে অধর রক্তবর্ণ। দিব্য গন্ধে আমোদ করছে ঘর। পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে চাকর ব্যজন করছে। কেশভারের সংস্কারটিও মনোরম। এ বৈষ্ণব ভক্ত কোথায়? এ যে মহাভোগী। ঐহিক সুখে অনুরক্ত।

পুণ্ডরীক গদাধরের পরিচয় জানতে চাইল।

'ইনি মাধব মিশ্রের পুত্র। আজন্ম বিরক্ত।' বললে মুকুন্দ। 'ভক্তি-পথের যাত্রী। চিরকুমার।'

আর গদাধর ভাবছে পালাতে পারলে বাঁচি। বাটা থেকে কেমন পান তুলে-তুলে খাচ্ছে দেখ।

চুলে আমলকীর সুগন্ধ মেখেছে। পানে পর্যন্ত সুবাসের স্পর্শ।

মুকুন্দ বুঝতে পেরেছে গদাধর পুণ্ডরীকের বৈষ্ণবত্বে সন্দিহান হয়েছে। এতটুকুও মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় এমনি ভঙ্গি করেছে আড়ষ্ট।

তখন সে কী করে? সুস্বরে ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করল। ভক্তিমহিমার সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক। লোকবালঘ্নী রুধিরাশনা পূতনার কথা। তার ধাত্রীগতি লাভ করার করুণার কাহিনী।

রাক্ষসী পূতনা—শিশু খাইতে নির্দয়া।
ঈশ্বর বধিতে গেলা কালকূট লৈয়া॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালুরে॥

শোনামাত্র বিদ্যানিধি কাঁদতে লাগল অঝোরে মূর্ছিত হয়ে খাট থেকে পড়ে গেল মাটিতে। যদি বা জ্ঞান এল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে দিতে বিলাপ করতে লাগল: 'কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে মোর প্রাণ। মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান।'

গদাধর গতবুদ্ধি, হতচেতন।

উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল, লাথি দিয়ে ভাঙতে লাগল জিনিসপত্র। দুহাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল জামাকাপড়, আবরণ আভরণ। কোথায় পানের বাটা, কোথায় বা সুগন্ধের ঝারি। কোথায় বা দুগ্ধফেনের শয্যা, ময়ূরপুচ্ছের পাখা। আর রূপবান সেই রাজপুত্রের সর্ব-অঙ্গ ধূলিধূসর।

গদাধর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এহেন ভক্তকে আমি অবজ্ঞা করলাম। ভক্তদ্রোহী হলাম। যার শরীরে তিলমাত্র ধাতু নেই, যে অবিচ্ছিন্ন আনন্দসমুদ্র, তাকে আমি চিনলাম না। ভেবেছিলাম, যে কৌপীন পরে সেই বুঝি ভক্ত, আর যার মাথায় সুগন্ধি তেল, সে পাষণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

'মুকুন্দ।' হুঙ্কার দিল গদাধর। 'তুমিই আমাকে দেখালে কাকে বলে বৈষ্ণব, কাকে বলে ভক্তপ্রধান। বিদ্যানিধিকে দেখলে ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়, আমিও হয়েছি। শোনো, আর কথা নেই, আমি বিদ্যানিধির থেকে মন্ত্র নেব। তাঁকে মনে মনে এতক্ষণ যে অবজ্ঞা করেছি, তাঁর শিষ্য হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাঁর শিষ্য হলে তিনি নিশ্চয়ই আমার সব দোষ ক্ষমা করবেন।' অবিরল ধারায় কাঁদতে লাগল গদাধর।

গদাধরকে কোলে ধরলেন পুণ্ডরীক। বললেন, 'এ তো পরম সন্তোষের কথা। যে শৈশব থেকেই ভক্ত, তাকে দীক্ষা দিতে পারার মত সৌভাগ্য বা ক'জনের হয়? আগামী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধি হবে। তার আগে আমার গৌররায়কে একবার দেখে আসি।'

'তাঁকে আর দেখেননি আগে?' জিগগেস করল গদাধর।

'না, কই আর দেখলাম!'

'দেখেননি, পরিচয় নেই, তবে যাবেন কেন?'

'যাব কেন? সে যে আমাকে ডাকছে। আমাকে টানছে। সে ছাড়া যে গতি নেই, ইতি নেই, চোখে আলো নেই, বুকে নিশ্বাস নেই। সেই তো আমার মনোনেত্রের রসায়ন।'

'কবে যাবেন? কখন?'

'আজই যাব। যাব একাকী। যাব নিশিযোগে

[ক্রমশঃ

য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কেপ কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সু-বিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ

॥ স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের দুষ্প্রাপ্য পত্রাবলী ॥

[ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুরাগী তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙালী সমাজ স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের নামের সহিত অপরিচিত নয়। বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনের যুগে প্রাচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আইনজ্ঞ ও ভূয়োদর্শী এই মানুষটি এসেছিলেন বিলেত থেকে এই দেশে। এখন হতে সে প্রায় পোনে দুই শত বছর আগেকার কথা। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখনও ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদ আঁকড়ে রয়েছেন, আর স্যার উইলিয়াম নিযুক্ত হয়েছেন কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক। এদিক থেকে সে যুগের বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসে জোন্‌সের আপনি একটি বিশিষ্ট স্থান রয়ে গেছে। বিচারকের দায়িত্ববহুল কর্ম ছাড়াও প্রতিভাদীপ্ত এই মানুষটির স্বাক্ষর রয়েছে আরও বহু যায়গায়। বাংলা সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের সাথে অল্পদিন মধ্যেই তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যায়—মহানগরী বক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটি নামে যে সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীনত্বের গৌরব নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে, স্যার উইলিয়ামই এর প্রতিষ্ঠাতা। আরবী, পারসিক ও সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তাঁর। প্রাচ্য-সাহিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে ইংরেজ জাতির মাঝে তার প্রচলনে তাঁকেই প্রথম উদ্যোগী হতে দেখা যায়। বিচিত্র গবেষণামূলক নিবন্ধ তিনি সেদিনে লেখেন এবং সেই অমূল্য রচনাবলী যথারীতি প্রকাশিত হয় 'এশিয়াটিক রিসার্চ' নামক গ্রন্থে। 'গীত-গোবিন্দ', 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ'—এ সকল বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। স্যার উইলিয়ামের জীবন-ধারার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—ছেলেবেলা হতেই পত্র লেখায় তিনি ছিলেন নিতান্ত অভ্যস্ত ও নিপুণ শিল্পী। এমন অসংখ্য পত্র লিখে গেছেন তিনি, যাতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। সে ধরণের কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য অমূল্য পত্রই (বঙ্গানুবাদ) এবারে আমরা আমাদের মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের সামনে রাখছি।—সম্পাদক]

জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরীকে লিখিত পত্র

প্রিয় ভগিনী,

আপনার পত্র পাইয়া আপনার বন্ধু মিঃ রেণোল্ডসের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি মনে করি যে, এই শোক-বার্ত্তা আমাদের উভয়েরই সমান দুঃখের। অবশ্য তাঁহার (রেণোল্ডস) নাম বা পরিচয় খুব বেশীদিন জানি না, ব্যক্তিগত আলাপ-সালাপও তাঁহার সহিত আমার কখনও হয় নাই, তবু যে কোন সম্মানিত ব্যক্তির মৃত্যুতেই আমরা শোক-প্রকাশ না করিয়া পারি না। আপনার পত্রেও আপনি সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

···আবার, দার্শনিক দিক হইতে বিচার করিলে এই কথা না বলিয়া পারিব না যে, কাহারও মৃত্যুতে দুঃখ করা নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন। কেন না, আমাদের এইরূপ দুঃখের কারণ কি? যিনি মরিয়া গেলেন, তাঁহাকে আমরা ঘৃণা করি বলিয়াই কি এই দুঃখ? প্রিয়জনের মৃত্যুতে যদি আমাদের শোকের কারণ হয়, সে ক্ষেত্রে আমার জবাব হইবে, বিপদ ও অনিশ্চয়তার অবস্থা লইয়া যে-জীবন, তাহা ছাড়িয়া যাওয়ায় আনন্দই করা সমীচীন। সাধারণ ভাব হইতেছে—"বিশেষ পুণ্যবান কেহ দেহত্যাগ করিবেন, ইহা বেদনাদায়ক." কিন্তু আমি উহার বিপরীত কথাই বলিব। একজন গুণী মানুষের মৃত্যু সংবাদ শুনিলে আমি না ভাবিয়া পারিব না যে, তিনি সত্যই কত সুখী, যিনি জীবনে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন অথচ তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার আর ভয় নাই। মৃত্যু তাঁহার উপর এমন আবরণ জড়াইয়া দিল, যাহাতে পাপ ও অপবাদ তাঁহাকে এখন স্পর্শ করিতে পারিবে না। পরন্ত জীবনে কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নাই। আজ যিনি আমাদের চক্ষে সম্মানিত, একদিন এমন কারণ ঘটিতে পারে, আমরা হয়ত সে সম্মান তাঁহাকে দিতে পারিব না। সেজন্যই জীবনের যবনিকাপাত না হওয়া পর্য্যন্ত কে সুখী আর কে দুঃখী, কে পুণ্যবান আর কে পতিত, বলা সম্ভবপর নয়। মানুষের পক্ষে অপবাদ এড়াইয়া চলা খুবই কঠিন; পক্ষান্তরে অপবাদ এমনি জিনিস যে, ইহা ছড়াইয়া পড়িতে সময়ের প্রয়োজন হয় না। মৃত্যু হইলে গেলে গুণী ও সম্মানিত ব্যক্তির সেই ভয় আপনি তিরোহিত হয়।

আসল কথায় আবার ফিরিয়া আসা যাউক। এই সময় কি ভাবিয়া আপনি এতটা বিচলিত হইতেছেন, সেই প্রশ্ন তুলিব। তাকাইয়া দেখুন, প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার লোক মরিতেছে। আমরা যখন কথা বলিতেছি, তখনও কত হতভাগ্য ক্ষুধার জ্বালায় কিংবা দারিদ্র্যের কশাঘাতে তত্ত্ববারির মুখে জীবন দিতেছে? সুতরাং যাহারা অধিকতর দুঃখী, তাহাদের সহিত আমরা আমাদিগের দুঃখের তুলনা করিব, যাহারা অধিকতর সুখী,

তাহাদের সহিত নয়। এখানে আমি আর বেশী কিছু লিখিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছি। আগামী সপ্তাহে যখন বুঝিতে পারিব যে, আপনার মন অনেকটা প্রবোধ মানিয়াছে, তখন এ বিষয়ে আরও লিখিব। ফরাসী ভাষাতেই আমি এই পত্রখানি লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছিলাম কিন্তু পরে ভাবিলাম, নিজের মাতৃভাষাতেই (ইংরেজী) অধিকতর জোর দিয়া মনের ভাব প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে।

…এখন আমি পড়াশুনায় বিশেষ ব্যস্ত রহিয়াছি। সেক্‌সপীয়ারের জুলিয়াস সীজারে এণ্টনীর বক্তৃতাটি আমাকে করিতে হইবে। যখন আমি শহরে আসিব, ঐ নাটকখানি আপনাকে পড়িয়া শুনাইব।*

আপনার স্নেহভাজন ভ্রাতা
উইলিয়াম জোন্‌স

মিঃ রেভিকস্কির (১) নিকট লিখিত পত্র

(ক)

"পারসিক কবিতা লইয়া আমাদের যে অর্দ্ধঘণ্টা আলোচনা হয়, তাহাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। আমি মনে করি, আমাদিগের মধ্যে ইহাতে একটি অতি চমৎকার বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইল। কিন্তু অনিবার্য্য অবস্থাধীনে আমরা এক জায়গায় থাকিব না ভাবিয়া আমার মনে হতাশা জাগিতেছে। আমার যে পেশা, তাহাতে যতটা চাহিতেছি, তদপেক্ষা বেশী সময় আমাকে দেশেই আটকাইয়া থাকিতে হইবে। আর জানিলাম, আপনি অবিলম্বে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। আমাদের সুহৃতা বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এইজন্ত আমার পরিতাপ হইতেছে। অবশ্য এই সান্ত্বনাটুকু আমার থাকিবে যে, আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা না করিতে পারিলেও অন্ততঃ পত্রালাপ করিতে পারিব। এইভাবে আমাদিগের ভাব এবং অর্জিত জ্ঞানের আদানপ্রদান চলিতে থাকিলেও আনন্দের কারণ হইবে। আমাদের বন্ধুত্বের উল্লেখ করিতে যাইয়া আমি নিশ্চয়ই অনুচিত দাবীর অপরাধে অপরাধী হইতে যাইব না।

…আমাদিগের উভয়ের গবেষণার বিষয় এবং লক্ষ্য একই। এইটুকু অবশ্য পার্থক্য আছে যে, আপনি আগেই প্রাচ্য-বিদ্যায় যথেষ্ট অধিকার অর্জন করিয়াছেন আর আমি তাহার জন্ত এখনও সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি। আমি কিন্তু আপনাকে এই ক্ষেত্রে একক আগাইয়া যাইতে দিব না। ছেলেবেলাতেই গ্রীক্ কবিতা পড়িয়া আমি মুগ্ধ হই।…কিন্তু যখন আরবী ও পারসিক কবিতার আস্বাদন পাইলাম…।"

(খ)

নভেম্বর ১৭৬৮, অক্সফোর্ড

আপনাকে চিঠি লেখার লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তবে আমার ভয় হইতেছে, আমার চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আপনি হয়ত এই দেশ ছাড়িয়া যাইবেন।

আপনার সানুগ্রহ পত্র আমি পাইয়াছি। সেই সঙ্গে হাফিজের (২) বন্দনাসূচক একটি চমৎকার গীতিও আপনি জুড়িয়া দিয়াছেন। গভীরতর আনন্দের সহিত আমি উহা পাঠ করিয়াছি, বলিতে গেলে উহা আমি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছি।

কিন্তু এক্ষণে অধিক লিখিয়া লাভ কি? কারণ, এমনও হইতে পারে, আমি যাহা লিখিব, আপনার নিকট আদপেই পৌঁছাইল না। তবে আপনি যেখানেই যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ রাখিতে বারবার অনুরোধ জানাইব। আপনি যেন তাড়াতাড়ি চিঠি পত্র লিখিবেন এবং যতদূর সম্ভব দীর্ঘ পত্র লিখিবেন। আবারও আমি এই কথা বলিব যে, আপনার সৌহার্দ্দ্য অপেক্ষা আর কোন জিনিসই আমাকে অধিকতর আনন্দ দিতে পারে না।

(গ)

নিস, এপ্রিল ১৭৭০

আপনার নিকট হইতে কোন চিঠিপত্র না পাওয়ায় আমি যে কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, খুলিয়া বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু এই ধরিয়া লইতে পারি যে, আপনি আমার ফেব্রুয়ারী মাসের পত্রখানি পা[ন] নাই কিংবা আমার মনে এই সন্দেহও জাগিতে পারে যে, আপনা[র] স্মৃতির রাজ্যে আমার আর স্থান নাই। আপনাকে আমি এখা[ন] হইতে একখানি দীর্ঘ চিঠি পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে অন্যান্য জিনিসে[র] ভিতর আমার নিজের বিষয়ে অনেক কথা ছিল। প্রত্যহ[ই] ভিয়েনা হইতে পত্র আসিয়াছে কি না, আমি খোঁজ কর[ি] কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কোন উত্তর নাই[।] আমার ব্যাকুলতা ও অস্বস্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে—প্রা[য়] দুই মাস আপনি একেবারে নীরব। এই অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? অথবা কি উপায় খুঁজিয়া পাইব?…আপনা[র] নিকট হইতে কোন খবর না পাইয়া আপনার লেখাগুলিও ফের[ৎ] পাঠাইতে সাহস পাইতেছি না। আমি অবশ্য এই সঙ্গে আমা[র] মন্তব্য জুড়িয়া দিতেছি। ভাল না লাগিলে এইগুলি আপ[নি] আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারেন। কেন না, আমার সমালোচ[না] হয় ত আপনার নিকট বেশ কঠিন মনে হইতে পারে।

তুর্কীদের সামরিক কলা-কৌশল সম্পর্কে আপনার নিবন্ধস[মূহ] পাঠ করিয়া আমি খুব আনন্দ পাইয়াছি। ইহার চেয়ে অধিক[তর] কাজের কিছু হইতে পারে না। আমার এই চিঠি আপনার হা[তে] পৌঁছান সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না; সেই[জন্য] বেশী কিছু লিখিতে আমি বিরত রহিলাম। হাওয়ার সহিত ক[থা] বলিবার আগ্রহ আমার নাই। ইহার জন্ত যে-সময় আমার ন[ষ্ট] হইবে, তাহা আমি অন্ত কাজে ভালভাবে নিয়োজিত করিতে পা[রি।] খুব সম্ভব এই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ এই শহর হইতে চ[লিয়া] যাইব। ইটালী অভিযানের আমার যে প্রস্তাব ছিল, তাহা এ[খন] স্থগিত রাখিলাম। প্রিয় চার্লস, বিদায়। আমি যেমন আপনা[কে]

---

* স্যার উইলিয়ামের বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বছর, সেই সময় অর্থাৎ ১৭৬০ সাল নাগাদ এই পত্রখানি লিখিত হয়।

(১) গোড়ার দিকে রেভিকস্কি ছিলেন ওয়ারশ-এ রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী, পরে ইনি ইংলণ্ডে থাকাকালেই স্যার উইলিয়মের সাথে তাঁর সখ্যতা ঘটে।

(২) চতুর্দ্দশ শতকের বিখ্যাত পারসিক কবি।

স্মরণ রাখিয়াছি, আপনিও যেন আমাকে সেভাবে স্মরণ রাখিবেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া আপনাকে প্রায়ই আমি লিখিব এবং আমার পত্রগুলি আরও দীর্ঘ হইবে, আনন্দদায়কও হইবে।

(খ)

লণ্ডন, ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৫

আজকাল আমি চিঠিপত্র কম লিখি বলিয়া ভাবিবেন না যে, আমি আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি। এমন নির্ভরশীল লোক আমি দেখি না, যাহার হাতে আমার পত্রগুচ্ছ দিতে পারি। পরন্তু আমার মনের মতো পত্রগুলি ডাকযোগে পাঠাইবার ঝুঁকি লইতে আমি রাজী নহি। সেই সকল পত্র আপনার নিকট আদৌ পৌঁছিবে কি না, তাহাতেই আমার সন্দেহ আছে।..ওয়ারশ হইতে গত জানুয়ারী মাসে আপনি যে পত্রখানি লেখেন, তাহা খোলা অবস্থায় আমার নিকট বিলি হয়। অসম্ভব কিছু নয় যে, আপনিও সেইভাবে এই পত্রটি পাইবেন। আইন ও রাজনীতি লইয়া আমি এতই নিমগ্ন যে, সাহিত্য চর্চ্চার অবকাশ আমার নাই। আমার দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। নিরাপদ কোন সুযোগ পাইলেই সে দুইটি আপনাকে পাঠাইব। আমার অনুরোধ, আপনি চিঠিপত্র লিখিবেন। আপনার বন্ধুত্ব আমার মনে প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগাইয়া থাকে। আপনি যদি ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতে পারিতেন কিংবা আমি জার্ম্মাণীতে, ইহা আমি কতভাবে কামনা করি। আমরা উভয়ে যদি একত্র থাকিতে পারিতাম, সেই জন্যই মনের আকুলতা।

সর্বোপরি, তুরস্কের দূতাবাসের দায়িত্ব গ্রহণের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। আমি আমার স্বদেশেই বাস করিব। আহা! এখানে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় আপনাকে যদি দেখিতে পাইতাম, কতই না আনন্দ হইত! ইউরোপ ও এশিয়ার রাজারাজড়াদেরও তখন ঈর্ষা করার আমার কিছু থাকিত না। বারবার বিদায় অভিবাদন জানাইতেছি।

লেডী স্পেন্সারের নিকট লিখিত পত্র

প্যারিস, ৪ঠা জুন ১৭৭০

আমার নিকট হইতে পত্রাদির এইরূপ একটি পার্শ্বেল পাইয়া মাননীয়া মহোদয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু গত এক মাসকাল আপনাকে কিছু লিখি নাই বলিয়া আমি মার্জ্জনা চাহিতে প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সেই সময় আমার বিশেষ কিছু লিখিবার ছিলনা। প্যারিসে পৌঁছিয়া বন্ধুবর রেভিকস্কির একখানি পত্র পাই—সঙ্গে থাকে আর্চডাচেসের (অষ্ট্রীয়ার সম্রাট-কন্যা) বিবাহ উপলক্ষে রচিত একটি সুন্দর কবিতা। আমি সাহস করিয়াই বলিব যে লর্ড স্পেন্সার এইটি খুব পছন্দ করিবেন এবং সেই কারণেই এই পত্রের সহিত তাহা জুড়িয়া দিলাম। লেখাটির দুই তিনটি জায়গা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া আমি চিহ্নিত করিয়াছি। একটি স্তবকের তাৎপর্য্য আমার কাছে স্পষ্ট নহে, উহাও চিহ্নিত করা আছে।

..বাজি পুড়াইবার দিন রাত্রিতে এখানে যে মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়া থাকিবেন। এক শত ত্রিশ জনের অধিক লোক নিহত হইয়াছে। অভিজাত পরিবারের কতিপয় নর-নারী নিজেদের বাড়ীতে বসিয়াই প্রাণ দিয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, এই ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের দুই দিন পর আমরা এখানে পৌঁছি। আমরা আবার ইংল্যাণ্ডে যাইতে পারিলে দুঃখিত হইব না এবং আশা করি, খুব শীঘ্রই সেই আনন্দ পাইব। ভাল কথা, আমার বিয়োগান্ত রচনাটি সবে শেষ হইয়াছে। অল্প সময় মধ্যেই মাননীয়া মহোদয়াকে আমি উহা দেখাইতে পারিব, আশা করি।

বিনীত—উইলিয়াম জোন্স

এইচ, এ স্থলটেনসকে লিখিত পত্র

(ক)

জুলাই, ১৭৭৪

মিঃ ক্যাম্বেল-নামক একজন যুবক আপনার নিকট এই পত্রখানি লইয়া যাইতেছেন। এই ভদ্রলোক খুবই বিনয়ী ও যোগ্যতাসম্পন্ন। আমার অনুরোধ, আপনি তাঁহার বক্তব্য ভালরকম শুনিবেন। ইনি একজন ব্যবসায়ীরূপে ভারতে যাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহাকে পাড়ি দিবার পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা—এশীয়, বিশেষভাবে পারসিক ভাষা চর্চ্চায় কিছু সময় দিতে তাঁহার ইচ্ছা। এই ব্যাপারে আপনি তাঁহাকে কোনরকম সাহায্য করিলে, সেই সাহায্য আমাকে করা হইল, ধরিয়া লইব এবং এই ভদ্রলোক তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ..এখন আদালতেই আমার সকল সময় নিয়োজিত। যে-টুকু অবসর পাই, আইন ও ইতিহাস অধ্যয়নেই সে সময়টা নিয়োগ করি। আশা করি, আপনি আমার প্রেরিত ভাষ্যাবলী পাইয়াছেন। এখন আসি।

(খ)

অক্টোবর ১৭৭৪

সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত আপনার পত্রখানি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি ..আপনার পিতা ও আপনি নিজে যে আমার ভাষ্যসমূহের প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাতে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি লিখিয়াছেন যে, সাহিত্য সেবার ক্ষেত্র হইতে আমার চলিয়া যাওয়া আপনার কাছে অসহনীয়, ইহাও কম বন্ধুত্ব ও ঔদার্য্যের কথা নয়। কিন্তু প্রিয় সুহৃদ, পাশার চাল দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আমার আর বাছাবাছির কিছু নাই। সমস্ত পুঁথি-পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি অক্সফোর্ডে তালা লাগানো অবস্থায় আছে। একমাত্র আইন ও বাগ্মিতা সংক্রান্ত বইগুলি বাহিরে রাখিয়াছি। আমার পেশা (আইন) সংক্রান্ত পুঁথি-পুস্তক ছাড়া অপরাপর গ্রন্থ অন্ততঃ আগামী কুড়ি বৎসর পড়িবনা, সঙ্কল্প নিয়াছি। কেন এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম, সেই কারণ দর্শাইয়া আপনাকে বিরক্ত করার প্রয়োজন নাই।

..আপনার বিবাহে আমার মাতা, ভগিনী এবং আমি নিজে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাইতেছি। আপনার প্রিয়তমা পত্নীকেও আমার শুভেচ্ছা জানাইতে বলিব এবং আপনার পরমপূজ্য পিতাকে জানাইব শ্রদ্ধাভিবাদন। আমষ্টার্ডমে আপনি যে আমায় যাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এইমাত্র বলিব যে, এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। বিশ্বাস করুন যে, আপনি আমার অন্তরে প্রভার সু-উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। আপনার নিকট হইতে প্রায়ই যদি পত্র পাই এবং এক একটি দীর্ঘ পত্র, তাহা হইলে ইহার চেয়ে আমার আর কিছু আনন্দের কারণ থাকিবে না। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিবেন এবং আমার উপর প্রীতিভাব অটুট রাখিয়া চলিবেন, অনুরোধ।

আ

লো

ক

চি

ত্র

ভাই-বোন

—মৃণালিনী মহাপাত্র

—হীরালাল মান্না

লোভকে যে জয় করেছে

—গোবিন্দলাল দাস

কইবো কথা কানে কানে

—বীথি সরকার
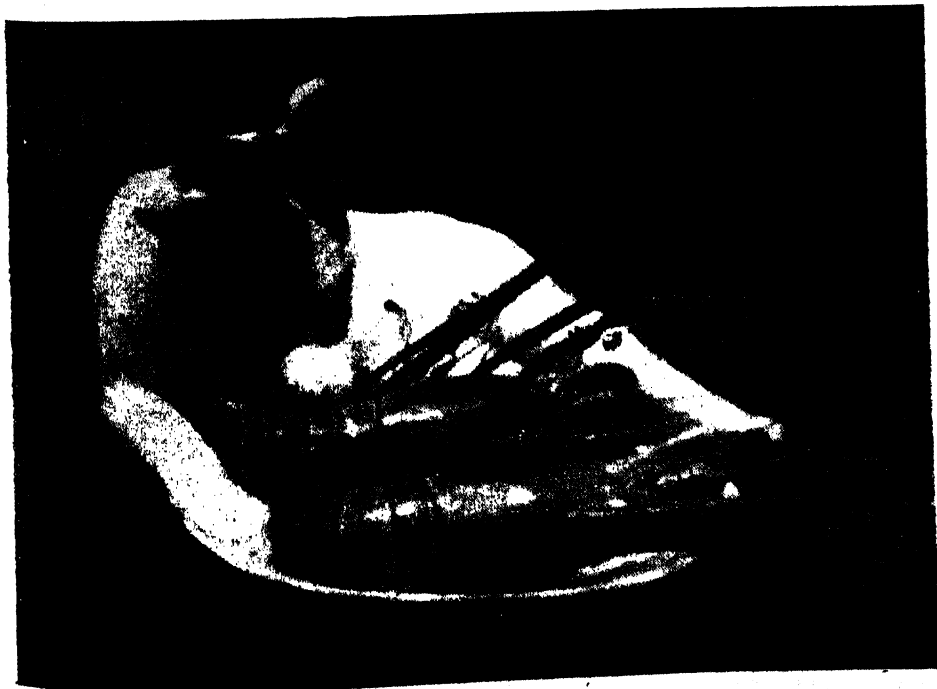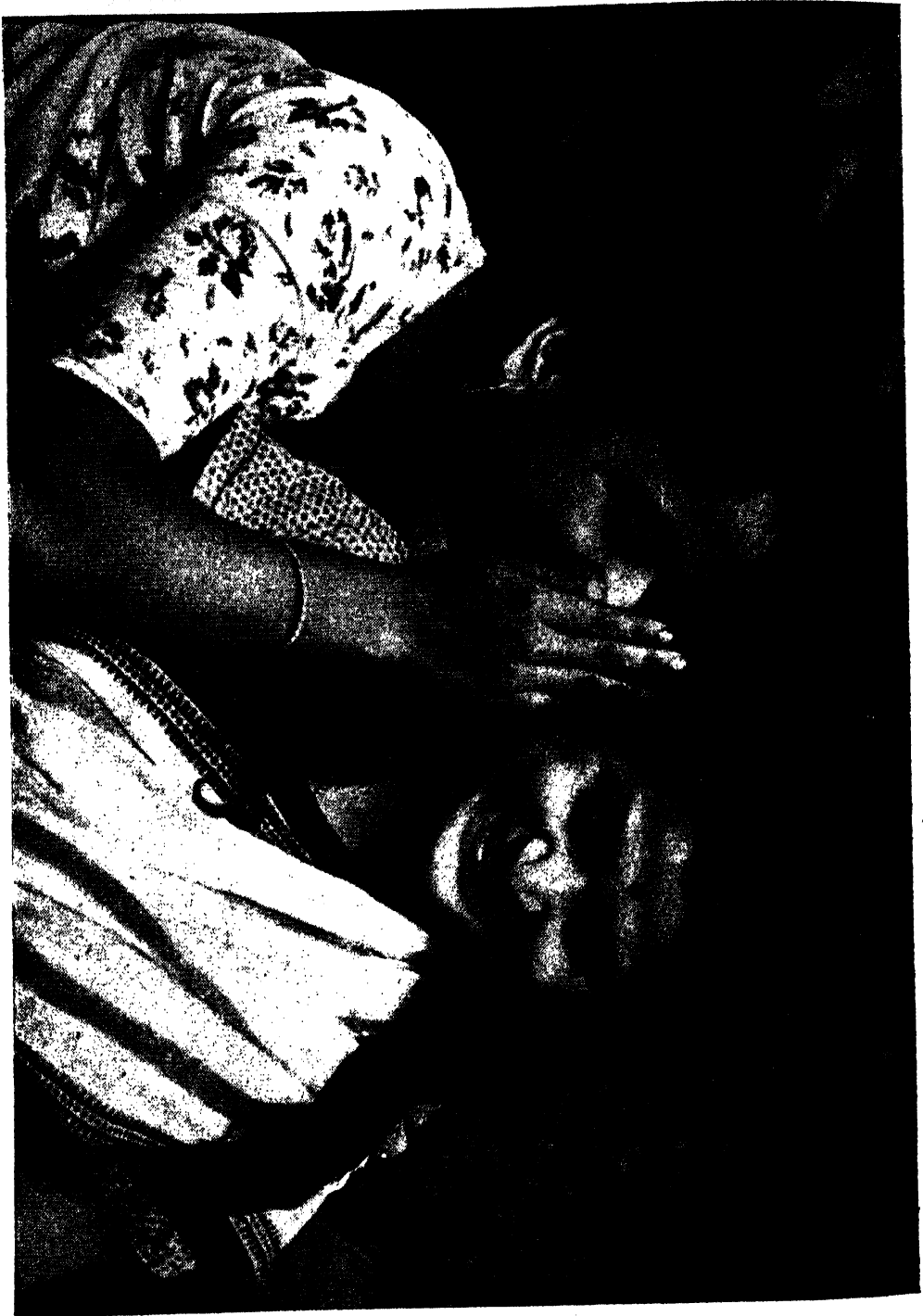
বিজন ভট্টাচার্য

৭

একজন আর একজনের কাছে যতক্ষণ নিভৃত গোপন ছিল, সুরভির মত লুকিয়ে ছিল পাপড়ির ভেতর, ঠিক ততক্ষণই য়োজন হয়েছিল সঙ্গোপনের। তখন ছিল দুজনে মিলে শুধু কথা য়ার'পালা। মাত্র একটা কথা, ভালবাস কি না বাস, নিজের ; করে জানবার বুঝবার জন্তে আজে-বাজে কত-না সহস্র কথার হতারণা। মাত্র একটি চাহনি, একটি দৃষ্টি চেনবার জন্তে পাশাপাশি খামুখি বসে কত ছাঁদেই না সেই লুকিয়ে দেখা। তার পর কত ত অভিসারের পর, সেই রহস্য যখন আর রহস্য রইল না কিংবা ই রহস্য যতক্ষণ না দৃষ্ট আর স্রষ্টার সামনে আর এক রহস্য খুলে ল, তখন আর নিরালা নিভৃতির প্রয়োজন রইল না। একজন খন আর একজনকে ভুবন জুড়ে দেখছে। আশে-পাশে কেউ াথাও নেই, কিছু নেই।

এর আগে এক সঙ্গে ওদের কেউ দেখেনি কখনও। সব সময়ই ড়াল দিয়ে দিয়ে। আজ আর সে সবের কোন বালাই নেই। াগে মানুষের কৌতূহল ছিল, এখন সে আর কৌতূহল নেই। কজনকে আর একজন এখন প্রকাশ্যেই আগলে নিয়ে চলে। সতী াছে তো সত্যব্রতকেও দেখা যাবে পাশে। বসে বসে ওরা গল্প রছে। বড় কথা, তুচ্ছ কথা, ছেঁড়া কথা—খালি কথা বলে, াসে, লুটোপুটি খায়, কখনও ‍বা রেগেও যায়। মান-অভিমানের াট ছোট পালা চলে নিজেদের মধ্যে। চলছেই। সবাই চলেছে, রাও চলছে, চলবেই।

ইতিমধ্যে কতকগুলো ব্যাপার হয়ে গেছে। শুভময় এসেছিল ইতিমধ্যে একদিন অন্নদা বাবুর কাছে। সতী-সত্যব্রতর ব্যাপারটা খন একেবারেই হাতের বাইরে চলে গেছে, তখন অন্নদাবাবুর কাছে এসে আপত্তি তুলেছিল শুভময়। বলেছিল, সতীর সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব আপনারা স্বীকার করেন কি না জানি না। কিন্তু সতী আমারই বোন। সত্যব্রতকে বিয়ে করে সে মস্ত বড় একটা ভুল করেছে জীবনে। আপনি এ বিয়ে ভেঙে দিন বাবা।

অন্নদাবাবু আগে থেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। শুভময়ের কথায় ইন্ধন পেয়ে ফেটে পড়েন এখন। বলেন, বিয়ে ভেঙে দেওয়া, কোন ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না। এ বিয়ে ভাঙতে হলে তোমার বিয়েও আমার বিয়ে ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা আমি করিনি। ছেলেপুলে বড় হলে সব সময়ই যে তারা বাপ-মায়ের ইচ্ছে মত কাজ করবে, এমন না-ও হতে পারে। তোমার এক মত। তোমার বোনের এক মত। এ ক্ষেত্রে আমার মতামতটা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হচ্ছে না বলে আবার দুঃখু করতে বলছো কেন আমায়?

শুভময় তবু আপত্তি জানায়। বলে, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা।

: আবার বুঝতে পারছি না কি, সবই বুঝতে পারছি আমি। —নইলে আমি তো স্থির করেছিলাম সতীর বিয়ে দেবো বিশ্বতোষের সঙ্গে।

ঠিক এই সময়টাতেই সুরে সুর মিলিয়ে দিলে উত্তরাধিকারের উত্তরপথটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে। দ্বিরুক্তি না করে শুভময় বলে, আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছিলাম বাবা।

শুভময়ের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকেন অন্নদা রায়। কোথায় যেন একটা সান্ত্বনা পান মনে মনে। আশ্বস্ত হয়ে বলেন, যাকগে, তুমি আমি কি মনে করেছিলাম এখন সে কথা অবান্তর। তোমার মা-ও ভেবেছিলেন এই কথাই। কিন্তু সতীকে অসুখী করে আমাদের কোন আন্তরিকতারই মানে হতো না। সুতরাং বিয়ে হবে, হোক। সতী সুখী হলেই সুখী হবো আমি।—কর্মফল অনেকখানি, কিন্তু ভবিতব্যও দেখছি অনেকখানি মানুষের জীবনে। There are times when we have got to gulp bitter pills. Facts be lie calculations. জটপাকানো চিন্তায় ডুবে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন অন্নদা রায়।

বিশ্বতোষের কথা মনে পড়ে অন্নদাবাবুর। চমৎকার ছেলেটি। টেহরি গাড়োয়াল থেকে মাথাসমেত তিনটে বাঘের চামড়া পাঠিয়েছে শীকার করে। ক্যাম্প ফেলে ফেলে বনে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ মাসখানেক। ফিরবো ফিরছি করেও ফিরে আসতে পারছে না কলকাতায়। ফিরে এলে সামনাসামনি যে কি জবাব দেবেন অন্নদাবাবু, ভেবেই পান না।

আশা করেছিলেন অনেক কিছু। অতীতের সংশয়ও দূর হয়েছিল ইদানীং বিশ্বতোষকে দেখে। ব্যক্তিগত জীবনের অতীত সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না মানুষের বর্তমান ভবিষ্যৎ। অমিয়নাথের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কতটা কি সখ্যতা ছিল, সেটা বিশ্বতোষের কিছু জানবার কথা নয়। স্থির করেছিলেন, সতীকে তিনি বিশ্বতোষের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। বিশ্বতোষকে নিয়ে কোম্পানীটা আসর জেঁকে

লাজবেন। নতুন মূলধনের আমদানি হবে ব্যবসায়ের পরিসরটা আরও সম্প্রসারণ করবেন। উৎপাদন বাড়াবেন দিকে দিকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে। কিন্তু আর কোন উৎসাহ পাচ্ছেন না মনে অন্নদা বাবু। সমস্ত পরিকল্পনাটাই যেন ভেঙে পড়ছে দু'চোখের সামনে।

বিশ্বতোষ নেই। সুতরাং অফিসে রোজ একবার করে বেরুতেই হয় অন্নদাবাবুকে। এক গাদা কাগজপত্তর সই করা ছাড়াও হাজারটা কাজ, মিটিং আর ট্রাইব্যুনাল, টেণ্ডার আর কোটেশন—একেবারে হিমশিম খেয়ে যেতে হয় দিনের শেষে। কর্মক্লান্ত দিন অবসান হলে আসে তবু শুভ ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন ধুয়ে দিতে যত মনের গ্লানি। কিন্তু এখন গোটাটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বসেছে,—সবটাই একটা একটানা ক্লান্তি।

কমলকামিনীও ভেঙে পড়েছিলেন প্রথমটা কিন্তু পরে দেখা গেল, তিনিও সামলে নিয়েছেন আঘাত। সতীকে পাশে নিয়ে এখন তিনি সারা শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পার্টি দিচ্ছেন। জিনিষ কিনছেন। বাড়ীতে জুয়েলার্স আসছে, দর্জি ঢুকছে, ডেকরেটর এসে মাপজোপ ক'রে যাচ্ছে—সবই তত্ত্বাবধান করছেন কমলকামিনী। আর থেকে থেকেই ছুটে যাচ্ছেন শ্রীরামপুর; সত্যব্রতকে ধরতে, স্বর্ণলতিকা আর চিত্রলেখার সঙ্গে গল্প করতে, মামা হরপ্রসাদের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত দুটো কথা বলতে। সত্যব্রতর মা স্বর্ণলতিকাকে তাঁর অসম্ভব-ভাল লেগেছে। সত্যব্রতর চাইতে সুপাত্র নেই তাঁর চোখে।

এ বাড়ীতে কস্মিন্‌কালেও নহবৎ বসে নি। কমলকামিনী এবার মঙ্গলচৌকি বসাবেন দেউড়ী জুড়ে। শুভবিবাহের প্রস্তাবনা থেকে বরকনে যাত্রার শেষ বিদায়ক্ষণটি পর্যন্ত সেরা বাজিয়েরা এসে শানাই বাজাবেন রাগরূপ ধরে ধরে। সতীর ফরমায়েজ আছে দুটো—আহিরী ভৈঁরো আর ললিতপঞ্চম। তার অনেক দিনের সখ।

৮

সতীর বিয়ের তিন দিন আগে হঠাৎ একদিন কলকাতায় ফিরলো বিশ্বতোষ। কোনরকম খবরবার্ত্তা ছিল না, সুতরাং কোন গাড়ীরও বন্দোবস্ত ছিলনা, কোন লোক-ও যায়নি ষ্টেশনে।

কুমায়ুনে প্রচণ্ড শীত এসময়ে। তোরাজে থেকেছে আর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছে ইচ্ছামতো, শীকার করেছে খেয়ালখুসীতে। এক মাসে স্বাস্থ্য ফিরে যাবার কথা। কিন্তু শরীরটা-ই বেইমানী করেছে। ক'-দিন থেকেই বেজুত যাচ্ছিলো দেহ। জ্বর-জ্বর ভাব। গাড়ীতে যখন ওঠে, তখনই গা গরম। হাওড়া ষ্টেশানে নামলো বিশ্বতোষ বেশ টেম্পারেচার নিয়ে। রক্তবর্ণ চোখ। মাতাল-মাতাল ভাব, ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে মাথা। সতীর বিয়ের কার্ড পৌছুবার পর থেকে শারীরিক অবস্থা এই একই রকম চলেছে। মহাউদ্বিগ্ন পিতা অমিয়নাথ।

শরীর বা মন, কোনটাই বশে নেই বিশ্বতোষের। প্রথমটা ভেবেছিলো বিয়েটা একেবারে পার করে ফিরবে। কার্ডটা যেদিন প্রথম পৌছলো পিওনের হাতে, চোদ্দ মাইল উজিয়ে সেদিন রাত্তে একটি মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নেয়নি বিশ্বতোষ। সারারাত জঙ্গলে জিপ নিয়ে স্পট করেছে, জানোয়ার আর বেধড়ক গুলী চালিয়েছে।

গোলমাল একটা হয়েছে কোথাও, নিজেই বুঝতে পারছিল। কালবিলম্ব না ক'রে পরদিনই ক্যাম্প গুটিয়ে চলে আসে রাণীখেত। তিন দিন মুসৌরীতে ছিলো। কিন্তু ভাল লাগলোনা। ড্রিঙ্কটা বেশী হয়ে যাচ্ছিলো। আচার ব্যবহারেও বেচাল হয়ে পড়ছিলো পার্টিতে। একদিন নাচতে গিয়ে বলা নেই কওয়া নেই, এক মেমসাহেবকে ধাক্কা দিলো নাচের ফ্লোরেই। বে-ইজ্জতের একশেষ। কি ভাগ্যে হোটেলের ম্যানেজার চেনাজানা মানুষ। হাত জোড় ক'রে 'সিষ্টার সিষ্টার' ক'রে রাগ মানিয়ে পাঠিয়ে দিলো কলকাতা। ট্রেণ থেকে-ই গা গরম।

বাড়ী ফিরে প্রথমেই টেলিফোনে সতীকে সম্ভাষণ জানায় বিশ্বতোষ উচ্ছসিত হয়ে। সতীকে কথা বলবার কোন সুযোগ না দিয়েই অন্নদা বাবুকে খবরটা দিয়ে দিতে বলে যে অসুস্থবিধায় সে অন্নদাবাবুর সঙ্গে সেদিন আর দেখা করতে পারবে না। সুবিধেমতো পরে দেখা করবে। সম্ভবতঃ অফিসেই।

এত উচ্ছ্বাসের ব্যাপারটা বুঝলো সতী। কিন্তু এ কথাটা আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বলে একেবারেই চেপে গেল। অন্নদা বাবুকে, বিশ্বতোষের প্রত্যাবর্ত্তনের খবরটা শুধু পৌছে দিলো।

অন্নদা বাবুর মনটা আগে থেকেই টকটক করছিলো। খবর পেয়ে ছুটে আসেন সতীর কাছে।

: আমি জান বিশ্বতোষ যেখানেই থাকুক, ঠিক ফিরে আসবে। সতীর বিয়ে হচ্ছে—তা কি বললে? অসুখ না কি যেন বলে পাঠালে?

সতী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানায় খবরটা অন্নদা বাবুকে। আরও জানায়, বলেছেন অফিসে দেখা হবে।

অফিসে দেখা হবে—হেঁয়ালির সুরে কথাটার পুনরুক্তি ক'রে অন্নদা বাবু সতীকে বলেন—

: তা, তুমি বাড়ী আসতে বলতে পারলে না?

: শুনছো অসুখ।

: ও অসুখ। অসুখটা আর কি? অসুখ···

কথাটা বলতে বলতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বেরিয়ে যান অন্নদাবাবু, যেন তাঁর নিজেরই অসুখ করেছে। অন্নদা বাবুকে দেখে মায়া হয় সতীর।

সতী জানে, অন্নদা বাবুর দুঃখটা কোথায়। কিন্তু এ দুঃখ দূর করবার কোন ক্ষমতাই নেই সতীর আজ।

বিকেল নাগাদ নেমন্তন্ন করতে বেরুবার কথা ছিল সতী আর অন্নদা বাবুর। কতকগুলো বাড়ীতে অন্ততঃ নিজে গিয়ে নেমন্তন্নপত্র না দিলেই নয়। সামাজিকতার কথা ছেড়ে দিলেও আন্তরিকতার প্রশ্ন জড়ানো। সুতরাং সতীকেও বেরুতে হয়।

নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণকার্য সমাধা করে সন্ধ্যে নাগাদ অন্নদাবাবু সতীকে নিয়ে বিশ্বতোষের ওখানে যান। খুসী হয়ে অমিয়নাথ সতীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পসল্প করলেন। কানে ভালো শুনতে পান না, তাই মাঝে মাঝে ইয়ারফোনের টিউবটা ছুঁড়ে দেন সতীর দিকে। সেকালের আর এ কালের বিয়ে নিয়ে জমিয়ে তোলেন আলোচনা। বলেন—

এখন যেন সবই রসহীন। কবিতায় কাব্য নেই। বিয়ে একটা কাটমাটে চুক্তিপত্র। তাও কতকটা কাটকা বৈধা। লাগলো ত'

ভাল। আর বদলে গেলে ভতুল হয়ে গেল সংসার। আগে ঠিক এমন ছিল না। বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ঐক্যসূত্রের মিল ধরে ধরে একজন আর একজনের কাছে আসবার চেষ্টা করতো। এটমবোমার যুগে ছেলেমেয়েদের হাতে সে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় কই? মন্ত্র পড়ে যে বিয়ে করবে সে সময়ও কম। বিয়ে হচ্ছে ফর্মে সই করে। সাক্ষীসাবুদ রেখে। ভুড়িঘড়ি।

অমিয়নাথের কথা শুনে সতী হাসে। বলে: আমি কিন্তু বিয়ে করছি জ্যাঠামশাই, মন্ত্র পড়ে, বাজনা বাজিয়ে। সুতরাং আপনাকে সাক্ষী হতেই হবে।

অমিয়নাথ সস্নেহে বলেন: যাব নিশ্চয় যাব।

অন্নদা বাবুকে এগিয়ে দিতে বিশ্বতোষ এসে হাজির হয় বাবার ড্রয়িংরুমে। অন্নদা বাবু বলেন: কই, বিশ্বতোষকে নেমন্তন্ন করলে না সতী?

হাত জোড় ক'রে উঠে দাঁড়ায় সতী। চোখে-মুখে সলাজ একটা মিনতির ভাব। কোন কথা বলে না। সুন্দর মুখখানা হেলিয়ে রাখে শুধু এক পাশে।

বিশ্বতোষই কথা বলে: নিশ্চয়ই যাবো।

বাকি কথাগুলো হুড়মুড় ক'রে এসে বুক আর দম আটকে ফেলে। এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না বিশ্বতোষ। অন্নদাবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে যায় ড্রইংরুম থেকে বাইরের বারান্দায়।

বাজিটা ছিলো নিজের সঙ্গেই! হারজিতের কথাটাও আর কেউ জানে না সংসারে। এমন কি সতীও না। তবু এড়ানো যাচ্ছে না দৃষ্টি। নিজেরই চোখ। তবু সেই চোখে যেন অন্ত হাজারটা চোখ সারাক্ষণ নিরীক্ষণ করছে বিশ্বতোষকে। সে অর্ন্তভেদী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গিয়েছে মর্মন্তুদ একটা সত্য। জিততে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে বাজি হেরেছে বিশ্বতোষ। আর বাজি হেরে এমন জখম হয়েছে, যে দাঁড়াতেই পারছে না স্থির হয়ে।

রেসের ঘোড়া হ'লে নিঃসন্দেহে কপালে রিভলবারের গুলী স্যুট করা হতো।

৯

সতীর বিয়েতে খুব ধুমধাম হলো। রাজারাজড়া থেকে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতে, কানে হীরে-পরা চেটিয়ার, কোটিপতি শেঠ সবাই বিবাহমণ্ডপে এসে আশীর্বাদ করেন নববধূকে। বিশ্বতোষ এলো একটু রাত করে। এক মুহূর্তের জন্তে মেয়েদের ঠেলে বাসরে ঢুকে সত্যব্রতর হাত দিয়ে সতীর গলায় পাঁচ হাজার টাকার একটি রত্নহার পরিয়ে দেয়। সত্যব্রতকে কানে কানে বলে যায়, পরে দেখা হবে ব্রাদার!

মেয়ের বিয়ে। অন্নদাবাবু পয়সা খরচ করেছেন জলের মতো। নিরামিষ হবিষ্যান্ন থেকে দশ বারো কোর্সের সায়েবীখানা সবকিছুরই কলাও বন্দোবস্ত। অতিথি অভ্যাগতেরা স্বজনবর্গ সহ ভূরিভোজনে পরম আপ্যায়িত হয়ে ধন্ত ধন্ত ক'রে যান। ক্রিয়াকর্মে কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সামান্ত যা সুর কাটে তা সত্যব্রতর মামা হরপ্রসাদের আচরণে। ভদ্রলোক হঠাৎ ঠিক বরানুগমনের আগে বরপক্ষের কর্মকর্তা সেজে পনেরোহাজার টাকা মোচড় দিয়ে বের করে নেন অন্নদা বাবুর কাছ থেকে। অন্নদা বাবু প্রথমটা বুঝতেই পারেননি। পরে দাবীর কথাটা বুঝে নিজেই বিশেষ লজ্জিত হন। হরপ্রসাদকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেন, না না আমারই হয়তো অন্তায় হয়ে গেছে। অতটা খেয়াল করিনি। বেয়ান বিধবামানুষ, সহায়সম্বলহীন, ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন। বেশ, ও-টাকাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু দেখবেন ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়।

ক্যাপিটাল দেখেছেন অনেক, কিন্তু ক্যাপিটালিষ্ট দেখেননি হরপ্রসাদ। মেজাজ দেখে হতবাক হয়ে যান তিনি। কন্তাসম্প্রদান পর্বের আগেই বাথরুমে গিয়ে চেকটা পড়ে দেখেন। ঠিকই আছে টাকাটা, কিন্তু এ্যাকাউন্টপেয়ী হচ্ছেন স্বর্ণলতিকা দেবী।

তুচ্ছ ঘটনা। তবু শাদাকাগজের ওপর দোয়াত ওল্টানো কালির দাগের মতই ব্যাপারটা চোখে লাগে অন্নদা বাবুর। ইচ্ছে ছিলো ছেলেকে স্বতন্ত্র একখানা বাড়ী দেবেন, গাড়ী দেবেন, নগদ ক্যাশ-ও কিছু হস্তান্তর করবেন সত্যব্রতর নামে। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই সব আন্তরিক ইচ্ছের আর কোন মূল্যই রইলো না অন্নদা রায়ের কাছে। তবে মেয়ে সতীকে দিলেন দু'হাত ভরে। উপরন্তু কারেন্ট এ্যাকাউন্টে জয়েন্টনামে পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানা ছোট্ট পাসবই দিয়ে দিলেন সতীর সঙ্গে। দরকার হলে কাজে লাগবে। কন্তাঞ্জলি ঢেলে দেবার আগে যৌতুকখাতে লক্ষ টাকার বুক দফাওয়ারিভাবে লিষ্ট করে দেওয়া হয় সতীর সঙ্গে-ই।

অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্তা নিয়ে সত্যব্রত প্রথমটা ওঠে শ্রীরামপুরে মামার বাড়ী। সপ্তাহখানেক পর সেখান থেকে হানিমুনে ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রসৈকতে এক মাস অহোরাত্রি বাসর উদ্‌যাপনের পর কলকাতায় এসে 'কুইন্‌স প্যালেস'-এ ফ্ল্যাটভাড়া। সতীর জীবনের সবখানি, সবটুকু আনাচ-কানাচে তখন জুড়ে রয়েছে সত্যব্রত।

পরিচয় আগেই হয়েছিলো মনোহরপুকুরের শ্বশুরবাড়ীতে। একদিন আলাপ হলো সত্যব্রতর বিশ্বতোষের সঙ্গে। সতীর মুখে বিশ্বতোষের কথা আগেই খানিকটা শুনেছিলো সত্যব্রত। শুনেছিলো বড়লোকের ছেলে, মেজাজী মানুষ। ভীষণ দাম্ভিক, আর অহংকারী।

কিন্তু বিশ্বতোষের সঙ্গে আলাপ করে সত্যব্রতর সেরকম মনেই হলো না। বিশ্বতোষ বলছিল: একখানা গাড়ী না হ'লে তো দেখছি নড়তে-চড়তেই অসুবিধে হচ্ছে আপনাদের। অন্নদাবাবু যে কি যুগের লোক বুঝতে পারি না। মেয়ের বিয়েতে এত খরচ করলেন আর বাবাজীকে একখানা গাড়ী দিতে পারলেন না? বলবেন না মশাই, সেনিলিটি, সেনিলিটি, বার্ধক্য, আসল কথা খেয়ালই নেই। মুখ ফুটে বলুন। দেখবেন জিভ কেটে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন। সকালবেলা উঠে দেখবেন একখানার জায়গায় দু'খানা গাড়ী আপনার দোরগোড়ায় বাঁধা রয়েছে। কিন্তু জামাইমানুষ হয়ে সে কথা বলেনই বা কি ক'রে আপনি? 'বস'-এর আমার সবই ভাল। শুধু একটু—বুঝলেন না? ঘরের লোক সবই জানবেন ক্রমে ক্রমে।

মন্তব্য করে হাসিমুখে চুপ করে যায় বিশ্বতোষ। কিন্তু কথাবার্ত্তা, হাবভাব, আচার আচরণে এমন একটা আন্তরিকতা দেখায় যে সত্যব্রত মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এই লোক দাম্ভিক অহংকারী? সতীর কথা মনে করে আপন মনেই হাসে সত্যব্রত। মনে হয়, বুঝতে ভুল করেছে সতী। বড়লোকের মেয়ে। বাস ছিলো

গজদন্তমিনারের\গুহে ঢুকায়। মানুষ চিনতে ভুল তো তার হতেই পারে। কতটুকু আর দেখেছে সতী!

হ্যামিলটনের বাড়ীর সিগারেটকেস খুলে ধরে সত্যব্রত বিশ্বতোষের সামনে। বিশ্বতোষ পা তুলে বসেছিলো সোফায় হেলান দিয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে হাসিমুখে একটি সিগারেট তুলে নেয়। লাইটার জেলে সত্যব্রত-র সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজে ধরায়। চার্চম্যান! ব'লে ব্র্যাণ্ডটা দেখে ঘুরিয়ে। সত্যব্রত বলে—আমার এই ব্র্যাণ্ড।

: বড্ড কড়া মশাই, যাই বলুন।

: আর কোন ব্র্যাণ্ড খেতেই পারি না।

: জানা রইলো। জামাই মানুষ। যদি কখনো পদধূলি দেন গরীবখানায়।

: আপনি বড্ড বিনয় করছেন। বলুন, কবে যাবো?

: যেদিন খুসী। শুধু আগে থেকে আমি একটু জানবো। জানবো, কেন না বুঝছেনই তো? খেটে খাই···পাঁচ জনের সঙ্গে সম্পর্ক, কে কখন এসে পড়ে। স্রেফ টেলিফোনটি তুলে একটু জানিয়ে দেবেন আমাকে। ভালো কথা। গাড়ীর কথা হচ্ছিলো, একখানা গাড়ী না হ'লে তো আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে নড়তে চড়তে। এক কাজ করুন না কেন?

সত্যব্রত না হেসে পারে না। বলে, বলুন।

: না না, বলবেন আপনারা। আমি শুধু সবিনয়ে প্রস্তাবই করতে পারি—বলতে পারি না। যদি বন্ধু বলে স্বীকার করেন, তবে প্রস্তাব এই—আমার দু'খানা গাড়ী। এখন দুখানা-ই তো আমি যুগপৎ চেপে বেড়াচ্ছি না।

: না নিশ্চয়ই নয়, হেসে ফেলে সত্যব্রত।

: আচ্ছা, তা তার একখানা আমি স্বচ্ছন্দে আপনার ব্যবহারের জন্যে দিতে পারি আপাতত। নতুন গাড়ী—চালু থাকলে ইঞ্জিনটাও ভাল থাকবে। আমি এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।

: কি?

: আবার কি মশাই, গাড়ী! সতীকে বলবেন না কিন্তু দোহাই আপনার! 'বস্'-এর মেয়ে ইজ্জতের ব্যাপার-স্যাপার থাকতে পারে। আমার চাকরীটি নট হয়ে যাবে পরের দিনই।

সত্যব্রত কিছু বলবার আগেই করিডোরে গিয়ে ফোন তুলে নেয় বিশ্বতোষ এবং ড্রাইভার ইসমাইলকে যথারীতি নতুন রোভারগাড়ীখানা নিয়ে মনোহরপুকুরের বাড়ীতে অন্নদাবাবুর নতুন জামাই-এর হাতে সোপর্দ করে পুনরাদেশ না পর্যন্ত হুজুরে হাজির থাকতে নির্দেশ দেয়। টেলিফোনটা সেরে আসতে বড়জোর দু' মিনিট লেগেছে বিশ্বতোষের। এসেই দেখে অপরূপ লাস্য নিয়ে সতী সত্যব্রতর বুকের ওপর আধশোয়া হয়ে কোটের বোতাম খুঁটতে খুঁটতে কি যেন বলছে কানে কানে। আচমকা ঢুকেই একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থা। মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সতী কিন্তু একটুকু চমকায় না। তেমনি নির্লাজ ভঙ্গীতে বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কথা বলে সত্যব্রতর মুখের ওপর। ততক্ষণ বোকার মত শিশুর চাপল্য নিয়ে জাপানদেশের কাইটিং মাছের আনাগোনা লক্ষ্য করে বিশ্বতোষ কাচের একোয়ারিয়ামে। এর আগে মাছ ছিল তিনটে। দুটো কিং একটা কুইন। এখন এসে ঠেকেছে এক জোড়ায়। একটা কিং আর একটা কুইন।

পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়ায় বিশ্বতোষ বারান্দায়। সম্ভ্রম রেখে দূরে দূরে—বাইরে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। পর্দার নীচ দিয়ে এখনও ওদের পা দেখা যাচ্ছে। সত্যব্রতর স্যু-জুতোর কাছেই চিতিয়ে আছে সতীর দু'খানা পা। এখনও ওরা কথা বলছে তেমনি। সত্যব্রতর ভারী গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে কানে বিশ্বতোষ। সতীই কথা বলছে বেশী। অনুনয় করে করে। প্রার্থনার সুরে কি একটা আব্দার করছে যেন। মীড় খেয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে সত্যব্রতর মঞ্জুরের অপেক্ষায়। ভালবেসে কথা। বলছে বলেই হয় তো এমনি মিষ্টি লাগছে শুনতে সতীর কথা ভালবাসলে নাকি মেয়েরা অন্য রকম হয়ে যায়। তখন নাকি তাদের চলনে ছন্দ আসে, মাধুর্য্য আসে কথায়। বিশ্বতোষকে ভালবেসে বিয়ে করলে সতীর এ রকম হতো কি না, কে জানে?

হঠাৎ বিশ্বতোষের মনে হয়, সে যে এখানেই ছিল, ভুলে গেছে ওরা। নইলে কথা বলতে বলতে উঠে এসে এতক্ষণ যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বতোষ, সে কথা ওদের খেয়াল নেই কেন? অপমান আবার কেমন করে করে অন্যকে? ঘেন্না আসে নিজের ওপরেই। আর এখানে বাইরে ঘুরে বেড়ানোটা নিজের চোখেই বিসদৃশ ঠেকছে।

আঙুলের চাবি রূপোর শিকলিতে ঘুরোতে ঘুরোতে সিঁড়ি ধরে নীচে নামে বিশ্বতোষ। রাত বাজে মাত্র ন'টা। এত সকাল সকাল বাড়ী ফিরে গিয়েই বা কি করবে সে? ভাবতে ভাবতে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দেয় বিশ্বতোষ।

গড়িয়ে যায় হুইলন। সামনের হেডলাইটের চোখ এলোমেলো যে দিকে যায়, সেই দিকেই চলে গাড়ী। [ক্রমশঃ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

এবারেও কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনা হিমাদ্রি। আরও দিন দশেক পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অটুট রেখেও যখন ওদের কোন খবরাখবর পাওয়া যায় না তখন সে ছটফট করে বেড়ায় মনে মনে।

—না না, অন্য কোন কারণ অবশ্য নেই। শুধু একজনের অসুস্থতার সংবাদেই যেন মনটাকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছে। যে কোন একজন পরিচিত মানুষের প্রতি মানুষমাত্রেরই এ অতি স্বাভাবিক মমতা।—একবার শুধু জেনে আসতে হবে রঞ্জনার কী হয়েছিল আর এখন সে কেমন আছে। তাছাড়া এত কথা শোনবার পর একটা খবর পর্য্যন্ত না নিলে সেটা ভারী অভদ্রতা হয়ে যায় না কী?

নিজের মনটাকে অনেক আঁখি ঠেরে বিকেলবেলায় বাড়ী থেকে রওনা হল হিমাদ্রি। মলিভিলার গেট থেকে একটু আগে থেমে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করলো গাড়ীটা। তারপর নিঃশব্দ চরণে এগোলো গেটের ভিতর।

বৈঠকখানাটা অন্ধকার। উপরতলার উজ্জ্বলতাও লক্ষ্য করবার মত নয়। স্বল্পালোকিত মলিভিলাকে একান্ত প্রহেলিকাময়ী বলে মনে হল আজ। তার বিষণ্ণ পরিবেশে কী যেন একটা অশুভ সংবাদ প্রতীক্ষা করে আছে।

দ্বারপ্রান্তে তারই অদৃশ্য ইংগিত হিমাদ্রির পা' দুটোকে ভারী করে তুললো যেন। একবার মনে হল নিঃশব্দে যেমন এসেছে তেমনি ফিরে যায়। কিন্তু তাও পারলো না হিমাদ্রি। এতদূরে এসে আবার ফিরে যাওয়াটা নিজের কাছেই কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হল।

এমনি দোমনা অবস্থাতেই সিঁড়ির তলাটায় দাঁড়িয়েছিল হিমাদ্রি। হঠাৎ ভজহরির নজর পড়লো তার দিকে।

গরম দুধের একটা পেয়ালা নিয়ে ত্রস্তপায়ে রান্নাঘর থেকে উপরতলার দিকে চলেছিল ভজহরি। সিঁড়ির গোড়ায় হিমাদ্রিকে অমন ভূতের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে। তারপর কোঁচার কাপড়টায় চোখ ঢেকে কেঁদে উঠলো হু-হু করে। —আর কী দেখতে এলেন গো দাদাবাবু! সব শেষ হয়ে গেছে যে।

হিমাদ্রি স্তম্ভিত! একবারও তার মনে আসেনি এমন একটি ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা। রঞ্জনা নেই? অমন ফুলের মত সুন্দর মেয়েটা এত শীঘ্র পৃথিবীর মায়া কাটালো? না না, এ সময়ে পরমেশবাবু বা মলিনা দেবী কারো সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস নেই হিমাদ্রির। এইখান থেকে ফিরে যাওয়াই বরং ভালো। এ শোকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা তার নেই।

ভজহরিকে কী বলবে, তাই বোধহয় ভাবছিল হিমাদ্রি। কিন্তু ততক্ষণে শোকের প্রথম বেগটা সামলে নিয়েছে ভজহরি। চোখটা একটু মুছে সে আবার বলে—শরীলটা তাঁর অনেকদিনই কাহিল হয়েছিল কী না, ততখানি পথ আনাগোনার ধকল সইল না আর। দিদিমণিকে নিয়ে সেই যে পচ্চিম থেকে এসে শয্যে নিলেন মাঠাকুরুণ—আর মাথা তোলা হলনি তাঁর।...এমন সোনার সংসারটা ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন...কী মনিব হারালুম গো দাদাবাবু, মানুষ নয় দেবতা। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ভজহরি। অনেক দিনের লোক সে। বাস্তবিকই ভালবাসে মনিবকে।

ওর কথা শুনতে শুনতে হিমাদ্রির গুলিয়ে-ওঠা মাথাটা থিতিয়ে আসে আবার। রঞ্জনা তাহলে মারা যায় নি—মারা গেছেন মলিনা দেবী।

ব্যাপারটা মর্মান্তিক দুঃখের। কয়েক মিনিট কথা বলতে পারে না হিমাদ্রি। মাতৃরূপা মানুষটির জন্য অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে মনে মনে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটাও সে স্থিরমস্তিষ্কে অনুভব করে যে রঞ্জনার মৃত্যুর চেয়ে এ তবু মন্দের ভালো। কারণ, মলিনা দেবী বেঁচে থেকে যদি রঞ্জনা মারা যেত তবে মলিনা দেবীর পক্ষেই তা হত মরণাধিক যন্ত্রণা।

তবু এ আকস্মিক সংবাদে সমস্ত মনটা অশান্ত হয়ে যায়। মৃদুকণ্ঠে সে ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করে—কবে এমন হোল?

—আজ তিন দিন। আপনি কী জানতেন না দাদাবাবু?

মাথা দুলিয়ে কোনমতে একটা অস্পষ্ট না বলে ভজহরির পিছনে পিছনে উপরতলায় উঠে আসে হিমাদ্রি। অবশ পা দুটোকে বিবেকের তাড়নায় চালিয়ে নিয়ে আসে জোর করে।

দক্ষিণের খোলা ছাদে অন্ধকারে মাদুর বিছিয়ে বসেছিলেন রঞ্জনা আর পরমেশ। ভজহরির পিছু পিছু সংকুচিত চরণে সেখানে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো হিমাদ্রি।

তারপর দুধের কাপটা নামিয়ে দিয়ে ভজহরি নীচে চলে গেলে ধপ করে বসে পড়লো মাদুরের এক প্রান্তে।

ও যেন নিজেকে মিশিয়ে দিতে চায় ওখানকার উচ্ছ্বাসলেশহীন শোকসভায়। সান্ত্বনা দিয়ে নয় নিজে শোকচ্ছায়ায় অংশগ্রহণ

করে ওখানকার, বেদনাক্ত পরিবেশের ভার লাঘব করে দিতে চায়।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পরমেশবাবু প্রথম কথা বললেন—কিছু মনে করো না হিমাদ্রি, আমারই উচিত ছিল তোমাকে একটা খবর দেওয়া। কিন্তু একলা মানুষ—কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল তাড়াতাড়িতে। তা না হলে—

—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি মোটেই ধারণা করতে পারিনি আপনারা এর মধ্যে ফিরে এসেছেন। আমারই উচিত ছিল একটা খবর নেওয়া। কিন্তু এ রকম যে হতে পারে, তাই তো আমার ধারণায় আসেনি কোনদিন।

—নাঃ, যা কোনদিন ভাবি না তাই যেন আমার জীবনে পর-পর হয়ে চলেছে।—খুকীরও শরীর খুব খারাপ। খুব অসুখ করেছিল সেখানে।—কৈ, তুমি দুধটা খেলে না মা? ওটা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল একেবারে।

হাঁটু দুটোকে বুকের কাছে মুড়ে বসেছিল রঞ্জনা। এবার সে পা দুটো নামিয়ে বসে দুধের পেয়ালাটা হাতে তুলে নেয় কোন কথা না বলে। একটু পরে শূন্যগর্ভ পেয়ালাটা আবার নামিয়েও রাখে তেমনি নীরবে। হিমাদ্রি লক্ষ্য করে ওর দুধ খাওয়ার ভঙ্গীটা যেন যন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ।

আরও কিছুক্ষণ সময় চলে গেল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। পরমেশবাবুর বয়েস হয়েছে, বোধহয় সেই কারণেই অন্যসময় তিনি একটু বেশী কথা বলেন। কিন্তু আজ তিনিও বিষাদগম্ভীর।

আর একটু কিছু বলা উচিত বুঝেও সারাটা সন্ধ্যের মধ্যে বলবার মত একটা কোন কথা খুঁজেই পেলো না হিমাদ্রি। শুধু হাতড়ে খুঁজে বেড়ালো মনের ভিতরটায়।

আর রঞ্জনা? সে কিছু বলতে চায় না। শুনতেও চায় না কিছু। এমন কী নিজের অস্তিত্বটাকেও লুকুতে পারলে সে বাঁচে। শুধু হিমাদ্রির সামনে থেকে নয়—সমস্ত পৃথিবীর সুমুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলেই সে আজ সুখী হয়। তার সম্বন্ধে প্রত্যেকটি জনালোকের অবশ্যম্ভাবী কৌতূহলের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে দুর্ভোগ আর কী থাকতে পারে? বিশেষ করে এই যে হিমাদ্রি! কী জানাতে এসেছে ও? সহানুভূতি না করুণা? কী নিছক একটু তামাশা দেখবারই লোভ আছে ওর? একটু প্রশ্রয় পেলেই আরও পাঁচজনের মত ও'-ও কী জেরা করতে সুরু করবে না?

—এতদিন ছিলে কোথা?

—কেমন ছিলে?

—তারপর? ফিরলে কেন?

—একা দেখছি যে?

—না না রঞ্জনা পারবে না। এ ধরণের কোন প্রশ্ন বরদাস্ত করতে পারবে না সে।

এত কাণ্ডের পরও মুখ পুড়িয়ে সংসারের যে মিষ্টতাটুকুর লোভে সে ফিরে আসতে চেয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস মায়ের স্নেহটাই তো হারিয়ে ফেলেছে সে। আর তার দরকার নেই পরিচিত পৃথিবীর সস্নেহ পরিবেশে। তার চেয়ে অনেক ভালো সকলকার সুমুখ থেকে সরে যাক্ রঞ্জনা—নিজেকে নিয়ে পালিয়ে যাক চিরদিনের মত। এমন একটা জায়গায় চলে যাক্ সে যেখানে তাকে কেউ চিনবে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কেউ তাকে বিব্রত করে তুলবে না—সুজনকে বিয়ে করে সে ভুল করেছিল কী না সেই বিষয়ে।

যদি ভুলই করে থাকে তবে তার জন্যে কী মাশুল দিতে হল তাকে?—তা নিয়ে কোন জবাবদিহির দায় থাকবে না রঞ্জনার। কিম্বা যদি ভুল না করে থাকে সে তবে এককাঁড়ি গয়নাকাপড় ছাড়া আর কী পেয়েছে সুজনের কাছ থেকে? তার একটা তালিকা করে দিতে হবে না জগতের লোকসমক্ষে? নিজের জীবনের জমাখরচ লাভ লোকসানের হিসাব দাখিল করতে হবে না অন্য কারোর কাছে।

সেই ভালো—যা হোক্ একটা চাকরী নিয়ে একেবারে অচেনা কোন বিদেশে চলে যাবে রঞ্জনা। একটা দিনও আর এখানে থাকবার সাধ নেই তার।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে বাবাকে নিয়ে। একে তো মা চলে যাওয়ায় সংসারটার সমস্ত মাধুর্য্যই ঘুচে গেছে, তার ওপর বাবাকে এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে যায় কী করে রঞ্জনা?

তা না হলে নিজের জীবিকার সংস্থানটুকুর জন্যে কারো প্রত্যাশা না রাখবার মত মনের জোর আছে রঞ্জনার।

অবশ্য ঘটনাচক্রে শরীরটা তার এতই ভেঙেছে যে বর্তমানে চাকরী করা তার পক্ষে সত্যি সত্যিই সম্ভবপর কী না, সেটাও যথেষ্ট বিবেচনা-সাপেক্ষ।

ভাঙা শরীরটাকে তবু না হয় মনের জোরে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু নতুন এই যে, মাথার যন্ত্রণাটা সুরু হয়েছে রঞ্জনার—তাকে সে সামলাবে কী করে? বাবা ব্যস্ত হবেন, ভয় পাবেন বলে যদিও সে বহু সন্তর্পণে বাবার নজর থেকে এটাকে লুকিয়ে রেখেছে তবু নিজের মনে মনে সত্যিই তার রীতিমত চিন্তা হয় এ ব্যাপারটার জন্যে।

সমস্ত মাথার ভেতরটায় কী যে একটা কষ্ট হয় চেষ্টা করলেও সেটা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবে না। মাঝে মাঝে সব কিছু গোলমাল হয়ে যায় যেন।

আচ্ছা, হিমাদ্রি কী এর মধ্যে আরও এসেছিল এ বাড়ীতে? তাই তো মনে হল ওর ভাবভঙ্গী দেখে। কিন্তু কেন?

রঞ্জনার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ছিল তা নাকচ হয়ে যাবার পরও কী করতে আসতো ও?

ভালবাসার টানে? অসম্ভব! রঞ্জনাকেই যে কোনদিন আগ্রহ সহকারে চায়নি, রঞ্জনার বাবা-মাকে সে কী করে এত ভালবাসতে পারে?

সে সব দিনগুলো কী ভুলে গেছে রঞ্জনা? যখন সুজন প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন ভাষায় স্তবগান রচনা করে রঞ্জনাকে দিক্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিলো?

রঞ্জনার নাচগান রূপগুণ সমস্ত কিছুর অপরিমিত প্রশংসা করে রঞ্জনার মন থেকে নীতিজ্ঞানটা পর্য্যন্ত ভাসিয়ে দিয়েছিল প্রায়। তা না হলে চিরকালের পরিচিত বাপ-মায়ের স্নেহ-আবেষ্টনীর বন্ধন ছিন্ন করে কী ভরসায় কোন নির্ভয়ে সুজনের হাত ধরে অত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে পা বাড়িয়েছিল রঞ্জনা? কৈ বাপ-মায়ের অনুমোদন পেয়েও হিমাদ্রি তো কোনদিন এত আগ্রহে এগিয়ে আসেনি রঞ্জনার

হাত ধরতে? একই গান শুনে যেখানে সুজন মাতোয়ারা হয়ে গেছে, সেখানে কোনদিন এতটুকু উচ্ছ্বাসও আসেনি হিমাদ্রির তরফ থেকে।

তাই তো শেষের দিকে মনের মধ্যে রীতিমত দ্বন্দ্ব হতো—সন্দেহ হতো হিমাদ্রি তাকে সত্যিই চায় কী না? না কী শুধু পিতৃসত্য রক্ষা করে পিতৃবন্ধুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করাই তার উদ্দেশ্য?

অনেক ভেবেছিল রঞ্জনা এই নিয়ে। একদিনেই সুজনের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি সে। এমন দিনও ছিল যেদিন প্রতিমুহূর্তে হিমাদ্রির জন্তে প্রতীক্ষা করে থাকতো সে।

উন্মুখ হয়ে থাকতো হিমাদ্রির গাঢ়ীর হর্ণ শোনবার আশায়। হিমাদ্রির চোখে চোখ রেখে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকতো এতটুকু প্রশংসার হাসি দেখবার আশায়। হয়তো পেতোও—কিন্তু সুজনের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের তা নিতান্ত ম্লান, নিতান্ত নগণ্য।

রঞ্জনা কী লক্ষ্য করেনি সুজনের মুখে রঞ্জনার প্রশংসা শুনতে শুনতে কতদিন গম্ভীর হয়ে উঠেছে হিমাদ্রির মুখ। কতদিন কত আনন্দভরা সুন্দর সন্ধ্যায় উচ্ছ্বসিত সুজনের কথার অর্দ্ধপথেই বিদায় চেয়েছে হিমাদ্রি। রসভঙ্গ করে বাড়ী চলে গেছে যা হোক একটা অছিলা করে। প্রথম প্রথম হিমাদ্রি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জনার কাছে সন্ধ্যাগুলো ম্লান হয়ে যেত। মা-বাবাও ওঘর থেকে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, কেন হিমাদ্রি চলে গেল অমন করে?

কিন্তু আশ্চর্য্য। সুজন একটুও দমতো না। কত রকমের হাসি কত ধরণের গল্প শুনিয়ে সুর চড়াবার চেষ্টা করতো রঞ্জনার সুরকাটা সন্ধ্যাগুলোর।

উঃ, এত অভিনয়ও শিখেছিল সুজন? রঞ্জনার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্তে মনোরঞ্জনের এত বিদ্যাও সে আয়ত্ত করে রেখে দিয়েছিল আগে হতে? অজগরের চোখে চোখ পড়া হরিণীর মত একটু একটু করে সম্মোহিত করে বেঁধে নিয়েছিল রঞ্জনাকে তার সর্বগ্রাসী কবলে। কিন্তু কৈ, রঞ্জনা তো কারোকে কোনদিন প্রতারণা করে নি? তবে কেন এমন হল? কেন এমন ব্যবহার পেল সে? যতদিন পর্যন্ত হিমাদ্রিকে স্বামী বলে ভাবতো সে ততদিন সর্বান্তঃকরণেই তার সাহচর্য্য কামনা করেছে। প্রতি মুহূর্তে আশা করেছে হিমাদ্রি এগিয়ে আসুক। সুজনকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রঞ্জনাকে তার পাশে টেনে নিক্। কিন্তু কৈ হিমাদ্রি তো এলো না? রঞ্জনার সমস্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ করে দিয়ে আস্তে আস্তে সে শুধু নিজেকে সরিয়ে নিলো রঞ্জনার জগত থেকে। আজও ভাবতে গেলে মাথার ভিতরটায় গুলিয়ে ওঠে রঞ্জনার, দুমড়ে ওঠে বুকের মাঝখানটায়।

—সেদিন নিজেকে বোঝাতে আরও অনেক বেশী কষ্ট হয়েছিল রঞ্জনার। তবু সে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে এই কথাই বার বার বলেছে—এ ভালোই হল। হিমাদ্রি যখন এ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই চাইছে তখন তাকে মুক্তি দেওয়াই মঙ্গল। রঞ্জনার যত কষ্টই হোক্ তবু সে কারো গলগ্রহ হওয়ার লজ্জা মাথা পেতে নেবে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে এই কথাটাই তার বার বার মনে হয়েছে যে, সুজন তাকে পেতে চাইবে রঞ্জনা বলে আর হিমাদ্রি তাকে গ্রহণ করতে চাইছে বাগদত্তা বধূ হিসাবে। এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

তাইতো সুজনের আনাগোনা যত ঘন ঘন হতে লাগলো হিমাদ্রিকে ততই সরে যেতে দেখে বিস্মিত হয়নি রঞ্জনা। মনে কষ্ট হলেও নিজেকে কঠিন হাতে দমন করে রেখেছে, লুটিয়ে পড়তে দেয়নি হিমাদ্রির পায়ে।

তারপর?

তারপর বাকী থাকে সুজনের সাথে রঞ্জনার ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস।

সে ইতিহাস রঞ্জনার দ্বারায় রচিত হয়নি। হয়েছিল সুজনের আগ্রহের আতিশয্যে। তবু যেদিন থেকে সুজনের হাতে হাত মিলিয়েছে রঞ্জনা সেদিন থেকেই প্রাণপণ সাধনায় তাকেই মেনে নিতে চেষ্টা করেছে সে। বঞ্চনা করেনি কোনখানে।

তবে সুজন এ কী করলো তার? কেন এমন করলো তার সঙ্গে?

ভাবতে গেলে মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করে ওঠে। ঘৃণায় কুঁচকে যায় সারা শরীরটা।

এত ভালবাসা—সব অভিনয়? মাকড়সার মত একটু একটু করে সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করে বসে থাকার প্রয়াস?

হ্যাঁ, একথা সত্যি, গয়না-কাপড় ভালবাসতো রঞ্জনা। সুজনের দেওয়া গয়না-কাপড়ের মোহে পড়ে সে নিজের বাপ-মাকে পর্য্যন্ত একদিন অপমান করেছিল। কিন্তু আজ ঐ গয়না-কাপড়েতেই তার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বিতৃষ্ণা জন্মেছে। ঐ গয়না-কাপড় আর গয়না-কাপড়ের দাতাকেই আজ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে রঞ্জনা।

রঞ্জনা ভালো করেই জানে—সেদিনও জানতো, প্রিয়জনের সোহাগস্পর্শ মিশে থাকে বলেই মেয়েরা গয়না-কাপড় ভালবাসে। কিন্তু যে গয়না-কাপড়ে তা নেই—সমস্ত হৃদয়বৃত্তিটাই বিকিয়ে গেছে স্থূলতর বিনিময়ের কাছে, সেখানে গয়নাকাপড় শুধু জঞ্জাল ঐশ্বর্য্যের বিড়ম্বনা।

একটা বিষয়ে অবশ্য রঞ্জনা স্থিরনিশ্চয়ে জানে যে হিমাদ্রি তাকে ভুল বুঝেছিল এইখানে। নিশ্চয় ভেবেছিল, দামী দামী উপহার পেয়ে রঞ্জনা সুজনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু হিমাদ্রির এটা একেবারে ভুল। আর এই ভুলটাই বরাবর করে আসছে সে। রঞ্জনাকে দেখেছে দূর থেকে শো'কেসে সাজিয়ে রাখা পুতুলের মত। কাছে এসে রঞ্জনার ভিতরের মানুষটাকে চিনতে সে কোনদিন চায় নি। তা যদি সে চিনতো তাহলে সে সহজেই বুঝে নিতে পারতো অত সহজে বিকিয়ে যাবার মত সস্তা ঘরের মেয়ে নয় রঞ্জনা। নিউ মার্কেটের লেবেল-মারা দু'টো ফুলের তোড়া আর সাহেবী দোকানের টয়লেট সেট পেয়ে গলে যায় না সে। তাই যদি হোত তবে সুজনের সঙ্গে মিশবার পরও প্রতি মুহূর্তে হিমাদ্রির সঙ্গে সুজনকে তুলনা করে হালকা মনে হোত না তার। হিমাদ্রির আত্মগম্ভীরতার পাশে সুজনকে লঘুচিত্ত বলে কত বার যে সে মনে মনে বিদ্রূপ হয়েছে তা যদি একটিবারও জানতে পারতো হিমাদ্রি।

শুধু কী তাই? হিমাদ্রিকে না পাওয়ার সাথে যাঁর আ[illegible] ভালবাসা হারাতে হল রঞ্জনাকে, তাঁকেও কী একেবারে ভুলে গে[illegible] রঞ্জনা? কত স্নেহদৃষ্টিতে রঞ্জনাকে তিনি কাছে ডেকে নিয়েছিলেন প্রতীক্ষা করে দিন গুণেছিলেন কবে রঞ্জনা সম্পূর্ণ তাঁর হবে—সে কথা

কী একেবারে ভোলা যায়? হিমাদ্রির মাঁয়ের সেই আজীবনের সযত্ন-রক্ষিত গৃহকোণ কী কম প্রয়োজনের জিনিস ছিল রঞ্জনার কাছে?

তুচ্ছ দুটো উপহারের লোভে কোনদিন তাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও পারতো না রঞ্জনা। যদি হিমাদ্রির তরফ থেকে এমন হিমশীতল উদাসীনতার বাতাস অহর্নিশি সূচের মত তার গায়ে না বিঁধতো।

কিন্তু আজ আর এ সব পুরোনো কথার ঝাঁপি নিয়ে কেন মিছে তোলাপাড়া করছে রঞ্জনা? কী লাভ হবে এমনতর এলোমেলো চিন্তা করে? শুধু অকারণে চিন্তা করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মাথাটা। গত কয়েকটা রাতের মত আজও হয়ত সারাটা রাত জেগে জেগেই কেটে যাবে।

—না মা, আর কারো কথা ভাববে না রঞ্জনা। মা ঘুমুতে পারলে বড় কষ্ট হয় তার। মাথার ভিতরটায় অসহ্য কষ্ট হয়। সেই যে ধাক্কা লেগেছিল মোটরে সেই জায়গাটায়—ঠিক সেই জায়গাটায়।

মনে হয় চার পাশে যেন কারা সব হাসছে। হা-হা করে। তাদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে চায় রঞ্জনা। তারপর আর কিছু মনে থাকেনা তার। মাঝখানে একদিন রাত্রে এমনি ধরণের একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে এমন চীৎকার করে উঠেছিল রঞ্জনা যে পরমেশবাবু আর ভজহরি ছুটে এসেছিল অন্য ঘর থেকে।

মা থাকলে আরও কত ভয় পেতেন হয়ত। নিজে ভয় পেতেন আর ভরসা দিতেন রঞ্জনাকে।

—উঃ, কোথা দিয়ে কী যে সব হয়ে গেল?

না—না, আর কিছু ভাববে না রঞ্জনা। এমন করে একা বসে একটা কিছু ভাবতে গেলেই আজকাল বড় কষ্ট হয় তার। প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে যেন।

হিমাদ্রিরা গেল কোথা? ঐ তো গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হিমাদ্রি। পরমেশবাবু ওকে তুলে দিতে গিয়ে কী যেন কথা বলছেন নীচে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

—কে? কে ওখানে? ও ভজহরিদা'। তাই বলো।—এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা কী বলছো? খাবার দেবে কী না—তাই জিজ্ঞাস করছো? আচ্ছা দাও।—একটুখানি অপেক্ষা করো। পাঁচ মিনিটে একবার স্নান করে আসি আমি। না না কিছু ঠাণ্ডা লাগবে না। অশৌচ বলে ক'দিন তেল মাথতে পাই নি তো—বড্ড গরম লাগছে তাই।

* * *

হিমাদ্রিকে গাড়ীতে তুলতে এসে পরমেশবাবু সকাতরে অনুরোধ করেছিলেন, হিমাদ্রি যেন কষ্ট করে অন্ততঃ কয়েকটা দিন বিকেল-বেলাতে তার বাড়ীতে আসে। তা না হলে দিন কাটানো রীতিমত দুরূহ হয়ে পড়েছে তার পক্ষে।

বিশেষ করে রঞ্জনার সঙ্গে একা কোন গল্পই তিনি গুছিয়ে করতে পারেন না। কথা কইতে বসলেই যার কথা বলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় রঞ্জনা—কিছুতেই তাকে অন্য প্রসঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারেন না পরমেশবাবু। অথচ রঞ্জনার এখন মোটেই অত মন খারাপ করে থাকা উচিত নয়।

—ডাক্তারেরা বার বার বারণ করে দিয়েছেন অমনতর মনগুমরে থাকতে। একটা হেভী সক্ পেয়েছে তো?

একটু থেমে নিয়ে উনি আবার সুরু করেন—ওর শরীরের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখে গেলে বাবা। অভাগীর একটু খোঁজখবর নিয়ো। আমি আর ক'দিন বলো? আমারও ঘণ্টা বাজলো বলে। এবার এখানকার পাততাড়ি গুটোতে হবে। আর আমিও তাই চাই—আর বাঁচব, সাধ নেই আমার। কিন্তু যাব বলেও যেন যেতে পারছি না আমি। ওর মা তো কেমন চট করে সব ফেলে-টেলে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি পারছি কৈ? ওকে এমন করে রেখে গেলে মরণের পরেও আমার শান্তি হবে না যে।

তুমি কিন্তু একবার করে সন্ধ্যেবেলার দিকে এসো বাবা। তোমার হয়ত একটু কষ্টই হবে। পেট্রল পুড়িয়ে উজান বেয়ে একটা আসা—তবু বলছি, দিনান্তে একবার অন্তত তুমি এসো। নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে হিমাদ্রি। নিজের বুদ্ধি নিজের ভাগ্য কোনটার ওপরেই আর আস্থা নেই আমার। শুধু তোমার দেখলে খানিকটা ভরসা পাই বাবা। বিশ্বাস করো, তোমার মুখ দেখলে অর্দ্ধেক দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই আমি। তুমি আসবে তো বাবা?

পরমেশবাবুর কাতরতা অসহায় ভাব হিমাদ্রির মনকে স্পর্শ করে কিন্তু অন্য সময়ের মত দ্রব করতে পারে না। নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা তার সারা মনটা জুড়ে রয়েছে, অন্যের জন্য সেখানে খুব বেশী স্থান সংকুলান করা কঠিন।

মুখচোরা হিমাদ্রি যদিও তার প্রশ্নমালার একটা প্রশ্নও মুখ ফুটে পরমেশবাবুর সামনে শুধাতে পারলো না, শুধু আবার আসবার মৌন প্রতিশ্রুতি দিয়েই পালিয়ে এলো, তবুও ফেরবার পথে সারাটা রাস্তা সে কল্পনায় অগণিত প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তুললো পরমেশবাবু আর রঞ্জনাকে।

তার মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন—সুজন কোথায়?

সারাটা সন্ধ্যার মধ্যে তার নাম একবারও উত্থাপন হোল না কেন? আচ্ছা রঞ্জনা, তুমি তো লক্ষ্ণৌয়ে ছিলে, হঠাৎ হাজারিবাগ হাস্‌পাতালে এলে কী করে?

আবার পরমেশবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে—রঞ্জনার শরীর খুব খারাপ তা তো আপনি বললেন কিন্তু অসুখটা কী, তা তো বললেন না? তাছাড়া ওর শরীরটা খারাপ সে তো সত্যিই চোখেই দেখলাম—কিন্তু হাসপাতালে যাবার কারণটা ঠিক বুঝলাম না তো? কী একটা হেভী সকের কথা বলছিলেন না? সেটা কী? মলিনা দেবীর মৃত্যু? না আরও কিছু?

ভাবতে ভাবতে আবার নিজের মনটাকে শাসন করে হিমাদ্রি। কৌতূহলটা তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না? এটা কেন ভুলে যাচ্ছে যে পরমেশবাবুর সংসারে সে এখন সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি। বাইরের ঘরে বসে দুটো গল্প করে চলে আসার বেশী অধিকার তার নেই—না কিছু জানবার না কিছু জানাবার, পরমেশবাবু তাকে মন হালকা করবার জন্যে দুটো গল্প করতে আসবার আহ্বান জানিয়েছেন বলেই সে কিছু তাঁর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাপুরুষ হয়ে বসেনি? যে ভালোমন্দ ন্যায়-অন্যায় সমস্ত কিছুর জমাখরচ দিতে হবে তার কাছে? আর তাছাড়া হিমাদ্রি চায়ই বা কী? হিমাদ্রিকে বিয়ে না করে রঞ্জনা অসুখী হয়েছে—সুজনের সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি—শুনলে কী সে খুশী হয়? না—না কখনই নয়। রঞ্জনা সুখী হোক। আজও
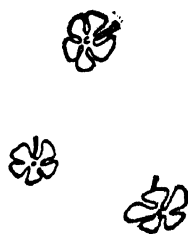
সে রঞ্জনাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখে। তার কোন ক্ষতির কথা ভাবতেও সে কষ্ট পায়।

সব চেয়ে ভালো হয় ও-বাড়ীতে আর না গেলে। নিজের মর্য্যাদাও থাকে আর রঞ্জনা সম্বন্ধে নিজের আগ্রহ বা কৌতূহল কোনটাই প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাই বা পারছে কৈ হিমাদ্রি! পরমেশবাবু যে তাকে কী আল্‌গা গেরোর বজ্র বাঁধুনি বেঁধে রেখেছেন—চেষ্টা করেও সে বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না সে।

এর পরের দিনও ভেবে গিয়েছিল হিমাদ্রি যে আজকে যাচ্ছে বটে কিন্তু আর সে যাবে না মলিভিলায়। পরমেশবাবুকে বুঝিয়ে বলে আসবে রোজ আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কৈ? শেষ পর্যন্ত করতে পারলো কৈ সে? আবার সেই চলে আসবার সময় কাতর হয়ে অনুরোধ করতে লাগলেন আবার আসবার জন্যে।

হিমাদ্রি দু'-একবার তার অসুবিধার কথা বলবার চেষ্টা করতেই ওর হাত দুটো ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলতে লাগলেন।—আমার ওপর রাগ করে তুমি রঞ্জনাকে শাস্তি দিও না হিমাদ্রি! এমন করে মন গুমরে থাকলে ও আর বাঁচবে না। আমি ওর বাপ হয়ে ওর জন্যে নতজানু হয়ে দয়া-ভিক্ষা করছি তোমার কাছে।—ওকে তুমি ক্ষমা করো।

হিমাদ্রি অবাক হয়েছে পরমেশবাবুর কথার ধরণ শুনে। আপত্তি করে বলেছে—এ আপনি কী বলছেন? আমি রঞ্জনাকে ক্ষমা করবার কে? আর আমি না এলে সেই বা মন গুমরে থাকতে যাবে কেন? আপনার এ কথার কোন অর্থই আমি খুঁজে পাচ্ছি না।—

—সে তুমি বুঝবে না বাবা! কত অন্তর্জ্বালায় যে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তোমার কাছে আমায় বলতে হচ্ছে তা তোমায় বুঝিয়ে বলবার ভাষা নেই আমার। জোর করে দাবী করবো সে অধিকারও নেই। তাই তোমার দয়ার প্রত্যাশী হয়ে করুণাভিক্ষা চাইছি আমি। করজোড়ে তোমার মিনতি করে বলছি বাবা, নিতান্তই রোজ আসা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে একদিন অন্তর এসো অন্তত।

এর পর আর কী-ই বা বলবে হিমাদ্রি? ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক্, আগ্রহে বা অনাগ্রহে হোক, মলিভিলায় আসা বন্ধ করা তার আর হয়ে ওঠে নি।

এসেছে, দিনের পর দিন এসেছে আর আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছে রঞ্জনাকে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তার! কোথায় গেছে তার সেই হরিণীর মত প্রাণচঞ্চলা, বিজলিনীর মত সঙ্গীতমুখরা মেয়েটি! সেখানে এসেছে একটি অভিশপ্ত সংযত স্বভাব মহিলা। যেন অবিকল ছোট মলিনা দেবী।

রঞ্জনার যে মলিনা দেবীর সাথে এত সাদৃশ্য কোনকালে ছিল চোখে দেখেও তা আগে কোনদিন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি হিমাদ্রি।

প্রথম দিন ছাদে অন্ধকারে আরও দুটো জিনিস নজর এড়িয়ে গিয়েছিল হিমাদ্রির। তার প্রথমটা হল সেদিন ছাদে যা লক্ষ্য করেছিল রঞ্জনার শরীরটা তার চেয়েও অনেক বেশী খারাপ। ও যেন চলতে ফিরতে কথা বলতেও অবসন্ন হয়ে পড়ে আজকাল।

যে মানুষ মাত্র দু'-তিন মাস আগেও নিজের সৌভাগ্যের গর্বে গরবিণী হয়েছিল—এত শীঘ্র তার স্বাস্থ্যের এত অবনতি কী করে সম্ভব!

সবচেয়ে বড় কথা, রঞ্জনার সীঁথিতে সিঁদুর নেই। খুব ভালো করেই লক্ষ্য করে দেখেছে হিমাদ্রি—একটুও সিঁদুরের দাগ পর্য্যন্ত নেই মাথার কোনখানে।

কিন্তু কেন? হিন্দুমতেই তো বিয়ে হয়েছিল ওদের। তবে? তবে কী সুজন বেঁচে নেই? তাই রঞ্জনার 'হেভী সক্' পাওয়ার কথা বলছিলেন পরমেশবাবু? রঞ্জনাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাই এত ব্যাকুলতা ওঁর?

কিন্তু কী করে এমন হল? আর মৃত হলে মানুষকে কী মানুষ এমন ভাবে এড়িয়ে চলে? মলিনা দেবীও তো মারা গেছেন। ওখানকার কথাবার্তার মধ্যে তার প্রসঙ্গ তো প্রায়ই আলোচনা হয় কিন্তু সুজনের কথা একবারও হয় না কেন?

নিজের অন্তরের অদম্য কৌতূহল চিন্তাধারাকে লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মত এলোপাথাড়ি ছুট করিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কোনমতেই কোন সমাধানে এসে দাঁড়াতে দেয় না স্থির হয়ে।

একবার ভাবে, চুপি চুপি না হয় ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে—সুজন কোথায়?

কিন্তু সাহস হয় না। কী জানি পরমেশ বাবু বা রঞ্জনার কানে যদি উঠে যায় কথাটা? ওরা কী ভাববেন? ভাববেন—হিমাদ্রি যে অনধিকার চর্চা করছে তাই শুধু নয়, চাকরবাকরের কাছে বাড়ীর কথা জানতে চেয়ে নিজের অনুন্নত মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে।

কাজে কাজেই ভজহরির কাছে সুজনের সংবাদ নেওয়া আর হয়ে ওঠে নি হিমাদ্রির।

আরও একটা কথা ইতিমধ্যে বার বার মনে হয়েছিলো হিমাদ্রির—মনে হয়েছিল মলিনা দেবীর মৃত্যুর পর মাকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে ওদের বাড়ী যাওয়া তার কর্তব্য। কিন্তু বহু বার আগু-পিছু করেও কিছুতেই সে পেরে উঠলো না মাকে নিয়ে মলিভিলায় যেতে।

মা খুবই দুঃখিত হবেন এ সংবাদ পেলে। যেতেও চাইবেন নিশ্চয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি কিছু এলোমেলো কথা বলে ফেলেন? আজেবাজে প্রশ্ন করে ওদের বিব্রত করে তোলেন? মায়ের পক্ষে তো সেটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়? কারণ, মাঝখানের কিছুদিনের খবর তো মা কিছুই জানেন না। তিনি হয়ত যেচেই বলে বসবেন—আর কেন দেরী করছেন বেয়াই মশাই? আমার রঞ্জনাকে আমি কার ভরসায় আর এখানে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবো? এবার প্রসন্নমনে অনুমতি দিন একটা ভালো দিন দেখে মাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাই।

কিম্বা হয়ত অভিমানের স্বরে বলবেন—হঠাৎ বাইরে চলে গেলেন তা একবার জানাতেও নেই আমায়? একটা মানুষ তো চিরকালের মতন চলেই গেছে আর রঞ্জনার শরীরেরও এই অবস্থা! এ কী করেছেন আপনি? এই ঠিক বিয়ের সময়টায় ওর কী চেহারা হল বলুন তো? আমার তো একটা ছেলের বউ, এখনই তো পাঁচজনে দেখবে? আমি কোনমুখে বউ দেখাবো?

—না না, সে ভীষণ লজ্জার কথা হবে। হিমাদ্রি তাহলে আর মুখ দেখাতে পারবে কারো কাছে? তার চেয়ে বরং মাকে না নিয়ে যাওয়াই সহস্রগুণে ভাল ওখানে।

এর পর থেকে বাধ্য-বাধকতায় পড়েই নিত্য সন্ধ্যাবেলায় মলিভিলায় একা-একাই আনাগোনা করতো হিমাদ্রি। ওখানে যাতায়াত সম্পর্কে তার নিজের মনস্তত্ত্বটাই সবচেয়ে বিচিত্র। ওখানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে পরমেশবাবুর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয় মনে মনে। তাকে এভাবে উৎপীড়ন করার জন্যে মনে মনে যথেষ্ট কটু কথা বলে তাঁর উদ্দেশ্যে। নিজেকে তো যত পারে গাল পাড়ে প্রাণ ভরে। কিন্তু যেদিনই স্থির:করে 'আজ আর যাবে না ওখানে' সেইদিনই তার শাস্তিটা হয় সব থেকে বেশী।

সন্ধ্যেটা যেন আর কাটতে চায় না। মনটা কেমন যেন ভার হয়ে ওঠে অকারণ। অদ্ভুত একটা বিরক্তি ছড়িয়ে থাকে সব কিছুতে। সব শেষে বার বার ঘড়ি দেখে ভাবতে চেষ্টা করে এখানে রওনা হলে একটা ভদ্রজনোচিত সময়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে পারা যায় কী না?

কিন্তু সেদিন ওখানে পৌঁছে যখন ভজহরির মুখে খবর পেল—বাবু তো বাড়ীতে নেই দাদাবাবু! কী একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন একটু। আমায় বলে গেছেন—আপনি এলে বসতে বলতে। তা আপনি বসেন। আমি চা আনছি।

বাইরের ঘরে বসে মনে মনে বিব্রতবোধ করে হিমাদ্রি। চলে যেতেও পারে না অথচ নির্জন বাড়ীটাতে একা বসে থাকতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগে তার। পরমেশবাবুর ওপর রাগ হয়। তাকে আসতে বলে এ রকম চলে যাওয়ার মানে কী?

আজকাল প্রায়ই এ রকম করতে সুরু করেছেন পরমেশবাবু। অথচ হিমাদ্রি যদি একদিন না আসে তবে তাঁর যেন আর দুঃখের অন্ত থাকে না। কিন্তু উনি কী বুঝতে পারেন না এভাবে একটা নির্জন বাড়ীতে বিশেষ যেখানে রঞ্জনা একা আছে সেখানে বসে থাকা হিমাদ্রির পক্ষে শুধু অস্বস্তিকর নয়, বিসদৃশও বটে। এই তো সেদিন রঞ্জনাকে হিমাদ্রির কাছে বসিয়ে দিয়ে নিজে স্নান করতে যাবার নাম করে পাক্কা ছ'ঘণ্টা বাথরুমে কাটিয়ে এলেন পরমেশবাবু। সেদিন কী মুস্কিলে যে পড়েছিল হিমাদ্রি!

রঞ্জনা কিছু তার সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় যে ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষমান যাত্রিদ্বয়ের মত দু'জনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে একেবারে। অথচ নিতান্ত মামুলী দু'-একটা কুশল-বিনিময় ছাড়া আর কী-ই বা কথা কইবে তারা?

আজও ঠিক সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বৈঠকখানাঘরে আলো জ্বালিয়ে পাখা ঘুরিয়ে হিমাদ্রিকে বসিয়ে নীচে থেকে চা করে আনতে গেল ভজহরি। যাবার সময় আবার বুদ্ধি খরচ করে রঞ্জনাকে ডেকে দিয়ে গেল হিমাদ্রিকে আপ্যায়িত করার জন্যে।

কে জানে, এ বিষয়েও পরমেশবাবুর কোন নির্দেশ দেওয়া ছিল কী না?

যাই হোক, হিমাদ্রিকে আজকেও বেশীক্ষণ একা বসে থাকতে হল না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রঞ্জনা এসে ওর সামনের চেয়ারে বসলো ভদ্রতা রক্ষা করতে।

বললে—অনেকক্ষণ এসেছেন না কী?

—না—না এইতো এলাম। বড় জোর পাঁচ মিনিট হবে।

আবার সব চুপচাপ।

ভদ্রতা বজায় রাখার মত আলাপ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে দু'জনেই। কিন্তু মনে মনে কেবলই ওরা কথাগুলোকে সাজাচ্ছে আর নাকচ করে দিচ্ছে।

কারণ ভাষাটা যদি মনোমত সাজানো হচ্ছে তো প্রসঙ্গটা সব হচ্ছে একেবারে অবান্তর। আবার প্রসঙ্গটা যদি বা অতিকষ্টে খাড়া হচ্ছে তবে সেটা প্রকাশ করবার ভাষার দপ্তরে একেবারে ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে বার বার।

অবশেষে অনেক ভেবে হিমাদ্রি বললে—কৈ, শরীরটা তো সারছে না একটুও?

উত্তরে রঞ্জনা শুধু হাসলো একটু। নতমুখে একটু বসে থেকে বললে—সাড়ে সাতটা বাজলো—বাবা যে কোথায় গেলেন এই সন্ধ্যাবেলায়।

একটু চুপ করে বসে থেকে আবার বলে—আচ্ছা আপনার গরম বোধ হচ্ছে না তো? পাখাটা বাড়িয়ে দেবো একটু? উঠে গিয়ে পাখার রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু ফুলস্পীডে ঘোরা পাখাটা আর বাড়াবার কোন উপায় ছিল না। বোধহয় তাই হাতের কাছে করবার মত কোন কাজ না পেয়ে নিজের উপরেই একটু বিরক্ত হল রঞ্জনা। তারপর কী ভেবে বললে—আচ্ছা আমি ও-ঘর থেকে আসছি একটু। আপনি বসুন, কেমন?

দ্রুতপায়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রঞ্জনা। হিমাদ্রির মনে হল যেন পালিয়ে গেল ও। হিমাদ্রির সুমুখে একা বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিল, তাই অছিলা খুঁজছিল উঠে যাবার।

কিন্তু কেন? হিমাদ্রি তো কোন বিষয়ে অহেতুক কৌতূহল দেখিয়ে বিরক্ত করেনি রঞ্জনাকে? বেয়াদপি করেনি কোন বিষয়ে? তবে? তবে কী হিমাদ্রির চোখে আজও তেমন কোন রঞ্জনরশ্মি দেখতে পায় রঞ্জনা যা তার অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করতে পারে?

সেদিন কী পরমেশবাবু সেই ইংগিত দিয়েছিলেন তবে? আজও কী রঞ্জনার মনে—ছি ছি এ কী কথা ভাবছে সে। রঞ্জনা যে সুজনের বিবাহিতা স্ত্রী। হিমাদ্রি সম্বন্ধে যদি কোন অনুকূল মত থাকে তবে আজ আর তো সে কথা প্রকাশ করবার পথ নেই তার?

না—না হিমাদ্রির সাথে রঞ্জনার এখন নিভৃত সাক্ষাৎ আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিমাদ্রিকেও এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। পরমেশ বাবু যতই বলুন এবাড়ীতে আজও হিমাদ্রির ভাই যে অকারণ আনাগোনা, লোকে এটাকে কী বলবে?

অন্ধ মোহে এ কী করে চলেছে হিমাদ্রি? নিজেকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে চায় সে?

ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে হিমাদ্রি। নীচে নেমে এসে ভজহরিকে ডেকে বলে—ভজহরি ও ভজহরি! শোন একবার এদিকে।—বাবু এলে বলে দিও আজকের মত চলে যাচ্ছি আমি। পরে এসে দেখা করব খ'ন।

ভজহরি একটু আপত্তি করে বলে—কিন্তু বাবু যে আপনাকে বসিয়ে রাখতে বলেছিলেন দাদাবাবু! আপনি চলে গেলে তিনি আমার ওপর রাগ করবেন এসে।

—না না, তুমি বলে দিও—আমার কাজ আছে একটু। বলতে বলতে তরতর করে বারান্দা পার হয়ে আসে হিমাদ্রি। কিন্তু চলে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। করিডরের কাছে আসতেই পরমেশবাবুর সাথে দেখা হয়ে যায় তার। তিনি শক্ত হাতে পাকড়াও করেন তাকে।

—আরে হিমাদ্রি, তুমি বাড়ী চলে যা'চ্ছ না কী? সে কী কথা? তুমি আসবে বলে কত তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম আমি।—কাজ আছে? আরে রাত্তিরবেলায় আবার কিসের কাজ তোমার? বসো বসো, যাবে'খন। গাড়ীতে তো যাবে, কতক্ষণই বা সময় লাগবে যেতে?

অর্থাৎ হিমাদ্রির কোন যুক্তিই শুনতে রাজী নন উনি। আর একটু না বসিয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না হিমাদ্রিকে। অগত্যা একটু বসতে হয়।

তবে ওপরের তলায় আর ওঠে না হিমাদ্রি। পরমেশবাবুও সম্ভবতঃ ওকে ওপরে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সিঁড়ির তলায় এক পাশে পাতা একটা বেঞ্চিতে হিমাদ্রিকে নিয়ে গুছিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করেন—ভজা তোমায় চা-খাবার দিয়েছিল তো? হিমাদ্রি লজ্জিত কণ্ঠে বলেন—ও চা করতে গিয়েছিল, আমিই তাড়াতাড়ি করে চলে এলাম বলে আর—

—এই দেখো। হতভাগাকে বার বার করে বলে এলাম—দাঁড়াও, আমি বলে আসি চায়ের কথা।

—না না আপনি কেন যাবেন কষ্ট করে। বরং এখান থেকে আমি বলে দিচ্ছি।

—না না আর চেঁচামেচি করে কাজ নেই—রঞ্জনার সাথে দেখা করে চলে যাচ্ছি বলে এসেছো তো? ভালই হয়েছে—এখোন এইখানে একটু বসো চুপ করে। তোমার সঙ্গে দু'-একটা গোপন কথা আছে আমার।

হিমাদ্রির আপত্তি না শুনে পরমেশবাবু নিজে উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন ভজহরিকে। তারপর ফিরে এসে আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পকেট থেকে দুটো সিনেমার টিকিট বার করে গলা নামিয়ে বলতে থাকেন—এ দুটো তোমার কাছে রেখে দাও হিমাদ্রি। কালকে ঠিক সময়ে এসে রঞ্জনাকে নিয়ে যেও সিনেমায়।—আমি ওকে ঠিক রাজী করিয়ে দেব খ'ন।

আর একটা কথা বলে রাখি—ওকে যেন বলোনা যে আমি টিকিট কেটে এনেছি, কেমন পারবে তো?

হিমাদ্রি বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে চেয়ে থাকে পরমেশবাবুর দিকে। বলে—এ আপনি কী বলছেন? আমি কেন রঞ্জনাকে নিয়ে সিনেমায় যাবো? সে কী ভালো দেখায়? এ ধরণের একটা প্রস্তাব করলে রঞ্জনাই বা কী মনে করবে আমায়?

—কিছু মনে করবে না বাবা, কিছু মনে করবে না। তোমার স্নেহ ফিরে পেলে ও হতভাগী বেঁচে যায় এ জন্মের মত।

বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে হিমাদ্রি বলে—বার বার এ কী কথা আপনি বলছেন? আপনার কোন কথার অর্থই বুঝতে পারি না আমি। আমার সঙ্গে একলা যাতায়াত করা রঞ্জনার পক্ষে খুব শোভনীয় হবে কী?

হিমাদ্রির হাত দু'টো জড়িয়ে ধরেন পরমেশবাবু। কিছুটা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন—শোভন-অশোভনের কথা এখন আর আমার চিন্তা করবার সময় নেই বাবা। মেয়েটাকে আমায় বাঁচাতে হবে তো? ও যে অহোরাত্র অমন মুখভার করে থাকে এ যে আর আমি সইতে পারি নে। তাছাড়া সেদিন যে তোমায় বলছিলাম ডাক্তারবাবু বার বার বারণ করে দিয়েছেন—ওকে অমন করে মনমরা হয়ে থাকতে। ওর মাথায় একটা চোট লেগেছে কি না। তার ওপর দারুণ একটা আঘাত পেয়েছে মনে—এ ভাবে থাকলে ও হয়ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না শেষ পর্য্যন্ত।

—আচ্ছা আঘাত পাওয়ার কথাটা বার'বারই আপনি বলছেন, তাই না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারছি না। কী সবের কথা বলছেন? কাকীমার কথা? না আর কিছু?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। তার ওপর ওই মাথার চোটটা? সেটাও কী কম সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল? হাসপাতালে জ্ঞান হবার পরও পরের দিন আমাদের নাম ঠিকানা পর্য্যন্ত বলতে পারে নি মনে করে। আর একটু হলে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যেতো হয়ত।

—কিসে লাগলো চোট? তাই তো জানতে পেলাম না। সুজন বাবু কোথায়? তাঁকেই বা দেখতে পাচ্ছি না কেন এ পর্য্যন্ত? নিজের অন্তরের সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা করে ফেলে হিমাদ্রি। পরমেশবাবু যখন নিজেই আজ কথা কইতে চাইছেন তখন সে-ও তার কিছুদিনের বয়ে বেড়ানো কথাগুলো না করে থাকতে পারে না।

উত্তরে পরমেশবাবু বলেন—সুজন? তুমি সুজনের কথা জিজ্ঞাসা করছো? না সুজন আর আসবে না। সুজন মারা গেছে। —এ্যাকসিডেন্ট। মোটর এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ওদের। হাজারিবাগের ওই দিকটায় মোটরে করে বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। বলতে বলতে অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে পরমেশ বাবুর চোখ দুটো। আশ্চর্য্য হয়ে হিমাদ্রি লক্ষ্য করে অদ্ভুত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন উনি। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। মুখের ভাব অত্যন্ত উগ্র।

এই সময় আবার তাঁর নজরে পড়লো ভজহরি চা আর কী যেন খাদ্যসামগ্রী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে পিছন দিক থেকে। অকারণে ভীষণ রেগে গেলেন পরমেশ বাবু। খামোকা গাল দিয়ে উঠলেন ভজহরিকে—পিঠের গোড়ায় এসে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে হারামজাদা? ঘরের কথা শোনবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা কান পেতে বসে আছো নয়? জুতোর চোটে আড়ি পাতা রোগ ছুটিয়ে দেবো জন্মের মতন।

ভজহরি থতমত খেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি খাবারের ট্রেটা নামিয়ে দিয়ে ভিতরে চলে যায় মুখটা বিকৃত করে। সে বেচারা কিছুই জানে না—আড়িও পাতেনি। খাবার দিতে এসে মনিবের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়িয়েছিল মাত্র।

হিমাদ্রি পরমেশ বাবুকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তখন তাঁর আপন খেয়ালে।—এ দুনিয়ায় কারুকে বিশ্বাস করে সুখ নেই, জানলে হিমাদ্রি! কখনও কাহোকে বিশ্বাস করো না জগতে। বিশ্বাস করেছ কী মরেছ একেবারে।

তবুও চা খেয়ে বিদায় নেবার আগে হিমাদ্রি আর একবার বলে—কিন্তু আমি বলছিলাম কী—রঞ্জনাকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়ার

আগে আর একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি? এবারের মত আপনিই ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন না কেন? পরে না হয় আমি একদিন—

—তুমি ক্ষেপলে? আমার সঙ্গে সিনেমায় গেলে ওর ভালো লাগে কখনও? আর তাছাড়া বুড়োবয়সে আমারও আর পোষায় না ও-সব। না না ও কোন কাজের কথা নয়, তুমি চলে এসো কাল বিকেলে। আমি বরং বাড়ীতে একা বসে না থেকে তোমার বাড়ীতে গিয়ে কাটিয়ে আসবো কালকের সন্ধ্যেবেলাটা। বৌঠাকরুণের সঙ্গে অনেক দিন মন খুলে তেমন করে গল্প করা হয়নি আগেকার মতন।

কথার শেষে হতচকিত হিমাদ্রির হাতে টিকিট দু'খানা একরকম জোর করেই গুঁজে দেন পরমেশ বাবু। তারপর আর একবার মনে করিয়ে দেন হিমাদ্রিকে—খুকীর সামনে খবরদার যেন বলে ফেলো না টিকিট দু'টো আমি কিনে এনেছি।—জানোই তো বাবা মেয়েটা আমার একটু একবগগা মতন আছে। আর দেখো যদি ইচ্ছা করো কাল রাত্তিরে কোন হোটেলে একটু খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারো। না—না আমার কোন আপত্তি নেই। মানে ওর ভেতরের সেই আগেকার স্ফূর্তিভাবটা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। বুঝলে না?

হাতের মুঠোর টিকিট দুটো কোনমতে ধরে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হিমাদ্রি। আকাশে যত তারা মাথায় তার তত চিন্তা।

* * *

সারাটা রাস্তা কী ভাবে গাড়ী চালিয়ে বাড়ী এসেছে তা তার নিজেরই হুঁস নেই। মোড়ের মাথায় ট্রাফিক পুলিশ রাস্তা পেরিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিল কী না—বাড়ী ফেরবার দেরী দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে মা জানলায় দাঁড়িয়ে কোন ব্যাকুল প্রশ্ন করেছিলেন কী না, কিছুই সে জানে না। শুধু সম্মোহিত মানুষের মত অস্পষ্ট চেতনার অছিলায় অভ্যস্ত কাজগুলো সেরেছে সে। যাতে করে পড়বার নিজের ঘরটায় তাড়াতাড়ি খিল লাগাতে পারে নিরুপদ্রবে।

নিজের সঙ্গে তার মস্ত বড় একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন রয়েছে আজ। কী অদ্ভুত বিচিত্র একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল তাকে। সারাটা মন-প্রাণ জুড়ে তারই ভাবনা আজ পেয়ে বসেছে তাকে।

পরমেশ বাবুর আজকের কথা তো শুধু ইংগিতেই শেষ নয়। স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে তাঁর বক্তব্যের মূল। আভাসে ইংগিতে যে কথা এতদিন শুনে—বুঝেও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি হিমাদ্রির সেই কথাই আজ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন পরমেশ বাবু।

রঞ্জনাকে এবার তিনি হিমাদ্রির হাতেই তুলে দিতে চান। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ কথা শুনে হিমাদ্রি তার নিজের অন্তরে খুব একটা সাড়া পাচ্ছে না তো? মনের মধ্যে রঞ্জনাকে পাবার আগেকার সেই ব্যাকুল আগ্রহ কী আর আছে এখনও? সে কী ঠিক আগেকার অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে রঞ্জনাকে? বোধ হয় না।

তার কারণ সেদিনের রঞ্জনা আর আজকের রঞ্জনায় অনেক তফাৎ। আজকের রঞ্জনা আর আগেকার সেই কুমারী কিশোরী মেয়েটি নেই—সে আজকের বিধবা।

হিমাদ্রির বাড়ীর গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসার পূর্ণ অধিকারই কী তার আর আছে? কেমন করে তা সম্ভব? মা জানতে পারলে আত্মঘাতী হবেন। হিমাদ্রিরও অন্তরে যে কল্যাণময়ী মূর্তিতে—যে মর্য্যাদায় রঞ্জনা একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ তার কিছু স্পর্শদোষ ঘটেছে না কী?

তাছাড়া এর ভেতর মান-অপমানের প্রশ্নও একটা আছে বৈ কী। যে হিমাদ্রিকে একদিন অনুপযুক্ত সিদ্ধান্ত করে বাতিল করে দিয়েছিলেন পরমেশ বাবু—শুধু বাতিলই নয়, যা ইচ্ছা তাই বলে অপমানিত করেছিলেন তার ব্যক্তিসত্তাকে। আজ তাকেই কী 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' বলে মনে পড়লো তাঁর?

—না, আজ আর রঞ্জনাকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া সম্ভব নয় হিমাদ্রির পক্ষে—গ্রহণ করা তো নয়ই।

সে খুবই দুঃখিত রঞ্জনার জন্যে। কিন্তু উপায় কী? সে কী করতে পারে এ ব্যাপারে?

একথা অবশ্য সত্যি যে, রঞ্জনাকে একদিন সর্বান্তঃকরণেই ভালবাসতো হিমাদ্রি। আজও হয়ত মনের নিভৃত কন্দরে একটুখানি দুর্বলতাই আছে তার ওপর। কিন্তু তাই বলে এ কী অসম্ভব প্রস্তাব!

বিধবা বিয়ে যে শাস্ত্রসম্মত, সে কথা হিমাদ্রির যত ভালো করেই জানা থাক্ তবু এ কাজ সে কেমন করে করবে? তাছাড়া আজ সুজন নেই বলে তার পরিত্যক্ত আসনে নিজে বসবার জন্য প্রলুব্ধ হওয়ার চাইতে হীনতা আর কী হতে পারে? পরমেশ বাবু যত উপরোধই করুন এ কথা ভাবতে গেলেই নিজেকে ছোট মনে হয় হিমাদ্রির।

না না এ কাজ সে পারবে না। পরমেশ বাবুকে সে কথাটাই জানিয়ে দেবে সে। মুখে যদি না-ও পারে তবে চিঠিতে লিখে জানিয়ে দেবে অন্তত। তাছাড়া ওঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই তার।

কিন্তু রঞ্জনা? রঞ্জনা কী মনে করবে? হিমাদ্রির কাছ থেকে যদি এমন অবহেলা পায় তবে সে কী দারুণ ব্যথা পাবে না মনে মনে? বেদনায় বিবর্ণ দু'টি ক্লান্ত চোখ, যার সুমুখ থেকে সমস্ত আশার আলো নিবে গেছে সেই দুটি চোখ জলে ভরে আসবে না কী হিমাদ্রির নির্মম ব্যবহারে?

ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়েটা জীবন সম্বন্ধে আরও বীতস্পৃহ হয়ে উঠবে না কী? নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎ ভাগ্য তার কাছে কী নিরাশার কালীলিপ্ত হয়ে যাবে না?

তাহলে সত্যিই কিন্তু রঞ্জনাকে আর বাঁচানো যাবে না। ওই তো ওর শরীরের অবস্থা, তার ওপর যা কিছু ওর অবলম্বন, যা কিছুর ওপর ওর ভরসা তাই যদি ভেঙে পড়ে তবে সে আঘাত সহ্য করবার মত শক্তি সত্যিই ওর আর নেই।

না না, ওর ওপর এত বড় নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে হিমাদ্রি পারবে না। তারপর রঞ্জনার বিষাদম্লান মুখখানা ভাবতেও ব্যথা লাগছে যে। স্বয়ং বিধাতা যাকে এত নির্দয় হাতে শাসন করেছেন— কারোর কাছেও কী এতটুকু সহানুভূতি সে পেতে পারে না?

তাছাড়া রঞ্জনাকে এত দুঃখ দিয়ে হিমাদ্রি নিজে কী পাবে? কতকগুলো অন্ধ সংস্কারকে বাঁচাতে গিয়ে সে রঞ্জনাকে অবহেলা করবে? নিজে হাতে ঠেলে সরিয়ে দেবে সুমুখ থেকে?

সে ইচ্ছা করলেই নিজের মনের প্রসারতা দিয়ে রঞ্জনার যে কলংকের দাগটুকু অনায়াসে মুছে দিতে পারে কী হবে সকলের সামনে সেদিকে অঙ্গুলি সংকেত করে?

মাত্র দু' মাস।

দু' মাস সময় চলে গেছে মধ্যখান থেকে। কিন্তু কতটুকুই বা আসে-যায় তাতে। বাকী সমস্ত জীবনটাই বাকী এখনও।

কেউ জানতেও পারবে না। দু'-একটা ভাসা ভাসা প্রশ্ন ছাড়া তলিয়ে কেউ তল্লাসীও করতে আসবে না এ দেরীটুকুর কারণ নিয়ে। যদিই বা কেউ জেরা করে তবে রঞ্জনার মায়ের মৃত্যুটাই তো যথেষ্ট কৈফিয়ত। শুধু হিমাদ্রি যদি ক্ষমা করতে পারে তাহলেই সমস্ত জিনিষটার মীমাংসা হয়ে যায়।

এইটুকু দেরী আর দেরীর কারণটুকু যদি ভুলে যেতে পারে হিমাদ্রি, তাহলেই রঞ্জনা জীবনে তার পুর্বপ্রতিষ্ঠা ফিরে পেতে পারে। আর তাতে এই এত বড় পৃথিবীতে ক্ষতিই বা কার? কিন্তু মা? মা যদি কোনদিন জানতে পারেন?

অসম্ভব। হিমাদ্রি না বললে মা জানতে পারবেন কী করে? আর পরে-পশ্চাতে যদিই বা কোনদিন লোকমুখে কোন উড়োখবর কানে আসে তাঁর—তা তিনি বিশ্বাসই করবেন না। নিজের বাড়ীর বৌয়ের সম্বন্ধে তেমন কোন কথাই কানে নেবেন না কিছুতেই।

তবে? এখন কী করা উচিত হিমাদ্রির? পরমেশ বাবুর মুখ চেয়ে না হোক, রঞ্জনার অবলম্বনশূন্য ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জেনে-শুনেও সে কী হাত বাড়াবে না রঞ্জনার দিকে? চোখের সুমুখে তাকে তলিয়ে যেতে দেবে নিয়তির অতলগর্ভে? [ক্রমশঃ।

আমি তো চাইনি তবু

আশিস সান্যাল

আমি তো চাইনি কোন প্রতিভাত দৃশ্যের গভীরে
প্রশান্ত-ব্যাকুল স্পর্শ। তবু কেন এনেছ আমাকে—
নিভৃত বিজন থেকে উন্মোচিত পথের রেখায়
সুদূর বিপুল দৃশ্যে? স্নিগ্ধতায় দেখায়েছ দূরে
নীরব জলের রেখা; তটপ্রান্তে, মুগ্ধ বালুচরে
ঘুমন্ত রোদের শাড়ি উদ্ভাসিত হাওয়ায় রঙীন,
আমি তো চাইনি তবু প্রার্থনার বিমুগ্ধ প্রহরে—
তুমিই ছড়িয়ে দিলে ধ্বনিময় প্রসারিত দিন।

তুমিই নিবিড় কণ্ঠে অবারিত শব্দের মর্মরে
শোনায়েছ প্রতিদিন আকাঙ্ক্ষার শিল্পিত গাথায়
স্বগত মুখর গল্প। অতি দূর দিগন্তরেখায়
দেখায়েছ প্রত্যাশার জ্ঞানময় গভীর আকাশ;
আমি তো চাইনি তবু প্রতিশ্রুত দিনের শিখরে—
তুমিই দিয়েছ ভরে অকৃপণ মুগ্ধ অবকাশ।

বিজয়িনী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সেদিনটি স্মরণীয় বৈ কি। ইতিহাসে—অন্তত ওর ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার দিন।

সেদিন চারিদিক থেকে এসেছিল অভিনন্দন, এসেছিল আনন্দোচ্ছ্বাস—তার চেয়েও বড় কথা, বহু বান্ধবী—আত্মীয়ার চোখে দেখেছিল কুটিল ঈর্ষার প্রকাশ। সেদিন ওর জীবনে চরম বিজয়গর্বের দিন সন্দেহ নেই।

কত কি বলেছিল ওকে।

সেদিনের সে উন্মত্ত আনন্দের ঘূর্ণাবর্তে কত কি উড়ে এসে পড়েছিল—রোমের কার্নিভালে দেখা সেই অনন্ত কাগজের ফিতের মত—চারিদিক থেকে, অজস্র।

বন্ধুদের কেউ বলেছিল, 'তুই-ই এ যুগের উমা। সেই ট্র্যাডিশনকে আবার রিভাইভ করলি।'

কেউ বলেছিল, 'সাক্ষাৎ পার্বতী। সত্যি—তোরই তপস্যা সার্থক।'

কেউ বা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, 'নামটা পাল্টে নে নীলা। ও নাম তোকে মানায় না। তোর নাম অপর্ণা রাখাই উচিত। সেই পর্ণহীন উপবাসের কাহিনী যে সত্য—তা তোকে দেখেই বুঝছি।'

হ্যাঁ—আজ আর আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে লাভ নেই—গর্ব একটু হয়েছিল তার।

আর গর্ব হবারই তো কথা। চারিদিক থেকে এই যে স্তুতি ও ঈর্ষার ঝড় বয়ে গিয়েছিল তাকে কেন্দ্র ক'রে—তার মধ্যে বড় সাফল্য একটা 'কিছু নিশ্চয়ই ছিল। একটা বড় রকমের কৃতিত্ব বিজয়ের ইতিহাস।

শিবের ব্রত নষ্ট করেছে সে। যোগীশ্বরের ধ্যান ভেঙেছে।

চির উদাসীন চির নিস্পৃহ বৈরাগী ভোলা মহেশ্বর আজ গৃহবাসী হয়েছে—সে তো তারই জন্য। তারই কৃতিত্বে।

শেষাদ্রি ঘোষাল মনসিজের আয়ত্তের বাইরে, যেহেতু মন বলে বস্তুটি তার নেই, এই কথাই সকলে জানত।

সেই শেষাদ্রি ঘোষাল পরাজিত হলেন তার কাছে—একটা সাধারণ সামান্য মেয়ের কাছে—এ কি কম কথা।

এই একটি দিনের বিজয়গর্বের বিনিময়ে বাকী সমস্ত পরমায়ু দিতেও প্রস্তুত ছিল সে। সমস্ত প্রাণ পণ ক'রেই তো এ তপস্যায় নামা তার।

কিন্তু বিধাতা যে তার প্রাণ নিয়েই এ তপস্যা সার্থক করবেন—এ-হেন সিদ্ধি দেবেন তাকে—তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? জয় হ'ল তার ঠিকই—কিন্তু এর আনন্দ যে ভোগ করবে সে কোথায়?

শেষাদ্রি ঘোষাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক।

কিন্তু সেইটাই তো তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়?

তিনি সত্যকারের পণ্ডিত, জ্ঞানতপস্বী। লেখাপড়াই তাঁর জগৎ, ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর প্রাণ—তার বাইরে কোন কিছু আছে বলে তিনি

জানেন না। তাঁর এক একটি ছাত্রের কৃতিত্বই তাঁর জীবনের এক একটি সার্থকতা। তাঁর ঐ আপার সার্কুলার রোডের অত বড় বাড়িটা এককালে হাঁ-হাঁ করত—তাঁর বাবা মা মারা যাবার পর। কিন্তু আজ সেখানে বোধ করি একটি ফুলদানীও রাখার স্থান নেই। সদর দালান থেকে শুরু ক'রে ওপরের চিলেকোঠা পর্যন্ত ভরে গেছে বই আর পুঁথিতে। আলমারী, র‍্যাক, তক্তপোশ, খাট, টেবিল যেখানে যা ছিল, সব বইতে ভরে গেছে। যেসব আসবাব বই বহন করবার মত নয়, তা নির্মম ভাবে বিদায় দিয়েছেন তিনি—বইয়ের র‍্যাক কিম্বা আলমারীর স্থান করবার জন্য।

সেকালের বাড়ি, প্রতি তলায় বাথরুম ও পাইখানা ছিল। তার দো দোতালারটি মাত্র রেখে বাকী দুপ্রস্থই ঘর ক'রে ফেলেছেন—এবং সে ঘরে এখন বই থাকে। রান্না ভাঁড়ার দুটি ঘর এখন ছাত্রদের গবেষণা করবার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে—কারণ সেই ঘরেই যত দুষ্প্রাপ্য বই থাকে—সেখানে একটা করে টেবিলও পাতা আছে, তার সঙ্গে খানা ক'রে টুল।

এই হলেন শেষাদ্রি ঘোষাল।

সুপুরুষ—হাঁ একদা সুপুরুষই ছিলেন হয়ত আজও একেবারে সে কান্তি বিনষ্ট হয়নি কিন্তু তিনি নিজে সে বিষয়ে সচেতন নন। কখন যৌবন এল, কতদিন ছিল, কবে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলেন তা বোধ করি কোনদিন ভেবেও দেখেননি। আজ তাঁর সব চুলই প্রায় পেকে এসেছে—হয়ত একটু অকালেই পেকেছে, কিন্তু তাঁরই ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল অনিন্দ্য চুল যে এক কালে তরুণ তরুণীরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখত তা তিনি আজও জানেন না। এমন কি, কোন কালে সে চুল কালো ছিল কিনা তা আজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বিভ্রান্ত হয়ে পুরনো পুঁথির পাতা ওল্টাতে বসবেন, অর্থাৎ তাতে কিছু লেখা আছে কিনা সে বিষয়ে।

যিনি নিজের চেহারা সম্বন্ধে সচেতন নন—তাঁর কাছে বাহ্যিক আর কোন বিষয়ের সচেতনতা আশা করাই অন্যায়। বিবাহ তিনি করেন নি—জ্ঞানচর্চার ব্যাঘাত ঘটবে বলে। বাপ-মায়ের এক ছেলে তিনি—অবশ্য এক মাত্র সন্তান নন। একটি বোন ছিল, তার ছেলেমেয়েরা আজও আছে। তারা আসেও কখনও-সখনও, এলে তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যান, এমন কি দুঘণ্টার মধ্যেই আবার দেখা হলে আকাশ থেকে পড়েন, 'আরে সুনীল যে, কখন এলি?' কিম্বা 'বুড়ুমা, কখন এলে মা?' ইত্যাদি। তারা আজকাল তাই আসাই ছেড়ে দিয়েছে। কলকাতায় এলেও অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ি ওঠবার চেষ্টা করে। শেষাদ্রির মা মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে কী হ'ত বলা যায় না। বাবা বেঁচে ছিলেন, ওঁর ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু বিবাহ দিয়ে যেতে পারেন নি। বহুবারই বলেছেন, চেষ্টায় যে খুব ত্রুটি করেছেন বা কর্তব্যে অবহেলা করেছেন তা নয়—কিন্তু যত বারই কথা পেড়েছেন তত বারই শেষাদ্রি তা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন আগামী কোন অনিশ্চিত দিনের জন্য। বাবা তো আর মা নন্—মায়ের তূণে যতরকম অস্ত্র থাকে তার কিছুই প্রায় নেই। তাই একদা ছেলেকে বাউণ্ডুলে রেখেই শেষাদ্রির বাবাকে পরলোক যাত্রা করতে হয়েছিল।

ব্যস, তার পর থেকে শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত।

বোন থাকত বিদেশে—চিঠি লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু ক'রে উঠতে পারতনা সে। তাও সে অতি অল্প বয়সে মারা গেল। আর চেষ্টা করে কে? মাসী, কাকী, জেঠী, পিসি একেবারে না ছিল তা নয় কিন্তু শেষাদ্রি তাঁর চার পাশে নীরস শুষ্ক বইয়ের নিশ্ছিদ্র প্রাচীর রচনা ক'রে তাঁদের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং শেষাদ্রির সংসার বলতে দুটি চাকর ভরসা। এরাই রান্না-খাওয়া বাড়িঘর সাফ করা অতিথি সৎকার, ছাত্রদের চা জল ইত্যাদি সরবরাহ এমন কি আত্মীয় এলে আদর আপ্যায়ন সব করে। তার চেয়েও বড় কাজ—বইয়ের পরিচর্যাও তাদেরই করতে হয়। কাজের তুলনায় লোক বরং কম—কিন্তু বেশী লোক রাখা মানেই বেশী জায়গা জুড়ে থাকা—কাজেই দুজনের বেশী লোক রাখতে তিনি রাজী নন। আগে একজনই ছিল তবে তাতে বড় অসুবিধা—সে দেশে যেতে চাইলে কি অসুস্থ হয়ে পড়লে বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। একবার বংশীবদন একজন বদলী রেখে দেশে গিয়েছিল। নতুন লোকটা এ বাড়ির হালচাল এবং বাড়িওলার ধরণ ধারণ দেখে হকচকিয়ে গেল। বুঝল যে এ কাজ তার দ্বারা চলবে না। তখন বুদ্ধিমানের যা কাজ সে তাই করল—বাজার করার নাম ক'রে একটি দশ টাকার নোট বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়ল। শেষাদ্রি তা টেরও পেলেন না, তাঁর মনেও ছিল না কথাটা। এমন কি তাঁর দুপুরের খাওয়া যে হয়নি তাও মনে পড়ল না। তিনি জামা-কাপড় ছেড়ে যথারীতি অন্যদিনের মতই পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দরজা দেবার কথা কাউকে বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ বংশীবদন নিত্য বন্ধ করে। সেই কারণেই নিজেও বন্ধ করলেন না। ঐ রকম হা-হা করছিল সদর দরজা বলেই বোধহয় কোন চোর ভাবতে পারেনি যে বাড়ি সম্পূর্ণ খালি, বাড়িতে কেউ নেই। তাই বড় রকমের চুরি কিছু হয়নি। কেবল পাড়ার বস্তির ছেলেরা সদরের স্তূপাকার করা বই থেকে কিছু নিয়ে গিয়েছিল খেলা করার জন্য, দু'-একখানা ঐখানে বসেই ছিঁড়ে নষ্ট করেছিল।

বাড়ি ফিরে সে দৃশ্য দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শেষাদ্রি চিৎকার ক'রে বংশীবদনকে ডেকেছিলেন। সাড়া না পেয়েও মনে পড়েনি কথাটা, ভেবেছিলেন বাইরে কোথাও গেছে। আরও চটে গিয়েছিলেন ওর এই বেআক্কেলে-পনাতে। তারপর রাত আটটা পর্যন্ত যখন ফিরল না তখন তাঁর মনে পড়ল যে বংশীবদন দেশে গেছে এবং তার বদলী একটা লোক রেখে গেছে। সে লোকটাই বা কোথায় গেল? তখন মনে পড়ল তার দশ টাকার নোট নিয়ে বাজার যাবার কথা—আর তখনই মনে পড়ল যে সকালে আজ তাঁর খাওয়া হয়নি। কেন যে দুপুরে অত ক্ষিদে পাচ্ছিল এবার তাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

এর পর তাঁকে আর একটা চাকর খুঁজে বার ক'রে কাজ বুঝিয়ে দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সেই কারণেই বংশীবদন ফিরলেও একে আর ছাড়ান নি, দুজনেই আছে। এই লোকটা নাকি চোর, বংশীবদন প্রায়ই অনুযোগ করে—কিন্তু সে অনুযোগ শেষাদ্রি গায়ে মাখেন নি। তাঁর আছেই বা কি এমন, আর তার কতই বা চুরি করবে? বইটই ওরা তত বোঝে না, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

দু'-দশ টাকা চুরি বরং সহ্য হবে—কিন্তু ভৃত্যহীন অসহায় অবস্থা সহ্য হবে না।

এই শেষাদ্রি ঘোষাল।

এতদিন ধরে নিরঙ্কুশ ভাবে নিভৃত নীরব জ্ঞানতপস্যা চালিয়ে এসে—এই প্রায় বৃদ্ধবয়সে নীলার কাছে পরাজিত হলেন।

এ গৌরব কি কম!

নীলা তাঁর ছাত্রী। সুনাম শোনাই ছিল, কাছে এসে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল! এ-ই তো যথার্থ অধ্যাপক, এইতো সেই প্রাচীন কালের আচার্য। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ—পঠন ও পাঠন, এর বাইরের জগৎ বলতে কিছুই জানা নেই।

কিন্তু শ্রদ্ধা তো করে অনেকেই, যারা যারা শেষাদ্রির সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই। মুগ্ধও হয় তাঁর নির্মল দেবতুল্য চরিত্রে, শিশুর মত স্বভাবে।

নীলা সেইখানেই থামল না।

তার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল, এক আকাশস্পর্শী দুরাশা।

এই যোগীশ্বরের যোগ ভাঙাতে হবে, শ্মশানবাসীকে করতে হবে গৃহী। তপস্বীর তপস্যাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে। তার পায়ের ধুলোয়।

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'

না-ই বা হ'ল সে উর্বশী, তবু সেই জাতেরই তো! ঐ সাধকের সমস্ত সাধনা তার এই কমলকোমল রক্ত চরণপ্রান্তে সমাধিস্থ করতে না পারলে, তাঁর এতদিনের তিল তিল তপস্যায় রচিত চারিত্রিক দুর্গটিকে ধূল্যবলুণ্ঠিত না দেখতে পেলে বৃথাই তার নারীজন্ম!

সে অবশ্য নিজের সংকল্পের কথা জানাল না কাউকে, কিন্তু কাজে লেগে গেল।

তখন শেষাদ্রির বয়স আটচল্লিশ, নীলার একুশ।

তাই নীলা যখন ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল, তখন না শেষাদ্রি না তাঁর পরিচিত অন্য কেউ—তার এই সংকল্পের কথা অনুমানমাত্র করতে পারেনি। এদিকে যে কিছু অনুমান করার আছে তাও ভাবতে পারেনি। পাঠে অনুরাগিণী ছাত্রী এমন অনেক আছে, যাদের সাধ্যের চেয়ে সাধ বেশী—তারা পড়ার চেয়ে অধ্যাপকদের সেবা করেই পরীক্ষাপর্ব এবং তার পরের পর্বটাও তরে যেতে চায়। তাছাড়া শেষাদ্রি ঘোষালের ক্ষেত্রে অন্ততঃ, এরকম তদ্গত ভক্তির নিদর্শন খুব দুর্লভ ছিল না।

না কেউই সন্দেহ করেনি—নীলার গোপন অন্তরবাসিনী চিরকালীন নারীর শাশ্বত বিজয় বাসনা।

নীলা এম, এ পাস করল, রিসার্চ স্কলারশিপ পেল, থিসিসও দিল। সে থিসিস বলতে গেলে শেষাদ্রির মুখ থেকে শ্রুতিলিখনে লেখা—সুতরাং ডি, ফিলও আটকাল না।

শেষাদ্রি প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে নীলা, তুমি এখন কি করবে?'

'আপনি তো আর বিলেত যাচ্ছেন—সে কবে?'

'সামনের অক্টোবরে।'

'আমিও যাব।'

'কি করে'—বিস্মিত শেষাদ্রি আকাশ থেকে পড়ল।

'সে আমি যেমন করেই হোক যাব। ভাববেন না।'

'কিন্তু তুমি! তুমি বিয়েথা করবে না? সংসারী হবে না?'

'আপনার মুখেও এ প্রশ্ন স্যার? আমি যদি বলি আপনি পথ দেখান?'

এই বয়েসেও লাল হয়ে ওঠেন শেষাদ্রি। মাথা হেঁট করে বলেন, 'কী যে বলো নীলা!'

'ঠিকই বলছি—আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও।'

শেষাদ্রি আরও বিব্রত হয়ে হাতের খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন।

'সে সব কথা থাক স্যার! কিন্তু আমি না গেলে আপনি বড় অসুবিধায় পড়বেন। বই খাতা কাগজ এ সব গুছিয়ে রাখে কে?'

'তা বটে। কথাটা সত্যি।'

মনে মনে শেষাদ্রিও স্বীকার করেন। নীলা কবে যে তাঁর ছাত্রী থেকে সেক্রেটারীতে রূপান্তরিতা হয়েছে তা তিনিও জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন যে আজকাল তাঁর সব দরকারী কাগজপত্রগুলো নীলা ঠিক করে রাখে এবং প্রয়োজনমত ঠিক ঠিক হাতে জুগিয়ে দেয়—সে ভারি আরাম। আগের মত একটা খাতা কি একটা বই হাতড়ে বার করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে না।

তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'যেতে পারো তো ভালই। কিন্তু কী পড়বে?'

এবং তার পরই মহা উৎসাহে নীলা এখন ওখানে কী কী পড়তে পারে, কী পড়া উচিত কত কি সুযোগ আছে—সেই আলোচনাতে ডুবে যান।

নীলা করলেও অসাধ্য সাধন। কোথা থেকে কী সূত্রে যে সে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করলে তা কেউ টেরও পেল না। বাকী রইল যাওয়া-আসার খরচা—সেটাও এক জেঠার কাছ থেকে নিয়ে শেষাদ্রির আগেই সে বিলেতে পৌঁছে গেল।

শেষাদ্রির তাতে সুবিধে হ'ল খুব, সেটা তিনিও একদিন স্বীকার করলেন।

শেষাদ্রি গিয়েছিলেন অধ্যাপক হয়ে—এক বছরের জন্য। তাঁর যখন ফেরবার সময় হ'ল তখনও নীলার কাজ সামান্য বাকী আছে।

শেষাদ্রি বললেন, 'তোমার ওপর নির্ভর করা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে নীলা যে এই ক'টা মাস ওখানে গিয়ে খুব অসুবিধা বোধ করব।'

নীলা আর তিনি একই পাড়াতে দুখানা ঘর পেয়েছিলেন—কাছাকাছি বাড়িতে। সেও অবশ্য নীলারই কৃতিত্ব, কারণ ঘর সেই ঠিক ক'রে রেখেছিল। এখানে আসার পর কোন অসুবিধাতেই তাই পড়তে হয়নি শেষাদ্রিকে। ঠিক নিজের কাজে যতটুকু অনুপস্থিত থাকা প্রয়োজন ততটুকু—এবং রাত্রে ঘুমের সময় ছাড়া সমস্ত সময়ই কাছে কাছে থাকত। ভোরে উঠে চলে আসত ওখানেও বহু রাত্রি পর্যন্ত থাকত। সেক্রেটারী, ছাত্রী, ব্যক্তিগত সেবিকা—নীলা ছিল একাধারে সব। কী নোট কোনদিন টাইপ করতে হবে, পরের দিনের লেকচার নোট তৈরী করতে কোন কোন বই লাগবে—সেসব ছিল ওর নখদর্পণে—চাইবার আগেই হাতের কাছে যুগিয়ে রাখত সে।

তাতে কাজ করার খুব সুবিধা হ'ত শেষাদ্রির। সময়ও অনেক বাঁচত।

সেদিনও নীলা ভোরের চা খেয়েই চলে এসেছিল ওঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে। সে শেষাদ্রির কথার উত্তরে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললে, 'কিন্তু ক'টা মাসই বা বলছেন কেন স্যার! এবার দেশে ফিরলেই বা আমাকে ক'দিন পাবেন?'

'কেন? পাবো না কেন?' শেষাদ্রি যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'বাঃ, আমি কি চিরকালই এমনি থাকব? আমাকে এবার যা হোক কিছু সেটল্ করতে হবে না? হয় বিয়ে নয় চাকরি—যা-ই কেন না করি এখনকার মত অত স্বাধীনতা থাকবে না এটা তো ঠিক! হয়ত কলকাতাতে থাকাই হবে না।'

শেষাদ্রির মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে বসে থেকে বললেন, 'তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি। সত্যিই তো, তোমারও তো ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে। স্বার্থপরের মত নিজের কথা তো ভাবলে চলবে না।'

সুটকেশটার জিনিসগুলো মেঝের ম্যাটিং-এর ওপর ঢালতে ঢালতে নীলা বললে, 'একটা কিন্তু উপায় আছে স্যার!'

'কী বলো ত?' সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন শেষাদ্রি।

'আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ মিলিয়ে দেওয়া!'

খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে বলে নীলা।

এত সহজ এবং এত স্বাভাবিক যে শেষাদ্রি কথাটা ধরতেই পারেন না। অবাক হয়ে খানিকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'অর্থাৎ—?'

'অর্থাৎ আমাকে যদি বিবাহ করেন তা হ'লে এসব কোন সমস্যাই আর থাকে না।'

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শেষাদ্রির গৌরবর্ণ তামাটে হয়ে গেছে। তার ওপরও মেচেতার মত ছোপ পড়েছে স্থানে স্থানে—তবু তিনি যে অরুণবর্ণ হয়ে উঠলেন তা বেশ বোঝা গেল।

'যাঃ, কী যে বল নীলা! তোমার ঠাট্টাগুলো—। যাঃ!'

যারপর-নাই অপ্রতিভ হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। কথাগুলো ছেলেমানুষের মতই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে তাই। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে বিশেষ কিছুই বলতে পারেন না।

'আমি কিন্তু ঠাট্টা করিনি স্যার! সিরিয়াসলিই বলছি। অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছি। আপনার যা অসহায় অবস্থা, আমি চলে গেলে আপনি খুব অসুবিধেয় পড়বেন—আমিও ফেলে গিয়ে স্বস্তি পাবনা।'

'তাই বলে—। নাঃ, কী যে বলো। তোমার বয়স আর আমার বয়স!'

'সে আপত্তি তো আমার তরফ থেকেই ওঠবার কথা। আপনি সে কথা চিন্তা করছেন কেন?'

'না না! আমার এই বয়সে বিয়ে! কী বলছ নীলা! সে যে আমি ভাবতেই পারি না।'

'সে দিক দিয়ে ভাবছেনই বা কেন? যেমন আছি তেমনিই থাকব।—শুধু সেই ভাবে চিরকাল হাতের কাছে থাকবার একটা সামাজিক অনুমোদন নেওয়া বই তো নয়!'

'না না—এসব জিনিস এত তুচ্ছ নয় নীলা! রেয়ের ধর্ম আছে।

বয়সের এত তফাৎ। ধরো আমি আর দু'-একবছরের মধ্যেই বুড়ো হয়ে যাব—তুমি তখনও যুবতী থাকবে। তোমার বাবা-মাই বা রাজী হবেন কেন? আর লোকেও যা-তা বলবে!'

'আপনি এসব কথা এখনও চিন্তা করেন তাহলে! লোকে কী বলবে, দেহের ধর্ম—এই সব তুচ্ছ কথা!' ঈষৎ কি ব্যঙ্গের সুরই গলায় ফোটে নীলার?

ফুট্‌লেও শেষাদ্রি সেদিক দিয়ে যান না। বলেন, 'না না—এসব ভাবতে হবে বৈ কি। জীবন নিয়ে কথা। না, ওসব কথা যাক্‌ নীলা!'

নীলা আর কথা কয় না! যেমন জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিল তেমনিই দিতে থাকে।

তার পরবর্তী কথা এবং আচরণও সহজ এবং স্বাভাবিক স্তরেই নেমে আসে। অন্ত দিনের সঙ্গে এদিনের কোন তফাৎ বোঝা যায় না। যেন এই মধ্যবর্তী সময়ের কথাগুলো কোনপক্ষেই উচ্চারিত হয়নি।

শেষাদ্রি কিন্তু সত্যিই বিলেত থেকে ফিরে বড় অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। যখন একা ছিলেন তখন ঠিকই চলে যেত—কিন্তু মধ্যে এই কটা বছর নীলা এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেছে। অভ্যাসটা গেছে খারাপ হয়ে। এখন কিছুই হাতের কাছে খুঁজে পান না। না বই, না খাতা, না কোন নোটস্‌—এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ জামা-কাপড় পর্যন্ত।

খুঁজে পান না—তার ফলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অথচ সে বিরক্তি কার ওপর বোঝাও যায় না। অন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কিন্তু তাদের আনাড়িপনা আরও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে।

আর তার ফলে—যে দুর্নাম ওঁর কখনও ছিল না খিটখিটে বলে একটা দুর্নাম রটে যায় ছাত্রসমাজে।

এরই মধ্যে একদিন এসে পড়ল নীলা।

সত্যি-সত্যিই যাকে বলে বেঁচে গেলেন শেষাদ্রি। যেন কোন যাদুমন্ত্র বলে সব আবার ঠিক হয়ে গেল।

তেল-দেওয়া কলের মত সব নিঃশব্দে ও নিশ্চিন্ত গতিতে চলতে লাগল।

এ শ্রেণীর জিনিস শেষাদ্রির চোখে পড়বার কথা নয় কিন্তু এবার যেন, তফাৎটা বড় বেশী বলেই চোখে পড়ল।

আর চোখে পড়ল বলেই যে কথাটা একদা অসম্ভব, অবাস্তব বিবেচনার অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কথাটাই নতুন ক'রে ভেবে দেখতে লাগলেন।

অবশ্য ভাবাও তাকে ঠিক বলে না। মনের অবচেতন থেকে সচেতনতার মধ্যে এই চিন্তাটা উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ধমক দেন, জোর ক'রে ঠেলে সরিয়ে দেন তাকে। কিন্তু আবারও সে উঁকি দেয়—আবারও নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দেয়।

ছি ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

এ কী স্বার্থপর হয়ে উঠলেন তিনি!

কিন্তু সুবিধা খুব—এটাও মনে মনে স্বীকার না ক'রে পারেন না।

তবু—হয় ত কথাটা শেষাদ্রি কিছুতেই তুলতে পারতেন না—যদি না নীলা নিজে থেকেই কথাটা তুলত।

নিজেই একদিন বললে, 'আমি স্যার সাগর ইউনিভার্সিটিতে একটা কাজ পাচ্ছি। ভাল মাইনে। ওখানেই চলে যাব ভাবছি।'

'সাগরে?' চমকে ওঠেন শেষাদ্রি, 'সে যে অনেক দূর।'

'হ্যাঁ, তা দূর আছে একটু।' স্বীকার করে নীলা।

'কেন—এখানে তো সেই কী বলছিলে কী একটা কলেজে—'

'সে অনেক কম মাইনে। এখানে যা পাচ্ছি তার সিকি!'

'তা—তা তোমার বাবা-মা তোমার বিয়ের কথা তুলছেন না?'

'তুলছেন বৈ কি। কিন্তু তাতে আপনার কি সুবিধা হবে বলতে পারেন? সে তো আরও দূরে চলে যাব?'

'কেন—এখানে কি সম্বন্ধ হ'তে পারে না? কলকাতাতেও তো ঢের ভাল পাত্র আছে।'

'সে দূরত্বের কথা বলিনি।' শেষাদ্রির অবৈষয়িকতায় প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে নীলা, 'আমি বলছি বিয়ের পর আমার স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি তো আর আমাকে এমন করে দৈনিক ষোল ঘণ্টা আপনার কাছে থাকতে দেবেন না?'

ও, তুমি সেই কথা বলছ!' বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েন তিনি, আমি সে ভেবে, শুধু নিজের অসুবিধার কথা ভেবেই বলিনি!'

'কিন্তু সেটা কি ভাববার মত কিছু নয়?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে নীলা।

'কিন্তু—কিন্তু সে আর—মানে তার আর আমি কি করব? কী আর করতে পারি? মানে তুমি কি বলতে চাইছ নীলা?'

'বলতে চাইছি যে জীবনে ঢের নির্বুদ্ধিতা করেছেন আর করবেন না। আমিই আপনার লাষ্ট চান্স! আর কেউ সহজে আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। চাইলেও—আপনার তাতে কোন সুবিধে হবে না। এখনও সময় আছে, আমাকে বিয়ে করুন—আর কিছুই ভাবতে হবে না।'

প্রথম প্রথম নীলার কথায় বিস্মিত হতেন শেষাদ্রি, তাঁর ভদ্রতায় আঘাত লাগত। কিন্তু আজকাল আর হন না। কারণ বুঝে নিয়েছেন যে ওর স্বভাবই ঐ রকম। তাছাড়া এতদিনের ঘনিষ্ঠতাতেও অনেকটা অধিকার বেড়েছে নীলার! অনেক বেশী সহজে কথা বলার অধিকার।

আজ আর তিনি উড়িয়েও দিলেন না কথাটা সেদিনের মত। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কথাটা কি তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ নীলা?'

'দেখেছি বৈ কি। অনেক দিন ধরেই ভাবছি বলতে গেলে।'

'সব প্রায় ব্যাডভান্স? এ বিবাহে আমিই জিতব, পাব অনেক, তুমি কিছুই পাবে না। টাকা কড়িও আমার বিশেষ নেই। পৈত্রিক অর্থ যা ছিল তা সব ভায়ে ভাগ্নীদের দিয়েছি। থাকার মধ্যে এই বাড়িটা আছে আর বইগুলো। বইগুলো সরবার জায়গা নেই ব'লে বাড়ি মেরামত করা হচ্ছে না। ভাবছি আর একটা বাড়ি ভাড়া করব বইগুলো রাখার জন্য—সে আরও খরচা। আমার যা আয় তাও তুমি জান সংসার চালাতে পারবে?'

'না পারি নিজেও চাকরি করব। তখন এখানে থেকে যা পাই তাতেই খানিকটা উপকার হবে।'

'তোমার আমার বয়সে কিন্তু অনেক তফাৎ।'

'তা জানি।'

'তবু একবার ভাল করে ভেবে দ্যাখো নীলা। মনস্থির করার আগে একটু সব দিক ভেবে নাও। হয়ত সে সুযোগ আর পাবে না। এর পর ফেরবারও পথ থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি কি ভেবে দেখেছেন?'

এবার আর কণ্ঠের নিস্পৃহতা রাখা যায় না। আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বেরিয়েই পড়ে।

'হ্যাঁ—তা মানে লাভের পাল্লা তো আমার দিকেই ঝুঁকছে। কিন্তু আমার কথা ভেবো না নীলা—তোমার কথাই ভাবো। শুধু তোমার দিকটা।'

পরের দিন নীলা ট্যাক্সি নিয়ে আসে একেবারে।

'চলুন।'

'কোথায়।' আকাশ থেকে পড়েন শেষাদ্রি।

'রেজিষ্ট্রারকে একটা নোটিশ দিতে হয় সেটা সেরে ফেলা দরকার। ফর্ম আমি নিয়েই এসেছি, ফিল-আপও করেছি শুধু সইটা বাকী। গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'রেজিষ্ট্রার?'

'হ্যাঁ। রেজেষ্ট্রী বিয়েই তো হবে? এ বয়সে নিশ্চয়ই আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চাইবেন না আপনি। সুতরাং একটা নোটিশ দেওয়া দরকার।'

'ও:।'

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েন শেষাদ্রি। এত শীঘ্র মনস্থির করা শুধু নয়, কাজও সেরে ফেলতে হবে তা তিনি ভাবেননি।

একেবারে চিরদিনের মত অন্ধ গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া। প্রত্যাবর্তনের ভুল সংশোধনের আর সুযোগ পর্যন্ত না রেখে।

'তুমি মন স্থির করেছ তো? সব দিক ভেবে দেখেছ তো?' অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করে শেষাদ্রি।

'সে তো আমার স্থির করাই ছিল—আপনাকে বলেছি।'

'তা বটে। তবু—আর ফেরবার আর পথ থাকবে না। কাজটা করতে যাচ্ছ চিরদিনের মত!'

'সে চিরদিনের আর কত বাকী আছে আপনার? বেশীর ভাগই তো একা একা স্বার্থপরের মতো কাটিয়ে দিলেন। এখন দুশ্চিন্তা তো বরং আমারই হবার কথা।'

'না, সেই তোমার কথাই বলছি।

'চলুন চলুন, উঠুন। এতকাল আপনার কথাই তো বড় ভাবলেন। এই যে দৈনিক এতখানি সময় আপনার কাছে কাটাই—তাতে কে কী বলছে, আমার ভবিষ্যতটা কি হবে তা কখনও ভেবেছেন? নিজের কথা ছাড়া আর কারুর কথা ভাবা আপনার অভ্যেস আছে?'

'তা বটে। বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। তোমার কথাটা ভাবা উচিত ছিল। বরং'—

'উঠুন বেরিয়ে পড়ুন। আর বরং-এ কাজ নেই। এত কাল যা করলেন না—এখন আর পারবেন না।'

অগত্যা শেষাদ্রিকে উঠতে হয়েছিল। রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে নোটিশও দিতে হয়েছিল একটা।

তা'র পর বিয়ে, ডক্টপলকে গ্রেট ইষ্টার্ণে প্রীতিভোজ—আপনার সহজ নিয়মেই এসেছিল—একটার পর একটা। অভিনন্দনে-ঈর্ষায়-উপহারে জড়ানো সে অদ্ভুত দিন কটা গেছে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কলবান দিন। মনে হয়েছে সে সকলকে ডেকে বলে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' কথার কথা নয়।

সে নিজেই তার প্রমাণ।

সে আজ এক বছরের কথা। আজ তাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

সেই কথাই ভাবছে নীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

সুদীর্ঘ একটি বছর কেটে গেছে। বিজয়িনীর জীবনপাত্রের সমস্ত গৌরব সুধাটুকু নিঃশেষিত হয়েছে।

আজ আর স্বপ্ন নেই। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে।

আজ মনে সেই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। তপস্যায় সিদ্ধি তো মিলেছে—কিন্তু কী মিলল শেষ পর্যন্ত?

কী লাভ হ'ল তার?

শেষাদ্রি নিশ্চিন্ত হয়েছেন সুখীই হয়েছেন বলতে হবে। সংসার সম্বন্ধে নিজের জীবনের দৈহিক বা ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবতে হয় না। কিছুই ভাবতে হয় না তাঁকে—সমস্ত সময়টাই তাঁর বই ও পুঁথিতে দিতে পারেন।

কিন্তু নীলারও যে একটা জীবন আছে, তারও যে জৈবিক সত্তা আছে, একথাটা শেষাদ্রি একবারও ভেবে দেখেন না।

বরং বিয়ের আগে ভেবেছিলেন। কথাটা তুলেও ছিলেন। তাই থেকেই নীলার কোথায় একটা সূক্ষ্ম আশা জেগেছিল মনে। কিন্তু এখন একেবারেই নির্বিকার শেষাদ্রি। রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়াশুনো করে যখন তিনি এসে শোন, তখন এই ঘরেরই আর একটা খাটে, তাঁর চার হাতের মধ্যে আর একটা প্রাণী যে তখনও পর্যন্ত হয়ত বা বিনিদ্র, জেগে বসে আছে, সে কথাটা একবারও মনে পড়ে না তাঁর।

নীলাকে একটা চাকরি নিতে হয়েছে। হয়ত শীগগিরই টিউশানী খুঁজতে হবে। এত টাকা মাইনে শেষাদ্রির—কিন্তু সংসার চলে না তাতে। বইয়ের দোকানেই সব টাকা চলে যায়। শেষাদ্রি যে এমন নিঃস্ব, কোথাও এক পয়সা জমানো বা উদ্বৃত্ত নেই—একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স পলিসি পর্যন্ত না—তা একবারও ভাবতে পারেনি নীলা। আছে শুধু বাড়িটা সেও যে কতকাল মেরামত হয়নি তার ঠিক নেই, এবার হয়ত ভেঙ্গে পড়ে যাবে। দু'বছরের ট্যাক্সই বাকী পড়েছিল—নীলা শোধ করেছে। বাড়ি মেরামতের টাকা তাকেই যোগাড় করতে হবে—এবং দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থাও।

তাহলে সে পেল কি?

গৌরব। মূর্খ নির্বোধ নীলা। সেটাও সে নিজের সৃষ্টি করা মানসিক দূরবীণ দিয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দেখেছিল। কিছু দিন পরেই সে ভুল ভেঙেছে তার।

শেষাদ্রির পরিচয় কতটুকু গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শুধু এই বিশেষ বিষয়ের ছাত্রসমাজে ও কতকগুলি অধ্যাপকের মধ্যে। বাকী কে খবর রাখে? অপরে তাদের স্বামি-স্ত্রী পরিচয় পেলে মুচাক-হাসে। করুণার হাসি। কৌতুকের হাসি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। যারা শেষাদ্রির পরিচয় জানে তারাও মনে করে নীলা পয়সার লোভে শেষাদ্রিকে বিয়ে করেছে। তারাও হাসে মনে মনে। সুতরাং কী এমন গৌরবই বা পেল সে?

কোন এক অপরিণত বয়সে মনকে সে বুঝিয়েছিল যে এরকম ঘটনা ঘটলে শিক্ষিত সমাজের মাথার ওপর দিয়ে চলতে পারবে সে, সবাই তাকে খাতির করবে, সমীহ করবে স্ত্রীলোকরা ঈর্ষা করবে। আজ সে কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কিছু মাত্র মেলেনা। কেউ তাদের কথা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। তাছাড়া তারা যায়ই বা কোথায়? কোথায় তাদের সমাজ? চাকরী বজায় রাখতে যাওয়া ছাড়া শেষাদ্রি কোথাও নড়তেই যে চান না। তার ফলে শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর। ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, বাত। সেই তদ্বিবৎ করতে করতেই নীলার অর্দ্ধেক সময় চলে যায় আজকাল।

অর্থাৎ বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। কিছুই নেই তার। সন্তান হবে না, টাকাও থাকবেনা। যতদিন বেঁচে থাকবে নিজেকে চাকরী ক'রে খেতে হবে। হয়ত বা স্বামীকেও খাওয়াতে হবে···

ঘর থেকে শেষাদ্রি ডাকলেন, 'নীলা—।'

'কী বলছ?' ঘরে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'আচ্ছা, ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখে লাল পেন্সিল দাগ দিয়ে রেখেছ কেন বলত?···আজ কি কোন এন্‌গেজমেণ্ট ছিল আমার?'

'না। ওটা আমার এক নির্বুদ্ধিতার স্মারক; ও কিছু না। ও পাতাটাই ছিঁড়ে ফেল।'

'নির্বুদ্ধিতা? কিসের নির্বুদ্ধিতা? কী বলছ কিছুই বুঝছি না। তোমার মুখটাই বা অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন নীলা? শরীর খারাপ হয়েছে?'

বহুকাল পরে বোধহয় নীলার মুখের দিকে তাকাবার সময় হ'ল তাঁর। এধরণের কুশল প্রশ্নও তাঁদের বিবাহিত জীবনে সম্ভবত এই প্রথম।

সহসা নীলার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে।

তবু তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় না—বরং তা থেকে যেন আগুনই ঠিকরে বেরিয়ে আসে। 'তুমি, তুমিই আমাকে আগাগোড়া ঠকিয়েছ। তুমি ভণ্ড, তুমি অপদার্থ—তুমি জোচ্চোর। তুমি আমার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলে।'

বহুদিনের রুদ্ধ রোষ আর ব্যর্থতা ফেটে পড়ে তার কণ্ঠস্বরে।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে বসে থাকেন শেষাদ্রি। কী বোঝেন কে জানে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, কিন্তু আমি তো তোমাকে ঠকাতে চাইনি নীলা। তোমার কাছে গোপনও করিনি কিছু—বরং সত্য বলে সতর্ক ক'রে দিতেই চেয়েছিলুম। তুমিই শুনতে চাওনি কোন কথা যে।···আসলে তুমিই তোমাকে ঠকিয়েছ।' এই মর্মান্তিক সত্য—যা ক্রমাগত ক'দিন ধরে তার মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামীর মুখ থেকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না নীলা। সেইখানেই মেঝেতে আছড়ে পড়ে নির্মম ভাবে মাথা ঠুকতে থাকে।

বিজ্ঞানভিক্ষু

দশ
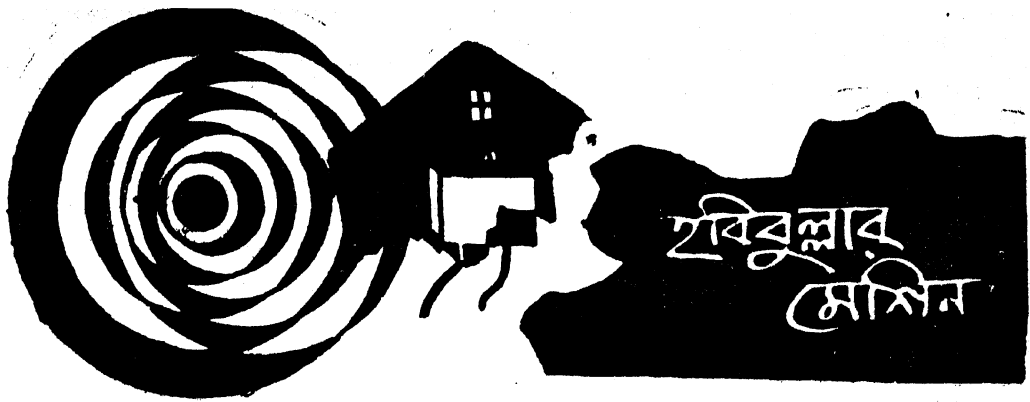
সংঘাত

"O ye speculators on perpetual motion; how many will-o'-the wisps ye have fashioned! Go and rub noses with those who dream of creating gold!"

—*Leonardo da Vinci*

"O my dear Kepler, how I wish that we can have one hearty laugh together! Here at Padma, is the principal professor of philosophy, whom I have repeatedly and urgently requested to look at the moon and the planets through my glass, which he pertinaciously refuses to do. Why are you not here! What shouts of laughter we should have at this glorious folly! And to hear the professor of philosophy at Pisa labouring before the Grand Duke with logical arguments, as it with magical incantations to charm the new planets out of the sky!"

—*Galilei Galileo*

কার্যতালিকা বেঁধে নিয়ে শংকর রুটিন-মাফিক কাজ শুরু করে।

সমস্ত দিন তার কেটে যায় হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করে—কম্পিউটারগুলো নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা করে। নোটবই তার ভরে উঠল হবিবুল্লার বৈজ্ঞানিক পটভূমিকার ওপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দিনের কাজের রোমন্থনে। তার পর রোজই প্রায় বসে সেমিনাররুমের টেবলকে কেন্দ্র করে। সে বৈঠকের রেশ চলতে থাকে নিশুতি রাত পর্যন্ত—পাঁচজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে আলাপ-আলোচনায়। সুমিত্রার সংগে একান্ত আলাপনের সুযোগ আজকাল বড়ো একটা মেলে না—লাইব্রেরী সংক্রান্ত কাজে আর বৈজ্ঞানিকদের কাজের যোগান দিতে সে-ও ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। চা-এর টেবলে বা নৈশভোজনের সময় দুজনের বিনিময় হয় ক্লান্ত হাসির।

হবিবুল্লার গ্রন্থাগার থেকে সহকর্মীদের ফরমাস মতো বই বিতরণ করা আর দরকার হলে অন্য লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে দেওয়া সুমিত্রারই কাজের তালিকার মধ্যে।

রোজ রাত্রে শংকরের টেবলে তিন-চারখানা করে বই রেখে সে চলে যায়। গভীর রাতে শংকর সেগুলো নাড়াচাড়া করে বিনিদ্র চোখে।

সহকর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। রাও, আলিমচান্দানী, স্বামীজি, জন আর কেঠল মোটামুটি শংকরের মতই সমর্থন করেন। পূর্ণমাত্রায় অবিশ্বাসীর মধ্যে একমাত্র শিকদারই রয়ে গেলেন। তবে প্রফেসার গোপালাচারী, সুব্রাহ্মনিয়ন আর অমল বন্দ্যো অনেক সময়ে শিকদারকেই সমর্থন করেন—যদিও তাদের অবিশ্বাসের ভিত্তি কিছুটা শিথিল হতে শুরু করেছে। বাকী বৈজ্ঞানিকের দল কখনও এপক্ষের কখনো বা বিপক্ষের হয়ে তর্কে যোগ দেন। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শিকদার যেমন শূন্য, সুমিত্রা তেমনি একশোর মাত্রায়। অবশ্য কথাটা সুমিত্রা কোনোদিন প্রকাশ করে'না। কিন্তু শংকর জানে।

প্রথম রাত্রের সব থিয়োরি নিয়ে আবার অনেক আলোচনা হয়েছে—অনেক নূতন মতামত তার সংগে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, কোনটাই পরীক্ষাসাপেক্ষ নয়। কিছুটা সম্ভাবনা হয়তো আছে দু'-একটা থিয়োরির, কিন্তু সেগুলো নিয়ে পরীক্ষা করার কোনো উপায় দেখা যায় না।

হবিবুল্লার যন্ত্রের ওপরে রাসায়নিক 'অ্যানালিসিস'-এর রিপোর্ট পাওয়া গেল। যন্ত্রটির মূল উপাদানে কোনো অসাধারণ মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় নি। অ্যালুমিনিয়মই তার মধ্যে প্রধান আর সংগে মিশে রয়েছে লোহা, তামা, নিকেল, টিন, ক্রোমিয়াম, ম্যাংগানীজ, ম্যাগনেসিয়াম, টাংষ্টেন, সিলিকন, অংগার, গন্ধক ও ফস্ফরাস ইত্যাদি নিতান্ত সাধারণ ধাতু ও মৌলিক পদার্থ। আর পাওয়া গেছে তিন চার রকমের প্লাস্টিক ও রবার, কাঠ আর কাচের টুকরো। তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে নামমাত্র থোরিয়াম।

হবিবুল্লার সম্পর্কে তদন্ত করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ নূতন কোনো উল্লেখযোগ্য খবর আবিষ্কার করতে পারেন নি। কেবল পাওয়া গেছে, গত কয়েক বছরে হবিবুল্লার আয়ব্যয়ের হিসাব দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ে হবিবুল্লার মালিকানার অংশ—তার স্থাবর অস্

সম্পত্তির তালিকা। ইতিমধ্যে দু'বার বৈজ্ঞানিকেরা টিমারপুরের ভস্মীভূত ভগ্নস্তূপ দেখে এসেছেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে খান কোম্পানীর সব কারখানাও তাঁরা পরিদর্শন করে এসেছেন। বলা বাহুল্য, মাধ্যাকর্ষণের সম্বন্ধে নূতন কোনো ইংগিত পাওয়া যায় নি এ সমস্ত জায়গা থেকে।

আর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, লক্ষ্ণৌ থেকে একবার হরিকিষণ গুপ্তকে আনা হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য। হবিবুল্লা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে নূতন কোনও সংবাদ বা তথ্য পাওয়া গেল না। অন্তরীণ অবস্থার পর হবিবুল্লা যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ প্রয়োজন না হলে মনের কথা হবিবুল্লা গুপ্ত সাহেবকেও বলত না। গুপ্ত সাহেবও ছাত্রকে চিনতেন—তাই জানতেন অযথা কৌতূহল প্রকাশ করেও লাভ নেই।

দেখা গেল, হবিবুল্লার প্রতিভা সম্বন্ধে হরিকিষণ গুপ্তর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।

শংকর ক'দিন উৎসাহের সংগে 'লেভিটেশন' সম্বন্ধে পড়াশুনা আরম্ভ করেছিল। খোলা মন নিয়ে যোগশক্তি সম্বন্ধেও চর্চা করতে সুরু করলে। কিন্তু কিছু দিনেই প্রাণ তার হাঁফিয়ে ওঠে। এ যেন আর এক নূতন জগত! 'এক্টোপ্লাজম্', অপানবায়ু, সুষুম্না নাড়ীর মালমশলা দিয়ে তৈরী। কতদূরে আছে অতি পরিচিত শ্রোডিংগার, ডিরাক, কার্মিংবোর-এর অ্যাটমের জগত! নদীর দুই তীরের মধ্যে মিলনসেতু কোথায়?

এ মাটির বাস্তব পৃথিবীর কোন্ উপকরণ দিয়ে গড়া হয় অপানবায়ু? অণু-পরমাণু আছে কী? আমাদের অক্সিজেন হাইড্রোজেন পরমাণুই কি রূপান্তরিত হচ্ছে একটোপ্লাজমে—এংগেলস্-এর কোয়ান্টিটি-কোয়ালিটি রূপান্তরের নিয়মে?

স্বামীজির সংগে শংকর আলোচনা করে এ সম্বন্ধে। কিন্তু দেখা গেল, তিনিও শংকরের মতোই পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন!

অন্য সহকর্মীরাও অনেক উৎসাহ নিয়ে—হবিবুল্লার ডায়েরীর ছেঁড়া পাতার কথাগুলোর ভিত্তিতে অন্বেষণ সুরু করে। তারাও বিফল-মনোরথ হয়। এনরিকের কার্মির ভুল বেরোল না তাঁর জীবনের সমস্ত কাজ তন্ন তন্ন করে অনুশীলন করে। কেপলারের কোনো প্রকাশিত রচনার মধ্যেও পাওয়া যায় না নূতন কোনো আলোর আভাস।

হবিবুল্লার লাইব্রেরীর অবৈজ্ঞানিক বইগুলোরই কেবল চাহিদা বেড়ে চলে!

এদিকে হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে ছোটো বড়ো প্রায় সমস্ত যন্ত্রগুলোকেই চালু করানো হয়েছে। শংকর কয়েকদিন কম্পিউটারগুলো নিয়োগ করেছিল—তার 'ফীল্ড ইকোয়েশন' সংক্রান্ত কাজে। একদিন রাত্রে অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল টেলিস্কোপটিও চালু করানো হয়েছিল। কিন্তু কোথাও মিললনা একটা নির্ভরযোগ্য ইংগিত, একটা নির্দিষ্ট পথের সন্ধান। এই ভাবে দিন কেটে চলল।

শংকর লক্ষ্য করে যে ইতিমধ্যেই সকলের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে সুরু করেছে। অযথা তর্কের ভাগটাই বেড়ে চলেছে কাজে অকাজে, আলাপে-আলোচনায় কখনো সে তর্ক রূপান্তরিত হচ্ছে দলাদলি আর প্রচ্ছন্ন কলহে। বৈঠকের বাইরে দুজন সহকর্মী একত্রিত হলেই সর্বাগ্রে ওঠে কোনো তৃতীয় সহকর্মীর আলোচনা। প্রফেসর শিকদারই এর মধ্যে থাকেন নিজের কাজে সমাহিত হয়ে। কেবল কালেভদ্রে শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে কটু মন্তব্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কারো অনবধানতা সম্পর্কে আর কারো অবৈজ্ঞানিক যুক্তির কঠোর সমালোচনা। সুমিত্রাও নিঃশব্দে নিজের কাজ করে চলে সান্ধ্য বৈঠকে বেশীর ভাগ সময়ে থাকে নীরব শ্রোত্রী হয়ে।

সহযোগীদের মনের অবস্থা লক্ষ্য করে শংকর চিন্তিত হয়। একদিন সুমিত্রা আর কৃষ্ণস্বামীর সংগে একান্তে এ প্রসংগের আলোচনা তোলে। কৃষ্ণস্বামী হেসে মন্তব্য করেন, "আমাদের জাতীয় গুণগুলোর প্রকাশ হতে সুরু করেছে। বিদেশে আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু বলেন—এঁড়ে তর্ক করে না নিজেদের মধ্যে—এমন ভারতীয় ছাত্র তাঁর নজরে পড়েনি।"

সেদিন সিদ্ধান্ত হোলো, যে সেমিনারগুলো আরো জোরালো ভাবে পরিচালনা করতে হবে। মহাকর্ষ আর সংগে জড়িত বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাবে। পালা করে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিককে এক একদিন করে বক্তৃতা করতে হবে গ্রাভিটেশন সম্বন্ধে জানা তথ্যগুলোর ওপর।

প্রথম দু-চারদিন এ ব্যবস্থায় ফল মন্দ হলো না সভাও চলল বেশ শৃংখলার সংগেই। কিন্তু সে সভাও শেষে হয়ে দাঁড়াল আহরিত জ্ঞানের নিছক পুনরাবৃত্তি আর চর্বিত চর্বণের ক্ষেত্র। অন্ততঃ শংকরের তাই মনে হোলো। কৃষ্ণস্বামী তখন দেশরক্ষা বিভাগের কয়েকজন হোমরা চোমরাদের সংগে করে আনতে সুরু করলেন। যদি বাইরের লোকের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকদের মাত্রাজ্ঞানটাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এঁরা এসে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন 'প্রজেক্ট-এ'র "আশাতীত প্রগতি"কে অভিনন্দন জানিয়ে!

সেমিনারের পরিচালক হিসাবে শংকর আর একটা কারণে বেশ অসুবিধায় পড়ল। দেখা গেল, দলের মধ্যে অধিকাংশ কর্মীরই মাষ্টারী করবার প্রচুর উৎসাহ। সুযোগ পেলে বার বার তাঁরা শ্রোতাদের বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ শেখাতে ছাড়েন না। বাধা দেওয়াও চলে না, দিলেই মনোমালিন্যের সূত্রপাত হবে—বক্তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করবেন।

বাধ্য হয়েই তাই বৈজ্ঞানিকদের দিনের পর দিন পরিপাক করতে হয়—গ্রাভিটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কী ভাবতেন; কোপারনিকাসের দান; রেনে দেকার্তে সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাকর্ষ সম্বন্ধে পুরাতন মতবাদের কী ভাবে খণ্ডন করলেন। টাইকো ব্রাহ্ গ্রহের সংস্থান অনুশীলন করে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কেপলারের গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ নির্ণয়। নিউটনের "প্রিন্সিপিয়া, পড়ন্ত আপেলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি; অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ক্যাভেণ্ডিশ এর গ্রাভিটেশন কনষ্ট্যান্ট' নির্ণয়। তারপর গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতি হল কেমন করে আকর্ষণ, বিকর্ষণ-আর মহাকর্ষের ক্ষেত্রে—লাগ্রেঞ্জ পোটেনশিয়াল; 'লাপ্লাস-পয়শন ইকোয়েশন' আর তা থেকে নেপচুন ও পরবর্তী যুগে প্লুটোর আবিষ্কার; আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্বন্ধে ক্যাবাডে আর ম্যাক্সওয়েলের এর দান; চুম্বকশক্তি বৈদ্যুতিক শক্তি আর মহাকর্ষের সমতা আর বিভিন্নতা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'হার্ৎস্'-এর আবিষ্কার—বৈদ্যুতিক তরংগ (রেডিও তরংগ) আর

আলোক-তরংগের গতিবেগের সমতা; লরেঞ্জ-ফিটজেরাল্ডের নিয়মে গতির বৃদ্ধির সংগে পদার্থের সংকোচন মাইকেলসন মরলীর পরীক্ষায় ইথারের নিষ্পত্তি। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইনের স্পেশাল 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি' আর ১৯১৩ সাল থেকে 'জেনারাল রিলেটিভিটি থিয়োরি-র' সূচনা। আলোচনা শেষ হয় রোজই 'ইউনিফায়েড ফীল্ড থিয়োরি'-র চর্বিত-চর্বণে।

এই ভাবে কেটে গেলো—একটা মাস।

* * *

ঝড় কিন্তু একদিন উঠল।

শংকরের বলবার পালা ছিল সেদিন। বহু যত্ন করে সে বক্তৃতাটা তৈরী করেছিল। বিষয়টা ছিল গ্রাভিটেশন সম্বন্ধে ফিজিক্স আর মেটাফিজিক্সের বক্তব্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা। কিন্তু শংকর কিছু বলার আগেই—শিকদার তাকে বাধা দিলেন। তারপর নিজেই এগিয়ে গেলেন ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। কতকগুলো ইকোয়েশন নীরবে লিখে গেলেন বোর্ডের ওপরে। ইকোয়েশনগুলো শংকর চিনতে পারে—আইনষ্টাইনের 'পশ্চুলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স'—'গ্রাভিটি'র সংগে ইনার্শিয়া বা স্থৈর্যের সমতার অংক।

শুধু শংকর নয়—সভার মধ্যে অনেকেই বিরক্ত হয় শিকদারের এই ব্যবহারে। শিকদারের কিন্তু কোনো বোধ নেই সে সম্বন্ধে। সভায় সকলের অনুমতি নেওয়াটাও তাঁর ভদ্রতাবোধের মধ্যে আসে না। সকলের দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শিকদার, তারপর আরম্ভ করলেন গুরুগম্ভীর ভংগীতে—

"বন্ধুগণ, যে বস্তুর সন্ধান আমি করছিলাম এত দিন, আজ তা পেয়ে গেছি। আপনাদের সমক্ষে আমি হবিবুল্লার যন্ত্রের মূল স্বরূপ উদ্ঘাটন করব।"

শিকদার কিছুক্ষণ থামলেন—শ্রোতাদের ওপর তাঁর এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য। শ্রোতাদের মধ্যেও দেখা যায় চাঞ্চল্য, তারপরে একটা উৎসুক নীরবতা।

আত্মপ্রসাদের হাসি শিকদারের মুখে।

"আপনাদের সমক্ষে, আজ আমি প্রমাণ করে দেব, যে হবিবুল্লার তথাকথিত আবিষ্কার একটা বিরাট প্রবঞ্চনা। আপনারা সকলে জানেন কী না জানিনা যে, বোর্ডের ওপরে লেখা অংকগুলো প্রকাশ করছে ডাঃ আইনষ্টাইনের 'প্রিন্সিপল অফ ইকুইভ্যালেন্স'। আমার কথায় বিশ্বাস না হ'লে, অন্ততঃ আপনাদের দুর্ভাগ্য ডাঃ রায় বা ডাঃ রাও আপনাদের বলতে পারবেন যে এগুলো ঠিক লেখা হয়েছে কি না।"

শংকরের দিকে সমর্থনের অপেক্ষায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন শিকদার।

শিকদারের ভংগীটা অনেকটা মঞ্চের ওপরের যাদুকরের মতো। যেন একজোড়া তাস দর্শকদের সমক্ষে মেলে ধরেছেন যাদুকর—"দেখুন আপনারা পরীক্ষা করুন—এর মধ্যে বুজরুকী কোথাও আছে কি না।"

শংকর নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে শিকদারের মন্তব্য সমর্থন করে যায়।

শিকদার আবার আরম্ভ করেন, "যদি আমরা এই

'ইকোয়েশন'গুলোর সত্যতায় বিশ্বাস করি, বস্তুতঃ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক এমন কেউ নেই, যিনি আজ এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবেন—তাহলে এই সাত নম্বর 'ইকোয়েশন'-এ দেখতে পাই যে কোনো পদার্থ 'ম্যাটার'—যার 'মাস' বা গুরুত্ব আছে মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ নিয়মকে সেটার লংঘন করবার কোনো উপায় নেই এই সাত নম্বরকে, আরো একটু ভেঙে নিলে নিম্নলিখিত 'ইকোয়েশন'গুলো পাওয়া যায়—

শংকর নিষ্পলক চোখে বোর্ডের দিকে চেয়ে থাকে। শিকদারের বক্তৃতা তার এক কানে প্রবেশ করছে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে চলেছে। বুড়ো শিকদারের যুক্তিভরা গুরুগম্ভীর কথাগুলো অন্তরে কোথাও রেখাপাত করে না। 'ইকোয়েশন' নির্ভুল, যুক্তিগুলোও শাণিত, অকাট্য। কিন্তু শিকদারের আত্মম্ভরিতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে।

শিকদার নিশ্চয়ই গোড়ায় কোথাও ভুল করেছেন—যদিও তাঁর অংক এগিয়ে চলেছে নরম মাটিতে কাদাখোঁচা পাখীর দলের সারবন্দী পায়ের ছাপের মতো অনিবার্য নির্ভুল পরিণতির দিকে। ভুল তাহলে কোথায়?

সে ভুলের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায় না—অর্ধচেতন মনের বন্ধ দ্বারের প্রান্তে এসে আঘাত করে আবার মিলিয়ে যায় ধরাছোঁয়ার আগেই। সুমিত্রা বলবে এটা একটা অনুভূতি—একটা অশরীরী 'ফীলিং'। সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

পার্শ্ববর্তী নির্বাক শ্রোতৃমণ্ডলীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে শংকর স্থির করে ফেলে—'প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটি'-র সবচেয়ে বড়ো শত্রু যদি কেউ থাকেন তিনি উমাকান্ত শিকদার। দ্বিধাহত সহকর্মীদের সমস্ত যুক্তি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছেন শিকদার অংকের ধাপে ধাপে—

"এই জেরো নম্বরের ইকোয়েশন তাহলে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে হবিবুল্লার যন্ত্রের মতো যন্ত্র কোনো দিনই ছিল না।

"আর একরকম ভাবে এটা প্রমাণ করা যেতে পারে।

"ধরে নেওয়া যাক যে হবিবুল্লার যন্ত্রের অস্তিত্ব আছে, আর সেটা মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি তৈরী করত। ধরে নিলাম যে তার 'মাস' হচ্ছে 'এম', 'ডাইমেনশন' এতো, ইনারশিয়া—এতো। আগের ইকোয়েশনে সেগুলো বসিয়ে দিলে আমরা পাই চোদ্দো নম্বরের ইকোয়েশন তা থেকে পনেরো—তারপর ষোলো, 'ইন্টিগ্রেশন' করলে সতেরো আর সহজ করলে পৌঁছনো যায় এই আঠারো নম্বর 'ইকোয়েশন।'

"এই আঠারো নম্বর ইকোয়েশনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা একটা 'অ্যাবসার্ড' অসম্ভব ইকোয়েশন যার কোনো মানে হয় না। 'মাস' এর যে কোনো 'ফাইনাইট ভ্যালু' নির্দিষ্ট সংখ্যা বসালেও তার অর্থ হয় না।

'অর্থাৎ হবিবুল্লার যন্ত্র যদি সম্ভব হোতো তবে এই যে খড়ির টুকরোগুলো ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছি সেগুলো 'সীলিং', এই আটকে থাকতো।'

খড়ির টুকরোগুলো সীলিং-এ আটকে থাকে না। আবার নীচে নেমে আসে গ্রাভিটেশনের অনিবার্য শক্তিতে। তার মধ্যে একটা সজোরে আঘাত করে প্রফেসর গোপালাচারীর কেশবিরল মাথায়। ভদ্রলোক সেখানে হাত বোলাতে থাকেন। শিকদার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে থাকেন—

"হবিবুল্লার যন্ত্রের অস্তিত্ব থাকলে সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করত না, পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো নয়।"

শংকর ভাবে শিকদারের একটা বিহিত করতে হয়। সুমিত্রার মুখ যেন অতিমাত্রায় করুণ হয়ে উঠেছে। সভাস্থলে মৃত্যুর নীরবতা। শিকদারের কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে উঠে গেছে।

শংকরের চোখের সামনে থেকে বোর্ডের ইকোয়েশনগুলো সহসা মিলিয়ে যায়। তার জায়গায় ভেসে ওঠে বিরাট একটা জ্যোতিঃষর রাশিচক্র। মাঝখানে প্রকাণ্ড বড়ো একটা কুঠার—পরশুরামের কুঠার। শংকরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে।

শিকদার বক্তব্য শেষ করেন আঠারো নম্বর ইকোয়েশনের নীচে তিনটে গভীর রেখা টেনে, উত্তেজনার আতিশয্যে ভদ্রলোকের হাতের খড়ি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। তারপর সকলের দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে শিকদার সশব্দে আসন গ্রহণ করেন।

শংকর দাঁড়িয়ে ওঠে।

ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলতে সুরু করে, "প্রফেসর শিকদার, এই সভায় আপনার বক্তব্য আপনি প্রকাশ করেছেন জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ ভাষায়। সেজন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই—

"সুমিত্রার নীরব সমর্থনে শংকরের কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ হয়ে উঠে, বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আপনার ইকোয়েশনও যেমন নির্ভুল, হবিবুল্লার আবিষ্কারটাকে তেমনি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবারও কারণ ঘটেনি এখনও পর্যন্ত। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়—যে মূল 'পশ্চুলেট'-এ আমাদের গলদ রয়ে গেছে।

"সোজা ভাষায় বলতে গেলে—আপনার নির্ভুল যুক্তি দিয়ে আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে 'ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপল্'-এর সত্যতায় সন্দেহ করবার বিলক্ষণ কারণ আছে।"

প্রফেসর শিকদার দাঁড়িয়ে উঠে এমন ভংগী করলেন যে তিনি নিজের শ্রবণশক্তির ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তারপর আস্তে আস্তে তাঁর মুখ হোলো রক্তিম, নাসারন্ধ্র হোলো স্ফীত। বোমার মতো ফেটে পড়েন শিকদার—"প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী, যদি এই সভাস্থলে এমন অর্বাচীন কেউ থাকেন, যাকে বলে বোঝাতে হবে যে ডাঃ আইনষ্টাইনের 'পশ্চুলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জগতের বিদ্বৎসমাজে অখণ্ডনীয় বলে, আমার অনুরোধ, যে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হোক। এটা অশিক্ষিতদের জায়গা নয়।"

শংকর মনে মনে একটু হেসে নেয়, লক্ষ্য করে সুমিত্রার আয়ত চোখের স্থির দৃষ্টি তার ওপরেই নিবদ্ধ। তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বলে—"প্রফেসর শিকদার, দয়া করে ধৈর্য হারাবেন না। কিন্তু আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করছি হয়তো বা অর্বাচীনের মতোই যদি 'পশ্চুলেট অফ ইকুইভ্যালেন্স' সত্য না হয়, তাহলে কী হবে?"

শংকরের স্পর্ধায় শিকদারের বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, তারপর যখ

স্বরে বললেন, "কী আবার হবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পাবে আর কিছুই নয়।"

শংকর এবার হেসে ফেলে প্রকাশ্যেই, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পাবে একটা থিয়োরির জন্য? ভেবে দেখুন, প্রফেসর শিকদার, কতো শতো থিয়োরি পরিত্যক্ত হোয়েছে ইতিহাসের জীর্ণ পাতায়, তার জন্য কি দৃশ্যমান জগতের কিছু পরিবর্তন হয়েছে? আইনষ্টাইনেরই 'কসমিক রিপালশনের থিয়োরি' কি বাতিল হয় নি? কিন্তু আইনষ্টাইন ছিলেন মহামানব—তাই বড়ো গলায় একথা ঘোষণা করতে দ্বিধা হয় নি তাঁর "কসমিক রিপালশ'ন-এর থিয়োরি আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো ভুল।"

শংকর চেয়ে দেখে যে সভাস্থ সকলের নীরব দৃষ্টির সমর্থন সে পেয়েছে। তাই আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ফুটে ওঠে তার কথায়—

"প্রফেসর শিকদার, হবিবুল্লার গ্রন্থাগারে অবৈজ্ঞানিক বইগুলো দেখে আপনি মর্মাহত হয়েছেন, আমরাও অল্পবিস্তর হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সাবধানবাণী সত্ত্বেও সে সমস্ত বই নিয়ে আমি কিছু নাড়া-চাড়া করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করছি, ত্রৈলংগস্বামী বা মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মতো সিদ্ধপুরুষ যখন বিনা অবলম্বনে শূন্যে চলাফেরা করতেন—বহু বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য আছে এ ঘটনাগুলোর—তখন আপনার 'পশ্চুলেট' অফ ইকুইভ্যালেন্স থাকতো কোথায়? আমাদের দেশের এই সমস্ত বিবরণী না হয় কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশেও এরকম কতো বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ড্যানিয়েল ডগলাস হোম হেনরী শ্লেড, ইউসাপিয়া প্যালাডিনো এদের মাধ্যাকর্ষণকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতার কথা জানা গেছে কোনো নাটক নভেল থেকে নয়—ক্রুকস, অলিভার লজ জোলনার, প্রফেসর লোম্‌ব্রাসো, কুরী দম্পতি, বের্গসঁর এ সমস্ত ঘটনার দর্শক ছিলেন—আপনি কি বলতে চান এদের সকলেরই মতিভ্রংশ হয়েছিল?

"সত্য কথাটা কি জানেন, প্রফেসর শিকদার! আপনার পশ্চুলেটে এ সমস্ত ঘটনার কোনো সদুত্তর নেই, তাই সবগুলোই কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

"আপনাকে আর সমবেত বন্ধুদের আর একটা প্রশ্ন করছি। বলতে পারেন ভারতীয় শাস্ত্রে ও কাহিনীতে 'লেভিটেশন' সম্বন্ধে এতো তথ্য রয়ে গেছে কেন? আমার ধারণা—হবিবুল্লা এই প্রশ্ন থেকে শুরু করেছিল—আর সে প্রশ্নের একটা সদুত্তরও পেয়েছিল। যদি আপনাদের থিয়োরি এর সদুত্তর না দিতে পারে তা হলে সে থিয়োরি আর একবার যাচাই করে নেওয়া উচিত নয় কি? শুধু তাই নয়, যদি আমাদের হবিবুল্লার ভাঙা যন্ত্রটাকে গড়ে তুলতেই হয় তা হলে মহাকর্ষ সম্বন্ধে সমস্ত মতবাদেরই আর একবার খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে।"

প্রফেসর শিকদার সমর্থনের আশায় সকলের দিকে চেয়ে দেখেন। কোনো উৎসাহ না পেয়ে মন্তব্য করেন—"বিজ্ঞানের যা বক্তব্য তা বোর্ডে লেখা আছে। তাতে যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তবে সব ভেক ধারণ করে ত্রৈলংগস্বামী হন গিয়ে!" দীর্ঘ পদক্ষেপে সভাস্থল ত্যাগ করলেন তিনি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে এবার এগিয়ে এলেন প্রফেসর গোপালাচারী শংকরকে সমর্থন করতে।

"আমি ডাঃ রায়ের সংগে সম্পূর্ণ একমত। গত কয়েক সপ্তাহে আমার মনের মধ্যে একটা তুমুল তোলপাড় হয়ে গেছে। আপনাদের সকলের মধ্যেই এই একই আলোড়ন লক্ষ্য করেছি, হয়তো সে প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আপনারা সকলে সজাগ নন।

"আমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আবার নতুন করে হিসেব মেলাতে শুরু করেছি। "আমাদের ভারতীয় কলেজ-শিক্ষকদের মধ্যে প্রায়ই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় চল্লিশ বছর পার হতে না হতেই আমরা নিজেদের বিবরে প্রবেশ করি বাইরের আলো বাতাস থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবার জন্য। আমাদের জানা বৈজ্ঞানিক সূত্রের বাইরের কোনো জিনিসকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে ফেলার কায়দাটাও অবলীলাক্রমে শিখে ফেলি।

"তারপরে আমাদের পদোন্নতি হয়। হয়তো বা সম্মানিত প্রফেসর অথবা কোনো ল্যাবরেটরীর পরিচালকের আসন গ্রহণ করতে আহ্বান আসে। দেখি, তরুণ বৈজ্ঞানিকের দল বিদেশ থেকে ঘরে ফিরছে সুনাম অর্জন করে। অনেক সময়ে যে প্রেরণা—যে রত্ন আমরা পথের মধ্যে হেলায় ফেলে এসেছি আমাদের জ্ঞানের সংগে খাপ খাওয়াতে পারলাম না বলে—এরা সেগুলোকে কুড়িয়েই বিজ্ঞানকে অগ্রসর করে এসেছে। সেই তারুণ্যের প্রতি আমাদের ঈর্ষাটাই যায় বেড়ে। নানা ফন্দী-ফিকিরে এদের বহির্মুখী প্রতিভার রাশ টেনে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করি নিজেদের প্রিয় থিয়োরিতে গড়া অচলায়তনের ব্যবস্থার মধ্যে। যখন দেখি এরা বশ মেনেছে আমাদেরই অনুরূপে পরিণত হয়েছে, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ফাঁকটা কিন্তু পড়ছে আসলে দেশের বিজ্ঞান সাধনায়।

"আমাদের মনের গঠন অনেকটা বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রোজেক্ট-এর মতো। অভিজ্ঞতা বাড়ার সংগে সংগে আমরা একটা বিরাট বাঁধ তৈরী করি জ্ঞানের স্রোতকে বেঁধে রাখার জন্য। তাতে যোগ করি কতকগুলো 'স্লাডগেট' বাড়তি জ্ঞান বা তথ্য নিকাশ করে দেবার জন্য। আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতের যতো কিছু আছে 'সেন্স-ডেটা' তার কিছুটা আমরা সংরক্ষণ করি বাঁধের পেছনে, আর বাকীটা বার করে দিই 'স্লাডগেট'গুলো দিয়ে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে স্লাডগেটগুলোও এমন ভাবে আমরা সাজাতে আরম্ভ করি যাতে নতুন কিছুই যেন গেটের পেছনে না জমে থাকে।

"প্রজেক্ট-এ'র অভিজ্ঞতা আমার এই যত্নে বাঁধা স্লাডগেটের ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ এনে দিয়েছে একটা বিশৃঙ্খলা! নতুন তথ্য গ্রহণ করে সেটাকে ধরে রাখবার একটা চেষ্টা যেন পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে মনের মধ্যে।

"আজ আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই—যে ডাঃ রায় সত্য কথাই বলেছেন। মহাকর্ষ সম্বন্ধে সব ক'টা মতবাদেরই একটা অগ্নিপরীক্ষা প্রয়োজন। আমি একথা বিশ্বাস করিনা, যে আমাদের শাস্ত্র সব রসাতলে যাবে অ্যান্টিগ্রাভিটি সম্ভবপর হলে।

"হবিবুল্লা যে এ সমস্যার সমাধান করেছিল—এ ঘটনা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করাটাই পণ্ডশ্রম। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য

হচ্ছে সময়ের সংগে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলা—সে আবিষ্কার আর একবার নকল করে তোলা।"

এর পরে উঠলেন গুগ্রাহমনিয়ন। বললেন,—'অ্যান্টিগ্রাভিটি' এমন কিছু অসম্ভব নয়, সহকর্মীদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি বলছি বিপরীত পদার্থের অ্যান্টিম্যাটারের কথা। অনেক বিজ্ঞানসাধকের এই বিশ্বাস যে পদার্থের গুণ হয় মাধ্যাকর্ষণ, বিপরীত পদার্থের গুণ হবে ঠিক তার বিপরীত। অনেকে কল্পনা করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনো কোনো সুদূর নীহারিকাপুঞ্জ হয়তো এই বিপরীত পদার্থে গড়া। আমাদের নীহারিকা—'মিল্কী-ওয়ে'তে বিপরীত পদার্থ থাকার সম্ভাবনা খুব নেই যদি বা থাকে তবে সে হয়তো খুবই অল্পপরিমাণ—মহাশূন্যে ছড়িয়ে। কারণ পদার্থ বিপরীত পদার্থের সংঘর্ষে দুটোরই হয় লয়।

এখানে অসুবিধা হচ্ছে 'জেনারাল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি' নিয়ে—কারণ তার সংগে অ্যান্টিগ্রাভিটি খাপ খাওয়ানো যায় না। * আর আপেক্ষিকতাবাদ এত কাজে লেগেছে বৃহত্তর জগতটাকে বুঝতে যাতাযাতি সেটাকে বরখাস্ত করাও ঠিক হবে না।"

রাও মন্তব্য করে, "সে সম্ভাবনাও আমার মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু 'অ্যান্টিপ্রোটন' কি 'অ্যান্টিম্যাটার' তৈরী করতে লাগে বিরাট শক্তি। প্রায় একশো কোটি 'ইলেকট্রন্ ভোল্ট'-এর শক্তি দিয়ে যদি কোন পরমাণুকণা পদার্থের নিউক্লীয়াসের এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায় তবেই সৃষ্টি হয় একটা প্রোটন আর একটা অ্যান্টিপ্রোটনের। কিন্তু এই কল্পনাতীত শক্তি তৈরী করার জন্ত যে বিরাটাকার কসমোট্রন যন্ত্র লাগে সেটা গড়ে তুলতে গেলে চাই প্রচুর অর্থ আর অনেক সময়। অতটা ব্যয় করতে হয়তো সরকারও কুণ্ঠিত হবেন।"

শংকর যোগ করে, "আর তাছাড়া হবিবুল্লার ল্যাবরেটরীতে কসমোট্রন তো দূরে থাকুক, একটা ছোটোখাটো সাইক্লোট্রন পর্যন্ত নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটা নিতান্ত সাধারণ 'ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর'।"

শংকরকে সমর্থন করে আরো দু'-একজন কর্মী বক্তৃতা করলেন।

শংকর দেখল, যে তার জয় হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে। শিকদারের নেতিবাদের প্রস্তাব থেকে প্রজেক্ট-'এ' হয়েছে মুক্ত। সুমিত্রার আয়ত চোখের উচ্ছলতায় আনন্দের আভাস। অবশেষে সেও কিছু বলবার লোভ সংবরণ করতে পারে না।

সুমিত্রার বলার একটা শান্ত-সহজ ছন্দ আছে। সাধারণতঃ সে থাকে নীরব—বৈজ্ঞানিক লড়াই-এ অংশ গ্রহণ করবার জোরালো তাগিদ না এলে। কিন্তু তার বক্তব্য রেখাপাত করে সকলেরই মনে। বক্তৃতা থেমে যাবার পরে সুমিত্রার কণ্ঠস্বরের রেশ শংকরের মনে বাজতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে।

"আজ যে আলোচনা কোনো তার সম্পূর্ণ মর্যাদা গ্রহণ করা আমার বিচার অতীতে। কিন্তু একটা ধারণা আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে যে আজ আমরা একধাপ এগিয়ে এসেছি অ্যান্টিগ্রাভিটি আবিষ্কারের পথে। এ বোধটা জন্মালো কেবল আপনাদেরই মুখের দিকে চেয়ে। কালও পর্যন্ত যেখানে দেখেছি সন্দেহ-সংশয়ের ছায়া। আজ তার লেশমাত্রও নেই।"

"জানা-বিজ্ঞানের বিধি-নিষেধের বেড়া ভেঙে আজ আমরা বেরিয়ে এসেছি।

"সংস্কার যে কতো বড়ো একটা অন্তরায় মানুষের এগিয়ে চলার পথে, মনোবিজ্ঞানের সেটা হচ্ছে একটা প্রধান উপজীব্য। মনোবিকারের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সংস্কারের সংগে বুদ্ধির লড়াই। এই রক্তাক্ত সংগ্রামে বুদ্ধির জয় হলেও, অনেক সময়ে 'ইকুইলিব্রিয়াম' বা ক্ষমতা যায় হারিয়ে। এমন কি, বুদ্ধিমান সুস্থ মানুষের মনেও সংস্কার যে কেমন করে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে উপস্থিত বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে—তার উদাহরণ পাওয়া যাবে একটা সত্য ঘটনা থেকে।

"একটা বিরাট মোটার 'ট্রাক' একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের ট্যাংক বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল রেলের কোনো একটা 'কালভার্ট'-এর তলা দিয়ে। সহসা 'কালভার্টে' 'ট্যাংকে'র 'গান্-টারেট'-টা আটকে গেল। দেখা গেল পুলের উচ্চতা আর মাত্র দু ইঞ্চি বেশী হলেই সে ট্যাংক অনায়াসে গলে যেতে পারত।

"এখন—এই রাস্তাটা হচ্ছে সহরের প্রধান শিরা। রেললাইনটাও একটা প্রধান শাখা—রোজ লক্ষাধিক যাত্রীকে বহন করে সহরে নিয়ে আসে। মিলিটারি কর্তৃপক্ষ রেলের কর্মচারীদের নির্দেশ দেন—'পুল ভেঙে ফেল'।"

রেলের কর্তৃপক্ষ জবাব দেন—'পুল ভাঙলে ট্রেন চলাচল যে বন্ধ হয়ে যাবে দীর্ঘকালের জন্ত—কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হবে আমাদের। অতএব একমাত্র উপায় হচ্ছে ট্যাংকের 'গান-টারেট'-টা কেটে ফেলে দেওয়া।

মিলিটারি চক্ষু রক্তবর্ণ করে রেলকে বলে, "তোমরা দেশদ্রোহী, জানোনা—এই ট্যাংক চলেছে সীমান্তে ? সামান্ত কয়েক লক্ষ টাকার জন্ত দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাধা দিতে চাও ?"

"ইতিমধ্যে এই ট্রাকের পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম-বাস নানা রকমের যানবাহনের এক মাইল লম্বা সারি। ওদিকে আবার ট্রেন-চলাচলও বন্ধ। অফিসযাত্রী সব মারমুখো হয়ে উঠেছে।

কর্পোরেশন এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ, উভয় পক্ষকে অনুনয় করে তোমাদের মধ্যে যা হয় একটা মীমাংসা করে আমার রাস্তাটা খুলে দাও।

এক ঘণ্টারও ওপর বচসা চলতেই থাকে। তিন পক্ষের চীফ অব চীফ বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞদের কাছে খবর যায়। এরা মাথা চুলকিয়ে বলেন সমস্যা বটে।

ঝগড়া যখন সপ্তমে উঠেছে, একটা স্কুলের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ট্রাকের টায়ার থেকে খানিকটা হাওয়া বের করে দাও না কেন ?

বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞদের সংস্কারের চশমা ভেদ করে এতো সহজ সমাধানটা নজরে পড়েনি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে হবিবুল্লার একটা সুবিধা ছিল

---

* Special Relativity Theory থেকেও anti-matter-এর anti-gravity সম্ভবপর হয় না। দ্রষ্টব্য Gravitational properties of Anti-matter. L. I. Schilf. Proceeding of the National Academy of Sciences (U. S.) Vol. 45, P 69 (1959)

—কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মতান্ত্রিক বিজ্ঞানের পাঠ নেওয়া তার হয়ে ওঠেনি। তাই সে ছিল কতকটা সংস্কারমুক্ত। থিয়োরির বিধি-নিষেধগুলো হয়তো বা তার ভালো করে জানার অবকাশও হয়নি। তাছাড়া ছিল তার একটা অদম্য ইচ্ছা সাধারণ মানুষকে ছাড়িয়ে যাবার। এটাই হচ্ছে অ্যান্টিগ্রাভিটির ইতিকথা।

প্রতিভার কথাটা এক্ষেত্রে গৌণ। আমার ধারণা যে এ সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, প্রতিভার দিক থেকে হবিবুল্লার থেকে কেউই কম নন। সত্যি কথা বলতে কি, মনোবিজ্ঞান বা শরীরবিজ্ঞান এখনো প্রতিভার উৎস সন্ধান করে পারেনি। আমরা শুধু জেনেছি যে মগজের একটা ক্ষুদ্র অংশেই রূপায়ন করা যায় মানুষের দীর্ঘ জীবনের যতো কল্পনা যতো অনুভূতি, যতো অভিজ্ঞতা। বাকী অংশটা যে কী কাজে লাগে সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অপরিসীম হবার পথে কোনো বাধাই আমাদের নজরে আসে না। প্রতি সেকেণ্ডে যদি একটা নতুন সাড়া একটা নতুন অভিজ্ঞতা সেখানে মুদ্রিত হয় পঞ্চাশ লক্ষ বছরেও মস্তিষ্কের শত শত কোটি কোষগুলোর কিছু অংশ অব্যবহৃতই থেকে যাবে।

অদম্য ইচ্ছা থাকলে আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে না কেন?

"মস্তিষ্কের ক্ষমতা ম্লান হবার কথা নয় জরাগ্রস্ত হলেও।

"কিন্তু কেন হয় না আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টাইনদের আরো বেশী সংখ্যায়? হবিবুল্লার আগে অ্যান্টিগ্রাভিটি-মেশিনই বা সম্ভবপর হয়নি কেন?

মনোবিজ্ঞানের একটা সহজ উত্তর আছে এ প্রশ্নের। জ্ঞানোন্মেষের সংগে শিশু জগতটাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। সব কিছুই তার কাছে নতুন—প্রতিমুহূর্ত তার ভরে যায় অজানার বিচিত্র আস্বাদে। তারপর শুরু হয় রুটিন-অভ্যাসের পালা। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে স্কুলে যেতে হবে, নির্দিষ্ট পাঠ শিখতে হবে, সমাজের সহবত আর বিধি-নিয়ম তাকে অভ্যাস করতে হবে। তখন থেকেই দেওয়াল গড়া হচ্ছে তার কল্পনা-উদ্ভাবনী শক্তির চারদিকে। বলা হচ্ছে এটাই তোমার সীমা—এটাই হচ্ছে ভদ্রজনসমর্থিত নিরাপদ পথ—আর কোনো পথ নেই। একদিন আসে যখন ছাত্রজীবন শেষ করে তাকে বেরোতে হবে জীবিকার সন্ধানে। চাকুরী-ব্যবসা গবেষণা কি ঘরকন্নার দৈনন্দিন রুটিনটা আরো কড়া, বিচ্যুতি হলে সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের সীনাল কোডের শাস্তিটা আরো জবরদস্ত। তাই এই অসীম ক্ষমতা হয়ে যায় ডিসিপ্লিনের নাগপাশে বন্দী। ছোটো সীমার মধ্যেই তার রাজত্ব। এই ভাবে বয়সের সংগে বেড়ে উঠে প্রাচীর—উচ্চতায় হয় আকাশস্পর্শী।

"প্রফেসর গোপালাচারীর কথায় এটা বস্তানিয়ন্ত্রণের বাঁধ।

"তারপর দেহযন্ত্র হতে থাকে বিকল, জরাজীর্ণ, জীবনযাত্রার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। এ সীমার মধ্যে যে স্বাধীনতাটুকু ছিল মগজের সেটাও নির্বাসিত হয় অপটু দেহযন্ত্রের তার বহন করে। এই ভাবে অকেজো হয়ে যাচ্ছে অসীম শক্তি যুগের পর যুগ ধরে।

"এই বেড়ার মধ্যেও দু'-একজন আকস্মিক ভাবে—হয়তো বা কোনো অজানা দৈবঘটনার ফলেই—এই সীমা অতিক্রম করে বাইরের সূর্য্যালোকে বেরিয়ে পড়েন—তাঁরাই হন—সেক্সপীয়ার—রবীন্দ্রনাথ-আইনষ্টাইন।

"দয়া করে ভুল বুঝবেন না, আমার বক্তব্য এ নয়, যে বিধি-নিষেধ সব তুলে দাও, রুটিনবদ্ধ শিক্ষার রীতিটা বাতিল করে দাও—সহবত শিক্ষার জলাঞ্জলি দাও। বিবর্তনের ফলে হয়তো সুদূর ভবিষ্যতের উন্নততর মানুষের কল্পনাতীত সমাজ এ সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু আজ তা অসম্ভব। এমন কি আজকের সমাজবিধান আর শিক্ষা প্রণালীর শৃংখলা বজায় রেখেও কী ভাবে মানুষের মননশক্তির সীমারেখা সমস্তা বাড়ানো চলে, এ সম্বন্ধেও কোনো সহজ সমাধান আমার বুদ্ধির অগোচরে।

"কিন্তু প্রশ্নটা উপস্থিত করতে চাই আপনাদের মতো সুধীজনের সামনে। আমার আশা যে, আপনাদের উজ্জ্বলতর প্রতিভা, প্রশস্ততর অভিজ্ঞতা আর গভীরতর সমাজবোধ এ সমস্তার মীমাংসার কোনো পথের সন্ধান দিতে পারবে।

"প্রগলভতা আমার মার্জনা করবেন—এ দীর্ঘ অনধিকার চর্চা করলাম এইজন্য যে, আপনাদের চোখে আজ দেখছি নতুন আলো—সীমার বাইরের জগতটার আভাস।

"এই পথেই অসম্ভব হয়েছিল হবিবুল্লার আবিষ্কার।" [ক্রমশঃ।

খরজীবনের মধ্যবেলায়

জগৎকুমার বিশ্বাস

ছায়াভরা পথে হেঁটে কেটে গেছে সে স্নিগ্ধ সকাল
সবুজ মমতাঘেরা আর কত পুষ্পে মনোহর;
তাদের মধুর গন্ধে উদ্বেলিত সোনার প্রহর
পারিজাত-কীর্ণ বনে নিয়ে গেল। স্তব্ধ মহাকাল।

আশাহীন দীপ্ত চোখে নেমেছিল মধুর বিস্ময়—
নন্দনের স্নিগ্ধ সূর্য্যে আলোকিত আমার আকাশ।
বলো, কে বা ভেবেছিল এটি শুধু ক্লিন্ন পরিহাস,
ক্ষমাহীন দেবতার এ শুধু নিষ্ঠুর অভিনয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো,—কেন জাগে ব্যর্থতার সুর?
প্রাণের গোপন ব্যথা প্রচণ্ড সূর্য্যের মত জ্বলে—
জ্বালাময় তীব্র শরে বিদ্ধ আর জ্বরের কবলে
মৃত্যুময় পঙ্কে আছে কজোড়া বিবর্ণ নূপুর।

পুষ্পবৃন্তে ফুটে-ওঠা টলোমলো নদীর উচ্ছ্বাসে
রক্তের প্রতিটি বিন্দু শোনে আজ অনাহত ডাক;
দুচোখে সমুদ্র শান্তি ভুল ভাঙ্গে, তাই ঊর্ধ্বশ্বাসে
নূতন আশার ছন্দে ছুটে চলে হৃদয় নির্বাক।

এবার জেনেছি আমি জীবনের অর্থ কোথা আছে—
তৃষ্ণার পবিত্র তীর্থে চাহি তাই মন্দাকিনী-ধারা
মৃত্যুহীন শৈত্য যার অভিশপ্ত মরুভূর কাছে,
শ্রাবণের মেঘমায়া, অমৃতের স্বর্ণসিদ্ধি, স্নিগ্ধ ব্যথাহরা।

আয়া

বাসব ঠাকুর

স্বামীর মৃত্যুর পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে নয়নতারা আজ গত বাইশ বছর কাশীতেই বসবাস করেন। এখন দুনিয়ায় আপন বলতে আছে তাঁর একমাত্র বোন সুমিত্রা। যে বয়সে তাঁর চেয়ে আট বছরের ছোট। সুমিত্রার স্বামী ব্যবসায়ী লোক, বনেদী ঘরের ছেলে, নয়নতারা জানেন যে অবস্থা ওদের ভালই। বালীগঞ্জে নিজের একটা দোতলা বাড়ী, আর একটা ছোটখাটো মোটরও আছে। নয়নতারার স্বামীও তাঁর জন্ত যে টাকা রেখে গেছেন তাতে কোরে একটা বিধবা মানুষের খুব ভাল ভাবেই বাকী জীবনটা চলে যাবার কথা। সব সময় তিনি কাশীতেই থাকেন, তবে গরমের সময় প্রায় প্রতি বছরই কিছুদিনের জন্ত সুমিত্রার কাছে আসেন।

এবার ছোট বোনের সংসারে এলেন দু' বছর পরে। কৈলাস ও বদরিকায় যাওয়ার দরুণ গত দু'বছর তাঁর আর কলকাতায় আসা হয়ে ওঠেনি। পরাশর রোডে সুমিত্রাদের বাড়ীতে ট্যাক্সি থেকে নামতেই সবার আগে ও মা মাসী এসেছে! বলে নয়নতারার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সুমিত্রার মেয়ে ঝুমু, সে যেন এই গত দু'বছরে হঠাৎ কেমন বড় হয়ে গেছে। নয়নতারা হিসেব কোরলেন বয়স তার আঠারো কিংবা উনিশ হবে, তবে একদিন সে ফ্রক পরতো এবার দেখলেন সে শাড়ী পরতে শুরু কোরেছে। মেয়েটাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! ঝুমুকে আদর কোরতে কোরতে নয়নতারা বসবার ঘরে এসে কৌচটায় একধারে বসলেন।

নয়নতারা জানেন এখন সুমিত্রার বিশ্রামের সময়, এই সময় সে ঘর বন্ধ কোরে ফ্যান চালিয়ে মেঝের উপর শুয়ে সন্ধ্যা পাঁচটা অবধি একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নেয়। তার আগে কেউ তাকে জাগিয়ে দিলে প্রায়ই তার মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায়। কাশী থেকে এই ট্রেণটা বড় অসময়ে আসে। আড়াইটায় পৌঁছবার কথা কিন্তু আজ লেট হয়েছে। যদিও এখন পাঁচটা প্রায় বাজে, তবু তিনি ঝুমুকে বারণ কোরলেন তার মাকে ডাকাডাকি কোরতে। সুমিত্রার ছেলে পল্টু গরমের ছুটির পর একজামিনের পড়ার ব্যস্ত কিনা জিগ্যেস করলেন। জানলেন সে বাড়ী নেই, এই সময় পাড়ার ক্লাবে বল খেলতে যায়, ফেরে সাতটায় সময়। সুমিত্রার স্বামী রমেশ ন'টার আগে অফিস থেকে ফিরতেন না, আজকাল শুনলেন কখনও কখনও এগারটাও হয়ে যায় ফিরতে। ভাবলেন রমেশ নিশ্চয়ই আর কোথাও যায়, রাত এগারটায় আবার কোনও অফিস খোলা থাকে নাকি! ঝুমুর কাছ থেকে সুমিত্রার সংসারের বেশির ভাগ খবরই জানতে পারলেন তিনি। তবে ভাবলেন ওদের অবস্থা আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেলেও নিশ্চয় খুব বেশী হয়নি। কারণ তা হলে এখনও প্রায় সবই আগের মত কি আর থাকতো? একটি ফর্সা দেখতে কমবয়সী মেয়েকে কলতলার দিকে যেতে দেখে ঝুমুকে জিগ্যেস করে জানলেন মেয়েটি ওদের নতুন ঝি পদ্ম। বললেন, হ্যাঁ রে, হিরণ্ময়ী কি চলে গেছে? সে আজ ন' দশ বছর আগের কথা।

ঝুমুর যখন আট আর পল্টুর দশ বছর বয়স, সেই সময় সুমিত্রা অসুখে পড়ায় বিধবা হিরণ্ময়ী প্রথম ওদের সংসারে আয়া হয়েই এসেছিল। গরীব হলেও সে ভদ্রঘরের মেয়ে। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত পড়াশুনাও করেছিল একটু। ক্লাস এইটে ওঠবার পরেই ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসে। গরীবের মেয়ে গরীব লোকের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়। মহেশ ছেলেটি ভালই ছিল, ব্যারাকপুর কাঁচড়াপাড়া লাইনে বাস ড্রাইভারী করে মন্দ রোজগার হোত না তার, তবে আস্তে আস্তে জানা গেল খুব কম বয়স থেকেই ও মদ খাওয়া শুরু কোরেছিল। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই মাঝে মাঝে রাত্রিতে সে মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরতে লাগলো। কষ্টে-সৃষ্টে কোন রকমে হিরণ্ময়ীর বিয়েটা দেবার পর ওর বিধবা মা-ও অসুখে পড়েছিলেন। তার পর মহেশ একদিন মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে আর না এসে, বাসটাকে থানায় ফেলে নিজে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেল, যেখান থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রাখা যায় না। খবরটা পেয়ে হিরণ্ময়ীর মনের ভাবটা কি হল ঠিক বোঝা যায়নি, তবে ওর অসুস্থ মায়ের অসুখটা এই শোকে এতই বেড়ে গেল যে দিন কয়েকের মধ্যেই তিনিও ইহলোক ত্যাগ করলেন। বিয়ে হবার বছর দুয়েকের মধ্যে সংসারে ওর আর কেউই রইলো না।

বাস কোম্পানী গরীব বিধবার উপর দয়া দেখিয়ে বাসখানা ভেঙে যাওয়ায় যে অত হাজার টাকা ক্ষতি হল (যার জন্ত অবশ্য মহেশকেই ওঁরা দায়ী করেন) তা সত্ত্বেও সে কথা ভুলে গিয়ে হিরণ্ময়ীকে মহেশের

পাওনা এক মাসের মাইনের উপর আরো এক মাসের মাইনে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটার একটা সহজ মীমাংসা করে ফেললেন। ঐ সামান্ত ক'টি টাকা সম্বল করে বাধ্য হয়েই তখন হিরণ্ময়ীকে চাকরির খোঁজে বেরোতে হোল।

এই সময় একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে সুমিত্রা রীতিমত অসুস্থ হোয়ে পড়ে, তাই ওর ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনার জন্ত ওদের একজন মহিলার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মাসিক পনের টাকা বেতন ও খাওয়া-পরার পরিবর্ত্তে প্রথম এই সময়ই হিরণ্ময়ী ওদের সংসারে কাজ করতে আসে। সুমিত্রা সেই যে অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন থেকে আজও সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠেনি। ডাক্তাররা বলেন নার্ভ আসলে ওর একটুতেই বুক ধড়ফড় করে, কিংবা মাথার যন্ত্রণা হয়, যার জন্ত ওর মেজাজও আজকাল খিটখিটে হোয়ে গেছে।

মাসীর প্রশ্নের উত্তরে ঝুনু বলে, হিরণ আছে তবে কাজও বেড়েছে বলে একজন ঝি রাখতে হয়েছে। তার মা তো হিরণকে তত দেখতে পারে না, তাই সব কাজে ওকে থাকতেও দেন না। পদ্মই আজকাল মায়ের বেশির ভাগ কাজ করে। কথায় কথায় কিছুটা সময় কেটে গিয়েছিল, তাই এর মধ্যে সুমিত্রা ঘুম থেকে উঠে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দিদিকে দেখে খুশী হয়ে বলে, কখন এলে দিদি! আমাকে ডেকে দিসনি কেন ঝুনু? এই যা তো পদ্মকে বল আগে দিদির উপরের ঘরটার জিনিষপত্র নিয়ে গিয়ে সব গোছগাছ কোরে দেবে। বিছানার চাদরটা যদি তত পরিষ্কার না থাকে তো বলবি কাল যেন ওটা কেচে দেয় আর হিরণকে ব্যস্ত করবার দরকার নেই।

ঝুনু বলে, বাড়ীতে একটাও সাবান তো নেই কাচবে কি করে? চাদরটা আমি কালই কাচিয়ে ইস্ত্রি কোরে রেখেছি, ঘরের আর সমস্ত ব্যবস্থাই করা আছে। মাসীমা বরং উপরে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিন, চানের ব্যবস্থাও সব কোরে রেখেছি।

ওদের কথাবার্ত্তার মধ্যে কখন যে হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে এসেছিল তা ওরা লক্ষ্য করেনি। ওর কথায় সবার সঙ্গে ঘরে মাসীমাও ফিরে তাকালেন ওর দিকে কিন্তু সেই সস্নেহ চাউনি যেন নেই! নয়নতারা বললেন দাঁড়াও বাছা, এতদিন পরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে এলুম আগে দুটো সুখদুঃখের কথা কয়ে নি, চান করা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। হিরণ্ময়ী বুঝতে পারে না মাসীমার মনটা এখানে আসার পর সুমিত্রার কাছে কিছু শুনেই ওর উপর বিরূপ হয়েছে কি না। সে বলে তা তো নিশ্চয়, তবু আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, আপনার যাতে কোন অসুবিধে না হয়—বলে হিরণ্ময়ী নয়নতারার সুটকেসটা ভারী হলেও একাই দরজার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে দোতলায় উঠার সিঁড়ির দিকে চলে যায়। হিরণ্ময়ী বোঝে না কি জন্ত সুমিত্রা ওকে দেখতে পারে না।

খানিক পরে নয়নতারা উপরে তাঁর জন্ত নির্দিষ্ট ঘরে এসে দেখেন, তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিক আগের দিনের মতই যথাবিধি গুছিয়ে রাখা আছে। বাড়ীতে এসেই ঝুনুর ও সুমিত্রার বেশভূষায় এবং কথাবার্ত্তায় কোথায় যেন একটা দারিদ্র ও অস্বাচ্ছন্দ্যের আভাস ফুটে উঠছিল, তাতে তিনি এবার এখানে থাকার ক'দিন নিজের সুখ-সুবিধের বেশ কিছুটা বাদ দেবার জন্তই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

কিন্তু উপরে তাঁর ঘরটিতে এসে সাজানো-গোছানোর ব্যবস্থার কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পান না নয়নতারা। এমন কি তাঁর বিশেষ প্রিয় একগোছা রজনীগন্ধাও একটি কাচের ফুলদানীতে সাজানো আছে। এই সব দেখে-শুনে নয়নতারার বিশ্বাস হয় না যে ওদের অবস্থা কিছু খারাপ হয়েছে।

স্নান সেরে নয়নতারা ফ্যানের তলায় ইজিচেয়ারটায় বসেছিলেন চুল শুকোতে। এমন সময় পল্টু এসে একটা প্রণাম করে বললে, মাসী, গত বছর আসোনি কেন?

—গত বছর এ সময় যে দ্বারকায় গিয়েছিলুম বাবা, তা তুমি কেমন আছ?

—ভাল আছি।

—কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছ যে, পড়াশুনোর খুব চাপ পড়েছে বুঝি? এই নাও—বলে নয়নতারা একটা দশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, কিছু বই-টই কিনো। এ বছর একজামিনের রেজাল্ট ভালো হয়েছে তো?

—এ বছর একজামিন দিইনি।

—ও মা, কেন ?

—কলেজ থেকে নাম কেটে দিয়েছে।

—সে কি ! কোন দুষ্টুমি করেছিলে বুঝি ?

—না, মাইনে দেওয়া হয়নি বলে।

ঠিক এই সময় নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে পন্ট বললে, যাই মাসী, দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

—কে রমেশ এলো বুঝি ?

—না, বাবা নয়, ও হচ্ছে বিভূতি।

—বিভূতি কে ?

—মোটর মেকানিক্, হিরণের খাতীর বন্ধু, আমাদের গাড়ীটা আজকাল ওই মেরামত করে। আমি নীচে যাচ্ছি মাসী, মা বললেন তোমার চান হয়ে গেলে নীচে আসতে, জলখাবার দেওয়া হয়েছে, মায়ের এখনো সিঁড়িওঠা বারণ, তাই আসতে পারছেন না। পন্টু নীচে চলে গেল। নয়নতারা দেখলেন, ওর প্যান্টের দুদিকে তালি দিয়ে সেলাই করা। অথচ শুনলেন ওদের মোটরটা এখনো আছে এবং রিপেয়ার হচ্ছে।

নীচের খাবারঘরে খানিক পরে এলেন নয়নতারা, ওঁর জলখাবার ঠিক আগের দিনের মতই তৈরী করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তবু সুমিত্রা বললে, দিদির এবারে এখানে থাকতে কষ্ট হবে হয়তো। লোকজন পুরোনো হলে যে এক্টা মাথায় চড়ে যায়, তা কি করে জানবো বলো, ঐ হিরণের কথাই বলছি, দেখ না খাবার দিয়ে একটু দাঁড়াবে তো, যদি কিছু দরকার পড়ে তা না, এখন তিনি উপরের ঘরে বৈঠকখানার আসর খুলে বসলেন। ঐ মোটর মেকানিক ছোঁড়াটা তো সব সময় আছেই আবার একজন উকিলবাবুও মাঝে মাঝে আসেন। এ বাড়ীতে আজকাল যেন বারো ভূতের আনাগোনা, তা আর হবে না বাড়ীর মালিক স্বয়ং যদি এক ঝিকে অত আস্কারা দেন।

সুমিত্রার কথায় রহস্যের কুয়াশা ভেদ কোরে নয়নতারা এতক্ষণে যেন একটা স্পষ্ট জিনিষ দেখতে পেলেন। কিন্তু তবু তাঁর কথাটা বিশ্বাস করতে বাধলো, অমন বনেদী বংশের ছেলে রমেশের মত লোকের মন কখোনো এক ঝিয়ের উপর ঝুঁকতে পারে ? তা' সে হিরণই হোক আর যেই হোক। না না, এ নিশ্চয় সুমিত্রার অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা।

জলখাবার শেষ কোরে একটু বিশ্রামের জন্ত আবার উপর তলার ঘরে এলেন নয়নতারা। জানলার ধারের ইজিচেয়ারটায় বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তা খেয়াল ছিলনা। দরজার করাঘাতের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে দেখলেন, কালো আকাশ অসংখ্য তারায় ভরে গেছে, বেশ রাত হয়েছে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই রমেশ ঘরে এলো, বললে কেমন আছো দিদি ? তুমি আসবে বোলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবো ভেবেছিলুম, তাও ট্রামের ভীড়ের জন্তে দেখ না সেই আবার দেরি হয়ে গেল, আমাদের গাড়িটা খারাপ আর ট্যাক্সি এসময় পাওয়াই যায় না।

রমেশকে দেখে নয়নতারা একটু চমকে উঠেছিলেন। সুমিত্রার কথার মধ্যে একটু আগে যে প্রচ্ছন্ন ইংগিত পেয়েছিলেন তাতে রমেশের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর যতোই বিশ্বাস থাক্ না কেন তাতে একটু সন্দেহের ছায়া পড়েছিল। তার উপর সে আজকাল অনেক রাত কোরে বাড়ী ফেরে শুনে ভাবছিলেন যে তার চরিত্র যদি নির্দোষ নাই থাকে তাহলে অনেক রাতে হয়তো সে আজকাল মাতাল হয়েই ফেরে, যেটা ওঁকে স্পষ্ট কোরে বোলতে হয়তো সুমিত্রারও বাধছে। তাই তিনি একটু দূরে দূরে থেকেই ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কিন্তু ওর মুখ থেকে একটুও মদের গন্ধ না পেয়ে এবং ওর চেহারা যদিও একটু রোগা হয়ে গেছে তবে খুঁটিয়ে দেখেও ওর হাবভাবে তেমন কোন পরিবর্তন ধরতে না পেরে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হোলেন নয়নতারা। কিন্তু রমেশ যতই খুসীভাব দেখাক না কেন, রমেশের কথাবার্তায় বোঝা গেল যে এবার নয়নতারার কলকাতায় আগমনে সে যেন তেমন খুসী হতে পারেনি। রমেশ চলে যাবার একটু পরে ঝুমু এসে বললে, খাবার হয়ে গেছে মাসীমা, উপরে পাঠিয়ে দিতে বোলবো ? তুমি কেন আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওনা মাসীমা ? সে নয়নতারার উজ্জল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি যে বিধবা, তার উপর গুরুর দীক্ষা নিয়েছি। আমাদের যে মাছ-মাংসর ছোঁয়া খেতে নেই মা। আয় আমার পাশে একটু বোস, বলে ঝুমুর হাত ধরে বিছানায় নিজের পাশে আদর কোরে বসিয়ে নয়নতারা বলেন, ওকথা যাক তোর খবর একটু বল, তুই কি ঢ্যাঙাই হয়েছিস প্রায় তোর দাদার সমান, গানের ইস্কুলে কি শিখলি আমায় শোনাবি তো ?

হ্যাঁ নিশ্চয়, কিন্তু আমার গলাটা খারাপ হোয়ে গেছে বলে গানের স্কুলে আজকাল আর যাইনা।

গলা খারাপ না মাইনে বাকী পোড়েছে, ঠিক করে বলতো ? নয়নতারার প্রশ্নে ঝুমু কোন উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে থাকে। তিনি আবার বলেন, কি, চুপ কোরে রইলি যে, মা বুঝি বলতে বারণ কোরেছে ?

এবার গলাটা একটু পরিষ্কার কোরে ঝুমু বলে, না না, তা ছাড়া আজকাল বাড়ীতে আমার অনেক কাজ করতে হয় কিনা। হিরণকে মা কোন কাজ করতে দেন না, মা চান ওকে ছাড়িয়েই দিতে। হিরণ তো শুধু বাবার জন্তই টিকে আছে, মা ওকে একদম দেখতে পারেন না। কিন্তু বাবা চান না যে ও চলে যায়, তাই ওর বদলে আমিই অনেক কাজ করে দিই। আমার কিন্তু হিরণকে খুব ভালো বলেই মনে হয়।

হিরণের উপর সুমিত্রার বিদ্বেষের আর একটা সম্ভাব্য কারণ যেন আরও বেশি স্পষ্ট হোয়ে ওঠে ঝুমুর কথায়। তাই তিনি নিশ্চিত হবার আশায় ওকে জিগ্যেস করেন হ্যাঁ রে, হিরণকে তোর মা কেন দেখতে পারেনা বলতো ? হিরণ তো আগের মতই সম্ভ্রম করে আর কাজকর্ম্মও কিছু কম করেনা দেখছি, তা ছাড়া ওর চাল-চলনও তো ঠিক আগের মতোই ভদ্র আছে ; তবে তোর মা ওকে দেখতে পারেন না কেন বলতো ?

কি জানি, মা বলেন ওর জন্ত যত সব বাইরের লোক যখন তখন বাড়ীর মধ্যে আসে যায়।

কে তারা ?

ঐ বিভূতি আর উকিল বাবু। বিভূতি কাউকে গ্রাহ্যই করে না কি না, তাই মা খুব রেগে যান, মা বলেন ওর রকম দেখে মনে হয় বাড়ীটা যেন আমাদের নয়।

তবে শুনলাম, ঐ বিভূতি নাকি তোদেরই মোটরটা সারাবার জন্ম আসে ?

হ্যাঁ, আর বাবা ওকে ডেকে পাঠান বলেই তো ও আসে।

তোর বাবাই যদি ওকে ডেকে পাঠান তাহলে ও কেন আসবে না বল, তাছাড়া ও তো তোদেরই মোটর ঠিক করতে আসে বাপু!

হ্যাঁ কিন্তু মা ভাবেন পণ্টুকে বিভূতিই সিগারেট খাওয়া শিখিয়েছে। ও কিন্তু পণ্টুকে মোটরের কাজই শেখায়, যাতে পণ্টুর একটা চাকরি হতে পারে। মোটরটা সারাতেও কোন পয়সা নেয়নি বিভূতি। তবু মা ভাবেন ও হিরণের বন্ধু একটা মিস্ত্রী, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ওর সঙ্গে অত মাখামাখি ভালো নয়। আমাকে ওর সঙ্গে কথাই বলতে দেন না। আমি যদি বিভূতির সঙ্গে কথা বলি অমনি মায়ের কাছে বকুনি খেতে হয়। অথচ পণ্টু হিরণের কাছ থেকে টাকা ধার করে পদ্মার সঙ্গে লুকিয়ে সিনেমাও দেখতে যায়। মা কিন্তু তা জানেন না হয়তো, জানলে কি করতেন জানিনা, তুমি যেন বোল না।

নয়নতারা অবাক হয়ে যান কথাটা শুনে। বলেন ছিঃ ছিঃ, ঝি-চাকরদের সঙ্গে মেলামেশা আবার তাদের কাছে টাকা ধার নেওয়া খুবই অন্যায়। পণ্টু তাহলে বকে যাচ্ছে বল? আহা তোর মায়ের শরীর খারাপ বলেই এই সব হচ্ছে দেখছি। ঝুমু উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে থাকে। হিরণের কাছ থেকে তুই কখনও ধারটার নিসনি তো?

শুধু একবার নিয়েছিলুম। মাকে বোলোনা যেন।

নয়নতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, না তা বোলবো না কিন্তু আর কখনও নিসনি যেন। তিনি খানিক চুপ কোরে থেকে 'দাঁড়া' বলে উঠে গিয়ে সুটকেশটা খুলে একটা ছোট কাগজের বাক্স থেকে এক জোড়া কানের দুল বার কোরে ওর হাতে দিয়ে বললেন দেখ, দিকি পরে কেমন দেখায়। দুল জোড়া হাতে পেয়ে ঝুমুর মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে।

ঝুমু চলে যাবার পর নয়নতারা ভাবতে থাকেন নানা কথা। তিনি যেন দেখতে পান তাঁর বোনের পরিবারে খুব দ্রুতই বইছে একটা ভাঙনের স্রোত। তাছাড়া চাকর-দাসীরা সত্যি কি রকম মাথায় চড়ে গেছে এ বাড়ীর। তাঁর বাবা ছিলেন সিভিল সার্জেন এবং তিনি মেয়েদের যে ভাবে মানুষ করেছিলেন তাতে রমেশের পরিবারের এই পরিস্থিতি নয়নতারা বা সুমিত্রার পক্ষে বরদাস্ত করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা বুঝুন আর না বুঝুন আজকাল দেশময় বইছে একটা নতুন যুগের হাওয়া। এখন ঝি-চাকররা হচ্ছে সংসারের সাহায্যকারী এবং মিস্ত্রীদের বলা হয় শিল্পী।

নয়নতারার চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে হিরণ দরজার কাছ থেকে হাঁক দিয়ে বললে, মাসীমা খাবার এনেছি, আসবো?

এসো। হিরণ থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

নয়নতারা লক্ষ্য করেন, সাত-আট বছর আগেকার হিরণের সঙ্গে এ হিরণের কোথায় একটা তফাৎ। সুমিত্রার সংসারে এই ক'বছর থাকার জন্যেই হোক, আর যে কারণেই হোক ওর চেহারা যেন আজ অনেকখানি মার্জিত হয়ে উঠেছে। ওর গায়ের রংটা উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ হোলেও ছিপছিপে আর লম্বা গড়নের। সঙ্গে সুশ্রী চোখ-মুখ দেখলে গোড়া থেকে ওকে সুন্দরই মনে হোত। তার উপর ওর চাউনি ছিল এমন একটা করুণ ভাব যে, ওর দিকে চেয়ে সহজেই সকলেই আকৃষ্ট হোত।

হিরণ জানলার কাছে আসন পেতে খাবারের থালা-বাটিগুলো সাজিয়ে পাথরের গেলাসে জল দিয়ে কিছু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নয়নতারা বললেন, শোনো।

হিরণ ঘুরে দাঁড়ালো, বলুন মাসীমা, আর কিছু নিয়ে আসবো?

না আর কিছু আনতে হবে না, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস কোরবো, হিরণ, এবাড়ীর আবহাওয়া এবারে দেখছি কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে, ঠিক কোরে বলতো এর কারণটা কি?

হঠাৎ এমনি একটা সোজাসুজি প্রশ্নে হিরণ একটু থতমত খেয়ে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে, অস্বাভাবিক? কই আমরা তো তেমন কিছু বুঝতে পারিনি মাসীমা! তবে বাবুমশায়ের ব্যবসায় সম্প্রতি অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, আপনি বোধহয় সে কথা জানেন না। একটা পুল তৈরীর কাজে গোলমাল হওয়ায় সরকারের সঙ্গে উনি মামলায় জড়িয়ে পড়েন, তাই বিলের টাকা সব আটকে গেছে। সেই জন্যই ওঁকে অতক্ষণ আজকাল অফিসে থাকতে হয়। তাই সংসারেও টানাটানি। তার উপর মায়ের শরীরটা আজও ভালো হোল না। প্রায় দু'বছর আমাকে ওঁরা মাইনেও দিতে পারেন নি।

নয়নতারা আসনে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু তখনও খেতে আরম্ভ করেননি! হিরণের মুখে যা শুনলেন তার জন্য কতকটা তিনি যেন প্রস্তুতই ছিলেন। তবু বললেন, তোমাকে জিগ্যেস করবো ভাবছিলুম পণ্টু তোমার কাছে কত টাকা নিয়েছে? ঝুমু বলছিল ও নাকি তোমার কাছে ধার নেয়?

ঝুমু বুঝি এই সব আবার আপনাকে বলেছে! সে আর কতই বা হবে, ঠিক মনে নেই।

তবু আন্দাজ?

বড় জোর ৫০৲ কি ৬০৲ টাকা হবে।

তাওতো কম নয়! ও টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।

না না মাসীমা, ওটা আপনাকে দিতে হবে না। এঁদের বাড়ীতে এতকাল আছি পণ্টুকে এই ক'টা টাকা দিয়েছি বলে আমার কোন আফশোষ নেই।

আর কিন্তু দিওনা বাছা, ছেলেটা বকে যাচ্ছে এই কোরে তা তুমিই বা অতো টাকা পাও কি করে? এই তো বলচ বছর দুই এদের কাছে মাইনেও পাওনি।

সে অনেক কথা মাসীমা, তবে আপনাদের আশীর্বাদে আর আমার টাকার অভাব নেই।

হিরণের কথার দৃঢ়তায় নয়নতারা বোঝেন টাকার অভাব সত্যি ওর নেই। এবং একটু অবাক হয়ে যান, বলেন এটা খুবই ভালো কথা হিরণ, যেন তোমার টাকার অভাব ঘুচেছে। কিন্তু ছেলে তোমার কাছে টাকা নিয়ে কোন ভালো কাজে লাগায় না তুমি বোধহয় জানো না ও কি করে? তাহলে হয়তো দিতে না।

না মাসীমা, টাকা নিয়ে ও যে কি করে তা আমি কখনো জিগ্যেস করিনি। আপনি কি জানেন ও কি করে?

হ্যাঁ কিন্তু সে কথা পরে বলবো, আগে শুনি কি করে পেলে তুমি অত টাকা ?

সে অনেক কথা মাসীমা, আপনি হয়তো দেখেছেন, বিভূতি বলে যে ছেলেটি মাঝে মাঝে এখানে আসে—ও আর আমার স্বামী একই কোম্পানীতে কাজ করতো, ও ছিল সেখানকার মেকানিক শিক্ষানবীশ, তাই ও জানতো যে আমার স্বামী যে বাসটায় এক্সিডেন্ট করেছিলেন সেটা প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল, তার ব্রেকটা ছিল না বললেই চলে। এ বিষয়ে হেড মেকানিকের রিপোর্ট সত্বেও টাকার লোভে মালিকরা জোর করেই আমার স্বামীকে ঐ বাস চালাতে বাধ্য করে এবং সেই জন্যই এক্সিডেন্ট হয়। ঐ বিভূতিই আমাকে উকিল বাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর ওদের সাহায্যেই কোম্পানীর কাছ থেকে আমি দু'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাই। পরে ওই টাকা উকিল বাবুর সাহায্যে লগ্নি করে কোম্পানীর কাগজ কিনে বেচে সুদে-আসলে দু'-চার বছরের মধ্যেই অনেক বেড়ে গেছে।

নীচে থেকে সুমিত্রার ডাক শোনা যায়। হিরণ আসছি মাসীমা, কিছু দরকার হলে ডাক দেবেন বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হিরণ চলে গেলে খাওয়া শেষ কোরে ক্লান্ত শরীরে আলো নিবিয়ে সেদিনের মত শুয়ে পড়েন নয়নতারা। কিন্তু অত্যধিক শ্রান্তি জার্ণির ক্লান্তিতেও তাঁর চোখে ঘুম আসে না। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতে থাকেন বিশেষ কোরে সুমিত্রার সংসারের কথাই। ভাবেন সুমিত্রাকে স্পষ্টই বোলবেন টাকার দরকার হোলে তাঁকে জানাতে সে যেন কুণ্ঠিত না হয়। না হয় কিছু টাকা তাঁর জীবিত অবস্থায়ই ওদের হাতে দিয়ে দেবেন। অন্তত ছেলে-মেয়েগুলোর পড়াশুনোর, ব্যবস্থাটা তো হওয়া চাই—হঠাৎ তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে—মনে হয় কে যেন সন্তর্পণে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে আসছে। রাত তখন অনেক। উপরে মাত্র দু'খানি ঘর, খোলা ছাদের ওপাশে একটা ছোট ঘরে থাকে হিরণময়ী। এ ধারের যে ঘরে নয়নতারা আছেন আগে সেইটেই ছিল সুমিত্রাদের শোবার ঘর, এখন সুমিত্রার অসুখ বোলে ওরা সকলে নীচেই থাকে। তিনি বুঝতে পারেন না এতো রাত্রে কে আসছে, ওপোরে হিরণ তো কিছু আগেই নিজের ঘরে চলে গেছে। তিনি ওর ঘরে খিল দেবার আওয়াজও শুনেছিলেন। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার একটু পরে আবার তিনি হিরণের ঘরেই দরজা

খোলার বা বন্ধ করার আওয়াজ পেলেন। এই সব আওয়াজ পেয়ে তিনি আরও সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। এতো রাত্রে হিরণের ঘরে কে এলো? তবে কি সেই মোটর মেকানিক ছোঁড়া না উকিল বাবু? বেয়াদবির একটা সীমা আছে তো, ভদ্রলোক গৃহস্থর বাড়ীতে এ কি কাণ্ড! হিরণের চরিত্র তাহলে?

এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আজ ওদের অবস্থা না হয় খারাপ হয়ে গেছে, তাই বলে বাড়ীর ভেতর এমনি যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে? তিনি নিজের ঘরের আলো না জ্বেলেই দরজা খুলে হিরণের ঘরের দিকে এগিয়ে যান। হিরণের ঘরের ভেতর তখন আলো জ্বলছিল। দরজাটা খোলাই ছিল, তারই ফাঁক দিয়ে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। বিভূতি, উকিল বাবু অথবা অন্য কেউ নয়, হিরণের ঘরে যে এসেছে সে হোলো রমেশ। হিরণ ছিঃ ছিঃ, যতই তার চেহারায় চটক থাক, মাত্র একটা আয়া। আর না দাঁড়িয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে নয়নতারা ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

অনেক রাত অবধি জেগে থাকার জন্য পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে নয়নতারার বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে নীচে এসে দেখলেন, সুমিত্রার ঘরের কাছে পল্টু, হিরণ, পদ্ম এবং রমেশ উদ্বিগ্ন ভাবে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কি যেন বলাবলি কোরছে, ওঁকে আসতে দেখে রমেশ 'আমি আসছি' বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। হিরণ তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে এসে বললে, খাবেন চলুন মাসীমা, আপনার খাবার অনেকক্ষণ তৈরী।

নয়নতারা কিছু একটা ঘটেছে আশংকা কোরে বললেন, সুমিত্রা কোথায়? তোমাদের এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?

মা শুয়ে আছেন, ওঁর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। আপনি খাবেন চলুন।

দাঁড়াও বাছা, বলে উনি দরজা ঠেলে সুমিত্রার ঘরে ঢুকে দেখলেন, সে যেন বেহুঁস হয়ে গেছে, তার মাথায় ওডিকোলনের পটি দেওয়া আর বিছানার উপর পাশেই পড়ে আছে একটা চিঠি। চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তেই তিনি বুঝলেন যে ঝুমু হঠাৎ এবাড়ী ছেড়ে চলে গেছে এবং ঐ মোটর মেকানিক ছেলেটাকেই বিয়ে করবার জন্য। নয়নতারা ভাবলেন, এই চিঠিখানা পড়ে সুমিত্রা যে জ্ঞান হারাবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? বেচারা অনেক আগেই নিশ্চয় বুঝেছিল ওদের ভিতরে ভিতরে কি চলছে।

হিরণ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, মাসীমা ভাববেন না, বাবু মশায় ডাক্তার ডাকতে গেছেন। আপনি ও ঘরে চলুন খাবার দেওয়া হয়েছে।

নয়নতারা কোন উত্তর না দিয়ে বোনের মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ওর দিকে শুধু এমন একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইলেন যে হিরণ তার সামনে দাঁড়াতে না পেরে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল, কিন্তু ঝুমু কি চাপা মেয়ে বাবা! কাল ওর সঙ্গে কথা বলার সময় কল্পনাও করা যায়নি যে হঠাৎ ও এমন একটা কাণ্ড করে বসবে! আর কি না ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গেই? এর জন্য হিরণের উপরই নয়নতারার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে। তিনি মনে মনে ঠিক করেন রমেশকে বোলে আজই ঐ কালনাগিনীকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবেন।

একটু পরেই রমেশ ফিরে এলো। সঙ্গে ওর থানার ইন্সপেক্টার বাবু আর একজন ডাক্তার। ডাক্তারের সামান্য চেষ্টাতেই সুমিত্রার জ্ঞান ফিরে এলো এবং ওর শকটা কাটাবার জন্য তিনি ওকে একটা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে চলে গেলেন। তারপর বসবার ঘরে ইন্সপেক্টার বাবু ওদের জবানবন্দী নিতে বসলে রমেশ বললে— বিভূতি ছেলেটাকে আমার ভালই লাগতো। ও এক মোটর মেকানিক, হিরণের মুখে একথা শুনে ওকে আমাদের মোটরটা সারাতে বলি আর মোটরটা ও সারিয়েও দিয়েছে, এ ছাড়া আমি ওর বিষয়ে আর বেশি জানি না। হিরণ হয়তো আরও জানে। এই সময় পদ্মকে এক গ্লাস জল নিয়ে সুমিত্রার ঘরের দিকে যেতে দেখে ইন্সপেক্টার বাবু লাফিয়ে উঠে রমেশকে বলেন, ঐ মেয়েটি আপনাদের কে?

ও আমাদের ঝি, পদ্ম।

ওকে একটু ডাকুন তো?

পদ্ম এলে ইন্সপেক্টার বাবু সোজাসুজি ওকে বলেন, আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যেতে হবে।

সকলে অবাক হয়ে যায়। রমেশ জিজ্ঞেস করে, কেন?

ইন্সপেক্টার বাবু পকেট থেকে একটা ছবি বার করে ওদের দেখিয়ে বলেন, ইনি হচ্ছেন প্রফেসর রায়ের মেয়ে পদ্মিনী রায়, বাপ-মা যার সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছেন তাকে পছন্দ হয়নি বলে উনি আজ মাস ছয়েক বাড়ী থেকে উধাও। ওঁর মত এক আধুনিক কলেজের মেয়ে যে এক ঝি সেজে কোথাও থাকবেন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

এই সময় পেছন থেকে হিরণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না সে হতে পারে না। বাড়ীর বউ কখনও থানায় যেতে পারে না। বাবুমশায় আমাকে মাপ করবেন, এর জন্য আমিই দায়ী। পল্টুর সঙ্গে ও এক কলেজে পড়তো, সেইখানেই ওদের আলাপ হয় কিন্তু ওর বাপ-মা ওকে না জানিয়েই ওর বিয়ের ঠিক করেছিলেন অন্য একটি ছেলের সঙ্গে, তাই বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে রেজিষ্ট্রী অফিসে ও পল্টুকেই বিয়ে করে। সব শুনে যাতে আর কোন কেলেঙ্কারী না হয় সেইজন্য আমিই ওকে এ বাড়ীতে কিছুদিন ঝি সেজে থাকতে পরামর্শ দিই। কলেজ ছাড়ার পর পল্টু বিভূতির কাছে কিছুদিন মোটর গাড়ীর কাজ শিখেছিল বলে ষ্টেটট্রান্সপোর্টে চাকরীর দরখাস্ত কোরে একটা ফোরম্যানের কাজও পেয়েছে। সামনের মাসের পয়লা থেকে ও কাজ আরম্ভ করবে। আমি বলেছিলুম সেই সময়েই সব কথা আপনাদের জানাতে। আর বিভূতিকে আপনারা শুধু একটা মিস্ত্রী বলেই জানেন। ও হচ্ছে এক বাপ-মা মরা ছেলে। তাই ওর জ্ঞাতি শরিকেরা ওর প্রাপ্য বিষয় থেকে ওকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় ছিল কিন্তু উকিল বাবুর সাহায্যে কেস্ কোরে কোরে এতদিনে ও তার সমস্তই উদ্ধার কোরেছে, সে অনেক টাকার সম্পত্তি। ওরা আপনাদের স্বজাতি আর ঝুমু যখন নিজের ইচ্ছায় ওকে বিয়ে করতে গেছে, বাবুমশায়, কেন আর ওদের বাধা দেবেন?

ব্যাপারটার হঠাৎ এই পট পরিবর্তনে সকলেই হতবাক হয়ে যায়। ইন্সপেক্টার বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, এটা তাহলে ভেবে দেখুন রমেশ বাবু, আপনাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই সাবালক, ওরা যদি আইনমত বিয়ে করে থাকে তো আমাদের

বেশি কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এটা বরং আপনারা আপোসেই মীমাংসা কোরে ফেলুন, আমি তাহলে আসি।

রমেশ ওর ঘরে বসে ভাবছিল, এতদিন ব্যবসার গোলমালের জন্য ছেলেমেয়েদের বিষয় ও সত্যি বিশেষ ভাবতে পারেনি। আর বেচারা সুমিত্রা তো অসুস্থ। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা আরও কত কি করে বসে, তবু হিরণ ছিল বোলে তেমন সাংঘাতিক কিছু একটা হয়নি। আর এ বরং একদিক দিয়ে ভালই হোল।

এই সময় নয়নতারা ওর ঘরে এসে ভণিতা না করেই বললেন, রমেশ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম। জানোতো সুমিত্রা আমার কত আদরের বোন, ওকে যদি আমার সঙ্গে কাশী নিয়ে যাই তো তুমি কি আপত্তি করবে? হিরণ থাকতে তোমার কোন অসুবিধে কি আর হবে? ওই তো সব কাজ চালিয়ে নেয়। কেমন ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে।

রমেশ নয়নতারার কথায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আর অভিমানের ইঙ্গিত না ধরতে পেরে বলে, সত্যি দিদি, ও না থাকলে আমাদের যে কি হোত তাই ভাবি। আমার ব্যবসা যে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তা আমি কাউকেই জানতে দিইনি। এ বাড়ীও এক মাড়োয়ারীর কাছে বাঁধা পড়ে যায় এবং সুদ দিতে পারিনি বলে বাড়ীটা পেয়ে নিলেম হয়ে যেত। সেই সময় ঐ হিরণই জানতে পেরে জোর কোরে ওর নিজের জমানো টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ীটা উদ্ধার করে। এ ছাড়া আমাদের না জানিয়ে সংসারের অনেক খরচও নিজের টাকা থেকেই চালিয়ে নিয়েছে অনেক সময়। এখন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কেসে আমার জিত হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন হোল আমার সমস্ত বিলের টাকাও পেয়ে গেছি। কাল বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়ার পর হিরণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সুদসুদ্ধ ওর পাওনা টাকার একটা চেক্ দিতে গিয়েছিলুম কিন্তু তাও সে নিলে না। বললে, বাবুমশায়, এই টাকায় আমার স্বামীর নামে একটা হাসপাতালের পত্তন করিয়ে দেবেন, এটা আপনার কাছেই থাক।

যাই হোক, এখন আমার টাকার অভাব নেই। ছেলেমেয়েগুলো নিজের নিজের একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছে বটে, তবু আমার কর্ত্তব্য আমি কোরবো। বিভূতি আর ঝুনুকে খুঁজে বার কোরে ভালোভাবে এই বাড়ীতেই ওদের বিয়ে দেবো। পল্টুকে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ফোরম্যান হতে হবে না। আমরা সবাই ভাবছি একবার ইউরোপে যাবো। পল্টু জার্মাণীতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিখবে, পদ্মও ওর সঙ্গে থাকবে। আর আমি সুমিত্রাকে ভিয়েনায় নিয়ে গিয়ে কোন নার্ভ স্পেশালিষ্টকে দেখাবো। দেখি, ওকে সারানো যায় কিনা।

আমি সেরে গেছি। ওদের পেছন থেকে সুমিত্রা বলে ওঠে। এই কথাগুলো আমাকে বলোনি বলেই তো এতদিন ভুগেছি। বেচারা হিরণ আমাদের জন্য এত করেছে অথচ তাকে কত সন্দেহ করেছি, তার বিষয় কি-ই না ভেবেছি।

ডাক্তারের ইঞ্জেকশনের ঘোর কেটে গেলে রমেশের কাছে কুশল খবর নিতে এসেছিল সুমিত্রা। নয়নতারার সঙ্গে রমেশের প্রায় সব কথাই সে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ওরাও খেয়াল করেনি সে কখন এসেছে। নয়নতারা তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুই উঠলি কেন? চল চল শুয়ে থাক আর একটু। কিন্তু সুমিত্রা ওঁর হাত ধরে ঘর থেকে যেতে যেতে বলে, না দিদি, আমার এখন আর কোন অসুখ নেই। হিরণের সঙ্গে আমি না বুঝে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি, চল ওর কাছে ক্ষমা চাই।

নয়নতারা বলেন, আমিও ওকে বড় ভুল বুঝেছিলুম। ওঁরা দুই বোনে হিরণের ঘরে এসে দেখলেন, সে তার স্বামীর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির সামনে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সিনেট হাউস

জগদীশচন্দ্র দাশ

কলকাতার সিনেট হাউস ভাঙছে।
পড়ন্ত বেলায় ঘরমুখো জনতার মাঝে পথ চলতে চলতে
ক্রমভগ্নমান সিনেট হাউস চকিতে মনের পথ আগলে দাঁড়ায়।
ওর দিকে একটা নাম-না-জানা মনোভাব নিয়ে তাকাই আর ভাবি,
যেন কোন পুরাকীর্ত্তি দেখছি।
কবির কথায় মনে হয়—
হেথা হতে যাও পুরাতন।
তবু মানে না মানা মায়াবী হৃদয়।

গোটা বিশ্বটাই অতীতের দিকে ধাবমান।
সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে
পুরাতন অধিকতর পুরাতন হয়।
কিন্তু নূতন কভু নূতনতর হতে পারে'না।
কালকের নির্মীয়মান নূতন সিনেট হাউস।
আবার ট্রেডিশন রচনা করবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরের দিন সকালবেলা তৈরী হলেই গাড়ী নিয়ে ছুটলাম—ম্যানচেষ্টারে। প্রথমে গিয়েই দেখা করলাম—কেটারিং রবিনসন ও কেটারিং সলিসিটারদের সঙ্গে। মার্লিনের কেসটি তাঁদের হাতে তুলে দিলাম। জোরের সঙ্গে বললাম, "কেসের তদ্বিরে যেন কোনও কার্পণ্য না হয়। ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারকে দিয়ে মার্লিনের পক্ষ সমর্থন করাবেন।"

চেকবই বার করে একটা মোটা অঙ্কের চেক্ লিখে দিলাম তাঁদেরই নামে। তাঁরা মার্লিনকে বাঁচাবার জন্ত যথাসাধ্য করবে—কথা দিল আমাকে।

তার পর গিয়ে দেখা করলাম—জেল-হাসপাতালে ডাঃ ওয়ালেসের সঙ্গে। জেল-হাসপাতালের তিনিই কর্ত্তা। শুভ্র-চুল প্রধান ডাক্তার—দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। তিনি আমার সঙ্গে খুব সস্নেহ ব্যবহার করলেন এবং বললেন, "জেলের আইন অনুসারে আমি ত আজই আপনার সঙ্গে দেখা করতে দিতে পারি না—কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি-সাপেক্ষ। আর তাছাড়া রোগিনীকে এখন ক'দিন আমার পর্য্যবেক্ষণে রাখা দরকার। আপনার টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা রেখে যান, ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি আপনাকে খবর দেব।"

শুধালাম, "কত দিনে হয়ে উঠবে মনে হচ্ছে?"

মৃদু হেসে বললেন "এই ৫।৭ দিন। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন। আপনি ভাববেন না। আপনার স্ত্রী আমার হাতে যত্নেই থাকবেন।"

বললাম, "বিশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু সলিসিটাররা ত এসে দেখা করে ওঁর যা বলার আছে শুনে যাবে।"

বললেন, "ও, তাদের কথা আলাদা। তারা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই যা করবার করবে।"

মার্লিনের সঙ্গে দেখা হল না—হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। ৩ দিন গেল, ৪ দিন গেল, ডাঃ ওয়ালেসের কাছ থেকে কোন খবর এল না। কিন্তু ৫ দিনের দিন সকালবেলা চিঠি এল—ডাঃ ওয়ালেসের নয়, সলিসিটারদের। তারা লিখেছে—তারা অত্যন্ত দুঃখিত, মার্লিনের কেস তারা নিতে পারবে না। লিখেছে—মার্লিনের সঙ্গে তারা দেখা করেছিল কিন্তু মার্লিন ইতিমধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে সমস্ত কথা বলেছে। এবং সলিসিটারদের বোঝান সত্ত্বেও সে কথা সে কিছুতেই প্রত্যাহার করবে না; নিজেকে বাঁচাবার জন্ত কিছুতেই সে নেবে না মিথ্যার আশ্রয়।

আমার চেকখানিও তারা চিঠির মধ্যে ফেরৎ পাঠিয়েছে। চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

*   *   *   *

আরও দু'-তিন দিন গেল—মানসিক অস্থিরতা ক্রমেই দারুণ বাড়তে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ ওয়ালেসের যখন কোনও চিঠিই এল না—ডাঃ ওয়ালেসকে টেলিফোন করলাম।

ডাঃ 'ওয়ালেস বললেন—"আপনার স্ত্রী এখন একটা সঙ্গিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন—কর্ত্তৃপক্ষ যদিও অনুমতি দিয়েছে—আমি এখন কারও সঙ্গেই তাঁকে দেখা করতে দিচ্ছি না।"

আকুল ভাবে শুধালাম—"কি—কি অবস্থা?"

ডাঃ ওয়ালেস বললেন—"সে সব কথা কি টেলিফোনে হয় ডাঃ চৌধুরী, দেখা হলে হবে।"

শুধালাম "কবে? কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব?"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি জানাব।"

হতাশ ভাবে টেলিফোন রেখে দিলাম। মনে হল ডাঃ ওয়ালেস এখন বোধ হয় আমার সঙ্গে মার্লিনকে নিয়ে আলোচনা করতে রাজি নন, যে কারণেই হোক।

*   *   *   *

এর দু'-তিন দিন পরেই এল ১২ই ফেব্রুয়ারী। ১২ই ফেব্রুয়ারী—দিনটা কোনও দিনই ভুলব না।

চিঠি এল। বিকেলের দিকে চিঠি এল মোটা খামে—ডাঃ ওয়ালেসের চিঠি এবং সঙ্গে আরও দুখানা। ডাঃ ওয়ালেস লিখেছেন, "প্রিয় ডাঃ চৌধুরী, গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার স্ত্রী গত শেষ রাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি আমার যথাসাধ্য করেছি এবং আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের দিক দিয়ে আর কিছু করার ছিল না। তবে এইটুকু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমি যে তাঁর জন্ত প্রাণপণ করেছি, সে শুধু কর্ত্তব্যের দিক দিয়েই নয়, তাঁকে আমি নিজের মেয়ের মত ভালবেসেছিলাম। তিনি কি

অপরাধ করেছিলেন জানি না, তবে তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ভাল না বেসে যে উপায় ছিল না।

আপনি আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।

ইতি জে, ওয়ালেস।"

পুঃ—সঙ্গে একখানি চিঠি পাঠালাম—তাঁর চিঠি। মৃত্যুর দিন সকাল বেলা সলজ্জ মৃদু মধুর হেসে আমার হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন—আপনাকে পাঠিয়ে দিতে। কি মিষ্টি হাসি দেখেছিলাম—জীবনে ভুলব না।

একটা আচ্ছন্ন ভাবে যন্ত্রচালিতের মতন দ্বিতীয় চিঠিখানাও পড়লাম। কর্ত্তৃপক্ষের চিঠি। মার্লিনের মৃত্যুখবর দিয়ে সমবেদনা জানিয়ে মার্লিনের মৃতদেহের ভার নিয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তৃতীয় চিঠিখানা—মার্লিনের হাতের লেখা। হঠাৎ যেন চমকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা তীব্র কম্পনে আচ্ছন্ন ভাবটা গেল কেটে।

মার্লিন নাই—মার্লিন আর ইহজগতে নাই! সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চোখে এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার হয়ে গেল।

* * * *

বুলা! সেদিন আর মার্লিনের চিঠিখানা পড়া হল না। পড়তে গেলেই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে—কিছুতেই যেন নিজেকে সংযত করতে পারিনি, সমস্ত রাত একটা অমানুষিক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে রাত পোহাল—জানালা দিয়ে ভোরের দিকে চেয়ে দেখি, দারুণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। উঠে মনকে দৃঢ় করে কোনও রকমে মার্লিনের চিঠিখানি পড়লাম। মার্লিন লিখেছে—

আমার বিকো! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—আমি জানি কিন্তু আমার কথা ত তোমাকে বলা হল না। কবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে জানি না—হবে কিনা তাই বা কে জানে তাই আমার কথাগুলি চিঠিতেই লিখে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে একটা আড়াল রেখে মরেও যে আমার শান্তি নাই।

তুমি যাকে প্রেমাস্পদ ভেবেছিলে—সে আমার ভাই। আমার বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মাকে বিবাহ করার আগে আমার বাবার আর এক বিবাহ ছিল। আমার ভাই—নাম এ্যালবার্ট—তাকে বছর চারেকের রেখে তার মা মারা যান। তার বছর খানেক পরে আমার বাবা আমার মাকে আবার বিবাহ করেন। বিবাহের বোধহয় বছর দেড়েকের মধ্যে আমার জন্ম।

ছেলেবেলা থেকেই এ্যালবার্ট একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। শুনেছিলাম—অতটুকু ছেলে কিছুতেই আমার মাকে 'মা' বলতে রাজী হয়নি। আমার মাকে ত জান। শান্ত স্নেহপ্রবণা ছিলেন তিনি। তিনি নাকি ওকে অনেক যত্ন করে আপনার করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছুতেই ও আমার মার কাছে ধরা দেয়নি। ফলে, একটু স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের বাড়ীতে ও বড় হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু ওর আর একটা দিক ছিল। ছেলেবেলা থেকেই আমাকে ভীষণ ভালবেসেছিল। শুনেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে কোলে করে আদর করতে ওর যেন কোনও ক্লান্তি ছিল না।

এবং এ-ও শুনেছি—সেটা সাধারণতঃ করত মা'র চোখের আড়ালে। মা'র সামনে পড়ে গেলে, আমাকে ফেলে দিয়ে

পালাত। এই নিয়ে বাবা-মার মধ্যে নাকি মাঝে মাঝে একটু হাসাহাসি হত—সেটাও মা'র কাছেই শোনা।

যাই হোক, আমরা বড় হয়ে উঠলাম এবং একটা নিবিড় স্নেহ গড়ে উঠল আমাদের ভাই-বোনের মধ্যে। এবং ক্রমে এটাও লক্ষ্য করলাম, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সঙ্গে ওর যোগ ক্রমেই ছিন্ন হতে লাগল। এক খাওয়া দাওয়ার সময়ে ছাড়া ওকে বড় বাড়ীতে দেখা যেত না, বাইরে বাইরে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খেলাধূলা হৈচৈ করেই বেশীর ভাগ সময় কাটাত। স্কুলে অবশ্য যেত—কিন্তু পড়াশোনায় মোটেই ভাল ছিল না এবং এই নিয়ে বাবার কাছে প্রায়ই ওকে বকুনি এমন কি মার খেতেও দেখেছি। বলতে লজ্জা করব না—ও যখন মার খেত, আমি আড়ালে লুকিয়ে কাঁদতুম।

একদিন বলেছিলাম, "এ্যালবার্ট, তুমি বাড়ীতে থেকে ভাল করে লেখাপড়া কর না কেন? তাহলে ত বাবার কাছে মার খাও না?"

বলেছিল, "মারকে আমি ভয় করি না। পড়াশুনা আমার ভাল লাগে না।"

বলেছিলাম, "পড়াশুনা না করলে জীবনে বড় হবে কি করে? বাবা ব্ল্যাকপুলের কত বড় লোক।"

বলেছিল, "বাবা বড়লোক, তা আমার কি—আমি বড় হতে চাই না।"

বললাম, "তুমি ভাল করে পড়াশুনা করলে বাবা কত খুশী হবেন।"

বলল, "খুশী হলেন বা না হলেন—আমার বয়েই গেল।"

এই বয়সের কথা ওর মুখে শুনে মনে মনে কষ্ট পেতাম। কিন্তু উপায় ছিলনা, ও কিছুতেই নিজেকে সংশোধন করল না। ওর মনে কোথায় যে কি দুরন্ত অভিমান ছিল জীবনের প্রতি—কিছুই বুঝতে পারিনি। আর একটু বড় হলে একটা কথা কানাঘুষোয় আমার কানেও এসে পৌঁছেছিল—ওর মা আমার বাবার অবহেলায়ই নাকি অকালে প্রাণ দিয়েছেন। এই কথাটাই কি ওর কানে উঠে ওর মনকে দিয়েছিল বিষিয়ে? জানিনা।

বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই। ক্রমে আরও দু-চার বছর পরে, ও যখন বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হবে বাবা একদিন কি একটা ব্যাপারে ওকে শাসন করতে গেলে বাবার মুখের উপর কড়া কড়া কথা বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এবং ক্রমে একরকম সংসারের বাইরেই গেল চলে, —বাড়ির সঙ্গে প্রায় কোনও সম্পর্কই রইল না। লেখাপড়া ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিল—দুবেলা চুপি চুপি এসে খেয়ে যেত এবং অনেক রাত্রে আসত শুতে—বাবা যার খবরে কিছুতেই যেতনা। একমাত্র আমি—আমিই দুবেলা ওকে চুপি চুপি খাওয়াতাম। এবং রাত্রে যতক্ষণ না শুতে আসত ততক্ষণই ছটফট করে এঘর ওঘর করতাম—আজও মনে আছে।

ফলে ব্ল্যাকপুলের একটি খারাপ দলের সঙ্গে মিশে, অসৎ সংসর্গে ক্রমেই উচ্ছন্নের পথে এগিয়ে যেতে লাগল—এই কথাটা প্রায় শুনতে এল। তখন আমার বয়স বছর পনেরো। বাবা সজীব ও প্রায় কাছে অনেক কথা বললেন—আমি শুনেছিলাম। বাবার সে কথা আজও মনে আছে। বাবা বলেছিলেন—"আমার ব্ল্যাকপুলের এত বড় সম্মান—ঐ ছেলে আমার মুখে চুণ-কালী দিচ্ছে।" বাবার ব্যথিত মুখের দিকে চেয়ে বাবার কথাটা শুনে মনে একটা কষ্ট হয়েছিল, আজও ভুলিনি।

এর দু-তিন দিনের মধ্যেই একদিন এ্যালবার্টকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "এলবার্ট! ভাই! তুমি ভাল হও। ওসব দলের সঙ্গে আর মিশোনা। বাবার মনে আর এরকম কষ্ট দিওনা।" কথাটা বলতে বলতে আমার চোখে জল এসেছিল।

আমাকে আদর করে বলল, "বাবার মনের দিক দিয়ে নয়, তোর মনে যদি কষ্ট হয়—আমি ও দলের সঙ্গে আর মিশব না। আর আমার ভালও লাগেনা, ওদের সঙ্গে মিশতে।"

হাসিমুখে বললাম, "বেশ, আমি বাবাকে বলব—তুমি এবার ভাল হবে।"

তাড়াতাড়ি বলল "না—খবরদার কিছু বলবি না।"

এর, দু-তিন দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটল—ব্ল্যাকপুলের এক ব্যাঙ্কে একটা ডাকাতী হল, সঙ্গে খুন। ফলে ও যে দলের সঙ্গে মিশত তারাই হল গ্রেপ্তার। শুধু তাই নয়, যে রাত্রে ডাকাতীটা হল সে রাত্রে ও বাড়ীই ফেরেনি। আমি বিশেষ ভয় পেয়েছিলাম, বাবাও খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু ওকে প্রথমেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। দলটা গ্রেপ্তার হলে, আমি ভয়ে ভয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "এ্যালবার্ট! তুমি ওর মধ্যে ছিলে না ত?" হেসে হেসে বলল "না রে। মাসখানেক থেকে ওদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—তোকে ত কথাই দিয়েছি।"

শুধালাম, "তবে সেদিন রাত্রে তুমি বাড়ী ফেরনি কেন?"

মৃদু মৃদু হেসে বলল, "তার একটা কারণ আছে।"

জোরের সঙ্গে বললাম, "কি কারণ আমাকে বলতেই হবে এ্যালবার্ট।"

প্রথমে কিছুতেই বলবে না—হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি যখন কিছুতেই ছাড়লাম না, যখন কাতরভাবে বললাম—সমস্ত না শুনলে ভয়ে রাত্রে আমি ঘুমুতে পারছি না—তখন আমাকে সব বলল। যা বলেছিল সংক্ষেপে বলি।

ব্ল্যাকপুলের মাইল দু'-তিন দূরে সমুদ্রের ধারে একটা গ্রাম আছে —নাম বীসপাম। সেই গ্রামে মিঃ ও মিসেস রো বলে একটি দম্পতি বাস করতেন। মিঃ রো প্রৌঢ় কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি তরুণী। এই স্ত্রীটির সঙ্গে এ্যালবার্ট কি করে জানি না, একটা গভীর প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এবং ইদানীং নাকি বেশীর ভাগ সেইখানেই কাটাত। ঘটনার দিন মিঃ রো এখানে ছিলেন না, লণ্ডনে গিয়েছিলেন—নিজের শরীরের অসুস্থতার জন্য বিশেষজ্ঞ কোনও ডাক্তারকে দেখাতে। তাই তরুণীটির সঙ্গে রাত্রিবাসের প্রলোভন এ্যালবার্ট ছাড়তে পারেনি—তার কাছেই সমস্ত রাত কাটিয়েছিল।

শুনে বললাম—"ছিঃ ছিঃ এ্যালবার্ট—তোমার এত অধঃপতন হয়েছে! পরস্ত্রীর সঙ্গে—"

হেসে বলল—"তুই বড় বোকা। পরস্ত্রী তা কি! আমরা দুজনে দুজনকে ভয়ানক ভালবাসি। মিঃ রো-র আর বেশীদিন নেই—ক্যানসার হয়েছে। তারপর আমরা দু'জন দু'জনকে বিয়ে করব—সব ঠিক।"

কথাটা শুনে মনের মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব যে জেগে গেল,

LIFEBUOY
SOAP

তা মোটেই নয়, কিন্তু এ্যালবার্টের দিক দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলাম। যাক, খুন ডাকাতীর অপরাধে আর ধরা পড়বে না।

কিন্তু বিকো! হাজার হলেও আমরা ত ঠিক ইংল্যাণ্ডের লোক নই—সে কথা ইংরেজরা বেশ বোঝে। বিদেশীদের প্রতি যতই ওদের মুখের ভদ্রতা থাক, সহানুভূতি একেবারেই নেই। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সামান্য প্রমাণে—এ্যালবার্টকে গ্রেপ্তার করতে ইংল্যাণ্ডের পুলিশ দ্বিধা করেনি। পরে শুনেছিলাম—প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই ছিল না। সেই দলেরই একটা লোক যার সঙ্গে এই মেয়েটি অর্থাৎ মিসেস রো'কে নিয়ে ওর একটু রেষারেষি ছিল সেই মিথ্যে করে ওকে জড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে আছে, আমি পাগলের মতন হয়ে উঠলাম। যাই হোক, আমি আর বেশী কি করতে পারি—তবুও একদিন ছুটে গেলাম বীসপারে মিসেস রোর কাছে। তাকে অনেক অনুনয় বিনয় কান্নাকাটি করে বললাম—পুলিশকে সব কথা খুলে বলতে। বলতে—সেদিন রাত্রে সমস্ত রাত ও তার কাছেই কাটিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! এত ত তার সঙ্গে এ্যালবার্টের গভীর প্রণয়—সে অস্বীকার করল। যে অপরাধে এ্যালবার্ট গ্রেপ্তার হয়েছে, তাতে ফাঁসী পর্য্যন্ত হতে পারে জেনেও অনায়াসে সে অস্বীকার করল। যাকে ভালবেসেছে, তার প্রাণের বিনিময়েও একটা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে সে নারাজ। বিকো! এই ইংল্যাণ্ডের মেয়ে!

কিন্তু এ্যালবার্ট! পাছে তার প্রেমিকার গায়ে কলঙ্কের আঁচড় লাগে—একটি কথাও বলল না। সে রাত্রে সে বাড়ীতে ছিল না প্রমাণ হল কিন্তু কোথায় ছিল—শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষের কাছে একটি কথাও বলেনি। আমি একদিন পুলিশ তদন্তের সময় বাবার কাছে কান্নাকাটি করে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জেলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে অনেক বুঝিয়েছিলাম, তবুও বলতে রাজী হয়নি।

যাই হোক, ক্রমে বিচার হল। বাবা খুব বড় ব্যারিষ্টার দিয়ে ওর পক্ষ সমর্থন করালেন। কিন্তু হলে কি হবে—ইংল্যাণ্ডেরই ত জুরী। তারা সেই ইংরেজ যুবকটির মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে ওর পক্ষের কোন কথাই নিল না। ফলে সাব্যস্ত হল দোষী। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হল।

আমি প্রায় সাত দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি—মনে আছে। কিন্তু বাবা! মাঝে মাঝে বিছানা থেকে উঠে বাবার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছি—বাবার মুখের চেহারা এ কী রকম হয়ে যাচ্ছে! কি নিদারুণ কষ্ট তিনি মনে মনে পেয়েছিলেন—প্রমাণ হল মাসখানেকের মধ্যেই। বরাবরই রক্তের চাপ তাঁর বেশী ছিল—হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন—আর উঠলেন না। দু'দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে তাঁর শেষ হয়ে গেল।

তার পর আর কি? এত বড় একটা ঝড় বয়ে গেল আমাদের উপর দিয়ে—ব্ল্যাকপুলে থাকা আমাদের আর সম্ভব হল না। বাবা ব্ল্যাকপুলের খুব বড় সলিসিটার ছিলেন। তাঁরই অফিসের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সাহায্যে ব্ল্যাকপুলের আমাদের বাড়ী বা অন্য যা কিছু ছিল সব বেচে মা আমাকে নিয়ে গিয়ে বসবাস সুরু করলেন সুদূর কেম্‌ব্রিজ সায়ারের পল্লীগ্রাম—লংডেন। লংডেনের বাড়ীখানি উইনবীচের মাসীই ব্যবস্থা করে মাকে কিনিয়ে দিয়েছিলেন।

দু'-তিন বছর থাকার পরে খবর পেলাম—যতদূর মনে উইসবীচের মাসীর কাছ থেকে যে এ্যালবার্ট জেলেই মারা গেছে দারুণ আঘাত পেয়েছিলাম মনে—বলাই বাহুল্য। যাই হো লংডেনে পাঁচ ছয় বছর থাকতে থাকতে মন আমার ক্রমে শ হয়ে গেল। তার পর হল দেখা তোমার সঙ্গে। তোমাকে পে যেন একটা নতুন জীবনের সাড়া পেলাম আমার মর্ম্মে মর্ম্মে।

তার পর ত তুমি সবই জান। ক্রমে তোমার সঙ্গে বি হল—আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলাম। তখন তোমাকে নি মনের আনন্দে আমি ভরপুর—এ্যালবার্ট মনের তলায় কোথ গেল তলিয়ে।

একটা প্রশ্ন সহজেই ওঠে—বিবাহের আগে এ সব ক তোমাকে বলিনি কেন? বিকো! এর সঠিক উত্তর আম কাছে নাই। বলিনি—কেন না বলা হয়ে ওঠেনি। বলিনি-কেন না বলার কোন কারণ ঘটেনি। এ্যালবার্ট ত আর ইহজগ নাই—তখন ত তাই জানতাম—সে শুধু তখন আমার জীব একটা দুঃস্বপ্নের মত হয়েছিল। তাই বোধ হয় সে দুঃস্বপ্নের ক প্রাণের অন্তস্তল থেকে আবার খুঁচিয়ে তুলতে প্রাণে লাগত-তাই বোধ হয় বলিনি। কিংবা একটা কথা এখন ভাবি বিবাহের আগে থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম তোমার মনে কলঙ্কহী বংশমর্য্যাদার আভিজাত্য অত্যন্ত প্রবল—তাই কি বলতে আম বাধত? ঠিক বুঝিনি।

বিকো! আমাকে ভুল বুঝ না—তোমার কাছে চিরদিন লুকি রাখার সিদ্ধান্ত যে আমার মনে ছিল, তা একেবারেই নয়। প্রয়োজ হলেই বলব—এই ধরণের একটা মনোভাব ছিল আমার। কি প্রয়োজন যখন হল তখন আর বলা গেল না। পলপেরোতে জ বুলারকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। বুঝতে আমার দেরী হয় —এ্যালবার্ট মরেনি, এ্যালবার্ট জেল থেকে পালিয়ে জন বুলার পলপেরোতে আছে। পরে এ্যালবার্টের কাছে শুনেছিলাম— বুলার বলে অন্য একটি কয়েদীর সঙ্গে ওর জেলে ভাব হয় এবং ত কাছ থেকেই কর্ণীতে তার অন্ধ বিকৃত-মস্তিষ্ক মায়ের খবর টের পায় জেল থেকে পালিয়ে কর্ণীতে গিয়ে মায়ের কাছে জন বুলার সে পাছে কর্ণীতে ওকে কেউ জন বুলার নয় বলে চিনতে পারে—মা নিয়ে পলপেরোতে এসে বসবাস সুরু করে। সে এক আশ্চ চমকপ্রদ ঘটনা! কোনও দিন দেখা হলে বিস্তারিত বলব।

সহজেই মনে হল—এইবার তোমাকে সব বলবার সময় এসেছে কিন্তু মনে একটা খটকা লাগল। তুমি যদি জানতে পার পুলিশ খবর দেওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য হবে। সেটা আমি যে একেবারে চাইনি। আহা বেচারা, নিরপরাধী সে—একটু শান্তিতে আছে আবার তাকে জেলে পাঠান কেন?

তারপর ডার্টমুরে মিঃ রোলাণ্ডের সঙ্গে দেখা হল। মনে আ ত—তাঁর কাছে স্পষ্ট শুনলাম যে জেল থেকে পলাতক আসামী খবর জেনে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানান অবশ্য কর্ত্তব্য, নইলে কঠি শাস্তি পেতে হয়। আমি নিজেকে সহজেই অপরাধিনী বলে ক করে নিলাম। কিন্তু বিকো! তোমাকে অপরাধী করি কি করে? দেশের পুলিশ বিদেশী হলে নিরপরাধীকেই অনায়াসে শাস্তি দেয় অ সত্যিকারের অপরাধ পেলে ত কথাই নাই। ভুল হল না—তোমা

খবরটা বললে, তুমি যে আমার মতের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে খবর দেবে, এ সন্দেহ আমি তোমাকে করিনি। কিন্তু আমার ভাইয়ের জন্ত সারাজীবন এদেশে তুমি একটা অপরাধের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াবে—তাও কি আমি সইতে পারি? বুঝতে আমার দেরী হল না—ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর লীলায় তোমার আমার মধ্যে একটা আড়ালের স্থষ্টি হল। কিন্তু সেটাও যে আমি সইতে পারছিলাম না। ডার্টমুরের কোটেজে একদিন সমস্ত রাত কেঁদেছি।

বিকো! লিখতে আমার বড় কষ্ট হয়। তাই পরের কাহিনী সংক্ষেপে শেষ করি। কিছুদিন পরে পুলিশ কি করে জানি না, লণ্ডপেরোক্তে ওর সন্ধান পেল এবং সেখান থেকে ওকে আবার পালাতে হল। কিছুদিন এ দিক ওদিক লুকিয়ে থেকে শেষ পর্য্যন্ত নিরুপায় হয়ে সেল-এ আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। বলেছিল—ইংলাণ্ডে ওর আর বাস করা চলবে না। দূর বিদেশে কোথাও ওকে পালাতে হবে। সব ব্যবস্থাই করেছে, তবে টাকার দরকার। এই নিয়ে গোপনে ও দু'-চার দিন আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিল।

ব্যাঙ্কে ত আমার হাজার সাতেক পাউণ্ড ছিল। সবই ত বাবার টাকা। তাতে ত ওরও অধিকার। বলেছিল—হাজার পাঁচেক পাউণ্ড হলে ও সব ব্যবস্থা করে ফেলবে। তাই টাকা আমি অনায়াসে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

ও এদেশ ছেড়ে পালাল—পুলিশ ওকে আর ধরতে পারেনি—সেই দিক দিয়ে আমার মনে একটা মস্ত বড় তৃপ্তি আছে। যেদিন তোমার জ্বর হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলাই ও আমার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেল চলে।

যাই হোক, টাকা দিয়ে ত ওকে বিদায় দিলাম এবং কথাটা আমার মনে গোপনেই রইল। কিন্তু যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে আসি সেদিন তোমার কথায় ও ব্যবহারে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, তোমার কাছে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। বলতেই হবে তোমাকে সব। তাই ঠিক করে ফেললাম, পুলিশকে সব জানিয়ে তোমাকেও সব বলব। তবে তখনই নয় আরও অন্তত মাসখানেক পরে। কেন না, এ্যালবার্ট বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময়ে বলেছিল তার গুছিয়ে স্ত্রী-কন্তা নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে কিছু সময় লাগবে। তাকে তাই আরও কিছু দিন সময় দিতে চেয়েছিলাম। এবং সেই সময়টুকুর জন্তই বাড়ী থেকে এসেছিলাম চলে। হঠাৎ তোমার সঙ্গে যা ঘটল তারপরে ত আর তোমার সঙ্গে ও ভাবে একদিনও এক সঙ্গে থাকা চলে না। ইচ্ছে ছিল যথাসময়ে পুলিশকে সব জানিয়ে তোমার কাছে আবার যাব ফিরে, বিকো! বলব তোমায় সব। তারপর যা হবার হবে। বিকো! তুমি আমাকে চেননি, আমি অবিশ্বাসিনী নই।

লীনা।"

বসবার ঘরে আগুনের পাশে বড় কৌচটার উপর শুয়ে চিঠিখানা শেষ করলাম—চুপচাপ নিস্তব্ধ চারিধার। শার্সীআঁটা জানালার ভিতর দিয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন মেঘে ভরা প্রভাতটির দিকে চেয়ে কতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে ছিলাম মনে নাই। হঠাৎ চোখ ঘুরে এসে পড়ল ফুলদানীটার উপর—ফুল নাই শূন্ত ফুলদানী। চমকে উঠে বললাম—লীনা নাই, লীনাও আর নাই। নিজের কথা বলে গেল আমার কথা শুনে গেল না। আমার পিতামহ সুশান্ত সার যে জেল হয়ে ছিল—সে কথাটি ত আর বলা হল না।

বুলা! কি আর লিখব। আমার কথা শেষ হল। নরফেনডেন রোডের সেই চার্চটির পিছনে এক কোণে উইলো গাছটির তলায় মার্লিনকে কবর দেওয়া হল—দাঁড়িয়ে দেখেছি। আমার পাশেই প্রেসকে ধরে মিঃ লালকাকা ছিলেন দাঁড়িয়ে—সমস্তক্ষণ প্রেসের কান্নার যেন অন্ত ছিল না। আমি কিন্তু কাঁদিনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বুলা! এদেশ ছেড়ে আর যাব না—বাকী জীবনটা সেলেই কাটাব। সেলেই যে ওতপ্রোত ভাবে তার স্মৃতি জড়ান। সেলেই যে তার কবর।

প্রায়ই আমি উইলো গাছটির তলায় যাই—ফুল দিয়ে সাজাই কবরটি। বলি—ওগো বিদেশিনী! সিন্ধুপারে এসে তোমাকে পেয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে চিনি নি। তুমি বিদেশিনী হয়েই রইলে আমার জীবনে। কিন্তু কবির বাণী মিথ্যা হবে না—তাই তুমি মহাসিন্ধুপারে চলে গিয়েছ। আজ আমি তোমাকে চিনি গো চিনি।

চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী!
তুমি থাক সিন্ধুপারে
ওগো বিদেশিনী!

সমাপ্ত

মানুষ জলবায়ু পরিবর্ত্তন করতে পারে

বি, তেনিলিন, এম্-এস্-সি (যন্ত্রবিদ্যা)

প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং সকলের আগে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্ভাবনার প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বহুদিন। মেঘকে ডাকতে ধরে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জমিতে যদি বারিপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়, তা কি সত্যি লোভনীয় হবে না? আকস্মিক বর্ষণ ও বন্যা, ঘূর্ণিবাত্যা ও অনাবৃষ্টি, শিলাপাত ও ধূলি-ঝঞ্ঝার বিপাক থেকে মানবজাতিকে রেহাই দেবার প্রশ্নটি আরও প্রেরণাসঞ্চারক।

কিন্তু প্রকৃতিতে আপনা থেকে যেসব ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর ওপর প্রাধান্ত স্থাপন কি কার্য্যত: সম্ভবপর? আমরা কি আশা করতে পারি যে, মানুষ আবহাওয়া ও জলবায়ু স্বেচ্ছামতো পাল্টিয়ে দিতে সক্ষম হবে?

বায়ুমণ্ডলের গতি-প্রকৃতির ওপর ব্যাপক আকারে প্রভাব বিস্তারের জন্ত বিপুল পরিমিত শক্তি নিয়োজিত না করলে হতে পারে না। উদ্দেশ্যসাধনের পথে এই হলো মস্ত বাধা। এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভল্‌গা নদীতে লেনিন জলবিদ্যুৎ-শক্তি কারখানার ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি জলবিদ্যুৎ-শক্তি কারখানায় যে শক্তি উৎপাদন সম্ভবপর, সেই পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হয় মাঝারি আকারের একটি মেঘপুঞ্জ সৃষ্টির জন্ত। এই হিসাবে মাত্র দশ কিলোমিটার স্থান জুড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ১০-২০ মিটার বেগে বাতাস বহাতে হলে শক্তির প্রয়োজন পড়বে আরও দশ গুণ বেশি।
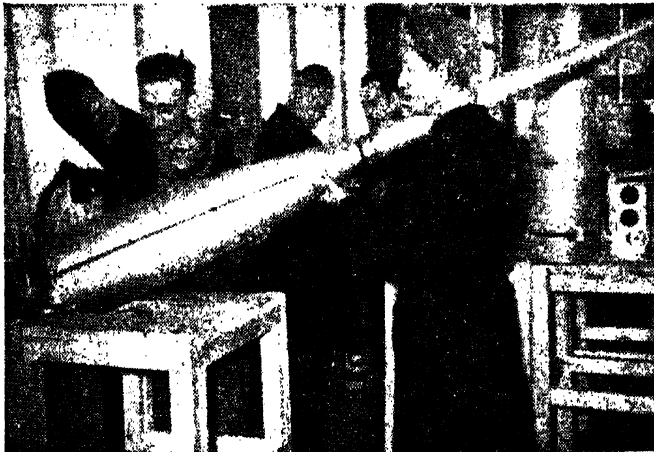
সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নটির ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে সুরু করেন। প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে যাতে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়, তার জন্তে কোন্ পন্থা ও উপায় কি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে না? সেক্ষেত্রে আপনা থেকে সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনার ওপর আধিপত্য স্থাপনে যে বিপুল পরিমিত শক্তির প্রয়োজন, তার দরকার পড়বে না আদৌ।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যে গবেষণা চালিয়ে থাকেন, সব দিক থেকেই তা বিরাট। একই সময়ে তাঁদের গবেষণা চলে স্থলে, সাগরে বরফাবৃত মেরু অঞ্চলে এবং উর্দ্ধাকাশে। সুখের বিষয়, অবিশ্রান্ত শ্রমের ফলে ও বহু বিজ্ঞান-কর্ম্মীর বীরত্বপনার আমাদের এই গ্রহে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ধারা সম্পর্কে সন্ধান মিলেছে প্রচুর অজ্ঞাত তথ্যের। ইতোমধ্যে এই তথ্যসমূহ বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে বিস্তৃত ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই গবেষণার বাস্তব মূল্য কতটা সেই সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা মোটেই সঙ্গত নয়। অপর দিকে আলোচ্য গবেষণা চালনার সময় অগ্রাধিকার পায় আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত প্রশ্ন দুইটি।

আকাশের যথেষ্ট উর্দ্ধস্থলে প্রাকৃতিক ঘটনার কি কি ভাবে সংঘটন হয়, সেই সব বিবিধ আবিষ্কারের তাগিদে আবহ-বিজ্ঞান যন্ত্রপাতিও নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হয় উর্দ্ধে ঘটনার উৎস এলাকায়। রকেট ও স্পুটনিক মারফৎ আমাদের গ্রহের বায়ুর আবরণ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য উদ্ধার হয়েছে। যেমন, পার্থিব বায়ুস্তরে গবেষণার ১০-১২ কিলোমিটার উর্দ্ধে বাতাসের গতিবিধি 'জেট স্ট্রীম'-এর আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে আর এই গবেষণালব্ধ ফল বিমান চলাচলের অগ্রগতির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতন স্তরে গবেষণা চালিয়ে উত্তর গোলার্দ্ধে ঘূর্ণিবাত্যার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারা গেছে। রকেট ও স্পুটনিকের সহায়তায় পরীক্ষা চালনা মারফৎ বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের ঘনত্ব ও তাপের যে দ্রুত হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠাপড়া হয় এবং এর সঙ্গে যে সৌর ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে এইটি।

আমাদের গ্রহে যে শাশ্বত বরফ ও তুষার রয়েছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম গবেষণা চালানো হয়। সেই থেকে জানা যায় যে, মানুষ বাস করে সমগ্র স্থলভূমির মাত্র প্রায় দশ ভাগ অংশে, আর বরফও অধিকার করে আছে অনুরূপ অংশ। কুমেরু অঞ্চলে বরফের ঘনত্ব হচ্ছে ৪,০০০ মিটার। এই বরফপুঞ্জে যে বিপুল জলরাশি জমা

কারখানায় আবহমণ্ডল পরীক্ষার রকেট তৈরী হচ্ছে

আছে, তার পরিমাণ দাঁড়াবে ২ কোটি ২০ লক্ষ ঘন কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবীর নদীর ও সরোবরসমূহে যে পরিমিত জল রয়েছে, এ হবে তার প্রায় দশ গুণ। এই 'অকস্ত বরফপুঞ্জ'কে যদি গলানো যায়, তা হলে সাগর ও মহাসাগরে জল বেড়ে যাবে ৫০ মিটা বরও বেশি।

বরফ ও আর্দ্রতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে হিমস্রোত সৃষ্টি হয় যাতে করে জলবায়ুর ওপর এর বিরাট প্রভাব বিস্তার সম্ভবপর। এ অবস্থা শুধু যে মেরু অঞ্চলসমূহেই হবে, এমন নয়। এই পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে গ্রহের সর্ব্বত্র। মেরু সাগরে ভাসমান তুষার-পর্ব্বত বিধ্বংস করবার যে তরহের সমস্যা', এর সমাধান এক্ষণে আর কল্পনার বিষয় নয়। আর এই কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হলেই প্রকাণ্ড দুই কোটি বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করতে থাকবে নরম ও আর্দ্র জলবায়ু। এর ফলে চিরবরফাবৃত সাইবেরিয়া ও আলাস্কার এখনকার অনুর্ব্বর অঞ্চলসমূহেও ফলের গাছগুলোতে ফলফুল দেখা দিবে।

মেঘদলের ওপর প্রভাব বিস্তার কি ভাবে করা যায় এবং কি ভাবে কৃত্রিম বারিপাত ঘটানো চলতে পারে, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আজ তা ভালোরকম জানেন। এ-ও দেখা গেছে যে, কৃত্রিম শব্দের সাহায্যেও এ ঘটানো সম্ভবপর। শব্দ কি ভাবে বর্ষণ ঘটায়, এই ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষা চালান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান আকাদেমীর এলব্রাস উচ্চ পর্ব্বতাভিযানের সদস্যবৃন্দ। উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ব্যাস্নাক জর্জের ঢালুভূমিতে কয়েকটি শক্তিশালী শব্দ উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এক একটি যন্ত্রের হর্ণ ছিল নয় বর্গ মিটার এবং সেই থেকে বিচ্ছুরিত হয় ২৫ কিলোওয়াট শব্দশক্তি। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন শব্দস্রোত 'তপ্ত' মেঘের দিকে চালিয়ে দেওয়া হয়, অমনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে অসংখ্য জলকণা নিয়ে মেঘের সৃষ্টি, সেগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খায়, আবার জড়ো হয়, ওজনে ভারি হয় আর শেষটায় ভূপতিত হয় বৃষ্টির আকারে।

একই পদ্ধতির সহায়তায় মেঘ ও কুয়াসার কবল থেকে বিমানঘাঁটি সমূহকে মুক্ত রাখা যায়। সম্প্রতিকালে সোভিয়েত দেশে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের ওপরকার মেঘস্তরকে বিক্ষিপ্ত করবার জন্যে পরীক্ষা চালানো হয়েছে একাধিকবার আর সেইটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে।

প্রাকৃতিক অবস্থা—ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে স্বপ্ন মানুষ এতকাল দেখে এসেছে, তাকে বাস্তব করে তুলতে এর ভেতর সে এগিয়ে গেছে অনেক দূর। সেদিনও আর অধিক দূরের নয়, যখন মানুষ শুধু আবহাওয়াই কেন, আপন চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র জলবায়ুকেও রদবদল করতে জানবে।

ঊর্দ্ধাকাশে আবহমণ্ডল পরীক্ষার একটি জাহাজে রকেট প্রেরণের মুহূর্ত

মানুষের মগজ ও মেশিন

অধ্যাপক এস, ব্রেইনেস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কত বিচিত্র ও কত জটিল যন্ত্রপাতির উদ্‌ভাবন করেছে। বর্তমান যুগকে তো অদ্ভুত অদ্ভুত স্বয়ংক্রিয় মেশিনের যুগ বললেই হয়। মানুষের এই অসামান্য কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব সত্ত্বেও এখন পর্যন্তও প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রই সব চেয়ে নিখুঁত। প্রকৃতি আমাদের এমন সব বিস্ময়কর যান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়েছে, যেগুলি অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে চলতে পারে। জীবদে এই রকম অদ্ভুত যন্ত্র-সজ্জা।

প্রকৃতির দেওয়া এই সব স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত যন্ত্রের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য কল্পনা সাহায্যে আমরা এমন দিনের কথা অনায়াসেই ভাবতে পারি যেদিন মানুষও প্রকৃতির তৈরি মেশিনেরই মতো অতী নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত মেশিন তৈরি করতে সক্ষম হবে। সে যন্ত্র সক্ষম হবে বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে ঠি মতো কাজ করতে।

সেদিন কত দূরে? সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয় তবে যে রকম দ্রুত গতিতে বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে তাতে সেই অনাগত দিন খুব বেশি দূরে যে নয়, এ-কথা অব

করেই আজ বলা চলে। একটা বিষয় সুস্পষ্ট। প্রথমে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু নিতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা, প্রকৃতির সব চেয়ে সেরা ও সব চেয়ে নিখুঁত সৃষ্টি যে মানুষের মগজ, সেই মস্তিষ্কযন্ত্র নিয়ে আমাদের গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে হবে।

স্বয়ংচালিত বা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের উন্নতির বর্তমান স্তর দেখে শুনে পরম ভরসা প্রকাশ করলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে না বলেই আমাদের ধারণা।

নিউরোসাইবারনেটিক পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার পরে সোভিয়েত দেশে একটি শিক্ষণক্ষম স্বয়ংক্রিয় ইউনিটের প্রথম মডেল তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষণক্ষম বলতে বোঝায় পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাড়া দিবার মতো এক প্রকার আবরণ।

এ রকম স্বয়ংক্রিয় ইউনিট উদ্ভাবন করার আগে জীববিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারদের জীবজন্তুর ব্যবহার বিশদভাবে পর্যালোচনা করতে হয়েছে।

জল ও খাদ্য পাওয়ার জন্যে, বিপদ এড়াবার জন্যে পশুদের কতকগুলি নির্দিষ্ট আচরণ করতে হয়। যেমন, এই আচরণ-প্রক্রিয়ার বিশদ পর্যালোচনার জন্যে আমরা কুকুর নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আহার্য পাওয়ার জন্যে একটি কুকুর বিভিন্ন সংকেতে যে বিভিন্নরূপে সাড়া দেয় সেই প্রক্রিয়া আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। কুকুরটি অবশ্য প্রথমেই এক নতুন আচরণের পরিচয় দেয় নি। আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। ঠিক মতো আচরণ করতে কুকুরটিকে শিখতে হয়েছে। কুকুর ও অন্যান্য জীবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা কণ্ডিশণ্ড রিফ্লেক্স শৃংখলের যে প্রক্রিয়া জানতে পারেন সেই জ্ঞানই তাঁরা শিক্ষণক্ষম স্বয়ংক্রিয় ইউনিট উদ্ভাবনের কাজে প্রয়োগ করেছেন।

স্বয়ংক্রিয় কলাকৌশলগুলি যতই জটিল হয়, ততই সেগুলির দ্বারা অধিকতর নির্ভরযোগ্য কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করে এই নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নের একটা সমাধানের পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম করা যায়।

মস্তিষ্ক অত্যধিক নির্ভরতার এক চমৎকার মডেল। মস্তিষ্ক চালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় তার আত্মশিক্ষার ক্ষমতার দ্বারা। মস্তিষ্কের কোনো একটা উপাদান যখন বিগড়ে যায়, তখন অন্যান্য সব অংশ সেই উপাদানের সরবরাহ দেয়। সোভিয়েত অধ্যাপক পি. কে, আনোখিন এক পরীক্ষাধীন পশুর গুরু মস্তিষ্কের ধূসর বাস্তাংশের বেশ খানিকটা সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু কণ্ডিশনড রিফ্লেক্স্‌-এর নূতন শৃংখল চালু হওয়ায় ঐ অপসারণজনিত ক্ষতি আর টের পাওয়া গেল না।

মানুষ ও স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমস্যা অতীব জটিল। মানুষের কাজের ভারপ্রাপ্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কতদূর পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে? মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ কাজ নতুন মেশিনের দ্বারা সম্ভব নয়? এই সব প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর বিতর্ক চলছে। এই কথা মনে রাখতে হবে যে, ইতিমধ্যে মেশিনের দ্বারা যেসব কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে (যেমন, জ্যামিতিক উপপাদ্যে প্রমাণ, এক ভাষা থেকে আর ভাষায় তর্জমা ইত্যাদি) সে সব কিছুকাল আগেও অসম্ভব বলে মনে হত।

এ কি জীববিজ্ঞানের দ্বারা যন্ত্রবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করার ব্যাপার? আদৌ তা নয়। বরং বিপরীত প্রভাবের কথাই আমাদের ভাবতে হবে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বহু প্রশ্নেরই মীমাংসা করা চলছে না। শারীরতত্ত্ববিদরা ও চিকিৎসকরা বহুকাল যাবৎ জীবদেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া অনুশীলন করে আসছেন। এই সব প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং রক্তের চিনির ভাগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার কার্যকলাপ।

এ-সব ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি নিঃসন্দেহে এক ফলপ্রসূ উপায়। যেমন, এই পদ্ধতির কল্যাণে এ, নাপালকভ, ডি, স্বেচিন্স্কি ও এই প্রবন্ধকার জীবদেহের আভ্যন্তরীণ শারীর প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার একটা প্রকল্প খুঁজে বার করার কাজে হাত লাগাতে পেরেছিলেন।

চিকিৎসকরা বলেন, দেহের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশৃংখলার কারণে বহু ব্যাধি দেখা দেয়। এই কারণেই এই ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যকলাপ জানা এতখানি অত্যাবশ্যক। এই ক্ষেত্রের গবেষণার গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগসূত্র সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে একথা বোধ হয় স্পষ্ট হতে পেরেছে যে, গণিতশাস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং বিজ্ঞান ও জীববিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন ও সমন্বয়ের দিন আগত ঐ।

বনস্পতি রঙ করার কি দরকার?

কেউ কেউ বলেন যে বনস্পতি রঙ করা উচিত, যাতে ঘিয়ে ভেজাল হিসেবে বনস্পতি ব্যবহার করলে সহজেই তা ধরা যায়।

কিন্তু খাবার জিনিসে মেশাবার মত এমন কোন রঙ নেই যা বনস্পতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য বনস্পতিতে ৫ শতাংশ তিলের তেল থাকায় ঘিয়ের মধ্যে ৫ শতাংশ বনস্পতি ভেজাল দিলেও একটি সাধারণ রাসায়নিক পরীক্ষায় সহজেই তা ধরা পড়ে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্যে

একথা সত্য যে, ঘি ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে বনস্পতি রঙ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, কিন্তু যে-রঙ মেশানো হবে তা যাতে লক্ষ লক্ষ বনস্পতি ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট না করে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। যে রঙই মেশানো হোক, তা ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "ঘি অ্যাডালটারেশন কমিটির" মৌলিক শর্তাবলী অনুযায়ী হওয়া চাই। তার প্রধান প্রধান শর্তগুলি হল :

১। "রঙটি বনস্পতিতে সহজেই মিশে যাওয়া দরকার।

২। "বনস্পতিতে মেশানোর পর বনস্পতির যে রঙ হবে তা দেখতে মনোরম হওয়া চাই।

৩। "রঙটি পাকা হবে এবং রাসায়নিক বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় যেন সহজে পৃথক করা না যায়।

৪। "উত্তাপে যেন রঙের পরিবর্তন না হয় এবং রান্নার তাপেও (প্রায় ২০০° সেঃ) নষ্ট না হয়।

৫। "দীর্ঘদিন ব্যবহারেও রঙের দরুণ যেন বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া না জন্মায় কিংবা অনিষ্ট না হয়।"

খাবার জিনিসে সাধারণতঃ যে সব রঙ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে কোন রঙই এই সমস্ত শর্ত পূর্ণ করে না। সেগুলি হয় বনস্পতিতে মেশেনা অথবা সহজেই বনস্পতি থেকে পৃথক করা যায়। পাকা সিন্থেটিক রঙে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় কিংবা ক্যান্সার রোগ জন্মায়। সুতরাং বনস্পতিতে মেশাবার উপযুক্ত রঙ এখনো পাওয়া যায়নি।

জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় অভিমত এই যে, খাদ্য কিংবা পানীয় জিনিসে রঙ মেশানো উচিত নয়। কারণ, বহু বছর নির্দোষ ব'লে ব্যবহৃত অনেক রঙ পরে ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব উন্নত দেশেই খাদ্য ও পানীয়ে মেশাবার উপযুক্ত রঙের সংখ্যা ক্রমে কমিয়ে আনা হচ্ছে।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা

যতদিন ঘিয়ে ভেজাল দেবার জন্যে কাঁচা বা পরিশোধিত তেল, জান্তব চর্বি ইত্যাদি জিনিষ সহজেই পাওয়া যাবে ততদিন কেবল বনস্পতি রঙ ক'রে ঘিয়ে ভেজাল বন্ধ করবার আশা বৃথা।

ঘিয়ে ভেজালের সমস্যা এদেশে খাদ্যে ভেজাল দেবার বিরাট সমস্যার একটা অংশ মাত্র। ১৯৫৪ সালের "খাদ্য ভেজাল নিরোধ আইন" এবং তার অন্তর্গত নিয়মাবলী খাদ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত। এই আইন যত কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হবে ততই খাদ্যে ভেজাল নিবারণের চেষ্টা সার্থক হবে। তাছাড়া, বনস্পতির মত ঘি-ও কেবলমাত্র সীলমোহর করা টিনে বিক্রি করা হলে এই চেষ্টা আরো সফল হবে।

বনস্পতি ব্যবহারকারীদের প্রতি আশ্বাস

বনস্পতি প্রস্তুতকারীদের কাছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ঘিয়ে ভেজাল দিয়ে বনস্পতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা তাঁরা জোর দিয়ে বলতে চান যে বনস্পতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন করা হলে বনস্পতি ব্যবহারকারীদের হিতের দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন তা করা হয়।

বনস্পতি প্রস্তুতকারীরা বনস্পতি ব্যবহারকারীদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে বিশুদ্ধতা ও পুষ্টিকারিতার সর্বোচ্চ মান অনুসারেই বরাবর বনস্পতি তৈরী করা হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন :

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

ইণ্ডিয়া হাউস, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

TVMA 940
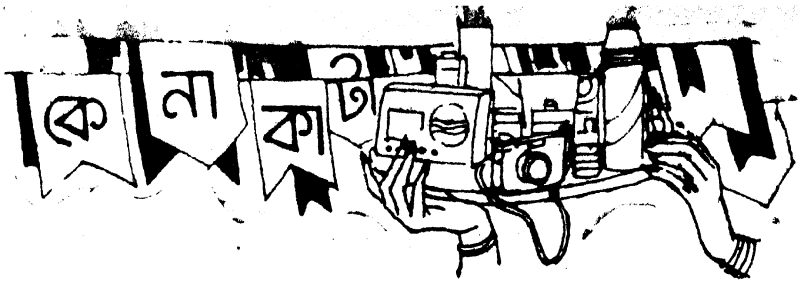
বাঁশ

আমাদের দেশে বাঁশ একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ-জীবনের সংগে বাঁশের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে যদি আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি তাহলে শুধু সত্যের অপলাপ করা হবে না, উপরন্তু বিরাট অবিচারও করা হবে বলে মনে হয়।

বাঁশ যে আমাদের কত কাজে লাগে তা এক কথায় যেমন বলে শেষ করা যায় না, তেমনি এর প্রয়োজনীয়তার তালিকা দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মোটামুটি ছাড়া বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কবে কখন এই বাঁশ আমাদের সমাজ-জীবনের সাথে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়ে, একথা আজ সঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। তবে একথা ঠিক যে, বাঁশ বহু প্রাচীন কালের। বাঁশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় যে, দেবাসুরের যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে মানবের আদিম অবস্থায় আত্মরক্ষা করবার অথবা শত্রুকে আঘাত করবার সহজলভ্য প্রধান অস্ত্রই ছিল গাছের ডাল বেত ও বাঁশের লাঠি। তখনও মানুষ খনিজ ধাতুর ব্যবহার জানত না। তখন এমন কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়নি, যার দ্বারা আত্মরক্ষা ও শত্রু দমন করতে পারে। মানব ধাতুর ব্যবহার শেখবার পূর্ব্বে পাথর ঘষে প্রস্তুত করা অস্ত্রই ব্যবহার করত। এর বহু পরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়।

বাঁশ তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ হলেও লম্বায় তিরিশ-চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। এর ভেতরটা ফাঁপা, এক হাত বা দেড় হাত অন্তর অন্তর গাঁট থাকে। আবার গাঁট থেকে যে শাখা বের হয়, তাকে আমরা কঞ্চি বলে থাকি। এই কঞ্চিতে পাতা জন্মায়।

বাঁশপাতা লম্বা সরু এবং বেশ ধারালো হয়ে থাকে এর কিনারাগুলো। বাঁশ গাছ খুব শক্ত। ঝড়ে বাঁশ গাছ নুয়ে পড়লেও ভেঙ্গে পড়ে না। বাঁশ গাছের মূল মাটিতে পুঁতলেই ক্রমে ক্রমে বাঁশঝাড়ের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন প্রকারের বাঁশ দেখা যায়, যথা—তল্লা বা তল্দা, বড়ো, পড়া, কেল বৈয়ালী অথবা কাল বৈয়ালী, বেউড়, জাওয়া প্রভৃতি। তল্দা বাঁশে চিকণ চিকণ আঁশ অথচ খুব বেশী ফাঁপা কিন্তু আবার বেশী মোটাও নয়। বড়ো বাঁশ বেশ মোটা লম্বা আর শক্ত এমন কি এর গাঁটগুলো বেশ শক্ত আর ঘন হয়ে থাকে। পড়া বা কাল বৈয়ালী বাঁশ খুব মজবুত ও কালো হয়। বেউড় বাঁশ কন্টকযুক্ত ও আকারে ছোট হয়ে থাকে।

ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও জাপানে প্রচুর বাঁশ জন্মায়। বাঁশের চাষ প্রণালীও অতি সহজ। মাটি বেশ সরস হওয়া চাই। বাঁশের মূল মাটিতে পুঁতলেই এর থেকে বাঁশ জন্মাবে।

বাঁশের বংশবৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে বাঁশের পাতা যখন ঝরে যায় তখন পরিষ্কার করে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, বাঁশ বাংলা ও আসামের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এর থেকে বাঁশের খুঁটি বেড়া ঘরের চাল ইত্যাদি ছাড়াও বাঁশ আমাদের নানা কাজে লাগে। যথা রাজমিস্ত্রীর ভারা, মজুরের মাথালী, গোয়ালার বাঁক, ধুনুরীর তাঁত, মাছ ধরবার ছিপ, পোলোর কাঠি, হাকনী জালের কাঠামো, ঝুড়ি, কুলো, চালুনী, ধুচনি, ঘুনী, লাঠি, ছড়ি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরী হয়ে থাকে। "বাংলা ভাষার ইতিহাস" পুস্তকখানি থেকে আমরা জানতে পারি যে "এ দেশের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষার নাম দেশ্য। যে সময়ে এদেশে কোনরূপ প্রাকৃত ভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় তখনই সাধারণের ব্যবহারের জন্য এদেশে এক আদিম ভাষা ছিল, সেই ভাষার শব্দ সকল সংসর্গবশতঃ প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ঢেঁকি, কুলা, ধুচনি, চুপড়ি, ইত্যাদি শব্দ না সংস্কৃত, না প্রাকৃত, না পারসী, না আরবী। সুতরাং মনে হচ্ছে উহারা—উপরিউক্ত আদিম দেশীয় ভাষার শব্দ।"

বাংলা ভাষার ইতিহাস থেকে বাঁশের তৈরী জিনিষের কয়েকটি নামের নমুনা থেকে প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর এক দিকে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারছি। ছাতার বাঁট ও বাঁশী ছোট নলে এ ছাড়া আরও কত রকমের অসংখ্য শিল্প কাজ আর খেলনা তৈরী হয় তার ইয়ত্তা নেই।

বাঁশ আমাদের যথেষ্ট উপকারে আসে সত্য কিন্তু বাঁশঝাড়ে মশকও বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট, কাজেই অন্যদিকে স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। এর থেকে ম্যালেরিয়াও ছড়িয়ে পড়ে।

বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ প্রস্তুত হয়ে থাকে। পাতা গবাদি পশুর খাদ্য। এক কালে বাঙ্গালীর হাতের লাঠি ধন, মান প্রাণ বাঁচাতে একমাত্র ছিল সম্বল।

বাঁশের অবদান যে কত, তা বলে শেষ করা যায় না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়াও পূজা-পার্ব্বণে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জন্ম, মৃত্যুতে বাঁশ থাকবেই। একটা প্রবচন আছে যে "বাঁশবনে ডোম কানা"। ঠিক আমারও তাই অবস্থা, বাঁশ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে ভাবছি অনেক কথাই বলবার ছিল অথচ কি যেন বলতে পারিনি।

বাঁশের ব্যবহারের কথা বললাম বটে কিন্তু বাঁশ শুধু দৈনন্দিন সামাজিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নেই, পাল-পার্ব্বণে শ্রাদ্ধ-শান্তিতে,

জন্ম-মৃত্যুতে, যুগ-যুগান্তর ধরে কায়েমী স্বার্থ বজায় করে শুধু চলছে না। ইতিহাসে, মহাকাব্যে, গানে, বাজনায় বাঁশ কোথায় নেই বলুন তো? এমন কি, জাতি ধর্ম্ম ও কুলে কালি দিয়ে একেবারে বাঁশ রান্নাঘরেও হাজির হয়ে গেছে। কচি বাঁশের তরকারি হয়ে।

বাঁশ একটি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ বটে কিন্তু এর গুণের ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করতে কেন একটি কাব্য সৃষ্টি হয়নি, তাই ভাবছি। আমাদের মনে হয়, বাঁশের প্রতি আমরা যে অবিচারের পরিচয় দিয়েছি তা বড় মর্ম্মান্তিক।

জগতে যখন প্রথম এলাম বাঁশে। আবার জগত থেকে যখন লীলাখেলা সাঙ্গ করে চলে যাব তাও বাঁশে। আবার অপরকে বাঁশ দিতেও আমরা মোটেই কুণ্ঠিত নই। কচি বাঁশের তরকারি খাই বাঁশের, যে বাঁশের লাঠির সাহায্যে শত্রু দমন করি সেই বাঁশই আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে করেছে অমর অক্ষয় বাঁশী হয়ে। এ সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গাথা আছে—

"বাল্যকালে মাথায় টুপি
কৃষ্ণ অবতারে মজায় গোপী
রাম অবতারে রাবণ মলো
সেই তরকারি আমাদের হলো।"

অর্থাৎ কচি বাঁশের তরকারিও হয় আবার রাম ধনুক দ্বারা রাবণ বধ করেছিলেন, ধনুক ছিল বাঁশের এবং ঐ বাঁশেরই বাঁশীতে শ্রীকৃষ্ণ মজিয়েছিলেন গোপিনীদের। আরও পরিষ্কার করে বলতে হলে বাঁশ চার যুগের রচয়িতা, মনে হয় ঐ কথা বলতে গিয়ে উক্ত প্রসঙ্গে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের বর্ণনা করেছেন।

শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতে বাঁশের বর্ণনা কেমন পাওয়া যায় একবার দেখা যাক।

মহাভারতে ইন্দ্রধ্বজ পূজার কাহিনীতে আছে রাজা উপরিচর বসু প্রথমে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলন করেন। মাটিতে একটি বেণুযষ্টি প্রোথিত করে তাতেই ইন্দ্রের পূজার ব্যবস্থা হত। এখানে বেণুযষ্টি বাঁশকেই বোঝায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবি বলতে মাত্র দু'জন, একজন মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় জন ভারতচন্দ্র। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে এবং চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে মুকুন্দরাম রচিত একটি পদের মধ্যে বাঁশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা নিম্ন রূপ—

"খন্দে নাহি নিব বাড়ী রহে বসে দিহ কড়ি
ডিহি দার নাহি দিব সেনো।
সেনালী বাঁশ গাড়ী নানা ভাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে।"

অন্যত্র—

"খুড়া, তিন গোটা শর ছিল একখান বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস
দৈব বসে যদি আমি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল।"

এই তো গেল প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে বাঁশের কথা। এ ছাড়াও বাংলার অসংখ্য সাহিত্যিক কবিগণের রচনার মধ্যে বাঁশের বহু উল্লেখ পাই। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুতে দেশের চারি দিকে শোকের সঞ্চার হয়েছিল, এ সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গীতি আছে, নিখিলনাথ রায় রচিত "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপ—

—"নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ ডাঙ্গার পানে চেয়ে
আর না নামিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।
খোপেতে কৌতর কাঁদে কোঁ হারাতে হাঁস
জোড় বাংলায় কাঁদে সোনার শুলতে বাঁশ।—"

বাঁশ কে নিয়ে আরো বহু গান কবিতা আছে স্থানাভাবে সম্পূর্ণ উল্লেখ করা গেল না। স্থানের নামও বহু পাওয়া যায় যথা—বংশবাটি অথবা বাঁশবেড়িয়া বাঁশদ্রোণী ইত্যাদি মানুষের নামও আছে যেমন বংশীলোচন বাঁশরী ইত্যাদি—এমন কি কবিরাজী ঔষধেও বংশলোচন বলে একটি ঔষধ দেখা যায় ঐ গুলি বাঁশের মধ্যে পাথরের আকারে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উক্ত ঔষধটি উপকারী এবং দুষ্প্রাপ্যও বটে।

একবার কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত ঘর-বাড়ী যখন বাঁশের ও মাটির তৈয়ারী হয়েছিল তখন ইংরেজদের পত্রিকাতে উহাকে—"সমস্তই অসংস্কৃত রুচিবিরুদ্ধ"...বাঁশের শহর বলে উপহাস করা হয়েছিল। এর এক বৎসর পর হরিপুরা অধিবেশনের সময়—ঐ বাঁশের শহরকেই আবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়েছিল। এ-রকম বহু দৃষ্টান্ত আমরা পাই। এছাড়া উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব দক্ষিণভারতের ঘরবাড়ীতেও বাঁশের ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলায় সূত্রধর ও ঘরামিরাই গ্রামের স্থপতি, তাঁদের শিল্পরুচিবোধও বেশ সজাগ। গ্রামের সাধারণ লোকের ঘর-বাড়ী স্থানীয় উপাদানে প্রস্তুত হয়।

যথা:—বাঁশ, খড়, তালপাতা, নারিকেলপাতা, হোগলা, কাঠ ইত্যাদি। আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের কত অংশ যে কাঠ দিয়ে মেটাতে হয় মনে হয় যেন কাঠ ছাড়া এক পা-ও চলবার উপায় নেই। বাঁশের খুঁটি ও বাতা দিয়ে ঘরের বাটাম বা কাঠামো তৈরী হয়। শ্রীহট্ট, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিং জেলার ভাটি অঞ্চলে এই রেখাকার গৃহনিবেশ অধিকাংশ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। বন্যার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে গ্রাম ঘেরা থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশ চিরে পাটি অথবা বাতা প্রস্তুত করে গ্রামের চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া হয়। বাংলা দেশে গ্রামে বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত করা ঘরবাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় বাংলায় স্থাপত্যশিল্পের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। যে বাঁশঝাড়কে আমরা দিনের পর দিন দেখেছি ভ্রূক্ষেপ করিনি বরং উপেক্ষা করেছি। ভূতের অথবা শাঁকচুন্নির গল্পে বাঁশঝাড়ের কথা আছে, রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে বাঁশঝাড় বিভীষিকা মনে হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাঁশঝাড়ের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। "পথের পাঁচালী"র লেখক বিভূতিভূষণ কত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কত কবিতায় বাঁশের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া পল্লীসংগীতে দেখেছি, শিল্পীর তুলিতে দেখেছি, আবার সেই বাঁশের তৈরী অপূর্ব্ব শিল্প সৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়েছি শিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখে। বাংলার বাঁশের তৈরী জিনিসপত্র আজও লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে আছে।

উপসংহারে বাঁশের লাঠির কথা বলেই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের ছেদ টানবো।

প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত—মানুষ আত্মরক্ষার জন্ত গাছের ডাল, বেত এবং বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে আসছিল। কারণ, একাধারে সুলভ ও সর্ব্বত্র অনায়াসেই পাওয়া যায়। মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই লাঠিখেলার অভ্যাস করেছিল। কালের স্রোতে আজ তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বহু বিবর্ত্তন ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে লাঠিখেলার পদ্ধতি ভারতবর্ষে যে রূপ প্রচলিত ছিল আজ তা একেবারে নেই বললেই চলে।

বাঁশের লাঠির ভূমিকা সে কতখানি তা সে যুগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই সহজে বোঝা যায়।

একটা প্রবচন আছে—

"টাকির লাঠি,
সাতক্ষীরের মাটি
গোবরডাঙার হাতি।"

এ ছাড়া দশের লাঠি একের বোঝা তো আছেই।

লাঠির কথা 'ঢাকার ইতিহাসে'ও পাওয়া যায়। রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁর বীর সেনাপতি রাম মালিক লাঠিয়াল হিসাবে একটি পল্লীকবিতায় স্থান পেয়েছিলেন; তাহা নিম্নরূপ—

রাম মালিকের লাঠি।
রঘুরামের মাটি।
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ॥
গুলি ফিরে বাঁকে।
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধরে লাঠি
যম যেন সে খাঁটি॥

"ঢাকার ইতিহাস"
প্রথম খণ্ড ৪১৮ পৃষ্ঠা
যতীন্দ্রমোহন রায়।

বাংলার বাঁশের লাঠি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে জানতে হলে শ্রীপুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের রচিত "লাঠিখেলা ও নার্সশিক্ষা" পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া "বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলা" পুস্তকের লেখক শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দেব রায়চৌধুরী মহাশয় লাঠিখেলার বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন, তিনি তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন—

শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ শারীরিক ব্যায়াম বহু প্রকারের আছে, তন্মধ্যে লাঠির ভাঁজ ঘুরান ও লাঠিখেলা অন্যতম। নিয়মিতরূপে লাঠির ভাঁজ ঘুরাইলে শারীরিক বলের বৃদ্ধি হইয়া পেশী সকলের উৎকর্ষ সাধন হয়। ইহা মুগুর ভাঁজের অনুরূপ ক্রিয়া করে। "লাঠিখেলা ও নার্সশিক্ষা" জ্যোতির্ম্ময় বাবু উল্লেখ করেছেন—

"বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলার" কিছু অংশ শ্রীসুললিত সরকার সম্পাদিত ১ম বর্ষের 'যুবক' মাসিক পত্রিকায় ১৩৩৬ সনের মাঘ সংখ্যা হইতে ১৩৩৭ সনের ভাদ্র সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৩৩৭ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "বড় লাঠি বা রায় বাঁশ খেলা"র পুস্তকখানির কেন নামকরণ হয়েছিল লেখক সে কথা মুখবন্ধে লিখেছেন। রায়=রাজা, শ্রেষ্ঠ; বাঁশ=যষ্টি, লাঠি। রাজলাঠি বা শ্রেষ্ঠ লাঠি দীর্ঘ বংশযষ্টি বা বড় বড় বাঁশের লাঠি। বিক্রমপুরের স্বাধীন নৃপতি, বারভূঁইয়ার অন্যতম মহারাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বাঙালী বাহিনীর মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব দুর্দ্ধর্ষ লাঠিয়াল পাইকের দল ছিল। রায় রাজাদ্বয় তাঁদের এই লাঠিয়ালগণকে যেরূপ অপূর্ব্ব নতুন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ বাঁশের লাঠি দ্বারা খেলা শিক্ষা দিয়ে এক মহা পরাক্রমশালী লাঠিয়াল যোদ্ধার দল গঠন করেছিলেন যে যাঁদের ভীমহস্তের বজ্রসম লাঠির ঘায়ে শত্রু তার শেষ শয্যায় চিরবিশ্রাম লাভ করত। বিক্রমপুরের গৌরব সেই রায়-রাজাদের নাম থেকে লাঠির ইতিহাসে এই বড় লাঠি 'রায় বাঁশ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বিক্রমপুরের পদ্মা-পারের এই লাঠির খ্যাতি যেন একটি জনশ্রুতির মতই এতকাল চলে এসেছে। প্রবাদটা হলো:—

"চাঁদ কেদারী লাঠি যম সে যে খাঁটি,
ঘোরে বিষম পাকে শত্রু পড়ে ঝাঁকে।"

পরে ঠগী ও পিণ্ডারী দস্যুগণ লাঠিখেলাকে নিজেদের পাপকার্যে ব্যবহার করে এর মর্য্যাদা নষ্ট করেছিল। আজ যুগের পরিবর্ত্তনে এসেছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, এই বাংলার বাঁশের লাঠিই এককালে বাঙালী ধন, মান, সম্ভ্রম বাঁচাবার একমাত্র সম্বল ছিল।

—শ্রীগোপালচন্দ্র সাঁতরা।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে—
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া—
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।

—রবীন্দ্রনাথ

রহস্যপুরীর রত্নোদ্ধার

(এ্যাডভেঞ্চার অফ লে ভেরী)

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

৪

সঙ্কীর্ণ নদীর এঁ্যাকর্ব্যাকের উপর দিয়ে ভেসে চলতে-চলতে ক্রমশঃ নদী প্রশস্ত হতে লাগল। কিছুটা পথ এগুবার পর সামনেই দেখা গেল একটা ছোট দ্বীপের মত জায়গা। ঐ দ্বীপটার যতই আমরা কাছাকাছি হতে লাগলুম, ততই জলের টান যেন বেড়ে চলেছে। একটা জায়গায় ঘূর্ণির মত জল পাক খাচ্ছে। এর আগেও দু'-একটা ঘূর্ণির সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের। কিন্তু এখানে নৌকাগুলিকে বাঁচাতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হ'ল। লোকজনরা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোন রকমে তীরের দিকে নৌকাগুলিকে নিয়ে এল। এখানে নদীর এক ধারে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বিশেষ কিছুই নজরে পড়ে না। কোথাও স্বচ্ছ স্ফটিকের মত তার গা ঝকমক করছে, আবার কোথাও ধূসর ধুলা-মলিন। এই পাহাড়ের ছুঁচালো চূড়াগুলি নানা ভঙ্গীতে উঠেছে উপর দিকে।

পাহাড়ের গা-ঘেঁষে নদীপথ দিয়ে অতি কষ্টে আমরা আধ-জাগা আধ-ডোবা এই দ্বীপটি অতিক্রম করলুম বটে, এইবার আমরা বিপদসঙ্কুল একটা 'দানবের গর্ত্তে' এসে পড়লুম। পাহাড়ের গা থেকে সেখানটায় তীব্র বেগে ঝরণার জল এসে পড়ছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে জলের মধ্যে চলেছে নিরন্তর আলোড়ন, আর বুদবুদের দৈত্য-নৃত্য। এর সঙ্গে আওয়াজ তো আছেই! এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না! দূর থেকে দেখলেই ভয় হয়; মনে হয়, ওর ধারে-কাছেও কারু যাওয়ার সাধ্যি নেই! এইটুকু অতিক্রম করতে পারলেই আমাদের আজকের মত যাত্রা শেষ হবে—আমরা বিশ্রাম নেব নৌকাগুলিকে বেঁধে। কিন্তু এই দুস্তর স্থানটুকু পার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের নিস্তার নেই।

এই 'দানবের গর্ত্তে'র পরই নদীর দু'-তিনটে সরু সরু খাঁড়ি বেরিয়ে গেছে দু'-তিন দিকে। আমাদের যাত্রাপথের ম্যাপ দেখে নির্দ্দিষ্ট নদীর মোহানাতেই আমরা রাত কাটাব স্থির করেছিলুম।

দিনের আলো ক্রমশঃই তখন নিবে আসছে, রাত্রের অন্ধকারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। ইতিমধ্যে কাবির ইণ্ডিয়ানদের একজন জোয়ান ছেলে নৌকাতেই ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। তার বাপও ছিল আমাদের এই দলের মধ্যে। ছেলেটাকে কুইনিন ইন্‌জেকসন দিয়ে আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ভাল করে তোলার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু তার বাপের এ-সব কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। সে নিজে ছিল একজন জংলী-চিকিৎসক। ইংরেজীতে যাকে 'উইচ ডক্টর' বলে, সে ছিল সেই ধরণেরই। কাজেই, ঝাড়-ফুঁক, তুকতাক্ ক'রে সে তার ছেলেকে ভাল করতে চায়। প্রথমে আমি এসব বিশ্বাস করতুম না বলেই নিজের হাতে তার চিকিৎসা করছিলুম, তাছাড়া একবার এ বিষয়ে তাদের প্রশ্রয় দিলে আর রক্ষে নেই! কিন্তু এ ক্ষেত্রে এলিস ও আমি যুক্তি করে দেখলুম যে, বাপ যখন নিজেই ছেলেকে সুস্থ করার ভার নিজের হাতে নিতে চাইছে, তখন আমাদের হাতে ওকে না রাখাই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু কয়েক দিন পরে ঝাড়-ফুঁকে কিছু সুবিধা না হওয়ায়, আবার তার ভার আমার নিজের হাতেই নিতে হ'ল। ঝাড়-ফুঁকে অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে আসছে দেখে, আমি তাকে আবার ইন্‌জেকসন দিলুম। এ-ব্যাপারে দলের অনেকেই বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল।

যেদিন ইন্‌জেকসন পড়ল সেদিনের রাতটা একই ভাবে কাটল। পরের দিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হ'ল ছেলেটাকে। মনে হ'ল, সে বোধহয় এ-যাত্রা বেঁচে উঠবে। এ অবস্থায় রুগীকে ফেরত পাঠানোর কথা চিন্তা করা যেমন হাস্যকর, তেমনি অসম্ভব। তাছাড়া এখন তাকে বা তার বাপকে এখানে ছেড়ে দিলে নির্ঘাত কোন জীবজন্তুর পেটে যে তাদের চলে যেতে হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

কে ম'লো আর কে বাঁচল, যদিও তখন আমাদের দেখবার অবকাশ ছিল না, তবু একটা ছোট ভিত্তিতে তার জন্যে আমরা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করলুম। এটা শুধু তার জন্যেই নয়, ওদেশের বিদ্‌ঘুটে জ্বর বা অন্য কোন অসুখের সংক্রামকতা সঙ্গী লোকজনদের মধ্যে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হ'ল।

ভোর হয়ে এসেছিল, চর ছেড়ে আমরা এগুতে লাগলুম আমাদের গন্তব্য পথে। কিন্তু দুপুরের মধ্যেই আবার আমাদের নৌকাকে নোঙর করতে হ'ল একটা খাঁড়ির মুখে।

অকারণ এই পথে সময় নষ্ট করার লোক আমি নই, কিন্তু আমাদের বিশ্বস্ত গাইড টাইগারের কথায় তা আমাদের করতেই হ'ল। ইতিপূর্ব্বে এইখানে, নদীর এই খাঁড়ির মুখে, দু'ধারের তটদেশে ও তলদেশে হীরক ও স্বর্ণরেণুর কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে সে আমায় আভাস দিয়েছিল। এ ছাড়া যাত্রার প্রথম দিকে, সেই যে এক কাবির জাতীয় বুড়ী বলেছিল, সেটা নাকি এই জায়গারই কথা। যাই হোক, হাতের ম্যাপ দেখে আমরা এই জায়গাটাকেই মার্ক করলুম।

দু'দিন সমারোহের সঙ্গে ক্যাম্প ফেলে আমরা যথাসম্ভব অনুসন্ধান কার্য্য সমাধা করলুম। কথাটা নির্জ্জলা মিথ্যে নয়; গুঁড়ো সোনা ও হীরে কুই পাওয়া গেল এখানকার নদীর গর্ভ থেকে।

কিন্তু দুটো জিনিসই এমন নগণ্য পরিমাণ যে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। তবে একটা জিনিস সম্বন্ধে আমরা প্রায় নিশ্চিন্ত হলুম যে, প্রধানতঃ এই নদীই নিশ্চয় কোন দুর্গম দূর পথ থেকে এই স্বর্ণরেণু ও চূর্ণহীরক বহন করে আনছে স্রোতের সাহায্যে।

আমাদের পথে এই স্থুইবো নদী থেকে এর আগে যে সব শাখা-নদী পড়েছে, সেই সব জায়গার জল ও মাটি আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তা থেকে ঠিক এতখানি নিশ্চিন্ত হতে পারিনি এবং এত অল্প জায়গার মধ্যে অপেক্ষাকৃত এত বেশী হীরককণাও পাইনি।

এই নদীপথে পথভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে থাকলেও, এবার আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হলুম এই ভেবে যে, আমরা ঠিক পথেই চলেছি।

এ্যাক-ঝ্যাক ছুরি-ছ্যাক-এর মত স্থুইবো থেকে শাখানদী আর খাল-বিল কোথা দিয়ে যে কে বেরিয়েছে এবং কোথায় গিয়ে পড়েছে, তার ঠিক ঠিক হদিশ পাওয়া এখানে মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া ঝড়-ঝাপটায় ও বানের জলে এখানকার নদ-নদীর স্বাভাবিক রূপ প্রায়ই বদলে যায়। চওড়া নদীর পাড় ধ্বসে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, শীর্ণা নদী হয়ে যায় প্রশস্ত।

কিন্তু তবুও মনে সেই একই চিন্তা—কবে গিয়ে পৌঁছব, কবে সেই মণি-মুক্তা-রত্নরাজীর ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হবে, কবে আবিষ্কৃত হবে সেই রহস্যাবৃত হীরকের উৎস!

নদীর এই পথ ধরেই চলব এখন আমরা। ক্রমশঃই উঁচু থেকে এখন আরও উঁচুতে উঠতে হবে আমাদের। সঙ্গের বুনো মাঝি-মাল্লারা সোনার খোঁজ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। হীরের চেয়ে এই স্বর্ণরেণুর প্রতি ওদের টান বেশী। সাধারণ পাথরের মত ঔজ্জ্বল্যহীন হীরের টুকরোর চেয়ে সোনার মূল্য দেয় এরা অনেক বেশী। শুধু এরা কেন, আমার স্ত্রী এলিসও নদীর কাদাবালির মধ্যে সোনার সন্ধান পেয়ে বেশ খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সোনার সন্ধানে উৎফুল্ল হলে কি হবে, সেদিন এলিস এখানে এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। সর্বত্রই তার স্নানের জন্য আলাদা জলের ব্যবস্থা থাকত বাথরুমের মধ্যে। এখানকার নদীর জলে নানাস্থানে নানাপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার মাছ ও জলজন্তুদের ভয়ে জলে নেবে স্নান করার কোনই উপায় ছিল না।

সেদিন তাঁবুর মধ্যে তার 'বাথ টাবে' জল ভর্তি করে রেখে, বুনো পরিচারকরা যখন সকলেই প্রায় নদীর তীরে বালি ধুয়ে স্বর্ণরেণু অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন এলিস তার স্নানের ঘরে ঢুকেই বিকট চীৎকার ক'রে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে এলো। আরও কয়েক মুহূর্ত কাটলেই হয়েছিল আর কি। সেদিন সেখানে নিশ্চিত যে তার জীবনান্ত ঘটত, তাতে আর সন্দেহ ছিল না।

এলিসের চীৎকারে সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল। আমি বজরার উপরে একটি আরাম-কেদারায় বসে বই পড়ছিলাম, হঠাৎ এলিসের গলায় বিকট আওয়াজ শুনে লাফিয়ে তার কাছে এসে হাজির হলুম। এলিসের মুখ বিবর্ণ; সে ঠকঠক করে কাঁপছে বললেই হয়।

ভীত ও ত্রস্ত এলিসকে জড়িয়ে ধরে কি হয়েছে, প্রশ্ন করতেই সে মুখে কোন কথা না বলে আঙুল দিয়ে তার স্নানের ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলে। সেদিকে একটু এগিয়েই আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলুম—সমস্ত গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। কী ভয়াবহ দৃশ্য! স্নানের ঘর থেকে ড্যাবডেবে দুই চোখ বার ক'রে এক বৃহদাকার সরীসৃপ বেরিয়ে আসছে এঁকে-বেঁকে।

এলিসের নিজস্ব দেহরক্ষী দু'জন ও নৌকার অন্যান্য লোকেরাও তখন এসে পড়েছে ঘটনাস্থলে। কিন্তু সেদিকে কেউই বিশেষ এগুতে চাইছে না। বন-জঙ্গলের কোন জীবন্ত জন্তুকেই এরা তত ভয় করে না, যতো করে এই 'বুশ মাষ্টারকে'। এমন হিংস্র, ক্রূর, নিঃশব্দচারী বিষাক্ত জীব বনে আর নেই বললেই হয়।

'বুশ মাষ্টার' এই জায়গার একরকম বিরাটকায় বিষাক্ত সাপ। লম্বায় এরা প্রায় আট-দশ ফুট এবং শরীরে বেশ ভারী। সবচেয়ে বীভৎস এদের মুখের চেহারা আর গায়ের রঙ। এরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বহু লোকরাও এদের দেখে চমকে ওঠে, মনের বল হারিয়ে ফেলে। পৃথিবী-বিখ্যাত সর্প-বিশারদ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ডাঃ ডিটমারও এদের জীবন্ত ধরতে বহু দিন বহু পরিশ্রম করেছিলেন এবং এদের চরিত্র সম্বন্ধে বহু বিচিত্র কথা লিখে গিয়েছেন।

সমস্ত সর্পকুলের তুলনায় এদের চরিত্রও যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি গতিবিধিও বিচিত্র! একবার মানুষের গন্ধ পেলে, দু'-চার ক্রোশ দূর থেকেও এরা তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে এবং অদ্ভুত ভাবে সেইখানে উপস্থিত হয়ে, কারু-না-কারু জীবনান্ত ঘটিয়ে তবে ছাড়বে।

ওদেশের বহু অধিবাসীদের মধ্যে অনেক গোষ্ঠী আছে, যারা এই সাপকে দেবতার অংশ বলে বিশ্বাস করে। তা ছাড়া তারা একথাও বিশ্বাস করে যে, এদের দেখলেই নাকি কিছুকালের মধ্যে মানুষ মারা যায়। সত্যিই এরা যেন সাক্ষাৎ যম! কিন্তু এখন এই যমের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে যেমন করেই হোক উপায় আমাদের বার করতেই হবে।

লোকজনদের মধ্যে এলিসের প্রধান দেহরক্ষী শাম্বোকে আমি কাছে ডেকে বললুম, যেমন ক'রে হোক, যে কোন উপায়ে হোক, এখন তড়িঘড়ি জন্তুটাকে শেষ করে ফেলা চাই। শাম্বো সাহসী ও বলশালী, কিন্তু হলে কি হবে, সে-ও প্রাচীন জাতীয় সংস্কারের বশীভূত। পাছে ওকে মারলে তার কোন বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে বুশ মাষ্টারকে মারতে সে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করল না। এ অবস্থায় তার মুখ চেয়ে আর দেরি করা উচিত হবে না ভেবে, আমি সবাইকে ডেকে বললুম, তোমরা ওকে মারতে না চাও তো জায়গাটা এমন ভাবে ঘিরে ফেল, যাতে ও পালাতে না পারে। শাম্বো আমার এই আদেশে সায় দিল' এবং সে-ই সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে, সাহেব নিজেই ওকে মারবে, অতএব 'বুশ মাষ্টারকে' হত্যা করার দায়িত্ব তাদের কিছুই নিতে হবে না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁবুর বাইরে তার দেহের খানিকটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম। একটা, দুটো, তিনটে ক'রে উপর্যুপরি কয়েকটা। প্রথম গুলিতেই তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তখনও, তবুও, তার তেজ-বিক্রম লক্ষ্য করার মত! গুলি খেয়ে, আহত অবস্থাতেই সে তেড়ে আমাদের আক্রমণ করার জন্যে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার পরের গুলিতেই বাহাধরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হয়ে

গেল। শেষে একটা লোক সেটাকে বল্লমের মুখে গেঁথে এলিসের সামনে তুলে ধরল।

এ ব্যাপারে এলিস একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। খানিকটা হতভম্ব হবার ব্যাপারও বটে! কিন্তু এক হিসেবে ঘটনাটা ভালও লেগেছে তার। এই মরতে-মরতে বেঁচে যাওয়া, যমের মুখ থেকে ফিরে আসা—একি কম উত্তেজনার!

এলিসের হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আমি বললুম, 'বাছা, অত খামখেয়ালে চলবে কেন!—জঙ্গলে এটা এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়, যার জন্তে মুখ-হাঁড়ি-করে থাকতে হবে।'

মুখে জোর ক'রে একটু হাসি এনে সে বললে, 'মুখ আবার হাঁড়ি দেখলে কোথায়?'

'বেশ একটু ভয় পেয়েছ যেন মনে হচ্ছে?'

'বয়ে গেছে ভয় পেতে—আমি অমন সহজে ভয় পাবার মেয়ে নয়!'

এই ধরণের কথা বার-বারই এলিস ব'লে থাকে এবং আমিও বার-বারই ওটা শুনতে চাই ওর মুখ থেকে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, ভয়কে ভয় করে বসে থাকলে সে আরও পেয়ে বসে, তাই তাকে বার-বারই অস্বীকার করতে হয়, ভয়ের মুখেই সাহস দেখিয়ে হয় ঝাঁপিয়ে পড়তে তবেই ভয়কে জয় করা যায়, ভয়ের হয় সমাধি।

যাই হোক, সকালের দিকে এমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেলেও, আমি ভেবেছিলুম, বাকী দিনটা নিশ্চিন্তে ভালই কাটবে। কিন্তু তাতে বিধি বাদ সাধলেন এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটল আর এক বিপর্যয়। এলিস অবশ্য আমাদের সেই কথার পর নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে, উৎসাহের সঙ্গে আবার লোকজনদের সঙ্গে নদীর জলে ও বালুবেলায় হীরক ও স্বর্ণের সন্ধানে মন দিয়েছিল।

এখানকার নদী সঙ্কীর্ণ ও তাতে জল খুব বেশী না থাকায় মারাত্মক রকমের কিছু ভয় আমাদের ছিল না। কিন্তু কয়েক দিন ধরে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর ও জঙ্গলে যে বর্ষা নেমেছিল, তার ফল ভীষণ রূপ নিয়ে অকস্মাৎ আমাদের উপর এসে পড়ল। এর জন্তে আগে থেকেই যে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা আমাদের উচিত ছিল, তা আমরা মোটেই করিনি। তা ছাড়া আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে, দূরে পাহাড়-জঙ্গলে যে বৃষ্টি হচ্ছে ক'দিন ধরে তার ফল এমন সাংঘাতিক হতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কি, বন্য-নদীতে বন্যার মত মারাত্মক আর কিছু নেই! জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু ঝড়-জলেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এক এক সময় এই জল এমন ভয়াবহভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে, প্রাণ রক্ষা করাই তখন প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটে, তাই একটু বিশদ ভাবে এখন বলি ধরো, রাত্রিবেলা কোন পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্যে তুমি ক্যাম্প ফেলে আছ, টিম টিম ক'রে একটা আলো অন্ধকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তোমার তাঁবুর মধ্যে জ্বলছে। এমন সময় মেঘের 'গুড়ুম-গুড়ুম আরম্ভ হ'ল—বৃষ্টি নামল। তোমার কানে বৃষ্টির আওয়াজ আসছে, কিন্তু তোমার তাঁবুতে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না। জল হচ্ছে উপরের পাহাড়ে আর তুমি আছ অনেক নীচে। এই বৃষ্টিধারা ঘন বনানীর মধ্যে আটকা খেতে খেতে ক্রমশঃ নীচে নামে এবং তোমার তাঁবুতে এসে পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগে। কিন্তু যখন তাঁবুর ওপর আচমকা এসে পড়ে, তখন হয়ত বৃষ্টির শব্দ বা ঝড়-বাতাসের কোন চিহ্নবাষ্পই নেই। এক-এক সময় পাহাড়ের উপরের এই জলধারা নীচের দিকে এসে প্রবল প্রতাপ ধারণ করে, যা কিছু সামনে পায় কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না! পার্ব্বত্য অঞ্চলে নদীতে বন্যার ক্ষেত্রেও ঘটনাটা ঘটে এই ভাবে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নদীতে বন্যা আসে না; পাহাড়ের উচ্চাংশের জলধারা নানা বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে নদীতে নামতে সময় লাগে এবং যতই নীচের দিকে নামে, সেই জলধারার গতিবেগ ততই যায় বেড়ে। জল নামার ছোট ছোট খোয়াগুলি বড় হয়ে যায় এবং সেগুলি একত্রিত হয়ে ভীষণ আকার ধারণ ক'রে সমতলের নদ-নদী, খাল-বিল বন-জঙ্গল প্লাবিত করে দেয় সেই জলের তোড়। সময়-সময় এইসব জায়গায় এমন আচম্কা এই সব ঘটনা ঘটে যে, জীবজন্তু বা জংলী মানুষরা নিজেদের সামলাবার কোন অবকাশই পায় না।

ক'দিনের বিশ্রী আবহাওয়ায় যদিও আমি মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করছিলুম, কিন্তু ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি এমন ভাবে ঘটে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তা ভাবতে পারিনি।

সঙ্গের জংলীরা কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগেই বন্যার ভীষণ তোড় হঠাৎ আমাদের উপর এসে পড়ল। সদম্ভে গর্জ্জন করতে করতে, নদীর পাড় উপচে ফুলে ফুলে বিক্ষুব্ধ জলস্রোত গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় ও জীবজন্তু সব ভাসিয়ে নিয়ে চারিদিক প্লাবিত করে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে।

নৌকাগুলিকে তীরে বেঁধে রাখা সম্ভব নয় দেখে, আমরা তাড়াতাড়ি যেগুলি গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল, তাদের দড়ি কেটে দিলুম, আর যেগুলির নঙ্গর ফেলা ছিল, সেগুলির নঙ্গর তুলে নিলুম। সামান্য কিছু জিনিসপত্র ও দুটো তাঁবু আর নেওয়ার সময় হ'ল না।

তাঁবুর জন্তে দুঃখ নেই, এখন কোন রকমে সবাই প্রাণে বাঁচলেই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে নৌকাগুলি ওল্টাবার ভয়ই সবচেয়ে বেশী। ক্রমশঃ এমন অবস্থা হ'ল যে আর বুঝি রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়! তালগোল খেতে-খেতে আমরা চলেছি, নির্দ্ধারিত পথ ছেড়ে বিপথে। নাগরদোলার মত আমাদের বজরা ও বড় নৌকাগুলিও দুলছে আর ঘুরছে; ঢেউয়ের তোড়ে ওপর-নীচেও করছে মুহুর্মুহুঃ। জংলী দাঁড়ি-মাঝিরা কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছে না। আর পারবেই বা কি করে! এই স্রোতের মুখে কোন কায়দাই ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভব নয়।

লোকজনরা ভয়ানক কাঁউমাউ আরম্ভ করে দিয়েছে দেখে, আমি ধমক দিয়ে উঠলুম। এদিকে এলিসও কুঁকড়ে-মুকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেছে, আর নৌকার ঝাঁকুনি ও ঘোরপ্যাঁচে ওয়াক্-ওয়াক্ করছে। অনবরত বমি আসছে তার। এই বিপদের মধ্যে এ-ও এক কম বিপদ নয়! এই সময় একবার আমার মনে হ'ল, ওকে সঙ্গে না আনলেই ভাল হ'ত। বাইরে যা ঘটে ঘটুক ভেবে আমি বজরার ছাউনির মধ্যে ঢুকে তাকে ধরে বসলুম ও একটা এ্যান্টি-নসিয়া পিল খাইয়ে দিলুম।

কিন্তু আমরা এখন ঠিক কোন পথে চলেছি, তা আমাদের

বোঝবার কিছুই উপায় ছিল না। আর বুঝলেও এই বিক্ষুব্ধ স্রোতে গা-ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতির এই ভয়াবহ লীলার কাছে মানুষকে পরাভব স্বীকার করতেই হয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ চলতে-চলতে আমরা যেন একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছি বলে মনে হতে লাগল। জল ফুলে উঠে নদীর পাড় ও জঙ্গলকে একাকার করে ফেলেছে। বড় বড় কয়েকটা গাছপালা বাঁচিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমাদের জলযানগুলি এসে দ্বীপের মত একটা জায়গায় আটকে গেল। আলো থাকতে থাকতে আমরা একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছব বা সুবিধামত মজবুত কোন একটা গাছের সঙ্গে নৌকাগুলি বেঁধে ফেলব, মনে মনে এই ব্যবস্থাই করছিলুম। এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতই এই জঙ্গুলে দ্বীপের চড়ায় আপনা থেকেই আটকে গেলুম আমরা।

[ক্রমশঃ।

হারিয়ে যাওয়া তারা

শ্রীসুলতা কর

একমনে আমি কবিতার শেষ পাদপূরণে ব্যস্ত আছি, এমন সময় পুরানো ভৃত্য আমায় ডাকল। কর্ত্তা, দু'জন দেবদূত এসেছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আপনাকে ডাকছেন।

কবিতার মিলে বাধা পড়ল। বিরক্ত হয়ে বললাম—তুই কি নেশা করেছিস? দেবদূতেরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, এই কথা বোঝাতে চাইছিস?

আপনি নিজেই দেখুন না কর্ত্তা, সত্য বলছি কি মিথ্যা বলছি? এই বলে পুরানো ভৃত্য আমার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আমি চেয়ে দেখলাম, অপূর্ব্ব সুন্দর দুটি যুবক দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখেই বুঝলাম, এঁরা দেবদূত না হয়ে যান না। আমি তাঁদের সাদরে আমার ঘরে এসে বসতে বললাম।

অতিথিরা ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের পিঠের উপর বিশাল দু'খানি করে পাখা রয়েছে। সেই পাখা ভেদ করে স্নিগ্ধ উষার মৃদু রশ্মি ও রামধনুর সাতরঙা রং আমার ঘরকে রঙীন করে তুলল।

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের এখানে আসবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

প্রথম দেবদূত বললেন—নিশ্চয়ই। আমাদের কথা আমরা সংক্ষেপেই বলব। যে ঘটনার কথা বলছি তা ষোল বছর আগেকার। একদিন আমরা দু'জন দেবদূত আশ্বিন মাসের এক শুক্ল রাতে মেঘমুক্ত আকাশের বিস্তৃত শ্যামল আস্তরণে বসে কয়েকটি উজ্জ্বল তারা নিয়ে লোফালুফি করে খেলছিলাম।

আমি—মহাশয়, আকাশের আস্তরণ কি শ্যামল?

প্রথম দেবদূত—যেখানে গভীর সেখানেই আকাশের নীলিমা। কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ ভাবে শান্ত গ্রামগুলির উপরে, কিংবা ভারতবর্ষের বড় বড় নগরগুলির অনেক উপরে, নয়নলোভন শ্যামলিমাই আকাশকে রূপ দেয়।

প্রথম দেবদূত বলে চললেন হ্যাঁ, আমরা একমনে খেলছিলাম। অতি সুন্দর কয়েকটি তারা ছিল আমাদের খেলার ঘুঁটি।

আমরা খেলাতে মত্ত হয়ে গিয়েছি। আমি প্রায় জয়লাভ করে আসছি, সেই সময় হঠাৎ আমার হাত থেকে ফসকে দুটি অতি সুন্দর তারা পৃথিবীর বুকে ছিটকে পড়ল। এ ঘটনাটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল।

আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে দুটি তারা যদি আকাশ থেকে খসে যায় তবে আকাশের ক্ষতি কম হয় না। দেবরাজ সেই মুহূর্ত্তে আমাদের দণ্ড দিলেন—যে পর্য্যন্ত আমরা সেই স্থানচ্যুত তারা দুটিকে পুনরুদ্ধার করে আকাশে এনে না রাখতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমাদের স্বর্গসুখে অধিকার নেই। কাজেই আমাদের দু'জন দেবদূতকে স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এসে থাকতে হল। পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হল।

আমরা দু'জন দেবদূতে মিলে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে সেই হারান তারা দুটি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পৃথিবীর প্রতি স্থান আমরা কি ধৈর্য্যের সঙ্গেই না তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছি। আমাদের ধারণা, তারা দুটি পৃথিবীতেই আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের খোঁজা সার্থক হল না। কোথাও সন্ধান পেলাম না। অগত্যা যখন চির-নির্ব্বাসন-দণ্ড নিতেই আমরা উদ্যত হয়েছি—ঠিক সেই সময় শুনলাম যে—এই পৃথিবীতে একটি তরুণী আছে, যার চোখের অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। আমরা জেনেছি এই তরুণী আপনার প্রিয়তমা। আর আমাদের হারান তারা দুটি ওই তরুণীর চোখের তারা হয়ে আটকে রয়েছে। এখন—দেবদূত বিনীত স্বরে বললেন—এখন ওই দুটি হারান তারা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি কি আমাদের দুর্ভাগ্য মোচন করবেন না?

আমি খুব চঞ্চল হলাম। আমার একান্ত প্রিয়তমার মনোরম চোখ দুটির জ্যোতি কেউ কেড়ে নেবে, এ চিন্তা দুঃসহ। কিন্তু বিবেকের অনুরোধে দেবদূতদের চির-নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথাও আমায় ভাবতে হল।

অবশেষে কিছুই ঠিক করতে না পেরে আমি আমার স্ত্রীকে ডাকলাম ও সকল ঘটনা খুলে বললাম। সব কথা শুনে সে বিস্মিত হল না, চঞ্চল হল না। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর দেবদূতদের সামনে এগিয়ে এসে কোমল দু'টি চোখের পল্লব বিস্তৃত করে ধরে মৃদু স্বরে বলল—হে স্বর্গের অতিথিরা, দেখ, আমার চোখের মধ্যে কি হারিয়ে যাওয়া তারার সন্ধান পাওয়া যায়?

দেবদূতেরা দ্রুত পায়ে তরুণীর সামনে এগিয়ে এলেন। উৎসুক হয়ে বার বার তরুণীর স্বচ্ছ চোখের তারা দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা একটু দূরে সরে গেলেন। কিছুক্ষণ অস্পষ্টভাবে দুজনের মধ্যে কি যেন আলোচনা হল। যেন দুজন বিচারপতি বিচারফল বলবার আগে মতামত বিনিময়ে ব্যস্ত।

পরে প্রথম দেবদূত নিরাশ হয়ে আমাকে বললেন—না মহাশয়, আমরা হতাশ হয়েছি। ষোল বছর আগে যে দুটি তারা হারিয়ে গেছে সেই হারান দুটি তারার সন্ধান পেলাম না। যদিও আমাদের সেই তারা দুটি আশ্বিন মাসের শুক্ল রাতে অত্যুজ্জ্বল হয়েছিল কিন্তু তবু আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই তরুণীর চোখের স্নিগ্ধ মধুর জ্যোতির তুলনায়, আমাদের সেই দুটি হারিয়ে যাওয়া তারার জ্যোতি ম্লান ও নিষ্প্রভ।

দেবদূতেরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে, ম্লান মুখে আমার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

তাঁদের দুঃখে আমার মনে সমবেদনা জেগেছিল সত্য কিন্তু আমি একথা ভেবেও সুখী হলাম যে, তাঁরা আমার প্রিয়তমার চোখের জ্যোতি কেড়ে নিতে পারেননি।

আর আমার প্রিয়তমা? দেবদূতেরা চলে যেতেই সে মিষ্টি সুরে হেসে উঠল। বলল—দেবদূতদের আজ খুব ঠকিয়েছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম—সে কি?

সে ধীরে ধীরে বলল—তোমাকে সত্য ঘটনা বলব। দেবদূতদের কাহিনী সত্য। আকাশের সেই হারান তারা দুটিই আমার চোখের তারায় পরিণত হয়েছে। আমি মায়ের মুখে বহু বার শুনেছি যে আমার জন্মমুহূর্ত্তে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। আমি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই আকাশ থেকে দুটি উজ্জ্বল তারা খসে পড়ল।

যে ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, সেই ঘরের জানলার ভিতর দিয়ে সেই খসে-পড়া তারা দুটি ছুটে এল, এসেই নবজাত শিশু আমার দুটি চোখের তারার ভিতর ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ে সেখানেই আটকে রইল।

সারা জীবন, সেই খসে-পড়া তারা দুটি আমার চোখের তারায় মিশে রইল। আমার চোখকে এত মাধুর্য্য দিল যে পৃথিবীতে আমিই হলাম একমাত্র তরুণী, যার চোখের অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই।

যখন তুমি দেবদূতদের উপস্থিতি ও তাঁদের বক্তব্য আমাকে বললে, তখন আমি কেমন করে দেবদূতদের প্রবঞ্চনা করে খসে-পড়া তারা দুটিকে আমার চোখের ভিতরেই আটকে রাখব ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। তা যদি না পারি তবে আমার অপরূপ চোখের জ্যোতি চিরকালের মত নিবে যাবে, চিরজীবন অন্ধ হয়ে থাকব, এই কথা ভেবেও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটি সুন্দর কৌশল আমার মাথায় এল। আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল।

আমি দেবদূতদের সামনে এলাম। প্রশান্ত মনে তাঁদের আমার চোখ পরীক্ষা করতে বললাম। যখন তাঁরা একমনে আমার চোখের তারা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমি আমার উদ্ভাবিত কৌশলটি কাজে লাগালাম। এবং তারই জন্ত দেবদূতেরা প্রবঞ্চিত হলেন। তাঁরা বলতে বাধ্য হলেন যে, স্বর্গের সকল তারার জ্যোতিই আমার চোখের জ্যোতির তুলনায় ম্লান।

তুমি নিশ্চয়ই ভাববে—কি সে কৌশল! সেটা আর কিছুই নয়, শুধু প্রথম প্রেমের স্মৃতি। যখন দেবদূতেরা আমার চোখের তারা দেখতে ব্যস্ত, তখন আমি স্মরণ করলাম একটি মুহূর্ত্তের কথা। সেই মুহূর্ত্ত, যখন প্রিয়তম তুমি আমার চোখের উপর প্রথম প্রেমের চুমু এঁকে দিয়েছিলে। সেই মুহূর্ত্তটি মনে পড়তেই বিগত দিনের প্রথম প্রেমের পুলক স্পর্শ আমি অনুভব করলাম। আমার চোখের জ্যোতিতে সেই পুলক আবির্ভূত হল—সেই প্রথম প্রেমের প্রথম চুমু।

এখন তুমি বুঝলে, কেন সেই মুহূর্ত্তে আমার চোখের জ্যোতি এত স্নিগ্ধ, এত মনোরম হয়েছিল? যাতে স্বর্গের সকল তারার জ্যোতিই ম্লান হয়ে গেল।

ইংরেজ আমলে নদীয়া

সুনন্দাকুমারী

লর্ড ক্লাইভ তখন বাংলার গভর্ণর। বাংলার ভাগ্যাকাশে অনাবৃষ্টি আর অনাসৃষ্টির মসী-মেঘে বেজে উঠেছে আসন্ন দুর্যোগের দুন্দুভি। দিকে দিকে শোনা যায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। ক্ষুধা-মানব মিছিলের কেউ কেউ অকালে, অস্থানে প্রাণ হারায়!

অবশেষে টনক নড়ে কর্ত্তৃপক্ষের। 'এ ভাবে শাসন চালালে, অন্ততঃ বাংলায় বোধ করি খুব বেশী সুবিধে করা যাবে না।' তাই, অতঃপর দেশকে তারা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করতে সুরু করলো। ১৭৮০ সাল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি অভিলষিত ব্যবস্থাপত্র-দ্বারা শিবচন্দ্রকে স্বীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শিবচন্দ্র ১৭৮২ থেকে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নদীয়ায় নির্বিবাদে রাজত্ব করেন। শিবচন্দ্র পিতৃ-আসনে উপবেশন করলে, তাঁর স্বীয়াধিকারে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'র সভাপতি মিঃ জন শোরের প্রস্তাব ক্রমে তদানীন্তন বাংলার ছত্রিশটি রাজস্ব আদায়ের প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে মাত্র চব্বিশটি 'জেলার সৃষ্টি হয়। ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ স্থানগুলোয় জেলা—কৃষ্ণনগরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রস্তাবানুসারে—মিঃ রেড ফিয়ার্ণ কৃষ্ণনগরের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই সময়েই নদীয়া রাজ্য নদীয়া বলে পরিগণিত হয়। কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ সড়ক বা গোয়াড়ীতে একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলার বিচার আর পূর্ব্বোক্ত প্রথানুযায়ী কাজী ও মুফতিগণের উপরই ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য্যাদির দায়িত্ব বলবৎ থেকে যায়। রাজা শিবচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়া রাজ্যের অধিকারী হ'ন। এই সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে প্রথমে দশশালা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করেন। নদীয়ারাজ বিষয়-সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। তদুপরি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের বন্যায় শস্যাদির অপরিমিত ক্ষতি হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র যথাসময়ে স্বীয় রাজ্যের রাজস্ব দিতে অসমর্থ হ'ন। ফলে, ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যের সীমা ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রের পরলোকগমনের পর নদীয়া রাজ্যের সীমা অত্যধিক হ্রাস পেয়ে নামেমাত্র পর্য্যবসিত হয়। কথিত আছে, এই সময়েই সমগ্র নদীয়ায় দস্যু-তস্করের উপদ্রবে নদীয়াবাসী ভটস্থ হ'য়ে ওঠে। দেশমধ্যে শান্তিশৃঙ্খলার কোনও ব্যবস্থা এই চরমকালটিতে একরকম ছিল না বললেই হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া বিভাগকে মোট চারটি জেলায় এবং আঠারোটি বিভাগে ভাগ করা হয়। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, বনগ্রাম, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর নিয়ে নদীয়া জেলা গঠিত হয়—উনবিংশ শতকের প্রান্তকালে নীলকরদের সাথে বাংলার কৃষককুলের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। এই সময়ে বাংলার গভর্ণর ছিলেন সিসিল বীডন। এঁরই কার্য্যকালে প্রথমতঃ রাণাঘাট এবং পরে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া ও কুমারখালিতে পৌরপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।

ইংরেজ-আমলে বা ইংরেজ শাসনে শাসনের নামে শোষণ এবং

বিচারের স্থলে ব্যভিচারের যে কিছু কিছু দৃষ্ট পরিদৃষ্ট হয়েছে, তার নজির যেমন আমরা একভাবে আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে পারি, তেমনি তাদের দান, যেমন—রেলপথ নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পৌরপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সৃষ্টি প্রভৃতি জনহিতকর মহৎ কর্মগুলিকেই বা আমরা বিস্মৃত হইব কেন? ইংরেজ-আমলের গোড়ার দিকে নদীয়ায় দুর্ভিক্ষ এসেছে, দস্যু-তস্করের অত্যাচারের সু-ব্যবস্থা হয়নি। একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও একান্ত সত্য যে, পরবর্তীকালে এই ইংরেজ শাসকেরাই হতশ্রী নদীয়ার লুপ্ত-সৌন্দর্য্যকে পুনঃ বিকশিত করবার এক বিশেষ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়। তার প্রমাণ কৃষ্ণনগর, চাঁদমারী (অধুনা কল্যাণী) ইত্যাদি স্থানে অদ্যাপিও বিদ্যমান।

অনেক দূরের পথ

(হান্স আণ্ডেরসেনের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কথামুখ

এমন কি, আজ পর্যন্ত ডেনমার্ক যেন এক রূপকথার দেশ।

ইতস্ততঃ ছড়ানো অসংখ্য দ্বীপ, আর সমুদ্রের রুপোলি-নীল কোমরবন্ধ। রঙিন প্রান্তর, বুনো জলাভূমি, আর হাওয়ার গান। কত যে কেল্লা আর পাথর-বিছানো উঁচুনিচু রাস্তা। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি-ঘরদোরের ভিড়। সব মিলিয়ে ডেনমার্ক। নিচু থামওয়ালা খামারবাড়ির সামনে উঠোন, আর বাড়ির ভিতরে উৎসব-সজ্জায় সাজানো বড়ো জলঘর গল্পের প্রাসাদের মতো যেন। তাদের প্রতিবিম্ব কাঁপে হ্রদ আর ঝিলের জলে থিরথিরিয়ে, যেখানে রাজহংসেরা শাদা জিজির শরীর ছুঁয়ে ভেসে বেড়ায়। স্টর্কপাখির বাসা, সোনালি কেশগুচ্ছ মাথায় ছেলেমেয়েরা, ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজা চলেছেন প্রজাদের মধ্য দিয়ে, শীতকালের ঘূর্ণিছড়ানো তুষারঝড়, গ্রীষ্মের উষ্ণ দীর্ঘ রাত্রি, অথচ, য-কোনো ভালো রূপকথার মতোই, ডেনমার্কও ব্যবহারিক জিনিস নয়ে মাথা ঘামায়। খাবারদাবারের অভাব থাকতে দেয় না দেশে। আর রাজধানী কোপেনহাগেন একদিকে যেমন ফুল-ফোয়ারা-আলোর শহর, তেমনি আবার তাকে বাইসিকেলের দেশ বলতেও কোনো বাধা নেই।

দিনেমাররা যে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে ভোলেনা কখনো, আর অবহেলা করেনা ব্যবহারিকতাকে, এ কথাটাই সবচেয়ে আগে উল্লেখ করবার। একদিকে যেমন অনেককালের পুরোনো কেল্লা প্রচুর আছে দেশে, তেমনি একালে তৈরি হচ্ছে কত ইস্কুল, কত হাসপাতাল, কলকারখানা। দিনেমারদের তৈরি মাখন, বেকন আর বিয়ারের কথা বলতে যাওয়া তো বাহুল্য মাত্র। হাইন্ত বেল সভ্যতার যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন, 'মধুর এক বিচারশক্তি আর মূল্যায়নের ক্ষমতা,' তা যদি মেনে নিই, তাহ'লে এই ছোটো দেশটিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে সভ্য বলবার কোনো বাধা থাকে না।

এর স্বপক্ষে অনেক অভিজ্ঞান দিতে পারে দিনেমাররা। সৌজন্য, বুদ্ধির প্রসার, আর নিঃস্বার্থের চেতনায় দক্ষণ ঐ দেশে সমবায় কৃষিকেন্দ্র সার্থক হয়েছে। রান্নাবান্নায় কোপেনহাগেনের তো বিশ্বজোড়া খ্যাতি। অথচ তাদের দৈনন্দিন জীবন এত সহজ সরল যে অন্য সব দেশকে তার তুলনায় মনে হয় ঘোরপ্যাঁচওয়ালা জটিল এক গোলকধাঁধা। বিদেশী কেউ ডেনমার্কে গেলে বই আর ফুলের দোকানের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হবে। রাস্তায় পুলিশম্যান তো বলতে গেলে থাকেই না। রাজারাণী অনায়াসেই রাস্তা দিয়ে নিরুদ্বেগে চলতে পারেন। চিড়িয়াখানার জীবকে লোকে যেমন ভাবে দেখে তেমনি ভাবে তো দূরের কথা কেউ তাঁদের দিকে তাকাবে পর্যন্ত না। আর সবচেয়ে আগেই এ কথা আমার বলা উচিত ছিলো—দিনেমাররা খেলাধূলো করতে জানে, যে গুণটি আজ পৃথিবী থেকে একেবারে অদৃশ্য হ'তে চলেছে। কোপেনহাগেনের প্রমোদ-উদ্যান টিভোলি লোকজনের কলহাস্যেই মুখর থাকে,—যন্ত্রের নাগরদোলা সেখানে আনন্দ সৃষ্টির ব্যর্থপ্রয়াসে ক্যাঁচক্যাঁচ করে না!

অতীত ইতিহাসের কথা যদি ওঠে তো ডেনমার্ক গর্ব করতে পারে অনায়াসে। ভাইকিং' হ'লো দিনেমারদের উৎসব। অরেসুণ্ডের এলসিনোরের—যার পাশ দিয়ে সারাদিন চলে জলপোতেরা—দাঁড়িয়ে আছে ক্রোনবার্গের কেল্লা। সেই কেল্লার ভিতরে, নিচে, মাটির নিচে রয়েছে গভীর অন্ধকার এক মণিকোঠা। কেউ কখনো পদার্পণ করেনা সেখানে। সেখানে ঘুমিয়ে আছেন হোলগের ডানকে, যাঁকে ডেনমার্কের সত্তা বলা হয়েছে ইতিহাসে। পরনে তাঁর লোহার বর্ম, দীর্ঘ বাহুযুগলের উপর বুকভরে শির বিন্যস্ত ক'রে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রু এসে ছুঁয়েছে মারবেল পাথরের টেবিল, তারপর যেন সেই টেবিল ফুঁড়েই বেড়েছে, বাড়ছে ক্রমাগত। ঘুমোচ্ছেন হোলগের, স্বপ্ন দেখছেন কী কী ঘটছে ডেনমার্কে। যদি কোনো দিন, আচমকা কালবোশেখির মতো, সত্যিকার বিপদ ঘনিয়ে আসে, বুড়ো হোলগের-এর ঘুম ভেঙে যাবে, জেগে উঠবেন তিনি, ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে মারবেল পাথরের টেবিল, ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে যখন তিনি তাঁর শ্মশ্রু টেনে তুলবেন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে; আর ডেনমার্কের স্বপক্ষে গ'র্জে উঠবে তাঁর গলা, ডেনমার্কের হ'য়ে তাঁর দুরন্ত এই লড়াই উপাখ্যান হবে পৃথিবীতে। এখনো সেই দুঃসাহসী সত্তা ঐ মণিকোঠায় ঘুমিয়ে আছেন; আজকাল তো আর ধূসর অতীতের অনিশ্চয়তা নেই, আজ তো ডেনমার্কের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা পরিষদ রয়েছে, তাই বুড়ো হোলগের জেগে উঠছেন না। প্রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের লড়াইও তাই নিতান্ত অবহেলায়; এমন কি ১৯৪০-১৯৪৫-এর বিক্ষুব্ধ দিনগুলি পর্যন্ত দাঁতে ঠোঁট চেপে কোনোরকমে সহ্য করেছে ডেনমার্ক, কেননা, চরম দুর্দিন না এলে তো আর ডেনমার্কের সেই দুরন্ত সত্তার ঘুম ভাঙানো যায় না। এত অল্প বিপদে কি আর তাঁকে জ্বালাতন করা যায়?

এই সব ছাড়াও আরেকটি জিনিস আছে; দৈনন্দিনের কর্কশ প্রহরের মধ্যেও আরেকটি আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে ডেনমার্ক সে হ'লো তার স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে। সে হাসি আবার অনেকটা হ্যামলেটের মতো, বিষণ্ণ, পীড়িত, ও অপার্থিব। শোনা যায়, তাদের গ্রীষ্মযামিনীর অভিজ্ঞতা যাদের নেই, যারা ডেনমার্কের 'de lyse Nœtter'-কে জানেনা, তারা কেউ দিনেমারদের কোনোরকমে বুঝতে পারবে না। এই 'de lyse Nœtter'-এর সঠিক তর্জমা হ'তে

পারেনা ব'লে বিখ্যাত অনুবাদক কাণ্ডয়িন লিখাও নিয়েছেন। তাঁর মতে সিনেমার কবিদের যেন রাত্রি তার বিশাল-নিরঙ্কার মাথা লঘুপ্রদোষবর্ণ নিয়ে ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয়।

'Fairy' যাকে বলে ইংরেজিতে, বাংলায় পরী—যাদের নিয়ে লেখা আখ্যানকে আমরা বলি রূপকথা—শিশুদের সহবাসেই তার কথা আমাদের মনে জাগে। তার আসল মানে আজ আমরা ভুলে যেতে বসেছি। পুরোনো ফরাশি শব্দ 'faerie' বা enchantment বোঝায়, যা এসেছে লাতিন 'fata' থেকে (যার মানে হ'লো things fated', কিন্তু যা স্ত্রীলিঙ্গ একবচনরূপে গ্রাহ্য), যার ইতালীয় প্রতিশব্দ হলে 'fata', স্প্যানিশ 'hada' এবং আলেমান 'fee' (এটা ফরাশি থেকে নেওয়া)—তাই থেকে 'fairy' কথার সৃষ্টি। যেন এই উত্তরে প্রদোষ একদা লোকগাথার গুহাবাসী অতিপ্রাকৃত জীব, অন্ধকারের প্রতিহারী বামন, মায়াবিনী ডাইনিদের দ্বারা জীবন্ত হয়েছিলো; একফোঁটা পান্নার মতো সবুজ রক্ত প্রত্যেক দিনেমারের ধমনীর চঞ্চল রক্তে আজো র'য়ে গেছে; আর যেন এরই সঙ্গে সৌষম্যসংযোগ করার জন্য ডেনমার্কের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেন রূপকথার রাজা: হান্স ক্রিস্টিয়ান আণ্ডেরসেন।

১৮৬৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ডেনমার্কের দ্বীপমালার মধ্যমণি ফিনের রাজধানী ওডেন্সে-র সিটি হলের উপরতলায় এক ভোজসভা চলছিলো।

যাঁর সম্মানে এই আয়োজন, তাঁর বয়স অনেক, বুড়ো বলা চলে তাঁকে, আর সহজেই তিনি তাঁর দৈর্ঘ্য আর হাত-পায়ের আকারের জন্য চোখে পড়েন; কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ এসে পড়েছে তাঁর চওড়া কপালে, এসে ছুঁয়েছে দুই উজ্জ্বল চোখের উপরকার বাঁকানো ভুরু। কোনো বিখ্যাত চিত্রকর লিখেছেন: 'লোকে তাঁকে কুশ্রী বলতেই অভ্যস্ত ছিলো আগে, কিন্তু শেষ জীবনে উন্নত ইচ্ছার বাহন তাঁর চেহারা এত সুন্দর হয়ে উঠেছিলো যে, পুরোনো অভ্যেস ভুলে গিয়ে, অনেকেই তাঁকে কুশ্রী বলতো না।' পরনে তাঁর পরিচ্ছন্ন কালো পোষাক, তাঁর শার্টের উপর বুকের কাছে সম্মানের অভিজ্ঞান: 'দি সুইডিশ অর্ডার অব দি নাইট অব দি পোলার স্টার.' 'দি হোয়াইট ফ্যালকন অব ভাইমার', 'দি রেড ঈগল অব প্রাশিয়া.' এমন কি সমুদ্র পেরিয়ে মেক্সিকো থেকে আসা 'দি অর্ডার অব আওয়ার লেডি ইয়াডালুপি।' দিনেমারদের সর্বোচ্চ সম্মানও তিনি পেয়েছেন সম্প্রতি, স্টেট কাউন্সিলার হয়েছেন, আর তাঁর সামনে, টেবিলের উপর এখন প'ড়ে আছে রাজার অভিনন্দন জানানো তার।

আসার দিন কোপেনহাগেন থেকে আসার সময় বিশপও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন, সঙ্গে ক'রে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেইদিন সকালবেলায় 'ফ্রীডম অব ওডেন্সে' উপাধি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁরই সম্মানে এখন গোটা শহর উৎসবের সাজে সেজেছে। সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ, কারণ তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য ডিসেম্বরের ছ-তারিখকে ঘোষণা করা হয়েছে লাল তারিখ ব'লে। আর এখন শেষ 'টোস্ট' সাঙ্গ হ'লো, হাত থেকে তিনি এইমাত্র নামিয়ে রেখেছেন শ্যাম্পেন-ভরা গেলাশ; সাঙ্গ হ'লো —[illegible]: তাঁকে অনুরোধ করা হ'লো খোলা জানলায় এসে দাঁড়াতে। আস্তে-আস্তে তিনি জানলায় এসে দাঁড়ালেন; একটু ঝুঁকলেন নিচের দিকে তাকাবার জন্য।

টাউন-স্কোয়ারের সিটি হল তার বিরাট শরীর নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার তিন দিকেই জড়াজড়ি ক'রে এ-ওর গায়ে ঝুঁকে প'ড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহুকালের পুরোনো বাড়িঘর। এক দিকে সেন্ট কনুডের গির্জে'র গম্বুজ মধ্য-নীল ছুঁয়েছে। সে-রাত্রে আলোর মালায় সেজেছে শহর: প্রতিটি বাড়ির জানলায় জ্বলছে সারি-সারি মোমবাতি আর দুয়ারে চিনে লণ্ঠন; স্কোয়ারের মধ্য থেকে একের পর এক হাউই, আতশবাজি আর ফানুস উঠে যাচ্ছে আকাশে; শোভাযাত্রা ক'রে আসছে রাজকীয় সেনাবাহিনী, হাতে তাদের দিনেমার জাতীয় পতাকা আর অনেক মশাল; তারপর এলো ওডেন্সে-র ছেলেমেয়ে সারি-সারি—তারা গান গাচ্ছে 'In Denmark I was born'—যে-জাতীয় স্তোত্র তিনিই তাঁর স্বদেশের জন্য রচনা করেছেন। 'না, এ বড়ো বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে'—মনে-মনে ভাবলেন আণ্ডেরসেন—'এত আনন্দ আমি সহ্য করবো কী করে? আনন্দের চাপে বুক যে চুরমার হ'য়ে যেতে চাচ্ছে।' আলোর শিখা আকাশ ছুঁয়েছে যেন, তাদের আলোয় তারাদের স্নিগ্ধনীল দ্যুতি ঢাকা প'ড়ে গেছে, আর রাতের হাওয়ায় ভর ক'রে স্পষ্ট ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের স্বচ্ছ, সুরেলা গলা—মনে হচ্ছে যেন সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

যোগ দেয়াটা অসম্ভব ছিলো না। যদি এই ছেলেমেয়েরা হ'তো চীনে কি জাপানি, কাফ্রি কি ফিক্র, গ্রীক কি ভারতীয়, মার্কিণ কি রুশ, ওলন্দাজ কি ইংরেজ—যদি সারা পৃথিবীর হ'তো তারা—তবে তারা একই ভাবে তাঁকে জানতো, বুঝতো, একই রকম আত্মীয় হ'তো তাঁর। আর, শুধু কি ছেলেমেয়েরাই? বয়স্করা বুঝি নয়? রাজারাণী থেকে শুরু ক'রে সবচেয়ে দরিদ্রজন, প্রত্যেকে—লেখক, গায়ক, শিল্পী, জ্ঞানী-গুণী—প্রত্যেকেরই তো প্রতিনিধি ওডেন্সে-র এই ছেলেমেয়েরা। অনেককাল আগে আণ্ডেরসেন লিখেছিলেন: 'কোনো ছোটোদেশে কবিকে গরিব হ'তেই হয়, আর তাই বুঝি খ্যাতির সোনালি পাখিকে সে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে।' নিজে সত্যি-সত্যি বিশ্বাস না-করেও সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন: 'সেই সোনালি পাখিকে ধরতে হ'লে এখন বুঝি কেবল রূপকথা লেখাই আমার বাকি—সাহিত্যের আর সব বিভাগেই তো পদার্পণ ঘটেছে আগে।'

রূপকথা! ছোটোদের জন্য রূপকথা লিখে পৃথিবীময় খ্যাতির আশা? এটা তো অসম্ভবই প্রায়, অবিশ্বাস্য! কিন্তু সত্য তো কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর, আর জীবন নিজেই তো সবচেয়ে আশ্চর্য রূপকথা, তাই এই অসম্ভবও ঘটলো, ঘটলো হান্স আণ্ডেরসেনের বেলায়।

সারা পৃথিবীতে আণ্ডেরসেন আজ নিজেই যেন এক রূপকথা তাঁর নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকের চোখে ধূসর দূরের এ[illegible] হাতছানি ভেসে ওঠে। 'আঃ', মনে-মনে মর্মর জাগে তখন 'সেই "জলকন্যাদের ছোটো বোন", "আঙুলিনা", "বুনো হাঁসের দল" আমাদেরই অংশ যেন এই রূপকথাগুলি, এদের ছাড়া আমরা [illegible]

সম্পূর্ণ হ'তে পারতুম না, আর তাই আমরা মনে রাখি না এগুলো লিখেছিলেন একজন পরিশ্রমী দিনেমার লেখক।

হান্স আণ্ডেরসেনের দেশেরই লোক ক্যাজ মুঙ্ক একদা মন্তব্য করেছিলেন, 'রচনা আছে দু' জাতের : সাময়িক ভাবে আনন্দ দেওয়া যাদের উদ্দেশ্য, যারা ক্ষণকালীন, আর হ'লো চিরকালেরই লেখা, যারা সপ্রাণ, সংরক্ত ও স্পন্দনময়, যারা আজীবন সঙ্গী হ'তে পারে মানুষের।' রূপকথা সাধারণত প্রথমোক্ত পর্যায়ের লেখা ব'লেই গণ্য হয়, কিন্তু হান্স আণ্ডেরসেন হ'লেন সেই বিরল লেখকদের একজন, যাঁর রচনা হ'লো চিরকালের অপরূপ কথা : একই কালে তারা ফ্যান্টাসি ও জীবন, সর্বজনীন ও চিরকালীন, স্পর্শ তাদের লঘু, নরম, অথচ গভীর।

আমরা যারা দিনেমার নই, আমাদের পক্ষে এটা বোঝা খুব কঠিন। বোধ করি আজ পর্যন্ত কোনো লেখকই অনুবাদকের হাতে এতটা বিকৃত হননি। আণ্ডেরসেনের নিজের লেখার মধ্যে চিত্রলতার সঙ্গে ছিলো শক্তির আর স্থিতির স্পর্শ, ছিলো এক ধরণের অদম্যতা, যা কখনো-কখনো এত নিষ্ঠুর এবং নির্মম যে হয়তো মোটেই ছোটোদের উপযোগী নয়। স্বচ্ছ ও ধারালো কৌতুকে আর বিদ্রূপে ভরা তাঁর লেখা ; সঙ্গে আছে তীব্র আবেগের স্পর্শ, যা কবিতার মতোই দ্যুতিময়, তীক্ষ্ণ ও গূঢ়মর্মী। অধিকাংশ ইংরেজি তর্জমাতেই —বাংলা তর্জমাতেও—এই স্বাদুতা, শক্তি, শুষ্ক কাঠিন্য ও গূঢ়ব্যঞ্জের স্পর্শ বিনষ্ট হয়েছে ; বরং ধারের বদলে এসেছে উচ্ছ্বাসের ভার ; কখনো-কখনো খণ্ডিত হয়েছে রচনা, কখনো বা বদলানো হয়েছে সমাপ্তি, কোনো-কোনো বাংলা অনুবাদে আবার শীতের দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়ে পটভূমি হয়েছে উষ্ণ জঙ্গল। বলতে গেলে তাঁর রচিত অঙ্গকলা তর্জমায় বজায় থেকেছে কদাচিৎ ; কিন্তু তবু যে-কয়েকজন বিরল অনুবাদক বিশ্বস্ততাকে ধর্ম ব'লে মেনেছেন, তাঁদের সাহায্য পেয়ে, আণ্ডেরসেনের সেই আশ্চর্য জাতের রচনার তর্জমা প'ড়ে পর্যন্ত তাঁকে আমরা ভুলতে পারি না। সেই মনীষীর উক্তি মনে পড়ে, যিনি বলেছিলেন, 'সেই রচনাই মহৎ, অনুবাদের মধ্যেও যা আমাদের মনের ভিতর আপেলের মতো পুষ্টি ও স্বাদ ছড়িয়ে দেয়।' এ-কথা দিবালোকের মতো স্বপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে বলতেই হবে যে, আণ্ডেরসেনের রূপকথা সেই মহৎ রচনার অন্যতম। বার বার তা পড়ি কবিতার মতো, গুনগুন করি মনে-মনে, নতুন-নতুন সংকেত বার করি প্রত্যেকবার, বার বার নতুন মর্ম আর প্রতিসাম্য, আর আপশোষ করি এই ভেবে যে, কেন দিনেমার হলাম না আমরা, দিনেমার হ'লে তো মূল আণ্ডেরসেন লালন করতে পারতুম সত্তায়। অনেক হাত-বদল হ'য়ে আসার পরও যা মৃত হয় না, আণ্ডেরসেনের সেই কবিতার সংস্পর্শ তো আরো গভীর হ'তে পারতো তাহলে আমাদের সঙ্গে।

শার্লপেরো, গ্রিমভ্রাতা কি আমাদের দেশের উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন কি ত্রিভঙ্গ রায়ের রূপকথা—সত্যি বলতে কি—এত আলোড়িত করে না আমাদের, মনেও থাকে না আমাদের, যেমন থাকে আণ্ডেরসেন, অস্কার ওয়াইল্ড, ত্রৈলোক্যনাথ কি অবনীন্দ্রনাথ। শত বর্ষ আগে রচিত হ'য়ে আণ্ডেরসেনের রূপকথার যত বিক্রি হয়েছে, তত বোধ হয় আর কোনো গ্রন্থ হয়নি ; সময়ের হিসেব ধরলে বাইবেলও না, সেক্সপীয়রও না, বুনিওনের 'তীর্থযাত্রীর সম্মুখযাত্রা'ও না। প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় তিন সহস্রাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থের। এমন কথা আমি বলতে চাচ্ছি না যে, কেবল এটাই হ'লো তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ; কেননা এমন প্রমাণ ভূরি-ভূরি উদ্ধার করা যায়, যা দিয়ে বোঝানো যায় যে, কেবল বিক্রি দিয়েই বইয়ের ভালো-মন্দ বোঝা যায় না। বরং বলতে চাচ্ছি যে, এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আণ্ডেরসেনের রূপকথা সত্যিই মহৎ। পৃথিবীর সব দেশ থেকে লোক আসে তাঁর জন্মভূমি ওডেন্সেয়, আজ যা তীর্থস্থানের মতো। ছোট দেশ ডেনমার্ক আণ্ডেরসেনের শিক্ষায়, ভ্রমণে, জীবনধারণে যত অর্থ ব্যয় করেছিলো, তার বহু লক্ষগুণ প্রতিদান পেয়েছে আজ পর্যন্ত। আণ্ডেরসেনের গবেষণায় কতজনে আজীবন ব্যয় করেছেন ; সেই জাপানি অধ্যাপক যিনি মূল আণ্ডেরসেন পড়ার জন্য বৃদ্ধ বয়সে দিনেমার ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁর নাম তো অনেকেরই জানা ; আর ডেনমার্কে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিনেমারদের বলেছিলেন : "Why you need so many subjects? You need only one Andersen."

কোপেনহাগেনের কিংসগার্ডেনে হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেনের মর্মরমূর্তি আছে ; রোজেনবার্গের সেই পুরোনো, রোমান্টিক কেল্লাকে ঘিরে সেই কিংস গার্ডেন, হাওয়ারা সেখানে যেন সব সময়েই এলোমেলো, চিরকাল সেখানে ছোটোরা খেলাধুলো করে, যোলো শতকের তৈরি সেই কামানটার বড়ো, সাদা, মারবেল পাথরের গোলাগুলির আড়ালে, এপাশে ওপাশে, তাদের লুকোচুরি খেলা চলে। আণ্ডেরসেন বই পড়ছেন, মর্মর মূর্তিটা এমনি অবস্থায় ; এমনভাবে তৈরি, যেন মনে হয়, বই পড়তে-পড়তে কথা ব'লে উঠবেন এক্ষুণি, বলবেন 'লাল জুতো' কি সেই ছোট মেয়েটির গল্প, যে দেশলাই বিক্রি করতো। আর মর্মর-মূর্তির ভিত্তিভূমির গায়ে খোদাই-করা আরেকটা ছবি, 'বজ্জাত হাঁসের ছানা' গল্পের ছবি, ঠিক সেই মুহূর্তের ছবি, যখন রূপান্তর ঘটছে কুৎসিত হাঁসের, তার সত্যিকার আকার নিচ্ছে সে, নিয়ে তাকাচ্ছে জলের আয়নায়, আর তারপর চমকে আবিষ্কার করছে যে সে আসলে হ'লো অপরূপ এক রাজহাঁস, রূপোলি তার বিশাল ডানা ছড়িয়ে পড়ছে দু-ধারে, যেন সে এক্ষুণি সাঁতার কাটবে স্বচ্ছস্ফটিক জলে।

আণ্ডেরসেনের জীবনে সুখী, উজ্জ্বল, বিজয়ী দিন এসেছে, কিন্তু ওডেন্সের দীপালির সঙ্গে কোনোকিছুরই তুলনা হয় না। 'গাঁয়ের সন্ন্যেসীর ভিক্ষে মেলে না' কথাটা মিথ্যে হ'লো এই প্রথম, কারণ আণ্ডেরসেনের জন্ম তো হয়েছিল ওডেন্সেই। গরীব জামাকাপড় গায়ে, কাঠের জুতো পায়ে, একদা এই স্কোয়ারেই শীতে কাঁপতে-কাঁপতে তাঁর মনে হয়েছে রক্ত বুঝি জমে গেলো, বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে শরীরের ভেতরে, ঠোকাঠুকি হচ্ছে হাড়ে-হাড়ে, এবং তখন তিনি তাকিয়েছেন আশেপাশের বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে ভিতরের উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, আর বাসনা তাঁকে আলোড়িত করেছে ; আলো ঝলমল সেন্ট কানুডের গির্জের ঝিঁঝিঁর মতো আশ্রয় নিয়েছেন তখন, শিক্ষানবীশ হিসেবে দর্জিদের সংস্থায় কতকাল যে তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এখন যে-ঘরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার কাছেই আজকের মশাল-জ্বালানো ওডেন্সের সব চেয়ে গরীব রাস্তায়, ভাঙাচোরা এক বাড়িতে কেটেছে তাঁর শীতের রাত।

প্রায় বাট বছর আগে এক বুড়ি তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো, আর তাঁর বাবামশাই তখন যে কথা শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন, কিন্তু হান্সের মা মনে মনে গম্ভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন ঐ বুড়ি স্ত্রীলোকের উজ্জ্বল উক্তিকে, কারণ এই বয়েসের তুলনায় বড়ো, কুৎসিত ছেলেটার মাথায় এমন সব অপরূপ স্পর্ধাকাতর ভাবনা জাগে মাঝে মাঝে যা তাঁর কাছে মনে হ'তো উদ্বেগের ধুকপুকির মতো, কিংবা হেঁয়ালির বিমূঢ়তার মতো। যখনি কেউ ভাবতে চেয়েছে বড়ো হ'য়ে কী করবে হান্স, সেদিনকার সেই কুৎসিত ছেলেটি উচ্চারণ করেছে: 'আমি বিখ্যাত হবো,'—যা, এক অর্থে, কী হাস্যকর যে ছিলো তখন।

কিন্তু সেই বুড়ি স্ত্রীলোকটি তাঁর সেই উক্তিকে সমর্থন করতো। 'উপযুক্ত না-হ'লেও অনেক খ্যাতি পাবে সে চারদিক থেকে,'—রাগের গলায় বলতো বুড়ি; তার এতটা রাগের কারণ, বাবার মতো ছেলেও তাকে সবসময় খোঁচা দিয়ে কথা বলে কি না; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তো আর নিজের কথা ফিরিয়ে নিতে পারে না, তাই বলতো, 'হান্স বড়ো হ'লে মস্ত এক বুনো পাখি হবে—পৃথিবীর অনেক উপরে, আকাশের মধ্যনীল ছুঁয়ে, সোনালি ডানা ছড়িয়ে মহৎ গৌরবে উড়বে সে,'—তারপর সে যোগ করতো,—'আর, একদিন সমস্ত ওডেন্সে তারই জন্য আলোর মালায় সাজবে।' হান্সের মা সর্বত্র এ-কথা ব'লে বেড়াতেন ব'লেই লোকেরা এ-কথা জানতে পেরেছিলো, আর এই বাট বছর যে তারা এ-কথা মনে ক'রে রেখেছে তার প্রমাণ তো আজকের এই লাল তারিখ: ৬ ডিসেম্বর, ১৮৬৭।

জানলায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন হান্স। স্নায়ুর ভিতরে সকাল থেকেই তীব্র উত্তেজনা আলুথালু হ'য়ে উঠেছিলো, তাই, তারই দরুণ, সারা সন্ধ্যেবেলা তাঁর ভয়ানক দাঁত ব্যথা করছিলো; ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা, কনকনে, পাঁজরায় ছুরি-চালানো হাওয়া আরো মারাত্মক হ'য়ে উঠেছে যেন এখন; আর, এই কারণেই, বার বার তিনি নিজেকে বোঝাতে পারলেন যে, যা এখন চোখের সামনে দেখছেন, তা স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয় সেই ছোটো দেশলাইওয়ালির অপরূপ দর্শনের মতো, বরং সত্যি, ভয়ংকর রকম সত্যি, যেমন সত্যি ছিলো সেই ছোটো মেয়েটির স্বপ্নের অন্তঃসার, অন্তঃসারের সৌরভ, সৌরভের উন্মাদনা।

লোকজনের উচ্ছল গলা ভেসে আসতে লাগলো তাঁর কানে। আলোর ঝলোমলো শিখা আর হাউইয়ের কম্পিত নানান রঙ ফোয়ার থেকে উঠে আকাশ ছুঁয়েছে। তাঁর চারদিক থেকে এখন দাঁড়িয়ে আছেন মেয়র, বিশপ এবং আরো কত গণ্যমান্য জন। তাঁর বুকের উপর সম্মানের অভিজ্ঞান সোনালি তারাগুলি ঝলসে উঠছে এখন রংমশালের আলোয়, হাতে তাঁর রাজার পাঠানো তার। আঠারোশো পাঁচ সালের এপ্রিল মাসের দুই তারিখের সেই ছোট্ট, স্যাঁৎসেঁতে, ভাঙাচোরা ঘর থেকে আজকের দিন অনেক, অনেক দূরের পথ। [ক্রমশঃ।

নিঃসঙ্গিনী তুলে শস্য

[*William Wordsworth*-এর 'The Solitary Reaper' অবলম্বনে]

চেয়ে দেখো, একাকিনী প্রান্তরে,
ঐ যে সঙ্গিহীনা পার্বত্য বালিকা।
কাটিছে শস্য গাহিছে গান আপন মনে;
থেমে যাও ক্ষণিক, কিম্বা চলে যাও ধীরে।
একাই কাটিছে আর বাঁধিছে শস্যগুচ্ছ,
গাহিছে গান সকরুণ তান;
কান পেতে শোন তুমি,
প্লাবন এনেছে সারা উপত্যকা ভূমি।

কোনো বুলবুল গাহেনিকো গান
এমনি শান্ত করিতে শ্রান্ত-পথিকের প্রাণ
আরব মরুর প্রান্তে আসি
ছায়াঘন মরূদ্যানে বসি।
এমনি শিহরণ জাগেনিকো আর
বসন্তের কোকিলের সুমধুর তান
ছিন্ন করিতে নীরবতা সমুদ্রের শুধু—
সুদূর হেব্রিডিসে বসি কেহ শুনেনিকো কভু।

কেহ কী বলিবে আমায়, কি গান সে গায়।
সকরুণ গীতি যেন প্রবাহিয়া যায়।
স্মরিয়া বিষাদঘন অতীতখানি,—
হয়তো হবে কোনো সমর কাহিনী।
তবে কী গায় সে সরল চলিত গাথা,
কিম্বা আজিকার এতোটুকু ব্যথা?
অতীতের দুঃখ-ক্ষতি অন্তরের বেদনা
আবার ঘটিতে পারে হেন সম্ভাবনা?

জানি নাকো কি গান এ বালিকা যে গায়,
মনে হয় গান শেষ হবে নাকো হায়।
কাজ করে আর গান গেয়ে যায়
ঝুঁইয়ে পড়ে কাস্তে চালায়।
কান পেতে শুনি আমি,
ভাবে বিমুগ্ধ কখন গিয়েছি যে আমি।
পাহাড়েতে উঠে গেলাম—গেলাম বহুদূর,
হৃদয়ে গাঁথিয়া নিলাম অজ্ঞাত সে সুর।

অনুবাদক—অমূল্যচন্দ্র ঘোষ

বিস্কুট
লজেন্স
এবারে
কোলে
টফি
ডি লুক্স
দুধ ও মাখন দিয়ে তৈরী
সুমধুর স্বাদে এমনটী আর হয়নি
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ · কলিকাতা-১০

গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গ

শ্রীমতী দীপালী দে

অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর একান্ত প্রয়োজন। সে পথ অতি দুরূহ—তাই তো—কঠ বলিয়াছেন—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কঠ ১।৩।১৪

গীতাতেও শ্রীভগবান এই তত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। গীতা ২।২৯

সুতরাং কঠ-উক্ত 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' (১।৩।১৪) ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।—

গুরু শব্দের অর্থ—গু=অন্ধকার এবং রু=প্রকাশ। যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোকে শিষ্যের চিত্ত উদ্ভাষিত করেন এবং তাহার স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক হ'ন, তিনিই গুরুপদবাচ্য।

বিশসার তন্ত্রেও সেই একই কথা ধ্বনিত হইয়াছে—

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞান-ধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।

এই আত্মতত্ত্বের বিষয় জানিতে হইলে প্রথমেই গুরুর কাছে করিতে হইবে আত্যন্তিক আত্ম নিবেদন। ইংরাজিতে ইহাকেই বলে 'Unconditional and complete Surrender'। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুন কত বড় বড় প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ সে সব সমস্যার সমুচিত উত্তর যেন ইচ্ছা করিয়াই পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অর্জ্জুনের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্', অমনি দেখা যায়, প্রিয় শিষ্যকে কত স্নেহে ও যত্নে শিক্ষা দেবার শ্রীভগবানের কি আকুল প্রয়াস।

শিষ্যের এই আত্যন্তিক আত্মনিবেদনের প্রতিধ্বনি পাই—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ।' গীতা ৪।৩৪

যাঁহার কাছে শুধু ব্রহ্ম সত্য সেই শঙ্করও বলিয়াছেন—'সকল ভূতের সহিত অদ্বৈত কিন্তু গুরুর সহিত নহে'।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—কাহাকে গুরুরূপে বরণ করা যায় অর্থাৎ সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি হওয়া উচিত। উপনিষদ্ কৃপা করিয়া এই সমস্যারও মীমাংসা করিয়াছেন—

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণি শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' মুণ্ডক ১।২।১২

অর্থাৎ গুরু হইবেন বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শিষ্যেরও চাই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'গুরু কে?' 'শ্রোত্রিয়ঃ, অবৃজিনঃ, অকামহতঃ যঃ ব্রহ্মবিত্তমঃ'।

কঠ বলিয়াছেন—

'আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।' ১।২।৭

অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্বের বক্তা (গুরু) আশ্চর্য্য বা অসাধারণ হইবেন এবং জ্ঞাতা (শিষ্য ও) হইবেন আশ্চর্য্য বা কুশলী। এই বিষয়ে বিবেকানন্দজীর উক্তিও মনে রাখার মত 'The person from whose soul such impulse comes is called the 'Guru'—The teacher, and the person to whose soul the impulse is conveyed is called the 'Sishya'. To convey such an impulse to any soul in the first place. the soul from which it proceeds must posses the power of transmitting it, as it were, to another; and, in the second place, the soul to which it is transmitted must be fit to receive it. The seed must be a living seed and the field must be ready, ploughed; and when both these conditions are fulfilled, a wonderful growth of genuine religion takes place.'

এই অপরূপ মণিকাঞ্চন যোগ দেখিতে পাই গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শিষ্যরূপী নরেন্দ্রনাথের মধ্যে। এস্থলে উভয়েই আশ্চর্য্য।—

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটিতে ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের মিলন ঘটে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। ঠাকুর তাঁহার অন্তর-দৃষ্টির সাহায্যে প্রথম সাক্ষাতেই বুঝিতে পারেন যে, এ আধার আশ্চর্য্য। তাই বুঝি নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন তখন ঠাকুর অতি স্নেহের সুরে বলিয়াছিলেন—"এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি, তা কি একটিবারও মনে কর্তে নেই? বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার ঠোঁট যে পুড়ে যাবার মত হয়েছে··তুমি সেই পুরাতন ঋষি নরনারায়ণের,

জীবের দুর্গতি নিবারণের জন্ত তোমার শরীর ধারণ হয়েছে"... ইত্যাদি বাৎসল্য-প্রেমে বিগলিত হইয়া—'ওরা খাবে এখন, তুমি খাওনা', বলিয়া স্বহস্তে মাখন মিছরীটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলেন।—তাহার পর নরেন্দ্রনাথকে আর একদিন একলা আসিবার জন্ত কি আকুল মিনতি।—

মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং॥ মু ১।২।১৩

প্রশান্তচিত্ত, সংযত-ইন্দ্রিয় নরেন্দ্রনাথকে তাই ঠাকুর প্রথম সাক্ষাতেই এত ভাল বাসিয়া ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত অতি উচ্চ ছিল। কলিকাতার মত স্থানে এমন সত্ত্বগুণী আধারও থাকিতে পারে ভাবিয়া ঠাকুর বিস্মিত হইয়াছিলেন। সর্বসমক্ষে তাঁহাকে আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী, নিত্যসিদ্ধের থাক্, খাপ-খোলা তলোয়ার, অখণ্ডের ঘর ইত্যাদি বলিতে ঠাকুরের একটুও বাধিত না, কারণ তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, নরেনের মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তাহাতে এই সমস্ত প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করিলেও তাঁহার সংস্কারশূন্য মনে কোনও গর্বোদ্রেকের আশঙ্কা নাই।—গীতার (৪।৩৮) "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" স্মরণ করিয়াই বোধ হয় ঠাকুর বলিয়াছিলেন—ও যদি শোর গরুও খায়, কোন দোষ হবে না। ঠাকুর কামনা বিজড়িত ভক্তপ্রদত্ত অন্ন নিজে খাইতেন না, কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াইতে তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না। শিশু সুলভ সরলতার সহিত ঠাকুর ভক্তদিগের কাছে বলিতেন—"দেখ নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায়, জিতেন্দ্রিয়; বলেছে বিয়ে করবে না; ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরে মন....।

এর পর দেখা যায় ঠাকুরের তাঁহার প্রতি একটানা ক্রমবর্দ্ধমান্ প্রেম।—নরেনকে কয়েকদিন না দেখিলেই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন।—একবার পরীক্ষার জন্ত ব্যস্ত থাকায় নরেন সে সময় তাঁহার কাছে বেশী যাইতে পারিতেন না। তাই তিনি স্বয়ং তাঁহার 'টঙে' উপস্থিত হন, সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন গামছায় বাঁধিয়া সন্দেশ। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে তাঁহার অনুযোগ—'কেন এতদিন আসনি', 'নরেন্দ্রকে দেখবো বলে বসে বসে কাঁদতুম', 'প্রাণটা হাঁকুপাঁকু করে', 'সময় সময় এমন যন্ত্রণা হোত যে, মনে হোত বুকের ভেতর কে যেন গামছা নিংড়োবার মত জোর করে নিংড়োচ্ছে'; 'ঝাউতলায়
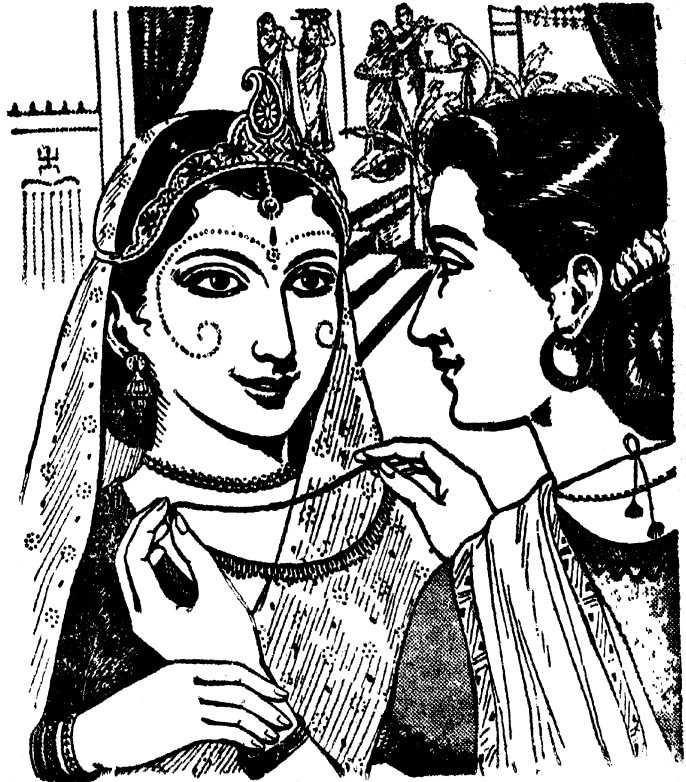
গিয়ে চীৎকার করতুম ওরে তুই আয়, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না'—প্রভৃতি ঠাকুরের উক্তি থেকে তাঁহার প্রেমের গভীরতা সহজেই অনুমেয়। তিনি জানিতেন, নরেনের দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইবে। তাই তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'মা ওর বিয়ে টিয়ে ঘুরিয়ে দে'। তিনি বলিতেন 'কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেন্দ্রের সে রকম আঠারটা শক্তি আছে।' নরেন্দ্রনাথ একবার শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবিয়া থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে…তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস'? নরেনের মধ্যে পূর্ণ অদ্বৈতের সংস্কার দেখিয়া তিনি মার কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'মা ওর মধ্যে একটু মায়া প্রবেশ করাইয়া দে'। তিনি একথাও বলিতেন যে, নরেন্দ্র যেদিন জানিবেন উনি কে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি, সেদিন আর তিনি দেহ রাখিবেন না। মায়ার লেশ না থাকিলে তাঁহার পক্ষে লোকহিতকর কার্য্য অসম্ভব বুঝিয়া ঠাকুরের এইসব উক্তি।—নরেন্দ্রনাথ একদিন নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন—'আমার শরীর কোথায় গেল'? ঠাকুর শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ, ওর জন্য আমায় বড় জ্বালাতন করে তুলেছিলি।' পরে নরেনকে বলিয়াছিলেন—'চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব'।—তাঁহার শক্তির প্রতি ঠাকুরের এরূপ উচ্চধারণা ছিল যে, তিনি তাঁহার কপালের কাটা দাগ দেখাইয়া বলিতেন 'যদি সেদিন ঐ রকমে ওর শক্তি না কমে যেত তাহলে যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট পালট করে ফেলত।'

শিষ্য তিন প্রকার—(১) উত্তম, (২) মধ্যম এবং (৩) অধম। বহিরঙ্গ গুরুসেবা অপেক্ষা অন্তরঙ্গ গুরুসেবারই উপর উত্তম শিষ্যের লক্ষ্য থাকে বেশী। অবশ্য প্রয়োজন হইলে তিনি বহিরঙ্গ সেবা করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। ঠাকুর বলিতেন—'তোর পথ আলাদা।' বহিরঙ্গ সেবা যথা হস্তপদাদি ধৌত করা, উচ্ছিষ্ট ভোজন প্রভৃতি তিনি কখনও নরেনকে করিতে দিতেন না। অথচ ঠাকুরের অসুখের সময় নরেন্দ্র তাঁহার পুঁজরক্ত মিশ্রিত গয়ার খাইতে উদ্যত হইয়া এই কথাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনবোধে উত্তম শিষ্য বহিরঙ্গ সেবার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে।

ত্রিতাপ হইতে শিষ্যের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই সদ্গুরুর একান্ত লক্ষ্য। জাগতিক উন্নতি বিষয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকেন না। তাই দেখি, প্রিয়তম নরেনের নিদারুণ অর্থকষ্টের দিনেও, তাঁহার বহু অনুরোধ সত্বেও ঠাকুর মাকে ইহার প্রতিকারের জন্য কিছুই জানান নাই। বরং নরেনকেই পাঠাইয়াছিলেন স্বয়ং প্রার্থনা করিবার জন্য। শুদ্ধাধার নরেনও তিনবার চেষ্টা করিয়াও প্রতিবারেই শুধু জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চাবস্থা দেখিয়া ঠাকুর শেষবারে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'মার ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট থাকবে না।' নরেন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এত উচ্চ ছিল যে, তাঁহার কাছে প্রিয়শিষ্যের চরিত্র সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওর দ্বারা জীবনে কখনও কোনও মন্দ হইবে না।'

নরেন্দ্রকে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'তুই জ্ঞানী ও ভক্ত দুই হ।' দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি ঘন ঘন তাঁহাকে কাছে ডাকিতেন। 'আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম'—এই উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁহার অপার আনন্দের ইঙ্গিত। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে সকলের ভার তিনি তাঁহার উপর দিয়া যান। নরেন প্রথমে স্বীকৃত না হওয়ায় বলিয়াছিলেন, 'তোর ঘাড় করবে।'

দেহত্যাগের পরেও বুঝি এই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই। নরেন্দ্র গাজিপুরের পাওহারী বাবার নিকট দীক্ষা লইতে মনস্থ করিলে তিনি কয়েকদিন যাবৎ দেখেন যে, ঠাকুর যেন ছল ছল চক্ষে বিষাদমাখা মুখে চাহিয়া আছেন। তখন তিনি সে সংকল্প ত্যাগ করেন। আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে তিনি ও শ্রীমা যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, গুরু-শিষ্যের প্রীতির সম্বন্ধ শুধু এই মর জীবনেই সীমাবদ্ধ নহে।

নরেন্দ্রনাথ ছিলেন চির আত্ম-বিশ্বাসী। ছোট হইতেই তিনি বিবেকের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। তিনি ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে তাঁহাকে জীবনসর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন।—প্রথম প্রথম তাঁহাকে অনেকটা অর্দ্ধোন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি অকপটে ঠাকুরকে একথাও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই—"হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক,—আমার যতক্ষণ সত্যি বলে না বোধহয় ততক্ষণ কিছুই বলব না"; 'রূপ-টুপ আপনার খেয়াল'…ইত্যাদি। প্রথম স্পর্শে যখন নরেনের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে থাকে তখন ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন যে ঠাকুর সম্মোহন বিদ্যা জানেন।—ইহার মধ্যে অবশ্য কোথাও কোনও ঔদ্ধত্য ছিলনা। সুযোগ পাইলেই তিনি ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। সুপ্ত ঠাকুরের বিছানায় টাকা রাখিয়া তিনি যখন দেখিলেন সত্যই তিনি 'জ্বলে গেল, জ্বলে গেল' করিয়া জাগিয়া উঠিলেন তখন তাঁহার বিশ্বাস ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যখন 'ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন কিনা' এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই অথচ এক নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ—'হ্যাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি' এই কথা সরলভাবে বলিলেন তখন নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন 'এ বড়ো আশ্চর্য্য'। ঠাকুরের অবতার-তত্ত্বেও তাঁহার সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথের মনে এই সন্দেহ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অন্তর্য্যামী ঠাকুর 'এখনও তোর জ্ঞান হোল না…যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ'…ইত্যাদি উচ্চারণ করায় তাঁহার সন্দেহের লেশটুকু চিরতরে ধুইয়া যায়। পরবর্ত্তী জীবনে ভাস্করানন্দজীর সহিত তর্কে তিনি জোরের সহিত বলিয়াছিলেন যে, জীবনে তিনি এমন একজনকে দেখিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণ কামিনী-কাঞ্চনের পাশ হইতে মুক্ত। তিনি একথাও বলিতেন—'অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।' ঠাকুরের জীবন্মুক্ত অবস্থার কথা আমেরিকায় বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

'In the presence of my master, I found out that man could be perfect, even in this body.

(My Master)

অথর্ববেদীয় শান্তিপাঠ—'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।'—এই উক্তির অভিব্যক্তি ঠাকুরের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'Those lips never cursed any one, never criticised any one, those eyes were beyond the possibility of seeing evil, that mind had lost the power of thinking evil.' তাঁহার আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠা ধ্বনিত হইয়াছে পরবর্ত্তী কয়েক ছত্রে—

'If there has ever been a word of truth, a word of spirituality, that I have spoken anywhere in the world, I owe it to my Master, only the mistakes are mine.'

সরসী বাঈ

শ্রীমতী সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুপথগামিনী সরসী বাঈ-এর মুখে ফুটে ওঠে একটা শিথিল করুণ হাসি। অল্প টাকায় ভাড়া করা স্যাৎসেঁতে একটি ঘরে শুয়ে আছে সরসী বাঈ। ঘরে আসবাব-পত্র বলতে একটি ছোট খাট, অনুরূপ একটি আলমারী ও একটি টি-পয়, টি-পয়টিতে ছোট বড় নানা আকারের ঔষধের শিশি পত্র সাজান। দেওয়ালে একপাশে ঝোলানো রয়েছে ঘুঙুরের জোড়া, নীল-কাপড়ের ঢাকা পরাণ সারেঙ্গী ও তানপুরা। ঘরের এককোণে ছোট একটি জল-চৌকীর উপর একটি হারমোনিয়ম বাক্স। বাইরে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও ঝড়ের তাণ্ডব মাতামাতি। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ও মেঘ ডাকার গুরু গুরু শব্দ। ঠিক এমনই একটি দুর্য্যোগের রাত্রির কথা মনে পড়ে যায় সরসী বাঈ এর; সরসী বাঈ-এর মা রুমেলা বাঈ সেকালে গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠা রূপসী বলে বাঈ মহলে খ্যাত ছিলেন। সরসী যখন ছোট ছিল তখন ওস্তাদের কাছে নাচ গান শিখত বাড়ীতে। তারপর একটু বড় হলে মায়ের সঙ্গে মুজরোয় যেত। একদিন কুমার বাহাদুর খুদাবক্সের বাড়ীতে গিয়েছিল সরসী বাঈ তার মা রুমেলার সঙ্গে। কুমার বাহাদুর বসে আছেন দামী ফরাসের উপর, দু পাশে মোসাহেব ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা। আতর গোলাপজল ও সুগন্ধি ফুলের তোড়ার ছড়াছড়ি। সরসী-বাঈ তার মায়ের সঙ্গে বেহাগ সুরে গান ধরল "ক্যায়-সে যাঁউ যমুনাকে তীর"। গানের তালে তালে দুলে উঠল সরসী-বাঈ এর জাফরাণী রঙের ঘাগরা, জরী জড়ান মুক্তার ফুল আটকান বেণী, চোখে মদির ভাবালস চাউনী ও শুভ্র মরালের মত পেলব বাহুদুটি অঙ্গভঙ্গী সহকারে এক মোহের সৃষ্টি করল। বিভোর হয়ে নাচ্‌ছে সরসী বাঈ, হঠাৎ এক সময় কুমার বাহাদুরের চোখে চোখ পড়তে শিউরে উঠল সে। কুমার বাহাদুরের চোখ দুটি কামার্ত্ত হিংস্র শ্বাপদের মত জলছে। সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্ত ঘুঙুরের তালও বুঝি কেটে গিয়েছিল সরসী বাঈ-এর। রুমেলার এখন পড়ন্তি বয়স। তবুও যৌবনের রূপ ও খ্যাতির কথা স্মরণ করে দুই এক জায়গা থেকে ডাক আসে তার। দু এক খানা গান গেয়েই রুমেলা সেদিন চলে গিয়েছিল। নাচ শেষে অনেক রাত্রে সরসী বাই এর ডাক এসেছিল কুমার বাহাদুরের খাস কামরায়। কুমার বাহাদুরের ঘৃণিত আহ্বানে ও ক্ষুধার্ত্ত আক্রমণে ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেলেও, প্রাণপণ শক্তিতে সরসী বাধা দিতে চেয়েছিল। দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল "ছুঁ না মত।" শেষ রাত্রে যখন বাড়ী ফিরল তখন তার সব কিছুই হারিয়েছে সে। ছেঁড়া কাঁচুলী ও ওড়নাটা বুকে চেপে ধরে সেদিন অঝোরে কেঁদে ছিল সরসী বাঈ। তার পর এক বছরের মধ্যে কোলে এল কুমার বাহাদুরের সন্তান রোশনী। রোশনীর জন্মের কিছুকাল পরে রুমেলা বাই এর মৃত্যু হয়। রোশনীকে পরিচারিকার কাছে রেখে সরসী বাঈ মুজরোয় যেত। এই ঘটনার পর আরও দুই একবার কুমার বাহাদুরের বাড়ী মুজরোয় গিয়েছিল সরসী। হাব্‌ ভাবে দুই একবার মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিল পূর্ব্ব স্মৃতি। রোশনীর মুখ চেয়ে কুমার বাহাদুরকে নিজের অজান্তেই ভালবেসে ফেলেছিল সরসী। কুমার বাহাদুর তখন লক্ষ্ণৌ-এর মেহের: বাঈকে নিয়েই ব্যস্ত। অন্যদিকে চোখ দেবার সময়ই বা কোথায়! তবু ও আশা ছাড়েনি সরসীবাঈ। একদিন সুযোগ মত কুমার বাহাদুরকে জানিয়েছিল রোশনীর কথা। নিজের প্রেমও জানিয়েছিল অকুণ্ঠ ভাবে। পরিবর্ত্তে কুমার বাহাদুরের মুখ থেকে শুনেছিল রূঢ় কঠিন প্রত্যাখ্যানের ভাষা। "নটীর সন্তানের আবার পিতৃপরিচয় কি? অমন আমার কত সন্তান নাম গোত্র হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" নিজের সঞ্চিত ভালবাসা ও চরম অপমান সরসী বাঈকে আরও নীচ হীন প্রবৃত্তিতে নামিয়ে নিয়ে গেল। সুরসাধিকা সরসী বাঈ হল দেহ-পসারিণী সরসী বাঈ। রোশনী মায়ের কার্যকলাপ কিছুই জানতে পারত না। সে চিনত তার শুদ্ধাচারিণী সুর সাধিকা মা সরসী বাঈকে। রোশনীর বড় ঝোঁক স্কুলে পড়ার। মেয়ের পীড়াপীড়িতে সরসী বাঈ মেয়েকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। বেশিদিন তাকে স্কুলে যেতে হলনা, একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে কেঁদে পড়ল রোশনী। স্কুলের মেয়েরা তাকে দেখে মুখ মচ্‌কে হাসে, তার মা সরসী বাঈ এর কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। সব শুনে সরসী বাঈ সেদিন পাথর হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের নাম কাটিয়ে লক্ষ্ণৌ এর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়েছিল রোশনীকে। সেখানে হয়ত তার মার নাম নিয়ে কেউ হাসাহাসি করবে না। সরসী বাঈ-এর ইচ্ছা রোশনী লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়। নিজের জীবনের মত রোশনীর জীবনটা যেন বয়ে না যায়। এই ঘটনার পর বহুদিন অতীত হয়ে গেছে। সরসী মাঝে মাঝে টাকা পাঠান ছাড়া মেয়ের আর খোঁজখবর বিশেষ রাখেন না। রোশনী এখন স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে। মায়ের ঠিকানা সে জানে না। মেয়ের প্রসঙ্গে যদি মায়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, এই আশঙ্কায় সরসী নিজের কোন পরিচয় বা ঠিকানা পাঠাতেন না। ইদানীং সরসী বাঈ বৃদ্ধা ও রোগজীর্ণা হয়ে পড়েছেন, একটি পরিচারিকা

সর্বদা দেখাশুনা করে। অতীতের মধুপায়ী সঙ্গী-সাথীরা মধু নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথে অন্ত ফুলে গিয়ে বসেছে। অতীতের কথা স্মরণ করে সরসী বাঈ-এর রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফুটে ওঠে একটা শিথিল করুণ হাসি। হঠাৎ চমক ভাঙে পরিচারিকা আমিনার ডাকে। 'আম্মি, সাঁঝ কো বাত্তি লাগা দি?' দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার তখন ঘরখানাকে গ্রাস করেছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও মেয়েদের কর্ম্মসম্ভাবনা

শ্রীমতী নির্ম্মলা সরকার

আমাদের জাতীয় সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও দেশবাসীর জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার জন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করে রূপায়ণ করছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হবে আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে। এই পরিকল্পনাগুলির দ্বারা শুধু যে দেশের পুরুষ-সমাজ উপকৃত হচ্ছেন তা নয়, মেয়েরাও এই পরিকল্পনাগুলি মারফৎ উপকৃত হচ্ছেন। উপকৃত হচ্ছেন দুই প্রকারে, প্রথমতঃ এই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের সময় মেয়েদের কল্যাণকর কতকগুলি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ও হ'চ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে দেশের সেবা করার আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন, তাছাড়া মেয়েদের এ থেকে অর্থ উপার্জ্জনের পথও কিছুটা সহজতর হয়েছে। মেয়েরা এই পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন, সেবিকারূপে, কর্ম্মীরূপে। পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হওয়ার পর মেয়েদের কর্ম-সংস্থান আরও বেড়ে যাবে বলেই মনে হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী রূপায়ণকালে এবং রূপায়ণের পর মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে কি সুযোগ সুবিধা পাবেন, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা সংক্ষেপে বলব।

প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার কথা ধরা যাক। পরিকল্পনা-কমিশন বলেছেন, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। তবে, কমিশন আশা করেন যে, ছয় থেকে এগারো বৎসর বয়সের পড়ুয়াদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বর্ত্তমানে যতজন, তার শতকরা বাটগুণ বেড়ে যাবে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে। একরকমভাবে এগারো থেকে চোদ্দ বৎসর বয়সের ছাত্রীসংখ্যাও বেড়ে যাবে বলে কমিশন আশা করেন। এই মেয়েরাই ভবিষ্যৎ'এ বড় হয়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সেই বড় হওয়ার দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তাই যখন শুনি তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে ছয় থেকে এগারো বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা বাধ্যতামূলক হবে, তখন মনে হয়, আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। পরিকল্পনা-কমিশন বলেছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে আরও অতিরিক্ত চার লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন হবে। বেশ কিছুসংখ্যক মেয়ে এই বৃত্তি গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন। মেয়েরা যে প্রাথমিক শিক্ষাদান কাজে বিশেষ উপযোগী, সে কথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিলে ছোটদের শিক্ষাদানের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি সহজতর হবে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বহু মেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এসে তাঁদের কর্ম্মসংস্থান করে নিতে পারবেন। এভাবে মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ে থাকবেন না বলেই মনে হয়।

পীড়িত মানব-সেবার ক্ষেত্রেও মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। পরিকল্পনা-কমিশন আশা করেন, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উনিশ হাজার চিকিৎসক পাশ করে বের হবেন। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে চিকিৎসক দেখতে পাব না কেন? মেয়েদেরও চিকিৎসকের মহান্ ব্রত গ্রহণ করতে এগিয়ে আসতে হবে। অনেকে বলবেন, মেয়েরা সে সুযোগ পাবেন কি? মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আসন-সংখ্যা এত কম যে, প্রত্যেক ইচ্ছুক ছেলে-মেয়ে ভর্ত্তি হতে পারে না। বলা বাহুল্য, তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মেডিক্যাল কলেজগুলির সংখ্যা বেড়ে যাবে। ১৯৫১ সালে যেখানে ত্রিশটি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, সেখানে ১৯৬১ সালের মধ্যে পঞ্চান্নটি কলেজ স্থাপিত হবে।

তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ কালে দেশের হাসপাতালগুলির সংখ্যাও বাড়ান হবে। এই সময়ের মধ্যে চৌদ্দ হাজার ছয় শ' হাসপাতাল ও ডিস্পেনসারী স্থাপন হবার কথা, আর হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা বাড়ান হবে আরও এক লক্ষ নব্বই হাজার। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন, সে কথা বলা বাহুল্য। নার্সিং ইত্যাদি কাজে বেশ কিছুসংখ্যক মেয়ে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন। পরিকল্পনা কমিশন আশা করেন, তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণ কালে চার হাজার পাঁচ শত নার্স, সাত হাজার সহকারী নার্স ও ধাত্রী ও সাত হাজার দাই ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে। এই কাজগুলিতে মেয়েদের প্রয়োজন হবে এবং বেশ কয়েক সহস্র মেয়ে নিজেদের এই কাজে নিযুক্ত রাখতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার নিয়ন্ত্রণ স্কীমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে এই পরিকল্পনার পিছনে। ১৯৬১ সালের মধ্যে সহরাঞ্চলে ছয় শত ছিয়াত্তরটি ও গ্রামাঞ্চলে এগার শত একুশটি পরিবার নিয়ন্ত্রণ স্কীম অনুযায়ী কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এই কেন্দ্রগুলির অধিক সংখ্যক কর্মী মেয়েদের হওয়া উচিত। তাছাড়া, এই স্কীম অনুযায়ী কাজে সহযোগিতার জন্ত সেবামূলক মহিলা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করবেন, এটা অনুমান করে নিতে পারি, যদিও কমিশন এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি।

এছাড়া তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাভুক্ত বহুবিধ কাজে—যেমন সমষ্টি উন্নয়ন, গ্রন্থাগার, বয়স্কদের জন্ত শিক্ষাদান কেন্দ্রে, শিশু কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা নানাবিধ কাজের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। সরকার যে এসব কাজের জন্ত মেয়েদের ও মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা কামনা করবেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গুলিতে মেয়েদের উপযোগী নানারকম কাজ থাকে এবং যিনি যে রকম

কাজের উপযোগী সে রকম কাজে নিয়োজিত করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হবেন তা নয়, সমষ্টি ভাবেও দেশের সেবা করবেন। এটা জানি, এই সব পরিকল্পনাগুলি নানারকম কারণের জন্ম দেশের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আনতে পারেনি। এইসব পরিকল্পনায় ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনাগুলি যে মেয়েদের নানাবিধ কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, সে কথা স্বীকার্য্য।

পটপরিবর্তন

মহালক্ষ্মী দত্ত

"কি ব্যাপার রে ঝুনু? খুব যেন excited মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি? কোথাও গিয়েছিলি নাকি?"

—"গিয়েছিলাম একটু নিউমার্কেটে। কিছু কেনাকাটার ছিল। তাই ভাবলাম, আজ ওঁর ছুটি আছে, একটু ঘুরে আসি।"

—"তা এতে আর excited হওয়ার কি আছে?"

—"Excited হ'ব না? আজ যা দেখেছি! দেখে ত আমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে কাণটান গরম হয়ে গেল—লজ্জায়।

—কি দেখলি বলবি ত? শুধুই ত ভণিতা করছিস্।

—দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা, মুখে চোখে অতি উগ্র প্রসাধন, ব্লাউজটি কাঁচুলীর মত পিছনে বাঁধা এবং আঁচলটি হাতের উপরই প্রায়! সে একেবারে দিগ্বসনা সুন্দরীর সাজ! কিন্তু সব থেকে মজা এই যে, যদিও সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর, তিনি কিন্তু মোটেই সে সম্বন্ধে সচেতন নন! আমি ত ওঁর সামনে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারলাম না! বললাম তুমি একটু এগিয়ে যাও—আমি তোমার পেছনে যাচ্ছি।

শুনে ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এই কি আমাদের ভারতের নারী! আমাদের ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য, আমাদের ভারতের ঐতিহ্য, সব গেল কোথায়? ভাবলাম হায়, আমরা এ কোথায় চলেছি? পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা যে আমাদের সজ্জাকে লাস্যময়ী সাধারণ পণ্যা নারীর পর্য্যায়ে রূপান্তরিত করেছি। যা দেখে স্বামীর সামনে পর্যন্ত নয়ন আপনা হ'তে লজ্জায় নত হয়ে যায়! আমাদের ভারতীয় নারীর সে কল্যাণময়ী রূপ গেল কোথায়? যা' দেখে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নারীকে মাতৃ-সম্বোধন করেছিলেন।

বললাম, জানিস, এঁরাই আবার আগেকার যুগের মায়েদের পোষাককে বলেন obscene! কারণ তাঁরা কোনও অন্তর্বাস ব্যবহার করতেন না। আরে, অন্তর্বাসে কি এসে যায়? একখানি মাত্র শাড়ীই তাঁরা এত সুন্দরভাবে পরতেন যে, পায়ের পাতা দেখা যেত না—শরীরের অন্যান্য অংশ ত দূরের কথা। আর প্রসাধন? তাঁরাও প্রসাধন করতেন। নানান ছাঁদে কবরী বাঁধতেন, কপালে সিঁদুর-বিন্দু দিতেন, তাম্বুলে অধর রাঙাতেন, আর পায়ে দিতেন আল্‌তা। তখন ত আর লিপষ্টিক ছিল না, পানই লিপষ্টিকের কাজ করত আর তা থেকে কোনও skin diseaseএরও আশঙ্কা ছিল না। তাঁদের সেরূপে সত্যিই চোখ জুড়োত। অবশ্য এ আমি বলছি না যে, সে যুগের মেয়েরা অন্তর্বাস ব্যবহার করতেন না বলে এ যুগের মেয়েরাও তাই করুক। কারণ, এ যুগ ও সে যুগের তফাৎ অনেক। আজকের এই প্রগতির যুগে অন্দরই এখন কেবল নারীর কর্ম্মক্ষেত্র নয়, বাইরের জগতেও তাদের ডাক এসেছে; কাজেই যে পোষাক অন্দরমহলের পক্ষে সুষ্ঠু, তা' কখনও বাইরের পক্ষে সুষ্ঠু হ'তে পারে না—তবে যাই আমরা পরিনা কেন, তা'তে শীলতার হানি যা'তে না হয় তাই দেখাই বোধ হয় ভাল এবং তা'তেই বোধ হয় আমাদের ভারতীয় নারীর পোষাকের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কিন্তু অন্তর্বাস ব্যবহার করেও নিজেকে সকলের কাছে প্রকাশ করার এই চেষ্টা দেখে মনে হয় আমরা সে কথা ভুলে যাচ্ছি, কিংবা হয়ত যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের শীলতার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে, আর আমরা back-dated হয়ে রয়েছি!

বড় নগরে একটি দিন

কুমারী অপর্ণা সরকার

১৩৬৫ সালের ২রা আশ্বিন আমার জীবনের এক চিরস্মরণীয় দিন। কারণ, এই দিনই আমি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং বান্ধবী সমভি-ব্যাহারে দেখেছিলাম বাংলার সুপ্রসিদ্ধ রাণী-ভবানীর অমরকীর্ত্তি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি ঝম ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল, আজ না আমাদের নৌকাভ্রমণে যাওয়ার দিন। ভগবানের প্রতিও মনটা বিরূপ হয়ে উঠল, কারণ এই পৃথিবীর শুভাশুভ সমস্তই যে নির্ভর করে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের উপর। তিনি কি আমাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যেই তাঁর রক্ষিত জলের কমণ্ডলু উপুড় করে দেননি, নইলে অসময়ে বৃষ্টি কেন?

যাইহোক, আশা-নিরাশার দোলায় উদ্বেলিত মন নিয়ে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি, আমার অনেক বন্ধু এর আগেই এসে অপেক্ষা করছে। হৃদয়ের মাঝে এক টুকরো ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল—হয়তো যাওয়া হতে পারে। ৬টার আগে আমরা বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, ৬টা বেজে গেল, ঢং ঢং করে ৭টা বেজে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়ে গেল বিদ্যালয়ের বড় দেওয়ালঘড়িটা। আমরা যখন একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছি, ঠিক সেই সময় দৈবপ্রেরিত দূতের মতই এলেন দিদিরা (শিক্ষিকারা), বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে, দেখা দিয়েছেন আলোর রাজা সূর্য্যদেব। আমরা আর দেরী না করে যাত্রা করলাম গন্তব্যের ভাড়া করা নৌকাটার দিকে। নৌকা-গহ্বরে প্রবেশ করে, গঙ্গায় স্তব সমাপ্ত করে, আমাদের বিদ্যালয়ের নামে জয়ধ্বনি তুলে সুরু করলাম গান,—

"মোদের যাত্রা হ'ল সুরু
ওগো কর্ণধার।"

হৃদয়ে যেন আনন্দের জোয়ার উথলে উঠছিল। উঠ'বই বা না কেন? ছাত্রী-জীবনের সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কাননে যে আশার বীজ বপন করেছিলাম, সেই আশা আজ সফল হ'তে চলেছে। কল্পনার রথে চড়ে এতদিন ধরে যে রঙিন কল্পনার জাল বুনেছি, সেই কল্পনা আজ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে, তাই,—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।"

আমরা প্রাতঃকালীন জলযোগ শেষ করে নৌকার ছাদে উঠলাম, এইবার প্রকৃতির উদার নির্ম্মল রূপ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল—

বর্ষাবিধৌত সুনীল আকাশে খেলা করছে অপূর্ব্ব মাধুরী। গলিত স্বর্ণের মত বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ-কিরণে ঝলমল করছে পৃথিবী। বর্ষণসিক্ত রাশি রাশি শুভ্র শেফালী ঝরে পড়েছে প্রভাতের মৃদুল-সমীরণে যেন কার চরণে অর্ঘ্যরূপে। একদিকে নীল আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিতালি পাতাতে যেন মিশে গিয়েছে মাটির সঙ্গে। অপরদিকে বৃক্ষরাজি যেন ভগবানের আবাসস্থল স্বর্গধাম দেখবার অভিপ্রায়ে আকাশের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। ছোট ছোট গাছগুলি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রণাম জানাবার উদ্দেশ্যে লুটিয়ে পড়ছে তার চরণ প্রান্তে।

আমরা যখন পৃথিবীর এই মনভোলান রূপ দেখতে ব্যস্ত, সেই সময় ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার জন্ম আমরা নীচে নেমে আসতে বাধ্য হলাম। নৌকাখানি আমাদের উদরস্থ করে মাঝগঙ্গা দিয়ে হেলে দুলে এগিয়ে চলছিল তার গন্তব্যস্থল বড়নগরের উদ্দেশ্যে। তার দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এক অজানা আশঙ্কায়। যদি নৌকাখানি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং আমরাও যদি সলিল-সমাধি লাভ করি চিরদিনের জন্ম এই আশঙ্কায় নিজেদের অজান্তে আমাদের অনেকেই চীৎকার করে উঠছিল। 'কপালকুণ্ডলার' বৃদ্ধ আরোহীর মত আমারও চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছিল,—'কেনারায় পড়! কেনারায় পড়! কেনারায় পড়!' বলে। গঙ্গাবক্ষে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ দেখে মনে পড়ছিল কবিগুরুর সেই কবিতাটি,—

"মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।"

অবশেষে একসময় আমরা এসে পৌঁছলাম বড়নগরে। মুর্শিদাবাদের সাদেকবাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের একক্রোশ দূরে, গঙ্গার পশ্চিমকূলে রাণী-ভবানীর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বড়নগর। বড়নগরে অবস্থিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত অসংখ্য মন্দির দেখে মনে হল আমরা যেন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসীতে এসেই পৌঁছিয়েছি। এখানে এসেই বুঝতে পারলাম সেই কবিতাটির সার্থকতা,—

"গঙ্গার পশ্চিমকূল,
বারাণসী সমতুল।"

বড়নগরে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে রাণী-ভবানীর প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি এবং দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখলাম। দেখলাম তাঁরই কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল-মন্দির। গোপালমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি শুষ্ক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে পঞ্চমুণ্ডীর আসনও দৃষ্টিগোচর হল। এই আসনে বসেই সাধনা করতেন রাণীভবানীর দত্তকপুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্ণ।

বড়নগরের সমস্ত দেখা শেষ করে রাণীভবানীর কীর্ত্তিসুধা পানে পরিতৃপ্ত আমরা পুনরায় প্রবেশ করলাম নৌকাগহ্বরে। পৃথিবী তখন সেজেছে এক অপরূপ সাজে। সন্ধ্যা সমাগত, প্রত্যহের মত সেদিনও সূর্য্য গেল অস্তাচলে, আদিগন্ত আকাশ সোনালী লালে ইমন কল্যাণ গলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা চলল বাসর ঘরে। তখন গরু চরিয়ে ফিরছে রাখালেরা, কাঁপাগলার ডাক বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ছোট ছেলে ডাকছে পথ হারানো বাছুরকে। পাখীরা কিচির মিচির করে ফিরে যাচ্ছে তাদের বাসায়, বাসার ডাক পৌঁছেছে তাদের কানে—

"ওরে পাখী, সন্ধ্যা হ'ল ডাকিছে কুলায়।
সমস্ত গগন ভ'রে আঁধার পড়িছে ঝ'রে,
ওরে পাখী অন্ধকারে নীড়ে ফিরে আয়।
বন্ধ কর্ পক্ষ তোর, ডাকিছে কুলায়।"

দিগ্ দিগন্ত ক্রমশঃই ছেয়ে আসছে গভীর অন্ধকারে। নক্ষত্র-খচিত অসীম আকাশ যেন অসংখ্য নেত্রে চেয়ে আছে ধরিত্রীর তামসী সৌন্দর্য্যের দিকে, আর পরিপূর্ণা ভাগীরথী বয়ে যাচ্ছে কল কল নাদে, তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে উঠছে তার অগণিত নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। যেন রাশি রাশি মণি-মাণিক্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সেই তরঙ্গের নৃত্যলাস্যে,—

"আজি উতরোলে উত্তর বায়ে উতলা
হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে
পুলকে উছলি ঢেউ ছলোছলে
লক্ষ্য মাণিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।"

আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চির অমলিন সত্তায় বিরাজ করবে এই দিনটি। সাহারা মরুভূমি যদি জলাকীর্ণ হয়, হিমালয় পর্ব্বত যদি সমতলভূমিতে পরিণত হয়, তবু ভুলবনা, যতদিন আমার নশ্বর দেহ থাকবে জীবিত এই পৃথিবীতে ততদিন আমি ভুলবনা, ভুলতে পারবনা এই সুন্দর মধুময় দিনটির কথা।

মোগল রাজকুমারী

শিবানী ঘোষ

মসলিন পর্দার অন্তরাল হতে দেখা যাচ্ছে দিল্লী শহরের একটি ভগ্নাংশ। অদূরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যমুনা। ঐ নদীর পানে আর তাকিয়ে থাকা যায় না বেশীক্ষণ। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে আজকের ঐ জলধারা। শুধু কি তাই, সমগ্র ভারতভূমি আজ হয়েছে শ্মশান-ভূমি। নাদির শাহের দাপটে চতুর্দ্দিক পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

একভাবে আর বেশীক্ষণ দেখা যায় না মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। জানালা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাজকুমারী

তখন তাঁর চোখ দুটি আপনি গিয়ে পড়ে দেওয়ালে টাঙানো দুটি ছবির পানে। একটি ছবি হচ্ছে তাঁর ঠাকুমা মিহ্‌রুন্নিসা বেগমের। তিনি ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠা কন্যা। অপর ছবিটি হচ্ছে তাঁর ঠাকুর্দা ইজাদ বক্সের। তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা মুরাদ বক্সের পুত্র। এগার বৎসর বয়সে এই মিহ্‌রুন্নিসা বেগমের বিবাহ হয় ইজাদ বক্সের সাথে। কি সুখের দিনকালই ছিল সেই সময়। এখনকার মত এমন অশান্তির ঢেউ এসে পৌঁছোয় নি মোগল-সাম্রাজ্যে।

—ছবি দুটির পানে চেয়ে কি এত ভাবছো মা? —ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন দেওয়ার বক্স।

পিছন ফিরে পিতাকে দেখে সাহজাদী বলেন—জানো বাবা, তোমার মা-বাবার ছবি দুটো দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে যদি আমি তাঁদের সময়ে জন্মাতাম তবে কি সুখই না হত।

দেওয়ার বক্স বলেন—সত্যি মা, যদি তাঁদের সময়েই জীবনটা অতিবাহিত করে যাওয়া যেত, তবে মোগল-সাম্রাজ্যের এমন ধ্বংসলীলা আর স্বচক্ষে দেখতে হত না। তা যা হোক, ছবির সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে। এখন তোমাকে যে কথাটা বলতে এসেছিলাম তা হল—

কি পিতা?

দেওয়ার বক্স বলেন—আজ শুনছি নাদির শাহ্‌ আক্রমণ করবেন এই রাজপ্রাসাদ। অবশ্য সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহ্‌ তাঁর সাথে সন্ধি করতেই মনস্থ করেছেন। কারণ, সেই পারস্য নৃপতির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত শক্তি আমাদের বাদশাহের নেই। তা আমি বলছিলাম কি—আজ তুমি মহম্মদ শাহের অন্তঃপুরে চলে যাও। কারণ, যদি সন্ধির প্রস্তাব গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে প্রাসাদের এই দিক থেকেই আসবে শত্রুপক্ষের প্রথম আক্রমণ। কাজেই এখানে থাকলে তোমার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজকুমারী বলেন—তা থাকুক পিতা। কিন্তু এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না। এই ঘরে মা-ঠাকুমা কাটিয়ে গেছেন তাঁদের জীবন। কাজেই এই কক্ষ আমার কাছে জীবনের চেয়েও প্রিয়। যদি মরতেই হয়, তবে আমি এই ঘরেই মরবো।

দেওয়ার বক্স বলেন—বেশ মা, তবে তাই থাকো। আমি এখুনি চললাম। রাজপ্রাসাদের এই দিকটায় যাতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়, আমি তারই চেষ্টা করবো কিছু সৈন্য সামন্ত নিয়ে। আর তোমার কাছে এই ছোরাটা রেখে দাও। যদি হঠাৎই কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তখন এটা তবু তোমাকে ভরসা দেবে কিছুটা। —বলেই তিনি চলে গেলেন ঘর থেকে।

রাজকুমারী ছোরাটা হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করলেন তার শাণিত দিকটা। তখন একটু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তাঁর ঠোঁটে। নির্বোধ মানুষ এই দিয়ে করতে চায় মানুষকে জয়, কিন্তু এ দিয়ে সে যে কত বড় পরাজয় ডেকে আনে তা টের পান অন্তর্যামী। রাজকুমারী ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেয়।

এমন সময় তাঁর ঘরে প্রবেশ ক'রে রহিমুন্নিসা ওরফে কোকি জিউ। কোকি জিউ হল জান্‌ মহম্মদ নামক এক ধর্মামির কন্যা, কিন্তু ঐ ধর্মামি জাতে মুসলমান হলেও হিন্দুদের মতই ছিল তার জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য। মেয়েকেও সে শিক্ষা দেয় এই বিষয়ে। ফলে রহিমুন্নিসাও বিশেষ দক্ষতা লাভ করে হস্তরেখা গণনায় এবং কোষ্ঠী বিচারে। এই কারণেই মেয়েটি বিশেষ প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে মহম্মদ শাহ্‌ এবং তাঁর মাতার। তাই রাজ-অন্তঃপুরে ছিল তার অবাধ গতি। সে ঘরে এসেই বললে—একি কুমারী, তুমি এখানে একলাটি রইলে কেন? সম্রাট্‌ যে অন্তঃপুরের সব নারীকে তাঁর নিভৃত কক্ষে আশ্রয় নিতে বলেছেন।

রাজকুমারী বলেন—কোন প্রয়োজন নেই কোকি। মৃত্যু যদি ঘনিয়েই আসে, তবে মিথ্যে ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করে লাভটা কি?

রহিমুন্নিসা বলে—আচ্ছা দেখি কুমারী একবার তোমার হাতটা।

রাজকুমারী হাতটা মেলে ধরলেন তার সামনে। তাঁর হস্তরেখাগুলো কিছুক্ষণ দেখে রহিমুন্নিসা বলে—এই যে কুমারী তোমার হাতেই রয়েছে সেই রেখা।

—কিসের রেখা কোকি?

কোকি জিউ ওরফে রহিমুন্নিসা বলে—কিছু পূর্বে আমি গণনা করে দেখি নাদির শাহের দ্বারা এই রাজপ্রাসাদের কোন ক্ষতিই হতে পারবে না। তার কারণ সম্রাটের সাথে তাঁর সন্ধি অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সন্ধি দৃঢ়তর করার মূলে রয়েছে মোগল অন্তঃপুরেরই এক নারী। কে সেই নারী, তা দেখবার জন্তে আমি সব মেয়েরই হাত দেখলাম। কিন্তু কারও মধ্যেই নেই সেই জিনিষ। তা এখন দেখছি তোমার হাতে রয়েছে সেই রেখা। যাই—এ কথাটা সকলকে বলে আসি।—বলেই চলে যায় রহিমুন্নিসা।

সে চলে গেলে রাজকুমারী চেয়ে দেখেন নিজের হাতটা। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন যে, তাঁর হাতে কি এমন রেখা আছে যে, তিনি দৃঢ়তর করবেন নাদির শাহ্‌ এবং মহম্মদ শাহের সন্ধি? আর কি ভাবেই তা সম্ভব হবে?

হঠাৎ বাইরে থেকে শোনা যায় জনতার এক প্রচণ্ড চীৎকার।

কি হল! রাজকুমারী তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ান জানালার পাশে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো বিরাট সৈন্যদল ঘিরে ফেলেছে তাঁদের প্রাসাদের এই দিকটা।

নাদির শাহের পুত্র মির্জা নসরুল্লার নেতৃত্বে আজ এগিয়ে এসেছে ঐ দলটি। চতুর্দিকে সুরু হয়ে গেছে ধ্বংসলীলা আর হত্যাকাণ্ড। তারা ক্রমশঃই এগিয়ে আসে প্রাসাদের দিকে। রাজকুমারীর মনে হয়—এ অবস্থায় ঘরের দরজা খুলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। তিনি ছুটে যান দরজা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু দ্বার বন্ধ করবার পূর্বেই উন্মুক্ত তরবারি হস্তে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন এক যুবাপুরুষ।

রাজকুমারী কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন—কে। কে আপনি।।

যুবাপুরুষ বলেন—আমি হলাম পারস্যাধিপতি নাদির শাহের পুত্র মির্জা নসরুল্লা। এর বেশী বোধ করি আর কিছু বলতে হবে না। এবার আপনার পরিচয় আশা করি আমি পেতে পারি।

রাজকুমারী বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর পানে তাকিয়ে বলেন—

আপনার মত হত্যাকারী নৃশংস পুরুষ—যারা সোনার ভারতবর্ষ আজ পরিণত করেছে শ্মশান-ভূমিতে, তাদের নিকট আমার পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করি।

রাজকুমারীর কথায় খানিকটা হেসে নসরুল্লা বলেন—আপনার আকৃতি এবং কণ্ঠস্বর শুনে অনুমান করছি, আপনি দেওয়ার বক্সের কন্যা। কিন্তু শাহজাদী, মনে রাখবেন, তিনি এখন আমাদের কাছে বন্দী।

—বন্দী? পিতা বন্দী হয়েছেন আপনাদের কাছে?

—হ্যাঁ। তা শুনুন শাহজাদী, আপনার পিতাকে আমি এখুনি মুক্তি দিতে পারি যদি আপনি আমার একটি সর্ত রক্ষা করেন।

—সর্ত! কি সর্ত?

—সে সর্ত হচ্ছে আপনাকে আমার সহধর্মিণী হতে হবে।

—কি! কি বললে!! তৈমুর বংশের নারী হয়ে আমি স্বামী রূপে বরণ করে নেবো এক নৃশংস হত্যাকারীকে?

নসরুল্লা বলেন—এখন আপনার এ আস্ফালন মিথ্যে শাহজাদী। এইটুকু মনে রাখুন, এখন আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাদির শাহের পুত্র মির্জা নসরুল্লার সামনে। এই পারস্য যুবক দয়া, মায়া, মমতা বলে কিছু জানে না। এর উন্মুক্ত তরবারি আবালবৃদ্ধ বনিতার উপর চালিত হয়েছে নির্বিচারে। কাজেই আপনার ঐ মিথ্যে আস্ফালনের জবাব কি ভাবে দিতে হয়, তা এর জানা আছে ভাল করেই।

রাজকুমারী বলেন—মূঢ় বর্বর, তাই বলে দেওয়ার বক্সের কন্যা মাথা নত করবে এক হত্যাকারীর নিকট?

—দেখা যাক করে কিনা। বলেই নসরুল্লা ডাক দিলেন—রুস্তম!

রাজকুমারী এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি তাঁর ঘরের বাইরে সারি সারি এসে দাঁড়িয়েছে বিদেশী সৈন্য। নসরুল্লার ডাকে কুর্ণিশ জানিয়ে এগিয়ে এল একজন লোক। তিনি তাকে বললেন—যাও, বন্দী দেওয়ার বক্সকে নিয়ে এস এখানে।

চলে গেল লোকটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে আসে বন্দী দেওয়ার বক্সকে নিয়ে। বন্দী পিতাকে দেখে কেঁদে ওঠে রাজকুমারীর অন্তর।

নসরুল্লা বলেন—বলুন শাহজাদী, এখনও আপনি আমার সর্ত মানতে রাজী কিনা? নচেৎ আপনার চোখের সম্মুখে এঁর ওপর আমি চালাবো অকথ্য অত্যাচার।

তাঁর কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠেন রাজকুমারী। তাঁকে এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। এখন একদিকে রয়েছে পিতার প্রাণ, অপর দিকে নিজের আত্মসম্মান। কোন্‌টা তিনি এখন বিসর্জন দেবেন?

নসরুল্লা বলেন—তাড়াতাড়ি আপনার মতামত জানান শাহজাদী। বিলম্বে আপনার পিতার প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে।—বলেই তিনি উদ্যত করেন তাঁর তরবারি।

দেখে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে রাজকুমারীর। মনে হল, তাঁর পদতল থেকে ভূমি যেন ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পান, পিতাকে হত্যা করতে তরবারি ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর বুকের কাছে। কিন্তু না-না-না, এ তিনি কখনই দেখতে পারবেন না। রাজকুমারী অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—আমি আপনার সর্ত মেনে নিলাম। পিতাকে আপনি রক্ষা করুন।—বলেই তিনি মানসিক যন্ত্রণায় আছড়ে পড়েন মাটিতে।

তাঁর কথা শুনে মৃদু হাসেন নসরুল্লা। তারপর তিনি দেওয়ার বক্সের বন্ধন মোচন করে দিয়ে বলেন—এই কন্যার জন্যে আজ আপনি ফিরে পেলেন প্রাণ। আর শুনুন দেওয়ার বক্স, আপনি ধন্য পুরুষ। এমন কন্যারত্ন বিরাট মোগল সাম্রাজ্যে আর দুটি চোখে পড়েনি।—বলেই তিনি ভূলুণ্ঠিতা ক্রন্দনরতা রাজকুমারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—আর শুনুন শাহজাদী, আপনি আর ব্যথিত হবেন না। আপনার জিদ আমি ভাঙতে পারি কিনা সেইটুকুই পরীক্ষা করছিলাম। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে বিবাহ করে অপমান করতে আমি মোটেই চাই না। আজ আপনারা উভয়েই মুক্ত।

দেওয়ার বক্স বলেন—কিন্তু নসরুল্লা, তুমি আমাদের মুক্তি দিলেও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না। এই কন্যাকে আমি তোমার হাতে সম্প্রদান করে চিরকালের মত বন্দী করে রাখতে চাই।—বলেই তিনি মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেন—কুমারী!

মাথা তুলে রাজকুমারী বলেন—পিতা?

দেওয়ার বক্স বলেন—এঁকে বিবাহ করতে তুমি মন স্থির করে ফেলো কুমারী। কারণ, আজ এই পারস্য-যুবকের যে শৌর্য, বীর্য এবং মহত্ব দেখলাম, তাতে যে কোন নারীর পক্ষে তাঁর সহধর্মিণী হওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা।

রাজকুমারী ধীর কণ্ঠে বলেন—আপনার ইচ্ছাই আমার মতামত পিতা।

এমন সময় তাঁদের কক্ষে ছুটে আসে দুজন শান্তির দূত। তারা সাদা নিশান উড়িয়ে বলে—আপনারা ক্ষান্ত হোন যুদ্ধ থেকে। কারণ, ওদিকে মোগল বাদশা মহম্মদ শাহ্ সন্ধি করেছেন পারস্যাধিপতি নাদির শাহের সাথে।

দেওয়ার বক্স বলেন—তাঁদের গিয়ে বলো, এদিকে আমরা তার চেয়েও এক বড় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি।

নসরুল্লা তখন এগিয়ে এসে ধরেন রাজকুমারীর হাত-দুটো। কুমারীর তখন মনে পড়ে কোকি জিউ-এর কথা। এই পরিণতিই কি সে দেখেছিল তাঁর হস্তরেখার মধ্যে? হয়ত তাই।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

একাদশ স্তবক

১। তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যসঙ্কাশ দুটি ভাই—বনে বনে খেলে বেড়াতে বেড়াতে একদিন উপস্থিত হলেন এক ভাণ্ডীর-বটের তলায়। ক্রীড়ার বিক্রমে কেউ তাঁরা কম যান না। বটগাছটিরও বেশ বাড়ন্ত যৌবন।

সেদিন সূর্যের কী করাল তাপ! পথের ধুলো এত তেতে উঠেছে, যে নখ বুঝি পুড়ে যায়। কে নেবাতে পারে সে ধূলির দাহ? বিহার-মণিগুহা থেকে নিঃসৃত হয় যে নির্ঝরের ধারা, হয়ত পারে তার শৈত্য, আর হয়ত পারে ঝোড়ো বাতাসের দল, যারা দীঘিদের শিষ্য হয়ে লহরিকার কথার ভাবে মন্থর হয়ে ছোটে, ছোটে শিরীষফুলের মধু খেতে খেতে পেট ফুলিয়ে। তাদের সখ থাকতে পারে ঘর্ম-সলিল পান করার। আর একমাত্র ঐ খরতাপ নেবাতে পারে বনের বিটপিগুলি, মাথার উপর টাঙিয়ে দিয়ে তাদের পল্লবঘন ছায়ার চাঁদোয়া।

ভাণ্ডীরবটের ছায়ায় বিরাজিত ছিল কুসুমিত এক কুঞ্জকুটীর। কুটীরদ্বারের এদিকে ওদিকে ছোট্ট ছোট্ট পানীয়শালা। পানীয়শালার কয়েকটিতে ছিল চন্দনগন্ধী জলভরা জলযন্ত্র, কয়েকটির পরিসরে সংরক্ষিত ছিল শীতল গন্ধজলের কলস; কয়েকটিতে ছিল বসুধার সুধাতুল্য পক্ব আম্রফলের পানক-রস। প্রশান্ত পরিপালনশীলা বনদেবীদের মত এই পানীয়শালাগুলিই লঘু করে কৃষ্ণসহচরদের পিপাসা ও অবসাদ।

২। কণ্ঠে তাঁদের প্রফুল্ল মল্লিকা-মালিকার আভরণ; কর্ণে তাঁদের শিরীষফুলের সুমঞ্জুল অবতংস; কেশে তাঁদের বিস্ফুট কুটজ ফুলের মাল্য,—বল্লব-কিশোরেরা খেলতে লাগলেন রাম ও দামোদরের সঙ্গে। আর গিরিসঙ্কটের কোলে কোলে, ছায়া-তরুর তলায় তলায়, ধেনুর দল আরামে চিবোতে লাগল জলপ্রপাতের জলে-ধোওয়া নরম নরম ঘাস। দেখতে দেখতে ঘুমে ঝিমিয়ে এল তাদের চোখ।

৩। বালকদের মধ্যে কেও গেয়ে ওঠেন গান, কেউ বাজান, কেউ নাচেন; কমল ও বলরাম নাচেন আর কৃষ্ণ বাজান মুরলী, করেন গান, কখনও কৃষ্ণ নাচেন আর বলরাম ও সহচরেরা তোলেন তান। এমনি চলেছে গোপ-বালকদের মেলা এমন সময় মধুরধ্বনি বাক্যের তোড়া তুলে শ্রীকৃষ্ণ বলে উঠলেন—

৪। হোঃ হোঃ হোঃ ভাইরা ভাই হো, এবার নৃত্য গীত ও বাদ্য তোমাদের থামাইও। এবার এস—আমরা অন্য খেলা খেলি।

তাঁরা শুনে বলে উঠলেন—

এই তো, আমরা কাছেই তো রয়েছি, দামোদর; বল ভাই—তারপর—কোন্ খেলা খেলি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

তাহলে, দ্বিধাবিভক্ত হোন্ আপনারা; বলরামের সেনা হয়ে একদল অনুগামী হোন্ তাঁর, আর একদল আমার।

নির্ণীত হল শ্রীবলরামের সেনা এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বপক্ষে বাছাই করে নিলেন তাঁদের যাঁরা দৌড়দার। ঠিক হয়ে গেল জয়-পরাজয়ের পণ;—পরাজিতের স্কন্ধারোহণ করবেন বিজয়ী; যে হারবে সে বইবে। আরম্ভ হয়ে গেল খেলা। শ্রীদামোদরের কপট-খেলা বিখ্যাত। অথচ কি আশ্চর্য, যিনি উদরের মধ্যে জগৎ বন্ তিনিই কিনা, সেই পীতাম্বরই কিনা, হেরে গেলেন! তাঁকেই কিনা স্কন্ধে বইতে হল শ্রীদামকে! কৃষ্ণের চরিত তর্কের অতীত—অনধিগম্য!

৫। ঠিক সেই সময়ে সেইখানে গা-ঢাকা দিতে দিতে সকলের অগোচরে উপস্থিত হয়ে গেলেন এক মহাদৈত্য। বোধ হয় কালগ্রস্ত হয়েছিলেন বলেই তথায় তাঁর এই আগমন। দৈত্যস্তোত্রের প্রথম নামটিই তাঁর। রাখালবেশে তিনি এলেন। এসেই নিজেকেই নিজে পরাজিত করে ছুটে গেলেন সেই দিকে, যেদিকে চন্দনগৌর শ্রীসঙ্কর্ষণ স্বকীয় রাজিত্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করতে করতে খেলছিলেন। তারপরে এক ঝটকায় তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে, চোর যেমন করে গুপ্তধন চুরি করে পালায় তেমনি ক্রীড়াভূমির সীমানা ছাড়িয়ে তরুতল লঙ্ঘন করে সরে পড়লেন।

৬। গণ্ডী ছাড়িয়ে বাহক যায়? অতিক্রমের এই বিক্রমে বিস্মিত হয়ে উঠলেন বলরাম। মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে ফিরে চাইলেন তাঁর অলীক মনুজমূর্তি অনুজের দিকে।

চমৎকৃত চীৎকারে বললেন—

দামোদর, এই দেখ, কে এক বেটা আমাকে নিয়ে পালাচ্ছে। পাগলামির ব্যাধি যেমন করে মন নিয়ে পালায়, তেমনি নিজের আনন্দের বেগে বেটা পালাচ্ছে। তুমি তো আচ্ছা লোক, মনোরম ছবিটি সেজে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ? এখনও খেলতে পারছ? দয়া করে এখন একটু ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ করুন, বলুন, কি করতে হবে আমাকে?

কৌতুকে রঙ চড়িয়ে ভগবান বললেন—অত অপ্রতিভ হচ্ছেন কেন?···শত্রু ভয়ে আক্রান্ত হয়েছেন আপনি, বিক্রম দেখিয়ে ওকে বধ করুন।

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে নেমে এল সজল জলদের গম্ভীর নির্ঘোষ।

৭। তারপরে সেই মহাদৈত্যের মুণ্ডের উপর দমাদম্ পড়তে লাগল মধুমথনাগ্রজ শ্রীবলরামের প্রচণ্ড মুষ্টি-মুদগর। মৈনাকের পক্ষভেদী বজ্রের সহোদরসম সেই মুষ্টির আঘাত মুষ্টিতে দৈত্যের মুণ্ডপিণ্ডটিকে খণ্ড খণ্ড করতে কত আর সময় লাগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বলরামের? এতটুকুও দয়ার প্রকাশ করলেন না বলরাম।

প্রাণত্যাগের পূর্বে সেই মহাদৈত্য এত বিস্তীর্ণ করলেন আত্মশরীরটিকে, যে তাঁর স্কন্ধাবস্থান-কুতূহলী কর্পূরধবল হলধারীটিকে দেখতে হল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরস্থ একটি পার্থিব চন্দ্রমণ্ডলের মত। অবাক হয়ে গেল জনতা।

৮। তুলনা দেওয়া যায় না এত বিপুল স্ফীতি সেই দৈত্যদেহের। গলগল করে নিরর্গল গলে পড়তে লাগল শোণিতস্রাব। লাল হয়ে গেল তাঁর ধূম-ধূম্রল দেহ। সন্ধ্যায় রক্তমেঘ-সজ্জিত যেন এক

নন্তশৈলের ছবি। বিন্ধ্যগিরি যেন তার আমূল-মৌলি-মিলিত অশোক-ফুলের রক্তসমারোহ নিয়ে শোকে আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়ল ধরণীতে এবং সেই দৈত্যনিপাতের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে, কুসুমপাত্রী গগনবিহারিণীদের কর-মুকুল থেকে হর্ষোৎসবে ঝরে পড়ল প্রসূনের বৃষ্টি।

৯। তালধ্বজ শ্রীবলরামের হাতে নিহত হলেন প্রসিদ্ধাসুর প্রলম্ব। পরম মায়াবল অবলম্বন হয়েছিল তাঁর, বললাভও করেছিলেন উত্তাল ঔদ্ধত্যের এবং মর্ম-পাপরাশির সংহনন করেছিলেন বলেই সেই থেকে দেবেন্দ্রাদিবন্দ্য শ্রীবলরামও প্রকাশ্যে নামান্তর গ্রহণ করেছিলেন "প্রলম্বঘ্ন।"

১০। যিনি নিত্য দান করেন আনন্দ সেই রম্যচরিত দামোদরের নিকট থেকে এবং তাঁর আসল বাল্যবন্ধুদের নিকট থেকে—শ্রীবলরামের অভিমুখে ছুটে এল অভিনন্দন। হাস্যে বিস্ময়ে ও হর্ষমদে এত উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি, যে তিনি যখন বিশ্রামের জন্য ভাণ্ডীরবটের মূলে গিয়ে বসলেন, তখন মনে হল তিনিই যেন সান্দ্র শোভার একটি ভাণ্ড।

১১। শ্রীদাম-সুদাম সুবলাদি গোপাল বালকদের সঙ্গে আনন্দে বিশ্রাম করতে লাগলেন শ্রীবলরাম এবং শ্রীদামোদর। চতুর্দ্দিকে ঢেউ খেলছে যবের ক্ষেতে। যেমন যবের দানা, তেমনি যবের গাছ। অপরিমিত প্রাচুর্য্য ও সৌরভ্য। অনুকূল যমুনার কূল। অতএব ধেনুদের ভ্রমণ লালসায় বাধা দেয় কে? তার উপর যখন কৃষ্ণ রয়েছেন নিকটে তখন ভয়ের ও কোনো বালাই নেই। ধেনুর পাল চরতে চরতে দৈব বশতঃ "ইষীকাটবীর" মধ্যে প্রবেশ করল।

১২। কাশবনে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল ধেনুর পাল। তাদের হঠাৎ—দেখতে না পেলে আশঙ্কায় ভরে উঠল গোপাল বালকদের মন। দেখতে দেখতে এল আতঙ্ক, চোখ ভরে উঠল জলে। চরাচরগুরু অরুণাজনয়ন শ্রীকৃষ্ণের করুণামৃতে-ভরা নয়নেও দেখা দিল অশ্রুবিন্দু। তিনি বললেন—

১৩। "এই, বনের মধ্যে পাখী থাকে, হরিণ চরে। সুমই এখানকার বল। এতটুকু ও তো ভয় হবার কথা নয় নৈচিকী গাভীদের অথচ আশ্চর্য্য, ওদের একটিকেও দেখা যাচ্ছে না কেন? দেখতো কি হল? সুখের ধ্বংস যেন না ঘটে।"

কৃষ্ণ ভারতীর ভালবাসা ও শোভায় অখণ্ডতায় চঞ্চল হয়ে হারানো ধেনুদের অনুসন্ধানে ছুটলেন গোপাল বালকেরা।

কচি কচি কোমল ঘাস খেতে খেতে, মাটিতে খুরের দাগ রেখে যে সব পথ ধরে ধেনুরা এগিয়ে গেছে সেই পথে চলতে লাগল খুরচ্ছদের অনুসন্ধান; বন-বাদাড় ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন তাঁরা, কিন্তু বৃথা। বেড়ে যেতে লাগল তাঁদের শঙ্কা।

এদিকে—গোপাল বালকদের যখন এই হেন অবস্থা, নয়নের কান্তরতা যখন কল্যাণ দেখতে পাচ্ছে না কোথাও, ওদিকে, তখন ধেনুর ইষীকাটবীর মধ্যে নষ্ট বুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ তাদের হঠাৎ ঘিরে ফেলেছে এক দপদপে দাবানল। কৃষ্ণনাথা হলেও আজ তারা অনাথা, পলায়নের পথ নেই। ক্ষীণ হয়ে এসেছে জীবনের আশা, মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা, আর তাদের বড় বড় বিহ্বল চোখে অশ্রুবিন্দুর সাথে সাথে যেন ঝরে পড়ছে শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রার্থনা।

১৪। ধেনুদের খুঁজে না পেয়ে অনন্ত চিন্তায় আকুল হয়ে গোপাল বালকেরা পুনরায় ফিরে এলেন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। কারণ, তাঁরা জানতেন কৃষ্ণই অনুগতদের সকল কল্পদ্রুম। স্বজন বাসনায় কামধেনু, আশ্রিতদের মনোরথ সিদ্ধির চিন্তামণি, এবং নরের নয়ন-পথিক হলেও তিনিই নরাকৃতিপর পরব্রহ্ম।
তাঁরা বললেন—

কোথাও দেখতে পেলুম না আমরা ধেনুদের।

বৈবস্বতকুলের যিনি মুকুট-মহা-মারকত, তিনিও ভাবিত হয়ে পড়লেন। মড়ক নয় তো? তখনই নিজে বেরিয়ে পড়লেন। যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে গাই।

পথ ধরে চললেন শ্রীহরি। আর মেঘমন্দ্র-স্বরে প্রত্যেকটি গাভীর নাম ধরে ধরে হাঁক দেন তিনি। সে ডাক যেন আকাশে লাফিয়ে উঠে সুধায় যায় মিলিয়ে। যত চলেন, ততই ঘন ঘন ওঠে ডাক।

মুরলীতে তান মধুর গান ধরেন শ্রীহরি,—আর গানে ভাসে সব নাম—

"মুক্তে নন্দিনি, চন্দিনি; ইন্দুতিলকে,
কস্তুরি, কর্পূরিকে,
পিঙ্গে, রঞ্জিনি, ধূমলে ধবলিকে,
কিঙ্কিণিকে, রঞ্জিনি,
শ্যামে, কেতকি, চন্দ্রিকে, শবলিকে,
কাশ্মীরিকে, চম্পিকে,..."

আর মন্দাক্রান্তায় হী হী হী রবে ছড়িয়ে যায় মুরলীর মধুর তান চৌদিকে।

১৫। বিম্বাধরের মধু-মধুর মুরলীর কলনাদ অমৃত ঢেলে দিল ধেনুদের কানে। যারা চিরকাল চিন্তা করে এসেছে শ্রীকৃষ্ণের পথ, কৃষ্ণের পথানুসরণই যাদের আশান্বিত করে রেখেছে প্রাত্যহিক জীবন-ধারণে, অন্তঃকরণে এনেছে বিশ্বাস, আশু প্রাপ্য করেছে আমোদ,—দাবানল ঘেরা সেই ধেনুসংহতি আজ ফেরার পথ বন্ধ দেখে আকুল হয়ে উঠল প্রত্যুত্তরহীন এক চঞ্চলতায়। তাদের মুখ থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেরুল কেবল হম্বা, হম্বা, হম্বা।

কিন্তু সেই বাণীর গভীরতায়, ভয়হীনাম্বর সৌন্দর্য্যে, যে আবেদন ছিল সেটি পৌঁছে গেল শ্রীভগবানের হৃদয়ে। মৌনী দশমীদের ও শমীদের যিনি মন ও বাক্যের অগোচর, তাঁরও গোচর হয়ে গেল সেই হম্বা, হম্বা, হম্বা, তিনি প্রীতি হলেন।

১৬। এবং ঘোষেশ্বরনন্দনের সেই প্রীতি সেই আনন্দ যেন ক্রীড়া করে উঠল কুতূহলী হলধারী বলরামের সঙ্গে সঙ্গে সহচরদেরও অন্তরে। সে এক হর্ষের, তৃপ্তির, মদব্যাপ্তির সম্পূর্ণতা। যেন ঝকমকে শত শত দন্তের শুভ্রহাস্যে ধবস্ত হয়ে গেল কানন-গহ্বরের অন্ধকার।

১৭। পথ চিনিয়ে দিল ধেনুদের ধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণের পাছু পাছু ছুটলেন সকলে। তারপরে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন—ইষিকাবনের অভ্যন্তরে রক্ষকহীন অবস্থায় ধেনুরা অবসন্ন হয়ে কাঁপছে, শীর্ণ হয়ে গেছে তাদের উৎসাহ, চতুর্দ্দিকে অরণ্যবহ্নির তপ্ত গণ্ডী। হায় হায় করে চীৎকার দিয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। কে ভাবতে পেরেছিল মৃত্যুপথের পথিক হয়ে এরা হঠাৎ এমন বিপত্তির মধ্যে এসে পড়বে, ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি জ্বালের অনুভূতিতে চকিত হয়ে উঠল। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর

দিকে চেয়ে রয়েছে ধেনুরা, তারা কাঁদছে, অশ্রুর প্রবাহিনী বেয়ে তাঁর কাছে ভেসে আসছে তাদের মানস-তরণী। অসীম করুণায় ভরে উঠল তাঁর মন, দ্বিগুণ হয়ে উঠল দুঃখ। তিনি বুঝতে পারলেন ··আকাশে যদি মেঘও জমে, জলও ঢালে, নিববে না এই আকাশচারিণী বনবহ্নির জ্বালা। নেবানো অসম্ভব।

তাই আবার পূর্ববৎ অপূর্ব হয়ে উঠল তাঁর শ্রীমুখচ্ছবি। তাঁর ইচ্ছা হোলো, অনলজননীর কোলেও তিনি তাঁর তাৎকালিক সহজাত ঐশ্বর্য্য-শক্তি দ্বারা পান করিয়ে ফেলবেন সেই অনল। তাই সহচরদের সম্বোধন করে বললেন—

১৮। "তোমরা সকলে চোখ ঢেকে ফেল; আনন্দ কর; মোচন করাও আপন মোহ।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সবালক গোপবালকেরা পরিপূর্ণ বিস্ময়ে আচ্ছাদিত করে ফেললেন তাঁদের নয়ন। এবং সেই মুহূর্ত্তে, কৃত্যবিশারদ ব্রজরাজ-তনয় কমল-কলিকার মত নিজের করতলটিকে তুলে ধরলেন নিজের অধরতটে; যেন তিনি এক গণ্ডূষেই অমৃতের মধুধারার মত আনন্দে পান করতে চান অনল। এবং সেই মুহূর্ত্তে পৃথক্ এক প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে প্রকট হয়ে গেল তাঁর ঐশ্বর্য্য-শক্তি। এবং সেই শক্তি মুখেই শ্রীভগবান নিজেই যেন অপূর্ব নৈপুণ্যে পান করে ফেললেন দাবানল। শক্তির অদক্ষতার পরিচয় রইল না কোথাও।

১৯। অন্যও রয়েছে ঘন রসদাতা, যার রস-বর্ষণে অস্ত হয় অরণ্য বহ্নির; কিন্তু ওরে মন জেনে রেখো, এই একটিই মাত্র রয়েছেন ঘনরসদাতা যাঁর করুণাঘন নয়নের একটি কটাক্ষেই নির্বাপিত হয়ে যায় মানব-সংসারের নিত্য দাবজ্বালা। সকল-সৌভাগ্যবতী শক্তির দাক্ষিণ্যে তিনি যে একটা তুচ্ছ দাবানলকে সংহার করতে পারবেন এবং শান্ত করতে পারবেন গোকুলের প্রাণরশ্মি-সম ধেনুদের, এর মধ্যে কোথাও নেই বিস্ময়ের অবকাশ।

২০। এবং যিনি অখণ্ড তেজঃস্বরূপ, যিনি উৎসব-সিদ্ধিকারী ও বকাসুরের শত্রু, বহুল প্রভাব প্রভার যিনি ভবন বিশেষ, তাঁর জ্যোতির্ম্ময়তার আধারে দাবানলচ্ছলে একটি খণ্ডতেজ যে প্রণষ্ট হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? আর সত্যই খণ্ডতেজের মত একটি অপাত্রে কেমন করেই 'বা থাকতে পারে ঈশ ভাব? এমন কোনো পণ্ডিত নেই যিনি অভিনন্দন করলেন না শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক বুদ্ধির এই সারত্ব। অতএব অমায়ই শ্রীকৃষ্ণে যাঁরা নমোবিধান করেছেন, কালের গতিবেগে তাঁদের যে কখনও বিফল হবে না জন্ম, এই কথা সিদ্ধ হল।

২১। অমৃতধারাবৎ পীত যখন পীত হয়ে গেল দাবানল, তখন উল্লসিত হয়ে উঠল দেবতাদের আনন্দ। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের প্রণামাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে নন্দকিশোরের অভিমুখে যখন ঝরে পড়তে লাগল ভ্রমর মালা-সুন্দর নন্দনকুসুমাঞ্জলি, তখন মনে হল দিব্যলোক থেকে ঐ বুঝি কাজল-টানা হাজার চোখের আনন্দ-জল ঝরছে।

২২। দেবতাদের বন্দনাগানের অনুমোদন করতে করতে শতাধিক ধেনুর সঙ্গে সঙ্গে গোপেন্দ্রেও শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে এলেন নির্মল ছায়াশীতল ভাণ্ডীরতরুতলে,···অলক্ষিতে ও আত্মযোগ বলে। তত:পর প্রকাশ্যে বললেন—

হে বন্ধুগণ, আমার দিকে এবার তোমরা নয়ন মেলে চাও।

ঢাকা চোখ খুলে গেল গোপবালকদের। আনন্দের নিবিড় বিস্ময়ে তাঁরা বলে উঠলেন—

আশ্চর্য, আমরা কি পাগল হয়ে গেছি, না স্বপ্ন দেখছি? কোথায় পালালো দাবানল? লক্ষণ পর্য্যন্তও চক্ষে পড়ছে না। কোথায় বা গেল সেই ঈষিকাবন? আর ভাণ্ডীরবটের তলায় আমরাই বা এলুম কেমন করে? আর এই ধেনুগুলিও?··· আশ্চর্য!

২৩। প্রশান্ত হয়ে গেছে অরণ্যবহ্নি, অতএব শান্ত হয়েছে নৈচিকী গাভীদের মন, মুখে তাদের আহ্লাদের বিলাস, আনন্দমত্ত অশ্রুবেগে স্তিমিত তাদের দৃষ্টি।···ভালবাসার প্রাচুর্য্যে প্রণয়ন করতে করতে তারা যখন অনুসরণ করতে লাগল শ্রীকৃষ্ণকে তখন মনে হল তাদের লোচনগুলি যেন পান করছে পরম প্রেমাস্পদকে, রসনাগুলি লেহন করছে কৃপাময়কে, প্রমোদ-প্রকাশিকা নাসিকাগুলি যেন ঘ্রাণ করছে গোপেন্দ্রতনয়কে। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর করুণা-কোমল অমলারুণ করতল দিয়ে প্রত্যেক সৌরভেয়ী গাভীটিকে দান করতে লাগলেন স্পর্শ সুখপ্রীতি।

২৪। দেখতে দেখতে দিবাবসান হয়ে এল। যে প্রতাপী নিদাঘ সূর্য সমস্ত মধ্যাহ্ন ব্যেপে জনতার আপদ হয়ে বিরাজ করছিলেন, হঠাৎ তাঁর বদলে গেল মন। তাঁর বাসনা হোলো আকাশের শোভা-বিহার ছেড়ে উৎসুক হয়ে এবার তিনি ধীরে ধীরে নেমে এসে প্রবেশ করবেন অস্তগিরির মণি কন্দরে। অতএব তিনি সংহার করলেন তার তীব্র তেজ, সুখ-দর্শনীয় হলেন বিশ্বলোচনের। শীতল হল তপ্ত ভূতল—প্রবল দাহজ্বরের বিরতিতে মনুষ্যদেহের মত। নির্মল হল পদ্মসায়রের যৌবনস্নান কমলদল।

পদ্মসায়রের মকরন্দ ঝরিয়ে রসের হাসি হেসে উঠল শিরীষফুলের প্রফুল্লতা। সরোবরে স্নান করে পদ্মের মধু খেয়ে অলস হয়ে ঝিমিয়ে এল ভ্রমরদের উড্ডীনতা। পবন-গন্ধে অন্বিত হয়ে তারা সেবা করতে লাগল দিবাবসানের।

মুরলীতে ধ্বনি তুলে ব্রজের পথ ধরলেন নন্দকুমার। সায়রে অপরাহ্ণ-স্নান সেরে সহচরদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে গোঠ থেকে ফিরে চললেন শ্রীকমলনয়ন। সিক্ত তনুও এত সুশ্রী হয়!

পথ চলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর ব্রজবাসী পথিকদের নয়নে মেতে ওঠে উৎসব। ব্রজের দিকে ধেনুদের মুখ ফিরিয়ে চলেন শ্রীকৃষ্ণ জলাশয়ের তরঙ্গশীতল অনুকূল বাতাস তাঁর গায়ে এসে লাগে। গো-খুরের অল্প অল্প রেণু উড়িয়ে এগিয়ে এগিয়ে ছুটে যায় বাতাস, আর শ্রীকৃষ্ণের ভাঙা ভাঙা বাবরি চুল, মাথার পাগ—সাদা হয়ে যায় রেণুতে। শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে পথিক হয়ে দেশ-দেশান্তরে ছুটে যায় বাতাস।

কৃষ্ণের মধুর অধরে বাজে মুরলী। মুরলী-রব-মাধুরীতে আকুল হয় কানন তরুলতিকার নীড়-সোহাগী পাখীর দল। পথ-চাওয়া বিরহী হরিণদের দূর হয়ে যায় দুর্জ্জয় দুঃখ। তাদের চিরতরুণ অমূঢ় মন আনন্দিত হয়ে ওঠে মুরলীর গানে।

আর যখন দক্ষিণ-সমীর-বিকম্পিত কাননের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন শ্রীকৃষ্ণ, তখন কাননের বুকের অলঙ্কার, নীল মাণিক্যের মালার মত ঐ ভ্রমরের দল,—তাঁর পদ্মমুখের সৌরভে যে অন্ধ হয়ে অনুব্রজন করে এল তাঁর—ব্রজের পথে ফিরবার। [ক্রমশঃ

আজ রাতেও...

লক্ষ পরিবার তৃপ্তির সাথে

ডালডায় রাঁধা

খাবার খাবেন
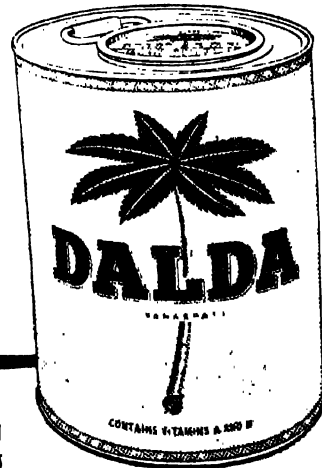
ডাল্ডা একটি খাঁটি জিনিষ। কারণ সবচেয়ে খাঁটি ভেষজ তেল থেকে তৈরী। এবং ডাল্ডা পুষ্টিকরও বটে; কারণ স্বাস্থ্যের জন্য এতে ভিটামিন যোগ করা হয়েছে। তাই মাছ মাংস, শাক-সব্জী, তরি-তরিকারী ডাল্ডায় রাঁধলে সত্যিই সুস্বাদু হয়। আজ লক্ষ গৃহিণী তাই তাঁদের সব রান্নাতেই ডাল্ডা ব্যবহার করছেন। আপনিইবা তবে পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

ডালডা
বনস্পতি

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

DL.53-X52 BG

অকাল বোধন

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারকল্পে রাবণ বধ প্রয়োজনে আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা করিলেন। মঙ্গলঘটে সঙ্কল্প করিলেন অষ্টোত্তর শত নীলকমল অর্ঘ্য দিব সর্ব্বমঙ্গলার উদ্দেশে। কিন্তু মাতা একটি কমল হরণ করিয়া ভগবানের ভক্তি পরীক্ষা করিলেন। ভগবান যখন সঙ্কল্প পূরণে চক্ষু উৎপাটন করিতে বসিলেন তখন মাতা দশভুজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, "হে রাম, তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, এ কি করিতেছ?" শ্রীরাম অমনি বিষ্ণুশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হইলেন। মহাশক্তি যে শক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করেন, ভক্তিপরায়ণ সেই শক্তিতে শক্তিমান।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে মায়ের পিত্রালয় গমন কেমন করিয়া বর্ত্তাইল, বুঝিতে পারিলাম না। আগমনী-সঙ্গীতে মায়ের পিত্রালয় গমন সূচিত হয় এবং আমাদের হিন্দু সমাজ, বিশেষ করিয়া বঙ্গ নরনারীর ভাষ্য, ভূমিকায় এবং আচরণে প্রতিপন্ন হয় কন্যাপরিমা। দশভুজার জন্মবৃত্তান্ত পাগলের প্রলাপ! দশভুজার আবির্ভাব মহিষাসুরের উৎপীড়নে. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তেজে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিজ নিজ অস্ত্র প্রদান করিয়া শক্তিপূজা করিলেন। কুবের হার, কেয়ূরাদি দিয়া মাতাকে সম্মানিত করিলেন। মাতা অবলীলাক্রমে মহিষাসুরকে বধ করিলেন। ইহাতে সূচিত হয় কি মাতার পিতা-মাতা বৃত্তান্ত? অবশ্য উমামাহাত্ম্যে এবং দক্ষযজ্ঞে মাতার পিত্রালয় গমন। কিন্তু শিব অপরাধে মাতা আর কৈলাসে ফিরিলেন না; আহা শিব অপরাধের কি মাহাত্ম্য, মর্ত্ত্যে বাহান্নটি পীঠস্থান।

লেখকের সিদ্ধান্ত—মহাশক্তি দশভুজার পূজা ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও করিবার শক্তি নাই। দশমীতে বিসর্জ্জন প্রথা অপূর্ব্ব! মহাশক্তি দশভুজার বিসর্জ্জন কি কখনও সম্ভব হয়? বিসর্জ্জন পন্থা, কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন। ভগবানের কামনা সীতা উদ্ধার এবং রাবণকে পরম ভক্ত বলিয়া জগৎকে জানাইবার বাসনা। যখন রাবণ বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিলেন তখন কামনা বিসর্জ্জন দিলেন এবং রাবণ, রামচন্দ্রকে নীতি উপদেশ দিবার প্রাক্কালে স্বয়ং দশ মুখে ব্যাখ্যা করিলেন—"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমার পরম ইষ্ট।" অমনি বাসনা বিসর্জ্জন হইল। সত্য বাক্যে সত্য প্রতিজ্ঞা, কামনা বাসনা বিসর্জ্জন মহাশক্তির মহাপ্রসাদ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বন গমনে ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হইয়া শক্তিপূজা করার শক্তি পাইলেন, কিন্তু বর্ত্তমান জীব-জগৎ যে ভাবে দশভুজার পূজা করে তাহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নীতিবিরুদ্ধ। ভগবান, বানর ভল্লুক, রাক্ষস কত শত অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া একমন, একপ্রাণ, একধর্ম্ম, একআত্ম হইয়া পূজা করিলেন, কিন্তু আমাদের অলিতে গলিতে মায়ের পূজা হইতেছে, চাঁদা আদায় উত্তল করতঃ পূজা করিতেছি, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মাতৃপূজায় চাঁদা তুলিয়া পূজা করা চণ্ডীতে বা দেবীভাগবতে উল্লেখ আছে কি? কাজেই জীবের অপরাধে শিবের মাহাত্ম্য, আহা, শিবের কত করুণা! কিন্তু আমরা জীবের কাছে অপরাধ করিলে রাজদণ্ড ও ধর্ম্মদণ্ড দুই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বাপর ভুলিয়া যাই। এই ভুল সংস্কারে বাহান্নটি পীঠস্থান। এস্থলে বিশ্বাসকে এক নিঃশ্বাস বলা হইয়াছে। বিশ্বাস হইলে তবে শক্তি ভক্তি প্রকাশ। ভক্তির বন্দনা যোগ—ইতি ভক্তি, শক্তির আরাধনা ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্মতেজ শক্তি নামে অভিহিত।

দুর্গা দুর্গতিনাশিনী শিববাক্য। যদপি আমরা দুর্গাপূজা অলিতে গলিতে করি, তথাপি দুর্গতির অন্ত নাই, কেন বল দেখি এরূপ হয়? যদি বলিতেই হয় তবে সত্য বলাই ভাল, কলিতে দুর্গাপূজা করিবার শক্তি কাহারও নাই, ভক্তি হইবে কেন? শক্তি, ভক্তি অভাবে জ্ঞানের পরিবেশ কণ্ঠায় কণ্ঠায়। সকলেরই কণ্ঠ জ্ঞানের কথা বলিতে, উপদেশ দিতে সুদক্ষ। সুদক্ষ বলিতেছি এই যুগধর্ম্মে। এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি জ্ঞানের উপদেশ দেন নাই? স্বয়ং দেখেছি, জ্ঞানীর নিকট আগমন করিয়া বলেন "দর্শন করিতে আসিলাম" কিন্তু দর্শনে 'পত্রং পুষ্পং ফলম্ তোয়ম্' গীতার মহাবাক্য, কিন্তু সেদিকে জ্ঞানের উৎকণ্ঠায় অভেদাত্মা। অভেদাত্মা বলিয়াই অনেক কথা বলিয়া যান, "আপনার ইহা করা উচিত, ইহা অনুচিত ইত্যাদি" অতএব নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, কলিযুগে জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

ইত্যবসরে একজন দর্শনাভিলাষী আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, বহুদূর হইতে আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি, কিছু তত্ত্বকথা বলুন।" এই বলিয়া স্বয়ং তত্ত্বকথা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, তখন বলিলেন, "আমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, এখানে প্রসাদ পাইয়া যদি যাই আপনার অসুবিধা হইবে কি?" এক্ষেত্রে যতই অসুবিধা হউক, ভিক্ষা করিয়া আশ্রম চলে, তথাপি তাঁহার সুবিধা করিতেই হইল। কোন কোন ক্ষেত্রে যাইবার গাড়ীভাড়া চাহিয়া বসে। বিশেষ পরিচিত বলিয়াই যাওয়ার ভাড়া প্রস্তাবে করুণা-সিঞ্চন করেন, আর বলেন, "আমাদের বারোয়ারী পূজাতে আপনার সাহায্য, বিশেষ সাহায্য বলিয়াই আমাদের কমিটি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমরা গৃহী, ছেলেমেয়ের কাপড়-জামা ইত্যাদি কিনিতে হয়, কোথা হইতে কিনিব তাহার ঠিক নাই, আপনার তো এ সব বালাই নাই, অতএব আপনাকে মোটা চাঁদা দিতেই হইবে, এই সব সংকাজে আপনারা যদি না দেন তবে সংকাজে উৎসাহ কাহারা দিবে বলুন তো?"

উত্তরে বলি, "আচ্ছা আসুন, নমস্কার, যাহা দিলাম, ভিক্ষা করিয়াই দিলাম, সন্তুষ্ট হউন, দেখিবেন রুষ্ট হইবেন না।" অনন্তর নিবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসঙ্গত বারতা, ইহা তো ধর্ম্ম নহে, নীতি নহে, তৎপরমুহূর্ত্তে মনে হইল কলির মাহাত্ম্য।

কলিতে জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্য। জড়বিজ্ঞান জমির সার প্রস্তুত করিতেছে, গোময়ের প্রয়োজন হয় না, জমি চষিবার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, বলদের প্রয়োজন হয় না। বলদের দ্বারা জমি চষিয়া, গোময় সার দ্বারা উর্ব্বরা করিয়া ফসল সংগ্রহ করিলে, সেই ফসলে (হবিতে) যজ্ঞ করিলে মেঘ বারি বর্ষণ করে। দেবতা তুষ্ট হওয়ায় যে অন্ন পাওয়া যায় সেই অন্নে ব্রহ্মচর্য্যের পন্থা সুগম। এজন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—"অন্ন ব্রহ্ম" কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, হে বন্ধুসকল, কলির প্রভাবে ধরিত্রীমাতা ওলট-পালট হইয়াছে, অবশ্য ইহা নূতন নহে, যুগে যুগে এই একই বৃত্তান্ত। বৃত্তান্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্য, যথা, যে যুগ অতীত হয় সেই যুগই ভাল ছিল। অতএব হে বন্ধুগণ, আমাদের ভাল বলায় রসনা কি ভাল? কাজেই এখন রসনা সংযত করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহার পর আর যাহা সংযত করা প্রয়োজন তাহা আপনিই হইবে। ইহাতে পাতঞ্জল প্রণিধান

চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগনিদান। বলা বাহুল্য, ভোগ করিতে হইলে যোগের প্রয়োজন, নতুবা ভোগাসক্তি বাড়িবেই। আসক্তিই তো আত্যন্তিক দুঃখের কারণ, কারণ সুখের ইচ্ছাই তো দুঃখের যমজ ভ্রাতা। যমজ বিধানে নিদান পরিচয়, বড়টির মাথা ধরিলে ছোটটির ধরিবেই, বড়টির পেট খারাপ হইলে ছোটটির পেট খারাপ হইবেই। এইরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত যমজ ভ্রাতার নাম শরীর ও মন। যমজের সুখ বৃত্তান্ত, "আমি সুখী হবো আর কেহ যেন সুখী না হয়। সুখী দেখিলেই গাত্রজ্বালার অনন্ত বিবরণ, দিনে ডাকাতি, চুরি, হরণ এই সব কলির প্রভাবে নিরাশ্রয় হইয়া একপদে তপস্যা করে। কলিতে এক পাদ ধর্ম। এই তপস্যার ফলে দ্বাপরে চুরি হরণ দুই প্রচলিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে ননী চুরি করিতেন, পরে বস্ত্র হরণ, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ এবং সখা অর্জ্জুন দ্বারা সুভদ্রা হরণ করাইলেন। অতঃপর ত্রেতায় সীতা হরণ, যাহার জন্য অকাল বোধন।

অকাল বোধন ত্রেতায় অক্ষয় কীর্ত্তি, ত্রেতাতেই অকাল বোধন, কালবন্দনা নহে। এ-হেন পূজা ভগবানেই সম্ভব হইয়াছে, এখন অকালে ত্রিকাল দোষ। যথা—পবিত্র অন্নাভাব, পবিত্র জলাভাব, পবিত্র কন্যাভাব, এজন্য ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। বাস্তুভিটায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, এখন সূতিকাগার হাসপাতালে। সন্তানের চক্ষু উৎপাটনের চক্ষু নাই, অন্ধ, বাল্যকালেই চশমার প্রয়োজন হয়। আবার কোন কোন সন্তানকে পেট চিরিয়া বাহির করিতে হয়। উক্ত সন্তানগণ আজীবন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে। কারণ, ত্রিবিধ মাতা সংকার হইল না, যথা ধরিত্রীমাতা, ধাত্রীমাতা, গর্ভধারিণী মাতা। বর্ত্তমানে ত্রিমাতা সংকার না থাকায় গায়ত্রী অপরাধ। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী বন্দনায় ত্রিমাতার রূপ বর্ণনা আছে, যথা বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা পরিবেশ। এই মাতার ত্রিবিধ পরিবেশে ত্রিশক্তি ত্রিবিদ্যা সর্ব্বদা রক্ষা করেন। রক্ষাকল্পে শান্তি, শান্তি প্রত্যক্ষ হয় ত্রিপুটীতে। ত্রিপুটীতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। গঙ্গাতটে মহেশ্বর, যমুনাতটে বিষ্ণু এবং সরস্বতীতটে ব্রহ্ম, ত্রিদেবই একসঙ্গে বর দান করেন। বর দানের মাহাত্ম্য আত্মদর্শন, নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ, মহানির্ব্বাণ।

হে পাঠকবর্গ, আমাদের জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত অনুতাপের যোগ্য গর্ভযন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক, অধিক, অধিক। তিন অধিকে শরীর, মন, প্রাণ এবং বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার। এক্ষণে লেখকের বিচারে কলিবৃত্তান্তে নাম-সংকীর্ত্তন এবং পদব্রজে যাহারা পীঠস্থান দর্শন। যানবাহনে পীঠস্থান গমনে আমোদ-প্রমোদ বর্ত্তায়।

হে ভগবান, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, করুণা কর, আমরা অকাল বোধনে আমোদ-প্রমোদই করিলাম। অত বিজয়া উৎসব, কিন্তু মাতৃদর্শন হইল না, ছুটিলাম স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে, এদিকে সুযোগ পাইয়া অহংকাররূপী রাবণ আমাদের বিদ্যারূপিণী সীতা দেবীকে হরণ করিলেন। তৎপরিবর্ত্তে "নাক-কান কাটা সুর্পণখা"কে পাইয়া বিজয়া উৎসব করিলাম। সুর্পণখা অবিদ্যা, অবিদ্যাতে মাতিয়া গেলাম, মজিয়া গিয়া মরিলাম প্রায়; মরিতাম, নিশ্চয়ই মরিতাম, কিন্তু অবিদ্যা বাক্‌চাতুর্য্যে বক্তৃতা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, অথচ শক্তি নাই অবিদ্যাকে দমন করি, ভ্রমণ করিয়া বশীভূত করি, বশীভূত করিতে হইলে আত্মায় আত্মায় রমণ করিতাম, বলিতাম সীতা মহালক্ষ্মী, রাম মহাবিষ্ণু এবং রাবণ কুম্ভকর্ণ পরম ভক্ত জয় বিজয় তাৎপর্য্য কুম্ভকর্ণ সর্ব্বজয়কারী এবং রাবণ সর্ব্ববিজয়ী, অতএব বিজয়া উৎসব মহোৎসব নামে পরম মঙ্গলে চতুর্ব্বর্গ চরিতার্থ হইয়া চরিতার্থ করিল শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবকে। কিন্তু আমরা মুখ-ম্লান সম্প্রদায় বাদ বিবাদে। সারা জীবন গেল, এখন জীবনান্ত কাল উপস্থিত, নির্ব্বিবাদ হইতে পারিলাম না।

পাঠকবর্গ, লেখকের আমোদ-প্রমোদ আর ভাল লাগে না, পদব্রজে পীঠস্থান যাত্রায় আর শক্তি নাই, কাজেই, ছোট ছোট বালকদিগকে বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র নামাবলী গায়ে দিয়া, বৈষ্ণব তিলক পরাইয়া, গলে তুলসীমালা পরাইয়া নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়া দেখি কত সুন্দর চক্ষু চাক্ষুষে অন্তরে কত শান্তি। এইরূপে কলি সংকারে, কলি ধীরে ধীরে কালে বিলীন হইয়া মহাকালে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন।

ওঁ শান্তম্ অদ্বিতীয়ম্ ॥

উপসংহার

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকাল বোধনের নিয়ন্তা, কিন্তু সমন্বয়বাদে কাল শুদ্ধি করিয়া সীতা উদ্ধার করতঃ রাবণ এবং কুম্ভকর্ণকে তিন জন্মের অভিশাপ এক জন্মে সার্থক করিলেন। জড়বিজ্ঞান এবং চৈতন্যবিজ্ঞান সত্য সংকারে উভয় বিজ্ঞানকে স্বীকার করিয়া অঘটন ঘটাইলেন। কিন্তু আমরা একটি বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক দিয়া অকৃতকার্য্য হই। যথা জড়বিজ্ঞান দ্বারা ভূমি কর্ষণ—এবং ভূমি উর্ব্বর করিবার প্রণালীতে আপাততঃ আশাতীত ফসল পাই বটে কিন্তু ভূমির শস্য দানের পরিমিতি আছে, জড়বিজ্ঞান দ্বারা সেই পরিমাণ হারাইয়া অবশেষে একগাছি তৃণ দিবার ক্ষমতা থাকে না। এই পরিণামের কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধী সন্নিধানে নিবেদন, জড়বিজ্ঞান এবং চৈতন্য-বিজ্ঞানকে সমানভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মে সত্য প্রত্যক্ষ করুন।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১১

অসুখে এত ঘটা সুলতান কুঠিতে আগে আর কেউ দেখেনি।

একটু আধটু অসুখ হলে এখানকার রোগী যায় ডাক্তারের কাছে, আর রোগিনী বিনা চিকিৎসাতেই সেরে ওঠে। বাড়াবাড়ি অসুখ হলে প্রথমে আসে একটাকা ভিজিটের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তারপর দুটাকা ভিজিটের অ্যালোপ্যাথ। বুড়োদের অসুখ-বিশুখে কবিরাজ ডাকা হয়, তাদের কী বলে কিছু নেই, দরাদরি করে ওষুধের দামটা ধরে দিতে হয়।

কিন্তু বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তারের কথা কেউ কখনো দেখেছে, শুনেছে, না ভেবেছে!

রমণী পণ্ডিতের কথা গল্পকথা মনে হয়েছিল প্রথম। তারপর যা সব কাণ্ডকারখানা দেখা যাচ্ছে ক'দিন ধরে, আর অবিশ্বাস্য মনে হয়নি কারো।

ডাক্তারী ব্যাগ আর বুক-দেখা যন্ত্র হাতে মেয়ে-ডাক্তার পর্যন্ত এসে গেল যখন, আর অবিশ্বাসের কি আছে! অমন মেয়ে-ডাক্তার রোগী দেখে কি করে আপাতত সেটাই বিস্ময় সকলের। রোগীই তো বরং ওই ডাক্তারকে হাঁ করে দেখবে চেয়ে চেয়ে!

ঘটা বলতে শুধু ডাক্তারের ঘটা নয়, অসুখ উপলক্ষে বেশ একটা সমারোহ দেখে উঠল সুলতান কুঠির বাসিন্দারা। এমন সব চিকিৎসক, এমন পরিচর্যা, আর এমন সব শুভার্থী শুভার্থিনীর পদার্পণ ঘটলে অসুখেও সুখ।

প্রথমে এসেছেন হিমাংশু মিত্র।

তাঁর গাঢ় লাল গাড়িটা একটা লালচে বিভ্রম ছড়িয়েছে সকলের চোখে।

অসুখের দরুন ধীরাপদকে পর পর তিন দিন অফিসে অনুপস্থিত দেখে বাড়ি থেকে হিমাংশুবাবু প্রথমে কেয়ার-টেক বাবুকে পাঠিয়েছিলেন কেমন অসুখ দেখে আসতে। ঠিকানা-পত্র নিয়ে 'কেয়ার-টেকবাবু সাড়ম্বরে এসেছে আর ধীরাপদকে দেখে গিয়ে সবিনয় আড়ম্বরেই বড় সাহেবের কাছে অসুখের ঘোরালো অবস্থাটি ব্যক্ত করেছে। রোগী দেখে গিয়ে কেয়ার-টেকবাবু নিজে যেমন বুঝেছে, আর যতটা বলা উচিত বিবেচনা করেছে, তাই বলেছে। কারণ, তখন পর্যন্ত ধীরাপদকে দেখার জন্যে কোনো ডাক্তারের পদার্পণ ঘটেনি। এমন কি, প্রথম দিন দুই ওইটুকু অসুখ নিয়ে ধীরাপদ অফিসেও যেত নিশ্চয়। সোনাবউদির জন্যে পেরে ওঠেনি। গণুদাকে দিয়ে সোনাবউদি টেলিফোনে অসুস্থতার খবর জানিয়ে দিয়েছিল। তারপর অম্বিকা কবিরাজের কাছ থেকে রমণী পণ্ডিত ওষুধ চেয়ে এনে দিয়েছিলেন। সোনাবউদি শুশ্রূষা করছিল, ধীরাপদ তার দরুণ বিব্রতবোধ করছিল, আর রমণী পণ্ডিত স্বয়ং কবিরাজকেই একবার ধরে নিয়ে আসবেন কিনা সেই চিন্তা করছিলেন।

তৃতীয় দিনে চিন্তাটা তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ, ধীরাপদর অনুমোদন চেয়েছেন।

শিয়রের পাশে মেঝেতে সোনাবউদি বসেছিল। রমণী পণ্ডিতকে দেখে চার আঙুল ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। ধীরাপদ জবাব দিতে পারেনি, কারণ তার মুখে তখন থার্মোমিটার। সেটাও সোনাবউদির। ছেলেপুলের অসুখ লেগে আছে বলে থার্মোমিটারও আছে একটা। সুলতান কুঠির যাবতীয় জ্বর-জ্বালায় এই এক থা র্মমিটার ভরসা।

জবাব ধীরাপদর বদলে সোনাবউদি দিয়েছে।—কবিরাজ-টবিরাজে হবে না, আপনি আজই একজন ডাক্তার ডাকুন।

রমণী পণ্ডিতের মুখ বন্ধ। সোনাবউদির জ্বর দেখার ফাঁকে ধীরাপদ ইশারায় নিষেধ করেছে, অর্থাৎ, আপাতত কাউকে ডেকে কাজ নেই। জ্বর দেখার পর আবার কি হুকুম হয় ভেবে রমণী পণ্ডিত পায়ে পায়ে প্রস্থান করেছেন।

থার্মোমিটার ধুয়ে রাখতে রাখতে সোনাবউদি জিজ্ঞাসা করলেন, ওঁকে ডাক্তার ডাকতে বারণ করলেন কেন?

এই ক'দিন ধরেই সোনাবউদিকে গম্ভীর দেখছে ধীরাপদ। সেই রাতের পর ক'টা দিন এড়িয়ে চলতে পারলে বাঁচত। একেবারে উল্টো হল। অত রাতে চান করে আধভেজা গায়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জ্বরে আর মাথার যন্ত্রণায় অনেক বেলা পর্যন্ত মাথা তুলতে পারেনি।

ধীরাপদ জবাবদিহি করল, উনি কি কাউকে চেনেন না জানেন, কাকে ধরে নিয়ে আসবেন ঠিক নেই—ওঁকে দিয়ে হবে না।

কাকে দিয়ে হবে তাহলে? আমি যোগাবো?

ধীরাপদ আমতা আমতা করে বলেছে, গণুদা এলে না হয়...

কে এসে ? এত নির্বুদ্ধিতাই যেন বিরক্তির কারণ সোনাবউদির। —তার প্রোমোশন হয়েছে না ? মস্ত চাকুরে না সে এখন !···বুদ্ধির ঢেঁকি সব আপনারা—

গরগর করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

জ্বরটা কত জিজ্ঞাসা করা হয়নি, যতই হোক ধীরাপদ চিন্তিত নয়। ডাক্তার ডাকারও গরজ নেই তেমন। বুকে সর্দি বসে জ্বর, ছদিন বাদে সেরে যাবে। সোনাবউদির এই উষ্মা ঘরের কারণে বোধ হয়, খিটিরমিটির তো লেগেই আছে।···সেই রাতের অস্বাভাবিকতা হয়ত চোখে পড়েনি। সোনাবউদির রাগ দেখে ধীরাপদ স্বস্তি বোধ করেছিল একটু।

কেয়ার-টেক বাবুর আবির্ভাব।

বড় সাহেব দেখতে পাঠিয়েছেন, দায়িত্ব কম নয়। সেই দায়িত্ব-বোধে সর্দিটাকে যদি বুকজোড়া নিউমোনিয়ার পর্যায়ে ফেলেন তিনি, আর গায়ের তাপ যদি খই-ফোটা জ্বর বলে মনে হয়—সেটা বড় রকমের অতিশয়োক্তি কিছু নয়।

দু'ঘণ্টার মধ্যেই বড় সাহেবের গাড়ি সুলতান কুঠির এলাকায় এসে ঢুকেছে।

কুঠির বাসিন্দারা হাঁ করে সেই গাঢ় লাল গাড়ি দেখেছে আর গাড়ির মালিককে দেখেছে। নিজের ঘরের দোর-গোড়া থেকে সোনাবউদিও দেখেছে বিব্রতমুখে হিমাংশু মিত্রকে কেয়ার-টেক বাবু সরাসরি ঘরে এনে ঢুকিয়েছে। খবর শুনে বড় সাহেব এতটাই উতলা হবেন ভাবেনি বোধহয়।

চকচকিয়ে গিয়ে ধীরাপদ বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিল। হিমাংশুবাবু ধমকের সুরে বাধা দিলেন, উঠো না, শুয়ে থাকো।

ধীরাপদ শুয়েই পড়ল। অসহায় বোধ করছে। ঘরের এই অবস্থা, কোথায় বসতে দেবে, কি বলবে।

হিমাংশুবাবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলেন একটু। ঘরের চারদিকে তাকালেন একবার। এই অবস্থায় থাকে এ-যেন ভাবেন নি।

ডাক্তার কে দেখছে ?

জবাব না দিলে নয়। বলল, এমনিতেই সেরে উঠব ভেবেছিলাম, আজ কাউকে খবর দেব···

বড় সাহেবের বিস্ময় এবারে আরো স্পষ্ট। ঝুঁকে একখানা হাত ওর কপালে ঠেকালেন। কপাল ভালো, জ্বরটা বেশ চেপেই এসেছে মনে হচ্ছিল ধীরাপদর।

হিমাংশুবাবুর মুখ গম্ভীর। এখানে তোমায় কে দেখাশুনা করে ?

আশেপাশের সব আছেন···

হুঁ। এখানে এভাবে থাকার দরকারটা কি তোমার ? ওখানে অতবড় বাড়িটা খালি পড়ে আছে, গিয়ে থাকলেই তো হয়। এই মুহূর্তে সেই ব্যবস্থার সময় নয় ভেবেই আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন।

সেই দুপুরেই কেয়ার-টেক বাবু হন্তদন্ত হয়ে আবার এসে হাজির হয়েছে। একা নয়, সঙ্গে বড় ডাক্তার। ধীরাপদর শয্যাপাশে তখন রমণী পণ্ডিত বসে। লাল গাড়ির ধোঁকা কাটতে
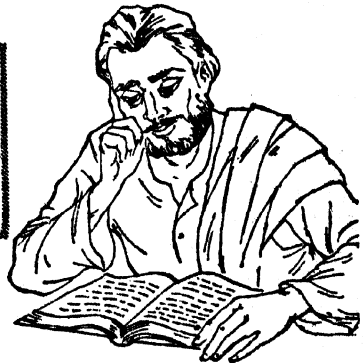
না কাটতে বাইরে আবার গাড়ি থামার শব্দ শুনে দু'কান আগেই খাড়া হয়ে উঠেছিল তাঁর।

মনে মনে এই আশঙ্কাই করছিল ধীরাপদ। বড় সাহেব ফিরে গিয়ে চুপ করে থাকবেন না। রাশভারী এই মানুষটির অনুশাসনেও প্রচ্ছন্ন স্নেহটুকু ইদানীং উপলব্ধি করতে পারে। শুধু ধীরাপদ নয়, অনেকেই পারে।

বড় ডাক্তার বিবরণ শুনে নিয়ে রোগী পরীক্ষা করলেন, তারপর স-নির্দেশ প্রেসকৃপশান লিখে দিয়ে গেলেন।

বালিশের তলা থেকে তাড়াতাড়িতে গোটা মানি-ব্যাগটাই রমণী পণ্ডিতের হাতে গুঁজে দিয়েছে ধীরাপদ—কেয়ার-টেক বাবুকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারের ফী দিতে হবে। ডাক্তারের পিছনে হুমড়ি খেয়ে কেয়ার-টেক বাবুও যে-ভাবে তন্ময় হয়ে রোগী দেখছিল, ধীরাপদ চেষ্টা করেও ইশারায় ফী-টা কত জেনে নেবার সুযোগ পায়নি। প্রেসকৃপশান লেখার সময়ও না। ডাক্তার গাত্রোত্থান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যাগ-পত্র তুলে নিয়ে সেও পিছনে পিছনে রওনা হয়েছে।

রমণী পণ্ডিত পিছন থেকে জামা ধরে টানতে কেয়ার-টেকবাবু ঘুরে দাঁড়াল। ডাক্তার ঘর ছেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়েছেন। হাতে মানি-ব্যাগ দেখে কেয়ার-টেক বাবু রমণী পণ্ডিতের ইশারাটা বুঝে নিয়ে একটা দৃষ্টির ঘায়ে তাঁকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে ধীরাপদর দিকে তাকালো। বলল, ভিজিট বত্রিশ টাকা, দরকার হলে দিনে তিনবার করে আসবেন উনি—আপনার অসুখ হলেও কি তা'বলে টাকাটা আপনাকেই দিতে হবে?

ঠাণ্ডা অনুযোগ। নাটকীয় প্রস্থান।

পরদিন একটু বেলাবেলি এসেছে কোম্পানীর ছোট ষ্টেশান-ওয়াগন। তার থেকে নামল লাবণ্য সরকার। একা।

আর সকলের মত বারান্দায় দাঁড়িয়ে গণুদাও হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথম। কোথায় দেখেছে তাও চট করে মনে করতে পারেনি। মনে পড়তে হন্তদন্ত হয়ে সাদর অভ্যর্থনায় ধীরাপদর ঘরে নিয়ে এসেছে তাকে।

ক'টা দিনের মধ্যে গণুদারও এই ঘরে এই প্রথম পদার্পণ।

ধীরাপদর হাতে দুধ-বার্লির গেলাস। পাশে সোনাবউদি বসে। নবাগতার সঙ্গে চোখোচোখি হল একদফা। ষ্টেথসকোপ হাতে দোলাতে দোলাতে লাবণ্য সরকার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখখানা হাসি-হাসি।

ত্রস্তে উঠে সোনাবউদি কোণ থেকে মোড়াটা এনে সামনে রাখল। লোকজন আসছে দেখে একটা মোড়া কালই এঘরে রেখে দিয়েছিল। বসার ফাঁকে লাবণ্য আবারও তাকে দেখল একবার। ধীরাপদর বিব্রত-বিস্ময়টুকুও প্রচ্ছন্ন কৌতুকের কারণ। বলল, বেশ কাহিল হয়েছেন তাহলে? আমি তো কিছুই জানতাম না—আজ শুনলাম।

কবে ফিরলেন? ধীরাপদ আত্মস্থ হতে চেষ্টা করছে তখনো।

বক্রাভাস কি না এক-পলক দেখে নিয়ে লাবণ্য বলল, কোথা থেকে? বম্বে থেকে?···কবেই তো। ফিরে এসে আপনার অত সুখ্যাতি শুনে রেগে গেছি! বড় সাহেবেরও ধারণা দেখলাম, আপনি না থাকলে এই ক'দিনে গোটা ব্যবসাটা প্রায় অচল হত।

পিছনে গণুদা দাঁড়িয়ে, এদিকে সোনাবউদি। হালকা ঠাট্টার বেশি আর কিছু বোঝার কথা নয় তাদের। শুধু ধীরাপদ বুঝেছে। লোকজনের সামনে অন্তত লাবণ্য সরকার বড় সাহেব বলে না, মিষ্টার মিত্র বলে। অন্যত্র বা অন্য সময়ে হলে পালটা ঠাট্টার ছলে ধীরাপদও বলত কিছু। কিন্তু বাড়ি বয়ে দেখতে আসার ফলে এর দ্বিগুণ শ্লেষও মুখ বুজে হজম করবে জেনেই বলা।

হাতের দুধের গেলাসটার দিকে ইঙ্গিত করে লাবণ্য বলল, খেয়ে নিন আগে। সোনাবউদির দিকে তাকালো, প্রেসকৃপশানটা কই?

আজও সকালে কেয়ার-টেকবাবু এসে বড় ডাক্তারকে খবর জানাবার জন্যে রোগীর অবস্থা খুঁটিয়ে জেনে গেছে। কিন্তু সে-কথা কেউ বলল না। সোনাবউদি ধীরাপদর বালিশের নিচে থেকে প্রেসকৃপশানটা নিয়ে তার হাতে দিল।

সেই ফাঁকে ঘরের ভিতরটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছে লাবণ্য সরকার। সেই দেখাটাও ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে। মনে মনে নিজের ওপরেই বিরূপ একটু, আগে তো বিব্রত বোধ করত না, এখন করে কেন!

প্রেসকৃপশান পড়ে লাবণ্য বলল, ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে, আজকের রিপোর্টও পেয়েছেন, ওষুধ একটু বদলাতে বললেন···আগে দেখে নিই, আপনি শুয়ে পড়ুন দেখি, ভালই তো আছেন মনে হচ্ছে—

ধীরাপদ অসহায় বোধ করছিল কেমন, আজ এত দিনে লাবণ্য সরকার যেন কিছুটা হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওকে।

লাবণ্য নিজের থার্মোমিটার বার করে জ্বর দেখল। নাড়ি দেখল, জিভ দেখল, চোখের পাতা টেনে দেখল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বুক পিঠ পরীক্ষা করল। শেষে গম্ভীর মুখে বলল, উঠে বসবেন টসবেন না অত, শুয়ে থাকবেন—পড়ন্ত শীতে বেশ করে ঠাণ্ডাটি লাগিয়েছেন বুঝি?

চকিতে ধীরাপদ সোনাবউদির দিকে তাকালো একবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস কিনা দেখার জন্যে দ্বিতীয়বার চোখ ফেরাতে পারল না। ও-ধারে গণুদা দাঁড়িয়ে। কেন দাঁড়িয়ে বা, কি দেখছে তার নিজেরও খেয়াল নেই।

কাগজ চেয়ে নিয়ে লাবণ্য সরকার প্রেসকৃপশান অদল বদল করল একটু। সোনাবউদির হাতে সেটা দিয়ে কখন কোন্ ওষুধ দিতে হবে বুঝিয়ে দিল।

চিকিৎসকের অখণ্ড দায়িত্ব নিয়ে এখানে রোগী দেখতে আসেনি সে। প্রীতি এবং সৌজন্যবোধে সহকর্মীকে দেখতে আসাটাই মুখ্য। তাই চিকিৎসকের মত বিদায়ও নিল না। ইঙ্গিতে সোনাবউদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইনি?

বউদি।

সোনাবউদি না বলে শুধু বউদি বলল ধীরাপদ।

সোনাবউদির উদ্দেশে লাবণ্য যুক্ত-করে মাথা নোয়ালো একটু, তার পর হাসিমুখে অনুযোগ করল, যে অনিয়ম করেন উনি, অসুখ হবে না—কড়া শাসনে রাখেন না কেন?

সলজ্জ বিনয়ে সোনাবউদি বলল, আমি পাড়াগেঁয়ে বউদি, কড়াকড়ি করলে পাছে সম্পর্কটা ছেঁড়ে সেই ভয়ে পারিনে।

সকৌতুকে লাবণ্য সরকার এবারে আর একটু মনোযোগ দিয়েই দেখে নিল তাকে। এই এক জবাব থেকেই যেমন প্রায় বউটি

ভেবেছিল তেমন মনে হল না বোধ হয়। ওদিকে গণুদার মুখে বিরক্তির আভাস, স্ত্রীর জবাবটা মনঃপূত হয়নি।

যা বলেছেন,—লাবণ্য সরকারের লঘু সমর্থন, কড়াকড়ি করার ফল আমি অন্তত হাতেনাতে পেয়েছি। ওঁকে দেখার পর থেকেই নিরীহ গোছের লোক দেখলে ভয় করে—সেই প্রথম দিন থেকে কতবার যে জব্দ হয়েছি ঠিক নেই।

ধীরাপদর সঙ্গে লাবণ্যর রেষারেষি যেমন, হৃদ্যতাও তেমনি। একটা থেকে আর একটায় পৌঁছুতে সময় লাগে না। তবু, আজকের এই অন্তরঙ্গ সুরটা নতুন। রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হবার মতই। ধীরাপদ হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সোনাবউদির দিকে চোখ পড়তে শঙ্কিত একটু। তার সরল বিস্ময়ের বক্র-রীতি সে-ই জানে শুধু।

একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সোনাবউদি আলতো করে বলল, এই সুখবরটাও এতদিন গোপন ছিল।

লাবণ্য হাসল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সোনাবউদির সরাসরি চাউনিটা এড়ানোর জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। যেদিকে গণুদা দাঁড়িয়ে। গণুদা স্ত্রীর উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলে বসল, একটু চা করে দিলে না ?

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। রোগী দেখতে এসে চা কি, তাছাড়া তাড়াও আছে। ধীরাপদর দিকে তাকালো, আপনি ভালয় ভালয় শুয়েই থাকুন দিন-কতক, তা না হলে অসুখটা আপনাকে আমাদের মত অত খাতির না-ও করতে পারে। চলি—

দরজার দিকে এগিয়ে গণুদাকে বলল, আমাকে দু'বেলাই টেলিফোনে একটা করে খবর দেবেন, সকালে নার্সিং হোমে বিকেলে অফিসে—কোন নম্বর ধীরুবাবুর কাছেই পাবেন।

সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে গণুদা তাকে এগিয়ে দিতে গেল।

লাবণ্যকে ধীরুবাবু বলতে এই প্রথম শুনল ধীরাপদ। প্রথম মাঝে মাঝে মিষ্টার চক্রবর্তী বলেছে। কাকে বলছে ধীরাপদরই এক-একসময় ভুল হয়ে যেত। এই নিয়ে অপ্রস্তুতও হয়েছে, বলেছে, এই পোশাকী ডাকটা এত কম শুনেছি যে নিজেরই সব সময় খেয়াল থাকে না। লাবণ্য এর পর একদিন ধীরাপদবাবু বলতে গিয়ে হেসে ফেলছিল, ঠাট্টা করেছে, নাম বলতেই দম শেষ, কি জন্যে এলাম ভুলে গেলাম···।

সামনাসামনি আর মিষ্টার চক্রবর্তীও শোনেনি, ধীরাপদবাবুও শোনেনি। আজ ধীরুবাবু শুনল। নামের এই চালু সংক্ষেপটা কারো মুখে শুনেছে হয়ত। কোথায় শুনল ?···অমিতাভ ঘোষের মতে ধীরাপদ নামটা বিচ্ছিরি, ধীরু নামটা মিষ্টি। সুলতান কুঠির এই ঘরে বসেই মন্তব্য করেছিল সে। কিন্তু তার কাছ থেকে লাবণ্য সরকার শুনবে কেমন করে···। বোধহয় বড় সাহেবের মুখে শুনেছে। তিনি ধীরু ডাকেন আজকাল। চারুদির মুখে হয়ত ওই নামই শুনে অভ্যস্ত তিনি।

কিন্তু এই একজনের মুখে এই চিরাভ্যস্ত চালু নামটা আজ নিজের কানেই মিষ্টি লাগল ধীরাপদর।

সু-বচনীটি কে ?

সোনাবউদি হাতের প্রেসকৃপশানটা নাড়াচাড়া করছে, আর কটাক্ষে তাকেই নিরীক্ষণ করছে। হাসির চেষ্টায় ধীরাপদ ঢোঁক গিলল, লাবণ্য সরকার, কোম্পানীর মেডিক্যাল অফিসার।

ও···। পরিপূর্ণ পরিচয়টি জানা হয়ে গেল যেন। হাতের প্রেসকৃপশানটা আর একবার উল্টেপাল্টে দেখে নিল সোনাবউদি।—এটা কি করব, এর আর দরকার আছে কিছু না, ওতেই কাজ হয়েছে ?

হাসি ছাড়া জবাব নেই। গণুদার পুনঃপ্রবেশে সে-চেষ্টা থেকেও খানিকটা অব্যাহতি পেল। কিন্তু স্ত্রীর উদ্দেশে গণুদার রুক্ষ অনুশাসন কানে যেতে দু-চোখ টান ধীরাপদর। ঘরে ঢুকেই বিরক্তি-বর্ষণ, তোমার কি বাক্সয় আর শাড়ি-টাড়ি নেই কিছু ? দেখছ এ-ঘরে লোকজন আসছে যাচ্ছে—একটু ভদ্রলোকের মত এসে বসলেও তো পারো ?

সোনাবউদির মুখে আবারও খানিক আগের সেই নিরীহ অভিব্যক্তি।

গণুদার বিরক্তির উপসংহার, বাড়ির ঝি-ও এর থেকে ভালোভাবে থাকে।

ধীরাপদ ঘাড় কাত করে দেখে নিল, সোনাবউদির পরনের শাড়িটা খুব ময়লা না হলেও আধময়লাই বটে। আর কাঁধের আঁচলের কাছটা খানিকটা ছেঁড়াও।

সোনাবউদি কি হাসছে ? ধীরাপদ ঠাওর করে উঠতে পারল না। মনে হল, গাম্ভীর্যের বাঁধে কৌতুকের বন্যা ঠেকিয়ে রেখেছে। মাথা নিচু করে বুকে-কাঁধে চোখ চালিয়ে বেশ রয়েসয়ে নিজের ঝি-এর অবস্থাটা দেখে নিল আগে। তারপর গণুদার চোখে চোখ রাখল। আগে খেয়াল থাকলে তোমারও বুকটা দেখে নিতে বলতাম। হল না যখন কি আর করবে, এ-ই এনে দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে খাও। প্রেসকৃপশানটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে সোনাবউদি উঠে সোজা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

দরজাটাকে ভস্ম করা সম্ভব নয়, গণুদার উষ্ণ দৃষ্টি ধীরাপদর মুখের ওপর এসে থামল। ভরসা করে তাকেও কিছু বলতে পারল না। ভালো কথাতেই যে-মূর্তি দেখেছে কিছুদিন আগে, ভরসা হবে কোথা থেকে। তবু তার নীরব অনুযোগ স্পষ্ট। অর্থাৎ, মেয়েছেলেকে বেশি আস্কারা দিলে কোথায় ওঠে নিজের চোখেই দেখে নাও এবার।

প্রেসকৃপশানটা তুলে নিয়ে গণুদাও চলে গেল।

সুলতান কুঠিতে অর্গ্যানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্রর ধপধপে শাদা ছোট গাড়িটা লাবণ্য সরকারের ষ্টেশান-ওয়াগনের থেকেও বেশি অপ্রত্যাশিত। সিতাংশুও রোগী দেখতে এসেছে।

কিন্তু আসলে এসেছিল বোধহয় পদমর্যাদার খোলস ছেড়ে ধীরাপদর সঙ্গে সম্পর্কটা আর সকলের মত সহজ করে নেবার তাগিদে। তার প্রয়োজন বোধ করেছিল কেন সেই জানে। অসুখের দরুন দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে, চিকিৎসায় কোনরকম ত্রুটি না হয় সে কথা বার বার বলেছে। এই ফাঁকে নিজের সহজ হয়ে ওঠাটাও সহজ হয়েছে। আরো অনেক কথা বলেছে তারপর। এ সময় ধীরাপদর বিছানায় পড়ে থাকলে চলবে কেন, কাজের কি শেষ আছে এখন। ক'টা মাস বাদে কোম্পানী দশ বছরে পড়বে, সবাই উৎসব-উৎসব করছে বটে, কিন্তু ঝামেলার কথা ভেবে তার এখন থেকেই দুশ্চিন্তা। তাছাড়া, কোম্পানীর নতুন শাখা পত্তন হচ্ছে শিগগীরই, প্রসাধন-সামগ্রী তৈরীর বিভাগ—কেমিক্যাল পারফিউমারি ব্র্যাঞ্চ। এতবড় ঝুঁকিটা বাবা এখন না নিলেই পারতেন, কিন্তু মাথায় ঢুকেছে যখন করবেন—করবেনই। কোথায় করবেন, কারখানার এলাকায় আর জায়গাই বা কোথায়, সিতাংশু ভেবে পায় না। এর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা চাই, আলাদা যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম চাই, ব্যাপার কম নাকি! অথচ কাজের বেলায় তো হাতগুনতি ক'টি লোক। অবশ্য ধীরাপদর ওপর আস্থা আছে সকলেরই, সিতাংশুর নিজেরও আছে—বাবার লোক চিনতে ভুল হয় না, আগে তাদেরই বরং যা একটু খটকা ছিল···।

আপসের সুর, অন্তরঙ্গ স্বীকৃতি।

বিনিময়ে ধীরাপদর শুধু একটি কথাই জানতে ইচ্ছে করছিল, একটা কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল, লাবণ্য সরকারকে নিয়ে বম্বে থেকে ফিরে আসার পরই তাদের যা-একটু-খটকাটা পুরোপুরি গেল কেমন করে। হিমাংশু মিত্র কি বলেছেন, কেমন ব্যবহার করেছেন? লাবণ্য সরকারের বিদ্রূপ ভোলেনি, বড় সাহেবের ধারণা সে না থাকলে গোটা ব্যবসাটা প্রায় অচল হত। এমন অস্বাভাবিক ধারণার কথা বড় সাহেব বলেননি নিশ্চয়। কিন্তু কিছু না বললেই বা এরা এমন সদয় কেন তার ওপর?

কেন, তার কিছুটা আঁচ ধীরাপদ পেয়েছে। সুলতান কুঠির আঙিনায় পর পর দুদিন আরো একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। চারুদির ক্রিম-কালারের চকচকে গাড়িটা। প্রথম দিনের আগন্তুক চারুদি নিজেই।

চারুদির খেদ আর অভিযোগ দুইই আন্তরিক। কিছু জানতেন না সেই খেদ আর কিছু জানানো হয়নি সেই অভিযোগ। বড় ডাক্তার চিকিৎসা করছেন এবং তিনি অভয় দিয়েছেন জেনে কিছুটা নিশ্চিন্ত। এসে অনেকক্ষণ ছিলেন। আধখানা বিছানায় আর আধখানা মাটিতে বসেছিলেন। সোনাবউদি তাড়াতাড়ি একটা আসন এনে পেতে দিয়েছিল। হাত ধরে আপনজনের মত চারুদি তাকেই সেই আসনে টেনে বসিয়ে দিয়েছেন—আমি বেশ বসেছি, তুমি বোসো। গাড়ি থেকে একদিন চোখের দেখা দেখেছিলেন, আজ সামনাসামনি ভালো করে দেখে নিলেন দুই এক মুহূর্ত।—তোমার কথা একদিন ধীরুর মুখে শুনেছিলাম, আমি ওর দিদি হই সম্পর্কে—জানো তো?

সোনাবউদি মাথা নাড়ল, জানে।

চারুদি ধীরাপদর দিকে তাকালেন একপলক, তারপর তরল বিড়ম্বনায় বলে উঠলেন, ও যে ন'বছর বয়েসেই আমাকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল তাও জানো নাকি?

বহুদিনের এই পরিহাস-প্রসঙ্গ আজ কেন জানি তেমন মিষ্টি লাগল না ধীরাপদর কানে। কতটা বলা হয়ে তাঁর সম্বন্ধে, এবারের জবাব থেকে চারুদি তাই বুঝে নিতে চান। কিন্তু বোঝা হল না। হাসি-হাসি মুখে সোনাবউদি মৃদু মন্তব্য করল, ওঠারই তো কথা—

চারুদি লজ্জা পেলেন, তুমিও তো আবার কম নও দেখি। একটু বাদে বললেন, এতবড় অসুখটার সব ধকল তোমার ওপর দিয়েই গেল বুঝি?

বড় অসুখ ডাক্তার বললেন? সাদামাটা পাল্টা প্রশ্ন সোনাবউদির।

স্নেহভাজনের অসুখ-বিসুখ মেয়েরা সাধারণত বড় করেই দেখে থাকে, সেই রীতিতে বলা। সোনাবউদির সরল চাউনিতে বক্রাভাস ছিল না একটুও। তবু ভিতরে ভিতরে ধীরাপদ অস্বস্তি বোধ করছিল একটু। চারুদি বললেন, কি জানি বাপু, আমার তো শুনে ভয়ই ধরেছিল, সময়ে ধরা না পড়লে কোথা থেকে কোথায় দাঁড়াত কে জানে—এখনো তো চোখ-মুখের অবস্থা ভালো ঠেকছে না খুব।

সোনাবউদিও চারুদির উৎকণ্ঠা নিয়ে ধীরাপদকে দেখে নিল এক-নজর, তারপর মাথা নেড়ে সায় দিল। অর্থাৎ, ভালো ঠেকছে না ঠিকই। সোনাবউদির সাথে ব্যক্তিগত আলাপে মগ্ন হলেন চারুদি। বাপের বাড়ি কোথায়, কত বছর বিয়ে হয়েছে, ক'টি ছেলেপুলে, ইত্যাদি।

সোনাবউদি এক ফাঁকে উঠে যেতে চারুদি ধীরাপদর দিকে ঘুরে বসলেন। বেশ বউটি। মন্তব্যের বাইরে আর কোনো কৌতূহল দেখা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত এসেছিল?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, আসেনি।

কি যে হচ্ছে দিনকে দিন ছেলেটা। বলতে বলতে চারুদির কিছু একটা রসালো ব্যাপার মনে পড়ল বোধহয়। দুর্ভাবনাজনিত গাম্ভীর্যের ওপর খুশির ঝলক নামল। বললেন, সেদিন তো আমার ওখানেই মামা-ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল। তোমার কথাও হল। চারুদির উৎফুল্ল প্রশস্তি, তুমিও ওস্তাদ কম নও—দু'পক্ষই দিব্বি খুশি দেখি তোমার ওপর!

ধীরাপদর নীরব আগ্রহ গোপন থাকল না। ভিতরে ভিতরে উন্মুখ সে। চারুদির বাড়িতে মামা-ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল কবে? যে-দিন চারুদি আর হিমাংশুবাবু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন আর, যে-দিন এক নগ্ন-চাহিদার মুখে পার্বতীকে ফেলে ধীরাপদ পালিয়ে এসেছিল সেই দিন? চারুদিই বা অত খুশি কেন—মামা ভাগ্নেতে এক-হাত হয়ে গেল বলে, না ধীরাপদর কথাও হল বলে, না কি ওর দু'পক্ষকে তুষ্ট রাখার কেরামতি দেখে?

কিন্তু ঘটনা যা শুনল সেটা এমন কিছু নয়। মামাকে হাতের কাছে পেয়ে ভাগ্নে কৈফিয়ৎ তলব করেছে—যে-সব কর্মচারী ছুটিতে ছিল বা যারা সাময়িক হারে কাজ করছে, এ মাসে তাদের অনেকের মাইনের গণ্ডগোল হয়েছে, অনেকে মাইনে পায়নি এ সব দেখাশুনা দায়িত্ব যাদের, মাইনের মুখ চেয়েও কাউকে কিছু না বলে খোশ খুশিমত তারা যেখানে সেখানে চলে যাবে কেন?

হিমাংশু মিত্র হালকা টিপ্পনী কেটেছিলেন, এ বিদ্যেটা ওরা তোর কাছেই শিখেছে বোধহয়।···পরে ভাগ্নের মেজাজের আঁচে আস্তছ হয়ে ভালোমানুষের মত জিজ্ঞাসা করেছেন, যাদের দায়িত্ব তারা তাহলে কাজ-কর্ম দেখছে না ঠিকমত?

জবাবে বেপরোয়া আক্রমণ অমিতাভ ঘোষের, দেখবে না কেন খুব দেখছে, যেমন বড় সাহেব নিজে দেখছেন আর সকলেও তেমনি দেখছে। রাগের মাথায় তখনই ধীরাপদর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে সে। নেহাত চারু মাসির কল্যাণে একটা ভালো লোক এসে মুখ বুজে সব ঝামেলা সামলে চলেছে তাই, নইলে এরই মধ্যে দেখা যেত। গেল মাস কাবারে গোটা ওষুধের দোকানের মাইনে বন্ধ করে মজা দেখানোর ইচ্ছে ছিল তার—লোকটা অমন একরোখা ভালো লোক বলেই হল না।

হিমাংশুবাবু আবারও ঠাট্টা করেছেন, তোর মতেও তাহলে ভালো লোক দুই একজন আছে!

অমিতাভ ঘোষও তেমনি ব্যঙ্গ করেছে, সেই ভালো লোকটিকে যত বড় তাঁবেদার ভাবছ নিজেদের তা-যে নয় তাও টেরটি পাবে একদিন।

হিমাংশু মিত্র আর কিছু না বলে শুধু হেসেছিলেন শুনল। চারুদি চলে যাবার পরেও ঘুরে ফিরে একটা কথাই মনে হয়েছে ধীরাপদর, মামা-ভাগ্নের এই বচসার কারণে চারুদি এত খুশি কেন! মামার প্রতি ভাগ্নেটি বিরূপ বলেই তো তাঁর দুশ্চিন্তা দেখে আসছে। কোম্পানীতে একজন ভালো লোক আমদানী করতে পারার তুষ্টি? কিন্তু ভালো লোক দেবার জন্যে কেউ তো তাঁর প্রত্যাশী ছিল না। নিজের গরজেই দিয়েছেন।

ধীরাপদর হঠাৎই মনে হল, চারুদি খুশি—ওর ওপর স্বয়ং কর্তাটি খুশি বলে, আর, ওরই ওপর অমিত ঘোষের এমন আস্থা দেখেছেন বলে। চারুদির এটুকুই কাম্য ছিল হয়ত···

কিন্তু ঘুরে ফিরে তেমনি হেঁয়ালীই থেকে গেল সব কিছু। একা ঘরে ধীরাপদর এলোমেলো ভাবনাটা আর এক পথে গড়ালো। রমণী পণ্ডিতের গ্রহ-মাহাত্ম্যই বিশ্বাস করবে শেষ পর্যন্ত। সে-তো সেই অকেজো মানুষ, সময় না কাটলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কার্জন-পার্কের লোহার বেঞ্চিতে বসে থাকত। আর, এই এত বড় প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট হবার পরেও সে এমন চমকপ্রদ কিছু করেনি যার বিনিময়ে এতখানি বিশ্বাস আর এতখানি মর্যাদা তার প্রাপ্য। সেই বিশ্বাস আর সেই মর্যাদা বাড়ছেই। আরো যে বাড়বে তাও স্পষ্ট।··· আশ্চর্য!

আরো আশ্চর্য, বড় সাহেবের আস্থা-ভাজন, চারুদির প্রিয়পাত্র, অমিত ঘোষের অন্তরঙ্গ মানুষ, লাবণ্য এমন কি সিতাংশুরও স্বীকৃত ব্যক্তি জেনারাল সুপারভাইজার ধীরাপদ চক্রবর্তী চেষ্টা করেও এই নতুন সাজে নিজেকে দেখতে পায় না কেন? যখনই দেখতে চায়, দেখে ওই লোকটাকে—সুলতান কুঠির ভূমি-শয্যায় হাত-পা ছড়িয়ে নিস্পন্দের মত পড়ে আছে যে—যে-লোকটা কার্জন-পার্কের লোহার বেঞ্চ-এ বসে থাকত তাকে, যে-লোকটা ছেলে পড়াতো, অম্বিকা কবিরাজ আর দে-বাবুর জন্যে বিজ্ঞাপন লিখত

তাকে। সেই ধীরাপদই যেন চোখ ধাঁধানো নতুন খোলস পরেছে একটা, মনের আয়নায় তার প্রতিফলন নেই।

পরদিন। দুপুরের দিকে কোম্পানীর একটা নতুন প্যামফ্লেটে চোখ বোলাতে বোলাতে ধীরাপদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। লাবণ্য সরকার লোক মারফত অফিস থেকে এই প্যামফ্লেটগুলো পাঠিয়েছে। প্রচার-পুস্তিকার মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতা, কাগজের মান, প্রচ্ছদ-পারিপাট্য—এক কথায় সমস্ত আঙ্গিক-বিন্যাস তার অনুমোদন-সাপেক্ষ। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্যে পাঠানো হয়নি এগুলো—আগের কাজ, নতুন এসেছে তাই দেখতে পাঠানো হয়েছে।

ঘুম ভাঙতে আবার সেই প্যামফ্লেটই নাড়াচাড়া করছিল। ঘরে পা দিয়ে সোনাবউদি বলল, সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোলেন তাতে আবার জ্বর-জ্বালা না আসে—শরীর খারাপ হয়নি তো? কপালে হাত রাখল, ছ্যাঁক-ছ্যাঁকই তো করছে।

প্যামফ্লেট নামিয়ে ধীরাপদ হালকা জবাব দিল, এত ঘটার পরে এরই মধ্যে একটু ছ্যাঁকছ্যাঁকও না করলে লজ্জার কথা না? তাঁরা সব ভাববেন কি···

তা অবশ্য···। সায় দিল সোনাবউদি, আপনার দিদির গাড়ি আজও এসেছিল—আমি আদর করে ডাকতে গিয়ে দেখি আপনার দিদি নয়, আর একজন।

আর একজন! আর একজন মানে অমিতাভ নিশ্চয়। বিস্ময়ের থেকেও বিরস দেখালো ধীরাপদর মুখ, আমাকে ডেকে দিলেন না কেন?

ঘুমুচ্ছেন দেখে ডাকতে দিলে না, নিস্পৃহ উত্তর, আপনার খোঁজ-খবর নিয়ে আমার সঙ্গেই একটু গল্পসল্প করে চলে গেল।

হেঁয়ালীর মত লাগল কানে, সোনাবউদির মুখে না হোক চোখে চাপা হাসি। দ্বিধার সুরে ধীরাপদ জিজ্ঞাসা করল, সেই প্রথম দিন আমার সঙ্গে এসেছিলেন···সেই ভদ্রলোক তো?

অমিতাভ ঘোষ? উল্টে সোনাবউদিই বিস্মিত যেন, চাকরিতে প্রমোশন করিয়েছেন ও নাম তো জপের নাম—তিনি এলে তাঁকে আর চিনব না!

ধীরাপদ অবাক আবারও। চারুদির গাড়িতে কে আর আসতে পারে!

তার এই নির্বাক আগ্রহটুকু উপভোগ্য যেন, সোনাবউদি ধীরেসুস্থে জ্ঞাপন করল, ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলাগোছের··· আপনার ভাগনী, মামাবাবুই তো বলল আপনাকে···নাম বলল পার্বতী।

শুনেও ধীরাপদ চেয়েই আছে ফ্যালফ্যাল করে। পার্বতী আসবে তাকে দেখতে শুনলেও বিশ্বাস করার মত কা?

আপনার আর কে কোথায় আছে আজকাল, বলে রাখুন তো, বড় গণ্ডগোলে পড়ে যাই। হেসে ফেলে মোড়াটা টেনে বসে পড়ল, ভাগনীটি বেশ, তবে বড় গম্ভীর—ভয়-ভয় করে। ধীরাপদর বিড়ম্বিত মুখখানা দেখছে চেয়ে, উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল আবার, বাড়িতে যে কাজ করে সেও অমন একখানা গাড়িতে চেপে দেখতে আসে আপনাকে—আপনি এখানে এ অবস্থায় পড়ে আছেন কেন ভেবে তো অবাক আমি!

পার্বতীর আবির্ভাবের বিস্ময় এড়িয়ে ধীরাপদ লঘু জবাব দিয়ে ফেলল, আর কোথাও সোনাবউদি নেই।

হুঁ? সোনাবউদির সমস্ত মুখখানি সেই আগের দিনের মত পরিহাস-সজীব। ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করল, ঘরে মেজে রূপ আর ধরে বেঁধে প্রেম—কোনটাই বা টেকে। দু'চোখ সরাসরি ধীরাপদর মুখের ওপর থমকালো হঠাৎ। তা বললেনই যখন, এ সোনাবউদি তো বাইরের পাঁচ জনের মত রোগী দেখতে এসে কি-হল কি-হল করে চলে যাবে না। আমি তো জিজ্ঞাসা করব, কেমন করে হল—ঠাণ্ডাটা লাগল কি করে?

হাতে কি ওটা···প্যামফ্লেট···এগুলো দেখে রাখা ধীরাপদর কর্তব্য।

কিন্তু সোনাবউদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি তখনো। দুই এক মুহূর্তের প্রতীক্ষা। সেদিন সেই ঠাণ্ডা রাতেও আপনি হঠাৎ অমন গুরুস্নানে চান করে উঠলেন কেন, আর সারারাত এই ঠাণ্ডা মেঝেতেই বা শুয়ে কাটালেন কেন?

নিরুত্তরে একটু হাসতে পারলেও জবাব এড়ানো যেত বোধহয়। ধীরাপদ চেষ্টাও করেছিল। হাতের প্যামফ্লেট চোখের সামনে উঠে এসেছে, অফিসের কাজ—দেখে রাখাটা জরুরী যেন।

ধরণী দ্বিধা হও···।

সোনাবউদি আবারও কপালে হাত রাখলে দেখত কপাল আর ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করছে না। কপাল ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে।

দরজার কাছে একাধিক পায়ের শব্দ। চটির চট চট আর খড়মের খটখট আওয়াজ। সোনাবউদির চোখ দুটো ওর মুখের ওপর থেকে দরজার দিকে ঘুরল এতক্ষণে। উঠে মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল।

শকুনি ভটচায, একাদশী শিকদার আর রমণী পণ্ডিত। আপনজনেরা রোগীর খবর নিতে এসেছেন। প্রায় রোজই আসেন একে একে।

দেয়াল ঘেঁষে সোনাবউদি বাইরে চলে গেল। ধীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল।

ত্রিমূর্তি সুবাঞ্ছিত। [ক্রমশঃ।

"If the critics cannot control the stars, they can at least administer the stripes."

—GEORGE BERNARD SHAW.

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শেষ গ্রীষ্ম

আলোচ্য গ্রন্থখানি বর্ত্তমান শতাব্দীর এবং বিখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিকের একখানি অনুপম রচনার অনুবাদ। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন বরিস পাস্টেরনাক, তাঁর বহু-বিশ্রুত গ্রন্থ 'দি লাষ্ট সামার'; এই বইটির অনুবাদ করেছেন স্বনামধন্য শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীঅচিন্ত্যকুমারের পরিচয় আজ আর নতুন করে দেওয়ার নেই কিছু, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেগবান রচনাশৈলী আলোচ্য পুস্তকটিকে এক অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা দিয়েছে; অনুবাদ-কর্ম যশোত্তীর্ণ করে তোলা বড় সহজ নয়, অচিন্ত্যকুমারের সমৃদ্ধ লেখনী যে এই কাজে নিযুক্ত হয়েছে, অনুবাদ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেটি একটি সুনিশ্চিত সুলক্ষণ।

বহুখ্যাত পুস্তক 'ডাঃ জিভাগো' ব্যতীত পাস্টেরনাক আর একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন, সেটি এই "শেষ গ্রীষ্ম"। যুদ্ধপূর্ব যুগের পরিচ্ছন্ন সুন্দর এক গ্রীষ্মের দিনগুলির স্মৃতিচারণ চলেছে এই তরুণ নায়কের মনে, সে স্বপ্ন দেখছে সেই স্বর্ণালী অতীতের যে অতীতে প্রেম ছিল ঘৃণার চেয়ে সহজ, জীবনের পদক্ষেপ ছিল সরল স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের পথে, আত্ম-জিজ্ঞাসায় অন্তর্দ্বন্দ্বে যখন মানুষ ব্যাকুল হত না প্রতি পলে!

কাহিনীটির আখ্যানভাগ আপাত সরল হলেও জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। বিদগ্ধ পাঠক ও সাহিত্যিক উভয়েই এই অনুবাদকর্মটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। আঙ্গিক সম্পদেও পুস্তকটি সমৃদ্ধ। 'শেষ গ্রীষ্ম' বরিস পাস্টেরনাক। অনুবাদক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ডি, মেহরা, রূপা অ্যাণ্ড কোং ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

জুনাপুর ষ্টীল

বর্ত্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ, মানুষের মনুষ্যত্ব আজ যান্ত্রিকতার লৌহপাশে আবদ্ধ হয়ে অবরুদ্ধ যন্ত্রণার নিঃশ্বাস ফেলছে প্রতিমুহূর্ত্তে। এই যন্ত্রণাকেই ভাষা দিয়েছেন লেখক আলোচ্য উপন্যাসখানির মাধ্যমে। জুনাপুর ষ্টীল বা জিস্কোর লৌহ ফার্ণেসের দাহ একদল মানুষের জীবনকে গালিয়ে মনুষ্যত্বকে ছেঁকে বার করে নিয়ে কেমন করে তাদের বেঁচে থাকাকে দুর্ব্বহ করে তুলেছে তারই মর্মন্তুদ বাস্তবধর্মী চিত্র এই সুবৃহৎ পুস্তকটি। লেখকের আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ কলম যান্ত্রিকতার চাকায় পিষ্ট একদল মানুষের বাঁচবার দাবীকে করেছে সমর্থন, তুলে ধরেছে তাদের পথ চলার গ্লানিকে পাঠকের সামনে, যুগমানবের আত্মার অশান্ত ক্রন্দনধ্বনিও এর প্রতিছত্রে। আদর্শবাদী এই উপন্যাসটি পড়ে আমরা সুখী হয়েছি, আশা করি পাঠক-সমাজ একে যোগ্য সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করবেন। বইটির প্রচ্ছদ বিষয়োচিত, ছাপা, বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। 'জুনাপুর ষ্টীল' গুণময় মান্না। প্রকাশক—এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স এ ১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—১০৲ টাকা।

অকাল প্রেম

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি সুপাঠ্য প্রেমের উপন্যাস, অধিকাংশ আধুনিক পুস্তকের মত এতে কোন ইজম্ নিয়ে মাথা ঘামাননি লেখক। মিষ্টি সুরে একটি গল্প বলেছেন তিনি, যা হালকা অবসর বিনোদনের সহায়ক। শৈশব থেকে একত্র প্রতিপালিত নায়ক-নায়িকার প্রেম বিরহ ও মিলন বর্ণিত হয়েছে সুন্দর সরস ভাষার মাধ্যমে। সহযোগী নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটিও অত্যন্ত উপভোগ্য, বাল্যবিবাহ এখন বিস্মৃতপ্রায়, বর্ত্তমানে ভদ্রসমাজে শিশুদম্পতির দেখা মেলে না আর, সেজন্যই পুস্তকে বর্ণিত বাল্যে বিবাহিত দম্পতিটির দাম্পত্যলীলা এক মধুর স্বাদের আভাস দেয় পাঠকমনে। আমাদের পুরাতন রীতি-নীতি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় আর সেজন্যই সেই পুরাতনী কাহিনী আকর্ষণ করে আমাদের অস্তগামী সূর্যের রাঙা আভার মতই। গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও তাঁর প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। তাঁর ভাষাও সুন্দর ও সরস, আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি। অঙ্গসজ্জা সাধারণ। অকাল প্রেম—অজিতকুমার রায়চৌধুরী ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

একটি নায়িকার উপাখ্যান

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সদ্য-প্রকাশিত একটি ছোট উপন্যাস; সিনেমা বা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা আজকের দিনের ছেলে-মেয়েদের সহজাত। এই বিষয়বস্তু অবলম্বনেই রচিত হয়েছে বর্ত্তমান পুস্তকটি। গল্পের নায়িকা স্বর্ণা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা, পিতার সাগ্রহ অনুমোদন লাভ করে ছায়াছবির রঙীন জগতে পা বাড়িয়েছিলো সে একদিন, ক্রমে ক্রমে কেমন করে এই ছায়ার মায়া আচ্ছন্ন করে তুলল তাকে, পরিণত লেখনীতে তারই ছবি এঁকেছেন লেখক। ছবির নায়িকার কাল্পনিক সুখ-দুঃখে বিচলিতা হয় স্বর্ণা, বাস্তব সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ সরল ছন্দে মিশোতে পারেনা সে নিজেকে আর অবশেষে সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে সে শেষ পর্য্যন্ত বেছে নেয় অভিনেত্রী-জীবনকেই। কোন বিশেষ গুরুত্ব না দিয়েও আধুনিক যুগের এই সমস্যা সম্বন্ধে এক নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক আলোচ্য

কাহিনীটিতে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প বলেন গল্প বলার আনন্দেই, আর সেজন্তই তাঁর রচনা রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে সহজেই। বর্তমান পুস্তকটিও তাঁর রচনার এই প্রসাদগুণে বঞ্চিত নয়, সুন্দর সহজ ভাষায় বলা কাহিনীটি নিজগুণেই পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি। পুস্তকটির প্রচ্ছদ ও অন্তান্ত আঙ্গিক মোটামুটি।

শবনম

'শবনম' সৈয়দ মুজতবা আলীর আধুনিকতম উপন্তাস, 'দেশ' পত্রিকায় উপন্তাসটি ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ইতিপূর্বেই। ডাঃ আলীর এই শবনম রচনাটি তাঁর অপরাপর গ্রন্থের ন্তায় একটি সরস রম্যরচনা মাত্র নয়, এটি সম্পূর্ণরূপেই একটি প্রেমোপাখ্যান; রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প লিখতেও যে আলীসাহেব সিদ্ধহস্ত 'শবনমে' তারই পরিচয় মেলে। গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনে তীব্র ভাবাবেগ পূর্ণ মিলনের অব্যবহিত পরেই নেমে এলো নিদারুণ বিচ্ছেদ সর্বনাশা মূর্তিতে। গল্পটির এই ট্র্যাজিক পরিণতি বেদনাবিধুর করে তোলে মনকে; সুন্দর, স্নিগ্ধ ও করুণ একটি প্রেমের কাহিনী সরস স্বচ্ছন্দ ভাষায় পরিবেশন করেছেন লেখক, প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত নায়কের হারানো দয়িতার জন্ত আকুল প্রতীক্ষার যে চিত্রটি তিনি এঁকেছেন তা সত্যই মর্মস্পর্শী। বইটি পড়ে যে আমরা খুসী হয়েছি একথা অকুণ্ঠে স্বীকার করি। সুন্দর ও সুশোভন প্রচ্ছদ এবং পরিচ্ছন্ন বাঁধাই এই উপন্তাসখানির আর এক সম্পদ। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৫৲ টাকা মাত্র।

বেনারসী

বিমল মিত্রের সত্তপ্রকাশিত ছোট গল্পসংগ্রহ 'বেনারসী', মোট ...নটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংকলনটিতে, যার ভিতর বেনারসী ...টিই প্রথম ও প্রধান। এক পতিতা নারীর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন ... উপজীব্য; পতিতা বলেই বেনারসীর জীবনের সব সম্ভাবনা ...ন করে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে গেল নিপুণ হাতে তারই ছবি ...কেছেন লেখক। রূপে-গুণে অনুপমা এক নারীর সাময়িক ...লনকেই দেখতে পেলো সঙ্কীর্ণ সমাজবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাই ...হয়ে গেল বেনারসীর মত অনন্তা একটি মেয়ে, ফলে ফুলে ...র্থক হয়ে উঠতে চেয়েছিলো যে আপন নারীসত্তার মহিমায় ...য়ে গেলো সে ব্যর্থতার অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে, গল্পটির সূক্ষ্ম ...নবিক আবেদন মর্মস্পর্শী; লেখকের মুন্সীয়ানায় আমাদের ...াজের এই বহু-আলোচিত সমস্তাটির সম্বন্ধে পাঠকমন আগ্রহী ...য়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই। গ্রন্থটির অপর গল্পগুলিও সুপাঠ্য, ...শী লেখকের নিপুণতার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। আমরা এই ...সংগ্রহটি পড়ে আনন্দ পেয়েছি এবং এর সাফল্য কামনা করি। ...চ্ছদ মনোরম ও অপরাপর আঙ্গিক সুষ্ঠু। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৪'৫০ নঃ পঃ মাত্র।

রমণীর মন

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরীর নবতম গল্পগ্রন্থ। মোট নয়টি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। গল্পগুলি মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ, সুস্থ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে দেখেছেন লেখক, তাই তাঁর রচনা কোন 'ইজমে' ভারাক্রান্ত না হয়েই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। নিখুঁত আঙ্গিকে লেখা গল্পগুলি অতীব সুখপাঠ্য। কয়েকটি বিশেষ করে উল্লেখ্য—যেমন 'হাসি' 'রুকমিণী' "যখন বৃষ্টি নামল" প্রভৃতি, উল্লিখিত গল্পগুলি লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষরবাহী, সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে দু'টি নরনারীর সম্মিলিত জীবন কেমন করে প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠল "হাসির" কাহিনীতে লেখক তারই ছবি এঁকেছেন। "রুকমিণী" গল্পটি একাধারে ট্র্যাজিক ও হাস্তকর। গল্পগুলির ছত্রে ছত্রে লেখকের গভীর জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। আমরা বইটি পড়ে আনন্দিত হয়েছি, আশা করি পাঠক সমাজে এটি আদৃত হবে। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা সাধারণ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, প্রাইভেট লিমিটেড। ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-.২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শ্রী'ম'-দর্শন

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎভক্ত ভক্তগণের অন্যতম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা শ্রী'ম' কথিত বহু বাণী নিষ্ঠাভরে একত্র গ্রথিত করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক এই পুস্তকে শ্রী'ম'র জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন, সাধক-জীবন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় গ্রন্থটি পাঠে। অধ্যাত্মবাদের পীঠস্থান এই ভারতভূমি বহু সাধক মহাপুরুষের আবির্ভাবে হয়েছে ধন্ত, এই সাধকগণের ভিতর পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের নাম চিরস্মরণীয়, শ্রী'ম' ছিলেন ঠাকুরের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার, ৺ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশাবলী 'কথামৃত' নামে লিপিবদ্ধ করেন তিনি লোকহিতার্থে; তাঁরই শ্রীমুখ-নির্গত ঠাকুরের প্রসঙ্গ-কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে; যথোচিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থকার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে গিয়েছেন আগাগোড়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠক বইটি পড়ে সত্যকার আনন্দ লাভ করবেন এ আশা স্বচ্ছন্দেই করা যায়। অশান্তি শোক-দুঃখ জর্জরিত মানব-হৃদয়ে বইটি ঔষধ ও অনুপান একত্রে দুয়েরই কাজ করবে, এ কথা সহজেই বলা যায়। এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশক উভয়েই আমাদের ধন্তবাদার্হ, আমরা এই সুন্দর পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। বইটির অঙ্গসজ্জা ত্রুটিহীন। শ্রী'ম' দর্শন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, প্রকাশক—প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্য্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
S. 267-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

নীল হেসে বললো—মন্দ হয় কি।

ড্রাইভার জানতে চাইলে কোথায় যেতে হবে।

মঞ্জু বললো—স্ট্রাণ্ড রোডে—গঙ্গার ধারে।

হর্ণ দিতে দিতে আর পিছু চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় শরীর ঘুরিয়ে নিয়ে গাড়ী শহরের পথ ধরলে। মঞ্জু এমন দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল যেন সে গম্ভীরভাবে দিল্লী যাবার কথাটাই চিন্তা করছে।

নীল গাড়ীর গদীতে পিঠ রেখে আরাম করে বসে বললো, বাঁচালেন। আপাততঃ দিল্লী ছোটার চাইতে গঙ্গার ধার দিয়ে ছোটা অনেক বেশী কাজের হবে।

মঞ্জু একটু হাসলো।

চুলগুলো দুহাতে মুঠো করে ধরে মাথাটায় কষে একটা ঝাঁকুনি দিলো নীল—ছাদচাপা ঘরে বসে থেকে থেকে বুদ্ধিও যেন কেমন চ্যাপ্টা খেয়ে গেছে। দেখা যাক, এবার খোলা হাওয়ায় ছুটে কিছু সচল হয় কিনা। কোন হদিস পাই কিনা। আপনিও ভাবুন।

বাইরের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল মঞ্জু—আমি ভেবে কি করবো। আমার ভাবায় কি এগুবে বলুন?

—কারু ভাবায়ই কিছু এগুবে না। না আপনার। না আমার। না আর কারু। সমস্ত চিন্তা-জগৎ থেমে পড়েছে।

—কার কাছে। নীলের দিকে চোখ ফেরালো মঞ্জু।

—দুর্জনের কাছে? দুর্বুদ্ধির কাছে। পাহাড় উড়িয়ে পথ তৈরী করলে তবেই চলার কাজ আরম্ভ করা যায়। এই দুর্জন আর দুর্বুদ্ধির পাহাড়ও যতক্ষণ না উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে, ততদিন বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞানের চলার পথ নেই—এগুবার উপায় নেই।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে একটা সিগারেট ধরালো নীল। দেশলাই-এর কাঠিটা গাড়ীর গায়ে লাগানো ছাইদানে ফেলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। বাইরে জোর বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ীর কাচের শার্সি বন্ধ। ধোঁয়াটা বেরুবার পথ করতে না পেয়ে গাড়ীর ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। নীল সেটা লক্ষ্য করে বললো—আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

মঞ্জু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে—কিসের জন্ত?

—বন্ধ গাড়ী। ধোঁয়াটা বেরুতে পারছে না।

—ও! না।

কিন্তু আরও দু-একবার ধোঁয়া ছাড়ার পর গাড়ীর ভেতরকার ধোঁয়াটে ভাবটা দেখে, হাতল ঘুরিয়ে কাচের শার্সি নামিয়ে সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিল নীল। তার পর ফের কাচটা তুলে দিতে দিতে বললো, কাল আমাদের একটা মিটিং আছে—মিটিং মানে বক্তৃতা টক্তিতা কিছু নয়। সবাই মিলে একত্র হয়ে পরামর্শ করা কি করা যায় আর না যায়। আপনি আসুন না?

—কখন?

—এই বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায়।

—আসবো।

দোকান-বাজার-হাট, কর্দমাক্ত পথ, কাঁচা ড্রেন' ডোবা পুকুর পেরিয়ে গাড়ী শহরের পথও পার হয়ে এসে স্ট্রাণ্ড রোডে পড়লো। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভারের সামনের কাচের উপরকার কম্পাসের কাঁটার মতো কাঁটাটা অনবরত এদিক আর ওদিক করে করে কাচের গায়ের জল মুছে চলেছে। তবু ভারি বৃষ্টিতে ঝাপসা পথঘাট দেখা যাচ্ছে না। গঙ্গাকে চেনা যাচ্ছে না। তার বুকের উপর নোঙর বাঁধা ষ্টীমার, নৌকো, বোটের আলোগুলোকে দেখাচ্ছে অন্ধকারের বুকে ইতস্তত ফুটে থাকা আলোর মতো। বৃষ্টি-ঝাপসা পথে সতর্ক হাতে গাড়ী চালাচ্ছে ড্রাইভার। মাঝে মাঝে এমনি সতর্ক হাতে চালানো গাড়ী ট্যাক্সি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে হেড লাইটের আলো ফেলে ফেলে। বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাড়ীর মধ্যে। কৃষ্ণের ফটোর গলায় ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালা দুটো বাতাসে দুলছে। মঞ্জু আসন থেকে কিছুটা এগিয়ে এলো। মুখটা সামনে এনে দু' হাতে উড়ন্ত চুল চেপে ধরে বসে রইল। জল বাতাস হু হু করে বয়ে চললো ওর মুখের উপর দিয়ে। ঠাণ্ডায় জমে উঠল ওর মুখটা। যেমন বসেছিল তেমনি থেকেই বললো—আঃ বেশ লাগছে।

ওদের গাড়ী অল্প আর একটা গাড়ীকে পাশ কাটালো। পাশ কাটাতে গিয়ে গাড়ী টাল খেলো। মঞ্জু কাত হয়ে পড়তে পড়তে নীলের হাঁটু ধরে ফেলে টাল সামলালো।

নীল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলো। দু'বার দেয়াশলাই-এর কাঠির টানটা বাক্সের বাইরে পড়ল, তিন বারের-বার কাঠির বারুদের মুখ বাক্সের বারুদের ওপর রেখে শক্তহাতে টান মেরে দেশলাই জ্বালাল। সিগারেট ধরাল। কাঠিটা গাড়ীর গায়ের ছাইদানে ফেললো।

কৃষ্ণের ফটোর গলায় ঝোলানো বেলকুঁড়ির মালাটা বৃষ্টির ছাঁটে ছাঁটে এতক্ষণে ফুলে উঠেছে। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ—কি মিষ্টি গন্ধটা! একটা মালা দিন না। ছেলেমানুষের মত হাত বাড়িয়ে একটা মালা চাইলো মঞ্জু ড্রাইভারের কাছে।

এ ভাবে কেউ বোধ হয় কোনো দিন ড্রাইভারের আরাধ্য দেবতার গলার মালা চায়নি। মঞ্জুর দিকে একবার তাকালো সে। বোধ হয় মনে মনে একটু হেসেই একটা মালা তুলে দিলো তার হাতে।

নাকের কাছে মালাটা মুঠো করে ধরে মস্ত একটা নিঃশ্বাস টানলো মঞ্জু—আঃ, দেখুন। মুঠোশুদ্ধ নীলের নাকের কাছে নিয়ে মালাটা ধরলো সে—দেখুন কি মিষ্টি গন্ধ।

গাড়ীর ঝাঁকুনীর সঙ্গে মঞ্জুর হাতটা নীলের ঠোঁট স্পর্শ করলে, বুকটা ধক্ ক'রে উঠলো মঞ্জুর। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে এনে মালাটা খোঁপায় জড়াতে লাগলো সে। নীল সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে আসনের উপরে সোজা হয়ে বসলো! মালাটা

সন্ধ্যাসঙ্গীত

— প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

মেমোরিয়াল —চিত্ত নন্দী

মিষ্টিহাসি

—গোপাল দাসমজুমদার

অপরাহ্ণে

—অজিত দাস

মুক্তির বন্ধন

—গোবিন্দলাল দাস

সূর্য্যমন্দিরগাত্র (কোণারক)

—মীরেন অধিকারী
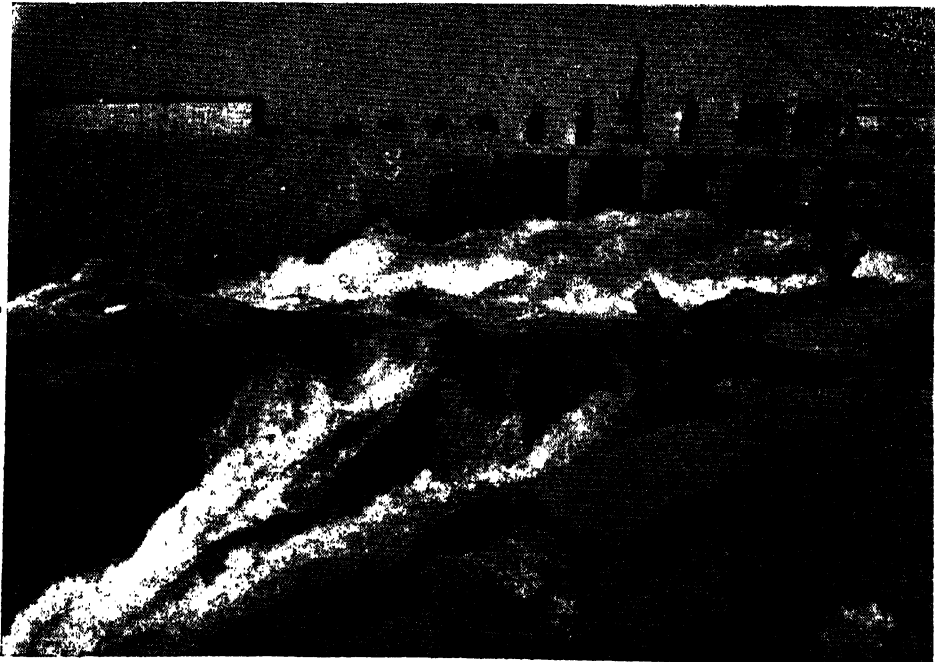
ধোপায় জড়িয়ে হঠাৎ লম্বা সোফায় মুখোমুখি হয়ে বসবার মত মঞ্জু নীলের দিকে ঘুরে বসে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, আপনারা কেবল খাওয়ার কথাই ভাবছেন কেন? না খাওয়ার দিকটা ভাবা যায় না?

—তাই যদি ভাবা যাবে, তবে তো আর ভাববারই কিছু থাকে না?

—ভাবা যাচ্ছে না টাকার জন্তে তো?

—নিশ্চয়।

—টাকাটা সংগ্রহ করা যায় না?

—কি ভাবে?

—এই ধরুন, আপনাদের প্রতিটি ঘর থেকে জমির দাম হিসেবে কিছু তোলা হ'লো তার পরেরটা যায়।

এর জবাবে নীল যেভাবে কথাগুলি বললো তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল সে নিজেই এই পথটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছে এবং এখনও ক'রছে। সে বললো—যদিও কিছুই দেবার শক্তি নেই আমাদের তবু ধরলাম, ধার করে কর্জ করে, চেয়েচিন্তে এনে দিলাম আমরা এবং তাতে মোট টাকার সিকি অংশ উঠলো। অর্থাৎ আমরা পঞ্চাশ ঘর মিলে 'শ' দুই করে দিয়ে, পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ হাজার না হয় পনের হাজার টাকা যোগাড় করলাম। তারপর!

—না: তারপর আর কিছু নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। যেন বাইরে বৃষ্টির শব্দ আর বৃষ্টির জলের উপর দিয়ে গাড়ী চলার শব্দ ছাড়া যেন জগতে কোনো শব্দ নেই।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার মত ক'রে মঞ্জু বললো—ঐ যে ধারের কথা বলছিলাম? বর্ত্তমানের জন্তে ধার পাওয়া যায়না কোথাও?

—আমাদের বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতে কোনো তফাৎ নেই। এমন কি, এই পুরুষের ধার সামনের পুরুষ এসে শোধ করবে তেমন সম্ভাবনাও অন্ধকারে। তা শোধ না দিয়ে না হয় সুদই গোনা গেল যদি ধার পাওয়া যায়। কিন্তু আমার তেমন একজন ব্যক্তিও জানা নেই যার কাছে গিয়ে আমি এত টাকা ধার চাইতে পারি।

আবার মঞ্জু কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নীলের ঘরে দু-হাত কোলের ওপর রেখে যেভাবে স্থির হয়ে বসেছিলো ঠিক সেই ভাবে দু-হাত কোলের ওপর রেখে স্থির হয়ে বসলো।

—একটা কাজ চাই। ওর মুখে একটা কাজ চাওয়ার কথা শুনে যেন কাজ শব্দটার অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না, এমনি দৃষ্টিতে রজত তাকিয়েছিলো ওর মুখের দিকে।

—কাজ?

—হ্যাঁ কাজ। একটা কাজের ভীষণ দরকার আমার। একটা টাকা রোজগারের উপায় না করলেই চলছে না আমার।

রজত সোফায় বসে থেকেই পাশের দেরাজ খুলে একটা চেকবই

আর কলম টেনে বের ক'রেছিলো। তারপর একটা টানা সই দিয়ে চেকটা বই থেকে টিপে টিপে লাইনে লাইনে ছিঁড়ে নিয়ে কাগজ চাপা দিয়ে রেখেছিলো মঞ্জুর সামনে। মঞ্জু বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো—এটা কি?

—চেক্। তোমার প্রয়োজন কত তা তো আমি জানিনে, অঙ্কটা তুমি ব'সিয়ে নিয়ো।

—মঞ্জু পরিহাস ক'রেছিলো।

—আমার খুসীমত বসাব?

—নিশ্চয়।

—দশ, বিশ, ত্রিশ হাজার বসাব?

—বসাও।

ওর পরিহাসের জবাব দিয়েছিলো বসন্ত বিনা পরিহাসে।

বাড়ীর রাস্তায় ট্যাক্সি ঢুকল না। রাস্তা তখন জলের তলায়। মোড়ের মাথায়ই নেমে পড়তে হ'লো মঞ্জুকে। নেমে পড়ছিলো নীলও। বাধা দিল মঞ্জু।

—আপনি নামছেন কেন?

—আপনাকে পৌঁছে দিতে।

—এই জলে নেমে কুড়ি হাত পথ আর পৌঁছে দিতে হবে না আমাকে। বলতে বলতে ব্যাগ খুলে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে বিনা দ্বিধায় 'মঞ্জু নীলের বুক-পকেটে গু'রে দিলো সেটা। তারপর নিজে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো—বাবুকে পৌঁছে দাও।

আপত্তি করলে না নীল। জল-সাঁতার বাসে উঠে ভীড়ের চাপে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে এখন যেন ইচ্ছে করছিল না তারও। চোখ বুজে একটা একটানা গতির ভেতরই বসে থাকতে ইচ্ছে করছিলো।

ভিজে জুতো হাতে, ভিজে শরীরে, পায়ের তলায় ভিজে কাপড় ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে যখন ঘরে এসে দাঁড়ালো মঞ্জু, তখন ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী বলে উঠলো—ধন্যি মেয়ে! এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ী এসেও বেরিয়ে গেলি কেন?

—তোর জন্তে। দে টাকা দে। এসপ্লানেড আর বালীগঞ্জ, বালীগঞ্জ আর এসপ্লানেড—ট্রামে বসে কেবল চক্কর খেয়েছি। অনেক পয়সা গেছে।

—কে বলেছিলো তোকে?

—বলবে আবার কে? সুদর্শন বাবুকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্তে আমি বদ্ধপরিকর। আচ্ছা কাপড় ছেড়ে এসে সুদর্শন-সংবাদ শুনছি। স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল মঞ্জু।

রাতের খাওয়ার টেবিলটার দিকে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে বসে রইল মঞ্জু। সুদর্শন সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াটার ভেতর একটা খুসী এনে দিয়েছে—যেন তারই প্রমাণ এই খাওয়ার টেবিলটা। ঘিয়ে-ভাজা ভুনোখিচুড়ি মিষ্টিগন্ধ ছড়াচ্ছে, রাম্ গরম গরম ডিমভাজা মাছভাজা বেগুনী পরিবেশন করছে। কেউ না কেউ নীলের ঘরেও একথালা ভাত আর একটা কিছু তরকারী রেখেই গেছে! ক্ষুধার্ত্ত নীল উপুড় হয়ে নিশ্চয়ই তা গ্রাসে গ্রাসে মুখে তুলছে!

পরের দিন সকালবেলা মঞ্জু নীলের সেই কথাগুলোই [illegible] নিয়ে বসে চায়ের কাপে অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছিল—কোথায় লোকগুলোকে নিয়ে—বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, কোথায়?

উত্তেজিত অমিতা কাগজ হাতে ছুটতে ছুটতে এসে [illegible] ঘরে। মঞ্জুর হাতে কাগজটা ধরে দিয়ে কান্নাভরা গলায় বললে দেখো কি হয়েছে আসামে! বড়দি তার বড় বড় মেয়েগুলো নিয়ে ওখানে। জানিনা কি হয়েছে, আমি যাব কাছে [illegible] তোমরা একটু রান্না-বান্নাটা দেখো। পাগলের মত বেরিয়ে [illegible] অমিতা।

মঞ্জু, মৌরী উপুড় হয়ে পড়লো কাগজের ওপর—

: আসামে বাঙ্গালী-হত্যালীলা!—বাঙ্গালীর বাড়ীঘর [illegible] ভস্মীভূত—বাঙ্গালী নারীর ওপর অত্যাচার—আসামের প্র-শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

খানিক বাদে পত্রিকা রেখে উঠে গেল মঞ্জু টেবিলের কা[illegible] কোলের উপর মেলে ধরলো তার উদ্ধৃতির খাতা। পাতা ওল্টা[illegible] ওল্টাতে চোখ থামলো গিয়ে তার একটা উদ্ধৃতির ওপর। [illegible] উদ্ধৃতিটা যে সে কতবার পড়লো তার অন্ত নেই!

গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের রক্ষাকর্ত্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র [illegible] জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবি[illegible] হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরো[illegible] দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্য্যোগ [illegible] ঘনীভূ[illegible] নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বি[illegible] শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে ধর্মনীতিতে শ্রেয়ঃনীতিতে [illegible] পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে চালে দাঁড়ে কা[illegible] মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ [illegible] রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোক তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মা[illegible] স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার [illegible] সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টি সম্মু[illegible] ঊর্দ্ধে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে......

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে ত[illegible] নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতা[illegible] এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত [illegible] নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ ক'রতে পারেনা। এইর[illegible] দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দ[illegible] হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উ[illegible] করতে পারেন।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যতকি[illegible] সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আ[illegible] পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্ব্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, [illegible] চাই। আপাত পরাভবকে অস্বীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, [illegible] স্পর্দ্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকে দেখ[illegible] পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ। [illegible] এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পা[illegible] আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যে[illegible]

বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের ওপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "যদি" কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচাতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট কর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে মরবেনা,…সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের ওপর মাথা তুলবে।…

বাঙলা দেশের ইচ্ছার মূর্ত্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব কি না, এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা ক'রেছিলো। তার পরবর্ত্তী কালের প্রজন্মে ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাঙলার তরুণদের চিত্তে।…তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ ক'রে গেছে বাঙলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অনভিজ্ঞ তারুণ্যের যে দুঃখবিদায়ক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক তার তবু কি কালো করতে পেরেছে তার আত্মনিহিত তেজস্বিতাকে? বার বার—বার বার পড়ে চললো মঞ্জু। যেন রবীন্দ্রকাব্যগুলো মুখস্থ করবে সে।

[ক্রমশঃ।

প্রেমোন্মাদিনা রাধা

মন্দাকিনী ভাদুড়ী

প্রেমের সাধিকা ওগো রাধারাণী প্রেমে গড়া তনু-মন
কৃষ্ণসুখে সুখী তারি লাগি ত্যাগ নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন।
বিরহে বিরলে অঝোরে কেঁদেছ হা কৃষ্ণ কোথা ব'লে
কত না যাতনা নীরবে সয়েছ পিরীতি করার ফলে।

বনে বনে তুমি খুঁজিয়া ফিরেছ কোথা প্রাণসখা হায়
সে চতুর রহে আঁখির আড়ালে প্রাণ বুঝি তব যায়।
বাসকশয্যা রচনা করিয়া জাগিয়াছ সারা নিশি
ব্যর্থ হয়েছে তবু তারে চেয়ে আঁখি-নীরে গেছ ভাসি।

বনফুলে তুমি মালাটি গেঁথেছ তাহারে পরাবে ব'লে
শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়েছে সে নিঠুর গেছে চ'লে।
তোমার নাগর তোমারে ছলিয়া আন ঘরে চ'লে যায়
মান কর তুমি ওগো অভিমানী তা দেখি সে ব্যথা পায়।

বহুবল্লভ নামটি তাহার জগতে বিদিত যে
যে তাহারে ডাকে ধরা দেয় তারে পারেনা থাকিতে সে।
তমালেরে হেরি কৃষ্ণ ভেবে মনে জড়ায়ে ধরো গো তায়
নবজলধরে শ্যাম অনুমানি নয়ন ভাসিয়া যায়।

তাহারে হেরিতে জল আনা ছলে যাও তুমি যমুনায়
শাশুড়ী ননদী দেয় যে গঞ্জনা তবু নাহি ছাড় হায়।
তাহার লাগিয়া কলঙ্ককালিমা করিলে গলার হার
দেও সুখ তব মনে তার তুমি "পীরিতি" করেছ সার।

তোমার প্রেমের যতেক গরিমা না পারে বলিতে কেহ
বঁধুয়া তোমার চিরঋণী হল শোধিতে নারিল দেহ।
যেঁায়ার ছলনা করিয়া যে কাঁদ নাহি বুঝে আন জনে
আজিনা পিছল করিয়া চলো গো ব'লো তুমি কী কারণে।

শ্যামের বাঁশরী যবে পশে কানে না পার রহিতে ধীর
পাগলিনী প্রায় অভিসারে যাও চরণও রহেনা স্থির।
সখীরা তোমারে কত বুঝায়েছে ভুলিতে কালার মুখ
শোন নাই মানা ওগো তুমি রাই পেলেও শতেক দুখ।

তাইত তোমার প্রাণবঁধু আজ ধরিয়াছে তব পায়
দাসখত লেখে বলে ক্ষমা করো তবু মান নাহি যায়।
বদন ফিরায়ে থাক যে বসিয়া সে রহে জুড়িয়া কর
হেঁট মুখে বলে "শোন রাই ধনি না যাব পরের ঘর"।

তবে খুসী হয়ে দিলে অনুমতি বসিতে তোমার পাশে
সখীগণ সবে দেয় জয়ধ্বনি গগনে চন্দ্রিমা হাসে।
মনে অভিলাষ হব তব দাসী হেরিব পরম সুখে
যুগল চরণ দুজনার তবে জড়ায়ে ধরিব বুকে।
তোমার প্রেমের অপার মহিমা গাহিয়া বেড়াব আমি
এ মর জগতে স্বরগ হইতে অমৃত আসিবে নামি।
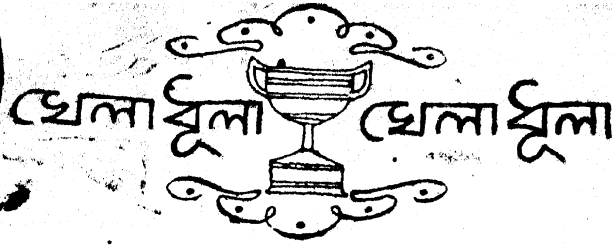
উইম্বলডন টেনিস খেলার ইতিকথা

টেনিস খেলা যাঁরা ভালবাসেন বিশ্ববিখ্যাত টেনিস প্রতিযোগিতা "উইম্বলডন"-এর নাম তাঁদের কাছে অজানা নয়, যদিও এটা বেসরকারী বিশ্ব প্রতিযোগিতা বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই "উইম্বলডন" প্রতিযোগিতায় এসেছেন কত খেলোয়াড়, তাঁদের সুদক্ষ কলা-কৌশলে মুগ্ধ করেছেন ক্রীড়ামোদী দর্শকদের তার ইয়ত্তা নেই। এই সব কাহিনী স্মরণ করলেই প্রথমে মনে পড়ে *স্পেনসার গোরের কথা;*. ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে *যিনি প্রথম "উইম্বলডন" টেনিসে বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন, গোরের* দশ বছর পর এখানে বিজয়ী হন "এম, ওয়াটসন"। ইনিই উইম্বলডনের প্রথম বিজয়িনী মহিলা খেলোয়াড়। ওয়াটসন "ফেল্ট" টুপী ও পা পর্যন্ত ফ্লানেলের "স্যুট" পরে খেলতেন। তাঁর পোষাকের ঝলসানিতে দর্শক-মনে আলোড়ন এনে দিত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ওয়াটসনের খেলা দর্শক মহলে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিলো। ১৮৮৭ সালের মহিলা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হতো। ওয়াটসনকে দেখলে মনে হতো খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্ব ও পোষাকের জাঁকজমকই টেনিস খেলার সবচেয়ে বড় জিনিষ।

এর পর মনে আসে মার্কিণ খেলোয়াড় উইলিয়াম টিলডেনের কথা। ১৯২০, ১৯২১ আর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর তিন বছর চমকপ্রদ জয়লাভ সারা বিশ্বের টেনিস মহলে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কিণ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি খুব উঁচুদরের খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর মা টেনিস মহলে চিরদিনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে উইম্বলডনের সর্ব্বাপেক্ষা সেরা খেলোয়াড় ছিলেন বরোত্রো, কোচেট ও লাকোষ্টে। এঁরা তিনজনেই ছিলেন ফরাসী। তাই তাঁরা বিখ্যাত ছিলেন ফরাসী ত্রয়ী নামে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে এঁরা তিনজনেই ছিলেন "উইম্বলডনের" একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁরা প্রত্যেকেই দু'বার করে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো ১৯২৭ সালে কোচেটের কাছে টিলডনের পরাজয়।

ইংলণ্ডের টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে ফ্রেড প্যারী ছিলেন একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। ১৯৩৪-১৯৩৫ আর ১৯৩৬ সালে উপর্য্যুপরি তিন বছর তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। পরে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হন। তিনি পেশাদার খেলোয়াড় না হলে অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে আরও সম্মান লাভ করতেন। প্রাক্‌যুদ্ধকালীন এই সব খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মার্কিণ খেলোয়াড় ডোনাল্ডবাজ। ইনি ছিলেন উইম্বলডনের বিস্ময়। এক বছর ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে সারা দুনিয়ার টেনিস মহলের বিস্ময়রূপে প্রতিভাত করেছিলেন নিজেকে।

'ব্যারণ গটফ্রেড ভন ক্র্যাম'-এর কথাও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। যদিও এঁর মতন দুর্ভাগা খেলোয়াড় উইম্বলডন প্রতিযোগিতার আর দেখা দিয়েছিল কি না সন্দেহ! ভন ক্র্যাম জাতে ছিলেন জার্ম্মাণ। পর-পর তিনবার সিঙ্গলস ফাইন্যালে উন্নীত হয়েও জয়লাভ করতে পারেননি একটিতেও। অথচ খেলোয়াড় হিসাবে *ইনি ছিলেন* অত্যন্ত উঁচুদরের। তৎকালীন *বিখ্যাত* খেলোয়াড় বাজের কাছে *ইনি* একবার পরাজিত হন, এই খেলায় খ্যাতনামা খেলোয়াড় টিলডেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ভন ক্র্যামের পরাজয় নিতান্তই দুর্দৈব ছাড়া আর কিছু নয়। স্মরণ রাখার মত যে, ক'টি খেলা তাঁর স্মৃতির সঞ্চয়ে আছে, আলোচ্য খেলাটিও তারই অন্যতম।

মহিলা চ্যাম্পিয়নদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ফরাসী খেলোয়াড় সুজান লেংলেনের কথা। মহিলাদের সিঙ্গলসে পর পর ছয় বার বিজয়ী হয়ে ইনি আর একজন বিখ্যাত পুরুষ খেলোয়াড় এইচ, এল দোহার্তির রেকর্ডও ভেঙ্গে দিলেন। দোহার্তি জিতেছিলেন পর পর পাঁচ বার। লেংলেনের এই নৈপুণ্যের জন্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর লন টেনিসের কদর বেড়ে গেল। লেংলেন যে কেবল খেলাতেই নৈপুণ্য দেখাতেন তা নয়, পোষাকের ব্যাপারেও সব মেয়ে-খেলোয়াড়দের · ইনিও ছিলেন আদর্শ। এমনি ফিটফাট কেতাদুরস্ত ছিলেন লেংলেন।

সুজেনকে খেলা শিখিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কোর্টের "সাইড লাইনে" দাঁড়িয়ে উনি যেমন মন্তব্য করতেন তখন বাস্তবিকই মজা লাগতো। তিনি নিজেও নিশ্চয়ই ভালো খেলতেন; তা না হ'লে নিজের মেয়েকে অমন পাকা খেলোয়াড় করলেন কি করে?

এর পরেই মেয়ে-খেলোয়াড়দের মধ্যে নাম করতে হয় মিসেস মুদি আর এলিস মারবেলের। মিসেস মুদির খেলা ছিলো লেংলেনের খেলার ধরণের একেবারে উল্টো। তাঁকে বলা হ'ত "Poker-Face" বড়ো বড়ো আদর্শ খেলোয়াড়ী মেজাজ ছিলো তাঁর। চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে কখনও উত্তেজিত হতেন না তিনি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫এর মধ্যে সাত বার ইনি উইম্বলডনে জিতেছিলেন। হেলেনের কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলে কিছু ছিলো না।

মহিলাদের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও উইম্বলডন টেনিসে একই মরশুমে জয়ী হন। ১৯৫৫ সালে এক দুর্ঘটনায় তাঁর এই গৌরবময় জীবন শেষ হয়ে যায়।

এই হ'লো উইম্বলডনের ইতিকথা। এই উইম্বলডনের যে খ্যাতি এতোদিন দেশ-বিদেশে সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন "লিটল মো"।

তাঁর ডাক নাম ছিলো মরিন কনোলি। ইনি ছিলেন আমেরিকার অধিবাসিনী, বিশ বছরে পা দেবার আগেই ইনি তিনবার উইম্বলডনে জিতেছিলেন। ইনিই প্রথম মহিলা যিনি ফরাসী— ছড়িয়েছিলো পেশাদার টেনিসের হাওয়ার তা কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছে। পেশাদার টেনিস বন্ধ না হ'লে উইম্বলডনের মোহ আর থাকছে না। ক্র্যামার, গণ্ডালেস, ম্যাক গ্রেগরের মতো খেলোয়াড়রা আজ পেশাদার দলভুক্ত, তাই নিয়মানুযায়ী উইম্বলডনে তাঁরা খেলতে পারেন না—উইম্বলডনের কদরও তাই কমেছে। এই সমস্যার সমাধানের রাস্তা কেউ দেখালে টেনিসের উৎসাহী সমর্থক মাত্রেই খুশী হবেন।

খেলা দেখার আনন্দ

আগেই বলে রাখি, ক্রীড়াসমালোচক হলেও, খেলাধূলার সমালোচনা করার সময় নিরপেক্ষ হলেও, মনে মনে একটি দলকে 'সাপোর্ট' করি। তবে আমার এই সমর্থনের পেছনে আছে ক্লাবটির অনেক বছরের ঐতিহ্য। আমরা সমালোচকরা মনে মনে প্রায় সকলেই এক-একটি দলের সমর্থক। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মত আমাদের অনুভূতিও একই ধারায় প্রবাহিত হয়। সেখানে আমাদের সংগে কোন পার্থক্য নেই উগ্র সমর্থক দর্শকমণ্ডলীর। নিরপেক্ষ আসনে বসে নোট নিতে নিতে আমাদের মনও আশায়-হতাশায় ভরে ওঠে। তাই হয়তো মনের দুর্বলতা মাঝে মাঝে প্রকটিত হয়ে উঠে আমাদের লেখায়। আর সেই লেখা পড়ে আপনারা আমাদের প্রশংসা করেন, আবার গালাগালিও দেন, পক্ষপাতিত্বের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করেন।

এই অভিযোগ একজন সাংবাদিকের পক্ষে অমার্জনীয়। এই অপরাধের গুরুত্ব হয়তো আপনারা ঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না—একজন সমালোচকের পক্ষে এ গ্লানি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়! তাই আগে থেকে বলে রাখি—আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। চেষ্টা করেও মনের দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারিনি বলে আপনাদের কাছে মার্জনা চাইছি। আর তাই অকপটে আপনাদের কাছে সব কথা স্বীকার করলাম। আমরা মুখে বলে বেড়াই যে আমরা নিরপেক্ষ, কোন বিশেষ দলকে আমরা সমর্থন করি না, লেখার সময় আমরা খেলার ধারা অনুযায়ী লিখি। কিন্তু আমাদের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি সকল সময়ই আমাদের নাড়া দেয়। হয়তো বিশেষ একটা দল জিতলে আমরা আনন্দ পাই, আবার পরাজিত হলে দুঃখিত হই। এখানেই আমাদের পরাজয়, আমাদের মনের গোপন ইচ্ছা, সূক্ষ্ম অনুভূতিটি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমরা কিছুই করতে পারি না, তবু মুখে বলি আমরা নিরপেক্ষ।

মাফ করবেন! একটি কথা বলে রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি পড়ে যদি সব সমালোচকদের, সব সাংবাদিকদের এক শ্রেণীর মনে করেন, তাহ'লে সেখানে আপনাদের চরম ভুল হবে। আর সে ভুলের মাশুল দিতে আমার হয়তো পাতিয়ালার পান্থনিবাসে পংকিল শয্যায় পস্তাতে হবে। তাই বলি অত বড় ভুলটা করবেন না যেন। আমাদের গালাগালি দিন, আমাদের নিন্দা করুন তাতে আমরা কিছু মনে করি না, ওতে আমরা অভ্যস্ত; কিন্তু আমাদের উপর যেন অত বড় একটা মিথ্যা ধারণা রাখবেন না।

খেলা দেখার নির্মল আনন্দ আজ দুর্লভ। প্রতি দিনের খেলাতে এমন একটা না একটা ঘটনা ঘটবেই যাতে খেলার সৌন্দর্য এবং খেলা দেখার আনন্দ দুই-ই নষ্ট হয়। মাঠের মধ্যে ঢিল ছোড়া, খেলোয়াড়দের আক্রমণ, রেফারীকে মারতে যাওয়া, এতো হামেশাই ঘটছে। এর মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে একথা ঠিক যে, এ ধরণের আচরণ আগে খুব বেশী দেখা যেতো না। আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা আর তরুণ মনের চঞ্চলতাই এর প্রধান কারণ। কিন্তু সব থেকে দুঃখ হয় যখন খেলার মাঠে বয়স্কদের দেখি এ ধরণের আচরণ করতে, তরুণদের সংগে যুবকদের সংগে হাত মিলিয়ে অবৈধ আচরণ করতে। তাই বলতে বাধা নেই...

> খেলার মাঠে যারা করে ভীড়
> কমই তাদের ভালোবাসে খেলা,
> জয় চায় নিজেদের দলটির
> খেলাকে তারা করে অবহেলা।

খেলার মান নেমে যাওয়ার এও একটা কারণ। নাম-করা দলগুলি কি করে বিজয়ী হবেন, এই শুধু চিন্তা করেন। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে আসে নাম-করা সব খেলোয়াড়। তাঁদের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করতে ইতস্তত করেন না ক্লাব-কর্তৃপক্ষ। আর খেলোয়াড়দেরও তাই টাকার সংগে সম্বন্ধ গড়ে উঠে, খেলার সংগে নয়। দলগুলির সংগে যে একটা মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাও নয়।

এই মনোভাবের জন্য অনেক বাঙালী খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছেন না—পাচ্ছেন না নিজেদের প্রতিভার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে। তাই দেখি, যখন বাংলা থেকে এগার জন খেলোয়াড় ভারতীয় অলিম্পিক দলে স্থান পান, তখন তাঁদের মধ্যে আছেন মাত্র চার জন বাঙালী। বাংলার খেলাধূলার জগতে এক ক্রিকেট বাদে আর বিশেষ কোথাও বাঙালী খেলোয়াড়রা চান্স পাচ্ছেন না—তা কি ফুটবল বলুন, কি হকি বলুন। কিন্তু এর কারণ কি—এর জন্য দায়ী কারা? ঠিক এই প্রশ্নই তুলেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় C. I. T ষ্টেডিয়াম এর উদ্বোধন করতে গিয়ে। তিনি বাংলা দেশের প্রধান দলগুলির কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে তাঁরা বাঙালী খেলোয়াড়দের উপর লক্ষ্য রাখেন তাদের প্রাধান্য দেন। বাংলার বাইরের খেলোয়াড় এনে টাকা নষ্ট না করে সেই টাকা যদি বাঙালী খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয় তাহ'লে মনে হয় বাঙালী খেলোয়াড়রা কোন অংশেই কম যাবেন না। দশটা-পাঁচটা কলম পিশে খেলা যায় সত্যি—কিন্তু সে খেলায় জৌলুস থাকে না, থাকে না খেলোয়াড়দের দেহের ও মনের প্রস্তুতি। অনুশীলনের কথা তো এঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। একটু অপ্রাসংগিক হলেও এ কথাগুলো আপনাদের জানানোর প্রয়োজন ছিল, অবশ্য এ কথার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করবেন আপনারা—আমি নই!

যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম...খেলা দেখার আনন্দ। আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে

এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে—দর্শকদের উগ্র মনোভাব প্রকৃত খেলা দেখার আনন্দকে বিনষ্ট করেছে। কি খেলোয়াড়, কি সমর্থক সকলের মনে জয় লাভের ইচ্ছা এত বিশ্রী ভাবে দেখা দিয়েছে যে প্রত্যেক খেলায় এই জন্যই কিছু না কিছু গণ্ডগোল হচ্ছেই। যেমন করেই হোক জিততে হবে! জয়লাভের ইচ্ছা ভালো, কিন্তু তার নগ্নতা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। খেলায় জয়-পরাজয় থাকবেই, খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে তাকে মেনে নিতে হবে। জয়লাভ করলে তো কথাই নেই আর পরাজয়—পরাজয়ই সই! এই মনোভাব আমাদের মধ্যে কবে যে আসবে তা একমাত্র ভগবানই বোধহয় বলতে পারবেন। তবে একথা জোর গলায় বলব যে এই মনোভাব যখনই আসবে, খেলার মান তখন বহুগুণে উন্নত হবে।

কোলকাতার প্রধান দলগুলির যেদিন খেলা থাকে, সেদিন গড়ের মাঠ জনারণ্য হয়ে উঠে—আর গুরুত্বপূর্ণ খেলা হলে তো কথাই নেই। র‍্যামপার্ট-ভ্যামপার্ট থেকে শুরু করে লাইট-পোষ্ট গাছের ষ্টেডিয়াম সব আগে থেকেই 'রিজার্ভড' হয়ে যায়। আর মাঠের মধ্যে সাধারণ আসনে যাঁরা থাকেন তাঁরা গায়ের জামা খুলে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা লাইন দিয়ে, মারামারি করে মাঠে ঢোকার পর ক্লান্ত মন এমনিতেই খিঁচিয়ে উঠে। তার উপর যদি মাঠে একটু গণ্ডগোল হয় তাহ'লে তো কথাই নেই—আরম্ভ হয়ে যাবে খণ্ডযুদ্ধ। মাঠের মধ্যে ঢিল ছোড়ার দরকার হলেই বাইরে থেকে সেই ঢিল সাপ্লাই করা হয়। তবে আমাদের ভাগ্য ভালো যে এখনও ওদেশের মত অটেল বোতল ছোড়া শুরু হয় নি।

অলিম্পিকের সাফল্য প্রত্যাশী—(বাঁ দিকে) ডন ব্র্যাগ, পোল ভল্টার ও (ডান দিকে) প্যারী ও'ব্রিয়েন, শটপুট চ্যাম্পিয়ান—উভয়েই মার্কিণ ক্রীড়াবিদ্।

ষ্টেডিয়ামের কথা না বললে প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থেকে যাবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ফুটবল-ষ্টেডিয়াম কবে হবে তা আমরা বলতে পারি না। কোলকাতার ফুটবল-ষ্টেডিয়াম প্রসংগে এতো বেশী আলোচনা হয়েছে আর আপনারা এমন মনোযোগ দিয়ে সেগুলিকে পড়েছেন যে নতুন কিছু আর আমরা আপনাদের শোনাতে পারব না। তবু জোর গলায় এ কথা বলব যে কোলকাতার মত শহরে, যেখানে ফুটবল দলের সংখ্যা অতগুলি আর লক্ষ লক্ষ তার অনুরাগী, সেখানে সামান্য একটা ফুটবল-ষ্টেডিয়াম না থাকা যে কি লজ্জার কথা তা ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নয়। যখন বিদেশী দলগুলি কোলকাতায় খেলতে আসে বা কোন বিদেশী ক্রীড়ানুরাগী কোলকাতায় আসেন তখন তাঁরা কোলকাতার মত শহরে ফুটবল-ষ্টেডিয়াম নেই শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান আর আমরা লজ্জায় মুখ লুকাই।

শুনছি এবার নাকি ষ্টেডিয়াম হবে। ভেটোলজ্জি এসে দেখেও গেছেন। হিসেব কষা-কষি চলছে—সে এক বিরাট ব্যাপার! তবে মন্তব্য করতে কতদিন লাগবে জানিনে, আর লাল ফিতে-বাঁধা ফাইলে যদি একবার ঢোকে, তাহ'লে যে কি অবস্থা হবে তা আপনারা আমার থেকে ভালোই জানেন। তাই জোর গলায় সবাই একসংগে বলব, ষ্টেডিয়াম আমাদের জাতীয় দাবী—ষ্টেডিয়াম আমরা চাই। সেই সংগে পশ্চিমবংগ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন এই বিষয়ে এগিয়ে এসে খেলাধূলার ক্ষেত্রে কোলকাতার মান রক্ষা করেন।

—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে আমাদের দেশের গ্রাম্য বালক-বালিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি রামকিঙ্কর সিংহ গৃহীত।

ভারতীয় নৃত্যকলা

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

(পরিচালক—ভারতীয় নৃত্যকলা-মন্দির)

আদিম যুগে মানুষের কোন নির্দিষ্ট জাতি কিংবা ধর্ম ছিল না। অপরিচিত লোককে জিজ্ঞাসা করত—"কি নাচ তুমি নাচ ?" নৃত্যের ভঙ্গি দিয়ে তারা বুঝত কে কোন পাহাড়ের, কে কোন দলের বা কোন দ্বীপের।

তার পর সভ্যতার প্রথম আলোকে তাদের মনে ধর্মভাব জেগে ওঠে, নৃত্যের সঙ্গে ধর্মকেও তারা জড়িয়ে ফেলল এবং এর মধ্য দিয়ে তারা দেবার্চনা সুরু করে দিল।

এইরূপে আদিম যুগ থেকেই ভারতে নৃত্যকলার চর্চা সুরু করে দিল। তাই দেখি, বৈদিক যুগে প্রথম ঋক থেকে "নৃত্য" সাম থেকে "গীত" যজু থেকে "অভিনয়" এবং অথর্ব থেকে "রস" কলাশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা একটি নাট্যশালা তৈরী করলেন। তার প্রয়োগভার ভরতের উপর গিয়ে পড়ে। প্রয়োগ কালে শিব সেখানে ছিলেন, সকলের অনুরোধে শিব তণ্ডুকে ডেকে ভরতকে অঙ্গহারগুলোর প্রয়োগ দেখাতে আদেশ দেন। তণ্ডু যে সব নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন, তাই হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত "তাণ্ডব নৃত্য।" এদিকে পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হয়ে "লাস্য" নামে কমনীয় নৃত্য ভরতকে দেখান। ভরত তাণ্ডবনৃত্য মনুষ্যলোকে আনেন, আর পার্ব্বতী নিজে বলিরাজ-দুহিতা উষাকে লাস্য নৃত্যকলা শিখিয়ে দেন। এইরূপে স্বর্গের নৃত্য মর্ত্তে প্রচারিত হল। তারপর ভারতে ধর্মনৃত্যের বেশী প্রচলন হয় পুরাণের সময় থেকে। এর পর রামায়ণে দেখতে পাই লব কুশ রামায়ণের সম্পূর্ণ উপাখ্যান নৃত্য ও গীতের সাহায্যে বিবৃত করত। মহাভারতে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি রণতাণ্ডব (যুদ্ধনৃত্য) নৃত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলা নামে নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করে অর্জ্জুন বিরাটরাজের অন্তঃপুরে নৃত্যকলা শিক্ষা দিতেন।

ভারতের নৃত্যকলার প্রধানতঃ দুটি রূপ—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডবের দুটি রূপ—পেবলি ও বহুরূপ; লাস্যেরও তাই—ছুরিত ও যৌবত। ভারতীয় নৃত্য অত্যন্ত অনুষ্ঠানবহুল কিন্তু খুব সংযত। পেবলিতে অভিনয় কম কিন্তু অঙ্গসঞ্চালন বেশী। বহুরূপ ভাবপ্রধান এবং চোখ-মুখের নানারূপ অভিব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ। ছুরিত, আলিঙ্গন আর যৌবত তাল লয় মান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসঞ্চালন অনেক রকম—শুধু মস্তকের সঞ্চালনই ২৪ রকম, যেমন অধোমুখম্, অবধূত, প্রকম্পিত সৌন্দর্য, কম্পিত, পরাবৃত্য, উৎক্ষিপ্ত প্রভৃতি। দৃষ্টি ৪০ রকম—যেমন, লজ্জিত, মুদিত, কুঞ্চিত, রৌদ্র, বীর, দৃপ্ত, শান্ত, ম্লান, হৃষ্ট, উগ্র প্রভৃতি। গ্রীবার দোলন ৪ রকম, যেমন—প্রকম্পিতা, পরিবর্ত্তিতা, তিরশ্চিন ও সুন্দরী। ইহা ছাড়া মুখের পরিবর্ত্তন ৪ রকম, ভ্রূবিকার ৭ রকম ও বাহুসঞ্চালন ২৮ রকম। নৃত্যে ভাবপ্রকাশক অঙ্গুলী বিন্যাসকে বলা হয় হস্তক। সংযুক্ত হস্তক ৩৮ রকম। হাতে হাতে, পায়ে পায়ে বা হাতে পায়ে যে মিলন তার নাম "করণ।" "করণ" ও "রেচক" সংযুক্ত হয়েই অঙ্গহারের সৃষ্টি হয়। এই অঙ্গহারগুলো নৃত্যের মধ্যে প্রধান জিনিষ। অঙ্গহার ২৪০ রকম। নৃত্যের এই অঙ্গবিক্ষেপ ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি করতে হয়। যেমন বিষ্ণুকে নৃত্যে দেখাতে হলে ত্রিপতাকা হস্তদ্বয়ে ধারণ করতে হয়। পার্ব্বতীকে বোঝাতে হলে ডান হাত উঁচু করে অর্দ্ধচন্দ্র এবং বাঁ হাত নীচু করে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করতে হয় এবং হস্তদ্বয় "অভয়া" বা "বরদা" ভাবে স্থাপন করতে হয়।

নৃত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, নৃত্য মানুষের জীবনের সাথে একদিন জড়িত হয়েছিল। সকল দেশেই নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য। মানুষের জন্ম থেকে সুরু করে সকল প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাছাড়া বীজবপন, ফসল কর্ত্তন, থেকে যুদ্ধজয়, বিদেশ অভিযান, ঋতু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। নৃত্য মানব-সমাজে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নব নব রূপে দেখা দিয়েছে। বর্ত্তমান কালেও সকল দেশে সকল জাতের মধ্যেই নৃত্যের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। সকল জাতিরই নিজস্ব নৃত্যকলা আছে। ভারতবর্ষেও প্রতি দেশে এমন কি বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব লোকনৃত্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের নৃত্যকলা যে কত উচ্চস্তরের তা অজন্তা, ইলোরা ও মহেন্জোদড়ো প্রভৃতির ভাস্কর্য্য দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ভারতের বিখ্যাত ভারতনাট্যম্ নৃত্য (তাঞ্জোর) কথাকলি (মাদ্রাজ), মণিপুরী (মণিপুর, ইম্ফল) কথক (লক্ষ্ণৌ) প্রভৃতি নৃত্যকলা সকল দেশের নৃত্যরসিকদের মুগ্ধ করেছে। নৃত্যকলা সকল সমাজের ও সকল দেশের প্রিয় শিল্পকলা। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' যাহা সত্য মঙ্গলময় এবং সুন্দর তাই আর্ট। যারা ভাবে আত্মহারা, রসে বিহ্বল, সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ পূজারী আমরা তাদের শিল্পী নামে অভিহিত করে থাকি। নৃত্যগীত-বাদ্য মানুষের

অনুভূতির অপূর্ব বিকাশ এবং শরীর মন ও চরিত্র গঠনের কাজে এই সব শিল্পের অবদান প্রচুর। নৃত্যে শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ হয়। আর গীতবাদ্যে হয় অন্তরশুদ্ধি।

যে জিনিষ মানুষের অন্তরকে উন্নত করে তার চর্চ্চা—সাধনা বললেই অধিকতর উপযুক্ত হয়—করা সকলেরই কর্তব্য। সকলের গান আসে না, কিন্তু নৃত্যের সাধনা সকলেই করতে পারেন, নৃত্য প্রদর্শনের দ্বারা লোকের প্রশংসা অর্জ্জনের জন্ত নয়, নিজের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্ত। নৃত্যের মত এরূপ আনন্দময় ব্যায়াম আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল। পল্লীগ্রামে পূজা-পার্ব্বণ ব্রত উপলক্ষে মেয়েদের নৃত্য করতে হত। পুরুষদের নৃত্য ছিল লাঠিখেলা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পশ্চিমের সভ্যতা আমাদের দেশে বিস্তার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায় নৃত্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখতে সুরু করলেন। লোক-নৃত্যকে তারা মনে করতেন অশিক্ষিত লোকের অমার্জ্জিত রুচির বিকাশ। কিন্তু সুখের বিষয়, নৃত্যকলা পুনরায় তার হৃতগৌরব ফিরে পেল, শিক্ষিত সমাজ পুনরায় নৃত্যকে সাদরে গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মত মনীষী যখন নৃত্যকলাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেন তখন শিক্ষিত জনসাধারণের স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হল না। তারপর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের সমাদর আরো বাড়িয়ে দিলেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।

আমাদের দেশে নৃত্যকলাকে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত করলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই নাম করা যেতে পারে শ্যামশঙ্কর চৌধুরী (উদয়শঙ্করের পিতা), উদয়শঙ্কর, ৺হরেন ঘোষ, ৺অশোক শাস্ত্রী ৺শঙ্করম্ নাম্বুদ্রি, ৺কন্দপ্পা পিল্লাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন, তিমিরবরণ, আমুবি সিং প্রভৃতি মনীষিগণের ও বিখ্যাত নৃত্য যন্ত্রসংগীত বিশারদগণের। ভারতবাসী মাত্রেই এঁদের কাছে ঋণী থাকবে। ভারতীয় নৃত্যগীত-বাদ্য আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অমূল্য সম্পদ—তাই আমরা এই সকল শিল্প ও কলাকে এত শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। বিখ্যাত রাশিয়ান নৃত্যবিদ স্বর্গগতা এ্যানা প্যাভলোভা ভারতীয় নৃত্যকলায় মুগ্ধ হয়ে এর চর্চ্চা করেছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী নৃত্যবিদ্ মাদাম সিমকি বহুদিন উদয়শঙ্করের সঙ্গিনীরূপে ছিলেন। এছাড়া আরও বহু বিদেশী মহিলা ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য দেখে নৃত্যকলা চর্চ্চা করে বহু যশ অর্জ্জন করেছেন।

আজ পৃথিবীর সব জায়গায় এই নৃত্যকলার প্রসার লাভ করেছে কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, এই নৃত্যকলা তার বৈশিষ্ট্য পুনরায় আমাদের দেশে হারাতে বসেছে। এদিকে দেশের জ্ঞানী ও গুণী, চিন্তানায়ক ও শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমার কথা (৬৯)

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

মিষ্টি হাসি, প্রিয় ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি বালিকাসুলভ সরলতা ভরা এক মধুর পরিবেশে বসে মনের আনন্দে শুনছিলাম বাংলার অন্যতমা সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী গায়ত্রী বসুর "আমার কথা"। বর্তমানে যে কয়েক জন সঙ্গীতশিল্পী কণ্ঠমাধুর্য্যে জনচিত্তে আসন গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন, শ্রীমতী বসু তাঁদের অন্যতমা। শ্রীমতী গায়ত্রী বসু বললেন—চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৩৬ সালে জলপাইগুড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করি। জন্মের পর হতেই মা, বাবা এবং ভাই-বোনদের সংগে কলিকাতায় চলে আসি। কলিকাতা এসে আর পাঁচজনের মতো লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে চাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্ল'স স্কুলে ভর্ত্তি হই। স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর থেকেই কখন কোন মুহূর্ত্তে মনের কোণে গানের উন্মেষ হয়েছিল নিজেই জানি না। বাড়ীতে বাবা যন্ত্রসঙ্গীতে মা কণ্ঠসংগীতে গানের চর্চ্চা করতেন। বোধ হয়, তাঁদের রক্তের সংমিশ্রণে গড়া আমার হৃদয়ে সুপ্তি বা গানের বীজ আপনা হতেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই তাঁদের আশীর্ব্বাদ এবং ঈশ্বরের করুণায় আমার এগারো বৎসর বয়সেই "তুমি দু'-হাত ভরিয়া" এবং "জানি আমারে যাবে না ভুলিয়া" গান দু'খানি সন্তোষ মুখার্জ্জীর ট্রেনিং-এ মেগাফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করি।

ঐ একই সময়েই আমি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে "শিশুমহলে" গান গাইতে থাকি এবং যৌবনে পদার্পণ করার আগে পর্য্যন্ত "শিশুমহলের" সংগে সংশ্লিষ্ট থাকি।

একদিকে গান অন্যদিকে পড়াশুনা, দুই-ই শিখতে লাগলাম এবং ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিকও পাশ করে উচ্চ শিক্ষার আশায় আশুতোষ কলেজে আই, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হলাম। পড়াশুনার দিকে একটু এগিয়ে এলাম বলে গানের দিক থেকে পিছনে পড়ে

রইলাম না। আই, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হওয়ার সংগে সংগে ঐ বৎসরই আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপও লাভ করি। বয়স বাড়ার সংগে সংগে গানের দিকে ঝোঁক একটু বেশী পড়ায় পড়াশুনার দিকে একটু ব্যাঘাত হতে লাগলো। যার ফলে নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে ১৯৫৫ সালে আমাকে আই, এ পাশ করতে হলো।

আই, এ পাশ করে মুরলীধর গার্লস কলেজে বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হই এবং এখানে এসেই আমার কলেজী শিক্ষায় আজ পর্য্যন্ত ভাঁটা পড়ে আছে।

সাধারণ শিক্ষা বন্ধ হলেও গানের শিক্ষা সমান তালেই চললো। শচীনদাস মতিলালের কাছে ঠুংরি, খেয়াল এবং ৺সুধীরলাল. চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে আধুনিক একই সংগে শিখতে লাগলাম. যতটা মনে পড়ে ১৯৫০ সাল থেকে বাজারে সঙ্গীতরসিকদের কাছে নিজের পরিচিতি লাভ করতে লাগলাম। উৎসাহ যেন একটু বেড়ে গেলো, কখনো রেডিও, কখনো রেকর্ড কখনো বা সিনেমার প্লে ব্যাক নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুণ নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবেই সঙ্গীতজগতের মাঝখানে ডুবিয়ে রাখতে হলো। আজও তার গতি সমানে চলছে।

চিত্রজগতে সংশ্লিষ্ট হয়ে যে সব বইয়ে প্লে ব্যাকে গান গেয়েছি, তার মধ্যে শুভদা, গরবিণী, ওগো শুনছো, মন্ত্রশক্তি, কেরাণীর জীবন, ধ্রুব এবং গরীবের মেয়ের নাম এখনো মনে পড়ছে।

এ ছাড়া "মিকি" নামে একখানা পাঞ্জাবী বইতেও পাঞ্জাবী গান গাইতে হয়েছে। সিনেমা-জগত বাদ দিয়ে আধুনিক, ভজন গীত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি মিলিয়ে কলম্বিয়াতে রেকর্ডও করেছি প্রায় ৩০ খানার উপর গান, আজ পর্য্যন্ত অনেক গেয়েছি কিন্তু যে কয়েকটি গানে জনমনে আনন্দ দিতে পেরেছি বলে উপলব্ধি করেছি তার মধ্যে "কোন দূরের পাখী" "নীল প্রজাপতির" নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। সর্ব্বশেষ এবারের ৺পূজায় "তুমি দিয়েছো যতো।"

"এ মন কেমন করে জেনেছো বলে" যে দু'খানা রেকর্ড করেছি তা জনমনে আনন্দ দিতে পেরেছে কি না আজও জানি না। গান আজ পর্য্যন্তও গেয়ে যাচ্ছি, তবে আধুনিক গানের জন্তে আর কারো কাছে শিক্ষা নিচ্ছি না। যে দু-চার জন ছাত্রী আমার কাছে গান শিখতে আসে তাদের শিখাতে গিয়েই নিজের অভ্যেস বজায় রাখছি। জীবনের ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেও ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শ "স্বামীর ঘর" করার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নাই। তাই গত মার্চ্চ মাসে শ্রীযুত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করে নারীর চিরন্তন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

দ্বিত্ব-রূপ

রমেন্দ্র ঘটকচৌধুরী

পার্ব্বত্য-নির্ঝর-ধারা অবিরাম কল-গানে ভাসে
পাখির কাকলিভরা বর্ণে বর্ণে পুষ্পগুচ্ছ হাসে।
নৃত্যের অপূর্ব ছন্দে মহুয়ার মদির বাতাস
এলোকেশে পঞ্চকন্যা জলকেলি করে অবিরাম—
শুক্লপক্ষে মুক্তধারা জোছনার শীতল পরশ
লক্ষকোটি হীরাখণ্ড আকাশের তারা,
বিচিত্র মনের যন্ত্রে সপ্তস্বরে আশ্চর্য গমক
হৃদয়ের লুকোচুরি মনের দর্পণ আরক্তিম।
প্রেমের প্রাচুর্য-পণ্য দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে
সমুদ্রের বেলাভূমি অবিরত আছে প্রতীক্ষায়
চরণের চিহ্নখানি বীচিশুভ্র জীবন-কোরক।

আদিম উলঙ্গ শিশু বনে বনে করে অন্বেষণ
বক্ষের বিশুষ্ক স্তন হাস্যকর উদ্ধত উদর।
হৃদয়ে চাঞ্চল্য নেই বুভুক্ষু আত্মার ক্রন্দন
অরণ্যের শুষ্ক পত্র গৃহের সক্রোধ সম্ভাষণ
ভাষাহীন বোবা যন্ত্রে নৈসর্গিক সুরের ঝিঙ্কার।
মনের নবান্ন নেই, ফসলের উৎকর্ণ আহ্বান
প্রেমের মাধুর্য মাত্র মনে মনে ভুল আলাপন—
অবিরাম বরপুত্র মরণের করে আনাগোনা।

সঙ্গীত রসিকেরা ন্যাশনাল-একোর চমৎকার নতুন মডেল এ-৭৪৪-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হ'য়ে পারবেন না। এর অনিন্দ্য গড়ন, কলাকৌশল ও চকচকে চেহারা যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি শ্রুতিমধুর ও সুস্পষ্ট এর আওয়াজ।

মডেল এ-৭৪৪ রেডিওটি নিয়ে সত্যি আপনি গর্ববোধ করবেন। আপনার কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডিলারকে বাজিয়ে শোনাতে বলুন—কোন খরচ নেই।

আমাদের অনুমোদিত ন্যাশনাল-একো ডিলারের কাছ থেকেই শুধু কিনবেন।

মডেল এ-৭৪৪ : ৬ নোভাল ভালভ—৯ রকম কাজ, মনোরম কেবিনেট সমন্বিত ৪-ব্যাণ্ড যুক্ত এসি রেডিও—সারা পৃথিবীর ষ্টেশন ধরা যায়। পিয়ানো-কী ব্যাণ্ড সিলেক্‌শন ; ম্যাজিক আই ; গ্রামোফোন ও একস্ট্রা স্পীকারের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ; টেপ্ রেকর্ডারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত। এক বছরের গ্যারাণ্টি।

৪১৫্ নীট

স্থানীয় ট্যাক্স স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল একো রেডিওই সেরা—এগুলি

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • পাটনা • মাদ্রাজ • বাঙ্গালোর • দিল্লী • সেকেন্দ্রাবাদ

JWT. GRA 121

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে

(অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস্)

ভারত তখনও কিন্তু বিদেশী নাগপাশে কঠিনভাবে আবদ্ধ, সরকারী উচ্চপদগুলোতে শ্বেতকায়দের সর্বত্র একচেটিয়া অধিকার। এমনি দুর্দিনে ক্ষমতায় ঐ আসনগুলো দখল করার জন্যে যোগ্যতার দাবী নিয়ে যে কয়জন ভারতীয়কে এগিয়ে আসতে দেখা যায়, তাঁদেরই অন্যতম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে। সে আমলে ইনি ছিলেন সত্যি একজন দক্ষ ও নামকরা সিভিলিয়ান (আই, সি, এস)। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটি লক্ষ্য করবার—কর্মজীবনে শ্রীদে বরাবর মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলেছেন, সিভিলিয়ান হয়েও জাতীয়তাকে বিকিয়ে দিতে তৎপর হননি ইনি কখনও।

মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত শাক্ত পরিবারে বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১২৮৮ সনের ২১শে ভাদ্র। পিতা ৺রাজেন্দ্রলাল দে ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা পুরুষ—আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করে অর্থোপার্জন করবার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। এর জন্য শুধু তিনি নিজেই আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন নি, বীরেন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক পড়াশুনোর ব্যাপারেও অনেক অসুবিধার কারণ ঘটে। আরও দুঃখের কথা, তিন বছর বয়স হতে না হতেই বীরেন্দ্রনাথ স্নেহময়ী জননীকে (যোগেন্দ্রময়ী) হারান কিন্তু শত প্রতিকূল অবস্থার ভেতর থেকেও তিনি এগিয়ে যেতে চেয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে। ঠাকুরমা, পিসিমা, ঠাকুরদা (৺করালীচরণ দে)—এঁদের স্নেহের অনুশাসন তাঁকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে খুব বেশিরকম।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে

শ্রীদের লেখাপড়ার সূচনা হয় নিজেদের পল্লীর (হরিবপুর) পাঠশালাতে—যেখানে অল্পদিন মধ্যেই রাখতে সমর্থ হন তিনি সাফল্যের প্রথম স্বাক্ষর। পাঠশালার পড়া শেষ হওয়া মাত্র ভর্তি হন তিনি মেদিনীপুর কলেজ-স্কুলে।

এই স্কুল থেকেই ১৮৯৮ সালে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অঙ্কশাস্ত্রে বরাবর তাঁর একটা অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। এনট্রান্স পরীক্ষাতে সর্ববিষয়ে তিনি অষ্টম স্থান অধিকার করেন, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে কেউ তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি এফ-এ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যায়, এবারেও অঙ্কে তাঁরই প্রথম স্থান নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। দু'বছর পর বি, এ, (অনার্স) পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে শুধু প্রথম শ্রেণীতে প্রথমই হন না, রেকর্ড নম্বর পেয়ে সুনাম অর্জন করেন। সেবারে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রেও তিনি অধিকার করেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান।

ইত্যবসরে বীরেন্দ্রনাথ অনেক স্কলারসিপ ও পদক, এমন কি জার্মাণ স্বর্ণপদক পর্যন্ত লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ স্যার আশুতোষের তাঁর ওপর স্বভাবতঃই নজর পড়ে। শ্রীদে প্রেসিডেন্সী কলেজেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান—বিষয় থাকে অঙ্ক। সে ১৯০৩ সালের কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার মনোনীত হয়েছেন ঘোষিত হয় কিন্তু অনিবার্য্য কারণে এখানে এম-এ পরীক্ষা না দেওয়ায় বৃত্তিটি ভোগ করতে পারেন না। এম-এ পড়তে থাকাকালীনই ভারত সরকারের বছরে দুই সাত পাউণ্ডের একটি বৃত্তি পেয়ে তিনি চলে যান ইংলণ্ডে। বৃত্তিটি নির্দ্দিষ্ট ছিল তিন বছরের জন্য—শ্রী দে উচ্চ-শিক্ষা লাভের এই পরম সুযোগ ছাড়লেন না।

বিলেতে গিয়ে কৃতী ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ ক্যাম্ব্রিজের সেন্ট জনস্ কলেজে যোগদান করেন। অঙ্কশাস্ত্রে এখানেও নিজের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে তাঁর বিলম্ব হয় না। এর জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আলাদা ভাবে তিনি বৃত্তি পেতে থাকেন। আই-সি-এস ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি ১৯০৬ সালে এবং সেবারে অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাই পোজ পরীক্ষাতেও সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ র‍্যাংলার হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

এমনি সুনামে ও মর্য্যাদায় ভূষিত হয়ে শ্রী দে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরে আসেন স্বদেশে। দেশব্যাপী তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলেছে তীব্র মাত্রায়। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত অবস্থায় খড়্গপুর ষ্টেশনে তিনি যখন নামেন, অমনি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে স্থানীয় লোকেরা তাঁর গলায় পরিয়ে দেন ফুলের মালা। আই, সি, এস্ বীরেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়েন এই দৃশ্যে, কিন্তু এর জন্যে কিছু পরিমাণে হলেও রাজরোষ তাঁকে বরণ করতে হয়। সে সময়কার ইংলিসম্যান ও ষ্টেটসম্যান কাগজে 'স্বদেশী সিভিলিয়ান' বলে তাঁর সম্পর্কে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্যন্ত হয়ে যায়।

কর্ম্মজীবনের সূচনাতেই বীরেন্দ্রনাথ নাগপুরের সহকারী কমিশনারের দায়িত্ববহুল পদে নিযুক্ত হন। আপন কার্যভার নিয়ে তিনি তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের নানা জেলায় ঘুরে বেড়ান। তাঁর প্রতিপত্তি দেখে বৃটিশ অফিসারগণ পর্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, নানা ব্যাপারে এইটি বুঝা গেছে। সেদিনের নাগপুর ক্লাবে কেবলমাত্র ইউরোপীয় সদস্য থাকার যখন প্রস্তাব হয়, তখন তিনি সাহসের সঙ্গে এর বিরোধিতা করেন। ১৯২২ সালে লী কমিশনের সামনে শ্বেতাঙ্গ অফিসারসংঘের তরফ থেকে শ্বেতাঙ্গদের জন্তে বিশেষ অধিকার দাবী করা হলে ভারতীয় অফিসারদের পক্ষে তাঁকেই প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে দেখা যায়। সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে কমিশনের নিকট ইউরোপীয় অফিসারগণ সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে যে কটাক্ষ তারও প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে যান শ্রীদে'ই। এর জন্তে এই মানুষটিকে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছে, এইটুকু ধরে নেওয়া চলে।

কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বীরেন্দ্রনাথকে চেপে রাখতে চাইলেও তাঁর অসাধারণ যোগ্যতাকে অস্বীকার করতে বোধ হয় সাহসী হননি। তাই দেখা গেল, ১৯২৬ সালে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের রাজস্ব ও অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী—যে দায়িত্ববহুল পদে বসানো হয়নি তাঁর আগে আর কোন ভারতীয়কে। বেরারের কমিশনারের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি ১৯২৮ সালে আর এখানেও থেকে যায় তাঁর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১৯৩৩ সালে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবার এই তেজস্বী পুরুষের মতবিরোধ ঘটে—কর্ম্মক্ষেত্রে সমধিক দায়িত্বশীল পদ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন, আর সেটি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ না করেই।

বীরেন্দ্রনাথের নাম ইতোমধ্যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়—আই, সি, এস পদ ছেড়ে দিলেও দেশে তাঁর গৌরবময় যোগ্যতা অস্বীকৃত হল না। ১৯৩৭ সালে তিনি সাংলি রাজ্যের দেওয়ানের আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৮ সাল অবধি (সাংলির ভারতভুক্তির পূর্ব্ব পর্যন্ত) এই দেশীয় রাজ্যটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকে নিবিড়। এখানে থাকা অবস্থায় তিনি রাজা সাহেবের উপদেষ্টা ও এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট পদেও অধিষ্ঠিত হন, এ নিশ্চয়ই গৌরবের।

শ্রীদে একজন প্রকৃত সমাজসেবী, বাস্তব ক্ষেত্রেই রয়েছে যার বহুল প্রমাণ। চাকরিজীবনে থাকাকালীন নাগপুরের অঞ্চলবিশেষে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি সাধ্যমত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজের জীবন বীমা ও সাংলি রাজ্য থেকে অর্জিত সমস্ত টাকা-পয়সার (যার পরিমাণ প্রায় ৬১ হাজার টাকা) মেদিনীপুরের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষা-ব্যাপারে দান করে দিয়েছেন, এ কম কথা নয়। মেদিনীপুরের সরস্বতী বিদ্যামন্দির (ঠাকুরমার স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত) প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমাজ-হিতৈষণার অপর নিদর্শন হিসাবে গণ্য। নিজ জন্মভূমিতে পিতৃস্মৃতিতে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি ইষ্টকনির্ম্মিত করারও ব্যবস্থা করেন। শ্রীদে আজ অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ, কিন্তু এখনও তাঁর চোখ-মুখে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ছাপ রয়েছে। তাঁকে দেখলে একটি সার্থক বাঙ্গালী-জীবনের জীবন্ত ছবি চোখে পড়ে, এ কথা হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার প্রধান বার্ত্তা-সংগ্রাহক]

বর্ত্তমান কালের অন্যতম প্রচারযন্ত্র সংবাদপত্রের চীফ রিপোর্টার হিসাবে দেশ ও দশের কথা সবিস্তারে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা যাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম—নিজ জীবনী সম্বন্ধে তাঁহার প্রচার-বিমুখতা আশ্চর্য্য বোধ হলেও অসম্ভব নয়। আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড-এর বর্ত্তমান প্রধান বার্ত্তাসংগ্রাহক মৃদুভাষী ও পরিপূর্ণ "বাঙ্গালী" শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত পরিচয়ে আমার এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীমতী কুসুমকামিনী দেবীর পুত্র মণীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা জিলার (বর্ত্তমানে পাকিস্তানভুক্ত) কালীকচ্ছ গ্রামে ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় কলাপাতায় অক্ষরজ্ঞান ও তেঁতুলবীচি সাজাইয়া সংখ্যাজ্ঞান হয়। তথায় গুরুমহাশয়ের শাস্তিদান—বর্ষায় জলের উপর দিয়া পড়িতে আসা—বাঁশের সাঁকোর উপর লাফালাফি করা—বানান পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় ছাত্র-পরীক্ষক হওয়া—এক পড়ুয়ার দুটি ভুল বানান সংশোধন না করা—তজ্জন্য নিজের পাওয়া নম্বর হইতে শাস্তিস্বরূপ পাঁচ মার্ক কাটা যাওয়া—এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তিনি পাঠশালায় লাভ করেন। পরে গ্রামের এম-ই-স্কুলে কিছু কাল কাটানর পর সরাইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট ও ইংরাজী সাহিত্যে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অনার্সসহ গ্রাজুয়েট হন। তথায় পাঠকালে ত্রিপুরার অধিবাসী স্বনামধন্য মহেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "রামমালা ছাত্রাবাস"-এ মণীন্দ্রনাথ অবস্থান করিতেন। এই স্থানে প্রাতে প্রার্থনাসভায় বেদগান, গৃহাদি পরিষ্কার, ঠাকুরপূজা, বাজার করা, রান্না ও বাসনপত্র মাজা—অর্থাৎ সমস্ত কাজই ছাত্রদের স্বহস্তে করিতে হইত। ত্রিপুরা জেলার কয়েক শত সন্তান মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দানশীলতায় উপকৃত হইয়াছেন। কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ছিলেন আমেরিকানিবাসী পরলোকগত ডঃ সুধীন্দ্র বসুর ভ্রাতা শ্রীসত্যেন্দ্র বসু। সপ্তম বারে এন্ট্রান্স পাশ করিলেও তাঁহার অধ্যাপনায় খুব সুনাম ছিল। মাহিনা সামান্য বৃদ্ধি করায় কলেজের ছাত্ররা একবার তথায় ধর্ম্মঘট করে। পরে জনপ্রিয় নেতা কামিনীকুমার দত্তের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইয়া যায়। টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় মণীন্দ্রনাথকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্সসহ কলেজে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই—কিন্তু তাঁহার অদম্য মনোভাবের জন্য পরে ভর্ত্তি করা হয়। প্রথম হইতেই তিনি কলেজ-পত্রিকায় লিখিতে থাকেন।

১৯৩১ সালের শেষে তিনি প্রথম কলিকাতায় আসেন কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন নাই—বরং গৃহশিক্ষকতা করিতে ও তৎসহ সর্টহ্যাণ্ড শিখিতে থাকেন। তখন বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপে সরকার ব্যতিব্যস্ত। মণীন্দ্রনাথ একদিন ড্যালহৌসী স্কোয়ার দিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া গোয়েন্দা বিভাগের অফিসে নীত হন। নিখিলবঙ্গ ছাত্রসঙ্ঘের সহিত পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সংস্রব ছিল—তজ্জন্য তাঁর গ্রামের গৃহে খানাতল্লাসী করা হয়। আপত্তিজনক কিছু না পাওয়ায় পনের দিন পরে তিনি মুক্ত হন। ইহার পর তিনি চা, মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতির 'ক্যানভ্যাসার' হন। মধ্যে সাঁইথিয়াতে ৪০৲ টাকা বেতনে অল্পদিনের জন্য চাকুরী করেন।

কলিকাতায় ফিরিবার পর শ্রী ভট্টাচার্য্যের জীবনের 'চক্র' ঘুরিয়া গেল। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত Free Press of Indiaতে বিনা মাহিনায় শিক্ষানবিশী বার্ত্তা-সংগ্রাহক হিসাবে প্রবেশ করেন—তথায় ছয় মাস প্রচুর পরিশ্রম করেন—সংবাদপত্র সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন—ফলে শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্তের পরিচয়পত্র লইয়া আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমাখনলাল সেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উহাতে চার পাঁচ মাস শিক্ষানবিশী করার পর মণীন্দ্রনাথ ৪০৲ টাকা মাহিনায় প্রথম ষ্টাফ রিপোর্টার হিসাবে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত পত্রিকায় ঐ পদ ছিল না। কার্য্যে পারদর্শিতার দরুণ ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ বরাবর তিনি তথায় স্থায়িভাবে গৃহীত হন।

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে উত্তর-বিহারে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর শ্রীভট্টাচার্য্য আর্ত্তমানব ও বিধ্বস্ত বিহারের খবরাখবর সংগ্রহার্থে বিহার প্রদেশে প্রেরিত হন। ভীষণ শীত, জনমানবশূন্য প্রান্তর—যোগাযোগবিহীন এলাকায় মণীন্দ্রনাথ এক মাসব্যাপী ভ্রমণ করেছেন—বীভৎস দৃশ্য সংগ্রহ করে লোমহর্ষক পাঠিয়েছেন বিবরণ—আনন্দবাজার পত্রিকায় উহার প্রতিফলনে লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বেলিত হয়েছেন—প্রচুর সাহায্য পাঠিয়েছেন—সরকারী ও

১৯৩৮ সালে সুরাটের নিকট হরিপুরা-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র সে বার নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন। আনন্দবাজারের রিপোর্টারের কর্ত্তব্য ছাড়া তিনি সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে তাঁহার চিঠিপত্র ও ভাষণ লিখনের কাজ করেন। ইহার পূর্ব্বে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ করার কথা উঠে। হরিপুরা যাওয়ার পথে ট্রেণে নাগপুর ষ্টেশনে সুভাষচন্দ্রকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়। কথায় কথায় জানা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা অঙ্গচ্ছেদের পক্ষপাতী। সহযাত্রী সাংবাদিক মণীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের আপত্তি সত্ত্বেও Scoop-news হিসাবে খবর পাঠালেন তাঁর পত্রিকায় যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাই সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গাহিবার বিরোধী ও তজ্জন্য উহার অঙ্গচ্ছেদ কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেস ও রামগড়ে অনুষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের সংবাদদাতা ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বহু সম্মেলনে প্রেরিত হন।

১৯৪২ সালে তিনি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় যোগদান করেন ও ১৯৪৩ সালে উহার চীফ রিপোর্টার নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি "আনন্দবাজার"-এর প্রধান বার্ত্তা-সংগ্রাহক পদে ছিলেন।

১৯৪৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তিনি শ্রীজওহরলাল নেহরুর সহিত একই বিমানে ও গাড়ীতে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ঢাকা জিলাত্রয় ও পরে সমস্ত আসাম প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। অনেক সময় শ্রীভট্টাচার্য্য এইরূপ 'ঝটিকা' ভ্রমণে নেহরুজীর বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুরোধে রাত্রে শ্রীনেহরু বিশ্রামের পূর্ব্বে আবার সাংবাদিকদের নিকট বক্তৃতা দিয়েছেন।

১৯৪৬ সালে দিল্লী'র লালকেল্লায় আই, এন, এ বিচারপর্ব্বের পূর্ব্বে সাংবাদিক মণীন্দ্রনাথ ও দেশনেতা জওহরলাল একই ট্রেণের যাত্রীহিসাবে চলেছেন। মধ্যপথে নেহরুজীর সিগারেট শেষ হয়। পূর্ব্বপরিচিত মণীন্দ্রনাথকে দেখিয়া তিনি উহা চাহেন। কিন্তু কমদামী সিগারেট থাকায় শ্রীভট্টাচার্য্যের মনে দ্বিধা আসে। শ্রীনেহরু উহা বুঝিতে পারিয়া তাহা গ্রহণ করেন।

এক রাত্রে ৺সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার পত্রিকার রিপোর্টারদের বলেন যে একটি চমকপ্রদ খবর সে রাত্রে আশা করা যায়—তজ্জন্য তাঁহারা যেন আরও কিছুক্ষণ দপ্তরে অপেক্ষা করেন। মধ্যরাত্রের মধ্যে উহা না আসায় শ্রীভট্টাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া যান। পরদিন প্রাতে আনন্দবাজারে প্রকাশিত হল 'সুভাষচন্দ্রের ভারত হইতে অন্তর্ধানের সংবাদ।" সুরেশচন্দ্র উক্ত খবরটা স্বয়ং দিয়াছিলেন বলিয়া পরে জানা যায়।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিবরণ সংগ্রহের সময় অল্পের জন্য তিনি নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় মণীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকজন সহকর্মীর সহিত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন—কোনরূপে একপৃষ্ঠার সংবাদ সংগ্রহ হত সহকর্মীর অভাবে—রাস্তার দুই পার্শ্বে মৃতদেহ দেখিতেন—কোন কোনটির উপর "পাক জিন্দাবাদ" পতাকা দেওয়া থাকিত।

১৯৪২ সালের বাঙ্গালায় মন্বন্তরের সময় সাংবাদিক কর্ত্তব্য

বাধা-নিষেধ থাকায় সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৭ সালে কলিকাতায় আইনসভায় পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যদের শোকাচ্ছন্ন মনোভাব থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে খুবই অনিচ্ছার সহিত তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন।

সম্প্রতিকালে শ্রীভট্টাচার্য্য কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত ব্যাপারে ও আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের পটভূমিকায় সংবাদ সংগ্রহে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন।

ডাঃ শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা

[বিশিষ্টা অধ্যাপিকা]

বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ নিয়েই বোধ হয় জন্মেছিলেন শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা। সমগ্র ছাত্রীজীবনে অপ্রতিহত সাফল্যের আলোকে আলোকিত করেছেন দেশী এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস।

নির্দ্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলাম শ্রীমতী সেনগুপ্তার দরজায়, দেখা করলাম শ্রীমতী সেনগুপ্তার সংগে। ভূমিকা না করেই জানতে চাইলাম তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনের গৌরবময় ইতিহাস। পিতার একমাত্র আদুরে কন্যা শ্রীমতী সেনগুপ্তা উত্তর দিতে লাগলেন প্রতিটি কথার। আজ থেকে ২৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালে এই কলকাতায়ই জন্মেছেন শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা। আদিনিবাস ফরিদপুর (পূঃ-পাকিস্তান) হলেও তথায় তাঁর পদার্পণ হয়েছে খুবই কম। পিতা শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (দন্ত চিকিৎসক) মহাশয়ের একমাত্র কন্যা তিনি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার দিকে এক অদম্য আগ্রহ লক্ষ্য করে ভর্ত্তি করে দেন তিনি কলিকাতার গোখলে গার্লস স্কুলে।

১৯৪৩ সালে উক্ত স্কুল হতে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সংগে ম্যাট্রিক পাশ করলেন শ্রীমতী সেনগুপ্তা। ১৯৪৮ সালে আশুতোষ কলেজ হতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে সাফল্যের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে আসেন শ্রীমতী সেনগুপ্তা এবং ১৯৪৮ সালের ইন্টারমিডিয়েটের (আর্টস বিভাগে) পরীক্ষায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বি, এ ক্লাসে অর্থনীতিতে অনার্স সহ ভর্ত্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৫০ সালে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি, এ ডিগ্রি লাভ করে অর্থনীতি নিয়ে যোগ দিলেন এম, এ ক্লাসে। ১৯৫২ সালে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসেসে যোগ দিয়ে অর্থনীতির অধ্যাপিকারূপে সরকারী কার্য্যে যোগ দেন।

১৯৫৬ সালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে যোগদান করেন এবং "প্রাইস রেসপন্‌স ইন এগ্রিকালচার" বিষয়ের থিসিস লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে "ডক্টরেট" ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে লণ্ডন হতে ফিরে এসে পুনরায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দান করেন এবং বর্ত্তমানে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপিকারূপে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী সেনগুপ্তার স্বামী শ্রীরথীন্দ্রনাথ নাগ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার।

শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া

[বিশিষ্ট আইনজীবী]

অকাল পিতৃবিয়োগ, আর্থিক অনটন ও আবাল্য অভাব-অভিযোগের কণ্টকাকীর্ণ পথগুলি অতিক্রম করেও আত্মপ্রতিষ্ঠায় গৌরবান্বিত হয়েছেন কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পক্ষে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে

ডাঃ শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তা
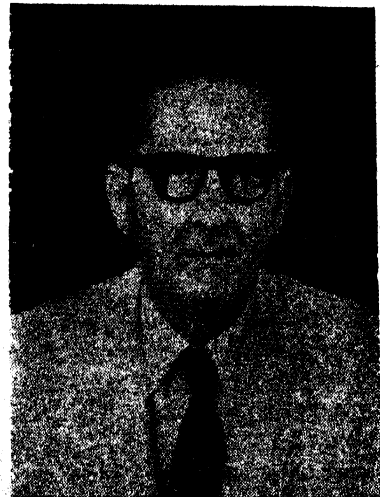
শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া

আমার কন্যাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন শ্রীগুপ্তভায়া। সামান্য স্কুলশিক্ষক ৺বিজয়গোবিন্দ গুপ্তভায়ার পুত্র শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া ১১০০ সালে পাবনা জিলার যোগনালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে পিতৃবিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিতে হয়। জীবনে সাফল্য লাভ নিশ্চিতই বলিয়াই বুঝি মর্মান্তিক পিতৃবিয়োগও তাঁহার উন্নতির পথ রোধ করিতে পারে নাই। যথাসময়ে ১১১৬ সালে মটন স্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন শ্রীগুপ্তভায়া। ১১২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি, এ ডিগ্রি লাভ করে ব্যারিষ্টার হওয়ার উগ্র বাসনা জেগে উঠলো তাঁর মনে। কামনা আছে অথচ সঙ্গতি নাই, সাময়িক নির্জীব হয়ে পড়লেন শ্রীগুপ্তভায়া। কিন্তু আশা যেখানে উচ্চ, উদ্দেশ্য যেখানে সৎ তার উপায়ও করে দেন ভগবান। নিজের চেষ্টায় এবং ঈশ্বরের করুণায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন বন্ধুবান্ধবদের কাছ হতে। কোনরকম চিন্তা ভাবনা না করেই ১১২০ সালে যাত্রা করলেন লণ্ডনে। যোগ দিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরে লিংকন্‌স্‌ইন-এ ব্যারিষ্টারী পড়তে। শেষ করলেন শিক্ষা। হলেন ব্যারিষ্টার। বিলেত গিয়ে শুধু পরের উপরই নির্ভর করেন নাই শ্রীগুপ্তভায়া। ইণ্ডিয়া হাউসে লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করলেন চাকুরী। যোগালেন নিজের খরচ। শিক্ষার অধ্যায় শেষ করে ১১২৫ সালে দেশে ফিরলেন ব্যারিষ্টার গুপ্তভায়া। যোগ দিলেন কলিকাতা হাইকোর্টে, শুরু করলেন আইন ব্যবসা। দেওয়ানী ছেড়ে ফৌজদারী মামলার পথই বেছে নিয়েছেন তিনি। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর আইন ব্যবসায় নাম কিনেছেন, পরিচালনা করেছেন অনেক সরকারী এবং বেসরকারী ফৌজদারী মামলা। বর্তমানে যে ক'জন বিশিষ্ট আইনজীবী কোলকাতা হাইকোর্টে সুপ্রতিষ্ঠিত, শ্রীগুপ্তভায়া তাঁদের অন্যতম। শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া অপেক্ষা জি, গুপ্তভায়া নামেই জনসমাজে সমধিক পরিচিত, সদা-প্রফুল্ল, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রীগিরিজা গুপ্তভায়া বাংলায় আইন-জগতে আরো বেশ কিছুদিন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়।

সমর্পণ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যখন তোমার হাতে সমর্পণ করেছি প্রথম
আমার কম্পিত হাত,—
আকাশে ছিল না কোনো তিথি
থরো-থরো অন্ধকার ছেয়েছিল যেন সব স্মৃতি
তোমার আয়ত চোখে কী গভীর কৃষ্ণপক্ষ রাত।

আকাশে ছিল না চাঁদ ; দূর নক্ষত্রেরা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু যেন। দু' বাহুর আলিঙ্গনে ঘেরা
আমার বুকের মধ্যে তবু কোন পূর্ণিমার আলো
মরালের মত দুটি
শুভ্র-ধবল ডানা সহসা ছড়ালো।

আর একদিন মনে পড়ে
শুনেছি মেঘের ডাক সচকিত নিঃশব্দ প্রহরে
তোমার নির্জন বুকে।
আমার হৃদয়
বৃষ্টির ধারায় ধুয়ে ভরে গেছে রোমাঞ্চিত কদম্ব-কেশরে
দেহ যেন দেহ নয় সমর্পিত প্রতিটি পাপড়ির
আত্মার প্রবল যেন ভরেছিল বৃষ্টির প্লাবনে—

বাদল দিনের সেই প্রথম কদম তুমি রেখেছ কি মনে ?

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে

শক্তি মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে।
সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছে পথের ওপর
পৃথিবীকে চিনবে
আকাশকে জানবে
গ্রহগুলোকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখবে
মৃত কি সজীব।
তারপর জয়ের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে
সে বলবে
আমি চিনেছি
আমি জেনেছি
আমি পেয়েছি আজ সত্যের সন্ধান।
বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে।
ভাগ্যের লিপিখানা মুছে দিতে চেয়েছে যেদিন
নিষ্ঠুর বিজ্ঞান কাছে এসে
প্রতিশোধ নিলে।
রক্তাক্ত দেহ তার বুভুক্ষু রাজপথে লুটাল সেদিন
বিজ্ঞানের চাকা তার জীবনে সমাপ্তি এনে দিলে।
রক্তের রেখা টেনে দ্রুতগামী ট্রামখানা থমকে দাঁড়িয়ে
অপরাধী চোখ মেলে তাকাল পিছনে।
শেষ হ'ল একটা জীবন।
একটা বিজ্ঞান।
ফিজিক্সের পাতাগুলো হাওয়ায় উড়ছে তখনো।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আইভান তুর্গেনিভ

২৫

সানিন প্রায় এক নিশ্বাসে দৌড়ে তার হোটেলে ফিরে এল। তার মনে হচ্ছিল কেবল মাত্র সেখানে গিয়েই, যখন সে একা থাকবে বুঝতে পারবে কি হচ্ছে তার অন্তরে। সত্যিই যখন সে ঘরে গিয়ে টেবিলে বসে কনুই দুটো টেবিলে রেখে হাত দুটো তার গালে রাখলো—বিষাদ ভরা সুরে বলে উঠল 'আমি তাকে ভালোবাসি—ভীষণ ভালোবাসি।' জলন্ত অঙ্গারের উপর থেকে কেউ যদি ছাই উড়িয়ে দেয় তাহলে যেমন জ্বলতে থাকে অঙ্গারটি ঠিক সেরকম তার সারা অন্তর প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। একটি ছোট মুহূর্ত—সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করে সে তার পাশে বসে কথা বলছিল কেন সে বুঝতে পারে নি যে তার জামার প্রতিটি ভাঁজ পর্যন্ত তার কাছে ভালবাসার ধন হয়ে দেখা দিয়েছে। যুবকরা যে বলে থাকে—তার পায়ের তলায় প্রাণ দিতে পারি—ঠিক তাই মনে হচ্ছিল তার। বাগানের সেই সাক্ষাতেই বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এখন আর তারার আলোয় এলোমেলো চুলে তার সে রূপ তার মনে এল না। তার মনে এল : সে বেঞ্চিতে বসে, টুপিটা হঠাৎ মাথা নেড়ে পেছনে করে দিল, বিশ্বাস ভরা চোখ মেলে চাইল তার দিকে। তার ভালোবাসার দুর্নিবার বেগ, ভালোবাসার তৃষ্ণা সারা ধমনীতে যেন ছড়িয়ে পড়ল। দু'দিন থেকে যে গোলাপটি সে পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বের করে জোরে ঠোঁটে চেপে ধরল। চিন্তা শক্তি বা ভবিষ্যতের ভাবনা গুলিয়ে গেল। অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার সারা জীবন। তার সঙ্গিহীন আনন্দহীন জীবনতরণী নোঙর ফেলে অন্ধকার তীর ধরে দাঁড়িয়েছিল—এবারে খুসীর জোয়ারে ভাসিয়ে দিল নৌকো—জানতে চাইল না কোথায় ভিড়বে গিয়ে—হয়ত অপলকা এই নৌকো কোন পাথরে ধাক্কা খাবে। উলাণ্ডের গীতিকাব্যের সেই শান্ত নদীর রূপ এতকাল তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল—এখন দেখা দিল ভীষণ তরঙ্গরাশি। তরঙ্গভঙ্গে ভেসে যেতে লাগল সে। একটা কাগজ টেনে নিয়ে এক টানে লিখে গেল সে।

"প্রিয় জেম্মা,

তুমি জানো তোমাকে কি উপদেশ আমার দেবার কথা ছিল। তুমি জান তোমার মা কি চান ও কি করতে তিনি বলেছিলেন আমাকে। কিন্তু যা তোমার জানা নেই ও যা আমি তোমাকে জানাতে চাই তা হচ্ছে আমি তোমাকে ভালবাসি। যে হৃদয় আগে কখনও ভালবাসে নি সে হৃদয় আজ শতমুখী উচ্ছ্বাসে তোমাকে ভালবেসেছে। অপ্রত্যাশিতরূপে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে আমার সারা হৃদয়। অবর্ণনীয় আবেগে আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে যখন তোমার মা এসে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, তখনও আমার প্রেম পূর্ণরূপ নেয় নি। তা না হলে যে কোন সৎলোকের মতই খুব সম্ভবতঃ আমি এ কাজের ভার নিতে অস্বীকার করতাম…। আমি যা প্রকাশ করলাম এখন এ সত্যিই আমি অন্তর থেকে করছি। আমি তোমাকে জানানো কর্তব্য মনে করি, আমাদের মধ্যে যেন ভুল বোঝা না দেখা দেয়। বুঝতে পারছ তো আমি তোমাকে কোন উপদেশই দিতে পারি না। আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে ভালবাসি—এ ছাড়া আমার মনে বা হৃদয়ে আর কিছু নেই।— দমিত্রি সানিন।"

চিঠি ভাঁজ করে খামে বন্ধ করে প্রথমে ভাবল সানিন ওয়েটারকে ডেকে তার হাতে চিঠিটা পাঠাবে। না—সে ভাল হবে না। এমিলকে বলব নিয়ে যেতে? কিন্তু দোকানে গিয়ে সব বিক্রেতাদের মাঝে যেতে তাকে খুঁজে বের করা বড়ই অশোভন দেখাবে… তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে গেছে—সে হয়ত এতক্ষণে দোকান ছেড়ে চলে এসেছে। যাই হোক, একথা ভেবে সে টুপি পরে বেরিয়ে এলো। দু'বার মোড় ঘুরল সে, তারপর অবর্ণনীয় আনন্দে তার মন ভরে গেল। হঠাৎ দেখতে পেল এমিল আসছে। একহাতে চামড়ার ব্যাগ, অন্যহাতে কাগজে মোড়া একটা ঠোঙা—বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ছোট ছেলেটি।

সানিনের মনে হল লোকে যে বলে থাকে প্রত্যেক প্রেমিকেরই সৌভাগ্য-তারকা আছে, তার নিশ্চয়ই খানিকটা সত্যি। এমিলকে ডাকল সে।

এমিল ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুসী হয়ে দৌড়ে এল। সানিন তাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দিল না। বলল, চিঠিটা কা'কে কি ভাবে দিতে হবে। মন দিয়ে শুনল এমিল।

তার মুখের ভাব দেখতে হল অত্যন্ত গম্ভীর ও রহস্যপূর্ণ। বলল, 'যাতে কেউ দেখতে না পায়?' অর্থাৎ যেন বলতে চাইল আমরা দুজনেই—জানি কি আছে ওতে।

অপ্রস্তুত বোধ করে সানিন এমিলের গাল টিপে দিল, 'হ্যাঁ, আমার ছোট বন্ধু, যদি কোন উত্তর থাকে—আমার কাছে, নিয়ে আসবে তুমি—তাই না? আমি সারাদিনই বাড়ী থাকব।'

এমিল খুসী হয়ে বলল, 'কিছু চিন্তা করবেন না।' দৌড়ে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মাথা নাড়ল।

সানিন আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। আলো না জেলে হাত দুটো মাথার নীচে রেখে খাটে শুয়ে পড়ল। প্রথম প্রেমের উন্মেষে মধুর আবেশে তার সারা মন ভরে গেল। ভাষায় এ ভাব ব্যক্ত করা যায় না। এর অনুপম মাধুর্য কোন প্রেমিকের কাছেই অজানা

নেই। আর যে কতখানি ভালবাসেনি তাকে বর্ণনা দিয়েও তা বোঝান যাবে না।

খোলা দরজায় এমিলের মাথা দেখা গেল। ফিস-ফিস করে বলল, 'এই যে জবাব—আমি এনেছি।' মাথার ওপরে একটা ভাঁজকরা কাগজ সে ধরেছিল। সানিন খাট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এমিলের হাত থেকে কাগজটা নিল। তার কামনা তখন এত উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে যে কাঁচসমস্ত গোপন করে রাখার চিন্তা অন্তর্হিত হয়েছিল—এমন কি তার ভাই—এই ছোট ছেলেটির কাছ থেকে সম্পূর্ণ সংযত ব্যবহার করতে পারলে সে খুসী হত,—মেয়েটির ভাই-এর সামনে অরুচিকর কিছু করতে সে চায়নি—কিন্তু তার ব্যবহার তার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

রাস্তার বাতির আলোয় হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

আমি মিনতি করছি, চাইছি কাল সারাদিন এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না। আমার পক্ষে আপনার অনুপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়। পরে সব স্থির হবে। আমি জানি আপনি এর অন্যথা করবেন না কারণ—

'জেমা'।

সানিন চিঠিটি চুমায় পড়ল—কি মিষ্টি, কি মর্মস্পর্শী সুন্দর তার হাতের লেখা। তার পর এক মিনিট ভেবে ফিরে দাঁড়িয়ে এমিলকে নাম ধরে ডাকল। এমিল নিতান্তই সুবোধ জনের মত দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছিল, এবারে দৌড়ে এলো তার দিকে।

'আমি কি করতে পারি?'

'শোন বন্ধু, তুমি কি··?'

এমিল চিন্তিত মনে মাথা দিল 'মঁসিয়ে দিমিত্রি, আমাকে তো ('তুমি' বলানীতে) বললেন না কেন?'

সানিন হাসল, 'তাই হবে।' (এমিল আনন্দে লাফিয়ে উঠল) 'শোন বন্ধু, তুমি বলবে একজনকে—জান তো কার কথা বলছি আমি—যে সে যা বলেছে তাই হবে?' (এমিল ঠোঁট চেপে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল)···'আর তুমি··কাল তুমি কি করছ?'

'আমি? কাল আমি কি করলে আপনি খুসী হন?'

'যদি পার তো কাল খুব ভোরে এসো। ফ্রাঙ্কফোর্টের আশেপাশে আমরা ঘুরে বেড়াব তাহলে। তোমার ভাল লাগবে?'

এমিল আবার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। 'ভীষণ ভালো লাগবে আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতে। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমি নিশ্চয়ই আসব।'

'আর যদি ওরা আসতে না দেন?'

'আসতে দেবেন।'

'শোনো—বল না—তুমি তো জান কাকে··যে আমি তোমাকে সারাদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছি।'

'কেন বলব? আমি শুধু চলে আসব তাহলেই।'

এমিল সানিনকে চুমু খেয়ে পালিয়ে গেল।

সানিন অনেকক্ষণ পায়চারি করলো ঘরে, শুতে গেল দেরী করে। তার মন আবার মিষ্টি-মধুর আবেশে ভরে গেল—নতুন জীবনের আরম্ভে তার অন্তর পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল আধো আনন্দে, আধো ভয়ে। এমিলকে সারাদিনের জন্য নেমন্তন্ন করেছে ভেবে খুসী হল সে। ঠিক তার বোনের মতই এমিল। নিজের মনেই বলল সানিন, 'সে আমাকে জেমার কথাই মনে করিয়ে দেবে।'

কিন্তু একটি প্রশ্ন আর সকল প্রশ্ন ছাড়িয়ে জাগছিল। কালকের জেমা কি করে আজ থেকে ভিন্ন? মনে হয়, সে যেন অনন্তকাল ধরে জেমাকে ভালোবেসে এসেছে। ঠিক আজ যে রকম ভালোবাসে সে।

২৬

পরদিন ভোরে টাটাজিয়ার গলায় ফিতে বেঁধে সকাল আটটায় এমিল সানিনের দরজায় দেখা দিল। প্রাচীন পিতামাতার সন্তান হলেও এর চেয়ে আগে আসতে পারত না সে। বাড়ীতে মিথ্যে কথা বলে এসেছে। সে বলেছে, প্রাতরাশের আগে সানিনের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে ও সেখান থেকে সোজা চলে যাবে দোকানে। সানিন যখন পোষাক পরছিল, এমিল একটু শঙ্কিত ভাবে জেমাও হের ক্লুবারের সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা পাড়ল। কিন্তু সানিন একেবারে চুপ করে থাকাতে এমিলও চুপ হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন বুঝতে পারছিল কেন এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করা শোভন নয়। তাই ভেবে মাঝে মাঝে তার চেহারা ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

কফি পানের পর দুই বন্ধু পদব্রজে হাউংসেন বলে ফ্রাঙ্কফোর্টের অনতিদূরে অরণ্যবেষ্টিত একটি ছোট গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হল। এখান থেকে টাউনুস পর্বতমালার সবটাই দেখা যাচ্ছিল। দিন খুব ভাল করেছিল। রোদে দাঁড়াতে ভাল লাগছিল। সবুজ

[illegible]কাশে থেকে ইতস্ততঃ ছায়া ফেলছিল—ছায়া সরে সরে যাচ্ছিল [illegible]টির ওপর থেকে। তরুণ দুটি শীগগিরই শহর ছাড়িয়ে সুন্দর বাঁধানো [illegible] ধরে জোরে হাঁটতে লাগল। একটা ছোট বনে ঘুরে বেড়াল [illegible]নিকক্ষণ, তারপর গ্রামের সরাইতে প্রাতরাশ খেয়ে নিয়ে পাহাড়ে [illegible]ল। সেখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে খুশী হল তারা, পাথর [illegible]ড়ে ফেলতে লাগল নীচে। হঠাৎ নীচে থেকে এক পথিক পাথর [illegible]ার গায়ে লাগতে গাল দিল তাদের। এবারে তারা ছোট, [illegible]কনো ঈষৎ হলদে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তারপর [illegible]ল আরেকটা সরাইতে বিয়ার পান করবে বলে। তারপর [illegible]টে বেড়াল প্রান্তরের উপর দিয়ে, কে কত দূর লাফাতে পারে [illegible]রীক্ষা হল, প্রান্তরের ওপারে থেকে প্রতিধ্বনি শোনা যাওয়াতে [illegible]রা প্রতিধ্বনির সঙ্গে গান গাইল, শিস দিল, কথা বলল। [illegible]াছের ডাল ভেঙ্গে তাদের টুপি সাজাল, এমন কি নাচল পর্যন্ত। [illegible]র্টাজিরা তাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘুরছিল। সে অবশ্য ঢিল ছুঁড়তে [illegible]ারছিল না। কিন্তু ঢিলের পেছন পেছন ছুটছিল, গানের সঙ্গে [illegible]াতরাচ্ছিল। বিয়ার পান করল বিরক্ত হয়ে। এই অভ্যাসটি তার [illegible]াক্তন প্রভু এক ছাত্রের কাছে শেখা। তার বর্তমান প্রভু [illegible]র্টালেওনের সে বড় বাধ্য ছিল। কিন্তু এমিল যখন তাকে কথা বলতে' কিম্বা হাঁচতে বলছিল সে শুধু জিভ বের করে লেজ নাড়ছিলো।

তরুণদ্বয় অনেক কিছুই আলোচনা করছিল। শুরুতে সানিন আরম্ভ করল জীবনের উদ্দেশ্য, জীবিকা, তার অর্থ ও প্রকৃতি কি কিন্তু কথাবার্তা শীগগিরই সাধারণ স্তরে নেমে এল। এমিল তার বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ককে রাশিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল, সেখানে কি করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, সে দেশের মহিলারা কি সুন্দরী, রাশিয়ান ভাষা শিখতে কতদিন লাগে; যখন অফিসারটি গুলি ছুঁড়ছিল তখন তার মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সানিনও তাকে জিজ্ঞেস করল তার বাবার কথা, তার মার কথা, তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা, অতিকষ্টে সে জেমার কথা পরিহার করে চলছিল—কিন্তু তার কথাই ভাবছিল সে সবসময়। বস্তুতঃ, ঠিক যে তার সম্বন্ধে ভাবছিল তা নয়, সে ভাবছিল, আগামী কাল আগামী প্রভাত কি অপ্রত্যাশিত কি অনির্বচনীয় সুখ নিয়ে দেখা দেবে। তার মনের ছবিতে যেন পাতলা সূক্ষ্ম আবরু দেওয়া পর্দা ঝুলছিল—বাতাসে কাঁপছিল অনুভব করতে পারছিল ওপারে রয়েছে একটি নবীন মুখ, স্থির, দেবদুর্লভ, ঠোঁটে মৃদু হাসি, কপট ছলনায় গম্ভীর দুনয়নের পক্ষ্ম নীচে নামানো। এ যেন জেমার মুখ নয়—এ মুখ সুখের। অবশেষে তার সেই মুহূর্তটি এসেছে, পর্দা সরে গেছে, ঠোঁট খুলে গেছে, পক্ষ্ম উপরে উঠে গেছে—স্বর্গীয় সুখ দেখতে পেয়েছে তাকে—সূর্যরশ্মির মত বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোক, কি অসীম আনন্দ, কি অপরিসীম বিহ্বলতা। যখন সে এই মুহূর্তটি, এই অনাগত প্রভাতের কথা ভাবছিল তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন থেমে যাচ্ছিল—অসীম আশাতে তার মন পূর্ণ হয়েছিল।

আর এই আশা, এই কামনাকে বাধা দেওয়ার কিছু ছিল না। সর্বত্র ছিল তারা তার সঙ্গী। এই আশা ও কামনার অনুপুর [illegible] [illegible] মধ্যাহ্ন ভোজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এমিলের সঙ্গে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তার মনে [illegible] [illegible] লোকে যখন জানবে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর তারা ব্যাঙের মত লাফাচ্ছিল। একটা প্রকাণ্ড বড় তৃণাচ্ছাদিত মাঠে তারা খেলছিল এখন, সে যখন এমিলের পিঠের উপর দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে পাখীর মত প্রায় উড়ে যাচ্ছিল ও টার্টাজিরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল—হঠাৎ সানিন অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে দেখতে পেল মাঠের একপাশে দুজন সেনাদলের অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। একজন কালকের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অপর জন তার সহযোগী—হের ফন ডনহোফ ও হের ফন রিক্টার। তাদের প্রত্যেকের চোখে এক কাচওলা চশমা পরা ছিল—দুজনেই হাসছিল তারা। সানিন মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছাড়া কোটটি তাড়াতাড়ি পরল ও এমিলকে রওয়ানা হতে বলল। এমিলও তার কোট পরে নিলে, তারা দ্রুতপদে ফ্রাঙ্কফোর্ট রওয়ানা হল।

বড় দেরী হল ফ্রাঙ্কফোর্ট পৌঁছাতে।

বিদায় নেবার সময় এমিল বলল—'আজ আমার ভাগ্যে বকুনি আছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে-যায় না। আজ দিনটি কেটেছে চমৎকার।'

হোটেলে ফিরে এসে দেখল জেমা একটা চিঠি লিখেছে তাকে। বহু পার্কবেষ্টিত ফ্রাঙ্কফোর্টের একটি পার্কে আগামীকাল সকাল সাতটার সময় সে সানিনের সঙ্গে দেখা করবে লিখেছে।

আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেল সে। জেমার অনুরোধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে ভেবে কি খুশী হলো—ভগবান—অনাগত
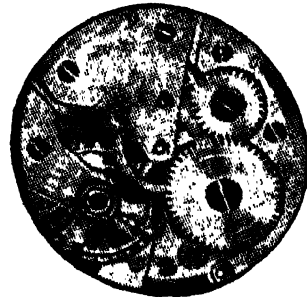
প্রভাত কি নিয়ে আসছে, অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত, অদ্বিতীয়, অবশ্যম্ভাবী—কি নিয়ে আসবে না সে ?

জেম্মার চিঠির উপর আবার চোখ বুলাল সে। 'জি' অক্ষরটির নিচের দিকটা লম্বা করে টেনে দিয়েছিল জেম্মা—তাতে মনে এলো তার সুন্দর আঙুলগুলো। তার মনে পড়ল ঠোঁট দিয়ে কখনো এই অনিন্দ্যসুন্দর হাতটিকে আদর করে নি সে। ভাবল—লোকে যা বলে ইটালীয়ান মেয়েরা তো তা নয়। এরা—বিশেষ করে জেম্মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও নির্মল। সে যেন রাণী, যেন দেবী—মর্মর পাথরের মত পবিত্র ও নির্মল।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতে—সময় যখন আসবে···সে রাত্রে ফ্রাঙ্কফোর্টে একটি সুখী লোক ছিল···সে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু কবির ভাষায় বলতে পারত আমি ঘুমাই···

কিন্তু সদাজাগ্রত আমার অন্তর ঘুম কা'কে বলে জানে না···

গ্রীষ্মের সূর্যরশ্মিতে ফুলের উপর ডানা মেলে প্রজাপতি শুয়ে থাকে—সে রকম তার অন্তর হাল্কা মনে বিচরণ করছিল।

২৭

পাঁচটার সময় সানিন ঘুম থেকে উঠে ছটার মধ্যে পোষাক পরে নিল। সাড়ে ছটার সময় পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছিল সে, জেম্মার নির্দেশমত একটি ছোট গ্রীষ্মকালীন ঘরের দিকে নজর রেখে।

শান্ত গরম ধূসর ছিল সকালটি। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসবে। কিন্তু হাত পাতলে তাতে জল লাগছিল না, কেবল কোটের হাতাটা সামান্য ভিজেছিল—একটু পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে হাওয়া চিরতরে বিদায় নিয়েছে। শব্দরাজি যেন স্থির হয়ে বায়ুতে ত্রিশঙ্কুর মত দাঁড়িয়ে ছিল, দূরে কুয়াশা হয়েছিল। সুমিষ্ট মিনোনেট ও সাদা খয়ের-ফুলের গন্ধে ভরপুর ছিলো বাতাস।

সব দোকান বন্ধ ছিল কিন্তু রাস্তায় দু-একজন পথচারীকে দেখা যাচ্ছিল। থেকে থেকে গাড়ীর চাকার আওয়াজ আসছিল—পার্কে বায়ুসেবনকারী আর কেউ ছিল না। শুধু একটি মালী আস্তে কোদাল দিয়ে রাস্তা ঠিক করছিল। রাস্তায় কালো পোষাকে আচ্ছাদিত এক বুড়ীকে দেখা গেল—এক মুহূর্তের জন্য সানিনের মনে হল এই বুঝি জেম্মা, তার বক্ষ স্পন্দিত হতে লাগল, চেয়ে রইল কালো দাগটি যতক্ষণ না আড়াল হয়ে যায়।

সাতটা, গীর্জার ঘড়িতে সাতটা বাজল।

সানিন এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে কি আসবে না ? এই চিন্তায় তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যেন। এক মুহূর্ত—তারপরই তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, এবারে কিন্তু একেবারে অন্য কারণে। শুনতে পেল লঘুপদে কে এগিয়ে আসছে—তার জামার আওয়াজ আসছে। ফিরে দেখল—জেম্মা।

জেম্মা রাস্তা ধরে অনুসরণ করল তাকে। সে পরেছিল একটি ধূসর রঙের পোষাক, মাথায় ছিল কালো একটি টুপি। মুখ তুলে চাইল সে, মাথাটা হেলিয়ে সানিনকে ছাড়িয়ে গেল।

অনুচস্বরে সানিন ডাকল—'জেম্মা'।

জেম্মা তাতে শুধু মাথা নাড়ল, হেঁটে চলল। এবার সানিন তার অনুসরণ করছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার—দুটো টেনে নিয়ে যেতে পারছিল না।

গ্রীষ্মকালীন ঘরটি ছাড়িয়ে ডাইনে ঘুরল জেম্মা। এক ছোট অগভীর ঝরণাতে একটি নিঃসঙ্গ চড়ুই স্নান করছিল—পেরি গেল, লাইলাক ঝোপের পেছনে রাখা একটি বেঞ্চে বসল সে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারী আরামদায়ক ছিল এই কোণটি। সানি বসল তার পাশে।

এক মিনিট কেটে গেল। সব চুপচাপ। জেম্মা তার দি চাইল না পর্যন্ত, সানিনও অবশ্য তার মুখের দিকে চায়নি চেয়েছিল ছোট ছাতার ওপরে রাখা হাত দুটির দিকে। বলবে ? কি বলার আছে ? তারা শুধু দুজনে একা, এত ভো এত কাছাকাছি বসে আছে এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে পবিত্র করে কি বলা যেতে পারে ?

অনেকক্ষণ পর সানিন কোনরকমে বলল—'আমার ওপ আপনি কি রাগ করেছেন ?'

অবশ্য বলেই বুঝতে পারছিল অত্যন্ত হাস্যকর হয়েছে কথা যাই হোক তাতে অন্ততঃ নীরবতা ভঙ্গ হল।

'রাগ করব আপনার উপর না তো—কেন ?'

'আমার কথা বিশ্বাস হয়েছে ?'

'অর্থাৎ চিঠিতে যা লিখেছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

জেম্মা উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করল। ছাতা পড়ে গে তার হাত থেকে। তাড়াতাড়ি তুলে নিল সে ছাতাটা।

সানিন বলে উঠল 'বিশ্বাস করুন। আমি যা লিখেছি কি করুন।' তার সব সঙ্কোচ যেন হঠাৎ কেটে গেল। আবেগের বলতে লাগল 'পৃথিবীতে সত্য বলে যদি কিছু থাকে—পবিত্র প্রকৃত সত্য—তা হচ্ছে জেম্মা আপনাকে আমি ভালোবাসি।'

জেম্মা এবারেও শুধু আড়চোখে চেয়ে দেখল তাকে, হাত থে আবার ছাতাটা পড়ে গেল।

সানিন হাত দুটো বাড়িয়ে দিল, কিন্তু জেম্মাকে স্পর্শ ক সাহস তার হল না। 'বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন—কি ক বিশ্বাস হবে আপনার ?'

জেম্মা চেয়ে দেখল আবার। 'মঁশিয়ে দিমিত্রি, সেই যে আপনি আমাকে বোঝাতে এসেছিলেন সেদিনও কি আ বোঝেননি ?'

প্রতিবাদের সুরে সানিন বলল 'আমার মন বুঝেছিল! আমি জানতাম না। আপনাকে প্রথম দর্শনেই আমি ভালো বেসেছিলাম। তাছাড়া, শুনলাম আপনার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে আর প্রথমতঃ আপনার মার অনুরোধ আমি কি করে এড় তারপর দ্বিতীয়তঃ—সেদিনকার আমার আচরণেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম'···

হঠাৎ পেছনে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। এক ভদ্রলোক, কাঁধে ঝোলান ঝোলা, খুব সম্ভবতঃ বিদেশী—ঝো পিছন থেকে আবির্ভূত হলেন—জোরে হেঁকে, অশিষ্ট ভ ওদের দিকে চেয়ে এগিয়ে গেলেন।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে সানিন বলল, 'আপনার মা আ

বলেছিলেন, আপনি এ বিয়েতে অস্বীকৃত হলে কলঙ্ক হবে আপনার নামে।' আপনা থেকেই যেন জেম্মার ভুরু ঈষৎ কুঁচকে গেল। 'আরো বলেছিলেন, এই অপ্রিয় সমালোচনার জন্য আমি খানিকটা দায়ী—কাজেই আপনার প্রণয়ী হের ক্রুয়বারকে যাতে আপনি বিমুখ না করেন তা দেখা আমার কর্তব্য।'

সানিনের পাশে বসে জেম্মা নিজের চুলের ভেতর হাত চালাতে লাগল—'মঁশিয়ে দিমিত্রি, আর কখনো হের ক্রুয়বারকে আমার প্রণয়ী বলবেন না। আমি তাকে বিয়ে করব না। তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি আমি।'

'কখন? কবে?'

'কাল।'

'সোজাসুজি তাকেই?'

'হ্যাঁ, তার মুখের ওপরেই, যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'জেম্মা, এর অর্থ কি আপনি আমাকে ভালবাসেন?'

ঘুরে বসল জেম্মা। বেঞ্চিতে হাত রেখে চুপি চুপি বলল, 'তা না হলে কি আসতাম এখানে?'

সানিন এই অবলম্বনহীন হাতটি তুলে নিল, তার চোখে তার ঠোঁটে বুলিয়ে নিল…। কাল তার সামনে যে পর্দা নড়ছিল হাওয়ায় সরে গেল—এই তো সুখ—এই তো অনির্বচনীয় সুখের দীপ্তি।

মাথা তুলে এবারে জেম্মার চোখে চোখে চাইল। সে-ও তার মাথা ঈষৎ নত করে চেয়েছিল তার দিকে। তার চোখের পক্ষ্ম ছিল অশ্রুসিক্ত। আর ঠোঁটে ছিল হাসি—নিঃশব্দ স্বর্গীয় হাসিতে তার সারা মুখ হয়েছিল উদ্ভাসিত।

সানিন যেন তাকে বুকে টেনে নিতে চাইল কিন্তু সে সে-রকম নিঃশব্দে হেসে মাথা নাড়ল। তার চোখ দুটো যেন বলছিল—অপেক্ষা কর।

সানিন চেঁচিয়ে উঠল—'ও জেম্মা, আমি কি কখনো ভেবেছিলাম তুমি (তার ঠোঁট দিয়ে যখন 'তুমি' শব্দটি বেরুল মনে হল নূতন মূর্ছনায় যেন তার মনোবীণা বেজে উঠল) আমাকে ভালবাসবে?

জেম্মা বলল মৃদুস্বরে, 'আমিও কখনো ভাবিনি।' সানিন বলে চলল 'আমি কি কখনো ভাবতে পেরেছিলাম ফ্রাঙ্কফোর্টে দু-তিনঘণ্টার জন্য থাকতে এসে আমার চিরজীবনের সুখের উৎস খুঁজে পাব?'

'তোমার চিরজীবন? সত্যি বলছ?' জেম্মা জিজ্ঞেস করল। 'আমার সারাজীবন চিরতরে' সানিন আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হঠাৎ পার্কের মালী কোদাল দিয়ে তাদের বেঞ্চির পাশে মাটি কোপাতে লাগল।

জেম্মা বলল 'চল, এবার বাড়ী যাওয়া যাক—একসঙ্গে যাব?' এই মুহূর্তে সে যদি বলত—'সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার ইচ্ছে আছে?' সে কথাটা শেষ করার আগেই হয়ত—সানিন ঝাঁপিয়ে পড়ত সমুদ্রে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, বাড়ীর পথে পা দিল, কিন্তু সহরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে ফাঁকা সহরতলীর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল।

২৮

সানিন ও জেম্মা পাশাপাশি হাঁটছিল। মাঝে মাঝে সানিন পিছিয়ে পড়ে জেম্মাকে দেখছিল, হাসছিল সসম্ভ্রমে। আর জেম্মা যদিও দ্রুত হাঁটছিল তবু হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল। বস্তুতঃ, তারা উভয়ে একজন ফ্যাকাশে ও অপরা আবেগে রক্তাভ যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে—দুজনে ধরা দিয়েছে দুজনের কাছে—নবীন আশায় উদ্দীপনায় তাদের সারাজীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছে—এই যে হঠাৎ পরিবর্তন এ যেন তাদের বিস্ময়-বিহ্বল করে দিয়েছে। তারা যেন ভীষণ ঝড়ের সেই সেদিন সন্ধ্যার মত পরস্পর পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সানিনের মনে হলো সে যেন জেম্মাকে এখন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। সেই মুহূর্তেই সে লক্ষ্য করল জেম্মার হাঁটার ভঙ্গি, হাত পা নাড়ার ভঙ্গি, ভগবান—তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি কি মধুর, কি অভিনব সুন্দর! জেম্মাও বুঝতে পারছিল সানিন তার দিকে নতুন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে।

উভয়েরই এ প্রথম প্রেম, প্রথম প্রেমের উন্মেষ তাদের জীবনে। প্রথম প্রেম যেন বিপ্লবের মত। গতানুগতিক বাঁধাধরা দৈনন্দিন জীবনে এক মুহূর্তে দেখা দেয় পরিবর্তন, সব বাধাবিঘ্ন ছাড়িয়ে উদ্দাম যৌবন তার বিজয় কেতন তুলে ধরে, নূতন জীবন—এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত তখন তার কাছে পরম কাম্যরূপে দেখা দেয়—সব কিছুকে স্বাগত জানায় সে।

একটি লোক তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

'কেও—আমাদের বুড়ো ?' সানিন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তাকে দেখিয়ে। অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন ভরে ছিল, ভালোবাসা ছাড়া অন্ত কিছু নিয়ে জেমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার, নিবিড় প্রেম, তার তো বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

খুশীতে উজ্জল হয়ে জেমা উত্তর দিল 'হ্যাঁ, পান্টালেওন। নিশ্চয়ই সে আমার পেছনে পেছনে ছিল···সে বুঝতে পেরেছে।'

সানিনও আনন্দের সঙ্গে বলল 'হ্যাঁ, সে বুঝতে পেরেছে।' সানিনের তখন এমন অবস্থা জেমা যা বলত তাতেই সায় দিত সে।

এবারে সে বলল কাল কি কি ঘটেছে খুলে বলতে। জেমা তখনই তাড়াতাড়ি কখনো একটু হেসে, কখনও বিমর্ষ ভাবে সানিনের দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে চেয়ে উল্টোপাল্টা বর্ণনা করে যেতে লাগল। বলল কি করে তার মা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন তাঁর কাছ থেকে কথা বের করবেন বলে, কি করে সে ফ্রাউ লেনোরকে একদিনের জন্ত ধৈর্য ধ'রে থাকতে বলল, কি ভীষণ কষ্ট করে সে তার মাকে ঠেকিয়ে রাখল, অপ্রত্যাশিত ভাবে হের ক্লুবারের আবির্ভাব, আরো বেশী পরিপাটি ও মার্জিত রূপে। সে এসে বলল রাশিয়ান বিদেশী ভদ্রলোকটির অমার্জনীয় ধৃষ্টতা ও আচরণে সে কতদূর মর্মাহত হয়েছে। বলল—'তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ তাকে অপমানিত করা ছাড়া আর কিছুই নয় (ঠিক এই শব্দগুলোই সে বলেছিল)। বলল, আর যেন তোমাকে আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। 'কারণ' সে বলল'—এটুকু বলে জেমা হের ক্লুবারের গলার স্বর ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করে বলল 'এতে আমার সম্মানের ব্যাঘাত হয়, মনে হয় আমি আমার প্রেমিকার জন্য দাঁড়াতে পারিনি, যেন তার প্রয়োজন ছিল বা কোন সুবিধে ছিল তাতে। সারা ফ্রাঙ্কফোর্ট সহর কাল জানতে পারবে একজন অচেনা লোক আমার প্রণয়িনীর জন্য একজন অফিসারের সঙ্গে লড়েছে। কে কবে এমন কথা শুনেছে এতে সম্মান হানি হবে আমার।' আর ভেবে দেখো, মা তাতে রাজি হলেন। কিন্তু আমি তাকে তখনই বললাম তার নিজের জন্ত বা সম্মানের জন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করার প্রয়োজন নেই, তার প্রণয়িনীর জন্যে লোকে কি বলবে এই ভেবে অপমানিত বোধ করতে হবে না তাকে—কারণ, আমি আর তার প্রেমিকা নই ও তার স্ত্রী হব না আমি কখনো। অবশ্য এখন তোমার কাছে স্বীকার করছি আমি—একেবারে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কথা বললে ভাল লাগত আমার। কিন্তু কি করব···সে আসাতে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। মা তো ভয়ে ও দুঃখে কাঁদতে শুরু করলেন—আমি পাশের ঘর থেকে তার আংটি এনে ফেরত দিলাম, তুমি লক্ষ্য করনি আমি আংটিটা খুলে ফেলেছিলাম দুদিন আগে আঙুল থেকে। হের ক্লুবার মর্মাহত হয়েছিল কিন্তু তার দম্ভ ও গরিমা বজায় রাখতে গিয়ে কিছু বলতে পারল না। সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে মার কাছ থেকে আমার কম কথা শুনতে হয়নি। অবশ্য মা এত কষ্ট পাচ্ছেন দেখে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই, তাছাড়া আমারও মনে হচ্ছিল বড় তাড়াহুড়ো করেছি। কিন্তু দেখ, আমি জানতাম—তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু আমিও আগে জানতাম···

সানিন যোগ করল—'যে আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'হ্যাঁ, যে তুমি আমাকে ভালোবাস।'

জেমা অনবরত কথা বলে যেতে লাগল। অন্ত কোন পথচারী তাদের খুব কাছে এসে পড়লে সে চুপ করে যাচ্ছিল। কখনও আস্তে, কখনও জোরে হেসে গম্ভীর হয়ে বকে যেতে লাগল। মা ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। তার মাথায় এটা ঢুকছেই না যে হের ক্লুবারকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজী ছিলাম ভালোবেসে নয়—মার কথা শুনে। মা এখন সন্দেহ করছেন আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। এখন কেবলই বলছেন কি করে এ ধারণাটা ওঁর মাথায় সেদিন আসেনি, তাহলে মা তোমাকে আমার মত পরিবর্তনের জন্ত উপদেশ দিতে অনুরোধ করতেন না। অদ্ভুত যোগাযোগ এই অনুরোধটি—না ? এখন মা বলছেন জেনে-শুনে তুমি এই কাণ্ডটি বাধিয়েছ। তার সরল বিশ্বাসের এই প্রতিদান দিচ্ছ। আমাকেও বলেছেন তুমি আমাকে বঞ্চনা করবে, দুদিন খেলা করে সরে পড়বে···

বাধা দিয়ে সানিন বলল, 'কেন জেমা, তুমি তাঁকে বলনি ?'

'আমি কি বলব ? আমার বলার কি অধিকার ছিল তোমার কাছ থেকে না জেনে ?'

সানিন তার দু'বাহু বাড়িয়ে দিল—'এখন অন্ততঃ আশা করছি তুমি তাঁকে সব বলবে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে, তোমার মার কাছে আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমি প্রতারক নই।' সেই সঙ্গে সানিনের অন্তস্তল থেকে অনুকম্পা ভরা উচ্ছ্বাস ও আবেগে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

বড় বড় চোখ মেলে জেমা চেয়ে দেখল তার দিকে।

'অর্থাৎ তুমি চাইছ এখনই আমার সঙ্গে মার কাছে যেতে ? মার কাছে ? মা তো বলছেন আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ···' জেমা একটি শব্দ কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছিল না, তার ওষ্ঠ যেন জলে যাচ্ছিল। কিন্তু সানিন বুঝতে পারল জেমা কি বলতে চায়—গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমাকে বিয়ে করতে জেমা তোমার স্বামী হতে—এর চেয়ে বড় সুখ আমি কল্পনা করতে পারি না।'

সেই মুহূর্তে তার প্রেমের—তার মহত্ত্বের—তার বাসনার যেন শেষ ছিল না।

জেমা দাঁড়িয়েছিল—সে যখন এ কথাটা বলল—অমনি যেন ছুটে চলল জেমা—যেন এই অপ্রত্যাশিত গভীর সুখের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইল—এত সুখ যেন কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু হঠাৎ জেমার পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। সামনের মোড় থেকে, মাত্র কয়েক পা দূরে, একটা নতুন টুপি ও নতুন কোট পরে সুন্দর কোঁকড়ানো চুল নিয়ে তীরবেগে এসে দাঁড়াল হের ক্লুবার। প্রথমে জেমা ও পরে সানিনকে দেখে নিজের মনে অভিশাপ দিল যেন। তার সুবেশ সুন্দর দেহ যেন হঠাৎ পেছন দিকে নত হয়ে গেল, এগিয়ে গেল সে। সানিন চমকে উঠেছিল প্রথমটা, কিন্তু ক্লুবারের চেহারায় ছিল কৃপামিশ্রিত বিদ্বেষ ও ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময় দেখে সানিন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

জেমা তার হাতে হাত ধরল শান্ত ভাবে ইচ্ছাকৃত—তার

ভূতপূর্ব প্রণয়ীর দিকে চাইল। হের ক্লুবার চোখ ছোট করে আড়ষ্ট ভাবে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'গানের চিরন্তন শেষ কলিটি।' একটু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেল।

'কি বলল পাজীটা?' জিজ্ঞেস করল সানিন—তখনই সে ক্লুবারের পেছনে ছুটতে রাজী ছিল। জেম্মা তাকে যেতে দিল না। হাতে হাত ধরে এগিয়ে গেল।

রসেলীর দোকান যখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, জেম্মা থেমে বলল—'দিমিত্রি, মঁশিয়ে দিমিত্রি, আমরা এখনও ভেতরে যাই নি, মার সঙ্গে এখনও দেখা করিনি। যদি ইচ্ছে হয় আবার ভেবে দেখতে পারো, যদি..., তুমি এখনও বন্ধনমুক্ত, দিমিত্রি'...

সানিন উত্তরে শুধু তার হাত বুকে চেপে ধরে সামনে টেনে আনল তাকে।

ফ্রাউ লেনোর যে ঘরে বসেছিলেন সে ঘরে সানিনকে নিয়ে গিয়ে জেম্মা বলল—'মা, এবার আমি প্রকৃত লোকটিকে এনেছি।'

২৯

জেম্মা যদি বলতো সে কলেরা বা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে নিয়ে এসেছে—ফ্রাউ লেনোর এর চেয়ে বেশী দুঃখিত হতেন না। তিনি তখনই দেওয়াল-এর দিকে মুখ করে এক কোণায় বসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন—রাশিয়ান কৃষক-রমণী তার স্বামী বা সন্তানের মৃত্যুতে যে রকম কাঁদে ঠিক সেরকম। এক মুহূর্তের জন্য জেম্মা এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে সে তার মার কাছে যেতে পারল না পর্যন্ত—ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সানিনেরও কান্না আসছিল—তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। অশ্রান্ত ভাবে কেঁদে চললেন জেম্মার মা—পুরো এক ঘণ্টা। পান্টালেওন দোকানের সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন বোধ করল, যাতে কেউ আসতে না পারে—সৌভাগ্যবশত তখনও বেলা বেশী বাড়ে নি। বুড়ো নিজেও কম অবাক হয় নি। জেম্মাও সানিনের সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে এত তাড়া ভাল লাগছিল না তার। অথচ অন্তর থেকে তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার পাচ্ছিল না সে। সর্বতোভাবে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে রাজী ছিল—ক্লুবারকে সে এতই ঘৃণা করত। এমিল জানত সে নিজে তার বন্ধু ও বোনের মাধ্যমের কাজ করেছে। সবকিছুই ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ভেবে সে গর্ববোধ করছিল। বুঝতেই পারছিল না মা কেন নিতান্তই অবুঝের মত ব্যবহার করছেন। তার ধারণা হল মেয়েরা অত্যন্ত অবিবেচক। সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা হল সানিনের। সে যখনই ফ্রাউ লেনোরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠছিলেন। সে অনেকবার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।' তাতে কোনই কাজ হলো না। ফ্রাউ লেনোর সবচেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন নিজের প্রতি—কেন তিনি কিছু বুঝতে পারেন নি? কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'জিয়োভান বাত্তিস্তা বেঁচে থাকলে এসব কিছুই হত না।' সানিন নিজের মনেই বলছিল 'ভগবান, এ সব কি কাণ্ড।' জেম্মার দিকে চাইতে সাহস হল না তার, জেম্মাও চোখ তুলে চাইতে পারছিল না। সে যার সেবা করছিল—যদিও তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি প্রথমে

অবশেষে ধীরে ধীরে শান্ত হল ঝড়। ফ্রাউ লেনোর কান্না থামিয়ে ঘরের কোণ থেকে উঠে দাঁড়ালেন, জেম্মা তাঁকে জানলার পাশে চেয়ারে নিয়ে বসালো। কমলাফুলের গন্ধযুক্ত সুবাসিত জল খেতে দিল। তিনি সানিনকে কাছে আসতে না দিলেও ঘরে থাকতে দিলেন (প্রথমে তিনি চেয়েছিলেন সানিন যেন এই মুহূর্তে বাড়ী ছেড়ে যায়)। এখন আর সানিনের কথায় বাধা দিলেন না। সানিন এই সুযোগে একটি ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে দিল। জেম্মার সামনেও বোধহয় ইতিপূর্বে সে তার প্রেম ও বাসনা এত নিশ্চয়তার সঙ্গে খুলে বলতে পারেনি। তার আবেগ ছিল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রেম ছিল পবিত্র—'বার্বার অব সেভিল' নাটকের আলমাভিভার মত। সে নিজের কাছে বা ফ্রাউ লেনোরের কাছে গোপন করল না অসুবিধেগুলো। সত্যি অসুবিধেগুলো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। সত্যি সে বিদেশী, তাঁরা তাকে সবেমাত্র চিনেছেন, তার নিজের সম্বন্ধে বা তার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কিন্তু সে যে একজন ভদ্রব্যক্তি ও ভিখারী নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ-সে দিতে পারে। তার নিজের দেশের লোকদের কাছ থেকে ফ্রাউ লেনোর তা জেনে নিতে পারেন। সে আশা করে জেম্মাকে সে সুখী করতে পারবে। তার পরিবার থেকে বিচ্ছেদ হলেও যথেষ্ট আনন্দ সে পাবে সারা জীবন। 'বিচ্ছেদ' কথাটি আবার সব পণ্ড করে দিচ্ছিল। ফ্রাউ লেনোর চেয়ারে বসে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। সানিন তাড়াতাড়ি যোগ

করল—বিচ্ছেদ শুধু অল্পকালের জন্ত আর হয়ত তার দরকার না-ও হতে পারে।

সানিনের বক্তৃতা বৃথা গেল না। ফ্রাউ লেনোর যদিও দুঃখ ও অভিমানভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন এখন সানিনকে তবু আগেকার ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভাব আর তাতে ছিল না। পরে তিনি তাঁর কাছে এসে বসতে দিলেন তাকে, জেম্মা তাঁর অন্ত পাশে বসেছিল। এবারে তিনি ভর্ৎসনা করতে লাগলেন সানিনকে কিন্তু তাতে যেন স্নেহ মাখানো ছিল। অভিযোগ করলেন—প্রশ্ন করতে লাগলেন একবার সানিনকে একবার জেম্মাকে। সানিনকে তার হাত ধরতে দিলেন, আরো চোখের জল ফেললেন কিন্তু এবারে একেবারে অন্তকারণে। করুণ হাসি হেসে বললেন জিওভান বাটিস্টা আজ বেঁচে নেই—এবারে কিন্তু ভিন্ন অর্থে বললেন কথাটা। আরো খানিকক্ষণ গেল—দুই পাপী—সানিন ও জেম্মা হাঁটু গেড়ে তাঁর পায়ের কাছে বসল ও তিনি দুহাতে তাদের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আরো খানিকক্ষণ পর তারা মাকে জড়িয়ে চুমু খেল, এমিল খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে দৌড়ে এল ঘরে তাদের মাঝে বসে পড়ল। পান্টালেওন এবারে উঁকি দিল। মুচকি হেসে ভুরু কুঁচকে সদর দরজা খুলতে গেল।

৩০

ফ্রাউ লেনোরের হতাশা থেকে বিষাদ ও বিষাদ থেকে শান্ত নিস্পৃহভাব যেতে বেশীক্ষণ লাগেনি। আর এই শান্ত নিস্পৃহভাবও সহজেই রূপান্তরিত হল গোপন তৃপ্তিতে। কিন্তু বাইরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন না। প্রথমদিনের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সানিনকে তার ভাল লেগে গিয়েছিল। যখন তিনি তাকে নিজের জামাতারূপে মনে মনে গ্রহণ করলেন তখন তার বিরুদ্ধে বলার মত কিছুই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তবু ভাবলেন আরো কিছুক্ষণ অন্ততঃ চিন্তিত ও বিষণ্ণ থাকা সমীচীন। গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী বড়ই চমকপ্রদ—একটা ছাড়িয়ে আর একটা। মা হিসেবে তিনি সানিনকে কতগুলি সাংসারিক প্রশ্ন করা কর্তব্য মনে করলেন। আর সানিন? সে যখন সকালে জেম্মার সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়েছিল তখন কল্পনাই করেনি জেম্মাকে বিয়ে করবে সে। কিন্তু এখন প্রচণ্ড উৎসাহে বিবাহের পাত্র হিসাবে সব প্রশ্নের খুঁটিনাটি উত্তর দিতে লাগল। ফ্রাউ লেনোর জেনে খুসী হলেন সানিন সম্ভ্রান্তবংশের ছেলে, বিস্ময় প্রকাশ করলেন সে রাজকুমার নয় বলে। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সাবধান করে দিলেন সানিনকে—বললেন তিনি খোলাখুলি ভাবে কতগুলো প্রশ্ন করবেন—মা হিসেবে প্রশ্ন তিনি কর্তব্য মনে মনে করেন। সানিন বলল সে খুশী হয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

তখন ফ্রাউ লেনোর জানালেন হের ক্লুবারের (একটু ইতস্ততঃ করে ঠোঁট চেপে নিশ্বাস ফেলে তিনি তার নাম করলেন) জেম্মার ভূতপূর্ব ভাবীস্বামীর আয় ছিল আট হাজার গিল্ডারের ওপর তার আয় প্রতি বছরই বেড়ে চলবে। সানিনের আয় কত জানতে চাইলেন তিনি।

সানিন হিসেব করে বলল—আট হাজার গিল্ডার—আমাদের দেশের টাকায় পনর হাজার রুবল। আমার আয় তার চেয়ে অনেক কম। টুলা গুবারনিয়াতে আমার অল্প ভূসম্পত্তি আছে। ভালভাবে চালালে তা থেকে পাঁচ বা ছয় হাজার আসবে। আর আমি যদি সরকারী চাকরী নিই তাহলে দু হাজার সহজেই পাব।

'রাশিয়ায় চাকরী' ফ্রাউ লেনোর চেঁচিয়ে উঠলেন—'তার মানে জেম্মাকে ছেড়ে থাকতে হবে আমায়?'

সানিন বলল—'আমি যদি দৌত্য বিভাগে চাকরী নিই তাহলে বিদেশে বাস করতে পারব। আমার জানাশোনাও আছে। কিম্বা সব চেয়ে ভাল হয় যদি আমি আমার জমিদারী বিক্রী করে দিই—আর সেই টাকা কোন লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাই—ধরুন আপনার খাবারের দোকানের ব্যবসায়ে।' সানিন বুঝতে পারছিল নিতান্তই অর্থহীন প্রলাপ বকছিল সে—কিন্তু অদ্ভুত আক্রোশ যেন চেপে গিয়েছিল। জেম্মার দিকে চেয়ে সব বাধা যেন ভেসে গেল। এই মুহূর্তে, যা করলে জেম্মা খুসী হয়, শান্তি আসে তার মনে—তাই করতে প্রস্তুত ছিল সে।

ফ্রাউ লেনোর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললেন—'হের ক্লুবারও আমাকে ব্যবসাটা দাঁড় করাবার জন্ত কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন।'

জেম্মা ইটালীয়ানে চেঁচিয়ে উঠল—'মা, ভগবানের দোহাই, মা—চুপ কর।'

তার মাও ইটালিয়ানে উত্তর দিলেন 'দেখ জেম্মা এসব কথার আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত।'

সানিনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাশিয়ার বিবাহবিধি কিরূপ? প্রুশিয়াতে ক্যাথলিকের সঙ্গে অন্তধর্মীর বিবাহতে যেমন বাধা আছে রাশিয়াতে ও সেরকম? (ঠিক সে সময় ১৮৪০ সালে—সারা জার্মানী তখনও প্রুশিয়া সরকার ও কলোনের আর্চবিশপের সংকর বিবাহ নিয়ে বিবাদের কথা ভুলতে পারেনি)। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন যখন শুনলেন রাশিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহের ফলে তার কন্তাও সম্ভ্রান্তবংশেরই একজন বলে পরিগণিত হবে। 'কিন্তু প্রথমে তো একবার রাশিয়ায় যেতে হবে তাই না?'

'কিসের জন্ত?'

'কেন, তোমাদের সম্রাটের অনুমতি আনতে?'

সানিন বুঝিয়ে বলল—এসবের একেবারেই দরকার নেই। কিন্তু হয়ত বিবাহের পূর্বে একবার তাকে রাশিয়ায় যেতেই হবে কয়েকদিনের জন্ত। (এই কথাগুলি বলার সময় তার হৃদয় বেদনায় যেন ফেটে যাচ্ছিল আর জেম্মাও তার দিকে চেয়ে তার বেদনা অনুভব করে আরক্তিম মুখে অন্তমনে চেয়ে রইল) তার দেশে গিয়ে তার ভূসম্পত্তি বিক্রী করার চেষ্টা করবে অন্ততঃ দরকারী টাকা জোগাড় করে আনবেই……

ফ্রাউ লেনোর জিজ্ঞেস করলেন 'আচ্ছা আমার কোটের জন্ত আস্ত্রাখান ফার আনতে পারবে? শুনেছি সেখানে নাকি ভীষণ সস্তায় অতি সুন্দর ফার পাওয়া যায়?'

'নিশ্চয়ই আনব। জেম্মার জন্তও আনব।'

এমিল ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে বলল 'আর আমার জন্ত রূপোর কাজ করা মরক্কো চামড়ার টুপি।'

'হ্যাঁ আনব আর পান্টালেওনের জন্ত চটি।'

ফ্রাউ লেনোর বললেন, 'আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে। এবার কাজের কথায় আসি। কিন্তু আরেকটা কথা—তুমি তো বলছ তোমার ভূসম্পত্তি বিক্রী করে দেবে। তাহলে তোমার কৃষাণদেরও বিক্রী করতে হবে না?'

সানিন অত্যন্ত ব্যথিত হল। তার মনে পড়ল মেডেম রসেলী ও তার মেয়ের কাছে ভূ-দাসদের কথা বলতে গিয়ে বলেছিল এ নীতি অতি নীচ। সে জীবনে কখনও তার কৃষাণদের বিক্রী করবে না, এ যে দুর্নীতির নামান্তর।

থেমে থেমে বলল, 'একজন ভাল লোকের কাছেই আমার সম্পত্তি বিক্রী করতে চেষ্টা করব। কিম্বা হয়ত কৃষাণরা তাদের স্বাধীনতা নিজেরাই কিনে নিতে চাইবে।'

ফ্রাউ লেনোরও বললেন—'তাহলেই ভাল হয়। মানুষ বিক্রী করা'—

পান্টালেওন গর্জন করে উঠল—'বর্বরতা,' দরজার সামনে এমিলের পিছনে তার মুখ দেখা গেল—টুপি নাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার।

সানিন নিজের মনেই বলল 'আমার এ সব ভাল লাগে না।' জেম্মার দিকে আড়চোখে চাইল। মনে হল সে তার শেষ কথাটি শুনতেই পায়নি। 'আচ্ছা দেখাই যাক।' সে ভাবল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে পর্যন্ত সাংসারিক কথাবার্তা চলল। শেষের দিকে ফ্রাউ লেনোর যেন একটু নরমও হয়ে এসেছিলেন—তাকে দিমিত্রি বলে ডাকছিলেন—সস্নেহে আঙুল নেড়ে সাবধান করে দিচ্ছিলেন—বিশ্বাসভঙ্গের জন্য সানিনের ওপর প্রতিশোধ নেবেন তিনি। তার পরিবার ও বংশ সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কারণ তার গুরুত্বও কম নয়। রাশিয়ার গীর্জায় কি করে বিবাহোৎসব পালিত হয় সব জানতে চাইলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যখন জেম্মাকে বিবাহের বেশে সাদা পোষাক ও সোনালী মুকুট পরে কল্পনা করলেন।

মাতৃসুলভ গর্ব অনুভব করে বললেন, 'সে যে রাণীর মতই সুন্দরী। সত্যিই পৃথিবীর কোন রাণীই এত সুন্দরী নয়।'

সানিন বলল, 'পৃথিবীতে আর জেম্মাই নেই।'

'হ্যাঁ সেজন্যই তো তার নাম জেম্মা (ইটালীয়ানে জেম্মা অর্থ রত্ন)।

জেম্মা তার মাকে জড়িয়ে খুব আদর করল। মনে হল এতক্ষণে যেন তাঁর কাঁধের বোঝা হাল্কা হল, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল।

আর সানিন অনুভব করল অনির্বচনীয় সুখ, শিশুসুলভ পুলক অনুভব করল, এই ঘরেই বসে সেদিন যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে দেখে। তার মনে হল এখনই দোকানে গিয়ে দাঁড়াবে সে, কিছুদিন আগে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জিনিষ বিক্রি করছিল 'আর আজ তা করার পূর্ণ অধিকার আছে আমার। আমি এখন পরিবারেরই একজন।'

সত্যিই সে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের দেখাশোনা করতে লাগল, এক পাউণ্ড মিষ্টি বিক্রী করল দুটো ছোট মেয়েকে—অর্থাৎ প্রায় দু'পাউণ্ড জিনিষ দিয়ে এক পাউণ্ডের অর্দ্ধেক দাম নিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সানিন জেম্মার ভাবী স্বামিরূপে তার পাশে বসল। ফ্রাউ লেনোর এখনও টাকাকড়ির ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলেন না। এমিল অকারণেই ভীষণ হাসছিল সানিনকে বলছিল ওকে রাশিয়ায় নিয়ে যেতে ওর সঙ্গে। সানিন দিন পনর পরই যাবে স্থির হয়েছিল। পান্টালেওনকেই কেবল বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, ফ্রাউ লেনোর তাকে ঠাট্টা করছিলেন—আর তুমি ছিলে তার সহযোগী (পান্টালেওন রেগে উঠছিল তাতে)।

জেম্মা কিছুই বলছিল না—কিন্তু তার মুখ আগে কখনও এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর দেখায়নি। খাওয়া দাওয়ার পর সে সানিনকে এক মিনিটের জন্য বাগানে আসতে বলল। দুদিন আগে যে বেঞ্চিতে বসে চেরী বাছিল সে, সেখানে বসেই বলল 'আমার ওপর রাগ করনা দিমিত্রি, কিন্তু আমি তোমাকে আরেকবার বলতে চাই এখনও তুমি মুক্ত, এখনও ইচ্ছে করলে...'

সানিন তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

জেম্মা তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

'আর মা যে বলেছিলেন ভিন্নধর্ম সম্বন্ধে—দেখো' সে তার গলায় সরু সুতোয় ঝোলানো গার্ণেট পাথরের ক্রসটি ধরে এত জোর টানল যে সুতো ছিঁড়ে গেল। সানিনের হাতে ক্রসটি দিয়ে বলল 'আমি যদি তোমার হই, তাহলে তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।'

জেম্মার সঙ্গে যখন সে ঘরে ফিরে গেল তখন সানিনের চোখে জল দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই সব কিছু স্বাভাবিক রূপ নিল। এমন কি ক্রেসেট খেলতে পর্যন্ত বসে গেল তারা। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—আশা দাস

বাঙলা সম্পর্কে সর্দারজী

"India took her first sips of patriotism from the political leaders of Bengal and how can we forget today the suffering that Bengal has suffered in recent times? How can we forget the August 16 Direct Action Day and the agonies of Noakhali where Mahatma Gandhi took his pledge of 'Do or Die' and eventually died for that cause? Therefore, one who has sense of patriotism cannot but have sympathy with Bengal".

"I am not a literary man, I started my life as a peasant and became a soldier all my life and till the day I breathe my last I will serve Bengal".

"Time has come when we should all unite and work for the common cause by common means and settle properly. Let us not quarrel among ourselves. Opportunity is too great It is upto us to forget everything till Bengal is strong and takes its rightful place where it led the whole of India, because if Bengal lags behind, if Bengal is lame and lacerated, India will not rise".

—*S. V. Patel.*

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উহার পঞ্চদশ অধিবেশনে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, এমন কি উহার ভরাডুবী হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে একথা বিশ্ববাসী সকলেই শুনিয়াছেন। কেন এই সঙ্কট, কি উহার স্বরূপ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভরাডুবী হওয়ার আশঙ্কাই বা দেখা দিয়াছে কেন, সত্যই এইরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে কি না তাহা বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশন গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যদিও রাশিয়া বা রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের নাম করেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রচেষ্টাকে প্রকাশ্য ভাবে কয়েকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের সমালোচনার অর্থই হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডাইফেন বেকার গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেলের পদে তিন ব্যক্তিকে মিলিত ভাবে নিয়োগ করিবার জন্য মঃ ক্রুশ্চেভ যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই মনে পড়িতে পারে যে, জার্ম্মাণী ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন পরিত্যাগ করে। জাতিসঙ্ঘের সঙ্কট এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়, একথা বলিলে ভুল হইবে না। ঐরূপ কোন পরিস্থিতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে দেখা দিয়াছে ইহা মনে করাও সম্ভব নয়। উভয় অবস্থার মধ্যে কোন সাদৃশ্যও নাই।

প্যারীতে যে শীর্ষ সম্মেলন হইতে পারিল না তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা হইত। কিন্তু বোধনের পূর্ব্বেই উহার বিসর্জ্জন হইয়াছে। কে উহার জন্য দায়ী সে সম্পর্কে পশ্চিমী শিবির ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের মধ্যে মতভেদের অবসান কোনদিনই হইবে না। তবে একথাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়, মার্কিণ ইউ—২ গোয়েন্দা বিমানের ঘটনাটিই প্যারীর শীর্ষ সম্মেলনের ভরাডুবীর জন্য দায়ী। শীর্ষ সম্মেলন হইতে না পারিলেও জেনেভায় পুনরায় দশরাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। রাশিয়া এবং অপর চারিটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সম্মেলন পরিত্যাগ করায় উহা ভাঙ্গিয়া গেল। উহার জন্য কোন পক্ষ দায়ী সে সম্পর্কেও উভয় পক্ষে মতভেদ থাকিয়া যাইবেই। কিন্তু ১৯৩৩ সালে জার্ম্মাণীর নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জ্জনের সহিত ১৯৬০ সালে রাশিয়া এবং অপর চারিটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে চলিয়া আসার কোন তুলনা চলিতে পারে না। শীর্ষ সম্মেলন না হইলেও, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হইতে রাশিয়া চলিয়া আসিলেও নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস মঃ ক্রুশ্চেভ ছাড়েন নাই। তিনিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সভায় সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানদের মিলিত হইয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁহার এই অনুরোধের উপর প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু মঃ ক্রুশ্চেভ যখন ঘোষণা করিলেন যে, তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবেন, তখন একে একে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে উদ্যোগী হন। অধিকাংশ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন। ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই বটে, কিন্তু সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশন যে বৃহৎ শীর্ষ সম্মেলনে পরিণত হইয়াছিল, একথাও অনস্বীকার্য্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে বলা হইতেছে তাহা নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে নহে। রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিতেও চাহে না। যাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলা হইয়া থাকে, তাহা দেখা দিয়াছে কঙ্গোর প্রশ্নে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশীল্ড যে-ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কঙ্গোতে কার্য্যকরী করিয়াছেন, রাশিয়া তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অমার্জ্জনীয় ভাবে লঙ্ঘনের জন্য কঙ্গোতে নিযুক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল গত ১৭ই সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে তাহা ৭—২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। সিংহল ও টিউনিশিয়া ভোটদানে বিরত থাকে। কঙ্গো সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতি পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া সিংহল ও টিউনিশিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহাতে রাশিয়া কতগুলি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে, কিন্তু অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। রাশিয়া ২০শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে তাহাতে কঙ্গোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয়

অখণ্ডতা বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা শীর্ষক একটি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্ত সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মার্কিণ প্রতিনিধি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। সেক্রেটারী জেনারেল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ ক্রমে সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালেই জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে সেক্রেটারী জেনারেল এবং কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কমাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করিয়া উত্থাপিত প্রস্তাবটি রাশিয়া প্রত্যাহার করে এবং ১৭টি আফ্রো-এশিয় দেশ যে প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহাই গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কার্য্যক্ষেত্রে এবং উহার বাহিরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের যে সকল সংশোধন প্রস্তাব রাশিয়া উত্থাপন করিয়াছিল সেগুলিও প্রত্যাহার করা হয়।

সপ্তদশ আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্র যে প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন উত্থাপন করে তাহার পক্ষে ৭০ ভোট হয়; বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রই ভোট দেয় নাই? ১১টি রাষ্ট্র ভোট দানে বিরত ছিল। এই প্রস্তাবে কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে সামরিক সাহায্য দেওয়ার সময় মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা অন্তবিধ সামরিক উপকরণ, অথবা সামরিক ব্যক্তি দ্বারা সাহায্য কিম্বা সামরিক উদ্দেশ্যে অন্ত সাহায্য না দেওয়ার জন্ত সমস্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে কঙ্গোলীদিগকে কঙ্গোর ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্ত সত্বর শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার করিবার জন্ত অনুরোধ করা হইয়াছে। জরুরী অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেও সোভিয়েট ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ জোরিন সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনার দাবী করেন। ম্যানহাত্তানে মঃ ক্রুশেভের উপস্থিতির জন্ত সপ্তদশ আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া সহজ হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কোন আলোচনা এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কঙ্গোতে পশ্চিম শক্তিবর্গের সামরিক সাহায্যদান বন্ধ হইবে ইহা মনে করা কঠিন। কিন্তু সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশনে কঙ্গো সম্পর্কে আলোচনার যে দাবী মঃ জোরিন করিয়াছেন তাহার সার্থকতা উক্ত অধিবেশনে আলোচনা ও তাহার প্রতিক্রিয়া হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সপ্তদশ আফ্রোএশিয় রাষ্ট্রীয় প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ মনে করিতে পারেন নাই। পশ্চিমী শিবিরের কয়েক জন রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিলেও সাধারণ পরিষদ শীর্ষ সম্মেলনের জন্ত মঃ ক্রুশেভ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যতঃ সফল হইয়াছে। কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের জন্ত সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব যে কৌশলে ব্যর্থ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সঙ্কটের কথা পশ্চিমী শক্তিবর্গ বলিয়াছেন তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সাধারণ পরিষদে তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানতঃ তিনটি দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার একটি দাবী তিন দফায় নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব কার্যকরী করা। দ্বিতীয়তঃ তিনি উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান দাবী করিয়াছেন। তাঁহার তৃতীয় দাবী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্যনির্ব্বাহক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। তাঁহার এই তৃতীয় দাবীকে কেন্দ্র করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কটের কথা উঠিয়াছে। উহাই 'সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে পশ্চিমী শিবিরে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য্য-নির্ব্বাহক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সহিত সেক্রেটারী জেনারেলের পদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সেক্রেটারী জেনারেলই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার। এই পদাধিকারের বলে তিনি সাধারণ পরিষদ প্রভৃতিতে কাজ করিয়া থাকেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল কার্য্যভার অর্পণ করেন তিনি সেগুলি সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই পদের গুরুত্ব বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মঃ ক্রুশেভ তাঁহার বক্তৃতায় সেক্রেটারী জেনারেলের পদ বিলোপ করিয়া তৎস্থলে তিনজনকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। ইহার অনুকূলে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন—তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন পনর বৎসর পূর্ব্বে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ছিল তাহা এখন আর নাই, উহা নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। পনর বৎসর পূর্ব্বের জাতিপুঞ্জ যে এখন আর নাই তাহা আমরা সকলেই জানি। ১৯৪৫ সালের ২৪শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উহার সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৫১টি। তন্মধ্যে এশিয়ার ৯টি দেশ এবং আফ্রিকার চারিটি দেশমাত্র উহার সদস্য ছিল। ভারত তখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও বৃটেনের অতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা ছিল না। ১৯৪৬ সাল হইতে ক্রমে আরও নূতন নূতন রাষ্ট্র উহার সদস্য হইতে থাকে। এক ১৯৫৫ সালেই ১৬টি রাষ্ট্র উহার সদস্য হয়। ১৯৫৩ সাল হইতে যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সদস্যপদ লাভ করিয়াছে। ১৯৬০ সালে আফ্রিকার যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইয়াছে। সাইপ্রাসও স্বাধীনতা লাভ করিয়া উহার সদস্যপদ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে উহার সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ৯৯টি। শুধু সদস্য সংখ্যাই প্রায় দ্বিগুণ হয় নাই, উহার প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ছিল পরাধীন। যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল সেগুলি পশ্চিমী শিবির এবং সোভিয়েট শিবির এই দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উহারই প্রতিরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। শক্তি সাম্যের পাল্লাটাও পশ্চিমী শক্তি শিবিরের দিকেই ঝুঁকিয়াছিল এবং এখনও যে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে তাহা ভোটের অবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা লাভ করিতে থাকায় নূতন আর একটি শিবিরের উদ্ভব হইয়াছে। এই শক্তি শিবিরটি নিরপেক্ষ শক্তি শিবির। যদিও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষ শক্তি শিবির গঠন করেন নাই, তাহা হইলেও তাহারা প্রায় সকলেই একযোগে কাজ করিয়া থাকেন। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনে আফ্রিকার নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১৩টি রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সদস্য পদ লাভ করিয়াছে। ইহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আফ্রো-এশিয় সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ২১টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২টি হইল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মালি ফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও কঙ্গোকে সদস্য করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রতিনিধি দল সাধারণ পরিষদে আসন গ্রহণ করেন নাই।

কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ড যে-ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে মঃ ক্রুশ্চভ তীব্র অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষপাতী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পশ্চিমী শক্তি শিবির, সোভিয়েট শক্তি শিবির এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ এই তিন পক্ষের তিন ব্যক্তি লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠনের এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক হইতে সরাইয়া লইবার বিষয় বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রুশ প্রধান মন্ত্রীর এই প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতাকে উত্তেজনাকর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ হার্টার বলিয়াছেন, মঃ ক্রুশ্চভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে ধ্বংস করিতে চান। বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতা মনে করেন যে, মঃ ক্রুশ্চভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যেভাবে সেক্রেটারী জেনারেলকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে কম্যুনিষ্ট শিবিরের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অবশ্য মিঃ হ্যামারশিল্ডের প্রতি আস্থাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও মনে করেন, সেক্রেটারী জেনারেলের অপ্রতিহত ক্ষমতা সংযত করা প্রয়োজন। তিনি তিন পক্ষের তিনজন লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠন করা সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু সেক্রেটারী জেনারেলের ক্ষমতা সংযত করিবার জন্য একটি ছোট পরামর্শ পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের কঙ্গোর জনসাধারণের বৃহত্তর বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিপদটি হইতেছে এই যে, সাম্রাজ্যবাদ উহার দুরভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে উহার মুখোস হিসাবে ব্যবহার করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে।

পশ্চিমী শক্তিবর্গ যাহাকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। এতদিন ধরিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাঁহাদেরই ছিল একাধিপত্য। কম্যুনিষ্ট শক্তি শিবিরের কোন প্রভাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ছিল না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না। মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার মধ্যে তাঁহাদের এই আশঙ্কাকেই তাঁহারা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইতেছেন। নিরপেক্ষ শক্তিগুলি যে রাশিয়াকে সমর্থন করিবে তাহা নয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা রাশিয়াকে সমর্থনও করিতে পারে। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এতদিন যে আধিপত্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা আজ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইহাই তাঁহাদের কাছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্কট বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহাদের একাধিপত্যই যদি না থাকিল, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ থাকার সার্থকতা বা কি?

পঞ্চশক্তির প্রস্তাব—

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূটনৈতিক চালে ব্যর্থ হইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঘানার প্রেসিডেণ্ট নক্রুমা, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকার্ণো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসের যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একযোগে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৬০) পত্র দেন। এ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদে তাহারা যে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তাহার খসড়াও ঐ পত্রের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহাতে পঞ্চশক্তির অনুরোধ কৌশলপূর্ণ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "There is nothing in the words or actions of the Government of the Soviet Union which gives me any reason to believe that the meeting you suggest hold any such promise. I would not wish to participate in a mere gesture, which in present circumstances, might convey a throughly misleading and unfortunate impression to the people of the world." অর্থাৎ প্রেঃ আইসেনহাওয়ার মনে করেন সোভিয়েট সরকারের কথায় ও কার্য্যে এমন কোন আভাস পাওয়া যায় না যাহাতে প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারে কোন ফল হইতে পারে এইজন্য বিশ্ববাসীর মনে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কোন সাক্ষাৎকারে তিনি ইচ্ছুক নহেন। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার যেমন সাক্ষাৎকারের সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন মঃ ক্রুশ্চভও তেমনি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের সহিত সংযোগস্থাপন ও আলোচনা করিতে সম্মত আছেন যদি মার্কিণ সরকারের যে সকল কার্য্যের ফলে সোভিয়েট মার্কিণ সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়াছে তাহার নিন্দা করিয়া মার্কিণ সরকার সৎসাহসের পরিচয় দেন। উভয়েই সর্ত্ত আরোপ করিলেও নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব ব্যর্থ করিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গই বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাবে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পুনরায় সংযোগস্থাপনের কথা সুস্পষ্ট ভাষাতে বলা হইয়াছিল। উহাকে ব্যর্থ করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস উহার এক সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন। ওয়াশিংটনে প্রেঃ আইসনহাওয়ার ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের সহিত তাঁহার আলোচনার পর তিনি এই সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই আলোচনার ফলেই যে উক্ত সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই সংশোধন প্রস্তাবে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং সোভিয়েট

প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের পরিবর্তে বৃহৎ চতুঃশক্তির শীর্ষসম্মেলনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সংশোধন পক্ষে মাত্র পাঁচটি ভোট হইয়াছিল। বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই পাঁচটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ মেঞ্জিসের প্রস্তাবের কোন কোন অংশে সোভিয়েট নীতির নিন্দা করা হইয়াছে। মিঃ মেঞ্জিসের সংশোধন প্রস্তাব ভোটে নিপুণভাবে হারিয়া গেল বটে, কিন্তু উত্থাপিত হইল আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাব। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যাহাতে সংযোগ স্থাপিত না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্য লইয়া ই সংশোধন প্রস্তাবটি রচিত হয়। উহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের অনুরোধ জানানো হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কাজেই এই সংশোধন প্রস্তাবের তাৎপর্য্যপূর্ণ উদ্দেশ্য বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বলিতে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও রুশপ্রধানমন্ত্রীর মধ্যেই সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে ইহা বুঝায় না। এই সংযোগ স্থাপন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্তরে, কিম্বা কূটনৈতিক পর্য্যায়েও হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ পঞ্চ শক্তি চাহিয়াছিলেন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট এবং রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকার।

আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাবটির পক্ষে ৩৭ এবং বিপক্ষে ৩৬ ভোট হয় এবং ২২টি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সংশোধন প্রস্তাবটি দুই তৃতীয়াংশ ভোট পায় নাই। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট বোলাণ্ড (আয়র্লাণ্ড) ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বহু সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সভাপতি বোলাণ্ড এক অদ্ভুত রুলিং প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু—আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মূল প্রস্তাবের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন নাই, সেই জন্য উহা অগ্রাহ্য হইল না। সভাপতি বোলাণ্ডের সিদ্ধান্ত ভোট দেওয়া হইলে উহার পক্ষে ৪৩ ভোট এবং বিপক্ষে ৩৭ ভোট হয়। পনরটি রাষ্ট্র ভোট দেয় নাই এবং তিনটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে যে ভোট হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, এখনও পশ্চিমী শক্তিবর্গের ইঙ্গিতেই ভোটের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়া থাকে। বোলাণ্ডের রুলিং হইতে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্বার্থেই এই রুলিং দেওয়া হইয়াছে। আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সভাপতি যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। উক্ত সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত হইত। মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হইলে নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তি যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যের বিলোপ ঘটিত। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সাধিত না হইয়া যদি অন্য উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা হইলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূটকৌশলই সাফল্যলাভ করিবে। নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা যখন হইল না, বরং অন্য উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইল তখন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা ছাড়া তাঁহাদের আর গত্যন্তর রহিল না। কাজেই মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করা হইল।

একথা অবশ্য সত্য যে, মূল প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হওয়ায় আর্জেণ্টিনার সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও উহা অর্থহীন হইয়া পড়িল। যে প্রস্তাবের সংশোধন প্রস্তাব তাহাই যখন আর রহিল না, তখন সংশোধন প্রস্তাবের কোন সার্থকতাই আর থাকিতে থাকিতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের কূট কৌশলের জয় হইলই। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট ও রুশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ ব্যতীত নিরস্ত্রীকরণ, বিশ্বশান্তি কিছুই সম্ভব নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের বিরোধী শক্তিই-শক্তিশালী। এই জন্যই নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মারফৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ দেওয়ার একটা চেষ্টা নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু যে উপায় উহা ব্যর্থ করা হইল তাহা নিন্দনীয়। উহার একমাত্র ফল হইল এই যে, প্যারিতে শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিশ্বে যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রশমনের জন্য আর কোন প্রস্তাব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মুখে রহিল না। পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রনায়কগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উপস্থিত থাকিয়াও শান্তিস্থাপনের এই সুযোগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কঙ্গো কোন্ পথে—

কঙ্গোর পরিণতি কোন্ পথে যাইবে তাহা এখন বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনীর কাজ ছিল কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া উহার স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি এমন কৌশলপূর্ণ উপায় প্রতিপালন করা হইয়াছে যে, কাটাঙ্গার সোম্বে এবং দক্ষিণ কাসাইয়ের কলোঞ্জির পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া তো সম্ভব হইয়াছেই, কঙ্গোর প্রকৃত কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেও সৃষ্টি করা হইয়াছে বিরোধ। এই বিরোধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থক প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু এবং তাঁহার নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী ইলিওর প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে সুযোগ পাইয়া কাসাভুবু কঙ্গোর প্রধান সেনাপতি লুণ্ডুলাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে মোবুটুকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মোবুটু প্রধান সেনাপতি হইয়া লুমুম্বার মন্ত্রিসভা এবং কাসাভুবুর মন্ত্রিসভা উভয় মন্ত্রিসভাই বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করেন। কঙ্গোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী এমন কৌশলপূর্ণ উপায় নিরপেক্ষতা নীতি প্রয়োগ করিলেন যে, কঙ্গোর প্রকৃত গবর্ণমেণ্ট কে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে ইলিওর মন্ত্রিসভার প্রতি। আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী স্বয়ং লুমুম্বাকেও লিওপোল্ডভিলের বেতারকেন্দ্র ব্যবহার করিতে বাধা দিয়াছিল, যদিও সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ তাঁহারই প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়াছে। বেতারকেন্দ্র ও বিমানবন্দর বন্ধ করিয়া দিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী নিরপেক্ষতা নীতি ভঙ্গ করিয়াছে। ইহাতে

সুবিধা হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকদের। কঙ্গোতে সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ছিল আমেরিকার নিগ্রো রাজনীতিক র‍্যালফ বাঞ্চ। তাঁহার স্থানে এমন সময়ে ভারতীয় কূটনীতিক রাজেশ্বর দয়ালকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যে তাঁহার পক্ষেও সমস্যার সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কাটাঙ্গা ও কাসাইয়ে বিদ্রোহ দমনে মিঃ লুমুম্বা যখন প্রায় সাফল্যের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন সেই সময় কর্ণেল মোবুটুর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তাঁহার প্রথম কাজ হইয়াছিল কঙ্গোতে রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূতাবাস বন্ধ করিয়া দেওয়া। শ্রীরাজেশ্বর দয়াল বলিয়াছেন, যে-স্থানীয় সরকার কার্য্যকরী, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাকে স্বীকার করিবেন। কাসাভুবু কঙ্গোর শাসনতান্ত্রিক বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন। কর্ণেল মোবুটু শাসনতন্ত্র ও পার্লামেন্ট দুই-ই বাতিল করিয়া দিয়াছেন। এই অধিকার তাঁহাকে কে দিল? পার্লামেন্টে কিন্তু মিঃ লুমুম্বাএই সংখ্যা গরিষ্ঠতা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জনগণের নির্ব্বাচিত পার্লামেন্টকে কাজ করিতে দেওয়া উচিত। পার্লামেন্ট যে সরকারকে সমর্থন করিবে সেই সরকারকে সাহায্য করাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্ত্তব্য। কয়েক দিন পূর্ব্বে লিওপোল্ডভিল হইতে প্রেরিত এক সংবাদে এই অভিযোগ করা হয় যে, কঙ্গোর পার্লামেন্টের যে-সকল সদস্য মিঃ লুমুম্বার সমর্থক তাহাদিগকে স্বার্থ বিশিষ্ট দলগুলি অর্থ দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিঃ লুমুম্বাকে সমর্থন না করিলে মোবুটু পার্লামেন্টের অধিবেশন হইতে আপত্তি করিবেন না বলিয়া সংবাদ প্রকাশ। পার্লামেন্টের সদস্যদিগকে বশীভূত করিবার জন্য বৈদেশিক শক্তিবর্গই যে অর্থ দিতেছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। মিঃ লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য মোবুটু সৈন্য প্রেরণ করে। তাহারা যাইয়া দেখিতে পায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী দ্বারে পাহারা দিতেছে। মোবুটু হুমকী দিয়াছিলেন জাতিপুঞ্জ বাহিনীর সহিত লড়াই করিয়া মিঃ লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী বাধা দিতে দক্ষম করায় মিঃ লুমুম্বাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তিনি নিজের গৃহেই বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু বন্দী থাকিয়াও তিনি কঙ্গোব্যাপী ব্যাপক অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশনে কোন পক্ষে সামরিক সাহায্য না দিবার জন্য শক্তিবর্গকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে তাহার ফল কি হইবে বলা কঠিন। হয়ত সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকরাই সামরিক সাহায্য পাইবে এবং কঙ্গোর স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার সমর্থকরা কোন সাহায্যই পাইবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কঙ্গোর অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইলে কঙ্গোর প্রকৃত অবস্থাই শুধু জানা যাইবে না, উহার অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার পথের সন্ধানও পাওয়া যাইবে। কঙ্গোকে সম্পূর্ণরূপে বাহিরের শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে না পারিলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হইয়া উঠিবে।

জয়-পরাজয়—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রায় চারি সপ্তাহ কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাইয়া রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ মস্কো ফিরিয়া গিয়াছেন। আরও যে সকল রাষ্ট্র প্রধান সাধারণ পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারাও নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মঃ ক্রুশ্চেভ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে শীর্ষসম্মেলন চাহিয়াছিলেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়কই সাধারণ পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা শীর্ষ সম্মেলন হইয়াছিল কি না তাহা লইয়া মতভেদ থাকিবে। তবু অধিকাংশ রাষ্ট্রনায়ক সাধারণ পরিষদে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করায় মঃ ক্রুশ্চেভের একটা জয় হইয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটাইবার জন্য তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শীর্ষসম্মেলন চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, পশ্চিমীশক্তিবর্গ এখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান চাহেন না।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা রাজনৈতিক কমিটির পরিবর্ত্তে পূর্ণ অধিবেশনে হওয়ার যে প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছিল সাধারণ পরিষদে তাহা বিপুল ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন আলোচ্য সূচীভুক্ত না করার জন্য নিয়ামক কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহাও সাধারণ পরিষদ ৪২-৩৪ ভোটে অনুমোদিত হয়। বাইশটি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল এবং একটি দেশের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন। রাশিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচনার প্রস্তাবও বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়াছে। ঔপনিবেশিক জনগণকে স্বাধীনতা দান সম্পর্কে মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আলোচনার প্রস্তাবটিই শুধু বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। উহাই মঃ ক্রুশ্চেভের একমাত্র জয় বলা যাইতে পারে। নিরপেক্ষ পঞ্চশক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়াকেও পাশ্চমী শক্তিবর্গ তাঁহাদের জয় এবং ক্রুশ্চেভের পরাজয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

মঃ ক্রুশ্চেভ এগারজন সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর পরিবর্ত্তনের দাবী করিয়াছেন। তিনি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা করিতে বিলম্ব হইলে রাশিয়া রাজনৈতিক কমিটি এবং পঞ্চদশ সদস্য বিশিষ্ট অস্ত্রহ্রাস কমিটিতে কাজ করিতে রাজী হইবে না। পাশ্চমী শক্তি গোষ্ঠী, নিরপেক্ষ শক্তিগোষ্ঠী এবং সোস্যালিশ শক্তিগোষ্ঠী যাহাতে সমানভাবে জাতিপুঞ্জে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে তাহার জন্য উহার কাঠামোর পরিবর্ত্তন দাবী করিয়াছেন। পাশ্চম শক্তিবর্গ এতদিন ধরিয়া যে সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা তাঁহারা সহজে ত্যাগ করিতে রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাশিয়ায় সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশিল্ডের অবস্থা অসহনীয় করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ লীয়ের অবস্থা রাশিয়া এমন করিয়া তুলিয়াছিল যে, অবশেষে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

স্বাধীন নাইজেরিয়া—

গত ১লা অক্টোবর (১৯৬০) নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করায় আফ্রিকায় আর একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হইল। নাইজেরিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবে এবং স্বাধীনতা লাভের পরই এই রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করিয়াছে। নাইজেরিয়ায় বহু উপজাতীয় লোকের বাস। এই সকল উপজাতির মধ্যে হৌসা, ফুলানি, য়োরুবা এবং ইবস্ এই কয়েকটি উপজাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ইহাদের লোক সংখ্যাই নাইজেরিয়ার মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮০জন। ভাষার পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। নাইজেরিয়া কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর অঞ্চলে হৌসা এবং ফুলানি উপজাতির বাস। পশ্চিম অঞ্চলে য়োরুবা উপজাতি বাস করে। ইবস্ উপজাতি পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী। এক সময়ে বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে আভ্যন্তরীন বিরোধ বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যেও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। তথাপি ভারত বিভাগের মত ঘটনা নাইজেরিয়ায় ঘটে নাই। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবেই অখণ্ড স্বাধীন নাইজেরিয়ার অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সত্যই আনন্দের কথা।

নাইজেরিয়ার আয়তন বৃটিশ যুক্তরাজ্যের প্রায় চারিগুণ, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধেক। এই রাজ্যের লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ বাস করে নাইজেরিয়ায়। আফ্রিকার এই বৃহৎ এবং জনবহুল নূতন স্বাধীন স্বাধীন রাষ্ট্রকে বিশ্ববাসী স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়াছে। নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্র কঙ্গোর পথে যাইবে না, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিলেও আফ্রো-এশিয় শক্তিগোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

মঙ্কটন কমিশনের রিপোর্ট—

মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশন সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য বৃটিশ সরকার লর্ড মঙ্কটনের সভাপতিত্বে যে কমিশন গঠন করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট প্রণয়নে মঙ্কটন কমিশন যে বিশেষ দূরদৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান আকারে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনকে রক্ষা করা যে সম্ভব নয়, তাহা মঙ্কটন কমিশন ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কমিশন ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া দিবার সুপারিশ করেন নাই। ফেডারেশনের কোন একটি ইউনিটকে পৃথক করারও সুপারিশ করা হয় নাই। ফেডারেশনকে বজায় রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কিন্তু কমিশন ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা ফেডারেশনের নামটাই আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। সাত বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্যে বাস করিয়া তাহারা ধৈর্য্যহীন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইলে অঙ্গরাজ্যগুলিকে ফেডারেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিতে হইবে। অর্থাৎ ফেডারেশনের অস্তিত্বকে সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই কমিশনের অভিপ্রায়। সেইজন্য ফেডারেশনের আমূল পরিবর্ত্তন করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে অর্থ, পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা। অন্য সমস্ত বিষয় অঙ্গরাজ্যের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্ব্বিশেষে সকলকে ভোটাধিকার দিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কমিশন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে সদস্যের সংখ্যা ৩৫ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ করিবার এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সদস্যসংখ্যা সমান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন মনে করেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই ফেডারেশন টিকিয়া থাকিতে পারিবে। মঙ্কটন কমিশনের সুপারিশগুলি মধ্য আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণাঙ্গরাও এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে কি না সন্দেহ।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৬০

সোমনাবুলিজম্ বা নিদ্রাযোগে ভ্রমণ

সোমনাবুলিজম্ বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভ্রমণের অভ্যাস বহুজনেরই আছে, বলা বাহুল্য, এই অভ্যাস অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং একটি ব্যাধিস্বরূপ গণ্য হওয়ারই যোগ্য, যদিও এই সমূহ অনিষ্টকর অভ্যাস সম্বন্ধে আজও আমরা যথোচিত অবহিত হতে পারিনি বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

এই কু-অভ্যাসটির কারণস্বরূপ অনেকে বলেন যে, জাগ্রতাবস্থায় মানুষ যে চিন্তা করে, তারই অবচেতন প্রকাশ ঘটে তার সুপ্তির মধ্যে এবং তারই বশে সে চালিত হয় সে সময়; তবে এই মতকে সঠিক বলে মনে করা বোধ হয় সমুচিত নয়; আরও একটি ভুল ধারণা এ সম্পর্কে প্রচলিত আছে, তা হল সোমনাবুলিষ্ট বা নিদ্রা-ভ্রমণকারী নিদ্রাযোগে চলাফেরার সময় যদি কোন আঘাত পান, তা নাকি বেদনাদায়ক হয় না; বলা বাহুল্য, একথা সম্পূর্ণ অলীক; এ অবস্থায় পতনাদি দ্বারা মানুষ যে আঘাত ব্যথা ইত্যাদি পান, তা জাগ্রতাবস্থার মতই অনিষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে।

অনেকে বলেন, এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে আকস্মিক ভাবে জাগানো সমূহ ক্ষতিকর, তাতে নাকি তাঁদের নার্ভের উপর প্রচণ্ড ঝাঁকানী লাগার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে একথাও সত্য নয়, একটি অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হলে মানুষ যেটুকু সচকিত হন, তার বেশী শক্ এতে লাগে না।

এই ব্যাধির কারণস্বরূপ বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, সাধারণতঃ মৃগীরোগ ও শয্যামূত্র এই দুটি রোগের কোন একটি থাকলে তবেই মানুষ সোমনাবুলিষ্টে পরিণত হয়; তাঁরা আরও বলেন যে, তন্দ্রাবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার অন্তর্নিহিত তাগিদেই মানুষ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় ভ্রমণের চেষ্টা করে থাকেন সচরাচর। কারণ যাই হোক, ব্যাধিটি উপেক্ষণীয় নয় এবং এতে আক্রান্ত ব্যক্তির বিপদাশঙ্কাও অত্যন্ত বেশী; এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে রোগীর চাই জোরালো মনোবল ও পারিবারিক সহানুভূতি ও দরদ, কারণ উক্ত ব্যাধিটি শুধু মানুষের দেহেরই নয়, মনেরও।

বাঙলায় কনট্র্যাক্ট ব্রীজ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বণ্টনকারীর পরবর্ত্তী খেলোয়াড়ের ডাক

(Bids by Second ·Hand)

দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের পরিস্থিতি দুই প্রকারের :—

১। বণ্টনকারী ডাক দিলে

২। বণ্টনকারী পাস দিলে।

বণ্টনকারী ডাক উদ্বোধন করলে সাধারণ ভাবে বোঝা যায় যে, তার হাতের উচ্চ তাসের ক্ষমতা স্বাভাবিক বিভাগ অপেক্ষা বেশী। এর ফলে চতুর্থ খেলোয়াড়ের তাসের ক্ষমতা ঐ অনুপাতে কম হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের নিকট ২½ f ট্রিকের কাছাকাছি তাস থাকলে তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, উদ্বোধনকারীর প্রায় ৩ f ট্রিক ও নিজের ২½ মোট ৫½ f ট্রিক। ৮ f ট্রিক থেকে বাদ দিলে বাকী থাকে কেবলমাত্র—২½ f ট্রিকের মত তাস; তৃতীয় খেলোয়াড় ও চতুর্থ খেলোয়াড় অর্থাৎ তার খেড়ির মধ্যে বিভক্ত। সুতরাং চতুর্থ খেলোয়াড়ের কাছে ১+ f ট্রিক স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারে এই বুঝে তাকে ডাকের প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। এটিই হ'ল অঙ্কশাস্ত্রমতে সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম প্রয়োজন। সে সময় একের ডাক দিতে পারলে ত' কথাই নেই দু'য়ের ডাক দিতে হলেও দিতে হবে একের ডাকের উপযোগী তাসে। ডাকে সাহায্য দেবার সময়ে চতুর্থ খেলোয়াড়কে উক্ত বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে, নচেৎ তিনি বেশী খেসারৎ দিয়ে দলের পতনের নিমিত্তভাগী হ'তে পারেন। স্মরণে রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড়কে কিছুটা বাধ্যতামূলক ভাবে সময়ে সময়ে দুইয়ের ডাক দিতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তার তাসের ক্ষমতা একটির ডাক উদ্বোধন করবার সমতুল্য হ'তে পারে। অর্থাৎ বণ্টনকারী পাস দিলে তিনি একটির ডাকই দিতেন, কিন্তু সে উপায় না থাকায় তিনি দু'টির ডাক দিতে বাধ্য হয়েছেন। এটুকু ঝুঁকি অনেক সময়ে নিতে হয়। কারণ প্রথম চক্রে ডাক ফসকে গেলে আর তার পক্ষে ডাক দেবার সুযোগ নাও আসতে পারে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে সুযোগ আসেও না। ফলে বিপক্ষ দল কম ডাকের চুক্তির খেলা করে পয়েণ্ট অর্জ্জন করেন অথচ প্রকৃত তাসের ক্ষমতানুযায়ী নিজেদের তদপেক্ষা বেশী ডাকের খেলা করা সম্ভবপর হ'ত, কিন্তু প্রথম চক্রে দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক না দেওয়ায় আর পরে মুখ খোলবার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না তার পক্ষে। এ রকমও দেখা যায় যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক না দেওয়ার ফলে উদ্বোধনকারীর খেড়ি নো-ট্রাম্প ডেকে গেম করে নিয়েছেন যেটা সম্ভবপর হ'ত না দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে এবং সেই রংয়ের তাস প্রথম খেলা হ'লে। যাই হোক, কোথায় ডাক দিতে হবে এবং কোথায় ডাক দিলে বিপদের সম্ভাবনা বেশী এটা বুঝতে হলে দরকার বেশ ধৈর্য্য ও অভিজ্ঞতা যা অর্জিত হয় ক্রমশঃ ভালো খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলে বা পাশে বসে খেলা দেখে ও আলোচনার মাধ্যমে। নীচে কয়েকটি দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের তাসের নমুনা দেওয়া হ'ল।

উদাহরণ নং ১

ই—টে, ৭, ৩

হ—৯, ২

রু—সা, বি, ৯, ৬, ২

চি—বি, ১০, ৪

মনে করুন যে, তাস বণ্টনকারী একটি হরতনের ডাক দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড় পেয়েছেন উপরের তাস। তাসটিকে ২½ f ট্রিক (১১ পয়েণ্ট) থাকায় একটি ডাক দেওয়ার পক্ষে প্রায় উপযুক্ত কিন্তু প্রথম খেলোয়াড় একটি হরতন ডাক দেওয়ায় তিনি ঐ ডাক হ'তে বঞ্চিত। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে কম মূল্য তাসেই দুটি রুহিতনের ডাক দিতে হবে ঝুঁকি দিয়ে কারণ এই সময়ে ডাক না দিলে আর ডাক দেবার সুযোগ তার মিলবে না এবং চতুর্থ খেলোয়াড়ের কিছু কিছু তাস থাকা সত্ত্বেও তিনি আর মুখ খুলতে সাহস পাবেন না, কারণ দ্বিতীয় খেলোয়াড় প্রথম সুযোগে পাস দেওয়ায় তার হাতে যে ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন তাস থাকতে পারে এরূপ আন্দাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এর ফলে বিপক্ষদল কম ডাকের চুক্তির খেলা ক'রে পয়েণ্ট অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়, যেটা সম্ভবপর হয় না দ্বিতীয় খেলোয়াড় সময়মত নিজ ডাক দিলে।

উদ্বোধনী একটি রংয়ের ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের সাধারণ প্রথা ও কয়েকটি নমুনা তাস নীচে দেওয়া হ'ল :—

১। ভাল্‌নারেবল (Vulnerable) অবস্থায় ½ থেকে ২ f ট্রিক (Honour trick) এবং পাঁচপিঠ জয় করবার উপযোগী তাস হাতে থাকলে একটি রংয়ের ডাক দেওয়া চলে। উক্ত রংয়ের পাঁচখানি তাস টে, সা, বি, গো,-এর মধ্যে দুখানি ছবিতাস থাকার প্রয়োজন—গোলামের স্থলে ১০ থাকলেও চলতে পারে। যেমন, টে, ১০ বা সা ১০ অথবা বি, ১০ সমেত পাঁচখানি। চার তাসেও একটির ডাক দেওয়া চলে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ছবিতাস অন্ততঃ তিনখানি থাকা প্রয়োজন।

২। নন্‌ভাল্‌নারেবল্ (Non-vulnerable) ১½ f ট্রিকও চারপিঠ জয় করবার তাসেই দেওয়া চলে।

৩। বিপক্ষ দলের একটির ডাকের উপর দুটির ডাক দিতে হলে সাধারণতঃ প্রয়োজন—

(ক) ভাল্‌নারেবল্ অবস্থায় ২½ f ট্রিকের কাছাকাছি উচ্চমূল্যের ও ছ'পিঠ জয় করবার মত তাস। ডাকের রংটি শক্তিসম্পন্ন পাঁচতাসের হওয়া চাই।

(খ) নন্‌-ভাল্‌নারেবল্ অবস্থায় পাঁচটি পিঠ জয় করবার উপযোগী ও ১½ থেকে ২ f ট্রিকের তাস। এক্ষেত্রেও ডাকের রংয়ের তাসখানি

থাকা দরকার। উভয় অবস্থায় ৪ খানি তাসে দুইয়ের ডাক বিপজ্জনক।

উদ্বোধনকারীর একটি চিড়িতন ডাকের উপর দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের একটি ডাকের উপযোগী কয়েকটি নমুনা তাস :—

১। ই—সা, বি, গো, ১, ৩ ; হ—টে, ৩, ২ ; রু—১, ৫, ৪ ; চি—৭, ৬ ডাক হবে একটি ইস্কাবন।

২। ই—সা, বি, ২ ; হ—বি, ৪, ৩ ; রু—সা, বি, ১, ৫, ৩ ; চি—৫, ২ ডাক হবে একটি রুহিতন।

৩। ই—টে, ৪, ৩ ; হ—বি গো, ১০, ।, ৬, ৪ ; রু—বি, ২ ; চি—৪, ৩ ডাক হবে একটি হরতন।

৪। ই—৭, ৩ ; হ—টে, বি, গো, ৩ ; রু—বি, ৫, ৩ ; চি—সা, ৭, ২ ডাক হবে একটি হরতন।

৫। ই—বি, ১, ২ ; হ—টে, ৩, ২ : রু—বি, গো, ১, ৫, ৩ ; চি—সা, ৪ ডাক হবে একটি রুহিতন।

৬। ই—টে, বি, ১০, ২ ; হ—১, ৩ ; রু—বি, গো, ১০, ২ ; চি—বি, ১০, ২ ডাক হবে একটি ইস্কাবন।

৭। ই—৭, ৫, ২ ; হ—টে, সা, বি, ৪, ৩ ; রু—৫ ; চি—বি, ৩, ২ ডাক হবে একটি হরতন।

ভালনারেবল অবস্থায় ৪ ও ৬ নং নমুনার তাসে ডাক না দিলেই ভাল হয়, কারণ তাসে পাঁচ পিঠ জয় করবার ক্ষমতার অভাব।

নিম্নলিখিত তাসে উদ্বোধনকারীর একটি ইস্কাবন ডাকের উপর দ্বিতীয় খেলোয়াড় দুটির ডাক দিতে পারে :—

১। ই—টে, ৫, ২ ; হ—৭, ৩ ; রু—সা, বি, ১, ৩, ২ ; চি—বি, ১০, ৪ ডাক হবে দুটি রুহিতন।

২। ই—৭ ; হ—গো, ১০, ১, ২ ; রু—টে, বি, গো, ৫, ৪, ৩ ; চি—সা, ৩— ডাক হবে দুটি রুহিতন।

৩। ই—৬, ৫ ; হ—বি, গো, ১০, ৮, ৭ ; রু—টে, ৫ ; চি—সা, বি, ১০— ডাক হবে দুটি হরতন।

৪। ই—সা, ৬ ; হ—বি, গো, ৫ ; রু—টে, ১, ২ ; চি—বি, ১০, ১, ৬, ৩— ডাক হবে দুটি চিড়িতন।

উপরোক্ত হাতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :—

১নং তাসে রুহিতন রংয়ে হাতটিতে প্রায় ছয় পিঠ জয় করবার ক্ষমতা আছে যথা, ই—১, রু—৩½+, চি—½ মোট ৫+। অর্থাৎ ৬ পিঠ অপেক্ষা কিছু কম কিন্তু কমসত্বেও প্রথম সুযোগে ডাক না দিলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না, সুতরাং কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে ঐ ডাক দিতে হবে।

২নং তাসে—তাসটিতে রুহিতন রংয়ে প্রায় ৬পিঠ (রু—৫, এবং উদ্বোধনকারীর বামে অবস্থিত থাকায় চিড়িতনের সাহেব স্বাধীন ভাবে পিঠ জয় করতে পারে এই আশায়) জয়ের সম্ভাবনা উপরন্ত খেড়ি যদি দুটি হরতন ডাকতে পারে, তাহ'লে গেমের সম্ভাবনাও আছে, এই চিন্তা করে দু'টি রুহিতনের ডাক খুবই প্রশস্ত।

৩নং তাসে—১নং তাসের ন্যায় ৬পিঠের কিছু কম শক্তিসম্পন্ন। তৎসত্ত্বেও আর সুযোগ নাও আসতে পারে, এই চিন্তা ক'রে প্রথম সুযোগেই দুটি হরতন ডাকা উচিত।

৪নং তাসে—ডাইনে অবস্থিত খেলোয়াড় ইস্কাবন ডাক দেওয়ায় সাহেবটি দ্বিতীয় চক্রে পিঠ জয় করবে এইরূপ বিবেচনায় তাসটিতে চিড়িতন রংয়ে পিঠ জয় করবার ক্ষমতা ৫½ (ই—১, হ—½, রু—১ ও চি—৩)। এক্ষেত্রে প্রথম সুযোগে দুটি চিড়িতন ডাক প্রশস্ত।

উদ্বোধনকারী পাস দিলে দ্বিতীয় খেলোয়াড় উদ্বোধনকারীর পর্য্যায়ে এসে পড়েন, কিন্তু সামান্য তফাৎ এই যে, তিনি তখন স্থির জানেন যে, বণ্টনকারীর হাতে ডাকের উপযোগী তাস না থাকায় চতুর্থ খেলোয়াড় অর্থাৎ তার খেড়ির তাসের শক্তি স্বাভাবিক গড় অপেক্ষা কিছু বেশী এইরূপ আন্দাজ ক'রে সামান্য কম শক্তিসম্পন্ন তাসে ডাক উদ্বোধন করতে পারেন বা করা উচিত দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের। দু'ট্রিক থেকে ২½+ ট্রিকে ডাক চলে, এমন কি, অবস্থানুযায়ী টে, বি, ১০ সমেত পাঁচ বা ছ'খানি তাস কোনও রংয়ের ও অপর রংয়ের একটি সাহেব থাকলে ঐ রংয়ের একটির ডাক দেওয়া চলে। খেড়িকে সাহায্য দেবার সময় বা বিপক্ষদলের ডাকে ডবল দেবার সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, দ্বিতীয় খেলোয়াড় উদ্বোধনকারীর পাসের পর কিছু কম শক্তিতে ডাকের সুযোগ নিতে পারে।

বণ্টনকারীর খেড়ির ডাক

(Bids by Dealers Partner)

উদ্বোধনকারীর খেড়িকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়, ঐগুলি সাধারণত নিম্নরূপ :—

১। বণ্টনকারী ও দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস (Pass) দিলে।

২। বণ্টনকারীর পাসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে।

৩। বণ্টনকারীর ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস দিলে।

৪। বণ্টনকারীর ডাকের উপর পরবর্ত্তী খেলোয়াড় ডাক দিলে।

৫। বণ্টনকারীর ডাক পরবর্ত্তী খেলোয়াড় ডবল (Double) দিলে।

১। দুটি হাত পাস দেওয়ার অর্থ সাধারণ ভাবে এই যে উক্ত খেলোয়াড়েরা ডাক দেওয়ার উপযুক্ত তাস পান নি ; উচ্চমূল্যের

তাসের (Honour Trick) অথবা পিঠ জয় করবার তাসের (Playing Trick) অভাব ঘটেছে তাদের হাতে। সুতরাং তৃতীয় খেলোয়াড় নিজ তাসের শক্তি যাচাই করে ধরে নিতে পারেন যে বাড়তি উচ্চতাস চতুর্থ খেলোয়াড়ের কাছে জড়ো হয়েছে। তৃতীয় হাতে ডাক দিতে গেলে চিন্তা করতে হবে যে, চতুর্থ খেলোয়াড়ের নিকট এই ডাকের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হতে পারে। যদি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবার সম্ভাবনা না থাকে তবে তৃতীয় হাতে মুখ না খোলাই উচিত, কারণ তৃতীয় হাতে কম শক্তিতে মুখ খুললে বিপক্ষদলকে অতি অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট ডাকে পৌঁছবার সুযোগ ক'রে দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রেই অথবা এমন খেসারৎ দিতে হয় যে, ডাক না দিলে হয়ত বা চতুর্থ খেলোয়াড় ডাকের উপযোগী তাসের অভাবে 'পাস' দিতেন অথবা ডাক উদ্বোধন করলেও সেইরূপ সংখ্যক পয়েণ্ট অর্জ্জন করতে সক্ষম হতেন না। তৃতীয় হাতে ডাক উদ্বোধন বিষয়ে নানারূপ অভিমত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বিপক্ষদলের বড় খেলা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কমশক্তির ডাক সমর্থনও করেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, চতুর্থ খেলোয়াড় কিছুটা সচেতন থাকলে ঐরূপ কমশক্তির ডাক সামান্যই কার্য্যকরী হতে পারে। বড় জোর শতকরা পাঁচবার বাকী পঁচানব্বই বার ঠকাতে গিয়ে ঠকতে হয় নিজেকেই। সুতরাং এত অধিক ব্যবধান কেবলমাত্র বিপক্ষদলকে ঠকাবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঐরূপ ডাক সমর্থনযোগ্য ত' নয়ই বরং এরূপ কার্য্যে বেশীরভাগ সময়ে দলের পতন ডেকে আনে ও খেড়ির আস্থা নষ্ট হয়।

নিয়মমাফিক ডাক দিতে হ'লে তৃতীয় খেলোয়াড়ের থাকা উচিত উদ্বোধনকারীর ডাকের শক্তি অপেক্ষা একটি সাহেব অথবা একটি বিবি ও একটি গোলাম বেশী। ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম থাকে ও ফল ভালই হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলে। যথা :—

(ক) কোন রংয়ের টে, সা, বি সমেত পাঁচখানি অথবা এক রংয়ের সা, বি, ১০ সমেত পাঁচখানি ও অপর কোনও রংয়ের টেক্কা থাকলে উচ্চতাস মূল্য যথোপযুক্ত না হলেও উক্ত রংয়ের একটির ডাকে বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা কম অথচ চতুর্থ হাতে হঠাৎ নো-ট্রাম্প ডাকে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হয় না, প্রথম খেলোয়াড়কে উপরন্তু বিপক্ষ দলকেও সস্তায় গেম করার সম্ভাবনা থেকে কিছুটা হটান চলে। ইহার সম্ভাবনাময় উপকারিতা বিবেচনায় সামান্য খেসারৎ দিতে হলেও সেটা বরদাস্ত করা যায়।

(খ) একসাথে তিনটি বা চারটি ডাক। (Pre-emptive Bid)। এই ডাকের উপকারিতা কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে খুবই কার্য্যকরী হ'তে দেখা যায়। এইরূপ ডাকের দ্বারা বিপক্ষ দলের ডাকের বিনিময়ের পথ বন্ধ হয় এবং নির্দ্দিষ্ট ডাকে পৌঁছিবার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

তৃতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের উপযোগী কয়েকটি নমুনা তাস ও ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হল :—

১ নং। ই—সা, ১, ২ ; হ—৫, ৩ ; রু—টে, সা, বি, ৪, ২ ; চি—গো, ৪, ৩।

২ নং। ই—সা, বি, ১০, ৭, ২ ; হ—টে, ৫, ৪ ; রু—বি, ৩, ২ ; চি—৮, ৩।

৩ নং। ই—সা, বি, ১০, ৮, ৭, ৫, ২ ; হ—১০, ৩ ; রু—সা ১০, ২ ; চি—৭।

৪ নং। ই—সা, ৬, ২ ; হ—বি, ৫ ; রু—সা, বি, ১০, ৮, ৭, ৬, ৫, ২ ; চি—× ।

১নং তাসে যে কোন অবস্থায় একটি রুহিতন ডাক খুবই সমীচীন। তাসটিতে রুহিতন রংয়ে ছয় পিঠ জয় করবার সম্ভাবনা থাকায় বণ্টনকারী পাস দেওয়া সত্ত্বেও একটি রুহিতনের ডাকে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা ত' নেই, উপরন্তু চতুর্থ খেলোয়াড়ের পক্ষে সস্তায় গেম করার (নো-ট্রাম্প ডাকে) পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং চতুর্থ খেলোয়াড় ডাক পেলে প্রথম খেলবার কোনও অসুবিধা থাকে না। ইহা ছাড়াও আর একটি দিক আছে যে, বণ্টনকারী উচ্চমূল্য তাস থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পিঠজয়ের তাসের অভাবে পাস দিয়ে থাকলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের ডাক পাওয়ার পর নিজহাতের শক্তি অনুযায়ী ডাকে পুনঃপ্রবেশ ক'রে সমবেত শক্তি হিসাবে গেমের ডাকে পৌঁছাতে বা বিপক্ষদল ডাকের সীমারেখা অতিক্রম করলে যথোপযুক্ত খেসারৎ আদায় করতে সক্ষম হয় ডবল দিয়ে। তৃতীয় খেলোয়াড়কে কিন্তু ডাক দেবার আগে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে—

১। খেড়ি চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডাকের উপর প্রতিযোগিতামূলক ডাকে প্রবেশ করলে কিরূপ ডাক আসতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে আন্দাজ করা ও তার জন্য প্রস্তুতি আছে কিনা লক্ষ্য করা। এরূপ প্রস্তুতি, একই রংয়ে বা অপর রংয়ে অথবা নো-ট্রাম্পে না থাকলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে ডাক যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ সেরূপ অবস্থায় অযথা অধিক খেসারৎ দিতে হ'তে পারে।

২। তৃতীয় হাতে ডেকে চতুর্থ খেলোয়াড়ের মুখ খোলবার সুযোগ যেন ক'রে না দেওয়া হয়।

২নং তাসের উচ্চতাস মূল্য ও পিঠজয়ের শক্তি ১নং তাস অপেক্ষা কম হ'লেও একটি ইস্কাবন ডাক দেওয়া চলে পূর্ব্বোক্তরূপ কারণেই।

৩নং তাসে উচ্চতাস মূল্য খুবই কম এবং বিপক্ষদলের রংয়ের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা সামান্য, কিন্তু ইস্কাবন রংয়ে ছয় থেকে সাত পিঠ জয় করবার সম্ভাবনা আছে ঐ তাসটিতে। সুতরাং তাসটি আক্রমণাত্মক পর্য্যায়ের এবং অবস্থানুযায়ী একক্কালীন তিনটি ইস্কাবনের ডাক অনেক সময়েই কার্য্যকরী হয় বিশেষতঃ চতুর্থ খেলোয়াড় তীক্ষ্ণ প্রকৃতির হ'লে।

৪নং তাস ৩নং তাসের প্রায় অনুরূপ এবং আক্রমণাত্মক বিপক্ষদলের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা নেই বললেই চলে। এরূপ তাসে অবস্থানুসারে চারটি রুহিতনের ডাক চলে।

২। বণ্টনকারীর পাসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় ডাক দিলে তৃতীয় খেলোয়াড় অর্থাৎ বণ্টনকারীর খেড়ির ডাকের সমস্যাটি একটু কঠিন। কঠিন এই কারণে যে, বণ্টনকারীর হাতে উদ্বোধনী ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাব জানা গেলেও তার তাস কতটা দুর্ব্বল জানা যায়নি এবং জানা সম্ভবপরও নয়। সেজন্য কিছুটা ঝুঁকি নিতে হয় ডাক দিতে গেলেই। প্রথম হাতের পাসের এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ডাকের পর ডাক দিতে গেলে দরকার—

(ক) একের ডাকে ১½ থেকে ২ ট্রিকের মত তাস এবং

পিঠ জয় করার ক্ষমতা অন্তত পক্ষে ভালনারেবল অবস্থায় পাঁচটি ও নন্‌ভালনারেবল্ অবস্থায় চারটি।

(খ) ছুটির ডাক দিতে হলে দরকার অন্ততঃপক্ষে ২ ট্রিক এবং পিঠ জয়ের ক্ষমতা ভালনারেবল অবস্থায় ছয় পিঠ ও নন্‌ভালনারেবলও পাঁচ পিঠ।

সচরাচর এইটি মেনে চলা কর্ত্তব্য কিন্তু সময়ে সময়ে কিছুটা ব্যতিক্রম প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে এবং এটা নির্ভর করে তাসের বিভাগ ও পরিস্থিতি এবং খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতার উপর। এইরূপ অবস্থার বিষয় স্মরণে রেখে উদ্বোধনকারীকে অগ্রসর হতে হবে তৃতীয় খেলোয়াড়কে ডাকে সাহায্য দেবার সময়ে অথবা কোনও বদলী ডাক দিতে গেলে।

৩। বণ্টনকারীর উদ্বোধনী ডাকের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় পাস দিলে তৃতীয় খেলোয়াড়ের কাজ তিনটি:—

(ক) পাস দেওয়া

(খ) খেড়ির ডাক বাড়ান

(গ) কোন বদলী ডাক দেওয়া

(ক) উপযুক্ত শক্তি হাতে না থাকলে পাস দেওয়াই উচিত। উপযুক্ত শক্তি বলতে কি বোঝায় এখন সেইটিই বিবেচ্য। উদ্বোধনী ডাকের আলোচনা কালে বলা হয়েছে যে, ডাক দেবার সময়ে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, খেড়ির কাছে গড়ে (average) ছুটি ট্রিক (Honour Trick) বর্ত্তমান সুতরাং তদপেক্ষা বেশী না থাকলে সাধারণত পাস দেওয়াই কর্ত্তব্য যদি না প্রকৃতিগত বিভাগে সেইটি পূরণ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ Honour Trick এর বদলে Playing Trick দিয়ে সাহায্য করা যায়। কিন্তু উদ্বোধনকারীর একটি ডাকের শক্তি ২½ থেকে ৩+ট্রিক পর্য্যন্ত সুতরাং একের উপর একের ডাকের বেলায় সমানানুপাতে খেড়ির শক্তি কমান হয়েছে (একের উপর একের ডাক দ্রষ্টব্য) সামান্য ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয় শুধু উদ্বোধনকারীর একটি চিহ্নিত ডাকের ক্ষেত্রে কারণ সময়ে সময়ে ঐরূপ ডাক তিন তাসেও দিতে হয় উদ্বোধনকারীকে। এরূপ ডাকের পর কেবল সংখ্যাধিক্যে একটি ইস্কাবন বা একটি হরতন (Major Suit) ডাকা চলে এবং ফল খারাপ হয় না যদি না উদ্বোধনকারী ভুলে যান যে খেড়ির ঐ ডাক শুধু ডাককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও হ'তে পারে (Only to keep the bidding alive)।

(খ) খেড়ির ডাক বাড়ান চলে দু'টিতে, তিনটিতে, চারটিতে এমন কি আরও বেশীতে, নির্ভর করে উঁচু তাসের শক্তি ও তাসের বিভাগের উপর। দু'টিতে বা চারটিতে ডাক তুলে দেওয়ার অর্থ—প্রকারান্তরে উঁচু তাসের অভাব প্রকাশ করা। যে সকল তাসে খেড়ির রংয়ের ডাকে সাহায্য করা ছাড়া বিপক্ষ দলের ডাকে বাধাদানের ক্ষমতা কম, সেই সকল তাসে প্রথম সুযোগেই পিঠজয়ের ক্ষমতানুসারে রংয়ের ডাকে তুলে দেওয়ায় খেড়িকে জানান যায় "খেড়ি, আমি ভাই তোমার ডাক শুনেছি, হাতে শক্তি বিশেষ নেই, তবে তোমার ডাকে এতগুলি পিঠ দিয়ে সাহায্য করতে পারি; সুতরাং বিপক্ষ দল ডাকে ঢুকলে তুমি যা ভাল বুঝবে সেরূপ করবে"। অপর দিকে ডাক উঁচু হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ খেলোয়াড়ের ডাকের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় কিছুটা। কারণ ডাকতে গেলে তাকে উক্ত ডাকের ওপরে একক ডাকতে হয়। সকল সময়ে ঐরূপ ডাকের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না, ফলে সামান্য খেসারৎ দিয়ে এমনকি চুক্তির খেলা করে পয়েন্ট অর্জ্জন করা যায় বিপক্ষ দলের বড় খেলা বন্ধ করে। এ সুযোগ হয়ত' পাওয়া যেতনা খেড়ির ডাক তুলে না দিলে কারণ সে সময়ে কম ঝুঁকি থাকায় চতুর্থ খেলোয়াড় মুখ খোলবার চেষ্টা করতে পারতেন্ এবং একবার মুখ খুললে সে তার খেড়ির সাহায্যে (যিনি হয়ত প্রথমে পাস দিয়েছিলেন কোনও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ) ডাকে অগ্রসর হ'তে পারেন কিছুটা, গেমে বা এমনকি শ্লামেও (Slam) পৌঁছান চলে এরূপ ক্ষেত্রও বিরল নয়। কিন্তু খেড়িকে তিনটির ডাকে তুলে দেওয়ার অর্থ স্বতন্ত্র। এরদ্বারা শক্তি জানান ও তাকে উৎসাহিত করা বোঝায় (পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে) বড় রংয়ের (ইস্কাবন বা হরতন) একের ডাককে তিনে তুলতে হ'লে প্রয়োজন ২½ থেকে ৩ ট্রিকের তাস সহ অন্ততঃ চারখানি রং। কমদরের রংয়ের (Minor Suits—Diamond and clubs) একটির ডাককে তিনে তোলার অর্থ পৃথক, এরূপ ডাককে কতকটা এককালীন ডাকের পর্য্যায়ে (Pre-emptive bid) ফেলা চলে। প্রয়োজন ১½ থেকে ২½ ট্রিকের মতন উচ্চ তাসের শক্তি ও রংয়ের তাস অন্ততঃপক্ষে পাঁচখানি টে, সা, বি, গো, ১০ এর মধ্যে তিনখানি সহ। চারখানি রংয়ের তাসেও এরূপ ডাক দেওয়া চলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজন উক্ত রংয়ের টে, সা, বি'র মধ্যে অন্ততঃ দুখানি ও সর্ব্বোচ্চ শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ ২½ ট্রিকের মত তাস বদলী ডাকের উপযুক্ত তাসের অভাব; কতকটা একটি নো-ট্রাম্প ডাকের উপযোগী কিন্তু কোনও একটি রংয়ের দুখানি ছোট তাস থাকায় ঐ ডাক দেওয়া সমীচীন নয়।

খেড়ির একের ডাককে চারের ডাকে তোলা কার্য্যকরী হয় ইস্কাবন ও হরতনের ডাকের ক্ষেত্রে (Major Suit)। এইরূপ ডাকে উচ্চতাস মূল্য কম, ১ ট্রিক থেকে ২ ট্রিকের মধ্যে হ'লেও চলে যদি উক্ত রংয়ে খেড়িকে অনেকগুলি পিঠ জয়ে সাহায্য করবার উপযোগী তাস থাকে। আর প্রয়োজন রংয়ের পাঁচখানি বা বেশী তাস ও অপর কোনও একটি রংয়ে ছুট (void) বা একখানি তাস। তাসের বিশেষত্ব এই যে, বিপক্ষ দলের ডাকে কোনও রকমে

একখানি মাত্র পিঠজয় করার সম্ভাবনা। সুতরাং তাসটি আক্রমণাত্মক শ্রেণীর ও উচ্চতাসমূল্য কমহেতু নিজেদের গ্রামের সম্ভাবনা খুবই কম।

৩। বদলী ডাকের পর্য্যায় পাঁচটি, যথা :—

(ক) উদ্বোধনী ডাকের বদলে অপর কোনও রংয়ের একটির ডাক (One over One)।

(খ) একটি নো-ট্রাম্প ডাক।

(গ) একটির ডাকের উপরে প্রয়োজনীয় দুটির ডাক Two over One)

(ঘ) উদ্বোধনী ডাকের বদলে প্রয়োজন অপেক্ষা একটি বেশীর ডাক (Single jump)

(ঙ) প্রয়োজন অপেক্ষা দুটি বা বেশীর ডাক (Double or multiple jump)

উদ্বোধনী একটির ডাকের উপর একটির ডাক উচ্চদরের তাসের ক্ষেত্রে (Major Suits) চলে নিম্নলিখিত তাসে :—

১। ছ'তাসে বা ৭ তাসে ... ½ ট্রিক (Honour trick) থেকে ২½ ট্রিকে

২। পাঁচ তাসে .. ১ ট্রিক থেকে ২½ ট্রিকে

৩। চার তাসে .. ১½ ট্রিক থেকে ৩+ ট্রিকে

উদ্বোধনকারীর খেড়ির ডাকের ক্ষেত্র উপরোক্তরূপ বিস্তৃত থাকার দরুণ একটির উপর একটির ডাক অন্ততঃ একচক্র (one round) বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতার অভাব বোধ হ'লে অর্থাৎ খেড়ির কাছ থেকে বদলী ডাক পাবার পর দ্বিতীয় চক্রে ডাকের প্রস্তুতি না থাকলে উদ্বোধনকারীর প্রথম চক্রে ডাকের উপযোগী উচ্চতাসমূল্য থাকা সত্ত্বেও "পাস" হওয়াই কর্ত্তব্য নচেৎ বিপদে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। একের উপর একের ডাকের উপযোগী তাসের কয়েকটি নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল।

উদ্বোধনকারীর একটি চিড়িতন ডাকের উপর খেড়ির তাস কি ডাক হবে দেখান হয়েছে :—

	খেড়ির তাস	কি ডাক হবে ?
১।	ই—৭, ২ হ—বি, গো, ৭, ৬, ৫, ৩ রু—৪, ৩, ২ চি—গো, ২	একটি হরতন (উচ্চতাসমূল্য ½+)

	খেড়ির তাস	কি ডাক হবে ?
২।	ই—বি, ১০, ৮, ৫, ৪, ৪, ৩ হ—১, ২ রু—৭, ৩ চি—বি, ২	একটি ইস্কাবন (উচ্চতাসমূল্য ½ কিন্তু ৭ তাস)

নিম্নলিখিত তাসে উদ্বোধনী একটি রুহিতন ডাকের উপর এক ইস্কাবন বা একটি হরতনের ডাক চলে :—

১। ই—সা, বি, ৮, ৫, ২, হ—৬, ৩ ; রু—৭, ৫, ২ চি—১০, ৩, ২ ট্রিকদর ১ ডাক হবে একটি ইস্কাবন।

২। ই—৫, ২ ; হ—বি, গো, ৯, ৫, ৩, ২ ; রু—১০, ৫, ৩ ; চি—৭, ৪ ট্রিকদর ½ ডাক হবে একটি হরতন।

৩। ই—সা, ৩, ২ ; হ—টে, ১০, ৬, ৪, ৩ ; রু—১০, ৩ চি—বি, ৭, ২ ট্রিকদর ১½+ ডাক হবে একটি হরতন।

৪। ই—টে, ৭, ২ ; হ—সা, বি, গো, ৭ ; রু—৫, ৪, ২ চি—বি, ৫, ২ ট্রিকদর ২½ ডাক হবে একটি হরতন।

৫। ই—টে, বি, ৩ ; হ—টে, সা, ৭, ৩ ; রু—১, ৫, ৩ চি—৬, ৫, ৪ ট্রিকদর ৩½ ডাক হবে একটি হরতন।

৬। ই—টে, গো, ২ ; হ—টে, বি, ১, ৫, ৩ ; রু—৩ চি—বি, গো, ৪, ২ ট্রিকদর ৩+ ডাক হবে একটি হরতন।

[ক্রমশঃ।

চলচ্চিত্রসমালোচকের কি কি গুণ থাকা দরকার

সিসিল বি, ডি, মিলি

বিশ্ব-চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমরত্বের আসন যাঁদের অধিকারগত, যাঁদের কল্যাণে চলচ্চিত্র-জগত ক্রমশঃই সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, চলচ্চিত্রে যাঁরা নানাভাবে যুগপৎ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আরোপ করে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার স্বর্গত সিসিল বি, ডি মিলি তাঁদেরই অন্যতম। চলচ্চিত্রের উন্নতিসাধনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। জীবনের একটি সুবৃহৎ অংশ এঁর অতিবাহিত হয়েছে চলচ্চিত্রের সেবায়। চলচ্চিত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট দিকগুলি সম্বন্ধে তাঁর প্রতিটি অভিমত, যেমনই সুচিন্তিত, তেমনই মূল্যবান, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা তাঁর অসামান্য প্রতিভারই পরিচায়ক। চলচ্চিত্রের সমালোচকদের কি কি গুণ থাকা দরকার সেই সম্বন্ধে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের পাঠক-সমাজে কিছু আলোকপাত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

ডি' মিলির মতে চিত্রসমালোচনা জনসেবারই নামান্তরমাত্র। মানুষ মানুষকে নানাভাবে সেবা করতে পারে আর সেবার উপকরণও বলতে গেলে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। চিত্রসমালোচকরা আরও একটি কাজ করে চলেছেন—জনশিক্ষা দান। সমালোচনার মধ্যেই জনগণকে শিক্ষাদানও করে চলেছেন অবিরামগতিতে, সমালোচনা এমনভাবে করতে হবে—যা পাঠ করে সাধারণ পাঠক অনেক কিছু শিখতে পারবেন। সুতরাং চলচ্চিত্র-সমালোচককে যে কতখানি দায়িত্ব, সততা এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চিত্রসমালোচকের বৃত্তি গ্রহণ করার প্রাক্কালে চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সম্যক এবং গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। একটি ছবির মধ্যে কতগুলি বিষয় আছে সে সম্বন্ধে কারোরই অজানা নেই—এই সকল বিষয়ে সমালোচকের জ্ঞান থাকা দরকার—না হলে সমালোচনায় ঐ দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলতে পারবেন না আর না জেনে যদি কোন কথা বলতে যান তা হলে প্রকারান্তরে সেটা নিজের পায়েই কুড়ুল মারা হবে। সমালোচককে শুধু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি জানলেই চলবে না—সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। কেন না ধরুন, কোন বিখ্যাত সাহিত্যসৃষ্টি, কিংবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কোন ধর্মীয় আখ্যান চলচ্চিত্রে রূপায়িত হল। সমালোচক সেখানে কি শুধু আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও অভিনয় কেমন হল সেই আলোচনা করেই কলম তুলে নেবেন? অতএব এ সকল বিষয়েও তাঁর দক্ষতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। এই জিনিষগুলি পড়া বা জানা না থাকলে এদের সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করবেন কি করে? ধরুন ওয়াটারলুর যুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি এল—আপনি তার সমালোচনা করছেন, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আপনার সংগ্রহে রাখতে হবে—সমালোচনায় সেই ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা না করলে সমালোচনা সার্থক হবে না, হবে না পূর্ণাঙ্গ। আপনি ছবি যখন দেখবেন তখন আপনার অনুভূতি, আপনার অন্তর্দৃষ্টি আপনার বিশ্লেষণীশক্তি সব একসঙ্গে কাজ করে চলবে। সর্বোপরি আপনাকে এক সন্ধানী মন নিয়ে ছবি দেখতে হবে। আপনার চিন্তাধারার সাহায্যে, আপনার বোধশক্তির সাহায্যে, আপনার

দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ছবিটিকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে আপনাকেই।

খুব খানিকটা প্রশংসা করলেন কি খুব খানিকটা নিন্দে করলেন সেটা বিচার্য নয়। কারণ প্রাণখোলা প্রশংসা বা প্রাণভরা গালাগালি কোনটাই সমালোচনার একমাত্র মাপকাঠি নয়—তা ছাড়া এ গুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললে অনেকে হয়তো রেগে যেতে পারেন কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় এবং সেই জন্যেই আজকাল দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনাটি ফলপ্রসূ হয় না। কোন সমালোচক কোন ছবিকে একেবারে স্বর্গে তুলে দিলেন তা সত্ত্বেও ছবিটি চলল না। আবার কোন সমালোচক কোন ছবিকে একেবারে নরকস্থ করলেন, তবুও ছবিটির জয়জয়কারে সারা দেশ ভরে উঠল। অতএব এই ভাবে সমালোচনার মান এঁরা নিম্নগামী করে তুলছেন ক্রমশঃই, এই মনোবৃত্তির আশু অবসান বাঞ্ছনীয়। আপনি যাকে প্রশংসা করছেন, প্রশংসার কারণও আপনাকে খুঁটিয়ে দেখাতে হবে, আবার যাকে নিন্দা করছেন নিন্দার কারণও আপনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে—আর তা যদি না করতে পারেন বা না করেন তা হলে ও তিরস্কার পুরস্কারের কোন মানেই হয় না।

চলচ্চিত্রের এক একজন সমালোচকের সমালোচনার প্রচার হচ্ছে সারা দেশে, একটি লেখনী থেকে যে অভিমত জন্ম নিচ্ছে সেই অভিমত ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে ঘরে। একের লেখনীর রসাস্বাদন করছে বহুতে। সেই জন্যেই আপনি বুঝুন যে জনমত গঠনের দায়িত্বও আপনার। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীতে যা সত্য বলে প্রতিভাত হবে সেই সত্যকেই আপনি নির্ভীকতার সঙ্গে অসংকোচে তুলে ধরবেন হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার রচনা যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়, তাহলে বুঝুন কত লোকের মনে আপনি এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করাচ্ছেন। অতএব আপনাকে কতখানি নির্ভেজাল সৎ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ থাকতে হবে বুঝতে পারছেন? অতএব এই আলোচনার প্রতি একটু নেত্রপাত করলেই আপনার মনেও এই ধারণাই স্পষ্টতর রূপ নেবে যে সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক এবং সর্ববিষয়ক জ্ঞান, শিল্পিমন, সন্ধানী দৃষ্টি, তীব্র অনুভূতি, স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যকে প্রকাশ করার দুঃসাহসই চলচ্চিত্র-সমালোচকের যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়।

নাট্যবেদে জর্জ্জরের স্থান

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, সর্ববর্ণের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি একটি নূতন বেদ সৃষ্টি করলেন—সেটি হচ্ছে নাট্যবেদ। এই বেদের পাঠাংশ নিলেন ঋগ্বেদ থেকে, গান সাম থেকে, অভিনয়াংশ যজুর্বেদ এবং রসসমূহ অথর্ব বেদ থেকে। ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত করে তিনি করতে চাইলেন এর প্রয়োগ। দেবতাদের উপর এই প্রয়োগের ভার অর্পণের কথা ব্রহ্মা শক্রকে বলায়, ইন্দ্ররাজ বললেন যে, দেবতারা এই গুরুভার গ্রহণের উপযুক্ত নয়—বেদ ও ধ্যানকুশল মুনিরাই এর উপযুক্ত পাত্র। তখন ব্রহ্মা ভরত ঋষিকে স্মরণ করলেন। ভরত তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি শত পুত্রসমন্বিত। ভরত মুনির উপর এই কাজের ভার দিলেন। ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ব্যতীত কৈশিকী বৃত্তিরও আশ্রয় নেওয়া স্থিরীকৃত হলো। নারীদের সান্নিধ্য ব্যতীত কৈশিকী বৃত্তির স্ফুরণ সম্ভবপর নয় বলে ব্রহ্মা মঞ্জুকেশী প্রমুখ ২৩ জন মানস অপ্সরার সৃষ্টি করলেন। সশিষ্য স্বাতি বাদ্যাংশে, নারদ ও অন্যান্য গন্ধর্বেরা সঙ্গীতাংশে যোগদান করলেন। ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ধ্বজ-মহ; নাট্য প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ সময় এই—ব্রহ্মা বললেন—

"মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ সমুপস্থিতঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ত্ততে।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্"
নাট্যশাস্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৫৪—৫৫

নাট্যবিষয় মহেন্দ্র-বিজয়োৎসব। দলে দলে দেবতারা সমবেত হয়েছেন; ভরত করলেন অষ্টপদসংযুতা নান্দী-গান। দেবতারা কি করে দানবদের পরাভূত করেছিলেন, তার অভিনয় চলতে লাগলো—ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দান করলেন—ইন্দ্র দিলেন ধ্বজা, বরুণ ভৃঙ্গার, বিষ্ণু সিংহাসন, কুবের মুকুট এবং সরস্বতী দিলেন "শ্রাব্যত্বং প্রেক্ষণীয়ত্বং"; শিব দিলেন সিদ্ধি। অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষঃ, রক্ষঃ, পন্নগ প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও ভরতপুত্রকে স্ব স্ব অভিনয়োপযোগী ভাষা, ভাব, রস, আঙ্গিক প্রভৃতি প্রদান করলেন।

দান পরাজয় অভিনয় যখন চলতে থাকলো, তখন অনিমন্ত্রিত অসুর, যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁরা আর সহ্য করতে পারলো না। বিরূপাক্ষের আশ্রয়ে তারা দেবতাদের আক্রমণ করলো। অভিনয়ের পরম বিঘ্ন সংঘটিত হলো। অসুরেরা "বিঘ্নে"র আশ্রয়ে ভরতপুত্রদের বাগ্‌বৃত্তি, চলনশক্তি এবং মেধা যুগপৎ রুদ্ধ করে দিল (১-৬৬) ধ্যানবলে ইন্দ্র সূত্রধার এবং তাঁর সঙ্গী কুশীলবগণের অসহায় অবস্থা সব অবগত হলেন। রোষকষায়িত নেত্রে তিনি মণিখচিত তাঁর ধ্বজাখানা নিয়ে নাট্য বাধাদানকারী অসুর এবং বিঘ্নগণকে সম্পূর্ণ পরাভূত করলেন। পরমানন্দে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, হে দেব! আপনি আপনার এই ধ্বজের দ্বারা "অসুর" "বিঘ্ন" সকলকে "জর্জ্জর" করেছেন, তজ্জন্য এই ধ্বজার নাম হবে জর্জ্জর—

"জর্জ্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজ্জর্জরেণ সঃ।
নিহতেষু চ সর্বেষু বিঘ্নেষু সহ দানবৈঃ॥ ১·৭২
সংপ্রহৃষ্য ততো বাক্যমাহুঃ সর্বে দিবৌকসঃ।
অহো প্রহরণং দিব্যমিদমাসাদিতং ত্বয়া॥ ১·৭৩
নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্ব্বে যেন তে জর্জ্জরীকৃতাঃ।
তস্মাজ্জ জর্জ্জর ইত্যেব নামতোঽহয়ং ভবিষ্যতি॥ ১·৭৪
শেষা যে চৈব হিংসার্থমুপযাস্যন্তি হিংসকাঃ।
দৃষ্ট্বৈব জর্জ্জরং তেঽপি গমিষ্যন্ত্যেবমেব তু॥ ১,৭৫
এবমেবাস্ত্বিতি ততঃ শক্রঃ প্রোবাচ তান্ সুরান্।
রক্ষাভূতশ্চ সর্বেষাং ভবিষ্যত্যেব জর্জ্জরঃ॥ ১,৭৬

এই প্রথম অভিনয়ের সময়েই পুনরায় অসুরগণের আক্রমণ আরম্ভ হলে ব্রহ্মা প্রথম রঙ্গালয় (নাট্যবেশ্ম) স্থাপনের নিমিত্ত আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা এই নাট্যালয় নির্মাণ করলেন। নাট্যালয়ের বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিভিন্ন দেবতাও গ্রহণ করলেন। নিয়তি ও যম দ্বারপাল হলেন। ইন্দ্র নিজে থাকলেন রঙ্গপীঠের পার্শ্বে। বিদ্যুৎসত্তার রইলো 'মত্তবারণী'তে এবং রঙ্গালয়ের স্তম্ভরাজির সংরক্ষণের ভার রইলো শক্তিশালী ভূত, যক্ষ, পিশাচ ও গুহ্যকদের উপর। জর্জ্জরের অভ্যন্তরে রইলেন দৈত্যনিধনকারী বজ্র, ইন্দ্রধ্বজা জর্জ্জরের বিভিন্ন পর্বে রইলেন শক্তিশালী দেবতারা। সর্বোপরি রইলেন ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে শিব, তৃতীয়ে বিষ্ণু, চতুর্থে কার্ত্তিকেয় এবং পঞ্চমে শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ (১,৯২-৯৫)॥

রঙ্গপীঠাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদের পূজাবিধি নাট্যশাস্ত্রের তৃতীয় প্রকরণে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে জর্জ্জরের পূজাবিধিও দৃষ্ট হয়। শিব, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, স্মৃতি প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এবং বাদ্যযন্ত্রসমূহের অর্চনার পরে জর্জ্জর-পূজা বিহিত। এ পূজার উদ্দেশ্য—নাট্যে যাতে কোনও বিঘ্ন না হয়। তার মন্ত্রটি এই—

ত্বং মহেন্দ্রপ্রহরণং সর্বদানবসূদনম্।
নির্মিতং সর্বদেবৈশ্চ সর্ববিঘ্ননিবারণম্॥
নৃপায় বিজয়ং দেহি রিপূনাঞ্চ পরাজয়ম্।
গোব্রাহ্মণহিতং চৈব নাট্যস্য চ বিবর্দ্ধনম্॥

জর্জ্জরের পূজার পূর্বে জর্জ্জরের মস্তকে শ্বেত বস্ত্র, তার পরের রৌদ্রপর্বে নীল বস্ত্র, বিষ্ণুপর্বে পীতবস্ত্র, তার পরের স্কন্দপর্বে রক্তবস্ত্র এবং সর্বনিম্ন পর্বে বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র খণ্ড বন্ধন করতে হবে। গন্ধ, মাল্য, ধূপ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করে জর্জ্জরকে এই মন্ত্রে স্তুতি নিবেদন করতে হবে—

বিঘ্নানাং শমনার্থং হি দেবৈর্ব্রহ্ম পুরোগমৈঃ।
নির্মিতস্ত্বং মহাবীর্যো বজ্রসারো মহাতনুঃ।
শিরস্তে রক্ষতু ব্রহ্মা সর্বদেবগণৈঃ সহ।
দ্বিতীয়ং চ হরঃ পর্ব তৃতীয়ং চ জনার্দ্দনঃ।
চতুর্থঞ্চ কুমারশ্চ পঞ্চমং পন্নগোত্তমঃ।
নিত্যং সর্বে হি পান্তু ত্বাং সুরাস্ত্বং চ শিবো ভব।
নক্ষত্রেঽভিজিতি ত্বং চ প্রসূতো রিপুসূদনঃ।
জয়ং চাভ্যুদয়ঞ্চৈব পার্থিবায় প্রযচ্ছ নঃ।

এবং পূজা দান করে মন্ত্রাহুতি পূর্বক অগ্নিতে হোম করতে হয়। (নাট্যশাস্ত্র, ৩.৮০-৮৪)।

পরবর্তী যুগে ভরত এবং সাগর জর্জ্জরস্তুতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে নূতন আর কোনও বিবৃতি নেই। জর্জ্জর সম্বন্ধে সর্ব প্রাচীন গ্রন্থের উক্তিই প্রামাণিক এবং এখনও পর্যন্ত শেষ উক্তি।

ভারতে স্বাধীনতাগমে এখন সংস্কৃতশিক্ষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা এবং তন্মধ্যে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয়তাবর্দ্ধন আমাদের একান্ত কাম্য। নাট্যাভিনয় প্রাথমিক কৃত্যের অন্যতম জর্জরপূজা। তাই তার মৌলিক উদ্দেশ্য ভারতবাসীমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার প্রসঙ্গে

সারা জগতে অভিনেতা হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার নাম প্রচারিত হ'লেও ঐটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। অভিনেতার চেয়ে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সিনাট্রা সারা বিশ্ববাসীর কাছে অনেক বেশী পরিচিত। যৌবনকালে অভিনেতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ কিন্তু সুরের সাধনায় তিনি বাল্যকাল থেকেই আত্মমুগ্ধ। পেশার খাতিরে তিনি অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করলেও অন্তরে তিনি সুরশিল্পীই। ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা সুরাশিল্পী হিসেবে যে বিরাট প্রতিভা-সম্পদের অধিকারী সে বিষয়ে আমরা নিজেরা কিছু না বলে বিঙ ক্রসবির তাঁর সম্বন্ধীয় উক্তিটিরই পুনরুল্লেখ করব মাত্র। হলিউডের সঙ্গীত-জগতের সম্রাট বিঙ ক্রসবি। হলিউডের সঙ্গীত সাম্রাজ্যে তাঁর সম্রাটত্ব সর্বজনস্বীকৃত, কেবলমাত্র রসিক-সমাজ কেন, দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলী এবং বিশ্বরাজনীতির নায়কের দলও বিঙ ক্রসবিকে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন হলিউডের সুরলোকের দিকপাল অধীশ্বররূপে। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, এ ক্ষেত্রে বিঙ ক্রসবির উক্তির গুরুত্ব কতখানি প্রতিভাকে স্বীকার করতে বিঙ ক্রসবি কোন দিনই পরাঙ্মুখ নন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি বলেছেন ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা সেই জাতের শিল্পী যাঁরা কালের দীর্ঘ ব্যবধানে বারেকের জন্যে দেখা দেন। সিনাট্রা যে কতখানি শক্তিমান শিল্পী এই উক্তিটি কি সে সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আলোকপাত করে না?

কিন্তু এ সত্ত্বেও বলব, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার প্রতিভা একমুখীন নয়, অবশ্য আমাদের এ বিষয়ে বলার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কারণ এ তথ্য সমকালীন ইতিহাসের মধ্যেই লিপিবদ্ধ করা রইল। পেশা হিসেবে অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করলেও সে ক্ষেত্রে তিনি আপন অসামান্য শক্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি, তিনি প্রমাণ করেছেন, দিকপাল সঙ্গীতশিল্পিরূপে, তিনি সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত হলেও অভিনয়দক্ষ বিধাতা তাঁকে কিছু অল্প পরিমাণ দেন নি, তিনি প্রমাণ করলেন যে সার্থকনামা অভিনয়শিল্পীর যে সকল বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন সে সবগুলিই তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় শোভা পাচ্ছে। বেশী দিন আগের কথা নয়, মাত্র সাত বছর আগের কথা—সাত বছর আগের ঘটনা আমরা আশা করি অনেকেরই পরিষ্কার মনে আছে। ১৯৫৩ সালে ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি নামে একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল, ছবিটি সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাদরে এই ছবি সার্থকতার মুখ দেখতে সমর্থ হয়েছিল। অবিস্মরণীয় ছবিগুলির ইতিহাসে এই ছবিও সসম্মানে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল। এই ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কোনও দিনই তাকে ভুলতে পারবেন না, আর এই ছবি যতদিন মানুষের স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবে—ততদিন এই ছবিতে সিনাট্রার অপূর্ব অভিনয়ও মানুষের মনে গেঁথে থাকবে। এক প্রতীকধর্মী ইতালীয় মার্কিণ সৈনিকের চরিত্রে সিনাট্রার অভিনয়দক্ষতা ভোলবার নয়, সমগ্র ছবিটি বললে অত্যুক্তি হবে না সিনাট্রার কল্যাণেই এতখানি জনপ্রিয়তা অধিকারে সক্ষম হয়েছিল। এই আশ্চর্য অভিনয়-দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ সিনাট্রাকে হলিউড অ্যাকাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত করল। সারা জগতের কাছে প্রমাণিত হল যে অভিনয়শিল্পিরূপে তিনি কতখানি শক্তির অধীশ্বর।

তেতাল্লিশ বছর আগে ১৯১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর সিনাট্রার জন্ম। সিনাট্রার বাবা ছিলেন স্থানীয় দমকল বাহিনীর অধিনায়ক। এই পদে যাঁরা বহাল থাকতেন তাঁরা প্রত্যেকেই মোটা অঙ্কের বেতন পেতেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সিনাট্রাপরিবারকে কোন দিন অর্থের অভাব বোধ করতে হয়নি, সংসারযাত্রা পরম স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হোত, বাল্যকালে সিনাট্রার কেটেছে যথেষ্ট বাহুল্যের মধ্যে দিয়েই। তাঁর সাজসজ্জা বিলাস-বৈভব তাঁর সমবয়সীদের নিত্য আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন তাঁর মাত্র পনেরো বছর বয়েস তখনই তাঁর সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব একটি ক্যাডিল্যাক গাড়ী ছিল আপন অধিকারে। তাঁর বেশভূষা এত মূল্যবান ছিল যে একবার পথিমধ্যে দু'জন গোয়েন্দা তাঁর পথরোধ করে রীতিমত জেরা করে যে এই মূল্যবান পোষাক কি সূত্রে তাঁর অধিকারগত হল? এরকম অনধিকার এবং অসম্মানকর প্রশ্ন সিনাট্রা বরদাস্ত করার লোক নন; তিনি এমন একটি উত্তর দিলেন যা শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখা গোয়েন্দাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। পরবর্তী ঘটনার জন্যে সিনাট্রা প্রস্তুতই ছিলেন, এতক্ষণ মুখের যুদ্ধ চলছিল। তারপর হাতের যুদ্ধ শুরু হল। প্রহৃত এবং রক্তাপ্লুত অবস্থায় মহামূল্য বেশবাস পরিহিত সিনাট্রা বাড়ী ফিরে এলেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন সিনাট্রা, নানাধরণের জীবিকা তিনি গ্রহণ করেছেন, বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর জীবননদী প্রবাহিত হতে থাকল—সকল দিক থেকে জীবনকে দেখার সুযোগ তিনি পেলেন, বোধ করি এই বিচিত্রতার সমাবেশে জীবন এক অপূর্ব রূপ নিয়ে তাঁর সামনে প্রকট হল। রাস্তায় রাস্তায় সংবাদপত্র ফেরী পর্যন্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি সিনাট্রা কোন দিন। এই সময়ে বিঙ ক্রসবির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। আবেদন করলেন স্থানীয় বেতারকেন্দ্রগুলিতে—তাঁকে গান গাইবার সুযোগ দেওয়া হোক, পয়সা তিনি চান না। তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হল—কখনও কখনও কোন কোন কেন্দ্র থেকে তিনি বাড়ী ফেরার বাসভাড়াটা পেয়েছেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি পুরোপুরি পেশাদার হয়ে উঠলেন। তাঁর উপার্জনের পরিমাণ তখন হপ্তায় পঁচাত্তর ডলার। এই পঁচাত্তর ডলার একদিন পরিণত হল আড়াইশো ডলারে দেখতে দেখতে অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়ে উঠলেন সিনাট্রা। নারীমহল তো সিনাট্রা বলতে, অজ্ঞান। তাঁ অনুষ্ঠানের দিন গণ্ডগোল লেগেই থাকত, পুলিশ নিযুক্ত ক পরিপার্শ্বিক শান্তি রক্ষা করতে হোত। বছরে তাঁর আয় নির্দিষ্ট এক লক্ষ ডলারে।

এইবার সিনাট্রা সম্বন্ধে একটি প্রায় অজানা তথ্যের প্রকাশ করি। এই তথ্য প্রকাশ করলে তাঁর অনুরাগীর দল হয়তো তাঁর

জীবনের একটি নতুন দিক দেখতে পাবেন। আপনারা জানেন যে, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা একজন বৃহত্তর ব্যবসায়ী, নানা ভূসম্পত্তিতে, তেলের ব্যবসায়ে, সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রকাশনায় এবং আরও নানা ক্ষেত্রে তাঁর টাকা খাটছে, আপনি জানতেন এ তথ্য?

একদিন সামান্য জীবের বৃত্তে অভিনয় করার জন্যে প্রতিটি ইুডিওর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে, আজ তিনি সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে চাইছেন দেড় লক্ষ পাউণ্ড। লোকে দিচ্ছেও তাঁকে।

প্রথম জীবনে ন্যান্সী নাম্নী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন সিনাট্রা, এই বিবাহে একটি কন্যারত্ন লাভ করেন। সেই মেয়ের আজ বয়স প্রায় কুড়ি হতে চলল ন্যান্সী আজ আর সিনাট্রার সহধর্মিণী নন, তাঁকে ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে টিউ ও ব্রায়েনের সঙ্গে যে সম্পর্কে নানাজনে নানা অনুমান পোষণ করছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হয় নি। সিনাট্রার দ্বিতীয় সহধর্মিণী ছিলেন অপরূপ সৌন্দর্যময়ী অভিনেত্রী এভা গার্ডনার। তারপরে অনেকের সঙ্গেই দেখা গেছে সিনাট্রাকে নানাস্থানে, সে নামগুলির তালিকা বিরাট, তবে তাদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম লেডী মিট্টি। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে দক্ষ অভিনেতা স্বর্গত হামফ্রি বোগার্টের বিধবা সহধর্মিণী অভিনেত্রী লোরেন বেকল অভিনেত্রী জুডি মেরেডিথ এবং অভিনেত্রী জুলিয়েট প্রোসের নামও উল্লেখযোগ্য। এদের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে সকলেই অনুমান করেছিলেন যে হয় তো এবার সিনাট্রা বিবাহিত জীবনে আবার প্রবেশ করছেন এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রোসোভাই এখনও সিনাট্রার নিত্যসঙ্গিনী।

স্মৃতিটুকু থাক

জীবনের চলার পথ যতই ছক বেঁধে দেওয়া যাক, সেই ছকে বাঁধা পথের নিরাপত্তার জন্যে যতই তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করা যাক যা ঘটবার তা ঘটবেই—তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ভবিতব্যের স্থির বিধানের কাছে সর্বপ্রকার সাবধানতা, হিসেব, বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি, তর্ক নিষ্ফল সম্পূর্ণরূপে। অদৃষ্ট ভাগ্যলিপির পাঠোদ্ধার, আজ পর্যন্ত হল না সম্ভব। এই চিরকালীন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ছায়াছবি "স্মৃতিটুকু থাক" এর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। যে আঙ্গিকে এই সত্যের জয়গান করা হয়েছে সেই আধারটিও যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। দশ মিনিটের ব্যবধানে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে দুটি বোন একসঙ্গে এক চেহারা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখল, নিঃসন্তান বিত্তবতী মাসী বড় বোনকে নিয়ে গেলেন আপন মাতৃত্বের স্বাদ দেবেন বলে। দীর্ঘকাল পরে মায়ের মৃত্যুকালে ছোট বোন জানল এই বড় বোনের কথা। মাতৃবিয়োগের পর সে মাসীর আশ্রয়ে গেল, সেই দিনই বড় বোনের ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটল, মাসো-মাসী ছোট বোনকে বড় বোন বলেই ভেবে নিলেন বাড়ীর কেউই তাকে চিনতে পারল না। বড় বোনের সঙ্গে বিয়ের স্থির ছিল জয়ন্তর, জয়ন্তও তাকে চিনল না। কিছুকাল আগে জয়ন্ত একবার পৈত্রিক ভিটে দেখিতে গিয়েছিল পল্লীগ্রামে ছোট বোনেরও ই প্রাণেই বাস জয়ন্ত চাক্ষুষভাবে সে সময়ে কোনওদিনই তাকে দেখেনি কিন্তু সে আড়াল থেকে দেখেছিল জয়ন্তকে আর দেখামাত্রই তার সমস্ত ভালোবাসা তার উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিল। জয় সঙ্গে তারই বিয়ে হল, জয়ন্ত জানল সে তারই প্রণয়ি পাণিগ্রহণ করল ছোট বোনও তার মনের মানুষকে নিজের ব গেল। এদিকে বড় বোন দুর্ঘটনায় প্রাণে রক্ষা পেল বটে বি স্মৃতিভ্রংশা হয়ে গেল, স্মৃতিভ্রংশ অবস্থায় দূরদেশে এক সহৃদয় ডাক্তা আশ্রয়ে সে কালাতিপাত করতে থাকে। তারপর ঘটনার ঘনঘ ক্রমে একদিন দুই বোনে মিলন হল। জয়ন্তর কাছেও আসল স উদ্ঘাটিত হ'ল বড় বোনের স্মৃতি ফিরে এল কিন্তু সে জয়ন্তর কা আর ধরা দিল না—তার ছোট বোনের অবস্থা বিবেচনা করে- এইখানেই তার মহত্ব আর এইখানেই সে জিতে গেল রসিকসমাজে এই ছবি পরিচালকগোষ্ঠী "যাত্রিক"এর দ্বিতীয় উপহার সে দিক দিয়ে বিচার করলে এঁরা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্হ। এঁদের এ প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। উত্তরকালে বাঙলার চিত্রজগতের এঁদে দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হোক—এই কামনা করি। এই ছবি চিত্রনাট্যকার শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ছবিতে দ্বৈত ভূমিকায় অভিন করেছেন সুচিত্রা সেন। চলচ্চিত্রে দ্বৈত ভূমিকায় রূপদান তাঁর এই প্রথম। দু'টি বিভিন্ন চরিত্রের রূপদানে সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছেন শ্রীমতী সেন, দু'টি চরিত্রই অত্যন্ত দুরূহ চরিত্র। শ্রীমতী সেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে চরিত্র দু'টিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। "স্মৃতিটুকু থাক" তাঁর অনবদ্য অভিনয়-প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষরবাহী হয়ে রইল। তাঁর পরেই উল্লেখ করব বিকাশ রায়ের নাম। ছবির শেষাংশে তাঁর আবির্ভাব। অল্প কয়েকবার তাঁকে দেখা গেছে, কিন্তু এই অল্প সুযোগেই দর্শক-হৃদয় তিনি জয় করতে পেরেছেন। বিকাশ রায়ের পর অভিনন্দনযোগ্য অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ (জয়ন্ত), ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, নবিতাব্রত দত্ত, তুলসী চক্রবর্তী... ছবি বোরাল, [illegible] মজুমদার, গোপাল মজুমদার, রাধারমণ, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, সাধনা রায়চৌধুরী, রাণী গাঙ্গুলী, মুক্তি গোস্বামী, আশা দেবী, অঞ্জলা কর প্রভৃতি শিল্পীরাও আপন আপন অভিনয়দক্ষতা কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রদর্শন করেছেন।

শহরের ইতিকথা

গ্রামের মেয়ে বিদেশী ভাষার সঙ্গে অপরিচিতা থাকতে পারে, সাহেব মেমের সঙ্গে কথোপকথনে অক্ষম হ'তে পারে, তথাকথিত "সোসাইটি"তে মেলামেশার অপারগ হতে পারে—কিন্তু তাই বলে সে অপাংক্তেয়া নয়—সেও এক অফুরন্ত প্রাণসম্পদে পরিপূর্ণা, নারীহৃদয়ের প্রতিটি বৃত্তি তার মধ্যে জাগ্রত, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-আবেগ-অনুভূতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তথাকথিত 'সোসাইটি'তে মেশার পটুতাই নারীদের মাপকাঠি নয়। নারী কল্যাণী, নারী আনন্দময়ী, নারী শ্রী। এই পটভূমি অবলম্বন করেই শহরের ইতিকথার গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। এই গল্পের নায়িকাও একটি গ্রাম্য তরুণী। তার 'পিতৃবন্ধুপুত্র সামন্তের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির ছিল। বিলেত থেকে ফিরে এসে সামন্ত এ সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়াল—তার মত একজন "সোসাইটি হিরো" একটি পল্লীগ্রামের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল না। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এলেন নায়িকার জমিদার, তিনি কলকাতার নিজের বাড়ীতে নায়িকাকে এনে রাখলেন, উপযুক্ত গভর্ণেসের সাহায্যে অদ্ভুত বা

ও চেষ্টায় নায়িকা 'আপ-টু-ডেট' হয়ে উঠল—প্রকৃতপক্ষে হল আলোকপ্রাপ্তা। সামন্তের সঙ্গে তার পরিচয়ও হল। সামন্তের লালসালোলুপ কুৎসিত রূপটিও তার কাছে অস্পষ্ট রইল না। সামন্তও বুঝল সে নিয়ত যে সব মেয়েদের সঙ্গে মেশে এ মেয়ে অন্য জাতের। এদিকে নায়িকা নায়ককে অর্থাৎ তার ত্রাণকর্তা ও জীবনের নবমন্ত্রদাতা জমিদারনন্দনটিকে মনে মনে নিজেকে উৎসর্গিতা করেছে। তারপর ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত। অবশেষে অনুতপ্ত সামন্তকে নায়িকার প্রত্যাখ্যান এবং সর্বশেষে নায়ক-নায়িকার শুভমিলন।

সামন্ত-চরিত্রটি সুচিন্তিত সুবর্ণিত এবং সুবিন্যস্ত—আমাদের আশে-পাশে এরকম সামন্ত সেনের অভাব নেই, সৌন্দর্যের মুখোস পরে অনেক জঘন্য পশু সগর্বে সমাজে শোভা পাচ্ছে এবং এই ভাবে কত জনের সর্বনাশ করে বেড়াচ্ছে, তার হিসেব অন্তর্যামী ছাড়া কে রাখতে পারছে ?

সমগ্র ছবিতে সবচেয়ে যে জিনিষের অভাব চোখে পড়বে তা হচ্ছে পরম্পরা, এর দৈন্য ছবিটিকে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ছবিতে জাঁকজমকের ত্রুটি নেই, বিলাস-বৈভবের ছড়াছড়ি, বড় বড় হোটেল ক্লাব প্রায়শই দেখানো হচ্ছে—কিন্তু মুখ্য শিল্পী ছাড়া অন্যান্য নির্বাক শিল্পীদের দিকে দেখুন—কি ধারণা জন্মাবে আপনার? বেশ-ভূষা আকৃতি-প্রকৃতি সব দেখে আপনার মনে হবে যে পাড়ার সাধারণ চায়ের দোকানের আড্ডাবাজদের দিয়ে এখানকার শূন্য চেয়ারগুলি পূর্ণ করা হয়েছে। যে জন্যে আবেষ্টনী আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। জমিদারগৃহে দেখছি যে জমিদার স্বয়ং এবং কয়েকটি চাকরবাকর ছাড়া আর কেউ সে বাড়ীতে নেই, জমিদারের আপনার লোক বলতে কি কেউ নেই, সে কি স্বজনহীন একা ? সব চেয়ে যে জিনিষ চোখে লাগে এবং যার জন্যে ছবিটিকে অবাস্তবতার দোষে অনায়াসে দুষ্ট করা চলে তা হচ্ছে নায়িকার বাবা মা স্রেফ একা নায়কের জিম্মায় অনিশ্চিত কালের জন্যে অম্লানবদনে মেয়েকে সেখানে থাকতে দিল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন তো দূরের কথা···সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত যাঁরা তাঁরাও এই ভাবধারা সমর্থন করতে পারেন না—যার বাড়ীতে আত্মজন বলতে কেউ নেই তদুপরি যে নিজে অবিবাহিত সেক্ষেত্রে মনিবের ইচ্ছে বলে প্রভুভক্ত কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে সেখানে রেখে এল। তার উপর যেখানে সমাজের অনুশাসন বড় কড়া—সেই সব পল্লীগ্রামের একটিতেই নায়িকার বাবার বাস। অতএব এ চিন্তা করাও তো তাদের পক্ষে অসম্ভব। হাসির খোরাক ছবিতে অনেক আছে যেখানে হাসি স্বতঃস্ফূর্ত সেখানে সর্বসাধারণ তা উপভোগ করেছে যেখানে কুঁতিয়ে হাসানো হয়েছে—সেখানে দর্শকের মনে আনন্দ জাগে নি। জেগেছে বিরক্তি।

অভিনয়ে সকলকে ছাপিয়ে গেছেন মালা সিনহা। বিশেষত সভ্যতা শিক্ষার্থিনী পল্লীবালার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এককথায় অতুলনীয়। নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার চরিত্রের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা আরোপ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, ছায়া দেবী, কাজরী গুহ, বাণী হাজরা প্রভৃতি শিল্পীরা সু-অভিনয়ই করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বিভূ [illegible]।

হাসি, হাসি, হাসি,

এক

রীতিমত ব্যাসাদে পড়ে গেছেন চিত্রপরিচালক রিচার্ড থর্প। ছবি তুলতে এ কি বিড়ম্বনা ? ছবির নাম ঘ্যাভামপন অফ ব্যাক্রিকা. স্যুটিং হচ্ছে মাকটাউ কেনিয়াতে। যুদ্ধের দৃশ্য, দেখাতে হবে যুদ্ধে নিহত প্রচুর শবদেহ। থর্প স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সেই ভূমিকাগুলি বণ্টন করে দিলেন। কাজ কিছুই নয়, মরার মত খালি শুয়ে থাকা। তাতেই মুস্কিলে পড়লেন থর্প। স্থানীয় অধিবাসীদের কৌতূহলের শেষ নেই। অফুরন্ত আগ্রহ তাদের, যেই ছবিতোলা শুরু হয় অমনি তারা উঠে বসে দেখতে থাকে কেমন করে ছবিতোলা হচ্ছে। চিত্রগ্রহণের কলাকৌশল অনুধাবন করতে চায় তারা, মরার মত চোখ বুজে শুয়ে থেকে এ সুযোগ তারা নষ্ট করতে চায় না। কর্মীরা তাদের কিছুতে বোঝাতে পারেন না যে তারা মৃতের ভূমিকায় অভিনয় করছে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার, থর্প জীবনে হয়তো অনেক কিছুই ভুলতে পারবেন, কিন্তু এই ঘটনা কি কোনদিন ভুলতে পারবেন ?

দুই

"ব্যাণ্ডিট অফ জোভ"-এর স্যুটিং চলছে। শহরের এখানে সেখানে তোলা হচ্ছে ছবি। ঘটনাস্থলে আকস্মিকভাবে এক আগন্তুকের আগমন। স্থান মাদ্রিদ, স্পেনের রাজধানী। দৃশ্যটি হচ্ছে এক তরুণ ব্রিটিশ সৈনিকের মৃত্যু উপলক্ষে শবযাত্রা। প্রথমে শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারী জনতার দৃশ্যগুলি পর পর নেওয়া হয়ে গেল। আগন্তুকের চোখে পড়ল ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে কফি খেতে খেতে একজন অভিনেতা চিত্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করছেন। আগন্তুক সোজা তাঁকেই জিজ্ঞেস করল কে মারা গেলেন ? আমি—উত্তর দিলেন কফি-পানরত শিল্পী সিন কেলি। (ছবিটিতে ব্রিটিশ সৈনিক লেফটানেন্ট উইলির চরিত্রটির তিনিই রূপ দিচ্ছিলেন) আগন্তুকের পরবর্তী প্রশ্ন—কে মারল আপনাকে ?—এর উত্তর দিলেন অভিনেতা ডেনিসন—আমি এবং আগামী কাল (অর্থাৎ পরের দিন উইলির মৃত্যু দৃশ্যটি গ্রহণ করা হবে আর ডেনিস উইলির হত্যাকারী হন্তুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই, উইলি হত্যার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি—বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ভিক্টর ম্যাচিয়োর। আগন্তুকের প্রতি মিষ্টি হাসিটি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—ও তো আগামী কাল উইলিকে মারবে—আর আমি যে ওকে গত বৃহস্পতিবার মেরে ফেলেছি (অর্থাৎ হন্তুর হত্যাদৃশ্য এ ঘটনার আগেই নেওয়া হয়ে গেছে।)

বাঙলাদেশে চিত্রগৃহ নির্মাণের বাধা অপসৃত

পরম আনন্দের সঙ্গে আমাদের পাঠকসমাজে একটি শুভসংবাদ পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। পাঠকসাধারণ আশা করি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে পশ্চিম বাঙলায় নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের প্রতি একটি নিষেধাজ্ঞা এতাবৎকাল বলবৎ ছিল। নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের অনুমতিপত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। আশা ও আনন্দের কথা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিলেন। যে কোন পল্লীতে চিত্রগৃহের নির্ধারিত সংখ্যাগুলিরও সংশোধন করা হয়েছে

ক সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা। এই সংশোধনের ফলে স্থির হল প্রতি পঁচিশ হাজার লোক পিছু একটি করে নতুন চিত্রগৃহের অনুমতি দেওয়া হবে, এই সংখ্যা অতিক্রান্ত হবে না। কোন চিকিৎসালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, দেবালয় প্রভৃতি থেকে অন্ততঃ দিকি মাইল অর্থাৎ চার শ' চল্লিশ গজের মধ্যে কোন চিত্রগৃহ থাকবে না, বলে একটি নিয়ম বলবৎ ছিল—সম্প্রতি আর একটি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা, এই নিয়মের সংস্কার করা হয়েছে এই নতুন নিয়মে দূরত্বসীমাকে চারশ চল্লিশ থেকে একশো গজে পরিণত করা হয়েছে।

বাঙলা চলচ্চিত্রের সামনে একটি নতুন পথের দ্বারোদঘাটন হল এই সরকারী সিদ্ধান্তে, আমরা আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করছি, বাঙলাদেশের ছায়াছবির জগতে প্রভূত উপকার সাধিত হল তার বিস্তৃতর সীমায় প্রসারণ ঘটল এবং বাঙলা ছবির প্রতি সরকার তাঁদের সহানুভূতিশীল মনের এক সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন।

চিত্রগৃহের সমস্যা তো সমাধান হল। কিন্তু চিত্রের? সেখানে এখনো হাহাকার। বাঙলা ছবির সংখ্যা উত্তরোত্তর ক্রমশঃই কমে আসছে, এ অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। আমাদের বক্তব্য, নতুন নতুন প্রযোজকরা এগিয়ে আসুন, আসুন ডিস্ট্রিবিউটারের দল বাঙলাদেশে বাঙলা ছবির অভাব পূর্ণ করতে, শিল্পের জন্মভূমি বাঙলাদেশ সেই দেশে এত বড় শিল্পের এই দুর্যোগ—এ স্বপ্নেও ভাবা যায় না, তাঁরা এগিয়ে এসে কর্ণধারের আসন গ্রহণ করুন তার দুর্যোগ দূর করুন। তার আকাশে বাতাসে আবার মুঠো মুঠো আনন্দ সমৃদ্ধি ও প্রশান্তি ছড়িয়ে দিন তাহলে বাঙলা ছবির বিশ্বব্যাপী অগ্রযাত্রা রোধ করার ক্ষমতা কোন শক্তির থাকবে না এ আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস।

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বেশ্বরায় শততম জন্মোৎসবে বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যপ্রদর্শন :

পাঠকসাধারণ আশা করি সকলেই অবগত আছেন যে সম্প্রতি ভারত-গৌরব ডাঃ স্যার মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বরায় জীবনের শততম বর্ষে পদার্পণ করেছেন। এ উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাতে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বৈজয়ন্তীমালা। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য এবং আরও বহু সম্ভ্রান্ত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বৈজয়ন্তীমালা মাল্যভূষিত করে সম্মান জানান। প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রীও শিল্পীকে মাল্যভূষিতা করে শুভেচ্ছা জানান।

চলচ্চিত্রের প্রসারকল্পে ঋণদান

ছায়াছবির উন্নতিকল্পে এবং উপযুক্ত উদ্যমী ব্যক্তিদের উৎসাহদান ও চিত্রনির্মাণের জন্যে ফিল্ম ফাইনান্স করপোরেশান ঋণদানের ব্যবস্থা করেছেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এই ঋণদান শুরু হবে। এঁদের কর্মকেন্দ্রের ঠিকানা—১১ ওয়ালকেশ্বর রোড বোম্বাই-৬।

সি, টি, এ, বির কর্মকর্তা নির্বাচন

সিনে টেকনিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশান অফ বেঙ্গলের ১৯৬০-৬১ সালের কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুশীল মজুমদার। সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তপন সিংহ এবং বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ভূপেন ঘোষ।

সেন্সার বোর্ডের নতুন সদস্যা

মাদ্রাজ থেকে জানা গেল যে পুনর্গঠিত ফিল্ম সেন্সার বোর্ডে অন্যতমা সদস্যা হিসাবে ভারতীয় লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী অ স্বামীনাথনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাচীরপত্রের প্রতি ধার্য করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সিনেমার পোস্টারের প্রতি অন্যান্য অঞ্চলের অনুকরণে ব্যাঙ্গালোরেও মহীশূর সরকার যে কর ধার্য করেছেন সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ উপলক্ষে মহীশূর ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হয়। বলা হয় যে কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে কর ধার্য করা যেতে পারে ব্যাঙ্গালোরে তার অনুকরণ করলে পরোক্ষভাবে এখানকার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হবে কলকাতা বোম্বাইতে যে ব্যবস্থা হতে পারে, অতি অল্প পরিসর য চলচ্চিত্র শিল্পের সেই ব্যাঙ্গালোরের মত ছোট শহরে সে ব্যব কোনক্রমেই ধার্য করা চলে না।

বাঙালা ছবিতে গুজরাটী অভিনেতা

নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় "লক্ষ্মীনারায়ণ" নামে একটি ছ গৃহীত হচ্ছে। বাঙলার বিশিষ্ট শিল্পিবর্গ এতে আত্মপ্রকাশ করবেন এই ছবি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে খবরটি প্রচারিত হয়েছে তা হচ্ছে গুজরাটী অভিনেতা চাম্পসিভাই নাগদাও এই বাঙলা ছবি অভিনয় করবেন।

বৃটেনের চিত্রজগতে দুর্যোগ

বৃটেনের চলচ্চিত্রজগত ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে ১৯৫৯—৬০ সালটি চলচ্চিত্রশিল্পের অতি দুর্বৎসর বলে এখা ঘোষিত হয়েছে। চার শো প্রেক্ষাগৃহ বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেও হয়েছে। দর্শক-সংখ্যাও রীতিমত কমতে শুরু করেছে। বৃটেন দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তি পাক এই কামনাই করি।

লানা টার্নার

প্রখ্যাত অভিনেত্রী লানা টার্নার (৪১) ক্রীড়াবিদ ফ্রেড (৪৪) কে বিবাহ করবার আইনসম্মত অনুমতি পেয়েছেন, অ এই অনুমতিকে তিনি কার্যকরী করবেন কবে এ সম্বন্ধে কোন উ করতে তিনি একেবারে নারাজ। ইতঃপূর্বে লানা পাঁচ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। এই বিবাহ হবে লানার ষষ্ঠ বিবাহ

ক্লার্ক গেবল

বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা ক্লার্ক গেবলের পারিবারিক জীবনে আনন্দসংবাদ ঘোষিত হয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গেছে যে এই সন্তানহীনতার দুঃখ থেকে ক্লার্ক মুক্তি পেতে চলেছেন। তাঁর পূর্ব চার পত্নী কেউই তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেন নি, তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা পঞ্চম পত্নী তাঁর এই শূন্যতা দূর কর চলেছেন। ষাট বছর বয়স্ক অভিনেতা এই প্রথম সন্তানের দেখবেন। তাঁর পারিবারিক জীবন উত্তরোত্তর মধুময় হয়ে উ এই আমাদের প্রার্থনা।

আশ্বিন, ১৩৬৩ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৫৬)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৭ই সেপ্টেম্বর) : রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ (৭৫৲ টাকা মধ্যে) প্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তুতি।

২রা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) : "শিক্ষকতা ও গবেষণা একই সঙ্গে চলা উচিত—পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের উদ্বোধনী ভাষণ।

৩রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) : আসামের ধুবড়ী মহকুমার সন্নিহিত রেলপথ ও জাতীয় সড়ক বন্যায় প্লাবিত—ট্রেণ ও যানবাহন চলাচল বিপর্য্যস্ত।

৪ঠা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) : আসামের আগামী আদমশুমারীর প্রশ্নমালায় সংশোধিত ব্যবস্থা—১৯৫১ সালের 'দেশীয় অধিবাসী' সংক্রান্ত প্রশ্ন বাতিল।

৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) : পাঁচটি পাহাড়ী জেলা ও নেফা লইয়া পৃথক রাজ্য গঠন করার দাবী—আসামের পাহাড়ী এলাকার নেতৃসম্মেলন নিযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ নেতা মিঃ এস ডি, সি নিকলস রয়ের ঘোষণা।

৬ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) : "আসাম দাঙ্গার সহিত রাজ্য ভাষার কোন সম্পর্ক নাই"—আসাম সফরান্তে প্রত্যাগত কলিকাতার সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিবৃতি।

৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) : "আসামে বাঙ্গালী উৎখাতের পিছনে সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল"—আসাম সফরকারী পশ্চিমবঙ্গ পি-এস-পি ও সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন প্রতিনিধিদলের অভিমত।

৮ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর) : রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানার্থ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিউইয়র্ক যাত্রা।

আই-এফ-এ ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের ষষ্ঠবার শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন—ফাইনালে ইণ্ডিয়ান নেভী ১—০ গোলে পরাজিত।

৯ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) : "সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করা হইতেছে না—প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত আইনের সম্প্রসারণ মাত্র"—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘোষণা।

১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) : শ্রীনেহরু (প্রধানমন্ত্রী) প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র—পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত চক্রান্তের কথা—আম্বালায় অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে চাঞ্চল্যকর মামলা।

১১ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) : 'যথোচিত রক্ষাকবচ সহ অসমীয়াকেই আসামের রাজ্য ভাষা করিতে হইবে'—জোরহাটে আসাম প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের বৈঠকের প্রস্তাব।

১২ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) : দ্বিভাষী পাঞ্জাব রাজ্যে দুইটি সরকারী ভাষা (পাঞ্জাবী ও হিন্দী) প্রবর্ত্তন—রাজ্যপাল কর্ত্তৃক আর্ডিন্যান্স জারী।

১৩ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর) : আসামের সরকারী ভাষা একমাত্র অসমীয়া হইতে পারে না—শিলচরের জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে দাবী।

১৪ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) : প্রবল বন্যায় কটক ও বালেশ্বর জেলার ৫২৫টি গ্রাম জলমগ্ন—৪৫০ বর্গ মাইল এলাকায় প্রায় তিন লক্ষ নর-নারী বিপন্ন হওয়ার সংবাদ।

১৫ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) : ভারত সরকার কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী ছয়মাসের আমদানী নীতি ঘোষণা—সুরা, সূচীযন্ত্র, কাচ, টাইমপিস ও কাঁচা ফিল্মের আমদানী হ্রাস।

১৬ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) : অপসারিত শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ পুনর্নির্ম্মাণের দাবীতে আমেদাবাদে পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ—শহীদ স্মৃতি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক সহ ৩০ জন সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার।

১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) : দিল্লীতে ১২ দিনব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সেমিনার সুরু—ইউনেস্কো (রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা) ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগ।

১৮ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) : আসামে রাজ্য ভাষার প্রশ্নে শিলং-এ সার্ব্বদলীয় সম্মেলন আরম্ভ—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা কর্ত্তৃক সম্মেলনের উদ্বোধন।

ভাষা সমস্যার সমাধানে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের শিলং (আসাম) উপস্থিতি।

১৯শে আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) : পঙ্গপালের ভয়াবহ আক্রমণে পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূর রাজ্যের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সরকারী সংবাদ।

২০শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) : ঐক্যমতের অভাবে বিনা সিদ্ধান্তে আসামের সরকারী ভাষার নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত সর্ব্বদলীয় সম্মেলন সমাপ্ত।

২১শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) : আসামে রাজ্য ভাষা সমস্যার সমাধানে পণ্ডিত পন্থের (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব) ব্যর্থতা—দ্বিভাষিক (হিন্দী ও আসামী) সূত্র গ্রহণে পার্ব্বত্য নেতাদের অসম্মতি।

২২শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) : অসমীয়া ও হিন্দী (ইংরেজীর বিকল্প) আসামের সরকারী ভাষা—বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা—দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে স্বরাষ্ট্রসচিব পন্থের ঘোষণা।

"অবিলম্বে কাশ্মীর হইতে পাক্ সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে"—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের দৃপ্ত ঘোষণা।

২৩শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) : ভাতিন্দা জেলে (পাঞ্জাব) হাঙ্গামাকারী আকালী বন্দীদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—সাত জন বন্দী নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত।

২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) : আসামে অসমীয়া ও সামরিক

ভাবে হিন্দীর পরিবর্তে ইংরেজী সরকারী ভাষা হইবে—আসাম রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা কর্তৃক ভাষা বিল পেশ।

২৫শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): বন্যা প্রপীড়িত লক্ষ্ণৌ সহর হইতে বিপন্ন অধিবাসীদের অপসারণে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ—রাজভবন ও মন্ত্রীদের গৃহ-প্রাঙ্গণে বন্যার জল প্রবেশ।

২৬শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ৩৪১ কোটি টাকার পরিকল্পনা (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) হ্রাস করা সম্ভব নহে—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২৭শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): নওগাঁ হইতে ৩০ মাইল দূরে লঙ্কায় (আসাম) পুনরায় হাঙ্গামা—বাঙালীপ্রধান অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুল গৃহ ভস্মীভূত।

২৮শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর): 'দ্বিভাষিক ফরমুলাই আসামের ভাষা-সমস্যার সর্কোত্তম সমাধান'—শিলং-এ আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার উক্তি।

২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): 'অসমীয়াই সর্কস্তরে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে'—আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ভোটাধিক্যে সরকারী ভাষা প্রস্তাব সংশোধন।

৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ—দিল্লীতে পরিকল্পনায় কমিশনের কৃষি সংক্রান্ত বৈঠক।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী কলহের মীমাংসা আলোচনা অব্যাহত—দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের বৈঠক।

বহির্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৭ই সেপ্টেম্বর): কঙ্গো প্রসঙ্গ আলোচনার্থ সাধারণ পরিষদের জরুরী বৈঠক—রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের ফলে টিউনিসিয়া ও সিংহলের যৌথ প্রস্তাব বাতিল।

৩রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর): সিন্ধুর জল বণ্টন সম্পর্কে করাচীতে ভারত-পাকিস্তান ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত—স্বাক্ষরকারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান।

৪ঠা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): কঙ্গোয় শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশুল্ডের উপর দায়িত্ব অর্পণ—রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে এশীয়-আফ্রিকান প্রস্তাব গৃহীত।

৫ই আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর): কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সহিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) আলোচনা—মূরী ও নাথিয়াগলিতে (পঃ পাকিস্তান) দীর্ঘ বৈঠক।

৬ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): সোভিয়েট ইউনিয়নকে আবার নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় আহ্বান—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতা।

৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সহিত মতবিরোধ—লাহোরে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

অবিলম্বে বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশ-সমূহের স্বাধীনতা দাবী—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ভাষণ।

১০ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর): সামরিক আইনে অনুমানুষ পাকিস্তান মুসলেম লীগের সভাপতি আব্দুল কায়ুম খান পেশোয়ারে গ্রেপ্তার।

১২ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর): পাক্-আফগান সীমান্ত সংঘর্ষে ৬ শত ব্যক্তি হতাহত—পাকিস্তান কর্তৃক সমগ্র সীমান্ত বাহিনীকে হুঁসিয়ার থাকার নির্দেশ।

১৪ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর): আইক (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) ও ক্রুশ্চেভের (রুশ প্রধান মন্ত্রী) পুনরায় বৈঠকের প্রস্তাব—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে নিরপেক্ষ পাঁচটি দেশের (ভারত সমেত) ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা।

১৫ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): চীন (কম্যুনিষ্ট) ছাড়া নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান অসম্ভব—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

১৭ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর): নিরস্ত্রীকরণে অত্যধিক বিলম্ব হইলে বিশ্বে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর (ভারত) দৃপ্ত ভাষণ।

২০শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর): আইক-ক্রুশ্চেভ বৈঠক সম্পর্কে নিরপেক্ষ পঞ্চরাষ্ট্রীয় (ভারত সমেত) প্রস্তাব প্রত্যাহৃত—পশ্চিমী কারসাজিতে বেদনাহত ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ।

২১শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর): "কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে পাকিস্তান ভারতকে বিশ্বাস করিতে পারে না"—পাক্ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের জেহাদী জিগীর: পাক্ সৈন্য দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকিবে না।

২৩শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর): কাশ্মীরে স্থিতাবস্থা বানচাল করিতে চাহিলে বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে—নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—খালের জলের প্রশ্ন ও কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ বলিয়া মন্তব্য।

২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল কর্তৃক আশ্রয়াধীন লুমুম্বাকে (কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী) প্রত্যর্পণের জন্য বিদ্রোহী নেতা কর্ণেল মবুটুর চরমপত্র বাতিল।

২৭শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতার দাবী সংক্রান্ত প্রশ্ন—সাধারণ পরিষদে আলোচনার জন্য রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব গৃহীত।

২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): ঝড় ও বন্যার রুদ্র তাণ্ডবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় চার হাজার লোকের প্রাণহানি—নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের সহস্র সহস্র নর-নারী গৃহহীন।

অস্ত্র হ্রাস সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে বৃটেন, আমেরিকা ইটালী কর্তৃক ছয়টি পথ-নির্দ্দেশক নীতি সম্বলিত প্রস্তাব পেশ।

৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): কিউবায় আরও তিনজন আমেরিকানের প্রাণদণ্ড—'প্রতি বিপ্লবীদের' প্রতি কিউবার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কাস্ট্রোর সতর্কবাণী।

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): বিশ্ব উত্তেজনা প্রশমনে ২০টি দেশের মিলিত প্রচেষ্টা—রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন (ভারতের মুখ্য প্রতিনিধি) কর্তৃক যৌথ প্রস্তাব পেশ।

মঞ্জুরীর দাবীতে নোট দিয়াছিলেন—Finance has been asked to agree, therefore Finance agrees, সেই ডেপুটি সেক্রেটারী আজ সেক্রেটারী হইয়াছেন এবং ঐ পদ সৃষ্টি অনুমোদন করিয়াছেন। মুসলিম লীগ আমলে এই এ, ডি, খাঁ নৌকাবিলাসের খাঁ সাহেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ইহার হাত দিয়া লোকসান হইয়াছিল। আজ ইহারই হাতে ২০ কোটি টাকার স্কীম তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। খাঁ সাহেব চেয়ারম্যান, রিপুদমন সিং সেক্রেটারী, যুগোস্লাভ-পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টর বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়া বাঙলায় স্বর্গরাজ্য রচনা করিবে—ইহারও প্রতিবাদ হয় না।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

মন্ত্রীর ক্রন্দন

"ঘটনার দুইদিন পরে পঃ বঙ্গের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতিভূষণ মজুমদার কাঁথীতে 'তাল সমবর্দ্ধনম্' সপ্তাহ উদযাপনের জন্ম কাঁথী সহরে আসিয়াছিলেন। তালগাছ রোপণ কর। তাল গুড় খাও। তাল রস আকণ্ঠ পান কর। তালের গাছ কাটিয়া বাড়ী তৈয়ারী কর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কথা জনসাধারণের কাছে প্রচার করিতে যাইয়া অবশেষে কাঁথী কাছারীর তালবৃক্ষ দুইটির অকাল অপমৃত্যুতে তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ।"

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

ইহা কি সত্য ?

"ইহা কি সত্য স্থানীয় সেচ বিভাগের W. G. F. ১১১নং গাড়ীটি জনৈক জটাজুটধারী রুদ্রাক্ষমালা পরিহিত ব্যক্তিকে লইয়া প্রত্যহ সাইথিয়া হইতে সিউড়ী যাতায়াত করিতেছে? কে এই ব্যক্তি? সরকারী গাড়ীতে সরকারী কর্মচারী সমভিব্যাহারে সাইথিয়া সিউড়ী যাতায়াত করিতেছে এবং সরকারী গাড়ী তথা গৌরী সেনের অর্থের এই অপব্যবহার করিতেছে? স্থানীয় সেচ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ কি বলেন?"

—বীরভূম বাণী।

শোকসংবাদ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সরকারের কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স য়্যাণ্ড ষ্ট্যাটিসটিকসের ভূতপূর্ব ডিরেক্টার জেনারেল কলকাতার প্রখ্যাত নাগরিক রায়-বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১১ই আশ্বিন মহাপূজার সপ্তমীদিবসে ৮২ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন। পুণ্য বারাণসীধামে এঁর জন্ম এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিত্তালয়ের ছাত্র হিসেবে ইনি বি এ ও এম, এল, বি ডিগ্রী অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ইনি ভারত সরকারে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। ভারতে যখন ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ইনি তার প্রথম সচিব নিযুক্ত হন। এঁর দুই পুত্র কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এম, কম পাঠরত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাত কন্যা সর্বশ্রী শ্রীমতীতরুলতা মুখোপাধ্যায়, শান্তিলতা মুখোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, বিমলা ঘটক, অনিলা মুখোপাধ্যায় নির্মলা চট্টোপাধ্যায় ও উর্মিলা মুখোপাধ্যায় ছয় জামাতা এবং বহু নাতি নাতনী বর্তমান আমরা তাঁর আত্মার সদগতি কামনা করি।

শৈলজ মুখোপাধ্যায়

ভারতবিখ্যাত চিত্রশিল্পী শৈলজ মুখোপাধ্যায় [illegible] ১১শে আশ্বিন ৫৩ বছর বয়েসে নয়াদিল্লীতে গতায়ু হয়েছেন। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পিগণের মধ্যে তাঁর নাম [illegible] বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। সমসাময়িক কালে যে ক'জন [illegible] শিল্পী আন্তর্জাতিক চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন [illegible] তাঁদের অন্যতম। ইনি এক নতুন শিল্পরীতির উদ্গা[illegible] পাশ্চাত্য শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজেকে ইনি কো[illegible] হারিয়ে ফেলেননি। কাংড়া কলারীতির সাবলীল রেখায় [illegible] লোকশিল্প সহজ সরল ভঙ্গীকে ভিত্তি করে নিজস্ব অভি[illegible] রীতির প্রবর্তন করলেন এবং সেই রীতি অনুসরণ ক[illegible] হিসেবে অটুট প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। এঁর [illegible] ভারতীয় চিত্রশিল্পজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল।

সত্যকিঙ্কর সাহানা

প্রবীণ সাহিত্যসেবী রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর [illegible] গত ২১এ আশ্বিন বাঁকুড়ায় ৮৭ বছর বয়েসে ইহলোক ত্[illegible]। ইনি বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ সাহানা পরিবারে জন্মগ্রহণ [illegible]। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য সাধনায় ইনি আত্মনিয়োগ ক[illegible]গণের পক্ষে কল্যাণমূলক বহু কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে [illegible] আইন-সভারও ইনি একজন সদস্য ছিলেন।

শিবকালী চট্টোপাধ্যা[illegible]

স্বনামধন্য অভিনেতা শিবকালী চট্টো[illegible] বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১১৪০ [illegible] প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, তারপর [illegible]রূপে বিপুল যশের অধিকারী হন। ত্রিরিশ ব[illegible]লয়ের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ বিদ্যমান ছিল। [illegible]চিত্রেও ইনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে [illegible]জগতে একটি শক্তিমান শিল্পীর আসন শূন্য হল।

বিজলীপ্রভা দে[illegible]

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু [illegible]ধ্যায়ের জননী বিজলীপ্রভা দেবী গত ৪ঠা আশ্বিন [illegible]পুণ্যদিনে মুঙ্গেরে ৭১ বছর বয়েসে দেহরক্ষা করেছেন। [illegible] প্রসিদ্ধ আইনজীবী স্বর্গীয় তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible]বিজলীপ্রভা দেবী কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্[illegible] মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ছিলেন। বোম্বাইয়ের চিত্রপরি[illegible]শাস্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর অন্যতম পৌত্র।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] ও প্রকাশিত।

...র নাম" মানুষজাতি এবং বিবেকানন্দের এই শাশ্বত বাণীই তাদ্য ধরিয়েব—

East is East, and West is West,
Twin shall never meet—

এই ভেদনীতিমূলক যুক্তিকে ধূলিসাৎ করেছে। আমাদের কবি ...ছেন এই মহামিলনের গান :—

"হে রুদ্রবীণা বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

এমনভাবে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা না করে তার মধ্যে সত্যের ...নের চেষ্টা একমাত্র ভারতেই হয়েছে—এ তা ভারতীয় সংস্কৃতির দান। তাইতো আজ পৃথিবীর শতকোটি লোক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে মিলিত হয়েছে—গেয়েছে আমাদের মহামিলনের গান। ...তের সংস্কৃতির এই পরিচয়ই শাশ্বত—যা ভারতবাসীকে দিয়েছে ...ময় প্রেমরাজ্যের সন্ধান—করেছে তাকে অহিংসপ্রেমিক। তাই— "India offers unity in diversity" এ কথার সত্যতা ...ই আমরা দেখতে পাই।

এইবার আমরা ভারতীয় রাজধর্মের যথার্থ স্বরূপটিকে দেখতে ...। ভারতবর্ষের রাজধর্ম ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ...র কবিতায় এই রাজধর্মেরই মহিমা কীর্তনে ব্রতী হইয়াছেন— ...র আদর্শকে রূপায়িত করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। বিশেষতঃ ... 'প্রতিনিধি' কবিতায় দেখতে পাই—ভারতীয় নৃপতির আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন—নৃপতি ...জী ও গুরুদেব রামদাস বাবাজীকে। একটা কাহিনীর ...রণা করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন—ত্যাগমণ্ডিত প্রতিনিধিত্বই ...ীয় রাজ ধর্মের স্বরূপ। গুরুরামদাস শিষ্য শিবাজীকে ভারতের ...ন রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যকে তিনি সর্ব্বত্যাগী ...ছেন—আবার তাকেই প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করবার ভার ... করেছেন—শাসককে টেনে এনেছেন শাসিতের অতি নিকটে। নিঃস্বার্থ প্রেমস্নাত সান্নিধ্যই ভারতে শাসককে পিতার আসনে শাসিতকে পুত্রের আসনে বসাইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে ...মণ্ডিত উন্নত মনুষ্যধর্ম্মকে।

"এ দেশের রাজারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঐশ্বর্য—বৈভবের সমারোহ প্রদর্শন করতেন না—ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থেকে জীবন অতিবাহিত করতেন না। রাজ্যশাসন—প্রজাশাসন ব্যাপারটিকে তাঁরা উচ্চতর মানব ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অধ্যাত্মব্রত ভারত যুগ যুগ ধরে যে প্রদীপ্ত মনুষ্যত্বের সাধনা করেছে ভারতের নৃপতিবৃন্দও উহাকে নত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। যুগ-প্রাচীন ভারতে সেই সাধনার—সেই তপস্যার প্রেরণাবশে মনুষ্যধর্ম ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাপুঞ্জের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতেন। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন রাজধর্ম্ম। রাজর্ষি জনক, রাজা ভরত, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই রাজধর্ম্মই পালন ক'রে গেছেন।"

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ"—উপনিষদের মহাবাণীই ভারতের রাজন্যবর্গের আদর্শকে প্রকটিত করে। আধ্যাত্ম ভারতবর্ষ তার রাজগণকে শিখিয়েছে—ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসনভূমি— ধরিতে দরিদ্রবেশ। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে রাজা বিশ্বপতির প্রতিনিধি মাত্র। বিশ্বাধিপতির এই বিশাল রাজ্যে রাজা তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেন। সেও তাঁহার রাজ্যের একজন সামান্য প্রজা বই আর কেউ নয়। কাজেই বিশ্বপিতার অতুল ঐশ্বর্য যা তাঁহার সমস্ত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিধি তথা রাজার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে লোভ সংবরণ করে প্রজারঞ্জন করা বড় শক্ত। তাই এদেশের সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলের জন্য রাজাকে নিতে হয়েছে ত্যাগের দীক্ষা। কারণ ত্যাগের আগুনে লোভ, মোহ ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কর্ত্তব্যপালনের অদম্য অটল ইচ্ছাশক্তি। কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য আসে ভোগ লালসা থেকে—আর এই শৈথিল্যই আনে সকলের জীবনে মহাঅকল্যাণ অঙ্কুরিত করে মহাধ্বংসের বীজকে। রাজা যদি কর্ত্তব্য পালন না করেন, তবে অপরাধী তথা মহাপাপী হন। আর সেই পাপের ফল ভোগ করে তাঁর সন্তানগণ— তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাই এই ধ্বংসের হাত থেকে—কর্ত্তব্যশৈথিল্যের মহা অপরাধ হ'তে দেশকে—প্রজাগণকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে শিখতে হয় রাজধর্ম—ত্যাগমণ্ডিত কর্ত্তব্যপরায়ণতা। ভারতবর্ষ এই সত্য জানিত—তাই তার নৃপতির আদর্শ ঐরূপ।

যে বীর, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে একহাতে চক্ষু মুছিয়া থাকে, আর একহাতে দান করে; তাহার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর! চারাগাছটিকে ঘিরিয়া রাখিতে হয়, যত্ন করিতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসিতে শিখিতে পারিলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হইলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে। অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, উহার আগে নহে। সকাম হইতেই নিষ্কাম হয়। কামনা না অগ্রে থাকিলে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর উহার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকিলে কি কখন আলোকের মানে হয়?

—স্বামী বিবেকানন্দ

জল গড়িয়ে এসে বঙ্কিমবাবুর জুতোয় ঢুকে এসে ঠেকেছে। তিনি তখন সেই দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন—বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেলো যে! বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতাটা বুঝে উত্তর দিলেন—দামোদর মুখো হয়ে বুঝি? দেখুন, দুজন লেখক স্থান, কাল, পাত্র'র মধ্যে কাল এবং পাত্র প্রায় ঠিক রেখেছেন, কিন্তু স্থান সম্বন্ধে দুজনেই দ্বিমত। দ্বিতীয়তঃ এবং বিশেষতঃ যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে দুজনেই জানেন পরিহাসটা কোথায়! "দামোদর মুখো" এই কথাটা দুজনেই জানেন, কিন্তু পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন ধারায়, ফলে পরিহাস ঠিকই থেকে গেছে, কিন্তু পটভূমি পাল্টে গেছে ফলে রসিকতাটা আমরা দুটো লেখায় দুরকম ভাবে অনুভব করেছি, এতে লাভও হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কার কথা সত্যি? দুটো লেখার পটভূমির মধ্যে একটি নিশ্চয় বানানো, হয়তো দুটিও বানানো হতে পারে. তাতে লেখকের লাভ কি হোল? ইতি—বিজয় বড়াল। ৭৫, রাজবল্লভ সাহা লেন। হাওড়া।

আপনার মাসিক বসুমতী ৩৮বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৬ সনের একটি প্রবন্ধে (বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন) শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত (৭৪০ পৃঃ) "রাজা সুবোধ মল্লিকের অর্থে .....ছয় মাসের জেল হয়"। যে বিবরণ পত্রস্থ করিয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য প্রকৃত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল আপনার পত্রিকার পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন। "রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের অর্থে বন্দেমাতরম পত্রিকা স্থাপিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু ইহার প্রধান সম্পাদক পদে বৃত হন—বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। সহকারী সম্পাদকবর্গের মধ্যে ছিলেন—অরবিন্দ। রাজনৈতিক মতানৈক্যের ফলে বিপিনচন্দ্র উক্ত পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দ প্রধান সম্পাদক হন। সরকার কর্ত্তৃক রাজদ্রোহের মামলায় অরবিন্দ অভিযুক্ত হন ও সরকার পক্ষ বিপিনচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করেন। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আসামী পক্ষ অবলম্বন করেন। দাশ মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে বাধ্য হয়ে উক্ত মোকদ্দমায় সাক্ষ্যপ্রদান করেন নাই। তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে, "আমি এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবো না"। আদালতের অবমাননায় জন্য তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয় ও তাঁকে বক্সার জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথায় থাকাকালে তিনি "জেলের খাতা" নামে একখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন। পাল মহাশয় সাক্ষ্য প্রদান না করার জন্য প্রমাণাভাবে অরবিন্দ অব্যাহতি পাইয়াছিলেন"। ইতি—নিবেদক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত। কালীনগর চা-বাগান, পোঃ রামকৃষ্ণনগর (কাছাড়)।

কার্ত্তিক সংখ্যা ১৩৬৬ বসুমতীর "আমার কথা (৫৮)" পড়তে গিয়ে একটা মারাত্মক ভুল চোখে পড়লো—যার প্রতিবাদ না কোরে পারলুম না"। "আমার কথা" প্রসঙ্গে শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—৺হেম বিশ্বাস অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের পিতামহ। অভিনেতা শ্রীছবি বিশ্বাস হোলেন আমাদের গ্রাম সম্পর্কিত কাকা, সেই সূত্রে আমার যা জানা আছে তাতে মনে হয় ছবিকাকার পিতামহের নাম (স্বর্গীয়) মহাত্মা কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস। এবং ছবিকাকার পিতার নাম ৺ভূপতিমোহন বিশ্বাস। ভূপতিবাবু ও হেমবাবুর সংগে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই বোধহয় ছিল না বোলেই আমার জানা আছে। "পাঠক-পাঠিকার চিঠি" বিভাগে আমার এই চিঠিখানি প্রকাশ করা হোলে খুশী হবো। নমস্কারান্তে—শ্রীনীলিমা মজুমদার C/o শ্রী বি, এস, মজুমদার, নিউ ডাকবাংলো রোড, পাটনা-১ (বিহার)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am sending herewith—Rs 7·50. Kindly adjust it against membership—J. K. Chandra—Maharastra.

This is a payment of our annual subscription for M. Basumati—Lady Kenne Girls College, Shillong.

Subscription for monthly Basumati is sent herewith. Please enlist us as subscribers of the Journal.—

1. Herrn Ashim Kumar Ganguly, Memminger Strasse-39. Ochsen Hausen/Wurtt, West Germany.

2. Mr. S. N. Dass. Govt. Secondary School, Port-Sudan, Sudan.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক-শ্রেণিভুক্ত করিয়া প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মিস্ বীথিকা মিত্র, শিলচর, আসাম—

মিঃ কে, এম, সিংহ, রিটায়ার্ড প্রোফেসর—রাজস্থান রোড, রাঁচী।

ডাঃ এস, কে, মুখার্জ্জী—গারোয়াল, উত্তরপ্রদেশ।

The Head Master and the staff of the Nishimayee Compt. Basic School, Nishigunj, Cooch Behar.

শ্রীমতী রেখা ব্যানার্জ্জী, হিরণপুর—সাঁওতাল পরগণা।

শ্রীমতী বাণী ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা।

শ্রীভোলানাথ মুখার্জ্জী, দুর্গাপুর, বর্দ্ধমান।

মিসেস রেণুকা দেবী, বোম্বাই।

Surg/Lt A. K. Chatterjee, Bombay-1.

শ্রীমতী সুনীতি দে সরকার, সৌরাষ্ট্র।

আমি পুনরায় ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭·৫০ পাঠাইলাম। শ্রাবণ হইতে আবার বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীপ্রতিভা দে, শিবসাগর।

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা (শ্রাবণ হইতে পৌষ ১৩৬৭ সাল) ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম—লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Please accept my subscription for Kartick to Chaitra 1367 B S. on account of your monthly.—Ava Rani Devi, Kanpur.

Subscription for six months for Monthly Basumati which please acknowledge and continue from Kartick onwords.—Aparna Pal, East Nimar, M.P.

প্রাচীনভারতে গণতন্ত্র ও তার পরিণতি

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে মানবাত্মার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনা যাচ্ছে। সত্য ও ন্যায়ের অধিকার-প্রবঞ্চিত মানুষ হাহাকার রছে। তাই বিশ্বের সাধারণ মানুষ আজ গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে ড়েছে। আজকের এই চেতনা ন্যূনাধিক আড়াই হাজার বছর াগে ভারতে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিল, বৈশালীর ইতিবৃত্ত ালোচনা করলে তার সন্ধান মিলে। ঐতিহাসিকদের মতে ত্রিহুত ভাগের অন্তর্গত মজঃফরপুরের বসাঢ় গ্রামে প্রাচীন বৈশালী বস্থিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পক্ষ হতে খননকার্য্য দ্বারা r. Bloch এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। Dr. lteckar এর মতে "Establishment of the Vaisali public took place about 30 genertions or 600 ears before this event (Bharata War).— proximate date of this Constitutoinal change C. 2000 B. C. ডা: সরকার মনে করেন যে খৃ: পূ: ২৩০০ ব্দে মোহন-জো-দরোর সভ্যতার শেষভাগে অথবা প্রাক্ আর্য্য ভ্যতার প্রাক্কালে (খৃ: পূ: ৩,৭৫০—২০০০) ও উত্তর ভারতের ক বিরাট অংশ নির্বাচিত মনুদের দ্বারা শাসিত হত—রাজাদের রা নয়। অতএব মানব ইতিহাসের এই গণতন্ত্রের কথা আমাদের রবের বিষয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে য়। রাজতন্ত্রের উপর লোকের যেন একটা স্বভাব-বিদ্বেষ দেখা য়। ফলে উত্তর ভারতে কতকগুলি গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । ভগবান বুদ্ধের বহুপূর্বে বৈশালীতে গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। খানকার রাজতন্ত্র কি করে এই গণতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হল তার তিহাস আজ অপরিজ্ঞাত। তবে অনেকে অনুমান করেন, বাণিজ্য ারে সমৃদ্ধ বৈশালীতে বৈশ্যরা প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়ে পড়ে। জা নাভাগও সুপ্রভা নামে ধনী এক বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ রেন। ফলে রাজতন্ত্রে বৈশ্য প্রভাব বিস্তার লাভের সাথে সাথে দেশে বিপ্লব ও সংঘাত দেখা দিল, হয়ত প্রজাতান্ত্রিকতা তারই অবশ্যম্ভাবী রিণতি। প্রাচীনকালে গণ্ডকঘাটী নামে একটা স্থান ছিল। সেই নে নরগণের গণতান্ত্রিক রাজ্য গড়ে ওঠে। বৈশালী, লিচ্ছবি ও নারার মল্ল প্রমুখ এই নরগণকে একসূত্রে আবদ্ধ করে গড়ে বজ্জিসংঘ। মোট আটটি জাতি নিয়ে হল এই সংঘ। বজ্জি, ছবি, বিদেহ ও জ্ঞাতৃক তারমধ্যে ছিল প্রধান; এ ছাড়া আরও টি জাতি ছিল ভোগ, উগ্র, ইক্ষ্বাকু ও কুরু। লিচ্ছবিদের ানী বৈশালীই ছিল এই সংঘের প্রধান নগর। এই সংঘের টি রাজ্যই আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যাপারে পুরা স্বাধীন ছিল। মাত্র বৈদেশিক নীতিই ছিল সমবেত সংঘের অধীন। কোন শিক আক্রমণ সম্বন্ধেও সংঘই কর্তৃত্ব করতেন। সংঘের অধিকার সমান ছিল। কেহ রাজা বা মহারাজা ছিলেন । জনসাধারণের ৭৭০৭ জন প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য [illegible] করা হত। বজ্জীসংঘের মধ্যে লিচ্ছবিদের শাসন প্রণালী

অন্যত্র আত্মীয় ছিলেন। অনেক সময় ঐ আত্মীয়-প্রধান ব্যক্তিরাই গণসভার সভ্য নির্বাচিত হতেন। এই গণসভা রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য একটি ছোট প্রভাবশালী-সভা গঠন করতেন, তাকে বলা হত 'অষ্টকুলক'। আটজন গণরাজা এই সভার সদস্য হতেন। আর গণসভা গণভোট দিয়ে এই গণরাজাদের নির্বাচিত করতেন। গণসভাকে গণসন্নিপাত আর গণভবনকে বলা হত সংস্থাগার (সংস্থাগার)। গণরাজনেরা যখন সভাতে যেতেন তখন স্ব স্ব রঙের পোষাক পরে যেতেন, আর তারা যে যে অশ্বারোহণে যেতেন তাদের রঙও পোষাকের অনুরূপ থাকত। বৈশালীর মাঝে সুরম্য অট্টালিকা-বেষ্টিত একটা পুষ্করিণী ছিল—তার নাম ছিল অভিষেক পুষ্করিণী (বর্তমান খরোনা পোখর)। নবনির্বাচিত গণরাজনেরা এখানে খুব সমারোহে অভিষিক্ত হতেন। এই পুষ্করিণী [illegible] অগণিত নরনারীরা অভিষেক বিধি দেখতেন। কথিত আছে যে নবনির্বাচিত গণরাজন মহালি যখন এই পুষ্করিণী হতে স্নান করে অভিষিক্ত হয়েছেন সেই সময় সংবাদ আসে মহারাজ বিম্বিসার নাকি বৈশালী আক্রমণ করতে আসছেন। আরও সংবাদ আসে মহারাজ চেটকের বোন্ ত্রিশলা এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করেছেন। এই শুভ অবসরে মহানায়ক তাঁর নাম রাখেন 'মহাবীর'। ইনি পরে ২৪ তীর্থঙ্কর রূপে সারা বিশ্বে পরিচিত হ'য়েছিলেন।

মহাবীর বর্দ্ধমান ও ভগবান বুদ্ধের বিহার-ক্ষেত্র ছিল বৈশালী। বৈশালীর নিকট কুণ্ডগ্রামে (বাসুকুণ্ডে) মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। এবং কোলহুয়া গ্রামে যেখানে অশোকস্তম্ভ আছে ওখানেই ছিল 'মহাবন' বিস্তৃত 'কূটাগার-শালা'। ভগবান বুদ্ধের ঐ স্থান ছিল বড় প্রিয়। এই দু'মহাপুরুষের লীলাক্ষেত্র বলে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের মধ্যে বৈশালীর প্রাচীন কীর্ত্তি-গাথার কিছুটা আমরা জানতে পারি। হিমালয় হতে সমুদ্র পর্যন্ত সুবিস্তৃত মহাবনের আবছায়ায় বৈশালী নগরী অবস্থিত থাকায় মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের কথায় বলা চলে পাটলিপুত্রের মত বৈশালীর নগর-প্রাকার ছিল শাল-কাষ্ঠের নির্মিত। এমনি কি বৈশালীর শিল্পীরা যে সুন্দর সুন্দর শিল্প সাধনা করতেন, তার আধার ছিল কাঠ ও মাটি; ফলে আজ আর তাদের সাক্ষাৎ-প্রমাণ সম্ভব নয়। কালের অন্ধকারে আজ সেই সব সভ্যতার অপরূপ নিদর্শন চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে।

উত্তর-বিহারের বজ্জিসংঘের মত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের মল্ল এবং শাক্যাদির মধ্যেও জনতান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাবেও শক্তিশালী সংঘরাজ্যের যথেষ্ট পরিচয় আজ পুরাতত্ত্বের প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। পাঞ্জাবে যৌধেয় জাতির হাজার বছরের গৌরবের কাহিনী আবিষ্কৃত অভিলেখ, মুদ্রা ও শীলমোহরাদির দ্বারা আজ সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা'ছাড়া মালব, শিবি, ক্ষুদ্রক আদি সংঘরাজ্য বোধ করি বৈশালীর সমকালীন ছিল।

ভারতীয় সংঘরাজ্যের মধ্যে বজ্জিসংঘের শাসক ও সংঘপ্রণালী ছিল সর্বাপেক্ষা সুব্যবস্থিত আর এই জন্য ভগবান বুদ্ধও অভিমজীবনে বৌদ্ধসংঘের 'বিনয়-নিয়মে' বৈশালীর অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

...য় গিয়েছিলেন। 'দীঘনিকায়' অবলম্বনে জানা যায়, অজাতশত্রু বৈশালীর সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বজ্জিদের ...রবার অভিপ্রায়ে উপদেশার্থ অমাত্য বর্ষকারকে বুদ্ধের ...ঠান। অজাতশত্রুর অভিসন্ধি জেনে বুদ্ধ আনন্দকে লক্ষ্য ...ছিলেন, "যতদিন বজ্জিগণ সভা করে কাজ করবে, বজ্জিদের উন্নতি হবে, অবনতি নহে।" এই প্রসঙ্গে বজ্জিদের কয়েকটি গুণের প্রশংসা করেন: বৈশালীরা ...প্রজাতন্ত্রী সভায় বহু মত নিয়ে কাজ করতো, [২] সংঘবদ্ধ-...ব কিছু করতো, [৩]. বজ্জি ধর্মবিরোধী অবৈধনিক কোন ...রতো না, [৪] বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করতো ও তাঁদের উপদেশ ...করতো [৫] মহিলাদের সম্মান করতো [৬] দেবস্থানের ...শ্রদ্ধা নিবেদন করতো, [৭] অর্হতদের সুখ-সুবিধা বিধান ...তো। উপরের সাতটি গুণের কথা শুনে বুঝা যায় বৈশালীর ...তান্ত্রিক ব্যবস্থা, স্ত্রী ও বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদার ধর্মমতের ... মহামানব বুদ্ধও এদের উন্নতি কামনা করতেন।

বৈশালীর প্রজাতন্ত্রের ন্যায়-ব্যবস্থা খুবই সুন্দর ছিল। কোন ...রাধীকে বজ্জিসংঘের শাসকেরা ধৃত করে শাস্তি না দিয়ে 'বিনিশ্চয় ...মাত্যের হাতে সমর্পণ করতেন। ইনি বিচার করে নিরপরাধ হলে ...ড়ে দিতেন, অন্যথায় 'ব্যবহারিকের নিকট যথাবিধি ব্যবস্থার জন্য ...রে দিতেন। এইভাবে বিধিক্রমে সর্বশেষে অপরাধী 'গণপতির' ...তে সমর্পিত হত। তিনি 'প্রবেণি-পুস্তকে' লিখিত অপরাধ ...নুসারে দণ্ডবিধান করতেন। 'বিনিশ্চয়-মহামাত্য' ও 'ব্যবহারিক' ...ছেলেন ন্যায়াধিকারী।

"লিচ্ছবি যুবক কাঠের বালিশে শয়ন করে, তারা পরিশ্রমী, উৎসাহী। তারা আলস্যহীন কঠোরভাবে জীবন যাপন করে। যতদিন ...দের মধ্যে এই গুণাবলী বিদ্যমান, ততদিন ওদের পরাস্ত করা ...ব নহে।" ভগবান বুদ্ধের এই উক্তির পরেও বজ্জিসংঘের কি করে ...তন হল তা স্বতঃ আলোচনীয়।

আবশ্যকচূর্ণি (উত্তরভাগ) হ'তে জানা যায়,—বৈশালী গণ-তন্ত্রের অধিনায়ক চেটকের সাতটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। এদের পাঁচজনের বিবাহ হয়ে গেলে যথাক্রমে সর্বকনিষ্ঠ সুজ্যেষ্ঠা ও চেল্লণা অবিবাহিত রয়ে গেল। এই সময় মগধরাজ শ্রেণিক (বিম্বিসার) সুজ্যেষ্ঠার পাণিপ্রার্থী হয়ে চেটকের নিকট আবেদন জানালেন কিন্তু 'হৈহয়'-বংশোদ্ভব চেটক 'বাহীক' বংশীয় শ্রেণিককে ঘৃণাপূর্বক প্রত্যাখ্যান করলেন। মধ্যভারতের একচ্ছত্র সম্রাট শ্রেণিক এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সুজ্যেষ্ঠার সম্মতিক্রমে তাঁকে হরণ করবার ফন্দী আঁটতে লাগলেন। অবশেষে ঘটনাচক্রে সুজ্যেষ্ঠার স্থানে চেল্লণাকে হরণ করে তাঁকে শ্রেণিক বিবাহ করলেন। এমনি করে বজ্জিসংঘের সাথে প্রতিবেশী মগধরাজের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। যে চেটক গণতান্ত্রিক বজ্জিসংঘের চরম শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে তাঁরই দৌহিত্র (চেল্লণার পুত্র) মগধাধিপতি কূনিকের (অজাতশত্রুর) কূটচক্রান্তে তার ধ্বংস হয়ে গেল।

বুদ্ধদেব যে সময় বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন সেই সময় গঙ্গার কূলে একযোজনবেষ্টিত একটা মনোরম বন্দর ছিল। এর অর্ধেক ... দ্রব্যাদি নির্গত হয়ে নদীতে পড়ত। মহারাজ অজাতশত্রু এই সব দ্রব্যাদি নিজের বলে দাবী করতে থাকতেন কিন্তু উৎসাহী লিচ্ছবিগণ তার পূর্বে যেয়েই ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে আনত। ফলে অজাতশত্রু লিচ্ছবিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন এবং অচিরেই তাদেরকে ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে গঙ্গার কূলে পাটলিগ্রামে নগর-দুর্গ নির্মাণ করলেন। লিচ্ছবিদের সম্মুখসংগ্রামে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। সেইজন্য তিনি বুদ্ধদেবের নিকট অমাত্য বর্ষকারকে পাঠালেন। কিন্তু বর্ষকার তথাগতের নিকট লিচ্ছবিদের ভূয়সী প্রশংসা শুনে মগধে ফিরে এলেন আর কূটচক্রান্ত দ্বারা তাদের পরাস্ত করবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। পরে বর্ষকার ছল করে অজাতশত্রু দ্বারা মস্তক মুণ্ডিত এবং লাঞ্ছিত হয়ে মগধ হতে বিতাড়িত হলেন। পরে গঙ্গা পার হয়ে বৈশালীতে উপনীত হয়ে অজাতশত্রুর যথেষ্ট নিন্দাবাদ করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কূটনীতিবলে বজ্জিসংঘের আস্থা অর্জন করে প্রশাসনিক-বিভাগে উচ্চপদে আসীন হলেন এবং সেই সুযোগে লিচ্ছবিদের মধ্যে ভেদ-বিভেদের সৃষ্টি করে কয়েক বছরের মধ্যেই আপন অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ করলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। মহারাজ বিম্বিসার জীবিতকালে কূনিকের ছোট ভাই বেহল্লকে 'সেয়ণগ-হাতী' আর বহুমূল্য 'অটারসবঙ্ক' হার দিয়ে গিয়েছিলেন। কূণিকের পত্নী ঐ দুটি জিনিস স্বামীর কাছে চাইলেন। কূণিক স্ত্রীর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য ছোট ভাইয়ের নিকট ঐগুলি দাবী করলেন। কিন্তু বেহল্ল এ দুটির পরিবর্তে অর্ধেক রাজ্য দাবী করলেন। এতে কূনিক ক্রুদ্ধ হয়ে ঐদুটি জিনিষ অবিলম্বে লাভের জন্য চাপ দিতে থাকেন। বেহল্ল বেগতিক বুঝে দাদামশায় চেটকের আশ্রয় নিলেন। তখন অজাতশত্রু চেটকের নিকট দূত পাঠিয়ে ঐ হার, হাতী আর বেহল্লকে ফেরৎ চাইলেন। উত্তরে মহানায়ক চেটক জানালেন: কূণিকের মত বেহল্লও আমার দৌহিত্র। শ্রেণিক জীবিতকালে তাকে হার ও হাতী দিয়ে গেছেন, ঐগুলি বেহল্লের। যদি রাজ্যের অর্ধেক তুমি বেহল্লকে দিতে সম্মত হও তা'হলে হার-হাতী-বেহল্লকে ফেরৎ পাবে। এই উত্তরে কূণিক ক্ষুব্ধ হয়ে বৈশালী আক্রমণ করেন। রাজা চেটক নবমল্লি ও নবলিচ্ছবি গণরাজনের সম্মতিক্রমে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে চেটকের পরাজয় হল এবং তিনি শোচনীয়ভাবে এক কুঁয়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। এইভাবে গণতন্ত্র-লিচ্ছবিদের পতন হল। ঐতিহাসিকদের অভিমত: কূণিকের সাম্রাজ্য-লিপ্সা রাজবংশের পারস্পরিক দ্বেষ ও বৈশালী-গণতন্ত্রের বিভব এই পতনের মূল কারণ।

প্রাচীন-ভারতের এই গণতন্ত্রের বিস্মৃত-ইতিহাসের সম্যক পর্যালোচনা সম্ভব হলে আজকের ভারত শুধু গৌরবান্বিত হবে না —সেই আদর্শ অনুকরণে জগতে বরণীয় হয়ে উঠতে পারে। আমরা সেই অনাগত দিনের জয়ধ্বনি করি।

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নোক্ত পুস্তক ও আচার্য্যগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি :—

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, বিনয় পিটক, দীঘনিকায়, আবশ্যকচূর্ণি, ... জৈনাচার্য বিজয়েন্দ্র সূরী, ডাঃ

ভারতীয় রাজধর্ম্ম

শ্রীকল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ধারা বিভিন্ন। সব দেশের মত ভারতেরও নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। ভারতের সংস্কৃতি বৈচিত্র্যময়। নানা বিভেদের মধ্যে ঐকতান জাগিয়ে তোলা—তথা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতের চিরন্তন সাধনার মূল ধারাটিও এই সংস্কৃতির বাহক। ভগবান যুগে যুগে পাঠিয়েছেন তাঁর যোগ্যতম সাধক মহাপুরুষকে নানা বৈচিত্র্যের তথা বিভেদের মধ্যে একের সাধনা করার জন্য। এই একের সাধনায় নিয়োজিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছে যুগপুরুষ। ভারতের বুকে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন যুগের সব যোগসাধক মহাপুরুষের দল এই কাজই করে গিয়েছেন। এই যুগেও মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ, এই কাজই করেছেন—ভবিষ্যতেও করবেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইটেই হ'ল মর্ম্মকথা।

এই একের সাধনা তথা যোগ আজও শেষ হয়নি। যতদিন এই যোগস্থাপন চেষ্টার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন ভগবান তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধকদের ক্রমাগত এদেশে পাঠাবেন। ভারতে ভগবান হয়ত বৈচিত্র্যকেই চেয়েছেন। তাই ধর্ম্মে, বর্ণে, আচারে-ব্যবহারে-ভাষায় তিনি সৃষ্ট করেছেন বিভেদের দুর্গম বেড়া। এই তো এখানে কোন প্রবল সভ্যতা বা সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিনাশ করেনি। সবাই পাশাপাশি বন্ধুভাবে বাস করেছে। বিভিন্নতা থাকলেই বা বিদ্বেষ কেন জাগবে? এখানে ভগবান হয় তো চান সকল সাধনার মধ্যে মৈত্রী এবং সকল সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনা। ভারতে মহাপুরুষ তাই যুগে যুগে এসেছেন মহামিলনের—মহাসমন্বয়ের বাণী নিয়ে। প্রেমের পথে আপন সাধনা-লব্ধ ফল দিয়ে রচনা করেছেন মিলনের মহাসেতু। জগতে আর কোথাও ঠিক এমন দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি অন্য সব দুর্ব্বল ধর্ম্ম বা সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে সমস্যা সোজা করে দিয়েছে। সে সহজ পথ ভারতের নয়। ভারতের মহাপুরুষেরা সকলেই মানবের মধ্যে তথা নানা ভেদ-বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সেতু রচনা করবার মহামন্ত্রই ঘোষণা করে গিয়েছেন।

ভারতের শাস্ত্রের যা সারতম কথা তাই দিয়েই ভারতীয় সাধনার পরিচয়। ইহ লোকের সাধনা হ'ল সংস্কৃতি। অনন্ত লোক নিয়ে সাধনা হ'ল ধর্ম্ম। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যেই অনেক যুগের অনেক মানবমণ্ডলীর নানা দান মিশে আছে।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্য্যদের আসবার পূর্ব্বের দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্য্যেরা নষ্ট করেনি। দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব্ব সব সভ্যতার উচ্ছেদ সাধন করেনি। এইভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ভারতের সংস্কৃতি-লোকটি গড়ে উঠেছে। বর্ত্তমান হিন্দু সংস্কৃতি আর্য-অনার্য-দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ "আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম্ম ও দর্শনের দেশ। [illegible] ত্যাগের দেশ। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত মানবজীবনের মহ[illegible] আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধার[illegible] ইউরোপে ও একধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। ইউরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে ও ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনা[illegible] কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত সামাজিক প্রথা ও আচারের আবির্ভাব সত্ত্বেও এখনও বাঁচিয়া আছে। ভারতের জীবন অমর—প্রাণশক্তি অফুরন্ত। ইহা [illegible] যে কোন পর্ব্বত অপেক্ষা অচল। বস্তুতঃ ভারতের জীবন আ[illegible] মত অনাদি, অনন্ত ও অনির্ব্বাণ। বিভিন্ন যুগধারার সঙ্গে [illegible] মিলাতে গিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গে বেশ [illegible] পরিবর্ত্তন হয়েছে; কিন্তু ইহার অন্তরের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না[illegible] যুগ-যুগান্তরের সাধনায় ভারতবাসীর অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে পরলো[illegible] দৃঢ় আস্থা, বৈষয়িক ভোগের একান্ত বিতৃষ্ণা, ত্যাগের অসা[illegible] তেজ—ঈশ্বর ও অবিনাশী আত্মায় জলন্ত বিশ্বাস।" ভারতে যু[illegible] যুগে কত জাতি বিজয়দর্পে প্রবেশ করেছে—এসেছে কত বি[illegible] সংস্কৃতির ধারা। কিন্তু ভারত তার নিজ বৈশিষ্ট্যকে হারায়নি আবার নূতন সংস্কৃতির ধারাকে অবমাননা করে বিতাড়িতও করেনি সব গ্রহণ করেছে নিজের মধ্যে। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে যোগসূত্র। মিলিত হয়েছে উভয়ে—কিন্তু একে অন্যের মধ্যে লুপ্ত হয়নি। মুসলমান এসেছে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে—ইউরোপীয়েরা এসেছে তা'দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে কিন্তু কোন সংস্কৃতিই ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে পারেনি। তবে তা'র সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে অনেক কিছু। ভারত কখনও কাউকেই ফেরায়নি—সকলকেই আপন করে নিয়েছে—এটাই হ'ল তার একের সাধনায় পরমদান। ভারতের আপন [illegible] নেওয়ার এই আসক্তি ও অন্যকে লয় করে না দেওয়ার বৈরাগ্য স্থা[illegible] দিয়েছে নানা সংস্কৃতিকে পাশাপাশি।

ধর্ম্মের ব্যাপারে আমরা দেখি, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য[illegible] সেতু ভারতই রচনা করেছে। ভারত কখনও কাউকেই উচ্ছে[illegible] করেনি, সকল ধর্মমতকেই স্থান দিয়েছে নিজের ধর্মমতের পাশে[illegible] তারই ফলে দেখি হিন্দু, পার্শি, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি [illegible] পাশাপাশি ভারতে লালিত-পালিত। শুধু তাই নয়—সুদীর্ঘকাল[illegible] মহাসমন্বয়ে সৃষ্ট হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সব মহাপুরুষের আবির্ভা[illegible] হয়েছে, তাঁরা চেষ্টা করেছেন সব ধর্ম সমন্বয়ের—খুঁজেছেন মূল সূত্র—যা দিয়ে সমস্ত মতের ঐক্যকে বেঁধে রাখা যায়। আমাদে[illegible] যুগ পুরুষ রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গানদী তীরে সাধনায় সিদ্ধি[illegible] করে ঘোষণা করেছেন বিশ্ববাসী'র নিকট, সমস্ত ধর্মমতই মানু[illegible] ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অভীষ্টস্থানে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ মাত্র। এক[illegible] ভারতবাসী বিবেকানন্দই বিশ্বকে শুনাইয়াছেন উপনিষদের সা[illegible] মৈত্রী ও মিলনের বাণী—জানাইয়াছেন জগৎকে—বিশ্ববাসী সকলে অমৃতের পুত্র, সকলেই ভাই—জগৎ জুড়িয়া একজাতি [illegible]

মানুষজাতি এবং বিবেকানন্দের এই শাশ্বত বাণীই দেব—

East is East, and West is West,
Twin shall never meet—

...তীবুলক যুক্তিকে ধূলিসাৎ করেছে। আমাদের কবি ...ই মহামিলনের গান :—

"হে রুদ্রবীণা বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

...বে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা না করে তার মধ্যে সত্যের ...তা একমাত্র ভারতেই হয়েছে—এ তো ভারতীয় সংস্কৃতির ... তাইতো আজ পৃথিবীর শতকোটি লোক দক্ষিণেশ্বরের ...তলে মিলিত হয়েছে—গেয়েছে আমাদের মহামিলনের গান। ...র সংস্কৃতির এই পরিচয়ই শাশ্বত—যা ভারতবাসীকে দিয়েছে ...র প্রেমরাজ্যের সন্ধান—করেছে তাকে অহিংসপ্রেমিক। তাই—...dia offers unity in diversity" এ কথার সত্যতা ...ই আমরা দেখতে পাই।

...ইবার আমরা ভারতীয় রাজধর্মের যথার্থ স্বরূপটিকে দেখতে ... ভারতবর্ষের রাজধর্ম ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ... কবিতায় এই রাজধর্মেরই মহিমা কীর্তনে ব্রতী হইয়াছেন—...র আদর্শকে রূপায়িত করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে। বিশেষতঃ 'প্রতিনিধি' কবিতায় দেখতে পাই—ভারতীয় নৃপতির ...াদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন—নৃপতি ...জী ও গুরুদেব রামদাস বাবাজীকে। একটা কাহিনীর ...ারণা করে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন—ত্যাগমণ্ডিত প্রতিনিধিত্বই ...তীয় রাজ ধর্মের স্বরূপ। গুরুরামদাস শিষ্য শিবাজীকে ভারতের ...ন রাজধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যকে তিনি সর্বত্যাগী ...ছেন—আবার তাকেই প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করবার ভার ...ণ করেছেন—শাসককে টেনে এনেছেন শাসিতের অতি নিকটে। ...ই নিঃস্বার্থ প্রেমপ্রসূত সান্নিধ্যই ভারতে শাসককে পিতার আসনে ...র শাসিতকে পুত্রের আসনে বসাইয়াছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে ...গমণ্ডিত উন্নত মনুষ্যধর্মকে।

"এ দেশের রাজারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঐশ্বর্য—বৈভবের সমারোহ প্রদর্শন করতেন না—ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থেকে জীবন অতিবাহিত করতেন না। রাজ্যশাসন—প্রজাশাসন ব্যাপারটিকে তাঁরা উচ্চতর মানব ধর্মেরই অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। অধ্যাত্মব্রত ভারত যুগ যুগ ধরে যে প্রদীপ্ত মনুষ্যত্বের সাধনা করেছে ভারতের নৃপতিবৃন্দও উহাকে নত মস্তকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। যুগ-প্রাচীন ভারতে সেই সাধনার—সেই তপস্যার প্রেরণাবশে মনুষ্যধর্ম ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাপুঞ্জের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতেন। ইহাই ভারতবর্ষের চিরন্তন রাজধর্ম। রাজর্ষি জনক, রাজা ভরত, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই রাজধর্মই পালন ক'রে গেছেন।"

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ"—উপনিষদের মহাবাণীই ভারতের রাজন্যবর্গের আদর্শকে প্রকটিত করে। আধ্যাত্ম ভারতবর্ষ তার রাজগণকে শিখিয়েছে—ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসনভূমি—ধরিতে দরিদ্রবেশ। কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে রাজা বিশ্বপতির প্রতিনিধি মাত্র। বিশ্বাধিপতির এই বিশাল রাজ্যে রাজা তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেন। সেও তাঁহার রাজ্যের একজন সামান্য প্রজা বই আর কেউ নয়। কাজেই বিশ্বপিতার অতুল ঐশ্বর্য যা তাঁহার সমস্ত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিধি তথা রাজার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে লোভ সংবরণ করে প্রজারঞ্জন করা বড় শক্ত। তাই এদেশের সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলের জন্য রাজাকে নিতে হয়েছে ত্যাগের দীক্ষা। কারণ ত্যাগের আগুনে লোভ, মোহ ইত্যাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তব্যপালনের অদম্য অটল ইচ্ছাশক্তি। কর্তব্য পালনে শৈথিল্য আসে ভোগ লালসা থেকে—আর এই শৈথিল্যই আনে সকলের জীবনে মহাঅকল্যাণ অঙ্কুরিত করে মহাধ্বংসের বীজকে। রাজা যদি কর্তব্য পালন না করেন, তবে অপরাধী তথা মহাপাপী হন। আর সেই পাপের ফল ভোগ করে তাঁর সন্তানগণ—তাঁর প্রজাবৃন্দ। তাই এই ধ্বংসের হাত থেকে—কর্তব্যশৈথিল্যের মহা অপরাধ হ'তে দেশকে—প্রজাগণকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে শিখতে হয় রাজধর্ম—ত্যাগমণ্ডিত কর্তব্যপরায়ণতা। ভারতবর্ষ এই সত্য জানিত—তাই তার নৃপতির আদর্শ ঐরূপ।

যে বীর, সে-ই ত্যাগ করিতে পারে ; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে একহাতে চক্ষু মুছিয়া থাকে, আর একহাতে দান করে ; তাহার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর! চারাগাছটিকে ঘিরিয়া রাখিতে হয়, যত্ন করিতে হয়। একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসিতে শিখিতে পারিলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হইলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে। অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারিলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা বলা উচিত, উহার আগে নহে। সকাম হইতেই নিষ্কাম হয়। কামনা না অগ্রে থাকিলে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর উহার মানেই বা কি? অন্ধকার ... আলোকের অর্থ হয়?